আরতী প্রসাধনী
রূপকথার রাজকন্যা—সোনার পালঙ্কে
গভীর ঘুমে অচেতন; কিন্তু নিমেষে
জেগে ওঠে সোনার কাঠির যাদুস্পর্শে।
আপনার সুপ্ত রূপ-লাবণ্যও প্রতীক্ষা
করছে 'আরতীর' মোহন স্পর্শ—পূর্ণ
বিকাশের জন্য।
আরতী
স্নো • আলতা • পাউডার
সিন্দুর • কেশতৈল
Arati COCO
আরতী
আরতী প্রডাক্টস্ • কলিকাতা-৩৬
দ্রষ্টব্য : আমাদের প্রত্যেক স্নোর বাক্সে ১লা সেপ্টেম্বর হইতে
৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত 'প্রাইজ কুপন' দেওয়া হইতেছে, উহা সংগ্রহ করুন।

বিষয় — লেখক

অর্দ্ধ শতাব্দী-খ্যাত ... ফোন
ছবি ও ফটো বাঁধাইয়ের জন্য —
অশ্বিনীপাল
১৫৪-বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

কথা ও কাহিনী

সূচীপত্র

কবিতা

বিষয় — লেখক

সূচীপত্র

ক্রীড়া জগৎ

অভিনয় জগৎ

ছোটদের পাততাড়ি

সুচীপত্র

ছোটদের পাত্‌তাড়ি

গৃহলক্ষ্মী

ভুখা রোগে ভুগে ভুগে মরে গেল বনিতা
তার চিতালোকে বসি লিখি এই কবিতা।
হাড়মাস জ্বলিতেছে, জ্বলে সারা অঙ্গ
আগুনেরে বুকে লয়ে প্রেমের কী রঙ্গ!
মুখখানি ছিল নাকি ফোটা ফুল পদ্ম
আজ দেখ সেই মুখ ছাইপোড়া গদ্য!

দেখে দেখে হাসি পায়, নেশা লাগে চক্ষে?
ভাগ্যিস্ মরে গেল, ছিল নাতো রক্ষে!
ভাত চাই, ডাল চাই, ব্যারামটা শক্ত
তার চেয়ে গলা দিয়ে পড়ুক না রক্ত?
পতির কোলেতে মরা সতীদের ধর্ম্ম
দুজনের বেঁচে থাকা বড় অপকর্ম্ম!

অতএব মরো তুমি, যাও তুমি সঙ্গে
তুমি যে শহীদ হলে দেশহিত যজ্ঞে।
এর পরে মাঠে মাঠে হবে কত ধান্য,
(মন্ত্রীরা মসনদে আরও হবে মান্য)!
তোমার ভিটায় আজ চড়ে ঘুঘু পক্ষী?—
চড়ুক না, ক্ষতি কিবা?—তুমি গৃহলক্ষ্মী!

আরে আরে নেভে চিতা, তাপ নাই কাষ্ঠে?
পুড়িবে না বউ এক, এত বড় রাষ্ট্রে?
ভালো কথা, খুলে নেই দু'কানের মাকড়ি
দাম দিতে হবে জেনো পোড়াবার লাকড়ি!

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

শ্রীদুর্গা-বাল্যের মা ভগবতী

ডাঃ কুঞ্জেশ্বর মিশ্র

গ্রামে জমিদার বাড়ীতে খুব সমারোহের সহিত শারদীয়া দুর্গাপূজা হইত। আমরা বাল্যকালে সমস্তদিন প্রায় সেই মা ভগবতীর চণ্ডীমণ্ডপে কাটাইতাম। অতি প্রত্যুষে পুকুরে স্নান করিয়া গামছা কোমরে বাঁধিয়া গঙ্গাজলে আতপ চাউল ধুইয়া বড় বড় কাঠের ও পিতলের পরাতে নৈবেদ্য সাজাইয়া তাহার চারদিকে পাকা কলা ও শীর্ষোপরি কলাপাতার ঠোঙ্গ করিয়া একটি চিনির চূড়া প্রস্তুত করিয়া দিতাম। আরতির সময় দুইদিকে বড় ধুনুচিতে ধূপ জ্বালাইয়া রুপোয় বাঁধা চামর লইয়া দুইজনে বাতাস করিয়া ধূমে আচ্ছন্ন করিতাম। রাত্রের আরতিতে এই চামরে বাতাস করিবার জন্য আমাদের অন্যান্য সমাগত সমবয়সীদের সহিত কাড়াকাড়ি করিতাম। আরতির পরে পাড়ার ইতর-ভদ্র সকলে চণ্ডীমণ্ডপের প্রশস্ত বারান্দার মেজেতে বসিয়া বৈঠকী গানে দাশু রায়ের পাঁচালীর, কমলাকান্ত, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিগণের রচনা হইতে সংগৃহীত সঙ্গীত শুনিতাম। কোন কবি গাহিয়াছেন—"সারা বরষ দেখিনি মা, মা তুই আমার কেমনধারা। এলি কি পাষাণী ওরে দেখব তোরে নয়ন ভোরে" "মা কেন বসে বিল্বমূলে" কহ গিরি, গৌরী আমার এসেছিল। স্বপনে দেখা দিয়ে চৈতন্য হারিয়ে চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকাল......" অন্যে "বসিলেন মা হেমবরণী হেরম্বে লয়ে কোলে। হেরে গণেশ জননীরূপ রাণী ভাসে নয়নজলে...।" নবমীর দিন রাত্রিতে শুনিতাম—"পোহাল নবমী নিশি শোনহে শিখরবর। নন্দী বৃষ সাজাইয়া আছে দেবারে দাঁড়াইয়া.." "নন্দি! গিরিনন্দিনী ত্রিনয়নের নয়নতারা।..." যেদিন "তিনদিন বলে গেছেরে মোর নয়নতারা...।" মা মেনকার আদরের কন্যা গৌরী যেন আমাদের দিদিদের ন্যায় তিনদিনের জন্য বাপের বাড়ী এসেছিলেন। তিনদিন বাদে দশমীর দিন নন্দী এলেন বৃষ লইয়া তাঁহাকে শিবের আজ্ঞায় লইয়া যাইতে। আবার মা জানিতেন তাঁহার মেয়ে গৌরী চৈতন্যরূপিণী, ঈশ্বরী স্বপনে বা ধ্যানে দেখা দিয়ে আবার অন্তর্হিতা হয়েন। তাই তাঁহাকে দশভূজারূপে পূজা করা হয়। আবার দশমীর দিন প্রাতে চিঁড়ে দই-এর ফলার খাইয়ে গৃহস্থ মেয়েদের মত বিদায়ও দেওয়া হয়। বঙ্গের দুর্গাপূজার একাধারে এই দুই রূপ' মেনকারাণীর আদরের একমাত্র কন্যা আসিয়াছেন বাপের বাড়ী। সেই "তুই যেমন সুরূপা তোর বর মিলেছে ন্যাংটা খ্যাপা"র নয়নতারাকে দেখিতে রাজ্যের লোক আসিলে রাণী তাহাদিগকে ভোজনে আপ্যায়িত করেন তাই দুর্গাপূজা 'দীয়তাং ভুজ্যতাং'এর ব্যাপার। কালিদাস কুমারসম্ভবে মেয়ের এই তপশ্চরণ নিষেধ করিয়াই লিখিয়াছেন "উমেতি মাত্রা তপসে নিষিদ্ধা পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখীজগাম।" উ—মা উ—পরমেশ্বর। মা—না তাই এই কন্যার নাম উমা রাখিয়াছিলেন মা মেনকা। এই উমা পূর্বে সতী ছিলেন। "সতী সতী যোগবিসৃষ্টদেহনিতাং জন্মনে শৈলবধূং প্রপেদে" (কু. স ২১)। সতী যোগে দেহত্যাগ করিয়া শৈলজায়া মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। উমাকে কেনোপনিষদে হৈমবতী বলা হইয়াছে। আচার্য শঙ্কর এই দ্ব্যর্থবোধক শব্দের হেমবৎ বা হিমাচল ও হেমবর্ণা এই দুই অর্থ করিয়াছেন। হিমবৎ শীতল অচল উ রূপী পরমাত্মা হইতে তাহাকে মাপ, মনন (মা=মাতি, মিমেতি বা) করিবার যে শক্তি বা কার্য কৃতি তাহারই আখ্যা উমারূপে, যক্ষরূপী ব্রহ্ম হইতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। হিঃ শব্দ শক্তিপ্রকাশক সংজ্ঞা। হিঃ। অণ=হিরণ্য হেমবর্ণ। অচল পরমাত্মা হইতে যে শক্তি উদ্ভূত হইয়া হিরণ্যগর্ভরূপে সমস্ত পদার্থ সৃষ্টি করিবার শক্তি নিজ গর্ভে ধারণ করেন তিনিই 'আত্মন্বী' গতিশীল আত্মারূপে প্রতি পদার্থে প্রবেশ করিয়া আছেন। তাই বেদ বলিলেন—"একঃ সুপর্ণঃ স সমুদ্র আবিবেশ স ইদং বিশ্বং ভুবনং বিচষ্টে।" একই অদ্বিতীয় পরমাত্মা—শোভনীয় পক্ষীরূপে যেন উড়িয়া উড়িয়াই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া আছেন; যেন চাষের ন্যায় এই বিশ্ব একবার বিকাশ এবং একবার বিনাশ করিতেছেন। চষ ধাতু বধার্থক। তাই প্রত্যেক জীবদেহে জীবাত্মারূপী পরমাত্মা বিরাজমান। গাত্রে আঘাত করিলে নিদ্রিত ব্যক্তিও উঃ ও সদাপ্রসূতমাতৃকল্প। শিশু উঁয়া বলিয়াই যেন দেহে আত্মার অস্তিত্ব জানায়। তাই উ অর্থে ঈশ্বর।

বঙ্গদেশীয় হিন্দু মাত্রেই যাত্রায়, নাট্যে দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগে একান্ন পীঠস্থানের উৎপত্তির বিষয় বেশ ভালরূপেই অবগত আছেন। বিশেষ বাঙ্গলা ও আসামেই তন্ত্রাচার ও তৎশাস্ত্রের উৎপত্তির স্থান বলিলে বাহুল্য হয় না। হরিদ্বার বা হরদোয়ারে কণখলে যাত্রীদিগকে একটি সতীর দেহত্যাগের নির্দিষ্ট স্থানও দেখান হইয়া থাকে এবং ব্রহ্মকুণ্ডকেই দক্ষের যজ্ঞস্থান বলা হয়। বর্তমানকালে এদেশীয় বালগঙ্গাধর তিলক প্রভৃতি এবং কোন কোন পাশ্চাত্য মনীষিগণ মহাভারতের ঐতিহ্য স্বীকার করিয়া প্রায় ৩৫০০ হাজার বর্ষ পূর্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল এরূপ প্রমাণ করিয়াছেন। সন্দেহের অবকাশ থাকিলেও বাল্মীকি রামায়ণের ঐতিহ্য স্বীকার করিলে লঙ্কাযুদ্ধ ন্যূনাধিক ইহার ২০০ বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল। এরূপ প্রমাণ বিষ্ণুপুরাণ হইতে পাওয়া যায় যে, যদু বংশীয় ভীমের রাজত্বকালে অযোধ্যায় রাম রাজা ছিলেন। মহাভারতের মতে ভীম রেবত, ঋষভ অন্ধক, বৃষগর্ভ, বসুদেব, বাসুদেব (শ্রীকৃষ্ণ) অষ্টমপুরুষে আবির্ভূত হইয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। আটপুরুষে প্রায় এইরূপ সময়ই গণনা করা যাইতে পারে। সুতরাং প্রায় পৌনে চারি হাজার বৎসর পূর্বে রচিত রামায়ণে প্রথমে এই দক্ষযজ্ঞের উল্লেখ পাওয়া যায়। সীতার স্বয়ম্বর সভায় রাজর্ষি জনক রাম-লক্ষ্মণসহ বিশ্বামিত্র ঋষি হরধনুর প্রাপ্তির বিষয়ে বলিতেছেন "দক্ষযজ্ঞ বধে পূর্বে ধনুমায়ম্য বীর্যবান"...ইত্যাদি। যেহেতু

দেবগণ তোমরা এই যজ্ঞে আমাকে ভাগ হইতে বঞ্চিত করিয়াছ, সেইজন্য আমি এই ধন আকর্ষণ করিতেছি। তোমাদের মুণ্ডচ্ছে শোভব্যামি করিব। তখন দেবগণ অনেক স্তুতি ব্যাখ্যায় তাঁহাকে শান্ত করিলে তিনি সেই ধন তাহাদিগকে অর্পণ করেন। পরে দেবগণ আমার পূর্বপুরুষের হস্তে সেই ধনু ন্যাস করেন।

মহাভারতের উপাখ্যানেঃ—দক্ষ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সমস্ত দেবগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে কিন্তু মহাদেব শিবকে করেন নাই। শিবপত্নী পার্বতী যখন সমস্ত দেবগণ যজ্ঞে গিয়াছেন তাঁহার স্বামীর নিমন্ত্রণ হয় নাই জন্য আক্ষেপ করিলেন, তখন মহাদেব বীরভদ্ররূপে রুদ্রমূর্তি ধারণ করিয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞধ্বংস ও দক্ষকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইলেন। তখন দক্ষ মহাদেবের অনেক স্তুতি করিয়া বলিলেন তিনিই পরমাত্মা পরমেশ্বর, সকল দেবগণের শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহার শক্তিতেই শক্তিমান হইয়া তাঁহারই নির্দেশেই প্রজাসৃষ্টি করিতে নিয়োজিত হইয়াছেন। তখন আশুতোষ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া স্বকার্যে ব্রতী হইতে আদেশ করিয়াছিলেন। দুই মহাকাব্যে এইরূপ আছে। তারপর শ্রীমদ্ভাগবতে এই দক্ষযজ্ঞের বিস্তারিত বর্ণনা শিবের নিন্দায় মুখরিত হইয়াছে। যে অগ্নি উপাসনা প্রবর্তক ভৃগুঋষি বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করাতে তাঁহাকে (বিষ্ণুকে) 'ভৃগুপদলাঞ্ছিত দক্ষ' বিশেষণ দেওয়া হয়, তাঁহাকেই বৈষ্ণব ভাগবত প্রণেতা টানিয়া আনিয়া শৈব সম্প্রদায়ের উপর তাঁহাদের বিদ্বেষের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। বস্তুতঃ এই পুরাণখানি যে তথাকথিত কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস রচিত নহে তাহা অনেক মনীষী প্রমাণ করিয়াছেন। প্রধান কারণ যে শুকদেবের মুখে ইহা কীর্তিত হইয়াছে, মহাভারতে ব্যাসদেব শরশয্যায় শায়িত ভীষ্ম মুখে বলিয়াছেন তৎপূর্বেই তাঁহার পুত্র শুকে গিরিশিখরে যোগারূঢ় হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন এবং তিনি (ব্যাস) শঙ্করের বরে ইচ্ছা করিলেই তাঁহার ছায়ামূর্তি দেখিতে পান। রামায়ণে ও মহাভারতে দক্ষদুহিতা শিবপত্নী সতীর কোনও উল্লেখ না থাকিলেও ভাগবত পুরাণ ও কুমারসম্ভবেও এ যোগবিসৃষ্টদেহা সতীকে কেন্দ্র করিয়া এই দক্ষযজ্ঞের অবতারণা যাত্রা, নাট্যে করা হইয়াছে এইরূপ অনুমান করা যায়। তন্ত্রশাস্ত্রে এ সতীদেহ ৫১ খণ্ডে পতিত হইয়া পীঠস্থান হইয়াছে। বেশিরভাগ পুরাণের উপাখ্যান বেদের কোন-না-কোন সূক্তকে অবলম্বন করিয়া নানা অলঙ্কারে রূপকে রচনা করিয়া সাধারণের মুখরোচক ও বোধগম্য করা হইয়াছে। তাই অনুমান হয় যে, বেদে দক্ষ সংশ্লিষ্ট কয়েক সূক্তের মধ্যে একটিকে ইহার সূত্র করা হইয়াছে।

সাংখ্যশাস্ত্রের প্রকৃতির শক্তি পঞ্চাশৎ—৫ ভাগে বিভক্ত বলা হইয়াছে। যথা—"এষ প্রত সর্গো বিপর্যয়া-শক্তি তুষ্টি সিদ্ধায়। গুণবৈষম বিবর্জিতা তস্য চ ভেদাশ্চ পঞ্চাশৎ"। (সাঃ ক ৪৯)। পক্ষান্তরে শিব বা পুরুষ এক হওয়াতে জড় প্রকৃতির এই প্রত্যেক অংশের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে তম অবস্থা হইতে রজাবস্থায় উদ্রিক্ত করিয়া সৃষ্টি সাধন করিতেছে। অচল শক্তিমান সর্বব্যাপী পরমাত্মা, যিনি এই অখণ্ড অসীম ব্রহ্মাণ্ডের পুরে স্থিত, (তাই পুরে উষতি—বাস করে জ

(ইহার পর ২৫৮ পৃষ্ঠায়)

সুকান্ত দত্ত অতি ভাল ছেলে. এম-এসসি পাস করার কিছুদিন পরেই পিএচ-ডি ডিগ্রী পেয়েছে। একটি ভাল চাকরির যোগাড় করে প্রায় বছরখানিক সিন্দ্রির সার-কারখানায় কাজ করছে। তার বাপ-মা নেই, মামাই তাকে মানুষ করেছেন।

আজ সকালের ডাকে মামার কাছ থেকে সুকান্ত একটা চিঠি পেয়েছে। তিনি লিখেছেন—

সুকান্ত, তোমার বিবাহ স্থির করেছি, বিজয়লক্ষ্মী কটন মিলের কর্তা বিজয় ঘোষের মেয়ে সুনন্দার সঙ্গে। বনেদী বংশ. বিজয়বাবু আমাদের কাছাকাছি শাঁখারীপাড়াতে থাকেন। মেয়েটি সুশ্রী. খুব ফরসা. বি-এসসি পাস করতে পারে নি, তবে বেশ চালাক। ফোটো পাঠালুম। তোমারই উচিত ছিল নিজে দেখে পাত্রী পছন্দ করা, কিন্তু একালের ছেলে হয়ে কেন যে তুমি আমার উপর ভার দিলে তা বুঝতে পারি না। যাই হক, আমি যথাসাধ্য দেখে শুনে এই পাত্রী স্থির করেছি, আশা করি তোমারও পছন্দ হবে। তেইশে ফাল্গুন বিবাহ, পাঁচ সপ্তাহ পরেই। তুমি এখন থেকে চেষ্টা কর যাতে পনরো দিনের ছুটি পাও। বিবাহের অন্তত দুদিন আগে তোমার আসা চাই।

সুকান্ত মামার চিঠিটা মন দিয়ে পড়ল, ফোটোটাও ভাল করে দেখল। কিছুক্ষণ ভেবে সে তার রঙের বাক্স থেকে তিন-চার রকম রঙ নিয়ে এক টুকরো কাগজে লাগাল এবং নিজের বাঁ হাতের কবজির উপর কাগজখানা রেখে বার বার দেখল তার গায়ের রঙের সঙ্গে মিল হয়েছে কিনা। তার পর আরও খানিকক্ষণ ভেবে এই চিঠি লিখল—

শ্রীযুক্তা সুনন্দা ঘোষ সমীপে। আমার সঙ্গে আপনার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়েছে। মামাবাবুর চিঠিতে জানলুম আপনি খুব ফরসা। আমার রঙ কিন্তু খুব ময়লা। হয়তো আপনি শুনেছেন শ্যামবর্ণ, কিন্তু ত. ত অনেক রকম শেড বোঝায়। আমার গায়ের রঙ ঠিক কি রকম তা আপনাকে জানানো কর্তব্য মনে করি. সেজন্যে এক টুকরো কাগজে রঙ লাগিয়ে পাঠাচ্ছি, আমার বাঁ হাতের কবজির উপর পিঠের সঙ্গে মিল আছে। এই রকম গাঢ় শ্যামবর্ণ স্বামীতে যদি আপনার আপত্তি না থাকে তবে দয়া করে এক লাইন লিখবেন—আপত্তি নেই। আমার ঠিকানা লেখা খাম পাঠালুম। যদি আপত্তি থাকে তবে চিঠি লেখবার দরকার নেই। পাঁচ দিনের মধ্যে আপনার উত্তর না পেলে বুঝব আপনি নারাজ। সেক্ষেত্রে আমি মামাবাবুকে জানাব যে এই সম্বন্ধ আমার পছন্দ নয়, অন্য পাত্রী দেখা হক। ইতি। সুকান্ত।

* * *

চার দিন পরে উত্তর এল। —ডক্টর সুকান্ত দত্ত সমীপে। আপত্তি নেই। কিন্তু প্রকৃত খবর আপনি পান নি, আমার গায়ের রঙ আপনার চাইতে ময়লা, কনে দেখাবার সময় আমাকে পেণ্ট করে আপনার মামাবাবুকে ঠকানো হয়েছিল। কিন্তু আপনার মতন সত্যবাদী ভদ্রলোককে আমি ঠকাতে চাই না। আমার কাছে ছবি আঁকবার রঙ নেই। আপনি যে নমুনা পাঠিয়েছেন সেই কাগজ থেকে এক টুকরো কেটে তার উপর একটু ব্লুব্ল্যাক কালি লাগিয়ে আমার হাতের রঙের সমান করে পাঠালুম।

পুরুষের কালো রঙে কেউ দোষ ধরে না, কিন্তু সবাই ফরসা মেয়ে খোঁজে. যে জোঁক-কালো সেও অপ্সরী বিদ্যাধরী বউ চায়। আপনি সংকোচ করবেন না, আমার কালো রঙে আপত্তি থাকলে সম্বন্ধ বাতিল করে দেবেন। আর আপত্তি না থাকলে দয়া করে পাঁচ দিনের মধ্যে এক লাইন লিখে জানাবেন। ইতি। সুনন্দা।

* * *

চিঠি পেয়েই সুকান্ত উত্তর লিখল। —আপনার রঙ আমার চাইতে এক পোঁচ বেশী ময়লা হলেও আমার আপত্তি নেই। তবে সত্য কথা বলব। প্রথমটা মন খুঁত খুঁত করেছিল, কারণ সুন্দরী বউ একটা সম্পদ, স্বামীর গৌরব আর প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে। কিন্তু পরেই মনে হল, এ রকম ভাবা নিতান্ত স্বার্থপরতা। ফোটো দেখে বুঝেছি আপনার সৌষ্ঠবের অভাব নেই, তাই যথেষ্ট। রঙ ময়লা হলেই মানুষ কুৎসিত হয় না।

আমার একটা কদভ্যাস আছে, জানানো উচিত মনে করি। রোজ পনরো-কুড়িটা সিগারেট খাই। আমার এক বউদিদি বলেন, সিগারেট-খোরদের নিশ্বাসে একটা বিশ্রী মুখপোড়া গন্ধ হয়, তাদের বউরা তা পছন্দ করে না, কিন্তু চক্ষুলজ্জায় কিছু বলতে পারে না। দু-চারটে বাঙালীর মেয়ে যারা মেমদের দেখাদেখি সিগারেট ধরেছে তাদের অবশ্য আপত্তি হতে পারে না, কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই সে দলের নন। আপনার আপত্তি থাকলে এক লাইন লিখে জানাবেন, আমি সম্বন্ধ বাতিল করে দেব।

ইতি। সুকান্ত।

* * *

চার দিন পর সুনন্দার উত্তর এল। —মুখ-পোড়া গন্ধে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু শুনেছি সিগারেট খেলে নাকি ক্যানসার হয়। আপনি ওটা ছেড়ে দিয়ে হুঁকো ধরুন না কেন? তার গন্ধেও আমার আপত্তি নেই। আমারও একটা বিশ্রী অভ্যাস আছে, রোজ বিশ-পঁচিশ খিলি পান আর দোক্তা খাই। দাঁতের অবস্থা বুঝতেই পারছেন। যারা পান-দোক্তা খায় তাদের নিশ্বাসে নাকি অ্যামোনিয়ার গন্ধ থাকে। আমার ছোট ভাই লম্বুর নাক অত্যন্ত সেনসিটিভ, কুকুরের চাইতেও। রেডিওতে যখন কৃষ্ণসোহাগিনী দেবীর কীর্তন হয় তখন লম্বু অ্যামোনিয়ার গন্ধ পায়। আবার গ্রামোফোনে যখন ওস্তাদ বড়ে গোলাম মণ্ডলার দরবারী কানাড়ার রেকর্ড বাজে তখন লম্বু রশুনের গন্ধ পায়। আমার কদভ্যাসে আপনার আপত্তি না থাকলে এক লাইন লিখে জানাবেন, নতুবা সম্বন্ধ ভেঙে দেবেন।

ইতি। সুনন্দা।

* * *

সুকান্ত উত্তর লিখল। —আপনি যখন সিগারেটের দুর্গন্ধ সইতে রাজী আছেন তখন আপনার পান-দোক্তায় আমার আপত্তি নেই। তা ছাড়া আমাদের এই কারখানায় অজস্র অ্যামোনিয়া তৈরি হয়, তার ঝাঁজ আমার সয়ে গেছে। আপনার হুঁকোর প্রস্তাবটি বিবেচনা করে দেখব।

কোনও বিষয়ে আমি আপনাকে ঠকাতে চাই না, সেজন্যে আমার আর একটি ত্রুটি আপনাকে জানাচ্ছি। পুরুষরা যেমন অনন্যপূর্বা পত্নী চায়, মেয়েরাও তেমনি এমন স্বামী চায় যে পূর্বে কখনও প্রেমে পড়ে নি। আমি স্বীকার করছি, আমি অক্ষতহৃদয় নই। ডেপুটি কমিশনার লালা তোপচাঁদ ঝোপড়ার মেয়ে সুরঙ্গীর সঙ্গে আমার প্রেম হয়েছিল। তার বাপ মায়ের তেমন আপত্তি ছিল না, কিন্তু শেষটায় সুরঙ্গীই বিগড়ে গেল। সম্প্রতি সে কমার্স ডিপার্টমেণ্টের মিস্টার হনুমন্থিয়াকে বিয়ে করেছে। লোকটি মিশ কালো যমদূতের মতন গড়ন, তবে মা[illegible] আমার প্রায় তিনগুণ। আমার হৃদয়ের ক[illegible] অনেকটা সেরে গেছে, আপনার সঙ্গে [illegible] পর একেবারে বেমালুম হবে [illegible]

সুরঙ্গীর একটা ফোটো আমার কাছে আছে, আপনার সামনেই সেটা পুড়িয়ে ফেলব।

সুরঙ্গীর বিবাহ হয়ে যাবার পরে আমার খেয়াল হল যে, আমারও শীঘ্র বিবাহ হওয়া দরকার। অবসরকালে আমি ছবি আঁকি, ফোটো তুলি, নানারকম বৈজ্ঞানিক গবেষণা করি। গৃহস্থালির ঝঞ্ঝাট পোহানোর জন্যে একজন গৃহিণী থাকলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের শখ নিয়ে অবসরযাপন করতে পারি। এখন আমার জ্ঞান হয়েছে, হঠাৎ প্রেমে পড়া বোকামি, একত্র বাস করার ফলে একটু একটু করে স্ত্রী-পুরুষের যে ভালবাসা জন্মায় তাই খাঁটী জিনিস। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগে তাকে তো দেখবার উপায় নেই, তথাপি মা বাপের স্নেহের অভাব হয় না। সেই রকম বিবাহের আগে পাত্রী না দেখলেও কিছুমাত্র ক্ষতি নেই। সেজন্যেই মামাবাবুর উপর সব ছেড়ে দিয়েছি।

আমার স্বভাব চরিত্র মতামত সবই আপনাকে জানালুম। আপত্তি না থাকলে একটু খবর দেবেন। ইতি। সুকান্ত।

* * *

সুনন্দার উত্তর এল। —আপনার স্বভাব চরিত্র আর মতামতে আমার আপত্তি নেই। যে সব চিঠি লিখেছেন তা থেকে বুঝেছি আপনি অতি সত্যনিষ্ঠ অকপট সাধু পুরুষ। অতএব আমিও অকপটে আমার গলদ জানাচ্ছি। পবনকুমার পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে পড়ত, তার সঙ্গে আমার প্রেম হয়েছিল। কিন্তু সে ভাদুড়ী ব্রাহ্মণ, তার সেকেলে গোঁড়া বাপ-মা আমাকে পুত্রবধূ করতে মোটেই রাজী হলেন না। পবন এখন ব্যাংগালোরে আছে, খুব একটা বড় পোস্ট পেয়েছে। তাকে পুরো ভুলতে পারিনি, তবে আপনার মতন মহাপ্রাণ স্বামী পেলে একদম ভুলে যাব তাতে সন্দেহ নেই। আমি বলি কি, সুরঙ্গী আর পবনের ফোটো পুড়িয়ে কি হবে, বরং একই ফ্রেমে দুটো ছবি বাঁধিয়ে শোবার ঘরে টাঙিয়ে রাখা যাবে। তাতে বিষে বিষক্ষয় হবে, কি বলেন? আপনার অভিপ্রায় জানাবেন। ইতি। সুনন্দা।

* * * *

সুকান্ত উত্তর লিখল। —সুনন্দা, তোমাকে আজ নাম ধরে সম্বোধন করছি, কারণ আমাদের দুজনের মধ্যে এখন আর কোনও লুকোচুরি রইল না, বিবাহের বাধাও কিছু নেই। লোকে বলে আমি একটু বেশী গম্ভীর প্রকৃতির লোক। শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা অধিকন্তু বলে আমি একটু বোকা। তোমার চিঠি পড়ে বুঝেছি তুমি আমুদে মানুষ, আর মামাবাবুর চিঠিতে জেনেছি বি-এসসি ফেল, হলেও তুমি বেশ চালাক। মনে হচ্ছে তোমার আর আমার স্বভাব পরস্পরের পূরক অর্থাৎ কমপ্লিমেন্টারি। সাইকোলজিস্ট-দের মতে এই হল আসল রাজযোটক, আদর্শ দম্পতির লক্ষণ। আজ ষোলই ফাল্গুন, সাত দিন পরেই আমাদের বিবাহ। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপের আনন্দ এখনই কল্পনায় উপভোগ করছি। তোমার সুকান্ত।

* * *

তিন দিন পরে সুনন্দার চিঠি এল। —আমাকে ক্ষমা করবেন, সব ভেস্তে গেল। পবন ভাদুড়ী এখানে এসেছে। কাল আমার সঙ্গে দেখা করে বলল, দেখ সুনন্দা, এখন আমি স্বাধীন, ভাল রোজগার করি, বাপ মায়ের বশে চলবার কোনও দরকার নেই। তুমি আমার সঙ্গে চল, ব্যাংগালোরে সিভিল বা হিন্দু ম্যারেজ যা চাও তাই হবে।

এই তো পরিস্থিতি। আমার অবস্থাটা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। পবন ভাদুড়ীকে হাঁকিয়ে দেওয়া আমার সাধ্য নয়, কালই অর্থাৎ আপনার নির্ধারিত বিবাহের দু দিন আগেই পবনের সঙ্গে আমি পালাচ্ছি। কিন্তু আপনার প্রতি আমার একটা কর্তব্য আছে, আপনার ব্যবস্থা না করে আমি যাচ্ছি না। আমার বোন নন্দা আমার চাইতে দেড় বছরের ছোট। দেখতে আমারই মতন, তবে রঙ বেশ ফরসা। সেও বি-এসসি ফেল। ঝকঝকে দাঁত, পান দোক্তা খায় না, এ পর্যন্ত প্রেমেও পড়েনি। আপনার সব চিঠিই সে পড়েছে, পড়ে ভীষণ মোহিত হয়েছে, আপনাকে বিয়ে করবার জন্যে মুখিয়ে আছে। ডক্টর সুকান্ত, দোহাই আপনার, কোনও হাঙ্গামা বাধাবেন না, বাড়ির কাকেও কিছু বলবেন না। আপনাদের প্রোগ্রাম অনুসারে বরযাত্রী নিয়ে যথাকালে আমাদের বাড়িতে আসবেন, পুরুত যে মন্ত্র পড়াবে সুবোধ বালকের মতন তাই পড়বেন, আমার বাবা নন্দাকেই আপনার হাতে সম্প্রদান করবেন। তাকে পেয়ে নিশ্চয় আপনি সুখী হবেন। আপনি তো গৃহস্থালি দেখবার জন্যে একটি গৃহিণী চান, সুতরাং সুনন্দার বদলে নন্দাকে পেলেও আপনার চলবে। নিজের বোনের প্রশংসা করা ভাল দেখায় না, নয়তো চুটিয়ে লিখতুম নন্দা কি রকম চমৎকার মেয়ে। আজ বিদায়, এর পর সুযোগ পেলে আপনার সঙ্গে দেখা করে আমি ক্ষমা চাইব। ইতি। সুনন্দা।

* * *

সুনন্দার চিঠি পড়ে সুকান্ত হতভম্ব হল, খুব রেগেও গেল। কিন্তু সে যুক্তিবাদী র‍্যাশনাল লোক। একটু পরেই বুঝে দেখল, সুনন্দার প্রস্তাব মন্দ নয়, গৃহিণীই যখন দরকার তখন এক পাত্রীর বদলে আর এক পাত্রী হলে ক্ষতি কি। সুকান্ত স্থির করল, সে হাঙ্গামা বাধাবে না, কোনও রকম খোঁজও করবে না, সম্পূর্ণভাবে মামার বশে চলবে, তিনি যেমন ব্যবস্থা করবেন তাই মেনে নেবে।

সুকান্ত কলকাতায় এলে তার মামার বাড়ির কেউ সুনন্দা সম্বন্ধে কিছুই বলল না, কোনও রকম উদ্বেগও প্রকাশ করল না। যথাকালে বরযাত্রীদের সঙ্গে সুকান্ত বিয়েবাড়িতে উপস্থিত হল। সেখানেও গোলযোগের কোনও লক্ষণ তার নজরে পড়ল না।

সুকান্ত দেখল, ষোল-সতরো বছরের একটি ছেলে নিমন্ত্রিতদের পান আর সিগারেট পরিবেশন করছে, কন্যাপক্ষের লোকে তাকে লম্বু বলে ডাকছে। তাকে ইশারা করে কাছে ডেকে সুকান্ত চুপি চুপি প্রশ্ন করল, তুমি সুনন্দার ছোট ভাই লম্বু?

লম্বু বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এদিকের খবর কি?

—খবর সব ভালই। দিদিকে এখন সাজানো হচ্ছে, একটু পরেই তো বিয়ের লগ্ন।

—সুনন্দা চলে গেছে?

—কি বলছেন আপনি, বিয়ের কনে কো[illegible] চলে যাবে?

—তোমার আর এক দিদি নন্দা, তার খ[illegible] কি?

—বা রে! আমার তো একটি দিদি, [illegible] সঙ্গেই তো আপনার বিয়ে হচ্ছে।

সুকান্ত চোখ কপালে তুলে বলল, ও!

* * *

রাত বারোটার পরে বাসর ঘরে অন্য কে[illegible] রইল না। সুকান্ত জিজ্ঞাসা করল, তু[illegible] সুনন্দা না নন্দা?

—দুই-ই। পোশাকী নাম সুনন্দা, আ[illegible] পোরে ডাকনাম নন্দা।

—চিঠিতে অত সব মিছে কথা লিখ[illegible] কেন?

—কোনও কুমতলব ছিল না। সত্যবা[illegible] উদারচরিত ভাবী বরকে একটু বাজি[illegible] দেখছিলুম সইবার শক্তি কতটা আছে।

—তোমার সেই পবননন্দন ভাদুড়ীর খব[illegible] কি?

—হাওয়া হয়ে উবে গেছে, তার অস্তিত্ব[illegible] নেই। আমার কাছে একটি হনুমানজীর ভা[illegible] ছবি আছে, তোমার সেই সুরঙ্গীর ফোটো[illegible] সঙ্গে বাঁধিয়ে রাখলে বেশ হবে না?

—তুমি একটি ভীষণ বকাটে মেয়ে। সে[illegible] জন্যেই বি-এসসিতে ফেল করেছ।

—ঝুনি মিত্তির আমার ডবল বকাটে, [illegible] ফার্স্ট হল কি করে? আমি অঙ্কে কাঁচা, ম্যা[illegible] ওয়েলের থিওরিটা মোটেই বুঝতে পারি [illegible] আর ওইটেরই কোশ্চেন ছিল।

—কেন, ও তো খুব সোজা অঙ্ক। বুঝি[illegible] দিচ্ছি শোন। ভি ইকোয়াল টু রুট ওভার ওঅ[illegible] বাই কাপ্পা মিউ—

—থাক থাক। বাসরঘরে অঙ্ক কষ[illegible] অকল্যাণ হয়।

—আচ্ছা, কাল বুঝিয়ে দেব।

—কাল তো কালরাত্রি, বর-কনের দে[illegible] হবার জো নেই। সেই পরশু ফুলশয্যায় দে[illegible] হবে।

—বেশ তো, তখন বুঝিয়ে দেব।

—ফুলশয্যায় অঙ্ক কষলে মহাপাতক হ[illegible] তা জান? ঠাকুমার আবার আড়পাতা রো[illegible] আছে, যদি শুনতে পান যে নাতজামাই ফু[illegible] শয্যায় অঙ্ক কষছে তবে গোবর খাই[illegible] প্রায়শ্চিত্ত করাবেন। তাড়া কিসের, আমি তো[illegible] পালাচ্ছি না। বছরখানিক যাক, তার পর বুঝি[illegible] দিও।

—আচ্ছা তাই হবে। এখন ঘুমনো যাক, [illegible] বল? দেখ সুনন্দা, তুমি খাসা দেখতে।

—তাই নাকি? তোমার দৃষ্টি তো খু[illegible] তীক্ষ্ণ।

—সুনন্দা, আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জান?

—আমাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে?

—ঠিক তা নয়। মনে হচ্ছে—

—মনে হক গে, এখন ঘুমও।

মেটাজী বলে দিলেন—রাঙা আলুর ক্ষেত। লতানে গাছ চেনো তো? দেখো যেন ঘাস তুলতে আসল গাছ তুলে ফেলো না।

মেটাজী যাবার সময় আবার বল্লেন—বেশ মন দিয়ে কাজকর্ম করবে। আমি সর্দারকে বলে গেলুম, সে কাল তোমাদের রোজ দেবে, তাই দিয়ে বাজার করে এনো।

মেটাজী বিদায় নিলেন আর আমরা "জয় দুর্গা" বলে মনের আনন্দে আলুর ক্ষেতে ঘাস তুলতে লেগে গেলুম। আমাদের আশেপাশে যে সব নর-নারীরা মজুরের কাজ করছিল, তারা কিছুক্ষণ এই জামা পরা মজুরদের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থেকে নিজেদের মধ্যে বোধ হয় আমাদের সম্বন্ধে কথাবার্তা বলতে বলতে আবার যে যার কাজে লেগে গেল। আমরা যে জায়গাটাতে ঘাস ছিঁড়ছিলুম সেখানে আরও গুটি দুই তিন পুরুষ ও নারী কাজ করছিল। তারা আমাদের অনভ্যস্ত হাতের কাজ দেখে মাঝে মাঝে কি সব বলাবলি ও হাসাহাসি করতে লাগল। দু[illegible]য় ঘাস ছেঁড়ারও ভাল মন্দ আছে। ভালোই হোক আর মন্দই হোক কোনো রকমে বেলা ছটা অবধি কাজ করবার পর সেদিনকার মতন কাজ শেষ হলো। আমরা তো এক রকম ছুটতে ছুটতে এসে সেই ভাঙা পাত্রে জল তুলে হাত মুখ ধুয়ে নিজেদের বাসস্থানে এসে ঢুকলুম।

বাসস্থান একখানি ঘর—যেমন লম্বা তেমনি চওড়া—ঠিক গির্জাঘরের মতন। প্রকান্ড দরজা ঢোকবার। দরজা বন্ধ করবার জন্য অসংখ্য হুড়কো, খিল ও ছিটকিনির ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই পুরোনো ও অনেক দিন অব্যবহারে প্রায় অকর্মণ্য হুড়কো প্রভৃতি যথাস্থানে সংযোজন করতে আমাদের প্রায় দমবন্ধ হবার অবস্থা। কোনো রকমে সেগুলি লাগিয়ে আমরা পূর্বদিকের একটি প্রকান্ড জানলা খুলে দিয়ে দাঁড়ালুম। তখনও সূর্য একেবারে অস্ত যায়নি। অস্তগামী তপনের [illegible]ত আলো এসে পড়েছে গাছের চূড়ায় চূড়ায়। আমাদের সম্মুখে দক্ষিণে বামে—যতদূর দৃষ্টি যায় সুদূরপ্রসারী বনশ্রেণী সবলে ধরণী মাতাকে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। দূর—দূর—আরো দূরে পাহাড়ের সারি স্পষ্ট থেকে অস্পষ্ট হতে হতে মেঘলোকে মিলিয়ে সত্য ও কল্পনায় জড়াজড়ি হয়ে গিয়েছে। তারই মধ্যে শত লক্ষ বিহঙ্গমের কাকলীতে মর্ত ও অন্তরীক্ষ পরিপূর্ণ।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ অনুভব করলুম কখন পাখীদের কলরব থেমে গিয়েছে, বনভূমি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছে।

অরণ্য মাতার কোলে আমাদের প্রথম সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল।

মোমবাতি জ্বালিয়ে নিজের নিজের ধুতি পেতে বিছানা করলুম। আমাদের কারো মুখে কোনো কথা নেই। সকলেরই মন ভারী। মনের কোন কোণে বিরাট বেদনা ও অভিযোগ জমা হচ্ছিল। কিসের বেদনা—কার ওপর অভিযোগ তার স্পষ্ট ধারণা নেই। মন যেমন ভারী, উদর তেমনি হাল্কা, তার ওপর সারাদিনের সেই পরিশ্রমে দেহ ক্লান্ত। শুয়ে শুয়ে এই তিনের ভারসাম্য করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লুম।

পরদিন ভোরের অনেক আগেই পাখীদের বিপুল চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙল বটে, কিন্তু শরীর এত দুর্বল যে পাশ ফিরতে পারি না।

সেদিন দুপুরে বেলা স্নান করে পরিতোষ যখন চুল আঁচড়াচ্ছিল, সেই সময় তার আয়নাখানা নিয়ে নিজের চেহারা দেখে চমকে উঠলুম। দেখলুম ডানদিকের গালের ওপরে অনেকখানি জায়গা একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছে। প্রথম যাত্রার ফলে দাঁতগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল—এবারে চুলে পাক ধরল অর্থাৎ স্থবির মহাস্থবিরে উন্নীত হ'লো—তখনও আমার সতেরো বছর পূর্ণ হয়নি।

বেলা প্রায় দুটোয় আমরা ক্ষিধের জ্বালা আর সহ্য করতে না পেরে একরকম কাঁপতে কাঁপতে সর্দারের কাছে গিয়ে বললুম—হয় আমাদের কিছু খেতে দিন আর না হয় পয়সা ও ছুটি দিন আমরা বাজারে গিয়ে কিছু খেয়ে আসি।

সর্দার তখন ঘুমোচ্ছিল। আমাদের চেঁচামেচি শুনে সুখশয্যা ছেড়ে এসে ক্ষিদের কথা শুনে প্রথমে তো মহাতম্বি সুরু করল। শেষকালে একটা লোক ডেকে তাকে ইকড়ি-মিকড়ি ক'রে কি বল্লে বুঝতে পারলুম না। শেষকালে আমাদের বল্লে—এই লোকের সঙ্গে বাজারে গিয়ে জিনিষপত্র কিনে নিয়ে এসো।

আমরা বল্লুম—পয়সাকড়ি দাও।

সর্দার একবার—ও—বলে ন'গন্ডা পয়সা একবার দুবার তিনবার গুনে আমার হাতে দিলে। আমিও বার তিনেক পয়সাগুলো গুনে জিজ্ঞাসা করলুম—ন' আনা কি হিসাবে দিচ্ছেন?

সর্দার বল্লে—তোমাদের রোজ ছ' পয়সা ক'রে মজুরী। দু-দিনের মজুরী তিন আনা, তিনজনের ন' আনা।

পয়সা হাতে নিয়ে তো একেবারে হকচকিয়ে গেলুম। এ্যাঁ! এই ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টে কাজ ক'রে দৈনিক ছ'পয়সা! এতে খাবই বা কি আর পরবই বা কি!

যাই হোক—লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে তখুনি ছুটলুম বাজারের দিকে। পথ চলেছি তো চলেছি—কিন্তু কোথায় বাজার! শেষকালে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পথ চলে একটা জায়গায় এসে পৌঁছলুম— শোনা গেল সেটা নাকি বাজার। বাজার বল্লে বটে, কিন্তু দোকান-পত্র কোথায়? দু-একখানা পাতা-ছাউনি ঘর তারও দরজা অর্থাৎ ঝাঁপ বন্ধ। একটা এই রকম ঘরের সামনে নিয়ে গিয়ে লোকটা আমাদের বল্লে—এই একটা দোকান।

প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে চেঁচামেচি করবার পর দোকানদার দরজা খুলতে আমাদের গাইড তাকে কি বল্লে। দেখা গেল খরিদ্দারের শুভাগমনে লোকটি বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—চাল আছে? ডাল?

সে অবাক হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রইল। বেশ বোঝা গেল চাল শব্দটি ইতিপূর্বে তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি। আমরা খাদ্য, তণ্ডু[illegible] অন্ন, ধান্য ইত্যাদি নানা শব্দ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলুম। ইতিমধ্যে [illegible]

ক'রে চারিদিক থেকে লোক এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়াতে আরম্ভ করল। আমাদের কথা শুনে তারাও নিজেদের বিদ্যা অনুসারে দোকানদারকে বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই সে বুঝতে পারলে না। শেষকালে চলে যাচ্ছি দেখে সে ভেতর থেকে একটা পুঁটুলি নিয়ে এসে আমাদের সেটা খুলে দেখালে। দেখলুম তার মধ্যে ধুলোর মতন খানিকটা কি জিনিষ রয়েছে—তাতে আবার পোকা ধরেছে।

সেটি কি দ্রব্য—জিজ্ঞাসা করায় দোকানদার ও আমাদের চারপাশে যত নর-নারী দাঁড়িয়ে ছিল সবাই মিলে চীৎকার করে সে দ্রব্যটির গুণাগুণ বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল। অনেক ধস্তাধস্তির পর বোঝা গেল বস্তুটি বাজরার আটা—খুবই রুচিকর এবং পুষ্টিকর খাদ্য। চাল যখন পাওয়া গেল না তখন আপাততঃ বাজরার আটাই দিতে বললুম এক সের। দোকানদার আবার বাড়ীর ভেতর থেকে এক-টুকরো পাথর দিয়ে সেই ধুলোরূপী পুষ্টিকর ও রুচিকর গুড়ো ওজন করে দিলে। সেখান থেকে এক পয়সার নুন কিনে বেরোলুম অন্য দোকানের সন্ধানে। পেছনে সেই ভিড়ও চলল আমাদের সঙ্গে। সে দোকানে অনেক চেষ্টা করেও হাঁড়ি কি দ্রব্য বোঝাতে না পেরে শেষ কালে আধা কলসী ও আধা হাঁড়ি গোছের একটা জিনিষ কিনে ছুটতে সুরু করলুম নিজের ডেরার দিকে।

জঙ্গলে গিয়ে যখন পৌঁছলুম, তখন সন্ধ্যে হয়ে এলেও একটু আলো ছিল। ওরি মধ্যে একরাশ শুকনো কাঠি জোগাড় করে নতুন পাত্রে জল ভ'রে ঘরে উঠে দরজা বন্ধ ক'রে দিলুম। বাজার থেকে ফিরে আসবার মুখে সন্ধ্যার আবছায়ায় কালীচরণ একটা চিচিঙ্গে ছিঁড়ে এনেছিল। সে বল্লে—শুধু রুটি খাওয়ার অভ্যেস তো কখনো নেই, এই চিচিঙ্গের কালিয়া দিয়ে রুটি মারা যাবে।

প্রায় তিনদিন একরকম নির্জলা উপবাসের পর এই মহাভোজের আয়োজন দেখে মনটা খুশীই হয়ে উঠল।

তিন গাছা ঝাঁটার কাঠি দিয়ে ঘরের মেঝে যতখানি পরিষ্কার করা সম্ভব তা করে রান্নার জন্য প্রস্তুত হলুম। উনুনের জন্য তিনখানা পাথর আগেই সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল। ঠিক হলো আধখানা চিচিঙ্গে এখন রাঁধা হবে আর আধখানা ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেওয়া হবে। কিন্তু আধখানা চিচিঙ্গে ছুরি দিয়ে কুচিয়ে

মনে হোলো রান্না হবে কিসে? পাত্র কিনে আনা হয়নি বলে এখন আফশোষ হতে লাগল। শেষকালে সর্দারের দেওয়া হাঁড়ির অংশ—যা এই দু'দিন আমাদের জলপাত্রের অভাব দূর করেছে, তাইতে জল দিয়ে আগুনে চাপিয়ে দেওয়া গেল। জল একটু শোঁ শোঁ করতেই কুচোনো চিচিঙ্গে তাতে ছেড়ে দিয়ে নুন দিয়ে আমরা আটা মাখবার বন্দোবস্ত করতে লাগলুম। মাটিতে কোঁচার খোঁট পেতে তাতে সেই ধুলোরূপী বাজরার গুঁড়ো ঢেলে একটু একটু করে জল দিয়ে মাখবার চেষ্টা করতে লাগলুম। মধ্যে মধ্যে উনুনেই কাঠি দেওয়া চলতে লাগল। ছোট ছোট নেচি করে থাবড়ে থুবড়ে রুটি করবার চেষ্টা করছি, উনুন থেকে শোঁ শোঁ চোঁ চোঁ শব্দ আসছে—মধ্যে মধ্যে কাঠি দিয়ে এক আধ টুকরো তরকারী নামিয়ে দেখা যাচ্ছে সেদ্ধ হয়েছে কিনা—কখনো বা পরামর্শ করছি যে রুটিগুলো সেঁকা হবে কি করে—এই রকম নানা কথা চলেছে এমন সময় টাই ক'রে এক বিরাট আওয়াজে চমকে উঠলুম। পরমুহূর্তেই অর্থাৎ চমক ভাঙবার আগেই একটি বজ্রনির্ঘোষ—তারপরেই অগ্নি বৃষ্টি---মুহূর্তের মধ্যে আমাদের মুখে হাতে পিঠে গরম চিচিঙ্গে চূর্ণ চড়বড়িয়ে উঠল।

—বাপরে---ব'লে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে চিচিঙ্গের টুকরোগুলো গা থেকে ঝেড়ে ফেলে ঘরের মধ্যে ছুটে দেখি মেজেতে তর-কারীর টুকরোগুলো পড়ে রয়েছে। সেই ভাঙা হাঁড়ির কানা—আবর্জনা বহন ক'রে যার শেষ জীবন কাটছিল, অতিরিক্ত চাপ সহ্য করতে না পেরে সে দেহরক্ষা করেছে। ভাবতে লাগলুম হাঁড়ি ভাঙা তো দেহরক্ষা করেছে, কিন্তু আমা-দের এখন দেহরক্ষার উপায় কি!

তখনো যেটুকু আগুন নিভন্ত অবস্থায় ছিল, তাতে ময়দার ডেলাগুলো পুড়িয়ে নিয়ে আর আধখানা যে চিচিঙ্গে ছিল, তাই দিয়ে দু'দিন নিরম্বু উপবাসের পর পরমানন্দে পারণ করতে প্রবৃত্ত হলুম। অনশনের পর এই ভোজনপর্ব সমাধা হতেই আমাদের কালীচরণের কি রকম ভাব লেগে গেল—সে সুরু করে দিলে---কি ছার আর কেন মায়া—কাঞ্চনকায়া তো রবে না।

সেদিন রাত্রে বেশ কিছুক্ষণ গল্পসল্প করে শুয়ে পড়া গেল। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি—হঠাৎ ঘুমের মধ্যে বিরাট একটা শব্দ কানে যেতে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লুম। আচমকা ঐ রকম আওয়াজে আমি যেন কি রকম জ্ঞানহারা হয়ে পড়লুম। আমার পাশেই যে বন্ধুরা শুয়ে আছে সে কথা স্রেফ ভুলে গিয়ে ভয়ে দিলুম দৌড়, কিন্তু বাইরে যেতেই আছড়ে পড়ে মাথা ও মুখে বিষম আঘাত লেগে সম্বিত ফিরে পেলুম।

এতক্ষণে কালী ও পরিতোষ উঠে মোমবাতি জ্বালিয়ে ফেল্লে। সেই স্বল্পালোকেই দেখতে পেলুম ভয়ে তাদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে আর হাত কাঁপছে একটু একটু করে। আওয়াজ তখনো সমানভাবে চলেছে। মনে হতে লাগল হাজার হাজার রাজহাঁস যেন একটা গলা দিয়ে চীৎকার করে চলেছে।

ক্রমেই আওয়াজ বাড়তে লাগল। ঘরের পূর্বদিকের চারটে দরজার সমান বড় বড় জানলা ছিল। মনে হতে লাগল যেন করে এক একবার কি একটা জানলার আওয়াজ হচ্ছে আর তারই ধমকে জানলা থর থর করে কাঁপছে। আমরা আস্তে ভূমিশয্যা ছেড়ে পা টিপে টিপে ঘরের দ দিকে দাঁড়ালুম। কে যে সেখানে দাঁড়ালুম তার ঠিক নেই। দরজার যেতেই জানলার দিকের আওয়াজ কমে বেশ মনে হতে লাগল—আওয়াজটা যেন সরে যাচ্ছে। একটুখানি প্রাণে ভ এলো—কিন্তু তখুনি আমাদের ভ্রম ছুটে বুঝতে পারলুম যে, আওয়াজটা জানলা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

পরিতোষ অনেক গবেষণা করে ব মনে হচ্ছে হাঁসভূত।

অতি দুঃখেও হাসি পেল। হংসা কথা লেখা আছে বটে—কিন্তু হংসভূতের তো কখনো শুনিনি বাবা!

ওদিকে হংসভূতের গর্জনের ঠেলা হতে লাগল ঘরের মধ্যে যমদূত এসে উপ হয়েছেন। ভয়ে আমাদের কালঘাম ! সুরু করলে। সন্ধ্যেবেলার কাঁচা চি ও আধপোড়া কাঁচা ময়দার ঠুলি জল হয়ে বেয়ে ঝরতে লাগল।

লেখকের মহাস্থবির জাতকের অপ্রক চতুর্থ খণ্ড হইতে উদ্ধৃত।

কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শনে

॥ শিবনাথ শাস্ত্রী ॥

এ কি দেখিলাম আজ, কি সেজেছ গিরিরাজ
মাথে পরি মুকুট রূপার!
তরুণ-অরুণালোকে, এ কি হে শোভা ঝলক
বর্ণে ইহা বর্ণে সাধ্য কার?
রূপা যেন গ'লে ঢালে, গড়ায় তোমার ভালে
শোভা ফলে নীলাম্বর পাটে;
শুভ্র জলদের রেখা, কি সুন্দর যায় দেখা,
শুভ্র বাস যেন কটি-তটে।
ডুবে যাই শোভা হেরে, আনন্দে পাগল করে
ইচ্ছা হয় যেন ছুটে যাই,
একবার দেখে আসি কিরূপে তুহিন রাশি
সাজাইল এ হেন গোঁসাই।
ওই উপত্যকা দিয়া যায় নদী গড়াইয়া
অশ্রুধারা হিমাদ্রি তোমার,
তরুকুঞ্জে বিভূষিত, তনু যেন কণ্টকিত
প্রেমে পূর্ণ পরশে তাঁহার।
প্রেমে মাতোয়ারা প্রায় বিহগ বিহগী গায়,
প্রেমানন্দে বনে বনে বুলে,
সুস্বরে চমকি চাই, কোথা না দেখিতে পাই,
শেষে দেখি দুলিতেছে ফুলে।
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ নয়, দেখে ফুল ভ্রম হয়
কিবা রঙ্গে রঞ্জিত সে দেহ,
সুখে করি মধু পান, করিয়া বেড়ায় গান,
গিরি যেন উহাদের কেহ।
নির্মল হৃদয় লয়ে যে বা থাকে এ আলয়ে
এ ভুবন তাহারি ভবন,
নিশ্চিত-নির্মল প্রেম, পাইয়াছি পাই ক্ষেম
সুখে ভোগ করি গো জীবন।

শ্রী সজনীকান্ত দাস

পাহাড়ী ছন্দ: প্লেন লিভিং অ্যান্ড হাই থিংকিং

ভ্যাপ্‌সা গরম ভাদ্র মাসের,
চলেছিলাম কাজে,
চলতে চলতে ট্রামখানা ঠিক
থামল পথের মাঝে।
ধর্মঘটীর বিরাট মিছিল
পথ করেছে রোধ,
ভিড় যে ততই বেড়ে চলে
যতই বাড়ে রোদ।
ঘেমে নেয়ে অ্যাক্‌সা হতেই
হঠাৎ বৃষ্টি নামে,
ভীরু পায়ের উপায় তো নেই
ব'সেই থাকি ট্রামে।
বৃষ্টিধারায় শহরবাসী
সৃষ্টিছাড়ার দল,
দমে না কেউ, ক্রমেই বেড়ে
চল্‌ল কোলাহল।
পাহাড় থেকে সদ্য নেমে
এসেছি এই প্লেনে,
ঝরণা-ধারায় স্নান করে হায়,
পড়নু যেন ড্রেনে।
ট্রামে ব'সেই স্বপন দেখি
মন ছুটে যায় দূরে,
পাইন দিয়ে লাইন-করা
পাহাড় পথে ঘুরে।

* * *

চলছি মহা-হিমালয়ের কোলে
দাবি-দাওয়ার কে রাখে আর খোঁজ,
বসে আছি ইয়াক-চতুর্দোলে
চোখে আমার রূপের রঙের ভোজ।
বরফ দৈত্য দিচ্ছে উঁকি কভু
পেঁজা তুলোর মতন মেঘের ফাঁকে,
ঢাকছে ফগে, মন মানে না তবু
সুদূরে শুধু হাতছানিতে ডাকে।
আড়াল করে হাল্‌কা বরফ-গুঁড়ো
পাঁচিল সমান কোথাও পাথর খাড়া,
আকাশ-গাঙে ভাসন্তি পাহাড়-চূড়ো
এগিয়ে যেতে দিচ্ছে খালি তাড়া।
খরস্রোতা তিস্তা রেখে বাঁয়ে
কালিম্পঙ্ ও পেডঙ গেনু ছেড়ে,
প্রজাপতি-ফুলের রংগিল-গায়ে
মুষলধারে বৃষ্টি এল তেড়ে।
সিকিম দেশের জেলেপ-লা যাই ফুঁড়ে,
পার হয়ে যাই সরাই ইয়াতুং,
শুনতে পেলাম সকল আকাশ জুড়ে
ধ্বনি, ওম মণিপদ্মে হুং।
চলে গেলাম গাউৎসা পার হয়ে
ফুলবাহারী চুম্বি উপত্যকায়।
চোমোলহারি পেছনে যায় রয়ে
অনাদিকাল খুঁজছে যেন সখায়।
...থ ভুলিয়ে নে যায় প্রেমুলারা
ঘাসের বনে বেগুন-রঙা ফুল,
...ায় তারা ছিঁড়ে এদের যারা
...পরবে চুলে, ক'রবে কানের দুল!
...চারিদিকে সিলভারফার,
লালে লাল রডোডেনড্রন;
খুনরঙা গোলাপের ঝাড়
চুম্বিকে চুমো খায় মন।

যত উঠি তরু ছায়াহীন
ধু ধু করে মরু তিব্বত;
পাখীদের কাকলীও ক্ষীণ
হারায় তুষার-ঢাকা পথ।
ফারি ছাড়ি তাং-লার পথে
পার হ'য়ে সমতল তুনা,
যেতে হলে লাসা কোনোমতে
এইটিই পথ যে অধুনা।
চলে ইয়াকের ক্যারাভান
লালবাস লামাদের দল
গম্ভীর বুদ্ধ সমান;
শুধু প্রপাতের কলকল
দূর প্রান্তর হতে আসে।
কাঞ্চনজঙ্ঘার শির
মেঘ ছিঁড়ে ক্ষণে ক্ষণে ভাসে
যেন মহারাণী পৃথিবীর।
হঠাৎ ওঠে তুষারঝড়,
সামাল-সামাল, পথিক ভাই—
এই তো আমি সামনে আছি,
এই তো আমি কোথাও নাই।
নীল আকাশের সব আলো
ইয়াক-দুধে ঢাকল কে—
হাড়-কাঁপুনে হাওয়ার ঘায়
মুমূর্ষু প্রাণ কার ধোঁকে!
কোথায় তাঁবু, জলদি কর্
তরল আঁধার হয় জমাট,
ডুবল যে তোর কোমরতক্
জ্বালতে আগুন আনরে কাঠ।
কাঠ নয়তো ইয়াক ডাং
রাখিসনি কি কুড়িয়ে তা।
শীতের ঘায়ে মরবি যে
ভিন্ন জ্বালানী নাই হেথা।
এখনো দূর খাম্বাজং,
শেখর টিংরি তাহার পর,
তুষার ঝড়কে সামাল দে,
বাঁধরে বাঁধ রাতের ঘর।

কেটেছে আঁধার ঘোর
এসেছে সোনার ভোর
বরফের ঝড় গেছে থেমে,
ঘোর গাঢ় নীলাকাশ
দেখে তো মেটে না আশ,
নীল বুঝি জলধির প্রেমে!

আর নয় নিঃসঙ্গা
মাকালু-কাঞ্চনজঙ্ঘা,
উঁকি দেয় এভারেস্ট দূরে,
তুহিন-শীতল শিরে
লেগে মেঘ নাহি ফিরে
তুষার-কেতন হয়ে উড়ে।

শীর্ষগিরি পৃথিবীর
ধ্বজা তার চিরস্থির
দেখিলাম রংবাকে এসে
বিশ্বের ঈশ্বরে স্মরি
লামারে প্রণাম করি
মন বলে, চল যাই ভেসে—

রংবাক গ্লেসিয়ার
বুকে হেঁটে হই পার
চড়ি পরে উত্তর কোলে*
বীর ম্যালরির মত
সাধি জীবনের ব্রত;
মরণের যবনিকা দোলে
দুলুক না, কিবা ক্ষতি
সবারি তো শেষ গতি
পরে যদি থেকে যায় নাম!
নেপালের পথে এসে
দক্ষিণ কোলে * শেষে
নিবেদিবে শ্রদ্ধা প্রণাম
তেনজিং হিলারীরা,
যারা জিনি গিরি-ক্রীড়া
ঘোষিয়াছে মানুষের জয়—
নাঙ্গায় মন ধায়
বুল যেথা একা যায়
ক্ষয়ে গিয়ে হয়েছে অক্ষয়।

রংবাক মন্দিরেতে
বসে থাকি জুড়ি দুই কর
গম্ভীর ওঙ্কার ধ্বনি
শুনিতেছি চিরিছে অম্বর।
হিমালয় নিত্য স্থির
বুদ্ধদেব স্থিরতর যেন
রহস্যের হাসি তাঁর
ওঠে হেরি, বুঝি স্ফিংক্স হেন
সবারে কহেন ডাকি
এ রহস্য হইও না পার;
জীবনের দুই তীরে
মানুষের তিমির-পাথার।
হেরিতেছি দিকে দিকে
ঊর্ধ্বলক্ষ্যে বীরদল ছোটে,
ক্ষণিকের পদাঘাতে
গিরিচূড়া কেঁপে কেঁপে ওঠে।
কামেত-ত্রিশূল-নন্দা-
নাঙ্গাকে-টু-অন্নপূর্ণা-শিরে
মানুষের জয়গান
ধ্বনিতেছে উদাত্ত গম্ভীরে;
মাকালু চোমোলহারি
ধ্বনিতেছে কাঞ্চনজঙ্ঘায়,
চিরজয়ী এভারেস্ট
তাহারও পতাকা ছিঁড়ে যায়।
সেই ঊর্ধ্বে মানুষের
অবস্থান শুধু ক্ষণস্থায়ী—
ফিরে আসে সমতটে
ধরণীর পঙ্ক অবগাহি'
বিস্ময়ে তুষারমৌলি
হিমাচল পানে ফিরে চায়
নেমে আসে যবনিকা
রহস্য রহস্য থেকে যায়।

* * *

নাড়া খেয়ে জেগে উঠি চলিতেছে ট্রাম।
ভূতলে নামিনু ছাড়ি হিমালয়-ধাম॥
যেতে হবে ঠিকানায়, পথে জল কাদা।
জনতার ভিড় দেয় পদে পদে বাধা॥
ভারত উত্তরে দেবতাত্মা হিমালয়।
অসহায় মানুষেরে দেন কি অভয়॥
ধরণীর রাজহংস সন্তরি অম্বর।
পঁহুছিবে কবে সে মানস-সরোবর?
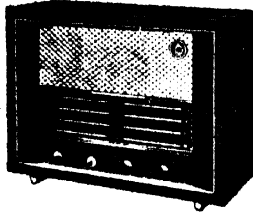
---

*North Col, *South Col,

সবিনয় নিবেদন

টি,এ/টিউ ২২৩
এসি, অথবা, এসি/ডিসি
৭ ভাল্ভ—৫৭৫৲

টি,এ/টিউ ৩২৪
এসি, অথবা, এসি/ডিসি
৬ ভাল্ভ—৪৫০৲
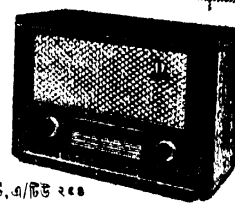
টি,এ/টিউ ২৫৪
এসি, অথবা, এসি/ডিসি
৬ ভাল্ভ—৩৯০৲
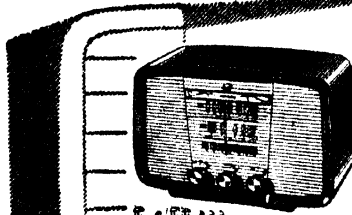
টি,এ/টিউ ২২২
এসি, অথবা, এসি/ডিসি
৫ ভাল্ভ—৩০০৲
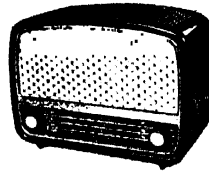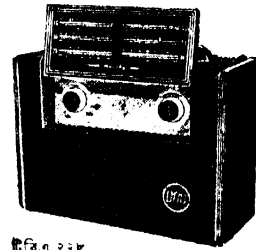
টিউ ২৯৮
এসি/ডিসি
৫ ভাল্ভ—২১৫৲

টিবিএ ২২৮
এসি/ড্রাই ব্যাটারি
৬ ভাল্ভ ৫৭৫৲

টিবি ৩২৭
ড্রাই ব্যাটারি চালিত
৭ ভাল্ভ—৪৭৫৲

টিবি ২৪৩
ড্রাই ব্যাটারি চালিত
৫ ভাল্ভ—৩২৫৲

টিবি ২৯৯
ড্রাই ব্যাটারি চালিত
৫ ভাল্ভ—২১৫৲
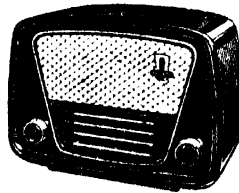
আপনার রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী বহুবিধ মডেল। পূর্বাঞ্চলের সমস্ত প্রধান প্রধান সহরে আমাদের মনোনীত শতাধিক ডিলার 'মার্ফি' সেট্ বিক্রয়ের আগে ও পরে আপনার সেট্-সংক্রান্ত সর্ববিধ সেবায় সদা প্রস্তুত।

murphy radio

পূর্ব ভারতের একমাত্র পরিবেশক
দেবসনস্ প্রাইভেট লিমিটেড
২, ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

D/PA/59

শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব প্রতিষ্ঠিত প্রায় দু'শ বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত দুর্গা প্রতিমা

[কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার কর্তৃক অঙ্কিত]
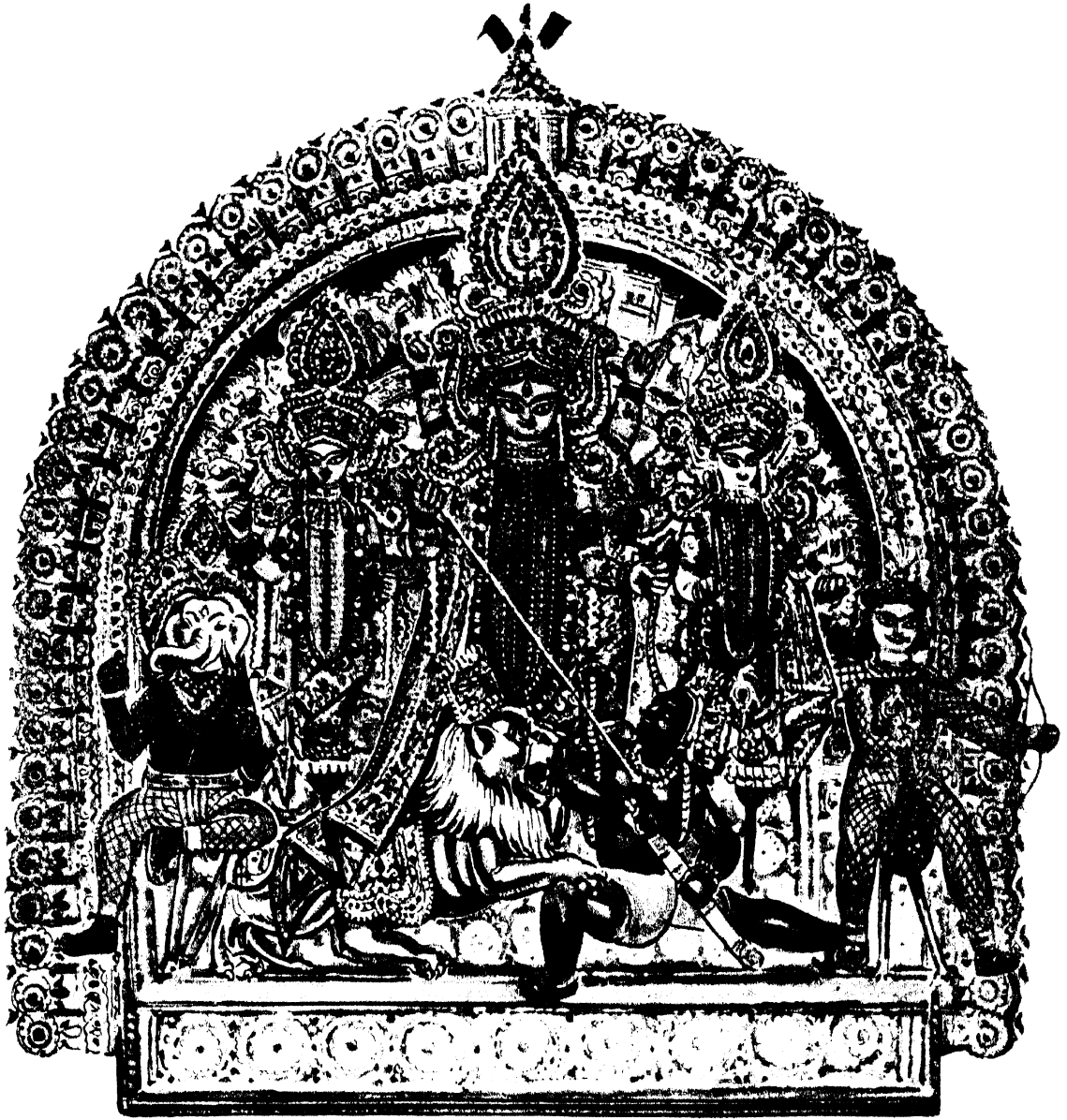
কালাপানির ডাক

বারীন্দ্র কুমার ঘোষ

কালের বাতাস বহিয়া চলিয়াছে আমাদের জীবনের প্রান্তর দিয়া, কখনও মৃদু হিল্লোলে—

"বসন্ত বায় বহিছে কোথায়
কোথায় ফুটেছে ফুল।"

আবার কখনও উদ্দাম ঝড়ের মাতনে আমাদের মনের প্রাণের আকাশ বজ্রনির্ঘোষে মথিত করিয়া। আমার বিচিত্র ঘটনাবহুল জীবনে এ সকলই ঘটিয়া গিয়াছে। আমার দিদি সরোজিনীর জীবনেও আমার ও শ্রীঅরবিন্দের সৃষ্ট রাজনৈতিক শৃংখল ভাঙ্গা তুফানের কম আঁচ লাগে নাই। গত ২৮শে নভেম্বর বুধবার, ১২ই অগ্রহায়ণ ১৩৬৩ তারিখে সেই একমাত্র দিদি আমাদের জগতের মায়া কাটাইয়া কোন্ অলখ তুরীয়লোকে চলিয়া গেলেন। জীবনের এলো-মেলো হাওয়া মানুষের সঞ্চিত কত সাধের আবর্জনা—কত চিঠিপত্র, লেখা, ছবি, স্মৃতিচিহ্ন কোথায় উড়াইয়া লইয়া যায়, থাকে অল্পই। দিদি তাঁহার সযত্ন-সঞ্চিত এমন বহু সুখের স্মৃতি কুড়াইয়া বন্ধু পরিচিত আত্মজনের ঘরে ঘরে বাক্সে, সুটকেসে, টিনে, ঝুড়ি পাটিরায় রাখিয়া যাইতেন। দিদির আপন ঘর বলিতে কিছু ছিল না। দেওঘরের রোহিণী রোডের নিজস্ব বাড়ী—"স্বর্ণলতা ভবন" কি খেয়ালের ঝোঁকে ইন্দ্রনাথ নন্দীর কাছে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বড় সাধ ছিল, রাজধানীর উপকণ্ঠে আবার বাড়ী করিবেন। এই সখের তাড়নায় জমি ও বাড়ী বিক্রীর বিজ্ঞাপনের স্তূপে স্তূপে কাটিং সঞ্চয় করিতেন। তাহার কতকগুলি তাঁহার একটা পুরাতন বাক্সে মৃত্যুর পরও পাওয়া গিয়াছে।

আর যাহা যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা আমারই জীবনের স্মারক, কাগজপত্র, চিঠি, ছবি ও টুকিটাকি কত কি। কবে কৈশোরে কাহাকে পত্রে কবিতা লিখিয়াছি, তাহাও এই বিচিত্র সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করিয়া ঢাকার জীবন শেষ করিয়া পাটনায় গিয়া B. Ghose's Tea Stall, Half-anna Cup. Rich in Cream — সেই বাঁকিপুর কলেজের গেটে চায়ের দোকানটি ফাঁদিয়াছিলাম এই বিচিত্র সংগ্রহের মধ্যে সে সময়ের দিদিকে লেখা একটি চিঠি পাওয়া গিয়াছে। এই তারিখহীন চিঠি এখানে কৌতূহলী পাঠকের পরিতৃপ্তির জন্য উদ্ধৃত করি—

পূজনীয়া দিদি,

পত্র দিতে পারি নাই তজ্জন্য ক্ষমা করিও। তোমাকে থাম পাঠাইবার জন্য অনেক দিন হইতে কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু ordinary letter box-এ তাহা ঢোকে না। পোষ্ট অফিসও অনেক দূর; তাই আজ কাল করিয়া পাঠানো হইয়া উঠে নাই। আজ পাঠাইলাম। আরও অধিক দরকার হয় তো লিখিও সেজদার কোন পত্র পাও কি? তোমার কলিকাতা যাওয়ার কি হইল? ছোট মাসীর ৪০্ টাকা মাহিনার টিউশনী হইয়াছে, বড় সুখের কথা; কিন্তু এবার যেন আজ যাইব কাল যাইব করিয়া আবার সব পণ্ড না করেন। পরের চাকরী, কথা মত কাজ করিতে হয়। এ সংবাদে আমি কত সুখী হইয়াছি এত বোধ হয় আর কেহ নয়। আমার শরীর অসুখ ছিল, এখন ভাল আছি। সম্মুখে ভীষণ দারিদ্র্য আসিতেছে; যে টাকা আছে তাহাতে মাস তিনেক চলিবে, তার পর কি হইবে ভগবান জানেন। যে দিন হইতে আমার দেবতুল্য বাবা মারা গিয়াছেন, সেই হইতে আমি এত নিঃসহায় তা আগে বুঝি নাই; বুঝিলে হয়তো কোন উপায় করিতে পারিতাম। আমার যাহা হয় হইবে, এখন তোমার দাদারা দু'টি অন্ন হইতে বঞ্চিত না করেন তবেই ভাল। আমায় সকলে দেখিয়া অবাক হয়, বলে Dr. K. D. Ghose-এর ছেলে, এতটুকু দোকান করিল! তখন লজ্জিত হইলেও আমি বাধ্য হইয়া বলি, আমায় কেহ সাহায্য করেন না। আমার প্রণাম লও। আজ আসি। মা কেমন আছেন?

ইতি
প্রণত বারীন।

চিঠিখানি জরাজীর্ণ, কাগজ ফাটিয়া ফাটিয়া যাইতেছে। যে ছোট মাসীর উল্লেখ এই পত্রে আছে তিনি হইতেছেন ঋষি রাজনারায়ণের কনিষ্ঠা কন্যা, কবি লজ্জাবতী বসু। শেষ বয়সে আমারই কাছে আসিয়া কঠিন আমাশয়ে ভুগিয়া সেই ক্যালকাটা হোমিওপ্যাথিক কলেজ হসপিটালে মারা যান যেখানে অন্তিমশয্যায় দিদিও আজ পরলোকে গেলেন। পাটনায় ভীষণ প্লেগের মড়ক লাগে, তখন এই দোকান তুলিয়া দিয়া বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের আশ্রয়ে প্রথম চলিয়া যাই, আমার রাঙা মা থাকেন সেই মহামারীর মাঝে আমারই উঠতি দোকান আগলাইয়া। সেসন জজ রাসবিহারী বসুর পুত্র সুরেন পরে আসিয়া মাকে কলিকাতায় লইয়া যায়।

তাহারও আগেকার—বোধ হয় ঢাকার জীবন শেষ করিয়া আসিয়া বৈদ্যনাথ দেওঘর হইতে মেজ বৌদিদিকে লেখা এক পত্র বাহির হইয়াছে এই বিচিত্র সংগ্রহ হইতে; উপরে সম্বোধন নাই এক টুকরা কাগজ—

"তোমার পত্র পাইয়া বড় আনন্দিত হইলাম। এত রহস্য করিলে শেষ ফেরার হইয়া পড়িব। তোমার দংষ্ট্রায়ুধ সম্বরণ কর। শুনিয়া সুখী হইবে আমি আবার কবিতা দেবীর সাধনা আরম্ভ করিয়াছি; একটা প্রাণপণ বিটকেল চেষ্টা করিতেছি যাহাতে রবিভূতকে ঘাড় হইতে নামাইতে পারি। তোমার কবিতা (সংগ্রহ) ছাপাইবার Scheme-এর কি হইল? যদি ছাপাও তবে আমিও মাজিয়া ঘষিয়া সে সংগ্রহে গোটা পনের দিতে পারি। আমার নূতন রচনা দেখ: প্রথম উচ্ছ্বাস কোন বীণা-করধৃতা মনোমগ্না রূপসী; তোমারটির সহিত মিলাইয়া দেখিও, দেখি মেলে কিনা।

শষ্পাচিত বনানীর হরিত উরসে
কিশোর সুতাম্ররাগ কিশলয় দেশে
মম মনোপুরে তুমি স্বর্গ বিহগিনী
শুনিছ মুরলী তব কোকিলায় জিনি।
স্ফটিক লহরী রচি স্বচ্ছ ঝরঝরে
অমরা অঞ্চল খসা মুকুতা নিঝরে
সে গীত সে বিধূনিত অমৃতনিক্কণ
প্লাবিনিয়া বহেছিল হৃদিবৃন্দাবন!
সে পূরবী রাগময়ী; ধন্য রচয়িতা!
স্বর্ণতার ইন্দ্রধনু স্খলিত কবিতা
তোমারই উর্মিল গীতি হে মম অপ্সরা
চকোরিণী তুই দেবী উষারুণ পরা!
মৃণাল ললিতকর নাচায়ে সঘনে (রবি বল্পে)
বাজাও কি সপ্তস্বরা মধু ঝলরণে।

মেজদা, মনোমোহনের স্ত্রী মালতী দেবীর সহিত পরামর্শ হইয়াছিল তাঁহার নামে বাংলা সাহিত্যে —Golden Treasury Series সংগ্রহের ন্যায় এক কবিতা-সংগ্রহ সৃষ্টি করিতে হইবে। বউদিদি ছিলেন লাজুক, সহজে ভীতা আপনাতে সংকুচিতা মানুষ। আমার তাড়নায় ও উৎসাহে পড়িয়া তিনি একে একে "পদ্মার" কবি প্রমথনাথকে এবং এমনই বহু কবিকে পত্র লিখিলেন তাঁহাদের রচনা হইতে উদ্ধৃতি বা গ্রহণের অনুমতির জন্য। সকলেই অনুমতি অম্লান বদনে দিলেন। ইতিমধ্যে আমি ঢাকা ত্যাগ করিয়া বুকে "কৃষি ক্ষেত্রের" স্বপ্ন লইয়া বাংলা দেশ হইয়া দেওঘরে ফিরিলাম। এসব কথা আনুপূর্বিক [illegible] আমার আত্মকথায়" আছে সবিস্তারে লেখা। দিদির আকস্মিক মহাপ্রয়াণ তাহারই কতকগুলি প্রমাণ হাওয়ায় উড়াইয়া আজ দিয়া গেল কোলের কাছে ছড়াইয়া। এই অতীত স্মৃতির খড়কুটার সূত্র-গুলি খুঁজিয়া পাইয়া প্রকৃত রসাস্বাদ করিতে পারিবেন "আমার আত্মকথার" পাঠকরা।

আমার সেই আমুদে সাংবাদিক বড় মামা যোগেন বসুর হস্তাক্ষর আমারই মনি-অর্ডার কুপনের কোণে দু' ছত্র লিখিত পাওয়া গিয়াছে। কুপনে আমি বোধ হয় বরোদা হইতে দিদি ও মায়ের খরচ বাবদ ২৫্ টাকা পাঠাই। দিদির খরচের জন্য টাকা পাঠাইয়া লিখিয়াছিলাম,

পূজনীয় বড় মামা,

১৫্ বেশি ভুলক্রমে সরোজিনীকে পাঠানো হয়েছিল, তা যদি তার দার্জিলিং যাওয়ার খরচ হয়ে থাকে লিখবেন, বাকি ১৫্ মার জন্য পাঠাব; আর যদি খরচ না হয়ে থাকে তাহা লইবেন।

ইতি
প্রণত বারীন

ইহার উপরে তারছাড়াবে বড় মামা লিখিয়াছেন, "স্নেহের সরো—বারি ১৫্ টাকা তোমার মা-র হিসাবে পাঠাইয়া কুপনে এই লিখিয়াছে দেখিব।" এতদিন পরে বড় মামার হস্তাক্ষর পরকালের পর্দা সরাইয়া যেন সাক্ষাৎ সদাহাস্যময় মানুষটির রূপ-গন্ধস্পর্শ লইয়া হাজির হইল!

তাহার পর ১৮৯৪ সালে পঁচিশে আগষ্ট তারিখে শনিবারে বরোদা ক্যাম্প হইতে দিদিকে লিখিত অরবিন্দের এক পত্র পাওয়া গিয়াছে। পত্রটির সাহিত্যিক মূল্য অনেকখানি। তখনও তিনি পরবর্তী কালের পরম যোগী পুরুষে রূপান্তরিত হন নাই, দিদিও ছিলেন না কোন গভীর তত্ত্বভূমির মানুষ। বরোদার মহারাজার চাকুরিয়া অরবিন্দ ঘোষ সে পত্রে তাঁহার স্নেহপ্রতিমা ভগ্নীকে লিখিয়াছেন—

"My dear Saro,

I got your letter the day before yesterday. I have been trying hard to write to you for the last three weeks, but have hitherto failed. Today I am making a huge effort and hope to put the letter in the post before nightfall. As I am now invigorated by three days leave. I almost think I shall succeed.

It will be, I fear, quite impossible to come to you again so early as the Puja, though if I only could, I should start tomorrow. Neither my affairs, nor my finances will admit of it. Indeed it was a great mistake for me to go at all; for it has made Baroda quite intolerable to me. There is an old story about Judie Iscariot, which suit me down to the ground Judas, after betraying Christ, hanged himself and went to Hell where he was honoured with the hottest oven in the whole establishment. Here he must burn for ever and ever; but in [illegible] he had done one kind act [illegible] this they permitted him by mercy of God to cool himself

hour every Christmas on an iceberg in the North Pole. Now this has always seemed to me not mercy, but a peculiar refinement of cruelty. For how could Hell fail to be ten times more Hell to the poor wretch after the delicious coolness of his iceberg? I do not know for what enormous crime I have been condemned to Baroda but my case is just parallel. Since my pleasant sojourn with you at Baidyanath, Baroda seems a hundred times more Baroda.

I daresay Beno may write to you three or four days before he leaves England. But you must think yourself lucky if he does as much as that. Most likely the first you hear of him, will be a telegram from Calcutta. Certainly he has not written to me. I never expected and should be afraid to get a letter. It would be such a shocking surprise that I should certainly be able to do nothing but roll on the floor and gasp for breath for the next two or three hours. No, the favours of the Gods are too awful to be coveted. I daresay he will have energy enough to hand over your letter to Manu as they must be seeing each other almost daily. You must give Manu a little time before he answers you. He too is Binu's brother. Please let me have Beno's address as I don't know where to send a letter I have ready for him. Will you also let me have the name of Bari's English Composition Book and its compiler. I want such a book badly, as this will be useful for me not only in Bengali but in Guzrati. There are no convenient book like that here.

You say in your letter "all here are quite well"; yet in the very next sentence I read "Bari have an attack of fever". Do you mean then that Bari is nobody? Poor Bari! That he should be excluded from the list of human being, is only right and proper; but it is a little hard that he should be denied existence altogether. I hope it is only a slight attack. I am quite well. I have brought a fund of health with me from Bengal, which, I hope it will take me some time to exhaust; but I have just passed my twenty-second mile stone, August 15 last since my birth day and am beginning to get dreadfully old.

I infer from your letter that you are making great progress in English. I hope you will learn very quickly; I can then write to you quite what I want to say and just in the way I want to say it. I feel some difficulty in doing that now and I don't know whether you will understand it.

With love.
Your affectionate brother
AURO

P.S. If you want to understand their new orthography of my name, ask uncle.
A.

স্নেহের সরো,

গত পরশু আমি তোমার চিঠি পেয়েছি। তিন সপ্তাহ ধরে তোমায় লিখতে খুব চেষ্টা করে এখনও পর্যন্ত পেরে উঠিনি। আজ আমি অত্যন্ত চেষ্টা করছি একজন্য এবং আশা করি রাত্রির আগেই চিঠিটা ডাকে দিতে পারব। তিন সপ্তাহের ছুটিতে জোর পাওয়ায় মনে হচ্ছে আমার এ চেষ্টা সফল হবে।

পুজোর কাছাকাছি তোমার কাছে পৌঁছানো অসম্ভব বলে মনে হয়, অবশ্য পারলে আগামী কালই রওনা হতাম। কিন্তু আমার বিষয়কর্ম এবং টাকাকড়ির দিক থেকে অসুবিধা রয়েছে। অবশ্য আদৌ যাওয়াটা আমার পক্ষে বড়ই ভুল হয়েছে, কারণ এতে বরোদা আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে।

Judie Iscariot সম্বন্ধে একটা পুরানো গল্প আছে। ওটা আমার সঙ্গে সুন্দর খাপ খায়। খৃষ্টের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পর Judac গলায় দড়ি দিলেন এবং নরকে গিয়ে উঠলেন। সেখানে তাঁকে সমস্ত নরকমণ্ডলের মধ্যে সবচেয়ে গরম উনানটি দিয়ে সম্মানিত করা হল। এখানে সে চিরকালের জন্য জ্বলতে থাকবে। কিন্তু জীবনে সে একটা মাত্র দয়ার কাজ করেছিল। একজন্য তারা তাকে ঈশ্বরের কৃপায় উত্তর মেরুর তুষারপ্রবাহে প্রত্যেক খৃষ্টমাসে এক ঘণ্টার জন্য নিজেকে শীতল করতে অনুমতি দিল। কিন্তু এ ব্যাপারটা আমার কাছে কৃপার বদলে অদ্ভুত ধরণের সূক্ষ্ম নিষ্ঠুরতা বলে মনে হয়েছে। কারণ তুষারপ্রবাহের রমণীয় শীতলতা লাভের পর এই হতভাগ্যের পক্ষে নরক দশগুণ বেশী নরক না হয়ে কি আর পারত? আমি জানি না কি প্রবল পাপের জন্য আমি বরোদায় নির্বাসিত কিন্তু আমার ব্যাপারটা একেবারেই অনুরূপ। বৈদ্যনাথে তোমাদের সঙ্গে সুখে ভ্রমণের পর বরোদা নিতান্তই বরোদা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমার মনে হয় বিনো তোমাকে ইংল্যান্ড ছাড়ার ৩।৪ দিন আগে চিঠি দিতে পারে। কিন্তু অতখানি সে করলে তুমি নিশ্চয়ই নিজেকে ভাগ্য-

(শেষাংশ ২৬৪ পৃষ্ঠায়)

একটি তিতির

হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

একটি তিতির
.....স্মৃতির পলাশবনে
আজো ডানা মেলি উড়ে আসে বারবার :
পুরানো খাতার ছেঁড়া পাতাখানি যেন,
চকিত বাতাসে
সহসা খুলিয়া দেয়
মনের গহনে রুদ্ধ সে কোন দ্বার!
ডাকে সে তিতির
স্বপ্ন বীথির তলে?
ডাকে পিউ—পিয়া-পিয়া।
ইরাণী মেয়ের ক্ষীণ কটিতটে বুঝি
শাণ দেয়া ছুরি
ক্ষণেকে ঝলকি ওঠে!
তাতার ভূমির ধূসর বালুকা পথে
থমকি দাঁড়ায় শ্রান্ত পথিক-হিয়া।
পারসী মেয়ের চঞ্চল নীল চোখে
ছিল কি যে মায়া!
অন্ধ নয়ন মোর
উঠেছিল নাচি চাতক-তিয়াস-ভরা
করুণ মিনতি ভরে:
দ্রাক্ষাকুঞ্জে জ্যোৎছনা রাত্রি
তখনো হয়নি ভোর।
সোনালী সূর্য
আবির ঢেলেছে গায়ে,
ইরিজের ঘুম ভাঙেনি পাখীর গানে:
শাদা পাথরের কবরে পড়েছে ঝরে
রক্তগোলাপ!
ঘুমভাঙা রাঙা চোখে
ইরাকী কিশোরী চেয়েছে মুখের পানে।
বেদুইন মন
মানে নি কো কোন মানা,
পার হয়ে গেছে স্বপ্নের পারাবার।
ঝরা কেতকীর গন্ধে অলস আঁখি,
নারিকেল বনে—
বিরল বিজন পথে,
মিতালি চেয়েছে মালাবারি বালিকার।
তুষার মায়ায়
কুয়াসা নেমেছে যবে—
নীলপরীদের সিক্ত বসন-বাসে,
কোহিমার কোন নিরালা বনান্তরে
মনের ময়ূর
মেলিয়াছে তার ডানা!
মণিপুরী মেয়ে নূপুর ফেলেছে খুলে,
বর্মী মেয়ের
নরম রেশমি চুলে
শিথিল হয়েছে সোনার চিরুণীখানি;
বাবলার ফুল ঝরেছে সবুজ ঘাসে।
এলো যে জোয়ার
দুকূলে ছাপানো স্রোতে :
ঘাট হতে ঘাটে ভাসিল তরণীখানি।
সাতরঙা পালে লাগিল উজান হাওয়া,
রূপ হতে রূপে
খুঁজিয়া ফিরিনু একা;
অজানা রূপসী দিল কত হাতছানি!
ঝরেছে পলাশ
চৈত্র দিনের শেষে :
ভাষাহীন রক্ত বাতাসে মিলালো তার।
পুরানো খাতার ছিন্ন পাতায় আঁকা
নাই কোন ছবি।
স্মৃতির মানসপটে,
একটি তিতির ডানা মেলি বারবার
উড়ে আসে যেন—মাটির গন্ধ বাহি!
শারদ দিনের অলস প্রহর শেষে
গ্রাম পথে যেতে সহসা দেখিনু চেয়ে
তন্বী কিশোরী মাটি দিয়ে গড়া যেন,
চকিতা হরিণী
.....শ্রস্ত চরণে চলে
এলায়িত কেশ—আনমনা চাষী মেয়ে।
কি যে ছিল মায়া
দুটি আঁখি তারকায়!
নিরালা মনের রুদ্ধ দুয়ারে যেন
আজো শতবার হাতছানি দিয়ে যায়।

দেশবন্ধুর গৃহে

আমার কবিতা গ্রন্থ "পর্ণপুট" একখানি দেশবন্ধুকে উপহার দিতে গিয়েছিলাম—তাতেই তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়, নানা কর্মে ব্যস্ত বড় ব্যারিষ্টার সে বই পড়ে দেখবার সময় পাবেন আমি সে প্রত্যাশা করিনি। আমি তখন রংপুর জেলার একটি পল্লীগ্রামে শিক্ষকতা করতাম। একদিন ডাকযোগে একখানি 'সাগর সঙ্গীত' পেলাম। ভারত বিখ্যাত ব্যারিষ্টার লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্র চিত্তরঞ্জন দাশ আমার মতন দরিদ্র পল্লীবাসী শিক্ষককে তাঁর রাজ-সংস্করণের কাব্যগ্রন্থ সস্নেহে উপহার পাঠিয়েছেন দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম। অপ্রত্যাশিত গৌরবের সঙ্গে আনন্দও আমাকে স্তম্ভিত করল। সহকর্মীদের দেখালাম তাঁদের মনে কি ভাবোদয় হ'ল ঠিক বুঝলাম না। তখন আমার একটি মাত্র কবিতা তাঁর সম্পাদিত নারায়ণে প্রকাশিত হয়েছিল।

তারপর তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা অপর্ণার বিবাহে নিমন্ত্রণ করেন এবং পৃথক পত্রে লিখেছিলেন, "বিবাহে যোগদান করবার যদি সুবিধা হয় জানালে T. M. O করে পাথেয় পাঠিয়ে দেব। আমার অবশ্য সে সুযোগ হয়নি। অত দূরে থেকে আসা সম্ভব হয়নি।

প্রথম দেশবন্ধুর সান্ধ্য মজলিসে যাই অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী গুপ্তের সঙ্গে। কৃষ্ণবিহারী সেকালের একজন বিখ্যাত গদ্য প্রবন্ধ লেখক এবং সমালোচক। তিনি ভাগলপুর কলেজের ইংরাজির অধ্যাপক ছিলেন। দেশবন্ধু একটা মামলা উপলক্ষে কিছুদিন ভাগলপুরে ছিলেন। সেখানকার সান্ধ্য মজলিসের তিনি দেশবন্ধুর একজন সঙ্গী ছিলেন। আমি যে দিন প্রথম তাঁর কলিকাতার মজলিসে যোগ দিলাম—সেই দিনই তাঁর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হয়ে পড়লাম। এ মজলিসে আমার পরিচিত অনেককে দেখলাম—তাঁদের মধ্যে বন্ধুবর গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি উপস্থিত ছিলেন।

সন্ধ্যার সময় তাঁর গৃহে যাঁরা যেতেন তাঁদের সকলকে তাঁর গৃহে রাত্রির আহার সমাপন করে বাসায় ফিরতে হ'ত। তাঁর অনুরোধ এড়াবার কারো উপায় থাক্‌তো না। সঙ্গীত, সাহিত্যালোচনা ও রসালাপে রাত্রি অনেক বেশি হয়ে যেত।

কোন দিন সংকীর্তন কোন দিন তাঁর রচিত সঙ্গীত গাওয়া হ'ত। এই মজলিসেই উপীনদার (উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর) সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনিও দেশবন্ধুকে গান শোনাতেন। তাঁর রচিত একটি গান শুনতে আমাদের খুব ভালো লাগত। গানটির আরম্ভ হচ্ছে—

আজিকে সখা থেক না দূরে
উঠেছে ঝড় হৃদয় পুরে—ইত্যাদি।

দেশবন্ধু বলতেন—"সন্ধ্যার পর আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন—কোন কাজকর্মকে আমল দিই না। সন্ধ্যার পর এই বৈঠকখানা আর লক্ষ্মীর এলাকায় থাকে না,—সরস্বতীর এলাকায় আসে। আপনারা প্রতিদিন দয়া করে এসে এখানে ইষ্ট-গোষ্ঠী করবেন। ভালো করে বাঁচতে হ'লে এরূপ মেলামেশার খুবই প্রয়োজন। নইলে জীবনটা নীরস হয়ে যায়। জীবনে যদি সরসতাই না থাকলো—তবে তার ভার বহন ক'রে লাভ কি?

অনেকে খবরের কাগজ পড়ে সন্ধ্যাকালটা কাটায়। বেশি খবরের কাগজ পড়াকে আমি সময়ের অপব্যয় মনে করি। সকালে একবার চোখ বুলিয়ে নিই।

যারা বেশি খবরের কাগজ পড়ে—তারা Serious জিনিষ পড়তে পারে না—Serious কিছু ভাবতেও পারে না। প্রতিদিনকার খবরকে যারা জবর মনে করে—তারা নিত্যকালের কোন খবরই রাখে না।

রাত্রে আহারের যে আয়োজন হ'ত তা বড় বড় ভোজেও হয় না। সকল অভ্যাগতকেই শ্বেত পাথরের থালা, বাটি, ডিস, গেলাসে খাদ্য-পানীয় পরিবেশন করা হ'ত।

এই ব্যাপার ছিল ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশের ভবনে প্রতি রাত্রিতে। দশ জনকে নিয়ে রাত্রি ভোজন করতে তিনি ভালো বাসতেন। আহারান্তে প্রত্যেককে নিজের গাড়ীতে কিংবা গাড়ী ভাড়া করে বাড়ী পাঠিয়ে দিতেন। তখন ট্রাম বন্ধ হয়ে যেত।

তিনি বলতেন দশজনের সঙ্গে ভোগ না করলে ভোগটা রোগ হয়ে দাঁড়ায়। সুরেশ সমাজপতি আমাকে বলেছে সুবর্ণ গর্দভ। সুবর্ণ গর্দভ সোনা বয়, নিজে ভোগ করে না। আমি ত আকণ্ঠ ভোগ করছি, আমি কি করে সুবর্ণ গর্দভ হ'লাম?

সন্ধ্যার সময় সঙ্গীত ও সাহিত্যালোচনার মধ্যেও চেকের খাতা আসত। কে কে সাহায্য-প্রার্থী সে কথা তাঁর মনে থাকত—তিনি চেকের খাতায় অঙ্ক পাত করে সহি করে কারো কারো পকেটে এক একখানি চেক গুঁজে দিতেন। গোপন দান করাই তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। সান্ধ্য সভাতেও যতদূর সম্ভব দানগুপ্তি রক্ষা করতেন। দানে তিনি অলৌকিক আনন্দ পেতেন। সে সুযোগ অনেকেই, অনেক সাহিত্যিকও গ্রহণ করেছিলেন।

যে সকল সাহিত্যিক 'নারায়ণের' সংস্পর্শে এসেছিলেন—তাঁরা সকলেই অর্থসাহায্য পেয়েছিলেন। 'নারায়ণে' লেখার জন্য তিনি যে পরিমাণ দক্ষিণা দিতেন সে পরিমাণ দক্ষিণা আজ পর্যন্ত কেউ দেয়নি। দক্ষিণাটা তাঁর কাছে বড় কথা নয়, দাক্ষিণ্যটাই বড় কথা। লেখার নাম ক'রে সাহিত্যিকদের সাহায্য করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। এমন কি 'নারায়ণ' পত্রিকা প্রকাশই সাহিত্যিকদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে—এ কথা বললেও অসঙ্গত হয় না।

এক সন্ধ্যায় আমার 'ব্রজবেণু' তাঁকে উপহার দিলাম—জানতাম এই শ্রেণীর কবিতাই তাঁর প্রিয়। তিনি এ বইএর ছাপা কাগজ বিষয়-বস্তুর উপযোগী হয়নি, ব'লে মত প্রকাশ করলেন। বললেন—"কত ছেপেছ? ওগুলো বিতরণ ক'রে দাও—আমি এর রাজসংস্করণ করে দেব। তা ছাড়া নতুন কবিতার বই বার করবার আগে আমাকে জানাবে। ভালো ক'রে ছাপতে হবে। রাধাকে কি বৈষ্ণবীদের পোষাকে সাজাতে হয়? রাধা গোপিনী কিন্তু গোপরাজ-কন্যা। 'ব্রজবেণুর' শোভন সংস্করণের ভার থাকল আমার হাতে।"

তাঁর এই কথাতেই কৃতার্থ হয়ে গেলাম—এবং গৌরব অনুভব করলাম। এর বেশি কিছু করা আমার দ্বারা সম্ভব হয়নি।

আর একদিনের কথা সেদিন তাঁর সঙ্গে আমার যেটুকু সাহিত্যালোচনা হয়েছিল তা বাঙ্গালী কবিদের নিয়ে। সে দিন মজলিসে কবি অক্ষয়কুমার বড়াল উপস্থিত ছিলেন। তিনি এসেছিলেন দেশবন্ধুকে জানাতে যে, তাঁকে ডাক্তারের উপদেশে বহু ব্যয়সাপেক্ষ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বিদেশে গিয়ে থাকতে হবে। তিনি কথাচ্ছলে চণ্ডীদাসকেই বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং বিদ্যাপতিকে তাঁর চেয়ে নিকৃষ্ট কবি ব'লে মত প্রকাশ করলেন।

আমি তাতে আপত্তি করে বললাম—"চণ্ডীদাস যত বড় কবিই হোক—বিদ্যাপতি তাঁর চেয়ে নেহাৎ কম ন'ন। বিদ্যাপতির আলঙ্কারিকতার কথা ভাবুন।" আমার এ কথা শুনে তিনি আমার শিক্ষাদীক্ষার ও রসবোধের নিন্দা ক'রে বললেন—"তুমি রবীন্দ্রনাথের অন্ধ ভক্ত—তুমি ওসব কথা বুঝবে না। তুমি থাম, দাশ সাহেবের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছে।"

দেশবন্ধু আমাকে তাঁর তিরস্কার হ'তে রক্ষা করবার জন্য বললেন—"চণ্ডীদাসকে আমিও বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলে মনে করি। বিদ্যাপতিকে আমিও কবি হিসাবে ভক্তি করি, চণ্ডীদাসের কাছাকাছিই মনে করি—তবে তাঁর আলঙ্কারিকতার জন্য নয়—যে ভাবমাধুর্য চণ্ডীদাসে প্রচুর তা বিদ্যাপতিতেও কতকটা আছে বলেই। বিদ্যাপতির যদি আলঙ্কারিকতায় এতো লোভ না থাকত তবে তিনিও হয়ত চণ্ডীদাসের সমকক্ষ হ'তে পারতেন। চণ্ডীদাস বাংলার নিজস্ব কবি, বাংলার মাটির অন্তরের খাঁটি রস পাবে চণ্ডীদাসে। মিথিলার কবি সংস্কৃত কবিদের শিষ্য—সংস্কৃত কবির প্রভাব তাঁর উপর অনেক বেশি—চণ্ডীদাসের মৌলিকতা বিদ্যাপতিতে নেই।"

আমি বললাম—"তা যদি হয় তবে সৎ-কবিতার সংজ্ঞা নিয়েই মতভেদ হচ্ছে। আলঙ্কারিকতাকে আমি কবিতার একটা প্রধান অঙ্গ স্বরূপ মনে করি—আপনি তা কবিত্বের অন্তরায় বলছেন। কবি হিসাবে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দ দাসকে আমি খুব বড়ই মনে করি—ব্রহ্মানন্দ সহোদরের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক। চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদ এঁদের চেয়েও বড়, কিন্তু ব্রহ্মস্বাদ সহোদরের জন্য নয়, ব্রহ্মস্বাদের জন্য।

কবিতা একটা কলাবিদ্যা। প্রকৃত

মাধুর্যের সঙ্গে কলাচাতুর্যের মিলন থাকা উচিত বলে আমার বিশ্বাস। সে জন্য আমি মহাকবি কালিদাসকে প্রাচীন যুগের এবং রবীন্দ্রনাথকে বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মনে করি।"

দেশবন্ধু বললেন—কিন্তু কলাচাতুর্যের জন্য রসমাধুর্যকে ক্ষুণ্ণ করা শ্রেষ্ঠ কবির লক্ষণ নয়। অলঙ্কারাদি দেহের ভূষণ মাত্র—তার চেয়ে আত্মা, প্রাণ এমন কি দেহলাবণ্যও ঢের বেশি দামী,—ঢের বেশী যত্নের সামগ্রী। অলঙ্করণের দিকে বা কলাচাতুর্যের দিকে যারা খুব বেশি ঝোঁক দেয়—কবিতার ভাব ও রসের দিকে তাদের দৃষ্টি কম পড়ে। তুমি চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের কবিতাতেও অলঙ্কার যথেষ্ট পাবে, তবে তা নীরস শুষ্ক সোনা জহরতের অলঙ্কার নয়—তাজা বনফুলের অলঙ্কার—ময়ূর পাখার অলঙ্কার—গঙ্গা-মৃত্তিকার তিলক চিত্র ও চন্দন কস্তুরীর অঙ্গরাগ।

দেখ, তোমার মুখে এসব কথা আমার খুব অস্বাভাবিক, শোনাচ্ছে। তোমার 'পর্ণপুট' কবিতা আমি পড়েছি—সে দিন 'ব্রজবেণু' দিয়ে গিয়েছ তাও পড়লাম। তোমার 'পর্ণপুট' থেকে ঢাকা সাহিত্য সম্মেলনের অভিভাষণে আমি ৮ লাইন তুলেছি দেখেছ নিশ্চয়ই। তুমি নিজে বিদ্যাপতি গোবিন্দ দাসের অনুবর্তী কবি নও— চণ্ডীদাস লোচন দাসের অনুবর্তী তাইত দেখলাম তোমার কবিতায়। অক্ষয়বাবু তোমাকে রবীন্দ্রশিষ্য বললেন—আমি তোমার লেখায় রবিয়ানা কিছু ত পেলাম না। অক্ষয়বাবু বোধ হয় তোমার লেখা পড়েন নি।

এরপর রবীন্দ্র প্রসঙ্গ এলো—আলোচনা আমার পক্ষে বেশ প্রীতিকর নয়। দেশবন্ধু বললেন—রবীন্দ্রনাথের যে সকল কবিতায় কৃত্রিমতা খুব বেশি এবং বিজাতীয় ভাবের প্রাধান্য, সে সকল কবিতা আমার ভাল লাগে না। বড়াল কবি এতে সায় দিলেন।

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর কটকী চটি পায়ে দিয়ে প্রত্যেক সন্ধ্যায় জোড়াসাঁকো থেকে দেশবন্ধুর আলয়ে আসতেন। তিনি ছিলেন নীরব শ্রোতা—একটি কথাও বলতেন না। রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতিকূল আলোচনায় সুধীবাবুর উপস্থিতি কোন সঙ্কোচ বা কুণ্ঠার সৃষ্টি করত না।

যে দিনের কথা আমি বলছি, সে দিন দেশবন্ধু একখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে অক্ষয়বাবু ও আমাকে তাতে রাত্রি ১২টার সময় উঠিয়ে দিলেন। পথে অক্ষয়বাবু বললেন—তোমরা মনে কর আমি রবীন্দ্রনাথের কবিতার নিন্দাই করি। এ ধারণা তোমাদের ভুল। জান, আমি রবীন্দ্রনাথের উপর একটা সনেট লিখেছি, রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা বেশ ভালো, সেগুলো টিকে যাবে। এই বলে তিনি কয়েকটির নাম করলেন। সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যে কবিতাগুলোর সুখ্যাতি বেরিয়েছিল—দেখলাম ঠিক সেইগুলোরই উল্লেখ করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তাঁর পরবর্তী কবিদের সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন—পরবর্তী কবিদের মধ্যে নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ও গিরিজানাথ মুখুয্যের কবিতা আমার ভালো লাগে। তা ছাড়া নিত্যকৃষ্ণ বসুর কবিতাগুলি চমৎকার। সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দশিল্পী মাত্র, করুণানিধান ভালো কবি। দাশ সাহেব ভুজঙ্গধরের কবিতার খুব সুখ্যাতি করেন বটে, ভুজঙ্গধরের একটা দোষ কি জান? সে বড় বেশি বকে। যেটা দশ লাইনে বলা যায়—সেটা ৫০ লাইনে বলে। তা ছাড়া বিজয় মজুমদার ছন্দের কসরৎ ক'রে শক্তির অপব্যয় করে। তবু তার শক্তি আমি স্বীকার করি। তার কতকগুলো কবিতা বেশ উৎরেছে। তোমরা জান না অমৃতলাল বসুর অনেক ভালো কবিতা আছে—তবে তিনিও বকেন বড় বেশি। বলেন ঠাকুরের সনেটগুলো পড়েছ? চমৎকার—আসল সনেট।

ভালো কবি হ'তে চাওতো কারো অনুকরণ কোরো না। তোমাকে একটা কথা বলব ভাবছিলাম পাছে দাশ সাহেব ক্ষুণ্ণ হ'ন বলে বলিনি।—ভাব গ্রহণ কোরো, কিন্তু পদাবলীর অনুকরণে রাধাশ্যামের নাম নিয়ে বৈষ্ণব কবিতা লিখোনা। ওসব আর চলবে না। প্রেমের কবিতা রাধাশ্যামের নামে চালানোর প্রয়োজন কি?"

অন্য একদিনের কথা বলি। সেদিন কবি দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল। এই একটি কবি, যাঁর কবিতার ভক্ত ছিল নবীন প্রবীণ সাহিত্যিকদের প্রত্যেকেই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমারও তাঁর কবিতার ভক্ত ছিলেন। অথচ এই কবি আজ বিস্মৃতপ্রায়।

দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতার প্রতি দেশবন্ধুর গভীর শ্রদ্ধা ছিল—তিনি বলতেন—দেবেন্দ্রনাথই রবীন্দ্র যুগে স্বতন্ত্র ভাবধারা ও রচনা-ভঙ্গীর প্রবর্তক। সর্বপ্রকার কৃত্রিমতার বিরোধী এই কবি দেশব্যাপী দুঃখবাদের মধ্যে আনন্দবাদের প্রবর্তন করেছেন—তাঁর উদ্দাম ভাবোল্লাস সর্ববন্ধন ছেদন করে সর্বভূষণ ত্যাগ করে প্রেমানন্দে যেন ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়েছে।

আমি বললাম—রবীন্দ্রনাথ তাঁর সোনার তরী 'তদীয় ভক্তের প্রীতি উপহার' বলে দেবেন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছেন। দেশবন্ধু উল্লাসের সঙ্গে বললেন—তাত আমি লক্ষ্য করিনি! তবেই দেখ—আমি ভুল করিনি। তুমি পাকা দলিল পেশ করলে। উভয় কবির মধ্যে কবিতায় অভিনন্দনের বিনিময়ও হয়েছিল। চিত্তরঞ্জন নিজে ছিলেন জীবনে সকল ক্ষেত্রেই আত্মভোলা পুরুষ,—তিনি কবিতাতেও এই আত্মভোলা ভাবটি ভাল বাসতেন।

তিনি দেশমাতার সেবা করেছিলেন জীবন দিয়ে—গান বা কবিতার মধ্যে দিয়ে তিনি নিজে দেশপ্রেম প্রচার করেন নি।

তিনি রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদের দেশপ্রেমমূলক গান ও কবিতাগুলিকে ভাল বাসতেন।

নব্যযুগের কবিদের মধ্যে তিনি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরীর কবিতার খুব পক্ষপাতী ছিলেন। 'নারায়ণের' জন্য আর এক নব্যযুগের কবির কবিতা তিনি চেয়েছিলেন—তিনি যে কবিতা দিয়েছিলেন—সে কবিতা তাঁর নিজস্ব ভাবাদর্শের অনুবর্তী ছিল না। তিনি কবিতা ফেরৎ দিয়েছিলেন কিন্তু কবিকে যথেষ্ট দাক্ষিণ্য দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন।

বাংলা কবিতার বিচারে তিনি বাংলা দেশের নিজস্ব সংস্কৃতি, বাংলার নিজস্ব প্রকৃতি, বাংলার চিরন্তন রচনা-ভঙ্গীর সঙ্গে যোগাযোগ আছে কিনা—তাই দেখতেন। বাংলা কবিতায় বিজাতীয় ভাবধারা বা বিদেশীয় রচনাভঙ্গী দেখলে বলতেন—বাংলা হবেকে ইংরেজি না ফরাসী। কবিতার অস্পষ্টতা, দুর্বোধ্যতা বা ভাসা ভাসা আবছায়া-রোগের ভাব সহ্য করতে

(শেষাংশ ২৫৮ পৃষ্ঠায়)

দিনশেষে — তুলসীদাস সিংহ

ক্লিওপেট্রা

বনফুল

শ্রীসুরেশ মল্লিকের ভাড়াটে বাড়ীর অভ্যন্তর। সাধারণভাবে সজ্জিত। সুরেশ মল্লিক আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বয়স ত্রিশ। পরিধানে আড়-ময়লা সাহেবী পোষাক। মুখের ভাব ক্লান্ত। হাতে যে চৌকো চামড়ার ব্যাগটি ছিল সেটি টেবিলের উপর রাখিয়া এদিক-ওদিক চাহিলেন। কাছে-পিঠে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল। ভিতরের দিকে মুখ ফিরাইয়া ডাক দিলেন।

সুরেশ। বীণু, বীণু, বীণা। [অর্ধস্বগত] আজও আবার কোথাও বেরিয়েছে না কি?

[ভৃত্য হারাধন প্রবেশ করিল]

হারাধন। মা বাইরে গেছেন। চাবিটা রেখে গেছেন। জল-খাবার ঢাকা দেওয়া আছে।

সুরেশ। কোথা গেছেন?

হারাধন। সিনেমা বোধহয়। ঠিক জানি না। কনকবাবু দুপুরে এসেছিলেন।

সুরেশ। ও!

[কোটটা খুলিয়া আলনায় রাখিলেন]

হারাধন। চায়ের জল চড়াব?

সুরেশ। চড়িয়ে দে। বীণু কিছু ব'লে যায়নি তোকে?

হারাধন। আলুর দম করতে ব'লে গেছেন। আলু কিন্তু নেই।

সুরেশ। সে কথা তাকে বলতে পারনি?

হারাধন। বলেছিলুম। তিনি বললেন, আমার কাছে পয়সা নেই বাবুর কাছে চেয়ে নিও।

[সুরেশ চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন এবং হেঁট হইয়া জুতার ফিতা খুলিতে লাগিলেন। হারাধন চটি জুতো আগাইয়া দিল]

সুরেশ। আলুর জন্যে ক'পয়সা দিতে হবে?

হারাধন। চার আনা।

সুরেশ। আর কিছু আনতে হবে?

হারাধন। না।

[সুরেশ মাণিব্যাগ বাহির করিয়া পয়সা দিলেন]

সুরেশ। আমার খাবারটা ঠিক ক'রে দিয়ে তারপর বাজার যা।

হারাধন। খাবার কি এখানেই আনব?

[সুরেশের মেজাজ ক্রমশঃই খারাপের দিকে যাইতেছিল, তিনি অকারণে ধমকাইয়া উঠিলেন]

সুরেশ। এখানে কি আমি খাই!

[হারাধন চলিয়া গেল। বাহিরের দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ হইল। সুরেশ গিয়া কপাট খুলিয়া দিলেন। ফতুয়া-পরা একটি লোক প্রবেশ করিল]

লোকটি। মুদির দোকানের বিল এনেছি বাবু। মা এই সময় আসতে বলেছিলেন।

সুরেশ। তিনি এখন বাড়ী নেই।

লোকটি। কখন আসব তাহলে?

সুরেশ। কাল সকালে এস।

[নমস্কার করিয়া লোকটি চলিয়া গেল। সুরেশ কপাটটা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং যদিও ঘরে কেহ ছিল না তবু কথা বলিতে লাগিলেন।]

আশ্চর্য মেয়ে দেখছি বীণু। রোজই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবে। রেডিও কিনতে চাইলে, ধার-ধোর ক'রে তা-ও কিনে দিলাম। তবু বাড়ীতে মন বসছে না। টো-টো ক'রে ঘুরে বেড়াতে ভালও লাগে। আশ্চর্য!

[ঘরের এক কোণে রেডিওটা ছিল, সেটার দিকে সুরেশ ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর কি মনে করিয়া সেটা খুলিয়া দিলেন। সরোদে একটা চটুল গৎ বাজিতে লাগিল। সঙ্গীতের আবহাওয়ায় কামিজটা খুলিয়া তিনি পাশের ঘরে গেলেন। একটু পরেই ফিরিলেন, তখন আর পরনে প্যান্ট নাই, লুংগি। দুয়ারে আবার কড়া নড়িল। কপাট খুলিয়া দিতেই প্রবেশ করিল কনক, সুরেশের সমবয়সী এবং বন্ধু। সুশ্রী চেহারা। মাথার চুল উস্কো-খুস্কো]

সুরেশ। সিনেমা শেষ হল? বীণা কই?

কনক। সিনেমা যাইনি। রেস খেলতে গিয়েছিলাম। হেরে ভূত হয়ে গেছি। কিছু ধার দিতে পারিস। একেবারে পেনিলেস আজ—

সুরেশ। আমারও ওই অবস্থা আমার যা কিছু জমানো টাকা ছিল তা বীণুর দুল কিনতে আর ওই রেডিও কিনতে শেষ হয়ে গেছে। রেডিওর সব দামটাও দিতে পারিনি এখনও। তোমার তবু চাকরি আছে আমার তাও নেই। কিছুতেই একটা চাকরী জোটাতে পাচ্ছি না। তুমি পাঁচ শ' টাকা মাইনে পাও তবু তোমার একার কুলোচ্ছে না!

কনক। কুলোচ্ছে কই। খরচ যে অনেক। তোমার বীণাই তো আমাকে আরও ফতুর করলে। আজ থিয়েটার কাল সিনেমা পরশু হোটেল—লেগেই আছে একটা না একটা। তুমি ওকে সামলে রাখ ভাই, আমি আর পেরে উঠছি না।

সুরেশ। কুকুর হলে বেঁধে রাখতাম। কিন্তু ও মানুষ, শুধু মানুষ নয়, বিংশ শতাব্দীর আলোক-প্রাপ্তা নারী। ওর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবার শক্তি আমার নেই। এদিকে আমার গৃহস্থালীও অচল হয়ে উঠেছে—কিন্তু কি করি বল?

কনক। তুমি ওকে বিয়ে করতে চাইছ কেন বল তো। ও রকম বোহিমিয়ান মেয়েকে নিয়ে সংসার করা চলে না, হৈ-হৈ করা চলে।

সুরেশ। ভালবাসি যে—

কনক। [মৃদু হাসিয়া] ও, বিয়ে না করলে বুঝি ভালবাসা যায় না?

সুরেশ। [অধীরভাবে] দেখ, ও সব তর্ক অনেক হয়েছে। আমি ওকে বিয়েই করব ঠিক করেছি। [সহসা রুক্ষকণ্ঠে] তুমি ওকে প্রশ্রয় দিচ্ছ কেন!

(শেষাংশ ২৬০ পৃষ্ঠায়)

রতন ঠাকুরঝি

শ্রী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ধারণাটা একটু পরেই বদলালো বটে, তবে প্রথমে যে মনে করেছিলাম তিনজনই এক পরিবারভুক্ত তার যথেষ্ট কারণও ছিল। আমি কুলির মাথায় মোটঘাট দিয়ে যখন পৌঁছুলাম, মেয়েটি তখন বৃদ্ধার পিঠে তেল মাখিয়ে দিচ্ছিল। পাশে আর একটি মেয়ে, এর চেয়ে একটু বড়, বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে, চেয়ারে বসে একটি ছোট শিশুকে কোলে নিয়ে ফিডিং বটলে দুধ খাওয়াচ্ছিল; তিনজনকে শাশুড়ী, বউ আর ননদ বলে ধ'রে নেওয়া যায়।

আমি হঠাৎ গিয়ে পড়তে মেয়েটি বৃদ্ধার কাপড়টা তার মাথা পর্যন্ত তুলে দিয়ে একটু আমার দিকে চাইল। তার অবশ্য প্রয়োজন ছিল না। খেয়াঘাটের ওয়েটিং রুম। ফার্স্ট ক্লাশ-সেকেণ্ড ক্লাশ, মহিলা-পুরুষ, সবার জন্য ঐ একটি; আমি মোটগুলো রাখিয়ে দিয়ে কুলিটাকে দিয়েই আরাম চেয়ারটা নদীর দিকের বারান্দাটায় দরজার কাছে রাখিয়ে গা এলিয়ে দিলাম, যাতে ভেতরে কি হচ্ছে এমনি দেখা না যায়, অথচ একটু চেষ্টা করলেই লগেজগুলোর ওপর নজর পড়ে।

কথাগুলো অবশ্য মোটামুটি শোনা যেতে লাগল, সেটা আমার দিক থেকে যেমন চেষ্টাকৃত নয়, তেমনি বক্তৃদেরও এমন কিছু চেষ্টা ছিল না যাতে না কানে যায় আমার। পড়ব, এমন কিছু নেই হাতে, একটা সিগারেট ধরিয়ে বর্ষার ভরা গাঙের ওপর দৃষ্টি ফেলে পড়ে রইলাম।—

"কে করে মা আজকাল? নিজের পেটের মেয়েই বড় করছে...তুমি কার বউ কার মেয়ে—একটুখানির জন্যে পথে দেখা...",

বৃদ্ধার গলা নিশ্চয়; বয়সের জন্য কাঁপা, তার ওপর আবেগে আরও খানিকটা কেঁপে গেছে। উত্তর হোল—"ধরে নিলেই হোল পেটের মেয়ে ব'লে জ্যাঠাইমা; পেট থেকেই পড়তে হবে তার মানে কি।"

"ধরে নিলেই হয় মা? ভাগ্যি চাই, নৈলে... ঐ—ঐখানটায় একটু বেশি ক'রে চু'চে দাও তো মা, দিচ্ছই যখন—পূর্ণিমে গেল তো, ব্যথাটা আউড়েছে...কী মিষ্টি হাতটি মা তোমার—ধুলোমুঠি ধরতে সোনামুঠি ধরো ঐ হাতে..."

মেয়েটি বিব্রত হয়ে পড়েছে, এবার অপরার দ্বারস্থ হোল, হেসেই বলল—"কি করি বলতো ভাই? অবিশ্যি বুড়ো মানুষ, ওঁর আশীর্বাদ মাথায় করে নেওয়ার জিনিস, কিন্তু তার জন্যে কিছু করাও তো চাই..."

"ওমা, করনি?—করছ না? আমিও প্রাণ-ভরে আশীর্বাদ করছি—গাড়ি ফেল করে কী আতান্তরে পড়তুম তুমি না থাকলে..."

"দেখো বিচার—দুজনে একদিকে হয়ে গেলেন!...তার চেয়ে ঐ সময়টা রেল-জাহাজ কোম্পানীকে শাপমন্যি দিলে তো কাজ হয়—আমারও গায়ের জ্বালা মেটে কতকটা..."

শেষের কথাগুলো তিনজনের হাসির মধ্যে মিলিয়ে গেল, অবশ্য অনেকটা সংযত হাসি।

বৃদ্ধা বললেন—"যে যার কর্মফল পাবেই, আমি মাঝখান থেকে পাপ কুড়ুই কেন মা এই গঙ্গাতীরে, মহাতীর্থ? তার চেয়ে তোমায় মন ভরে আশীর্বাদ করি মা—আমার মাথায় যত চুল তত পরমায়ু হোক..."

"ও জ্যাঠাইমা, তোমার মাথায় আর চুল কোথায়!! তাহলে তো দেখছি..."

এবার দুজনের কণ্ঠে যে হাসি উঠল—অবশ্য চাপাই তাতে শেষের কথাগুলো একেবারে শোনা গেল না। আমাকেও মুখটা ভালো করেই ঘুরিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে হোল, পাশের যুবকটিকেও ভালো ক'রে সিনেমা কাগজটির আশ্রয় গ্রহণ করতে হোল।

হাসতে হোল একটু বৃদ্ধাকেও, তবে তখনি সামলে নিয়ে একটু রাগের ভাব টেনে এনে বললেন—"বালাই, ষাট! কথা দেখো মেয়ের!... যে ক'গাছাই চুল থাক—কিছু না হোলেও একশ'র তো ওপরেই হবে—তত বছর পরমায়ু নিয়ে, পাকা চুলে সিঁদুর পরে..."

হাসির ঝোঁক আরম্ভ হয়ে গেছে। মেয়েটি আবার শিউরে উঠে বলল—"ও বাবা! ...ততদিন আমার পাকা চুল একটিও থাকবে নাকি জ্যাঠাইমা সে..."

হাসির দমকটা সামলে নিয়ে বলল—"থাক; সে যা হবার হবে, এবার আপনার স্নানের ব্যবস্থাটা করে দিই।"

"কি ব্যবস্থা করবি? একটা ডুব দিয়ে আসতে পারব না? এমন গঙ্গা, লোভ হয়।"

"গঙ্গারও লোভ আছে জ্যাঠাইমা, বললেন—এমন পাকা বুড়িটি। ...প্ল্যাটফর্মের নীচে থেকেই ঢালু নেমে গেছে, আর উঠে আসতে হবে না। ...আমি করছি ব্যবস্থা।"

"গঙ্গা থেকে তুলিয়ে আনাবি জল?"

"ক্ষ্যামা দাও। ঐ গিরিমাটি গোলার ম[illegible]ন নতুন জল! সদ্য নিমোনিয়া। আমি করছি ব্যবস্থা, মা গঙ্গারও অভাব হবে না, আপনি ব'সে ব'সে দেখুন না।"

বেরিয়ে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটু কুণ্ঠা, তখনই সেটা কাটিয়ে ডাকল—'ওগো শুনছো?"

(শেষাংশ ২৬২ পৃষ্ঠায়)

সুনিপুণ
স্বর্ণশিল্পী
ও
মণিকার
গিনি
ম্যানসন
জুয়েলার্স
প্রধান কার্যালয়ঃ—
১২৬, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা—১৯
গ্রাম ঃ "গিনিম্যান" ঃ ঃ ফোন ঃ ৪৬-১৪৭২
শাখাসমূহ ঃ
জগুবাবুর বাজার, ভবানীপুর, কলিকাতা—২০
১নং হিন্দুস্থান মার্ট, বালীগঞ্জ, কলিকাতা—২৯
ফোন ঃ ৪৬—১৪২৫

পূজার
সাদর
সম্ভাষণ
গ্রহণ
করুন
ন্যাশনাল কারবন কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) লিঃ, বোম্বাই • কলিকাতা • মাদ্রাজ • নয়াদিল্লী

চার্বাক

নিতান্ত মূঢ় ব্যক্তিতেও জানে যে মানুষ দেহসর্বস্ব নয়।

গৌতম

তবে 'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ' এই উক্তির তাৎপর্য কি?

চার্বাক

তুলাদণ্ডের অসমান দিকটায় একটু 'পাষাণ' দিতে হয়—দুটো দিককে সমান করে নেবার উদ্দেশ্যে।

গৌতম

সে তো নিত্য দেখতে পাই পণ্যশালায়।

চার্বাক

'ভস্মীভূতস্য দেহস্য' উক্তি সেই পাষাণ খণ্ড, চাপিয়ে দিয়েছি জীবন তুলার অসমান দিকে।

গৌতম

তোমার ভাষ্য সূত্রের মতোই দুর্বোধ্য।

চার্বাক

তোমাদের মতো হাড় খট্‌খটে মুনি-ঋষিরা জীবন তুলার আত্মার দিকটায় এমন ভার চাপিয়েছে যে দেহের পাল্লাটা উঁচু হয়ে গিয়ে ঠেকেছে নিরর্থকতার শূন্যে।

গৌতম

তাই—

চার্বাক

তাই আমাকে কিছু ঝোঁক দিয়ে দেহের গৌরব প্রচার করতে হয়েছে।

গৌতম

শুধু প্রচারে গুরুত্ব বাড়বে কি?

চার্বাক

অবশ্যই বেড়েছে নইলে তোমার মতো জ্ঞানী ব্যক্তি কেন তর্কের আসরে নামতে যাবে? কেন তোমাদের তারস্বরে প্রতিবাদ করতে হচ্ছে যে দেহটা কিছু নয়।

গৌতম

এটুকু ভুল। দেহটা কিছু নয় আমরা কখনো বলিনে, আমরা বলি যে দেহ ও দেহাতীতের মধ্যে গৌণ মুখ্যের সম্বন্ধ।

চার্বাক

তোমাদের মতে দেহটা গৌণ।

গৌতম

আর দেহাতীত মুখ্য।

চার্বাক

প্রমাণ?

গৌতম

দেহটা ভস্মীভূত হলে সমূলে লোপ পায়।

চার্বাক

থাকে কী?

গৌতম

দেহাতীত।

চার্বাক

দেহ বাদ দিয়ে দেহাতীত কল্পনা করতে পারো?

গৌতম

কেন নয়?

চার্বাক

এই কারণে যে তোমরা সর্বদা সেই অনির্দিষ্ট পদার্থটাকে দেহের সঙ্গে জড়িয়ে উল্লেখ করো—ব'লে থাকো দেহাতীত। এখন দেহটাকে বাদ দিলে থাকে 'অতীত' অর্থাৎ এমন একটা পদার্থ যা তোমাদের ধারণার অতীত কিনা অলীক।

গৌতম

কে বল্‌লে ধারণার অতীত?

চার্বাক

কী তার নাম?

গৌতম

আত্মা।

চার্বাক

দেহ ধ্বংস হ'লে কি ক'রে থাকে আত্মা?

গৌতম

বাসা ধ্বংস হলেই কি বাসী ধ্বংস হয়?

চার্বাক

এখানে বাসা ও বাসী যে এক, রেশমকীট ও তার গুটির মতো।

গৌতম

ঐখানেই তোমার সঙ্গে আমাদের ভেদ।

চার্বাক

এ ভেদ তোমার আমার মধ্যে নয়, বাস্তব অবাস্তবের মধ্যে।

গৌতম

আত্মা অবশ্যই অবাস্তব, কারণ তা বস্তুগত নয়।

চার্বাক

বস্তুগত নয় এবং ধারণাগতও নয়।

গৌতম

তোমার ধারণাগত না হ'তে পারে।

চার্বাক

বেশ তো আমার ধারণাগত ক'রে তোল না

গৌতম

তা দেবতাদেরও অসাধ্য।

চার্বাক

চোরের সাক্ষী শৌণ্ডিক।

গৌতম

কি রকম?

চার্বাক

অবাস্তব আত্মার বোধয়িতা অবাস্তব দেবতা।

গৌতম

তুমি নিতান্তই বস্তুসর্বস্ব—তার অতিরিক্ত কিছু কি নেই তোমার ধারণায়?

চার্বাক

অবশ্যই আছে—তাকেই তো বলি অবাস্তব

গৌতম

তুমি দেহের উপরে সর্বস্ব পণ ক'রে ব'সে আছ, তোমার দেউলে হ'তে বিলম্ব নেই

চার্বাক

তবু তো আমার সম্মুখে পণ্য কিছু আছে তুমি যে একেবারে শূন্যে লাফ মেরেছ।

গৌতম

কি রকম?

চার্বাক

যা নেই তার উপরে ভরসা ক'রে যা আছে তা হারালে।

গৌতম

কি আছে?

চার্বাক

দেহ।

গৌতম

কতক্ষণ আছে?

চার্বাক

যতক্ষণ থাকে।

গৌতম

বড় ক্ষণস্থায়ী।

চার্বাক

তুমিই কোন্ চিরস্থায়ী?

গৌতম

আত্মারূপে আমি অমর।

চার্বাক

সেই অনিশ্চিত অনির্দিষ্ট অবাস্তব অলীক অমরত্বের উপরে আমার এতটুকু ভরসা নেই।

গৌতম

দেহবাদীর এই তো স্বাভাবিক শোচনীয় পরিণাম।

চার্বাক

আর দেহাতীতবাদীর পরিণামটাই বা এমন কি প্রার্থনীয়? দেহটাকে জীর্ণ করতে করতে শুষ্ক হরতকির কোঠায় এনে ফেলেছ।

গৌতম

পরিণামে তোমারও ক'খানা হাড়ের বেশি থাকবে না।

চার্বাক

সেই হাড় ক'খানা কি জানো? তোমার দেহাতীতের মুখের উপরে নিক্ষিপ্ত পাশা।

গৌতম

কি তার পণ?

চার্বাক

দেহ পণ।

গৌতম

দেহ তো ধ্বংস হ'ল।

চার্বাক

সেই কথাই তো সগৌরবে প্রচার করে শুষ্ক অট্টহাসে।

গৌতম

জয়টা হ'ল কার? দেহের না দেহাতীতের।

চার্বাক

দেহের।

গৌতম

কি ভাবে?

চার্বাক

দেহাস্থি নীরবে বিদ্রূপ করে দেহাতীতকে, বলে এইখানে সব শেষ।

গৌতম

তার বিদ্রূপের অর্থ ভুল বুঝেছ বলে ভেবেছিলাম সব শেষ কিন্তু এখন দেখছি সব শেষ হ'ল না।

চার্বাক

আমরা কি অলীক তর্ক করছি না?

গৌতম

হাঁ, প্রায় দেহাতীতের কোঠায় এসে পৌঁছেছি।

চার্বাক

অতএব ফিরে যাওয়া যাক।

গৌতম

উত্তম।

চার্বাক

দেহকে, জগৎকে অবহেলা ক'রো না, অসীম তার রহস্য, অনন্ত তার সৌন্দর্য, অমোঘ তার আকর্ষণ।

গৌতম

ঐ আকর্ষণটুকু কাটলে দেখতে পাবে আত্মার, জগদাতীতের পরমতন ঐশ্বর্য, চার্বাক শেষ নাই তার শেষ নাই।

চার্বাক

এ কথা দেহসৌন্দর্য সম্বন্ধেও প্রযোজ্য—সৌন্দর্য মাত্রেই কি অসীম নয়?

গৌতম

দেহ ধ্বংসের পরেও?

চার্বাক

পুষ্প থেকে পুষ্পান্তরে যেমন বিচরণ করে ভ্রমর—সৌন্দর্যের তেমনি বিচরণ দেহ থেকে দেহান্তরে। দেহ ধ্বংসশীল, সৌন্দর্য অমর।

গৌতম

তার মানে প্রকারান্তরে তুমি অমরত্ব স্বীকার করছ?

চার্বাক

সে কেবল দেহের সম্পর্কে, জগতের সম্পর্কে।

গৌতম

এ বড় বিচিত্র! তুমি সৌন্দর্য মানো, কল্যাণ মানো, শুভ মানো। এ সমস্ত কি দেহাতীত গুণ নয়? এ সমস্ত কি মনকে আশ্রয় করে নাই?

চার্বাক

কিন্তু মন বলে যদি কিছু থাকে তবে সে তো রয়েছে দেহকে আশ্রয় ক'রে, দেহ না থাকলে—

গৌতম

চার্বাক, তুমি জ্ঞানী হ'য়ে অজ্ঞানের অভিনয় করছ। মন যদি না থাকে তবে ভোগ করছে কে? তুমি যখন পুষ্পের গন্ধ গ্রহণ করছ, কিম্বা সূর্যাস্তের সৌন্দর্য দর্শন করছ, তা উপভোগ করছে কে? তোমার নাসিকা ও চক্ষু কি?

চার্বাক

অবশ্যই নয়, উপভোক্তা আমার মন।

গৌতম

তবে?

চার্বাক

'তবে' তো ওঠে না। আমি সেই থেকে বোঝাতে চেষ্টা করছি মন আছে, ধীশক্তি আছে, খুব সম্ভব আত্মা বলেও কিছু একটা আছে—কিন্তু এ সমস্তই দেহের সম্পর্কে মাত্র আছে, তদতিরিক্তভাবে আছে কিনা জানিনে, জানবার প্রয়োজনও অনুভব করিনে।

গৌতম

আচ্ছা ধরো—ভূপৃষ্ঠ থেকে মানবজাতি লোপ পেল, তখন কি পুষ্পগন্ধ থাকবে না, চন্দ্রোদয় সূর্যাস্ত থাকবে না।

চার্বাক

থাকবে, কিন্তু সৌন্দর্য ও সৌগন্ধ থাকবে না।

গৌতম

উপভোক্তা মনের অভাবে তবেই মনটা অপরিহার্য হ'য়ে পড়ে।

চার্বাক

দেহটা অপরিহার্য হ'য়ে পড়ে ব'লে। দেখো গৌতম, দেহ ও জগৎকে অস্বীকৃতির বা গৌণপদ দানের ফলে মানুষ আজো পরমপদ লাভ করতে পারছে না।

গৌতম

যে-সব অসভ্য জাতি দেহ ও জগৎটাকেই প্রাধান্য দেয় তারাই বা কোন্ পরমপদ লাভ করেছে?

চার্বাক

তারাও দেহ ও জগতের যথার্থ মর্যাদা দেয় না; তাদের চোখে এ সব জড়পিণ্ড মাত্র।

গৌতম

সত্যই কি এ সব জড়পিণ্ড নয়?

চার্বাক

জড়ে যখন অজড়ের আরোপ হয় তখন তার সীমা গিয়ে চৈতন্যলোক স্পর্শ করে।

গৌতম

চৈতন্যলোক! এ কথা তোমার মুখে নূতন বটে।

চার্বাক

চৈতন্যলোককে আমি অস্বীকার করিনে, সৌন্দর্য, শুভ, কল্যাণ এ সব তো চৈতন্যলোকের গুণ।

গৌতম

তবে তর্কের বেলায় উল্টোপাল্টা কথা বলো কেন?

চার্বাক

তোমরা কেবলই চৈতন্যলোক মানো, আর কিছু মানতে চাও না, তাই আমি দেহটার উপরে কিছু ঝোঁক দিয়ে কথা বলে থাকি, চৈতন্য ও দেহের গুরুত্বের হেরফের ঘুচিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে।

গৌতম

আর আমরা দেহকে অস্বীকার না ক'রেও চৈতন্যলোকের উপরে কেন গুরুত্ব আরোপ করি জানো?

চার্বাক

বলো।

গৌতম

অতি প্রত্যক্ষ দেহ ও জগতটা তো ইন্দ্রিয়-গুলোর উপরে এমন ঘন যবনিকা টেনে দিয়ে রয়েছে যে, তদতিরিক্ত কিছু উপলব্ধ হ'তেই চায় না। তাই চৈতন্যলোকের উপরে আমরা ঝোঁক দিয়ে কথা বলি।

চার্বাক

তার ফল কি হয়েছে দেখো, তোমার শিষ্যগণ স্বর্গ, মুক্তি, পরলোক বলে ক্ষেপে উঠেছে।

গৌতম

তোমার দেহসর্বস্ব তত্ত্ব প্রচারেই কি বিপরীত ফল ফলেনি? তোমার শিষ্যরা দেহ-তন্ত্রের অধিক মানতে অসম্মত।

চার্বাক

দু'দলের দু'রকম ভুল। তবু তোমার শিষ্যদের ভুলটাই অধিকতর মারাত্মক।

গৌতম

হেতু?

চার্বাক

স্বর্গ মুক্তি পরলোক না মানলেও এক রকম চলে যায়, কিন্তু মর্ত্য বন্ধন ইহলোক না মানলে যে অচল। অনন্তকে অস্বীকারকারী অন্ধকারে গিয়ে পড়ে, কিন্তু অন্তকে অস্বীকারকারী কি গভীরতর অন্ধকারে গিয়ে পড়ে না? অনন্তের উপরে ঝোঁক দিয়ে চলবার ফলে আমাদের ইতিহাসের নৌকাখানা এক পেশে হ'য়ে চলছে, পাছে নিমজ্জিত হয় আশংকায়। আমি অন্য

(শেষাংশ ২৯৩ পৃষ্ঠায়)

গল্পের প্লট ভাবছিলাম, এমন সময় কবি কালিদাসের আবির্ভাব ঘটল আমারই সম্মুখে। তিনি প্রশ্ন করলেন, এত দুশ্চিন্তা কিসের?

গল্পের প্লট।

তার জন্য ভাবনা কি?

সে আপনি বুঝবেন না, কারণ আপনাদের সময়ে ছোট গল্প ছিল না, উপন্যাস ছিল না, তৈরি কাহিনী থেকে কাব্য রচনা নাটক রচনা।

তৈরি কাহিনীর বাইরে কি কিছু লিখিনি?

লিখেছেন বৈকি। আপনার মেঘদূত আমার বেশ ভাল লাগে, কিন্তু একালে ডাকঘর হওয়াতে মেঘদূত অচল। আপনি যে মেঘে বার্তা পাঠিয়েছেন, সে-মেঘের বিদ্যুৎ ট্যাক্সমুক্ত ছিল, নইলে বিদ্যুৎ-বার্তার রেট আজকের হারে দিতে হলে—আট আনা শব্দ ধ'রে দেখুন না, মেঘদূতে কত শব্দ আছে এবং কত টাকা দিতে হত। তা ভিন্ন এখন আপনার কনকবলয়ভ্রংশ রিক্তপ্রকোষ্ঠ অবস্থার একখানা ফোটোগ্রাফ পাঠালেই যথেষ্ট, অত কথা লেখার দরকারই হয় না।

কালিদাস বললেন, সরল জিনিস সব সময় ভাল এ-কথা তোমরা ভাবতে পার, আমরা পারি না। তোমাদের গল্প লেখা তো কিছুই না, এক নিশ্বাসের ব্যাপার, একটি কথাও রসাত্মক না হলেও তোমাদের চলে। কোথায়ও একটা উপমা নেই, কেমন যেন নেড়া-নেড়া ভাব, একেবারে অলঙ্কারহীন মেমসাহেব, শুধু ঠোঁটে আর গালে একটু রং ঘষলেই আহা মরি! বুঝতে পেরেছ তোমাদের গল্প-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নেই?

আমি বললাম, আপনার ধারণা ভুল। অলঙ্কার নেই বলেই গল্প লেখা কঠিন, জানানো বড় শক্ত।

কবি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এ-কথায়। বললেন, ওটা একটা ধাপ্পা। ক্ষমতাহীনের ছলনা। ছোট গল্প কি ক'রে লিখতে হয়, তাও আমরাই ভাল জানি। আমাদের যুগে ছোট গল্প লেখা পাপ কার্য ব'লে গণ্য হত, তাই লিখিনি। কিন্তু লিখতে পারতাম ইচ্ছে করলে। একটি সঙ্গেই আছে। ছাপবে গল্পটা?

আমি খুশি হয়ে বললাম, অবশ্য ছাপব।

কত দেবে?—কবি আমার কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন।

আমিও চাপা গলায় একটি অঙ্কের কথা বললাম।

কবি বললেন—উঁহু, ওতে হবে না।

আরও কিছু বাড়িয়ে বললাম।

কবি বললেন—আরও কিঞ্চিৎ।

তারপর একটা রফা হল। অগত্যা তাঁর গল্পটিই এবারে প্রকাশ করছি।

* * *

মৃত্যুর মতো গভীর রাত্রি। যেন একখণ্ড কালো কাচ পৃথিবীটাকে ঢেকে রেখেছে, কিন্তু দূরের নক্ষত্রশলাকাগুলি এ-বাধা ভেদ ক'রে ছুটে আসছে পৃথিবীতে। তারা এ-বাধা সহ্য করতে পারছে না।

নগরের এক প্রান্তে এক প্রৌঢ় ব্যক্তি স্বগৃহ থেকে নির্গত হল। যেন একটি ছায়া মানুষের রূপ ধরেছে।

প্রৌঢ় ব্যক্তি ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ, তা তার ছায়া দেখেই বেশ বোঝা যায়। লোকটির হাতে একটি সিঁদকাঠি। বর্ষার জলের মতো ফুলে ফুলে ওঠা পেশীযুক্ত হাতে কাঠিটি দেখাচ্ছে যেন বর্ষায় ফুলে-ওঠা জলে একটি সরু ভাঙডাল খাড়া হয়ে ভেসে চলেছে।

লোকটি চোর। কিন্তু চোর হওয়া সত্ত্বেও মনটা তার উদার। যা চুরি করে, তার মতো গরীব লোককে তার কিছু ভাগ দেয়। নিজে অতি দরিদ্র, তাই দরিদ্রের বেদনা বোঝে।

চোর ধীরে ধীরে তার অভীষ্ট গৃহসমীপে গিয়ে উপস্থিত হল। দিনের বেলা দেখে রেখেছিল গৃহটি, ধনীর ব'লেই তার মনে হয়েছিল।

প্রাচীরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল চোর। ঝড়ের পূর্বে হাওয়া স্তব্ধ হল যেন। এমন সময় মাথার উপর দিয়ে একটি বাদুড় উড়ে গেল। চোরের মনটা একটু কেঁপে উঠল। এ কি কোনো অশুভ ইঙ্গিত?

না, অশুভ নয়। ও যেন জানিয়ে দিয়ে গেল ভয় নেই। তুমি নিশাচর, আমিও নিশাচর, আমি ফলের গাছে গিয়ে বসব, তুমিও সফল হবে।

চোরের মনের ভয় কেটে গেল।

তারপর হঠাৎ সে সিঁদকাঠি দিয়ে অতি সন্তর্পণে একটি একটি ক'রে ইঁট খুলতে লাগল প্রাচীর থেকে। যেন কৃপণ একটি একটি ক'রে টাকা বের করছে সিন্দুক থেকে।

একটি লোকের প্রবেশপথ তৈরি হল—অন্ধকার অজানা ভবিষ্যতের পথ যেন। অজানাই বটে। তাই পরীক্ষা। সে আগে চিৎ হয়ে দু'খানা পা ঢুকিয়ে দিল সেই গর্তে। ধীরে ধীরে অনেকখানি ঢুকে গেল, বাইরে রইল শুধু মাথাটি। গর্তমুখো একটি সাপ যেন ধীরে ধীরে একটি ব্যাঙকে গিলছে, একটি নীরব ব্যাঙকে।

না, অজানা ভবিষ্যতের অন্ধকারে কোনো বিপদ নেই।

চোর নিশ্চিন্ত হল। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসতে লাগল সেই গর্ত থেকে। সম্পূর্ণ

বেরিয়ে এলো। যেন একটি অতিকায় মানবশিশু সদ্য ভূমিষ্ঠ হল।—একটি নীরব নবজাতক।

চোর একটুখানি থেমে সিঁদের মধ্যে দ্রুত মাথা ঢুকিয়ে দিল—যেন একটি মৌমাছি ডিম পাড়ার জন্য মৌচাকের একটি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করছে।

ভিতরে কি হচ্ছে বোঝা যায় না।

দারুণ অন্ধকার।

এমন সময় হঠাৎ একটি শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার। চোর চোর শব্দে পল্লী মুখরিত।

চোর পালাতে পারেনি।

ধরা পড়ে গেল।

কারণ, এ-ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম-স্বরূপ চোর পালাবার আগেই সবার বুদ্ধি বেড়ে গিয়েছিল।

যেন সূর্যোদয়ের পূর্বেই আলোর উদয়।

চোর অবনতমুখী।

যেন অঙ্গুলিস্পৃষ্ট লজ্জাবতী লতা।

বিরাট দেহ। নগররক্ষক এসে তার হাতে-পায়ে শিকল পরিয়ে দিয়েছে।

এখন সে মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গ। মুখে কথা নেই, দেহে সাড় নেই। দর্শকদের মধ্যে সবাই একবার ক'রে চোরকে মেরে যে-যার মতো ঘরে ফিরে গেল ঘুমোতে।

এবারে নগররক্ষকের পালা।

এমন সময় এক ঘটনা ঘটল।

গৃহস্বামীর কন্যা সুমতি এতক্ষণ দূরে ছিল, সে কাছে এসে চোরকে দেখল।

অনেকক্ষণ ধ'রে দেখল।

দিগন্তের আড়াল থেকে সূর্য যেমন দেখে অন্ধকারকে।

সুমতি দেখল এবং মনে মনে আওড়ালো—ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ এই চোর, কে?

সুমতির মনের দিগন্তে আলো ফুটে উঠল, অন্ধকার দূরে হয়ে গেল। জাতিস্মর পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করল যেন।

চোর সুমতির দিকে নির্বোধের মতো চেয়ে রইল।

যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন চাঁদ চেয়ে রইল দ্বিধাজড়িত পদ্ম ফুলের দিকে।

নগররক্ষকের হস্তস্থিত ডাণ্ডাটি উদ্যত অবস্থায় থেমে রইল, যেন লাথির ভরে উদ্যত-মাথা ঢেঁকি ঊর্ধ্বে স্থির হয়ে আছে। ঢেঁকির মাথা আর নিচে নামে না।

এখন সুমতি কি বলে তার অপেক্ষা।

সবাই রুদ্ধশ্বাস। একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে যাচ্ছে অবশ্যই।

সুমতি নগররক্ষক ও তার পিতা প্রতাপ-চাঁদকে উদ্দেশ ক'রে বলল—বন্দী চোরের সঙ্গে নিভৃতে আমি কিছু আলাপ করতে চাই।

প্রতাপচাঁদ এ-কথায় ক্রোধে ছটফট করতে লাগলেন। মেয়ের একি ঘৃণিত ব্যবহার!

কিন্তু কন্যার চোখে জল।

পাষাণ বিগলিত হল। প্রতাপচাঁদ অনুমতি দিলেন। নগররক্ষকও মনে মনে কিছু মজা অনুভব ক'রে অনুমতি দিল, বলল, বন্দী যেন না পালায়।

সুমতি প্রতিশ্রুতি দিল, পালাবে না।

পা-বাঁধা বন্দী-চোরকে সুমতি আগে যেতে ইসারা করল—সে নিজে চলল বন্দীকে অনুসরণ ক'রে। মনে হল যেন রজক তার জোড়-পা বাঁধা গাধাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

* * *

সুমতির শয়নকক্ষ।

বন্দী এবং সুমতি সামনাসামনি বসে।

একটি বন্দী বাঘ আর হরিণ।

সুমতির দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

চোর বলল, আমার সঙ্গে একি রসিকতা তোমার? মনে হচ্ছে তোমাকে কোথায় দেখেছি এর আগে—ঠিক মনে পড়ছে না কবে।

সুমতি কোনো কথার উত্তর না দিয়ে বলল, ছি ছি—তুমি চোর?

চোর বলল—সে-কথা তো সবাই বলে। ভেবেছিলাম—তুমি নতুন কিছু বলবে। কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে এ-রকম ব্যবহার করছ কেন? তুমি কে?

সুমতি কোনো কথা বলে না। তার চোখে শ্রাবণের ধারা।

দেরি হয়—অনেক সময় বৃথা কেটে যায়—কেউ কোনো কথা বলে না।

প্রতাপচাঁদ অধীর হয়ে ওঠেন। বলেন, আর অপেক্ষা করতে পারেন না। ঝড়ের মেঘ যেমন সব আয়োজন পাকা ক'রে আর বসে থাকতে পারে না।

বাইরে থেকে বলেন, তোমাদের কথা অবিলম্বে শেষ কর।

কিন্তু বাইরের তাড়া এদের কানে পৌঁছয় না।

প্রতাপচাঁদ দরজা ঠেলে ভিতরে এসে ঢুকলেন। তিনি আকাশচুম্বী সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো এদের সামনে এসে ভেঙে পড়লেন তাঁর তিরস্কারের ভাষা নিয়ে। তারপর গ্রীষ্মের সূর্য যেমন প্রচণ্ড রক্তচক্ষু মেলে ধরে পৃথিবীর উপর, তেমনি এসে দাঁড়ালেন ওদের সামনে। তারপর সগর্জনে বললেন, এই পাষণ্ডের সঙ্গে তোমার এত কি কাজ থাকতে পারে, যাতে তুমি পরি-বারের সুনাম কলঙ্কিত করতে যাচ্ছ? তুমি জান, যখন গরিব ছিলাম, তখনও সুনাম হারাই নি, আর আজ তুমি ধনীর মেয়ে হয়ে ভেবেছ যা' ইচ্ছে করতে পার?

প্রতাপচাঁদ ঘরে প্রবেশের আগে নগররক্ষকের হাতের ডাণ্ডাটি হাতে করে এনেছিলেন, সেটি চোরের শিরে সদ্ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হলেন। বললেন, যে চোর, তাকে চোরের উপযুক্ত শাস্তি দিতেই হবে।

প্রতাপচাঁদ এগিয়ে এলেন।

মনে হল, যেন তিনি নগররক্ষকের চেয়েও হিংস্র হয়ে উঠেছেন, যেমন সূর্যের চেয়ে সূর্য-তপ্ত বালি বেশি হিংস্র হয়।

চোরের শির দ্বিখণ্ডিত হয়-হয়, এমন সময় মূঢ় কন্যা ছুটে এসে প্রতাপচাঁদের পা জড়িয়ে ধরল। যেন একটি চাঁপা ফুল মাদার গাছের গোড়ায় আছাড় খেয়ে পড়ল।

তারপর বলল, কর কি বাবা, ও যে তোমার জামাই!

প্রতাপচাঁদ চমকিত হলেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, প্রমাণ?

সুমতি বলল, তুমি ভুলে গেলে কেন বাবা, যে, তোমার জামাইটি তোমার কাছে কিছু পাবার সম্ভাবনা নেই জেনে বিয়ের রাত্রেই নিরুদ্দেশ হল?

প্রতাপচাঁদ গর্জন ক'রে বললেন, না না, মিথ্যা কথা, রাক্ষসী, তোর বিয়ে হয়নি। আগের কথা তুই ভুলে যা।

সুমতি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তা হয় না বাবা। তুমি একটু সদয় হও। তুমি ইচ্ছে করলেই এখন একে মানুষ ক'রে তুলতে পারবে। এখন তোমার অবস্থা ফিরেছে। দয়া কর বাবা।

প্রতাপচাঁদের উদ্যত ডাণ্ডাটি যথাস্থানে না পড়তে পেরে মাথার উপরে খাড়া করা ছিল, এতক্ষণে তা শিথিল হাতের সঙ্গে নিচে নামল। সুমতি সাহস পেয়ে বলল, তোমার পায়ে ধরি বাবা, তোমার জামাইকে একটা ন্যায্য মূল্যের আটার দোকান খোলার ব্যবস্থা ক'রে দাও। তোমার হাতে এখন কত ক্ষমতা। তা হলেই জামাই তোমার মানুষ হতে পারবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। শিশু যেমন অনেক অধঃ-পতনের পর নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখে, তেমনি। বাবা, দয়া কর।

প্রতাপচাঁদ অনেক চিন্তা ক'রে রাজী হলেন।

এর পরবর্তী কর্তব্য আর বলে দিতে হল না এবং নগররক্ষকের হাতে দ্বিতীয়বার পড়ার আগেই সে কাজ গুছিয়ে নিতে পারবে, মনে এই বিশ্বাস নিয়ে সে দোকান খুলে বসল।

সুমতি এখন প্রকৃতই সৌভাগ্যবতী।

বাস্তুহারা অরুণ সেনগুপ্ত

লণ্ডন

মনোজ বসু

সাহেবদের দেখাদেখি সেকালে আমাদের কেউ কেউ বিলাতকে বলতেন 'হোম'; লণ্ডনের টিকিট কেটে জাঁক করে দেখাতেন : হোমে যাচ্ছি। মাস দুয়েক আগে আমারও প্রায় সেই গতিক। ইউরোপের বিস্তর অঞ্চলে চক্কোর দিয়ে বেড়িয়েছি। দোভাষিণী মাত্র সম্বল। চোখ-কান-মুখ থাকা সত্ত্বেও উক্ত ঠাকরুণ বিহনে আমি কানা-কালা-বোবা। ঘরে-বাইরে কত সব লেখাজোখা, মানুষজন হাসি-স্ফূর্তি, রঙ্গ-রসিকতা করছে—তার মধ্যে মুখোমুখি মুখে আমি হাত ঘুরানো, চোখ ঠারা ইত্যাদি আদিম ব্যবহার নিয়ে আছি। সকলের মধ্যে বিচরণ করেও তাদের কেউ নই। তাজ্জব অবস্থা। মরবার পরে ভূত হয়ে বুঝি এমনি-তরো ঘটে!

কিন্তু ডোভারের মাটিতে পা দিয়েই হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। যে যা বলছে, বুঝতে পারি। যেখানে যত লেখা বিলকুল পড়ে ফেলি! বাড়ি এসে গেলাম নাকি? নানান ঘাটের জল খেয়ে এসে তাই এবারে মনে হচ্ছে। খড়ির পাহাড়, রেল-রাস্তার টানেল সমস্ত চেনা আমার। বলে যাচ্ছি, বর্ণনা মিলিয়ে নিন। চোখে কখনো না-ই দেখি, লণ্ডনের শহরের নাড়ি-নক্ষত্র জেনে বসে আছি কেতাবের মারফত। গোটা শ্বেতদ্বীপেরও বিস্তর জানি। ছোট্ট বয়সে, মনে পড়ে, এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ড্যাফোডিলের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন—ওটা হল এক রকমের পোকা। সেই পোকা চোখের সম্মুখে আজ ফুলের সমারোহে চারিদিক জুড়িয়ে আছে। উইপিং-উইলো বোঝাতে গিয়ে সেই তিনি মাথা চুলকে বললেন, কোন শোকাতুরা স্ত্রীলোক। সত্যি তাই। আমার জানলার ওধারে বিশাল এক উইলো গাছ—অজস্র ডালপাতা ঝুলে রয়েছে ঝাঁকড়া-চুল ডাইনি বুড়ির মতো। যা-কিছু দেখতে পাই, আগেভাগে বর্ণনা পড়েছি, হয়তো বা ছবিও দেখেছি। রাস্তার নামও অচেনা নয়।

বর্তমান শুধু নয়, জানি এদের অতীতও। পথে-পার্কে যাদের হামেসাই দেখছি, তাদের অনেকের চেয়ে অনেক বেশি জানি। একদিন মাদাম তুষোর মোমের-পুতুল একজিবিশনে গেলাম। ছেলেমেয়ে, বুড়োবুড়ি সকলে ছাপা ক্যাটলগের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে বিস্তর গলদঘর্ম হচ্ছে, আমরা মূর্তির সামনে গিয়ে অবলীলাক্রমে বলে দিই : ইনি ড্রেক, উনি

পণ্ডুকে ভিক্ষা দিন

ভলতেয়ার, ঐ হলেন চশার, এই দেখ লণ্ডন-টাওয়ারে রাজপুত্রদের হত্যার দৃশ্য... ওরা অবাক চোখে তাকায়, হয়তো বা ভাবল—ফকির-জ্যোতিষী-জাদুকরের দেশ—আঙুলে গুনে টপা টপ বলে দিচ্ছে। আরে বাপু, দু'শ' বছরের ঘরকন্না যে তোমাদের সঙ্গে! পেটের দায়ে জানতে হয়েছে। তোমাদের একাল-সেকাল যাবতীয় নখদর্পণে নিয়ে আছি, রাজরাজড়ার কুলজি মুখস্থ সাল-তারিখ সুদ্ধ। তবু তো চাকরি মেলে না।

জ্যোতিষীর কথা উঠল তো বলি। লণ্ডনেও ও'দের একটি দেখলাম। লম্বা ঝুলের গলাবন্ধ কোট, কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা। হাজার জনের মধ্যেও নজর পড়বে। নজরে পড়বার জন্যই তো আয়োজন। দুটো-চারটে কথা হল পণ্ডিত-মশায়ের সঙ্গে। নিতান্ত দায়সারা গোছের—বলছেন ভিন্ন দিকে তাকিয়ে। বলতে বলতে হঠাৎ মক্কেলের গন্ধ পেয়ে হনহন করে ছুটলেন। আমি হতভম্ব। জ্যোতিষী আরও একজন আছেন নাকি। তিনি বনেদি, রাস্তায় ছুটোছুটির ব্যাপারে নেই। ঘরভাড়া নিয়ে রীতিমত অফিস সাজিয়ে বসেছেন। খবরটা শুধু মাত্র শুনেছি নাম-ঠিকানা নেবার আগেই পণ্ডিতমশায় মক্কেল ধরতে ছুটে বেরুলেন। দোষ দিইনে। অফিসের ছুটি হয়ে ফুটপাথ ধরে জনতার স্রোত বইছে। দিনের মধ্যে এই সময়টুকুর জন্য তাক করে থাকেন—এখন থেকে এক ঘণ্টা দু'ঘণ্টার মধ্যে যত কিছু কাজ-কারবার। হেন অমূল্য সময় আমার সঙ্গে ভ্যানর-ভ্যানর করে কাটানো চলে না!

গিয়ে দাঁড়াবেন এখন কোন-এক মোড়ের মাথায় নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে। মক্কেলের সাড়ে পনের আনা মেয়ে—কমবয়সি মেয়ে। তাদের দিকে তাকাবেন। চোখাচোখি হল তো মৃদু শিরকম্পন। ব্যস, লাগবার হয়তো এতেই লেগে যাবে। চেহারা দেখে কানা মানুষও বোঝে ভারতের মানুষ। সিঁদুরের ফোঁটায় বোঝা যাচ্ছে ভূত-ভগবান ও ভবিষ্যতের ব্যাপার নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। যার গরজ সে আসবেই এগিয়ে, চুম্বকের আকর্ষণের মতো কাছে এসে দাঁড়াবে। পণ্ডিতমশায় মোলায়েম দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন, হয়তো বা চুকচুক করলেন একটু মুখে।—টান তো তারও আছে মা, কিন্তু মুশকিল করল মাঝে এক শয়তানী এসে পড়ে'। কিংবা 'ছোঁড়াটা লোক সুবিধের নয়, তার চেয়ে আর একজন যে দূরে-দূরে বেড়াচ্ছে...।' ঐ বয়সের মেয়ে মাত্রেরই প্রেমঘটিত বাথাবেদনা থাকবেই, চোপ গাঁথতে দেরি হয় না। অবস্থার গুরুত্ব অনুসারে এর পর পার্কে গিয়ে লক্ষণ বিচারেও বসতে হয় কোন কোন মক্কেল সহ। ঝাড়ফুঁকে তাগা-মাদুলির ব্যবস্থা আছে কি না, জিজ্ঞাসার ফুরসুৎ পাইনি। হপ্তায় পাঁচ-সাত পাউণ্ডের মতো দক্ষিণা জোটে। এক প্যাকেট সিঁদুর মূলধনে রোজগারটা নিতান্ত হেলা-ফেলার নয়, কি বলেন?

রবিবারে ইস্ট-এণ্ডে হাট বসে। লণ্ডনে গিয়ে যেমন বৃটিশ-মিউজিয়াম দেখেন, হাটখোলাতেও তেমনি দুটো-একটা পাক দিয়ে আসবেন। দোকানের জন্য চালা বেঁধে দিয়েছে—কিন্তু কতটুকুই বা জায়গা আর ক'খানাই বা চালা! ঐ

ইস্ট-এণ্ডের হাট

ইস্ট-এণ্ডের হাটে ভারতীয় মহিলা দোকান দিয়েছেন

(ফোটোগ্রাফগুলি হিমানীশ গোস্বামী কর্তৃক গৃহীত)

অঞ্চলের কোনখানে রবিবারে গাড়ি চলে না। রাস্তা জুড়ে দোকানপাট কেনাবেচা হাটুরে মানুষের হৈ-হল্লা, গাড়ি ওর ভিতরে ঢুকবে কোথায়? যার যেখানে খুশি দোকান দিয়েছে; সস্তা-সস্তা বলে চেঁচাচ্ছে চতুর্দিকে; রীতিমতো বক্তৃতা ফেঁদেছে—যার মর্ম হল এমনিতরো জিনিষ এই দামে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ত্রিভুবনের মধ্যে কেউ দিতে পারবে না। হঠাৎ বা হাতুড়ি দিয়ে প্যাকিং-বাক্স দমাদম পিটতে লাগল : গেল, গেলরে, একেবারে জলের দামে চলে গেল। একটা সার্টের দর ধরুন, চেয়ে বসল পনের বব। হাটের গতিক আপনার জানা আছে : পাঁচ বব দিতে পারি। দোকানদার এই মারে তো মারে। গম্ভীর চালে আপনি চলে যাচ্ছেন। তখন ডাকছে, শোন শোন—আট ববে কেনা আমার, তাই দিয়ে দাও, তোমার কাছে লাভ করব না। এখন বুঝেছেন, অষুধ ধরে গেছে। দরদাম করে দেখছিলেন, কিনতে তো আসেননি। না না—বলে ভিড়ের মধ্যে গা ঢাকা দেবার তালে আছেন। তখন হয়তো ছুটে এসে আপনার হাত এঁটে ধরে হিড়হিড় করে টানবে। এই দরাদরি কেবল ইস্ট-এন্ডে—এবং একটা দিনের জন্য। অন্য কোনখানে বাঁধা দরের একটি পেনি কমিয়ে আনুন দেখি! লোকে ভাবতেই পারে না। রবিবার বলে সভ্যতার নিয়ম শৃংখলা যেন একটা দিনের ছুটি নিয়ে নিয়েছে।

বাদর-নাচ হচ্ছে একটা মধ্যে। ভিখারিরা ভিক্ষা চাইছে—সাহেব এখারি, কেতা-দুরস্ত; টেবিল সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দান করে আপনি কৃতার্থ হন। দোকানদার ভিন্ন দেশেরও আছে। এক ভারতীয় নারী, দেখি, চালাঘরে কাচের চুড়ি ও ধূপকাঠির দোকান দিয়েছেন। বাচ্চা মেয়ে—ওঁর নিজের মেয়ে বলে মনে হয়—জিনিস ঠেকাচ্ছে।

হিমানীশকে বলি, ছবি নিতে পার তো নিও বাহাদুর। দেখতে পেলে ছবি নিতে দেবে না। চেঁচাবে।

দুনিয়ার হেন বস্তু নেই, এখানে যা না দেখছি। খদ্দেরের বেজায় ভিড়। নানান দেশি মানুষ। এক দরজার পাশে ধুলোর উপর তিন ব্যক্তি উবু হয়ে বসে। মাথায় ফেজটুপি, পরনে লুঙি, পায়ে দেশি মুচির জুতো। কী ভাল যে লাগল! হোক ইস্ট-এন্ড—তবু খাস লণ্ডন শহরের মধ্যেই। হেন স্থানে ওদের পেয়ে যাব ভাবতে পারিনি।

মিঞা সাহেবের নিবাস?

নোয়াখালি জিলায়।

কদ্দিন এয়েছেন লণ্ডনে?

চোখ ঠারাঠারি করছে, সন্ত্রস্ত ভাব। তখন অধিক ঘনিষ্ঠতা করবার জন্য বিগলিত কণ্ঠে বলি, আমারও বাড়ি আপনাদের দেশে। লণ্ডনে নতুন এসেছি। এখানে আছেন কোথায়?

জাহাজে আছি। কেনাকাটা সেরে আবার জাহাজে ফিরে যাব।

কোথায় জাহাজ?

বন্দরে আছে, আবার কোথায়?

খিঁচিয়ে উঠল তারা। অবাক হলাম। বিড়বিড় করে আরও কি বলতে বলতে গলিতে ঢুকে পড়ল।

হিমানীশকে বলি, রোদ চড়ে যাচ্ছে, যাওয়া যাক। ধূপের দোকানের ফোটো নিয়ে নাও যদি পেরে ওঠো।

হিমানীশ বলে, ফোটো তোলা কখন হয়ে গেছে!

বিশ্বাস হয় না। সর্বক্ষণ পাশে পাশে—আমিও কিছু জানতে পেলাম না! কিন্তু তুলেছিল ঠিকই—তার তো এই নমুনা দেখলেন।

ইতিমধ্যে এক চোস্ত পোশাকের সাহেব এসে ইতিউতি তাকাচ্ছেন। চেহারায় যাই হোন, পোশাকের খাতিরে ইংরেজিতে বলছি, তিনটে লোক ছিল এখানে, তাদের খুঁজছেন বোধ হয়?

তিনিও শুরু করলেন ইংরেজিতে। কিন্তু ইয়েস অবধি বলে আর সুবিধা হল না। স্বভাষায় বললেন, গেল কোথা হতভাগারা?

গলিতে ঢুকেছে। আপনিও বুঝি নোয়াখালির লোক?

কটমট চোখে চেয়ে ভালমন্দ কোন জবাব না দিয়ে তিনিও নিষ্ক্রান্ত হলেন। দোষ-ঘাট কি হচ্ছে—সবাই এমনিধারা করে কেন?

রহস্য পরে জানলাম। ওকিবহাল একজন সমাধান করে দিলেন। যেচে ভাব করতে যাওয়ায় আমাকে ওরা চর ঠাওরেছে। ঐ তিনজন জাহাজ-পালানো লোক সম্ভবত। এবং পরের মানুষটি দালাল। মজুরের বিস্তর চাহিদা ওদেশে। ওদেরই চাচা-দাদারা কলে খাটছে, তারা চিঠি লিখেছে : চলে আয়। জাহাজের লস্কর হয়ে নিখরচায় চলে এসেছে। বন্দরে ছুটি পেয়েই ফোত। দালালে লুকিয়ে থাকে—লুফে নিয়ে ওয়েলসে কিংবা আর কোন দূরপ্রান্তে সঙ্গে সঙ্গে চালান দেয়। জাহাজ থেকে খোঁজখবর করে ধরবার জন্য—রীতি-রক্ষার মতো ব্যাপার—জাহাজের কর্তারাও জানে, বাইরের চারগুণ তলব ছেড়ে দরিয়ার উপরে মানুষ কয়লা ঠেলে মরতে যাবে কেন? টাকা পাঠানোর অসুবিধা নেই—জাহাজে ভাই-বেরাদার কত রয়েছে, তা ছাড়া চাচা-দাদারা পাঠাচ্ছে সেই সঙ্গেও পাঠানো যায়। আর কপালে থাকল তো মেমসাহেব জুটিয়ে এখানেই ঘরকন্না জুড়ে দিল। ভোটারের লিস্টে নেলি সর্দার, ডরোথি বিশ্বাস বিস্তর এমনি নাম পাবেন। বিশ বছর ঘর করছে—বিবিজান ককনি চালাচ্ছে, মিঞা সাহেব সিলেট-নোয়াখালির বাংলা। কথা না বুঝেও বিন্দুমাত্র অসুবিধা নেই। মূর্খ-বিজ্ঞ কতজনে আমাদের রুজিরোজগার করে খাচ্ছে, দিনকতক লণ্ডন শহরে চক্কোর দিয়ে বেড়ালে তবে মালুম হবে।

স্বাধীন ব্যবসাই বা কত! একটার ভারি চল—হোটেলের ব্যবসা। ঢাকা-রেস্তোরাঁ, বোম্বাই-রেস্তোরাঁ, পাঞ্জাব-রেস্তোরাঁ—পদে পদে দেখতে পাবেন। দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। খদ্দেরের বিস্তর ভিড়, বেশি ভিড় সাদা মানুষের,—দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারে না। বাংলা কথাবার্তায় এক-দিন মালিকের সঙ্গে জমিয়ে নিলাম : ব্যাপার কি বলুন তো—ওরা এত জমে কেন? মালিক বলে, কি জানি মশায়! ঠেসে তো ঝাললঙ্কা দিই। খেতে খেতে সাহেব-মেমের চোখে জল বেরিয়ে আসে। তাইতে যেন বেশি মজা পেয়ে যায়। পরের দিন দেখি, সেই মানুষই এসেছে নতুন এক গণ্ডা সঙ্গে জুটিয়ে। ভারত কিম্বা পূর্ব-অঞ্চলে কোন সূত্রে যারা একবার-দু'বার গিয়েছে তাদে[র] তো টিকিবাঁধা এই সব হোটেলে।

সব ভাল, একটা ব্যাপারে কেবল মুসড়ে যাই। অভিমানে আঘাত লাগে। দেশভূঁয়ে আপনারা কালো বলে তাচ্ছিল্য করেন—ইউরোপের দেশে দেশে সেই কালোর দেমাকে এতাবৎ ধরাকে সরার তুল্য গণ্য করে এসেছি হ্যাঁ, সত্যি কথা। রাস্তায় বেরুলে দূরের মানু[ষ] দ্রুতপায়ে কাছে আসে এক নজর দেখবার আশায়। ট্রামে যাচ্ছি, দেখি সবগুলো দৃষ্টি আমার দিকে। কেউ সোজাসুজি তাকাচ্ছে, ভদ্রতা বজায় রেখে কেউ বা আড়চোখে। গোড়ায় ঘাবড়ে যেতাম—কী আজব চিজ লোকে দেখে এমন করে! শেষটা একজনে বাতলে দিলেন—ঘৃণা-বিদ্বেষ নয়, নয়নে ওদের বিস্ময় এবং লোভও কিঞ্চিৎ। আকুল হয়ে কালো রূপ দেখে। গায়ের সাদা রং এতটুকু বাদামি করবার জন্য কড়া রোদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকে এটা-ওটা মাখে। ফর্শা হবার জন্য আমাদের দেশে গায়ের চামড়া ঘষে ঘষে অর্ধেক তুলে ফেলে দেখেন না? তারই উল্টো আর কি!

তখন বুক চিতিয়ে রূপ দেখিয়ে বেড়াই—দু'চোখ ভরে দেখ সকলে এবং ঈর্ষায় জ্বলে-পুড়ে মরো। কিন্তু লণ্ডনে এসে সকল দর্প ভাঙল। কালো মানুষ আমার মতন হাজার হাজার—কে কার খবর রাখে? তা ছাড়া ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ ও আফ্রিকার ভায়ারা আছেন,—কৃষ্ণাঙ্গের দাপটে সকলকে নস্যাৎ করে পথে-ঘাটে অবাধ বিচরণ—আর গৌরাঙ্গিণীরা ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে তাঁদের চতুর্দিকে। জ্যামাইকা তো বারো আনা লণ্ডন-নন্দিনীর শ্বশুরবাড়ি হতে চলল। এই নিয়ে ভাবনা ঢুকে গেছে। অথচ মুখ ফুটে বলবারও জো নেই। হারাধনের দশটি ছেলের সমস্ত মরে হেজে গিয়ে বাকি এখন ঐ একটা-দুটো কলোনি। আহারে বিহারে দেখাতে হচ্ছে সকলে এক সমান। এ বাজারে নয় তো শিগড়ে উঠতে কতক্ষণ। ঐ মহাশয়দের পাশে আমা হেন ব্যক্তিও ফর্শা বলে অবহেলার পাত্র। আমার এখানে খাতির হবে কিসে?

চা বাগানে — কৃষ্ণা বসু

মরমী সাধক শহীদ সরমদ্

রেজাউল করীম

বাবর হইতে আওরঙ্গজেব এই ছয়জন সম্রাট মোগলবংশের মুকুটমণি। বাবর মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। আকবর এই সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ও প্রসারিত করেন। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের যুগে মোগল গরিমার চরম বিকাশ ও উন্নতি হইয়াছিল। আর, দূরদৃষ্টির অভাবে আওরঙ্গজেব এই বিশাল সাম্রাজ্যকে নানা দিক দিয়া দুর্বল করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহারই সময় মোগল সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতনের সূত্রপাত হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ববর্তী সম্রাটগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করিয়া যে সমন্বয়ের ধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, আওরঙ্গজেব তাহাতে বাধা সৃষ্টি করিলেন, তাঁহার ধর্মান্ধতার দ্বারা। এই জন্য তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। আকবরের উদারতা দেশের মধ্যে একটা মহৎ মনোভাব সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু আওরঙ্গজেব শরিয়তের নামে সেই উদার আবহাওয়াকে বিষাক্ত করিয়া তুলিলেন। পূর্ববর্তী মোগল সম্রাটদের উদারতার প্রভাবে দেশের মধ্যে চিন্তাধারার পরিবর্তন হইতেছিল। কিন্তু আওরঙ্গজেব শরিয়তী শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর মানুষকে সপ্তম শতাব্দীতে ফিরাইয়া লইতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি ঘড়ির কাঁটাকে পিছাইয়া দিয়া মনে করিলেন যে, এই ভাবেই অতীত যুগ ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু তিনি বুঝিলেন না যে, তাহা সম্ভব নয়। তাঁহার বিবেচনাহীন শাসন নীতির ফলে মোগল সাম্রাজ্য টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। পূর্ববর্তী মোগল সম্রাটদের প্রভাবে দেশে যে উদার ঐতিহ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, আওরঙ্গজেব যদি তাহাতে বাধা সৃষ্টি না করিতেন তবে হয়ত তাহা ভারতের পক্ষে শুভ হইত। একজন ঐতিহাসিক আওরঙ্গজেবকে স্পেনের সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। আওরঙ্গজেব দ্বিতীয় ফিলিপের মতই ধর্ম ব্যাপারে সঙ্কীর্ণমনা ছিলেন। ধর্মান্ধতার জন্যই ফিলিপের রাজনৈতিক জীবন ব্যর্থ হইয়াছিল। আওরঙ্গজেবও সেই একই কারণে বহু দিক দিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন। ফিলিপের পরে স্পেন আর কোনওদিন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। ঠিক তেমনি আওরঙ্গজেবের অদূরদর্শিতার ফলে মোগলের গৌরবসূর্য চির-অস্তমিত হইয়া গেল। তিনি ধর্মান্ধতার যূপকাষ্ঠে নিজের ভ্রাতৃগণকে বধ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। শুধু ভ্রাতৃহত্যা করিয়া তিনি ক্ষান্ত থাকেন নাই। ধর্মান্ধতাবশত তিনি সেই যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সাধককে শরিয়তের নামে হত্যা করিয়াছিলেন। এই সাধকের নাম সুফী সরমদ্। সরমদ্ সে যুগের একজন আত্মভোলা ফকির। সর্বসম্প্রদায়ের লোকের তিনি শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু শরিয়তপন্থী আলেমগণ আর তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক আওরঙ্গজেব এই নিতান্ত নিরীহ স্বভাবের সুফীকে সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে শরিয়তের নামে হত্যা করিয়া তাঁহারা মনে করিলেন, ধর্মের পথ নিরঙ্কুশ হইয়া গেল। কিন্তু ঐভাবে কোনদিন ধর্মের পথ নিরঙ্কুশ হয় নাই। এ প্রবন্ধে সরমদ্ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সরমদের আদি বাসস্থান পারস্যদেশে। শৈশব কাল হইতে তিনি প্রতিভার পরিচয় দিতে থাকেন। উত্তরকালে তিনি কবিখ্যাতিও লাভ করিয়াছিলেন। সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। নানা গ্রন্থ পাঠ করিয়া ধর্ম সম্বন্ধে একটা উদার ভাব পোষণ করিতে লাগিলেন। অনেক সময় তিনি এমন সব বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন শরিয়ত শাস্ত্রে যাহার সমর্থন পাওয়া যাইত না। সেইজন্য রক্ষণশীল মৌলবী সম্প্রদায় তাঁহাকে ঘৃণা করিতেন। আর তাঁহাদেরই চক্রান্তে ঘাতকের হস্তে তাঁহাকে প্রাণ দিতে হইয়াছিল।

পারস্যের অন্তর্গত "কাশানে" ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে সরমদ্ একটি য়িহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা আরমেনিয়ান য়িহুদী ছিলেন। য়িহুদীদের প্রথা অনুসারে সরমদ য়িহুদী ধর্মগ্রন্থ দিয়া পাঠ আরম্ভ করেন। তাঁহার ছিল প্রচণ্ড প্রতিভা। অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত য়িহুদী ধর্মশাস্ত্র তিনি সমাপ্ত করিলেন। অধিক জ্ঞান লাভের জন্য তিনি খৃষ্টান ধর্মের "নিউটেস্টামেণ্ট" বা নব-বিধান পাঠ করিলেন, কিন্তু ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। আরও অধিক জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে তিনি ইসলাম ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। যে কোন ধর্মগ্রন্থের সার শিক্ষা তিনি সহজেই গ্রহণ করিতে পারিতেন। সুতরাং ইসলাম ধর্মে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিতে অধিক বিলম্ব হইল না। আরবী ও ফারসী ভাষায় তিনি গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করিলেন। মৌলানা মোল্লা সাদরউদ্দিন সিরাজ এবং মোল্লা কাসিম ফিন্দারসকি সে যুগের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। সরমদ্ এই দুইজন পণ্ডিতের নিকট শিক্ষালাভ করিলেন। এই দুইজন শিক্ষক আদৌ গোঁড়া ও ধর্মান্ধ ছিলেন না। বিশেষ করিয়া মোল্লা কাসিম ফিন্দারসকি ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের প্রতি বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। বেদ ও উপনিষদের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়া সরমদ্ স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার অভ্যাস লাভ করিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি স্বাধীন চিন্তার অভ্যাস ত্যাগ করিলেন না। সে-যুগের সাধারণ মুসলমানের সঙ্গে তাঁহার ধর্মবোধ ও ধর্মবিশ্বাসের অনেক পার্থক্য ছিল। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেও তিনি সর্বধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। অতঃপর তিনি ভারতবর্ষে চলিয়া আসিলেন।

ভারতবর্ষে আসিবার পূর্বে সরমদের জীবনের অনুপূর্বিক বিবরণ জানিবার উপায় নাই। তবে এইটুকু জানা যায় যে, তিনি কিছুদিন পারস্যের সুফী সম্প্রদায়ের সান্নিধ্য লাভ করার পর ব্যবসায় উপলক্ষে ভারতবর্ষে আসেন। সে-যুগে ভারতবর্ষ ও ইরাণের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। উভয় দেশের বণিকগণ স্বাধীনভাবে মালপত্র লইয়া আসা-যাওয়া করিতেন। সরমদ্ ভারতবর্ষের খ্যাতি পূর্ব হইতে শুনিয়া থাকিবেন। পণ্য বিক্রয় উদ্দেশ্যে তিনি সমুদ্রপথে ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করিলেন।

অনুমান ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে সরমদ্ ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। সিন্ধু প্রদেশের টাট্টা নামক একটি বন্দরে তাঁহার জাহাজ নোঙর করিল। এই বন্দরে কিছুদিন তিনি ছিলেন। এইখানে অভয়চাঁদ নামক একটি বালককে তাঁহার খুব ভাল লাগে। এই বালকটি তাঁহার অন্তরের দোসর হইয়া পড়িল। তাহাকে দেখিতে না পাইলে তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন। সে-যুগে সুন্দর বালককে ভালবাসার একটা রেওয়াজ হইয়া গিয়াছিল। পাছে কোন দুর্নাম রটনা হয়, এই ভয়ে অভয়চাঁদের পিতা তাঁহার ছেলেকে একটি অজ্ঞাত স্থানে লুকাইয়া রাখেন। এই বালককে দেখিতে না পাইয়া সরমদ্ অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া একেবারে উলঙ্গ হইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সে যুগের মোগল চিত্রে সরমদের এই বস্ত্রহীন অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। একটি বালকের প্রতি সরমদের এই ভালবাসার মধ্যে কোন কাম-প্রবৃত্তি বা পাপের লালসার লেশমাত্র ছিল না। বোধহয় সেইজন্য সরমদের ভালবাসা বালকটির উপরও একটি অলৌকিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বালকটি পরে পিতার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া সরমদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার পর হইতে বহুদিন তাঁহারা একত্রে ছিলেন। কিছুদিন পর তাঁহারা উভয়ে লাহোরে আসেন। মুহাম্মদ খাঁ সে-যুগের একজন নামকরা লেখক। তিনি বলিতেছেন,—"আমি একটা উদ্যানে সরমদকে দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম যে, তিনি একেবারে উলঙ্গ।...... আঙ্গুলে লম্বালম্বা নখ। তিনি অনবরত কথা বলিয়া যাইতেছেন। আর মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার ফারসী ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করিতেছেন। মনে হইল যে, তিনি একজন কবি।"

সমসাময়িক বিবরণ হইতে আমরা সরমদ্ সম্বন্ধে তিনটি বিষয় জানিতে পারি: (১) তাঁহার ভারতবর্ষে আগমনের তারিখ, (২) একটি বালকের প্রতি তাঁহার নিষ্কাম ভালবাসা। এই ভালবাসার ফলে, তিনি সংসার বিরাগী উদাসীন হইয়া পড়িলেন; (৩) তাঁহার লাহোর আগমনের তারিখ। কারণ এই সময় সম্রাট শাহ্‌জাহান কাশ্মীর হইতে লাহোরে আসেন। এই সময় সরমদ যে একেবারে সংসার বিরাগী হইয়া পড়িয়াছিলেন আর একটি ঘটনা হইতে তাহা জানা যায়। তাঁহার যাহা কিছু সম্পদ ছিল সমস্তই তিনি দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেন। সরমদ্ উলঙ্গ অবস্থায় জনবহুল পথে পাগলের মত ঘুরিতে লাগিলেন। এইজন্য লাহোরের সংস্কৃতিবান সমাজে ভয়ানক আন্দোলন হইতে লাগিল। কিন্তু সরমদ্ কাহারও কোন কথা শুনিলেন না। সেই যে বস্ত্র ত্যাগ করিলেন সারা জীবন আর তাহা গ্রহণ করিলেন না। জনসাধারণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত বলিয়া লাহোরের কর্তৃপক্ষ তাঁহার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন না।

এইখানে একটা কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার। আজিকার যুগের মানুষের মার্জিত

দ্বিজ ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র

কিংখাবে জরির কাজ
মিহি বুটি রেশমী মসৃণ,
সূক্ষ্ম আঙুলের স্পর্শে অনুভব করে জানি বটে,
পাবো না প্রাণের যাদু;

তবু নই জীবন-বিমুখ
যখন রাত্রের বাতি নক্ষত্র-সভাকে দূরে ঠেলে,
জ্বলে স্থির
বিনিদ্র আমার যন্ত্রণায়,
জড়ে ফের নবজন্ম নিতে।

শুধু-ই কি প্রাণ আমি,
অন্ধ স্রোত জননে হননে?
দ্বিজ হব তপস্যায়
এই মোর গূঢ় অঙ্গীকার।

তোমাকেও তাই শুধু খুঁজিনাকো নগ্ন বাসনায়।
সুনিপুণ দৃঢ় হাতে তীক্ষ্ম পল তুলি
সুকঠিন কামনার গায়।
হৃদয়ের তন্তু বুনি
সূর্যাস্ত পরাস্ত করা রঙে।
পুষ্প নয়, পুতিরে ফেরাই
স্বপ্নাতীত সুরভিতে।

লুব্ধ আমি তোমার শরীরে,
মনও চাই।

তবুও অতৃপ্ত থাকি,
যতক্ষণ এ উন্মত্ত মোহ
মথিত জারকে জীর্ণ না হয় মদিরা গাঢ়রীত।

এই রচনায়
তারপর তোমাকেও কখন ছাড়িয়ে
দ্বিজ হই তপোবনে
অন্তহীন রহস্য-সত্তায়।

চোখ ॥ জগদীশ ভট্টাচার্য

জীবনের জনারণ্যে কত শব্দ, কত কোলাহল!
সংসার-সৈকতে বসে পরচর্চা রসনারোচন—
কার চিত্ত কোথা বাঁধা, কার হল বন্ধনমোচন,
কার ওষ্ঠে সুধা ওঠে, কার কণ্ঠে কেবলি গরল।
কত ধানে কত চাল—তারি ভাষ্য চলে অবিরল;
রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, কত তথ্য তত্ত্ব-আলোচন,
রাজা-ও-উজির-মারা বিক্ষোভ, কি অনুশোচন!—
বাগ্‌যুদ্ধে দিগ্‌বিজয় সংগ্রামের শেষের সম্বল!

তুমি শুধু একা বসে চুপ ক'রে চোখ তুলে চাও,
সে-চাওয়ায় জীবনের সব-কথা সুধা হয়ে ঝরে,—
তৃষাতপ্ত এ-ধরায় সে-সুধার ধারা তুমি ঢালো:—
গোধূলি-আকাশে তাই ভেসে আসে কনে-দেখা আলো,
দিগ্‌বধূর আঁখি-দীপে সন্ধ্যাতারা প্রেমারতি করে;—
হঠাৎ তোমার চোখে তারাভরা আকাশ উধাও!

রুচি সরমদের বালকের প্রতি ভালবাসা সমর্থন করিতে পারিবে না। কিন্তু মধ্যযুগের সাধক ও সুফীদের জীবনেতিহাস হইতে জানা যায় যে, তাঁহারা কোন কামপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কাহাকেও ভালবাসেন নাই। তাঁহারা এক প্রকারের কবি ছিলেন। যে কোন বস্তুতে সৌন্দর্য দেখিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হইতেন। প্রত্যেকটি সৌন্দর্যকে তাঁহারা মনে করিতেন ঈশ্বরের আনন্দ সৌন্দর্যের একটা ঝলক মাত্র। তাঁহারা আরও বিশ্বাস করিতেন যে অন্যান্য বিষয়ের মত যৌবনের সৌন্দর্য হইতেছে ঈশ্বরের মহিমার প্রতীক। আর সৌন্দর্যের আরাধনা তাঁহাদের নিকট ঈশ্বর আরাধনার মতই নিঃস্বার্থ ও নৈর্ব্যক্তিক। ব্যক্তির সৌন্দর্যকে আরাধনা করিতে করিতে প্রকৃত সুফীর জীবনে এমন একটা স্তর আসে যখন তাঁহার নিকট ঈশ্বর ও তাঁহার ভালবাসা আস্পদের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না। সব এক হইয়া যায়। মহর্ষি মনসুর এই স্তরে উপনীত হইয়া বলিতে পারিয়াছিলেন —"আনাল্ হক"—আমি ঈশ্বর। চণ্ডীদাস বলিতে পারিয়াছিলেন—"রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ কামগন্ধ নাহি তায়"। সরমদ একটি শ্লোকে এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন— "এই বিশ্বের পুরাতন মঠে জানি না আমি —কে মোর প্রভু, অভয়চাঁদ না অন্য কেহ।" বালকের প্রতি এই ভালবাসার যে কোন ব্যাখ্যাই করা হউক না কেন সে যুগের লোকই ইহার মধ্যে কোন নৈতিক স্খলন দেখে নাই। প্রিয় শিষ্যের প্রতি যোগীর, অথবা পুত্রের প্রতি পিতার যে ভালবাসা অভয়চাঁদের প্রতি সরমদের ভালবাসা আত্মিক দিক দিয়া সেইরূপই ছিল। অভয়চাঁদ সরমদের সঙ্গে সারা জীবন কাটাইয়াছেন। ঘাতকের হস্তে সরমদের জীবনাবসান হইলে অভয়চাঁদও মনের দুঃখে দেহত্যাগ করেন। সরমদের সংস্পর্শে আসিয়া অভয়চাঁদেরও বহু উন্নতি হইয়াছিল। সরমদ তাঁহার প্রিয় ভক্তকে প্রচলিত বিজ্ঞান ও সাহিত্য শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবে অভয়চাঁদ কবিতা রচনা করিতে শিখেন। অভয়চাঁদের কবিতাগুলি আজ দুষ্প্রাপ্য। তবে তাঁহার রচিত কবিতার একটি শ্লোক আজিও প্রচলিত আছে। ইহা তাঁহার কবিপ্রতিভা ও উদার হৃদয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে—"হাম মতিয়া ফুরকানাম্ হাম কাশিশিরী রাহবানাম্ রাব্বিয়ি এহুদানাম কাফিরাম মুসলমানম" অর্থাৎ "আমি একই সময় কোরআনের অনুবর্তী, আমি পুরোহিত, সন্ন্যাসী, য়িহুদী যাজক, হিন্দু ও মুসলমান।"

অভয়চাঁদ ও সরমদের ধর্মবিশ্বাস যে কত উদার সার্বজনীন তাহা এই শ্লোকটি প্রমাণ করিতেছে। অতঃপর ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে সরমদ হায়দরাবাদ যাইবার পথে দিল্লীতে উপনীত হইলেন। এই সময় যুবরাজ দারাশিকোহ ধর্মালোচনায় নিমগ্ন ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ধর্মে মিস্টিসিজম বা মরমীবাদের তত্ত্বান্তরে প্রবেশ করিবার জন্য সাধনা করিতেছিলেন। তিনি সরমদের মত সংসার বিবাগী সাধু-পুরুষের সন্ধান করিতেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঠিক এই সময় সরমদের সহিত দারার পরিচয় হয় নাই। হায়দরাবাদে কিছুদিন থাকার পর সরমদ যখন পুনরায় দিল্লীতে আসেন সেই সময় তাঁহার সঙ্গে দারার বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল।

হায়দরাবাদের তৎকালীন রাজা আব্দুল্লাহ্ কুতুব শাহ সরমদকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। এখানে সরমদ নানা শ্রেণীর লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। রাজা ও তাঁহার প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত আরও অনেকে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিত। তাহারা তাঁহার বহু অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া মুগ্ধ হইত। তিনি যাহাদেরকে আশীর্বাদ করিতেন তাহারা নানাভাবে উপকৃত হইত। তিনি মীরজুমলাকে এই বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন যে তিনি অনেক বড় পদ পাইবেন। তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরেই মীরজুমলা মোগল সেনাদলে যোগদান করিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই বাঙলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। সরমদ হায়দরাবাদের প্রধানমন্ত্রীকে সাবধান করিয়াছিলেন যে অবিলম্বে তাঁহার মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে। তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণীও সত্য প্রমাণিত হইয়াছিল। কারণ কিছুদিন পরে মক্কা যাইবার পথে জাহাজ ডুবিতে প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল। হায়দরাবাদে সরমদ্ মুখে মুখে বহু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

(শেষাংশ ২৬২ পৃষ্ঠায়)

বৃন্দাবনের পথে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

একটি কিংবদন্তীর জন্ম

সতীনাথ ভাদুড়ী

ওষুধের গন্ধর সঙ্গে চন্দনের মৃদু সুবাস এসে মিশেছে রুগীর ঘরে।

"বাস করো!"

বন্ধ করো! নওরঙ্গী চৌবের হুকুম। বিধাতার নির্দেশের মত অমোঘ। বাঁধকে, কিম্বা রুককে বলে গাড়ী থামালে, সে গাড়ী আবার চলে। লাল সিগনাল উঠলে আবার নামে। কিন্তু এ হল অন্য জিনিস।

কাঠির মত সরু হাতখানার সিগনাল ওঠাতে গিয়ে, নড়ল খালি ভারী আড়ষ্ট দুটো আঙুল। ওই আঙুলের ইশারাতে এখানকার দাও-দাও-নাও-নাওএর অফুরন্ত এই চোখ-ধাঁধানো আবর্ত চলছে, তাঁর একটা আঙুল নড়লেও যথেষ্ট হত।

মালিকের ভাষা বোঝে ম্যানেজার নাটোয়ার চৌধুরী। বাপের সময়কার বিশ্বস্ত কর্মচারী। অনেককাল ওই আঙুলের ইশারার হুকুম তামিল করেছে। কত রকমের কাজ। অকাজ-কুকাজও। কুকাজের পরিমাণ সৎ কাজের চেয়ে কম নয়।...চন্দনের গন্ধটা হঠাৎ উগ্র হয়ে এসে নাকে লাগে।

মুহূর্তের জন্য চাঁপিয়া থেমে গিয়েছে। মালিকের সর্বাঙ্গে চিমটি কেটে কেটে আরাম করে দেওয়া তার কাজ। শুধু সে নয়—আরও জনকয়েক আছে। ডিউটি বদলায়। পালা করে না করলে একজনে পারবে কেন। বেটাছেলেদের দিয়ে এ কাজ হয় না। আঙুলের ডগা নরম হওয়া চাই। এ কি এলোপাথাড়ি খামচানি? চেষ্টা করে, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এ কাজ শিখতে হয়। বয়স থাকতে চাঁপিয়ার মা মালিককে এই আরাম করে দিত। চাঁপিয়া বড় হলে শেখে এই কাজ মায়ের কাছ থেকে। আবার সেও জনকয়েককে শিখিয়েছে। এরা সবাই এখানকার অনুন্নত শ্রেণীর লোকের বাড়ীর মেয়ে—স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘর সংসার করে। চাঁপিয়ার চিমটিই মালিকের সবচেয়ে পছন্দ। তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে ছোট ছোট চিমটি। বহুকালকার অভ্যস্ত বিলাসের অভিজ্ঞতায়, নওরঙ্গী চৌবে শুধু চিমটির চাপ থেকে চোখ বুজে বলতে পারেন, সেবাদাসীটির বয়স আন্দাজ কত। চিমটি থামলেই তাঁর ঘুম ভেঙে যায়; তাই কারও ঢুলবার উপায় নাই।

নাই বা থাকল হাড় আর চামড়ার মাঝের ইস্পাতের মত পেশীগুলো আজ মালিকের; তবু তাঁর হাত তোলবার প্রাণপণ চেষ্টাটা চাঁপিয়া নিজের আঙুলের ডগায় অনুভব করতে পারে।...তবে কি মালিক চিমটি কাটা বন্ধ করতে বলছেন? সে তাঁর মুখের দিকে তাকায়। বুঝতে পারে না ঠিক। তারপর তাকাল ম্যানেজার সাহেবের মুখের দিকে। বোঝা গেল না তবু। যার বোঝবার সে ঠিক বুঝেছে।

ব্যস করো! আর না!

একমাত্র নাটোয়ার চৌধরীই জানে এর মানে। আর বোধ হয় শুনলে খানিকটা আন্দাজ করে নিতে পারতেন বলভদ্র উকিল। তিনি এখন রুগীর ঘরে নাই।

আর হরবিলাস চৌবে? নওরঙ্গী চৌবের ওই একই ছেলে। সে কতটুকু বুঝল? সেতো এখনই ঘরে ঢুকেছে। খানিক আগেই সে ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে বাইরে গিয়েছিল। মাইল দেড়েক দূরে তাঁদের বিশাল প্রাসাদ—এখানে সকলে বলে 'ডেউঁড়ি'। বড় ডাক্তার, ছোট ডাক্তার, নার্স, হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, কবিরাজ সবাই থাকেন তিন নম্বর 'গেষ্ট-হাউস'এ—ডেউঁড়ির কাছে। রুগীর কাছে আসতে পারেন ডাক পড়লে—নইলে নয়। খানিক আগেই দেখে গিয়েছেন তাঁরা। ছেলেরও এ বাড়ীতে আসবার অধিকার কোনকালে ছিল না। অনুমতি না পাওয়া সত্ত্বেও, বাবার অসুখের বাড়াবাড়ি হবার পর থেকে, দিনে দুবার ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে আজকাল আসেন। ডাক্তারবাবুদের 'গেষ্ট-হাউস'এ পৌঁছে দেবার সময় রুগীর আধুনিকতম খবরে চিন্তিত হয়ে আবার এসেছেন। এখানে একলা আসা তাঁর এই প্রথম।

'ব্যস করো!' আর নয়।...বাবা বোধ হয় বলছেন যে, আর ওষুধ খাবেন না। ওষুধ খাওয়া বৃথা সে কথা বাবা ডাক্তারকেও বলেছেন। আজ প্রথম নয়, এর আগেও বলেছেন; কিন্তু আজকের বলাটার সুর আলাদা। চেনা সুর। নড়চড় নাই এ সুরের কথার। হুকুম। মুখ থেকে বার হবার যেটুকু দেরী; তারপর কার ঘাড়ে কটা মাথা যে নওরঙ্গী চৌবের হুকুম তামিল করবে না! রোগে উত্থান-শক্তি রহিত হলেও।...চন্দনের গন্ধতেও মনে হচ্ছে যেন ঝাঁজ আছে।

বুড়ো নাটোয়ার চৌধরী হরবিলাসের মুখ দেখে বুঝে নিল যে, ছেলে বাপের হুকুমের মানেটা ঠিক ধরতে পারেনি।...পারবে কেমন করে?

চন্দনের মৃদু গন্ধটা হঠাৎ উগ্র মনে হচ্ছে চাঁপিয়ার সয়ে যাওয়া নাকেও। চন্দন কাঠের কথাটা যে গ্রাম সুদ্ধ সবার জানা। গ্রাম সুদ্ধ কেন--জেলা সুদ্ধ। নওরঙ্গী চৌবের সব কথাই জেলা সুদ্ধ সকলের জানা—শুধু একটা কথা ছাড়া।

চাঁপিয়া দেখছে, ম্যানেজারসাহেব ঝুঁকে পড়েছেন মালিকের মুখের দিকে, কথা বোঝবার জন্য। জোরে জোরে কথা বলবার ক্ষমতা যে তাঁর এখন নাই।

"হুকুম, মালিক।"

মালিকের রুগ্ন পান্ডুর চোখমুখে উত্তেজনার ছাপ। উৎকণ্ঠায় চাঁপিয়া নিজের ডিউটি ভুলে গিয়েছে। মালিক ভুলে গিয়েছেন যে, কেউ আর এখন তাঁকে চিমটি কেটে আরাম করে দিচ্ছে না।

...কী যেন বলবেন মালিক এবার! রোগের কথা নয়; কাজের কথা!........কী এত কাজের কথা? ...ম্যানেজারসাহেব কান নিয়ে এসেছে একেবারে মালিকের মুখের কাছে!...

চন্দন কাঠের গন্ধ।

"ব্যাস করো! নাটোয়ার, ব্যস করো!...বন্ধ করো হিসাবের 'দ' খাতা! ...আর নয়। খত

কাল চলল, চালালাম।...তুমিই সাক্ষী নাটোয়ার—একটা পয়সা এদিক ওদিক হতে দিইনি। পাই পাই হিসাব রেখেছি।...উপর থেকে তিনি সে সব দেখছেন!...কাউকে ফাঁকি দিইনি। দিলে যে ফাঁকিতে পড়তাম নিজেই।......সেবার যখন কমিশনার সাহেব আমাকে রাজাসাহেব খেতাবের জন্য সুপারিশ করতে চেয়েছিল, তখন আমিই হাত-জোড় করে বারণ করেছিলাম তাঁকে। সেই খেতাবের মধ্যে যে এই জিনিসের ছোঁয়াচ। ...সে সব কথাতো তোমার জানা।..."

মালিকের চোখমুখে তৃপ্তির আভাস—আজীবন নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের কর্তব্য করে আসবার সন্তোষ।

"হুজুর।"

"বলভদ্র উকিল।"

হুজুর বলভদ্র উকিলকে ডাকছেন। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন ম্যানেজার সাহেব ঘর থেকে। এই বয়সেও তাঁর গতিভঙ্গীতে কোন রকম আড়ষ্টতা আসেনি। বলভদ্র উকিল আছেন এখন তিন নম্বর 'গেষ্ট-হাউস'এ। সেখানে তো যাচ্ছেনই নাটোয়ার চৌধরী; কিন্তু তার আগের কাজ যে বাকি। এক মিনিটের তো কাজ। সেটাকে সেরে নিতে হয়। কাজ ফেলে রাখা, তাঁর কোষ্ঠীতে লেখেনি।

...ব্যস করো! বার করো! রুগীর মুখের অস্পষ্ট কথাটা প্রথমে ওই রকমই লেগেছিল। বার করে দাও ফটোগ্রাফারবাবুকে! ফটোগ্রাফারবাবু, মালিকের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। ম্যানেজার সাহেব গলা খাঁকার দিয়ে তাঁর পরদা দেওয়া ঘরে ঢুকে কি যেন বললেন। মালিকের শখের ফটোগ্রাফির ঘর—ঝি-চাকরের পর্যন্ত ঢুকতে মানা এ ঘরে। ফটোগ্রাফারবাবু যেন তৈরীই ছিলেন। হাতে সুটকেস, গলায় ক্যামেরা ঝোলানো—বেরিয়ে এলেন তিনি নাটোয়ার চৌধরীর সঙ্গে। মালিকের হুকুম অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। ঘরখানায় তালা দিয়ে, চাবিটা পকেটে পুরলেন ম্যানেজার। ঘরের বাইরে বারান্দা। বারান্দার নীচে গোবর দিয়ে নিকানো প্রকান্ড উঠান। তারপর সারি-সারি অনেকগুলি ফসল রাখবার গোলা। সমস্ত জায়গাটা বাঁশের জাফরির মজবুত বেড়া দিয়ে ঘেরা। তারই বাইরে দাঁড় করানো মোটর গাড়ীতে গিয়ে বসলেন দুজনে।

"তিন নম্বর গেষ্ট-হাউস!"

সুরসিক নওরঙ্গী চৌবে সুস্থ অবস্থায় বলতেন—আজকালকার দিনে "উৎসবে ব্যসনে চৈব"...শ্লোকটা পুরনো হয়ে গিয়েছে; আজকাল বন্ধু হয় তিন রকমের—ক্লাস ফ্রেন্ড, গ্লাস ফ্রেন্ড, আর ফ্ল্যাশ ফ্রেন্ড। ফ্ল্যাশ এক রকমের তাসের জুয়ো খেলার নাম। বলভদ্র উকিল ছোটবেলায় কিছুদিন নওরঙ্গী চৌবের সঙ্গে পড়েছিলেন; দুজনে এক গ্লাসের ইয়ার এবং এক সঙ্গে তাসের জুয়ো খেলতেন এখানে এলেই। অর্থাৎ সব রকমের সংজ্ঞা অনুযায়ীই বলভদ্র উকিল মালিকের বন্ধু। যবে থেকে রুগীর অবস্থা খারাপের দিকে গিয়েছে, তবে থেকে তিনি কোর্টের কাজকর্ম ফেলে এখানে রয়েছেন। অবশ্য মোটা দৈনিক 'ফি'তে।

এক একবার মোটর গাড়ী এসে দাঁড়ায় রুগীর ওখান থেকে আর অমনি সাড়া পড়ে যায় 'ডেউড়ি'তে। যে উঠে না দাঁড়ায়, সেও নড়েচড়ে বসে। কান খাড়া করে রাখে সবাই, মালিকের আধুনিকতম খবর জানবার জন্য। অনেকে গাড়ী কোথায় থামবে সেইটার আন্দাজ করে নিয়ে, আগে থেকে সেই দিকে ছুটতে আরম্ভ করে। অন্দরমহলের দরজা খুলে ছুটে আসে চৌবে গৃহিণীর খাস দাই, আর গেষ্টা-হাউসগুলো থেকে আসে অনেকে।

কিন্তু কারো দিকে তাকাবার ফুরসৎ নাই এখন ম্যানেজার সাহেবের। তিনি নামলেন গাড়ী থেকে একা।

"ফটোগ্রাফারবাবুকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে, তুমি গাড়ী এনে রাখবে তিন নম্বর গেষ্ট-হাউসে ডাক্তারবাবুদের ঘরের সম্মুখে! কোন লোক আনবে না ষ্টেশন থেকে, বলে দিচ্ছি! আর আমাকে জিজ্ঞাসা না করে গাড়ী তিন নম্বর গেষ্ট-হাউসের সম্মুখ থেকে সরাবে না।"

"হুজুর!"

"যাও!"

গেষ্ট-হাউসের লোকরা ঘিরে ফেলেছে তাঁকে। বলভদ্র উকিলও আছেন। চোখোচোখি হ'ল দুজনের। ঠিক ধরতে পেরেছেন বলভদ্র উকিল না-বলা কথাটা। ডাক্তারদের ঘরের সম্মুখে একখানা গাড়ী সব সময় রাখা থাকে—কখন কি দরকার লাগবে বলা'তো যায় না। সেই গাড়ীখানার দিকে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলেন ম্যানেজার সাহেব। পিছনে বলভদ্র উকিল। গাড়ীর দরজাটা খুলে ধরেছেন তিনি, উকিলবাবুকে ঢুকতে দেবার জন্য। একটু নার্ভাস আর অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন উকিলবাবু। গাড়ীর দরজা বন্ধ করবার সময় নাটোয়ার চৌধরী যদি বলভদ্র উকিলের হাতখানাকে ঠেলে সরিয়ে না দিতেন, তাহ'লে তাঁর আঙুলগুলো থেঁতলে যেত।

এইবার বুঝি তাঁর সময় হ'ল। সবাই ম্যানেজার সাহেবের দিকে এগিয়ে আসতে চায়, তাঁকে প্রশ্ন করতে চায়। রুগীর শারীরিক অবস্থা জিজ্ঞাসা করা শুধু একটা অছিলা মাত্র। তার পরের কথাটাই আসল। নতুন হুকুম জারি হয়ে গিয়েছে খানিক আগে সে খবর এরা এখনও জানে না।

কমিশনার সাহেব আসছেন!...খবর দিলেন চাপা গলায় খয়ের খাঁ অ্যাসিস্টেন্ট সার্জন। "...খানিক আগেই এসেছেন!" ...অর্থাৎ সবাই পথ ছেড়ে দাও। সবচেয়ে আগে তাঁরই অধিকার ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে কথা বলবার!...কমিশনার সাহেবের সঙ্গে আলাপ জমাবার ছলে, অ্যাসিস্টান্ট সার্জন এক নম্বর গেষ্ট-হাউসে গিয়ে, রুগীর অবস্থার কথা জানিয়ে এসেছেন। তবু যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এসেছেন, তার আশা ছাড়েননি একেবারে এখনও। অন্য দিন হলে নাটোয়ার চৌধরী নিজেই আগিয়ে যেতেন, ডিভিজনাল কমিশনারকে সেলাম করবার জন্য; কিন্তু আজ যে এ সব বন্ধ করবার হুকুম হয়ে গিয়েছে। কমিশনার সাহেব রুগীকে একবার দেখতে যাবার প্রস্তাব পাড়লেন ম্যানেজারের কাছে।

"না।"

শুকনো, দৃঢ় জবাব। বেশী কথা বললে, বা এখানে আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে পেয়ে বসতে পারে, এই ভয়ে অতি সংক্ষেপে বলা।

বিস্ময়ের ঝাঁকানি লাগা এতগুলি লোকে[র]
দিকে একবার তাকিয়ে দেখবারও দরকার বো[ধ]
করলেন না নাটোয়ার চৌধরী। কারও ক[থা]
কানে যাচ্ছে না। তাঁর এখন বহু কাজ। স[ময়]
নাই মোটে। অন্দরমহলের দাইটা ভীড় ঠে[লে]
আসতে পারছে না কাছে। তার দিকে ছু[টে]
গেলেন ম্যানেজার সাহেব।

"মালিকানীকে বলে দিস যে মালিক এক
রকম আছেন। ছেলের সঙ্গে কথা বলছে[ন]
এখন।" ...মিথ্যা আশ্বাস দিতে কুণ্ঠিত হ[লে]
চলবে না এখানে। ...বাড়ীর মেয়েদের এ[খন]
বোধহয় একবার রুগীর ওখানে যেতে দেও[য়া]
দরকার। ...কিন্তু এখনও যে হুকুম হয়[নি]
মালিকের! ...এখানকার দরবারের কারও সাহ[স]
নাই নওরঙ্গী চৌবের হুকুমের একটুও নড়[চড়]
করে।

হ্যাঁ, দরবারই বটে। রাজা নয়, জমিদার ন[য়]
তবু এটা একটা দরবার। নওরঙ্গী চৌবে সম্প[ন্ন]
গেরস্ত—এদেশে বলে 'কিষাণ'। ধনী গৃহস্থ।
গঙ্গার ধারে দু'হাজার বিঘা জমি আছে। পলি
মাটি-পড়া 'দিয়ারা' জমি। জল সরবার প[র]
কালো পাঁকের উপর শুধু ছিটিয়ে কলাই ফেল
দাও; হাল দেবার দরকার নাই; চারা পোঁতব[ার]
দরকার নাই; ক্ষেত নিড়াবার দরকার নাই; অ[ন্য]
কোন খরচ নাই; সোনার ফসল বাঁধা; শু[ধু]
কেটে ঘরে তোলবার মেহনত।

আর আছে দোর্দণ্ডপ্রতাপ লাঠির জো[র],
সরকারী মহলে উপর পর্যন্ত পরিচয়ের জো[র],
অগ্র-পশ্চাৎ বোধহীন জিদের জোর, যাকে ইং[রেজ]
কিনবার মত অর্থের জোর।

এখান থেকে দেড় মাইল দূরে নওরঙ্গী
চৌবের পৈতৃক ভিটে। তিনি চিরকাল সেখানে
থাকেন। ওই খোলার ঘরে তাঁর বাবাও থাকতে[ন]
এক সময়। সেই খাপরার বাড়ীটাকে সবাই ব[লে]
'ভিটা বাংলা'। বাড়ীর লোকের সেখানে যাব[ার]
হুকুম নাই। তাই অন্দরমহলের মেয়েদের চো[খে]
'ভিটা বাংলা' এক রহস্য ও কৌতূহলে[র]
জ্যোতির্মণ্ডলে ঘেরা। এত দেখবার ইচ্[ছা]
খুঁটিয়ে জানবার ইচ্ছা, তবু সেখানে যাব[ার]
নামে বাড়ীর মেয়েদের বুকের রক্ত হিম হ[য়ে]
আসে। ঠাকুমার মুখে শোনা যে, সেখানে যাব[ার]
দুর্লভ সুযোগ আসে এমন সময়, যখন গি[য়ে]
চোখের জলে কিছুই দেখা যায় না। সে অনুমতি
সে সুযোগ বাড়ীর লোক চায় না।... তার চে[য়ে]
যে রামচন্দ্রজী ভগবান, বাড়ীর মেয়েদের যে[ন]
যেতে না হয় সেখানে—রোগ সারিয়ে দ[াও]
মালিকের!...

নওরঙ্গী চৌবে প্রাতঃমধ্যাহ্ন ভোজন করে
আসতেন 'ডেউড়িতে'; তারপর বিশ্রাম করতে[ন]
সেখানেই। দুপুরে বিশ্রামের সময় মালিকা[নী]
স্বামীর গায়ে চিমটি কেটে কেটে আরাম ক[রে]
দিতেন। দাইদের মুখে শোনা যে তিনি এ[ই]
বিদ্যার সূক্ষ্ম কলাগুলো আয়ত্ত করবার চে[ষ্টা]
করেছিলেন চাঁপিয়ার মাকে অন্দরমহলে ডে[কে]
এনে।

নওরঙ্গী চৌবে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে মর্যা[দা]
দিতেন পুরো। কেউ কোনদিন বলতে পারবে [না]
যে, তিনি তাঁদের অনুরোধ কখনও উপে[ক্ষা]
করেছেন। কিন্তু যে বিষয়টা বাড়ীর লোক
তাঁকে বলি বলি করেও সারাজীবন বল[তে]
পারেননি, সেটা হচ্ছে তাঁর অপরিমিত খ[...]

(ইহার পর ১৩২ পৃষ্ঠায়)

যখন বৃষ্টি নামল

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

অন্ত্রঘটিত কঠিন একটা ব্যাধি। ডাক্তারী শাস্ত্রে তার একটা মস্তবড় নামও আছে। কিন্তু তা শুনে আমাদের কোনো লাভ নেই। মোট কথা বড় ডাক্তারেও জবাব দিয়ে গেছেন। বাঁচবার আশা নেই। পেরোবো দিন, কি বড় জোর একটা মাস। বাড়ির সকলেই প্রত্যক্ষভাবে ডাক্তারের অভিমত জেনেছে। পরোক্ষভাবে প্রমথনাথ নিজেও।

শুয়ে শুয়ে শান্তভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেন তিনি।

আর ভাবেন।

ভাবনার অনেক কিছু আছে। মনে মনে ভাববার। কিন্তু তার একটি বিন্দুও, মুখ দিয়ে দূরে থাক নিশ্বাসের সঙ্গেও প্রকাশ করার উপায় নেই। অথচ কথাটা গোপনীয় কিছু নয়। গোপন নেইও। স্ত্রী জ্যোতির্ময়ী জানেন। একমাত্র পুত্র ইন্দ্রজিৎ, যার নিজেরই কয়েকটি ছেলে মেয়ে হয়েছে, সেও জানে। কন্যা মৃন্ময়ীও জানে। জানে না শুধু নাতি নাতনীরা।

সেই সকলের জানা কথা, কেউ বা ভুলে গেছে, কেউ বা ভোলেনি, তাই নিঃশব্দে, মনের একান্ত গভীরে রোমন্থন করছেন প্রমথনাথ দিনে রাত্রে এবং দিনের পর দিন।

মুখ ভালো মনে পড়ে না। মনে পড়ার কথাও নয়। ছাঁদনা তলায় সকলের পীড়াপীড়িতে, ভদ্রতার খাতিরে, একবার চোখ মেলে চেয়েছিলেন মাত্র। তখনই আশাভঙ্গের বিরক্তিতে চোখ নামিয়ে নিয়েছিলেন।

কী বিশ্রী মুখ! যেমন রং, তেমনি শ্রী!

তখন এম-এ পাশ করে আইনের শেষ পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন প্রমথনাথ।

তার পরেও অনিবার্যভাবে কয়েকবার দেখা হয়েছে। কিন্তু সেও না দেখাই। সংসারে পথ চলতে অনেক জিনিস আমাদের চোখে পড়ে। কোনোটা ভালো, কোনোটা মন্দ। কিন্তু চোখে পড়া মানেই দেখা নয়। যা আমাদের চোখে পড়ে, তার সবটাই আমরা দেখি না।

কালীতারাও অনেকবার প্রমথনাথের চোখে পড়েছেন। কিন্তু প্রমথনাথ তাকে দেখেননি। অন্তত সেই অনেকবার চোখে-পড়া মেয়ের মুখ আজ পঞ্চাশ বৎসর পরে প্রমথনাথ স্মরণ করতে পারছেন না।

কিন্তু তাতে কিছু অসুবিধা হচ্ছে না। মুখটাই বড় নয়। নাই মনে পড়ল মুখ, অনেক টুকরো কথা,—কিছু কালীতারার, কিছু কালীতারার বাপ-মায়ের, কিছু তাঁর নিজের বাপ-মায়ের, অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবের,—সমস্ত মিলিয়ে এই মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের মুদ্রিত চোখের সামনে এক নতুন কালীতারার আবির্ভাব হয়েছে। নতুন, কিন্তু সেই পুরোনো কালীতারা থেকে অভিন্ন।

তাই রোমন্থন করছেন তিনি দিন রাত্রি এবং দিনের পর দিন।

রোমন্থন করছেন অকস্মাৎ রোগশয্যায় নয়, যখন মৃত্যু শিয়রে। রোমন্থন করছেন কয়েক বৎসর থেকেই, যখন মৃত্যুর কথা তাঁর চিন্তাতেও আসেনি।

যাঁর কথা গত প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে একবার পলকের জন্যেও ভাবেননি, গত কয়েক বছর থেকে কেন তাঁরই কথা বারে বারে মনে পড়ছে, তাও তিনি বলতে পারেন না।

কিন্তু পড়ছে।

অনেক টুকরো কথা, আরও টুকরো-টুকরো হয়ে, এলোমেলো ভাবে।

মনে পড়ছে, বিয়ের কয়েক মাস পরে একদিন গভীর রাত্রে পিতার শয়নকক্ষের পাশ দিয়ে চলতে চলতে মাকে বলতে শুনেছিলেন : কাজটা ভালো করনি গো। এমন জোর করে বিয়ে দেওয়া উচিত হয়নি।

পিতা কি উত্তর দিয়েছিলেন, শোনা যায়নি। হয়তো কোনো উত্তরই দেননি তিনি। নিঃশব্দে গৃহিণীর অনুযোগ মেনে নিয়েছিলেন মনে মনে। কি হয়তো মেনে নেননি। তাঁর মনের মধ্যে জেদের লাভাপ্রবাহ তখনও টগবগ করে ফুটছিল।

মনে পড়ে, বন্ধুরাও একবাক্যে বলেছিলেন, কাজটা ভালো হয়নি। এমন বিয়ে না করলেই পারতে।

দেবার মতো একটি উত্তরই প্রমথনাথের ছিল : উপায় ছিল না।

কথাটা মিথ্যা নয়। উপায় সত্যই ছিল না। দুর্দান্ত জমিদার নরেন্দ্রনাথের নামে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খেত। পিতার আদেশে বিবাহ না করে প্রমথনাথের উপায় ছিল কোথায়?

কিন্তু কাজটা ভালো হয়নি।

প্রমথনাথের মা একথা স্বীকার করেছেন, বন্ধুরা স্বীকার করেছেন, মৃত্যুর পূর্বে অশেষ অনুতাপের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথও স্বীকার করে গেছেন এবং প্রমথনাথ নিজেও স্বীকার করেন।

অথচ উপায় ছিল না।

হয়তো এরই নাম ভবিতব্য।

কালীতারার ভবিতব্য, এবং তাঁর নিজেরও।

এক ফোঁটা চোখের জলের মতো অন্তত এই একটি বিন্দু সান্ত্বনা মুমূর্ষু বৃদ্ধের চোখের সামনে চিকচিক করছে।

জ্যোতির্ময়ী এসেছেন অনেক পরে।

নরেন্দ্রনাথের জীবিতকালে দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহের সাহস প্রমথনাথের ছিল না। নরেন্দ্রনাথ জানতেন সেকথা। তাঁর মনের কোণে হয়তো একটা আশা ছিল, 'আজকালকার' ছেলেরা বংশের থেকে রূপ পছন্দ করে। রূপসী বউ না পেলে তারা ক্ষেপে যায়। তখন তারা তড়পায় খুব। সুতো ছেড়ে দিতে হয় তখন। টান দিলে সুতো ছিঁড়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে, ছুটোছুটি করে মাছ ক্লান্ত হয়ে পড়লে তখন তাকে ধীরে ধীরে ডাঙায় তুলতে হয়।

তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন।

প্রমথনাথ আইন পাশ করে হাইকোর্টে বেরুতে লাগলেন। বেরুনমাত্রই পশার হয় না। খুব কষ্টেই তাঁর বাসাখরচ চলে, সকালে বিকেলে দুটো ট্যুইশান করে। তার পরে একটি বেসরকারী কলেজে অধ্যাপনা পেলেন। তারও মাইনে বেশি নয়। একটা লোকের বাসাখরচ চলে যায় মোটামুটি।

সুবিধার মধ্যে বাপের কাছে হাত পাততে হয় না।

না হলেও সে দুর্দিন বড় সামান্য ছিল না! নরেন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন, এই দুর্দিনে প্রমথনাথের পক্ষে আর বেশি দিন মেরুদণ্ড সোজা রাখা সম্ভব হবে না। মাছ ক্লান্ত হয়ে আসছে। এই-বার ডাঙায় উঠবে।

এতকাল পরেও সে কথা ভাবতে প্রমথ-নাথের বিবর্ণ ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটে উঠল : নরেন্দ্রনাথ ভুল বুঝেছিলেন। দুর্দিন যত চাপতে লাগল, প্রমথনাথের জেদও তত চড়তে লাগল।

অবশেষে পাটোয়ারী বুদ্ধি খাটিয়ে নরেন্দ্র-নাথ মৃত্যুর পূর্বে আর এক কাণ্ড করে বসলেন : তাঁর সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রী এবং পুত্রবধূ দুজনের

দুজনে সমান ভাগ করে নিয়ে উইল করে গেলেন। উইলে আরও উল্লেখ থাকল যে, স্ত্রীর অবর্তমানে তাঁর অংশ পুত্রবধূই পাবেন।

এতদিন পর্যন্ত কালীতারার উপর প্রমথনাথের মায়ের যথেষ্ট স্নেহ ছিল। কিন্তু উইলে একমাত্র পুত্র যখন সম্পত্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হলেন, তখন তিনি অকস্মাৎ পুত্রবধূর উপর বিরূপ হলেন। করুণার সঙ্গে মিশে মাতৃস্নেহ পুত্রের দিকে ছুটল। তাঁর ধারণা হল, এই অনর্থের মূলে কালীতারা। তাঁকে তিনি ক্ষমা করতে পারলেন না। দেখতে দেখতে কালীতারা তাঁর দুচোখের বিষ হয়ে উঠলেন। এবং শ্বশুর-গৃহে থাকা নিরর্থক দেখে একদিন পিত্রালয়ে চলে গেলেন।

জ্যোতির্ময়ী এলেন তার পরে, মাতৃ-সম্পত্তির সাহায্যে প্রমথনাথের অবস্থা একটু স্বচ্ছল হল।

কত কালের কথা! কিন্তু রোগশয্যায় শুয়ে প্রমথনাথের মনে হয় যেন দিন কয়েক আগের কথা! নববধূবেশে জ্যোতির্ময়ীর রূপে যেন আর ধরে না। সেই রূপের কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তুচ্ছ হয়ে যায়।

সেই রূপের বন্যায় যুবক প্রমথনাথ ভেসে চললেন একখানা ছোট্ট জেলে-ডিঙির মতো—কালীতারা যেন দূরে, আরও দূরে।

কিন্তু দূরে খুব নয়।

যখন জ্যোতির্ময়ী একখানা আকাশের মতো তাঁকে বেষ্টন করে ফেলেছেন, তার সেই দিগন্ত-রেখার মধ্যে কালীতারাকে একটা কালো বিন্দুর মতোও দেখা যাচ্ছে না, তখন হঠাৎ কালীতারার ক[illegible] থেকে একখানা চিঠি এল:

শ্রীচরণকমলেষু—

বাবার মুখে শুনিলাম তুমি আবার বিবাহ করিয়াছ। শুনিয়া যে কি আনন্দ হইল তাহা বুঝাইয়া বলিবার নয়। তোমার জন্য বড় কষ্ট হইত। আমার কিছুই নাই, না রূপ, না বিদ্যা। তোমাকে কিছু দিতেও পারি নাই। তোমার সমস্ত জীবন কি করিয়া কাটিবে, ভাবিতেও বুকের ভিতরটা কি রকম করিয়া উঠিত। এখন নিশ্চিন্ত হইলাম।

তোমাকে আমার আরও কিছু বলিবার আছে। সেটা খুবই জরুরী। এই চিঠির উত্তর পাইলে সাহস করিয়া বলিব। ভগবান তোমাদের উভয়কে কুশলে রাখুন। তুমি আমার প্রণাম নাও এবং জ্যোতি ভগ্নীকে আশীর্বাদ দিও। ইতি—

সেবিকা
কালীতারা

এও কতকালের কথা। কিন্তু মনে হয় সেদিন।

কালীতারার মুখ মনে পড়ে না। সে চিঠিও আর নাই। কিন্তু মোটামোটা ভাঙা ভাঙা অক্ষর-গুলো যেন চোখের সামনে ভাসছে!

জ্যোতির্ময়ীর রূপের ছোঁয়ায় তখন প্রমথ-নাথের মনের কপাট খুলে গেছে। আকাশ বিস্তৃত এবং উদার। সেই ঔদার্যে তিনি এ চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন। যদিচ চিঠিখানি জ্যোতির্ময়ীকে দেখাতে কিংবা এ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে তিনি সাহস করেননি।

তার উত্তরে কালীতারার কাছ থেকে আর একখানা চিঠি এল। এইখানাই সবচেয়ে জরুরী। এও আগের চিঠির মতোই সংযত এবং সংক্ষিপ্ত। সামান্য দু'একটা কথার পর লেখা হয়েছে:

"শ্বশুর ঠাকুর তাঁর সম্পত্তির অর্ধেক আমাকে দিয়া গিয়াছেন। কেন যে এরূপ করিয়া গেলেন জানি না। ইহাতে আমি খুবই কষ্ট পাইতেছি। আমার বাবার অর্থের অভাব নাই। তাঁহার সংসারে দুই বেলা দুই মুঠা খাইবার অসুবিধা কোনোদিন হইবে না। তোমাকে আমি ভালো জানি না। কিন্তু যতটুকু জানি, অভাবে পড়িলে তুমিও সাহায্য না করিয়া পারিবে না। তবে শ্বশুর-ঠাকুর এমন করিলেন কেন?

যাহাই হউক, তোমার এই বিবাহের পর মায়ের মন একেবারেই ভাঙিয়া গিয়াছে। বাহির হইতে দেখিলে স্পষ্ট বোঝা যায় না বটে; কিন্তু আমি বুঝিতে পারি: তিনিও যেন একটা প্রকাণ্ড ধাক্কা সামলাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। কেবল, বিশ্বাস কর, আমি সুখী হইয়াছি। তোমার জীবনে একটা অভিশাপ হইয়া থাকিয়া বড় মনোকষ্টে ছিলাম।

বাবা এবং মা আমাকে লইয়া বৃন্দাবন যাইবার সংকল্প করিয়াছেন। সেই মত তিনি সম্পত্তির ব্যবস্থা করিতেছেন। শেষ জীবন তাঁহারা আমাকে লইয়া সেখানেই কাটাইবেন। শ্বশুরঠাকুর, হয়তো ভালো হইবে আশা করিয়াই, যে বাঁধনে আমাকে বাঁধিয়া গিয়াছেন, গোপাল-গিরিধারীর চরণে পৌঁছিবার পূর্বে সে বাঁধন খুলিয়া যাইতে চাই। তুমি তো উকিল, একটা দানপত্র লিখিয়া দাও না। দানপত্র আর কি! তোমাদের সম্পত্তি ভুলিয়া আমার হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। সেই অন্যায় সংশোধন করিতে চাই। বাবা মা আমার ইচ্ছায় সম্মত হইয়াছেন। তুমি দয়া করিয়া সম্মত হও, ইহাই প্রার্থনা।

সময় বেশি নাই। সুতরাং তাড়াতাড়ি দলিলটা পাঠাইও। আমি সই করিয়া দিব এবং বাবা স্বয়ং সাক্ষী হইবেন।"

এই চিঠিখানা প্রমথনাথের লোহার সিন্দুকে এখনও বোধ হয় আছে। তাঁর পশার তখনও তেমন জমে নি। খরচপত্র সম্বন্ধে জ্যোতির্ময়ী খুব হিসাবী নন। অধ্যাপনার সামান্য বেতন এবং অর্ধেক সম্পত্তির আয়ে তাঁর টানাটানি চলছিল। তবু এতে তিনি অসম্মতি জানিয়েছিলেন। তাঁর রক্তেও দুর্দান্ত জমিদার নরেন্দ্রনাথের জেদ।

কিন্তু শুধুই কি তাই?

আজ রোগশয্যায় শুয়ে প্রমথনাথ অতীতের অন্ধকার হাতড়ান। শুধু তাই নয়। পিতার জবরদস্তি যা পারেনি, ওই এক ফোঁটা মেয়ের চিঠিতে তাই সম্ভব করেছিল। এতদিন মনে হত পিতার জেদে নত হয়ে বিয়ে করাটা উচিত হয়নি। সেদিন চিঠিখানা হাতে করে আর একটা প্রশ্ন জেগেছিল: বিবাহ যখন পিতার জেদে হয়েই গেল, তখন আবার একটা বিবাহ করা কি ঠিক হল?

বৃন্দাবন যাত্রার আগে পায়ের ধুলো চেয়ে কালীতারা একখানা চিঠি দিয়েছিলেন। তার অর্থ, একবার চোখের দেখা। হয়তো শেষ দেখা। শেষ দেখাই তো। কালীতারা বৃন্দাবনে রয়েই গেছেন। তাঁর পিতামাতা পরলোকে। মেয়ের জন্যে তাঁরা একখানা বাড়ি, বরং মন্দির বলাই ভালো, আর দেবসেবার ব্যয় নির্বাহের জন্যে সেইখানেই সামান্য কিছু সম্পত্তি রেখে গেছেন। তাই নিয়ে সেইখানেই রয়ে গেছেন তিনি। আর এখানে, এই কলকাতা শহরে প্রমথনাথ। মৃত্যুশয্যায়।

শেষ দেখাই তো।

প্রমথনাথের ঠিক মনে পড়ল না, বৃন্দাবন থেকে এ পর্যন্ত ক'খানা চিঠি দিয়েছেন কালী-তারা। তিনখানা, না আরও বেশি? ঠিক মনে পড়ল না। শেষ চিঠি কবে এসেছিল? সে চিঠির কি তিনি উত্তর দিয়েছিলেন?

তাঁর মনশ্চক্ষু স্মৃতির অন্ধকার পাথারে লগি ঠেলে উজানে চলতে লাগল।

না, সে চিঠির উত্তর দেওয়া হয়নি বোধ হয়। ঠিক সেই সময়েই হাইকোর্টে তাঁর পশার জমতে আরম্ভ করেছে। সকাল-সন্ধ্যায় বাড়িতে এবং দুপুরে কোর্টে মক্কেলের ভিড় লেগেছে। সেইবারেই বড় ছেলে প্রিয়তোষের জন্ম হল বোধ হয়।

না। কালীতারার শেষ চিঠির জবাব দেওয়া হয়ে ওঠেনি। কী যে লিখেছিলেন তিনি সেই শেষ চিঠিতে তাও এখন আর মনে পড়ে না। প্রথম প্রথম মাঝে মাঝে মনে পড়ত। দূরের মেঘে বিদ্যুচ্চমকের মতো। আবছা মনে পড়ত। কারণ ওর আকাশে তখন অঢেল আলো।

তার পরে আর আবছাও মনে পড়ত না।

বহুকাল পর্যন্ত না। মনে পড়তে সুরু করেছে দুরারোগ্য ব্যাধিতে বিছানা নেওয়ার পর থেকে। সব চেয়ে আশ্চর্য, মনে যা এখন পড়ছে, সবই পুরোনো কথা, ভুলে-যাওয়া কথা। নতুন কথা ভুল হয়ে যাচ্ছে।

প্রিয়তোষ সমস্ত সকালটা তাঁর বিছানার পাশে বসে থাকে। অফিস যাওয়ার সময়ও এক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে দুটো কুশল প্রশ্ন করে যায়। অফিস থেকে ফিরে হয় ডাক্তারের বাড়ি ছোটে, নয় বাপের কাছেই বসে। তাকে প্রমথ-নাথের মনে পড়ছে না।

সাংসারিক কাজের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোতির্ময়ী প্রায়ই এসে বসছেন। ঔষধ খাওয়াচ্ছেন, পথ্য দিচ্ছেন, গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। তাঁকেও মনে পড়ছে না। কী যে হয়েছে প্রমথ-নাথের, কাছের জিনিষ দূরে সরে গেছে, দূরের জিনিস কাছে এসেছে।

কাছে এসেছে তাঁর ছেলেবেলার বন্ধুবান্ধব, স্কুল-কলেজের সতীর্থ দল,—যাদের কেউ বা বেঁচে আছে, কেউ বা নেই। কাছে এসেছে তাঁর দেশের বাড়ি, বাড়ির পিছনের পদ্মদীঘি, ঠাকুর দালান-নাটমন্দির, পুরোনো নায়েব-গোমস্তা-কর্মচারীর দল।

সব চেয়ে কাছে এসেছেন কালীতারা যাঁর মুখও তাঁর ভালো করে মনে পড়ে না। অথচ তিনি থাকেন দূরে। দেশের থেকে অনেক দূরে। বৃন্দাবনে।

মায়ের মৃত্যুর পর প্রমথনাথের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হলেন কালী-তারা। সেই সময় তিনি প্রমথনাথকে যে চিঠি লিখেছিলেন সম্ভবতঃ সেইটিই কালীতারার সর্বশেষ চিঠি। অন্তত সেই চিঠিটার কথা প্রমথনাথের এখনও স্মরণ আছে।

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত চিঠি: ম্যানেজারের কাছ থেকে তোমাদের সমস্ত সম্পত্তির তালিকা পেলাম। এখানকার উকিল দিয়ে দানপত্র তৈরি করালাম। আমাকে আর কষ্ট দিও না। দয়া করে গ্রহণ করে দায়মুক্ত কর।

মনে হচ্ছে, এই শেষ চিঠিটারই তিনি উত্তর দেননি। যদিও কালীতারাকে আর তিনি কষ্ট দেননি। দানপত্র গ্রহণ করেছিলেন।

রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে এই সব পুরোনো কথা বিস্মৃতির অতল গর্ভ থেকে তুলে বাছতে বাছতে অকস্মাৎ একটা উদ্ভট খেয়াল প্রমথনাথের মাথায় এল : দেশে যাব।

জ্যোতির্ময়ী এবং প্রিয়তোষকে ডেকে এ কথা বলতে তাঁরা তো অবাক। মায়ের মৃত্যুর পর প্রমথনাথ আর দেশে যাননি। কোনোদিন দেশের উল্লেখ মাত্র তাঁর কাছে কেউ শোনেনি। সময়ের অভাব ছিল না। হাইকোর্টে লম্বা লম্বা ছুটি। প্রত্যেক ছুটিতে তিনি বাইরে গেছেন বেড়াতে। গ্রীষ্মে দার্জিলিং, সিমলা, কার্সিয়াং, শিলং। পুজোয় দক্ষিণ কিংবা পশ্চিমে। একটা ছুটিতে ঘুণাক্ষরেও দেশে যাওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নি। হঠাৎ এ কী উদ্ভট খেয়াল!

বললেন, দেশের জন্যে মনটা বড়ই অস্থির হয়েছে।

—সেখানে কে আছে যে, তার জন্যে অস্থির হয়েছে?

হেসে বললেন, তোমাদের ধারণা মানুষের জন্যে, আত্মীয়-স্বজনের জন্যে গ্রামের ওপর টান? তা নয়। গ্রামের জন্যেই গ্রামের ওপর টান। নেই কি? পদ্মদীঘি ভরে পদ্মফুল। জানালা খুললেই চোখে পড়বে কৃষ্ণচূড়া আর কনকচাঁপার গাছ। ছেলেবেলায় ওই দুটো গাছই আমি পুঁতেছিলাম। এখন তাতে কত ফুল, কত বাহার! ওরাও আত্মীয়, ওরাও টানে। আমি যাবই।

জ্যোতির্ময়ী আর প্রিয়তোষ সন্দিগ্ধভাবে পরস্পরের মুখের দিকে চান। প্রমথনাথের মাথা কি সুস্থ নেই?

—যাবে যে, কি করে যাবে। স্টেশন থেকে অতখানি রাস্তা গরুর গাড়ির ঝাঁকুনি সইতে পারবে?

—খুব পারব। পেটের দায়ে শহরে বাস করলেও আমি তো পাড়াগাঁয়ের ছেলে। গরুর গাড়ির ঝাঁকুনি আমাকে লাগেই না। খড়ের ওপর বেশ পুরু করে বিছানা করে নিলে।

জ্যোতির্ময়ী স্বামীর বালসুলভ আবদারে সস্নেহে ধমক দিয়ে বললেন, থাম। আর বলতে হবে না। হয়েছে। কিন্তু সেখানে যে যাবে, এই কঠিন অসুখ। সেই অজ পাড়াগাঁয়ে কি ডাক্তার আছে, না ওষুধ আছে, না পথ্য পাবে।

এবারে প্রমথনাথ গম্ভীর হলেন। শান্তকণ্ঠে বললেন, তোমরা কি ভাব, ডাক্তারে জবাব দিয়ে গেছেন, আমি জানি না তা? জ্যোতু, মরতেই যদি হয়, এখানে মরার কোনো মানে হয়? তার চেয়ে কোনক্রমে দেশে গিয়ে মরতে পারলে হাড় ক'খানা জুড়বে।

জ্যোতির্ময়ীর একখানা হাত ধরে প্রমথনাথ ছোট ছেলের মতো কাঁদতে লাগলেন : তোমরা বাধা দিও না। আমাকে আমার দেশের বাড়িতে নিয়ে চল।

কিন্তু প্রমথনাথ পাগল হলেও জ্যোতির্ময়ী তো আর পাগল হয়নি। প্রিয়তোষও না। যা এ অবস্থায় হবার নয়, তা নিয়ে অকারণে তাঁরা মাথা ঘামালেন না।

সান্ত্বনা দিলেন, তুমি সেরে ওঠ। তার পরে আমরা সবাই মিলে বেশ কিছুদিন দেশে গিয়ে থাকব। এখন নয়।

সুতরাং প্রমথনাথ হতাশভাবে এ সাধ বিসর্জন দিলেন।

কিন্তু দিন কয়েক পরে আর একটা সাধ তাঁকে পেয়ে বসল। জেদ ধরলেন কালীতারাকে টেলিগ্রাম করে নিয়ে আসতে হবে।

প্রিয়তোষ তো আকাশ থেকে পড়ল। জীবনে সে কখনও কালীতারার নামও শোনেনি।—না বাপের কাছে, না মায়ের কাছে। উভয়েই এই কথাটা সযত্নে তাদের কাছ থেকে গোপন রেখেছিলেন।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি কে?

প্রমথনাথ বলতে যাচ্ছিলেন, তোমার বড়মা। কিন্তু জ্যোতির্ময়ী তাঁর মুখ চাপা দিলেন।

বললেন, তুমি বাইরে যাও প্রিয়। ওসব তোমাকে শুনতে হবে না।

প্রিয়তোষ চলে যেতে জ্যোতির্ময়ী কপালে করাঘাত করে বললেন, হা আমার পোড়া কপাল। তাঁকে ভোলনি এখনও?

প্রমথনাথ অম্লান বদনে স্বীকার করলেন, না। তা ছাড়া তাঁকে দরকার আছে।

—দরকার আছে! এতকাল পরে হঠাৎ তাঁকে দরকার পড়ল?

—হাঁ। তুমি জান না, আমাদের যা-কিছু পৈতৃক সম্পত্তি, তার মালিক আমি নই, তিনি। বাবা আমার ওপর রেগে এইটে করে গেছেন। তিনি আবার আমার নামে এটা দানপত্র করে গেছেন।

এ সমস্ত বিন্দুবিসর্গও জ্যোতির্ময়ী জানতেন না। প্রমথনাথ এ সম্পর্কে কোনোদিন তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন নি।

সবিস্ময়ে বললেন, তাই নাকি!

—হাঁ। কিন্তু দানপত্র গ্রহণ করলেও তাঁর দান আমি গ্রহণ করিনি। ওই সম্পত্তির একটা পয়সাও আমি ছুঁইনি। এখন আমার অবর্তমানের কথা ভেবে ওই সম্পত্তি সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করা দরকার। ওর ওপর ন্যায়ত আমাদের কোনো অধিকার নেই।

—কি করবে তাহলে? সম্পত্তি ফেরৎ দেবে?

—না। তাঁকে অপমান করা হবে তাতে। আমি তাঁর সম্পত্তির জন্য একটা ট্রাস্ট করেছি। তার মধ্যে তুমি আছ, প্রিয়ও আছে। আর আছে গ্রামের একটি বন্ধু। সম্পত্তির সমস্ত আয় দিয়ে বাবার নামে একটা স্কুল, মায়ের নামে একটা বালিকা বিদ্যালয় আর কালীতারার নামে একটা হাসপাতাল তৈরি হবে।

—এইজন্যে তাঁকে দরকার?

—না শুধু এই জন্যেই নয়, এতদিন পরে তাঁকে একবার দেখবার জন্যে মনটা বড় ব্যাকুল হয়েছে।

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ জ্যোতির্ময়ী কি ভাবলেন তিনিই জানেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর ঠিকানা জান?

—জানি।

প্রমথনাথ ঠিকানাটা বলে দিলেন।

সেই দুপুর থেকেই আশঙ্কিত সংকট মুহূর্তের আবির্ভাব হল। সন্ধ্যার পরেই যেন ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে মৃত্যুর ছায়া ঘুরে বেড়াতে লাগল। সমস্ত বাড়িতে নেমে এল স্তব্ধতা।

চাকর বাইরে থেকে একটা টেলিগ্রাম এনে জ্যোতির্ময়ীর হাতে দিলে। কালীতারার কাছ থেকে জবাব এসেছে :

কলকাতা যাওয়া এখন অসম্ভব। আজ রাত্রে গুরুদেবের সঙ্গে তীর্থ পর্যটনে বার হচ্ছি। কবে ফিরব জানি না। ভগবান তোমাকে নিরাময় করুন।

এ টেলিগ্রামের অর্থ কি?

অর্থ বুঝতে পারতেন একমাত্র প্রমথনাথ। বুঝতে পারতেন, এবং বুঝে নিশ্চিন্ত হতেন, পৃথিবীতে কালীতারার চাওয়া-পাওয়ার বাঁধন খুলে গেছে। আর কাকেও তাঁর প্রয়োজন নেই।

কিন্তু প্রমথনাথ তখন মৃত্যুর দ্বারদেশে।

বিরলে তোমার আনত আননখানি
নয়নে আমার লেগেছিল বড় ভালো,
আলুগোছে যেন অপরাহ্ণের আলো
যাবার বেলায় দিল গুণ্ঠন টানি।
আধো আলো আধো ছায়া
তোমার সে ঘরে যেন থরে থরে
ছড়াল মধুর মায়া।

সে কি করুণায় চাহিলে মুখের পানে
ভুবন-ভুলান অপলক দুটি আঁখি,
বলিতে আমার কিছু ত ছিল না বাকি
অনেক কথারই ছিল নাক তবু মানে;
কথার জোয়ারে ভেসে
আমার মনের আসল কথাটি
ডুবে গেল কোন দেশে।

তোমার দুয়ারে অতিথিজনের মত
দাঁড়াইতে আজ লজ্জায় মরে যাই,
বার বার আসি, বার বার ফিরে চাই।
প্রভাতের আশা সন্ধ্যায় অপগত।
ভিক্ষার ধনে ভাণ্ডার ভরেনাক
খুদ কুঁড়ো দিয়ে অমৃত ভোগের
পাত্র লুকায়ে রাখ।

অথচ সেদিন তোমার অশ্রু ধারায়
আমার শুষ্ক হৃদয়ে ডাকিল বান,
তোমার কণ্ঠে ভুলে যাওয়া মোর গান
নব নব সুরে ফুটিল লক্ষ তারায়।
ধূসর আকাশে আজি—
বিদায় বেলার পূরবীর সুর,
কেন বা উঠেছে বাজি?

বলে যাও অভাজনে,
সকলের মাঝে তুমি যে একেলা
সে কথা পড়ে না মনে?

"তোমার শাড়ীতেও দেখছি টিনোপাল ব্যবহার করা হয়েছে"!
সাদা কাপড়চোপড়কে টিনোপাল যে কতটা জ্বলজ্বলে সাদা করে' তোলে তা' সহজেই ধরা যায়। সামান্য একটু টিনোপাল যথেষ্ট কাজ দেয় কারণ একবার ব্যবহার কোরলে এর জের তিন চার ধোপ পর্যন্ত টিকে থাকে।
টিনোপাল ব্যবহার করলে
সাদা জামাকাপড় সবচেয়ে বেশী
সাদা হয়ে ওঠে
টিনোপাল
"টিনোপাল" এক্টে রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক-জে. আর. গায়গী, এস. এ. বাসেল, সুইজারল্যাণ্ড।
সুহৃদ গেইগি ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড, পোঃ বক্স ৯৬৫, বোম্বে।

পুরুষ সিংহ

আশাপূর্ণা দেবী

শিবানীর প্রশ্নে দস্তুরমতো শব্দ তুলে হেসে উঠেছিলো প্রাণতোষ। বলেছিলো—

"করবো না, এমন কথা তো বলিনি কোনোদিন! অবশ্যই করবো। বিয়ের প্রতি আমার বীতরাগ আছে, এ কথা ভাবলে ভুল করবেন। বরং গভীরতম হৃদয়ের কথা যদি শুনতে চান বৌদি, তো বলবো বিয়ে বা বৌ জিনিষটার ওপর রীতিমতো লোভই আছে আমার। কিন্তু—"

শিবানী চোখ বড়ো বড়ো করে বলেছিলো—"ওমা এ ভদ্দরলোক বলে কি! 'ইচ্ছে' নয়, 'বাসনা' নয়, একেবারে 'লোভ'! তবু বলছো এখন নয়, এখন নয়।"

"তবু বলছি"—মুচকে হেসে প্রাণতোষ বলেছিলো। "তার কারণ আমার মতে আগে ঘর, তবে ঘরণী।"

শুনে শিবানী থতমত খেয়ে গিয়েছিলো।

বোকাসোকা—ভালো মানুষ, তার পক্ষে এটা অবাক হবার মতোই কথা। তিন তলার ছাতের ওপর টালীর শেড দেওয়া যে লম্বা ঘরখানা প্রাণতোষের দ্বারা দখলীকৃত, সেই ঘরখানাও তো শিবানীর কাছে রীতিমতো লোভের বস্তু। চারিদিক খোলামেলা, বাতাসে যেন উড়িয়ে নিয়ে যায়। সর্বোপরি নির্জনতায় মধুর। সংসার-যন্ত্রের ঘর্ঘর শব্দটা ওখানে পৌঁছয় না। শিবানী যখন কোনো দরকারে ওঘরে যায়, মনে মনে ভাবে, 'আমার ঘরটার সঙ্গে ঠাকুরপোর ঘরটা যদি বদলে নেওয়া যেতো!' কাজেই প্রাণতোষের ঘরের প্রসঙ্গে এহেন মন্তব্যে থতমত না খেয়ে করবে কি! বলেছিলো বোকার মতো—"ওমা! সে কি কথা ভাই, ঘর কি তোমার নেই?"

"ঘর!"

এবার এক প্রচণ্ড হাসির পালা।

এ হাসিতে কৌতুক ঝরেনি, ঝরছিলো ব্যঙ্গ আর তাচ্ছিল্য।

"ঘর? মানে, ছাতের ওই টালীঢাকা ঘরটার কথা বলছেন?"

শিবানী বোকা হলেও মেয়েমানুষ। কিছু না বুঝুক তাচ্ছিল্যটা বোঝে। তাই সে-ও ব্যঙ্গের হাসি হেসে পাল্টা জবাব দিয়েছিলো—'তা ভাই, ওই বা কম কি? ওইটুকুই বা ক'জনের ভাগ্যে জোটে? ছাত যা দিয়েই ঢাকা হোক, চারখানা দেয়ালের ঘের তো আছে? সে দেয়ালে দরজাও আছে, আর দরজায় একটা ছিটকিনিও আছে। আর কি চাই?"

"মাপ করবেন বৌদি, চারখানা দেয়াল ঘেরা একটুকরো জায়গা আর ছিটকিনি লাগানো একটি দরজা হলেই যাদের সমস্ত চাহিদা মিটে যায়, দুঃখের বিষয় আমি তাদের দলে নই।"

এবারে আর হাসির সঙ্গে তাচ্ছিল্য ঝরেনি, মুখের সমস্ত রেখায় রেখায় সেটা ফুটে বেরিয়েছিলো প্রাণতোষের।

শিবানী তবুও বলেছিলো মুচকে হেসে, "আচ্ছা একবার পরীক্ষা করতে দিয়েই দেখো না, মত বদলায় কি না দেখি।"

"এবারেও মাপ চাইতে হলো বৌদি। অবিশ্যি এ ছাড়া আর কিছু যে আপনি বলতে পারবেন না তা জানতাম। কারণ মাপকাঠি আপনাদের কাছে একটাই আছে, আর সেটা নিজেদেরকে মাপতেই অভ্যস্ত।"

অতঃপর মুখ কালো করে উঠে গিয়েছিলো শিবানী।

আর তার দিকে তাকিয়ে প্রাণতোষ আর একবার নিজের মনে ব্যঙ্গের হাসি হেসেছিলো।

সত্যি বলতে—দাদা বৌদির দাম্পত্য জীবন দেখে দেখেই আরো প্রাণতোষের মেরুদণ্ড দৃঢ়তর হয়েছে। ছিঃ! এই কি জীবন! ছি! ছি! এরা কীট-পতঙ্গ পশু-পক্ষীর চাইতে কতোটুকু উন্নত? খাওয়া ঘুমোনো ইত্যাদি করে গোটা কয়েক বিশেষ জৈব প্রয়োজন সাধন ছাড়া তার কোনো লক্ষ্য আছে ওদের? কিছু না। চাহিদার শেষ কথা তো এইমাত্র নিজে মুখেই ব্যক্ত করে গেল শিবানী। কী লজ্জা! নাঃ! বিয়ে, বৌ, আর দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে যতোই লোভ থাকুক প্রাণতোষের, সে লোভকে দমন করবার মতো সংযমও তার আছে।

প্রাণতোষ মানুষের মতো করে বাঁচতে চায়, দাদার মতো করে নয়। আরো একবার হাসির একটা সূক্ষ্ম রেখা ফুটে উঠেছিলো প্রাণতোষের মুখে। দৈবে সৈবে কোনোদিন যদি শিবানী একখানা ভালো শাড়ী পরে, কি একটু প্রসাধন করে, মনোতোষের মুখে কি হ্যাঙলা হাসিই ফুটে ওঠে! আর কালে কস্মিনে সংসারের জুতো সেলাই চণ্ডীপাঠ সব সেরে ছেলেগুলোকে ঘুম পারিয়ে শিবানী যদি রাত ন'টার শোতে মনোতোষের সঙ্গে সিনেমায় যায় তো কেমন কৃতার্থমন্যের ভাব ফুটে ওঠে শিবানীর মুখে চোখে! সে সময়, মানে ঘোঁপ্ট ঠুন ঠুন রিকশা গাড়ীখানার ওপর চড়ে বসার সময় আবার যেন মহিমময়ী মহারাণীর ভঙ্গী!

দেখলে করুণা হয়, ঘৃণা হয়।

ক' বছরেরই বা বড়ো মনোতোষ প্রাণতোষের চাইতে, তবু যেন বুড়োর বেহদ্দ। আর হবে না-ই বা কেন, দাদার ছেলেটাই তো ক্লাশ ফাইভে উঠে পড়লো। কোন্‌কালে বিয়ে হয়েছে, যৌবন শব্দটার মানেই বেচারারা জানলো না কোনোদিন। জানে খালি চাল ডাল মাছ আলুর দর কষতে, আর যা পেলাম তাতেই কৃতার্থ হয়ে থাকতে।

মাঝে মাঝে আবার মাঝ রাত্রে শিবানীর ঘরে ধুপ জ্বলে। যে ঘরের মধ্যে আধখানা মেঝে জুড়ে ময়লা বিছানা বিছিয়ে তিনটে ছেলে ঘুমিয়ে আছে। ধুপের গন্ধে গা ঘিন ঘিন করে ওঠে প্রাণতোষের। একদিন তো স্পষ্টাস্পষ্টি মুখের ওপর হেসেই উঠেছিলো প্রাণতোষ, সকালবেলায় দাদা বৌদির ঘরে তাদের বিয়ের রাতে তোলা টোপর-চেলিআঁটা যুগল ফটোর গায়ে একগাছা রজনীগন্ধার মালা দুলতে দেখে। উঁচু দেয়ালে টাঙানো ধোঁয়া ধোঁয়া ছবিখানার দিকে দৃষ্টি পড়বার কথা নয়, পড়েও না কোনোদিন, সেদিন ওই রজনীগন্ধার গন্ধটাই বুঝি দৃষ্টিকে হাত ধরে ডেকে নিয়েছিলো, আর দেখে প্রাণতোষ না হেসে কিছুতেই পারেনি। শিবানীর হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটা নিতে নিতে হেসে বলেছিলো, "ব্যাপার কি বৌদি, ওটা আবার কি বস্তু?"

প্রাণতোষের হাসির ধরণটাই কেমন যেন 'বিশ্ব নস্যাৎ করা'। তাই শিবানীর মুখে লজ্জার বদলে রাগের অভিব্যক্তিই প্রকাশ পেয়েছিলো। সে গম্ভীর মুখে বলেছিলো—"দেখতেই তো পাচ্ছো, মালা!"

"আহা তা' তো পাচ্ছিই, কিন্তু হঠাৎ? বিবাহ বার্ষিকী-টার্ষিকী নয় তো?"

"ধরে নাও তাই। আরশোলারও মাঝে মাঝে পাখী হতে ইচ্ছে যায় বৈ কি ঠাকুরপো"—বলে ঘর থেকে চলে গিয়েছিলো শিবানী। আর প্রাণতোষ মনে মনে হেসে বলেছিলো—

'আরশোলাই বা কোথা? বরং বলো যে, গুবরে পোকা।'

হাসির মধ্যে সেদিন দুঃখও হয়েছিলো প্রাণতোষের, এরাই তার নিকটতম আত্মীয় বলে। কী ক্ষুদ্র এরা, কী ক্ষুদ্র! আর সবচেয়ে শোচনীয় যে, সেই ক্ষুদ্রত্ব সম্বন্ধে কোনো বোধই নেই এদের।

ক্লাশ ফাইভে পড়া ছেলেটা সন্ধ্যাবেলা যখন দুলে দুলে পড়া মুখস্থ করে, আর মনোতোষ একখানি মাদুর পেতে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে চোখ বুজে বুজেই ওর পড়ার ভুল ধরে, আর মানে বলে দেয়, নির্ঘাৎ তখন মনোতোষ রঙিন আশার স্বপ্ন দেখে যে, ছেলেটা কোনো রকমে ম্যাট্রিকটা পাশ করে ফেলে একটা চাকরী-বাকরীতে ঢুকে পড়লেই মনোতোষের সকল দুঃখের লাঘব হবে। আর তার পরই যা হ'য়ে থাকে, ছেলের বিয়ে! শিবানী তো একদিন বলেই ফেলেছিলো "বাবা! বাবা! খোকারে! কবে যে তোর বৌ এসে সকালবেলা ভাতের হাঁড়িটা চড়াবে, আর আমি ঘুম থেকে উঠে আর একবার পাশ ফিরে শোবো, সেই আশায় দিন গুণেছি।"

এই আশা! এই আশায় দিন গুণেছে।

অবস্থার উন্নতির আশাটুকু করবারও ক্ষমতা নেই! ছি! ছি!

প্রাণতোষের মনের গড়ন আলাদা।

তার ন্যূনতম চাহিদা হচ্ছে—অন্ততঃ ছবির মতো সাজানো গোছানো ছোট-খাটো একটি বাড়ী, অন্ততঃ একখানা টু-সীটার গাড়ী, অন্ততঃ জনাতিনেক চাকর-বাকর, অন্ততঃ স্ত্রীকে মাসে দু' চারখানা দামী শাড়ী কিনে দেবার এবং বছরে একবার দামী টিকিটে এখান ওখান বেড়িয়ে আনবার সামর্থ্য!

"অন্ততঃ এটুকু না হলে বিয়ে করা চলে না।"

বলেছিলো প্রাণতোষ বন্ধু জগদীশের কাছে।

"সত্যি ভাই যা বললে—" বলেছিলো জগদীশ "তোমার 'অন্ততঃ'গুলো ভারী হৃদয়গ্রাহী। আমরা অন্ততঃ অহরহই এগুলোর অভাব অনুভব করে থাকি, কিন্তু কথা হচ্ছে—"

"এর মধ্যে আর কিন্তু নেই জগদীশ, এ একেবারে কিন্তুবিহীন শেষ কথা।"

"তবুও যাই বলো, কিন্তু—" কুটিল হাসি হেসে জগদীশ বলেছিলো—"তোমার অন্তর পুরুষটিকে তো ঠিক ব্রহ্মচারী বলে মনে হয় না, অতো অপেক্ষা সইবে তো?"

প্রাণতোষ আত্মস্থের হাসি হেসেছিলো—"আমার অন্তর পুরুষ হচ্ছে পুরুষ সিংহ বুঝলে হে। আমার ওই কথা, আগে রাজ্যপাট, তবে রাণী।"

তা' খুব মিথ্যে অহঙ্কার করেনি প্রাণতোষ।

রাজ্যপাটের সাধনাতে উঠে পড়ে লেগেছে সে সেই তখন থেকে। আর সিদ্ধির দরজার সন্ধানও পেয়েছে।

আর পুরুষ সিংহের অহঙ্কারটা?

সেটাও মিথ্যে নয়। শিবানী যে 'লোভ' শুনে হেসেছিলো, সেই লোভটা যে প্রাণতোষের জীবনে চরম সত্য, এতে তো ভুল নেই। তবু সেই লোভকে দাবড়ানি দিয়ে দিয়ে ঠান্ডা করে রেখেছে তার অন্তরের ওই পুরুষ সিংহটিই তো! সে লোভ ভিতরে ভিতরে দুঃসহ জ্বালা ধরিয়েছে, কাঁটার চাবুক মেরেছে, পাগল করে তুলবার চেষ্টা করেছে, তবু হার মানেনি প্রাণতোষ। চরম যন্ত্রণার মুহূর্তে স্মরণ করেছে সেই পুরুষ সিংহটিকে।

নইলে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে যখন জোড়ায় জোড়ায় তরুণ-তরুণী গায়ের কাছ দিয়ে হাসতে হাসতে আর কথা বলতে বলতে যেন হাওয়ায় ভেসে চলে গেছে—রুমালের সেন্ট আর খোঁপার বেলফুলের গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের হৃদয় রহস্যকেও ছড়িয়ে দিয়ে, তখন প্রাণতোষের সমস্ত প্রাণটাও কি ওদের সঙ্গে সঙ্গে অভিসারে যেতে চায়নি? যখন এই সহর কলকাতার উন্মত্ত কলকোলাহলের মাঝখানেও এতোটুকু নিভৃতে কোনো প্রেমিক যুগলের কল-গুঞ্জনরত মূর্তি চোখে পড়েছে, তখন প্রাণতোষের প্রাণটা কি অসীম শূন্যতায় হাহাকার করে ওঠেনি? যখন ওর সেই খোলামেলা ছাতের ঘরেও হঠাৎ কোনো রাতে দম বন্ধ হয়ে আসা অনুভূতিতে ঘুম আসেনি, তখন ছাতে পায়চারি করতে করতে সহসা আলসের ধারে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রাণতোষ কি পাথরের পুতুলের মতো স্তব্ধ হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়নি অগ্নি-গোলক দুটো চক্ষু নিয়ে?

আশপাশের বাড়ীগুলো সবই তো প্রায় একতলা দোতলা। তাছাড়া মধ্য রাত্রির অস-তর্কতায় কেই বা খেয়াল করবে এই নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে কোথাকার কোন্ তিনতলার ছাতে দুটো অগ্নি-গোলক জ্বলে জ্বলে নিজেকেই পুড়িয়ে ছাই করছে!

হ্যাঁ, অহঙ্কার করা তার সাজে। নিজেকে পুড়িয়ে ছাই করেছে প্রাণতোষ, তবু হার মানেনি। পায়ে মাথায় ঠান্ডা জল ঢেলে আবার ঘুমের আরাধনা করে করে শেষ রাতে স্বপ্ন দেখেছে—দামী সুট, দামী সিগারেট, অবহেলায় নোটের গোছা উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গী, সাজানো বাড়ী, সুন্দর গাড়ী, সুসজ্জিতা স্ত্রী। শুধু সুসজ্জিতা কেন, সুন্দরীও।

সুন্দরী স্ত্রী আহরণ করবার উপযুক্ত রেস্ত হাতে নিয়ে তবে তো স্ত্রীর কথা। হ্যাঁ সেই স্ত্রীকে পাশে নিয়ে উধাও হয়ে ছুটেছে প্রাণতোষ পথচারীদের গায়ে গাড়ীর চাকার কাদা ছিটিয়ে, এ না হলে স্বপ্ন!

উপকরণহীন ভোগ?

ছিঃ!

পশুদের সঙ্গে প্রভেদ কোথায় তাহলে?

বাঁচতে হয় তো মানুষের মতো বাঁচতে হবে, ভোগ করতে হয়তো মানুষের মতো ভোগ করতে হবে। দাঁতে ঠোঁট চেপে এখন শুধু টাকার সাধনা! তা' সে সাধনা ব্যর্থ হয়নি প্রাণতোষের। ধীরে ধীরে স্বপ্নকে সত্যের রূপ দিয়েছে সে। হয়তো বা তারও বেশী। অন্ততঃ ওর সেই "অন্ততঃ"কে ছাপিয়ে উঠেছে ওর কৃতিত্বের জৌলুসে। সরে গিয়েছে প্রাণতোষ পুরনো কেন্দ্র, পুরনো পরিবেশ থেকে। মনোতোষকে দেখলে এখন আর প্রাণতোষ চিনতে পারবে কিনা সন্দেহ, মনো-তোষও হয়তো ভাইকে চিনতে ভয় পাবে।

এছাড়া উপায়ও ছিলো না।

মায়ার গণ্ডির মধ্যে পাক খেলে, আর যাই হোক জীবনে উন্নতি হয় না।

এবার বিয়ে করা চলে।

হ্যাঁ এবার বিয়ে না করলে চলছে না।

প্রাণতোষ এবার যেন মৃগয়ান্তে নিঃশ্বাস ফেলে বললো "এবার চড়াও মাংস।" অবিশ্যি ভাষাটা একটু অন্য, বললো "এবার খোঁজো পাত্রী।"

জন্মসূত্রে পাওয়া আত্মীয়দের থেকে দূরে সরে এলেও অর্থসূত্রে পাওয়া আত্মীয়ের অপ্রতুল ছিলো না। তারা বললো—"আজ্ঞে কি যে বলেন! আপনার জন্যে পাত্রী খুঁজতে হবে? কতোজনা এসে মেয়ে নিয়ে ধর্ণা দেবে।"

প্রাণতোষ কথাটা মেনে নিয়ে সহাস্যে বললো—"আহা, তবু পাত্রীর বাজারে একবার খবরটা পৌঁছনোও তো দরকার?"

"আজ্ঞে স্যার, সে ধরুন পৌঁছেই গেছে, আপনি যখন ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন।" বললো প্রাণতোষের ডানহাত হরিপদ গুঁই। আর হরিপদর কথা প্রমাণিত হতেও দেরী হলো না। মেয়ে নিয়ে ধর্ণা দিতে এলো অনেক মেয়ের বাপ। মেয়ের বিয়ের আশায় হাল ছেড়ে দেওয়া বাপ, শিক্ষিতা মেয়ের বাপ। শিক্ষিকা মেয়ের বাপ।

কিন্তু তার মধ্যে একটা মেয়েও কি প্রাণতোষের প্রাণতোষণের উপযুক্ত? প্রাণতোষের আযৌবনের ধ্যানের সঙ্গে সামান্যতমও মিল আছে এমন একটা মেয়েও যে মেলে না।

'চোখে কেন লাগছে না কো নেশা'—

প্রাণতোষ বললো—"হরিপদ ওদের ভাগাও, আর সহ্য হচ্ছে না। এতোটুকু চোখে ধরে এমন একটাও মেয়ে দেখলাম না এ পর্যন্ত, ব্যাপার কি বলো তো?"

হরিপদ মাথা চুলকে বললো—"আজ্ঞে তাই তো ভাবছি।"

"ভেবে তো সবই করবে! কাগজে বিজ্ঞাপন দাও!"

"তাই তো! তাই বটে! বেশ কথা মনে করলেন স্যার—" দাঁতে জিভ কাটলো হরিপদ, এ পরামর্শ সে দিতে ভুলে গেছে বলে।

পরের সপ্তাহেই ইংরিজি বাংলা সমস্ত দৈনিক কাগজের 'পাত্রপাত্রী' বিভাগে প্রাণতোষের রূপগুণ বয়েস বিদ্যাবত্তা, অর্থ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির বিশদ বর্ণনার সঙ্গে "সুন্দরী শিক্ষিতা সংস্কৃতি-সম্পন্না বয়স্থা" পাত্রীর জন্য ফটোসহ আবেদনের নির্দেশ ছাপা হলো।

হরিপদ দাঁত বার করে বললো "দেখে নেবেন স্যার, দরখাস্তয় বাড়ী ভরে যাবে।"

তা' হরিপদ খুব ভুলও বলেনি, দরখাস্তয় বাড়ী না হোক টেবিল ভরে উঠতে লাগলো। প্রতিদিন এ এক অদ্ভুত কাজ হয়েছে প্রাণতোষের। সেই প্রার্থিনীর স্তূপ থেকে পাত্রী অনুসন্ধান। প্রথম ক'দিন ভারী উন্মাদনা বোধ হয়েছিলো, কিন্তু ক্রমাগত হতাশায় হতাশায় কেমন যেন ক্ষিপ্ত ভাব এসে যাচ্ছে।

টেবিল জুড়ে, ড্রয়ার ভরে নানান বয়সের নানান মাপের, নানান চেহারার পাত্রী যেন প্রাণতোষের কৃপার আশায় মৌন আবেদনে চেয়ে থাকে, আর প্রাণতোষ অধীর অসন্তোষে নতুন আবেদনের আবরণ উন্মোচন করে চলে। কিন্তু এ কি? ভালো মেয়েরা কি যুক্তি করে বাংলা-দেশ থেকে হারিয়ে গেছে? কোথায় সেই অধরা রূপসী, যে মেয়ে পাত্রী নয় "কনে?" যে প্রার্থিনী হবে না, হতে পারবে বিজয়িনী?

কোথায়? কোথায় সেই লাবণ্যে টলমল স্বাস্থ্যে জ্বল জ্বল মুখ? কোথায় সেই মদির স্বপ্নময় চোখ? যে মুখ দেখে প্রাণতোষের

আহ্লাদে চোখে জল এসে যাবে, যে চোখ দেখলে প্রাণতোষের প্রাণ আছড়ে মরতে চাইবে!

প্রাণতোষ চিরকাল ভেবে এসেছে লাবণ্যের খনি তো ঘরের পাশেই আছে, ওর জন্যে ভাববার কি আছে? সময় হলেই ফিরে তাকালে হবে। অভিযান চাই স্বর্ণখনির উদ্দেশে। কিন্তু স্বর্ণ-মৃগয়া শেষ করে ঘরের দিকে চোখ ফিরিয়ে এখন আর লাবণ্য খনির সন্ধান পাচ্ছে না। হিসেবে যেন গরমিল হয়ে যাচ্ছে। এটা কি হচ্ছে?

কিন্তু আর যে সবুর সইছে না।

যতোক্ষণ রান্না হতে দেরী থাকে সবুর সয়, ভাত বাড়তে দেরী হলে সবুর সয় না।

আজকের ডাকে আসা দরখাস্তগুলোর 'কভার' ছিঁড়ে ছিঁড়ে একপাশে ঠেলে রাখতে রাখতে প্রাণতোষ হতাশ ভাবে বলে "ব্যাপারটা যথার্থ কি বলো তো হরিপদ! বাংলাদেশটা কি শুধু পেঁচা আর হাড়গিলের রাজ্য হয়ে উঠলো?"

"আজ্ঞে, কি বলছেন স্যার?"

অবাহিত হয়ে প্রশ্ন করলো হরিপদ।

"বলছি ফটোগুলো দেখে যাচ্ছো?' আশ্চর্য একটা ছবিও কি চলনসই পর্যন্ত হতে নেই? শ্রীনেই, লাবণ্য নেই, এ সব কি মেয়ে?"

হরিপদ উঁকি মেরে দেখলো।

প্রাণতোষের আক্ষেপ মিথ্যে নয়। অনেকগুলো ছবি ছড়ানো রয়েছে টেবিলের ওপর। রোগা রগচেপা, গাল-বসা, ক্লিষ্ট-ক্লান্ত, কোলকুঁজো আবার মোটা হাতী, গাল ফুলো, চোখ পিটপিটে, অথবা পেণ্ট্ লিপস্টিক্, আঁকা ভুরু কাজলে ভাবশূন্য পুতুল মুখ, নানা রকমের নানা বয়সের নানা ভঙ্গীর মেয়ে। হরিপদর পছন্দে লাগে এমন মেয়েও নেই। তবু হরিপদ মাথাটা চুলকে বললো "আজ্ঞে স্যার, সাবিশেষ মতন তো দেখছি না, কিন্তু এযাবৎ দেখাও তো হলো ঢের, তাই বলছিলাম কি ওর মধ্যে থেকেই যদি বেছেগুছে একজনাকে সিলেক্টো করে ফেলেন—"

"ওর মধ্যে থেকে?" বাঘের মতো গর্জন করে ওঠে প্রাণতোষ "ওর মধ্যে থেকেই সিলেক্ট করতে হবে? তোমরা কি বলতে চাও হরিপদ, গাঙ্গুলী কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রাণতোষ গাঙ্গুলীর বিয়ে করবার সাধ জাগলে, ওর চাইতে ভালো পাত্রীর আশা করা চলবে না?'

"আজ্ঞে আজ্ঞে সে কি সে কি?" অপ্রস্তুত জিভ বার করে ফেলে হরিপদ। ফের মাথা চুলকে বলে "সবই দৈবের বিড়ম্বনা স্যার, মিলছে না যখন! তাছাড়া—স্যার আমাদের বায়নাটাও যে অনেক স্যার! শিক্ষিতা সংস্কৃতি সম্পন্না ইয়ে—অনেক কিছু চাহিদা থাকায়—"

প্রাণতোষ খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে থেকে, হঠাৎ কেশর ফোলানো সিংহের ভঙ্গীতে মাথা উঁচু করে ঘাড় বাঁকিয়ে বলে "আচ্ছা ঠিক্ আছে। এবার অন্যভাবে বিজ্ঞাপন দাও, ওসব কিছু লেখবার দরকার নেই, লেখো "কেবলমাত্র প্রকৃত সুন্দরী বয়স্থা পাত্রী আবশ্যক। পাত্রীপক্ষ পাত্রীর অভিভাবককে নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত।"

হরিপদ চমকে বললো—"কি বললেন স্যার?"

প্রাণতোষ অন্যমনস্কভাবে—একখানা ফটোর মুখের ওপর কালির আঁচড় টানতে টানতে নির্লিপ্ত সুরে বলে "ওইতো বললাম, প্রকৃত সুন্দরী পেলে পাত্রপক্ষ পাত্রীর পিতাকে পাঁচ হাজার টাকা যৌতুক দিতে প্রস্তুত।"

হরিপদর চোখে একবার যেন একটুকরো বিদ্যুৎ খেলে গেলো, কিন্তু মুখখানা সে যথা-সম্ভব কাঁচুমাচু করে বললো "সেটা কি ঠিক হবে স্যার?"

"কেন?"

আরো নির্লিপ্ত হচ্ছে প্রাণতোষ। আরো কায়দায় নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে স্প্রীঙের গদি-আঁটা চেয়ারের কোলে।

হরিপদ আর একবার মাথা চুলকোলো, "তাতে ওপক্ষ অন্যরকম সন্দেহ করতে পারে স্যার।"

"সন্দেহ! সন্দেহ মানে? কিসের সন্দেহ?"

কায়দা ছেড়ে সোজা হয়ে বসলো প্রাণতোষ।

"মানে আর কি—ওরা ভাবতে পারে পাত্র-পক্ষের আবার যৌতুক দেওয়ার গরজ কেন? মানে আর কি, বুঝতেই তো পারছেন স্যার, এটা উল্টো হয়ে যাচ্ছে কিনা! পণ বলুন, যৌতুক বলুন, আমাদের বাঙালী সমাজে সবই কন্যা-পক্ষের দেয়, কাজে কাজেই ধরুন না কেন, তারা মনে করতে পারে পাত্তরের কিছু খুঁৎ আছে, নইলে—"

"বটে!"

প্রাণতোষ আর একটু চুপচাপ বসে থেকে ঝাঁজালো গলায় বললো "হুঁ, তাহলে তুমি কি বলতে চাও? একটা শাঁকচুন্নি কি ঢাকাই জালাকেই বিয়ে করে ফেলি?"

"আ ছি ছি! সে কি কথা স্যার! তবে বলছিলাম কি—"

"ভনিতা রেখে স্পষ্ট বলো—" প্রাণতোষ প্রচণ্ড ধমকে উঠলো—"মনে হচ্ছে তুমি যেন মজা দেখছো! তোমার মনের কথাটা খুলে বলবে?"

হরিপদ চোখ মিটমিটিয়ে বললো—"আজ্ঞে মনের কথাটথা কিছু নয়, তবে কথা হচ্ছে প্রকৃত সুন্দরী মেয়ে পাওয়া একটু দুর্ঘট বটে।"

"কেন বলো দেখি? বাংলাদেশের এতো দুর্দশা কবে থেকে হলো? হাজারটা মেয়ে থেকে বাছাই করে একটা সুন্দরী মেয়ে জুটবে না?"

"আজ্ঞে ব্যাপারটা কি জানেন স্যার, জুটবে না কেন, জুটবে।—হাজারটাই জুটতে পারে। কিন্তু কথাটা যে আলাদা। ওই যে একটি প্যাঁচ কষে রেখেছি আমরা "বয়স্থা!" ওইখানেই স্যার মেরে দিয়েছে। মানে, আপনাকে আর বুঝোবো কি স্যার, সবই তো বোঝেন, সুন্দরী মেয়েরা আর "বয়স্থা" হতে যাবে কোন দুঃখে? তারা তো স্যার—ইয়ে—হট্ কেকের মতো কোনকালে উঠেই গেছে বিয়ের বাজার থেকে—। ওই চালুনির নীচে কুড়োতি পড়োতি যারা পড়ে থাকে তারাই স্যার 'বয়স্থা' হতে থাকে। আর যদিও বা লেখা-পড়ার ঝোঁকে দু'একটা রূপসী মেয়ে টিকে থাকে স্যার, তারা আর থাকে না।"

"থাকে না! থাকে না মানে?"

প্রাণতোষ যেন গর্জন করে ওঠে।

হরিপদ থতমত খেয়ে বলে "মানে আর কি তা'বা আর রূপসী থাকে না স্যার, সেই কথাই বলছি। ওই কেমন যেন কেলকুঁজো মেরে দুড়িয়ে গুটিয়ে যায়। দেখছি কি না সর্বদাই। তাই বলছি—"

"কিছু বলতে হবে না, থামো তুমি।"

প্রাণতোষ বিরক্তিতে চোখমুখ কুঁচকে আরো যে ক'টা দরখাস্ত বাকী ছিলো খাম ছিঁড়ে ছিঁড়ে টেনে টেনে বার করতে থাকে। এখুনি একটা লাবণ্য ভরা দৃপ্ত মুখ ঝলসে ওঠে, তো ব্যাটা-ছেলে হরিপদ গুঁইয়ের মুখের মতো জবাব হয়।

কিন্তু কোথায়?

কোথায় সেই জবাব?

ফটোগুলো ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস্ করে ছিঁড়ে ফেলে দেবার দুরন্ত ইচ্ছে কষ্টে সংবরণ করতে হচ্ছে।

কিন্তু রাণী চাইই চাই! রাণী!

শূন্য রাজাপাটের মাঝখানে আর টিকতে পারছে না প্রাণতোষ।

"আচ্ছা তুমি এখন যাও—" বলে নিজেই চেয়ার ঠেলে উঠতে গেলো প্রাণতোষ, হাঁটুটা ককিয়ে উঠলো। ক'দিন থেকে বেশ একটা যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে—হাঁটুটার মধ্যে। বললো

(ইহার পর ১৩৭ পৃষ্ঠায়)

॥ বিমলচন্দ্র ঘোষ ॥

চিরদিন মনে রেখোনা, অথবা রেখো
কিযে বলি? কি যে না-বলেও তবু বলি?
চোখে যদি পড়ে না-দেখেও তবু দেখো।
অবিরাম গতি খেয়ালেই যদি চলি।

ভুলে যাবো? ভুলে যাবো না। অথবা ভুলে
নাম করি। এরি নাম বুঝি ভালবাসা!
হায় তুমি সেই ভুলের যমুনা কূলে
ফাগুনে ফুলের দিয়েছিলে পরিভাষা।

অভিধানে যা'র মানে খুঁজে মরা মিছে
তুমি শুধু তুমি! কী যে সুমধুর তুমি!
চাঁদ ওঠে তাই উদাসী ছায়ার নিচে
বুকে ঝরা ফুল কেঁদে মরে বনভূমি।

কি কথা বলতে কী সব কথারা এসে
ভিড় করে তুমি কথাহীন কালো রাত!
অকূলে তারার ঢেউ তুলে যাই ভেসে
ছায়াপথে তবু কেন যে বাড়াও হাত?

আমায় ডাকো না! কাকে ডাকো? কেন ডাকো?
ফাঁকা আকাশের ফাঁকা মন ভরে কই?
ভালো তো বাসোনি! মনে যদি ভেবে থাকো
নিরুপায় হয়ে সংসারে তবু রই।

রাশ ছেঁড়া মন নিরাকার কালো ঘোড়া
চোখ-ধাঁধা আলো বুকে নিয়ে তবু ছোটে,
অপযশ যা'র অদেখা জগত জোড়া
ঝড়ে এলোমেলো তা'রও বুকে ফুল ফোটে!

কেন? তুমি জানো। সে জানার কোনো মানে
যদি থাকে, তবে সে-থাকা না-থাকা মিছে
চেনা সুরে চেনা বেদনার ভাষা গানে
সুরভি ছড়ায় ফাটা কবরের নিচে।

সুর তোলো মহাকালের গমকে মীড়ে
আমি যে তোমারি হাড়ের হারানো বাঁশী
বেজে যাই একা উতলা ঝড়ের নীড়ে
মনে-রাখা মনে না-রাখাই ভালোবাসি।

পুরানোদিনের কয়েক ঝলক

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

খুব ছোটবেলার কথা বলতে গেলে কেমন যেন খেই হারিয়ে যায়। অনেক দিন হয়ে গেছে। পিছনে ফেলে আসা পুরোনোর ওপর দিনে দিনে জমা হয়েছে অনেক পলি, মাটি, ভোলা আধ ভোলার অনেক আগাছা গজিয়ে উঠেছে সেই নরম মাটিতে। কতটা তার খাঁটি, কতটা বানান, তা ঠিক করাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। নিজের অজান্তেই মানুষের মন তার বুদ্ধিকে ফাঁকি দেয়। এই হল মনের ধরণ!

নিখুঁত স্মৃতিকথা তাই লেখা যায় না, লেখার মানেও হয় না কিছু। তবু পুরোনো কথা বলতেও চান সবাই, শুনতেও চান। কারণ সব মানুষেরই স্মৃতির দুনিয়াটা হল সময় সমুদ্রে হারান মস্ত একটা দ্বীপের মত। অন্যের মনের খানিকটা আলো পড়লে, নিজের মনের এই ঘুমন্ত দ্বীপটা জেগে ওঠে সকলের। এই জন্যেই সবাই বলে, গল্প শোনাও। সেই গল্পই শোনাই দু'একটা।

বয়স তখন নয় কি দশ। কলকাতার ছেলে এসেছি গ্রামে। গ্রাম্য হাল চাল জানি না একেবারেই। সমবয়স্কেরা ঠাট্টা করে সাঁতরাতে পারি না, গাছে উঠতে জানি না বলে। গুরুজনরা সর্বদা সামাল সামাল করেন, পাছে খাল বিলে ডুবে মরি। কিংবা সাপ খোপের হাতে প্রাণ হারাই।

কিন্তু ক'দিন ঠাট্টা থাকে? ক'দিনই বা চোখ চোখ করে সামলান যায় বাচ্চা ছেলেকে? অল্পে অল্পে বেশ বড় একটা দল জুটে গেল। মানুষও করে তুলল তারা দু' পাঁচ দিনের মধ্যেই। বোঝা গেল ডানপিটোমির বিদ্যায় পোক্ত হতে খুব বেশী দিন লাগে না।

প্রথম অভিজ্ঞতা খেজুর রস চুরির। ভাট আশসওড়া আকন্দভরা গ্রামের রাস্তা এঁকে বেঁকে চলে গেছে সেখপাড়ার মাঠে। মাঠের পর মাঠ। কোথাও লক লক করছে অজস্র পাটের গাছ, কোথাও ক্ষেত আলো করে ফুটেছে বেগুনী রঙের রাশি রাশি মটরের ফুল। তার মাঝে মাঝে খেজুর গাছ। সদাকাটা গলায় ঝুলছে বড় বড় মেটে কলসী। পাট কাঠির শলা দিয়ে টুপ টুপ করে ঝরছে তাতে জিরেন কাঠের টাটকা রস।

তখনো ভালো করে সকাল হয়নি। সবেমাত্র আকাশে একটু লালের আভাষ ফুটেছে, আর সেই আলোয় কিচি কিচি করে বাসা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে পাখীরা। লোক নেই, জন নেই, এই ফাঁকে কলসী নামিয়ে রস খেতে হবে।

সড় সড় করে উঠে পড়ল দু' তিনজন খেজুরে গাছে এবং এক হাতে কলসীর দড়ি ধরে আর এক হাতেই অদ্ভুত কৌশলে নেমে এল চোখের নিমেষে।

এক একটা পাটের কাঠি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সঙ্গে করে। কলসীর মধ্যে তা ডুবিয়েই চোঁ চোঁ টান। কেউ আধ কলসী, কেউ সিকি কলসী শেষ করেছে, এমন সময় নিকারিপাড়ার কোণা থেকে উঠল একটা হৈ হৈ শব্দ। লোকেরা টের পেয়েছে।

আর কি কেউ দাঁড়ায়? যে যার কলসী ফেলে দে দৌড়। দৌড়ুতে দৌড়ুতে সবাই এসে পড়লাম সেনেদের কলম বাগানে। সামনেই ছোলা মটরের খেত, কচি কচি শুঁটি ধরেছে। পোয়াল জ্বালিয়ে ঝলসান শুঁটি খেতে ভারী ভালো লাগে। সবাই লেগে গেলাম গাছ ওপড়াতে।

কিন্তু এ কি কান্ড? গলা চুলকোচ্ছে কেন? আস্তে আস্তে গলা জিভ ঠোঁট সব ফুলে উঠল। রীতিমত যন্ত্রণা হতে লাগল মুখের ভেতর।

তাঁতীদের পটলা বলল, ব্যাটারা কচু দিয়ে রেখেছিল রসের কলসীতে। চল তেঁতুল খাই গে, নয়ত শেয়াকুল। টক খেলেই ঠিক হয়ে যাবে সব।

ঠিক যা হল সে আর বলে লাভ নেই। পুরো দুদিন মুখ ফুলে রইল। রস খাবার শিক্ষা হয়ে গেল ভালো করেই। যদিও জিনিষটা জানল না কেউ।

এর পরের অভিজ্ঞতা হল ঘোড় দৌড়ের। গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় এক জাতের ছোট ছোট ঘোড়া। হাত দুই উঁচু, নাদার মত গোলগোল পেট, সবাই বলে ফকরে ঘোড়া। কাঁসারিরা এদের পিঠে বাসন বোঝাই দিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘোরে বিক্রির জন্যে। সামনের দুটো পায়ে দড়ির ছাঁদ বেঁধে এদের ছেড়ে দেয় মাঠে চরাই করতে। ঠুক ঠুক করে লাফিয়ে লাফিয়ে গাছপালা খেয়ে বেড়ায় ঘোড়াগুলো।

পটলা, গেনু, আহ্লাদ, দলের মধ্যে যারা ছিল সর্দার শ্রেণীর, এগিয়ে গিয়ে ফটাফট আটক করল চারটে ঘোড়াকে কপালের ঝুঁটি চেপে ধরে। আর একদল ছুটে গিয়ে আশপাশের নোনা আতার ডাল ভেঙে আনল এক রাশ। তা থেকে লম্বা লম্বা দড়ির মত ছাল টেনে তোলা হল। তাই দিয়ে করা হল ঘোড়ার লাগাম। তারপর পাশাপাশি চার ঘোড়া দাঁড় করিয়ে উঠল তাদের পিঠে চার পালোয়ান।

বাকীরা মাঠের কোণায় দাঁড়িয়ে হাঁক দিল, রেডী। এক, দুই, তিন! সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে পড়ল কঞ্চির ছপটি এবং পেটে গোড়ালির টোকা। ছুটল ঘোড়া চারটি খট মট খট মট করে।

যদু মোড়লের ইঁটের ভাঁটি, পুরানো নীলকুঠি, চাকন্দীর বিল, সাহেব বাগান, একে একে পার হয়ে চলে গেল তারা। প্রায় বিশ মিনিট পরে ফিরল। কে প্রথম হল, কে দ্বিতীয় হল, সে আর মনে নেই।

দ্বিতীয় কিস্তি চড়া আমাদের। আবার নূতন লাগাম পরান হল। আমি সহুরে ছেলে, অপোক্ত, তাই ছেঁড়া চট খানিকটা বেঁধে দেওয়া হল আমার ঘোড়ার পিঠে। শুনলাম তার নাম বাংলা জিন।

ধরাধরি করে তুলে দিল দুজন আমাকে একটার পিঠে। লাল ঘোড়া, শুধু কপালের খানিকটা শাদা। লাগাম ধরে বসলুম কায়দা করে আর সকলের মত। কিন্তু অবাক কান্ড, ওদের ঘোড়া ছুটল, আমার ঘোড়া এক পা এক পা করে হাটতে লাগল বুড়োর মত।

পটলা বললে, টাগল দে। টাগল কি পদার্থ, তা ত জানি না। তাই উপদেশে কাজ হল না। তখন হেই হো হো শব্দ করে উঠল তারা পিছন থেকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রমত্ত বেগে ঘোড়া ছুটল, আগের তিনজনের পিছু পিছু নয়, চাকন্দীর বিলের পাহাড়ীর দিকে।

প্রথমটা ভারী মজা লাগল। কিন্তু অল্পক্ষণেই মজা ছুটে গেল। দেখি লাগাম ঘোড়ার মুখে নেই, খানিকটা শুধু রয়েছে আমার হাতে। আর আমি ঘোড়ার পিঠ থেকে ঘাড়ে, ঘাড় থেকে পিঠে বার বার ঠিকরে এসে পড়ছি তার নাচুনির তালে তালে। এ রকম আর কতক্ষণ চলে? হঠাৎ বাংলা জিন শুদ্ধ ছিটকে পড়লাম এক রাশ কালকাসিন্দার ঝোপের মধ্যে, আর ছুটন্ত ঘোড়া বেরিয়ে গেল পাঁই পাঁই করে বিলের ঢালু পাড়ের দিকটায়।

পটলারা ছুটে এল সঙ্গে সঙ্গে। টেনে তুলল আমাকে ঝোপ থেকে।

বলল, লাগাম শক্ত করে ধরে রাখিস নি কেন?

দেখালাম লাগামের খানিকটা তখনো রয়েছে আমার হাতের মুঠোয়।

গেনু বলল, যাঃ তোর লাগাম খেয়ে ফেলেছে ঘোড়ায়।

পটলা বলল, ঘোড়াটা এখনো পিঠ দেয়নি রে। তাইতেই দৌড়ে ফেলেছে।

গালের এক পাশ, হাঁটুর কতকটা ছড়ে গিয়েছে। গালে হাত বুলোতে বুলোতে ফিরে এলাম। এই হল ঘোড়দৌড় ও তার নগদ দক্ষিণা।

পর পর দুটি স্থলের অভিজ্ঞতার পর এবার এলাম জলে এবং এবারকার অভিজ্ঞতা প্রায় অতুলনীয়।

ভৈরব নদ অন্যসময়ে খুবই শান্ত, বর্ষার সময় তার চেহারা হয় ভীষণ। কিন্তু পটলারা সেই ক্ষ্যাপা নদীতেই বেদম সাঁতার কাটে। কিনারা ধরে হেঁটে হেঁটে চলে যায় রাজপাড়া পর্যন্ত, তারপর সেখান থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে চিৎ হয়ে ভাসতে ভাসতে চলে আসে বাঁদা পাড়ায়।

দেখে আমার গায়ে কাঁটা দেয়। সহুরে ছেলে সাঁতার জানি না। আর জানলেও এই স্রোতে সাঁতরান কি কম সাহসের কথা!

একদিন দুপুরে ঋষি বলে একটা ছেলে এসে ডেকে নিয়ে গেল নদীর ঘাটে। সেখানে পটলা, গেনু, আহ্লাদ, তার ছোট ভাই প্রহ্লাদ, সবাই রয়েছে। সবাইকার হাতে এক এক খানা লগি।

পটলা বলল, চল ওপারে যাই। আখ খেতে হবে, আর কোম্পানীর মাঠ থেকে ভুট্টা।

ভয়ে ভয়ে বললাম, সাঁতার জানি না।

দূরে বোকা বলে, ওরা দেখাল সার দিয়ে বাঁধা জেলে নৌকাগুলো।

সবাই মিলে চেপে বসা হল তারি একটায়। পটলা ধরল হাল, আর সবাই হল দাঁড়ি। নৌকা চলল।

ওপারে পৌঁছেছি যখন তখন বেলা পড়ে এসেছে। নির্জন ধু ধু করা মাঠ। তার মাঝখানে মাথা সমান উঁচু আখের ক্ষেত, আইরি ক্ষেত। এক আধটা বাবলা গাছ হলদে ফুলে ঝলমল করছে। সবাই মিলে খাড়া পাহাড়ী ভেঙে ওপরে উঠছি, হঠাৎ কানে

শক্তি পরীক্ষা — রমেশ পাল

আর এক পৃথিবীর জন্যে

• • • গোপাল ভৌমিক • • •

কখন যাবো, যাবো কি আদৌ বলনা!
নাকি এ তোমার মিথ্যাই শুধু ছলনা
ভুলিয়ে আমার কৃষ্ণাকাতর মনে
গ্রহ গ্রহান্ত দেখাও সংগোপনে?
পৃথিবীকে আমি ভালবাসি, তাই তাকে
ছেড়ে যেতে চাই; যেহেতু অভীপ্সাকে
পিষে মেরে আমি বাড়াতে চাই না ভার—
প্রেমের বলায়ে সেকি নয় অনাচার?
পৃথিবী আমাকে কি আর নতুন দেবে?
লক্ষ বছর খুঁজে দেখে ভেবে ভেবে
প্রতি অণুকণা করেছি আবিষ্কার—
তাই তাপহীন প্রেমের অঙ্গীকার।
রোমাঞ্চ নেই, নেই নব বিস্ময়
এমন কি নেই আদিম কালের ভয়।
বিংশ শতকে কি নিয়ে তাহলে বাঁচি?
মহেন্জোদরো পিছনে, সামনে রাঁচি।
পিছনে হাটিতে শিখিনি বলেই বুঝি
বিজ্ঞানিগণ ঝেড়ে ঝুড়ে সব পুঁজি
চুম্বক ঝড় এবং অ্যাটম বম্
উপহার দেন; যা করে কি ছম্ ছম্?
বেদনা কোথায়? প্রেম যদি মরে যায়—
যাক না পৃথিবী রসাতলে এক ঘায়।
শূন্যবিহারী কল্পনা দিয়ে বাদ
আমি পেতে চাই নবজীবনের স্বাদ।
মঙ্গল বুধ শুক্রেরা কত দূরে
জিজ্ঞাসা করি তাইতো করুণ সুরে।
বন্ধু তুমি সেথা নিয়ে যেতে পারবে কি?
অথবা এ ছল পলায়ন বাদে মেকি!
আমি মরে যাই, মরুক পৃথিবীটাও!
কবিতাকে তুমি যদিই বাঁচাতে চাও
নতুন পৃথিবী খুঁজতেই হবে তবে
মোহের কাজল এঁকে আঁখি পল্লবে।

দিকে কোথায় একটা আওয়াজ থেকে ঝুপ করে একটা শব্দ, তারপরই ডিগবাজী খেয়ে নাচতে নাচতে মাথায় এক হাত লম্বা একটা কুমীর পড়ল জলে লাফিয়ে।

মুখে অদ্ভুত এক রকম আওয়াজ করে হাততালি দিতে লাগল পটলারা। আমি কাঁপতে লাগলাম ভয়ে। কে জানে যদি কুমীরটা উঠে আসে!

আর খাওয়া হল, ভুট্টা নেওয়া হল পরে খাবার জন্যে।

সবাই মিলে তারপর আবার নৌকায়। নৌকা হাত আষ্টেক এসেছে, পটলা তখন কিনারার দিকে কান রেখে বলল, ফেউ।

ফেউ কি?

দূর তুই কিচ্ছু জানিস নে! বাঘ বেরুলেই শেয়ালে ফেউ ডাকে।

বাঘ?

হ্যাঁ, জল খেতে আসছে আর কি। সারাদিন আখের ক্ষেতে লুকিয়ে ছিল, এখন আঁধার হতে বেরিয়েছে।

দেখা কুমীর, অদেখা বাঘ, আর দুরন্ত বর্ষার নদী। তবু এই নৌকাবিলাস ভালো লাগেনি, তা বলতে পারব না!

শেষ অভিজ্ঞতা পাখী ধরার। বোশেখ জষ্টি মাসে গাছ পালা, বন বাদাড়ে রাজ্যের পাখী বাসা করে। বনটিয়া, ফিঙে, ছাতারে, ঘুঘু, বউ কথা কও, কত রকম পাখী আসে নানা দিক থেকে। সকলকে চিনি না, নামও জানি না অনেকের।

পটলা বলল, তোদের কলম বাগানে বুলবুলির বাসা আছে। ছানা হয়েছে ছোট্ট ছোট্ট। চল ধরে আনি।

বাড়ীর পিছনেই কলম বাগান। আম জাম কাঁঠাল লিচু, রকমারি ফলের গাছ আছে। আছে কামরাঙা আর মিষ্টি কদবেলের গাছ। মাঝখানে একটা হাজা মজা পুকুর।

পটলা, আহ্লাদ, প্রহ্লাদ, আর বরুণ বলে একটা ছেলে সহ এসে হাজির হলাম দুপুরে বেলা এই বাগানে পাখীর ছানা ধরতে।

সিঁদুরে আমের গাছে বুলবুলির বাসা। মস্ত বড় গাছ, গোড়াটা তার ন্যাড়া, চাঁচা ছোলা। ধরে ওঠার মত কোন কিছু নেই।

দিগ্বিজয়ী পটলা হার মেনেছে, তাই আনতে হয়েছে বরুণকে। দুপায়ে আর হাতে ছেঁচড়ে কেমন কেমন করে উঠে পড়ল বরুণ। সটকা ডাল ধরে মাথার দিকের একটা বড় ডাল লক্ষ্য করে এগোতে লাগল। নীচেয় অপেক্ষা করছি আমরা। হঠাৎ পাতার ফাঁক দিয়ে পা দুটো দেখা যেতে লাগল বরুণের। দেখি সে ডাল ধরে ঝুলছে, তারপরই ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ল। বলল, ফোকরে গোখরো সাপ ঢুকেছে বাচ্চা খেতে। অর্ধেকটা বাইরে হিল হিল করছে।

পটলা বলল ছানাগুলো খেয়ে ফেললো। ধরতে পারলে বেশ হত রে।

সবাই এক দৃষ্টে তাকালাম ওপরের দিকে। তাইত, কালো একটা সাপ অর্ধেকটা ঢুকে রয়েছে একটা ফোকরের মধ্যে, আর তার থেকে একটু দূরে চিঁক চিঁক করে চক্কর দিয়ে ঘুরছে গোটা দুই বিব্রত পাখী। হয়ত হতভাগা বাচ্চাদের মা বাপ।

ফিরে এলাম। নিষ্ফল অভিযান, তবে কাঁচা আম, কদবেল আর পাকা কামরাঙা জোগাড় করতে ভুল হয়নি। এ ব্যাপারে ভুল হয় না কোন দিন পটলার!

এ কাহিনীর এখানেই শেষ। কেন না কলকাতার ছেলে আবার ফিরে এল কলকাতাতেই, আর সেই যে গ্রামের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল তার, সে ভাঙা সম্বন্ধ আর জোড়া লাগেনি।

এদিকে মেঘে মেঘে বেলা হয়ে গেছে অনেক, পড়ন্ত রোদ্দুরে বিকালের ছায়া। পিছনে তাকিয়ে দেখি, চেনা মাটি দূরে সরে গেছে। মাটির আশ্রয় হারিয়ে মনও তেশূন্যে ঘুরছে বিবাগী হয়ে। পুরানো দিনের গ্রাম, আর সেই গ্রামের সঙ্গে জড়ান বাল্য দিনের কথাগুলো আজ তাই নূতন করে ভাবতে ভালো লাগছে। কারণ না পাওয়াকে চাওয়া, আর হারানকে ফিরে ডাকাই ত জীবন।

তিন খানি চিঠি

হোরেশিয়ো কুই রোগা

অনুবাদক: পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

[**লেখক পরিচিতি :** হোরেশিয়ো কুইরোগা (১৮৭৮—১৯৩৭) উরুগুয়ের সালটোয় জন্মগ্রহণ করেন। কিছুদিন ব্যুয়েনস আয়ার্সে বাস করে উত্তর আর্জেণ্টিনার পরনা অরণ্যে চলে যান এবং সেখানে অনেকদিন বসবাস করেন। প্রায় একশোটি গল্প তিনি রচনা করেন, তার অধিকাংশই অরণ্যের কাহিনী। পশুর অরণ্য ও মানুষের অরণ্য দুই তাঁকে সমান আকর্ষণ করেছিল।]

এক

মান্যবরেষু,—

আমার এই কয়েকটি লাইন চিঠি আপনাকে পাঠাবার ঔদ্ধত্য মাপ করবেন। আপনার নিজের নামেই এটি প্রকাশ করবেন এই সনির্বন্ধ অনুরোধ ও আশা নিয়েই পাঠালাম। আপনাকে এরকম অনুরোধ করার কারণ এই যে, আমার নিজের নাম সই করে পাঠালে কোন পত্র-পত্রিকাই তা ছাপবে না বলেই আমার বিশ্বাস। যদি প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে আমার মনোভাবের এখানে ওখানে কিছু পুরুষালি ছোঁয়া লাগিয়ে অদলবদল করবেন, ফলে রচনাটি বরং অধিকতর মনোজ্ঞই হবে।

আমার চাকরির প্রয়োজনে দিনে দুবার করে বাসে চড়তে হয়, আর পাঁচ বছর ধরে একই রুটে যাতায়াত করছি। ফেরবার সময় কখনও বা দু-চারজন সহকর্মিণী সঙ্গী পেয়ে যাই, কিন্তু কাজে যাবার সময় একাই যেতে হয়।

বয়স আমার তেইশ, আমার চেহারা লম্বা, খুব রোগা নয়। গায়ের রঙও ময়লা নয়। আমার মুখের হাঁ অবশ্য বড় কিন্তু মুখখানা ফ্যাকাশে নয়। আমার ধারণা, আমার চোখ দুটিও ছোট নয়। আমার রূপের যে বর্ণনা দিলাম তার মধ্যে কোন বাড়াবাড়ি যে করিনি তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। তবু আমার চেহারার ওই কয়টি বৈশিষ্ট্য দিয়েই আমি অনেক পুরুষের মূল্য নিরূপণ করতে পেরেছি, আর সেই পুরুষের সংখ্যা এত যে মাঝে মাঝে মনে হয়, সব পুরুষেরই চরিত্র ধরতে পেরেছি।

আপনিও জানেন যে ট্রামে বা বাসে ওঠবার আগে পুরুষেরা জানলা দিয়ে চট করে একবার যাত্রীদের উপর চোখ বুলিয়ে নেন। আর এভাবে আরোহীদের সবখানি মুখ ভালো করে দেখে নেন। অবশ্য শুধু মহিলা যাত্রীদেরই মুখ দেখেন, কারণ তাদের সম্পর্কেই আপনাদের যা-কিছু উৎসাহ। এই আনুষ্ঠানিক বোধনটুকু সেরে নিয়ে আপনারা গাড়িতে উঠে আসেন এবং আসন গ্রহণ করেন।

বেশ তো উঠলেন। কিন্তু দরজার কাছথেকে সরে আসতে পেরেছেন কি অমনি ভিতরটা একবার ভালো করে দেখে নিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে নিতে পারি, মানুষটি কি ধরণের। সে সত্যি সত্যি কোথাও যাবার তাগিদেই বাসে চড়েছে, না, কোন শিকার ধরবার সহজ উপায় হিসেবেই দশটা পয়সা খরচ করছে তা বুঝতে আমার কোন অসুবিধা হয় না। কে ভালোভাবে আরামে যেতে চায়, আর কে কষ্ট করেও মেয়েদের পাশে অল্প জায়গা থাকলেও সেখানেই বসতে আগ্রহ বোধ করে, আমি দেখলেই তা বুঝতে পারি।

আমার সীটের পাশের অংশ যখন খালি থাকে, জানলা দিয়ে তাকানো দৃষ্টি থেকেই চটপট বুঝে নিতে পারি, কে একেবারে উদাসীন, যে-কোন জায়গায় হোক তার বসলেই হল। কারুর উৎসাহ পরিমিত, বসবার পর একবার ধীরে মাথা ঘুরিয়ে আমাদের ওপর চোখ বুলিয়ে নেবে, আর সব শেষে কারুর বা উৎসাহ এত বেশী যে, সাতখানা খালি আসন ছেড়ে দেবে সেই কোণে এসে আমার পাশের খালি জায়গাটুকুতে কষ্টেসৃষ্টে বসতে।

বুঝতেই পারছেন, এই শেষোক্ত লোকগুলি নিয়েই আমাদের যা-কিছু মাথাব্যথা। যেসব মেয়ে একলা বাসে ট্রামে চলে তাদের অভ্যাস হল পুরুষ-যাত্রী পাশে বসতে এলে দাঁড়িয়ে উঠে জানলার পাশের আসনটি তাকে ছেড়ে দেওয়া। আমার কিন্তু উল্টো ব্যবস্থা। নিজেই জানলার ধারে সরে গিয়ে নবাগতকে অনেকখানি জায়গা ছেড়ে দিই।

অনেকখানি জায়গা! কথাটা কিন্তু অর্থহীন। কোন মেয়ে যদি আসনের তিনপোয়া জায়গাও ছেড়ে দেয়, পুরুষ আরোহীর পক্ষে তাও যথেষ্ট নয়। বেশ খানিকটা যথেচ্ছ নড়াচড়ার পর ভদ্রলোক হঠাৎ আশ্চর্যরকম নিশ্চল হয়ে যান। মনে হয়, যেন পাথর বনে গেছেন। কিন্তু সেটা কিন্তু কেবল বাহ্যিক প্রকাশ। কারণ, এই অচল অবস্থা যদি কেউ সন্দিগ্ধ চোখ নিয়ে লক্ষ্য করেন, দেখবেন, ভদ্রলোকের দেহটি খুব সূক্ষ্ম চতুরতার সঙ্গে ধীরে ধীরে জানলার দিকে সরে চলেছে। তার উদাসীন মনোভাবের সঙ্গে দেহের এই অলক্ষণীয় গতির একটা শোভন সামঞ্জস্য থাকে। মেয়েটি বসে আছে জানলার ধারে, সেদিকে ভদ্রলোকের দৃষ্টি নেই। দেখলে মনে হবে, এতটুকু আগ্রহও নেই কেউ পাশে বসে আছে কিনা, অথচ দেহটি তার অদৃশ্যভাবে সেদিকে আকৃষ্ট হয়ে এগোচ্ছে।

এই হল এদের রেওয়াজ। দেখলে হলপ করে বলা যাবে, নিশ্চয়ই সে চান্দ্রতত্ত্ব চিন্তা করছে। ওদিকে কিন্তু সারাক্ষণ তার ডান-পাখানি (কখনো বা বাঁ পা) অতি সূক্ষ্মগতিতে সেই একই চাল বেয়ে একই দিকে এগিয়ে চলেছে।

আমি স্বীকার করছি, ব্যাপারটা যখন ঘটে চলে, আমি যে খুব বিরক্ত বোধকরি, তা নয়। জানলার দিকে আরো সরে যাবার সময় আমি একঝলক দেখেই তার বীরত্বের পরিমাপ করে নিতে পারি। বুঝতে পারি মানুষটি সহজ আবেগ এড়াতে না পারার মত সাধারণ প্রাণবন্ত মানুষ অথবা ঝানু ওস্তাদ, আমাকে জ্বালাবার মতলবে আছে। বুঝতে পারি, সে ব্যবহারে ভদ্র, না কুরুচিপূর্ণ লোক। পাকা চোর, না, চতুর পকেটমার, কোন তরুণীর মনে একটু নাড়া দিয়েই সে খুশী, না, তাকে পিষে মারবার মতলব।

এটা সহজেই মনে হতে পারে যে, 'মুখে ভণ্ডামির মুখোস পরে ধীরে ধীরে পা চালিয়ে

হাট ফেরৎ — সমরেন্দ্রনাথ মিত্র

দেওয়ার দুষ্টামি এক শ্রেণীর লোকই করে থাকে—সে হল চোর। কিন্তু তা ঠিক নয় এবং যে-কোন মেয়ে একথা আপনাকে বলবে। প্রতিটি ভিন্ন ধরণের লোক প্রসঙ্গে বিশিষ্ট মত প্রকাশ করা চলে। কিন্তু মোটামুটি বলা যেতে পারে যে, পাশে বসা লোকটি যদি তরুণ হয়, তার পোষাক দেখেই বোঝা যায়, সে পকেটমার কিনা।

লোকগুলি যে কত রকমের কৌশল করে তার ঠিকানা নেই। প্রথমে আচমকা কাঠ হয়ে গিয়ে চাঁদের কথা ভাবছে এমন ভাব দেখায়। তারপরেই চকিতে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় পার্শ্ববর্তিনীর দেহের উপর। সে দৃষ্টি দ্রুত চালিত হলেও এক নিমেষের জন্য মুখের উপর থমকে যায়। কিন্তু এই দেখে নেওয়ার মূল উদ্দেশ্য দুজনের পায়ের মধ্যেকার দূরত্বটা মেপে নেওয়া। খবরটুকু সংগ্রহ হয়ে গেল, এবার জয়যাত্রা সুরু।

আপনারা—পুরুষেরা—একবার জুতোর ডগা আর একবার জুতোর গোড়ালি ঘুরিয়ে পা সরিয়ে নেবার যে কৌশলটি করেন, ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ হাস্যকরই মনে হয়। আপনারা হয় তো রসটা ধরতে পারেন না, কিন্তু একদিকে উপর-মুখো বোকা-বোকা হাসিমাখা মুখ, হয় তো ভাবাবেগেরই প্রকাশ, আর একদিকে এগার নম্বরের জুতো—এই দুয়ের মধ্যে ইঁদুর-বেরাল লুকোচুরি খেলা। পুরুষজাত যতই উদ্ভট কান্ডই করুক না কেন, এর সঙ্গে কোন কিছুরই তুলনা চলে না।

আগে বলেছি, আমি এতে বিরক্ত হই না; কেন মজা পাই তা বলছি। যেই মুহূর্তে মদনচরটি কতটা পা সরাতে হবে তা খুঁটিয়ে বুঝে নিয়েছেন, তারপর থেকে এক নিমেষের জন্যও তাঁর দৃষ্টি নিম্নগামী হয় না। দূরত্বের পরিমাপ সম্বন্ধে তিনি এতখানি নিশ্চিত যে, বার বার তাকিয়ে আমাদের সাবধান করে দিতে চান না। ব্যাপারটা আশা করি বুঝতে পারছেন। ওরা প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ চায়, শুধু দেখে তৃপ্তি পায় না।

এই পর্যন্ত তো হল, পাশের আসনের শিষ্টদর্শন ব্যক্তিটি অর্ধেক এগোতে না এগোতেই আমিও সেই খেলায় যোগ দিই। তারই মত চালাকির সঙ্গে পার্শ্ববর্তী সম্বন্ধে উদাসীন, অথচ অন্য বিষয়ে গভীর চিন্তামগ্ন—এই ভাব করে তাকে নিয়ে পুতুল খেলা সুরু করি। শুধু আমার পায়ের গতি হয় উল্টো দিকে, অর্থাৎ তার পা থেকে বিপরীতে সরিয়ে নিই। বেশী দূরে নয়, ইঞ্চি দুয়েক হলেই যথেষ্ট।

বেশ মজা লাগে দেখতে। কি হতাশায় মুখখানি ভরে যায় যখন তার রাজুলচরণ হিসেব মত যথাস্থানে এগিয়ে এসেও স্পর্শ করার মত কিছুই পায় না—একেবারে শূন্য! বেচারা এগারো নম্বরের জুতো নিঃসঙ্গ অবস্থায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। এ দুঃখ কি সহ্য করা যায়? একবার মেঝের দিকে তাকায়, তারপর আমার মুখের দিকে। আমার চিন্তা কিন্তু তখনো হাজার মাইল দূরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর পুতুলটি নিয়ে খেলা করছি। কিন্তু এতক্ষণে অবস্থাটা ও বুঝতে শুরু করে।

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে হিসেব করেই বলছি, সতেরো জনের মধ্যে পনেরোজন লোক বিরক্তি সৃষ্টি করতে এসে নিজেরাই বিরক্ত হয়ে প্রচেষ্টা ছেড়ে দেয়, কিন্তু বাকী দুজনের বেলায় বাধ্য হয়েই আমাকে শাসনসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হয়েছে। সে দৃষ্টিতে রাগ, ঘৃণা বা অপমানবোধ—কোন ভাব প্রকাশেরই প্রয়োজন হয় নি। এমন কি, সোজাসুজি তার দিকে তাকানোরও দরকার হয় নি। মাথাটা তার দিকে একটু ঘোরানোই যথেষ্ট। এ সব ক্ষেত্রে দৃষ্টি-বিনিময় না করাই ভাল। হঠাৎ যখন মানুষটা আমার প্রতি গভীর ও সত্যিকার আকর্ষণ বোধ করেছে তখন চোখাচোখি হবার দরকার কি? পকেটমার যে সাংঘাতিক চোর হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে না তার কি স্থিরতা আছে! যারা খাজাঞ্চি, অনেক টাকার পাহারাদার হয়ে বসে থাকতে হয়, যাদের, তারা ব্যাপারটা জানে, আর জানে যে কোন তরুণী, যে খুব রোগা নয়, রঙ যার ময়লা নয়, মুখের হাঁ যার বড় আর চোখ দুটিও ছোট নয়—এমন চেহারার অধিকারিণী।

ভবদীয়

এম. আর

দুই

সুচরিতেষু,

আপনার পত্রের জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আপনার অনুরোধমত আপনার অভিজ্ঞতা-বিষয়ক নিবন্ধে আমি সানন্দে নিজের নাম সই করব। তবু আপনার সহ-লেখক হিসেবে একটা বিষয় জানবার জন্য বড় কৌতূহল বোধ করছি। যে সতেরোটি বিশিষ্ট পার্শ্বযাত্রী পুরুষের কথা আপনি বলেছেন, তাছাড়া কোন পাশে বসা পুরুষযাত্রীর প্রতি আপনি নিজে কি একটুও আকর্ষণ বোধ করেন নি!—সে লোকটি বেঁটে বা লম্বা, ফরসা বা কালো, রোগা বা মোটা—যাই হোক না কেন। মনের গোপন কোণে এমন কি, অবচেতন অংশে—এতটুকু লোভও কি কোন দিনই হয় নি—যার ফলে পা সরিয়ে নিতে আপনার ভালো লাগেনি, বরং অস্বস্তিই বোধ করেছেন।

এইচ. কিউ

তিন

মাননীয়েষু,

সহজ স্বীকারোক্তি করছি। একবার, জীবনে মোটে একবার আমি পার্শ্ববর্তী কোন পুরুষ-যাত্রীর কাছে আত্মসমর্পণে প্রলুব্ধ হয়েছিলাম। অর্থাৎ কি না, পা সরিয়ে নিতে যে আলস্যের কথা আপনি বলেছেন তা বোধ করেছিলাম। সে পুরুষ আপনি স্বয়ং কিন্তু সে সুযোগ গ্রহণের মত বুদ্ধি আপনার ছিল না। ইতি—

এম. আর
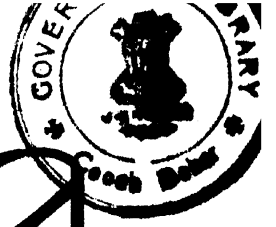
চেনা চেনা গলার স্বর। মিনতি করছে। কিন্তু কিছুতেই ভেতরে ঢুকতে দেবেন না নরেনবাবু। তিনি বেশ জোরে কথা বলছেন। তাঁর প্রত্যেকটি কথা কানে আসছে সুরমার। বিছানায় শুয়ে উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন সুরমা। ওঠবার ক্ষমতা নেই। নাহলে বাইরে এসে মেয়েকে দেখে যেতেন একবার। সুরমার বুঝতে দেরী হয় না অসুখের খবর পেয়ে নমিতা এসেছে তাঁকে দেখতে।

একমাত্র নমিতারই পথ রোধ এমন করে করতে পারেন নরেনবাবু। আর কাউকে বাইরে থেকে কর্কশ স্বরে বিদায় করে দিতে পারেন না তিনি। বিছানায় শুয়ে হঠাৎ ছটফট করতে থাকেন সুরমা। বিরক্ত হয়ে ওঠেন মনে মনে। স্বামীর ওপর নয়। মেয়ের ওপর।

কি দরকার ছিল সোহাগ দেখাতে আসবার। এতই যদি টান মায়ের ওপর তাহলে অদ্ভুত বিয়েটা করবার সময় সেকথা খেয়াল ছিল না কেন। অদ্ভুত বৈকি। অমন বিয়ে এ বংশে আর কেউ কখনও করেনি। হোকনা কলকাতার বনেদী বংশের ছেলে। তা বলে তার জন্যে জাতকুল বিসর্জন দিতে হবে।

ভেতরে ভেতরে কখন রস ঘন হয়ে উঠেছিল একেবারেই বুঝতে পারেননি সুরমা। একটুও সন্দেহ করতে পারেননি মেয়েকে। যদি পারতেন তাহলে শুরুতেই সে-পথে কাঁটা দিতেন। কলেজের খাতা থেকে সবচেয়ে আগে নাম কাটিয়ে দিতেন। চোখের আড়াল করতেন না এক মিনিটের জন্যেও। দেখা যেত বাপ-মায়ের অবাধ্য হয়ে ভিন্ন জাতে বিয়ে করবার সাহস মেয়ের কেমন করে হয়। কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন ওসব কথা ভেবে আর লাভ নেই।

না জানিয়ে বাড়ি থেকে চলে গিয়ে বিয়ে অবশ্য করেনি নমিতা। কিন্তু জানিয়েছিল ঠিক সময়। একদিন আগে পরে নয়। জানিয়েছিল যেদিন বিয়ে করল সেইদিন।

নমিতা বলল ভেবে ভেবে আস্তে আস্তে বেশ গুছিয়ে। কিছু গোপন না করে জানিয়ে দিল সুরমাকে। যেন তিনি ঘাড় নেড়ে সায় দেবেন—যেন ব্যাপারটা সহজ এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি যাওয়ার মতোই। বাপের সঙ্গেও কোন দ্বিধা না করে সমানে তর্ক করল নির্লজ্জ মেয়ে। আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন সুরমা। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে অনেক সময় লেগেছিল তাঁর।

এ বিয়ে তুমি করতে পারবে না—কিছুতেই না। এমন বিয়ে এ বংশে কেউ কখনও করেনি—

কেউ করেনি বলে যে কেউ কখনও করতে পারবে না এমন কোন অমোঘ নিয়ম নেই।

একশ' বার আছে। আমাদের মুখে কালি ছিটিয়ে যাবার কোন অধিকার তোমার নেই।

কালি ছিটিয়ে যাচ্ছে কে? সত্যকে মেনে নেওয়ার নাম কালি ছিটোনো নয়।

কিন্তু তোমার বংশের দাম নেই?

তার চেয়েও অনেক বেশি আমার মনের দাম।

থাম। ভিন্ন জাতের ছেলেকে নিয়ে বড়াই কর না। আমরা কি ভাল ছেলের সন্ধান আনতে পারতাম না?

জানি না।

জাত কুল ভুলে নীচে নামবে তুমি? আর কারুর কথা না ভেবে নিজের স্বার্থ বড় করে দেখবে?

তোমরাই বা আমার কথা না ভেবে শুধু নিজেদের স্বার্থের কথা ভাববে কেন? রূপ, গুণ বিদ্যাবুদ্ধি অর্থ—কোনদিক থেকেই অরবিন্দ কারুর চেয়ে ছোট নয় বরং অনেক বড়—

সব চেয়ে বড়—

দুজনকে থামিয়ে দিয়েছিলেন নরেনবাবু। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। বাধা দিয়েও লাভ হবে না। করুক নমিতা যা খুশি। না মানুক নিয়ম। কিন্তু যতদিন বেঁচে থাকবেন নরেনবাবু ততদিন তিনিও তাঁর নিজের সত্যকে ছাড়বেন না। ততদিন মেয়ের মুখ দেখবেন না তিনি। সন্তান বলে স্বীকার করবেন না তাকে। সে যেন কোনদিন কোন কারণেই তাঁদের কাছে আর না আসে! নমিতার বিয়ে মৃত্যু বলেই ধরে নেবেন তিনি।

চমকে উঠেছিলেন সুরমা। সামলে নিয়েছিলেন পরমুহূর্তেই। তাঁর স্বামীর প্রত্যেকটি কথা তাঁকেও মেনে নিতে হবে। এ পরিবার থেকে চলে যাক নমিতা। মরে যাক। মৃত্যু-

শোকের মতোই আঘাত দিয়ে ফুরিয়ে যাক একেবারে।

তারপর নরেনবাবুকে দেখতে দেখতে আশ্চর্য হয়ে গেছেন সুরমা। অটল ধৈর্যের সঙ্গে তিনি সব সহ্য করেছেন। মেয়ের নাম মুখে আনেননি একদিনও। যার খুশি সে চলে যাক। কিন্তু এবাড়ির একটা নিয়ম আছে। এখানে যারা বাস করবে তাদের সে-নিয়ম মানতে হবে বৈকি। অসামান্য ব্যক্তিত্ব নিয়ে নিয়ম মেনে চলেছেন নরেনবাবু।

মাঝে মাঝে বরং সুরমাই অন্য সুর গেয়েছেন। মেয়ের জন্যে আকুল হয়েছেন। জামাইকে দেখতে চেয়েছেন। করুণ মুখে নরেনবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করেছেন। দাগ কাটবার চেষ্টা করেছেন তাঁরও বুকে।

কিন্তু নরেনবাবু নির্বিকার। ভাবে-ভঙ্গিতে তিনি এই কথাটাই সুরমাকে বুঝিয়েছেন যে, মৃতের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখা যেমন সম্ভব নয়, নমিতার সঙ্গে দেখা হওয়াও তেমনি অসম্ভব। কাজেই মনের ক্ষীণতম ইচ্ছাকেও যেন সুরমা প্রশ্রয় না দেন।

প্রশ্রয় দেননি সুরমা। মনপ্রাণ দিয়ে নরেনবাবুকেই মুগ্ধ বিস্ময়ে অনুকরণ করেছেন। একের পর এক ছিঁড়ে ফেলেছেনে নমিতার চিঠি। অনেক চিঠি লিখত সে প্রথম প্রথম। ক্ষমা চেয়ে, অন্যায় স্বীকার করে, অরবিন্দকে নিয়ে একবার এবাড়িতে আসবার অনুমতি প্রার্থনা করে। কিন্তু কোন চিঠির উত্তর দেননি সুরমা। সাহস পাননি নরেনবাবুকে এসব কথা জানাবার।

সুরমা অন্তিমশয্যায়, সে খবর কোথা থেকে পেয়ে সব ভুলে তাঁকে দেখতে এসেছে নমিতা। তাঁর মাথার কাছে সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। কিন্তু প্রেতচ্ছায়া এ সংসারে প্রবেশ করতে পারে না। সেই কথাটা তাঁকে জোর গলায় বুঝিয়ে দিচ্ছেন নরেনবাবু। নিজের স্বার্থের জন্যে সে নিয়ম ভাঙতে পারে কিন্তু অন্যকে দিয়ে নিয়ম ভাঙাতে পারে না। প্রেতিনীর কোন অনুরোধ মানবেন না নরেনবাবু। কিছুতেই বাড়ির ভেতরে সে ঢুকতে পাবে না।

সুরমা দুই কান খাড়া করে সব শুনলেন। তাঁর কাছে আসতে পারল না নমিতা। আর একজন কে নরেনবাবুর কথা শেষ হবার পর বলে উঠল, নমিতা চল ফিরে যাই। গলা শুনে আন্দাজে সুরমা ধরতে পারলেন—তাঁর জামাই। ওরা দুজনে এসেছে তাঁকে দেখতে একসঙ্গে। মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল সুরমার। হয় তো আর বাঁচবেন না তিনি। জামাইকে কোন যত্ন করতে পারবেন না কোনদিন। তাঁর সঙ্গে আর কারুর দেখা হবে না। বড় বংশের ছেলে। বাইরে থেকে বিতাড়িত হল। কোন্ পরিচয় পাবে সে নমিতার বাপ-মায়ের! শেষবারের মতো, মাত্র অল্প সময়ের জন্যে তাঁর মাথার কাছে এসে তাদের দাঁড়াতে দিলেই তো পারতেন নরেনবাবু। একটু কান্নাকাটি, একটু মিষ্টিমুখ, একটু আদর-যত্ন—তাহলেই শান্তিতে মরতে পারতেন সুরমা। মরবার সময় আর কোন দুঃখ থাকত না তাঁর।

অন্ধকার হয়ে এসেছে। অল্প অল্প শীতের আমেজ আছে হাওয়ায়। ম্লান আলো জ্বলছে সুরমার ঘরে। আস্তে আস্তে নরেনবাবু এসে বসলেন খাটের পাশে। কোন কথা বললেন না। অটল ব্যক্তিত্ব তাঁর। সুরমা জানে ওদের সম্পর্কে কোন কথাই তুলবেন না তিনি।

ছটফট করতে লাগলেন সুরমা। ভেবেছিলেন তিনিও চুপচাপ থাকবেন। যেন জানতে পারেননি ওদের আগমন। জয় করে নেবেন ভাবপ্রবণ কতগুলো দুর্বল মুহূর্তে। কঠিন নির্বিকার হয়েই থাকবেন নরেনবাবুর মতো। বংশের সুনামের কথা ভেবে মনের জোর বজায় রেখে শেষ নিশ্বাস ফেলবেন। কিন্তু বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারলেন না সুরমা।

ওদের কয়েক মিনিটের জন্যে—ইতস্ততঃ করলেন সুরমা, আমার কাছে আসতে দিলেই তো পারতে—ভেবেছিলেন সেই পুরোনো কথাই বলবেন নরেনবাবু। যে ইহলোকে নেই তাকে আনা যায় নাকি ঘরের ভেতরে। নমিতা তো মরে গেছে ওর বিয়ের দিন। কোন কথা বললেন না নরেনবাবু। মাথা নিচু করে সুরমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন চুপচাপ।

বেশি দূরে তো যায়নি, ওঠবার চেষ্টা করে আবার বললেন সুরমা, যাবে? ডেকে আনবে? মেয়ে-জামাইকে এক সঙ্গে দেখব না? তবু নির্বিকার নরেনবাবু। তবু কথা বলেন না। সুরমা তাঁর হাত চেপে ধরলেন। অনুনয় করলেন। ওরা আসুক। ওরা তাঁকে দেখে যাক মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে। আর কোনদিন ওদের দেখতে চাইবেন না সুরমা।

তারপর কি হবে? কঠিন নয়, নির্বিকার নয়, আর্তের মতো গলার স্বর নরেনবাবুর, বড়লোকের ছেলে। বসতে দেব কোথায়? ওই ভাঙা চেয়ারে? যদি থাকতে চায়, মেয়ে-জামাইকে থাকতে দেব কোথায়? এই একটিমাত্র দম বন্ধ করা ছোট ঘরে? খেতে দেব কি? বড়লোক জামাইকে যত্ন করবার পয়সা কোথায়? একটু চুপ করে থাকেন নরেনবাবু, ব্যবধান থাক সুরমা। বাইরে থেকে ব্যক্তিত্বের দম্ভ দেখে মনে মনে শ্রদ্ধা নিয়ে জামাই ফিরে যাবে। কিন্তু ব্যবধান ঘুচিয়ে ভেতরে আসতে দিলে ও কৃপা করবে। দারিদ্র্যকে শ্রদ্ধা করতে পারে নাকি কেউ?

কথা শুনতে শুনতে বিমূঢ় হয়ে যান সুরমা। একটা বিরাট পর্বত যেন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে তাঁর চোখের সামনে। নরেনবাবুর হাত ঠেলে দূরে সরিয়ে দেন তিনি। বাইরে থেকে শ্রদ্ধা নিয়ে ফিরে যাক মেয়ে-জামাই। কিন্তু ভেতর থেকে স্বামীর ওপর শ্রদ্ধা নিয়ে কেমন করে এ সংসার ছেড়ে যাবেন তিনি। একটু আগে তাঁর মৃত্যু হলেই ভাল হত—ওদের বিদায় করে নরেনবাবুর ভেতরে আসবার ঠিক আগের মুহূর্তে!

গাধা গাধাই

গাধার পিঠে মণিমাণিক যত চাপাও, হায়
গাধা তবুও চিরটাকাল গাধাই থেকে যায়।
ডক্টর টমাস ফুলার।

দিল্লীর পথে ট্রেনে

কৃষ্ণ ধর

মনে হয় কতোদূরে, তবু
কতো কাছে এলে তুমি,
আমার যান্ত্রিক মন ছুঁয়ে গেলে,
ছুঁয়ে গেলে তুমি,
শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছে
নিলে পথের ধূলোকে
হৃদয়ে উত্তাপ দিলে, স্পর্শ
দিলে তোমার আলোকে।

কথা তুমি কম বলো,
চোখে তাই জ্বলেছে ইঙ্গিত
শর্তভিষা তারা যেন, আকাশের জেনেছো সংগীত
নীরবে, নিভৃতে কোনো মৌন,
স্থির সন্ধ্যার হাওয়ায়
বাউল মেঘের ডাকে, শ্রাবণের অশান্ত ধারায়;
তুমি তো তারই সংগী,
নয়নে আকাশ নিয়ে আছো,
কখনো আনন্দ নিয়ে, কখনো কান্নাকে ভুলিয়াছো।

আমার মনের ট্রেন পার হ'ল বহু নদী নদ,
দ্রুততালে মধ্যরাতে নিদ্রাহারা তোমার সে মন
কতোদূরে, পেল নাক তার
কোনো অজানা ঠিকানা,
আমার চলন্ত মন সমুদ্র
আকাশ পথে করে আনাগোনা।

সন্ধ্যা হলো, পার হই শোণ নদী, তবুও এলো না,
বাতায়নে একবার বললে, না, এভাবে মেলেনা
হৃদয়ে অতল জল, ডুব দাও অনেক গভীরে,
আর কবে পাওয়া যাবে সেই মুখ জনতার ভীড়ে।

বাদশাহী দিল্লীর পথে, কুতুবে কিম্বা ওখলায়,
দৃশ্যপট বারবার নানা বর্ণে কেবলি বদলায়।
অকস্মাৎ দেখা দিলে, মিশে গেলে কনট সার্কাসে,
বাসকসজ্জিকা সন্ধ্যা, ছায়া
নামে দিল্লীর আকাশে।

আলো জ্বলে, হৃদয়েতে কান্না
জমে, কার অপেক্ষায়,
এবার দিল্লীর ট্রেন ফিরে যাবে সেই কলকাতায়।

সূর্যমুখী

গৌর দত্ত

‘ফ্লু’
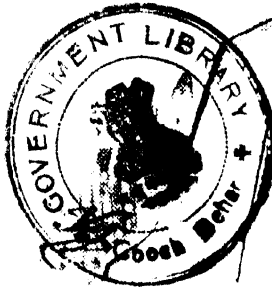
সম্বুদ্ধ

সুনীতিকুমার বসু।

লোকটি ভাল। বয়স একষট্টি। একষট্টি বছর বয়সের নায়ক বললে যাঁর আপত্তি, তিনি দুর্গাদাস বাঁড়ুয্যেকে স্মরণ করবেন।

লোক ভাল, আগেই বলেছি। স্বাস্থ্যও ভাল। বেশী লম্বা নয়—বেশী বেঁটেও নয়—বেশী রোগা নয়—বেশী মোটা নয় চেহারা। ফর্সা রং। মাথায় সামনে টাক পেছনে কালো চুল। গোঁপ আছে দাড়ি নেই। পান, তামাক, চা খান না। মাছ মাংস আগে খেতেন, হালে ছেড়ে দিয়েছেন, যদিও দাঁত এখনও মজবুত। বার্মাশেলের অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট ছিলেন। ষাট বছর বয়স হল বলে গেল বছরে রিটায়ার্ড হয়েছেন। টায়ার্ড হননি, তা সত্ত্বেও।

আদি দেশ ছিল ঢাকায়। আদত মালখানগরের বোস। ঘোর কুলীন। মাতুলগোষ্ঠী ছিলেন বানারিপাড়ার গুহঠাকুরতা। ঢাকার বুদ্ধি আর বরিশালের জিদ দুটোই পুরোমাত্রায় পেয়েছেন উত্তরাধিকার সূত্রে এবং অনেকটা সেই কারণেই, সর্বদিক দিয়ে এমন সুপাত্র হয়েও তাঁর পাত্রী জোটেনি। চেষ্টা অবশ্য হয়েছিল, খুবই হয়েছিল। তাঁর যখন মাত্র চোদ্দ বছর বয়স, তখনই পাত্রীর খোঁজ করেছিলেন দুই কুলের ঠাকুরদারা আর দাদামশাইরা।

তবু হ'ল না। বিয়ে করবার স্বপ্ন মনে ছিল না এমন নয়, তবু কী-যে মন্ত্র কানে ঢুকিয়ে দিলেন ইস্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার—সিধে বলে দিলেন, বাল্য-বিবাহ আমি করব না।

তাই নিয়ে লাঠালাঠির উপক্রম। লাঠি যত উঁচু হয়, পিঠ তত বেঁকে ওঠে। শেষে এক ঠাকুরদা বললেন, আমি কথা দিয়েছি যে।

বললেন, আমি দিই নি। কথা দিয়ে থাকেন, যিনি দিয়েছেন তিনিই রাখুন। তাঁরা পিঁড়ি চিত্তির করে থাকেন, আপনিই বসে পড়ুন।

ঠাকুরদা হুংকার করে বললেন, তাই পড়ব বসে। তখন বুঝবি, কী রত্ন হেলায় হারালি।

ঠানদিদি-কন্সার্নড্ ফোঁস করে বললেন, তার মানে?

এর পরে আলোচনাটা স্বভাবতই অন্য পথে দাঁড়িয়ে চলে গেল। সুনীতির কথা আর মনেই করলে না কেউ।

চোদ্দর পরে চব্বিশ। আবার ঘটকের আনাগোনা। ঠাকুরদারা তখন অন্তর্হিত। জ্যেঠামশাই বললেন, টাকা শুনে কী করব ঠাকুর, টাকা ঢের লোকের আছে। কুল চাই। বুঝছ ত, এদিকে মালখানগর ওদিকে বানারিপাড়া, কোন্ ঘরের মেয়ে দেবে?

ঘটক বললেন, আজ্ঞে, সে ভাবনা আমার। সাতপুরুষের কুলজী যাচাই করে নেবেন, সাত পুরুষের মাতৃকুল মাতামহীকুল অবধি—দোষ বার করতে পারেন ত আমার কান কেটে নেবেন।

—কান আর কাটব কোত্থেকে, তুমি ত দু'কান কাটা। বেশ, দেখাও কুলজী, বুঝি কেমন মেয়ে।

—মেয়ে আজ্ঞে আপনাদের জানাই বলতে গেলে।

ঘটক বাণ্ডিল-বাঁধা খাতাপত্তর খুলে বসেছেন, জ্যাঠাইমা এসে বললেন, ও আর খুলে কি হবে। ছেলের কথা শুনেছ?

—কি কথা?

—কুলীনের মেয়ে হলে সে বিয়ে করবে না।

—অপরাধ?

—বলছে, ওসব কুসংস্কার।

জ্যাঠামশাইর হাতে ছিল মস্তবড় শ্বেতপাথরের গ্লাস, তাতে ভর্তি সিদ্ধির শরবৎ। সেই গ্লাসে ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছিলেন, আর কথা বলছিলেন। থেমে, চুপ করে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর—গ্লাসটাকে ছুঁড়ে মারলেন, ঘর পেরিয়ে দেয়ালে লেগে গ্লাস টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। ঘটক খাতাপত্তর দু'হাতে জড়িয়ে নিয়ে কেটে পড়লেন, ধীরে সুস্থে বেঁধে নেবার সময় হ'ল না।

এর পরে, চৌত্রিশ। চাকরি নিয়ে, কায়েম হয়ে বসেছেন সেও পাঁচ সাত বছর হ'য়ে গেল। জ্যাঠামশাই জ্যাঠাইমা নেই। বাপ-মা গিয়েছেন আরও আগে। আছেন শুধু ছোট পিসীমা। বাল-বিধবা, এই সংসারেই চিরদিন। সুনীতির চেয়ে বছর পনেরোর বড়, কোলে-কাঁখে করেছেন ছেলে বেলা থেকে।

বললেন, সব ত হ'ল নিতু, এবার বিয়েটা কর, আমি দেখে যাই।

সুনীতি মস্ত মোটা খাতা খুলে হিসেব কষছিলেন। চোখ না তুলেই বললেন, যাচ্ছ কোথায়?

—আর কোথায়। বয়স হ'ল, এখন মরতে হবে না?

—এই কথা। তা, তার সঙ্গে আমার বিয়ের সম্পর্কটা কোথায়? বৌ না এলে তোমার মুখাগ্নি হবে না?

—বাজে কথা ছাড়। বিয়ে করবি কি করবি না, সোজা কথায় বল।

—এই বয়সে? মাথা খারাপ!

বলে সুনীতি আবার নশো-সাতানব্বই ইন্টু এক্শো-তিরাশির হিসেব করতে লাগলেন। মাথাই খারাপ, আর কারো না হোক এই কোম্পানীর—তারও মাথাটাকে খারাপ না করে ছাড়বে না। নশো-সাতানব্বই টাকা লোককে মাইনে দেবার কোন মানে হয়? আর তিনটে টাকা বাড়িয়ে দিলে যে হিসেব কষা কত সোজা হয়ে যায়, তা বুঝবে?

পিসীমা অনেকক্ষণ থম খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন, আমি কাশী যাব। আমাকে পাঠিয়ে দে।

—না। কাশী সর্দি ম্যালেরিয়া কিচ্ছু হবে না তুমি। তুমি যাও, আর আমি ভাত রেঁধে দেবার জন্যে বুড়ো বয়সে বৌ খুঁজে বেড়াই। ইয়ার্কি পেয়েছ?

—ইচ্ছে করে, ঠাস্ করে একটা চড় বসিয়ে দিই। বৌ আসবে না, চিরদিন আমি রেঁধে খাওয়াব তোমাকে? মরব না?

—তার কী ঠিকানা আছে। আমিও ত আগে মরতে পারি।

চড়টা ঠেলেই উঠছিল হাতে। সেটাকে সামলে নিয়ে পিসীমা উঠে চলে গেলেন। হয়তো সামলাবার জন্যেই খুব তাড়াতাড়ি।

তারপর আরও ছাব্বিশ বছর কেটেছে। বিয়ের কথা আর ওঠেনি। পিসীমা তুলতেই দেননি কাউকে। জিদ? বেশ, দেখি না কার জিদ বড়। তুই মালখানগরের বোসের ছেলে, আমিও সেই মালখানগরের বোসেরই মেয়ে।

ছাব্বিশ বছর কেটে গেল। সুনীতি আপিস করেন, পিসীমা রান্না করেন। রাঁধুনী বামুন তিনি ঢুকতে দেবেন না বাড়িতে। বললে বলেছেন, ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আসবে, তার হাতে ভাঁড়ার তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরব—তাই করতে দিলে না হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া শুয়োর। থাক, আমার মায়ের হাতের হাতাখুন্তি আমার হাতেই থাকবে যতদিন আছে। মাইনে-করা চাকরের হাতে সেই হাতা তুলে দেব আমি? নিজের হাতে?

সুনীতিও কোনদিন কিছু বলেন নি। একবার মাত্র বলেছিলেন, বছর দশেক আগে। পিসীমার খুব জ্বর হয়েছিল, তাই নিয়ে রাঁধতে বসেছেন। বলেছিলেন, একটা ঠিকে বামুন দেখব?

পিসীমা কথা বলেন নি। শুধু [illegible] ফিরিয়ে চেয়েছিলেন। অতি বড় বড় সাহেবও [illegible] [illegible] সে চাউনি সামনে দাঁড়িয়ে [illegible] পারত না। সুনীতি নিঃশব্দে ভেগে পড়েছিলেন।

তারপর কত-কী হ'ল। চাকরিতে প্রোমোশন হ'ল। ক্লার্ক থেকে অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট, জুনিয়র থেকে সিনিয়র। যুদ্ধ হ'ল, দাংগা হ'ল। স্বাধীনতা হ'ল, দেশ ভাগ হ'ল, আবার দাংগা হ'ল, ঢাকার বাস তুলে আসতে হ'ল। বিষয়-সম্পত্তি কতক বিলি-ব্যবস্থা হ'ল, কতক ফেলেই এলেন। তবু কুড়িয়ে-গুছিয়ে যা হাতে রইল, তাই দিয়ে ঢাকুরে পাড়ায় জমি কিনে ছোট্ট একটি বাড়ি করলেন। বড় বাড়ির সার্থকতা কিছু নেই—লোকও নেই যে ভরে রাখবে, উত্তরাধিকারীও নেই যার জন্য রেখে যাবেন। তবু পরের বাড়িতে ভাড়াটে বাড়িতে থাকা কেমন অপছন্দ, তাই নিজের মত একখানা খাড়া করা।

তারও পরে একদিন ষাট বছর পূর্ণ হ'ল। আর খাটবার মানে হয় না। রিটায়ার করলেন। সহকর্মীরা বেশ তোড়জোড় করে ফেয়ারওয়েল দিলেন; কেউ-বা কোলাকুলি কেউ-বা প্রণাম করে বললেন, দাদা, ছাড়লেন বলে ভুলে যাবেন না। মনে করবেন মাঝে মাঝে।

ঘাড় নেড়ে বললেন, নিশ্চয়। আর এদিক পানে আসতে ত হবেই।

বলতে বলতে হঠাৎ গলাটা কিরকম আটকে গেল। মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, তোমরাও রোয়। বুঝতেই ত পার, এখন বাড়িতে বসে একা একা—

আবার গলাটা ধরে এল।

বড় সাহেব বক্তৃতা দিলেন, হাত ঝেঁকে দিয়ে বললেন, সো উই পার্ট ম্যাট ল্যাস্ট।

সুনীতি কি বললেন ভাল শোনা গেল না। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে লিফ্‌টে ঢুকলেন। লিফ্‌টওয়ালা বললে, স্যর, আজ চলে দিয়ে গেলেন?

—হাঁ বলে তার হাতে একটা পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিলেন।

বাড়িতে এসে ঢুকলেন, তখন সন্ধ্যা হব-হব। রোজ এই সময়ে ফেরেন, রোজের মতো একটু ঘুরে এলেন। সেদিন ইচ্ছে হ'ল না। চুপ করে বসে রইলেন।

পিসীমা এসে বললেন, খাবার দিই?

—না। অনেক খেয়েছি।

—শরবৎ?

—দাও।

চেন্‌কি নে?

—না।

—তবে চান কর। পরে এসে শুয়ে থাক বরং।

—শোবো কেন।

—বললি ভাল লাগছে না।

—বলেছি?

—মনে মনে বলেছিস। ও রকম হয়। অনেক দিনের আপিস ত। আমি যেদিন সব ছেড়ে ফিরে এলাম মালখানগরে, দিনকতক খুব খারাপ লেগেছিল।

সুনীতি অন্যমনস্ক। কিছু খেয়াল না করেই বললেন, তারপর কি হ'ল?

—হবে আবার কি। লাগল খারাপ দিনকতক, তারপর আবার সামলে গেল। অতবড় বাড়ি, অতগুলো ছেলেপুলে, তাই সামলাতে জীবন কেটে গেল। কোথা দিয়ে গেল টেরই পেলাম না।

—হুঁ।

—এই জন্যেই বিয়ে-থা করে লোকে, সংসার পাতে। চাকরি থেকে, ব্যবসা থেকে যখন ছুটি নিতে হয়, তাদের নিয়ে নতুন করে কাজ পেয়ে যায়। এখন এই একা-একা শূন্য পুরী, বোবা ঠ্যালা।

সুনীতি উত্তর দিলেন না, শুধু চোখ কট্‌কট্ করে চাইলেন পিসীমার দিকে।

পিসীমা সোজা উঠে বাইরে চলে এলেন।

সুনীতি ডেকে বললেন, শুনে যাও।

পিসীমা বাইরে থেকেই জবাব দিলেন, জাকিসনে আমি ভয় পেয়ে গেছি।

রাতে শুয়ে শুয়ে মনে হ'ল, এতদিনে নিশ্চিন্ত, নির্ঝঞ্ঝাট হওয়া গেল। আর অফিস নিয়ে ফাইল নিয়ে ঝামেলা নেই, ন'টা না বাজতে নাইতে খাবার তাড়া নেই। ছিল দেশের বাড়ি, পৈতৃক সম্পত্তি, চিরদিন জানতেন চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর দেশে গিয়ে বসবেন, সেই সম্পত্তি দেখবেন। সে আপদও মিটেছে। নেই, ভাবলে মনটা খচখচ করে। বহুকালের স্বপ্ন—ছেলেবেলার খেলাধুলোর জায়গাগুলোকে বুড়ো বয়সে আবার একটু দেখেশুনে যাবেন। হ'ল না।

যাক—গেছে যা তা গেছে, ভেবে আর কী হবে। অনেক চিন্তা অনেক দায়িত্বও গেছে সেই সংগে, সেইটেই এক সান্ত্বনা। কাল থেকে আর ভোর থাকতে উঠতে হবে না, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হবে না। ভাবতে ভাবতে একটা পরম পরিতৃপ্তির ভাব এল মনে, ঘুমিয়ে পড়লেন। কাল আর আটটার আগে তিনি জাগবেন না, কিছুতেই না।

কিন্তু, ঘুম ভাংগল রাত না কাটতেই। ভেংগেই মনে হ'ল, উঠে পড়তে হয়। সংগে সংগেই মনে হ'ল, উঠে আর করব কি। ভেবে মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠবার কথা, তা উঠল না, বরং যেন কেমন মুসড়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে থেকে করব কি সারাদিন? কাল মনে হয়েছিল ছুটি পেলেন। এখন মনে হ'ল বেকার হয়ে পড়লেন।

একদিন দুদিন দারুণ অস্বস্তি বোধ হ'ল। তারপর আবার সয়েও গেল। গেল ঠিক নয়, সইয়ে নিলেন। বাজার ঘুরে ঘুরে বই কিনলেন অজস্র—নানা-রকমের বই। সারা জীবন ধরে কতবার কত-কি জানতে ইচ্ছে হয়েছে, পড়বার সাধ হয়েছে, ফুরসৎ পান নি। এতদিনে ফুরসৎ হ'ল। এবারে পড়ে নেবেন বই আশ মিটিয়ে। বই এল, শেল্‌ফ এল, দোতলায় পূব-দক্ষিণ কোণের ঘরটিতে মনের মত করে পড়ার-ঘর সাজিয়ে নিলেন।

আরেকটি শখ ছিল মনে মনে, বাগান। ছেলেবেলায়, দেশের বাড়িতে ছিল পুকুর আর বাগান আর ক্ষেত। মাঠের আলে-আলে আর গাছের ডালে-ডালে সারাদিন ধরে হুটোপাটি খেলা। আমের ডাল থেকে ঝাঁপ খেয়ে পড়তেন পুকুরের জলে, দল বেঁধে চলত সাঁতার আর ডুব-সাঁতার, চোর-চোর খেলা। ঘাটের রানায় বসে মুঠোমুঠো ভাত ছুড়ে দিতেন, বড় বড় বুড়ো বুড়ো রুই আর কাৎলা মাছেরা এসে ঠেলাঠেলি করে ভাত খেত, বসে বসে দেখতেন। সেই খেলা কোনদিন ভুলতে পারলেন না। কতদিন লেকে আর গোলদীঘিতে গেছেন, মুড়ি দিয়েছেন মাছকে। খেয়েছে, তেমনি করেই খেয়েছে। তবু যেন মনে হ'ত ঠিক তেমনটি হ'ল না। গোলদীঘির মাছ, সে গোলদীঘির মাছ, পরের মাছ। বাড়ির মাছ ছিল নিজেদের মাছ। ভাবতেন, আবার যাব, সেই মাছকে আবার খাবার দেব হাতে করে। কতজনকে চিনতেন তাদের—নামও রেখে দিয়েছিলেন কতজনের। তারা বহুদিনের মাছ, তাদের ধরা বারণ। এখনও কি বেঁচে আছে তারা?

নাঃ, এসব ভাবতে নেই, মনকে দুর্বল করে ফেলে। নাড়া দিয়ে চাংগা করে তুললেন মনকে। গেছে, যাক। আবার করব। বাড়িতে উঠোন ছিল একটুখানি। ফুলের আর পাতাবাহারের গাছ বসালেন। মালী নয়, নিজের হাতে। কিন্তু মন ভরে না। বাগানের পাম টবের ফার্ণ, দেশের বাড়ির সুপুরিপাতা, বেতঝাড়ের রং আর যৌবন সে পাবে কোথায়। দালাল লাগালেন, শহর থেকে পাঁচ দশ মাইলের মধ্যে ভাল জমি বিঘে কতক খোঁজ কিনা—সেখানে তিনি নতুন করে বাগান আর পুকুর করবেন।

মুশকিল, এসব ইচ্ছে মুখ ফুটে বলবার জো নেই। লোকের মধ্যে আছেন পিসীমা। বলতে গেলেই নাকমুখ কুঁচকে বলেন, মরে যাই, সে গাছের ফল খাবে কে, সে পুকুরে নাইবে কে?

ঐ এক বাতিক। কেন, নিজের ছেলে আর নাতি ছাড়া অন্য কেউ চড়লে ফল খেলে আমগাছের অমংগল হয়? পুকুর হ'ল, হ'ল। তাকে সার্থক করবার জন্যে মানুষ থাকতেই হবে কতগুলো, তার এমন কী মানে আছে?

তবু, বারবার এক কথা, এক ঘ্যানঘ্যানানি শুনতে ভাল লাগে না। উলটে বলাও যায় না কিছু। থাক গে, বলা-কওয়ার দরকারই বা কী। যা করবার করে গেলেই হ'ল। দালালকে বললেন, খোঁজখবর যা নেবার দেবার গোপনে কোরো।

কিন্তু, যতই করেন আর করতে চান, মনটা যেন ভরে না। খালি মনে হয়, এ কী হল। কাজ করবার সব শক্তি সমান বজায় রয়েছে, মনও ক্লান্ত হয়নি, তবু কাজ ছাড়তে হ'ল। কেন? বুড়ো ত হননি। পৃথিবী ঠিক রইল, সবই ঠিক চলল, শুধু তিনিই গেলেন ফুরিয়ে?

অফিসের সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম হিসেব তিনিই একা হাতে মিলিয়ে নিয়েছেন গত ত্রিশ বছর ধরে। কোন্ বছর কোন্ ব্রাঞ্চের কেনাবেচা আয়-ব্যয় কতখানি হয়েছে, সব তাঁর নখদর্পণে। ভেবেছিলেন, এই ত্রিশ বছরের অংক নিয়ে একটা সামারি খাড়া করবেন। তার ফলে, ভবিষ্যতেও কোন্ সেণ্টারে কতখানি কাজ, কোথায় কত স্টাফ আর সাপ্লাই দরকার, তার একটা চিরকেলে খতিয়ান হয়ে থাকবে—রেডি রেকনার। করা হয়নি। এমন হঠাৎ ষাট বছর পুরো হয়ে যাবে, এটা খেয়াল হয়নি। ওটা শেষ করে রেখে আসা উচিত ছিল। আর কেউ কি পারবে? পারলেও ভাল পারবে না। জানবে কি করে? শুধু তো খাতার হিসেব টুকে তার মধ্যখান কষে দেওয়া নয়। কখন কোথায় কিভাবে ব্যবসাকে পুশ্ করতে হয়েছে, কোন্‌বার কোন দিক দিয়ে বাধা-ব্যাঘাত এসেছিল, তার সম্পূর্ণ স্মৃতি আর জ্ঞানকে নিয়ে হিসেব কষতে হবে। সে-স্মৃতি ও-অফিসে আর আছে কার? বড় সায়েব ত এই সেদিন মাত্র এল, বিলেত থেকে। ইচ্ছে করে বড়সায়েবকে গিয়ে বলেন, এই চার্টটা করে দিয়ে যাই, মাইনে-টাইনে কিছু দিতে হবে না।

কিন্তু ইচ্ছে করলেও বলা যায় না এ কথা। তারা আমল দেবে না—চাকরি থেকে যে চলে গিয়েছে, তার সংগে আর সম্পর্ক কি? তিনি ছাড়া আর কেউ পারবে না? বয়ে গেল, যাদের কাজ তাদেরই ত মাথাব্যথা নেই। থাকলে ত তারাই বলত, এইটে শেষ করে রেখে যাও। আগে থেকেই বলতে পারত, যাতে ছেড়ে আসবার আগেই সেরে রেখে আসতে পারেন।

চুলোয় যাক। এক কাজ নেই, অন্য কাজ হবে। সৃষ্টি করে নেবেন কাজ। জমিটা কেনা হোক। ফলের গাছ লাগাবেন, ফুলের গাছ। জানোয়ার কিনবেন। গরু। ছাগল। ভেড়া। হাঁস। মুরগী। মুরগী পুষেছেন শুনলে পিসীমা অনর্থ করে ছাড়বেন। দরকার কি বলার।

বংশানুক্রমিক কুলগুরু হঠাৎ একদিন এসে হাজির হলেন। বহুকাল দেখা-সাক্ষাৎ নেই। বললেন, এইবার দীক্ষাটা নিয়ে ফেল। সারাজীবন পরের কাজ নিয়ে ভুলে রইলে, এবার নিজের কাজ গুছিয়ে নাও, ধর্মকর্মের দিকে একটু মন দাও।

এর উত্তরে বলতে হয়, আজ্ঞে তা ত বটেই। বলতে যাচ্ছিলেনও হয়ত। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, কমই রইল না আর, ধর্ম দিয়ে কী হবে!

গুরুদেব দুঃখিত হলেন।

পিসীমা ক্ষেপে উঠলেন। বংশের গুরু। অসম্মান না কখনও, ভাল ভেবে বলতে এলেন—তাঁকে এমন করে অপমান? সুনীতি থ মেরে গেলেন। অপমান কই করিনি ত। নিজের সম্বন্ধে নিজের মতটা বলেছি। ওঁর এতে অপমান হবে কেন?

—তুই কী বুঝবি কেন। উনি ত জেনে গেলেন তোর ধর্মে মতি নেই, তাই ওঁকে উপহাস করলি।

—আমি এমন কিছু বলিনি।

—উনি ত তাই বুঝলেন।

—ইচ্ছেমত বুঝে নেন ত আমি কী করব?

—এটা একটা কথা হ'ল? এর তো মানে হয়, তিনি ইচ্ছে করে তোর কথার বাঁকা মানে ধরেছেন। তাঁকে আবারও অপমান করছিস।

—কথা কইলেই যদি অপমান করা হয়, কথা কওয়াতে না এলেই হয়।

—কওয়াতে তিনি আসেন নি। কইতে এসেছিলেন, তা-ও তোরই ভাল ভেবে।

—আমার ভাল ভাবতে হবে না।

—তার মানে?

—মানে কিছু নেই। আমি কাউকে কিছু বলতেও চাইনে, কারও কথা কিছু শুনতেও চাইনে।

—দীক্ষার কথা বললেন, সেটা কুকথা হ'ল?

—দীক্ষা যখন নেবার হবে, তখন আমি আপনিই ডেকে নেব'খন।

—তার মানে, নিবি নে। ইহকাল ত চিবিয়ে খেয়েছিস, পরকালটাও খা।

—তবু একটা নতুন রকম খাওয়া গেল। বেশ ভাল ক'রে রেঁধো, লঙ্কা-ফোড়ন দিয়ে।

—পারব না রাঁধতে। কাশী পাঠিয়ে দে আমাকে।

—যাও না, আটকাচ্ছে কে।

পাঁজি পেড়ে বললেন, কাল দিনটা ভাল ছিল। একটু আগে বললে না!

—আগে বলার কি আছে। গুছিয়ে নেবার মধ্যে ত দু'খানা কাপড়। কালই যাব।

—কাল যাবে নয়, কাল চলে গেছে।

—মানে?

—মানে গতকাল দিন ছিল। আজ নেই।

—কবে আছে?

—তিন মাস নেই। মলমাস।

—যাত্রায় মলমাস কি?

—হয় ওরকম। ভাল দিন পেলে আমিই বল্‌ব'খন। আপাততঃ যাও, পরকালের চর্চ্চাটা ভাল ক'রে রেঁধো একটু।

—ধন্যি দেখালি যা হোক।

—আমি কিছু দেখাই নি। দেখাচ্ছি।

—কি?

—ক্রিয়াকলাপ। হালচাল। ঘটনাচক্র। গুরুঠাকুরকে পথ-খরচা দিয়ে দিতে হবে ত?

—তার ভরসায় তিনি বসে আছেন কিনা।

—মানে? চলে গেছেন?

—আমিই পাঠিয়ে দিয়েছি। যেখানে থাকার সার্থকতা নেই, সেখানে তিনি থাকেন না।

—সেটা আমিও বুঝি। ট্রেণভাড়া দিয়ে দিয়েছ?

—যদি না দিয়ে থাকি?

—ডাকে পাঠিয়ে দাও!

—এত গরজ কেন?

—নইলে ঋণ থেকে যাবে। সেই ঋণের ছুতো ক'রে আবার আসবেন।

—তার মানে?

—মানে, আমার যাঁর কাছে দীক্ষা নিতে ইচ্ছে হবে, আমিই তাঁকে বলব। শেধে দীক্ষা দিতে এলে তাঁর কাছে নেব না।

—এসেছিলেন, তাঁর কর্ত্তব্য বলে।

—না। কর্ত্তব্য যদি মনে করতেন, জোর করতেন, জিদ করতেন। এক কথায় মান করে চলে যেতেন না।

—গুরুত্যাগ করবি?

—ধরিই নি কোনদিন, ত্যাগ হ'ল কি করে?

—কর যা খুশী।

—তাই ত করছি। বাণ্টুকে ডেকে দাও।

—কি হবে?

—ব্যাঙ্কে যাবে।

বাণ্টু গ্রামের ছেলে। এ-বাড়ীতে থেকে পড়ে। বাণ্টুকে চেক লিখে দিলেন। দু'শো। গুরুদেবকে টাকাটা পাঠিয়ে দেবেন। প্রণামী। দীক্ষা নেওয়া-না-নেওয়া তাঁর নিজের ইচ্ছে। নিলে গুরুদেবের কিছু প্রাপ্য হত। সেটা থেকে ব্রাহ্মণকে কেন বঞ্চিত করা।

ফিরে এসে বাণ্টু বললে, আপনি কি ও-পাড়ায় যাবেন দু'-একদিনের মধ্যে?

—কেন?

—গেলে একবার ব্যাঙ্ক হয়ে আসবেন।

—কেন, বলেছে কিছু?

—বললে, হিসেব দেখে নিয়ে, যা টাকা আছে, সেটাকে যদি খানিক তুলে বা আর খানিক জমা দিয়ে একটা রাউণ্ড ফিগার করে দেন, তবে ভাল হয়।

—কেন?

—নয়া পয়সা হ'ল ত। ওদের এখন সব একাউণ্টকে নয়া পয়সার হিসেবে কনভার্ট করতে হচ্ছে। রাউণ্ড ফিগার পেলে খাটুনিটা অনেক কমে যায়।

বটে। মাথার রক্ত খানিকটা নেমে আসছিল, চড়াৎ করে উঠে গেল একেবারে ব্রহ্মতালুতে। তিনিও খেটেছেন সারাজীবন, পরের টাকার হিসেব মিলিয়েছেন। কোনদিন ত বলেন নি নশো সাতানব্বুইকে রাউণ্ড ফিগারে নিয়ে হাজার টাকা করে দাও। মাইনে আর পি এফ কষতে আমার সুবিধে হবে।

ড্রয়ার খুললেন, পাস-বই বার করলেন। প'য়ত্রিশ হাজার তিনশ' ঊনত্রিশ টাকা তেরো আনা দু' পয়সা। বললেন, চেক দিচ্ছি, সবটা তুলে নিয়ে আয়।

—সবটা?

—হ্যাঁ। রাউণ্ড ফিগার হয়ে যাবে—একেবারে রাউণ্ড, জিরো।

বাণ্টু নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। পিসীমাকে গিয়ে বললে, ওপরে যান। ভারি গরম।

পিসীমা উঠে এলেন। হাতে মালিত। বললেন, কি হ'ল?

—সব ফাঁকিবাজ। মাইনে-চোর। ব্যাঙ্কের কেরাণী, তার কাজই হচ্ছে হিসেব কষা। হুকুম পাঠিয়েছেন, টাকাটাকে রাউণ্ড ফিগার করে দাও হিসেব কষা সহজ হবে।

—বলেছে ত হয়েছে কি। কাজের সুবিধে যদি হয়, বলবে না?

—না। এটা কাজের সুবিধে নয়, নিজের বোঝা এড়াবার চেষ্টা। আমি ত কই সে-চেষ্টা করিনি কোনদিন?

—করিস নি? তুই করেছিস সবার চেয়ে বেশী।

—আমি?

—হ্যাঁ। সংসারের কর্ত্তব্য, বংশের কর্ত্তব্য এড়িয়ে চলেছিস, আমার বাবাকে নির্বংশ করেছিস। এখন আবার এড়াচ্ছিস পরকালের কর্ত্তব্য। তুই বাঁচিস পরকে?

—নাঃ, টিক্‌তে দিলে না।

সুনীতি উঠলেন। জামা পরলেন। জুতোটা পায়ে গলিয়ে দুই লাফে সিঁড়িতে।

পিসীমা বাধা দিলেন না। বললেন, কখন ফিরবি? আমার বড়া ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

—কিসের বড়া?

—পরকালের। এক্ষুণি ফিরিস।

—আর ফিরবই না।

রাস্তায় প'ড়ে খুব হন্‌হন্ করে হাঁটলেন খানিকক্ষণ। রামচন্দ্র ইস্কুলের মোড় অবধি হেঁটেই যেতে হবে। মোড়ে এসে দাঁড়ালেন। বাস দেরী করছে। অনেকক্ষণ পরে এল একটা। বাদুড় ঝুলছে। ওঠা অসম্ভব। আরেকটা আসবে পাঁচ মিনিট পরে; সে-ও এমনিই কাঁঠালগাছ হ'য়ে। আরও ঘন ঘন বাস দিলে কী হয়? দেবে না—স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকারী বাস। বেশ, চাই না কারো ভরসা। সবাই স্বাধীন হ'ল, তিনি

স্মরণী
শ্রীশান্তি পাল

হেমন্তের [illegible] পথ ঢাকে কুয়াশায়,
গ্রাম-প্রান্তে কুন্দকলি কাঁপে থরথরে
শ্বেতঝাঁটি সর্বজয়া মাগিছে বিদায়,
সূর্য্যমুখী খোলে কুঁড়ি দুটির চত্বরে।
প্রতীক্ষার দীপ জ্বালি বসে আছি একা
সুপ্তিহীন আঁখি নিয়ে সন্তর্পণতলে,—
স্বপ্নাকীর্ণ স্মৃতি-পথে যদি পাই দেখা—
সেই দুটি লীন ভৃঙ্গ নয়ন-কমলে!
যে কমলে ছিল নাকো শুধু মধু ভরা,
ছিল লাজ সুমোহন পিপাসা বেদন,
ছিন্ন পরিমল মূক ভাষার পশরা,
গর্ব হাসা ছিল লাস্য [illegible] আমন্ত্রণ।
কাজল-কার্ম্মুকে ঘেরা রহস্য অতল
কভু অভিমানে হ'ত শিশির—সজল।

নিদাঘের খরতাপে শুকাল মৃণাল,
নির্মম করকাপাতে হল ছিন্নদল,
মুদ্রিত পত্রের পরে নামিল ভয়াল
ঘুমের নিবিড় ছায়া, আঁধার ভূতল।
ঋতুচক্র ঘুরে পৃথ্বী-আবর্তন সাথে,
যাহারে হারাই তারে ফিরিয়া না পাই;
তবু মনে হয় যেন মোর অসাক্ষাতে
কোথা সে দাঁড়িয়া আছে, মৃত্যু তার নাই।

পিয়ালীর খেয়াপারে সন্ধ্যা ধীরে নামে,
হাট হ'তে যাত্রী দল ফিরে কলরবে,
[illegible] ঝোপের শিরে বাদুড় এসে থামে,
রূপার হাঁসুলি চাঁদ দেখা দেয় নভে।
পক্ষহীন অশ্ব আজি [illegible];
আঁকে না ঊর্মিল স্বপ্নে [illegible]।

পারলেন না। দেশ ও তাকে বাদ দিয়ে বাকিটুকু স্বাধীন হয়নি। নিজের পা স্বাধীন চলা। দিলেন চেনে হাঁটা। গাড়িয়াহাটের মোড় অবধি। সমান ছিল ট্রামেও। ট্যাক্সি? না। পথ রয়েছে, পা রয়েছে। দেশশুদ্ধ সবাই কি ট্যাক্সি চড়ছে দুবেলা? ট্যাক্সি চড়ে বড়লোকে আর সৌখীন লোকে। তিনি কোনটাই নন। চড়ে রোগীতে আর বুড়োতে। ওঁর রোগ হয়নি, বুড়োও হননি।

চললেন হেঁটেই। বেলা পৌনে বারোটা। তারিখ পয়লা জুন, ১৯৫৭। টেম্পারেচার কত কে জানে। হয়ত একশো সাত, হয়ত দশ। গরমটা অসহ্য, গা যেন জ্বলে যাচ্ছে। এমন লঙ্কার ঝালমার্কা গরম দেখেন নি কোনদিন। অ্যাটম বোমা ফাটছে নিশ্চয়—কোথায় কে জানে। নে ফাটিয়ে যত পারিস। দিন পেয়েছিস। বৃষ্টি নেমে যাবার কথা এতদিনে, তারও খোঁজ নেই। কালবোশেখী ত হলই না। আলিপুরের খবর রোজই থাকে কাগজে : অপরাহ্নে ঝড়বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা। হয় না একদিনও। লেখা থাকে বলেই হয় না হয়ত—কাগজ পড়ে বৃষ্টিরা সাবধান হ'য়ে যায়। আসল কথা, স্বাধীনতা। সব স্বাধীন হয়ে গেছে—বৃষ্টির কী দায় পড়েছে নিয়ম মেনে চলতে। বলে বছর, তাই ঘুরে গেল, পয়লা বোশেখ চলে গেল চোত্ মাসের ছউই তারিখে। মাঝখানের দিনগুলো যায় কোথায়?

সায়েবরা চলে গেছে, যাবার আগে সব কলকব্জায় উলটো মোচড় দিয়ে রেখে গেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে পশ্চাদপসরণের সময়ে যা করে যাওয়া নিয়ম। পশ্চাদপসরণটাই ভাল রপ্ত করে নিয়েছিল কিনা ইদানীং। উলটো মোচড় দিয়ে গেছে ফলে যা-কিছু হিসেব করা হয় সে কল দিয়ে, সবই
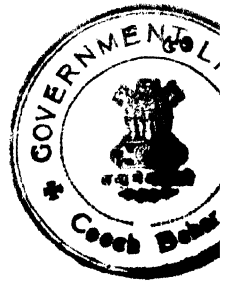
উলটো হ'য়ে বেরোয়। এমন সব আহাম্মক, তাই অবিকল ছেপে দিচ্ছে, আর লোকের গালাগাল খেয়ে মরছে। লোকে ত বলবেই, ছাড়বে কেন! বলে, হাওয়া অফিস, পবনের ভর হয়েছে, উনপঞ্চাশ পবন। বলাই উচিত। নইলে দিনকের দিন দেখছিস আজ দশ বছর ধরে, যা যা বলিস সব উলটো উলটো হ'য়ে যায়—এইটুকুন বুদ্ধি থেলে না যে, কম্মকজ্জাগুলোকে একবার টেস্ট্ করে দেখ? তবেই হয়েছে। তাই দেখবে? স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক যে। কাজ শিখব বললে মান যাবে না? সব ফাঁকিবাজ। সব ডিউটি-চোর।

হাঁটো, হাঁটো। রাসবিহারী এভিনিউ ধরে। আগে কাওড়াতলা পৌঁছে তবে কথা। এল পোষ্ট-অফিস টুয়েণ্টি-নাইন। লোকজনের ভিড়। মাসখানেক আগের কথা মনে পড়ল। সে কী ঝগড়া, কী মারামারি-বকাবকি নয়া পয়সা আর পুরোনো পয়সার হিসেব নিয়ে।

সে ও ঐ—স্বাধীনতা। নতুন কিছু করতে হবে ত, নইলে ক্ষমতা হাতে পেয়ে কী লাভটা হ'ল। ঘুঁটেকুড়ুনীর বোনপোরা সব বসেছেন রাজতক্তে। তাই না হয় বুদ্ধিমানের মত কর, কাজ করবি ত শিখে নে। চৌষট্টি ভাগ না একশো ভাগ তা নিয়ে ত নয় মাথা ফাটাফাটি—আদতে গোল বাধিয়েছে ঐ নামটি, 'নয়া পয়সা'। মরি মরি, কী নাম রে। নয়া পয়সা ত আর পুরোনো হবে না কোনদিন—নয়াই থাকবে পঞ্চাশ বছর পরেও। বিদেশীরা বলবে, 'দি নিউ পাইস'। এ যেন নতুন জামাই এল। নতুন জামাইবাবুই নাম রয়ে গেল—তার পরে পরে বাড়ীর আরো এগারোটা মেয়ের বিয়ে হ'য়ে যাবার পরেও। লোকও পড়ছে তেমনি ধাঁধায়—চার পয়সা—মানে ছ' পয়সা আর আট পয়সা মানে তেরো পয়সা—যত হিসেব কষছে, ততই ঘুলিয়ে যাচ্ছে, আর যতই ঘুলিয়ে ফেলেছে, ততই চটে যাচ্ছে। কোন জ্বালা হ'ত না, যদি নতুন নাম একটা দেওয়া হ'ত—দাম, কি ছিদেম, কি শতক। শতক হলেই বেশ হ'ত—একশো ভাগের এক ভাগ, এক সেণ্ট। শুনতেও ভাল হ'ত, মানেও ঠিক থাকত, বুঝতেও সবাই—পয়সা আর নয়া পয়সার নামের ধাঁধাকলে পড়ে মানুষগুলো চুবুনি খেত না।

তা হবে কেন, স্বাধীন দেশ যে। ইচ্ছেমত বেয়াকুবি করবার আর দেশশুদ্ধ লোককে বেয়াকুব করবার স্বাধীনতাই যদি না থাকল, কী হ'ল তাহলে দেশ স্বাধীন হ'য়ে? তিনি সামান্য কেরাণী, তাঁর মাথায় এল, আর গোদা গোদা মাথাগুলোতে ঢুকলো না এই সোজা কথাটা? ঢুকবে কেন—ঢুকলে আর তফাৎ কোথা রইল নরলোকের মাথায় আর বড়লোকের মাথায়।

হয়েছেও তেমনি। উত্তম হয়েছে, মরছেন সব খাটুনি আর গালাগাল খেয়ে। পাবলিকের কি, আস্ত টাকা দিয়ে খাম-পোষ্টকার্ড চাইবে, ফেরৎ রেজ্‌গি গুণতে না গেলেই হ'ল। তোদের পোষ্ট-মাষ্টাররাই তো মাথায় জল ঢালছে রে। বড়কর্তাদের বড় মাথাগুলোয় জল ঢেলে দেয় না কেউ? বিশুদ্ধ হিন্দু মতে, সুপবিত্র সুপ্রাচীন গোবর জল?

কালীঘাট। ডানদিকে বেঁকলেন। হাজরা পার্ক পেরিয়ে, থানা পেরিয়ে হেঁটে চললেন। যাবেন কোথায় কোন স্থির নেই—আমি পথিক, পথ আমারই সাথী। জগুবাবুর বাজার ছাড়ালেন। সার্কুলার রোড। বেলা প্রায় দুটো। হঠাৎ মনে পড়ল, শনিবার। ডালহৌসী পাড়ায় গিয়ে আর লাভ নেই। গেলে পুরোনো অফিসে বসে একটু মন ঠাণ্ডা করা যেত।

দূত্তোর, আর হেঁটেই কী হবে। থিয়েটার রোডে পৌঁছে বাঁয়ে বেঁকে মাঠে নামলেন। গাছতলায় ছায়ায় বেঞ্চি। সেই বেঞ্চিতে বসলেন। তখন গা হাত-পা ঝিমঝিম করছে। তার পর কাঁপুনি শুরু করতে লাগল। মাথার চাঁদিতে জ্বলন ধরিয়ে ... শুকিয়ে কাঠ। বুকের মধ্যে কাঠকয়লা। চোখমুখ ... জ্বালা করছে।

এক আইসক্রীমওলাকে ডাকলেন, তিনটে কাঠি-বরফ খেলেন। তারপর উঠলেন, ট্যাক্সিতে চেপে বললেন, ঢাকুরিয়া। বাড়ীতে এসে নামলেন যখন, জ্বর একশ' তিন।

সারারাত ঘুম হ'ল না। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে। সারা গায়ে কে ধানীলংকা ঘষে ঘষে দিয়েছে। মাথার মধ্যে ভাবনার ঘোড়দৌড় চলেছে। অথচ গুছিয়ে ভাবাও যাচ্ছে না কিছু, সব এলোমেলো।

আর কিছু নয়, সিংগাপুরী জ্বর। ইনফ্লুয়েঞ্জা। ফ্লু। বানানটা কি, Flu? না Flew? Fly—Flew—Flown. Fly মানে মাছি। Flew মানে কি হবে তাহলে, মাছিয়াছিল?

ধোৎ। Fly verb মানে মাছি নাকি। ওর মানে ওড়া, বা পালানো। কে উড়ল? বা কে পালাল? কোথা থেকে? কে জানে।

নাঃ। ও Flu-ই হবে। ফ্লু, মানে ইনফ্লুয়েঞ্জা। অতবড় নাম, জ্বরে যখন সারা গা-মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে তখন উচ্চারণ করে বলাই মুশকিল। তাই নামটা ছেঁটে ছোট্ট করে বলা হয়। উঁহু, অন্য কারণ। অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ ত—ছুঁয়েছ কি গিয়েছ। দেখাই তো যাচ্ছে চারদিকে—যে বলেছে আমার হয়নি বা আমাদের বাড়ীতে ঢোকেনি এখনও, ব্যস, দু' দণ্ড না যেতে সব কাৎ। নাম নিলে নাম শুনলে অবধি নিস্তার নেই। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষম্। তাই লোকে সাবধান হ'য়ে গেছে। সবটা নাম বলে না, ঐটুকু বীজাক্ষর বলে সংক্ষেপে সেরে নেয়। নাম করাও হ'ল না, বোঝাও গেল কার কথা হচ্ছে।

সিংগাপুরী নাম কেন হ'ল? সিংগাপুরী ত হয় কলা, আর আনারস। সিংগাপুরী না হাতী। ও কলা ত এই দেশেই জন্মায়—কাবুলে কলার মত। জ্বর কি সিংগাপুর থেকেই এসেছে? তাদের কারখানায় তৈরী জ্বর? মোটেই না। সেখানে এল কোত্থেকে? থেকে আর কোথা। অ্যাটম বোমা। ক্রিসমাস দ্বীপ আর বিকিনি আর নেভাডা—মনের আনন্দে বোমা ফাটাচ্ছেন বসে বসে কর্তারা। তার ফলে গোটা পৃথিবীর আবহাওয়া সব ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। কোনদিন দেখেছে কেউ। কলকাতার গরমে গা জ্বলে পুড়ে যায়, বৃষ্টি হচ্ছে, দাঁড়িয়ে ভিজছি, তবু যে গা-জ্বালা কমছে না, কলকাতা সি, পি, হয়ে গেছে? পেয়েছে কায়দাটা ভাল—এত করেও ত যুদ্ধটা বাধানো যাচ্ছে না এশিয়ার মাথার ওপরে, দেশ, হাতে না পারি ভাতে মারি। তাই জন্যেই ক্রমাগত 'এক্সপেরিমেণ্ট' চলছে অ্যাটম বোমার—এমন সব জায়গা হিসেব করে, যেন তার আঁচ আর ধোঁয়া সবটাই ভেসে আসে এশিয়ার দিকে। এ অতি ভাল কায়দা, বৈজ্ঞানিক কায়দা—যুদ্ধ হল না, কিন্তু তার সুফলটুকু ঠিক পাওয়া হয়ে যাচ্ছে, এশিয়াকে মনের আনন্দে ঝলসে দেওয়া যাচ্ছে। আবার ঠাট করে নাম দেওয়া হয়েছে, সিংগাপুরী ইনফ্লুয়েঞ্জা। অপরাধ হল সিংগাপুরের। বিকিনি ফিভার, ক্রিসমাস ফিভার বললে পাপ হ'ত—সত্যি কথা বলা হয়ে যেত কিনা।

ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত লাগল, ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্ন দেখলেন, অর্জুন হাঁটু গেড়ে দুই হাতের অঞ্জলি বাড়িয়ে বসে; শিব তাঁর হাতে পাশুপত অস্ত্র দিচ্ছেন আর বলছেন, এই নাও। কিন্তু খুব সাবধান, বুঝেসুঝে ছুঁড়ো। আর্যদের ওপরে প্রয়োগ কোরো না একে, তারা স্বজাতি। অনার্য, দৈত্যদানব অনেক পাবে, কালকেয় নিবাতকবচ, তাদের ওপরে অম্লানবদনে ছুঁড়ে দেবে, তাতে পাপ নেই।

ঘুম ভেঙেগ গেল। তবে আর সায়েবদের দোষ কি, তারাও ত অসায়েবদের ওপরেই ঝাড়ছে অস্ত্র। কিন্তু, সত্যি কি স্বয়ং শিবও এই কথাই শিখিয়ে ছিলেন অর্জুনকে? মহাভারতটা ভাল করে পড়তে হচ্ছে।

সকালবেলা জয়গোবিন্দবাবু এলেন। পিসীমা ডেকে পাঠিয়েছেন। জয়গোবিন্দবাবু প্রতিবেশী, ডাক্তার, দীর্ঘকালের বন্ধু। অসুখ-বিসুখে তিনিই আসেন। ফ্যামিলি বলতে ত নেই কিছু, নইলে বলা যেত ফ্যামিলি-ফিজিশিয়ান।

টিপেটুপে দেখলেন, নল চোঙা সব লাগালেন, তারপর বললেন, ফ্লুই বটে। অ্যানাসিন খান।

সুনীতি হঠাৎ ক্ষেপে উঠলেন : কক্ষণো খাব না, ইয়ার্কি!

জয়গোবিন্দবাবু ভড়কে গেলেন। এ কি কাণ্ড!

সুনীতি ঝড়ের বেগে বলে যাচ্ছেন : ইয়ার্কির আর জায়গা পায় নি, না? এদিকে বোমা ফাটিয়ে জ্বর ছেড়ে দিচ্ছে, ওদিকে আবার ওষুধ বানিয়ে পাঠাচ্ছে, খাও। মানে, মরলে ত আপদ গেল, ইতি-মধ্যে ওষুধ খাইয়েও টুপাইস হল। কিছুতেই খাব না আমি ওদের ওষুধ!

জয়গোবিন্দবাবু বিচক্ষণ লোক। তর্ক করলেন না, নিঃশব্দে কেটে পড়লেন। পিসীমাকে বলে গেলেন, ওষুধ এখন থাক। বরফ দিন।

—কি হ'ল?

—ডাক্তারি ওষুধ খাবেন না।

—জ্বালালে!

পিসীমা বাণ্টুকে ডাকলেন।

—হ্যাঁ রে, জান কোনখেনে আছে কেউ, জানিস?

—আছেন ত, সীতিকণ্ঠবাবু। কেন?

—ডেকে আনবি।

—কি হ'ল!

—ডাক্তারি ওষুধ খাবেন না। আমারই হয়েছে জ্বালা—মরিও না।

বাণ্টু ঘুরে এল। কোবরেজ মশাই বাইরে গেছেন, ফিরতে দেরি হবে দুচার দিন।

—দেখ। আর কেউ নেই।

—আছেন, আকিবাবু।

—ডাক তাঁকেই।

—এখন পাব না। সন্ধেবেলা।

—তাই ডাকিস। বরফ নিয়ে আয়।

বরফ নিয়ে ধস্তাধস্তি। সুনীতি বরফ লাগাবেন না কিছুতেই না। পেয়েছে কি সায়েবরা? বোমা ফাটিয়ে জ্বর সৃষ্টি করবে, আবার সাদা লোক উপদেশ ঝাড়বে আমাদের অ্যানাসিন খাও, আমাদের আইসব্যাগ কিনে মাথায় চাপাও। হবে না ওসব। ইংরেজ ত মোটে দুশো বছর। তার আগে বরফ ছিল কোথায়? মানুষের রোগ হ'ত না তখন? না তারা সবাই মরে যেত চাঁদি ফেটে?

পিসীমা বললেন, তখন পাতা পাকুরের পাঁক দেওয়া হ'ত। তাই যা বাণ্টু, কাটিপালানপাড়া শেকড় তুলে নিয়ে আয় একমুঠো। এই চাপা দিয়ে রেখে দিই। বুড়ো বয়সে খোকাপনায় পেয়েছে।

বরফ লাগাতে দিলেন না সুনীতি। বেলা একটা বাজল, দুটো বাজল। আকাশ থেকে আগুন ঝরছে। ঘরের ছাত আর দেয়াল তেতে পাঁউরুটির তুন্দুর বনে গিয়েছে। সর্বাঙ্গে ধানীলংকা। মাথার ভেতরে তেঁতুলে বিছে। বিছের কামড় আর তুড়ুবুড়িকে ভোলবার জন্যে নানাবিধ সচিন্তা করতে লাগলেন।

এই জ্বর তো এল বিকিনি থেকে সিংগাপুর, সেখান থেকে মাদ্রাজ আর বাংলা। ক্রমে সারা ভারত বর্ষে ছড়াবে। জাপানে ত ছড়িয়েইছে ইতিমধ্যে। কিন্তু বোমা যাদের আছে তাদের আছে—হাওয়া ত কারো কেনা নয়। বিকিনি আর কিসমাস থেকে হাওয়া পশ্চিমদিকেই ঠেলে নইবে, এই ভরসা করে বোমা ফাটাচ্ছেন যাদুরা। হাওয়া যদি উলটো ঘুরে যায়? জ্বর যদি ইউরোপ আর আমেরিকাতেই গিয়ে হাজির হয়? তখন বুঝবে ঠ্যালাটা। আমাদের কি, আমরা মলেও লোকসান চার নয়া পয়সা। মরবও না দেখো, দুদিন বার্লি খেয়ে দাঁড়াবার হেঁচে আর বেশে ঠিক খাড়া হয়ে উঠব। কিন্তু বাছাদের দেশে যদি পৌঁছে যায় একবার ইউরোপে

(ইহার পর ১৬৯ পৃষ্ঠায়)

অফিস থেকে অত্যন্ত বিশ্রী মেজাজ নিয়ে ফিরেছেন সুকুমার। প্রথম ব্যাপার হল, এবার পুজোয় খুব সম্ভব 'বোনাস্' পাওয়া যাবে না এবং তাদের ইউনিয়নের এমন জোর নেই যে, তা নিয়ে একটা আন্দোলন গড়ে তোলা যায়। দু নম্বর, অজিত মুখোটি ফস্ করে বলে বসল: তোমরা সব রাশিয়ার দালাল।

তর্ক বাধলেই এমনিভাবে আক্রমণ করে লোকটা। হিটিং বিলো দি বেল্ট। অফিসের দলিলওয়ার প্রশ্ন—তার মধ্যে অকারণ বাজে কথা টেনে আনা। আমাদের দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগের সঙ্গে রাশিয়ার যে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই এ কথা কোনোমতেই বোঝানো যাবে না অজিত মুখোটিকে।

অগত্যা পাল্টা জবাব দিতে হয়েছে।

—আর তুমি কোত্থেকে টাকা পাও মুখোটি? ফরমোসা?

হাতাহাতির উপক্রম হচ্ছিল, সবাই মাঝখানে পড়ে থামিয়ে দিলে। কিন্তু মনের সেই বিশ্রী বিরক্তিটা কিছুতেই কাটতে চাইছে না সুকুমারের। অহেতুক বিদ্বেষ—অর্থহীন কলহ। এ যুগে যেন প্রত্যেকে প্রত্যেককে ঘৃণা করে। মানুষে মানুষে ওই একটি ছাড়া আর কোনো সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না এখন। ট্রামে, ট্রেনে, অফিসে, খেলার মাঠে, চায়ের দোকানে। তর্ক, নিন্দা, অপমান, হাতাহাতি। কেউ আর কাউকে সহ্য করতে পারে না।

এমন কি ঘরেও নয়। সেখানেও যেন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচিত্র প্রাগৈতিহাসিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

বাড়ীতে পা দিয়েই সেটা অনুভব করল সুকুমার। গলির ভেতরে অন্ধকার ঘরে বিকেল সাড়ে পাঁচটাতেই অকাল সন্ধ্যা নেমেছে আর জানলার পাশে ছায়ার ভেতরে আরো এক রাশ ঘন ছায়া রচনা করে বসে আছে অনুশ্রী।

ঘরের সামনে সুকুমার দাঁড়িয়ে পড়ল নিজেকে যেন প্রস্তুত করে নিলে কয়েক মুহূর্তে আজ আবার একটা কিছু ঘটবে। ঘণ্টাখানিক তিক্ত কলহ—স্নায়ুছেঁড়া যন্ত্রণা, আধপেটা খাওয়া আর বিনিদ্র রাতের প্রহরগুলিতে ঘড়ির আওয়াজ শুনতে শুনতে একান্ত প্রার্থনার মতো নিজের মৃত্যু কামনা করা। সুকুমার তৈরি হয়ে নিল।

—আলো জ্বালাও নি যে?

অনুশ্রীর জবাব এল না।

সুকুমার দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। জানলার পাশে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে অনুশ্রী। সামনে তেতলা বাড়িটার ওপর দিয়ে আকাশ খুব বেশি দেখা যায় না। কিন্তু যেটুকু দেখা যায়, তার মধ্যেই যেন অনুশ্রী নিজের মুক্তি খুঁজছে। সুকুমারের কাছ থেকে মুক্তি—এই জীবন থেকে মুক্তি।........

......সুকুমার জানে, সে অনুশ্রীকে সুখী করতে পারেনি। বাড়ীর সঙ্গে সব সম্বন্ধ মুছে দিয়ে, চারদিকে ঝড় তুলে অনুশ্রী এসেছিল তার কাছে। ভেবেছিল, সুকুমার পুরুষের মতো চারদিকের অপমান থেকে তাকে রক্ষা করবে, তাকে মর্যাদা দেবে, পুরো দাম দেবে তার ত্যাগের, তার ভালোবাসার। কিন্তু অনুশ্রী জানত না সুকুমার দেবতা নয়, তার ভুল আছে, তার ত্রুটি আছে, তার দুর্বলতা আছে। চার-দিকের দুর্যোগের ভেতরে সে অনুশ্রীর কাছেই আশ্রয় চায়, অনুশ্রীকে একান্ত করে আশ্রয় দেবার শক্তি নেই তার।

শুরু হল ভুল বোঝবার পালা। বিষ জমতে লাগল দিনের পর দিন।

সুকুমার জানে আজ আট বৎসর ধরে অনুশ্রী মুক্তি চাইছে তার কাছ থেকে। দেখেছে, তার চোখে অদ্ভুত বন্যদৃষ্টি, তার মুখ যন্ত্রণায় নীল। যেন হিংস্রতম শত্রুকে দেখছে এমনি ভঙ্গিতে এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে কতদিন। সামনে থেকে খাবারের থালা ছুঁড়ে ফেলে দেবার বর্বর প্রেরণা অনেক কষ্টে সংযত করেছে সুকুমার।

নিদ্রাহীন রাতে মাথার মধ্যে যখন লক্ষ লক্ষ যন্ত্রণার ছুঁচ বিঁধেছে, ঘড়ির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে, সে যখন নিজের মৃত্যুকামনা করেছে, তখন হয়তো চোখে পড়েছে, মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে পড়ে অনুশ্রী কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে। সহানুভূতির উচ্ছ্বাসে নিজের যন্ত্রণা ভুলে গেছে সুকুমার, পাশে এসে বসেছে অনুশ্রীর। মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়ার সাহস হয়নি, কেবল গভীর মমতায় মন্ত্রোচ্চারণের মতো নিঃশব্দে বার বার বলেছে, ছুটি দেব, এবার তোমায় ছুটি দেব। আর এমন করে বেঁধে রাখব না।

ছুটি দেওয়া খুব শক্ত কাজ নয়। সিভিল ম্যারেজের বিয়ে। আগুন আর শালগ্রাম শিলা সাক্ষী থাকেনি, দেবতারা আশীর্বাদ করেনি, হোমের ধোঁয়ায় পিতৃলোকের ছায়াশরীর আবির্ভূত হয়নি, সপ্তপদীর পদসঞ্চারে জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন তৈরি হয়নি। চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে দুজনে ঘর বেঁধেছে। রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ইহ-পরকালের অচ্ছেদ্য ডোর নয়—ওটাকে ছিঁড়ে টুকরো করতে কয়েক সেকেণ্ডের বেশি সময় লাগে না।

কিন্তু!

ওই কিন্তুটাই আশ্চর্য। সুকুমার জানে ওই ঘৃণার সঙ্গে কী অন্ধ ভালোবাসা পাকে পাকে বেঁধেছে অনুশ্রীকে। সুকুমার কাছে থাকলে সে সহ্য করতে পারে না। দূরে চলে গেলে আরো অসহ্য লাগে। একদিনের জন্যে সে কলকাতার বাইরে গেলে অনুশ্রী ছটফট করে—পথের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। মেয়ে খুকু না থাকলে হয়তো রান্নাবান্নাও সে করত না। অথচ বাড়ী ফেরবার সঙ্গে সঙ্গেই বিচিত্র অভ্যর্থনা।

—এত তাড়াতাড়ি এলে যে? —অনুশ্রীর ঠোঁটের কোণে জ্বালা ভরা হাসি ঠিকরে পড়ে: বন্ধুর বাড়ীতে আরো পাঁচ সাত দিন কাটিয়ে এলেই পারতে। শরীর-মন দুই জুড়োত।

সুকুমারের ইচ্ছে হয়েছে সেই মুহূর্তেই সে আবার ফিরে যায় হাওড়া স্টেশনে। যে কোনো গাড়ীতে উঠে পড়ে, চলে যায় যেদিকে খুশি।

সুকুমার জানে। মুক্তি অনুশ্রী নিতে পারে না। সুকুমারই কি দিতে পারে? অনুশ্রী চলে গেলে তার পায়ের তলা থেকে পৃথিবী সরে যাবে। শরীর আর মনের এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, অনুশ্রীহীন নিজের অস্তিত্ব সে কল্পনাই করতে পারে না।

তার বন্ধন ওই খুকু। ওই ছ' বছরের মেয়েটা।

মা আর বাবা—কাউকে ছেড়ে সে থাকতে পারে না। মা'র চোখে জল দেখলে সে মুছিয়ে দিতে আসে, বাবার মুখ গম্ভীর দেখলে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে দু'হাতে।

সব সময় সে আদর পায়, তা নয়। মা হয়তো খামোখা তার পিঠে এক ঘা বসিয়ে দিয়ে বলে, মর্—মর তুই। তুই মরলেই আমি বাঁচি। তা হলেই আমার ছুটি।

খুকু আগে কাঁদত। এখন আর কাঁদে না। দুটো জলভরা চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তার পর সুকুমারের কাছে এসে ডাকে : বাবা!

সুকুমার বলে, এখন আমায় বিরক্ত কোরো না খুকু। খেলা করো গে—যাও।

খুকু ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ছোট টিনের বাক্সটা খুলে তার খেলার সরঞ্জাম নিয়ে বসে। গোটাকয়েক ন্যাকড়া আর সেলুলয়েডের পুতুল, না-র ব্লাউজ আর শাড়ীর কয়েকটা টুকরো, কয়েক ছড়া পুঁতির মালা আর একটা লাল বল সামনে ছড়িয়ে নিয়ে চুপ করে বসে থাকে। কী যে ভাবে সে-ই জানে।

অনুশ্রী হঠাৎ জ্বলন্ত চোখে তাকায় সুকুমারের দিকে।

—তোমার চালাকি আমি বুঝতে পারি না ভাবছ?

—চালাকি? —সুকুমার ভুরু কোঁচকায়।

—চালাকি নয়তো কী। মেয়েটাকে ছেড়ে এক পা-ও আমি চলে যেতে পারি না, সে তুমি জানো। তাই আমাকে যা মুখে আসে তাই বলো।

অসহ্য বিরক্তির মধ্যেও হাসি পায় সুকুমারের। খুকুর জন্যেই কি চলে যেতে পারে না অনুশ্রী? শুধু খুকুর জন্যেই?

শীতল শান্ত গলায় সুকুমার বলে, বেশ তো, খুকুকে নিয়েই তুমি আলাদা হয়ে যাও।

—যেতেই তো চাই। কিন্তু তাতেও তুমি বাদ সেধেছো। কী মন্ত্রে মেয়েকে বশ করেছ সে তুমিই বলতে পারো। তোমার কাছ ছাড়া করলে একটা দিনও ওকে আমি বাঁচাতে পারব না। তুমি আমাকে মারবে, মেয়েটাকেও মারবে।

দুধারী তলোয়ার। কোনোদিকেই পরিত্রাণ নেই। সুকুমার চুপ করে থাকে।

সত্যি খুকুই সব চেয়ে বড় বাধা। রাত্রে ঘুমের ঘোরে একবার বাবাকে খোঁজে—একবার মা-কে। বুকের ওপর তার ছোট নরম হাতখানা চেপে ধরে সুকুমার ভাবে, খুকুর জন্যেই তাকে বাঁচতে হবে, প্রতিদিনের বিষ নীলকণ্ঠের মতো পান করেও বেঁচে থাকতে হবে।

আত্মহত্যার চেষ্টা কি করেনি? সে ব্যবস্থাও হয়েছিল একদিন। একটা ঘুমের ওষুধ সে সংগ্রহ করেছিল—যার গোটা ছয়েক ট্যাবলেট এক নিঃশ্বাসে খেলে ঘুম আর কোনোদিন ভাঙবে না। [illegible] টেবিল ল্যাম্পটা জেলে অনুষ্ঠানিক চিঠি [illegible] লিখে ফেলেছিল : 'আমার মৃত্যুর জন্যে কেহ দায়ী নয়'—ইত্যাদি। তার পর এক গ্লাস জল নিয়ে যখন সে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলছিল, সেই সময় খুকু কেঁদে উঠল ঘুমের ঘোরে।

—বাবা, কোথায় যাচ্ছ? আমিও যাব।

এমন তো কতদিন বলেছে খুকু। সঙ্গে বেড়াতে যাবার জন্যে কেঁদেছে, বায়না ধরেছে। কিন্তু আজ এই কান্না সম্পূর্ণ একটা নতুন অর্থ নিয়ে এল সুকুমারের কাছে—যেন একটা তীর এসে তার বুকে বিঁধল। সুকুমার দেখল টেবিল ল্যাম্পের ফিকে নীল আলোয় খুকুর মুখ কী পাণ্ডুর, কী করুণ হয়ে গেছে। চোখের কোণে চিকচিক করছে জলের রেখা।

সুকুমার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চিঠিটা ছিঁড়ে কুঁচি কুঁচি করে ছড়িয়ে দিলে বাইরে। ঘুমের ওষুধটা লুকোল টেবিলের টানার ভেতরে। ক্লান্ত হতাশায় গ্লাসের জলটা নিঃশেষ করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল।

বন্ধুবান্ধবের মধ্যে দু একজন যারা ব্যাপারটা জানে, তারা উপদেশ দিতে চেষ্টা করে।

—ব্যাপারটা মিটিয়ে দাও না হে, যা হোক একটা কম্‌প্রোমাইজ্ করে ফেলো। এভাবে রাতদিন স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে কেউ বাঁচতে পারে নাকি!

বর্ণহীন হাসি হাসে সুকুমার।

—তাই তো ভাবছি : 'অবণাং তেন গন্তব্যং'। এবার বাণপ্রস্থই নেব, বাসা বাঁধব সুন্দরবনে গিয়ে।

—তাতে সুবিধে হবে না। এটা সত্যযুগ নয়, একালে জঙ্গলের মালিক গভর্ণমেণ্ট। বনে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট ট্রেসপাস্ কিংবা পোচিং-এর দায়ে থানায় চালান করে দেবে। ওসব মতলব ছাড়ো। একটা রফা করো স্ত্রীর সঙ্গে।

রফা? কিন্তু কোন্‌খানে রফা করবে সুকুমার? এমন তো বড় কোনো ঘটনা ঘটেনি, যার জন্যে স্বামী-স্ত্রীর ভেতরে এই মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়েছে; এমন তো স্পষ্ট কোন কারণ ঘটেনি—যে জন্যে এ ওকে ভুল বুঝতে পারে। এই বিদ্বেষ তার অঙ্কুর পেয়েছে অবচেতনার কোন্ অন্ধকার মৃৎকক্ষ থেকে, সহস্র মূল কোনো জটিল গুল্মের মতো এ নিজের বিষরস আহরণ করছে সংসারের অগণিত তুচ্ছ বস্তু থেকে। একে উৎপাটিত করবার কোনো উপায় নেই, নিজেকে উপড়ে ফেলবার আগে পর্যন্ত এর পাশবন্ধন সুকুমারকে মুক্তি দেবে না।

দূরে চলে যাওয়ার উপায় নেই—অনুশ্রীর ঘৃণা জর্জরিত অথচ অন্ধ ভালোবাসা তাকে দুর্নিবার টানে চক্রপাকের মধ্যে নিয়ে আসবে; মরবার শক্তি নেই, খুকুর ডাক শোনা যাবে পেছন থেকে, তার শীর্ণ করুণ মুখের ওপর টেবিল ল্যাম্পের নীল আলো কী বিষাদের মতো জড়িয়ে ধরবে তাকে!

আর এইভাবেই বাঁচতে হবে সুকুমারকে। আরো পঁচিশ বছর, ত্রিশ বছর—হয়তো আরো বেশি। এবং খুব সম্ভব, সুকুমার পাগল হয়ে যাবে না। চাকরি করবে, বাজার করবে, সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা করবে—নিজে রসিকতা করে অন্যকে হাসাবে এবং অন্যের রসিকতায় পাগলের মতো হেসে উঠবে!

আশ্চর্য!

মানুষ বাঁচে কেন?

এই দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর জেনেছে সুকুমার। অভিনয় করবার জন্যে।......

......দরজার গোড়ায় প্রায় দশ মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে সুকুমার সুইচ্‌টা টেনে দিলে। ঘরের দেওয়ালে, ছবির কাচে, ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় আলোটা হঠাৎ জ্বলে উঠল খানিক আগুনের মতো। অনুশ্রী ফিরে চাইল একবার, তার পরেই দুহাতে চোখ আড়াল করে আবার মুখ ফিরিয়ে বসল জানালার দিকে।

জবাব পাবে না জেনেও অভ্যাস রক্ষার জন্যে সুকুমার বললে, শরীর ভালো নেই?

অনুশ্রী চোখ ঢেকে বসে আছে। আকাশটাও বোধ হয় আর দেখতে পাচ্ছে না এখন। একরাশ কালো মেঘ জমা হয়েছে সেখানে। মুক্তির নীল বিস্তার আর নেই, এখন মনের ভার বজ্র-বিদ্যুৎ-বর্ষণের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে রয়েছে।

বুঝতে কিছুই বাকী নেই। ছোট্ট একটা কোনো উপলক্ষ হয়তো ঘটেছে। হয়তো চিঠি এসেছে একখানা, হয়তো বাসায় কোনো আত্মীয় কয়েক মিনিটের জন্যে পদক্ষেপ করেছিলেন। কিংবা কিছুই ঘটেনি—সামনের আকাশটার মতো আপনিই মেঘ এসে জমাট বেঁধেছে। আজ আর বাইরে থেকে উপকরণের দরকার হয় না, মনের বিষগ্রন্থি আপনিই লালা ক্ষরণ করে।

মধ্যযুগের নাইটদের মতো ধীরে ধীরে আসন্ন যুদ্ধের জন্যে তৈরী হল সুকুমার। বর্ম পরা কিংবা ঘোড়া সাজানোর দরকার ছিল না, তার বদলে জামাটা খুলে ব্র্যাকেটে রাখল, হাত ঘড়িটা খুলে রাখল ড্রেসিং টেবিলের ওপর, ট্রাউজার ছেড়ে একটা আধময়লা ধুতি জড়িয়ে নিলে লুঙ্গির মতো, তারপর সস্তার একটা আধপোড়া বর্মা চুরুট ধরিয়ে নিয়ে নিজেকে এলিয়ে দিলে ইজি চেয়ারে।

বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়েও সব টের পাচ্ছিল অনুশ্রী। অথবা টের পাওয়ার দরকার ছিল না। প্রত্যেক দিনের এরা বাঁধা নিয়ম। ঘড়ির কাঁটার মতো এক পথ ধরেই চলে। আট বছরে এ-সব মুখস্থ হয়ে গেছে অনুশ্রীর।

সুকুমারই যুদ্ধের সূচনা করল।

—কথা বলছ না যে?

অনুশ্রী দু চোখে বিদ্যুৎ জেলে মুখ ফেরালো আবার।

—কী অপরাধ করেছি তোমার কাছে যে একদণ্ড চুপ করে বসে থাকতে দেবে না?

—অপরাধের কথা হচ্ছে না। —চুরুটটা যেমন বিস্বাদ, তেমনি কড়া—সুকুমারের গলা জ্বলতে লাগল। সেই জ্বালাটার স্বাদ নিতে নিতে বিকৃত মুখে সুকুমার বললে, চুপ করে বসে থাকারও একটা ধরণ আছে।

—তুমি কি গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে চাও?

—ঝগড়া করতে চাই না। কারণটা জানতে চাইছি।

—কারণ কিছু নেই। —চাপা নিষ্ঠুর গলায় অনুশ্রী বললে, আমার ভালো লাগছে না—তাই চুপ করে আছি। তাতে তোমার কি খুব অসুবিধে হচ্ছে? বলো তা হলে, আমি ছাদে চলে যাচ্ছি।
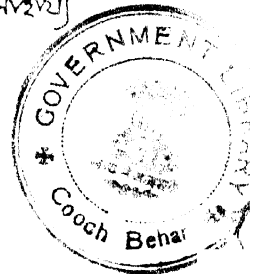
পীড়িত স্নায়ুগুলো আরো জর্জরিত হয়ে উঠছে সুকুমারের। গলায় অসহ্য লাগছে চুরুটের ধোঁয়াটা। কেউ যেন উত্তপ্ত শিসের মতো খানিকটা তরল ধাতু ঢেলে দিচ্ছে সেখানে। সারা দিনের ক্লান্তির পরে মানুষ বাড়ী ফিরে আসে শান্তির আশায়, আশ্রয়ের সন্ধানে। এই তার আশ্রয়, এই তার শান্তি। সুকুমার দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল।

খানিক চুপ চাপ। কয়েকটা উত্তেজিত দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ল সুকুমারের।

অনুশ্রী বললে, হাত মুখ ধুয়ে তোমার খাবারটা খেয়ে নাও। টেবিলেই ঢাকা দেওয়া আছে। আমি চা করে দিচ্ছি উনুন ধরিয়ে।

সুকুমার বললে, আমি খাব না। আমার খিদে নেই।

—বেশ, খেয়ো না তা হলে। ---নিরাসক্ত ভঙ্গিতে কথাটা বলে আবার বাইরে চোখ মেলে দিলে অনুশ্রী।

সাড়ে ন'টায় সেই দু মুঠো খেয়ে অফিসে বেরিয়েছে। সারা দিন গেছে ঘাড়ভাঙ্গা কাজের চাপ। বাড়ীতে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে এইভাবে আপ্যায়ন না করলে কী ক্ষতি হত অনুশ্রীর? অন্ততঃ আধ ঘণ্টার জন্যে একটু স্বাভাবিক, একটু স্নিগ্ধ হতে তার কী বাধা ছিল? মনের ভেতরে যত ভারই জমে থাক, কিছুক্ষণের জন্যে সামান্য একটু অভিনয়ও সে কি করতে পারত না? একটুখানি খাবার, এক গ্লাস জল, এক পেয়ালা চা—সহজভাবে এগিয়ে দিলেই সুখী হত সুকুমার। এর বেশি দাবী তার আজকাল আর নেই—এর বেশি দাবী করবার উৎসাহও না।

কিন্তু কী সংকীর্ণ—কী নির্মম হয়ে গেছে অনুশ্রী। একবারও জিজ্ঞাসা করল না—কেন খাবে না, কি জন্যে খিদে নেই। সুকুমারের কাছ থেকে আজ সে এত দূরে সরে গেছে যে, একটুখানি সাধারণ সৌজন্যও সে রাখতে চায় না। এই প্রাণহীন, শীতল বরফের পিণ্ডকে বুকের ওপর সে কতদিন বয়ে চলবে আর?

চুরুটটাকে ঘরের কোণায় ছুড়ে দিয়ে সুকুমার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

—আমি একটু বেরুচ্ছি।

---চা খাবে না?

—না, প্রবৃত্তি হচ্ছে না।

—কোথায় যাচ্ছ? —এবার অনুশ্রী উঠে দাঁড়ালো। তার মনের সম্পূর্ণ চেহারাটা যেন ফুটে উঠেছে মুখের আয়নায়। স্নেহ মায়া, কোমলতা—কোনো কিছুর চিহ্ন নেই সেখানে। সব প্রাগৈতিহাসিক, সমস্ত জান্তব।

নিজের মুখ দেখতে পেলো না সুকুমার, কিন্তু তার রূপও অজানা নেই। দুটো অন্ধ প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি এখন। কে কাকে কতখানি ক্রুর আর কুটিল আঘাত দিতে পারে, তারই প্রতিযোগিতা।

চাপা গলায় সাপের মতো গর্জন করে সুকুমার বললে, যেখানে খুসি। এ ঘরে আর কিছুক্ষণ বসে থাকলে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। খানিকক্ষণ পথে পথে ঘুরে আসব।

সুকুমার বেরিয়ে যাচ্ছিল, অনুশ্রী এসে দরজা আটকে দাঁড়ালো।

—একটা কথা শুনবে?

দাঁতে দাঁত চেপে সুকুমার বললে, বলো।

—রোজ এমনভাবে সিন ক্রিয়েট করে লাভ কী?— অনুশ্রীর শরীরটাও যেন ফণা তোলা সাপের মতো দুলতে লাগল অল্প অল্প : আমার জন্যেই নিজের ঘরে এসেও তুমি এক মুহূর্তের জন্যে শান্তি পাও না। আমিই চলে গেলে কেমন হয়? ঠিক তক্ষুণি পার্ক থেকে বেরিয়ে ফিরে এল খুকু। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলো সব। সেই প্রতিদিনের পুনরাবৃত্তি আরম্ভ হয়েছে। বাবা এখন তার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে, মাকে সে আর চিনতে পারছে না। একরাশ প্রবল কান্নাকে কোনোমতে সামলে নিলে খুকু—তারপর নিঃশব্দে সরে গেল ছায়ার মতো।

সুকুমার দেখতে পেলো খুকুকে—কিন্তু খুকুর কথা ভাববার মতো মনের অবস্থা তার নয়। তখনো অনুশ্রী ফণা তোলা সাপের মতো দুলছে তার সামনে।

—কী বলো তুমি? আমি চলে গেলে কেমন হয়?

এ-কথা এর আগেও অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছে অনুশ্রী, সুকুমার জবাব দেয়নি। কিন্তু আজ আর নিজের রাশ সে টেনে রাখতে পারল না। হাতের মুঠোয় রাখা দেশলাইটা আঙ্গুলের চাপে মটমট করে উঠল। সুকুমার বললে, ভালোই হয়—খুব ভালো হয়। তুমি মুক্তি পাও---আমিও নিস্তার পাই এই নরক যন্ত্রণা থেকে।

বারুদের পলতেয় ওইটুকু আগুনের জন্যেই যেন প্রতীক্ষা করছিল অনুশ্রী। চক্ষের পলকে মট করে ভেঙ্গে ফেলল হাতের শাঁখা জোড়া—হাড়ের টুকরোর মতো তারা মেজের ওপর ঝরে পড়ল। তারপর পাগলের মতো আঁচলের প্রান্তে সিঁথির সিঁদুর ঘষে তুলতে তুলতে বললে, বেশ, তোমাকে নিস্তারই আমি দিচ্ছি। ইচ্ছে হয় লিগ্যাল সেপারেশনের জন্যে কোর্টে দরখাস্ত করতে পারো—না করলেও ক্ষতি নেই। আর এক্ষুণি তোমার বাড়ী থেকে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি।

সুকুমারের হাতের মুঠোয় দেশলাইটা গুঁড়িয়ে গেল। অন্ধ জিঘাংসায় কাঠিগুলোকে ছুড়ে ছড়িয়ে দিলে ঘরময়। এই মুহূর্তে একটা বীভৎস রকমের কিছু সে করে বসতে পারে। হাতের সামনে একটা খোলা ক্ষুর পেলে বসিয়ে দিতে পারে নিজের গলায়, একটা হাতুড়ি পেলে তাই দিয়ে একঘায়ে নিজের মাথাটাকেই চুরমার করে দিতে পারে।

থরথর করে কাঁপতে লাগল সুকুমার। কোনো কথা বলতে পারল না।

একটানে একটা সুটকেস নামিয়ে আনল অনুশ্রী। ডালা খুলে ভেতরের যা কিছু উবুড় করে ফেলল। ঝর ঝর করে টুকরো টুকরো হল একজোড়া চায়ের পেয়ালা।

তবুও কথা বলল না সুকুমার। কিছু বলবার চেষ্টা করলে এখন কেবল চিৎকার বেরিয়ে আসবে একটা। সে চিৎকার মানুষের নয়।

আলনা থেকে কতগুলো শাড়ী, ব্লাউজ টেনে নিয়ে তালগোল পাকিয়ে সুটকেসে ভরে ফেলল অনুশ্রী।

—আমি খুকুকে নিয়ে এখুনি চলে যাচ্ছি।

বার কয়েক ঠোঁট দুটো কাঁপবার পরে সুকুমার বোবা ধরা আওয়াজে বললে, না, খুকু থাকবে আমার কাছে।

—খুকুকে রাখতে চাও? —রহস্যময় বিচিত্র হাসি হেসে অনুশ্রী বললে, বেশ, তাই রাখো। ও মায়ায় আমায় আর বাঁধতে পারবে না। সব সম্পর্ক চুকিয়েই আমি চলে যাব।

এতক্ষণের মেঘে আচ্ছন্ন আকাশ থেকে এই-বারে বৃষ্টি নামল। ঝমঝম করে নামল।

দাঁতে দাঁত ঘষে সুকুমার বললে, যাওয়ার আগে ওয়াটারপ্রুফটা নিয়ে যেয়ো। বৃষ্টি পড়ছে।

—ঠাট্টা করছ? —অনুশ্রী পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠল : ওয়াটারপ্রুফের কথা মনে করিয়ে দিয়ে আমার আর উপকার করতে হবে না। ঝড়ের মধ্যেই যখন বেরিয়ে পড়েছি—তখন এটুকু বৃষ্টিতে আমার কিছু আসে-যায় না।

একটা তীব্র নীল দ্যুতিতে ড্রেসিং টেবিলের কাচ, অনুশ্রীর রক্তহীন হিংস্র মুখ আর ঘরের চারটে সাদা দেওয়াল এক সঙ্গে উদ্ভাসিত হল। বিকট শব্দ তুলে বাজ পড়ল কাছাকাছি কোথাও।

আর অনুশ্রী বললে, শুধু যাওয়ার আগে খুকুকে একবার দেখে যাব। বৃষ্টিতে খুকু হয়তো পার্কের কোনো ছাউনির নিচে দাঁড়িয়ে আছে। সেইখানেই তাকে বলে যাব—তার মা মরে গেছে।

আবার খানিকটা নীল দ্যুতি ঘরের মধ্যে লক লক করে গেল। প্রচণ্ড শব্দে বজ্র পড়ল আবার।

তখন সুকুমারের মনে পড়ল।

—খুকু ফিরে এসেছে।

---ফিরে এসেছে? —হঠাৎ মুখের চেহারা বদলে গেল অনুশ্রীর : তবে গেল কোথায় খুকু? এখন মেঘ ডাকছে—বাজ পড়ছে---খুকু কোথায়? খুকু—খুকু—

খুকুর সাড়া এল না।

অনুশ্রী ছুটে বেরিয়ে এল। খুকু বারান্দায় নেই, বসবার ঘরে নেই, রান্নাঘর, কলঘর, কোথাও নেই।

সমস্ত ভুলে গিয়ে অনুশ্রী শক্ত করে সুকুমারের হাত চেপে ধরল। তারপর আরো উন্মত্ত, আরো উদ্‌ভ্রান্ত গলায় চেঁচিয়ে বললে, বলো, আমার খুকু কোথায়। বলো—সে কোথায় গেল!

সুকুমারের কপালের দুধারে রক্তের চাপে রগ দুটো প্রায় ফেটে যেতে চাইছে—হৃৎপিণ্ডটা ফুলে উঠতে চাইছে বেলুনের মতো। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সুকুমার বললে, ব্যস্ত হয়ো না, আমি দেখছি।

প্রায় তিন লাফে কুড়ি বাইশটা সিঁড়ি পার হয়ে সুকুমার ছাদে উঠে এল।

তীরের মতো বৃষ্টি পড়ছে। কালো কবন্ধ আকাশ থেকে বিদ্যুতের ঝিলিক। চশমার কাচ ঝাপসা হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ বিভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে থেকে তারপর সুকুমার দেখতে পেলো।

গঙ্গা জলের ড্রামটার ঠিক পাশেই। একটি ছোট মানুষ লুটিয়ে পড়ে আছে। গোলাপী ফ্রকটা লেপটে গেছে গায়ের সঙ্গে আর ছোট্ট

(ইহার পর ৬৪ পৃষ্ঠায়)
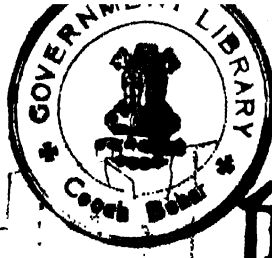
চির-চঞ্চল

বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত

ক্লাশ শেষের ঘণ্টা বাজলেই তাড়াহুড়ো লেগে যায়। একদল ছেলে মেয়ে বেরিয়ে পড়ে তার একদল ঢোকে। লোহার গেটটার সামনেই যত ভীড়। এরই ফাঁকে ফাঁকে একটু দৃষ্টিবিনিময়, একটু বিদ্যুৎ চাপা হাসি, এক মুহূর্তে হাত টিপে দেওয়া, ঈষৎ ধাক্কা, নানা স্পর্শের ইঙ্গিত, মনের সংকেত আরও কত কি! তারপর চায়ের দোকান, কফি হাউস বা সিনেমা সবই আছে।

টুটুল ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকে রমার আশায়। রমা যখন পাশ ঘেঁষে চলে যায়, সে এক-দৃষ্টে শুধু চেয়ে থাকে। খানিক দূরে গিয়ে রমা ফিরে তাকায়। আরও খানিকটা দূরে গিয়ে আবার ফেরে। দেখে টুটুল তেমনি নয়ন মেলে দাঁড়িয়ে আছে। রমা আবার একটু বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। টুটুল তখন ক্লাশে ঢোকে। বয়সের সংকট সন্ধিক্ষণে নারী পুরুষের একই কলেজে পড়ার ব্যবস্থা হ'লে এমন অনেক ঘটনা ঘটেই থাকে। বয়সের স্বভাব যাবে কোথায়?

সাবিত্রী মেমোরিয়াল ছিল স্কুল, এখন হয়েছে কো-এডুকেশন বা সহশিক্ষার কলেজ। কলেজ বাড়ীর উত্তর পশ্চিম কোণে পাথরের ট্যাবলেটে কলেজ প্রতিষ্ঠাত্রীর নাম লেখা আছে, আর সেই সঙ্গে লেখা আছে তার প্রতিষ্ঠাতা সত্যবান বসু ইঞ্জিনীয়ারের নাম। একটি নাম উপরে একটি নীচে। ট্যাবলেটটা প্রায়শঃই ধূলি-ধূসরিত হয়ে পড়ে থাকে। পানঘসা চূণের ছাপে আর সিগারেটের ছাই মোছা টিপে তা বিবর্ণ।

নারী শিক্ষার আলো তুলে ধরেছে ব্রাহ্ম সমাজ, আর সেই আলোকে প্রদীপ্ত হয়েছে সমগ্র বঙ্গের নারী সমাজ। নৈতিক জীবনের নব পথ প্রদর্শকরূপে তাঁরাই স্মরণীয় হয়ে আছেন। আর সেই পথের আলোকবর্তিকারূপে যাঁরা সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, সাবিত্রী রায় তাঁদেরই অন্যতমা। শিক্ষয়িত্রীর শুভ্র পবিত্রতায় তাঁর জীবন কেটেছে। কলেজের ইংরেজী অধ্যাপনা থেকে তাঁর জীবন সুরু আর ডিভিসনাল হেড স্কুল ইনস্পেক্ট্রেসরূপে তাঁর পরিসমাপ্তি।

গিরিডির উশ্রী নদীর পাশে ওই যে টিলার মতো একটু উঁচু জায়গায় একটা ছোট বাড়ী এখন নাথুমল-নাগরমলের ইঁট চূণ সুড়কির আড়ম্বরূপে বিরাজ করছে, ঐখানেই এককালে গড়েছিলেন সাবিত্রী রায় তাঁর অবসরের আবাস।

নীচু থেকে ঘুরে গিয়ে পথটা উপরে উঠে গিয়েছে, সেখান থেকে সোজা খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আবার একটু নেমে গেছে উত্তর মুখে। লতাকুঞ্জে ঘেরা, দেশী-বিদেশী ফল ও ফুলের শোভায় সাবিত্রী রায়ের বাংলোটি স্বপ্নময়, ঝর্ণা ধারা উশ্রীর কলপ্রবাহে উচ্ছ্বসিত।

সময় ও সুযোগমত এখানে অনেকেই আসে বেড়াতে। যেখানে অভ্যর্থনার অভাব নেই, সম্বর্ধনা শুধুই মৌখিক নয়, সেখানে অভ্যাগতের অভাব হয় না। নিকট আত্মীয়, দূর আত্মীয়, পরিচিত, অর্ধ পরিচিতের শুভাগমন লেগেই থাকে।

আজই এসে পৌঁছেছে মায়া দত্ত। ছোট্ট একটি সুটকেস রিক্সা থেকে নামাতেই সাবিত্রী রায় ছুটে এলেন,—'এই যে, সত্যিই তা হ'লে এসে পড়লে। এসো! এসো!'

'আপনি অত করে ব'লে এলেন, বাবা বললেন, একবার না গেলে বড্ড খারাপ দেখায়। চারদিন এক সঙ্গে ছুটি পাওয়া গেল, তাই ছুটে এলাম। নৈলে বাবাও ক্ষুণ্ণ হ'তেন।'

'তোমার বুঝি তেমন ইচ্ছে ছিল না?' নত হয়ে পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে মায়া দত্ত ফিক করে হেসে ফেললে, 'তা কি আপনি জানেন না?'

না জানারই কথা। বেথুন কলেজে পুরস্কার বিতরণ সভায় সাবিত্রী রায় মায়াকে প্রথম দেখেছে। রচনা প্রতিযোগিতায় তার রচনাই সেই প্রথম হয়েছে। তারপর গানের আসরে আবার গান দিয়ে [illegible]

করে দিয়েছে, সে আর স্থির থাকতে পারেনি। অজস্র আশীর্বাদে অভিষিক্ত করে সে তার বাবাকে বার বার বলে এসেছে, গিরিডিতে আমার ওখানে ওকে অবশ্য একবার পাঠাবেন।

মায়াকে দেখে তার ভারি মায়া লাগে। সৌন্দর্যে নয়, মাধুর্যেই তাকে আকৃষ্ট করেছে। সুন্দরী, বিদ্যুৎলতা তার আরও অনেক চোখে পড়েছে, কিন্তু এত স্নিগ্ধ শান্ত মেয়ে কদাচিৎ দেখা যায়।

বাগানের মালী বনমালী এক বালতি জল নিয়ে বাথরুম দেখিয়ে দিয়ে আর এক বালতি জলের জন্য বাইরে ইঁদারার দিকে চলে গেল। মায়া একটু ব্যস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো। 'জল আমিই এনে নেবো। ও'র আবার কষ্ট করা কেন?'

সাবিত্রী হাত দিয়ে ঠেকিয়ে হেসে বল্লেন, 'থাক্ থাক! তুমি কত কষ্ট ক'রে এসেছো!'

সন্ধ্যার দিকে মায়াকে কাছে বসিয়ে স্নেহস্পর্শে অভিষিক্ত ক'রে সাবিত্রী বল্লেন, 'মায়া! একটা গান শোনাও ত! সেই গানটা!'

'কোন্‌টা?'

'সেই যে কলেজের পুরস্কার বিতরণে গেয়েছিলে—'সুন্দর, হে সুন্দর!'

বাইরে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, মহুয়া, শাল, হরিতকী, দেবদারুশ্রেণী নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে, জনহীন নির্জন পুরীর স্তিমিত আলোকে সুরের সুধা ছড়িয়ে মায়া আবেশ জড়িত কণ্ঠে গাইল—'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।'

শেষ রেশ মিলিয়ে গেল। অন্ধকারের নীরবতা আরও গভীর হয়ে উঠল। সাবিত্রী রায় ধরা গলায় নীরবতা ভঙ্গ করলেন—'জানো, এ গানটা ব্রাহ্ম সমাজের প্রার্থনার গান।'

'ওইখানেই ত এটা শিখেছি।'

তিন দিনে মায়া বাড়িয়ে মায়া দত্ত কল্‌কাতা চলে গিয়েছে। ষ্টেশন থেকে ফিরে এসে সাবিত্রী আরও নিঃসঙ্গ বোধ করতে লাগল। অবসর গ্রহণ করার পরেও তার বিশ্রাম নেই। নানা চাকুরির পরীক্ষার খাতা তাকে এখনও দেখ্‌তে হয়, সভা-সমিতিতে বক্তৃতা উপদেশের আহ্বান আসে, রচনা প্রতিযোগিতার সেরা রচনা বাছাই, আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে নানা স্থানে অহরহ তাকে ঘুরে বেড়াতে হয়। তবু কেন যেন তার এই একক নিঃসঙ্গ জীবন মাঝে মাঝে দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। শত কর্ম-কোলাহলের মধ্যেও কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

অতর্কিতে আপনা থেকেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে পড়ে।

মায়ার কথাই মনে ঘুরছে। মায়া কেমন স্নিগ্ধ, শান্ত, সপ্রতিভ অথচ মমতার প্রতিমূর্তি। নিরীহ এই মেয়েটিকে দেখলেই মনে হয় তাকে কাছে রাখি। আর যাকে সে আপন হাতে সারা জীবন দিয়ে মানুষ করেছে, সে কত চঞ্চল, আর কত অস্থির মতি! পিতৃহীন দূর আত্মীয় রণেন—তাকে সে বহু অর্থ ব্যয়ে এম-এ পাশ করিয়েছে, বিলেত পাঠিয়েছে, কিন্তু ভাল লাগে না বলে না জানিয়েই সে চলে এসেছে। কল্‌কাতায় তার জন্য একটা কাজ ঠিক করা হয়েছে,—সে চলে গেছে পাটনায়। তাও যদি তার নিজের সম্পর্কে বিশ্বাস থাকতো! কলেজে কাজ নিয়েছে, থাকবার জন্য জায়গা স্থির করে দিতে লিখেছে তাকেই। কল্‌কাতার প্রতিবেশী সমবায় সমিতির ইনস্পেক্টর অবনী ভট্টাচার্যের বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা তাকেই করে দিতে হয়েছে। অবনীবাবু চমৎকার লোক, ভারি অতিথিপরায়ণ। কতবার তিনি গিরিডিতে এসে তার বাড়ীতে বেড়িয়ে গেছেন। এই অক্টোবর মাসেও তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিলেন।

অবনীবাবু ভারি আমুদে। কারো খোসামোদের ধার ধারেন না। এক ডাকেই মানুষকে আপন করে নেবার তাঁর ক্ষমতা অদ্বিতীয়। দু'বছর আগে প্রথম যখন গিরিডিতে এলেন, নিজেই মেঝেয় বিছানা পেতে শুয়ে পড়লেন, বল্লেন, 'আমায় কেউ ডাকবেন না। ঘুমুলে আমার জ্ঞান থাকে না।'

'কেন, ওই যে তক্তপোষে আপনার বিছানা করা হয়েছে।'

কিন্তু কে শোনে? সকালবেলা উঠে লাফিয়ে বল্‌বেন, চা হ'য়েছে? না হ'লে নিজেই উনুনের কাছে চলে যাবেন। খুট খুট করে নিজেই সব করে নেবেন। তাঁর তোয়ালে এগিয়ে দিতে হয় না, স্নানের জলের জন্য হাঁক-ডাক লাগে না—জামা কাপড় দরকার মতো তিনি নিজেই গুছিয়ে রাখেন।

সকালের দিকে ঘণ্টাখানেক টয়লেট সেরে তাঁর স্ত্রী তপতী যখন দরজা খুলে বেরোলেন, অবনীবাবু উচ্চস্বরে গান ধরলেন—'সে যে আসে, আসে, আসে। তোরা শুনিসনি কি শুনিস্ নি? তার পায়ের ধ্বনি।' ধনী ঘরের দুলালী তপতী, তার টয়লেটে একটু বেশী সময় কাটে। অভিজাত পরিবারের ওটা সহজাত ধর্ম। অবনীবাবু হাসলে কি হবে!

সাবিত্রী রায়ের বেশ লাগে। এই হাসি, এই কৌতুক, এই যৌবনের উচ্ছলতা। অল্প দিনের পরিচয় হলেও মনে হয়, এ'রা যেন কতকালের আত্মীয়। রণেন পাটনায় যখন চাকুরি পেল, সাবিত্রী রায় অবনীবাবুকেই লিখলেন, একটা থাকবার যায়গা খুঁজে দিন না।

অবনীবাবুর উত্তর এলো। যেমন নিঃসংকোচ তেমনি আত্মভোলা। 'জানেন দিদি, আমরা যে সমবায় নিয়ে কাজ করি, তার মটো হচ্ছে—'সকলের তরে সকলে আমরা'। রণেনকে অবিলম্বে আমার এখানে আসতে বলুন, না হয় আমিই গিয়ে নিয়ে আসবো। আমার বাসা থাকতে সে কোথায় থাকবে!' অবনীবাবু নিজেই গিয়ে রণেনকে তার হোটেল থেকে নিয়ে এসেছিলেন। সেখানে সে ভালই আছে।

তারপর তপতী-অবনীবাবুও আসেন, রণেনও আসে, মায়াও কয়েকবার এসেছে, তবে সে আপনা থেকে কখনও আসে না, সাবিত্রী রায়ের চিঠি পেলেই এসে হাজির হয়। বড়দিনের ছুটিতে রণেনকে ডেকে সাবিত্রী রায় বললেন, 'কথা এক রকম ঠিক করেই ফেলেছি, মায়াকে ঘরে বৌ করে আনতে হবে। আপত্তি করবিনে ত!'

গিরিডির শীতের হাওয়া একটু কনকনে। রণেন মায়াকে দেখেছে, ভালোও লেগেছে। তবু শীতের রাগটা আর একটু গায়ে চেপে ধরে, রণেন বললে, 'তোমার যদি তাই ইচ্ছে, তবে তাই করবো।'

মনের হাওয়া হালকা হ'য়ে গেল। সাবিত্রী রায়ের শুধু এই কাজটিই বাকী ছিল। রণেন চাকুরি পেয়েছে, কাজ করছে, বিদ্যে বুদ্ধিও বেশ আছে। ঘরসংসারে মন দিলে তার অস্থির মতিও শান্ত হবে। তারপর সাবিত্রী রায়ের জীবন-নাটকে আর কোন পার্ট নেই। ঝরাপাতার মতো হাওয়ায় উড়ে যাও, বা সাগর জলে ডুবে মরো, কারো তাতে কিছু যায় আসে না।

পুরোনো দিনের স্মৃতিগুলি ভেসে আসে, লঘু মেঘখণ্ডের মতো। তাদের তাড়ানো যায় না, ছাড়ানো যায় না। আপনা থেকেই তাদের আনাগোনা।

সেই কলেজ জীবনে মনে পড়ে পড়ার ঘরে বসে শুনেছিলেন সাবিত্রী রায় তার পাশের ঘরে মায়ের আলাপ।

'সত্যবানের বাবা নিজেই এসে বলে গেলেন, উপযাচক হয়ে, তবু তোমার গুমর ঘুচল না? সাবিত্রী-সত্যবান! নামেরই বা কেমন মিল দেখ দেখি।'

'হাঁ, হাঁ, কাহিনীটাও মনে রেখো।'

'আহা অমন কথা কেন বলচো? এদের বিয়ের যোগ হলে তাতে বিয়োগ কখনই হবে না, এ আমি স্বপ্নে দেখেছি, সত্য জানি, উভয়ের অন্তরের দিকে চেয়ে মানি।'

বাবা ক্রুদ্ধ হয়ে বল্‌লেন, 'যা বোঝ না, বুঝতে পারো না, বোঝালেও বুঝবে না তা নিয়ে এত মাথা ঘামাতে এসো না।'

পিতাই গৃহের গৃহকর্তা, তাঁর আদেশ মায়েরও শিরোধার্য, কন্যারও। একবার 'না' বললে তাঁকে হ্যাঁ বলবার উপায় ছিল না।

সাবিত্রী রায়ের নেই মনের বল, সত্যবানের নেই অর্থের জোর। অতএব সংযোগ আর ঘটলই না।

মা কেঁদে থামলেন সত্যবানের বাবা বার বার উপেক্ষায় হতাশ হ'য়ে ফিরলেন। সাবিত্রীর দীর্ঘশ্বাস মিলিয়ে গেল সত্যবানের বুকে।

(ইহার পর ৬৪ পৃষ্ঠায়)

চরিতার্থ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

গেয়েছি তোমার গান কৈশোরে যৌবনে,
অতিক্রম করিয়াছি দীর্ঘ-দীর্ঘ পথ,
কিছু ত ছিল না, শুধু ছিল ভবিষ্যৎ,
ছিল সে অনন্ত আশা স্বপ্ন ছিল মনে।
উৎসর্গ করেছি প্রাণ। সেই অন্বেষণে
মানি নি—মানি নি বাধা ক্ষুদ্র কি বৃহৎ।
সাধনা কি হ'ল সিদ্ধ—তপস্যা মহৎ?
পেয়েছি কি দেখা তব আমার জীবনে?

শত দুর্যোগের পর, শত দুঃখ সহি'
তোমারে পেয়েছি আজ আনন্দে উৎসবে।
কল্পনার মূর্তি আর নহ তুমি অয়ি,
হয়ত প্রভেদ আছে স্বপ্নে ও বাস্তবে।
তুমি সেই স্বাধীনতা? হে মহিমময়ী,
তুমি এলে, হ'ল নব-সূর্যোদয় নভে।

উৎসব - আনন্দে
পূজো-পার্ব্বণে-
ভীম নাগের
সন্দেশ ও মিষ্টির খাবার
৬-৮, ওয়েলিংটন স্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন—৩৪-১৪৬৫
৮নং বিবেকানন্দ রোড,
(জোড়াসাঁকো জংসন)
৪৬নং ষ্ট্র্যান্ড রোড (বড়বাজার)
ফোন—৩৩-৩৩৭৮
৩৩।১।২, নেতাজী সুভাষ রোড,
(খুরুট রোড) ফোন—হাওড়া—৮২৪

সমুজ্জ্বল মুখশ্রী
নিয়মিত "বোরোলীন" ব্যবহারে আপনার
তনুশ্রী দিন দিন উজ্জ্বল ও কমনীয়
হয়ে উঠবে।
মুখশ্রীর কোমলতা ও সজীবতা বজায়
থাকবে। এর প্রাণস্পর্শী স্নিগ্ধ সুবাস
আপনার মনে আবেশময় অনুভূতি
এনে দেবে।
উচ্চাঙ্গের ফেসক্রীম বোরোলীন
পরিবেশক
জি, দত্ত এণ্ড কোং
১৬, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা-১
সকল ষ্টেশনার্স ও ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

রন্ধ্রগর্ভে ॥ অবধূত

দক্ষিণাচার আর বামাচার।

দুনিয়ায় দুটি মাত্র আচার আমার চোখে পড়ে। অবশ্য স্ত্রীআচার নামে আর একটি আচার চালু আছে জগতে। যাঁরা বিয়ে করেছেন, তাঁরা সেই আচার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন। অর্থাৎ স্ত্রীআচার সম্বন্ধে তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে বলে শুনেছি। কিন্তু সেই তৃতীয় আচারটি সম্বন্ধে কিছু লিখতে যাওয়া নিরাপদ নয়। কারণ বহু বিয়ে করা বন্ধু-বান্ধবকে জিজ্ঞাসা করে দেখেছি যে ওই আচারটি সম্বন্ধে তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কাহিনী কিছুতেই পরস্পরের সঙ্গে মেলে না। প্রত্যেকটির বর্ণনা বিলকুল আলাদা ধরণের। কাজেই তৃতীয় আচার সম্বন্ধে গবেষণা না করাই সুবুদ্ধির কাজ।

এখানে আমি প্রথম ও দ্বিতীয় আচারটি নিয়ে আলোচনা করব। দক্ষিণাচার আর বামাচার, অর্থাৎ ডান হাত আর বাঁ হাতের কারবার। বহু-দিন বহুরকমের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমার এই জ্ঞানটুকু হোয়েছে যে দুনিয়ায় মাত্র দুটি আচার অর্থাৎ দুরকমের কারবার চালু আছে। একটির নাম দক্ষিণ হস্তের কারবার আর একটির নাম বাম হস্তের কারবার।

প্রথমে দক্ষিণ হস্তের কারবার সম্বন্ধে বলা যাক।

হাতটান, হাত সাফাই, হাত গুটিয়ে নেওয়া, হাত তোলা বা হাত পাতা এই সব ব্যাপার যেখানে চলছে, সেখানে বুঝতে হবে যে, দক্ষিণাচার চলছে। হাতছানি দেওয়া বা হাতানো, হাতুড়ি পেটা বা হাতড়ানো এগুলোকেও দক্ষিণাচারের মধ্যে ফেলা যায়। সাধারণতঃ মানুষে ডান হাতের সাহায্যেই এই সব কাজকর্ম করে। হাতাহাতি করতে অবশ্য দু'হাতই ব্যবহার করতে হয়। অর্থাৎ যেখানে হাতাহাতি চলছে সেখানে বুঝতে হবে দক্ষিণাচার বামাচার এই উভয় আচার আছেই। কিন্তু এই দ্বৈত আচার নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। কারণ আমি দ্বৈতবাদী নই।

দক্ষিণাচারীরা বা বামাচারীরাও দ্বৈতবাদী নন। খাঁটি অদ্বৈতবাদী ওঁরা। একমাত্র হাতা-হাতি করার সময় ওঁরা দ্বৈতবাদী হন। অন্য সময় নৈষ্ঠিক অদ্বৈতবাদী থাকেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা দক্ষিণাচার পালন করেন তাঁদের দস্তুরমত সাধনা করতে হয়। যেমন ধরুন হাতপাতা ধর্ম যাঁরা পালন করেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা দক্ষিণা-চারী, অর্থাৎ ডান হাত পাতেন যাঁরা, তাঁদেরও বেশ কিছু দিন অভ্যাস করতে হয় হাতপাতা।

বেশ কিছু দিন সময় লাগে ধর্মটা ধাতস্থ হ'তে।

রপ্ত না থাকলে হঠাৎ কারও গণ্ডে ঠাস ক'রে একটি চড় কষানো যেমন সম্ভব নয় তেমনি ধাতস্থ না থাকলে খপ ক'রে ডান হাতখানি মেলে ধরাও একান্ত কঠিন কাজ। রাগে, অভিমানে বা সংসারের ওপর পিত্তি জ্বলে উঠলে মুখে এসে পড়ে—"না হয় ভিক্ষে মেগে খাব, তবু—।" তবু যদি সত্যিই কখনও বেকায়দায় পতনের ফলে কারও সামনে দক্ষিণ হস্তখানি মেলে ধ'রে দয়া ক'রে কিছু দান কর'—এই ভাবটি ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজন হয় নিজের মুখে, তখন মালুম হবে যে হাতখানা জগদ্দল পাথরের মত ভারি হোয়ে উঠেছে আর ঘাড় সোজা ক'রে মুখখানা মোটে তোলাই যাচ্ছে না। জীবনে প্রথমবার চুরি করতে যাবার সময় নাকি ওই রকম হয়, পা উঠতে চায় না, হাত নড়তে চায় না। হাজার সাহস, শক্তি, বুদ্ধি থাকলেও কি রকম যেন বাধোবাধো ঠেকে। হাত-সাফাই, হাতানো বা হাতাহাতি করার সময় বুদ্ধি, সাহস, শক্তির প্রয়োজন হয়ত হয়, কিন্তু হাত পাতার সময় ও-সমস্ত কিছুরই দরকার করে না। যে অতিমানুষিক ক্ষমতার প্রয়োজন হয় তখন তা' অতি সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না কোথাও। আমার আমিত্বটুকুকে দু'পায়ে পিষে তার ওপর খাড়া হোয়ে দাঁড়ান খুব হালকা কাজ নয়। আর আমিত্বটুকুর ওপর খাড়া হোয়ে না দাঁড়াতে পারলে হাতখানা তুলতেই পারা যাবে না। তবে একবার রপ্ত হোয়ে গেলে ঐ হাতটান বিদ্যের মত হাতপাতা বিদ্যেটিকেও যেখানে সেখানে যখন তখন কাজে লাগানো যায়। না হয় চিৎ করা হাতে পড়বে না কিছুই, বড়জোর দু'চারটে বাঁকা বাঁকা বোলচাল শুনতে হোতে পারে। কিন্তু মারধোর খাবার বিন্দুমাত্র ভয় নেই বা ভিক্ষে চাইবার দরুণ থানাতে টেনে নিয়ে যাবার আইনও এখনও বানানো হয় নি দেশে। সুতরাং হাত টান, হাত-সাফাই এ সমস্ত ঝুঁকি-ওয়ালা কারবারে না নেমে এই হাতপাতা কারবারে হাত পাকানো ঢের ভাল। কারণ এতে ঝঞ্ঝাট নেই বললেই চলে একরকম।

দক্ষিণাচার অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তের কারবার সম্বন্ধে আর কিছু বলবার আগে বামাচার অর্থাৎ বাম হস্তের কারবার সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু বলে নি। দুনিয়ায় বাঁ হাতের কারবারের মত মজার কারবার আর কিছুই নেই। বামাচার পালন করতে মোটেই বাধোবাধো ঠেকে না কারও। বরং বিশেষ সম্মান আর প্রতিপত্তির সঙ্গেই চালান যায় এই কারবারটি। স্থান-মাহাত্ম্যের গুণে বামাচারকে একটি অতি পবিত্র কর্ম বলে বিবেচনা করা হয়। সেই সব মহিমময় স্থানে যে সব শ্রীযুক্ত বামহস্তগুলি চির প্রসারিত হোয়ে আছে, সেই হাতের মালিকদের মানুষ অত্যন্ত সম্মান করে। সকলে মনে করে যে, নেহাত করুণাবশেই তাঁরা অর্থাৎ সেই বাম হাতগুলির মালিকেরা তাঁদের করকমল প্রসারণ করার কষ্টটুকু স্বীকার করেন। সেই অদ্বৈতবাদী বামাচারীদের পবিত্র বামহস্তগুলি পরিপূর্ণ করে দিতে পারলে মানুষ নিজেদের কৃত-কৃতার্থ জ্ঞান করে। ভাগ্যদোষে না পারলে তার ফল হাতে হাতে ভোগ ক'রে একেবারে নাজেহাল হোয়ে যায়।

দেখা যাচ্ছে যে দক্ষিণাচার পালন করতে গেলে নিজেকে যথেষ্ট পরিমাণে খাটো করতে হয় এবং বামাচার পালন করলে সাধারণ লোক যথেষ্ট ভক্তি সম্মান করে। এই তুলনামূলক সমালোচনা করবার সময় আর একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে দক্ষিণাচারীরাও বিশেষ দাপটের সঙ্গে তাঁদের আচার প্রতিপালন ক'রে থাকেন। কিন্তু সেই পন্থাগুলিকে দ্বৈতাচার বলা হয়। কারণ অনেক সময় প্রকৃত যাঁরা বামাচারী তাঁরাও বাঁ হাত ব্যবহার না ক'রে ডান হাত ব্যবহার করেন। অর্থাৎ দক্ষিণাচারী বামাচারী উভয় আচারীরাই নিম্নলিখিত পন্থাগুলি অবলম্বন ক'রে একমাত্র দক্ষিণ হস্তের দ্বারাই তাঁদের ধর্ম পালন ক'রে থাকেন।

এই দ্বৈতাচারের মধ্যে প্রধান এবং উল্লেখ-যোগ্য কর্ম হচ্ছে—পরের উপকার করা। এটি এমন একটি কর্ম যার জন্যে নিজেকে খাটোও করতে হয় না বা কাউকে চোখও রাঙাতে হয় না। অসংকোচে দক্ষিণ হস্তখানি যার তার সামনে মেলে ধরা যায়। অর্থাৎ পরের উপকার করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে হাত পাততে কোথাও কিছু-মাত্র বাধোবাধো ঠেকে না। পরের উপকার করার জন্যে করাও যায় অনেক কিছু। আগের দিনে ক্ষুধার অন্ন, তেষ্টার জল, লজ্জা নিবারণের বস্ত্র, রোগের চিকিৎসা, মাথা গোঁজার ঠাঁই এইগুলোর সংস্থান ক'রে দেওয়াই ছিল পরের উপকার করা। এখন দিনকাল পালটেছে, আমরা উন্নত হোয়েছি, সভ্য হোয়েছি এবং চিন্তা-জগতে বহুদূর অগ্রসর হোয়ে পড়েছি। এখন শরীর রক্ষা কর্মটিকে আমরা আদবেই আমল দিতে চাই না। শরীর রক্ষা ও গরু-ছাগলেও করে এবং করছেও ঘাস-জল খেয়ে। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, গরু ছাগলে খাবার সময় ডান হাত বাঁ হাত কোনও হাতই ব্যবহার করে না। কিন্তু আমরা মানুষ, মানুষ যে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা খাবার সময় হাত ব্যবহার করি। অবশ্য বানর-গুষ্টিরাও তা করে। কিন্তু এখানেও বানরের সঙ্গে মানুষের একটা মৌলিক তফাৎ আছে। বানর বললেই একটি লেজও বুঝায়। মানুষ বললে তা' বুঝায় না এবং লেজ না থাকার দরুণ আমরা পরের উপকার করি। বানরেরা স্ব স্ব লেজের জ্বালায়ই মন, ওরা পরোপকার করবে কেমন করে।

যাক, যা বলছিলাম, কথা হচ্ছে আমরা মানুষ, তাই আমরা মনে করি যে শরীর রক্ষার চেয়ে অনেক বেশী জরুরী হচ্ছে মনের খোরাক জোটানোর হাঙ্গামা। আমরা জানি যে, দেহ রক্ষার চেয়ে মন রক্ষা করাটা অনেক বড় কথা। মন রক্ষা করতে হ'লে মান রক্ষা করা প্রয়োজন। মান রক্ষা করতে হ'লে কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এগুলিকে রক্ষা করতে হয়। কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এই সমস্ত গুণগুলিকে চাঙ্গা ক'রে তুলতে না পারলে জাতি হিসাবে আমাদের অস্তিত্বই থাকে না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য—নিজের নিজের ঘরে খিল এঁটে ব'সে বাঁচানো সম্ভব নয়। এ জন্যে দল পাকাতে হয়, সম্মেলন ডাকতে হয়, প্যাণ্ডেল বেঁধে মাইক ভাড়া করতে হয়। সভাপতি চাই, প্রধান অতিথি চাই, ভালো ভালো গাইয়ে, বাজিয়ে চাই। ছায়ালোকের সেরা সেরা নক্ষত্র আমদানি করতে হয় থিয়েটার করতে হয় নাচতে হয় নাচাতে হয়। ভাঁড় ভাড়া করে এনে হাসতে হয়, হাসাতে

য়। নামকরা যাঁরা মরে বেঁচেছেন, তাঁদের জন্ম-তিথি পালন করতে হয়। নাম-না-করা যাঁরা বেঁচে মরে আছেন, তাঁদের মৃত্যুতিথি কামনা করতে হয়। এ ছাড়া রয়েছে সর্বজনীন পূজো, নির্বংশে বিসর্জন আর সর্বাত্মক হরতাল করানো। এই সমস্ত কর্মগুলোও পরোপকার শ্রেণীতে পড়ে এবং এই সব পরোপকারের একটিও বিনা পয়সায় করা চলে না এবং যেহেতু ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো কর্মটিকে আমরা নেহাতই অপকর্ম জ্ঞান করি, তাই হাত পাততে হয়। এই হাত-পাতা হচ্ছে ডান হাত পাতা। দক্ষিণাচারী বামাচারী উভয় আচারীরাই এই সব পরোপকার করার জন্যে অসংকোচে ডান হাতখানি পাতেন। তাতে আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগার ভয় নেই, বা কেউ উপরি উপার্জন করছে ব'লে বদনামও দেয় না। কারণ ঘোর বামাচারীও পরোপকারের জন্যে হাত পাততে হলে ডান হাতখানাই পাতেন। তাই এই আচারটির নাম দৈবতাচার।

এই দৈবতাচারে আবার অনেক সময় ডান বা কোনও হাত না পাতলেও চলে। পাততে যা হয়, তার নাম পা অর্থাৎ পাদপদ্ম। ডান বাঁ দুখানি চরণই এগিয়ে দিতে হয় এবং উপযুক্ত শ্রীপাদপদ্মে তখন দৈবতাচারের খরচা নিজে থেকেই গিয়ে আছড়ে পড়ে।

এই খরচাটির নাম হচ্ছে পারলৌকিক খরচা। কৃষ্টি সংস্কৃতি ঐতিহ্য এগুলি এই মরজগতের উন্নতি, অবনতি, আধিভৌতিক সুখ দুঃখের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু এই মরজগৎ ছাড়াও আলাদা একটা জগৎ আছে। তার নাম আধ্যাত্মিক জগৎ। সেই আধ্যাত্মিক জগতেও সুখ-শান্তি, ভাল-মন্দ, উন্নতি-অবনতি আছে। সেই সমস্ত আধ্যাত্মিক ব্যাপার নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান তাঁরা দুঃখ হোলে নিতান্ত কৃপা ক'রে পরোপকার করা আরম্ভ করেন। আধ্যাত্মিক জগতে নিজেদের মোল আনা সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা হয়ে যাবার পর তাঁরা সাধারণ জীবকে সেখান-কার অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল করার মহান ব্রত গ্রহণ করেন। এই কর্মটির নাম হচ্ছে জীব উদ্ধার করা। এই জাতের পরোপকার ব্রত পালন করতে গেলেও মহামহোৎসব মহা-সম্মেলন, মহানাম সংকীর্তন, মহাবাণী প্রচার ইত্যাদি সব মহা মহা কাণ্ড কারখানা করতে হয়। তাতেও ঐ প্যাণ্ডেল, মাইক প্রধান অতিথি, সভাপতি, গান, বাজনা, নৃত্য, সংবাদপত্র সিনেমা সব কিছু লাগে এবং লাগে যখন তখন টাকারও প্রয়োজন। অর্থাৎ কিনা টাকা এমন এক বস্তু যা আধ্যাত্মিক পথের পাথেয় হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সেই আধ্যাত্মিকতার পাথেয় বা পারলৌকিক খরচার জন্যে ডান বাঁ কোনও হাতই পাততে হয় না, পাততে যা হয় তার নাম শ্রীচরণ অর্থাৎ পাদপদ্ম। পারলৌকিক খরচার স্বভাব হচ্ছে উপযুক্ত পাদপদ্মে গিয়ে পড়া এবং যেহেতু শ্রীপাদপদ্মের কাছে কেউ হিসেব চাইতে যায় না, সুতরাং নিশ্চিন্ত।

কথায় কথায় যখন হিসেবের কথাটা উঠেই পড়ল তখন এ সম্বন্ধে এখানেই দু'চারটে কথা বলে নি। দক্ষিণাচার বামাচার কোনও আচারেই হিসেব টিসেবের প্রশ্নই ওঠে না। দৈবতাচারের মধ্যে অবশ্য কোনও কোনও স্থানে একটা হিসেব দেখানো হয়। সেটা কিন্তু আধ্যাত্মিক হিসেব। সে হিসেব নিয়ে মরজগতের মানুষ মাথা ঘামায় না। আধ্যাত্মিক হিসেবের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আধ্যাত্মিক হিসেব পরীক্ষকই করতে পারেন। ইহজগতের হিসেব পরীক্ষকরা সে হিসেবের ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারেন না। কারণ এটা ত' মোদ্দা কথা যে ইহজগতের আইন-কানুনে আধ্যাত্মিক জগৎ চলে না। কারণ ইহজগতের হিসেব-নিকেশের নিকেশ চুকিয়ে দিতে না পারলে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশের ছাড়পত্রই মেলে না।

তা'হলে দেখা যাচ্ছে যে, দুনিয়াশুদ্ধ মানুষকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। মানুষ হয় দক্ষিণাচারী হবে, নয় বামাচারী হবে, আর সব চেয়ে বুদ্ধিমান যারা তারা দৈবতাচারী হবে। মোটামুটি এইটুকু জেনে রেখে অর্থাৎ এই জ্ঞানটুকুর ওপর ভিত্তি ক'রে দুনিয়ায় শান্তির ইমারত গ'ড়ে তোলা যায়। কি ক'রে তা সম্ভব সেই সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে আমি এই সারগর্ভ প্রবন্ধ শেষ করব।

এখন অশান্তির উৎপত্তি হয় কেমন ক'রে তা আগে দেখা যাক। বিদ্বান ও চিন্তাশীল মানুষ যাঁরা তাঁরা ব'লে গেছেন যে, অসন্তোষ থেকেই অশান্তির সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ যে যা করতে চায় তা' করতে না পেলেই অসন্তুষ্ট হোয়ে পড়ে। তার ফলে রেগে গিয়ে কাটাকাটি খুনোখুনি পর্যন্ত বাধিয়ে বসে।

ধরা যাক, নৈষ্ঠিক দক্ষিণাচারীদের কথা। যাঁরা এই হাত-টান, হাত-সাফাই হাত-তোলা, হাত-পাতা, হাতছানি দেওয়া বা হাতড়ানো এই সব ব্যাপার নিয়ে থাকতে চান, তাঁরা যদি নিরুদ্বেগে তাঁদের ধর্ম পালন করতে পারেন তাহলে তাঁরা অসন্তুষ্ট হবেন না কিছুতেই।

আর নৈষ্ঠিক বামাচারীরা, যাঁরা উল্লেখযোগ্য স্থানে অস্থানে স্থান পাবার ফলে সম্মান প্রতিপত্তি আর দাপটের সঙ্গে বাঁ হাতের কারবার চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা যদি শান্তিতে তাঁদের ধর্ম পালন করতে পারেন তা'হলে তাঁদেরও চটে ওঠার কোনও কারণই থাকতে পারে না।

দৈবতাচারী যাঁরা, তাঁরা যদি অনায়াসে পরোপকার ব্রত চালিয়ে যেতে পারেন তা'হলে তাঁরাও কিছুতেই খেপে ওঠেন না।

কিন্তু এই তিন দল কিছুতেই নির্বিবাদে স্ব স্ব ধর্ম পালন করতে পারছেন না বলেই দুনিয়ায় এত অশান্তি, এত গণ্ডগোল।

অর্থাৎ এঁদের বাধা দেবার জন্যে, এঁদের ধর্ম পথের বিঘ্ন হোয়ে আরও কিছু মানুষ এখনও জগতে আছে।

তাঁরা কারা?

যদি কোনওক্রমে তাঁদের বেছে বার করতে পারা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই বাধাদানকারী-দের গলায় এক একটি ফুটো কলসী বেঁধে সাগরে নিক্ষেপ করা যায়, তাহলেই দুনিয়া থেকে অশান্তির বীজ সমূলে ধ্বংস করা সম্ভব।

কিন্তু কে করবে সে কাজ? সে কাজ করাবার মানুষ একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না জগতে। দেখা গেছে দক্ষিণাচারী বামাচারী বা দৈবতাচারী যে দলের হাতেই অধার্মিকদের শায়েস্তা করার ভার দেওয়া হয় সেই সেই পাষণ্ডদের আপন দলে টেনে নেন। তার ফলে পাষণ্ডরা শায়েস্তা হওয়া দূরে থাকুক আরও মাথায় উঠে বসে। অর্থাৎ তখন তারা বামাচারীর দলে ঢুকে দক্ষিণাচারীকে ঠাণ্ডা করতে ছোটে. দক্ষিণাচারীর দলে স্থান পেলে বামাচারীর মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে চায়। আর দৈবতাচারী হোয়ে পড়তে পারলে সকলের মাথায় ঘোল ঢালার ফন্দিতে ফেরে।

অতএব অনেক ভেবে চিন্তে এই সিদ্ধান্তে আমি এসেছি যে, মানুষ যদি আরও কিছু দিন টিকে থাকার বাসনা রাখে জগতে তা'হলে তাকে বামাচার, দক্ষিণাচার দৈবতাচার ত্যাগ করতে হবে এবং তা সহজেই সম্ভব।

যদি আমরা প্রত্যেক মানুষ আমাদের দুখানি করে হাতের মায়া ত্যাগ করতে পারি, অর্থাৎ হাত দুখানি কেটে বাদ দিতে পারি তা'হলেই পৃথিবীতে শান্তি সম্ভব। দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই হাত না থাকলেও বহু জীবের বেশ চলে যাচ্ছে। গরু-ঘোড়া-ছাগল-ভেড়া থেকে আরম্ভ করে সাপ বাঘ পাখী মাছ কারোরই হাতের বালাই নেই। সুতরাং এবার আরম্ভ হোক হস্ত বিসর্জন অর্থাৎ হস্ত দান আন্দোলন। নচেৎ আর আমাদের রক্ষা নেই। কারণ আমাদের বেশ বুঝে ফেলেছে শুধু ঐ ডান হাত বাঁ হাতের কারসাজির ফলে। হাত বিসর্জন না দিতে পারলে এই বদ্ধ্যন্ত কারসাজির হাত থেকে আমাদের পরিত্রাণ নেই।

খুলে দে ঘোমটা তোর

আবুলকাশেম রহিমউদ্দীন

সহসা পাখির গানে গানে এলো ভোর—
এ-গাছে ও-গাছে ফুল ফোটা হলো শেষ;
ও বধূ এবার খুলে দে ঘোমটা তোর,
ভালবাসা হোক এ-হাওয়ায় এলোকেশ!
হাসিতে ফুটুক কৃষ্ণচূড়ার ঝড়,
নিঃশ্বাস তোর ঝাউবনে ফিরে যাক,
দৃষ্টিতে হোক সূর্য পঞ্চশর—
এ-আকাশ দিক ক্ষিপ্ত বাঁশির ডাক।

দূর দিগন্তে সাগরে মদির ঢেউ—
পেতে দে এবার নদীতে গোপন হৃদয়।।

মাঠ ঘাট পথ দাঁতে দাঁতে চিরে খুঁড়ে
রাতের বরাহ তোর কোনো সন্ধান
পায় নি, আলোর তীরে বিঁধে বহুদূরে
সরেছে; আহত মাটিতে জেগেছে গান—
যে-গানের বহু স্বপ্নের শতদল
বাসি হ'য়ে ছিল বুকের দিঘিতে জমে,
পথ চেয়ে ছিল দু'চোখে মেঘের ঢল
বর্ষণহীন বেদনায় থমথমে।

লাঞ্ছিত মাটি আজ হোক তোর বীণা,
খুলে দে ঘোমটা, এসেছে গানের সময়।।

সমুদ্র তোর চোখের কঠিন মেঘে
বসন্ত জ্বেলে, অধীর বুকের পলি
জোয়ার ভাটার গভীর লীলায় ভেঙে
সৃষ্টির ঘরে ভ'রে দিক অঞ্জলি!
তারপর তোর বাসনাই হোক দিন,
সমুদ্র হোক সারাজীবনের গান,
দেখা দিক তোর কোল জুড়ে অমলিন
নতুন পৃথিবী—সমুদ্র সন্তান।
খুলে দে ঘোমটা সমুদ্র বিলাসিনী,
মদন সূর্য ললাটেই হোক উদয়।

নীলকণ্ঠ

(৫৮ পৃষ্ঠার পর)

মাথাটির কালো চুলগুলি জলের একটা স্রোতে যেন ভাসছে।

—খুকু! ---বুক ফাটা আর্তনাদ করে ছুটে গেল সুকুমার। দু হাত দিয়ে খুকুকে তুলে নিলে বুকের ভেতর। ছোট শরীরটা ঠান্ডা আর শক্ত হয়ে গেছে—মাথাটা সুকুমারের কাঁধের ওপর ভেঙে পড়ল।

আবার আর্তনাদ করে সুকুমার ডাকল: খুকু?

ততক্ষণে অনুশ্রীও ছুটে এসেছে ছাদে। মাথার চুল খোলা, আঁচল লুটিয়ে পড়েছে—বাঘিনীর মতো ছুটে এসে সুকুমারের বুক থেকে খুকুকে টেনে নিলে।

—একি। এ যে ঠান্ডা হয়ে গেছে। খুকু-খুকু। ওগো---খুকু কথা কইছে না কেন? খুকুর কী হল?---অনুশ্রী হাহাকার করে উঠল।

একটু আগেও সংযম হারায়নি সুকুমার—এখনো হারালো না। সংক্ষেপে বললে, অজ্ঞান হয়ে গেছে। চলো—নিচে নিয়ে চলো শিগগীর।

ডাক্তার ওষুধ দিয়েছেন, ইনজেকসন দিয়েছেন, ভরসা দিয়ে গেছেন। কিন্তু ভরসা নেই স্বামী-স্ত্রীর। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে খুকুর, মুখ টকটকে লাল। মাথার কাছে অনুশ্রী, আর বিছানার পাশে চেয়ার টেনে নিয়ে রাত জাগছে সুকুমার।

দুটো আরক্ত বিহ্বল চোখ মেলল খুকু। শূন্য দৃষ্টি ফেলে কী যেন দেখছে।

অনুশ্রী ডাকল: খুকু—

খুকু জবাব দিল না। ভীত অস্বাভাবিক চোখে তখনো কী যেন খুঁজছে সে।

সুকুমার খুকুর জ্বরতপ্ত কপালে হাত রাখল। তীব্র উত্তাপে শিউরে উঠল শরীর।

—খুকু-খুকু---

খুকু কথা কইল। বিড়বিড় করে বললে, যাব না, আমি ঘরে যাব না—

—খুকু-মা আমার, মাণিক আমার---অনুশ্রী কাঁদছে।

খুকু প্রলাপ বকতে লাগল: যাব না, আমি ঘরে যেতে পারব না। কেন রাতদিন ঝগড়া করো তোমরা? কেন বাবা না খেয়ে অফিসে যায়? কেন মা এমন করে কাঁদে? আমি যাব না—

নিঃশ্বাস ফেলে খুকু পাশ ফিরল।

বাইরে ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। বজ্র বৃষ্টি আর নেই এখন, আকাশের কান্নার পালা চলছে। দীর্ঘশ্বাসের মতো হাওয়া এসে শব্দ তুলছে জানলার খড়খড়িতে।

সুকুমার অনুশ্রীর দিকে তাকালো। কোমল গলায় ডাকল, অনু।

অনুশ্রী জল ভরা চোখ তুলল।

খুকুর গায়ের ওপরে রাখা অনুশ্রীর হাতখানা মুঠো করে ধরল সুকুমার। আস্তে আস্তে বললে, এ আমরা কী করেছি অনু? আমাদের পাপের দণ্ড এ কাকে বইতে হচ্ছে?

সেই বজ্র, সেই বিদ্যুতের উদ্ভাস মুহূর্তে একটা নগ্ন ভয়ংকর সত্যকে উদ্ঘাটন করে দিয়েছে। দু জনের সমস্ত বিষ অঞ্জলি পেতে তিলে তিলে নিয়েছে খুকু—সেই বিষের জ্বালায় এই ছোট মেয়েটাই নীলকণ্ঠ হয়ে গেছে। অন্ধ, অর্থহীন মনোবিকারে আচ্ছন্ন চোখ নিয়ে ওরা কেউ এতদিন তা টেরও পায়নি। বুঝতেও পারেনি, দিনের পর দিন ওরা কেমন করে সবচেয়ে নিরপরাধকে সবচেয়ে নির্মমতার আঘাতে জর্জরিত করে তুলছে।

—অনু, এবার আমাদের প্রায়শ্চিত্তের পালা। ---অনুশ্রীর হাতে চাপ দিয়ে আবার ক্লান্ত, কোমল গলায় বললে সুকুমার।

অনুশ্রী জবাব দিল না। জবাব দেবার দরকারও ছিল না। সুকুমারের হাতের ওপর টুপ করে এক ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়ল, অনুশ্রীর সমস্ত অনুতাপ, সমস্ত বেদনা আর সমস্ত মমতা মাখানো গলায় প্রার্থনার মতো উচ্চারণ করল: খুকু—আমার মা---আমার মা মণি---

---

চির-চঞ্চল

(৬০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

গোপন আত্মনিবেদনের কাহিনী সংগোপনে ভাবতেও সুখ। ক্ষত শুকোলেও দাগ মিলায় না। নিঃসঙ্গ নির্জনে স্মৃতিটুকুই সম্বল হয়ে আছে। সে ছাই-চাপা আগুনে ফুঁ দিয়ে জাগিয়ে তুলে আর কি হবে?

কে? কে?

গেটের কাছে রিক্সা থামল। উস্কো-খুস্কো চুল, বোতাম খোলা জামায় একটা স্যুটকেস নিয়ে নেমে এল অবনী।

'অ-ব-নী! রণেন কোথায়? দু'দিন আগে তার আসার কথা গেছে, টেলিগ্রাম দিয়েছি, চিঠি পাঠিয়েছি, সে সব পেয়েছো কি?'

'বসুন! বলচি।'

'রণেন তপতীকে নিয়ে নিখোঁজ হয়েছে। বলো কিহে?' মাথায় হাত দিয়ে এলিয়ে পড়লেন সাবিত্রী।

গল্পের চেয়ে সত্য অনেক সময় বিস্ময়কর। অবনীর কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এল। অশ্রুর বান আর থামতে চায় না। সেই সদা প্রফুল্ল অবনী একেবারে ভেঙে পড়ল।

'আমারই বোধ হয় ভুল হয়েছিল দিদি! অত বড় ঘরের মেয়ে আমার কুটিরে এসে মন বসল না।'—'কিন্তু রণেন ত আরও ছোট ঘরের অবনী।'

'অত রূপসজ্জা, টয়লেট কি ঘরের খাঁচার জন্য হ'তে পারে?'

পর পর দুটো দীর্ঘশ্বাস ফেলে অবনী বললে—'পরামর্শের জন্যই এসেছি দিদি! নারীর মনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পুরুষ পারে না। আদালতেও যাব না। স্বেচ্ছায় যে চলে গেছে, তাকে ফিরিয়ে আনবার বা খুঁজবার চেষ্টাও করব না। এ নিয়ে হৈ চৈ করাও আমার ইচ্ছে নয়। কেবল ঘটনাটা আমাদের ডাইরেক্টরকে জানিয়ে বলে এসেছি—আমাকে চাইবাসায় অবিলম্বে ট্রান্সফার করে দিন স্যার। সমবায় সমিতির ডাইরেক্টর বড় ভালো লোক দিদি। আমায় অনেক সান্ত্বনা দিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, এক্ষুণি ট্রান্সফারের জন্য তার করে দিচ্ছি! সেখানে একটা কাজও খালি পড়ে। আমি না হয় নির্জনবাসেই জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবো। কিন্তু আশার কি হবে?

আশা অবনীর আট বছরের মেয়ে। সাবিত্রী খানিকক্ষণ মাথায় হাত বুলোলেন, বললেন, 'সে আমার এখানেই থাকবে। এ ঘর এ বাড়ী তাকেই দিয়ে যাবো।'

'তা কি হয়, এই বয়সে আবার নূতন বন্ধনে আপনাকে জড়াই কি করে? আর কিছু ভাবুন।'

অবনীই বললেন, 'আচ্ছা, আশাকে একটা কনভেন্টে রাখা যায় না?'

আজীবন শিক্ষার কাজে কাটিয়ে এসেছে সাবিত্রী রায়, তাঁর কাছে এটা কিছু কঠিন বিষয় নয়।

প্রজাপতির মতো পাখা উড়িয়ে চলাই যদি তপতীর ইচ্ছে ছিল, তবে ঘর করতে এল কেন?

এই 'কেন'র উত্তর কে দেবে?

সাবিত্রী রায়ের মাথায় বাজ পড়ল। লক্ষ্মীছাড়া রণেনকে না হয় সে ত্যাগ করবে, কিন্তু আশ্রয়দাতা অবনীর ঘরে বসে একি সর্বনাশা আগুন?

মেয়েদের অনেক খেলাই দেখেছে সাবিত্রী রায় তার সুদীর্ঘ শিক্ষয়িত্রীর জীবনে। মাঝে মাঝে তার মনে অস্পষ্ট আশঙ্কাও জেগেছে যে, আগামী যুগের শিক্ষিতা মেয়েরা তার মাতৃত্বকেই বড় করে দেখবে না। ভারতে যে মাতৃরূপকে সর্বাপেক্ষা বড় বলে গণ্য করা হয়েছে, তা যেন পিছিয়ে পড়ছে। জায়া ও জননীর রূপটাই শিক্ষিতা নারীর হৃদয় মন আচ্ছন্ন করছে। ভাঙছে—শুধু ভাঙছে। যে প্রেম নিয়ে সে আত্মোৎসর্গ করেছে, প্রণয়ের নিত্য পাখীপনা তাকে লঘু করে আনছে।

রাত্রিতে আর কারো ঘুম হ'লো না।

সাবিত্রী রায়ের কালো চুলগুলি হঠাৎ সাদা হয়ে গেল। মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে আসতেও বিলম্ব হ'ল না। দুঃখের ভারে যে হৃদয় নুয়ে পড়েছে, সেও আঁকড়ে ধরতে পারে ক্ষীণতম আশার কণিকা। কিন্তু সবল, কি দুর্বল কোন রকম কুটোই তার চোখে পড়ছে না যাকে সে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে পারে।

সাবিত্রী রায়ের ছোট শিক্ষামন্দিরটির নাম পালটে সাবিত্রী মেমোরিয়াল কলেজ করে দিয়েছেন সত্যবান বসু। সেখানে চলছে কো-এডুকেশনের সঙ্গে প্রজাপতির খেলা ফিক্ ফিক্ হাসি আর চটুল চাহনির বিনিময়

যে দিন সকল মুকুল গেল ঝ'রে

অবনী চক্রবর্ত্তী

অমিয় তরফদার

এই ভারতেই

অমিয় সান্যালকে লইয়া তাহার বন্ধু-বান্ধবেরা একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। বেবি মুখার্জি ফিফ্‌থ ইয়ারে পড়ে। খুব ভাল গান গায়। ইউনিভার্সিটির নানা ফাংশনে, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের নানা উপলক্ষ্যে, রেডিও-তে, পাড়ার বিভিন্ন প্রকার উৎসবে, সর্বত্রই সে গান গায়। সর্বত্রই সে প্রশংসা পায়, কোথাও কোথাও মেডালও পায়। বেবি দেখিতেও বেশ ভাল। গায়ের বর্ণ ধবধবে সাদা না হইলেও বেশ ফর্শাই বলা চলে। ব্যবহারে চালচলনে আধুনিক হইলেও উৎকট আধুনিকতা নাই। লিপস্টিক সে ব্যবহার করে না। নখেও রং মাখে না। তবে ছাতা, জুতা, সাড়ী, ব্লাউজ বেশ ম্যাচ করিয়াই পরে। কথাবার্তা বলে ধীরে, হাসি-হাসিমুখে। তাহাতে চটুলতা নাই, অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যও নাই। গান ব্যতীত আর কোন বিষয়েই তাহার এমন কোন অতি-অভিব্যক্তি নাই, যাহাতে সাধারণ লোকে তাহাকে অসাধারণ মনে করিতে পারে। তবু সে ছাত্র-ছাত্রী মহলে বেশ সুপরিচিত। তাহাকে দেখিলে সকলেরই আনন্দ হয়।

কিছুদিন হইতে শুনা যাইতেছে আমেরিকা প্রবাসী রমেন সরকারের সহিত তাহার বিবাহের কথাবার্তা হইতেছে। উভয় পক্ষের পিতামাতারাই কথাবার্তা চালাইতেছেন। ইহা লইয়া কোন প্রবল আলোচনা হয় না। কারণ দুই পক্ষের এক পক্ষ বহু দূরে। এবং যাহা কিছু আলাপ-আলোচনা তাহা হইতেছে তৃতীয় পক্ষদ্বারা। তবে যাহারা একটু খোঁজ-খবর রাখে, তাহারা জানে রমেনের সঙ্গে বেবির বিবাহে কোন বাধা থাকিতে পারে না। কারণ ইউনিভারসিটির ভিতরে বা বাহিরে কোন যুবকের সহিত বেবি ঘনিষ্ঠভাবে মেশে, এমন কোন সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ প্রমাণ কেহ কখনো পায় নাই।

মুস্কিল হইয়াছে অমিয়কে লইয়া। যেখানেই বেবি গান গাহিতে যায়, অমিয় সেখানে যাইবেই। কোন কোন স্থানে নিমন্ত্রণপত্র বা প্রবেশপত্র সংগ্রহ করিতে পারে, আবার কোন কোন স্থানে রবাহুত হইয়াই গিয়া উপস্থিত হয়। যেখানে কোন প্রকারেই প্রবেশ করিতে পারে না, সেস্থলে সেই বাড়ীর বা হলের যথাসম্ভব নিকটে কোন স্থানে উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। প্রায় সর্বত্রই মাইকের ব্যবস্থা থাকে বলিয়া তাহার পক্ষে বেবির গান শোনার পক্ষে বিশেষ বাধা হয় না।

অমিয়র সিক্সথ ইয়ার। বিষয় এক্সপেরিমেণ্টাল সাইকোলজি। বেবির গান শোনা এমন একটা অভ্যাস বা নেশা হইয়া উঠিয়াছে যে, এজন্য তাহার পড়াশুনার রীতিমত ক্ষতি হইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু রমেশ একদিন তাহাকে একটু ভৎসনা করিয়াই বলিল, এ তুমি কি পাগলামী আরম্ভ করেছ? বেবির সঙ্গে তোমার বিয়ের কোন সম্ভাবনাই নেই। ওর মা-বাবা অনেকটা গোঁড়া পরিবারের লোক। বেবিকেই হোক বা আর কাকেও হোক, বিয়ে করবার যোগ্যতা তোমার এখনো হয়নি। তোমার বয়সও ঠিক বিয়ের বয়স নয়। আর বেবির যে মত নেই, মত থাকতে পারে না, সেটা তোমার এতদিনে বোঝা উচিত ছিল। তুমি এ পাগলামী ছাড়।

অমিয় বলে, দেখ রমেশ, তোমরা আমাকে ভয়ানক ভুল বুঝেছ। বেবিকে বিয়ে করবার কোন কল্পনাই আমার মনে ওঠে না। আমি চাই শুধু ওর গান। ওর গান না শুনতে পেলে আমি মরে যাব। ও মানুষটির প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই।

রমেশ বলিল, দেখ, তুমি নিজেকে ঠকাচ্ছ। মানুষটির প্রতি মোহ হয়েছে বলেই ওর গান তোমার এত ভাল লাগছে। আরও অনেক গায়িকা আছে, যারা ওরই মত ভাল গায়। তোমার এ দুর্মতি ছাড়।

অমিয় বলিল, দেখ, আমি সাইকোলজির ছাত্র। আমার মনের খবর আমি ভাল করেই জানি। গানের একটা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট আর্টিস্টিক ভ্যালু আছে, যেটার সঙ্গে গায়িকার দেহের কোন সম্পর্ক নেই। সত্যিই বলছি, বেবির গান আশ্চর্য অপূর্ব অসামান্য সুন্দর।

রমেশ বলিল, আচ্ছা, যদি বেবির মত বা বেবির চেয়েও বিখ্যাত গায়ক বা গায়িকার গান শুনবার সুযোগ পাও, তাহলে?

অমিয় বলিল, আমি অনেকের অনেক গান শুনেছি, ওর মত মিষ্ট স্বর আর মিষ্ট সুর আমি কোথাও শুনিনি।

রমেশ বলিল, তুমি কতখানি মোহগ্রস্ত হয়েছ, তা বুঝতে পারছ না। যার সঙ্গে বিয়ে হবার কোন সম্ভাবনা নেই, সর্বদা তার পিছনে পিছনে ঘুরে তুমি যে কি ভয়ানক অন্যায় করছ, তাহা বুঝবার শক্তি পর্যন্ত লোপ পেয়েছে।

অমিয় বলিল, আমাকে বিশ্বাস করো ভাই, ওই মানুষটির প্রতি কোন লোভ আমার নেই। আমি কোনদিন ওর মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখিনি। কোনদিন ওর সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করিনি। কোনদিন ওর কথাবার্তা শুনবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিনি। ও যখন ইউনি-ভারসিটিতে আসে, বা ইউনিভারসিটি থেকে ফিরে যায় কখনো পথের পানে চেয়ে থাকিনি। ট্রামে-বাসে কোথাও ওকে দেখলে এতটুকু কৌতুহল বা আনন্দ প্রকাশ করিনি। রেস্তোরায় কখনো দেখা হলে এক টেবিলে বসবার জন্য অনুরোধ জানাই নি। লাইব্রেরীতে ওর কখনো কোন বই বা নোটবই চাইনি। কোন নূতন বই হাতে দেখলে কখনো জিজ্ঞাসা করিনি, ওটা কি বই? কোনদিন জিজ্ঞাসা করিনি, অমুকের লেকচার আপনার কেমন লাগল? বারান্দায় বা সিঁড়িতে কোথাও পিছন দিক থেকে দেখলে এগিয়ে গিয়ে সামনের দিক থেকে দেখবার কথা কখনো মনে হয়নি। কিছুদিন আগে যখন ও হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল তখন ওকে ধরে তুলবার জন্য কোন আগ্রহই হয়নি। যখন কোন ফাংশনের আয়োজন হয়, আমি কখনো ওর কাছে গিয়ে বলিনি, আপনাকে কিন্তু গান গাইতে হবে। অন্য ছেলেমেয়েরা যখন গিয়ে অনুরোধ করেছে, তখন আমি তাদের সঙ্গেও যাইনি। সুতরাং বুঝতে পারছ, ওর জন্য আমার একটুও মাথাব্যথা নেই—শুধু ওর অদ্ভুত মিষ্টি গান ছাড়া আর কিছুর জন্যই আমার এতটুকু উদ্বেগ নেই।

রমেশ বলিল, এ লক্ষণ তো ভাল নয়। এও একটা ম্যানিয়া। একটা ডাক্তার-টাক্তার দেখালে হয় না?

অমিয় বলিল, তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না। ওর গানের যে মোহিনী শক্তি আছে, সেটা যদি তুমি বুঝতে পারতে, তাহলে তুমিও এমনি ব্যস্ত আর ব্যগ্র হয়ে ওঠতে।

রমেশ বলিল, আমি কি হতাম বা না হতাম সেটা এখনকার প্রশ্ন নয়। তোমার পড়াশুনো যে গোল্লায় যাচ্ছে, পরীক্ষা এগিয়ে আসছে, অথচ তুমি এমন করে—। আচ্ছা, তোমার ক্লাশ সায়েন্স কলেজে আর বেবির ক্লাশ আশুতোষ বিল্ডিং-এ। ওর সঙ্গে তোমার দেখা হ'ল কেমন করে?

অমিয় বলিল, আমি যে লাইব্রেরীতে যাই প্রায়ই। ওখানকার প্রফেসর দত্তর মেটাফিজিক্সের ক্লাশটাও সুযোগ পেলেই অ্যাটেণ্ড করি। কিন্তু তুমি যা মনে করছ, তা একেবারেই নয়। দূর থেকে দেখেছি, পরে গান শুনেছি। কিন্তু শুধু গান ছাড়া আর কোন আকর্ষণই আমার নেই, সে কথা আর কতবার বলব?

রমেশ বলিল, আজ আর তর্ক বাড়াতে চাইনে। তোমার সম্বন্ধে সত্যই আমরা বেশ একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। কি যে করা যায় ভেবে পাচ্ছিনে। আচ্ছা, যদি ওর গানগুলো, এই ধর কুড়ি পঁচিশটা, রেকর্ড করে দেওয়া যায়, তাহলে তাই গ্রামোফোনে বাজিয়ে শুনতে পার। যখন ইচ্ছে হবে একখানা রেকর্ড শুনে নেবে। তারপর মন দিয়ে পড়াশুনো করবে। যদি এ ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তোমার শান্তি হবে? শুধু গানই যখন তোমার কাম্য, তখন এ ব্যবস্থায় তোমার আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না। এ ব্যবস্থা হলে আর সভা-সমিতিতে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে না?

অমিয় বলিল, তা-তা, মনে তো হয় মনে একটু শান্তি পাব। কিন্তু ওর গানের রেকর্ড পাওয়া যাবে কেমন করে?

রমেশ বলিল, দেখি, চেষ্টা করে।

(২)

একদিন রমেশ ও তাহার আর একটি বন্ধু আশুতোষ বিল্ডিং-এর উঠানে বেবিকে দেখিতে পাইয়া তাহার নিকট গিয়া নমস্কার করিয়া বলিল, আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল, শুনবেন অনুগ্রহ করে?

বেবি বলিল, কেন শুনব না! আসুন, একটু ওপাশে গিয়ে বসি।

তিনজনে একপাশে গিয়া বসিল। কথা হইল শুধু রমেশ এবং বেবির মধ্যে। রমেশ বলিল, আপনি অমিয়কে চেনেন?

চিনি, কিন্তু কখনো আলাপ হয়নি।

ওকে নিয়ে আমরা একটু মুস্কিলে পড়েছি।

কি হয়েছে?

আপনার গান শোনবার ওর ভয়ানক আগ্রহ। এই আগ্রহটা এত বেশি হয়েছে যে, তার জন্য ওর পড়াশুনার খুব ক্ষতি হচ্ছে। আপনি যেখানেই গান করতে যান, আহূত বা রবাহূত হয়ে সেখানে যাবে আর আপনার গান শোনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকবে।

আমিও সেটা জানতে পেরেছি। আমাদের ক্লাশের লীনা ওর চালচলনের দিকে খুব লক্ষ্য রাখে। সেই আমাকে প্রথমে একথা বলে। তারপরে আমি নিজেই লক্ষ্য করেছি। কিন্তু আমি কি করতে পারি বলুন?

আমরা একটা ভাবছিলুম। আপনি যদি অনুগ্রহ করে আপনার কতকগুলি গানের রেকর্ড করিয়ে দেন, তাহলে একটা গ্রামোফোনে সেইগুলো বাজিয়ে শুনতে পারে। শুধু শুধু আপনার পিছনে পিছনে টো টো করে বেড়াতে হয় না।

আপনারা যদি মনে করেন, এই ব্যবস্থায় উনি সন্তুষ্ট হবেন, ও'র পড়াশুনোয় মন বসবে, তাহলে আমার আপত্তি নেই। একজন সহপাঠীর পড়াশুনো যাতে মাটি না হয়, সেটা দেখা আমাদের কর্তব্য বই কি? কতগুলো রেকর্ড চান আপনারা?

এই ধরুন, কুড়ি পঁচিশ খানা।

কিছু খরচপত্রও তো হবে আপনাদের।

সেজন্য ভাববেন না। অমিয়র বাবার অনেক পয়সা। কখানা রেকর্ডে আর কি হাতী ঘোড়া খরচ হবে!

বেশ, তাহলে সেই ব্যবস্থাই করুন।

হ্যাঁ। এইচ এম ভি'র ষ্টুডিওতে রেকর্ড করা যাবে। যদি ওদের একটু পছন্দ হয়, তাহলে খরচ তো লাগবেই না, বরঞ্চ—

না, না ওসব ব্যবসাদারী ব্যাপার এর মধ্যে টেনে আনবেন না। সে সব যদি করতে কখনো ইচ্ছা হয় তবে পরে দেখা যাবে। আপাততঃ অমিয়বাবুর বিপদটার কথাই ভাবুন।

আচ্ছা, তাই ঠিক রইল। আমি একটা দিন ও সময় ঠিক করে আপনাকে জানাব। তারপরে সময়মত গিয়ে রেকর্ড করে আসা যাবে। আমরাও গান শুনব কিন্তু।

বেবি হাসিয়া বলিল, নিশ্চয়ই শুনবেন। অন্যকে শোনানর জন্যই গান গাওয়া।

আচ্ছা আজ তাহলে ওঠা যাক। চলুন, রেস্তোরাঁয় একটু চা খাওয়া যাক।

তিনজনে উঠিয়া রেস্তোরাঁর দিকে অগ্রসর হইল।

(৩)

অমিয়র পড়ার ঘর। ছোট ঘরখানি দুই-দিকে খোলা। জানালায় সবুজ পর্দা। একটি আলমারি আর একটি শেলফ বইতে ঠাসা। দেওয়ালে দুখানা ছবি, একখানা রবীন্দ্রনাথের আর একখানি একটি বড় ল্যান্ডস্কেপ। একটি জানালার পাশে একখানি সুদৃশ্য ক্যালেন্ডার। আর একটি জানালার পাশে একখানি ভারতবর্ষের নূতন ম্যাপ। ঘরের মাঝখানে একটি হাফ-সেক্রেটারিয়েট টেবিল, তাহার উপরে বইখাতা কলম পেন্সিলের গাদা।

সম্প্রতি ঘরের এক কোণে একটি নূতন বস্তু আসিয়াছে, একটি চকচকে গ্রামোফোন। তার পাশে একটি ছোট টেবিলে অনেকগুলি রেকর্ড।

অমিয় পড়াশুনো করে। কিছুক্ষণ পরেই উঠিয়া গিয়া একখানি রেকর্ড বাজাইতে আরম্ভ করে। তন্ময় হইয়া রেকর্ড শোনে। তারপর আবার গিয়া বসে পড়ার টেবিলে। নোট লেখে, পুরাতন প্রশ্নপত্রের উত্তর প্রস্তুত করে। ক্লাসে বসিয়া যে সকল স্থানে ষ্টার, ডি ষ্টার লিখিয়াছে সেগুলি ভাল করিয়া পড়ে। আবার টুক করিয়া উঠিয়া যায় গ্রামোফোনের কাছে, একখানা রেকর্ড শোনে আবার ফিরিয়া আসে পড়ার টেবিলে। এমনি করিয়া দিন কাটিতে লাগিল।

অমিয়র দিদি অনীতার শ্বশুরবাড়ী কলকাতাতেই। প্রায়ই আসে বাপের বাড়ীতে। অমিয়র নূতন সখ দেখিয়া হাসে। কি ছেলেমানুষ! একটা করিয়া গান না শুনিলে ওর পড়ায় মন লাগে না। আজকালকার ছেলেদের কি যে হয়েছে! রেকর্ডগুলি যে সবই একটি মেয়ের, তাহা অনীতা প্রথমে লক্ষ্য করেন নাই। যখন লক্ষ্য করিলেন, তখন মাকে গিয়া বলিলেন, মা, লক্ষণ ভাল নয়। একটা ঘটক-টটক পাঠাও।

মা বলেন, কি যে বলিস অনী। একবার বলে দেখ না। মারতে আসবে। শুধু গান ছাড়া ও আর কিছুই চায় না।

অনীতা অমিয়র কাছে গিয়া বেবির কথা পাড়িতেই প্রায় ধমক খাইয়াই ফিরিয়া আসিল।

মায়ের কাছে আসিয়া বলিল, আমি এখানে থাকিনে। সব সময় সব কথা তোমাকে বলতেও পারে না। তবু একটু লক্ষ্য রেখ। আর বেবির ঠিকানাটা জোগাড় করবার চেষ্টা কর। কি জাত, বাপ কি করে—

যা করবার তুমিই কর। আমার অত সাহস নেই।

আচ্ছা, আমিই দেখব। ইউনিভার্সিটিতে আমার চেনা অনেক মেয়ে আছে। তাদের কাছেই সব জানা যাবে। কতদিন আর লুকোবে?

অনীতা অমিয়কে দু'একটি সদুপদেশ দিয়া শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেল।

(৪)

একদিন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে একটা ফাংশন ছিল। বেবির গান গাহিবার কথা।

রমেশ যখন গেটের ভিতর ঢুকিতেছে, তখন অমিয়র সঙ্গে দেখা। রমেশ একটু আশ্চর্য হইয়া বলিল, আবার আরম্ভ করেছ বুঝি? গ্রামোফোন কি হল?

অমিয় বলিল, ভাবলুম, রেকর্ড করা নেই, এমন কোন নূতন গান হয়তো শুনতে পাব। তাছাড়া গ্রামোফোনের স্বরটা যেন ঠিক স্বাভাবিক শোনায় না। কেমন যেন একটু খনখনে, একটু যাকে বলে মেটালিক সাউন্ড। ঠিক গলার স্বরটা পাওয়া যায় না।

রমেশ বলিল, সেই জন্য পড়াশুনো ফেলে স্বাভাবিক স্বর শুনতে এসেছ। নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। যদি অতই মনে ধরে থাকে, বল না, ঘটকালি করি।

অমিয় বলিল, আবার সেই পুরানো কথা! ওর গান ছাড়া আর কোন কিছুর জন্যই আমার এতটুকু লোভ নেই, সেকথা তোমরা কিছুতেই বুঝবে না। যাক, তোমাদের কাছে অনুরোধ, তোমরা ওসব আজগুবি প্রস্তাব আমার কাছে কর না।

রমেশ বলিল, তোমার এখনও ধারণা যে তুমি শুধু গানের জন্যই বেবির কাছে, বেবির সামনে যেতে চাও। আর কোন মোহ নেই?

নিশ্চয়ই না। এবিষয়ে আমার মনে এতটুকু সংশয় নেই। তোমরা ও নিয়ে আর মাথা ঘামিও না।

রমেশ ও অমিয় হলের ভিতরে গিয়া বসিল।

অনুষ্ঠান শেষ হইবার পর উহারা বাহিরে আসিলে, রমেশ বলিল, তুমি যাও, আমি একটু পরে যাব। অমিয় চলিয়া গেল।

(ইহার পর ৭৫ পৃষ্ঠায়)
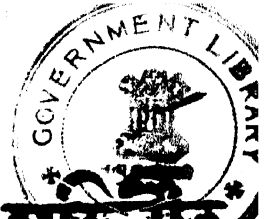
একটি বহু অভিনীত দৃশ্য

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

পাঁচ বছর অজ্ঞাতবাসের পর ওরাই প্রথম আবিষ্কার করল আমাকে। ওরা মানে নেতাজী পাঠাগারের কিশোর সভ্যেরা। একদিন ছুটির সকাল বেলায় পাঁচ ছ'জনের একটি ক্ষুদ্র দল সদর দরজায় কড়া নাড়ছিল সন্তর্পণে। সামনের ঘরে বসে বই পড়ছিলাম, সাড়া দিতেই সদর দরজা ঠেলে ওরা অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে সামনে এসে দাঁড়াল।

কচি কচি কিশোর মুখে ভীরুনম্রতার হাল্কা ছায়া। অধিকাংশেরই পরনে ঢিলে পাজামা, কারো বা হাফপ্যান্ট গায়ে গলা খোলা হাত-কাটা সার্ট ওরই মধ্যে যতটা সম্ভব ভব্য হবার চেষ্টা দেখা যায়। একজনের হাতে চটি মত একখানা একসারসাইজ বই—বুক পকেটে পার্কার অনুকরণে কলম। ও-ই মনে হল—দলের মুখপাত্র।

কিছু চাই? জিজ্ঞাসা করলাম। অনুরোধ করলাম বসবার জন্য।

ওরা হুড়মুড় করে একসঙ্গে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে—এক সঙ্গে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল—আসন গ্রহণ করল একসঙ্গেই। কারো দৃষ্টি ভূমি সংলগ্ন, কেউ বা মুখ ফিরিয়ে দেওয়ালের ছবি আর আলমারির মধ্যেকার বই দেখতে লাগল।

মুখপাত্র ছেলেটি বলল, আজ্ঞে, আপনার কাছেই এসেছি আমরা। মানে—আসচে বোশেখে আমরা কবি জয়ন্তী করব—তাই...... আপনার কি সময় হবে স্যার?

সময় আমার অফুরন্ত, কিন্তু এই সব কিশোর ছেলেদের সভায় যাব না বলেই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম দু' বছর আগে। একটা তিক্ত অভিজ্ঞতার কাহিনী সেটা।

ছেলেদের পানে চেয়ে দেখি ওদের মুখে কেমন যেন অসহায় ভাব। অগ্রণী ছেলেটির প্রশ্নটিকে লুফে নিয়ে অপর ছেলেগুলিও যখন দেওয়াল আর আলমারির গা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আমার মুখের উপরে ভীরু চাহনির আলো ফেলেছে সন্তর্পণে। নিশ্বাস ওদের পড়ছে কি পড়ছে না—অপ্রত্যাশিত স্থির; একটি ব্যগ্র প্রত্যাশায় আশা নিরাশার মাঝ পথে এসে দাঁড়িয়েছে সব ক'টি কিশোর চিত্ত। কেমন মায়া হল।

প্রশ্ন করলাম রবীন্দ্র জয়ন্তী তো?

ওরা একযোগে ঘাড় নাড়ল, হাঁ স্যার।

কখন আরম্ভ হবে?

আজ্ঞে—ঠিক ছ'টায়।

ক'ঘণ্টার প্রোগ্রাম?

আজ্ঞে সামান্য ক্ষণই। দু'একখানা গান—আবৃত্তি, ছোট মত একটি নাটিকা আর আপনার ভাষণ। বড় জোর ঘণ্টা দেড়েক সময় নেবে।

কিন্তু অতক্ষণ যদি না থাকতে পারি?

সামান্য ক্ষণ থাকবেন। আপনার ভাষণ হলেই—

তা এক কাজ করলে না কেন—স্থানীয় কোন গণ্যমান্য লোককে সভাপতি করলে তিনি শেষ পর্যন্ত থাকতে পারতেন।

মুখপাত্র ছেলেটি বলল, আমরা একজন সাহিত্যিককে চাইছি স্যার। বড়রা দু'জন বিখ্যাত সাহিত্যিককে এনেছিলেন—সভাপতি আর প্রধান অতিথি করে।

বড়দের সঙ্গে তোমাদের মিল নাই বুঝি?

আজ্ঞে—ওঁরা তো আমাদের পাত্তাই দেন না! বলেন, রবীন্দ্রনাথের লেখা তোরা কি বুঝবি? তবে স্যার—আমাদের ক্লাবের যাঁরা পৃষ্ঠপোষক—তাঁরাও তো প্রাচীন—নামকরা লোক। তাঁরাই বললেন, রবীন্দ্রনাথ কি শুধু বড়দের জন্যই লিখেছেন? উনি ছেলেদের জন্য ভেবেছেন দারুণ, ছেলেদের ভালোবাসতেন সাংঘাতিক লিখেছেনও তাদের জন্য দুর্দান্ত-ভাবে।

মুখপাত্রের পানে চাইলাম সবিস্ময়ে। বাহ্যত নিরীহ মনে হলেও বাচনভঙ্গীতে এ যুগের তালে পা ফেলেই চলেছে।

দৃষ্টিতে বিস্ময়ের সঙ্গে আরও কিছু হয়তো মিশে ছিল, ছেলেটি চোখ নামিয়ে বলল, তাহলে আপনি আসচেন তো স্যার? একটু থেমে বলল অবশ্য বলতে পারেন কবি পক্ষ পেরিয়ে কেন জয়ন্তী করছি আমরা। তা স্যার—উপায় কি এই দেখুন না, ২৫শে বৈশাখ থেকে ৮ই জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করেছি আপনাদের মত একজন বিখ্যাত সাহিত্যিককে আনবার জন্য পাইনি কাউকে। জানি তো ওই পনেরো দিন আপনারা নাওয়া খাওয়ার ফুরসৎ পান না—এক একদিনে চার পাঁচটি করে সারতে হয়। মানুষের শরীর তো—তাই বিরক্ত করতে সাহস করিনি.....

ওর বাক্-উৎস মুখ থেকে বিনম্র-আতিশয্যের পাথরখানি হঠাৎ সরে গেছে—এতক্ষণে নিজেকেই কেমন অসহায় বোধ করছি।

তাড়াতাড়ি বললাম, দেখ—কোন একটা কারণে কোন সভাতেই যেতে চাই না আমি—

কারণটি কি স্যার?

মানে যে পাড়ায় দু'টি দল আছে, সেখানে সভাক্ষেত্রে প্রায়ই গণ্ডগোল হয়। প্রতিপক্ষেরা সভা জমলেও সেটা নষ্ট করে দেবার চেষ্টা করে।

ত্রস্ত হয়ে উঠল ওরা। না—না—স্যার, আমাদের পাড়ায় সে রকম কোন দল নেই। বড়রা সভা করলে আমরা ঢিল ছুঁড়ি না—বিড়াল বা পাখী ডাকি না—বেঞ্চি ও চেয়ার ঘষে শব্দ করি না—সিটি দিই না মুখে। ওঁরাও শেষ পর্যন্ত চুপচাপ বসে শোনেন। শুনে আশ্বস্ত হলাম।... কৌতূহল হল ওদের পাঠাগার সম্বন্ধে।

জিজ্ঞাসাবাদ করতেই মুখপাত্র ছেলেটি বলল, ছোট পাঠাগার—খেলাধুলার ক্লাবই ছিল তো। স্বাধীনতা লাভের পর দাদারা ছোটমত একটা লাইব্রেরী করেছিল। তা ওঁরা পাশ করে আপিসে ঢুকেছেন—এখন আমরাই.....

ক্লাবের নাম নেতাজী রেখেছিলেন—ওঁরাই, নয়?

আজ্ঞে।

নেতাজীর জন্মোৎসব কর নিশ্চয়।

এই প্রশ্নে ওরা চনমন করে উঠল। মুখপাত্র ছেলেটি মুখ নামিয়ে শুকনো গলায় বলল, আজ্ঞে—প্রথম বার দুই হয়েছিল—সেই যেবার সবাই করেছিল ধুমধাম করে। বড়রাও ছিলেন তো। এখন কোথাও তো তেমন হয় না, তাই......

বুঝেছি—এখন রাজনীতি ছেড়ে—সংস্কৃতির দিকে মন দিয়েছ সব। তা বেশ, এখন বুঝি

বঙ্কিমচন্দ্র—শরৎচন্দ্র এ'দের জন্মোৎসব হয়?

আমার হাসিমুখ দেখেও ছেলেটি মুখ তুলল না। ওর সঙ্গীরাও দেওয়াল আর আলমারির গায়ে নিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে রইল।

মিনিট দু'তিন কাটল নিঃশব্দে। কেমন অস্বস্তি বোধ করছিল ওরা, প্রশ্ন করে আমিও। সেটা কাটিয়ে নেবার জন্য একটু প্রশ্রয়ের সুরে বললাম, তা অনেকেই তো করেন না এ'দের জন্ম-জয়ন্তী—তোমরা তো ছেলেমানুষ।

মুখপাত্র ছেলেটি উৎসাহিত হয়ে উঠল, সত্যি বলতে কি স্যার—ও'দের জয়ন্তী করায় অসুবিধা আছে বেশ। ধরুন না কেন—আমরা কেউই জানি না বঙ্কিমচন্দ্র কবে জন্মেছিলেন, বা কি কি বই লিখেছিলেন। ও'র দু' একখানি উপন্যাস ছাড়া কিছুই পড়িনি আমরা। অবশ্য শরৎচন্দ্রের অনেক বই সিনেমা হয়েছে—দেখেছিও, ও'র জন্ম দিনটিও জানি, কিন্তু স্যার খুব বেশী ক্লাবে ও'দের নিয়ে ফাংশান হয় না তো!

কেন হয় না? জিজ্ঞাসা করলাম।

শুনেছি ফাংশান তেমন জমে না।

জমে না। সে কি!

আমার সবিস্ময় উক্তিতে ছেলেটি ঈষৎ হাসল। বলল, ও'দের নিয়ে ফাংশান করলে আর্টিষ্টদের কাউকে তো পাওয়া যায় না। ও'রা গান রচনা করেননি, কবিতা লেখেননি, নাটকও নয়। কি নিয়ে সভা জমবে বলুন!

......মনে মনে স্বীকার করতেই হল—কবি-গুরুর দূরদৃষ্টি ছিল। সভা জমানোর উপকরণ তিনি প্রচুর রেখে গেছেন। ভাগ্যিস অনেকগুলি গান তৈরী করেছিলেন, না হলে শুধু কবিতা বা নাটক ও'র জন্ম-তিথিকে বিস্মৃতির গহ্বর থেকে টেনে তুলতে পারত না!

বললাম, তোমরা তরুণ, দেশের ভবিষ্যৎ—এগুলি করা উচিত তোমাদের।

মাথা না নামিয়েই প্রতি-প্রশ্ন করল ছেলেটি, স্যার নাচ, গান নাটক না থাকলে লোক জমবে কি সভায়?

ছেলেটি শুধু জমার কথাই ভাবছে। যাঁদের নিয়ে সংস্কৃতির গৌরব তাঁরাও এদিকে মৃত্যুর সঙ্গেই জমে পাথর হয়ে গিয়েছেন—একটু উত্তাপ, আলো বা রং কিছুই লেগে নেই স্মৃতিতে। কিন্তু এমনি ঔদাসীন্য আর বিস্মৃতি নিয়ে বাঁচব কি আমরা, বাঁচিয়ে রাখতে পারব কি আমাদের সংস্কৃতিকে?

ওরা চলে গেলে ঠিক করলাম সভাক্ষেত্রে এই দিকটাই বেশ তীব্র করে তুলে ধরব। একটু কড়া করে না বললে চৈতন্যোদয় হয়না কারও। আজকাল রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে প্রায়ই দেখি সভাপতি বা প্রধান অতিথিরা সভা-আহ্বায়কদের কড়া কড়া কথা শুনিয়ে জমিয়ে তোলেন সভা। এইটিই নাকি রীতি। ঝাঁজ না থাকলে বক্তৃতা জমে না। উদ্যোক্তারা এতে কি পরিমাণ মনোক্ষুণ্ণ হন জানি না, শ্রোতারা হন পুলকিত। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ তো শ্রোতারাই।

সুতরাং এইভাবে সভা জমিয়ে একটি দীর্ঘ ভাষণ দেব। ওদের নাচ, গান, আবৃত্তির উপর কাঁচি চালিয়ে জয়ন্তী-উৎসব সম্বন্ধে সচেতন মনোভাব তৈরী করবার চেষ্টা করব।

ভাবতে ভাবতে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠলাম।...বলতে কি সভাক্ষেত্রে না পৌঁছানো পর্যন্ত দিন-রাত্রি প্রায় উত্তেজনাতেই কাটল।

* * *

উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সেই মুখপাত্র ছেলেটিই আমাকে সভাস্থ করল। গলায় পরিয়ে দিল ফুলের মালা, হাতে দিল এক চিলতে কাগজ—কর্মসূচী। সূচী দেখে আশ্বস্ত হলাম—মাত্র কয়েকটি নাম—গায়ক এবং আবৃত্তি-কারদের। দীর্ঘ ভাষণ দিতে অসুবিধা হবে না।

ছেলেটি বলল, 'আপনি বসে থাকুন—আমরাই ঘোষণা করে দেব।

তাই করলও। কিন্তু—একে, একে অন্তহীন ঘোষণা!—এত নাম এলো কোথা থেকে? গানের খাতা নিয়ে গায়ক-গায়িকারা আসচেন মঞ্চে—রবীন্দ্রনাথের বই হাতে করে আবৃত্তিকারেরা যোগ দিচ্ছেন সে মিছিলে। মিছিল—রীতিমত ভুখা মিছিলেরই গোত্রজ। তেমনি দীর্ঘ আর ভোজ্যলোলুপ। জন্মদিনের এমন সমারোহ শেষ জীবনেও কি কল্পনা করেছিলেন কবি?

স্যার—কিছু মনে করবেন না। আর্টিষ্টরা একে একে আসচেন—। ও'দের 'ইনভাইট' করে আনা হয়েছে, দর্শকরাও ও'দের গান শোনবার জন্য......এই বড় জোর আধ ঘণ্টা। কষ্ট হচ্ছে না তো স্যার?

হলেও মুখ ফুটে বলি কেমন করে। রজনী-গন্ধার মালা থেকে তখনও যে মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বার হচ্ছে!

সত্যি বলতে কি—অতঃপর সময়ের হিসাব রাখিনি। ক্লান্তিভরে মাজা পিঠ টন্ টন্ করছিল বলেই হয়তো তাকিয়াটা টেনে নিয়ে তার উপর দেহভার রেখেছি। চোখের সামনে আলোর সমারোহ—নৃত্যগীত আবৃত্তির বন্যা—শ্রোতাদের উল্লাসদীপ্ত করতালি ধ্বনি সম্মোহ রচনা করে ছায়ার রাজ্যের গভীরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। স্বপ্ন-রঙ্গমঞ্চে একটি বৃহৎ নাটকের অসংখ্য দৃশ্য মিছিল সাজিয়ে চলেছে—প্রেক্ষাভূমি মুছে গিয়েছে, একমাত্র দর্শকের আসনে বসে আছি আমি—অন্তহীন কালের তরঙ্গ দোলা দিচ্ছে দেহে—তন্দ্রার আমেজে বন্ধ হয়ে আসছে দু'চোখ।

প্রচণ্ড করতালি ধ্বনিতে চমক ভাঙ্গল। মঞ্চের সামনে সাদা পরদাটা কখন নেমে এসেছে, ছেলেরা উঠে এসেছে আমার কাছে।

স্যার, এইবার আপনার ভাষণ। ঘোষণা করে পরদা তুলে দিই?

ঘোষণান্তে পরদা উঠলে দেখলাম চলমান জীবনের ছবি—যে ছবি কবির কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল একদিন ঝিলমের তীরে সন্ধ্যার আকাশে উড়ন্ত হংস বলাকাকে দেখে। সেদিন কবি দেখেছিলেন সমস্ত পৃথিবীব্যাপী জীবনের সমারোহ—এমন কি মাটির আকাশেও লক্ষ লক্ষ বীজের অঙ্কুর পাখা মেলেছিল।

সভার উচ্চ মঞ্চে সম্মানের আসনে বসে যদি এই দৃশ্য দেখতেন......

চুপ-চুপ—স্থির হয়ে বসুন আপনারা। আর সামান্যক্ষণ অপেক্ষা করুন। মাননীয় সভাপতি মশায় অল্পক্ষণই ভাষণ দেবেন—তার পর রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনীত হবে।

মাইকটা আমার মুখের কাছ থেকে টেনে নিয়ে মুখপাত্র ছেলেটি ঘোষণা করে চলেছে: এই নাটকে যাঁরা রূপদান করবেন—তাঁরা সকলেই আপনাদের সুপরিচিত শিল্পিবৃন্দ। এতে নামছেন সর্বশ্রী.........

চলমান জনতা যেন মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত স্থির হয়ে গেল—যে যার আসনে বসল স্থির হয়ে। আমার ভাষণদানকালে কিন্তু সমুদ্রের কল্লোলধ্বনি প্রবল হয়ে উঠল। কাছোপিঠে পুরীর সমুদ্রের ধারে গিয়ে যাঁরা কোন দিন বসেছেন—তাঁরা আমার অসহায় অবস্থাটা কল্পনা করে নিন। যত উচ্চৈঃস্বরে আর তীব্র করে বলা হোক কথা—তরঙ্গ দল তা অনায়াসেই আত্মসাৎ করে নেবে। সেখানে প্রধান বক্তা হল সমুদ্র। নিজের মহিমা-উচ্ছ্বাস-আনন্দ বেদনাকে বিরামহীন বাকধারায় প্রকাশ করেই চলেছে সে—! অসহায় মানুষ চুপ করে শোনে তরঙ্গ আরাব—দেখে নীলাম্বু বিস্তারের শোভা, আর সেই সঙ্গে অসংখ্য ভাঙ্গা ঢেউয়ের হিসাব করতে করতে সমস্ত হিসাববোধের সীমানা পার হয়ে যায়। সহসা করতালি ধ্বনি প্রবল হয়ে উঠল। আমার ভাষণ শেষ হয়েছে। ভাষণ তীব্র হল, না মোলায়েম হল, সংক্ষিপ্ত হল, না দীর্ঘ হল জানি না; কেউ শুনল, কি শুনল না—কিছু বুঝল কি, বুঝল না, কে জানে। শুধু কবির কথাটাই স্মরণ হলঃ

বুঝিলাম—নাহি বুঝিলাম, জয়—তব জয়।

মুখপাত্র ছেলেটি পুনরায় কাছে এসে দাঁড়াল। বিনীত হাস্যে বলল, চমৎকার বলেছেন স্যার। এইবার স্টেজের সামনে গিয়ে বসবেন চলুন। আর সামান্যক্ষণ আপনাকে কষ্ট দেব স্যার—আমাদের অভিনয়টা দেখে যেতে হবে।

জানি কষ্টের প্রসঙ্গ তোলা ভদ্রতাবিরুদ্ধ। একটু হাসলাম মাথা হেলিয়ে—মঞ্চ থেকে নেমে প্রেক্ষাভূমির দিকে চললাম। অভিনয় দেখতেই তো এসেছি—না দেখে উপায়ই বা কি।

আশা

বিভা সরকার

নিত্যদিন রহি রহি বাজে সঙ্গোপনে
জীবনবীণায় মোর বিচিত্র রণন।
অন্তরালে শুধু কাঁদে সুপ্ত এ জিজ্ঞাসা
তৃপ্তি কোথা—হল কই জীবনদর্শন?
দূরে যাহা নিভৃত সে মন অন্তঃপুরে
কুহকিনী ভীরু আশা শঙ্কায় শিহরে-
প্রাণ হতে লয়ে প্রাণ অণু হতে অণু
বিশ্বের নয়নে সে ত সদাই অতনু।
সে যে মোর একান্ত সম্বল
সর্বহারা ভিখারীর নয়নের জল—
লোভাতুর বালকের রঙিন খেলনা
ভীরুপক্ষ শাবকের লক্ষ্যহীন ডানা।
মরু মাঝে ফল্গুধারা নদী
বাধা পায় বহে নিরবধি।
কুঁড়ি সে সযত্নে ঢাকে আপন কোরকে
যে আশা মুখর হয় পুষ্পের স্তবকে!
কিশলয়ে কিশলয়ে করে কানাকানি
সে কথাটি জানি, তবু সে ত নাহি জানি!
স্বীকৃতি পাবে কি কভু অমৃত জিজ্ঞাসা
মর্মের কোরকে কাঁদে মৃত্যুহীন আশা!

নাম সংকীর্তন

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
নাম সংকীর্তন কলৌ পরম উপায়॥

নীলাচলে গম্ভীরায় লোক কল্যাণের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে আনন্দে শ্রীমহাপ্রভু বলিয়া উঠিলেন—স্বরূপ দামোদর, রামানন্দ রায় শোন, কলি জীবের চরম উপেয় লাভের পরম উপায় হইল নাম সংকীর্তন। শ্রীভগবানের নাম, লীলা গুণাদির উচ্চ ভাষণ কীর্তন। অনেকে মিলিয়া সম্মিলিতভাবে এই উচ্চ ভাষণের অভিধানই সংকীর্তন। সম্মিলিতভাবে শ্রীহরির নাম লীলা গুণাদি কীর্তনই সংক্ষেপে নাম-সংকীর্তন নামে পরিচিত।

একক কীর্তনের কথায় শ্রীমহাপ্রভু খাইতে-শুইতে যথাতথা নাম লইবার উপদেশ দিয়াছেন। বলিয়াছেন, ইহাতে যেমন দেশকালের নিয়ম নাই, তেমনই সর্বসিদ্ধি লাভ সম্বন্ধে সংশয়েরও অবকাশ নাই। নাম গ্রহণের পূর্বে মানসিক প্রস্তুতির বিশেষ আবশ্যকতার কথাও তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন। বলিয়া গিয়াছেন শ্রীহরির পাদপদ্মে আপনাকে তৃণের মত নত করিয়া রাখিবে। সুখ-দুঃখ লাভালাভ জয়-পরাজয়ে তরুর মত সহিষ্ণু থাকিবে। আপনি অমানী হইয়া অপরকে মান দান করিবে। শ্রীভগবানের নাম-কীর্তনীয়াকে সর্ববিধ কৈতব পরিহার করিতে হইবে। দেহ মন এবং বাক্যের ঐক্য সম্পাদন করিতে হইবে। তবেই নাম তোমাকে কৃপা করিবেন এবং একথা অতি সত্য যে নাম ও নামীতে কোন প্রভেদ নাই।

নাম-সংকীর্তনে পাঁচজনে মিলিয়া শ্রীহরির নাম কীর্তনে কিন্তু কয়েকটি নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। সর্বপ্রথম লোক সংগ্রহে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। একই ভাবের ভাবুক কয়েকজন লোক চাই। তাহাদের সুরে তালে কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। মৃদঙ্গ বাদক কম-পক্ষে দুইজন দরকার। কীর্তনে এবং বাদ্যে যাহাতে অমিল না হয়, তজ্জন্য সকলে মিলিয়া কয়েক দিন সাধিয়া লইবে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় একটি পবিত্র স্থানে মিলিত হইয়া শুচি-শুদ্ধ ভাবে শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে নাম-সংকীর্তনের সাধনা করিবে। অতঃপর নাম গান করিতে করিতে গ্রাম প্রদক্ষিণে বাহির হও, দেখিবে আপনা হইতেই লোক তোমাদের দলে ভিড়িবে। লোকে তোমাদের ভালবাসিবে, তোমাদের কথা শুনিবে। শ্রীহরির নাম গ্রহণ করিতে হইলে কেমনভাবে প্রস্তুত হইতে হইবে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমুখে তাহা শুনিয়াছ। সেই উপদেশ কয়েকটি দলের কয়েকজনেও যদি জীবনে সত্য করিয়া তুলিতে পার, তোমরা অসাধ্য সাধন করিবে। তোমাদের দ্বারা সমাজের পরম কল্যাণ সাধিত হইবে।

নামাভাসেই সর্বানর্থ নাশ হয়। সঙ্গে সঙ্গে জীবনে শুভ অভ্যুদয়ের আবির্ভাব ঘটে। আমার কথা বিশ্বাস কর, একবার আচরণ করিয়া দেখ। এই তোমার স্বধর্ম। এই ধর্ম স্বল্প মাত্র আচরিত হইলেও মহাভয় হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবে। এ দুর্দিনে ইহা ভিন্ন দ্বিতীয় কোন পথ নাই। আমার অনুরোধ রাখ, অকপট হও এবং শ্রদ্ধান্বিত হও। দেশকে শ্রদ্ধা কর, দেশের মাটী জলকে শ্রদ্ধা করিতে শেখ, দেশের অতীত ঐতিহ্যকে, দেশের মানুষকে শ্রদ্ধায় আপনার করিয়া লও। ঋষি বাক্যে আস্থা স্থাপন কর, ঋষি বাক্যে শ্রদ্ধান্বিত হও। ঋষি বলিতে আমি শ্রীপাদ-রূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ দাস এবং শ্রীপাদ জীব গোস্বামীকে লক্ষ্য করিতেছি। শ্রীল স্বরূপ দামোদর এবং শ্রীল রায় রামানন্দের উল্লেখ করিতেছি। ইঁহা-দের নির্দেশ অবিচারিত চিত্তে পালন করিয়া দেখ, তোমার জীবন সার্থক হইবে। তোমার কুল পবিত্র, জননী কৃতার্থা হইবেন।

নাম সংকীর্তনের পারমার্থিক দিক্ দেখিবার যদি অবসর না থাকে, স্বার্থের দিকটাই দেখ। যদিও পরমার্থই জীবের পরম স্বার্থ, তথাপি লৌকিক স্বার্থের কথাটাই বলি। জন সংগ্রহের গণ-সংযোগের এমন সহজসুলভ শুদ্ধ ও সুন্দর সুপরিষ্কৃত দ্বিতীয় একটা পথের নাম করতো দেখি। এমন উদারতর সুপরিসর সরল নিরাপদ দ্বিতীয় একটা পথ খুঁজিয়া বাহির করতো দেখি। এ যে প্রেম-বিগ্রহ শ্রীমন মহাপ্রভুর চরণাঙ্কিত সরণী। এ পথ যেমন অবিনশ্বর, এ পথের পথিকও তেমনই অমর। এই পথের প্রতি ধূলিকণায় সর্বভীতিহরণ মৃতসঞ্জীবন অমৃত মিশিয়া আছে। এই পথকে প্রণাম করিয়া পথের ধুলা গায়ে মাখিয়া নাম-সংকীর্তনে মাতিয়া অগ্রসর হও, দেখিবে দানবারিগণ তোমার প্রত্যুদ্গমন করিতেছেন, সর্বসিদ্ধি তোমার পদানুসরণ করিতেছে। পরশমাণিকের কথা শুনিয়াছ, পরশ স্পর্শ না করিলে লৌহ কাঞ্চন হয় না। আর আমার শ্রীগৌরাঙ্গের গুণ গাহিয়া নাচিয়া এই পথে কত মানুষ যে মাণিক হইয়া গিয়াছে, ইতিহাস তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে নাই।

পথের আর একটি সুবিধা—এ পথে কোন "পারিয়া" নাই। পথে স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের বিচার নাই। এ পথে ব্রাহ্মণ, চণ্ডালের সমান অধিকার। এখানে আইন রচিয়া অস্পৃশ্যতা পরিহারের বিধান দিতে হয় না। এ পথের পথিকেরা মানবতার পূজারি, বিষ্ণুর ভক্ত। যে প্রকৃত ভক্ত, সেই তো মানব প্রেমিক। যে বিষ্ণু ভক্ত, জীবে দয়া মানবের সেবাই তাহার ধর্ম। তাইতো আচার্যগণ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—বিষ্ণুভক্ত চণ্ডাল বিষ্ণুভক্তিহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

এ পথের সন্ধান অপরে কেহ জানিত না। শ্রীমহাপ্রভুই এই পথের আবিষ্কর্তা, তিনিই এই পথের প্রথম পথিক। এই পথে না চলিলে বাঙ্গালী বাঁচিত না। শ্রীমহাপ্রভুই বাঙ্গালী জাতিটাকে এই পথে আনিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া দিয়া গিয়াছেন। তাহার জাতীয়তায় নূতন জীবন দান করিয়াছেন। সে দিন এই নাম-সংকীর্তনই বাঙ্গালীকে রক্ষা করিয়াছিল। এই জীবন সংকটের দিনে যুগ-সন্ধিক্ষণে বাঙ্গালী রূপেই বল, আর ভারতীয়রূপেই বল বাঙ্গালীকে বাঁচিতে হইলে আবার নাম-সংকীর্তনকেই অবলম্বন করিতে হইবে। বাঙ্গালার ব্রজভূমি নদীয়ার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া অন্তরে অন্তরে এই প্রার্থনাই করিতে হইবে—মনে করি, ঐ নদীয়াপুরি হউক মোর হিয়া। তাহাতে গৌরাঙ্গ নাচুক পদ প্রসারিয়া।

তৃপ্ত

দেবাশীষ গুহ

প্রকাণ্ড একটা হল ঘর। যেমনি লম্বা, তেমনি ছাদটা বেশ উঁচু। ফাঁকা থাকলে বোধ হয় ঘোড়া ছুটান যায়। কোনো সৌখিন আসবাবপত্র নেই—এই যেমন জল-রঙা তেল-রঙা ছবি, ফটো, দামী আলমারী, বিলাতি নৈসর্গিক দৃশ্য।

দু'সারিতে পাশাপাশি অনেকগুলো লোহার খাট। পাশে রোগীর হিস্ট্রি, শিয়রে ডাক্তারের নাম লটকান। একটু দূরে একটা ছোট্ট আলমারী। মাথায় জলের কুঁজো, ভিতরে হয়ত গোটা কয়েক ফল।

বিশু পঁচিশ নম্বর বেডের পেসেন্ট। নতুন ভর্তি হয়েছে। এখনো ওষুধপত্রের গন্ধ সে রপ্ত করতে পারেনি। অথচ একেবারে শয্যাশায়ী নয় যে বিছানায় পড়ে থাকবে। তাই সে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। আলাপ জমিয়ে নেয় আশ-পাশের বেডের সঙ্গে। ডান হাতখানা ভাঙা, ব্যাণ্ডেজ করা। বাঁ হাতখানা দিয়ে হয়ত কখনো গুছিয়ে দিলে সিস্টারের টেবিলটা, বয়স বিশ বাইশ। হাত ভাঙলেও মন ভাঙেনি।

তেইশ নম্বর নড়তে পারে না, ছাব্বিশ নম্বরের হাঁপানি। এদের কাছে যত রাজ্যের সংবাদ এনে সরবরাহ করে বিশু। কে ভাল সার্জন, কে অপদার্থ রেসিডেণ্ট ফিজিসিয়ান, কার ওয়ার্ডে হাসতে মানা, কোন্ নার্সটি সুদক্ষ টেলিফোন স্পেসালিস্ট।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা একচোখো একুশ নম্বর ফোকলা দাঁত বার করে হাসে। সময়তে বিশুকে কাছে ডেকে বসায় ইব্রাহিম মিঞা। ভাবী আমুদে ছেলে! তুলসিদি বলেন, হসপিটাল গেজেট।

প্রয়োজনের তাগিদেও সহজে এ ওয়ার্ডের কেউ টেলিফোন ছোঁয় না। নমিতা তো বারণ করে দিয়েছে কেউকে রিং করতে।

জীবন মরণের ঢেউয়ের ভিতর বিশু যেন একখানা কাগজের নৌকা। কখন কার ঘাটে যে বিদ্রূপের পাল নিয়ে নাজেহাল করতে ভিড়বে।

কদিনের ভিতর এ-ওয়ার্ড থেকে ও-ওয়ার্ড, তারপর সারা হাসপাতাল ময় বিশুই শুধু আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আয়া থেকে সিনিয়র সার্জন এই একঘেয়ে কাজের মধ্যে যেন হাসির খোরাকী পান।

কিন্তু একদিন কথাটা ওঠে আই এম এস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর কানে। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে সন্ত্রাস। পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড তো ভেবে কাঠ। মেট্রন, ওয়ার্ড মাস্টার, নার্স সব টিপ-টপ। দরোয়ান সেলাম নিয়ে প্রস্তুত। রোগীদের বেশি কথা বলতে বারণ। নমিতাদি, ইন্দিরাদি হাঁটেন তো না, যেন ড্রিলের পা ফেলেন।

গম্ভীরভাবে বিশু বলে, লেফট রাইট, লেফট রাইট!

কটমটিয়ে তাকান দিদিরা।

বিশু তখন অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে কবিতা আবৃত্তি করে—

পরেন বটে গাউন সোজা, চলেন বটে
সোজা সোজা
তাকান বটে কটমটিয়ে রেগে
রোগীর 'পরে......
তবু দেখ দিদির স্নেহ, আঁখির কোণে
দিচ্ছে সাক্ষ্য
যেমনটি ঠিক দেখা যায় তোমার
আপন ঘরে......

খানিকের জন্য চাপা হাসির ঝড়ে ভেঙে পড়তে চায় পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড। ইব্রাহিম সম্যক কিছু না বুঝলেও বলে, এক্ষুণি তোমায় ডিসচার্জ করে দেবে।

বত্রিশ নম্বর বলে, এত আনম্যানার্লি হওয়া ভাল না।

শঙ্কা এবং ত্রাসের মধ্যে কদিন কাটে, কিন্তু সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসেন না। হাউস সার্জন এবং অন্যান্য ষ্টাফদের সঙ্গে নিয়ম মেনে মেনে বশংবদ রোগীরা হয়রান। একদিন একটা থার্মমিটার ভেঙে লজ্জা পান অলকাদি।

দিন সাতেক বাদে হঠাৎ অসময়ে এসে উপস্থিত হন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। রাত প্রায় আটটা। রোগীরা কেউ খাচ্ছে কেউ বা তোড়জোড় করছে, আশ্চর্য, শুধু পঁচিশ নম্বর বেড নয়, আরো কয়েকখানা খালি। ওয়ার্ডের সিস্টারের তো চোখে জল আসার জোগাড়!

এ সব কারো পরামর্শ মুহূর্তে বুঝে ফেলেন সিস্টার। আস্কারা দেওয়ার জন্যই এ কটা ছেলেটি এমন অনর্থ ঘটাতে সাহস পেয়েছে!

কিছু জিজ্ঞাসা করেন না সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তাঁর নজর পড়ে বারান্দার পাশের লম্বা এক ফালি বাগানের দিকে। সিস্টার ওয়ার্ড বয় চোখে দেখে চার পাঁচটি প্রাণীর মাথা চকচক করছে জ্যোৎস্না আলোতে। তাসে মসগুল। এদিকে খেয়াল নেই যে কি হচ্ছে।

একটু দূরে সিজন ফ্লাওয়ার এক সার। তার পাশে বিশু। হাতে একখানা বই। কি যেন পড়ছে মন দিয়ে। হাওয়ায় উড়ছে কপালের উপরের পাতলা চুলগুলো।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের জুতোর শব্দে তাসের দল নিমেষে হাওয়া।

তোমরা এখানে কি করছ?

সকলে বিশুর জবাব শোনার জন্য কাণ খাড়া করে থাকে।

ধীরে ধীরে বিশু বই গুটায়। —আমরা বেড-রিডেন পেসেণ্ট নই। আমাদের জন্য তো একটা লাইব্রেরী কিম্বা ক্লাব চাই।

ঠিক বলেছ।

পরদিনই একখানা লাইব্রেরী রুমের বন্দোবস্ত হয়ে যায়। যে রোগীরা ভাল হয়ে বেরিয়ে যাবে, তাদের সাহায্যে কেনা হবে বই। বিশু প্রাথমিক সংগঠন শেষ করে দিদিদের বলে, একটা জিনিষ বাড়তি থাকবে, সেটা আপনারাও ব্যবহার করতে পারবেন।

কি ভাই কি?

টেলিফোন।

যেখানে দু'জন সেখানেই বিশুর কথা। কি বিড়ি মুখে, ঝাড়ু হাতে। কি স্টেথিসকোপ, গাউন। দু'পাঁচজন রোগী একত্র হলে তো কথাই নেই।

হঠাৎ পঁয়ত্রিশ নম্বর বেডে এক রোগী এসে কেড়ে নেন সমস্ত আলোচনা। বিশু তলিয়ে যায়। এখন মুখে মুখে শুধু পঁয়ত্রিশ নম্বর। শ্রদ্ধা সম্মান কৌতূহল যেন উপচে পড়ে।

বিশু ভাবে মানুষটা কে? কিন্তু সে কোন উচ্চবাচ্য করে না। কোনো প্রশ্ন কিম্বা ঔৎসুক্য তার মুখে প্রকাশ পায় না।

এত দিন বাদে সে তার ভিজিটিং সার্জনের কাছে কমপ্লেন করে যে তার হাড়ের ভিতর টনটনাচ্ছে। রাত্রে ভাল ঘুম হয় না।

ব্যাপারটা কি? কোনো রকম চোট টোট লাগেনি তো?

বিশু জবাব দেয়, প্ল্যাস্টারের ভিতর কি করে চোট লাগবে? এ হাত নিয়ে তো আমি বাথরুমেও লড়িনে।

হাড়ের বিশেষজ্ঞ মনোবিকলনের অধ্যায় ওলটান না। ভেবে-চিন্তে একটা মামুলী ঘুমের ওষুধের ব্যবস্থা করে দেন।

রাতটা ভালই কাটে বিশুর। কিন্তু সকাল না হতেই আবার চিনচিন। কোনো উৎসাহ বোধ করে না লাইব্রেরী সংগঠনের জন্য। এর সঠিক হেতুটা কি বিশু নিজেই বুঝে উঠতে পারে না।

বিশু মুখ কালো করে বিছানায় বসে থাকে। ডান হাতটা দিয়ে মাঝে মাঝে কপালের রগ দুটো চেপে ধরে। পাশ দিয়ে অলকাদি ইন্দিরা-দি চলে যান, বিশুর কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করেন না। সবাই পঁয়ত্রিশ নম্বরকে নিয়ে ব্যস্ত। এই ইনজেকসন, এই ওষুধ।

বিশু ছাড়া যে যখন সুবিধা পায় জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছে?

একটু ভাল।

যাক, ঈশ্বর রক্ষা করুন।

সকলেই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করে, পঁয়ত্রিশ নম্বর সুস্থ হয়ে উঠুক।

বিশু আবার নিজের সম্বন্ধে কমপ্লেন করে।

ব্যতিব্যস্ত হাউস সার্জন একটু দাঁড়ান,—কি বললে? চটপট বলো, ব্যথাটা কি কমেনি? ঘুম?

রাত্রে এক রকম হচ্ছে, কিন্তু—

দিনেও কি ঘুমের ওষুধ খেতে চাও? সর্বনাশ ড্রাগ হ্যাবিট ফর্ম করতে পারে।

পেইনটা যে কিছুতেই কমছে না?

একটু সহ্য করো, সেরে যাবে। জ্বর হয় না তো?—নাড়ীটা একটু ধরেই ছেড়ে দেন হাউস সার্জন।—কোনো ভয় নেই।

একটি নার্স এসে হাউস সার্জনকে ডেকে নিয়ে যান—তাড়াতাড়ি আসুন, পঁয়ত্রিশ নম্বর ডাকছেন। আর এম ও এসেছেন। কি যেন জিজ্ঞাসা আছে।

হাউস সার্জন দ্রুত পায় চলে যান। পিছে পিছে নার্স।

নার্স দিদিটি অপরিচিত নন। অপরিচিত নন ডাক্তারবাবুটি। ভাঙা হাতখানা একটু পরীক্ষা করে দেখলেও দুঃখ ছিল না বিশুর। এখানা বাঁ হাত নয়, মানুষের চরম প্রয়োজনীয় ডান হাত, রুজি রোজগার যা কিছু নির্ভর এখানার ওপর। সামান্য অবহেলার পরিণতি হতে পারে মর্মান্তিক।

ইলাদিরও দরদ নেই। অদ্ভুত পরিবর্তন। এঁরা মানুষ নন,—ওপরে দিব্যি খোলস, ভিতরে ছুরির কাঁচি। বিশুর মনে হয়, হাসপাতাল শুদ্ধ সব বুচার। এখন মানে মানে বাড়ি যাওয়াই ভাল।

বিকালে পঁয়ত্রিশ নম্বরের কাছে দলে দলে লোক, আত্মীয় অনাত্মীয় মেয়ে পুরুষ। বিশুর বিছানার কাছে শুধু এক মহিলা।

মা বাড়ি যাব?

কেন বাবা? আর কটাদিন বাদে তো ওরা ডিসচার্জ করেই দেবেন। এই যে সেদিন বললি এখানে বেশ আছিস, এঁদের ছেড়ে যেতে বড় দুঃখ করে।

বিশু ধরাগলায় বলে, না—এখানে থাকলে আমার কিছু উপকার হবে না।

দূর, দূর পাগলা? ব্যথা নয়, তোর যেন কি হয়েছে।

বিশু তবু আবদার করে।

মা বলেন, আচ্ছা কাল ওঁকে পাঠিয়ে দেব।

পরদিন বিশুর ঘুম ভাঙে খুব ভোর বেলা। তখন পর্যন্ত অনেকেই জাগেনি। শুধু ছাব্বিশ নম্বর একটু বেশি হাঁপাচ্ছে। আর ওদিকে কে যেন কাতরাচ্ছে অপারেশনের যাতনায়। আজ তো বিশু চলে যাবে। কিন্তু এত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিটি কে তা তো ভাল করে জানা হল না? এক নজর মুখখানাই বা দেখলে কি এমন দোষ হত?

বিশু উঠে দাঁড়ায়, আবার শুয়ে পড়ে, এমন একটা কি রাজাগজা বটেন?

একটু বেলা বাড়লে পাশের বেড সংবাদ জানায়, পঁয়ত্রিশ নম্বর চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। মানুষটার যেন হাড়ে কথা কয়। অমন রোগা লিকলিকে কিন্তু তিন তিনটে জাঁদরেল সাহেবকে ধরে নাকি জ্বলন্ত ফারনেসে ঠেলে দিয়েছে।

বিশু আতঙ্কে চেঁচিয়ে ওঠে, খুনী!

না, না, রাজনৈতিক বন্দী। এঁর দলের নাম শোনেন নি? আহা ভুলে যাচ্ছি, মস্ত বড় রেভোলিউসনারী পার্টি। উনি একজন ডাবল এম-এ। কারখানায় ধর্মঘট। মজুরদের কোনো কথা শুনবে না কোম্পানী। তারপর তুমুল আন্দোলন। শেষটায় খুন-জখম, পনর বছর জেল। এ সব লোক দেখাও পুণ্য।—পাশের বেড আরও অনেক কথা বলে। ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের মত স্মরণীয় করে দেখায় পঁয়ত্রিশ নম্বরকে।—পরের জন্য নিজের জীবন তুচ্ছ করে ক'জন লড়তে পারেন?

তবু সন্ত্রাসবাদী। একজন সামান্য খুনী আসামীর চাইতে বেশি কিছু নন। যত শিক্ষিতই হন পঁয়ত্রিশ নম্বর, মানবতাবোধের খাতায় তাঁর দাম নেই আদৌ। ঝগড়া তর্কের ভয়ে মুখ খোলে না বিশু—শুধু নীরব হয়ে ফিরিস্তি শোনে।

এঁর জন্য এতগুলো লোক আকুল—নির্ঘাৎ উন্মাদের লক্ষণ! এ পরিবেশ থেকে চলে যাওয়াই শ্রেয়। নইলে বিশুও বাদ যাবে না রোগের আক্রমণ থেকে।

হত্যাকারী আর যা-ই হন, মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে পারেন না। শুধু খুন করলেও কথা ছিল, অতি নৃশংসভাবে পুড়িয়ে মারা। ঘটনাটা কল্পনা করে শিউরে ওঠে বিশু।

যত শ্রদ্ধার পাঁচিলই খাড়া করুক পাশের বেড, বিশুর কাছে তা ভেঙে পড়ে ঘৃণায়।

যাক অত করে ভেবে লাভ কি? বিশু তো ত্যাগ করছে হাসপাতাল। আর বড় জোর ঘণ্টা আটেক এখানে আছে। চোখ কান বুজেই না হয় কাটিয়ে দেবে।

বিকালের দিকে বাবা আসেন না। মা'রও দেখা নেই। সে ঠিক করে সন্ধ্যার পর হাউস সার্জন এলে, ছুটি নিয়ে সে বেরিয়ে যাবে। এ আবহাওয়ায় তার আর থাকা পোষাবে না।

দলে দলে দর্শক আসে এবং চলে যায়, ঘড়ির দিকে চেয়ে বসে থাকে বিশু।

রাত আটটা।

যথারীতি রাউণ্ডে আসেন হাউস সার্জন।

বিশু বলে, বাড়ি যাব ছুটি চাই। আমায় ডিসচার্জ করে দিন।

টাকা জমা দিয়েছ, যখন ফুরোয়নি, তখন আর কটা দিন থেকে যাও।

বিশু বলে, না।

হাউস সার্জন প্রয়োজনীয় উপদেশ নির্দেশ দিয়ে বিদায় নিলেন। বিশু একটা বড় থলেতে তার টুকিটাকি জিনিষপত্র বইখাতা গুছিয়ে তুলে নেয়। একবার চোখ তুলে চারদিকে তাকায় সে। কিন্তু কারুর কাছে বিদায় নেয় না।

এদিকের গেট বন্ধ হয়েছে। পঁয়ত্রিশ নম্বরের পাশ দিয়ে যেতে হবে। মানব নয়, দানবের পাশ দিয়ে। উপায় নেই। প্রায় চোখ বুজে এগিয়ে চলে বিশু।

কিন্তু কেবিনের করিডোরে আর্মড পুলিশ চারজন। লোহার খাটে পঁয়ত্রিশ নম্বর, সাধারণ মানুষের মতই সিগ্রেট ধরিয়েছেন।

কথা হচ্ছে পুলিশ এবং আসামীতে।

কৌতূহলে দাঁড়িয়ে পড়ে বিশু।

যে দল আমাদের পাকড়াও করলে সে দলে তুমিও ছিলে কিন্তু জান না কেন আমরা ধরা পড়লাম। একটি বই রিভলবারে টোটা ছিল না। পঁয়ত্রিশ নম্বর একটু থামলেন।

তাই নাকি?—পুলিশটি বিস্মিত হয়ে বলে, থাকলে হয়ত আজ আর দেখা হত না আপনার সঙ্গে।

অসম্ভব নয়—শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন পঁয়ত্রিশ নম্বর—আচ্ছা দারোগাবাবুর কি হল? ঐ একটা গুলী তো তাঁকেই লক্ষ্য করে মেরে-ছিলাম।

ডান পা-টা একেবারে প্যাকাটির মত ভেঙে গিয়েছিল।

বল কি। তারপর?—উত্তেজনায় পঁয়ত্রিশ নম্বর সিগ্রেট টানা বন্ধ করলেন।—উঃ!

দারোগাবাবু বললেন, যখন আমার ডান পাখানা গিয়েছে, তখন তোমরা আমার কপালে গুলী করো, কপালে—

তারপর?—এবার জ্বলন্ত সিগ্রেটটা পড়ে যায় হাত থেকে।

পুলিশটি বলে, তারপরের খবর আমি আর জানিনে। উনি চলে গেলেন হাসপাতালে, আমি চলে এলাম রিজার্ভে।

বিশু শুধু জানে পরের খবর, ছাই না হওয়া পর্যন্ত সিগ্রেটটা পুড়ছে, পুড়ছে।

নাটকীয়

কালীপদ চট্টোপাধ্যায়

মানুষ যা করবে ব'লে ভাবে, অনেক সময়ই তা হয় না—ঘ'টে যায় অন্যকিছু। নিত্যানন্দের নাটুকে বাতিক, তার বরাবরই সাধ ছিল নিজের বিয়ের প্রীতিভোজ উপলক্ষে ভাল একটা নাটক নামাবে। নিজেদের ক্লাব তো রয়েছেই। কিন্তু নাটকে হাতই দেওয়া গেল না। নতুন নাটক তৈরি করার সময় কোথায়? তা ছাড়া, ওড়াবার মত টাকারও অভাব।

তবে, নাটক হয়নি বলে আফসোস নেই। নাটক না হয়ে যা হয়েছে, তা' একেবারেই নাটকীয়। বিয়ে-বাড়ি-ভর্তি আত্মীয়-কুটুম্ব ও আত্মীয়া-কুটুম্বীরা তা নাটকের চেয়ে কম উপভোগ করেননি। শুধু খোদ নিতাই, তার মা, তার নতুন বউ, তার ভোলাদা এমনি জনকয়েক লোকের তা উপভোগ করা চলেনি, তার কারণ, তাঁরাই ছিলেন ওই নবনাটের কুশীলব।

নিত্যানন্দর বিয়ের সম্বন্ধটা যে ঘটেছে, তাও একটু বিচিত্র ধরণের কিনা। ছেলেটার বিয়েই হচ্ছিল না। অচল পাত্র সে নয়, বরং কর্‌করে সচল। চেহারা চমৎকার, স্বাস্থ্যটি ভাল, পাশে এম, এস-সি, চাকরিতে উচ্চবর্ণ, শহরে না হোক শহরতলীতে বাড়ি রয়েছে নিজেদের...... সোনার পাত্র। কিন্তু চালায় কে? বাপ বেঁচে নেই, মা নেহাতই ভালমানুষ, নিতাই তাঁদের বড় ছেলে। সে-ছেলে নিজে চেষ্টা ক'রে নিজের আইবুড়ো বোনের বিয়ে দিয়েছে, কিন্তু নিজের বিয়ের পাত্রী খুঁজবে তেমন পাত্রই নয়। প্রেম ক'রে যে একটি জোটাবে সে সাহস নেই, আর মা তাতে মনে দুঃখ পেতে পারেন এমন ভয়ও আছে। কাজেই তার চোখের সামনে দিয়ে ড্যাঙডাড্যাঙ ক'রে তার সব বন্ধুরেই বিয়ে হয়ে গেছে, আর সে শুধু খেটে কালি হয়েছে আর উপহার দিয়ে মরেছে।

কন্যাদায়ের দেশ, অথচ কোন কন্যাপক্ষ ওর দিকে মুখ তুলে তাকাতে সাহস পান না—অমন রত্ন-পাত্র, কত হাঁকবে কে জানে! এদিকে তার মা বলেন, "ভগবান যখন জোটাবেন তখন জুটবে, আমি কেন মিছে হাঁকপাঁক ক'রে মরব!"

এরই মধ্যে একদিন এলেন নিতাই-এর মেসোমশাই। তার মায়ের দিদির বর। মফস্বল শহরে বাড়ি। তাঁর ছেলে ভোলানাথ নিত্যানন্দর চেয়ে চার মাসের বড়। সেই ছেলের জন্য তিনি এসেছেন এ-অঞ্চলে এক পাত্রী দেখতে। নিতাইকে বললেন, "[illegible]

নিত্যানন্দের ইচ্ছে ছিল না যাবার। বন্ধুদের বিয়ের পাত্রী দেখে দেখে অনেক দীর্ঘশ্বাসই তো ফেলেছে সে! তাতেই বুক যথেষ্ট ফাঁকা হয়েছে। আর কেন? কিন্তু মাতৃভক্ত ছেলে। মা বললেন, "তুইও তোর মেসোমশাই-এর সঙ্গে যা নিতু, না হলে বুড়োমানুষ, বিদেশে-বিভুঁয়ে কোন্ অঘটন ঘটিয়ে বসবেন তার ঠিক আছে? বাড়ি থেকে ও'র একা বেরনোই ঠিক হয়নি।"

'বিদেশ-বিভুঁই' বলতে ঢাকা-দিল্লি নয়। শিয়ালদা স্টেশন থেকে নিতুদের বাড়ি যত স্টেশন, হাওড়া থেকে পাত্রীপক্ষের বাড়ি তার চেয়ে দুটো স্টেশন উত্তরে। গঙ্গা পেরিয়েও যাওয়া যায়। কিন্তু নৌকা চড়তে বৃদ্ধ নারাজ।

এদিকে ছুটির দিন, ওদিকে মাতৃ-আদেশ, নিতুকে যেতেই হয় মেসোর সঙ্গে ভোলাদার পাত্রী দেখতে। সেখানে গিয়ে যথারীতি নোন্তা-মিষ্টি-চা-যোগের পরে ক'নে-দ্যাখার পালা। মাঝখানে মধ্যমণি হয়ে বসেছেন মেসোমশাই, তাঁর এপাশে নিতু, ওপাশে ক'নের বাপ, দোরের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন মেয়ের দাদা। ঘরের দোরটা একেবারে নিতুর মুখোমুখি।

মেয়েটি ঘরে ঢুকে যেই নিচু চোখ একবার উঁচু করেছে, হয়ে যায় নিতুর সঙ্গে চোখাচোখি। ক'নে তো ফের চোখ নামিয়ে তার আসনে বসে কিন্তু নিত্যানন্দর চোখের আর পলক পড়ে না। প্রথম দর্শনেই শ্রীমানের চক্ষুস্থির এবং বক্ষ অস্থির।

বাইরের জানালায় খুক্ ক'রে এক মিষ্টি হাসির শব্দ হয়। মানে, বাইরে তো জানালায় চোখ রেখে বাড়ির অন্দরিকারা ঘরের ভেতরের সব ঘটনা লক্ষ্য করছেন। সেই হাসির শব্দে নিত্যানন্দর সম্বিত ফেরে, চোখের পলক পড়ে। পড়তেই সে যেন মরমে ম'রে যায়। ছি-ছি-ছি! নিতাই-এর এ আত্মহারা দশা দেখে, বাইরে ও'রা এবং ভেতরেরও কেউ যদি লক্ষ্য ক'রে থাকেন তাঁরা কী ভাবছেন! তাঁরা কি ভাবছেন না যে, এ ছোঁড়া জন্মে কখনও মেয়ে দ্যাখেনি!

মেয়ে নিতাই ঢের দেখেছে। ট্রেনে, বাস-এ, ট্রামে, পথে, আপিসে, সিনেমায় মেয়ের অন্ত নেই। বন্ধুদের বিয়ের কৃপায় এমনি ক'নে-মেয়েই কি সে কম দেখেছে? বিয়ের পাত্রী দেখে দেখে তো ঘেন্না ধ'রে গেছে তার। মেয়ের ওপর নয়। মেয়ে দেখে দেখে যে-তরুণের ঘেন্না ধরেছে, তার জন্মকে ধিক! নিত্যানন্দর ঘেন্না ধরেছে দালদার খাবার আর গুঁড়ো-দুধের চা-এর ওপর। যত মেয়েই জীবনে দেখুক, নিতু মনে মনে তখনই স্বীকার করে যে, এমন মেয়ে সে আর কখনও দ্যাখেনি।

খুঁত যদি কেউ ধরতে আসে, যদি বলা হয় যে, মেয়ে প্রকৃত ফরশা নয়, তা হলে নিতাই বলবে, হলদে-ফরশা তো রক্তহীনতার লক্ষণ, লাল-ফরশাকেই বলা যায় টুকটুকে রঙ। যদি বলা হয় যে, মেয়েটির নাক আর একটু টিকলো হলে শাস্ত্রসম্মত হত, তা হলে নিতাই বলবে, নাক বেশি টিকলো হলে মেয়েদের মর্দামর্দা দ্যাখায়। যদি বলা হয় যে, মেয়েটির চোখ যেমন টানা, সে অনুপাতে চওড়া নয়, তা হলে নিতাই বলবে, অতখানি টানা অনুপাতে চোখ যদি চওড়া হয়, তবে সে মুখ হ'য়ে দাঁড়াবে ষষ্ঠীতলার শেতলামায়ীর মুখ—সারা মুখে চোখ ছাড়া আর কিছু নেই যেন! ওসব খুঁত ধ'রে কি রূপ চেনা যায়? নিত্যানন্দ শুধু দেখে, যেখানে যেমনটি করলে সবচেয়ে ভাল মানায়, এ মেয়ে গড়ার পাকা কারিগর তার কিছুই করতে বাকি রাখেননি।

কল্যাণী। নামটা যখন বলে, তখন মনে হয়, গলার স্বর যেন একটু ফাঁশ্‌ফেঁশে; কিন্তু গান যখন ধরে—আহা! মধু! তখন নিত্যানন্দর মনে পড়ে বিখ্যাত গায়ক সেই ওস্তাদ......সেই যে কী-না-কী খাঁ, যাঁর নামটা সে কিছুতেই মনে করতে পারছে না, তাঁর কথা। ওস্তাদজি যখন বাতচিত করেন, যেন মর্দা-হাঁস, আর গান যখন ধরেন, যেন টিপরা বাঁশি! মেয়ে আই এ পাশ করে বি-এ পড়ছে ঘরে। ছুঁচ কুরুশকাঠি উল্‌বোনা—সবতাতে পরিপাটি হাত। ঘরের কাজে—বাড়ির বড় মেয়ে মায়ের ডান হাত।

নিতুর মাথার ভিতর তখন ঝিমঝিম করতে থাকে: এ মেয়ে বিয়ে করবে ভোলাদা! আর সেই বিয়েতে নিত্যানন্দ শুধু বরযাত্রী আসবে! সে শুধু বউভাতের লুচি-মিষ্টি গিলে বধূবেশা এ-মেয়ের হাতে একটা উপহার তুলে দিয়ে নমস্কার জানিয়ে চলে আসবে! এ মেয়েকে 'বৌদি' বলে শুধু 'ঠাকুরপো' সম্ভাষণ শুনে তুষ্ট থাকতে হবে! তার বেশি আর কী করাব অধিকার থাকবে নিতুর? বড়জোর মাঝে মাঝে মাসির বাড়ি বেড়াতে গিয়ে বউদি-রূপা এই মেয়ের সঙ্গে খানিক আড্ডা মেরে, কি এর একটি

গান শুনে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চ'লে আসবে। এমনিতে নিতু বছরে একবার মাসির বাড়ি যায় কিনা ঠিক নেই, ভুতোদার বিয়ের পরে সেখানে ঘন ঘন গেলে কি ভাল দ্যাখাবে? সে-যাওয়া কি ভাল চোখে দেখবে ভোলাদা! যদি দ্যাখেও, ভোলাদা যদি ভোলানাথই হন, তা হলেও নিত্যানন্দও তো ভদ্রলোক।

রূপকথার রাজকুমার কোন্ অজানা দেশে শিকারে বেরিয়ে অচিন রাজ্যের রাজকুমারীকে একটিবার দেখেই আহার নিদ্রা ছাড়ে। নিত্যা-নন্দরও সেই হাল হবে নাকি! কিন্তু দৈব চিরদিন রাজকুমারের সহায়। দৈত্য-দানব রাক্কস-খোক্কস ডাইনি-ড্রাগন সব শত্তুরকে মেরে কেটে, মায়াপাহাড় ছলানদী সব বাধা ডিঙিয়ে, পলক-দ্যাখা রাজকন্যাকে পক্ষীরাজের পিঠে তুলে উড়ে-ছুটে আপন রাজ্যে ফিরে এসে রাজপুত্র তাকে বিয়ে ক'রে সুখে রাজ্যে বাস করে। নিত্যানন্দর আর কয়েক মিনিট দ্যাখা কল্যাণীর মাঝখানে ভোলানাথ দৈত্য দানব, ভোলানাথ রাক্কস-খোক্কস, ডাইনি-ড্রাগন, ভোলানাথ মায়াগিরি ছলাসাগর—নিত্যানন্দ কী করবে? নিত্যানন্দ নিরুপায়। নিত্যানন্দর অদৃষ্ট অভিশপ্ত। নিরাশ আঁধারে একমাত্র আলো প্রজাপতি দেবতা। নিত্যানন্দ একমনে 'প্রজাপতি' জপ করতে থাকে।

পাত্রী দ্যাখা সাঙ্গ হয়। কল্যাণী চলে যায় ঘর অন্ধকার ক'রে। তখন পাত্রীকর্তা বলেন, "দয়া ক'রে যদি আপনাদের মতামতটা........"

নিতাই ব'লে ওঠে, "সে সব বাড়ি গিয়ে চিঠিতে জানানো যাবে।"

কিন্তু মেসো তার বুকে বজ্রাঘাত করেন, "না, আপনার মেয়েটি আমাদের পছন্দ হয়েছে।"

হায়, প্রজাপতি, মেসোকে কেন মনে করালে না যে, মেয়েটির নাক থ্যাবড়া, চোখ সরু, রঙ ফরশা নয়, গলা ফ্যাশফেঁশে!

পাত্রীপক্ষ পণের দাবীও তখনই জানতে চান। কেন না, মাসের শেষ পক্ষ চলেছে এবং এ মাসটি শেষ হলেই বিয়ের এ মরসুম খতম। ফের মরসুম পড়বে তিন মাস পরে।

"প্রজাপতি! দোহাই প্রজাপতি! ওং প্রজাপতি! রিং প্রজাপতি!" কিন্তু প্রজাপতির মূলমন্ত্র কী? নিত্যানন্দ জানে না। অগত্যা সে জপতে থাকে, "প্রং প্রজাপতি! প্রং প্রজাপতি!"

মেসোমশাই নগদে গয়নায় জিনিসপত্রে যে দাবি জানান, তা যোগাতে পাত্রীপক্ষকে খরচ করতে হবে অন্তত ন'টি হাজার টাকা।

পাত্রীর পিতা জোড়হাত করেন, "ক্ষমা করবেন, এর আধা দেবার ক্ষমতাও আমার নেই।"

"জয় প্রজাপতি!" প্রায় স্পষ্ট বেরিয়ে যায় নিত্যানন্দের মুখ দিয়ে।

অতঃপর দুই পিতাই নিজ নিজ দুর্ভাগ্যের দোহাই পাড়েন এবং ভোলানাথের পিতা উঠে দাঁড়ান। কিন্তু নিতাই উঠতে পারে না। সে ব'সে থেকেই বলে, "আপনারা কী দিতে পারেন —অর্থাৎ স্বচ্ছন্দে—মানে, কী নিয়ে আপনারা প্রস্তুত আছেন, তা যদি দয়া করে বলতেন......"

অতি সংক্ষেপেই কল্যাণীর পিতা নিজের দীন তালিকা দাখিল করেন। সাকুল্যে সাড়ে তিন হাজার পর্যন্ত দাঁড়ায়।

মেসোমশাই নিতুর হাত ধ'রে তাকে টেনে দাঁড় করান।

পথে এসে মেসো বলেন, "মেয়েটি দেখতে ভালই, কী বল, নিতু?"

সর্বনাশ! নিতু বলে, "দেখতে আর এমন কী? রঙ বলেছিল ফরশা। এ তো বড়জোর উজ্জ্বলশ্যাম বলা চলে। নাক থ্যাবড়া, চোখ পিটপিটে। আর গলার স্বরটা......"

"তা ঠিক।" মেসোমশাই জোর পান, "আমি কি বেশি চেয়েছি?"

"বেশি কী আর চেয়েছেন?" নিত্যানন্দ বলে, "পাত্র হিসেবে ভোলাদাও তো ফ্যালনা নয়।" ভোলাদার রূপ-গুণের তালিকা দাখিল করে নিতাই। বি-এ বি-এল পাস করেছে ভোলাদা। আদালতের অ্যাসিস্ট্যান্ট। সরকারী চাকরি। মফস্বল আদালত হলেও, নিজের বাড়ি থেকে যাতায়াত ক'রে চাকরি করা যাচ্ছে। তাতে পুরো টাকাই ভোলাদা বাপকে দিতে পাচ্ছে, কিন্তু কলকাতায় এ চাকরি করতে হলে, এর আধাও দিতে পারত না। তার ওপর, ভোলাদার চেহারা ভাল, স্বাস্থ্য ভাল, গায়ের রঙ ওই উজ্জ্বল-শ্যাম তো বটেই।

ভোলানাথকে তার বাপের কাছে মূল্যবান ক'রে তোলে নিত্যানন্দ।

পথে তৃতীয় প্রাণী না থাকলেও মেসো গলা নামিয়ে বলেন, "নগদ তিন হাজারের কমে আমি কী ক'রে কুলোব বল? বাড়ি তো নামেই বাড়ি। ভোলা বিয়ে ক'রে যে বউ নিয়ে থাকবে, তার একখানা বাড়তি ঘর আছে? ছাতের ওপর একটা ঘর তুলতেই হবে। আজকের দিনে দুটি হাজার টাকার কমে হবার জো আছে? এদিকে বাকি এক হাজার টাকায় বিয়ের খরচ কুলোতে বেশ টানাকষা করতে হবে।"

"পারবেন না কুলোতে।" মুখ কুঁচকিয়ে পরম হিসেবির মত বলে নিতাই।

শিয়ালদা স্টেশনে শান্তিপুরের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে দেখে নিতাই বলে, "বাঃ! আপনাদের দেশের গাড়ি একেবারে হাতের কাছেই তৈরি। ফাঁকাও রয়েছে ঢের। চলুন, সময় থাকতে জানালার ধারে জায়গা নেওয়া যাক। এসব দূর-পাল্লার গাড়িতে আবার দেখতে না দেখতে ভিড় জমে যায়।"

গাড়িতে মনের মত একটা জায়গা পেয়ে, আরাম ক'রে বসেন তিনি, বলেন, "আমি তা' হলে আর তোমাদের ওখানে নামব না।"

জয় প্রজাপতি! বিশেষ উৎসাহ দেয় না নিত্যানন্দ। মেসোমশাই-এরও মন খিঁচড়ে গেছে। গত দু' বছর ধ'রে তিনি ভোলানাথের জন্যে পাত্রী খুঁজে বেড়াচ্ছেন; কিন্তু কিছুতেই আর কাউকে পছন্দ হচ্ছে না। ওই পণের দাবিতে এসে ঠেকে যাচ্ছে সব জায়গাতেই। ছেলে বিয়ে দেওয়ার একটি ঢিলে তিনি পাঁচ পাখি বধ করবেন: ছেলের থাকার ঘর তুলবেন, সে-ঘর সাজাবেন, ছেলে সাজাবেন, লোক খাওয়াবেন, আর, বউ তো ছেলের বিয়ে দিলে আসবেই।

ওই গাড়িতে মেসোমশাই বাড়ি চ'লে যান। নিতাই মনে মনে হাত জুড়ে বলে, "ক্ষমা কর, প্রজাপতিদেব। হিসেব করে দেখতে গেলে আমি কোন অপরাধ করিনি। মেসোর মন ঘোরাবার জন্যে আমাকে আসলে কোন চেষ্টাই করতে হয়নি, তাঁর খাঁই-এর টাকার চাকা তাঁর মন ঘুরিয়েই বসে আছে। এবার তুমি দয়া করে আমার মাথায় তোমার ডানার আশিস বুলিয়ে দাও, দেবতা!"

নিতাই বাড়ি ফেরে। মা জানতে চান, "জামাইবাবু কোথায়?"

"বাড়ি চ'লে গেছেন।"

"মেয়ে কেমন দেখলি?"

"চমৎকার মা, অতুলনীয়া যাকে বলে। এমন চমৎকার পাত্রী তুমি দুটি পাবে না খুঁজে।"

"জামাইবাবুর পছন্দ হয়েছে?"

"খুব। এ মেয়ে যার পছন্দ হবে না, তার চোখ কানা।"

"তা হলে এখানেই ঠিক হচ্ছে ভোলার বিয়ে?"

"না। ক'নে পছন্দ হলেও পণ পছন্দ হয়নি তোমার জামাইবাবুর। পণটাই তো আসল। বউ তো ফাউ।"

"তা হলে?"

"বাতিল ক'রে এসেছেন মেসোমশাই।" পণ এ-পক্ষ কী চাইলেন আর ও-পক্ষ কী দিতে পারবেন, তার বিবরণ দেয় নিতাই।

মা নিঃশব্দে রান্নাঘরে ঢোকেন। সেখান থেকে বলেন, "ওসব পরে শোনা যাবে। এখন হাতমুখ ধুয়ে আয়। আমি চা করছি।"

চা-এর জন্যে কি গলা শুকিয়ে যাচ্ছে নিতুর? মেয়েটির সম্বন্ধে নিতুর নিজস্ব অভিমত কী, তা কি বিশদভাবে জানতে চাওয়া উচিত ছিল না মা'র?

অবশ্য নিতুই কি পারত বিস্তারিত বলতে?

গভীর রাত্রে সংসারের কাজ চুকিয়ে মা যখন শুতে যান, দেখেন, তাঁর বালিশের ওপর চাপা দেওয়া রয়েছে এক চিঠি, তার ওপর নিতুর হাতের লেখা—"পরমারাধ্যা মাতৃদেবীর শ্রীশ্রীচরণকমলেষু"

ব্যাপার কী! আদ্যোপান্ত চিঠিটা পড়েন মা। পড়া হয়ে গেলে একটুক্ষণ ভাবেন, তারপর গিয়ে নিতুর ঘরের রুদ্ধ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে তার নাম ধরে ডাকেন। দ্বিতীয়বার ডাকতে হয় না। এক ডাকেই সাড়া মেলে। কিন্তু দোর খোলে না নিতু। মা ডাকেন, "দরজা খোল। অনেক কথা আছে যে।"

নিতু এপাশ থেকে বলে, "কাল হবে, মা। আজ ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।"

নিঃশব্দে হাসতে হাসতে মা নিজের ঘরে ফিরে আসেন।

পরদিন কল্যাণীর মা'র কাছে একখানা চিঠি দিয়ে তিনি মেজ ছেলেকে পাঠিয়ে দেন।

ভোলানাথেরা এবং নিত্যানন্দরা সগোত্র। কাজেই এখানে কল্যাণীর বিয়ে হতে কোন বাধা নেই। নিজের ছেলের যোগ্যতাদির যথাযথ বিবরণ মা পত্রে জানিয়েছেন, কল্যাণীকে নিত্যা-নন্দর অত্যন্ত পছন্দ হয়েছে—তাও লিখেছেন এবং সবশেষে লিখেছেন যে, ও'দের অনুমতি পেলে তিনি নিজে গিয়ে শ্রীমতীকে দেখে আসবেন।

চিঠি তো নয়, যেন হাতে স্বর্গ পান কল্যাণীর মা-বাবা। কল্যাণী তার বউদির এবং বোনের দৃষ্টি এড়িয়ে একান্তে নিরালায় দাঁড়িয়ে নিত্যানন্দর সেই প্রথম দৃষ্টির অর্থ খোঁজে আর একা হাসে।

তারপর যা যা হবার তাই তাই হয় এবং এক শুভরাত্রে নিত্যানন্দর সঙ্গে বিয়ে হয় কল্যাণীর। দু' বাড়িতে আনন্দের মেলা বসে। শুধু এত তাড়াহুড়োর মধ্যে নিত্যানন্দর এতদিনের বাঞ্ছিত নাটক নামানো সম্ভব হয় না।

তার মেসোমশাই আসেননি বিয়েতে। পরে জানিয়েছেন, "অকস্মাৎ অসুস্থ হইয়া পড়া নিবন্ধন শুভকার্যে উপস্থিত থাকিতে পারিলাম না বলিয়া মনে কিছু করিও না।"

মাসিমার তো আসবার উপায় নেই—তিনি অম্বলের রোগে শয্যাশায়িনী।

আসে ভোলানাথ। অবশ্য বিয়ের দিনে নয়। তার পক্ষে বরযাত্রী যাওয়া অসম্ভব। বউভাতের সন্ধ্যায় এসে হাজির হয়। এসেই নিতাইকে বলে, "নিতে, বাবা কী বলেন, জানিস? বলেন—আমি যে মেয়ে বাতিল ক'রে এসেছি, সেই মেয়ে সেধে বিয়ে করল, নিতেটা এমনি হ্যাংলা!"

নিতাই বলে, মনের মত জিনিসটি পাবার জন্যে হ্যাংলামো করা আমার স্বভাব, ভোলাদা। তুমি হ্যাংলামো না করে এমন একটি বউ জোটাও—আমরা তাকে দেখে নাইলন শাড়ি উপহার নিয়ে আসব। এখন তোমার বাপের বাতিল করা মেয়েটিকে দেখবে এস।" হাত ধরে সে টেনে নিয়ে যায় ভোলানাথকে বউ দ্যাখাতে।

নতুন বউ কল্যাণী শাড়িতে গয়নায় ফুলের সাজে দেবীপ্রতিমাটির মত বসে আছে নারী-আসর আলো ক'রে। তার সামনে মুখ হাঁ করিয়ে আর বুক চেপে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ভোলানাথকে, কিন্তু বাইরে এসে আর চেপে রাখতে পারে না, চাপা একটা আর্তনাদই ছাড়ে সে, "নিতে! এ মেয়ে বাতিল করেছে আমার বাপ! এমন বাপের সঙ্গে আজ থেকে কোন সম্পর্ক নেই আমার!"

মুখ টিপে হাসে নিতাই, "ত্যাজ্য বাপ করবে নাকি!"

"হাসছিস নিতে! তুই হাসবার দিন পেয়েছিস। চক্রান্ত ক'রে তুই আমায় ঠকিয়েছিস!" রীতিমত উত্তেজিত হয়ে ওঠে ভোলানাথ, "তুইও তো বাবাকে বলেছিলি যে, এ মেয়ে দেখতে ভাল নয়!"

"আর তোমার বাবা বুঝি অমনি বাধ্য ছেলেটির মত মেয়েটিকে বাতিল করলেন?" নিতাই বলে, "আমি যখন পাত্রীপক্ষকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, স্বচ্ছন্দে তাঁরা কত টাকার যৌতুক দিতে পারেন, তখন তোমার বাপ আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে এসেছিলেন কার চক্রান্তে? বিয়ের সাজে তোমার মত করার, ঘর সাজাবার, তোমায় সাজাবার, লোক খাওয়াবার টাকার যোগাড় করার পরামর্শ কি তোমার বাবাকে আমি দিয়েছিলাম?"

"বার বার বাপ বাপ করিসনে নেত্যে!" একটা হুংকার ছাড়ে ভোলানাথ, "আমার বাপ নেই। আমার বাপ ম'রে গেছে......!"

"আঃ! করছ কী, ভোলাদা। বাড়ি-ভর্তি লোক ভাবছে কী? নতুন বউ কী ভাবছে!" হাত ধ'রে ভোলানাথকে টেনে অন্যত্র নিয়ে যায় নিতাই। তারপর সে নিজের কাজে চলে যায়। বাড়ির কর্তা সে। ভোলানাথকে আগলে থাকলে তার চলবে কেন?

এদিকে ভোলানাথের মাসির বাড়ি এটা। সে যেখানে খুশি যাবে—ঘুরবে। তাকে রুখবে কে? সে খানিক পরেই এসে দাঁড়ায় নতুন বউ যে ঘরে ব'সে আছে সেই ঘরের বারান্দায়। সেখানে দাঁড়িয়ে হাঁ করে চেয়ে থাকে কল্যাণীর দিকে—অপলক দৃষ্টিতে। ঘরের দোরে ভিড় হলে ভোলানাথ জানালায় গিয়ে দাঁড়ায়। বউ দেখতে যারা ঘরে আসে আর বউ দেখে যারা বেরিয়ে যায়, তাদের ধাক্কা লাগে ভোলানাথের গায়ে। কিন্তু তার হুঁশ নেই!

সে রাত্রে যতক্ষণ সেই ঘরের দরজা-জানালা খোলা থাকে, ততক্ষণ ভোলানাথ ঘরের বারান্দা ছাড়ে না। বধূ যখনই দরজা দিয়ে কি জানালা দিয়ে একবার বাইরে তাকায়, তখনই দেখতে পায় ভোলা-ভাশুরঠাকুর হাঁ ক'রে তার দিকে চেয়ে আছেন।

মুশকিলেই পড়ে কল্যাণী। নববধূ সে—দৃষ্টি নত ক'রে তাকে ব'সে থাকতেই হয়। কিন্তু ঘাড় নামক অঙ্গটা লোহার তৈরি নয়। যখনই সে একবার মুখ তোলে, তখনই দেখতে পায়, সেই ভোলা-ভাশুর—সেই হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে দু' চোখ দিয়ে গিলছেন ভাদ্রবধূকে।

একবার কী কাজে সেদিকে এসে নিত্যানন্দ তাকে সে-অবস্থায় দেখে, টেনে নিয়ে খেতে বসিয়ে দেয়। কিন্তু খেয়ে কি গিলে ভোলানাথ খানিক পরেই আবার হাজির! তাকে আবারও সেই অবস্থায় দেখে নিত্যানন্দরই লজ্জা হয়। সে চাপা গলায় বলে, "এদিকে চলে এস, ভোলাদা। এখানে দাঁড়িয়ে অমন ক'রে......"

"অত গুমোর দেখাসনে, নেত্য,—ওপরওয়ালা সইবে না।" ভোলানাথ খোলা গলায় বলে, "আমার শ্রাদ্ধের টাকার ভাবনায় বাপের যদি মাথা না বিগড়োত—কি ধর, তুই না গিয়ে যদি আমি যেতাম ক'নে দেখতে বাপের সঙ্গে, তা' হলে ও বউ কার গলায় ঝুলত? তখন তুই-ই কি এই আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে ক্যাবলা হয়ে চেয়ে থাকতিস না?"

নিত্যানন্দ বলে, "সে সুবুদ্ধিটা আগে যখন হয়নি, তখন আর সে কথা তুলছ কেন, দাদা? যা হবার হয়ে গেছে, এবার এক কাজ কর, বাপের ভরসায় না থেকে নিজেই বেরিয়ে পড় নিজের জন্যে ক'নে দেখতে। ভাগ্যে থাকলে এর চেয়ে ভাল জুটে যেতে পারে।"

ইতিমধ্যে ভোলানাথের কীর্তি বাড়িভর্তি স্বজন-অভ্যাগত সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভোলানাথকে ঘিরে ভিড় জমে যায়। তখন আর তাকে উদ্ধার করবে কে?

পরদিন তো আর বউভাত-প্রীতিভোজ নয় যে, ঠাকরুণটি সেজে এক জায়গায় নতুন বউকে বসে থাকতে হবে। সকালে উঠেই ভোলানাথ সেখানে ছুটে আসে; কিন্তু কল্যাণীকে দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে। তার চেহারা এক রাতেই রুখু হয়ে গেছে। সারা রাত তো ঘুম হয়নি। তার ওপর চা-এর টেবিলে দেখা গেল, তার ভাবটা যেন কেমন অস্থির অস্থির। নিত্যানন্দর করুণা হয়, সে বলে, "ভোলাদা, বেশ ক'রে চান করে একটা ঘুম দাও দেখি। চেহারার হাল হয়েছে কী!"

ভোলানাথ বারান্দায় এসে হাত-ইশারায় ডাকে নিতাইকে। সে কাছে এলে ভোলা বলে "হ্যাঁ রে, বউদি গেল কোথায়? সকাল থেকে তো একবারও দেখতে পাইনি। চল্ বউদির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিবি।"

বউদি! এ বাড়িতে ভোলাদার আবার বউদি কে? জ্ঞাতিবর্গীয়দের মধ্যে ভোলাই তো সবার দাদা। নিতাই প্রশ্ন করে, "কে বউদি?"

ভোলা বলে, "কেন, বউদি তোমার বউ—যাকে তুমি বিয়ে করে এনেছ।"

নিত্যানন্দর দু'চোখ তার কপালপানে ঠেলে চলে, "কার বউদি?"

"আমার বউদি।" ভোলা দৃঢ়স্বরে বলে, "তোমার বউ আমার বউদি হয় না? চল, তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে চল্।"

নিতাই হাঁ ক'রে থাকে বেশ খানিকক্ষণ। যখন হাঁ বোজাতে পারে তখন বলে, "চিরকাল তুমি আমার দাদা, আর এখন আমার বউ তোমার বউদি?"

"আলবাত!" একটা অর্ধহুংকার ছাড়ে ভোলানাথ এবং সেটাকে অধিকতর জোরদার করার জন্যে শব্দটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে নিত্যানন্দর বুকে একটা ঘুশির তাল ঠুকে দেয়, বলে, "যা চিরকাল জেনে এসেছ, সেটা বে-আইনী।"

আইন! ভোলানাথ তো আবার আইনের ঘরের লোক—আদালতী আদমি! ঘাবড়ে যায় নিত্যানন্দ। তার মুখ দিয়ে একটা নির্জীব প্রশ্ন বেরিয়ে আসে, "অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ?" ভোলানাথ অর্থ প্রাঞ্জল করে, "তুমি যে চাকরি কর, আপিসে তোমার বয়সের প্রমাণ দাখিল করেছ কী দিয়ে?"

"ম্যাট্রিক-সার্টিফিকেট।" নিত্যানন্দ বলে।

"আমারও বয়সের প্রমাণ ম্যাট্রিক-সার্টিফিকেট।" ভোলানাথ বলে, "তাতে তোমার বয়স কত আর আমার বয়স কত, মনে আছে তো? ভুলে যাওনি তো?"

ভুলে না গেলেও, ওটা মনে ছিল না। এখন মনে পড়ে নিত্যানন্দর। সার্টিফিকেটের লেখা অনুসারে নিতাইর বয়স ভোলার বয়সের চেয়ে তিন মাস না ক' মাস বেশি বটে। নিতুর বাবা যখন তাকে তার ছেলেবেলা ইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করান, তখন দরখাস্তে বয়স লিখেছিলেন ঠিক কোষ্ঠী অনুযায়ী বছর-মাস-দিন দিয়ে; আর, ভোলাকে ভর্তি করাবার সময় তার বাবা কোষ্ঠী থেকে শুধু বছরটাই লিখেছিলেন; তারই ফলে এ দশা। নিতাই বলে, "তোমার সার্টিফিকেটে মিথ্যে বয়স আছে, সেটা কি আমার দোষ?"

"দোষগুণ বুঝিনে। আমি জানি আইন।" ভোলানাথ নিজের মুখে আইনজ্ঞের হাসি ফুটিয়ে তোলে।

নিতাই বলে, "তা হলে এতকাল দাদাগিরি ফলিয়ে এসেছ কেন?"

"ভাইগিরি ফলাবার দরকার হয়নি বলে। অস্ত্র তোলাই থাকে, দরকার মত হাতে করতে হয়।" ভোলানাথ বলে, "ওসব যুক্তি চলবে না, মশাই। আমার হাতে রয়েছে মোক্ষম আইন, তাই দিয়ে তোমার টুঁটি চেপে ধরব।"

আপাতত সে মুহূর্তে ভোলানাথের শুধু হাতই নিত্যানন্দর টুঁটির কাছে এগিয়ে যায়। সদ্যলব্ধ ঘুশির অভিজ্ঞতা থেকে নিতাই পেছিয়ে যায়। এক পা দু' পা করে পেছিয়ে পেছিয়ে যে ঘরে তার বউ আছে সেই ঘরে পৌঁছে যায়। কিন্তু কল্যাণীর সঙ্গে ভোলানাথের আলাপ করিয়ে দেওয়া নিরাপদ মনে হয় না। যে দশা দ্যাখা যাচ্ছে, তাতে ভোলা যে নববধূর কাছে প্রেম নিবেদন করে বসবে না, তার কিছু কি ঠিক আছে?

কল্যাণীও রাজি হয় না, বলে, "ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়ে ভেঙে গেছে, এখন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আমার লজ্জা হয় না? তাছাড়া, ভাশুরকে ঠাকুরপো বলা...অসম্ভব, আমার দ্বারা হবে না।"

নিতাই বোঝাবার চেষ্টা করে, "সত্যি তো আর ঠাকুরপো নয়। আইনত আর কি— ইংরেজিতে যাকে বলে 'ইন্ ল'। যেমন তোমার বোন আমার 'সিস্টার ইন্ ল'—মানে আইনত ভগ্নী, অথচ ধর্মত শালী।" কিন্তু নববধূ আইনের ধার ধারে না, বলে, "তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে একেবারেই ধর্মত।"

আগের রাত থেকেই বাড়িভর্তি আত্মীয়-অভ্যাগতদের নজর আছে ভোলানাথের হাল-চালের ওপর। মধ্যাহ্নভোজন সমাধা হয়ে যাবার পরে শত রথী-রথিনী মিলে তাকে ঘিরে ফ্যালে। কিন্তু নব-অভিমন্যু অটল।

এক সময় নিতুর মা নিজেই এগিয়ে আসেন, বোনপোকে বল্লেন, "তা, বউমা'র সঙ্গে আলাপ করতে তোকে দেওর হতে হবে কেন রে, ভোলা? আজকাল ভাশুরের সঙ্গে কথা বলছে না ভাদ্রবউএরা? আকছারই বলছে। তাতে নিন্দেও হচ্ছে না। ওটা চল হয়ে গেছে আজকাল। আয়, বউমার সঙ্গে আমি তোর আলাপ করিয়ে দেবো। তবে, বউমা যেন ওকে আবার ভোলাদা বলে ডেকো না—ভাশুরের নাম নিতে নেই।"

দু'চোখের অগ্নিদৃষ্টি দিয়ে ভোলানাথ ভস্ম করে ফ্যালে মাসির প্রস্তাব। ভোলানাথ আইনদাস—সে আইন ছাড়া আর কিছু বোঝে না। দেবরত্বের দাবি সে কিছুতেই ছাড়বে না।

বড়ই নিরানন্দ হয়ে পড়ে নিত্যানন্দ। তার মা'রও বিপদ কম নয়। কল্যাণী কিছুতেই ভাশুরকে ঠাকুরপো বলবে না, ভোলানাথও কিছুতেই তা না বলিয়ে ছাড়বে না। সে যদি আত্মীয় না হত, সে যদি নিমন্ত্রিত না হত, তাহলে নিত্যানন্দ তাকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ত। কিন্তু তা তো করা যায় না। তার ওপর মা'র আবার বোনপো। বোনপোর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ভেবে মা ইতিমধ্যেই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। কী করা যায়? একটা সমস্যার সম্মুখীন মা এবং ছেলে। আরও কী হয়, জল কতদূর গড়ায়, তা দেখবার জন্য কৌতূহলী অভ্যাগতেরা অপেক্ষমাণ।

এমন সময় ঘটে এক আবির্ভাব। এক কিশোরের সঙ্গে এক তরুণী। কিশোর বাহন মাত্র। তরুণীই আসল। নিত্যানন্দকে তার নমস্য মুখ উজ্জ্বল করতে হয়, মাকে তার চিন্তিত মুখে হাসি ফোটাতে হয়, উভয়েরই মুখে স্বাগত ভাষণ ওঠে, "এস—এস!"

তরুণী এবং কিশোর মাকে আর নিত্যানন্দকে প্রণাম করে। মা তাদের চিবুক ছুঁয়ে চুমু খেয়ে তরুণীকে বলেন, "কাল আসনি কেন, মা? এদিকে বোনটিকে না দেখে দিদিটির মুখ অন্ধকার! আহা, এক-বোঁটায় দুটি ফুল যেন।" হাত ধরে তিনি তরুণীকে নিয়ে যান কল্যাণীর কাছে। অভ্যাগতের ভিড়ও সঙ্গে সঙ্গে যায়। এখানে থাকে শুধু ভোলানাথ আর নিত্যানন্দ।

ভোলানাথের চোখে পলক নেই। তরুণী অদৃশ্য হতে সে প্রশ্ন করে, "কে রে, নিতে?"

"আমার শালী।" সগর্বে নিত্যানন্দ বলে, "অসুখ হয়েছে বলে কাল আসতে দেয়নি শাশুড়ি। এদিকে কল্যাণী কেঁদে সারা। কালই শ্বশুরবাড়ির লোকেরা চলে যাবার সময় বলে গিয়েছে, আজ যদি [illegible] না এসে"

কথা শেষ হয় না, তার আগেই ভোলানাথ বলে, **"শালী যে তোর বউএর চেয়েও সুন্দরী।"**

"আমার চোখে তো বটেই!" নিত্যানন্দ বলে, "সবচেয়ে সুমধুর ছোট শালিকা।"

ভোলানাথ জানতে চায়, "বিয়ে হয়েছে?"

নিতাই ভ্রূকুঞ্চিত করে, "তোমার কি সত্যি মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ভোলাদা!.... কী করবে? তুমি বিয়ে করবে?"

হঠাৎ নিতাইকে জড়িয়ে ধরে গদগদ হয়ে ওঠে ভোলানাথ, "[illegible]!"

(ইহার পর ৭৯ পৃষ্ঠায়)

শুধু গান

(৬৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

রমেশ বেবির কাছে গিয়া বলিল, আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল, কিন্তু আজ আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, রাতও হয়ে যাচ্ছে।

বেবি বলিল, আচ্ছা, কাল বিকালে পাঁচটা'র সময়ে আশুতোষ বিল্ডিংএর উঠানে আসবেন। তখন কথাবার্তা বলা যাবে।

তাই হবে। আগেই চা খেয়ে রাখবেন না যেন। আমরা এক সঙ্গে চা খাব রেস্তোরাঁয়, কেমন?

এই তো সেদিন খাওয়া হ'ল। আবার কেন আপনি—

তাতে কি? আচ্ছা, কাল পাঁচটায়।

এই কথার পর তাহারা নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিল।

পরদিন পাঁচটার সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। আলোচনার বিষয় অমিয়। উহাকে আত্মপ্রবঞ্চনা হইতে মুক্ত করিতে হইবে। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর উহারা পূর্বব্যবস্থামত রেস্তোরাঁয় গিয়া চা ও কিছু খাবার খাইল। রেস্তোরাঁ হইতে বাহির হইবার সময়ে লীনার সঙ্গে দেখা। তাহাকে দেখিয়াই বেবি রমেশকে বলিল, আচ্ছা, আপনি আসুন। আমি লীনার সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলি। নমস্কার!

রমেশ চলিয়া গেল। বেবি লীনাকে রেস্তোরাঁর মধ্যে ডাকিয়া লইয়া এক পাশে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা বলিল। তারপর দুইজনেই হাসি হাসি মুখে পথে বাহির হইয়া পড়িল।

(৫)

একদিন বৈকালে রমেশ অমিয়র সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, চল, একটা গানের জলসা আছে। অনেক ভাল ভাল গায়ক-গায়িকারা আসবেন।

অমিয় গম্ভীর। জলসার প্রতি কোন উৎসাহ দেখা গেল না। সে কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। রমেশের পীড়া-পীড়িতে অবশেষে বলিল, আমার গানটান আর ভাল লাগে না।

রমেশ বলিল, লাগবে, নিশ্চয়ই লাগবে। বেবির চেয়েও ভাল গায় এমন একটি তরুণ গায়ক আসছে এ জলসায়।

না, ভাই, আমার আর গান শোনবার ইচ্ছে নেই।

চলই না। ভাল না লাগে, উঠে চলে এস।

অনেক পীড়াপীড়ির পর অমিয় সম্মত হইল।

একটা বড় হল। এক পাশে উঁচু ডায়াসের উপরে গায়ক-গায়িকারা সমবেত হইয়াছেন। জলসার সম্পাদক মহাশয় এক একজনকে অনুরোধ করিতেছেন এবং তদনুসারে পর পর গান গাওয়া হইতেছে।

অমিয় এবং রমেশ বসিয়াছে ডায়াস হইতে একটু দূরে। অমিয় গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছে। কোন গানই তার ভাল লাগিতেছে না।

কয়েকটি গান হইবার পর সম্পাদক মহাশয় অনুরোধ জানাইলেন একটি তরুণ গায়ককে। গায়কটিকে ঠিক বাঙালী বলিয়া মনে হয় না। চোখে রিমলেস চশমা, ঠোঁটের উপর ঈষৎ গোঁফের রেখা, পরনে লম্বা জহর কোট, মাথায় একখানি কাশ্মীরী রুমাল। ধীরে ধীরে তরুণটি গান আরম্ভ করিল। সমস্ত হলের লোক মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। গান শেষ করিয়া একটি নমস্কার জানাইয়া তরুণটি স্বস্থানে গিয়া বসিল।

রমেশ অমিয়কে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন লাগল? চমৎকার, না?

কি যে বল তার ঠিক নেই। বেবির গানের কাছে এই গান! এই কথা বলিয়া আবার গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল।

আরো কয়েকটি গানের পর সভা শেষ হইল। জনস্রোত ক্রমশঃ হলঘরের বাহিরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ শিল্পী-দিগকে দেখিবার জন্য মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইল। সকলেই পরস্পরের সহিত বলাবলি করিতে লাগিল, ভারি চমৎকার হয়েছে। এক সঙ্গে এতগুলি গুণীর সমাবেশ বড় একটা হয় না।

হল হইতে বাহির হইবার সময়ে দরজার নিকটে একটু পাশে দেখা গেল, সেই তরুণ গায়কটিও বাহিরের দিকে যাইতেছে। রমেশ এবং অমিয়কে দেখিয়া সে একটু তাহাদের দিকে আগাইয়া আসিয়া বলিল, নমস্কার!

তারপরেই মুহূর্ত মধ্যে সে তাহার মাথার রুমাল এবং ঠোঁটের উপরের গোঁফ খুলিয়া ফেলিল এবং চশমাটিও চোখ হইতে নামাইয়া খাপের মধ্যে পুরিয়া ফেলিল। একটু হাসিয়া বলিল, কি, অমিয়বাবু, চিনতে পারছেন?

বেবির মুখের দিকে চাহিয়াই অমিয় একেবারে নির্বাক হইয়া গেল।

বেবি পুনরায় একটি নমস্কার করিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

(৬)

এ গল্পের পরিসমাপ্তি অতি সংক্ষিপ্ত। রমেশ পরদিন অমিয়কে গিয়া বলিল, কি সাইকোলজিস্ট মশায়, খবর কি?

অমিয় অধোবদন হইয়া রহিল। কোন কথা বলিল না।

তারপর রমেশ ও লীনার মধ্যস্থতায় অমিয় এবং বেবির পিতামাতা যথাবিধি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। শুভদিনে শুভ কার্য সুসম্পন্ন হইল।

অমিয় প্রত্যহ বেবির গান শুনিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া থাকে কিনা, সে কৌতূহল নিতান্তই অবান্তর। তবে বেবি মাঝে মাঝে তাহার নিজের রেকর্ড বাজাইয়া শুনিয়া থাকে।

ঘট্ট ঘটাং, ঘট্ট ঘটাং,—হুস্—যেন ঐক-তানের স্বরলিপি। সেকেন্ড ক্লাশ আওয়াজ করল ঘট্টা ঘটাং, ফার্স্ট ক্লাশ থেকে প্রতিধ্বনি হল ঘট্টা ঘটাং, তারপর ট্রাম চলল হুস—হু।

লাফ দিয়ে সেকেন্ড ক্লাশে যে মেয়েটি উঠল সেকেন্ড ক্লাশে উঠা তার কথাই নয়। নেহাৎ নিজের গাড়ী নেই তাইতে ফার্স্ট ক্লাশ ট্রামে যাতায়াত করতে হয়। তাছাড়া সেকেন্ড ক্লাশ ট্রামে ভীড় হয় বিচ্ছিরি। বিচ্ছিরি মানে বেশী যে তা নয়, অনেক সময় ফার্স্ট ক্লাশেও বেশী ভীড় থাকে—তবে সেকেন্ড ক্লাশের ভীড়টা বড় নোংরা। কিন্তু করা যাবে কি, এই তো আফিস যাবার তাড়া, এই ট্রামটা ছেড়ে দিলে আবার পরের ট্রামটা পাওয়া যাবে কিনা কে জানে? হয়ত আবার আরও ভীড় হবে।

তাইতে সেকেন্ড ক্লাশেই উঠতে হলো। পাদানিটায় দাঁড়ানো যায় না। লোকজন ওঠে আর নামে—তাইতে একধাপ উঠে সীটগুলোর সামনে দাঁড়াতে হয়। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে হরেক রকম লোক। আফিসের কেরাণী, রাস্তার ফেরিয়ালা, কারখানার কুলী, পাইপ মেরামত করার উড়ে মিস্তিরী—নানারকম।

ওরা সেকেন্ড ক্লাশেরই লোক। আফিস যাবার সময় অন্য ক্লাশের দুএকজন বাবু দেখতে ওরা অভ্যস্ত। বিবি দেখতে অবিশ্যি ততটা অভ্যস্ত নয়। বিবি মানে বাবুর স্ত্রীলিঙ্গে বিবি—সাহেব বিবির বিবি নয়। তবুও দুই একজন বিবি আজকাল দেখা যায়।

পায়ে হাইহীল জুতো—দেহের ভাঁজের সাথে মিল রেখে দুটো সায়ার উপর শাড়ী জড়ানো, জড়ানো শাড়ী পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উপরে উঠেছে, দেহের সব মোড়ে মোড়ে মোড় খেয়ে। শাড়ী কি আবরণ? জর্জেট শাড়ী নিশ্চয়ই নয়। দেহের সব ভাঁজকে, সব সৌন্দর্যকে আরও সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করে—কই ঢেকে ত' রাখে না।

বরং আভরণ বলা যেতে পারে।

তবে শুধু জর্জেট শাড়ী কেন? সুন্দরীর আভরণ সবই। ক্লিপ দিয়ে শক্ত করে আঁটা সামনের চুলও আভরণ আর পেছনের এলো খোঁপাও আভরণ। দেহ ঢাকার ব্লাউজ শাড়ীও আভরণ আবার খালি হাতের পাউডারের রেণুও আভরণ। শুধু পাউডার রেণু কেন? পাউডারের রেণু ত' সূক্ষ্ম—বড় সূক্ষ্ম—গোটা ট্রামটাই ত' আভরণ। সুন্দরীর সৌন্দর্যকে যে ভাল করে প্রকাশ করে সেইতো আভরণ। তাহলে চলতে চলতে ট্রামটা যখন দোলে, দোলার তালে তালে যখন লোহার রডে ভর দেয়া দেহলতা ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলে ওঠে, পিছনের এলো খোপা আর পাশের ঝুমকো দোদুল তালে নাচতে থাকে তখন কি ট্রাম একটা আভরণ নয়? আর তাছাড়া চার পাশে স্বল্প পোষাকের যে পারিপার্শ্বিক সেওত' আভরণ; কারণ এদের সজ্জার অভাব, রুচিহীন সজ্জা, সজ্জাহীন দেহ সবইত সুন্দরীর বিরোধী ভাবের সৃষ্টি করে। সেই বিরোধী ভাবের পশ্চাৎপটেই ত সুন্দরীর সৌন্দর্য আরও ফুটে ওঠে। তাইতে বলতে হয় সুন্দরীর আভরণ কি নয়? সবই সুন্দরীর আভরণ।

আফিসের তাড়ায় কি ট্রামটা একটু তাড়াতাড়ি ছোটে? গড়িয়াহাট থেকে গুরুসদয় রোড অবধি মাঠের ভিতর দিয়েই নয় তার পরে পার্কসার্কাসের রাস্তা দিয়ে বেশ জোরে যায়—লোয়ার সার্কুলার রোড দিয়েও। ভীড়ে ভীড়ে দুটো কামরাই বেশ চেপে ভর্তি করা—মানুষ তো নয় যেন টিনের মাছ। তাইতে নড়াচড়া কম, ওঠানামাও কম। আফিসের জন্যে যারা বসে কি দাঁড়িয়ে ট্রামে অপেক্ষা করে, ভরাপেটে ভাতের নেশায় তাদের হয়ত একটু ঝিমও ধরে। তাছাড়া এ গাড়ীর সেকেন্ড ক্লাশে ত' একটু ঝিম ধরবেই। সুন্দরীর রুগ্ন দোদুল মূর্তি যেন খানিকটা মায়া ছড়িয়ে দিয়েছে গোটা কামরায়। মায়াটা ডালহৌসী স্কোয়ার অবধি থাকবে? নিশ্চয়ই। সুন্দরী যদি ডালহৌসী স্কোয়ার অবধি যান তাহলে—আর যদি না যান তাহলেও থাকবে। কামরায় যা মায়া রেখে যাবেন ডালহৌসী স্কোয়ার অবধি তা চলবে।

কিন্তু চলে না। সুন্দরীর বঙ্কিম দেহটা হঠাৎ ছিলাছেঁড়া ধনুকের মতন সোজা হয়ে ওঠে। মিহি গলার লম্বা সরু চিৎকারে গোটা সেকেন্ড ক্লাশ চকিত হয়ে ওঠে। না কথা বেশী নয়—একটিমাত্র শব্দ—'জানোয়ার'।

চোখটা গর্তে ঢোকা, কোলে গভীর কালি, গালটা ভাঙা, গাঢ় খয়েরি ছোপ ঠোঁটে আর সাদাটে ছোপ মুখের কোণে আর রোগা। পোষাক চকচকে কিন্তু বিশেষভাবে অনভিজাত। লোকটি কুঁকরে সরে যায় মহিলার কাছ থেকে। মহিলার ছাতার একটা বাড়ি পড়ে লোকটির মাথায়—আরও কুঁকরে ওঠে লোকটি। অনুনয়ে করুণ হয়ে কাকুতি করে। না মহিলার গায়ে হাত সে ইচ্ছে করে দেয়নি। ভিড়ের ভিতরে খেয়াল ত' করা যায় না, হঠাৎ লেগে গেছে। উত্তরে ছাতার একটা খোঁচা পড়ে লোকটির

পেটে। কোমর বেঁকিয়ে লোকটির দেহে যে কোণ সৃষ্টি হয় তা বোধ হয় সমকোণের চাইতেও ছোট। লোকটির মুখে শুধু যে কেবল করুণ মিনতি তাই নয়। বেড়াল মাছ চুরি করে খেয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে মার খেলে তার মুখের যে চেহারা হয় দেখেছেন? খানিকটা বোধ হয় তার সংগেও আদল আসে।

সেকেণ্ড ক্লাশের প্রাকৃত লোকরা কি সেই আদলের আভাস বুঝতে পারে? তাছাড়া মুহূর্তে সারা ট্রাম ঢিল খাওয়া মৌমাছির চাকের মতন চঞ্চল হয়ে উঠবে কেন?

লোহার কারখানার কুলি রামবুঝ খৈনি ছেড়ে চমকে ওঠে। 'আথসে লৌকৎ নৌহি?'

গর্জনে মুখ থেকে হাওয়াটা বোধ হয় জোরে বের হয়। হাত থেকে খৈনি উড়ে যায়। পাঁচজনের নাকে ঢুকে যায়। দু'জন হাঁচি বের হয়।

অপরাধী লোকটি আরও পিছিয়ে যায়।

ফেকু মিঞা মুসলমান, ঘোড়ার গাড়ী চালাত। তার মুসলমান ঘোড়া দুটো দাঙ্গায় প্রাণ দিয়েছে। এখন যায় কেমিকেলের কারখানায়। ফেকু মিঞার লবজ ত' নয় যেন তোপ —দুম দুম করে আওয়াজ বেরুতে থাকে— 'বেসরম, বেওকুফ, বেতমিজ, বেআদপ, বেইমান, বেএক্তিয়ার......

দোলগোবিন্দ অধিকারীর বাবা ছিলেন হরিবিলাস অধিকারী। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব—খোল বাজাতেন। মন থেকে দেহ অবধি তাঁর ছিল বিনয়ে নোয়ানো। কেবল হাতটা কড়া পড়া—খোল বাজাতেন কিনা। দোলগোবিন্দ অবিশ্যি খোল বাজায় না কিন্তু হাতটা তারও কড়া পড়া। কারখানার কাজ, যত কাজ তত পয়সা—হাতে কড়া ত' পড়বেই। তবে মনটা এখনও নরমই আছে। বৈষ্ণব হরিবিলাসের সন্তান—অনার্য আচরণে দোলগোবিন্দের প্রায় বাকরোধ হয়ে যায়। ফিস্ ফিস্ করে বেরিয়ে আসে—ছি ছি ছি......।

পীতাম্বর মুই—বাড়ী কটক জিলা। নল মেরামতের কাজ করে। নল অবিশ্যি আমাদের বাংলা। পীতাম্বর বলে ডুঙ্গা। ও ওরকম বলে। লবণকে বলে ডবড়। বড় নিরীহ লোক। নলের কাজ করে—ডাল ভাত আর শুকনো লংকা খায়। কিন্তু পীতাম্বরের বিবেকেও আঘাত লাগে। বিড় বিড় করে বলে ওঠে—

"সড়া অন্ধা অছি"

নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বড় ভয়ানক। নৃপেন্দ্র অর্থাৎ রাজার রাজা, সংগে নাথ জুড়লে হয় তস্য রাজা, আর চক্রবর্তী যদি রাজচক্রবর্তী হয় তাহলে মোটামুটি অর্থ দাঁড়ায়—রাজার রাজা, তস্য রাজা এবং তস্য রাজা। অবিশ্যি রাজাটাজা বোধ হয় এখন নেই তাইতেই সেকেণ্ড ক্লাশ ট্রামে চড়ে কেরাণীগিরি করতে চলেছেন। শরীরটাও একটু রোগা হয়ে গিয়েছে। রাজ্যই নেই, খাওয়া দাওয়ারও কোন জুৎ নেই। তা না থাক, মেজাজটা বেশ আছে। একেবারে গর্জন করে ওঠেন—"হারামজাদা—চাবকে পিঠের চামড়া তুলে দেয়া উচিত।"

মোটের উপরে কথা—মহিলার এই অপমানে সারা ট্রামেরই বিবেক যেন জ্বলে ওঠে। সুন্দরীর চোখের স্ফুলিংগ—তার ক্ষমতা অসীম। চোর বেড়ালের মত চোখগুলো, আসামী আরও বেঁকে
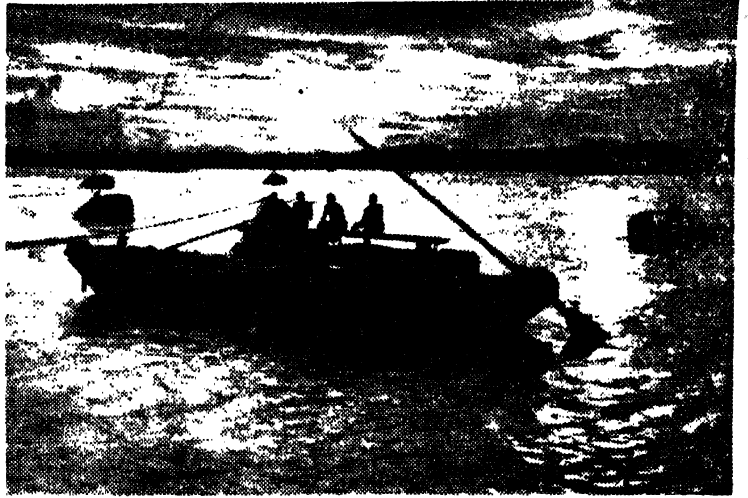
দিনশেষে — ধীরেন গাঙ্গুলী

যায়। এমনিতেই কোমরের কাছে সমকোণের চাইতেও ছোট কোণ হয়েছিল—সে কোণ বোধ হয় আরও ছোট হয়ে যায়। আর বেড়ালের ধূর্ত হাসিটাও মিলিয়ে যায়। গুটি গুটি লোকটা পিছু হটে। চারদিকে, না থুড়ি, ছ'দিকে—কারণ নীচের রাস্তা আর উপরের সীট—এ দুটো দিকও ধরতে হয়। হ্যাঁ, ছ'দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে লোকটা আস্তে আস্তে দরজার দিকে পিছু হটে। সমস্ত ট্রামের তিরস্কার যেন আগুন হয়ে ওকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। লোকটা হয়ত ভয় পায়, নৈতিক আর বাচনিক প্রতিবাদ কখন যে শারীরিক প্রহারে পরিণত হবে তা ত' আর বলা যায় না। সে ভয় হয়ত পেয়েছে।

নাকি হয়ত ভেবেছিল—যা চেয়েছিল তা ত' পেয়েইছে—অনর্থক আর থেকে লাভই বা কি? উপরতলার এই তরুণীর দেহের চুড়া ছোঁয়ার চাইতে আর কিই বা সে আশা করতে পারে!

ট্রামটা চলে। বেশ জোরেই চলে। পার্ক স্ট্রীট, ইলিয়ট রোড, ওয়েলেসলী সব ছাড়িয়েই চলে। কখন যেন লোকটি টুক করে নেমে যায়। সেই চোর বেড়ালের মার খাওয়ার পর যে রকম মুখ হয় সেই রকম মুখওয়ালা লোকটি। ট্রামটা যেন সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ফার্ষ্ট ক্লাশের দিকে যে দেয়ালটা সেই দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল ট্রামের বাঙালী কণ্ডাক্টর। লোকটা নামাতে তারও সোয়াস্তি হয়। কে জানে বাবা একটা মারপিট ঝামেলা লেগে গেলে তখন আবার ঝঞ্ঝাট। সবার দিকে সে একবার তাকিয়ে নিল। পিছনের দেয়াল থেকে পাশের দরজা, পাশের দরজা থেকে উল্টো দিকে বসবার জায়গা। মায় একদম পিছনের দেয়াল পর্যন্ত। বদলোকটা নেমে গিয়েছে তো—সবার দৃষ্টি এখন আবার মহিলার দিকে। অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে যখন বেরুলেন সীতা দেবী—সেই ক্ষত্রিয়ানী সীতা দেবীর চাইতেও স্পষ্ট করে লেখা সারা মুখে সারা দেহে—উনি জিতেছেন।

শুধু উনি কেন? ও'র মুখের দিকে তাকিয়ে রামবুঝ থেকে দোলগোবিন্দ সবাইই যেন জিতেছে। সবাই তাকিয়ে আছে।

কণ্ডাক্টার আবার দেখে রামবুঝ তাকিয়ে আছে, ফেকু মিঞা তাকিয়ে আছে, দোলগোবিন্দ অধিকারী তাকিয়ে আছে—মায় নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাকিয়ে আছে।

আস্তে আস্তে পিছনে তাকিয়ে দেখি একজন কেবল তাকিয়ে নেই। একদম পিছনে যে বসবার জায়গাটা—যেখানে কোম্পানীর হিসাবে বসতে পারে দুজন আর আসলে বসতে পারে দেড়জন সেইখানে বসে আছে সে।

কালো—ভীষণ কালো—নিরাবরণ তার বুক, নিরাভরণ তার দেহ। কোলে একটা বাচ্চা, কালো, কালো মাটির পুতুলের মতন কালো—পোড়ামাটি নয়—থলথলে কাদা মাটি। নিরাবরণ বুকে বসানো, কালো পাথরের—না থুড়ি, পাথর নয়, সে তুলনা পাথরেও হয় না, মাটিতেও হয় না। শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, কামদেবের জয়দুন্দুভির মতন। তবে আমি বলি—জয়দুন্দুভিটা কামদেবের নয়—গোটা প্রকৃতি দেবীরই জয়দুন্দুভি। বুকের দুপাশে বসানো। আবরণ ত' নেই, সবাই দেখতে পারে।

কালো মাটির তালের মতন, শিশুটা হয়ত' কখনও খাচ্ছে—মা তাকিয়ে থাকছে শিশুর দিকে। হয়ত' কখনো খাচ্ছে না। সবার মাথার উপর দিয়ে, ফেকু মিঞা, দোলগোবিন্দ, কণ্ডাক্টার, ট্রামের ছাদ—সবাইকে ছাড়িয়ে তখন মায়ের দৃষ্টি কোথায় যেন চলে যায়।

ট্রামটা চলে মায়া ছড়িয়ে দেয়। মহিলা দোলেন, পিছনের চুলের খোপা, কানের দুল দোদুল তালে দোলে। সবাই আবার তাকায়—সবাই।

বেচারা কণ্ডাক্টার সেদিকে মুখ ফেরাতে পারে না। মুখটা পিছনের সীটের দিকে আটকে থাকে। শুধু মুখটা কি? মনটাও।

শুধু অন্য পাড়ায় নয়—অন্য স্তরে চলে যায়।
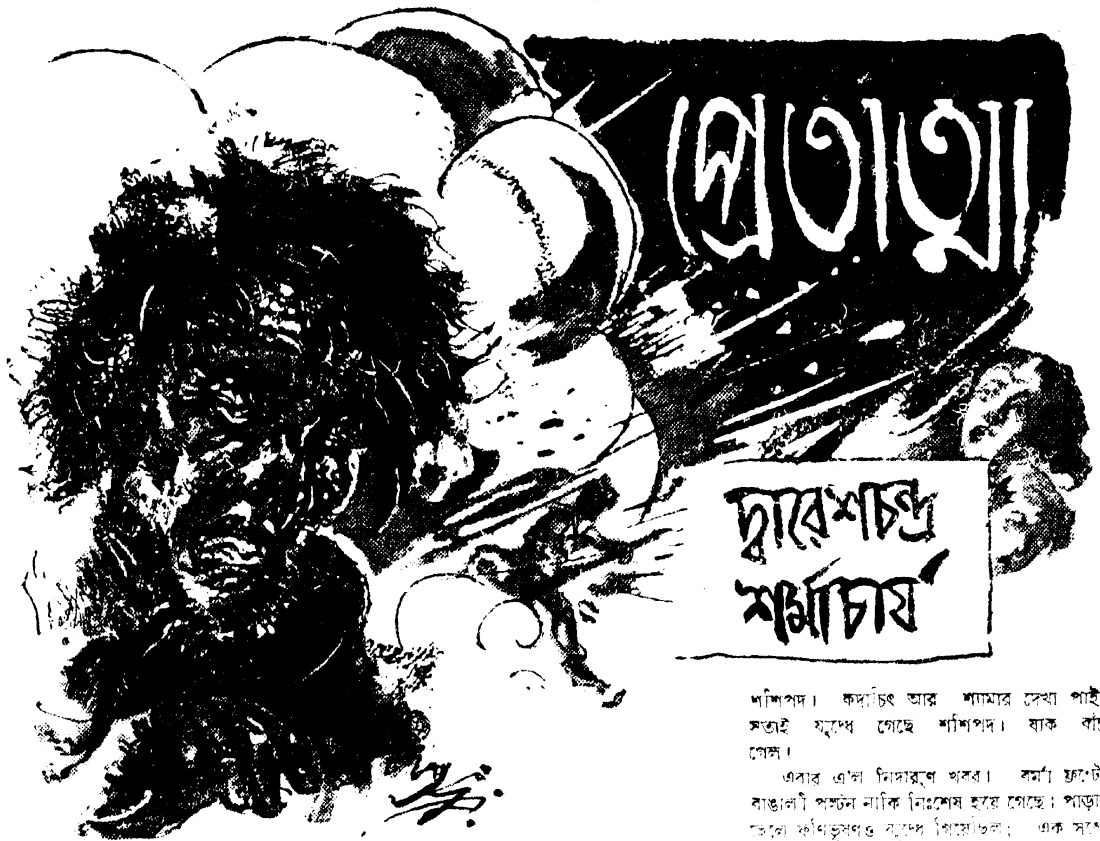
অভিনেত্রী শ্যামলী রায়!
চিত্র-পরিচালক এক বন্ধুর অনুরোধে এসেছি। তাঁরই খাস-কামরায় বসে আছি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর প্রণাম করলে এসে শান্তমূর্তি এক নারী। বেশবাসে কোন জাঁকজমক নেই। সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে কাটার দাগ। মুখোমুখি হ'তেই চমকে উঠলাম। এ যে পরিচিত মুখ! তবু বিশ্বাস হ'ল না।

ছলছল চোখে নারী মূর্তি বললে,—চিনতে পারলে না দাদা! আমি শ্যামা!

—এাঁ, তুমি শ্যামা! তুমিই তাহলে শ্যামলী রায়?

মাথা নীচু ক'রে সে উত্তর দিলে,—হ্যাঁ দাদা! ভুলে গেলে?

ভুলেই গিয়েছিলাম। আমাদের শশিপদর বউ শ্যামাকে ভুলেই গিয়েছিলাম। কত দিন, কত বছর হ'য়ে গেল তার কোন খবরই নেই। লোকে কত কথা বলে,—কেউ বলে আত্মহত্যা করেছে, কেউ বলে গঙ্গায় ডুবে মরেছে সে। কেউ বা বলে নষ্ট মেয়ে বেরিয়ে গেছে! ইদানীং শুনি সিনেমায় নেমেছে সে। কে কার খবর রাখে। শুধু শুনেই যাই।

কিন্তু তার ছেলেটির কি হ'ল? দেড় বছরের ছেলে আর সপ্তদশী বউ শ্যামাকে রেখে শশিপদ হঠাৎ কোথায় উধাও হয়েছিল। কোন এক অফিসে কেরাণীর কাজ করত শশিপদ। সামান্য লেখাপড়া জানত সে। তার পদবীতে বংশ-মর্যাদার ছাপ থাকলেও কয়েক পুরুষ অবস্থার বিপর্যয়ে অতি দীনভাবে বস্তীতেই তারা বাস করত। শ্যামার মায়েরও একই অবস্থা ছিল। বিধবা শ্যামার মা ভদ্রবাড়িতে রান্নাবান্নার কাজ করত।

অভাব-অভিযোগের অন্ত নেই। গুজব রটে গেল,—ধিক্কারে যুদ্ধে চলে গেছে শশিপদ। শ্যামার মা অন্নজল প্রায় ত্যাগ করল। সপ্তদশী শ্যামা ও শশিপদর খোকার দিকে তাকিয়ে কোনরকমে বুক বাঁধল শ্যামার মা। শ্যামার চোখ-মুখ কেঁদে কেঁদে ফুলে উঠল। তার উচ্ছল হাসি থেমে গেল। কৌতুকমুখরা শ্যামা আনন্দেই ছিল; আজ সে প্রায় নির্বাক হ'য়ে গেছে। দিনের মধ্যে অন্তত দশবার হাত দেখাতে আসত শ্যামা,—কি হ'ল দাদাঠাকুর?

—হবে আর কি? যুদ্ধে গেছে; এবার তোদের বরাত ফিরে যাবে।

শ্যামার মা বলে—কাজ নেই বাবাঠাকুর। সে শুধুহাতে ফিরে আসুক। মা-কালীকে পাঁঠা দেবো। বাবা তারকনাথের কাছে ধর্ণা দেবো মায়ে-ঝিয়ে।

এরকম ক'রেই দিন কাটে। মাসের মধ্যে অন্তত দু'চারবার শ্যামাকে প্রবোধ দিতে হ'ত,—ভাবছিস্ কেন দিদি? শশী ফিরবে, তোদের সুদিন আসবে। বাড়িগাড়ি হ'তে পারে তোদের।

শ্যামার চোখে অশ্রুসজল হাসি ফুটে উঠত। বুকে চেপে ধরত সে তার খোকাকে। তাদের মুখের দিকে তাকালে কষ্টই হ'ত। এমনি কত আসে জ্যোতিষীর জীবনে। তারা কেউ কেউ দাগ কেটে যায়!

তারপর দু'তিন বছর কেটে গেল। এরই মধ্যে দু'একবার নাকি টাকাও পাঠিয়েছিল শশিপদ। কদাচিৎ আর শ্যামার দেখা পাই। সত্যিই যুদ্ধে গেছে শশিপদ। যাক বাঁচা গেল।

এবার এ'ল নিদারুণ খবর। বর্মা ফ্রণ্টের বাঙালী পল্টন নাকি নিঃশেষ হয়ে গেছে। পাড়ার ছেলে ফণিভূষণও যুদ্ধে গিয়েছিল; এক সঙ্গে ছিল তারা। শশিপদই চিঠি লিখেছিল। তার এল, ফণিভূষণ মারা গেছে। কিন্তু শশীর কোন খবরই নেই। কত লেখালেখি আর খোঁজখবর করেও কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। নিদারুণ শোকে শ্যামার মা দু'এক মাসের মধ্যেই মারা গেল।

তারপর, এদের আর বিশেষ কোন খবর পাইনি। শুনেছিলাম শ্যামা নাকি কোন এক গানের স্কুলে গান শিখত।

শ্যামা আর হাত দেখাতে আসেনি।

আর আজ শ্যামা—শ্যামলী রায় আমার সম্মুখে। ছোট্ট বাড়ি কিন্তু আভিজাত্যের আভাস আছে তাতে। অভিনেত্রী শ্যামলী রায়ের অভিনয়ের সুখ্যাতি সবার মুখে। লীলাচপল অভিনয়-কৌশলে সে আজ অসংখ্য স্তাবকের সৃষ্টি করেছে। শ্যামলী রায়ের সাক্ষাৎ লাভই আজ সহজ নহে।

তবু তার গলার স্বর কাঁপছে। চোখে-মুখে তার বিষাদ-কালিমা ও আতঙ্কের ছাপ। ধরাগলায় শ্যামা বললে,—শেষে আপনাকেই ডাকতে হ'ল দাদা! আমাকে বাঁচান।

বিস্মিত হই শ্যামার কথায়। আমার মত লোক তার কি উপকার করতে পারে? বললাম,—আমি? আমি কি করতে পারি শ্যামা? কি হয়েছে তোমার?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শ্যামা বললে,—সে আসে দাদা! সে আসে!

—কে আসে?

—খোকার বাবা। কিন্তু এমনটি ক'রে আসাত আমি চাইনি দাদা!

মনে মনে ভাবলাম,—এখন আর চাইবে

কেন? তুমি এখন শ্যামলী রায়। গরীব শশিপদ কি তোমার এখন যোগ্য?

আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে শ্যামা বললে,—রাত্রে ঘুম হয় না, জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়! সে কি ভীষণ মূর্তি!

শ্যামা ঠকঠক ক'রে কাঁপতে লাগল। তারপর বললে,—অপঘাতে মরেছে সে। তাঁর আত্মার শান্তি হয়নি দাদা! আমি কি করব? আমার হাতটা দেখুন।

কাকুতি ফুটে শ্যামার কণ্ঠে। কিন্তু কি বলব তাকে? বললাম,—হাত দেখে কি করব? হাতে কি এসব কথা লেখা থাকে?

আমার কথা শুনে হতাশ হয়ে শ্যামা বললে,—তাহলে কি হবে দাদা?

—কি আর হবে? এসব তোমার মনের ভ্রম।

—না, না দাদা! আমি নিজের চোখে দেখেছি। ঘুমন্ত খোকা কঁকিয়ে উঠে—'বাবা! বাবাগো!' ব'লে ঘুম ভেঙে যায়, দেখি জানালার দিক্ থেকে কে সরে গেল। ছায়ামূর্তি! একদিন নয়, পর পর দু'তিন দিন দেখেছি। তারপর মাঝে মাঝে প্রায়ই আসে।

কেউ হয়ত ভয় দেখায় শ্যামা!

—না-না! মানুষের এমন মূর্তি হতে পারে না। নাক নেই; কানও একদিকের নেই। এক-দিকের গালও যেন চ্যাপ্টা হয়ে বসে গেছে; সাদা সাদা ছোপ মুখের উপর।

—তুমি এত কিছু দেখলে সে ছায়ামূর্তিতে।

—হাঁ, একদিন হঠাৎ আলো জেলে ফেলে-ছিলাম। পালিয়ে যেতে তার মুখটা দেখলাম।

—এ রকম ক'রে ত ভূত আসে বলে শুনিনি শ্যামা! পাহারা রাখ; নিশ্চয়ই কেউ ভয় দেখাচ্ছে। জানালাটা বন্ধ রাখলে পার।

—এখন বন্ধ ক'রেই রাখি। তবু মনে হয়, সে আশেপাশেই ঘুরে বেড়ায়।

কি বলে বুঝাব শ্যামাকে বুঝতে পারিনে। ব্যাপারটাও সঠিক হৃদয়ঙ্গম হ'ল না। শ্যামা আবার খোকার কথা বললে। কোন্ খোকা? শ্যামাকে বললাম,—তোমার খোকা ভয় পেয়েছে নিশ্চয়ই।

সকরুণ হাসি হেসে শ্যামা বললে,—খোকা আমার এখন বারোতে পা দিয়েছে দাদা! আমার মনে হয় তারই টানে সে এসেছে।

—হতে পারে শ্যামা! শুনেছি, এরকম হয়ে থাকে।

—আমি যে আর বাঁচব না দাদা! একটা বিহিত আপনাকে করতে হবে। আমার জন্য ভয় নেই, শুধু তাঁর খোকার জন্যে।

মনে মনে ভাবলাম, সত্যই শ্যামা অভিনেত্রী! হাজার হোক্ নাড়ীর টান! নিজের ছেলেও! মানুষ করেছে; কিন্তু মায়ের কীর্তিকলাপ কি ছেলের সহ্য হবে? মুখ দেখাবে কি ক'রে? আবার ভাবলাম, এ রকম সমাজ ত আজকাল গড়ে উঠছে। শ্যামাকে বললাম,—শুনেছি গয়ায় পিন্ড দিলে প্রেতাত্মার মুক্তি হয়।

—তাহলে আপনাকে এ ভারটা নিতে হবে দাদা!

আমাকে? আমার চৌদ্দপুরুষে কেউ কোন-দিন গয়ায় যায়নি শ্যামা! তুমিই কাউকে নিয়ে গয়ায় চলে যাও, কোন ব্রাহ্মণ-পন্ডিতের ব্যবস্থা নিও।

—দশ বছর ধরে তাঁর আশায় বসে রয়েছি দাদা! জানি, সে আমায় নেবে না। তবু তাঁর খোকাকে তাঁর হাতে সঁপে দিয়ে যেতাম। কিন্তু, —কিন্তু, এমন ক'রে সে যে আসবে তা কোন দিন ভাবিনি দাদা! যে যাই বলুক, আমার মনে হ'ত সে এখনও বেঁচে আছে।

ঝর ঝর ক'রে শ্যামার চোখের জল ঝরতে লাগল। কেঁদে উঠল শ্যামা। সহানুভূতিতে আমার অন্তরটা ভরে গেল। সান্ত্বনার সুরে বললাম,—যা হবার তা হয়ে গেছে শ্যামা! এখন যাতে তার আত্মার তৃপ্তি হয় তাই কর। আমি না হয়, আমাদের শিবনাথ পন্ডিতকে পাঠিয়ে দেব তোমার কাছে।

হঠাৎ একটা গুজবের কথা মনে পড়ে গেল। শশিপদ নাকি ফিরেছে; বিকৃত হয়েছে তার মাথা, বিকৃত হয়েছে তার আকৃতি। কেউ কেউ নাকি তাকে দেখেছে। এখন মনে হ'ল,— নিশ্চয়ই শশিপদর প্রেতাত্মাকে দেখেছে তারা। যাক্, কথাটা চেপে গেলাম।

শ্যামা বললে, অনেক রাত হয়ে গেল দাদা! আপনাকে বিরক্ত করলাম। আমিই আপনাকে পৌঁছে দেবো।

শঙ্কিত হলাম, অভিনেত্রী শ্যামলী রায় হবে আমার সহযাত্রিণী। বাধা দিয়ে বললাম,—না, না, কোথায় আবার ভয় পেয়ে যাবে। আমি একাই যেতে পারবো। আর মিস্টার রায়ের গাড়ীও রয়েছে।

শ্যামা আর উচ্চবাচ্য করলে না। বিদায় নিলাম; শ্যামা কাঁদছে; শ্যামলী রায়ের এ কি অভিনয়?

ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে; ছুটে চলেছে মিস্টার রায়ের গাড়ি। আবছা অন্ধকারে কে ছুটে আসছে গাড়ির দিকে? ঐ যে, ঐ যে,— কি বীভৎস মূর্তি, নাকটা যেন নেই; একদিকের কানও যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, সাদা সাদা ছোপ মুখের উপরে—পুড়ে গেছল বোধ হয়। নাঃ, সেই প্রেতাত্মা!

পাশ থেকে একটা গাড়ি এসে চাপা দিল; আঃ! কি ভীষণ আর্তনাদ! মিস্টার রায়ের গাড়ির ড্রাইভার জোরে গাড়ি চালিয়ে দিলে—। বললে,—কি আপদ! পাগলটা মরে গেল! আমার গাড়িটা দেখলেই ছুটে আসে।

ধক্ করে যেন বুকে কি বিঁধল! হঠাৎ মনে হ'ল,—শশিপদর আত্মার মুক্তি হয়েছে। আর গয়ায় পিন্ড দিতে হবে না!

নাটকীয়

(৭৫ পৃষ্ঠার পর)

"কেন? গঙ্গায় জল নেই? বাজারে কলসি নেই? দড়ি নেই? তোমার মত একটা পাগলের গলায় ঝুলিয়ে দেব আমার ওই সোনারচাঁদ শালীকে—কেন?...ছাড়—ছাড়।" ভোলার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় নিতাই সবলে।

"পাগল কি অমনি হয়েছি, নিতে? পাগল আমায় করেছে......"

"কে?" নিতাই চোখ পাকিয়ে প্রশ্ন করে, "আমার বউ?"

"না। তোর বউ আমার বউমা, নিতে..."

"আচ্ছা!" নিতাইর মুখে হাসি ফোটে, "আইন পালটাচ্ছে যে!"

ভোলানাথ বলে, "পাগল করেছে আমার বাপ। আজ দু' বছরের ওপর ধরে আমার জন্য শুধু ক'নে দেখছেনই আর দেখছেনই। একএক জায়গায় তিনি পাত্রী দেখতে রওনা হন, আর আমি আকাশে উঠে যাই। সেখান থেকে যখন ফিরে এসে মুখ বেঁকিয়ে বলেন, 'নাঃ, পছন্দ হল না', তখন আমি সেই আকাশ থেকে ধপ্ করে মাটিতে প'ড়ে যাই। এতদিন তবু ভেবে সান্ত্বনা পেয়েছিলাম যে, বাপ বুঝি আমার জন্য উর্বশী-মেনকা খুঁজে বেড়াচ্ছেন বলেই পছন্দ আর হচ্ছে না, কিন্তু এখন বুঝতে পেরেছি..."

"কিন্তু আমার শালীকে তোমার তো পছন্দ হল, তাকে দেখে তোমার পাগলামো ছেড়ে গেল, কিন্তু," নিতাই বলে, "তোমার বাপ তো পণাপণি ক'রে একেও বাতিল করবেনই। আমার শ্বশুরে তো তোমার বাবার ন' হাজার টাকার খাই মেটাতে পারবেন না।"

"পণ! ও মেয়ে আমি বিনা পণে বিয়ে করব—এই আমার পণ।" ভোলানাথ বলে, "বাপ যদি বউ ঘরে তোলেন, তবে যেমন আছেন তেমনি 'পিতা স্বর্গ' হয়ে থাকবেন। যদি বউ ঘরে না তোলেন, মা তুলবেন, সে ভরসা আমার আছে। মাও যদি আমার বিয়ে-করা বউ ঘরে না তোলেন, সে ঘর আমার চাইনে। তাঁদের চোখের সামনে বউ নিয়ে আমি ভাড়া-বাড়িতে থাকব, নিতে। পরোয়া করিনে—আমার চাকরি পার্মানেন্ট। নিজের বাড়ি আমি নিজের রোজগারে তুলব।"

"এই তো পুরুষের মত কথা।" নিত্যানন্দ তারিফ করে। সহানুভূতি ফুটে ওঠে তার মুখে।

ভোলানাথ বলে "আলাপ করিয়ে দে, নিতু!"

"ফের আলাপ!"

"না—না, কল্যাণীর সঙ্গে নয়।" ভোলানাথ ভুল ভাঙিয়ে দেয় নিত্যানন্দর, "আমি ভেবে দেখেছি, ভাশুরের সঙ্গে বউমা যদি আলাপ করতে অরাজি হন, তবে আলাপ না করাই ভাল। পরে একদিন ছোটবোনের বর হিসেবে আমার সঙ্গে তিনি আলাপ করবেন, তুই সেই ব্যবস্থা ক'রে দে নিতু। আমি আলাপ করার কথা বলছি তোর শালীর সঙ্গে।"

নিতাই বলে, "চেহারা যা বানিয়ে তুলেছ এক রাতের মধ্যে, এ চেহারা দেখলে তার মন বিগড়ে যাবে। তার চেয়ে এক কাজ কর। ওর এখন যেতে দেরি আছে। হয়তো অজ থাকতেও পারে এখানে। তুমি ততক্ষণ একটা ঘুম লাগাও। ঘুমিয়ে তাজা হয়ে, চান্-টান করে একটু ভদ্রলোক সেজে নাও, তারপর আলাপ করিয়ে দেওয়া যাবে।"

একান্ত বাধ্যভাবে ঘুমোবার জন্যে অগ্রসর হয় ভোলানাথ। কিন্তু হঠাৎ ফিরে আসে, "নিতু!"

"কী হল আবার?"

"ইএ—মানে —" ভোলানাথের ঝোড়ো মুখ লাল হয়ে ওঠে, "কী নাম যেন ওর।"

শালীর নাম জানায় নিতাই, বলে, "শুয়ে শুয়ে জপ করগে—একশ' আট বারের আগেই ঘুমিয়ে পড়বে, দেখো।"

ইউক্লিডের মৃত্যু

শ্রী অজিতকৃষ্ণ বসু

ইউক্লিড মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিলেন। জ্যামিতি (অথবা রেখাগণিত) আবিষ্কর্তা, ভাবী-বিশ্ববিখ্যাত ইউক্লিড।

তাঁহার অন্তিম শয্যার দুই পাশে উপবিষ্ট ইউডেমাস ও ইউফোনাস। ইহারা ইউক্লিডের যমজ পুত্র, সমবাহু ত্রিভুজের দুইটি সমান বাহুর মত। ইউক্লিড-পত্নী ইউরেকা সোজা দাঁড়াইয়া আসন্ন চিরবিচ্ছেদ বেদনায় ম্রিয়মাণা; চোখে অশ্রু নাই, কিন্তু যাহা আছে তাহা অপেক্ষা অশ্রু থাকিলেই বোধ করি ভাল হইত।

পত্নীর পানে তাকাইয়া ইউক্লিড কহিলেন, "প্রিয়ে ইউরেকা! আমার নিকটে আসিয়া উপবেশন কর। নেত্রদ্বয়ে অশ্রু আনয়ন করিও না। সমস্ত সমান্তরাল রেখা যে অসীমে গিয়া মেশে, আমি সেই অসীমের উদ্দেশেই যাত্রা করিতেছি। আমার জীবনের কার্য সাঙ্গ হইয়াছে, এবারে খুশী মনে হাসি মুখে আমাকে বিদায় দাও, পিছুটান টানিয়া অকারণ আমার এবং তোমাদের দুঃখের কারণ হইও না। জ্যামিতির বহু তত্ত্ব, সম্পাদ্য, উপপাদ্য ইত্যাদি ভাবীকালের জন্য রাখিয়া গেলাম। ভাবীকাল তবুও যদি আমাকে ভুলিয়া যায়, সে অপরাধ ভাবীকালের, আমার নহে।"

পতিব্রতা সতীসাধ্বী ইউরেকা চোখ মুছিয়া পতির আদেশানুযায়ী তাঁহার শয্যা পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

এতদিনের বিবাহিত জীবনের কথা তাঁহার মনে পড়িল। আদর্শ একনিষ্ঠ পত্নীব্রত স্বামী ইউক্লিড। ইউরেকা ব্যতীত অপর কোনও স্ত্রীলোকের পানে তাকাইবার মত সময়ই ছিল না ইউক্লিডের; অহোরাত্র কেবল জ্যামিতি, জ্যামিতি আর জ্যামিতি। জ্যামিতি যেন ইউরেকার সতীনের স্থান অধিকার করিয়াছিল। ইহাতে খানিকটা দুঃখ বোধ করিলেও ইউরেকা মোটের উপর সুখীই ছিলেন, কেন না, জ্যামিতি অপর কোন নারী নহে। সুতরাং ঐ অত্যধিক জ্যামিতি-প্রিয়তার জন্য স্বামীর বিরুদ্ধে মনে মনে তাঁহার মৃদু নালিশ থাকিলেও স্বামীর প্রতি তিনি মোটের উপর কৃতজ্ঞই ছিলেন। সেই স্বামী আজ চিরবিদায় নিতেছেন!

ইউক্লিড ইউরেকার পানে তাকাইলেন। এতদিন বাদে যেন আজ প্রথম লক্ষ্য করিলেন ইউরেকা আর সেই তন্বী তরুণী নাই, মেদভার-বিপুলা গিন্নীবান্নী হইয়াছেন। তথাপি তাঁহার বিদায়োন্মুখ চোখে ইউরেকাকে অতুলনীয়া অপরূপা মনে হইল। সঙ্গে সঙ্গে এই ভাবিয়া অনুতাপও হইতে লাগিল যে, এতগুলি বিবাহিত বছর কাটিয়া গেল, অথচ একটি দিনের তরেও তিনি প্রেয়সী ইউরেকার রূপের প্রশংসা করেন নাই! পৃথিবীর প্রত্যেক নারীই যে স্বামী বা প্রেমিকের মুখে আপন রূপের প্রশস্তি শুনিবার আশা করে, এই সহজ সত্যটা এতদিন জ্যামিতির তলায় চাপা পড়িয়া ছিল। আজ অন্তিমকালে সে যেন মাথা চাড়া দিয়া উঠিল।

অনুতপ্ত কণ্ঠে ইউক্লিড কহিলেন "প্রিয়তমে ইউরেকা, যে কথা তোমাকে বহুবার বলা উচিত ছিল অথচ একবারও বলি নাই, তাহা আজ বলিয়া না গেলে তোমার মনে চিরদিনের জন্য দুঃখ থাকিয়া যাইবে। তাই বলি, তুমি যে আমার হৃদয়ের কতখানি জুড়িয়া ছিলে তাহা বুঝাইয়া বলিবার ভাষা আমার ছিল না বলিয়াই এতদিন বুঝাইবার চেষ্টা করি নাই। জ্যামিতি-গবেষণার অন্তরালে ফল্গু-প্রবাহের মত—"

এইখানে আসিয়া ইউক্লিড ঠেকিয়া গেলেন, ভাষায় আর কুলাইল না। ইউরেকা ছলছল নেত্রে কহিলেন, "প্রভু, আর বলিতে হইবে না। বুঝিয়াছি। আমার প্রতি আপনার অকৃত্রিম প্রেম না থাকিলে আপনি আমাকে বিবাহ করিতেন না এবং আমার দুই পুত্রের জনক হইতেন না। আপনার জ্যামিতির জ্বালায় কিছুটা জ্বলিয়াছি বটে, কিন্তু আপনার প্রেমে কোনদিন সন্দেহ করি নাই।"

প্রেম! জ্যামিতি! দুটী শব্দ ইউক্লিডের দুই কানে যেন দুই ফোঁটা মধু বর্ষণ করিল। ইউক্লিড যেন দিব্য দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ দেখিতে দেখিতে কহিলেন, "প্রেমের সহিত জ্যামিতির অতি নিকট সম্বন্ধ। একদিন মানুষ প্রেমের জগতে ত্রিভুজের কথা বলিবে। দুই পুরুষ এক নারী অথবা দুই নারী ও এক পুরুষের প্রেমের ব্যাপারে চিরন্তন ত্রিভুজ অথবা ত্রিভুজ-প্রেমের কথা উঠিবে। হায় রে চিরন্তন!"

ক্ষণস্থায়ী মানুষ চিরন্তনের স্বপ্ন দেখে, এ কথা চিন্তা করিয়া আসন্ন-মৃত্যু ইউক্লিডের অধরে কৌতুকের হাসি ফুটিয়া উঠিল।

ইউক্লিড কহিলেন, "দুনিয়ার কিছুই চিরন্তন নহে ইউরেকা। এমন কি প্রাকৃতিক নিয়মগুলিও যে যুগে যুগে বদলায় না এমন গ্যারাণ্টিই বা কে দিতে পারে? ধরো মাধ্যাকর্ষণের কথা, যাহার তত্ত্ব ভাবীকালে আবিষ্কার করিবে ইংরাজ বৈজ্ঞানিক নিউটন। এই মাধ্যাকর্ষণ যে বিবর্তিত হইতে হইতে কয়েক সহস্র লক্ষ বা কোটি বছর পরে মধ্য-বিকর্ষণে পরিণত হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? তখন গাছের আপেল বোঁটা ছাড়িলে হয়তো নীচের দিকে না পড়িয়া উপর দিকে উঠিয়া যাইবে। তাই আবার বলি জগতে কিছুই চিরন্তন নহে।"

ইউক্লিডের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইউডেমাস কহিল, "পিতঃ, তাহা হইলে আপনি জ্যামিতিতে যে সব তত্ত্ব প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন তাহারাও হয় তো চিরন্তন নহে, পরিবর্তনশীল। আপনি প্রমাণসহ আপনার জ্যামিতি গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন যে, কোন ত্রিভুজের যে কোন দুটি বাহু একসঙ্গে জুড়িয়া দিলে তৃতীয় বাহুটির চাইতে বেশী লম্বা হয়। আপনার সদ্য-বর্ণিত বিবর্তন তত্ত্ব যদি সত্য হয় তাহা হইলে হয় তো কয়েক হাজার বা কয়েক লক্ষ বছর পরে ত্রিভুজের যে কোন একটি ভুজ বাকী দুটির যোগফলের চাইতে বড় হইবে।"

মুমূর্ষু ইউক্লিড পরম উদার কণ্ঠে কহিলেন, "কিছুই বলা যায় না। হইতেও পারে। এই ধরো

'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি'— রবি দত্ত
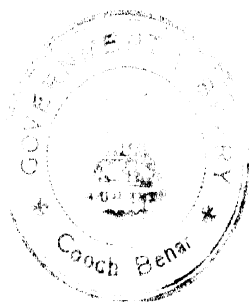
না কেন প্রেম-ত্রিভুজ। হয়তো প্রেম-ত্রিভুজকে টপকাইয়া প্রেম-চতুর্ভুজ, প্রেম-পঞ্চভুজ ইত্যাদির ছড়াছড়ি ঘটিবে। তাহা ভিন্ন, আমি দিব্য চোখে দেখিতেছি, ভাবীকালে একজন সেরা বাঙালী সাহিত্যিক তাঁহার একটি রসাল কাহিনীতে প্রেম-চক্রের কথাও লিখিবেন। কাল পরিবর্তনশীল। তাই কালের সঙ্গে সকলই বদলায়। কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান। শুধু মহাকাল—"

ইউফোনাস ব্যাকুল হইয়া কহিল "পিতঃ, নীরব হন, নীরব হন। আপনার কণ্ঠ অবসন্ন। উহার উপর আর চাপ দিবেন না।"

দম নিয়া ইউক্লিড কহিলেন, "পুত্র, ক্ষণকাল পরে চিরদিনের জন্য নীরব হইয়া যাইব। তাহার পূর্বে কিছুক্ষণ যথাসাধ্য সরব হইতে দাও। পরে পাছে বলিতে ভুলিয়া যাই, তাই বলি আমি চলিয়া গেলে তোমার জননীকে তোমরা দেখিও। উহার যেন কোনরূপ কষ্ট না হয়। তোমরা দুই ভ্রাতা বিবাহ করিয়া সুন্দরী বধূ ঘরে আনিও। পুত্রবধূ আমি দেখিয়া যাইতে পারিলাম না বটে, কিন্তু তোমাদের জননীর দেখাতেই আমার দেখা হইবে জানিও।"

পতির এই কথা শুনিয়া পতিব্রতা ইউরেকা আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে বক্ষ ভাসাইতে লাগিলেন। অতীতের কত করুণ মধুর স্মৃতি দ্রুতবেগে পতি-পত্নীর মনে পড়িতে লাগিল।......

ইউক্লিডের পিতা ইউরেনাসের ছিল মুদি দোকান। ইউক্লিড পিতার বেশী বয়সের একমাত্র সন্তান। ইউরেনাস নিজে ভাল লেখাপড়া জানিতেন না, তাই দোকানে হিসাবের ব্যাপারে তাঁহার একটু অসুবিধা হইত। ইউক্লিডকে তিনি তাই এক নামকরা পণ্ডিতের পাঠশালায় দিয়াছিলেন বিদ্বান হইবার জন্য। পাঠশালায় কিছুদিন ভালই পড়াশুনা করিল ইউক্লিড। কিন্তু কিছুদিন পরেই ইউক্লিডের মস্তিষ্কে বিকারের লক্ষণ দেখা দিল। সে যেখানে সেখানে নানারকমের নক্সা আঁকিয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে বসে, কখনো কখনো স্নান, আহার এবং নিদ্রা ভুলিয়া ভাবিতে থাকে। সে বিষয়ে কেহ কিছু শুধাইলে বলে, "এ সব তোমরা বুঝিবে না।"

কেহ কেহ ইউরেনাসকে বুদ্ধি দিলেন, "উহাকে বাধা দিও না, যাহা খুশী করিতে দাও। পণ্ডিতের কাছে বেশী বিদ্যা শিখিয়া তাহার বদহজম হইয়াছে। কিছুদিন বাদে আপনি ঠিক হইয়া যাইবে।"

একদিন হঠাৎ শোনা গেল গলা ছাড়িয়া পরমানন্দে ইউক্লিড গাহিতেছে:

"বিশ্ববাসী, শোন্ তোরা শোন্
ত্রিভুজের বাহুত্রয় সমান হইলে হয়
সমান তাহার তিন কোণ্।
কিম্বা যদি তিন কোণ সম বলি যায় গোণা
সম হবে ত্রিবাহুর বাবা।
ইথে ভেদ বুদ্ধি যার সে যাউক ছারেখার,
ইউক্লিড তাহারে কহে হাবা।"

দুর্বোধ্য গান শুনিয়া পিতা ইউরেনাস মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। পাগলামির একটা নূতন উপসর্গ বাড়িল। এ উপসর্গটি ইউরেনাসের কাছে আরো রহস্যময়, কারণ মুদি ইউরেনাস গান বাজনার ধার ধারিতেন না। তিনি তাঁহার প্রিয়তমাকে (অর্থাৎ ইউক্লিডের মাকে) কহিলেন, "প্রিয়ে, পুত্রকে কি উন্মাদ চিকিৎসাগারে ভর্তি করিয়া আসিব? নতুবা ছাড়া থাকিলে যদি কোনো দিন ভয়ানক কিছু একটা করিয়া বসে, তাহা হইলে—"

ব্যাকুলা হইয়া ইউরেনাস-গৃহিণী কহিলেন, "নাথ, আর ক'টা দিন দেখুন।"

গোপনে ইউক্লিডকে শুধাইলেন, "তোর কি হইয়াছে বাবা?"

ইউক্লিড কহিল, 'কিছুই হয় নাই মা। শুধু এমন কিছু জিনিষ জানিতেছি যাহা আজ পর্যন্ত আর কেহ জানে নাই।"

শুনিয়া ইউক্লিড-জননী চিন্তিতা হইয়া কহিলেন, "দেখিস্ বাপু। বেশী জানিতে গিয়া আবার ফ্যাসাদ বাধাইয়া বসিস না।"

"কোনো ফ্যাসাদ হইবে না মা।" ইউক্লিড আশ্বস্ত করিল মাকে।

ইহার দিন কয়েক পরেই আবার ইউক্লিডের গান শোনা গেল। এবারকার গান আরো উচ্ছ্বসিত, আরো জটিল:

"আহা, বালুতে আঁকিয়াছিনু বৃত্ত।
কিবা অপরূপ শোভা, অনুপম মনোলোভা,
সহজে হরিল মোর চিত্ত।
পড়িয়া বৃত্তের ফাঁদে রূপালী তপন কাঁদে,
সোনালী স্বপনে কাঁদে চাঁদ গো!
বিশ্বে যত থালা, চাকা বৃত্ত না হইলে ফাঁকা,
এ নহে বৃত্তের অপরাধ গো!
যদিরে সরল রেখা বৃত্ত সাথে করে দেখা,
বিন্দুমাত্র ছোঁয় বাহিরেতে,
স্পর্শেই মিটায় খেদ, বৃত্তেরে করে না ভেদ,
ভিতরেতে নাহি চায় যেতে,
যদি বৃত্ত কেন্দ্র থেকে এতটুকু নাহি বেঁকে
আরেক সরল রেখা নেমে
পূর্ববর্তী রেখা যেথা বৃত্তেরে ছুঁয়েছে সেথা
ঠিক সে বিন্দুতে যায় থেমে,
কিম্বা ভেদ করে তারে, তবে তার দুই ধারে
সৃষ্ট হবে সমকোণ দুটি।
ইথে ভেদ বুদ্ধি যার, ইউক্লিড কহিছে তার
মগজেতে আছে কিছু ত্রুটি।"

এবারে ইউরেনাস আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বন্ধু এনোবার্বাসের কাছে গেলেন। ইউরেকার বাবা এনোবার্বাস কহিলেন, "ইউরেকার কাছে সব শুনিয়াছি বটে। ইউরেকা তো ইউক্লিড বলিতে অজ্ঞান। আর ইউরেকা রূপে, গুণে, বংশমর্যাদায় তোমার পুত্রবধূ হইবার অযোগ্যা নহে। আমি বলি কি, উহাদের দুই হাত এক করিয়া দাও। তাহা হইলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। ইউরেকাই ইউক্লিডকে সামলাইয়া ঠিক করিতে পারিবে।"

ইহার অল্পদিন পরেই ইউরেনাস ও এনোবার্বাসের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হইল।

সুন্দরী পত্নী পাইয়াও ইউক্লিডের কিন্তু স্বভাব পরিবর্তিত হইল না। বরং বায়রাম আরো বাড়িল। জানিয়া শুনিয়া পাগলের সঙ্গে একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়াছেন বলিয়া এনোবার্বাসকে অনেকে সমবেতভাবে ধিক্কার দিতে লাগিল। সে ধিক্কারকে গ্রাহ্য করিলেন না এনোবার্বাস। অগ্রাহ্য করিবার মত অর্থবল এবং বুকের পাটা তাঁহার ছিল। তাঁহার পুত্র ছিল না। ইউক্লিড পুত্রের ন্যায় তাঁহার গৃহে বাস করিয়া নিশ্চিন্ত মনে রহস্যময় পাগলামি করিতে লাগিল। আপন গবেষণার রহস্য ইউক্লিড শ্বশুরকে এবং সহধর্মিণীকে বুঝাইতে গেল, কিন্তু না গেলেই ভাল হইত। এনোবার্বাস এবং ইউরেকার কাছে রহস্য আরো জটিল হইয়া উঠিল।

ইউক্লিড জননী পরলোক যাত্রা করিলেন। ইউক্লিড-জনক ইউরেনাস এই শোকের ধাক্কা সামলাইতে পারিলেন না। অন্তিমশয্যায় শয়ন করিলেন। সেই সময় তাঁহার মুদি দোকানের জয়জয়কার। প্রতিদিন বহু খরিদ্দারে দোকান গম্‌গম্ করে, এবং মোটা লাভ হয়। শেষ সময় ইউক্লিডকে এবং ইউক্লিডের পিস্‌তুতো ভাই ইউমেনাসকে কাছে ডাকাইয়া ইউক্লিডকে কহিলেন, "বৎস ইউক্লিড, আমি তোমার মা'র কাছে যাইতেছি। যাইবার পূর্বে আমার মুদি-দোকানখানা উইল করিয়া যাইব। তোমার পাগলামির জন্য এই জনপদের সমস্ত লোকে একবাক্যে ছি ছি করিতেছে। তোমার উদ্ভট খামখেয়ালের অর্থ কেহ কিছু বুঝিতেছে না। তাই বলি—"

ইউক্লিড কহিল, "এ দেশের বা একালের মানুষ না বোঝে নাই বুঝিল। কিন্তু ভাবীকাল বুঝিবে, এবং বুঝিয়া ধন্য ধন্য করিবে।"

ব্যথিত ইউরেনাস কহিলেন, "এ কালের চাইতে ভাবীকালই তোমার কাছে বড় হইল ইউক্লিড?"

ইউক্লিড কহিল, "পিতঃ! এ কাল আর কতটুকু? ভাবীকাল অনেক লম্বা।"

ইউরেনাস কহিলেন, "তোমার পাগলামী যদি না ছাড় তাহা হইলে আমার সমস্ত ঐশ্বর্য, অর্থাৎ সম্পূর্ণ মুদি-দোকানটি আমার এই ভাগিনেয় ইউমেনাসকে উইল করিয়া দিয়া যাইব। তোমাকে কিছুই দিব না।"

ইউক্লিড মুদি-দোকানের লোভে তাহার জ্যামিতি-চর্চা ত্যাগ করিতে রাজি হইল না। মুদি-দোকানটি ইউমেনাসকে উইল করিয়া দিয়া ইউরেনাস দুঃখিত মনে পরলোক-যাত্রা করিলেন।

(ইউক্লিড যদি জ্যামিতি বর্জন করিয়া মুদি-দোকান গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে আজ পৃথিবীর ইতিহাস অন্যরূপ হইত। কিন্তু ইউক্লিড জ্যামিতি আঁকড়াইয়া থাকার ফলে পৃথিবীর ইতিহাস অন্যরূপ হইতে পারে নাই।)

অল্প ব্যবধানে বৈবাহিকা ও বৈবাহিকের মৃত্যুর পর এনোবার্বাসের উপর নানারকম হামলা নানাদিক হইতে আসিতে লাগিল। তিনি যে বেনামী চিঠি পাইলেন তাহার সারাংশ এইরূপ:

"আপনার জামাতা ইউক্লিড শয়তানের উপাসক বলিয়া অনেকে সন্দেহ করিতেছে। উহার গতিবিধি হাবভাব রহস্যময়। উহার শয়তানী প্রক্রিয়ার ফলে জনপদের উপর অকল্যাণ নামিয়া আসিতেছে, দক্ষিণ অঞ্চলে ইতিমধ্যে কয়েকটি মানুষ, পাঁঠা, কুকুর এবং ভেড়া মারা গিয়াছে। ইহা আগামী মড়কের পূর্বাভাষ বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ইউক্লিড জ্যামিতির নক্সা বলিয়া যাহা চালাইতেছে তাহা আসলে শয়তানকে চিঠি লিখিবার সাংকেতিক ভাষা। অতএব এই জনপদের জনগণের নিরাপত্তার জন্য আপনি যদি তাহাকে না সরান তো তাহাকে সরাইবার জন্য যে ব্যবস্থা করা হইবে তাহা আপনার ও আপনার কন্যার পক্ষে সুখকর নাও হইতে পারে।"

জনপদের সমস্ত পণ্ডিতগণ একযোগে এনোবার্বাসকে জানাইলেন যে, ইউক্লিডের জ্যামিতি তাঁহাদিগকে এবং দেশশুদ্ধ লোককে বোকা বানাইবার জন্য এক বিরাট ধাপ্পা মাত্র। তাহার এই ধাপ্পার অপমান কিছুতেই বরদাস্ত

ছুটি
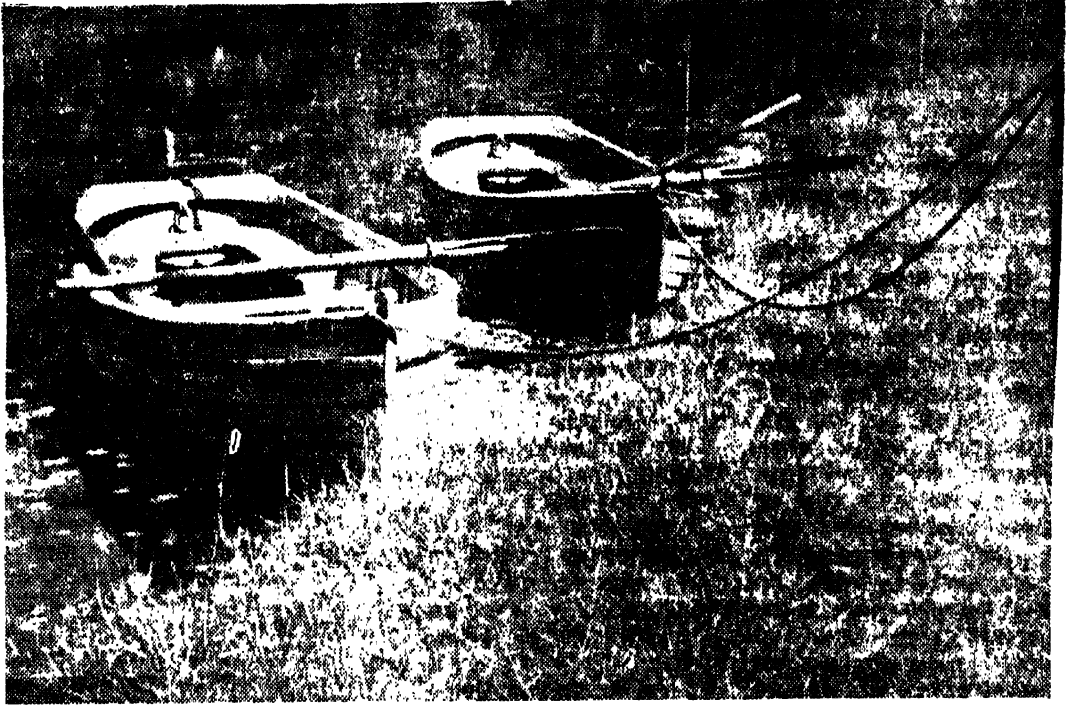
কথা চলিবে না। অর্বাচীনের এরূপ অপরিসীম ধৃষ্টতা অসহ্য।

পাড়ার লোকেরা জানাইল এরূপে পাগল পাড়ায় থাকিলে নিশ্চিন্ত হইয়া পাড়ায় বাস করা অসম্ভব। একটা হেস্তনেস্ত করা আবশ্যক।

এরূপ নানা অপ্রিয় মন্তব্য এবং ভয়ানক শাসানির চোটে এনোবার্বাস অতিষ্ঠ হইয়া জনপদের জ্যোতিষীশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ টেলিফোনাসের শরণ নিলেন। টেলিফোনাস ইউক্লিডের ঠিকুজী কোষ্ঠী চাহিয়া লইয়া বিচার করিতে বসিলেন। তিনি জনপদের অন্য সবার চাইতে বেশী বোঝেন বলিয়া মনে করিতেন এবং গর্ব বোধ করিতেন। ইউক্লিড সম্বন্ধে কে বা কাহারা কি কি প্রকার মন্তব্য করিয়াছে বা মীমাংসায় পৌঁছিয়াছে সমস্তই তিনি নিবিষ্ট মনে এনোবার্বাসের নিকট শুনিলেন।

সম্পূর্ণ নূতন কিছু না বলিলে তাঁহার অতুলনীয় জ্ঞানের মর্যাদা থাকে না, তাই তিনি অপরাপর মতের প্রতি অনুকম্পার হাসি হাসিয়া আপন মত প্রকাশ করিলেন। কহিলেন, "ইহারা সব নিতান্ত মূর্খ, বাতুল, অর্বাচীন, তাই তোমার অতুলনীয় প্রতিভাবান ক্ষণজন্মা জামাতা ইউক্লিডের অনন্যসাধারণত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই, পারিবেও না। ইহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলে হিতে বিপরীত হইবে মাত্র। তোমার জামাতার জ্যামিতি একদিন সারা বিশ্বময় বিখ্যাত হইবে, এবং জ্যামিতির সহিত ইউক্লিডের নাম অমর হইয়া থাকিবে।"

এনোবার্বাস কহিলেন, "কিন্তু বর্তমানে যে এখানে ইউক্লিডের জীবন সংশয়। মূর্খ, বাতুল, অর্বাচীনের দল যেরূপ ক্ষেপিয়াছে তাহাতে ইউক্লিডকে পথে ঘাটে বাগে পাইলে ঘায়েল করিতে ইহারা দ্বিধা করিবে না। এমন উপায় ?"

[illegible]

এখান হইতে মানে মানে অন্য কোথাও সরাইয়া দাও। গেঁয়ো যোগী আপন গাঁয়ে ভিখ না পাইলেও অপর গাঁয়েও যে পাইবে না, এমন কোন কথা নাই।"

টেলিফোনাসের পরামর্শমত এনোবার্বাস কন্যা ইউরেকা এবং জামাতা ইউক্লিডকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিলেন। সেই স্থানান্তরে ইউক্লিড নির্বিঘ্নে জ্যামিতি চর্চা ও সংসার চর্চা করিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে ইউডেমাস ও ইউফোনাসের পিতা হইলেন। অতীতের এই সব স্মৃতিগুলি ইউক্লিড ও ইউরেকার মনের গহনে চকিতবেগে উঁকি দিয়া গেল। উভয়ে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ইউক্লিড কহিলেন, "বৎস ইউডেমাস! আমার সারা জীবনের একাগ্র সাধনার ফল জ্যামিতি-তত্ত্বের কাগজপত্র আমি তোমাকে দিয়া গেলাম। এই মধুচক্র হইতে বিশ্বজন আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি। এবং বৎস ইউফোনাস! তোমাকে দিয়া যাইতেছি আমার অনেক দিনের দিনপঞ্জী, অর্থাৎ ডায়েরি। ইহা হইতে আমার জ্যামিতির বহু সম্পাদ্য, উপপাদ্য প্রভৃতির জন্ম বিবরণী পাইবে। জ্যামিতির দৃষ্টিকোণ হইতে জীবনকে এবং জীবনের দৃষ্টিকোণ হইতে জ্যামিতিকে আমি কিরূপে দেখিয়াছি তাহারও প্রচুর আভাস আমার দিনপঞ্জীতে মিলিবে। আমার এই শেষ দান তোমরা সযত্নে রাখিও এবং তাহাদের যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করিও। আশীর্বাদ করি তোমরা সুখী হও। তোমাদের জন্য কিছু রাখিয়া যাইতে পারিলাম না বটে, কিন্তু ভাবীকালের জন্য তোমাদের জিম্মায় যাহা রাখিয়া গেলাম..."

ইউক্লিডের বাক রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি সেই বহুসাধের জ্যামিতি মিলাইয়া গেলেন যেখানে দিকের সমস্ত সমান্তরাল সরল রেখা এক হইয়া হইল।

ইউরেকা অঝোর ধারায় অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। ইউডেমাস এবং ইউফোনাসও তাহাই করিতে লাগিল। তাহাদের দুঃখ, অর্থাৎ ইউরেকার পিতা এনোবার্বাস তাহাদিগকে দুইটি ভাল চাকুরিতে বহাল করিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং সেদিক দিয়া ভাবনার কিছু ছিল না। তাহাদের দুঃখ শুধু এই যে, তাহাদের পিতৃদেব সারাটা জীবন শুধু পাগলামি করিয়াই গেলেন।

শ্রাদ্ধাদি চুকিয়া গেলে শোকসন্তপ্তা জননী ইউরেকাকে জিজ্ঞাসা করিল "মা, এগুলির কি ব্যবস্থা হইবে?"

(এগুলি মানে ইউক্লিডের জ্যামিতি এবং দিনপঞ্জীর পাণ্ডুলিপি।)

ইউরেকা কহিলেন, "বৎস, ইহারা তোমাদের পিতৃদেবের শেষ স্মৃতিচিহ্ন। ইহাদিগকে পরম যত্নে রক্ষা কর। একালে কেহ ইহাদের মর্ম নাই বা বুঝিল, ভাবীকাল ইহাদের মর্যাদা দিবে।"

ইউরেকার ভবিষ্যদ্বাণী আংশিকভাবে সত্য হইয়াছে। ইউক্লিডের জ্যামিতি আজ বিশ্ববিখ্যাত।

কিন্তু হায়, ইউক্লিডের দিনপঞ্জী অর্থাৎ ডায়েরির কথা আজ আর কেহ জানে না। উহার পাণ্ডুলিপি ইউফোনাস সযত্নে রক্ষা করিয়াছিল কিনা, করিয়া থাকিলে তাহা বর্তমানে আছে কিনা এবং কোথায় কি অবস্থায় আছে কে জানে? উহা আবিষ্কৃত হইলে উহা হইতে ইউক্লিডের জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে তথ্য ছাড়াও হয় তো বহুমূল্য তথ্যের নূতন আলোকের ইসারা মিলিবে। সভ্য জগৎ আপনার অজ্ঞাতসারে বুঝি বা তাহারই জন্য দিন গুণিতেছে।

রিসীভারটা যথাস্থানে নামিয়ে রেখে মুখার্জি সাহেব অন্যমনস্কভাবেই জানলার ধারে এসে দাঁড়ালেন। পাইপটা হাতে আছে বটে—তবে তাতে আগুন নেই, দেশলাই জ্বালিয়ে ধরাবার মত উৎসাহও নেই তাঁর।

সংবাদটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত বৈকি! আর যাই হোক, এ খবরের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না কথাটা। টেলিফোনে বড় সাহেবের গলা পেয়ে প্রথমটা ভেবেছিলেন অফিস সংক্রান্ত কোন ব্যাপারেই কথা কইতে চান তিনি। মুখার্জি সাহেবের যে বাবা আছেন বা ছিলেন—এ সম্বন্ধেই ত কোন সচেতনতা ছিল না তাঁর। যিনি আছেন তিনিই মরতে পারেন। যিনি আছেন কি নেই—

তবু, তিনি মারা গেছেন এটা ঠিক। এইমাত্র তাঁর ওপরওলা ফোন ক'রে জানালেন যে কলকাতা থেকে অফিসে ট্রাঙ্ককল এসেছে—মুখার্জি সাহেবের বাবা নাকি আজ দুপুরবেলা রাস্তায় চলতে চলতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন, হাসপাতালে যেতে যেতে মারা গেছেন। হাসপাতাল থেকেই ওঁদের বাড়ীতে খবর দিয়েছে—মুখার্জি সাহেবের স্ত্রীর কাছে। মিসেস মুখার্জি তখনই স্বামীকে কনেক্‌ট্‌ করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সাড়া পাননি, তাই অগত্যা শ্রীবাস্তবকেই জানাতে বাধ্য হয়েছেন। মুখার্জি যদি এখনই রওনা হ'তে পারেন ত ভাল হয়, ওঁরা কাল ভোর পর্যন্ত সৎকার স্থগিত রাখবেন।

এই পর্যন্ত সংবাদ, তারপরে আর একটু মিঃ শ্রীবাস্তব যোগ ক'রে দিয়েছেন—পৌনে পাঁচটার প্লেন যদি মিঃ মুখার্জি ধরতে পারেন ত ভালই, নইলে নাইট প্লেনে যেন অবশ্যই চলে যান। অফিসের কাজের জন্য ভাবনা নেই, শ্রীবাস্তব জরুরী কাজগুলো নিজেই দেখে-শুনে চালিয়ে নেবেন।......শেষে একটু সহানুভূতিও জানিয়েছেন বড় সাহেব, সেই সঙ্গে মামুলি সান্ত্বনাও খানিকটা। আশা প্রকাশ করেনে যে, ঈশ্বর এই শোক সামলাবার মত শক্তি দেবেন মিঃ মুখার্জিকে। সব শেষে মিসেস মুখার্জির জন্য একটুখানি শ্রদ্ধা ও প্রীতি-মেশানো বাণী। আই-সি-এস অফিসার শ্রীবাস্তব কর্তব্য পালন করতে জানেন, আর নিখুঁতভাবেই সেটুকু করেছেন।

ছি-ছি, মিনুর এতটুকু বুদ্ধি নেই। সব জেনে শুনেও সে শ্রীবাস্তবকে ফোন করতে গেল! একবার পায়নি তাকে, আর একবার চেষ্টা করতে পারত। এখন এই এক হাজার জবাবদিহির মধ্যে পড়তে হবে তাকে—আর অবাঞ্ছিত সব সহানুভূতি! কালই ওর অফিসের কর্মচারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগে যাবে—কে কতখানি সহানুভূতি দেখাতে পারে মুখার্জি সাহেবের এই শোকে। শোক—! শোকই বটে!......মিনু ত সবই জানে মিছি-মিছি—। তারও কি হঠাৎ এই মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? সে কি সত্যিই আশা করে যে প্রবীর মুখার্জি গিয়ে 'শোকসন্তপ্ত চিত্তে' বাপের মুখাগ্নি করবেন, কাছা গলায় দেবেন এবং শেষ পর্যন্ত মাথা কামিয়ে শ্রাদ্ধ করতে বসবেন!

অবশ্য, এখন যা পরিস্থিতি হ'ল—বাহ্যিক ব্যাপারটা বজায় রাখতেই হবে। অন্ততঃ দিন কতকের জন্যে কোথাও গিয়ে মাথাটা কামিয়ে আসতে হবে।......

মাথা কামানো—এবং সেটা ঢাকবার জন্যে সেই একটা কিম্ভূত-কিমাকার টুপি পরার ব্যাপার।

কথাটা মনে পড়তেই নতুন করে রাগটা বেড়ে যায়। স্ত্রীর ওপর—কতকটা নিজের ওপরও বটে। আজই বা তিনি হেঁটে আসবার নাটকটা করতে গেলেন কেন!

কোনদিনই নির্দিষ্ট সময়ের আগে তিনি অফিস থেকে বেরোন না, বরং এক একদিন দেরীই হয়। বড়বাবুদের কাজ শেষ হবার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। আজই দুপুরবেলা কি একটা যে হ'ল—অকারণে কেমন একটা মন খারাপ—হঠাৎ শ্রীবাস্তবকে ব'লে বেরিয়ে পড়লেন অফিস থেকে, সেই বেলা দেড়টার সময়। তখন ভেবেছিলেন স্ত্রী-পুত্রের বিচ্ছেদই এটার মূল কারণ—এখন মনের অবচেতনে একটা সংশয় কেবলই উঁকি মারছে, একেই কি সাইকিক্‌ যোগাযোগ বলে?......না-না, 'গস্‌ য়্যান্ড নন্‌সেন্‌স্‌।...... মিনু ছেলেকে ডাক্তার দেখাতে কলকাতা গেছে, কিছুদিন থেকেই লিভারটা ভাল যাচ্ছে না ছেলেটার, ডাঃ চৌধুরীকে দেখানো দরকার—ছুটি তিন দিন গেছে বটে কিন্তু শিশু পুত্রের বিচ্ছেদ, তিনদিনই যথেষ্ট।......

প্রবীর টেবিলের ধারে ফিরে এসে দেশলাইটা সংগ্রহ করলেন কিন্তু জ্বালা হ'ল না তবুও। আবারও এসে দাঁড়ালেন জানলার ধারে। ছুটির সময় হয়ে গেছে—জনস্রোত

চলেছে নিউ দিল্লীর রাস্তা দিয়ে—সাইকেলের মালা একেবারে; টাঙ্গা, গাড়ী, ট্যাক্সী—জন-বিরল পথ হঠাৎ যেন জেগে উঠেছে।

অফিসে থাকলেও হ'ত। কিংবা যদি তখনই চলে আসতেন সোজা বাড়ীতে—

গাড়ী গ্যারেজে তুলে দিতে বলে দুপুরের নির্জন পথে হাঁটতে হাঁটতে গিছলেন 'ওডিয়ন', সন্ধ্যার শো'র একখানা টিকিট কেটে আবার হাঁটতে হাঁটতেই বাড়ী ফিরেছেন। পথ খুব কম নয়—কিন্তু অনেকদিন পরে হাঁটলেন বলে ভালই লাগল।

এই পাগলামী যদি না চাপত মাথায়, তাহ'লে মিনুর টেলিফোনটা তিনিই প্রথমে ধরতে পারতেন—আর তাহ'লে চুপি চুপি তাকে সাবধান ক'রে দেওয়া চলত, এ সব নিয়ে অকারণ হৈ-চৈ যেন না করে।....পাকেটে সিনেমার টিকিটটা খসখস ক'রে উঠল। তাড়াতাড়ি হাতঘড়িটা আলোতে মেলে ধরে দেখলেন, আর বেশি দেরী নেই। যেতে হ'লে এখনই যাওয়া উচিত।.....মন খারাপ ছিল বলেই টিকিটটা কেটেছিলেন—কিন্তু, এখন আর সিনেমাতে যাওয়ার মত মানসিক অবস্থাও নেই! দুঃখিত? মোটে না। শোকার্ত ত নয়ই—উত্যক্ত বলাই ঠিক।

না। টিকিটটা নষ্টই হ'ল। আর কাউকে দিয়ে দিলে হ'ত বোধহয়। কিন্তু কাকেই বা দেবেন। সাড়ে তিন টাকার টিকিট চাকর-বাকরকে দেওয়া ঠিক নয়।

রহমান বাবুর্চি চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকল। মুখার্জি সাহেব চায়ের হুকুম করেননি—তিনি একটু বিস্মিতই হলেন—রহমান কখন দেখে গেছে সাহেবকে ঘরে দাঁড়িয়ে থাকতে, বুদ্ধি ক'রে একেবারে নিয়েই এসেছে। মিনু শাসিয়ে গেছে বারবার, সাহেবের যদি একটুকু অযত্ন হয় ত রক্ষা থাকবে না। সে ট্রেখানা টিপয়ে রেখে সবশুদ্ধ ধরে জানলার কাছেই এনে বসিয়ে একখানা চেয়ার সরিয়ে দিয়ে গেল। শেষ শীতের অপরাহ্ন ঘরের মধ্যে ইতিমধ্যেই বেশ অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু রহমান জানে সাহেব এই সময়ের দিবালোক পছন্দ করেন—উনি ঘরে থাকলে আলো জ্বালতে দেন না কিছুতেই। তাই সে চেষ্টাও সে করলে না।

মুখার্জি সাহেব চা দেখে অবাক হয়ে গেলেও খুশি হলেন খুব। অনেকখানি হেঁটে এসেছেন। যেমন ক্ষিদে পেয়েছে, তেমনি তেষ্টা। বাড়ী ফিরেই চায়ের ফরমাশ করবেন, ভাবতে ভাবতেই এসেছিলেন, সব গোলমাল হয়ে গেল ঐ টেলিফোনটা এসেই—

টেবিলে বসে আগেই খানিকটা চা ঢেলে নিলেন। বলতে গেলে এক নিঃশ্বাসে আধ পেয়ালা চা খেয়ে নিয়ে আহার্যের দিকে তাকালেন মুখার্জি সাহেব। ওমলেট, কেক, সন্দেশ আর টোস্ট। সবগুলিই তাঁর প্রিয় খাদ্য। ছুরি-কাঁটা ধরে প্রথমেই ওমলেট খানিকটা কেটে নিলেন—কাঁটায় বিঁধলেনও, কিন্তু কে জানে কেন শেষ পর্যন্ত খেতে ইচ্ছা হ'ল না। কেকও খেলেন না। টোস্ট ও সন্দেশ দিয়ে চায়ের পর্ব শেষ ক'রে—চেয়ারটা একেবারে জানালার কাছে এনে পাইপ ধরিয়ে বসলেন।

বাইরে জনস্রোত ক্ষীণ হয়ে এসেছে, তবু এখনও পর্যন্ত মুখর আছে রাস্তা। দূরে কনট সার্কাসের আলোগুলো জ্বলজ্বলে হয়ে উঠল। বাইরেও বেশ অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

কেন ডিমটা খেলেন না এবং ডিম দেওয়া কেক খেলেন না—এ প্রশ্নটা কিছুতেই মনে উঠতে দিলেন না মিঃ মুখার্জি। অশৌচ তিনি মানবেন না—এ ক্ষেত্রে অন্ততঃ নয়, মায়ের সময় তখন নতুন ক'রে চিন্তা করা যাবে। তাঁর প্রশ্ন আলাদা।

বাবা?

বাবা তাঁর মারা গেছেন অনেকদিন। সত্য-কিঙ্কর মুখোপাধ্যায় নামধেয় যে মানুষটি কলকাতার রাজপথে পড়ে মারা গেছে—সে ও'র বাবা নয়।

জুয়াড়ী, মাতাল, চোর! সমাজের কলঙ্ক। ঘৃণ্য জীব সব। এ রকম কোন মানুষের মৃত্যুতে অশৌচ হয়— প্রবীর মুখার্জি তা স্বীকার করেন না। ও বাপের কাছে তাঁর কোন ঋণও নেই। ছিল হয়ত, শৈশবে কিছু স্নেহ সে পেয়েছে—কিন্তু সে বহুকালের কথা। পিতারও কিছু ঋণ থাকে সন্তানের কাছে, এ পৃথিবীতে আনবার ঋণ। শৈশবে ও বাল্যে লালন করতে, প্রতিপালন করতে তিনি বাধ্য। সে কর্তব্যও পালন করেননি সত্যকিঙ্কর। প্রবীরের যখন মোটে আট বছর বয়স, ছোট ভাইটার পাঁচ এবং বোনটির দুই—তখন থেকেই তিনি শুধু শত্রুতা করে এসেছেন ওদের। হঠাৎ বড়মানুষ হওয়ার লোভে লটারীর টিকিট কিনতেন বরাবরই, ক্রমশঃ রেস খেলা ধরলেন। খেলাটা নেশায় পরিণত হ'তে কিছুমাত্র দেরী হয়নি। আর সেই নেশার রসদ জোগাতে অফিসের ক্যাশ ভাঙ্গলেন—এ পথের এর চেয়ে স্বাভাবিক পরিণতি আর কি হ'তে পারে? সাহেবরা সব কজনই ভাল লোক ছিলেন, তাই জেলটা বাঁচল কিন্তু চাকরীটা রইল না কিছুতেই। অফিসের টাকা ভাঙ্গবার পরও চাকরী থাকবে এটা আশা করাও যায় না।

তারপর আর চাকরী পাননি সত্যকিঙ্কর। আত্মীয়স্বজনদের কাছে (তখনও পর্যন্ত তেমন বোকা যে কজন ছিল) যা কিছু ধার করতে পেরেছিলেন তাই দিয়ে দু-তিনবার ব্যবসা করতে গিয়েছিলেন কিন্তু তার পরিণতিও ত জানা! সে সব টাকা যাওয়ার পর পৈত্রিক বাড়ীর অংশ, তারপর মার গহনা। টাকার শোক ও জীবনের ব্যর্থতা ভোলবার জন্য মদ ধরলেন। সস্তা দামের দেশী মদ। পাড়ার যত পোঁচ মাতালদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু হ'ল। শেষে বাড়ীর বাসনকোসনও চুরি ক'রে বেচতে লাগলেন।

তখন মুখার্জি সাহেবের বয়স দশ বছরও পুরো হয়নি। ভাল সাহেবী ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন—সে সব ঘুচে গেল। পড়া-শুনোর পাটই রইল না। খেতেই জোটে না, পড়াবে কে?

কিন্তু মিশনারী ইস্কুলের ঐ দু-তিনটি বছর ব্যর্থ হয়নি। ইতিমধ্যে শিক্ষায় সত্য-কারের অনুরাগ জন্মে গিয়েছিল ঐটুকু ছেলেরই। বছরখানেক চুপ ক'রে বাড়ীতে বসে থাকবার পর একদিন নিজেই খুঁজতে খুঁজতে গিয়েছিলেন পুরোনো ইস্কুলে এবং সাহেব রেক্টরের সঙ্গে দেখা ক'রে আনুপূর্বিক সব কথা অকপটে খুলে বলেছিলেন। তাঁর বুদ্ধি-দীপ্ত মুখের আন্তরিকতা ও চোখের জল রেক্টরকে অভিভূত করেছিল। তিনি বলেছিলেন, 'বেশ, বিনা মাইনেতে পড়াবার ব্যবস্থা আমি ক'রে দিচ্ছি, বইও কিছু কিছু জোগাড় ক'রে দেব—কিন্তু তুমি এতটা পথ কি রোজ হেঁটে আসতে পারবে? গাড়ীর ব্যবস্থা ত হ'তে পারবে না!'

সাগ্রহে রাজী হয়েছিলেন প্রবীর। হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেয়েছিলেন যেন। সাড়ে তিন মাইল পথ, যাতায়াতে সাত মাইল, তবু ভয় পাননি তিনি। তার ভেতরও অর্ধেক দিন খাওয়া হ'ত না। সকাল থেকে চালের জোগাড় করতেই মায়ের অনেক বেলা হয়ে যেত—সেটা ছিল নিত্যকার সমস্যা। অথচ নটার না বেরোলে সাড়ে দশটার আগে পৌঁছতে পারতেন না প্রবীর। একদিন ক্লাসের মধ্যেই মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। শিক্ষকের মুখে সে খবর পেয়ে রেক্টর ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কোন প্রশ্ন করেননি তিনি, ও'র নিরতিশয় শুষ্ক মুখের দিকে চেয়েই ব্যাপারটা অনুমান ক'রে নিয়েছিলেন। সেইদিন থেকে ব্যবস্থা করেছিলেন, টিফিনের সময় তাঁর ঘরে গিয়েই এক কাপ দুধ ও খানিকটা রুটি খেয়ে আসবেন।

এ অনুগ্রহের মর্যাদা রেখেছিলেন তিনি। প্রতি শ্রেণীতেই প্রথম হয়ে উঠেছিলেন। স্কুলের নিয়ম অনুসারে বৃত্তিও পেয়েছিলেন। প্রথম চার টাকা—তারপর ছয়, একেবারে ওপরে গিয়ে আট। কিন্তু এতেও কি শান্তিতে পড়তে পেরেছিলেন? রাত্রে মদ খেয়ে এসে বাবা প্রতিদিনই অশান্তি করতেন। না, তাকে কোন-দিন মারতে সাহস করেননি—কিন্তু ভাই-বোন-দের ত প্রতিদিনই, এমন কি মায়ের গায়েও হাত তুলতেন মধ্যে মধ্যে। ওর মা রাত্রে জেগে ক্রুশ বুনে অপরের জন্য, জামা সেলাই ক'রে দু-চার পয়সা রোজগার ক'রে নিত্যকার অন্ন সংস্থান করতেন—সেই অন্ন পেতেন অনায়াসে, বেশ জুলুম করেই। তার ওপর ছিল চুরি। পরের জামার কাপড় নিয়ে গিয়ে বেচে মদ খেতেন। সেই কাপড়ের গুণাগার দিতে বহু বিনিদ্র রজনীর পরিশ্রম যেত মায়ের। ছেলে-মেয়েদের পড়বার বই নিয়ে গিয়ে বেচে দিতেন মধ্যে মধ্যে। একদিন প্রবীর প্রতিবাদ করতে, ও'র সব বই-খাতা ছিঁড়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন রাগ ক'রে। সে দুঃখদিনের তুলনা হয় না, ঐটুকু ছেলে মাথা খুঁড়ে মাথা রক্তাক্ত ক'রে ফেলেছিলেন মনে আছে।

ম্যাট্রিক পাস ক'রে আই এস-সি পড়ে-ছিলেন প্রবীর নিজের স্কলারশিপে। সেই সঙ্গে টিউশনিও করতে হয়েছিল, নইলে ভাই-বোন-দের পড়ানো যেত না। বি, এস-সি পড়বার সময় দুটো টিউশনিও নিয়েছিলেন—তার ফলে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পাননি, কিন্তু উপায়ও ছিল না, মার শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়ল, দুরারোগ্য রোগে পড়ল বোনটি, সংসারের চাল-ডাল বাজারের ভারটা অন্ততঃ চালাতেই ত হবে!

কিন্তু সেই সময়েই একটি কাজ করে-ছিলেন—সত্যকিঙ্করকে ঘাড় ধরে বার ক'রে দিয়েছিলেন প্রবীর। এবং বলে দিয়েছিলেন যে কোন দিন কোন কারণেই আর যেন বাড়ীতে ঢোকবার চেষ্টা তিনি না করেন। সেদিন নিন্দায় মুখরিত হয়েছিল পাড়া, পঞ্চমুখ হয়ে

উঠেছিলেন আত্মীয়সমাজ। এমন কান্ড কেউ কখনও শোনেনি। কিন্তু সে সব কোন সমালোচনাতেই কান দেননি প্রবীর, গ্রাহ্য করেননি কাউকে। শুধু মনে আছে—ও'র এক সম্পর্কীয় মাতামহ সংবাদটা পেয়ে সংক্ষেপে এক লাইন অভিনন্দন জানিয়েছিলেন আর বাল্যের এক শিক্ষক বলেছিলেন, 'আমার হয়ত সাহসে কুলোত না বাবা, তবু তোমার সৎসাহসের প্রশংসাই করছি।'

এ'দের দুজনকেই শ্রদ্ধা করতেন প্রবীর, সুতরাং এই দুটি সমর্থন অনেকখানি মনের জোর জুগিয়েছিল তাঁকে।

তারপর বহুবার সত্যকিঙ্কর চেষ্টা করেছেন বাড়ীতে ঢুকতে। বহু লোককে দিয়ে সুপারিশ করেছেন কিন্তু এই একটা দিকে প্রবীর ছিলেন অটল। ভোর পাঁচটা থেকে রাত বারোটা অবধি পরিশ্রম করতে হয় তাঁকে—শান্তি একটু চাই-ই। তবে মাকে তিনি বলে দিয়েছিলেন, 'যদি তোমার ইচ্ছা হয় তুমি তোমার স্বামীকে নিয়ে ঘর করতে পারো—কিন্তু আমি অন্ততঃ সে-ঘরে থাকব না। ভাই-বোনদেরও আমি নিয়ে যাবো!' মা তাতে রাজী হননি। স্বামীর প্রতি এতটুকু ভালবাসাও আর অবশিষ্ট থাকবার কোন কারণ ছিল না।

পরবর্তী জীবনে—বড় সরকারী চাকরী পাওয়ার পর, ছোট ভাইয়ের অনুরোধেই, একটি কাজ তিনি করেছিলেন, একটি হোটেলে মাসিক খরচা দিয়ে বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছিলেন—সেখানে দুবেলা খাওয়া এবং থাকার ব্যবস্থা হ'তে পারবে। এবং যদি সৎভাবে নিয়মিত থাকেন ত পরিধেয় কাপড়ও মিলবে, সেটা হোটেলওলাই দিয়ে ও'র কাছে বিল করবে। হোটেলওলার টাকাটা তিনি দিল্লী থেকেই মণিঅর্ডার করে পাঠান।

ছোট ভাইও অবশ্য মানুষ হয়ে উঠেছে, তবে তার শরীর ভাল নয়। বোনটি ত গেছেই—ভাইয়ের দেহেও বাল্যের অনশন এবং অর্ধাশন ছাপ রেখে গেছে জখমের। সে বেশী কিছু উপার্জন করতে পারে না। তার এবং মায়ের জন্য তিনি নিয়মিত খরচা পাঠান, মার পক্ষে রুগ্ন, দুর্বল ছেলেকে ফেলে আসা সম্ভব নয়—তা তিনি আশাও করেন না, সেখানে একটা পুরো সংসারই চালান বলতে গেলে। ভাই ত মোটে দুশোটি টাকা পায়, আরও আড়াই শ' টাকা না হ'লে তাদের ভদ্রভাবে চলে না। সবই দেন প্রবীর কিন্তু ঐ একটি শর্ত তাঁর—কোনদিন কোন কারণেই সত্যকিঙ্করকে সে বাড়ীতে বা সে সংসারে ঢুকতে দেওয়া চলবে না। তাহ'লেই সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করবেন তিনি। ঐ শ্রেণীর লোককে আত্মীয় বলে স্বীকার করতে তিনি প্রস্তুত নন। বাবা ত নয়ই।

অন্ধকার ঘর, কত রাত হয়েছে কিছুই টের পাননি মুখার্জি সাহেব। একেবারে চমক ভাঙ্গলো রহমানের কণ্ঠস্বরে, 'ডিনার রেডি হুয়া সাব!'

'ডিনার! কত রাত হয়েছে রহমান?'

'সাড়ে আট হো গিয়া সাব!'

সাড়ে আট! বিস্মিত প্রবীর রাস্তার দিকে তাকালেন। নিউ দিল্লীর রাস্তা জনবিরল হয়ে এসেছে। দূরে কনট সার্কাসের আলোও স্তিমিত হ'তে শুরু করেছে। অর্থাৎ দোকান-

শখের সওদা

কুমারেশ নন্দী

পশারের আলো নিভছে একে একে। কিছুক্ষণ আগেও সেখান থেকে টাঙ্গা ও ট্যাক্সির শব্দ এবং প্রমোদবিলাসী নর-নারীর কণ্ঠস্বরের একটা মিলিত গুঞ্জন ভেসে আসছিল, কখন তাও ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হয়ে এসেছে, তা লক্ষ্যও করেননি প্রবীর।

না, রাতই হয়েছে।

'ঠিক হ্যায়। তুম সার্ভ করো রহমান, ম্যায় গোসলখানা যাতা হুঁ!'

বাথরুমে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলেন প্রবীর। গরম জলে স্নান ক'রে অনেকটা যেন সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ মনে হ'ল। অনেক কাজে তাঁর, এখনই খেতে খেতে একটা 'প্ল্যান' ছকে ফেলতে হবে। অকারণ বসে বসে স্মৃতির রোমন্থন করার মানুষ তিনি নন, ওসব তাঁর ভালও লাগে না। কলকাতায় তিনি যাবেন না—কাল ভোরেই একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়ে তিনি সরে পড়বেন কোথাও। হরিদ্বার অথবা হৃষীকেশ—কিম্বা ওদিকে পুষ্কর। যেখানে তীর্থযাত্রী যাবে কিন্তু অফিসের লোকের সঙ্গে বিশেষ দেখা হবে না। সেইখানে দশটা দিন কাটিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে ফিরে আসবেন তিনি। শ্রাদ্ধ? প্রতুল করতে চায় করুক, মিনুর যদি না-দেখা শ্বশুরের জন্যে এত দরদ উথলে থাকে ত সেও করতে পারে। তিনি বরং কিছু টাকা পাঠাতে রাজী আছেন কিন্তু নিজে ওসব ব্যাপারে নেই।......

মাথাটা ভাল ক'রে না আঁচড়েই কোনমতে একটা ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি এসে খেতে বসলেন মুখার্জি সাহেব। রহমান রাঁধে ভাল—ডিনারটা ঠাণ্ডা ক'রে লাভ নেই।

টেবিলে বসে একবার 'কোর্স'গুলোর দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। সুপ, কাটলেট, ফাউল রোস্ট, পুডিং-আয়োজনে খুঁত নেই কোথাও।... তার সঙ্গে কিছু ফল, আপেল, কলা, লেবু—রসগোল্লাও কোথা থেকে জোগাড় হয়েছে দুটো!

পরিচিত এবং প্রিয় আহার্যের সুঘ্রাণ। মনটা প্রসন্ন হয়ে ওঠবারই কথা। যথেষ্ট উৎসাহ সহকারে মুখার্জি সাহেব সুপ-প্লেটের উপর

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নুন ও মরিচের গুঁড়ো ছড়ালেন। তারপর হাতা-মার্কা চামচে করে মেশাতে লাগলেন সেটা—

কিন্তু মেশাতে মেশাতেই কেমন যেন উন্মনা অনামনস্ক হয়ে পড়লেন। শবটা এখনও হয়ত তাঁদের বাসাতেই আছে। অপেক্ষা করছে তারা ও'র জন্য। জ্যেষ্ঠ সন্তান গিয়ে মুখাগ্নি করবে! হুঁ!

আরও একবার সজোরে চামচটা ঘুরিয়ে নিলেন মুখার্জি। ওদের আর আজ খাওয়া হবে না। কাল ও'র পৌঁছবার সময় দেখে তবে তারা শ্মশানে যাবে। ফিরতে ফিরতে অপরাহ্ন। কালও বিশেষ কিছু খাওয়া হবে না। পরশু শনিবার, সেদিনও হবিষ্য হয় না।

এখনও এত মনে আছে তাঁর, আশ্চর্য!

অথচ তাঁকে সবাই পাক্কা সাহেব বলেই জানে।

আর কারো খাওয়া না হয়, সেজন্য ও'র দুঃখ নেই। খোকনটাকেও উপোস করিয়ে রাখবে হয়ত। মিনু যা সেকেলে, আরও সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে করবে, সে যে মেম সাহেব হয়ে যায়নি সেইটে প্রমাণ করার জন্যে।......একে ছেলেটার শরীর খারাপ—এই কদিনেই দেখছি আধমরা হয়ে যাবে। খোকনের জন্যই অন্ততঃ যাওয়া দরকার—

খোকনটা সুপ বড় ভালবাসে। সুপ আর রসগোল্লা—এই দুটি জিনিষই তৃপ্তি ক'রে খায়। আর কিছু দিতে এলে বলে, 'না-না'—'না-না।'

ছেলেবেলায় তিনিও রসগোল্লা ভালবাসতেন খুব। একেবারে যখন শিশু তখন বাবা রোজই রাত্রে তার জন্য রসগোল্লা নিয়ে আসতেন। তারপর ভাই হ'ল, বোনটি হ'ল—খাওয়ার লোক বাড়ল এবং আয় কমল, তখন আর রসগোল্লা আনতে পারতেন না, মির্জাপুর স্ট্রীটের কোথায় রসে-ফেলা ক্ষুদে ক্ষুদে রসমুণ্ডি করত—রসগোল্লারই 'বেবি-সাইজ' এক পয়সায় চারটে তাই নিয়ে আসতেন। বলতেন, 'একটু ছোট, তা তেমনি দুটো করে পাচ্ছিস!'

এ কি, কার কথা বলছেন? বাবা কে? যে ব্যক্তি মরেছে সে নয়—সে সত্যকিংকর মুখার্জি, তার সংগে ও'র কোন সম্পর্ক নেই। ও'র বাবা, সেই শৈশবে যা কটি বছর পেয়েছিলেন তাঁকে, স্নেহময় সর্ব উপদ্রবসহ। সে কটি বছরে ফাঁক ছিল না পিতৃস্নেহে, ছিল না কোন ত্রুটি! সত্যি, আজ সব কথা মনে পড়লে—একে একে বহু টুকরো দিনের স্মৃতি ভীড় ক'রে দাঁড়াচ্ছে মনে- এইটেই মনে হয় সেদিন ও'র বাবাও ও'কে এমনি ভালবাসতেন, যেমন উনি ভালবাসেন খোকনকে। শুধু যদি ঐ সর্বনেশে সাংঘাতিক নেশা না পেয়ে বসত তাঁকে—হঠাৎ বড়লোক হবার নেশাটা! মানুষটা এমনি মোটেই মন্দ ছিলেন না।

পয়সা পয়সা ক'রে ক্ষেপে উঠেছিলেন—আর ঐ এক নেশা থেকেই সব কিছু নেশা, সব বদভ্যাস।

কেবলই বলতেন মাকে, 'দ্যাখো না, ছেলেমেয়েগুলোকে প্রাণভরে খেতে দিতে পারি না, ভাল ভাল জামা-কাপড় দিতে পারি না—এই কটা টাকা মাইনেতে কি হয়? একদিনও যদি মোটামুটি কোথাও থেকে কিছু পাই ও'দের আশাটা মিটিয়ে দিই। এই দেশায় পেয়েছেও কি তাহ'লো ছিল তাঁদের প্রতিই স্নেহ, তাঁদের জন্য উৎকণ্ঠা?

সুপের প্লেটটা ঠেলে সরিয়ে দিলেন। ঠাণ্ডা হয়ে গেল ভাবতে ভাবতে। ঠাণ্ডা সুপ খাওয়া যায় না।......কাটলেটের প্লেটটা সামনে টেনে নিলেন মুখার্জি।

আইনতঃ এখনও তাঁর অশৌচ হয়নি কিন্তু শবদাহ না হ'লে অশৌচ শুরু হয় না। আশ্চর্য, অনেক নিয়মই এখনও তাঁর মনে আছে দেখছি!......

রক্তে আছে এ সংস্কার। পিতা মেনেছেন, পিতামহ মেনেছেন, প্রপিতামহ মেনেছেন। মাতামহ, প্রমাতামহ—সবাই। তাঁদের রক্ত বয়ে এনেছে তাঁদেরই সংস্কার, তাঁদের বিশ্বাস। পিতা, হ্যাঁ—পিতারও। রক্ত না হোক অস্থি এবং মজ্জা এগুলোকে অস্বীকার করা যায় কি করে? বাপের বীর্যেই নাকি অস্থি গঠিত হয়।......বাপের শব পড়ে আছে সেখানে—অশৌচ শুরু না হ'লেও, বিধর্মীপৃষ্ট মাংস আহার—তাঁরা কি এটা প্রসন্ন মনে মেনে নিতেন, তাঁর পূর্বপুরুষরা?

অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ালেন মুখার্জি সাহেব।

রহমান বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল, 'কেয়া হুঁয়া সাব?'

'কুছ নেই। তুম যাও। আপনা কাম করো। তবিয়ৎ ঠিক নেহি। থোড়া দেরসে খায়েংগে ডিনার!'

রহমান বহু দিনকার বাবুর্চি। বিস্ময় এবং কৌতূহল দমন করতে জানে। সে নিঃশব্দে সেলাম করে চলে গেল।......

আবারও জানালার ধারে এসে দাঁড়ালেন মুখার্জি।

যতই অস্বীকার করুন সত্যকিঙ্করকে, এই দেহটাকে যতক্ষণ না অস্বীকার করতে পারছেন—সম্পর্কটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সমাজে বাস ক'রে ত নয়ই। মাথা তাঁকে কামাতেই হবে। তবু ত শুধু শ্রীবাস্তব জেনেছেন কথাটা। তিনি বাঙ্গালী নন। তাঁর কোন বাঙ্গালী সহকর্মী বা অধীনস্থ কর্মচারী জানলে, সহানুভূতি ও উপদেশ সশরীরে এখানে এসেই পৌঁছত। তখন তাদের সামনে তাঁকে জুতোটা খুলতে হ'ত, তখনই কিছুই খেতে পেতেন না। অর্থাৎ সত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়কে জীবদ্দশায় যতই অবহেলা করুন না কেন—সুদশুদ্ধ পুষিয়ে নিতেন ভদ্রলোক।

না-না—এসব কি ভাবছেন তিনি?

মুখার্জি সাহেব আবারও এসে টেবিলে বসলেন। কাটলেটটাও অখাদ্য হয়ে গেছে। রোস্ট-এর থালাটা টেনে নিয়ে ছুরি দিয়ে কাটতেই কেমন একটা গন্ধ এল নাকে—বিশ্রী। বোটকা গন্ধ।

হঠাৎ এক একটা কথা মনে পড়ে যায়। যখন বাবা পুরোপুরি অধঃপাতে যাননি, সবে মদ খেতে শুরু করেছেন, সেই সময় একদিন পকেটে করে নিয়ে এসেছিলেন কোন এক বিখ্যাত হোটেলের (রেস্তোরাঁ বলার চলন হয়নি তখনও) চপ। ও'কে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি পকেট থেকে বার করে বলেছিলেন, 'খা। এইখানে দাঁড়িয়ে খেয়ে নে। বেশী পয়সা ছিল না, একটার বেশি আনতে পারিনি। পচুটা আবার দেখতে পেলে বায়না নেবে।'

স্নেহ ছিল বৈকি! নেশার ভূতে না পেলে, একেবারে পাগল হয়ে না গেলে এমন অমানুষ হয়ত হতেন না!

না, এ রোস্টটাও খাওয়া যাবে না। আজ রহমানের হ'ল কি?

থাকগে। মুখার্জি মনে মনে বললেন, কি আর হবে একদিন মাংস না খেলে। তিনি পুডিং-এ চামচ ডুবোলেন। কিন্তু মুখে তুলতে গিয়েও তুলতে পারলেন না। অদ্ভুত একটা কথা, তাঁর পক্ষে অন্ততঃ অদ্ভুত, মনে হ'ল। যখন মাংসই খেলেন না, তখন এই ডিম-দেওয়া পুডিংটাও নাই খেলেন। মাথাও যখন কামাতে হবে, একটা বাহ্যিক 'শো' বজায় রাখতে হবে—তখন মিছিমিছি কি লাভ?

সামান্য কিছু ফল ও রসগোল্লা খেয়ে উঠে পড়লেন মুখার্জি সাহেব। আবার জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

কলকাতাতেই যাবেন নাকি শেষ পর্যন্ত? অর্থাৎ শেষের দিকে? একেবারেই যদি না যান—মার মনে হয়ত কোথাও একটা সূক্ষ্ম আঘাত লাগতে পারে। হাজার হোক তাঁর স্বামী, তাঁর সন্তানের পিতা। চিরদিনই ত লোকটা অমানুষ ছিলেন না। এক সময় দুজনের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক নিশ্চয়ই ছিল। সে স্মৃতি কি মার মন থেকে মুছে গেছে একেবারে? না, মাকে কষ্ট দেওয়া উচিত হবে না, মার কাছে তাঁর ঋণ ঢের। মা না থাকলে, মার কাছে উৎসাহ না পেলে ঐ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে মানুষ হ'তে পারতেন না কিছুতেই। তাছাড়া........তাঁরা পাড়াতে, আত্মীয়স্বজনের কাছে কি ই বা জবাবদিহি করবেন? পুতুলটা অপ্রস্তুত হবে!

আরও একবার অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ালেন মুখার্জি।

যদি যেতেই হয়—আজ গেলেই বা বাধা কি? সেইটেই বোধহয় সব দিক দিয়ে শোভন ও সংগত হয়।

এখনও হয়ত নাইট প্লেনের সময় আছে। শ্রীবাস্তব ও বলেইছেন, অফিসের জন্যে ভাবতে হবে না।......

মুখার্জি সাহেব টেলিফোনের রিসীভারটা তুলে নিলেন।

শরৎ ॥ রাণা বসু

শীত ছোঁয়া শারদ রাতে,
আমি ঘরের বাইরে বেড়াচ্ছিলুম।
দেখলুম লালমুখো চাষীর মতন
রাঙা টকটকে চাঁদ
এক লতার বেড়ার ওপর হেলে পড়েছে।
কথা বলার জন্যে আমি থামলুম না
শুধু মাথা নোয়ালুম।
চাঁদকে চারপাশ থেকে ঘিরে ছিল
ফ্যাকাশে-মুখ শহুরে ছেলেমেয়ের মতোই
চিন্তান্বিত তারার দল॥*

* টি. ই. হাল্ম-এর কবিতার অনুবাদ।

এই ধরণীরে..

দেবেশ দাশ

সুপার ফরট্রেস বোমারু বিমানটা হঠাৎ যেন দু'ভাগ হয়ে খুলে গেল।

মহাশূন্যের বুক চিরে আমাদের অ্যারো-প্লেন এগিয়ে চলেছিল। একেবারে ধূমকেতুর মত। হ্যাঁ, ধূমকেতুর মত। এইমাত্র আমরা একটা বর্মী গ্রামে শুধু আগুনের ধোঁয়া ছাড়া আর কিছু রেখে আসিনি।

জাপানী সৈন্যদের একটা আগুয়ান ঘাঁটির খোঁজ আমরা পেয়েছিলাম। আমাদের ওরকম লুকোনো ঘাঁটি ওদের মুলুক সন্ধান নিয়ে বেড়ায়। তাদের কাছ থেকে রেডিয়োতে খবর পাওয়া মাত্রই আমাদের এয়ার ফিল্ডের কন্ট্রোল রুমে সাড়া পড়ে গেল। পড়ে গেল দৌড়োনর পালা। সাজ সাজ রব নয়। সেজে আমরা ছিলামই। মরবার জন্য, মারবার জন্য এমন-ভাবে রাত-দিন তৈরী থাকে না আর কেউ। তার উপর আমি মোটে কাল ফার্লো ছুটী থেকে ফিরে এসেছি। বোমারু স্কোয়াড্রনের লোক আমি। শত্রুর ঘাঁটি তাক করে আকাশ থেকে বোমা ঝরাতে তর সয় না।

তাই বাড়ী থেকে লড়াইয়ে ফিরে আসাতেও তর সয়নি। এই বর্মা-আসাম সীমান্তের সবুজ নরক "গ্রীণ হেল" তাতেই চলে এলাম। সন্ধ্যাবেলা তাঁবুর তলায় ব্লাক আউটের মধ্যে এয়ার ফোর্সের জঙ্গীরা ঠাট্টা করল—ফ্রম ব্লু হেভেন টু গ্রীন হেল, নিজের কুটীরের নীল স্বর্গ থেকে গহন জঙ্গলের সবুজ নরকে।

ঠিক তাই। নরক কাকে বলে দুষমনকে তা এইমাত্র দেখিয়ে এসেছি। উল্কার মত নীচে প্লেন নামিয়ে এনে আমরা মোটে হাজারখানেক ফুট উঁচুতে এসেছি। স্কুলের গুলি খেলার মত তাক করে করে বোমা ফেলেছি জপানী ছাউনীর উপরে। ওদের মরণ চীৎকারের সঙ্গে মিশে গেছে ওদেরই গোলা-বারুদ আগুনের হুঙ্কায় ফেটে ফেটে যাওয়ার আওয়াজ। সে কি তান্ডব। সে কি প্রলয়কান্ড। সবুজ নরকের আগুন-রাঙা নেশায় বার বার ফিরে এসেছি সেখানে। ছুঁচের মুখের মত সরু আর নিশ্চিত নিশানা করে আবার মেশিনগান চালিয়েছি। আবার। আবার। সবুজ নরকের মধ্যে রাঙা আগুন।

আসামে বলে হাতী নাকি যৌবন তাড়নায় "মস্তু" হয়। তখন নাকি পাগলের মত হয়ে সব কিছু লন্ডভন্ড করে। তছনছ করে। কিন্তু বেচারী হাতী। আমাদের বিজ্ঞানের কাছে কোথায় লাগে একটা অবোলা হাতী। নিজের মনেই হাসি পেল। খুব তাচ্ছিল্য করে নীচে মাটির দিকে তাকালাম।

ধুৎর তোর ধরণী।

শুধু একটা অনসক্ত অবহেলা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারি না, ওই মাটির পৃথিবীকে। তিনশো মাইল বেগে চলেছি। বাতাসকে কলা দেখিয়ে চলেছি আজ। শব্দের চেয়েও জোরে যাব শিগ্গির। অথচ প্লেনে বসে মনে হচ্ছে যেন একটুও গতি নেই। নেই নড়ন-চড়ন। ওই যে নীচে সবুজ নরকে গুলজার আর তোল-পাড় চলছে তার একটুখানি ঢেউও কি ছুঁতে পেরেছে আমার প্লেনকে?

আমাদের পাইলটও ঠিক এই কথাই ভাবে। আর বলে যে, ওর দেশের আকাশের চেয়ে আমার দেশের আকাশে এই তাচ্ছিল্যের ভাবটা আরো বেশী আসে। এখানে আকাশটা নিস্তরঙ্গ, বাতাস প্রায়ই নিথর। নীচে পৃথিবীর লোক-গুলো ঝড়-বাদলা মেঘ এ সব নিয়ে মাথা ঘামায়। আমরা তার অনেক উপরে উঠে এসে মজা দেখি। ধুলো-মাটির ধরণী আর মেঘ বিদ্যুৎ ভরা আকাশের তোয়াক্কা রাখি না।

এই ত দেখছিলাম প্রকান্ড একটা হ্রদ। এটা এমন গোপন দুর্গম জায়গায় যে আমাদের ম্যাপে পর্যন্ত নেই। চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতে চিকচিকে জল মিলিয়ে গেল। এল পাহাড়ের চূড়ার পর চূড়া। নীচে গাছের আর ঘাসের সবুজ জাজিম; মাথায় পাথরের ইস্পাত-রঙা মুকুট। আর কয়েক মিনিট পরেই নামতে আরম্ভ করব। সন্ধ্যার আগেই জঙ্গলে লুকোনো বিমানঘাঁটিতে পোঁছতে হবে। বোঁ-ও-ও-ও।

বোঁ-ওঃ—ওঃ। হঠাৎ কান যেন ছিঁড়ে গেল আওয়াজে। প্লেনটা দু' টুকরো হয়ে গেছে। ককপিট ভরে গেল ধোঁয়াতে। যন্ত্রের মত আঙ্গুল চালিয়ে নম্বর টিপলাম। ট্রেণিং ম্যানুয়ালে সব লেখা আছে। উপরের চাঁদোয়াটা নীচে ফেলে দিলাম। আরেকটা বোতাম টিপে নিজেকে ককপিট থেকে বাইরে ছুঁড়ে ফেললাম। প্যারাসুটের রশি ধরে টানলাম। রেশমী ছাতার তলায় ঝুলতে ঝুলতে পাহাড়ের চূড়াগুলোর দিকে নেমে চলেছি। পরিষ্কার, নাঙ্গা চূড়াগুলো বেয়নেটের ফলার মত নিষ্ঠুরভাবে আমার দিকে উঠে আসছে। একটা ফলা ত নিশ্চয়ই আমায় বিঁধে দেবে। একেবারে ফুঁড়েও দিতে পারে। না। তবু ভয় করি না। আমি এয়ার ফোর্সের

লেফটেনান্ট রঞ্জন দত্ত। সবুজ নরকের রাঙা নেশায় আমি জ্বলছি।

(২)

বা হাঁটুটা বোধ হয় ভেঙ্গে গেল। না, হাঁটু নয়, সম্ভবতঃ গোড়ালী। হতভাগা পৃথিবী শোধ নিয়েছে। তাই মাঠে নয়, পথে নয়, পুকুরে নয়, পাথরে ঠুকে দিল। ঠিক আছে। আমিও ভাঙ্গি না। মাটিতে পড়ে শুয়ে শুয়ে আমার চারদিকের নিঃশব্দতার সঙ্গে পরিচয় করতে লাগলাম। প্লেনে ওঠার পর থেকে এই প্রথম নির্জন নিঃসঙ্গ নিঃশব্দতা।

আর কি কি আছে আমার সম্পত্তি? একটা রিভলবার, একটা ছুরি আর কয়েকটা বুক ম্যাচ। অর্থাৎ অ্যামেরিকান ধাঁচের দেশলাই কাঠির প্যাকেট। প্যারাসুট দিয়ে নামবার সময় যে সব যন্ত্রপাতির ব্যাগ সঙ্গে থাকে তা নিয়ে নামার সময় হয়নি। যাক গে।

কতটা উঁচু এই পাহাড়? কি জানি। বুঝছি না। তবে শ্বাস নিতে একটু কষ্ট হচ্ছে বৈকি। অর্থাৎ একলা একটা লোকের পক্ষে বেশী উঁচু। আবার একজন বোমারু পাইলটের পক্ষে বেশী নীচু। যাক্ গে।

শুধু একটা নিয়ম এখন মেনে চলতে হবে। নীচের দিকে নেমে যাওয়া। পাহাড়ের পর পাহাড়ের ঢেউ। একটা দিয়ে গড়িয়ে নেমে নীচে যেখানে যাই, সেখানে আরেকটা পাহাড়ের গা গড়িয়ে এসে মিশে গেছে। সেখান থেকে আবার উপরে উঠব কি করে? আর উঠেই বা আবার কোথায় যাব? যেখানেই যাই পৃথিবী বন্ধ হয়ে গেছে আমার জন্য। কিন্তু জঙ্গলী জোঁকের রক্তচোষার শিকার মিলে গেছে। একটু পরে পরেই পা থেকে জোঁক ছাড়িয়ে নিতে হয়। বড় জ্বালা করে। মাটির সৃষ্টি কিনা।

পরের দিন।

তারো পরের দিন।

আরো কত পরের দিন এমন করে গেল হিসাব নেই। দিন যায় গড়িয়ে। আমিও।

দুই পাহাড়ের জোড়াতে ছুরি দিয়ে গর্ত করলে একটু জল মেলে কখনো কখনো। একদিন ত একটা ঝর্ণাই পেয়ে গেলাম। কিন্তু ভাল জল খেয়ে ক্ষিধে পেয়ে গেল। কি খাই? কি খাই? পরশু দিন একটা বুনো জানোয়ার পেয়েছিলাম। রিভলবারের গুলীতে মারলাম। পাহাড়ী কাঠ দিয়ে ঝলসিয়ে দু'দিন ধরে খেলাম। তার খানিকটা এখনো পড়ে আছে। কিন্তু পচে গেছে। মাটি আর পাহাড় ত রিফ্রিজারেটার নয়।

মনে পড়ল সেই জাপানী সিপাইর গল্পটা। একবার হামলা দিয়েছিলাম একপাল পথ হারিয়ে যাওয়া জাপানীর উপর। ওরা যে অনেক দিন খেতে পায়নি, তা বুঝতে পেরেছিলাম। ওরা দল থেকে ছিটকে পড়েছিল সে খবর জানতাম। কিন্তু এরাই বেশী বেপরোয়া হয়। তাই ওদের ঠিক মাঝখানে একটা বোমা ফেলে দিলাম। ককপিট থেকে দেখলাম একজনের পিঠ থেকে খানিকটা মাংস আলগা হয়ে খসে গেল। সে বেচারা দৌড়াতে দৌড়াতে খপ করে সে মাংসের টুকরোটা নিজের মুখে পুরে দিল। দিয়েই ফেলে দিয়ে থুথু ফেলতে লাগল। কিন্তু ওর মুখে বাইরে ফেলবার মত থুথুও বাকী ছিল না। এখন সেই জাপানী সিপাইর গল্পটা থেকে থেকে মনে আসছে। যেন আমার বোমারু বিমানের ককপিট থেকে বার বার নীচে পাগলের মত দৌড়ান তার চেহারাটা দেখছি।

তার চেহারাটা আমার উপরের আকাশকে আঁধারে ঢেকে দেয় রোজ রাতে। আগুনে ঝলসিয়ে দেয় রোজ দিনে। সেই ঝলসানোর জ্বালা খাঁক করে দিচ্ছে আমার পেট, আমার হাঁটু। হাঁটুর কথা মনে পড়তেই একবার আকাশের দিকে তাকালাম। ওই আকাশ, তার বুকে পাখীর মত সাঁতার কেটে, ভেসে বেড়াত আমার সুপার ফরট্রেস। মাটিতে ত নয় যে খুঁড়িয়ে না হয় গড়িয়ে চলাফেরা করতে হবে।

আরো ক দিন ক রাত গেল। কতগুলি তা জানি না। হিসাব রাখবার উপায় নেই। রেখেই বা কি হবে। পাটকাই বুম শৈলমালা ম্যাপে দেখেছি আর মুচকি হাসি হেসেছি। জুম জুম করে আকাশ ফুড়ে উঠে যাই। বুম ত কোন্ ছার, "ওভার দি হাম্প", হিমালয়ের কুঁজের উপর দিয়ে এক ঝাঁপ দিয়ে পেঁছে যাই চীনে। পাটকাই বুমকে হিসাবের মধ্যেই আনিনি কখনো। আজ সুবিধা পেয়ে সেই বুমও আমার উপর শোধ তুলছে।

না, তবু আমি হার মানি না। এই খোঁড়া হাঁটু নিয়েই আমি এগিয়ে চলেছি। কোথাও না কোথাও পেঁছাবই।

হঠাৎ আজ সকালে মনে পড়ল উপনিষদে নাকি লেখা আছে চরৈবেতি—এগিয়ে চল। সেই এগিয়ে চলারই চেষ্টা করছি।

পরের দিন হাসি পেল সে কথা মনে পড়ে। পেট আর পিঠ মিশে গেছে, হাত আর পা সমান অকেজো। সামনে একটা বড় নদী। আর আমি মনে করছিলাম উপনিষদের কথা। যেন বৈতরণীর তীরে পেঁছেছি।

কিন্তু নদীটা পার হতে হবে। পায়ের জুতো জোড়া ছাড়া চলে না। রিভলবার আর বাকী গুলীগুলোকেও শুকনো রাখতে হবে। না হলে একেবারে না খেয়ে মরতে হবে। ইউনিফর্মটাও রেখে যাওয়া চলবে না। যদিও এটা বোধহয় নাগা দেশ, এলাইড আর্মি আমায় দুষমন বলে ধরবে। নাগারা হয়ত মাথাটা নিয়ে ঘরের বারান্দা সাজাবে।

তাই সব কিছু সম্বল নিয়েই নদীতে নামলাম। বুট জোড়া বেঁধে তার ফিতে দুটো দাঁতে চেপে রেখেছি। কিন্তু নদীতে বড় স্রোত। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। হাত দুটো অবশ হয়ে গেল। পা দুটো আর চলে না। ইউনিফর্মটা পিঠের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছিলাম। সেটা ভিজে ভারী হয়ে উঠেছে। পাথরের বোঝার মত টেনে আমায় জলের তলায় নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। গা এলিয়ে দিলাম স্রোতে। যাক, যেখানে খুসী নিয়ে যাক।

নাক দিয়ে মুখ দিয়ে জল ঢুকছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। শরীরটা আর বেশীক্ষণ ভাসিয়ে রাখতে পারব না। গলা দিয়ে অনেকটা জল পেটে চলে গেল। নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে যেই মুখ হাঁ করলাম বুট জোড়া নদীতে তলিয়ে গেল। চোখ মেলে তাকাতে গিয়ে দেখি ওপারের কাছে এসে পড়েছি। পারে দাঁড়িয়ে দেখছে সারি সারি নাগা। হাতে বর্শা পিঠে তীর-ধনুক। হেড হান্টার হবে নিশ্চয়ই। একবার এমন মাথাকাটুনে নাগা গ্রামের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলাম। ওরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওদের ঘরের চাল থেকে ঝুলছিল সারি সারি শুকনো ফলা। ফলা নয়, মানুষের কাটা হাত। শুকিয়ে কুঁকড়ে গিয়ে কালো ফলার মত দেখাচ্ছে। আর দেখতে পেলাম না। চোখ বন্ধ হয়ে গেল। কানে আর এল না সর্ সর্ করে ঘা মেরে মেরে এগিয়ে যাওয়া স্রোতের আওয়াজ।

(৩)

বৃহস্পতিবার আর্মি মেসে ব্যান্ড নাইট। আমি এয়ার ফোর্স লেফটেনান্ট রঞ্জন দত্ত গ্রীন হেল থেকে ফার্লো নিয়ে এসেছি। মাত্র ক'দিনের জন্য। আমার কাছে ওরা অনেক মজার মজার গল্প শুনবে। শুনবে সবচেয়ে হালের চটকদার রগড় আর দুষমনের কেচ্ছা। ওই জাপানী সিপাইর নিজের কাঁধের মাংস নিজের মুখে পুরে দেওয়ার গল্পটার মত গল্প নাকি আর দ্বিতীয় হয়নি। 'ব্ল্যাক লেডি' ককটেল মদ আর্মির সবচেয়ে নতুন আবিষ্কার। সেটির দিব্যি দিয়ে বলতে হবে যে এই গল্পটা বানানো নয়, সত্যি।

তাই বেচারী মনোর নিজের হাতের তৈরী রান্না আজ আমার ছুটির শেষ রাতে খাওয়া হবে না। ওর চোখ ছল ছল দেখে বিরক্ত হলাম। সেই সাবেকী প্যানপেনে বাঙ্গালী মেয়ে। এতদিন এয়ার ফোর্স অফিসার্স ফ্যামিলি ব্যারাকে থেকেও শুধরাতে পারল না। হাতের লোহাকে সোনার পাতে মুড়েছে পাছে ফেলো অর্থাৎ সহকর্মী ইংরেজ অফিসাররা ঠাট্টা করে। পাছে বলে যে ওটা পতিদেবতার দেওয়া হাতকড়া। সিঁথির সিঁদুরের ছোঁয়াটা যাই যাই করেও মিলিয়ে গেল না। সেদিন একজন সদ্য বিলেত থেকে আমদানী ওয়াক-আই মেয়ে অফিসার ত জিজ্ঞেসই করে বসল যে, এদেশে পুরুষরা বিয়ের পরে ঠোঁটের বদলে সিঁথিতে চুমু খায় কিনা।

মনো নিজের হাতে ব্যারাকের বারান্দায় তোলা উনুনে রেঁধেছিল। হোক তা মাছের ঝোল, হোক মিষ্টি অম্বল মনো বোঝে না যে আমার পৃথিবী আর মাটিতে নেই। আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ, মনোর সঙ্গে এতদিন পরে ক'দিনের দেখা। আজ শেষ সন্ধ্যাটা এক সঙ্গে থাকার মধ্যে আনন্দ আছে বইকি। কিন্তু আর্মি মেসে বুক ফুলিয়ে ইউনিফর্মের উপরে বোনা পাখীর পাখা জোড়া দেখাব। টেক্কা মেরে বুঝিয়ে দেব আমি রঞ্জন দত্ত ওদের চেয়ে কত উপরে উড়ি। শুধু চলি-ফিরি না; একেবারে ভাসি আর উড়ি। তোমরা যখন মাটির বুকে পিঁপড়ের মত গুটি গুটি হেঁটে এগিয়ে চল, আমি ততক্ষণ বাজপাখীর চেয়ে জোরে বাতাস চিরে উড়ে যাই। ঝড়ের মুখে ঝরা পাতার মত দুষমনকে লণ্ডভণ্ড করে দিই। মনো, বেচারী বাঙ্গালী মেয়ে। স্বামীর গৌরব, তার ওড়বার ক্ষমতা, দৃষ্টির বিশালতা এ সব বোঝে না।

মনে মনে বিশেষ করে সেই কথাটাই ঘুরছিল। আজকের ব্যান্ড নাইটে তাই খুব জাঁকিয়ে গল্প জুড়ে দিলাম। ব্রিগেডিয়ার তখনো এসে পেঁছাননি। সাব অল্টার্ণরা সব-

(ইহার পর ৯৬ পৃষ্ঠায়)

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আছে। গঙ্গাজলের মত ঘোলাটে রঙ ধরেছে। চাতক পাখী উড়ছে অনেক উঁচুতে। দূরে দিগবলয়ে ময়দা কলের চিমনী থেকে ছাই রঙের ধোঁয়া উঠছে সাপের মত এঁকে বেঁকে। আজকের দিনটা যেন গুমোট আর গরমে থমথম করছে। মেঘের আবরণে সূর্য লুকিয়ে আছে, তবুও যেন উত্তাপ কমে না। এমন দিনে কোন কাজে মন লাগে না, চুপচাপ বসে থাকতে ইচ্ছা হয়। আলস্য ধরে যেন। এক গৃহস্থের ঘরের ছাদ ভেদ ক'রে মাথা তুলেছে একটি নারকেল গাছ। হাওয়া নেই, তাই গাছের পাতা অনড় হয়ে আছে। গাছের শিখরে পত্রশাখায় একজোড়া কাক ব'সে আছে কতক্ষণ ধ'রে। গুমোট আবহাওয়ার মতই নিশ্চুপ কাক দু'টো।

টেবিলের ধারে ব'সে মুক্ত জানলা থেকে ঐ গাছটি কতদিন দেখে আশালতা। বৈচিত্রহীন রূপ এখন আকাশের। খন্ড মেঘের চিহ্ন নেই কোথাও, আকাশ যেন একাকার হয়ে আছে। আশালতার সামনে খোলা পড়ে আছে আজকের সংবাদপত্র। আবহ-বিজ্ঞপ্তিতে লিখেছে : 'আজকে ঘন ঘন বজ্রপাতসহ পশলা পশলা বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।' কিন্তু আকাশ এমনই কৃপণ যে, একফোটা বর্ষণের মায়া কাটাতে পারে না। পাখার স্পীড বাড়িয়ে দিতে উঠল আশালতা। অত্যধিক গরমে ভেতরের ছোট জামাটা পর্যন্ত ভিজে গেছে। খোঁপার তলায় ঘাম জমেছে। ভিজে তোয়ালেয় মুখ মুছতে থাকে সে। তারপর একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ড্রেসিং টেবিলের সামনে যায়। সাজসজ্জা কাকে বলে আশালতা যেন ভুলে গেছে। মুখে হাসি নেই, হাসতেও ভুলেছে হয়তো। পাউডারের পাফ্ তুলে খোঁপার তলায় আর ভিজে ঠান্ডা বুকে পাউডার মাখাতে থাকে।

পাখার গতি বর্ধিত হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলনায় ঝুলোনো কাপড়-জামা যেন সজীব হয়ে উঠলো। বুদ্ধদেবের ধ্যানমূর্তির ছবির একটি ক্যালেন্ডার নেচে নেচে ওঠে দেওয়ালে। ঘরের কড়ি থেকে ঝুলন্ত আলোর শেড্ ধীরে ধীরে দুলতে থাকে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত।

আয়নায় নিজেকে লক্ষ্য ক'রলো আশালতা। এই প্রথম দেখলো, তার মুখশ্রী নেই আর আগের মত। শুভ্রবর্ণ ঘুচে গিয়ে তামাটে রঙ হয়েছে মুখের। চোখের তলায় ঘন কালিমা। রাঙা অধর কেমন যেন কৃষ্ণাভ হয়ে আছে। চোখের চাউনিতে ভয়ের উদ্বেগ। রুখু চুলের অবাধ্য কুন্তল নাচে কপালে। কি মনে পড়ে কে জানে, আশালতার বুক দুরু দুরু করে থেকে থেকে। হাত দুটি ঠান্ডা হয়ে যায় যখন তখন। সিঁথির সিঁদুর প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে, খেয়াল নেই তার। রুদ্ধদ্বার ঘরে দিনের পর দিন একলা থেকে থেকে পৃথিবীর রূপটা যেন ভুলে গেছে।

কি মনে পড়লো কে জানে, আশালতা আয়নার সমুখ থেকে সরে যায়। টেবিলের ধারে ষ্টীলের চেয়ারটায় আবার বসে পড়লো চোখে দু' হাত চেপে। নেহাৎ শ্বশুরবাড়ী তাই অ'র ডাক ছেড়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে পারে না। এমনই অনন্যোপায় যে কান্নার অধিকারও যেন নেই তার। চাপা কান্নার গরম অশ্রুধারায় হাতের তালু সিক্ত হতে থাকে। লজ্জা আর সঙ্কোচে মুখ দেখাতে পারে না আশালতা। ঘর থেকে সহজে বেরোতে চায় না। আশালতা যেন এক অসূর্যম্পশ্যার চরিত্র অভিনয় করে।

নাঃ, আর কাঁদবে না কখনও। কতবার মনে মনে পণ করেছে আশালতা। কিন্তু শপথ রক্ষা হয় না। চোখের জল এমনই অবাধ্য! আঁচলে চোখ মুছতে হয়, যদি কেউ ঘরে এসে পড়েন সেই আশঙ্কায়। আশালতার কোন দোষ নেই, তবুও শাস্তি ভোগ থেকে রেহাই পায় না সে। অবরোধবাসিনীর মত লুকিয়ে থাকতে হয়। শাশুড়ী আর ননদরা বলেন,—স্বামীকে বশ করতে পারে না যে মেয়ে তার আর বেঁচে থেকে লাভ কি! তার মরণই মঙ্গল। অন্য মেয়ের দিকে চোখ পড়বে কেন বিয়ে করা স্ত্রী থাকতে!

অন্য মেয়ের দিকে দৃষ্টিদানের জন্য কোন ক্ষোভ আর জ্বালা নেই আশালতার মনে। তাকে ছেড়ে অন্য একজনের প্রতি আকর্ষণের জন্য একবিন্দু হিংসা হয় না তার। আশালতা এমনই অনন্যা নয়। কিন্তু লজ্জা আর ভয় থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় কোন্ উপায়ে! বুকে উদ্বেগ নিয়ে প্যাড আর কলম টেনে নেয় আশালতা। খস খস চিঠি লিখে যায় একটানা। একবারও থামে না, একটি শব্দ পর্যন্ত বদলায় না কেটে-কুটে। আশালতা লিখে যায় :

১২বি, ক্যামাক ষ্ট্রীট,
মাননীয় ডাক্তার সেনগুপ্ত, কলিকাতা।

আমি আপনার মূল্যবান উপদেশ পাওয়ার আশায় এই চিঠি লিখছি। এই চিঠির কথা আমি আর আপনি ছাড়া পৃথিবীতে তৃতীয় কোন কেউ জানতে পারবে না। আমার অনুরোধ, আপনিও জানাবেন না। খুব শীঘ্র আমাকে একটা কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবেই, কিন্তু আমি কিছুতেই স্থির করতে পারছি না কার

কথায় আমি বিশ্বাস রাখতে পারি। আমি আমার বাবা আর মাকে পর্যন্ত মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছি না। কারণ তাঁদের জানালে তাঁরা হয়তো আর আমাকে শ্বশুরঘর করতে দেবেন না। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, বিয়ে হওয়ার পর মেয়ে যদি শ্বশুরঘর করতে না পায়, কি অবস্থা হয় তার। বিশ্বাস করুন, মনের কথা আপনাকে জানাতে না পারলে যেন শ্বাসরোধ হয়ে আসছে আমার। আপনি যা উপদেশ দেবেন তাই পালন করবো। যখন তখন আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু পারি না লোকলজ্জার ভয়ে। আত্মহত্যা করলে সমাজের কাছে কি পরিচয় আমার রেখে যাবো, আপনিই বলুন। তা ছাড়া শুনেছি, আত্মহত্যার মত পাপ আর নেই। পাপের ভয় না থাকলে কেরোসিন তেলের সাহায্যে নিজের দাহকার্যটা নিজেই সেরে ফেলতাম।

আমার অবস্থাটা আপনাকে খুলেই জানাচ্ছি। আমার বিয়ে হয় গত বৈশাখে। আমার স্বামী একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক, তা আপনি জানেন। কেন না, আমার বিয়ের রাতে আপনিও এসেছিলেন আমন্ত্রণ পেয়ে। আপনার মনে আছে কিনা জানি না, প্রীতি-উপহার দিয়েছিলেন আপনি—একটি কাসকেট। যাই হোক, আমি জানতাম না, আমার স্বামী বিয়ের আগে থেকেই একজন মেয়েকে ভালবাসতেন। স্বামীর কাগজপত্রের মধ্যে একদিন একখানি চিঠি পাই। রঙীন কাগজে লেখা প্রেমপত্র। সেই চিঠি দেখেই আমি সব কিছু জানতে পেরেছি। কিন্তু এটা আমার কোন বিপদ নয়। অন্য কাকেও ভালবাসায় আমার মনে হিংসা বা বিদ্বেষ আসে না। বরং বেশ রোমাঞ্চই লাগে এই কথা ভাবতে।

ফুলশয্যার রাত্রিটা আমার ঘুমিয়েই কেটেছিল। স্বামী নিজেই বললেন, তাঁর শরীর ভাল নয়। আমেরিকায় তৈরী ওষুধের শিশি বের করে দুটি ট্যাবলেট খেতে দেখলাম তাঁকে। ওষুধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লেন। বুঝলাম না কিছুই। জেগে বসে সেই স্মরণীয় রাতটা কাটিয়ে দিলাম। এই রকম আরও কয়েকটি রাত কেটে গেল। তারপর একদিন দেখলাম, ডাক্তার এসেছেন। আমার স্বামীর হাতে কি এক ইনজেকশন দিচ্ছেন। তারপর একদিন তিনি অফিস থেকে আর বাড়ী ফিরলেন না। শুনলাম তিনি নাকি হাসপাতালে গেছেন। কেন গেছেন কিছুই জানতে পেলাম না। শাশুড়ী আর ননদরা আমাকে ভর্ৎসনার সুরে কথা বলতে শুরু করলেন। স্বামীর কাগজপত্রের মধ্যে একখানি রক্ত পরীক্ষার কাগজ খুঁজে পেলাম একদিন। পড়ে কিছুই বুঝলাম না। শুধু মাত্র একটি কথা অতি কষ্টে বুঝলাম—শব্দটি ইংরেজীতে লেখা Gonorrhoea—যদিও তার অর্থ কিছুই বুঝলাম না। শুধু মাত্র বুঝলাম, এ এক কোন গোপন ব্যাধি। আপনি নিশ্চয়ই বুঝেছেন, আমি কি বলতে চাইছি। এখন আপনি আমাকে বলে দিন, আমি তাঁর সঙ্গে আর একত্রে বসবাস করতে পারি কি না। ইতিমধ্যে একদিন হাসপাতালে গিয়েছিলাম তাঁকে দেখতে। স্বামী আর স্ত্রীর সম্পর্ক কি আমি এখনও জানতে পারলাম না, কারণ তাঁর খুব কাছে একদিনও আমি যাই নি। হাসপাতালের ডাক্তার বললেন, ভয় নেই কিছু। আমার স্বামীও আমাকে একা পেয়ে বললেন,

যাত্রীর আশায় রমেন পাল

'ভয় নেই, আমি ঠিক সেরে উঠবো।' আমার বেশ মনে পড়ে, আমার বাবা একবার যেন বলেছিলেন, মানুষের কতকগুলি গোপন ব্যাধি আছে যা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। মৃত্যু নাকি অবশ্যম্ভাবী সেই সব রোগে। আমি আমার বাবার কথা বিশ্বাস করি। আমার স্বামীর কথাও বিশ্বাস করি, তিনি সেরে উঠবেন। কিন্তু আপনার কাছ থেকে উপদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কোন বিশ্বাসই ধ'রে রাখতে পারছি না মনের মধ্যে। হতাশায় কেমন যেন মুসড়ে পড়ছি। আপনার পায়ে পড়ি, আপনি আমাকে ব'লে দিন আমি কি করতে পারি। আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন কেবলমাত্র আপনিই, আর কেউ নয়। আপনার চিঠির আশায় আমি বেঁচে থাকলাম জানবেন। শত সহস্র প্রণাম গ্রহণ করবেন। ইতি—

আশালতা বসু।

লেখার শেষে চিঠি ভাঁজ ক'রে খামে ভরতে ভরতে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো আশালতা। খামের আঠা জিবে ভিজিয়ে খাম এঁটে ফেলে তাড়াতাড়ি। শাশুড়ী কিংবা ননদরা যদি ঘরে হঠাৎ এসে পড়েন, সেই ভয়ে খামখানা বালিশের তলায় রেখে দিতে হয়। এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে ছিল যেন। খামখানা লুকিয়ে রেখে একটি স্বস্তির শ্বাস ফেললো যেন। কোথাও কারও পদধ্বনি শুনতে না পেয়ে খামটি আবার বের করলো। ডাক্তার সেনগুপ্তের নাম আর চেম্বারের ঠিকানা লিখতে হবে।

আশালতা ভাবে, ডাক্তার সেনগুপ্ত নিশ্চয়ই পথ বাতলাতে পারবেন। কর্তব্য বলে দিতে পারবেন। কেন না, প্রত্যহ তিনি কতজনকে উপদেশ দিচ্ছেন, কতজনকে রক্ষা করছেন মৃত্যুর হাত থেকে। হয়তো অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে তাঁকে জানাতে। অনেক, অনেক দেরী হয়ে গেছে, যখন আর হয়তো কোন উপায় নেই। হঠাৎ যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলো আশালতা। ঠিকানা লেখা শেষ হতেই খামখানি বুকের মধ্যে পুরে রাখলো ভয়ে ভয়ে। দুরু দুরু বুকে জুতোয় পা গলিয়ে রুদ্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো। সিঁড়ির পথ ধরে নেমে চললো তর তরিয়ে। অনেক অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে হয়তো। আর হয়তো কোন উপায় নেই। কে জানে এখনও, এখনও হয়তো সময় আছে। এখনও যদি এই চিঠি পাঠানো যায়, হয়তো মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে আশালতা। দ্রুতগতিতে পা চালিয়েছে আশালতা। কার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে যেন ছুটে চলেছে।

শাশুড়ী কোথায় ছিলেন, জুতোর শব্দ পেয়ে সিঁড়ি মুখে এসে হাজির হলেন। বললেন,—বৌমা, কোথায় চললে তুমি এমন হনহনিয়ে? বলে গেলে না যে!

—হাসপাতালে যাচ্ছি মা। তাঁকে দেখতে। ভিজিটিং আওয়ার শেষ হওয়ার আগে না পৌঁছলে—

আশালতার শেষ কথা শোনা গেল না। সদরের দরজা পেরিয়ে রাস্তায় নেমেছে সে। কার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে যেন ছুটে চলেছে।

হাসপাতালের রাস্তা নয়, ডাকঘরের রাস্তা ধরলো আশালতা। আশপাশের পথিকরা তার এই ব্যস্ত চলা সাগ্রহে লক্ষ্য করছে, দৃষ্টি নেই যেন সেদিকে।

মেঘ ডাকলো কড়কড়িয়ে। হঠাৎ গর্জে উঠলো আকাশ। বিদ্যুতের ঝলক খেললো সোনালী ঝিলিক তুলে। অনেক আশার চিঠিখানি বুকে ধ'রে রেখে আশালতা ডাকঘরের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। তার নিজের জীবন-মরণের সমস্যা ঝুলছে মাথার 'পরে। তাই আর হাসপাতাল নয়, সোজা ডাকঘরের পথ ধ'রে চললো সে।

আবার মেঘ ডাকলো গুম গুম শব্দে। ঘন ঘন কামান দাগার মত শব্দ ভাসছে ইথারে। বিদ্যুতের সোনালী ঝিলিক লাগছে আশালতার দেহে। হয়তো বজ্রপাত হবে এখনই।

ডাকঘরের লাল ডাকবাক্সটা বহুদূর থেকে চোখে পড়ে। লাল পোষ্ট বক্সের হাতছানি দেখতে পায় যেন আশালতা। মৃত্যু নয়, জীবনের আশা দেয় যেন ডেকে ডেকে। আশালতা প্রায় ছুটতে থাকে যেন। হাসপাতালের ভিজিটিং আওয়ার শেষ হওয়ার ভয় নেই, ডাকঘরের লাষ্ট মেল চলে যাওয়ার সময় না উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

আকাশ আবার ডাক দেয়। কামান দাগার মত গুম গুম শব্দ ভাসে ইথারে। আশালতা আরও জোরে পা চালায়। লাষ্ট মেলকে ধরতেই হবে আজ!

পাগলিনী

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

শেষ পর্যন্ত নিজের বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় নি পাটনার সমরেশ চাটার্জিকে; নিস্তারিণীকে নিয়ে সপরিবারে অসিতই দেশে ফিরে গিয়েছে।

তবে নিস্তারিণীর রোগ সারে নি। কি করে সারবে? ও যে শিবেরও অসাধ্য রোগ।

প্রাচীন পাটলিপুত্রের খ্যাতির সঙ্গে তুলনীয় নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু একালের পাটনা শহরের বিনামূল্যে বিতরণীয় পাগলের মহৌষধির খ্যাতি সে সময় নিতান্ত কম ছিল না। সেই খ্যাতির আকর্ষণে মধুলুব্ধ ভ্রমরের মত আকৃষ্ট হয়ে ঢাকা থেকে অসিত মজুমদার সমরেশকে চিঠি লিখেছিল যে, তার প্রৌঢ়া মায়ের চিকিৎসার জন্য তারা সপরিবারে পাটনায় এসে সমরেশের বাসায় কিছুদিন অতিথি হিসাবে অবস্থান করতে চায়।

রোগিণী সমরেশের অপরিচিতা; কিন্তু অসিত কলকাতার কলেজে তার সহপাঠী ছিল। সেই সময়ে যে বিশেষ কারণে তাদের পরিচয় প্রগাঢ় সৌহার্দ্যে পরিণত হয়েছিল তা তাদের উভয়ের চেহারার আশ্চর্য সাদৃশ্য। সে সময়ে অনেক অধ্যাপকও নাকি তাদের একজনকে আর একজন বলে ভুল করতেন। ওরকম বিস্ময়কর সাদৃশ্যের সুযোগ তারা নিজেরাও পুরোপুরি উপভোগ করতে চাইত বলেই অনেক মধুর ও কুটিল ষড়যন্ত্রের ভিতর দিয়ে তাদের বন্ধুত্ব গাঢ় হয়ে উঠেছিল। সুতরাং কলেজের পড়া শেষ হবার পরেই তাদের পরস্পরের ছাড়াছাড়ি হয়ে থাকলেও একজনের স্মৃতি আর একজনের মনের তলায় বেঁচে ছিল। অসিতের চিঠি সমরেশের হাতে এল তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে, সে চিঠি একটিবার পড়তেই সমরেশের মনের পরদার উপরেও অসিত সম্পর্কীয় অনেক মধুর স্মৃতিই জ্বল জ্বল করে ফুটে উঠল।

আপত্তি করতে পারলে না সমরেশ। অন্তরের তাগিদ না থাকলেও আপত্তি করা শক্ত হত তার পক্ষে। সে ভাল চাকরি করে; সে অবিবাহিত; এবং বড় বাড়ীতে একটি মালী ও একটিমাত্র পাচক ভৃত্য নিয়ে সম্পূর্ণ নির্ঝঞ্ঝাট তার জীবন। এ রকম লোক বিপন্ন অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করবে কোন যুক্তিতে?

সুতরাং অসিতকে সপরিবারে সাদর নিমন্ত্রণ জানিয়েই তার পত্রের উত্তর দিল সমরেশ। নির্দিষ্ট দিনে নিজেই স্টেশনে গিয়ে অভ্যর্থনা করেও নিয়ে এল ওদের সবাইকে।

নিস্তারিণীকে সে ভাল করে দেখলে ওঁরা তার বাসায় আসবার পর। প্রথম দৃষ্টিতে রোগের কোন চিহ্নই দেখা যায় না তাঁর মধ্যে। বয়স যা-ই হোক, দেহ বেশ শক্ত আছে তাঁর; তেমনি অক্ষুণ্ণ আছে ওঁর গঠনের পারিপাট্য। নিস্তারিণীর বর্ণ উজ্জ্বল গৌর। গরদের থানের আবরণের মধ্যে তাঁর মহিমময়ী মাতৃমূর্তি। তাঁর চলাফেরা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; অস্বাভাবিক যদি কিছু থাকে তো কেবল তাঁর চোখ দুটিতে। কেমন যেন নিষ্প্রাণ সে চোখের দৃষ্টি—কাছের সব কটি মানুষ ও সব দৃশ্যবস্তুকে নির্মমভাবে উপেক্ষা করে কিসের সন্ধানে যে তা নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে তা অনুমান করবারও উপায় নেই। আর চোখ দুটি অমন নিষ্প্রাণ বলেই তাঁর অমন সুগঠিত মুখখানিও মনে হয় যেন পাথরের অসম্পূর্ণ কোন মূর্তির মুখাবয়ব।

সমরেশের প্রশ্নের উত্তরে অসিত বললে, মাকে এই এখন যেমন তুমি দেখছ, অধিকাংশ সময়েই প্রায় এমনি থাকেন উনি,—এমনি শান্ত, এমনি উদাসীন।

যেন চিনতেই পারেন না আমাদের, বললে অসিতের স্ত্রী সুলতা, কথা যদি কিছু বলেন তো সে একা ঐ মঙ্গলা পিসীমার সঙ্গে—যাকে সঙ্গে আনতে হয়েছে মায়ের পরিচর্যার জন্য। তবে—

বলে হঠাৎ থেমে গেল সুলতা; অসিতের সঙ্গে চকিতে একবার চোখাচোখি হল তার; তারপর কতকটা যেন অপ্রতিভের মত সে আবার বললে, আর বাইরের লোক বাড়ীতে এলে অনেক সময়ে অদ্ভুত আচরণ প্রকাশ পায় ওঁর মধ্যে।

ঘুম? সমরেশ জিজ্ঞাসা করলে অসিতকে, ঘুম কেমন হয় ওঁর?

খুব কম, অসিত উত্তর দিল, গভীর রাত্রেও খোঁজ নিতে এসে দেখেছি, শুয়ে শুয়েও চোখ মেলে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে আছেন।

নিস্তারিণীর কাছে এগিয়ে গেল সমরেশ; একটু ইতস্ততঃ করে একেবারে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে সে।

প্রতিক্রিয়া যেটুকু দেখা গেল তা নগণ্য। পা টা একটু সরিয়ে নিলেন নিস্তারিণী; সমরেশের মুখের দিকে চেয়ে মুহূর্তের জন্য তাঁর চোখের তারা দুটি ঈষৎ যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন তিনি।

পাশের ঘরে গিয়ে সমরেশ অসিতকে জিজ্ঞাসা করলে, কতদিন হল এ রকম হয়েছে?

অসিত উত্তর দিল, এই বছর দেড়েক হবে।

কেন এ রকম হল?

দেবাঃ ন জানন্তি।—ম্লানমতন একটু হেসে উত্তর দিল অসিত।

হাসি থামিয়ে একটু পরে অসিত আবার

বললে, আমাদের আত্মীয় ও প্রতিবেশীরা সবাই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন ভাই। দেখছ তো মায়ের স্বাস্থ্য—কোন দিন কোন শক্ত রোগে ভোগেন নি উনি। সকলেই দেখেছেন ও'র অসাধারণ মনের জোর। আমাকে কোলে নিয়ে বিধবা হয়েছিলেন মা। কিন্তু অতবড় আঘাতও ওকে কাবু করতে পারে নি। শক্ত হাতে সংসার-তরণীর হাল ধরে তকে তীরে এনে ভিড়িয়েছেন উনি—হ্যাঁ, ভিড়িয়েছেন বলব বই কি! ও'রই চেষ্টা ও পরিচালনায় আমি লেখাপড়া শিখেছি, চাকরি পেয়েছি, বিয়ে করে সংসারী হয়েছি। আর তার পর কি না এই অবস্থা হল ও'র।

তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে অসিতের চোখের দিকে চেয়ে সমরেশ জিজ্ঞাসা করলে, তুমি ও'র মনে কোন শক্ত আঘাত দাও নি তো?

না ভাই, হেসে উত্তর দিল অসিত, বরং ও'র মনে বিন্দুমাত্রও আঘাত যাতে না লাগে সেই জন্য নিজের অনেক স্বপ্নকে গলা টিপে মেরে উনি বলতেই ও'রই পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে করলাম আমি। তা সত্ত্বেও—

চুপ করলে অসিত। বেশ বুঝতে পারলে সমরেশ যে, শেষের দিকে অসিতের গলাটা ভারি হয়ে এসেছে।

তার নিজের বুকের ভিতরটাও কেমন যেন করে উঠল। সমবেদনার কোমল কণ্ঠে সে বললে, দেখ একবার পাটনার দৈব ওষুধ ব্যবহার করে। এত যখন এর জনপ্রিয়তা, তখন নিশ্চয়ই অনেকের উপকার হয় এ ওষুধে। মাসীমারও উপকার হতে পারে।

সুলতার কাছে অগ্রিম মার্জনা চেয়ে নিলে সমরেশ। লক্ষ্মীহীন সংসারে লক্ষ্মীছাড়া তার জীবন। সকালে সে অনেক বেলায় ওঠে, ভাতে-ভাত খেয়ে আপিসে যায়, মধ্যাহ্ন ভোজন করে আপিস থেকে ফিরবার পর এবং তারপর নিজের ঘরের সবকটি দরওয়াজা-জানালা বন্ধ করে প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত সে গাঢ় দিবানিদ্রা উপভোগ করে। সন্ধ্যার পর সে ছাদে গিয়ে বসে সখের লেখাপড়া করবার জন্য; রাত ন'টার পর সে বেড়াতে, মানে আড্ডা দিতে বের হয় এবং মধ্যরাত্রে ফিরে এসে সে কাউকে না জাগিয়ে এবং কিছুই না খেয়ে শয্যাগ্রহণ করে।

এ রকম লোকের কাছে কোন সাহায্যই প্রত্যাশা করবেন না আপনারা। —উপসংহারে সমরেশ বললে, সুতরাং আমার সবেধন নীলমণি এই গিরিধারীকে আপনাদের হাতে সমর্পণ করে আমার কর্তব্য আমি শেষ করলাম।

অবশ্য একথা বলবার পূর্বে সাত দিনের ব্যবহার্য পাগলের মহৌষধ সম্পূর্ণ বিধানপত্র সহ অসিতকে এনে দিয়েছিল সে।

প্রথম দু'দিন নিস্তারিণীর দেহে ঔষধের কোন প্রতিক্রিয়াই প্রকাশ পেল না। কিন্তু তৃতীয় দিন দেখা গেল যে, সকালবেলাতেই তিনি ঘুমোচ্ছেন। সেই শুরু: তারপর আর সময় অসময় নেই। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পুত্র, পুত্রবধূ ও সকলাকে একেবারে তাক লাগিয়ে দিলেন তিনি। মহৌষধ যিনি বিতরণ করেন, তিনি সংবাদ পেয়ে খুশী হয়ে বললেন, এটি অতীব সুলক্ষণ। চালিয়ে যান আমার ওষুধ। রোগিণী নিঃসংশয়ে আরোগ্যলাভ করবেন।

আপাততঃ অসিত আর সুলতা তাদের চিন্তারোগ থেকে অনেকটা অব্যাহতি পেল যেন। সমরেশ তাদের উৎসাহ দিয়ে বললে, মাসীমার জন্য এখন একা তোমাদের এই পিসীমাই যথেষ্ট। তোমরা এখন নিশ্চিন্ত হয়ে পাটনা আবিষ্কার করতে বের হতে পার। কাছাকাছি রাজগীর-নালন্দা দেখে আসতে চইলেও আপত্তি নেই।

অসিত সুলতার দিকে চেয়ে লুব্ধকণ্ঠে বললে, তা মন্দ হয় না। যাবে নাকি?

সুলতা কিন্তু একটুও উৎসাহ প্রকাশ করলে না; বরং মুখ গম্ভীর করে ঘাড় নেড়ে সে বললে, না, কারণ তোমার মত কাণ্ডজ্ঞান আমার লোপ পায় নি।

ফিরে সমরেশের মুখের দিকে চেয়ে ঈষৎ একটু হেসে সে বললে, না সমরেশবাবু, অতদূরে যাওয়া চলবে না। তবে এখন থেকে বৈকালে বেড়াতে বের হব আমরা।

এর দিন দুই পর নিস্তারিণীকে দেখে সমরেশের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

সকাল আটটায় অভ্যাস ও নিয়মমত রান্না-ঘরের বারান্দায় ভাতে-ভাত খেতে বসেছিল সমরেশ।

জায়গাটা খোলা। ওখান থেকেই একদিকে প্রাঙ্গণ ও স্নানের ঘর এবং অপরদিকে মূল অট্টালিকার খান কয়েক প্রকোষ্ঠ বেশ দেখা যায়। অন্দরমহলে একা গিরিধারী ছাড়া আর কারও চোখ সমরেশকে কোন দিন আঘাত করে না বলেই খাবার জায়গা হিসাবে ঐ খোলা বারান্দাই সে নির্বাচন করেছিল।

কিন্তু সেদিন ঘাড় গুঁজে খেতে খেতে হঠাৎ এক সময়ে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হল সমরেশের। মাথা তুলে ঘাড়টি বাঁ দিকে ঈষৎ ফিরিয়ে চমকে উঠল সে—স্নানের ঘরের খোলা দরওয়াজার সামনে দাঁড়িয়ে অনবগুণ্ঠিতা নিস্তারিণী একদৃষ্টে তারই দিকে চেয়ে আছেন। আরও বিস্ময়ের বিষয়, নিস্তারিণীর পাথরের মত চোখ দুটিতে যেন দৃষ্টি ফুটেছে। সমরেশের আরও মনে হল যে সে দৃষ্টিতে যেন ঈষৎ কৌতূহলও মাখা রয়েছে।

খাওয়া আর হল না সমরেশের। কিন্তু নিজে সে পাত ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই নিস্তারিণী মুখ ফিরিয়ে তাঁর অভ্যস্ত ধীর-মন্থর গতিতে তাঁর শোবার ঘরের দিকে চলে গেলেন।

তাঁর ঘরের সম্মুখ দিয়েই সমরেশের নিজের ঘরে যাবার পথ। দোরের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল সমরেশ; একটু ইতস্ততঃ করবার পর মাথাটা ঘরের ভিতরে ঢুকিয়ে নিস্তারিণীকে উদ্দেশ করে সে বললে, এখন কেমন আছেন মাসীমা।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। নিস্তারিণী মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন, ভাল।

কিন্তু তার পরেই একেবারে বিপরীত দিকে ফিরে বসলেন তিনি।

রাত্রে ঘটনাটা অসিতের কাছে আনুপূর্বিক বর্ণনা করলে সমরেশ। তারপর বললে, আমার মনে হয় যে, ওষুধে খুব ভাল কাজ হচ্ছে।

শুনেই অসিত ও সুলতার মধ্যে সচকিত দৃষ্টি বিনিময় হল; তারপর অসিত মাথা নেড়ে সন্দিগ্ধ স্বরে বললে, কৈ আমার তো মনে হল না তা। বরং পিসীমার মুখে শুনলাম যে, আজ দুপুরে খুব কম ঘুমিয়েছেন উনি।

একটু থেমে সে আবার বললে, তবু তুমি যখন বলছ, তখন দেখি আর একবার।

মিনিট দশেক পর ফিরে এসে অসিত বললে, না ভাই, কোন পরিবর্তনই চোখে পড়ল না আমার—একটি প্রশ্নেরও উত্তর পেলাম না।

শুনে সমরেশ অপ্রতিভের মত বললে, কি জানি! তবে আমিই জেগে স্বপ্ন দেখলাম নাকি?

নাও হতে পারে, মন্তব্য করলে সুলতা, বাহিরের লোকের সংগে মাঝে মাঝে কথা বলেন উনি। দু এক সময় এমন ব্যবহারও করেছেন যে, আমরা সবাই ভড়কে গিয়েছি। না গো?—বলে সুলতা তাকাল অসিতের দিকে।

অসিত অপ্রতিভের মত চোখ নামিয়ে নিলে। কিন্তু সমরেশ হেসে সকৌতুক কণ্ঠে বললে, না, আমি যদি জেগে স্বপ্ন না দেখে থাকি তো যা দেখেছি, তাতে ভড়কাবার মত কিছুই ছিল না।

কিন্তু পরদিনই মত বদলাতে হল সমরেশকে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঘুম থেকে উঠে যথারীতি ছাদে গিয়ে বসেছিল সে।

মোটামুটি রকমে সাজানো তার ছাদের এই নিরিবিলি কোণটি। চেয়ার আছে, টেবিল আছে, ওর উপর আছে একটি টেবিল ল্যাম্প। পাশে একখানা ক্যানভাসের আরাম কেদারা। সিঁড়ির দিকে পিছন ফিরে তাতেই চুপ করে বসেছিল সমরেশ।

রোজই এ সময়ে এমনি করে সে। চা খেয়ে শূন্য বাটিটি পিছনে নামিয়ে রাখে, যাতে গিরিধারী নিঃশব্দে এসে তার মনোযোগকে বিক্ষিপ্ত না করেও সেটি নিয়ে যেতে পারে। নিজে সে অন্ধকারে চুপচাপ বসে থাকে কিছুক্ষণ, লিখবার বা পড়বার জন্য মনে মনে তৈরি হয়ে নেয়।

সেদিনও চুপচাপ বসে ছিল সমরেশ। অন্ধকার তখনও গাঢ় হয়নি—আলো জ্বালবার কথাই ওঠে না এ রকম সময়ে; সুতরাং লেখা বা পড়া শুরু করবারও নয়।

হঠাৎ পিছন থেকে মাথার উপর কোমল একটি স্পর্শ অনুভব করলে সমরেশ। চমকে মুখ ফিরাতেই তার চোখে পড়ল—ঠিক তার পিছনে দাঁড়িয়ে নিস্তারিণী। তাঁর ডান হাত-খানি সমরেশের মাথার উপর থেকে অনিবার্য-রূপেই সড়ে গিয়ে থাকলেও তখনও প্রসারিত রয়েছে।

একেবারেই অবিশ্বাস্য ব্যাপার—সন্দেহ হয় যে অলৌকিক। শিউরে উঠল সমরেশ। বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মতই উঠে দাঁড়িয়ে অস্ফুট স্বরে সে বললে, মাসীমা, আপনি!—

উত্তর হল, একা এই অন্ধকারে বসে থাকে নাকি!! ঘরে চল।

তারপরেই বিস্মিত সমরেশকে একেবারে যেন পাথরে পরিণত করে দিয়ে নিস্তারিণী চায়ের শূন্য বাটিটি হাতে তুলে নিয়ে তাঁর পক্ষে অসাধারণ ক্ষিপ্রপদেই যেন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেন।

ঘটনাটি ঘটতে একটি মিনিটও সময় লাগেনি। শূন্য ছাদে একা দাঁড়িয়ে বিশ্বাসই হচ্ছিল না সমরেশের যে অমন একটি ঘটনা সত্যই ঘটেছে। কিছুক্ষণ মূঢ়ের মত ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবার পর স্বীয় অন্তরের সন্দেহের নিরসনের জন্য সে-ও নীচে নেমে গেল।

না, চোখের বা কানের ভুল তার নয়। ননদিনী মৃদু স্বরে ভৎসনা করছিলেন

নিস্তারিণীকে। বেশ বোঝা যায় যে, একটু আগেই চায়ের পেয়ালাটি নিস্তারিণীর হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে সে। সমরেশকে সেখানে উপস্থিত দেখে মঙ্গলাই অপরাধিনীর মত বললে, আমি একটু বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, বাবা,—এরই মধ্যে উনি উপরে গিয়ে এই কাণ্ডটি করে বসেছেন। কি জানি কি খেয়াল চেপেছে ওঁর মাথায়!

সুইচ টিপে আলো জ্বালল সমরেশ। স্পষ্ট দেখা গেল নিস্তারিণীর মুখ। কিন্তু একটু আগেই ছাদে দাঁড়িয়ে সমরেশ তার যে মুখ দেখেছিল, এ সে মুখ নয়; এটি ভাবলেশহীন পাগলিনীর মুখ, চোখ দুটি খোলা থাকলেও তাতে যেন দৃষ্টি নেই।

মঙ্গলাই পুনরায় সনির্বন্ধ কণ্ঠে সমরেশকে বললে, অসিত বা বৌমাকে এ কথা যেন বলো না বাবা। তারা জানতে পারলে আমাকেই বকবে!

চুপ করেই থাকল সমরেশ। কিন্তু সেটা বাইরে। মনের মধ্যে তার অনেকক্ষণ পর্যন্ত তুমুল আলোড়ন চলল। থেকে থেকেই সন্দেহটা তার মনের মধ্যে খচ খচ করতে লাগল ছাদে গিয়ে নিস্তারিণী যা করেছেন, সে কি নিছকই পাগলামি? আর তা যদি না হয় তো কি তা?

সুতরাং পরদিন সকালে আবার যা ঘটল তা সমরেশের কাছে বিস্ময়কর ঘটনা হলেও একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়।

যথাসময়ে যথারীতি স্নান সেরে খেতে বসেছিল সে, গিরিধারী যথানিয়মে খাদ্য পরিবেশন করবার পর যথারীতি ফিরে গিয়ে তার নিজের কাজে মন দিয়েছিল। কিন্তু মাথা নীচু করে খেতে খেতে সেই আর একদিনের মত হঠাৎ এক সময় সমরেশ সচকিতে মুখ তুলতেই সে দেখলে একেবারে তার পাতের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন নিস্তারিণী। তাঁর মুখে গাম্ভীর্য কিন্তু দৃষ্টি শান্ত এবং কোমল। তাতে আবার উদ্বেগের আভাস।

আগের দিন ছাদে তাঁর যে স্বর শুনেছিল সমরেশ অবিকল সেই স্বরেই নিস্তারিণী বললেন, এ কি খাচ্ছ তুমি? এই খেয়ে কি মানুষে বাঁচে?

উত্তর দিবার সময়ই পেল না সমরেশ, রান্নাঘরের ভিতরে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল গিরিধারী—হঠাৎ যেন ভূত দেখেছে সে।

আর তারই দিকে মুখ ফিরিয়ে নিস্তারিণী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, এ কি ছাই রেঁধেছ ঠাকুর? কাল থেকে তোমার আর রেঁধে কাজ নেই আমিই রাঁধব।

কিন্তু পরক্ষণেই একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। ওদিক থেকে 'হা' 'হা' করে মঙ্গলা ছুটে এল এবং তার পিছনে পিছনে অসিত ও সুলতা।

সুলতা গালে হাত দিয়ে বললে, যা ভয় করেছিলাম আমি শেষ পর্যন্ত তাই হল।

অসিত নিস্তারিণীকে উদ্দেশ করে ধমক দিয়ে বললে, এখানে এসেছ কেন মা? চল, ঘরে চল।

সমরেশের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে অন্য স্বরে বললে, মা তোমার খাওয়া মাটি করলেন বুঝি?

সমরেশ যতখানি বিব্রত, তার চেয়ে বেশী বিরক্ত হয়ে বললে, উনি আমার খাওয়া মাটি করবেন কেন? করছ তো তোমরা।

সুলতার দিকে চেয়ে সে বললে, আপনি তো আরও অবাক করলেন আমাকে। কি ভয় করেছিলেন আপনি আর কি হল? আমি তো দেখলাম যে মাসীমা বেশ ভাল হয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু এখন দেখুন, বললে সুলতা আঙ্গুল দিয়ে সে দেখাল নিস্তারিণীর দিকে।

প্রতিবাদ করবার উপায় নেই। আবার যেন পাথর হয়ে গিয়েছেন নিস্তারিণী; আবার ফিরে এসেছে তার ভাবলেশহীন মুখ, লক্ষ্যহীন উদাস দৃষ্টি, আর অমন যে নির্মম পরিবেশ তারও প্রতি একটা কঠিন উপেক্ষা।

টেনে ও ঠেলে সুলতা ও মঙ্গলা নিস্তারিণীকে তার নিজের ঘরের দিকে নিয়ে গেল।

ভাতের থালায় জল ঢেলে উঠে দাঁড়াল সমরেশ।

অসিত নিকটেই দাঁড়িয়েছিল। অপরাধীর কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, সত্যি খাওয়া হল না তোমার?

সমরেশ গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল, খাওয়া আমার আগেই হয়ে গিয়েছিল।

একটু থেমে সে পুনরায় বললে, কিন্তু অসিত, তোমরা দল বেঁধে এসে মাসীমাকে অমন বাধা না দিলেই বুঝি ভাল করতে।

অনেক রাত্রে মার্জারের মত নিঃশব্দে বাড়ীতে ফিরে নিজের শয্যা নিজের হাতে পেতে চুপি চুপি শুয়ে পড়াই সমরেশের অভ্যাস। সপরিবারে এসে অসিত এ বাড়ীতে অতিথি হবার পর সে আরও বেশী সতর্ক হয়েছিল, যাতে অত রাত্রে ওদের কারও ঘুম না ভাঙ্গে। সমরেশের ঐ অতিরিক্ত সতর্কতার জন্যই সে রাত্রে অসিত ও সুলতা তাদের নিজেদের শোবার ঘরে জেগে থেকেও জানতে পারলে না কখন সমরেশ ঘরে ফিরে শয্যা আশ্রয় করেছে। আর ওরা সতর্ক হবার কোন প্রয়োজন বোধ করেনি বলেই ওদের আলাপের কিছু কিছু কানে এল সমরেশের।

সুলতার কণ্ঠস্বর চাপা হলেও তাতে উত্তেজনা প্রকাশ পাচ্ছিল, অসিতের কণ্ঠস্বরে কুণ্ঠা।

সুলতা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে স্বামীকে বললে, আমি গোড়াতেই তোমাকে বারণ করেছিলাম, তুমি শুনলে না। এখন বোঝ যে ভদ্রলোককে কি বিপদে ফেলেছ তুমি।

সত্যি, অসিত বললে, কি লজ্জাই যে করছে আমার।

তোমার চেয়ে আমার লজ্জা করছে বেশী, সুলতা উত্তর দিল, কারণ তোমরা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখালেও যা দেখতে পাও না, তা অনায়াসে আমাদের চোখে পড়ে।

চোখে আমারও পড়ছে, বললে অসিত, সমরেশের সঙ্গে এ দু'দিন মা এমন ব্যবহার করলেন যেন ও তাঁর কত দিনের চেনা।

তাতেই তো ভয় পাচ্ছি আমি।

অসিত নিরুত্তর।

একটু পরে সুলতাই পুনরায় বললে, দেখ কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপই যে বেরিয়ে পড়বে না, তা বলা যায় না।

তাহলে এখন কি করতে বল তুমি?

বলি যে বাড়ীতে ফিরে চল। কতবার তো বলেছি তোমাকে যে ও'র এই পাগলামি সারবার নয়। অন্ততঃ এখানে রেখে তা সারাবার চেষ্টা করলে হিতে বিপরীত হতে পারে। ছিঃ ছিঃ! এরই মধ্যে ভদ্রলোক না জানি কি মনে করছেন।

এটা আবার তোমার বাড়াবাড়ি, অসিত ঈষৎ বিরক্ত, প্রায় রুষ্ট কণ্ঠেই বললে, তোমার পাগলামি মাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, কিন্তু সমরেশ পাগল নয়, নির্বোধ তো নিশ্চয়ই নয়।

সেই জন্যই মুস্কিলে পড়েছিল সমরেশ। সেদিনও নিস্তারিণীকে সে আর পাগলিনী বলে ভাবতে পারছিল না। অথচ একথাও সে নিজের মনে অস্বীকার করতে পারছিল না যে পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে নিস্তারিণীর ব্যবহার তখনও সহজ হয়ে ওঠেনি। সন্দেহ জেগেছিল তার মনে যে, হয়তো বা নিস্তারিণী একই সময়ে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক জগতে বাস করছেন সেই সংশয়ের শৃঙ্খলে এখন যেন আরও একটি অতিরিক্ত গ্রন্থি পড়ল। স্বামীর সঙ্গে আলোচনায় কি ইঙ্গিত করছিল সুলতা?

ওটা পরিষ্কার হল পরদিন।

বিকালে ঘুম থেকে উঠে সে যথারীতি ছাদে গিয়ে বসেছিল। কিন্তু অন্যান্য দিনের মত চা নিয়ে গিরিধারী একা এল না আজ। তাকে অনুসরণ করে এল সুলতা।

বিস্মিত এবং কতকটা বিব্রত হয়ে সমরেশ জিজ্ঞাসা করলে, আপনারা বেড়াতে যান নি আজ?

সাহস হল না, সুলতাও কুণ্ঠিতস্বরে উত্তর দিল, মা আবার যদি কোন কাণ্ড বাঁধিয়ে বসেন।

কেন? আজও আবার কিছু হয়েছে না কি?

না।

তবে?

আমাদের সঙ্গে বা সামনে তো অসাধারণ কোন ব্যবহার করেন না উনি। যা ঘটছে তা আপনাকে অবলম্বন করে। পরশু সন্ধ্যাবেলার ঘটনাটির কথাও আমরা পিসীমার মুখে শুনেছি। কি লজ্জাই যে করছে আমাদের। উনি তো আপনার সামনে আসতেই চাইলেন না।

অল্প একটু হেসে সমরেশ বললে, উনি যে পাগল সে কথা আমাকে জানিয়ে তবেই তো আপনারা এখানে এসেছেন। তবে আর এত লজ্জা পাচ্ছেন কেন? পাগল শান্ত হলেও এক আধটুকু পাগলামি তো করবেই।

কিন্তু আপনি তো ওর আচরণকে পাগলামি মনে করছেন না। করছেন?

অপ্রতিভ হয়ে মুখ নামিয়ে নিলে সমরেশ, কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, ঠিকই ধরেছেন আপনি। আমার কেমন মনে হচ্ছিল যে উনি ভাল হয়ে উঠেছেন, বেশ স্বাভাবিক আচরণ করছেন—অন্ততঃ আমার সঙ্গে।

তাতেই তো লজ্জা হচ্ছে আমাদের—অন্ততঃ আমার।

কেন?

আমি যে মেয়েমানুষ।

অন্ধকার ছাদ। তথাপি সমরেশের মুখ লাল নয়, কালো হয়ে গেল। অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকবার পর মৃদু, গম্ভীর স্বরে সে বললে, দেখুন, কাল রাত্রে আপনাদের দু'একটি কথা আমার কাণে এসেছিল। তার অর্থ তখন বুঝতে পারিনি, এখন পারলাম। তা এ শহরে আমার থাকবার জন্য অনেক জায়গা আমি পেতে পারি।

এরকম যখন ঘটছে, অন্ততঃ আপনারা এরকম যখন মনে করছেন তখন কিছুদিন না হয় তেমনি কোন জায়গায় গিয়ে আমি থাকি।

ছিঃ! বলে উঠে দাঁড়াল সুলতা : আমরাই ঠিক করেছি যে, দু'একদিনের মধ্যেই বাড়ীতে ফিরে যাব। উনি আমায় সেই কথাই আপনাকে বলতে বললেন।

সে রাত্রে অনেক দেরীতে রীতিমত ক্লিষ্ট এবং অনেকটা উদ্‌ভ্রান্ত মন নিয়ে নীচে নামল সমরেশ।

অনেকটা দুর্ভোগ ভুগবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়ে তবেই সে তার বাসায় এসে থাকবার জন্য অসিতদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তাই বলে এত দুর্ভোগ আর তা-ও এই জাতীয়!

ততক্ষণে খাওয়া-দাওয়া সেরে যে যার ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ করেছে—অন্ততঃ তাই মনে হয়েছিল সমরেশের। পা টিপে টিপে নিজের ঘরে গিয়ে আলো জ্বালল সে। নিঃশব্দেই বাইরে যাবার জামাকাপড় পড়ল। কিন্তু দোরগোড়ায় এসেই চমকে উঠল সে।

সামনেই নিস্তারিণী—আর একটু হলেই সমরেশ একেবারে তাঁর গায়ের উপর গিয়ে পড়েছিল আর কি!

আপনি!—রুদ্ধনিশ্বাসে বললে সমরেশ।

কিন্তু কিছু মাত্র ইতস্ততঃ না করে নিস্তারিণী উত্তর দিলেন, হ্যাঁ আমি। আর তো চোখে সয় না। তাই বলতে এলাম কথাটা।

মৃদু কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠস্বর। ঘরের ভিতরকার আলো যতটুকু বাইরে নিস্তারিণীর মুখের উপর গিয়ে পড়েছে তাতেই দেখতে পেল সমরেশ—ভাবলেশহীন পাথরের মুখ তা নয়; চোখের দৃষ্টিতেও বুদ্ধি ও আবেগের আভাস রয়েছে।

কিন্তু দেখে আগের মত উৎফুল্ল হল না সমরেশ। সুলতার ইঙ্গিতটি বুঝবার পর সন্দেহের কালো ছায়াপাত হয়েছিল তারও মনের উপর। এই মুহূর্তে নিস্তারিণীকে সে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ বলে নিজের মনে বিশ্বাস করতে পারলে না বলেই সেই কালো ছায়াটি আরও গাঢ় হয়ে তার মনের আকাশটুকু সম্পূর্ণ ঢেকে ফেললে। কতকটা যেন ভয় পেয়েই ঘরের আলো নিভিয়ে দিলে সে; ক্ষিপ্রহস্তে দরওয়াজায় তালা বন্ধ করতে করতে অস্ফুট কণ্ঠে সে বললে, কাল সকালে আপনার কথা শুনব। এখন ঘরে যান আপনি।

কিন্তু সদর দরজা অতিক্রম করে বাইরের বারান্দায় এসেই সবিস্ময়ে দেখলে সমরেশ যে, নিস্তারিণীও তাকে অনুসরণ করে বারান্দায় এসে গিয়েছেন।

বারান্দার নীচে ছোট একটু বাগান; তার পরেই শহরের অন্যতম সদর রাস্তা। রাজপথের সরকারী আলোতে বারান্দাও আংশিক আলোকিত। পথে লোকজন ও সাইকেল রিক্সার চলাচল আছে তখনও। পাশাপাশি দু'একখানা বাড়ীতে আলোও জ্বলছে। অপেক্ষাকৃত দূরের একখানা বাড়ীর বারান্দায় ছোট একটি পারিবারিক বৈঠক এখান থেকেও অস্পষ্টভাবে দেখা যায়।

দেখে একটু আশ্বস্ত হল সমরেশ। তথাপি নিস্তারিণীর কাছ থেকে বেশ একটু দূরে সরে গিয়ে সে তাকে জিজ্ঞাসা করলে, কি মাসীমা? কি কথা বলবেন আপনি?

শুনে ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হল নিস্তারিণীর; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কেমন যেন একটু হাসিও তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটে উঠল। তিনি উত্তরে বললেন, রঙ্গ দেখে আর বাঁচিনে। যখন যা মুখে আসে এখনও তাই বলে ডাকবে নাকি আমাকে?

ভাষায় কোন অস্পষ্টতা নেই। কিন্তু অর্থ? সমরেশ হতভম্বের মত বললে, কি বলছেন আপনি?

বলছি আমার মাথা আর মুণ্ডু। কোথায় চলেছ তুমি?

বেড়াতে।

এই কি বেড়াতে যাবার সময়?

রোজই তো এই সময়েই বেড়াতে যাই আমি।

তাতেই রাত দিন হয়ে যাবে নাকি?

সমরেশ নিরুত্তর। কিন্তু একটু পরেই নিস্তারিণীই অধিকতর তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন, তোমার বাপু সবেই অনাছিষ্টি কাণ্ড। সময় মত খাওয়া নেই, শোওয়া নেই। তার ওপর এত সব লোক কোথা থেকে এনে জুটিয়েছ তুমি? আর কেন?

বিহ্বল স্বরে পাল্টা প্রশ্ন করলে সমরেশ, কাদের কথা বলছেন আপনি?

আবারও কিছু মাত্র ইতস্ততঃ না করেই নিস্তারিণী বললেন, ন্যাকা সেজো না বাপু। ঐ মেয়েটি কে? তোমার সঙ্গে এত কি কথা ওর? সন্ধ্যাবেলায় ছাদে গিয়ে ও কি বলছিল তোমাকে?

চমকে উঠল সমরেশ। নিজের দেহটিকে বেশ একটু জোরে নাড়া দিল সে বিহ্বল চিত্তকে সচেতন করে তুলবার জন্য। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আবার সে তাকাল নিস্তারিণীর চোখের দিকে। না, স্বচ্ছ নয় সে দুটি চোখ, স্নিগ্ধ নয় তাদের দৃষ্টি সুস্থও নয়—কিন্তু পাগলিনীর উদ্‌ভ্রান্ত শূন্য দৃষ্টিও তা নয়। কেমন যেন একটা দুর্বোধ্য আশঙ্কায় বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল সমরেশের; শুষ্ককণ্ঠে সে বললে, ওঁকে চিনতে পারছেন না আপনি?

না, বাপু,—নিস্তারিণী উত্তর দিলেন, চিনে কাজও নেই আমার। ওদের তুমি বিদায় করে দাও। আমার শরীর এখন বেশ ভাল হয়েছে। কাল থেকে আমিই রাঁধব।

নিস্তারিণীর চোখের দিকে আরও একবার তাকাল সমরেশ; তারপর নিঃশব্দে একটি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে সে বললে, আচ্ছা, তাই হবে। এখন শুতে যান আপনি।

আর তুমি?

আমি এখন বেড়াতে যাব।

না, নিস্তারিণী বললেন, এত রাত্রে বেড়াতে যায় না কেউ। তুমিও ঘরে চল।

একেবারে বদলে গিয়েছে নিস্তারিণীর কণ্ঠস্বর। যেমন সমরেশ শুনেছিল সেই প্রথম দিন ছাদের উপর এবং পরদিন সকালে খেতে বসে, তেমনি—মমতায় কোমল ও আবেদনে করুণ, একটু আবদারেরও মিশাল আছে তাতে।

সে কণ্ঠস্বর মুহূর্তের জন্য যেন নাড়া দিল সমরেশের মনকে। চমকে চোখ তুলে তাকাল সে।

চোখাচোখি হতেই নিস্তারিণী আবার বললেন, অত রাত পর্যন্ত বাইরে থাকে কেউ? আমার মন কেমন করে না?

না পাগলিনীর কণ্ঠস্বর মোটেই নয়, দৃষ্টি তো নয়ই। কিন্তু তাই বুঝেই বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল সমরেশের; অকস্মাৎ সারা দেহ ঘামে ভিজে গেল তার; মাথার মধ্যে সমস্ত উপলব্ধি উলোট-পালট হয়ে গেল। যেন আত্মরক্ষার অন্ধ প্রবৃত্তির প্রেরণাতেই তৎক্ষণাৎ নিস্তারিণীকে সজোরে ভিতরে ঠেলে দিলে সে; তারপর কম্পিত হস্তে সদর দরওয়াজায় তালা বন্ধ করেই সে এক লাফে রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

যেন ভূত দেখে পালাচ্ছে সমরেশ। পরিচিত একজন পথচারী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসাই করে বসল, ক্যা বাবুজী?

সমরেশ উত্তর না দিয়েই আরও জোরে পা চালিয়ে দিল হার্ডিঞ্জ পার্কের দিকে—আজ আর আড্ডা নয়, তার প্রয়োজন নিরিবিলির।

প্রায় শেষ রাত্রে চুপি চুপি বাড়ীতে ফিরে শয্যা আশ্রয় করেছিল সমরেশ। পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে উঠতে পারল না সে। তার ঘুম ভাঙল বেশ একটু বেলায় এবং তা-ও অস্বাভাবিক, কর্কশ একটা গোলমাল শুনে।

দূর থেকে ভেসে আসা কয়েকটি কণ্ঠের সম্মিলিত গুঞ্জরন তা। কথা বোঝা যায় না তবে অনুমান হয় যে, একাধিক চাপা, উত্তেজিত কণ্ঠস্বর কাকে যেন ভর্ৎসনা করছে। ধড়মড় করে উঠে বসল সমরেশ। উদ্বিগ্ন হয়ে সে অন্দরমহলের দিকে খানিকটা অগ্রসর হতেই যে দৃশ্য তার চোখে পড়ল তা সুন্দরও নয়, স্বাভাবিকও নয়, সুতরাং রীতিমত অস্বস্তিকর।

মঙ্গলা ও সুলতা নিস্তারিণীর দুই হাত ধরে তার ইচ্ছা ও সক্রিয় প্রতিরোধের বিরুদ্ধে তাঁকে তাঁর ঘরের দিকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। তিনটি নারীই বিস্রস্তবসনা ও আলুলায়িতকুন্তলা; আজ আর পাগলিনীর ভাবলেশহীন মুখ নয় নিস্তারিণীর—শৃঙ্খলিতা সর্পিণীর মত অক্ষম আক্রোশে ফুঁসছেন তিনি। সুলতার মুখচোখও উত্তেজনায় লাল, অসিতের মুখে অপরিসীম বিরক্তির চিহ্ন। কেবল গিরিধারীই যেন এদের সঙ্গে যোগ দিতে না পেরেই ভীড় থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে,—হতভম্ব, বিপন্ন তার মুখচ্ছবি।

দ্রুতপদে ওদের কাছে ছুটে গেল সমরেশ; রুদ্ধনিঃশ্বাসে সে জিজ্ঞাসা করলে, আবার কি হল আপনাদের?

সংক্ষেপে উত্তর দিল গিরিধারী। সে নিয়মমত উনোনে আঁচ দিয়ে বারান্দায় বসে রান্নার আয়োজন করছিল। এমন সময় বুড়ী মাইজী ওখানে গিয়ে উপস্থিত। গিরিধারীকে তিনি বললেন যে, রান্নাবাড়া তিনিই করবেন এবং বলেই তরকারির ঝুড়ি টেনে নিয়ে নিজেই কুটনো কুটতে শুরু করলেন তিনি। হতভম্ব হয়ে সে বহু-মা ও বাবুকে খবর দিয়েছিল। তার পরেই এই সব কাণ্ড।

সমরেশও হতভম্বের মতই বললে, মাসীমা রান্না করতে চাইলেন?

চাইবেন না? আপনাকে রেঁধে খাওয়াবার সাধ হয়েছে যে ওঁর।—উত্তর দিল সুলতা।

একটু থেমেই অধিকতর তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে আবার বললে, মা গো মা, একেও আবার লোকে পাগল বলে।

সপাং করে একটি চাবুকের আওয়াজ হল যেন এবং সে চাবুক গিয়ে পড়ল যুগপৎ অসিত ও সমরেশের মুখের উপর। বিবর্ণ মুখ অপরিসীম কুণ্ঠায় নত করল অসিত; সমরেশও

অপরাধীর মত মুখ নত করে দ্রুতপদে তার বজন্য বাথরুমের দিকে চলে গেল।

স্নান সেরে সমরেশ যখন বের হয়ে এল তখন গোলমাল থেমে গিয়েছে। সুলতা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল—তার মুখে তখন উত্তেজনার কোন চিহ্ন আর অবশিষ্ট নেই। তাই বলে স্বাভাবিকও নয় সে মুখ। অন্যমনস্কের মত সে কি যেন ভাবছিল; সমরেশকে দেখে কুণ্ঠিত, মৃদুস্বরে সে বললে, সবই লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে আজ। সুতরাং আপনার ভাতে-ভাতও যেতে একটু দেরী হবে সমরেশবাবু। তাতে কি খুব বেশী অসুবিধে হবে আপনার?

না, সুলতার দৃষ্টি এড়িয়ে উত্তর দিল সমরেশ, দেরী করে আপিসে যাবার স্বাধীনতা আমার আছে। কিন্তু আজ আর মোটে খেতেই ইচ্ছে নেই আমার। সুতরাং এক্ষুণি যদি আমার অভ্যস্ত খাদ্য পাওয়াও যেত তো আমি না খেতাম না।

আচ্ছা, ঘরে গিয়ে বসুন আপনি, বলে সুলতা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

মিনিট দশেক পর সমরেশের শোবার ঘরে এসে প্রবেশ করলে সুলতা। তার হাতে খাবারের বারকোস। তাতে খানকয়েক লুচি, তরকারি, ভাজাভুজি এবং চা।

চুল আঁচড়ে, আপিসের জামাকাপড় পরে, দোরের দিকে পিঠ দিয়ে সমরেশ তার লিখবার টেবিলের সামনে বসে দরকারী কাগজপত্রগুলি গুছিয়ে নিচ্ছিল। অকস্মাৎ চুড়িপরা দুটি নিটোল হাতে বাহিত হয়ে অমন সুসজ্জিত খাবারের বারকোষখানির আবির্ভাব চোখের সামনে দেখে চমকে উঠল সে। ঈষৎ সঙ্কুচিত হয়ে কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, এ কি করেছেন?

আপনাকে কিছু বলবার মুখ নেই আমাদের, সুলতা উত্তরে বললে, তথাপি বলব, দয়া করে এটুকু আপনাকে মুখে দিতে হবে। আজ সময়-মত চা-ও তো আপনার খাওয়া হয় নি—অসময়ের চায়ের সঙ্গে দুখানা লুচি আমি যোগ করে দিয়েছি।

সমরেশ তথাপি কুণ্ঠিত স্বরে বললে, মুস্কিলে ফেললেন আপনি—খেতে মোটে ইচ্ছে নেই আমার।

না খেলে বুঝব যে আমারই উপর রাগ করে পোষ করছেন আপনি।

সুলতার কণ্ঠে ঈষৎ যেন আবদার বেজে উঠল। সবিস্ময়ে মুখ তুলতেই চোখে পড়ল সমরেশের, সাদা ঠোঁট দুখানি ঈষৎ ফুলেছে সুলতার; চোখের দৃষ্টিও একটু যেন কুটিল।

সেই চোখের সঙ্গে সমরেশের চোখ গিয়ে মিলতেই সুলতা হাসল; মাথাটা ঈষৎ দুলিয়ে সে বললে, খান।

আর প্রতিবাদের ভাষা ফুটল না সমরেশের মুখে; থালার উপর ঝুঁকে পড়ে একখানা লুচি হাতে তুলে নিলে সে।

কিন্তু খাওয়া আর হল না। অকস্মাৎ তার কানে এল একটি অস্ফুট, আর্ত চীৎকার—পরক্ষণেই কি একটি কোমল ভারী জিনিসের মেঝেতে পতনের শব্দ।

চমকে দোরের দিকে মুখ ফিরিয়েই নিজেও সে অস্ফুট চীৎকার করে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল; প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুলতাও আঁৎকে উঠে বললে, ও মা!—আবার—

স্বয়ং নিস্তারিণী অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছেন। বিস্ফারিত তাঁর দুই চোখ—মণি দুটি যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে; মুখ দিয়ে গাঁজলা উঠছে তাঁর; কণ্ঠে একটা অব্যক্ত গোঁ গোঁ শব্দ!

পাশেই মঙ্গলা। তারই মুখে এই আকস্মিক দুর্ঘটনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শোনা গেল। সুলতাকে সমরেশের ঘরের দিকে যেতে দেখেই নিস্তারিণী পা টিপে টিপে এই ঘরের দোর-গোড়ায় এসেই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। মঙ্গলাও দেখতে পেয়েই ছুটে এসেছিল তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু চক্ষের পলকে কি যে ঘটল—নিস্তারিণী চীৎকার করে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

প্রাথমিক শুশ্রূষার পর ডাক্তার ডাকতে হল। তারপর তাঁর ব্যবস্থামত চলল আনুষঙ্গিক চিকিৎসা ও বিশেষ শুশ্রূষা। নিস্তারিণীর আকস্মিক মারাত্মক মূর্চ্ছা যে স্বাভাবিক সুনিদ্রায় পরিণত হয়েছে সে সম্বন্ধে সমরেশ যখন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের নিশ্চিত আশ্বাস পেল তখন বেলা বারটা পার হয়ে গিয়েছে। ডাক্তারকে বিদায় করে সে ক্লান্ত দেহ ও অবসন্ন চিত্ত নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে সটান বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কিন্তু মিনিট দশেক পরেই আবার উঠে বসতে হল তাকে। অসিত তার ঘরে ঢুকে একেবারে তার শয্যার উপর বসে পড়েছে। তারও উসকো খুসকো চুল, শুকনো মুখ, ক্লান্ত চোখ দুটিতে বিষণ্ণ, বিপন্ন দৃষ্টি।

সমরেশ উঠে বসল; একটু রসিকতা করে সে বললে, রোগিণীর চেয়ে তোমাকেই যেন বেশী রুগ্ন মনে হচ্ছে, অসিত।

তাতে আর আশ্চর্য হচ্ছ কেন?—অসিত উত্তর দিল, শরীর ও মনের উপর দিয়ে অল্প ধকল গেল নাকি!

সে তো আমার উপর দিয়েও গেল। কিন্তু কৈ?—তোমার মত ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত চেহারা তো আমার হয় নি—দেখ না ঐ আয়নাতে।

বিপরীত দিকের দেওয়ালে প্রকাণ্ড একখানি আয়না। এককালে সমরেশ নিয়মিত ব্যায়াম করত। ব্যায়ামকালে সে যাতে দেহের প্রতিটি মাংসপেশী স্পষ্ট দেখতে পায় সেই জন্য সে ঐ বড় আয়নাখানি ঐ বিশেষ স্থানে স্থাপন করেছিল। সেই আয়নাতে এখন তাদের দুজনেরই প্রায়-সম্পূর্ণ দেহই যথাযথ প্রতি-ফলিত হয়েছিল। যেটুকু বাকি ছিল, সমরেশের কথা শুনে অসিত নিজের মুখখানা ঘুরিয়ে সোজা ঐ আয়নার দিকে তাকাতেই তাও পূর্ণ হয়ে গেল।

পাশাপাশি দুইখানা মুখ, কিন্তু একই জাতীয় চোয়ালের হাড়ের কাঠামোর মধ্যে সন্নিবিষ্ট বলে হঠাৎ দেখলে একই রকম মনে হয়।

ঐ সাদৃশ্যের দিকেই অসিতের মনোযোগ আকর্ষণ করে সমরেশ সকৌতুক কণ্ঠে বলে উঠল, আরে! দেখেছ অসিত? কে বলবে যে আমরা যমজ ভাই নই!

যেন লজ্জা পেয়েই চোখ নামিয়ে নিল অসিত; অল্প একটু হেসে সে বললে, নূতন চোখে পড়ল নাকি তোমার। মনে নেই, কলেজে এই সাদৃশ্যের কি সুযোগটাই না আমরা নিয়েছি!

বলতে বলতে খাট ছেড়ে উঠেই দাঁড়াল অসিত; পাশের চেয়ারখানাকে টেনে আরও একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তারই উপর উপবেশন করে একেবারে পরিবর্তিত কণ্ঠে সে পুনরায় বললে, আমি এর চেয়েও আশ্চর্য আর একটা সাদৃশ্যের কথা ভাবছিলাম সমরেশ।

কি?—সমরেশ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

সে দিনও ঠিক এই রকমই হয়েছিল,—মানে, মায়ের এই রোগ যেদিন শুরু হয়।

তার মানে?

মুখ ঘুরিয়ে নিলে অসিত; খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সে; তারপর মুখ না ফিরিয়েই অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বললে, সেদিনও বৈকালে সুলতা আমার শোবার ঘরে আমার জলখাবার নিয়ে এসেছিল। বেশ মনে আছে আমার, মা এলেন পিছনে পিছনে। দোরের পাশে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে আমার খাওয়া দেখলেন কিছুক্ষণ; তারপর হঠাৎ অস্ফুট একটা আর্তনাদ করেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন—ঠিক আজ যেমন হয়েছে।

বল কি অসিত!—সমরেশ রুদ্ধনিশ্বাসে বললে।

অসিত উত্তর দিল, হ্যাঁ ভাই। সেই মূর্চ্ছা ভাঙবার পর থেকেই আমাদের সঙ্গে আর কথা নেই ওঁর। যেন চিনতেই পারেন না আমাদের—না আমাকে, না সুলতাকে।

অসিত বিষণ্ণ, কিন্তু শুনতে শুনতে সমরেশের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল—অন্ধকারে অকস্মাৎ সে আলো দেখতে পেয়েছে।

প্রত্যাশার মুহূর্তে

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

কী এনেছো কী এনেছো দেখা হলে
জিজ্ঞাসা আমার
পুনোট মেঘের দেশে। তুমি ম্লান অবনত চোখে
আড়ালে লুকোও হাত যে-হাতের রিক্ত ভঙ্গিমায়
বিচিত্র বিষণ্ণ ছবি অস্তমুখ সূর্যের আলোক
মধুর করুণ। ভয়ের ছায়ারা আজো মাঠে ঘাসে
ছড়ায় বিবিক্ত দীর্ঘশ্বাস। মুহূর্তের ইসারায়
চাঁদ আনে মেঘলোকে রূপালী প্রপাত।
দীপ্ত হাসে
সন্ধ্যা বৃন্তের ফুল। তারপর নিমেষে হারায়
চাঁদের স্খলিত আলো অরণ্যের ফুলের আঘ্রাণ
শান্তির উত্তাল লগ্নে। অমনি দুর্গম সন্ধানেই
সর্বত্র তোমাকে খুঁজি। আজো যে
ঘরের দিকে টান
অকৃত্রিম। চেয়ে দেখি কিছুই তোমার হাতে নেই
ক্ষুধার তৃষ্ণার দিনে দিকে-দিকে নিঃশব্দ সঞ্চারে
ছায়া নামে। রিক্ত হাত আড়ালে
লুকোও বারে-বারে।।

শেষ মিনতি

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আমারে ফিরায়ে দাও আমার সে দুরন্ত যৌবন
হে মোর দেবতা;
দাও রক্তে সঞ্চারিয়া সে দিনের সেই উদ্দীপনা
ভাবের মত্ততা।

ডমরুর গুরুগুরু, তালে তালে নাচে মৃত্যুনাচ
ক্ষ্যাপা মহেশ্বর।
সে দিন আমরা যত গাজনের তরুণ সন্ন্যাসী
ক্ষ্যাপার দোসর।

আরাম-কেদারা ফেলে চলেছি দুর্গম শৈলপথে
আমরা বিপ্লবী;
ধ্যান-চক্ষে দীপ্তি পায় শাপমুক্ত দেশমাতৃকার
দিব্যোজ্জ্বল ছবি।

বিজলি ঝলকে শূন্যে, হাঁকে বজ্র, দিগন্ত হইতে
ঐ নাম-হারা
কারা আসে ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ সমুদ্রের অগণ্য দুর্বার
তরঙ্গের পারা?

ওরাই তো নীলকণ্ঠ যুগে যুগে মৃত্যুর অধরে
রেখেছে চুম্বন!
সেই মৃত্যু বারম্বার ধরণীতে আনিল প্রাণের
ফেনিল-প্লাবন!

ভূগর্ভের অন্ধকারে ওরাই তো ভিতের পাষাণ—
নাহি নাম-যশ;
খ্যাতনামা রথীরা তো অভ্রভেদী মন্দির-চূড়ায়
সোনার কলস।

মরি, মরি, সে কী নৃত্য! অত্যাচার চরণের ঘায়ে
চূর্ণ হ'য়ে যায়।
আ-সমুদ্র হিমাচল গর্জমান ক্ষিপ্ত-সিন্ধু যেন
আক্রান্ত ঝঞ্ঝায়।

সে দিন সে ঊর্মিশিরে সেই মহাজীবনের স্বাদ—
কোথা জুড়ি তার?
নিশ্চিহ্ন সমস্ত সীমা! দিকে দিকে অবারিত মোর
প্রসন্ন বিস্তার!

শতাব্দীর শীর্ষে এলো সর্বধ্বংসী পরমাণু বোমা:
এরই লাগি হায়!
যুগে যুগে মানুষের ক্লান্তিহীন এত আরাধনা
জ্ঞানের গুহায়?

দরিদ্র রবে না কেহ, রবে মাত্র নারায়ণ—এই
কল্পনা বিপুল
বাস্তবে হবে না মূর্ত? শ্রেণীহীন সমাজ রবে কি
আকাশের ফুল?

যৌবন, আমারে আজ ভুলিও না, মজ্জার শোণিতে
বহ্নিশিখা জ্বালো!
অবসাদ দেহে মনে বৈপ্লবিক দিব্য চেতনার
সোমরস ঢালো!

সে দিন যে মহানন্দে ভেঙেছিনু সাম্রাজ্যবাদেরে—
সে আনন্দে আজ
রক্ত দিয়ে, ঘর্ম দিয়ে গড়ে যাবো মুক্ত-মানবের
সাম্যের সমাজ।
সে-সমাজ বন্ধ্যা নয় 'মেশিন' এর জগদ্দল চাপে,
কুটিল হিংসায়;
কেন্দ্রে যার সমাসীন পরিপূর্ণ স্বাধীন মানুষ
সম্রাটের প্রায়!

জীবন সায়াহ্নে রক্তে, হে যৌবন, জ্বালো শেষবার
আগুনের শিখা।
শেষ যুদ্ধ করে যাবো মানুষের ধূলিমাখা ভালে
দিতে রাজটীকা!
শেষ-রক্ত দিয়ে যাবো সর্বোদয় সমাজের ঊষা
দিগন্তে আনিতে!
শেষ অস্ত্র নিক্ষেপিব অন্যায়েরে নিশ্চিহ্ন করিতে
আমার বাণীতে!

এই ধরণীরে

(৮৮ পৃষ্ঠার পর)

চেয়ে খুদে-খুটি অফিসার। ওরা সাড়ে সাতটাতেই এসে জড়ো হয়েছিল। বড় কর্তা-দের সামনে ওরা থরহরি কম্পমান হয়ে যাবে। তাই তামাক আর মদ দিয়ে ওরা নিজেদের গরম করে তুলছে। আস্তে আস্তে মৌতাত জমে উঠল। জমে উঠল একটার পরে একটা আরো বেশী রগড়ভরা ধাপ্পা।

চাটনীর মত চুটকি ঠাট্টা পরিবেশন হতে লাগল জিন আর হুইস্কির ফাঁকে ফাঁকে। মনোর মুখখানার কথা ভেবে এখন মন খারাপ করা অন্ততঃ আমার সাজে না।

চতুর্থবার যখন জিন ঢালা হয়েছে, বাজনা তখন বেশ জমে উঠেছে। ব্যান্ড ম্যাস্টার নিজেও এক গ্লাস পোর্ট একটু আড়ালে আবডালে সাবড়ে এসেছে। কাজেই সবটাই দারুণ জম-জমাট। একজন বিলেতী মাঝ-বয়সী কর্নেল ভাবের আবেগে আমায় জড়িয়ে ধরে যা বলল বাংলায় তার মানে দাঁড়ায় চমৎকার। সে বলল,—তুমি ত বাওয়া আমাদের রামধনুতে চড়ে বেড়ানো পিটার প্যান। একটি বার দেখিয়ে দাও না তোমার বিনা তারে আকাশে ওড়ার নমুনোটা।

বুকটা আরো ফুলে উঠল বইকি।

আরেকজন সবিনয়ে নিবেদন করল যে, সে মেঝেতে হামাগুড়ি দিতে দিতে সোফার আড়াল থেকে দেখবে যদি আমি তাকে হাওয়াই হামলার একটা নমুনো এখুনি দেখিয়ে দিই।

হাসি আর আনন্দের চোটে নিজেকে সামলান দায় হয়ে উঠল। আমি ত আর ওদের মত চুর হয়ে যাইনি। যদিও আমারি সবচেয়ে বেশী মাতাল হবার অধিকার হয়ে গেছে। ব্রিগেডিয়ার নিজে হাতে আমায়—এয়ার ফোর্সের এই জুনিয়ার বাচ্চা বীর আমায়—খাতির করে পথ দেখিয়ে নিয়ে খাবার টেবিলে তার পাশে বসালেন। বিমান বীর যে পরের দিন ভোরেই আবার 'গ্রীণ হেলে' ফিরে যাচ্ছে জাপানীদের 'হেল' দেবার জন্য।

আমার মাথাটা আরো উপরে উঠে গেল। সামনে ক্রিয়ার সুপের প্লেট; তার মধ্যের ছায়াতে দেখতে পাচ্ছি ঊর্ধ্ব গগনে এয়ার ফোর্সের রঞ্জন দত্তকে। পরম হেলায় সে নীচের পৃথিবীকে তুচ্ছ করে উড়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে সে মশগুলে হয়ে গেল।

দেখতে দেখতে সে ওই শ্যাম রঙের ক্রিয়ার সুপের মধ্যে বোঁ বোঁ করে নেমে আসতে লাগল। জোরে জোরে সুপের মধ্যে ঢেউ উঠতে লাগল। আশ্চর্য, রঞ্জন, এয়ার ফোর্সের রঞ্জন দত্ত সেই সুপের শ্যামল সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে ডুবে যেতে লাগল। সুপ যে এত অতল, এত অপার হতে পারে, তা কে জানত।

তার চেয়ে মাছের ঝোল অনেক ভাল। সব কিছুই তার চেয়ে ভাল। মিষ্টি অম্বলও অনেক ভাল। উপরে আকাশের দিকে তাকাল, প্রাণপণে তাকাল রঞ্জন। সেখানে নেই তার সুপার ফরট্রেস বোমারু বিমান। নেই খোলা আকাশের নীলিমা। রয়েছে শুধু রঙহীন, ভরসাহীন, সীমাহীন শূন্য।

তার চেয়ে মাটি ভাল। মাটি, শ্যামলা কাদা মাটি। যা দিয়ে বানাব ঘর, যাতে বাঁধব বাসা, আবার সুরু করব প্রতিদিন আর প্রতি রাতের কাঁদা-হাসা। মাটি, ধুলো-মাটি, কাদা-মাটি। কই মাটি?

কঠিন হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরেছি খানকটা মাটি। আর ছাড়ব না। নিশ্চয়ই মাটি। অমনি নরম পরশ, স্নিগ্ধ আবেশ। মাটি, মাটি। না হয় মাথা কাটনেওয়ালা নাগারাই ধরে নিয়ে যাক। তবু ত পা থাকবে যেখানে সেটা মাটি। আঃ, সে কথা ভাবতেও আরাম।

আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকালাম। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, চোখ মেলে তাকাতে কষ্ট হয়। তাকিয়েও বিশেষ কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আঁধার ঘরে শুধু একটু নীল আলো। এক পাশে রয়েছে কারা? ডাক্তার? নার্স?

আর অন্য পাশে কার হাতটা অমন করে চেপে ধরে আছি? মনো? মনোর হাত। মাটির মত নরম, স্নিগ্ধ। সবুজ নরক থেকে ফিরে এসেছি। মৃত্যুর ওপার থেকে ফিরে এসেছি আমার 'মুহেভেনে'। নীল স্বর্গ নয়, নীল সংসারে।

স্কেচ দেবনাথ মুখোপাধ্যায়

পথচারী	মদন দত্ত

৮

আধুনিক পরিবার

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

আফশোষের আর অন্ত নেই। বিরাট রেল-ইয়ার্ডের ঠিক ধার ঘেঁষে বিস্তৃত রেলওয়ে কলোনীতে ছোট, বড়, ভারি গোছের যত কোয়ার্টার—ঠিক তত বেকার যুবকেরও সংখ্যা।

প্রত্যেক কোয়ার্টারে ছেলে, ভাইপো, ভাগ্নে, এ ছাড়া আরও দূর সম্পর্কের আত্মীয় স্বজন বেকার যুবক তো আছেই।

এই সব বেকার যুবকদের আফশোষের আর সীমা নেই।

এরা ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ, পাশ করে যতদিন চাকরীর জন্যে অপেক্ষা করে, ততদিন প্রাইভেট টিউটরী করে নিজেদের হাত খরচ চালিয়ে নেয়। সিগারেট আর সিনেমার খরচ—ছাড়া বন্ধুদের চা খাওয়ানোর খরচ তো নেহাৎত কম নয়।

কলোনীর মধ্যেকার ছেলেরা প্রায় সকলেই স্কুলের কোচিং-এ প্রাইভেট পড়ে। মেয়েরা বেশীর ভাগ তেরোর কোঠা ছাড়ালেই—ইস্কুল ছেড়ে দিয়ে সংসারের হাল ধরে। অর্থাৎ পরবর্তী কালের গৃহিণী অন্ততঃ হয়। কিছু মেয়ে উচ্চ শিক্ষার দিকে এগিয়ে যায়। এদেরই বারো থেকে তেরো পেরোলেই গৃহ শিক্ষকের প্রয়োজন হয়।

বছর তিন চারেক ধরে যুবক বয়সের গৃহ শিক্ষকের কাছে মেয়েদের পড়ানোর রেওয়াজটা কলোনীতে একেবারেই উঠে গেছে।

দীপক, সমীর, অলক প্রভৃতি বেকার যুবক। ঘন ঘন আফশোষের নিঃশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে বল্‌লো—"কবে একদিন দুজন ছাত্রী আর শিক্ষক অন্যায় করলো,—তার জের টেনে চলবো আমরা।"

সত্যিই তাই। ছাত্রী ও শিক্ষক দোষ করেছিল দুজনেই। কেন ওরা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবেসেছিলো? যদি ভালোবাসলো দুজনে দুজনকে—তবে শিক্ষকটি কেন ছাত্রীকে বিয়ে করল না?"

"শিক্ষকের বিয়ে করবার উপায় ছিল না" বেকার যুবকরা রাস্তা দিয়ে হাটতে একদিন আলোচনা করছিল।

কলোনীর মেয়ে ছাত্রীরা তখন ইস্কুল থেকে ফিরছিল। এবার ওরা সেভেন, এইট ক্লাশে উঠেছে। ইংরেজী অঙ্কের জন্যে একজন গৃহ-শিক্ষক না হলে ওরা কিছুতেই প্রমোশন পাবে না। বাবা স্কুল ছাড়িয়ে দেবেন। মেয়ে শিক্ষকের যে চার্জ রেলবাবুদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।

এবার মেয়ে ছাত্রীদের মধ্যে থেকে একজন বেকার যুবকদের কথার উত্তর দিল। একই পাড়ায় ওরা বাস করে। কিছু মুখচেনা ও কিছু আলাপ পরিচয় ওদের মধ্যে আছে।

অমিতা দীপকের কথার উত্তর দিল। "কেন শিপ্রাদিকে বিয়ে করবার উপায় ছিল না তার মাষ্টার মশাইর?"

সবিতা বল্‌লো—"যদি জানো বিয়ে করতে পারবে না—তবে প্রেম করতে গিয়েছিলে কেন?"

দীপক বল্‌লো—"মাষ্টারমশাই বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে। ছেলে খুব প্রতিভাবান—মামার কাছে থেকে এম-এ ল একসঙ্গে পড়তো। রাত্রিবেলা শিপ্রাদিকে পড়াতো।"

"হ্যাঁ ভাই" শ্লেষের কণ্ঠে সবিতা বললো—"অনায়াসেই সে শিপ্রাদিকে বিয়ে করতে পারতো। যখন সমাজের দিক থেকে কোনও বাধা আসছে না।"

এবার সমীর উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে বল্‌লো—"বা তা কী করে হয়? মাষ্টার মশাইর মা যে বেশ মোটা টাকায় ছেলেকে বেচ্‌বে ঠিক করে রেখেছে,—অত টাকা দেবার তো আর শিপ্রাদির বাবার ক্ষমতা নেই—, তাই যেমন ওদের ভালোবাসার কথা জানাজানি হোল, সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে নিয়ে মা পাত্‌তাড়ি গুটোলেন।"

"উঃ কী ধাড়িবাজ মেয়েমানুষ—" উত্তেজিত-কণ্ঠে সবিতা বল্‌লো।

অমিতা বল্‌লো—"শিপ্রাদির কী অবস্থা হয়েছে, তাকালে চোখের জল সামলানো যায় না।"

সত্যি তাই। শিপ্রাকে বছর তিনেক যারা দেখেছে—সকলেই এক বাক্যে বলেছে—"যেমন একহারা সুন্দর দৈহিক গঠন। চোখদুটি টানা-টানা। ধবধবে রং ফর্সা। হাসিখুসী যেন পরিপূর্ণা ছিল। আজ সেই তন্বী-তরুণী মেয়ে যেন হচ্ছে—শীর্ণা নদীর মত নিস্তরঙ্গ। ঠোঁটের কথা সব যেন ফুরিয়ে গেছে। নির্বাক, নিস্তব্ধ। চুপচাপ জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে। বিড়বিড় করে কি যেন ব'লে। অধিকাংশ সময় কথা বলে না।"

শিপ্রা যে পাগল হয়ে গিয়েছে—এ কথা সকলে জানে। শিপ্রার পাগলের অনেক চিকিৎসা হয়েছে—কিন্তু এতটুকু সারেনি।

এরপর থেকে সব মেয়ের বাপেরা মেয়েদের গৃহ-শিক্ষকের কাছে পড়ানো বন্ধ করে দিয়েছেন।

এ ছাড়া আর উপায় নেই। কী কষ্ট—পাগল মেয়ের দুঃখ বাপ-মায়ের নিরন্তর দেখা।

আফশোষের সীমা নেই বেকার যুবকদের? দু-একটা মাষ্টারী থাকলে, বেকার জীবনে চাকরী খোঁজাটা একবারে অসহ্য হয় না।

অসহ্য লাগে তরুণী মেয়েদের? তরুণ যুবকদের তারা গৃহ-শিক্ষক করতে পারছে না? অথচ কী উপায়ে ইংরেজী আর অঙ্ক বুঝ্‌বে? ফেল করলে লেখাপড়া বন্ধ করতেই হবে অনেক পিতা কন্যাকে জানিয়ে দিয়েছেন।

ইদানিং কয়েকজন প্রগতিপরায়ণা মেয়ে নিজেদের ক্লাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে—ওদের ক্লাশ-টীচার প্রতিভাদিকে কোচিং ক্লাশ নেবার জন্যে সম্মত করাবেন।

অমিতা বল্‌লো—"কারও বাড়ীতে সুবিধে না হলে—আমাদের ক্লাবেই পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।"

সবিতা বল্‌লো—"এর জন্যে প্রতিভাদিকে ট্রাম ভাড়াটা দিলে হবে।"

মেয়েরা কোনও প্রকারে ওদের লেখাপড়া শেখার একটা ব্যবস্থা করে। কিন্তু বেকার ছেলেদের আফশোষের সীমা আর নেই। মাষ্টার মশাইর সঙ্গে প্রেম হোল শিপ্রার আর তার জের টেনে বেড়াব আমরা।

কলোনীর মধ্যে শিবরামবাবু বেশ ভারিক্কে ধরণের মানুষ। মাইনে সাত আটশো টাকা পান। সম্প্রতি গুডস সুপারভাইজার হয়েছেন। তাঁর মেয়ে ক্লাশ এইটে উঠলো। তিনি ঘোষণা করলেন মাসে একশ' টাকা মাইনে দিয়ে মেয়ের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা পর্যন্ত মেয়ের জন্য বৃদ্ধ গৃহ-শিক্ষক রাখবেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিলেন।

শিববাবুর স্ত্রী বল্‌লেন—"অত হাঙ্গামায় না গিয়ে, ভালো ঘর বর দেখে উমার বিয়ে দিয়ে দাওনা—"

শিবরামবাবুর স্ত্রী বল্‌লেন—"অত হাঙ্গামায় বর, অর্থাৎ বিদ্বান বর চাও? বরের অবস্থা স্বচ্ছল [illegible]

আজকালকার শিক্ষিত ছেলেরা কম পক্ষে ম্যাট্রিক পাশ, গান-বাজনা জানা মেয়ে চায়।"

"তাতো চাইবেই" স্ত্রী বললেন—"এদিকে মেয়ে পড়াশুনা করতে থাকুক, বিয়েরও খুব চেষ্টা করতে হবে, যা'তে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিতে পারি—"

"তা পারবে—শিবরামবাবু বললেন—" "তোমাদের মামার বাড়ীর গ্রামে কে ছেলে আছে যেন—"

"হ্যাঁ স্বপনকে আমার বেশ পছন্দ হয়—" "গৃহিণী বললেন—দেশে তো মামাতো ভাইরা আছে—তাদের সঙ্গে চিঠি লিখে ব্যবস্থা করো।" গৃহিণী স্বামীকে যতখানি সম্ভব সতর্ক করে দিয়ে বললেন—"তুমি বাপু যতখানি সম্ভব মাষ্টার মশাইকে বাজিয়ে নিও। খুব বুড়ো হয় যেন।"

প্রেম করবার মত এতটুকু রসকষ যেন না থাকে।

"না—না সেদিকে তুমি পরম নিশ্চিন্ত থাকো।" উজ্জ্বল হেসে শিবরামবাবু উত্তর দিয়েছিলেন।

সত্যই তাই। বিশ পঁচিশখানা দরখাস্ত পড়েছিল বৃদ্ধ গৃহ শিক্ষকের। শিবরাম পছন্দ করলেন সবচেয়ে যে বৃদ্ধের চুল সাদা। আনন্দের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন শিবরামবাবু—"তা আপনার চুল দেখেই বোঝা যায়, বয়স যে আপনার ভালই হয়েছে, দেশ কোথায়? নাম কী মশাইর?"

"দেশ হোল সে অনেকদূর—এখন আর বড় যাওয়া টাওয়া হয় না। সেই মৈমনসিং। নাম হরিশঙ্কর ভট্টাচার্য। বয়স প্রায় আশী হয়ে এল। বরাবরই স্কুলে পড়িয়েছি। দশ বছর হেড-মাষ্টারই ছিলাম। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বার-কয়েক খুক্ খুক্ করে কেশে নিয়ে হরিশঙ্কর বললেন—"ভেবেছিলাম—এত বুড়ো হয়ে গেছি, আর বোধহয় পড়াতে পারবো না। তা আপনাদের এদিকেই টালা ট্যাঙ্কের কাছে বাড়ী করেছি। বাড়ীর দেনা এখনও শোধ হয়নি—তাই কাজটা একেবারেই কাছে পেলুম—আর হাতছাড়া করলুম না—"

"খুব ভালো করেছেন—" উচ্ছ্বসিত হেসে শিবরামবাবু বললেন, "বড় বড় মেয়েদের পড়াতে আর ওই ছেলে ছোকরাদের বিশ্বাস করা যায় না।"

সবাই মহাখুশী মাষ্টার দেখে। গৃহিণী বললেন—"মেয়ে নিশ্চয়ই তিনটে লেটার নিয়ে পাশ করবে।"

কলোনীর ছেলে-মেয়েরা সবাই তাঁকে 'মাষ্টার দাদু" বলে সম্বোধন করতে লাগলো।

মাষ্টারদাদুর যত সম্মান—তত খ্যাতি এ কলোনীতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হতে লাগলো। দিন অগ্রসর হতে লাগলো। এত বৃদ্ধ বয়সের মাষ্টার-দাদু—, তবু পড়ানোর কী চমৎকার কায়দা। প্রত্যেক বছর ফার্ষ্ট অথবা সেকেন্ড হয়ে মেয়ে ক্লাশ প্রমোশন পাচ্ছে।

এদিকে মেয়ের মা খুব তোড়জোড়ের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন। ছেলের মামার সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়। ছেলের মামা বর্ধমানে থাকে। ছেলের মামার বাড়ী হোল শিবরামবাবুর স্ত্রীর মামার বাড়ীর দেশে। মেয়ে দেখা—, দেনাপাওনা নিয়ে কথাবার্তা সব শেষ

স্কেচ — অমিতাভ সেন

হয়েছে। ছেলে এম-এস-সি পাশ করে, বোম্বেতে কী যেন এক ফ্যাক্টরীতে কাজ করে। সে বলেছে—"ভয়ানক কাজ—' ছুটী পাবার একটুও উপায় নেই। একেবারে বিয়ের দিন কোলকাতা যাবে। মেয়ে আমি আর কি দেখবো? বাবা মা, কাকা মামা দেখলেই হবে।"

শিবরামবাবু মেয়ের ফটো পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মেয়ের ছবি দেখে ছেলে খুবই পছন্দ করেছে।

দেখতে দেখতে মেয়ের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেল। বিয়ের লগ্ন আসন্ন হয়ে এল। স্বপনের সঙ্গে উমার বিয়ে। প্রথম মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন শিবরামবাবু। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কাউকে আর বাদ দেবেন না। সমস্ত কলোনীর ছেলে থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত স্বপন ও উমার বিয়েতে নিমন্ত্রণ পেয়েছে।

যথাসময়ে বিয়ের দিন এসে গেল। সকাল থেকে সানাইতে ভৈঁরো, পূরবী নানা রাগিণী বাজছে।

নির্দিষ্ট সময় বর এল। বরকে আসরে বসানোর সঙ্গে সারা ঘর আনন্দ কলরবে মুখরিত হয়ে উঠলো। এ কী—বর যে মাষ্টারদাদু? কী ধড়িবাজ ছোড়া—চব্বিশ বছরের ছোকরা হয়ে আশী বছরের বৃদ্ধ সেজে আড়াইটে বছর বেশ মাষ্টারী করে কেটে গেল।"

বর মৃদু হেসে বললো—"বিশেষ তো কিছুই না—একটু শুধু মেকআপ। সাদা চুল-গুলোই আমাকে বাঁচিয়েছে। এম-এস-সি পাশ করে সাইন্স কলেজে রিসার্চ করছিলুম। অ্যামেরিকা যাবার অফার পেয়েছি। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে ভাবলুম—শুধু বয়সের জন্য এমন চান্সটা কেন নষ্ট হয়ে যাবে।" বর যত কথা বলে ঘরে তত হাসির হুল্লোর ওঠে।

বর বললো—"কী মুস্কিল—বাড়ী থেকে যখন খবর পেলাম, এ বাড়ীতেই ওঁরা বিয়ের সম্পর্ক করছেন—ভয়ে মরি আর কী? শেষকালে অনেক বুদ্ধি টুদ্ধি বের করে জানালুম—বাবা কাকা, মামাদের সব কথা। বললুম—"তোমরা সব ঠিকঠাক করে ফেল। বলবে আমি এখন বোম্বে চাকরী করছি, আসার উপায় নেই।"

উমার মা এক গাল হেসে বললো—"তুমি যে কী দুষ্টু ছিলে ছোটবেলায়—সে যখন মামার বাড়ী গিয়েছি—জানতে পেরেছি। তখন থেকেই তোমার উপর আমার ঝোঁক ছিল—"

"যাক্ ঝোঁকটা সফল হোল তাহলে—"

"এই সময় পুরোহিত জানালেন—লগ্ন এবার উত্তীর্ণ হয়ে যাবে।"

শুভদৃষ্টির সময় বর ও কনের দৃষ্টি বিনিময় আর হয় না। কনে শুধু বরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে আর ভাবছে—"আশ্চর্য মানুষ—শুধু মাথা ভর্তি সাদা চুল নিয়ে বেশ আমাদের বোকা বানিয়ে দিল।"

বর মৃদু মৃদু হাসছে আর কনের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছে—

"কেমন ঠকিয়েছি—কেমন জব্দ হয়েছ?"

পরামানিক এবার তাড়া লাগালো—"অনেক হয়েছে শুভ দৃষ্টির?

তিন বছর ধরে শুভ দৃষ্টি হোল—তবু দেখে আশা মিটলো না?"

এমনি যখন হাস্যরস চলছে স্বপন ও উমার বিয়ের আসরে, ঠিক সেই সময় পাগল মেয়ে শিপ্রা সারা বাড়ী কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। মধ্যে মধ্যে কান পেতে সানাইর রাগিণী শুনছে। বিড়বিড় করে বলছে—

মাষ্টারমশাই আপনি যে বলেছিলেন আমাদের বিয়েতে সানাই আনবেন? সে কবে? কবে কবে আনবেন?"

শিপ্রার গলার স্বর ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগলো।
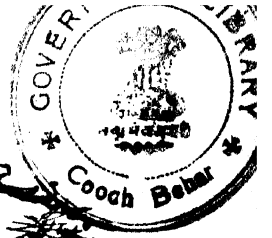
কচুরিপানা আর দু-চারটা কৃষ্ণচূড়ার পাপড়ি বুকে করে ভাটার খালের জল নদীর দিকে গড়িয়ে চলেছে। এপারে গ্রাম আলতা, ওপারে বিশাল মাঠের শেষে গাছের সারি আকাশের নীল পটভূমির উপর সবুজ রেখা টেনে দিয়েছে। আলতার খালের উপর কেতুর বাড়ি। বাস-ঘর, গোশাল, ঢেঁকিশাল। গোয়ালের ডাইনে ফুলে ফুলে ছাওয়া একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ।

সারাদিনের কাঠফাটা রোদের পর দখিন হাওয়ায় গ্রীষ্মের বেলাশেষ বেশ রমণীয় হয়ে উঠেছে। দিক-দিগন্ত ব্যেপে চলেছে লাল-নীল সবুজের খেলা। গোয়ালমুখো গরুর খুরের ধুলোয় ওপারের মাঠ হয়েছে ধূসর। খালের উজান বেয়ে দু-একখানা নৌকা চলেছে আলতার হাটখোলার দিকে।

ছইওয়ালা একখানা নৌকা এসে কৃষ্ণচূড়া গাছটার নিচে থামল। কাদার মধ্যে মাঝির লগি পোতার শব্দে কেতু ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

পাঞ্জাবিপরা জুতো পায়ে তেড়ি কাটা বিশ-বাইশ বছরের এক তরুণ নৌকার ছইয়ের বাইরে এসে ইতস্ততঃ করছিল নামবে কি না। নৌকা ও পারের মাঝে হাঁটুসমান আট-দশ হাত পাঁক। শুধু কৃষ্ণচূড়ার ফুল নয়, দু-চারটা ভাঙ্গা ডালও তার মধ্যে পড়েছে। কাদায় নামলে ভুরভুর করে গন্ধ বেরুবে। পায়ে কাঁচ ফুটবে। মাঝি বলল, গাজি গাজি করে নেমে পড় কর্তা।

যুবক একবার নিজের জুতো ও কাপড়ের দিকে তাকাল, আবার তাকাল মাঝির দিকে।

কেতু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। সে ডেকে বলল, জুতো হাতে করেই নেমে আয় কটকে। ঐ কাদায় ত কত হুটোপাটি করেছিস।

কটকে অগত্যা জুতো হাতে করেই হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে কাদায় নামল। কেতু বলল, মরন কিসের অত? কাপড় আর একটু তোল।

কাপড় তুলতে গিয়ে কটকে তাল সামলাতে পারল না। মুখ থুবড়ে কাদায় পড়ে গেল।

সহুরে ভূত—বলে কেতু কাদায় নেমে কটকেকে পাঁজাকোলে করে এনে পারের উপর বসিয়ে দিল। তার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, অমন ভুরু কোঁচকাচ্ছিস কেন?

পায়ে কি যেন ফুটেছে।

ছেলের পায়ে বাঁশের চোঁচ ফুটেছে। কেতু সেটা টেনে তোলার সঙ্গে সঙ্গে কটকের খেয়াল হল তার কলমও পড়ে গেছে। সে বলল, আমার পেন?

ফাঁণ্টি কলম? সেটাও খুলে নামতে পারনি?

কেতু আবার কাদায় নামল।

বাপ-ছেলে দুজনেই ভূত বনে গেছে। ছেলের নাক, মুখ, চোখ সব মিলে যেন একটা কাদার পিণ্ড। দেখলে চেনা যায় না। মাঝি অবাক হয়ে দেখছিল কেতুর দেহের গড়ন, তার শক্তি ও তৎপরতা। সে জিজ্ঞাসা করল, উনি আপনার কি হন বাবু?

কেতু বলল, বাবু আমি নই, উনি—আমার সহুরে ছেলে।

পিতার এই শ্লেষ ছেলের কানে বাজল। মাঝি আবার বলল, সহরে উনি ভাল চাকুরী করেন বুঝি? কলকাতা না হাওড়া, কোথায়?

কেতু কোন উত্তর করল না।

উঠানে কটকের মা ও দাদার সঙ্গে দেখা। 'কি রে পারলি এতদিনে আসতে?' এইটুকু মাত্র প্রশ্ন করেই দাদা কাজে চলে গেল।

মা বলল, লাগেনি ত খুব? বাপ-বেটার চেহারা যা হয়েছে। দাদা আছে কেমন? পাগড়ি পরা চাপরাস আঁটা চাকরে, সে পারলনা ভাগনের একটা কাজ জুটিয়ে দিতে! যে সে ভাগনে নয়—কর্তার পাশের দরজা অবধি পৌঁছেছে।

কটকের মুখ থেকে বিরক্তিব্যঞ্জক অর্ধ-স্ফুট একটা শব্দ বেরুল।

সমবয়সী বৌদি পটলির সঙ্গে কটকের দিয়ে পটলি বলল, দেশে ফিরেই ঠাকুরকে কাদায় গড়াগড়ি খাওয়ালে?

পায়ে চোঁচ না ফুটলে পড়ে যেতুম না বৌদি।

পটলি হেসে জবাব করল, পায়ে চোঁচ, কাঁটা তো আমাদেরও ফোটে। তুমি সহুরে বাবু, তাই পড়ে গেছ। আচ্ছা কলকাতায় কি কাঁটা, কঞ্চিও নেই?

আছে, তবে তার রকম আলাদা। সহুরে কাঁটা ত।

বাবা, সহুরে কাঁটারও তোমাদের এত অহংকার।

হবে না? তবে কি সহুরে লোকে অহঙ্কার করবে কাদামাটি আর গেঁয়ো বউ নিয়ে?

ইস। সেই পাড়াগেঁয়ে বউই একটা কপালে জুটুক দেখি।

কাদায় পড়া নিয়ে ঠাট্টা সেইখানেই শেষ হল না। আলতার ছেলে, জল-কাদায় চলতে পারে না, এ এক অবাক কাণ্ড। পরের দিন সকালেও দু-একজন ঠাট্টা করল, কি রে, একেবারে সাহেব বনে গেছিস!

কটকের মনে হল এর মধ্যেই খবরটা অনেকে জেনে ফেলেছে। জানাই স্বাভাবিক। গ্রামে লেখা-পড়া জানা মানুষ সে একা। সবেধন নীলমণি।

কেতু ছা-পোষা চাষী, দুই ছেলে তার ফটকে ও কটকে। সে ঠিক করেছিল তারাও চাষী হবে, তারই মতন জীবিকা সংগ্রহ করবে মাটির রস থেকে।

শুধু তাদের নয়, আলতার সকল পরিবারেরই এই ইতিহাস। ছেলে বড় হয়ে বাপের হাল-বলদ নিয়ে মাঠে নামে, তার ছেলেও আবার পিতার অনুবর্তী হয়। পুরুষ-পরম্পরাক্রমে এই ধারাই চলে আসছে।

কটকের বয়স যখন নয় তখন তাদের মামা মুকুন্দ কলকাতা থেকে ভগ্নীপতির কাছে

আমার ইচ্ছা মিনির এক ছেলেকে এনে আমার কাছে রাখি। লেখা-পড়া শিখিয়ে তাকে উপরের ধাপে তুলে দি। তোমার ও মিনির মত হলে এক ছেলেকে কালবিলম্ব না ক'রে কলকাতায় পাঠিয়ে দিও।

লোভনীয় প্রস্তাব। ছেলে উপরের ধাপে উঠলে নিজেরাও উঠতে পারবে। তাছাড়া দাদা মুকুন্দ পাগড়ি মাথায় পরে চাকরি করে। সেই পাগড়ি সম্বন্ধে মিনির মনে একটা দুর্বলতা ছিল। ছেলের মাথায় পাগড়ি উঠবে। সেও বড় হবে। স্বামী-স্ত্রীতে সলাপরামর্শ করে ছোট ছেলে কটকেকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিল।

বড় ছেলে ফটকের নামের সঙ্গে মিলিয়ে বাপ-মা ছোট ছেলের নাম রেখেছে কটকে। কলকাতায় গিয়ে তার নাম হল মনোজ। স্কুলে ভর্তির সময় ভাগনে কটকে বেরাকে মাতুল মনোজ সেনাপতি বানিয়ে দিল।

প্রায় প্রত্যেক ক্লাশেই দু' বছর থেকে কটকে ক্লাশ টেন পর্যন্ত উঠেছিল। কিন্তু স্কুল ফাইনালের ফটক আর পার হতে পারল না। বারতিনেক চৌকাঠে কপাল ঠুকে মা সরস্বতীর মন্দির একেবারে ছেড়ে দিল।

এবার চাকরির চেষ্টা। মামা ইংরেজীতে নাম সই করতে পেরেই সরকারী আপিসে পেয়াদাগিরি পেয়েছে। দু-একজন দূর আত্মীয়কেও পেয়াদা বানিয়েছে। কিন্তু সে কাল আর এ কাল। আজকাল স্কুল ফাইন্যাল কেন, আই-এ পাশকরা ছেলেরও মুরুব্বীর জোর না থাকলে পেয়াদাগিরি জোটে না। একে ত স্কুল ফাইন্যাল ফেলকরা, তার উপর মুরুব্বীরও জোর নেই। কটকের পেয়াদাগিরি জুটল না।

চাকরীর নিষ্ফল চেষ্টায় দু-দুটো বছর কেটে গেল। কেতুর স্ত্রী পত্র লিখল, পূজনীয় দাদা, কটককে দেশে পাঠিয়ে দিন। উপরের ধাপে উঠে আর কাজ নেই। আপনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন কিন্তু আমাদের বরাত মন্দ। ছেলের মাথায় তাই 'পগ্গ' উঠল না। কটকচন্দর কলকাতায় ষাঁড়ের নাদ হয়ে গেছে। সে দেশে এসে মাঠে নামুক, চাষ করুক, গরু রাখুক। তাহলেও অন্ততঃ একটা রাখালের খোরাকিও বেঁচে যাবে।

'রাখালের খোরাকি বাঁচবে', 'ষাঁড়ের নাদ'— মায়ের এই চিঠি স্কুল ফাইন্যাল পড়া ছেলের আত্মসম্মানে আঘাত করল। দুঃখও হ'ল মায়ের জন্য। কি নজর! ছেলের মাথায় পাগড়ি পরিয়ে খুসী।

সে আরও কিছুদিন চাকরীর চেষ্টা করল।

সেখানে যে কোন কাজ পেলেই তার মান বজায় থাকত। কিন্তু কোন কিছুই জোগাড় হল না।

মুকুন্দেরও মেয়ে বড় হয়েছে, ঘরে জামাই এসেছে। ভাগনেকে রাখার আর ইচ্ছা নেই। দিন দিন তাদের ব্যবহারে এটা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। কটকেকে অগত্যা একদিন কলকাতা ছাড়তে হ'ল।

দেশে সে খুব কম আসত। এলে খাতির পেত খুব। একদল আসত চিঠি বা দলিলপত্র পড়াতে, কেউ চিঠি লিখিয়ে নিত, মণি অর্ডারের ফারম পূরণ করাত। এবারও সে দেশে ফেরার পর দিনই উপেন নাপিতের বউ একখানা পোষ্ট কার্ড নিয়ে এসে বলল, লিখে দাও ত ঠাকুরপো তোমার দাদা মিন্সেকে। আজ তিন মাস চিঠি নেই, টাকা পাঠানোর নাম নেই, এই যদি মনে ছিল ত বিয়ে-সাদি করেছিল কেন? ছেলেপুলে হয়েছে কেন? জোর কলমে লিখে দাও ত। তোমার ইঞ্জিরি কলমে।

কটকে চিঠি লিখে পড়ে শোনালে উপেনের বৌ বলল, উহু, আরও কড়া করে লেখ। অখাই মাতব্বরের মেয়েকে বিয়ে করার ঠেলাটা বুঝুক।

কটকে হেসে বলল, এতদিনেও বোঝেনি? আশ্চর্য।

কেতুর বন্ধু হুসেন আলা এল দলিলের মুসাবিদা নিয়ে। রেসোর কাছে জমি বন্ধক রেখে টাকা নেবে সে। রেসো দলিল লিখে দিয়েছে। হুসেন বলল, পড়ে শোনাও ত কটকচন্দর। তুমি বললে তবে টিপসই দেব। জমি বন্ধক দিয়ে পঁচিশটা টাকা নিচ্ছি। সুদ মাসে এক টাকা।

একজন এসে জিজ্ঞাসা করল, ছেলে পটকাকে পাশের গাঁয়ের পাঠশালে দেব ভাবছি। কি কলম কিনব, খাগের, পাখীর পালকের, না ইষ্টিলের? তুমি লিখতে কিসে? বই বা কোনটা কিনি, বিদ্যাসাগর, বটতলা, ঝামাপুকুর—কলকাতার অনেক বাবু মশাইরা বই বানিয়েছে।'

একদল কলকাতার খবর জিজ্ঞাসা করে— টেক্স আর কত বাড়বে? এরা লোক উপোস করিয়ে মারবে নাকি? কলকাতার বাবুরা কি বলে? তারা জোর বক্তৃতা করছে ত?

বাইরে খাতির আছে কিন্তু বাড়ীতে আগের মত খাতির নেই, আদর-যত্ন নেই। দাদা এমনিতেই স্বল্পবাক, তার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু বাবা তার সামনে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে থাকে। মা কথা বলে খুবই কিন্তু তার অধিকাংশই মুকুন্দের সম্পর্কে। তার বুকের ব্যথাটা কেমন, ডাক্তার বদ্যি মাংস খেতে দেয় ত, কি অসুখ চলছে এখন, ডাক্তারী ইনজেক্টো, না কবিরাজী জড়ি বুটি, তার মাইনে বাড়ল কি না, পাগড়িটা আরো উঁচু হ'ল কিনা।

কটকের মায়ের ধারণা পাগড়ির উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গেই পাগড়িধারীর মর্যাদা ও বেতন বৃদ্ধি পায়। তার সবচেয়ে বড় দুঃখ যে, কটকের আর পাগড়ি পরা হ'ল না।

একদিন শেষটায় কটকে মাকে ধমক দিয়ে উঠল, খালি পাগড়ি আর পাগড়ি, পাগড়ির ভূতে পেয়ে বসেছে তোমায়।

মাও সমানে জবাব করল, বিষ নেই কুলোপানা চক্কর।

দিন কাটে, কেতু বড় ছেলেকে নিয়ে মাঠে যায়। নিজে গরু চরায়। কিন্তু কটকেকে মাঠে যাওয়ার কিংবা গরু রাখার কথা কিছু বলে না।

হাল-বলদ নিয়ে মাঠে কাজ করতে পারবে কিনা এ সম্বন্ধে তার মনে সন্দেহ ছিল যথেষ্ট। মাঠে যাওয়ার ইচ্ছাও যে ছিল খুব তা নয়। আবার বাবা মাঠে নামতে না বলায় সে কেমন যেন অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগল। বাবা মনে করে কোন কাজের যোগ্য নয় সে।

গাঁয়ের পাঁচজনের ব্যবহারও বদলেছে। আগে তার সঙ্গে তারা দূরত্ব রক্ষা করে চলত, শিক্ষিতের সঙ্গে অশিক্ষিতের দূরত্ব। সেও মনে করত এটা তার ন্যায্য পাওনা। কিন্তু এবার অবস্থা অন্য রকম। অনেকেই তাকে নিজেদের সমকক্ষ মনে করে, কেউ বা ঘাড়ে হাত দিয়েই বলে, কি রে কলকাতায় এত অঢেল চাকরী, আর তোর কোন কাজ হ'ল না। পরোক্ষে হয়ত মুচকি হাসেও। মনে করে পড়া-শুনো তো হোলোই না—মাঠেও সুবিধা করতে পারবে না। চাষী হওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়।

উপরের ধাপে উঠতে পারল না, আশে-পাশের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গেও নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না, অবস্থা ত্রিশঙ্কুর মত। তার রাগ হয় বাপ-মায়ের উপর। কি কুক্ষণেই না মামা উপরের ধাপে ওঠার কথা লিখল, মা অমনি পাগড়ির স্বপ্ন দেখল। ছেলের মাথায় পেয়াদার পাগড়ি, কি নজর!

কখনও বা নিজের উপরে রাগ করে, নিজের অযোগ্যতার উপর ততটা নয় যতটা ভাগ্যের উপর। এইভাবে আরও কিছু দিন কাটল।

কটকে আজ মাঠে নেমেছে। জমিতে মই দেবে।

মই আগেও দেওয়া হয়েছিল, লাঙলের ফলায় ওঠা মাটির ঢেলাগুলো রোদে পুড়ে পুড়ে ঝামা হয়ে গেছে। আবার মই দিয়ে সেগুলোকে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। কটকেরা দুই ভাই মইয়ের উপর, দুজন দুধারে। ঢেউয়ের উপর নৌকার মতন ছোট বড় মাটির ঢেলার উপর মই যেন আছাড় খায়। কটকেরাও দোল খায় তার সঙ্গে সঙ্গে।

সোনালী রোদে রোদে ছেয়ে গেছে দিক-দিগন্ত। আকাশ খেলে চলেছে হলুদের হোলি। সারা মাঠে আজ মই দেওয়ার উৎসব। মইয়ে দাঁড়িয়ে চাষী হাসি-গল্প করে—তামাক টানে। অদ্ভুত এ প্রাণচাঞ্চল্য।

বড় ভাই ফটকে কাপড় হাঁটুর উপর তুলেছে, কটকেকেও ওইভাবে কাপড় তুলতে বলেছে। সে শোনেনি। মালকোঁচা দিয়েছে বটে, কিন্তু কাপড়ের প্রান্ত হাঁটুর নিচ পর্যন্ত নামানো। তার পায়ের তলায় মই কাঁপছে, উঠছে, থামছে। তাল সামলাতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে তার। মাঠের প্রাণচাঞ্চল্য তাকে স্পর্শ করেনি। ঘেমে গেছে, হাঁপিয়ে উঠেছে সে। ভাবছে সারা মাঠ চেয়ে আছে তার দিকে। দেখছে স্কুল ফাইন্যাল পড়া চাষীর ছেলের জমিতে মই দেওয়া। তার অপটুতায় কৌতুক অনুভব করছে।

এই মাঠে সে একটা বিশিষ্ট মানুষ, সে জানে বুদ্ধ, অশোক, আলেকজাণ্ডারের ইতিহাস, নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের খবরও রাখে। অথচ মাঠে সে জাতভাইদের পরিহাসের পাত্র। এ এক করুণ অবস্থা।

কেতু কাছেই ছিল। মই দিচ্ছে না সে—মই দেওয়া দেখছে। দুবার সে সতর্ক করে দিয়েছে, পায়ের দিকে নজর রাখিস কটকে।

ক্রমে ক্রমে রোদ চড়তে লাগল। কটকের গায়ে ছুঁচ বিঁধছিল যেন, কপাল চিন্ চিন্ করছে। সামনে দেখছে অন্ধকার। একবার ভাবল, কাজ নেই আর মই দেওয়ার, বাবাকে বলে সে মই থেকে নেমে যাবে। কিন্তু পারল না, লজ্জা করতে লাগল।

তার বাবা বলল, কি ভাবছিস কটকে?

(ইহার পর ১১৬ পৃষ্ঠায়)

কানে মাটি

শক্তিপদ ভট্টাচার্য

দ্রলোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলো ট্রেণে।

তিনি যাচ্ছিলেন নাগপুরে, আমি যাচ্ছিলাম র চেয়ে অনেক কাছাকাছি, গালুডি। দারুণ ীষ্মকাল, ট্রেনযাত্রীর সংখ্যা সে সময় খুবই কম। কটি সেকেণ্ড ক্লাসের কামরাতে আমরা দুজন রই ছিলাম, তৃতীয় ব্যক্তি কেউ ছিল না।

ভদ্রলোক যখন হাওড়াতে প্রথম এসে মরার মধ্যে ঢুকলেন একটি সুটকেস হাতে য়ে আর কুলির মাথায় বেডিং চাপিয়ে, তখন াঁর চেহারা দেখে বাঙালী কি ভোজপুরী কি গপুরী তা ঠিক বোঝা যায়নি। মিশকালো ং-এর হৃষ্টপুষ্ট বপু, মাথার চুল কাফ্রিদের তো ঘন আর কোঁকড়ানো, কান দুটোর গা থেকে ত বেশী চুল বেরিয়েছে যে, মনে হয় দুই কানে লের ঝালর দেওয়া। পরনে ঢিলে পাজামা, য়ে হাওয়াই শার্ট, পায়ে কালো পাম্পশু। য়ের রং-এর সঙ্গে জুতোর রং প্রায় মিশে যায়। লায় বিলক্ষণ পাউডার মেখেছেন তা স্পষ্ট খা যাচ্ছে, গায়ে কিছু সেণ্ট মেখেছেন তারও ন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

বেঞ্চের উপর জুত করে বসে তিনি জানলা য়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে মুখ বাড়ালেন। সঙ্গে ঙ্গে একজন কাগজওয়ালা নানারকম সাময়িক দৈনিক পত্রিকা নিয়ে তাঁর সামনে এসে াজির হলো। তিনি তার ভিতর থেকে বেছে ছে একটি দৈনিক 'যুগান্তর' কিনলেন আর কটি বিলাতী ম্যাগাজিন কিন্‌লেন। তাতেই ুঝলাম তিনি বাঙালী। মনে হলো, নিশ্চয় বাসী বাঙালী, বাংলাদেশে বাস করেন না। র কারণ বাঙালী হলেও চেহারা এবং চাল-লন ঠিক বাঙালীর মতো নয়, অন্য প্রদেশে থকে থেকে সকল বিষয়ে সেখানকারই ছোপ রেছে।

আমি নির্বাক ও গম্ভীর হয়ে বসে ইলাম।

ইংরেজী ম্যাগাজিনটা উল্টেপাল্টে কিছুক্ষণ যাবৎ পড়লেন, তারপর এক জায়গায় কাগজখানিকে খোলা অবস্থাতেই উল্টে বেঞ্চের উপর ফেলে রেখে বাংলা কাগজ পড়তে লাগলেন।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমি চুপচাপ বসে রইলাম। গাড়ি যখন মেচেদা স্টেশনে থামলো, তখন ভদ্রলোক দুটো ডাব কিনে উপর্যুপরি দুটো ডাবেরই জল চক্‌চক্‌ করে পান করে ফেললেন। খুব সম্ভব বেজায় তৃষ্ণা পেয়েছিল। ডাবের জল খেয়ে আবার সিগারেট ধরিয়ে তিনি কাগজের দিকে মন দিলেন।

আমি চুপ ক'রে বসে সমস্তই দেখছি। কিন্তু কতক্ষণ ঐ ভাবে চুপ ক'রে থাকা যায়! সামনেই সেই ইংরেজী ম্যাগাজিনটা ওল্টানো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আমি এক সময় হাত বাড়িয়ে বললাম—"কাগজটা কি আমি একটু দেখতে পারি?"

ভেবেছিলাম যে, ভদ্রলোক বিনা বাক্যব্যয়ে কাগজখানি আমার দিকে বাড়িয়ে দেবেন, আমি তাই পড়ে সময়টা খানিক কাটাবো। কিন্তু ভদ্রলোকের সে রকম কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। তিনি মুখে এমন এক বিদ্রূপের ও তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন যেন আমার সঙ্গে তাঁর কতকালের চেনা। হেসে বললেন—"ও আর কি পড়বেন স্যার, পড়বার মতো কিছুই নেই। সেই সব মামুলী কথা। হয় দেখবেন ইনিয়ে-বিনিয়ে বলা স্ত্রী-পুরুষের সস্তা প্রেমের গল্প—আর না হয় স্ত্রীলোকের মুখে গোঁফ-দাড়ি গজিয়ে তারা পুরুষ হয়ে যাচ্ছে কিম্বা পুরুষেরা গোঁফ-দাড়ি খসে গিয়ে স্ত্রীলোক বনে যাচ্ছে। সেই একটা কথাই খুব বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখে নানারকম ছবি দিয়ে লোকের মনে চমক লাগিয়ে দেবার চেষ্টা। কিন্তু ওতে কি আর চমক লাগে! ও সব তো জানা কথা। আপনিও জানেন, আমিও জানি, একটা সিগারেট ধরান। অনেকক্ষণ থেকে চুরুট টানছেন, একটু মুখ বদলে নিন।"

কাগজগুলো মুড়ে তিনি একপাশে সরিয়ে রাখলেন। আমার সঙ্গে গল্প করতে চান।

আমি অগত্যা চুরুট ফেলে দিয়ে তাঁর দেওয়া একটি সিগারেট ধরালাম। তারপরে এমনি যাহোক কোনো একটা কথা তো কইতে হবে, সেই ভেবে জিজ্ঞাসা করলাম—"জানা কথা কোন্‌টা বলছিলেন?"

"কেন, এই স্ত্রী-পুরুষ দুইই ক্রমে ক্রমে বদলে যাবার কথা। এই তো শেষ পর্যন্ত হতে চলেছে, স্পষ্ট দেখাই যাচ্ছে। বাইওলজিক্যাল ইভোলিউশনের গতিই তো চলেছে সেই দিকে। প্রকৃতির উদ্দেশ্যই তাই।"

"কোন্‌ দিকের ইভোলিউশনের কথা বলছেন? স্ত্রীপুরুষে এমনি অদলবদল হবে?"

"না না, স্ত্রী পুরুষ বলে আলাদা আলাদা কিছু আর থাকবেই না, সবাই হবে হার্মাফ্রোডাইট। একই শরীরে নারী-পুরুষ দুইই থাকবে। কাজেই তখন মানুষের সাহিত্যে এই সব সেকেলে এবং একেলে প্রেমের গল্প লেখা একেবারে অচল হয়ে যাবে। দেখছেন না, প্রকৃতি ক্রমশঃই সেদিকে এগিয়ে চলেছে। কৃমি প্রভৃতি অনেক রকম জানোয়ারই হার্মাফ্রোডাইট আছে, এবার মানুষও হবে তাই।"

ভদ্রলোকের কথা শুনে আমি অবাক হলাম। বললাম—"ছোট প্রাণীদের মধ্যে এ জিনিস থাকলেও এমন উন্নত ধরণের প্রাণীদের বেলা তাই কখনো হতে পারে?"

তিনি বেঞ্চের উপর এক চাপড় মেরে বললেন—"নিশ্চয় হবে, হতে বাধ্য। এখনই কি মানুষ কতকটা তাই নয়? সকলের মধ্যেই রয়েছে খানিকটা পুরুষ আর খানিকটা মেয়ে। আসল কথা, সবই তো ভিতরকার হর্মোনের ব্যাপার। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে নারী আর পুরুষ দুই

প্রথম ভ্রূণের অবস্থাতে ছেলে হবে কি মেয়ে হবে তার কিছুই বোঝা যায় না, তার পরে যার মধ্যে পুরুষের হর্মোন বেশী হয়, সে হয়ে যায় পুরুষ, মেয়ের হর্মোন বেশী হলে সে হয়ে যায় মেয়ে। এর পর থেকে ভবিষ্যতে এমন কম-বেশি আর হবে না, দুই হর্মোনই সমান সমান হয়ে যাবে।"

আমি বললাম—"তাই কি কখনো হতে পারে?"

তিনি বললেন—"ও তো দূরের কথা। কারো কারো দেহের মধ্যে দুই রকমের রক্ত পাওয়া যাচ্ছে, তা কি আপনি জানেন? ডাক্তারি জার্ণালে লিখেছে, এক মহিলার রক্ত পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল যে, তার রক্তের মধ্যে পুরুষের 'ও-সেল্' রয়েছে, আবার মেয়েদের 'এ-সেল্'ও রয়েছে। কেমন করে হলো?"

আমি বললাম—"সেটা হয়তো এখনকার এ্যাটম বোমা কিংবা হাইড্রোজেন বোমার প্রভাব থেকে হয়েছে। তেজস্ক্রিয় বিস্ফোরণের ফলেই এই সব বিপর্যয় ঘটছে। ওর বেশী বাড়াবাড়ি হতে থাকলে হয়তো মানুষ জাতটাই একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে।"

ভদ্রলোক হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। বললেন—"কিছুই ধ্বংস হবে না স্যার, আবার চড় চড় ক'রে সব গজিয়ে উঠবে। ইঁদুরের জাতকে তো আপনারা বিষ দিয়ে আর নানা উপায়ে কতই মারছেন, কিন্তু মেরে মেরে ওদের কি ধ্বংস করতে পারছেন? শস্যের ক্ষতি হচ্ছে দেখে বৃটিশদের কৃষি দপ্তর ঠিক করলে যে, সায়ানাইড প্রভৃতি তীব্র বিষাক্ত গ্যাস দিয়ে দেশের সমস্ত ইঁদুরকে নির্মূল ক'রে দেবে। শতকরা ৯৭ ভাগ ইঁদুর তাতে মরে গেল, মাত্র তিন ভাগ রইল বেঁচে। কিন্তু তার থেকেই দেখা গেল মাত্র ছয় মাসের মধ্যে আবার সেই ইঁদুরের গোষ্ঠী আগেকার সংখ্যাতে পৌঁছে গেল। অত বেশী মেরে ফেললেও আগেও যত ইঁদুর ছিল, ছ'মাস পরেও ততই ইঁদুর। তার কারণ যারা বেঁচে গিয়েছিল তারা তখন খাদ্য পেলে প্রচুর, জায়গা পেলে প্রচুর, নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিছু রইল না। কাজেই খুব তাড়াতাড়ি তারা বংশবৃদ্ধি ক'রে ফেললে। মানুষের বেলাতেও তাই হবে। যতই মরুক, আবার দেখতে দেখতে সংখ্যা বেড়ে যাবে। একশো মাত্র থাকলেও তার থেকে হাজার হবে, হাজার থেকে লক্ষ, লক্ষ থেকে কোটি।"

ভদ্রলোকের মুখে এই সব কথা শুনে আমার তাক লেগে গেল। আমতা আমতা ক'রে বললাম—"তবে যে সবাই এত ভয় পাচ্ছে, পৃথিবী একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে!"

ভদ্রলোক একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন—"গোড়াকার কথাটা লোকে জানে না বলেই ভয় পাচ্ছে। সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় এই পৃথিবী তো একটা তুচ্ছ ধূলোর কণার মতো। এই গোটা ইউনিভার্সটা—যাকে আমরা বিশ্ব বলি, তার সৃষ্টি হয়েছিল দুই বিলিয়ন বছর আগে, অর্থাৎ দুশো হাজার কোটি বছর আগেকার কথা। তখন এই বিশ্ব একটিমাত্র বিরাট অ্যাটম্ ছাড়া আর কিছুই নয়। এর ভিতরকার যে নিউক্লিয়াস, তার উত্তাপ ছিল এত বেশী যে, তা ডিগ্রির গণনার মধ্যে আমা যায় না। সেই উত্তাপ যখন কমে আসতে আসতে দুই বিলিয়ন ডিগ্রিতে এসে দাঁড়াল, তখন সেই অ্যাটম ফেটে তার থেকে প্রথম নিউট্রনের গুঁড়ো ছিটকে বেরোতে লাগল। নিউট্রনের থেকে হলো ইলেকট্রন, তার থেকে অ্যাটম, তার থেকেই বিশ্বের সব কিছুর সৃষ্টি। সেই বিশ্ব এখন ক্রমশঃ বেড়ে আর ফেঁপে চলেছে, বেলুন যেমন ক'রে ফুলে ওঠে তেমনি ক'রে ফুলে উঠেছে, তার ভিতরকার জায়গা ক্রমশঃ বেড়ে বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে। এই বিশ্ব আবার যখন গুটিয়ে আসবে তখন হবে ধ্বংসের পালা। তাতে আরো কত বিলিয়ন বছর লাগবে তার ঠিক কি! তার আগে ধ্বংস কি অমনি হলেই হলো? এর কোনো কিছুই তার আগে ধ্বংস হবে না।

ভদ্রলোকের কথা শুনতে শুনতে আমি হকচকিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি আরো অনেক কথাই বলে গেলেন, সব আমি বুঝতেও পারিনি, আর সব আমার মনেও নেই। কথা শুনতে শুনতে আমার মাথার মধ্যে তালগোল পাকাতে লাগল। আমি তখন অসাড় হয়ে শুনে যেতে লাগলাম, অর্থাৎ শুনছি কিন্তু কানে নিচ্ছি না, বোঝবারও চেষ্টা করছি না। শুধু তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছি, আর কথার ঝড় কানের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে।

খড়্গপুরে এসে যখন গাড়ি দাঁড়াল তখন তিনি থামলেন।

অতঃপর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নেমে তিনি এক ঠোঙা মুড়ি কিনলেন, এক ছড়া কলা কিনলেন ও এক ভাঁড় গরম চা নিলেন। সমস্তই তখনই বেমালুম গলাধঃকরণ করলেন। দেখলাম ভদ্রলোক বেশ খেতে পারেন। কলা ছিল এক ডজন। মুড়ির ঠোঙাটাও ছোটো নয়।

আবার পাছে তাঁর ঐ সব বৈজ্ঞানিক বার্তা শুনতে হয়, তাই আমি নিবিষ্ট হয়ে ইংরেজী ম্যাগাজিন পড়তে শুরু করে দিলাম। আমার ভাবভঙ্গী দেখে ভদ্রলোক জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চুপ করে বসে রইলেন।

গাড়ি যখন গিডনি ষ্টেশনে গিয়ে থামল, তখন আবার তিনি নেমে গেলেন। প্ল্যাটফর্মের দোকান থেকে কিনে আনলেন এক ঠোঙা পান্তুয়া। বসে বসে সমস্ত পান্তুয়াগুলি তিনি খেলেন। আমি আড়চোখে চেয়ে গুণে দেখলাম, ষোলটা পান্তুয়া একে একে পেটের মধ্যে তলিয়ে গেল।

আমি আর থাকতে পারলাম না। একটু হেসে বললাম—"ষ্টেশনের কেনা এতগুলো পান্তুয়া খাওয়া কি ভালো? ও তো ঘিয়ের তৈরি নয়, দালদা বনস্পতি কিংবা তার চেয়েও খারাপ কৃত্রিম জিনিষ দিয়ে হয়তো তৈরি। এতো খেলে পেটের অসুখ হতে পারে!"

তিনি বললেন—"আপনি জানেন না, এই গিডনির পান্তুয়া খুব বিখ্যাত। খেলে কোনো অসুখ হয় না। আর এর পর থেকে তো আমরা নিজেদের ল্যাবরেটরিতে তৈরি ঘি তেল খেতেই শুরু করবো, স্বাভাবিক গোরু মোষের ঘি কিংবা স্বাভাবিক তেলের কোনো ধারই ধারব না। গোরু, মোষ, পোকা মাকড় কারো সাহায্যই আমরা নেব না, নিজেদের জন্যে যা কিছু দরকার হবে তা নিজেরাই তৈরি করে নেবো! পৃথিবী হবে মানুষেরই রাজত্ব, তা ছাড়া আর কারো নয়।"

আমি আর কোনো কথা বললাম না। কিছু বলে ফেললেই মুশকিল।

গিডনি ষ্টেশন থেকে গাড়ি ছেড়ে দিলে। আর খানিকক্ষণ পরেই গালুডি পৌঁছে যাবো। মনে মনে নিশ্চিন্ত হলাম।

ভদ্রলোক জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বসেছিলেন। হঠাৎ তিনি মাথাটা টেনে নিয়ে বেঞ্চ ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন এবং ক্রমাগতই সজোরে মাথা ঝাঁকাতে লাগলেন। তারপর গাড়ির মধ্যে ছুটোছুটি শুরু ক'রে দিলেন।

আমি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কি হয়েছে? অমন করছেন কেন?"

তিনি বললেন—"জানলা দিয়ে যখন মুখ বাড়িয়েছিলাম, তখন হঠাৎ কি একটা পোকা বোঁ ক'রে উড়ে এসে কানের মধ্যে ঢুকে গেল। পোকাটা কানের মধ্যে থেকে কামড়াচ্ছে, কিছুতেই বেরোচ্ছে না।"

আমি উঠে গিয়ে তাঁর কানের মধ্যে দেখবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। কানের বাইরের ফুটো চুলে ঢাকা। সেই চুলের আবরণ ভেদ ক'রে পোকা একেবারে ভিতরে ঢুকে গেছে।

ভদ্রলোক যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলেন, গায়ের জামা টেনে ছিঁড়ে ফেললেন, কানের মধ্যে আঙুল ঢোকিয়ে প্রচণ্ড বেগে খোঁচাতে শুরু করলেন। যন্ত্রণায় তাঁর চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে লাগল। মুখ দিয়ে লালা ঝরতে লাগল।

তখন তিনি পাগলের মতো আচরণ শুরু করলেন। কখনো বা জানলা দিয়ে লাফ মেরে পড়তে যান, আমি জোর ক'রে ধরে রাখি। কখনো বা অমানুষিক চিৎকার ক'রে ওঠেন। কখনো বা আমার দুটো হাত ধরে বলেন—"শীগ্‌গির আমাকে বাঁচান নইলে এখনই মরে যাব।" কিন্তু কেমন ক'রে আমি তাঁকে তখন বাঁচাই!

অবশেষে গাড়ি গালুডিতে এসে পৌঁছলো।

ভদ্রলোককে আমি বললাম—"এখানেই আপনি নেমে পড়ুন, আমার বাড়িতে চলুন। সেখানে গিয়ে আপনার কানের পোকা বের করা যাবে। পরের দিনের গাড়িতে আপনি যাবেন।

ভদ্রলোকের তখন কোনো দিক্‌বিদিক জ্ঞান নেই। আমার সঙ্গে তিনি নেমে পড়লেন।

কাছেই বাড়ি। বাড়িতে পৌঁছে তাঁর কানে খুব খানিকটা গরম তেল ঢেলে দিলাম। তার পর মাথাটা উলটে ঝাঁকানি দিতেই তেলটা গড়িয়ে বেরিয়ে এলো, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো একটা মরা মৌমাছি। সেই মৌমাছির কামড়েই তিনি অমন করছিলেন।

ভদ্রলোককে সেইটি দেখিয়ে বললাম—"এই দেখছেন তো, প্রকৃতির প্রতিশোধ। এর পর থেকে গোরু মোষ পোকা মাকড় কারোরই আর নিন্দে করবেন না।"

ভদ্রলোক গুম্ হয়ে বসে রইলেন। কানটা তখন বেশ ফুলে উঠেছে।

গুপ্ত কথা

গুপ্ত কথা গোপনে রাখিলে
হবে তাহা দাস-অনুদাস
গুপ্ত কথা প্রভু হবে, যদি
পাঁচজনে কর তাহা ফাঁস।

—আরব প্রবাদ

প্রিয়নাথ গলির মোড়ে একটু থমকে দাঁড়ালেন। প্রায় সন্ধ্যা। আগের দিনে এমন সময় সারা গলি জেগে উঠত। লোকজনের চলাফেরা, বেলফুলওয়ালাদের চীৎকারে পাড়া সরগরম। এখান থেকে গান-বাজনার আওয়াজও কানে আসতো। ফাঁকে ফাঁকে ঘুঙুরের ঝঙ্কার, জড়ানো গলার তারিফ। কিন্তু সে সব কিছু নেই। দু' একটা ক্ষীণ গলার শব্দ অবশ্য শোনা যাচ্ছে, হারমোনিয়মের আওয়াজ। আর কিছু নয়।

মাত্র পাঁচটা বছর। এর মধ্যেই এ পাড়া এমন নিস্তেজ, প্রাণহীন হয়ে গেল। ছন্দ, সুর সব হারাল এত অল্প সময়ের মধ্যে।

এক আধদিন নয়। একটানা চার বছর এ গলিতে প্রিয়নাথ যাওয়া-আসা করেছেন। অন্ততঃ সপ্তাহে বার দুয়েক। প্রতিটি লাইট পোস্ট তাঁর চেনা, প্রতিটি বাসিন্দার খবর নখদর্পণে। বিশেষ করে সতেরোর দুইয়ের বাসিন্দা।

যেমন রূপ তেমনি গলা। চেহারা দেখে আর গান শুনে আশা যেন মেটে না। অন্ততঃ প্রিয়নাথের মেটেনি। অবস্থা যখন ভাল ছিল, রোজ এসেছেন। কালো রংয়ের বুইক গাড়ী নিজে চালিয়ে। তারপর অবস্থা পড়তির মুখে যখন, তখন সপ্তাহে বার দুয়েক। পায়ে হেঁটে। সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢেকে।

সপ্তাহে বার দুয়েক না এসে প্রিয়নাথ থাকতে পারতেন না। এরই জন্য স্ত্রী ভুলেছেন, এমন কি একমাত্র শিশু সন্তানকেও। বাপের রেখে যাওয়া সম্পত্তি আর টাকা প্রায় শেষ করে এনেছেন। তলানীটুকুর দিকে নজর পড়তে প্রিয়নাথের টনক নড়েছিল। এটুকু আর ক'দিন। স্ত্রীর কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। স্ত্রীর কথা, মানে স্ত্রীর অলঙ্কারের কথা। কিন্তু সাহস হয়নি। অনেক বছর দেখা সাক্ষাৎ নেই। গতিক দেখে স্ত্রী ছোট ছেলেটিকে কোলে নিয়ে বাপের বাড়ী গিয়ে উঠেছিল। পাড়াগাঁয়ে! প্রিয়নাথের মতি-গতি ফেরাবার চেষ্টা হয়েছিল কয়েকবার, কিন্তু সুবিধে হয়নি। প্রিয়নাথকে বাড়ীতে পাওয়াই দুষ্কর, পাওয়া গেলেও সব সময়ই বেসামাল অবস্থা।

প্রিয়নাথ সম্পত্তি রাখার শেষ চেষ্টা একবার করলেন। দালালের মারফৎ ছোটখাটো এক কলিয়ারী কিনে ফেললেন ঝরিয়া অঞ্চলে। মোটা মাইনের ম্যানেজার রাখা সম্ভব নয় বলে, নিজেই গিয়ে হাজির হলেন কলিয়ারীতে। তারপর আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়লেন জালে। হাজার ঝামেলা। নানান্ ফ্যাসাদ। একটার পর একটা। আসি, আসি ক'রেও শহরে ফিরতে পারলেন না। টানা পাঁচ বছর রয়ে গেলেন। কিন্তু এততেও সুরাহা হ'ল না। কলিয়ারীর রস যা কিছু সবই নিংড়ে নিয়েছিলেন ভূতপূর্ব মালিকেরা, শুধু ছিবড়ে নিয়ে প্রিয়নাথ সুবিধা করে উঠতে পারলেন না। কোন রকমে এক ইহুদী মহিলাকে বেচে দিয়ে আবার শহরে ফিরে এলেন।

একটু এগিয়েই প্রিয়নাথ থেমে গেলেন। এই তো সতেরোর দুই। লাল রংয়ের দুতলা। কিন্তু সে জোর বাতি কোথায়! বাজনার আওয়াজও নেই। সব যেন মিইয়ে গেছে। নিজের কথা মনে হতেই প্রিয়নাথ মুখ টিপে হাসলেন। শুধু কি সামনের বাড়ীটাই মিইয়ে গেছে! তাঁর নিজের অবস্থাও তো হাওয়া-বেরিয়ে যাওয়া বেলুনের মতন। মাস কয়েকের মধ্যেই বসতবাড়ী নীলামে উঠবে। ভারি ভারি আসবাবপত্র তো সবই গেছে। যে কটা আছে, সেগুলোও যাবার দাখিল।

তাই নিভে যাবার মুখে প্রিয়নাথ একবার জ্বলে উঠতে চান। বারুদের শেষ কণাটুকু সম্বল করে।

এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে কড়া নাড়লেন। চাপা গলায় ডাকলেন পদ্ম, ও পদ্ম!

আর একটা কি নাম ছিল। সোহাগী কি সোনালী। কিন্তু প্রিয়নাথ সে নাম নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি ডাকতেন পদ্ম বলে। যৌবনের শতদল মেলে থাকত তাই বোধ হয়।

প্রথমদিকে প্রিয়নাথ একলাই যাওয়া আসা করতেন। তখন ট্যাঁকের জোর ছিল, বুকেরও। তারপর আর কুলিয়ে উঠতে পারলেন না। ওঁর অর্থকৃচ্ছ্রতার রন্ধ্রপথে শনি প্রবেশ করল। শনি কোন এক ইস্পাত কোম্পানীর বড়বাবু। প্রিয়নাথের চেয়ে বয়স কম, অবস্থাও সচ্ছল। প্রিয়নাথ আপত্তি করেননি, করলেও টিঁকত কিনা সন্দেহ। আরো বার দুয়েক কড়া নাড়তেই ভিতর থেকে দরজা খোলার শব্দ হ'ল। প্রিয়নাথ দু' পা পিছিয়ে রুমাল দিয়ে কপাল আর মুখ মুছে নিলেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে দেখা। মনে মনে দু একটা রসিকতার কথাও ঠিক করে নিলেন। একেবারে খালি হাতেও আসেননি। বোতাম আর আংটি বিক্রি করা টাকা কটা পকেটেই রয়েছে।

দরজা খুলে যেতেই প্রিয়নাথ আরো কয়েক পা পিছিয়ে এলেন। চোখ ফিরিয়ে এদিক ওদিক দেখলেন। কলিফেরানো দেয়াল বিবর্ণ, পাঁজর-প্রকট। মেঝেয় গালিচা নেই। ছেঁড়া মাদুর। সব চেয়ে বড় কথা, সামনে দাঁড়িয়ে পদ্ম নয়, বছর সাতেকের একটি শ্যামাঙ্গী মেয়ে।

বিড় বিড় করে প্রিয়নাথ কথাগুলো বললেন, বাড়ী ভুল করেছি, এ বাড়ী তো নয়।

মনে মনেও ভেবে নিলেন। নেশার ঘোরে অন্য গলিতেই ঢুকে পড়েছেন, না বেসামাল অবস্থায় বাড়ীর নম্বর দেখতেই ভুল করেছেন।

ফিরে যাবার মুখেই কিন্তু বাধা পেলেন। মেয়েটি ছুটে এসে হাত ধরেছে। দাঁড়িয়েছে পথ আগলে।

—ভুল করোনি। ঠিক জায়গাতেই তো এসেছ। আমি বলে রোজ বিকেলে তোমার জন্য বসে থাকি আর ভগবানকে ডাকি, ভগবান আমার বাবাকে ফিরিয়ে আনো।

আচমকা একটা ধাক্কা খেলেন প্রিয়নাথ। বুঝলেন, কোথায় ভুল হয়েছে, কিন্তু কিছুতেই মেয়েটির হাত ছাড়াতে পারলেন না। প্রিয়নাথ বোঝাবার চেষ্টা করলেন, আমি তোমাদের কেউ নই। বাড়ী ভুল করেছি। সতেরোর দুই অধর মিত্তিরের গলি খুঁজছি আমি।

—বারে, মেয়েটি খিলখিলিয়ে হেসে উঠল, এটাই তো সতেরোর দুই অধর মিত্রের গলি। তুমি কিচ্ছু জানো না বাবা।

সতেরোর দুই? তা হ'লে পদ্ম বলে এখানে থাকত একজন? পদ্ম?

মেয়েটি আবার হেসে উঠল, তুমি জানলে কি করে এ নাম?

প্রিয়নাথ থতমত খেয়ে গেলেন। খুব একটা গোপন কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে মুখ চোখের এমনি ভাব। কিন্তু তিনি জানবেন না তো জানবে কে? নিরালায় আদর করে এই নাম ধরেই তো তিনি ডাকতেন।

এসো, ঘরের মধ্যে, এসো। মা এখনি ফিরে আসবে। মেয়েটি আবার হাত ধরে টানল।

সামান্য সন্দেহের ঝিলিক। খুব সামান্য। কিন্তু প্রিয়নাথ চিন্তায় পড়লেন। তাই কি!

অনেকদিন থেকে পদ্মর গোপন এক কামনা ছিল। প্রথম প্রথম নিভৃতে বুকের রক্ত দিয়ে এমন কামনা সে লালন করত, তারপর একদিন বলেই ফেলল মুখ ফুটে। প্রিয়নাথের আদরের ফাঁকে।

একটি ছেলে কিংবা মেয়ে। তার নিঃসঙ্গ জীবনের সাথী। নয় তো কি নিয়ে সে জীবন কাটাবে। যৌবনের বান থিতিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সব আলোও তো নিভে যাবে। রোগজীর্ণ দেহ, হয়তো দারিদ্র্যক্লিষ্টও। সেই আগামী দিনের ভয়াবহতার দিকে চোখ ফিরিয়েই পদ্ম শিউরে উঠত।

শেষ পর্যন্ত তাই হয়তো করেছে। নেবার মতন ছেলে মেয়ের আজকাল অভাব নেই পথে-ঘাটে। লোকে দেবার জন্য হাত বাড়িয়ে আছে। তবু যদি ছেলে মেয়েটা খেয়ে পরে বাঁচে। তেমন একটা কাউকেই হয়তো যোগাড় করে থাকবে।

তা না হয় করল, কিন্তু ঘর-দোরের এমন অবস্থা কেন! পাঁচটা বছরে নিশ্চয় দেহ ভেঙে পড়েনি, মিইয়ে যায়নি গানের গলা। তবে? এ তবের উত্তর প্রিয়নাথ পেলেন নিজের দিকে চোখ ফিরিয়ে। পাঁচটা বছর তাঁর জীবন থেকেও তো কম মাশুল আদায় করেনি। এমন আধ ময়লা জামা কাপড়ে তিনি এ পাড়ায় আর কোনদিন কি এসেছেন কখনও? আর কটা দিন, তারপর বসতবাড়ী পরের হাতে তুলে দিয়ে নিজেকে গুটি গুটি কোন মেসে আস্তানা বাঁধতে হবে। মানুষের অবস্থার কথা কখনও বলা যায়! আজ বাদশা কাল বান্দা। আজ উজীর কাল ফকির। ওঠানামার এই খেলা তো দুনিয়া জুড়ে চলেছে। নিজের চোখে প্রিয়নাথ কত দেখেছেন।

চৌকাঠ পার হয়ে মেয়েটির পিছন পিছন ঘরে ঢুকতে ঢুকতে প্রিয়নাথ বললেন, তোমার মা গেছেন কোথায়?

প্রিয়নাথের হাত ধরে মাদুরের ওপর বসাতে বসাতে মেয়েটি বলল, রোজ যেখানে যায়, গান শেখাতে।

গান শেখাতে! প্রিয়নাথ খাঁজ ফেললেন কপালে। অবস্থা এমন হয়েছে পদ্মর! পেটের দায়ে গলা বিক্রি করতে হচ্ছে! অনেকটা প্রিয়নাথের বাড়ী, কাঁনয়ারী বিক্রি করার মতনই।

প্রিয়নাথ কথা বলতে গিয়েই বাধা পেলেন! মেয়েটি একেবারে তাঁর গা ঘেঁষে বসেছিল, হঠাৎ নাকটা উঁচু করে বাতাসে কি একটা শোঁকার চেষ্টা করে বলল, উঃ, তোমার গা থেকে কি বিশ্রী একটা ওষুধের গন্ধ বেরোচ্ছে গো!

প্রিয়নাথ তাড়াতাড়ি মুখে রুমাল চাপা দিলেন। পকেট থেকে কয়েকটা লবঙ্গ বের করে চিবোতে শুরু করলেন, তারপর এ প্রসঙ্গটা চাপা দেবার উদ্দেশ্যেই বললেন, তুমি একলা বাড়ীতে থাকো, তোমার ভয় করে না খুকী?

—বারে আমি খুকী নাকি, আমি তো মিনতি। আমার নামটাও বুঝি ভুলে গেছ? কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মিনতি ঘাড় নেড়ে বললে, আগে আমার ভয় করত, কিন্তু এখন আর একটুও ভয় করে না। আমি বড় হয়ে গেছি কিনা। তা ছাড়া পাশের বাড়ীর সরযূর মা মাঝে মাঝে আমার খোঁজ নিয়ে যায়।

সরযূর মা! প্রিয়নাথের বেশ মনে আছে. পাশের বাড়ীতে থাকত মধুমালা। আকারের জন্য সবাই বলত মোটা মধু। পাঁচ বছরে দুনিয়ার কত কিছু ওলোট পালোট হয়ে গেছে। কোথাকার মানুষ কোথায় ঠিকরে পড়েছে. ঠিক আছে!

হঠাৎ কথাটা প্রিয়নাথের মনে পড়ল। মিনতির দিকে ফিরে বসে বললেন, আচ্ছা তোমাদের বাড়ীতে লোকজন আসেন এখনো? মানে বাইরের লোক।

হ্যাঁ, আসে বৈ কি। প্রায়ই তো আসে। বসে মার গান শোনে, দু একজন খাওয়া দাওয়াও করে, তারপর চলে যায়।

মুহূর্তের জন্য প্রিয়নাথের বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। পাঁজরের ফাঁকে তীব্র একটা ব্যথা। কিন্তু সামলে নিলেন। দুটো চোখ কুঁচকে ঠোঁট কামড়ে বসে রইলেন, তারপর চাপা গলায় বললেন, পদ্মর কাছে তুমি কতদিন আছ?

প্রশ্নটা মেয়েটি বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারল না। ভ্রূ কুঁচকে প্রিয়নাথের দিকে বড় বড় চোখ মেলে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। পরে চুলের গোছা দুলিয়ে বলল, দাদুও মাকে ওই নামে ডাকত। বলত, পদ্মা, রাক্ষুসী পদ্মা, তাই একুল ওকুল দুকুল খেয়ে বসে আছিস।

দাদু! আবার প্রিয়নাথ বিচলিত হয়ে পড়লেন। ভুলই হয়েছে, গলি, বাড়ী সব ঠিক আছে, হয়তো নামটাও, কিন্তু আসল মানুষটা সরে গেছে এখান থেকে। তাই হবে।

কোঁচা সামলে প্রিয়নাথ ওঠার চেষ্টা করলেন, কিন্তু মিনতি শক্ত হাতে জামার আস্তিনটা চেপে ধরল।

—বারে, উঠে পড়ছ যে। তোমাকে আমি কিছুতেই যেতে দেব না।

—আমি যার খোঁজে এসেছি, সে এ বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে।

—আহা, তাই বই কি! মা কতদিন থেকে আমায় বলেছে তুমি ঠিক আসবে একদিন। যখন আমার একলা থাকতে খুব ভয় করত, তখন মা বলেছে, তুমি সব সময় আমার কাছে কাছে থাক। ঠিক সময় পেলে আমার কাছে আসবে। এতদিন পরে যখন এলে, তোমায় ছেড়ে দিচ্ছি কিনা। আর কক্ষণো যেতে দেব না।

কথার সঙ্গে সঙ্গে মিনতির দুটো চোখ জলে ভরে এল। দু' একটা ফোঁটা ঝরেও পড়ল ফ্রকের ওপর।

দু' হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে সে আবার বলল, জানো বাবা, সরযূটা কি বোকা! বলে, তোর বাবা কবে মরে গেছে, তোর বাবা আবার আসবে? দাঁড়াও না মা এলে, সরযূকে ডেকে এনে দেখাব।

প্রিয়নাথ মন শক্ত করে নিলেন। আর নয়, এর পরেও বসে থাকলে ব্যাপার কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কিছু বলা যায় না। দু এক মিনিট একটু ভেবে নিলেন। এদিক ওদিক মতলব। মিনতির পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, আমি একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি। তোমার জন্য একটা জিনিষ কিনে আনব দোকান থেকে। যাব আর আসব।

একবার বেরতে পারলে হয়। আর এমুখো নয়। যেমন করে হোক পদ্মকে খুঁজে বের করতেই হবে। মোড়ের পানওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলেই বোধ হয় হদিশ মিলবে।

মিনতির মুঠো একটু শ্লথ হতেই প্রিয়নাথবাবু ওঠবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু উঠতে যাবার মুখেই বাধা।

ঠিক দরজার সামনে। সাদা ব্লাউজ আর সাদা থান। পায়ে সস্তা দামের চটি। দারিদ্র্যজর্জর কাঠামো। সারা মুখে কোথাও একটু কোমলতার আঁচড় নেই। নিষ্ঠুর পৃথিবীর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করে করে কেমন একটা কঠিন ভাব। প্রিয়নাথকে দেখেই চশমার কাচ দুটো ঝিক-মিকিয়ে উঠল।

এই দেখ মা, বাবা এসেছে। মিনতি চিৎকার করে উঠল।

—আঃ মিনু। চাপা তর্জন। প্রিয়নাথের মনে হল এ ভর্ৎসনা মিনুকে নয় তাঁকেই। সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে না বলতে পারলে এ অস্বস্তিকর আবহাওয়া কাটবে না।

—দেখুন, একটু কেশে প্রিয়নাথ গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন, বছর পাঁচেক আগে আমি এই বাড়ীতে আসতাম। বহুদিন আমি শহর-ছাড়া। ইতিমধ্যেই হয়তো—

প্রিয়নাথ কথা আরম্ভ করতেই ভদ্রমহিলা একটু এগিয়ে আসছিলেন, প্রিয়নাথ কথা শেষ করার আগেই নাকে কাপড় চাপা দিয়ে আবার পিছিয়ে গেলেন।

শুকনো, খটখটে গলা, আপনি যাদের খোঁজে এসেছেন, তারা আজ বছর চারেক এ পাড়া ছেড়ে গেছে। পুলিশ সরিয়ে দিয়েছে। এটা গেরস্তর বাড়ী। যান বাইরে যান।

প্রিয়নাথ এক মিনিটও সময় নষ্ট করলেন না। তাড়াতাড়ি উঠে ভদ্রমহিলার সন্তর্পণে পাশ কাটিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। ভদ্রমহিলা বিড় বিড় করে মেয়েকে কি বলছেন শোনা গেল না, কিন্তু পরমুহূর্তেই মিনতির আর্তনাদ কানে গেল।

—কেন তুমি বাবাকে তাড়িয়ে দিলে? বাবাই তো ফিরে এসেছিল এতদিন পরে। বাবা, বাবা!

দু' হাতে কান চেপে প্রিয়নাথ দ্রুত চলতে শুরু করলেন। আশ্চর্য, গলির মোড়ে এসেও নিস্তার নেই। এত দূরেও ঠিক কানে আসছে কান্নার সুর। বাবাই তো ফিরে এসেছিল এতদিন পরে। বাবা! বাবা!

চলতে চলতে প্রিয়নাথ দাঁড়িয়ে পড়লেন। না, বাইরে থেকে এ আওয়াজ আসছে না। মিনতির কণ্ঠস্বরও এ নয়। এ শব্দ উৎসারিত হচ্ছে প্রিয়নাথের অন্তস্তল থেকে। অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে এ গলার আওয়াজ।

অনেক দিন আগে ফেলে আসা আত্মজের ব্যাকুল চীৎকার। সুদীর্ঘ দিন হয়তো সেও এমনি একটা মানুষের ফিরে আসার প্রত্যাশায় দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে প্রিয়নাথকে মাথা নিচু করে আজকের মতন পালিয়ে আসতে হবে না তো? জোর করে দৃঢ় মুষ্টির বাঁধন খুলে দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট অন্য কারো নিষ্ঠুর নির্দেশে পথে এসে দাঁড়াতে হবে না?

———

নারী

উমা দেবী

অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল রাজকমলের। চুপি চুপি উঠলেন বিছানা ছেড়ে। একবার আলোটা জ্বালালেন। খাটের পাশে দাঁড়িয়ে অনিমেষে দেখলেন স্ত্রীর মুখ। দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হোলো—বড্ড বুড়িয়ে গেছে তাঁর স্ত্রী অনুজা—বন্ধ্যা কুক্কুরীর মতন কেমন কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে!

—বুড়ী—কুচ্ছিৎ মাগী—থুঃ থুঃ—জানলার পাশে দাঁড়িয়ে রাজকমল থুথু ফেললেন। একটা পৈশাচিক আনন্দে বুকটা ফুলে উঠল। জীবনে এই প্রথম তিনি স্ত্রীকে তাচ্ছিল্য করলেন—নগণ্য মনে করলেন। আর কোনোদিন তাঁকে স্ত্রীর সামনে দরিদ্র ভিখারীর মতন কুণ্ঠিত হস্ত-প্রসারণ করতে হবে না। ঐ কি কামিনী। কামিনীর কঙ্কাল! কোনো কালে কামিনী ছিল? —কোনো কালে না—জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ঘাড় নাড়িয়ে নাড়িয়ে রাজকমল স্ত্রীর কামিনীত্ব একেবারে অস্বীকার করলেন।

কিন্তু তাঁর মনের এই অস্বীকৃতিকে ছাই ক'রে দিয়ে জ্বলে উঠল পুরোনো দিনের স্মৃতির আগুন। ষোলো বছরের সুকুমারী কিশোরী ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল ফুলশয্যা ছেড়ে। নববধূর চেলাঞ্চল খসে পড়ল মাথাথেকে। ময়ূরকণ্ঠী চোলির উপরে কাঁপতে লাগল মুক্তার মালা—থর থর অশ্রুর মতন। আর গর্বিতা অভিমানিনীর আরক্ত ওষ্ঠাধরের উপর চোখ থেকে ঝরতে লাগল উষ্ণ অশ্রুজল।

রাজকমল নিজেও বিমূঢ় হ'য়ে পড়েছিলেন, ব্যথিত হয়েছিলেন। তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়ায়নি, কিন্তু হৃদপিণ্ডের সমস্ত রক্তই অশ্রুর সমুদ্র হ'য়ে উঠেছিল।

নববধূ অনুজার সঙ্গে প্রথম আলাপের সূত্রপাত তখন। সেদিন কোন্ তিথি ছিল? বোধ হয় কৃষ্ণপক্ষের কোনো তিথি। অনেক রাত্রে আকাশ আলো করে সোনালি চাঁদ উঠেছিল। অনেক কোকিল ডেকেছিল আর হাসনুহানার মনমাতানো গন্ধ বহন ক'রে এনেছিল অবিশ্রান্ত দক্ষিণ বাতাস। সলজ্জ নববধূর নয়ন ছিল নিমীলিত—অনেক আশা, অনেক সুখ, অনেক সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্য বহন ক'রে এনেছিল সে। কিন্তু রাজকমলের ভাগ্য ছিল বিরূপ।

অনুজার ঘামে-ভেজা নরম রাঙা হাতখানি হাতের মুঠোয় চেপে চুড়িগুলি নেড়েচেড়ে দেখছিলেন রাজকমল। হঠাৎ কি খেয়াল হোলো—নিজের হাত থেকে হাতঘড়ি খুলে পরিয়ে দিলেন। তারপরেই মুখখানি নামিয়ে রাখলেন অনুজার হাতের উপর।

কি বলতে চেয়েছিলেন তিনি সেই ফুলের মতন রঙীন আর নরম হাতের স্পর্শে দু-চোখ বুজে? শিশিরে ভেজা গোলাপের মতন সুগন্ধি নরম হাত অমন কাঠের মতন কঠিন হ'য়ে উঠল কখন? কেন? রাজকমল বিস্মিত হ'য়ে অনুজার মুখের দিকে তাকালেন। কিন্তু তখন তার দু-চোখে স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ হচ্ছে—সারা দেহ থর থর ক'রে কাঁপছে। রাজকমল আহত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হোলো অনু?

অনুজা এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ঘাড়ের দিকে আঙুল তুলে বললে—কানের পাশে ও সাদা দাগ কিসের?

—সাদা দাগ?—রাজকমল অবাক হ'য়ে—ক্ষুব্ধ হ'য়ে—ভীত হ'য়ে কানের পিঠে হাত বুলিয়ে দেখলেন। বললেন—কই? না!

—হাত বুলিয়ে কি দাগ বোঝা যায়?—নববধূ অনুজা এগিয়ে গেল। তার হাত থেকে খসে পড়ল নতুন ঘড়ি—রাজকমল তুলে নিলেন তাড়াতাড়ি. আর সেই মুহূর্তেই নজরে পড়ল নিজের একটি ছোট সাদা দাগ—ঠিক মণিবন্ধের উপরে— সুস্থ মানুষের দেহে যেটিকে নখের আঁচড়ের দাগ বলে মনে হবে।—যাক, গেছে সেসব দিন—রাজকমল দীর্ঘশ্বাস ফেললেন—বিবাহ রাত্রির আকাশ তাঁর জীবনে অনেক দুঃস্বপ্ন ছড়িয়ে দিয়ে গেছে।

ঘড়ির কাঁটা হাত বাড়িয়ে তিনের ঘর ছুঁয়ে বেজে উঠল—টং টং টং। এবার অনুজা পাশ ফিরল—হাত বাড়িয়ে কি যেন খুঁজল—কাকে বুঝি খুঁজল! রাজকমল সকৌতুকে দেখলেন, তারপর ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিবিম্ব পড়ল বড় ঝোলানো আরশিতে।

বীভৎস চেহারা তাঁর। মোটা থসথসে শরীর—দু-পাশে চেয়ারের হাতলের ফাঁক দিয়ে ফেটে বেরুচ্ছে। দাগ কাটা-কাটা গলার খাঁজে খাঁজে মেদস্ফীতি, মুখের দু-পাশে গালের মাংস ঝুলে পড়েছে। কাঁচায় পাকায় মেশানো একজোড়া জবরদস্ত গোঁফ—উদ্যত তীব্র ভ্রূ, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। শ্বেতিরোগে সর্বাঙ্গ চিত্রবিচিত্র, বিশেষ ক'রে মুখ আর গলা। সাদা ঠোঁট—সাদাটা ক্রমশ উপরের দিকে উঠে আক্রমণ করেছে ডানদিকের চোখ—চারপাশ দিয়ে রচনা করেছে একটি শ্বেতমণ্ডল। বাঁ-দিকের গালের স্বাভাবিক রঙ এখনো আছে কিন্তু চিবুকের পাশ দিয়ে সাদা নেমে গেছে বাঁদিকের গলা বেয়ে বুকে। নিজের চেহারার প্রতিবিম্ব দেখে ঘৃণায় মুখ ফেরালেন রাজকমল।

রাত্রি প্রায় শেষ। অল্প আলো ঘরে ছড়ানো আছে। আয়না সুতোর জালে ঢাকা—তারই ফাঁকে ফাঁকে মুখের চেহারা খানিকটা খানিকটা দেখা যায়। আবার তাকালেন তিনি নিজের প্রতিবিম্বের দিকে। দেখতে দেখতে মৃদু একটি হাসির রেখা ফুটে উঠল মুখে—দু-হাতের আঙুলে গোঁফ মুচড়ে তিনি মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। কালকের রাত্রের স্মৃতি তাঁর মনে পড়ছে।

কালকের রাতটিকে বাঁধিয়ে রাখা যায় না সোনা দিয়ে? বুকের ● রক্ত দিয়ে রাত্রির অন্ধকারকে ধুয়ে দিয়েছেন কাল। সারা জীবন ধরেও যে টাকা তিনি সঞ্চিত করতে পারতেন না সেই বিশ হাজার টাকার আগুন জ্বালিয়ে সমস্ত জীবনের জমাট করা অন্ধকারের জঞ্জালকে জ্বালিয়ে ছাই ক'রে দিয়েছেন। সে সময় কি অন্ধ

স্ত্রীর কথা মনে পড়েছিল? ননীর পুতুলী পুত্রের কথা? কুমারী কন্যার কথা? মাথা নাড়লেন রাজকমল। কিছু মনে পড়েনি—কারুর কথা নয়, কোনো কথা নয়। সাধকের মতন দেবীর সাধনায় মগ্ন ছিলেন।

দেবী! মনে পড়তে আবার হাসলেন। দেবীই বটে—শুধু নিলামে ডেকে দেবীকে পেতে হয়েছিল। তা হোক—তবু সেই এক রাত্রির স্বাদ তাঁর জিহ্বায় এখনো লেগে রয়েছে—সেখানে শ্বেতি-রোগের সাদা ছোপ নেই।

সেই যে বাসররাত্রে নববধূ অনুজা ঘাড় বাঁকিয়ে উঠে গিয়েছিল মিলন-শয্যা থেকে আর কি সেখানে তাকে ফেরানো গিয়েছিল? সে কি স্বামীর পাশে দাঁড়িয়েছিল সহকর্মিণী হয়ে, শয্যায় এসেছিল সহমর্মিণী হ'য়ে? স্বেচ্ছায় আসেনি—আসতে হয়েছিল তাকে। রাজকমলের তিনটি সন্তানের জননী অনুজা! সেই যৌবনেই অনুজার কী যে হোলো— সারা দেহে কিসের যন্ত্রণা—তাকে একরকম পঙ্গু হয়েই কাটাতে হচ্ছে—পাঁচ-ছ বছর। সেই সুন্দরী, অভিমানিনী, গর্বিতা অনুজার ছায়াকঙ্কালকে নিয়ে রাজ-কমলের গৃহস্থালী—তাতে তার কোন দুঃখ নেই। প্রয়োজন মিটলেই হোলো—প্রেম কোথা থেকে দেবে অনুজা রাজকমলকে? চামড়া-ছোলা চেহারা রাজকমলের—আলো না নিভালে খাটে পাশ ফিরে শুয়েই থাকে অনুজা।

মনে কি পড়ে রাজকমলের সেই বাসর রাত্রির কথা? সেদিন শয্যায় কোন্ রাজকমল মুহ্যমান হ'য়ে পড়েছিলেন? কাকে স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন—কে তাঁর উদ্যত বাহুর উন্মুখ আলিঙ্গন এড়িয়ে দু-হাতে মুখ ঢেকে পালিয়ে গিয়েছিল? রোদনমুখী পলায়নপরা কার দু-পায়ের উপর আছড়ে পড়েছিলেন তিনি—কেন মনে হয়েছিল তাঁর সমস্ত জীবন পুড়ে ছাই হোয়ে গেল? সে কোন্ রাজকমল? বিশ হাজার টাকা এক কামিনীর জন্য এক রাত্রে খসিয়ে দিতে পারে যে রাজকমল—সে রাজকমল নয়। আজ সে রাজকমলও নেই, সে অনুজাও নেই।

সেদিনের সেই রাত্রের পর রাজকমল ছুটে বেরিয়েছিলেন—ঘুরে বেরিয়েছিলেন অনেক দেশ। অনুজাও চলে গিয়েছিল পিতার গৃহে। সেখানে অনেক দিন কাটাবার পর পিতার নির্দেশে স্বামীগৃহেই ফিরে আসতে হয়েছিল তাকে। ভাবলেশহীন পাংশু মুখে প্রথম রাত্রিকে সে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। রাজকমলের মনে আছে সে রাত্রের কথা—অনুজাকে ক্ষমা তিনি করেন নি।

দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বাঙ্গের শ্বেতি। গায়ের গেঞ্জী খুলে শয্যায় এসে বসেছিলেন। ভয়ে অনুজা সাদা হয়ে গিয়েছিল—বালিশ আঁকড়ে উপুড় হয়ে শুয়ে থর্‌থর্ করে কেঁপেছিল। অনেক অনুনয় করেছিল আলো নিভিয়ে দিতে কিন্তু রাজকমল তা দেননি। আহত পৌরুষের জ্বলন্ত অভিমান বয়ে বেড়াচ্ছিলেন—নবনীতের মতন কোমল রমণী দেহ তাতে ইন্ধন যোগাল মাত্র। এতদিনে স্বামীকে অবহেলা করবার যোগ্য শাস্তি পেল অনুজা।

স্মৃতির সরণি বেয়ে অনেকদূর এসে পৌঁছেছেন—ক্লান্ত হয়ে রাজকমল একটা সিগারেট ধরালেন। সব কথা মনে পড়ছে—এক এক করে সমস্ত ঘটনা। কি দুঃসহ অপমান, কি গভীর বেদনা বয়ে বেড়িয়েছেন তিনি বছরের পর বছর। সেই অনুজা এখন—

তাকালেন অনুজার দিকে। চামড়া-জড়ানো একটি কঙ্কাল মাত্র। ঘুমের মধ্যেই কি যেন হাতড়ে বেড়াচ্ছে। হাসিই পেল রাজকমলের। এখুনি কাতরে উঠবে অনুজা, তারপর তাঁকে ডাকবে। তাঁর হাত ধরে থরথর করে কাঁপবে। তারপর কাঁপা-কাঁপা গলায় বলবে—আমায় একটু তুলে ধরো। নিজে উঠে জল গড়িয়ে খাবার মতনও অবস্থা নেই তার! মাত্র তিনটি সন্তানের জননী হয়েই সে বলতে গেলে পঙ্গুই হয়ে গেছে। রাজকমলকে সে কি ঘৃণা করে না? নিশ্চয়ই করে—দারুণ ঘৃণা—সেই ঘৃণার বিষেই দেহ তার বিষিয়ে গেছে।

দোষ কি রাজকমলের ছিল? সিগারেট টানতে টানতে রাজকমল ভাবেন—দোষ কি অনুজারও ছিল? অথচ কি ভাগ্যবিড়ম্বনা!

প্রথম সন্তান হবার দিনের কথা মনে পড়ল। রাজুপিসিমার কাছে খবরটা শুনেছিলেন। আনন্দে উদ্বেল হয়ে ছুটে গিয়েছিলেন দেখতে—কিন্তু দেখতে গিয়েই ছুটে পালিয়ে এসে-ছিলেন।

খাটের উপর অনুজা চোখ বুজে শুয়েছিল। হঠাৎ সে পাগলের মত কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসল—উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগল সন্তানকে। কি সে খুঁজছিল—জানেন রাজকমল। কোনো সাদা দাগ শিশুর দেহে থাকলে বুঝি গলা টিপে মেরেই ফেলত অনুজা।

না—অনুজার কোনো সন্তানই তেমন হয় নি—এদিক দিয়ে সে ভাগ্যবতী। তিনটি সন্তান—তিনটি চাঁদের টুকরো, বাড়ী আলো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবু অনুজা তাদের কাছে ডাকে না, এলে চোখ বুজে শুয়ে থাকে—ভয়ে সাদা হয়ে যায়—যেন চোখ খুললেই কি যেন দেখতে পাবে—দেখবে হয়তো ছোট্ট একটু সাদা দাগ যা ক্রমশঃই ছড়িয়ে যাবে সারা দেহে—জলের ওপর তেলের মতন।

এটা অনুজার মনের রোগ। শ্বেতি ছোঁয়াচে ব্যারাম নয়, তবু রাজকমলের হাতে হাত ঠেকলে শিউরে ওঠে সে। ঘরের চারপাশে আয়না টাঙ্গানো, শুয়ে শুয়ে দিনরাত আয়নায় নিজেকে দেখছে। রোগ ছাড়া কি? মনের রোগ। মনের রোগ এখন দেহেও আত্মপ্রকাশ করেছে—অনুজা একরকম পঙ্গু হয়েই গেছে, এই অবস্থাতেই জন্মেছে তার শেষ সন্তান।

অনুজা আবার কাতরে উঠল। অন্ধকারেই চোখ মেলে কাকে যেন খুঁজল, যেন জীবন তার হারিয়ে গেছে। তারপর দৃষ্টি পড়ল রাজকমলের দিকে। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ডাকল অনুজা—শোনো—

রাজকমল উঠে এলেন। প্রতিদিনই উঠে আসেন। মোটা দুই বাহুর মধ্যে দুর্বল ঐ ক'খানা চামড়া-ছাওয়া হাড় থর্‌থর্ করে ওঠে। ঐ টুকুতেই হাঁপিয়ে পড়ে অনুজা। কোনোমতে জলের গেলাস হাতে নিয়ে দু-এক ঢোঁক জল খায়। তারপর মোটা বাহুর ঠেসান দিয়ে আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ে।

যেদিন রাত্রে চাঁদ ওঠে না, আকাশ-ভরা তারা ঢাকা পড়ে যায় মেঘে, বৃষ্টির জল ছল্‌ছল্ সুরে ঝরতে থাকে আর থাকে আলো নেভানো সেদিন অনুজার মনও ছলছলিয়ে ওঠে। রাজকমলের বুকের উপর মাথা রেখে ডাকে—ওগো, শুনছ—

—কি বল—রাজকমল ঝুঁকে আসেন। অনুজার মাথা কাছে টেনে এনে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞাসা করেন—বড্ড শরীর খারাপ লাগছে?

অনুজা কিছু বলে না কিন্তু তার ফোঁপানি শোনা যায়। দু-এক ফোঁটা জলও পড়ে টপ্ টপ্ ক'রে। তার পর আস্তে আস্তে বলে—ব্যথাই শুধু দিলুম তোমায়—

—আর তুমি!—কপালে চুমু খেয়ে রাজকমল বলেন, তুমিই কি কম দুঃখু পেলে! দুঃখের বিষে শরীর তোমার জরে গেল—

মুহূর্ত মাত্র কঠিন হয়ে ওঠে অনুজার দেহ—তার পরেই এলিয়ে যায়। কেউ কাউকে দেখতে পায় না—দুই মন শুধু এক হয়ে যায়—এক নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মতন অন্ধ এক নিয়তি দুজনকেই গ্রাস করে। তার পর আসে ঘুম—ঘুম—ঘুম—আহা, এই ঘুম যদি আর না ভাঙত—অনুজা ভাবে।

আবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে যায় সন্তানদের কথা। সে চলে গেলে চাঁদ, সোনা আর টুকুনকে কে দেখবে? যাদের ছেলে তারাই দেখবে—উদার নিস্পৃহতার সুরে অনুজার মন বলে ওঠে। দুটি সন্তানের জন্ম দিতে তার দুই পাঁজরা ধসে গেছে। আর এই প্রায়-পঙ্গু অবস্থায় জন্মানো তৃতীয় সন্তান টুকুন তার হৃৎপিণ্ডই বুঝি উপড়ে ফেলে দিয়েছে। সন্তানের কোনো দায়িত্বই নিতে পারবে না অনুজা। তিনটি সন্তানই শুধুই রাজকমলের।

মাঝে মাঝে যখন রাজকমল রাত্রে থাকে না তখন চোখ বুজে পড়ে থাকে অনুজা। হঠাৎ এক সময় উগ্র সৌরভে ঘরের বাতাস মাতাল হয়ে ওঠে। বুক ভরে সে সৌরভ অনুজা পান করে—দম বন্ধ হয়ে আসে তার। হঠাৎ দমফাটা স্বরে জিজ্ঞাসা করে—কে?

প্রশ্নটা যেন কান্নায় ভাঙা, আক্রোশে রাঙা।

কৌতুক অনুভব করেন রাজকমল। ধীরে ধীরে বলেন—আমি।

মোহাচ্ছন্নের মতন অনুজা বলে—আমি কে?

—আমি গো। —সকৌতুকে উত্তর দেন রাজকমল—ঘুমোওনি অনু?

না, অনুজা ঘুমায় না। রাজকমল জানেন এ রকম রাত্রে অনুজা ঘুমায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত উগ্র সুগন্ধে ঘরের বাতাস ভারী হ'য়ে না ওঠে, যতক্ষণ পর্যন্ত যেখানে গিয়েছিলেন সেখানকার কথা না বলেন ততক্ষণ অনু ঘুমায় না। তারপর রাজকমল ঘুমান আর অনুজা জাগে। জাগে আর জেগে জেগে নিঃশব্দে কাঁদে। পাখীর পাঁজরের মতন বুকের পাঁজরায় প্রাণটা হাঁপাতে থাকে, তারপর ধীরে ধীরে সেও ঘুমিয়ে পড়ে। পরদিন যথারীতি সকাল হয়—সকালে আর চোখ খুলতে ইচ্ছে হয় না তার।

এই অনুজা! অনুজাকে ধীরে ধীরে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে রাজকমল আবার ভাবতে বসেন। যে কিশোরীকে তিনি চেয়েছিলেন তাকে পাননি—পেয়েছেন তার ছায়াকে। সে পিতৃগৃহে রেখে এল সৌন্দর্য আর গরিমাকে। শিশু যেমন দেরীতে প্রাপ্য বস্তু পেলে দুমড়ে আছড়ে ফেলে দেয়, অনুজাকেও তেমনি রাজকমল দুমড়ে আছড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। অনুজাকে দিয়ে তাঁর তৃষ্ণা মেটেনি।

না হোলে তিনি ছুটে যাবেন কেন সেই

মাছের খোঁজে ভোঁদড় — পরিমল গোস্বামী

বিলাতি হোটেলে—মরুমরীচিকায় তৃষ্ণা মেটাবার চেষ্টায়? তা—তৃষ্ণা তাঁর মিটেছে, অন্তত ব্যর্থ পৌরুষের জ্বলন্ত ধিক্কারকে তিনি ভুলতে পেরেছেন। স্ত্রীর মনে তাঁর কোনো অস্তিত্ব নেই—এ কি ভোলবার মতন জ্বালা!

প্রথম তিনি কাগজেই পড়েছিলেন রাজো-য়াড়ার সেই বিখ্যাত হত্যার কাহিনী। যে রূপসীর রূপের আগুনে পুড়ে মরেছিলেন দুই রাজা—তাদের ছবিও তিনি দেখেছিলেন। সে রূপসীর নাম ছিল ইন্দ্রজায়া। সুঠাম দেহে তার সাজানো ছিল থরে থরে রত্নালংকার, গ্রীবায় গর্ব, চিবুকে কোমলতা, আর দুই আয়ত চোখে মদালস তন্দ্রা। বুড়ো রাজার মৃত্যুর পর ছোট রাজার হাতে এল সেই বরবর্ণিনী। তারও কিছুদিন পরের ঘটনাচক্রে ইন্দ্রজায়া এল এক নবাবের হাতে—পালিয়ে চলে এল—তারপর রাজায়-নবাবে বাঘ-ভালুকের যুদ্ধ। ফলাও করে গল্প বেরুতো কাগজে কাগজে—ছবি ছাপা হতো পাতায় পাতায়। সে অনেক কালের কথা—রাজকমল তখন সদ্য কৈশোর ভেঙে যৌবনে পদার্পণ করেছেন। ক্রমে ইন্দ্রজায়ার কথা লোকে ভুলেই গিয়েছিল।

সেই ইন্দ্রজায়া বোম্বে যাবার পথে মাত্র দু'দিনের জন্য কলকাতায় থাকছেন—এ কথা কাগজে পড়ে প্রৌঢ় বয়সেও রাজকমলের মন নেচে উঠল। একবার চোখের দেখা কি দেখা যায় না?

ঠিকানা অনুযায়ী উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি। হোটেল ঘিরে জনতা। মাঝে মাঝে জনতার এক একটা চাপ ঠেলে ঠেলে এগিয়ে আসছিল, পুলিশের লাঠির ভয়ে মাঝে মাঝে ভেঙেও যাচ্ছিল। মৌচাকে খোঁচা দিলে মৌমাছি-গুলি চারপাশে ছড়িয়ে ছতরে প'ড়ে আবার যেমন ঘন হ'য়ে আসে সেই জনতাও তেমনি ফিরে ফিরে হোটেলের সামনে ভিড় জমাচ্ছিল। এই জনতার মধ্যে প্রৌঢ় রাজকমলও ছিলেন।

তাঁর সেই সাদা ছোপ দেওয়া চেহারা কি কারুর নজরে পড়েছিল? না হ'লে এত লোক থাকতে রাজকমলকেই বা ডেকে উপরে নিয়ে গেল কেন? পরে অবশ্য তিনি জেনেছিলেন—সে ছিল ইন্দ্রজায়ার দালাল।

উপরে এসে দেখলেন প্রায় দশবারোটি বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন প্রদেশের নানান বয়সী লোক বসে আছে। প্রায় আধঘণ্টা উদগ্রীব হ'য়ে বসে থাকবার পর দালাল এসে উপস্থিত হলেন—বললেন—আর কেউ নেই, এখন ডাক সুরু হ'তে পারে।

—ডাক? কিসের ডাক?—অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন রাজকমল। সে দিনের কথা মনে পড়লে আজও হাসি পায়। কিছুই জানতেন না তিনি—শুধু দেখবার লোভেই এসেছিলেন। এখন যখন শুনলেন ডাকের উপর রাতের চুক্তির কথা তখন তিনিও লোলুপ হয়ে উঠলেন।

ডাক সুরু হোলো। সুরু করেছিল এক কিশোর কিন্তু সে বারো হাজারের বেশী ডাকতে পারেনি। আসল ডাক সুরু হয়েছিল রাজ-কমলের সঙ্গে এক বৃদ্ধের। রাজকমল হেঁকে গেলেন—বারো হাজার—বারো হাজার পাঁচশ—চৌদ্দ হাজার—চৌদ্দ হাজার—আঠার হাজার—আঠার হাজার পাঁচশ—বিশ হাজার—বিশ হাজার—বিশ হাজার—

বিশ হাজারের বেশি ডাক ওঠেনি। সকলে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল রাজকমলের দিকে—এক বাঙালী বাবুর দিকে। ইন্দ্রজায়ার জন্যে এত টাকা খরচ করতে কেউই রাজী নয়। এতক্ষণে সকলের মনে হোলো—এক বিগত-যৌবনা নটীর জন্য এক রাত্রে দু-হাজার টাকাও খরচ করা বাতুলতা মাত্র। পূর্ব-গৌরবের কলঙ্কচিহ্নিত এক ইতিহাস আজ তার চারপাশে দুর্লভতার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি ক'রেছে মাত্র। আসন্ন বার্ধক্যের ছায়া পড়েছে যে দেহে তার কতটুকু মূল্য? এতক্ষণে রাজকমলের মনে হোলো মোহ-গ্রস্তের মত এ কি করে বসলেন? সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থ তাঁর চার-পাঁচ হাজারের বেশি নেই। বিক্রি করলে অনুজার গহনার দাম দু-হাজারের বেশি হবে না। তবে উপায়! এক রাত্রির ইন্দ্রত্বের অধিকার যখন পেয়েছেন তখন উপায় বার করতেই হবে।

উপায় মিলিয়ে দিয়েছিলেন ভগবান। পাগলের মতন বাড়ী ফিরেছিলেন—সর্বস্ব খুইয়েও তাঁর পাঁচ-সাত হাজারের বেশি অর্থ-সংগ্রহ হবে না। কাম্য স্বর্গ এসে হাতের মুঠো থেকে খসে যাবে? ভগবান্ কি তাহ'লে নেই?

সে দিন রাত্রে তাঁর কাছে নাগরলাল ঢল-মলিয়ার লোক এল। দু-লাখ ত্রিশ হাজার টাকার ইনকামট্যাক্স বাকি তার। পাড়ায় থাকেন রাজ-কমল, "কুছ্ মেহেরবাণী" ক'রে তিনি কি গরীবের জান্ বাঁচাতে পারবেন না?

—কত দেবেন আমাকে?—রাজকমল চিন্তিত হ'য়ে প্রশ্ন করেছিলেন।

আজও মনে পড়ে তাঁর—কত কারসাজি আর কারচুপি ক'রে সন্ধানের ভার নিজের হাতে নিয়ে কাজটা শেষ করতে পেরেছিলেন। সেজন্যে অর্থ যা পেয়েছিলেন তাতে তাঁর কাম্যলাভ করতে আটকায়নি। ভগবান্ মিলিয়ে দিয়েছিলেন—তা ছাড়া আর কি! বিশ হাজার টাকার অঙ্কটার যে ফাঁক থাকেনি সেজন্য ঢল্‌মলিয়ার কাছে তিনি কৃতজ্ঞ। শুদ্ধ, শান্ত, অপাপবিদ্ধ ভগবান্ ইন্দ্রজায়ার ইন্দ্রত্বের অধিকার একদিনের জন্য রাজকমলকে দিয়েছিলেন! ধন্যবাদ তাঁকে।

কিন্তু তারপর? তারপরের কথা স্মরণ করতে শিউরে ওঠেন তিনি! কি এর পরিণাম—তা কে জানে!

অনুজার অসুখের যন্ত্রণা সেদিন বেড়েছিল। কোমরের দু-দিক থেকে যন্ত্রণাটা উঠে একটা চলে যায় শিরদাঁড়া বেয়ে ঘাড়ের দিকে আর একটা নেমে যায় ডান পা দিয়ে বুড়ো আঙুলের দিকে। অসহ্য—অসহ্য সে যন্ত্রণা। সেদিন সন্ধ্যে থেকেই রাজকমল শুনছিলেন অনুজার কাতরানি। কিন্তু এ শোনায় কোনোদিনই তিনি কাতর হন না। সারা দেহে সৌরভের তরঙ্গ তুলে অনেক রাতে যেদিন ফেরেন সেইদিন শুধু অনুজার গা ঘেঁসে বসেন। পাথরের মতন শক্ত আর স্থির অনুজার কপালে তাঁর চিবুক ছুঁইয়ে জিজ্ঞাসা করেন—বড্ড কি যন্ত্রণা অনু?

অনু সে কথার জবাব দেয় না—ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে—এত গন্ধ কিসের—কেন? কোথায় যাও?

কিছু বলেন না রাজকমল। শুধু তাঁর মাথাটা

আরো কাছে টেনে নেন—স্মিত হাসি ওষ্ঠপ্রান্তে জেগে থাকে। এও এক ধরণের পীড়ন—মধুর ও নিষ্ঠুর পীড়ন। এক আত্মপ্রসাদে তাঁর অন্তর ভরে উঠল।

এইতো কালই সন্ধ্যায় জরিপাড় উড়ুনিতে গন্ধ ঢালতে ঢালতে, চিত্র-বিচিত্র মুখখানা আয়নায় দেখতে দেখতে আর রুগ্না স্ত্রীর কাতরানি শুনতে শুনতে অভিসার-সজ্জায় সজ্জিত হয়েছিলেন—তারপর একখানা ট্যাক্সি ধরে পৌঁছেছিলেন সেই ইন্দ্রধামে যেখানে ইন্দ্রজায়া একদিনের এক নতুন ইন্দ্রের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

ইন্দ্রজায়ার পূর্বগৌরব আর ছিল না। নবাব-বাদশা, রাজা-উজির শূন্যে দিগন্তে ইন্দ্রধনুর মতন মিলিয়ে গিয়েছিল। তরুণীর বসন-ভূষণে সজ্জিতা প্রৌঢ়া ইন্দ্রজায়াকে কেন রাজকমলের কুৎসিত বলে মনে হয় নি? কেন তার পায়ে আপন ভবিষ্যৎকে বিলিয়ে দিলেন তিনি? এক রাত্রের বিলাসখেলায় সম্মান, গৌরব, সততা, নিরাপত্তা—সমস্তই হারিয়ে গেল।

নীল-পরীর মতন নীলাভ আলোকে দাঁড়িয়েছিলেন ইন্দ্রজায়া—এখনও রাজকমলের মনে আছে সেই দীপ্ত রূপ। প্রগাঢ় হৃদয়রাগের মতন রক্তবর্ণ গালিচার উপরে নানাবর্ণ রত্নখচিত পাদুকার ময়ূখমালায় অলঙ্কৃত দুটি রক্তাভ চরণ পেতে মূর্তিমতী শৃঙ্গার-লক্ষ্মীর মতন দাঁড়িয়েছিল ইন্দ্রজায়া। কুয়াশার মতন প্রায়-স্বচ্ছ অতি সূক্ষ্ম নীলাভ বসনে দেহের নিম্নাঙ্গ প্রায় নিরাবরণ, মুক্তা গাঁথা নরম শাদা রেশমের চোলিতে উত্তরাঙ্গ অর্ধাবৃত। কণ্ঠে অত্যুজ্জ্বল হীরার কণ্ঠী। তার ঈষৎ সবুজ দীপ্তি গিয়ে মিশেছে দুটি সুগঠিত শ্রবণের উপর বিলম্বিত মুক্তাজালে। মুক্তাজাল থেকে কয়েকটি সূক্ষ্ম স্বর্ণকেশর কাঁপতে কাঁপতে হারিয়ে গেছে ঘনকৃষ্ণ কুন্তলে। অপূর্ব—অপূর্ব—রাজকমলের সামনে এ-কোন্ রূপের প্রতিমা মূর্ত হয়ে উঠল।

ঘরে একটা বিলিতি বাজনা বাজছিল—তারই মৃদু সুরের সঙ্গে মিশছিল মদিরার মধুর সৌরভ। দূরের হল থেকে বিদেশিনী নারীকণ্ঠের সঙ্গীতের তীব্র ব্যাকুলতা ঘরের বাতাসে স্বপ্নের রাঙা ফুলঝুরির মতন জ্বলে উঠে নানান বাজা সুরের হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে মিশিয়ে যাচ্ছিল।

ইন্দ্রজায়া অভিবাদন জানালো পদ্মকোরকের মতন দুটি অঞ্জলি তুলে—ঝিকমিকিয়ে উঠল আংটির পাথর। অধরোষ্ঠে কি কোনো বিদ্রূপের হাসি ছিল? না—বিশ হাজারের বিনিময়ে যে হাসি কেনা যায় তাতে অবিমিশ্র মাধুর্য ছাড়া আর কিছুই থাকে না। সেই হরিণনয়নার হরিণচোখে চিতাবাঘিনীর তীব্র দৃষ্টি দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল রাজকমলের। তারপর ধীরে ধীরে এক অনাস্বাদিতপূর্ব সম্মোহন তাঁকে গ্রাস করেছিল। ধন্য ইন্দ্রজায়া—ভাগ্যবান্ রাজকমল। ধন্যবাদ নাগরলাল চনামলিয়াকে। ভগবান তাকে দীর্ঘজীবী করুন।

কতক্ষণ কাটল স্মৃতিরোমন্থনে রাজকমলের? কখন তাঁর চমক ভাঙল অনুজার কাতরস্বরে? অনুজা ডাকছে। জানেন রাজকমল—এইবার বাথার পুরিয়াটা চাই।

বিরক্তিভরে উঠলেন তিনি। ভোর হয়েছে, পূবের অন্ধকারে আলোর প্রথম সবুজ দেখা দিয়েছে। রাত্রির মোহস্বপ্ন ছুটে গেছে। সর্বনাশের অবশ্যম্ভাবী অন্ধকার এইবার তাঁকে ঘিরবে—ভালো করেই জানেন সে কথা। বিভাগীয় অনুসন্ধান চলবে তাঁর সম্বন্ধে। এত টাকা কি করে পেলেন তিনি—কোথায় পেলেন? তিন শ' টাকা মাইনের যে কেরাণীকে সংসার পোষণ করতে হয় সে কি ক'রে বিশ হাজার টাকা একদিনে খরচ করে? কোন্ ব্যাঙ্কে টাকা ছিল তাঁর, কবে টাকা তুলেছেন? নানান্ অভিযোগ জমবে তাঁর নামে—সাময়িকভাবে অপসারিত হবেন তারপর হবেন বিতাড়িত। আদালতে মামলাও উঠবে—বিশ হাজার টাকা ঘুষ নিয়ে সরকারের দু লাখ তিরিশ হাজার টাকা নষ্ট করবার প্রচেষ্টার অভিযোগ। এ সমস্ত ঘটবেই—জানেন রাজকমল। তারপর আসবে দারিদ্র্য—অভাব, অনটন, রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্ট, গ্লানি-অনুতাপ—সর্বশেষে অবাঞ্ছিত মৃত্যু। দুয়ে দুয়ে চার—অঙ্কের মতন কষে দিতে পারেন তিনি। তবু এক অন্ধ নিয়তির আকর্ষণে, ভবিষ্যের অলঙ্ঘ্য নির্দেশে শিখাময়ী এক রূপমরীচিকার পিছনে ছুটে গেছেন।

তবু দুঃখ তাঁর কিছু নেই। দুঃখ সমুদ্র মন্থন ক'রে এক রাত্রির অমৃতপান করেছেন। যে অনির্বাণ রূপসম্ভোগতৃষ্ণা তাঁকে অগ্নিতে দগ্ধ করে মেরেছে আজ সে অগ্নিতে স্নান ক'রে তিনি শুদ্ধ। তিনি আজ সুখী, শান্ত—জয়ী।

সহসা অনুজার জন্যে এক অপরিসীম করুণায় তাঁর অন্তর পূর্ণ হয়ে গেল। শ্বেতি রোগে ক্ষতবিক্ষত দেহ তাঁর—কুৎসিত তিনি। তাঁরই জন্যে অনুজার ঐ স্নায়ুরোগ। নিজের দেহের সোনা গলিয়ে তিনটি সোনার পুতলী অনুজা তাঁকে উপহার দিয়েছে। বিনিময়ে আজ অনুজাকে তিনি কি দেবেন? দেবেন তাকে দারিদ্র্যের অতল গহ্বরে যেখান থেকে পঙ্গু অনুজার কোনো দিনও উদ্ধারের আশা নেই।

তাকালেন অনুজার দিকে—সারা রাত্রি কাতরিয়ে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছে বেচারী। হঠাৎ কি মনে হোলো রাজকমলের—তার পাশে বসে আস্তে আস্তে তার রুগ্ন হাতটি তুলে নিলেন নিজের হাতে। বড় কোমল, বড় দুর্বল—রক্তহীন ফ্যাকাশে হাত অনুজার। রাত্রে তার মুখের দিকে তাকিয়ে যে সব কথা ভেবেছেন—বলেছেন—এখন ভোরের আলোয় সে সব ভেবে বড় লজ্জা বোধ করলেন। অপরাধী মনে হোলো নিজেকে। আস্তে আস্তে তার দুর্বল হাতখানি তুলে ধরে চুমু দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলে চাইল অনুজা। বিস্ময় ভরা চোখে রাজকমলের মুখের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে চোখ বুজল আর সঙ্গে সঙ্গে ঝরঝরিয়ে ঝরে পড়ল অশ্রুধারা। কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল—আমায় ক্ষমা করেছ তুমি?

—কিসের ক্ষমা অনু!

—যে অপরাধ করেছিলুম সেই বিয়ের পর বাসর রাতে—

—তুমি তো কোনো অপরাধ করনি অনু—শুধু ভয় পেয়েছিলে—

—না না—সে কথা বোলো না। তোমায় ঘৃণা করেছিলুম—ঘৃণায় সরে এসেছিলুম। তুমি যে আমায় এত ভালবাস তা জানতুম না। কাল তুমি সারা রাত জেগে বসেছিলে—আমারই জন্যে। কাল রাতে বড় কষ্ট গেছে আমার—যন্ত্রণায় সারা রাত চেঁচিয়েছি—তোমায় ঘুমুতে দিইনি—বার বার তোমায় ডেকেছি—তোমায় এতদিন ভুল বুঝেছিলুম—

এ কি শুনছেন রাজকমল! পায়ের তলায় কি কেউ বাসর রাতের ফুল বিছিয়ে গেল? একটা ভুলের উপর এ কোন্ স্বর্গ রচনা করল অনুজা? থর থর করে কাঁপতে লাগল রাজকমলের হাত।

দু-হাত দিয়ে সেই কাঁপা হাতটি চেপে ধরে চোখ বুজেই অনুজা বলে চলল—তোমার শ্বেতি রোগ—কুৎসিত তুমি—নির্দয় তুমি পশুর মতন আমাকে চেয়েছ—এই কথাই এতদিন ভেবেছি—অন্তরে তোমার এত আলো তা বুঝিনি, বুঝতে চাইনি—আমায় ক্ষমা কর, আমার সেই প্রথম অপরাধের কথা ভুলে যাও—

রাজকমল এমন ছটফট করছেন কেন? এ সব তিনি কি শুনছেন? তিনি কি পালিয়ে যাবেন অনুজার চোখের সামনে থেকে? তাঁর মিথ্যাচরণকে এ কোন্ প্রেমের আলো দিয়ে বরণ করে নিল অনুজা?

অনুজা বলে চলল—তুমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছ জানি। বোধ হয় ভাবছ—অসুখটা বেড়েছে তাই ডাক্তার ডাকবার জন্যে ছটফট করছ। কিন্তু দেখো—এবার থেকে আমি সেরে উঠব—কারুকে ডাকবার প্রয়োজন নেই। আমায় আজ কথা বলতে দাও শুধু। আমার সেই অপরাধের বোঝা তুমি নিজে একা বহন করেছ নীরবে—ঘৃণাক্ষরেও আমাকে কোনো ভর্ৎসনা করনি—

রাজকমল কি পাগল হয়ে যাবেন! আজ এই চরম বঞ্চনার প্রভাতে কি করে তিনি এই সরল পূজা গ্রহণ করবেন?

—একটু স্থির হয়ে বস—অনুজা ধীরে ধীরে বলল—কাল সারা রাত তুমি ঘুমোওনি, ঐ চেয়ারে বসে সারা রাত আমায় চোখের আড়াল করনি—কত কষ্ট পেয়েছ তুমি তা কি জানিনে? বল আমায় ক্ষমা করেছ—ঝরঝরিয়ে কাঁদতে থাকল অনুজা।

কাঁদতে ইচ্ছে হোলো রাজকমলেরও, কিন্তু তাঁর চোখের অশ্রু বুকে তুষার হয়ে জমে আছে। বললেন তিনি—তুমি ভুল বুঝেছ অনু—

—না না, আমি ভুল বুঝিনি।—অধীর হয়ে বলল অনুজা—আর ভুল বুঝতে কোনো দিনও দিও না। আমি ঠিকই বুঝেছি, আর কোনো কথা বুঝতে চাই না। সত্যের আলো এসে চোখে লেগেছে আর মিথ্যে দেখব না। ওগো—তোমার সেই আতর আমার গায় একটু দাও না—সেই যে আতর মাঝে মাঝে উড়ুনিতে লাগাও—

ব্যাধের বাহু বন্ধনে এক বনহরিণী মৃগনাভির গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে—স্বপ্ন দেখছে মায়ামৃগের। বৃথা—কিছু বলার চেষ্টা করাও বৃথা। কিন্তু এতদিনে! রাজকমল শুষ্ক দৃষ্টিতে একবার উপরে তাকালেন—এতদিনে! যখন সর্বনাশের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন!

ভোরের আলো ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে। এখুনি কর্মব্যস্ত জগৎ জেগে উঠবে—ছুটবে বিচিত্র দিকে—বিচিত্র সুরে গান গাইবে এক বিচিত্র জগৎ। কিন্তু সে জগতে রাজকমল-অনুজার কাহিনী কেউ কি জানবে না? সেখানে সমস্ত ভ্রান্তি কি সত্যের আলোয় প্রদীপ হয়ে জ্বলবে না?

মিথ্যা প্রেম

সুমথনাথ ঘোষ

জানি, আমার মত আপনারাও অনেক পড়েছেন প্রেমের কাহিনী! পৌরাণিক ঐতিহাসিক, আধুনিক, অতি আধুনিক, রোমাণ্টিক, প্লেটোনিক্—স্বদেশী ও বিদেশী কিছুই বাদ দেননি। আবার যা কানে শুনেছেন ও চোখে দেখেছেন, তার সংখ্যাও নেহাত কম নয়। নাগরিক জীবনের বহু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মত সেগুলি গা-সওয়া হয়ে গেলেও বয়েস, মান, জাতি, ধর্ম ও পেশা-ক্রমে তাদের শ্রেণী বিভাগ করতে হলে রীতিমত ভাষাতত্ত্বের ওপর দখল থাকা চাই! এক কথায় এগুলোকে ঘরোয়া প্রেম নামে অভিহিত করা চলে, যদিও এর বহু শাখা প্রশাখা। যেমন ভাড়াটে বাড়ী প্রেম, জানালা প্রেম, স্কুল কলেজী প্রেম, শিক্ষক-ছাত্রী প্রেম, গুরু-শিষ্যা প্রেম, মনিব-চাকরাণী প্রেম, ঠাকুর-দাসী প্রেম ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার এর ওপর আছে বিশ্বপ্রেম! অর্থাৎ দৈনিকপত্র মারফৎ বিশ্বের যে সব প্রেম-কাহিনী, আইন আদালত স্তম্ভে, প্রতিদিন ঘুম ভেঙে, চোখ খুলেই আপনারা দেখেন।

মোট কথা, প্রেম যে বহুমুখী এবং তার গতিও যে বিচিত্র, সে সম্পর্কে বেশী বলার আর কিছু নেই! সকলেই তা জানে এবং একবাক্যে মেনেও নিয়েছেন। আবার এবিষয়ে কারুর কারুর জ্ঞান এত বেশী এবং অভিজ্ঞতা এত বিচিত্র যে, একথাও তাঁরা স্পর্ধার সঙ্গে বলেন যে, জগতের প্রেমের কাহিনীর স্টক্ সব নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে, নূতন বলতে আর কিছু নেই। এখনকার প্রেম কাহিনী সেই পুরনো বস্তাপচা প্রেমেরই পুনরাবৃত্তি একটু-আধটু রঙের অদলবদল বা রকমফের মাত্র!

সম্প্রতি এঁদের একজনের কাছে আমি একটা গল্প বলেছিলুম। গল্পটির 'কপিরাইট একেবারে সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব! কারণ এটি যার জীবনে ঘটেছিল, তাঁর মুখ থেকেই শোনা এবং আমি ছাড়া জগতের আর দ্বিতীয় কোন প্রাণী জানে না। কিন্তু সব শুনে তিনি ব্যঙ্গ করে উঠলেন, হুঃ, একে আবার প্রেমের কাহিনী বলে নাকি? এর মধ্যে প্রেমটা কোথায় দেখলে শুনি?

লোকটির মতামতের ওপর আমার শ্রদ্ধা ছিল। ভেবেছিলুম, আমার এই গল্পটি শুনিয়ে তাঁকে তাক লাগিয়ে দেবো। তাঁর ধারণা পালটাতে হবে। তাই ওকথা শোনার পর আমার মনের মধ্যেটা কেমন গোলমাল হয়ে গেল। তাহ'লে কি আমারই বোঝার ভুল! ওর মধ্যে প্রেম বলে কিছু নেই! মনে সংশয় জাগে। ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত ভাষার ছোট বড় অভিধান, শব্দকোষ ও শব্দাম্বুধির পাতা-গুলো একে একে চষে ফেলে দিলুম। তবু 'প্রেম' কথাটির যথার্থ অর্থ কোথাও খুঁজে পেলুম না। তবে কি প্রেমের কোন বাঁধাধরা অর্থ নেই! ওকি আকাশের মত উদার যার চোখে যখন যেটুকু ভাল লাগে! সেই জন্যেই কি পণ্ডিত জ্ঞানী গুণীরা ওর অর্থ কিছু নির্দিষ্ট করে লিখে যাননি।

যত ভাবি, তত আমার বন্ধুর মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে! যদি ওর মধ্যে প্রেম কোথাও না থাকে, তাহ'লে কিসের আশ্বাসে, এই দীর্ঘদিন ধরে ওটাকে লুকিয়ে রেখেছে, সে তার বুকের মধ্যে এত সঙ্গোপনে?

যাক, ওর তত্ত্বকথা নিয়ে আর বৃথা মস্তিষ্ক ক্ষয় না করে এখন সংক্ষেপে সেই গল্পটা আপনাদেরও শোনাচ্ছি। আপনারা সব বহুদর্শী, আমার বিশ্বাস, নিজের মন দিয়ে বিচার করতে পারবেন, এটা সত্যি, না মিথ্যা প্রেমের কাহিনী!

আমার এই বন্ধুটির নাম চিন্তামণি। বন্ধু বলছি বটে, আসলে কিন্তু সে ছিল আমার সহপাঠী, মাত্র চার বৎসর এক সঙ্গে আমরা পড়ে-ছিলুম। ক্লাশ ফাইভ থেকে ক্লাশ এইট। ব্যস্ তারপর ছাড়াছাড়ি। মাঝখানে শুধু কালের সুদীর্ঘ ব্যবধান নয়, বিস্মৃতির অতল সমুদ্র! তার মধ্যে ওই দুটি তরুণ কিশোর কোথায় যে বিলুপ্ত হয়ে যায়, কে তার সন্ধান রাখে। তারপর ত্রিরিশ বছর পরে হঠাৎ এক অভাবিত সাক্ষাৎ! সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে, নতুন আব হাওয়ায়! কাশীর কেদারঘাটে সেদিন খুব প্রত্যুষে স্নান করতে গিয়েছিলুম। মাথা মুছতে মুছতে শেষ সিঁড়িটায় যেমন উঠেছি, দেখি ঠিক আমার সামনে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। পরনে জীর্ণ পট্টবস্ত্র, কাঁধে ততোধিক পুরনো একটা বিবর্ণ চাদর, বগলে কুশাসন হাতে কমণ্ডলু। লোকটি আগে ওইখানে ঘাটের ওপর চোখ বুজে বসে জপ করছিল। বয়েসটা ঠিক কত বোঝা না গেলেও দেখলুম ঘাড়ের দু'পাশের চুলে পাক ধরেছে এবং মুখের খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফের মধ্যেও বেশ কিছু সাদা। রঙটা কালো নয়, রোদ-পোড়া তামাটে ধরণের। চোখগুলো ছোট ছোট, কোটরাগত। গাল ভাঙা ও তোবড়ানো বহু ব্যবহৃত পুরনো টিনের সুটকেসের ডালার মত। হাত-পাগুলোও কি তেমনি ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা, কাঠি কাঠি, কোথাও কোন রসকষ নেই, অনেকটা মালবাহী নৌকোর কাছির মত শক্ত অথচ পাকানো। চোখকে আকৃষ্ট করে বা মনকে স্পর্শ করে এমন কিছুই বিধাতা দেননি, তার দেহে বরং একবার দেখলে তাকাবার ইচ্ছা চিরদিনের মত দূর হয়ে যায়।

তবু যে আমি বার বার তার মুখের দিকে তাকাচ্ছিলুম তার একটা কারণ ছিল। সধবা স্ত্রীলোকদের মত দুটি কুণ্ডল ছিল তার কানে। আর এই কুণ্ডলকে উপলক্ষ্য করে বহুদিনের ভুলে যাওয়া এক কিশোর বালকের মুখ তখনি ভেসে উঠলো আমার চোখের সামনে! সে মুখের সংগে এ মুখের কোথাও এতটুকু সাদৃশ্য খুঁজে না পেলেও তবু তাকাচ্ছিলুম কৌতূহল-বশতঃ। কোন পুরুষের কানে, সেই আমার সহপাঠী ছাড়া আর কখনো এই রকম কুণ্ডল দেখিনি কিনা?

আমার চোখের এই অনুসন্ধানী দৃষ্টি লক্ষ্য করে সেও বারবার সন্দিগ্ধভাবে আমার মুখের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছিল।

অবশেষে কৌতূহল দমন করতে না পেরে আমি বলেই ফেললুম, আচ্ছা, আপনি কি কখনো মানে বাল্যকালে নবদ্বীপে ছিলেন?

কেন বলুন ত? এবার বেশ স্পষ্ট দৃষ্টি ফেলে সে আমার মুখের দিকে তাকালো।

বললুম, কিছু মনে করবেন না, আমার সংগে তখন একটি ছেলে পড়তো, আপনার সংগে তার কিছু একটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করেই জিজ্ঞেস করছি। অবশ্য এতদিনের কথা, আমার ভুল হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। নামটা আমার মনে নেই, তবে সে ছিল ভট্টাচার্য, তাকে আমরা ক্লাশে 'পণ্ডিত' বলে ক্ষেপাতুম।

হাঁ, ঠিক ধরেছেন। আমি-ই সেই বটে। আমার নাম চিন্তামণি ভট্টাচার্য। তারপর একটু থেমে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললে, আচ্ছা, আপনার নাম কি দেবব্রত ঘোষ?

বললুম, হাঁ, ঠিকই অনুমান করেছেন। আমিই সেই ব্যক্তি!

এর পরের অবস্থা আর কি বলবো! মুহূর্তে বয়েস, পদমর্যাদা সব ভুলে গিয়ে যেন আমরা দুজনে আবার সেই স্কুলের বেঞ্চিতে পাশাপাশি এসে বসলুম। 'আপনিটা' কখন যে 'তুমি'তে নেমে এলো তাও যেমন বুঝতে পারলুম না, তেমনি ঘাট থেকে উঠে দুটো গলি পেরুতে না পেরুতেই, কোথা দিয়ে এবং কেমন করে যে আমাদের এই দীর্ঘ অদর্শনের ফাঁকটা ভরাট হয়ে গেল বন্ধুত্বের আন্তরিকতায় তাও জানতে পারলুম না। শুধু আর একটা গলি ছেড়ে, আমার বাসার সামনে এসে, ভিতরে না ঢুকে অপরাহ্নে আসবার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে সে যখন বিদায় নিলে, তখন দেখলুম কথায় কথায় তার সম্বন্ধে যেটুকু জেনেছি, তাতেই খুব স্পষ্ট না হলেও মোটামুটি রকমের একটা ছবি আঁকা হয়ে গিয়েছে মনের মধ্যে। সে অকৃতদার। আত্মীয়স্বজন বলতে তার কেউ নেই। মামামামী কাশীপ্রাপ্তি হওয়ায়, তাঁদের বাড়ীটা ওই পেয়েছে। তবে নামেই বাড়ী। পাঁচখানা ঘরের চারটিই ভগ্নস্তূপ, শুধু একটা কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে, তার মধ্যে মাথা-গুঁজে থাকে। পুজো পাঠ, স্নান আহ্নিক, ধর্মশাস্ত্র আলোচনা, সাধুসজ্জন সঙ্গ, এই সব নিয়েই দিন কাটে। স্বপাকে রান্না করে কোন-দিন একবেলা হবিষ্যি খায়, কোনদিন বা একটু ফল বা এক পোয়া দুধ খেয়ে কাটিয়ে দেয়। পেশা বলতে, দুটি স্কুলের ছেলে পড়িয়ে মোট মাসিক আয় এই বাজারেও দশ টাকা। তাছাড়া ওখানকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দু'চারজন ওকে খুবই স্নেহ করেন। তাঁদের অনুগ্রহেও মধ্যে মধ্যে ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে সহকারী পুরোহিত হিসাবে কাজ করেও কিছু উপার্জন হয়।

মোট কথা ছেলেবেলায় যে অবস্থায় ওকে দেখেছিলুম, এখন তার চেয়ে কিছুমাত্র ভাল বলে মনে হলো না, তখনও স্কুলে আসতো একটা উড়ুনী গায়ে দিয়ে খালি পায়ে। ওর বাবা ছিলেন নবদ্বীপের একটা ছোট টোলের অধ্যাপক। দিনকাল খারাপ, দু'পাতা ইংরিজী না শিখলে আর করে খাবার উপায় থাকবে না—এই ভেবে তিনি ওকে আমাদের ইংরেজী স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন নিজের পেশায় না রেখে।

এরপর আরো যে ক'দিন আমি কাশীতে ছিলুম, প্রত্যহ সে দু'বেলা আমার কাছে আসতো এবং আমায় নিয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখাতো, কোন্ মন্দিরের কি মাহাত্ম্য, কোন্‌টা কে কবে তৈরী করেছিল, কোথায় কোন্ সাধু-সন্ত এখনো আত্মগোপন করে আছেন তার দৌলতে সবই আমার জানা হয়ে গিয়েছিল। তবে এই প্রসঙ্গে দেখলুম, পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র তার কণ্ঠস্থ! অথচ মজা এই ক্রমশঃ তার জীবনের অন্য দিকটার যা পরিচয় পেয়েছিলুম তা হচ্ছে, লেখাপড়ার দৌড় তার এই ক্লাশ এইট পর্যন্ত। তারপর হঠাৎ বাপ কলেরায় মারা যেতে একমাত্র আশ্রয়স্থল ওই মামামামীর কাছে কাশীতে চলে আসে। এখানে বৃদ্ধ ও অসুস্থ মামামামীর সেবাতেই জীবন উৎসর্গ করে। অবস্থা তাঁদেরও বিশেষ ভাল ছিল না। দেশ থেকে জমিজমার আয় বাবদ মামার খুড়তুতো ভাইয়েরা যা পাঠাতেন, তাতেই একরকম করে চলে যেতো। কিন্তু মুস্কিল হলো, যখন সে আয়ের পথ বন্ধ হলো, তাঁর খুড়তুতো ভাইয়েরা জানাতে লাগলেন কোন বছর অজন্মা, কোন বছর অতিবৃষ্টি, কোন বছর ফসল পোকায় নষ্ট করে দিয়েছে বলে। অবশেষে চিঠিপত্র দেওয়াও তাঁরা বন্ধ করে দিলেন। তারপর পাঁচ ছ'বছর একেবারে চুপচাপ। শেষে এক সময় ওর মামা আবিষ্কার করলেন যে, বেনামী করে তাঁর অংশ খুড়তুতো ভাইয়েরা সব গ্রাস করেছেন। তখন চিন্তামণিকে নদে জেলার সেই ঘোর পল্লীতে পাঠিয়ে মামা মামলা রুজু করে দিলেন। তিন বছর মামলা চললো। শেষে চিন্তামণি যখন নষ্ট জমি পুনরুদ্ধার করে আনলে, তখন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হলো। মামার এই সম্পত্তি যার একমাত্র উত্তরাধিকারী চিন্তামণি, তা পাকিস্থানে চলে গেল। কোন রকমে প্রাণ নিয়ে হিন্দুরা সব পালিয়ে গেল, যে দিকে পারলে! এরপর তার মামা আরো দুটো বছর বেঁচে ছিলেন, মামীর কাশীপ্রাপ্তি আগেই হয়েছিল। মামার সঞ্চিত অর্থ যা কিছু ছিল, সবই মামলার পেছনে খরচ হয়ে গিয়েছিল, তাই চিন্তামণিকে আবার চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পড়তে হলো। কিন্তু একটা জিনিষ দেখে আশ্চর্য লাগল এর জন্যে কোন দুঃখ সত্যি সত্যি ওর মনকে স্পর্শ করেনি। ভগবান সকলকে সব জিনিষ দেন না। তাঁর যেমন ইচ্ছা সেই মত হয়েছে! কাজেই সে বেশ ভালই আছে, ভগবানের সেবায় নিজেকে এইভাবে উৎসর্গ করতে পেরেছে বলে মধ্যে মধ্যে স্বর্গীয় হাসি হেসে আমার মুখের দিকে তাকাতো।

আমার মত সংসারী ও বিষয়ী লোকের কাছে তার এই নির্বান্ধব ও নিঃসঙ্গ জীবনকে যেন একটা দণ্ড বিশেষ বলে মনে হতো! কিন্তু তার মুখ দেখে কিছুই বোঝবার উপায় ছিল না, সব সময় তার দিলখোলা হাসিখুশি ভাব!

এক একদিন মনে হতো, জিজ্ঞেস করি, সত্যি সত্যি সে কি মনে কোন বেদনাবোধ করে না, এই সব স্ত্রী-পুত্র পরিজনভরা সংসারী লোকদের দেখে? কথাটা বলতে গিয়েও তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলা হয়নি, অনেকবার চেপে গেছি।

চলে আসবার আগের দিন, অনেক রাত পর্যন্ত আমরা দুজনে পঞ্চকোটের কালী মন্দিরের বিরাট প্রশস্ত চত্বরটায় বসেছিলুম। ভারী ভালো লাগে আমার এই জায়গাটা। দেবতার স্থান ও মন্দির ওখানে অগণিত। কিন্তু ঠিক ওরকম পরিবেশ আর কোথাও দেখিনি। সামনে মা কালীর মূর্তিকে রেখে একটু ডাইনে গঙ্গার দিক ফিরে আমরা গল্প করছিলুম। ওই ঘাটটার সম্বন্ধে যত প্রাচীন কাহিনী ও কিম্বদন্তী আছে, একে একে সব বলা শেষ করে যখন থামল চিন্তামণি, তখন চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখলুম, শুধু আমরা দুটি প্রাণী ছাড়া আর কেউ কোথায়ও নেই। সেই বিরাট চত্বরটা খাঁ খাঁ করছে। আমাদের পিছনে ও পাশে অন্ধকারে ফুল ও ফলের কতগুলো গাছ দাঁড়িয়ে আছে নীরব ও নিস্তব্ধ! ডানদিকে মুখটা ফিরিয়ে দেখি গঙ্গার কালো প্রশস্ত বক্ষে দু'একটা নৌকো জলচর জীবের মত নিঃশব্দে ভেসে চলেছে—আরো দূরে রামনগরের চূড়ায় শুধু জমাট অন্ধকার। আকাশের শেষ-প্রান্তে যেখানে কালো বনরেখার মাথায় চাঁদের ক্ষীণ আলো যেন স্থির হয়ে রয়েছে কিসের অপেক্ষায়। আর আমরা যেখানে বসেছিলুম ঠিক আমাদের মাথার ওপরে যেন জ্বলজ্বলে চোখে কতকগুলো বড় বড় তারা এক-দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। তাদের যেন এছাড়া আর অন্য কোন কাজ নেই।

চিন্তামণি কালীমূর্তির দিকে চেয়ে চুপচাপ বসেছিল।

হঠাৎ আমি তাকে একটা অবান্তর প্রশ্ন করে বসলুম! সেই সময় আমার মনে কেন যে সেকথাটা জাগলো, তা আমি বলতে পারবো না। বললুম, আচ্ছা মণি তুমি কি জীবনে কারুর প্রেমে পড়োনি বা কেউ তোমার প্রেমে পড়েনি?

কথাটা শুনে নিঃশব্দে সে যেন চমকে উঠলো। তারপর একটু থেমে বললে, না-না-তুমি যে ভাই কি সব বলো তার ঠিক নেই।

বললুম, লজ্জা কি বয়েস ত ঢের হলো, এখন আর সেকথা বলতে দোষ কি? এটা আমার শুধু নিছক কৌতূহল! একটা মানুষের জীবন শেষ হতে চললো, কিন্তু সে সাধুও হলো না, গেরুয়াও পরলে না, সংসারের মধ্যে রইলো চিরোপবাসী! আর শুনেছি ও জিনিষটা নাকি এমন যে—ওর হাত থেকে কারুর নিস্তার নেই। তা সে যেমন অবস্থায় থাকুক না কেন?

কালী প্রতিমার দিকে চোখটা তার ফেরানো ছিল, বোধ হয় তার বিবেক বলে উঠলো, একি করছিস, মায়ের সামনে মিথ্যা বলছিস। তাই একটু আমতা আমতা করে সে আবার বললে মানে, সে এমন কিছুই নয়! লোকে মিথ্যে একটা বদনাম দিয়েছিল বটে, কিন্তু আমি বলি

ও কিছুই নয়। সম্পূর্ণ মিথ্যা। বলতে বলতে চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখলে যেন অন্য কেউ না শোনে। তারপর আমার কাছে আর একটু সরে এসে ধীরে ধীরে আরম্ভ করলে। তোমায় ত বলেছি, মামার সম্পত্তি উদ্ধার করার জন্যে নদে জেলার মেহেরপুর গ্রামে গিয়ে আমায় তিনটি বছর কাটাতে হয়েছিল। হাঁ, সেই সময় একটা অনাথ ব্রাহ্মণের ছেলেকে ভিক্ষে করতে দেখে, আমি তাকে নিজের কাছেই এনে রেখেছিলুম এবং সন্তানের মত পালন করছিলুম। ছোট ছেলে, দশ-এগারো বছর বয়েস হবে। কাশীতে নিয়ে এসে যা-হোক একটা কিছু কাজে লাগিয়ে দেবো, মনে এই রকম একটা সংকল্প ছিল।

এই ছেলেটা একবার কঠিন রোগে পড়লো। ডাক্তার বললে, টাইফয়েড, ওষুধের সঙ্গে বার্লি আর ছানার জলের ব্যবস্থা করে গেল। পাড়ায় থাকতো সৌরভী কৈবর্তের মেয়ে অনাথা, বিধবা। তার ছিল দু'টি গাই। সারাদিন মাঠে মাঠে তাদের চরাতো, আবার নিজেই তার দুধ দুয়ে বিক্রী করে কোন রকমে জীবনধারণ করতো। আমি ওর কাছেই দু'বেলা দু'পোয়া দুধের ব্যবস্থা করলুম। ও কখন দুধ দিতে আসে, আর কখন চলে যায় আমি কিছুই জানতুম না। ঘরের মধ্যে একটা বাটিতে দুধটা চাপা দিয়ে রেখে সে চলে যেতো। সকাল, বিকাল, ঠিক তার আসবার সময়টাতেই আমাকে ডাক্তারের বাড়ী ছুটাছুটি করতে হতো। দেড়-ক্রোশ দূরে ডাক্তারবাবু থাকতেন। তবে হাঁ, দৈবাৎ কোনদিন দেখা হয়ে যেতো। হয়ত সে বাড়ী থেকে বেরুচ্ছে, আমি এসে পড়লাম। এই রকম।

হঠাৎ একদিন শুনে স্তম্ভিত হলুম যে, আমি নাকি সৌরভীর প্রতি আসক্ত, সে গোপনে আনাগোনা করে আমার ঘরে। লোকের মুখে মুখে সে দুর্নাম এমন ছড়িয়ে পড়লো যে পথে-ঘাটে আমায় দেখলে, লোকে চোখ ঠেরে ইসারায়, নিজেদের মধ্যে যেন কি বলাবলি করে! ছেলেটা সুস্থ হয়ে গিয়েছিল, তাই তার কাছে দুধ নেওয়া তখনি বন্ধ করে দিলুম। আর রাস্তাঘাটে হঠাৎ সৌরভীকে আসতে দেখলে হয় মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিতুম নয়তো কোন একটা ঘুরপথে অন্যদিকে চলে যেতুম। কি জানি, কাছাকাছি দেখলে হয়ত লোকের মনে আরো সন্দেহ বাড়বে, কিংবা ভাববে, ইচ্ছা করেই এই ভাবে দু'জনে সরে যাচ্ছে।

সৌরভীর মুখে-চোখেও কেমন একটা সন্ত্রাসের ভাব ফুটে উঠতো আমাকে কাছাকাছি আসতে দেখলে। লোকলজ্জার ভয়ে, না সত্যি সত্যি তার মনে কিছু ছিল তা জানি না ভাই। এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ চুপ করে যায় চিন্তামণি। তারপর আমার মুখের দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফেলে কিছুক্ষণ যেন কি ভাবে। আবার এক সময় নিজেই সুরু করে, কিন্তু এর মধ্যে প্রেমটা কোথায় হলো তুমি তো এত লেখাপড়া শিখেছো বল তো ভাই? সত্যি বলছি, সৌরভীর সম্বন্ধে কোনদিন আমার মনের কোণে লেশমাত্র কল্পনাও জাগেনি। এমন কি তাকে যে কেমন দেখতে কোনদিন তাও চোখ মেলে নিরীক্ষণ করিনি। তবু লোকে যদি এই রকম বদনাম রটায় ত নাচার! আমি কি করতে পারি, বল ত ভাই? বরং নানা মন্তব্য কানে আসাতে তাকে দেখলে আমার বুকটা দুরদুর করে কেঁপে উঠতো ভয়ে। ভগবানকে মনে মনে ডাকতুম এই সময় যেন কেউ এসে না পড়ে পথে!

এমন সময় মামার শরীর খুব খারাপ সংবাদ এলো। আমি কাশী থেকে একবার কয়েকদিনের জন্যে ঘুরে যাবো স্থির করলুম। ইতিমধ্যে মামলায় যে আমাদের জিত হয়েছে সে সংবাদটাও তাঁকে মুখেই দেবো, ভেবে যাত্রার আয়োজন করতে লাগলুম।

প্রতিদিন আমার ভোরে স্নান করা অভ্যাস। সেদিন কাশী যাত্রা করবো বলে আরো একটু আগে স্নান করতে গিয়েছিলুম নদীতে। স্নান সেরে সবে সূর্যপ্রণাম করতে যাবো এমন সময় পিছনের দিকে নজর পড়তে দেখি সৌরভী একটা মাটির কলসী কাঁখে নিয়ে ঘাটে আসছে। তাকে দেখামাত্র আমার বুকের মধ্যে কে যেন ঢেঁকীতে পাড় দিতে লাগল। একে নির্জন ঘাট, তায় তখনো ভাল করে ফর্সা হয়নি। সূর্য-প্রণামটা না করেই আবার জলের মধ্যে নেমে ডুব দিতে সুরু করলুম, যাতে আমি দাঁড়িয়ে আছি আর সৌরভীও দাঁড়িয়ে আছে আমার কাছে—এ অবস্থায় কেউ না দেখতে পায়! বরং আমি ডুব দিতে দিতে লক্ষ্য করিনি, আর সেও আমায় চিনতে পারেনি—এই অবস্থায় যদি কেউ দেখে তাহলে তত্টা মারাত্মক হবে না!

কিন্তু কতক্ষণ মানুষ ডুবে থাকতে পারে। তাই এক সময় হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়াতেই দেখি সৌরভী একেবারে ঘাটের শেষ সিঁড়িতে, আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর কেমন্ যেন একটু জড়িত স্বরে সে বললে, ঠাকুর মশায়, একটা কথা বলবো, রাখবেন?

এবার আমার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে উঠলো। কণ্ঠ শুকিয়ে আসতে লাগলো। তবু একটা উত্তর না দিলে যদি বে-ফাঁস কিছু বলে ফেলে তাই গম্ভীর কণ্ঠে বললুম, না, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। চোখে তার জল ছলছল করে এলো, কণ্ঠ আর্দ্র হলো। বললে, আপনি ইচ্ছে করলে, নিশ্চয়ই সম্ভব হবে, আমি জানি! আমার জীবনের এই শেষ সাধটা আপনাকে মেটাতেই হবে! না বললে আমি মরে যাবো ঠাকুরমশাই।

বলে কি! যদি এই সময় কেউ এসে পড়ে তা হ'লে একথা শুনে কি মনে করবে। সবে তখন স্নান করে উঠেছি তবু দরদর করে ঘাম বেরুতে লাগল আমার দেহ থেকে। পৈতেটা আঙুলে জড়িয়ে মনে মনে আমি গায়ত্রী জপ করতে শুরু করলুম। এর পরে আবার কি সৌরভী বলবে, কে জানে! তার আশঙ্কায় আমার হাত পাও ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছিল।

সৌরভী এবার গলার স্বরটা আরো নামিয়ে এনে বললে, শুনলুম আপনি আজ কাশী যাচ্ছেন, শিগ্‌গির আবার ফিরবেন। যদি একটা পিতলের ঘটি আমায় ওখান থেকে এনে দেন—আমার জীবনের এই শেষ ইচ্ছাটুকু পূরতেই হবে ঠাকুরমশাই। না বললে শুনবো না। শেষ জীবনটা যেন আমার বাবা বিশ্বনাথের ওই ঘটির জল মুখে দিয়ে প্রাণ বেরোয়! যা টাকা লাগে আপনি এলে, আমি দিয়ে দেবো।

এই পর্যন্ত বলে চিন্তামণি হঠাৎ যখন থামলো তখন তার মুখেচোখে যেন কিসের একটা চাপা উত্তেজনা। গলার স্বরও কেমন যেন অস্বাভাবিক। সে আমার মুখের ওপর চোখ তুলে বললে, এই ত ঘটনা, এর মধ্যে প্রেম কোথায়, আসক্তি কোথায় বলো ত? এটা মিথ্যা রটনা ছাড়া আর কি? বলে একটু থেমে নিজের মনেই হেসে উঠলো। এই যা আমার জীবনে এপর্যন্ত ঘটেছে ভাই! প্রেম নয় বরং তার কলঙ্ক বলতে পারো। আমি তার মুখচোখের ভাবটা এতক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলুম। এখনো ত গল্প শেষ হয়নি ভাই, তারপরে কি কি হলো বলো? চিন্তামণি কি যেন একটা বুকের মধ্যে চেপে নিয়ে বললে, এর পরে আর কোন ঘটনা নেই। কারণ সেখানে ফিরে যাবার দু'দিন পূর্বে ও জায়গাটা পাকিস্থানের মধ্যে পড়ে গেল! আমি বললুম, জায়গাটা ত পাকিস্থানে পড়লো, কিন্তু ঘটির কি হলো? চিন্তামণি একটা ঢোক গিলে বললে, মিথ্যে বলবো না ভাই, ঘটি একটা কিনে ছিলুম তার জন্যে। ভেবেছিলুম ওখানকার কোন লোক-জনের সঙ্গে যদি কোনদিন দেখা হয়ে যায় কাশীতে ত পাঠিয়ে দেবো! কিন্তু এই দীর্ঘ দশ বৎসরেও সে রকম কোন লোকের দেখা পাইনি আর আমিও সেখানে যাইনি, তাই সে ঘটিটা এতকাল ঘরে ফেলে রেখে রেখে এখন নিজের কাজে লাগিয়েছি, ওটাতে আমার পুজোর গঙ্গাজল থাকে। বলে এমন-ভাবে কথাটা দ্রুত শেষ করলে যেন ও সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন উঠতেই পারে না। অবশ্য আমিও আর কোন কথা জিজ্ঞেস করিনি। শুধু তার দিক থেকে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে তাকিয়ে ছিলুম গঙ্গার দিকে। ফিকে চাঁদের আলোয় গঙ্গার বুকের ঠিক মাঝখানটা তখন যেন থরথর করে কাঁপছিল!

স্বীকারোক্তি : যক্ষ্মারোগীর

কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার আকাশে বিষাদের ঘন ঘোর,
বুকেতে জমেছে কত সুতীব্র বেদনা,
নয়নে শুধুই শূন্যের সমারোহ—
হারিয়ে ফেলেছি মানস মনের চেতনা।

কত যে অগুরু বৃথাই হয়েছে ঢালা,
পুড়ে ছাই হ'ল কত সুগন্ধ ধূপ,
পুলক পরশ জাগায় না মনে আর
শত তরুণীর লাবণ্যময়ী রূপ।

পাংশু ওষ্ঠে নরম ঠোঁটের স্পর্শ
অন্তর থেকে বলছি লাগছে তিক্ত,
চোখের সামনে পরিজনদের ভীড়
তবু কেন আজ মনে হয় আমি রিক্ত?

মধু-ফাল্গুনে গরল উঠেছে শুধু
চারপাশে যেন বাজছে বেসুরো বীণ।
হলাহলে ভরা ভগ্ন-জীবন পাত্রে
তিক্ত গন্ধ আয়ুকে করছে ক্ষীণ।

এখনো আকাশে নীলের মিছিল দেখি,
বাঙলার বুকে শ্যামল শোভন ছায়া।
মমতায় ভরা গৃহলক্ষ্মীর মন,
মানুষের চোখে গাঢ় স্বপ্নের মায়া।

খোসমেজাজের নতুন ওষুধ

॥ পূর্ণেন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥

সংসারে খুব কম লোকই আছে যার সব সময়ে মেজাজটা ঠান্ডা থাকে। মনের মত কিছু একটা না হলেই মেজাজটা বিগড়ে যায়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যক্তিগত আচরণ ও ব্যবহার এই মেজাজের উপর অনেকটা নির্ভর করে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে আরও যে, সব সময় মেজাজ দেখান বা মেজাজ মাফিক কাজ করা যায় না। বেমালুম মেজাজ হজম করে যেতে হয়। তাতে আরও মেজাজ খারাপ হয়। মনে বিরক্তি, ঘৃণা, ভয়, রাগ ইত্যাদি ভাবের উদ্রেক হলে তার বাহ্যিক প্রকাশ হয় শরীরের নানা রকম ভঙ্গিমায় ও আনুসঙ্গিক অঙ্গ চালনায়। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকর্মও উপযুক্ত মত পরিবর্তিত হয়। অপ্রীতিকর ভাবগুলিতে শরীরে একটা উত্তেজনা ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত চলাচল সবই বিরোধের আশংকায় প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। অনবরত অথবা ঘন ঘন এরকম অবস্থা হলে মেজাজ খারাপ, অনিদ্রা ছাড়াও শরীরে এবং মনে এর দরুণ নানা রোগের সৃষ্টি হয়।

আজকাল যে সব রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেড়ে যাচ্ছে বৈজ্ঞানিকদের মতে তার অনেকগুলির আসল কারণ দীর্ঘদিন যাবৎ প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য মানসিক উৎকণ্ঠা, অশান্তি বা উত্তেজনা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে অনেক দেশের মানুষের বৈষয়িক উন্নতি হয়েছে খুব। চিকিৎসা শাস্ত্রের অনেক উন্নতির ফলে অনেক রোগ, বিশেষ করে জীবাণুঘটিত বা সংক্রামক রোগ, পৃথিবীর ধনী দেশগুলিতে প্রায় নির্মূল হয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে ব্লাড প্রেসার, হার্টের ব্যারাম, গ্যাস্ট্রিক আলসার, মানসিক বিকার, নিউরোসিস, অনিদ্রা ইত্যাদি অনেক রোগ বেড়ে গেছে।

কাজেই মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতেই হবে। তার দুটো উপায় আছে। এক চিত্ত বিক্ষোভকারী প্যারিপার্শ্বিক অবস্থা এড়িয়ে যাওয়া অথবা উত্তেজনার মধ্যে বাস করেও আত্মরক্ষা করা। সেকালের ত্রিকালদর্শী ঋষিরা প্রথম উপায়ের বিধান দিয়েছিলেন সংসার ত্যাগ ও বনবাস। নানা কারণে সেটা এখন সম্ভব নয়। বনও আর নাই। দণ্ডকারণ্যেও লোকারণ্যের ব্যবস্থা হচ্ছে। যাও দু একটা বন আছে সেগুলোও রিজার্ভ করা জন্তু-জানোয়ারদের জন্য। সেখানে মনুষ্য প্রবেশ নিষেধ।

শোক-দুঃখময় সমস্যাসংকুল সংসারে বাস করেও মহাপুরুষেরা দার্শনিক উদাসীনতায় অথবা যোগবলে মনের শান্তি রক্ষা করেন। কিন্তু সে পথ সাধারণ লোকের নয়। সাধারণ লোকে এর সহজ উপায় বের করেছিল নেশায় আর ঘুমে। মদ, আফিঙ, গাঁজা ইত্যাদি অনেক দিন ধরেই মানব সমাজে পরিচিত। চিকিৎসকেরাও এই সব জিনিষ নানা ওষুধের মধ্যে দিয়ে ব্যবহার করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানও এই সব জিনিষ নিয়ে গবেষণা করে এদের দোষগুলি শোধন করে ও নতুন রাসায়নিক ওষুধ আবিষ্কার করে উন্নততর ঘুমের ওষুধ ও অজ্ঞান করবার ওষুধ বার করেছে।

চিকিৎসায় মনের অশান্তি দমন করতে এতদিন এই সব নেশার ওষুধ বা ঘুমের ওষুধ ব্যবহৃত হয়েছে। এ সব ওষুধ প্রধানতঃ মস্তিষ্কের যাবতীয় ক্রিয়া দমন করে। যার ফলে স্নায়ুমণ্ডলের উপর বাইরের উত্তেজনার অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া যেমন হ্রাস পায়, তেমনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শিথিলতা ও মানসিক জড়তা আসে। বেশী মাত্রায় সম্পূর্ণ চেতনা লোপ পায়। কোন কোন ওষুধের ক্রিয়ায় প্রথমাবস্থায় মানসিক উত্তেজনা আসে। অপ্রীতিকর অনুভূতিগুলি দমন করে মনে উচ্ছলতা আনন্দ ও মাদকতা আনে। কিন্তু তারপরই অবসন্নতা আসে। এইগুলিই সাধারণতঃ মাদক বা নেশার জন্য ব্যবহার হয়। ওষুধ হিসেবে সাময়িক কোনও বিশেষ প্রয়োজনে নির্দিষ্ট মাত্রার ছাড়া এগুলি ব্যবহার হয় না। যেগুলি ঘুমের ওষুধ হিসেবে ব্যবহার হয়, সেগুলিতে প্রাথমিক উত্তেজনা হয় না। ধীরে ধীরে মানসিক চঞ্চলতা ও অস্থিরতা কমে গিয়ে স্বাভাবিক নিদ্রার সুবিধা হয়। এই সব ওষুধ অল্প মাত্রায় মানসিক অশান্তি দূর করবার জন্যও ব্যবহার হয়। কিন্তু উত্তেজনার অবস্থায় অনেক সময় এ সব ওষুধ অল্প মাত্রায় যথেষ্ট মানসিক শান্তি আনতে পারে না। আবার বেশী মাত্রায় দিলে অতিরিক্ত ঝিমুনী বা নিদ্রালুতা অথবা শারীরিক জড়তা আনে। কাজেই এ সব ওষুধ অনবরত ব্যবহার করা যায় না।

নেশার বা ঘুমের ওষুধে বাস্তবতা থেকে সাময়িকভাবে পালান যায় বটে, তবে খোস-মেজাজে জীবন উপভোগ করা যায় না। এমন ওষুধ চাই যাতে মস্তিষ্কের নিম্নস্তরের ভাব বিক্ষোভ দমন হয় অথচ সে ওষুধে চৈতন্য আচ্ছন্ন হবে না, চিন্তাধারায় ব্যাঘাত হবে না, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শিথিলতা আসবে না ইন্দ্রিয় সকল সচেতন ও সতেজ থাকবে।

আমাদের মস্তিষ্কের কার্যপদ্ধতি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, মস্তিষ্কের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরণের ক্রিয়া কেন্দ্রীভূত হয়েছে—আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাবতীয় অনুভূতির এই রকম বিভিন্ন কেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। শরীরের প্রায় সব কাজকর্মই মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়। মনের প্রধান বৃত্তিগুলির, যেমন কাম ক্রোধ ভয়, ঘৃণা ইত্যাদির বিশেষ কোন কেন্দ্র আছে বলে সঠিক কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তবে অনুমান করা হয় যে, থেলেমাস বা হাইপোথেলেমাস নামক মস্তিষ্কের নিম্নস্তরে

'বৈদূর্যমণি' সিদ্ধার্থ গঙ্গোপাধ্যায়

এই বিপদ্গুলির প্রধান কেন্দ্র। স্নায়বিক পথে এই কেন্দ্রের সঙ্গে উচ্চতর মনের এবং অন্যান্য কেন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।

মানসিক বিকার, চঞ্চলতা, অশান্তি, উদ্বেগ বা বদ মেজাজের মূলে কেন্দ্রীয় বিক্ষোভ কাজ করে বলে বিশ্বাস। বহির্জগতের অতিরিক্ত উত্তেজনার ফলে ভয়, ভাবনা, উৎকণ্ঠা ইত্যাদির কেন্দ্র হাইপোথেলেমাস বা তার আশে-পাশে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সেখান থেকে এই আলোড়ন স্নায়বিক যোগাযোগসূত্রে উচ্চতর মনের কেন্দ্রে ও মস্তিষ্কের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। যদি এমন ওষুধ বের করা যায় যেগুলি মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্তরে ও বিভিন্ন কেন্দ্রে আলাদা আলাদাভাবে এবং সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে কার্যকরী হবে, তাহলে সহজেই বিক্ষোভ সৃষ্টিকারী বিশেষ কোনও কেন্দ্রকে দমন করে মস্তিষ্কের অন্যান্য কেন্দ্রগুলিকে রক্ষা করা যাবে। অথচ অন্য কেন্দ্রগুলির কাজের উপর সাধারণ ঘুমের ওষুধের মত বিশেষ কোনও ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে না।

এই রকমের ওষুধের সন্ধান এখন চলেছে। চিকিৎসা শাস্ত্রে গবেষণায় নিম্ন শ্রেণীর জন্তুর উপর পরীক্ষা বা এক্সপেরিমেন্ট একটা প্রধান অঙ্গ। নতুন ওষুধের ফলাফল আগে জন্তুদের শরীরে পরীক্ষা করা হয়। তারপর সন্তোষজনক ফল পেলে মানুষের উপর প্রয়োগ করা হয়। মনমেজাজের উপর কার্যকরী ওষুধের ক্রিয়া জন্তুদের উপর পরীক্ষা করে, তার ফলাফল নির্ধারণ করার প্রধান অন্তরায় হচ্ছে যে জন্তুদের মানুষের মত মন নেই। থাকলেও তাদের মনের অবস্থা আমরা আকার ইঙ্গিতে ছাড়া জানতে পারি না। তাছাড়া ওষুধের ক্রিয়া দেখবার জন্য ইচ্ছা মত জন্তুদের মনে বিভিন্ন ভাবের সৃষ্টি করাও সহজ নয়। তবুও নানা রকম উপায় উদ্ভাবন করে এই সব পরীক্ষা করা হয়।

কুকুর বেড়াল জাতীয় জন্তুর মাথার ভিতর মস্তিষ্কের বিভিন্ন জায়গায় ইলেকট্রোড বসিয়ে চামড়ার উপর বের ক'রে রাখা যায়। ঐ ইলেকট্রোড এর সঙ্গে তার লাগিয়ে ইলেকট্রিক শক দিয়ে ইচ্ছামত মস্তিষ্কের বিভিন্ন জায়গায় উত্তেজনা সৃষ্টি করা যায়। এই উপায়ে দেখা গেছে যে, মস্তিষ্কের বিশেষ এক জায়গায় শক দিলে জন্তুটা হঠাৎ রেগে গিয়ে তেড়ে আসে। কোন কোনও ওষুধ প্রয়োগ করলে দেখা যায় যে, তখন আর ঐ রকম শক দিয়ে জন্তুটাকে রাগান যায় না। এই ওষুধে যদি জন্তুটার গতিবিধি বা স্বাভাবিক আচরণের তারতম্য না হয়, তবে বোঝা যায় যে ঐ ওষুধটা কেবল মস্তিষ্কে যে বিশেষ কেন্দ্রে শক্ দেওয়া হয়েছে সেইখানেই কার্যকরী। এই রকম দুই একটা ওষুধের সন্ধান পাওয়া গেছে যেগুলো স্বাভাবিক হিংস্র প্রকৃতির জানোয়ারদের উপর প্রয়োগ করলে তাদের হিংস্রতা কমে যায় এবং তাদের পোষ মানান সহজ হয়। এই ধরণের ওষুধ মানুষের শরীরেও প্রয়োগ করা হচ্ছে। বিশেষ করে চঞ্চল, উচ্ছৃঙ্খল বেয়াড়া ছেলেপিলেদের শোধরাবার জন্য। অনেক মানসিক রোগেও এগুলি ব্যবহার করা হয়। মেপ্রোবামাট ও রিসারপিন্ (সর্পগন্ধা থেকে পাওয়া যায়) এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

অনেকে মনে করেন যে, এই ধরণের পরীক্ষায় জন্তুদের উপর যে অবস্থার সৃষ্টি করা হয়, সেটা মানুষের মানসিক অশান্তির সঙ্গে তুলনা করা যায় না; মানুষের মানসিক উদ্বেগ কেবল সাময়িক কোনও বাইরের উত্তেজনার উপর নির্ভর করে না। নানা অবস্থায় মনের মধ্যে যে সব বিপরীত ভাবের সংঘর্ষ বা কনফ্লিক্ট (Conflict) বাধে তার প্রতিক্রিয়াই এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী। এই রকম মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষের উপর ওষুধের কোন প্রভাব আছে কিনা পরীক্ষা করতে হলে পরীক্ষার জন্তুদের মনেও ঐ রকম অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে। এর জন্যও নানা রকম উপায় বের করা হয়েছে। যেমন তারের খাঁচায় ইঁদুর পুষে, খাঁচার তারে মাঝে মাঝে ইলেকট্রিক শক্ লাগান হয়। আচমকা শক্ খেয়ে ইঁদুরটা ভয় পেয়ে অস্থির হয়ে ওঠে। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এরকম শক দিতে থাকলে, ইঁদুরটাও কিছুক্ষণ পর পর আসন্ন আক্রমণের আশংকায় সমস্ত শরীর আড়ষ্ট করে উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে। এটা যখন প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়, তখন শক না এলেও ইঁদুরটার অস্থির ভাব দূর হয় না। এই অবস্থায় ওষুধ দিয়ে তার অস্থিরতা দূর করে ইঁদুরটাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় কিনা পরীক্ষা করা যায়। এই রকম আরও নানা উপায়ে কুকুর, বিড়াল, খরগোস ইত্যাদি জন্তুদের মধ্যেও পরীক্ষামূলক মানসিক অস্থিরতা সৃষ্টি করা যায় এবং সেই অবস্থার প্রতিকারের জন্য ওষুধের ফলাফল পরীক্ষা করা যায়।

এই সব পরীক্ষার ফলে কতগুলি ওষুধের সন্ধান পাওয়া গেছে যেগুলি মানুষের উপর প্রয়োগ করেও সুফল পাওয়া গেছে। যেমন ক্লোরপ্রোমাজিন, রিসারপিন্, বেনঅ্যাক্টিজিন, মেপ্রোবামাট। অবস্থা বিশেষে এই সব ওষুধের কোন কোনটা মানসিক উত্তেজনা, উদ্বেগ ও অশান্তিজনিত নানা রকম উপসর্গ কমাতে পারে। এগুলিকে বলা হয় ট্রাঙ্কুইলাইজার।

এছাড়াও আরেক ধরণের ওষুধের সন্ধান পাওয়া গেছে, যেগুলি মানসিক শক্তি বাড়ায় ও শারীরিক অবসাদ দূর করে। এই ওষুধের ফলে মনের স্ফূর্তি বাড়ে, নিরাশার ভাব দূর হয়, কল্পনা ও চিন্তাশক্তির সহজ স্ফূরণ হয়। শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি দূর হয় ও নিদ্রাভাব কেটে যায়। গত বিশ্বযুদ্ধে সৈনিকদের চরম বিপদের মুখে মানসিক স্থৈর্য, সাহস ও সহিষ্ণুতা বাড়াবার জন্যে ও অনাহার অনিদ্রা সত্ত্বেও শ্রমশক্তি বাড়াবার জন্য এই ওষুধ "Pep pills," "Energy pills" ইত্যাদি নামে অনেক ব্যবহার হয়েছে। এই সব ওষুধের প্রধান উপাদান অ্যাম্ফিটামিন। আজকাল অনেক টনিক ওষুধে এ জিনিষ ব্যবহার হয়।

কোন কোন দেশে এই সব ওষুধ সাধারণ সংবাদপত্রে এত প্রচার লাভ করেছে যে লোকে এখন অ্যাসপিরিনের মত নিজেরাই এ সব কিনে খেতে আরম্ভ করেছে। এক আমেরিকাতেই নাকি বছরে প্রায় ৭৫ মিলিয়ন ডলারের এই সব ট্রাঙ্কুইলাইজার ও ঘুমের ওষুধ অথবা 'Pep Pills' বিক্রি হয়, যদিও এ সবের ব্যবহারে অপেক্ষিত পূর্ণ ফল পাওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তবে সকল ভাবনা-চিন্তার হাত থেকে নিশ্চিত দূরে যেতে হলে অন্ততঃ ২৮০০০ ফুট উপরে ওঠা দরকার। সেখানে সব মনের পূর্ণ প্রশান্তি আপনা থেকেই আসবে—যেমন এসেছে পর্বত আরোহীদের।

ডানা ভাঙা পাখী

শ্রীকৃষ্ণধন দে

আকাশের নীলে হাল্কা মেঘের বাসা
মনে আনে সাধ, চোখে কত ছবি দোলে,
উঁচু শাখাগুলি বনের মনের আশা
রঙিন ফুলের গুচ্ছে ভরিয়া তোলে।
নিরালা দুপুরে আগুনে রোদের ঢেউ
খেলা করে এসে দোদুল্ ফলের গায়ে,
লোভালু পাখীও ছুঁয়ে যায় না'ক কেউ,
কাছে এসে বসে সবুজ পাতার ছায়ে।
ডানাভাঙা পাখী ভাবে ঠোঁট তার তুলি',
কবে ডানা তার উঠিবে আকাশে দুলি'।

নদী বালুচরে ছোট ঝিনুকের মেলা,
শৈবালে ভরা কাজল দীঘির ঘাট,
কোথা দলে ভিড়ে ঘাসবীজ নিয়ে খেলা,
উড়ে পার হওয়া সবুজ-বিছানো মাঠ।
ডানা ভরে তোলে বনের শিরীষ রেণু,
চোখে মুখে লাগে পূবের সজল হাওয়া,
নদীমোহনায় ঢেউয়ে ঢেউয়ে বাজে বেণু,
তারি সুরে সুরে শুধু উড়ে উড়ে যাওয়া।
ডানাভাঙা পাখী ভাবে ঠোঁট তার তুলি',
কবে ডানা তার উঠিবে আকাশে দুলি'।

হায় রে পাখীর মনের হারানো আশা
গাছের কোটরে শুধু কেঁদে কেঁদে মরে,
রোদ্-ঝলমল্ আকাশের ভালবাসা
এতটুকু আর নেই আজ তার তরে।
কুয়াসায় ভেজা যবশীষ খেতে খেতে
ফড়িংয়ের পিছে ডানা মেলিবার সাধ,
নিঝুম রাতের ঘুমভাঙা গানে মেতে
উড়ে উড়ে দেখা কখন ডুবিবে চাঁদ।
ডানাভাঙা পাখী ভাবে ঠোঁট তার তুলি',
কবে ডানা তার উঠিবে আকাশে দুলি'।

যে আকাশ ছিল দিগন্তে সীমাহারা,
কত না বনের সুরভি স্বপনমাখা,
সোনালী রোদ, নিবিড় বরষাধারা
ছিল যেথা, সেথা মেলিবে না সে যে পাখা!
কানে ভেসে আসে কত ডানা-ঝাপটানি,
প্রণয়ী পাখীর কত না কূজন গীতি,
নীড়ের বাঁধনে ধরা দিতে দুটী প্রাণী
পাতার আড়ালে নিরালায় বসে নিতি।
ডানাভাঙা পাখী ভাবে ঠোঁট তার তুলি',
কবে ডানা তার উঠিবে আকাশে দুলি'।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সাংবাদিকের খবর-শোঁকা নাক নাক......।

ভিড়ের পাশ কাটাতে গিয়ে পা থেমে গেল। অর্থাৎ নাক গলাবার মত কিনা আঁচ করার জন্য একটু থামতে হল। উৎসুক জনতার মুখভাবে মনে হ'ল ঠিক যেন মামুলি ভিড় নয়। তেমন হাঁকাহাঁকি উত্তেজনা নেই। সকলের মুখেই বেশ একটু রসের আমেজ। রসালো টিপ্পনীও কানে এলো দুই একটা।

অনুমান মিথ্যে নয়।

ফুটপাথ ঘেঁষা জনতা-চক্রব্যূহের মাঝখানে একটা রিকশ। রিকশয় এক নারী মূর্তি। পরিচ্ছন্ন শাদাসিদে বেশবাস। বয়েস পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে। প্রায় সুদর্শনা। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে রোষারক্ত চাঁন্ডলোচনা। শুধু অস্ত্রের অভাব একখানি। থাকলে এ অবস্থায় নির্বিচারে সুরাসুর দুই-ই নিধন করতে পারেন বোধ হয়।

রিকশর মুখোমুখি মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক। বিব্রত, বিপর্যস্ত, ঘর্মাক্ত। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। মোটামুটি সুদর্শন ইনিও। জনতার কাঁচামিঠে কলকাকলিতে ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা দুজনেই নির্বাক। অবাঙালী রিকশওয়ালার চোখে হতাশ বিস্ময়। তার সময় নষ্ট।

সম্ভবতঃ, দু'চার পশলার পর সাময়িক বিরতি এটা। পকেট থেকে রুমাল বার করে ভদ্রলোক ঘাড়মুখ মুছে নিলেন। পরে কণ্ঠস্বরে অনুনয় ঝরিয়ে বললেন, মনু এত লোকের মধ্যে কি কাণ্ড ক'চ্ছ বলো তো? লক্ষ্মীটি বাড়ি চলো, তারপর সব শুনব।

জবাবে মহিলা দুই চোখে ভদ্রলোককে ভস্ম করতে চাইলেন যেন। তারপর দাঁতে অধর দংশন করে বসে দম নিতে লাগলেন।

ততক্ষণে সামনাসামনি একটু জায়গা করে নেওয়া গেছে। আশপাশের কলগুঞ্জন থেকে ব্যাপারটাও মোটামুটি বোঝা গেল। রিকশ করে যাচ্ছিলেন মহিলা। হঠাৎ ভদ্রলোকটি ছুটতে ছুটতে এসে পথরোধ করে দাঁড়ান। তারপর সেই থেকে মহিলাকে বাড়ি ফেরার জন্য আকুতি-মিনতি। মহিলার ক্রুদ্ধ চিৎকার চেঁচামেচিতে লোক জমে যায়। তাঁর সঙ্গে বাড়ি যাওয়া দূরের কথা, মহিলা তাঁকে চেনেন বলেও স্বীকার করেন না। জনতার উদ্দেশে সরোষে বারবার তিনি অনুরোধ করেছেন, লোকটাকে এক্ষুনি ধরে নিয়ে পুলিসে দেওয়া হোক, একজন ভদ্রমহিলার উপর দুর্বৃত্তের এরকম জুলুম তাঁরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন কি করে, ইত্যাদি।

ভদ্রলোকের বিপন্ন বিবৃতি, মহিলা তাঁর স্ত্রী, সকলের অগোচরে নিরুদ্দেশ হয়েছেন বহু কষ্টে যদি বা সন্ধান পাওয়া গেল এখন এই বিপদ। বাড়ির ঠিকানা দিয়ে দুই একজনকে অনুরোধ করেছেন, দশ পনের মিনিটের পথ, যদি কেউ গিয়ে একটা খবর দেয়।

কিন্তু এ পরিবেশ ছেড়ে কারো নড়ার আগ্রহ হয়নি বোধ হয়। ভদ্রমহিলা তাঁর গন্তব্য স্থানের ঠিকানা দিয়েছেন সম্পূর্ণ উল্টো দিকে।

একাধিক চাপা কণ্ঠ কানে এলো, একজন আর একজনকে ফিসফিস করে বলছে, বুঝতেই তো পারছেন...মাথার গণ্ডগোল। একজন আবার মন্তব্য করলেন, গণ্ডগোল থাক আর যাই থাক ভদ্রলোক বাড়িতে নিশ্চয় অত্যাচার করেন নইলে মহিলা এত বেপরোয়া হয়ে উঠবেন কেন?

লোকটির দিকে চেয়ে একবারও কিন্তু তা মনে হল না। বরং ভারী একটা করুণ ভাব মুখের। পাছে রিকশ নিয়ে মহিলা চলে যান, এই ভয়ে রিকশ আগলে দাঁড়িয়ে আছেন। কাছে গিয়ে কানে কানে পরামর্শ দিলাম, উনি থানায় যেতে চাইছেন যখন, সেখানেই নিয়ে যান না সেখান থেকে যাহোক কিছু ব্যবস্থা করে বাড়ি নিয়ে যাবেনখন।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখি আরক্ত নেত্রে মহিলা এদিকেই চেয়ে আছেন। আরো দুই একজন সায় দিলেন, থানায় যাওয়াই ভালো। অকূলে কূল পেলেন যেন ভদ্রলোক। বললেন, সেই ভালো, থানায় চলো, সেখান থেকে যা হয় হবে।

কাছেই থানা। অনেকেই সঙ্গ নিতে প্রস্তুত। একজন পরামর্শ দিলেন ভদ্রলোককে, আপনিও গিয়ে উঠুন রিকশয়—।

শোনামাত্র গর্জে উঠলেন ভদ্রমহিলা। —না! কক্ষনো না! এঁর সঙ্গে এক রিকশয় যাব না আমি!

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক শান্ত করতে চেষ্টা করলেন তাঁকে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি ঠাণ্ডা হয়ে বোসো, আমিও হেঁটেই যাচ্ছি। এই রিকশ, চলো—

হুকুম পেয়ে রিকশওয়ালা রিকশ তুলল। কাগজের দৌলতে থানা অফিসার ভদ্রলোক আমার পরিচিত। কি ভেবে আমিও পায়ে পায়ে চলেছি। সত্যি কথা বলতে কি, ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে মায়া হচ্ছিল কেমন। পেয়েও যেন হারাবার ভয় যায়নি তাঁর। পাশে চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করলাম, ক'দিন এরকম হয়েছে?

ভেবে জবাব দিলেন, তা অনেক দিন হবে...প্রায় বছরখানেক।

—ভালো করে চিকিৎসা করিয়েছেন?

বিব্রত মুখে ভদ্রলোক তাকালেন আমার দিকে। পরে বললেন চিকিৎসা তো তেমন...।

(ইহার পর ১১৬ পৃষ্ঠায়)

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

শ্রীরাধা একদিন বলেছিলেন—

"এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে"—

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীশ্রীরাধার থেকেও অনেক বেশী সহ্য করেছিলেন। "বদন থাকিতে না পারে বলিতে তেঁহি সে অবলা নাম"—জগতের শ্রেষ্ঠ অবলা বিষ্ণুপ্রিয়া মুখে কিছুই বলতেন না, কিন্তু কাজে সবকিছু করে গেছেন—গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে মাতৃবক্ষে লালিত-পালিত সংপুষ্ট করে গেছেন। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে ধর্ম-স্রোতের গঙ্গাবতরণ মুখে অবতারণা করেছেন, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সে স্রোতকে মাতৃস্নেহধারায় পুষ্টতর, বলবত্তর করে দেশ-বিদেশের নর-নারীর গৃহদ্বারসম্মুখীন করে গেছেন—পূর্ণ গৌরবে, ভাগবতী শক্তিতে।

শ্রীশ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় কবি কর্ণপুর গোস্বামী বলেছেন, "বিষ্ণুপ্রিয়া জগন্মাতা ভূকন্যা ভূস্বরূপিণী।" তিনি পুনরায় স্বকীয় অনুপম গ্রন্থ চৈতন্যচন্দ্রোদয় গ্রন্থে অদ্বৈত প্রভুর মুখে বলিয়েছেন—যিনি স্বয়ং ভক্তি, যাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন মহাপ্রভু নিজেও, তিনিই আজ নবদ্বীপ-ধামে স্বয়ং কান্তারূপিণী করে বিরাজমানা তিনিই বিষ্ণুপ্রিয়া—"ইদানীং সৈব বিষ্ণুপ্রিয়া।"

রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্র এবং মহামায়া দেবী যেদিন বিষ্ণুপ্রিয়াকে কন্যারত্নরূপে লাভ করলেন—সেদিন থেকেই নবদ্বীপের অগণিত লোক প্রচার করতে লাগলেন, স্বয়ং রাজ-রাজেশ্বরী জগজ্জননীই সনাতন গৃহে এসে জন্মগ্রহণ করেছেন—

"সেই হেতু সেই ভাবে মনেতে বিচারি।
জগৎজননী এই রাজ রাজেশ্বরী॥"

বিষ্ণুপ্রিয়াকে জননী শচীদেবী যেদিন গঙ্গাতীরে প্রথম দেখতে পেলেন, তিনি ভাবলেন সেদিন, এতো মনুষ্য শরীর নয়, "লাখবাণ সোনা।

ঝলমল করে যেন কনক-প্রতিমা॥"

এ কনক-প্রতিমাকে তিনি গৃহের লক্ষ্মী করে নিয়ে এলেন; আদর্শ ঘরণী বিষ্ণুপ্রিয়া নবদ্বীপের সকল নারীকে পতিব্রতা ধর্ম, ধর্মের প্রকৃত অর্থ প্রভৃতি শিক্ষা দিতে লাগলেন। অল্প বয়স থেকেই বিষ্ণুপ্রিয়া ছিলেন মধুর-ভাষিণী; প্রয়োজন হলে, মৃদু-কঠোর—

"বিন্দুমাত্র অমর্যাদা দেখে যদি কায়।
মধুর বচনে দেবী তাহারে শিখায়॥
পুনঃ দুষ্কৃতের পক্ষে মৃদু কঠোরতা।
নদীয়ায় রাজধানী জগতের মাতা॥"

একদিকে নবদ্বীপের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত নিমাই শত শত ছাত্র ও ভক্তগণকে শিক্ষা দান করছেন, অন্যদিকে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শত শত নারীকে সর্বাশ্রম ধর্ম প্রভৃতি শিক্ষা দিচ্ছেন, ফলে—

"শিক্ষাদীক্ষা ক্ষেত্র হল প্রভুর ভবন।
নরনারী যাতায়াত করে অগণন॥"

কিন্তু অতি অল্প দিনের মধ্যেই শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার এই সুখের খেলা সাঙ্গ হলো। তাঁর চতুর্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তজনের বহু কাকুতি-মিনতি উপেক্ষা করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন।

জননী শচী পুত্র-বিরহে প্রায় উন্মাদ অবস্থা-প্রাপ্ত হলেন। নিজের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট সংগোপন করে বিষ্ণুপ্রিয়া অহোরাত্র মাতৃসেবা, ভগবদারাধনা প্রভৃতিতে নিজকে নিয়োজিত করে রাখলেন। শচীমাতার মূর্চ্ছার ভয়ে তিনি চোখের জলও ফেলতে পারতেন না, উচ্চৈঃস্বরে রোদনের কথা তো দূরেই থাকুক।

বিষ্ণুপ্রিয়ার অসহনীয় অন্তস্তাপে পশু-পক্ষী, তরুলতা সকলেই যেন ম্রিয়মাণ, সকলেই নিরন্তর অশ্রু সেকে রত—"পশু পাখী তরুলতা এ পাষাণ ঝুরে।"

বংশীবদন তাঁর বংশী শিক্ষা গ্রন্থে বলেছেন যে, মহাপ্রভু নিজেই তাঁকে জননী শচীদেবী ও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার পরিচর্যার ভার গ্রহণ করতে বলে গিয়েছিলেন, তাঁর নীলাচলপুরে প্রত্যাবর্তন সময়ে—

"মহাপ্রভু এই আজ্ঞা করিলা আমায়।
সেবিতে মাতায় আর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায়॥"

ঈশান নাগর বংশীবদনের মুখে এই কথা শুনে সেদিন থেকেই তাঁদের সেবায় বংশীকে নিযুক্ত করে দেন। কিন্তু অতি পুরাতন পরিচারক ঈশান নাগর এবং নবনিয়োজিত সেবক বংশীবদন কেও সহজে বিষ্ণুপ্রিয়ার দেখাই পেতেন না।

মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থানকালে রথ-যাত্রা সময়ে প্রত্যেক বৎসর বহু ভক্ত-শিষ্য শ্রীধাম পুরীতে গমন করতেন, বর্ষাকাল সেখানে যাপন করে অনেকেই ফিরতেন। দামোদর বঙ্গদেশ থেকে উড়িষ্যায়, উড়িষ্যা থেকে বঙ্গদেশে প্রায়ই যাতায়াত করতেন। তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সম্বন্ধে একদিন প্রসঙ্গক্রমে মহাপ্রভুর সমক্ষেই বলেছিলেন —শচীমাতার পাত্রশেষ মাত্র ভক্ষণ করে বিষ্ণুপ্রিয়া জীবনধারণ করেন। অহোরাত্র বিষ্ণুপ্রিয়া শচীদেবীর সেবা করেন, এমন সেবা "সহস্রেক জনে নারে ঐছে করিবার।" মাতার সেবার কার্য সমাপন করে যদি সময় পান, তা হইলে তিনি নির্জনে বসে নিরন্তর হরিনাম জপ করেন। দামোদর আরো বলছেন—বিষ্ণুপ্রিয়ার কৃপাতেই ধন্য হয়ে তাঁর স্বরূপ কিছুমাত্র যেন তাঁর (দামোদরের) বোধগম্য হয়েছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার এত সহস্র গুণ—সহস্র মুখ অনন্তও তাঁর সদ্গুণ বর্ণন করতে সমর্থ হবে না, এক মুখে দামোদর তাঁকে তাঁর গুণাবলী কি-ই বা বলবেন—

"তান সদ্গুণ শ্রীঅনন্ত কহিতে না পারে।
এক মুখে মুই কত কহিব তোমারে॥"

এ প্রসঙ্গে ভক্তশ্রেষ্ঠ দামোদর যে কথা বলেছেন, পণ্ডিত জগদানন্দও সে কথার সমর্থন করেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়াই গৌরহরির পূজার অবতারণা করেন। মহাপ্রভুকে দামোদর বলছেন—

"তব রূপসাম্য চিত্রপট নির্মাইলা।
প্রেমভক্তি মহামন্ত্রে প্রতিষ্ঠা করিলা॥
সেই মূর্তি নিভৃতে করেন সুসেবন।
তব পাদপদ্মে করি আত্মসমর্পণ॥"

কাঞ্চনা সখী একদিন বিষ্ণুপ্রিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রভু তো তোমাকে "মন দেহ কৃষ্ণে চরিতে" বলে অনুক্ষণ কৃষ্ণের ধ্যান করতে বলে গেলেন। তা সখি আজীবন কৃষ্ণ-ধ্যান তুমি কি রকম করলে?' বিষ্ণুপ্রিয়া উত্তরে বললেন—

"সখি হে হম আন কছু নাহি জান।
গৌর চরণ যুগ বিমল সরোরুহ হৃদে
করি অনুখন ধ্যান॥"
(ভুবনদাস)

শ্রীগৌরাঙ্গই তাঁর কৃষ্ণ, তাঁর কৃষ্ণকেই তিনি অনুক্ষণ ধ্যান করেছেন, প্রভুর বাক্য তো অন্যথা করেননি।

উত্তর-জীবনে যখন তিনি বংশীবদনের সাহায্যে প্রভুর দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং প্রভুর পূজা সার্বজনীন করে তুললেন, সেদিন তিনি পরম পরিতৃপ্তি সহকারে বলেছিলেন—

"সেই ত পরাণ-নাথে দেখিতে পাইনু।
যাঁর লাগি মন আগুনে দহিয়া মরিনু॥"

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মহাপ্রভুর কাছে নিজের সুখ-শান্তির জন্য কিছুই প্রার্থনা করেন নি, বলেছিলেন শুধু— প্রভো!

আপনি যে সব তুমি নিয়ম পালিবে।
তা হতে কঠোর নিয়ম এ দাসীরে দিবে॥"

মহাপ্রভু যখন যে সাধনা করেছেন, তার থেকে কঠোর সাধনা করেছেন বিষ্ণুপ্রিয়া নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহাশ্রমে। মহাপ্রভু গম্ভীরা লীলায় যখন নিরত, মহাশক্তি বিষ্ণুপ্রিয়া তখন নবদ্বীপে মহাগম্ভীরা-লীলায় নিরতা।

কঠোর তপশ্চরণ-রতা বিষ্ণুপ্রিয়ার সাধনা কঠোরতম রূপে আত্মপ্রকাশ করলো—জননী শচীদেবীর দেহরক্ষার পর। শচীদেবীর অন্তর্ধানের পরে তিনি ভক্ত-দ্বার রুদ্ধ করে-দিলেন। তাঁর আদেশ ব্যতীত কেও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারে না—"অত্যন্ত কঠোর ব্রত করিলা ধারণে।" আগে তবু শচীমাতার পাত্রশেষ ভক্ষণ করতেন, এখন তাও প্রায় বন্ধ করে দিলেন। শ্রেষ্ঠ পরিচারক-ভক্ত ঈশান নাগর ও বংশীবদনও ছয় মাসে একবার তাঁর দেখা পেতেন না এবং ফলে বুঝতে পারতেন না—জননীর কি অবস্থা॥ একবার রটে গেল যে, বিষ্ণুপ্রিয়া গৃহাভ্যন্তরে কঠোর তপশ্চর্যা ও সুদীর্ঘকাল অনশনের ফলে সংজ্ঞাহীনা হয়ে আছেন, জীবনের আশা কম। অদ্বৈত প্রকাশে ঈশান নাগর কেঁদে কেঁদে বলছেন—

"বজ্রঘাত সম বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ভাবিনু মাতারে কৈছে পাইমু দরশন॥"

তাঁর বড়ই সৌভাগ্য হলো যে, সে সময়ে শ্রীরাম পণ্ডিত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ভক্তেরা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন; ঈশান ভক্তদের অনেক হাতে-পায়ে ধরে, কান্না-কাটি করে ঈশ্বরীর কাছে যাবার অনুমতি পেলেন।

"তবে বিষ্ণুপ্রিয়া মাতার আজ্ঞা অনুসারে।
মো অধমে লঞা পণ্ডিত গেলা অন্তঃপুরে॥
যাঞা দেখি কাংড়াপটে অঙ্গখানি ঢাকা।
কোটিভাগ্যে শ্রীচরণে পাইনু মাত্র দেখা॥"

ঈশানের মুখে এই সব কথা শুনে অদ্বৈত প্রভু কেঁদে ফেললেন॥

মাতৃদেবীর সেবা ব্যতীত মহাপ্রভু বিষ্ণুপ্রিয়ার উপর আরো একটি বিশেষ ভার অর্পণ করেন—সেটি হচ্ছে ভক্ত-সন্তানগণের সংরক্ষণ। মহাপ্রভু জানতেন মায়ের কল্যাণ হস্ত বিলেপনে সন্তানগণের সর্বদুঃখ বিদূরিত হবে, তাঁর মহাশক্তির ফলেই ধর্ম হবে সুসংস্থাপিত। ফলতঃ—

ঈশ্বরী বিষ্ণুপ্রিয়া নিজের বক্ষপুটে সমগ্র বৈষ্ণব ধর্মকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন—তাই তাঁর ধর্মের গায়ে তাঁর জীবদ্দশায় কোনও প্রকারে ধূলিকণা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। ঈশ্বরীর হৃদয় ছিল নবনীত কোমল। সে জন্য যখন শ্রীনিবাস প্রভু গঙ্গাতীরে উপবাস আরম্ভ করলেন, তখন তিনি আর গৃহ মধ্যে তপশ্চর্যায় স্থির থাকতে পারলেন না, উন্মাদিনীর মত ছুটে গেলেন গঙ্গাতীরে। প্রেম-বিলাসে লিখিত আছে—

"এত কহি বস্ত্রে বেষ্টিত চরণ অঙ্গুলি।
শ্রীনিবাসে ডাকি চরণ মাথে দিলা তুলি।
চরণপরশে অতি প্রেমাবেশ হৈলা।
লোটাইয়া ধরণীতলে কান্দিতে লাগিলা॥"

শ্রীনিবাস ধন্য হলেন। শ্রীনিবাসকে যে যে উপদেশ বাণী তিনি দিয়েছিলেন, শ্রীনিবাস তা' অনুসরণ করে উত্তর-জীবনে মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ রূপে ভক্ত-সমাজে সমাদৃত ও পূজিত হয়েছিলেন।

অনশনে অর্ধাশনে জননী এত কঠোর তপশ্চর্যা সাধন করতেন, যাতে তাঁর কনক-বর্ণ শরীর ধীরে ধীরে মসী-বর্ণ ধারণ করলো। দিবসের শেষভাগে স্বল্প তণ্ডুল স্বহস্তে রন্ধন করে, প্রভুকে প্রদান করে এবং বেশীর ভাগ ভক্তবৃন্দকে প্রসাদরূপে বিতরণ করে দিতেন নিজের জন্য প্রায় কিছুই রাখতেন না। তাই ভক্ত কবি হাহাকার করে বলেছেন—

"কেহ না জানয়ে কেন,রাখয়ে জীবন"
(ভক্তি রত্নাকর॥)

জননী এমনি কঠোর তপশ্চর্যায় নিজের দেহ যষ্টিখানাকে ধূপের মতো জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে নিখিল বিশ্বে বৈষ্ণব ধর্মের সৌরভ বিকিরণ করে গেছেন—সুদীর্ঘকাল॥ তাঁর অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব, তপঃশক্তি—সর্বোপরি মাতৃত্ব সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে এক মহা মহনীয় রূপ প্রদান করেছে—যা সম্পূর্ণভাবে অতুলনীয়। মহাপ্রভুর সমগ্র শিক্ষার প্রকৃষ্ট রূপ দিয়ে গেছেন জননী বিষ্ণুপ্রিয়া। তাঁর সাধনার ফলে খণ্ড-বিখণ্ড বঙ্গদেশে একটা অখণ্ড ভাগবত রূপ মূর্ত হয়ে উঠে, সাধনার প্রভাবে সমগ্র দেশ ঐক্যের মহাশক্তিতে শক্তিশালী হয়ে উঠে। প্রেমবিলাস সত্যই বলেছেন—

"প্রভুর প্রেয়সী যিঁহো তাঁহার কি কথা।
দিবানিশি হরিনাম লয়েন সর্বদা॥
তাঁহার অসাধ্য কিবা নামে এত আর্তি।
নাম লয়েন, তাহে রোপেন প্রভুর শক্তি॥"

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ জননীর এই ঈশ্বরী রূপে উপলব্ধি করে কৃতকৃতার্থ হয়েছিলেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পঞ্চশত বৎসরের পরিপূর্তির প্রাক্কালে আমরা দেশবাসী সকলেরই এই বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ উপলব্ধি জগজ্জননী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট কামনা করি॥

ছাগল ও বিজ্ঞতা

লম্বা দাড়ি আছে বটে রামছাগলের
তাই বলি বিজ্ঞ সেই—উক্তি পাগলের।
—চীনা প্রবাদ

এক সন্ধ্যায়

(১১৪ পৃষ্ঠার পর)

একটু থেমে সাগ্রহে ফিরে প্রশ্ন করলেন, চিকিৎসা করালে বাড়ি ছেড়ে পালানোর ভয় আর থাকবে না বলছেন?

বিরক্ত হয়ে সামনের দিকে তাকাতে দেখি রিকশ থেকে ঘাড় ফিরিয়ে মহিলা দু'চোখে যেন আগুন ছড়াচ্ছেন!...ও চোখে কোনো বিকৃতির আভাস মাত্র নেই। বরং মনে হল নিজের গন্তব্য পথে যেতে পারলেন না বলে এবং থানায় যেতে হচ্ছে বলে রাগে কাঁপছেন। চকিতে আর একটা সম্ভাবনা মনে এলো!...ভদ্রলোক চিকিৎসা করাননি কেন? হয়ত ও সব কিছু নয়। আর কিছু। হয়ত মহিলার মনোযৌবনে আর কারো অভিসার চলছে।

ভদ্রলোকের ভীরু ব্যস্ততা এবং মহিলার রুক্ষ ছটফটানি দেখে সেই বিশ্বাসই বদ্ধমূল হল। তাঁর ওই জ্বলন্ত চোখে চোখ রাখা সহজ হল এবারে। সরোষে ঘাড় ফিরিয়ে নিলেন তিনি। থানার দোরে আসতেই রিকশ থেকে নেমে উত্তেজিত মুখে দ্রুত ভিতরে চলে গেলেন। সকলের ঢোকা হল না। প্রহরী বাধা দিলে। ভদ্রলোককে নিয়ে আমি প্রবেশের ছাড়পত্র পেলাম। সামনেই অফিস-দপ্তর, তারপর থানা অফিসারের ঘর। মহিলা বোধ করি সরাসরি অফিসারের ঘরেই গেছেন।

আমরা আপিস ঘরে ঢুকতেই দু'তিনজন অপরিচিত এগিয়ে এসে ভদ্রলোককে ছেঁকে ধরলেন। একজন বলে উঠলেন, কোথায় ছিলে সমস্ত দিন? চারদিকে খুঁজে সারা আমরা—

ভদ্রলোকের মুখে ক্লান্ত তৃপ্তি। ঈষৎ হেসে জবাব দিলেন, পেয়ে গেছিরে সদা—বলেছিলাম না যেমন করে হোক ওকে খুঁজে বার করে তবে ফিরব। দেখি রিকশ চড়ে দিব্বি যাচ্ছে—ভাগ্যে চোখে পড়েছিল, আসতে কি চায়—এই ভদ্রলোকেরা খুব সাহায্য করেছেন।

কৃতজ্ঞ নেত্রে তিনি আমার দিকে তাকালেন। সদা নামের লোকটি বলল, ঠিক আছে, এখন বাড়ি চলো শিগগীর, মা সেই থেকে ভেবে অস্থির—।

—হবেই তো, চট করে এদিকে ব্যবস্থা করে চল যাই। ও কোথা গেল, ওই ঘরে?

—হ্যাঁ। তোমাকে কিছু ব্যবস্থা করতে হবে না, হীরু, মানিক ওরা আছে ওখানে। পরে কানে কানে বলল, তোমার সঙ্গে কি যেতে চাইবে নাকি! ওরা ভুলিয়ে ভালিয়ে ট্যাক্সি করে নিয়ে আসবে'খন—তোমাকে দেখলে বেরুবেই না এখান থেকে। আমরা আগেই সব বলে রেখেছি এখানে চলো—।

ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। —চল তাহলে। তাড়াতাড়ি বেরুতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন। শ্রান্ত, বিব্রত হাসি। দু'হাত তুলে বললেন, নমস্কার, খুব কষ্ট দিলুম।

কিছু বলার আগেই তাঁরা নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।...না পেলে ভদ্রলোকের কি অবস্থা হত ভাবতে গিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল একটা।

কিন্তু........

এই কিন্তুর আকর্ষণে পায়ে পায়ে ও. সি'র ঘরে প্রবেশ করেই চকচকিয়ে গেলাম একেবারে। অফিসারের পাশের চেয়ারটিতে মহিলা বসে আছেন। ও. সি ছাড়া আর যাঁরা উপস্থিত সেখানে, সকলেই এখানকার পরিচিত কর্মচারী।

ও. সি আপ্যায়ন করলেন, আসুন আপনিও এই হাঙ্গামায় পড়ে গেলেন নাকি?

বিমূঢ় নেত্রে তাকালাম মহিলাটির দিকে। তিনিও এদিকেই দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। আর রোষের চিহ্নমাত্র নেই ও মুখে। বরং একটা বেদনার ছায়া যেন।

মহিলা উঠে দাঁড়ালেন। মৃদু কণ্ঠে বললেন, আমি চলি এখন...। যুক্তকরে সকলকে নমস্কার জানিয়ে এবং আমার বিমূঢ় মুখের ওপর আর একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে প্রস্থান করলেন তিনি।

সঙ্গে সঙ্গে একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় বুকের ভিতরটা টনটনিয়ে উঠল যেন। জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার?

হাই তুলে, চেয়ারে গা এলিয়ে ও. সি জবাব দিলেন, আর বলেন কেন, সেই কবে কার সঙ্গে ভদ্রলোকের বউ পালিয়েছে—এ এক অদ্ভুত ঝামেলা! এক বছরের মধ্যে এই নিয়ে তিনবার হল এরকম।

ত্রিশঙ্কু

(১০০ পৃষ্ঠার পর)

হুসেন আলী বলল, কলকাতায় ... দেখছে।

এই সময় কটকে মই থেকে পড়ে ... ব্যথা পেয়েছিল বেশ, কিন্তু চার পাশের ... লাগল বুঝি', 'বেচারা নতুন নেমেছে' এই সহানুভূতি তাকে বেদনা বোধ করতে দিল... কিছুই যেন হয়নি এইভাবে সে আবার ... মইয়ে উঠল। কিন্তু এবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল। সহানুভূতির বাণী নয়, ... উঠল হাসির রোল। কটকে ব্যথা বেশী পে... ছিল, তার কপাল ফুলে উঠল। সে কো... রকমে উঠে দাঁড়াল কিন্তু আর মইয়ে চড়ল... মাথা নীচু করে হেঁটে চলল বাড়ীর দি... পিছন থেকে তার কানে আসতে লাগল কে... যেমন বুদ্ধি ওই ছেলেকে নামিয়েছে মাঠে।

ঘোড়ারোগ হয়েছিল, ছেলেকে ... করবে, পাগড়ি পরাবে।

কিন্তু সর্বাধিক বেদনা পেল—কে... টিপ্পনিতে—কে ভেবেছিল ও অমন ... গরু হবে?

কটকে বাড়ীর দিকে গেল না। ... দিয়ে হাঁটা যে পথটা স্টীমার স্টেশনের দি... চলে গেছে—সেই পথ ধরে চলল। হাতে এক কপর্দক নেই, সম্বল শুধু পা দুখানা। ... জানে এই পথ কোথায় তাকে নিয়ে যাবে ... অনভ্যস্ত পদে সে যেন হোঁচট খেতে খেতে চলেছে। অবস্থা পালছেঁড়া নৌকার মত।

বেলা দুপুর, একটা শব্দে তার চোখ পড়ল ... খালের দিকে। চেয়ে দেখে সোনাকান্ত ... মাঝি পারের কাছ ঘেঁষে নৌকো বেয়ে চলেছে ... সে একটু হেসে বলল, দেশ-গাঁয়ে পোষাল না ... বুঝি বাবু? তাই আবার সহরে ফিরে ... এসো, আমার নৌকায় এসো।

নদীতীরের পথ ছেড়ে কটকে এবার মাঠের আল বেয়ে চলতে লাগল। তার কানে বাজছে দেশ-গাঁয়ে পোষাল না বুঝি বাবু?

মল্লিকা

শ্রীমতী সুষমা দেবী

পারব না, পারব না, পারব না, তোমার কথা আমি রাখতে পারব না, শেখর।

কেন? কি তোমার এমন কাজ যে আমার এ সামান্য অনুরোধটুকু রাখতে পারবে না? আজ ত নতুন নয়, কতদিন ধরে তোমায় বলছি, কিন্তু আমার এই সামান্য কথাটুকু রাখবার সময় তোমার নেই? ব্যাপারটা তোমার কাছে হয়ত নিতান্ত তুচ্ছ, কিন্তু আমার এই একঘেয়ে জীবনে এটা একটা সঞ্চয় হয়ে থাকবে। যখনই তোমায় বলি তখনই কথা এড়িয়ে যাও কেন বলো ত? আমি কি কোনও দিন তোমার কেউ ছিলাম না? আমার বুকের দিকে চেয়ে বলো, এখানে কি কখনও তোমার দাগ পড়েনি? কি অদ্ভুত তুমি বদলে গেছ মল্লিকা, দেখে আমি সময়ে সময়ে আশ্চর্য হয়ে যাই।

কি করব, শেখর? আমার কোনও উপায় নেই। এখনই বাড়ি ফিরতে হবে আমায়। রুগ্ন শয্যাশায়ী স্বামী, কচি মেয়েটা, আমারই পথ চেয়ে আছে। তাদের নিরাশ করে কি করে এখন তোমার সঙ্গে হোটেলে চা খেয়ে সিনেমা দেখতে যাই? সে আমি পারব না।

দৃঢ়স্বরে শেখর বলল—তোমায় পারতেই হবে, না পারলে চলবে না।

মল্লিকার রোগা শির-বারকরা ঘাম চটচটে ঠাণ্ডা একটা হাত শেখর খপ করে টেনে নিয়ে চেপে ধরল।

আঃ, ছাড়ো, কী করো? লোকে দেখে বলবে কী?

যে যা বলে বলুক গে, আমি ভয় পাই না।

তুমি না পেলেও আমি পাই। হাত ছেড়ে দাও শেখর, রাস্তার লোকে হাঁ করে চেয়ে দেখছে।

ঝটকা মেরে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে মল্লিকা ভিড় ঠেলে ফুটপাথের ওপর দিয়ে তাড়াতাড়ি চলতে লাগল। শেখর সমান তালে তার পাশাপাশি চলতে চলতে বলল—এই নিয়ে আজ কতদিন হল তা জানো? দিল্লী থেকে বদলি হয়ে এখানে আসার পর হঠাৎ যেদিন সেণ্ট্রাল এ্যাভিনিউএ তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, সেই দিন থেকেই। প্রথমেই ত বলতে পারতে, যেতে পারবে না, 'যাব', 'যাব' বলে কেন নিছক বাজে আশা দিলে আমায়?

সত্যি বলছি শেখর, বাড়ি থেকে বেরোবার আমার উপায় নেই। শুধু সংসার চালাবার জন্যে নেহাত বাধ্য হয়েই এই ক্লার্কের কাজটা নিতে হয়েছে।

কেন নিলে? কে নিতে বলেছিল? তখন যে নিজের ভাগ্য হাতে করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলে! এখন তার ফল ভুগতে হবে না? পরাগের রাঙা মুখখানা দেখেই যে তখন সব ভুলে গিয়েছিলে, তাই আমার সঙ্গে শঠতা করে লুকিয়ে তাকেই বিয়ে করলে, আমাকে একটু জানতে দিলে না! পরাগকে দেখেই আমার এতদিনের ভালবাসা এক মুহূর্তে ভুলে গেলে! তখন বলিনি আমি—'ও রুগ্নটার প্রেমে পড়ে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরো না'? শুনেছিলে আমার কথা?

পথের মাঝে এ সব কথা কেন, শেখর? ও ত অনেক পুরনো হয়ে গেছে? দেখা হলেই বুঝি বলতে হবে? এ ছাড়া কি দুনিয়ায় তোমার অন্য কথা নেই?

নেই-ই ত! বিনা অপরাধে একজনের সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ করে দিয়ে ভেবেছিলে সুখী হবে, শান্তি পাবে! পেলে কি তাই? ভগবানই তোমার সব সুখ ঘুচিয়ে দিলেন—

দিন গে, তাতে তোমার কী? আমার স্বামীর বিষয়ে এ ধরণের কথা আমি সহ্য করব না, শেখর। আমার সুখ-শান্তির বিষয়ে বিচার করতে তোমায় ডাকিনি। আমি সুখীই বা নই কিসে? খুবই সুখী।

রেগে মল্লিকা হন হন করে আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে প্রায় চলন্ত একটা বাসে লাফিয়ে উঠে পড়ল। শেখর ওঠবার আগেই বাস জোরে চলতে আরম্ভ করল। মুখে তার বিরক্তি ফুটে উঠল, মল্লিকার বাসখানার দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল।

দোতলা বাস জোরে হেলতে-দুলতে চলেছে। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে মল্লিকা রগড়ে রগড়ে কপালের, ঘাড়ের ঘাম মুছতে লাগল। তার চোখের ওপর রুগ্ন স্বামীর ম্লান মুখখানা ভেসে উঠল। না, না, না, শেখরকে সে কিছুতেই প্রশ্রয় দেবে না। পরাগকে সে নিজে থেকে ভালবেসে বিয়ে করেছিল। তার অপরাধ কী? রোগ ত মানুষের হাত ধরা নয়? অসুখ হলে উপায় কী? এবার থেকে যেমন করে হোক কিছু টাকা জমিয়ে মল্লিকা ভালো করে স্বামীর চিকিৎসা করিয়ে তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলবে। কিন্তু টাকারই যে টানাটানি? গত মাসে দেনা শোধ করতে সোনার বালা দুটো বিক্রি করতে হয়েছিল। আর ত এমন কিছু নেই যা দিয়ে সে পরাগের ওষুধ আনে? এ দারিদ্র্যের সঙ্গে এমন করে আর কতদিন যুদ্ধ করা চলবে?......

বাসের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চাইতে দুপাশের বাড়ি আর নীচে রাস্তায় জনতার স্রোত মল্লিকার চোখে পড়ল, সেই সঙ্গে শেখরের মুখখানাও কেমন করে হঠাৎ মনে পড়ল। শেখরের ওপর তার অনুকম্পা হল। আহা, বেচারার দোষ কী? বছরের পর বছর তাকে নিয়ে খেলিয়েছে মল্লিকা, বিয়ে করবে বলে আশাও তাকে দিয়েছিল। সেই সুযোগ নিয়ে শেখরের পয়সায় সে ছিনিমিনি খেলেছে। শেখর ভাবতেও পারেনি যে, মল্লিকা এমনি করে তাকে দাগা দেবে।......কী স্বাস্থ্যবান চেহারা শেখরের! যেমন বুকের ছাতি, তেমনি আঁট

গড়ন। তার মাংসপেশল শক্ত হাত দুটোর স্পর্শ এখনও যেন মল্লিকার সর্বাঙ্গে লেগে আছে। অবশ্য পরাগের রূপের পাশে কোনও দিনই শেখর দাঁড়াতে পারেনি, কিন্তু আজ মল্লিকার মনে হচ্ছে পরাগের চেয়ে সে অনেক বেশী সুন্দর।......সেই পরাগকে কি এখন চেনবার উপায় আছে? এক বছর ধরে রোগে ভুগে যেমনি তার শ্রীহীন চেহারা হয়েছে, তেমনি অসম্ভব রকম দুর্বল হয়ে পড়েছে।......

হঠাৎ ঝাঁকানি দিয়ে বাস থামল। হাজরা রোডের মোড় এসে গেছে দেখে বাস থেকে নেমে মল্লিকা চলতে লাগল। এই যাঃ, ভুল হয়ে গেল। শেখর আজ তার সব গোলমাল করে দিল। মল্লিকা ভেবেছিল চুমকির জন্যে খানকয়েক বিস্কুট আর স্বামীর জন্যে দুটো কমলা লেবু আনবে। তার কিছুই হল না।......সে ত বেশ ছিল? রুগ্ন স্বামী আর তিন বছরের মেয়েকে নিয়ে কোনও দিন ত তার খারাপ লাগেনি? মল্লিকার মনের সমস্তটাই ত তারা দুজনে জুড়ে ছিল? কিন্তু আজকাল থেকে থেকে কেন শেখরের মুখখানা তার মনের কোণে উঁকি মারে? না, না, এবার থেকে তাকে আরও শক্ত হতেই হবে, পরাগের কাছে সে অপরাধী হবে না।

মল্লিকা বাড়ি ঢুকতেই চুমকি ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল—বিস্কুট এনেছ মা?

না ত? একেবারে ভুলে গেছি চুমকি!

বারে! আমি যে খাব বলে তখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি—ডান হাতের তর্জনী দিয়ে চুমকি চোখ রগড়াতে লাগল।

কাল আনব মা, কেঁদো না—বলে, আদর করে মেয়েকে কোলে নিয়ে মল্লিকা ভেতরে গেল। পরাগ নিঝুম হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। সন্ধ্যা হতে চলল, তবুও তার ঘরের দরজা-জানলা তেমনি বন্ধ। অন্য দিন ঝি খুলে দেয়: আজ দেয়নি দেখে বিরক্ত হয়ে মল্লিকা চুমকিকে জিজ্ঞাসা করল—হাবুর মা গেল কোথায়? রোজ বুঝি তাকে এক কথা মনে করিয়ে দিতে হবে?

সে ত আমায় দুধ খাইয়ে দিয়েই চলে গেছে তরকারি আনতে?

মল্লিকার মনে পড়ল, বাজার ছিল না বলে সে নিজেই তাকে বলেছিল বিকালে যেতে। স্বামীর বিছানার কাছে এগিয়ে এসে তার কপালে হাত রেখে মল্লিকা জিজ্ঞাসা করল—আজ কেমন আছ?

বোজা চোখ দুটি মেলে হেসে পরাগ জবাব দিল—ভালো নয় মল্লি, জ্বরটা বোধ হয় বেড়েছে। কেমন শীত শীত করছে।

তাই ত? কপালটা ত বেশ গরম ঠেকছে। সেই ওষুধটা বুঝি খাওনি? হাবুর মা দেয়নি? আর পারি না বাবু, ওকে রেখে কোনও লাভ নেই দেখছি!

তাক থেকে ওষুধ এনে মল্লিকা স্বামীকে খাইয়ে দিল, অফিসের কাপড় ছেড়ে সংসারের কাজে লাগল। কাজের ফাঁকে এসে এক সময় পরাগকে খাইয়ে গেল, সে কেমন আছে দেখে গেল। মল্লিকা রান্না চড়াল, অন্য সব কাজও করল ঠিক কলের মতো, নিত্যকার মতো, কিন্তু মনের মধ্যে কী একটা যেন থেকে থেকে কাঁটার মতো বিঁধতে লাগল।...শেখর ঠিকই বলেছে, এ তার তুলে নেওয়া দুঃখ, একে ফেলবার ত উপায় নেই? নইলে এরই মধ্যে কি ওর জীবনের সব সাধ-আহ্লাদ চুকেবুকে যাবার সময়? মাত্র চার বছর হল ওদের বিয়ে হয়েছে, মল্লিকার প্রাণের ভেতর এখনও সবই নতুন, সজীব রয়েছে......

মল্লি, মল্লি, জল দাও না?

এই যে দিই—বলে ছুটে গিয়ে সে রুগ্ন স্বামীর মুখে জল দিয়ে এল, চুমকিকে খাওয়াল, তারপর নিজে খেয়ে হাঁড়ি হেঁসেল তুলে রুগ্ন স্বামীর বিছানার পাশে এসে যখন বসল তখন পরাগের জ্বরটা কমে এসেছে, গা-মাথা ঘামে ভিজে গেছে। তোয়ালে দিয়ে ঘাম মুছিয়ে জামা বদলে দিয়ে তার পাশে মল্লিকা শুয়ে পড়ল।

ঘুম তার এল না। চিন্তায় বুকটা ভারি হয়ে এল। কেন সে এমন করল? এ দুর্বুদ্ধি কেন তার হয়েছিল? যে কথা চার বছরের মধ্যে একটা দিনও তার মনের কোণে উঁকি মারেনি, আজ সেই কথাই কেন এমন করে তাকে পেয়ে বসল?

দিল্লী সেকেণ্ডারি বোর্ড থেকে আই-এ পাস করে যেবার সে ইন্দ্রপ্রস্থ কলেজে বি-এ পড়তে যায়, সেই সময়েই পরাগের সঙ্গে ওর প্রথম পরিচয় হয়েছিল। মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে পরাগের সুন্দর মুখশ্রী, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, আর শান্তগম্ভীর চেহারা তাকে আকৃষ্ট করেছিল। শেখরের বাচালতা, চপলতা, মল্লিকার পায়ে পায়ে জড়ানোকে তার ভালো লাগেনি, শেখরকে বড় হালকা, অনায়াসলভ্য বলে মনে হয়েছিল। কতদিন সহপাঠিনীদের সঙ্গে সে বাজি রেখেছিল, পরাগের সঙ্গে ভাব করবে বলে। অনেক মেয়েরই সেই একই দুরাশা ছিল, কিন্তু পরাগের কাছে কেউই এগোতে পারেনি। কেবল মল্লিকাই নাছোড়বান্দা হয়ে তার পিছু নিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তারই জয় হয়েছিল। কিন্তু হলে হবে কি, পরাগ তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি, বলেছিল—'আমার নিজেরই অন্নের সংস্থান নেই, অপরের ভার নেব কী করে? আগে যোগ্য হই, তারপর সে কথা হবে।' মল্লিকার এক বান্ধবীর বাবা ছিলেন দিল্লীর চীফ কমিশনারের অফিসের বড় অফিসার। বান্ধবীকে ধরে তার বাবাকে অনুরোধ উপরোধ করে দিল্লী গভর্ণমেণ্টের একটা ভালো কাজই সে পরাগকে জুটিয়ে দিয়েছিল। তার পরই তাদের বিয়ে। মল্লিকা গরিবের মেয়ে, একমাত্র মা তার সম্বল ছিলেন। মেয়ের বিয়ে হবে শুনে তিনি আতঙ্কে দিশাহারা হয়েছিলেন টাকার চিন্তায়। মল্লিকাই শেখরের কাছ থেকে টাকা চেয়ে এনে মার হাতে দিয়েছিল খরচের জন্যে, মিথ্যা করে শেখরকে বলেছিল—'টাকাটা আমার বড় দরকার, ধার হিসেবেই দাও, আমি পরে শোধ করে দোব।' অগাধ বিশ্বাসে মল্লিকার হাতে সে হাজার টাকা তুলে দিয়েছিল। তারপর যখন পরাগের সঙ্গে মল্লিকার বিয়ের কথা সে শুনল, তখন কথাটা সে প্রথমে বিশ্বাস করতেই পারেনি। এমন স্বার্থপর, এমন বিশ্বাসঘাতক কেউ হয়! তার মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়েছিল।......

প্রায় অন্ধকার ঘরের কোণে মিটমিট করে একটা মোমের বাতি জ্বলছে। তারই অল্প আভায় স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে মল্লিকার গা যেন শিউরে উঠল। কে বলবে, একদিন পরাগের ঐ মুখখানা দেখেই মল্লিকা দুনিয়ার সব কিছুই ভুলে গিয়েছিল? পোড়া রঙ, রক্তহীন রুগ্ন মুখ, গালের দুদিকের হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে, খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফে মুখ ভরতি, মাথার সামনের চুলের রাশি পাতলা হয়ে সিঁথিটা চওড়া হয়ে গেছে। এই কি সত্যি সেই পরাগ?......

মল্লিকা শুয়ে থাকতে পারল না, উঠে বসল। রাজ্যের ভাবনা এসে তার মাথায় বাসা বাঁধল। একশ'টি টাকা মাত্র সে মাইনে পায়, মাগ্গিভাতা ইত্যাদি নিয়ে একশ' ষাট টাকাতে দাঁড়ায়। এই সম্বল করে অত বড় রুগ্ন স্বামীর চিকিৎসা, সংসার খরচ চলতে পারে? পরাগের কাশি, জ্বর, বুকে পিঠে ব্যথা। ডাক্তারেরা যক্ষ্মা বলে সন্দেহ করেন। এ বড়মানুষি রোগের বড়মানুষি চিকিৎসার ব্যবস্থা সে কী করে করবে? হাসপাতালের দরজায় দরজায় ঘুরে ডাক্তারদের হাতে-পায়ে ধরেও কোথাও পরাগকে সে ভর্তি করতে পারেনি। সকলেরই এক কথা—'বেড খালি নেই, মধ্যে মধ্যে এসে খবর নিয়ে যাবেন।' এই এক বছরের মধ্যে বেড আর কোথাও খালি হল না, মাঝখান থেকে পরাগের যেটুকু সামান্য শক্তি ছিল, তাও নিঃশেষ হয়ে এল।...মল্লিকার মা গত বছর মারা গেছেন, কোনও কুলে আর তার কেউ নেই যার কাছে সাহায্যের জন্যে হাত পাততে পারে।

কী একটা স্বপ্ন দেখে পরাগ হঠাৎ চমকে উঠল, ঘুমের ঘোরে কী যেন বলতে গেল। মল্লিকা এগিয়ে গিয়ে তাকে ঠেলা দিল—কী হয়েছে? অমন করছ কেন?

নড়ে চড়ে পাশ ফিরেই পরাগ আবার ঘুমিয়ে পড়ল। মল্লিকা একই ভাবে বিছানায় বসে রইল, চোখ বুজতে পারল না।

* * *

কদিন কোন্ রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেছ, মল্লিকা? রোজই কাজ শেষ হবার আগেই উঠি-ত-পড়ি করে এসে এখানে তোমার প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে থেকেছি, কিন্তু একদিনও তোমার দেখা পাইনি।

মল্লিকা চমকে উঠল, ভয়ে তার মুখ এতটুকু হয়ে গেল—তুমি? তুমি এখনও এ পথে রোজ দাঁড়িয়ে থাকো? আমি ভেবেছিলাম, কদিন না দেখলে আসা ছেড়ে দেবে।

হাঁ, রোজই দাঁড়িয়ে থাকি। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। বেশ, রেস্তোরাঁয় না যাও, চলো, কাছেই কোনও নির্জন জায়গা দেখে বসিগে যেখানে দুটো কথা বলা যায়।

'না' বলতে গিয়ে মল্লিকা শেখরের মুখেরই দিকে চেয়ে থেমে গেল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার সঙ্গে সঙ্গে চলল। আজ কদিন ধরে দিবারাত্র সে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে। পরাগের ভালবাসা, পরাগের পরনির্ভরতা আর যেন তাকে সেরকম ব্যাকুল করে তুলছে না।

কোথায় যাবে, শেখর? আমার কিন্তু বেশী সময় নেই।

চলো না গঙ্গার ধারে, সে ত বেশী দূরে নয়?

আরও মিনিট পাঁচেক হেঁটে তারা গঙ্গার ধারে জেটির ওপর গিয়ে দাঁড়াল। শেখর বলল—দাঁড়িয়ে কথা হয় না, মল্লিকা, বসতে হবে।

দ্যাখো, কটা বেজেছে!—বলে মল্লিকা তার হাতঘড়িটা শেখরের চোখের সামনে ধরল।

না, আমি দেখব না। তুমি দ্যাখো!

হতাশ হয়ে বসে পড়ল মল্লিকা। স্ট্র্যাপ দেওয়া ব্যাগটা ঘাড় থেকে নামিয়ে কোলের উপর রেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে শেখরের দিকে চেয়ে রইল, বলল—বলো, কী বলবে?

আমি তোমায় চাই। যে ভুল করেছ তা ধরে নাও, মল্লি। তুমি আমার কাছে চলে সো। ঐ রুগ্নটার সঙ্গে জড়িয়ে নিজেকে রে ফেলো না।

পকেট হাতড়ে একটা ছোট ফোটোগ্রাফ বার রে শেখর জিজ্ঞাসা করল—একে চিনতে রো?

সেদিকে চেয়ে সলজ্জ হেসে মল্লিকা উত্তর ল—কেন পারব না? ও ত আমারই ছবি? বার যখন আগ্রায় আমাকে তাজমহল দেখাতে য়ে গিয়েছিলে, সেখানে তুলেছিলে।

হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ। কিন্তু এই ছবিটার সঙ্গে এখন তোমার কোনও মিল আছে, চোখ দুটো ার ঐ লম্বা টানা ভুরু ছাড়া? ছি, ছি, কি করছ মি? চিরকালই খেয়ালে চলবে? তোমার কোনও যা শুনতে চাই না আমি—বলে মল্লিকার একটা ত ধরে শেখর ঝাঁকানি দিয়ে উঠল। ঝর ঝর রে চোখের জল তার হাতে এসে পড়ল।

তা হয় না শেখর। যা হয় না, সে অনুরোধ রো কী করে? আমি বিয়ে করেছি। রুগ্ন ামী—

আঃ, বারে বারে সেই রাস্ক্যালটার কথা নিও না। বিয়ে করেছ ত মাথা কিনেছ!

তাকে ছেড়ে তুমি কী করে আমায় আসতে লা? এমন অন্যায় অনুরোধ—

বেশ করি! কেন করব না? জানছি ত দুদিন দে পরাগ পটল তুলবে, তখন কোথায় গিয়ে ড়াবে মেয়েটার হাত ধরে? ওদিকে আমি াবার হয়ত শীগগির বম্বেতে বদলি হয়ে যাব। র আগে হেস্তনেস্ত একটা করে ফেলতে চাই। রাগকে হাসপাতালে ভর্তি করে দাও, দিয়ে ল এসো।

জলভরা চোখ মেলে মল্লিকা শেখরের দিকে ইল। পুরুষালি চেহারা, গলার স্বরে, ভাবে গীতে শক্তি যেন ফুটে উঠেছে। কোনও কিছু বধা না করে এর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা য়। কিন্তু পরাগ? পরাগ ত মল্লিকারই ওপর ভরশীল? তার ত আর কোনও অবলম্বন, শ্রয় নেই? ফিরতে দেরি হলে রুগ্ন রক্তহীন খ দুটি খুঁজে খুঁজে বেড়ায় মল্লিকাকে। সে ষ্টিতে কুণ্ঠা, আশঙ্কা ফুটে ওঠে সব সময়ে। ই অসহায় স্বামীকে ছেড়ে ফেলে দিয়ে সে ন আসবে শেখরের কাছে? না, না, এতখানি ষ্ঠুর সে হতে পারবে না। চোখের জল মুছে স্বরে সে বলল—পরাগ আজ দুর্বল, শক্তি- ন, তাই তুমি এ কথা আমায় অনায়াসে বলতে রলে, শেখর। নইলে বলবার স্পর্ধা হত না মার।

স্পর্ধা আগেও যেমন ছিল এখনও তেমনি াছে, না থাকবেই বা কেন? আসলে তুমি মার, আমারই থাকবে। বিধাতার বিচার ত খতে পাচ্ছ? এখনও চোখ খুলছে না? পরের নিষ ফাঁকি দিয়ে নিলে তার ফল ভোগ করতে য়, পরাগ তাই করছে। এখন ত হিন্দুদের ভোর্সের আইন পাস হয়ে গেছে, তবে আবার র কী?...মল্লি, শোন, অমন অবুঝ হোয়ো না। মার প্রাণটা যে পা দিয়ে মাড়িয়ে দলে দিয়ে লে, সে কথা ত কই একবারও তোমার মনে হয় ? তার কারণ—তুমি জানো সেটা। তোমার কান্তই নিজের, তুমি ছাড়া তার গতি নেই, তা নয়?

তা কেন? তুমিও ত বিয়ে করে সুখী হতে পারো, শেখর?

তা পারি না, তা পারলে অনেক দিন আগেই করে তোমার এই অন্যায়ের শিক্ষা দিতাম—যেদিন আমার চোখে ধুলো দিয়ে পরাগের সঙ্গে গাটছড়া বেঁধেছিলে, সেই দিনই। ভেবেছিলাম তোমায় শিক্ষা দোব, চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারিনি।......সর্বাঙ্গে তোমার দারিদ্র্যের ছাপ ফুটে বেরোচ্ছে। কেন তুমি এমনি করে নিজেকে শেষ করছ? আমিই তা করতে দোব কেন?

ফিক করে হেসে ফেলে মল্লিকা হাত পেতে বলল—বেশ ত, আমার ওপর যখন তোমার এত- খানি করুণা, দাও না কিছু টাকা? ধার বলেই নোব। তা পেলে পরাগের চিকিৎসা করাই, তাকে ভালো পথ্য দিই। উপযুক্ত ব্যবস্থা যদি আমি করতে পারি, নিশ্চয়ই সে সেরে উঠবে।

দোব বই কি! আমার শত্রুকে বাঁচাবার রাস্তা করে দোব না? এতখানি উদার আমি হতে পারব না। এক পয়সাও পাবে না—

চাই না তোমার পয়সা, দিও না। এতদিন যা করে চলছে এখনও তাই চলবে।

তড়াক করে উঠে পড়ল মল্লিকা, বলল—আর বসব না।

তার হাত ধরে টান মেরে উত্তেজিত স্বরে শেখর বলল—যেতে দোব না। চুলোয় যাক তোমার সংসার, স্বামী, মেয়ে!

চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে মল্লিকা যেন শেখরকে ভস্ম করে দিতে চাইল।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল গঙ্গার জল, ধূসর আকাশ এক হয়ে গেল। আধ অন্ধকারে জনশূন্য জেটির ওপর হঠাৎ পাগলের মতো হয়ে শেখর মল্লিকাকে জড়িয়ে ধরল—মল্লি, আমার মল্লি, তুমি এমন নিষ্ঠুর হলে কী করে?

জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মল্লিকা হতাশ স্বরে বলে উঠল—আমায় এমনি করে নীচে নামিয়ে এনো না শেখর। একভাবে নিজেকে চালিয়ে আসছিলাম, তুমি সব ওলটপালট করে দিলে, পরাগের কাছে আমায় বিশ্বাসঘাতক করে দিলে।...

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে মল্লিকা ঝড়ের মতো বেগে বেরিয়ে গেল।

* * *

মল্লিকা যখন বাড়ি পৌঁছাল তখন চারদিকে আলো জ্বলছে। চুমকি ঘরের কোলে দালানে পড়ে ঘুমোচ্ছে। ঝি নেই। দরজা খোলা। স্বামীর ঘর অন্ধকার কোনও সাড়া নেই। ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকে দেওয়াল হাতড়ে আলোর সুইচ টিপেই মল্লিকা আঁতকে উঠল। রক্তে বিছানা ভেসে গেছে, তারই ওপর দৃষ্টিহীন চোখ মেলে পরাগ নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে।

ভূত ও নারী

ভূত আর নারীদের একই পরিচয়
কথা না কহিলে কেহ কথা নাহি কয়।

—রেঃ রিচার্ড বারহাম।

আজি চল চল ছল ছল নদীর জলে
পড়ে শ্রাবণের ঘন কালো মেঘের ছায়া—
মাঝি তরণী কূলের পানে বাহিয়া চলে,
শুধু কবির পরাণে জাগে মাটির মায়া!

তাই সারাটি দিনের শেষে সহসা যবে,
দূরে দিগন্তে লাগে দোলা গোধূলি ক্ষণে,
কবি বারেকের লাগি' বুঝি রহে নীরবে,
তার কী জানি কাহার কথা পড়িল মনে।

আজ মনে পড়ে কত স্মৃতি কত না আশা,
রচি' আপন কুটিরখানি নদীর কূলে,
নিয়ে মিলনের মধু-গীতি, প্রাণের ভাষা—
তাই কম্পিত ঢেউগুলি উঠিছে দুলে।

হোথা কবির প্রিয়ার চোখে ক্লান্তি নাহি,
বুকে করুণ মিনতি শুধু বাঁধন-হারা—
যেন পিয়াসী চাতকী-সম রয়েছে চাহি
রাখি' সজল কাজল নভে আঁখির তারা।

আজি দীর্ঘ বরষ পরে এল বারতা—
কোন্ সুদূর রাজ্য হ'তে প্রবাসী কবি
আসে নিয়ে কত ব্যথা, কত না-বলা কথা—
বুকে অনুরাগ-রঞ্জিত প্রিয়ার ছবি।

তাই তুলসীর বেদীমূলে প্রদীপ জ্বালি'
বাঁধি' কুঞ্চিত কুন্তলে কবরী-রাশি,
হেম- চম্পক ফুলভারে ভরিয়া ডালি,
বধূ ত্রস্ত চরণ-পাতে দাঁড়ালো আসি'।

হেরি দিগন্তে ঘন দেয়া তরাসে কাঁপে,
তার অঞ্চল খসি' পড়ে কম্প্র-লাজে;
বহে নিঃশ্বাস মুহু মুহু বিরহ-তাপে,
সে যে উন্মনা, নাহি মন গৃহের কাজে।

কালো আকাশের বুক চিরে বিজলী কেলি
করে অশনি-লাস্যভরা চকিত খেলা,
মাঝি তরণী বাহিয়া চলে উজান ঠেলি'—
পাড়ি দিতে হ'বে ত্বরা করি'—বিগত বেলা!

কেগো দাঁড়ায়ে রয়েছো দূরে শিরীষ-মূলে,
এই প্রলয়-ঝঞ্ঝাহত দৃশ্যপটে,
কোন্ প্রিয়জন-অভিসারে আপনা ভুলে,
তুলি' উৎসুক আঁখি-দুটি নদীর তটে?

ওই শঙ্কিত টলমল তরণী ডোবে—
জল খল খল উতরোল ছুটিয়া চলে,
বুঝি আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে বিপুল ক্ষোভে,—
কবি ঝাঁপায়ে পড়িল সেই নদীর জলে।

বধূ থর থর কম্পিত চাহে না ফিরে,
সে যে আপনারে যেন আর রোধিতে নারে—
পাড়ি' তরঙ্গ-খরধার ক্ষুব্ধ নীরে
কোন্ অভিসারে চলে আজি অজানা পারে!

মাথাব্যথা, গা হাত-পা জ্বালা, কি দাঁত কন্‌কনানি যে ভারি একটা অসুখ নয়,—বিভূপদ তা জানে।

কিন্তু, বোঝে না যে, তারই জন্য নিত্য নতুন ওষুধ আর পথ্যের কি দরকার!

তা ছাড়া,—সেই কথাই রকমারী ভঙ্গিতে প্রকাশ করতে হবে সকলের কাছে,—আর তার বদলে প্রত্যাশা করতে হবে সহানুভূতির।

অন্ততঃ, বিভূপদ যা একেবারেই পছন্দ করে না! কথাটা ভাবতে ভাবতে আয়নার সামনো-সামনি এসে দাঁড়ায় ও। তাকায় নিজের দিকে।

কি-ই বা হ'য়েছে এমন! একটু রোগা! গালের দুদিকের হাড় উঁচু হ'য়ে উঠেছে একটু! চোখ দুটো খোলে ব'সেছে চারপাশে কালি ঢেলে।

আর?

আর শাদা রং লেগেছে কানের ওপোরের চুলে।

এই তো?

এগুলো তো নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে যা হ'য়েই থাকে,—তাই। কিন্তু উপায়ও তো র'য়েছে নিজের হাতের মুঠোয়; অর্থাৎ, আয়নায় দেখে ওগুলো টেনে তুলে ফেললেই তো মিটে যায় হাঙ্গামা।

তবু, এসব তো বড় কথা নয়, সমস্যা দাঁড়িয়েছে ভক্তিকে নিয়ে।

স্বামীর শারীরিক সুস্থতা আর অসুস্থতা নিয়ে তার যতখানি দুর্ভাবনা হোক, মানসিক দিকটায় লক্ষ্য তার একেবারেই নেই!

প্রসঙ্গক্রমে সাবধানও তাকে ক'রে দিয়েছে বৈ কি বিভূপদ; ব'লেছে—

"—এত বাড়াবাড়ি কিছুই ভালো নয়,—জানো ভক্তি!" কিন্তু,—সে কথা গায়েই মাখেনি ও।

বরঞ্চ মনে হ'য়েছে কে যেন কার ঝাড়ে বাঁশ কাটছে, এমনি ভাবখানা ওর।

অগত্যা বিরক্ত হ'য়েই চুপ ক'রে গেছে বিভূপদ। এক একবার ভেবেওছে যে, দেওয়া যাক না হয় ভক্তিকে কিছুদিনের মত ওর বাপের বাড়ী পাঠিয়ে। তারপরেই আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ওর অবর্তমানে ছেলে মেয়ে সামলানোর।

সে ও এক মহাবিভ্রাট! তার চেয়ে বরঞ্চ স্বদেশে নিজেই চ'লে যাক—কিছুদিনের মত ছুটি নিয়ে।

যাতে নিজেও বাঁচে, ভক্তিও জব্দ হয়।

কিন্তু, দুটোর একটাও করা হয়নি আজ পর্যন্ত! মাঝে থেকে জ্বর ভোগের পর কিছুদিন অফিসের ছুটিতে বিশ্রাম করতে হ'চ্ছে ঐ ভক্তিরই ডাক্তার ভগ্নিপতির ব্যবস্থামত।

অবশ্য, ছুটিটাও পাওনা ছিল।

সামনের জানালাটা খোলা,—ভেতর থেকে আটকানো আছে কেবল তার শার্শিটা।

ওর ভেতর দিয়েই আকাশের দিকে তাকাল' বিভূপদ। নিচে নম্বর মেলানো ই'টকাঠের আশ্রয়, আর তার ওপোর ঝুলছে এক ফালি আকাশ।

সে আকাশ থর্‌থর ক'রছে নীল রঙে। শ্রাবণের দিন। সারাদিনভোর ঝ'রছে বৃষ্টি আর বইছে বাদ্‌লা হাওয়া।

সামনের ঐ হেলানো কৃষ্ণচূড়া গাছটার ডালে ডালে এসে বসতে আরম্ভ ক'রেছে ভিজে কাক-গুলো। ওদের বারো মাসের আস্তানা।

ওখানে—

সন্ধ্যা হবার আগে থেকেই ওখানে সুরু হবে বুক কাঁপানো কা-কা' রব।

সে রবের সঙ্গে ভক্তির কণ্ঠস্বরের কোথাও কোনও মিলমিশ আছে কি না কে জানে, কিন্তু, এই দুটোতেই বিভূপদ সমান চমকায়।

মনে হয়,—ক'লকাতার এই উত্তর দিককার সব সম্পর্ক ছিঁ'ড়ে খুঁ'ড়ে সে যদি একেবারে দক্ষিণদিকে পালাতে পারতো, তা হ'লেই বাঁচতো কিছুদিন।

আর, এ যেন সে তার বদলে দিনের পর দিন ধরে ক'রে চ'লেছে অপমৃত্যুর উদ্বোধন।

হঠাৎ—ভাবনার গতিপথে ছেদ পড়ে।

ভক্তি এসে দাঁড়ায় একেবারে সামনা-সামনি; দুই চোখে ওর আতঙ্ক।

ব'লে—ঃ

ঃ ওমা কি আক্কেল তোমার বল দেখি!—" উত্তর দিতেই হয়। বলে—

—ঃ কেন? আক্কেলের কি দেখলে?

—ঃআক্কেল নয়! অসুখ শরীরের এত তদ্বির তদারক ক'রতে ক'রতে প্রাণ বার হ'য়ে যাচ্ছে আমার, আর নিজে কিনা ব'সে থাকা হ'য়েছে আলগা গায়ে! তার ওপোর এই ঠাণ্ডার দিনে!—"

—ঃ কিন্তু, জানালার শার্শিটাই তো বন্ধ, ঠাণ্ডাটা আসবে কেমন ক'রে?"—

—ঃ ওরই ফাঁকে ফাঁকে বলা যায় কি কিছু? তাইতো ব'লছি,—সাবধানের মার নেই।"

কোলের ওপো'র একটা গেঞ্জি ছুড়ে দিয়ে আদেশের ভঙ্গিতে ব'ললে—

—ঃ পরো শীগ্গির,—পরো ব'লছি।—'

বিরক্তি চেপেও শুনতে হ'লো কথাটা—কাজও করতে হ'লো ভক্তির কথামতই; তবে লঙ্কাকাণ্ড বাধলো এর একটু পরেই।—"

গরম দুধের গ্লাশ নিয়ে ভক্তির পুন-রাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই রাগে বিরক্তিতে জ্বলে উঠলো বিভূপদ'র সমস্ত অন্তর। ব'ললে—

—ভেবেছ কি বলতো!

ভক্তি ব'ললে—

—তার মানে? দুধ খাবার সময় হ'চ্ছে বেলা তিনটে, আর এখন সওয়া তিন। খেয়াল আছে সে কথা? আমার না হয় নানা ঝঞ্ঝাটে মনে না থাকতে পারে, কিন্তু তুমি তো ব'সেই আছ!—একবার মনে ক'রে দিলে—কি ক্ষতিটা হ'তো—শুনি? আর এরকম অনিয়মের কথা শুনলে জামাইবাবুই বা কি ব'লবেন?"

—ইচ্ছে ছিল, জানালার বাইরের দিকে চোখ রেখে নির্বাকেই ব'সে থাকবে বিভূপদ,—তা হ'লোনা।

—চোখ ফেরাতেই হ'লো, আর সে চোখে ছুটে এলো মনের উত্তাপ।

ব'ললে—

ঃ পেটটা যে আমার ডাষ্টবিন নয়, একথা তোমার এতদিনেও জানা উচিত ছিল।

আর, সকাল থেকে পর পর এতগুলো হজমের ক্ষমতাও আমার নেই। দশটায় ভাত, বারোটায় ডাব, দুটোয় ফল, আবার তিনটেয় সেরখানেক দুধ হজম করতে হ'লে আমায় মহাভারতের বিরাট পর্বে ফিরে যেতে হবে।

বুঝেছ?—"

নিজের ত্রুটি স্বীকার করা ভক্তির কোষ্ঠীতে লেখেনি, তাই ব'ললে—

—বা-রে! আমি কি ক'রবো? জামাইবাবু ডাক্তার, তাঁর হুকুমেই তো—"

—খুব ভালো কথা।—"

ভক্তির কথায় বাধা দিয়ে ব'লে চ'ললো বিভূপদ—

—এবার থেকে—তাঁর হুকুমটাই মেনে চলো বরাবর,—আমার মতামতের দরকার কি? আর আমার জন্যে নেহাৎ যেটুকু না ক'রলে নয়,—তাই করো—তোমার জামাইবাবুর 'হস্‌পিটালের' 'নার্স'দের মত। এর বেশী তোমার কাছ থেকে কিছুই চাইনে আমি,—চাইবার নেইও।—"

বিস্ময়ে আর বেদনায় কথা হারিয়ে ফেললে ভক্তি।

তবুও নিস্তার নাই,অন্ততঃ বিভূপদ তাকে রেহাই দিলে না কথা শোনাতে। বিড় বিড় ক'রে আরও কত কী যেন ব'লে গেল কানের কাছে।

ঠিকমত জবাব দেবার ইচ্ছে থাকলেও গুছিয়ে ব'লতে পারলে না ভক্তি—ব'লে উঠলো—

—ঃ ভেবেছ কি আমাকে? মেয়ে, ছেলে এমন কি, ঝি-চাকরের সামনেও বার বার জামাইবাবুর খোঁটা দিয়ে কথা ব'লতে লজ্জা করে না তোমার? কিন্তু, তোমার কথায় আমার লজ্জা করে। মনে হয় সব ছেড়ে ছুড়ে এমন কোথাও চ'লে যাই,—যেখানে—"

গলার স্বরটা ভারি হ'তে হ'তে বন্ধই হ'য়ে এলো বোধ হয়।

দুধের গ্লাশটাকে টেবিলের ওপো'র বসিয়ে ঘরের বার হ'তেই কানে এলো পেছন থেকে কাঁচ ভাঙার আর্তনাদ।

এপাশ ওপাশ দিয়ে দুধের স্রোত গড়িয়ে গড়িয়ে চ'ললো সেই সঙ্গে; ছড়িয়ে প'ড়লো খণ্ড খণ্ড কাঁচ।

ভক্তি বুঝলো, বিভূপদ মুখের কথায় রাগ-প্রকাশ ক'রলে না এবার, করলে দুধের গ্লাশটা মেঝের ও'পোর আছড়ে ফেলে।

বিভূপদ'র ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো বটে ভক্তি, তবে অন্য ঘরে গেল না।

বাইরে দাঁড়ালো ঠিক দরোজার পাশেই,

মার ঘরের মধ্যে প'ড়ে রইল ওর সমস্ত মনটা। এক সময়ে সেই মন দিয়েই বুঝলো, জানালার সার্শিটা বিভূপদ খুলে দিচ্ছে সশব্দে।

হয়তো, খোলা জানালা দিয়ে এখন ছুটে আসছে দমকা হাওয়া! বৃষ্টির ছাটও বোধ হয় সেই সঙ্গে এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে সব।

ভিজুক্।

ভক্তি আপত্তি জানাবে না আর। প্রতিবাদও করবে না একটা। থাকুক বিভূপদ। নিজের খেয়ালে। করুক যা ওর খুশী।—

অথচ, একথাও তো মিথ্যা নয় যে, এই বিভূপদই একদিন তাকে খুশী করার সুযোগ খুঁজেছে নানাছলে। নানা ছুতোয় ওরই সান্নিধ্যে খুশীর পশরা উপচে প'ড়েছে তার!

আর তারপরেও তার পরিণতি ঘটেছে একদিন ছাঁদনাতলায় দাঁড়িয়ে, সেই চিরাচরিত প্রথায়। শালগ্রামশিলা সাক্ষী রাখা, আর পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের পরেও। নির্বাকেই বিভূপদ শুনেছে সেই,

"কড়ি দিয়ে কিনলাম—আর "দড়ী দিয়ে বাঁধলাম" এর মেয়েলী সুর।...

এসব কি কিছু মনে পড়ে না ওর?

কিন্তু, ভক্তি তো ভোলেনি তার একটাও! বরং জানতে চাইলে সে আজও সেযুগের কথা ব'লতে পারে একটার পর একটা সাজিয়ে, গুছিয়ে—আর সুন্দর ক'রে।

তবু—সেদিন আজ চলে গেছে।

সে বিয়ের পর যুগান্তরও ঘটতে চলেছে আজ! তাই সেদিনের কিশোরী ভক্তি আজ যৌবনের পরিপূর্ণতার মধ্যে দাঁড়িয়েও ভাবছে,—আর কয়েকটা বছর পরেই প্রৌঢ়ত্বের দরোজাতেও গিয়ে দাঁড়াবে সে।

তারই আয়োজন চ'লেছে তার সমস্ত দেহ আর মনটাকে ঘিরে!—

ভাবনার যেন অন্ত নাই! আজ যেন অতীতের অতলান্তিকে ডুব দিয়েছে ভক্তি। দৃষ্টি আছে কেবল সামনের বাড়ির ঐ কার্ণিশের দিকে; যেখানে ব'সে ব'সে ভিজে ডানা ঝাড়ছে একটা দাঁড়কাক,—কাছাকাছি ঘুরছে দুই একটা ক্ষুধার্ত চড়ুই।

ও—কি?—ঘরের মধ্যে থেকে—কণ্ঠস্বর ভেসে এলো বিভূপদ'র—

—"উঃ

হঠাৎ কে যেন সেই অতলান্তিক সমুদ্র থেকে এক ধাক্কায় ওপোর দিকে ঠেলে দিল ভক্তিকে।

ঘরের মধ্যে এসে ও দেখলে—চেয়ার ছেড়ে মেঝের ওপোর নেমে ব'সেছে বিভূপদ।

দুহাতের মুঠোয় যে পা'খানাকে ও শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধ'রেছে—, তার নিচে থেকে গড়িয়ে পড়ছে টাটকা লাল রক্ত।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখা ভক্তির পক্ষে অসম্ভব; তাই, আইডিন আর তুলোর বাণ্ডিলটা আনতে আনতেই জানতে চাইল—

—ঃ কাটলো কিসে?—"

—ঃ কাচে।

ব'লে, যেমন নিষ্ক্রিয়ভাবে পা ধ'রে ব'সেছিল বিভূপদ, তেমনিই রইল; আর কাটা জায়গাটায় আইডিন তুলো দিয়ে বাঁধতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো ভক্তি।

বিভূপদ আপত্তি ক'রলে না। এর পরের ঔৎসুক্যও যেন তার কিছু নেই—। যা করবার তা ক'রবে ঐ ভক্তিই;—

যেন,—এ দায়িত্ব তারই একার, আর কারো নয়।

দিদি এলেন সন্ধ্যার আগেই,—সঙ্গে জামাইবাবুও। হর্ণ দিয়ে গাড়িটা নিচের ফুটপাত ঘেঁসে দাঁড়াতেই মেয়ে আর ছেলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে জানালে—

—ঃ মাসীমা আসছে; হুররে......

এরপরে দরোজা খুলে অপেক্ষার পালা।

অন্ততঃ সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় উঠতে মাসীমা আর মেশোমশাইয়ের যতটুকু সময় লাগে,—ততটুকু।

আধময়লা কাপড়খানা বদ্লে, চুলে চিরুনি আর মুখের ওপোর আলতোভাবে পাউডারের পাফ্‌টাকে বুলিয়ে,—ছেলে মেয়ের পাশে এসে দাঁড়ালো ভক্তি।

ব্যস্।

এবার বাকি কেবল একটু সৌজন্যবোধের হাসি হাসা। তাহলেই সম্পূর্ণতা দেখা দেবে তার ভদ্রতায়; অন্ততঃ বেমানান দেখাবে না কোথাও।

এবার দেখা গেল দিদি আর জামাইবাবুকে।

পাশ কাটিয়ে দিদি গেলেন বিভূপদ'র ঘরে, আর জামাইবাবু ব'ললেন—

—ঃ কুইক! কুইক!! জল্‌দি তৈরী হ'য়ে নাও ভক্তি। তোমার দিদি তোমার জন্যেও একটা সিট রিজার্ভ" ক'রে এসেছেন। মানে,—নতুন বই কিনা —

বিভূপদ'র ঘর থেকে এইবার হাসতে হাসতে বার হ'য়ে এলেন দিদি। ব'ললেন—

— হুকুম নিয়ে এলাম তোমার পতিদেবতার; অতএব, নির্ভাবনায় চলো। —দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি—।"

ফিরবার পথে বাসায় নামিয়ে দিয়ে গেলেন— দিদিই।

ওপোরে এসে ভক্তি প্রথমেই গিয়ে ঢুকলো বিভূপদ'র ঘরে। মুখে চোখে ওর একটা সকুণ্ঠ হাসি। ব'ললে—

—ঃ যাবার সময়ে এমন তাড়াতাড়ি সব ক'রে দিলেন ও'রা—যে আসাই হ'লোনা এঘরে।"—

ঃ ও। তাই বুঝি সেই ত্রুটিটা শুধরে নিতে এলে!"

সে কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপে পরিপূর্ণ।

উত্তর দিলে না ভক্তি। কেবল দেখলে—সেই চেয়ারখানাতেই বিভূপদ ব'সে আছে এখনও। পার্থক্যের মধ্যে কেবল পা' দু'খানা সামনের টেবিলের ওপোরে তোলা। তাছাড়া, ওখানে এলোমেলোভাবে ছড়ানো র'য়েছে য়্যাসট্রে, খবরের কাগজ আর চা-শূন্য ডিস্-কাপ।

সামনের বড় আয়নাটায় প্রতিফলিত বিভূপদ'র মূর্তির পেছনেই দেখা গেল—ভক্তিকে। দেখা গেল একটা রঙীন ব্লাউস আর শাড়ী জড়ানো ওর ভরন্ত দেহটা, শ্যামল মুখখানা।—

হয়তো বিভূপদ'র বিদ্রূপটা সে ভালো বুঝলে না, কিম্বা শুনতে পেলনা—ব'লেই যেন একটা প্রত্যাশা নিয়ে ব'লে উঠলো—

—ঃ ব'লে গেলে অবিশ্যি ভাবনা হ'তোনা কিন্তু না ব'লে গিয়ে যে কি ভাবনাই হচ্ছিল!........

এবারও মুখ না ফিরিয়েই বিভূপদ' জবাব দিলে—ঃতাই নাকি? কিন্তু আমাকে বলবারই বা কি দরকার? বিশেষ ক'রে দিদি আর জামাইবাবু যখন সঙ্গেই র'য়েছেন—তখন তো সিনেমা দেখাটাই সব নয়। চৌরঙ্গী হোটেলে খাওয়া আর ময়দানের বিশুদ্ধ হাওয়ায় বিশ্রামেরও দরকার হ'তে পারে তো? কারণ, শ্যামবাজারের ফ্ল্যাটে তো ওসব মেলে না, আর স্বাস্থ্যও খারাপ হয় বৈকি!—"

—"ঃ কি!—"

যেন বিদ্যুতের ছোঁয়া লেগেছে ভক্তির,—এমনি চ'মকে স'রে দাঁড়ালো' সে।—

বিভূপদ'র কথায় এবারও একটা শক্তমত জবাব দেবার ইচ্ছা থাকলেও মুখে এলোনা তার। কেবল ব'লে বসলো—

—ঃ পারেই তো! আর সেই জন্যেই তো গিয়েছিলামও। বেশ ক'রেছি, খুব ক'রেছি, আরও ক'রবো। কেন,—মারবে নাকি?

হঠাৎ, নিজের শক্ত মুঠোয় চেপে ধ'রলো বিভূপদ ভক্তির হাতখানা. তারপর গর্জন ক'রে উঠলো যেন নিষ্ফল আক্রোশে—

—ঃ মারাই উচিত ছিল তোমায়,—কিন্তু মারবো না। অত ছোট আমি নই,—বুঝেছ?—"

একটা ধাক্কায় ওর হাতখানা ছুঁড়ে ফেলে বার হ'য়ে গেল ঘর থেকে।—আর মুখ থুবড়ে প'ড়তে প'ড়তে নিজেকে সামলে নিলে ভক্তি। সঙ্গে সঙ্গে থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো ওর নিচের ঠোঁটটা।

—দুই গালের ওপোর নেমে এলো চোখের জলের ধারা।

ঝন্! ঝন্! ঝনন্—।..............

দরোজার কড়া বেজেই চ'লেছে, অথচ যেন কেউই শুনতে পাচ্ছে না।

দারুণ বিরক্তিতে দরোজাটা খুলেই কিন্তু চ'মকে উঠলো বিভূপদ—

"এ-কি! দিদি যে? এমন অসময়ে?—

দিদি হাসলেন। বিকৃত হাসি।

ব'ললেন—

"হাঁ, অসময়েই এসে প'ড়েছি বটে, আর খবর না দিয়েই! অর্থাৎ—খবর পাঠাবার আর সময় হ'লোনা। ভাবলাম—গিয়েই যখন ব'লবো যে ভক্তিকে নিতে এলাম—তার জ্বর শুনে,—তখন আর খবর পাঠাবার কি আছে? আমার কাছে থাকবে তো মাত্র কয়েকটা দিন, জ্বর সারলেই পাঠিয়ে দেব আবার।—এতে তোমার আপত্তি নেই তো!—

জ্বর হ'চ্ছে ভক্তির! অথচ বিভূপদ কিছুই জানে না! বিস্ময়ের ঘোরটা কেটে গেল তখনই।

সত্যই তো, কি ক'রে জানবে? কারণ সেই সিনেমা দেখার দিন থেকেই তো ভক্তির সঙ্গে কথাবার্তা নাই তার,—কেবল সাংসারিক দুই একটা কাজের সময় দেখা হওয়া ছাড়া।

জানবে কি ক'রে?— তবু হাসতেই হ'লো খুশীর হাসি; ব'লতেও হ'লো বিভূপদকে—

ঃ একথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন?— আপনারা যখন আছেন তখন যা ভালো বুঝবেন, তাই করবেন। এর জন্যে আমার মতামতেরই বা দরকার কি?—

বিভূপদ স'রে গেল,—দিদিও চ'লে গেলেন ভক্তির ঘরের দিকে।

(ইহার পর ১২৫ পৃষ্ঠায়)

তখনো পুরোদমে চলছে বৃটিশ রাজত্ব। তবে সেটা তার শেষ যুগ।

উত্তরমুখো গেট দিয়ে ঢুকলেই সামনে একটা চতুষ্কোণ পুকুর। জেলগেট আর পুকুরের মাঝখানে ছোট ছোট নুড়ি ফেলা লালপথ। তার দু'ধারে পাতাবাহার আর মৌসুমী ফুলগাছের সারি। পুকুরের দক্ষিণ পারে ঘাস-মোলায়েম সুন্দর একটি চার কোণা মাঠ। তারই তিন দিক ঘিরে প্রেসিডেন্সি জেলের লাইন বাঁধা কয়েদী-বাস।

পূর্বদিকের ওয়ার্ডগুলো জেনানা ফাটক। দীর্ঘ মেয়াদী বন্দিনীদের স্বাধীন রাজ্য। নিষিদ্ধ অঞ্চল। পুরুষের পা বাড়ানো মানা সে পথে।

বন্দিনীরাই পাহারায় নিযুক্ত মেয়ে ওয়ার্ডে। মেয়ে হলেও পৌরুষে পুরুষের চেয়ে কোন বিচারেই কম যায় না এখানকার প্রহরীরা। আকৃতি ও আচরণে বরং অনেক ক্ষেত্রেই তারা পুরুষ পাহারাদারদেরও ত্রাসের কারণ।

তেমনি এক বন্দিনী প্রহরীকে নিয়েই সারা জেলখানায় জটলা। সে নাকি কাবু করে ফেলেছে রেহানুদ্দিনকে—এমন যে সর্বজয়ী পুরুষ রেহানুদ্দিন, তাকেও!

পুকুরপারের রাস্তা ধরে পশ্চিম দিকে কয়েক পা এগুলে প্রথমেই চোখে পড়বে চৌকা। চৌকা একটি কয়েদী পরিভাষা। আসলে এ রান্নাশাল। জেলখানায় এমনি পরিভাষার অন্ত নেই। ছোটখাটো একটা অভিধানও তৈরি করা চলে তা দিয়ে।

নিত্য রন্ধনযজ্ঞের ব্যবস্থা চলে এই চৌকায়। রোজ প্রায় হাজার দুই লোকের ক্ষুন্নিবৃত্তির দায়িত্ব পালন করতে হয় চৌকার ভারপ্রাপ্ত কয়েদী কর্মীদের। এ যেন রীতিমতো কারখানা একটা। আর এখানে ডিউটি পাওয়া কয়েদীদের পক্ষেও আশাতীত সৌভাগ্যের কথা। মধ্যবিত্ত ভদ্র যুবকদের প্রায় আই-সি-এস হওয়ার স্বপ্ন দেখার মতোই যেন।

এর কারণও আছে। শুধু যে পেটপুরে খাওয়ার সুযোগই মেলে চৌকার কাজে নিযুক্ত বন্দীদের তা নয়, অন্যের ক্ষুধার গ্রাস নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও অনেকটা এদের হাতে। তাই আর সকল কয়েদীরা ভয় করে তাদের। অতি বলিষ্ঠ কয়েদীও খাতির করে চলে চৌকার ক্ষীণতম কর্মীটিকে, যাতে বরাদ্দের চেয়ে তার ভাগে অন্ততঃ একখানাও রুটি বেশি মেলে, এই আশা!

এই চৌকাতেই কাজ করে রেহানুদ্দিন। চৌকার রাক্ষুসে উনুনগুলোতে নিয়মিত ইন্ধন জোগানো তার কাজ। দীর্ঘাকৃতি বিরাট-বপু পুরুষ। মাথা বোঝাই ধোঁয়াটে রঙের কাঁচা-পাকা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। মুখ ভরতি অযত্ন বর্ধিত এক ঝাড় দাড়ি-গোঁফ।

বয়েস প্রায় ষাটের কাছাকাছি রেহানুদ্দিনের। কিন্তু এখনো বোধহয় একাই সে মহড়া নিতে পারে সাত জোয়ানের। তাই তো কয়েদীরা কেউ বলে তাকে দৈত্য-দানব, কেউ বলে রাক্ষস। তবে আড়ালে আবডালে এ সব বিশেষণে বিশেষিত করলেও সামনে সবাই তাকে ডাকে চাচা বলে। তা বলবে না তো কি! ভয়-ডর আছে না! এমনিতে শান্তশিষ্ট হলেও রাগলে নাকি সে ভয়ংকর।

খুব সহজে কারুর পক্ষেই বোঝা সম্ভব নয় এ দেশের কোন্ অঞ্চলের মানুষ রেহানুদ্দিন। উর্দুঘেঁষা হিন্দীতেই সে কথাবার্তা বলে সব সময়। তবে তারই মধ্যে কচিৎ কখনো এমন এক একটা কথা হঠাৎ বেরিয়ে আসে তার মুখ থেকে যা শুনে অবাক না হয়ে পারে না তার সহ-বন্দীরা। সে সব বেফাঁস কথা আসলে বাংলা অর্থাৎ কিনা পূব বাংলার কথারই অপভ্রংশ। অবশ্য রেহানুদ্দিনকে একবার জিগেস করলেই তার পরিচয় সমস্যার পরিষ্কার মীমাংসা হয়ে যায় একেবারে। বিনা দ্বিধায় অনর্গল সে বলে যায় তার জীবনের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার কথা।

এই বাংলা দেশেরই লোক রেহানুদ্দিন। ঢাকা জেলার শিমুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা। এক সঙ্গে তিন তিনটে জোয়ানকে খুন করেছিলো সে ফরিদপুর জেলার ভোজেশ্বর হাটে এক গদী লুঠ করে এসে। সে প্রায় ছত্রিশ বছর আগেকার পুরনো কথা।

তিন যুগ আগের সেই পুরনো কাহিনী কেই বা আর মনে করে রেখেছে এতোদিন ধরে? তাই রেহানুদ্দিনের মস্ত ভরসা। নিজেকে সে প্রমাণ করতে চায় স্বদেশী ডাকাত বলে। কথায় কথায় বলে, তিনটে সায়েবকে সে টিপে মেরেছিলো ছারপোকার মতো করে। আর ঠিক ছারপোকা মারার মতো ভঙ্গি করেই অহরহ সে এ কথা বলে বেড়ায় তার জেল সঙ্গীদের কাছে। আসলে কিন্তু ঘটনাটা সম্পূর্ণ অন্য রকম, তাহলেও অত্যন্ত রোমাঞ্চকর।

ভোজেশ্বর হাটের গদী লুঠের খবর জানে না এমন লোক খুবই বিরল ঢাকা-ফরিদপুরে। বিরাট ধনী ব্যবসায়ীর গদী। গদীর মালিকের প্রতিজ্ঞা, যতো টাকাই লাগে লাগুক, শায়েস্তা করতেই হবে ডাকাত দলকে। অকাতরে টাকা ছড়ান তিনি তার জন্যে। পুলিশকে যেমন প্রচুর টাকা খাইয়েছেন, মোটা রকমের পুরস্কারও ঘোষণা করেছেন ডাকাত দলের সন্ধানদাতার উদ্দেশ্যে। সন্ধান চলে তাই দিকে দিকে।

হঠাৎ একটা উড়ো খবর এসে পৌঁছয় রেহানুদ্দিনের কানে। তার দলের লোকের মধ্যে ধরা পড়ার ভয় ঢুকেছে নাকি কারুর কারুর মনে। পুরস্কারের লোভও যে নেই তার সঙ্গে তাও বলা যায় না।

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মাথায় যেন খুন চেপে যায় রেহানুদ্দিনের। সিদ্ধান্তও করে ফেলে সে মুহূর্তের মধ্যে! তিনজন

সাকরেদের চাল-চলন কথাবার্তায় সন্দেহ জাগে তার।

সময় দেওয়া বিপজ্জনক। ঝোঁকের মাথায় যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। সেদিনই রাত্রিতে তিন তিনজন সঙ্গী খুন হয়ে যায় রেহানুদ্দিনের হাতে। সেই যে গ্রাম থেকে পালানো, তারপর আর গাঁয়ের মুখ দেখা হয়নি তার এ অবধি।

বৃটিশ আমলে পুলিশের চোখে ধূলি দিয়ে কতোদিন আর সম্ভব পালিয়ে থাকা। ঢাকার ডাকাত সর্দার মাস দুই বাদে ধরা পড়ে যায় ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জে। তার বিরুদ্ধে ডাকাতি আর খুনের অভিযোগ এক সঙ্গে।

বিচারে প্রথম ফাঁসির হুকুমই হয়েছিলো রেহানুদ্দিনের। তারপর আপীলে হলো কালাপানি।

বড়ো আদালতের হাকিম দয়াপরবশ হয়ে, না তার ওপর চটে গিয়ে এমনি আদেশ দিলেন, তা সেদিন বুঝতে পারেনি রেহানুদ্দিন। তাই রায় শুনে প্রথমটায় কেমন যেন একটু হাসি পেয়ে গিয়েছিলো তার। বিস্ময়ের হাসি। ফাঁসিটা কি এমন খারাপ ছিলো এর চেয়ে? সে কথা ভেবে হাসি। এই তো!

যাক গে! বাইরে [illegible] যদি না চলা গেলো ত' হলে সব অবস্থাই সমান। রেহানুদ্দিনের অন্ততঃ তাই ধারণা।

সেবার যখন সে জেলখানায় ঢোকে, রেহানুদ্দিন তখন জোয়ান মরদ। বাড়িতে নতুন বিবি কোলে তার প্রায় বছরখানেকের এক ছাওয়াল। মামলার রায় শুনে, জেল ফাটকের সামনে এসে তাদের কথা তার মনে পড়েছে।

কিন্তু কি লাভ ভেবে? তার চেয়ে বরং খোদার ভরসায় স্ত্রী-পুত্রকে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। সত্যি সত্যি তাই করেছে রেহানুদ্দিন। মাটির তলায় পুঁতে রাখা কিছু অর্থের সন্ধান তো বিবি রাখেই। তাতেই চলে যাবে তাদের বেশ কিছুদিন। কাজেই ওদের কথা ভাবারই বা আর কি আছে? আর জেলখানায় বসে যতোই ভাবুক না কেন সে, তাতে কোন্ উপকারটা হবে তার বৌ-ছাওয়ালের? কাজেই শেষ পর্যন্ত সবাইকে ভুলে থাকার সিদ্ধান্তটাই যে ঠিক হয়েছে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই রেহানুদ্দিনের।

সব কিছু ভুলে থাকতে পারলে মনের জোরও দ্বিগুণ বেড়ে যায় নাকি। এ রেহানুদ্দিনেরই কথা। বোধহয় সে কথাটা একেবারে বাজে কথা নয়! তা নইলে পূর্ণ দণ্ড-ভোগের পর আন্দামান থেকে কোলকাতার বন্দরে এসে নেমেই এক ঘুষিতে একটা কুলির মাথা ফাটিয়ে দিতে পারলো রেহানুদ্দিন! কি সামান্য কথা কাটাকাটি থেকে এই কাণ্ড। মরতে মরতে বেঁচে গেছে লোকটা। তার জন্যে আবার কয়েক বছর জেল। তা থেকে মুক্তি পেয়ে দুদিনের মধ্যেই একটি ডাকাতি মামলায় আর এক দফা কারাদণ্ড। সে যাত্রায় ছয় বছর।

এমনিভাবেই কেটে যায় প্রায় ছত্রিশ বছর। এক এক করে ঢাকা, আলিপুর, কানপুর, পেশোয়ার প্রভৃতি বড়ো বড়ো সব কটা জেলই ঘুরে এসেছে রেহানুদ্দিন। বেশির ভাগ সময়ই বাংলার বাইরে বাইরে রাখা হয়েছে তাকে। অল্প কিছুকাল আগে প্রেসিডেন্সি জেলে বদলি করা হয়েছে।

রাধাকৃষ্ণ — ভগবতীশঙ্কর দে

এতোকাল পর বাংলার আবহাওয়া ফিরে পেয়ে রেহানুদ্দিন যে একটু আনন্দ-মুখর হয়ে উঠবে সে তো স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্য, সে আনন্দ সে প্রকাশ করতে পারে না তার মাতৃভাষায়। ইচ্ছে হয়েছে তার বার বার বাংলা ভাষায় কথা বলতে। কিন্তু চেষ্টা করেও তা আর পেরে ওঠেনি সে।

কি করেই বা পারবে? এতোকালের বন্দীজীবনে বিশেষ করে ঢাকা আর আলিপুর জেল থেকে স্থানান্তরিত হবার পর কোন সুযোগই হয়নি তার বাংলায় কথাবার্তা বলার। কোন রকম চিঠিপত্র লেখারও ধার ধারেনি সে। আর লিখবেই বা কি করে? অক্ষর জ্ঞান থাকলে তো! তা ছাড়া গরজও ছিলো না মোটেই। প্রথম থেকেই তো তার সিদ্ধান্ত অন্য রকম। সবাইকে এবং সব কিছু ভুলে থাকা। কাজেই চিঠি লেখার কথাই ওঠে না।

সংসারে তার কেউ নেই, কিছু নেই—এ কথাই রেহানুদ্দিন এতোদিন ধরে বলে এসেছে তার জেল-সঙ্গীদের। সে কথা তার সবাই বিশ্বাসও করেছে। ফলে তার ভাগ্যে সহানুভূতি, স্নেহ, ভালোবাসা ইত্যাদি জিনিষগুলো একটু বেশি করেই জুটেছে সব জেলখানায়। সেও তার পুরোপুরি সুযোগ নিতে কসুর করেনি কোনদিন। এখানে আসার পরেও তেমনিভাবেই দিন কাটছিলো রেহানুদ্দিনের। পেশোয়ার থেকে প্রেসিডেন্সি জেলে এসেছে সে মাস পাঁচ ছয়। কয়েদীদের সে যেন এক রকম আপন চাচাই হয়ে বসেছে এরই মধ্যে। চৌকার কর্মী বলে যে একটু বেশি খাতির জোটে তার অদৃষ্টে, তাতে কোন সন্দেহ নেই, সত্যি কথা। কিন্তু তার স্বজনহীনতার পরিচয় তার দিকে যে সব কয়েদীর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ বিষয়ে রেহানুদ্দিন নিজেই নিঃসন্দেহ।

আসমান বিবির মনের আকর্ষণের কারণও তো অনেকটা তারই জন্যে। রেহানুদ্দিনকে নিয়ে নানা রকমের গালগল্প চলেছে গোটা জেলখানায়। ফিমেল ওয়ার্ডেও এই দুঃসাহসী দাঁতো মানুষটাকে নিয়ে নিত্য আলোচনা। কিন্তু সে যে আত্মীয়-পরিজনহীন মানুষ সে সংবাদটা ফিমেল ওয়ার্ডে পৌঁছেছে অনেকদিন বাদে।

জমাদারনীর সঙ্গে খুব ভাব আসমানের। তার কাছ থেকেই আসমান মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর নেয় রেহানুদ্দিনের। এমনি একটা মরদের মতো মরদকেই তো খুঁজে ফিরছিলো তার মন। এক হাতে একই সময়ে তিন তিনটে মানুষকে খুন! কলিজায় অসুরের মতো জোর না থাকলে পারে কোনো বান্দা! হ্যাঁ, আর সাহস দেখিয়ে গেছে বটে খোদাবক্স! জমিদার বাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়ে পুলিশ আর গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে লড়াইয়ে নিজের জান দিতে হলেও সেও বড়ো কম লোককে ঘায়েল করে যায়নি মরার আগে।

মরণকে ভারি গ্রাহ্যই করতো খোদাবক্স।

পুলিশের গুলীবিদ্ধ হয়ে হাসতে হাসতেই সে মরেছিলো যাত্রার আসরে। যাত্রাগান উপলক্ষ্য ক'রেই ডাকাতির আয়োজন করা হয়েছিলো জমিদার বাড়িতে। পুলিশ কি করে যেন তা টের পেয়ে যায় আগে থেকে। তারই ফলে যতো গোলমাল। সব কিছু লণ্ডভণ্ড। সাধারণ শ্রোতাদের মধ্যে যেমনি ডাকাতদের লোক, তেমনি প্লেনড্রেস পুলিশ মাঝে মাঝে। তারপর মধ্য রাতে ডাকাতি সুরু হতেই দুই পক্ষে ভীষণ লড়াই।

আসমান নিজেও ছিলো তখন ঐ ডাকাত দলে। তবে লড়াই-এর মধ্যে পড়তে হয়নি তাকে মেয়েদের মধ্যে ছিলো বলে। তা হলেও পুলিশের হাত থেকে রেহাই পায়নি সে। ধরা পড়েছে সেই-দিনই শেষ রাত্রে। তাদের দলের আরো চারজন ধরা পড়েছিলো আহত অবস্থায়। পুলিশের মুখ থেকেই সে শুনেছিলো কি রকম-ভাবে খোদাবক্স মারা গিয়েছিলো বীরের মতো লড়াই করতে করতে। রেহানুদ্দিনের দুঃসাহসি-কতার নানা গল্প শুনে আসমান বিবিরও মনে পড়ে যায় তার মৃত স্বামীর অসমসাহসিকতার কথা। তেমন পালোয়ান বলেই না আসমান পিরীত করেছিলো খোদাবক্সের সঙ্গে! আবার ঠিক তেমন কাউকে পেলে আবারও করে। কিন্তু সচরাচর বড়ো একটা চোখে পড়ে না তেমন জোয়ান। রেহানুদ্দিনকে দেখে তাই তার এতো স্ফূর্তি।

ক'দিন ধরে গরমে প্রাণ আই-ঢাই। সারাদিনরাত যদি জলে ডুবে থাকা যায় তবেই যেন রক্ষে। এই গ্রীষ্মে বেশি মোটা মানুষগুলোর যে কি শোচনীয় অবস্থা তা কল্পনা করাও ভয়ের ব্যাপার। রেহানুদ্দিন সে দলের। আসমানও তাই। তবে মেয়ে মানুষ বলে একটু ঢেকেঢুকে থাকতে হয় বৈকি! রেহানুদ্দিনের তো আর সে বালাই নেই। হেড জমাদারের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা জমিয়ে নিয়েছে সে অনেকদিন ধরেই। তারই সঙ্গে যোগসাজসে ফাঁকে ফাঁকেই সে দু' চারটে ডুব দিয়ে যায় জেলপুকুর থেকে।

সেদিনও এই জেলপুকুরেই নাইছিলো রেহানুদ্দিন। হাওড়া হাটের এক ফালি ছোট্ট গামছা কোন রকমে কোমরে জড়িয়ে সে যখন আসছিলো ঘাটের দিকে, সে অবস্থায়ই তাকে দেখতে পেয়ে হোঃ হোঃ করে হেসে উঠেছিলো আসমান। এযেন অনেকদিন পর মনের মানুষের সন্ধান পাওয়ার আনন্দ-হাসি। সে হাসির ধ্বনি দূরে থেকে ভেসে গিয়ে রেহানুদ্দিনকেও কেমন নাড়িয়ে তোলে। জলে নেমেই সে তাই এক ডুবে চলে যায় পুকুরের পূব পারে।

জেনানা ফাটকে একক পাহারায় তখন আসমান। বাইরে মাথাফাটা রোদ। লোকজনের আনাগোনা নেই বল্লেই চলে। এই সুযোগে দু' চারটে কথা বলে নিতে কি আর ভয়। নির্ভয়েই রেহানুদ্দিন আসমানকে একটু কাছে ডেকে নিয়ে জিগ্যেস করে বসে অমনি করে তার হাসবার কারণ। আসমান খুলে বলে সব কথা। একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তার মনের কথা।

ঠিকমতো নিজের মনকে খুলে ধরতে পারছে না রেহানুদ্দিন। এ তার নিজের আশঙ্কা। আসমানের অভিনন্দন পেয়ে সে উচ্ছ্বসিত. কিন্তু সেও কি কম মুগ্ধ আসমানের মতো ভীমাকৃতি এক দুর্ধর্ষ মেয়ে মানুষের সন্ধান পেয়ে! সে কথাটাই সে বার বার বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করে তার উর্দু মিশ্রিত হিন্দী ভাষায়। আসমান যে তা বুঝতে পারেনি তা নয়, তবে রেহানুদ্দিনের সন্দেহ, ঠিক মতো ধরতে পারেনি সে তার মনের কথা। ঠিকই ধরেছে।

প্রায় বছর ঘুরে এলো আসমান জেলখানায়। এখানকার অধিকাংশ কথাবার্তাই তো হিন্দীতে। কাজেই এতোদিনে হিন্দীটা তারও যে অনেক-খানি আয়ত্তে এসে গেছে তা আর রেহানুদ্দিন জানবে কি করে।

জেলার আসছেন এদিক দিয়ে। হেড জমাদারের সংকেত পায় রেহানুদ্দিন। অমনি ডুব। আসমানও যেন কিছুই জানে না এমনি ভাব। আর সে তো পুকুরের অন্য পারে। জেলার চলে যান নির্বিকার ভাবে। জল থেকে উঠে এসে রেহানুদ্দিনও চলে যায় যথাস্থানে।

পুকুরের পশ্চিম দিকে চৌকা পেরিয়ে গেলেই সারিবদ্ধ সব ওয়ার্ড। পুরুষ কয়েদীদের বাস সেখানে। দোতলার ওয়ার্ডগুলোতে থাকেন স্বদেশী বাবুরা, আর একতলায় সব সাধারণ অপরাধীর দল। অবশ্য দু' চারজন স্বদেশী কয়েদীও যে নিচের তলায় নেই তা নয়। তবে সম্পদ-কৌলিন্যের অভাবে জীবনের সকল ক্ষেত্রের মতো এখানেও তারা অন্ত্যজ, অপাংক্তেয় গোছের। তাদেরও 'সরকার সেলাম' দিতে হয় আর সব সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গেই 'ফাইলে' দাঁড়িয়ে। মাথায় টুপী, কোমরে ডোরাকাটা গামছা, হাতে টিকিট নিয়ে তাঁদেরও পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হয় সামন্ত প্রভুর ভংগিতে যখন রাজছত্র মাথায় জেল-সুপার চলে যান সমুখ দিয়ে। মনুষ্যত্বের এই অবমাননার কোন প্রতিকার যে নেই তা নয়, কিন্তু তা এতোই প্রয়াসসাধ্য যে, ততোদূরে যাবার কথা সব সময় চিন্তাও করা যায় না। তা ছাড়া জীবনে কোনদিন যে সম্মান ও মর্যাদা জোটেনি, হঠাৎ জেলে এসে উপোস করে তা আদায় করার কথা ভাবতেও যেন সংকোচ বোধ হয়। এমন কি ওপরতলার স্বদেশী বাবুরাও অনেকে অনেক সময় বড়ো বিরত হয়ে পড়েন তৃতীয় শ্রেণীর রাজনীতিক অপরাধীদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবীর কথা শুনে। মনে মনে যেন বলেন তাঁরা 'বাইরে তো সব খেতে কচু ঘেঁচু, ঘাস পাতা, শুতে তো ভাঙা কুঁড়ে ঘরের মেঝেয়। যতো আরাম কি দরকার বাপু এই দেশের কাজ করতে এসে?' সুতরাং দরকার কি ওসব ঝামেলায় —গান্ধীবাদী সাধারণ সত্যাগ্রহীদের কোনই প্রয়োজন নেই আরামের।

এই সাধারণ স্বদেশী বাবুদের প্রতি রেহানুদ্দিনের কিন্তু খুব সহানুভূতি। সত্যি কথাই তো, এঁরা ভদ্দরলোক। দেশের জন্যে জেল খাটছেন। তাঁদের কেন রাখা হবে চোর, বদমায়েস, গুণ্ডাদের সঙ্গে? তাঁদের কারুর দেখা পেলে প্রাণ খুলে কথা বলে রেহানুদ্দিন। বলে, সেওতো আসলে স্বদেশীর কাজেই ধরা পড়েছে, তবে তিনটে সাহেব খুন করে খুনীর সাজা ভোগ করতে হচ্ছে তাকে, এই যা তফাৎ!

পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে থাকে রেহানুদ্দিন। দেড়শ' কয়েদীর বাস এখানে। সকলেই 'বি কেলাস' অর্থাৎ দাগী কয়েদী। সব জাতের সব প্রদেশের চোর-ডাকাত-পকেটমারদের নরক গুলজার। ছোট-বড়ো সমাজতন্ত্র যতো অচ্ছুতের আড্ডা। এখানে আঠারো বছরের জেলখাটা দুর্গা কাহারের নিত্য সঙ্গী ছোকরা কয়েদী তফেন। ছোকরা ফাইলে থাকার বয়েস অবশ্যি পার হয়ে গেছে তফেনের। তা হলেও আরো কিছুকাল দীর্ঘমেয়াদী কয়েদীদের কাছ থেকে সরিয়ে রাখাই উচিত ছিলো তাকে। এতো কালের অভিজ্ঞতায় রেহানুদ্দিনের অন্ততঃ তাই ধারণা। আর সব কয়েদীরা কতো রকম টিট্‌কারি দেয় ওদের নিয়ে। তফেন সে সব শুনেও শোনে না যেন। রোজ তাকে যে দুর্গা বিড়ি দেয় চারটে করে!

এই একই ওয়ার্ডের আর এক বিচিত্র বন্দী কামারশালার মহাবীর। গলায় তার কাঁচি-পাকি দু ধরণেরই থলি। একটা সোনার আংটি আর এক টুকরো বিছে হার তার পাকি থলিতে। মহাবীর বলে, ও দুটো নাকি ওর দুর্দিনের সম্বল। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর যে কটা দিন তাকে বাইরে থাকতে হবে তখনকার কথাও তো ভাবতে হয়। এগুলোর ওপর নির্ভর করেই তখন দিন কাটাতে হবে তাকে। বেরুলেই যে কেস্ মিলবে এমন কোন কথা নেই। একথা বেশ ভালো করেই জানে পাকা চোর মহাবীর। কাঁচি থলিতে রাখে সে খুচরো টাকা-পয়সা। এ দিয়ে চলে তার ছুট্‌কো কেনাকাটা। চলে যতো রকমের ঘুষ-ঘাষ। চৌকার মেট রাগচীর সঙ্গে তার বাঁধা ব্যবস্থা—রোজ দুটো বিড়ির বিনিময়ে প্রতি সকালে এক হাতা করে বেশি ভাত আর নিত্য বিকেলে একখানা করে বেশি রুটি বরাদ্দ তার জন্যে। রেহানুদ্দিনের মাধ্যমেই এই যোগাযোগ। তার জন্যে তারও রোজকার পাওনা দুটো করে বিড়ি মহাবীরের কাছ থেকে। এ ছাড়া জমা-দারকেও মাঝে মাঝে দিতে হয় কিছু কিছু করে। এ ঘুষ না দিয়ে উপায় নেই তার। ভারি কাজ করার শক্তি নেই তার দেহে। কামারশালার হাপর টানার কাজ, সে কি বড়ো সহজ ব্যাপার? তা থেকে রেহাই পেতে হলে জমাদারকে হাতে রাখতেই হবে। তার ওপর আবার আফিং না হলে একদিনও চলে না মহাবীরের। এই আফিং স্মাগল্ করাতেই কি কম খরচ করতে হয় তাকে?

এমনি সব লোকজনের মধ্যে জীবনের এতো-গুলো বছর কাটিয়ে দিলো রেহানুদ্দিন। মাঝে মাঝে কখনো কখনো তারো মনে যে রোমাঞ্চ জাগেনি তা নয়। কিন্তু সবই সে এতোদিন দুহাতে দু'পাশে ঠেলে ফেলে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। আজ আর কেন সে পারছে না তেমনি ভাবে এগুতে! আসমানকে রোজই এখন অন্ততঃ একবারটি দেখতে না পেলে প্রাণটা ছ্যাৎ ছ্যাৎ করে ওঠে কেন? বয়েসের কথা মনে হলে লজ্জায় আপনা থেকেই যেন কুঁচকে যায় রেহানুদ্দিন। কিন্তু তবু নিজেকে সামলাতে পারে এমন ক্ষমতা নেই তার। হেড জমাদারকে মনে মনে ধন্যবাদ জানায় সে। লুকোচুরি করে হলেও তার জন্যেই তো তবু কোন রকমে সম্ভব হচ্ছে আসমানের সঙ্গে ফাঁকে ফাঁকে দেখা-সাক্ষাতের, দু'চারটে কথাবার্তা বলার।

জেনানা ফাটকের জমাদারনীর কাছেও কৃতজ্ঞতার সীমা নেই রেহানুদ্দিনের। মাস-খানেক ধরে সেইতো ডাকঘরের কাজ করে আসছে তার আর আসমানের মধ্যে। খোঁজ-খবরের আদান-প্রদান সবই তার মাধ্যমে। আর সেদিন রাত্তিরের অন্ধকারে আসমানের সঙ্গে তার যে মোলাকাৎ সে কি সম্ভব হতো এই জমাদারনী আর হেড জমাদারের কারসাজি ছাড়া?

ওদিকে সিনিয়র ফিমেল ওয়ার্ডার, এদিকে চীফ হেড ওয়ার্ডার দুজনই নাকি জানে সব ব্যাপারটা। কিন্তু সব চুপচাপ। এ যেন জাদুমন্ত্র!

জমাদারনী একদিন নাকি কথা দিয়েছিলো

আসমানকে, যেমনি করেই হোক এক রাত্তিরে মুখোমুখি করবে দুজনকে। সে প্রতিজ্ঞা রেখেছে সে। তার জন্যে কার ভাগ্যে কি পুরস্কার জুটেছে কে জানে! তবে সে রাত্তিরে বেশ ভালো করেই যে মন জানা জানি হয়েছে রেহানুদ্দিন আর আসমানের তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু তা হলে কি হবে সেই মধুর স্মৃতি হঠাৎ যেন চাপা পড়ে যায় একটা গভীর দুশ্চিন্তায়। প্রকাণ্ড ভুলই করে ফেলেছে রেহানুদ্দিন। এতোদিন ধরে আত্মগোপন করে শেষটায় কিনা সে এমনি করে পরিচয়টা ফাঁস করে দিলে সেনের কাছে! সবাই জানতো তার কেউ নেই, কিছু নেই। আসমানও তো তাই জানে। আর তার জন্যেই একেবারে আপন করে পেতে চেয়েছিলো তাকে। কিন্তু সবই তো জানাজানি হয়ে যাবে এবার!

সত্যি সত্যি এ এক দুশ্চিন্তার ব্যাপার। কি দরকার ছিলো বাড়িতে তার চিঠি দেবার? সেনই যতো নষ্টের গোড়া। পকেটমার হলেও সেনকে ভালো লাগতো তার। বছরখানেক বয়েসের যে ছেলেটাকে ফেলে রেখে রেহানুদ্দিন এসে জেলে ঢুকেছে তার বয়েস এখন প্রায় বছর ছাব্বিশ। ঠিক সেনের বয়সী। তার খুবই সখ ছিলো, ছেলেটাকে ভদ্দরলোকদের মতো লেখাপড়া শেখাবে সে। তাকে হাকিম করবে। কিন্তু সে আশা সুরুপাতেই সমূলে নাশ। এমন কি ছেলের নামকরণ হবার আগেই পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য হলো সে। কিন্তু তা হলেও ছেলের বয়েস গুণতে কখনো ভুল হয় না তার। তার বন্দীকালটাও যে গুণতে হয় মাঝে মাঝে। দুয়েরই যে এক বয়েস!

প্রথম দিন থেকেই সেনকে ভালো লেগেছে রেহানুদ্দিনের। কি সুন্দর ইংরেজীতে কথা বলে সেন! ঠিক যেন সাহেবদের মতো। হিন্দীও বেশ বলে। তার ছেলেটাও তো এমনি ইংরেজীই বলতে পারতো যদি রেহানুদ্দিনকে জেলখানায় আটকে থাকতে না হতো। মনের এ ভাবটাকে অনেক দিন চেপে রেখেছিলো সে। কিন্তু হঠাৎ কথায় কথায় কোন্ এক দুর্বল মুহূর্তে একদিন সেনের কাছে সে প্রকাশ করে ফেলেছিলো তার ছেলের কথা। বলেই থমকে গিয়েছিলো সে। কিন্তু সেনের এমনি কড়া জেরা যে, সেদিন আর রেহানুদ্দিন নিস্তার পায়নি তার কাছে সব কথা খুলে না বলে।

চাচি জানতে পারবে না তুমি এতোকাল পরে আবার ফিরে এসেছো বাংলা দেশে, এ হতেই পারে না চাচা।—হিন্দীতে খুব জোরের সঙ্গে এই কথাটি বলে সেদিনই সঙ্গে সঙ্গে রেহানুদ্দিনের বাড়ির ঠিকানায় তার বিবির কাছে চিঠি লিখে দেয় সেন।

আরে দূর, কবে মরে মামদো হয়ে গেছে তোর বুড়ি চাচি, তার কি ঠিক ঠিকানা আছে কোন। ছেলেটাই বা কোথায় আছে, কি করছে কে জানে! কেন আর শুধু শুধু এ সব চিঠিপত্র লিখে ঝামেলা বাড়ানো?—হিন্দীতেই এ কথা বলে সেনকে নিরস্ত করতে চেয়েছিলো রেহানুদ্দিন। কিন্তু পারেনি। বরং সেনের চাপাচাপিতে বাড়ির চলতি নামটাও তার জানিয়ে দিতে হয়েছিলো তাকে। মহম্মদ হানিফ নামেই সে পরিচিত ছিলো বাড়িতে এবং গাঁয়ের লোকের কাছে। আর যে সব নাম সে নিয়েছে এ পর্যন্ত তা সে এবং তার দলের লোকেরাই জানে, আর কিছু কিছু জানে পুলিশ।

সেনের লেখা সে চিঠিরই জবাব এসেছে ক'দিন আগে। সংসারের তেমন বিশেষ কোন খবর নেই সে জবাবে। দীর্ঘকাল পর রেহানুদ্দিনের খবর পেয়ে উতলা হয়ে উঠেছে মনোয়ারা বেগম তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। সেই সাক্ষাৎ ব্যবস্থার জন্যে সরকার বাহাদুরের কাছে বিবির তরফ থেকে যে আবেদন করা হয়েছে সে কথাই বিশেষভাবে জানানো হয়েছে ঐ জবাবে। তবে তাতে এ অবধি তেমন কোন গুরুত্বই দেয়নি রেহানুদ্দিন। গাঁয়ের কোন লোক রসিকতা করেও তো অমনি একটা জবাব দিতে পারে! আসলে বিবির বকলমে অন্যের লেখা উত্তর বই তো এ আর কিছুই নয়। তাই এ উত্তরকে এক রকম উপেক্ষা করেই চলছিলো রেহানুদ্দিন। কিন্তু আজ? আজতো আর তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না সে কথা।

জেল আফিস থেকে আজ নোটিশ এসেছে। কালই আসছে মনোয়ারা বেগম তার স্বামী রেহানুদ্দিন ওরফে মহম্মদ হানিফের সঙ্গে দেখা করতে। এখন আর বিবির চিঠির সত্যতাকে উড়িয়ে দেবে কি করে সে। যার বেঁচে থাকার কথাই বিশ্বাস করতে পারা যায়নি, সেই কিনা দেখা করতে আসছে তার সঙ্গে! রেহানুদ্দিন আশ্চর্য সেই ভেবে। কিন্তু মনোয়ারা যে তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে এতো উতলা তারও যে সেই একই কারণ, সেই বা তা বুঝবে কি করে? এতোকাল ধরে যার কোন রকম খোঁজ-খবর পাওয়া যায়নি, সে লোক যে বেঁচে থাকতে পারে মনোয়ারার কাছেও তো তা পরম বিস্ময়। তাই সে ছুটে আসছে ঢাকার পাড়াগাঁ থেকে শহর কোলকাতায় তার যৌবন-সঙ্গী মনের মানুষটির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে।

কিন্তু তা নয় হলো। কাল-বিকেলে এ সাক্ষাৎকারের পর মুখে মুখে রটে যাবে না সে কথা! কি রকম মিথ্যেবাদী প্রমাণিত হয়ে যাবে সে তখন সবার কাছে? আর সকলের কথা মন থেকে মুছে ফেলতে মুহূর্ত সময়ও হয়তো লাগবে না রেহানুদ্দিনের, কিন্তু কিছুদিন ধরে এতো মাখামাখি করে এর পর আর কি করে সে মুখ দেখাবে আসমানকে? জেল আফিসের নোটিশ পাবার পর থেকে রেহানুদ্দিনের মাথায় কেবল ঐ এক চিন্তা।

পরদিন বিকেলবেলা সময় মতোই মনোয়ারা এসে হাজির প্রেসিডেন্সি জেলে। গ্রামেরই একটি ছেলে তফাজ্জল নিয়ে এসেছে তাকে। কোলে তার বছর তিনেকের একটি শিশু।

পুলিশের লোকের সামনেই রেহানুদ্দিনের সঙ্গে মনোয়ারার সাক্ষাৎকার। কিন্তু কারো মুখেই কোন কথা নেই! অশ্রুসজল চোখে মনোয়ারা চেয়ে থাকে রেহানুদ্দিনের দিকে। কিন্তু রেহানুদ্দিনের বিস্ময়ভরা দৃষ্টি শিশুটির দিকে। এ যে সেই চোখ মুখ, সেই চেহারা! তন্ময় হয়ে যায় রেহানুদ্দিন।

মনোয়ারা তার স্বামীর দিকে এগিয়ে ধরে শিশুটিকে। বলে, এ তার বেটার বেটা। চোখ দুটো বড়ো হয়ে ওঠে রেহানুদ্দিনের। লোহার বেড়ার ভেতর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আদর করে সে বাচ্চাটিকে। তাকে একটিবার কোলে নেবার জন্যে কেমন যেন একটা আকুলতা ছেয়ে ফেলে তার সারা অন্তরকে।

শাড়ির আঁচলে বার বার চোখ মোছে মনোয়ারা। সে আর চেপে রাখতে পারে না খোদাবক্সের মৃত্যুর কথা। অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে পুত্রের বীরত্ব কাহিনী জানায় সে স্বামীকে। নির্বাক হয়ে শোনে সব রেহানুদ্দিন।

তারও দু' চোখ হয়ে ওঠে অশ্রু-ছলছল।

এরই মধ্যে নাতিকে একবার চুমু খায় মনোয়ারা। আহা, ওযে তার সাত রাজ্যের কুড়ানো মাণিক! কিন্তু তবু কি হতভাগ্য সে! সে কথাই মনোয়ারা বলছিলো রেহানুদ্দিনকে।

বাপও মরলো, মায়ের আদরও যে কি তা আর বুঝলো না এ ছেলে। এমনি কপাল।—এই বলে নিজের কপালেই করাঘাত হানে মনোয়ারা।

কিঁউ?—আশ্চর্য হয়ে জিগ্যেস করে রেহানুদ্দিন।

বারে, সেও যে ছিলো খোদাবক্সদের ডাকাত দলে। ধরা পড়ে তিন বছর জেল হয়েছে তার। আরো দু'বছরের মতো বাকি তার খালাস হতে। এই কোলকাতারই তো কোন জেলে আছে আসমান বিবি।

আসমান বিবি!—রেহানুদ্দিন একেবারে কাঠ হয়ে যায় এ নাম শুনে। গভীর বিস্ময়ে একটি বার মাত্র নামটি উচ্চারণ করে নিশ্চল হয়ে যায়।

ঐকান্তক

(১২১ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

একটু পরে,—আড়ালে থেকেও বিভূপদ লক্ষ্য ক'রলে একাই দিদি নেমে যাচ্ছেন,—সঙ্গে ভক্তি নাই।

রাত কত হবে, কে জানে!

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল ভক্তির; চমকে উঠলো সে—

ঃ কে? কে এখানে?

যার হাতখানা কপালের ওপোর এসে পৌঁচেছিল, সে জবাব দিল

—ঃ আমি।'

চেনা কন্ঠস্বর। বিভুপদ ব'ললে—

—ঃ জ্বর হ'চ্ছে কদিন ধরে, আমাকেও জানাওনি; আর দিদির সঙ্গেও গেলে না। কেন?

'আমার ইচ্ছে।'

কেবল তোমার ইচ্ছেতেই চলতে হবে সকলকে? আর কারো কোনও ইচ্ছে এখানে খাটবে না ব'লতে চাও?—

বিভুপদর কন্ঠস্বরটা যেন আজ বড় বেশী রকম নরম শোনাচ্ছে,—বেশী রকম আস্তেও, আর সহানুভূতিপূর্ণ। বিস্ময়বোধ হলেও সে বিস্ময়কে কাটিয়ে মাথা উঁচু করে তুললে এতদিনের ক্ষোভ আর দুঃখ।

ইচ্ছে করছিল, সমস্ত শক্তি সঞ্চয় ক'রে কপালের ঐ হাতখানার সঙ্গে মানুষটাকেও ঠেলে ফেলে সেদিনের শোধ নেয় ভক্তি।

কিন্তু পারলে না।

বেশ বুঝলো—ঐ হাতখানার স্পর্শের মতই একটা স্নেহ মমতায় ভরা স্পর্শ ওর সারা দেহের মত সমস্ত অন্তরটাকেও পাকের পর পাক দিয়ে জড়িয়ে, পেঁচিয়ে একেবারে সাপটে ধরেছে একান্ত নির্ভরতায়। যার বাঁধন সে অস্বীকার করতে পারে না। এখনও পারলে না।

বোধোদয়

সুশীল রায়

এর চেয়ে মুষল ধারায় বৃষ্টি ভালো। কয়েকদিন ধরে এক নাগারে ঝিরঝির ঝিরঝির করে একটানা বৃষ্টি হচ্ছে এই পাহাড়ে।

রাস্তায়-ঘাটে জল কোথাও দাঁড়িয়ে নেই। পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে জল গড়িয়ে কোথায় নেমে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু অদৃশ্য হচ্ছে না এই বৃষ্টি। অদৃশ্য নিজে তো হচ্ছেই না, দৃশ্যও যা কিছু তার সবই বৃষ্টির ঐ চিকে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

তবু, দু-দিনের জন্যে পাহাড়ে বেড়াতে এসে নিজেকে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখা যায় না। ছাতাও আনিনি, ওয়াটারপ্রুফও নয়। চেরাপুঞ্জিতে গেলে কথা ছিল, বৃষ্টির দেশ সেটা, বৃষ্টির জন্যে হয়তো তৈরি হয়েই যেতাম। কিন্তু এখানে, এই কার্সিয়াঙে, এই জুন মাসে, এসেছি কেবলমাত্র কলকাতার গরমের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে একটু ঠান্ডা উপভোগ করতে। সে ঠান্ডার মাত্রা যদি হিসাবের চেয়ে বাড়তি হয়ে যায়, সেই জন্যে এখানে আসার সময় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি মাত্র বাড়তি কয়েকটা জামা, সেই সঙ্গে একটা র‍্যাপার আর একটা সোয়েটার।

ছাতা আর ওয়াটারপ্রুফের বদলে গায়ে সোয়েটার আর সর্বাঙ্গে র‍্যাপার জড়িয়ে তাই এই ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যেই ঘুরে বেড়াই। কোনো দিকে কিছুই দেখার উপায় নেই, কুয়াশার মত হাল্কা মেঘ চারদিকটা আড়াল করে ঝুলে আছে।

কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে, পাহাড়ী দৃশ্য কাকে বলে, কাঞ্চনজঙ্ঘা, গৌরীশৃঙ্গ বা ধবল-গিরির উপর সকালবেলার রোদ পড়লে সপ্ত-রঙের যে অদ্ভুত বর্ণবৈচিত্র্য দেখা যায় বলে শুনেছি তারও কোনো চিহ্ন পাচ্ছিনে, তবু বেশ ভালো লাগছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেও এখান থেকে পালিয়ে যাবার কোনো আগ্রহ হচ্ছে না। রোজই একটা আশা নিয়ে ঘুম দিই। মনে হয়, জেগে উঠেই হয়তো দেখব চারদিক ঝলমল করে উঠেছে সোনালী রোদে।

মন্টিভিয়ট রোডে আমার বাসা। আমাদের আফিসের মৃগাঙ্কের কাকা এখানে বাড়ী কিনেছেন, মাঝে-সাঝে বেড়াতে আসেন, সারা বছর বাড়ীটা বন্ধ থাকে। এই বাড়ীটার চাবি নিয়ে এসে একটা ঘর খুলে একলা আছি। খাওয়া-দাওয়া করছি এভারেস্ট হোটেলে।

বৃষ্টিকে পরোয়া না করে রোজ একবার করে যাই সেন্ট মেরীর গির্জায়। জায়গাটা বড় ভালো লাগে। পাইন আর ক্রেপটোমানিয়া গাছ দিয়ে জায়গাটা বেশ সাজানো। রোজ বিকেলে যাই, ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। ঐ গির্জা থেকে, অর্থাৎ কার্ট রোডের ঐ এলাকা থেকে মন্টিভিয়টের আমার এই ডেরা বেশি দূরে নয়, কিন্তু আসতে হয় অনেকটা রাস্তা ঘুরে—প্রায় স্টেশনের কাছ পর্যন্ত পিছিয়ে গিয়ে আবার এই দিকে নেমে আসতে হয়। একটা শর্ট-কাট রাস্তা থাকলে যাতায়াতের বড় সুবিধে হত।

সেদিন সন্ধ্যার সময় গির্জা থেকে নেমে এসে কার্ট রোডের উপর দাঁড়িয়ে হোসনে-ঝোরার জলপ্রপাত দেখছি। ঝরণাটা ভীষণ প্রবল হয়ে উঠেছে। মাথার উপর ঝরছে ঝরঝর বৃষ্টি আর ঐ ঝরণা থেকে ছিটে এসে জলের গুঁড়ো পড়ছে আমার চোখে-মুখে।

ঝরণার ঐ জলোচ্ছ্বাসের শব্দ ডিঙিয়ে হঠাৎ কানে এল সমস্বর কলকণ্ঠ।

ফিরে দেখি চড়াইয়ের দিক থেকে ঢালু পথে কার্ট রোড ধরে হেঁটে চলেছে চার জোড়া পা। তারা কারা দেখার উপায় নেই। ওয়াটার-প্রুফের বোরখা দিয়ে ওদের সর্বাঙ্গ ঢাকা।

সর্বাঙ্গে র‍্যাপার দিয়ে জড়িয়ে আমিও আমার ডেরায় ফেরার জন্যে ওদের পিছন-পিছন হাঁটতে আরম্ভ করলাম।

কলকল শব্দে কথা বলতে বলতে ও খিলখিল শব্দে হাসতে হাসতে আমার সামনে সামনে তরতর করে চলতে লাগল রবারের জুতো পরা চার জোড়া পা।

এই মাত্র হোসনে-ঝোরার কিনারে দাঁড়িয়ে ঝরণার যে উচ্ছলতা দেখছিলাম, এখনো যেন আমার সামনে অবিকল সেই রকম চারটি ঝরণা প্রাণের উচ্ছলতা ছড়াতে ছড়াতে চলেছে।

তাদের পিছনে পৃথিবী ধূলিসাৎ হয়ে গেল কি না, তাদের পিছনে পাহাড় চুরমার হয়ে গেল কি না, কিংবা তাদের পায়ের পীড়নে কোনো প্রাণী পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে কি না—সে সব লক্ষ্য করার অবসর তাদের নেই। তারা এই ঝিরঝির-বর্ষণের সঙ্গে নিজেদের পায়ের তাল রেখে তরতর করে হেঁটে চলেছে। ভর সন্ধ্যার এই ভিজা অন্ধকারে কালো বোরখার আবরণে আচ্ছন্ন ঐ চারটি চলন্ত শরীর অবিকল চারটি জীবন্ত স্বপ্নের মত আমার চোখের সম্মুখে হেঁটে চলেছে।

ওদের পিছন পিছন অনেকটা চলে এলাম। সিনেমা হলের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে গেলাম শেডের নীচে। ওদের পিছন-পিছন হাঁটতে হাঁটতে যতটা ধুঁকে গিয়েছি, ভিজে গিয়েছি তার চেয়েও বেশি। তাই, বৃষ্টিটা একটু ধরে আসে কি না দেখার জন্যেই এই আশ্রয় নেওয়া। আর, ওদের পিছন-পিছন হেঁটেই বা লাভ কি? ওরা তো পিছন ফিরে একবারও চেয়ে দেখছে না তাদের অনুসরণ করে কেউ আসছে কি না। ওদের ঐ আচরণে নিজের উপর ধিক্কারও এসে থাকবে, কিন্তু ভিজে গিয়ে মন

এমন স্যাঁতসেঁতে হয়ে গিয়েছে যে, ধিক্কারের কথা একটুও মনে আসছে না।

দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ লক্ষ্য করলাম বৃষ্টির চিকের ওপার থেকে কে যেন ডাকছে আমাকে।

ভালো করে চেয়েও চেনা গেল না। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, স্টেশনারী দোকানের আলোটা তেজী বটে কিন্তু আলোর দিকে সে পিছন ফিরে দাঁড়ানো, তাই তার সর্বাঙ্গই একটা ছায়ার মত দেখাচ্ছে। আমার মুখে হয়তো রাস্তার আলো আর দোকানের বাতি সোজাসুজি পরায় আমাকে চিনতে কোনো কষ্ট নেই।

শেড ছেড়ে ওপারে গিয়েই চিনতে পারলাম। সবিতা দেবী। মন্টিভিয়েট রোডের যে ঘরে আমি আছি তার এক ধাপ নীচেই থাকেন মনোহর আচার্য। মনোহরবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও। সেই সূত্রে সবিতা দেবীর সঙ্গেও। মনোহর-বাবুর স্ত্রীর বন্ধু সবিতা। এখানে কনভেন্টে টিচারী করেন সবিতা দেবী।

সবিতা দেবী বললেন, ব্যাপার কি? ভিজে কাক হয়ে গেছেন যে।

বল্লাম উঁহু। কাক না, বেড়াল। ভিজে-বেড়াল হয়ে আছি আপনাদের পাহাড়ে।

—যা ইচ্ছে হোন। সবিতা বললেন, কিন্তু পাহাড়ী বৃষ্টিতে ভিজলে যে জ্বরে পড়বেন, অসুখ করবে যে।

সবই বুঝতে পারছি। কিন্তু ঘুরে বেড়ানোটা একটা নেশায় দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ঘরে ফিরে হিটারে হাত-পা সেঁকে নিই রোজ, আজও না হয় তাই নেওয়া যাবে।

সবিতা দেবী বললেন, আপনার ডেরাও তো এখান থেকে অনেক দূর। সেখানে যেতেও তো আরও ভিজবেন।

কেমন যেন মনে হল, সবিতা দেবী বুঝি আমাকে আজ ফিরতে বারণ করছেন, কাছে-ভিতে কোথাও হয়তো আমাকে আশ্রয় দেবার প্রস্তাব করছেন।

কিন্তু না তিনি বললেন অন্য কথা। বললেন, এখান থেকে মন্টিভিয়টে যাওয়ার শর্ট-কাট একটা রাস্তা আছে বটে, কিন্তু এই অন্ধকারে সে রাস্তায় যেতে বলিনে।

বললাম, যাই না-যাই সেটা পরে দেখা যাবে, রাস্তাটা তো বাৎলে দিন।

পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স হবে সবিতা দেবীর, শরীরটা একটু স্থূল, কিন্তু তার জন্যে খুব খারাপ দেখায় না তাঁকে। অতি সাধারণ আর সাদা-সিধে পোষাক তাঁর পরনে, দুই হাতে একটি করে প্লাস্টিকের চুড়ি।

আমি তাঁর এই সহজ পরিচ্ছদটি লক্ষ্য করছিলাম না, লক্ষ্য করছিলাম তাঁর দুই চোখের তারায় দুটি হাসি চকচক করে উঠেছে, সেই হাসি-দুটো।

নেহাত বালিকার মত হেসে সবিতা দেবী বললেন, বিদেশীদের নিয়ে বিষম বিভ্রাট আমাদের, পথঘাট চেনে না। আমাদের তারা পেয়েছে যেন বিনে বকশিসের গাইড।

বলে ফেলল্যাম, কি বকশিস চান বলুন।

—বকশিস পরে, আগে পথটা তো চিনিয়ে দিই। বলেই তিনি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন বাঁ দিকের একটা ঢালু গলি।

আমাদের পায়ের নীচেই কখন কোন্ সুড়ঙ্গ খোঁড়া থাকে আমাদের নিজেদেরই তা জানা থাকে না অনেক সময়। জানা যে থাকে না তার প্রমাণ আজ এক্ষুণি পেলাম একেবারে হাতে-হাতে। প্রায় পায়ের কাছেই যে রাস্তাটা অগাধ নীচের ঐ মন্টিভিয়টে নিয়ে যাবার জন্যে ঢালু হয়ে পড়ে আছে তার কথা জানাই নেই।

ভিজে গিয়ে শীত করছিল, আনুষ্ঠানিক-ভাবে বিদায় নেওয়া আর ঘটে উঠল না, শুধু বললাম, চলি তবে।

বলেই ঐ পথ ধরে হাঁটা দিলাম।

তিন ভাঁজ করা রাস্তা, বাংলার দ বা ইংরেজীর জেড—যে কোনো অক্ষরের সঙ্গে এর তুলনা করা চলে। বড় অন্ধকার পথ, একটু দুর্গম রাস্তাই বটে। তাহলে হবে কি, তিন মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম আমার বাসার কাছে।

ইশারায় সবিতা দেবীর সেই ডাক, এই পথ বাৎলে দেওয়া, বালিকার মত সেই সরল হাসি—সবই ঠিক আছে। কিন্তু সবই যেন ঠিক নেই। আমার চোখে লেগে আছে সেই স্বপ্নটা। চার জোড়া পা তরতর করে হেঁটে চলেছে চারটি স্বপ্নের শরীর বয়ে নিয়ে।

ঐ রাস্তাটার আমি নাম দিয়েছি সবিতা রোড। যেখানে আমাকে রোজ যেতে হয় ত্রিভুবন ঘুরে, সেই সেন্ট মেরীর গির্জায় যাবার জন্য আমি আর এখন পরোয়া করিনে মোটেই। চট করে ঐ তিন ভাঁজ রাস্তার খাড়াই ভেঙ্গে দুটি পাক খেয়ে উঠে পড়ি কার্ট রোডে।

উঠেই চারদিকে তাকাই। কাকে খুঁজি? আমি নিজেই যেন বুঝতে পারিনে আমি খুঁজি কাকে। আমার খোঁজা উচিত সবিতা দেবীকে—তিনিই দেখিয়ে দিয়েছেন এই চোরা পথটা এবং দেখিয়ে দিয়েছেন ঠিক এই জায়গাতে দাঁড়িয়েই। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি বেইমান নই, তবু আমি খুঁজি অন্য জিনিষ। সে জিনিষের নাম নতুন করে আবার আমাকে বলতে বলবেন না।

পাহাড়ের বৃষ্টি কমে এসেছে অনেক। এখন চারদিক অনেক ঝরঝরে আর অনেক ঝকমকে দেখাচ্ছে। এখন পূব আকাশ আড়াল করে দাঁড়ানো দূরবীন দাঁড়া, আর পশ্চিম দিগন্ত বেষ্টন করে দাঁড়ানো ধবলগিরি, কাঞ্চনজঙ্ঘা আর গৌরীশৃঙ্গ অনেক সময় স্পষ্ট দেখা দেয়।

কিন্তু পাহাড়ই দেখি শুধু স্পষ্টভাবে, স্পষ্ট করে আর কিছু দেখতে পাওয়া যায় না।

সবিতা দেবী আসেন মাঝে-সাঝে। গোল-গাল, ছোট-খাট দেখতে মানুষটি, কিন্তু মানুষটি বড় ভালো। কোনো জাঁক নেই, কিন্তু যখন বসেন, তখন বসেন যেন বেশ জাঁকিয়ে। চমৎকার গল্প করতে পারেন।

আজ এসে আমার দরজার পুরদা একটু ফাঁক করে বললেন, কি মশাই আছেন?

বেতের ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে বসে কিছু একটা নিশ্চয় ভাবছিলাম, হঠাৎ ঐ গলা শুনে চমকে উঠলাম।

—আমি সবিতা। আচার্যানি বলছিলেন, আপনার নাকি শরীর খারাপ তাই দেখতে এলাম।

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আসুন আসুন।

তিনি এলেন, বিছানার উপর বসে পড়লেন, বললেন, এত ঝড়-জলে পাহাড়ে টহল দিয়ে বেড়ালেন; বৃষ্টিরও দম ফুরিয়ে গেল, সেই সঙ্গে আপনার দমও বুঝি ফুরিয়েছে? গির্জার পাইন-বনে দেখিনে তো আর আপনার ছায়া? শরীর বুঝি কাহিল করে ফেলেছেন?

—তা ফেলেছি। তিনবার কেশেছি আজ, আর বার কয়েক হেঁচেছি।

—বলিনি, বলিনি, বলিনি?

প্রায় তেড়ে আসার মত করে সবিতা দেবী আমার দিকে চেয়ে বললেন। আরও বললেন, এ যা-তা জায়গা না—এ পাহাড়। এখানকার বৃষ্টি যাচ্ছেতাই জিনিষ।

মনোহর আচার্যের স্ত্রীকে সবিতা এতদিন মনোহারী বলেই ডাকতেন, আমি আসার পর তিনি আচার্যানি হয়েছেন।

বললাম, আচার্যানি বুঝি আমার হাঁচি আর কাশি শুনে ফেলেছেন?

সবিতা বললেন, শুধু হাঁচি আর কাশিই না, আরও অনেক কিছু তিনি শুনে ফেলেছেন।

—কি, কি?

—আপনার মনের কথাও।

আর জেরা করতে চাইলাম না সবিতা দেবীকে। বুঝতে পারলাম, মনোহরবাবু ও তাঁর স্ত্রীর দরবারে বসে প্রাণ খুলে প্রাণের অনেক কথা বলে ফেলেছি কাল। নেহাত বৈঠকী আলাপ সেটা। সে আসরের সব কথাই অসার বলে ধারণা করেছিলাম আমি, তাই অকপটে কোনো কথা বলতেই দ্বিধা করিনি।

সবিতা দেবী বললেন, একটা স্বপ্ন নিয়ে মশগুল হয়ে আছেন।

যেন অপরাধ করে ফেলেছি, এইভাবে বলল্যাম, আচার্যানির ওটা রসিকতা।

রসিকতা তো বটেই, আমার এ কথাটাও অরসিকতা ভাববেন না।

সবিতা দেবী উঠে দাঁড়ালেন, আমিও দাঁড়ালাম তাঁর সঙ্গে সঙ্গে, বললাম, সঙ্গে আসব?

কোনো উত্তর দিলেন না সবিতা দেবী। আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যে, মনে হল, আমার এ প্রস্তাবে তাঁর সম্মতি নেই। তাঁর এই ভাব পরিবর্তনে বড় অপ্রস্তুত মনে হল নিজেকে। মনে হল, আমার এই স্বপ্নে ভর করে থাকাটা তিনি যেন পছন্দ করছেন না।

সবিতা দেবী রওনা হলেন, তার কিছুক্ষণ বাদে আমিও বের হলাম। পা চালিয়ে চললাম। তিন ভাঁজ করা রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করছি আজকাল। সহজেই কার্ট রোডে পৌঁছে যাওয়া যায়, আর এ পথটায় আদপে লোক চলাচল নেই বলে যেমন নির্জন তেমনি মনোরম।

এই পথ ধরে দ্রুত হেঁটে সামান্য একটু এগুতেই দেখতে পেলাম সবিতা দেবীকে। কিছুটা আগে তিনি হাঁটু ভাঁজ করতে করতে খাড়াই ধরে উঠে চলেছেন। তাড়াতাড়ি হেঁটে তাঁর পাশে এসে পৌঁছে বললাম, কি সৌভাগ্য!

ঘাড় ফিরিয়ে বাঁকা চোখে চেয়ে তিনি বললেন, কি রকম?

বললাম, ঠিক এই রকম। এমন নির্জন আর নীরব পথে আপনাকে সঙ্গী পাওয়া। পাহাড়ে এসে দুটো কাজ করেছি মনের মতন।

এক হচ্ছে, মনোহরবাবুর স্ত্রীর নামকরণ; দ্বিতীয়টি হচ্ছে এই অখ্যাত রাস্তাটিকে আপনার নামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া।

সবিতা দেবী হাঁফাচ্ছিলেন, হাঁফাতে হাঁফাতে হাঁটছিলেন, বললেন, আর, আর-একটি। তৃতীয়টা?

তাঁর পাশে-পাশে চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন্‌টার কথা বলছেন?

ব্যঙ্গ করে সবিতা দেবী বললেন, সেই চলন্ত চার জোড়া চরণ আবিষ্কার।

মনে হল, ভুল করে ফেলেছি সে আবিষ্কার করে। এবং তার চেয়েও বড় ভুল হয়েছে সে আবিষ্কারের কথাটা ফাঁস করা। যা নেহাতই আমার মনের নিজস্ব সম্পদ তা বারোয়ারী করে ফেলাটা বড় বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে।

ও-প্রসঙ্গ আর তুললাম না, অন্য প্রসঙ্গে এসে গেলাম হঠাৎ, বললাম, নির্জন রাস্তা ধরে এভাবে আমরা দুজনে চলেছি, কেউ দেখে ফেললে কি যে মনে করবে ঠিক নেই।

চোখের কিনার দিয়ে আমার দিকে চেয়ে সবিতা দেবী বললেন, সে-বোধ তবে আছে? আমার তো ইচ্ছে ছিল একটা বোধোদয় কিনে দেব।

—তা দেবেন বই-কি। আপনার কন্‌ভেন্টের ছাত্রদের দেবেন।

কথা শুনে সবিতা দেবী একটু হাসলেন। আমার দিকে কেমন করে যেন তাকালেন। ও-চাউনিটা পথ-হাঁটার ক্লান্তির জন্যেই, না, অন্য কোনো কারণে ধরতে পারলাম না।

বলি-বলি করছিলাম অনেকক্ষণ থেকে, এবার বেপরোয়া হয়ে বলে ফেললাম কথাটা বললাম, রাস্তাটা কিন্তু একটা আইডিয়াল রাস্তা। রোমান্স করার পক্ষে একেবারে ইউনিক। জীবনে এমন রাস্তা আর দেখিওনি, আর পাইওনি। আর, ভবিষ্যতেও পাব কি না সন্দেহ। রোমান্স করার পক্ষে—তাই না?

সবিতা দেবী আবার বললেন, সে-বোধও আছে দেখছি। যাক, বোধোদয় আর কিনে দিতে হবে না।

তা কিনে না দিতে হল, কিন্তু আমি যে প্রস্তাবটা দাখিল করলাম, তা গৃহীত হল কিনা, তার উত্তর কই। হাঁফাতে হাঁফাতে তড়বড় করে ওভাবে চড়াই ভাঙলেই কি তার জবাব দেওয়া হল?

উঠে এলাম আমরা কার্ট রোডে। এখানে দাঁড়িয়ে একটু দম নিতে হবে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি দুজনে; সামনেই ধিক-ধিক করে দার্জিলিঙের দিকে চলে গেল একটা ট্রেণ। তার ইঞ্জিনের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে চারধার। প্রবল হাওয়ায় ধোঁয়া অদৃশ্য হয়ে গেল একটু পরেই।

সবিতা দেবী বললেন, ঐ যে, ঐ যে।

তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললাম, কি?

তিনি বললেন, সেদিন আমি দেখেছিলাম ওদের। আপনি ভিজে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে ওদের পিছন-পিছন আসছিলেন। তারপরেও আমি অনেকবার দেখেছি তাদের।

—হ্যাঁ কই তারা?

আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল ভীষণভাবে, আমি তাকাতে লাগলাম চারধারে। সবিতা দেবীর চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে আমি তাকালাম। এই দিনের স্পষ্ট আলোয় দেখতে পেলাম চারটি প্রাণী। বর্ধমান রোড ধরে তারা চলে আসছে—তাদের সবটা শরীর দেখতে পাচ্ছিনে, দেখতে পাচ্ছি মাত্র বুক থেকে মাথা পর্যন্ত, সেই চারটি চরণ ঢাকা পড়ে আছে পাহাড়ী গোলাপের নিবিড় বনের আড়ালে।

দুটি ছেলে আর দুটি মেয়ে।

ওদের দেখে সবিতা দেবীর মুখের দিকে তাকালাম।

সবিতা দেবী বললেন, এরাই আপনার চোখের ভুল আর মনের আকাঙ্ক্ষা মিলে-মিশে আপনাকে ধোঁকা দিয়েছিল সেদিন সন্ধ্যায়। যাদের আপনি পৃথক চার ভেবেছিলেন তারা দুয়ে দুয়ে চার। কি, মন খারাপ হয়ে গেল বুঝি? স্বপ্নটা বুঝি ভেঙে দিলাম?

দুটি সবুজ টিয়ার মত সবুজ জামায় সবুজ শাড়ীতে সর্বাঙ্গ ঢেকেছে মেয়ে দুটি, সঙ্গে সঙ্গে ট্রাউজার পরে চলেছে যেন দুটি জীয়ন্ত হরিয়াল।

সবিতা দেবী বললেন, ওরা পাহাড়ে এসেছে রোমান্স করতে, রোমান্স খুঁজতে না। বুঝলেন মশাই?

বুঝলাম। কিন্তু বুঝতে গিয়ে বিশেষ সুখবোধ যে করছিনে তা আমার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল।

ওই চারটি প্রাণী বর্ধমান রোড থেকে নেমে কার্ট রোড ধরে তরতর করে চলে গেল স্টেশনের দিকে। ওরা যে এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে তা ওদের চলার ধরন দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে।

আমার চোখের সম্মুখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল আমার স্বপ্নটা।

সবিতা দেবী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, কয়েকদিন আছেন ত পাহাড়ে?

—উঁহু। এবার চলে যাব।

—যেতে দিলে তো!

বললাম, কেন, বাধা দিচ্ছেন কেন?

—এমনি। ইচ্ছে করছে। বিকেলে থাকবেন তো বাসায়? আমি যাব।

প্রস্তাবটা ভালো লাগল। বললাম, বেশ। আসুন।

সেখান থেকেই বিদায় নিলাম আমরা। তিনি চলে গেলেন কার্ট রোড ধরে, আমি নেমে গেলাম সবিতা রোড দিয়ে।

বিকেল যেন আর হয় না। বারে বারেই ঘড়ি দেখি, আর অনবরত জল খাই। আজ এলে ঐ সবিতা রোড ধরে একটু নিভৃতে বেড়াব এই বাসনা প্রবলভাবে পেয়ে বসেছে আমাকে। কিন্তু বাসনা পূরণ করবে যে, তারই দেখা নেই।

হঠাৎ পরদা নড়ে উঠতেই সাড়া দিয়ে উঠলাম, কে?

উত্তর না পেয়ে উঠে গেলাম, পরদা সরিয়ে দেখি—কেউ না।

কিছুক্ষণ বাদে কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে উঠে গিয়ে পরদা সরিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি—আচার্যানি।

এই অসময়ে তাঁর এখন আসার কোনো দরকার ছিল না। কিন্তু তবু তিনি আসছেন। হাসতে-হাসতে আসছেন তিনি, বিকেলের

হাসনাহেনার চারা

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

মেঘের রঙ ছড়িয়ে দিলে মাঠে
বিছিয়ে দিলে বৃষ্টি ফোঁটার ধারা
উঠোন কোণে চোখ চেয়েছে দেখি
ছোট্ট সবুজ হাসনা হেনার চারা।

এদের সবার গোপন কথা তবে
বাজবে এখন রাতের উৎসবে।

সেই কথাটি আজকে ভেবে দেখি
কোথায় যেন বাঁধন বাঁধা আছে
এত বিরাট আকাশখানা সেও
নেমে এল ছোট্ট চারার কাছে।

সবুজ দুটি পাতায়-ঘেরা প্রাণ
হয়না যেন তাহার অসম্মান।

কে জেনেছে বিশ্ব জুড়ে এত
দেয়া-নেয়ার অমিত বিস্ময়
ছোট্ট চারার কান্না শুনে শুনে
মেঘের চোখে অশ্রু জড়ো হয়।

এই যে প্রাবৃট এই যে মাটি জল
কতো প্রাণের লীলায় সে উচ্ছল।

উঠোনকোণে হাসনা হেনার চারা
কখন তারি সবুজ দুটি কথা
সারা আকাশ ছড়িয়ে দিয়ে গেছে
ছোট্ট স্নেহের মোহন বিহ্বলতা।

পড়ন্ত রোদেও তাঁর দাঁতগুলো মুক্তোর মত ঝকমক করছে।

ঘরে এসে বসলেন আচার্যানি, মূর্তিমতী সতী মনোহারী। সবিতার রুচিবোধ আছে, নামটা ভালোই দিয়েছিল।

বললাম, কি খবর বলুন?

—খবর? আচার্যানি মাথায় কাপড়টা একটু টেনে বললেন, খবর শুভ। সবিতা এসেছে আমাদের বাড়ীতে। তার আসতে লজ্জা করছে, তাই আমাকে পাঠাল খবরটা দিয়ে।

—কি খবর, কি খবর? ব্যস্ত হয়ে উঠলাম আমি।

আচার্যানি বললেন, আপনাকে কয়েকটা দিন থাকতে হবে, সবিতার অনুরোধ। এখন যাওয়া হবে না।

—তা তা, কেন কেন—

আমি কথা খুঁজে পেলাম না।

আচার্যানি বললেন, আসছে শুক্রবার ওর বিয়ে। এই নিমন্ত্রণপত্রটা ও পাঠিয়ে দিল।

তাড়াহুড়ো করে পড়তে লাগলাম চিঠিটা। এই পাহাড়ে এসে একটা রাস্তার উপর তার নাম এঁকে দিলাম, কিন্তু ঐ পত্রের মধ্যে ছাপার অক্ষরে আমার নামটাও নেই দেখলাম।

বললাম, বড় আনন্দ হল চিঠিটা পেয়ে।

আচার্যানি বললেন, ও বড় শান্ত মেয়ে, মানুষকে আনন্দ ছাড়া দুঃখ দিতে জানে না।

তাঁর কথার প্রতিবাদ করিনি।

ঘরে ফেরা

শ্রীমতি বীথি সরকার

ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স

পি ঘোষ

অটোগ্রাফ
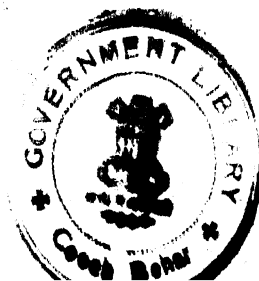
অনন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
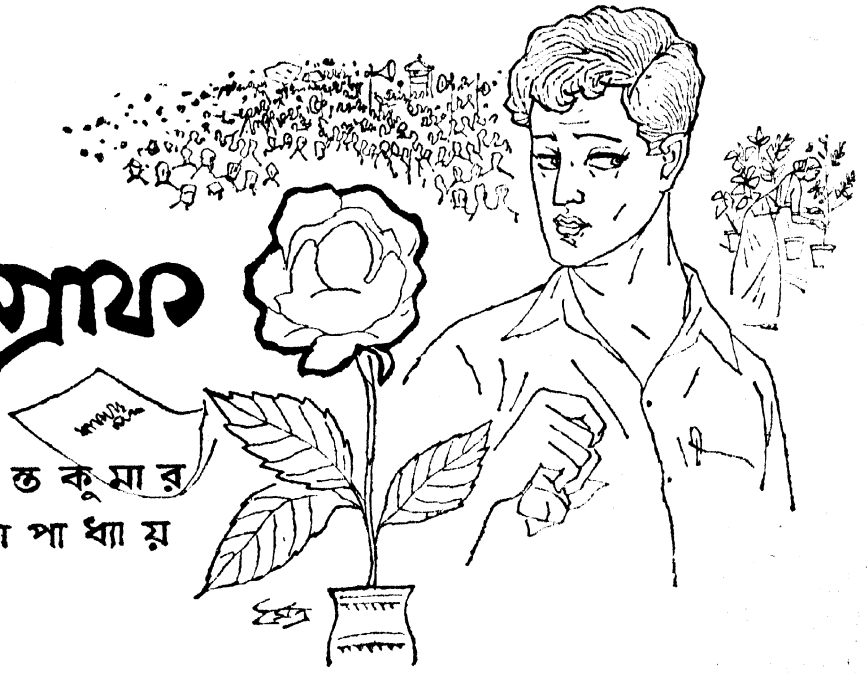
সুকান্ত আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে। দমদম এয়ারপোর্টে একবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে—তারপরে দুদিন রাস্তার ধারে উদগ্র, উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে রৌদ্রে খাড়া দাঁড়িয়ে কাটিয়েছে—কিন্তু বৃথা। আজ শেষ সুযোগ, আজ যদি না পারে তাহলে জীবনে আর কোনদিন পারবেনা সে বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ।

চারিদিকে অসংখ্য নরমুণ্ডের দিকে চেয়ে সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ল। অসম্ভব, এই ভীড় ঠেলে, এগিয়ে যাওয়া তার পক্ষে, শুধু তার পক্ষে কেন কারো পক্ষেই বোধ হয় সম্ভব নয়। অনেক ভোরেই সে এসেছিল—সঙ্গে এনেছিল একটুকরো খবরের কাগজে জড়িয়ে কয়েক স্লাইস রুটী আর দুটো ডিমসেদ্ধ, কিন্তু ওর চেয়ে উৎসাহী মানুষের অভাব কোলকাতায় নেই—তারা আরও আগে এসে আগেভাগে জায়গা করে নিয়েছে। ফ্লাস্কে চা, টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার, আয়োজনে আর অধিষ্ঠানে ওকে সবাই হার মানিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু এত লোক কোলকাতায় ছিল কি করে?—কত হবে—দশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ লাখ? কি জানি কোটিও হতে পারে বোধ হয়, কালকের খবরের কাগজে তার একটা হিসেব বোধ হয় থাকবে। মাঝের লাল মণ্ডপটা জনসমুদ্রে ভাসছে বলে মনে হচ্ছে। সুকান্ত সামনের দিকে একটু চাপ দিলে।

—"কি দাদু, কোলে চড়বেন নাকি?"—মন্তব্য করল একজন!

—"আহা দেখছেন না সামনে এ্যাট্রাকসন্ রয়েছে" মুচকী হাসলে আর একজন।

"—দূর বোকা, দাদার ভেতরে যাবার টিকিট আছে—পথ হারিয়ে ফেলেছেন,—তা বলে চেপটাবেন না স্যার"—আর একজনের টিপ্পনি।

সুকান্তর নিজেকে সব চেয়ে অসহায় লাগছে। মানুষের মাঝে মানুষের অসহায়বোধের মত করুণ কিছু আর পৃথিবীতে নেই। দাঙ্গার সময় অন্ধকার গলির মধ্যে মানুষ দেখলে যেমন গা ছমছম্ করত......অবশ্য এখন গা ছমছম্ না করলেও গা ঘিনঘিন করছে। নিজেকে ভারী দুর্বল লাগছে তার—কেমন যেন বমি বমি ভাব আসছে। ভিজে ভ্যাপসা ঘামের গন্ধ, সামনে পিছনে আশে-পাশে চাইলে মাথা ঘুরে ওঠে।

খানিকটা দূরে পুলিশ কর্ডন। সুকান্ত দেখলে তারা যেন হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। আরো দূরে জনতার একটা মিশ্রিত অব্যক্ত গুঞ্জন ঢেউএর মত এগিয়ে আসছে। সেটা স্পষ্ট হতে সুকান্ত শুনল—"আসছে—আসছে—"

চোখের উপর বাইনাকুলার তুলে ধরেছে পাশের ছেলেটি। তার ইচ্ছে হল ছোঁ মেরে সেটা নিজের চোখের উপর তুল নেয়। সুকান্ত ডিঙি মেরে সারসের মত ঘাড়টা উঁচু করে তুললে। নাঃ—তাঁরা কেউ নয়, কোন সরকারী উঁচুদরের আমলা বোধ হয়—কিংবা কোন উপনেতা।

আবার থিতিয়ে গেল জনতা। সুকান্ত হিসেব করে দেখল, এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোন অর্থ হয় না। সান্নিধ্য ত নয়ই, দর্শনও অস্পষ্ট। সে আবার সামনের দিকে একটু চাপ দিল।

"—কি মশাই জোর দেখাচ্ছেন—দেখবেন নাকি একটু!"

দুর্বল লোকের অনেক সময় হঠাৎ বুদ্ধি এসে যায়—না হলে প্রবলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতায় কবে সে শেষ হয়ে যেত। সুকান্তর মাথায়ও বুদ্ধি এসেছে। অত্যন্ত কাতর হয়ে বললে—আমায় বেরিয়ে যেতে দিন, বড্ড শরীর কেমন করছে, এক্ষুণি বমি হয়ে যাবে!"

"বমি হবে ত মরতে ঢুকেছিলেন কেন—লেবু খাবেন, কমলালেবু" চুলে সাবান দেওয়া ছেলেটি কাঁধে ঝোলান নক্সাকাটা থলের মধ্যে হাত পুরল।

সুকান্ত ঘাড় নেড়ে বিকৃত মুখের উপর হাত চেপে ধরল। গা বমি করলেও সত্যিই তার বমি হত না—তবুও ওর আসেপাশের লোক সন্ত্রস্ত হয়ে পথ ছাড়তে লাগল।

আঃ—একেবারে পুলিশ কর্ডনের ধারে এসে গেছে। এবারে জনতা নয়, পুলিশ এসে বাধা দিলে। ও সেই একই অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি করল। সন্দিগ্ধ পুলিশ অফিসার ওর দিকে চেয়ে দেখল। সারাদিন রৌদ্রে দাঁড়িয়ে ওর অবস্থা হয়েছে বিশ্বাস করবার মত।

"স্যার, বমি, ভয়ানক বমি পাচ্ছে।"

"—কিন্তু এখান দিয়ে আপনাকে যেতে দেবো কি করে।"

—"আপনার পায়ে পড়ি স্যার, যে কোন লোক দিয়ে আমাকে বার করে দিন, আমি আর ভেতরে আসবার চেষ্টা কোরবো না।"

সুকান্ত চমকে উঠল নিজের এই দীনতায়। ছিঃ, পায়ে পড়ি বলল কি করে। এবার জনতার দিকে চাইতেই লজ্জা করল তার—মনে হল তার কথাগুলো সবাই শুনেছে, চাইলেই লক্ষ লক্ষ মুচকী হাসির সঙ্গে একেবারে চোখাচোখি হয়ে যাবে।

অফিসারটি একটু চিন্তিতভাবে বললেন—"আচ্ছা দাঁড়ান দেখি........"

কিন্তু দাঁড়াতে হল না। চারিদিকে জনতা অকস্মাৎ প্রচণ্ড উল্লাসে জয়ধ্বনি করে উঠল। অসংখ্য পতাকা জনতার মধ্য থেকে উর্দ্ধে উঠেছে—যেন একখানা লাল সামিয়ানা মাথার উপর টেনে ধরেছে। রাশী রাশী ফুল এসে পড়ছে চারিদিক থেকে।

অবিশ্বাস্য মানুষগুলিকে সুকান্ত একেবারে সামনে দেখলে মোটর থেকে নামতে। পুলিশ অফিসারটি নিজের ডিউটিতে সজাগ হয়ে অন্যত্র সরে গেছেন। পুলিশ কর্ডনের বলিষ্ঠ প্রতিরোধ নেই, কিন্তু এগিয়ে যাওয়াও তো চলে না। এ যেন মন্দিরে শুচিতার মত—কতকগুলি নিরুক্ত নিষেধ পথ আগলে দাঁড়িয়েছে।

ফুলের মালা আর গোছা গোছা ফুলের স্তবকে সামনের কার্পেট আর দেখা যাচ্ছে না—এত ফুলও কোলকাতায় ছিল। সুকান্ত হাত তুলে চোখ বাঁকাচ্ছে, সম্মানিত অতিথিরাও।

তার মনে হল এঁরাই ত তাঁরা—যাদের এক

হাতে বরাভয়, অন্য হাতে শক্তিশেল, ভারতের বন্ধু, নেহরুর বন্ধু! কিন্তু একেবারে সাধারণ মানুষের মত—হাসিটিও।

ওদিকের একজন লোক কি করে যেন ফুলের সঙ্গে সামনে গিয়ে ছিটকে পড়ল। সাদা পোষাক পরা দুজন পুলিশের লোক তাকে সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেললে। কিন্তু আশ্চর্য! পরম আশ্চর্য! ওই দেবোপম মানুষটি মৃদু হেসে ওদের নিষেধ করে লোকটিকে কাছে ডাকলেন। লোকটি সামনে গিয়ে দু'হাত দিয়ে তাঁর বলিষ্ঠ হাতখানা ধরে করমর্দন করাতেই বোধ হয় চেয়েছিল, কিন্তু আচ্ছা বোকা ত! হাঁটুগেড়ে বসে শুভ্র হাতখানা মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করলো—কি আশীর্বাদ চাইলে।

সুকান্তর চোখদুটো উত্তেজনায় বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে, লোভে চকচক করছে বোধ হয়। এইত সেই অভাবনীয় মুহূর্ত—সেও এক লাফে সামনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল—যেমন করে গাজনের সময় সন্ন্যাসীরা বঁটির উপর, কাঁটার উপর ঝাঁপ দেয়। ওর বাহুর উপর কঠিন হাতের স্পর্শ, অদ্ভুৎ মিনতি ওর চোখে। এবারও বিশ্ব-জনগণ মন অধিনায়ক হাত তুলে ছেড়ে দিতে বললেন। বলবেনই ত!—সাধারণ মানুষ, সাধারণ মানুষের স্পর্শ, তাদের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার অংশ পেতে চান ওঁরা, সেই কথাই ত সুকান্ত শুনে এসেছে, পড়ে এসেছে, বিশ্বাস করে এসেছে এতদিন।

কম্পিত হাতে পকেট থেকে একটা কাগজ আর কলম বাড়িয়ে ধরল সুকান্ত—"সিগনেচর—অটোগ্রাফ"। কোনরকমে দুটো কথা বলে ফেলেছে। অল্প হেসে নাম লিখে কাগজ আর কলমটা ফিরিয়ে দিলেন তিনি। কলমটা—কলমটা ফিরিয়ে না নিলে কেমন হত? কিছু যেন বলতে গেলও সে—তার ঠোঁটদুটো শুধু একবার কাঁপল কথা বেরোলো না। শাদা পোষাকপরা পুলিশ দুজন তৎক্ষণে তাকে মৃদু আকর্ষণ করতে করতে অনেকটা পেছনে টেনে এনেছে। ওদিকে লক্ষ লক্ষ মানুষের চিৎকারে আর জয়ধ্বনিতে ময়দান মুখর হয়ে উঠেছে।

বুকপকেট চেপে দাঁড়িয়ে রইল সুকান্ত। কেমন যেন ভয় ভয় করছে। হাজার হাজার লোকের মাঝে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে তার। তার পকেটে সাত রাজারধন মাণিক বুকের উত্তাপে মড় মড় করছে। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে যারা দেখেছে তাদের কেউ যদি......

সুকান্ত আবার ভীড়ের মধ্যে ঢোকবার চেষ্টা করল, আবার মারমুখী জনতা বাধা দিলে। সুকান্তর এগুনো হলনা সেইখানেই বসে পড়ল। কিন্তু বক্তৃতা শোনেনি সুকান্ত, বক্তৃতা হচ্ছে, একখাটা লাউডস্পীকারের নীচে বসেও একবারও মনে হয়নি তার। শুধু একটা কথা, কথা নয় ছবি মনে পড়েছিল তার। লোড ব্র্যাবোর্ণ রোডে আর্ট একজিবিসন হয়েছিল সেবার দেওয়াল জোড়া এক খানা ছবি উজ্জ্বল রৌদ্রালোকে ক্ষেতের পাকা ফসল নিয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ... সেই রোদ্দুর, সেই হাসি, সেই সোনার রংএর ফসলের দানা কি করে যেন ওর বুকে পকেটে এসে গেছে।

আবার বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে ওর চৈতন্য ঘা খেলে। সভা ভেঙ্গেছে, নেতারা ও অতিথিরা কখন মঞ্চ থেকে নেমে এসে গাড়ীতে উঠেছেন সুকান্ত লক্ষ্যই করেনি। আর একবার কাছে যাওয়া যায় না......না অসম্ভব। আর প্রয়োজনই বা কি? ভারতের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে কজন বলতে পারবে তার কাছে আছে মহামান্য ভারত-অতিথির অটোগ্রাফ, ক'জনের কলম তাঁর করস্পর্শে ধন্য হয়েছে। বাঁ হাতটা বুকের উপর সর্বক্ষণ রেখেছিল সুকান্ত—এবার একবার চাপ দিয়ে অনুভব করলে।

অতি ভোজনের পর একধরণের আলস্য আসে—তেমনি আলস্য এসেছে তার। ইচ্ছে হচ্ছে বিকেলের লাল রোদ্দুরে, ছেঁড়া কাগজ আর চিনেবাদামের খোসা বিছানো দলিত ঘাসের উপর বেশ খানিকক্ষণ শুয়ে থাকে। কিন্তু তাড়াতাড়ি একটা নিরাপদ আশ্রয়ে ফেরার তাগিদও আছে তার।

ট্রামে বাসে, ঝুলে যাবার মতও ঠাঁই নেই। ট্যাক্সি একটা নেবে, কিন্তু কোথায় ট্যাক্সি। স্রোতের মত দু ফুটপাথ বেয়ে মেয়ে-পুরুষ চলেছে রাস্তার উপর দিয়েও কম নয়, তাদের সতর্ক করতে ভ্যাঁক ভ্যাঁক করে মোটরের ভেঁপু বাজছে। সুকান্ত তাদের সঙ্গে মিশে হেঁটেই বাড়ী ফিরল।

মা বললেন, "এত দেরী করলি সুকু, মিনতি এতক্ষণ ছিল, এই চলে গেল, দেখেছিস ওর গাছের ফুলটা!"

মায়ের দৃষ্টি অনুসরণ করে সুকান্ত দেখলে—ড্রেসিং-টেবিলের উপর চকচকে মাজা পেতলের ফুলদানীতে একটা প্রকাণ্ড রক্ত গোলাপ জ্বল জ্বল করছে-রক্তের মত রাঙ্গা।

সুকান্ত এগিয়ে গেল। ফুলটার দিকে চেয়ে একটু হাসলে তার নিজের হাসিটা সামনের ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় প্রতিফলিত দেখলে, আশ্চর্য লাগল তার; তার হাসিটা অবিকল মহামান্য নেতার মত—তেমনি করুণায় ভরা।

মুখে হাতে-পায়ে ভাল করে জল দিল সুকান্ত। তার গা থেকে একটা রোদপোড়া গন্ধ পাচ্ছে মাথাটাও ভারী লাগছে। নিজের ঘরে গিয়ে ভাবলে আজকের ডায়েরীটা এখুনি লিখে ফেলা দরকার। পকেট থেকে অটোগ্রাফটা বার করে একবার বিস্ফারিত চোখে দেখলে- স্পষ্ট, বলিষ্ঠ, সুন্দর হস্তাক্ষর—আহা! যদি আরো একটু ভাল কাগজে নেওয়া যেত।

ডায়েরী খুলতেই একটা ভাঁজ করা কাগজ মাটিতে খসে পড়ল। সুকান্ত তুলে নিয়ে সেটা খুললে। মিনতি লিখেছে—"তুমি বলেছিলে আমার গোলাপ বন্ধ্যা—আমিও জিদ করে বলেছিলাম এ গাছে ফুল ফোটাবই। আজ সেই ফুল ফুটেছে তো! তোমার জন্য ফুল নিয়ে এসে মাসীমাকে দিয়ে গেলুম—লজ্জা করল তোমার হাতে দিতে। মাঠের ভীড়ে কী কষ্টে যে অটোগ্রাফটা পেয়েছ অন্তর্যামী জানেন। আরো একটা কুঁড়ি আছে এটাও তোমার—তুমি নিজে এসে নিয়ে যেও কালকেই। - মিনু"

প্রথমবার পড়তে কিছুই যেন বুঝতে পারল না সুকান্ত। এরপর খানিকটা অর্থহীন প্রীতি। মনে পড়ল ঐ গোলাপের গাছটাকে কেন্দ্র করে কত ঠাট্টা করেছে মিনতিকে। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল গাছে গোলাপ যেদিন ফুটবে......

হিমালয় জেগে উঠে স্বপ্নাতুর চোখে
কণ্ঠ হতে খুলে নিল সূর্যদীপ মালা
ধ্যানমগ্ন ভারতের কণ্ঠে দিল তুলে।

অমৃতের সন্তানেরা উঠেছিল জেগে
আর জেগেছিল এক প্রচ্ছন্ন কল্যাণ
সেকি তুমি? মহীয়সী শাশ্বত জননী?

তোমার অমৃতলোকে ছড়ায়েছে মৃত্যু বিভীষিকা
তুমি কি সয়েছ জ্বালা দুর্যোধন-মাতা গান্ধারীর?
বহে কি তোমার অশ্রু পুণ্যতোয়া গঙ্গা ভাগীরথী,
অযুত জঠোরে কাঁদে—সেকি তব যৌবন কামনা?

তবে তুমি কথা কও সাড়া দাও মৌন তমসায়
তবে তুমি নেমে এস জননীর অশান্ত মিছিলে।

বিপুল সাধনা; সৃষ্টির সাধনাকে অনুভব করেছে সুকান্ত। জল দিয়ে, সার দিয়ে, ছোট্ট বাড়ীতে টবটাকে সরিয়ে সরিয়ে আলো-বাতাস খাইয়ে গাছটাকে পুষ্ট করেছে মিনতি। কি সুপ্রচুর বিশ্বাস, গাছে তার ফুল ফুটবেই।

হঠাৎ মনে পড়েছে, শাদা পোষাক পরা দুজন পুলিশ ওর দু'হাত চেপে ধরেছে। মহামান্য ভারত অতিথি করুণার হাসি হেসে তাদের নিষেধ করে ওর বাঞ্ছাপূরণ করছেন। আহা! কোটি কোটি অভুক্ত, অশিক্ষিত, অনুন্নত ভারতবাসী তাদেরই একজনকে একটু প্রীতির উপঢৌকন করুণার কণা...... দুর দেশেরই প্রেস ফটোগ্রাফার ছবি নিয়েছে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফিলম তুলেছে, কালকের খবরের কাগজে হয়ত সে ছবি বেরোবে কয়েকদিন পরে সিনেমার পর্দায় দেখা যাবে, করুণ ভিক্ষার্থী সুকান্তকে ওর পরিচিত মহল চিনতে পারবে—মিনতিও।

ওর সারা দিনের নিষ্ঠুর গৌরব, দুর্লভ সম্পদের গৌরব কেমন যেন ফিকে মনে হচ্ছে। লজ্জা লজ্জাই অনুভব করছে এতক্ষণে। মিনতি ফুল ফুটিয়েছে একাগ্র সযত্ন পরিশ্রমে, আর তার প্রিয় মানুষটি ওদিকে নত হয়ে করুণা কুড়োচ্ছে। প্রীতিহীন করুণা ভোজসভার অজস্র মানুষের উল্লাসে, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্বর্ধনায় এতক্ষণে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

মিনতি ওদিকে তার বাকী কুঁড়িটার দিকে চেয়ে আছে সুকান্ত নিজে গিয়ে সেটা নেবে—নেবে নয়, আদর করে তার খোঁপাতেই পরিয়ে দেবে ... লজ্জায় ... আভায় মিনতির মুখখানা লাল দেখাচ্ছে; সার্থক সাধনার পুরস্কার নিচ্ছে তার সার্থক মানুষটির হাত থেকে, সর্বোত্তম—যে সর্বোত্তম একটু আগে বুক ফুলিয়ে প্রীতিহীন করুণা উঞ্ছবৃত্তি করে কুড়িয়ে এনেছে।

সুকান্তর হাতের মধ্যে অমূল্য অটোগ্রাফ দলা পাকিয়ে উঠেছে, মিনতির চিঠির কাঁচা কালির দুটো অক্ষর ধুয়ে গেছে।
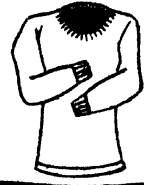
মধু বাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ

মধুময় হউক আমাদের জীবন,
আনন্দময় হউক
শারদীয় দিনগুলি

পূর্ব রেলওয়ে

ER/PA/C,

একটি কিংবদন্তীর জন্ম

(৩৪ পৃষ্ঠার পর)

সংক্রান্ত কথা। এ অনুরোধ তিনি হয়ত রাখতেনও না।

কিন্তু আজ হুকুম হয়ে গিয়েছে—'ব্যস করো।' বন্ধ কর। সবচেয়ে প্রথমে গেস্ট-হাউস-গুলো। এক এক শ্রেণীর লোকের জন্য এক এক রকমের গেস্ট-হাউস। এক নম্বর, দুই নম্বর, তিন নম্বর—গেস্ট-হাউস। মাইনে, আর্থিক অবস্থা, যশখ্যাতির পরিমাণ দিয়ে ঠিক হয় কার কোন্ গেস্ট-হাউসে জায়গা হবে। এ ছাড়া আরও একটা সাধারণ অতিথিশালা আছে। সেখানকার ব্যবস্থা ধর্মশালা গোছের—নিজে ইঁদারা থেকে জল তুলে স্নান করো, খাটিয়াতে নিজের বিছানা পেতে শোও, রান্নাঘরে গিয়ে ভাত, অড়রের ডাল আর একটা ভাজি খেয়ে এস।

প্রার্থীদের ভীড়। অফিসারদের আস্তানা। চোদ্দও ব্যবস্থা। অতিথিশালাগুলো সব সময়ে সরগরম। সরকারী কর্মচারীরা আসেন সাধারণতঃ টুরের অছিলায়। আশ্রয়, আদর, আপ্যায়ন ছাড়াও অনেকের অন্য চাহিদাও থাকে। সবরকম চাহিদা মিটাবার আয়োজন আছে। এই আদর আপ্যায়নের শঙ্খবিষে জর্জর সরকারী কর্মচারী মহল যার হাতের মুঠোয়, সে লোক ভয় করবে কাকে? এমনিতেই ভয়ডর বলে জিনিষ কোনকালে নাই নওরঙ্গী চৌবের। জীবন আর পৃথিবীটাকে বেপরোয়া তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে। শখের খেয়ালে বল্লম নিয়ে ভুট্টা ক্ষেতে বুনোশুয়োর মারতে যায় রাত্রিতে। পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেলকে নিয়ে শিকার করতে গিয়ে, একা বুনো মোষের দলের দিকে এগিয়ে যায়, কারও বারণ না শুনে। এত আদর আপ্যায়নের ঘটা; কিন্তু কি যেন একটা জিনিষ আছে নওরঙ্গী চৌবের স্বভাবে, যে যতবড় অফিসারই হোন না কেন, কেউ কাছাকাছি দাঁড়িয়ে, নিজেকে তাঁর চেয়ে বড় বলে ভাবতে পারেন না।

চেয়ে নিয়ে যাও তাঁর কাছ থেকে যার যা ইচ্ছা—হাত পেতে নাও—মাথা না নোয়ালেও চলবে। কিন্তু একবার নিজের অধিকার ফলাতে এস, আইনের পয়েন্ট দেখাও, থানার পথ ধর, —বুঝতে পারবে নওরঙ্গী চৌবের আসল স্বরূপ। এ খবর এ অঞ্চলের সকলের জানা। ভয়ে কাঁপে সবাই; আবার শ্রদ্ধাও করে। শ্রদ্ধা করে দানসাগরকে। এ জেলায় নওরঙ্গী চৌবের নাম হয়ে গিয়েছে দানসাগর। এত যে লোক অতিথিশালাগুলোতে, এরা সব তাঁর দানের প্রার্থী।

দানের খাতার হিসাব দেখেন নাটোয়ার চৌধরী নিজে। খাতাপত্র থাকে তাঁর খাস-কামরার খাস সিন্দুকে। আর কেউ জানে না সে সব খাতায় কি লেখা হচ্ছে না হচ্ছে; এক শুধু বলভদ্র উকিল কিছুটা জানতে পারে।

ব্যস করো, নাটোয়ার চৌধরী! গুটিয়ে নাও 'দা' খাতা। মিটিয়ে ফেল তার শেষ হিসাব-নিকাশ। কোন্ বিষয়টা কোন্ খাতে যাবে—তার কত রকমের জটিল হিসাব কিতাব! আরও কত কাজের কত কাজ বাকি!... হিসেবটা সেরে ফেল! তাড়াতাড়ি!... তাড়াতাড়ি! এখনই হয়ত আবার ডাক পড়বে ভিটা বাংলায়—বলভদ্র উকিলের কাজটা হতে যেটুকু দেরী!...

কমিশনার সাহেবের আরদালী ছুটে এল। অন্য সব ছোট হাকিমরা একটু গা ঢাকা দিয়ে আছেন দুই নম্বর গেস্ট-হাউসে—যাতে কমিশনারের সম্মুখে না পড়েন।

"ম্যানেজার সাহেব আপনিই তো সব। যে কাজের জন্য কমিশনার সাহেব এসেছিলেন, সে কাজ কি আপনার কাছে হতে পারে না? সাহেব যেন সেই রকম কথাই জিজ্ঞাসা করছিলেন।"

"না।"

"তাহ'লে সাহেবের ষ্টেশনে ফিরে যাবার জন্য একখানা গাড়ী দেন।"

"গাড়ী নাই।"

"ওই যে রয়েছে।"

"ওটার দরকার এখানে। গরুর গাড়ীতে চান তো যেতে পারেন। হাতীও দিতে পারি।"

"তাহ'লে যে এ ট্রেন ধরা যাবে না। মোটর থাকতে না দেওয়া কি ঠিক হবে?"

আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারলেন না নাটোয়ার চৌধরী। —"সাহেব চটলে বাড়ীতে গিয়ে বেশী করে খানা খাবেন, আর কি হবে?"

আরদালী চলে যাবার সময়, জোরে জোরে পা ফেলে বুঝিয়ে দিল যে সে এই সব কথা এখনই কমিশনার সাহেবকে বলতে যাচ্ছে পরে যেন তাকে দোষ দেওয়া না হয়।

সকলে দেখল। মুহূর্তের মধ্যে কথাটা ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। সবাই আঁচ করে নেয় আসল ব্যাপারটা। তবু এখনও যদি কিছু আশা থাকে! কি বোকামিই করে ফেলেছেন একদিন আগে না এসে!... আগে ভাগে গেলে, এখনও যদি কিছু মেলে ম্যানেজার সাহেবের কাছে!...

সবচেয়ে আগে এলেন হাতে থলি, মাথায় টুপি, কারিতকর্মা রাজনৈতিক দলের নেতা। বার্ষিক বরাদ্দ এক হাজার টাকা।

"নমস্তে! কেমন আছেন দান-সাগর এখন?"

"এখন কি চাঁদা নেবার সময়?"

"একখানা গরুর গাড়ী দিতে পারেন, ষ্টেশনে যাবার জন্য?"

"না!"

নমস্তে'

কত রকমের প্রার্থী। একের পর এক। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা, জরাসন্ধের চুরীর প্রত্নতত্ত্বীয় খননে আগ্রহশীল ঐতিহাসিক, কনৌজী ব্রাহ্মণ-কুলপঞ্জীর লেখক, কাণপুরের অনাথালয়ের সেক্রেটারী, 'ভারতবাণীর' সম্পাদক, ট্রাউজার-পরা শার্টের আস্তিন গোটানো রাজনৈতিক কর্মী, কলেজের অধ্যক্ষ, পকেটে-অফিস ঠগ জোচ্চোর, অখিল ভারত-অমুক-প্রতিষ্ঠান-লেখা-প্যাড-সম্বল প্রার্থী, শিবারের তাঁবু, 'বিটার', গাইড প্রভৃতির প্রার্থী সাহেব। বিয়ের দিনের ঘি দুধ দই মাছের জন্য প্রার্থী কোর্টের আমলা—আরও অনেকে। বিভিন্ন মূর্তি, বিভিন্ন পোষাক, বিভিন্ন ধরণ কথা আরম্ভ করবার; বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া নাটোয়ার চৌধরীর দৃঢ় প্রত্যাখ্যানের।... হাত দিয়ে বানের জল আটকাবার মতই দুঃসাধ্য।

তবু তারই চেষ্টা করতে হচ্ছে আজ ম্যানেজার সাহেবকে।

"নহী, নহী, নহী। না, না, না।"

এই এক জবাব! এতবার না বলবারও ফুরসত নাই তাঁর এখন। 'না' শব্দটা যেখানে চিরকাল অজানা আর নিষিদ্ধ, সেখানে আজ কেবল 'না'এর পালা।

অতিথিশালার চাকরবাকরদের উপর কড়া হুকুম ছিল এতকাল, কাউকে যেন না না বলে। একবার একজন ঠাকুরকে এই অপরাধে বরখাস্ত করবার আগে, মালিক নিজ হাতে চাবুক দিয়ে তার গায়ের ছাল ছিঁড়েছিলেন। সেই দান-সাগরের উৎসমুখে আজ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

জানালা দিয়ে নজরে পড়ে ম্যানেজার সাহেবের—একজন ভদ্রলোক আসছেন গরুর গাড়ীতে। হলদে সুটকেশ দেখা যাচ্ছে—নিশ্চয়ই ষ্টেশন থেকে আসছেন।... এখনও কি এর বিরাম নাই!... মোতি সিং! ষ্টেশনে একজন লোক রেখে দাও—নতুন ভিখারীদের আসতে বারণ করতে! অতিথিশালাগুলোতে বলে দাও, যাতে আর নতুন লোক ঢুকতে না দেয়!... না, না, যারা আছে, তাদের চলে যেতে বলবার দরকার নাই!... আপনা থেকেই তারা চলে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে। আজকের বরাদ্দ বাজার তো হয়েই গিয়েছে। নতুন করে আজকে তো কিছু কিনতে হবে না তাদের জন্য।... গরুর গাড়ী, ঘোড়া, সাইকেল, সব এখন হাতের মধ্যে রাখা উচিত। মালিক যাওয়া মাত্র এসব জিনিষগুলোর দরকার পড়বে।... শুধু সরকারী অফিসারদের এখনও ষ্টেশনে যাবার গরুর গাড়ী দিতেই হবে।... তাকে এখন মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। নিজে দাঁড়িয়ে এ পর্ব শেষ করে, তবে তাঁর ছুটি। তারপর সাদের জিনিষ ... গুছো নিকা।... একেবারে নিশ্চিন্ত ... মাথায় নিয়ে, একনিষ্ঠ ভাবে মালিকের কাজ যে করে এসেছেন—সে শুধু নওরঙ্গী চৌবের বড়ো নাপাকে একবারের কথা দিয়েছিলেন বলে। সম্পূর্ণ অন্যায় প্রভুভক্তি নয় সে বুড়োর সম্বন্ধে নিজের অন্য স্বার্থও জড়িত ছিল না এর সঙ্গে, একথা তিনি হলপ খেয়ে বলতে পারেন না।... ব্যস করো, নাটোয়ার চৌধরী! দানের খাতার হিসাব-নিকাশ শেষ করে দাও! সবরকম খাতা, অ্যাকাউন্ট হিসাবে, অর্থাৎ দানের খাতার উপর, বলভদ্র উকিলের নামে একখানা চেক কাটতে হবে।... তারপর সোনাকে আগাবার জন্য মোটরবাইকে লোক পাঠাতে হয়।... কিন্তু অত টাকা নিয়ে বেরুবার ট্রেনে যাওয়াতেই ভাল।... হাঁ, যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, মালিক মরে গেলে ব্যাঙ্ক টাকা তোলায় ঝঞ্ঝাট বাধাবে।...

গেস্ট হাউসের কাছেই দানসাগর পোস্ট-অফিস। একবার ডাক বিভাগের একজন বড় সাহেব এখানকার গেস্ট-হাউসে এসেছিলেন দিন কয়েক। কৃতজ্ঞতায় আর দানের সমারোহ দেখে অভিভূত হয়ে, তিনি নিজে থেকে এখানে পোস্ট অফিস স্থাপিত করবার হুকুম দিয়েছিলেন। নামকরণটা পর্যন্ত তাঁর নিজের। সেই পোস্ট অফিস থেকে ডাক নিয়ে এল একজন লোক। অনেকগুলো চিঠি। চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার ম্যানেজার সাহেব সেগুলোর উপর। খান কয়েক পাঠিয়ে দিলেন পাশের ঘরের দপ্তরের মুহুরীর কাছে।... এদের সকলকে আসতে বারণ করে চিঠি লিখে দাও!...না,—না,—না।... ব্যস

হবার হুকুম হয়ে গিয়েছে।... এর ডাকখরচটা দ'খাতায় টুকে রাখতে হবে। হিসাব শেষ হবার আগে।... হিসাব-নিকাশ করবার পর মালিককে এ সম্বন্ধে খবর দিতে হবে।

সিন্দুক খুলতে যাবেন, তিন নম্বর গেস্ট-হাউসের বাবুর্চি এসে সেলাম করে দাঁড়াল।

"হুজোর"!

চমকে সিন্দুকের ডালা বন্ধ করলেন ম্যানেজার সাহেব। কি চায় লোকটা?

"হুজুর তিন নম্বর গেস্ট-হাউসে বিয়ার ফুরিয়ে গিয়েছে। ডাক্তারবাবুরা চাচ্ছেন। এক নম্বর গেস্ট-হাউসের বাবুর্চির কাছ থেকে ধার নিই এখনকার মত?"

"না। মুন্সীজীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে সাইকেলে চলে যাও বিয়ার আনতে!"

......ডাক্তারবাবুদের হয়ত আরও দুই তিন-দিন থাকতে হবে। ডাক্তারদের খরচ আসবে জেনারেল তহবিল অর্থাৎ জমি জিরেতের আয় থেকে। আজকের মত দিনে তাঁর মালিকের দানখাতা-সংক্রান্ত-ইচ্ছা, তিনি চুলচেরা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন। নইলে মালিকের আত্মা স্বর্গে গিয়েও শান্তি পাবে না। তিনি জানেন যে, এই দিককার তৌষাচ, জেনারেল হিসাবে না লাগতে দেবার দিকে নওরঙ্গী চৌবের কি রকম সজাগ দৃষ্টি—একেবারে শুচিবাই-এর মত।......

সেরিস্তা-ঘরে গিয়ে নাটোয়ার চৌধরী আমলাদের বলে দিয়ে এলেন, কেউ যাতে নিজের নিজের জায়গা থেকে না ওঠে। কখন কার দরকার পড়বে বলা যায় না।

যাতে কেউ আর তাঁকে এখন অযথা বিরক্ত করতে না আসে, সেইজন্য ঘরের দরজা বন্ধ করে দানখাতার শেষ হিসাব কষতে বসলেন। মাথার উপর খাঁড়া ঝোলা অবস্থায়ও যিনি জীবনে বিচলিত হননি, আজ তাঁর হাত কাঁপল প্রথম।

ওদিকে নওরঙ্গী চৌবের অসুখ বাড়বার কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামে, লোকের মুখে মুখে। নিজের নিজের কাজকর্ম ছেড়ে মেয়ে-পুরুষ সকলে গুটিগুটি এসে দাঁড়াচ্ছে, ভিটে-বাংলার মাঠের চারিদিককার বেড়া ঘিরে।... হরিবিলাস চৌবেকে বাইরের বারান্দায় পায়চারি করতে দেখে, তারা ততটা আশ্চর্য হয়নি, যতটা হয়েছে চিমটি কাটবার সেবাদাসীদের বাইরে চলে আসতে দেখে। চাঁপিয়ার দলের যে, দেউড়ির স্ত্রীলোকদের এখানে আসবার সময় ছাড়া, আর কখনও বেরিয়ে আসবার কথা নয়। তাঁরা এখনও আসেননিতো! ... এখনতো শুধু বলভদ্র উকিল রয়েছেন ভিতরে! তাঁর সঙ্গে এত কিসের গোপন কথা? ছেলে পাবে তো কিছু? অবশ্য নগদ যদি কিছু আজও থাকে।! সকলের চোখে মুখে প্রশ্ন, কত প্রশ্ন, কত উত্তর। আর এই সব প্রশ্নোত্তরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়ান অনুচ্চারিত এক বিরাট জিজ্ঞাসা। রুগীর নামের সঙ্গে সে প্রশ্ন মিশানো, ভিটেবাংলার প্রাঙ্গণে সে প্রশ্ন ছিটানো, বহুদিনের কৌতূহলের রসে সিঞ্চিত সে প্রশ্ন। রহস্যের কুয়াশায় ঢাকা। অতিথিশালার ভিড়ের সঙ্গে, তাঁর দানসাগর উপাধির সঙ্গে, তাঁর নাম, যশ, পশার প্রতিপত্তির সঙ্গে এর সম্বন্ধ। দানসাগরের উৎসমুখ সম্বন্ধে তাদের চিরকালের জল্পনা-কল্পনাগুলো আজ হঠাৎ স্পষ্টতর রেখায় আঁকা হয়ে গিয়ে, মনের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। জ্ঞাতসারে জানতে

বিষ ও বাঁশি ধীরা বসু

চাচ্ছে রুগীর বর্তমান অবস্থার কথা, কিন্তু অজান্তে হাতড়ে বেড়াচ্ছে অন্য একটা উত্তর।

এ নিয়ে কৌতূহল কি শুধু গ্রামের লোকের? জেলার এমন কোন বয়স্ক ব্যক্তি বোধ-হয় নাই, যে খোশগল্পের আসরে কখনো না কখনো, এ নিয়ে আলোচনা করে নি। সম্পন্ন গৃহস্থ বলতে যা বোঝায়, নওরঙ্গী চৌবের ক্ষেতজমি নিশ্চয়ই তার চাইতে বেশী। জমি ভাল, লাঠির জোর আছে, চাষবাসের কাজে শৃঙ্খলা আছে—সব ঠিক। কিন্তু চাষ-বাস থেকে আয়ের তো একটা সীমা আছে। কত আর হতে পারে? অন্য সম্পন্ন গৃহস্থের চেয়ে পাঁচগুণ বেশী? দশ গুণ? বিশগুণ? তার চেয়ে তো বেশী নয়? এই শ্রেণীর এত বিঘা জমি থেকে কত আয় হতে পারে তার একটা আন্দাজ আছে লোকের। তাতে মদ, মোসাহেব, মোটরগাড়ীতে খরচ করে সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকা যেতে পারে মাত্র; তার বেশী নয়। কিন্তু দানসাগরের আসল খরচ যে দানে। সে যে হাজার হাজার টাকার ব্যাপার। কেউ যে ফিরে যায় না খালি হাতে। আর দেওয়া মানে বেশ প্রাণভরে দেওয়া। দায়িত্বশীল প্রার্থী বুঝলে তিনি কখনও নিজে থেকে দানের পরিমাণ ঠিক করেন না। আন্তরিক বিনয়ের সঙ্গে শুধু জিজ্ঞাসা করেন—কত দিতে হবে?

দানের নেশা। সত্যিই এ এক অদ্ভুত আসক্তি; অথচ যেন নিরাসক্ত অবহেলায় ছিটিয়ে ফেলা। কোন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে হরির লুট লোটানোর কথাটা তবু বোঝা যায়; কিন্তু এ যেন ছেলেপিলের খোলামকুচি ছিটিয়ে খেলা।

এত টাকা আসে কোথা থেকে?

বাপ যদি ধরে নাও, কিছু নগদ টাকা রেখেও গিয়ে থাকেন, কিন্তু যে হারে খরচ তাতে সে টাকা ফুরাতে ক'দিন লাগে?

তবে এত টাকা আসে কোথা থেকে? কোন গোলমেলে ব্যাপার নাইতো এর মধ্যে?

এ খালি অজ্ঞ লোকের প্রশ্ন নয়। দানের পরিমাণ সরকারী সি-আই-ডি ডিপার্টমেন্টের নজরে পড়েছিল এক কালে। কিন্তু পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল শিকারের জন্য যাঁর আতিথ্য স্বীকার করেন, তাঁর বিরুদ্ধে কি কোন বুদ্ধিমান পুলিশ কর্মচারী এক কলমও লেখে?

আজও সেই প্রশ্নটা ঠেলে মনের উপর উঠে আসছে এতগুলো মেয়েপুরুষের। বেড়ার চারিদিক দিয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েরা, ভিটে বাংলার দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করে। বর্তমানের চেয়ে অতীতের কথাই মনে পড়ছে বেশী। সকলের স্মৃতিই যে খুব সুখপ্রদ তা' নয়। ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা অনুকূলে, যৌবনে, সম্মুখের ভিটাবাংলায় অন্তত একরাত্রিও কাটায়নি এমন মেয়ে এখানে কম। সেদিনকার ভয় কবে মন থেকে মুছে গিয়েছে; মনে লেগে আছে হয়ত একটু মধুর স্মৃতির রেশ।... কী মিষ্টি করে কথা বলতে পারেন!...... কী রকম ভাল ব্যবহার!......ভয় ভাঙ্গানর জন্য কেমন মজার মজার গল্প করতে পারেন! কে বলবে যে এ সেই সেই দোর্দণ্ড-প্রতাপ নওরঙ্গী চৌবে যার ভয়ে সরকারী জরিপের সময়, কোন আধিয়ারের সাহস হয়নি, নিজের অধিকার সম্বন্ধে সত্য কথা বলবার! যে লোকটা থানার দারোগার বাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছিল একবার রাগ করে, সে এত নরম!...এত উচ্ছৃংখল, অথচ এত সংযত!...

পুরুষদের মনে ক্ষোভ আছে, গ্লানি আছে, অপমানের রেশ হয়ত এখনও সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। কিন্তু ওই একটা দুর্বলতা ছাড়া সবই যে গুণ লোকটার! এত স্বেচ্ছাচারী, অথচ এত সহানুভূতি লোকের উপর! অন্ধকার রাত্রিতে যার লাস ভাসিয়ে দিয়ে আসে মাঝগঙ্গায়, তার পরিবারের আজীবন ভরণপোষণের ভার নেয়, বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত না হয়েও। খেয়ালের চাহিদা না মিটলে দুর্বৃত্তেরও অধম; অথচ 'ডেভৌড়ি'র শিবালয়ের শিবের মাথায় জল না দিয়ে, কিছু মুখে দেয় না!...এত বিশাল যার 'ডেউড়ি', তাঁর শেষ নিশ্বাস পড়বে কিনা এই ঘুপচী খোলার ঘরে! ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞা চৌবেজীর! বিচিত্র খেয়াল! নওরঙ্গী চৌবের বাবাও এই ঘরে মারা গিয়েছিলেন। অদ্ভুত আরেণ এ পরিবারের লোকের! বোম্বাই শহরে নওরঙ্গী চৌবের শরীর খারাপ হ'ল; সেখানে চিকিৎসার কত ভাল ব্যবস্থা; চলে এলেন এই ঘুপচীর ভিতর মরবার জন্য! আগে আর একবারও চলে এসেছিলেন শরীর খারাপ নিয়ে, নৈনীতাল থেকে! এঁ'র বাবা ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। ছেলে বড় হবার পর থেকে সঙ্গে সঙ্গেই রাখতেন—রাত্রিতেও। নিজের ছেলে হরবিলাসের বেলায় নওরঙ্গী চৌবে কিন্তু এ ব্যবস্থা বজায় রাখেননি। একদিনের জন্যও উনি ছেলেকে ভিটাবাংলায় আসতে দেননি।... কিন্তু কেন থাকে এরা এই খোলার বাড়ীটাকে আঁকড়ে পড়ে? শোনা যায় ওদের নাকি পাকা ছাত সয় না। দেখা যাচ্ছে যে, হরবিলাসের তো পাকা দালানের নীচে রাত কাটানো, বেশ সয়! তবে?...সেও কি বাপ মরলে এই ভিটাবাংলাতে এসেই শোবে রাত্রিতে?......

আরও কত কথা, কত সন্দেহ। তবু আসল প্রশ্নের উত্তর মেলে না।...এত টাকা আসে কোথা থেকে?...

বলভদ্র উকিল তাহলে এতক্ষণে ছুটি পেলেন!...হরবিলাসবাবু আবার রুগীর ঘরে ঢুকলেন।...আজ আর ছেলে, বাপের ঘরে ঢোকবার অনুমতির অপেক্ষা রাখছেন না। বাবার সঙ্গে চোখ তুলে কথা বলতে পারেন না কোনদিনই—এমনই ছিল সম্বন্ধ আর শিক্ষা। বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবারই নিয়ম। আজ সে নিয়ম ভাঙ্গলেন। [illegible] করুণ হাসি রুগীর মুখে।...একটু যেন মৃদু ভর্ৎসনা, না ডাকতে আসবার জন্য।...আশীর্বাদ করবার জন্য হাত তোলবার একটু যেন ব্যর্থ চেষ্টা।... তোর উপর এ ভূতের বোঝা চাপিয়ে যাব না—যেমন করেছিলেন আমার বাবা।...সে ভুল আর আমি করি!...

"হবে। হবে। পরে। পরে। আর একটু পরে।"...

এখনও যে এ পর্ব শেষ হয়নি। বলভদ্র উকিল তার নির্দেশ পেয়েছে। সে গেল ডেউড়িতে নাটোয়ার চৌধরীর কাছে। সেখানকার কাজ দুজনে মিলে শেষ করে, আবার তারা আসবে এখানে। তাদের বিদায় করে, তারপর তোদের ডাকবো।...

চাঁপিয়া এসে বসল মালিকের গায়ে আরাম করে দিতে। তার সঙ্গিনীরা পর্দার ফাঁক থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে—একটু নতুন ব্যাপার কিনা। আজ মালিকের ছেলে আর চাঁপিয়া দুজনে একই খাটে রুগীর পাশে বসেছে! বাবার ঘরবোঝাই চন্দনকাঠ স্টক করে রাখবার খেয়ালে, আগে ছেলের হাসি আসত; আজ গন্ধটা নাকে আসায় চোখ ছলছল করছে। চাঁপিয়ারও চোখে জল।

আসল খবর জানতে পারা যাচ্ছে না কিছুই। বেড়ার চারিদিকের মেয়েদের মধ্যে অধৈর্য গুঞ্জন ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বলভদ্র উকিল ডেউড়ির দিকে চলে গেল গাড়ীতে।...লোক ভাল উকিলবাবু!...যে কয়জন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে নওরঙ্গী চৌবে তাসের জুয়া খেলতেন সম্মুখের বারান্দায়, তাদের মধ্যে উকিলবাবুকে কতবার দেখেছে এরা। বারান্দার নীচের প্রশস্ত নিকানো জায়গায় এই সব মেয়েরা ক্ষেতের ফসল ঝাড়ে, শুকয়, গোলার ফসল রৌদ্রে দেয়, আবার গোলায় তুলে রাখে। এ কাজে পুরুষ জনমজুর নিযুক্ত করবার রেয়াজ নাই কোনকালে ভিটাবাংলার প্রাঙ্গণে। জুয়ার আসর বসবার দিনগুলোতে আবার বেশী বয়সের স্ত্রীলোকেরা কাজ পেত না। এ নিয়ে মেয়েদের মধ্যে রেষারেষি পড়ে যেত। প্রতি হাত শেষ হবার পর জেতা পয়সা, ছিটিয়ে হরিরলুট দিয়ে দেওয়া হত মেয়েদের মধ্যে। কাড়াকাড়ি, হুড়োহুড়ির মধ্যে, আড়চোখে, বিজুলী খেলানার ধুম লেগে যেত, চৌবেজীর ইয়ার-দোস্তদের খাতিরে।...সে সব দিন কি আবার আসবে!...ডেউড়িতে—মানুষ হরবিলাসবাবু কি আর ভিটেবাংলার এসব পাট রাখবে? সে এত টাকা পাবে কোথায়। হরবিলাসবাবু করছে কি এতক্ষণ ধরে ঘরের মধ্যে? বাপ বুঝিয়ে দিচ্ছে না তো কি করে যকের ধনের সিন্দুক খুলতে হয়?...না না তা' কি করে হবে; চাঁপিয়া যে রয়েছে ঘরের ভিতর।...ওটাকে ঘর থেকে বার করে দিলেইতো পারে! ওটা কি আর এখন ঘর থেকে নড়বে? চালাক আছে।...দেখা যাক কত দিয়ে যায় ওকে!...ওই নাটোয়ার চৌধরী থাকতে সেটি হবার জো নাই! সে গুড়ে বালি!...এত টাকা আসে কোথা থেকে?...

আর ওদিকে ডেউড়ির অফিসঘরে ম্যানেজার সাহেব আর বলভদ্র উকিল দরজা বন্ধ করে এতক্ষণ ধরে এত কি গোপন আলোচনা করছেন, তা নিয়ে আমলা মহলে জল্পনাকল্পনার শেষ নাই।...কোন গণ্ডগোলের ব্যাপার নিশ্চয়ই!... মালিককে দিয়ে কিছু লিখিয়ে নিল না তো? ...হরবিলাসবাবুর বিরুদ্ধে কোন ফন্দিফিকির নাইতো?...ম্যানেজার সাহেব সে রকম ধরণের লোক না তো। ম্যানেজার সাহেবের উপর হরবিলাসবাবু আর তাঁর মা বেশ বিরক্ত মালিককে হাতের মুঠোয় এনে এত টাকা দান খাতায় খরচ করিয়ে দেয় বলে। মালিক গেলে আর কি হরবিলাসবাবু ম্যানেজার সাহেবকে রাখবে চাকরিতে?...তখন বোঝা যাবে এত টাকা আসত কোথা থেকে।...কি করে যে মালিককে জাদু করেছে নাটোয়ার চৌধরী!...

বন্ধ ঘরের দরজা ধাক্কা দিয়ে অন্দরমহলের দাই জানিয়ে গেল—বুড়িমা বলছেন, গেস্টহাউসে বসে বসে ডাক্তারগুলো করছে কি? মালিক যদি তাদের ঘরে ঢুকতে বারণও করেন, তাহ'লেও তো তা'রা ভিটাবাংলার বারান্দায় বসে থাকতে পারে। রুগীর কাছাকাছি থাকাটাই কি উচিত না?...অন্দরমহলের কথার জবাবে বিরক্তি প্রকাশ করবার সাহস নাটোয়ার চৌধরীর নাই। দরজা খুললেন না; শুধু বললেন—"আচ্ছা"।

আমলাদের চোখে চোখে খেলে গেল—"এত কিসের কাজ?"

দরজা খুলল ঘণ্টা দুয়েক পর। দোতলার জানলা থেকে কয়েক জোড়া ব্যথাতুর চোখের দৃষ্টি গিয়ে থামল নীচের মোটরগাড়ীখানার উপর।

..এরাতো দেখি নিজেরাই আবার ভিটাবাংলায় চলল! কাজ না ছাই!...বোধ হয় বাড়ীর মেয়েদের যেতে দেবে না ঠিক করেছে। এরকম সময়েও রেহাই দেবে না নাটোয়ার চৌধরী! ..জোর করে তাঁরা চলে যেতে পারেন ভিটাবাংলায়। নাটোয়ার চৌধরী যদি গাড়ী নাও দেয়, তাহলে তাঁরা হেঁটেও বেরিয়ে পড়তে পারেন।...কিন্তু মালিক যদি চটেন তাঁদের যেতে দেখে!...সে সাহস, সে অধিকার, সে দাবি এ বাড়ীর মেয়েদের নাই। ব্যর্থ, অব্যক্ত আক্রোশ চোখের জল ছাড়া আর অন্য কোন পথ পাচ্ছে না বার হবার।

ভিটাবাংলার বেড়ার চারিদিকের মেয়েপুরুষে সরে দাঁড়িয়ে, পথ করে দিল ম্যানেজার সাহেব আর বলভদ্র উকিলকে, ভিতরে ঢোকবার।

...আঁ! এটা আবার কে? ভিড় ঠেলে ঢুকল ভিতরে? ছুটছে! জুম্মরাতিয়ার মা না? হাতে একটা ডাব!

"ম্যানেজার সাহেব! ম্যানেজার সাহেব!"

বারান্দায় ওঠবার সিঁড়িতে দুজনে থমকে দাঁড়ালেন।

এত সাহস কোথা থেকে পেল বুড়িটা!...

শঙ্কাকাতর মিনতি জুম্মারাতিয়ার মায়ের। ...দানসাগরের নামে বাঁজা গাছে ফল ধরে।...এ অঞ্চলে নারকেল গাছ বিরল। উঠনে লাগানো নারকেল গাছে ফল ফললে, প্রথম ফল মানত করা ছিল দানসাগরের নামে। ভেবেছিল তিনি ভাল হলে দেবে।...কিন্তু...কিন্তু...

হাউ হাউ করে কাঁদছে সে।......

এখন কি রুগীর ডাব খাবার সময়? তবু নাটোয়ার চৌধরী ডাবটা নিলেন বুড়ির হাত থেকে।

কই এঁ'রা দুজন ঢুকতে হরবিলাসবাবু বেরুলেন না তো! চাঁপিয়াও থাকল ভিতরে! বাড়ীর লোক আর ডাক্তার বদ্যি, এদেরইতো এখন রুগীর কাছে থাকবার সময়; কিন্তু থাকছে যত বাইরের লোক!...ভিটাবাংলার সবই অদ্ভুত! বোঝা যায় না কিছুই।

......কিসের এত কথা? কেন এত আনাগোনা? কী রে? কখন রে? কাকে রে? অসংখ্য

ছোট ছোট প্রশ্নের অফুরন্ত স্রোত অজানাতে এগিয়ে চলেছে দানসাগরের একটা মনের-মত উৎসমুখের সন্ধানে।

নাটোয়ার চৌধরী একবার বাইরে এসে জুমরাতিয়ার মাকে জানিয়ে গেলেন যে, মালিক তার ডাবের জল খেয়েছেন, আর সেই খবরটা তাকে জানিয়ে দিতে বলেছেন। ডুকরে ডুকরে কাঁদছে বুড়িটা। জুমরাতিয়া তাকে ধরে বাইরে নিয়ে এল।

...কোথাকার কোন এক বুড়ির উপর যাঁর এত দরদ তাঁর কি এখনও একবার, নিজের আত্মীয় পরিজনের কথা মনে পড়ছে না?...

...মনে পড়বে না কেন—হরবিলাস, পড়ছে। সবুর! আর একটু সবুর কর!...আগের কাজ আগে।...যা করছি এও তোমাদেরই জন্য! এর ছোঁয়াচ লাগাতে দিতে চাই না তোমাদের গায়ে। আমার সঙ্গে সঙ্গে এ শেষ হয়ে যাক!...

বাবার চোখের হঠাৎ আসা স্নেহকোমল দৃষ্টিটুকু আরও কত কি বলছে ছেলেকে।

তাঁর মুখের কাছে কান নিয়ে গিয়ে তাঁর কথা বুঝতে চেষ্টা করছেন ম্যানেজার সাহেব। ফিসফিস করে বলা কথা; তাই তাঁর ঠোঁটের কাঁপনের উপর নজর রেখেছেন বলভদ্র উকিল।

চাঁপিয়া আর হরবিলাসবাবু কিছু কিছু শুনতে পাচ্ছেন কথাগুলো। তাঁদের চেয়ে বেশী বুঝতে পারছেন বলভদ্র উকিল। কথার সবটুকু বুঝছেন শুধু নাটোয়ার চৌধরী।

চাঁপিয়া আর হরবিলাসের সম্মুখে একটু বাধোবাধো ঠেকায়, ম্যানেজার সাহেব মালিকের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন যথাসম্ভব সংক্ষেপে।

"...হাঁ হুজুর।...সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। ...যেমন যেমন বলেছিলেন।...কিছু চিন্তা করবেন না আপনি।...আমি আছি কিসের জন্য। ...হাঁ গিয়েছে। হাঁ হয়েছে।...ওটাও হয়েছে। ...একেবারে আলাদা রাখা হয়েছে ও হিসাব। ...বলভদ্রবাবু এখনই যাচ্ছেন সদরে।...ওঁকে সব বুঝিয়ে দেওয়া আছে। কাল কাজ সেরে ফিরে আসবেন হুজুরকে খবর দিতে। এবার তাহলে আমরা যাই? বাড়ীর লোকদের পাঠিয়ে দেইগে?"

"দাঁড়াও!"

এরপর ম্যানেজার সাহেব আর কোন কথা বলেননি। বলেছেন মালিক। দরকারী কথা। অন্তিম নির্দেশ। নিজের সম্বন্ধে। শুনতে বাধ্য সকলে।..."গঙ্গাতীরে না।...এই বারান্দায়। ঘরভরা চন্দনকাঠ। আরও অন্য কাঠ। প্রচুর। প্রচুর ঘি। বাড়ীটা পুড়ে যাক। মরবার দু'ঘণ্টার মধ্যে!...বাস!"

বোঝা গেল ছেলের উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তিনি তাঁর শেষ ইচ্ছা জানিয়ে গেলেন ম্যানেজার সাহেবকে—যাতে পরে এ সম্বন্ধে বাড়ীর অন্য লোকদের ওজর আপত্তি না টেকে।

চারজনের চোখেই জল।

বলভদ্র উকিল আর নাটোয়ার চৌধরী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ীতে চড়লেন। তারপর বেরুল চাঁপিয়া।

চাঁপিয়াকে বেরুতে দেখেই বেড়ার ধারের লোকরা বুঝে গিয়েছে যে, এইবার মায়েরা আসছেন। ঠিকই তাই; সিঁড়ির কাছ থেকে **ঘর পর্যন্ত যাবার জায়গাটা কানাত দিয়ে আড়াল করে দেওয়া হল। আর আশা বুঝি নাই!** ...মেয়েরা সব ঘিরে ধরেছে চাঁপিয়াকে—সঠিক খবর পাবার জন্য।

হাঁরে চাঁপিয়া ফটোগেরাপের ঘরের মধ্যে যকের ধনের সিন্দুক আছে নাকিরে? একদিন উঁকি মেরে দেখালিনা কেন? তোর কি মনে হয়—এত টাকা কোথা থেকে আসতোরে?

'আসে' না—আসতো। অতীতকাল। আর কেউ ভুলেও নওরঙ্গী চৌবে বলবে না—বলবে দানসাগর।

চাঁপিয়ার দল বেরিয়ে এসেছে, আর বাড়ীর মেয়েরা ঢুকেছেন ভিটাবাংলায়। ভিটাবাংলার স্মৃতি-বর্ণালীর উগ্র রঙগুলো মুহূর্তের মধ্যে মুছে গিয়েছে মন থেকে।—অতীতে মিলিয়ে গিয়েছে এর চোখঝলসানো জলুস। এক শান্ত জ্যোতির্মণ্ডলের কোমল সোনালী দ্যুতি ভিটাবাংলাকে ঘিরে। কারও মুখে কথা নাই। ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। চাঁপিয়া কত পেল সে কথা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছে মেয়েরা তাকে। মুহূর্তের মধ্যে রহস্যের একটা সমাধান, কি করে যেন এতগুলি মনকে নিজের আওতায় টেনে নিয়েছে। নাটোয়ার চৌধরীর হুকুমে একদল মজুর এখানকার গোলাগুলো থেকে ফসল সরিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। পুরুষ মানুষে আজ প্রথম এখানকার গোলার কাজে হাত দিয়েছে; তবু মেয়েরা অবাক হল না। যেন এইটাই এখানকার চিরাচরিত প্রথা।

'বাস করো'—সংক্রান্ত কাজ শেষ হয়েছে নাটোয়ার চৌধরীর। তবু কাজের বোঝা তাঁর মাথা থেকে নামেনি এখনও। মালিক যে হুকুম দিয়েছেন, মারা যাবার দু ঘণ্টার মধ্যে সব শেষ করতে হবে! কত কাজ! সময় নাই তাঁর মোটে। "মোতি সিং! কলাইএর বস্তাগুলোকে গাড়ী থেকে নামিয়ে রাখাও এক নম্বর গেস্টহাউসে!"

স্টেশন যাবার পথে বলভদ্র উকিল আনমনা হয়ে পড়েছেন। ভিটাবাংলার চন্দনের গন্ধটা যেন এখনও নাকে এসে লাগছে।...উকিল মানুষ। বহু রকম লোকের সংস্পর্শে তাঁকে প্রত্যহ আসতে হয়; কিন্তু এমন বিচিত্র খেয়ালের লোকের সান্নিধ্য তিনি আর কখনও পাননি। অদ্ভুত বিবেক নওরঙ্গী চৌবের! দান-খয়রাতের তহবিলে যত খরচ হয়, সেই আয়ের উপর প্রাপ্য সরকারী ট্যাক্স সে কড়ায়গণ্ডায় চুকিয়ে দিতে চায়। বিবেক পরিষ্কার রাখবার এই টাকাটা, নাম না জানিয়ে যথাস্থানে পাঠানর ভার তাঁর উপর।

...ছোটবেলায় মাত্র কিছুদিন দুজন এক সঙ্গে পড়েছিলেন। তারপর ওর বাপ, ওকে পাঠিয়ে দেয় বোম্বাইতে ভাল করে ফোটোগ্রাফি শিখবার জন্য। বন্ধু হিসাবে নওরঙ্গী চৌবে তাঁকে যে এতকাল মনে করে রেখেছে, সেই ঢের। ওকালতি জীবনে—সামান্য কাজের জন্য কম টাকা পাননি তিনি বন্ধুর কাছ থেকে।......

কিন্তু এত টাকা কোথা থেকে আসত?

তিনিও সঠিক জানেন না। কোনদিন এ কথা জিজ্ঞাসা করেননি বন্ধুকে। শুধু **এইটুকু বুঝেছেন যে দানসাগরের স্রোতের** উৎসমুখ গোপনে রাখবার জিনিস। **উকিলের** মন, তাই মনে হয়েছে যে ভিটাবাংলার ফোটোগ্রাফির ঘরের সঙ্গে, এর **হয়ত সম্বন্ধ থাকতে** পারে। নওরঙ্গী চৌবের বাবাও **শোনা যায় ওই** ঘরে রাত্রিতে জপতপ করতেন।...কাল **যখন** তিনি রাতের ট্রেণে আবার ফিরবেন, **তখন হয়ত** স্টেশনেই খবর পাবেন যে একটু **দেরী করে** ফেলেছেন তিনি আসতে।...স্টেশনের **প্ল্যাটফর্ম** থেকে দূরে অন্ধকারে তাকালে দেখবেন ভিটেবাংলার দিকের আকাশ **হয়ত লাল হয়ে** গিয়েছে। দূর থেকে বাঁশ ফাটার **শব্দ কানে** আসছে।...আগুনের **হলকা সত্ত্বেও অগণিত** লোক হয়ত চাপ বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকবে ভিটেবাংলার চারিদিকের বাঁশের বেড়া ঘিরে। ...নীরব, শোকান্বিত, শ্রদ্ধাবনত, **মোহাবিষ্ট।** ...ধোঁয়ার সুবাস, আগুনের উত্তাপ, আর **মনের** আবেশের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে **একটি নূতন** কিংবদন্তীর বীজকণা। একদৃষ্টে **তাকিয়ে** রয়েছে আগুনের শিখার দিকে। **প্রতি মুহূর্তে** আশা করছে দেখবে, লাল-চেলি-পরা **এক নারী**-মূর্তিকে, ধোঁয়ার কুণ্ডলীর **উপর ভর দিয়ে,** আকাশের দিকে চলে যেতে!...আগুন নিভলে পুরুষেরা এই ছাই আঁজলা ভরে ভরে নেবে; মেয়েরা নেবে আঁচলে বেঁধে; মায়েরা ঠেকাবে ছেলের কপালে!...'এত টাকা কোথা থেকে আসত?' এ প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গিয়েছে তারা।......

উঁচুনীচু রাস্তায় একটা হঠাৎ ঝাঁকানিতে গরুর গাড়ীর ছৈয়ের সঙ্গে মাথা ঠুকে গেল বলভদ্র উকিলের।

মুহূর্ত

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আশ্চর্য আলোর মত অপরূপে সময় মিলায়।
এ মুহূর্তে খসে' পড়ে যায়:
গোলাপের পাপড়ি যেন স্তব্ধ চোখে দেখে
কেন যে দাঁড়িয়ে দেখা এত কাছে থেকে!
মুহূর্তে হারায়—
কবে কার মত চোখ অপ্রস্তুত-দুর্বল লীলায়।

প্রস্তুত ছিলাম তবু রাখী নিয়ে হাতে
দুটিকেই বেঁধে রাখি কোনো এক রাতে।

চৈত্রসন্ধ্যা: অভাবিত বৃষ্টি আর ঝড়ে
বাহুভঙ্গী শ্লথমায়া সিক্ত করে মন।
কিসের স্বীকৃতি যেন ঝরে' ঝরে' পড়ে!
আবার বৈশাখে এক ধুলোমাখা ঘরের কোণেতে
আলোর জাফ্‌রি কালোনীল ছায়া-জমিতে তখন
ফুটে উঠে কথা কয়: মিশে যায় মৌনের বনেতে

কত যে শরৎ এল স্পর্শ-অকাতর!
কথা আলো ভেসে গেল, ভরে গেল মেঘ।
অন্তর্নিত কোজাগর: তবু তো পাথর—
নিথর মুহূর্ত ওড়ে, শূন্যেরই আবেগ।

শহরের ভীড় ছেড়ে
কল্যানীতে চলুন
মহানগরীর কল-কোলাহলের বাইরে,
প্রকৃতির শান্ত-সবুজ পরিবেশে,
সুন্দর উপনিবেশ এই কল্যাণী।
ছকে-বাঁধা ছোট-বড় বাড়ী,
কর্মক্লান্ত দিনান্তের শেষে
মনে মনে জনে জনে শান্তি দিবে আনি।
১৮৮এ, রাসবিহারী এ্যাভিনিউতে একটি সেল্‌স্ প্রমোশন অফিস খোলা হয়েছে। কল্যাণী সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় সম্পর্কে উক্ত অফিসে সন্ধান পাবেন।
পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

পুরুষ সিংহ

(৪১ পৃষ্ঠার পর)

থামো, যাবার সময় ডাক্তার নন্দীকে একবার কল্ য়ে যেও দিকি—। হাঁটুটা দেখানো দরকার।"

"যে আজ্ঞে" বলে চলে গেলো হরিপদ। আজ র বিজ্ঞের মতো বলতে গেলো না, "আমার শ্বাস স্যার, এটা গেঁটে বাতের পূর্বলক্ষণ—"। দিন বলে মার খেতে খেতে রয়ে গিছলো।

একটু পরেই কিন্তু যে এলো সে ডাক্তার ন। এতো তাড়াতাড়ি তাঁর আসার কথাও নয়। এলো সে একেবারে অপ্রত্যাশিত। এলো নোতোষ।

প্রাণতোষের লেক্ প্লেসের বাড়ীতে নোতোষের এই প্রথম পদার্পণ।

দাদা!

অবাক হলো প্রাণতোষ, হয়তো বা একটু বিস্মিতও।

সম্পর্ক রাখবার গরজ প্রাণতোষ কোনোদিন অনুভব করেনি, অথচ মনোতোষ আজ নিজেই এলো।

মনোতোষের মুখে কিন্তু সে অভিমানের চিহ্নমাত্র নেই।

কাঁচাপাকা চুলের নীচে বয়েসের রেখাঙ্কিত মুখটা যেন খুশিতে জ্বল জ্বল করছে।

"তা'পর ভালো আছো তো? আসাটাসা হয়ে ওঠে না ভাই, নানান ঝামেলা জানোইতো? তার ওপর তোমার বৌদির সাধে ইচ্ছে করেই আর এক ঝামেলা বাধাচ্ছি—" ছোটখাটো এই ভূমিকাটুকু করে মনোতোষ সন্তর্পণে পকেট থেকে একখানি হলদে কাগজের নিমন্ত্রণ পত্র বার করে। কুণ্ঠিত হাসি হাসি মুখে বলে "তোমাকে আর 'পত্তর' দিয়ে কি বলবো, সে সব কিছু না, চিঠিটা দেখানোর জন্যেই দেওয়া, সামনের বুধবার খোকার বিয়ে, যেতে হবে, করা কর্ম্ম—সবই করতে হবে বুঝলে তো?" বড়ো হাসি হাসি ভরা মুখে তাকিয়ে থাকে মনোতোষ।

প্রাণতোষের প্রাণ থেকে কিন্তু এই হৃদয়োচ্ছ্বাসের সাড়া ওঠে না, সে কেমন যেন অসাড় দৃষ্টি মেলে অবাক হয়ে বলে "খোকার বিয়ে! আমাদের খোকার!"

"হ্যাঁ ভাই, দিয়েই ফেলছি। তোমার বৌদির সাধ! তা'ছাড়া—আমিও ভাবলাম একটা কর্তব্য তো বটে, ও যতো মিটিয়ে ফেলা যায় ততোই মঙ্গল। চাকরী বাকরী যাহোক একটা করছেও যখন।"

অনেকদিন আগের সেই কথাটা মনে পড়লো প্রাণতোষের।

সেই যখন ক্লাশ ফাইভে পড়তো খোকা, মাদুরে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে শুয়ে পড়া বলে দিতো মনোতোষ, আর প্রাণতোষ—ওদের দিকে চেয়ে ঘৃণার হাসি হেসে ভাবতো—

কিন্তু আজ আর সেই ঘৃণাটা খুঁজে পেলো না প্রাণতোষ। চিরদিনের অনভ্যস্ত—চিরদিনের হেয়, ক্ষুদ্রপ্রাণ দাদার ওই খোঁচা খোঁচা দাড়িসম্বলিত মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন ঈর্ষা বোধ করলো—[illegible] কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রাণতোষ গাঙ্গুলী। আর বোধ করি কি বলবে ভেবে না পেয়েই হঠাৎ একটা প্রসঙ্গান্তর কথা বলে বসলো "দাড়ি কামাওনি কেন?"

"দাড়ি।" গালে একবার হাতটা বুলিয়ে হেসে উঠলো মনোতোষ, "আর দাড়ি কামানো। তোদের বৌদি কদিন থেকে যা নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে! উঃ! জগতে যেন আর কারুর ছেলের বিয়ে হয় না। কিন্তু যেতে হবে ভাই—" মনোতোষ যেন ভাইকে তুই বলবে কি তুমি বলবে বুঝে উঠতে পারছে না। তাই মনের ভুলে একবার তুই বলে ফেলেই সন্তর্পণে 'তুই তুমি' বাঁচিয়ে কথা চালায়। "যেতে হবে করতে হবে, সময় হলে না বললে চলবে না। মনে থাকে যেন। তা' হলে উঠি? আরো অনেক জায়গায় যেতে হবে।"

মনোতোষ চলে যাবার পর প্রাণতোষ অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে চেষ্টা করলো—মনোতোষ তার চাইতে ক'বছরের বড়ো।

চার? পাঁচ? তার বেশী আর কোথা থেকে হবে, প্রাণতোষ যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে তখনই না দাদার বিয়ে হলো? তখন? তবে কখন? নাঃ কিছুতেই আর হিসেব ঠিক হলো না।

বিয়ের দিন যাওয়ার সময় হয়নি।

সেদিন সন্ধ্যায় কোম্পানীর একটা জরুরী মীটিং ছিলো।

গেলো ফুলশয্যার দিন, যেদিন বৌভাতের ভোজ।

সুট পরেই বয়েসটা কাটলো।

তবু পোষাকী হিসেবে খানকতক শান্তিপুরী ধুতি আছে বাহান্ন ইঞ্চি বহরের, আছে কড়া আদ্দি আর মোলায়েম গরদের কটা পাঞ্জাবী। কনে দেখতে যাবে বলে করিয়েছিলো—সম্প্রতি আর দুটো।

পরিপাটি করে সেই ধুতি পাঞ্জাবী পরে নিলো প্রাণতোষ। মাখলো আতর।

হঠাৎ ভারী স্ফূর্তি আর কৌতূহল বোধ করছে, যেন বন্ধুর বিয়ের নেমন্তন্নে যাচ্ছে! কেন কে জানে!

সাড়ে তিন শো টাকা দিয়ে একটা নেকলেস কিনে নিলো, নামী জুয়েলারের দোকান থেকে, খোকার জন্যে একটা আংটি কিনলো এক শো তিরিশ টাকায়। গুছিয়ে গাছিয়ে গাড়ীতে উঠলো প্রাণতোষ।

টু-সীটারে নয়, প্রকাণ্ড স্টুডিবেকারে।

পৈত্রিক বাড়ীর সেই গলির মধ্যে গাড়ী ঢুকলো না, সাবধানে কোঁচা বাঁচিয়ে—পায়ে পায়ে ঢুকে পড়লো প্রাণতোষ বাড়ীর মধ্যে। আর সহসা যেন বিয়ে বাড়ীর সমস্ত হৈ চৈ মৃদুরবে ঠাণ্ডা হয়ে এলো।

"প্রাণতোষ এসেছে, প্রাণতোষ!"

অস্ফুট সেই মন্দ্র-গুঞ্জরণ।

শুধু পিসতুতো ভাই কানাই সহাস্য কলরবে এগিয়ে এলো, "আরে পানুদা যে! মনুদা, মনুদা, বৌদি, পানুদা এসেছে। তা'পর? বেশ আছো পানুদা, দিব্যি একখানা লৌকিক দিলে যা হোক।"

চিরদিনের বখা কানাই, স্বভাব বদলায়নি। চেহারাটাও যে বিশেষ বদলেছে তাও নয়। দেখা গেলো কানাই-ই আপাততঃ কর্মকর্তা। [illegible] ওপর গোঞ্জি পরে সে একেবারে হৈ চৈ করে বেড়াচ্ছে।

কখনও কি ভালবেসেছিলে

অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়

কখনও কি ভালবেসেছিলে?
সেই ভালবাসা
যা তোমায় কাঁদিয়েছিল
প্রত্যাহের দুঃসহ বিরহে,
যা তোমার তনুমন ছেয়ে
আনন্দের আলো
সন্তর্পণে দিয়েছিল জেলে।

সেই ভালবাসা
যা তোমায় পথে এনেছিল
দীনতম অকিঞ্চন সাজে,
যা তোমায় দিল উদাসীর
নির্লিপ্ত বিত্ত
ঐশ্বর্য্যের ভূরিভোজ মাঝে।

সেই ভালবাসা
যা তোমায় করেছিল রাজা
আপন বাঞ্ছিতের অহংকারে,
যা তোমার অসীম শূন্যতা
ভরে দিয়েছিল
বেদনার অমৃত সম্ভারে।

সেই ভালবাসা
যা তোমার যৌবনের সুধা
কণ্ঠভরি পান করেছিল
তান্ত্রিকের নির্মম বিলাসে।
যা তোমায় স্নিগ্ধ শান্তমনে
করেছে প্রণাম
নিষ্কলুষ পূজা অভিলাষে।

সেই ভালবাসা
যা তোমার ধেয়ান মগনা
যুগান্তর পারে মহাশ্বেতা,
যা তোমারে দিল পরাজয়
তবু বুঝেছিলে
জীবনের শ্রেষ্ঠ এই জেতা।

সেই ভালবাসা
যা তোমার প্রাণকেন্দ্র ঘিরে
আশা ভরা বাসা বেঁধেছিল
হৃদয়ের উষ্ণতার পাশে,
যা তোমার দিবস রাত্রিরে
পূর্ণ করেছিল
সত্য-শিব-সুন্দর সুবাসে।

ওকে দেখে নিজেকে কেমন আড়ষ্ট লাগছে প্রাণতোষের।

কিন্তু আড়ষ্টতা নেই শিবানীর মধ্যে। সে এসে সস্নেহে আহ্বান জানালো—"এসো ঠাকুরপো বৌ দেখবে চলো।"

কই কারো তো কোনো অভিযোগ নেই প্রাণতোষের ওপর, যেন ও [illegible]সেছে এই [illegible]। কিন্তু প্রাণতোষের এতো লজ্জা করছে কেন?

ভোজের আয়োজন পাশের প্রতিবেশীর বাড়ীতে। বৌ বসানো হয়েছে তিন তলার ছাতে চাঁদোয়া টাঙিয়ে। বাড়ীতে আর জায়গা কোথা? শিবানীর এই প্রথম কাজ, [illegible]

অতিরিক্ত লোক জড়ো করেছে. মহিলার দল ছাতেই চাঁদের হাট বাজার বসিয়েছেন।

সিঁড়িতে উঠতে হাটুটা খচ্ খচ করছে, আস্তে আস্তে উঠতে হচ্ছে প্রাণতোষকে, শিবানী অভ্যস্ত ভংগীতে চটপট করে উঠছে কটা সিঁড়ি, আবার ভদ্রতা দেখাতে একটু দাঁড়াচ্ছে। কতোদিন আগে বুড়ো হয়ে গিয়েছিলো শিবানী, এখনো এই রকম সিঁড়ি ভাঙতে পারে?

"এই যে বৌমা মুখ তোলো! তোমাদের কাকাবাবু। সেই যাঁর কথা গল্প করছিলাম—"

বৌয়ের মুখটা একটু তুলে ধরলো শিবানী। আর—আর সেই মুহূর্তে প্রাণতোষ যেন স্তব্ধ হয়ে গেলো। এ কী! এ কে!

এই তো সেই মুখ, লাবণ্যে ঢল ঢল, স্বাস্থ্যে জ্বল জ্বল!

এই তো সেই চোখ! মদির স্বপ্নময়!

এই তো 'কনে'!

এমনি একখানি কনেরই তো ধ্যান করে এসেছে প্রাণতোষ সমস্ত বয়েসটা ধরে! শিবানী এ 'কনে' কোথায় পেলো?

এরকম তো ভাবেনি প্রাণতোষ? যখন পৈত্রিক বাড়ীর গলির মধ্যে এঁটো কলাপাতা আর ভাঙা গেলাস খুরির স্তূপ ডিঙিয়ে পা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে আসছিলো, তখন ভেবেছিলো 'যেমন দান তেমন দক্ষিণা! যেমন বিয়ে, তার তেমনি আলতা।' নির্ঘাৎ কালো-কুলো গোল-গাল চোখে কাজল একটা খুকি জুটিয়েছে শিবানী, খোকা ছেলের জন্যে।

কনে দেখে হঠাৎ মনে হলো, শিবানী যেন এতোদিন পরে প্রাণতোষের ব্যংগের শোধ নিয়েছে।

কিন্তু শিবানীর মুখে শুধুই নির্মল খুসির আলো।

ঘাম ঘাম তেল তেল মুখ, সিঁদুরের টিপটা লম্বা হয়ে কপালে ছড়িয়ে পড়েছে, রগের কাছে কঁগাজা চুলে রুপোলি আভা, খস্‌খসে একখানা নতুন গরদের শাড়ী জড়িয়ে-সড়িয়ে পরা, সেই আঁচলেই মুখের ঘাম মুছতে মুছতে উচ্ছ্বসিত প্রশ্ন করছে শিবানী—

"বৌমা পছন্দ হয়েছে তো ঠাকুরপো? আমি ভাই নাম করে ডাকবো না, বৌমাই বলবো, আমার বৌমা বলার বড়ো সাধ। এখন বলো দিকি আমার পছন্দকে নিন্দে করতে পারবে?"

প্রাণতোষ এতোক্ষণে যেন চৈতন্যের রাজ্যে এসে পৌঁছয়। তাড়াতাড়ি কেস সুদ্ধই গহনাটা নতুন বৌয়ের হাতে গুঁজে দিয়ে বলে "বেশ বৌ হয়েছে, বেশ বৌ হয়েছে। ইয়ে খোকার জন্যে একটা আংটি এনেছিলাম।"

"ওমা! কী কান্ড! আবার খোকার জন্যেও গয়না! তা' সে কি আর এ মুল্লুকে আছে? বোধ হয় ও বাড়ীতে পরিবেশন করছে। দাও, আমার কাছেই দাও।"

পরিবেশন! আ ছি ছি ছি!

গা টা গুলিয়ে উঠলো প্রাণতোষের। জীবনের পরম কাব্য আর চরম সৌন্দর্যের দিনে ছ্যাঁচড়া আর ছোলার ডালের বালতি নিয়ে ছুটোছুটি!

ঠিক আছে! ঠিক আছে! আজো এদের অনায়াসেই কল্পনা করতে পারে প্রাণতোষ।

নিমন্ত্রিত মহিলাদের ভীড়কে পাশ কাটিয়ে ছাতের এদিকে আসতে গিয়েই কিন্তু আর একবার চমকে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো প্রাণতোষকে। এ আবার কি! এখানে এ পরীর রাজ্য তৈরি করলো কে? এ কোন্ ঘর? সেই টালীর ছাত দেওয়া ঘরটা? বিদ্যুৎ বাতির ব্যবস্থাপনায় ঘরের মধ্যে উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার মতো স্নিগ্ধ সুষমাময় আলো, জানলা-দরজায় হালকা নীল পাতলা ছিটের পর্দা, সামনের দেওয়ালে ড্রেসিং আয়নার ওপর থরে থরে প্রসাধন দ্রব্য সাজানো, মাঝখানে ধূপদানীতে ধূপ জ্বলছে। পাশের দেওয়াল ঘেঁসে সৌখিন বেডকভার বিছানো নতুন খাট বিছানা, আর সমস্ত খাট আর খাটের ছত্রি ঘিরে শুধু ফুল আর ফুল, শুধু মালা আর মালা!

ফুলের গন্ধ ধূপের গন্ধ, আর এসেন্সের গন্ধ, সব মিলিয়ে ঘরটাও যেন নববধূর মতো মৌন প্রতীক্ষায় মন্থর!

'এই ঘরে নাকি!'

অস্ফুট একটা জিজ্ঞাসা যেন অশরীরী প্রেতের মতো দগ্ধ নিশ্বাস ফেললো।

শিবানীর লক্ষ্য কম, সে বকে চলেছে "হ্যাঁ ভাই! তোমার সেই ঘরটি। এই ঘরটুকু ছাড়া ছেলে বৌকে দেবার মতো ঘর আর কই বাড়ীতে? মেজেটা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো, বদলে নিলাম। এই খাট বিছানা খোকার শ্বশুর দিয়েছে, আর ওই ড্রেসিং আয়নাটা। আলমারি চেয়ার কিছু দিতে পারেনি, যাক্‌গে, আমিই বা রাখতাম কোথায়! তত্ত্বয় কিন্তু দেদার ফুল দিয়েছে ভাই, খোকার বন্ধুরা এসে সাজিয়ে দিয়ে গেলো! কে বলবে সেই ঘর, চেনবার জো রাখেনি।"

হঠাৎ ভারী অবাক লাগলো প্রাণতোষের। অবাক আর অরুচি। সেই একটা বাচ্চা ছেলের জন্যে ভোগের এই আবেশময় আয়োজন! এই পুষ্প আর পুষ্পসার সুরভিত ঘর, এই কুসুমাস্তীর্ণ যুগল শয্যা, অথচ দেখে লজ্জা করছে না এদের?

লজ্জা যেন প্রাণতোষেরই। ভয়ংকর সেই লজ্জার তাড়নাতেই বুঝি তাড়াতাড়ি নিচের তলায় নেমে এলো প্রাণতোষ, পায়ের ব্যথা ভুলে।

শিবানী অনেক দুঃখ করে বললো—"খোকার বিয়েতে তুমি খাবে না ঠাকুরপো? আমার বড়ো সাধ ছিলো আজকের এই একটা দিন তোমাদের দুই ভাইকে একসঙ্গে বসিয়ে খাওয়াবো।"

মনোতোষ বোধ হয় শিবানীর এই ধৃষ্টতায় লজ্জা পেলো। তাড়াতাড়ি বললো "না না, শরীর যখন ভালো নয় বলছে পীড়াপীড়ি কোরোনা। তুমি বরং একটু ভালো মিষ্টি গাড়ীতে তুলিয়ে দাও।"

গাড়ী আছে বড়ো রাস্তায়,—গলিটা হেঁটে পার হতে হবে। সন্দেশের বাক্স নিয়ে ছুটে আসছে কানাই গাড়ীতে তুলে দিতে। "শরীরটা একখানি এতো খারাপ করে ফেলেছো পানুদা সে নেমন্তন্ন খেলে সয়না? আমার দেখছো? এখনো লোহা খেয়ে..... কে নন্তু, এই শোন্ শোন্ ইদিকে আয়! জ্যাঠামশাইকে প্রণাম কর। এইটি আমার বড়ো ছেলে পানুদা, গেলো বছর আই এস সি পাশ করেছিলো, যাদবপুরে ভর্তি করে দিয়েছি — [illegible] মাঝে মাঝে দেখা হলে বেশ লাগে কিন্তু। তুমি তো আমার [illegible]কে ভাগেই করেছো—"। ছুটে চলে গেলো কানাই। নন্তুও গেছে। গাড়ীর কোণটায় নিজেকে নিক্ষেপ করে চোখটা বোজে প্রাণতোষ। আসার সময় নিজে বসেছিল চালকের সিটে, এখন আর সে এনার্জি নেই।

"সিধে বাড়ী তো স্যার?"

ড্রাইভার ফুলচাঁদের প্রশ্নে "হুঁ" দিয়ে বসে রইলো প্রাণতোষ দামী গাড়ীর আরামদায়ক সিটের এক কোণে। ঘাড় হেলিয়ে নয়, কেমন যেন ঘাড় গুঁজে।

হাঁটুটায় অসম্ভব চিড়িক মারছে, ভারীও হয়ে উঠেছে। নামবার সময় ফুলচাঁদের সাহায্য নিতে হবে বোধ হয়। গোঁজা গোঁজা ঘাড়ের জন্যেই কি মুখটা অমন ঝোলা ঝোলা দেখাচ্ছে প্রাণতোষের? না ছেলেমানুষ খোকার ফুল বিছোনো দাম্পত্য শয্যার লজ্জায় মুখটা তার অমন ঝুলে পড়েছে?

ঝড়ে-জলে ধ্বসে-পড়া জরাজীর্ণ সেকেলে বাড়ির
আমরা ভিতর থেকে ঘুণে-খাওয়া আসর মানুষ।
এ পৃথিবী আমাদের আহতের আশ্রয়-শিবির,
পরাস্ত জীবন-যুদ্ধে, জ্বরে আর
বিকারে বেহুঁস্।

চারিদিকে কোলাহল—কারা যেন কাঁদে,
কারা হাসে;
সে হাসি কান্নার শব্দে মাঝে মাঝে
ভাঙে তন্দ্রা-ঘোর,
সহসা দুঃস্বপ্নে যেন চেতনা পীড়িত হয় ত্রাসে
তারপর মুহূর্তেই আবার সে তন্দ্রায় বিভোর।

আমাদের পথে নেই সুদূরের অদৃশ্য আহ্বান,
আমাদের পথ-চলা একই পথে নিত্য যাতায়াত;
সে-পথে পড়ে না চোখে শ্যামশোভা রমণীয় স্থান,
নগ্ন পায়ে লাগে শুধু কংকরের কঠিন আঘাত।

আমাদের মন নেই, আছে শুধু জৈবিক কামনা,
তাই নিয়ে চলে নিত্য জীবনের যত লেন-দেন;
যেখানে মাংসের গন্ধ সেখানেই করি আনাগোনা,
আকণ্ঠ করেছি পান সংসারের মদিরা সফেন।

আমরা তলিয়ে গেছি সমুদ্রের চোরা পাকে পড়ে,
দু'চোখ ছড়িয়ে দেব কূলে উঠে আকাশের নীলে
সে আশা নির্মূল,—ফের কল্পনার পক্ষীরাজে চড়ে
যোগ দেব মানুষের আনন্দ ও বেদনা মিছিলে।

নিঃশেষিত আমাদের আলো আর উত্তাপের পুঁজি,
নিয়ত সংঘর্ষ লেগে নক্ষত্রের মতো গেছি ক্ষয়ে,
নতুন মানব গ্রহ আকাশের কোণে তাই বুঝি
চুপি চুপি দেখা দিল নতুন প্রাণের বার্তা বয়ে।

আমাদের
অভিবাদন
গ্রহণ করুন
অনুমোদিত মূলধন ৪,০০,০০,০০০, টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ২,০০,০০,০০০, টাকা
সংরক্ষিত তহবিল ১,১৫,০০,০০০, টাকা
চেয়ারম্যান
জি, ডি, বিড়লা
জেনারেল ম্যানেজার
এস, টি, সদাশিবন
দি
ইউনাইটেড
কমার্শিয়াল
ব্যাঙ্ক লিঃ
কলিকাতা
দৃঢ়তা ও সেবার জন্য

নতুন যুগের প্রতীক্ষা

আমাদের দেশে শারীরিক শিক্ষার সংজ্ঞা নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ দেখা যায়। শারীরিক শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্য এই সব বিভিন্ন মতাবলম্বীরা নানা রকম মতের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে থাকেন। কেউ বলেন, পেশী সঞ্চালন প্রদর্শন ও দৈহিক সৌষ্ঠব বৃদ্ধিই শারীরিক শিক্ষার আদর্শ; কেউ মনে করেন মল্লযুদ্ধ, ভারোত্তোলন, রাইফেল চালনা, ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার ইত্যাদিই শারীরিক শিক্ষার লক্ষ্যস্থল—আবার কেউ বা শুধু যোগ ব্যায়ামকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। ফুটবল, বাস্কেটবল, ভলিবল, ক্রিকেট, হকি, টেনিস, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, এ্যাথলেটিকস, তীর ছোঁড়া, জিমন্যাসটিকস্, সাঁতার প্রভৃতি এবং আত্মরক্ষা-মূলক ব্যায়াম, ঘোড়ায় চড়া—এমনকি স্বাস্থ্য শিক্ষাও শারীরিক শিক্ষা তালিকার অন্তর্গত। সুতরাং উপরোক্ত যে কোনও দু' একটি বিষয় নিয়ে গোঁড়ামী করে সেই বিষয়গুলিকেই বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে শারীরিক শিক্ষা বলে প্রচার করে কোনো লাভ নেই।

শারীরিক শিক্ষা, আজ শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন এক দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে বিবেচিত হয়ে স্থান গ্রহণ করেছে শিক্ষা ব্যবস্থায়। বিদ্যায়তনের শিক্ষা থেকে শারীরিক শিক্ষাকে এখন আর আলাদা করে দেখা হয় না। শিক্ষা ও শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য এক, দৃষ্টিভঙ্গীও এক—সুতরাং শারীরিক শিক্ষা, শিক্ষাবহির্ভূত বিষয়-বস্তু নয়—শিক্ষা ও শারীরিক শিক্ষা ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত। শিক্ষা ও শারীরিক শিক্ষা একই বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই শারীরিক শিক্ষা আজ বিদ্যালয়ের অবশ্য শিক্ষারূপে বিবেচিত হচ্ছে এবং জগতের প্রগতিশীল দেশগুলিতে খেলার মাঠ ছাড়া কোনো বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিকল্পনাও রচিত হয় না।

শিশু শিক্ষায় খেলাধূলোর স্থান সর্বাগ্রে। শিশুর খেলাই স্বাভাবিক বৃত্তি—এ বৃত্তিকে নিরোধ করে শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার রীতি অস্বাভাবিক বলে পরিগণিত হয়েছে। শিশু শিক্ষায় বর্তমানে খেলাধূলোর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি আজ আবিষ্কৃত হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে নানা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্যে খেলাধূলোর মধ্য দিয়ে শিশুর চরিত্র গঠন ও অন্যান্য শিক্ষা অতি সহজেই সম্ভব হয়। ক্রমে শিশু শৈশব থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করে এবং অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তার খেলাধূলো অথবা শারীরিক শিক্ষার শিক্ষা তালিকাও পরিবর্তন হতে বাধ্য। শারীরিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম শিশু, কিশোর, যুবক, স্ত্রীলোক ও পুরুষ ভেদাভেদ রেখে দেশ, কাল, প্রকৃতি, স্বভাব, আগ্রহ বিচার করে রচিত হয়ে থাকে। এইরূপ শারীরিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম অনুশীলন করলে অনুশীলনকারী সত্যই লাভবান হন। বয়সানুপাতে শারীরিক ও মানসিক শক্তি বিবেচনা করে শারীরিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম একদিকে অনুশীলনকারীর সুস্থ শরীর লাভের সহায়তা করে, অন্যদিকে সে সুনাগরিকরূপে নিজেকে গড়ে তোলে। নম্রতা, শৃঙ্খলাপ্রিয়তা, ক্ষিপ্রতা, সহযোগিতা, ভদ্রতা, নেতৃত্ব, নেতাকে অনুসরণ করার ক্ষমতা, জয়-পরাজয়ে সমতা, ন্যায় ও নিষ্ঠা প্রভৃতি সদগুণ লাভ শারীরিক শিক্ষা দ্বারা শিশু মনে বিকাশ করানো সম্ভব। এইসব গুণ একবার যদি শিশুর মনে বিকশিত করানো সম্ভব হয়, তবে এইসব শিশুরা কৈশোর ও যৌবনে যে এই গুণরাশি অর্জন করে দেশের সুনাগরিক হবে—এ আশা অত্যন্ত সঙ্গত।

আমরা স্বাধীন হয়েছি দশ বৎসর। এই দশ বৎসর ধরে আমাদের বহু গুরুতর সমস্যার সমাধান করতে হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে। শারীরিক শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে আজ শিক্ষাবিদদের মনে কোনো দ্বন্দ্ব, দ্বিধা না থাকলেও, পরিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থায় শারীরিক শিক্ষা ব্যবস্থা 'আবশ্যিক'ভাবে করতে হলে অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়। জনসাধারণ ও সরকারের সহ-যোগিতা ছাড়া উন্মুক্ত স্থানে খেলার জায়গা পাওয়া সম্ভব নয়। প্রত্যেক বিদ্যালয় কর্তৃ-পক্ষেরই উচিত বিদ্যালয়ের সাথে খেলার মাঠের ব্যবস্থা করা। বিদ্যালয় গৃহ থেকে যেন খেলার মাঠ নিকটে হয়—অন্ততঃ এরূপ ব্যবস্থা করা দরকার। বাংলা গভর্ণমেন্টের উদ্যোগে শারীরিক শিক্ষার জন্য একটি শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে এই মহা-বিদ্যালয়টি কোলকাতা থেকে বাণীপুরে স্থানান্তরিত হয়েছে। সেখানে এই বৎসরেই মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষক না থাকলে শারীরিক শিক্ষা সফল হয় না। একদল সমালোচক বলে থাকেন,

(শেষাংশ ১৪৫ পৃষ্ঠায়)

অনুশীলনই প্রকৃষ্টপথ

কার্তিক বসু

বাংলা দেশের খেলাধূলোর জগতে পুজোর মাসটা সন্ধিক্ষণ বিশেষ, একটা মরশুম বিদায় নিতে চলেছে আর একটা উঁকি মারছে। এই সন্ধিক্ষণে বিগত কটা দিনের হিসেব নিকেশের সঙ্গে আসন্ন কদিনের প্রত্যাশাকে কেন্দ্র করে আলোচনার অবতারণা করা অপ্রাসঙ্গিক নয়, অবাঞ্ছনীয়ও নয়।

যা অতীত তা চলে গিয়েছে নাগালের বাইরে কিন্তু যা অনাগত তা আছে আমাদেরই আয়ত্তের মধ্যেই। প্রস্তুতি থাকলে অনাগতকালে যে সম্ভাবনার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে আছে তা একদিন ফলে ফুলে বিরাট মহীরূহে পরিণত হতে পারে। মানুষ বেঁচে থাকে আশায় আশায়, জীবন সংগ্রামে তাকে প্রতিনিয়তই শক্তি যোগায় ভবিষ্যতের সম্ভাবনা, আগামী দিনের প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশাই আজ আমাদের আহ্বান জানাচ্ছে নতুন দিনকে গড়ে তুলতে। তাই আমার ভাবনা ভবিষ্যতকে নিয়ে।

গড়ার কাজ সহজসাধ্য নয়, গড়ে তোলার পথ দুরূহ সাধনার পথ। তার জন্যে চাই চেষ্টা, আন্তরিকতা এবং পরিশ্রম সাপেক্ষ নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন। বাংলা দেশের তরুণ কিশোরেরা সহজাত প্রবৃত্তির টানে খেলাধূলোর আনন্দ সাগরে যে অবগাহন করছে। খেলা করে তারা যে আনন্দ পায় সে আনন্দ উপভোগের মাত্রা একাধিকে বাড়াতে পারে যদি তারা পারে আরও ভাল খেলতে। ক্রীড়ামানের যদি উন্নয়ন ঘটে তা হলে মাঠে মাঠে ক্রীড়ার স্বাচ্ছন্দ্য এবং বাধাই হবে তাদের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক এবং সে ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সাফল্যই হবে মনে আনন্দ, প্রশান্তি এনে দিতে পারে।

কিন্তু খেলার মাঠে ব্যক্তিগত সাফল্য অর্জন করতে হলে চাই ব্যক্তিবিশেষের সাধিত প্রয়াস। আর ব্যক্তিবিশেষের সাফল্যই শেষ পর্যন্ত দলগত, জাতিগত প্রচেষ্টাকে সফল, সার্থক করে তোলে। বাংলা দেশের যে কিশোর তরুণেরা আগামী মরশুমে ক্রিকেট খেলতে চায়, ব্যক্তিগত চেষ্টায় যারা দলের স্বার্থ রক্ষায় অভিলাষী, যারা মনে করে দূর ভবিষ্যতে একদিন তাদেরই কেন্দ্র করে সর্বভারতীয় খেলার আসরে বাংলাদেশ সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবে কেবলমাত্র তাদেরই সামনে আমি আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতাপ্রসূত চিন্তাধারার কিছুটা তুলে ধরছি।

কে না জানে যে, ভাল খেলা নিয়মিত অনুশীলন সাপেক্ষ, বিশেষতঃ ক্রিকেট খেলা। ফাঁকির পথে কোন বড় কাজ করা যায় না। ভালভাবে খেলতে হলে, খেলার মতো খেলতে হলে আগে দরকার মানসিক প্রস্তুতি। তার পর কায়িক পরিশ্রম আর সুচিন্তিত পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা অনুসারেই আগামী দিনের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মরশুমের প্রাক্কালে নির্দিষ্ট অনুশীলনের মাধ্যমে কঠোর ব্রতে আত্মনিয়োগ করতে হবে। অনুশীলনের কোনো বাঁধাধরা পদ্ধতি নেই, যার দুর্বলতা যেখানে সেখানেই তাকে কোমর বাঁধতে হবে। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, সপ্তাহের অন্যূন পাঁচ দিন অনুশীলন করা চাইই।

অনুশীলন পদ্ধতি পরিচালিত হবে শুধু মাত্র একটি বিষয়ে নয়, ক্রিকেটের তিনটি মূল বিভাগকে কেন্দ্র করেই। অনুশীলনের সময় ব্যাট করতে হবে, বল করতে হবে আর করতে হবে ফিল্ডিং। শেষের বিষয়টির উপরই আমি বেশী জোর দিচ্ছি, কারণ দলগত ক্রিকেট খেলায় ফিল্ডিংয়ের গুরুত্ব সব চেয়ে বেশী হলেও অনেক সময় এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটি যেন উপেক্ষিত থেকে যায়। অথচ ব্যাটিং, বোলিং আর ফিল্ডিংয়ের মধ্যে শুধুমাত্র চেষ্টার জোরেই ফিল্ডিংয়ের মানোন্নয়ন করা যায়। সেই হিসেবে বলা চলে যে, ভালভাবে ফিল্ডিং করার বিষয়টা একান্তভাবেই একজনের নাগালের মধ্যে থেকে যায়, কিন্তু এ কথা ব্যাটিং বা বোলিং সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। ব্যাটিং বা বোলিংয়ে সাফল্যলাভ করতে হলে বিপক্ষের দুর্বলতার সন্ধান করতে থেকে, উঁচু-নীচু, দূরপাল্লার, কাছাকাছি এক শরীরের দু পাশেই যেন বল এসে পড়ে থ্রোয়িং বা বল ছোঁড়ার পদ্ধতি দু রকমের। কখনো শরীরের পাশ থেকে যাকে বলা যায় 'সাইড ওয়েজ' আবার কখনো কোমরের নীচে থেকে তলা দিয়ে হাত ঘুরিয়ে যাকে বলি 'আন্ডার আর্ম থ্রোয়িং'।

প্রথম প্রথম সজোরে বল না ছোঁড়াই বিধেয়। পেশীগুলি অভ্যস্ত হওয়ার আগে সজোরে বল ছুঁড়তে গেলে হাতের আঘাত ছাড়া পৃষ্ঠদেশের পেশীতে এমনই টান পড়ে যায়, সে জখম সেরে উঠতে অনেক সময় লাগে। অনেক সময় এ চোট সারেও না, তাই দেখি অনেক নামকরা বোলার সারাজীবনে 'সাইড ওয়েজ' থ্রোই করতে পারলেন না। ক্যাচ ধরার সময়েও আঙুলে যাতে আঘাত না লাগে সেদিকে নজর রাখতে হবে। আসলে সব কিছু সইয়ে নিয়ে নিজেকে করতে হবে প্রস্তুত।

ব্যাটিং অনুশীলনের সময় দৃষ্টিকে আরও সজাগ রাখা দরকার। উইকেট বা পিচের অবস্থা যদি আদর্শ না হয় তাহলে প্রথমদিকে যথার্থ ফাস্ট বোলিংয়ের সম্মুখীন হওয়া উচিত নয়। অনিশ্চিত উইকেটে পড়ে জোর বল লাফিয়ে ব্যাটসম্যানের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে ভয়ের ভূত ছাড়ানো সহজ নয়। নরশুমের সুরুতে কোনো ব্যাটসম্যানকে সামনে না রেখে শুধু স্ট্যাম্প পুঁতে নেটে ঠিক মতো লেংথে বল খেলার অভ্যাস করা বোলারদের পক্ষে

ক্রিকেট খেলতে হলে সবার আগে ফিল্ডিং অনুশীলন প্রয়োজনীয়।

হয়, খুঁজতে হয় পরের ভুলচুকের ফাঁকফোকরগুলি, ক্ষেত্র বিশেষে বিপক্ষের পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দিতে প্রয়োজন ঘটে নিজের অসামান্য দক্ষতার।

ফিল্ডিং অনুশীলনের সময় মাঠের প্রকৃত অবস্থার দিকে দৃষ্টি থাকা চাই। উঁচু নীচু মাঠে গড়ানে বল ধরতে গিয়ে আঙুলের ডগায় আঘাত পেলে অথবা উঁচু ক্যাচ ধরতে গিয়ে পা মচকিয়ে গেলে হিতে বিপরীত ঘটে যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে প্রাথমিক আঘাতই হয়তো মরশুমের মাঝে কোনো খেলোয়াড়কে সাময়িক অবসর গ্রহণে বাধ্য করে দেবে। কোন খেলোয়াড় প্রতিদিন কতক্ষণ ফিল্ডিং অনুশীলন করবে সে বিষয় নির্দিষ্ট করে দেওয়া অনুচিত, তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, একটা মোটামুটি রীতি অনুসরণ করা ভাল। তীব্রগতিতে কয়েকবার ছুটে গড়ানো বল ধরা ছাড়া অন্ততঃ বার পঞ্চাশ করে ক্যাচ ধরা ও বল ছোঁড়া উচিত। ক্যাচ ধরার সময় বল আসবে যে কোনো দিক

শ্রেয়। কারণ তাতে লক্ষ্য স্থির হয় এবং বোলারদের মনঃসংযোগের ক্ষমতা বাড়ে।

মরশুম সুরু হবার পর শিক্ষার্থীদের অনুশীলন পদ্ধতি কিছুটা বদলে ফেলা দরকার। সপ্তাহের দুটি দিন ম্যাচ খেলার জন্যে রেখে বাকী পাঁচ দিনই অনুশীলন করা, বিশেষ ভাবে ফিল্ডিং করা উচিত। গত কদিনের প্রস্তুতির পর এবার সজোরে ছুটে গড়ানে বল ঠিকভাবে ধরেই উইকেটরক্ষকের হাত লক্ষ্য করে চকিতে ছুঁড়ে দিতে হবে, উঁচু নীচু যে কোনো ধরণের ক্যাচ বিনা সঙ্কোচে ধরে ফেলতে হবে এবং সব চেয়ে বড় কথা হলো যে বল কোনদিকে যেতে পারে সে বিষয়টা আগেই তাহাকে বুঝে নিয়ে নির্দিষ্ট দিকে পা বাড়িয়ে রাখতে হবে আগেভাগেই। বল মারার পর অথবা বল ছোঁড়ার পর নিজেকে প্রস্তুত করে বলের দিকে যাওয়ার মানেই তো বৃথা সময়ের অপচয় ঘটানো। বিশেষতঃ বর্তমান

(শেষাংশ ১৬৬ পৃষ্ঠায়)

সঙ্কল্প ও সাধনা

শঙ্কর বিজয় মিত্র

গোপনচারিণী গহন রাত্রি। নিবিড় আঁধারে পৃথিবীর বক্ষ ঢেকেছে। সুষুপ্তির ক্রোড়ে আশ্রয় নিয়েছে নর-নারী। শুধু একটি নারীর চোখে ঘুম নেই। অসহ্য রোগ যন্ত্রণায় শয্যায় ছটফট করছে। তবুও একটি আশা মনের কোণে বিদ্যুতের শিখার মত জ্বলে উঠছে—আর কি গিগোলোর পিঠে চড়ে ঝড়ের মত উড়ে যেতে পারবো না কোন দিন? আরব-বেদুইনদের মত ঊষার মরুর বুকের উপর বালি উড়িয়ে ছুটবে না—কি আমার বাহন গিগোলো? অমানিশার ঘোর কাটবে একদিন হয়তো—এইতো কয়েক দিন আগেও অটুট স্বাস্থ্য আর অপরিমেয় যশ তাঁর মুঠোর মধ্যেই ছিল। সুদৃঢ় বাহুতে, সমগ্র শরীরে শক্তির বন্যা বয়ে যেত আর আজ সে পঙ্গু, পরাভূত, যন্ত্রণায় কাতর।

হাসপাতালের মৌন পরিবেশে রোগশয্যায় শুয়ে আকাশ-পাতাল ভেবে চলেছেন এই নারী। এই নারী আর কেউ নন, বিশ্ব বিজয়িনী অশ্বারোহিণী মাদাম লিস হার্টেল। কোপেন-হেগেনবাসিনী লিস হার্টেল বাল্য থেকে যৌবন পর্যন্ত অশ্বারোহণে পারদর্শিতা লাভ করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করলেন। বিবাহ বন্ধনে বন্ধ হয়ে সংসার পাতলেন, স্বামী পুত্রের স্নেহ নীড়ে আনন্দের ধারা বইল। তারপর অকস্মাৎ ১৯৪৪ সালে একদিন আক্রমণ হল দুরন্ত ব্যাধি অপঙ্গের।

হাসপাতালে ডাক্তার, নার্স সকলেই যখন তাঁর চলচ্ছক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নৈরাশ্যের কথা বললেন, তখনও লিস হার্টেল পুনরায় অশ্বা-রোহণের কথা ভাবছেন। অসাধারণ মনের জোর এই নারীর। হাসপাতালের শয্যায় দেহ তাঁর যখন অক্ষম, অশক্ত হয়ে পড়ছে, মন তাঁর তখনও ছুটে চলেছে। শুধু তাই নয় সংকল্প তাঁর হয়েছে দৃঢ় হতে দৃঢ়তর। তাই হাস-পাতালে কোন রকমে দুটো সপ্তাহ কাটলেই লিস হার্টেল বাড়ী যাবার সিদ্ধান্ত করলেন।

গৃহে এসে চলল তাঁর অখণ্ড সাধনা। জরা জয়ের কঠোর তপস্যায় ব্রতী হলেন লিস হার্টেল। এই সাধনায় তাঁর সর্বক্ষণের সহায়ক হলেন একদিকে তাঁর প্রিয়তম দয়িত, অন্যদিকে তাঁর স্নেহময়ী জননী। ডাক্তারী চিকিৎসা, অঙ্গ সংবাহন ও বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিস হার্টেল নিজ পদ্ধতিতে চালালেন এক অদ্ভুত চিকিৎসা।

বিছানা থেকে ঘরের ছাদের সঙ্গে কতক-গুলো কপিকল লাগানো হল, আর লিস হার্টেলের হাত-পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে বেঁধে রাখা হল বিভিন্ন ধরণের রজ্জু। অপর প্রান্তে কপিকলের সঙ্গে সমান ওজনের ভার রাখা হল। মাংসপেশীর সামান্যতম আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে হাত বা পা কপিকলের সাহায্যে আন্দোলিত হবে এই ব্যবস্থায়। কিন্তু দিনের পর দিন গেল। মনের অদম্য ইচ্ছাশক্তি এতটুকু আন্দোলনের সৃষ্টি করতে পারলো না তাঁর দেহে। মাঝে মাঝে ভেঙে পড়ে মন। কি হবে এই ব্যর্থ সাধনায়? ব্যর্থ বাসনার দাহ জ্বালিয়ে দিতে থাকে অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত। তবুও আশা ছাড়েননি হার্টেল।

তারপর একদিন এক শুভ ক্ষণে ক্ষীণতম আশার রশ্মি দেখা দিল। সেদিন সকাল থেকে হার্টেল বার বার তাঁর ডান হাতখানা তোলবার চেষ্টা করছেন। অকস্মাৎ হাতখানা নড়ে উঠলো। কী আনন্দ! তবে কি তাঁর সাধনা সফল হবে? আনন্দে, আকুলতায় চোখ ভরে জল এল। বাড়ীতে সেদিন এই ক্ষীণতম হস্ত দোলনকে কেন্দ্র করে উৎসব বসে গেল। আশার বহ্নিকে প্রজ্বলিত রাখতে হবে যে!

অবিচল সংকল্প ও নিরলস সাধন ব্যর্থ হয় না কখনও। হার্টেলের অপঙ্গ অঙ্গগুলি তাই ক্রমে ক্রমে প্রাণ পেতে থাকে। এখন সে উঠে বসতেও পারে। এবার তাই প্রক্রিয়ার পালা বদল। মেঝের সঙ্গে জিমন্যাসিয়ামের

মাদাম লিস হার্টেল

দু'খানা বাইসাইক্লিং মেসিন ফিট করা হল এমনভাবে যে একটাতে প্যাডেল করলে অন্যটার প্যাডেলও আপনা থেকে ঘুরতে থাকবে। এর একখানায় বসে লিস অন্যখানায় বসে তাঁর মা কিম্বা স্বামী। কী প্রাণান্তকর প্রয়াস! কিছু-ক্ষণ এইভাবে চালাবার পরই লিসকে শুইয়ে দিতে হয় বিছানায়। তবুও চলতে থাকে এই জীবনপণ ব্রত সপ্তাহের পর সপ্তাহ! এই প্রক্রিয়ায় উরুতের মাংস পেশীতে যেন খানিকটা প্রাণ সঞ্চার হল।

এই সাফল্য অধিকতর উৎসাহ এনে দিলে। এবার সুরু হল হামাগুড়ি দেবার পালা। মেঝেতে একখানা বড় তোয়ালে পেতে লিসকে উবু করে তার উপর ছেড়ে দেওয়া হল। তোয়ালের একদিক ধরে থাকেন স্নেহময়ী মা, অন্যদিক ধরে থাকেন প্রেমময় পতি! মেঝে থেকে সামান্য তুলে ধরা হয় লিসের তন্বী-তনু—হামা দিয়ে শিশুর মত এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে সে। এই প্রক্রিয়াই সবচেয়ে শ্রম-সাধ্য। তাঁকে যখন এই চেষ্টার পর বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হত, তখন লিস প্রায় সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলতেন। প্রথম প্রথম লিস কোন-ক্রমে কয়েক ইঞ্চি মাত্র হামা দিতে পারতেন। ক্রমশঃ এই প্রক্রিয়ায় উন্নতি হতে থাকে এবং লিস হার্টেল প্রতিদিন পূর্ব দিনের তুলনায় এক গজ বেশী হামা দিতে লাগলেন।

এখনও তো লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাতে অনেক দেরী। অধীর হয়ে ওঠেন হার্টেল। আর দেরী নয়, এবার হাঁটতে হবে। চললো এবার হাঁটার সাধনা—নবীন শিশুর মত হাঁটেন হাঁটি হাঁটি পা-পা। কিন্তু দেহের ভার রেখে পাও আর নড়তে চায় না। বগলে ক্রাচের উপর ভর দিয়েও যে চলা যায় না। তবে কি, এইখানেই ইতি করতে হবে সাধনার? না। না। চেষ্টা চালাও। ফল ফলবেই একদিন। হলও তাই। বহু দিনের চেষ্টার পর ক্রাচের উপর ভর দিয়ে কয়েক পা চলতে পারলেন হার্টেল। সংকল্পে অবিচল এই নারী দুখানা ক্রাচের উপর ভর রেখে এখন পথ চলতে সুরু করলেন।

দীর্ঘ আট মাসের সাধনায় লিস যখন চলতে পারলেন, আত্মীয় বন্ধুর দল আনন্দে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে গেল। অপঙ্গ (পোলিও) রোগকে জয় করে তিনি অঙ্গকে সচল করে-ছেন আবার। ধন্য নারী লিস, ধন্য তাঁর সাধনা।

বন্ধু-বান্ধবরা ভাবলে লক্ষ্যের চরম স্থানে লিস পৌঁছেছে। এর বেশী কীই বা সম্ভব। কিন্তু লিস হার্টেল ভিন্ন ধাতের মেয়ে। তাঁর কাছে সাধনায় আংশিক সাফল্যই সব নয়। সংকল্পের পূর্ণ পূর্তিই সাধনার চরম লক্ষ্য। তাই একদিন দেখা গেল হার্টেলের চক্র চেয়ার-খানা এগিয়ে চলেছে তাঁদের অশ্বাবলের দিকে যেখানে বাঁধা আছে তাঁর প্রিয় অশ্ব গিগোলো। গিগোলোকে তার সাজ সরঞ্জাম পরিয়ে আনা হল হার্টেলের কাছে।

শরীরের এই অবস্থায় অশ্বারোহণ চলে কিনা এই নিয়ে অবিশ্যি মা, মেয়ে ও পতির মধ্যে প্রবল বিতর্ক হয়ে গেছে, কিন্তু লিসের যুক্তির কাছে সব আপত্তি স্রোতের মুখে কুটোর মত ভেসে গেছে। লিস বললেন, হয়তো বা গোড়াতে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যেতে পারে সে, কিন্তু এই পতনের মুখে মনের ভয় তার শরীরের শিরা উপশিরাগুলিকে এমনভাবে একটা ধাক্কা দেবে যাতে তারা আবার নতুন প্রাণ পাবে। স্বীকার করতে হলো তার যুক্তিকে। চেয়ার থেকে চড়িয়ে দিতে হলো গিগোলোর পিঠে। ঘোড়া চলতে সুরু করেছে—টলমল করছে লিসের দেহ। সত্যি সত্যি পড়েও গেলেন। কিন্তু এই পতনের আঘাতকে উপেক্ষা করে লিস আশা ও আনন্দের বাণী শুনালেন মাতা ও প্রিয়তমকে। বললেন, ডাক্তার, বদ্যি কি বলবে জানি না। কিন্তু আমার কল্পনা আমার পরিকল্পনা সফল হয়েছে। পড়তে পড়তেও আমি গিগোলোর পিঠে চাপ দিতে পেরেছি এই দু'খানা শীর্ণ পায়ের সামান্য শক্তি দিয়ে। আজ আমার আশা হচ্ছে, আবার আমি গিগোলোর পিঠে চড়ে ঐ বিস্তীর্ণ রাজপথ, ঐ বিশাল প্রান্তর অতিক্রম করতে পারবো।

কিন্তু এই অশ্বারোহণের শ্রম লিসকে

(শেষাংশ ১৪৪ পৃষ্ঠায়)

দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন

শৈলেন মান্না

লেখক আমি নই, আমি খেলোয়াড়। মেহনত করে খেলাধূলো চালিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে কষ্টসাধ্য নয়, কিন্তু মাথা খাটিয়ে নিজের বক্তব্যকে সাধারণের সামনে পরিষ্কার করে ধরা আমার পক্ষে সত্যিই দুঃসাধ্য।

বক্তব্য আমার অনেক থাকতে পারে। অনেক কথাই আমার চিন্তা রাজ্যে জট পাকিয়ে রয়েছে, কিন্তু গ্রন্থি উন্মোচনের সমস্যা দুরূহ। তবুও কলম ধরেছি দায়ে পড়ে। দায়িত্বও কিছু রয়েছে বৈকি। আমার অসংলগ্ন বক্তব্যের সুর যদি কারুর কানে পৌঁছয়, এক খেলোয়াড়ের অভিজ্ঞতা যদি চিন্তানায়কদের চিন্তার নতুন খোরাক জুগিয়ে দিতে পারে তাহলে সে দায়িত্ব কিছুটা পালন করা হবে। আমার পরিশ্রম হবে সফল, খেলাধূলোর কল্যাণ কামনায় সমাজ সেবার যে পরিকল্পনা আছে আমাদের মতো অনেকেরই, তা' তখনই সার্থকতা লাভের পথের দিকে এগোবে।

বাংলাদেশ তথা ভারতে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সর্বাধিক প্রচারিত হলো ফুটবল খেলা। এ সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। মাঠে ঘাটে, অলিতে গলিতে ফুটবলকে কেন্দ্র করে যে উৎসাহ উদ্দীপনার জোয়ার বয়ে যায়, তার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে থাকতে পারে কে? বড় বড় শহরের চেনা কফিহাউস রেস্তোরাঁর মধ্যে ফুটবলের পাঁয়তারা আর গ্রামীণ বাজারের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র মুদিখানাতে চলে ফুটবলের আলাপ আলোচনা।

বিদেশের অনুপাতে আমাদের ফুটবলের মান যাই হোক না, আমাদের ফুটবল অনুরাগীদের উৎসাহ অন্য কোনো দেশের ক্রীড়ামোদিদের চেয়ে কম নয়। আমাদের খেলার মান অবশ্য আশানুরূপ উন্নত নয়। আগের চেয়ে আমাদের সার্বিক ক্রীড়া পদ্ধতির কিছুটা উন্নতি হলেও আমাদের আরও এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, বিশেষ করে বাংলাদেশের। কারণ, সর্বভারতীয় ফুটবলের আসরে বাংলা বরাবরই রয়েছে নায়কের নির্দিষ্ট ভূমিকায়।

আমাদের ফুটবলের যথাযথ মানোন্নয়ন কেন ঘটলো না? ঘটলো না আমাদের চিন্তার দৈন্যে। ফুটবল নিয়ে আমরা যতোটা সোরগোল তুলেছি, তার তুলনায় চিন্তা করেছি অনেক কম। আমরা খেলা দেখতে যাই, কিন্তু খেলাটা ভাল হোক এমন কথা জোর গলায় বলি না। বলার মতো বলা হলে, চাওয়ার মতো চাইতে পারলে অনুন্নত থাকার অভিশাপ থেকে হয়তো আমরা এতোদিনে মুক্তি পেতাম। আর কেন যে চাইনি তাও জানি না, খেলা আরও ভাল হলে ফুটবল খেলা দেখার সাধ কি আমাদের অপূর্ণ থেকে যেতো?

খেলার মানোন্নয়ন করতে হলে সবার আগে চাই বিজ্ঞানসম্মত পথে উপযুক্ত শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন। কিন্তু এ ব্যবস্থা আমাদের দেশে একেবারে নেই বললেই হয়। আমাদের ভবিষ্যৎ তরুণ কিশোরেরা কোন পথে পরিচালিত হলে সহজাত দক্ষতা ও শিশু প্রতিভা উপযুক্তকালে বিকশিত হতে পারে সেই পথের সন্ধান নেওয়া দরকার। সেই পথই আমাদের নির্দেশ দিচ্ছে বর্তমানের বীজকে ভবিষ্যতের মহীরুহে রূপান্তরিত করার তাগিদ, তাগিদ বাঁচিয়ে রাখার, সযত্নে লালন পালন করার।

উচ্চ, উন্নত ক্রীড়ামানের প্রত্যাশা থাকলে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে সেই সব শিক্ষা গৃহের দিকে যেখানে জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরেরা পাঠ্যপুস্তক সামনে রেখে তৈরী হচ্ছে। স্কুল, গুরুগৃহে, সবরকম শিক্ষার আয়োজন সেখানে থাকা চাই। খেলাধূলোর যথার্থ শিক্ষা পেতে হলে বিদ্যায়তনে প্রশস্ত অঙ্গনে ক্রীড়া শিক্ষার বিস্তৃত ব্যবস্থা থাকা চাই। কিন্তু এখনও আমাদের দেশে এ ব্যবস্থা নেই। এটা বেদনারই কথা। অনেক স্কুলে ব্যায়াম শিক্ষক আছেন, তাঁরা হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গড়ে

ফুটবলের মানোন্নয়নে চাই বিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন।

তুলতে চান, কিন্তু প্রচলিত লোকপ্রিয় খেলা শেখাবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়া বিশেষজ্ঞ শিক্ষকেরা বিদ্যায়তনে অনুপস্থিত। ব্যায়াম শিক্ষকদের এ পরিকল্পনা নিতান্তই অসম্পূর্ণ। কারণ স্কুলের গণ্ডি ছাড়ার পর শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশীরভাগই হালকা ব্যায়ামের আকর্ষণ ভুলে জনপ্রিয় খেলাধূলোর আসরে এসে উপস্থিত হয়। কারণ সেখানে তারা এমন কিছু পায় যার আবেদন, মূল্য তাদের বিবেচনায় স্কুলের হালকা ব্যায়ামের আবেদন ও মূল্যের চেয়ে বেশী।

সাম্প্রতিক বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি অনুসরণে স্কুল কলেজে ফুটবল ও অন্য লোকপ্রিয় খেলা শিক্ষা দেওয়া হয়। ইউরোপের প্রতিটি রাষ্ট্রে শিক্ষা ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান ব্যাপক শিক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, তাই ইউরোপ আজ আন্তর্জাতিক ফুটবল জগতের নায়ক। রাশিয়া ঠিক এই পথ অনুসরণ করেই আজ বিশ্ব শ্রেষ্ঠের মর্যাদা পেয়েছে। সোভিয়েট দেশে স্কুলের ছাত্রদের খেলাধূলা বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা, অভিজ্ঞ শিক্ষক, বিশেষজ্ঞদের সজাগ দৃষ্টির সামনে ছাত্রদের নিয়মিত অনুশীলন করতে হয়। ফলে দিনে দিনে সে দেশের সামগ্রিক ক্রীড়া মানের উন্নয়ন ঘটে।

জার্মাণীর শিক্ষণ ব্যবস্থা আমার আরও ভাল লেগেছিল। বাধ্যতামূলক আয়োজন ছাড়া সেখানে প্রতিভাবান ছাত্র-খেলোয়াড়দের জন্যে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। এই সব বাছাই ছাত্রদের আলাদা করে এক একটি বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রে বা ক্যাম্পে রাখা হয়, ক্যাম্প পরিচালনা করেন জার্মাণীর নামকরা কোচ বা বিশেষজ্ঞরা। ক্যাম্পে তারা মৌখিক ও হাতে-কলমে শিক্ষা লাভ করে। ক্যাম্পের অন্যান্য আয়োজনও নিখুঁত, শিক্ষার্থীদের আহার্য, সুচিকিৎসা ও সুষ্ঠু জীবন যাপনের অপরিহার্য অন্য সব আয়োজনও রয়েছে সেখানে। ইংলণ্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন প্রভৃতি দেশের ব্যবস্থাও কতকটা অনুরূপ।

ইউরোপের দেশগুলির পাশাপাশি নিজেদের দেশের অবস্থার কথা চিন্তা করলে দুঃখ হয়। আমাদের দেশের ছেলেরা শিক্ষণ ব্যবস্থা দূরে থাকুক, খেলার মাঠেরই সন্ধান পায় না। তাছাড়া আমাদের অভিভাবকেরা আজও খেলাধূলোকে তাতে তুলতে স্বীকৃত হননি। অভিভাবকের সম্মতি, উৎসাহ, পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া শিশু ক্রীড়া প্রতিভা বিকশিত হতে পারে না, একথা নিঃসংকোচেই বলবো, কারণ এ সম্পর্কে আমার নিজেরও কিছু অভিজ্ঞতা থেকে গিয়েছে।

অবস্থা প্রতিকূল, পরিস্থিতি আশাব্যঞ্জক নয়, সুযোগ সুবিধা সামান্য, আয়োজনও অসম্পূর্ণ, তবুও আমি ভবিষ্যতের সম্ভাব্য খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে বলবো যে, নিরাশ হলে চলবে না। আমাদের দেশেও যাঁরা বড় খেলোয়াড় হয়েছেন, তাঁরাও কিছু কম অসুবিধে ভোগ করেননি। তাঁদের কথা চিন্তা করেই আগামী দিনের খেলোয়াড়দের বড় হবার স্বপ্ন দেখতে হবে; তাঁদের দৃষ্টান্তে প্রেরণা পেয়ে করতে হবে নিয়মিত, নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন।

(শেষাংশ ১২৫ পৃষ্ঠায়)

সঙ্কল্প ও সাধনা

(১৪২ পৃষ্ঠার পর)

আবার শুইয়ে দিলে বিছানায়। পক্ষকাল নিতে হলো পূর্ণ বিশ্রাম। এমনি করেই চলে অশ্বারোহণের সাধনা। কিন্তু এগোয় না ত তাঁর পরিকল্পনা। ক্লান্ত হয়ে একদিন তিনি বলে উঠলেন "আর পারি না খুলে ফেল সব সরঞ্জাম।' কিন্তু অদ্ভুত এই মেয়ে। পরের দিনই আবার সেই চেষ্টায় অগ্রসর হলেন তিনি। দিনের পর দিন গেল, দমলেন না তিনি। তারপর একদিন কারুর সাহায্য না নিয়েই গিগোলোর পিঠে বসতে পারলেন। এই কঠোর চেষ্টার ফলে উরুদের পেশীগুলো যেন বলশালী হয়ে উঠেছে। এখন আর টলটল করে না নিজের দেহ, ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারছেন। দেখতে দেখতে অসাধ্য সাধন করলেন তিনি। তিনি মাতা ও স্বামীর বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে কদমে চালিয়ে দিলেন গিগোলোকে। অশ্বা-রোহণের সংকল্প পূর্ণ হোলো।

১৯৪৬ সাল। অপঙ্গ (পোলিও) আক্রমণের পর কেটে গেছে দুইটি বছর। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার অশ্বারোহণ চ্যাম্পিয়ানসিপ প্রতিযোগিতা দেখতে গেলেন লিস। প্রতিযোগিতার শেষে পুরোনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা হলো অনেক দিন পর। যৌবনের অশ্বারোহণ প্রতি-যোগিতার দিনগুলির কথা মনে পড়লো তাঁর। বন্ধুরা অভিনন্দন জানাল তাঁকে। অনেকে সহানুভূতিও জানালে, লিস আর তাদের সংগে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে পারছে না বলে। এই মৌখিক সহানুভূতি সহ্য হলো না লিসের। জানিয়ে দিলেন, তিনি সামনের বছরেই আবার তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবেন।

যেই কথা সেই কাজ। লিস তাই পরের বছর সত্যি সত্যি প্রতিযোগিতায় যোগ দিলেন। এখনও তাঁকে ঘোড়ার পিঠে চলবার সময় আর নামবার সময় সাহায্য করতে হয়। কিন্তু ঘোড়ার পিঠে চড়বার পর লিস যেন অন্য মানুষ। চ্যাম্পিয়ানের মতই তিনি ছুটিয়ে দিলেন তাঁর ঘোড়া, আর সকলকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করে নারীদের অশ্বারোহণ প্রতি-যোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কারও জয় করে নিলেন। বিকলাঙ্গ দেহ নিয়েও যে অশ্বারোহণ প্রতি-যোগিতা জয় করা যায়, একথা কি কেউ ভেবে-ছিল কোন দিন?

এখানেই থামেননি লিস হার্টেল। পূর্ণ জয়ের পূর্বে শ্রান্তি নেই তাঁর। আবার তাই পূর্ণোদ্যমে চলতে লাগলো তাঁর সাধনা। এর মধ্যে কয়েকটি অস্ত্রোপচার করিয়ে নিয়ে দেহটাকে অনেকটা স্বাভাবিক করলেন লিস। ক্রাচ আর তাঁর দরকার হয় না। একখানা লাঠির সাহায্যই যথেষ্ট। তবে হাঁটুর নীচের পেশীগুলো সম্পূর্ণ সবল হলো না। দেহের এই বৈকল্য স্বীকার করতেই হলো তাঁকে। এই ত্রুটি দূর করবার জন্য বিশেষজ্ঞদের উপদেশ, অধ্যয়ন, আর সাথে সাথে অশ্বারোহণ চললো অপ্রতিহতভাবে। ১৯৫০ সালের মধ্যে আবার তিনি অশ্বারোহণে পূর্বের খ্যাতি ফিরিয়ে পেলেন।

১৯৫২। হেলসিংকিতে বসেছে বিশ্ব অলিম্পিকের মেলা। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অশ্বা-রোহীরা সমবেত হয়েছেন অলিম্পিকের জয়-মাল্য জিনে নেবার জন্যে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে নর-নারী মিলিয়ে চব্বিশজন প্রতি-যোগী অবতীর্ণ হলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্মান আহরণের জন্যে। লিস—বিকলাঙ্গ লিস বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন। অশ্বারোহণে বিশ্ব জয়ের বাসনা পূর্ণ হলো তাঁর।

সংকল্পের দৃঢ়তা আর সাধনার নিষ্ঠা যে কোন মানুষকে তার চরম লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারে, একটি নারী তাঁর জীবনে সেই স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ক্রীড়াঙ্গনের এই সাফল্য সর্বস্তরের মানুষকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে গৌরবের উচ্চতম শিখরে আরোহণের পথ নির্দেশ করবে চিরদিন।

অনুশীলনই প্রকৃষ্ট পথ

(১৪১ পৃষ্ঠার পর)

মরশুমের সুরুতে স্যাঁতসেঁতে মাঠে বল ভিজে ভারী হয়ে উঠতে পারে বলে সুরুতে ক্যাচ ধরায় অনেক সময় বিপত্তি ঘটার আশংকা থাকে। কিন্তু শুকনো শীতে সে আশংকা কম বলে মরশুমের মাঝে ক্যাচ উঠলেই হাত বাড়াতে কুণ্ঠিত হবার কারণ নেই। যে কোনো ধরণের ক্যাচ উঠলেই হাল্কা বলের সামনে হাত প্রসারিত করায় কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। ক্যাচ ধরা অনুশীলনের সময় কোনো খেলোয়াড় যেন ব্যাট দিয়ে মেরে বলকে শূন্যে তোলে, নইলে ব্যাটে লাগার পর বলের গতি কি, কোন পথে পরি-বর্তিত হয় সে সম্পর্কে ফিল্ডসম্যানের জ্ঞান বাড়বে না। আমি আবার বলছি যে, ভালভাবে ক্রিকেট খেলার সাধ থাকলে সবার আগে ফিল্ডিং অনুশীলন প্রয়োজনীয়। ব্যাটিং বা বোলিংয়ে দক্ষতা অর্জন না করতে পারলেও শুধু ফিল্ডিংয়ের জোরেই যেকোনো খেলোয়াড় বহু দিন ক্রিকেট মাঠের শোভা হয়ে থাকতে পারে।

উইকেটের অবস্থা বিবেচনা করে, বোলারের আচরণের প্রতি লক্ষ্য রেখে যে খেলোয়াড় বাস্তব পরিস্থিতিকে মানিয়ে নিতে পারে তাকেই আমরা বলি ভাল ব্যাটসম্যান। বাস্তব পরিস্থিতিকে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা যার নেই সে কোনোদিন ভাল ব্যাটসম্যান হতে পারবে না। ভিন্ন মাঠ, ভিন্ন দল ব্যাটসম্যানদের সামনে ভিন্নতর পরিবেশ সৃষ্টি করেই চলবে এবং সে অবস্থাকে সামলে দেওয়ার দায়িত্ব একমাত্র ব্যাটসম্যানের। অভাবনীয় পরিস্থিতিকে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা অনেকের সহজাত, তারা সত্যিই প্রতিভাবান ব্যাটসম্যান। আর যারা তেমন প্রতিভাশালী নয় তাদেরও করতে হয় নিয়মিত অনুশীলন, মরশুমের আগে ও মাঝে অভিজ্ঞ শিক্ষক নির্দেশিত যথোপযুক্ত পথে। বল ব্যাটে লাগার সময় ব্যাট কোথায় থাকবে, পা কোথায় যাবে, হাতের অবস্থান কিরকম হবে সব বলে দেবেন সেই শিক্ষক বা কোচ।

আত্মরক্ষামূলক পদ্ধতি অথবা আক্রমণাত্মক ভঙ্গী, যে পথই অবলম্বন করা হোক্ না কেন, সব সময়েই ব্যাটসম্যানের দৃষ্টি থাকবে বলের ওপর। বল কোথায় পড়ছে, মাটীতে পড়ে কোনদিকে চলেছে, তীক্ষ্ণ নজরে তা লক্ষ্য করতে হবে। চোখ চেয়ে বল দেখে খেলাটা ব্যাটসম্যানের অভ্যাসে পরিণত হওয়া চাই। যে খেলোয়াড় যতো পরে বল খেলে সেই ততোবড় ব্যাটসম্যান। অর্থাৎ যে বেশী সময় করে নিতে পারে তার ভুল হয় কম কারণ সে শেষ পর্যন্ত বলের গতিবিধি বুঝে নেবার প্রয়াস পায়। ব্যাটসম্যানের জপের মন্ত্র হলো : বল ছাড়ার আগে বোলারের হাতের দিকে, বল পড়ে কোন দিকে যাচ্ছে সেই দিকে এবং ব্যাটে বলে সংঘর্ষের মুহূর্তে বলের প্রতি দৃষ্টি রাখা। বোলারের আচরণ বা বলের গতিবিধির দিকে দৃষ্টি না রেখে, না বুঝেই আগে থেকে বল কিভাবে মারবে সে সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আত্মঘাতী নীতি অবলম্বনের সামিল এবং সে মনোভাব সর্ব ক্ষেত্রেই বর্জনীয়।

ব্যাটিং সম্পর্কে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা চলে যে সাধারণতঃ ফাস্ট বোলিংয়ের বিপক্ষে পা পিছিয়ে নিয়ে মার মারা এবং স্পিন বোলিংয়ের বিপক্ষে পা এগিয়ে মারার নীতিতেই অধিকতর সুফল ফলে। নীতি হিসাবে এই ক্রীড়াপদ্ধতি গ্রহণ করা ভাল অবশ্য বলের পিচ অনুযায়ী ক্ষেত্র বিশেষে এ পদ্ধতি পরিবর্তন সাপেক্ষ। ভালভাবে ব্যাট করতে হলে বা অনেক রাণ করতে হলে দরকার অসামান্য ধৈর্য ও স্থির বুদ্ধি। রাণ করতে হলে রকমারি মারেরও প্রয়োজন ঘটে না, স্বাভাবিকভাবে যে খেলোয়াড় যে মারটা ভালভাবে মারতে পারে তার পক্ষে সেই বিশেষ ধরনের মারের প্রতি দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্তব্য।

সম্ভাব্য বোলাররা বল হাতে সহজভাবে উইকেট পর্যন্ত দৌড়ে আসবে, তারপর বল ফেলে ঠিক করে নেবে বলের লেংথ ও ডিরেকশন। লেংথ ও ডিরেকশন ঠিক করে নিতে একটি স্টাম্প পুঁতে লক্ষ্য স্থির রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুশীলন করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। লেংথ ও ডিরেকশনই হলো বোলিংয়ের মূল সম্পদ। যে বোলার লেংথে বল ফেলতে পারে না বা যার ডিরেকশন ঠিক নেই সে অনেকটা স্পিন বা সুইং করিয়েও অভীষ্ট সিদ্ধ করতে পারে না। স্পিন অথবা সুইং করার ক্ষমতা না থাকলেও বোলাররা লেংথ আর ডিরেকশনের গুণে ব্যাটসম্যানদের পরাজয় স্বীকারে বাধ্য করাতে পারে। ব্যাটসম্যানদের মতো বোলারদেরও বলি যে নানান রকম চেষ্টার আগে এই দুটি বিষয়ে যেন তারা সিদ্ধহস্ত হয়।

কিন্তু সব কিছুর মূলে রয়েছে ঐকান্তিক অনুশীলন। ঠিক পথে অনুশীলন করা ছাড়া ভালভাবে ক্রিকেট খেলা কেন কোনো খেলাই খেলা যায় না এই কথাটাই আমি আগামীদিনের খেলোয়াড়দের আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। সহজাত দক্ষতার অধিকারী যারা তাদের সাক্ষাৎ মেলে অল্পই, অনুশীলনের মাধ্যমে যারা নিজে-দের যথাযথভাবে প্রস্তুত করে নিতে পেরেছেন তাঁদের সংখ্যাই দুনিয়াতে বেশী। সুতরাং অনুশীলনই যে সিদ্ধিলাভের একমাত্র পথ এই শাশ্বত সত্য যেন ভুলে না যায় কোনো আশাবাদী, উচ্চাভিলাষী তরুণ—কিশোর।

পান্না সেন

নৌকা-বিলাস

নতুন যুগের প্রতীক্ষা

(১৪০ পৃষ্ঠার পর)

লয় আছে, খেলার মাঠ আছে, কিন্তু ছাত্ররা ধূলোর প্রতি নির্লিপ্ত। এর উত্তরে বলা যদি শৈশবে খেলাধূলোর প্রতি অনুরাগের বুনে দেওয়া যায় বিদ্যালয়ের মাধ্যমে, তবে রা কখনও কোনোদিনই খেলার প্রতি খ হতে পারে না। আমাদের যেহেতু শৈশব ক ধাপে ধাপে শারীরিক শিক্ষার কোনো স্থা নেই—সেই জন্যই এই সব শিশু ও শোররা কিংবা কলেজের ছাত্ররা খেলাধূলোর ও বিমুখ থাকে।

মেয়েদের শারীরিক শিক্ষার কথা আলোচনা । একান্তই দরকার। পুরুষদের মতই মদের শারীরিক শিক্ষার সমান প্রয়োজনীয়তা ছে। মেয়েদের শারীরিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম য়েদের আগ্রহ, রুচি, মানসিক বৃত্তি ও রীরিক শক্তির উপর বুনিয়াদ করে তৈরী করা চত। দশ বৎসর পর্যন্ত ছেলে ও মেয়েদের লাধূলোর পাঠ এক হলে ক্ষতি নেই—কিন্তু । বছরের পর মেয়েদের পাঠ্যক্রম হবে আলাদা। ই পাঠ্যক্রম বিশেষভাবে মেয়েদের শারীরিক ক্তি ও গঠন, মানসিক বৃত্তি ও সন্তানধারণের থা মনে রেখে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর রচিত ওয়া চাই।

যুগ বদলে যাচ্ছে। মেয়ে পুরুষের সমান ধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবারে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছেন শ্রীমতী গ্রীটা এণ্ডারসন পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করে। মেয়েদের শিক্ষা দিলে তাঁরা যে পুরুষদের প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করতে পারেন, এও যেমন সত্য—তেমনি মাদের সর্বাগ্রে মনে রাখতে হবে মেয়েরা জাতির জননী। মেয়েরা সৃষ্টিধর্মী—আণবিক যুগে মেয়েদের যদি আমরা এ্যাডভেঞ্চারে নামিয়ে দেই—তবে পরিণাম কি হবে সে কথা ভাবতে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিকেই অনুরোধ করি।

আমাদের ভাবতে হবে—দেশের প্রত্যেকটি মেয়ের কথা। আজ প্রগতিশীল দেশগুলিতে শারীরিক শিক্ষাবিদরা শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন মেয়েদের পুরুষদের সাথে শারীরিক শক্তি নিয়ে পাল্লা দেবার দৃষ্টান্তে। ১৯৪৯ সনে কোপেনহেগেনে প্রথম আন্তর্জাতিক মহিলা শারীরিক শিক্ষা সম্মেলনে প্রত্যেক প্রগতিশীল দেশের শারীরিক শিক্ষাবিদরা পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের এই পাল্লা দেবার কথা নিয়ে আলোচনা করেন। সেখানে এ কথা ব্যক্ত হয় যে, পুরুষদের মত যাঁরা শারীরিক কৌশল অনুশীলন করে যে যোগ্যতা নারী লাভ করে—তাতে যদিও সন্তান-ধারণ করা চলে, তবুও একথা ক্রমশঃ প্রকাশ হচ্ছে যে, সেই নারী তাঁর রমণীর কমনীয়তা—তথা রমণীসুলভ সদ্গুণাবলী লাভে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাই দেখা গেছে যে, সন্তানধারণে অযোগ্যতা না থাকলেও সন্তান পালনে তার বিমুখতা এসে গেছে! এবারে তৃতীয় আন্তর্জাতিক মহিলা শারীরিক শিক্ষা সম্মেলনেও এ বিষয়ের আলোচনা লণ্ডনে গত জুলাই মাসে হয়েছে। জাতির জননী যদি গৃহ ছেড়ে—মায়া মমতা, স্নেহ ও স্বাভাবিক বৃত্তি নিরোধ করে বাইরে এসে পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দেয়, তবে ঘরের ও সন্তানের কি অবস্থা হবে এ কথা আমাদের প্রথম থেকেই চিন্তা করে দেখতে হবে।

মেয়েরা প্রকৃতিগতভাবে ছন্দোবদ্ধ ব্যায়াম, নৃত্য, খেলাধূলো, সাঁতার পছন্দ করে। আমাদের শারীরিক শিক্ষা পাঠ্যক্রমে মেয়েদের দেহ ও মনের স্বাস্থ্য ও গঠনের প্রতি নজর রেখেই পাঠ্যক্রম রচনা করতে হয়।

আমাদের দেশে শারীরিক শিক্ষার নামে অনেক রকম অনুষ্ঠান হয়। অনেক সঙ্ঘ ও সমিতি প্রতি বৎসর খেলাধূলোর প্রতিযোগিতা, সাঁতারের প্রতিযোগিতা, নানা প্রকার দৈহিক শক্তির প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা করে থাকেন। এ ছাড়া সপ্তাহকালীন শিবির অথবা স্বল্প-কালীন শিবিরও হয়ে থাকে। শারীরিক শিক্ষার প্রচার হিসাবে এই সব অনুষ্ঠানের মূল্য আছে স্বীকার করি। তবু বর্তমানে যখন আমরা স্বাধীন দেশের গঠনমূলক পরিকল্পনার কাজে আত্মনিয়োগ করতে চাই—তখন সর্বদাই মনে রাখতে হবে, এই অর্থ জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য স্থায়ীভাবে ব্যয়িত হওয়া আবশ্যক। এই অর্থের দ্বারা যদি একটি সুইমিং পুল, কিংবা একটি স্থায়ী শিবিরের জন্য জমি, কিংবা একটি জিমনেসিয়াম, কিংবা খেলার মাঠের জন্য জমি, কিংবা খেলাধূলোর সাজসরঞ্জাম কেনা সম্ভব হয়, তবে সেই চেষ্টাই হওয়া উচিত।

খেলাধূলোর মান উন্নয়ন করতে হলে, শারীরিক শিক্ষাকে সফল করতে হলে, এই সব সংগঠন ও সমিতিগুলিকে বিশেষ করে যোগদানকারীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করে—বছরের পর বছর তাদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে হবে। এই উন্নতি শুধু শারীরিক কৌশল অর্জন করতে নয়—মানসিক সদ্গুণ লাভও এই উন্নতির মধ্যে পরিগণিত হবে। আজ লোকের মুখে মুখে কোলকাতার খেলাধূলোর মাঠের গুণ্ডামীর কথা চারিদিকে ব্যাপ্ত। এই কলঙ্ক শারীরিক শিক্ষার নয়—এই কলঙ্কের উদ্ভব হয় শারীরিক ও মানসিক শিক্ষার সমন্বয় হয় না বলে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় শারীরিক শিক্ষা 'আবশ্যিক' হলে—খেলাধূলোর প্রতি সম্মান ও নিষ্ঠা বেড়ে যাবে, তখন নতুন সূর্যোদয় হবে—আমরা সেই দিনেরই প্রতীক্ষা করি।

দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন

(১৪৩ পৃষ্ঠার পর)

বড় হবার পথ সাধনা, পরিশ্রমসাপেক্ষ। ভাল ফুটবল খেলোয়াড়ের পরম পাথেয় তাঁর ধৈর্য।

সুখের কথা, জাতীয় সরকারের দৃষ্টির কিছুটা আজ খেলার মাঠের ওপর গিয়ে পড়েছে। কল্যাণ রাষ্ট্রের নায়কদের কল্যাণে দেশের কিশোর তরুণদের শিক্ষণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলে আন্ত-র্জাতিক মহলে ভারতের সুনাম বাড়বে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার কেন্দ্রে শুধু আত্মপ্রকাশ করলেই ভারত ভূমির মর্যাদা বাড়ে না, সুনাম বাড়ে, ঐতিহ্য গড়ে ওঠে যদি ভারত যোগ্যতার অম্লান নিদর্শন উপস্থাপন করতে পারে সে আসরে।

সবশেষে শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষের কাছে আমি আবার অনুরোধ জানাই যে, মহান ভারত গড়তে গিয়ে ভারতের সম্ভাবনার সব দিকটা যেন তাঁরা নজরে আনেন। পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে খেলার মাঠ ও ক্রীড়া শিক্ষণ পরিকল্পনার সুযোগ সুবিধেও যেন তাঁরা ছেলেদের হাতে তুলে দেন। ইউরোপ যা পারে নব ভারতের তরুণেরা তা পারবেন না কেন, যদি তাঁরা ইউরোপে অনুসৃত সুযোগ সুবিধে পান? আমি বিশ্বাস করি যে, আন্তর্জাতিক ক্রীড়া জগতে ভারতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে এমন উপাদান দেশে ছড়িয়ে আছে, দরকার সেই উপা-দানগুলিকে সংগ্রহ করে গড়ে তোলার। অনেক সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে অলক্ষ্যে, আমাদের প্রয়োজন শুধু সে প্রতিভাকে সংগঠনের মাধ্যমে জাগিয়ে তোলার। সে প্রয়োজন আধুনিককালে ঐতিহাসিকও বটে।

মেয়েরা ছন্দোবদ্ধ ব্যায়াম পছন্দ করে। (লোকেশ পালিতের সৌজন্যে)

ঐতিহাসিক সাফল্য

অজয় বসু

রাজকুমারেরা পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে সাত সমুদ্দুর তেরো নদী ডিঙিয়ে রূপবতী রাজকন্যা ও অর্দ্ধেক রাজ্য জয় করে রূপকথা রচনা করতেন।

আর আণবিক যুগে যারা অশ্বারূঢ় হয়ে নতুন রাজ্য জয় করে নিলেন, তাঁরা করলেন রূপকথা নয়, ঐতিহাসিক কাহিনী রচনা। তাঁরাও রাজকুমার আর মহারাজের দল, রূপকথার দেশেরই সন্তান। রাজকুমারীর চাঁদপানা মুখের সন্ধান হয়তো তাঁরা পেলেন না, সে উদ্দেশ্যও তাঁদের ছিল না, কিন্তু তাঁরা অর্ধেক নয়, পুরোপুরিই একটা রাজ্য জয় করে নিয়েছেন। বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনের বিশাল সাম্রাজ্যের কণামাত্রে ভারত এতোদিন অংশীদার ছিল, আমাদের পোলো দলের সাফল্যে সে সাম্রাজ্যে ভারতের অধিকার আর একটু প্রসারিত হলো বৈকি!

রূপকথা আমরা ভুলে গিয়েছি, কিন্তু ভুলিনি অজানাকে জয় করার প্রয়াসে রূপকথার মানুষগুলোর সফল প্রচেষ্টার কাহিনী। গণতান্ত্রিক ভারতে একদিন আমরা রাজা-মহারাজাদের নিশ্চয়ই ভুলবো, কিন্তু বিস্মৃত হবো না সেই কটি দিকপাল ক্রীড়াবিদকে যাঁদের যোগ্যতা ও নিপুণতায় আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারত আবার নতুন করে সসম্মানে সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। হোন তাঁরা ক্ষয়িষ্ণু, গতপ্রায় বিলুপ্তপ্রায় অভিজাত সম্প্রদায়ের শেষ প্রতিভূ, তবু তাঁরা ভারতবাসীই। সার্থক প্রযত্নে তাঁরা আজ মাতৃভূমির সুনাম উঁচুতে তুলে ধরেছেন, তাঁদের চেষ্টাতেই ভারতভূমির সুমহান ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ থেকে গিয়েছে। তাঁরা যেন আজ আবার নতুন করে আমাদের নিজেদেরই চিনে নেবার নির্দেশ দিয়ে গেলেন।

আধুনিককালে হকি ছাড়া আর কোনো খেলাধুলোর সূত্রে ধরে আমাদের দেবার মতো কোনো পরিচয় ছিল না, সম্প্রতি পোলো বিশারদ ভারতীয়দের চেষ্টায় নতুন এক পরিচয়ের সন্ধান মিললো। এই পরিচয়ের অম্লান স্বাক্ষরে আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর ইতিহাসকে যাঁরা চিহ্নিত করে দিলেন তাঁরা স্মরণীয়। তাঁরা হলেন দলপতি জয়পুরের মহারাজা, রাওরাজা হনুৎ সিং, বিজয় সিং, ক্যাপ্টেন কিষেণ সিং ও অতিরিক্ত খেলোয়াড় কর্ণেল প্রেম সিং। বিগত আগষ্টের শেষে নর্মাণ্ডীর দাভিলে যে বিশ্ব প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয়ে গেল, তাতে এঁদেরই দক্ষতায় ভারত শীর্ষস্থান পেয়েছে। দাভিলের আসরে, বিশ্ব বিজয় করার পথে শেষ বাধাস্বরূপ দাঁড়িয়েছিল ফরাসী-মেক্সিকান—স্পেনীয় খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত দুর্ধর্ষ দল 'লেভারসিন'; কিন্তু তিন দেশের সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে নিষ্ফল করে দিয়ে সেই ঐতিহাসিক আয়োজনে ভারতীয় দল জয়লাভ করেছে ৫—২ গোলে।

বিশ্ববিজয়ী ভারতীয় পোলো দলঃ (বাম হইতে) ক্যাপ্টেন কিষেণ সিং, বিজয় সিং, রাও রাজা হনুৎ সিং ও অধিনায়ক জয়পুরের মহারাজা।

পোলো খেলায় আমরা বিশ্বজোড়া নাম পেয়েছি, তার মূল্য কম নয়, তাই ভবিষ্যৎ প্রত্যাশায় পোলোর ভবিষ্যতের দিকে আমা[...] দৃষ্টি দেওয়া দরকার। রাজা মহারাজ[...] চলে যাবেনই সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁরা [...] সঙ্গে করে নিয়ে যেতে না পারেন [...] অননুকরণীয় ক্রীড়াশৈলী, যে পদ্ধতি অ[...] সরণে আমরা ভারতবাসীরা বিশ্ববা[...] সপ্রশংস স্বীকৃতি ও অভিনন্দন আদায় [...] নিতে পেরেছি। সুখের কথা, আশার [...] এই যে পোলো খেলায় আমাদের সম্ভাবনা [...] দক্ষতার কথা স্মরণ রেখে ভারতীয় ঐতি[...] ধারণ করে রাখার চেষ্টা করছেন ভারত[...] সেনাবাহিনীর ঘোড়সওয়ারেরা। পূর্ব সূরী[...] অনুকরণ ও অনুসরণের এই চেষ্টা ফলপ্র[...] হোক, ভারতীয় নওজোয়ানদের প্রয়[...] ভারতের অর্জিত নাম অক্ষুণ্ণ থাকুক, আমা[...] মতো ক্রীড়ামোদীদের অন্তরের এই সাধ ভারত[...] স্বার্থেই পূর্ণ হোক।

দরিদ্র ভারতবর্ষের পক্ষে পো[...] খেলা ব্যয়বহুল সন্দেহ নেই, কিন্তু আমু[...] উন্নতকালে ভারতে প্রচলিত যে সব খে[...] লোকপ্রিয় তার মধ্যে কোনটি ব্যয় সাপে[...] নয়? খেলাধুলোর ক্ষেত্রে এগিয়ে যাও[...] দুনিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে ব্যয় আমা[...] করতেই হবে, করছিও। শুধু যেন [...] হিসাবে পোলো খেলার বেলায় ব্যয় [...] ধুয়ো তুলে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব, আমাদের ঐতি[...] ক্ষুণ্ণ করার প্রয়াস না পাওয়া হয়।

ভারতীয় খেলাধুলোর মধ্যে পোলো [...] সুপ্রাচীন অনুষ্ঠান। পোলো খেলার উৎপ[...] এদেশে নয় কিন্তু আমরাই বিশ্ববাসীকে পো[...] খেলতে শিখিয়েছি। ভারতীয়দের দে[...] অন্যেরা পোলো খেলতে [...] হয়েছে। [...] হাজার বছরে[...] আগে পারস্যে [...] পোলো জাতীয় খেলা [...] প্রাচীন গাথা, কাব্যে এই জাতীয় খেলার উল্লে[...] আছে, কিন্তু তখনো পোলো বলে এই খে[...] নামকরণ হয়নি।

নামকরণ হয়েছে মণিপুরের আদিবা[...] সম্প্রদায়ের একদল ক্রীড়াবিদদের [...] ১৮৬২ সালের কথা, মণিপুর থেকে এক[...] ঘোড়সওয়ার বেড়াতে গিয়েছেন পাঞ্জাবে[...] পাঞ্জাবে অবস্থিত বৃটিশ সেনাবাহিনী[...] অফিসারদের চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে [...] বেপরোয়া ঘোড়ায় চড়ার কৌশল দেখালে[...] আর সেই সঙ্গে প্রদর্শন করলেন বিদ্যুৎগতি[...] ঘোড়া ছুটিয়েও কি করে একটি যষ্টির সাহা[...] বল নিয়ে খেলা করে অনাবিল আনন্দ উপভো[...] করা যায়। মণিপুরের আদিবাসীদের অশ্ব[...] চালনার কৌশল ও ক্রীড়াভঙ্গীতে সাহেব[...] মুগ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'এ খেলার ন[...] কি?' স্মিত হেসে আদিবাসীরা জবাব দিলে[...] 'পুলু'। আমাদের দেশে বহুদিন থেকে [...] খেলা চালু রয়েছে।'

সেদিনের সেই 'পুলু' উত্তরকালে ইংরে[...] ভাষাভাষীদের উচ্চারণ ভঙ্গীতে বদলে পোলো[...] দাঁড়িয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামা[...] মণিপুরে মহা উৎসাহে যে 'পুলু' খেলা হ[...] তার অনেক নজীর আছে। এক সময় 'পুলু[...] ছিল মণিপুরের জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান। পা[...] পার্বণে, জাতীয় উৎসব কেন্দ্রে, মেলার আস[...] মণিপুরীরা দলে দলে 'পুলু' খেলতেন। কথি[...] আছে 'পুলু' খেলায় শিক্ষিত একটি রাজ অ[...]

[illegible]ওয়ায়, একদা মণিপুর রাজ্য হারানো [illegible] উদ্ধারের সংকল্পে একটি পুরো সেনা-[illegible]ী পাঠিয়েছিলেন কাছাড়ে। মণিপুরের [illegible]াসীদের অনেকে পরবর্তীকালে কাছাড়ে বসবাস করেন এবং বলা বাহুল্য, তাঁদের 'পুলু'ও গিয়ে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় [illegible]ড়র উন্মুক্ত মাঠে ময়দানে। পারস্য থেকে [illegible]থ ধরে পোলো এসে হাজির হয়েছিল [illegible]রের পাহাড়ী অঞ্চলে, সেপথের চিহ্ন [illegible] মুছে গিয়েছে, কারণ ইতিহাস এখানে [illegible]।

কাছাড়ের চা-বাগানের ইংরেজ মালিকেরা [illegible]রের আদিবাসীদের দেখে উৎসাহিত হয়ে [illegible] সালে তাঁদেরই সঙ্গে পোলো খেলতে [illegible] করেন এবং ক'বছরের মধ্যে একটি পোলো [illegible] প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত সংস্থার নাম শিলচর পোলো ক্লাব। ভারতের প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত এই শিলচর ক্লাব বিশ্বের [illegible]নতম পোলো ক্রীড়া সংস্থা। শিলচর ক্লাব [illegible]ষ্ঠার দশ বছর পর ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর [illegible]হুসার শাখার সদস্যরা ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে [illegible]শে পোলো খেলার প্রবর্তন করলে [illegible] [illegible] আরও কয়েকটি সংস্থা গড়ে ওঠে এবং [illegible] রিচমণ্ড পার্ক মূলতঃ এক পোলো [illegible] পরিণত হয়। বর্তমানে রিচমণ্ড [illegible] প্রতি পোলো মরশুমে দেশ-বিদেশের [illegible]য়াড়দের সম্মেলন হয়, সে সম্মেলনে [illegible] উপস্থিত থাকেন। ইংলণ্ড থেকে [illegible] খেলা ক্রমশঃই ছড়িয়ে পড়ে আমেরিকায়, [illegible], আর্জেন্টিনায়, ফ্রান্স ও বিশ্বের আর [illegible] প্রান্তে। পঞ্চদশ শতাব্দী ও তার পরে [illegible] ও [illegible]। [illegible] পোলো খেলা [illegible] জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও তারও আগে [illegible] প্রান্তেও যে কিছু কিছু পোলো [illegible] তার ঐতিহাসিক নজীরও কিছু [illegible] গিয়েছে। লাহোরের দাস রাজবংশের প্রথম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উল্লেখ রয়েছে যে [illegible] [illegible] অবস্থায় পোলো [illegible] [illegible] দিতে গিয়ে পড়ে যান এবং সেই [illegible] তার মৃত্যু ঘটে। এই স্মারকস্তম্ভ [illegible] হয়েছিল দ্বাদশ শতকে।

শাহেনশা আকবরও পোলো খেলার পৃষ্ঠ-[illegible]সক ছিলেন। তিনি নিজে খেলতেন, তাঁর [illegible] যাঁরা পোলো খেলায় সুদক্ষ হয়ে উঠতেন [illegible]রা লাভ করতেন সম্রাটের অপরিসীম [illegible]। বুদ্ধিমান বাদশা আকবর বৈজ্ঞানিক [illegible] পোলো খেলা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে খেলায় অবশ্য প্রয়োজনীয় কিছু কিছু নিয়ম কানুনেরও সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন।

বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সংস্থা স্বীকৃত নিয়মানুসারে ভারতে পোলো খেলা নিয়ন্ত্রণে ও পরিচালনায় যোধপুরের মহারাজা প্রতাপ সিংয়ের অবদান অনস্বীকার্য। আধুনিক ভারতে তাঁরই উদ্যোগে পোলোর পুনরুজ্জীবন ঘটেছে। ভারতীয় পোলোর খেলার মানোন্নয়নে, খেলাটিকে জনপ্রিয় করে তুলতে এবং বহু অর্থ ব্যয়ে বিদেশে ভারতীয় দলের সফরের আয়োজন করে যোধপুরাধিপতি উত্তরকালের পোলো অনুরাগীদের প্রেরণা জুগিয়েছেন। মহারাজা প্রতাপ সিংয়ের দৃষ্টান্তেই উৎসাহিত হয়ে পরবর্তীকালে ভুপালের নবাব, পাতিয়ালা, কাশ্মীর ও জয়পুরের মহারাজা পোলো খেলায় পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। যোধপুরের রতানাদা মাঠ ভারতীয় পোলো খেলোয়াড়দের কাছে তীর্থক্ষেত্র বিশেষ। স্যার উইনস্টন চার্চিলকেও একদিন এই মাঠের খেলায় মেতে উঠতে দেখা গিয়েছিল।

যোধপুর, জয়পুরের মহারাজার দল এবং কাশ্মীরাধিপতির দল ইতিপূর্বে বহির্ভারত সফর করেছিল, তার মধ্যে জয়পুরের মহারাজার দলের সাফল্যের বিষয়ই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। জয়পুর দল ইউরোপ সফরে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের ছাড়া সম্মিলিত বাছাই দলকে হারিয়েছিল। সেকালে বিশ্ব প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল না, থাকলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই সম্ভবতঃ ভারত বিশ্ব বিজয় করতে পারতো। বহির্ভারত সফরকারী জয়পুর মহারাজার দলের পক্ষে সেবার খেলেছিলেন মহারাজা নিজে, হনুৎ সিং, আভে সিং ও স্বর্গীয় পৃথ্বী সিং। এই দলের প্রথম দুজনে এবারেও প্রবীণ বয়সে বিশ্ব প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সকলেই জানেন যে, পোলো খেলায় নিয়মানুযায়ী ব্যক্তিগত যোগ্যতা অনুসারে খেলোয়াড়দের গোলের ব্যবধান বা হ্যাণ্ডিকাপ নিয়ে মাঠে নামতে হয়। যুদ্ধ পূর্ববর্তীকালে ইউরোপ সফরে এই জয়পুর দলকেও সেই রীতি অনুসরণে খেলতে হতো। [illegible] দলটির মোট হ্যাণ্ডিকাপের সংখ্যা ছিল [illegible]ত্রিশ অর্থাৎ দলের প্রত্যেক সদস্যের হ্যাণ্ডিকাপ [illegible] আটটি করে গোল। এই ব্যবধান বা হ্যাণ্ডিকাপের সংখ্যা থেকেই সে দলের ক্রীড়ানিপুণতার যাথার্থ্য যাচাই করা যেতে পারে।

কিন্তু মহাযুদ্ধ পূর্ববর্তীকালে ভারতীয় পোলো খেলোয়াড়দের বহির্ভারত পরিক্রমা ছিল বেসরকারী আয়োজন, ফলে তাঁদের সফরের বিবরণ আনুষ্ঠানিক মর্যাদাভূষিত হয় নি। যুদ্ধোত্তরকালে স্বাধীন ভারতের পক্ষ থেকে এ বছরেই সর্বপ্রথম সরকারীভাবে ভারতীয় ক্রীড়া প্রতিনিধি দল অন্যত্র প্রেরিত হলে ভারত বিশ্ব প্রতিযোগিতায় সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে বিশ্বের চ্যাম্পিয়ন আখ্যা অর্জন করে নিয়েছে। ভারতীয় পোলো দলের এবারের সাফল্যের বিষয় ভারতের খেলাধুলার ইতিহাসের আর এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৯২৮ সালে ভারতীয় হকি দলও এমনিভাবে সর্বপ্রথম অলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গনে আবির্ভূত হয়েই অন্য সমস্ত প্রতিযোগীকে নতিস্বীকারে বাধ্য করিয়েছিল।

দ্যভিলে যাওয়ার আগে ভারতীয় দলটি ইংলণ্ডের পোলো মরশুমে আয়োজিত নানান প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে স্মিথ রাইল্যাণ্ড, সাদারল্যাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতা প্রভৃতি আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান এবং দ্যভিলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ছাড়া সিলভার [illegible] ট্রফিও লাভ করেছে।

আমাদের স্মরণ থাকতে পারে যে, নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থায় পড়েও ভারতীয় দলটি বিশ্ব প্রতিযোগিতায় (কাপ ডিওর) শ্রেষ্ঠের সম্মান অর্জন করেছে। কে না জানে যে, উন্নত পর্যায়ের পোলো খেলায় অপরিহার্য হলো উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষিত অশ্ব। কিন্তু অর্থনৈতিক অসুবিধার জন্য ভারতীয় খেলোয়াড়েরা সাগর পারে চাহিদা অনুযায়ী নিজেদের শিক্ষিত অশ্বগুলিকে নিয়ে যেতে পারেন নি এবং অনেক সময় বিদেশী বন্ধুদের কাছে হাত পেতে বাহন ধার করে তাঁদের কাজ চালিয়ে নিতে হয়েছিল। তাছাড়া এবারের দলের দুজন সেরা খেলোয়াড় রাও রাজা হনুৎ সিং এবং জয়পুরের মহারাজা, দুজনেই ছিলেন বয়সে প্রবীণ। হনুতের চুল পেকে সব সাদা হয়ে গিয়েছে, বয়স পঞ্চান্নর কম নয় এবং দলপতির বয়সও প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। কিন্তু এই সব অসুবিধা সত্ত্বেও ভারতীয়দের অভীষ্ট সাধনের পথে কোনো বাধাই দুরতিক্রম্য প্রতিবন্ধকতা বলে বিবেচিত হয় নি।

পোলো খেলা সাহস ও দক্ষতা সাপেক্ষ। অশ্ব চালনায়, চারু অশ্বের পিঠে বসে সরু এক [illegible]ের সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র একটি বলকে মাঠের [illegible] নিয়ে যাওয়া বা লক্ষ্য স্থির রেখে গোল করা যে কতোদূর নিপুণতাসাপেক্ষ তা সহজেই অনুমান করা যায়। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে হকির মতো পোলো[illegible]ও ভারতীয়দের দক্ষতা ও নিপুণতা [illegible] হয় সহজাত।

'ফ্লু'

(৫৪ পৃষ্ঠার পর)

ইনফ্লুয়েঞ্জা? আ-হাহাহা— তখন আর দেখতে হবে না, ঝড়াঝড় সব পড়বে আর মরবে। দরকারও তাই। ইউ-এনো বানিয়ে বসেছেন—কি? না জগতের শান্তি রক্ষা করবেন। করছেনও, পরের ঘরে অশান্তি সৃষ্টি করে। কর্তব্যের দোহাই দিয়ে অকর্তব্যের খেলা—খুব হয়, উচিত শাস্তি হয়। যার নাম নেমেসিস। ভগবান কি আর বুঝছেন না সেটা?

দেবেনই পৌঁছে এই জ্বর ইউরোপে—দেখা যাক নতুন করে একবার নেয়াজে ডিলিউজ।

ধ্যেৎ, হবে না ছাই। ভগবান কি আর ভগবান আছেন এখন, গড্ হয়ে গেছেন। চার্চে শুয়ে ঘুমোন আর গবর্মেন্টের মাইনে খান। ও গড্-ফাডের ভরসায় থাকলে কিছু হবে না, নিজেদেরই করতে হবে যা করবার।

করলেই ত হয়। অন্যে কেন, নিজেই ত পারেন। রিটায়ার করেছেন, অফিস আর ছুটির বালাই ত নেই। তাই হবে, তিনিই যাবেন। পাসপোর্ট করবেন, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, রাশিয়া সব ঘুরে ঘুরে আসবেন। দেরি না, এই জ্বরটা থাকতে থাকতে। কালকই পাসপোর্টের দরখাস্ত দিতে হচ্ছে। যাবেন, ম্যাকমিলান, আইজেনহাওয়ার, ক্রুশ্চেভ সকলের সঙ্গে ইন্টারভিউ নেবেন, সামনে ঘেঁসে কথা বলতে বলতে ফ্যাচ করে হেঁচে দেবেন দুবার একবার, বাস কর্মসিদ্ধি।

কিন্তু না, অত সোজা নয়। অনেক দিনের ব্যাপার, অতদিন কি থাকবে এই জ্বর? তার ঢের আগেই হয় সেরে যাবে নয় মেরে ফেলে দিয়ে যাবে। আর অত ভেবেই বা কি হচ্ছে। এই জ্বর নিয়ে ত উঠতেই দেবে না প্লেনে বা জাহাজে, নামতে দেবে না তাদের দেশে, কোয়ারেন্টিন। ইন্টারভিউ ত দূরেই থাক।

যাক না, কী দরকার। ডাকে পাঠিয়ে দেবেন জ্বর। লম্বা লম্বা চিঠি লিখবেন সব, চিঠিগুলোকে মুখের সামনে ধরে বেশ খানিক করে হেঁচে আর কেশে দেবেন, সেই সব চিঠি খামে পুরে পুরে ডাকে ছেড়ে দেবেন। ম্যাকমিলান আইজেনহাওয়ার নিজের হাতে চিঠি খোলেন না, এই ত? নাই বা খুললে। সেক্রেটারী খুলবে। তার হবে। দেখতে যাবেন কর্তারা। তখন তাদের হবে। আর শুধু কর্তারা কেন। ইউরোপ আর আমেরিকার সব শহরে শহরে এই রকম চিঠি হাজার দু-হাজার পাঠিয়ে দিচ্ছেন তিনি—দেখাই না। খরচা আর এমন কি পড়বে—প্লেনের ভাড়ার চেয়ে ত বেশী নয়। লিখবেন সবাইকে একধার থেকে—মিনিস্টার আর সেক্রেটারী, মেয়র আর আর্কবিশপ, কেউ বাদ যাবে না। ডাকটিকিট কিনতে হচ্ছে। এক্ষুণি।

বান্টুকে ডাকলেন। কালকের সে মণিঅর্ডার পাঠিয়েছিলি?

—ঠিকানা বললেন নি ত।

—দরকার নেই। ঐটে নিয়েই যা পোস্ট অফিসে, ফরেন খাম কিনে নিয়ে আয়।

—কটা?

—যত পাস। ইউরোপে যাবে, আমেরিকায় যাবে।

—দুশো টাকার?

—হাঁ।

ঢাকুরে, যাদবপুরে কোলাডাঙা, একডালিয়া, রাসবিহারী, সব পোস্ট অফিস ঘুরে ফিরে এল বান্টু। ফরেন খাম নেই। সব্বার ফ্লু, পোস্ট অফিসের আদ্দেক লোক অ্যাবসেন্ট। যার যার ডেস্কের চাবি তার তার নিজের কাছে।

—বটে!

বান্টু বললে, জি পি ওতে যাব?

—থাক।

কী হবে জি পি ওতে গিয়ে। হয়তো শুনবে দরজাই খোলে নি—দরোয়ান ফ্লু হয়ে দেশে চলে গেছে, চাবি তার পকেটে। আরে, অসুখ করবে মানুষের। তাই বলে ডেস্কের চাবি যে-যার ঘরে রেখে শুয়ে থাকবে? নিজে আসতে না পারে, পাঠিয়েও দেবে না? আর অফিসই বা কি রকম—ডুপ্লিকেট চাবি থাকে না? একটা মানুষ, আটকে যেতে পারে, আচমকা মরে যেতে পারে, ছেলেধরায় ফুসলে শুঁকিয়ে নিয়ে যেতে পারে। চাবিও নিখোঁজ হবে তাই বলে? এ হালে কখনও অফিস চলে? সব ফাঁকিবাজ, ডিউটি-চোর। শার্কার। দ্যাটস্ দি ওয়ার্ড—শার্কার। শার্ক, হাঙর। শার্কার, হাঙরতর। যা দেখছে খালি কামড়ে নিচ্ছে আর গিলছে। ওগরাতে হবে সে কথা মনে থাকছে না। কিন্তু হজমও ত পারছে করতে!

বেলা পড়ে এল। রোদের ঝাঁজ কমেছে। গায়ের জ্বলুনিও যেন কম একটু। বান্টু এসে মাথা ধুইয়ে দিয়ে গেল। দিতে দেবেন না—বান্টু নাছোড়। বড় ভাল ছেলেটা, বড় শান্ত, বকাঝকা করতে মায়া লাগে। এই ত সারা দুপুরটা ঘুরে এল, খাসের খোঁজে। জল একটু ঢেলে যদি তৃপ্তি পায়, পাক। তার আর কি হবে ও জলে। মাথার ভেতরে জ্বলছে আগুন, সে কি বালতির জলে নেভে।

সন্ধ্যেবেলায় এলেন কবিরাজ। অকৃত কবিরাজ। ছিপছিপে হালকা চেহারা, ছাঁটা গোঁফ, কুচকুচে কালো চুল।

দেখে বললেন, এ কি আনলি বান্টু, এ যে নিতান্ত ছেলেমানুষ।

কবিরাজ বললেন, ভয় নেই আমার ওষুধ খুব পুরোনো। হাতটা একটু দেখি?

হাত বাড়িয়ে দিলেন সুনীতি। বললেন, বয়স কত তোমার? পঁচিশ?

কবিরাজ নাড়ী দেখছেন। বললেন, আটত্রিশ।

—ভাগ্! চেহারা এমন কাঁচ থাকল কি করে?

—যত্নে থাকি। বাড়ীর ছোট ছেলে কিনা।

পিসীমা বললেন, কে কে আছে, বাড়ীতে?

—সবাই। বাবা। মা। দাদা। বৌদি। বোনরা।

—আর? বৌ?

—সেও আছে একটা একপাশে পড়ে।

সুনীতি বললেন, কবিরাজ? হুঁঃ। শুধু কবি। কবিতা লেখো-টেখো?

—আমি লিখি না। দাদা লেখে।

—এই হল। দেখলে? কি মনে হল?

—সেরে যাবে।

—সে ত সবাই জানে। সেরে যাবে না ত কি মরে যাব এইটুকুন জ্বরে?

—তাও যাচ্ছে কেউ কেউ। তবে আপনার সেটা দরকার হবে না।

—বটে? গ্যারান্টি দিয়া ব্যাধি আরোগ্য করিয়া থাকি?

—না। এবার সারিয়ে দিয়ে যাব। আবার হবে না, এমন লেখাপড়া করে দেব না। গ্যারান্টি মানে তাই।

—আবার হবে?

খালি পেটে রোদে ঘুরলেই হবে।

—বান্টুচন্দর রিপোর্ট দিয়েছেন বুঝি?

রিপোর্ট দরকার কি। নাড়ী দেখেই বোঝা যায়।

—বটে! রোগটা কী স্থির হল?

ইনফ্লুয়েঞ্জা?

কবিরাজ কি ইনফ্লুয়েঞ্জা বলে? পৈত্তিক জ্বর।

—চিকিৎসাটা কি রকম হবে?

—কিরকম চিকিৎসা আপনার পছন্দ?

—যদি বলি ইনজেকশন?

—দিয়ে দেব। পেনিসিলিন।

—তাতে কি হবে?

আপনার যেতে বাধ্য হবে। দিনও কমতে পারে দৈবাৎ। আমার, কিছু আয় হবে।

—তবে আর কি, দিয়ে দাও।

—দেব না। আমি ত কবিরাজ। বড়ি খাওয়াব।

—কি বড়ি? মকরধ্বজ?

—মকরধ্বজ বড়ি নয়। রামবাণ।

—রামবাণ? কেন, পাশুপত নেই তোমার?

—আছে, কিন্তু সেটা এর জন্যে নয়। এখানে রামবাণই ব্যবস্থা।

—কভি নেহি। রামবাণ কেন খাব। আমি কি দশমুণ্ড রাবণ?

—আপাতত খানিকটা ত বটেই। মনে হচ্ছে না, মাথাটা ভার হয়ে দশটার সমান হয়ে গেছে?

—খাব না আমি ওষুধ।

—সেকথা আগে ভাবলে পারতেন। আমাকে ডেকে এনেছেন, এখন খাব না বললে হবে কেন।

—মানে? জোর করে খাওয়াবে তুমি?

—তা-ও দরকার হতে পারে? এসে যখন পড়েছি, তখন না সারিয়ে দিয়ে যাব কি করে।

—বাঃ! বান্টু, যা সঙ্গে ওষুধ নিয়ে আয়।

পাশ ফিরে শুলেন।

নাঃ, ছেলেটা ভাল। পরিশ্রমও আছে, কাজ শেষ করার বলে [illegible] আছে। শার্কার নয় ডিউটি-চোর নয়। নিশ্চয় [illegible] ভাল চলে।

শেষরাতের দিকে জ্বরটা কমে এল। মাথার যন্ত্রণাও। ভোরের হাওয়ায় খুব ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্ন দেখলেন, ফ্লুয়ের [illegible] ঘুম [illegible] দেশময়।

পিসীমার [illegible] হয়নি। এ-কী বিপদে

পাঁচালীর দেশ

◉ আর্য্যপুত্র সুপ্রিয়

এই দেশ অন্নদার বরে
শ্যামল সোনার রাজ্য!
সোনারূপো চমকায়
জমকালো সবুজের গায়,
নদী-নালা পূর্ণ দুধে সরে।
অমৃত-ব্যঞ্জন আছে সোনার থালাতে;
সন্তানেরা আছে দুধে-ভাতে।

পথঘাট পার হয়ে, হে পথিক
এস এই পাঁচালীর দেশে।
ছদ্মবেশে,—
পথপ্রান্তে কাতরায় কত ভিখারিণী;
তারই মাঝে রয়েছেন চণ্ডিকা বা
লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
প্রান্তরে বায়সকুলে কে জানে কে হন,
ছদ্মরূপী লক্ষ্মীর বাহন।
এই দেশে পাঁচালীর রীতি—
কে জানে কখন কার চরণ পরশে—
কাঠের কৌটো হবে সোনার সেঁউতি

পাঁচালীর যুগ হল পার,
ইদানীং নতুন সংসার।
সতী বেহুলার কন্যা সাজিয়েছে নতুন বাসর—
জাফরাণী কুর্তা গায়ে লালায় বেসর।
পাঁচালীর যত রঙ হয়েছে বিলীন।
সাধ হয়, প্রশ্ন করি, বাঁচিয়ে আইন—
অন্নদার ভাণ্ডারের চাবি কার হাতে?—
ঈশ্বরী পাটনীর সেই
সন্তানেরা আছে দুধে ভাতে?—

ঠেকালে, বল ত? এখনও এই বয়সেও, এই বুড়ো খোকাকে নিয়ে কী জ্বালাতন!

খুব ভোরে উঠলেন। বাসি পাট সেরে, বালিশ করে রেখে, বান্টুকে বললেন, উঠলে খাবার দিস, ওষুধ দিস। আমি বেরোচ্ছি।

—কোথায়?

—কালীঘাটে। একটু শুধিয়ে আসি, আমাকে কি নেবে এবার, না এমনি কাঠখোলায় ভাজা হয়েই থাকব?

গঙ্গার ঘাটে চান সেরে উঠে এসেছেন; সামনে এক বুড়ো। বয়স তাঁর চেয়েও বেশী, শীর্ণ চেহারা, কিন্তু বেশ শক্ত। 'মা, দর্শন হবে' বলতে বলতে থেমে গেলেন, একটু তাকিয়ে দেখে বললেন, আপনাদের দেশ কোথায়?

পিসীমাও তাকালেন, প্রণাম করে বললেন, ঠিকই চিনেছেন। ঠাকুরমশাই।

—কতকাল পরে দেখা। আর কত কি যে হ'য়ে গেল, কে আছে কে নেই—তাই কে জানে। আছেন কেমন?

—সে আর এক কথায় কি বলব। সেইখানে দাঁড়িয়ে অনেক কথা হ'ল—অনেক সুখ-দুঃখের ইতিহাস। শেষে বললেন, এখন এই ছেলেকে নিয়ে আমি একা কি করে সামলাই, বলুন। কখন আমি রাঁধি কখন রুগীর শুশ্রূষা করি।

রাঁধবার লোক একজন জোগাড় করে নিন না।

—সে হবে না।

একটু থেমে বললেন, যা-হোক একটা মানুষ যদি থাকত বাড়িতে যে রুগীর দিকটা একটু সামলে দেয়—তা আছেই বা কে। এক বান্টু সে পরের ছেলে, তার কলেজ আছে।

—তাহলে শুশ্রূষা করবার লোকই একজন রেখে নিন।

—কাকে রাখব? লোক পাওয়া যায় জানি। কিন্তু ঐ মেজাজ—তাকেই কখন কি বলে বসবে তার ঠিক আছে? মিথ্যে পরকে ডেকে মুখ পোড়ানো। আর, হাসপাতালের নার্স মানে ঐ আধা-খেষ্টান ছুঁড়িগুলো—ও আমার ভাল লাগে না।

—আপনি যান মা, পুজোটা দিয়ে আসুন।

—যাই। কতকাল পরে দেখা, ইচ্ছে করে আরও কত কথা কই। সে দেশও আর হবে না, সে মানুষও আর দেখব না।

—যাবেন কেন, আমারই কি ইচ্ছে করে না দুটো কথা বলে নিতে। পুজোটা সেরে আসুন, আমি দাঁড়াচ্ছি এইখানেই।

পুজো সেরে এলেন। বললেন, সত্যি এমন একটা কেউ হ'ত, রুগীটাকে ক'দিন দেখত। ছুকরী নার্স নয়, একটু ভার-ভারিক্ক লোক—আছে এমন কেউ?

অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে যখন চোখ মেললেন সুনীতি দেখলেন, ঘরের ওপাশে চেয়ার ঘুরিয়ে কে একজন ব'সে। পিঠ ফিরিয়ে বসেচেন, সাদা রঙের শাড়ি, কালো ফিতে পাড়। বালিশে বিছানায় মৃদু একটা মিষ্টি গন্ধ।

শাড়ি-ধারিণী কাছে এলেন, হাতে একটি ছোট্ট গ্লাস। বললেন, ওষুধ খান।

আগে গ্লাসে করে মুখে জল দিলেন। মুখ ধোওয়া জল বোলে ধ'রে নিলেন। তারপর ওষুধ খাওয়ালেন। জল খাওয়ালেন। ছোট্ট তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিলেন। ঘরের অন্য কোণে একটি সরু দড়ি টাঙিয়েছেন, তার ওপরে তোয়ালেটি মেলে দিলেন।

সুনীতি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। বয়স্কা মহিলা। চুলে সাদা রং ধরেছে। মুখটি শীর্ণ, শ্রান্ত, কিন্তু এখনও বেশ সুন্দর। এককালে রীতি-মত রূপসী ছিলেন বোঝা যায়।

বললেন, আপনি কে?

—নার্স।

—নার্স কেন?

—আপনি অসুস্থ। পিসীমা একা সামলাতে পারছেন না।

—তাই আপনি খেটে মরবেন?

—মরবার কিছু নেই। অমনি খাটব না, টাকা নেব। এই আমার জীবিকা।

—হাসপাতালের নার্স ত আপনি নন। তাদের পোষাক আলাদা।

—আমি প্রাইভেট নার্স।

—ও! সুনীতি আবার চোখ বুজলেন। একটু পরে টের পেলেন, তাঁর টাকের ওপরে খুব আলগোছে কি একটা লেগে লেগে যাচ্ছে। মিষ্টি গন্ধটা বেড়ে উঠল। বুঝলেন, নার্স অডিকোলন-জলে তুলো ভিজিয়ে তাঁর মাথায় বুলিয়ে দিচ্ছেন।

একটু পরে ডাক এল, দেখি টেম্পারেচারটা নিই একটু।

মুখে থার্মোমিটার বসিয়ে দিয়ে নার্স কপালে হাত দিলেন। কী ঠাণ্ডা হাতখানা!

থার্মোমিটার তুললেন, খাতায় লিখে রাখলেন।

—কত?

—নিরেনব্বুই। মুখ ধুয়ে নিন, তারপর খাবার আনি।

মুখ ধুইয়ে দিয়ে সব জিনিষপত্র তুলে নিয়ে জায়গা মুছে নিয়ে নার্স চলে গেলেন। সুনীতি চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেন, মানুষের হাত এমন ঠাণ্ডা হয়? জানতেন না, নার্স তার আগে বরফজলে হাত ডুবিয়ে নিয়েছিলেন।

দুদিন পরে। পিসীমা আবার কালীঘাটে গিয়েছেন। পুজো দিতে। জ্বর ছেড়েছে, আর ভয় নেই। রোগীকে নিয়েও আর চিন্তা নেই, মেজাজ আশ্চর্যরকম শান্ত হ'য়ে গেছে। নার্সটি ভাল। চমৎকার সেবা করছে, ভার ছেড়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। নিজেই তাকে বলেছেন, জ্বর ছেড়েছে, তা হোক, তুমি কিন্তু আরও ক'টা দিন থেকে সামলে দিয়ে যাও। আমি তাহ'লে একটু জুড়োই।

নার্স বলেছে, আমার আর আপত্তি কি, আমি তো থাকলেই টাকা পাব।

পুজো দিলেন, তারপর বুড়ো ঠাকুরমশাইর ঘরে গেলেন। ঘর মানে, ফুল-বেলপাতা বিক্রীর একটি দোকান। বললেন ঠাকুরমশাই, পুজো দিয়ে গেলাম। জ্বর ছেড়েছে।

বেশ, বেশ; ভাল খবর। সবই মায়ের ইচ্ছে। তারপর, কাজ করছে কেমন?

—ভারি ভাল। মাইনে-করা লোক এমন হয় জানতাম না।

—হ্যাঁ, বড় ভাল। কিন্তু বড় দুঃখী।

—কেন?

—যেমন রূপ ছিল, তেমন গুণ। বংশও বড়।

—সে ত দেখেই বুঝি। যেমন সোনাযন্ত্র তেমন বুদ্ধি। দুঃখী কেন? বিধবা বুঝি?

—বিয়েই হয়নি। সেই ত দুঃখ।

—কেন?

—এক জায়গায় বিয়ের কথা হ'ল, ছেলে বললে, বিয়ে করবে না। তাই শুনে মেয়েও বেঁকে বসল। মেয়ে বললে কি এত সস্তা আমরা—ইচ্ছেমত বললে বিয়ে করব আর করব না?

—বটেই ত'।

—সেই রাগে নিজেও বিয়ে করলে না। বাপ মা মরে গেল। ভাইরা আলাদা হ'ল। আশ্রয় বলতে কিছু নেই। নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখল। মাষ্টার হ'ল। তাও ভাল লাগল না। তারপর এখন এই করেই বেড়ায়। লোকের সেবা করে, টাকাও নেয়—কিন্তু সেবাটা করে সেবার জন্যেই টাকার জন্যে নয়।

পিসীমা চুপ করে রইলেন। আহা। ঘর বাঁধবার কত সাধ ছিল মনে সেই সাধ পরকে নিয়ে মেটাচ্ছে। বললেন, আপনি খোঁজ পেলেন কি করে?

কোথা আপনায় দুঃখের ভার
গোপনে হৃদয় লয়ে।
কারা যে নীরব রয়েছে কাহারা
কাঁদিছে আকুল হয়ে,
কেহ চোখ মুঁজে থাকে আর কেহ
দেখেও দেখেনা চাহি।
অতিকায় এক মিছিল চলেছে
সংসার পথ বাহি।
যারা দীন হীন, বিষাদে পড়িয়া
রহিল পথের পাশে।
অন্য সকলে ছুটিয়া চলেছে
আপন জয়োল্লাসে।
ওঠে কলোরোল হাসি কান্নার
সেই জনতার মাঝে
কোটি মানুষের বেদনার সুরে
একতারা মোর বাজে।

—মা, দুঃখীজনের খোঁজ দুঃখীজনেই পায়, নইলে, তারা বাঁচে না। আমিও ত বড়লোক নই।

কথাটা কোথায় বিঁধল।

পিসীমা বললেন, আমি যাই।

আরও দুদিন পরে।

সুনীতি হঠাৎ বললেন, আপনার দেশ কোথায়?

—গাভা।

আপনারা বামুন?

—না। কায়স্থ।

সুনীতি অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। বললেন, গাভায়, বাপের বাড়ি? আপনার বাবার নাম বলবেন?

—ঈশ্বর মহিমারঞ্জন ঘোষ দস্তিদার। সুনীতি চমকে উঠলেন। অনেকক্ষণ কিছু বললেন না। তারপর বললেন, আপনার বয়স কত?

নার্স মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠল। একটু ধারালো গলায়ই উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন। সামলে নিয়ে বললেন, কেন?

—বলুন না।

—চুয়ান্ন।

সুনীতি মৃদুস্বরে বললেন, আমার একষট্টি।

আরও তিনদিন পরে।

বান্টুর হাতে একটি চেক দিলেন সুনীতি। বললেন, টাকাটা তুলে সেই বুড়ো ঠাকুরকে দিয়ে আসবি। কোন ঘরটা, পিসীমার কাছে শুনে নে।

—ঘর আমি চিনি।

পিসীমা বললেন, টাকা কিসের?

—ঐ ঠাকুরই দেখলাম খাঁটি লোক। চোদ্দ বছরে পেছন নিয়েছে, একষট্টি বছরে পেড়ে ফেললে আমাকে। শার্কার নয়। ডিউটিফুল—কর্তব্যনিষ্ঠ।

হঠাৎ হাত বাড়িয়ে বললেন, দেখি দে তো?

চেকটাকে ছিঁড়ে ফেললেন। নতুন একটা লিখলেন। দিয়ে বললেন, বলবি, দুজনের পক্ষ থেকে দু' হাজার। আর বলবি, মন্তরও তাঁকেই পড়াতে হবে।

'ফ্লু' কথাটির মানে তাঁর হঠাৎ জানা হ'য়ে গেছে। Fly মানে দ্রুতবেগে যাওয়া। Flew মানে দ্রুতবেগে পৌঁছিয়াছিল।
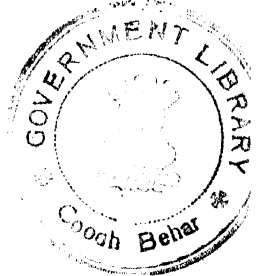
নবগোপালবাবুর একটু একটু ভাবনা হচ্ছিল। গেলেন বকেদের দেখতে হঠাৎ পাওয়া মিঠে কথাটাই ভুলে গেলেন! এই নিয়ে অবশ্য লক্ষ্মী সারাটা সন্ধ্যে কাটিয়ে দেবে। নবগোপাল খেতের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, শালবনীর যেখানে পলাশ গাছগুলো এ বছর এরই মধ্যে ফুল ধরে গেছে। কিন্তু লক্ষ্মী আজ কিসের খুঁটিনাটি করছে, হাওয়া দিচ্ছিল না হলেই তার চলবে না। একবার মনে হল যাই ফিরে, আবার মেয়েও মন সরে না, কারো পথ তো নয়। দিকটা ভারী নিরিবিলি, লক্ষ্মীর বাবা বুদ্ধি করেই এখানে বাড়ি করেছিলেন।

বাড়ি বলতেই মনে পড়ল শিবুকে [illegible] কথাটা না বলে দিলেই নয়। ভিতর ঘরের ছাদের কোণাটাতে সুতোর মতো দাগ দেখা দিয়েছে, লক্ষ্মীর কথাই হয়তো ঠিক, ফাটলই বোধ হয় ওটা, বর্ষাকালে জল চোঁয়াবে। লক্ষ্মী বলে বাড়ি তৈরী করতে করতে বাবার সঙ্গে তারিণী কনট্রাক্টরের কি একটা সামান্য বিষয় নিয়ে মহা ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল। তারিণীকে সবাই ভারী সৎ আর ধার্মিক বলেই চিরকাল জানত, কিন্তু বাড়িটার যে যে অংশ ঝগড়ার পর তৈরী হয়েছিল, দশ পনেরো বছর বাদে, তারিণী মরলে পর, সে সব জায়গায় নানারকম ছোটখাটো খুঁত দেখা যেতে লাগল। বেশী কিছু নয়, খুব যে খরচের ব্যাপার তাও নয়, তবু বিরক্তিকর। যেমন ঐ স্নানের ঘরের স্কাইলাইটটা। আজকাল একটু জোরে বাতাস দিলেই খট করে একটা দারুণ জোরে শব্দ হয়ে সেটা উল্টে যায়। কাচ ভাঙতে কতক্ষণ। এ কথাটাও শিবুকে বলে দিতে হবে। কাচের কাজ অবিশ্যি শিবু করবে না, কিন্তু ওর ঐ ভায়রাকে দিতে পারে। কি যেন তার নাম লক্ষ্মী বলেছিল। নাঃ, কাল সকালে মাছ ধরতে যাওয়া আর হয়ে উঠবে না, গণেশ চটবে। কিন্তু কি আর করা! সারাটা জীবন লক্ষ্মী যত্নে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি বজায় রাখবার চেষ্টা করে এসেছে; কোনো দিনও নিজের আরামের বা সুখের জন্য কিছু করে নি; মেয়েটার যখন ভালো বিয়ে হয়ে গেল, সেও স্রেফ লক্ষ্মীর জোরে—নাঃ, গণেশকে একটা চিরকুট পাঠিয়ে দিতে হবে। গণেশের বৌ তাই নিয়ে হাসাহাসি করবে নিশ্চয়। ভারী ভালো মাছ ধরবার চার তৈরী করে গণেশের বৌ। রাঁধেও খাসা। কিন্তু কি অগোছালো সে আর ভাবা যায় না; কোথাকার জিনিষ কোথায় ফেলে, ঘরদোর এলোমেলো, ঘরে এটা আছে তো সেটা নেই। রাগারাগও করে না কখনো, হারানো জিনিষ খুঁজে খুঁজে ঘেমে নেয়ে ওঠে, ঝাঁটা ঝাড়ন আর একগাল হাসি নিয়ে কাজে লেগে যায় যখন তখন। নেড়ি কুত্তো পোষে না ঠিক, কিন্তু কোনো নেড়ি কুত্তো ওদের বাড়ি থেকে না খেয়ে ফেরে না।

কম পাজীও নয় নেড়ি কুত্তোগুলো। গেটের তলায় লক্ষ্মী শিক লাগাবার পর, মোদির বেড়ার ভিতচার জায়গায় টানেল বানিয়ে ফেলল! শেষটা অনেকগুলো টাকা খরচ করে লক্ষ্মী আগাগোড়া বিলিতী তারের ঘের দিয়ে নিতে বাধ্য হল। লক্ষ্মীর কাছে পার পাবার জো নেই। নিজেকেও কোনো রেয়াৎই দেয় না কখনো, পরকেও তেমনি ছেড়ে কথা হয় না। বাড়িতে একটা কুটো পড়ে থাকে না, একটা কণা নষ্ট হয় না। সংসারের একটা কর্তব্য বাকি পড়ে থাকে না; সব চাঁদা দেয়া হয়, সব চিঠির উত্তর যায়, সব ছেঁড়া সেলাই হয়, সব অন্যায়ের প্রতিকার হয়, সব গুণের আদর হয়, সব দোষের সাজা হয়—এইখানে ফটিকের কথা মনে হতেই নবগোপালবাবু ছোট্ট একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে গেলেন। যাক লক্ষ্মীছাড়া! বলে কিনা পড়বে না কারখানায় যাবে। যাক না কারখানায়, বুঝুক কত মজা। লক্ষ্মীর আর কি দোষ, ওর ভালোর জন্যই যা বলবার বলেছে, মা নেই, বাপ একটা মোদো মাতাল, মামী বলবে না তো কে বলবে—তবু খালি খালি মনদার কেটে নোটে কোঁকড়া চুলো বোকা হাসিমাখা মুখটার কথা মনে হতে লাগল। ছোটবেলায় ভারী ন্যাওটা ছিল নবগোপালবাবুর, ভারী আদরের ছিল। দাদার জন্য, নবগোপালবাবু পেয়ারা গাছে চড়লে, গাছের গুঁড়ি ধরে দাঁড়িয়ে থাকত মনে গাছ উল্টে পড়লে ঠেকা দেবে বলে। সূর্য ডুবে যাবার পরও মাঝে মাঝে যে একটা লালচে আলো দেখা যায়, সেই আলো আজ চারিদিকে মেখে রয়েছে। নবগোপালবাবু আকাশের দিকে চাইলেন, এক ঝাঁক বক উত্তর দিকে উড়ে চলেছে। কোথায় গেল ফটিকটা কে জানে, একটুতেই সর্দি লাগে, রোজ মাছ খাওয়া অভ্যাস।

বাড়ির পথের মোড় ঘুরেই, নবগোপালবাবু থমকে দাঁড়ালেন। কে একটা লোক পথের ধারের কৃষ্ণচূড়ো গাছটার নীচের ডালটা ধরে দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। মতলব নিশ্চয় ভালো নয়। নবগোপালবাবু নিজেও একটু নজর করে দেখলেন। কেউ কোথাও নেই। বুধু বাড়ির সামনের দিকের বেড়া ছাঁটছে, তার কাঁচির খচ্ খচ্ শোনা যাচ্ছে, আর পিছনের গোল বারান্দায় একটা জলচৌকীতে বসে লক্ষ্মী নিবিষ্ট মনে একটা কাঠির আগায় সাবান মাখা ন্যাকড়া জড়িয়ে, রাশি রাশি শিশিবোতল পরিষ্কার করছে। ঐ রকম মেয়ে লক্ষ্মী। কোনো জিনিষ ফেলবে না, নষ্ট হতে দেবে না, প্রাণপণ যত্ন করবে। শিশিবোতলওয়ালার কাছে বেচলে কিছু হবে, সে বোতলগুলোও নিজের হাতে ধুয়ে রাখবে। ভারী লক্ষ্মী মেয়ে লক্ষ্মী। ওর হাতে পড়ে নবগোপালবাবুর জীবনটাই অন্যরকম হয়ে গেছে। নইলে এমন সময় ছিল যখন সূর্য ডোবার পর ঐ লালচে আলো আর বক ওড়া দেখলে নবগোপালবাবুর মনটা আনচান করে উঠত, মনে হত—ততক্ষণে কৃষ্ণচূড়ো গাছের ডাল ধরা লোকটার একেবারে সামনাসামনি এসে পড়েছেন নবগোপালবাবু।

"কি, হচ্ছে কি?"

লোকটা এমনি তন্ময় হয়ে তাকিয়েছিল যে, দারুণ চমকে [illegible] পড়েই যাচ্ছিল। কোনো রকমে সামলে নিল। তার

মুখটা যেন ভারী খুসিতে ভরা। একটু লজ্জিত ভাবে বলল, "না; কি হতে পারত তাই দেখছি।" কেন জানি লোকটাকে ভারী ভালো লাগল নবগোপালবাবুর। দু'এক দিন দাড়ি কামায় নি, পরনে একটা রং ওঠা কর্ডুরয়ের পেণ্টেলুন আর হাতকাটা খালি সার্ট, পায়ে এক জোড়া মেটে রং-এর ক্যাম্বিশের জুতো, গালভরা হাসি, মাথাভরা কাঁচা-পাকায় মেশানো রাশি রাশি ঢেউ খেলানো চুল, এলোমেলো হয়ে সেগুলো কপালে এসে পড়ছে আর দুই চোখের তারায় সূর্য ডোবার পরের লালচে আলো লেগে রয়েছে। ঠিক সেই সময়, যেন কিছুর সাড়া পেয়ে লক্ষ্মী একবার হাতের শিশি থেকে চোখ তুলে, গেটের দিকে তাকাল, তারপর শিশিটাকে তুলে ধরে ভেতরটা পরীক্ষা করতে লাগল। কি জানি কেন সেই লোকটার সঙ্গে নবগোপালবাবুও করবী গাছের ঘন অন্তরালে সরে দাঁড়ালেন। লোকটা কানে কানে বলল—"ও মেয়েদের কাছ থেকে পালানো ছাড়া উপায় নেই। আসুন আমার সঙ্গে।"

করবী গাছের নীচে, টক দই-এর কৌটো—ভাঁড় আনার অসুবিধা দেখে লক্ষ্মী কৌটোর ব্যবস্থা করে দিয়েছে, পুরোনো সাজা তিন দিনের বেশী রাখতে হয় না, লক্ষ্মী বলে—মাখনের টিন, কাপড় কাচার সাবান আর কাগজের ঠোঙায় কি কি যেন ছিল, সব নামিয়ে রেখে, বিনাবাক্যব্যয়ে নবগোপালবাবু গুটি গুটি লোকটির সঙ্গে চললেন।

বাগমারির রাস্তার বাঁক ঘুরে পথের ধারে একটা পুরোন নড়বড়ে মোটরগাড়ি দাঁড়িয়েছিল, সেকালে যেমন থাকত, দুপাশে তার পাদানি রয়েছে। কোনো কথা না বলে দুজনে পাশা-প্যাশি সেই পাদানির উপর বসে পড়লেন। লোকটা পকেট থেকে তুবড়োন এক প্যাকেট সিগারেট বের করে একটা ও'র হাতে গুঁজে দিল, একটা নিজে ধরাল। তার পরেই মুখ থেকে সিগারেটটা আবার বের করে বলল "ভগবানের কি দয়া ভেবে দেখুন, ঐ মেয়ের হাতে আমি আরেকটু হলেই আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছিলাম।"

নবগোপালবাবু বললেন, "কবে ?"

"ও সে ত্রিশ বছরেরও বেশী হবে। ও গাড়িটা ওর বাবার ছিল। ও-ও ঠিক ঐ রকমই ছিল, আরেকটু বয়স কম ওজন কম, রং ফর্সা, মাথায় চুল বেশী, নইলে হুবহু ঐ রকম। কি জানি কি চোখে দেখেছিলাম ওকে, দারুণ প্রেমে পড়ে গেছিলাম। জানেনই তো প্রেমের কোনো নিয়মকানুন নেই, কত সময় ভুল লোকের সঙ্গে প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করে, তার সঙ্গে কত লোকে জীবন কাটিয়ে দেয় সে যে ভুল লোক তা সন্দেহও না কোরে। আমারো আরেকটু হলেই তাই হচ্ছিল। টাকাপয়সা জোগাড় করে একটা হীরের আংটিও কিনে ফেলেছিলাম, ওর ভারী সখ। তারপর এমনি সন্ধ্যাবেলায় ওদের ঐ বাড়িতে যাচ্ছিলাম এমনি লালচে আলো, শির শিরে বাতাস আর বক ওড়ার সময়। ঐ কেষ্ট চুড়োর গাছটা তখন ছিল না, বড় রাস্তা থেকেই সব দেখা যেত। দেখলাম ঠিক ঐ জায়গায়, ঐ জলচৌকীটাই কি না তা বলতে পারলাম না, তবে ঠিক ঐ রকম করে কাঠির আগায় ন্যাকড়া জড়িয়ে শিশিবোতল পরিষ্কার করছে। ঐ রকম করে যেই আলোর দিকে তুলে ধরেছে, বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল, চোখ থেকে রঙীন চশমা খসে পড়ল বুঝলাম দুনিয়াকে দেখবে ও বোতলের ভিতর

প্রোষিতভর্তৃকা — নীলিমা সেন (গঙ্গোপাধ্যায়)

দিয়ে। কি বলব আপনাকে, জিনিষ কেনবার সময়ও যদি দাঁড়িপাল্লার ডান দিকে সওদা আর বাঁ দিকে বাটখারা রেখে একবার ওজন করে আবার পাল্টে নিয়ে বাঁ দিকে সওদা আর ডান দিকে বাটখারা রেখে দুবার কোরে ওজন না করে তো কি বলেছি'—দেখুন যে মেয়ে ঠকতে ভয় পায় তাকে কখনো বিয়ে করবেন না।"

নবগোপালবাবু গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, "তারপর কি হোল ?"

সে বললে, "হীরের আংটি পকেটে নিয়ে দিলাম টেনে দৌড়। হীরের আংটি বিক্রী করে প্রথমে একটা ঘোড়ার গাড়ি কিনেছিলাম, ঘুরে ঘুরে হোমিওপ্যাথি ওষুধ বিক্রী করতাম। কোথায় যে যাই নি সে আর কি বলব। আসামে গেছি, বর্মায় গেছি, কাম্বোডিয়া গেছি। ঘোড়ার গাড়ি বেচে নৌকো কিনেছিলাম। নৌকো বেচে এই গাড়িটা কিনেছি। জানেন আমার ভাপ্পি খেতে ভালো লাগে। পাথরের শিশিতে আছে একটু আমার কাছে, চেখে দেখবেন ?" লোকটা অমনি উঠে দাঁড়াল। নবগোপালবাবু বললেন, "ও বাবা, না!" "কেন, ভয় কিসের ? গন্ধকে ভয় পান নাকি ? আমি উটের চামড়ার থলিতে রাখা উটের দুধের দই খেয়েছি তা জানেন ? গন্ধ আর আমার কিছু করে না। শুঁকুন, এটা কি ?" কি একটা ন্যাকড়ায় জড়ানো ছোট্ট শিশি নবগোপাল-বাবুর নাকের তলায় ধরল। ভুরভুর করতে লাগল কস্তুরীর গন্ধ। লোকটা লজ্জিতভাবে বললে, "কাঁচা কস্তুরী। নিজে খুঁজে পেয়েছিলাম।"

মাথার ওপরে খুব নীচু দিয়ে বক ওড়ে, সূর্য ডোবার পরেও লালচে আলো ফিকে হয়ে আসে, লোকটা উঠে দাঁড়ায়।

"চলি। রাতের জন্য একটা আস্তানা খুঁজে নিতে হবে। নেবেন একটু কস্তুরী ? পাঁচ সিকে ছোট শিশি, পাঁচ টাকা বড় শিশি।"

বড় দুঃখে নবগোপালবাবু মাথা নাড়লেন। লক্ষ্মীর কাছে কড়ায় গন্ডায় হিসেব দিতে হয়। যেন মনের কথা বুঝতে পেরে লোকটি বললে, "আচ্ছা থাক। কথা ব'লে বড় আনন্দ পেলাম।" গাড়িতে ওঠে এঞ্জিনে ষ্টার্ট দিয়ে আবার বললে, "যারা সরু লম্বা খাতায় হিসেব লেখে এমন মেয়ে কখনো বিয়ে করবেন না। চলি তবে।" হাত নেড়ে চলে গেল লোকটা।

নবগোপালবাবু আস্তে আস্তে ফিরে এলেন, করবী গাছতলা থেকে সওদাগুলো তুলে নিয়ে, পিছনের গেট খুলে আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরলেন। লক্ষ্মী ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। "কিছু হয় নি তো ? এত দেরী দেখে ভাবনা হচ্ছিল। যেতে কুড়ি মিনিট, আসতে কুড়ি মিনিট। সেখানে আধঘণ্টাই ধরলাম, তার বেশী তো লাগা উচিত নয়।"

তারপর জিনিষগুলি তুলতে তুলতে বলল, "দইটার ওজন দেখেছিলে ? ভারী ঠকায় কিন্তু।"

বাইরের আকাশ থেকে সূর্য ডোবার পরের লাল আলোর শেষ চিহ্নটুকু মুছে গেল। এক ঝাঁক বক, এত নীচু দিয়ে উড়ে গেল যে, তাদের ডানার ঝটপটি কানে এল।

রাত্রে হয়তো ঝড় হবে। নাকে একটু একটু কস্তুরীর গন্ধ লেগে আছে।

ভয়

সুব্রত সমাদ্দার সেদিন বড় ভয় পেয়েছিল। এই কলকাতা শহরে একজন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ভয়ের বিশেষ কিছু নেই। তিনশ টাকা মাইনের সরকারী চাকরী আছে সুব্রতের। স্ত্রী গড়িয়াহাটা গার্লস হাইস্কুলে টিচারি করে। বুড়ো মা তিনটি ছেলে-মেয়েকে আগলান। দুটি ছেলে কিণ্ডারগার্টেনে পড়ে। আড়াই বছরের মেয়েটি ঠাকুরমার জপের মালা। সুব্রতের না খেয়ে মরবার ভয় নেই। পারিবারিক অশান্তিও নেই এমন কিছু। হয়তো মার সঙ্গে স্ত্রীর একদিন একটু কথান্তর হল কি স্ত্রীর সঙ্গে নিজের খানিকটা মতান্তর তাকে ভয়ঙ্কর কিছু বলা যায় না।

স্বজন বন্ধুদের মধ্যে সুব্রতের সজ্জন বলে খ্যাতি আছে। কারো সাতে পাঁচে নেই. ইষ্ট ছাড়া অনিষ্ট কারো করে না। দু'চারজন বাছা বাছা বন্ধু-বান্ধব নিয়ে তার জগৎ। কেউ প্রফেসর, কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনীয়ার কি ভালো চাকুরে। সমাজের আর একটু উঁচু ধাপের লোকের সঙ্গেও সুব্রতের পরিচয় আছে। তাঁদের সাজানো ড্রয়িং রুমে বসে সাহিত্য আর রাজনীতি নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করে চা খায়. কোনদিন বা হয়তো সখ করে দু-তিন ডিল ব্রীজ খেলে। তাদের রাসবিহারী এভেনিয়ুর একতলার ভাড়াটে ফ্ল্যাটেও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে এই ধরণের আলোচনা কি তাসের আসর বসে।

সুব্রতের স্ত্রী সুপ্রীতির বয়স তিরিশের কাছাকাছি। মোটামুটি সুদর্শনা। স্বাস্থ্য ভালো বলে আরো কম মনে হয়। শুধু দেহ-সজ্জা নয়, গৃহসজ্জার দিকেও তার লক্ষ্য আছে। রোজ ফুল কিনে ফুলদানি সাজায়। ঘরদোর [illegible] পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে। শুধু ঠিকে ঝির উপর ভরসা করে থাকে না। স্কুলে ভালো পড়ায় বলে সুপ্রীতির সুনাম আছে। কিন্তু নেই সুখ্যাতি তার পারিবারিক কর্তব্যে ঔদাসীন্য আনে না। ছেলে-মেয়ে আর তার বাবার উপর সুপ্রীতির মনোযোগ অবিচ্ছিন্ন। এদিকে আত্মীয়স্বজন কেউ এলে তাদেরও হাসিমুখে আপ্যায়ন করতে জানে। শুধু চা জলখাবার খাওয়ায় না, অনুরোধ করলে মিষ্টি গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীতও শোনায়। উৎসবে-আনন্দে, বিপদে-আপদে,

পাড়া-পড়শী, আত্মীয়, বন্ধুর খোঁজ-খবর নেয়, অসুখ-বিসুখে সময় থাকলে রোগীর একটু শুশ্রূষা করে, বিয়ে, অন্নপ্রাশনে কি জন্মদিনের উৎসবে পোষাকী শাড়ী ছেড়ে রেখে তরকারি কোটা কি পরিবেষণে অংশ নেয়। এই সব কারণে সুপ্রীতি কুটুম্ব-স্বজন-প্রিয়া। বসুধৈব কুটুম্বকম কথাটা মহাপুরুষদের জন্যে। সাধারণ মানুষের পক্ষে আত্মীয়স্বজনের যে বসুধা তাকে সুধায় ভরে রাখতে পারলেই হল।

সুব্রত স্ত্রীকে ভালোবাসে। স্ত্রীর ভালো-বাসা পায়। দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে তার ভয়ের কিছু নেই, যে ভয় অনেক বন্ধুর চোখে সে মাঝে মাঝে দেখে থাকে। বন্ধুরা তাকে গৃহ-পালিত বলে ঠাট্টা করে. কিন্তু গৃহ-ভীত হওয়ার চেয়ে গৃহ-পালিত হওয়া বরং ভালো। মানুষ বনের ভয়ে ঘরে আসে, কিন্তু ঘরের ভয়ে বনে গিয়েও শান্তি পায় না।

ভয় কথাটা সুব্রত প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। চোর, ডাকাতের ভয় তার নেই। এমন কিছু ধন-সম্পদ সে করেনি যার ওপর চোরের লোলুপ দৃষ্টি পড়তে পারে। যেটুকু যা আছে তা সুব্রতের স্ত্রী আর মা-ই পাহারা দিয়ে রাখেন। সেফডিপজিট ভল্টে সুপ্রীতি তার গহনাগুলি রাখে। নিজের ঘড়িটা, পেনটা সুব্রতের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। বাড়ীতে আর যা আসবাবপত্র আছে সেগুলি সম্বন্ধে সুব্রতের মা মোটামুটি সতর্ক। রাত্রে সদর দরজা তিনিই বন্ধ করেন—শেষ রাত্রে একবার উঠে দেখেন সব ঠিক আছে কিনা. দিনের বেলায়ও সুব্রতের সন্তান আর সম্পদ তাঁরই রক্ষণে আর অবেক্ষণে থাকে।

তবু সুব্রতের মা ছেলেকে মাঝে মাঝে সাবধান করে দেন, 'পথঘাট সাবধানে পার হয়ো বাপু, গাড়ি-ঘোড়াটোড়া দেখে-শুনে চলো।'

ঘোড়া আর কলকাতা শহরে কই। ঘোড়ার গাড়ি প্রায় উঠে গেছে, ঘোড়াও আর দেখা যায় না। এ নিয়ে বরং সুব্রতের মনে একটু আফশোষই আছে। সভ্যতা এমন একটি সুন্দর প্রাণীকে হারাল। তার কাছে মোটর গাড়ির

য়ে ঘোড়ার সৌন্দর্য অনেক বেশি। কিন্তু ল কি হবে নাগরিকরা রেসের মাঠেই ড়াকে আটকে রাখবে। বাহন হিসেবে সে র কোনদিন ফিরে আসবে না।

সুব্রত একটু অন্যমনস্ক বলে তার জন্যে স আর মোটর একসিডেন্টের ভয় তার মার বশ্য আছে। সুপ্রীতিও মাঝে মাঝে উদ্বেগ নায়। কাগজে বাস একসিডেন্ট আর মোটর ঘটনার খবর প্রায়ই বেরোয় আর কখনো খনো ট্রেণ কি প্লেন ক্র্যাসের দুঃসংবাদ। াগজে যখন এ সব খবর বেরোয় তা নিয়ে কছুক্ষণ কি বড় রকমের ঘটনা ঘটলে হতা-তের সংখ্যা বেশি হলে কিছুদিন তা নিয়ে মালাপ-আলোচনা হলে কাগজে সম্পাদকীয় ন্দর্ভ বেরোয়। তারপর লোকে আবার সব ভুলে যায়। যে কোন মুহূর্তে লোকান্তরিত বার ভয় তো মানুষের আছেই। কিন্তু সে ভয় কেউ মনে রাখে না।

তবু শহরের সভ্য স্বচ্ছল মানুষে বহু দুর্ঘটনার ভয়কে অতিক্রম করেছে। বিশেষতঃ এই কলকাতা শহরে সাপের মত বেণী আছে কিন্তু চিড়িয়াখানা ছাড়া সত্যিকারের সাপ, বাঘ নেই, ঝড়, ভূমিকম্প, বন্যার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেই, সুব্রতের মত অরাজনৈতিক নির্বিরোধ মানুষের পক্ষে রাজরোষ নেই, গোয়েন্দা পুলিশের অস্তিত্ব নেই, ভয়ের কথা কেন মনে থাকবে সুব্রতের? সে Crime Story পড়ে না, ডিটেকটিভ নভেল ছোঁয় না, জীবনে কি শিল্প সাহিত্যে uncanny যা কিছু আছে তার ধার দিয়েও ঘেঁষে না। ভয়কে তার মনে পড়বার কথা নয়।

তবু সুব্রত সেদিন দারুণ ভয় পেয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যার পর রাত তখন আটটার বেশি হবে না, কাগজের অফিসের এক বন্ধুর সঙ্গে গল্প-গুজব সেরে সোজা পথে এসপ্লানেডে না গিয়ে ম্যাডান স্ট্রীট দিয়ে ধর্মতলায় পড়তে গিয়ে দু'বার ঘুরপাক খেয়ে এক সরু গলির মোড়ে এসে থেমে পড়েছিল সুব্রত। এ অঞ্চলে আসা-যাওয়া নেই। তাই একটু দিক-হারা আর দিশেহারা হয়েছিল ঠিকই। আর সময় বুঝে ঠিক সেই মুহূর্তে ঘটনাটি ঘটল। পাতাল ফুঁড়ে কোত্থেকে বেরোল একটি মেয়ে। রূপ তার সীতার মত নয় বরং শূর্পণখার কাছাকাছি। রোগাটে ছিপছিপে চেহারা। খাটো চুল, চোখে সুর্মা, ঠোঁট দুটি রক্তবর্ণ, নখও তাই, পরনে পুরোন লাল জর্জেট, চোয়াল লাগা, গাল দুটি ভাঙ্গা, কিন্তু স্তন দুটি অতিপুষ্ট আর উদ্ধত, অন্য প্রত্যঙ্গের অনুপাতে একটু বা বিসদৃশ, হাতে ছোট একটি ভ্যানিটি ব্যাগ। যেতে যেতে সুব্রতকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে সেও যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। তারপর মৃদু হেসে বলল, 'চিনতে পারছ?'

সুব্রত মুহূর্তকাল নির্বাক আর নিষ্পলক হয়ে থেকে বলল, 'না। কে আপনি?'

'একেবারে আপনি? আমি ঠিক এই আশঙ্কাই করছিলাম। তুমি চিনতে পারবে না, মানে চিনতে চাইবে না। তবু একটু দেখ না চেষ্টা করে।'

মেয়েটি হাসল।

আর তার সেই লাল ঠোঁটের পটে সাদা দাঁতের হাসিতে ভয়ে সুব্রতের সর্বাঙ্গ শির-শির করে উঠল। চেনা মুখের হাসি নয়, অচেনা মুখের অনর্থকর হাসি।

সুব্রতের মুখ থেকে কথা বেরোতে চায় না। তবু সে কোনরকমে অতিকষ্টে বলল, 'পথ ছেড়ে দিন। আমি আপনাকে জানিনে, চিনিনে, কোনদিন দেখিনি। আপনি নিশ্চয়ই ভুল করেছেন। কি নাম আপনার?'

মেয়েটি অত সহজে ধরা দিল না, আগের মতই মিষ্টি হেসে বলল, 'মুখ দেখে যখন চিনতে পারনি নাম শুনেই কি পারবে! এক নামে হাজার মেয়ে আছে। তুমি অত ভয় পাচ্ছ কেন?'

ভয় পেয়েও সুব্রত বলল, 'আমি মোটেই ভয় পাইনি।' তার গলা অবশ্য নির্ভীকের মত শোনাল না, 'আপনি আমাকে কি করে চিনলেন, কোথায় দেখেছেন তাই বলুন।' মেয়েটি বলল, 'আজ আর অতীতের কথা বলে কিছু লাভ নেই। তোমার কোন কথাই মনে পড়বে না। তার চেয়ে এসো বর্তমান আর ভবিষ্যতের গল্প করি। কিন্তু সে গল্প তো রাস্তায় দাঁড়িয়ে হবে না। চল কোন চায়ের দোকানে গিয়ে বসা যাক।'

ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। সুব্রত শুধু আরক্ত নয়, ভিতরে ভিতরে রক্তাক্ত এবং ভয়ার্ত হয়ে অস্ফুট স্বরে বলল, 'না-না। আপনি চলে যান।'

মেয়েটি বলল, 'অত ভয় পাচ্ছ কেন? আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না, শুধু খানিকক্ষণ গল্প করব। এতকাল বাদে দেখা।'

সুব্রত এবার চারদিকে তাকাল। ধারে কাছে লোক নেই। একটু দূরে পান-সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে জন দুই লুঙ্গি পরা লোক তাদের দিকে তাকাচ্ছে আর নিজে-দের মধ্যে কি যেন বলাবলি করছে। সুব্রতের গা ফের শির্‌শির করে উঠল। কে জানে ওদের হাতে ছুরি-ছোরা আছে কিনা, কে জানে ওরা এই মেয়েটিরই দলের লোক কি না। হঠাৎ সুব্রত চারদিক অন্ধকার দেখল আর সেই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল একটি আলেয়াকে—তার চোখে তৃষ্ণা, মুখে হাসি। সে হাসি যেমন সহজবোধ্য তেমনি দুর্বোধ্য, আর অস্বস্তিকর।

হঠাৎ সুব্রত বলল, 'পুলিশ পুলিশ।'

সভ্য জগতের এই প্রয়োজনীয় আর অতি পরিচিত শব্দটা কেনই বা এতক্ষণ সে ভুলে ছিল, কেনই বা হঠাৎ তার মনে পড়ল তা বলা যায় না। হয়তো দূরে রাস্তার মোড়ে লাল পাগড়ির আভাস দেখে থাকবে। কিন্তু তার সেই ভয়ার্ত স্বর অত দূরে তো ভালো, কাছের মেয়েটির কর্ণকুহর ছাড়া আর কোথাও পৌঁছল কিনা সন্দেহ। এবার তার চোখে আর মুখেও ভয়ের ছাপ পড়ল। কিন্তু সে তা গোপন করে হাসতে চেষ্টা করে বলল, 'এ কি তুমি পুলিশ ডাকছ? তোমার কি কাণ্ডজ্ঞান সব গেছে? তুমি কি পাগল হয়েছ? তুমি কি আরো কেলেঙ্কারি বাড়াতে চাও? ছি-ছি-ছি।'

কিন্তু যতই বলুক মেয়েটি যে ভয় পেয়েছে তা বুঝতে সুব্রতের আর দেরি হল না। মেয়েটিকে এক পা দু পা করে পিছিয়ে যেতে দেখে সে আরো নিঃসন্দেহ হল। আর একটু গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে ডাকল 'পুলিশ পুলিশ।'

এবার মেয়েটির চোখের ভয় সুর্মার চেয়েও কালো আর ঘনতর হল। মুহূর্তের জন্যে নির্বাক নিষ্প্রভ, প্রায় নিষ্প্রাণ হয়ে রইল সে।

কিন্তু সুব্রতের ভয়ার্ত গলা যতই চড়ুক মোড় পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল না। পানের দোকানের দুজন লোকই তার সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এল—'কি হয়েছে বাবু সাহেব, কি হয়েছে?'

কিন্তু মেয়েটি ততক্ষণে বেশ খানিকটা দূরে চলে গেছে। সুব্রত কিছু বলবার আগে সে লোক দুটির দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'আমি বলছিলাম কি, আমি ওই পাঁচতলা বাড়ীটার ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ব।'

দুজনের একজন বলল, 'কেন, আপনি তা পড়বেন কেন?' আর একজন যার মাথায় কাঁচা-পাকা চুল মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি সে বলল, 'কেন আপনার কিসের দুঃখ?'

মেয়েটি হেসে উঠল, 'দুঃখ আবার কিসের, আমি মনের আনন্দে রোজ পাঁচতলার ওপর থেকে ছ'তলার ওপর থেকে লাফিয়ে ফুটপাতে পড়ি। আমার কিছু হয় না। আবার রোজ উঠি। আমার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে ভালো লাগে না, লিফটে উঠতে ভালো লাগে না, আমি পাইপ বেয়ে বেয়ে উঠি।'

তাদের তিনজনকে নির্বাক করে রেখে মেয়েটি দ্রুত পায়ে গলির অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। দাড়িওয়ালা লোকটি বলল, 'জেনানা পাগলী আছে বাবু।'

তার পাশের লোকটি বলল, 'পাগলী নেহি সেয়ানা বদমাস আছে। চলে যান বাবু, কুছ ডর নেহি আপকো।'

সুব্রত এবার রাস্তাটুকু পার হয়ে ধর্ম-তলায় পড়ল। দিব্যি পরিচিত সুসভ্য শহর। চারদিকে আলো। ট্রাম চলছে, বাস চলছে। সিনেমা হাউসটার সামনে বেশ ভিড়। বোধহয় একটা শো এবার ভাঙ্গল। এক পাশে দাঁড়িয়ে লাল পাগড়ি বাঁধা দুজন সমবয়সী কনেষ্টবল মনের সুখে গল্প করছে।

সুব্রত ট্রাম লাইনটা পার হয়ে বালিগঞ্জ-গামী দু নম্বর বাসটা ধরল। একতলায় জায়গা থাকা সত্বেও দোতলায় উঠে সব চেয়ে সামনের বেঞ্চটিতে গিয়ে বসল। নিজের ভয়ের জন্যে এবার লজ্জা বোধ করল সুব্রত। নিজের মনেই হাসল। অত ভয় পেতে গেল কেন সে। মেয়েটা তার কিই বা ক্ষতি করতে পারত। এত বড় শহরে যেখানে পুলিশ আছে, লোকজন আছে, সব আছে—।

বাড়ীতে এসে মার কাছে ব্যাপারটা বলতে তার লজ্জা বোধ হল। কিন্তু স্ত্রীর কাছে একটু একটু করে প্রায় সবই বলল। হাসতে হাসতেই বলল। ভয় পেলেও সে যে মারাত্মক রকমের ভয় পেয়েছিল সে কথা স্ত্রীকে বুঝতে দিতে চাইল না।

কিন্তু সুপ্রীতি চালাক তো কম নয়। সে বলল, 'হুঁ তোমার যা সাহস তা আমার জানা আছে। তুমি পুলিশ ডাকতে অত দেরি করলে কেন? জানো ওরা সব পারে। তোমার কাছে ঘড়ি ছিল, কলম ছিল, পকেটে পাঁচ টাকা দশ আনার পয়সা ছিল। কিছুই আর ফিরে আসত না।'

ছেলে-মেয়েরা ঠাকুরমার কাছে পাশের ঘরে শোয়।

(ইহার পর ১৫[illegible])

জীবনী

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বাগচী

যে-কোন গল্প তা সে কল্পিতই হোক আর বাস্তবই হোক, কারো না কারো জীবনী। তবে আমি যা লিখছি তা জীবনী না গল্প তা অন্ততঃ আমার কাছে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

এদেশে জীবনী লিখবার একটা রীতি আছে। যাঁদের জীবনী লিখতে হবে তাঁদের ছেলেবেলা থেকেই প্রতিভার বিকাশ দেখাতে হয়। তিনি পরবর্তী জীবনে সংগীতজ্ঞ হবেন, তাই অন্যান্য শিশুর মত কেঁদে চাপা দিয়ে দেখাতে হবে যে তিনি প্রথমে 'মা' উচ্চারণ করেন নি, প্রথমে উচ্চারণ করেছিলেন 'সা রে গা মা'। তিনি বীর, তিনি চার বছর তিন মাস বয়সে একটি কুকুরকে অবলীলাক্রমে নিধন করেছিলেন,—ইত্যাদি।

আমাদের নিধিরাম এ-সবই করেছে, কিন্তু একসঙ্গে করেছে। পাখা চুরি করেছে, নামতা মুখস্থ করেছে, রাশি রাশি মাছি মেরেছে, দানও করেছে। অর্থাৎ সে বাল্যকালে সবই করে ফেলে আমাকে এমন বিপদে ফেলেছে যে, পরবর্তী জীবনে সে কি হবে তা কারো ধারণাতেই আসে না।

নিধিরামের জন্মস্থান কোথায় তা কেউ জানেনা। তবে সে বাঙালী। বাঙলার নদ-নদী, আলো-হাওয়া, সুজলা-সুফলা কচুরীপানা, ম্যালেরিয়া, কাঁঠাল, আমড়ায় গড়া তার দেহ-যষ্টি। রূপে, গুণে, শৌর্যে, বীর্যে, ঐশ্বর্যে সে বাঙালী।

সে পথে পথে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু সেজন্য সে কাউকে দায়ী করেনা। সে একমাত্র দোষ দেয় অদৃষ্টকে, যে অদৃষ্ট তাকে বাঙালী করেছে।

কিন্তু তারও নাকি পিতা-মাতা, ভাই-বোন, ঘর-বাড়ী সবই ছিল, কিন্তু আজ তা স্বপ্নের মতো মিথ্যা।

নিধিরামের পিতা যখন রোগে, শোকে, দারিদ্র্যে শয্যাগ্রহণ করলেন তখন বাঙালী প্রতি-বেশিগণ এবং আত্মীয়গণ বুঝতে পারলেন যে, এটা আর কিছু নয়, শুধু স'রে পড়বার মতলব সুতরাং এইটাই তাঁদের সুবর্ণ-সুযোগ।

তাঁরা উদ্যোগী বাঙালী সুতরাং নিধিরামের পিতার সম্পত্তি দখল করতে দেরী করলেন না। শ্মশান যাত্রার পূর্বেই নিধিরামের পিতার বাস্তু বেহাত হ'ল।

নিধিরাম পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। তার পেট এবং পিঠের মধ্যে যে সামান্য স্থান আছে তাতে যৎসামান্য খাদ্যেরই প্রয়োজন। কলের জলে তা কিছুদিন ঠাণ্ডা রাখবার পরে নিধিরাম একটি গৃহশিক্ষকের কাজ পায়, দক্ষিণা দশ টাকা। ছাত্রের পিতাও বাঙালী। কত কষ্টে যে তিনি ঐ দশটি টাকা ছেলের শিক্ষা-খাতে ব্যয় করেন তা বাঙালী মাত্রেই বুঝতে পারেন। তাঁরও কয়েকটা ছেলেমেয়ে আছে। সামান্য বেতনের চাকরী। বড় মেয়েটি চব্বিশ বছরে পড়েছে। লেখা-পড়া শেখানোর পয়সা নেই। মেয়ের বিয়ে দেবার সামর্থ্যও নেই। এত বয়স পর্যন্ত ফ্রক পরিয়েই রেখেছেন। বাড়ন্ত গড়নের দোহাই দিয়ে যতদিন চলে। তাঁর উদ্দেশ্য এই যে, কোন একটি সুদিন এলেই মেয়ে পাত্রস্থ করবেন। কিন্তু বাঙালীর আর সুদিন আসে না। অথচ বর-পক্ষের গুণাবলী বিষয়ে এখন আর তাঁর কোন মোহ নেই। পূর্বে সে-সব ছিল, শিক্ষিত হওয়া চাই, স্বচ্ছল অবস্থা হওয়া চাই ইত্যাদি কিন্তু ক্রমে ক্রমে তিনি সে সব দাবী ত্যাগ করেছেন। এখন মাত্র একটি দাবী আছে,—পুরুষ হ'লেই হ'ল।

নিধিরামকে তিনি যেন মাঝে মাঝে পুরুষ ব'লে সন্দেহ করতে লাগলেন। হঠাৎ একদিন তাঁর মনে হ'ল, 'তাইতো, হাতের কাছে নিধিরাম আছে তা চোখেই পড়েনি।' তবে নিধিরামের ঘর বাঁধা দরকার। নিধিরামের চাকরী হোক বা না হোক, তার আশ্রয়ে একবার মেয়েকে পাঠাতে পারলে হয়। তারপরে সে বুঝবে।

নিধিরামও কথাটি শুনল। সে বাঙালী তাই তার মনেও ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। একখানা ছোট ঘর। সামনে একটু ফুলের বাগান। বেল, যুঁই, চামেলি, রজনীগন্ধা। মাধবীলতায় ফটক মোড়া। আরো যদি একটু বাড়তি জমি থাকে তাহ'লে পুঁই, বেগুন, লঙ্কার কয়েকটি চারা আর লাউ কুমড়োর গাছ হ'লেই চলবে।

আর কোন আশা নেই। সামান্যই তার আকাঙ্ক্ষা। সেই ছোট বাড়ী নিজেরই হোক আর ভাড়া বাড়ীই হোক।

মেয়ের মা শুনে বললেন, "তা বেশতো, নিধিরাম বি. এ. পাশ করেছে, চাকরী একটা হবেই। আর চেহারাটাও খারাপ নয়,—বাঙালীর মতই। আমার আর আপত্তি কি?"

কন্যা রমার কাছেও খবরটি গোপন থাকে না। সে তার শিশু-সুলভ কৌতূহল প্রকাশ করল। "ওমা, নিধিদা আমার বর হবে কেন?"

মা বললেন,—"নিধি তোকে বিয়ে করবে যে।"

রমা বলল, "তাই নাকি!! বেশ হবে, দিদির হবে, না মা?" মনে মনে বলল, 'আর অভিনয় করা যায় না, লজ্জা করে।'

রমার মনেও অনেক রঙিন কল্পনাই ছিল। বাড়ী, গাড়ী আরো কত কি! কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেও তার কল্পনাকে ছোট ক'রে এনেছে। ছোট একখানা নিজস্ব বাড়ী হ'লেই তার চলে। নিজের ঘর, নিজের খাট-বিছানা, নিজের সংসার।

নিধিরাম চাকরীর খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। চাকরী তাকে করতেই হবে। রমাকে নিয়ে তাকে ঘর বাঁধতে হবে। কত রঙিন কল্পনা। ইতিপূর্বেও সে বহুবার চাকরীর খোঁজে বেরিয়েছে কিন্তু এবারে অদম্য উৎসাহ। 'জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি।'

নিধিরাম এ-শহর সে-শহর ক'রে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু চাকরী পায়না। তার একমাত্র অপরাধ যে সে বাঙালী। বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, বাঙালীর শক্তি-সামর্থ্যই তার সম্বল।

বহুদিন পরে কাঠিসার-দেহধারী নিধিরাম এক গাড়ীতে উঠল। পরের আয়ের উপরেই এখন তাকে নির্ভর করতে হয়। গাড়ীতে উঠে নিধিরাম বলে,—"মনস্কামনা সিদ্ধ হোক, একটা পয়সা।"

আরোহীরা বলে, "ভিক্ষে করতে লজ্জা হয় না? খেটে খেতে পার না?"

নিধিরাম বলে, "খেটে খেতে পারি কিন্তু কেউ খাটাতে চায় না।"

আরোহীরা বাঙালী। তারা নিধিরামকে অপমান করে, ভিক্ষে দেয় না। বলে—"ভিক্ষে [illegible]া স্বভাব, বাঙালীদের ঐ বড় দোষ।"

এবারে অপমানিত নিধিরাম সমাজ ত্যাগ করল, মানুষের সমাজ। তার আর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। নানা জনে নানা কথা বলে। সে নাকি সংসার ত্যাগ করেছে,—তার বৈরাগ্য হ'য়েছে। তীর্থ-পর্যটনে সে দাক্ষিণ দিকে যাবে, একেবারে রামেশ্বরম্। সেখানেই সে তপস্যা করবে।

হঠাৎ যখন নিধিরামের খোঁজ পাওয়া গেল তখন দেখা গেল সে কঠোর তপস্যা করছে। কখনও মোটা মোটা বালিশের উপরে পা তুলে হেঁট মুণ্ডে, কখনও কাৎ হ'য়ে, কখনও চিৎ হ'য়ে এমন নিদারুণ তপস্যা করছে যে দেবতাদের অনড় টনকও নড়ে' গেল। দেবতা দেখা দিলেন যাদবপুরের টি, বি, হাসপাতালে। নিধিরাম সেখানেই তপস্যা করছে। রামেশ্বরমের দিকে বেশি দূর অগ্রসর হ'তে পারেনি।

মনে হ'তে পারে এটা নিছক রূপকথা। কিন্তু এটা রূপকথা নয় সত্যই জীবনী। একদিন সত্য সত্যই পিতামহ ব্রহ্মা চারপ্রকার হাসিতে চারটি মুখ উজ্জ্বল ক'রে তপস্যারত নিধিরামের সামনে এসে উপস্থিত হ'লেন।

নিধিরাম চোখ বন্ধ ক'রে তপস্যা ক'রেই চলেছে, চোখ খুলছে না। তবে থেকে থেকে ক'রে [illegible] সাড়া দিল। ব্রহ্মাকে দর্শনের অভিলাষও [illegible]। সে ব্রহ্মাণ্ড দেখেছে—তাতেই সে [illegible]।

পিতামহ বললেন, "বৎস নিধি! তোমার তপস্যায় আমি বড়ই প্রীত হ'য়েছি। তুমি বর প্রার্থনা কর, একটি দিয়ে যাই।"

[illegible] নিধিরাম বলল, "প্রভু, জীবনে [illegible], আমার কোন আকাঙ্ক্ষাই নেই। [illegible] সম্বন্ধেও আমার কোন স্পষ্ট ধারণা [illegible] যে তপস্যা করছি তা, আমিও [illegible]। তপস্যা করতে হয় তাই করলাম, যদি [illegible] দেব। আমার কোন [illegible] নেই।"

ব্রহ্মা [illegible] নাক থেকে ফোঁস্ ক'রে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে বললেন,—"বৎস! সবই বুঝি। তুমি আবার ভেবে দেখ, আমি যখন এসে পড়েছি তখন একটি বর তোমাকে দেবই দেব।"

নিধিরাম আর কি চাইবে! সে তার অন্তর অনুসন্ধান ক'রে দেখল সেখানে বিরাট শূন্যতা। কোনদিন কোন আকাঙ্ক্ষাই তার পূর্ণ হয়নি। একটি বরে সেই বিরাট শূন্যতার কতখানি পূর্ণ হ'তে পারে? যার অভাব অল্প তার কাছে বরের হয়ত মূল্য থাকতে পারে। কিন্তু নিধিরামের যে সবটাই অভাব। জীবনে কোন আশাই যে তার পূর্ণ হয়নি।

তবু তাকে চাইতে হয়। পিতামহ বড়ই পীড়াপীড়ি করছেন। কিছু একটা না চাইলে আর ভদ্রতা থাকে না। নিধিরাম বাঙালী, ভদ্রতাই তার সম্বল। কিন্তু সে কি চাইবে?

হঠাৎ নিধিরামের মনে পড়ল বল্লভভাইয়ের কথা। কেন মনে পড়ল তার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। নিধিরাম একবার ময়দানে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সভায় গিয়েছিল। সেই দৃশ্য তার মানসপটে ভেসে উঠল। লক্ষ লক্ষ নরনারীর [illegible] বিরাট জনসমাবেশ। অগণিত ভক্তদের গগনবিদারী জয়ধ্বনি। মাঝখানে মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে দীপ্ত কঠোর সর্দারজী। সে দৃশ্য নিধিরাম কখনও ভুলতে পারবে না। যদি মানুষ হ'তে হয়, যদি সমস্যার আপোষহীন সমাধান করতে হয়, তাহ'লে ঐ সর্দারজীর মতই হ'তে হবে।

নিধিরাম ভেবেই চলেছে,—কোন সাড়া নেই। এমন কি নড়েও না। পিতামহ বরদান করতে এসে আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবেন? তাঁকে আরো বহু বাঙালীর কাছে যেতে হবে। বর-প্রার্থী সকলেই বাঙালী। আপাততঃ তাঁর হাতে যে ক'টি কেস আছে, তাদের বর প্রদান করতেই পঞ্চাশ বছর কেটে যাবে। নূতন কেসের তো কথাই ওঠে না। তিনি আর কতক্ষণ দাঁড়াতে পারেন?

এবারে তিনি অসহিষ্ণু হ'য়ে বললেন—"বৎস নিধি! দয়া করে একটি বর চাও বাবা, আমিতো আর দাঁড়াতে পারিনে বাবা।"

নিধিরাম বলল, "অনর্থক আর আপনাকে কষ্ট দেব না, যদি একান্তই কিছু দিতে হয় তাহ'লে বুঝলেন কিনা, সর্দার—"

নিধিরাম আর কিছু বলতে পারল না। তার দম বন্ধ হ'য়ে গেল।

ব্রহ্মা বললেন, "তথাস্তু। বাংলার ঘরে ঘরে নিধিরাম সর্দারের নাম প্রচারিত হোক।" [illegible] তাঁর খাতায় নিধিরামের টাইটেলটি লিখে নিলেন।

ব্রহ্মা চ'লে যাবার পরে ডাক্তার এলেন। তিনি এসে দেখলেন যে নিধিরামের যাবার সময় হ'য়েছে। ব্রহ্মার দেখা পেলে তাকে তাঁরই সঙ্গে পাঠাতেন, কিন্তু দেখা না পাওয়ায় ডোমকে ডাকতে হ'ল, তারা শবাহী গাড়ী আনল।

নিধিরামের বাকদত্তা পত্নী রমারও যাদবপুরে যাবার কথা ছিল কিন্তু অর্থ এবং অভিভাবকের অভাবে যেতে পারেনি। পথেই তার সঙ্গে ব্রহ্মার দেখা হ'ল। সৃষ্টিকর্তা তাকেও বর দিতে প্রস্তুত হ'লেন কিন্তু বরের উপরে রমার আর কোন আকর্ষণ নেই, কোন আস্থা নেই। তাই সে কোন বর প্রার্থনা করল না, শুধু কাশির সঙ্গে গুণ গুণ ক'রে গাইল,—

'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা
স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না ক তুমি—"

ব্রহ্মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে তাল ঠুকতে লাগলেন। ভেবেছিলেন রমা গান শেষ ক'রে বর চাইবে। কিন্তু তা হ'ল না। সে গান শেষ করল। পিতামহ তাল ঠুকেই চলেছেন—খেয়াল নেই। পরে যখন খেয়াল হ'ল তখন মুখের দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে দেখলেন যে রমা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রেছে। [illegible] [illegible] ত্যাগ করলেন তবে সে [illegible] নয়, স্বস্তিনিঃশ্বাস এবং দাড়ি [illegible] [illegible] বললেন [illegible] একটি খাঁটি বাঙালী।

কালজয়ী

বংশীধারী দাস

এখনো হৃদয়-নটীর নূপুরে
রৌদ্রমদির অলস দুপুরে
সুরে ভরে দেয়, ভরে দেয় সুর
জীবনের তারে
কালের তীক্ষ্ণ হাওয়ার প্রহারে
এ গান কখনো থামবে না।
অজেয় হৃদয় পরাভব কভু মানবে না।

ক্ষণিক আলোর স্বপ্নবৃত্ত
ভাঙ্গে আর গড়ে খেয়ালে নিত্য,
খুশির হাওয়ার ঝলকে চিত্ত
রঙে ও রেখায় কত ছবি আঁকে
রেখাগুলো তার
কালের রোমশ হাতের বিচার
জানি নিঃশেষে মুছে দিতে আজো পারবে না।
শিল্পী হৃদয় তুলিটি কখনো ছাড়বে না।

ছুটির দিনের
ভাবনাবিহীন অপরাহ্ণের
রঙের মিছিল,
মায়াবী মনের আলোর নিখিল
রক্ত স্বেদের বাস্তবতার কঠোর কুঠার
ভেঙ্গে দিতে আজো পারবে না।
স্থূল বস্তুর লড়াইয়ে হৃদয় হারবে না।

স্বপ্নেরা করেছে ভীড়

মণিমালা দাশগুপ্ত

স্বপ্নেরা করেছে ভীড়!
ভীড় শুধু মানুষের নহে।
নহে শুধু, অগণন—
শব্দের মুহূর্তে পার হওয়া
দুর্গম পথের 'পরে
পা ফেলে ফেলে—,
স্বপ্নেরা চলেছে ডানা মেলে
ঝিকিমিকি আলোদের
চঞ্চল কাঁপনে—,
এখানে সংবাদ আসে
রাত-জাগা মানুষের মনে,
আকাশ-কুসুম কল্পনার
দিন অবসান।
স্বপ্নেরা করেছে ভীড়!
ইতিহাসে সাড়া জাগে।
আন্দোলন, প্রতিরোধ,
চূড়ান্ত সংগ্রাম আর
শান্তির শপথ—;
সংক্রামিত সময়ের পথে,
স্বপ্নরা উত্তীর্ণ হোলো
কল্পলোক হোতে।
ভীড় হোলো ইতিহাসে।
স্বপ্নে সৃষ্টি হোলো তারিখে ও সনে,
স্বপ্নেরা প্রস্তুত হোলো
মানুষের শ্রেষ্ঠ রূপায়ণে।

রাগ-রাগিণী

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

"তুমি কি রাগ করেছ?"

"না ভাই, আমি ত রাগিনি!"

প্রাচীনকালে এই গোছের একটা কথা-বার্তা থেকেই 'রাগ' আর 'রাগিণীর' প্রসঙ্গটা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এসে পড়েছিল কিনা, তা নিয়ে অনেক গবেষণা করে ফেল্‌লে আমাদের হাবু।

হাবু কিন্তু নিতান্ত হাবা নয়। তাকে যখন তার গবেষণার বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে বলা হ'ল, তখন সে বলল "দেখুন, ক্রোধে মন বিক্ষিপ্ত হয়, মাথায় রক্ত ওঠে, এই রক্তের রঙ থেকেই ক্রোধের রঙ লাল কল্পনা করা হয়েছে। ব্যাপারটা আসলে রঙেরই খেলা। দেখেননি, লাল কাপড় দেখলেই কোনো কোনো জানোয়ার ক্ষেপে যায়? মানুষের মনও এই রঙের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়,—বরং রঙের খেলা মানুষের মনে আরো অনেক বেশী বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। এখন রঙ মানেই হচ্ছে রাগ, অর্থাৎ কিনা রাগ মানে রঙ—যা দিয়ে রঞ্জন করা যায়। সঙ্গীতজ্ঞরা বলেন, রাগ-রাগিণী বলতে আমরা যে সব সুরের নক্সা বুঝি, মনের ওপর নানারকমের রঙ ফলানোই তাদের কাজ।"

বাধা দিয়ে বললাম "তোমার বক্তৃতায় ত শুধু লাল রঙের সন্ধান পাওয়া গেল,—তা' হলে কি বুঝব যে লাল ছাড়া বাকি যেসব রঙ আছে সে-গুলো রাগ-রাগিণীর ক্ষেত্রে বাতিল?"

হাবু—"না, তা কেন? সব রকমের রঙই রাগ-রাগিণীতে প্রযোজ্য, তা নইলে এত যে রাগ-রাগিণীর চিত্র পাওয়া যায় তাদের মধ্যে শুধু লাল রঙই থাকত,—এত যে রাগ-রাগিণীর ধ্যান রচিত রয়েছে তাদের মধ্যে এত বিচিত্র বর্ণ-বিন্যাস থাকত না। তবে লাল রঙের কথা গোড়ায় বলবার কারণ এই যে, যাবতীয় রঙের মধ্যে লাল রঙটাই আদি রঙ। সূর্য ওঠবার সময় লাল থাকে, প্রথমে যে দেবতার পুজো দিতে হয় সেই গণেশের রঙ লাল,—এমন কি যিনি আদিতে বিশ্ব সৃষ্টি করলেন, সেই ব্রহ্মার দেহটিও লাল রঙের। অন্যান্য রঙগুলো এসেছে পরে। রাস্তায় চলতে দেখুন, পুলিসের পোষাকের রঙ যা-ই থাকুক আগেই চোখে পড়বে তার লাল পাগড়ী।"

আমি—"কিন্তু তুমি যে বললে, সূর্য ওঠবার সময় লাল দেখায়, তোমার এই কথাটা ত নিঃশেষে মেনে নিতে পারছি না,—অস্তাচলে যাবার সময়েও সূর্য রক্তবর্ণ দেখায় না কি? তোমার কথা মানতে গিয়ে কি শেষে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তকে এক বলেই স্বীকার করব? এ দুটোর মধ্যে কি কোনো তফাৎ নেই?"

দ্বিধামাত্র না করে হাবু বল্‌লে "না, কিছুমাত্র নেই। ছেলে বেলায় ভূগোলে পড়েন নি যে, আপনারা যখন সূর্যাস্ত দেখছেন, আমেরিকার লোকেরা তখনই দেখছে সূর্যোদয়? এর গূঢ় মানে হচ্ছে কোনো বস্তুর বা বিষয়ের আরম্ভ আর শেষ একই পদার্থ; প্রলয় আর সৃষ্টি একই জিনিষের এপিঠ আর ওপিঠ।—এই তত্ত্বটা না বুঝবার ফলেই আপনারা যখন তখন গোলমালে পড়েন। বাস্তবিক, বলতে গেলে..."

কে জানত যে একটা সাধারণ প্রসঙ্গ এইভাবে শেষে তত্ত্বজ্ঞানের গভীর গর্তে প্রবেশ করতে আরম্ভ করবে!—একটু উৎকণ্ঠার সঙ্গেই বল্‌লাম "তুমি কি শেষে দর্শনশাস্ত্রের আশ্রয় নিলে?"

হাবু—"নেব না ত কি? কিন্তু আপনি দর্শন বলতে কি বোঝেন?

আমি—"দর্শন বলতে আমি বুঝি সেই শাস্ত্র যার সাহায্যে সহজ সরল বিষয়কে জটিল করে তুলবার উপায় জানা যায়।"

হাবু—"আপনি যা-ই মনে করেন করুন,—আমি ত দর্শনের সোজা মানে মনে করি 'দেখা'। আপনি যখন গান শোনেন তখন আপনার মন একটা কিছু দেখে অর্থাৎ অনুভব করে এবং তৃপ্তিলাভ করে,—সেই দেখার বিষয়বস্তু হচ্ছে রস। রসবস্তুকে বর্ণনা করে বুঝানো যায় না, সুতরাং আপনার মনে রাগ-রাগিণীর যে চিত্রটা ফুটে ওঠে সেটাকেও আপনি ভাষায় বুঝিয়ে দিতে পারেন না। তবে বুঝাতে পারেন না বলেই ত আর বলতে পারি না যে, বুঝতে পারেন না? অবশ্য মুস্কিলের ব্যাপারটাই হচ্ছে এই যে, ওটা আপনি বুঝতে পারেন অথচ বুঝাতে পারেন না। এতক্ষণ যে লালরঙের কথা হ'ল, সেই লাল রঙ কি, তা কি আপনি ভাষায় বুঝিয়ে দিতে পারেন? তা পারেন না, কিন্তু আপনি ত বর্ণান্ধ নন,—লালরঙ নিশ্চয়ই আপনি চেনেন।"

আমি—"তা চিনি বৈ কি? তবে রাগ-রাগিণীর প্রসঙ্গটা ত তোমার এই ব্যাখ্যার পরেও কিছুই বুঝা গেল না। রঙগুলি সবই হয় ত আমার জানা আছে, কিন্তু তাতে ক'রে রাগ-রাগিণী চিনব কি ক'রে?"

হাবু—"সে ত আলাদা কথা। এতক্ষণ যা বলছিলাম সেটা হ'ল রাগ-রাগিণী এল কোত্থেকে। এ প্রশ্নের সমাধান যখন আপনার মনের মতন হয়েছে ব'লেই মনে হচ্ছে, তখন এই শেষের সমস্যাটা নিয়েও দু চার কথা বলতে পারি, যদি অনুমতি দেন।"

আমি—"বেশ, তাই বল।"

হাবু—"দেখুন, আগেকার আমলের চিত্রকররা একটা রাগ বা রাগিণী শোনা মাত্রই পট তুলি আর রঙ নিয়ে বসে যেতেন ছবি আঁকতে। সেই সব ছবিতে লাল, নীল, কালো, সবুজ, হলদে নানা রঙেরই কাজ হ'ত। ছবি দেখে বুঝা যেতো ওটা পুরুষের না মেয়ের অর্থাৎ রাগের কি রাগিণীর;—ছবির মূর্তিটা নবাবী মেজাজে তাকিয়া হেলান দিয়ে গড়গড়া টানছে, কি খোলা মাঠে সঙ্গীবিহীন একটা গাছের তলায় একাকী বা একাকিনী অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে ভরসাহীন ভবিষ্যতের কথা ভাবছে, অথবা যোদ্ধার-সুলভ চোগা চাপকান প'রে কোনো অদৃশ্য শত্রুকে লক্ষ্য করে তরবারি আস্ফালন করছে।—তার মাথার ওপরে কাঠফাটা রোদ্দুর অথবা ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টিপাত। তা ছাড়াও বুঝা যেত মূর্তির স্বভাবে কোন্ মেজাজ প্রকটিত,—শান্ত, কি করুণ, কি উগ্র ইত্যাদি।"

আমি—"কিন্তু এমনও ত দেখা যায় যে, একই রাগের বা রাগিণীকে উপলক্ষ্য করে বিভিন্ন সময়ে যে সব চিত্র আঁকা হয়েছে তাদের মধ্যে তোমার বর্ণনা মাফিক মিল ত পাওয়া যাচ্ছেই না, বরং পরস্পর-বিরোধী ভাব পাওয়া যাচ্ছে। যেমন ধর একটা ছবিতে কোনো একটা রাগ যাত্রার দলের ভীমের পোষাক পরে মহা দর্পে একটা শূলের আঘাতে মেঘমুক্ত আকাশের বুকটা ফুটো করে দিতে চেষ্টা করছে, সেই রাগই আবার পরবর্তী আমলে আঁকা আর একখানি ছবিতে লজ্জাশীলা বিনম্রবদনা এক রাগিণীর মূর্তিতে আরাধ্য দেবতার মন্দিরে বাষ্পাকুললোচনে জপ-মালা ধারণ ক'রে ধ্যানরত। কোথায় শত্রু সংহারে উদ্যত শূল, আর কোথায় জপনিরত হস্ত। একই রাগের মধ্যে এই রকম বিপরীত ভাবের আরোপ কি যুক্তিসঙ্গত?"

হাবু—"আপনি দেখছি কালধর্ম মানতে চান না। কিন্তু মানুষের মেজাজ যে পরিবেশের তারতম্যে বদলে যায় এ কথা কি আপনার জানা নেই? 'স্থানস্থিতঃ কাপুরুষোঽপি সিংহঃ', জায়গার গুণে কাপুরুষও সিংহের মেজাজ পায়, এটা ত অতি পুরোনো কথা। রূপকথার অন্তরালে আমাদের দেশে যে সত্যিকার ইতিহাস রচিত হয়েছে, তাতেও দেখতে পাই 'সিংহের মামা আমি নরহরি দাস। পঞ্চাশটা বাঘে মোর একটি গরাস!!'—শেয়ালের এই দম্ভোক্তি শুনে বাঘ বেচারা ভয়ে আধখানা হয়ে নিজেই একেবারে শেয়াল বনে গেল, আর ফাঁকিবাজ শেয়াল অক্লেশে পশুরাজের আসনে বসে রাজত্ব করতে লাগল। মেজাজ এইভাবেই বদলায়,—এইটেই জগতের চিরন্তন ইতিহাস। তা ছাড়া জৈবতত্ত্বে রহস্যময় রীতি-নীতির ফলে আজ যে পুরুষ আছে, কাল সে নারীতে পরিণত হ'ল, এরকম ঘটনা ত রোজই খবরের কাগজে পড়ছেন। তার ওপরেও আর একটা কথা আছে।—পটে আঁকা রাগ-রাগিণীর এই যে, ছবি, একে আমাদের পণ্ডিতরা রাগ-রাগিণীর 'দেবময় রূপ' বলে থাকেন। এখন, যেখানে দেবদেবীর কথা এসে গেল, সেখানে ভক্তের দৃষ্টিতে পুরুষ-নারী ভেদের কথাই আসতে পারে না। কেননা গানে আছে,

'তারা পরমেশ্বরী।

কখনো পুরুষ হওমা

কখনো ষোড়শী নারী॥'

সুতরাং রাগ-রাগিণীর বেলায়, এক যুগে যা 'হিন্দোল', আর যুগে তার নাম হ'ল 'হিন্দোলী'; এক যুগের রাগ 'কেদার' পরবর্তী আমলে হয়ে দাঁড়াল রাগিণী 'কেদারিকা'; যে ছিল 'বসন্ত' সে হ'ল 'বাসন্তী'—এতে অবাক হয়ে যাবার কি আছে?"

আমি—"ধন্য হাবু, তোমার অপূর্ব ব্যাখ্যার গুণে রাগ-রাগিণীর ব্যাপারটা এখন খানিকটা বুঝতে পারছি বলে মনে হচ্ছে।"

হাবু—"ছাই বুঝেছেন, আমার সব কথা ত এখনো বলাই হয়নি! আগেই বলেছি গান শুনলেই শ্রোতার মনে একটা দাগ পড়ে, মানে রঙের দাগ,—তার মানে একটা ছবি ফুটে ওঠে। এই ছবিটা অন্তরপটে অঙ্কিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রোতার মেজাজের মধ্যেও একটা বাঞ্ছিত

অথবা অবাঞ্ছিত পরিণতি ঘটে, এটা কথনো চিন্তা করে দেখেছেন কি ?”

আমি—“পরিণতিটা বাঞ্ছিত হতে পারে, একথা স্বীকার করছি, কিন্তু অবাঞ্ছিত পরিণতির কারণ কি ঘটতে পারে শুনি ?”

হাবু—“এই জন্যেই ত বলছিলাম, আপনি আসল কথাই বুঝতে পারেন নি। রাগ-রাগিণীর চেহারা বদলানোর যে বিবরণটা এতক্ষণ শুনলেন, তা ছাড়াও এ সম্বন্ধে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আপনার মনে সাড়াই দেয়নি। একটাই রাগ বা রাগিণী আপনি রাম ওস্তাদ আর শ্যাম ওস্তাদের মুখে আলাদা আলাদা করে শুনলেন,—শুনে কি আপনার মনে একই রঙের দাগ পড়ল ? তা যে পড়ে না সেটা আপনার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই একদিন ধরা পড়েছিল :—

“বোধ হয় আপনার মনে আছে, আপনি সেদিন আসরে গান শুনছিলেন, আমার পাশেই বসে :—মোলায়েম খাঁ খেয়াল গাইছিলেন, সঙ্গে জুড়ীতে গাইছিল তার সাগরেদ জব্বর মিঞা। গান শুনতে শুনতে একবার আপনার দিকে চোখ পড়তেই আমার মনে হ'ল আপনার মানসপটে ধীরে ধীরে কালো একটা দাগ পড়ছে,—কারণ আপনি আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ছিলেন,—সুললিত কণ্ঠে সুরের যে কমনীয় বিস্তার হচ্ছিল তারই আরামপ্রদ নির্ঘাত প্রতিক্রিয়া আপনার চোখে মুখে ফুটে বেরুচ্ছিল। এদিকে জব্বর মিঞা দেখল, তার ওস্তাদের রাগ বিস্তার আর শেষ হচ্ছে না, অথচ তানবাজির যে সব খেল কি আর কৌশল সে এতদিন রোজ দশ ঘণ্টা করে রেয়াজ করে আসছে সেগুলি আসরে নিবেদন করবার কোনো অবসরই তার ভাগ্যে মিলছে না—এতেই সে মনের আবেগ জোর করে চাপতে চাপতে অধীর হয়ে উঠছিল। আপনার নাক এখন ডাকল ডাকল এই রকম একটা অবস্থায় এসে পৌঁছেছে নিঃশ্বাস ইতিপূর্বেই বেশ ভারী হয়ে এসেছিল,—আমিও তখন দেখছিলাম, একটা তাকিয়া আপনার কোলের সামনে ঠেকিয়ে দেওয়া যায় কিনা'—এমন সময় সহসা বজ্রপাত ! জব্বর মিঞা আর সামলাতে না পেরে আচম্বিতে সৌদামিনীকম্পনকারী একটা হলখ্ তান দিয়ে ফেলল ! ফলে আপনার এবং আপনার মত আর যারা সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিতে এতক্ষণ সম্বিৎহারা হয়েছিলেন সকলের যুগপৎ সলক্ষ নিদ্রাভঙ্গ ! নিশ্চিন্তে নিদ্রার উপক্রম করবার সময় হঠাৎ 'আগুন ! আগুন !' চীৎকার শুনলে লোকের যা অবস্থা হয় তাই !—আমি লক্ষ্য করলাম রাগে আপনার চোখেও আগুন বেরুচ্ছে ! তার মানে আপনার মনের সেই কালো দাগটা যা এতক্ষণ নিরেট অন্ধকারে পরিণত হতে যাচ্ছিল সেটা হঠাৎ কেটে গিয়ে সেখানে রাগের লালরঙ জ্বলতে আরম্ভ করেছে। কাজেই দেখতে পাচ্ছেন রাগ ছিল একটাই, কিন্তু পরিবেশন বৈচিত্র্যের দরুণ আপনার মনে রঙের খেলাও হয়ে গেল বিচিত্র !”

বলা বাহুল্য আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে এই আলোচনার মধ্যে টেনে আনাটা মোটেই আমার পছন্দ হয়নি। আমি একটু চটেই বললাম—“এই বার তুমি সত্যিই বাজে বকতে আরম্ভ করলে !”

হাবু বলল “আপনি কি রাগ করলেন ?”

তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে, বললাম—“না ভাই, আমি ত রাগিনি

ভয়

(১৫৫ পৃষ্ঠার পর)

নিজেদের শোবার ঘরে এসে গ্লাস কেসটার সামনে দাঁড়িয়ে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে খাটের ওপর লম্বা হয়ে শোওয়া স্বামীর দিকে তাকিয়ে সুপ্রীতি ঠোঁট টিপে ফের একটু হাসল, 'সব তো যেতই। আজ রাত্রে তোমাকেও ফিরে পেতাম কিনা সন্দেহ।'

সুব্রত বলল, 'মানে সিঁথিতে বেশি সিঁদুর তো আজকাল আর দাও না। যেটুকু আছে সেটুকু নিয়েও টানাটানি পড়ত।'

সুপ্রীতি এবার স্বামীর মুখের কাছে মুখ এগিয়ে এনে বলল, 'না গো মশাই না। আমার সিঁথির সিঁদুরের কিছুই হত না। তুমিই কাল ভোরে মুখখানা সিঁদুর মাখা—থুড়ি থুড়ি, লিপষ্টিক মাখা করে ফিরে আসতে। দাড়ি কামানো সাবানে কি আর সে দাগ উঠত, কাপড় কাচা বাসনমাজা সাবানে ঘষতে হত।'

শেষ রাত্রে ফের ঘুম ভাঙল সুব্রতের। নিদ্রিতা প্রেয়সী নিশ্চিন্তে পাশ ফিরে শুয়ে আছে। অন্ধকার ঘর। বন বন করে পাখার আওয়াজ হচ্ছে। এই সুখশয্যায় শুয়ে হঠাৎ সেই সন্ধ্যা রাতের ভয়ার্ত মুহূর্তটির কথা মনে পড়ে গেল সুব্রতের। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, কি দারুণ ভয়ই না সে তখন পেয়েছিল। ছেলেবেলার ভূত আর রাক্ষসের ভয়ের চেয়েও সে ভয় বাড়া। সাপের ভয় বাঘের ভয়, বাস কি মোটরকারের একসিডেণ্টের ভয়, কোন ভয়ের সঙ্গেই সে ভয়ের তুলনা হয় না। কারণ এ ভয় মানুষের মানুষকে। মানুষ যতখানি মানুষের ক্ষতি করতে পারে তেমন আর কেউ পারে না। মানুষ মানুষকে ছুরি বসিয়ে মারে, এটম বোমায় মারে, তার চেয়েও যা মারাত্মক তিলে তিলে শোষণে-পেষণে মারে। মানুষ মানুষকে ভয় দেখিয়ে জীবন্মৃত করে চিরজীবনের জন্যে অমানুষ করে। কে বলে যে ভয় নেই ? সভ্য মানুষ সুব্রতের মত ভয়ের দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকে বলেই, ভয়কে এড়িয়ে চলে বলেই অমন নির্ভীক সেজে থাকতে পারে। তার সাহসের কোন মানে নেই, কোন দাম নেই, যতদিন এক বিন্দু ভয়ের কারণ পৃথিবীতে আছে ততদিন নির্ভয়তার বড়াই তার কোন অধিকার নেই।

মেয়েটির কথা ফের মনে পড়ল সুব্রতের যে তাকে ব্লাকমেইল করবার চেষ্টা করেছিল। হতেও পারে, নাও হতে পারে। হতে পারে মেয়েটি সত্যিই পাগল, কি প্রতারিত লাঞ্ছিতা। হতে পারে সুব্রতকে সে প্রথমে চেনা লোক বলেই ভুল করেছিল। তারপর সে ভুল আর ভেঙে দিতে চায়নি। হয়তো নিঃসঙ্গ জীবনে আরও একটি ভুল করবার লোভ তাকে পেয়ে বসেছিল। পুলিশের কথায় বেচারা শেষে নিজেও ভয় পেয়েছিল। সুন্দর সপ্রতিভ মুখে ভয়ে যে কত বিকৃতি দেখায় তা সে দেখেছে। নিরপরাধ শান্ত-শিষ্ট ভদ্রলোকের বুকও যে কিসের এক অহেতুক ভয়ে ধুক ধুক করে এক

মুহূর্ত পরে সুব্রত অনুভব করেছে। মুহূর্ত তো নয়, যেন এক যুগব্যাপী যন্ত্রণা।

কে ওই মেয়েটি ? পরিচিত, অর্ধপরিচিত অনেক মেয়ের মুখের সঙ্গে ওই মুখটি মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করল সুব্রত। তাদের কারো সঙ্গে মিল নেই। তাদের কারোরই এখানে ওভাবে ওবেশে যাওয়ার কথা নয়। তবু মনে হল মুখখানি যেন চেনা চেনা। হয়তো ট্রামে-বাসে পথে কি পার্কের কোণে কোন একদিন দেখে থাকবে। হয়তো অমন মুখ শহরে শুধু একখানাই নেই; অনেক আছে, অনেক আছে। আর হঠাৎ ওই মুখখানার জন্যেই ভারি মায়া হল সুব্রতের মনে। মন মমতায় ভরে উঠল তার সঙ্গে সঙ্গে সেই অচেনা অজ্ঞাতকুলশীলা মেয়ের মুখে এক অবর্ণনীয় মাধুর্যে পূর্ণ হয়ে উঠল। সন্ধ্যায় যা মুখের দিকে দুশ্চর আশঙ্কায় ভয়ে সে ভালো করে তাকাতে পারেনি সেই রাত্রে মানসপটে সেই মুখের ছবির দিকে সে নির্ভয়ে সহানুভূতির দৃষ্টি তুলে ধরল।

পল্লী মায়ের গান

অনিল ভট্টাচার্য্য

আবার এসেছি ফিরে মোরা পল্লী সেবক দল !
বন্ধুরপথ-যাত্রী আমরা আনন্দ চঞ্চল।
শোনাব আমরা পল্লীমায়ের
অশ্রু-হাসির গান
নিতি নব-সুরে ছন্দ রচিয়া
অমলিন অফুরান
কল্যাণ শুভ শান্তি মাখানো পল্লীর মঙ্গল।
গানে গানে উঠবে বেজে
মেঠো সুরের বেণু
পড়বে মনে বটের ছায়ায়
রাখাল ছেলের ধেনু—
পড়বে মনে ছায়া-শীতল অশথ গাছের তল
পড়বে মনে সাঁঝের আলোয় দীঘির কালো জল।
ঝিলের জলে নীল-কুমুদ যেমন মেলে আঁখি
যেমন সুরে বকুল-ডালে ডাকে কোকিল পাখী।
সেই কথাটি বলব গানে গানে—
নীল আকাশের রামধনু রঙ, আলোছায়ার খেলা
রাঙা মাটির পথে পথে ছায়া ছবির মেলা
সেই কথাটি কইব কানে কানে—!
কামার কুমোর জেলে চাষার ভাঙা ঘরের বাসা
গানের সুরে আঁকবো ছবি বলব তাদের ভাষা।
মাঠের মজুর যে গান গাহে দিনের কাজের ফাঁকে
ঘাটের নেয়ে যেমন সুরে পারের পথিক ডাকে।
আমরা জানি বাংলা মায়ের দুঃখ সুখের কথা
সাঁঝ-সকালে গানের সুরে বলব সে বারতা।
দুখিনী এই পল্লী-মায়ের দুখের অশ্রু জল
মুছিয়ে দেবো আমরা সবাই পল্লী সেবক দল।

পূজোর চিঠি

মহালয়ার নিশীথ রাতে—স্বপনবুড়ো এসে—
খোকায় নিয়ে উধাও হল সব পেয়েছির দেশে!
ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমী যে দেয় পাহারা দ্বারে—
গান শুনিয়ে সবার আগে করবে খুশী তারে।
আদ্যিকালের বৈদ্যি বুড়ী ঝুঁকিয়ে আছে মাথা—
তাহার হাতে রেহাই পেতে নামতা বকো যা-তা!
সব পেয়েছির আকাশ পথে ওড়ে যে শুক-সারি
তাহার পিঠে তেপান্তরে কসে লাগাও পাড়ি।
পক্ষীরাজের ঘোড়া আছে—সবার আগে আগে—
সাত সাগর আর তের নদীর পারে একা জাগে!
তাহার পিঠে পৌঁছে যাবে খোকা নিঝুম পুরে—
ঘুমিয়ে কোথা রাজার মেয়ে দেখবে ঘুরে ঘুরে!
সোনার কাঠি রুপোর কাঠি পালঙ্কেতে রয়—
সোনার কাঠির ছোঁয়ায় মেয়ে জাগবে সুনিশ্চয়।
আসল কথা বলে দিয়ে পালায় স্বপন বুড়ো
রাজকন্যা বিয়ে করে—খাও না মাছের মুড়ো॥

মহালয়া — **শুভার্থী**
ছোটদের পাততাড়ি — **স্বপনবুড়ো**
১৩৬৪।

দিলীপ সেনগুপ্ত

দিলীপ সেনগুপ্ত

তোমাকে সত্যিই ভালবাসি, দাদা!

ভগবান সদ্য তখন পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন,—সেই সঙ্গে সৃষ্টি করেছেন মানুষ, আর জন্তু-জানোয়ার—পাখী, সাপ, ব্যাঙ, আরশুলো, টিকটিকি, মাকড়শা, গিরগিটি, ফড়িং, মশা, মাছি ...যত জীবকে।

পাখীদের ডানা দিয়েছেন, তারা আপন মনে আকাশে উড়ে বেড়ায় আর জন্তু-জানোয়ারের দল থাকে জঙ্গলে। লোকালয় তৈরী হয়েছে, মানুষরা লোকালয়ে আছে।

জানোয়ারদের মধ্যে বাঘ, সিঙ্গী, হাতী, গণ্ডার—এদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শরীর...নখে, থাবায়, দাঁতে, খড়্গে জোর আছে...জোর যার মুল্লুক তার। তারা সভা বসিয়ে দল গড়ে সিঙ্গী হয়েছে রাজা, বাঘ সেনাপতি, হাতী-গণ্ডারদের মধ্যে কেউ মন্ত্রী, কেউ সদাগর, কেউ কোটাল—আর যাদের শরীর ছোট, থাবা, দাঁত, নখের ধার নেই, তারা খাটবে ওদের খিদমৎ!

কিন্তু এমন অবিচার—আর যত ছোটরা সহ্য করলেও মাকড়শার সহ্য হলো না। রাগে আগুন হয়ে সে চললো স্বর্গে ভগবানের কাছে... নালিশ করতে!

স্বর্গে ভগবান তখন যত দেবতাকে নিয়ে বসে পরামর্শ করছেন, সৃষ্টি তো হলো—এখন এ সৃষ্টি রক্ষা করতে হলে কি কি করা প্রয়োজন,—মাকড়শা এসে দাঁড়ালো সে আসরে। তার দু'চোখ রাগে রাঙা! এসেই সে ডাকলো—ঠাকুর!

ভগবান চারদিকে ফিরে চাইলেন, বললেন,—মাকড়শা তুমি হঠাৎ এখানে।

চোখ পাকিয়ে মাকড়শা বললে,—আজ্ঞে হাঁ, আসতে হলো। আপনার এ কি অবিচার। বাঘ, সিঙ্গী, হাতী গণ্ডার...ওরা হলো রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি—আর আমরা তাদের খিদমৎ খাটবো।

ভগবান বললেন,—ওদের বড় বড় শরীর—দাঁত আছে, ধারালো নখ আছে, খড়্গ আছে, শুঁড় আছে—কাজেই...

বাধা দিয়ে মাকড়শা বললে,—ওগুলোর জোরেই ওরা জঙ্গল-রাজ্য রক্ষা করবে ভাবেন! দাঁত, নখ, খড়্গ, শুঁড় থাকলেও ওদের বুদ্ধি? বুদ্ধির জোরই আসল জোর—বুদ্ধির সঙ্গে লড়াই করতে পারবে ওরা? কখ্খনো না! আমার মাথায় যে বুদ্ধি আছে, সে বুদ্ধির জোরে আমি ওদের ঘায়েল করতে পারি!

—বটে! হেসে ভগবান বললেন,—পারো তোমার বুদ্ধির পরিচয় দিতে?

—আলবৎ, মাকড়শা বললে—বলুন, কি করে বুদ্ধির পরিচয় দেবো?

ভগবান বললেন—বেশ। তোমাকে তিনটি কাজের ফরমাশ দেবো। যদি সে তিনটি কাজ করতে পারো, তাহলে নিশ্চয় এর বিহিত করবো!

মাকড়শা বললে—বলুন, আপনার কি তিনটি কাজ?

ভগবান বললেন—প্রথম কাজ,—দশ হাত লম্বা বাঁশের চোঙায় করে এক লক্ষ জ্যান্ত মৌমাছি এনে দেবে। দ্বিতীয় কাজ,—বিশ হাত লম্বা ডাণ্ডায় জড়িয়ে বড় একটা জ্যান্ত ময়াল সাপ আনতে হবে। তৃতীয় কাজ,—জ্যান্ত একটা কেঁদো বাঘের ল্যাজ ধরে টেনে আমার কাছে আনবে! এ তিনটি কাজ যদি করতে পারো, তাহলে বুঝবো, ওদের চেয়ে তোমার শক্তি অনেক বেশী।

মাকড়শা বললে—বেশ, এ তিনটি কাজ আমি করবো—পর পর তিনদিন—কাল, পরশু, তরশু—তিনদিনে আপনাকে এ তিনটি জিনিষ এনে দেবো।

পরের দিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে উঠে মাকড়শা একটি দশ হাত লম্বা বাঁশের চোঙা জোগাড় করলো—করে সেই চোঙা নিয়ে জঙ্গলের সবচেয়ে বড় গাছের ডালে সবচেয়ে বড় যে মৌচাক, সেই মৌচাকের দিকে চেয়ে বড় গাছটার চারিদিকে ঘুরতে লাগলো— ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে বিড়বিড় করে বকছে—ধরবে না...এ চোঙায় ধরবে না এক লাখ মৌমাছি? হ্যাঁ, ধরবে...আলবৎ ধরবে।

মৌচাকের মৌমাছিরা গুণগুণ করে মৌচাকে ঢুকছে, মৌচাক থেকে বেরুচ্ছে—মাকড়শাকে বিড়বিড় বকতে বকতে ঘুরতে দেখে মৌমাছিদের সর্দার এলো মাকড়শার কাছে। বললে,—বাঁশের চোঙা নিয়ে এমন চর্কি-ঘোরা ঘুরছো কেন ভাই মাকড়শা? আর বিড়বিড় করে বকছোই বা কি?

মাকড়শা দাঁড়ালো, বললে—এই যে দাদা—হাঁ, বলি, তাহলে শোনো...ভগবানের সঙ্গে আমার কাল সারাদিন তর্ক। ভগবান বলেন, দশ হাত চোঙায় এক লাখ মৌমাছি কখনো ধরতে পারে না? আমি বলি, আলবৎ ধরবে। ভগবান বললেন—কেমন ধরে, এনে আমায় দেখাতে পারো? আমি বলে এসেছি, পারি! তাই তোমাদের দেখছি আর মনে মনে গুণে হিসাব করছি। তা তুমি কি বলো? এ চোঙায় তোমাদের এক লাখ মৌমাছি ধরবে না?

মৌমাছি-সর্দার বললে—জল্পনা-কল্পনা কেন তুমি ধরো তোমার চোঙা...আমরা দলে দলে তোমার চোঙার মধ্যে ঢুকবো—তুমি গুণে দেখ।

—ঠিক কথা বলেছো! বা!! মাকড়শা ধরলো বাঁশের চোঙার খোলা মুখের দিকটা বাঁকিয়ে। সর্দারের কথায় মৌমাছিরা দলে দলে চোঙার মধ্যে ঢুকলো। মাকড়শা গুণছে—এক, দুই, তিন, চার...

যেমন লাখ পুরেছে অমনি চোঙার মুখটা ছিপি এঁটে বন্ধ করে চোঙা নিয়ে একেবারে স্বর্গে ভগবানের কাছে হাজির। হাজির হয়ে চোঙার ছিপি খুলে চোঙা থেকে মৌমাছিদের উড়িয়ে দিয়ে মাকড়শা বললে—গুণে নিন ঠাকুর, এক লাখের একটিও কম পাবেন না—আর সবগুলোই জ্যান্ত!

দেখে ভগবানের তাক লাগলো! তিনি বললেন—হাঁ তোমার বুদ্ধি খুব স্বীকার করছি! এখন বাকি দুটি কাজ?

মাকড়শা বললে—তার একটি করবো কাল, আর একটি পরশু! তাহলেই খুশী হবেন তো?

পরের দিন সকালে বিশ হাত লম্বা একটি ডাণ্ডা নিয়ে মাকড়শা এলো উঁচু পাহাড়ের গায়ে ময়াল সর্দারের গুহা—সেই গুহার সামনে। এসে পাহাড়ের পাথরে ঠকাঠক ডাণ্ডা ঠুকতে লাগলো।

শব্দ শুনে ময়াল-সর্দার এলো গুহা থেকে বেরিয়ে...বললে, পাগল হয়েছো নাকি মাকড়শা? পাহাড়ের গায়ে লাঠি ঠুকছো কেন?

মাকড়শা বললে—পাগলই হয়েছি, দাদা! ভগবান আমাকে পাগল না করে ছাড়বে না, দেখছি।
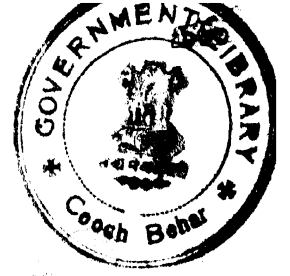
ময়াল বললে—কেন, ভগবান হঠাৎ...

বাধা দিয়ে মাকড়শা বললে—তা নয় তো কি। কাল আমার সামনে তাঁর কি তর্ক! আমি যত বলি, ময়াল সৃষ্টি যা করেছো ঠাকুর—বাহাদুরে বটে! বিশ হাত লম্বা ময়াল! ভগবান বলেন,—না, মা—বিশ হাত লম্বা নয়—হতে পারে না। তিনি বলেন, লম্বায় ময়াল বড়জোর পাঁচ সাত হাত হবে। আমি যত বলি—কখনো না, তিনি বলেন—হ্যাঁ, আলবৎ। শেষে ভগবান বললেন, এই বিশ হাত ডাণ্ডা দিচ্ছি, এই ডাণ্ডার ডগা থেকে তলা পর্যন্ত ময়ালকে জড়িয়ে এনে দেখাতে পারো যদি, তবেই তোমার কথা মানবো। তাই এই ডাণ্ডা নিয়ে......

ময়াল বললে, ধরো তুমি ডাণ্ডা ঠিক করে—আমি এখনি তোমার ডাণ্ডাটা পাক মেরে জড়িয়ে ধরি—তখন ডাণ্ডাশুদ্ধ আমাকে নিয়ে গিয়ে ভগবানকে দেখাতে পারবে!

—আঃ, তা যদি করো দাদা,—না হলে' এ তর্কের মীমাংসা হবে না তো।

ডাণ্ডাটা পাক দিয়ে ময়াল জড়ালো—মাকড়শা ডাণ্ডা নিয়ে গিয়ে দেখালো ভগবানকে।

তিনদিনের দিন—

একটা ছুঁচে সুতো পরিয়ে সেই ছুঁচ নিয়ে মাকড়শা এলো সকালে জঙ্গলে কেঁদো বাঘের গর্তের সামনে—এসে দুচোখের উপর ছুঁচে সুতো গলাতে গলাতে সুর ভাঁজতে লাগলো—তুম-ত-না-তা-রে-না...

সুর ভাঁজা শুনে কেঁদো বাঘ এলো তার গর্ত থেকে বেরিয়ে—বেরিয়ে এসে বললে—ব্যাপার কি মাকড়শা! সুর ভাঁজছো—এত কিসের ফূর্তি?

বাঘের গলা শুনে চোখের উপর থেকে ছুঁচ সুতো নামিয়ে নিয়ে মাকড়শা বললে—সুর ভাঁজবো না? ফূর্তি হবে না? আমি যা দেখলুম, তুমি যদি তা দেখতে—তাহলে তুমি শুধু সুর ভাঁজতে না—চার পায়ের থাবা তুলে ধেই ধেই নাচতে।

কেন? কেন? কেন? বাঘ বললে—কি তুমি দেখলে এমন...

মাকড়শা বললে—শুধু চোখে নয়, দুচোখ সুতো চালিয়ে সেলাই করে—বুজিয়ে, বন্ধ চোখে এ পৃথিবীর কত—কত দূরে পর্যন্ত দেখলুম—ওঃ, কি প্রকাণ্ড পৃথিবীতে, বাবা—আর কত কি আছে পৃথিবীতে।

বটে! বটে! আমি তো দেখছি—এই এতটুকুন পৃথিবী!

মাকড়শা বললে—খালি চোখে এর বেশী দেখা যাবে কেন? ছুঁচ সুতো চালিয়ে দুচোখ সেলাই করে বন্ধ চোখে আমি দেখছিলুম।

বাঘ বললে—আমি দেখবো—আমাকে দেখাও—আমার দুচোখ সেলাই করে দেখাও ভাই মাকড়শা।

মাকড়শা বললে—কিন্তু প্যাট প্যাট সেলাই করবো—চোখে যাতনা পাবে!

বাঘ বললে—যাতনা পাই পাবো। তাহলে পৃথিবীর চেহারা খানা দেখবো না। তুমি চালাও আমার দুচোখে ছুঁচ—

কেঁদো বললো—আর মাকড়শা ছুঁচ চালিয়ে চালিয়ে কেঁদোর দুচোখ দিলো ফোঁড় তুলে তুলে টাইট সেলাই করে—

বলেই কেঁদোর ল্যাজ ধরে টান! কেঁদো বললে—এ কি—ল্যাজ ধরে টানছো কেন?

মাকড়শা বললে—এখনটা খুব ঝোপঝাপ—তোমাকে নিয়ে গিয়ে তুলবো ফাঁকা জায়গায়—উঁচু পাহাড়ের মাথায়—সেখান থেকে যা দেখবে—তখন বলবে হ্যাঁ, দেখার মতো কিছু দেখলুম বটে।

কেঁদো বললে—ওঃ, তাই! তা বেশ—

কেঁদোর ল্যাজ ধরে টানতে টানতে মাকড়শা হাজির হলো ভগবানের কাছে। বললে—এনেছি ঠাকুর আপনার কেঁদো বাঘ।

ভগবান দেখলেন, দেখে বললেন—হ্যাঁ, তোমার বুদ্ধি খুব, ধন্য তোমার শক্তি। তোমার সঙ্গে কেউ পারবে না টক্কর দিতে। তোমাকে সকলে ভয় করে চলবে আমার পৃথিবীতে। তোমার জালে কেউ পড়লে, তাকে নাস্তানাবুদ হতে হবে—তোমার জাল দেখলে সে ধারে কেউ ঘেঁষবে না—মানুষ বলো, হাতী বাঘ গণ্ডার বলো, কেউ না। তোমার জাল যদি কেউ ছিঁড়ে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে তুমি ফুঁ দিয়ে জাল তৈরী করতে পারবে—আর ফুঁয়ের জোরে সুতো ছাড়তে ছাড়তে বাতাসে ভর করে তুমি আকাশে উঠতে পারবে—তোমাকে কেউ তুচ্ছ করতে পারবে না—কখনো না।

মহারাষ্ট্র দেশের ইতিহাসে কলঙ্কের কালিমা লেপন করিয়া গিয়াছেন রঘুনাথ রাও বা রাঘোবা। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে অতি নির্দয়ভাবে হত্যা করিয়া রাঘোবা পেশোয়ার পদের শুধু দাবী নয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন পুণার পেশোয়া গদীতে—যে অন্যায়ভাবে ন্যায্য অধিকারী নারায়ণ রাওকে নিহত করেন, ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়।

এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের জন্য মহারাষ্ট্র দেশের সর্বত্র নিন্দা ও গ্লানি প্রচারিত হইয়াছিল। যে এমন কাজ করিতে পারে, আপনার ভাইপোর বুকে বসাইতে পারে তরবারি সে কি মানুষ? তার মনুষ্যত্ব কোথায়? সে যে পিশাচ, এই হত্যাকাণ্ডে মারাঠার হাটে-মাঠে-ঘাটে সর্বত্র লোকে করিত তাঁহার গ্লানি। মারাঠা কৃষাণ ক্ষেতে চাষ করিতে করিতে অভিশাপ দেয় রঘুনাথ রায়কে, মারাঠা নারী ধিক্কার দেয় এই হত্যাকারী রাঘোবাকে। রক্ত রক্ত রক্তে মাখা হাত লইয়া রঘুনাথ রাও বসিলেন পেশোয়ার পুণ্য সিংহাসনে। বসিলে কি হইবে? মনে তাঁর শান্তি ছিল না। রাত্রিতে তাঁর ঘুম হয় না, স্বপ্নে দেখেন নানা বিভীষিকা।—কি রাজপ্রাসাদে কি অন্তঃপুরে কি দরবারে কি

জনসমাজে কোথাও তাঁর শান্তি নাই। রাজপথে চলেন জাঁকজমকে সান্ত্রি-পাহারা সৈন্যসামন্ত লইয়া—তখন লোকমুখে শুনিতে পান অধার্মিক নরহত্যাকারী রঘুনাথ ঐ—ছিঃ ছিঃ আকাশে বাতাসে লোকের মুখে সর্বদা শোনে নিন্দা ও গ্লানি। এত অপমান এত লাঞ্ছনা সে কি সওয়া যায়!

বিপন্ন রঘুনাথ সংকল্প করিলেন—এই অপমান, এই লাঞ্ছনার হাত হইতে মুক্ত হইবেন। মনে ভাবিলেন যদি এমন একটা কিছু করিতে পারেন যাহার হাত হইতে মিলিবে মুক্তি, লোকে ভুলিয়া যাইবে তাঁর কলঙ্ক-কাহিনী, তবেই হইবেন সুনাম ও সুযশের অধিকারী।

এ সময়ে মহীশূরের মুসলমান সুলতানেরা ছিলেন খুবেই প্রতাপশালী—তিনি স্থির করিলেন মহীশূরের সুলতানদের বিরুদ্ধে করিবেন রণ-অভিযান—ঝাপাইয় পড়িবেন রণভূমিতে। তাহা হইলে দেশের লোকেরা তাঁহার স্বদেশ প্রীতির জন্য এবং বিজয় অভিযানের জন্য ভুলিয়া যাইবে হত্যার কলঙ্ক কথা এবং যদি বিধর্মীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বিজয়ী হইতে পারেন, তবে তাঁহাকে মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের রাজ্য বৃদ্ধির জন্য মারাঠা জাতি তাঁহার কণ্ঠে পরাইয়া দিবে বিজয়-মাল্য—লাভ করিবেন তিনি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য।

এইরূপে ভাবিয়া রাজ্য মধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন মহীশূরের সুলতানের বিরুদ্ধে রণ-অভিযানের কথা। তাঁহার আদেশে সৈন্য সাজিল, চারিদিকে পড়িয়া গেল সাজ-সাজ রব। বাজিয়া উঠিল রণ-দামামা। যাত্রার প্রারম্ভে তিনি আহ্বান করিলেন এক দরবার সকলকে তাঁহার এই মহৎ উদ্দেশ্যের কথা বিশদভাবে জানাইবার জন্য—সকলে যাহাতে তাঁহার প্রতি অনুকূল মত প্রকাশ করেন, সহযোগিতা প্রকাশ করেন, এই বাসনা মনে মনে পোষণ করিয়া এক দরবার আহ্বান করিলেন।

—দুই—

বিশাল দরবার। পেশোয়ার বিস্তৃত সুন্দর সুসজ্জিত রাজকীয় পরিশোভিত দরবারে রাজ্যের প্রধানগণ নেতাগণ, সেনাধ্যক্ষ, মন্ত্রী রাজ-কর্মচারী, সম্ভ্রান্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সকলে উপস্থিত হইলেন। এই দরবারের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত জ্ঞানী ও গুণী প্রধান বিচারপতি সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র রামশাস্ত্রী।

দরবারে সকলে মিলিত হইলে পর, পেশোয়া রঘুনাথ বলিলেন :—বন্ধুগণ, রাজ্যের প্রধানগণ, সর্দার, হাবিলদার সকলে শুনুন, কেন আমি আজ এই দরবার আহ্বান করেছি, আমি আপনাদের কাছে এক মহৎ কার্য সাধনের জন্য চাই বিদায়, কেন চাই বলছি—মুসলমান সাম্রাজ্য মহীশূরকে মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যভুক্ত করবার জন্য, চাই শিবাজী মহারাজের মত আমার পূর্ববর্তী পেশোয়াগণের মত রাজ্যের গৌরব, পেশোয়া পদের সম্মান বৃদ্ধি এবং জাতির গৌরব এবং বিশাল হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আমি চাই মহীশূরের সুলতানের বিরুদ্ধে এক রণ অভিযান। আমি সেই উদ্দেশ্যে সেই মহৎ সংকল্প বুকে করে দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করিব আর আপনাদের সকলের কাছে চাই শুভ ইচ্ছা, প্রেরণা ও উদ্দীপনা। আপনারা সকলে এই যুদ্ধে যাত্রা করিবার জন্য আমাকে উৎসাহ দিন, সাহস দিন, ঐকান্তিক দীক্ষা দিন, আসুন আপনাদের সকলের সাহায্যে আমি মুসলমান সুলতানকে পরাজিত করে মহারাষ্ট্র জাতির ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করি। জয় জয়! হর হর মহাদেব! জয় শঙ্কর!

রাঘোবার উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যশেষে দরবার গৃহের একদল লোক বিজয়-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। আর একদল লোক রহিলেন নীরব।

একপাশে বসিয়াছিলেন ব্রাহ্মণ রামশাস্ত্রী প্রধান বিচারপতি রামশাস্ত্রী, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, নিমেষ মধ্যে তাঁর বাণী বজ্রের মত গর্জিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সভাস্থলে তিনি বলিলেন, রঘুনাথ রাও, দেবাদিদেব মহাদেব তোমাকে আশীর্বাদ করবেন? মিথ্যা মিথ্যা। যে নরপিচাশ আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে নৃশংসভাবে হত্যা করতে পারে, যার দুই-হাতে এখনও সেই রক্ত—রক্তরঞ্জিত সেই হাত দু'খানা চেয়ে দেখ তোমরা সকলে, নিরীহ, শান্ত, ভদ্র, ধর্মভীরু, তরুণ কিশোরের বুকের রক্ত দিয়ে যে হস্তরঞ্জিত হয়েছে, সে পাপিষ্ঠ নরাধমের হাতে শোভা পায় না পেশোয়ার রাজদণ্ড, সে মহারাষ্ট্র জাতির বিজয়-গৌরব গর্বিত পবিত্র তরবারি স্পর্শ করবার অধিকারী হতে পারে না। আমি এ রাজ্যের প্রধান বিচারপতি, মহারাষ্ট্র দেশের সর্বজনের প্রতিনিধি-রূপে একথা প্রশ্ন করি তোমাকে—উত্তর দাও যে পর্যন্ত তোমার হত্যার জন্য বিচার না হয়, সে পর্যন্ত তুমি পুণা ত্যাগ করে এক-পাও অগ্রসর হতে পারবে না। বিচার বিচার চাই।

বৃদ্ধ রামশাস্ত্রীর তুষারের মত ধবল কেশ, শুভ্র শ্মশ্রু, বিদ্যুতের মত তীক্ষ্ম নয়ন জ্যোতি যেন অগ্নিকণার ন্যায় বিক্ষিপ্ত হইতেছিল। তার সারা দেহ ক্রোধে ও উত্তেজনায় কাঁপিতেছিল। তিনি দুই বাহু প্রসারিত করিয়া বলিলেন—'রঘুনাথ রাও, সাবধান, তুমি পুণা ত্যাগ করবার অধিকারী নও। বিচার, তোমাকে মানতেই হবে। মনে রাখবে এ-কথা। জানি তুমি পেশোয়া নও......নরহত্যাকারী পাষণ্ড। হত্যাকারী কখনো পেশোয়ার আসন গ্রহণ করতে পারে না।

আমি পেশোয়া কিনা—সে বিচারের অধিকার নেই তোমার রামশাস্ত্রী—মনে রেখো রাজ্যের অধিকর্তা যিনি তিনি সকলের ওপর—তাঁর কথা বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তোমার কোন কিছু বলবার অধিকার নেই। যাও এই মুহূর্তে বিদায় হও দরবার থেকে...তোমাকে ন্যায়াধীশের পদ হতে নিষ্কৃতি দিলাম।...যাও রামশাস্ত্রী—দরবার ত্যাগ কর। পেশোয়ার বিরুদ্ধে কথা বলবার স্পর্ধা তোমাকে কে দিয়েছে। এখুনি চলে যাও.....

বৃদ্ধ রামশাস্ত্রী ধীরকণ্ঠে বলিলেন : রঘুনাথ রাও আমাকে পদচ্যুত করবার ক্ষমতা তোমার নেই। তুমি যদি নানা পেশোয়া হও—তা হলেও নেই। সুক্ষ্ম আইনের বিচারে তাও করতে পার না। তুমি আমাকে পদচ্যুত করবে? হাঃ হাঃ হাঃ। বিদ্রূপের হাসি হাসলেন ন্যায়াধীশ।

আমি আপনা হতেই পদত্যাগ করলাম। এই পাপের রাজ্যে আর একদণ্ডও নয়......আমি চললাম। পাষণ্ড নরহত্যাকারীর দরবারে উপস্থিত থাকা অপমানজনক। ভ্রাতুষ্পুত্রের শোণিতে রঞ্জিত হত্যাকারী তুমি! সিংহাসনে বসে মারাঠা জাতির ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরদিনের জন্য কলঙ্ক লেপন করেছো—এই বলিয়া বৃদ্ধ রামশাস্ত্রী দরবার ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। কেহ তাঁহাকে বাধা দিল না, কেহ একটি কথাও বলিল না। তিনি উন্নতমস্তকে ন্যায়াধীশের গৌরবে বিদায় হইলেন পুণা হইতে।

যতদিন রঘুনাথ রাও পেশোয়া ছিলেন, ততদিন পুণাতে পদার্পণ করেন নাই। পরে রঘুনাথ রাও বিতাড়িত হইলে নারায়ণ রাওয়ের পুত্র মাধো রাও নারায়ণকে নানা ফার্ণাবিশ এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। সে সময়ে ধার্মিক ও তেজস্বী ব্রাহ্মণ রামশাস্ত্রী পুণায় আসিয়া ন্যায়াধীশের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইতিহাসের পাতায় বিচারক ন্যায়পরায়ণ স্বাধীনচেতা ব্রাহ্মণের কথা চির উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।
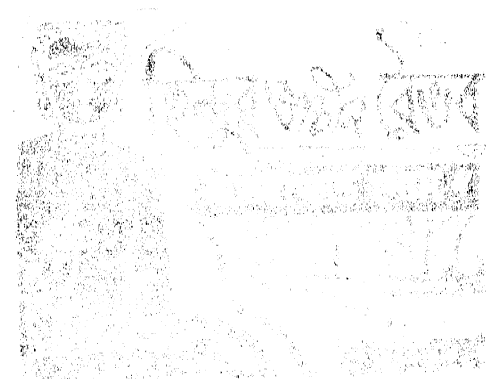
হিন্দু রাজারা যখন ছিলেন, তখন তাঁদের রাজত্ব কি রকমের ছিল? অর্থাৎ সম্রাট অশোক যখন রাজত্ব করতেন সেই সময়ে বা তাঁরও আগে অন্য রাজারাও যখন ছিলেন, তখন তাঁদের রাজ্য ছিল কি রকমের? কি রকম ছিল তাঁদের ক্ষমতা বা প্রতাপ? তাঁদের কীর্তি এখন কোথায়? কীর্তি কিছুই নেই। বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তাঁদের প্রতাপ বা ক্ষমতা বা কীর্তি। সে সকল শুধু এখন কাহিনী বলেই মনে হবে। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিই। যেমন নালন্দা বিহার। তেইশ শত বছর আগেকার কথা নালন্দা বিহার অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ভারতব্যাপী তো ছিলই, ভারতের বাইরেও তার সুখ্যাতি ছিল।

শুধু কি নালন্দা? আরো ছিল, যেমন—বিক্রমশীলা, উদন্তপুর, তক্ষশিলা। কিন্তু নালন্দা ছিল সর্বোত্তম। তার শোভা, সৌন্দর্য, প্রাসাদের উচ্চতা, আর অপূর্ব অতুলনীয় কারু-কার্যের কাছে আর কেউই দাঁড়াতো না। এখানে ছিল তিন শত প্রকোষ্ঠ, আর আটটি বৃহৎ সভাগৃহ। প্রাসাদের চূড়া ছিল তিন শত ফুট উঁচু। বর্বরের কুঠারের আঘাতে সব চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে। আগুনের উত্তাপে সব ধ্বংস হয়ে গেছে। কারা করলে এ সর্বনাশ? বলে কি হবে? সে কথা সবাই জানে।

নালন্দায় আশি ফুট উঁচু তামার এক বুদ্ধ মূর্তি ছিল, যে মূর্তিটি তৈরী করেছিলেন সম্রাট অশোকের বংশধর পূর্ণবর্মা। বুদ্ধের সে তাম্রমূর্তিও বর্বরের কুঠারের আঘাতে ধ্বংস হয়েছিল। একটি [illegible] এখন আছে। কিন্তু হিন্দু রাজাদের আমলে তাঁদের সমৃদ্ধি অথবা অধিকারের পরিমাপের কত কীর্তি যে ধ্বংস হয়ে গেছে বর্বরের কুঠারের আঘাতে তার সীমা-সংখ্যা কে করবে?

তখনকার রাজাদের প্রতাপ কি রকমের ছিল? এক দৃষ্টান্ত দিই। সম্রাট কুমারপালের রাজত্বকাল। সে হোল একাদশ শতাব্দীর কথা। অসংখ্য রাজাকে তিনি যুদ্ধে পরাস্ত করলেন। তারপর পরাজিত রাজাদের সোনার মুকুট সংগ্রহ করা হোল। আর সেই সকল সোনার মুকুট দিয়ে এক সোনার সিংহ তৈরী করে রাজার সুউচ্চ প্রাসাদের শীর্ষ দেশে বসানো হোল। সর্বসাধারণে তা দেখে কেউই না মুগ্ধ হোত? কোথায় গেল সে রাজ প্রাসাদ আর সে সোনার সিংহ? সেও ধ্বংস হয়েছে বর্বরের হাতের কুঠারের আঘাতে।

কোথায় গেল মহারাজা বিজয় সেনের সুবৃহৎ স্বর্ণ কলসী? যে কলসী তিনি স্থাপন করেছিলেন অতি বিশাল প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরে। একজন তার প্রশংসা করে বলে ফেলেছিলেন যে তেমন কলসী বিধাতাও বুঝি তৈরী করতে পারেন না,—সে কলসী ছিল এমনই বিচিত্র শোভাময়।

পাঠশালায় পড়তে গিয়ে ঘোৎনার আর একটা নাম হয়েছিল—কাগের ডিম।

গুরু মশায় তালপাতায় অ-আ, ক-খ দেগে দিয়ে ঘোৎনাকে তার উপর কালী বুলোতে দিয়েছিলেন। ঘোৎনা সব অক্ষরের টানটোন একাকার করে লিখে রেখেছিলো। কতগুলো গোল গোল ডিম। তা দেখে গুরুমশায় হেসে বললেন, "বেড়ে লেখা হয়েছে রে! যেমন লেখা তেমনি লিখিয়ে! দুই-ই কাগের ডিম!" সেই হতে পাঠশালার সবাই ও তাকে ডাকতে আরম্ভ করল—কাগের ডিম।

এই কাগের ডিমের লেখা লিখেই কোনো রকমে সে পাঠশালার চৌকাঠ পেরোলো। তারপরে ইংরেজী ইস্কুলের পড়া। সেখানে গিয়ে এ-বি-সি-ডি লেখার বেলায় ডিমগুলোর চেহারা একটু বদ্‌লালো বটে। কিন্তু তখনো তা বগের ডিমের উপরে উঠল না।

এই রকম কাগের ডিম আর বগের ডিম লিখে মা সরস্বতীর মন্দিরের কাছে যাওয়া আর ডিঙোনো চলে? তাই অল্প দিনের মধ্যেই ঘোৎনার ইস্কুলের বিদ্যে হলো খতম।

মহারাজা নয়পাল যে সকল বিশাল-বিশাল দীঘি খনন করিয়েছিলেন সে ছিল সমুদ্রের মতো গভীর। সে সব দীঘি এখন কোথায়? কিছুই নেই। সব গেছে ধ্বংস হয়ে।

মুসলমানরা আসবার আগে, তখনকার কালে মথুরায়, মগধে আর আমাদের বঙ্গদেশে সোনার তৈরী অতি বৃহৎ বৃহৎ দেব-বিগ্রহ সব ছিল। সে সকল বিগ্রহের পূজোর জন্য শত শত উদ্যান উজাড় করে পুষ্পরাশি আনা হোত। সেই সকল দেব-বিগ্রহ কোথায় গেল? আর গগনস্পর্শী অপূর্ব কারুকার্য শোভিত সে সকল মন্দিরই বা কোথায় গেল? সে সব কিছুই নেই। এ সব কীর্তি ধ্বংস করে কি কৃতিত্ব? কীর্তি নষ্ট করে কি কেউ বড় হয়? কিন্তু নষ্ট হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে সবই। কিছুই নেই।

তবে আছে। আছে শুধু এক কোণে লুকিয়ে অজন্তার শিল্প সম্পদ। সে এখনো বেঁচে আছে, কেন না সে আত্মগোপন করে রয়েছে। এ ছাড়া আর কি আছে? আর আছে অপূর্ব হিন্দু কীর্তি বহু দূরের বরোবুদরে, আছে হিন্দু শিল্প সেই অতি দূরে বালীর প্রম্বনমে। এ ছাড়া ভারতের আর কোথাও কিছু নেই। অতীতের কীর্তি কাহিনী আছে শুধু ইতিহাসের পাতায়।

কিন্তু এ সকল ধ্বংস হওয়াতে হিন্দুর কি ক্ষতি হয়েছে কিছু? তার জড় জগতের বাহ্য সম্পদ লুপ্ত হয়ে গেছে বটে, কিন্তু সে আরো বড় হয়েছে অধ্যাত্ম সম্পদে। বিদ্যায়, জ্ঞানে কবিত্বে সে মহান হয়েছে। এই সকল আত্মধনে সে মহা-ধনবান। হিন্দুর ধ্বংস নেই।

এরপর রোজগারের পালা। কিন্তু গাঁয়ে যার নাম ঘোঁৎনা, তার উপর একটা ফাউ নাম কাগের ডিম চেনা-শুনো জায়গায় তার রোজগারের উপায় কি? চাকরী-বাকরীর আশায় সে চল্‌লে কলকাতায়। সেখানে তার মায়ের মেসো থাকেন। তাঁর সাহায্যে চেষ্টা-তদ্বিরের সুবিধা হবে।

* * * *

ঘোঁৎনার মায়ের মেসো ছিলেন ডাক্তার। একদিন তিনি ঘোঁৎনার কাগের ডিম বগের ডিম লেখা দেখে বল্‌লেন—'দাদুভাই, তোমার লেখার ছিরিটা দেখ্‌ছি জাঁদরেল ডাক্তারদেরই মত,—যিনি যত বড়ো ডাক্তার হাতের লেখাও হয় তাঁর তেমনি প্যাঁচানো. কার সাধ্য পড়ে! তুমি ডাক্তারী আরম্ভ করো, দুদিনেই নাম কিনতে পারবে তোমার হাতের লেখারই গুণে।'

দাদুর উপদেশটা নাতির মনে ধরল। কিন্তু মুস্কিল হ'লো। ডাক্তারীর লাইনটা ঠিক করার বেলায়। ডাক্তার-দাদুর মুখে সে শুনেছিল কলকাতায় কি কি চিকিৎসা চলে। কিন্তু মনোমত লাইনটা ঠিক করতে গিয়ে তার খটকা বাধল। এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক অষুদগুলোর যে কট্‌কটে নাম, —বাব্বাঃ!— তা কি মুখস্থ করা যায়! বায়োকেমিক চলে বটে সামান্য কটা অষুদ দিয়ে কিন্তু তাতেও তো নামের খটমটি আছে। সব থেকে ঝঞ্ঝাট নেই হাইড্রোপেথির। কিন্তু অত সাদাসিধে আর সকলের জানা-শুনো অষুদ দিয়ে কি রোগী পটাতে পারা যাবে?

এই সমস্যার মধ্যে একদিন তার নজরে পড়্‌ল রাস্তার একটা হ্যাণ্ডবিলের উপর। তাতে লেখা ছিল—অদ্ভুত ইলেকট্রিক চিকিৎসা। এই চিকিৎসায় নিমতলার মড়াও চোখ মেলে চায়। বিজ্ঞাপনটা পড়েই ঘোঁৎনার মনের ধাঁধা ঘুচে গেল। সে ঠিক করল—ঐ ইলেকট্রিক আর হাইড্রোপেথী এই দুরকম চিকিৎসার নাম দুটোর ল্যাজা-মুড়ো জুড়ে সে করবে হাইট্রিক-চিকিৎসা,—আনকোরা নতুন নাম শুনেই লোকের চমক লাগবে। তারপর অষুদ?—একদিকে আছেন, মা গঙ্গা, আর একদিকে বিজলী বাতি—চিন্তা কি!

* * * *

হাইট্রিক-চিকিৎসার ডাক্তার হ'য়ে বসল ঘোঁৎনা। বড় ডাক্তাররা অষুদ-পত্তর দেওয়ার ঝোঁক রাখেন না, অষুদের ব্যবস্থা লিখে দিয়েই খালাস, তারপর যার যে অষুদ, কিনে নাও বাজারের দাওয়াইখানা থেকে। ঘোঁৎনারও ব্যবস্থা হ'লো সেই রকম। ডাক্তার-খানায় দু-চারখানা চেয়ার আর ছোট্ট একটা টেবিলের উপর ডাক্তারের নাম-ছাপানো প্রেস্‌ক্রপশন-লেখার প্যাড্‌,—বাস,—এই সাজ-সরঞ্জাম নিয়েই সে ডাক্তারী আরম্ভ করল।

কিন্তু ল্যাঠা হ'লো প্রেস্‌ক্রপশনের লেখায়। ডাক্তারের কাগের ডিম বগের ডিম লেখা পড়ে কার সাধ্য! ঘোঁৎনা বখরায় একটা ছোট দাবাইখানার সঙ্গে ব্যবস্থা ক'রে রাখল। কথা হ'লো—লোকের মুণ্ডু আর ভুঁড়ির দিকে নজর রেখে অষুদ দেওয়া, ব্যামোসারানোর এ দুটোই হ'লো সারকথা। দাবাইখানা ঐ বটের যে কোনটার অষুদ দিবে, তার প্রেসক্রপশন পড়া যাক্‌ আর না যাক্‌।

হাইট্রিক চিকিৎসা—একেবারে নতুন জিনিস। ডাক্তার কবরেজের ফেরতা রোগীরা আশায় আশায় এই নতুন ডাক্তারখানায় এসে জুটল। তারা ভাবল—দেখাই যাক্‌ না শেষ চেষ্টাটা ক'রে এই নতুন চিকিৎসায়।

* * * *

ঘোঁৎনার রোগীদের মধ্যে একজন ছিল জৌনপুরের এক সদাগর। রোগটা তার কি, শিবেরও ধরার সাধ্য ছিল না। একটা ঢেঁকুর উঠল, কি একটা হাঁচি পড়ল, অমনি তার ভয় হ'তো গতর বিগড়েছে। তাই তাঁর বাতিকই ছিল দাওয়াই গেলার। পয়সাওলা লোক, টাকা-পয়সা খরচ করতেও পেছপা নয়। একদিন সেই রোগীটি এলো হাইট্রিক চিকিৎসার জন্যে। তারপর হপ্তায় হপ্তায় তার আসা-যাওয়া চল্‌ল দাওয়াইর ব্যবস্থা নিতে। তা নিতে আসত, কখনো সে নিজেই, কখনো তার এক নোকর। এই রোগীতেই ঘোঁৎনার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সন্ধান মিলল। তাই ঘোঁৎনার কাছে সে-রোগীর খাতির যত্নেরও সীমা ছিল না।

* * * *

পুজোর আগে ঘোঁৎনা একটা মতলব করল। দেশে থাকতে সে বড়শীর মুখে ছোট মাছ গেঁথে জলে ফেলে রাখত। রুই-কাতলা সেই মাছ খেতে এসে বড়শীতে আটকা পড়ত। তার উদ্দেশ্যটা ছিল সেই রকমের। সে ভাবল পয়সাওলা রোগীদের একটা ভোজ দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। তার আশা হোল—ভোজের এই ব্যবস্থায় যা খরচ হবে তার চারগুণে উশুল হ'য়ে আসবে পার্বণীটা পেয়ে তাঁদের কাছ থেকে,—আর তাতেই পুজোর খরচা সম্বন্ধে নিশ্চিন্তি। এই ঠিক ক'রে বেছে বেছে কয়েকজন রোগীকে সে ভোজের নেমন্তন্ন চিঠি দেবে ঠিক করল।

ভোজের দুদিন আগে জৌনপুরী সদাগরের নোকর এসে ডাক্তারখানায় উপস্থিত—তার মনিবের দাওয়াই চাই। নোকর দেখে ঘোঁৎনা তাড়াতাড়ি প্রেসক্রপশনের প্যাড্‌টার একটা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে খসখস ক'রে লিখে তার হাতে দিল। পুরোনো রোগী, রোগটাও তো হয় একটা ঢেঁকুর, নয় তো একটা হাঁচি বাড়াবাড়ি—জিজ্ঞাসা-বাদের তেমন কিছু দরকার হয় না। তাই ঘোঁৎনা কিছু না বলে কয়েই তাই কাগজখানা দিয়ে দিল। সদাগরের নোকরও মুখবুজে তা নিয়ে চলে গেল।

* * * *

কয়েকদিন বাদে ঘোঁৎনা [illegible] দিয়ে যাচ্ছে পেছনে শুনতে পেল—'রাম রাম, ডাক্তারবাবু! এদিকে কোথায়?'

ঘোঁৎনা ফিরে দেখে—জৌনপুরী সদাগর! সেও 'রাম রাম' বলে সাড়া দিয়ে জিজ্ঞেস করল—'এ কি, আপনি এখানে!'

দুজনেরই মুখে একই [illegible]—এখানে, নইলে ছিল।'

তারপরই সদাগরের কাছে ঘোঁৎনা বলল—[illegible] আপনার দেখা পাওয়া গেল, আমার নালিশটাও আপনাকে জানাতে পারছি। সেদিন আপনাকে খাওয়ার নেমন্তন্ন-চিঠি দিলেম, আপনি আমার গরীবখানায় একবার পায়ের ধুলোটা দিলেন না! আপনি আসবেন কত আশা ক'রে ছিলুম!'

নেমন্তন্ন-চিঠি!'—সদাগর অবাক হয়ে বলল—'কই, সে রকম চিঠি তো আমি পাইনি।'

—'সে কি? পাননি বলছেন কি? আপনারই নোকর যে আমার কাছে গিয়েছিল, সেই চিঠিই তার হাতে দিয়েছি। আমি ভেবেছিলেম আপনাদের দুটো খাইয়ে একটু শান্তি পাব আশা ছিল। কিন্তু আপনি না গিয়ে আমাকে বড়ই দুঃখ দিয়েছেন।'

সদাগর চিঠির কথাটাই [illegible] এতক্ষণ ভাবছিল। হঠাৎ বলে উঠল—রামো রামো! আমার নোকরের হাতে আপনি চিঠি দিয়েছিলেন শুনে এবার সব মালুম হ'লো ডাক্তারবাবু! আপ প্রেসক্রপশনের কাগজে লিখেছিলেন তো চিঠিটা? একেবারে তাক্‌ কায়দায়,—আমার নামটা উপরে নীচে আপনার সই। এ দাটো অক্ষরের চেনা দেখে বুঝতেই পেরেছি। কিন্তু মাঝখানে লিখেছেন, তা কি আমরা পড়তে পারি? ভাবলুম—আগেকার মত দাওয়াই-টাওয়াইর নাম। তাই সেই কাগজটা পাঠিয়ে দিলুম আপ

ভোরবেলা আজ ছাতে উঠে দেখি
বসেছে সেখানে জোর সভা দেখি!
খোকার কুকুর জিম্ সভাপতি,
খুকুর মেনিটা প্রধানা অতিথি।
খরগোস উঠে বলছে দাঁড়িয়ে—
মানিব বেজায় উঠেছে বাড়িয়ে!
থাকবোনা আর আমরা এখানে
কষ্ট যে কতো টিয়া-পাখী জানে!'

'বাড়ী নয় যেন জেলখানা এটা!'
পিসিমার পোষা টিয়া পাখী সেটা
পায়ের শিকলি দু'পাক পেঁচিয়ে,
টাঁ-টাঁ করে উঠে বললে চেঁচিয়ে,
'দিনরাত দাঁড়ে আছি চেনে বাঁধা'!
জিম বলে 'দিদি মিছে তোর কাঁদা
দেখনা টুটিতে আঁটা বগ্‌লোশ্
খোলা শুধু মেনি আর খরগোস!'
খরগোস বলে, 'আরে দাদা রাতে,
পিঁজরেয় পুরে রেখে দেয় ছাতে।
খাটের তলায় জিম ঠাঁই পায়,
মেনি তোফা গিয়ে ঘুমোয় সোফায়!'

খাঁচার ভিতরে ঘেরা টোপে ঢাকা,
ময়না পাখীর কথা পাকা পাকা
বলে শিস্ দিয়ে—'শোন বলি তবে'
দেশজোড়া চোর! সাধু কেবা ক'বে?
ছাতু-ছোলা মারে, দেয় না কো পোকা
খাঁচায় ঝিমিয়ে পড়ে আছি বোকা!'

জিম্ বলে, 'পাই টেংরির হাড়
মাংস দেবার নেই কারো চাড়!
চাল চড়ে গেছে, ভাত দেয় কম
হলুদে ফোটানো দেয় শুধু গম!'

মেনি বলে, 'ভাই, খাই কাঁটাপোঁটা,
শস্ত এখন চুণো মাছও জোটা!
ওরা বলে, মাছ চার টাকা সের
মেনির জন্যে যা দিই তা ঢের!'

খরগোস বলে, 'গাজর মামুলি
শালগম, মুলো, স্বাদ গেছি ভুলি
এখন কেবল কুটনোর খোসা—'
'ও সব বাবুদের সখ পাখী পোষা!'
টি টি র করে টিয়া বলে ওঠে,
'পাটনাই ছোলা বরাতে না জোটে,
শুকনো মটর, বরবটী, শুঁটি
অল্প স্বল্প দেয় মোটামুটি
ফলমূল খাওয়া প্রায় গেছি ভুলে
আধমরা হয়ে দাঁড়ে আছি ঝুলে!'

খরগোস বলে 'আবার ময়না,
শোনো 'টকে দিদি শোনো যা ময়না
জিম ভাই শোনো শোনো মেনি বোন,
এতো হেনস্থা সয় কোন জন?
কানিসে ওই কেকোগোল গুলো
পড়ে আছে যেন নেই চালচুলো,
পায়রা মটর কেউতো পায় না,
বক্ বকমটা তবুতো যায় না?
থাকবো না আর এ বাড়ীতে—ধিক!'
টিক্ টিক শুনে বলে, 'ঠিক! ঠিক!'
'জীবে দয়া-শুনি ধর্ম হিঁদুর—'
এই বলে সেই নেংটি ইঁদুর

এসেছে সেখানে সরু ল্যাজ নেড়ে,
মেনি আর জিম গেল তাকে তেড়ে,
'কা-কা' কয়ে কাক ছুটলো পাঁচিলে,
চিলের ছাতেও নেমে এল চিলে,
খোকা খুকু কেউ দেখলোনা হায়,
বুঝতো তারাই এরা কী যে চায়?

সেই দাওয়াইখানায়। সেখানকার লোকজনেরা নাকি মুড়ি আর ভূঁড়ি এই রকম কি কথা ব'লে এক বোতল দাওয়াই দিয়ে বল্‌ল,—সাতদিনের অষুদ। রোজ তিন তিন দাগ খাওয়াতে হবে। সেই এক বোতল দাওয়াই খেয়ে এ কদিন আমি আছিও ভালো।'

সদাগরের কথা শুনে ঘোংনা অবাক। সে ভেবে রাখল—শীগ্‌গীরই একটা টাইপরাইটার না কিনলে চল্‌ছে না দেখছি। এখন হ'তে চিঠিপত্র তাতেই টাইপ ক'রে দিতে হবে।

স্বপনবুড়োকে দাদা বলে ডাকি বলেই—তিনি দাদাগিরীটা ফলান আমার ওপরই সবচেয়ে বেশী। পুজোর মরশুমে তাঁর আসর বসাবার সময় এলেই—হুকুম আসে,—"ভায়া কিছু জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন খবর পাঠিও, আমাদের আসরে।"

হুকুমটা যতো সহজ, কাজটা তত সহজ নয়। কারণ বিজ্ঞান হলো বিজ্ঞানীদের কারবার। মেলাই তথ্য আর সত্য নিয়ে ঘাটাঘাঁটি নাড়াচাড়া করতে হয় বিজ্ঞানের দরবারে পা বাড়ালেই। ফাঁকি, গোঁজা-মিল। গুলগাপ্প চালাবার উপায় নেই ওব্যাপারটিতে। অর্থাৎ ওসব বিষয়ে কিছু লিখতে বলতে হলেই, বসতে হয় মোটা মোটা বই নিয়ে। সেই ঝামেলাটা 'স্বপন-বুড়ো' দাদা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে জব্দ করেন আমাকে প্রতিবারই, এবারও সেই মতলবেই সেই ভার আমার ঘাড়ে চাপিয়েছেন। কিন্তু ভাই মুস্কিল কি জানো! তোমাদের বোঝাবার মতো, তোমাদের খুশি করার মতো, জ্ঞান-বিজ্ঞানের খবর বার করার ব্যাপারে, তোমাদের সাহায্য সহায়তাটাই আমার বড় বেশী কাজে লাগে।

বিজ্ঞানের নানা বিষয়কে ঘিরে তোমাদের ছোট ছোট মনের সিন্দুকে যে-সব কৌতূহল আর প্রশ্ন লুকিয়ে রেখেছ সে-গুলো আমাকে দেখিয়ে, শুনিয়ে একাজে সাহায্য করবার মতো একদল ছোট্ট বন্ধু আমার আছে বলেই—'স্বপনবুড়ো' দাদার ফরমাস মতো কাজে হাত দিতে ভরসা পাই।

এবার তাই আমার ছোট্ট বন্ধুদের কয়েকজনকে ডেকে বললাম—"ওরে তোরা শিগ্‌গিরী আয়! স্বপনবুড়ো দাদা আবার আমায় প্যাঁচে ফেলেছে।"

ঘণ্টে, ছকাই, নিরু, হাঁদু সব্বাই ছুটে এলো—বললে—"ভেবোনা মৌমাছি কিচ্ছুটি, তোমার তো নতুন নতুন প্রশ্ন চাই? তার আর অভাব কি, আমরা রয়েছি কি করতে"

"হ্যাঁরে হ্যাঁ, ঠিক ধরেছিস? তোরা প্রশ্ন দিলে তবেইতো তোদের মনের মতো জবাব বার করে সব ছোট্ট বন্ধুদের তাক লাগিয়ে দিতে পারবো।"

বাস! ওরা সবাই আমার চারধারে ঘিরে বসলো। সবাই এক-সঙ্গে বলে বসলো—"আমাদের কিন্তু আলুকাবলী খাওয়াতে হবে "মৌমাছি ভাই?"

—"বেশ! তাই খাওয়াবো? এখন বল তোরা কে কি জানতে চাস?"

ছকাই ওর ডানহাতের আঙুলগুলো দিয়ে ডানহাতের কব্জির ওপরটা চুলকোতে চুলকোতে বললে—"মশার কামড়ের জ্বালায় কি স্থির হয়ে বসবার যো আছে।"

নিরু অমনি কটকটু করে একটা খোলাশুদ্ধ চিনেবাদাম চিবোতে চিবোতে বললে—"হয়েছে! হয়েছে! প্রশ্ন পাওয়া গেছে—"বলতো মৌমাছিভাই মশার ক'পাটি দাঁত?" বাদবাকি সবাই সায় দিয়ে বলে উঠলো—"আমাদেরও এ খবরটা জানার ইচ্ছে অনেকদিন থেকে।"

ওদের কথা শুনে আমারই তো দাঁত-কপাটি লাগার যোগাড়! মাথা চুলকিয়ে, বইগুলো ঝট্‌পট্ উল্টে-পাল্টে দেখে নিলুম—জবাবও একটা পেয়ে গেলাম। বললাম সেটা। কি বললাম জানো?

যদিও আমরা বলে থাকি মশারা কামড়ায়। তাহলেও মশায়রা জেনে রাখুন মশাদের একটি দাঁত নেই। কিন্তু ওদের ধারালো এমন ঠোঁট আছে, যা দিয়ে তারা কামড়ের কাজটা সারতে পারে। বিশেষ করে মেয়ে মশাদের ঠোঁট এমন ধারালো আর এতো শক্ত যে, সহজেই তারা চামড়া ফুটো করবার শক্তি রাখে। কিন্তু অধিকাংশ পুরুষ মশাই ওসব কামড়-টামড়ের ধার ধারে না, কারণ তাঁদের ঠোঁট অত মজবুত নয়। তারা বড় জোর নরম ফুল, ফল আর পাতা কামড়িয়ে তার রস খেয়েই খুশি থাকে। মেয়ে মশারাও তা পারে, তবে ওঁদের একটু রক্ত পিপাসাটা বেশী। মশারা শুধু যে মানুষদের দেহে কামড় বসিয়ে রক্ত শুষে খায় তা মনে করোনা। ওরা সুযোগ সুবিধা মতো পশু-পাখী, ব্যাঙ, মাছ ইত্যাদির রক্ত শুষে খায়। তবে গরম রক্ত-ওয়ালা জীবজন্তুদের রক্তের উপরই লোভটা ওদের বেশী। তোমাদের কামড়াতে পেলেই মশারা হন সবচেয়ে খুশি।

মশার কামড় দেওয়ার কায়দাটাও [illegible] ব্যাপার। গায়ের চামড়ায় বসলো আর [illegible] করে কামড়ালো, তা নয়!

হাঁদু বললে—"মশারা কামড়াবার আগে দেখেছি, বেশ খানিকটা উড়ে উড়ে ঘুরে [illegible] কামড়ের [illegible] বসতে কামড় দিতে অনেকটা তার সময় লাগে।"

—"লাগবেইতো! [illegible] আবিষ্কার করতে হয় তাকে অনেক খুঁজে পেতে [illegible] রেখে। যেখানে-সেখানে কামড় বসালে যে রক্ত পাবে না [illegible]। এই জরিপ-জমিন ঠিক করবার [illegible] ওদের ঠোঁটের দুপাশে দুটো শুঁড় [illegible] আসল জায়গাটা খুঁজে বার করে। [illegible] খুঁজে পাওয়ার পর তার ঠোঁটটি [illegible] আমাদের চামড়ার নীচে লুকানো রক্ত [illegible]।

ঘণ্টে বললে—"[illegible] কি [illegible] এসব! আমরা তো দেখতে পাইনে এত কাণ্ড!"

শুধু চোখে দেখা যায়না এসব। মাইক্রোস্কোপ বা অণু-বীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে দেখতে পাবে মশার এই ঠোঁটের ভেতর কত কেরামতি! মশার [illegible] ঠোঁটের [illegible] লম্বা ছুঁচলো অংশটাই হচ্ছে—ওর রক্ত-শোষবার [illegible] খাপ। এই খাপটির ভেতর খালি চোখে দেখা যায় না, এমন ছোট ছোট, দুটি [illegible] অস্ত্র আছে।

মশার নীচের ঠোঁটের [illegible] খাপটা [illegible] চামড়ার [illegible] পর ঐ [illegible] ঠিক ঠিক জায়গায় কাজে লাগিয়ে দেন মশা মশাই। নীচের দিকে মুখ করা বর্শার ফলার মতো দুটো যন্ত্র চামড়া ফুটো করার কাজ চালায়। আর আছে ছোট ছোট দুটি করাত সেটা চামড়াটাকে [illegible] করে দেয়। এই কাজগুলো সারা হলেই ঠোঁটের খাপটা [illegible] গুটিয়ে নেয় সে। তারপর ছোট [illegible] মশা তার লালা ইনজেকসন করে মিশিয়ে [illegible] ওটি করবার ফলেই রক্ত আর জমাট বাঁধে না। তারপর শুরু হয় সাইফন বা শোষণ যন্ত্রটি দিয়ে রক্ত-শোষার কাজ।

প্রিয় বন্ধুদের জগতে শিশুরা

শিল্পী ঃ (১) রামকিংকর সিংহ, (২) নরেন্দ্রনাথ বসু, (৩) দীপ্ত ভট্টাচার্য।

তোমরা জানো যে, ভারত রাষ্ট্রের যিনি প্রধান অর্থাৎ যিনি রাষ্ট্রপতি—তিনি জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে থাকেন। পৃথিবীর প্রায় সব দেশে এ নিয়ম প্রচলিত দেখতে পাওয়া যায়। যাঁদের উপর দেশ শাসনের ভার তাঁরা শাসনের অধিকার লাভ করেন জনসাধারণের কাছ থেকেই। এই রকম শাসন ব্যবস্থার নাম গণতন্ত্র।

অনেক আগে আমাদের দেশ শাসন করতেন রাজারা। তাঁরা পুরুষানুক্রমে রাজত্ব করতেন। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে জনসাধারণ তাঁদের স্বাধীন ইচ্ছানুসারে রাজা নির্বাচন করতেন। জনসাধারণের অধিকার শুধু আজকেই স্বীকৃত হয়েছে তা নয়, বহু বছর আগেও এই অধিকারকে মেনে নেওয়া হতো এরকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

তোমরা পাল রাজাদের কথা শুনেছ। যাঁদের রাজত্বকালে শৌর্যে, বীর্যে, শিক্ষা-দীক্ষায় বাঙ্গালী সেই যুগের ভারতবাসীদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিল। এই পাল বংশের স্থাপয়িতা গোপাল রাজবংশীয় ছিলেন না। সাধারণ নাগরিক ঘরেই তাঁর জন্ম হয়েছিল। সেই সময় দেশে খুব অরাজকতা চলছিল। সেই অরাজকতাকে মাৎস্য ন্যায় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 'মাৎস্য ন্যায়' কথাটা গালভরা। কিন্তু এর অর্থ বুঝতে তোমাদের কোনো কষ্ট হওয়া উচিত নয়। মাছের যুক্তি মানে জোর যার মুলুক তার। যাদের শক্তি বেশী অর্থাৎ বলবান তারা ছোটদের ধরে ধরে খায়। এই হলো মাছেদের রীতি। সে যুগে প্রবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করতো, যার ফলে দেশে ঘোরতর অরাজকতা দেখা দিয়েছিল। এই অরাজকতার হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য বাংলার জনসাধারণ সেদিন গোপালকে রাজপদে নির্বাচিত করেছিল। ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় গোপালের সুযোগ্য নেতৃত্বে অরাজকতার অবসানে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

গোপাল ছাড়াও মধ্যযুগের বাংলায় রাজা নির্বাচনে জনসাধারণের অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল এরকম দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। পাল শাসনের অবসানে সেন বংশ নামে বাংলা দেশে এক নতুন রাজবংশ স্থাপিত হয়েছিল। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেন। এঁর সম্বন্ধে মধ্যযুগের সাহিত্যে একটা কাহিনী শোনা যায়। সেটি তোমাদের কাছে বলছি।

ভারী গরীব ছিল বিজয় সেন। চাকরী-বাকরী কিছুই ছিল না। ক্ষেত খামার জমি জমা যৎসামান্য ছিল। কি করে সংসার চালানো যায় এই তার মস্ত ভাবনা। শেষকালে অনেক ভেবেচিন্তে ব্যবসা করবে বলে স্থির করলো। কিন্তু ব্যবসা করতে হলে তো মূলধন চাই। অনেক চেষ্টা করেও মূলধন যোগাড় হলো না। শেষে স্ত্রীর কথায় সে বন জঙ্গল থেকে কাঠ যোগাড় করে তাই বিক্রি করে কষ্টে-সৃষ্টে সংসার চালাতে লাগলো।

কাঠ বিক্রি করে যা লাভ হতো তা যৎসামান্য—তাও সে পুরোটা গৃহিণীকে দিতো না। অত্যন্ত শিবভক্ত ছিল বিজয় সেন—রোজ শিবপূজা করা চাই। তাই সেই পয়সা দিয়ে সে শিবের পূজা করতো।

আষাঢ় মাস। সন্ধ্যা থেকে মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছিল—সেই বৃষ্টি সারারাত চললো—সকালেও তার বিরাম হলো না। দুপুরেও যখন বৃষ্টি ধরলো না—তখন বিজয় সেন দাখানা নিয়ে সেই বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে গেল। ঘরে একটিও পয়সা নেই—গিন্নীর হাতে কি দেবে? কিন্তু অত বৃষ্টিতে তো কাঠ কাটা সম্ভব নয়, তাই সে এক প্রতি-বেশীর বাড়ী গিয়ে দাখানা বাঁধা দিয়ে কয়েকটি পয়সা ধার করলো—আর তাই সে গিন্নীর হাতে দিলো।

সেদিনের মত হলো। পরদিন সকালে উঠেই বিজয় সোজা যার কাছে দা বাঁধা রেখেছিল তার কাছে গিয়ে হাজির হলো। দাখানা নিয়ে কাঠ কাটতে যাবে কিন্তু হলো কি হয়—লোকটি সোজা অস্বীকার করলে দা তার কাছে নেই। বিজয় বেশী কথার মানুষ নয়, তাই মুখবুজে চলে এলো। কিন্তু ভাবনার শেষ হলো না—শুধুহাতে বাড়ী ফিরবে কি করে? গৃহিণী তাহলে বকাবকি করবে। তাই বাড়ী না ফিরে পথের ধারে একটা বেলগাছ তলায় বসে রইল। মন খুব খারাপ—শিবপূজা হলো না বলে। বসে থাকতে থাকতে সন্ধ্যার খানিক পরে সে শিবনাম করে শুয়ে পড়লো।

এদিকে ভক্তের জন্য শিবের টনক নড়লো। অনেক রাত্রে তিনি ছদ্মবেশে এই গাছের নীচে এসে বিজয়কে বললেন, তোমার দা যদি ফিরে পেতে চাও তাহলে রাত ভোর হতে না হতে গঙ্গাতীরে যেও।

গঙ্গাতীরে বহু লোকের ভীড়। আজ ক'দিন পালরাজ রামপালের গঙ্গাতীরে অন্তর্জলি হচ্ছে। রামপাল অপুত্রক ছিলেন—পঞ্চাশেরও বেশী বছর রাজত্ব করেছেন—এইবার সিংহাসন ছেড়ে ভগবানের নাম করতে করতে পরলোকে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছেন—তাই ইহলোকের চিন্তা তাঁর নেই। কিন্তু মন্ত্রীদের ভাবনা অনেক। কে নতুন রাজা হবে এই নিয়ে তাঁদের মস্ত ভাবনা। প্রধানমন্ত্রীর নাম সহদেব—তাঁরই ভাবনা সব চেয়ে বেশী। ভাবতে ভাবতে রাত্রে তাঁর ঘুম হয় না—একদিন আধঘুমন্ত অবস্থায় সহদেব দেখলেন যেন স্বয়ং শিব তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে বলছেন: "ওহে, রামপালের মৃত্যুর দিন

(শেষাংশ ১৭০ পৃষ্ঠায়)

নিক্কু বললে—"ওরে বাবা! এত কাণ্ড করে তবে মশারা আমাদের রক্ত খায়।"

—কিন্তু এই যে এত কাণ্ড করে যখন মশাটা কাটা-ছেঁড়ার কাজ চালাতে থাকে, তখন তোমরা তার যন্ত্রণাটা টেরই পাও না। যন্ত্রণাটা শুরু হয় তখনই, যখন মশারা ইনজেকশন করে, লালাটা রক্ত টানার ব্যাপারটাকে সহজ করে দেয়।

কথা শেষ করতে না করতেই নিক্কু হুটির গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিয়ে বললে "মশারে মশা।"

হুটি আচমকা চড় খেয়ে নিক্কুর চুলের মুঠি চেপে ধরে বললে—"ইয়ার্কি মারবার জায়গা পেলে না? মশার নাম দিয়ে আমার গালে চড়টা চালিয়ে দিলে।" তারপর লেগে গেল ওদের তুমুল ঝটাপটি, আমিও সেই ফাঁকে পুঁথিপত্তর গুটিয়ে সরে পড়লাম—আমার দাঁত-কপাটি বাঁচাবার জন্যে।

(একাঙ্কিকা)
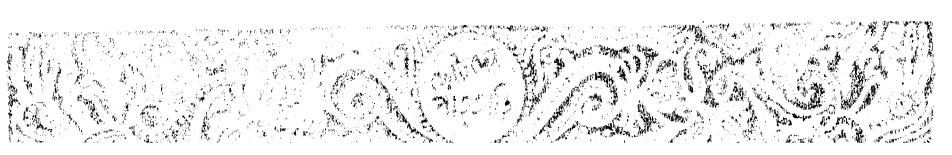
[একটি স্কুলে ছাত্রদের সরস্বতী পূজা। পূজা কমিটির অফিস কক্ষ। পূজোর ভোগের দ্রব্যাদি এই কক্ষে ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে। মাইকে ফিল্মের গান চলিতেছে—ইচিক দানা বিচিক দানা......। কানাই ভোগের ঢাকা পাত্রগুলি গুছাইয়া রাখিতেছে।

(১৬৯ পৃষ্ঠার পর)

সকালবেলা বিজয় সেন নামে একটি লোক গঙ্গাতীরে আসবে—তাকেই তোমরা রাজা করো—তোমাদের মঙ্গল হবে।"

পরদিন সকালবেলা রামপালের মৃত্যু হলো। সহদেবকে অন্যদিনের তুলনায় কম চিন্তিত দেখাচ্ছিল। কিন্তু তিনি যেন ভীড়ের মধ্যে কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন হঠাৎ একটি লোকের দিকে চোখ পড়তেই—তিনি সেপাই সান্ত্রীদের বল্লেন ধরে নিয়ে আসতে।

সিপাই সান্ত্রীদের দেখে বিজয় সেনের চক্ষুস্থির—! তার রকম-সকম দেখে সেপাইরা বল্লে : জানো না মহারাজ সুস্থ হয়ে উঠেছেন! তাঁর কল্যাণে প্রধানমন্ত্রী বলিদান করবেন—আর তোমাকেই সেই বলির পাত্র বলে স্থির করা হয়েছে।

সেপাইদের কথা শুনে বিজয় সেন তো কান্না শুরু করে দিল। তাহলে সেই ছদ্মবেশী আগের রাত্রে তার সঙ্গে ছলনা করে গেল? কোথায় তারা? যাখান থেকে তার প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

কিন্তু উপায় নেই—রাজার আদেশ পালন করতেই হবে। কাঁদতে কাঁদতে সে মন্ত্রী সহদেবের সামনে এসে দাঁড়াল। বিজয় মন্ত্রীকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে : আমাকে কি আপনারা বলি দেবার জন্য এনেছেন?

মন্ত্রী তো অবাক! বললেন : সে কি কথা? আপনি আসন গ্রহণ করুন। এই বস্ত্র অলংকার পরিধান করুন—সুস্থ হোন।

তারপর সহদেব রাজ্যের অন্যান্য প্রধান যাঁরা মিলিত হয়েছিলেন—তাঁদের লক্ষ্য করে বল্লেন : "কাল রাতে আমি ভগবান শিবের আদেশ পেয়েছি—মহারাজের উত্তরাধিকারীরূপে এই অভ্যাগত মহাপুরুষকে রাজপদে যেন নির্বাচন করা হয়। আপনারা শিববাক্য রক্ষা করুন। রাজ্যের অশিব দূরে হয়ে যাবে।"

রাজ্যের নায়করা একবাক্যে সম্মতি দিলেন। বিজয় জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং রুদ্রের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে 'মহারাজ বিজয় সেন' নামে পরিচিত হলেন।

বাংলার অতিপরিচিত সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন এই বিজয় সেন।

পূজা কমিটির সম্পাদক গজানন এবং হুয়া এবং ভোলা হিসাব মিলাইতেছে।]

গজানন ॥ সরস্বতী প্রতিমা কুড়ি টাকা—ভাউচার কই হাবুল?

হাবুল ॥ ভাউচারটি হারিয়ে ফেলেছি গজানন দা।

গজানন ॥ তা' বললে তা চলবে না হাবুল, হেড-মাস্টার ছেড়ে কথা কইবে না। বলে বসবে, পনেরো টাকার প্রতিমা বিশ টাকা ধরে দিয়েছ।

হুয়া ॥ বললেই হলো! একটা ডুপ্লিকেট ভাউচার এনে দেনা হাবুল

হাবুল ॥ অঞ্জলি না দিয়ে যাবো?

গজানন ॥ অঞ্জলি দিয়েই চলে যাস হাবুল। (হুয়াকে) মাইক এনেছিস তুই হুয়া! তিরিশ টাকার একটা রসিদ দেখছি—

হুয়া ॥ ওটা এ্যাডভান্স দেওয়া টাকার রসিদ। মাইকের ধার্য পুরোপুরি একশ, টাকা।

কানাই ॥ এক শ' টাকা! বাপ্স......

ভোলা ॥ তুই আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর তুই কি রাখিস কানাই!

হুয়া ॥ তাও ভাগ্যিস পেয়েছি—নইলে এ ইচিক দানা আর খেতে হতো না বাপধন!

গজানন ॥ হেডমাস্টারের বাজেটে দেখছি মাইকের দরুণ লেখা আছে মাত্র তিরিশ। এখন ঠেলা সামলাবে কে?

হুয়া ॥ পূজো মানেই মাইক লাইট আর লরী। এর একটাও যে বাজেটে বাদ যাবে সেটা বাজেট নয়—সে পূজো পূজোই নয়।

গজানন ॥ তা ঠিক! আমাদের নিজেদের খাতের টাকা থেকে মাইকের ও টাকাটা আমি বের করে নেব। পাড়ার আর আর স্কুলের কাছে মাথা হেঁট করতে পারবো না আমরা।

ভোলা ও হুয়া ॥ (এক সঙ্গে) গজানন রায় কি জয়, সরস্বতী মাঈ কি জয়।

হুয়া ॥ পুরুতের পাঁচটা টাকা দাও দেখি! সটান বলে দিয়েছে অঞ্জলির আগে চাই।

ভোলা ॥ ওটা দিয়ে দেওয়াই ভালো। নাহলে মন্ত্র টন্ত্রগুলো ভুল পড়বে। মা সরস্বতী যাবেন চটে। রাগটা গিয়ে পড়বে আমাদের পরীক্ষার খাতায়।

গজানন ॥ অত কথার দরকার কি!—এই নে পাঁচ টাকা (পকেট হইতে মাণিব্যাগ বাহির করিতে গিয়া দেখে মাণিব্যাগ নাই) সর্বনাশ! আমার মাণিব্যাগ!

ভোলা ॥ কেন, পকেটে নেই?

গজানন ॥ না তো! কি আশ্চর্য! পকেটেই তো রেখেছিলাম।

হুয়া ॥ এসে কি কোথাও পড়ে গেল গজানন দা?

গজানন ॥ পড়ে গেলে টের পেতাম। মাণিব্যাগটা তো রীতিমতো ভারী ছিল।—হাঁ প্রায় আড়াইশ' টাকা ছিল।

ভোলা ॥ সর্বনাশ! এখন উপায়!

গজানন ॥ আজকের পুজোর সব খরচা ছিল ওতে।

হুয়া ॥ চল কোথায় পড়লো খুঁজে দেখি।

গজানন ॥ আরে এ ঘরে যখন এসেছি তখনও আমার পকেটে ছিল মাণিব্যাগ।—হাঁ আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে।

ভোলা ॥ তবে এই ঘরেই ভাল করে খুঁজে দেখ।

[ভোলা, হুয়া এবং গজানন তিনজনেই এই ঘরে মাণিব্যাগ খুঁজিয়া দেখিল কিন্তু পাইল না।]

গজানন ॥ আশ্চর্য! আমি বলছি এই ঘরেই মাণিব্যাগ আছে এ ঘরে আমরা যখন ঢুকেছি তখনও আমার পকেটে ছিল মাণিব্যাগ। এ ঘরে এসে আর আমরা কেউ বেরুইনি

নতুন কোনো লোকও এ ঘরে আর আসেনি। আমাদের ভেতরই কারো কাছে আছে এ মাণিব্যাগ, এ আমি জোর করে বলতে পারি।

ভোলা ।। তুমি কি বলতে চাও, আমরা কেউ তুলে নিয়েছি মাণিব্যাগ ?

কানাই ।। (সক্রোধে) আমরা কেউ তোমার পকেট কেটেছি এই কথাই কি তুমি বলতে চাও গজাননদা ?

গজানন ।। চটছো কেন কানাই ? মাণিব্যাগটা যাবে কোথায়। ও মাণিব্যাগ আমাকে ফিরে পেতেই হবে, নইলে আমাদের সরস্বতী পুজো কি বন্ধ হয়ে যাবে ?

ভোলা ।। বেশ। আমাদের সার্চ করো।

হুয়া ।। কিন্তু যদি না পাও তবে তোমাকে আমরা ছেড়ে কথা কইবো না এও জেনো।

গজানন ।। বেশ তো, তাই হবে।

[গজানন উঠিয়া ভোলার কাছে গেল। ভোলা দুই হাত উঁচু করিল। গজানন তাহার জামা এবং দেহ খুঁজিয়া দেখিল, পাইল না। গজানন তখন হুয়ার সামনে গিয়া দাঁড়াইল কিন্তু তাহাকেও সার্চ করিয়া মাণিব্যাগ পাওয়া গেল না।]

গজানন ।। বেশ, এবার তোমরা আমাকে সার্চ করে দেখ।

ভোলা এবং হুয়া ।। (উভয়ে) নিশ্চয় দেখবো।

[গজানন হাত তুলিল। ভোলা এবং হুয়া এক সঙ্গে তাহাকে সার্চ করিল কিন্তু মাণিব্যাগ পাওয়া গেল না।]

ভোলা ।। নেই।

হুয়া ।। আশ্চর্য !

[ইহারা তিনজনেই এবার কানাইয়ের দিকে তাকাইল।]

গজানন ।। কানাই, এগিয়ে এসো ভাই।

কানাই ।। না।

অন্য তিনজন ।। না !

গজানন ।। 'না' বললে তো চলবে না কানাই !

কানাই ।। আমি মরিয়া হয়ে বুঝবো।

ভোলা ।। তবে সার্চে আপত্তি করছিস কেন ?

কানাই ।। চোর-ডাকাতদেরই সার্চ করা হয়। ওটা একটা মস্ত অপমান। সেটা আমি সইবো না।

গজানন ।। রাখো তোমার অপমান। আমরা জোর করে তোমাকে সার্চ করে দেখবো।

কানাই ।। আমি মরীয়া হয়ে বুঝবো।

গজানন ।। হুয়া ও ভোলাকে) ধর তো !

কানাই ।। খবর্দার।

[ছুটিয়া হাবুলের প্রবেশ]

হাবুল ।। গজানন দা, তোমার মাণিব্যাগ। (মাণিব্যাগটি সম্মুখে ধরিল)। অন্য সকলে হতবাক হইয়া হাবুলের দিকে তাকাইল।]

গজানন ।। কোথায় পেলি ?

হাবুল ।। বারান্দায়। তোমার পকেটটা বোধহয় ছেঁড়া, যা ভারী—পড়ে গিয়েছে।

[গজানন মাণিব্যাগটি লইয়া রুদ্ধশ্বাসে টাকাগুলি গণিয়া দেখিল ঠিকই আছে।]

দিদির মাথার শিয়রে বসেছিলেন অক্ষয়কুমার। অসুস্থ দিদি, দীর্ঘদিন ধরে ভুগছেন। বয়সও হয়েছে অনেক, তার উপর ভুগে ভুগে বিছানার সঙ্গে যেন একেবারে মিশে গেছেন। আজ দু'দিন হ'ল জলগ্রহণ পর্যন্ত করছেন না। বেশ বোঝা যাচ্ছে, আস্তে আস্তে জীবন প্রদীপ নিবে আসছে তাঁর।

মাথার শিয়রে বসে মায়ের মত এই দিদির কথাই ভাবছিলেন অক্ষয়কুমার, আর দেখছিলেন মৃত্যুর কালিমায় ছায়াম্লান মুখখানির দিকে। একদিন সমস্ত সংসারটাকে মাথায় করে ছিলেন এই দিদিই। তাঁর বাহুল্যের আড়ালে সংসারের যা-কিছু, জ্বালা যন্ত্রণা সব ঢেকে রেখেছিলেন। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসেন দিদি। চলে আসেন অন্য কোন কারণে নয়, একমাত্র সন্তান নয়নের মণি দশ বছরের ছেলেকে হারিয়ে। অসুখে ডাক্তার পর্যন্ত ডাকেনি শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই ছুটে গিয়েছিলেন ডাক্তার আনতে। কিন্তু ডাক্তার আসার আগেই সব শেষ হয়ে যায়! সেই থেকেই শ্বশুরবাড়ি ছাড়া দিদি। অনেক বিষয়সম্পত্তি থেকেও তিনি আর সে মুখো হননি—কোন সম্পর্কই রাখেননি শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে।

টপ টপ করে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল অক্ষয়কুমারের চোখ থেকে। পড়বি তো পড় একেবারে দিদির মুখের উপর। চমকে উঠে চোখ চাইলেন দিদি। ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'কিরে কাঁদছিস ?'

হুয়া ।। পকেটটা তোমার ছেঁড়া কিনা দেখ তো! (গজানন পকেটটা উল্টাইয়া দেখিল।)

গজানন ।। ছেঁড়াই তো! আমাকে তোরা মাপ কর ভাই। কানাই, তোর কাছে আমি ক্ষমা চাইছি। ভোগের জিনিষের চার্জ রইলি তুই আর অন্য দুই বন্ধুকে। আয়, আমরা এবার চলি। পুজো কতদূর এগুলো দেখি। (হুয়া ও ভোলার সহিত গজানন চলিয়া গেল।)

কানাই ।। নাঃ, এর পর আর এসব চলে না।

[দুই পকেটে লুকায়িত খাবারগুলি বাহির করিয়া রাখিতে লাগিল। দেখা গেল, লোভী এই ছেলেটির দুই পকেটে জড়ো হইয়াছিল কিছু আমের আচার, কিছু লেডিকেনি, কিছু রসগোল্লা ও সন্দেশ।]—দোহাই মা সরস্বতী শুনি জিভের ডগা তুমি মুখে নাকি কথা জোগাও তুমি 'মা' যে বসতু জিভদ্বারে! আমার খাবার লোভটা একটু কামড়ে দিয়ে বিদেয়টাই বাড়িয়ে দিয়ো মা! (সরস্বতীর উদ্দেশ্যে নমস্কার)।

দিদির এই কথায় আরও যেন অভিভূত হয়ে পড়লেন অক্ষয়কুমার। এক রকম কাঁদতে-কাঁদতেই বললেন 'দিদি, একবার তুমি অনুমতি দাও ডাক্তার দেখাবার। আমাদের শেষ সান্ত্বনার জন্যেও অন্ততঃ একবার বলো। আজ কবিরাজ মশাই তো বলেই গেলেন : এখন আপনারা এ্যালোপ্যাথিক করাতে পারেন।

ছেলে মারা যাবার পর থেকে নিজের জন্যে জীবনে কখনো ডাক্তার ডাকেনি দিদি। বাড়িতে ডাক্তার ডাকার কথা হলেও চটে যেতেন। এ ব্যাপারে দিদির অসম্মতি যে কেন তা সকলেই জানত। তিন বছর আগে ডাক্তার দেখাবার অভাবে ছেলে মারা যাওয়ায় ডাক্তারের উপরেই তাঁর যেন একটা বিরাগ জন্মে গিয়েছিল।

চোখের জল পুঁছছেন অক্ষয়কুমার এমন সময় হঠাৎ দিদির কথা শুনে বিস্মিত হয়ে উঠলেন। এযে দিদির কথা—না অন্য কেউ কথা বলছে। জ্বর বেশী হওয়ায় বিকারের ঘোরে নিজের মনেই যেন নিজে কথা বলছেন তিনি। চোখ বোজা অথচ কথা বলে চলেছেন। তাঁর মুখের কাছে কানটা এগিয়ে নিয়ে গেলেন অক্ষয়কুমার। দিদি বলছেন 'হ্যাঁ হ্যাঁ ডাক্তারই দেখ অক্ষয়, আমার সেই ডাক্তার ছেলেকে নিয়ে আয় রে ....সে এলেই সব সেরে যাবে। কত ডাক্তার হয়েছে যে কত আমার।' ...

নিশ্চিত বিকারের ঘোর। তবু মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে অক্ষয়কুমার জিজ্ঞেস করলেন 'কোথায় তোমার ডাক্তার ছেলে দিদি?'

চোখ বোজা অবস্থাতেই জড়িয়ে জড়িয়ে উত্তর দিলেন দিদি। রাস্তার নাম ও বাড়ির নম্বর বললেন স্পষ্ট। তারপর একটু থেমে টেনে টেনে আবার বললেন 'সময় বেশী নেই রে ... শিগ্‌গির যা ...'

কি মনে করে যে অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থাতেই উঠে পড়লেন অক্ষয়কুমার। চাদরটা কাঁধে ফেলে চটিটা পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে পড়লেন পথে। দিদি যে রাস্তার কথা বলেছিলেন সেই রাস্তায় গিয়ে ঢুকলেন। রাস্তাটি তাঁদের বাড়ি থেকে খুব বেশী দূর ছিল না কিন্তু সে রাস্তায় কোন ডাক্তার থাকে বলে মনে করতেই পারলেন না অক্ষয়কুমার। রাস্তায় ঢুকে নম্বর খুঁজে বার করলেন।

একখানি দোতলা মাঝারি ধরণের বাড়ি। নীচে একটি লোককে ঘোরাফেরা করতে দেখে অক্ষয়কুমার জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কোন ডাক্তার থাকেন কি?' উত্তরে লোকটি বললে 'হ্যাঁ উপরে উঠে যান।' পাশের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলেন অক্ষয়কুমার। গিয়ে দেখলেন একটি দরজার গায়ে ডাক্তারের নাম লেখা ডোর-প্লেট। দরজার কাছে গিয়ে ডাকতেই একজন চাকর বেরিয়ে এসে বললে, 'আপনি কাকে চান?' অক্ষয়কুমার ডাক্তারবাবুর কথা বলতেই সে তাঁকে ঘরে বসতে ব'লে ভিতরে চলে গেল। একটি চেয়ারে বসে অক্ষয়কুমার কি ক'রে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ডাক্তারের কাছে কথা পাড়বেন তাই ভাবছেন এমন সময় তাঁর চিন্তায় বাধা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন ডাক্তারবাবু। ত্রিশ একত্রিশ বছর বয়স, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলিষ্ঠ চেহারা। প্রতিভার দীপ্তিতে চোখ দুটি জ্বল্ জ্বল্ করছে। অক্ষয়কুমারকে দেখেই ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করলেন, 'বলুন, কি প্রয়োজন আপনার?'

অক্ষয়কুমার ডাক্তারের চেয়ে বয়সে অনেক বড় হলেও সংকোচের সঙ্গে বললেন 'একটি অত্যন্ত রহস্যজনক ঘটনার সূত্র ধরে আপনার সন্ধান পেয়েছি, উপস্থিত আপনি যদি দয়া করে একবার আমাদের বাড়ি যান তা'হলে বিশেষ উপকৃত হব।'

ডাক্তারবাবু মুখে মৃদু হাসির রেশ টেনে বললেন 'সমস্ত ঘটনাটা আমায় যদি না খুলে বলেন, তা'হলে কি করে বুঝব বলুন ...'

তখন অক্ষয়কুমার যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবে তাঁর দিদির ব্যাপারটা খুলে বললেন ডাক্তারের কাছে। সব বলা শেষ ক'রে অক্ষয়কুমার ডাক্তারকে আবার বললেন, 'আপনি কি দয়া করে এখুনি যাবেন একবার?'

—'নিশ্চয়ই যাব। মা'র এমন অসুখ, মা ডেকেছেন আর আমি যাব না, তা কি হয়! আপনি একটু বসুন, আমি এখুনি ব্যাগটা নিয়ে আসছি।'

দু'জনেই তাঁরা এক সঙ্গে এসে ঢুকলেন রুগীর ঘরে। ডাক্তার প্রথমেই রুগীর নাড়ীতে হাত দিয়ে বললেন, 'মা, আমি এসেছি—দেখ তো চেয়ে।'

ডাক্তার হাত ধরতেই অক্ষয়বাবুর দিদি হঠাৎ যেন চোখ মেলে চাইলেন। তারপর নিজের হাতটা আস্তে আস্তে তুলে ডাক্তারের মুখে হাত বুলোতে বুলোতে কাঁপা গলায় বললেন 'বাবা, তুই এসেছিস, এবার আমি নিশ্চিত ভাল হয়ে উঠব। ... কই মুখটা তোর দেখি একবার।' ... আর বেশী কথা বলতে পারলেন না তিনি। চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল তাঁর। ডাক্তারও কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়লেন এই ধরণের ঘটনায়।

সত্যিই কয়েক দিনের মধ্যে ডাক্তারের চিকিৎসায় ভাল হয়ে উঠলেন অক্ষয়কুমারের দিদি। তারপর অনেক দিন বেঁচে ছিলেন তিনি। কিন্তু যতদিন বেঁচেছিলেন, ডাক্তারবাবুও ওঁকে মা বলে ডাকতেন আর ঐ বৃদ্ধাও ওঁকে ভালবাসতেন নিজের ছেলের মত। মুখে বললেন এই তাঁর সেই মৃত সন্তান।

ঘটনাটি সম্পূর্ণ সত্য। এই ডাক্তার ও অক্ষয়কুমার যে কে ছিলেন তা শুনলে তোমরা আশ্চর্য হয়ে যাবে। এই ডাক্তার হচ্ছেন বিখ্যাত স্যার নীলরতন সরকার। তখন তিনি সবেমাত্র মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে বেরিয়েছেন। আর অক্ষয়কুমার হচ্ছেন বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম প্রাচীন লেখক ও সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার মৈত্র।

এই কাহিনী সম্বন্ধে পরে অক্ষয়কুমারের দিদিকে যখনই কেউ প্রশ্ন করত যে আপনি কি ক'রে ঐ রাস্তার নাম ও বাড়ির নম্বর দিলেন, উত্তরে তিনি বলতেন, 'ও আমার কিছুই মনে নেই।'

এই কাহিনী ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকারের জামাতা "প্রবাসী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মুখে শোনা।

আলপনা ইন্দিরা বিশ্বাস

প্রতিদিন সকালে রাজা হবুচন্দ্র বাহাদুর রাজসভায় বসেন বেলা দশটা-এগারোটা অবধি। বেলা এগারোটার সময় রাজা বাহাদুর স্নানাহারে যান। একদিন বেলা এগারোটার ঘণ্টা পড়লো হলো, একে একে সবাই উঠে চলে গেল, কিন্তু গবুচন্দ্র তখনও বসে আছে। রাজা বললেন—কি মন্ত্রী মশাই, বসে রইলেন যে? কিছু বলবেন?

—আপনার কাছ থেকে একটা পরামর্শ চাইছিলাম, মহারাজ।

—কি বলুন?

—ছেলেটা একেবারে বিগড়ে গেছে, আমার কথা আর শোনে না, পাড়ার যত বখাটে ছোঁড়াদের সঙ্গে মিশে একেবারে দুর্দান্ত হয়ে উঠেছে। কি করি বলুন তো?

—এ আর করার কি আছে, অতি সামান্য ব্যাপার! অন্যায়কে অঙ্কুরেই বিনাশ করুন, অন্যায় আর বেড়ে উঠতে পারবে না। ছেলের ফাঁসী দিয়ে দিন।

—ছেলের ফাঁসী দিয়ে দোব! আমার তো ওই একটা ছেলে মহারাজ!

—আমাদের শাস্ত্রে আছে, বরং মরা ছেলে ভাল, তবু দুষ্টু ছেলে ও মূর্খ ছেলে ভাল নয়। আপনার ছেলে লেখাপড়া কিছু শিখেছে? ন্যায়, ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শন, বেদ কিছু অধ্যয়ন করেছে?

—অতদূর না পড়লেও বই সে অনেক পড়েছে—প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা, বোধোদয়, আখ্যান মঞ্জরী, ধারাপাত, শুভঙ্করী, আরো অনেক বই, সব আমি নাম জানি না।

—না, ওসব বই না পড়লেও চলবে, পড়া চাই ন্যায়, দর্শন, কাব্য, ব্যাকরণ, বেদ।

—কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত পড়তে বলেছিলাম, পড়েনি।

—মূর্খ ছেলে ওসব পড়বে কি? ওর একমাত্র প্রতিকার হলো ফাঁসী দেওয়া। এমন ছেলেকে ফাঁসী দিয়ে দিন।

হবুচন্দ্র শেষ কথা বলে উঠে চলে গেলেন। গবুচন্দ্র পাকা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বাড়ী ফিরলেন। একটিমাত্র ছেলে, তার ফাঁসী দিতে মন চায় না। বাড়ীতে এসে গিন্নীকে ডেকে বললেন—মহারাজ তো বলে দিলেন ছেলের ফাঁসী দিয়ে দাও!

মন্ত্রী গিন্নি তো শুনেই চোখ কপালে তুললেন, বললেন—আঃ, বল কি? একটা ছেলে তাকে ফাঁসী দিয়ে দেবে? তুমি কি পাগল হলে নাকি? ছেলে বয়সে সবাই অমন দুষ্টু হয়, তা বলে তাকে ফাঁসী দিতে হবে? তার আগে তোমরা বরং আমার ফাঁসী দিও।

গবুচন্দ্র আর কিছু বললেন না। চুপ করে গেলেন।

পরদিন রাজসভায় যেতেই রাজা বললেন—কি হলো মন্ত্রী মশাই, ছেলের ফাঁসী দিলেন?

—না মহারাজ, গিন্নী বলেন—ওকে ফাঁসী দেবার আগে আমার ফাঁসী দাও!

হবুচন্দ্র মাথা নেড়ে বললেন—আপনার গৃহিণী সত্যই খুব বুদ্ধিমতী, তিনি নিজের উদাহরণ দিয়ে ছেলেকে শিক্ষা দিতে চান। আপনি গৃহিণীর ফাঁসী দিন, একটা ফাঁসী হলে ছেলের শিক্ষা হবে। আজই গৃহে গিয়ে আপনি গৃহিণীকে ফাঁসী যেতে বলুন, ভাল ফল হবে। মা কি না, ছেলেকে শিক্ষা দেবার জন্য উপযুক্ত কথাই বলেছেন?

গবুচন্দ্র দাড়িতে হাত বুলোন আর ভাবেন। সভা শেষ হলে বাড়ী গিয়ে বললেন—গিন্নী তুমি তো বললে ছেলেকে ফাঁসী দেবার আগে তোমাকে যেন ফাঁসী দেওয়া হয়। তা মহারাজ বললেন সেই ভাল, তুমিই আগে ফাঁসী যাও। তা থেকে ছেলের যদি কিছু শিক্ষা হয়তো হোক, না হলে পরে তারও ফাঁসী হবে।

মন্ত্রী গিন্নী তো খানিকক্ষণ থ হয়ে গেলেন তাঁর মুখে আর কথা জোগালো না। খানিক পরে বললেন—ফাঁসী দেখে ছেলে কি শিখবে?

—ভয় পাবে, ভয় পেলে শুধরে যেতে পারে।

—তাকে ভয় পাওয়াবার জন্য তো ফাঁসী যাওয়া? সে তো যে কেউ গেলে পারে। সে আমি কেন? চাকরটারও তো ফাঁসী দিলে হয়।

গবুচন্দ্র বললেন ঠিক তো, একথা আমার মাথায় আসেনি। ভয় দেখাবার জন্য যখন ফাঁসী, তখন যারই হোক ফাঁসী একটা দেওয়া হলেই হলো। তা চাকরটাকে এখনই ডেকে বলে দি।

—না না, এখন থাক, আগে কাজকর্মগুলো শেষ করুক, সন্ধেবেলা বলো।

—বেশ কথা।

গবুচন্দ্রের মনটা এবার হাল্‌কা হলো। বিকালের দিকে তিনি বাজার থেকে ভালো দড়ি কিনে আনলেন। সন্ধ্যার পর চাকরকে ডেকে বললেন—ভজা, রাজা বলেছেন তোকে ফাঁসী যেতে হবে। খোকা বকে যাচ্ছে সেজন্য তোর ফাঁসী যাওয়া দরকার।

—খোকাবাবু বকে যাচ্ছে, সেজন্য আমার ফাঁসী হবে কেন?

—খোকাবাবু তাহলে ভয় পাবে, শুধরে যাবে। নে তুই আর দ্বিমত করিসনে। আমি বাজার থেকে ভালো দড়ি কিনে এনেছি, ফাঁসী যেতে তোর একটুকু কষ্ট হবে না। দুগ্গা বলে আজ ঝুলে পড়। আমি তোর মাইনে বাড়িয়ে দোব।

—আমি মরে গেলে মাইনে কে নেবে বাবু?

—না নিস্, খাতায় জমা করে রাখবো। জমবে। এই নে দড়ি, আর কথা বাড়াস নে যা।

ভজা দড়িগাছা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

নিজের ঘরে এসে সামান্য দু-একটা জামা-কাপড় যা ছিল, পোঁটলা বাঁধলো। আজ রাত্রেই সে এখান থেকে পালাবে। মুখে আর কিছু বলার দরকার নেই।

রাত্রে পোঁটলাটা হাতে নিয়ে বেরিয়েছে, এমন সময় বারান্দায় ক্যাবলার সঙ্গে দেখা। ক্যাবলা জামা-কাপড় জুতো পরে কোথায় যেন চলেছে। ভজা বললো—এই রাতে কোথায় যাচ্ছ খোকাবাবু?

—চুপ, চুপ, আস্তে। হাটে যাত্রা হবে, যাত্রা দেখতে যাচ্ছি। বাবা জানতে পারলে যেতে দেবে না।

—বেশ, তুমি সারারাত বসে যাত্রা দেখগে, আর তোমার জন্য আমি ফাঁসী যাচ্ছি।

—তুই হাসালি ভজা, পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে নিয়ে কেউ ফাঁসী যায় নাকি? কাশী যাচ্ছিস্ বল্?

—না গো না, ফাঁসী যাচ্ছি।

ভজা গরগর করে সব কথা বলে গেল।

সব শুনে ক্যাব্‌লা হেসে বললো—আমাকে ভয় দেখানোর জন্যে একজনের ফাঁসী যাওয়া দরকার। তা বেশ, তোর দড়িটা দিয়ে যা, আমি এখনি ব্যবস্থা করছি।

—সে কি, তুমি কাউকে খুন করবে নাকি?

—মানুষ নয় রে, মানুষ নয়, বাঁদর। সে যা করার আমি ঠিক করবো এখন, তুই নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোগে যা।

দড়িগাছা নিয়ে ক্যাব্‌লা চলে গেল।

ভজা কিন্তু আর এ বাড়ীতে থাকতে ভরসা পেলে না, সেও পোঁটলা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে গবুচন্দ্র ঘুম থেকে উঠেই তো চমকে উঠলেন, ঘরের সামনে বারান্দায় তাঁর পোষা বাঁদরটা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলেছে। ভারী রাগ হলো, ভজাকে বলেছিলেন ফাঁসী যেতে, আর তার জায়গায় এই বাঁদরটা। হাঁক দিলেন—ভজা! ভজা!

ভজার বদলে এলেন গিন্নী, বললেন—ভজা কাল রাত্তিরে কখন কাপড়-জামা নিয়ে পালিয়ে গেছে।

—তাতো যাবেই। ব্যাটা আমার সঙ্গে চালাকি করে গেছে। এই বাঁদরটা ফাঁসী দিয়ে গেছে!

—ঠিকই তো করেছে। আমরা ওকে বাঁদর বলে গাল দিতুম, ও তাই একটা বাঁদরকেই ফাঁসী দিয়েছে। অন্যায় তো কিছু করেনি।

মন্ত্রী বললেন—ঠিক কথা, এটা তো আমার মাথায় আসেনি।

রাজসভায় গিয়েই গবুচন্দ্র বললেন—মহারাজ ফাঁসী হয়ে গেছে।

—কার ফাঁসী হলো?

—বাঁদরের, অর্থাৎ আমার চাকরের।

—ভালো হলো। আপনার ছেলে বেঁচে গেছে। পরে যদি সে চুরি-ডাকাতি করে তার আর সাজা হবে না। তার সাজা তো আগেই হয়ে গেল।

গবুচন্দ্র দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—আপনার বিচারের কোথাও ফাঁক নেই মহারাজ!

হবুচন্দ্র হেসে বললেন—ন্যায্য বিচার না করলে কি আর রাজ্য চালানো যায় মন্ত্রীমশাই!

এদিকে ক্যাব্‌লা বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশে শেষে একটা চোর হলো। রাজার ধনাগারে এক রাত্রে সিঁদ কেটে চুরি করতে গিয়ে ক্যাব্‌লা ধরা পড়লো। পরদিন সকালেই রাজসভায় রাজা তার বিচার করতে বসলেন, বললেন—তুমি চুরি করেছ তোমার ফাঁসী হবে।

ক্যাব্‌লা হাত জোড় করে বললো—মহারাজ, আমার একটা নিবেদন আছে।

—কি বল?

—একটা লোকের ক'বার ফাঁসী হয় মহারাজ?

—একবার।

আমার দু'বার ফাঁসী হবে কেন? আমি পাছে ভবিষ্যতে চুরি-ডাকাতি করি বলে এর আগে আমার একবার ফাঁসী হয়ে গেছে।

—সে তো তোমার বাড়ীর চাকরের ফাঁসী হয়েছে, তোমার কি?

—রামের দোষে শ্যামের ফাঁসী হয় না মহারাজ, তাহলে ন্যায়শাস্ত্র মিথ্যা হয়ে যায়। আপনি কি চান যে, হিন্দুর প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্র মিথ্যা হয়ে যাক?

—না। তা চাইব কেন?

—তাহলে আমার অপরাধে আমার বাড়ীর চাকরের ফাঁসী হলো বলে মনে করলে ন্যায়শাস্ত্র মিথ্যা হয়ে যায়, সে আমারই ফাঁসী হয়েছে বলে ধরতে হবে।

মন্ত্রী বললেন—সে একটা কথা বটে!

রাজা বললেন—বেশ, তাই না হয় ধরলাম।

—তাহলে যার একবার ফাঁসী হয়েছে, তার আর একবার ফাঁসী হতে পারে না।

কিন্তু সত্যি তো আর তোমার ফাঁসী হয়নি, দিব্যি বেঁচে আছ, চুরি করছ।

—সেই কথাই তো বলতে চাই হুজুর। আমি ফাঁসী গেলাম, বাবা আমার শ্রাদ্ধ করলেন না। শ্রাদ্ধ না করলে আমি মরে শান্তি পাই কেমন করে? তাই আমি আপনার ধনাগারে এসেছিলাম, শ্রাদ্ধের টাকাটা জোগাড় করতে। মন্ত্রীর ছেলের শ্রাদ্ধ, অনেক টাকার ব্যাপার। শ্রাদ্ধটা হয়ে গেলেই জানবেন আমি মরে গেছি।

রাজা হবুচন্দ্র মন্ত্রীর দিকে ফিরলেন—বললেন—মন্ত্রী মশাই ছেলে মারা যাবার পর শ্রাদ্ধ করেননি?

গবুচন্দ্র মাথা চুলকে বললেন—ছেলে কোথায় মহারাজ, সে তো বাঁদর।

—বাঁদর নয়, সে আপনার ছেলে। একজনের অপরাধে আরেকজনের ফাঁসী হয় না। ন্যায়শাস্ত্রের অপমান করবেন না। বলুন: সে বাঁদর নয়, আমার ছেলে।

—সে বাঁদর নয়, মহারাজ, সে আমার ছেলে।

—তার ফাঁসী যাবার পর তার শ্রাদ্ধ করেছিলেন?

—না, মহারাজ।

—আজই তার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করুন গে।

ক্যাব্‌লা বললো—কিন্তু বাবার হাতে টাকা নেই মহারাজ।

—বেশ, আমি এখনি দু'হাজার টাকা দিয়ে দিচ্ছি।

—টাকাটা আমার হাতে দিন মহারাজ, আমার শ্রাদ্ধ আমিই করে যেতে চাই।

—বেশ, খাজাঞ্চি মশাই, এখনই একে দু'হাজার টাকা দিয়ে দিন।

রাজার বিচার শেষ হলো। দুটি হাজার টাকা হাতে নিয়ে ক্যাব্‌লাকান্ত রাজসভা থেকে বেরিয়ে এলো। সেই যে বেরুলো, একেবারে সেই রাজ্যের সীমা পার হয়ে তবে সে থামলো।

গবুচন্দ্র একদিন দুঃখ করে বললেন—মহারাজ, ছেলেটা দু'হাজার টাকা হাতে পেয়ে সেই যে কোথায় চলে গেল আর কোন খবরই নেই।

হবুচন্দ্র গম্ভীরভাবে বললেন—তার তো চুরির দায়ে ফাঁসী হয়ে গেছে। আবার কিসের খবর?

গবুচন্দ্র দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলেন—তা বটে, ভুলে গিয়েছিলাম মহারাজ।

—অমন ভুলো মন হলে আপনি আর মন্ত্রিত্ব করতে পারবে না, সে আমি আগে থেকেই বলে রাখছি।

চাকরী যাবার ভয়ে গবুচন্দ্র চুপ করে দাড়িতে হাত বুলোতে লাগলেন।
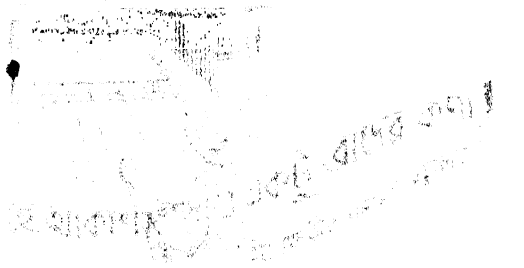
ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন। বড় বড় চওড়া চওড়া রাস্তা, আকাশ-ছোঁয়া উঁচু উঁচু বাড়ী, পথে পথে লোকের ভিড়। আলোতে, বাহারে ঝলমল করছে যেন!

একদিন এই সহরেই এসে ঢুকল একটি গরীব ছাত্র। পাড়াগাঁর ছেলে, বড় সহরে কোনদিন থাকেনি, আত্মীয়স্বজনও তেমন কেউ নেই। নিজের সমস্ত ব্যবস্থা—কলেজের খরচ, থাকবার জায়গা—সব নিজেকেই যোগাড় করে নিতে হবে।

কিন্তু গরীব হ'লেও ছেলেটি ছিল ভারী মেধাবী। আর তার জীবনের আকাঙ্ক্ষা ছিল সে হবে ডাক্তার,—মানুষের দুঃখ দূর করবার ব্রত নিয়ে জীবন সফল করবে সে। অনেক চেষ্টা-চরিত্র ক'রে শেষে ছেলেটি এক ডাক্তারী কলেজে ভর্তি হ'ল।

এবারে সমস্যা হ'ল থাকবার জায়গা নিয়ে। তার যা আর্থিক অবস্থা তাতে কোনও ভাল হস্টেলে কিংবা কোনও ভাল ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকা সম্ভব নয়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর খুব অল্প ভাড়ায় একটি ঘর পাওয়া গেল। ছেলেটি সেইখানে চলে এল।

কিন্তু ঘর দেখলে কান্না পায়। যেমন স্যাঁৎসেঁতে তেমনি অন্ধকার। কোন দিক দিয়ে এক ফোঁটা আলো আসে না ঘরে। যে সূর্য তার অফুরন্ত আলো দিয়ে সারা পৃথিবীকে ভাসিয়ে রেখেছে এ ঘরে তার প্রবেশের কোনই পথ নেই। বাঁচবার জন্যে এসে যেন বুঝি আটকে মরে সে।

ছেলেটির তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। তাকে জীবনে বড় হ'তে হবে—বড় ডাক্তারী শিখতে হবে। একটি মুহূর্ত সে নষ্ট করতে রাজী নয়। সেই অন্ধকার ঘুপচি ঘর থেকে পারতপক্ষে সে বেরোয় না। সেইখানে বসেই দিনরাত পড়াশোনা করে। সেখানেই খায় অবসরও কাটায় সেখানেই। কিংবা, সত্যি কথা বলতে অবসরের কোন বালাই রাখে না সে। পড়া—পড়া—আর পড়া! মানুষ যে হ'তেই হবে তাকে।

কিন্তু কিছুদিন পরেই তার মনে হ'ল শরীরটা যেন তেমন যুৎসই লাগছে না। ক্রমেই যেন দুর্বল হয়ে পড়ছে। কেমন যেন একটা অবসাদ আসে যখন তখন। কিসের যেন একটা অভাব বোধ করছে সে। দেখতে দেখতে শরীর তার আধখানা হয়ে গেল।

এমনি দিনে, হঠাৎ তার খেয়াল হ'ল, ছাদের দিকে যেন একটা পুরোনো স্কাই-লাইট দেখা যাচ্ছে। বহুদিন,—হয়তো বা বছর ধরে কেউ জানে না, ওটা বন্ধ করা রয়েছে। ধুলো, কালিতে স্বচ্ছ কাঁচ ঝাপসা হয়ে—কালো হয়ে তাদের দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেছে যেন।

ওটা কি একটু ফাঁক করা যায় না? পাশের বাড়ীতে মিস্ত্রীরা কাজ করছিল, সেখান থেকে একটা মই চেয়ে আনল ছেলেটি। তারপর দুর্বল দেহ টানতে টানতে সেই মই বেয়ে বহু চেষ্টায় স্কাই-লাইটটা খুলে দিল।

পরক্ষণেই এক ঝলক টাটকা রোদ ভগবানের আশীর্বাদের মত এসে লুটোপুটি খেতে লাগল ঘরের মেঝেতে।

সেইদিন থেকে যেন ফিরে গেল ঘরের চেহারা, আর সেই সঙ্গে ছেলেটিরও। অল্পদিনের মধ্যেই মনে হ'ল তার স্বাস্থ্য অনেকটা ফিরেছে,—দুর্বলতা নেই বললেই হয়।

কোন চিকিৎসাই তো করেনি ছেলেটি! ওষুধপত্রের পয়সাই বা পাবে কোথায়? খাওয়া-দাওয়াও যেমন ছিল তেমনি চলছে। তবে শরীর ভাল হচ্ছে কি ক'রে? তবে কি ঐ স্কাই-লাইট দিয়ে আসা রোদটুকুই এই অসম্ভব কান্ড ঘটিয়েছে?

ডাক্তারী কলেজের ছাত্র, সুতরাং স্বভাবতঃই এবিষয়ে কৌতুহল হ'ল ছেলেটির। সে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের ওপর সূর্য কিরণের প্রভাব নিয়েও পরীক্ষা সুরু ক'রে দিল। —যাকে বলে গবেষণা।

পাওয়া গেল আশ্চর্য ফল। ছেলেটি বুঝল—মানুষের স্বাস্থ্যশ্রী ফেরবার পক্ষে টাটকা রোদের প্রয়োজন বড় কম নয় এবং, কোন কোন অসুখে, এর মত প্রতিষেধক আর কিছু নেই।

এই ছেলেটিই পরবর্তী জীবনে সূর্যালোক চিকিৎসার প্রণালী আবিষ্কার করে এবং তার প্রয়োগ ক'রে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিল। ডাক্তার ফিনসেনের নাম শুনেছ কি? এই ছেলেটিই সেই বিখ্যাত ডাক্তার ফিনসেন।

ডাক্তার ফিনসেনের পরেও সূর্যালোক চিকিৎসা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। এর মধ্যে ডাক্তার রোলিয়ারের নাম করা যেতে পারে। রোলিয়ার এই প্রণালীতে যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা করে আশ্চর্য সুফল পান। ও রোগে, তাঁর মতে, এর চেয়ে ভাল চিকিৎসা আর হয় না। তাঁর কথা তিনি হাতে-নাতে পরীক্ষা করেও দেখিয়েছেন। সুইট্জারল্যাণ্ডে—যেখানে পাহাড়ের ওপর বিশুদ্ধ সূর্যকিরণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়—সেখানে যক্ষ্মাবাস বা স্যানিটোরিয়াম তৈরী ক'রে তিনি কত লোককে যে এই দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে নিরাময় করেছেন তার ঠিক নেই। তাঁর দেখাদেখি ও অঞ্চলে আরও বহু যক্ষ্মা-স্যানিটোরিয়াম্ তৈরী হয়েছে। শুধু ওখানে নয়, পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায়ও হয়েছে। যক্ষ্মার মত কুষ্ঠরোগেও আশ্চর্য ফল পাওয়া গেছে সূর্যালোক-চিকিৎসা ক'রে। অন্য অসুখেও। আজও প্রতি বছর বহুলোক সুইট্জারল্যাণ্ডে গিয়ে খালি গায়ে সূর্যকিরণ লাগিয়ে শরীর সারায়। একে বলা হয় 'সান বাথ' বা 'রৌদ্র স্নান'।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন সূর্যের কিরণ দেখতে সাদা হ'লেও আসলে নানা রঙের আলোক-রশ্মি দিয়ে তৈরী। এর সবগুলো আমাদের চোখে ধরা পড়ে না—কেবল পর পর সাতটা রং (যা আছে রামধনুতে) আমরা দেখতে পাই। ঐ সাত রংএর একদিকে বেগুনী আলোর পাশে আছে 'অতি-বেগুনী' বা 'আলট্রা-ভায়োলেট' রশ্মি। আর এই আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মিই হচ্ছে আমাদের শরীরের পক্ষে পরম প্রয়োজনীয়। আমাদের শরীরে ক্যালসিয়াম্, ফস্ফরাস্, লোহা, রক্তের হিমোগ্লোবিন্ (এর মধ্যেও লোহা আছে) বাড়াতে এর জুড়ি নেই। তাছাড়া এর সাহায্যে আমরা পাই ভিটামিন-ডি—যা নাকি হাড়ের বৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক এবং যার অভাবে হয় 'রিকেট' রোগ। যে সব জায়গায় স্বাভাবিক সূর্যকিরণ পাওয়া কঠিন সেখানে ডাক্তারেরা কৃত্রিম আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি প্রয়োগ করে সুফল পেয়েছেন। ●

আমাদের দেশেও কিন্তু সূর্যালোকের এই রোগ-প্রতিষেধক গুণের কথা বহুদিন থেকেই জানা ছিল।—সেই পৌরাণিক যুগ থেকেই বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণের ছেলে শাম্ব'র গল্প হয়তো তোমরা শুনেছ। শাম্বর হয়েছিল কুষ্ঠব্যাধি। তখন তাঁকে পরামর্শ দেওয়া হ'ল সূর্যের আরাধনা করতে। শাম্ব তাই-ই করলেন এবং ঐ সূর্যের আরাধনা করেই তাঁর কুষ্ঠ একদম সেরে গেল। সূর্য প্রণামের যে মন্ত্র তাতেও সূর্যের এই সব গুণের কথা আছে। তাতে বলা হয়েছে—সূর্য হচ্ছেন মহাদ্যুতি ধ্বান্তারি অর্থাৎ অন্ধকারের শত্রু এবং সর্বপাপঘ্ন—অর্থাৎ তিনি সমস্ত পাপ ধ্বংস করেন। রোগও যে একটা বড় পাপ তাতে আর সন্দেহ কি?

এক সময় আমাদের দেশে নানা জায়গায় বড় বড় সূর্যমন্দির প্রতিষ্ঠা করা হ'ত। অনেকের ধারণা এবং উদ্দেশ্য ছিল ঐ সূর্য-কিরণ সেবন। কারণ, দেখা যায়, মন্দিরগুলি এমন সব জায়গায় তৈরী হ'ত যেখানে বিশুদ্ধ সূর্যালোক প্রচুর পরিমাণে বর্ষিত হয়। তোমরা পুরীর কাছে সমুদ্রতীরে কোণারকের (কোণার্ক) বিখ্যাত সূর্য মন্দিরের কথা বোধ হয় সকলেই জান। কাশ্মীরেও মার্টন ব'লে একটা জায়গায় ঐ রকম একটি অতিকায় ভাঙ্গা সূর্যমন্দির (মার্তণ্ড-মন্দির) আমি দেখেছিলাম। উঁচু পাহাড়ের গায়ে বিরাট চত্বরের ওপর কালো পাথরে তৈরী বিশালকায় মন্দির। চারপাশে, যেদিকে তাকানো যায় চোখে পড়ে সাদা বরফের চূড়া মাথায় ধাপে ধাপে উঠে গেছে হিমালয়ের শৈলশিখর—একটার পর একটা। নীচে—বহু নীচে এঁকে-বেঁকে বয়ে চলেছে পাহাড়ী নদী ঝিলাম। সে দৃশ্য আমি জীবনে ভুলব না। সূর্যালোকের এমন অফুরন্ত ধারাবর্ষণ সচরাচর দেখা যায় না।

আয়ুর্বেদেও সূর্যকিরণকে যক্ষ্মা, কুষ্ঠ প্রভৃতি মারাত্মক মারাত্মক রোগের অব্যর্থ প্রতিষেধক ব'লে বলা হয়েছে। স্নানের আগে রোদে বসে অনেকক্ষণ গায়ে তেল মালিশ করার যে নিয়ম আমাদের দেশে আগে দেখতে পাওয়া যেত তারও কারণটা যে এই তা বুঝতে কষ্ট হয় না। পালোয়ানরা এখনও এ ব্যাপারটাকে নিত্যনৈমিত্তিক কাজ বলে মনে করেন। আর ছোট ছেলেদের তেল মাখিয়ে রোদে শুইয়ে দেবার কথা কে না জানে?

সব সূর্যকিরণেই কিন্তু এই রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা থাকে না। কারণ, আগেই বলেছি, সূর্যালোকের এ গুণ আসে তার আলট্রা-ভায়োলেট্ রশ্মি থেকে। ভোর বেলার রোদে এই অলট্রা-ভায়োলেট্ রশ্মি বেশী থাকে, বেলা হ'লে কমে যায়। তা ছাড়া, বাতাস নির্মল না হ'লে তার ভিতর দিয়ে এ রশ্মি আসতে পারে না। ধোঁয়া, ধুলো, এমনকি কাঁচের সার্সির ভিতর দিয়েও এর যাবার ক্ষমতা নেই। এই জন্যই উঁচু পাহাড়ের ওপর বা সমুদ্রের ধারে পরিষ্কার বাতাসে ভোর বেলা বেড়াবার পরামর্শ দেন ডাক্তাররা। পল্লীগ্রামের বাতাস পরিষ্কার বলে সেখানকার মাঠেও এ জিনিসের অভাব নেই। সহরে এ জিনিস পেতে হ'লে কল-কারখানা বা ঘিঞ্জি জায়গা ছেড়ে খোলা ময়দানে চলে আসতে হবে ভোর বেলা। তাতে অবশ্য অন্য আনন্দও পাওয়া যাবে প্রচুর।
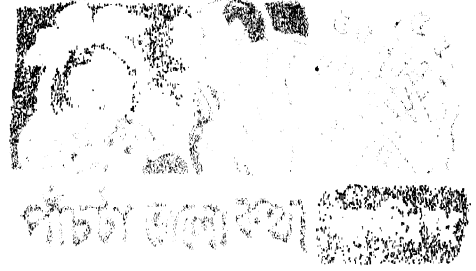
পাঁচন খেতে পাঁচের মতো মুখটা ব্যাজার করো,
পাঁচকড়ি তো আনন্দেতে সবটা দিল সাবড়ে।
ভোর পাঁচটায় বিছনা ছেড়ে উঠতে যখন বলি
তখন কেন প্যাঁচার মতো আঁৎকে ওঠ ঘাবড়ে?
পাঁচমেশালী আনাজ দিয়ে রাঁধেন পাঁচিপিসি
সবাই বলে মধুর, আহা, পঞ্চ সে ব্যঞ্জন।
শ্রাদ্ধ-পুজো হয় কখনও পঞ্চগব্য ছাড়া?
সবার সেরা দেবতা জেনো শিব সে পঞ্চানন।
তাই তো বলি পাঁচটা ভালো, পঞ্চ সবার সেরা,
আঙুল দেখ পাঁচটা করে সবার পায়ে হাতে—
কলম ধরা তাইতো এমন সহজ হলো জানি
পাঁচ-আঙুলে পায়ের জোরেই চলছি দিনে রাতে।
পঞ্চবটীর কাননেতেই ছিলেন রাম ও সীতা
পঞ্চভূতে মিশেই এমন বিশ্ব রমণীয়!
অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী
পঞ্চকন্যা নামেই তাঁরা আজও স্মরণীয়।
কুরুক্ষেত্র প্রভাস গয়া পুষ্কর ও গঙ্গা
পঞ্চতীর্থ এই ভারতের বলেন মুনিঋষি।
পঞ্চরত্ন থাকলে তোমার আর কী তুমি চাও?
পঞ্চরত্নের চূর্ণ ক'রে দাঁতে লাগাও মিশি!
পাঁচটি বামুন, পাঁচটি কায়েত, আনেন আদিশূর
কুলীন বলেই আমরা সব কান্যকুব্জ থেকে—
তাই তো বলি পাঁচটা ভালো, পঞ্চ সবার সেরা,
পাঁচ রকমের পাঁচটা জিনিস দেখে সবাই শেখে।
চৌ-এন্‌লাই তাইতো গাহেন পঞ্চশীলের জয়
মোদের পরিকল্পনা তার পাঁচ বছরের আয়ু।
পঞ্চনদের তীরে তীরেই আর্য মানুষ যত
ছড়িয়ে গেলেন সবার প্রথম সুসভ্যতার বায়ু।
তাই তো বলি পাঁচটা ভালো, পঞ্চ সবার সেরা,
রাঁধুনি যে গাইবে দেখো পাঁচফোড়নের জয়।
পঞ্চমুখে করব সুনাম আমরা পঞ্চজনা
সত্যি যদি দূর ক'রে দাও পাঁচন গেলার ভয়।

পাখী-পাখী খেলা

জহর ঘোষ

এক বুড়ো সেপাই ছুটি নিয়ে বাড়ী চলেছে। আর পায়ে পড়েছে ফোস্কা আর খিদেও পেয়েছে। এক গাঁয়ে এসে সে প্রথম কুঁড়েটির দরজায় দিল ঘা।

সে জিগ্যেস করলো, 'ভেতরে আসতে পারি কি?'

এক বুড়ী দরজাটি খুললো।

সে বললে, 'ভেতরে এস, সেপাই।'

'তোমার খাবার কিছু আছে, গিন্নী?'

বুড়ীর প্রত্যেক জিনিষই ছিল প্রচুর, কিন্তু সে বেজায় কঞ্জুস ছিল আর তাই সে গরীব এমনি ভান করতো।

'আহা, বাছা, গতকাল থেকে আমি নিজেই কিছু খেতে পাইনি।'

সেপাই বললে, 'তা যদি তোমার না থাকে তো খাবে না।'

ঠিক তখনই তার নজরে পড়লো বেঞ্চখানার তলায় একখানা কুড়ুল পড়ে আছে। তার বাঁট নেই।

সেপাইটি বললে, 'যদি আর কিছু না থাকে, একখানা কুড়ুল দিয়েই হালুয়া করাযেতে পারে।'

বুড়ী সেপাইয়ের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলো।

'কুড়ুল দিয়ে হালুয়া?'

'হাঁ, হাঁ, তুমি কেবল আমাকে একটা পাত্র দাও।'

তাই বুড়ী একটা পাত্র আনলো।

সেপাইটি কুড়ুলখানা ধুলো, পাত্রটির মধ্যে রাখলো তার মধ্যে কিছু জল ঢাললো এবং সেটা দিল আগুনে চড়িয়ে।

বুড়ীর চোখ দুটো মাথা থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসে আর কি।

সেপাই একখানা চামচ বার করলো এবং সুরুয়াটুকু নাড়তে আরম্ভ করলো। তারপর সে তা চাখলো।

সে বললে, 'এখনই তৈরি হয়ে যাবে। দুঃখের কথা যে আমার কাছে একটুও নুন নেই।'

বুড়ী বললে, 'আমার কাছে খানিকটা আছে। এই যে, ওতে নুন দাও।'

সেপাইটি তাতে নুন দিল এবং আবার চাখলো।

সে বললে, 'এক মুঠো সুজী হলেই ঠিক হতো।'

বুড়ী ভাঁড়ারের খোপ থেকে সুজীর একটি ছোট ঠোঙা আনলো

'এই নাও, ওর সঙ্গে ঠিক মতো মিশিয়ে ঘন কর।'

সেপাই সিদ্ধ করছে তো করছেই আর খাবারটি নাড়ছে।

তারপর সে আবার তা চাখলো।

বুড়ী তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না।

সেপাই বললে, 'খাসা হালুয়া। যদি একটু মাখন পাওয়া যেত তাহলে হতো ঠিক জিনিষ।'

বুড়ী খানিকটা মাখনও জোগাড় করলো।

তারা হালুয়ায় মাখন মিশালো।

'একখানা চামচ আন, গিন্নী।'

তারপর তারা হালুয়া খেতে শুরু করলো। খাদ্যটির সুখ্যাতি মুখে আর ধরে না।

বুড়ী অবাক হয়ে বললে, 'আরে, আমি কখন ভাবিইনি যে কেউ কুড়ুল দিয়ে এমন সুস্বাদু হালুয়া তৈরি করতে পারে।'

সেপাইটি খেয়েই যেতে লাগলো আর হাসতে লাগলো মনে মনে। *

* রুশীয় লোককথা।

এই রূপকথাটি অতি প্রাচীনকালের কাহিনী। এক যে ছিলো জেলে তার ছিলো এক জেলেনী। স্বামী আর স্ত্রী মিলে ছোট্ট তাদের সংসার। তারা ছিলো খুবই গরীব। যার ফলে, পৃথিবীতে আপনার জন বলতে কেউই তাদের ছিলো না। পাহাড় ঘেরা সমুদ্র তীরের ছোট্ট এক কুঁড়ে ঘরে থাকতো তারা স্বামী আর স্ত্রীতে। একমাত্র দুর্যোগের দিন ছাড়া সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত জেলেটি সমুদ্রের পাড়ে ঘুরে ঘুরে মাছ ধরতো---আর যা পেতো, তা সহরে গিয়ে বিক্রি ক'রে সেই পয়সাতেই সুখে-দুঃখে সে তার সংসার চালাতো।

একদিনের একটি ঘটনা। জেলে তো সকালে গেছে মাছ ধরতে। এমনি, প্রায় রোজই সে যায়। সকালে বেরোয় আর দুপুরেই ঘরে ফিরে আসে। সেদিন কিন্তু, সকাল থেকে দুপুর—দুপুর থেকে বিকেল গড়িয়ে গেলো— জালে তার একটি মাছও ধরা পড়লো না। জেলের মনে তো দুঃখের আর সীমা নেই। সারাদিন জাল ফেলে ফেলে শরীর তার হয়ে পড়েছিলো খুবই ক্লান্ত---তাই, মনে মনে সে ঠিক করলো—শেষবারের মত এইবারই সে তার জাল ফেলবে—এতে মাছ কিছু উঠুক আর নাই উঠুক, সে বাড়ী ফিরে যাবে। শেষবারের মত জাল ফেলে, সে যখন তা টেনে তুললো---তখন দেখা গেলো চকচকে সোনালী রঙের মত খুব ছোট্ট একটা মাছ তার জালে আটকা পড়েছে। এইটুকু মাছ দিয়ে কি-ই বা আর করবে সে? তাই ভাবছিলো, সমুদ্রের জলেই সে ছেড়ে দেবে ঐ সোনালী মাছটাকে। কিন্তু, যেই সে মাছটাকে ধরতে গেছে---অমনি সেই ছোট্ট সোনালী মাছটা মিনতির সুরে ব'লে উঠলো--

জেলে ভাই জেলে ভাই
নিও না মোর প্রাণ,
আমার কাছে চাইবে যে বর,
করবো সে বর দান।'

মাছের মুখে মানুষের মত মিষ্টি ছড়া শুনে জেলে তো অবাক! বিস্ময়ে সে খুবই অবাক হ'লো বটে— কিন্তু, যখন তার বর

দিবার কথাটি মনে হ'লো, তখন না হেসে সে আর থাকতে পারলে না। এই পচুকে মাছটা বলে কিনা—'যে বর তুমি চাইবে— সে বরই তোমাকে দেবো। সোনালী মাছটা কি ক'রে যেন জেলের মনের কথা বুঝতে পেরে, ছড়া কেটে ব'লে উঠলো,—

আমার কথা শুনে তোমার
হ'চ্ছে না প্রত্যয়?
এতল্লাটে সবাই রাখে
আমার পরিচয়।

বন্ধু, আমাকে ছেড়ে দিলে তোমার কল্যাণই হ'বে দেখে নিও। জেলে আর কোন কথা না ব'লেই, সোনালী মাছটাকে নীল-সাগরের গভীর জলে সযত্নে ছেড়ে দিলো। জলে ছাড়া পেয়ে সংগে সংগেই তিড়িক ক'রে এক ডুবে গভীর জলের নীচে নেমে গেলো সোনালী মাছটা। ব্যাপার দেখে, জেলে তো কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইলো সবিস্ময়ে! হঠাৎ সোনালী মাছটা আবার ভেসে উঠে জেলেকে ডেকে ব'ললো,—বন্ধু, তুমি আমার জীবন দান দিয়েছে—তোমার কোন প্রয়োজন হ'লেই এখানে এসে এই ছড়াগুলো ব'লে আমায় ডকবে,—

'নীল সাগরের জলে
সোনার যে মাছ চলে
তীরের কাছে এসে
ওঠতো ভাই ভেসে'

তবেই আমার দেখা পাবে—আর তোমার প্রয়োজন মত আমি তোমাকে সাহায্য করবো। একথা ব'লেই, সোনালী মাছটা নীল সাগরের গভীর জলে আবার নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেলো।

জেলেটি খেতে বসেছিলো। জেলেনীর সংগে কথায় কথায় সোনালী মাছের ঘটনাটি ব'লে ফেললো—শুনে, জেলেনী তো তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে চেঁচিয়ে বললো—তোমার মত অমন বোকা কেউ আছে এ সংসারে? সেধে সেধে অমন বর দিতে চাইলো—আর তুমি কি না কোন বরই চাইলে না—চালে এলে? যাদের, আজ কিছু জোটে তো কাল জোটে না—কাল জোটে তো পরশু জোটে না—সংসারে যাদের এই হাল! আমি তোমাকে ব'লে রাখলুম, কাল সকালে গিয়েই তাকে ডেকে এনে বর চাইবে। নাহলে, আমাদের খাওয়া-পরার অভাব মিটিয়ে দাও বুঝলে, তো? জেলেনীর বকুনী খেয়ে জেলের মনে ভারী দুঃখ হ'লো—পরের কাছে কিছু চাইতে তার কেমন লজ্জা লাগে যে। কিন্তু, কি আর করবে সে? জেলেনীর মুখের ভয়ে পরের দিন সকালেই সে আবার তার জাল নিয়ে বেরুলো। সাগরের তীরে এসে সোনালী মাছকে সে ছড়া কেটে ডাক দিলে,—

'নীল সাগরের জলে
সোনার যে মাছ চলে
তীরের কাছে এসে
ওঠতো ভাই ভেসে'

সংগে সংগে চারদিক আলো ক'রে সোনালী মাছ তো এসে হাজির! কি চাই বন্ধু, তোমার? লজ্জায় কিন্তু, জেলে তার স্ত্রীর কথা মত কিছুই চাইতে পারলো না, সোনালী মাছের কাছে চুপ করেই রইলো শুধু। সোনালী মাছ হেসে ব'ললো, আমি বুঝতে পেরেছি বন্ধু,—তুমি ঘরে ফি'রে যাও, আজ থেকে তোমাদের কোন অভাবই থাকবে না জেনো—আমার বর যে মিথ্যে নয়—এখন বাড়ী গেলেই তার প্রমাণ পাবে।

জেলে আর জেলেনীর আজ-কাল কিন্তু কোন অভাব নেই। দিন তাদের সুখেই যাচ্ছিলো—জেলে তো এতেই খুব খুশী—'জেলেনীর কিন্তু আশা-আকাঙ্ক্ষা আর লোভ দিন দিন বেড়েই চ'লেছে। তার কোন কিছুর প্রয়োজন হ'লেই স্বামীকে ব'কে-ঝ'কে পাঠিয়ে দেয় সোনালী মাছের কাছে বর চাইতে। আর বর চাওয়ার সংগে সংগেই পূরণ হয় জেলেনীর যত আশা আর আকাঙ্ক্ষার। দিন যায় একদিন জেলেনী স্বামীকে তার বললো দেখ আমার আর তেমন বেশী কিছু সাধ নেই—তুমি সোনালী মাছের কাছে এবার একটি শুধু বর চাইবে—যাতে আমি পৃথিবীর সেরা সুন্দরী রাণী হ'তে পারি—আর তার সংগে সংগে আমাদের এই বাড়ীখানা হ'বে পৃথিবীর সেরা মনোরম রাজপ্রাসাদ। জেলেনীর কথা শুনে জেলে তার মুখখানাকে ম্লান ক'রে ব'ললো,—কি প্রয়োজন এ সবের-বেশ তো আমরা সুখে আছি। কে শোনে, কার কথা? জেলেনীর জেদ! বাধ্য হ'য়েই সে গিয়ে সোনালী মাছের কাছে জেলেনীর মনের মত বর চাইলো—সংগে সংগে জেলের বাড়ী পরিণত হ'লো বিরাট এক মনোরম রাজপ্রাসাদে—আর জেলেনী হ'য়ে গেলো পৃথিবীর সেরা সুন্দরী এক রাণী।

জেলের বাড়ী এখন আর জেলের বাড়ী নেই বিরাট এক মনোরম রাজপ্রাসাদ-জেলেনীও আর সেই জেলেনী নেই—পৃথিবীর সেরা সুন্দরী এক রাণী। পাইক-বরকন্দাজ, আমলা-কর্মচারী, দাস-দাসী পরিবেষ্টিত এই প্রাসাদপুরী। দেশ-বিদেশের রাজ-রাজরারা এখন এখানে যাওয়া আসা করেন। রাণীর আদর-অপ্যায়ন পেয়ে তাঁরা শত মুখে রাণীর গুনগান ক'রে যান। তাই, বারো মাস নিত্য দিনই লেগে রয়েছে এই উৎসব আর হৈ-হুল্লোড়!

রাজপ্রাসাদে আর যারই প্রবেশ অধিকার থাকুক না কেন—জেলের কিন্তু, সেই অধিকার ছিলো না। জেলেনীর জন্যে বর চেয়ে তাকে সুন্দরী রাণী ক'রে দিয়েছে বটে, কিন্তু নিজের জন্যে তো সে আর কোন বর চেয়ে নেয়নি? তাই সে যেই জেলে সেই জেলেই র'য়ে গিয়েছে। কাজেই, রাণীর প্রাসাদে জেলে ঢুকবে কি ক'রে? ভবিষ্যতে সোনালী মাছের কাছে বর চাইতে হবে ব'লেই সে শুধু জেলেকে প্রাসাদের বাইরের এক আস্তানায় থাকতে দিয়েছে—নইলে, অনেক অনেক আগেই তাকে বিদেয় ক'রে দিতো রাণী। জেলে কিন্তু, তার স্ত্রীকে খুবই ভালবাসতো—তাই, সব অন্যায় আব্দারই সে ক'রে থাকুক না কেন,—সে তা রক্ষা ক'রে এসেছে। রাণীর দিনগুলো যখন আমোদ-আহ্লাদ ও হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে কাটছিলো তখন জেলের দিনগুলো যাচ্ছিলো বেদনা এবং অশান্তির মধ্য দিয়ে।

একদিনের ঘটনা। রাণী এসে জেলের কাছে হাজির হ'য়ে ব'ললো, সোনালী মাছের কাছে আমার জন্যে আর একটি মাত্র বর চেয়ে আনতে হব। এই বরই আমার শেষ আকাঙ্ক্ষার বর আর কোন দিনই এর জন্যে তোমাকে কষ্ট পেতে হবে না বুঝলে? বিষণ্ণ জেলে ম্লান মুখে জিজ্ঞাসা করলো, এবারে তার কি বর চাই? রাণী একটু দম নিয়ে ইতস্ততঃ ক'রে বল'লো, পৃথিবীর মধ্যে সুন্দর এবং শ্রেষ্ঠ যে রাজা তাঁর সংগে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে হ'বে—আমি তাঁর সংগেই করবো আমার খাঁটি বন্ধুত্ব! রাণীর কথা শুনে জেলের মুখখানি হ'য়ে গেলো মড়ার মতই ফ্যাকাসে। কিন্তু, কোনই প্রতিবাদ না ক'রে নীরবেই সে তার জালখানাকে কাঁধে ফেলে সটান বেরিয়ে পড়লো সমুদ্রের দিকে—যেখানে গেলে সোনালী মাছের দেখা মিলবে।

সকাল গড়িয়ে দুপুর এলো—দুপুর গড়িয়ে বিকেল এলো—সেই বিকেলও যে গড়িয়ে চললো সন্ধ্যার দিকে—সে খেয়াল কিন্তু, হারিয়ে ফেলেছে জেলেটি—সে সমুদ্র তীরে গালে হাত দিয়ে ব'সে অন্যমনস্ক হয়ে শুধু ভাবছে আর ভাবছে। হঠাৎ, যখন তার খেয়াল

হ'লো—তখন সন্ধ্যে প্রায় হয় হয়। ধড়মড় ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে, উচ্চ কণ্ঠে ছড়া কেটে ডেকে সেই সোনালী মাছটাকে,—

'নীল সাগরের জলে
সোনার যে মাছ চলে
তীরের কাছে এসে
ওঠতো ভাই ভেসে।

সঙ্গে সঙ্গে আবার তেমনি চারদিক আলো ক'রে সোনালী মাছ জেলে বন্ধুর ডাকে এসে হাজির! বন্ধু কি চাই তোমার? একি! তোমাকে এমন শুকনো, মনমরা দেখাচ্ছে কেন? কি চাই তোমার ব'লো, বন্ধু? জেলে লজ্জিত এবং ব্যথিত কণ্ঠে ব'ললো, আমার স্ত্রী শেষবারের মত একটা বর তোমার কাছে চেয়ে পাঠিয়েছে। এ বর পেলে, সে কোন বরই জীবনে আর চাইবে না। সোনালী মাছ হেসে ব'ললো, বেশ তো, বন্ধু—কি বর তোমার স্ত্রী চেয়েছেন বলো। কি বর, সে কথা ব'লতে গিয়ে জেলের মুখে কয়েকবার আটকে গেল—সে আর ব'লতে পারলে না—লজ্জা ও বেদনায় মাথা নীচু করে রইলো। জেলের অবস্থা দেখে, সোনালী মাছ ব'ললো, বন্ধু, তোমার স্ত্রী যা চাইছেন, তাতে যদি তোমার মন সায় দেয়—তবেই সেই বর পূর্ণ হবে—নয় তো সে প্রার্থনা তার পূর্ণ হবার নয়। এখন বলো, বন্ধু—কি বর তোমার চাই? জেলেটি করুণ দৃষ্টিতে সোনালী মাছের মুখের পানে তাকিয়ে মিনতি ভরা কণ্ঠে ব'ললো, আচ্ছা, বর দিয়ে তুমি আবার আমাদের আগের মত গরীব জেলে জেলেনী ক'রে দিতে পার না, বন্ধু? তোমার এই কামনাই পূর্ণ হবে ভাই। তবে, তোমার মত নির্লোভী সৎ লোককে আমি আর দারিদ্র্য ফিরিয়ে দিতে পারবো না—তোমরা স্বামী-স্ত্রীতে ঐ কুঁড়ে ঘরে থেকেই সারা জীবন সুখে কাল কাটাতে পারবে। ব'লেই, সোনালী মাছটি চোখের পলকে নীল সাগরের গভীর জলে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

বাড়ী ফিরেই জেলে দেখতে পেলো, তার স্ত্রী কুঁড়ে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে উদ্বেগে তার জন্যেই অপেক্ষা করছে। স্বামী কাছে আসতেই অভিযোগ ক'রে ব'ললো, সারাদিন নাওয়া নেই খাওয়া নেই, কোথায় ছিলে শুনি? তুমি এমনি আর একদিনও করেছো কি আমি মাথা খুঁড়ে মরবো, দেখে নিও। এই বিরাট পরিবর্তন দেখে

(শেষাংশ ১৮০ পৃষ্ঠায়)

শোন—শোন দাদা গো
মন দুঃখে গান গাই
সারে গামা পাধা গো—
গাছে ছিল টুস্ টুস্ পাকা পাকা আমড়া
যেন মোরে ডেকে কয়—"উঠে এসে কামড়া"।—

জানতো কে তায় এত বাধা গো
শোন শোন দাদা গো—
আমড়ায় চার পাশে মুখ করে গোমড়া
বসেছিস্ ও'ৎ পেতে বোলতা ও ভোমরা
দেখিনি তা আমি এক হাঁদা গো।
শোন—শোন দাদা গো—
কি যে হল তারপর খেতে গিয়ে আমড়া
ভোমরার কামড়েতে ফুটো হ'ল চামড়া—

পড়ি যেন বামুনের ছাঁদা গো
শোন্ শোন্ দাদা গো—
চিৎপাত পড়ে থাকি ছোটে কাল ঘামরা
কাকা এসে কান ধরে বলেঃ তুই দামড়া—
পাজী ছুঁচো গাধা গো—
দাদা গো—দাদা গো—!
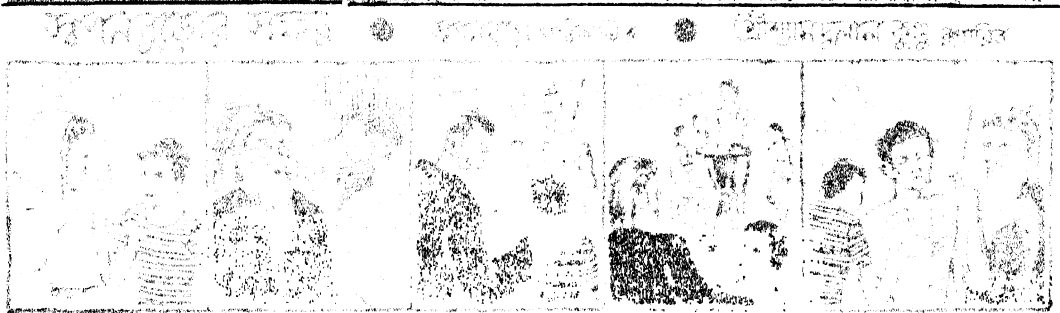
"পুজোর দিনের পার্বণী দিই
ছোট্ট যে এই সিকি"
মা হেসে কন "ভালো কাজে
খরচ করো দিকি!"

স্বপনবুড়ো রাত দুপুরে
কয়, "সফরে যাই।"
শুনে খোকা লাফিয়ে ওঠে
চিন্তা ত' আর নাই।

"লাটিম, বেলুন খেলনা কিনে
করবে খরচ সিকি?"
খোকন বলে, দেখ্‌ব আমি
আর পাওয়া যায় কী কী।

"পুজোর দিনের কোন উপহার
খোকন সোনা নেবে?"
বল্‌ছে খোকা, "স্বপনবুড়ো
দেখ্‌ছি আমি ভেবে।"

হঠাৎ দেখি খোকন সোনা
অন্ধেরে দেয় সিকি—
স্বপনবুড়ো বল্লে, "এবার
কাজ করেছ ঠিকই।"
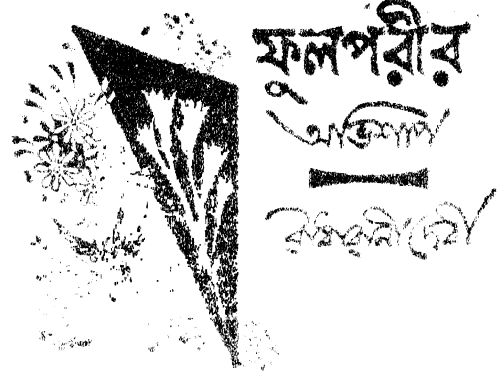
সিংহগড়ের দুর্গ রচনা তখনো হয়নি শেষ,
মদগর্বেতে ভ্রমিছে শিবাজী জয় করি নানা দেশ।
অশ্ব পৃষ্ঠে চলিয়াছে বীর,
পরি রাজবেশ উন্নত শির,
কে কোথায় কাজ কতটুকু করি গঠনে অগ্রসর,—
হেরিতে হেরিতে হর্ষ বিভোল মরাঠা অধীশ্বর।
গেছে শৈশব, গেছে কৈশোর স্বপ্ন সাধনা লয়ে,
ব্যথা বেদনায় সহিষ্ণুতায়, শত লাঞ্ছনা সয়ে,
যৌবনে লভি ধৈর্য দৃঢ়তা,
দুঃখের সাথে করি মিত্রতা
স্থাপিয়াছে সে যে বিশাল রাজ্য আপনার বাহু বলে,
তাহারি অন্নে পালিত সকলে—মহান সে মহীতলে।
ভাবিতে ভাবিতে দুর্গ শীর্ষে দাঁড়ায়ে শিবাজী কহে—
'মোর করুণায় লক্ষ প্রাণীর প্রাণ ধারা নিতি বহে,
এদের কর্ম চেতনার মূলে
আমি জাগ্রত,—কোন দিন ভুলে
ভেবেছে কি কেহ? না রহিলে আমি,—মরি ত যে অনাহারে,
জীবন-জীবিকা নির্বাহ তরে এরা রহে মোর দ্বারে।'
সন্ধ্যা তখন সমাগত প্রায়। গোধূলির আলো মেখে
ফিরিছে শিবাজী সিংহগড়ের দুর্গের চূড়া থেকে
দাঁড়ালেন পথে রামদাস স্বামী,
তুরগ পৃষ্ঠ হোতে বীর নামি
প্রণত হইয়া কহিল—'গুরুজি! হেথা দিবে দর্শন
কহিলে না কেন পূর্বে আমারে? করিতাম আয়োজন।
'—এ পথে কঠিন পাষাণ খণ্ড উপল সংখ্যাতীত,
তোমার রাতুল চরণে বিদ্ধ হোতে পারে,—তাই ভীত!
শিবিকা ব্যতীত কেমনে তোমারে
যেতে দিব প্রভু! দুর্গ প্রাকারে

(১৭৯ পৃষ্ঠার পর)

জেলে তো অবাক! সোনালী মাছের উদ্দেশ্যে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে স্ত্রীর হাত ধরে সে কুঁড়ে ঘরে গিয়ে ঢুকলো। এর পরে, আর কোন দিনই কোন দুর্যোগ আসেনি তাদের জীবনে।

রূপকথা মোর ফুরোল
হাঁপ ছেড়ে প্রাণ জুড়োল।

স্বর্গের নন্দনকানন।

পারিজাতের সুবাস ভুরভুর হাল্কা হাওয়া বইছে। স্বর্গের রাণী তার সপ্তসখী নিয়ে অমরাবতীর ফুল বাগানে বিহার করছেন।

রাণীর সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে বড়ো সখী বললে,—আমাদের এই নন্দনকাননে শুধু পারিজাত কুসুমেরই ছড়াছড়ি। নানা রকম-বিরকমের ফুল নেই।

মেজো সখী বলে উঠলো—মর্ত্যের ফুলবনে কিন্তু হাজারো রকমের ফুল। আর তার গন্ধও হরেক রকমের।

মোর সাথে তুমি ফিরে চলো এবে—হাসিলেন রামদাস,
কহেন—এ পথে যাওয়া-আসা মোর প্রতিদিন অভ্যাস—'
শিবাজী তখন গুরুজীর সাথে পায়ে হেঁটে পথ চলে,
যেতে যেতে একশিলা খণ্ডেরে হেরিয়া দুর্গতলে
কহেন গুরুজী—'আনো প্রস্তর—'
আদেশ তাঁহার লভি সত্বর
শুধায় গুরুরে—'কহ প্রভু মোরে কি বা আছে অভিনব—'
'—ভাঙো পাষাণেরে, একটি জীবন বুকে করে আজ লব—'
পাষাণ খণ্ড ভাঙিল শিবাজী। ভেক লম্ফনে করি
আসিল বাহিরে, কহেন গুরুজী 'কেমনে জীবন ধরি
এই প্রাণী আজো রহিয়াছে বেঁচে?
হের মোর কাছে আসে নেচে নেচে,
কে দিল ইহারে ক্ষুধায় অন্ন? কে দিল তৃষায় জল?
তোমার শাসিত ভূমিতে কাহার করুণায় পেলো বল!'
'সে কি তুমি? কহ, মোরে বীরবর! সবার অন্নদাতা!—
ভাবো মনে সদা—গুরুর চরণে নীরবে নোয়ায়ে মাথা
ভাবিল শিবাজী অন্তরে ত্রাস
করে বুঝি মোর গুরু রামদাস!
দৃপ্তকন্ঠে কহিলেন গুরু—'গরিমায় ভরা মন
জানে না জীবনে জীবিকার হেতু হারায়ে সত্যধন—'
বিশাল রাজ্য রহে করে তব, গর্ব করো না রাজা,
বিধাতার বরে নগণ্য তুমি হইয়াছ আজ রাজা।
সবার শাসন-পালনের ভার
দিয়েছে দেবতা! মর্যাদা তার
রক্ষা করিতে হও আগুয়ান,—বহুরূপে ভগবান
তাহারি সেবায় আপনারে তুমি দিনে দিনে কর দান।'
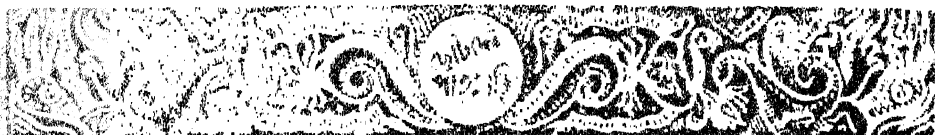
সেজো সখী অমনি বললে,—কিন্তু সই, তাদের পরমায়ু খুবই অল্প। আজ ফুটে, কাল ঝরে যায়, শুকিয়ে যায়।

ন' সখী মাথা দুলিয়ে বললে,—আমাদের পারিজাত কিন্তু বাসি হয় না, শুকোয় না, ঝরে না, মরে না। চিরকাল এক রকমই তাজা এক রকমই মধুর সুরভি।

নতুন সখী ঠোঁট উলটিয়ে বললে,— কিন্তু মর্ত্যের ফুলবনে যেমন নিত্যি নতুন নতুন নানা রঙের, নানা রকম গন্ধের ফুল ফোটে, এমনটি আমাদের স্বর্গে নয়।

কনে সখী কণকণ্ করে কয়ে উঠলো—তা' বলে বাসি ফুল, ঝরা ফুল, মরা ফুল, শুকনো ফুল স্বর্গে চাও নাকি? জঞ্জালে আর দুর্গন্ধে স্বর্গ যে নরক হয়ে উঠবে সই!

তখন ছোটো সখী আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা গলায় বললে,—স্বর্গের ফুল স্বর্গে থাকবে। মর্ত্যের ফুল মর্ত্যেই থাকুক। তার চেয়ে চলো না আমরা একদিন দেবরাণীকে নিয়ে মর্ত্যে নেমে সেখানকার রকমারি ফুলেদের দেখে আসি।

দেবরাণী হেসে বললেন,—চলো কালই তা' হলে দেখে আসি। সাত সখী উল্লাসে কল কল করে উঠলো। চলুন চলুন দেবরাণী, কালই আমরা মর্ত্যে ফুল দেখে আসি।

আজকে ফুটে কালকে ঝরে মর্ত্যভূমিতেই।
এই-তাজা এই-শুকনো যারা এই-আছে এই-নেই।।

বড়ো সখী বললে,—কিন্তু আমরা যে মর্ত্যে নামবো সেখানে যদি আমাদের গায়ে দুঃখের ছোঁয়া লেগে যায়? মর্ত্যে নাকি আকাশে-বাতাসে আনাচে-কানাচে দুঃখু ঘুরে বেড়ায়।

মেজো সখী বললে,—উহু, তা তো নয়। মর্ত্যে যেখানেই সুখ, তার পিছনেই নাকি দুঃখু হাজির।

সেজো সখী বলে উঠলো—আর দুঃখুর পিছনেই সুখ। তার মানে মর্ত্যে সুখ-দুঃখ এক সুতোতেই বাঁধা।

দেবরাণী বললে,—স্বর্গের দেব-দেবীর হৃদয়ে দুঃখু দাগ কাটতে পারে না। যাদের চোখে জলই থাকে না, কাঁদবে তারা কী করে? দুঃখু আমাদের দেখে লজ্জায় লুকিয়ে পড়বে।

সপ্তসখী হাততালি দিয়ে হেসে উঠে বললে, তা' বটে, তা' বটে!!

অমৃত পান করছে যারা গন্ধ শুঁকে নন্দনে—
তারা কি আর পড়তে পারে ধরার দুখ-বন্ধনে?

তখন দেবরাণী ফুলপরীকে ডেকে পাঠালেন। বসন্তের হাওয়ায় গড়া ঝিরঝিরে পাতলা পাখা মেলে মিষ্টি সোনালী আলোয় গড়া শরীর ফুলপরী উড়ে এসে দেবরাণীকে প্রণাম করলে।

দেবরাণী বললেন,—ফুলপরি! কাল ভোরবেলা আমরা মর্ত্যে নামবো ফুল দেখতে। সারা মর্ত্যভূমিতে যেখানে যতো ফুল আছে সবাইকে তুমি গাছে গাছে ফুটিয়ে হাজির করে রেখো। ফুলপরী বললে,—যে আজ্ঞা দেবরাণী।

তখন শীতকাল। ফুলপরী উড়তে উড়তে দুই পাখায় অঢেল বসন্তের হাওয়া নিয়ে মর্ত্যের ফুলবনে এসে ঢুকলেন। তারপরেই আরম্ভ হয়ে গেলো রাতারাতি ফুল ফোটাবার পালা।

গ্রীষ্মের ফুল, বর্ষার ফুল, শরতের ফুল, শীতের ফুল কিছু আর বাছ-বিচার রইলো না। জলের ফুল, স্থলের ফুল, সকালবেলার ফুল, দুপুরবেলার ফুল, সন্ধ্যাবেলার ফুল, রাত্রিবেলার ফুল—হুড়োহুড়ি পড়ে গেল ফুল মালঞ্চে—ফুলের বনে—

ফুলপরী জরুরী তলব দিয়েছেন: আজ রাত্তিরেই সবাইকে তৈরী হয়ে আপন আপন বোঁটায় সেজেগুজে বেরিয়ে আসতে হবে। জলপদ্ম, স্থলপদ্ম গোলাপ, গন্ধরাজ, সূর্যমুখী, কুমুদ, কহ্লার, মল্লিকা, মালতী, অতসী, অপরাজিতা, জবা, করবী, বেলি, চামেলি, জুঁই, হেনা, সন্ধ্যামণি, নয়নতারা, নাগকেশর, ভুঁইচাপা, কনক চাঁপা, কাঁঠালে চাঁপা, মায় কৃষ্ণকলি, কৃষ্ণচূড়া পর্যন্ত—।

যারা অগাধে ঘুমিয়ে ছিলো গাছ মায়ের বুকের ভেতরে তাদের সব্বাইকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তোলা হোলো। অসময়ে ঘুম ভেঙে চোখ রগড়াতে রগড়াতে হাই তুলে ঘুম-ঢুলু ঢুলু চোখে যে-যার বোঁটার মুখে এসে সভ্যভব্য হয়ে সেজেগুজে বসলো।

ফুলপরী সারা রাত্রি ধরে সারা পৃথিবী সারা ফুলবন ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে প্রতিটি ফুলকে জাগিয়ে তুলতে লাগলেন। ফুলকুমারীরা কেউ স্যাটীন, কেউ ভেলভেট, কেউ জরী, কেউ মিহি ফিনফিনে মসলিন, কেউ রেশম, কেউ পশমে, লাল, নীল, হলদে কমলা নানা রঙ-বেরঙের চমৎকার চমৎকার পোষাক পরে মালঞ্চ আলো করে তুললে। শিশির জলে স্নান করে ঝকঝকে তকতকে হয়ে সর্বাঙ্গে নানা রকম সুবাস মেখে তারা উজ্জ্বল হয়ে রইলো।

ভোরবেলার সোনার মেঘে চড়ে সপ্তসখী নিয়ে স্বর্গের রাণী মর্ত্যের ফুল মালঞ্চে নেমে এলেন। ভোরের হাওয়ায় মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে ফুল মেয়েরা সব্বাই তাঁকে নমস্কার করল। আকাশে-বাতাসে পরিমল সৌরভ ছড়িয়ে তাঁর অভ্যর্থনা গান গাইলো ফুলেরা। আমরা যেমন মুখের ভাষায় কথা বলি, ফুলেরা কথা বলে সৌরভের ভাষায়।

স্বর্গের রাণী আর তাঁর সখীরা মর্ত্যে এত রকম রঙের এত রকম গন্ধের এমন রকমারি ফুল দেখে খু-উ-ব খুসী হলেন সকলে।

ফুল মেয়েদের আদর করে আশীর্বাদ করে রোদ্দুর ওঠার আগেই তিনি স্বর্গে ফিরে যাওয়ার জন্যে ফুলপরীকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চললেন। হাজার হাজার মর্ত্যের পাখী মিষ্টি গলায় ভোরের গান গেয়ে উঠলো।

সপ্তসখী বললে,— দুঃখু থাক আর যাই থাক, যেখানে এমন ধারা হাজার হাজার রকমের ফুল আর এমন মিষ্টি পাখীর গান থাকে সে দেশ স্বর্গের চাইতে একটুও খারাপ নয়।

দেবরাণী শুনে হাসলেন। মালঞ্চ থেকে বেরোতে গিয়ে দেখতে পেলেন ফটকের পাশে একটি গাছে কোনও ফুল নেই। দেবরাণী থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলে উঠলেন—এ কি? এমন সুন্দর সাজানো ফুল বাগানে একটা আগাছা রয়েছে কেন? মালী কি আগাছা সাফ করে না?

ফুলপরী ব্যস্ত হয়ে ডাকলেন—মালী! মালী!

বাগানের বুড়ো মালী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললে,—আজ্ঞে না।

এতো আগাছা নয়। এ যে ফুলের গাছ।

দেবরাণী আশ্চর্য হয়ে চোখ বড় বড় করে ফুলপরীর দিকে তাকিয়ে বললেন,—ফুলের গাছ? তা' হলে এর ফুল কই? এর ফুল আজ ফোটেনি কেন?

মালী বললে,—এর নাম মধুগন্ধা। শীতকালে তো এ ফুল ফোটে না। গ্রীষ্মকালে এর ফোটার সময়।

দেবরাণী মুখ রাঙা করে ফুলপরীর দিকে তাকালেন। ফুলপরীর মাথায় বজ্রাঘাত! নাও, এখন সামলাও!!
মর্ত্যের সমস্ত ফুল ফুটিয়ে রাখার হুকুম,—আর নির্বোধ মালীটা বলে কিনা—এখন ফোটবার সময় নয়।

ফুলপরী অতিকষ্টে দেবরাণীকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করে সোনা মেঘের নৌকোয় উঠিয়ে দিয়ে হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলেন। তারপরে মালঞ্চে ফিরে এসে ডেকে পাঠালেন—অবাধ্য ফুল মধুরগন্ধাকে।

এই সব হৈ-চৈ গোলমালে ততক্ষণে মধুরগন্ধার ঘুম ভেঙ্গে গেছে। আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলে ফর্সা রোগা ছিপছিপে ফুল মধুরগন্ধা বাগানে এস উঁকি দিল—ব্যাপার কি? ব্যাপার কি?—

গোলাপ, গাঁদা, পদ্ম, পারুল, কুন্দ, জবা শোন তো রে!

সন্ধ্যা, সকাল, গ্রীষ্ম, শরৎ এক হোলো কোন মন্তরে?—শোনাচ্ছি তোমায় মন্তর! পাজি মেয়ে! কেন তুমি বাইরে আসোনি? সারা রাত্রি ধরে সবাইকে আমি ডেকে ডেকে জাগিয়ে তুলেছি। কিসের জন্যে তুমি আমার ডাকে সাড়া দাওনি?—

মধুরগন্ধা অবাক হয়ে ফুলপরীর দিকে তাকিয়ে বললে,—বা রে! আমার তো ফোটার সময় সন্ধ্যেবেলা। আমি কেন সকাল বেলায় আসবো? তা ছাড়া এখন তো আমার ফোটার ঋতুও নয়। বাগানে বিষম হৈ-চৈ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল, তাই আমি উঁকি মেরে দেখতে এলুম।

ফুলপরী আগুনের মত রাঙা হয়ে বললেন,—কী! আমি এসেছি ফুলবনে। এখন শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সব ঋতুর সমস্ত ফুলেই বেরিয়ে এসে আমায় নমস্কার করেছে। আর মধুরগন্ধার এতো বড়ো আস্পর্ধা বলে কিনা—তার ফুটবার ঋতু ফুটবার লগ্ন না হলে সে বাইরে আসবে না?

ফুলপরী রাগে থর্‌থর্ করে কাঁপতে লাগলেন।

বাগানের এক কোণে ছোট্টো একটি মেয়ে কুন্দ তার মুক্তোর মতন দুধে-দাঁতের পাটি খুলে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠে বললে,—সবাই কি আর এত ভোরে ঘুম ভেঙ্গে বিছানা ছেড়ে উঠে আসতে পারে পরীদিদি? আমিও তো আসব নাই ভেবেছিলাম। জুঁইদি আর মল্লিকাদি আমাকে টেনে তুলে নিয়ে এলো তাই। এতো ভোরে ঘুম ভেঙে ওঠা জীবনেও অভ্যাস নেই কি না!

ক্ষুদে মেয়ে কুন্দর আস্পর্ধা দেখে ফুলপরীর রাগ আরও সপ্তমে চড়ে গেল। চীৎকার করে অভিশাপ দিলেন—আজ থেকে তা হলে তোমার হাসি আর গান বন্ধ হোক। আর পূব আকাশ সাদা হওয়ার আগেই তোমায় বাগানে এসে হাজির হতে হবে। আর ঐ মধুরগন্ধা—শীতকালে ওর বাইরে আসতে আলস্য হয়েছে। আমি হুকুম দিচ্ছি এখন থেকে বারো মাসই যে কোনও সময়ে ওকে মালঞ্চে এসে হাজির হতে হবে। আর সকালবেলায় ও যখন উঠতে চায়নি, অভিশাপ দিচ্ছি, দিনেরবেলায় ওর সৌরভ একটুও থাকবে না। মোমের ফুলের মতন গন্ধহীন, প্রাণহীন, আড়ষ্ট হয়ে থাকবে। যতক্ষণ না সন্ধ্যার অন্ধকার নামবে ওর প্রাণ আসবে না গান আসবে না।

সেইদিন থেকে মধুরগন্ধা ফুল দিনেরবেলায় রুপোর কাঠি ছোঁয়ানো রাজকন্যের মতন প্রাণহীন মৃত মোমের ফুল হয়ে যায়, সন্ধ্যার সোনার কাঠির ছোঁয়ায় সুন্দর সুবাসে আকাশ-বাতাস মাতিয়ে তোলে। রাত্রির আঁধারে প্রাণ পায় বলে মধুরগন্ধা নাম বদলে তার নাম হয়ে গেল রজনীগন্ধা। আর ছোট্ট কুন্দ ফুল সেইদিন থেকে তার সুন্দর শুভ্র রূপ নিয়েও গন্ধহীন শোলার ফুলের মতন হয়ে গেছে।

তোমার কৃপা-কণায় আমার
ঘোচাও মনের কালো,
চরণ পরশ দিয়ে প্রাণে
ভাবের প্রদীপ জ্বালো;
দিগন্তের ওই পারাবারে
যেথায় রবি বারে বারে—
যে প্রকারে দিচ্ছে আলোক
সেই কথাটি বলো,
আমাকে ওই রঙিন-দেশে
ভাসিয়ে নিয়ে চলো।
লাল সিঁদুরের দেশে
তোমার সাথে এসে,
সুষমার ওই খনির মাঝে
থাকবো মোরা রোজ,
বিশ্ব-ভুবন কেউ-ই তখন
পাবে না আর খোঁজ।
আসবে ছুটে জলধর—
শব্দ হবে কড় কড়,
তড়িৎ সাথে বৃষ্টি-বারি
নামবে ধরার বুকে,
রঙিন-দেশে স্বপন দেখে
দেখবো মোরা সুখে;
নিম্ন দিয়ে ঝরবে জল
শব্দ হবে ছলাৎ-ছল—
বিশ্ব-ভুবন শীতল হবে
স্নিগ্ধ-স্বচ্ছ নীরে,
আমরা যেন সেই সু-সময়
স্বপন-মন্দিরে।
শান্তি সুখের বাণী,
মর্মে আমার আনি—
নেইকো যেথায় কোলাহল
নেইকো কলরব,
ভুবন মাঝে সুধায় সাঝে
বসন্তের উৎসব;
সেই খানেতে আমাকে লয়ে রাখবে চিরসুখে,
বিশ্ব-ভুবন কাতর নাহি দেখবো সম্মুখে।
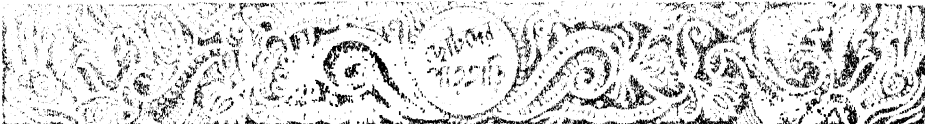
কুরুক্ষেত্রে ঘোর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, জয়লাভ করেছেন পাণ্ডবরা! যুধিষ্ঠির রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। এবার তিনি বিপুল সমারোহের সংগে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন! সারা ভারতের সকল রাজা ও রাজপুত্রেরা সমবেত হয়েছেন এই যজ্ঞ উৎসবে যোগদান করতে। কত ব্রাহ্মণ, কত দরিদ্র ভিখারি এসেছে দেশের চারদিক থেকে, রাজা যুধিষ্ঠির তাদের প্রচুর দানে তৃপ্ত করলেন, তারা খেল যথেষ্ট নিল আরো বেশী! লোকেজনে, দানে দানে আয়োজনে সে এলাহি কাণ্ডকারখানা! এরই মধ্যে কোথেকে এসে হাজির হল একটি নকুল, সভাস্থলে সমবেত অতিথিসজ্জন পুরোহিতের একেবারে মধ্যস্থলে।

সে এসেই, বলা নেই কওয়া নেই, সভাস্থলেই এক গড়াগড়ি দিয়ে উঠল, তারপর হেসে উঠল একেবারে মানুষের মত! সেই উচ্ছ্বসিত হাস্যধ্বনিতে শব্দমুখর সভাস্থল নিস্তব্ধ হয়ে গেল মুহূর্তে, সবাই পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো, একি অদ্ভুত জানোয়ার! এটা কি ভূত না প্রেত, যক্ষ না গন্ধর্ব, দৈত্য না দানো? জন্তুটার দেহের একটা অংশ আবার সোনার মত উজ্জ্বল। সভামণ্ডপে চারদিকে বসে রয়েছেন অগণ্য রাজা, রাজপুত্র, পণ্ডিত ব্রাহ্মণসজ্জন, সে সকলের দিকে বেশ ভাল করে চোখ বুলিয়ে দেখে বলতে আরম্ভ করল মানুষের ভাষায়, দেখুন, আপনারা বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন যে যজ্ঞটা বেশ জাঁকজমকের সংগে সম্পন্ন করেছেন, এমন আর ভূভারতে কেউ করেনি। কত দান ধ্যান করেছেন রাজা যুধিষ্ঠির। কিন্তু কুরুক্ষেত্রে বহুদিন আগে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। একদিন তিনি যে দান করেছেন সামান্য কিছু পরিমাণ শস্য দিয়ে তার তুলনা এ জগতে খুব বেশি নেই, যত স্বর্ণ, মণি রত্ন দান করেছেন মহারাজ যুধিষ্ঠির, সেই ব্রাহ্মণের দানের কাছে সব মলিন হয়ে গেছে, কাজেই বৃথা অহংকার আপনারা করবেন না।

ব্রাহ্মণরা শুনে বল্লেন, তুমি কে হে বাপু, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বিরাট অশ্বমেধ যজ্ঞের নিন্দে করছ, তুমি জানো যে শাস্ত্রের নির্দেশ মত এই যজ্ঞের প্রতিটি ব্যাপার আমরা সম্পন্ন করেছি, চতুর্বর্ণের প্রতি ব্যক্তি সুখী ও সন্তুষ্ট হয়ে ঘরে ফিরে গেছে, এতটুকু ত্রুটি কোথাও হয়নি, এই বৃহৎ অনুষ্ঠানের, কিন্তু তুমি কি বলে সমালোচনা ক'রছ, কে তুমি অর্বাচীন বলো দেখি?

জন্তুটা তখন মুচকি হেসে বল্ল, দেখুন, রাজা যুধিষ্ঠির সৌভাগ্যবান, আপনারাও লক্ষ্মীর বরপুত্র, আমি কাউকে ঈর্ষা করি না, আমি শুধু বলতে চাই, এই যে যজ্ঞ আপনারা সম্পন্ন করলেন সুবিপুল সমারোহে, যার জন্য মহারাজকে আপনারা ধন্য ধন্য করছেন, এর সংগে তুলনাই হয় না সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের দানের, ত্যাগের, আমি ত তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। সেই মহান ত্যাগের পুণ্যে স্বর্গ থেকে রথ নেমে এসেছিল, ব্রাহ্মণ তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূসহ সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন রথে চড়ে! সেই গল্প শুনুন তা হলে, কুরু পাণ্ডবের গৃহ যুদ্ধের বহু বহু পূর্বে কুরুক্ষেত্র ভূমিতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করতেন, ব্রাহ্মণ মাঠ থেকে শস্যকণা কুড়িয়ে এনে জীবিকানির্বাহ করতেন। ব্রাহ্মণের পরিবারে ব্রাহ্মণী ছাড়াও ছিলেন তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূ! তাঁরাও ঐভাবেই জীবিকানির্বাহ করতেন। দিবস অন্তে সন্ধ্যেবেলায় তাঁরা একবারই শুধু আহার্য গ্রহণ করতেন! তাঁদের একটি নিয়ম ছিল যে তাঁরা কখনো সঞ্চয় করতেন না, প্রতিদিনের খাদ্য প্রতিদিন সংগ্রহ করতেন। যেদিন জুটতো না, সেদিন উপবাস করতেন!

সেবার হল দারুণ দুর্ভিক্ষ, দিকে দিকে হাহাকার। ব্রাহ্মণ সপরিবারে অনেক দিন উপবাস করে একদিন কিছু শস্যের দানা কুড়িয়ে পেলেন, দিন শেষে তাই দিয়ে হল খাদ্য প্রস্তুত, চারটি প্রাণী সেই অতি সামান্য তুচ্ছ খাবার চার ভাগ করে খেতে বসলেন ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করে। ইষ্ট দেবতা বোধ হয় হেসেছিলেন তখন! ঠিক সেই সময় এসে হাজির হলেন এক উপবাসী অতিথি। অতিথি নারায়ণ! কুরুক্ষেত্রবাসী ব্রাহ্মণ উঠে সাদরে তাঁকে আহ্বান করলেন, পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে তাঁর নিজের খাদ্যাংশ সম্পূর্ণ নিয়ে অতিথি ব্রাহ্মণকে সবিনয়ে নিবেদন করলেন। অতিথি ভোজন করলেন কিন্তু তাঁর খিদে মিটল না। তাঁর অতৃপ্ত মুখ দেখেই সেটা ব্রাহ্মণ ও তাঁর পরিবারের সবাই বুঝতে পারলেন। ব্রাহ্মণের স্ত্রী তাঁর নিজের অংশ দিতে উদ্যত হলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ করতে লাগলেন, বল্লেন, সে কি করে হয়, নিখিল চরাচরে পশু-পাখী, জন্তু-জানোয়ার সকলেই স্ত্রী জাতিকে সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করে, আর আমি মানুষ হয়ে কেড়ে নেব তোমার ক্ষুধার অন্ন? কিন্তু ব্রাহ্মণী শুনলেন না, বল্লেন, অতিথি নারায়ণ, তাঁকে তুষ্ট করা সর্বপ্রধান কর্তব্য! অতঃপর সেই বুভুক্ষু অতিথি ব্রাহ্মণীর খাদ্যাংশ খেয়ে ফেল্লেন কিন্তু তাঁর খিদে মিটেছে বলে মনে হ'ল না! এগিয়ে এলেন যুবক পুত্র! নিবেদন করলেন আপন খাদ্য, এবারও ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ করলেন, বাছা, তুই ত শিশু আমার কাছে, তুই কি করে না খেয়ে থাকবি? পুত্র বল্লেন, অতিথি যে নারায়ণ তাঁকে কি ক্ষুধার্ত রাখা যায়?

অতিথি নারায়ণ ব্রাহ্মণের পুত্রের খাদ্যও উদরসাৎ করলেন কিন্তু এবারও তাঁর ক্ষুধার পরিতৃপ্তি হ'ল না! এবার ব্রাহ্মণের পুত্রবধূ নিবেদন করলেন তাঁর আপন খাদ্য। ব্রাহ্মণ কন্যাসমা পুত্রবধূর উপবাসশীর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে হায় হায় করে উঠলেন, মা তুই তোর মুখের খাবার দান করে নিজে না খেয়ে থাকবি?

কিন্তু পুত্রবধূ শুনলেন না, পরম শ্রদ্ধাসহকারে নিজের খাদ্য অতিথির সামনে এগিয়ে দিলেন।

এবার তৃপ্ত হলেন অতিথি! সত্যিই তিনি ছিলেন নারায়ণ! বল্লেন, ব্রাহ্মণ তুমি ধন্য, ধন্য তোমার আতিথ্য, তোমার আতিথেয়তার চরম পরীক্ষা হয়ে গেল! এই যে প্রাণীদেহের ক্ষুধা, এ বড় বর্বর, এ মানুষের বিবেক মনুষ্যত্ব সব নষ্ট করে, কিন্তু ধন্য তুমি, চরম অনশন ও উপবাস কিছুই তোমাকে ধর্মচ্যুত করতে পারেনি। বিরাট রাজসূয় অশ্বমেধ যজ্ঞ, রাজারা যাতে বিপুলচিত্ত ও বৈভব উৎসর্গ,

আটারশো বায়ান্ন।

বিঠুরের পেশোয়া-প্রাসাদ। সম্প্রতি পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর মৃত্যু হয়েছে। পেশোয়ার মৃত্যুর সংগে সংগেই বার্ষিক আট লাখ টাকা বৃত্তি বন্ধ হ'ল।

পেশোয়ার বিপুল সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করার চেষ্টা হচ্ছে।

কিন্তু সত্যি কি কোন উপায় নেই?

রাত অনেক হ'য়েছে। অমাবস্যার রাত—আকাশ শ্লেটের মত কালো—ঝড় উঠবে বোধ হয়। দরবার ঘরে এখনও আলো জ্বলছে। ঘরের মধ্যে একজন অশান্তভাবে পাইচারী করছেন। মুষ্টিবদ্ধ দুটি হাত পেছনের দিকে, গায়ে বেনিয়ান, বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে—তবে কানের কাছে দু-একটি চুলে পাক ধরেছে। দেহ সুগঠিত। ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন কোন অসাধারণত্ব নেই, কিন্তু মুখে অসাধারণ উদ্বেগ। একটু শব্দ হ'লেই দরজার দিকে চেয়ে দেখেন। মাঝে মাঝে দুর্জয় ক্রোধে দাঁতে দাঁত চেপে ভাবছেন। পেশোয়ার দত্তকপুত্র ধুন্দুপন্থ নানা সাহেব—ভারত ইতিহাসের আসন্ন প্রলয়ের অধিনায়ক নানা সাহেব।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কে একজন নানার দরবার ঘরে ঢুকল। চিন্তাক্লিষ্ট নানা প্রথমে একটু চমকে উঠেছিলেন, তারপর আগন্তুককে দেখে তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হ'ল।

—তাও ভাল, আজিমুল্লা তুমি! যাই হোক, তুমি এসেছো তা হ'লে। আমি ভেবেছি তুমি বোধ হয় কানপুরে সেই ফিরিঙ্গীদের পাড়ায় রাতটাই কাটিয়ে দেবে।

জিভ কেটে আজিমুল্লা উত্তর দেয়: আপনি কি আমাকে এত নীচ ভাবেন হুজুর। আজিমুল্লা খাঁ ফূর্তিটূর্তি ভালবাসে। কিন্তু হুজুরের কাজ সকলের আগে। আপনার চিঠি পেয়েই চ'লে এসেছি। আদেশ করুন।—' নানা ও আজিমুল্লার মধ্যে অনেকক্ষণ গোপন পরামর্শ হ'ল।

আজিমুল্লার বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ। গায়ের রং অসম্ভব ফর্সা—তীক্ষ্ণ নাসা, মুখে বুদ্ধির দীপ্তি। ছুঁচোলো ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির অগ্রভাগের ওপর ডান হাতখানা যেন আপনি এসে পড়ে—হয়তো মুদ্রাদোষ, হয়তো বা কানপুরের ইংরেজ-ফরাসী কিম্বা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানা পাড়া থেকে সে কায়দাগুলো রপ্ত করেছে। আজিমুল্লা যেমন স্মার্ট, তেমনি চৌকস।

পাশেই নথিপত্রের বাণ্ডিল। নানা সেগুলো আজিমুল্লার হাতে তুলে দিতে দিতে বলেঃ চোদ্দই তারিখেই একখানা জাহাজ ছাড়বে—তাতেই চেপে বসবে কিন্তু।—তারপরে যেন নিতান্ত আত্মগতভাবেই বলেঃ কমিশনার মোরল্যাণ্ড সাহেবকে যথেষ্ট তেল দিয়েছি। গাটের পয়সা খরচ ক'রে তিন দিন ডিনারও দিলাম। ব্যাটারা একেবারে অকৃতজ্ঞর জাত।—

—আচ্ছা, আপনি না কোর্ট অব ডিরেক্টারসের কাছে আবেদন করেছিলেন, উত্তরে তারা কি বল্লে?—

—এতক্ষণ তা হ'লে শুনছ কি? কোর্ট কিছুই করেনি। এবার দেখো সামনা-সামনি কিছু করতে পার কিনা?—নানার কণ্ঠে উষ্মা।

নানা সাহেবের বৃত্তির দরবার করার জন্য নানার এজেন্ট হিসেবে আজিমুল্লা চোদ্দই তারিখ বিলেত রওয়ানা হবেন।

আজিমুল্লা চলে যাওয়ার খানিক পরেই প্রবল ঝড়বৃষ্টি এলো। আকাশে মেঘের গুরু-গর্জন। বিঠুরে পেশোয়া-প্রাসাদ কেঁপে ওঠে।

* * * * *

পেশোয়া-প্রাসাদের কিছু দূরেই আজিমুল্লা খাঁদের বাসা। ছোট্ট হ'লেও বাড়ীখানি সুদৃশ্য। অনেকগুলি কাগজ স্তূপীকৃত। তার চোখেও আজ ঘুম নেই। সামনে লাল পানীয়। মদের নেশায় অতীতের পর্দা সরে যায়। মনে পড়ে.... সাঁইত্রিশ সালের দুর্ভিক্ষের কথা। অনাহারে মায়ের মৃত্যু হ'ল। তখন তার বয়স বোধ হয় দশ বছরের বেশী হবে না। কানপুর ফ্রি স্কুলের হেড মাষ্টার প্যাটন সাহেবের কোয়ার্টারের বাইরের রকে নভেম্বরের শীতের দিন সে ঠকঠক ক'রে কাঁপছিল। ফুটফুটে ছেলেটিকে দেখে সায়েবের মায়া হ'ল—পরের দিন থেকে সে সায়েবের বাড়ীতে খানসামার কাজে লেগে গেল। দশ বছর সায়েবের বাড়ী থেকে সে ইস্কুল পড়া শেষ করল। সায়েব-সুবোদের সংগে থেকে সে ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা বলতে কইতে শিখল, আর শিখল কেতাদুরস্ত আদব-কায়দা।

ওই ইস্কুলের একটি মাষ্টারীও সে পেয়েছিল। এতে সে মোটে খুশী হয়নি—লোকে বলে বারো বছর মাষ্টারী করলে নাকি গাধা হয়। আজিমুল্লার উচ্চাকাঙ্ক্ষা অসীম। মাষ্টারী কাজে ইস্তফা দিয়ে সে ব্রিগেডিয়ার স্কটের কাছে মুন্সীর কাজ নিল। তখনকার সায়েবেরা কল্পতরু—কিন্তু তারও একটা মাত্রা আছে। ঘুষের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে উঠল। সেখানে চাকরী যাওয়ার পর থেকেই সে নানা সায়েবের কাছে। আজিমুল্লা ভেবেছিলেন, নানা উদয়-সূর্য—দু' দিন বাদেই পেশোয়া হবেন।

আজিমুল্লার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়। পেশোয়া-প্রাসাদের পেটা ঘড়িতে চারটে বেজে ওঠে।

করবে, সব তুচ্ছ ও মলিন হয়ে যাবে তোমার এই ভয়ংকর দান ও ত্যাগের মহিমার ক... ওই দেখ স্বর্গ থেকে রথ নেমে আসছে তুমি সপরিবারে স্বর্গে গমন করো! এই বলে সেই অতিথি অদৃশ্য হয়ে গেলেন!

আমি কাছেই ছিলাম, ব্রাহ্মণের খাদ্যের ঘ্রাণ আমি পেয়েছিলাম তাতেই সমস্ত শির আমার সোনা হয়ে গেল। আনন্দে আমি বিভোর হয়ে গেলাম, সামান্য একটু খাদ্য যা পড়েছিল ওখানে, আমি গড়াগড়ি দিলাম তার ওপর, তাতে আমার দেহের একটা অংশ সোনার দীপ্তি পেল, আমি আবার গড়াগড়ি দিলাম, কিন্তু সেখানে আর ত কোন খাদ্যকণা অবশিষ্ট ছিল না, তাই বাকি অংশটা আর সোনার বরণ হল না, কিন্তু বাকি অংশটাও স্বর্ণকান্তি করার জন্য আমি সেই ঘুরে বেড়াই, কোথায় কে যাগ-যজ্ঞ করছে বিরাট দান-ধ্যান, পস্যা। শুনেছিলাম মহারাজ যুধিষ্ঠির সম্পন্ন করেছেন বিরাট ধ যজ্ঞ, তাই এসেছিলাম এখানে, কিন্তু না, আমার দেহের বাকি সোনা ত হ'ল না, কাজেই কি করে বলি এ যজ্ঞ পেয়েছে সেই ...র দানের গরিমা ও মহিমা? এই বলে সেই অদ্ভুত জন্তুটি হয়ে গেল সভাস্থল থেকে!

আমি আজ ফটো নেবো
দাঁড়া সারিতে—
গলাগলি করে আয়
নহে আড়িতে ।।
ফোটো—শঙ্করনাথ দত্ত

আমার খোকা গাড়ী চড়ে
হাওয়া খাবেই আজ
তাই ত' আমি চল্‌ছি একা
রাজপথেরই মাঝ ।।
ফোটো—রেখা সেনগুপ্তা

মোর ভীরু খরগোস—
কী ভালো বাসে—
যখন-তখন ছুটে
কোলেতে আসে ।।
ফোটো—রাজকিঙ্কর সিংহ

আমি ভাই এ সভাতে
সভাপতি হয়েছি
বক্তৃতা মাঝে তাই
কত কথা কয়েছি ।।
ফোটো—অজয় দত্ত

খোকাবাবু এ পাড়ার
জেনো সেরা ডাক্তার
তাইত সাহেবী বেশে
এত বেশী জাঁক তার ।।
ফোটো—কে মিত্র

পাখা হাঁস খেলা করে মোর সঙ্গে—
ওরই সাথে সারাদিন থাকি রঙ্গে ।।
ফোটো—বিভূতিভূষণ কুমার

"হ্যাটট্রিকে" মোর সাথে
পারবে না কেউ ত।
আমি হই ব্যাট্—
[illegible] ত।

কালো মোর ওড়নাটা—
আমি যেন রাত্রি—
তোমরা ঘুমাও যবে—
আমি একা জাগি ।।

"দুই"
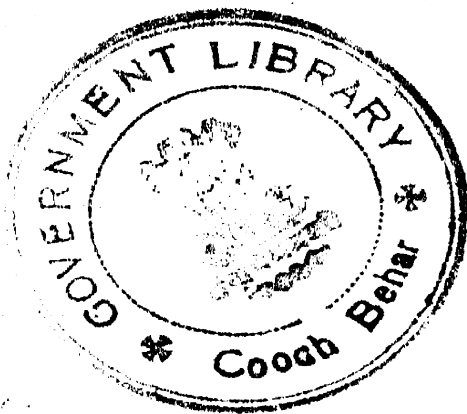
বিদ্রোহ সুরু হয়েছে। দিল্লী...মীরাট...কানপুর...অযোধ্যা...বিহার...ঝাঁসি...পাঞ্জাব—গোটা উত্তর ভারতে দাবানল জ্বলে উঠেছে। ভারতবর্ষের সিপাহীদের মধ্যে দুর্বার প্রত্যয় জেগেছে। বহু গুজব ছড়িয়ে প'ড়েছে, তার মূল অনুসন্ধান করা এখন আর সহজ নয়। লণ্ডনে গিয়ে আজিমুল্লার দরবার ব্যর্থ হয়েছে। তবে সে তার বদলে আর এক কাজ ক'রেছে। ফেরার পথে সে ক্রিমিয়া ঘুরে এসেছে। রাশিয়ানদের রণ-কৌশল দেখে সে বিস্মিত হয়েছে। দেশে ফিরেই সে ব্রিগেডিয়ার জাওলা প্রসাদের কাছে বলেছে: আরে, ইংরেজদের শুধুই আমরা বৃটিশ-সিংহ বলে থাকি। আসলে তারা রাশিয়ানদের কাছে শিশু। রাশিয়ানদের যুদ্ধ দেখে আমার রোস্তমের কথা মনে পড়ল।—

কথাটা ছড়িয়ে পড়তে দেরী হ'ল না যে, ইংরেজদের হটিয়ে দেওয়া এমন কিছু দুরূহ ব্যাপার নয়। দিল্লীশ্বর বাহাদুর শা-কে কেন্দ্র ক'রে আবার সকলে আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে। দ্বিধাগ্রস্ত নানা ভাবলেন সসৈন্যে তিনি দিল্লীর দিকেই যাবেন। আজিমুল্লা হাত চেপে ধরলেন:

—খবরদার হুজুর, এমন কাজও করবেন না। দিল্লীর বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে আমরা সব হারিয়ে যাব। বরং কানপুরে ব'সে বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব করুন। কথাটা নানার খুব মনঃপূত হল। নানাও ক্ষমতা চায়।

সাতাশে জুলাই। কানপুরের ইতিহাসে এক সর্বনাশা অধ্যায়—সতী চৌরীঘাটের সেই বীভৎস হত্যাকাণ্ড। হত্যাকাণ্ডের দু'দিন আগে আজিমুল্লা, জাওলাপ্রসাদ ও বালা রাও নানাকে আশ্বাস দিলেন:

—ইংরেজ বন্দীদের নিয়ে আপনি ভাববেন না। ছোট-খাটো ব্যাপারে হাত দিয়ে সময় নষ্ট ক'রে এখন লাভ নেই। ব্যাপারটি আমাদের হাতে ছেড়ে দিন— কোন ক্ষতি হবে না।—

সেদিন আজিমুল্লার কপিল চোখে নানা এক অজানা সংকেত দেখেছিলেন, কিন্তু উপায় ছিল না। দুষ্কৃতি এমনই একটি বস্তু যে এমন একটি অবস্থা আসে তখন দুষ্কৃতকারীরও এমন অবস্থা থাকে না যে, একে থামিয়ে দিতে পারে।

সাঁইত্রিশ বছর পর কর্ণেল মাড্ লিখছেন: কাগজপত্র ঘেঁটে আমার মনে হ'ল নারী ও শিশুর এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের ওপরে নানার কোন হাত ছিল না, হয়তো তাঁর রক্ত পিপাসু অনুচররাই এই চরম দুষ্কৃতিটি ক'রেছে, যাদের এই কাজ রোধ করবার ক্ষমতাও তাঁর ছিল না।—

বিদ্রোহের আগুন নিভল।

লক্ষ্মীবাই রণক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন বীরাঙ্গনার মত বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর শঠ চক্রান্তে তাঁতিয়াটোপীর হ'ল ফাঁসি। বাহাদুর শায়ের শেষ জীবন কাটল রেঙ্গুনে। কিন্তু নানা সাহেব, আর আজিমুল্লা কোথায়? নানা সাহেব সন্দেহ ক'রে কত জনকে ধরা হল, আবার প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দেওয়া হ'ল।

*   *   *   *

অক্টোবর মাস। তরাইয়ের পার্বত্য-বন্ধুর ঘন অরণ্যে শীতের হিমানী-শাসন। বিরাট এক গাছের তলায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কে একজন এলো। তার বয়স অনুমান করা সম্ভব নয়—পয়ত্রিশ থেকে পঁয়ষট্টি যে কোন বয়সই হ'তে পারে। মুখে অযত্নবর্ধিত দাড়ি, খালি পা, জামা কাপড় ছেঁড়া—হাতে একখানা লাঠি। পায়ে বিষাক্ত ঘা হ'য়েছে, ময়লা কাপড়ের পটি দিয়ে বাঁধা। লোকটার দাঁড়ানোর ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। গাছটার গুঁড়ির ওপরেই শুয়ে পড়ে। লোকটা বোধ হয় প্রলাপ বকছে। গলার স্বর জড়িত:—ভিক্ষে করে আর কতদিন যাবে, শালারা সবাই সন্দেহ করে। রাস্তার ছেলে রাজা হ'তে চেয়েছিলাম। ইয়া আল্লা! ...বিলেতে বেশ ছিলাম...। খানিক পরে চীৎকার ক'রে ওঠে.....খুন করেছি... খুন... সতীচৌরীর ঘাট... বিবি ঘর.....। বাতাস সুরু হ'য়েছে। আর কথা শোনা গেল না। লোকটার মাথা গাছের গুঁড়ি থেকে নীচে পড়ে গেল—নিথর চোখের কোণে এক ফোঁটা জল।

তরাইয়ের অক্টোবরের রাত ক্রমশঃ ভয়াবহ হ'য়ে ওঠে।
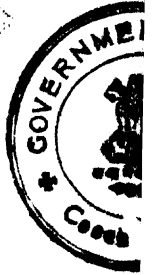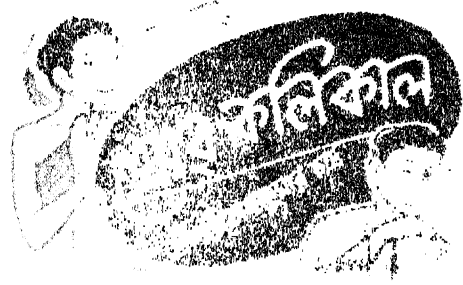
খাঁটি দুধের দামটি নিয়ে দুধ দ্যায় যে জোলো,
গয়লানীকে নিয়ে দেখি ভারি বিপদ হোলো।
ধরা যখন যায় না দুধে জল মেশালো কিনা,
দোষী তারে করি কিসে আসল প্রমাণ বিনা!
তকে তকে থাকি রোজই যায় না ধরা মোটে,
জোলো দুধই হয় যে খেতে, ফল নেইকো চোটে।
সাধনাতেই সিদ্ধি লাভ খাঁটি কথাটাই,—
অবশেষে জলের প্রমাণ, আর তো ছাড়ান নেই।
এক সকালে চাকি ও গিয়ে ঠাকুর দ্যাখে দুধে
ভাসছে কুচো চিংড়ি মাছ ছোট্ট খুদে খুদে।
গয়লা বুড়ীর জারিজুরি ফাঁসাবো আজ ঠিক,
এবার আমায় কেমন জবাব দেবে সে তা দিক!
পরের দিনে দেখা হোতেই বলি তারে ডাকি
'আজকে প্রমাণ যা পেয়েছি চলবে নাকো ফাঁক।
খাঁটি দুধের নামে তুমি দিচ্ছ ডোবার জল—
নইলে দুধে কুচো চিংড়ি কেমনে এলো বল?'
ঘাবড়ানো তো দূরের কথা চোখ কপালে তুলে
বললে বুড়ী, 'ঐ কথাটাই বলতে গেছি ভুলে।
গোরুটা মোর যে পুকুরের রোজ্ই খায় যে জল,
তাতে বেড়ায় চিংড়ি মাছ, আমার কি দোষ বল?'
শুনে বলি, 'বলতে কি চাও,— মানে তোমার গিয়ে
সেই চিংড়ি বেরায় গোরুর বাঁটের ভেতর দিয়ে?'
কপালে হাত ঠেকে বললে বুড়ী, 'ঘোর কলিকাল বাবা
আমার কাণ্ড দেখে নিজেই হোয়ে গেছি হাবা।'

মিত্তিরদের বড়ো পুকুরটায় টলটলে জল। একদিক তার কলমি আর শালুক ফুলে আলো হয়ে আছে। পুকুরধারে মহানিমের গাছ।

ঝিরিঝিরি হাওয়া বয়, আর জলের উপর মহানিমের ছায়া আস্তে আস্তে কাঁপতে থাকে। আর তারি সঙ্গে কাঁপে একটি ছোট্ট বাড়ির ছায়া। তার রংকরা মাটির দেয়াল আর লাল টুকটুকে টালির ছাদ।

এই বাড়িতে থাকে খোকনবাবু আর তার মা। বাবা থাকে বিদেশে। সারাদিন মা আলতাপরা পায়ে ঘুরঘুর করে কত কাজ করে।

মাঝে মাঝে কিন্তু খোকার বড্ড মন কেমন করে। ঠিক দুপুরে-বেলায়, যখন মা তাকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে নিজেই ঘুমিয়ে পড়ে, যখন ঘাটের ধারে হাঁসগুলো পালকের মধ্যে ঠোঁট ডুবিয়ে বসে থাকে, একটু একটু গরম হাওয়া ফুলের গন্ধ মেখে খোকার জানালা দিয়ে ঢোকে, আর মহানিমের ডালে বসে কুকোপাখি একটানা ডেকে চলে, 'কুপ্ কুপ্ কুপ্ কুপ্' ঠি—ক তখন জানালার পাশে বসে খোকন কী যে ভাবে কে জানে?......

এমনি এক মন-কেমন-করা দুপুরে একদিন এক ভা—রী মজার কান্ড হল। তার খবর শুধু খোকন জানে। মাকে, যে মাকে সে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে। তাকেও সে বলেনি।

সেদিনও দুপুরে খোকন তো রোজকারের মতো চুপচাপ্ জানালার কাছে বসে আছে। পুকুরের জলে রোদ পড়ে চিক্‌চিক্ করছে। আর জলে পোঁতা একটা বাঁশের মাথায় চুপটি করে বসে আছে একটা রামধনু পাখি। রামধনু তো খোকন দেখেইছে, সেই যেদিন রোদ ছিল, বৃষ্টিও এক পশলা হল, শিয়ালের বিয়ে হল ক—ত ধুম করে, সেদিন দূরের আমবাগানের মাথায় সাতরঙা রামের ধনুক খোকন আর তার সব বন্ধুরাই দেখেছে। তারই মতো রং পাখিটার গায়ে ডানায়। তার লাল লম্বা ঠোঁট, মাথাটি একটু বড়ো, মাথা ও পেট খয়েরী। গলা, বুক ও গাল সাদা, লেজ, ডানা নীল সবুজে মেশানো। সারা গায় রামধনুর ঝিলিক। আর পাখিটা খেপলো নাকি? উড়ে গিয়ে পুকুরপাড়ে একটা গর্তে ঢুকলো একটা মাছ মুখে নিয়ে! আবার পা দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে গর্ত থেকে ধুলোবালি বাইরে ফেলতে লাগল!

খোকনের চক্ষু তো ছানাবড়া! আস্তে আস্তে ঘর থেকে দাওয়ায় নেমে এল, দাওয়া থেকে পুকুরপাড়ে। ততক্ষণ রামধনু পাখি গর্ত খোঁড়া শেষ করে আবার বেরিয়ে এসে বাঁশের মাথায় বসেছে। খোকনকে দেখে বললে, 'কি ভাই, হাঁ করে কি দেখছো? মাছ ধরার কায়দা শিখতে চাও বুঝি?' খোকন রামধনু পাখির সঙ্গে কথা বলতে পেয়ে ভারী খুশি হয়ে বললে, 'হ্যাঁ গো রামধনু পাখি! তোমাকে কি রামচন্দ্র তাঁর ধনুকের রং মাখিয়ে দিয়েছেন?' হো হো করে হেসে পাখি বললে, 'আরে, আমার বেশ একটা নতুন নাম তুমি বের করেছ তো? আমাকে লোকে মাছরাঙা বলেই ডাকে। মাছ ধরে খাই আর এতো রং মেখে থাকি বলেই এমন সুন্দর নামটি আমার হয়েছে, বুঝলে?' 'এতো রং কোথায় পেলে ভাই?' মাছরাঙা গম্ভীরভাবে বললে, 'যিনি আকাশের গায়ে নীল রং দিয়েছেন, যিনি গাছের পাতায় পাতায় সবুজ রং মাখিয়েছেন, যিনি মাছগুলিকে চকচকে রুপোলী জামা পরিয়েছেন, তিনিই আমার গায়ে রামধনুকের তুলি বুলিয়েছেন।'

মাথা চুলকে খোকা বললে, 'তা তুমি ঐ পুকুরধারের গর্তে ঢুকে বালি খুঁড়ছিলে কেন? ওখানে মাছই বা লুকিয়ে রেখে এলে কেন?' 'মাছরাঙা বললে, 'তোমর নজর কি সবদিকেই আছে? ওটা যে আমার বাড়ি। যাবে খোকন আমার বাড়িতে?' খোকন বললে, 'মাছরাঙা ভাই, তুমি কিন্তু বড্ড বোকা। আমি কি তোমার মতন ছোট্ট এ্যাত্তটুকু? আমার সাড়ে তিন বছর বয়েস। আমি এ্যাত্তবড়ো ছেলে, মার চেয়েও বড়ো, তোমার ঐ ছোট্ট বাসায় ঢুকব কেমন করে? তা হলে তোমাকে আরও অনেক খুঁড়তে হবে।'

মাছরাঙা পুকুরের জলের উপর গোটাকতক পাক খেয়ে একটা ছোট্ট চকচকে মাছের বাচ্চা নিয়ে এল। বলল, 'এইটে খেয়ে ফ্যালো তো দেখি!' খোকন বললে, 'মা উঠুক, ভেজে দেবে, তবে খাব।'

'তা হবে না, এক্ষুনি খাও, ভাজা মাছের চেয়ে ভালোই লাগবে।' যেই না খোকন মাছের বাচ্চাটা কোঁৎ করে গিলেছে,— অমনি,—ওমা! দেখতে দেখতে সে একেবারে এ্যাত্তটুকুন হয়ে গেল, সে—ই যে ঠাকুমার ঝুলির গল্পে শুনেছিল দেড় আঙ্গুলে বাবুর, —ঠিক তার মতো, শুধু টিকিটি নেই। ইজেরটাও ছোট্টটি হয়ে গেছে, ঠিক গায়ের মাপের।

মাছরাঙা বললে, 'এবার চলো।' বলে পিঠে করে তাকে নিয়ে গেল পুকুরপাড়ে গর্তের মধ্যে। খানিক দূর গিয়েছে গর্তটা। গর্তের শেষে মাছের কাঁটার বিছানা। সেই বিছানায় বসে আছে ছোট্ট তিনটি বাচ্চা মাছরাঙা। বাচ্চারা মাকে দেখেই 'খিদে পেয়েছে খিদে পেয়েছে' বলে বিকট হাঁ করে চেঁচাতে লাগল। একটা একটা মাছ মুখে পুরে দিয়ে মা মাছরাঙা এক ধমক দিল, 'এ—ই, একটু সভ্যভব্য হওতো দেখি বাছারা, দিনরাত কেবল খাই খাই। এই দেখ্ তোদের বন্ধু খোকনবাবু এসেছে।'

তারা তো দেড় আঙ্গুলে খোকনকে দেখে খু—ব খুশি। খোকন তাদের সঙ্গে অনেক খেলা করল। তারপরে পেটভরে মাছরাঙা মায়ের দেওয়া মাছটাছ খেয়ে খেলা শেষে আবার তার পিঠে চড়ে বসল। পিঠে চড়ে উড়তে কী ভালোই না লাগল! দূরে মেঘের কোলে মাঝে মাঝে যে সব পেলেন যায় গোঁ গোঁ শব্দ করে, মা বলেছে তাদের পেটের মধ্যে নাকি মানুষ বসে থাকে। খোকন কতদিন ভেবেছে, বড়ো হলে পেলেনে চড়বে। ছোট্ট হয়ে রামধনু পাখির পিঠে চড়ে বেড়াতে পেলেন চড়ার চেয়েও মজা!

দেখতে দেখতে খোকা নিজেদের দাওয়ায় এসে পড়ল। মা এখনও ঘুমোচ্ছে, হাতপাখাটা পাশে পড়ে আছে। এলোচুলে চামেলি তেলের গন্ধ। মা তো চিনতে পারবে না দেড় আঙ্গুলে খোকাকে!— খোকার এই ভাবনা। পাখি হেসে নিজের ডানা খোকার মাথায় বুলিয়ে দিতেই খোকা আর তার ইজের আবার আগের মতো বড়ো হয়ে গেল। তখন খোকনকে চুমো খেয়ে রামধনু পাখি বল্লে, 'আজ
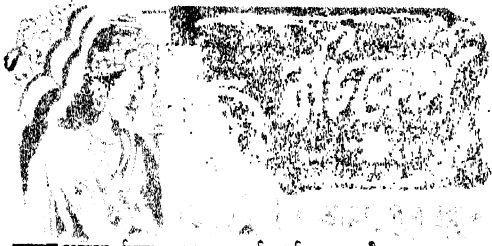
আগেকার দিনে ভারতের মুনি-ঋষিরা বেশীর ভাগ যাগ-যজ্ঞ, তপস্যা নিয়ে দিন কাটাতেন।

একদিন বাজশ্রবস ঋষির তপোবনে মুনি-ঋষিরা সব সমবেত হয়েছেন। ঋষি বাজশ্রবস 'বিশ্বজিত্‌-যজ্ঞ' করবেন।

এই যজ্ঞের নিয়ম হলো, যিনি যজ্ঞ করবেন, তাঁকে যথাসর্বস্ব দান করতে হবে, নিজের বলে তিনি কিছুই রাখতে পারবেন না।

'বিশ্বজিত্‌-যজ্ঞ' শেষ হল। এবার বাজশ্রবস ঋষি তাঁর যেখানে যা কিছু সম্পত্তি ছিল সমস্তই দান করলেন। সকলেই দাঁড়িয়ে এই অপূর্ব দৃশ্য দেখছিলেন।

সকলের মধ্যে একটি অনিন্দ্যসুন্দর ছেলেও এই মহাযজ্ঞ দেখছিল। বাজশ্রবস ঋষিরই ছেলে। ছেলেটির নাম নচিকেতা।

দানের পর দক্ষিণা দিতে হয়; কিন্তু দক্ষিণার অবস্থা বড়ই খারাপ। মাত্র কয়েকটি হাড়গোড় সার গরু ছাড়া ঋষির আর কিছুই সম্বল ছিল না। কি আর করেন, সেগুলিই পুরোহিতদের দক্ষিণা দিলেন।

নচিকেতা কিন্তু এই রকম দক্ষিণা দেখে ভারী লজ্জিত ও দুঃখিত হলো, সে ভাবতে লাগল, তাইতো এই বিরাট-যজ্ঞের পর এই দক্ষিণা! কেন আমিও তো বাবার সম্পত্তির মধ্যে: অতএব আমাকেও তিনি দান করতে পারেন।

যেই এই কথা মনে হওয়া, অমনি নচিকেতা তার বাবার কাছে গিয়ে বললে, 'বাবা, আমাকে তুমি কাকে দান করলে?'

অতিথি অভ্যাগতদের বিদায় দিতে ঋষি তখন মহাব্যস্ত তাই নচিকেতার কথা তাঁর কানেও গেল না। নচিকেতা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখল সবাই প্রায় চলে যায়, আরও দেরি করা চলে না; তাই তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ঋষির কাছে বল্লে,— 'বাবা, আমাকে তুমি কার কাছে দান করলে?'

তবুও নচিকেতার বাবা কথা কানে তোলেন না, পিতা হয়ে নয়নের মণিকে কেউ দান করতে পারে নাকি?

নচিকেতা এবার অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লো—না, আর দেরি করলে সব পণ্ড হবে। তাই সে একেবারে তার বাবার সামনে গিয়ে দৃপ্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, 'বিশ্বজিত যজ্ঞকারী ঋষি আপনি আমাকে কাকে দান করলেন?'

(শেষাংশ ১৮৮ পৃষ্ঠায়)

আমি সোনা! এখনও অনেক মাছধরা বাকি।' বলেই ডানা ছড়িয়ে রামধনু রং ঝলমলিয়ে উড়ে চলে গেল পুকুরপাড়ে।

খোকন মাকেও বলেনি, এমন মজার ব্যাপারটা। মা যদি বলে, যাঃ, তাই বুঝি আবার হয় কখনো!' তোমরা কিন্তু আবার শুনে-টুনে ঐরকম কিছু একটা বলে বসো না যেন, তবে কিন্তু খোকন তোমাদের সবার সঙ্গে একদম আড়ি করে দেবে, আর কোনদিন কিচ্ছুটি বলবে না।

(১৮৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ছেলের সর্দারী দেখে ঋষি ভয়ানক রেগে গেলেন : এইটুকু ছেলের সবই বাড়াবাড়ি! তাই ভৎর্সনা করে বল্লেন, 'যমকে'।

আর যায় কোথা, নচিকেতা মহা খুসী; যাক এবার তাহলে ভাল জিনিষ দিলেন। এই যজ্ঞ সার্থক হল।

এদিকে পুরোহিতরা যে যার দান-সামগ্রী নিয়ে চলে যাচ্ছে, এমন সময় সবাই দেখে কি নচিকেতাও তাদের সঙ্গে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে।

ঋষি জিজ্ঞাসা করলেন, 'নচিকেতা তুমি ওদের সঙ্গে কোথায় যাচ্ছ?

নচিকেতা তার বাবাকে প্রণাম করে বল্লে, 'বাবা, আপনার দানকে সার্থক করার জন্য আমি যমের কাছে যাচ্ছি।'

ছেলের মুখে এই কথা শুনে ত ঋষি একেবারে স্তম্ভিত, তাই তো এ ছেলে বলে কি! আদর করে বুঝিয়ে বললেন, 'সে কি কথা, রাগের মাথায় মুখের একটা কথা বেরিয়ে গেছে, মন থেকে কেউ কি কখনও যমের কাছে ছেলে পাঠায়!'

নচিকেতা গম্ভীরভাবে উত্তর করলে 'তা হয় না বাবা, আপনার মত ঋষির মুখ থেকে যে কথা বেরিয়েছে তা মিথ্যা হবার নয় আর এতে আপনি বিচলিত হচ্ছেন কেন! মানুষ জন্মালেই মরবে সত্য পালনের জন্য আমি না হয় কিছু আগেই যমের কাছে যাব। আপনি আমায় এ যাবৎ সেই শিক্ষাই দিয়েছেন, 'সত্যপালনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমি যেন সেই ধর্ম পালন করতে পারি আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন।' এই কথা বলে ঋষিকে প্রণাম ক'রে নচিকেতা যমের বাড়ীর উদ্দেশে রওনা হল।

ধর্ম বলে আর ইচ্ছা শক্তিতে সত্য-সত্যই নচিকেতা মরণের দরজায় এসে উপস্থিত হল।

কিন্তু যমের দরজার সামনে গিয়ে দেখে দরজা বন্ধ। যমরাজ কোথায় গিয়েছেন। তিনি ছাড়া সে ঘরের দরজা কেউই খুলতে পারে না।

নচিকেতা কি আর করবে, দরজার সামনেই বসে পড়ল, যমের অপেক্ষায়।

একদিন যায়, দু'দিন যায়, তিনদিন যায়। তিন দিনের পর যম ফি... এসেই দেখেন কি দরজার সামনে বসে এক মানব শিশু। ছেলের কি রূপ যেন সূর্যের মত জ্বলছে। যম বুঝলেন মানুষের ছেলে হ'লে কি হবে এ ব্রাহ্মণ কুমার সামান্য নয়। এমন ছেলেকে তিনদিন উপবাসী হয়ে তাঁর অপেক্ষা করতে হয়েছে, এতে তাঁর দোষ হয়েছে। দোষ ক্ষালনের জন্য যমরাজ প্রথমেই নচিকেতাকে বল্লেন, 'যদ... জানি না তুমি কি উদ্দেশে এবং কেমন করে এখানে এসেছ! কিন্তু তোমাকে এভাবে উপবাস করে আমার জন্য তিনদিন বসে থাকতে হয়েছে আমার এ অপরাধের জন্য আমি ক্ষমা চাইছি। তুমি যেমন ইচ্ছা, আমার কাছে তিনটি বর চাও। তুমি বল কি বর পেলে তুমি খুসী হবে?'

আমরা এ রকম অবস্থায় পড়লে কি না কি আমাদের মনোমত জাগতিক জিনিষ চেয়ে বসতাম। কিন্তু নচিকেতা কি বর চাইলেন শোন—

নচিকেতার সর্বপ্রথম মনে পড়ল তার বাবার কথা, তাই সে বলল, 'আমায় বর দিন, যেন আমার বাবার আমার জন্য উদ্বেগ ও দুর্ভাবনা দূর হয়। আমি যেন তাঁর কাছে যেতে পারি, তিনি যেন আমার প্রতি প্রসন্ন হন।

যমরাজ তৎক্ষণাৎ বল্লেন, 'তথাস্তু।'

তারপর যম বললেন, 'এবার তুমি বড় কিছু প্রার্থনা কর, আমার ঐশ্চর্যের শেষ নেই, তুমি যা চাইবে—তাই পাবে।'

নচিকেতা বিনীতভাবে বললে, 'আমি ঐশ্বর্য নিয়ে কি করব! আপনি আমায় বর দিন আমি যেন লোভ, মোহ, মিথ্যা ও ভয়কে জয় করে স্বর্গে যেতে পারি।'

যমরাজ বল্লেন, 'তথাস্তু।'

যম কিন্তু এ ছেলেটির কথা যত শুনেছেন ততই তিনি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছেন, তাই বললেন, 'এবার তুমি শেষ বর ভেবে-চিন্তে চাও, আমার অদেয় কিছু নেই।'

নচিকেতা স্থিরভাবে চিন্তা করলে, তারপর দৃঢ়কন্ঠে বললে, 'জগতে যা কিছু দেখছি সবই তো দু'দিনের জন্যে কিছুই চিরস্থায়ী নয়, আজ যা আছে কাল তা নেই, অতএব এ সব নশ্বর জিনিষে আমার প্রয়োজন নেই। আপনি দয়া করে আমায় আত্মজ্ঞান দিন। আত্মার স্বরূপ কি! আমি কি ও কে, কোথা থেকে এলাম, আবার কোথায় যাব এবং সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও কাম্য মানুষের কি আছে!'

যম এই শিশুর মুখে এই কথা শুনে যেমন বিস্মিত হলেন খুসীও হলেন তেমনি। তিনি তাঁর রত্নহার গলা থেকে খুলে সাদরে শিশু নচিকেতার গলায় পরিয়ে দিয়ে বল্লেন 'এবার আর একবার ভেবে দেখ, তুমি কি চাও, এরপর চাইলেও আর পাবে না।'

নচিকেতা করজোড়ে মৃত্যুকে প্রণাম করে, বললে, 'নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে!' নচিকেতা এ ছাড়া আর অন্য কোন বর প্রার্থনা করে না।'

যমরাজ তখন প্রসন্নচিত্তে দেবতার দুর্লভ সেই আত্মজ্ঞানের মন্ত্র নচিকেতাকে দিলেন।

মানব শিশুর ধর্মনিষ্ঠা ও মনোবল দেখে তাঁরও মন উদ্বেল হয়ে উঠল, নচিকেতাকে উদ্বুদ্ধ করে তিনি বল্লেন 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত।

মানব শিশু ঋষিকুমার নচিকেতা সেদিন পৃথিবীতে নিয়ে এলো মৃত্যু দেবতার আশীষ বাণী—

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত।।

বীর পুরুষ

একলা আমি পুজোর বাজার
করতে ঠিকই প্যারি—
তাই দেখনা সেজেগুজেই
এলাম তাড়াতাড়ি।।
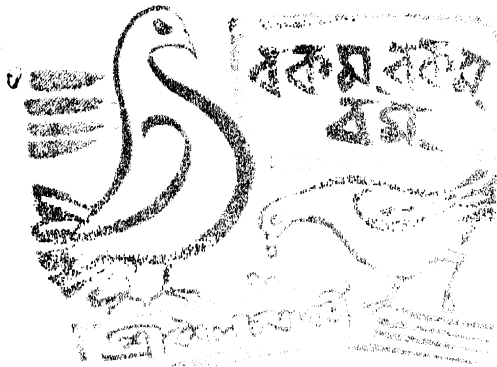
বকম্‌ বকম্‌ বম্‌
করছে ঝমাঝম্‌
ঠিক দুপুরে পায়রা ওড়ে
ঝুপ্‌ ঝুপোঝুপ ডানা নড়ে
লাগায় ঝমাঝম্‌
বকম্‌ বকম্‌ বম্‌।

সকাল সময় বকম্‌ বকম্‌
দেখছি তাদের রকম সকম্‌
কর্তা মশাই ঘাড় বেঁকিয়ে
যেন রাজার সঙ্‌
বকম্‌ বকম্‌ বম্‌।
গিন্নী আসেন দুলে দুলে
মুখটি তাহার তুলে তুলে
দেখান কত ঢং
বকম্‌ বকম্‌ বম্‌।

এদিক সেদিক খুঁজে খুঁজে
অনেক দেখে অনেক বুঝে
হেলে দুলে চলেন তিনি
মুখেতে গম গম্‌
বকম্‌ বকম্‌ বম্‌।

তিনটি মটর ছোলা
যেমনি ঠোঁটে তোলা
কর্তা রেগে টং
বকম্‌ বকম্‌ বম্‌।

একটি খাবেন তিনি
একটি খাবে গিন্নি
আরটি খাবে কে?
গিন্নী বলেন ডিম পেড়েছি
বাড়ীতে আছে সে।
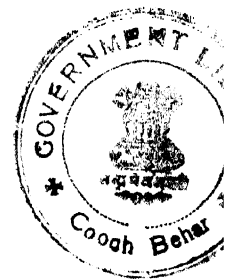
কর্তা তখন ফুলে ফুলে
হাসেন শুধু দুলে দুলে
যেন রাজার সঙ্‌
বকম্‌ বকম্‌ বম্‌।
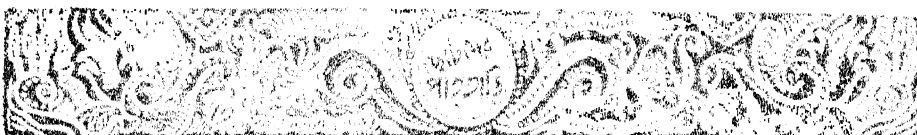
শরতে সোনালী রোদ ছড়াইছে হাসি,
রঙিন আলোক আনে জীবনের-স্বাদ ;
মনে মনে আপনারে আরও ভালোবাসি,
হৃদয় ভরিয়া ওঠে পরিপূর্ণতায়।
আজ কোনও দুঃখ নাই, নাহিকো বিষাদ,
প্রকৃতির মন-বন ফুটিয়াছে তাই ;
সবুজ আবেশ জাগে পাতায়-পাতায়,
কাকলি-তরঙ্গ মাঝে ভেসে যেতে চাই।

ঘুমন্ত কুঁড়ির বুকে অজানা বারতা,
কাহার পরশ লভি' জেগে ওঠে আজ ?
কা'র তরে শরতের এ' বিচিত্র সাজ—
চঞ্চল আভাষে আজ জাগায় মমতা !

দুর্গতি-নাশিনী মাতা আসে বুঝি তাই ?
—এসো সবে তাঁর পায়ে প্রণতি জানাই।

কিতীভূষণ ঘোষ

ওপাড়াতে মেঘ দাঁড়িয়ে
পশলা খানেক জল
এপাড়াতে ঘরের ছাতে
রোদটুকু ঝলমল।
সেজেগুজে পুজোবাড়ী
চলেছে দুই সই
রোদে বেশি ঘুরিসনে, মা
বলেছে পই পই।

ওমা কী আপদ !
কোথায় গেল রোদ ?
মাঝপথেতে মেঘ-বাতাসে
করল সুরু যুদ্ধ

সাজ কাঁচাতে আলো ছায়া
ছুটেছে এলো [illegible]
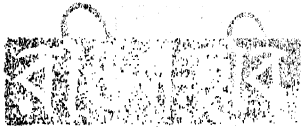
স্বপন দেখি, স্বপন দেখি ঘুমিয়ে রাতে গহন মনে
স্বপন বুড়োর রঙিন ছবি নিদ্রারত দুই নয়নে।
কি-সে মধুর ঝিলিক খেলা, কি-সে মধুর পুলক ফেলি—
বলতে গিয়ে বলার ভাষা পাইনা খুঁজে হারিয়ে ফেলি।
কখন দেখি হলুদ বরণ দাঁড়িয়ে আছে বিশ্ব জুড়ে—
কখন দেখি অসীম পানে পাখীর মত যাচ্ছে উড়ে।
সবুজ ঘন স্বপন লতায় ফুরফুরে বায় উঠছে দুলে
কখন্ কখন্ উচ্ছল্ হোয়ে হিজল পাতায় পড়ছে ঢুলে।
কখন্ সাজে—কেশবতী রূপ ঝলমল রাজকুমারী
কখন বা হয় শাওন ধারায় ঝির্-ঝির্ বাদল বারি।

হায়-রে! এ কোন্ আদ্যিকেলে প্রাচীন ছবি করছে খেলা
এক রঙে নয়, এক ঢঙে নয়, রঙ্ ধরে সে মেলা মেলা।
কে-জানে তা, কোন সে কেলে স্বপনপুরীর স্বপন বুড়ো
দেখতে কেমন কত বড়, মেপে মেপে পাই না মুড়ো
কী জাতি, আর কোন দেশে ঘর, কোথায় যে তার দেশ সীমানা
এ দেশ সে দেশ খুঁজে তবু পেলাম না সেই ঠাঁই ঠিকানা।
স্বপন বুড়ো তোমার খেলায় নিত্য ভেঙে নিত্য গড়ে—
তাই ত তুমি নও পুরাতন, তাই ত তুমি অনেক বড়।
সকল রঙে রঙ ধোরে যে খেলছে সবার মাঝে থেকে
স্বপন ছাড়া দেখতে বলো, কে পায় তাকে এমনি ডেকে।।

আলপনা—

শ্রীরমা বন্দ্যোপাধ্যায়
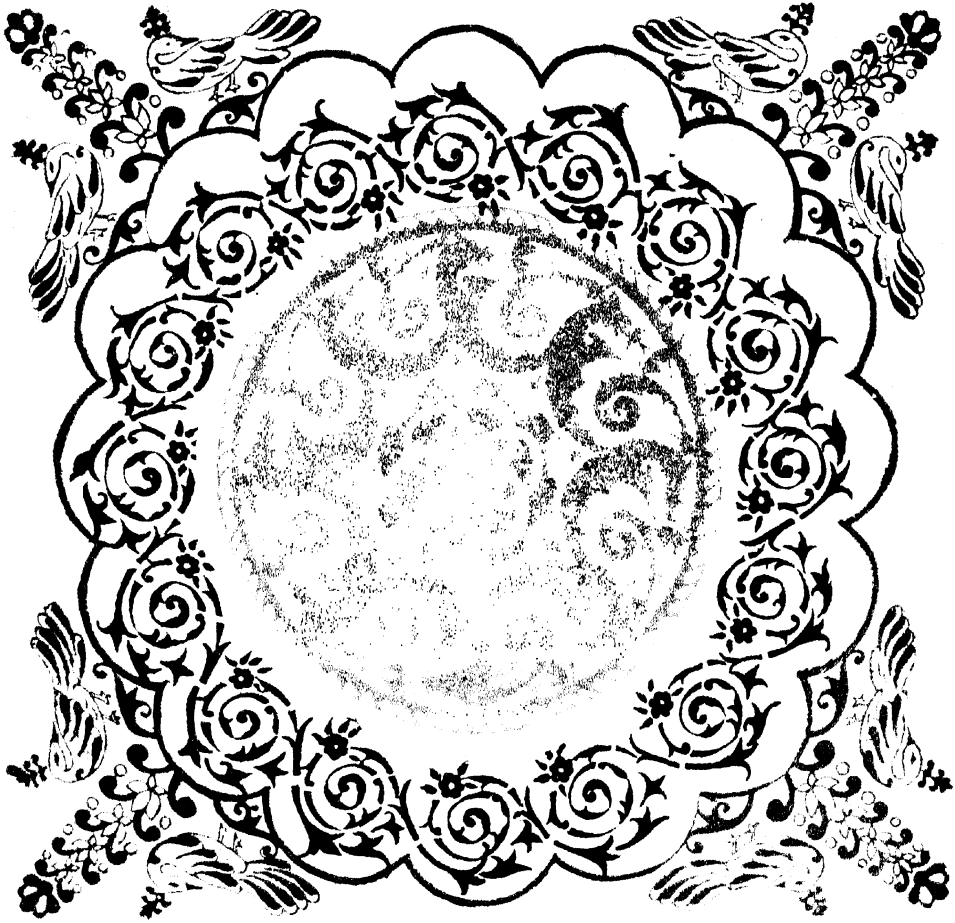
পাততাড়িতে যাঁরা অর্ঘ্য সাজিয়েছেন ঃ—

—লেখায়—

শ্রীসুখলতা রাও, সুনির্মল বসু, শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযামিনীকান্ত সোম, শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীনরেন্দ্র দেব, মৌমাছি, শ্রীইন্দিরা দেবী, শ্রীমন্মথ রায়, শ্রী বিশু মুখোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, শ্রীমনোজিৎ বসু, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীহরেন ঘটক, শ্রীআশা দেবী, শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, শ্রীরাধারাণী দেবী, শ্রীহিমালয়নিঝর সিংহ, শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীসবিতা সেনগুপ্তা, শ্রীরেবতীভূষণ ঘোষ, শ্রীপুষ্প বসু, শ্রীকল্যাণী প্রামাণিক, শ্রীসমর দে, শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্র, খাদু-রত্নাকর এ সি সরকার, শ্রীধীরেন বল, শ্রীশৈল চক্রবর্তী, শ্রীসুনন্দা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাগবুলে ইস্‌লাম ও স্বপনবুড়ো।

—রেখায়—

শ্রীপ্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার, শ্রীসমর দে, শ্রীধীরেন বল, শ্রীশৈল চক্রবর্তী, শ্রীসন্দেশ্বর মিত্র, শ্রীঅনিল মুখোপাধ্যায়, শ্রীরেবতীভূষণ ঘোষ, শ্রীসত্যসেবক মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামদুলাল কুণ্ডু, শ্রীসমীর ঘোষ, শ্রীসুধীর মৈত্র, শ্রীবিরাজ সেনগুপ্ত, শ্রীরঞ্জনকুমার দাস, শ্রীরমা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীইন্দিরা বিশ্বাস ও শ্রীমিন্টু লাহিড়ী।

—আলোক-চিত্রে—

শ্রীভগবতী দে, শ্রীঅমিয় তরফদার, শ্রীমায়া দে, শ্রীপ্রতিমা বল, শ্রীদেব দত্ত, শ্রীঅমিয়া পাল, শ্রীসমীরেন্দ্র সিংহরায়, শ্রীরথীন রায় ও শ্রীঅমল গুহ।

Silver
Exide
সিলভার
এক্সাইডের
বিশেষত্ব
পরভিকের
সেপারেটর
Exide
প্রচলিত
মূল্যে
EBSC-2A
প্রধান পরিবেশক ঃ
এফ এণ্ড সি অস্‌লার (ইণ্ডিয়া) লিঃ
কলিকাতা — গোহাটী

শারদীয়ার
আনন্দে...
TOSH'S
টসের
পূজা স্পেশাল চা
এ. টস এণ্ড সন্স
কলিকাতা

লাম্প অফ ফ্লেশ

শ্রীমতী বাণী রায়

ঝাউপাড়বোনা, মাধবীলতাসুবাসিত ছোট একটি গলি, অন্ধকার সেখানে আদরের মত নেমে আসে। অবশ্য অন্ধকার ঘনীভূত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার ঝকঝকে আলোকদণ্ডে জ্বলে ওঠে বিজলীপ্রভা। অন্ধকার হেসে ওঠে কৌতুকে।

এমন গলি কিন্তু অখ্যাত-অনাদৃত কলিকাতার সহস্র গলির একটা নয়—যেখানে ভাঙা বাড়ীর সার জীর্ণমুখে ভীড় করে আছে, যেখানে মানুষের অতি সহজে টি বি হয়। এ গলি বনেদী, বড় রাস্তার কোলাহল থেকে আত্মরক্ষার জন্য অভিজাত আশ্রয়।

আমরা কয়েকজন বাড়ীটার প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে ছিলাম। প্রবেশান্তে অতি ভদ্র আবহাওয়ায় গাত্রনিমজ্জনের পূর্বে একটু জিহ্বা-কণ্ডূয়ন ভিন্ন বাঁচা চলে কি? জানি, ক্লাসিকাল গানের আসরের কণ্টকিত নীরবতা। মিসেস সোমের বঙ্কিম আর্টের পরাকাষ্ঠা, বসবার ঘরে ঢুকবার আগে যে যার জমা কথা হালকা করে নিচ্ছিলাম।

খট্ করে ছোট লাল গাড়ী থামল। নেমে এলেন একজন মহিলা। সুন্দর কি কুৎসিত বলা শক্ত। ঘন সবুজ জামার গায়ে হালকা সবুজ শাড়ী নেতিয়ে আছে। জেড-মুক্তো গাঁথা গলার হার ষাঁড়ের মত সাদা সুস্পষ্ট ঘাড় আঁকড়ে। গোল গাল জোড়া মুখের অর্ধেক অংশ জুড়ে নিয়েছে, বাকী অংশে কষ্টে জেগে আছে একটা নাক, এককালে হয়তো রোমান ছিল জাতে; দুখানা রঙীন ঠোঁট, গোলাপের কুঁড়ি এখনও; এক জোড়া মেদেবসা টানা চোখ। প্রকাণ্ড, মেদবিকৃত দেহ শক্ত নিরেট, বক্ররেখা-বিহীন। হাতে ঝুলছে রুপোলী জালিব্যাগ, পায়ে উঁচু হীল রুপোলী জুতোয় মেদবহুলও টকটক করে কাঁপছে।

মহিলা একখানা পাতলা সিফনের রুমালে মুখখানা মুছে ফেলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে গাড়ী থেকে নামার কষ্টে বিচলিত অবস্থায় তিনি বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন।

আর, ললিত গাঙ্গুলী আতঙ্কের ভান করে বলে উঠল, "বাবা, কি দেখলাম! এ লাম্প্ অফ্ ফ্লেশ্। একতাল মাংস!"

বাড়ীর মধ্যে চলে গেলাম আমরা। মীরা সোমের বসবার ঘরে দাড়িওলা মিয়া সাহেবের পাশে মেজের কার্পেটে 'ল্যাম্প্ অফ্ ফ্লেশ' বসে আছেন। তানপুরোর কানে মোচড় পড়ছে, সারেঙ্গী সুর বাঁধছে। গান সভাকে ধরো ধরো করছে।

আমরা একপাশে বসলাম দলে বলে। চিত্রিত কোয়ার্টার প্লেটে কাজু বাদাম, বিস্কুট বিস্কিট, কুচি সন্দেশ আর দামী কাপে বাজে জোলো চা বসল আমাদের সামনে। চাপা গলায় এটা-ওটা বলতে বলতে আমরা খাবারে ঠোকর দিতে লাগলাম।

"সুতপা সান্যাল যেন আরও জুটিয়েছে, না?" কানের কাছে শুনলাম। ফিস্‌ফিস্ করে ঢাকাই পরা একটি চাকমুখো মেয়ে এক কটকী শাড়ীকে বলছে।

"অথচ, আগে কি দারুণ সুন্দর ছিল। ভাই, কে বলবে সেই লোক আর এই লোক এক!"

"ডাঃ সান্যাল মেয়ের যে কি করলেন!"

"টাকা আছে, ভাবনা কি?"

"চুপ, চুপ! চশমা-পরা মহিলা শুনেছেন।"

ততক্ষণে আমার যা শোনবার আমি শুনে নিয়েছি। ইতস্ততঃ জোড়া দিয়ে কাটা ঘুড়ীর মত জুড়ে নিয়েছি সুতপাকে। অনেক দিন আগের কথা হ'লেও আমি ভুলিনি।

একটি রেল ষ্টেশনে সুতপা প্রথম আমার চোখে পড়ে। সেদিন তার পোষাক ছিল লাল পাড় গরদের শাড়ী। কপালে এক বিন্দু সিঁদুর ছিল। আমার মনে হয়েছিল ঋজু-দেহা-গৌরবর্ণা তরুণীর উপস্থিতি সারা ষ্টেশনটি আলো করে দিয়েছে।

সেদিনের সুতপাকে 'লাম্প অফ ফ্লেশ' কেউ বলবে না। দোহারা শরীর লাবণ্যের নদী। আধুনিকীর অঙ্গে শোভন বেশ একটু সাধারণ থেকে পৃথক। চোখে পড়ে।

আমাদের কামরার সামনে সুতপা এক বর্ষীয়ান ভদ্রলোকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এক দুইজন যুবক বর্ষীয়ানের সঙ্গে কথা বলছে। সুতপা নিস্পৃহ।

একটু পরে তারা ষ্টেশন থেকে বার হয়ে চলে গেল। রূপমুগ্ধ আমি খবর নিয়ে জানলাম সুতপা সান্যাল ডাক্তার নিখিল সান্যালের একমাত্র সন্তান। ভক্তের ভিড়ে সুতপা বিব্রত। আমাদের গাড়ী চলে গেল ষ্টেশন ছাড়িয়ে। সেই অপরূপার স্মৃতি কিন্তু মনের গহনে জেগে রইল।

তারপর অপরূপাকে অনেক দিন পরে দেখলাম আমাদের কলেজে। আর্টস্‌এ বি-এ পাশ করে বিজ্ঞান বক্তৃতা শুনতে সুতপা মাঝে মাঝে কলেজে আসত। ঋজু-দোহারা দেহে সেদিনের মত লাবণ্য-নদী উচ্ছ্বসিত না হয়ে উঠলেও রূপ আরও প্রখর। যেন তপকৃশ দেহে পঞ্চতপা উমা যজ্ঞস্থল থেকে উঠে এলেন। সুতপা শ্যাওলা রংয়ের কার্ডিগান গায়ে কলেজের বাগানে নিজের মনে বই হাতে বসে থাকত। আমাদের চেয়ে বয়সে সে বড় ছিল, তাই সর্বদা হয়তো আমাদের মধ্যে চলাফেরায় সঙ্কোচ হ'ত। কপালে আর সিঁদুরবিন্দু শোভা পেত না সুতপার। বাদামী উঁচু গোড়ালী জুতো আর পশমের কার্ডিগানে তাকে ইঙ্গ-বঙ্গ লাগত। শুনলাম, মনোনীত স্বামীকে গ্রহণ করবার পথে পিতার আপত্তি বাধা হওয়ায় সুতপা অধ্যয়ন-তপস্যা অবলম্বন করেছে। একমাত্র সন্তানের ভবিষ্যৎ ধনী পিতা সহজে নষ্ট করতে দেননি। মাতৃহীনা

কন্যাকে মানুষ করেছেন বিপত্নীক অবস্থায়। এখন কন্যা বাবাকে এক কথায় ছেড়ে যায় কেমন করে?

গৌরবর্ণে সুতপার পাণ্ডু আভা দেখতাম। বাগানের ফুলগুলো যেন হতাশায় মাথা নাড়ত। এক পাশে একটি পাথরের জলদেবীর মূর্তি ছিল। তারি নীচে ঘাসের বুকে সে বসে থাকত—কখনও বা কলেজের কম্পাউণ্ডে তার ছোট নীল ম্যারিস গাড়ীর গদির বুকে সুতপাকে দেখা যেত—যেন ড্রইংরুমের সোফায় বসে আছে। জনতার মধ্যে বসবার কমন-রুমে কখনও তাকে আমি দেখিনি।

ডুমুর গাছের পাড়া মেঘলা আকাশের নীচে মেঘ হয়ে আছে। ক্লান্তবর্ষণস্নিগ্ধ বাতাসে কেয়া সৌরভ। সুতপার মেঘকালো চুলের আড়ালে দুলছে। ভাবতাম, সুতপার প্রেমিক না জানি কি অসামান্য!

শীতের মৌশুমী ফুলের বেডের পাশে কখনও দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে যেতাম সুতপার সঙ্গে কথা বলার সুযোগের আশায়। ফ্টক ফুলের ঝরা দল মাড়িয়ে ভ্রমণ করত সুতপা—পায়ের নীচে তার ঝরা ফুলের সুখমৃত্যু। কথা বলতাম—একেবারে বাইরের কথা। মনের চাবি তার বন্ধ থাকত। কলেজের স্বল্প দিনের স্বল্প পরিচিতা ছাত্রীদের মধ্যে আমি ছিলাম একজন মাত্র। তার বেশী নয়।

তারপরে সুতপা আর এল না। শুনলাম ওর স্বাস্থ্য ভাল নয়। আমারও কলেজ জীবন শেষ হল। এতদিন পরে আজ এখানে দেখা। আজ সুতপা লাম্প্ অফ্ ফ্লেশ্। আজ আবার ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন সুতপার সঙ্গে আলাপ হল। তাকে মনে রেখেছিলাম সে অসামান্যা বলে। আমাকে মনে রাখবার কোন কারণ ছিল না তার। আকৃতি আমার পরিবর্তিত। সাধারণ নামের সাধারণ মানুষকে সুতপা মনে রাখেনি।

আমি সরকারী শিল্প বিভাগে যুক্ত আছি। সুতপা আমাকে জানাল যে তার বাড়ীর একটি ঘরে একটা শিল্পকেন্দ্র চলে। আমি কি সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করে দিতে পারি? সুতরাং নির্দিষ্ট দিনে সুতপার বাড়ী চায়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে হ'ল।

অনেক রাত্রে যখন ঘুম এল না চোখে, মনে পড়ে গেল সুতপাকে। আজকের মাংসের তাল বা লাম্প্ অফ্ ফ্লেশ্ নয়—কলেজ জীবনের তন্বীকে। কৃষ্ণচূড়া গাছের পাতার আড়ালে না-বলা বেদনায় বাতাস কেঁদে যায়—অনেক দিনের কুয়াসা-জড়ানো ছায়াছবি ঘুমের রাজ্য থেকে উঠে আসে। পুরাতন স্মৃতি-বিহ্বল মন পুলক-বেদনায় উতলা হয়ে ওঠে মুহূর্তে। যা পেয়েছি তার আনন্দ, যা হারিয়েছি তার ব্যথা। বলিনি তো সুতপাকে আমাদের পূর্ব পরিচয়। বলতে পারিনি।

একখানা ঘরে শিল্পকেন্দ্র, পাশের ছোট ঘরে গুদাম। বেশী সময় লাগল না। অতঃপর সুতপা আমাকে চা-খাওয়াতে নিয়ে গেল দোতলায় তার ঘরে। তখন অপরাহ্নের শেষ।

একখানা চামড়া-মোড়া আরাম চেয়ারের পাশে চা-কেক-স্যাণ্ডউইচ। বিছানার সামনে পরদা ঝোলানো। বইএর আলমারী আছে একাধিক। রোলটপ ডেস্ক, গদি আঁটা চেয়ার। ঢাকা অংশের আসবাবপত্র চোখে পড়ল না।

"আপনাকে আমার ঘরেই আনলাম একটু নিরিবিলি গল্প করবার জন্য। নীচে বসবার ঘরে শান্তি নেই। ডাক্তারের বাড়ী কিনা।" চা ঢেলে দিল সুতপা।

চিকেন স্যাণ্ডউইচ গ্রাস করতে করতে বললাম, "আপনাকে আগে অনেকবার দেখে-ছিলাম। কিন্তু"—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুতপা বলল, "চিনতে পারেননি তো? আমাকে এখন কেউ চিনতে পারে না। যা মোটা হয়ে গেছি।"

ধীরে ধীরে বললাম, "একটু ব্যায়াম করলে ফল পেতেন হয়তো।"

"না ভাই, ব্যায়াম আমার চলবে না।" অন্তরঙ্গ সুরে সুতপা সংবাদ দিল, "আমার হার্টের অসুখ আছে। তাইতো এমন মোটা হয়ে গেলাম। কিন্তু, কিছুই করবার উপায় নেই।"

কিন্তু, তুমি তো দুঃখিত নও, তুমি নিশ্চিন্ত, সুতপা। কি করে এমন মেদভারে মজ্জমান হয়ে শুওরের মত দিন কাটাচ্ছ? বিগত বসন্তের দিন কি মনেও পড়ে না?

শিল্পকেন্দ্র সম্পর্কে কথাবার্তা শেষ করে বিদায় নিলাম। সুতপা আলো জ্বালাল। বিছানার পরদা-ঢাকা রহস্য আমার কাছে অগোচর থাকলেও সুতপার মোটা শরীর বিশ্বাসঘাতকতা করে উঠল। মোটা দেহ শোভন চলনে অভ্যস্ত নয়, ধাক্কা লেগে পরদা সরে গেল। চকিতে দেখলাম বিছানার পাশে যেন সাইড-বোর্ড একটা। ডিকাণ্টার ও গ্লাস সাজানো আছে। বিস্মিত হলাম।

বসবার ঘরের পাশে সরু গলি দিয়ে বার হ'তে হ'তে সুতপার মোটা দেহ আবার ধাক্কা খেল পরদায়। পরদা ঠেলে এক ভদ্রলোক বার হয়ে এলেন।

মাঝারি চেহারা, প্রৌঢ়। পরিচ্ছন্ন সাহেবী পোষাক, অমায়িক মসৃণ গোল মুখ। তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি কিন্তু আমার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে দেখল।

"আমার বাবা"। সুতপা পরিচয় দিল।

তারপরে নূতন করে আলাপ হল। পূর্ব পরিচয়ের রেশমাত্র সুতপার মনে নেই, অতএব আমি রেশ টানতে বিরত হলাম। শিল্পকেন্দ্রের কল্যাণে আমাদের কদাচিৎ যাতায়াত চলতে লাগল। কিন্তু বিস্ময়কর এই যে, সুতপা আমাকে একেবারে চিনতে পারল না। নিশ্চিন্তে মোটা দেহ টেনে টেনে দিন কাটাতে লাগল সে। আমিও চেনাবার চেষ্টা করলাম না। হয়তো সুতপা ভোলার সাধনা গ্রহণ করেছে। তাই নির্বিচারে সমস্ত কিছু ভুলে থাকছে সে। ভুলে থাকছে পরিণতি নিজের।

সেদিন সন্ধ্যার পরে শিল্পকেন্দ্রের সেক্রেটারী আমাকে দোতলার সিঁড়ির মুখে পৌঁছে দিলেন—"আমাদের প্রেসিডেণ্ট সুতপা সান্যালকে একটু পরিকল্পনার কথাটা বলে যান দয়া করে। আমি জিনিষপত্রের নমুনাগুলোয় নাম্বার দিচ্ছি—আমি আর যাব না। তাছাড়া, আমরা সাধারণতঃ ওপরে যাই না কিন্তু আপনার কথা আলাদা।"

আমার ইতস্ততঃ ভাব দেখে তিনি আবার বল্লেন, "যান-না, মিস সান্যাল সন্ধ্যার পরে সাধারণতঃ বাড়ী থাকেন। আপনাকে দেখলে খুশী হবেন।"

সুতপার উপর চিরাচরিত আকর্ষণের প্রভাবে চলে গেলাম সোজা।

সিঁড়ির পরেই যেন নিস্তব্ধ নীরবতা। যেন জগতের সমস্ত নিষেধ পুঞ্জীভূত হয়ে জমে প্রহরা দিচ্ছে সুতপার দরজায়। গোলাপী পরদার মধ্য দিয়ে স্তিমিত আলো দেখা যায়, কিন্তু সেই আলো দেখায় না ঘরের অধিবাসিনী আছে কিনা। হঠাৎ পা ভারী হয়ে এল। মৃদু স্বরে দরজার বাইরে থেকে ডাকলাম, "মিস সান্যাল!"

সুতপা তৎক্ষণাৎ বার হয়ে এল। হাসি-মুখে তাকিয়ে বলতে গেলাম, "অসময়ে এলাম না তো—" কিন্তু আমার হাসি জমে বরফ হয়ে গেল সুতপার দিকে চেয়ে।

মুখ রক্তাভ সুতপার, ললাটের শিরা স্ফীত। কর্কশ কণ্ঠে সে আমাকে বিস্মিত—অপদস্থ করে বলে উঠল, "কে এখানে আসতে বলল আপনাকে?"

আমি জীবনে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইনি। স্মিতহাসিনী, ভাল মানুষ মোটা-সোটা সুতপার মধ্য থেকে যেন অন্য এক মূর্তি উদয় হল। একবার ভাবলাম, সুতপা পরিহাস করছে না তো?

কিন্তু মুখে কোথাও পরিহাসের চিহ্ন নেই সুতপার। ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে জোরে, মোটা শরীর ফুলে উঠছে রাগে, আরও বীভৎস দেখাচ্ছে। একটু যেন টলায়মান লাগছে ওকে।

বিনা কারণে এত অভদ্রতা! অথচ আমাকে সে সাগ্রহে বাড়ী ডেকে আনত, কথা বলতে খুসী হত। নিজেও আমার বাড়ী গিয়েছিল। আজ বিশিষ্ট ভদ্রমহিলা হয়ে আর একজন বয়স্থা মহিলাকে অপমান করল! এত রাগের কারণ কি?

চকিতে সন্দেহ এল—পরদার আড়ালে প্রেমিককে লুকিয়ে রেখেছে নাকি সুতপা, যে এত উষ্মা? একটু পাশ কাটিয়ে ঘরের মধ্যে তাকানোর চেষ্টা মাত্রে সুতপার স্খলিত কণ্ঠ কানে এল, "এখানে কি দরকার, শুনি?"

আর সহ্য করতে পারলাম না। রাস্তায় নেমে এলাম।

দ্রুতবেগে চলতে চলতে লজ্জা-ধিক্কার ও অসহায় রাগ আমাকে দগ্ধ করতে লাগল। নিজে ডেকে নিয়েছিল, সুতপা আমার ওখানে যাবার কোন প্রয়োজন ছিল না। সেই অসামান্যা আর তো অসামান্যা নয়। স্থূলতা কেবল মাত্র দেহকে তার স্পর্শ করেনি, আত্মাকেও করেছে। কাদায়-ডোবা মহিষের মত স্থূলতার পাহাড় হয়ে ধনী পিতার ঘরে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাচ্ছে। আমাকে দিয়ে ওর শিল্পকেন্দ্রের কাজ গুছিয়ে নিতে ও আমার সঙ্গে গলে-পড়া ভদ্রতা দেখিয়েছিল। আজ স্বরূপ প্রকাশ হ'ল।

কিন্তু কেন? এক মুহূর্ত পূর্বেও সুতপার অমন আকৃতির অস্তিত্ব জানা ছিল না।

অত রাগের কারণ কি? রাগ হ'লেও অনাত্মীয়া মহিলার প্রতি মৌখিক অসদ্ব্যবহার পাগলেও করে না।

তবে,—ওকি সাময়িকভাবে উন্মাদ হয়ে যায়? নইলে এমন বিসদৃশ ব্যবহার করবে, কেন? পরদার আড়ালে কোন প্রণয়ীর আত্মগোপনও মনে হল না। ওই মোটা হাতীর এখন জুটবেই বা কে?

আচ্ছা, তিনি তো নন যিনি ডাক্তার সান্যালের দ্বারা বিতাড়িত? কিন্তু শুনেছি তিনি তো বেলুচিস্থানে যেয়ে বসবাস করছেন? তাহ'লে বোধ হয় বিরহে সুতপা মাঝে মাঝে জ্ঞান হারায়। তাই অমনি মোটা হয়ে গেছে—আধির সঙ্গে ব্যাধি যুক্ত হয়েছে।

কৌতূহল প্রবল হ'ল। লাঞ্ছিত হয়ে বাড়ী ফিরবারও প্রবৃত্তি রইল না। আমার অপমানের মূলদেশ সন্ধান না করা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।

গেলাম অংশুমান ঘোষের বাড়ী, পথেই পড়ে। অংশু ঘোষ সুতপার বন্ধু। সুতপার অনেক কথাই ও জানে।

আমাকে দেখে অংশু উৎফুল্ল হয়ে উঠল, "নীলিমা যে। কাজের লোক পথ ভুলে অকেজো লোকের বাড়ী, ব্যাপার কি?"

অংশু ঘোষ আমার মামার বন্ধু—মামার মতই রিফ্‌লেস্ ব্যারিস্টার। তাসের আড্ডায় বাড়তি সময় কাটে।

বললাম, "পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম আপনার খবরটা নিয়ে যাই।"

"বেশ করেছ। ওরে, কফি আন। বোস এখানেই, মা থিয়েটার দেখতে গেছেন। গৃহিণী-হীন গৃহে আদর করবে কে?"

"গৃহিণী করলেই পারতেন। মামা দিব্যি সংসারী হয়েছেন। ওঁর বন্ধু আপনি অযথা ভেসে বেড়াচ্ছেন।"

"আর ভাই, ভাসা থেকে ডাঙায় তুলতে তো এলে না কেউ এগিয়ে।"

"বাজে কথা রাখুন।" বেয়ারা কফির সরঞ্জাম আনায় অংশু ঘোষের ছ্যাবলামি বন্ধ হল।

কাহিনী বললাম অংশু ঘোষকে। চোখ মিট্ মিট্ করে অংশু বলল, "পাগলামিও বটে। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় সুতপা সান্যালের এমন পাগলামি দেখা দেয়।"

"তার মানে কি? চরিত্র খারাপ না কি?"

"হুঁ, তোমাদের মত ভাল মেয়ে তাকে চরিত্র খারাপই বলবে।"

"হেঁয়ালি রেখে খুলে বলুন না।"

পাইপে সুখটান দিতে দিতে অংশু ঘোষ বলল, "দেখ নীলিমা, তোমাকে আমার এইজন্যে ভাল লাগে যে, মহিলাজনোচিত ন্যাকামী বা তথাকথিত শালীনতা থেকে তুমি মুক্ত। আর তাই এখনও এ হৃদয় তোমারি বশ।"

আমি উঠে দাঁড়ালাম, "বাজে কথা শুনবার সময় আমার নেই।"

"বোস, বোস। দাঁড়াও, সুতপা-রহস্য উন্মোচিত হচ্ছে। অত তাড়াতাড়ি করলে কি চলে, ভাই? এ সব হাই সোসাইটির স্ক্যাণ্ডেল। কোভিয়ারের মত রসিয়ে খেতে হয়। তোমাদের সুতপা মাতাল।"

"মাতাল?"

"চমকে উঠো না। সন্ধ্যার পরে বোতল সুতপার বন্ধু হয়। নিরিবিলি ঘরে বসে তিনি এক-আধটু সেবন করেন। ওই সময়ে লোক গেলে ক্ষেপে ওঠেন।"

অবিশ্বাসের ভাবে বললাম, "সন্ধ্যার পরে তো ওঁকে এখানে ওখানে দেখেছি।"

"সে দিনগুলো মহৎ ব্যতিক্রম।"

তবু আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। আবার আপত্তি দিলাম, "শিল্পকেন্দ্রের সেক্রেটারী যে আমাকে যেতে বল্লেন ওপরে। তিনি কি জানতেন না?"

"তুমি বড় অবিশ্বাসী, নীলিমা। তারা তো ওপরে উঠতে পায় না। আমি ভাল করে জানি বলেই বলছি। দেখেও কি বোঝ না? অত মোটা কি স্বাভাবিক? অ্যালকহলিক ফ্যাট।"

গলায় কফি বেধে গেল। মাথা নীচু করে বসে হিসাব মিলাতে লাগলাম। সুতপা টলছিল, গলার ভাষা জড়িত ছিল, মুখ লাল। ধিক! ছিঃ, ছিঃ!

অংশু ঘোষ পাইপ নামিয়ে আমাকে সান্ত্বনা দিল, "মন খারাপ কোর না। মাতালের কাণ্ড। রাগ করে পরে আবার অনুতাপে কেঁদে ভাসিয়ে দেবে।"

ডিকাণ্টার-গ্লাসের অতল রহস্য বুঝলাম। আমার কৈশোর স্বপ্ন সুতপা!

অংশু ঘোষের কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করতে পরের দিনই আমার অফিসে এল সুতপা। থপথপে দেহ লিফ্‌টে টেনে সে হাঁপাতে হাঁপাতে এল।

হাত যোড় করে সুতপা বলল, "মাপ করবেন আমাকে? মাথার মধ্যে কেমন যেন করছিল কাল। লোক চিনতে পারছিলাম না।"

স্বাভাবিক স্বরে বলতে চেষ্টা করলাম, "রাগ মানুষের সহজ রিপু। কিন্তু, কারণ কিছু ছিল না রাগের। আপনি অন্য ব্যাপারে ব্যস্ত আছেন জানলে আমি যেতাম না।"

'অন্য ব্যাপার' কথাটি শুনে সুতপা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে মিন্ মিন্ করে এক বোঝা মিথ্যা বলল, "রাগ? না না, রাগ কেন? আমার মায়ের মৃত্যু-তারিখ ছিল কি না......তাই ছবির কাছে কাঁদছিলাম......এত বয়সে কান্না......তাই, তাই কেমন হতবুদ্ধি হয়ে......মাপ করুন। দয়া করে একদিন আসবেন, কথা দিন। আপনার ওপর রাগের প্রশ্ন ওঠে না কি? আপনার জন্যে আমার শিল্পকেন্দ্র সরকারী সাহায্য পাচ্ছে। আপনার কাছে আমি ঋণী। সত্যি, মনে হয় আপনি আমার নূতন আলাপী নন, পুরনো চেনা বন্ধু। কবে যাবেন?"

ওর মুখের দিকে তাকাবার প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। কোনমতে মুখ ফিরিয়ে বললাম নীরস স্বরে, "দেখা যাক।"

চিত্র-প্রদর্শনীতে দেখা হ'ল। সুতপার সাগ্রহ বন্ধুত্ব এড়িয়ে এক কোণে চলে এলাম।

সোনালী ছাপ গরদের লাল শাড়ী, রংচঙে বেশ সুতপার। একজন জার্মাণ ভদ্রলোকের সঙ্গে হাত নেড়ে গল্প করতে করতে বা'র হয়ে গেল। হি-হি হাসির সঙ্গে মোটা-সোটা গাল ফুলে' ফুলে' উঠছে। গলার স্বর এখনও মোটা নয়, তাই অত মোটা দেহের বাহন হিসাবে বেমানান লাগে। কচ্ছপের মত গড়াতে গড়াতে বা'র হয়ে গেল ও।

ভ্রূকুঞ্চিত করে সেইদিকে চেয়ে আছি। পিঠে একটা হাত পড়ল।

অংশু ঘোষও ছবি দেখতে নিমন্ত্রিত হয়েছিল। অংশু হাসতে হাসতে বলল, "সুতপাকে অত ঘেন্না কেন?"

"ভদ্রঘরের মেয়ে মাতাল! শোবার ঘরে মদ রেখে সন্ধ্যাবেলা রোজ খায়। মদ নিয়ে ভুলে আছে ও। আমি ভাবতাম, প্রেম ভুলবার জন্য সব ভুলেছে।"

"কি আবার নূতন ভুল হ'ল সুতপার?"

"আমার সঙ্গে কলেজের আলাপও ভুলে গেছে। তখন কথা বলবার দরকারে আমার সঙ্গে আলাপ রেখেছিল। এখন আলাপ রেখেছে শিল্পকেন্দ্রের দরকারে। অথচ আমাকে যে এক-কালে চিনত, মনে নেই। কিন্তু, চেনা মনে হয়, বলল সেদিন।"

"তুমি কলেজের আলাপিতা ছিলে জানাতে বাধা কি ছিল?"

উত্তর না দিয়ে বললাম, "সুতপার এমন অধঃপতন হয়েছে জানলে ওর বাড়ী যেতাম না।"

অংশু ঘোষ আস্তে আস্তে বলল, "সুতপার অধঃপতনের জন্যে সুতপাকে দায়ী করে তাকে এড়িয়ে চলা ঠিক নয়। সুতপার দশার জন্যে দায়ী অন্য লোক।"

"কে সে?"

"অত সহজে বলা চলে না এখানে দাঁড়িয়ে। সুতপার জীবনের কমিক অংশ শুনেছ, ট্র্যাজিক অংশ শুনবে না?"

"বলুন না।"

সনেট—শুদ্ধসত্ত্ব বসু

তবু কোন চিন্তা শেষে,
হয়তো বা একান্ত নির্জনে
হয়তো বিলোল ক্ষণে,
কি করে যে নিজেকে চিনেছি
কি করে যে প্রত্যয়-সে,
কোন মূল্যে তাকে যে কিনেছি
আজকে সে-ইতিহাস তোলা থাক;
জানি, মনে মনে
অমৃত যন্ত্রণা এক
পুড়িয়েছে তারুণ্যে যৌবনে
ভীরু কোন কল্পনার পিছে পিছে
অন্ধ হয়ে গেছি
করুণার ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে।
তবু কি জিনেছি
অলকার অধরাকে—
দেখি যাকে শয়নে স্বপনে?
কখনো ভেবেছি এই প্রেম দিয়ে
রচে দেব অমৃত সোহাগ
সে প্রিয়ার ছন্দে গানে,
চাহনিতে, কথায়, ভাষণে
কখনো বা এঁকে দেব আপনার
আশ্চর্য কুহক
অধরার দুটি ঠোঁটে
চুম্বনের ফোটাবো কমল,
আবার কখনো, ভাবি—
একটি ফুলের কুঁড়ি দিয়ে
চিরক্ষণ প্রতীকের গাথা
থাক বসন্ত-বিলাপ!

———

"এখানে হ'বে না। ধৈর্য ধর। কাল বাড়ী যাব। পকৌরী ভেজে রেখ চাট্টি।"

কথামত অংশু ঘোষ চলে এল। চা-খাওয়ার পরে আসল কথায় এলাম আমরা। অংশু একটি গল্প বলল।

সুতপার বাবা বুকে করে মাতৃহীনা কন্যাকে মানুষ করেছিলেন। এক মুহূর্ত চোখের আড়ালে পাঠাতে পারতেন না। খাওয়ানো, পরানো, বেড়ানোর ভার সম্পূর্ণ নিজের উপর নিয়ে অন্যান্য স্বজনদের সংগছাড়া মনের মত মেয়েকে মানুষ করেছিলেন।

রূপসী কন্যা, বাবা বিচক্ষণ ডাক্তার। নানা ঔষধপত্র প্রক্রিয়ায় কন্যাকে অপরূপা করে তুললেন। সৌন্দর্যে সুতপার যোড়া পাওয়া যেত না।

কিন্তু, একটা ভুল হয়েছিল। কমল বিকশিত হয়ে উঠলে ভ্রমরের দল জুটবে। ভ্রমরের দলকে ঠেকিয়ে রাখা ডাক্তার সান্যালের দায় হয়ে উঠল।

উপযুক্ত পাত্র ডাক্তার সান্যালের মতে কেউ নয়, এই অজুহাতে প্রায় সকলেই সরে যেতে বাধ্য হ'ল। কিন্তু, সোমনাথকে সরানো শক্ত হল। সুতপা তাকে ভালবেসেছে।

সোমনাথের কৃতিত্ব ছিল, রূপ ছিল। কিন্তু দারিদ্র্যের অপরাধে ডাক্তার সান্যাল তাকে তাড়িয়ে দিলেন। সুতপার প্রতিবাদে ফল হল না। চোখে-চোখে বাবা তাকে রাখতে লাগলেন। যে কোন লোকই আসুক না কেন সুতপার কাছে, এখন পর্যন্ত বাবার চোখ এড়ায় না।

মনের কষ্টে সুতপা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল তখন. কিন্তু জোর করে সোমনাথের সঙ্গে মিলিত হবার কথা সে ভাবতেও পারল না। বাবার যে কেউ নেই! বাবা তাকে মায়ের অভাব বুঝতে দেন নি। বাবার মনে কষ্ট দিলে বাবা মরেই যাবেন—সুতপা এত বড় পাপ করতে পারবে না।

বন্ধুদের অসন্তোষ সুতপা থামিয়ে দিল। বাবা তার ভালোর জন্যই সোমনাথকে 'বাড়ী বন্ধ' করেছেন। বাবা ভাবতে পারেন না গরীবকে বিয়ে করে সুতপা কষ্ট পাবে। দেখা যাক, বাবার মন বদলায় কিনা। সোমনাথ তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না।

কিন্তু মনের চাপ পড়ল স্বাস্থ্যে। বাবা নিজে মেয়ের চিকিৎসা ধরলেন।

তখনও সুতপার চারপাশে অসংখ্য প্রার্থী—কি করে তাদের তাড়ানো যায়?

গল্পের এই অংশে আমি বিস্মিত প্রশ্ন করেছিলাম, "দরকার কি? সোমনাথ না হয় ডাক্তারবাবুর মতে অযোগ্য ছিল—সুতপার মত মেয়ের নিশ্চয় বহু পাত্র জুটেছিল। মেয়ের বিয়ে তো দিতেই হ'ত।"

বিদ্রূপের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে অংশু ঘোষ বলল, "না, তুমি বড় বোকা, নীলিমা। বুঝেও বুঝতে চাও না।"

অস্বস্তি বোধ করলাম, "কি বলতে চান আপনি?"

"বলতে চাই, ওই বাবা মেয়েকে কাছ ছাড়া করতে পারতেন না। তাই কোন রকম বিয়েতেই ওঁর মত ছিল না। কারণ, ওঁর মনোবৃত্তি স্বাভাবিক নয়।"

"কি যা-তা বলছেন?"

"ঠিকই বলছি। তা নইলে উনি যা করেছেন কেউ তা পারত না। শুধু বিয়ে কেন, সুন্দরী মেয়ের প্রেমিকও যাতে না জোটে, সে ব্যবস্থা হয়েছে।"

"মানে?"

"মানে? সুতপা অসুস্থ হয়ে পড়ল। বাবা বোঝালেন সুতপার হার্ট খারাপ। কাজকর্ম ঘোরাফেরা চলবে না। বিয়ের প্রশ্ন তো ওঠেই না।"

"বাঃ, চমৎকার!"

অংশু ঘোষ চাপা সুরে বলে চলল, "চমৎকার এখনও কিছুই নয়। চিকিৎসার ব্যবস্থাটাই হল চমৎকার।"

আমি জিজ্ঞাসু হলাম। অংশু পাইপ নামিয়ে বলল, "উনি স্টিমউলান্ট হিসাবে মেয়েকে মদ ধরালেন। একটু একটু করে মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন, যাতে অবশেষে নেশায় পরিণত হয়। জানি, তুমি বোকা মেয়ে, চিৎকার করে উঠবে কেন বলে। প্রেমের পরিবর্ত সুরা, জানো না? একটা কিছু আঁকড়ে ধরে সমস্ত ভুলে ডুবে গেল সুতপা। ধীরে ধীরে লাবণ্য চলে গেল, মোটা পাহাড় হয়ে উঠল। প্রার্থীরা সরে গেল। সুতপা তখন সকলের ছোঁওয়ার বাইরে।"

"আশ্চর্য! নিজের বাবা এমন হয়?" আমি একদিনের দেখা সেই অমায়িক চেহারার ভদ্রলোকের কথা স্মরণ করতে চেষ্টা করলাম। "মদ ফুরিয়ে গেলে বাবাই যোগান। মনের আনন্দে আছে সুতপা। পুরনো দিনের কথা মনেও আনে না। মেয়ে চোখের ওপরে ঘুরছে ফিরছে, এক টেবিলে বসে খাচ্ছে। বাবাও মনের আনন্দে আছেন। রাত্রে একা বিছানায় মেয়ে ঘুমোচ্ছে—বাবা ভারী আনন্দে আছেন।"

অংশু ঘোষ হা হা করে হেসে ঘর ফাটিয়ে দিল। "সোমনাথ ব্যাপার দেখে বেলুচিস্থানে চাকরী নিয়ে পালাল। আমরাও ছিটকে এলাম।"

চমকিত হয়ে বললাম, "আমরাও? আপনি কি—" অংশু ঘোষের চোখের তারায় ক্ষণের জন্য নিরাশা প্রতিফলিত দেখলাম—"হ্যাঁ, আমিও। সবাই ওকে ভালোবেসেছিলাম!" "তাহলে?—এখনও তো সুতপার বিয়ে হয়নি?"

অংশু ঘোষ মুখ বিকৃত করে তার পূর্ব-সত্তায় ফিরে গেল। ললিতের মুখে যে বিশেষণ শুনেছি সুতপার, বহু পুরুষের মুখে সে বিশেষণে সে চিহ্নিত, তাই আবার শুনলাম অংশু ঘোষের মুখে, —"এখন? ছোঃ, ছোঃ! এ লাম্প্ অফ্ ফ্লেশ্!"

অংশু ঘোষের গাড়ীর শব্দ মিলিয়ে গেলে দক্ষিণের জানালা খুললাম। রোদের উত্তাপে বন্ধ ছিল, এতক্ষণ খুলবার প্রয়োজন হয়নি। অংশুমান ঘোষ নীয়ন লাইটের জগৎবাসী, দক্ষিণের আকাশ তার জন্য নয়।

আমার চার পাশে আজ দক্ষিণের বাতাস তুহিন শীতল। দৃষ্টির সম্মুখে ভেসে এল পুরাতন দিন। আমি সুতপার পূর্ব পরিচিতা সে কথা তাকে জানাইনি কেন, অংশুমান ঘোষ জানতে চেয়েছিল।

নারীর দেহসুষমার সঙ্গে যার প্রেম অন্তর্ধান করে, তেমন অংশুমানকে কি বোঝাব আমি?

কলেজের সেই দিনগুলো—অনেক দূরের পৃথিবী। চোখের সামনে সুতপা বসে আছে—অপরূপা। পাথরের জলদেবী মাথার শিয়রে। সবুজ ঘাসে স্টক ফুলের পরাগ বিস্তৃত।

হঠাৎ সুতপা জমে পাথর হয়ে গেল—ওই পাথরের জলদেবীর মত। ঘাসের রং পাংশু হয়ে গেল, ফুলের পাপড়ি শুকিয়ে গেল।

একতাল মাংস ছাড়া সুতপা আর কি? তার খাদক পিতা ইচ্ছামত তাকে রূপ দিয়েছেন।

অনেক দূরের পৃথিবী আমাদের সকলেরই আছে। সেখানে কত সম্ভাবনা, কত প্রেম!

সেই পৃথিবীর স্বপ্ন বিফল হলে সে কথা কাউকেই বলা যায় না।

চির বিরহ

॥ কল্যাণী মজুমদার ॥

যুগ-যুগান্ত ধরি
তরুণী পৃথিবী নিত্যই নব অভিসার সাজ করি;
তপনের সাথে মিলনের তরে করিছে প্রদক্ষিণ,
তপস্যারতা উমার মতন, শ্রান্তি ক্লান্তিহীন।
মিলন হয় না হায়,
সকল বাসক-সজ্জা তাহার বৃথাই টুটিয়া যায়।
প্রেমিক টানিছে আকুল পরাণে
প্রেমিকাও উন্মুখ,
মাঝে রহিয়াছে অসীম বিরহ ভাগ্যের কৌতুক।
হায়রে সূর্যমুখী—
কার তরে তুই আকাশে চাহিয়া
এমন ঊর্ধ্বমুখী।
বৃথাই নিজেরে সাজায়ে তুলেছ,
বৃথাই রয়েছ চাহি
প্রেমের সাধনা হবে না সিদ্ধ,
মিলনের পথ নাহি।
আকাশের চাঁদ জাগে
সরসী কন্যা কুমুদের লাগি
হৃদিভরে অনুরাগে।
কুমুদ চাহিছে দয়িতের পানে, নয়নে নয়ন রাখি,
তবুও তো হায় হয় না মিলন,
লাজে মুদে আসে আঁখি।
প্রেমের পশরা লয়ে—
কাঁদিতেছে রাধা আর্তহৃদয়ে সকল দুঃখ বহে।
তবুও তো হায় প্রেমের ঠাকুর
আসিয়া মিলেনা তার,
বৃথা হয় তার কুসুম সজ্জা,
বৃথা হয় অভিসার।
এমনি বিরহ ব্যথা,
চিরকাল শুধু জাগায় ব্যাকুল, নিষ্ফল আকুলতা,
দুই তীরে রহি চাহিয়া নীরবে
আকুল দুইটি প্রাণ,
মাঝে বহে চিরবিরহের স্রোত
রচে শুধু ব্যবধান।

শরীরের বড় বাবু—শ্রীমগজ

হেড আপিসের কান্ডকারখানাই আলাদা। তার সঙ্গে আবার অন্য কিছুর তুলনা? অসম্ভব। তাও কখনও কি চলে? কখনও না, কোনকালে নয়, কোন মতে নয়। মাথার উপর ঘুপটি মেরে যিনি বসে আছেন তিনি হোলেন শরীরের বড়বাবু—শ্রীমগজ। সেই হাতে সর্বশরীরের ওঠা-বসা, চলা ফেরা, ঘুমান, দাঁড়ান—সব কিছুর লাগাম পরান। সর্বক্ষণ শরীরটাকে সব কিছুর সমুখ থেকে হ্যাট হ্যাট করে চালিয়ে নিয়ে চলেছে। কি হুঁসিয়ার ঘোড়সোয়ার! সময় সম্বন্ধে এতটুকু বেহুঁস হওয়ার উপায় নেই। অথচ যদি কোন অসতর্ক মুহূর্তে কেউ মাথার এক্তিয়ারে একটুক কাজ করে বসে, তখুনি হৈ হৈ ব্যাপার রৈ রৈ কান্ড বেধে যাবে। চারদিক থেকে কলরব উঠবে—আ, লোকটার কান্ড দেখ, নিশ্চয়ই মাথা খারাপ, তা না হোলে কিনা শেষ পর্যন্ত এমনি করে বসে! হেড আপিসে নির্ঘাৎ গানডুগোল।

হাড়ের বাক্সের মধ্যে সযত্নে রাখা আছে মগজখানি। যাতে সহজে আঘাত লাগতে না পারে। তা বলে তেমন হাতের একখানা আস্ত বোম্বাই গাঁট্টা যদি এসে পড়ে তা হোলে মগজের নাম বাবাজী তখুনি বেরিয়ে যাবে। চোখে দেখতে হবে চড়কগাছ—মাথা বম হয়ে যাবে। কিন্তু সচরাচর ঘাত-প্রতিঘাত ও আঘাত থেকে বাঁচবার জন্যেই এই ব্রেন-কেস। স্কাল—করোটি। কলকাতার মত এমন জাঁদরেল সহরের পথে ঘাটেও মাঝে মধ্যে এই করোটি দেখতে পাওয়া যায়—ফুটপাত-আসীন গণৎকারদের কাছে। অবশ্য ল্যাবোরেটারীতে নানা রকমের স্কাল দেখা যায়—মাছের, ব্যাঙের, সাপের, কুমীরের, ছুঁচোর, গরিলার ও মানুষের। সব একাকার হয়ে পড়ে আছে। তা দেখে কিম্বা ঠেকে শিখতে হয়।

কিন্তু যারই স্কাল যেমনই দেখতে হোক না কেন—আসল ব্যাপার হোলো তাদের ভিতরে কি মাল আছে এই নিয়ে? সেইটেই জ্ঞাতব্য। সেই ভিতরকার বস্তুর দৌলতে কোথাও দেখছি বুদ্ধি দিয়ে, বিবেচনা দিয়ে, বিচক্ষণতা দিয়ে সব কাজকর্ম হচ্ছে। আবার কোথাও এর কিছুই করা সম্ভব হচ্ছে না। তার কৈফিয়ৎ অবশ্য রয়েছে হেড আপিসের নানারকম কান্ডকারখানার মধ্যে। হেড আপিসটা মাথায় কিন্তু তার ব্রাঞ্চ আপিস দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। মাথাটা হোলো অনেকটা হাওড়ার কনট্রোল-রুমের মত। সেখানে প্রতিক্ষণ কতরকম ভাবনার মালগাড়ি আনাগোনা করছে—মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সবকিছুর ভিতর দিয়ে কেবল আসা আর যাওয়া। অবশ্য তাতে কারুর সঙ্গে কারুর কোন ঠোকাঠুকি হয়ে যাচ্ছে না। যে যার নিজের রাস্তা ধরে চলেছে। কোথায় কোন পায়ের আঙগুলের ডগায় একটুখানি কুট করল, তার খবর খুট করে মাথায় তখুনি পেঁছে গেল। চুলে একটু টান পড়ল, তার সংবাদ পেঁছতে দেরী হয় না হেড আপিসে। যখন কালে ভদ্রে। কখনও মাথা ধরে ওঠে তখন ভাবনা-চিন্তার লাইন এনগেজড হয়ে যায়—দাওয়াই দিয়ে তখন আবার লাইন ক্লিয়ার করার পালা। যতক্ষণ তা না হচ্ছে, ততক্ষণ বিচ্ছিরি ব্যাপার।

মাথা খাওয়া আর কথা রাখা

মাথা খাওয়া আর কথা রাখা—কথা রাখা আর মাথা খাওয়া। একই সঙ্গে এ দুটো জিনিসের প্রচলন থাকলেও, দুটো জিনিস কিন্তু একই রকমের নয়। একটা আর একটার উপর নির্ভরশীল। অবশ্য দুটো জিনিসই রাখা বা না-রাখা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল মাথার উপর। কথা যেমন একটা নয়, মাথা খাওয়াও তেমন একপ্রকারের নয়। একটা গোটা রুই মাছের মাথা চিবিয়ে চিবিয়ে খাওয়া শক্ত না হোক, সময় সাপেক্ষ। তেমনি একটা পাঁঠার ব্রেন-কাটলেট খাওয়া তত খটমট নয় যত তৈরী করার মারপ্যাঁচ। জলজ্যান্ত মানুষের আস্ত মাথাটা মানুষই দিব্যি চিবিয়ে খেয়ে দিতে পারে—অকারণ প্রশংসা করে করে।

কিন্তু মাথা কি করে কথা রাখে? শুনতে পেলুম হাওয়ায় ভেসে এলো—আচ্ছা বেশ, মনে করে কাল ঠিক এস। বললুম আচ্ছা। মাথার মধ্যে 'কাল এস' আসার অপেক্ষায় রয়ে গেল। সেই কাল এলো, তখুনি মনে পড়ে গেল—আরে আজ যে যাবার কথা দেওয়া আছে। মাথা মনে করিয়ে দিল—'কথা দেওয়া' আছে। ভুল হোলেই মাথা খেয়ে নেওয়া হোত। বহু সময় দেখা যায় কথা দেওয়া হোলেও কথা রাখা সম্ভব হোলো না—বেমালুম ভুলে গিয়ে চুপচাপ। দোষ নিজেদের নয়—এ বিস্মরণের জন্যে দায়ী হেড আপিস। কারণ কার্যক্ষেত্রে কোন অর্ডারই দেওয়া হয়নি সেখান থেকে। মাথার মধ্যে দিনরাত খেয়ালের লাট্টু বনবন করে ঘুরছে। সব দিকে হুঁস রাখতে হয় কোথায় কি প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে বা দেওয়া নেই।

মাথা যে কথা দেবে তার আগে আর একটা ব্যাপার আছে। শরীরের মধ্যে কতকগুলো রিসেপটার অরগান বা সংকেত গ্রহণের দরজা আছে, যেগুলোর কৃপায় মাথায় খবরাখবর সহজে পেঁছে যায়। এই যেমন কান-নাক চোখ মুখ, আঙগুল, পা, গা, সমস্ত চামড়া এরা সব যেন মাথারই ব্রাঞ্চ আপিস। এদের সঙ্গে হেড আপিসের যোগাযোগ অচ্ছেদ্য। কানে শুনছি বোলেই না কথা দেওয়ার প্রশ্ন উঠছে। চোখে দেখছি বোলেই না বুঝতে পারছি কে কথা দেওয়াতে চাইছে। বুঝতে পেরেই তবে তো বলি—আচ্ছা বেশ। এই সব রিসেপটার অর্গানের বা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে নার্ভের যোগাযোগ সুন্দর। কোন কিছু খবর ব্রাঞ্চ আপিস থেকে হেড আপিসে পেঁছতে খুব সময় কম যায়। যখন ধীরে সুস্থে আবেগ নার্ভের ভিতর দিয়ে চলে তখন বাইরে থেকে মাথায় খবর এসে পড়তে সময় লাগে আধ সেকেন্ডের মত। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে যখন এখুনি এখুনি খবর পেঁছে দেবার দরকার হয় তখন কল্পনাতীত কম সময় লাগে—অনুমান করতে পারা যায় না, দেহের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে খবর ছুটে চলে নার্ভের ভিতর দিয়ে এক সেকেন্ডের তিন হাজার ভাগের মাত্র এক ভাগে। খবর একবার মাথায় পেঁছে গেলে তখন থেকে সব ঝুক্কি মাথার—অন্য কারুর নয় মাথা যা আদেশ দেবে তাই হবে।

মাথার হাতে সর্বশরীরের লাগাম পরান

মাথার সঙ্গে সর্বশরীরের লাগাম পরানর ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত। এখন অটোম্যাটিক টেলিফোন ব্যবস্থা আমাদের হাতের কাছে পেয়ে সবাই বর্তে যাচ্ছি। কিন্তু নিজেদের দেহের ভিতরে কতদিন থেকে যে চলে আসচে এই স্বয়ংক্রিয় যোগাযোগ ব্যবস্থার সাফল্য! হেড আপিসের সঙ্গে ব্রাঞ্চ আপিসের যোগাযোগ ব্যবস্থা সর্বক্ষণ অবিচ্ছিন্নভাবে রয়েছে হেড আপিস মাথায় বসে ব্রাঞ্চ আপিসদের সঙ্গে খবরাখবর নিচ্ছে, নির্দেশ দিচ্ছে, কাজ করাচ্ছে। এ যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়েছে নার্ভের যোগাযোগের ভিতর দিয়ে। আমাদের ব্রেন থেকে ডান দিকে আর বাঁ দিকে বারটা ক[...] নার্ভের জীবন্ত তার নেমেছে শরীরের নান[া] জায়গার সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি করতে। যেমন প্রথম নম্বর নার্ভের তার নাকের দিকে গিয়েছে —ঘ্রাণ আঘ্রাণের খবর ব্রেন-এ পেঁছে দেবার জন্যে। তেমনি দ্বিতীয় নম্বরটি চোখের সঙ্গে মাথার যোগাযোগ করছে—অপটিক নার্ভ এ হোলো আলো অন্ধকারের খবর মাথা[য়] যাতায়াতের পথ। যে নার্ভের তারের ভিত[র] দিয়ে শোনা না-শোনার ব্যাপারটি চলে, সেটি আট নম্বরের নার্ভ—অডিটরি নার্ভ। এ[র] মধ্যে দশ নম্বরের নার্ভটি দশকর্মের র[...] ভেগাস নার্ভ। মাথা থেকে বার হয়ে দী[র্ঘ] নেমে আসে গলা পার হয়ে একেবারে পেটে[র] ভিতর পর্যন্ত। ভেগাস নার্ভ থেকে হৃদযন্ত্রে পাকস্থলীতে ও ঘাড়ের দিকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তারের যোগ আছে। ভেগাস নার্ভ আমাদে[র] শরীরের অনেকখানি জায়গার সঙ্গে মাথা[র] অচ্ছেদ্য বন্ধন সৃষ্টি করেছে—তা অবশ্য আম[রা] বাইরে থেকে বুঝতে পারি না। যেমন ব্রে[ন] থেকে নার্ভ বার হয়েছে তেমনি স্পাইনাল কর্ড থেকেও ৩১ জোড়া করে নার্ভ বেরিয়ে শরীরে[র] বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে যোগাযোগ করে দিচ্ছে সেইসব জায়গার খবর স্পাইনাল কর্ড-এ এ[সে] পেঁছলেই হেড আপিসে অবিলম্বে পেঁ[ছে] যায়। ব্রেন আর স্পাইনাল কর্ড ও সেখ[ান] থেকে বার হওয়া ৮৬টি নার্ভকে বলা হ[য়ে] থাকে সেনট্রাল নারভাস সিসটেম। যা দেহে[র] বোধ বুদ্ধি বিবেচনা, শোনা, গন্ধ পাওয়া, স্পর্শ অনুভব করা, স্বাদ গ্রহণ করা প্রভৃ[তি] কাজগুলোর জন্যে দায়ী। এ ছাড়া আমাদে[র] শরীরের মধ্যে আর এক রকম নারভাস সিসটেম বা স্নায়ুমন্ডল আছে যা অন্য আরও কত[-] গুলো প্রয়োজনীয় জিনিস করে থাকে। [...] নারভাস সিসটেমকে বলা হয় সিমপ্যাথেটি[ক] নারভাস সিসটেম। লম্বা চেনের মত স্পাইন

কর্ডের দুপাশে পড়ে আছে সিমপ্যাথেটিক নার্ভ, সেখান থেকে আবার নার্ভের শাখা বার দিয়ে পেটের মধ্যে সর্বত্র গেছে। সিমপ্যাথেটিক নারভসকে বলা হয়ে থাকে অটোম্যাটিক নারভাস সিসটেম। যার উপর আমাদের হাত নেই—আপনা আপনি হয়। সিমপ্যাথেটিক নার্ভের কাজ হোলো হৃদযন্ত্রের তাল, মানে উত্তেজনা, বাড়িয়ে দেওয়া, রক্ত চলাচলের আর্টারিদের সংকুচিত করে দেওয়া, অতিরিক্ত অক্সিজেন আসার জন্যে ফুসফুসের মধ্যে নলীকাকে স্ফীত করা এবং যকৃত থেকে অতিরিক্ত চিনি-জাতীয় জিনিস গ্রহণ করিয়ে পেশী-সমূহের সজাগ রাখা। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার সিমপ্যাথেটিক নার্ভ যা কাজ করে ভেগাস নার্ভ তার উল্টোটা করে বসে। তাই ভেগাস নার্ভের আর এক নাম প্যারাসিম-প্যাথেটিক নার্ভ। উদাহরণে বলা চলে সিমপ্যাথেটিক নার্ভ যখন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াকে বাড়িয়ে তুলতে চায়—প্যারাসিমপ্যাথেটিক তাকে প্রশমিত করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ভেগাস শ্বাস প্রশ্বাসকে সংযত করে। এইরকম হ্যাঁ আর না। নার্ভের টানা পোড়েনে আমাদের দেহটা কাজ করে যাচ্ছে। তবে সিমপ্যাথেটিকের সঙ্গে সেনট্রাল নার্ভ নারভাস সিসটেমদেরও বন্ধনী আছে। কেমন ভাবে এই জোট পাকিয়েছে সেটা এবার বোঝা যাবে।

নার্ভের তার নিউরন দিয়ে তৈরী

আপনার মাথা ঠান্ডা না গরম? এ কথার উত্তর দেওয়া শক্ত। কারণ একেবারে চব্বিশঘন্টাই তা বরফের মত ঠান্ডা, একথা কেউ হলপ করে বলতে পারবে না। তেমনি সবার মাথা সব সময়ে একেবারে তেলেবেগুনে হয়ে রয়েছে, একথাও বলা চলে না। সাধারণ লোকের মাথা বলতে গেলে নাতিশীতোষ্ণ। এবং সে ভাবটাও নির্ভর করে নার্ভের তারের ভিতরে যে অসংখ্য নিউরন সেল আছে, তারা কেমন উত্তেজনা বা অবসাদে আন্দোলিত বা অবনমিত হচ্ছে তার ওপর।

সে সেনট্রাল নার্ভাস সিসটেমই হোক আর সিমপ্যাথেটিক সিসটেমই হোক—প্রত্যেক নার্ভের মধ্যে রয়েছে অগুণতি নিউরন। সুতো পাকিয়ে সলতে করার মত এই নিউরন পাকিয়ে নার্ভের তার তৈরী হয়। সাধারণ সেল এর মত নিউরনদের চেহারা কিন্তু নয়। এক একটি নিউরনকে দেখতে ভারি তাজ্জবের। এ যেন হাত পা বিশিষ্ট সেল। প্রত্যেকটি নিউরন সেলএ নিউক্লিয়াস যুদ্ধ সেল-বডি থাকে—সেটি যেন মাথা। সেখান থেকে একটা সরু লম্বা সুতোর মত ফাইবার বার হয়ে যায়—সেটি যেন পা—একসন। আর সেল-বডি থেকে অনেকগুলো সরু সরু সুতোর মত প্রোসেস বার হয়। সেগুলো যেন হাত—ডেনড্রাইট। এই বহু হাত বিশিষ্ট একপা সমেত নিউরনগুলো আরও ভয়ানক কিছু কান্ড করে। কখনও কখনও একসনগুলো বেজায় লম্বা হতে পারে—আধ ইঞ্চি থেকে কয়েক ফিট পর্যন্ত। বিভিন্ন নিউরনএর ডেনড্রাইটএও একসনএ স্পর্শ করে অসংখ্য সাইনাপস বা মিলন-বন্ধনী সৃষ্টি করে। এই সাইনাপসএর ফলে এক নিউরন থেকে আর এক নিউরনে ইমপালস সহজে সম্প্রসারিত হতে পারে। আবেগ সাধারণতঃ ডেনড্রাইটএ উদ্গত হয়ে বহুদূর পর্যন্ত চলে আসতে পারে। নিউরনের জীবন্ত তারের ভিতর দিয়ে আবেগ শেষপর্যন্ত হেড আপিসেই এসে পৌঁছয়। হেড আপিসে রয়েছে অসংখ্য সাইনাপস।

যখন কোন ভাবনা নিউরনের ফাইবারের ভিতর দিয়ে তরঙ্গায়িত হয়ে ছুটে চলে তখন এই সক্রিয় আবেগের প্রবাহকে বলা হয় firing of the neuron, ঠিক যেন এক যায়গা থেকে খবরটা দপ করে জ্বলে উঠে ফাইবারের ভিতর নিমেষে চলে যায়। চেতনার ম্যাগনেসিয়াম তারে আবেগের আগুন ধরান বিশেষ।

সকাল থেকে রাত্রি অবধি আমাদের শরীরের কয়েক কোটি নিউরন কতবার fire করে তার হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়। চব্বিশ ঘন্টা নিউরনের দেওয়ালি হচ্ছে। তবে দেখা যায় প্রত্যেকটি নিউরন এতবার ইমপালস ব্রেনএ কাটিয়ে কাটিয়ে দিনান্তে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। নিউরনের ভিতর নিসেল গ্রানিউল বলে এক রকম জিনিষ থাকে—সেগুলো নার্ভসেলএর খাবার। প্রত্যেকবার firing হয় আর নিসেল গ্রানিউল একটু একটু করে কমতে থাকে—রাত্রি বেলায় অনেক পরিশ্রমের পর নিউরনের রসদ প্রায় খালি হয়ে আসে। তখন দিনান্তের যত অবসাদ মাথার মধ্যে নেমে আসে। চোখে নেমে আসে ঘুম। রাত্রে এক চোট ঘুমুলে সকালে দেখা যায় প্রত্যেক নিউরনের ভিতর নিসেল গ্রানিউলে ভর্তি হয়ে গেছে। আবার ইমপালস্ পাঠাতে যত firing-এর দরকার, নিউরনরা তার জন্যে প্রস্তুত। সারা দিনে এই নিউরনের উপর দিয়ে কখনও সুখের কখনও দুঃখের কখনও অব-সাদের কখনও বেদনার কত কি আবেগ চলে যায়। সবকিছুর সংকেতকে বহন করতে হয় নার্ভের জীবন্ত তারেকে।

বুদ্ধির ঘট কার কত বড়?

যে যত ঠান্ডা মাথার মানুষই হোক না কেন, তার মাথাকে উদ্দেশ্য করে কেউ যদি বলতে আসে—ঠিক গরুর মত বা গাধার মত; তার প্রতিবাদে যে একটা ছোটখাট কুরুক্ষেত্র বাধবে তা বেশ বোঝা যায়। তার কারণ গরুর মাথা ঠিক গরুরই মতন, গাধারটার ঠিক গাধার মতন। মানুষেরটা তাদের মতন হতে যাবে কোন্ দুঃখে? অতএব মানুষের বুদ্ধির ঘটে নিশ্চয়ই এমন কিছু সারপদার্থ আছে, যা অন্য কোন জীবজন্তুর ঘটে নেই। কিন্তু দুচারজন মানুষ সবসময়েই থাকে যারা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সব জিনিসই বলতে নেই একটু দেরীতে বোঝে। সেই সব বিশিষ্টজনরা হোলেন লোকনথোরার দল। কিন্তু কোন সজ্ঞান মানুষকে তার মাথা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি কি বলবেন যে, তিনি কম বোঝেন বা লেটে বোঝেন। কখনই না।

এই বুদ্ধির ঘট জীবনের ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং মানুষের ভিতর তার পূর্ণতার ইঙ্গিত এসেছে। এ জগতে এমন জীব আছে যার মাথা নেই। অবশ্য সবার মাথা থাকলেই যে মাথা থাকবে তা বলতে চাইছি না। এককোষী জীব এ্যামিবার বুদ্ধির ঘট বলতে সেই একটি সেল। সেই দিয়েই সব-কিছু করছে—আলাদা কিছু নেই। প্রাণিজগতে প্রথম বুদ্ধির ঘট তৈরী হয় কেঁচো জাতীয় জীবের মধ্যে; অবশ্য সে তেমনি ঘট—ছোট্ট এতটুকু। ওখানে কত বুদ্ধিই আর আঁটবে। মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভিতর আস্তে আস্তে বুদ্ধির ঘট ওরফে ব্রেন বড় হয়ে উঠেছে।

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে মগজের পরিমাণ বিভিন্ন প্রাণীতে অনেকটা এই রকম:

গিবন	৯২৫	কিউবিক	সেন্টিমিটারের	কাছাকাছি
ওরাং	৫০০	"	"	"
সিম্পাঞ্জি	৪৮০	"	"	"
গেরিলা	৬০০	"	"	"
অস্ট্রেলোপিথিকাস	৬৫০	"	"	"
প্রথম পর্যায়ের মানুষ (পিথিকানথ্রোপাস)	৭৫০	"	"	"
পরের পর্যায়ের মানুষ (নিয়ানডারথাল)	১৪৫০	"	"	"
আধুনিক মানুষ (ক্রো-মাগনন)	১৬৫০	"	"	"
আজকের সভ্য মানুষ	১৫০০	"	"	"
আজকের আদিবাসী	১২০০	"	"	"

এ কথাটা হয়তো এখানে প্রকট হয়ে উঠবে যে, মাথার মধ্যেকার পরিমাপটার কমবেশীর তারতম্যের উপর বুদ্ধি-বিবেচনার প্রাখর্য নির্ভর করে, কিন্তু সেটা সর্বদিক দিয়ে ঠিক নয়। কারণ মানুষের মধ্যে আজ পর্যন্ত যে লোকটি সর্বাধিক ঘিলু-বিশিষ্ট বলে পরিগণিত হয়েছেন তিনি একজন দিনমজুর। তেমনি একথাও জানা আছে এনাটোল ফ্রাঁসের মত বিশিষ্ট ধী-শক্তি-সম্পন্ন প্রতিভার মগজের পরিমাণ ছিল নিতান্ত স্বল্প—মাত্র ১,১০০ সি সি। তেমনি টুরগেনিভের মত লেখকের মগজের পরিমাপটা ছিল পেল্লায় বড়—২,০০০ সি সি। শুধু ব্রেনের পরিমাপটা কোন কাজের কথা নয়—ঘিলুর মধ্যে নিশ্চয়ই আরও কোন ব্যাপার আছে। আলোক-প্রাপ্ত মানুষের মগজের চেয়ে একজাতের এস্কিমোদের মাথা বড় হোলেও বুদ্ধি বড় নয়।

বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য নির্ভর করে মগজের ভিতরে বিভিন্ন নিউরনরা পরস্পরের মধ্যে কত ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে সাইনাপস সৃষ্টি করেছে এবং তাদের সংখ্যা কিভাবে বেড়েছে, পাকিয়ে অর্থাৎ কনভলিউসন হয়ে। মানুষের ব্রেনেই এই সাইনাপস ও কনভলিউসনএর চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যায়। যে লোক যত কেন্টবিষ্টু হবে, বুঝতে হবে তার মাথায় নিউরনরা এই দুটির কান্ড তত বেশি করে ঘটিয়েছে। গাধার মাথায় এই সাইনাপসএর সংখ্যা মানুষের তুলনায় কম। তেমনি রাফেলের মত আর্টিস্ট, দান্তের মত কবি, হেলমেটজের মত বৈজ্ঞানিকদের মাথার আয়তন ছোট হোলেও কনভলিউসন ও সাইনাপস-এর অভাব ঘটেনি। তাই তাঁরা এত বড়। বেচারা ডাইনোসররা—তাদের চেহারাটারই

দাপট ছিল—বুদ্ধির ঘট সের নয় পোয়ার সাইজে ছিল।

মাথারও মাথা আছে

বাবার যেমন বাবা আছে, প্রত্যেক মাথারও আবার তেমন একটা করে মাথা থাকে। সম্প্রতি এ কথা প্রমাণ করা হয়েছে যে, ব্রেনের ভিতরে মধ্যিখানে একটা বিশেষ জায়গা আছে সেটাকে বৈজ্ঞানিকরা বলছেন রেটিকিউলার ফরমেসন, সেই জায়গাটি মাথার যেন মাথা। মগজের বাকি আর সব জায়গা এই জায়গাটির কাছে জি হুজুর হয়ে আছে। এই জায়গাটি সমস্ত ব্রেনের তুলনায় খুব ছোট—আয়তনে জোর কড়ে আঙ্গুলের মত হবে। এখানে দেখা গেছে ব্রেনের সর্বপ্রান্তের সঙ্গে নিউরনদের সাইনাপ্‌স সৃষ্টি করে জটলা পাকিয়ে আছে। ব্রেনের অন্য জায়গার উপর এটি প্রতিক্ষণ টহলদারি করছে। এমন কি একথাও দেখান হয়েছে যে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও এই রেটিকিউলার ফরমেসন থেকেই খবরদারির বন্দোবস্ত আছে। এই যেমন এলার্ম দিয়ে রাত্রে ঘুমুলুম—সকালে যখন এলার্ম বাজল, সে খবরটি প্রথম এইখানে গোচরীভূত হয় এবং হবার পরই অন্যত্র পাঠান হয়। তারপর জাগরণ এবং আরও অন্য কাজ।

ব্রেনের অংশবিশেষের সঙ্গে এর যোগাযোগ খুব সুস্পষ্ট। ব্রেনের বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে থাকে। এই সব জায়গাকে বলা হয় সেনটারস। যেমন শোনার সেণ্টার, দেখার সেণ্টার, স্মরণশক্তির সেণ্টার ইত্যাদি যাবতীয় কাজের জন্য ব্রেনে নির্দিষ্ট জায়গা দাগ করা আছে। আর ব্রেনের উপরের বাইরের দিকটা জুড়ে যে অংশটা আছে—সেটার নাম সেরিব্রাম। অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে মানুষের সেরিব্রাম অনেকটা জায়গা নিয়ে থাকে। এই সেরিব্রামের সামনের দিকটা অর্থাৎ কপালের ঠিক ভিতরের দিকটার একটা আলাদা নাম আছে—প্রিফ্রনটাল লোব। এই জায়গাটি মননশীলতার খোদ আস্তানা। যতকিছু ভাবনা, পরিকল্পনা, চিন্তা যা সম্ভব হয় এইখানকার নিউরনদের কৃপায়। এ ছাড়া সেরিব্রামের পিছন দিকে ব্রেনের যে জায়গাটি সেটির নাম মেডালা, হৃদযন্ত্রের উপর এ খবরদারি করে থাকে।

ব্রেন থেকে কিম্বা ব্রেনের মধ্যে যখনি কোন সংকেত যায়—যাকে আমরা পূর্বে বলেছি ইম্‌পালস—সেটির পিছনে যে নানান রাসায়নিক প্রক্রিয়া আছে, সে সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা ক্রমে পরিষ্কার হয়ে উঠছে। ব্রেনের ভিতর থেকে বা তার উল্টো পথে যখনই কোন আবেগ চলে আসে, তখন সেখানে এসিটিকোলিন জাতীয় রসায়ন নির্গত হয়, ও সেই সঙ্গে তাপের তারতম্যও দেখা দেয়। এবং যখন নার্ভের ভিতর কোন আবেগ বা শিহরণ বন্ধ হয়ে যায়, তখন এড্রিনালিন জাতীয় রসায়ন বার হয়। এই নার্ভের ভিতর এসিটিকোলিন ও এড্রিনালিন বার হওয়া বা না হওয়ার মধ্যে চেতনার রাসায়নিক সঙ্কেত (Chemistry of Consciousness) পরিলক্ষিত হয়।

মানুষ মাত্রেই ছিটগ্রস্ত।

যদি সে রকম দেখার মত দেখতে হয়, তাহোলে এ কথা সহজেই ফাঁস হয়ে যাবে যে, এ দুনিয়ায় এমন কোন লোক নেই, যে না এক এক ভাবের এক এক রকম পাগল। তা চিরকালের মধ্যে হোক বা ক্ষণকালের জন্যে হোক। পাগল কি আর এক রকমের—লক্ষ রকমের—লোক যত রকমের, পাগলও তত রকমের। তার মধ্যে যাতে যাদের প্রসিদ্ধি আছে, এই যেমন—পয়সার জন্যে পাগল, বিয়ে করতে পাগল, কবিতা লেখায় পাগল, মাইক্রোশকোপ নিয়ে পাগল, দেশ সেবায় পাগল, গায়ে পড়ে আলাপ করতে পাগল; বৃষ্টির অভাবে গরমে পাগল, হেসে লুটুপুটি খেয়ে পাগল, ঘেমে গলদঘর্ম হয়ে পাগল, খুঁতখুঁতে স্বভাবে পাগল; আর সবচেয়ে বড় পাগল হোলো সাজা পাগল। এর মধ্যে আবার কেউ ছোট পাগল কেউ বা বড় পাগল। রবীন্দ্রনাথও এক ধরণের ছিটের পাগল, আবার আইনষ্টাইনও।

কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের মাথায় সাধারণ বা অসাধারণ হোক সেখানে যে এত ছিট আছে, সে কথা কিন্তু খাঁটি সত্যি। তাই অকারণেই আমাদের পাগলামি। কারণ মাথার মধ্যেকার নিউরনগুলো দু' প্রকারের—গ্রে ম্যাটার ও হোয়াইট ম্যাটার। যার যত গ্রে ম্যাটার থাকবে, তার বুদ্ধির তত কৌশল। এ সব গ্রে রংএর ছিট। এ ছিট তো বাদ দেওয়া চলে না। হোয়াইট ম্যাটার সাধারণতঃ এসোসিয়েশন ফাইবারের কাজ করে—ব্রেনের বিভিন্ন সেনটারের সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখে। খুব ছোটবেলা এই সব এসোসিয়েশন ফাইবার তৈরী হয় না এবং বুড় বয়সে এদের অবনতি ঘটে। সেই কারণে জীবনের এই দুই সময়ে বুদ্ধির প্রাখর্য থাকে না।

বুদ্ধি বেশী চাইলে সেই সঙ্গে অধিক ছিটেরও অধিকারী হতে হবে। অতএব বুদ্ধিমান মাত্রেই ছিটগ্রস্ত। জন্তু-জানোয়াররা বেশী বুদ্ধিমান নয়—তাদের মাথায়ও তাই ছিট অনেক কম থাকে। একটা বাঁদর তার হাতকে ব্যবহার করতে পারে; একটা পাখি শব্দ নকল করতে পারে, কিন্তু কেন করবে, সে কৈফিয়ৎ এক মানুষ ছাড়া আর কেউ ভাল করে দিতে পারবে না। মানুষের মাথা হোলো অভিজ্ঞতার সেফটি ভল্ট—গ্রে ম্যাটারএর সহায়তায় মানুষ এত বড় বোদ্ধা হয়েছে। তার অবচেতন মন থেকে চেতন মনে চিন্তার আনাগোনা সহজ এবং স্বচ্ছভাবে হয়। গ্রে ম্যাটার থাকার ফলে বাদ-বিচার করা সম্ভব হয়—তাই তার এত খুঁতখুঁতে স্বভাব। একটা পিঁপড়ে, একটা বিছে কিম্বা একটা হাতী কখনও মানুষের মত ল. সা. গু বা গ. সা. গু করতে জানে না। কতটুকু তাদের বুদ্ধি খাটে? এখন মানুষের মাথায় বিদ্যুতলেন্স যন্ত্র বসিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে, মাথা থেকে যে তরঙ্গ বার হয়, তার সঙ্গে অন্য প্রাণীর তফাৎ কোথায়। সাধারণ লোক অপেক্ষা যাঁরা প্রতিভাধর, তাঁদের মগজ থেকে বেশী মাত্রায় এই তরঙ্গ বার হয়।

অবশ্য প্রায়ই দেখা যায়, যাঁর বাঁধাপথের পথিক না হয়ে সৃষ্টির কোন নতুন পথ ধরেছেন, তাঁদের এই ব্যতিক্রম সাধারণের চোখে পাগলামি বলেই প্রথমে মনে হয়। এটা সেই মগজের সত্যিকার ছিটের দোষ। তাই কোপারনিকাশকেও প্রথমে সবাই পাগল ঠাওরেছিলেন, গ্যালিলিও এবং নিউটনকেও। আইনষ্টাইনও বাদ যাননি। অবশ্য এই দুনিয়াদারিতে এই রকম পাগলামিটা যে কত প্রয়োজন, তা বেশিদিন যেতে না যেতেই সবাই বোঝে। চিন্তার এমন ব্যাকুল বেগ আছে তাই রক্ষে, তা না হোলে সৃষ্টির ঘরে তালাচাবি পড়ে যেত। অনন্ত জিজ্ঞাসা চোখে নিয়ে মানুষ চাইতে ভুলে যেত।

বুদ্ধির জালে ক্রমে ক্রমে দুনিয়া বাঁধা পড়ছে। এ জিনিস কেউ কেউ বা বরদাস্ত করছেন, কেউ করছেন না—ভাবছেন দুনিয়াটা বুঝি রসাতলে যেতে বসেছে। আর এর জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী মাথার মধ্যেকার শয়তানের আড্ডাখানা—Devil's Workshop। সেখান থেকে যত কিছু কাণ্ড ঘটছে। তাই কি সত্যি? ভাবনার মণিকোঠা, যেখানে স্বপ্ন-কল্পনা উপলব্ধির আধার, সেটা যেন একটা মৌচাক। বুদ্ধি সচকিত মন নিয়ে সেখান থেকে কত কিছুর উদ্ভব—কত ব্রেন-ওয়েভ সেখানে। না দরকার হোলে থাক, আর দরকার হোলে বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া লাগুক টাটকা সিগারেট থেকে; এক টিপ নাস্য নিয়ে বুদ্ধিতে হাঁচো হাঁচ্যো হোক, কিম্বা নিদেন কাপ কাপ গরম গরম চা দিয়ে বুদ্ধি তাতুক—আসল কথা বুদ্ধির মৌচাক থেকে ফুরফুর করে নতুন ভাবনার মৌমাছি ওড়াতে পারেন—তা হোলেই সাবাস। প্রত্যেক মাথায় এক মাথা করে ভাবনার মৌমাছি।

চিঠি

শচীন দত্ত

মনে পড়ে
সেদিনই তো বস্তির সেই ছোট্ট অন্ধ কামরায়
(বারান্দায় মাতালটার বিশুদ্ধ অশ্লীল উচ্চারণ)
নীল অন্ধকারে মুখ গুঁজে বলিনি কি?
বলেছি তো,
শাশ্বতী, আমরা প্রাচীন ওই বট
সবুজ ঘাসের বুকে খসে পড়া
করুণ পাতার মত পীত
আমাদের শরীরের ঘ্রাণ আর স্বাদ শুষে শুষে
প্রহরে প্রহরে ঝরে যায়
স্তন্যপায়ী বংশধর মুহূর্তেরা।

দিনের বল্কলে বেঁধে প্রখর রৌদ্রের
তীক্ষ্ণ-তির্যক শরেরা
রাত্রির হিমের হাত মমতার মৃদু হাতে ছুঁই,
ঘাসের গভীরে যাই ডুবে, গল্প করি
আর ভাবি না কিছুই;
কোনোদিন কিছুই ভাবিনি—
কেন ওই শান্তছায়া বট আর তার কোলে
দীর্ঘাঙ্গী সাপিনী।
বলেছি তো, লক্ষ দিন কোটি বৎসরের
বিদীর্ণ পৃথিবী আর
রঙ্গীন আকাশ আমাদের বহু পরিচিত
তাই নিভে যাই যাই তবু ফের
জ্বলে উঠি কালের কল্লোলে
মৃত্যুর বধির কান্না বুকে ভরে
হই সে অনেক—অনেক
ব্যথিত মুখ দেখি ছায়া ঝর্ণা জলে.
নানা পথ ঘুরি, কেটে ছক
আমরা অনেক হই এবং একক॥

রাগমঞ্জুরিকা

সাধনা দেবী

পশ্চিম দিগন্ত পরিক্রমা শেষে শ্রান্ত আদিত্য বিশ্রাম মানসে চলিয়াছেন অস্তাচল শিখরে। শেষ দিনের লুপ্তপ্রায় রক্তিমাভা থরে থরে বিচিত্র বর্ণসুষমার ডালি সাজাইয়া আকাশ-দয়িতার বাসর কক্ষ রচনা করিতে ব্যস্ত।

প্রাসাদশিখরে স্তম্ভোপরি দেহভার ন্যস্ত করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন রাজকুমারী রত্নশ্রী। গোধূলির মনোলোভা বর্ণালিম্পনের মাধুরী উপভোগ করিবার জন্য যে তিনি শীর্ষারোহণ করিয়াছিলেন তাহা নহে। আকাশের দিকে তাঁহার দৃষ্টিই ছিল না। করপুট দ্বারা চক্ষুর সম্মুখে অন্তরাল রচনা করিয়া রাজকন্যা একাগ্র মনে শিকার অনুসন্ধান করিতেছিলেন। প্রতি-দিন এই সময়ে এই স্থানে তিনি বিশেষ ক্রীড়ায় ব্যাপৃত থাকেন। তাঁহার প্রিয় ক্রীড়া হইতেছে স্বীয় পালিত শুকপক্ষীটিকে ওষ্ঠে রক্তবর্ণ কন্দুক লগ্ন করিয়া চাতুর্যপূর্ণ ইঙ্গিত সহকারে উড়াইয়া দেওয়া, বৃক্ষে বৃক্ষে পত্রান্তরালে সে সমগোত্রীয়কে আবিষ্কার করিয়া পত্রগুচ্ছে বা পল্লব শাখায় কন্দুকটি লোভনীয় ভঙ্গীতে রাখিয়া দেয়—পরিপক্ক ফল ভ্রমে অন্য পক্ষী উড়িয়া আসিয়া চঞ্চু দ্বারা আঘাত করিতে যায়—রাজকন্যা শুধু শুকের কূজন শুনিয়া শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করিয়া পক্ষী শিকার করেন। ধনুর্বিদ্যায় রাজকন্যার পারদর্শিতা শুধু অসাধারণ নহে—অস্বাভাবিক।

পিছনে অলঙ্কার শিঞ্জন শুনিয়া রাজকন্যা মুখ ফিরাইলেন। সোপানাবলীর ঊর্ধ্ব দ্বার-প্রান্তে সহচরী মালবী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

: কি সংবাদ মালবী?

: মহারাজ স্মরণ করিয়াছেন।

: সভাগৃহ প্রস্তুত?

: প্রস্তুত রাজকুমারী।

: চলো। আমিও প্রস্তুত।

উজ্জয়িনী রাজসভা জনতার অরণ্যে পর্যবসিত হইয়াছে। সম্প্রতি রাজকন্যা রত্নশ্রী বিচারসাগর অধ্যয়ন সাঙ্গ করিয়াছেন। মহারাজ রুদ্রদামন কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন—বিবাহান্তে রাজকুমারী রাজবধূরূপ পরিগ্রহ করিয়া সুদূর বিদেশ গমন করিবেন। তাহার পূর্বে অধীত বিদ্যা প্রয়োগ ও আলোচনার নিমিত্ত তিনি স্বয়ং আজ দরবারে বসিবেন। নিদাঘ অহ্নকালের উত্তাপ অসহনীয়। সুতরাং দিনান্তে সভার অধিবেশন হইবার কথা পূর্বে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। উৎসুক নাগরিকের দল তাই দিনশেষে দরবার-গৃহ প্রায় ভাঙিয়া ফেলিতেছে।

যথাসময়ে দৃঢ় পদক্ষেপে রাজকুমারী সভা-গৃহে আসিয়া স্বীয় গজদন্ত নির্মিত আসন অধিকার করিলেন। লাবণ্যহীন উগ্র রূপের আভায় সভাগৃহের কেন্দ্রস্থ সিংহাসন মঞ্চের উপরিভাগ আলোকিত হইয়া উঠিল। ক্রমাগত শাস্ত্র ও শস্ত্র আলোচনার ফলে রাজকন্যার কোমল নবনীত দেহে কাঠিন্যের স্তর পড়িয়াছে। সিংহাসনে মহারাজ রুদ্রদামন আসীন রহিয়াছেন—একমাত্র সন্তান পুত্রসমা কন্যার বিচারকার্য প্রত্যক্ষ করিবার জন্য উৎসুক চিত্তে অপেক্ষা করিতেছেন। রাজকন্যার পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি আসনে সহচরী মালবী উপবেশন করিল। সভাগৃহ নিস্তব্ধ। ব্যগ্র জনতা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল : জয় রাজকন্যা রত্নশ্রীর জয়।"

প্রথমে কয়েকজন সাধারণ অপরাধীর বিচ
হইল। নগররক্ষক এক বিভীষণাকৃতি দস্যু
রাজকন্যা সমক্ষে নীত করিলেন—রাজক
তাহার যোগ্য শাস্তি বিধান করিলে
দুটি জটিল বিষয়—রাজকন্যা সুকৌশ
তাহার মীমাংসা করিলেন। অপূর্ব দক্ষত
সহিত পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কিত এক
সমস্যার গ্রন্থি ছেদন করিলেন।

বিচারকার্য সাঙ্গ প্রায়। গোধূলিকে বিলু
করিয়া সন্ধ্যা আবির্ভূতা হইয়াছে।

এমন সময়ে সহসা এক যুবক উত্তেজি
ভাবে সভাস্থলে প্রবেশ করিল। যুবকের ল
মুক্তার ন্যায় বিন্দু বিন্দু স্বেদকণিকা ফু
উঠিয়াছে।

: মহারাজ বিচার চাই।

মহারাজ মৃদুহাস্য করিলেন।

: আজ আমার কাছে বিচার চাহিয়া কো
ফল হইবে না যুবক।

আজ বিচারকর্ত্রী তোমাদের ভা
পালয়িত্রী রাজকুমারী।

যুবকের যুগ্ম বঙ্কিম ভ্রূলতা আকু
হইয়া উঠিল।

: রাজকন্যার নিকটে হয়তো বিচার চা
পাওয়া যাইবে। কিন্তু সে শুধুই বিচা
সুবিচার মিলিবে কি?

রাজকন্যার দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল।

: এ কথার অর্থ কি ভদ্র?

: অর্থ এই যে, প্রতিবাদী কখনো স
বিপক্ষাচরণ করে না।

: তথাপি বুঝিলাম না।

: বুঝিতে বিশেষ পরিশ্রম হইবে না।

জানিতে পারিবেন কাহার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ ?

ঃ কাহার বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ ?

যুবক অকম্পিত স্বরে একটি একটি অক্ষর স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিল,

ঃ রাজকন্যা রত্নশ্রী।

রাজকন্যার প্রখর দৃষ্টি এইবার শাণিত হইয়া উঠিল।

ঃ যুবক, মনেও করিও না যে, সভায় খুব একটা বড় রকমের চমক লাগাইতে পারিয়াছ। নিজেকে সহসা প্রকট করিয়া তুলিবার অন্য কোন পন্থা সন্ধান করিয়া বাহির কর—এ উপায় ব্যর্থ হইল। তাহার কারণ আমি, রাজকন্যা রত্নশ্রী—জ্ঞানতঃ কোনো অন্যায় কখনো করি নাই। আর যদি বা ছোটোখাটো কিছু করিয়া থাকি তো মহাক্ষত্রপ রাজকুলের নিকটেই করিয়াছি—কোনো হীন বংশজাত কর্তৃক প্রকাশ্য রাজসভায় অভিযুক্তা হইবার মতো অপরাধ রাজকুমারী রত্নশ্রী করে না।

আচ্ছা সভাসদগণ—আজিকার মতো সভা ভঙ্গ হোক।

রাজকন্যা আসন পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অমাত্যগণও দণ্ডায়মান হইলেন।

গর্বিত পদক্ষেপে রাজকন্যা মঞ্চ হইতে নামিয়া অন্তঃপুর অভিমুখে চলিয়া গেলেন। তাঁহার চীনাংশুকের সূক্ষ্ম অঞ্চল মসৃণ কুট্টিমের উপরে লুটাইতে লুটাইতে সঙ্গে চলিল। পিছনে পিছনে গেল দুই কিঙ্করী, চামর বাহিকা ও সহচরী মালবী।

যতক্ষণ তাঁহাদের দেখা গেল মহারাজ রুদ্রদামন স্তব্ধ হইয়া সিংহাসনে বসিয়া রহিলেন। তাঁহারা দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেলে তিনি সুগম্ভীর কণ্ঠে আদেশ করিলেন ঃ অমাত্যগণ। নিজ নিজ আসন পরিগ্রহ করুন। সভাস্থল ত্যাগের প্রয়োজন নাই।

অমাত্যগণ নীরবে আদেশ পালন করিলেন।

যুবক এতক্ষণ রোষে ক্ষোভে জর্জরিত হইয়া অধোবদনে দাঁড়াইয়াছিল। সহসা মুখ তুলিল ঃ মহারাজ দেখিলেন তো, আমি বলিয়াছিলাম —বিচার হয়তো মিলিবে কিন্তু সুবিচার প্রত্যাশা করিতে পারিব না—সে স্থলে বিচার করা তো দূরের কথা—অভিযোগে অবধি রাজকুমারী কর্ণপাত করিলেন না। আমাদের ভাবিষ্য পালয়িত্রী কি প্রজাদের দুঃখের কথা, অভিযোগ অনুযোগ কান পাতিয়া শুনিতে অবধি পারিবেন না? তাহাতেই তাঁহার কর্ণপীড়া ঘটিবে ?

মহারাজ শীতলকণ্ঠে বলিলেন ঃ যুবক! ক্ষান্ত হও। অগ্রে বিফলমনোরথ হইয়া তাহার পর দোষারোপ করিও, রুদ্রদামনের সভা হইতে কোনো বিচারপ্রার্থী গতকল্য পর্যন্ত প্রত্যাখ্যাত হইয়া ফিরিয়া যায় নাই—আজিও যাইবে না। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। অমাত্যগণ—আজিকার বিচার ভার অর্পিত ছিল রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারিণী রাজকন্যা রত্নশ্রীর উপরে। তিনি তাঁহার উপরে আরোপিত কার্যভার সুষ্ঠুরূপে সমাধা করিয়া সভা ভঙ্গ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্থানের পরে আমি আবার নূতন করিয়া সভা আহ্বান করিতেছি। আজিকার মূল বিচার সভার ক্ষেত্রজ শাখা বিচার সভা সান্ধ্যলগ্নে অধিবেশিত হইতেছে। মহারাজ রুদ্রদামন স্বয়ং এর বিচারপতি।

যুবক, এইবার তোমার অভিযোগ সর্বসমক্ষে ব্যক্ত কর।

যুবক একবার মহারাজের প্রতি সপ্রশংস নেত্রপাত করিল। তাহার পর অবিচলিত স্বরে কহিল, ঃ মহারাজ, রাজকুমারীর ব্যসন বড়ো মারাত্মক। তিনি নিজের খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য আমাদের মতো হীন বংশজাতদের প্রাণ সংশয় করিয়া তুলেন।

'হীন বংশজাত' কথাটির উপর যুবক ইচ্ছা করিয়াই একটু বিশেষ জোর দিল।

মহারাজ জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাইলেন।

ঃ সত্য কি? এ সংবাদ আমার অগোচর ছিল। তুমি কোন্ জাতি সম্ভূত?

ঃ আমরা ব্যাধ মহারাজ।

ব্যাধ!! মহারাজের বিস্মিত দৃষ্টি যুবকের সর্বাঙ্গ সঞ্চালন করিয়া ফিরিতে লাগিল। নগ্ন গাত্র, নগ্ন পদ, দীর্ঘকান্তি যুবক—চম্পাগৌর বর্ণ দেহের সর্বত্র দীপ্তি বিকিরণ করিতেছে। একটি মাত্র মানবদেহে বলিষ্ঠ যৌবনশ্রী এত অপরূপ হইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে?

ঃ তোমার অভিযোগ এখনো জানিতে পারি নাই, যুবক!

ঃ জানাইবার জন্যই তো রাজসকাশে আগমন করিয়াছি মহারাজ। রাজকুমারী শুকপক্ষী ও কন্দুক লইয়া প্রাসাদ শিখরে প্রতি অপরাহ্ণে ক্রীড়া করেন—গতকল্য ওই ক্রীড়াকালে তিনি আমার পালিত বানরটিকে শরযোজনা করিয়া হত্যা করিয়াছেন। এটি সাধারণ বানর নহে! মহারাজ—আমরা জাতিতে ব্যাধ, পশুপক্ষী শিকার আমাদের কৌলিক ব্যবসায় কিন্তু কেন বলিতে পারি না জন্মাবধি আমার জীবহত্যা পশু শিকারে পরম বিতৃষ্ণা। পাঁচ বৎসর পূর্বে আমি ঐ বানরটি এক বাজীকরের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছিলাম, বানরটি যে সে বানর নহে গুণে কপি-বংশীয় মর্কট—অসাধারণ চতুর।

বাজীকর বড়োই উচ্চমূল্য লইয়াছিল। আমরা অতি দরিদ্র মহারাজ, আমাদের পক্ষে যথাসর্বস্ব ব্যয় করিয়া বিনিময়ে বানরটি পাইয়াছিলাম। তাহার প্রতিদানও পাইয়াছি। যাদুকর আমাকে বঞ্চনা করে নাই। এই পাঁচ বৎসর যাবৎ ঐ বানর আমাদের ভরণ-পোষণ করিয়া আসিতেছে। উহারই নৃত্য প্রদর্শন করা বর্তমানে আমার জীবিকা—আমার বৃদ্ধ, রুগ্ন পিতা, অক্ষম অসহায়া অন্ধ মাতা, এক ভগিনী —একটি সম্পূর্ণ পরিবার ঐ বানরটির উপরে নির্ভর করিয়াছিল মহারাজ—আমার সেই প্রাণতুল্য অঙ্গদ-মাণিক্য—আমাদের সকলের অন্নদাতা, প্রতিপালক তাহাকে চক্ষুর পলকে শরযোজনা করিয়া রাজপুত্রী হত্যা করিলেন—স্বীকার করি ধনুর্বিদ্যায় তাঁহার দক্ষতা অতুলনীয় কিন্তু সে পরিচয় দানের এই কি উপযুক্ত ক্ষেত্র মহারাজ? সম্প্রতি এবং সহসা সমস্ত দ্রব্যাদি অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিয়াছে—বানরও কোনোরূপে আমাদের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিতেছিল—অতিরিক্ত একটি কপর্দকও গৃহে সঞ্চিত নাই—ঐরূপ মূল্যবান একটি জীব দ্বিতীয়বার কিনিবার মতো সামর্থ্য আমাদের ন্যায় হতদরিদ্রের কিরূপে থাকিবে মহারাজ? যদি বা কেহ অনুগ্রহ করিয়া ঋণ দান করেন তথাপি পুনরায় নূতন আরেকটিকে ধৈর্য সহকারে কতকাল ধরিয়া শিক্ষা দেওয়া—না মহারাজ আমার অত আদরের মাণিক্য......প্রজাকুলের জীবিকার উপায়কে নৃশংসভাবে বিনষ্ট করিয়া, ভবিষ্যৎ অন্ধকার করিয়া দিয়া কি আমাদের ভাবিষ্য পালয়িত্রী রাজ্যপালনরূপে মহৎ কার্যের গৌরচন্দ্রিকা সুরু করিলেন?

মহারাজ বজ্রনির্ঘোষে বলিলেন ঃ যুবক! অভিযোগ করিবার কথা, করিয়াছ। আর নয়। মন্তব্য করিবার, মতামত দিবার বা রাজপুত্রীর কার্যের সমালোচনা করিবার অধিকার তোমার নাই—স্মরণ রাখিও।

ঐরূপে একটি বানর ক্রয় করিতে কি পরিমাণ অর্থ তোমার প্রয়োজন হইবে?

(ইহার পর ২২৪ পৃষ্ঠায়)

ওগো আজিকার কবি

শ্রীমতী বাসবী বসু

তোমরা বলেছো কবিতার যুগ নাই
আমিও ভেবেছি তাই
আজিকে ভোরেই প্রখর তপন
ঘুচলো সকল মায়া আবরণ
প্রথম উষার কোমল সুষমা—আজি তার স্থান নাই।
উদয় শিখরে প্রখর সূর্য দেছে খরা রোশনাই।
বৃথা রূপকথা রচে
আজি সাহিত্যে কাব্য ঢেলো না মিছে।
পৃথিবী যে আজ ঘাত-প্রতিঘাতে
রূঢ় বাস্তব হোল সংঘাতে
হে কবি তোমার সাহিত্যে তারি জ্বালাময়
ছবি চাই।
যুগ-সাহিত্য সূচনায় আজি দীপকে আলাপ চাই।
সত্য বলেছো ভাই
কাঁদিছে পৃথিবী দিগন্তে তারি কান্না
শুনিতে পাই।

* * *

তবুও মিনতি করি
তোমার কবিতা সাহিত্য শুধু দিয়ো না
কান্না ভরি।
আরো কান পেতে রাখো—
প্রেমের পীড়নে যার লাগি কাঁদি প্রেম ভুলো নাকো।
ওগো আজিকার কবি—
তোমার কবিতা ফোটাবে কী শুধু বেদনার
জলছবি।
দেখোনি কী তুমি গোধূলি-বেলায়
আজও দিগন্ত লাল হোয়ে যায়
বেদনা মলিন ধরণীর বুকে আজও শতদল ফোটে
কপালে মায়ের চুমা পেয়ে শিশু কী হাসি
ফোটায় ঠোঁটে।
ওগো তারি কিছু দিও
তোমার দীপক আলাপে কিছুটা ললিতেও
মিশাইও।
বেদনা মলিন এ ধরার ছবি
যদি-বা আজিকে আঁকো তুমি কবি
তোমার তুলিতে তবুও কিছুটা সবুজের রং নিয়ো।
কঠিন শিকলে পরাইয়ে ফাঁস
রচো নাকো শুধু যুগ ইতিহাস—
আহরণী কিছু মধু করো তারে রমণীয়॥

চট্টগ্রামী প্রবাদ ও ছড়া

রেণুকা বিশ্বাস

ছন্দের প্রতি মানুষের চিরদিনকার আকর্ষণ। সাধারণ কথাকে ছন্দে গেঁথে বলা কোন্ দিন থেকে সুরু হয়েছিল তার কোন নির্দিষ্ট তারিখ পাওয়া যায়নি। সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দোবন্ধভাব ধীরে ধীরে কাব্যরূপ পরিগ্রহ করে মানুষকে অসীম আনন্দদান করেছে, করছে এবং চিরকাল করবে। কাব্যরস আস্বাদনের অনির্বচনীয় আনন্দ মানুষের সর্বোত্তম অধিকার। কাব্যের মূলে ভোরের কাকলির মত রয়েছে প্রবাদ, প্রবচন এবং ছড়াগুলো। কাব্যোৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে এরা কিন্তু বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। নিজস্ব মূল্যে সব ভাষাতেই বিরাজ করছে। দৈনন্দিন জীবন যাপনের মধ্যে হঠাৎ যে সত্যগুলো আমাদের দৃষ্টির সামনে প্রকট হয়ে ওঠে সেগুলোকে ছন্দে গাঁথা হয়েছে এই প্রবাদ প্রবচনগুলোতে। জ্ঞান-গর্ভ এগুলি মানুষের বহুদিনকার অভিজ্ঞতার ফল। তাই এরা হারায়নি এখনও। মুখে মুখে সঞ্চালিত হয়ে এরা বেঁচে আছে। ছাপাখানার দৌলতে কিছু কিছু প্রবাদ ও ছড়া অক্ষরের বন্ধনে গ্রন্থাবদ্ধ হয়েছে ঠিক, তবু অজানা খনির মধ্যে এমনি আরও কত অনমোল মণি-সম্পদ লুকানো আছে তার ঠিক কি! বিশেষতো লিখিত ভাষা নয় এমন লৌকিক ভাষায় এ ধরণের সম্পদ অনেক আছে। আমি একটি লৌকিক ভাষার কয়েকটি প্রবাদ এবং ছড়া আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি। ভিন্ন লৌকিক ভাষা-ভাষীরা তার রসগ্রহণ করে আনন্দ পাবেন নিঃসন্দেহ। ছড়াগুলোও লৌকিক প্রয়োজনে সৃষ্ট এবং সমাজের আনাচে কানাচে এর প্রভাব এখনও বর্তমান।

চট্টগ্রামী লৌকিক ভাষার প্রবাদ এবং ছড়াই এ প্রবন্ধের উপজীব্য। তার আগেই বলে রাখি চট্টগ্রাম মুসলমানপ্রধান স্থান। হিন্দুদের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়, কারণ মুসলমান এবং ইংরেজ আমলে বাঙলার অন্যান্য প্রান্ত থেকে অনেক হিন্দু এসেছিলেন চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করার জন্য। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীও আছেন। এঁরা হিন্দুদেরই একটা অংশ। এই তিন ধর্মাশ্রিত সম্প্রদায়ের লৌকিক ভাষায়ও কিছুটা পার্থক্য বর্তমান। একই কথা হয়ত তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভিন্ন শব্দকে অবলম্বন করেছে। অবশ্য ভাবগত মূল্য অপরিবর্তিতই রয়েছে। হিন্দু এবং বৌদ্ধদের মধ্যে পার্থক্য কম এবিষয়ে। কিন্তু মুসলমানদের সঙ্গে শব্দগত এবং উচ্চারণগত পার্থক্য খুব। যেমন হিন্দুরা "সকাল"কে বলবেন "বেয়ান্যা" (বিহান) কিন্তু মুসলমানরা বলবেন "ফজরত।" হিন্দুরা বলবেন "আন্দুআ" (আজকে), মুসলমানেরা বলবেন "আজিয়া"। প্রবাদ এবং ছড়ার মধ্যেও এমনি শব্দ এবং রচনার পার্থক্য আছে। তবে সব সময়ে এটি প্রযোজ্য নয়।

প্রথমে কয়েকটি প্রবাদের কথা বলছি।

(১) উয়ার (উঁচু ঢিবির) উত্তর (উপর)
উইট্‌টো (উঠেছো) বলি
ও'চোল (উঁচু) অই (হয়ে) ন'অ
যাইও (যেও না),
মাঝে মাঝে মনত্ কইর (মনে করে)
নীচ্‌র (নীচের) মিক্যা (দিকে)
চাই-ও (দেখো)।

কথাটার মূলে উপদেশটুকু বুঝতে বিশেষ কষ্ট হবে না। উঁচুতে উঠে যেন নীচের কথা না ভুলে যান কেউ, তাই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

(২) থাইক্‌তো (থাকবার জন্য) নাই
জাগা (জায়গা)
কুত্তা (কুকুর) আইন্যে (এনেছে)
বাগা (ধার হিসাবে)

নিজের থাকবার জায়গা নেই, অন্যকে ঘরে আশ্রয় দিতে এনেছে। উদারতা কিম্বা চক্ষুলজ্জা যার খাতিরেই হবে হোক না এমন কাজ না করার উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। কারণ এতে নিজেকে বিপদগ্রস্ত করা হয় মাত্র।

(৩) হতীনর্ (সতীনের) পোআরে দি'
(ছেলেকে দিয়ে)
হাপ্ (সাপ) ধরান্ (ধরানো)।

বিপদের ক্ষেত্রে অন্যকে ঠেলে দিয়ে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করা সম্বন্ধে এটি প্রয়োগ করা হয়।

(৪) কাইল (কালকের) বেয়াইন্যার (সকালের)
গাত্তোআ (গর্তে বাস করে যে) যোগী
(যুগী-তাঁতী), বাত্তরে (ভাতকে) কঅযে
(বলে যে) অন্ন।

অশিক্ষিত বা সমাজের নিম্নস্তরের লোক যদি শিক্ষিত বা উচ্চস্তরের লোকের মত আচরণ করে তাহলে তাকে বিদ্রূপ করে এই প্রবচন উল্লেখ করা হয়।

(৫) ওরে নিদ্ধন্যায় (নির্ধন) ধন পাইলে (পেলে)
টিবি টিবি (টিপে টিপে) চায় (দেখে),
ওরে হা-বাত্যায় (হাভাতে) বা-ত্ (ভাত)
পাইলে
মথি' মথি' (ভাল করে মেখে মেখে) খায়।

কিছুটা বিদ্রূপ এবং কিছুটা সমবেদনার আভাস রয়েছে এই প্রবচনটিতে। যে কখনও কোন জিনিস পায়নি, আকস্মিকভাবে কিছু পেলে তার প্রতি অহেতুক সাবধানতা অবলম্বন করে, তা' নিয়ে গর্ব করে। যার পেটে ভাত পড়েনি অনেককাল, সে যে প্রতিটি গ্রাস অতি যত্নে এবং পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাবে তাতে আর সন্দেহ কি? কোন জিনিসের প্রতি অতিরিক্ত দরদ দেখালে তাকে খাটো করার জন্য বিদ্রূপাত্মক অর্থেও প্রযোজ্য হয়।

(৬) বন্ পোড়া যা (যায়) হঅলে (সকলে)
দ্যাকে (দেখতে পায়),
মন্ পোড়া যা কেঅ (কেহ) ন' দ্যাকে।

গভীর সমবেদনায় এর রচয়িতা এ প্রবাদ রচনা করেছেন। বন এত বড় যাতে আগুন লাগলে সকলেরই দৃষ্টিগোচর হয়। মনের তল পাওয়া যায় না, সীমা পাওয়া যায় না। অথচ গভীর দুঃখ-বেদনায়, শোকে, বিরহে সে মন যখন জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যায় তখনও সহজে চোখে পড়ে না। পড়ে না বলিই বা কি করে? সংবেদনশীল মন হলে মানুষের বহিরঙ্গে মনের যতটুকু ছায়া প্রতিফলিত হয় তা' থেকে ঠিকই বুঝতে পারে। এমনি মনের সংখ্যা কম।

এ ধরণের অসংখ্য প্রবাদ প্রবচন চট্টগ্রামী ভাষায় রয়েছে।

কয়েকটি ছড়া পরিবেশন করছি। ঘুম-পাড়ানী ছড়া, খেলার ছড়া, ঋতু ভেদে গাওয়া হয় এমন বহু ছড়া রয়েছে। ছড়ার আকারে বহু ধাঁধা ও হেঁয়ালীও আছে।

হেঁয়ালী—

(১) বড় পইর (পুকুর) মাঝে
কালা বিলাই (বেড়াল) হাঁসে (হাসে)
কালা বিলাই লড়ে চড়ে
ঝুর্‌ঝুরাইয়া মুক্তা পড়ে— (উঃ খই)।

(২) আকাশেতে চুল্‌মুল্‌ (চুল্‌চুল্)
পাতালেতে (পাতালে) লেজ
কন্ খোদায় (কোন্ খোদা) বানাই দিয়ে
(বানিয়ে দিয়েছে)
বুয়র্ (বুকের) মাঝে কেশ। — (উঃ আম)

(৩) ইলত্ (এখানে) লুড়ে (লুটিয়ে পড়ে)
বিলত্ (বিলে অর্থাৎ ওখানে) লুড়ে
লেজত্ (লেজে) ধইল্লে (ধরলে)
ফাল্ দি' (লাফ্ দিয়ে) উড়ে (উঠে)।
—(উঃ ঢেঁকি)

শিশুকে দোলনায় শুইয়ে-ঘুম পাড়ানোর রীতি সব দেশেই আছে। এই গানগুলির আবেদন সার্বজনীন। চট্টগ্রামে দোলনাকে বলে "চুলইন"। ছোট্ট শিশুকে এতে শুইয়ে দোলনা দুলিয়ে দুলিয়ে—গান করেন চট্টগ্রামী মায়েরা। অথবা কাঁধের উপর শুইয়ে হেঁটে হেঁটে, কোঁল পেতে বসে কোলে শুইয়ে কিংবা শুয়ে শিশুর গায়ে আস্তে আস্তে চাপড় দিয়ে—বা হাত বুলিয়ে মায়েরা গান করেন।

(১) অলি অলি অলি (মৃদু হাতের চাপড়
দেবার শব্দ)
বাইরগ্যা বাঁশর্ (এক ধরণের মোটা বাঁশের)
ঝাঁক (বেড়া)
দৈরগ্যা পুডি (নদীর পুঁটি মাছ)
ধইর্‌গেয় (ধরেছে) উজান্
পগলা (পাগলা) ঘুম্ জাইতো (যাবে)
বলি (বলে)।

পাগলা ছেলেটা ঘুমাবে বলেই তো নদীর পুঁটি মাছগুলো উজান বেয়ে যাচ্ছে। বাঁশের একরকম মাছ ধরার ফাঁদ পাতা হয় বর্ষায়। ঝাঁকে ঝাঁকে পুঁটি, মোরলা মাছ জলের সঙ্গে এসে সেই ফাঁদে ঢোকে। সম্ভবতো এমনি ফাঁদে আটকে যাওয়া বর্ষার বড় বড় ডিমভরা পুঁটির লোভ দেখানো হচ্ছে শিশুকে। বর্ষায় খাল, বিল যখন জলে ডুবে যায় তখন পুকুরের পাড় কেটে দেওয়া হয় জল বার করার জন্য এবং খালের মাছও পুকুরে ঢোকে। এ সময় সেই কাটা অংশে ফাঁদ পাতা হয়। এই ফাঁদে মাছ ঢোকার দৃশ্য যাঁরা দেখেছেন তাঁরা বুঝতে পারবেন কেন শিশুকে এই গান গেয়ে ঘুম পাড়ানো হচ্ছে।

(২) ও বাঙ্গাইল্যা, ও বাঙ্গাইল্যা, (তাঁতী জোলা
প্রভৃতি সম্প্রদায়কে সাধারণভাবে বলা হয়)
তুলি' (তুলে) ধরঅ (ধর) ছাতি (ছাতা)
ছোডঅ ন' মোডঅ ন' (ছোটোমোটো নয়)
—(অমুক) শউর্ (শ্বশুরে) নাতি।

ছোটদের বড় হবার সখ চিরন্তন। তাই যেন রচয়িতা বলতে চান ছোট নয়, খোকা বড় হয়েছে, তাকে সম্মান দেখিয়ে মাথায় ছাতা ধর। অমুকের স্থানে ঠাকুরদার নাম অথবা পদবী জুড়ে তারপর গাওয়া হয়।

(৩) দঅ দঅ (দোলনা দোলাবার শব্দ)
লালার মা (খোকার মা)
কি বা-ত্ (ভাত) রাইন্ধঅ (রেঁধেছো)
চাইল—এনা, (এ যে চাল শুধু)
গঅরে মুজুরে (কুলি-মজুরেরা) খাইল না,
বাঁদী-এ দাসী-এ (দাসীবাঁদীরা)
পাইল না (পেল [illegible]

টুক্কুরুশ্। (কপালে টিকা দেবার সময় মুখে এ আওয়াজ করা হয়)
দোলনায় শোয়া খোকাখুকু দোলনার দুলুনীতে, সুরের মোহে ও স্নেহের স্পর্শে (কপালে) ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখে, আর মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে রাখে মুখে।

(৪) আয় চান্ আয় চান্ (আয় চাঁদ আয়)
কলা (মুসলমানেরা 'কেলা' বলেন)
দিয়োম (দেবো) মলা (মোয়া) দিয়োম্
ধেয়ান গাইঅর (গরুর) দুধ্ দিয়োম্
আরজ (আমাদের) বাছারে চুম্ (চুম্বন)
দিয়োম।

চাঁদকে আহ্বান করা হচ্ছে যেন স্বপ্নজাল বিস্তার করার জন্য। লোভ দেখান হচ্ছে দুধ, কলা এবং মোয়া দেওয়া হবে। কিন্তু স্বপ্ন দেখা শিশুকে শুধু স্নেহচুম্বনই দেওয়া হবে।

ঘুমপাড়ানী এই গানগুলো শুনলেই বোঝা যায় সুর এবং বিষয়বস্তু সবই গ্রামাজীবনের। সহজ সুন্দর সুর এবং দৈনন্দিন জীবন থেকে আহরিত কথায় যে ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে তা নাগরিক কৃত্রিম জীবনে দুর্লভ।

শিশুর দু'হাতে তালি দিয়ে শিশুর খেলার সংগী হয় মা, বাবা, ভাই-বোন সকলে।

† তাই তাই তাই,
নানার (দাদুর) বাড়ীত্ (বাড়ীতে) যাই
নানার-বৌএ (দিদিমা) বা-ত্ ন' দিলে
পাতিলা (হাঁড়ি) ভাংগি খাই।
পাতিলার (হাঁড়ির) মইধ্যে (মাঝে)
ধোরা হাপ্ (ডোরা সাপ)
ফাল্ দি' উইট্ট্যে (উঠেছে) বউর্ (বৌ এর)
বাপ্।
বউর্ বাপ্ চতুরা (চতুর)
দৈরগ্যার (নদীর-দরিয়ার) পানি মথুরা।
মথুরার মইধ্যে চিঅন (পাতলা) মুতি,
বলদে নিল শিংগত্ (শিংএ) গাথি (গেঁথে)
বাড়ীইছে (বাড়ীর পেছনে) কানাইয়া (কানাই)
বদ্দার্ (বড় দাদার) বউ ন'নাইয়া (আহ্লাদে)
অ বউ, অ বউ ন' কাইন্দ্যো (কেঁদোনা)
বদ্দা আইলে (এলে) বাপ্ ডাইক্যো (ডেকো)।
যাইম্‌গৈ রে (চলে যাবো) যাইম্‌গৈ
আন্ডা (ডিম্) খোলাত্ (তপ্ত খোলা বা ভাজবার পাত্র) দিয়োমগৈ (দেবো)
আন্ডা খাইএ বিলাইএ (বেড়ালে)
বউরে (বৌকে) ধরি (ধরে) কিলাইয়ে (মেরেছে)।
শীত্ত গরার্ (করছে) যে শীত্ত গরার্
বা-ত (ভাত) বারের (বাড়ছে) যে কনে (কে)
খা-র্ (খাচ্ছে)
কিস্তা মিস্তা মাইরগলর্ (নারকেলের)
চুচ্ (কোরা নারকেল)
বঅর্ ত্তে (বাপের) ন' উইট্টো (ওঠেনি)
পোয়াথে (ছেলের) উইট্টো (উঠেছে) মউচ্
(মোচ্)

ছড়া কেটে খেলাগুলোও সুন্দর।

১। দুধা খেলা

১ম—দুধারে দুধা দুধ্ ক্যা (কেন) ন' দেস্ (দিস)
২য়—বাগর্ (বাঘের) ডরে।
১ম—বাগে কিইরে? (বাঘ কি করে?)
২য়—মারে ধরে। (মার-ধোর করে)
১ম—বাগর্ নাম কি?
২য়—"উইটা"
১ম—চুলত্ (চুলে) ধরি (ধরে) মুইট্ট্যা
(ঘুঁষি লাগাও)

২। হাডু-ডু

† উলু (নলখাগড়া) বনে অইন্ (আগুন) দিলে
চচ্চরাইয়া (চড়চড় করে) যায়।
যেই পোয়াউয়া (ছেলে) বাপ্ ডাবি (ডাকবি)
*লগে লগে (সংগে সংগে) আয়।

হুম্ মাকে মারে ঘুম্
চাইন্‌চোড়া (চড়ই) খলিফা বাদ্‌শা হুম্।
উত্তরে (উত্তরে) গেলাম্ বেত্ কাইড্‌তাম
(কাটতে)
বেতে ছড়্‌ছড়ায় (বেতের শব্দ)
হাঁড়িকুঁড়িয়ে (হাঁড়িচাচা) বজা পারে
কঅলে (ঘুঘু) কট্‌কডায় (ঘুঘু ডাকে)।

আরও দু'একটি ছড়ার পরিবেশন করছি। ছোটোরা এগুলো ঘরে ঘরে জানতো এক সময়ে চট্টগ্রাম অঞ্চলে। এখনও আছে। ভাঙ্গা ঘরে বাতি জ্বালিয়ে রেখেছেন মুসলমান ভায়েরা। তবে একটি ধারা বিলুপ্তির পথে। কারণ হিন্দুরা আজ সোনার দেশ ছাড়া হয়ে ছিন্নমূল নাম নিয়ে এঘাটে-ওঘাটে জীবনতরী ভিড়িয়ে কোনমতে বাঁচার চেষ্টা করছেন।

শীতের সময় ঘন বন সন্নিবিষ্ট পাহাড়ী এই জায়গাতে শীতের প্রকোপ বড়ো কম হয় না। "উঃ কী শীত। কষে গাও গীত।"—এনীতি অনুসরণ করার জন্যই যেন বলা হয়—

রোইদ্ দে রোইদানী (রোদদাত্রী)
চাঁদার মা-রে (মাকে) ফুতানী (শুইয়ে দাও)।
চাঁদ্‌র (চাঁদের) হাতত্ (হাতে) বকফুল
চচ্চড়াইয়া রোইদ (রোদ) তুল্ (তোল্)

মঅরঅ (মামার) পিছে কলার-ডিগ্ (কলার ছড়া)
কলা অইয়ে (হয়েছে) বা-তি (আধপাকা)
গোঁয়াইর্ (গোঁসাঈ' বা ঠাকুরের) মাথাত্
(মাথায়) ছাতি।
দেয়াল্‌র্ (দেওয়ালের) মাথাত্ লাথি।

ব'অনর্ ঝি রে ব'অনর্ ঝি (বামুনের ঝি)
সুয্যা (সূর্য) উইট্টে (উঠেছে) কোন্নান্‌দি
(কোথায়)?
বেল্ গঅর (গাছের) তল্লান দি (তলায়)
বেল্ ধইরগ্যে (ধরেছে) থোবা থোবা
(থোকা থোকা)
চিলে মাইরগ্যে (মেরেছে) এক্কো (এক)
থাবা (ছোঁ)।

রোদ দিতে পারে রোদানী। তাকে বলা হচ্ছে রোদ দিতে। রাতের রাজা চাঁদ। তার মাকে শুইয়ে দেওয়া হোক্ সে ঘুমাক্ আর রোদানী সেই ফাঁকে চড়্‌চড়্ ক'রে রোদ্ তুলবে। মামা-বাড়ীর পেছনে কলার ছড়াগুলো আধপাকা হয়েছে। সম্ভবতঃ রোদানীকে এই জন্যই বলা হচ্ছে এক কথায় যে আর একটু তাপ পেলে কলাগুলো পাক্‌তো। এমন রোদ উঠুক যেন ঠাকুর দেবতার মাথায় ছাতা উঠুক। বৈশাখ মাসে চট্টগ্রাম অঞ্চলে ঠাকুরদেবতার মাথায় ছাতা ওঠে তাঁদের রূপোর বা সোনার ছোট্ট সিংহাসনের ওপরে। সব দেওয়ালের মাথায় লাথি মেরে সম্ভবতঃ বোঝানো হচ্ছে যে ঘরের অন্ধকারে বড্ড শীত। দেওয়াল ভেঙ্গে সূর্যের আলো ঢুকতে দাও। তারপরেই কুলশ্রেষ্ঠ বামুনের মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে "বামুনের ঝি (মেয়ে) তুমি বলতে পারো কোথায় সূর্য ঠাকুর দেখা দিয়েছেন?" বামুনের মেয়ের জবাব—বেল্ গঅর (গাছের) তল্লান্‌দি (তলে)। সে বেল-গাছে বেল ধরেছে অনেক আর চিল এসে তাতে ছোঁ মেরেছে। চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চলে খালি গায়ে দোলানী অর্থাৎ মোটা সুতোর চাদর গায়ে জড়িয়ে পুকুরপাড়ে বা উঠোনে অথবা দাওয়ায় বসে দুলে দুলে এই ছড়া গান করে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা। গ্রামে অফিস বা স্কুলের তাড়া বিশেষ নেই। সাধারণ গৃহস্থ এবং কৃষকের বাস। তাঁদের ছেলেমেয়েরা এমনি ছড়া পেলে শীত তাড়াবার চেষ্টা করে আর যেন তাদের গানের জোরেই হঠাৎ রোদের প্রসন্ন হাসি ঝল্‌মল্ করে ওঠে শিশির ধোওয়া ঘাসের ওপর।

সরস্বতীকে কি দান দেবো? না কুল। এত সাধের কুল হোকনা তার আকৃতি এত ছোট্ট। এর প্রতি ছোটদের আকর্ষণ দুর্বার। তাই কুলের প্রথম অবস্থাতেই টের পেলে গাছে পাতা সুদ্ধ থাকে না ছোটদের দৌরাত্ম্যে। এর হাত থেকে গাছগুলোকে রক্ষা করার তাগিদে সরস্বতী পুজোর আগে কুল খাওয়া মানা। বিদ্যে হবে না তাহলে এই দোহাই দেওয়া হয়, কিন্তু সত্যি বলতে কি ছোটদের মধ্যে নাস্তিকের সংখ্যা বেশী। ছোটদের বলি কেন, আমরা অল্পস্বল্প বড়োর দলও এবিষয়ে ঘোর নাস্তিক। ছড়া কেটে কেটে কুলগাছের ডাল নাড়া দেওয়া বা টুপ টুপ করে কাঁচা-পাকা ঝরে পড়া কুলগুলো কুড়ানোর মজা যাদের অভিজ্ঞতা নেই তাঁরা কম বুঝবেন—

নাতিন্ বড়ই খা, বড়ই খা
(নাত্‌নী কুল খাও)
হাতে লইয়া নুন্
ঠেইল্যা ভাঁঞ্জ পইরগ্যে নাতিন্
(ডাল ভেঙ্গে পড়েছে নাত্‌নী।
বড়ই গাছথুন
(কুল গাছ থেকে।)
কেয় কঅ জে আছে পরাণ
(কেহ বলে আছে প্রাণ)
কেয় কঅ জে নাই।
চোক্ পাগাইয়া আছে নাতিন্
(চোখ মেলে)
লাল্ বড়ইওয়ার লাই—
(লাল কুলটির জন্য)।

দাদুর মনে বড়ই কষ্ট। বেচারী নাত্‌নী। কুলগাছের ডাল ধরে নাড়া দেবার সময় নরম ডাল ভেঙ্গে পড়ে গেছে। কাঁটা গাছের ডাল ভেঙ্গে উঁচু থেকে পড়েছে নীচে। আশংকার কথা। কেউ বলে প্রাণটা আছে আবার অন্যরা বলে না প্রাণ নেই ধড়ে। দাদুর প্রাণ হাহাকার করে উঠেছে, কারণ আহত নাত্‌নী তখনও যেন বড় বড় চোখ করে লাল টুকটুকে কুলটার দিকে তাকিয়ে আছে! আহা ঐ কুল খাওয়ার জন্যই তো এত অঘটন! কিন্তু গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়ার ভয় যতই দেখানো যাক না কেন, ছোটদের দৃষ্টি মন প্রলুব্ধ হয়ে ওঠে তবু, লাল টুকটুকে, মিঠে-টক কুলগুলোর জন্য। যেন যতই বলো 'আমি কি ডরাই কভু..."

আরও কত ছড়া আছে। বিভিন্ন ঋতুতে ফুল, ফল ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য সম্পদ দোলায় মানুষের মনের কোমল তারে ঘা দিয়ে লেখা কত ছড়া। এইগুলি সংগৃহীত হয়ে ছাপা হলে বাঙলা সাহিত্য আরো সমৃদ্ধ হবে। শুধু চট্টগ্রামী কেন, অন্যান্য লৌকিক ভাষা সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। কিছু কিছু সংগৃহীত হয়েছে সত্য। কিন্তু আরও অসংখ্য অনাবিষ্কৃত হয়ে রয়েছে। সুধীজনের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষিত হ'লে একটি বড় কার্য সাধিত হবে। বিশেষ করে বাঙলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধকদের এই বিষয়ে দৃষ্টিক্ষেপ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

---

† মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত।
*বিশেষ করে মুসলমানরা বলেন। হিন্দুরা বলেন "হঙ্গে হঙ্গে"।

ইস্কুল থেকে দূরে

অনিল বসু
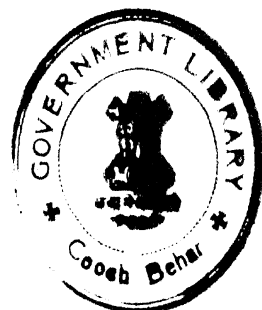
দি মার্কেসাস্ আরকিপেলাগো—এ পার্ট অফ দি পলিনেশিয়ান গ্রুপস্ অফ আইল্যান্ডস্ ইন্ দি প্যাসিফিক ওশেন। ইট ইজ আন্ডার স্প্যানিস অকিউপেশন। দি টু লারজেস্ট আইল্যান্ডস আর নুকুহিহবা অ্যান্ড হিহবাওয়া—'

পলিনেশিয়া! পলিনেশিয়া!

নুকুহিহবা, হিহবাওয়া সামোয়া পাগো-পাগো তুয়ামোতু গুলোসেঙ্গা তোঙ্গা হাওয়াই ফিজি ফিনিক্স—দ্বীপময় পলিনেশিয়া।

নির্মেঘ দিনে যেদিকে তাকাও, দেখবে নীল। সমুদ্রের ঘননীল ফিকে হয়ে মিশে গেছে দিগন্তের আকাশে। সাগরবিহঙ্গের মতো শূন্য থেকে নীচে তাকাও, দেখবে প্রবাল দ্বীপের মালা। নীল মেখলা ফুলিয়ে পান্নার হার দুলিয়ে চলেছে সুন্দরী বসুন্ধরা। তারপরেই সহসা কখন যেন দিকচক্রবালে দেখা যায় কালোর আভাস; বেড়ে যায় বাতাসের বেগ, চঞ্চল হয়ে ওঠে সিন্ধুলহরী। ঘরমুখো হয়ে জেলে ডিঙি ক্যাটামারানের বহর ছুটে আসে দ্বীপের নিরাপদ আশ্রয়ে। পুঞ্জপুঞ্জ মেঘ ধেয়ে আসে ট্রেডউইন্ডসে ভর ক'রে। আসে তুফান, আসে হ্যারিকেন।

'তুমি কিচ্ছু শুনছ না, বাবা! আমার ভুল হলো তা তুমি ধরলে না!'

'কি ভুল হলো, সোনা? দ্যাখো দেখি, কিছুই শুনিনি তো!'

'ওই যে বলে ফেললাম—স্প্যানিশ অকিউপেশন সে তো অনেক আগে ছিল, এখন মার্কেসাস তো ফ্রেঞ্চ পোজেশন।'

তাই তো শকুন্তলার জিওগ্রাফীর পাতায় চোখ রেখে চিত্তদুয়ার খুলে কোথায় পড়েছি বেরিয়ে। পড়া বলতে এসেছিল আমার মেয়ে শকুন্তলা। আমি মন দিচ্ছি না, তাই গঞ্জনা।

না মা তুমি ব'লে যাও, এবারে শুনব। ল্যাটিচিউড-লঙ্গিচিউড বলো, বলো টোট্যাল এরিয়া কত, আর পপুলেশন?'

'হ্যাঁ বাবা, বলছি। আচ্ছা আমি ব'লে যাই আর সঙ্গে সঙ্গে তুমি ম্যাপটা দ্যাখো, কেমন? —ইট এক্সটেন্ডস ওভার টু-হ্যান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি মাইলস্, টোট্যাল এরিয়া—'

মহাসিন্ধুর বুকে ওই বিন্দুর সমষ্টি—ওর কোনটি তোঙ্গাবাতু, যার এক পাশে কোলোহনাই গ্রাম? গাঁয়ের আকাশে পাক খেয়ে এসে হ্যালসিওন পাখী বুঝি ভাসে সমুদ্রের বুকে; ঢেউ নাচে আর হ্যালসিওন বুঝি দোলে সেই নাচের তালে। ওদিক থেকে ব্রেকার্স এসে কোর‍্যাল রীফে আছাড় খায়। প্রবালের বাঁধ ভেঙে সে ঢেউ এপারে লেগুনের স্বচ্ছ নীলকান্ত শান্তি বিক্ষুব্ধ করে না।

নুকুহিহবার কন্যা, কোলোহনাই গাঁয়ের বধূ ফিলিতা, ফিলিতার স্বামী মিসা আর তাদের বাচ্চা মেয়ে মোআনা; মাদাম নিকোলেৎ-এর পলিনেশিয়ান ব্যালে—একে একে মনে পড়ে সকলকে। আর ব্যথায় মন ভারে যায় ফ্রাঁসোয়া দাভিয়ের কথা ভেবে।

'বাবা, তুমি বইয়ের পাতায় না দেখে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছ কেন? দ্যাখো না মা, বাবা আমার পড়া নিতে গিয়ে কেমন মজা করছেন। কিচ্ছু শুনছেন না, খালি খালি অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন।' হতাশ হয়ে হাসে শকুন্তলা। চায়ের পেয়ালা হাতে মা ঢুকছিল ঘরে, মেয়ে বাবার নামে নালিশ করছে।

অভিসারিকা ফিলিতা।

পামের পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে ফিলিতা গুন্ গুন্ ক'রে গান গাইছে লেগুনের ধারে ওই উঁচু ঢিবিটায় হেলান দিয়ে। আর মিসা? সে বুঝি পাশে আধ শোয়া হয়ে ফিলিতার গলার পদ্মহার নিয়ে খেলা করছে।

না-কি ফ্র্যাঙ্গিপানি-চর্চিত ফিলিতার অঙ্গ-সৌরভে গন্ধ-বিধুর বাতাস আর সেই সুগন্ধে ফ্রাঁসোয়া বিহ্বল! রক্তজবার গুচ্ছটা চুল থেকে খসে পড়েছে। শ্রান্তিতে এত আরাম, এত সুখ!

আজে-বাজে কি যে ভাবি! সে তো বিশ বছর আগেকার কথা; এখন বয়সের ভারে ভারী হয়েছে নৃত্যচঞ্চল তনুদেহ, কালো চুলে লেগেছে রুপোলীর ছোঁয়া। নুড়িছাওয়া ঘরের মেঝেতে নিজের হাতে-বোনা মসলন্দে শুয়ে শুয়ে হয় তো নিষ্পলক তাকিয়ে আছে ফিলিতা রাতের শেষ তারার দিকে। হয় তো পাশে হাত বাড়িয়ে ঘুমকাতর মিসার কণ্ঠলগ্ন হয়ে তার বুকে গুঁজেছে মাথা, যেমন করতো কেনুকুঞ্জের বাসর শয়নে, অনেক অনেকদিন আগে। নয়তো কান পেতে রয়েছে ফিলিতা, যদি শুনতে পায় তরঙ্গের গর্জনে ফ্রাঁসোয়ার কণ্ঠস্বর।

মোআনা? সে কোথায়? অভিসারের পালা সাঙ্গ করে মেয়েটা কি আজ বেছে নিয়েছে তার ঘর-বাঁধার সাথীকে? কি জানি!

কোলোহনাইয়ের প্রবাল-বাঁধের গায়ে সাগরের গভীরে শুক্তিশঙ্খের আশে-পাশে আজও কি এই মুহূর্তে ফ্রাঁসোয়ার মোটা গলায় নীচু ক'রে আবেগ ভরে গাওয়া সেই গানের সুরের রেশ ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে:

ও-সুইট্ ফিলিতা, ফেয়ার ফিলিতা,
ডে অ্যান্ড নাইট আই ড্রীম অফ ইউ লাভ
অ্যালোন,
হোয়্যার দ্য সার্ফ লে-হু-য়া লেহ[illegible],
দেয়ার আই ওয়ান্ডার বাই ইটস্ ওয়েভস্,
এভার লংগিং ফর ইওর লাভ, মাই ওন্!

—এক—

পথ নির্দেশ করতে গিয়ে এই কলকাতার রাজপথেই একদিন ফ্রাঁসোয়া দাভিয়ের সঙ্গে

আলাপ না হয়ে গেলে ফিলিতা মিসা-নিকোলেৎ এদের কাউকেই আমি জানতে পারতাম না. আর তা'হলে হোসেন সারেঙ্গীরা, বড়ে মিঞা কিম্বা আলম-মীর্জার কাহিনীর মতো আরও একটা গল্প আমার বলাই হয়ে উঠত না।

'সরি টু ট্রাবল্ ইউ স্যার, কড ইউ প্লীজ টেল্ মী হোয়্যার দি নেদারল্যাণ্ড ব্যাংক ইজ্ ?'

লোকটি নেদারল্যাণ্ড ব্যাংকের অফিসটা খুঁজে পাচ্ছে না, ভদ্রতা করে বিদেশীকে একেবারে ব্যাংকের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে গেলাম।

বিরাট লম্বা লোকটি। গায়ের রঙ মিশ-কালো। মাথার চুল নিগ্রোদের মতো পশমী—কিন্তু একটু যেন বাদামীর লেশ আছে। লম্বা লম্বা পা ফেলে অফিসপাড়ার ওই বেলা এগারোটার ভীড়ে পথচারীর গা বাঁচিয়ে চলছে—সে-চলা যেন মানুষের চলা নয়; বনের মধ্যে গাছ-গাছড়া এড়িয়ে যেন সাবলীল ছন্দোময় গতিতে চলেছে কালো একটা প্যান্থার।

ব্যাংকের অফিসের দরজায় পৌঁছে সে আমার হাত ধ'রে বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই ব্যস্ত মানুষ। কাজের সময়ে তোমার দেরী ক'রে দিলাম, কিন্তু তুমি আমায় রাস্তা চিনিয়ে না দিলে আমাকে যে আরও কতক্ষণ খেই হারিয়ে ঘুরে মরতে হতো, কে জানে! এক ঘন্টা ধ'রে পথের লোক কেবল আমায় উল্টোপাল্টা ঘুরিয়ে মেরেছে।'

এর উত্তরে যা বলতে হয় তাই ব'লে তার হাত ছেড়ে দিয়ে নিজের পথে এগোচ্ছিলাম। লোকটি আবার আমায় থামালো। বলল, 'যদি খুব ব্যস্ত না থাকো তো আজ বিকেলে আমার হোটেলে এসে আমার সঙ্গে চা খাও না—এই যে আমার কার্ড।'

লোকটিকে বেশ ভালো লাগছিল। একটু ভেবে বললাম, 'বেশ তো যাব।' অফিসের কাজ সেরে গেলামও।

সব বাটাভিয়ার প্রোগ্রাম শেষ করে ইম্প্রেসারিও মাদাম নিকোলেৎ কলকাতায় এসেছেন কন্টিনেন্টাল হোটেলের সঙ্গে চুক্তি-বদ্ধ হয়ে। আপাততঃ তাঁর সঙ্গে আছে কেবল দুটি শিল্পী ফিলিতা আর মিসা—স্বামী-স্ত্রী। স্ত্রী নাচে আর গায়, স্বামী গীটার বাজায়। এখানে এরা দুজন, কলম্বোয় তুপেলো আর নিউজ্যালা কায়রোতে তুলিপা আর মেলো, এডেনে মাসিনা আর আলো—এমনি করে নিকোলেৎ-এর শিল্পীরা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে আছে নেচে-গেয়ে বেড়াচ্ছে। কয়েক মাস পরে সকলে গিয়ে জুটবে প্যারিসে। ইওরোপে মাদামের পলিনেশিয়ান ব্যালের লম্বা প্রোগ্রাম ঠিক করা আছে। প্যারিসে শুরু হবে নানাদেশ ঘুরে সে প্রোগ্রাম আবার প্যারিসেই ফিরে এসে শেষ হবে, এক বছর পরে।

সেদিন বিকেলের চায়ের নিমন্ত্রণে কন্টি-নেন্টাল হোটেলে ফ্রাঁসোয়ার ঘরে ব'সে নিকোলেৎ আর তাঁর পলিনেশিয়ান ব্যালের বিবরণ ফ্রাঁসোয়ার কাছ থেকেই শুনেছিলাম।

ভেবেছিলাম ফ্রাঁসোয়া নিকোলেৎ-এর সেক্রেটারী অথবা অমনি কিছু একটা হবে। জিগ্যেস ক'রে কিন্তু জানলাম, তা নয়। সে নিজে প্যারিস ইউনিভারসিটির মিউজিকো-লজি অর্থাৎ সংগীত শাস্ত্রের বিদ্যার্থী। বছর পাঁচেক আগে পলিনেশিয়ায় গিয়েছিল সে-দেশের মিউজিক সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করতে। গিয়ে সেখানেই থেকে গিয়েছিল এতদিন। নিকোলেৎ-এর দলের সঙ্গে বিশেষ অন্তরঙ্গতা ব'লে এখন ওদের সঙ্গে দেশ-বিদেশ ঘুরছে।

'কিন্তু এবারে বোধ হয় এমন ক'রে ঘুরে বেড়ানো শেষ করতে হ'বে' ফ্রাঁসোয়া বলে, 'বাবার শরীর ভেঙে পড়েছে। আমাদের পারিবারিক ব্যবসা হলো শংখ, ঝিনুক তার মুক্তো কুড়িয়ে সারা দুনিয়ায় চালান দেওয়া—যাকে বলে পার্ল অ্যাণ্ড শেল ফিশিং, তাই। তার-ও এখন চলেছে মন্দা। ছেলেবেলাতেই মা মারা গেছেন। বাবার অসুস্থতায় কারবারের দেখাশোনা করছে বিধবা বড়ো-বোন মার্সেলিনা। সে বারে বারে চিঠি লিখছে, ফিরে গিয়ে ব্যবসার ভার নিতে।'

ফ্রাঁসোয়ার পিতামহ ছিলেন খাস ফরাসী। এক সাগর থেকে অন্য সাগরে জাহাজ নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন মুক্তোর সন্ধানে ঝিনুক কুড়িয়ে। খুঁজতে খুঁজতে কবে যেন পেয়ে গেলেন এক কৃষ্ণমুক্তো—কাফ্রী-সুন্দরী ফ্রাঁসোয়ার পিতা-মহীকে। তাঁকে নিয়ে দেশে না ফিরে থেকে গেলেন মাদাগাস্কারে। পত্তন হলো মাদাগা-স্কারের সংকর দাভিয়ে বংশের। ধাপে ধাপে তারা পেল আভিজাত্য।

লোকটি উচ্চশিক্ষিত মিউজিকোলজির ছাত্র শুনে উৎসাহভরে আমি আমার সংগীতানুরাগের কথা ওকে বললাম। আরও বললাম, 'পলিনেশিয়া গেলে, অথচ যাওয়ার পথে গীত-রসিকদের তীর্থক্ষেত্র ভারত ঘুরে গেলে না?'

'না, আমি এদিক দিয়ে যাইনি। যাত্রা শুরু করেছিলাম আফ্রিকা দিয়ে। সে-দেশটার সবটাই ঘুরলাম আদিম-মানবের সংগীত শুনে। ইওরোপে তো আগেই ঘুরেছি, ছাত্রাবস্থার আদ্যন্তেই। আফ্রিকা সেরে গেলাম পশ্চিমে—দুটো আমেরিকার কোনোটাই বাদ দিইনি। ইচ্ছে ছিল সাউথ-আমেরিকা থেকে মেলা-নেশিয়া, পলিনেশিয়া, জাপান, চীন, জাভা, বলিদ্বীপ হয়ে পৌঁছবো তোমাদের দেশে। সেইভাবে এগোচ্ছিলাম-ও।'

"পথে তো জাভা-বালি হয়ে এলে শুনলাম। তাহলে চীন-জাপানটাই বাদ গেল, বলো!"

একটু চুপ ক'রে থেকে ফ্রাঁসোয়া বলল "না, সংগীতশিক্ষা আমার শেষ হয়ে গেল নুকুহিভায় পৌঁছে। আমার ডক্টরেটের থিসিস্ রইল বাক্সবন্দী; সারা পৃথিবীর লোকসংগীতের মধ্যে যে ঐক্য আমি খুঁজে ফিরছিলাম সেই অন্বেষণ মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেল। বিদ্যেবুদ্ধি সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। কিন্তু সব দিয়ে পেলাম আমার সাগরিকাকে।"

ফ্রাঁসোয়ার কথা শুনতে শুনতে বারবার চোখে পড়ছিল ওর পাশের রাইটিং টেবলের ওপরে রাখা একটি রঙীন ফোটো। প্রশ্ন করলাম "ওই কি তোমার সেই সাগরিকা?"

ফ্রেমশুদ্ধ ছবিটা তুলে এনে আমার হাতে দিয়ে বলল, "এটা ফিলিতার ছবি।"

মেয়েটির পরনে পিংক রঙের কাপড়—
দাঁড়িয়ে বলল ওই কাপড়কে পলিনেশিয়ানরা বা
লাভালাভা, ওদের ছেলেমেয়ে সবাই পরে, কে
পরবার কায়দাটা একটু আলাদা। সেই গোলা
লাভালাভা নেমে এসেছে কোমর থেকে পা
গোছের একটু ওপর পর্যন্ত। গায়ে আছে সা
ভয়েলের ব্লাউজ। কানের কাছে কালো চু
গোঁজা রয়েছে লাল একটি স্থলপদ্ম। টানাটা
কালো চোখ আর একটু চাপা সুন্দর নাকে
খাঁজে মধুর এক হাসির আভাস। সবটা মিলি
যেন এক-চাপ লাবণ্য ঢলঢল করছে।

"হাউ গ্রেসফুল"—আমার বলা শেষ হয় ন
ঘরের ভিতর দিককার একটা দরজা হঠাৎ খু
গেল, আর সেদিক থেকে দুড়দুড় ক'রে দৌ
এসে ফ্রাঁসোয়ার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল চা
পাঁচ বছরের ছোট্ট একটি মিষ্টি মেয়ে। ন
খালি গা—কোমরে গেরো দিয়ে একটা তোয়া
জড়িয়ে বাঁধা, আলুথালু চুলগুলি কাঁধের ওপ
নাচছে। পরিচ্ছদ তো ওই, এদিকে মেয়ের গল
দুলছে পরিপাটি করে গাঁথা একটি লাল-সা
ফুলের মালা। এক একবার ফ্রাঁসোয়ার কোল থে
মাথা তুলে আর পিছনে তাকিয়ে তারস্ব
চীৎকার করতে থাকে, "তিনা, তিনা—"

চেয়ার ছেড়ে উঠে উঁচু কাঁধের ও
মেয়েটাকে বসিয়ে হাসতে হাসতে ফ্রাঁসোয়া ব
"আসুক দেখি তোমার তিনা, আসুক তোম
দুষ্টু মা-টা—তুমি আর আমি তাকে ধ'রে কা
পিট্টি লাগাবো।"

"মোআনা—"

যে দরজা দিয়ে মোআনা ঢুকেছি
চেয়ে দেখি সেখানে দাঁড়িয়ে আছে আমা
হাতের ছবিতে দেখা সেই মেয়েটি। একটু কে
তফাৎ—লাভালাভা আছে কিন্তু তা ছা
নিরাবরণ অঙ্গ।

চোখ নামিয়ে নিলাম। অচেনা আমাকে দে
মেয়েটিও যেন একটু অপ্রতিভ হলো। কি
সে নিমেষের জন্যে। হাত বাড়িয়ে আলনা থে
একটা স্কার্ফ টেনে নিয়ে গা ঢেকে ফেল
তারপরে মেয়েকে ধরবার জন্যে মুখে হাসি ও
চোখে রাগ মেখে ধেয়ে গেল ফ্রাঁসোয়ার দি
ছোট্ট ছোট্ট কয়েকটা লাফ দিয়ে ফ্রাঁসোয়ার কাঁ
ওপরে নাগাল পেল না। স্কার্ফটা আ
সামলে নিয়ে আমায় লক্ষ্য ক'রে ভাঙাভ
উচ্চারণে ইংরেজীতে বলল, "ফ্রাঁসোয়া তু ত
প্লীজ ক্যাচ নতি মোআনা ফর মী, মিস্তার
নিজের মালাটা গলায় প'রে বেটি আমার মাল
ছিঁড়ে দিয়ে পালিয়ে এসেছে।"

ফ্রাঁসোয়ার কাঁধে ব'সে মোআনা তখন এ
টানা চীৎকার ক'রে চলেছে। মাঝে মাঝে আ
খিলখিল ক'রে হাসছেও। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রাঁসোয়
চেঁচাচ্ছে, "নো-নো ফিলিতা, আমার মোআনা
তুমি মেরোনা।"

"উঃ বেজায় হট্টগোল করছ তোমরা" বল
বলতে একই দরজা দিয়ে প্রবেশ করল দী
সাগরপারের প্রাণপ্রাচুর্যে সুন্দর সুঠাম-দেহ
প্রৌঢ়। নাঃ, চুলে পাক ধরলেও প্রৌঢ় বলা চ
না। চল্লিশের কোঠায় পড়েছে কি পড়ে
এমনি বয়স।

আরও খানিক হুটোপাটি ক'রে মা মেয়ে
বলল, "যাঃ—মিস্তারের খাতিরে এ-যাত্রা
বেঁচে গেলি। আয়, ঘরে আয় এখন!" হাস
হাসতে আমার দিকে একনজর তাকিয়ে ফিরে চ
ফিলিতা। মিসা-ও ওর সঙ্গে সঙ্গে চ'লে যাচ্ছি
মোআনাকে চেয়ারের ওপরে বসিয়ে দিয়ে ও

ডেকে ফ্রাঁসোয়া বলল, "চলে যেও না, চা খেয়ে যাও, আর আমাদের এই নতুন বন্ধুটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই এসো।"

আমার জন্যে মায়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে আমার ওপরে খুব খুশি হয়েছে মোআনা। কাছে ডাকতেই সুড়সুড় ক'রে এল। একটুকরো কেক ওর হাতে দিয়ে মেয়েটাকে কোলে বসিয়ে এদের সঙ্গে গল্প করছি, এমন সময়ে পিছন থেকে কে যেন কথা ব'লে উঠল। শুভ্রকেশ লোলচর্ম এক বৃদ্ধা অলক্ষ্যে কখন যেন ঘরে ঢুকেছেন। ফিলিতার আদুড় গায়ের দিকে কঠোর দৃষ্টি রেখে বলছেন, "তোমায়ন্না ফিলিতা বারবার বলেছি যে, এটা তোমার নুকুহিহবা বা কোলোহবাই নয়—এ রকম ক'রে জামা গায়ে না দিয়ে ঘর থেকে বেরিও না।

গম্ভীর গলার আওয়াজেই ফিলিতা সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছিল। মোআনাকে টেনে নিয়ে ইশারায় মিসাকেও ডেকে সে নিজের ঘরে চ'লে গেল।

মহিলাকে দেখে আমরাও উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। আমাদের বসতে ব'লে নিজেও ব'সে প'ড়ে মাদাম নিকোলেৎ বললেন, "মিশন স্কুলেই শিক্ষা পেয়ে থাকুক, কিম্বা হাজারবার বিদেশ ঘুরেই আসুক, এই পলিনেশিয়ান মেয়েগুলির আক্কেল হবে না কোনোদিনও। দেশে তো কারও গায়ে কাপড় রাখার বালাই থাকে না, তাই জামা গায়ে দিতে বললে এদের মাথায় যেন বাজ পড়ে।"

আমার সামনে ফিলিতার এই লাঞ্ছনায় ফ্রাঁসোয়া যেন একটু বিচলিত হলো: তবু হাসিমুখেই বলল, "তুমি কেবল ওকে বকাবকি কর মাদাম, কিন্তু যার পক্ষে যেটা স্বাভাবিক সেটা সে করবেই। যে-দেশের যা রীতি।" কথাগুলো শুধু নিকোলেৎ-কেই বলা হলো না, নবাগত আমাকেও যেন কৈফিয়ৎ দেওয়া হয়ে গেল একই সঙ্গে।

— দুই —

বাল্যকাল থেকে চিরদিনই আমার যা অভ্যেস, কোথাও নৃত্যগীতের কোনো সুন্দর পরিবেশের সন্ধান পেলেই সুযোগ খুঁজে বেড়িয়েছি কী ক'রে নিজেকেও তার মধ্যে মিশিয়ে দিই। এখানেও তাই ঘটল। এদের সহজ ব্যবহারে ঘনিষ্ঠভাবে এদের সঙ্গে মিশে যেতেও অসুবিধে হলো না। কণ্টিনেণ্টাল হোটেলে ঘন ঘন যেতে লাগলাম ফিলিতার নাচগান আর মিসা-র বাজনা শুনতে।

এরই মধ্যে একদিন লক্ষ্য করলাম, সন্ধ্যের প্রোগ্রামে একটু যেন বিশেষ আয়োজন হয়েছে।

লালরঙের লাভালাভাটা কোমরে আঁটতে আঁটতে ফিলিতা আমার দিকে তাকিয়ে হাসে। নিজের ভাষায় মিসাকে কী যেন বলে। তারপরে আমার দিকে ফিরে বলে, "আমাদের দেশে প্রথা আছে, এক দ্বীপের লোকেরা নৌকোর বহর নিয়ে আরেক দ্বীপে যায় মৈত্রী-উৎসব করতে। সেখানে দুই গাঁয়ের ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ী সকলে মিলে হয় বিরাট ভোজ, আর সেই সঙ্গে হয় নাচগান হাসিতামাশা। ঐই যাত্রাকে আমরা বলি 'মালাঙ্গা', আর তাতে যে নাচ হয় তার মধ্যে বিশেষ একটি নাচ-কে বলে—"

ফিলিতাকে থামিয়ে দিয়ে মিসা বলে, "ওরে বাস্‌রে, তুমি যে একেবারে আমাদের সমাজ-বিধি নিয়ে লেকচার শুরু করেছ, ফিলিতা।" আমার দিকে ফিরে বলে, "শোনো ভায়া, আসল কথাটা বলি। তোমাকে ফিলিতার খুব ভালো লেগে গেছে। আমাদের বলে তুমি নাকি ওর 'ওল্ড ফ্লেম' ওবের গাঁয়ের সেই তিরালিঙ্গোর মতো দেখতে। তবে গায়ের রঙ তোমার একটু কালো—"

পাদপূরণ ক'রে হাসতে হাসতে বলি, "আর নাকটা একটু মোটা আর চোখদুটো ক্ষুদে ক্ষুদে।"

ফ্রাঁসোয়া একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। সে যাতে শুনতে না পায় এমনি ক'রে গলা খাটো ক'রে আর চোখ টিপে মিসা বলে, "তাই ব'লে ফ্রাঁসোয়ার মতো কালো তুমি নও।"

ফিলিতা বলল, "ইস্! ফ্রাঁসোয়ার নিন্দে হচ্ছে, তোমার নিজের গায়ের রঙ যদি ওর মতো অমন সুন্দর কালো হতো তো বর্তে যেতে।"

মিসা বলল, "মরুক গে, চেহারা আর গায়ের রঙ, আসল কথাটা হচ্ছে, তোমার অনারে আমাদের মালাঙ্গা উপলক্ষ্যে মেয়েদের যে-সব বিশেষ বিশেষ নাচ হয়, ফিলিতা তাই দেখাবে আজ।"

মুগ্ধ হয়ে এদের দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকি। ভাবপ্রবণতার দোষ বরাবরই ছিল, আবার তখন তো তরুণ বয়স। আরও সহজেই মনে নাড়া দিত মানুষের একটু স্নেহ, একটু ভালোবাসা। ভাবি, ক'দিন আগে কোথায় ছিল এরা, কোন্ অজানা দেশ থেকে এসে দু'দিনেই এত আপন ক'রে নিল আমাকে।

ফিলিতা আজ মোআনাকে খুব সাজিয়ে এনেছে। সে-ও নাকি আজকের আসরে নাচবে। তাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করি।

ওদিকে মিসা ততক্ষণে স্টেজে উঠে গিয়ে তার গিটারে দিয়েছে টংকার। ফ্রাঁসোয়ার সঙ্গে ব্যাক-স্টেজ থেকে বেরিয়ে এককোণ ঘেঁসে একেবারে স্টেজের সামনে গিয়ে দুজনে বসলাম।

যেন সুরের ঝড় বইয়ে দিয়েছে মিসা। গিটারের টংকারে প্রকাণ্ড হল-ঘরটা গম্ গম্ ক'রে উঠেছে। আঙুলের খেলার সঙ্গে সঙ্গে 'পিক্'-গুলি ঝক্‌ঝক্ করছে রুপোর বাঘনখের মতো। কিন্তু সে নখরাঘাতে লাল রক্ত না ঝ'রে যেন সাগরের নীল ঢেউ উত্তাল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, ডাইনে-বাঁয়ে পিছনে-সামনে।

তুফানের পরে উত্তরঙ্গ সমুদ্র যেমন ক্রমে ক্রমে শান্ত হয়ে আসে তেমনি ক'রে মিসার সুরের তীব্রতা হয়ে আসে মৃদু, আলাপের ছন্দ দুলতে দুলতে কখন যেন এসে যায় মনদোলানো এক তালে।

টবে-বসানো পাম্-গাছগুলি দুলে উঠল। তারপরে যেন প্রবাল-বাঁধের কোন্ এক ভাঙন দিয়ে চুরি ক'রে লেগুনের স্থির জলে দোলা লাগিয়ে দিল ছোট্ট একটা তরঙ্গিনী।

"মোআনা, মোআনা—" মৃদুগুঞ্জনে হল-ঘরটা ভ'রে গেল।

বাজাতে বাজাতে দরাজ গলায় মিসা গেয়ে ওঠে:

'আমি দখিন হাওয়া—বেণুবনের শাখায়
শাখায় মাতন জাগাই

নাচতে নাচতে কচিগলায় আধো আধো স্বরে মোআনা ছন্দ মেলায়:

'আমি জলকুমারী—নাচের তালে
সাগরবুকে দোলা লাগাই।'

মি— মেঘে যখন ঝিলিক হানে
তুফান হয়ে ধাইগো বেগে

মো— তখন প্রবালবাঁধে আছড়ে পড়ি,
কাঁদি বুকে ব্যথা লেগে।

গোল গোল ছোট্ট ছোট্ট হাত দুখানি পায়রার বুকের মতো নরম গায়ের ওপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মোআনা গাইতে থাকে:

কাঁদি বুকে ব্যথা লেগে।'

সমস্ত হল-ঘরটা যেন গুমরে ওঠে জমাট আদরে। গেলাসগুলো ঠেলে দূরে সরিয়ে রেখে অভ্যাগতেরা—করতালি দিতে দিতে সেই হা... গুলি যেন জোড়ায় জোড়ায় এগিয়ে আসে ... মেয়েটাকে বুকের মধ্যে টেনে নিতে।

মিসা কিন্তু 'এন্‌কোর'-এ কান না দি... গিটারের তালে তাল রেখে চেঁচিয়ে বলে: সি-হ... ফিলিতা, সি-হুরা—শুরু হোক ফিলিতার নাচ

স্টেজের কোণে দেখা যায় লাল ... একপ্রান্ত আর চম্পকবরণী বাহুলতার ... লীলায়িত ভঙ্গি।

হাওয়ার মাতনে বুগেনভিলিয়ার পুষ্প... লতা যেন হিল্লোলিত হয়ে উঠেছে! আর ... সঙ্গে তান লয় ছন্দ! বর্ণনার ভাষা আমার নেই।

আমার হাত শক্ত ক'রে চেপে ধরে ফ্রাঁসোয়া... চেয়ে দেখি চোখ দুটো তার চক্‌চক্ করছে... আমার সপ্রশ্ন চাহনির উত্তরে বলে, "মালাঙ্গা সিহুরা, ফিলিতার সবচাইতে ভালো নাচ। পলি... নেশিয়ার সেরা নাচ। নুকুহিহবায় এই নাচ দে... আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলুম—আর পারি... ফিলিতার সঙ্গ ছাড়তে।"

— তিন —

ফ্রাঁসোয়ার প্রণয় যে একতরফা নয় ... বুঝতেও আমার বেশী দেরী হয় নি, ... এ-নিয়ে ওরা কেউই কোনো লুকোচুরি ক... না।

মনে হয়েছিল, এ-ও কি আর এক ... পাহারায় ব্যভিচার-পর্ব ... ওস্তাদ ... অংশ গ্রহণ করেছে মিসা। কিন্তু ধাঁধা ... যখন দেখতাম ফিলিতার পতিপ্রেমেও কোনো খ... নেই।

ফ্রাঁসোয়ার কোলে মাথা রেখে তার সার্টে... বোতাম নিয়ে খেলা করতে কর... ফিলিতা আমাকে একদিন বলেছে... "আমি জানি না, বলতে পারি ... যে ফ্রাঁসোয়া আর মিসা-র মধ্যে কাকে ... বেশী ভালোবাসি। দুজনেই এত ভালো ... দুজনেই এত বড়ো মিউজিশিয়ান!" ধড়মড় ক'... ফ্রাঁসোয়াকে ঠেলে উঠে প'ড়ে দারুণ উৎসা... ফিলিতা আমায় বলল, "তুমি শুধু মিসা... বাজনাই শুনলে, ফ্রাঁসোয়ার পিয়ানো-বাজনা ... তোমাকে একদিনও শোনানো হয় নি। দাঁড়... আজই আমি ব্যবস্থা করছি।"

ফ্রাঁসোয়া রাগ ক'রে বলল, "কী যে তোম... ছটফটানি আর ছেলেমানুষী! আমার বাজনা ... কোনোদিন শোনালেই হবে।"

মিসা আমার পাশেই ব'সেছিল। সে কি... ফিলিতাকেই সমর্থন করল। বলল, "ঠিক ব'লে... ফিলিতা। আজ সন্ধ্যেবেলার প্রোগ্রামে পলি... নেশিয়ান নাচের বদলে স্প্যানিশ-ডান্স হো... —ফ্রাঁসোয়া বাজাবে, ফিলিতা আর আমি পার্টনা... হয়ে নাচব।"

ফ্রাঁসোয়ার কোনো কথায় কান না-দিয়ে গা... একটা জামা চড়িয়ে মিসা ছুটল ব্যবস্থা করতে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা কণ্টিনেণ্টালের ডান্স-রু... মুখরিত হলো ফ্রাঁসোয়ার পিয়ানোর ধ্বনিতে।

এক টেবিলে মাদাম আর আমি পাশাপা... ব'সেছিলাম। পিয়ানোর সঙ্গে বাজাচ্ছিল হোটেলে... স্থায়ী গোয়ানীজ অর্কেস্ট্রার কয়েকটি বাদ্যযন...

ম্যারাকাস্ আর ক্যাস্টানেট্-এর খরখরানি আর কিটি-কিটি শব্দের মধ্যে নিকোলেৎ আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, "কী বাজাচ্ছে জানো? 'দি ক্যারিওকা'—সারা ইওরোপ অ্যামেরিকা মত্ত হয়ে গেছে ওই ক্যারিওকার ছন্দে নেচে। তোমাদের দেশে এ-নাচ এখনও ভালো ক'রে চালু হয় নি। আর হ'লেও ফ্রাঁসোয়ার মতো পিয়ানিস্টের বাজনা বোধ হয় তোমাদের শোনা হয়ে উঠবে না।"

ফিলিতা আর মিসা-কে মাঝে রেখে সে-রাত্রের অতিথিরা তালে হোক্ বে-তালে হোক্ নেচে চলেছে উন্মাদের মতো।

কিন্তু আমার মনটা ঠিক সুরে চলছিল না সেদিন।

ফ্রাঁসোয়া একটার পর একটা বাজাচ্ছে আর ওরা নেচে চলেছে অক্লান্ত। নিকোলেৎ সেই মিউজিকের ব্যাখ্যা ক'রে আমাকে কী-সব যেন বলছেন। মাঝে মাঝে বাজনা থামলে আবার মজার মজার গল্পও বলছেন পলিনেশিয়ার সম্বন্ধে। পঞ্চাশ বছর ধ'রে ওদেশে ঘুরে কত অদ্ভুত অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ও'র হয়েছে, তারই বিবরণ। কবে কোন্ উৎসবে ও'কে আপ্যায়িত ক'রে তোংগার রাণী অক্টোপাসের মাংসের কাবাব খাইয়েছিলেন, আর তাই খেয়ে কী অবস্থা হয়েছিল ও'র—এমনি সব গল্প।

কিন্তু সেই যে দুপুর বেলা থেকে কেবল আমার মাথায় ঘুরছে—আমি অবাক হয়ে ভাবছি—কী ক'রে ফ্রাঁসোয়াকে বরদাস্ত করতে পারে মিসা কেমন ক'রে স্ত্রীকে সে গ্রহণ করে সহজ-ভাবে, সে ভাবনায় সেদিন রাত্রের ওই সঙ্গীত নৃত্যের তালে মন আমার তাল রাখতে পারছিল না।

— চার —

সেই রাত্রের পরে ক'দিন আমি আর কন্টি-নেণ্টাল হোটেলে যাই নি। যেতে পারি নি।

ছ' সাতদিন পরে আবার আমার ডাক পড়ল। নিজেকে যাচাই ক'রে বুঝলাম, মনে মনে এই আহ্বানের অপেক্ষাই আমি করছিলাম। তাই ফিলিতার টেলিফোন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হোটেলে উপস্থিত হলাম।

ফ্রাঁসোয়া ছিল না। নো-আনাকে নিয়ে কাছেই কোথায় যেন গিয়েছিল।

এ-গল্পে আমার নিজেকে স্থান না দিলেই বোধ হয় ভালো হ'তো। প্রথমে ভেবেছিলাম যে, শুধু ফ্রাঁসোয়া ফিলিতা ওদের নিয়েই লিখব। নিজের কথা বলব না। তাছাড়া তখন মনের মধ্যে আরও একটি দ্বন্দ্ব চলেছিল।

উত্তমপুরুষের একবচনে গল্প-উপন্যাস লেখার ভালোমন্দ বিচার করতে গিয়ে প্রখ্যাত এক ঔপন্যাসিক বলেছেন যে, এভাবে লেখার কায়দাটা ততক্ষণই ভালো যতক্ষণ লেখক নিজেকে একজন দূরদর্শী নিঃস্বার্থ সংবেদনশীল দর্শক হিসেবে কাহিনীর চরিত্রদের পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পারেন। তাতে অনেক সুযোগ সুবিধেও পাওয়া যায়। নানা কথা দিয়ে, নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে লেখক নিজেকে এবং নিজের বৈদগ্ধকেও বেশ জাহির ক'রে নিতে পারেন। শুধু বিপদ ঘটে তখনই যখন কোনো অবাঞ্ছিত অশোভন পরি-স্থিতিতে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে কাহিনীকার পাঠকের সামনে ধরা প'ড়ে যান সে [illegible] একটি অর্বাচীন-চলতি ভাষায় যাকে বলে নিরেট একটি গর্দভ।

স্কেচ — অরুন্ধতী ঘোষ

তাই এই কাহিনী লিখতে শুরু করবার আগে ওই মান্যব্যক্তির সাবধানবাণী একাধিকবার আমার লেখনীকে বিরত করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেবে ঠিক করলাম যে, নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে কাহিনীকে খর্ব করবার অধিকার আমার নেই।

ফিলিতা যখন শুনল যে আমার কোনো অসুখ-বিসুখ হয় নি, এমনি এমনিই ক'দিন আসি নি, তখন মুখভার ক'রে বলল, "বুঝেছি, দর বাড়াচ্ছো তুমি। কেন তোমায় কি আমি কম আদর করি, না ওরা তোমায় ঠিকমত খাতির করে না?"

থতোমতো খেয়ে কী যেন কতকগুলো বাজে উত্তর দিলাম। মিসা আমার জন্যে চায়ের অর্ডার দিতে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। আমার কথা শুনে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বলল, "ফিলিতা, তোমার 'বয়-ফ্রেণ্ডের' সংখ্যা যে-ভাবে বেড়ে চলেছে তা'তে আমার পক্ষে মানে মানে বিদায় নেওয়াই ভালো।"

এমনিতেই ফিলিতা হাসত চোখ দিয়ে। ওর টানাটানা কালো চোখের কথা তো আগেই বলেছি। আর সেই চোখের হাসির সঙ্গে ওর চাপা নাকের খাঁজে ফুটে উঠত ভারি একটা রেশ। কিন্তু মাথায় যখন ফিলিতার কোনো দুষ্টুবুদ্ধি খেলতো—প্রায়ই তা' খেলতো—তখন ওর হাসি বেরোত ঠোঁটের কোণে। পাতলা লাল ঠোঁট দুটো বেঁকিয়ে সে হাসত তার দুষ্টুমির হাসি।

মিসার ঠাট্টা শুনে তার ঠোঁট বেঁকে গেল। আমার একটি হাত টেনে নিল তার দুই হাতের উষ্ণতার মধ্যে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচিয়ে বলল, "কি-গো, লেখাবে নাকি নাম আমার বয়-ফ্রেণ্ডের লিস্টিতে?"

হাতটা আমার ঘেমে উঠেছিল। ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু সেই ভিজে হাত আর আমার বিব্রত ভাব দেখে ফিলিতা মুখ তুলে আমার দিকে ভালো ক'রে চাইল। তার ঠোঁটের বাঁকাহাসি মিলিয়ে গিয়ে ফুটে উঠল বিস্ময়।

মিসা তখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। ফিলিতা একহাতে আমার হাতটা ধ'রে রেখে অন্য হাত দিয়ে আমার গালে ছোট্ট একটা চড় মেরে আবার হেসে ফেলল। মুখে কিছু বলল না, পায়ের দিক থেকে ওর লাভালাভার খুঁটটা টেনে আমার হাতের ঘাম মুছতে লাগল।

মিসা ফিরে এসে আমাদের দেখে একটু হেসে কিছু না ব'লেই পাশের ঘরে চ'লে গেল। খানিক পরেই শুনতে পেলাম সে তার দৈনন্দিন গিটারের রেওয়াজ সুরু করেছে।

গুনগুন ক'রে সেই সুরটা গাইতে গাইতে আমার হাতটা কোলের ওপর টেনে নিল ফিলিতা। একবার একটু থেমে বলল, "তোমার কেন এমন

পূজোর প্রীতি-সম্ভাষণ
দি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ
স্থাপিত ১৮৯৫
চেয়ারম্যান্
শ্রী এস. পি. জৈন
জেনারেল ম্যানেজার
মিঃ এ. এম. ওয়াকার

হলো। বলো তো? আমি তোমার থেকে যে বয়সে অনেক বড়ো। ফ্রাঁসোয়ার চাইতেও বোধ হয় বড়োই হব। বুড়ী হয়ে যাব ক'বছর পরেই।"

জড়তাটা কাটিয়ে উঠেছিলাম। বললাম, "কেন তা' ঠিক বলতে পারব না।"

"আমার রূপ দেখে?"

"না—তুমি সুন্দরী তা' ঠিক, কিন্তু আমার চেনা এমন মেয়ে আছে যারা তোমার চেয়ে দেখতে অনেক ভালো।"

"তাহ'লে বোধ হয় আমার গান শুনে আর নাচ দেখে, তাই না?"

"উঁহু, তাও নয়।"

"তবে?"

থেমেথেমে বললাম, "অতো ভেবে দেখি নি। কিন্তু এইটুকু বুঝেছি যে তোমাকে আমার বড়ো বেশী ভালো লেগে গেছে, যদিও জানি তুমি আমার থেকে বয়সে বড়ো।"

"ফ্রাঁসোয়া আমায় ভয়ানক ভালোবাসে তা' তুমি জানো?"

"জানি বৈকি!"

"আমি মিসা আর ফ্রাঁসোয়া দুজনকেই খুব ভালোবাসি, তাও জানো?"

"হ্যাঁ, তাও বুঝি।"

"হিংসে হয় না তোমার?"

এবারে হেসে ফেললাম। বললাম, "তোমার সঙ্গে আমার ক'দিনেরই বা আলাপ, আর আমার কী-ই বা অধিকার আছে তোমায় যারা ভালোবাসে তাদের হিংসে করবার?"

আমায় কাছে টেনে নিয়ে আমার কাঁধে মাথা রেখে ফিলিতা বলল, "সেই ভালো, খালি ভালো-লাগা আর ভালোবাসাই ভালো। যেমন ক'রে মিসা আমায় ভালোবাসে। ফ্রাঁসোয়া অনেক চায় আমার কাছে, তাই তাকে আমার ভয় করে।"

আমার হাতে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ফিলিতা আবার বলল, "তুমি আর আমি কেউ কারও কাছে কিছু দাবী করব না, কেমন? খালি ভালোবাসব। তারপরে যখন আমি এদেশ ছেড়ে চ'লে যাব তখন দূরে থেকেই দুজনে দুজনকে ভালোবাসব।"

মিসার গিটারের আওয়াজ তখন বেশ বেড়ে গেছে। অন্য একটা সুর ধরেছে।

ফিলিতা বলল, "জানো, নুকুহিভার মালাঙ্গার সময়ে নাচগানের আসরের মধ্যে থেকেই মিসা আর আমি প্রথম যেদিন লুকিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে গেলাম, সেদিন রাত্তিরে সমুদ্রের ধারে ব'সে এই গানটাই আমি ওকে প্রথম শুনিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স আর কত? এই ষোলো কি সতেরো। কোলোহুনাইয়ের দলের সঙ্গে মিসা এসেছিল আমাদের গাঁয়ে। প্রথম দিনেই ওকে দেখে আর ওর বাজনা শুনে আমার খুব ভালো লেগে গিয়েছিল। আর মিসা বলে যে, তখন নাকি আমাদের ছোট মেয়েদের মধ্যে সবচাইতে ভালো নাচতাম আমি।"

"তোমাদের বিয়ে কবে হলো?"

"বিয়ে? সে তো হলো এই সেদিন—বছর সাতেক আগে।"

"তাহলে তার আগে অতো বছর ধ'রে তোমাদের প্রেম চলছিল?"

ফিলিতা বলল, "না, সেই মালাঙ্গার পরে মাঝে তো প্রায় সাত-আট বছর আর দেখা-ই হয়নি আমাদের। মিসা অ্যামেরিকান হাইস্কুলে পড়তে হাওয়াই-তে গিয়ে অনেকদিন ছিল। দেশে ফিরে নি। আবার আমাদের দেখা হলো মাদামের দলে ঢুকে।"

"অতো বছর ধ'রে মিসার কথা ভেবে ভেবেই কাটালে?"

"দূর, তুমি কিচ্ছু জানো না" আমায় এক ঠেলা দিয়ে হাসতে হাসতে ফিলিতা বলে, "মিশন বোর্ডিংএ থাকতে আমার কত বয়-ফ্রেন্ডস্ ছিল। মাদার সুপীরিয়রকে ফাঁকি দিয়ে সিস্টারদের লুকিয়ে আমরা মেয়েরা পালা ক'রে প্রায়ই সন্ধ্যে-বেলা পালাতাম, ফিরতাম সেই ভোরে।"

অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম এই বহুবল্লভার দিকে।

"কী ভাবছ?" কাঁধ থেকে মাথা তুলে ফিলিতা বলে।

"ভাবছি? আচ্ছা, এই-যে তুমি তোমার জীবনে এতজনকে ভালোবেসেছ, তা' তোমার সেই পুরোনো বন্ধুদের জন্যে মন খারাপ লাগে না? তাদের একজনকে বাদ দিয়ে যখন আর একজনের কাছে গিয়েছ তখন সেই আগের বন্ধুটির জন্যে কষ্ট হয় নি?"

"বা রে, তা কেন হবে? আমি স'রে গেলে সে-বন্ধুটিও তো বেছে নিয়েছে মনের মতো আর একটি মেয়েকে। এই তো রীতি আমাদের দেশের। মিসারও তো কত বান্ধবী ছিল। তারা কেউ কেউ এখন ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করছে, আবার কারও কারও হয় তো বিয়ে ভেঙেছে এরই মধ্যে দু'তিনবার।"

"তোমাদের বাবা-মা, সমাজের প্রধানেরা—তাঁরা কিছু বলেন না তোমাদের?"

"আঃ—বললাম না, এই আমাদের দেশের রীতি, আর তা' চলে আসছে কবে থেকে কে জানে? তবে হ্যাঁ, আমার পুরোনো বন্ধুরা কেউ যদি কখনো কোনো কষ্টে পড়ে তাহলে দুঃখ পাই বৈকি। খুব মন খারাপ লাগে।"

চুপ ক'রে ওর কথা শুনছিলাম। হঠাৎ ফিলিতা ব'লে উঠল, "আমাদের কথা তো অনেক শুনলে, এবারে তোমাদের কথা বলো!"

"আমাদের মেয়েদের কথা আর একদিন তোমায় বলব। কিন্তু তাদের কথা কি তুমি বুঝবে? যাক্‌গে, এখন আর একটা প্রশ্নের জবাব আমাকে দাও। তুমিও তো অ্যামেরিকান স্কুলে পড়েছ। আচ্ছা, মিশন স্কুলে তোমাদের যাঁরা পড়াতেন তাঁরা বলেন-নি যে, তোমাদের এই জীবনযাত্রা দোষের?"

"ওরে বাবা! বলে নি আবার! কত লেকচারই না শুনতে হয়েছে সিস্টারদের কাছে। বাইবেলের 'টেন কমাণ্ডমেণ্টস্' মুখস্থ বলতে হতো সপ্তাহে তিন দিন।"

"তবে?"

ফিলিতা ফুলে ফুলে হাসতে লাগল। তার-পরে হাসি চেপে বলল, "এদিকে তো এই নীতি-শিক্ষা আর ওদিকে এক অন্ধকার রাতে আমাদেরই মিশনের ছেলেদের সেকশনের এক তরুণ ফাদার আমাদের এক সিস্টারের সঙ্গে অভিসারে বেরিয়ে গাঁয়ের লোকের কাছে হাতে হাতে ধরা পড়ে গেলেন। ওঁরাই তো আমাদের মর‍্যাল ট্রেনিং-এর ক্লাস নিতেন।" হাসতে হাসতে সোফার ওপরে গড়িয়ে পড়ল ফিলিতা।

আমার যে হাতটা ফিলিতার হাতের মধ্যে ধরা ছিল, শলথ হয়ে এল তার অনুভূতি। কিন্তু ঘৃণা করতে পারলুম না ফিলিতাকে—যেমন ক'রেছিলাম ওয়াহিনাকে আর নুন্দরিকে।

আস্তে আস্তে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে মিসার বাজনা শোনার অছিলাতে পাশের ঘরে চলে গেলাম।

— পাঁচ —

হোটেলে ফ্রাঁসোয়া আর মিসার ঘর ছিল পাশাপাশি, আর মাদামের ঘরটি ছিল অন্যদিকে অনেকটা দূরে। নিকোলেৎ-এর যা' কিছু কাজ-কর্ম প্রায় সবই ফ্রাঁসোয়া দেখাশোনা করত। তাই দিনের মধ্যে অনেকটা সময়ই সে তাঁর ঘরেই কাটাতো।

ফ্রাঁসোয়ার মাধ্যমেই এদের সঙ্গে পরিচয় আর বন্ধুতা; তাই হোটেলে পেঁৗছেই আমি তাকে খবর পাঠাতাম। খবর পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে নিজের ঘরে চ'লে আসত। তারপরে কোনোদিন হতো গানবাজনা, আবার কোনোদিন চলত নিরবচ্ছিন্ন আড্ডা।

ইদানীং লক্ষ্য করছিলাম যে, খবর পাঠালেও ফ্রাঁসোয়া আর সহজে আসে না, কোনো কোনোদিন একেবারেই না। শেষে বাড়ী ফেরবার সময়ে আমি মাদামের ঘরে গিয়েই তার সঙ্গে দেখা করতাম। টাইপরাইটার থেকে মাথা তুলে হাসিমুখে ছোট্ট ক'রে ফ্রাঁসোয়া কেবল বলত, "আরে! এরই মধ্যে চললে?" ওর নিজের ঘরে ওর অনুপস্থিতি সম্বন্ধে অনুযোগ করলে নিকোলেৎ-এর দিকে তাকিয়ে বলত, "ওঁর লামবেগোর ব্যথাটা বেড়ে গিয়ে আমারও কাজ বেড়ে গেছে কিনা, তাই আর আগের মতো ক'রে তোমার সঙ্গে আড্ডা দিতে পারি না।"

তেমনি একদিন মাদামের ঘরে গিয়েছিলাম। ওঁদের দুজনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসছি এমন সময়ে মাদাম আমায় ডেকে কাছে বসালেন। একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন, "ইউ আর সাচ্ এ নাইস্ অ্যান্ড ক্লেভার বয়, তাই সাহস ক'রে তোমায় বলছি, অন্য কেউ হ'লে বলতাম কি-না জানি না—আমার মনে হচ্ছে ফ্রাঁসোয়ার মতোই ইউ উইল অলসো হার্ট ইওরসেলফ। তুমি বোধ হয় জানো যে, আমরা ফরাসীরা সেক্স-লাইফ সম্বন্ধে খুবই লিবারেল আর আমাদের ছেলেরা পরকীয়া তত্ত্বটা ভালো ক'রেই জানে।"

মাদামের হাবভাব আর কথা বলার ভঙ্গিতে বেশ অস্বস্তি বোধ করলাম। একটু উশখুশ ক'রে ফ্রাঁসোয়ার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে অতিকষ্টে আবার স্থির হয়ে বসলাম। মাদামের পিছনে বসে ফ্রাঁসোয়া মিটিমিটি হাসছে।

শিশি থেকে খানিকটা ও-ডি-কলোন রুমালে ঢেলে তাই দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে মাদাম বললেন, "আমরা ইংরেজদের মতো কপট নীতি-বাগীশ নই। এ-বিষয়ে আমাদের স্বামীদের অগাধ স্বাধীনতা তো আছেই, স্ত্রীদেরও আছে। এমন-কি যদি কোনো বিবাহিতা ফরাসী মেয়ে স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের প্রেমে পড়ে, তবে সেই স্ত্রী স্বামীর অনুমতি নিয়ে যাতে ওই অন্য লোকটির সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে তার বিধান-ও আমাদের সমাজে আছে। আমরা এই ব্যবস্থাকে বলি 'লা-হিন্দ-এ-ত্রোয়া, মানে ত্রয়ীর জীবনযাত্রা।'

মাদাম একটু থামলেন। আমি বললাম, 'অদ্ভুত উদারতা তো আপনাদের।"

এবারে ও-ডি-কলোন মাখা ভিজে রুমালটা হাতের পাতায় জড়িয়ে নিয়ে নিকোলেৎ বললেন, "তা' উদারতাই বলো বা দুর্নীতিই বলো এই প্রথাকে আমরা মেনে নিয়েছি। সেই আমরা ফরাসীরাও এই পলিনেশিয়ানদের মূল্যবোধের

সংগে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি না। এতদিন ধ'রে ওদেশে থেকেও এখনও মাঝে মাঝে আমার খুবই খারাপ লাগে এদের শিথিল যৌনজীবন দেখে। আর তোমরা ইণ্ডিয়ানরা তো শুনেছি এ-বিষয়ে বেজায় গোঁড়া। তাই বলছিলাম ফিলিতার সংগে তোমার মেলামেশাটা—"

ফ্রাঁসোয়া তার সিগারেটে সশব্দে একটা টান দিল। মাদাম চমকে উঠে বিরক্ত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠলেন, "হ্যাঁ, বুঝতে পারছি আমার কথা ফ্রাঁসোয়ার ভালো লাগছে না। তুমি নিজে এইজন্যে বিদ্যেবুদ্ধি অর্থসম্পদ সবকিছু জলাঞ্জলি দিতে ব'সেছ কিনা তাই আমার এসব কথা তোমার ভালো লাগবে না, ফ্রাঁসোয়া। কিন্তু তোমার এই বন্ধুকে একটু উপদেশ না দিয়ে পারছি না।"

একটু রূঢ়ভাবেই তাঁকে বাধা দিয়ে ফ্রাঁসোয়া বলে, "যথেষ্ট তো বলেছ ওকে, আর কত বলবে?"

আমাকে একটানে আসন থেকে উঠিয়ে একেবারে ঘরের বাইরে এনে ফেলল ফ্রাঁসোয়া। হাসতে হাসতে বলল, "কিছু মনে করোনা বুড়ীর কথায়। ওঁর মঁসিয়ে বৃদ্ধবয়সে মরবার আগে পর্যন্ত সামোয়ার নামজাদা ডন-জুয়ান ছিলেন কি-না, তাই ওঁর এত রাগ পলিনেশিয়ান মেয়েদের ওপর।"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললাম, "তুমি আমাকে এড়িয়ে চলছ কেন ফ্রাঁসোয়া? ফিলিতার সংগে বেশী মেলামেশা করছি বলে?"

আমার পিঠ চাপড়ে আগের মতন-ই হাসিমুখে ফ্রাঁসোয়া বলল, "ডোণ্ট বি সিলি। ফিলিতাকে তুমি কেড়ে নেবে আমার কাছ থেকে? পাগল! আসলে ফিলিতাকে ছেড়ে থাকার রিহার্শাল দিচ্ছি, কারণ দু'এক সপ্তাহের মধ্যেই আমায় এদের ছেড়ে মাদাগাস্কার চলে যেতে হবে। ফিরে আসতে বোধহয় কিছু দেরীই হবে। চার বছর পরে ওর সংগে এই হবে আমার প্রথম বিচ্ছেদ।"

"কেন তোমার বাবার শরীর কি বেশী খারাপের দিকে?" আমি উৎকণ্ঠা প্রকাশ করি।

"হ্যাঁ, সে তো আছেই, তা'ছাড়া আরও কতকগুলো পারিবারিক সমস্যা দেখা দিয়েছে যার জন্যে মার্সেলিনা আমায় কড়া তাগিদ পাঠিয়েছে। মনে হচ্ছে মার্সেলিনা আবার বিয়ে ক'রে সংসার পাততে চায়। পরিষ্কার ক'রে লেখেনি কিছু।"

চৌরঙ্গীর রাস্তা পার হয়ে অন্ধকারে হেঁটে হেঁটে রেড রোডের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম। ফ্রাঁসোয়ার অনুরোধে ময়দানের মধ্যে একটা বেঞ্চে দুজনে বসলাম।

জিগ্যেস করলাম, "তোমার যাওয়ার কথা শুনে ফিলিতা কী বলল?"

কিছুক্ষণ কোনো উত্তর দিল না ফ্রাঁসোয়া। তারপরে হঠাৎ যেন গর্জে উঠল, "ফিলিতাকে মিসার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতাম এবারে। ওকে বলেছিলাম মোআনাকে নিয়ে আমার সংগে মাদাগাস্কার চলে আসতে। ডাইভোর্স ক'রেই যেতে বলেছিলাম। কিন্তু ফিলিতা আমায় কী উত্তর দিল জানো?"

মানুষের চোখ যে অন্ধকারে এমন ক'রে জ্বলে ওঠে আগে তা' জানতাম না। আফ্রিকার নিবিড় অরণ্যবাসিনী আদিম-মানবী ফ্রাঁসোয়ার সেই পিতামহীর প্রাণস্পন্দন যেন নিজের সত্তাকে দীপ্ত করে তোলে উত্তরপুরুষের চোখের বিদ্যুতে।

"কী বলল?" প্রশ্ন করতে গিয়ে আমার গলা কেঁপে গেল।

"ফিলিতা বলল—মিসাকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না। আমি যদি সাগর ছেঁচে সাতরাজার ধন এক মাণিকও তার জন্যে এনে দিই তা'হলেও না।"

"ওকে কি তুমি ধনসম্পদের লোভ দেখিয়েছিলে?"

আমাকে যেন এক ধমক দিয়ে ফ্রাঁসোয়া চেঁচিয়ে উঠল, "কী বলছো তুমি! আজ চার বছরের ঘনিষ্ঠতায় সামান্য দু-এক টুকরো সিল্ক ছাড়া কোনো উপহারই ফিলিতা আমার কাছ থেকে গ্রহণ করে নি কোনোদিন। সেবারে দেশ থেকে একছড়া দামী মুক্তোর মালা আনিয়ে ওকে দিয়েছিলাম। খুশি হয়ে সেটা সে আমার কাছ থেকে নিল-ও। ছ'দিন পরে শুনি, আমার নাম ক'রে ফিলিতা সেই মালা ফিজির কুষ্ঠাশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছে আর দাতা হিসেবে সারা পলিনেশিয়া আমার জয়জয়কারে ছেয়ে গিয়েছে। ধনীর ঘরণী হওয়ার লোভ কি তারপরেও আমি ফিলিতাকে দেখাতে পারি?"

আবার অনেকক্ষণ আমরা দুজনেই চুপ করে রইলাম।

মৌনতা ভেঙে ফ্রাঁসোয়া বলল, "আমি যাব ফিরে মাদাগাস্কারে। সেখানকার কাজকর্ম সামলে আবার যাব তোংগাবাতু। তারপরে যেমন ক'রে চীফ উংগাম্বার মেয়েকে লুঠ ক'রে এনে বিয়ে করেছিলেন আমার পিতামহ, তেমনি ক'রে মিসার কাছ থেকে কেড়ে আনব ফিলিতাকে।"

ওর উত্তেজনা একটু কমলে পর আস্তে আস্তে বললাম "ভুল ভাবছো ফ্রাঁসোয়া, যে তোমাকে কখনও প্রত্যাখ্যান করে নি তার ওপরে জোর খাটাতে গেলে ঠকবে তুমি। আর মিসা? তুমি যদি সত্যিই ফিলিতাকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে যাও, তা'হলে আমার তো মনে হয় না যে, দেহের শক্তি বা লোকবল দিয়ে সে তোমাকে বাধা দেবে। তা'ছাড়া তোমার শিক্ষাদীক্ষা, দাভিয়ে বংশের আভিজাত্য—তার মর্যাদা তুমি রাখবে না?"

স্পষ্ট উচ্চারণে ফ্রাঁসোয়া জবাব দিল, "না, সবার চাইতে আমার প্রেম বড়ো। ফিলিতাকে কারও সংগে ভাগ ক'রে আমি গ্রহণ করবো না, একান্ত নিজের ক'রে তাকে আমি চাই।"

আর কিছু বলা আমার পক্ষে বাতুলতা হতো। বাড়ী ফেরবার নাম ক'রে উঠে পড়লাম। ফ্রাঁসোয়া সেই অন্ধকারেই ব'সে রইল। বলল, আরও খানিক পরে সে হোটেলে ফিরবে।

দিনকয়েক পরে ফ্রাঁসোয়া চ'লে গেল। তাকে বিদায় দিতে জাহাজঘাটে আমরা সকলেই গিয়েছিলাম। নিকোলেৎ মিসা আর আমার কাছ থেকে সে হাসিমুখেই বিদায় নিল। মোআনাকে কোলে ক'রে খুব খানিকটা আদর করল। শুধু সবার শেষে যখন ফিলিতার ম্লান মুখের দিকে তাকাল তখন মনে হলো ফ্রাঁসোয়ার চোখ দিয়ে যেন চেয়ে রয়েছে দুর্ধর্ষ আফ্রিকান চীফ উংগাম্বা—না-কি তার কন্যাকে যে হরণ করেছিল সেই দুঃসাহসিক ফরাসী বণিক দ্যাভিয়ে!

—ছয়—

ফ্রাঁসোয়া চলে যাওয়ার পরে কণ্টিনেণ্টাল হোটেলে যাওয়া কমিয়ে দিলাম। এক কারণ হলো, ফিলিতার সংগে মেলামেশায় নিকোলেৎ-এর অনিচ্ছা; দ্বিতীয়, সেদিন ময়দানে ফ্রাঁসোয়ার মনোভাবের সেই উদগ্র প্রকাশ।

একদিন ওখানে গিয়ে শুনলাম যে, পলিনেশিয়ান ব্যালের ইওরোপ ঘোরার প্রোগ্রাম কয়েকমাস পিছিয়ে গেছে। এদিকে কণ্টিনেণ্টাল হোটেলের মালিকেরা চাইছে যে, ফিলিতা আর মিসা আরও কয়েকমাস এখানে থেকে যায় আর সেজন্যে আগের চাইতে বেশী টাকা দিয়ে তারা নতুন কণ্ট্র্যাক্ট করতে চায়।

নিকোলেৎ বললেন, চিঠি লেখালেখি ক'রে একটু চেষ্টা করলে কলম্বো এডেন কায়রো এবং আরও যে-যে জায়গায় তাঁর আর্টিস্টরা রয়েছে সেইসব কণ্ট্র্যাক্টের মেয়াদ-ও বাড়িয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু বাতের ব্যথাটা বেড়ে গিয়ে নিজে তিনি কোনো কাজই করতে পারছেন না, সারাদিনই প্রায় শুয়ে শুয়ে কাটাচ্ছেন।

মাদাম আমায় একজন স্টেনো-টাইপিস্ট ঠিক ক'রে দিতে বললেন। তাই শুনে ফিলিতা ব'লে বসল, "ভারী তো দিনে আট দশটা চিঠি টাইপ করা আর হপ্তায় দু-একবার ব্যাংকে যাওয়া, তার জন্যে আবার মাইনে-করা সেক্রেটারীর কী দরকার?"

শ্লেষের সুরে মাদাম বললেন, "মিসা বা তুমি কেউই তো টাইপ করতে পার না আর তোমার স্বামী তো সারাদিন প্রায় ঘরেই ব'সে থাকে, রাস্তাঘাট কিছুই চেনে না যে ব্যাংকে যাবে। তাহ'লে ওই কাজগুলো কে করবে শুনি?"

ফিলিতার ঠোঁটের কোণে সেই বাঁকাহাসির আভাস দেখা দিয়েই নিমেষে মিলিয়ে গেল।

পলকের জন্যে আমার দিকে তাকিয়ে তারপরে যেন একটু কুণ্ঠিত হয়েই আমাকে বলল, "কেন, এইটুকু কাজ তো তুমিই রোজ একবার ক'রে এসে ক'রে দিয়ে যেতে পার। এতে খুব অসুবিধে হবে না বোধ হয় তোমার—না?"

এ-অনুরোধের উত্তরটিও ফিলিতার প্রশ্নে প্রচ্ছন্ন। তাই আমাকে ওর কথার জের টেনে বলতে হলো, "কী-যে আপনি বলেন মাদাম, আমি থাকতে এইটুকু কাজের জন্যে আলাদা লোক রাখতে হবে আপনার?"

নিকোলেৎ-এর মনে মনে হয় তো আপত্তি ছিল, কিন্তু অসুস্থ শরীরে তিনি এই ব্যবস্থা মঞ্জুর না ক'রে পারলেন না। ঠিক হলো পরের দিন থেকেই আমি মাদামের সেক্রেটারীর পদে বহাল হব।

আমি আর ফিলিতা সারা বিকেল মাদামের ঘরে ছিলাম। মোআনার সামান্য জ্বর হয়েছিল, তাকে নিয়ে মিসা নিজেদের ঘরেই আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। সেদিন ছিল রবিবার—ওদের নাচগানের ছুটী থাকত প্রতি রবিবারে।

মিসা আমার নতুন কাজের খবর শুনে খুশি হলো। মোআনাকে একটু আদর ক'রে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি চলে আসছিলাম, ফিলিতা বাধা দিয়ে বলল, "মোআনার জন্যে ডাক্তারখানা থেকে কাল সকালে ওষুধ আনতে যাচ্ছে মিসা। ও-বলছে সারাদিন ঘরে ব'সে থেকে থেকে ওর মাথাটা ভার হয়ে রয়েছে, একটু হাওয়া খেয়েও আসবে ময়দান থেকে। আমি একা একা থাকব! বসো না একটু। মিসা ফিরে এলে যেও।"

সন্ধ্যে হয়ে আসছিল। মিসা বেরিয়ে গেল।

মোআনাকে আমি কয়েকটা পুতুল খেলনা কিনে দিয়েছিলাম। সেই পুতুল

নামকরণও হয়ে গিয়েছিল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে মোআনা আমায় হুকুম করল, "ওংকেল, টেবিলের ওপর থেকে মালা আর লোলাকে নিয়ে এসে ওদের ডিনার খাইয়ে দাও তো। আমার অসুখ কিনা তাই ওদের আজ এখনও খাওয়ানো হয় নি।"

'আংকল্' বলতে পারত না মোআনা। ফ্রাঁসোয়ার মতো আমাকেও 'ওংকেল' ব'লে ডাকত।

ফ্রাঁসোয়ার ঘরটা খালিই ছিল। হোটেল-মালিকের অনুমতি নিয়ে দুই ঘরের মাঝের দরজা খোলা রেখে আগের মতোই সেই ঘরটা ওরা ব্যবহার করছিল। মোআনাকে আমার কাছে রেখে ফিলিতা স্নান সারতে পাশের ঘরে গেল।

মেয়েটার বিছানায় ব'সে পুতুলগুলিকে খাওয়ানোর খেলায় মশগুল হয়ে ছিলাম। হঠাৎ সারাঘর তীব্র মধুর এক গন্ধে ভ'রে উঠল— শ্রাবণ মাসে জুঁইয়ের ঝাড়ের খুব কাছে দাঁড়ালে দমকা হাওয়ায় যেমন গন্ধ পাওয়া যায়, তেমনি মিষ্টি কিন্তু তীব্র।

যেন ছবির সেই ফিলিতা বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। পরনে সেই গোলাপী লাভা-লাভা, ভিজে চুলে কানের পাশে গোঁজা রয়েছে একটি লাল গোলাপ। খুশিতে চোখ দুটি হাসছে। আমার পাশে ব'সে প'ড়ে বলল, "কিসের গন্ধ বলো তো?"

"চেনা-চেনা গন্ধ, কিন্তু তবুও ঠিক যেন চেনা নয়।"

মোআনা খিলখিল ক'রে হেসে বিজ্ঞের মতো বলে, "এ-মা! ওংকেল ফ্র্যাঙ্গিপানির গন্ধ চেনে না!"

মাথাটা আমার খুব কাছে এনে ফিলিতা বলল, "আমাদের দেশী পারফিউম—লাল ফেনুমীনের কেশর বেটে ঘরে তৈরী অঙ্গরাগ। বেশ গন্ধ, না?"

জিগেস করলাম, "আজ এত সাজনে যে বড়ো?"

"এমনিই ইচ্ছে হলো।" বাঁকাঠোঁটে সেই হাসি।

হাই তুলছিল মোআনা। ঘুমে তার চোখ জুড়ে আসছিল। পুতুল দুটোকে আস্তে আস্তে সরিয়ে রেখে চাদর দিয়ে মেয়ের গা ঢেকে ফিলিতা আমায় ইশারা ক'রে পাশের ঘরে যেতে বলল।

সে-ঘরে গিয়ে পিছনের জানলায় ভর দিয়ে গাছপালার ফাঁকে ওল্ড-এম্পায়ার থিয়েটারের আঙিনায় মানুষের আনাগোনা দেখছিলাম। একটু পরে ফ্র্যাঙ্গিপানির বিহ্বল করা গন্ধে সে ঘরটিও ভুরভুর ক'রে উঠল।

কাছে এসে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ফিলিতা তার সদ্যঃস্নাত একটি হাত আমার হাতের ওপরে রাখল। বেশী জ্বরে হঠাৎ যদি কেউ গায়ে খুব ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া লাগায় তখন যেমন প্রথমটায় সর্বাঙ্গ শিরশির ক'রে ওঠে, তেমনি এক শিহরণে কেঁপে উঠলাম।

কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। চুপ ক'রে রইলাম দুজনে।

খানিক পরে বললাম, "খুব দেখালে তুমি আজ! দুষ্টুমি ক'রে মাদামের সেক্রেটারীর কাজে আমায় জড়িয়ে দিলে।"

আমার হাতটা ফিলিতার মুঠোর মধ্যেই ছিল। জোরে একটা চিমটি কেটে আমার চোখে তার সেই কালো চোখের গভীর দৃষ্টি রেখে বলল, "বোকা ছেলেদের অমনি ক'রেই জব্দ করতে হয়, বুঝেছ পণ্ডিত?"

ওর দিকে চেয়ে থাকতে ভয় করছিল। ঝুঁকে প'ড়ে জানলার নীচে সিনেমার ইণ্টারভ্যালের জনারণ্য দেখতে লাগলাম। আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিলিতা আবার বলল, "বেজায় বোকা তুমি!"

ওল্ড-এম্পায়ারে ইণ্টারভ্যাল ফুরোবার ঘণ্টা বাজল। তারপরে কখন যেন সিনেমা-ও ভেঙে গেল।

ঘর অন্ধকার ছিল। ফিলিতা আলো জ্বালিয়ে দিল। ড্রেসিং-টেবলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথার ফুলটা ঠিক ক'রে লাগাতে লাগাতে বলল, "আমার ফীগারটা এখনও ভালোই আছে, না?"

কিছু বললাম না।

"আমার বয়সে আমাদের দেশের মেয়েগুলো এমন ধুমসী হতে শুরু করে—মা গোঃ!"

পাশের ঘরে খুট্ করে দরজা খোলার শব্দ হলো।

"কোথায় তোমরা?" মিসার গলা।

আঃ আস্তে কথা বলো, মেয়েটা ঘুমিয়েছে যে!" ফিলিতা চাপা গলায় মিসাকে বকে।

মোআনার অসুখের জন্যে আজ আর মিসার বাজনা শোনা হলো না; গল্প করতেও ভালো লাগল না। ওদের কাছে ছুটী নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমায় এগিয়ে দিতে ফিলিতা গেট পর্যন্ত আমার সঙ্গে এল।

দিনকয়েক পরে একদিন। মাদামের ঘরে কোনো কাজ ছিল না, তাই মোআনাকে 'ম্যাগ্নোলিয়া'-র দোকানে আইসক্রীম খাইয়ে ফিরে এসে মিসার সঙ্গে এটা-ওটা নিয়ে টুকরো আলাপ করছিলাম।

ফিলিতার সঙ্গে দেখা হয় নি। শুনেলাম হেয়ারড্রেসিং করাতে গেছে অনেকক্ষণ আগে, এখনও ফেরে নি। ফিরল অনেক পরে। কী নিয়ে যেন ওর সঙ্গে একটা রসিকতা ক'রে অন্যদিনের মতো পাল্টা জবাবের অপেক্ষায় ছিলাম। কোনো উত্তর না পেয়ে ওর মুখের দিকে ভালো ক'রে চেয়ে দেখি খুব বিমর্ষ হয়ে রয়েছে।

ইশারা ক'রে আমায় পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। স্কার্টের পকেট থেকে মস্ত মোটা একটা খাম বের ক'রে আমায় দিল। সেটা হাতে নিয়ে ইতস্ততঃ করছিলাম।

"খুলে দ্যাখো—ফ্রাঁসোয়ার চিঠি" গম্ভীর স্বরে ফিলিতা বলে।

"নাঃ, তোমাকে লেখা ফ্রাঁসোয়ার চিঠি আমি পড়ব না। তুমিই বলো না কী লিখেছে, আর সেজন্যে তোমার মুখভার করবার মতোই বা কী হয়েছে?"

ফ্রাঁসোয়া লিখেছে যে, মার্সেলিনা আবার বিয়ে ক'রে হানিমুন করতে দক্ষিণ-ফ্রান্সে গিয়েছে। আরও লিখেছে যে, ঝিনুক কুড়িয়ে মুক্তোর ব্যবসা করা আর চলছে না, তাই বাবার নির্দেশে ফ্রাঁসোয়াকে জাপান যেতে হচ্ছে জাপানী ক্রোরপতি বণিক মিকিমোতোর কাছ থেকে কালচার্ড-পার্লের এজেন্সি নিতে। নিজেদের 'ট্রলার'-জাহাজ আর ডুবুরী সঙ্গে নিয়ে চলেছে, যাতে ফিরতি পথে ফিজির সমুদ্রে দু'একটা ডুব দিইয়ে পাথেয় খরচটা তুলে নিতে পারে। সেখান থেকে সে কলকাতায় আসবে। ফিলিতাকে সঙ্গে না-নিয়ে মাদাগাস্কারে ফিরবে না ফ্রাঁসোয়া। 'তোমাকে ছেড়ে আমার বাঁচা চলবে না ফিলিতা, সে-কথা মিসাকে বুঝিয়ে বলে ছুটি চাও তার কাছ থেকে"—খাম থেকে চিঠি বের ক'রে শেষের লাইন ক'টা ফিলিতা আমায় পড়ে শোনালো।

সজল চোখে বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ফিলিতা বলে, "আমার ভালোবাসাকে ভুল বুঝল ফ্রাঁসোয়া তা'তে দুঃখ করব না, কিন্তু সে মিসার বন্ধুত্বের এত বড়ো অপমান করল, এই দারুণ গ্ল্যানি সহ্য করতে পারি না যেন।"

আদর ক'রে ওর কাঁধে একটা হাত রেখে আমি বললাম, "কিন্তু এ-কথা তো নতুন নয়, সে তোমায় আগেও বলেছে তার সঙ্গে চ'লে যেতে।

"তুমি কী ক'রে জানলে?" মুখ তুলে ফিলিতা বলে, "ওঃ বুঝেছি, ফ্রাঁসোয়াই তোমায় ব'লে গেছে। কিন্তু সে তো কেবল তার মুখের কথা ভেবে আমি খালি হেসেছি। সীরিয়াসলি নিই নি কোনোদিনও। ফ্রাঁসোয়াকে আমার সব দিয়েছি; কিন্তু তাই ব'লে আমি মিসার সঙ্গে করব বিশ্বাসঘাতকতা? না-না কখনোই না!"

এ-সেই পলিনেশিয় নারীর মূল্যবোধ। স্বামীকে না লুকিয়ে এই মেয়ে একই সঙ্গে আরও ক'জনের সঙ্গে প্রণয় করতে পারে, কিন্তু সেজন্যে তার স্বামীকে ভালোবাসা কমে না। এই মূল্যবোধে ছলনার স্থান নেই, ঈর্ষার স্থান নেই, আর নেই দেহবিক্রয়ের রীতি।

কাঁদতে কাঁদতে ফিলিতা বলে, "তোমাকে তো বলেছি আমার প্রথম প্রেমের কথা। আমার জীবনে প্রথম প্রেমের সুর শিখিয়েছিল মিসা। আমায় মাতৃত্ব দিয়েছে মিসা, পেয়েছি ওই ফুলের মতো সুন্দর মেয়েটাকে। সেই মিসাকে ছেড়ে আমায় চ'লে যেতে বলে ফ্রাঁসোয়া!"

তার আকুলতায় অভিভূত হয়ে বললাম, "কেন এত ব্যাকুল হচ্ছো ফিলিতা? ফ্রাঁসোয়াকে পরিষ্কার ক'রে জানিয়ে দাও তোমার মনের কথা। ফিরে আসতে বারণ করো তাকে।"

ফ্রাঁসোয়াকে তুমি জানো না। এই চার বছরে আমি তাকে চিনেছি; সে ভয়ংকর। আমার মানা সে শুনবে না।" ঝরঝর ক'রে একরাশ অশ্রু ঝ'রে পড়ল দিশেহারা সেই মেয়েটির দুচোখ বেয়ে।

বোধ হয় ফিলিতার ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শুনেই গিটার হাতে মিসা কখন যেন এসে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছিল, টের পাইনি। কাছে এসে সযত্নে ফিলিতাকে ধ'রে কৌচের ওপরে বসিয়ে দিল। নিজে বসল পায়ের কাছে গালিচায়। আমাকেও বসতে বলল।

গিটারে টুং টাং করতে করতে আস্তে আস্তে বলল, "আমি ফ্রাঁসোয়াকে চিঠি লিখে দেব। তা' সত্ত্বেও যদি সে আসে, আসুক। ভয় কি তোমার ফিলিতা, সে ভয়ংকরকে তুমি আর আমি জয় ক'রে ফেলব।"

এই ব'লে সে নিজের ভাষায় সেই গানটা ধরলো, যেটা আগেও ওর মুখে শুনেছি :

ওই পান্থপাদপের শাখার মতো
সবুজ আমার প্রেম
ওই মেঘমুক্ত আকাশের মতো
স্বচ্ছ আমার প্রেম
ওই দিগ্বলয়ের মতো প্রসার
আমার ভালোবাসার।
বসন্তের স্নিগ্ধ বাতাসের মতো আমার অনুরাগ
লাল-প্রবালের মতো রঙীন আমার প্রণয়
নীলসাগরের মতো অনন্ত সেই ভালোবাসা।

জমাট অশ্রুর করুণতা ছাপিয়ে ফিলিতার চোখে আবার ফুটেছে সেই অপরূপ হাসি। মিসার সঙ্গে সে মৃদুস্বরে গাইতে থাকে :

লাল-প্রবালের মতো রঙীন আমার প্রেম
নীলসাগরের মতো অনন্ত সেই ভালোবাসা।

এ-গান যেন শুধু ওদের দুজনের পরস্পরের সুরে সুরে কথা-বলা। ওদের সমবেদনা সহানুভূতির এই ব্যঞ্জনার সমুখে আমি যেন এক মূর্তিমান রসভঙ্গ। বুঝতে পারি, এই পরম-মুহূর্তে আমি এখানে অবান্তর।

পারিপার্শ্বিক ভুলে ওরা দুজনে শুধু দুজনকেই দেখছিল। সে দৃষ্টিরেখায় কোন বিক্ষেপ নেই। ওদের কাছে যেন আমার আর কোনো অস্তিত্বই নেই।

আমি নিঃশব্দে পাশের ঘরে চ'লে এলাম। সেখানে লোলা আর মালাকে দুই হাঁটুর ওপরে শুইয়ে পুতুলের-মা মোআনা বাবা-মার দ্বৈত-সংগীতের তালে তালে তার পুতুলদের দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে।

সেদিনের পর থেকে ফিলিতা আর মিসা যেন নতুন ক'রে প্রেমে পড়ল। এত নাচ, এত গান আর এত বাদ্য-বৈচিত্র্য এর আগে কখনও দেখিনি কিম্বা শুনি নি। যেন ভাবতরঙ্গে ওরা দুলেছে, নব অনুরাগের রসের স্রোতে যেন ওরা ভেসে চলেছে। সুরে সুরে দুজনে যেন দুজনকে বলছে : কিছু ভয় নেই, তুমি আছ আর আমি আছি।

নিকোলেৎ-এর কাজ সেরে রোজই একবার ফিলিতার ঘরে যাই। সে আমাকে যত্ন করে আগের মতোই, তবু যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে আমার। যে-আদরে ফিলিতা আমায় এতদিন ঘিরে রেখেছিল তার সমস্তটাই নতুন ক'রে অধিকার ক'রে নিয়েছে মিসা।

এই হারানোর বেদনায় বিচলিত হয়েছিলাম? হ্যাঁ, প্রথমটায় হয়েছিলাম। হই-নি বললে সত্যকে অস্বীকার করা হবে। কিন্তু কয়েকদিনের অন্তর্দ্বন্দ্বের পরে ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল আমার মন। না-চাইতে ফিলিতা আমায় যেটুকু দিয়েছিল তার প্রসাদে পরিপূর্ণ হলো আমার অন্তর।

ওদের যাওয়ার দিন ঘনিয়ে এল। মিসা ফ্রাঁসোয়াকে কোনো চিঠি লিখেছিল কিনা মনে নেই, কিন্তু ফিজি থেকে মাদামের কাছে ফ্রাঁসোয়ার একটা চিঠি এল। লিখেছে যে আর কয়েকদিনের মধ্যেই সে কলকাতায় পৌঁছবে।

ডাকের চিঠিখানা আমি খুলে পড়েছিলাম। মিসা আর ফিলিতার কাছে গিয়ে খবরটা দিলাম। একটুকু আর বিচলিত হলো না ফিলিতা। হেসে ছোট্ট ক'রে বলল, "আসুক্।" আত্ম-প্রত্যয়ের দৃঢ়তা তার মুখে।

দেখতে দেখতে সেই কয়েকটা দিনও কেটে গেল। কিন্তু ফ্রাঁসোয়ার জাহাজ এসে পৌঁছল না।

তার বদলে মাকংগাইয়ের কুষ্ঠাশ্রমের অধ্যক্ষের কাছ থেকে নিকোলেৎ-এর নামে এক চিঠি এল। এ-চিঠিও আমিই খুলে মাদামের হাতে দিয়েছিলাম। সংযমের বাঁধ ভেঙে অশ্রুর বন্যায় প্লাবিত হলো বৃদ্ধার চোখমুখ। তার শোকে অবরুদ্ধ কণ্ঠে অস্ফুট আর্তধ্বনি দমকে দমকে বেরোতে লাগল। হাত নেড়ে আমায় ইশারা করলেন ঘর ছেড়ে চলে যেতে। একা থাকতে চান তিনি।

গীতমুখর দ্বীপপুঞ্জে সংগীতবিশারদ ফ্রাঁসোয়াকে সকলেই চিনত। মাকংগাইয়ের অধ্যক্ষ মহাশয় তাকে বিশেষ ক'রে জানতেন, কারণ ফিলিতাকে দেওয়া ফ্রাঁসোয়ার সেই কণ্ঠহার ফ্রাঁসোয়ার দান ব'লে তাঁর হাতেই ফিলিতা পেঁৗছে দিয়েছিল।

চিঠিতে খবর ছিল যে, আশ্রমের কাছেই সমুদ্রের এক চোরাপাহাড়ে ধাক্কা লেগে ফ্রাঁসোয়ার ট্রলার ডুবে গিয়েছিল। আর যেখানে ডুবেছিল ঠিক সেই স্থানটি হাঙরে-ভরা। কুখ্যাত এক টাইগার-শার্ক আর তার গুটিকয়েক সঙ্গিনীর লীলাভূমি সেই চোরাপাহাড়ের খাঁজে খাঁজে, আশেপাশে। জাহাজের অল্প কয়েকজন নাবিকের মধ্যে একটি লোক ছাড়া আর কেউই তাদের কবল থেকে রক্ষা পায় নি, আর সেই লোকটি ফ্রাঁসোয়া নয়।

"না-না না-না! এ হতেই পারে না। কই সে চিঠি?" আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে মাদামের ঘরের দিকে ছুটে গেল ফিলিতা।

মিসা আর আমি—মাথা হেঁট ক'রে রইলাম দুজনে। ফিলিতাকে সামলাবার শক্তি তখন আমাদের ছিল না।

প্যারিস থেকে দেশে ফিরে বছরখানেক পরে মিসা আমাকে একটা চিঠি লিখেছিল।

ইওরোপে ওদের অর্থ ও যশ দুই-ই জুটেছিল প্রচুর। এখন কিছুদিন ওরা দেশ ছেড়ে আর কোথাও যাবে না। ফিলিতার ইচ্ছে মতো নিজেদের থাকার জন্যে আলাদা একটা বাড়ী তৈরী আরম্ভ করেছে মিসা।

মোআনা তার ইন্ডিয়ান ওংকেলের কথা প্রায়ই বলে, বিশেষ ক'রে পুতুল খেলার সময়ে।

মিসার লেখার নীচে ফিলিতাও কয়েক লাইন জুড়ে দিয়েছে : "গৃহপ্রবেশ করব এখন থেকে তিনমাস পরে পূর্ণিমার রাত্রে। পারলে নিশ্চয়ই এস সেই উৎসবে। তোমায় দেখতে খুব ইচ্ছে করে। আর একজনকেও কাছে পেতে মন চায়। সে ভুল ক'রেছিল—তার প্রচণ্ড প্রেমের আগুনে আমায় দগ্ধ করতে এসেছিল। কিন্তু এ-কথা আমি কেমন ক'রে ভুলি বলো তো, যে সেই প্রচণ্ডতার সঙ্গে মিশে ছিল আমার জন্যে তার সর্বস্ব পণের প্রতিশ্রুতি? তাকে আর ফিরে পাব না। শুধু গভীর রাত্রে সাগরের ঢেউয়ের গর্জনে শুনতে পাব তার ডাক জানো, মাঝে মাঝে মনে হয় প্রবাল-বাঁধের ওপারে গভীর জলের মধ্য থেকে ভারী গলায় কে-যেন আমার নাম ধ'রে ডাকে, গান গায়। মিসাকে বলি। সে বলে ওটা নাকি আমার মনের ভ্রম। তবুও আমি যে কতদিন রাত্রে কান পেতে থাকি—শুনতে পাই যেন পিয়ানোর নীচু অক্টেভের মন্দ্রধ্বনির সঙ্গে মোটা গলায় প্রহরের পর প্রহর ফ্রাঁসোয়া গেয়ে চলেছে :

হোয়্যার দি সার্ফ লে-হুয়া লেইবস্
দেয়ার আই ওয়ান্ডার বাই ইট্‌স্ ওয়েভ্‌স্
এভার লং ইং ফর ইওর লাভ, মাই ওন্!

উদ্বাস্তু

শ্রীসুলেখা ঘোষ
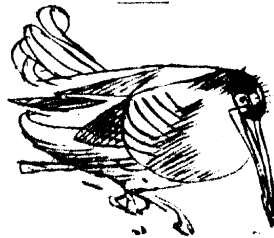
ভেসে চলে জোয়ারের উন্মত্ত তরঙ্গ ঘায়ে
  ক্ষুব্ধ জনস্রোত
নাহি কূল, নাহি তীর, কোথায় জীবনতরী
  ভাসে অনুক্ষণ
কে তার হিসাব রাখে কোথা ওঠে মরণের
  ক্ষণিক বুদ্বুদ?
অশান্ত ব্যাকুল হিয়া বাঁচিবার তরে করে
  বৃথাই ক্রন্দন।

ধন নাই, মান নাই, নাই বিত্ত
  কোথায় আশ্রয়?
জোয়ারের মুক্ত স্রোতে ভেসে যায়
  জীবন তরণী
লাঞ্ছিত জীবন শুধু জেগে রয়
  ক্ষীণ প্রত্যাশায়
ওদের ক্রন্দন রবে সিক্ত আজ
  বিষাক্ত ধরণী—।

পেয়েছে আশ্রয় ওরা পথে ঘাটে
  জঞ্জালের পাশে
প্রাণের স্পন্দন শুধু সাক্ষী রয়
  নহে ওরা মৃত
নিষ্ঠুর অদৃষ্ট হায় ভরে তোলে
  হাস্য পরিহাসে
বিতাড়িত ঘৃণ্য ওরা, ক্রন্দসীর
  ওরা অবাঞ্ছিত।

পিশাচ কুকুর দল একধারে
  তুলিছে চীৎকার—
ওরাও জানায় দাবী বাঁচিবার
  থাকিবার মত,
চাই স্থান, চাই খাদ্য তাহাদেরও
  আছে অধিকার
বিতাড়িত এলো যারা তাহারা কি
  এতই লাঞ্ছিত?

তাদের এ মর্মব্যথা, তাদের কঠিন
  দীর্ঘশ্বাস
মিশিয়া হয়েছে এক বাতাসের
  শিরায় শিরায়
আকুল আহ্বানে আজ পারিনাকো
  করিতে বিশ্বাস
নহে এরা অভাজন—। আজ এরা
  পথেতে লুটায়।

অভাবের নগ্নরূপ, রিক্ততার
  ছিন্ন আবরণ
ইহাদের ভাগ্য পরে পড়িয়াছে
  বাজ বিধাতার
নিখিল ভরিয়া তোলে ইহাদের
  দুঃসহ ক্রন্দন
নিশা অবসান হতে ইহাদের
  কত দেরী আর?

নগেন্দ্রনাথের
হিমকল্যাণ
বিশুদ্ধ
আয়ুর্ব্বেদীয় কেশ তৈল
★
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস (প্রাইভেট) লিঃ
কলিকাতা-৪

কিশোরী-বেশ

বেলা দে

দেশ বিদেশের কবিরা ক্ষণ-বসন্তের সংগে ফুলের ক্ষণস্থায়ী আয়ুর তুলনা করেছেন নারীর যৌবনের। কথাটা ঠিকই --যৌবনে তার মূল্য বোঝবার বোধ হয় সময় হয় না। সময় যায় বিগতপ্রায় যৌবনের প্রতি চেয়ে, কবে তাঁদের মত সাজ-সজ্জা করতে পারবো, এই ভেবে আর তাঁদের চালচলনের অনুকরণ করবার চেষ্টা করে। অল্প বয়সে, বয়স বাড়বার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর বেশী বয়সে পলায়মান যৌবনকে বহু সাধনা করে ধরে রাখবার চেষ্টা বহু নারীর সময় কাটে এই গোলক ধাঁধাঁর মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে। কিশোরী লোলুপ দৃষ্টিতে অনুকরণ করছে পরিণত যৌবনের—আর পরিণত যৌবন অনুকরণ করছে এগিয়ে যাওয়া যৌবনের! অপ্রিয় হলেও এ রকম দৃষ্টান্ত যে একেবারে বিরল নয়, এ কথা অনেকেই স্বীকার করবেন।

চৌদ্দ বছরের কিশোরী, তার দিদির মত চুল বাঁধতে, কাপড় গয়না পরতে কেন পারবে না তা সে বুঝে উঠতে পারে না। আঠারো উনিশ বছরের তরুণীদের তো সমস্যা আরো ঘোরতরো! তারা ভাবে এত বয়স হল তবুও মা কেবলি সাবধান করে দেন এটা করো না, ওটা করতে নেই, অমুক জিনিষটা মেখো না, মুখের চামড়া খারাপ হবে ইত্যাদি। বাধা নিষেধের আর শেষ নেই। দিদির বেলায় কিন্তু এ সবের বালাই নেই। এমনি যাঁদের মনোভাব, সেই কিশোরী বোনেদের নিয়েই আমার কথা আর তার চেয়েও বড় কথা, তাদের সাহায্য করবার উদ্দেশ্যেই আমার এই প্রবন্ধের অবতারণা।

তোমরা যে ভাবে বেশ বিন্যাস করতে চাও আর বড়রা যে ভাবে চান—আর তোমরা সাজ-সজ্জা করো, এর মধ্যে কোন্‌টার মধ্যে কতখানি রয়েছে যথার্থ উপকারিতা, আগে সে কথা জানতে হলে দেখতে হবে তোমার স্বাস্থ্য ও মুখখানি কেমন। তুমি যদি স্বাস্থ্যবতী

হও, তাহলে বাইরে থেকেই তোমার মুখে চোখে স্বাস্থ্যের দীপ্তি আপনিই ফুটে উঠবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্যেরা মাখছে বলেই, তুমিও পুরু খানিকটা পাউডারের তলায় তোমার মুখখানি ঢেকে ফেলবে, তা কেমন করে সম্ভব? তবে যদি তোমার স্বাস্থ্য সত্যিই খারাপ হয়, যার জন্য তোমায় রুগ্ন বা অসুস্থ দেখায়, সে ক্ষেত্রে কিছু 'মেক-আপ' তোমার প্রয়োজন। তবে সে 'মেক-আপ' খুব যত্নের সংগে করা চাই। যাদের বয়স কুড়ির কম তাদের আমি বলি, তোমাদের সবচেয়ে ভালো দেখাবে—যখন তোমাদের স্বাভাবিক দেখাবে। অবশ্য এর মানে নয় যে, তোমরা সৌন্দর্য চর্চা থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকো। অনেকে আবার অল্প বয়স থেকে বেশ বিন্যাসে সম্পূর্ণ উদাসীনতা প্রকাশ করে থাকে—আমার মতে এরা স্বাস্থ্যকে অবহেলা করে চলে, মনে করে ওতে কিছু হবে না। কিন্তু এই অবহেলার কুফল তাদের সারা জীবন ভোগ করতে হয়।

পনেরো কুড়ি বছরের মেয়েদের প্রয়োজন নিয়মানুবর্তিতা। কোন মতেই এর নড়চড় হবে না যদি অবশ্য সৌন্দর্য সত্যি সত্যিই বজায় রাখতে চাও। তোমাদের প্রত্যহ রাত্রে শোবার আগে গরম জল ও ভালো সাবান দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে। এর পর শীতকালে রাত্রে একটু করে অলিভ অয়েল ঘসে ঘসে মাখতে হবে মুখে। আর গরমকালে শুধু মুখখানি ধুয়ে মুছে শুতে গেলেই চলবে। যদি মুখে ব্রণ বা ফুসকুড়ি আরম্ভ হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু শুধু ক্রীম পাউডারে তাকে ঢেকে রাখলে চলবে না, নজর দিতে হবে নিয়মিত পেট পরিষ্কার রাখা ও খাওয়া

দাওয়ার প্রতি। এ ছাড়া বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া দরকার।

এর পর প্রসাধন ব্যবহার করবার কথা বলি—কম বয়সের মেয়েরা ফলের

...ষ্টিক ব্যবহার করবে। পাউডারের রং ...ব প্রথমে একটু পাউডার নিয়ে হাতের ... দিকে ঘসে দেখবে যে সেই রংটি তোমার ...র রংয়ের সঙ্গে এক হয়ে মিশে যাচ্ছে ...! তাহলেই ঐ রংয়ের পাউডার ব্যবহার ...। টকটকে লাল লিপষ্টিক এবং রুজ ...বারেই ব্যবহার করবে না। মোট কথা যাই ... সব কিছুই এমনভাবে ব্যবহার করবে ...কেবলমাত্র স্বাভাবিক রং টুকুরই অভাব —দেখলে বোঝা শক্ত যে লালিমা ফোটাতে ...র সাহায্য নেওয়া হয়েছে। রূপসজ্জার দ্বারা ...তিক স্বাস্থ্যের আভাটুকু ফুটিয়ে ...র প্রয়োজন—মুখে লাল, গোলাপী ও ...র মুখোস পরার উদ্দেশ্য নয় এবং তা ...ন সুশ্রী দেখায় না। নিজেরা যদি ...বরের রং বাছতে না পারো তাহলে এই ...দের যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁদের সাহায্য ...।

...সব দেশে শাড়ী জামা পরার কথা একটু ...। [illegible] স্কুলে যাও তারা কেমন বেশ [illegible] স্কুলে যাওয়ার সময় ... পোষাক হওয়া উচিত সাধারণ অথচ ...র পরিষ্কার জামা কাপড়। বেশ পরিষ্কার ...চুল বেঁধে অর্থাৎ দুটি বিনুনি পিঠে ...য়ে দিয়ে কাপড়ে একটি পিন আটকে ...টি [illegible] গেলে তাদের পক্ষেও সুবিধা ...দেখতেও ভালো লাগে। স্কুলের মেয়েরা ... [illegible] বেশী গয়না পরবে না সম্ভব ...হাতে ঘড়িও বাধা যেতে পারে, নয় তো ...একগাছি বালা বা চুড়ি থাকবে। স্কুলের ... [illegible] সাদাসিদে বেশভূষা করবে। ... [illegible] ... [illegible] সাজবে না, নিশ্চয়ই সাজবে ... [illegible] দেখাবার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে ... [illegible] চলতে বলছি। বিয়েবাড়ী ... [illegible] জন্মদিনে নিমন্ত্রণে যাবে ... [illegible] স্কুলের বেশভূষায় যাবে না— ... [illegible] কাজ করা জর্জেট বা সিল্কের ... [illegible] পরলে ... [illegible] সেই সঙ্গে চুলের বিনুনীতেও রূপোর ...গয়না ভালোই মানাবে অথবা শাড়ী ...কুঁচিয়ে পরে মাথায় একটু ফুল দিয়ে, ...হাতে গলায় সরু ধরণের বালা বা কঙ্কণও ...যেতে পারে। ছোট মেয়েরা একটু উঁচু ...ভেলভেট জুতো ব্যবহার করবে। কিন্তু কখনো ... [illegible] রাখবে না। অনেক ছোট মেয়েদের ...বাবা মা বা বড়দের কাছে হীরা জহরতের ...রাশ গয়না পরে নিমন্ত্রণ বাড়ীতে ...। এতে কত যে দৃষ্টিকটু লাগে তা ...যায় না। তার চেয়ে বরং দু' একখানি ...ন গয়নায় নিজেকে আরো সুন্দর করে ...তে পারো।

পনেরো থেকে আঠারো-কুড়ি বছরের মেয়েরা ...রাত্রের দিকে কোনো বিয়ে বাড়ীতে ...ত্রণে যায় তাহলে, কিন্তু হালকা রংয়ের ...সোনালী বুটি দেওয়া বা কাজকরা ...বা ঢাকাই বেনারসীও পরতে পারো—এর ...ভেলবেটের ব্লাউজ আর সোনালী কাজ ...শাড়ী হলে, দু' একখানি সোনার গয়না, ...রূপালী কাজ হলে রূপোর গয়না, আর ...শুধু ফুলের গয়নাও পরা যেতে পারে। ...অল্প কাজকরা চটী বা একটু উঁচু ...হীলের জরীর কাজকরা জুতো পরবে। বড়দের দেখে কখনো কপালে টিপ পরবে না, বিনুনীর সঙ্গে বরং জরী বা রূপো সোনার কোনো ফুল লাগিয়ে দিতে পারো। না হলেও কিছু আসে যায় না। তবে যদি বিকেল বা সকালে কোথাও বেড়াতে যাও তাহলে কিন্তু একেবারে সাদাসিদে বেশভূষা। যেমন সাদা বা কোনো হালকা রংয়ের মসলিন, খাদি বা দাক্ষিণ ভারতীয় সুতীর শাড়ী এইগুলোই পরতে পারো, চোলি ব্লাউজ অথবা হাতে গলায় কালো বা শাড়ীর সঙ্গে মানানসই করে [illegible] বসিয়েও ব্লাউজ পরা যায়। সাদা ভয়েলের ওপর আজকাল নানা রকম কাজকরা শাড়ী দেখা যাচ্ছে, এগুলো যদিও সকলেই ব্যবহার করছেন তথাপি আমার মনে হয় ছোট [illegible] দেরই এগুলো পরলে ভালো দেখাবে। যে ধরণেরই বেশভূষা করুন না কেন বেশী জমকালো সাজ-পোষাক ছোটদের অর্থাৎ যারা স্কুলে পড়ো তাদের কোন মতেই পরা উচিত নয়। যখনকার যা তাই করতে হবে। কাকী দিদি বা বড়রা যা পরেছেন, তাই দেখে দোকানে বাজারে গিয়ে কতকগুলো শাড়ী জামা কিনে এনে এখন থেকেই নিজেদের রুচি নষ্ট না করাই ভালো। ভেবে দেখবে তোমার বয়স তোমার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য এবং যা পরবে তা তোমাকে ঠিক মানাবে কিনা! যেমন সতেরো-আঠারো বছর বয়সের কোনো মেয়ে যত সুন্দরীই হোক না কেন—তারা কালো শাড়ী জামা পরবে না! কারণ তার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এ রংয়ের সংঘর্ষ অনিবার্য। কালো রংয়ের শাড়ীর জন্য ফর্সা রংয়ের দরকার নেই, বার্ধক্যেরও নয়, বিজ্ঞভঙ্গিরও নয়—সচেতন গর্বের। তাই আবার বলছি, তোমাদের বয়সে শাড়ী যতই আশ্চর্য মনে হোক না কেন দুর্বল মুহূর্তে না ভেবে চিন্তে কখনো কিনো না, শাড়ী দেখানো নিশ্চয়ই তোমাদের উদ্দেশ্য নয়—উদ্দেশ্য হলো নিজের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলা।

বিষ্ণুপ্রিয়ার ব্যথা

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী পঞ্চতীর্থ

মানুষের দুঃখদৈন্য আমার
কৈশোর-চিত্ত করেছিল ম্লান,
চেয়েছিনু কায়মনে ভানুদয়ে
আনিতে রাত্রির অবসান
আমার পরম-বাঞ্ছা পৃথিবীর
লাঞ্ছিতের দুঃখ দূর করা;
বাঞ্ছাকল্পতরু এক সহৃদয়
শান্তিধর সর্বব্যথাহরা
শুনেছিল পাতি কান, মর্মে
তার লেগেছিল কঠিন আঘাত,
তাই হাসিভরা মুখে এ হাত
ধরার লাগি বাড়াইল হাত।
নীরবে বলিল মোরে
জলভরা ছলছল চোখের ভাষায়
নিশ্চিন্ত হইয়া থাক হে প্রেয়সি,
পূর্ণ হবে তব অভিপ্রায়।
প্রেমারুণে করপাতে রাঙাইয়া দিব
আমি মানুষের মন,
অর্পিব অধন্য নরে সর্বস্তরে
সর্বোত্তম অনর্পিত ধন,
রচনা করিব দেবি,
ধরণীর ধূলিতলে নব-বৃন্দাবন।
মানুষের দুঃখ দৈন্য, গ্লানিপাপ,
মানুষে মানুষে হানাহানি,
ঘৃণা-দ্বেষ বিদূরিয়া সাম্যশান্তি
চির সুখ দিব আমি আনি।
প্রাণের শ্রবণে মোর শুনিলাম
অশ্রুভরা সে চোখের ভাষা;
বুঝিলাম প্রিয়তম নিশ্চিত পুরাবে
তার প্রেয়সীর আশা।

তখন কি জানিতাম কত দাম
দিতে হবে ইহার লাগিয়া?
তখন কি জানিতাম এর তরে
ছিন্ন করি দিতে হবে হিয়া?
তখন কি জানিতাম প্রভুর চোখের
ভাষা কত কথা কহে,
তখন কি জানিতাম আমাদের
দুজনের সত্তা দুই নহে?
চাহিয়াছিলাম যাহা পরিপূর্ণভাবে
তাহা করিয়াছি লাভ,
ধরণীর ধূলিতলে দেখিয়েছি
গোলকের নব-আবির্ভাব।
পূর্ণ মনস্কাম তবু ক্ষণেকের তরে
আমি ভুলিতে না পারি—
পতি সেবা তৃষ্ণাতুরা, পতি সঙ্গ পিপাসিতা
আমি এক নারী।
গাগরী ভরিয়া বারি আনিবারে
গিয়াছিনু প্রেম-সিন্ধু-তটে,—
তখন কি জানিতাম
আনিতে হইবে অশ্রু হৃদয়ের ঘাটে?
আর্ত মানুষের তরে যে মহতী
আর্তি প্রভু করেন স্বীকার
স্মরি তা নিয়ত চিত্ত তাঁর দুখে দুঃখী হয়ে
করে হাহাকার।
অধম পতিত লাগি অসীম কৃপালু
প্রভু দুঃখ বোধ করে;
আপন প্রিয়ার লাগি না জানি
কি ঘন ব্যথা অনুভব করে!
অন্তর্গূঢ় অব্যক্ত সে বেদনার
প্রকাশের কোনো পথ নাই
আচ্ছাদিতে তারে আজ কৃষ্ণহারা
রাধিকার বিরহ ত তাই।
হৃদয়-বীণায় মোর তাঁহারি
গভীর ব্যথা করে গুঞ্জরণ,
মনের অঙ্গনে মোর তাঁহারি
মনের ছায়া করে সঞ্চরণ,
তাঁহারি নয়ন-বারি বন্যা
নামাইয়া আনে নয়নে আমার
তাঁহার সে অপ্রকাশ মৌন ব্যথা
স্তব্ধ করে মোর হাহাকার,
মহানাম ব্রত তাঁর সুকঠোর
ব্রতরূপে করি আচরণ
কৃষ্ণনামে তাঁর নামে এক করি
সত্তা মোর করি বিসর্জন।
ব্যথার কাহিনী মোর জানিবার,
জানাবার নাহি প্রয়োজন
শ্রীচৈতন্য-চক্ষু-জলে প্রকাশিত
বিষ্ণুপ্রিয়া-হৃদয় বেদন।
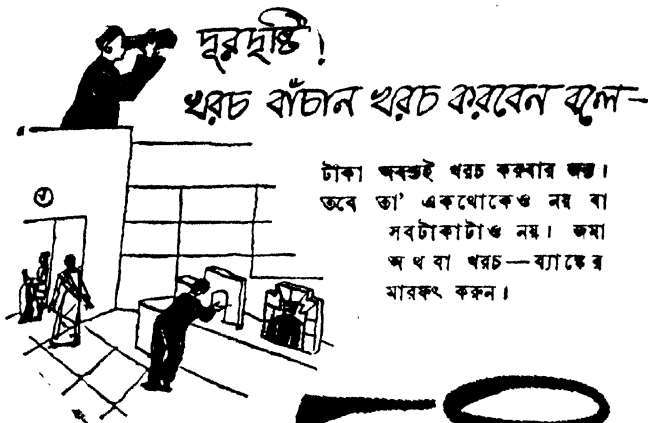
গত ইন্দোর কংগ্রেসে নেহেরুজী একটি কথার উল্লেখ করেছিলেন, আমার মনে হয় সেটি ভারতের মেয়েদের কাছে চিরস্মরণীয়। কোনো দেশ কি পরিমাণে উন্নত, তা জানতে গেলে আমাদের দেখতে হবে যে, সে দেশে কি পরিমাণ ইস্পাত ও বিদ্যুৎ তৈরী হয়, আর সে দেশের মেয়েরা কতদূর স্বাধীন।

আমরা আমাদের এক প্রতিবেশী রাষ্ট্র ব্রহ্মদেশকে জানি যা'র স্ত্রী-স্বাধীনতা সমগ্র এশিয়া [illegible] বলমাত্র এশিয়া কেন, ইউরোপেরও [illegible]নও কোনও দেশের চেয়ে উন্নত অবস্থায় আসীন। কিন্তু সে দেশের [illegible]নও লৌহ বা ইস্পাতের কারখানার [illegible] আমরা জানি না, দুইটি প্রধান সহর রেঙ্গুণে ও ম্যান্ডালের অধিবাসী ছাড়া অন্য অধিবাসীদের কাছে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার একটি বিলাসিতার জিনিষ বলে গণ্য। ব্রহ্মদেশ বহুদিন [illegible]ত ইংরাজের একটি শ্রেষ্ঠ উপনিবেশ ব'লে [illegible] হ'ত। ব্রহ্মের অতুল খনিজ সম্পদ এবং কাঠ [illegible] ইংরাজ জাতিকে অগ্রগতির পথে নিয়ে গেছে। সেইজন্যই তার দেশে কোনও বৃহৎ শিল্পের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে নি এবং ইংরাজ উপনিবেশিকতাবাদ ব্রহ্মদেশকে স্বাবলম্বী হবার জন্য কোনও ভারী শিল্পের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে দেয় নি।

কিন্তু ব্রহ্মদেশের স্ত্রী-স্বাধীনতা কোনও [illegible]তেই বাধাপ্রাপ্ত হয় নি। ব্রহ্মদেশীয় স্ত্রী-জাতির অবাধ স্বাধীনতা দেখে অন্য দেশের লোকেরা ঐ দেশীয় পুরুষদের অবস্থা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হবেন। বৃটিশ রাজত্বের ঠিক পূর্বেই দেশের শাসনভার কয়েকজন অপদার্থ রাজার হাতে ছিলো। তাঁদের সময় সম্ভ্রান্ত [illegible] মেয়েদের কোনও পৃথক সত্তা বা অস্তিত্ব ছিল না। সেই সব মেয়েদেরকে সে সময়ে পুরুষদের [illegible] সম্পত্তির মধ্যে ধরা হ'ত। এই রীতি কেবলমাত্র সম্ভ্রান্ত বংশের বিশেষ করিয়া রাজবংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এর প্রভাব সাধারণ নাগরিক জীবনের মধ্যে [illegible] মাত্র বিস্তার লাভ করতে পারে নি।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক G. E. Harvey এই সব রাজবংশের বিষয় লিখেছেন, "তিন শতাব্দীর মধ্যেই এদের বংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তিন পুরুষ পর্যন্ত এদের শৌর্য, বীর্য যথেষ্টই [illegible] কিন্তু তারপর থেকেই এই সব বংশের অধঃপতন আরম্ভ হয়। হারেম প্রথাই এর অন্যতম কারণ।

"সাধারণ ব্রহ্মবাসীর কাছে তাদের স্ত্রীরা তাদের কর্মসহচারী, জীবন-সঙ্গিনী এবং চলার পথের সাথী। তাদের ছেলে-মেয়েরা বাপ এবং মা দু'জনেরই সমান যত্নে মানুষ হয়ে উঠত। তা'রা (ছেলেমেয়েরা) তাদের বাপ এবং মা দু'জনেরই আদর্শ এবং শিক্ষা সমানভাবে পেত। দৈনন্দিন জীবনে তা'রা স্বামী স্ত্রী উভয়েই উভয়ের সুখ-দুঃখের অংশীদার ছিল। কিন্তু একজন ব্রহ্মদেশীয় যুবরাজকে শৈশব থেকেই রাজপ্রাসাদের দুর্নীতি, হিংসা ও হীন চক্রান্তের মধ্যে বড় হয়ে উঠতে হ'ত। তা'র মা'র আসন সেখানে ছিল গৌণ। তা'র চারপাশে কোনও দিনই স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারের পারিপার্শ্বিকতা ছিল না।"

ব্রহ্মের স্ত্রী স্বাধীনতার ট্র্যাডিশন যে কোথা থেকে এলো তা'র হদিস পাওয়াই দুষ্কর। কারণ ব্রহ্মদেশ তার যে দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও চীনের সাংস্কৃতিক ধারার মধ্যে গড়ে উঠেছে, সেই দুই দেশের নারী-সমাজের ইতিহাস খুঁজলে মেয়েদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া ভার হবে। যদিও ভারতের বৈদিক যুগে মেয়েদের বিশেষ সম্মান দেওয়া হ'ত এবং স্বয়ম্বর প্রথার মাধ্যমে পাত্র নির্বাচনের স্বাধীনতা ছিল, কিন্তু মুসলমান রাজত্বের দৌরাত্ম্যে ভারতীয় মেয়েদেরকে পর্দার আশ্রয় নিতে হয়েছিলো। এই সেদিনও চীন দেশের মেয়েরা দাসত্বের শৃংখলে বাঁধা ছিল। কিন্তু ব্রহ্মের মেয়েরা এ'র বিপরীত ব্যবস্থায় গড়ে উঠেছে। যদিও এ দেশের মেয়েরা প্রচুর স্বাধীনতা-ভোগী তবুও ব্রহ্মের সমাজজীবন বা সংসার মাতৃতান্ত্রিক নয়, অন্যান্য অধিকাংশ দেশের মতই পিতৃতান্ত্রিক।

ব্রহ্মের মেয়েদের অবাধ স্বাধীনতা লাভের সুবিধা প্রধানতঃ তিনটি কারণে হয়েছে, (১) উর্বরা ও প্রাকৃতিক সম্পদে ঐশ্বর্যশালিনী দেশ, (২) অনায়াসে ও অল্প পরিশ্রমে জীবিকার্জন, (৩) বৌদ্ধধর্মের প্রভাব। কারণ বৌদ্ধ আইনে ঐ দেশের মেয়েদের উপার্জন সমাজে সসম্মানে স্বীকৃত এবং ঐ কারণেই নারী পুরুষের সমান অধিকার মেনে নেওয়া হয়েছে। নারীর আর্থিক স্বাধীনতা, নারী স্বাধীনতার একটি প্রধান অঙ্গ।

প্রাকৃতিক সম্পদে ব্রহ্মদেশ খুবই ঐশ্বর্যশালিনী। সেই দেশের আইন অনুযায়ী উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ কর হিসাবে রাজার প্রাপ্য। কিন্তু পূর্বতন রাজারা বিশেষ করে উত্তর ব্রহ্মে (Upper Burma) রাজারা উৎপন্ন শস্যের প্রায় সবটুকুই প্রজাদের কাছ হতে কেড়ে নিতেন। তবুও ব্রহ্মবাসীকে কখনও দুর্ভিক্ষের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে হ'ত না। অথচ তারই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও চীনকে প্রায় প্রতি বৎসরই দুর্ভিক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়।

প্রকৃতির এই অফুরন্ত দান ব্রহ্মের জাতীয় চরিত্রে পুরোপুরিভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে। প্রকৃতির এই দানের মধ্যে বেড়ে ওঠার জন্যে তাদের সামাজিক ও সাংসারিক জীবন খুবই মধুর। কারণ স্বতঃসিদ্ধ যে, আর্থিক সংকটের মধ্যে কখনও স্নেহ, প্রেম গড়ে উঠতে পারে না। এই একটিমাত্র কারণে বর্মী দেশের মেয়ে সদা হাসামুখী, লাস্যময়ী, প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত।

এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের মেয়েদের থেকে বর্মী মেয়েদের পার্থক্য এই যে, তাদের যে কেবল কুমারী অবস্থায় উপার্জনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে তা' নয়, তাদের উপার্জন সর্বকালে, সর্বক্ষেত্রে, বৌদ্ধ আইন মতে ন্যায়সঙ্গত।

এ দেশের মেয়েরা যে বিয়ের পর রান্নাঘরেই বন্ধ থাকবে তা' নয়। বিয়ের পরেও তারা বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার সম্পূর্ণ সুযোগ পায়। কিন্তু তা'রা তাদের সমাজে রঙিন প্রজাপতি হয়ে ঘুরে বেড়ায়, তা' নয়। তারা পুরোপুরিভাবেই তাদের স্বামীদের কর্মসহচরী হয়। তারা আইনের সাহায্যে তিনরকম ভাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়। (১) পাভিন (Payin)—বিয়ের আগে এবং পরে বর্মী মেয়েরা যে সমস্ত গহনাপত্র, টাকাকড়ি বা সম্পত্তি যৌতুক হিসাবে পায় তাকেই "পাভিন" বলে। আমাদের "স্ত্রীধনের" মত আর কি। এই "প্যাভিনের" উপর কারুর কোনও দাবী থাকে না, এটি মেয়েদের সম্পূর্ণ নিজস্ব। (২) ন্যাপাজন (Hnapazon)—এ'টি হলো স্বামী-স্ত্রীর যৌথ উপার্জনে যে সম্পত্তি তৈরী (স্থাবর, অস্থাবর) হয়েছে। কিন্তু যদি কোনও কারণে স্ত্রী পৃথকভাবে বাস করে, তবে এই সম্পত্তির অর্ধাংশ স্ত্রীর প্রাপ্য। (৩) লেত্তেৎ পয়া (Lettet-pwa)—এ'টি হ'ল বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর নিজস্ব উপার্জন। এটি উভয়ের পৃথকভাবে নিজ নিজ সম্পত্তি।

আমরা বিবাহের আগে এবং পরে বর্মী মেয়েদের উত্তরাধিকার আইন নিয়ে আলোচনা করলাম। কিন্তু ব্রহ্মদেশের বিবাহ প্রথাটিই অনেক দেশের থেকে ভিন্ন রকমের। ঐ দেশে পাত্র পাত্রী নির্বাচন, কোনও ক্ষেত্রে অভিভাবকরাও করে থাকেন, আবার কোনও ক্ষেত্রে প্রেমিক-প্রেমিকারাও নিজে নিজে ক'রে থাকেন। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই বৌদ্ধ পুরোহিতের (Pongyis) কোনও স্থান নেই। সেইজন্য এই বিবাহে ধর্মের বন্ধনের চেয়ে চুক্তির বন্ধনই বড়।

সন্তান-সন্ততির দায়িত্ব কোনও সময়েই মা'র উপর থাকে না। যদি পিতা বৌদ্ধধর্ম মতে সন্ন্যাস অবলম্বন করেন তাহলেও সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। কিন্তু সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই দেশের বিবাহ প্রথায় এত শিথিলতা থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় এখানে বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা খুবই অল্প। ব্রহ্মদেশে পারিবারিক শান্তি সব থেকে বড়। প্রতিটি পুরুষ যে প্রতিটি মেয়ের কাছে অতি সম্মানার্হ, সেই বিষয়টি ছোট বয়স থেকেই তাদেরকে (মেয়েদের) শিক্ষা দেওয়া হয়। আইনে "উইল" ব'লে কোনও জিনিষ নেই, স্বামীর মৃত্যুর পর, বিধবা স্ত্রী কয়েকটি সম্পত্তি ছাড়া, অন্য সমস্ত সম্পত্তিরই একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। কয়েকটি সম্পত্তি প্রথম সন্তানের (সে ছেলে কিম্বা মেয়ে যাই হোক) প্রাপ্য, তাতে স্ত্রীর কোনও অধিকার নেই।

বর্মাদেশের মেয়েদের নামকরণ প্রথাটিও অতি চমৎকার। তাদের নামের আদ্য অক্ষর তাদের জন্ম-বারের অক্ষর দিয়ে রাখা হয়। যুবতী বর্মী মহিলাকে "মা" (Ma) এবং বৃদ্ধাদের "ড" (Daw) বলা হয়।

প্রাক্ বৃটিশ যুগে ব্রহ্মদেশের মেয়েদের শিক্ষার ভার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মঠগুলির উপরই ন্যস্ত ছিল। এ'র পরে বৃটিশ রাজত্বে খৃষ্টান ধর্মযাজকদের চেষ্টায় কিছু পরিমাণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সেই সময় অধিকাংশ অভিভাবক এই সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে মেয়েদেরকে শিক্ষার জন্য পাঠাতে রাজী হতেন না। এইজন্য মাঝে শিক্ষিতা মেয়ের সংখ্যা খুবই কমে গিয়েছিলো। ইউনেস্কোর রিপোর্টে দেখা যায় যে, মাঝে ব্রহ্মদেশে

(ইহার পর ৫২৪ পৃষ্ঠায়)

আত্মাশ্রয়ী : মিতা

দিলীপ দাশগুপ্ত

তুমি কি হারিয়ে গেছ? অথবা আমিই!
শান্তিপর্বে, কালিদাসে, রবীন্দ্রদীপ্তিতে
মনের অস্থির গলি ক্লান্ত আলো খুঁজে!!
তবুও প্রত্যাশা আর সমুদ্র ফেনিল
অনন্ত প্রশ্নের ঢেউ প্রজ্ঞার আকাশে
সূর্যস্বাদে মেঘডুবি প্রতি রাত্রে দিনে।
একজোড়া অজন্তার প্রেম-আবিষ্কার
প্রাচীর রন্ধ্রের কোণে ফোটা কোনো ফুলে,
নিস্তব্ধ মুহূর্তে লোভী আকাঙ্ক্ষার চরে
চায়ের পেয়ালা ধরে নির্জন বিশ্রাম ঃ
পরে জনস্রোতে

দেহ-বন্দরেই
প্রতি বাতিঘর দেখে তরী নিয়ে ফেরা!
নিমেষ-ঘুমের ঘ্রাণে সব অস্থিরতা
স্থির নক্ষত্রের মতো একলক্ষ্য হ'য়ে
যাকে পেতে চায় বুকে—
সেই বুকে দেখি
প্রত্যাশা-প্রতীক্ষা অতিক্রান্তার মতোই
তুমিই রয়েছ আরতির দীপ্তি হ'য়ে।
তবু একবার
দাবানলসম-দীপ্ত জ্বালা আর জ্বালা
সরোবরে প্রতিবিম্ব দেখে নিতে ভয়!
কতো না সংশয় ঃ সংকেত নির্ভয়
নিরুদ্দেশ মন!
অকস্মাৎ
ঝনঝন—ন্-ন্-ন্
কাচভাঙা শেষ।

শেষ তবু শেষ নয়। তারপরে শুরু
প্রাত্যহিক চেতনার, জিজ্ঞাসার আর
নির্বিকার ভাবনার সেই তুমি আজ-ও
হারিয়ে কি ফিরে এলে
তুমি—আমি হ'য়ে?

বর্মা দেশের মেয়ে

(২২৩ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষিতা মহিলার সংখ্যা শতকরা ৩০ জন দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু স্বাধীন বর্মায় প্রত্যেকটি মেয়েকে সুশিক্ষিতা হ'তে হয়। বর্তমানে "রেঙ্গুণ মেডিক্যাল কলেজের" ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শতকরা ৫০ জন ছাত্রী এবং বর্মার মহিলা ডাক্তারেরা সুদক্ষা চিকিৎসক হিসাবে গণ্য। অন্যান্য ক্ষেত্রেও মহিলারা যথেষ্ট অগ্রগামী। বর্মী মেয়েরা এই পরিমাণ অবাধ-স্বাধীনতাভোগা ও আলোকপ্রাপ্তা হওয়া সত্ত্বেও, সুগৃহিণী হিসাবে পৃথিবীর যে কোনও দেশের মেয়েদের থেকে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিতা।

রাগমঞ্জুরিকা

(২০৫ পৃষ্ঠার পর)

ঃ ঐরূপ বানর পূর্বেই দুষ্প্রাপ্য ছিল মহারাজ বর্তমানে তো সম্পূর্ণ দুর্লভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ঃ আমার সমস্ত কোষাগার যদি উহার জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিই?

ঃ তাহাতেও আমার মাণিক্যের ক্ষতিপূরণ হইবে না।

ঃ তবে?

পার্শ্ব প্রকোষ্ঠের দ্বার হইতে সহসা সুমধুর কণ্ঠ শ্রুত হইল।

ঃ এই যে মহারাজ। অভিযোক্তার ক্ষতিপূরণ-রাজকুমারী প্রেরণ করিয়াছেন।

সহচরী মালবী। তাহার হস্তে একটি বস্ত্রাবৃত বস্তু।

সভাস্থ সকলের দৃষ্টি প্রশ্নাকুল হইয়া উঠিল। মালবী ধীরে ধীরে তাহার হস্তস্থিত বস্তুটির আবরণ অপসারিত করিল। একটি নাতিবৃহৎ পিঞ্জর—তাহার কেন্দ্রস্থলে দণ্ডের উপরে রাজকন্যার প্রিয় শুকপক্ষীটির মৃতদেহ এলাইয়া রহিয়াছে—বক্ষে একটি তীরবিদ্ধ—তখনো ক্ষতস্থান হইতে শোণিতক্ষরণ বন্ধ হয় নাই, রক্তবিন্দু ঝরিতেছে আবরণ বস্ত্রটির অবাধ স্থানে স্থানে রুধির-রঞ্জিত।

দৃশ্যটির আকস্মিকতা যেন সহসা উপস্থিতবর্গ প্রত্যেকের পক্ষে কশাঘাত করিল। মহারাজ মুখ ফিরাইয়া লইলেন। পক্ষীটি কন্যার যে কত প্রিয় তাহা তিনি জানিতেন।

উদ্যানবাটিকার কুঞ্জবীথির অন্তরালে লতাবিতানে একটি নারীমূর্তি নিশ্চলভাবে শায়িতা ছিল। অপরাহ্নকাল—কিন্তু প্রাসাদ শিখরে নিত্য-নৈমিত্তিক প্রমোদ-ক্রীড়ার অবসান হইয়া গিয়াছে গতকাল। এই সুদীর্ঘ অলস অপরাহ্ন যাপন করিবার প্রিয় সঙ্গীটির শেষকৃত্য স্বহস্তে তিনি সমাধা করিয়া আসিয়াছেন।

ঃ রাজকুমারী!

শায়িতা মূর্তিটি আহ্বানে ঈষৎ সচকিত হইয়া উঠিলেন। মুদ্রিত চক্ষু পদ্ম-কোরকের ন্যায় ধীরে ধীরে উন্মীলিত হইল।

ঃ রাজকুমারী!

বিকৃতস্বরে রাজকুমারী বলিয়া উঠিলেন ঃ তথাপি কি হয় নাই? আর কত ক্ষতিপূরণ আমাকে দিতে হইবে প্রজার নিকট?

ঃ আর সামান্যই দিতে হইবে।

ঃ কি দিতে হইবে, বলো! দ্বিধা করিব না—চিন্তা করিব না.........সে সব আমার জন্য নহে, রাজ্যভার যেহেতু এককালে স্কন্ধে ন্যস্ত হইবে সে হেতু পূর্বাহ্নেই আমাকে এই মানবীয় স্কন্ধ তরবারি দ্বারা খণ্ডিত করিয়া তাহার স্থলে পাষাণ অথবা লৌহনির্মিত স্কন্ধ সংযোজনা করিতে হইবে—যাহাতে আজীবন গুরুভার বহনের যোগ্য হইতে পারি—জানি আমি জানি তাহা—বলো বলো যুবক—আর কি অবশিষ্ট আছে?

ঃ অবশিষ্ট আছে রাজপুত্রি! স্কন্ধ নহে আপনার ঐ অনাহত হৃদয়টি উৎপাটিত করিয়া আমাকে দান করিতে হইবে।

ঃ যুবক!

ঃ বিনিময়ে আপনি এইটি উপহার পাইবেন। যুবক নূতন একটি পিঞ্জর তুলি ধরিল চক্ষুর সম্মুখে। ভিতরে হৃষ্টপুষ্ট সুন্দরী শারী একটি।

ঃ যুবক! ধৃষ্ট হইবারও সীমা আছে রাজপুত্রীকে উপহার দিতে আসিয়াছ সামা- ব্যাধ হইয়া?

ঃ রত্নশ্রী! ধৃষ্টতার সীমা আছে কেব- অহঙ্কারই বুঝি অসীম হইতে পারে? বিবাহে পাণপত্র হইয়া যাইবার পর লোক পরম্পরা শুনিতে পাইলাম উজ্জয়িনীর উত্তরাধিকারিণ অহমিকার ফলে চক্ষুতে দেখিতে পান না কর্ণে শুনিতে পান না। শুনিয়া ভীত হই- উঠিলাম। —শেষ পর্যন্ত অন্ধ ও বধির স্ত্র অদৃষ্টে জুটিবে? শঙ্কা আমাকে দেবগি- হইতে উজ্জয়িনী—এই সুদীর্ঘ পথ তাড়- করিয়া লইয়া আসিল।

উজ্জয়িনী কন্যা—দেবগিরিরাজ চি- শেখরকে হৃদয় দান করিতে আপত্তি আছে কি

রত্নশ্রীর আয়ত নয়নে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হই- উঠিল। ঃ আপত্তি থাকিবে না? গর্ব ও দম্ভের শিখরে সমাসীনা রাজকন্যা রত্নশ্রী অহঙ্কার যে আকাশস্পর্শী—হীনম্মন্য ব্যক্তির তাহার নাগাল পাইবার স্পর্ধা করে কি প্রকারে?

চিত্রশেখরের মুখশ্রী মৃদু হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

একটি নমস্কার

গোবিন্দ চক্রবর্তী

এতে জং ধ'রে গেছে—
তেমন সুতীক্ষ্ন এরা নয়ক' যে আ
দুঃখ-জ্বালা-দারিদ্র্যের, পুরোনো এ আয়ুধ তো
তত যেন বেঁধেনাক' ঝাঁঝরা হৃদয়ে—
ভীত, অভিভূত নই আমি কোন ভয়ে,
শত্রু যার পরাক্রান্ত, প্রবল, নির্ভীক ঃ
তাকেও যে হ'তে হয় দুঃসাহসী, দুরন্ত সৈনি
—কাপুরুষ শুধু দেয় অদৃষ্টে ধিক্কার।

নিপুণ, নিপুণ অস্ত্র—
আরো তুমি কর আবিষ্ক
বজ্রের প্রচণ্ড বীর্যে হানো, তারে হানো ঃ
ঝলকে ঝলকে ধ্বংস ব'য়ে-ব'য়ে আনো।
চূর্ণ-বিচূর্ণ অহংকার
হৃদয় রক্তাক্ত হোক, বিধ্বস্ত - বিদীর্ণ হোক—
জীবনে উঠুক হাহাকা

জানি, জানি শেষ নেই—অফুরন্ত মর্ত্য-কামন
লোভের লেলিহ বহ্নি
আকাশে আকাশে শিখা করে যে বিস্তা
সম্পদ-সাম্রাজ্য চায়, তুঙ্গশীর্ষ খ্যাতি চায়,
সবটুকু সুধা চায় বসুন্ধরার—
একাকীই, রাহু যেন—একান্তে একাকী;

আমি যে আরেক ক্ষুধা নিয়ে বেঁচে থাকি—
হে সম্রাট, সম্রাট আমার!
এ বিদ্রোহী নতশির রাখে নমস্কার।
এবার অন্তিম কিছু দাও তুমি তারে—
পাঠাও মৃত্যুকে দ্বারে
আর নয় অমৃতের—পরিতৃপ্ত, পূর্ণ অধিকার।

সুনীল জানা

বঙ্গোপসাগরের তীরে

ত্রিপুরার পার্বত্য সুন্দরী　　　　　　　　　　　　　　　　রবীন সেন

রাই

রণজিৎকুমার সেন

গ**ঙ্গাবিধৌত** মাণিকচকঘাট থেকে উঠে এসেছে রাজমহল রোড। একদা দুর্ধর্ষ মোঘল বাদশা ঔরংজেবের আক্রমণে ভীত হ'য়ে রাজা মানসিংহ তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত ক'রেছিলেন এই রাজমহলে। দৈর্ঘ্যে প্রায় বাইশ মাইলের পথ। মালদহের ইংরেজবাজারের গুমটিতে এসে এপথের শেষ। কিন্তু গতি তার রুদ্ধ নয়। বিসর্পিল গতিতে লক্ষ লক্ষ জনতার পদচিহ্ন বুকে ধ'রে ক্রমান্বয়ে সে 'গোদুরেল ব্রীজে' এসে মিশেছে। তারপর অতীতের নাম পশ্চাতে রেখে নতুন নাম নিয়েছে 'হাই রোড'। দু'পাশে ঘন আমবাগানের সারি। ডাইনে সাদুল্লাপুরের রাস্তা গিয়ে গঙ্গার শাখায় মিশেছে। তারই মাঝ দিয়ে হাই রোড গিয়ে প'ড়ছে গৌড় রোডে। মোঘল আমলে এ রাস্তার নাম ছিল 'বাদ্‌শাহী সড়ক'। বাঁয়ে 'ভাটিয়ার বিল' শিকারের জন্যে লোক আসে এখানে ঢাল, সড়কি আর বন্দুক নিয়ে, ডাইনে পুলিশ ফাঁড়ি আর কাঞ্চন টাওয়ার।

আজ এ পথে কোথাও বড়-একটা লোক-সমাগম নেই। দূরাগত যাত্রী যদি কেউ কখনও প্রাচীন গৌড়ের ভগ্নাবশেষ দর্শনের মানসে এ পথে আসে, তবে এই নিশুতি-নির্জন পথগুলো অকস্মাৎ কিছুক্ষণের জন্যে মুখর হ'য়ে ওঠে। নয়তো বারো মাসের যে নির্জনতা, সেই নির্জনতা। কিন্তু এম্-নির্জনতাও একদিন উৎসবের প্রাণবন্যায় কাকলিমুখর হ'য়ে ওঠে। জ্যৈষ্ঠের সংক্রান্তি সেদিন। শ্রীচৈতন্য এইদিনে গৌড়ের পথে এসে বিশ্রাম নিয়েছিলেন রামকেলির কেলিকদম্বের ছায়ায়। সেই থেকে প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠের এই সংক্রান্তিতে শ্রীচৈতন্যের স্মরণে মেলা বসে। ভারতের নানা অঞ্চল থেকে বৈষ্ণব আর বৈষ্ণবীরা এসে মেলাকে মুখর করে তোলে। তাদের কেউ বা বাউল, কেউ বা ফকির দরবেশ, কেউ বা ঘর ছাড়া পথিক। মাণিকচকঘাট থেকে সুরু ক'রে গৌড়ের এই দুর্গতোরণ পর্যন্ত তাদের চরণস্পর্শে মুখর হ'য়ে ওঠে বিভিন্ন জনপদগুলি।

আজও সেই জ্যৈষ্ঠের সংক্রান্তি, রামকেলির মাটিতে আজ আবার সেই প্রাণবন্যা।

নবদ্বীপের শূন্য আখড়ায় একা একা প'ড়ে থাকতে মন মানছিল না কৃষ্ণদাসের। রামকেলির মেলার কথা স্মরণ ক'রে এবারে সেও বেরিয়ে প'ড়লো আখড়া থেকে। শরীরে আজ আর আগেকার মতো রক্তের জোর নেই। বয়স প্রায় পঞ্চাশে এসে ঠেকলো। একা একা এমন শূন্য আখড়া আর কতকাল সে আগ্‌লাবে? দেখতে দেখতে পঁচিশটা বছর তার কেটে গেল এই আখড়ায়। প্রতিদিন ভোরে উঠে জল সেচন ক'রে প্রাভাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে দিনের সুরু, আবার রাত্রে যাহোক্ দু'টো মুখে দিয়ে কোনো রকমে মাথা গুঁজে প'ড়ে থেকে নিশীথিনীর নিবিড় প্রহরগুলিকে শেষ ক'রে দেওয়া। নিয়মের কোথাও একতিল ব্যতিক্রম নেই। এম্‌নি ক'রেই পঁচিশটা বছর তার কেটে গেল এই আখড়ায়। অথচ উত্তরাধিকার-সূত্রে এ আখড়ার যে আসল মালিক, সে আজ আর এখানে নেই। সে হরিদাসী। কবেই তো দীনু ঠাকুরের হাত ধরে নবদ্বীপের সীমা অতিক্রম ক'রে দূরে কোথায় সে চ'লে গেছে। দেখতে দেখতে সেও আজ প্রায় বছর সাতেক হ'লো। কোথাও কি খুঁজতে তাকে বাকী রেখেছে কৃষ্ণদাস? ওদিকে মায়াপুর, এদিকে শান্তিপুর, খড়দহ। কোথাও নেই হরিদাসী। যাবার আগে শুধু একদণ্ড কাছে এসে দাঁড়িয়ে ব'লেছিলঃ 'আমি আবার আসবো, আবার তোমার কাছে ফিরে আসবো নাগর; তুমি যেন এ আখড়া ছেড়ে কোথাও যেয়ো না।' কোথাও যায়নি সেই থেকে কৃষ্ণদাস। হরিদাসী কথা দিয়ে গিয়েছিল, সে ফিরে আসবে; তার জন্যে প্রতীক্ষা ক'রে ক'রেই সাতটা বছর কেটে গেল, যেমন ক'রে রামচন্দ্রের জন্যে প্রতীক্ষা ক'রে কেটেছিল শবরীর। এম্‌নি ক'রে হয়তো এই জীবনটাই কেটে যাবে কৃষ্ণদাসের, তবু হরিদাসীর দর্শন আর মিলবে না। যদি নাই মিল্‌বে, তবে মিথ্যে আর কতকাল সে এই আখড়া আগ্‌লে প'ড়ে থাকবে? এক সময় তাই ঝাঁপে তালা লাগিয়ে সাধের একতারাটা হাতে নিয়ে নামসঙ্গীতে কণ্ঠ ভ'রে পথে বেরিয়ে প'ড়লো কৃষ্ণদাস। অনেক দূর তাকে যেতে হবে, এই নবদ্বীপ থেকে সোজা রাজমহল, তারপর গঙ্গা পেরিয়ে গৌড়ের সিংহদ্বার রামকেলিতে। প্রভুর নামে মেলা, আহা, সে মেলা দেখেও যে পুণ্য। তারপর অদৃষ্টে যদি থাকে, গৌড় আর পাণ্ডুয়ার ভগ্নাবশেষ দেখে জীবন সার্থক ক'রবে সে।

বেরিয়ে প'ড়লো কৃষ্ণদাস।

ট্রেণে ট্রেণেই সারাটা রাত কাটলো। সঙ্গী পেতে অসুবিধে হ'লো না। নাকে কপালে রসকলি এঁকে ঝোলা কাঁধে আরও অনেকে এসে ভিড় ক'রেছে ট্রেণের কামরায়। তাদের কেউ বা খঞ্জনী বাজিয়ে গান ধ'রেছে, কেউ বা বাঙ্কের উপর টান্ টান্ হ'য়ে শুয়ে ঘুমের সাধনায় মেতেছে। কিন্তু চেষ্টা করেও সারা রাত্রির মধ্যে দু'চোখের পাতা এক ক'রতে পারলো না কৃষ্ণদাস। ঘুম তো তার চোখ থেকে কবেই পালিয়েছে, আজ তার জন্যে মিথ্যে চেষ্টা। ট্রেণটা যত দ্রুত ছুটে চ'লছিল, ততই যেন হরিদাসীর জন্যে আজ আবার নতুন ক'রে কোন্ দূর-দূরান্তে তার সমস্তটা মন ছুটে বেড়াতে লাগলো। মায়াপুর, নবদ্বীপ,

শান্তিপুর, খড়দহ—কোথাও নেই হরিদাসী। তবে কি দীনু ঠাকুরের কাছে প্রত্যাখ্যাতা হ'য়ে সে আত্মঘাতিনী হ'লো? না, না, না, তা কেন, সে কাজ কেন ক'রতে যাবে হরিদাসী? সে তো তেমন মেয়ে নয়! তার যে মনের জোর ভীষণ। একদিন সেই মন দিয়ে কৃষ্ণদাসকে কাছে টেনে নিয়েছিল সে; আর কেউ না হোক্, সে তো অন্ততঃ চেনে হরিদাসীকে! হয়তো মিথ্যেই আশ্বাস দিয়েছিল সে কৃষ্ণদাসকে. আসলে দীনু ঠাকুরকে নিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে হয়তো সুখের নীড় বেঁধেছে হরিদাসী! সেই সুখী পরিবেশের মধ্যে একটা মুহূর্তের জন্যেও আজ আর মনে প'ড়ছে না তার নিজের আখ্ড়াকে বা কৃষ্ণদাসকে। একটা মুহূর্তের জন্যেও যদি আজ অন্ততঃ হরিদাসীর দেখা পেতো সে, তবে তার হাতে আখ্ড়ার চাবিটা তুলে দিয়ে চির-কালের মতো তার কাছ থেকে বিদায় চেয়ে নিতে পারতো কৃষ্ণদাস। কিন্তু কোথায় হরিদাসী?

ট্রেনের অবিরাম ঝক্‌ঝক্ শব্দে মুখরিত হ'য়ে উঠেছে সারা বন প্রকৃতি। কিন্তু সেই শব্দের দিকে এতটুকুও কান নেই তার। হরিদাসীর কথা ভাবতে গিয়ে তার মুখখানি অনবরত দু'চোখের তারায় ভেসে উঠ্‌ছিল কৃষ্ণদাসের; আর সারা মনটাকে তার তোলপাড় ক'রে তুলছিল। হরিদাসীর সঙ্গে প্রথম দিনের পরিচয় থেকে সুরু ক'রে তার চ'লে যাবার মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিদিনের প্রতিটি ঘটনা কেবলই তার বুকের মধ্যে নাড়া দিয়ে উঠ্‌তে লাগলো। শত চেষ্টা করেও তা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারলো না কৃষ্ণদাস।

আজ থেকে পঁচিশ বছর আগেকা'র কথা। কৃষ্ণদাসের বয়স তখন খুব বেশী হ'লে বছর তেইশ চব্বিশ। লোকে ব'ল্‌তো—সুন্দর চেহারা, সুন্দর স্বাস্থ্য। সেই প্রথম বৈষ্ণবধর্মে তার দীক্ষা। ললিতা সখীর কাছ থেকে শিখলো সে নারীভাবে কৃষ্ণসাধনা। গোপী-জনবল্লভকে পেতে হ'লে গোপীর মতো তাতে অনুরাগী হ'তে হবে। তিনি এসে একদিন ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'রবেন। সংসার ছেড়ে কৃষ্ণদাস নাম নিয়ে একদিন সে সেই ভজনাতেই আত্মনিয়োগ ক'রলো। আপন মনে নাচে গায়, আপন মনে ফুলে মালায় কৃষ্ণমুরারির বিগ্রহ সাজায়। সন্ধ্যার আরতিতে এসে যোগ দেয় নানা লোক; তাদের কেউ বা বৈষ্ণব, কেউ বা গৃহী। এমনি ক'রেই দিন যায়।

সেদিন আরতি শেষ হ'তে অনেক সময় নিল; কি একটা যোগ সেদিন। একে একে সবাই উঠে যে যার মতো চ'লে গেল, কিন্তু গেল না শুধু একটি মেয়ে। অবাক বিস্ময়ে সে অনেকক্ষণ থেকে কৃষ্ণদাসের মুখের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। উজ্জ্বল গৌর-বর্ণ চেহারা, উন্নত ললাট, উন্নত নাসিকা, তার উপর দিয়ে রসকলি আঁকা; গলায় দুল্‌ছে কুন্দ ফুলের মালা, প্রথম যৌবনের ললিত-লাবণ্যে ভাস্বর হ'য়ে উঠেছে সারা দেহশ্রী। সেই দেহ নারীর নয়, পুরুষের। সেই দেহশ্রীর দিকে তাকাতে গিয়ে নিজের কথা ভুলে গেল মেয়েটি। একসময় আরতি শেষ হ'লে কৃষ্ণদাস জিজ্ঞেস ক'রলো, 'সবাই যে যার মতো চ'লে গেল তুমি যে শুধু ব'সে আছ?'

মেয়েটি ব'ললো 'আরতি শেষ হবার আগে উঠে গেলে পাপ হবে ব'লে।'

কৃষ্ণদাস ব'ল্‌লো, 'যারা চ'লে গেল, তারা তো এ কথা একবারও ভাবলো না!'

মেয়েটি ব'ল্‌লো, 'তারা হয়তো সবাই আমার মতো পাপ-পুণ্যের বিচার করে না!'

কৃষ্ণদাস ব'ল্‌লো, 'তোমার ললাটে চন্দন-শোভা দেখে মনে হ'চ্ছে তুমি বৈষ্ণবী. তা—নাম কি তোমার, থাকো কোথায়?'

মেয়েটি কোনো রকম সঙ্কোচ ক'রলো না, ব'ল্‌লো, 'নাম আমার হরিদাসী; বিষ্ণুপ্রিয়ার মন্দিরের পাশে আমার নিজের আখ্ড়া আছে, আমি সেইখানেই থাকি।'

—'তুমি একা?'

—'বাবা দেহ রাখবার পর আমি একাই থাকি আখ্ড়ায়।'

কৃষ্ণদাস এবারে মুহূর্তের জন্য একবার থামলো, তারপর ব'ল্‌লো, 'প্রসাদ এনে দিই, প্রসাদ মুখে দিয়ে তবে যাও।'

হরিদাসী ব'ল্‌লো, 'দাও, দু'দিন জ্বরের জন্যে শুধু জল ভিন্ন কিছু মুখে তুলিনি; আজ ঠাকুরের প্রসাদ মাথায় ছুঁইয়ে ঠাকুরের নাম ক'রতে ক'রতে চ'লে যাই।'

রেকাবী থেকে প্রসাদ এনে কৃষ্ণদাস এবারে হাতে তুলে দিল হরিদাসীর, তারপর ব'ললো, 'রোজ এসো আরতিতে। তোমাদের সবাইকে নিয়েই যে তবে আমার এই সাধন ভজন।'

উঠে যেতে যেতে হরিদাসী শুধু ব'ল্‌লো, 'আসবো।'

কৃষ্ণদাসের কি জানি কি হ'লো, নিজের কাজের দিকে মন দিতে গিয়ে অপলকনেত্রে এক-বার দূরদৃষ্টি প্রসারিত ক'রে হরিদাসীকে লক্ষ্য ক'রলো। বেশ লাগলো তার পট্টবাস পরিহিত চলার ভঙ্গীটি। মনে হ'লো—শুধু আজ নয়, জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে যেন এমনই এক-খানি কমনীয় মুখশ্রীকে মনে মনে সে কল্পনা ক'রে আস্‌চে; কিন্তু কেন, তা সে নিজেও জানে না। এমনি ক'রেই সে রাতটা কেটে গেল।

পরের দিনও হরিদাসী এলো। লোক-সমাগম সেদিন খুব একটা হয়নি, তবু আরতির শেষে দেখা গেল—একা হরিদাসীই শুধু ব'সে আছে। আজও সেই একই প্রশ্ন তুলে ধরলো কৃষ্ণদাস : 'সবাই চ'লে গেল, তুমি যে বড় গেলে না?'

অসঙ্কোচে হরিদাসী ব'ল্‌লো, 'তোমাকে শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস ক'রবো ব'লে।

—'কি কথা, বলো।'

হরিদাসী এতটুকুও দ্বিধা ক'রলো না, ব'ললো, 'তোমার এই অল্প বয়সের পুরুষালী যৌবনকে তুমি এমন ক'রে নারীত্বের আবরণে আবৃত ক'রে আছো কেন?'

আবেশে একবার চোখ দু'টি বুজিয়ে নিল কৃষ্ণদাস, তারপর ব'ললো, 'কান্তমণি গিরি-ধারী লালকে পাবো ব'লে। প্রিয়াবেশে তাঁকে আমি আলিঙ্গন ক'রবো।'

—'সে তো তুমি শ্রীদাম সুবলের মতো সখ্য ভাবেও ক'রতে পারো। সখা হ'য়ে প্রভু এসে তোমাকে কোল দেবেন।' ব'লে কৃষ্ণদাসের মুখের দিকে অপলকনেত্রে তাকিয়ে রইল হরিদাসী।

জবাব দিতে গিয়ে এবারে থামতে হ'লো কৃষ্ণদাসকে। ভাবলো—মিথ্যে কথা বলেনি হরিদাসী। নারীর আবরণ গায়ে চাপিয়ে কেন মিথ্যে সে তার এই পুরুষালী যৌবনকে লাঞ্ছিত ক'রছে? সে তো সত্যিই শ্রীদাম সুবলের মতো সখ্যভাবে ঠাকুরের ধ্যান ক'রতে পারে, তাতে সে ঠাকুরকেও পায়, ঠাকুরের পূজারিণীকেও—।

ভাবতে গিয়ে নিজের জিভে অলক্ষ্যে একটা কামড় ব'সে গেল কৃষ্ণদাসের। ছিঃ, ছিঃ একি ভাবচে সে? খানিকটা প্রকৃতিস্থ হ'তে চেষ্টা করে কৃষ্ণদাস ব'ললো, 'আমি ভেবে দেখবো তোমার কথা।'

হরিদাসী এবারে আর একদণ্ডও অপেক্ষা ক'রলো না, বিগ্রহের উদ্দেশে উপুড় হ'য়ে একবার প্রণাম ক'রে সোজা নিজের আখ্ড়ার দিকে চ'লে গেল।...

এরপর দিন দুয়েকের মধ্যে আর হরি-দাসীর দেখা পাওয়া গেল না। আরতির আসর লোকসমাগমে পূর্ণ হ'য়েও যেন কেমন ফাঁকা থেকে গেল কৃষ্ণদাসের কাছে। নিজে থেকে কাছে এসে যে-নারী তার নিজেকে ভালো ক'রে বুঝতে দেয়নি কৃষ্ণদাসকে, আজ দু'দিন তার অনুপস্থিতিতে কৃষ্ণদাসের কেবলই মনে হ'তে লাগলো—সে-নারী শুধু তাকেই ভাবায়নি, একদিন সারা বৃন্দাবনকেও ভাবিয়ে তুলেছিল। সে কি কেবলই হরিদাসী? না, না, সে যে রাধা-বিনোদিনী। বৃন্দাবন ছেড়ে নবদ্বীপে এসেছে সে হরিদাসী হ'য়ে।

ভাবতে গিয়ে কেমন যেন একটা মাতাল নেশায় পেয়ে ব'সলো কৃষ্ণদাসকে! আরতি শেষ হ'লে এক সময় বিগ্রহের দরজায় তালা লাগিয়ে নিজের পরিধান পরিবর্তন ক'রে সোজা গিয়ে দাঁড়ালো সে হরিদাসীর আখ্ড়ায়। আকাশে তখন বাঁকা কাস্তের মতো তৃতীয়ার চাঁদ। হরিদাসী আপনমনে দাওয়ায় ব'সে ব'সে কি যেন ভাবছিল। হঠাৎ কৃষ্ণদাসকে চোখে পড়তেই তাকে সাদর অভ্যর্থনা ক'রে একটি আসনে এনে বসালো; তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'সে কি, এই বেশে এমন সময়ে তুমি? তোমার দূতীবেশ গেল কোথায়?'

—'সেই কথাই যে তোমাকে ব'লতে এলাম হরিদাসী!' আসনে উপবেশন ক'রে কৃষ্ণদাস ব'ল্‌লো, 'তোমার কথাই ঠিক। আজ দু'দিন ধ'রে তোমার কথা নিয়ে আমি যতই ভেবেছি, নিজের নারীত্বের আবরণকে ততই তুচ্ছ ব'লে মনে হ'য়েছে। আজ তাই সে আবরণ ত্যাগ ক'রে আমি তোমার কাছে ছুটে এলাম। তুমিই আমার ধ্যান, জ্ঞান, তুমিই আমার সব। তোমাকে দেখার পর থেকে তুমি আর আমার গিরিধারীলাল আমার কাছে এক হ'য়ে মিশে গেছ। যদি অদৃষ্টে থাকে, তবে তোমার মধ্য দিয়েই আমি আমার গিরিধারীলালকে পাবো। তুমি আমাকে নাও হরিদাসী, তুমি নইলে আমার সাধনভজন সব মিথ্যে হ'য়ে যাবে। তাইতো আমি বিগ্রহের মন্দির ছেড়ে তোমার কাছে ছুটে এলাম।'

খিল খিল্ ক'রে হাসতে হাসতে এবারে প্রায় মাটিতে মিশে যেতে চাইল হরিদাসী, ব'ললো, 'সে কি, এত শীগ্‌গির? আমার জন্যে তুমি তোমার বিগ্রহকে ত্যাগ ক'রে এলে নাগর?'

কৃষ্ণদাস ব'ল্‌লো, 'এলাম, সত্যিই এলাম। যদি অধিকার দাও, তবে আজ থেকে তোমার এ আখ্‌ড়া আমারও আখ্‌ড়া; তুমি আমি দু'জনে মিলে গোবিন্দের সেবা ক'রবো।'

হাসি থামিয়ে হরিদাসী বল্‌লো, 'তবে তাই হোক্‌। এতকাল যক্ষের মতো একা একা এ শ্মশানপুরী আগ্‌লে ছিলাম, আজ থেকে আবার মুরলী ধ্বনিতে প্রাণ ফিরে আসুক এ আখ্‌ড়ায়।' ব'লে সুর ক'রে আপন মনে দু'কলি গান ধরলো হরিদাসী—

হায় গোবিন্দ, এই কি তোমার ইচ্ছে ছিল?
প্রেম-পাখী যে কখন এসে
হৃদয় আমার হ'রে নিল!
—এই কি তোমার ইচ্ছে ছিল?...

আকাশে ত্রয়োদশীর চাঁদ কখন ধীরে ধীরে অস্তমিত হ'য়ে গেল, কেউ জানলো না, না হরিদাসী না কৃষ্ণদাস।...

কি একটা বড় ষ্টেশনে এসে মিনিট কয়েকের জন্য গাড়ীটা দাঁড়িয়েছিল, এবারে সিটি দিয়ে আবার চল্‌তে সুরু ক'রলো। বাঙ্কের উপর যারা এসে আশ্রয় নিয়েছিল, এতক্ষণে তারা ঘুমিয়ে পড়েছে; নিচের সিটে ব'সে যেসব বাবাজীরা মৃদুকণ্ঠে একটু আগেও নামকীর্তন ক'রছিল, তাদের কণ্ঠও এখন নিস্তেজ। রাত্রি গভীর। বাইরের ঘন-ঘোর অন্ধকারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটা জোনাকী ভিন্ন আর কিছু চোখে পড়ে না। গভীর রাত্রির বুকচিরে ট্রেণ ছুটে চ'লেছে দ্রুতবেগে। এই মুহূর্তে সারা পৃথিবী যেখানে ঘুমে আচ্ছন্ন, সেখানে ঘুম নেই শুধু একটি প্রাণীর, সে কৃষ্ণদাস। ট্রেণের দ্রুতগতির মতো তারও মনটা অনবরত ছুটে চ'লেছিল অতীতের খণ্ডচ্ছিন্ন নানা ইতিহাসকে রোমন্থন ক'রে।—

—সেই ত্রয়োদশীর রাত্রি থেকে কৃষ্ণদাসকে প্রেমে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল হরিদাসী। ব'লেছিল, 'তুমি আমার নাগর গো, সোনার নাগর। যাত্রার দলের অভিনয়ের মতো পুরুষ মানুষকে কি কখনও মেয়ে সাজলে ভালো দেখায়? এখন দেখ তো একবার নিজের দিকে তাকিয়ে, কেমন দেখাচ্ছে?'

উত্তরে কৃষ্ণদাস ব'লেছিল, 'তোমার ভালো লেগেছে, এই তো আমার পুরস্কার। তাই তো আমার গোবিন্দ, আমার গিরিধারীলালকে খুঁজতে তোমার কাছে চ'লে এলাম।'

উত্তরে কিছু-একটাও আর না বলে মুরলী-ধ্বনিতে কণ্ঠ মুখর ক'রে তুলেছে হরিদাসী—

আমি কি পারি গো তোমায়
গোবিন্দ এনে দিতে,
আমি যে অবলা নারী!
আমি তোমারে জেনেছি আমার
গোবিন্দ বিহারী।...

একতারায় সুর তুলে তার জবাব দিয়েছে কৃষ্ণদাস—

আমি যে তোমায় পেয়ে তাঁরে পেলাম,
আমি সেই প্রেমেতে ম'জে গেলাম।
যেই কৃষ্ণ, সেই তুমি, সেই আদি প্রেম,
সেই দয়া সেই মায়া, সেই মহাক্ষেম;
আমি সেই প্রেমে ম'জে গেলাম।।...

এম্‌নি ক'রেই প্রেম-সাগরে ডুব দিয়ে কত নগর, কত জনপদ তারা ঘুরে এসেছে, শচীমাতা আর বিষ্ণুপ্রিয়ার উপাখ্যান প'ড়ে 'হা নিমাই, হা নিমাই' ব'লে কেঁদেছে, পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদকে গোরাচাঁদের মুখের সাথে তুলনা ক'রে মহাভাবে বিভোর হ'য়ে উঠেছে দু'জনে।

তারপর একদিন এলো অভিমানের রাত্রি।

সেদিনও আকাশে ত্রয়োদশীর চাঁদ। সারাদিন ব'সে ব'সে নানা ফুলের মালা গেঁথেছে হরিদাসী আর আপন মনে গুন্‌ গুন্‌ করে গান ক'রেছে। এজীবনে এত মালা কোনোদিন গাঁথে নি সে।

কৃষ্ণদাস ইদানীং হরিদাসীকে 'রাই' ব'লে ডাকতো। এক-সময় সে জিজ্ঞেস ক'রলো, 'এত মালা কোনোদিন তো তোমাকে গাঁথতে দেখিনি রাই? এসবই কি গোবিন্দের জন্যে?'

উত্তরে হরিদাসী কিছু একটাও জবাব না দিয়ে শুধু চোখের কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টি কৃষ্ণদাসের মুখের দিকে তুলে ধ'রে ঠোঁটের পাশে মৃদু হাসি টেনে নিল।

এমন দৃষ্টি এর আগে কিন্তু কোনোদিন লক্ষ্য করেনি কৃষ্ণদাস। কেমন উদাস উদাস, কেমন মাদকতাময়, মনে হয়—সেই দৃষ্টির মোহিনী-মায়া-অনলে বুঝি সে গ'লে গ'লে একেবারে অবচেতনার অবলেপে মিশে যাবে! তবু আর একবার জিজ্ঞেস ক'রলো কৃষ্ণদাস: 'এত মালা কার জন্যে রাই?'

হরিদাসী আর একবার চোখের তেম্‌নি দৃষ্টি মেলে ধ'রে সুর ক'রে গান ধরলো—

যে আছে চোখের কাছে,
যে আছে মনের মাঝে,
এমালা যতনে আমি তারে যে পরাবো;
সে যে গো জীবনস্বামী,
ভালোবেসে তারে আমি
চিরদিন প্রেম দিয়ে হৃদয় ভরাবো।
পরাবো এমালা আমি তারে যে পরাবো।...

কিন্তু কেন যেন এখানে সাড়া দিতে পারলো না কৃষ্ণদাস। একদিন সংসার ত্যাগ ক'রে সে এই সাধনপথে এসেছে। এখানেও যদি সংসারের আসক্তি, তবে কোথায় গেলে তার সাধনা পূর্ণ হবে? না, না, এ সে কিছুতেই পারবে না। হরিদাসীর মনের ইচ্ছা সে বুঝতে পেরেছে; সে চায় সংসারের বন্ধন, কৃষ্ণদাস চায় সাধনায় মুক্তি। হরিদাসীকে তার ভালো লেগেছিল, তার ডাকে সাড়া দিয়েছিল সে, সে শুধু হরিদাসীর কাছাকাছি থাকতে পারবে ব'লে। এছাড়া আর কিছু নয়, আর কিছু হওয়া সম্ভব নয়। এ তার গুরুর নিষেধ, এ তার সংস্কার। যখন সে গৃহী ছিল এম্‌নি করে হরিদাসীর মতই একটি মেয়ে তাকে ভালোবাসতো, তাকে না পেয়ে সে বিষ খেয়েছিল, সে মাধবী। আজ যদি হরিদাসীর মালা গলায় তুলে হরিদাসীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে কৃষ্ণদাস, তবে তাকে অভিশাপ দেবে মাধবী, কেঁদে মরবে মাধবীর আত্মা। না, না, এ সম্ভব নয়, এ কিছুতেই সম্ভব নয়।

বিগ্রহমূর্তিকে সাজিয়ে অধিক রাত্রে যখন অভিসারিকার বেশে এসে ঘরে প্রবেশ করলো হরিদাসী, দেখলো—কৃষ্ণদাস ঘরে নেই। স্তিমিত শিখায় শুধু ঘরের একপাশে পিলসুজটা মিট্‌-মিট্‌ ক'রে জ্বল্‌ছে। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের দেউড়ীতে দাঁড়ালো হরিদাসী, তারপর এখানে ওখানে উঁকি দিয়ে দেখলো, নেই, কোথাও নেই কৃষ্ণদাস। গলা ছেড়ে বার কয়েক ডাকলো হরিদাসী: 'নাগর আমার নাগর কোথায় গেলে?'

কিন্তু কোথাও সাড়া নেই কৃষ্ণদাসের। নিজের দেহ-বাস যেন নিজের কাছে কণ্টক ব'লে মনে হ'লো হরিদাসীর। ছুঁড়ে ফেলে দিল গায়ের উর্ণি-বাস, ছিঁড়ে ফেলে দিল সারাদিনের সাধের গাঁথা মালা; তারপর অভিমানে ফুলে ফুল্‌তে একসময় মেঝের উপর আলুলায়িত কেশে শুয়ে পড়ে অনেকক্ষণ ধ'রে আপনমনে কাঁদলো। আকাশে ত্রয়োদশীর চাঁদ এক-সময় অস্তাচলে নেমে গেল। কখন্‌ যে নিদ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে প'ড়েছিল হরিদাসী, তা সে নিজেও জানে না।

ভোরে যখন ঘুম ভাঙ্‌লো, তাকিয়ে দেখলো হরিদাসী, শিয়রে ব'সে তার আলুলায়িত কেশ-গুচ্ছের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে অঙ্গুলী-সঞ্চালন ক'রছে কৃষ্ণদাস, আর গুন্‌ গুন্‌ ক'রে গাইছে—

'রাই জাগো, রাই জাগো,
শারী শুক বলে,
কত নিদ্রা যাও কালা মাণিকের কোলে?
রাই জাগো—।'

ধীরে ধীরে চোখ খুলে তার মুখের দিকে তাকাতেই চোখ দু'টি অশ্রুভারে ঝাপ্‌সা হ'য়ে গেল হরিদাসীর।

কৃষ্ণদাস ব'ল্‌লো, গিরিধারীলালের নাম করো, গোবিন্দকে স্মরণ করো রাই। কাল সারা-রাত গঙ্গার তীরে ব'সে ব'সে গঙ্গার কুলু-কুলু প্রবাহে আমার গোবিন্দকে দেখলাম, তোমাকে দেখলাম রাই। যে-জীবন আমাদের গোবিন্দে সমর্পিত, সে-জীবন কি সত্যিই আর কাউকেও দেওয়া যায়? এ যে দু'দিনের মায়া, দু'দিনের খেলা, যেনাহং নামৃতা স্যাং, কিমহং তেন কুর্যাম! আমরা যে অমৃতপিয়াসী, সামান্যের সুখ তো আমাদের জন্যে নয় রাই! আমাকে তুমি ভুল বুঝো না। ওঠো, গা তোলো, আলুলায়িত কুন্তল বেঁধে নাও তোমার খোঁপায় আমি আজ কনকচাঁপার স্তবক পরিয়ে দেবো; ওঠো।'

উঠে ব'সলো হরিদাসী। কিন্তু মুখে তার একটিও কথা নেই। এম্‌নি ক'রেই ক'টা দিন কাটলো। তারপর ধীরে ধীরে আবার সে ক্রমে সহজ হ'য়ে এলো। কিন্তু সহজ হ'লেও কৃষ্ণদাস লক্ষ্য করে দেখলো, আগেকার সেই প্রাণ-চাঞ্চল্য যেন ফুরিয়ে গেছে হরিদাসীর; চোখের দৃষ্টিতে সেই মায়া নেই, কণ্ঠে নেই সেই স্বতঃউৎসারিত মধুর সুর। তবু বাইরের জগতে তার ত্রুটি নেই কোথাও।

এম্‌নি ক'রেই একে একে কোথা দিয়ে আঠারোটা বছর কেটে গেছে, গড়িয়ে গেছে আঠারোটা বসন্ত জীবনের উপর দিয়ে।...

ট্রেণটা একই গতিতে রাত্রির অন্ধকার ভেদ ক'রে সাম্‌নের পথে ছুটে চল্‌ছিল। জানালায়

শুধু একবার একটি খোঁপায়
একটি গোলাপ-গুচ্ছ,
একটি প্রহর অনুরাগ-রাঙা
বাকি দিনক্ষণ তুচ্ছ।

একবার শুধু পথ খুঁজে পাওয়া
একটি চোখের তারায়
ময়ূরের মতো মনকে ছড়ানো
নতুন মেঘের সাড়ায়।

একটি কান্না নায়িকার মতো
একাকিনী রাত যাপে,
একটি কথার দ্বিধার চূড়ায়
জন্মের বীজ কাঁপে।
একটি কোকিল, এক বসন্ত,
একবার গান গাওয়া
শুধু একবার প্রথম লগ্নে
সব দিয়ে সব পাওয়া।

মুখ বাড়িয়ে কি যে একবার লক্ষ্য করতে চেষ্টা করলো কৃষ্ণদাস, কিন্তু দৃষ্টিতে এলো না, চোখ ধেঁধে গেল। উপরে নিচে সবাই এখন ঘুমে অচেতন; ঘুমের এই ইন্দ্রপুরীতে জাগ্রত প্রহরীর মতো শুধু জেগে বসে আছে কৃষ্ণদাস, আর রোমন্থন করে চ'লেছে অতীতের খণ্ড খণ্ড ইতিহাসের এক-একটি ঘটনাকে।—

—একে একে আঠারোটা বছর কেটে গেল হরিদাসীর সাথে এক সঙ্গে। মাঝে মাঝে চিত্ত বিচলিত হয়েছে তার, বিচলিত হয়েছে কৃষ্ণদাস নিজেও। কিন্তু সেই মুহূর্তেই সংযমে বেঁধে নিয়েছে সে নিজেকে। এতবড় অগ্নি-পরীক্ষার জন্যে সত্যিই কি প্রস্তুত ছিল কৃষ্ণদাস? আঠারোটা বছর ধ'রে যার সঙ্গে একত্রে বিহার করলো সে, তাকে পূর্ণ ক'রে পেয়েও প্রেমের পূর্ণতা তাকে দিতে পারলো না কৃষ্ণদাস। অথচ সেই কি কম ভালোবেসেছে হরিদাসীকে? সে ভালোবাসায় ইন্দ্রিয়াসক্তি ছিল না, ছিল শুধু ভালোবেসে মাতাল হবার আসক্তি। হয়তো হরিদাসী সেটুকু বোঝেনি, বারে বারে আড়ালে গিয়ে তাই মাথা কুটেছে, বারে বারে তাই মালা গেঁথে অলক্ষ্যেই আবার ছিঁড়ে ফেলেছে আর কেঁদেছে। কিন্তু সে কান্না যে একদিন তাকে এমন করে ঘরছাড়া করবে, এও কি ভাবতে পেরেছিল কৃষ্ণদাস?

—সেবার রাসের মেলা নবদ্বীপে। সারা সহর বৈষ্ণব আর শাক্তের ধর্মীয় উৎসবে মেতে উঠেছে। নানা জায়গা থেকে নানালোকের ভিড়ে তিলধারণের জায়গা নেই কোথাও। ইতিমধ্যে একসময় হরিদাসীর আখড়ায় এসে উঠলো দীনুঠাকুর। হরিদাসীর বাবা বেঁচে থাকতে দীনুঠাকুর রোজ সন্ধ্যায় আখড়ায় এসে নাম-কীর্তন করতো। স্নেহ করতেন তাকে হরিদাসীর বাবা। সেই সূত্রে হরিদাসীর সঙ্গেও ভাবটা তার কম জমে উঠেছিল না। দীনুঠাকুরকে সেদিন প্রেমের ঠাকুর বলে মনে হয়েছিল হরিদাসীর। মনে হয়েছিল—দীনুঠাকুরকে কেন্দ্র করে জীবনের বহু দূর পথ সে অতিক্রম ক'রে আসতে পারবে। কিন্তু তার আগেই একদিন মথুরার পথে যাত্রা করলো দীনুঠাকুর। হরিদাসীর বাবার মৃত্যুটাও সে চোখে দেখে যেতে পারলো না। মথুরায় গিয়ে কোন্ এক গুরুর কাছে নতুন ক'রে দীক্ষা নিয়ে মথুরাতেই থেকে গেল দীনুঠাকুর। বাবা মারা যাবার সময় শুধু একবার অস্ফুটকণ্ঠে ব'লেছিলেনঃ 'দীনুটা আর ফিরে এলো না।' উত্তরে কি যেন একটা বলতে গিয়ে ঠোঁট দুটি একবার কেঁপে উঠেছিল হরিদাসীর। ঠিক তার পরমুহূর্তেই দেহ রাখলেন বাবা। আঁচলে চোখ মুছে সেদিন থেকে এতবড় এই পৃথিবীতে একা মাথা তুলে দাঁড়াতে হলো হরিদাসীকে। কিন্তু একাকিত্বের জ্বালা ক্রমেই যেন তাকে বিষিয়ে তুলছিল! কৃষ্ণদাসকে কাছে পেয়ে মনে হয়েছিল—এতদিনে বুঝি তার ভরা গাঙের তরী ডাঙার স্পর্শ পেলো! কিন্তু কী পেলো হরিদাসী? শুধু কাছাকাছি থাকা, শুধু মুখোমুখি ব'সে এক-সঙ্গে নাম-কীর্তন করা, আর ভাঙা মনটাকে মাঝে মাঝে জোড়া দেবার ব্যর্থ প্রয়াস। এছাড়া আর কিছু নয়। এমনি ক'রেই এক-একটা বছর কেটে যাচ্ছিল; ইতিমধ্যে পুনরায় আকস্মিক আবির্ভাব দীনু ঠাকুরের।

হরিদাসী ব'ললো, 'এতদিনে এপথ তোমার মনে প'ড়লো ঠাকুর?'

দীনু ঠাকুর ব'ললো, 'গুরুকে ছেড়ে কোথাও বেরোতে পারি না, তাই আর দীর্ঘকাল এদিকে আসিনি। নইলে তোমাকে কি ভুলতে পারি?'

—'ঈস্, পারো আবার না! এই ক'বছরে তা তো দেখতেই পেলাম!' ব'লে চোখ দু'টো একবার উঁচিয়ে ধ'রলো হরিদাসী দীনু ঠাকুরের মুখের দিকে।

দীনু ঠাকুর ব'ললো, 'গুরুর ইচ্ছে ছিল না, তাই আসতে পারিনি; সেজন্যে আমার দুঃখও কম নয়। তা—গোসাইজী এমনি ক'রে হঠাৎ আমাদের ছেড়ে চ'লে যাবেন, একথা জানলে তাঁর শেষ সময়ে এখান থেকে আমি এক পা-ও নড়তাম না।'

গোসাইজী অর্থে হরিদাসীর বাবা। কিন্তু হরিদাসীর মুখে কিছু একটাও জবাব নেই।

দীনু ঠাকুর ব'ললো, 'ঘরে তোমার নতুন লোক দেখতে পাচ্ছি!'

হরিদাসী ব'ললো, 'কি আর করি বলো, নারীর যৌবন শুনি নদীর জোয়ারের মতো; তাকে সামলাতে পাহারাদার চাইতো?'

দীনু ঠাকুর ব'ললো, 'তাই মনের মানুষ জুটিয়েছ?'

উত্তরে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে হরিদাসী ব'ললো, 'মন ব'লে যখন একটা পদার্থ আছে, তখন মানুষ একটা চাইতো। কিন্তু যা চেয়েছি তা বোধকরি ভুল ক'রে চেয়েছি, তাই এজীবনে মনের দুঃখ আর ঘুচলো না ঠাকুর।'

হরিদাসীর মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে উত্তরে দীনু ঠাকুর ব'ললো, 'গোসাইজী দেহ রেখেছেন জানলে আমি কবে এসে তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতাম! একটুও দুঃখ রাখতে দিতাম না তোমার মনে। চলো, কিছুক্ষণ বরং রাস থেকে ঘুরে আসি।'

হরিদাসী ব'ললো, 'আগে গোবিন্দের দু'মুঠো প্রসাদ মুখে দিয়ে একটুকাল জিরিয়ে আমার নাগরের সঙ্গে আলাপ করো, তবে তো!'

কথা রাখলো দীনু ঠাকুর। সারা দুপুর ব'সে ব'সে সে কৃষ্ণদাসের সঙ্গে গল্প ক'রলো, তারপর পড়ন্তবেলায় একসময় হরিদাসীকে নিয়ে মেলায় বেরিয়ে প'ড়লো।

বিষয়টা যে কৃষ্ণদাসের কাছে ভালো লাগলো, তা নয়। অথচ এই নিয়ে হরিদাসীকে যে নিভৃতে কিছু জিজ্ঞেস ক'রবে, তাতেও কোথায় যেন বাধলো তার। মনের খেদে একসময় সে একতারাটাকে হাতে তুলে নিল, তারপর আপনমনে গুন্ গুন্ ক'রে গান ধ'রলো—

আমার মন-পাখী যায় উড়ে রে
ভিন্ খাঁচাতে;
গোকুল ছেড়ে বৃন্দাবনে
চায় সে কারে নাচাতে!...

দীনু ঠাকুরকে নিয়ে যখন হরিদাসী আখড়ায় ফিরলো, রাত্রি তখন গভীর। ঘুমে তখন দু'চোখ জড়িয়ে এসেছে কৃষ্ণদাসের। একসময় নিভৃতে তার শিয়রে এসে ব'সে হরিদাসী ব'ললো, 'ঘুরতে ঘুরতে অনেক রাত হ'য়ে গেল। অনেককাল পরে ঠাকুর এলো, কথা তার ঠেলে ফেলতে পারলাম না। তুমি বুঝি রাগ ক'রেছ নাগর?'

ভাবলো—একথার কোনো জবাব দেবে না কৃষ্ণদাস। কিন্তু তাতে বরং রাগটা আরও স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে। এই ভেবে একসময় সে ব'ললো, 'না, রাগ কেন ক'রবো, তোমার ঠাকুর এলো এতকাল পর তোমার কাছে, তাকে নিয়ে তুমি বেড়াবে, রাত কাটাবে, যা ইচ্ছে তাই ক'রবে, তাতে আমি রাগ ক'রলেই বা এসে যায় কি!'

খিল্ খিল্ ক'রে স্বভাবসুলভ হাসিতে ফেটে প'ড়ে এবারে হরিদাসী ব'ললো, 'তুমি ধরা প'ড়ে গেছ নাগর, ধরা প'ড়ে গেছ। তোমার মান ভাঙাতে এবার আমাকে মানভঞ্জন গাইতে হবে দেখতে পাচ্ছি।'

দীনু ঠাকুর তখন আখড়ার আঙিনায় ব'সে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে বোধকরি কিছু একটা গভীর কথা ভাবছিল।

হরিদাসীর কথার জবাবে কৃষ্ণদাস কি যেন একটা ব'লতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য একবার থামলো।

হরিদাসী জিজ্ঞেস ক'রলো, 'আজকের রাতটা কি উপোস দিয়েই কাটাবে ঠিক ক'রেছ?'

কৃষ্ণদাস ব'ললো, 'আমার ক্ষিদে নেই, তোমরা খাও।'

অভিমানের কণ্ঠে এবারে হরিদাসী ব'ললো, 'ক্ষিদে যে তোমার নেই, সে কি আর আজ নতুন জানি, না নতুন শুনচি! তবু একবার উঠে গোবিন্দের একটু প্রসাদ মুখে দিয়ে তারপর কি ঘুমোতে পারো না?'

হঠাৎ এবারে হরিদাসীর একখানি হাত নিজের হাতের মুঠোয় সজোরে চেপে ধ'রে উচ্ছ্বসিত আবেগে গলা খাটো ক'রে কৃষ্ণদাস ব'ললো, 'পারি, তুমি শুধু সারা রাত আমার পাশে থাকবে, বলো? তোমার কোনো সাধ আজ আর আমি অপূর্ণ রাখবো না রাই। তোমার জন্যে যদি আমি আমার নিজের পথ থেকে স'রে আসতে পারলাম, তবে তোমাকেও আমি সুখী ক'রতে পারবো।'

হরিদাসী ব'ললো, 'ছিঃ, ছিঃ, এসব কি

বল্‌ছো তুমি নাগর? আমি কি অসুখী? তোমাকে কাছে পেয়েছি, এই কি আমার কম সুখ? এর বাইরে আর কিছু বলোনা, দোহাই তোমার, শুনতে পেলে ঠাকুর হাসবে, চাইকি তোমাকে ছেলেমানুষ মনে ক'রে ঠাট্টা ক'রবে। সে আমি সইতে পারবো না। রাত ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, যাই, গিয়ে গোবিন্দের প্রসাদের জোগাড় করি।'

উঠ্‌তে গিয়ে মুহূর্তের জন্য আর একবার বসলো হরিদাসী, ব'ল্‌লো, 'ভালো কথা, কাল খুব ভোরে ঠাকুরকে নিয়ে আমাকে একবার মায়াপুর যেতে হবে। আস্‌তে হয়তো একটা দিন দেরী হ'তে পরে। তুমি যেন আখ্‌ড়া ছেড়ে কোথাও যেয়োনা। যত তাড়াতাড়ি পারি, আমি ফিরে আসবো। এসে বোঝাপড়া ক'রবো তোমার সাথে।'

কৃষ্ণদাস শুধু ব'ল্‌লো, 'আমার সাথে বোঝাপড়া তো তোমার শেষই হ'য়েছে রাই, আর কেন?'

কিন্তু এ 'কেন'র জবাব হরিদাসীর মুখে নেই। ধীরে ধীরে সে একসময় উঠে গেল কৃষ্ণদাসের পাশ থেকে। তারপর সারারাত্রির মধ্যে একটিবারও আর কাছে এলো না। সে রাতটা যে কি ক'রে কাটলো কৃষ্ণদাসের, তা সে ভিন্ন আর কেউ জানলো না।

ভোরে ঘুম ভাঙ্‌তে বেশ দেরী হ'লো তার। ততক্ষণে দীনু ঠাকুর আর হরিদাসী তৈরী হ'য়ে নিয়েছে। কাছে এসে একবার কৃষ্ণদাসের মাথাটাকে নরম হাতে নাড়িয়ে দিয়ে হরিদাসী ব'ল্‌লো, 'ওঠো, এবারে উঠে বসো নাগর, তাকিয়ে দেখ কত বেলা হ'য়েছে! এরপর আরও রোদ উঠলে যেতে আমাদের কষ্ট হবে। আমরা রওনা হচ্ছি। তুমি যেন আখ্‌ড়া ছেড়ে কোথাও যেয়োনা; আমি খুব তাড়াতাড়ি আবার ফিরে আসবো।'

ঘুমের চোখেই হঠাৎ ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো কৃষ্ণদাস। কিন্তু একটি কথা ব'ল্‌বারও অবকাশ পেলো না। তার আগেই দীনু ঠাকুর আর হরিদাসী আখ্‌ড়ার দরজা পেরিয়ে পথে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপর কখন তারা চোখের অদৃশ্য হ'য়ে গেল, লক্ষ্যে প'ড়লো না কৃষ্ণদাসের।

হরিদাসীকে সে একটা দিনের জন্যও অবিশ্বাস ক'রতে পারেনি। আজও পারলো না। বরং কাল্‌কের রাত্রিটার কথা মনে ক'রে অনুশোচনা বোধ ক'রলো কৃষ্ণদাস। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, যে দেহ তার গোবিন্দে সমর্পিত, যে দেহকে আরতির প্রদীপ ক'রে তুলে ধ'রেছে সে তার গিরিধারীলালের কাছে, সেই দেহের প্রতিটি অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি ক'রতে চেয়েছিল সে হরিদাসীকে! কত ছোট হ'য়ে গেল সে হরিদাসীর কাছে! দীনু ঠাকুরের প্রতি ঈর্ষা মনে মনে তাকে এতখানি অতলে নামিয়ে এনেছিল কাল রাত্রে। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ।

কিন্তু দীনু ঠাকুরের সঙ্গে একদিনের নাম ক'রে হরিদাসী বেরিয়ে গিয়ে আর আখ্‌ড়ায় ফিরলো না। এক একটা দিন ক'রে কেটে যেতে লাগলো, আর দুর্ভাবনায় ভেঙে প'ড়তে লাগলো কৃষ্ণদাস। এমনি ক'রে যখন আরও কিছুকাল কেটে গেল, তখন আর নিশ্চিন্তমনে ব'সে থাকতে পারলো না সে। একদিন বেরিয়ে প'ড়লো সে হরিদাসীর খোঁজে। মায়াপুরে, খড়দহ শান্তিপুর—কোথাও খুঁজে দেখতে বাকী রাখলো না সে। কিন্তু নেই, হরিদাসী বা দীনু ঠাকুর—কারুর খোঁজ নেই। রাগে এবারে সারা গা জ্ব'লে যেতে লাগলো তার দীনু ঠাকুরের ওপর। হরিদাসীকে সে যাদু ক'রেছে, যাদু ক'রে হরিদাসীকে নিয়ে পালিয়েছে সে এখান থেকে। কিন্তু হরিদাসী? সেই বা তার নিজের আখ্‌ড়াকে ভুলে গেল কেমন ক'রে? এখনও যে আখ্‌ড়ায় গোবিন্দের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত র'য়েছে! তার সেবা ক'রবে কে? যত্ন ক'রবে কে তাকে? সেই কাজের জন্যই কি তবে কৃষ্ণদাসকে রেখে গেল হরিদাসী?

ব্যর্থমনে আবার আখ্‌ড়ায় ফিরে এলো কৃষ্ণদাস। আগে হরিদাসীর সঙ্গে ব'সে ব'সে সে নামকীর্তন ক'রতো; আজ আর একা একা নামকীর্তনে মন ব'সতে চাইলো না তার। কেমন যেন কোথা দিয়ে সব তচ্‌নচ্‌ হ'য়ে গেল! অথচ এজন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না কৃষ্ণদাস। হরিদাসীর শূন্য আখ্‌ড়া আগ্‌লে কতকাল আর সে এম্‌নি ক'রে ব'সে থাকবে!

তবু আশা—এই বুঝি হরিদাসী ফিরে আসে, ফিরে এসে তার আখ্‌ড়ার ভার নিয়ে কৃষ্ণদাসকে মুক্তি দেয়!

সেই আশাপথ চেয়ে চেয়েই একে একে সাতটা বছর কেটে গেল। কিন্তু হরিদাসীর আর দেখা পাওয়া গেল না। দেহে আজ আর আগেকার সেই জোর নেই, নইলে আর একবার নানা জায়গা ঘুরে খুঁজে দেখতে পারতো কৃষ্ণদাস—কোথায় আছে তার রাই? তার হাতে আখ্‌ড়ায় চাবি তুলে দিয়ে হাসিমুখে বিদায় নিত সে হরিদাসীর কাছ থেকে; ব'ল্‌তোঃ 'আমার কাজ ফুরিয়েছে, এবার আমার ছুটি।' কিন্তু সেই ছুটি কি সত্যিই তাকে দেবে হরিদাসী?

কিছুদিন কোথাও থেকে ঘুরে না আসতে পারলে এরপর হয়তো পাগল হ'য়ে যাবে কৃষ্ণদাস। পাগল কি এখনই কিছু কম হয়েছে সে? বিগ্রহের পায়ে দুটো ফুল দিতে অবধি আজ আর আগ্রহ নেই। যখনই সে তার গিরিধারীলালকে ভাবতে যায়, চোখের সাম্‌নে অশরীরী রূপ নিয়ে এসে দাঁড়ায় হরিদাসী। আর নয়, আর এম্‌নি করে শুধু দিনযাপনের গ্লানি নিয়ে মিথ্যে আশাপথ চেয়ে ব'সে থাকা নয়। এখান থেকে দূরে কোথাও চলে যাবে কৃষ্ণদাস, দূরে—বহু দূরে, যেখানে নবদ্বীপের ছায়া অবধি গিয়ে পৌঁছাতে পারবে না।

একসময় গাড়ীতে চেপে ব'সলো সে। সেই গাড়ী চলেছে নিশুতি রাত্রির বুক চিরে সরীসৃপগতিতে। কোথায় প'ড়ে রইল বাংলা আর সাঁওতাল পরগণার সীমা, কোথায় প'ড়ে রইল তিলপাহাড়ের উঁচু উঁচু টিলা, ট্রেণ চলেছে। সরীসৃপগতিতে রাজমহল। তারপর গঙ্গা পেরিয়ে মাণিকচকঘাট।

পুণ্যার্থীদের ভিড়ে কোথাও তিলধারণের ঠাঁই নেই। কারুর কাঁধে ঝোলা, কারুর কণ্ঠে নামকীর্তনের কলি। তাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে কৃষ্ণদাসও একসময় সাম্‌নের পথে এগিয়ে চল্‌তে চল্‌তে একতারায় সুর তুলে গুন্‌ গুন্‌ ক'রে আপনমনে গান ধ'রলো—

'আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে॥..'

গাইতে গাইতে একসময় সে হাইরোড পেরিয়ে গৌড়ের সিংহদ্বারে এসে পৌঁছালো। সারা রামকেলি তখন মেলার ভিড়ে মুখর হ'য়ে উঠেছে। জ্যৈষ্ঠের সংক্রান্তি। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এইদিনে গৌড়ের পথে এসে বিশ্রাম নিয়েছিলেন রামকেলির কেলিকদম্বের ছায়ায়। সেই কেলিকদম্বের শিশুচারা আজ নানা পত্রে-পুষ্পে সুশোভিত। তাকে কেন্দ্র ক'রে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়। এতবড় বিরাট বৈষ্ণবমেলা এর আগে কোনোদিন দেখেনি কৃষ্ণদাস। দেখ্‌ছিল আর অবাক হ'য়ে যাচ্ছিল সে। এখানে কীর্তনের আসর ব'সেছে, ওখানে দোকান ব'সেছে; নানা লোকের নানা গুঞ্জনে কান পাত্‌বার ঠাঁই নেই কোথাও।

সেই ভিড়ের মধ্যে পথ ক'রে ক্লান্তদেহে একটু একটু ক'রে এগোতে লাগলো কৃষ্ণদাস। পুণ্যার্জনের এমন শুভমুহূর্ত বোধ করি এজীবনে কোনোদিন আর আসবে না। এই অবকাশে সারা গৌড়ভূমিকে একবার প্রদক্ষিণ ক'রে যাবে সে। প্রাচীন বাংলার কীর্তিগাথা এখনও তার স্তরে স্তরে প্রক্ষিপ্ত রয়েছে। দেখে এজীবনের মতো নয়ন সার্থক ক'রে যাবে কৃষ্ণদাস।

কেলিকদম্বের ছায়া অতিক্রম ক'রে কয়েক-পা দক্ষিণে এগোতেই খঞ্জনীর সুরে একটি নারীকণ্ঠ ভেসে এলো কানে। হাতে গুন্‌ গুন্‌ করে এতক্ষণ নামকীর্তনের একটা সুর বাজছিল একতারায়। সহসা সে সুর থেমে গেল, খঞ্জনীর সুরের দিকে মুহূর্তের জন্য কান খাড়া ক'রে একবার থম্‌কে দাঁড়ালো কৃষ্ণদাস। খঞ্জনীর সুরটা ক্রমেই যেন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ছে, কণ্ঠ

(শেষাংশ ২৩৪ পৃষ্ঠায়)

স্মরণে তোমারে পাই

• মৈত্রেয়ী দত্তচৌধুরী

তোমাকে ভেবেছি কবে সেই কথা আজো
ভুলিনি তো:
বিষণ্ণ বাদল শেষে একান্ত নিরালা,
জীবনের ক্লান্ত দ্বিপ্রহর;
তোমার সে পদ-ধ্বনি দূর হতে আজো আনে
'স্টেপি'র তুষার বুকে হিমেল শিহর।
দৃষ্টি হারালো পথ, নেই কোন প্রাণের সঞ্চয়;
প্রতারিত অতীতের শুধু অশান্ত প্রলাপ,
স্মৃতির সঞ্চয় নিয়ে শুধু আঁখি খুঁজে ফেরে
সেদিনের রামধনু পুচ্ছ তোলা
রঙ্গিন কলাপ।
একদিন আঁখি ভরে এনেছিলে কামনার ঢেউ,
নিষ্ঠুর পদ্মার সেই তীর ভাঙ্গা খেলা,
সে বালুকা-বেলা,
আজো তো রেখেছে সেই প্লাবনের জলের আঘাত,
রেখেছে গভীর করে বিস্মৃতির সে সজল দাগ।
তুমি তো হারায়ে গেছ
প্রতারিত অসীম তিমিরে;
তোমাকে ভুলিনি তবু, যার নাম আজো ফিরে ফিরে
মস্তিষ্কে দহন তোলে; মন বলে শুধু ছুটি চাই,
জীবনের প্রশ্ন খুঁজে বসে শুধু 'দর্শনের'
পাতা ওল্টাই।

পাষাণী

প্রীতি দেবী

পাষাণীকে যেদিন ঘরে আনি সেদিন আমার বাড়বাড়ন্ত ষোলকলায় পূর্ণ হতে চলেছে। সদ্য মোটরগাড়ীও কেনা হয়েছে। আর বেচে দিয়েছি আমার সেই বহু পুরানো সাইকেলখানা—যাকে কেন্দ্র করে এক দীর্ঘ বন্ধুত্বের কাব্য রচনা করব বলে ভেবেছিলাম এককালে। মোটরগাড়ী থামতেই ড্রাইভার হর্ণ বাজালে। দরজা খুলবার আহ্বান। স্ত্রী স্বয়ং এগিয়ে এলেন। অমনি তাকে অভ্যর্থনা জানালে মেও—মেও......ও......

শ্রীমতী তৃপ্তি বললেন, কে ও?

তৎক্ষণাৎ আবার শোনা গেল, মেও—ও।

উত্তরে শ্রীমতীর পরিতৃপ্তি হল কি না, বোঝা গেল না। শুধু পাষাণী যখন আমার কোলে চুপটি করে গাড়ী থেকে নামলে তখন তিনি কৃত্রিম ক্রোধে বলে উঠলেন, পছন্দ আছে বলতে হবে। মোটরগাড়ীর পরেই মার্জার! আঃ মরি!

শ্রীমতীকে আমি বিলক্ষণ জানি। তিনি আমার ত্রুটি ধরতে পারলে হাতে স্বর্গ পান। অথচ ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ দিতে চান না। দোতলায় উঠতে উঠতে এবারেও দেখা গেল স্ত্রী-স্বভাব তাঁর একবিন্দুও পাল্টায়নি অর্থাৎ তিনি আমার আঃ মরি পছন্দের পেছু লেগেছেন সম্পূর্ণ অন্যভাবে।

দেখি না, বেশ মিশকালো রঙটা। বলেই ছোঁ মেরে পাষাণীকে জবরদখল করলেন।

বুঝলাম পাষাণীর আর ভাবনা নেই। এখন থেকে সে আমার কোল পাক বা না পাক, শ্রীমতী তৃপ্তিরাণীর কোলে চিরবহাল।

অনুমান মিথ্যে নয়। বেশ কয়েকদিনের মধ্যেই পাষাণী আমাদের সংসারে একান্ত আপন জন হয়ে জেঁকে বসল। ছেলেমেয়েদের খেলার সাথী সে। আর শ্রীমতীর আহারে-বিহারে অপরিহার্য। আমিই যেন কেমন ওদের মধ্যে বে-মানান। পাষাণী বলে ডাকলে ছুটে এসে কোলে ঝাঁপ দিতে যে একদিনে ওস্তাদ হয়ে উঠেছিল, সে যেন বেদম পাল্টে গেছে। আর শ্রীমতী তৃপ্তিরাণী, তাঁর কথা না-বলাই শ্রেয়। কথায় কথায় পাষাণীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে কত অভিযোগই না শুনতে হয়। শ্রীমুখের অভিযোগ বলেই উল্লেখ না করে পারি না। যেমন, পাষাণী যে খাঁটি দুধ না পেয়ে কৃশ হয়ে যাচ্ছে, অতএব ওর জন্যে নতুন গোয়ালা ঠিক না করলেই নয়। কিংবা—পাষাণীর গরমে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, ওকে আমাদের বিছানায় পাখার তলায় ঘুমাতে দিলে এমনকি বেদ অশুদ্ধ হয়ে যায়! আরও কত কি!

অভিযোগ যখন মিথ্যা নয়, তখন যথার্থই এক রাতে পাষাণীকে আমাদের শয্যায় আশ্রয় দেওয়া হল। কেবল খাঁটি দুধের ব্যবস্থাতেই শ্রীমতীর সন্তোষ না হওয়ায় মাছের বরাদ্দটাও পাষাণীর জন্য বাদ পড়ল না।

এমনি করে দিন কেটে যাচ্ছিল।

কেমন যেন ঘটে গেল ইতিমধ্যে আমার জীবনে। বিপর্যয় বললেও চলে। যে পথে, যেভাবে টাকা-পয়সা আসছিল, সে পথটায় সহসা ভূমিকম্প হয়ে থাকবে। নইলে সংসার অচল হতে বসবে কেন? দুনিয়ার দরিয়ায় সংসার নৌকোখানির মাঝি আমি, দিব্যি নৌকোখানি পারে নিয়ে চলেছিলাম শান্ত স্রোতের বুক পেরিয়ে। হঠাৎ ঢেউ উঠল, তুফান জাগল। টালমাটাল সুরু হল। চোখে অন্ধকার দেখলাম।

আমার কেবল পাষাণীই নয়, পোষ্য ছিল বেশ-কিছু। কর্মচারীদের বাদ দিলেও অঙ্গাদ, (বানর) হীরা-পান্না (মাছ) ও বামন (গাছ) যেন আমার রক্ত-মাংস। না যেন বুকের কলিজা, এরাই আমার সুখের হাসি, দুঃখের কান্না।

যারা এতকাল কাজ করেছে এ-সংসারে, তাদের একে একে বিদায় দেওয়াই স্থির করলাম। না করে উপায় কোথায়? কিন্তু একদিনে, একসংগে বিদায় পর্বটা সারা অসম্ভব। তাই একে একে একজন, দুজন করে জবাব দেবার পালা চলল কিছুদিন।

এরই মধ্যে প্রত্যাশা দিন যদি ফেরে। না, দিন ফিরল না। ক্রমশঃ দুর্দিন এগিয়ে আসতে লাগল।

শ্রীমতী তৃপ্তির চোখে ঘুম নেই। সন্তানের জননী তিনি। কি করে মানুষ করবেন নিজের ছেলেমেয়েদের। ওদের চিন্তার উপরি তার কোনো চিন্তাই রইল না। দিনের পর যতই দিন যায়, ততই তিনি যেন অন্য প্রকৃতির হয়ে উঠতে লাগলেন। অঙ্গদের উপরে তাঁর আক্রোশ জমে উঠল, হীরা-পান্নার জলের আয়োজনে অহেতুক অনিয়ম ঘটতে লাগল। বামনকে বিদায় করে দিতে পারলেই যেন বাঁচেন।

কেবল পাষাণীকে খাবার সময় তাঁর মনে পড়ত। তিনি খুঁজে ফিরতেন সারা বাড়ী। কোথায় পাষাণী! কখনও দেখা যেত, সে ছাদের কোণে লুকিয়ে, কখনও বা সিঁড়ির তলায়। জোর করে তাকে না খাওয়ালে সে কিছু ভুলেও মুখে তুলত না। মাঝে মাঝে বড় জ্বালাতন লাগত। অহেতুক এক পাষাণীর জন্য হয়রাণি। পেটে আগুন। আহারে বসেও শান্তি নেই। খোঁজ, খোঁজ সারা বাড়ী। কোথায় শ্রীমতী তৃপ্তিরাণীর সোহাগী পাষাণী! রেগে বলতাম—বিদায় করে দাও।

অত পাষাণ না-ই বা হলাম!

ইচ্ছে হত বলি, পাষাণীর জন্য দরদ যে আর ধরে-না! কিন্তু অপরপক্ষের কাছে এই আঘাত যে কত মর্মান্তিক হতে পারে, সেই আশঙ্কায় দাঁতে দাঁত চেপে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না।

দিনকাল আরো ভীষণ।

কর্মচারীদের বিদায়পর্ব শেষ।

তবু দিন চলে না।

গাড়ী আগেই গেছল, আসবাবপত্র বিক্রীর হিড়িক চলল। তাতেই সংসার চলে তখন। তথাপি দিন ফেরে, এ প্রত্যাশা যে যেতে চায় না।

আশা প্রত্যাশারও অবসান প্রায়।

তখন একদিকে সত্যি সত্যিই চরম ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিজ্ঞা নেওয়া হল। শ্রীমতীকে বললাম, চল, অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে। যেখানে আমাদের কেউ জানে না, কেউ চেনে না—নতুন জীবনের সন্ধানে......

আর বলা হল না।

শ্রীমতী সজলচক্ষে বল্লেন যে, তাঁরও তাই ইচ্ছে।

একমাত্র বন্ধন—বাড়ী। আমারই স্বোপার্জিত অর্থে এ বাড়ী। এ আমার জীবনের এক ঐতিহাসিক অধ্যায়। সে অধ্যায়ের পূর্ণচ্ছেদ ঘোষণার বেদনা—যে ভুক্তভোগী নয়, সে জানে না, কখনো জানবেও না। শোকে মানুষ নাকি সংসারকেও ভুলে যায়, দুঃখে বেদনায় আমি ভুলেছিলাম আহার নিদ্রা। চিন্তা না কি শোকেও লোককে জ্বালায়। আমার যেন কেমন হয়েছিল, কোনো চিন্তাই মাথায় আর ঠাঁই পাচ্ছিল না। নইলে সে রাতে শ্রীমতীকে অমন অন্ভুতমনা দেখেও কোনো কারণ কেনো খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অথচ কিছু জিজ্ঞেস করতেও রীতিমত আশঙ্কা হচ্ছিল। তাই চুপচাপ.........হঠাৎ শ্রীমতীই বল্লেন, আচ্ছা, বাড়ী না হয় বিক্রী করে দেবে। কিন্তু পাষাণীকে......

তাইতো.........

পাষাণীকে সঙ্গে নেওয়া চলে না? বামনকে বাসন্তীদের দিয়ে দেওয়া যাবে। হীরা-পান্না পাশের বাড়ীর ওরা চাইছিল। সেও না হয় দিয়ে দিলে হল। শ্রীমতীর গলা আর অগ্রসর হল-না।

কথার গোড়া ধরে বললাম,—কি করে সঙ্গে নেওয়া যাবে বুঝে উঠতে পারছি না!

অনেকক্ষণ চুপচাপ, কেমন একটা অস্ফুট গোঙানীর শব্দ। সেদিকে কান পাততে চাইছিলাম, কোথায় কে যেন কাঁদছে! কোথায়? কে কাঁদে! পাশের ঘরে প্রশান্ত নয় ত, প্রশান্ত আমার কনিষ্ঠ পুত্র—সবে মায়ের কাছ ছেড়ে আলাদা শুতে এই আরম্ভ করেছে!

কখন যে প্রশান্তর জননী উঠে পড়েছেন জানতেই পাইনি। জানতে পেলাম যখন তিনি পাষাণীকে বুকে চেপে কাছে এসে বললেন, দ্যাখ না, আবদার! কিছুতেই প্রথমটা কোলে আসবে না। দুষ্টু কোথাকার!

ও-ঘরে প্রশান্তর পায়ের কাছে পড়ে কো-কো করা হচ্ছে। যেই আনতে গেছি, সেকি অভিমান। কিছুতেই—না!

এ-কোল ক'দিন পায়নি কি না—তাই। তাও বলি, কত বড়টি হয়েছিস, এত আহ্লাদ কি ভালো দেখায়।

ও বলে, ম-ও-ও। অর্থাৎ বড় হয়েছি, কে বলে!

বিছানায় শুইয়ে শ্রীমতী আবার বললেন, এত আবদার যার, তাকে কেমন করে ফেলে যাবে বলোতো?

এ কথার উত্তর মেলেনা। শ্রীমতীরও মেলেনি। তারপর থেকে পাষাণী যেন আরো পালটে গেছে। পালটে গেছেন কি শ্রীমতী ভূপিতরাণীও! আজকাল কে কাকে দেখে! আমি রাতদিন বাড়ী বিক্রীর ধাঁধায় ঘুরি। কোনো কিছুই দেখবার ফুরসৎ হয় না। তারপর এই ত কাল অঙ্গদের সংগে খেলতে গিয়ে প্রশান্ত সিঁড়ি থেকে পড়ে রক্তপাত ঘটাবার পরই ওর মা অঙ্গদকে পার করে দিলে;—অঙ্গদের সে কী কান্না! শুনতে পেলাম শ্রীমতীর চোখের জলের বর্ণনায়; কিন্তু সেই পর্যন্তই। হীরা-পান্নার জল পাল্টানোর থেকে বামনের দেখাশুনা সমস্তত্তেই এককালে কতই না আগ্রহ ছিল। মনে হয় এখন, ওসব অতীতের স্বপ্ন।

সেদিন সকাল হতেই ছবি খবর দিলে, বাপি, দেখবে চল, বামনের পাতা ঝরছে।

বামনের পাতা ঝরছে! অসময়ে!

সত্যিই ত। কালটা যদিও শরৎ—এ-ও তবে দেখতে হল। ও যেন জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। যাক, আর ক'টা দিন-ই বা।

পুজোর আগেই বেরিয়ে পড়ার ইচ্ছা, আগামী এগারই আশ্বিনে বাড়ীটা হস্তান্তর করে দিতে পারলেই বিদায়, বিদায় হে আশ্রয়-দাত্রী, ধাত্রী আমার!

পুজো নাকি এগিয়ে আসছে। ছবি-প্রশান্তর চোখে-মুখের হাসিতে অন্যবার পুজোর আগমনী সংবাদ পেয়েছি। এবারে ওদের মায়ের চাপা কান্নার মুখরতায় অনুমান করছি পুজো আগত-প্রায়। এগারই আশ্বিনেরই বা ক'দিন আর!

পাষাণীকে গতবার পুজোয় জরির পোষাক দেওয়া হয়েছিল। ও পুজোর খুশিতে আগেই নেচেছিল গেল বছর। এ বছর নাচা তো দূরে থাক, ওকে চোখেরই যে নাগালে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, নাগালে পাবার আমার প্রয়োজন ঘটেছে—তাই নাগালের কথা বলছি। নইলে......

এগারই আশ্বিনের দু'দিনই বাকী। মাত্র দুটি দিন। বাড়ীর বাবদ ত্রিশ হাজার ত পাচ্ছি। দূরের পথে পাড়ি জমাতে ওই যথেষ্ট। ওর থেকে এবার পুজোয় আমাদের যৎসামান্য বরাদ্দ হলেও পাষাণীর পোষাক হতে তাতে আটকাবে না!

বাড়ীর শোকে এদিকে কিন্তু প্রশান্তর মা শান্তি হারিয়ে বসেছেন। আমার বাইরে আনন্দ নেই, ভেতরে আনন্দের স্রোতে আমি মশগুল হয়ে আছি। কি হবে, এই তুচ্ছ যা কিছু ভেসে যাচ্ছে, তাই নিয়ে অহেতুক ভাবনার বোঝা বাড়িয়ে। কত নিদারুণ দুঃখে এ মনপ্রাণ দার্শনিকতার চরম ও পরম আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে আমিই জেনেছি—আর ত কারো জানবার কথা নয়।

আর আজকের রাতটা। কাল এগারই আশ্বিন। সারারাত প্রশান্তর মা ছটফট করলেন। শেষরাতে এক সময় বললাম, বাড়ীর শোক ভুলতে না পারার এতই বেদনা!

তিনি বললেন, না গো না। পাষাণীর জন্য মন কেমন করছে। ওর যে অসুখ।

—ও কিচ্ছু না, ঘুমাও।

—ঘুম নেই। পাষাণীকে কাকে দিয়ে যাবে বলো তো। যাকে তাকে দিলে ওর যে যত্ন হবে না। ও আমার বড় আদুরে—

—সে পরে ভেবে দেখা যাবে। লক্ষ্মীটি ঘুমাও।

* * *

পরের দিন।

বাড়ী রেজেস্ট্রি করে, পরের কাছে কয়েক-দিনের আশ্রয় ভিক্ষা চেয়ে সবে ঘরে ফিরেছি। প্রশান্ত খবর দিলে, বাপি, পাষাণী চলে গেছে।

বহুকাল কেটে যাবার পর আজও আমাদের প্রশ্ন জাগে, ও কেনো চলে গেল! সে কি আমাদের দুশ্চিন্তা দূর করতে, না চিরমুক্তি দিতে।

স্কেচ কালীকিংকর

শূন্যবাদীর প্রতি

॥ সুনীলকুমার লাহিড়ী ॥

বল ভীরু-মন, বল, বল কোন সাধে—
দীক্ষা নেবেই এখনি শূন্যবাদে?
নোঙর যখন তুলেছ জমাতে পাড়ি,
মাঝ-দরিয়ায় বিবাগী এ মন ছাড়ি,
বন্দর কোথা সন্ধান নাও তার—
পণ্য বিকোতে মন রাখো হুঁশিয়ার।
নিমেষে নিমেষে সন্দেহবাদী মন,
সংশয়-দোলে অস্থির অনুখন;
আদি ও অন্তবিহীন অমাতে তাই,
জেনো চিরকাল নিখিল রচিছে ঠাঁই।
শুধু নেতিবাদে স্বতঃসিদ্ধ পাওয়া—
অনন্তকাল মরীচিকাপানে ধাওয়া—
ইহ-জনমের সেই তো চরম ফাঁকি;
শূন্যদৃষ্ট শূন্যে মেলিয়া রাখি!
প্রচণ্ড তেজ ভরা বাসনার নদী—
বঞ্চনা-বাঁধে বাঁধিতে তাহারে যদি
মিথ্যা আয়াস ক'রে থাকো তুমি মন,
হোক নিরস্ত এখনি সে আয়োজন।
যেখানে ছড়ানো নানা বিচিত্র শোভা,
লতা-পাতা-মেঘে সম্ভোগ মনোলোভা—
যেখানে মায়াবী সোনার চিত্রভানু—
রথবেগে করে সচল যা-কিছু স্থাণু,
সেথা এ জড়তা হইতে লভিছে ত্রাণ,
কর এ তামস-বিনাশী সূর্যস্নান।
নিরাশা-নিলীন নিভৃত স্বপ্নচারী
ফসল-প্রয়াসী সে মন—তাহারে ছাড়ি
অপারগতার ঊর্ণাজালের ফাঁদে
প'ড়েই কি নেবে দীক্ষা শূন্যবাদে?

রাত্রি

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

পাখিরা তো উড়ে গেলো যথারীতি কী জানি
কোথায়।
সব রঙ মুছে যায়। অবশেষে অন্ধকার হলো।
তবুও একটি পাখি একা একা। ডানা ঝাপটায়।
দীঘির কাজল চোখ বেদনায় করে ছলো ছলো॥

সন্ধ্যার মুহূর্ত শেষ। কখন উধাও সব আলো।
আকাশে তারার ভিড়। তবু কিছু নেই মনে হয়।
শ্বাপদের মত শুধু অন্ধকার: ঝোপে ঝোপে
কালো।
এখানে-ওখানে এক অকারণ ছায়া-ছায়া ভয়॥

হাওয়া আসে। ঢেউ ওঠে। ঢেউ ভাঙে দূরে আর
কাছে।
পায়ে-চলা-পথ হাঁটে। হেঁটে হেঁটে যায় সে
হারিয়ে।
ধান-কাটা-মাঠ। শূন্য। চারিদিকে খড় পড়ে আছে।
একটি জারুল গাছ অন্ধকারে রয়েছে দাঁড়িয়ে॥

সময়। সময় যায়: অর্থহীন চক্রপথ ধ'রে।
মৃত্যুর রহস্য আসে রাত্রির পাখায় ভর ক'রে॥

জেকবের 'দি মাঙ্কিস্ প' গল্পটি খুব মন দিয়ে পড়ছিলুম।

হঠাৎ কে যেন মৃদু তিরস্কারভরা কণ্ঠে বলে—বাজে জিনিষ না পড়ে আমাকে নিয়ে একটা গল্প লেখ, কাজের কাজ হবে।

অদৃশ্য কণ্ঠের অদ্ভুত অভিব্যক্তিতে চমকে তাকিয়ে দেখি ঘরের কোণে টিপয়ের উপরে রাখা পঞ্চপ্রদীপটি যেন নড়ে উঠছে......

প্রায় তিন হাত লম্বা এক অনুপমা নারী-মূর্তি এই পঞ্চপ্রদীপ, প্রচুর চুলে তার সমস্ত দেহ ঢেকে গেছে—যেন সবুজ পাতায় ঢাকা বিবসনা পৃথিবী। হাতে তারার মালার মত পঞ্চপ্রদীপ।

অনেকদিন থেকেই এই পঞ্চপ্রদীপটি আমাদের ঘরে আছে। এর ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামাতাম না আমরা—আমরা অবাক হয়ে দেখতাম ওর মুখভাব। সে মুখে নিবিড় ঘৃণা, প্রতিশোধপরায়ণতা, আত্মহত্যার সংকল্প। আর, সেই মুখভাব এত সজীব—এত সদ্য যে, মনে হয় কেউ এইমাত্র চিন্ময়ী নারীকে মৃন্ময়ী মূর্তিতে রূপান্তরিত করেছে! কিন্তু যতই হোক মাটীর মূর্তির পক্ষে কথা বলা......

বই বন্ধ করে আমি একদৃষ্টে তাকাই। এবারে স্পষ্ট দেখতে পাই ও যেন আমাকে ডাকছে। ধীরে আরও এগিয়ে যাই ফিস্‌ফিসিয়ে ও যেন বলে—কাছে এস—আরও কাছে এস। তোমার মনের উত্তাপ সঞ্চারিত কর আমার বুকে—জমাট কঠিন বরফ গলিয়ে দাও। আজ আমার নিদ্রা ভেঙেছে...আজ আমার জীবন কাহিনী সমগ্র দেহের শিরায় উদ্বেলিত। তুমি এগিয়ে এস—শুনতে পাবে সেই অশ্রুত কাহিনী। আমার জীবন-মরণের ইতিহাস। তুমি শোন—তুমি প্রকাশ কর। নইলে যে আমার মুক্তি নেই।

......সে ছিল একটি মেয়ে—নাম তার কাজরী। কত......কতদিন আগে এই বাংলা দেশেরই একটা গ্রামে বাস করতো সে। কি নাম ছিল তখন বাংলার? গৌড়! রাঢ়। সুহ্ম। কে জানে! তা নিয়ে কখন মাথা ঘামাতো না কাজরী কিংবা ওর গাঁয়ের লোকরা। আঁকাবাঁকা মাটীর পথ আর সবুজ গাছে ঘেরা তাদের ছোট গ্রামখানিকেই চিনতো ওরা। সেই সবুজ পরিচয়ের রেখা [illegible] পড়েছে আশে-পা[illegible] [illegible] গ্রামে—তার বাইরে পৃথিবী একান্তই ধূসর—একান্তই অপরিচিত।

সেই ছোট গ্রামের ছোট মেয়ে কাজরী। হাল্কা খুসী আর হাল্কা হাসিতে ভেসে, হেসে, সে নেচে বেড়াত মাটী-লেপা গৃহের অঙ্গনে আর ঝরেপড়া শিউলী তলায়। ছোট মেয়ে। কালো কোঁকড়া চুল আর চঞ্চল দুটি কালো চোখ।

আকাশের আলোতে সেই কালো চুল ঝকঝকিয়ে উঠতো—চকচকিয়ে উঠতো দুটি চোখের তারা—আকাশের হাওয়ায় তার চুলগুলি দুলে উঠতো—চোখের তারা উঠতো নেচে—হরিণ শিশুর মত ছুটে বেড়াত সেই মেয়ে চকচকে চোখে, আর চঞ্চল গতিতে—কিন্তু...

কিন্তু, মাঝে মাঝে হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়াতো সে। কঠিন সবুজ গাছের নীচে দাঁড়িয়ে, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো আকাশের ধূসর-নীল আভার দিকে—স্থির কঠিন হয়ে উঠতো দুটি চোখের তারা—

সে ভাব অবশ্য খুবই কচিৎ-কদাচিৎ। প্রায় সময়ই কাজরী চঞ্চলা-হরিণী—

ওরই সঙ্গে খেলতো পাশের গাঁয়ের একটি ছেলে। নাম তার বিজয়। শান্ত তার চোখ। স্থির তার দৃষ্টি—কাজরীর মত সে চোখ কাঠিন্যের স্থিরতায় ভরা নয়—নির্মল নীল হ্রদের মত স্বচ্ছ নরম ভাব।

হাসিভরা মুখে, আনন্দভরা চোখে সে দেখতো কাজরীর চঞ্চলতা—আর অবাক-বিস্ময়ে একটু যেন ভয়ে সংকুচিত হয়ে সরে যেত—পালিয়ে যেত যখন কাজরী তার সেই কঠিন দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকতো আকাশের ধূসর-নীলাভার দিকে।

সেবার কাজরীদের গাঁয়ে এলেন একজন সন্ন্যাসী। গ্রামের মাঝেই—লোকালয় থেকে একটু দূরে প্রকান্ড বড় বটগাছটার নীচে নিজে হাতে কুঁড়ে গড়ে রইলেন তিনি। দুবেলা গ্রামবাসীদের ভিড়ে ভরে যেত ঐ গাছের তলা।

দুদিন যেতে না যেতেই ভিড় পাতলা হয়ে এল। কি করতে যাবে? তুকতাক, মন্ত্র, জলপড়া, ঝাড়ফুঁক কিছুই দেন না উনি। জানেন না মাটী থেকে সোনা বানানো, দূরের মানুষ টেনে আনা, বশীকরণ। তবে! কি করতে যাবে লোক! সাধারণ লোকের সঙ্গে যদি কোন তফাৎই না রইলো তবে সন্ন্যাসী হয়ে লাভ কি!

নিয়মিত দর্শনপ্রার্থী ছিল মাত্র দুটি—কাজরী আর বিজয়। ছোট দেহে কোন রকমে মোটা শাড়ী জড়িয়ে, কোঁকড়া চুল দুলিয়ে, চোখের পাতা নেড়ে ছুটতে ছুটতে আসতো, কাজরী—আর শান্ত সংযত স্থির পদক্ষেপে, গভীর গম্ভীর চোখে ঠিক একই সময় একই গতিতে সেখানে এসে দাঁড়াতো বালক বিজয়।

সন্ন্যাসী পুজো করতেন—তাকিয়ে থাকতো কাজরী একদৃষ্টে। সন্ন্যাসীর দিকে নয়—তাঁর পাশে রাখা প্রজ্বলিত পঞ্চপ্রদীপের দিকে।

আকর্ষণীয় আকার বটে সেই পঞ্চপ্রদীপের। পিতলের ছোট বৃত্তের মাঝে পাঁচটি প্রদীপ পাঁচটি ফুলের মত ফুটে উঠেছে—পঞ্চপ্রদীপ নয় যেন পঞ্চপদ্ম। এত ভারী যে এক হাতে তা তোলা যায় না—দুহাতে তুলতে কষ্ট হয়।

প্রদীপের স্নিগ্ধ শ্বেত পবিত্র আলোর দীপ্তি ছড়িয়ে পড়তো চারিদিকে—শ্বেত-বরণা শ্বেত-বসনা দেবী শ্বেতপদ্মের মত পবিত্র হাসি হাসতেন।

সেই হাসির প্রতি বিভোর নেত্রে তাকিয়ে থাকতেন সন্ন্যাসী। কাজরী একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতো পঞ্চপ্রদীপের দিকে। বিজয় তাকাতো কাজরীর দিকে। এ যেন এক অনুপম ছবি।

পুজো শেষে প্রসাদ হাতে সন্ন্যাসী বেরিয়ে আসতেন। ওদের দিকে তাকিয়ে হেসে শুধাতেন কি খবর?

শান্ত স্তব্ধ বটবৃক্ষতল কাজরীর কলকণ্ঠে মুখরিত হয়ে উঠতো। গ্রামে কি কি ঘটেছে—কি ঘটা উচিত ছিল এবং কিভাবে চললে এসব ঘটতো না—তার ন্যায় অন্যায় সবই বুঝিয়ে দিত কাজরী—আর, শান্ত স্নিগ্ধহাসি হেসে নীরবে সায় দিত বিজয়।

সেদিন সন্ন্যাসী পুজো শেষে বেরিয়ে আসতেই কাজরী তার স্থির কঠিন চোখ দুটি মেলে তাকিয়ে বলে সন্ন্যাসী, আমাকে ঐ প্রদীপটা দেবে!

—সে কি? চমকে ওঠেন সন্ন্যাসী। প্রদীপ দিয়ে কি করবে তুমি।

—রেখে দেব। বড় হয়ে জ্বালাবো...।

—বড় হয়ে জ্বালাবে...ধীরে ধীরে কেটে কেটে উচ্চারণ করেন সন্ন্যাসী—জ্বালাবে—না নিজে জ্বলবে...।

—না, না, জ্বলবো না, জ্বালাবো—ছোট শিশু সরল উত্তর দেয়—তুলসী তলায় জ্বালিয়ে দেব—তোমার মত দুহাতে তুলে করবো আরতি......

সন্ন্যাসী কাজরীর দিকে তাকিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলেন—এ প্রদীপ কি করে জ্বালাতে হয় জানতো—নিজে হাতে তৈরী সলতেকে এর বুকের মাঝে পুড়িয়ে দিতে হবে ঘি দিয়ে—

সন্ন্যাসীর কথা বুঝবার মত বয়স কাজরীর নয়—তবু, সেই শিশু স্থির কঠিন দীপ্তিময় দুই চোখ মেলে বলে—তাই করব।

ওর গম্ভীর ব্যগ্র মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু ম্লান হাসি হাসেন সন্ন্যাসী।

সেদিন থেকে রোজই একবার করে আর্জি পেশ করে কাজরী। প্রদীপটা তাকেই দিয়ে দেওয়া হোক—এটা বেখে সন্ন্যাসীর কি লাভ—ততবড় একটা ভারী জিনিষ বয়ে নিয়ে এধার ওধার যাওয়াও তো কঠিন ইত্যাদি।

কোন উত্তর না দিয়ে শুধু মৃদু হাসতেন সন্ন্যাসী।

শেষটা কাজরী একদিন বিজয়কে ডেকে বলে—তুই বল।—কি? শুধায় বিজয়।

এ প্রদীপটা চেয়ে নে—শান্ত গাম্ভীর্যে বলে কাজরী।

—কেন। ওটা দিয়ে কি করবো আমি! অবাক কণ্ঠ বিজয়ের।

—তুই একটা বোকা। কাজরী ক্রুদ্ধ হয়। কত কাজ হতে পারে ওটা দিয়ে—কি সুন্দর দেখতে প্রদীপটা—

তবু বিজয়ের মুখে স্বীকৃতির ছবি ফুটে ওঠে না দেখে বলে—ঠিক আছে, আমি চাইছি কাজেই।

কাজরীর প্রার্থনার সংগে বিজয়ের অনুরোধ মিলিত হতে দেখে অবাক হয়ে সন্ন্যাসী বলেন—তুমিও।

একটু পরে ধীরে ধীরে বিষাদ-ধূসর কণ্ঠে বলেন—নারীর উচ্চাশার নিকট যুগে যুগে পুরুষ বলি দিয়েছে নিজেকে।

পরদিন কাজরী বটগাছতলায় গিয়ে দেখলো বিজয় গাছে হেলান দিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। কুটীরে কেউ নেই—চলে গেছেন সন্ন্যাসী —তাঁর সমস্ত জিনিষ নিয়ে গেছেন তিনি—শুধু পড়ে আছে সেই পঞ্চপ্রদীপ।

দুহাতে প্রদীপটা তুলে বাইরে নিয়ে আসে কাজরী। বিজয় এগিয়ে এসে বাধা দেয়—থাক ওটা।

—কেন! বিরক্তি-বিস্ময় কাজরীর কণ্ঠে সন্ন্যাসী আমাকে এটা দিয়ে গেছেন আমি নবনা কেন?

—তুই একটু ধর—বিজয়ের দিকে তাকিয়ে আদেশ করে।

—না। শান্ত গাম্ভীর্যে উত্তর দেয় বিজয়। তুই একাই নিয়ে যা। স্থির কৃষ্ণ-কালো চোখ দুটি তুলে আকাশের দিকে একবার তাকায়। বোধ হয় ভাবে—সন্ন্যাসীকে হারালুম আর নিয়ে যাচ্ছি এই পঞ্চপ্রদীপ।

কাজরী সেই পঞ্চপ্রদীপ দুহাতে তুলে নিয়ে যায়—মেজে-ঘষে পেতলকে সোনার মত ঝকঝকে করে তোলে। রোজ সন্ধ্যায় শেফালীর মত শুচি এবং সাদা সলতে ঘি দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়, প্রদীপের পবিত্র শিখা এবং অপরূপ আলোকে তুলসী অংগন উজ্জ্বল ও সুন্দর হয়ে ওঠে।

কতদিন কেটে গেছে—বালিকা কাজরী আজ পূর্ণা যুবতী। তার কালো চকচকে চোখে মধুর আবেশময় প্রেমের অঞ্জন। কালো চুলের মাঝে উজ্জ্বল সিন্দুরবিন্দু। পান-রাঙা ঠোঁটে প্রাণ-মাতানো হাসি।

তকতকে নিকানো মাটীর উঠানের কোণে বাঁধা থাকতো পাটলি রংয়ের গাই আর তার কালো বাছুর। বাছুরের কপালে অর্ধচন্দ্রের সাদা টিপ। তারি কাছে ছুটে ছুটে খেলা করতো দুধের মত সাদা ছাগলছানাগুলি। আলপনা দেওয়া আঙ্গিনায় মাটীর থালায় রাখা কতগুলি ফুল—লাল, নীল, সাদা, সোনালী।

নীল আকাশে তারা জ্বলতো ঝকঝকিয়ে—মাটীর উঠোনে ফুলগুলি যেন জ্বলতে থাকতো। আর চলন্ত চাঁদের মত ঘুরে বেড়াতো কাজরী। ঝকঝকে পঞ্চপ্রদীপে সাঁঝের বাতি জ্বালাতো—সাদা শাঁখ দুহাতের মুঠোয় ধরে ফুঁ দিত—সেই সুন্দর গম্ভীর শব্দে যেন চমকে উঠে বড় বড় দুটি কালো চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতো পাটলি রংয়ের গাইটি—কালো রংয়ের বাছুরের সাদা চাঁদের টিপ স্থির হয়ে তাকিয়ে থাকতো। এমন কি চঞ্চল ছাগলছানাও যেন স্বভাবগত চঞ্চলতা ভুলে একদৃষ্টে তাকায় পঞ্চপ্রদীপের পাঁচটি শিখার দিকে। তারি সংগে জাগে পদধ্বনি। সবাই উৎসুক চোখে তাকায়। বিজয় কাজ থেকে ফিরছে।

মধুর হেসে এগিয়ে যায় কাজরী। পাটলি রংয়ের গাইটি একবার মাথা নেড়ে বাছুরকে চেটে দেয়—ছাগলছানাগুলি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ছুটতে ছুটতে যায় চলে।

শান্তি! এ বাড়ীর চারিদিকে যেন এক অখণ্ড শান্তি বিরাজমান। বিজয়ের গভীর দুটি শান্ত চোখে অপরূপ শান্তির আলো—শান্ত সংযত পদক্ষেপে অনুপম শান্তির ব্যঞ্জনা। কাজরীর শাদা ফুলের মালা ঘেরা কালো চুলে আর লাজুক ঠোঁটের মধুর হাসিতে সেই শান্তিরই প্রকাশ। পঞ্চপ্রদীপের সুরভিত শিখা যেন সেই শান্তিরই কপালে এঁকে দেয় সুন্দর টিপ।

এমনিভাবে দিন যায়। প্রতি সন্ধ্যায় কাজরীর গৃহাংগনে জ্বলে ওঠে পঞ্চপ্রদীপ তার শুচিস্মিত সৌন্দর্যে—একদিন কাজরীদের গ্রামে এলেন এক সাধু।

গ্রামবাসীরা তাঁকে সমাদরে গ্রহণ করলো। এক-একটি গৃহস্থ বাড়ীতে একদিন করে থাকতেন তিনি। গৃহস্থকে শোকে সান্ত্বনা দিতেন—রোগে ঔষধ দিতেন। অবশ্য, তা অর্থকরী নয়। কাজরীদের বাড়ীতেও তিনি থাকলেন একদিন। প্রতিদিন সন্ধ্যার মত সেদিনও কাজরী পঞ্চপ্রদীপে আলো জ্বালিয়ে দিল—উঠোনের কোণে বসেছিলেন সাধু—এগিয়ে এলেন পায়ে পায়ে—অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন প্রদীপটার দিকে।

সাঁঝের বাতি নিভে গেল—আকাশ একটু কালো হয়ে উঠলো—সাধু প্রদীপ তুলে অনেকক্ষণ দেখলেন—দেখলেন তাকে উল্টে-পাল্টে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে—তারপর প্রদীপটি কাজরীর হাতে দিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন—সাবধানে রেখ—হারিয়ো না।

পঞ্চপ্রদীপটিই কাজরীর সবচেয়ে প্রিয় এবং সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পত্তি। তাকে খুব সাবধানেই রাখে কাজরী। তবু সাধুর এই সশঙ্ক সাবধানতায় কৌতূহলী নারী চমকে বলে —কেন? এটি কি খুব দামী। এটি কি সোনার।

সাধু একটু হেসে বলেন—আমি দ্রব্যমূল্যের কথা বলিনি, দ্রব্য গুণের কথা বলেছি।

কি গুণ আছে এর। ব্যাকুল প্রশ্ন কাজরীর।

অনেকক্ষণ অনুরোধের পর সাধু বলেন—একটি বিশেষ প্রার্থনা পূর্ণ করবার ক্ষমতা আছে এর।

সেদিন রাত্রে কাজরীর ঘুম হয় না। কালো আকাশের দিকে কঠিন কালো চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে ও। রাতজাগা তারাগুলি অবাক চোখে তাকায়—সেদিকে লক্ষ্য করে না কাজরী।

অনেক রাতে কি যেন দুঃস্বপ্নে কিংবা এমনি-ই বিজয়ের ঘুম ভেঙে যায়—চমকে তাকিয়ে দেখে পাশে কাজরী নেই। ঘুমভাঙা চোখে ঘুমে ভরা মনে ভাবে—এও কি স্বপ্ন। একটু পরে চমকে জেগে ওঠে—না, সত্যই কাজরী নেই তার পাশে—

তীরের মত বাইরে বেরিয়ে এসেই হঠাৎ যেন থেমে যায়—

কালো রাত্রির আকাশে—ফিকে কালো আঁধারে মূর্তিমতী বেদনার মত দাঁড়িয়ে আছে কাজরী। কি হলো ওর।

—কাজরী...কোন সাড়া নেই। কাজরী ...কাজরী...

—কি! কাজরী যেন ঘুম থেকে জেগে ওঠে—নিদ্রা না মোহনিদ্রা।

—তোমার কি হয়েছে কাজরী, ব্যাকুল প্রশ্ন বিজয়ের।

—কিছু হয় নি তবে হবে। স্বামীর স্পর্শে যেন প্রকৃতিস্থ হয় কাজরী। সমস্ত কথা খুলে বলে স্বামীকে।

—কিন্তু, এ সবে আমাদের কি দরকার। প্রতিবাদ জানায় বিজয়—আমরা তো বেশ আছি।

—বেশ আছি! কালো চোখ দুটি তুলে কাজরী তাকায়। শান্ত, সুন্দর পবিত্র গৃহ যেন শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে। আর দেখে—স্বামীর কালো দুটি চোখ—প্রেমভরা, মধুভরা।

—আরও ভালো থাকতে ক্ষতি কি। ভ্রূ দুটো কুঁচকে বলে। স্থির চোখ দুটি যেন জ্বলে ওঠে।

আলেয়ার আলোর মত সেই দৃষ্টি শিখার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে বিজয়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—কাজরী, নদীর এক পাড় ভেঙে অপর পাড় গড়ে।

—মানে?

—অস্বাভাবিক উপায়ে অবস্থা পরিবর্তন করতে চাইলে তার ফল অস্বাভাবিকই হবে। আশা ভাল—দুরাশা......

বাধা দিয়ে বিরক্ত কণ্ঠে কাজরী বলে—আশা-দুরাশা দুই-ই সমান ঘৃণ্য তোমার কাছে। কর্মবিমুখতার কালো আবরণ তোমার চোখে—কোন রকমে জীবন কাটিয়ে দিতে পারলেই হল।

কাজরী উঠে দাঁড়ায়। তীক্ষ্ন স্বরে বলে—আমি কর্মবিমুখ নই—আমি কর্মী আমার শক্তি আমার সামর্থ দিয়ে আয়ত্তাধীন জিনিষ আমি পেতে চেষ্টা করবো—তত্ত্বকথার জালে আলস্য লুকাব না।

ওর স্থির চোখ দুটির দিকে একবার তাকিয়ে ধীরে ধীরে নীরবে উঠে যায় বিজয়। চোখ বুজে বসে থাকে কাজরী—যেন ধ্যানে বসেছে।

মধ্য রাত্রির গভীর গাম্ভীর্যের মাঝে চোখ মেলে সে। কি এক কালো ছায়ায় ঢেকে গেছে সমস্ত আকাশ-বাতাসও যেন স্তব্ধ হয়ে রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে অপেক্ষিত।

পঞ্চপ্রদীপ তুলে নিয়ে ধীর পাদপাতে বেরিয়ে যায় কাজরী—কোনদিকে দৃকপাত করে না সে। সুদৃঢ় পদক্ষেপ তার। কোন বাজে ভাবনাকে মনে আমল দেয় না সে—একাগ্র তার মন।

পৃথিবী তার কালো দুটি সশঙ্ক চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে। ওর পদক্ষেপের তালে তালে নির্জন গ্রাম্যপথের হৃদয় আর্তনাদ করতে থাকে।

গ্রামের বাইরে প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ায় কাজরী, অঙ্গ থেকে খুলে ফেলে সমস্ত আভরণ—সমস্ত আবরণ, কালো চুলে ঢেকে দেয় শ্যাম শরীর। হাতে তুলে নেয় পঞ্চপ্রদীপ। ঘিয়ে ভেজান সাদা সলতেগুলির শুভ্র শিখা চারিপাশে ছড়িয়ে পড়ে—

মুদিত চোখে প্রার্থনা জানায় কাজরী—এ

যেন শুনতে পায় দূরাগত পদধ্বনি। প্রার্থনা-পূরক ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

কিন্তু কই! কেউ নেই তো। আবার প্রার্থনা জানায় কাজরী, সাড়া জাগে না কোথাও। পৃথিবী নীরব। প্রকৃতি নিস্তব্ধ।

বিনষ্ট পদপাতে প্রত্যাখ্যাতা নারী ফিরে আসে। অপমান, অভিমান, প্রত্যাখ্যানের মাঝেও কি যেন এক শান্তির সান্ত্বনা তার মনের প্রদাহে অমৃত পরশ বুলিয়ে দেয়।

পরদিন বিজয় ওকে সম্ভাষণ না করেই কাজে চলে যায়। কয়েকটি গ্রাম পরে একজন জমিদারের নিকট কাজ করে সে।

বেদনার এক ছবির মত কাজরী ঘরের অঙ্গনে বসে থাকে—এই প্রথম তাদের বিদায়ক্ষণ প্রেম মধুর হয়ে ওঠেনি।

সমস্ত দিনই আলসে-আবেশে পড়ে থাকে কাজরী। সন্ধ্যা হয়। আজই প্রথম কাজরী চুল বাঁধে না—খোঁপায় জড়ায় না ফুলমালা। আজই প্রথম নীল আকাশের তারার ডালিকে লজ্জা দিয়ে আলপনা আঁকা উঠোনে মাটীর থালায় জ্বলে না—সাদা, নীল, বেগুনী ফুল। পাটলী গাই আর চাঁদ-কপালে কালো বাছুর অবাক কালো চোখে তাকিয়ে থাকে—ছাগলছানাগুলিও যেন ভুলে যায় চঞ্চলতা।

আজই প্রথম তুলসীমূলে জ্বলে না পঞ্চ-প্রদীপ। রাত হয়ে উঠে। কাজরীর মনে হয় কি যেন সশংক ক্রুর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে এই রাত। দুর্বার কোন কিছু ঘটবে।

গভীরতর হয় রাত, নির্দিষ্ট সময় গড়িয়ে-যায়—বিজয় ফেরে না, উৎকণ্ঠিতা নারীর মনে হয় এখন জীবনে একটি মাত্র প্রার্থনা স্বামী ফিরে আসুক।

প্রতীক্ষা না মৃত্যু যন্ত্রণা! সেই যন্ত্রণার শেষ প্রান্তে গিয়ে যেন দেখতে পায় কাজরী দূরে কতগুলি আলোর রেখা। ক্রমেই এগিয়ে আসে আলোগুলি—থামে তার গৃহাঙ্গনে।

অনেক-অনেক লোক। তার মাঝে তার স্বামী নেই—গ্রামের সমস্ত লোক এসে জমায়েৎ হয় কাজরীর উঠোনে—উঠোন ভরে যায়।

প্রভুর অশ্বশালা রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যু-বরণ করেছে বিজয়। সেই জন্য দয়াপরায়ণ প্রভু বিজয়ের জীবনের মূল্যস্বরূপ দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা বিজয়ের বিধবাকে দিয়েছেন।

দশ সহস্র! স্থির নিষ্কম্প কাজরী যেন একবার চমকে ওঠে—পরক্ষণেই মূর্চ্ছিতা হয়ে মাটিতে পড়ে যায়।

যখন তার জ্ঞান হয় তখন চাঁদ পশ্চিমে ঢলে পড়েছে—লোকের ভিড় অনেক কমে গেছে—শুধু কয়েকজন প্রতিবেশিনী তাকে ঘিরে বসে আছেন।

—দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা—একটি বেশী নয়... একটিও কম নয়—নিজের মনেই বলে কাজরী।

—কি বলছ? একজন প্রতিবেশিনী ওর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে।

—এই কটি টাকাই চেয়েছিলাম যে...। প্রতি-বেশিনীরা পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। সাময়িকভাবে মাথা খারাপ হয়ে গেছে মেয়েটির।

বিনিদ্র চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে কাজরী সবাই ঘুমে ঢুলে পড়েছে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় সে। স্বামীর মুখের আবরণ সরিয়ে মৃত স্থির নীরব ঠোঁট দুটির দিকে একবার তাকায়—ঘী দিয়ে সিক্ত করে সমস্ত দেহ— হাতে তুলে নেয় পঞ্চপ্রদীপ। হঠাৎ ওর মনে হয়—সন্ন্যাসী যেন সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। বাথা ধূসর দুটি চোখ মেলে বলছেন—চিরন্তন এই রূপ। মানব-মন-বিচিত্ররূপিণীর হাতে চিরদিন জ্বলে এই পঞ্চপ্রদীপ—কামনা, বাসনা, লোভ, মোহ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিজেকে আহুতি দিয়েই তবে নিবৃত্তি করতে হয় সেই প্রবৃত্তিকে।

রাই

(২২৯ পৃষ্ঠার পর)

পরিচিত পরিচিত বলে মনে হচ্ছে গানের গলা। তবু মেলার শব্দে ঠিক ধরা যাচ্ছে না। কোথায় বাজছে খঞ্জনী, কে এমন মধুর কণ্ঠ মেলে ধরেছে এই মাহেন্দ্র মুহূর্তে? ভিড়ের মধ্যে পথ ক'রে এবারে আরও কয়েক পা এগিয়ে গেল কৃষ্ণদাস; কে, কে এমন ক'রে মধুর কণ্ঠে সুর ধ'রেছে—

আমার প্রাণ গেল প্রাণ গেল মাধব,
তোমায় তবু পেলেম না।...

আপন মনে গলা ছেড়ে এবারে কৃষ্ণদাস নিজেও গেয়ে উঠলো—

আমি নিশিদিন প্রেমের কাঙাল,
তবু প্রেম তো আমায় চায় না;
আমার মনের মানুষ ছেড়ে গেল,
আমার মন তবু তারে ছেড়ে যায় না।...

অলক্ষ্যে খঞ্জনীর সুর কখন থেমে গেছে, লক্ষ্য গেল না সেদিকে কৃষ্ণদাসের। সামনের পথটা অপেক্ষাকৃত কিছু ফাঁকা, সেই পথে এসে পা দিতেই হঠাৎ কৃষ্ণদাস নিজের মধ্যে কেমন যেন সচকিত হ'য়ে উঠলো। চিৎকার ক'রে কে যেন একবার ডাকলোঃ 'নাগর, আমার নাগর, তুমি এসেছ, কোথায় তুমি, কোথায় কত দূরে?'

মুহূর্তের জন্য গলা থামিয়ে একতারায় আর একবার সুর টানলো কৃষ্ণদাস, কিন্তু সে সুরও অলক্ষ্যে কখন তলিয়ে গেল! আর একবার কানে এসে সেই নারীকণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলোঃ 'কোথায় তুমি নাগর, তুমি কোথায় কৃষ্ণদাস? আমি ঠিক চিনেছি, গলা শুনে আমি ঠিক চিনেছি তোমাকে, কোথায় তুমি কৃষ্ণদাস, আমি যে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না!'

বুকের মধ্যে যেন দারুণ একটা ঝড়ের ঘূর্ণি হাওয়া হঠাৎ উত্তাল হ'য়ে উঠলো কৃষ্ণদাসের। সামনে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে ধরতেই চোখে ভেসে উঠলো তার সাত বছর আগে হারিয়ে-যাওয়া হরিদাসী, তার রাধা-বিনোদিনী রাই। তবু যেন আজ আর আগেকার মতো তাকে চেনা যায় না, কেমন রুক্ষ, কেমন মলিন হ'য়ে উঠেছে মুখশ্রী! একটা কদম গাছের ছায়ায় ব'সে আপন মনে এতক্ষণ খঞ্জনী বাজিয়ে সে-ই গান করছিল। দ্রুত পায়ে এবারে কাছে এগিয়ে এসে ভাবকম্পিত কণ্ঠে কৃষ্ণদাস বললো, 'সে কি, তুমি, হরিদাসী, আমার রাই! তাই যদি, তবে এমনি ক'রে এখনও চোখ বুজে আছো কেন? চোখ খোলো, আমি যে তোমার জন্যেই সাত বছর ধ'রে ফকির হ'য়েছি, ফকির হ'য়ে কেবল তোমারই সন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছি। ওঠো রাই, ওঠো, চোখ খোলো।'

অলক্ষ্যে হাত থেকে খঞ্জনী খসে প'ড়লো মাটিতে। সেই হাত দু'খানি সামনে প্রসারিত ক'রে কি যেন একবার খুঁজতে চাইল হরিদাসী; খুঁজে খুঁজে কৃষ্ণদাসের পা দুখানিকে সহসা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো সেঃ 'আমার পাপের শাস্তি তুমি দাও, আমি মাথা পেতে নেবো নাগর, কিন্তু আমার গোবিন্দ যখন একবার তোমার দর্শন মিলিয়ে দিয়েছেন, তখন আমাকে যেন তুমি ত্যাগ ক'রে চ'লে যেয়ো না।'

কৃষ্ণদাস জিজ্ঞেস ক'রলো, 'তোমার সেই নরপাতক ঠাকুরটি কোথায়?'

হরিদাসী ততক্ষণে কৃষ্ণদাসের পায়ের পাতার উপর মাথা রেখে অশ্রু বিসর্জন ক'রছে। ঈষৎ মুখ তুলে এবারে সে ব'ললো, 'পথে বসন্তে আক্রান্ত হ'য়ে সে মারা গেল, আমি অন্ধ হ'লাম। তোমাকে যে আজ নয়নভরে' দেখবো, সে দৃষ্টিটুকুও আজ আর আমার নেই! আমি কি নিয়ে বাঁচবো নাগর?'

ঝড়ের ঘূর্ণি হাওয়ায় যে বুকখানি এতক্ষণ কেবলই আন্দোলিত হ'য়ে উঠছিল, এবারে সেই বুকখানি ভেঙ্গে বুঝি গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে গেল কৃষ্ণদাসের। বার্থ কণ্ঠে এবারে সে হাহাকার ক'রে উঠলোঃ 'তোমারও তবে বসন্ত হয়েছিল, তুমি অন্ধ, তুমি আর তবে চোখে দেখতে পাও না রাই? আমি যে একদিন তোমার দুচোখে আমার গিরিধারী-লালের বিশ্বরূপ দর্শন ক'রেছিলাম! সে চোখ তবে চিরদিনের জন্যে তোমার বন্ধ হ'য়ে গেছে?'

অশ্রু তো নয়, যেন বন্যা; সেই বন্যায় দু'পা ভেসে যেতে লাগলো কৃষ্ণদাসের। কাঁদতে কাঁদতেই হরিদাসী বললো, 'আমার চোখ অন্ধ হ'য়েছে, তার জন্যে আজ আর আমার এতটুকুও দুঃখ নেই, এবারে সারা মন দিয়ে, সারা প্রাণ দিয়ে দিনরাত তোমাকে দর্শন ক'রবো। একবারটি বলো নাগর, তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রেছ?'

সারা রামকেলি উচ্ছল হ'য়ে উঠেছে মেলার কল-গুঞ্জনে। কত কত দেশের লোক, কত বাবাজী আর বৈষ্ণবীর অপূর্ব সম্মেলন। কোনোদিকে একটি বারের জন্যও আর চোখ গেল না কৃষ্ণদাসের। দূরে পড়ে রইল গৌড়ের প্রাচীন ঐতিহ্যের কীর্তিগাথা, রামকেলির কেলিকদম্বের শাখায় শাখায় মুরজ-মুরলীর শব্দ-তরঙ্গ বুঝি স্তব্ধ হ'য়ে গেল। উপুড় হ'য়ে হরিদাসীর একখানি হাত নিজের হাতের মুঠোয় টেনে নিয়ে কৃষ্ণদাস শুধু বললো, 'ওঠো রাই, ওঠো; তোমার জন্যে তোমার নবদ্বীপের আখড়া পথ চেয়ে আছে, উপবাসী হয়ে আছেন তোমার গোবিন্দের বিগ্রহ। তোমার হাতে তুলে দেবো ব'লে আমি যে সঙ্গে ক'রে চাবি নিয়ে এসেছিলাম। ওঠো, চলো, আমরা ফিরে যাই।'

শারদীয়ার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ

রাত নেমে আসছে তাড়াতাড়ি। সাদা কুয়াশা মাটির বুক ঘেঁষে জমেছে। সন্ধ্যা আকাশের গায়ে নারকোল গাছগুলো কালো। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় রাস্তার লোক কাঁপতে কাঁপতে যাচ্ছে। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড টানা বিছোনো, সমতল ধানক্ষেত আর ছোট গাঁ চিরে। একটা গাঢ় নীল বুইক গাড়ী ছুটে চলেছে ওই রাস্তা দিয়ে, সমস্ত কাঁচ তোলা, শীতের ঠাণ্ডা হাওয়াকে বাইরে বন্ধ রেখে।

গাড়ীর মধ্যে দুজন লোক। তুলোর মতন সাদা চুল বুড়ো নিস্তব্ধ ড্রাইভার, আর পেছনের সীটের এক কোণে একজন রোগা স্ত্রীলোক, সূক্ষ্ম কাজকরা দামী শালে জড়ানো। তার বিশাল চোখে একটা ক্ষুধার্ত দৃষ্টি।

'জমির, ওখানে পেঁছিতে আর কতক্ষণ লাগবে?'

'আর এক ঘণ্টা'—ড্রাইভার বললে নরম গলায়, যেন ছোট্ট ছেলেকে ভোলাচ্ছে। সত্যি জমিরের এমন এক সময় মনে পড়ে যখন তার পেছনে শকুনীর মতন বসে যে গুমরোচ্ছে সে ছিল হাসিখুসি ছোট্ট একটি মেয়ে, যাকে সবাই ভালবাসত। বেশী আদর পেয়ে আব্দারে হয়েছিল বটে, তবু দেখলেই তাকে সবাই ভালবাসত। চম্পা-বাবাকে চিরকালই সবাই ভালবাসত। কিন্তু বিয়ের পর বদলে সে আর একজন মানুষ হয়ে গেল। এখনও সে সুন্দর, কিন্তু এখন সে হয়ে গিয়েছে রোগা আর শক্ত, আর তার যা দুর্দান্ত মেজাজ হয়েছে, সারা বাড়ী কাঁপে চম্পা-বাবা রাগ করলে। তার স্বামী সুপুরুষ, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, আর তাঁর যা ধৈর্য—সে দেবতার মতন। কেউ কোনদিন শোনেনি তিনি স্ত্রীকে একটা কড়া কথা বলেছেন, যদিও রাগের কারণ তাঁর অনেক। চাকরেরা নিজেদের মধ্যে কানাঘুষো করে, কোন মতুন লোকের নাম যার ওপর চম্পা-বাবার সাময়িক সুনজর পড়েছে,—সরিয়ে অন্য একজনকে পছন্দ করার আগে। দুটি ছেলেমেয়ে হয়েছে, কিন্তু তাতেও তার কোন তৃপ্তি নেই। জমির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

—'আরো জোরে চালাতে পারো না?'

'গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ভারি লরিগুলো...' জমির বললে আধা কৈফিয়তের সুরে। স্পীডো মিটারের কাঁটা ষাটে ঘুরে উঠে পড়ল, তারপর ক্রমশঃ ষাট ছাড়িয়ে চলল। জমির একটা কুকুরকে চাপা দিতে দিতে এক চুলের জন্যে বাঁচিয়ে নিলে।

'আমাকে চালাতে দাও'—চম্পা বললে।

জমির ভয়ে তার ষ্টিয়ারিং হুইলটা আঁকড়ে চেপে ধরল। চম্পা-বাবা যখন ছোট ছিল, তখনও সাংঘাতিক একগুঁয়ে। এখন বয়স হবার সঙ্গে বেপরোয়া বলে এমন এক নাম হয়েছে, যার জুড়ী মেলা ভার।

'আর ৪০ মিনিটে আমরা ওখানে পেঁছে যাব। আরো জোরে চালাচ্ছি, দ্যাখো না, আরো জোরে চালাচ্ছি।'

চম্পা বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল তার নিজের হাড় বেরকরা আঙুলের রুপোলি-গোলাপি রং দেওয়া নখের দিকে। অস্থিরতায় জোরে হাত মুঠো করলে, যত্নে রং করা সৌখিন লম্বা নখ ফুটে গেল হাতের তেলোয়। ছোট-খাট গড়ন, আর এত রোগা বলে বয়সের চেয়ে তাকে দশ বছর কম মনে হয়।

সামনে রেলের লেভল্ ক্রসিং। তাদের চোখের ওপর গেট নামিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দিল। চম্পা ফেনিয়ে উঠল অস্থিরতায়। তাদের পেছনে কয়েকটা বাস ও লরি অপেক্ষা করছে।

'আর এখন বেশী দেরি হবে না, আর দেরি লাগবে না'—জমির বলে চলল অনবরত। গর্জন করে লাইন কাঁপিয়ে একটা ট্রেণ এল। চম্পা চুপ করে ওটার দিকে চেয়ে রইল যতক্ষণ না সেটা চলে গেল।

অবশেষে তারা আবার ছাড়া পেল, পথ চলতে, রাত্তির চিরে ছুটে যেতে। 'যাও জমির, সবার আগে যাও। তোমাকে ছাড়িয়ে ওই বাসটাকে এগিয়ে যেতে দিও না, জোরে চালাও, আরো জোরে।' চম্পা কখনো কোন লোককে তাকে হারিয়ে এগিয়ে যেতে দেবে না। এজন্য অনেক সময় সে জখম হতে হতে বেঁচে গেছে। তার একেবারে কোন রকম ভয় ডর নেই। জমির দেখেছে চম্পা যখন গাড়ী চালায় তখন ওকে রাস্তায় চলার আইন-কানুন আর সাবধানতার কথা মনে করিয়ে দেওয়ায় কোন লাভ নেই।

* * *

চম্পা-বাবার বিয়ের আগে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা হয়েছিল। ওর ইচ্ছে ছিল অন্য বর্ণের এক ছেলেকে বিয়ে করে। এতে ওর মা বাবা আধুনিক হলেও রাজি হননি। সে নির্ঘাত ওই ছেলেটার সঙ্গে পালাত, যদি না ছেলেটার অমন মাথা ঠাণ্ডা হোত। জমিরের মনে পড়ে গতকালের মতন স্পষ্ট চম্পা-বাবার বিয়ের আগের রাতটা। চম্পা ছেলেটাকে ডেকে পাঠিয়েছে চুপি চুপি মালীর মেয়েকে দিয়ে। বাগানে এক বড় অশ্বত্থ গাছের তলায় তারা কথা বলছিল। 'তুমি কখনও বুঝবে না তোমাকে আমি কত ভালবাসি। তুমি সে ভালবাসা ধারণাও করতে পারবে না। আমি তোমাকে যে রকম ভালবাসি, তুমি কি করে আমাকে সে রকম ভালবাসতে পারবে?' মিহির দে, সেই ছেলেটি তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করেছিল। 'কিন্তু করা যাবে কী, যদি কেউ না রাজি হয়? আমরা ত' চেষ্টা করেছিলাম, করিনি?' তখন চম্পা রাগে জ্ঞান হারিয়ে ছেলেটার ওপর ল্যাফিয়ে পড়েছিল, মেরে আঁচড়ে কামড়ে একসা করে। জমির তাকে হিঁচড়ে টেনে সরিয়েছিল দুর্ভাগা ছেলেটার কাছ থেকে; আর ছেলেটাকে বলেছিল দৌড়ে পালিয়ে যেতে বাড়ীর কেউ জানবার আগে। সে কত বছর আগের কথা।

* * *

আশ-পাশের গাঁ রাত্রে ধোঁয়াটে গাঢ় নীল, ছুটে পালাচ্ছে গাড়ীর দু'দিক দিয়ে।

'জমির, লিলির পাশের বাড়ী যে মিত্তিরেরা থাকে তাদের জানো?'

'কোন মিত্তিরেরা? যে সাহেব ডাক্তার? হ্যাঁ, আমি তাকে আর তার বাড়ীর লোকদেরও দেখেছি।'

'তাহলে তুমি ওর মেয়েদের দেখেছ? ওর দুটো না তিনটে মেয়ে আছে।'

'হয়ত দেখেছি যখন তোমায় লিলি মেম-সাহেবের বাড়ী নিয়ে যাই।'

'ওদের কি রকম দেখতে? ছোট্ট মেয়েটা?'

জমির চিন্তিত হয়ে তার দিকে ফিরে তাকাল 'কি বলবো? ওরা খুব ছেলেমানুষ' কম বয়সী। মন্দ দেখতে না।'

'ছোটটা, যার নাম নূপুর?'

'আমার ঠিক মনে পড়ছে না। ওরা দুই বোন বোধ হয়, তিন না……।'

চম্পা তখন চুপ করে রইল। বাইরে ফিকে চাঁদের আলো সন্ধ্যার কুয়াশার সঙ্গে মিশছে।

'দে সাহেব কেন সহর থেকে এত দূরে থাকেন?'—জিজ্ঞেস করলে জমির।

'তাতে আমাদের মাথা ব্যথার কী?'

'দ্যাখো না ও'র কাছে যেতে কত সময় লাগে। সহরে কাজ করতে যান কি করে?'

—'তার রেসিং কার আছে, আর সে জোরে চালায়, তোমার মতন না।'

—'আল্লা! যা জোরে গাড়ী চালান! ভাগ্য ভালো যে এখনও কোন খারাপ এক্সিডেন্ট হয়নি। উনি কি বাড়ী থাকবেন? দেখা করতে যাচ্ছ জানিয়েছিলে?'

—'কথা বন্ধ করে দয়া করে গাড়ীটা জোরে চালাবে?'

সেই মিহির দে'কেই এখন 'দে সাহেব' বলে জমির। মিহির দে অবিবাহিত রয়ে গ্যাছে। এইটাই একমাত্র প্রকাশ্য চিহ্ন চম্পার জন্যে তার ভালবাসার। এ ছাড়া কালে ভদ্রে দৈবাৎ সে চম্পার কাছে দেখা করতে আসে। কিন্তু চম্পা যদি শোনে যে তার অসুখ করেছে বা কোন বিপদ হয়েছে, সে যা কিছু করছে ছেড়ে তখুনি ৫০ মাইল ছুটে চলে যাবে গ্রাণ্ড ট্রাংক রোডের ওপর তার খাপছাড়া বাঙ্গালো বাড়ীতে। জমির দেখে দে সাহেব কি খুসী হয় চম্পা বাবা এলে। কিন্তু এত ধীর বুদ্ধি বলে মিহির দে ওর সামনে কড়া, এমনকি কর্কশ হয়ে যায়।

—'আমি কচি ছেলে না। আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে নিজেকে দেখাশুনো করবার। তুমি কেন আমার জন্যে এত ভাবো, একটু ঠাণ্ডা লাগলে কি মাথা ধরলে?'

এ রকম ব্যবহারের পর চম্পা সাংঘাতিক রেগে ওঠে। কোন নতুন পুরুষ নিয়ে মাস খানেক মেতে থাকে। কিন্তু তাতে কি আর ও সুখী হয়? কোন কিছুই তাকে সুখী করতে পারে না যতক্ষণ না হঠাৎ আবার একদিন ও ছুটে ফিরে যায় দে'র কাছে।

—'দে সাহেবের শরীর ভাল আছে ত?'

—'নিশ্চয়ই, শরীর খারাপ হবে কেন? অত কথা বোলো না। আর একটু জোরে চালাতে পারো না?'

জমির দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। দে'র জন্যে চম্পার এই টানটা তার একদম অপছন্দ। এখন তার বিয়ে হয়েছে, ছেলেমেয়ে আছে না? ভাগ্যিস দে সাহেব এত ভদ্রলোক। জমির জানে, যদিও এসব কথা ভাবতেও তার লজ্জা করে, যে দে সাহেবের একটা ইঙ্গিতে এত বছর বিয়ের পরও চম্পা তার বাড়ী ঘর ছেলে মেয়ে সব ছেড়ে তার সঙ্গে পালিয়ে যেতে পারে। হয়ত তার স্বামী এটা জানেন, নিজের দুর্বল অবস্থা। তাই তিনি ওর কাছে সব সময় ধৈর্য ধরে থাকেন, সব সময়ে নরম। এ সমস্ততে জমিরের ঘেন্নায় মাথার ভেতর কেমন করে। ভদ্রলোকের বাড়ীর ভালো ঘরের মেয়ে!…… জমির ভেবে বুঝতে চেষ্টা করে এবার আবার কি হয়েছে যার জন্যে চম্পার দে সাহেবের কাছে যাবার এত তাড়া। চম্পা মেয়েকে ঘুম পাড়াচ্ছিল, একটা ফোন এসেছিল, কিন্তু দে সাহেবের কাছ থেকে না। বেয়ারা বললে লিলি মেম সাহেব করছেন। আর তৎক্ষণাৎ চম্পা ছুটে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। মেয়েটা ছাড়তে চাইছিল না, আঁকড়ে ধরে কাঁদছিল, কিন্তু চম্পা তাকে একটা কথাও বললে না ভোলাতে।

জমির অবশেষে গাড়ীটা দে সাহেবের বাঙ্গলোতে ঢোকালে। বারান্দায় কোন আলো নেই, গ্যারাজ খালি। একজন চাকর বললে সাহেব বাড়ী নেই। জমির খুসী হোল। চম্পার দিকে ফিরে বললে—'বেরিয়ে গ্যাছেন আমরা এতখানি রাস্তা মিছিমিছি এলাম। গত দুবারও যখন আমরা এসেছিলাম বাড়ী ছিলেন না। এখন আমরা করব কী?

চম্পা গাড়ী থেকে নেমে ভেতরে গেল। বারান্দার আলোটা সুইচ টিপে জেলে দিলে। কিছুক্ষণের জন্যে একদম নিস্তব্ধ, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অন্ধকার বাগান আর তার ওধারে নদীর দিকে চেয়ে। তারপর আস্তে আস্তে বাঙ্গলোর এক ঘর থেকে আর এক ঘরে যেতে লাগল। 'তুমি ত' জানো যে সাহেব বাড়ী নেই!' জমির আপত্তি করলে। সে ওর কথা শুনতে পেল মনে হোল না। সব শেষে দে সাহেবের শোবার ঘরের সামনে এসে চম্পা থমকে দাঁড়াল।

নতুন আসবাবপত্রে ঘর সাজানো, বড় বড় গোলাপের তোড়া নানান পাত্রে রাখা। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় ঝুলছে যুঁই-এর মালা। ঘরটায় ফুলের দোকানের মতন গন্ধ। ফুল আর মালাগুলো একটু শুকিয়ে এসেছে। নতুন জোড়া খাটে বসে আছে খুব অল্প-বয়সী একটি ছেলেমানুষ মেয়ে, ফর্সা, সুন্দর। চম্পাকে দেখে সে অবাক হয়ে উঠে দাঁড়াল।

—'তুমি নূপুর না?' চম্পা তাকে জিগ্যেস করল শান্ত গলায়।

—'হ্যাঁ, আমার নাম জানলেন কি করে?' মেয়েটি হেসে জিগেস করলে, তার গালে টোল খেল হাসির সঙ্গে।

—'তোমার বিয়ে হল কবে?'

—'চার দিন আগে, সোমবার। উনি বললেন, এখন কাউকে জানাবেন না। উনি বললেন, বয়স হয়েছে, ও সব হৈ চৈ চাই না। শুধু আমার নিকট আত্মীয়রা বিয়েতে এসেছিল, আর কেউ না। বাবা মা, বোনেরা, আমাদের সব্বার ইচ্ছে বিয়ের সময় ভাল করে লোক নেমন্তন্ন, বাজনা, আলো এ সব হবে, যেমন হয়।…… কিন্তু আমরা কী করব?……আপনি ভাই বসবেন না? আমার এত আনন্দ হচ্ছে আপনি এসেছেন বলে! আপনি ও'র আত্মীয় বুঝি?

চম্পা ওর দিকে পাথরের মতন কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল—'না তা ঠিক না……হ্যাঁ।' বিয়ে নিয়ে ধুমধাম করার পক্ষে ওর বেশী বয়স হয়েছে। ও তোমার বাবার বয়সী। তুমি তা জানো বোধ হয়? মিহির আমাকে বলেনি… আমি আর একজনের কাছ থেকে শুনলাম মাত্র আজকে…একটু আগে। কে বিয়ের ঠিক করলে?'

মেয়েটি এবার হেসে উঠল খুব খুসী হয়ে। —'ও মা! জানেন না বুঝি? কেউ বিয়ের ঠিক করেনি। উনি আমায় দেখেছিলেন সুরলহরী সঙ্গীত বিদ্যালয়ের একটা উৎসবে। আমি ওখানে গান আর ভারত নাট্যম্ শিখতে যাই, তা ভ্যারাইটি শোতে আমায় একটা ভজন গাইতে দিয়েছিল। উনি সেদিন প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন। উনি ত নিজে গিয়ে আমার বাবাকে বিয়ের কথা বললেন…আর সে কি তাড়া' ……

—'তোমার বয়স কত?

—'অনেক বয়স হয়েছে, ষোলো। সমস্ত বিয়ের জোগাড় মাত্র এক হপ্তার মধ্যে করতে হোল সব কেনা কাটা গয়না গড়ানো··। উনি বললেন উনি চান না আমি বাপের বাড়ী থেকে কোন জিনিষ আনি। এ রকম পাগলামির কথা কখনও শুনেছেন ভাই?

'ও কোথায় গিয়েছে?'

'ও, উনি? উনি আমার জন্যে একটা মাসিক পত্র আনতে গ্যাছেন। আমি চেয়েছিলাম। আফিস থেকে ফেরবার সময় আনতে ভুলে গিছলেন। বললেন বর্ধমান স্টেশানের বই-এর দোকান থেকে পেয়ে যাবেন। এই মাসের ফিল্ম রিভিউ, মধুবালার কতগুলো সুন্দর ছবি বেরিয়েছে। আপনি দেখেছেন নাকি?'

'না আমি দেখিনি……। ও তোমাকে ভালো রকম দেখাশুনো করছে দেখছি!' চম্পার মুখে

আকাশ-পিপাসা

ব্রজেন্দ্রনাথ মল্লিক

আকাশ পিপাসা নিয়ে কামনায় পাখা মেলে
মন উড়ে যায়
মাটির গন্ধেই রেখে ঘুমন্ত বিষাদ সুর
বেদনা বীণায়,
কোলাহল ঊর্ধ্বে গিয়ে অরণ্য পাখির ডাকে
সুর ফিরে আসে
সুদূরে মেঘের কোন একটি স্বরের রেশে
বাঁধা সুর ভাসে
গভীর আবেগে প্রাণে;
রঙ ছুট বিকেলের সূর্যের আকাশ
কৃষ্ণকলি লাল নিয়ে চোখে চোখে
এক ঝাঁক হৃদয় আভাস
বুঝি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়;
দক্ষিণী বাতাসে আসে অরণ্যের ঘ্রাণ
মনে হবে মিশে আছে মিহি বৃষ্টি
মিষ্টি স্বাদে সেখানের প্রাণ।

এলোমেলো ঝড় এলো
মনের অরণ্যে কত দেবদারু ঝাড়ে
আকাঙ্ক্ষা অসহ্য ভিড়ে,
একটি পাখীর সুর যেন বারে বারে
গানের ঝরণা ধ্বনি
বেদনা পাহাড়ে ঝরে চঞ্চল আশায়;
নরম স্বপ্নের রোদে রুপালী জলের ছিটে
কামনা জাগায়।

তখন পাখির মন আকাশ-পিপাসা নিয়ে
খোঁজে দুটি চোখ
আচ্ছন্ন সময় নিয়ে হয়তো
যেখানে রাত্রি তারার আলোক।

পূজার প্রীতি উপহার...
M. V. রেডিও,
গ্রামোফোন ও রেকর্ড,
মারফি রেডিও,
জাইস-আইকন ও
আগফা ক্যামেরা ও
ফিল্ম এবং
টেপ-রেকর্ডার।
বিবরণীর জন্য
লিখুনঃ
লান এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
৯এ, ডালহৌসি স্কোয়ার কলি-১

ভারতীয় শিল্পের শ্রেষ্ঠ কারুকার্য্যে
দে এণ্ড দত্ত
অলঙ্কার শিল্পী ও স্বর্ণ রৌপ্য ব্যবসায়ী
১১৭/২, বহুবাজার ষ্ট্রীট • কলিকাতা ১২
ফোন-৩৪ ৪৭৬০

প্রিয়জনের প্রীত্যর্থে
কেশরঞ্জন
একটি অসাধারণ
কেশ তৈল!
কবিরাজ এন, এন, সেন
এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড।
কলিকাতা। ১।

ফুটে উঠল তীব্র বিদ্বেষ। জমির অপ্রস্তুত হয়ে মাথা নামিয়ে সরে এল ওর পাশ থেকে।

ছেলে মানুষ কনে বউটি তার নতুন সোনার চুড়ি রিনঝিন্ করে আনন্দে ভরপুর হয়ে বলল —'তা হ্যাঁ ভাই উনি আমাকে ঠিক নিজের মার মতন যত্নে দেখাশুনো করেন। সত্যি বলতে কি, মার চেয়েও বেশী। মা ত' দুষ্টুমী করলে বকে, উনি বকেন না। উনি বলেন আমাকে বলো তোমার কি চাই, তোমার জন্যে আমি নিশ্চয়ই এনে দেব। তোমার জন্যে আকাশের চাঁদ নামিয়ে নিয়ে আসব।' এবার সে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে মাথা নিচু করে খিল্‌খিল্ করে হাসতে লাগল। যখন আবার মুখ তুলে তাকাল তার মুখটা আনন্দে ঝল্‌মল্ করছে। 'আপনাকে একটা কথা বলবো ভাই যদি কাউকে না বলেন। কাল রাত্তিরে বামুনটা রান্না করতে দেরি করেছে, অনেক সব সৌখিন রান্না করতে বলেছিলেন সেই জন্যে। আর আমার অভ্যাস ত' খুব সকাল সকাল শুতে যাওয়া, আমি প্রায় অর্ধেক ঘুমিয়ে পড়েছিলাম,...তাই উনি আমায় খাইয়ে দিয়েছিলেন।'

চম্পা একটা চেয়ার টেনে বসল মেয়েটার মুখোমুখি। তাকে খুঁটিয়ে দেখল তীব্র অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে। কিসে সৌখিন অভিজ্ঞ লোকটা আকৃষ্ট হয়েছে? এর সরলতা আর ঝরঝরে কৈশোর, খুসী শিশুর মুখ ও মন, এ ছাড়া আর কিছু খুঁজে পেল না। চম্পার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল কিছুক্ষণ চুপ করে গুমরে সে ভাবল।

'তোমাকে আমার কিছু খারাপ খবর দিতে হবে। তোমার বাবার শরীর ভাল নেই। আমাকে পাঠিয়েছেন এখুনি তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে।

'আমার বাবা? কী হয়েছে?' মেয়েটার মুখটা ছাই হয়ে গেল। 'বাবার কী হয়েছে?'

'খুব সাংঘাতিক কিছু না, ওঁর......উনি পড়ে গিয়েছিলেন, পা ভেঙ্গে গ্যাছে—যন্ত্রণা হচ্ছে।' চম্পা আর একটু ভেবে নিল। তুমি আমার গাড়ীতে চল। মিহির আমাকে বেশ ভালো চেনে। যখন শুনবে তুমি আমার সঙ্গে গেছ আমাদের পেছনে চলে আসবে। আর আমি সময় নষ্ট করতে পারব না। এক্ষুণি এসো।'

* * *

'আমি এবার চালাব'—চম্পা বললে জমিরকে। জমির কুঁকড়ে পিছিয়ে গেল তার মুখের উম্মাদ হিংস্রতা দেখে। 'আমার পাশে এসে বোসো'—মেয়েটাকে বললে চম্পা।

'মেয়েটা চম্পার পাশে বসে কাঁদতে লাগল।

পেছনের সীটে বসা জমিরের কাছে এ সব বড় এলোমেলো লাগছে। কখন চম্পা-বাবাকে বলা হয়েছে মেয়েটাকে তার বাপের কাছে নিয়ে যেতে? চম্পা ত' মিত্তির সাহেব ডাক্তারকে চেনে না? খালি কখনও কখনও তাদের পাশের বাড়ী গ্যাছে, কারণ ওর বন্ধু লিলি ওখানে থাকে। দে সাহেব ফেরা অবধি ও রইল না কেন? তাঁর ত' বেশী দেরি হোত না।

'আমার বাবার কি বড্ড কষ্ট হচ্ছে? বাবা কি আমায় নিয়ে যেতে বললে? মেয়েটা জিগ্যেস করলে।

'হ্যাঁ, এবার কান্না থামাও।' চম্পা দুরু কেঁচিকাল। গাড়ীটা গেট থেকে ভীষণ জোরে

তিনটি কবিতা
কল্যান কুমার দাশগুপ্ত

(এক)

কাস্তে দিয়ে ধানকাটার বিচিত্র ভঙ্গিতে
আয়না-দীঘিজলে
আলতো পায়ে কুমারী চাঁদ
একলা হেঁটে চলে,
এমন সময় দুষ্টু হাওয়া এসে
দাঁড়ালো তার পথে বুঝি খেলা করার ছলে॥

(দুই)

হারিয়ে গেছে কত না মুখ—মুখের ছায়াছবি,
হৃদয় জুড়ে একদা ছিল যারা,
জোনাকি হ'য়ে ঘুরে বেড়ায় আঁধার এই রাতে
স্মৃতি তাদের,—নাকি নিজেই তারা!

(তিন)

নিথর রাত, অন্ধকার
বাতাস নিশ্চুপ,
আমার ঘরে জ্বলছে একা
গন্ধভরা ধূপ,
একলা ঘর, ঘুম চোখে নেই
কেমন ক'রে বলি
কত রাতের কান্না নিয়ে
সারাটা রাত জ্বলি॥

ছিটকে বেরিয়ে গেল। জমির ভয় পেল উল্টে যাবে বুঝি, যখন গেট থেকে ঘুরিয়ে রাস্তায় আনল।

ছেলেমানুষ মেয়েটা ভয় পেল চম্পার থমথমে গম্ভীর মুখ দেখে, নিঃশব্দে চোখের জল মুছে ফোঁপানো কান্না চাপতে চেষ্টা করল। তার কাপড় জামা থেকে যুঁই ফুলের গন্ধ আসছিল। খোপায় জড়ানো ছিল যুঁইয়ের মালা। গাড়ীটা ঘণ্টায় ষাট মাইলের বেশী জোরে ছুটেছে। চম্পার কাশ্মীরী শালটা হাওয়ায় উড়ে মেয়েটার গালে এসে ঝাপটা দিলে। সে চেষ্টা করলে ঠিক করে শালটা চম্পার গায়ে জড়িয়ে দিতে। চম্পা তাকে ঝাঁকানি দিয়ে সরিয়ে দিলে, মেয়েটার হাতের ছোঁয়া গায়ে লাগায় বিতৃষ্ণায় শিউরে উঠলো। স্পীডো মিটারের কাঁটা সত্তরে উঠে পড়ল। 'ওই ভারি ভারি লরীগুলো একটু আস্তে চালাও। একটু আস্তে।' জমির এবার চেঁচিয়ে উঠল।

চম্পা দাঁতে দাঁত চেপে বলল 'আস্তে চালানো আমি সহ্য করতে পারি না।'

—'ওঁর মতন, ঠিক ওঁর মতন! আমার এত ভয় করে যখন উনি ওই লাল রেসিং কারটা চালান। সব খোলা। আমার চুল টুল উড়ে একাক্কার হয়ে যায়। উনি বলেন, তখন আমাকে নাকি দেখতে ওঁর ভালো লাগে'। মেয়েটা হাসল তার ভাবনা ভুলে গিয়ে।

চম্পা হঠাৎ গাড়ী থামালো। চাকাগুলো ভীষণ তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ করে নিশ্চল হোল।—'গাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও জমির। সারাক্ষণ তুমি চেঁচিয়ে উপদেশ দিলে আমি চালাতে পারব না। দে সাহেবের গাড়ীতে তুমি পরে ফিরতে পারবে।

জমির চম্পার দিকে অবাক হয়ে তাকাল, যা শুনছে তা বিশ্বাস করতে না পেরে। চম্পা ভয়ংকর রেগে উঠল। —'আমি যা বলছি

আশ্বিন
অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

তবুও আশ্বিন আসে, আশ্চর্য আশ্বিন
শিউলির সূক্ষ্ম স্বপ্নে গন্ধকান্ত আনন্দে নবীন
মেঘমুক্ত স্বর্ণাভ আশ্বিন
অভিনব।...সহসা তখন
নীলাকাশে আঁখি মেলে পাখী হলে মন—
ভুলে যাই কবে কোথা হয়ে গেছে অশান্ত প্লাবন,
ভেসে গেছে ঘর-বাড়ী, হাল-গোরু
গোলাভরা ধান,
ভেসে গেছে সাজানো বাগান।

গত রাত্রে অতি বৃষ্টি। কুঁড়েঘরে এক হাঁটু জল,
মাচায় শিশুরা বসে অবিরল করে কোলাহল,
কাগজের নৌকা গড়ি' গান করি' সাগরে' ভাসায়,
নৌকাডুবি হয়ে গেলে নির্ভয়ে সাঁতার দিতে চায়—
নিষেধ মানে না, নামে, নৌকা ধরে
বলে : 'রাখ্ রাখ্'।
শিশুদের খেলা দেখে আমি তো অবাক।

তবু ভাবি এ খেলা কি আকাশেরো নয়?
শ্রাবণের ঘেরাটোপে কতকাল রয়
নীলাকাশ? সূর্যের খেলার সঙ্গী এ আকাশ
খেলে না আশ্বিন?
আনে না স্বপনে পশি' সপ্তরঙা
স্বর্ণঝরা দিন?

শোনো।' চীৎকার করে উঠল—'আমি কি তোমার চাকর, না তুমি আমার?'

জমির চম্পা-বাবাকে ছোটর থেকে বড় হতে দেখেছে। চোখে জল ভরে এল অপমানে। সে তার কাছে খালি চাকর নয়, একজন স্নেহময় অভিভাবক। তা কি ও বুঝতে পারে না? জমির গাড়ী থেকে নেমে পড়ল। অনেক দূরে তাদের পেছনে দেখতে পেল আলোর দুটো ছোট বিন্দু ক্রমশঃ বড় হয়ে এগিয়ে আসছে, শুনতে পেল রেসিং কারের এঞ্জিনের আওয়াজ। জমির সরে গিয়ে একটা গাছের তলায় দাঁড়াল। চম্পাও এগিয়ে আসা আলোর দিকে তাকাল। তারপর অসম্ভব জোরে গাড়ী চালিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল।

রাস্তা দিয়ে তাদের দিকে আসছিল এক মাল বোঝাই ভারি লরী, প্রায় চম্পার গাড়ীর সমান জোরে চলেছে রাত্তিরে ফাঁকা রাস্তা পেয়ে। হেডলাইট কমিয়ে সেটা এক পাশে সরে গেল। এখন লাল রেসিং কারটা পেছনে দেখা যাচ্ছে। জমির দেখল চম্পা চালাচ্ছে এক অদ্ভুতভাবে। এঁকেবেঁকে চলেছে তার গাড়ী, যেন কোন মাতাল চালাচ্ছে। লরীটা রাস্তা ছেড়ে আধেক ঘাসে নেমে গেল ওকে পাশ কাটিয়ে যেতে দেবার জন্যে, কিন্তু চম্পা অসম্ভব জোরে চালিয়ে ইচ্ছে করে তার গাড়ীটা মুখোমুখি ধাক্কা লাগাল লরীটার সঙ্গে।

জমির মুখ ঢেকে মাটিতে বসে পড়ল। লাল রেসিং কারটা তার পাশ দিয়ে তীরের মতন ছুটে বেরিয়ে গেল।

ছায়ানট

॥ পরিমল চক্রবর্তী ॥

যদিও হয়েছে মৃত্যু
দু'চোখের সাগরের নীরে
বহুবার, বহু ক্লান্ত
থমথমে রাতদিন জুড়ে—
তবুও পেয়েছি খুঁজে
মরণের অতল গভীরে
একটি অমৃতদীপ:
জীবনের পিপাসার সুরে,
সেই দীপ দূর ক'রে
হতাশার অন্ধকার ধুধু
চেতনার বেদনার
দোলনায় দোলা দেয় শুধু

আকাঙ্ক্ষার ঢেউগুলো
হৃদয়ের কূল ছুঁয়ে ছুঁয়ে
চলে গ্যাছে বহুদূরে;
কান্নার সমুদ্র পার হয়ে,
কে যেন সভয়ে এসে
বকুলের মালাখানি লয়ে
আমাকে পবিত্র করে
বেদনার অশ্রুজলে ধুয়ে।
আমি তো জানিনা আহা,
কে-যে সেই ব্যথা-বিলাসিনী—
তবু যেন মনে হয়
বহু যুগ হতে তাকে চিনি!

অনেক নাবিক এসে
প্রত্যহের বন্দরে বন্দরে
রেখে গ্যাছে নানা পণ্য—
রকমারী, বিচিত্র প্রচুর;
তবু কেন স্বপ্নবতী এ-মনের
নিভৃত কন্দরে
বেজে ওঠে বারবার
অন্তহীন শূন্যতার সুর?

তাই আজ তীব্রতম বেদনার নীলপদ্ম গানে :
আমিও পেয়েছি খুঁজে জীবনের অন্যতর মানে ॥

নদীর উত্তর

বটকৃষ্ণ দে

তীরে তরু, পাখী, প্রেম, ভোরের মালতী,
আশ্চর্য সংসার, জীবনের: আমি দেখি,
সুখের আলোতে খেলা, দুঃখ, লাভ ক্ষতি,—
সমস্ত পেরিয়ে এক শ্বেত শান্তি সে কী!
কী সে রহস্যের রঙ্গ, রঙের বলয়ে,—
: নদীর জিজ্ঞাসা হয়ে আমি যাই ব'য়ে!

আমি ভাঙি, গড়ি ক্ষেত, শস্যের ফসল,
সবুজ নবীন দ্বীপ হাসিতে উজ্জ্বল
প্রাণস্পর্শে! অনন্তের আনন্দ সদাই,
: নদীর উত্তর হয়ে আমি ব'য়ে যাই॥

জীবনে জীবন

• ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী •

হৃদয় ও মনের শত শিরা উপশিরায়;
অটুট বন্ধন ছিল শৃঙ্খলে জড়ায়ে
মৃত্তিকার আচ্ছাদনে নির্ভয়ে নিশ্চিত;
রসাশ্রয়ী সুকোমল শিকড়ে সংহত।
কত সে যে পরিতৃপ্ত স্তব্ধ অবকাশে,
বন্ধনের ছিন্ন ডোর ক্ষণ কল্পনায়।
তুফান উঠেছে মনে দারুণ সন্ত্রাসে,
মঞ্জীর মন্দ্রেছে মৃদু ঝনন্‌ঝনায়।
যেই সত্য প্রত্যহের আকাশেতে লেখা,
হিরণ্ময় নক্ষত্রে তার বৈদ্যুতিক শিখা,
আমার বক্ষাস্থি তা কি স্পর্শ করেছিল?
তবুও ভাঙেনি ভুল স্বপ্নে শুধু ছিল।
মাটীর অন্তরাশ্রিত শতমুখী মূলে
দৃশ্যান্তরে কখনও কি হয় নিঃশেষিত।
জীবনে জীবনাতীত সমুদ্রে অকূলে
বালুকার স্তরে স্তরে কাল্পান্তে বিস্তৃত।

ব্যর্থ বার্তা

✻ মনীষী রায় ✻

ছন্নছাড়া ছন্দহারা জীবন আমার যাপ্য;
ভাষা আমার নয়কো খাসা, কাব্য অপ্রাপ্য।
ভাবের আমার নাইতো অভাব; তাইতো বসে ভাবি,
না-বলা মোর মনের খবর কেমন ক'রে পাবি।

* * * *

তারপর, হঠাৎ :
লভিয়াছি, লভিয়াছি, লভিয়াছি ভাষা,
কণ্ঠভরা কলরোল, কাব্যময় আশা।
কিন্তু, কি আমার বাণী? তাহা নাহি জানি।
অব্যক্ত রহিল তাই ব্যর্থ লিপিখানি।

জিজ্ঞাসা

পারুল ঘোষ

জানার উত্তপ্ত তৃষ্ণা বুকে নিয়ে চলেছে মানুষ
ফুল ফল পশুপাখী জল স্থল আকাশ সাগর—
যা কিছু যেখানে আছে, গিরি নদী বন্দর নগর
সবই সে জানিতে চায়। কল্পনার উড়ন্ত ফানুস
ওড়ে তার দিগ্বিদিকে, সীমাহীন প্রমত্ত পৌরুষ
টানে তারে অহর্নিশি। মরুভূমি মেরুলোক
পর্বত-গহ্বর,
সর্বত্র আপন গর্ব প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা দুর্মর
কেড়েছে তাহার শান্তি, কেড়েছে বিবেক বুদ্ধি
হুঁস।

* * * *

তবু কি হয়েছে জানা সমস্ত রহস্য পৃথিবীর?
খুলেছে কি রুদ্ধদ্বার জিজ্ঞাসার আদিগন্ত
জোড়া?
জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখ সমাকীর্ণ প্রতি অনুটির
পরিচয় পেয়েছি কি প্রজ্ঞা তার? কিংবা এই ঘোরা
এই শ্রান্তিহীন খোঁজা জন্মগত জৈব প্রবৃত্তির
দুর্বোধ্য সমস্যা এক, অর্থ যার বুঝিনাক মোরা?

নির্জন কান্না

সুনীল ভট্টাচার্য

দুঃখের আবর্তে ডুবে সমুদ্রের উত্তাল ঝড়ে
আমার এ জীবনের মাঝি সে কি বারে বারে মরে!
যন্ত্রণায় দগ্ধনীল প্রান্তরের উন্মত্ত কাফনে
আমি তাই চুপি চুপি ধীরে ধীরে পথ চিনে চিনে
ফিরে আসি মোহমুগ্ধ এ পৃথিবী, এ মাটির টানে
আবার তোমাকে দেখি তন্দ্রাতুর রৌদ্রের খেয়ানে।

অন্ধকারে তুমি কাঁদো বন্ধদ্বারে বেলা বুঝি পড়ে
অশ্রু-ঝর্ণা বারে বারে তাই কি নির্ঝর হ'য়ে ঝরে।
আলোর প্রহারে আমি আর্ত তবু আহত পাষাণ
মেঘ নাই, বৃষ্টি নাই, আছে শুধু বেদনার দান।
উন্মুখর আকাঙ্ক্ষার স্বর্ণপাত্র শূন্য পড়ে থাকে
তোমার নির্জন নাম আমার দিগন্তে ছবি আঁকে।

আজ তাই ফিরে ডাকি জানি তবু বিমুখ দেবতা
চোখ তুলে চাইবে না মুখ খুলে বলবে না কথা।

সে

চিত্তরঞ্জন পাল

তবু সে বলে না কথা। কি যে মুগ্ধ মুখরতা মনে
শ্রাবণী আবেগে থরো থরো; নীল জ্বালার দহনে
স্বপ্নের সাম্রাজ্য জুড়ে বেদনার মেঘ-ম্লান ছায়া :
ফুলে ফুলে ফেরে অলি, গীতালির অপরূপ মায়া
প্রজাপতি-হৃদয়ের কথা কয় গুন্ গুন্ সুরে—
কম্পিত-প্রাণের গান মলয়ের মোহন নূপুরে।
জীবনে আহ্বান আসে পৌরুষের প্রমোদ-উদ্যানে,
পরশের প্রসাধন ও মনোহর আলাপের মানে
স্পষ্টতর ইসারায় নগ্নতার চিত্র মনে হয়—
প্রেমের দক্ষিণা বুঝি দেহের নিবিড় পরিচয়।
কম্পিত সংশয়ে তবু সংকোচের নম্র আনাগোনা
পারে না নিঃশঙ্ক হতে। নীরবে স্বপ্নের
জাল বোনা।
কালের পাখায় কাঁপে পঞ্চশর—বাসনার দিন
অকৈতব প্রেম চায়;—বাদী, হায়, প্রকৃতির ঋণ।

একটি প্রশ্ন

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

তুমি উজ্জ্বল শরতের আলো
শিউলি ভোরের হাসি;
আমি শুধু আজো বিষাদখিন্ন
শ্রাবণ সাঁঝের কান্না।

তবু তোমার আকাশে মনে হয় কেন
মেঘ হয়ে শুধু ভাসি,
তোমার বুকেতে ছুটে যেতে চায়
আমার প্রাণের বন্যা?

'উদয়াস্ত দুই তীর'— অমলেন্দু দাসগুপ্ত

মুক্তিদিবস সমাসন্ন!

অভিনয়ে...

শেভাকলার অবদান

পথে হ'ল দেরী

পরিচালনা :: অগ্রদূত

সুরারোপ :: রবীন চ্যাটার্জী

আগামী আকর্ষণ...

অগ্রগামী প্রোডাকসন্সের
নিবেদন
তারাশঙ্করের

শ্রেঃ কালী ব্যানার্জী
শোভা সেন।
সাবিত্রী চ্যাটার্জী

সুরারোপ।
সুধীন দাশগুপ্ত

উলুব্রুক্ষ পরিবেশিত
পারশমল-দীপচাঁদ
রিলিজ

দেবকীকুমার বসুর
পরিচালনায়

ডিলুক্স নিবেদিত

সোনার কাঠি

ভূমিকায় :: নীতীশ ॥ ভারতী ॥
প্রশান্ত ॥ আশীষ ॥ তপতী ॥
শিখারানী ॥ শ্রাবনী ॥
সীমা দত্ত ॥

সুরারোপ :: রাজেন সরকার

কিশোর প্রোডাকসন্স-এর
প্রথম নিবেদন

কিশোরকুমার•মালা সিংহ
অনীতা গুহ অভিনীত

পরিচালনা :: কমল মজুমদার
সুরসৃষ্টি :: হেমন্তকুমার

বাংলায় সোভিয়েত-সাহিত্য

মাকারেঙ্কোর বিশ্ব-বিখ্যাত বই

★ রোড টু লাইফ ★

যে বই ছায়া-চিত্রে আলোড়ন এনেছিল।
প্রতি স্কুল কলেজ ও লাইব্রেরীর অপরিহার্য।
তিন খণ্ড একত্রে—১৪।৹

লেভ্ তলস্তয়ের
শৈশব, কৈশোর ও যৌবন—৫।৹

তুর্গেনিভের
রুদিন—৩৲

ওয়াই উসপেন স্কায়ার
আওয়ার সামার—৫৲

এ, সেরাফিমোভিচের
দি আয়রন ফ্লাড—৪॥৹

এ, কাজানসেভের
এগেন্স্ট্ দি উইন্ড—৩।৹

—ছোটদের—

সোনার ঝাঁপি—৩৲
রুশ গল্প সঞ্চয়—২॥৹

আলেক্সি মুসাতভের
চাষ করি আনন্দে—৪৲

কে গাংগুলী অ্যান্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ
১, কলেজ রো ॥ কলিকাতা—৯ ॥

এক মাসের জন্য

কনসেসন

টাকা প্রতি
দুই আনা

এসিড প্রুফ ২২ K T
রোল্ড গোল্ড গহনা
গ্যারান্টি ১০ বৎসর

সংক্ষিপ্ত মূল্য তালিকা

চুড়ি বড় ৮ গাছা ২০৲, ঐ ছোট ১৬৲, নেকলেস অথবা মফচেন প্রতি ছড়া ১৫৲, পেনডেণ্ট চেন ১০৲, নেকচেন ৭৲, আংটী ১টি ৬৲, বোতাম হাতা বা গলা ৪৲, ঐ চেন সহ ৬৲, কানপাশা, কানবালা অথবা ইয়ারিং জোড়া ৭৲, আর্মলেট বা অনন্ত ১৮৲, চুড়, বালা বা কংকণ জোড়া ১৪৲, ডাকমাশুল ১।৹ অগ্রিম দেয়।

ইণ্ডিয়ান রোল্ড
গোল্ড কোং

১৯০, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিঃ-১২
শো রুম—১নং কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

রতন-ঠাকুরঝি

(২২ পৃষ্ঠার পর)

কাগজের আড়াল থেকেই উত্তর হোল—"না জেনে উপায় আছে?"

প্রগলভতাটুকুর জন্য মৃদু বিদ্রূপও হ'তে পারে অপরিচিত বাঙ্গালী রয়েছে, সতর্ক ক'রে দেওয়াও হতে পারে; রাগ নয়। মেয়েটি বেরিয়ে এসে চেয়ারের কাছে চলে গেল। কানের কাছে মুখটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বলল—"ইয়ার্ডের টিউব-ওয়েল থেকে এক বালতি জল আনিয়ে দাও কুলিকে দিয়ে।"

"নিজে গেলে হয় না?"

"ঠাট্টা নয়, আনিয়ে দাও। আহা বুড়ো মানুষ। পানি-পাঁড়েকে আনা দুয়েক দিলেই বালতি দিয়ে দেবে। চাই কি, নিজেও এনে দিতে পারে। ওঠ, লক্ষ্মীটি"

শেষের কথাটি নিশ্চয় অভ্যাসের বশে মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়ে থাকবে।

একটু সংকুচিত হয়ে উঠল হঠাৎ। যুবকটি ছোট একটি আপত্তির শব্দ করে উঠল। সংকুচিতই, বড় সহজেই "লক্ষ্মীটি" হয়ে উঠে পড়তে হোল তো,—একজন অপরিচিত বাঙ্গালীর সামনে। ওয়েটিং রুমের ভেতর দিয়েই ষ্টেশনের দিকে চ'লে গেল।

এক বালতি নয়, দু'বালতি জল এসে উপস্থিত হোল। ...কে জানে, আবার কাকে নাওয়াবার ঝোঁক হবে। নিজের জায়গায় এসে বসল যুবকটি।

মেয়েটি একটা ঘটি বের করে কুলিটাকেই বলল—"গঙ্গা থেকে এক ঘটি জল নিয়ে এস বাছা, এনে এই দুটো বালতি একটু ভেতরে করে দাও; আমি তোমায় আলাদা পয়সা দোব এর জন্যে।

জল এলে বৃদ্ধাকে দেখিয়ে বলল—"এই দেখুন জ্যাঠাইমা—অবিশ্যি গঙ্গাতীরে সবই গঙ্গা, তবু খানিকটা ক'রে এই ঢেলে দিচ্ছি গঙ্গাজল; আর তো খুঁতখুঁতুনি রইল না মনে?"

বৃদ্ধা বললেন—"না মা, তুমি পর্শ করে দিলেই গঙ্গা, আর এতো স্বয়ং এসে অবতীর্ণা হলেন। ...কী ব'লে যে আশীর্বাদ করি তোমায়!"

তৃতীয়ার কণ্ঠস্বরে একটু টিপ্পনী হোল—"যা আতঙ্ক ধরিয়ে দিয়েছ তুমি আশীর্বাদে ভাই।"

একটু হাসি ছলকে উঠল আবার। কুলি বালতি দুটো বাথ রুমে দিয়ে পয়সা নিয়ে চলে যেতে মেয়েটি বলল—"এবার তুমি জ্যাঠাইমাকে নাইয়ে দাওগে ভাই। ...দাও, খোকাকে আমি নিচ্ছি।"

"তুমি রাখতে পারবে? বড্ড দুষ্টু সে।"

"খুব পারব। কী চমৎকারটি ভাই! ...রাখতে পারা কি?—তোমার বরং ভয় হওয়া উচিত ফিরিয়ে দোব কি না।...এসো তো খোকা, মাসী হই।"

"দরকার কি ফিরিয়ে দিয়ে? ...আর তাইবা কেন, আশীর্বাদ করছি—ওর চেয়ে চমৎকার একটি কোলে আসুক শীগ্গির...অবিশ্যি অমন দুষ্টু নয়..."

একটা যে চুপচাপ গেল তাতে কি ধরণের দৃষ্টি-বিনিময় হোল সেটা অবশ্য দেখা গেল না।

এর পরের বিরতিটুকু শিশুটির আদর-গুঞ্জরণে ভরে রইল খানিকটা, তারপর মেয়েটি তাকে নিয়ে ষ্টেশনের দিকের প্ল্যাটফর্মে চলে গেল টহল দিতে।

কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধা বধূর সঙ্গে বেরিয়ে এলেন আশীর্বাদ করতে করতে—"কী তৃপ্তি যে হোল মা—ত্রিবেণী স্তানের—পুণ্যির হাত তো—চিরএয়োস্ত্রী হয়ে থাকো—ছেলেপুলে নাতি-নাতনী নিয়ে..."

মেয়েটি দোরের কাছেই পায়চারি করছিল, ভেতরে এসে বৃদ্ধার বাক্যস্রোতে বাধা দিয়ে বলল—"এই ছেলে তোমার দুষ্টু হোল ভাই? —কী ভাব হয়ে গেল আমার সঙ্গে এর মধ্যে! তুমি আর মার কাছে যাবে না তো খোকা?—কত খাবার দোব, কত খেলনা কিনে দোব...পোড়া ইষ্টিশানে কিছু কি পাওয়ারই জো আছে ছাই? —মিছি মিছি কাঁচ ছেলেকে..."

এই সময় একটি ব্যাপার হোল। গঙ্গার উল্টা দিকে, লাইন পেরিয়ে রেলের কলোনীটা। সেই দিক থেকে একটি ছোট্ট দলকে কি একটা বেশ উল্লসিত আলাপ-আলোচনা করতে করতে এগিয়ে আসতে দেখা গেল—একজন প্রৌঢ়, একটি যুবা, একটি যুবতী—দু'জনেই প্রায় এদের সমবয়সী, আর একটি বছর বারো-তেরো বয়সের ছেলে। বড় মেয়েটি, অর্থাৎ শিশুটির মা একটু বিস্মিত-ভাবে ঠাহর করে দেখে বলে উঠল—"ওমা, এযে পুষ্পাদিদি, মেসোমশাই, অশোক—এ'রা এখানে কোথা থেকে এলেন!"

সবাই তখন হৈহৈ করতে করতে উঠে এসেছে। কথার একটু জড়াজড়ি হতে লাগল, তার সঙ্গে প্রণাম আশীর্বাদ, তার মধ্যেই টের পাওয়া গেল—যুবকটি পরিবারটির অভিভাবক, বৃদ্ধার পুত্র, শিশুটির পিতা।

প্রৌঢ়টি সম্পর্কে মেসোমশাই—মনে হোল যেন একটু দূরে সম্পর্কে। মেয়ে আর ছেলেটি ও'র কন্যা এবং পুত্র। অন্য ষ্টেশনে ছিলেন, হঠাৎ সপ্তাখানেক হোল বদলি হয়ে এসেছেন এবং হঠাৎই যুবকটির সঙ্গে দেখা। বাড়ীতে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন, তারপর নিয়ে যেতে এসেছেন।

চেয়ারটা প্রথম ঝোঁকেই যে একটু ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম,কতকটা যেন অজ্ঞাতসারেই, সেই-রকমই আছে।

মেয়েটি—যেটি এল ওদিক থেকে—সবচেয়ে উচ্ছ্বসিত। কোনমতেই ছাড়বে না, যাবেই নিয়ে সবাইকে—একি আশ্চর্য কথা—বাড়ী রয়েছে আর এই আ-ঘাটায় পড়ে থাকতে হবে!

এদিক থেকে যুবকটি বলল—আর আধ ঘণ্টাটাক পরেই গাড়ী, চাই কি যে দেরিটা হয়ে গেছে সেটা পুষিয়ে নিয়ে আরও আগেই এসে পড়তে পারে—এইটুকুর জন্যে গিয়ে আবার ফিরে আসা। হয়তো গাড়িটা হাতছাড়া হয়েই যেতে পারে। উত্তর হোল ফিরে আসতে দিচ্ছে কে যে ফিরে আসবে? অবশ্য ঘণ্টা তিনেক পরে আছে গাড়ি একটা, কিন্তু সেটাতেও নয়, একটি দিন পুরো থেকে যেতে হবে, তারপর কাল আবার নেয়ে খেয়ে এই গাড়িতে।

মনের জোর মেয়েটিরই বেশী, যুক্তিটাও তো ওর দিকে—কত দিন পরে দেখা, আবার কে কোথায় থাকবে, যায় কি ছাড়া, না, উচিত?

ওজর-আপত্তি বন্ধ করিয়ে দিয়ে ছেলেটিকে বলল—"যাও তো অশোক, দুটো কুলি ডেকে নিয়ে এসো, শীগ্গির।"

তার পরেই হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বোধ হয় ওদিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে। শিশুটি তখনও তার নূতন "মাসী"র কোলেই, একবার তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে বলল—"আর শুনে-ছিলাম যেন নিখিলদার একটি ছেলে হয়েছিল।"

...কতকটা ভয়ে ভয়েই বেরুল কথাটা, কে জানে, বলা যায় না তো..

আমি দেখছিলামই মাঝে মাঝে, কিম্বা চেয়ারটা ঘুরে যাওয়ায় আপনিই গিয়ে নজরটা পড়ছিল; ওরা দুজনে মুখটা একটু ঘুরিয়ে নিল, বৃদ্ধাই বললেন—"ঐ যে রয়েছেন গুণনিধি, নতুন মাসী পেয়ে..."

প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল মেয়েটি, কোল থেকে ছোঁ মেরে নেওয়ার জন্য, সঙ্গে সঙ্গে ঘরের হাওয়াটা গেল বদলে। 'সঙ্গে সঙ্গে' বা বলি কেন? পরিবর্তনের সূত্রপাত একটু আগেই হয়েছিল।

তবে আমি ছাড়া অন্য কারুর নজরে পড়েনি, এখন এই ব্যাপারটুকুতে হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠল।

লক্ষ্য করছিলাম—তার সেই জন্যই আমার নজরটা বেশী ক'রে ওদিকে গিয়ে পড়ছিল—নতুন মাসীর মুখের ভাবটা একেবারে গেছে বদলে। অত যে সেই হাসি-খুসি, চোখে মুখে উছলে পড়ছিল, তার জায়গায় একটা থমথমে ভাব। সবচেয়ে আশ্চর্য ঐ নবাগতা মেয়েটির ওপর কিসের যেন একটা বৈরী ভাব, শিশুটিকে নিয়ে একটু পাশ কেটে দাঁড়িয়ে আছে, আর আড়চোখে দৃষ্টি ফেলে কী যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে—সে দৃষ্টিতে যত রাজ্যের ঈর্ষা, আক্রোশ, ঘৃণা, আরও সব কি যা মেয়েদের দৃষ্টিতেই যায় দেখা।

মাঝে মাঝে মুখটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে সামলাবার চেষ্টাও যে না করছে এমন নয়।

নবাগতা শিশুটিকে নেওয়ার জন্য হাত বাড়াতেই, কতকটা যেন চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে একটু চেপে ধরল তাকে, তক্ষুণি অবশ্য সামলে নিয়ে দিয়ে দিল, তবে ওকে নয়, হাত বাড়িয়ে ওর মায়ের কোলে দিল তুলে।

বিরূপতাটুকু এত স্পষ্ট যে, অত যে হৈচৈ, একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল, খানিকক্ষণ কারুর মুখেই যেন আর কোন কথা বেরোয় না। শেষে শিশুটির মা-ই, বোধ হয় এই ব্যাপারটাকে চাপা দেওয়ার জন্যই একটা নূতন পন্থা উদ্ভাবন করল, ওদের বলল এদের দুজনকেও নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতে। এদের কলকাতার দিকের গাড়ি, এখনও ঘণ্টা তিনেক দেরী, যখন একটা সুযোগ হোল, মিছামিছি প্ল্যাটফর্মে পড়ে শুকাবে কেন?

শাশুড়ী বেটায় মিলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল, যাওয়ার জন্য জিদ, ওদের পক্ষ থেকেও ঝুলোঝুলি। বিশেষ করে মেয়েটির, কিন্তু একটু টসকানো গেল না। শেষকালে ঐ মেয়েটিরই সানির্বন্ধতার উত্তরে বেশ বিরক্তির সহিতই বলল "না—না—না,বলছি পারব না যেতে তবু অন্যায় জিদ করছেন কেন?

এতই রূঢ় হয়ে পড়ল ব্যাপারটা যে এদিককার বারান্দায় স্বামী পর্যন্ত চেয়ার থেকে উঠে প'ড়ে দরজার সামনা-সামনি হয়ে পায়চারি করল বার-কয়েক।

এ-পর্ব কিন্তু এইখানেই শেষ হয়ে গেল। কুলি এল, মাথায় মোটঘাট চাপিয়ে ওরা চলে গেল।

একটা বিশ্রী রকম কৌতূহল লেগে রইল আমার মনে। প্রায় সমস্তটুকুই তো দেখলাম, এর মধ্যে এমন কি হয়েছে যার জন্য অমন ক'রে গায়ে পড়ে ভাব করবার মানুষ, সে একেবারে অতটা বিরূপ হয়ে উঠল! আর, বিরূপতা ঐ নবাগতা মেয়েটির ওপরই। অথচ বেশ টের পাওয়া যায় ওর সঙ্গে এই প্রথম দেখা।

যুবকটিও আমার মতই সংশয়গ্রস্ত, এবং অভদ্রতাটুকুর জন্য স্বভাবতই লজ্জিত; অধিকন্তু বিরক্তও। একটা নির্লিপ্ত ভাব মুখে ফুটিয়ে রেখে আস্তে আস্তে পায়চারি করছে, তবু বেশ বুঝতে পারছি ভেতরে গিয়ে কথাটা যেন পাড়তে চায়।

ঠিক করে ফেললাম—শুনতে হবে; পারিবারিক কোন কথা নয়, সে ধরণের দাম্পত্যও এমন কিছু নয় যখন। তবু হয়তো একটু অনুচিত হতে পারে, কিন্তু অত চুল-চেরা হিসাবের মধ্যে আর গেলাম না। যেন সিগারেট মুখে নিজের কী একটা চিন্তা নিয়েই ছিলাম, ঘরে কি হয়েছে না-হয়েছে তার কিছুই খোঁজ রাখি নি, কি হবে তাও রাখতে যাওয়ার অভিরুচি নেই—এইভাবে ওর চেয়েও বেশী ক'রে মুখে নির্লিপ্ততার ভাব ফুটিয়ে বললাম—"পত্রিকাটা আপনার পড়া হয়ে গেছে কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, এই যে, পড়বেন?"

—হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল, আমিও একটু উঠে পড়েই নিলাম, এবং বসবার আগে চেয়ারের মুখটা পূর্বের মতো সোজাসুজি গঙ্গার দিকে ঘুরিয়েও নিলাম। একটু সরিয়েও নিলাম দরজা থেকে।

শুধু শুনতে পেলেই আমার কাজ চলে যাবে।

আমি যখন দুখানা মলাটের মধ্যে একেবারেই বাহ্যজ্ঞানহীন, যুবকটি পায়চারি করতে করতেই প্রবেশ করল। একটু পরেই আরম্ভ হোল কথাবার্তা। অবশ্য চাপা গলাতেই; শুধু যে প্রসঙ্গটা জানে এবং বাহ্যজ্ঞানরহিত হয়ে ঐদিকেই মন দিয়ে রয়েছে সেই পারে বুঝতে—

"কী হোল ব্যাপারটা!"

"কোথায় আবার কি হোল!"

"হোল বৈকি। সব শুনেছিলাম; দেখলামও। কী মনে করলেন ও'রা?...এ'রাও, যাঁদের সঙ্গে এত গলাগলি ভাব।"

একটি বিরতি; তারপর—

"কে কি মনে করলে অত বুঝি না; স্পষ্ট কথা বলা অভ্যেস, বলেছি। যাব না তার জন্যে অত জিদ কেন?"

"না হয় যেতামই একটু; কি এমন মহাভারতটা, অশুদ্ধ হয়ে যেত?"

"হোত অশুদ্ধ..."

"কিছু হোত না।—আমি তো যাবই মনে করেছিলাম; শুধু এমন অবস্থা দাঁড় করিয়েছিলে ভেতরে পা দিতে লজ্জা..."

"যেতে তুমি!!"—মনে হোল যেন মেয়েটি মুখ তুলে সামনাসামনি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

"যেতাম বৈকি। কি হয়েছে?"—

"তাহলে তোমাকেও স্পষ্ট করেই বলি—তুমি যে জন্যে যেতে আমি সেই জন্যেই যেতে চাইলাম না। জানতাম তুমি যাওয়ার জন্যে হামড়ে পড়বে।"

"তার মানে!" —এত বিস্মিত হয়ে গেছে যুবকটি যে আমার কথা আর মনে নেই; গলার স্বর গেছে একটু চড়েই।

"তাহ'লে আরও স্পষ্ট করে বলতে হবে? ...আচ্ছা, সত্যি করে বলো দিকিন, মেয়েটার চেহারা ঠিক রতন-ঠাকুরঝির মতন নয়? —চোখ, মুখ, কপাল, নাক, চুল, গড়ন, রং, হাবা ভাজলে চলবে না, আমার গায়ে হাত দিয়ে দিব্যি ক'রে বলো..."

"কে রতন-ঠাকুরঝি!"

"ন্যাকা সেজো না, সব সইতে পারি, আদিখ্যেতা সয়ে, ন্যাকামি সইতে পারি না। কেন, চেনো না বোসেদের বাড়ির..."

"ও! সাধনকাকার মেয়ে রতু? তা সে বেচারি..."

"ব্যাস, চিনলেন তো আদরের নাম ধ'রে গলে পড়লেন—রতু!...বেচারি!...আরও দু'একটা কিছু হোক না..."

একটু বিরতি গেল। দৃশ্যটা ঠিক আন্দাজ করতে পারলাম না। তবে এরপর যা কথা হোল তাতে মনে হোল যুবকটির বিস্ময় একটু তরল হাসিতে গলে এসেছে—

"ও বুঝেছি! —বেচারি একটু সুন্দর বলে তোমার সেই চিরকেলে..."

*　　*　　*

কুলি এসে বলল—"টরেন্‌কা সিংগল হো-গিয়া বাবু!"

জটিল রহস্যটার খুঁটও হাতে এসে গেছে; উঠে পড়লাম।

—

বিচিত্র সংলাপ

(২৫ পৃষ্ঠার পর)

পাশে কিছু অতিরিক্ত ভার চাপিয়ে দিয়েছি। ক্ষতিটা কি হয়েছে?

গৌতম

কিছুই না। দু'পাশে ভার চাপাবার ফলে নৌকার গতি না অতলের দিকে হয়।

চার্বাক

গৌতম, ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, ভারি নৌকার চেয়ে খালি নৌকা ডুবে থাকে বেশি। আর তাছাড়া নৌকা তো খালি থাকবার জন্যে সৃষ্টি হয়নি।

গৌতম

চার্বাক, তুমি দেহতত্ত্বের ঋষি, কিন্তু নিজের দেহটাকে মানো বলে তো মনে হচ্ছে না।

চার্বাক

হঠাৎ এমন মনে হওয়ার কারণ?

গৌতম

সকাল থেকে বিতণ্ডা করছ, দেহ মানলে দেহের ধর্ম মানতে। ক্ষুধা তৃষ্ণা কি পায়নি?

চার্বাক

তার্কিকের ঐ এক বিপদ। তর্কের দৌড়ে ক্ষুধা তৃষ্ণাগুলো পিছে প'ড়ে থাকে। এখন তোমার কথায় ঐ দুটো বাচাল মুখর হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু উপায় কি?

গৌতম

নিকটেই আমার আশ্রম। উত্তম মুদ্গ আর ইক্ষু গুড় আছে, আর আছে সদ্যভর্জিত পুরোডাশ সেই সঙ্গে সদ্যোগত হৈয়ঙ্গবীন। আর ফলমূলে সে সব কোন্ ঋষির আশ্রমে না থাকে। আর গতকল্য আমার এক ধনী শিষ্য সপ্ত কলস গান্ধার প্রদেশজাত সোমরস পাঠিয়ে দিয়েছে।

চার্বাক

আহা-হা, এতো বিশুদ্ধ চৈতন্যবাদীয় আশ্রমের উপযুক্ত উপকরণ নয়।

গৌতম

নয়ই তো। আমরা বিশুদ্ধ চৈতন্যবাদী বলেই চৈতন্যের আধারস্বরূপ এই দেহটার যত্ন করতে ভুলি না। আজ দয়া ক'রে আমার আতিথ্য গ্রহণ করো। অতঃপর একদিন না হয় তোমার আশ্রমে গিয়ে অতিথি হ'ব।

চার্বাক

তাতে খুবই ঠকবে।

গৌতম

কেন?

চার্বাক

আমার আশ্রমে গেলে গোটাকতক শুষ্ক হরতকি আমলকি আর বহেড়া ছাড়া কিছু দিতে পারবো না।

গৌতম

চমৎকার! এ যে একেবারে ত্রিফলার ব্যবস্থা। কিন্তু তোমার চলে কি ক'রে? দেহটি তো মন্দ দেখছি না।

চার্বাক

আজ যে-ভাবে চলল সেইভাবেই চলে। নদীতে স্নানের ঘাটে বসে থাকি, জটাওলা মুনি-ঋষি দেখলে তর্ক বাধিয়ে বেলা গড়িয়ে দিই, শেষে তারা আমার মুখ বন্ধ করবার আশায় আশ্রমে নিমন্ত্রণ করে, দিব্য চলে যায়। কঠোরতপা মুনি-ঋষিগণ খায়দায় ভালো। তাছাড়া আশ্রমকন্যাকাগণও দেখতে শুনতে মন্দ নয়।

গৌতম

তুমি বলেছ—

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ,
ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।

তুমি তো এ-আশ্রম সে-আশ্রমে ঘুরেই খাও। তবে ও কথার সার্থকতা কি?

চার্বাক

তোমাদের যাতে কখনো ঘৃতের অভাব না হয়, তাই ঐ উপদেশ। তোমরা ঋণ ক'রে ঘৃত কিনবে, আমি তা খাবো।

গৌতম

আপাতত ঋণ করবার প্রয়োজন নেই, একটি শিষ্যের বাড়ী থেকে প্রচুর হৈয়ঙ্গবীন এসেছে।

চার্বাক

তবে আর বিলম্ব নয়, শীঘ্র চলো।

—

টাস ফিল্মস্-এর দ্বিতীয় সশ্রদ্ধ নিবেদন—
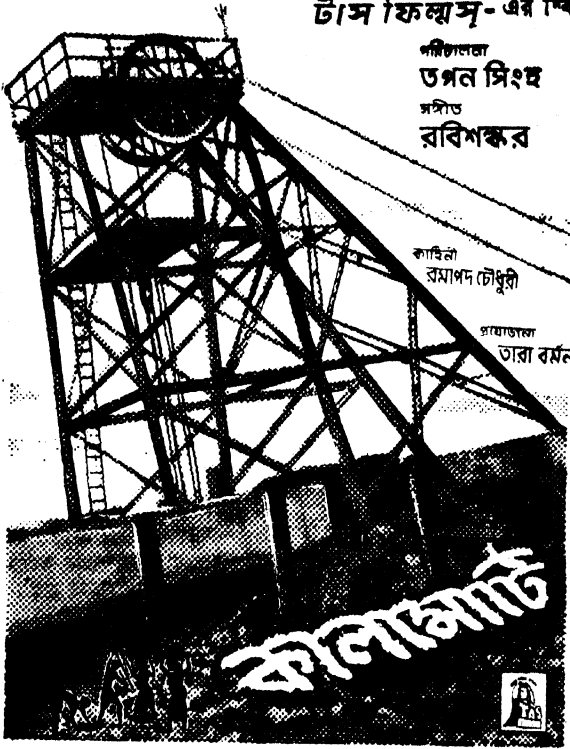
কয়লাখনির পটভূমিকায় রচিত এক সার্বজনীন আবেদনের বেদনা-মধুর কাহিনী—যাহা ইতিপূর্বে চলচ্চিত্রায়িত হয়নি!

বিশিষ্ট শিল্পী ও কলা-কুশলী সমন্বয়ে

✱ প্রস্তুতির পথে ✱

সিনে আর্ট প্রোডাকসনের নিবেদন

অন্তরীক্ষ

পরিচালনা
রাজেন তরফদার

সঙ্গীত
ওস্তাদ আলী আকবর খান

পরিবেশক
নারায়ণ পিকচার্স
(প্রাইভেট) লিমিটেড

— এক —

সাহিত্য আকাদেমী ইংরেজী ভাষায় একখানি বই বার করেছেন। তার নাম দিয়েছেন কন্‌টেম্পোরারি ইণ্ডিয়ান লিটারেচার; বাংলা ভাষায় বোঝাতে হলে বলতে হয় 'সমসাময়িক ভারতীয় সাহিত্য পরিচয়'। বইখানি ইংরেজী ভাষায় রচনা করিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে বোধ করি বিদেশীদের কাছে ভারতীয় সাহিত্যের বাণী পৌঁছে দিতে এবং আকাদেমীরও মহান প্রয়াসের পরিচয় দিতে। পনেরোজন পণ্ডিত লিখিত ভারতীয় পনেরোটি ভাষার সাহিত্যের পরিচয় রয়েছে এই বইখানিতে। নাটকেরও পরিচয় রয়েছে। বইখানি পড়ে জানলাম আসামী, ওড়িয়া, গুজরাতী, হিন্দী, মালয়ালম, মারাঠী, পাঞ্জাবী, তামিল, তেলেগু, কানাড়া, উর্দু সকল ভাষাতেই নাটক আছে—নেই শুধু সমসাময়িক বাংলা ভাষায়! বাংলা ভাষার সাহিত্য-সৃষ্টির বিচার করেছেন এবং রায়ও দিয়েছেন কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব। নাটক তিনি বিচার করা বাহুল্য মনে করে সরাসরি রায় দিয়েছেন এই ভাষায়ঃ—

We have seen that modern Bengali literature is fairly rich in poetry and fiction. But in drama its position is not, unfortunately, high. It began well with Dinabandhu Mitra's *Nildarpan* in the sixties of the last century; but melodrama blocked its path of progress, and has not cleared off yet. Giris Chandra Ghose and Dwijendra Lal Roy, two of our most renowned dramatists, are also essentially writers of melodramas. Rabindra Nath's dramas form a class by themselves. Most of them are literary jewels, but with the exception of a few, they cannot take the place of dramas for the people.

(খ)

ভারতবিখ্যাত বহুরূপী সম্প্রদায় হালে তাঁদের অনুরাগীদের নিয়ে একটি স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় কাশিমবাজারের রাজবাড়ীর লনে 'মেলা-মেশা' করেছিলেন। সেই মেলা-মেশায় বহুরূপীর পক্ষ থেকে বলা হয় যে, ঘন-ঘন নাটক পরিবেশন করে তাঁরা তাদের অনুগ্রাহকদের খুসি রাখতে পারছেন না যে-যে কারণগুলির জন্য, তাদের মাঝে নাটকের অভাব একটি প্রধান কারণ। অপ্রধান নয়, এমন আরো দুটি কারণ হচ্ছে, তাঁদের নিজস্ব নাট্যগৃহের অভাব এবং টাকার অভাব।

(গ)

মঞ্চমুগ্ধ নামক একটি প্রতিষ্ঠান গত দশ বছরের শ্রেষ্ঠ নাটক হিসাবে সত্যিকারের শ্রেষ্ঠ নাটকের রচয়িতাকে এবং বর্তমান বর্ষেরও শ্রেষ্ঠ নাটক রচয়িতাকে দুটি পুরস্কার দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। প্রত্যেকটি পুরস্কার নগদ এক হাজার টাকা।

মঞ্চমুগ্ধ কিন্তু বিচারের ভার গ্রহণ করেননি। তাঁরা সে ভার অর্পণ করেছেন তাঁদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন কয়েকজন নাট্যরসিক বলে পরিচিত ব্যক্তির ওপর। আমিও তাদের মাঝে স্থান পেয়েছিলাম। কিন্তু আমার আর তুলসী লাহিড়ীর বিচারক হিসেবে থাকা সম্ভব হলো না। কেন না বিগত দশ বছরে-লেখা আমাদের কিছু কিছু নাটকেরও বিচার হবে। আমরা সরে এলাম। বিচারকদের মাঝে একজন স্পষ্ট বল্লেন তাঁর বদ্ধমূল ধারণা, বাংলা ভাষায় নাটক নেই। আমার আর তুলসী লাহিড়ীর জায়গায় যাঁদেরকে নেওয়া হয়েছে, তাঁদের ধারণা কি, তা নটরাজই জানেন।

(ঘ)

একজন মঞ্চ-পরিচালক হাঁক-ডাক করেই বলেন রাশি-রাশি নাটকের পাণ্ডুলিপি তিনি পড়ে দেখেছেন—কিন্তু একখানাও নাটক পাননি। বাধ্য হয়ে নাটক মঞ্চস্থ করবার প্রয়াস ছেড়ে দিয়ে তিনি উপন্যাসই সংলাপের ভিতর দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করেছেন এবং সুফলও পাচ্ছেন।

(ঙ)

প্রগ্রেসিভ নাট্যকে দলগুলির অনেক খ্যাতনামা অভিনেতা-অভিনেত্রী নাট্যশাস্ত্র পড়বার জন্য ওয়েস্ট-বেঙ্গল সংগীত-নৃত্য-নাটক আকাদেমীতে ছাত্র বা ছাত্রী হিসেবে নাম লিখিয়েছেন। তাদের কেউ কেউ কোন সময়ে বলতেন বাংলা নাট্যশালার দোষেই বাংলায় না হচ্ছে নাটক, না হচ্ছে অভিনয়, না হচ্ছে নাটকের প্রডাকশন। কিন্তু আকাদেমীতে যে গুরুদেব কাছে তাঁরা শিক্ষা গ্রহণ করছেন, তাঁদের মাঝে স্বয়ং নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, সন্তোষ সিংহ এবং সতু সেন বাংলা নাট্যশালাতেই এতদিন শিক্ষকতা ও পরিচালনা করে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন।

— দুই —

প্রবন্ধ লেখকরা, প্রয়োগকর্তারা এবং প্রগ্রেসিভরা সকলেই যে-কালে বলছেন নাটক নেই, সে-কালে আমার মতো একজন তথা-কথিত নাটক লিখিয়ের পক্ষে প্রমাণ করা সম্ভব নয় যে, নাটক বাংলা দেশে আছে এবং কিছু কিছু নাটকের সাহিত্যগুণও আছে, সাধারণের মনোরঞ্জন করেছে অসংখ্য নাটক। আসলে আমি ত একজন আসামী। আসামী বিচারক হলে তার রায় কেউ মানে না। কিন্তু চোর চুরি করে কেন, তা চোরই কেবল জানে; সাক্ষী-সাবুদের মুখ থেকে শুনে দলিল-পত্র দেখে বিচারক সব সময়ে তা জানবার সুযোগ পান না। আর যা জানতে পারেন, তাও মেনে নেন না; মানেন আইন। তাই আইনের বিচার সর্বত্র যথোচিত বিচার হয় না। আইন অমান্যের নৈতিক সমর্থন রয়েছে আইনকে কেবল বিধি-নিষেধে সীমাবদ্ধ রাখা অন্যায় বলে, অসঙ্গত বলে। আইনকে যদি মানবতার ওপর প্রতিষ্ঠা দেওয়া যায়, তা হলে আর আইন-অমান্যের নৈতিক সমর্থন থাকে না। মানুষের সকল প্রয়াসে, সকল সৃষ্টিতে, এই মানবতাই হচ্ছে বড় কথা। নাটকেও তাই, সাহিত্যেও তাই। সাহিত্য আকাদেমী প্রকাশিত যে বইখানা আমাকে এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার প্রেরণা দিয়েছে, তারই মুখবন্ধে সাহিত্য আকাদেমীর ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ডক্টর রাধাকৃষ্ণন লিখেছেনঃ—

Literature must voice the past, reflect the present, and mould the future. Inspired language, *Tejomayi Vak*, will help readers to develop a humane and liberal out look on life, to understand the world in which they live, to understand themselves and plan sensibly for their future.

ডক্টর রাধাকৃষ্ণন যা বলেছেন, তা নিয়ে যাঁরা তর্ক তুলবেন না, মেনে নেবেন, তাঁরা যদি নিরপেক্ষ মন নিয়ে বাংলা নাটকে ওই গুণগুলি আছে কিনা সন্ধান করে দেখেন, তাহলে নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন অনেক বাংলা নাটক, সবগুলি গুণের অধিকারী না হলেও, অনেকগুলি গুণের অধিকারী। দোষ নেই, তা বলি না। দোষ-মুক্ত আদর্শ কোন নাটক, উপন্যাস, পৃথিবীতে আছে বলে শুনিনি।

সেক্সপীয়ার মলিয়ার এ দেশে জন্মাননি বলেই যে, এ দেশের নাটকের গুণগুলি স্বীকৃতি পেতে পারেই না, তাদের দোষগুলির জন্য চিরদিনই অচ্ছুতের পর্যায়ে পড়ে থাকবে, এমন কথা কিন্তু

জাহির করবার জন্য বলা যায়, ন্যায়সংগতভাবে বলা যায় না। সৌভাগ্যবশতঃ নাটক যাঁরা দেখেন সে লক্ষ লক্ষ সহর-পল্লীর শিক্ষিত অশিক্ষিত দর্শকরা তা বলেন না। তাঁদেরই কল্যাণে বাংলার নাটক ও নাট্যশালা শতবর্ষ বেঁচে আছে এবং তাঁদেরই তাগিদে নাট্যশালার বহিরাঙ্গ অনেক সুশোভন হয়েছে, নাটকও তাঁদেরই তাগিদে উন্নত হবে। নাটক নিজে উঠ্‌তে পারে না। জনগণের ওঠবার প্রয়াসকে অবলম্বন করেই নাটক ঊর্দ্ধে ওঠে এবং তাই উঠে, অপেক্ষাকৃত ঊর্ধতর স্তর থেকেই জনগণকে তাদের স্বরূপের পরিচয় দেয়।

(ক)

এইবার আবার ওদুদ সাহেবের কথায় ফিরে আসা যাক্। তিনি যা লিখেছেন, তা লেখবার অধিকার অবশ্যই তাঁর আছে। প্রকৃত পণ্ডিতরা অনধিকার চর্চা করেন না। কিন্তু সাহিত্য আকাদেমী প্রবন্ধটির আলোচ্য অংশটি ছেপে ভালো কাজ করেন নি। ওটি হচ্ছে ওদুদ সাহেবের ব্যক্তিগত মত। আকাদেমী প্রকাশিত কোন সাহিত্য পরিচিতিতে কোন ব্যক্তি 'ওপিনিয়ন' দিয়েই একটা বিষয়ের শেষ মীমাংসা করে ফেলা সংগত নয় অন্যায়। অন্য ভাষার সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁরা প্রবন্ধ লিখেছেন, তাঁরা নাটক আলোচনা প্রসঙ্গে ওদুদ সাহেবের মতো ওপিনিয়ন-সর্বস্ব হননি। তাঁরা বলেননি যে, তাঁদের সাহিত্যে বৃহৎ নাটকীয় সৃষ্টি রয়েছে। অনেকেই বলেছেন তাঁদেরও নাট্য-সাহিত্য দুর্বল। কিন্তু সকলেই সমসাময়িক নাট্যসাহিত্যের প্রয়াসের পরিচয় দিয়েছেন। ওদুদ সাহেব তা দিলে কারু কিছু বলবার ছিল না। প্রয়াসটাই হচ্ছে বড় কথা, জিনিয়াস কেন হয় না, তাই নিয়ে আফ্‌শোষ বড় কথা নয়। জিনিয়াস প্রবন্ধ লিখে সৃষ্টি করা যায় না। কিন্তু সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধে যদি সাহিত্যিক প্রয়াসের পরিচয় না দিয়ে জিনিয়াস বন্দনা করেই প্রবন্ধ সমাপ্ত করা হয়, তাহলে তাকে আদর্শ প্রবন্ধ বলা চলে না এবং সাহিত্য আকাদেমীও যদি তেমন প্রবন্ধ তাঁদের প্রকাশিত পুস্তকে স্থান দেন, তাহলে আকাদেমীও সৎ সাহিত্য প্রচারের মর্যাদা দাবী করতে পারেন না। অ-বাঙ্গালী যে-কেউ ওই বইখানি পড়বে, সে-ই ধরে নেবে ভারতের সবগুলি রাজ্যেই নাট্য প্রয়াস রয়েছে, নেই শুধু বাংলায়, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে। কথাটা সত্য নয়। একটা বিশেষ ভাষাভাষী সম্বন্ধে অযথা কোন একটা মিথ্যে ধারণা যাতে না সৃষ্টি হয়, আকাদেমীর সম্পাদকের সে-দিকে নজর রাখা উচিৎ ছিল। কিন্তু তিনিও তা রাখা প্রয়োজন মনে করেননি, ওদুদ সাহেবের ওপিনিয়নকে বাংলার সকল নাট্যপ্রয়াসের চেয়ে মূল্যবান বলে মেনে নিয়েছেন। ওদুদ সাহেব নাটক সম্বন্ধে মাইকেলের নামোল্লেখও করেননি। অথচ মাইকেলেরই দু'খানা নাটক হিন্দীতে তর্জমা করবার দায়িত্ব ওই সাহিত্য আকাদেমীই নিয়েছেন। যাঁর দু'খানা নাটক অনুবাদ করবার দায়িত্ব আকাদেমী নিয়েছেন, তাঁরও নামোল্লেখ করা হয়নি দেখেও বইখানি যিনি সম্পাদনা করেছেন, তাঁর হুঁস হোল না!

ওদুদ সাহেব মেলোড্রামাকেই সর্বনাশের মূল কারণ বলে ধরেছেন এবং বলেছেন 'নীলদর্পণ' যে আদর্শ স্থাপন করেছিল, মেলোড্রামার অভিযানের ফলে তা ব্যর্থ হয়ে গেল। নীলদর্পণ যদি মেলোড্রামা না হয়, তাহলে প্রফুল্ল, বলিদান, শাস্তি কি শান্তি মেলোড্রামা হবে কেন? সংগঠনের দিক দিয়ে নীলদর্পণের চেয়ে শেষোক্ত তিনখানিকে নিরেস বলবার কী কারণ আছে? ওদুদ সাহেব তা বুঝিয়ে দেননি।

বাংলার বহু উপন্যাস নাটকে রূপান্তরিত হয়েছে। সেগুলির নাট্যরূপ সকল মৌলিক-নাটকের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর রূপ পায়নি। পায়নি কেবল নাট্যরূপদাতাদের বা প্রয়োগ-কর্তাদের অথবা অভিনেতৃদের অক্ষমতার জন্যই নয়, তাদের নিজেদের [illegible] জন্য। বাংলার সকল নামকরা উপন্যাসই মেলোড্রামার উপাদান থেকে মুক্ত নয়। আর মেলোড্রামা বৃহৎ সৃষ্টি না হলেও, ব্যর্থ সৃষ্টি নয়। বাংলা নাটকেও বৃহৎ সৃষ্টি রয়েছে। আর কিছু না থাকুক রবীন্দ্রনাথ কিছু বৃহৎ সৃষ্টি করেছিলেন ওদুদ সাহেবই বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল বিগত হননি। তিনি জীবিত ছিলেন যখন, তখন সকল বিদগ্ধও তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব বোঝেননি; অনেকেই বলেছেন তা নাটক হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ নাটকের একটা ট্রাডিশন তৈরী করতে চেয়েছিলেন। তিনি তা পারেন নি। মাইকেল, দীনবন্ধু, গিরিশ, দ্বিজেন্দ্রলাল পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই ট্রাডিশানে ফাটল ধরিয়ে গেছেন। আর সেই ফাটল বাড়িয়ে দিয়েছে ইউরোপ আমেরিকা আগত নানা রকমের, নানা ধরণের, ছোট-বড় নাটকীয় ধাক্কা এবং আজকার দুনিয়ার নানা সমস্যা।

রবীন্দ্রনাথের নাটককে আদর্শ করে আজ একটা ট্রাডিশন হয়ত গড়ে উঠত। কিন্তু এলো বাস্তুহারা

তপন সিংহ পরিচালিত ও এল বি ফিল্মস্ নিবেদিত জরাসন্ধের জনপ্রিয় কাহিনীর চিত্ররূপ "লৌহ-কপাট"-এ কান্তির ভূমিকায় মালা সিন্‌হা।

এলো নিম্নমধ্যবিত্তদের অবর্ণনীয় দুর্দশা, প্রগাঢ় হতাশা। নবীন নাটক লিখিয়েরা এই জাতীয় দুর্ভাগ্যকে তুচ্ছ মনে করে বৃহৎ সৃষ্টির ধ্যান ও ধারণায় আত্মনিয়োগ করতে পারলেন না। অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, নাটকেও এসে পড়ল। রাজনীতি এলো বলে দলাদলিও এল। আর দলাদলি এল বলেই একদেশদর্শিতাও এল, এল ফ্রাস্ট্রেশন আর এস্‌কেপিজম। নাটককে অবলম্বন করে জাতির মানুষের এই তিন অবস্থা প্রকাশ পাচ্ছে। তাই যেমন কৃষক, শ্রমিক, কেরাণী, মাষ্টার, বেকার এসেছে নাটকে, তেমন এসেছে বিদেশী নাটকের রূপারোপের ধাক্কা, তেমনই এসেছে উপন্যাসের নাট্যরূপের প্লাবন। নানা স্তরের, নানা মতের মানুষ তাদের রুচি অনুযায়ী নাটক দেখছে। নাটক সম্বন্ধে হতাশ হবার সময় এটা নয়। তবে নাটক সম্বন্ধে জানা-অনেক-কথা ভোলবার এবং না জানা অনেক কথা জানবার, আর মানবারও, সময় এটা। সেক্সপীয়ার-ইবসেন এদেশে জন্মাবেন না। যে দেশে তাঁরা জন্মেছিলেন, সে দেশেও না। কিন্তু তা না এ দেশের, না সে দেশের, দুর্ভাগ্যের কথা। তাঁরা ত অমরই রয়েছেন। আগে ছিলেন সাত-সমুদ্রুরের পরপারে, আজ রয়েছেন পৃথিবীর সকল শিক্ষিতের শেল্‌ফে শেল্‌ফে। মানুষের এবং মনুষ্যত্বের মান নির্ণয়ের দিনে অমর আর মুমূর্ষুদের কাছ থেকে প্রেরণা পেতে পেতে নাটক যে নতুন রূপ পরিগ্রহ করচে, সারা বিশ্বের নাট্যপ্রয়াসের ভিতর দিয়ে তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। সে পরিচয় এই পোড়া বাংলা দেশেও পাওয়া যায়।

(খ)

এইবার বহুরূপীর সংকটের কথায় আসা যাক। বহুরূপী নাটক পাচ্ছেন না। সকলেই কিছু যে-কোন নাটক অভিনয় করবার প্রেরণা পেতে পারেন না, যদি না অভিনয়কে পেশা করে নেন। বহুরূপীকে প্রেরণা দিতে পারে এমন নাটক যখন নেই, তখন বহুরূপীকে হয় এই পোড়া দেশ পরিত্যাগ করে নাটক-সুলভ কোন দেশে চলে যেতে হয়, নয় অভিনয় ছেড়ে দিতে হয়, নয়ত কালে-ভদ্রে নাটক পেলে তার অভিনয় করে শিল্প-সাধনার তাগিদ মেটাতে হয়। তিনটের কোন একটাও সমস্যার সমাধান নয়। তাঁদের দ্বিতীয় সংকট তাঁদের নিজস্ব গৃহ নেই। কিন্তু নাটকই যদি না পান, গৃহ তৈরী করে দিলেও সে-গৃহে তাঁরা অভিনয় করতে পারবেন না। কালে-ভদ্রে অভিনয় করেও তাঁরা গৃহ আয়ত্তে রাখতে পারবেন না। গৃহ আয়ত্তে রাখবার জন্য নাট্যশালাকে অনেক কিছু করতে হয়; খারাপ নাটক অভিনয় করতে হয়, ছুটির দিনে পাল পার্বণে দিনে দু'বার অভিনয় করতে হয়, সারারাতও অভিনয় করতে হয় কখনো কখনো। শুধু গৃহ আয়ত্তে রাখবার তাগিদেই ওর অনেক কিছু করতে হয়।

বহুরূপী কিছু দিন মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয় করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। সে-সুযোগ তাঁরা যদি কাজে লাগাতে পারতেন, তাহলে ওই গৃহে তাঁরা অনেক দিন থাকতে পারতেন। কিন্তু ওই গৃহটি এবং বাংলা নাট্যশালার সামগ্রিক পরিবেশটিই তাঁদের ভালো লাগে না। তাঁরা ওখানে থাকবার চেষ্টা না করে চলে আসেন। কাজেই গৃহ-সমস্যাটা শুধু গৃহেরই সমস্যা নয়, তাঁদের মনের মতো গৃহ আর পরিবেশ পাবারও সমস্যা। কে তাঁদের হয়ে এই সমস্যার সমাধান করে দেবে তাঁদেরই অভীপ্সা অনুসারে? তাঁদের পরিচালক বলেন, কেউ যদি তাঁদেরকে জমি দেয়, তাঁরা বাড়ী করবার টাকা তুলতে পারবেন বলে ভরসা রাখেন। তিনি আরো বলেন, সরকার যদি তাঁদেরকে ঋণ দেন অথবা বাড়ী তৈরী করে দেন, তাহলে টাকা পরিশোধ করবার দায়িত্ব তাঁরা গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের অনুরক্ত কেউ জমিও দিতে পারেন, টাকাও দিতে পারেন। কিন্তু তেমন লোক তাঁদের জানা নেই। সরকার কোন একটি প্রতিষ্ঠানকে এ-রকম ঋণ দিয়ে থাকেন কিনা, আমি জানি না। তবে কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠান গড়ে কিছু টাকা তুলে কাজ সুরু করলে বোধ করি সরকার থেকে কিছু টাকা পাওয়া যেতে পারে। তাতে হয়ত বহুরূপীর গৃহ সমস্যার সমাধান হতে পারে। কিন্তু নাটক নিয়ে যে সমস্যায় তাঁরা পড়েছেন, তার সমাধান কি করে হবে? অবশ্য শুধু রবীন্দ্র-নাটক নিয়েই একটা প্রতিষ্ঠান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে দেশের ও নাট্য-শিল্পের হিত করতে পারেন। কিন্তু তা করেও বহুরূপী গৃহ আর সম্প্রদায় দু'টোকেই কায়েম রাখতে পারবেন কিনা সন্দেহ। ওর জন্য প্রচুর টাকার দরকার। একমাত্র সরকারই কেবল তা দিতে পারেন। কিন্তু বিষয়টিকে বহুরূপী যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন, সরকার যে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবেনই অথবা

(শেষাংশ ২৫৬ পৃষ্ঠায়)

পণ্ডিত মশায় — দেবকীকুমার বসু

[এটা গল্প নয়, সত্য কথা। নাম বদলে লিখেছি—গোপন কর্বার জন্য নয়, কর্তব্য বলে।]

প্রায় ত্রিশ বছর পরে দেখা হোলো পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে। খুব বৃদ্ধ হয়ে গেছেন তবু সেদিনের মতই চলা, ভঙ্গী, কথা: শুধু যেন একটু ক্লান্ত। আগে তাঁর ক্লান্তি ছিল না। তীক্ষ্ণ চোখ, মুখ—কথায়, ভঙ্গীতে কোন দ্বিধা ছিল না। আজও ঠিক তেমনি, শুধু কোথাও যেন একটু মেঘ জমেছে—বোধ হয়, বার্ধক্যের।

প্রথম পরিচয়ে পণ্ডিত মশায়ের বয়স ছিল মাত্র ৩৩।৩৪ কিন্তু দেখে মনে হোতো বয়স ঢের বেশী—অসুস্থতায় নয়, গাম্ভীর্যে। গায়ে মোটা চাদর, মাঝে মাঝে আধা-হাতের একটা জামা— জুতো কোনদিন পরতেন না। বর্ষায় মোটা ছাতলের একটা ছাতা, আর শীতকালে গায়ের মোটা চাদরটা আরও মোটা হোতো। কলেজে সংস্কৃত পড়াতেন, চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে —আমি তাঁর ছাত্র—ইংরাজী ১৯২১ সাল। পড়াশুনা করতাম না, ফুটবল দেখা আর খেলা; প্রতি সপ্তাহে থিয়েটার দেখা আর মাসে গড়পড়তা একবার হয় দেশে, নয় কলকাতার ক্লাবে থিয়েটার করা। পণ্ডিত মশায় শুনেছিলেন আমার গুণের কথা। বিরক্ত হোতেন বুঝতে পারতাম। কলেজে যেদিন প্রথম ছাত্রদের থিয়েটার হোলো, শিক্ষকরা সবাই এসেছিলেন, পণ্ডিত মশায় আসেন নাই। য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের ডায়েস-এর উপর মঞ্চে অভিনয় করছি, অভিনয় সুরু হবার প্রথম ঘণ্টা বেজে গেছে, ঐকতান বাজছে, পিছনের গ্রীণরুম-এ পোষাক আঁটতে জুতো খুলে যাচ্ছে —সস্নেহে জুতোর ফিতে ঠিক করে দিচ্ছেন ইংরেজীর প্রফেসর, কলেজে ইংরাজী কাব্য পড়াবার সময় যাঁর বাচনভঙ্গীতে মুগ্ধ হতাম আমরা সবাই—তিনি জুতোর ফিতে ঠিক করে দিচ্ছেন! মনে হোলো—অভিনয়ের পূর্বে যে ঐকতান বাজে তার চেয়ে মধুর বোধহয় জগতে আর কিছুই নাই। তখুনি পণ্ডিত মশায়ের কথা মনে হোলো, ঐকতান তখন বন্ধ হয়ে গেছে—সব একটা ফাঁকা—তারপর হুড়োহুড়ি। "ড্রপ উঠেছে।" "আমার সোর্ডটা কই", কেউ বলে "আমার দাড়ি!" কি বিশ্রী একটা ডিস্‌কর্ড! দশ বছর পরে চলচ্চিত্রে প্রবেশ করে' ভেবেছিলাম যে, নাটকে যতই ঘাত-প্রতিঘাত থাকুক ভেতরে ব্যাকগ্রাউন্ডএ একটা ঐকতান না থাকলে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত জীবনের সত্যিকার ঘাত-প্রতিঘাতের চেয়েও কঠিন হয়ে ওঠে। নাটকে বাস্তবতা ভাল, কিন্তু অতি-বাস্তবতা নাটকও নয়, বাস্তবও নয়।

কিন্তু এসব ভাবলে কি হবে। দুদিন পরে কলেজে যখন প্রফেসরেরা আমায় ডেকে ডেকে সেদিনের অভিনয়ের জন্য আমার প্রশংসা করছেন তখন কানে এলো পণ্ডিতমশায় কাকে বলছেন, 'জীবনটা থিয়েটার নয়'। ভাবলাম কোন দুর্ভাগা ছাত্রটির উপর এই অমোঘ বাণ বিদ্ধ হোলো. ভয়ে ভয়ে দূর থেকে চেয়ে দেখলাম সে ছাত্র নয়, তিনি প্রফেসর অংকুশ ব্যানার্জি—কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল দোর্দণ্ডপ্রতাপ এ, সি, বি—পণ্ডিত মশায় তাঁকেই বলছেন "জীবনটা থিয়েটার নয়—!" পালিয়ে গেলাম।

তারপর হঠাৎ কলেজ থেকেই চলে গেলাম। কলেজ ছেড়ে, লেখাপড়া ছেড়ে। অসহযোগ আন্দোলন, ইংরাজের শিক্ষালয় ছেড়ে দিতে বল্লেন নেতারা, তাঁদের সঙ্গে গেলাম বেরিয়ে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের কি একটা বড় বাড়ীতে—শুনলাম এইখানে আমাদের স্বদেশী কলেজ হবে। তার পূর্বে দেশের নানা কাজ আছে। কত কি করলাম। একদিন আদেশ হোলো তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ করতে হবে, গেলাম। হঠাৎ মন্দিরের পাশে পুকুরের ধারে দেখা পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে। থিয়েটার করা ছেড়ে দেশের কাজ করছি তাই বুকে স্বদেশী শক্তি নিয়ে ওঁর সামনে দাঁড়ালাম—বল্লাম "আমি সত্যাগ্রহী"।

কেন!"

এ কি সাংঘাতিক প্রশ্ন—সারা দেশ যাতে মেতে উঠলো সেটা তো প্রশ্নেরই বাইরে। বল্লেন "তুমি জান সত্যাগ্রহ মানে কি।" জবাবটা যখন ভাবছি নেতাদের বক্তৃতা অনুসরণ আর অনুকরণ করে তখন হঠাৎ এই মন্দিরে সেই শক্তিশেল আবার আমারই উপর,—বল্লেন "জীবনটা নিয়ে থিয়েটার করছো!" মনে ব্যথা পেলাম। ব্যথা নয়, সেদিন রাগ হয়েছিল। ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বুকে সাহস বেড়েছিল, মুখে জবাব উঠেছিল কিন্তু সেটা দেবতার মন্দির, আর আমি সেদিন সত্যাগ্রহী, তাই বিনয়ের গর্বে আমি চুপ করে গিয়েছিলাম।

তারপর সাত বছর অসহযোগ আন্দোলনের নানা কাজে ঘুরলাম—ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে লোকের দুয়ারে দুয়ারে গিয়েছি। মোটা খদ্দরের কাপড়, চাদর, জামা, পায়ে জুতো নেই। আমার জেলার গ্রামে গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের বোঝাবার চেষ্টা করেছি—নেতাদের বাণী।

কেউ বুঝেছে, কেউ বোঝে নাই, কেউ গাল দিয়েছে। গ্রামের হাটে বাজারে মদের দোকানের সামনে দুয়ার রোধ করে শুয়ে পড়েছি—কেউ ফিরে গেছে, কেউ ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকেছে তার কিছু পরে ঘরের ভেতরের শক্তিতে যে গাল দিয়েছে, সে গাল সেদিনের শ্রেষ্ঠ সত্যাগ্রহীদেরও কানে আঙুল দিয়ে তবে সহ্য করতে হয়েছে।

বাইরে এই লাঞ্ছনা—ঘরের লাঞ্ছনা আরও বেশী। অভিভাবকদের আশা ছিল জেলা আদালতের ভাল উকিল হব, জেলায় গণ্যমান্য হব। ওকালতি আমাদের পৈতৃক আর মাতৃক দুই ধারাতেই প্রবাহিত। সেই আদালতের সামনে "ইংরাজেরা আদালত ছাড়ুন" বলে দাঁড়ালাম, তখন পিতৃবন্ধুরা রেগে উঠলেন। একজন অভিভাবক বল্লেন, "উচ্ছন্নে গেল একেবারে—" আর একজন বল্লেন—"পেট চলবে কি করে।"

পেট চলা আর 'উচ্ছন্নে যাওয়া—কোনটাই গ্রাহ্য করলাম না—কিন্তু নস্যির পয়সা চাই। মাদক বর্জনের বিরুদ্ধে যে অভিযান তাতে মদ ও সিগারেট টারগেট হয়েছে, নস্য হয় নাই। তাই নস্য ব্যবহার বেড়েই গেছে। শেষে দেশের কাজ করতে করতে নিজের কাজও কিছু সুরু হোলো—একটি ছাপাখানায় প্রুফ দেখতে সুরু করলাম। নস্য কেন, চায়ের খরচাও উঠে গেল। তারপর সেই ছাপাখানার একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকার দেখাশুনোর ভার নিলাম—তারপর একদিন সম্পাদক হয়ে গেলাম। কাজে যেটা বেশী করতে পারি নাই, লেখায় তা বাড়াবাড়িই করতে লাগলাম। প্রতি সপ্তাহে তীব্র সমালোচনা করি—ইংরাজ শাসনের ইংরাজ জাতির। ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের কল কেমন করে দেশের তন্তুবায়দের হাত মুচড়ে ভেঙে দিল সেই কথা লিখতে ইংরাজকে মহাভারতের দুঃশাসন বল্লাম। জেলার ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট শুনেছিলেম আমার স্বর্গত বাবা আদালতের বড় উকিল ছিলেন, এবং বিশেষ সুনাম ছিল তাঁর মানুষ হিসেবেও। সাহেব নিজের বাংলোয় আমায় ডেকে পাঠিয়ে বল্লেন—ঐ রকম আর লিখলে হাজতে পাঠান ছাড়া তাঁর আর কোন উপায় থাকবে না। অভিভাবকরা, পিতৃবন্ধুরা শুনে বল্লেন—"এইবার ঠিক হয়েছে"।

কিন্তু তাঁদের অভিসম্পাত ফললো না। থিয়েটারের সেই পুরোনো নেশা কখন আমায় মাতাল করে জেলখানার দরজা থেকে একবারে কলকাতার চলচ্চিত্র ষ্টুডিও-এর দরজায় ঠেলে নিয়ে গেল সে আমি নিজেও বুঝতে পারি নাই। মনে হচ্ছে দমদমের পথে ষ্টুডিওতে যেতে যেতে মনে হোল টাকা রোজগার হলে বোধহয় অভিভাবক ও পিতৃবন্ধুদের গাল থেকে অব্যাহতি পাব। উল্টো হোলো—শুনলাম আমি কুলাঙ্গার!—ফিল্ম করা! নট-নটী!—হঠাৎ আমার মনে হোলো পণ্ডিত মশাইর কথা! এ বোধহয় তাঁরই অভিসম্পাত—'জীবনটা থিয়েটার নয়—' থিয়েটার না হয়ে চলচ্চিত্র হলে কি পাপ কম হবে!

তারপর এক যুগ কেটে গেল। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, প্রদেশের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী এঁদের সঙ্গে পরিচয় হোলো চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। নাম ও টাকার মাধ্যমে পিতৃবন্ধু, অভিভাবকের সঙ্গে পুনর্মিলন হোলো। চলচ্চিত্রে নামবার প্রায় ২৯ বছর পরে গ্রামে গেলাম—পৈতৃক বাড়ী—ঐখানে একদিন বংশমর্যাদা নষ্ট করার অপবাদে আত্মীয়দের কাছে বংশের কলঙ্ক নাম পেয়েছিলাম। ২৯ বছর পরে গ্রামের ইস্কুলে আমার সম্বর্ধনা হোলো, ওখানকার হেড পণ্ডিত আমায় স্তুতি করে গান রচনা করলেন, ছাত্ররা গাইলো সেই গান—শুনলাম আমি বংশের (কলঙ্ক নয়) কুলপ্রদীপ। মনে হোলো এই পণ্ডিত মহাশয় সেই পণ্ডিত মশায়ের নিশ্চয়ই কেউ নন।

চলচ্চিত্রে প্রবেশ করে যখন কুলাঙ্গার আখ্যা পেয়েছিলাম তখন থেকে আমার পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে আর দেখাও হয় নাই। আজ দেশ থেকে কুলপ্রদীপ হয়ে যখন সহরে ফিরে এলাম তখন হঠাৎ দেখা পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে! ষ্টুডিও যাচ্ছি খুবই ব্যস্ত হয়ে, মেজাজটা সম্বন্ধেও সুনাম নাই। হঠাৎ গাড়ীতে উঠতে গিয়ে দেখা —পণ্ডিত মশাই।

"তুমি দেবকী—"

আজ্ঞে বলে প্রণাম করলাম। প্রণাম আপনি এলো।

"কাজে যাচ্ছো?'

"তা হোক্—আসুন ভেতরে—"

(শেষাংশ ২৫৪ পৃষ্ঠায়)

শ্রীরামকৃষ্ণ ও রঙ্গমঞ্চ

দেবনারায়ণ গুপ্ত

আমাদের দেশে যাত্রা বা পালা গানের রেওয়াজ বহুদিনের। ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে চন্দ্রশেখরের গৃহে নিমাই পণ্ডিতের দল 'রুক্মিণী সংবাদ' পালা অভিনয় করেছিলেন তার প্রমাণ আমরা পাই। শুধু তাই নয়, সে অভিনয়ে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন নিমাই পণ্ডিত অর্থাৎ চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ, হরিদাস, অদ্বৈত, শ্রীবাস, রামাই পণ্ডিত ও আরো অনেকে। বৈষ্ণব ভক্ত এবং পণ্ডিতেরা অভিনয়ের মাধ্যমে লোকশিক্ষা দানের উদ্দেশ্যেই পালা গানের প্রবর্তন করেন।

এরপর দেশে পালাগানের প্রচলন ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়। দেশের লোক নাট্যাভিনয়ের প্রতি বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠেন। দাক্ষিণাত্যের পরম বৈষ্ণব ও সুপণ্ডিত রায় রামানন্দ নিজে নাটক রচনা করে ষোড়শী যুবতীদের নিজে হাতে বেশবিন্যাস করিয়ে অভিনয়ের রস-গ্রহণ করে 'রস বৈস রস ভাবঃ' প্রাপ্ত হতেন। ভক্তের পক্ষে চিত্ত-শুদ্ধির অন্যতম উপায় অভিনয় দর্শনে ভাব-গ্রহণ করা। রায় রামানন্দ রচিত 'জগন্নাথ-বল্লভ নাটক' সে যুগে ভক্ত হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আমাদের দেশে মানুষের কল্যাণের জন্যে এইভাবেই নাট্য-রচনা ও নাটকাভিনয়ের প্রয়োজন হয়েছিল।

নাটকাভিনয়ের প্রতি বাংলাদেশের লোক বেশী আগ্রহশীল হয়ে ওঠেন, ইংরেজ রাজত্বের গোড়ার দিকে। এর কারণ বোধ হয় এই যে, পরাধীনতার গ্লানিতে দেশের লোকের দেহ মন যখন বিষিয়ে উঠেছিল, ঠিক সেই সময় তাঁরা তাঁদের হৃতসর্বস্বকে মানুষের চোখের সম্মুখে তুলে ধরে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে আগ্রহশীল হয়ে উঠেছিলেন।

বাংলাদেশের যাত্রার দল ও সাধারণ নাট্যশালা দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির পথে যে যথেষ্ট সহায়তা করে এসেছে, সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই।

দীর্ঘদিন ধরে বাংলা ও বাঙ্গালী নাট্য-সাধনায় রত ছিল। ইংরেজরা ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় থিয়েটার করা সুরু করলে, ইংরেজদের অভিনয়-কলা-পদ্ধতির অনুসরণে বাংলা নাটককে পালাগানের আসর থেকে থিয়েটারে রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলতে থাকে। ১৮৫৭-১৮৭১ সাল পর্যন্ত কলিকাতা সহরের বিভিন্ন স্থানে নাটককে নাট্য-মঞ্চে অর্থাৎ থিয়েটারে যথাযথ-রূপ দেবার চেষ্টা চলতে থাকে। ১৮৭২ সালে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনও পর্যন্ত স্ত্রী ভূমিকাগুলি পুরুষেরাই অভিনয় করতেন। এ সময় অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি একদিকে যেমন মঞ্চের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন, অপরদিকে আবার বহু শিক্ষিত ব্যক্তি থিয়েটার বা অভিনয় করা যে বখাটে ছেলেদের কাজ, এমন অভিমতও ব্যক্ত করতেন।

১৮৭৩ সালে বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই থিয়েটারে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে সর্বপ্রথম স্ত্রী ভূমিকাগুলি মেয়েদের দ্বারা অভিনীত হয়। যাঁদের চোখে এতদিন থিয়েটার করা বখাটে ছেলেদের কাজ ছিল, তাঁরা মেয়েদের নিয়ে অভিনয় করায় একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। আবার বিলাসী মানুষের দল চুনোট করা জামা-কাপড়ে আতর মেখে, হাতে বেলফুলের মালা জড়িয়ে অভিনয়-আসরে এসে রাত্রি যাপন করতে লাগলেন। ফলে, থিয়েটার এক সম্প্রদায়ের কাছে অতীব নিন্দনীয় হয়ে উঠল। থিয়েটারের স্বপক্ষ দল অপেক্ষা বিপক্ষ দলই হলেন সংখ্যায় ভারী। অভিনেতারা সমাজে হলেন অপাংক্তেয়। নটের বৃত্তি গ্রহণ করায়, তাঁদের 'নোটো' আখ্যা পেতে হলো। অথচ শাস্ত্রকার বলেছেন—

"ন তজ্ জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
ন স যোগো ন তৎ কর্ম নাট্যেঽস্মিন যন্ন দৃশ্যতে॥"

অর্থাৎ এমন জ্ঞান, বিদ্যা, কৌশল বা কর্ম নেই যা নাটকের মধ্যে নেই। এক কথায় নাটক সর্ব-বিদ্যার আধার। তাই নাট্য-মন্দিরকে অনেকেই বিদ্যা-মন্দিরের ন্যায় পবিত্র স্থান বলে মনে করেন। কিন্তু বাংলাদেশের থিয়েটারকে গোড়ার

রাজেন তরফদার পরিচালিত সিনে আর্ট প্রোডাকসন্সের "অন্তরীক্ষ" চিত্রে নবাগতা কাজল চ্যাটার্জি।

দিকে বহু প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সে সময়ের বহু বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকায় বিরুদ্ধ সমালোচনা স্থান পেয়েছে থিয়েটার সম্পর্কে।

১৮৭৯ সালের ১৯শে এপ্রিল তারিখের "সুলভ সমাচারে" ন্যাশনাল থিয়েটার সম্পর্কে অভিযোগ করে লেখা হয়—

"ন্যাশনাল থিয়েটারের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আসিতেছে। থিয়েটারের লোকেরা মন্দ স্ত্রীলোক লইয়া অভিনয় করে, মদ খায়, অভিনয়-স্থলে মারামারি হুড়োহুড়ি করিয়া দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার করিতেছে দেখিয়াও শিক্ষিত ভদ্রলোক তাহাতে উৎসাহ দিয়া থাকেন, আমোদ করেন, তখন আর এ দুরাচার কে নিবারণ করিবে? এখন আমার বাবুরা নিজের পরিবার লইয়া এই থিয়েটার করিয়া না বসেন, আমাদের আশঙ্কা হইতেছে।"

এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৭৯-১৮৮৩ চার বৎসর কাল বাংলাদেশের থিয়েটারের পরিচালকবর্গকে বহু বাধা-বিঘ্ন ও বিপক্ষ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়।—এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মাঝেই গিরিশচন্দ্র পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে যোগদান করেন এবং সর্বতোভাবে থিয়েটারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। গিরিশচন্দ্রের অকাতর শ্রম ও সাধনাই উত্তরকালে রঙ্গমঞ্চকে মান ও মর্যাদা দান করেছিল। এই সময়ে তিনি অনেকগুলি নাটক রচনা করেন। তন্মধ্যে 'রাবণ-বধ' নাটক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, নিজস্ব নূতন ছন্দে (পরে গৈরিশ ছন্দ নামে খ্যাতিলাভ করে) রচনা করে শিক্ষিত সমাজে বিশেষ প্রশংসালাভ করেন। এই নাটকের অভিনয় দর্শনে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, "এতদিন পরে নাটক রচনার এক নূতন ছন্দ আবিষ্কৃত হোল।" এই সময়ে সাহিত্যিক মহলে গিরিশচন্দ্র কথঞ্চিৎ সমাদর লাভ করলেও সাধারণ মানুষের কাছে তিনি নট বা 'নোটো' আখ্যায় হেয় হয়েই ছিলেন। সেদিন প্রতিভার মূল্য যেমন তিনি পাননি, তেমনি সামাজিক মর্যাদা লাভও তাঁর ভাগ্যে জোটে নি। কিন্তু এর জন্যে গিরিশচন্দ্রের কোন দুঃখ ছিল না। তিনি 'তিরস্কার পুরস্কার কলঙ্ক কণ্ঠের হার' করে নটনাথের সেবা ও সাধনা করে যেতে লাগলেন। তাঁর এ সাধনা সফল হোল, সার্থক হোল, ১৮৮৪ সালের ২রা আগষ্ট। এই দিন ষ্টার রঙ্গমঞ্চে তাঁর 'চৈতন্যলীলা' পাদ-প্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। কলিকাতার ন্যায় বিশাল মহানগরী 'চৈতন্যলীলার' প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল। মঞ্চ-বিমুখ ব্যক্তিরাও দলে দলে 'চৈতন্যলীলার' অভিনয় দেখতে ছুটে এলেন। বিদ্বজ্জন সমাজে 'চৈতন্যলীলা' সম্পর্কে আলোচনা চলতে লাগলো। ফলে থিয়েটার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা নূতন উদ্যম ও উৎসাহ লাভ করলেন। এইভাবে 'চৈতন্যলীলা'র প্রশংসা একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের কানে গিয়ে উঠলো। তিনি ১২৯১ সালের ৫ই আশ্বিন সশিষ্য 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় দেখলেন। মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনির মাঝে তিনি ভাবসমাধিস্থ হলেন। অভিনয় শেষ হোল। চমক ভাঙলো। গিরিশচন্দ্র এলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। জিজ্ঞাসা করলেন—'কেমন দেখলেন?' শ্রীরামকৃষ্ণ স্মিতহাস্যে জানালেন—'আসল আর নকল এক দেখলাম'। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি নকলের মাঝে আসলের সন্ধান পেলেন। এরপর গিরিশচন্দ্রকে একান্ত আপনার করে নিতে ইচ্ছা করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। দুর্বার বাসনা-কামনার বেড়াজাল থেকে গিরিশচন্দ্রকে টেনে আনতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের। মনে যাঁর বাঁক, তাঁর জীবনের মোড় ঘোরান কি সোজা কথা? শেষ পর্যন্ত কিন্তু গিরিশচন্দ্রের জীবনের মোড় একদিন ফিরলো। শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যই তখন হোল তাঁর জীবনের একমাত্র শান্তি ও সান্ত্বনা। যিনি নিত্য-নতুন সৃষ্টির আনন্দে বিভোর হয়ে থাকতেন, তিনিই শেষে একদিন রঙ্গমঞ্চ থেকে অবসর গ্রহণ করতে চাইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পদ-প্রান্তে বসে একদিন মনের কথা ব্যক্ত করে বল্লেন—'আপনাকে পেয়েছি, এখন আবার ও কাজ করা কেন?

(শেষাংশ ২৫৯

এত সমাদর কেন ❋ মহেন্দ্র সরকার

সংখ্যার দিক থেকে ভারতবর্ষ চলচ্চিত্র উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে, প্রথম স্থান মার্কিণের।

মার্কিণ চলচ্চিত্র চীন রাশিয়ার মত সোসালিষ্ট দেশগুলো ছাড়া পৃথিবীর আর সর্বত্রই আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে, সর্বত্রই তার অবাধ গতি, অপ্রতিহত ব্যবসায়।

ভারতীয় চলচ্চিত্র অবশ্য বিদেশে মার্কিণ অথবা বৃটিশ ছবির মত জনপ্রিয়তা বা আধিপত্য লাভ করেনি কিম্বা আমেরিকা-বৃটেনের মত ভারতের বিশ্বজোড়া বাণিজ্যিক জালও পাতা নেই। তথাপি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী যুগে ভারতীয় চলচ্চিত্র ব্যবসায় ধীরে ধীরে ভারতের বাইরে প্রসারলাভ করতে থাকে।

বর্তমানে পাকিস্থান ছাড়াও ভারতীয় ছবি আফগানিস্থান, আরব, পারশ্য, সিরিয়া, মিশর, তুরস্ক, লেবানন, জর্ডন, আবিসিনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নেপাল, ব্রহ্মদেশ, মালয়, শ্যাম, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইনস্ প্রভৃতি দেশে প্রায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রদর্শিত হয়। চীন, জাপান, রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, জার্মাণী, ফ্রান্স, যুগোশ্লাভিয়া, বৃটেন এবং আমেরিকাতেও ভারতীয় ছবি সমাদর লাভ করেছে।

বিদেশে ভারতীয় চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের ক্রম-বিস্তার এমন কিছু আকস্মিক অথবা আশ্চর্য ঘটনা নয়। ভারতীয় চলচ্চিত্রের ক্রমবর্ধমান জন-প্রিয়তা লক্ষ্য করে বরং এদেশের শিল্পীগোষ্ঠী ও বুদ্ধিজীবীদের আত্মপ্রত্যয় ফিরে আসা উচিত।

কাঁচামাল উৎপাদন, কারিগরী দক্ষতা, প্রদর্শন ব্যবস্থার অপ্রাচুর্য, প্রণালীবদ্ধ ব্যবসায় প্রভৃতির অভাব সত্ত্বেও ভারতীয় চলচ্চিত্র তার বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্য, মানবিক আবেদন ও এক অপূর্ব সহনশীলতা সমন্বয় এবং সহঅস্তিত্বের পরিচয় বহন করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জন-প্রিয়তা অর্জন করেছে।

সাধারণভাবে ভারতীয় চলচ্চিত্র বিশ্বের বাজারে যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু গত কয়েক বছরের মধ্যে কিছু কিছু ছবি এমন স্তরে পৌঁছেচে যার ফলে দেশ-বিদেশের বুদ্ধিজীবী, পাণ্ডিত, শিল্পী এবং সাধারণ মানুষের হৃদয় হরণ করতে সমর্থ হয়েছে। এইসব ছবি চলচ্চিত্র শিল্প-রীতিতে বা কারিগরী দক্ষতায় হলিউড, বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালী বা রাশিয়ার ছবির সমগোত্রীয় নয় কিন্তু বিষয়বস্তু, শিল্প সৌন্দর্য ও দৃষ্টি-ভঙ্গির দিক থেকে সারা বিশ্বের প্রশংসা লাভ করেছে। কয়েক বছরের মধ্যেই 'নীচানগর' 'বাবলা', 'দো বিঘা জমীন', 'বিরাজ বহু' 'আওয়ারা' পুরস্কৃত অথবা প্রশংসিত হয়েছে এবং সাম্প্রতিককালে 'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত', কাবুলিওয়ালা', 'একদিন রাতে', বা জাগতে রহো', বৃটেন, ইতালী, ফ্রান্স, চেকো-শ্লোভাকিয়া, জার্মাণির শ্রেষ্ঠ পুরস্কারগুলি অর্জন করে সারা দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 'পথের পাঁচালী' আগের চারটি পুরস্কার ছাড়াও সম্প্রতি এডিনবার্গে সেল্‌জ্‌নিক প্রবর্তিত গোল্ডেন লরেল পদক পেয়েছে, চেকোশ্লোভাকিয়ার কার্লোভি ভারী চলচ্চিত্র উৎসবে 'জাগ্‌তে রহো' বা 'একদিন রাত্রে' গ্র্যাণ্ড প্রিক্স পেয়েছে। 'কাবুলিওয়ালা' পশ্চিম জার্মাণীর আন্তর্জাতিক চিত্র উৎসবে বিভিন্ন দেশের প্রায় ত্রিশখানি ছবির প্রতি-যোগিতার প্রথম পাঁচখানির মধ্যে চতুর্থ স্থান লাভ করেছে কিন্তু সঙ্গীতের বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে নির্বাচিত হয়ে পুরস্কৃত হয়েছে।

এই রাবীন্দ্রিক গল্পটির সূক্ষ্ম ভাবরস ভারতীয় জনতার কাছে যেভাবে অনুভূত হয়েছে, ইউরোপীয় জনতার কাছে সম্ভবতঃ সেভাবে অনুভূত হয়নি। কারণ ভারতীয় জনতার কাছে 'কাবুলিওয়ালা'র আবির্ভাব এবং সেই আবি-র্ভাবের তাৎপর্য উপলব্ধি না করলে দর্শকদের ওপর রহমৎ ও মিনির শাশ্বত সম্পর্কের প্রতি-ক্রিয়ার বৈচিত্র্যও ধরা যাবে না। রুক্ষ পাষাণ থেকে উৎসারিত ঝরণা ধারার মত রহমতের অপূর্ব পিতৃত্ব ভারতীয় জনতার কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, তাই এমন অপূর্ব। কাবুলিওয়ালার নাটকীয় জীবন ও নাটকীয় পরিণতি নিছক

অগ্রগামীর বহির্দৃশ্য-প্রধান "ডাক হরকরা" চিত্রে শোভা সেন ও কালী ব্যানার্জি।

সংঘাতময় বলেই ভারতীয় দর্শকের মনোহরণ করেছে তা নয়, তারা নাটকীয় পরিণতিকে উন্নততর দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখেছে। যমসদৃশ নিষ্ঠুর কাবুলিওয়ালাকে তারা পিতারূপে আবি-ষ্কার করে সম্মোহিত এবং ভাবরসে আপ্লুত হয়েছে। কাবুলিওয়ালাতে সেই ভারতীয় জীনিয়াসের সন্ধান মেলে যা জাতিধর্ম-আচার-ব্যবহারের ভেদাভেদ লুপ্ত করে দেয়। জাতিধর্ম অনুষ্ঠানের চেয়ে মানুষই বড় সে তত্ত্বকে সুপ্রকাশ করে। বহু হৃদয় একাত্মতা লাভ করে। তাঁর নাটকীয় সংঘাতের মধ্যেও হয়ত এই তত্ত্বকে বুদ্ধি দিয়ে অনুধাবন করা যায়, কিন্তু বিদেশীর পক্ষে বিশেষতঃ ইউরোপীয় দর্শকের পক্ষে এ তত্ত্বকে ভারতবাসীর মত হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এই কারণেই সম্ভবতঃ 'কাবুলিওয়ালা' কাহিনী হিসাবে ইউরোপের উচ্চ প্রশংসা লাভ করতে পারেনি। কিন্তু সঙ্গীত যোজনায় 'কাবুলিওয়ালা' উচ্চতম প্রশংসা লাভ করেছে। "কাবুলিওয়ালা"র ক্ষেত্রে দেখা যায় ভারতীয় সঙ্গীত বিদেশেও সমাদৃত।

এ বছরে ভেনিসের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 'অপরাজিত'র সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাওয়াও ভারতীয় চলচিত্রের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভেনিস ফিল্ম ফেষ্টিভ্যালের জুরীরা একমত হয়ে 'অপরাজিত'কে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'গোল্ডেন লায়ন অব সেণ্ট মার্ক' প্রদান করেছেন। সাতচল্লিশটি দেশের প্রায় পঁয়ষট্টিখানি ছবি প্রাথমিক নির্বাচনে আসে এবং শেষ নির্বাচনের জন্য চৌদ্দখানি নির্দিষ্ট হয়। 'অপরাজিত' চৌদ্দখানির মধ্যে স্থানলাভ করলেও ভেনিসের নির্বাচনে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানলাভ করবে এমন আশা অবশ্য করা যায় নি। কারণ ভেনিসের পুরস্কার প্রদান নিয়মাবলীর এক ধারায় বলা হয়েছে—

'the films should demonstrate a real progress of Cinemato-graphy as a means of artistic expression'.

এই অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চৌদ্দখানি ছবির মধ্যে 'অপরাজিত' সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়ে পুরস্কার লাভ করে। শুধু তাই নয়, 'অপরাজিত'কে আরও দুটি পুরস্কার দেওয়া হয়,—'সমালোচকদের' পুরস্কার এবং "একটি বিশেষ পুরস্কার"। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের পত্তন থেকে আজ পর্যন্ত 'বিশেষ পুরস্কার' ইতিপূর্বে আর কোনো ছবিকে দেওয়া হয়নি। সে দিকের বিচারে 'অপরাজিত'র এই সাফল্য শুধু ভারতের নয়, বিশ্ব চলচ্চিত্রেরই এক ইতিহাস রচনাকারী ঘটনা। এতদ্‌প্রসঙ্গে কান্‌ চলচ্চিত্র উৎসবে ভারত সরকারের ফিল্ম ডিভিশানকৃত "গৌতম দি বুদ্ধ" প্রামাণ্য চিত্রটির পুরস্কার পাওয়ার কথাও উল্লেখ্য। এ সবই সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। একই বছরে পর পর এতগুলি পুরস্কার লাভ বড় সহজ কথা নয়। বিশেষতঃ যান্ত্রিক উৎকর্ষতার দিক থেকে ভারতবর্ষ যখন এখনও অনেক পশ্চাতে পড়ে রয়েছে।

ইউরোপ, আমেরিকার চলচ্চিত্র শিল্পের বিস্ময়কর যান্ত্রিক অগ্রগতির তুলনায় ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প প্রায় সর্বতোভাবে পশ্চাদপদ্। তত্রাচ বিদেশে ভারতীয় চলচ্চিত্র কেবলমাত্র কাহিনীগত ভাব-সম্পদ ও শিল্পসৌষ্ঠবের জন্য যেভাবে সমাদৃত হচ্ছে তাতে আশান্বিত হওয়ার কারণ আছে বৈকি।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রশংসা ও পুরস্কার লাভের সঙ্গে সঙ্গে সকল দেশই ভারতের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে বাধ্য হচ্ছে। এই মুহূর্তেই ভারতীয় চলচ্চিত্র ইয়োরোপে উল্লেখ-যোগ্যভাবে ব্যবসায়িক সাফল্যলাভ না করলেও হতাশ হবার কারণ নেই। ইউরোপের প্রশংসা লাভ করলে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ভারতীয় চিত্রের মর্যাদা সত্বর বেড়ে যাবে। শুধু এশিয়ার বিভিন্ন দেশেই নয় এই ভারতেই ভারতীয় চিত্রের গুণবৃদ্ধি ঘটবে। এ দেশের শিক্ষিত গুণী-সম্প্রদায়, বুদ্ধিজীবী পণ্ডিত এবং পাশ্চাত্য চিত্র-রসিকেরা দেশীয় চিত্রের প্রতি দৃষ্টি ফেরাবার প্রেরণা পাবেন। বস্তুতপক্ষে ভারতীয় চলচ্চিত্রের পক্ষে এ একরকম মনস্তাত্ত্বিক বিজয়।

থিয়েটার ও বাংলা নাটক • রেণুপদ দাস

আধুনিক বাংলা থিয়েটার ও নাটকের ইতিহাস সুপ্রাচীন নয়—একশ' বছরের ইতিহাস বাংলা নাট্যসাহিত্যের। নাটকে রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' দিয়ে আধুনিক বাংলা নাট্যসাহিত্যের পত্তন হয়েছে বললে ঠিক অতিরঞ্জন হবে না। তৎকালীন কলকাতার রাজামহারাজা আর বাবুমহলে অর্ধশিক্ষিত এক সংস্কৃত পণ্ডিত নাট্যকারের প্রতিপত্তি দেখে কবি মধুসূদন প্রায় ক্ষেপে উঠেছিলেন এবং প্রায় চ্যালেঞ্জের সুরে নাটক রচনা করতে উদ্যত হন। নেপথ্য লোক থেকে নাটকে রামনারায়ণ মধুসূদনকে নাট্য রচনায় প্রেরণা দিয়েছিলেন। অতঃপর দীনবন্ধু মিত্রের প্রসিদ্ধ 'নীল দর্পণ' ও 'সধবার একাদশী' রচিত হোল। এই তিন নাট্যকারও গিরিশচন্দ্রের মধ্যবর্তী যুগে বাংলা নাট্যসাহিত্যে 'বিধবা বিবাহ' রচয়িতা উমেশচন্দ্র সিংহ বা 'শরৎ সরোজিনী' 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' রচয়িতা ভবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়দের মত নাট্যকারদের রাজত্ব চলছিল। এঁদের নাটকগুলি রোমাঞ্চকর তীব্র আবেগ-চঞ্চল আখ্যান ও ঘটনায় ঠাসা থাকত। সতীর সতীত্ব নাশ, মাতলামি, ডাকাতি, জাল, গোরা-ঠ্যাঙানি, বিধবা বিবহ থেকে মায় স্বদেশী বক্তৃতা প্রভৃতির কিছুই বাদ যেত না এই সব নাটকে।

অসিত সেন পরিচালিত ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত বাদল পিকচার্সের "জীবন তৃষ্ণা"য় উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন।

থিয়েটার জগতে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা নাটকক্ষেত্রের পালাবদল শুরু হোল। মধুসূদন-দীনবন্ধুর সমাজ-বাস্তবতার ধারাটি গিরিশচন্দ্রে অক্ষুণ্ণ তো থাকলই উপরন্তু তার সঙ্গে এই সর্বপ্রথম বাঙালী নাট্যকারের একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিরও সন্ধান পাওয়া গেল। এ দৃষ্টিভঙ্গি যতটা ভক্তিমূলক ততটা সমাজ ও রাজনীতি চেতনামূলক নয়। তাঁর 'জনা', 'সিরাজদ্দৌলা', 'নিমাই সন্ন্যাস' বা 'পাণ্ডব গৌরব' নাট্যরীতি, চরিত্রায়ন, উদ্দেশ্য, প্রযোজনা, অভিনয়ে পূর্ববর্তীদের থেকে পৃথক। পাশ্চাত্য ধরণের কাঠামোয় একটা বাংলা নাট্যরীতির উদ্ভবের সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল। গিরিশচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন বাংলা সাহিত্যে নব সেক্সপীয়রের আবির্ভাব হবে না, সে সেক্সপীয়রের দরকারও ছিল না—বাংলার পালগান যাত্রাগানের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে নয়া বাংলার নয়া নাট্যসাহিত্যের সৃষ্টি হবে। নট ও নাট্য প্রযোজক হিসেবে গিরিশচন্দ্র এই সত্যকে উপলব্ধি করলেও নাট্যকার হিসেবে তাঁর পরিকল্পনা সার্থক হয় নি। সম্ভবতঃ ভক্তিরসের দৌর্বল্য এবং রেনেশাঁ যুগচেতনার সুস্পষ্ট প্রকাশের অভাবই তাঁর ব্যর্থতার কারণ। রসরাজ অমৃতলাল, অথবা রাজকৃষ্ণ, অতুলকৃষ্ণ সকলেই গিরিশ সমসাময়িক এবং নাট্যরীতিতে গৈরিশ পন্থানুসারী। ইতিমধ্যে রাজনীতিক্ষেত্রে স্বদেশী আন্দোলন একটা উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল, পেশাদার রঙ্গমঞ্চের পরীক্ষাও সফল। উনবিংশ শতাব্দী থেকেই বাংলা রঙ্গমঞ্চ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, পরমহংসদেবের মত সমাজ ও ধর্ম সংস্কারকদের আশীর্বাদ পেয়ে এসেছে, বিংশ শতাব্দীতে রাজনীতিবিদদের আশীর্বাণী পেতে থাকল। সুদীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলনে রঙ্গমঞ্চের একটা সুস্পষ্ট ভূমিকা ছিল। নাট্য সাহিত্যের ভেতর দিয়ে স্বাদেশিকতাকে দেশবাসীর হৃদয়ে অহরহ জাগিয়ে রাখাই তার কর্ম ছিল। এদিক থেকে নাট্যসাহিত্য সর্বদেশে এবং সর্বযুগেই প্রোপাগান্ডিস্টের ভূমিকা নিয়েছে। নাট্যসাহিত্য সুস্পষ্টভাবে সমাজদর্শন এবং সমাজের প্রতিচ্ছবি। কাজে কাজেই 'সাংকেতিক বৈঠকী নাটক' ছাড়া সকল নাটকই এক দিক থেকে কাল সীমায় আবদ্ধ। অবশ্য নাট্যসাহিত্য কালে আবদ্ধ হয়েও কালজয়ী হতে পারে। নাট্যকারের দূরদৃষ্টি এবং সঠিক সমাজচৈতন্যের ওপরই নাটকের জীবনীশক্তি নির্ভর করে। বাংলা নাট্যসাহিত্যও এই প্রোপাগান্ডা ফরমুলার বাইরে পড়ে নি। ক্ষীরোদপ্রসাদ, ডি এল রায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁদের নাটকের ভেতর দিয়ে স্বাদেশিকতা প্রচার করেছেন। অত্যন্ত আধুনিক কালে বাংলা নাটকের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক ভাবধারাও প্রবাহিত হয়েছে।

এই একশ বছরের বাংলা নাট্যসাহিত্য আলোচনা করলে অনেক শক্তিশালী নাট্যকার, অনেক সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা এবং নানা নাট্য আন্দোলনের পরিচয় পাওয়া যাবে—তথাপি এক বিজ্ঞ সমালোচক বাংলা নাট্যসাহিত্যে সত্যিকারের নাটকের সাক্ষাৎ পাননি। 'সত্যিকারের নাটক' সৃষ্টি না হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করে তিনি ঘোষণা করেছেন বাঙালীর 'জাতীয় জীবনে প্রাণবন্যার' অভাবই এর হেতু। জাতি হিসেবে বাঙালী মৃতকল্প, তার সমগ্র জীবনটাই নিস্তেজ নিস্তরঙ্গ এবং নিষ্প্রভ। বাস্তবিকই এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, জাতীয় জীবনে প্রাণবন্যা না এলে মানুষের কর্মধারা শতমুখে উৎসারিত হয় না। কৃষি শিল্পে বাণিজ্যে আবিষ্কারে দুঃসাহসিক যাত্রায় ভ্রমণে ক্রীড়ায় বিদ্যায় মানুষের কর্মধারা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলে তবেই নাটক ও নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

প্রসঙ্গক্রমে এ কথাও অবশ্য স্মরণযোগ্য যে, 'জাতীয় জীবনে প্রাণবন্যা' বলতে তীব্র জাতীয় চাঞ্চল্য বা বৈপ্লবিক চিন্তা ও নিরন্তর খর কর্মস্রোতকেই বুঝায় না। কর্মের এই অস্বাভাবিক তীব্রতা জীবনের বিকার নয় কি? কাজেই অস্বাভাবিক জীবন প্রণালী অথবা জীবনধারাই কেবল নাটকের উপাদান নয়।

নাটক হচ্ছে সমাজদর্পণ। জীবনে বিকার ও অস্বাভাবিকতা অথবা অত্যুগ্র স্বাভাবিকতা অসত্য নয়—কিন্তু জীবনের এই অস্বাভাবিক মুহূর্তটুকুই কেবল সত্যের আলোয় ঝলমল করে উঠে তেমন বাক্য সর্বদা গ্রাহ্য নয়। এতদ্ব্যতীত অস্বাভাবিক বিকার ছাড়া জীবনে চাঞ্চল্য নেই এ কথাও ঠিক নয়। জীবনের উত্থান ও পতন নিত্যই চলছে, নিত্যই মানুষ তুচ্ছতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে, নিত্যই তার জীবন আলোছায়ার লীলায় দুলছে। কাজেই 'প্রাণ-বন্যার' তীব্র বিকার ছাড়াও মানুষের জীবনে চাঞ্চল্যের অভাব নেই। এই কারণে কোন জাতির পিঠের ওপর মৃতকল্পের একটা মার্কা মেরে দিয়ে সেই জাতিকে নাটকের বার করে দেওয়া অন্যায়।

আলোচ্য সমালোচকের বক্তব্যের প্রথম অংশ ঠিক বলে প্রতীতি হয়। বাংলা ভাষায় রবীন্দ্র-closet drama কখানি ছাড়া উল্লেখযোগ্য বা কালজয়ী নাটকের সৃষ্টি হয়নি বললে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু উক্ত সমালোচক সার্থক বাংলা নাটক সৃষ্টি না হওয়ার কারণ

শারদীয়া অর্ঘ্য

এল, বি, ফিল্মস্ ইন্টারনাশন্যাল

১২৩, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড · কলিকাতা-২৬

হিসেবে যে 'প্রাণবন্যার' অভাবের কথা উল্লেখ করেছেন, সে 'প্রাণবন্যা' গত দু'শো বছরের মধ্যে বাংলাদেশে বা ভারতবর্ষে দেখা যায়নি বলে এদেশে কোন কালেই ছিল না এমন মত মানা চলে না। ঐতিহাসিককালে কি প্রাগৈতিহাসিক পৌরাণিক যুগে এ দেশে সহস্র কর্মধারার কিছুমাত্র অভাব ছিল না। তত্রাচ বাংলা ভাষায়, কি কোন আধুনিক ভারতীয় ভাষায় উল্লেখযোগ্য নাটক রচিত হয়েছে? অতঃপরও পূর্ব প্রশ্নই উঠে তাহলে এদেশে সত্যিকারের নাটকের অভাব কেন; এর একটিমাত্রই উত্তর: জীবন নাট্যকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে দর্শন করে তাকে রূপরসদৃশ্যময় করে তোলার সেই অঘটনঘটনপটীয়সী যোগ্যতা নিয়ে এখনও কোন বাঙ্গালী নাট্যকারের জন্ম হয় নি। সার্থক নাটক সৃষ্টি না হওয়ার কারণ আধুনিক বাংলা নাট্যসাহিত্যের ওপর পাশ্চাত্ত্য নাটকের অখণ্ড প্রভাব। আবার পাশ্চাত্ত্য ধাঁচের তীব্র সংগ্রামবিক্ষুব্ধ দুঃখান্তক নাটক সৃষ্টির বাধা এ দেশের যাত্রাগানের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য। যাত্রা নাটকের ক্লাইমাক্সে বিবেক অকস্মাৎ অকুস্থলে প্রবেশ করে মায়াময় সংসার সম্পর্কে গান গেয়ে উদ্দিষ্ট চরিত্রের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটায় কিম্বা শান্ত ও গঠনমূলক কর্মধারার প্রবর্তন করিয়ে নাটককে নিষ্করুণ ট্র্যাজেডির হাত থেকে রক্ষা করে। ভারতীয় চিন্তাধারার প্রভাবের ফলেই যাত্রা নাটকের গঠনরীতি এই রকমের গীতিপ্রধান হয়ে পড়েছে। এই রীতির ফলেই উচ্ছ্বসিত আবেগ—ড্রামাটিক টেম্পো কথঞ্চিৎ শ্লথ হয়ে পড়ে এবং নিঃসীম নৈষ্কর্মের মধ্যে ক্রমে অবসিত হয়। ভারতীয় গ্রামীণ সভ্যতার মন্থরগতি জীবনযাত্রাকেও এই রীতির পরিপোষক বলে মনে করা হয়। মোটের ওপর এতে সন্দেহ নেই যে, প্রাচ্যের সাধারণ লোকের জীবনেও *সামঞ্জস্যবিধান ও সহ-অস্তিত্বের আশ্চর্য ধারা প্রবহমান। কাজে কাজেই মনে হয় খাঁটি পাশ্চাত্ত্য ধাঁচের নাটক বাঙ্গালী জনগণের হৃদয় হরণে সমর্থ নয়। এই কারণেই গিরিশচন্দ্র এ দেশের মাটির রসে তাঁর নাটকগুলিকে সঞ্জীবিত করতে চেষ্টা করেছিলেন।* কলকাতার থিয়েটারগুলি প্রকৃত নাটক সৃষ্টির অন্তরায় এমন অর্বাচীন কথাও সময় সময় শোনা যায়। এই থিয়েটারগুলি নাকি সত্যিকারের নাটক ও নাট্যকারদের পাত্তাই দেয় না, পরীক্ষা নিরীক্ষার ধারে কাছেও ঘেঁষে না। কিন্তু কথাটি আনুপূর্বিক সত্য নয়। কলকাতার থিয়েটার বহু নাট্যকারের জন্ম দিয়েছে, বহু পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে, নট-নাট্যকার প্রযোজকও কলকাতার থিয়েটারে দেখা গেছে—তত্রাচ বাংলা নাটক গিরিশচন্দ্রের সমাজচৈতন্য ভক্তিভাবাতিরেক এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ ডি এল রায় শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের রোমান্টিক স্বাদেশিকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে নি। এমন কি, এই সুদীর্ঘ একশ' বছরের মধ্যেও বাংলা নাটক 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'একেই কি বলে সভ্যতা', বা 'নীলদর্পণ', 'সধবার একাদশী' বা বিধবা বিবাহের' দুর্বল বাস্তবতাকেও অতিক্রম করতে পারে নি। তাছাড়া আধুনিককালে অর্ধ-পেশাদার, সৌখীন সম্প্রদায়, পোলিটিক্যাল পার্টি প্রভাবিত নাট্যসংস্থা প্রভৃতি কেউই একখানি উল্লেখযোগ্য নাটকও দিতে পারেন নি। কাজে কাজেই বাংলা ভাষার উল্লেখযোগ্য নাটক সৃষ্টির অন্তরায় পেশাদার থিয়েটারগুলি নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও রঙ্গমঞ্চ

(২৪৯ পৃষ্ঠার পর)

আর ভাল লাগে না।' শ্রীরামকৃষ্ণ এই অশান্ত ছেলেটির মাথায় সেদিন স্নেহ-শীতল করস্পর্শ দিয়ে বল্লেন—'না রে না, অমন কাজও করিস্ না। ও কাজ তোকে করতেই হবে ও কাজ ভাল। ওতে লোক-শিক্ষা হয়।' শ্রীরামকৃষ্ণের এই আদেশের পরও কাজ অর্থাৎ থিয়েটার ছাড়া গিরিশচন্দ্রের সম্ভব হয়নি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লোকশিক্ষার কাজে তাঁকে নিয়োজিত থাকতে হয়েছিল। কেন না, ঠাকুর ব-কল্মা গ্রহণ করে 'নোটো গিরিশের' সব ভার নিয়েছিলেন ইতিমধ্যেই। তাই, ঠাকুরকে ব-কল্মা দিয়ে গিরিশ হয়ে পড়েছিলেন—নিষ্ক্রিয়। রঙ্গমঞ্চের জন্যে গিরিশচন্দ্র যা করে গেছেন, তার প্রতিটি কাজের মধ্যে ঠাকুরের অদৃশ্য হাতের স্পর্শ ছিল।

নরেন্দ্রনাথ অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ প্রায়ই গিরিশচন্দ্রকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতেন থিয়েটার করার জন্য। নরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রকে ডাকতেন জি-সি বলে। ঠাকুর একদিন বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ীতে এসেছেন। নরেন্দ্রনাথ, রাখাল, কালী, শরৎ, তারক, বাবুরাম প্রভৃতি ভক্তরা ঠাকুরকে ঘিরে বসে আছেন। গিরিশও চুপচাপ বসে আছেন এক কোণে। তাঁর চোখে-মুখে গভীর চিন্তার ছায়া। নরেন্দ্রনাথ জি-সি'র এ ভাবান্তর সহ্য করতে পারলেন না। জি-সিকে খোঁচা দিয়ে বলে উঠলেন—'জি-সির থিয়েটার করাও আছে, আবার ঠাকুরের উপদেশ শোনাও আছে।' গিরিশকে যে উদ্দেশ্যে নরেন খোঁচা দিলেন, সে উদ্দেশ্য কিন্তু সফল হোল না। গিরিশ কোন প্রত্যুত্তর করলেন না। ঠাকুর দেখলেন, গিরিশ *যেন আজ কি রকম অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন। ঠাকুর গিরিশকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুই আজ অমন মনমরা হয়ে আছিস্ কেন?" গিরিশচন্দ্র জানালেন—'থিয়েটার আর তাঁর ভাল লাগে না। ঠাকুরকে ছেড়ে থিয়েটারে যেতে তাঁর মন চায় না।'*

ঠাকুর জানালেন, থিয়েটারের কাজ সাধারণের কাজ। ওতে লোক-শিক্ষা হয়। ঠাকুরের কথা শুনে ভক্তরা অবাক হয়ে গেলেন। থিয়েটারকে যাঁরা এতদিন ঘৃণার চক্ষে দেখে এসেছেন, ঠাকুরের কথায় তাঁদের মতের পরিবর্তন হোল। সকলেই বুঝলেন, থিয়েটার লোক-শিক্ষার আসর। কিন্তু গিরিশের তবুও মন চায় না থিয়েটারে যেতে। ঠাকুরকে চোখের আড়াল করা তাঁর পক্ষে যেন একরকম অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ঠাকুর গিরিশের মনের অবস্থা বুঝতে পারেন। বলেন—"তুই আমাকে ব-কল্মা দিয়েছিস্। তোর ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কিছু যায় আসে না। আমার ইচ্ছায় তোকে থিয়েটার করতে হবে।" ঠাকুরের ইচ্ছানুসারে এইভাবে চালিত হয়েছিলেন গিরিশচ[ন্দ্র] আর দেহাবসান না হওয়া পর্যন্ত ঠাকুরও [...] বেড়িয়েছেন, নটগুরুর ব-কল্মা। দয়াল ঠা[কুর] এমনি করে সেদিন যদি নটগুরুর ব-কল্মা নিতেন, তাহলে হয়ত গিরিশ নাট্য-সাহিত্য [...] ফলেফুলে কোনদিনই ভরে উঠত না। [...] বাংলার নাট্যশালাও দেশ ও জাতির কাছে [...] যে সমাদর লাভ করেছে তাও হয়ত সম্ভব হ[ত] না। তাই পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের ৮৫ বছ[রের] ইতিহাসে ঠাকুরের ব-কল্মা গ্রহণের ইতি[হাস] হয়ে আছে স্মরণীয়। আর মঞ্চসংশ্লিষ্ট শি[ল্পী] ও কর্মীদের কাছে ঠাকুর হয়ে আছেন বরণী[য়]। মঞ্চের সকল কর্মীরা আজও আগে গু[রু] গুরুকে প্রণাম করেন, তারপর নটগুরু[কে]। তারপর তাঁরা মঞ্চের ধুলো মাথায় তুলে [...]

বাংলা নাট্যসাহিত্যের দুর্দশার হেতুই হচ্ছে ক্ষমতাবান নাট্যকারের অভাব। বর্তমানে উপন্যাসের নাট্যরূপ এবং উত্তেজনাসর্বস্ব বুলিপ্রধান নাটকের জনপ্রিয়তা দেখে মনে হয় আবার উপেন্দ্রনাথ দাস মশায়ের 'শরৎ সরোজিনী', 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'র যুগই বুঝি ফিরে এল। তবে ভরসার কথা 'শরৎ সরোজিনীর' যুগ অত্যন্ত স্বল্পায়ু। আশা করা যায় এই যুগের অবসানে বাংলা রীতির নাটকের উদ্ভব হবে।

পণ্ডিত মশায়

(২৪৮ পৃষ্ঠার পর)

"কাজে যাও। আমি শুনলাম তুমি [...] বড় হয়েছ!"

"ভুল শুনেছেন।"

উত্তর না দিয়ে বল্লেন—"হঠাৎ তোমার ক[থা] মনে হলো—প্রায় ৩০।৩৫ বছর পরে তো[মায়] দেখলাম, না?"

"তার বেশী হবে বোধহয়। আসুন ভেতরে।"

"না—আর একদিন আসবো—তুমিও [...] বৃদ্ধ হয়ে উঠেছ অকালে—" তারপর [...] স্থির হয়ে হঠাৎ বল্লেন 'জীবনে কি অভিজ্ঞ[তা] অর্জন কর্লে তুমি? দু-এক কথায় বল—হাস[ছ] কেন?'

"আমার হঠাৎ মনে পড়ছে, পণ্ডিতমশা[য়] আপনি বলতেন, জীবনটা থিয়েটার করে[...] না—"

"আমার মনে আছে"—

"আপনি জানেন আমি চলচ্চিত্রের পরিচালক—অভিনয় শেখাই"।

"তোমার খবর আমি রাখি, এইজন্য হাসছো?"

"না পণ্ডিত মশায়, আপনি আমার খবর রাখেন শুনে কলেজের সেদিনের ছাত্রের মত আমার গর্ব হচ্ছে। হাসছি আপনার প্রশ্নের আমার উত্তরটা ভেবে।"

"কি—"

"যেটা আপনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন সেইটাই আমার অভিজ্ঞতা পণ্ডিত মশায়, জীবনটা অভিনয় ছাড়া আর কিছুই নয়। এই আমার অভিজ্ঞতা।"

বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয়ের চোখ কি হঠাৎ সজল হোলো! না, এ আমারই ভ্রম। পণ্ডিত মশায় বল্লেন, "এস, কাজে যাও, আমি আর একদিন আসবো।"

চলে গেলেন—তেমনি চলা তেমনি ভঙ্গী, সেই চাদর ছাতা—শুধু পা—মাঝে কেটে গেছে ৩৫।৪০ বছর।

আবারো নাটকের কথা

(২৪৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

না দেখলে অন্যায় করবেন, তাও বলা চলে না। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারও গৃহ চান, টাকাও চান। তাঁকে তা দেওয়া সম্ভব হয়নি। আরো কোন প্রতিষ্ঠানও ও-সব চাইতে পারেন। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের জন্য পৃথক পৃথক বাড়ী এবং পৃথক-পৃথকভাবে টাকা দেওয়া সম্ভব নয়। কোন রাষ্ট্রই তা দেয় না।

আমি মনে করি, প্রতি রাজ্য সরকার এবং প্রতি মিউনিসিপ্যালিটি তাঁদের এলাকায় একটি করে নাট্যগৃহ যদি তৈরী করে দেন, আর নাট্যাচার্যের বা বহুরূপীর মতো প্রতিষ্ঠানগুলিকে যদি অল্প ভাড়ায়, আর প্রমোদ-কর থেকে মুক্তি দিয়ে, টিকিট বিক্রীর অধিকার দিয়ে, অভিনয় করবার সুযোগ করে দেন, তাহলে সমস্যাটার সমাধান কিছুটা হতে পারে। কিন্তু তারও বিপদ আছে। ওগুলি তৈরী হবে সর্বসাধারণের টাকায়। তাই বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলির জন্যই ওদের দুয়ার খোলা রেখে আর সবার জন্য বন্ধ রাখা হয়ত সম্ভব হবে না। আলোচ্য প্রতিষ্ঠানগুলি বেঁচে না থাকলে নাটকের শ্রীবৃদ্ধি হবে না। নাটকের সমস্যা অবশ্য প্ল্যান করে সমাধান করা যাবে না। নাটকের পর নাটক অভিনয় করে যেতেই হবে। তাদের যে দোষ-ত্রুটি থাকবে, মানতে হবে তা জাতিরই দোষ-ত্রুটি। তা নিয়ে আলোচনা করবার ক্ষেত্র নাট্যশালার বাইরে। সেই আলোচনার ফলে জাতি যতটা দোষ-ত্রুটি মুক্ত হবে, নাটকও তত উন্নীত হবে। এইদিক দিয়ে থিয়েটার সেণ্টার বড় ভালো কাজ করছেন নাটকের পর নাটকের অভিনয় করে। তাঁদেরকে নাটকের অভাবের কথা বলে ক্ষোভ করতে হচ্ছে না। থিয়েটার সেণ্টার যে নির্বিচারে যা পাচ্ছেন, তাই-ই অভিনয় করছেন তা নয়, একটা মানদণ্ড তাঁরাও স্থির করে নিয়েছেন। কিন্তু পদে পদে অশুচি স্পর্শ করবার শঙ্কায় স্তব্ধ থাকা তাঁরা বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। কিছু ভালো নাটক তাঁরা পেয়েছেন এমন কথা মুরুব্বিদের মুখেই শুনেছি।

বহুরূপীর সামনে, আমার বিবেচনায়, তিনটি পথ আছে। প্রথম : তাঁদের প্রতিষ্ঠানকে কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠান করা; দ্বিতীয় : রবীন্দ্র-ভারতীর সঙ্গে মিশে যাবার চেষ্টা করা; আর তৃতীয় : থিয়েটার সেণ্টারের অনুরূপ একটি ল্যাবরেটারি করে শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া।

(গ)

মঞ্চমুগ্ধ নামটি শুনে ভেবেছিলাম সম্প্রদায়টি বাংলা-মঞ্চেরই দানে মুগ্ধ। কিন্তু ওঁদের সঙ্গে মেলা-মেশা করে, ওঁদের বিচারকদের সঙ্গে গোটা-কয়েক বৈঠকে বসে সন্দেহ হয়েছে, যে মঞ্চ ওঁদেরকে মুগ্ধ করেছে, তা ওঁদের কল্পলোকের মঞ্চ, বাংলার নিরন্তর নিন্দিত মঞ্চ নয়। তাই আজ মনে হচ্ছে, যে বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধা নেই, তাকে পুরস্কার দেবার অমর্যাদা কি কারুরই কল্যাণ করবে? ও-দেশে 'বেষ্ট প্লেজ অব দি ইয়ার' বার করবার যে রেওয়াজ আছে তা নাট্যশাস্ত্রের ব্যাকরণ বিচার করে নির্বাচিত হয় না, নাটক বলে মেনে নিয়েই মঞ্চাভিনীত নাটকগুলির সেরা নাটক সংগ্রহ করা হয়। একবার মঞ্চমালিকদের কাছে পরীক্ষা দিতে হবে, একবার প্রয়োগকর্তার প্রযোজনা-কটাহে ভাজা-পোড়া হতে হবে, একবার সমালোচনার সুড়সুড়ি বা কশাঘাতে স্ফীত অথবা সংকুচিত হতে হবে, তারপরও চলবে বিশেষজ্ঞদের ভিভিসেকশন! এ কি পুরস্কার?

(ঘ)

মঞ্চমালিকরা উপন্যাসের নাট্যরূপ দেখিয়ে লাভবান হচ্ছেন তা চোখেই দেখতে পাচ্ছি, যেমন দেখতে পাচ্ছি ভেজাল মাল-বিক্রেতাদের আর চোরা কারবারীদের আশাতীত লাভ। উপন্যাসের ওপর আমার কিছুমাত্র বিরাগ নেই, অনুরাগই আছে। উপন্যাসের নাট্যরূপ আমিও দিয়ে থাকি। চির-দিনই এদেশে, এবং সকল দেশেই, সেরা উপন্যাস-গুলি নাটকে রূপান্তরিত হয়েছে, আর তা থেকে নাটকেরও উন্নতি হয়েছে। উপন্যাস জাতীয় সম্পদ, একথা অস্বীকার করবে কে? কিন্তু যে উপন্যাসের নাট্যরূপ দেখে গভীর ধ্যানে মগ্ন হওয়া উচিত, সেই উপন্যাসের নাট্যরূপ যদি হাসির উপাদান যোগায়, তাহলে মন স্বভাবতই বিরূপ হয়। বলা হয়, দর্শকরা যে ওই-ই চায়। কিন্তু ওই জিনিষটাই ওর চেয়ে ভালো হলে যে দর্শকরা তা দর্শনের অযোগ্য মনে করে উঠে যেত, তা মনে করবার কারণ নেই। উপন্যাস নাটক নয়। নাটককে এমন কিছু করতে হয়, যা করবার দায়িত্ব উপন্যাসের থাকে না। কাজেই নাট্যরূপ দেবার সময় নাটকের স্বধর্ম মনে রাখতে হবে। কারু অক্ষমতার জন্য নাট্যরূপ ব্যর্থ হতে পারে, সক্ষমতার জন্য সার্থকও হতে পারে। কিন্তু সব অবস্থাতেই নজর রাখতে হবে নাটকের স্বধর্মের ওপর। তা অবহেলা করলে নাটকের ভবিষ্যতে কাঁটা দেওয়া হয়। সেই কাজই নিন্দনীয়।

(ঙ)

প্রগ্রেসিভরা যখন নাটকের প্রগ্রেসের কথা বলেন, তখন প্রগ্রেসিভ হতে হলে মনকে যতটা উদার করা দরকার, ততটা উদার করেন না; গণ্ডির পর গণ্ডি কাটতে থাকেন নিজ-নিজ রুচি অনুযায়ী। প্রগ্রেস নিশ্চতই আপেক্ষিক কথা। তা বোঝাতে হলে অপর কিছুকে স্থিতিশীল অথবা বিলম্বিত গতিসম্পন্ন বোঝাতে হয়। আসলে এই প্রগ্রেস হচ্ছে মানসিক ব্যাপার। যদি তারই ফলে হয় মেটিরিয়াল প্রগ্রেস। প্রগ্রেসিভরা এককালে নাট্যশালার সব-কিছুই স্থিতিশীল বলতেন, আর তার সব-কিছুরই নিন্দা করতেন। কিন্তু প্রগ্রেস অনন্ত হলেও কোন এক সময়ে প্রগ্রেসিভদেরকেও প্রতিষ্ঠা পাবার কথা ভাবতে হয়। অনন্তকাল তাঁরা ভেসে বেড়াতে পারবেন না। তাই তাঁদের অনেকে আজ পেশাদারী মঞ্চে যোগ দিয়েছেন, পেশাদারী মঞ্চের অভিনেতাদের কাছে, প্রয়োগ-কর্তাদের কাছে, শিক্ষা নিতে চাইছেন। এর ফলে যদি পেশাদারী মঞ্চকে তাঁরা নব-জীবন দিতে পারেন, যেমন দিয়েছিলেন আগেকার প্রগ্রেসিভরা, অর্থাৎ নাট্যাচার্য নটসূর্য, নাট্যবিনোদ, নটশেখররা—তাহলে নাটকের ও নাট্যশালার উন্নতি অবশ্যই হবে। আগেকার প্রগ্রেসিভরা নাট্যশালায় এসেছিলেন শ্রদ্ধা নিয়ে। আজকার প্রগ্রেসিভরা যদি শ্রদ্ধা নিয়ে না আসেন, তাহলে তাঁদেরকে অপরচুনিষ্ট বলবার সুযোগ দেবেন।

প্রগ্রেসিভ নাট্যপ্রতিষ্ঠানগুলি অনেক কাজ করেছেন, এখনও করছেন। কিন্তু তাঁদের কোনটিই ন্যাশনাল হতে পারেন নি, অথবা চাননি। ন্যাশনাল বলতে আমি কিন্তু সরকারী প্রতিষ্ঠান বলছি না। তাঁরা যে-সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, রবীন্দ্র-নাথকেও সেই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনিও তাঁর নিজের নাটক দিয়ে, প্রতিভা দিয়ে, সে সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি। তাই তিনি শেষটায় পেশাদারী মঞ্চের সঙ্গে আপোষ করেছিলেন। ওদুদ সাহেব বলেছেন রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি are a class by themselves। কথাটা ও-ভাবে বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ নানা ধরণের নাটক লিখেছেন। সবগুলিকে কোনমতেই এক শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। মেলোড্রামা রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন। কিন্তু রবীন্দ্র-নাথের নাটককে ন্যাশনাল করবার তেমন ঝোঁক ছিল না, যেমন ঝোঁক ছিল ইণ্টারন্যাশনাল মানব-মনের সংঘাতকে প্রাচীন ভারতীয় দৃষ্টি-রশ্মি দিয়ে উদ্ভাসিত করবার। কিন্তু তখনকার নেশন সে দৃষ্টি পায়নি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন ভারতীয় ফর্মকে ন্যাশনাল করতে, যা গিরিশ চেয়েছিলেন কনটেণ্টস-এর ভিতর দিয়ে প্রতিষ্ঠা দিতে। তাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পেশাদারী মঞ্চে সহজেই আসতে পেরেছিলেন। আর তিনি এসেছিলেন শ্রদ্ধা নিয়ে, অনুকম্পা নিয়ে নয়। মানতে হবে পেশাদারী মঞ্চ হচ্ছে নাট্যকল্পতরুর মূল শিকড়। সকল যুগেরই সৌখীন আর প্রগ্রেসিভদের সমস্যা সমাধান করে করে অথবা সমাধানে ভুল করে করে পেশাদারী মঞ্চ আজকার এই রূপ পেয়েছে, কিন্তু ন্যাশনালও রয়েছে। নেশনের দোষের, গুণের, মনের, যোগ্যতার, ঝোঁকের সব পরিচয় এর নাটক থেকে, প্রযোজনা থেকে, অভিনয় থেকে, আদর্শ থেকে সুস্পষ্ট পাওয়া যাচ্ছে। প্রগ্রেসিভরা এককালে এর ক্ষতি করে প্রগ্রেস করতে চেয়েছিলেন। প্রগ্রেসের পথে নানা বাধা-বিপত্তি দেখে আজ তাঁরা যদি রবীন্দ্রনাথের মতোই এর শক্তি বৃদ্ধি করতে চান, তাহলে আরো ব্যাপকতর অর্থে পেশাদারী থিয়েটার ন্যাশনাল থিয়েটার হবে।

আসল বিষয়টায় কিন্তু সব দেশেই জট পাকিয়ে তুলেছে, ফিল্ম-এর নায়কত্ব। ফিল্ম জন-চিত্ত জয় করেছে যে কারণেই হোক্। এই ফিল্ম-এর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে থিয়েটার নাটকত্ব উপেক্ষা করছে। কিন্তু এই অনুকৃতি বাঁচবার পথ নয়। তাতে করে মূল শিকড় কাটা পড়বে। ফিল্ম থেকে কেবল ততখানিই নেওয়া যাবে, যতখানি নিলে নাটকের স্বধর্মে গ্লানি না হয়। ফিল্ম আর নাটক এক নয়, যেমন উপন্যাস আর নাটক এক নয়। আম খেতে ভালো লাগে, আপেল খেতেও ভালো লাগে, আঙুরও খেতে ভালো লাগে। তাই বলে ওদের আর মানুষেরও স্রষ্টা সব ফলগুলিকে এক আকার, এক রূপ, এক রস, এক স্বাদ, এক বর্ণ-গন্ধ দেননি। তার জন্য পৃথিবীর প্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায়নি।
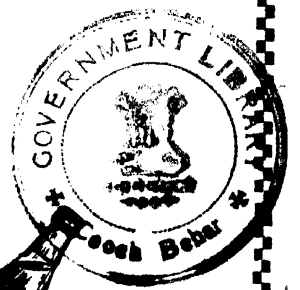
DYER MEAKIN BREWERIES LTD.
ESTD. 1855
TRADE MARK
Solan
On the festive occasion of Durga Puja we wish our patrons the very best of good cheer
N. N. MOHAN
Managing Director.
XXX RUM
XXX RUM
Head Office:
SOLAN BREWERY
(Simla Hills)
A view of our Solan Brewery perched on the Simla hills
Branches:
LUCKNOW DISTILLERY
KASAULI DISTILLERY

শ্রীদুর্গা—বাল্যের মা ভগবতী

(১০ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

পুরুষ) সেই বেদের সহস্র না অনন্তশীর্ষ (মস্তক) সহস্রপদ পুরুষেরই চলচ্ছক্তি (Dynamic energy) ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশরূপে আত্মন্বী (অততি গত্যমে তাই আত্মা) হইয়া এক একটি জড়প্রকৃতির অংশকে জীবন্ত করিয়া তাহার সহিত একাত্মভাবে মিলিয়া দেহাত্মবোধে অভিভূত হইয়া থাকে। এই দেহী আত্মাই সাংখ্যের পুরুষ, প্রকৃতির পূর্ণ পরিণতি দেহরূপ পুরে বাস করেন।

কালিদাস কুমারসম্ভবে রূপকে কি এই পুরুষ ও প্রকৃতির চিত্রাঙ্কিত করিয়াছেন? বৃহদারণ্যক উপনিষদে পরমাত্মাকে অশনযথা মৃত্যু রূপে আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সেই মৃত্যুই মন সৃষ্টি করিয়া আত্মারূপে চলচ্ছীল হইয়া এই বিচিত্র বিশ্বের সৃষ্টিতে প্রকটিত (Manifested) হইলেন। মৃত দেহ হিম ও অচল। সেই মৃত্যুরূপী পরমাত্মার প্রতীকই হিমাচল, যাহার পর্বে পর্বে অর্থাৎ থাকে থাকে বিবিধ সৃষ্টির প্রকৃতিজ উপাদান অপ্রকট অবস্থায় নিহিত ছিল। পঞ্চভৌতিক এই উপাদানের প্রথম প্রকটিত অবস্থা জল—বাষ্প, মেঘ ও শীলা (বরফ) রূপে সত্ত্ব, রজ ও তম তিন অবস্থায় বা পর্বে স্থিতিই হিমাচলের প্রতীক। সৃষ্টিরূপে পরিণত হইবার জন্য সেই হিমাচল হইতে একদিকে প্রকটিত হইলেন যেন কৈলাসরূপ পুরবাসী পুরুষ—পঞ্চভূতের জন্ম তাই পঞ্চানন ভূতনাথ; অন্যদিকে সেই পরমাত্মারই যেন অর্ধাঙ্গিনী প্রকৃতিরূপিণী, পঞ্চভূতের আধার স্বরূপা গৌরী—গৌরবর্ণা বা হেমবর্ণা হিরণ্যগর্ভের প্রতীক—"সুধাব্ধি মধ্যে মণিমণ্ডপরত্নবেদী সিংহাসনপরিগতাং পরিপীতবর্ণাং, পীতাম্বরাং, কনকভূষণমাল্যশোভাং" —যেন সর্বথা হেমবর্ণা চণ্ডীর দেবী—হিমাচল দুহিতা মা ভগবতী।

এই অমৃত পরমাত্মারূপে অচল, হিম সিন্ধু বা জলাশয়ে যিনি পুরুষ রূপে ছিলেন, তিনিই স্বচ্ছমণির ন্যায় শুভ্র বর্ণমঙ্গলময় শিব রূপে প্রতিষ্ঠিত, মৃত্যুভয়ই জীবের সর্বাপেক্ষা অমঙ্গল। তাই ভয়হীন অর্থাৎ অমৃতত্ব অবস্থাই সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল বা শিবত্ব প্রাপ্তি। কে—জলে+লসতি—আভাতি=কৈলাস। স্বচ্ছ সিন্ধুজমণির ন্যায় তাই শিব শুভ্ররূপে রূপায়িত হইয়াছেন। এই পরমাত্মারূপী শিব অবর্ণ, অরূপ ইত্যাদি নানা বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন—নেতিরূপে উপনিষদে। সাত বর্ণে রঞ্জিত পক্ষযুক্ত কোন চক্রাকার পদার্থ ঘূর্ণিত হইলে সমস্ত রং এক শুভ্রাকারে পরিণত হয় পরে অদৃশ্য হয়। আবার তাহার গতি মন্থর হইলে সেই শুভ্রাকারেই পুনঃ দৃশ্যমান হয় (বিজ্ঞানপাঠ্য) Spectroscopre-এ দেখিয়েছেন। তাই প্রথম প্রত্যক্ষ যে বর্ণে এই অদৃশ্য পরমাত্মা রূপায়িত হইয়া থাকেন তাহাই শ্বেত বর্ণ। হিঃ শক্তির দ্যোতক বা শক্তির প্রকাশক সংজ্ঞা। তাহাই পরমাত্মার Static অক্রিয় অবস্থায় স্থিতি হইতে Dynamic সক্রিয় অন্য অবস্থায় পরিণতি হইলে হিঃ+অন্য=হিরণ্য বা সুবর্ণ বলে রূপায়িত। গৌরবর্ণা সক্রিয় শক্তির প্রতীক গৌরী—উমা।

"তুই যেমন সুরূপা, তোর বর মিলেছে ন্যংটা খ্যাপা।" কালিদাস লিখিলেন এই খ্যাপাকে যখন অচ্যুত বা বিষ্ণু হাত ধরিয়া বৃষপৃষ্ঠ হইতে হিমাচল গৃহে নামাইলেন তখন তাঁহাকে যেন "শারদঘনাদ্দিধীতমান ইব উষ্ণু"-রূপে অর্থাৎ যেন শরৎকালীন শুভ্রমেঘমণ্ডল হইতে মুক্ত উজ্জ্বল আভাশালী ভাস্করের ন্যায় সেই শুভ্র বৃষারোহীকে প্রতীয়মান হইয়াছিল। ইনিই যেন সাংখ্যের পুরুষ, যিনি চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণে অক্রিয় প্রকৃতিকে ক্রিয়াশীল করিয়া সৃষ্টির বিকাশ করেন। ইহাই সৃষ্টির প্রথম পর্ব যাহা হিমালয় পর্বতে রূপায়িত হইয়াছে। এক পর্ব শুভ্র শিবরূপ পুরুষ, অন্য পর্ব প্রকৃতিরূপা হেমবর্ণা উমা।

রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ততে নর্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ততে প্রকৃতি"!
সাং ৫৯।

যেমন নর্তকী রঙ্গালয়ে দর্শকগণের সম্মুখে নৃত্য প্রদর্শন করিয়া নিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি পুরুষের উদ্দেশ্যে স্বকীয় কার্য প্রদর্শন করিয়া নিবৃত্ত হয়। যেন সুরূপা প্রকৃতিরূপী উমা সেই ন্যাংটা খ্যাপা পুরুষকে প্রথমে মোহিনী মূর্তিতে ভুলাইতে না পারিয়া শেষে যোগিনীরূপে সেই বাহ্যজ্ঞানশূন্য যোগীবরকে ভুলাইয়া প্রথম সৃষ্টির বিকাশ করিলেন। যেন সমভাবাপন্ন দুই আত্মার একীকরণ হইল।

পুরুষ ও প্রকৃতিরূপ পিতামাতার সম্মিলনেই নবজাত শিশু বা কুমারের সৃষ্টি হয়। সর্ব প্রাণীতেই এই একই রূপ প্রণালীতে সৃষ্টি হইতেছে। তাই কালিদাস এই উভয়কে পিতরৌ আখ্যা দিয়া বলিয়াছেন: "জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ॥" এখানে এই প্রকৃতিরূপা উমাকে পর্বতদুহিতা বা পার্বতী বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। অথবা এই ঈশ্বরদ্বয় উভয়েই পর্বত হইতে উদ্ভূত। সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই অজ ও স্বয়ম্ভু। গতবুদ্ধিদর্পণে হৃদাকাশে একীভূত পুরুষ ও প্রকৃতির প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া সাধকের আত্মদর্শন সফল হয়। কিন্তু উপনিষদে বলা হইয়াছে—

"হিরণ্ময়ে পরেকোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তাচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতি স্তদাত্মাবিদো-
বিজু॥"

হিরন্ময় কোশের পরে বিরজ নিষ্ফল ব্রহ্মাকে যেন জ্যোতির্মণ্ডলের ও কর্তৃস্বরূপ শুভ্র জ্যোতিরূপে আত্মবিদ জানে সুতরাং পুরুষ ও প্রকৃতি সেই এক বিরজ নিষ্কল ব্রহ্মেরই দুই পর্বে প্রকটিত স্বরূপ—সৃষ্টিতে বিকশিত হইবার জন্য ক্ষণিক পরিগৃহীত। তাই মা ভগবতীকে বিসর্জন দিবার সময় সেই দর্পণের প্রতিরূপকে ঘটস্থ জলে নিমজ্জিত করা হয়। এই সত্ত্ব বুদ্ধির বিসর্জনের পর নির্বিকল্প সমাধি।

স্মৃতিকথা

(২০ পৃষ্ঠার পর)

পারতেন না। এ ধরণের কবিতাকে লক্ষ্য করে বলতেন আগাগোড়া ফাঁকি ও একপ্রকার বুজরুকি। লেখকের বলবার কিছু নেই—ভিতরে সব ভুয়ো—তাই অস্পষ্টতার আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখেছে।

আমার মনে হয় দেশবন্ধু নিজে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব একেবারে অতিক্রম করতে পারেন নি। তিনিও রবীন্দ্রনাথের ভাবেরই ভাবুক ছিলেন—তার নিদর্শন তাঁর অনেক কবিতায় পাওয়া যায়। বাংলার যে নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল সেই সংস্কৃতি রবীন্দ্রনাথের বহু রচনার প্রধান উপজীব্য। বরং দেশবন্ধুই সে সংস্কৃতিকে কাব্যে রূপদান করতে পারেন নি। যে বৈষ্ণব রসতন্ময়তার দ্বারা দেশবন্ধু নিজে আবিষ্ট ছিলেন—রবীন্দ্রনাথের রচনাতে তারও অভাব নেই—তা তিনি লক্ষ্য করেন নি।

তবে দেশবন্ধু যে বলতেন—নব্য কবিরা মুখর ঝঙ্কারে ও অলঙ্কারের সিঞ্চনে আপনার রচনার সাজের অলঙ্কারকেই ঝঙ্কৃত করেন—এ কথার যাথার্থ্য ক্রমে আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

উত্তর জীবনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নিজেও অলঙ্করণ ও কলাচাতুর্যে ক্রমেই উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন— সে তথ্য তাঁর স্বীকারোক্তিতেই পাওয়া যায়।

আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলঙ্কার
তোমার কাছে রাখেনি আর সাজের অহঙ্কার।
অলঙ্কার যে মাঝে পড়ে
মিলনেতে আড়াল করে
তোমার কথা ঢাকে যে তার মুখর ঝঙ্কার।

এই কয় চরণ আমি আবৃত্তি করেছিলাম। তাতে দেশবন্ধু বলেছিলেন, "দেখলে, কবি নিজেই নিজের ত্রুটি ধরতে পেরেছেন। অতবড় কবি কি চিরদিন কৃত্রিমতার কারবার চালাতে পারেন? থাকতাম পদ্মা, তিস্তার ওপারে দূর দেশে। কলকাতায় খুব কম আসতাম। বেশীদিন এই মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ করা ভাগ্যে ঘটেনি। যখন কলকাতায় এসে তাঁর প্রতিবেশী হলাম তখন কবি চিত্তরঞ্জনকে আর পেলাম না—তখন তিনি সর্বস্বত্যাগী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

দুই মিনিটের পথও তখন দুইশত যোজনে পরিণত হয়েছে। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিইনি—কোন্ লজ্জায় তাঁর কাছে যাব। একদিন দেশবন্ধু হেমন্তকুমারের মারফৎ আমার নতুন কবিতার বই চেয়ে পাঠিয়েছিলেন।

আমি হেমন্তকে বললাম—বলো আমি নিজেই যেতাম কিন্তু তাঁর ব্রত অনুসরণ করতে না পেরে আমি এত লজ্জিত যে তাঁর চরণ পার্শ্বে দাঁড়াবারও যোগ্য আমি নই। তার উত্তর হেমন্তর মারফৎ যা পেয়েছিলাম তা তাঁরই যোগ্য।

"লজ্জার কোন কারণ নেই। দেশের সেবা নানাভাবেই করা যায়। কবির কাজও দেশেরই সেবা। ভগবান এক একজনের মাথায় এক একটা ভার দিয়েছেন। সবাই এক মন্ত্রে উপাসনা করবে—এক পদ্ধতিতে সেবা করবে—তাও সম্ভব নয়।"

ক্লিওপেট্রা

(২১ পৃষ্ঠার পর)

কনক। বাড়ীতে এসে হাজির হ'লে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেব? দেওয়া যায় কখনও, বিশেষতঃ বীণুর মতো মেয়েকে? আমিও তো ওর সহপাঠী। তাছাড়া [হাসিয়া] প্রথমে আমিই ওর প্রেমে পড়েছিলাম। আমি যদি ওকে প্রশ্রয় দিতুম তুমি কনকে পেতে না।

[ইহাতে সুরেশের আত্মসম্মান বেশ ক্ষুণ্ণ হইল। কিন্তু তাঁহার আহত আত্মসম্মান ধূল্যবলুণ্ঠিত হইত যদি তিনি ক্রোধ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু তাহা তিনি করিলেন না।]

সুরেশ। 'যদি ওকে প্রশ্রয় দিতুম' একথা বলছ কেন। প্রশ্রয় তখনও দিয়েছিলে, এখনও দিচ্ছ। আমি যদি ওকে ভাল ক'রে না চিনতাম অন্য রকম সন্দেহ হ'ত। কিন্তু ওকে আমি ভাল ক'রে চিনি, কিন্তু আই মাস্ট সে—

[হঠাৎ থামিয়া গেলেন]

কনক। চটেছো মনে হচ্ছে। চললাম তাহলে। বীণুকে ব'লে দিও যে রঙের শিফনের শাড়ী সে চেয়েছিল সে রং পাইনি। আচ্ছা, চললুম।

[কনক চলিয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবেশী রমণীমোহন-বাবু প্রবেশ করিলেন। ভদ্রলোক প্রৌঢ়, কিন্তু তবু বেশ ছিমছাম, কবি-কবি ভাব]

সুরেশ। [ভদ্রতা সহকারে] আসুন রমণীবাবু, কি মনে ক'রে?

রমণী। শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী কি ফিরেছেন?

[কথাগুলি ওজন করিয়া খুব মোলায়েমভাবে বলিলেন]

সুরেশ। না, কোনও দরকার আছে কি?

রমণী। তিনি আমার সাইকেলটা নিয়ে গেছেন কি না। আমাকে এখন একবার বেরুতে হবে।

সুরেশ। আপনার সাইকেল নিয়ে গেছে না কি! কি অন্যায়! এখনও ফেরেনি তো। সত্যি কি অন্যায়।

রমণী। তাতে কি হয়েছে, আমি না হয় অপেক্ষা করব। দুপুরে তো প্রায়ই নিয়ে যান উনি আমার সাইকেল।

সুরেশ। [বিস্মিত] তাই না কি?

রমণী। তাতে কি হয়েছে, তাতে কি হয়েছে?

[বীণুর প্রবেশ। সঙ্গে একটি ৮।১০ বছরের ছেলে। হাফ-প্যান্ট, হাফ-শার্ট পরা। সুশ্রী সজীব চেহারা। তাহার হাতে একটি ব্যাট রহিয়াছে। বীণু তন্বী রূপসী। বব্ করা চুল। রং খুব ফরসা নয়, কিন্তু সে যে মোহিনী তাহাতে সন্দেহ নাই। দেখিবামাত্র আকৃষ্ট হইতে হয়]

বীণু। [রমণীবাবুকে] ও, আপনি এখানে। আমি আপনার সাইকেল নীচের ঘরে রেখে এলাম। আপনার অসুবিধে হয়েছে বোধহয়। মাপ চাইছি—দেরী হয়ে গেছে সত্যি। রাগ করেছেন তো?

[রমণীমোহন ভদ্রতার আতিশয্যে গলিয়া পড়িলেন।]

রমণী। না, না, কিছুমাত্র নয়। আমাকে এখুনি একবার একটু বেরুতে হবে তাই খোঁজ করতে এসেছিলাম আপনি ফিরেছেন কি না। যদি দরকার হয় আবার নিতে পারেন, আমি আধ ঘন্টার মধ্যেই ফিরব। ছেলেটার জন্য ওষুধ আনতে হবে।

বীণু। ও, আপনার ছেলের অসুখ না কি। তা তো জানতুম না। চলুন দেখে আসি [যাইতে উদ্যত]

রমণী। [কৃতার্থ] যাবেন? আচ্ছা, আমি ফিরে আসি তারপর যাবেন। এখুনি ফিরব।

[রমণীমোহন চলিয়া গেলেন। সুরেশ নিষ্পলক দৃষ্টিতে বীণুর দিকে চাহিয়াছিলেন। বীণু সেদিকে চাহিয়া একটু মুচকি হাসিল। তাহার পর কথা বলিল।]

বীণু। [ছেলেটিকে দেখাইয়া] আমার নতুন বন্ধুটিকে দেখ।

সুরেশ। ও, নাম কি?

বীণু। তোমার নাম কি বল। ইনিও আমার একজন বন্ধু।

[ছেলেটি নমস্কার করিল।]

ছেলেটি। আমার নাম শ্রীইন্দ্রজিৎ বসু।

বীণু। রাস্তায় একটা রিক্সার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আমি সাইকেল থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। সবাই আমাকে ঘিরে হৈ-হৈ করতে লাগল, কেবল এই দৌড়ে গিয়ে বাড়ী থেকে টিংচার আইয়োডিন, ছেঁড়া ন্যাকড়া, তুলো নিয়ে এসে পা-টা বেঁধে দিলে। ছ'ড়ে গেছে খানিকটা।

[শাড়ী একটু তুলিয়া পা দেখাইল]

সুরেশ। তাই না কি। বেশী লাগেনি তো, হাড়হাড়?

বীণু। কিচ্ছু না, লাভই হয়েছে বরং। অ্যাকসিডেণ্ট না হলে এমন বন্ধুটি কি পেতুম? ওকে একটা ব্যাট কিনে দিয়েছি। ইন্দ্রজিৎ কিছু খাবে না কি?

ইন্দ্রজিৎ। না, আমার পেট ভরা আছে। আর একদিন আসব। দেরি হলে মা ভাববে। চললুম এখন

[এক ছুটে বাহির হইয়া গেল]

বীণু। চমৎকার ছেলেটি, না?

সুরেশ। ছেলেটি তো চমৎকার। কিন্তু তোমার ব্যাপার কি বল তো। একদিনও বাড়ী ফিরে দেখলাম না যে তুমি বাড়ীতে আছ।

বীণু। [বিস্মিত] তোমার অপেক্ষায় দিন-রাত ঘরে বসে থাকব। তাই তুমি প্রত্যাশা কর না কি। যা কখনও করিনি তা করব কি ক'রে?

সুরেশ। যদি গৃহস্থালী পাততে চাও—

বীণু। তাহলে বাইরের জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করতে হবে?

সুরেশ। কনকের ওখানে বড্ড বেশী যাতায়াত করছ।

বীণু। কনকের কাছেও যাব না! [সহসা] আচ্ছা, তুমি কি হয়ে যাচ্ছ বল তো—! আমি কি একটা নির্জীব আসবাব যে দিন-রাত ঘরের কোণে প'ড়ে থাকব?

সুরেশ। সাধারণ আসবাব নও। বহুমূল্য রত্ন। যেখানে সেখানে প'ড়ে থাকলে টপ ক'রে তুলে নেবে কেউ।

বীণু। ইস্ নিলেই হল। দু-একজন চেষ্টা করেছে অবশ্য। ও, হ্যাঁ একটা কথা বলতে ভুলেছি। ক্লিওপেট্রার ওপর তুমি যে থীসিসটা লিখেছ সেটার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিলেন প্রফেসার মজুমদার। সত্যি খুব ভাল হয়েছে ওটা একটু ইতস্ততঃ করিয়া, সহসা] একটা কথা তোমাকে বলব? তোমাকে ছাড়া আর কাকেই বা বলব। কিন্তু চেঁচিয়ে বলতে লজ্জা করছে। স'রে এস কানে কানে বলি।

[সুরেশের কানে কানে গিয়া বলিতেই সুরেশ চমকাইয়া পিছাইয়া গেলেন। মনে হইল তাঁহাকে যেন বৃশ্চিক দংশন করিল]

সুরেশ। আমি সংযম করে' আছি, আলাদা ঘরে শুই—আর তুমি বলছ—.

বীণু। কি জানি কোথা দিয়ে কি করে' কি হ'য়ে গেল।

সুরেশ। আর সে কথা তুমি আমাকে বলছ!

বীণু। তোমাকে বলব না তো কাকে বলব। তোমাকে যে আমি ভালবাসি। আমার সমস্ত বিপদ আপদ দোষ ত্রুটি তোমাকেই তো সামলাতে হবে। আর আমি জানি তুমি তা পারবে। ক্লিওপেট্রার সম্বন্ধে অমন দরদ দিয়ে যে থীসিস লিখতে পারে সে—

[দুয়ারের কড়া নড়িল। দ্বার খুলিতেই পিওন চিঠি দিয়া গেল]

সুরেশ। [চিঠিটা পড়িয়া] যাক এ চাকরিটাও হ'ল না।

বীণু। তুমি কোথায় দরখাস্ত করেছিলে?

[সুরেশের চিঠিটা লইয়া দেখিল]

আরে, আমিও যে এখানে দরখাস্ত করেছিলাম। আমি সিলেক্টেড্ হয়েছি। আমার ইনটারভিউ ছিল আজ। সেখানেই তো গিয়েছিলাম। [লীলাভরে মাথা নাড়িয়া] আমার ফার্স্ট ক্লাস ছিল মশাই, তোমার সেকেণ্ড ক্লাস—।

[সুরেশ বিবর্ণ মুখে চেয়ারটাতে বসিয়া পড়িলেন। বীণু সোজা গিয়া তাহার কোলের উপর বসিল এবং গলা জড়াইয়া ধরিল]

ও কি, আমার দিকে চাও। অমন করছ কেন। সমস্যা তো মিটেই গেল, তুমিই চাকরি পাও বা আমিই চাকরি পাই, একই কথা। কালই চল বিয়েটা সেরে ফেলা যাক।

সুরেশ। [তিক্ত হাসি হাসিয়া] ফার্স্ট ক্লাসের সঙ্গে সেকেণ্ড ক্লাসের কি রাজ-যোটক হবে?

বীণু। কিন্তু তুমি যে ডকটরেট পাবে শুনে এলাম। আমি বই মুখস্থ করে' ফার্স্ট ক্লাস হ'তে পারি। কিন্তু ক্লিওপেট্রার ওপর অমন থীসিস লিখতে পারি কি? [সহসা] তুমি আমার অ্যান্টনি—

[পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর সহসা আলিঙ্গনবদ্ধ হইল]।

মরমী সাধক শহীদ সরমদ্

(৩১ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ব ও মরমী সাধকগণ তাঁহার এইসব কবিতা গ্রহের সহিত শুনিতেন। তাঁহার এইসব বিতা রাজ্যের সীমা পার হইয়া ভারতের সর্বত্র ড়াইয়া পড়িল। বিদ্বান সমাজ বুঝিলেন যে, কজন প্রকৃত কবি এদেশে আসিয়াছেন।

ইতিপূর্বে কবি হিসাবে এবং একজন তত্ত্ব-ণী সাধক হিসাবে সরমদের খ্যাতি দিল্লীতে ড়াইয়া পড়িয়াছিল। দিল্লীবাসিগণ তাঁহাকে খিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছিল। হায়দরাবাদ রত্যাগ করিয়া তিনি যখন দিল্লীতে পদার্পণ রলেন তখন বহু লোক তাঁহার দর্শন লাভের ন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তাহাদের নেকে অবশ্য তাঁহার অদ্ভুত চেহারা, হাবভাব ও বিন পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই লঙ্গ সন্ন্যাসী খাঁটি সাধু না হইয়া পারেন না। র্ণিয়ার সাহেব বলেন—"তিনি দেখিলেন, মদ্ আদিম শিশুর মত উলঙ্গ অবস্থায় ল্লীর পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি ওরঙ্গজেবের প্রলোভন ও ভয়-ভীতিকে নভাবে উপেক্ষা করিয়াছেন।" মানুসী আর কজন ইউরোপীয়ান পরিব্রাজক। তিনি খিয়াছেন যে, সরমদ্ সর্বদা সর্বক্ষণ উলঙ্গ বস্থায় থাকিতেন। ব্যতিক্রম হইত কেবল রাশিকোহ্‌র বেলায়। কারণ দারা তাঁহার নিকট পস্থিত হইলে তিনি এক-টুকরা কাপড় দিয়া জাস্থান ঢাকিতেন।

মত্ত অবস্থায় মুখে মুখে কবিতা আবৃত্তি র এই প্রকার উলঙ্গবেশ—যে দেখিয়াছে সেই ধ হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নীরবে রে চরণে প্রণতি জানাইয়াছে। দারাশিকোহ হার নিকট সর্বদা আসিতেন। তিনি ক্রমেই -সরমদের নৈকট্য লাভ করিতে লাগিলেন। া তাঁহাকে গুরু বলিয়া সম্বোধন করিতেন। হাদের উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বের এই সম্পর্ক র উভয়ের পক্ষেই বিপজ্জনক হইয়াছিল। হারা উভয়েই ধর্ম সম্বন্ধে উদার মত পোষণ রতেন শুধু তাহাই নহে, তাঁহারা শরিয়তের ধান অপেক্ষা আধ্যাত্মিক ও মরমী আদর্শকে ধান্য দিয়াছিলেন। সরমদ্‌কে সম্রাট শাহ্-হানের নিকট পরিচিত করাইবার জন্য দারা চেষ্টা করিয়াছিলেন। শাহ্‌জাহান সরমদের লৌকিক শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য এনায়েৎ কে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ায়েৎ খাঁ সরমদের বাহ্যিক হাবভাব দেখিয়া ক্তি বোধ করিলেন। তিনি মনে করিলেন সরমদ্ একটা নিতান্ত বাজে লোক। সুতরাং নি শাহ্‌জাহানের নিকট এই রিপোর্ট পেশ রলেন যে, "সরমদের কিছুই অলৌকিক শক্তি ই। আর গুপ্তস্থান সদা উন্মুক্ত, ইহা ব্যতীত হার আর কিছুই বৈশিষ্ট্য নাই।" কিন্তু হ্‌জাহান এই বিবরণের উপর বিশ্বাস স্থাপন রতে পারিলেন না। তিনি এনায়েৎ খাঁকে লেন যে, "একটুকরা বস্ত্রই দুর্নামকারীর ইবাকে সংযত করিতে পারে।" শাহ্‌জাহানের হত সরমদের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল কি-না হা বলা যায় না। কিন্তু যেহেতু দারা মদ্‌কে শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন সেই ্য শাহ্‌জাহান সরমদের নিন্দা সহ্য করিতে রিতেন না। রক্ষণশীল ব্যক্তিগণ সরমদের নিন্দা করিয়া বেড়াইলেও দারার সহিত সরমদের নৈকট্যের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রহিল। তাঁহাদের মধ্যে প্রায় দেখা-সাক্ষাৎ হইত, আলাপ-আলোচনা ও পত্রালাপ হইত। তখনও দারা যুবরাজ মাত্র। তবুও তাঁহার উপর কতকগুলি রাজকার্যের ভার ন্যস্ত ছিল। কিন্তু তিনি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব অপেক্ষা ধর্মালোচনায় অধিক সময় ক্ষেপণ করিতেন। তাঁহার দরবার সাধু-সুফীগণের জন্য অবারিত ছিল। রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের প্রতি এই প্রকার অবহেলার জন্য তাঁহাকে পরে বহু বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। শীঘ্রই এইসব আলোচনার চির অবসান হইল। কারণ অল্প-দিনের মধ্যেই আওরঙ্গজেব সমস্ত রাজক্ষমতা হস্তগত করিয়া লইলেন। তিনি শাহ্‌জাহানকে বন্দী করিলেন। ভ্রাতৃরক্তে হস্ত কলুষিত করিলেন। আর যেখানে পারিলেন শরিয়ত বিরোধী মরমী সাধকগণকে গ্রেপ্তার করিয়া জল্লাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। দারার সঙ্গী ও গুরু ছিলেন সরমদ্। সুতরাং তিনিও ধর্মান্ধতার কবল হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। কিভাবে নিরীহ সুফী সরমদের জীবনাবসান হইল, এইবার সেই কথা বলিব।

আওরঙ্গজেব রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া শরিয়তী ব্যবস্থার উপর জোর দিলেন। দারা ও তাঁহার সঙ্গিগণ যে উদার ধর্মমত প্রচার করি-তেন তাহা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। এইবার তিনি তাঁহাদের দণ্ডদানের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। বহু পূর্বে সরমদ্ ভবিষ্য-দ্বাণী করিয়াছিলেন যে, শাহ্‌জাহানের পর দারাই রাজা হইবেন। কিন্তু আওরঙ্গজেব ইতিমধ্যে দারাকে হত্যা করিয়া ফেলেন। সুতরাং সরমদের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হইল। আওরঙ্গজেব রাজপদে উপবেশন করিয়া সরমদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন আপনার প্রিয় রাজকুমার কোথায় আছেন?" তদুত্তরে সরমদ্ বলিলেন—"তিনি এইখানেই উপস্থিত আছেন, তবে আপনি তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন না। কারণ আপনি আত্মীয়স্বজনদের উপর অত্যাচার করিয়াছেন। এবং নিজে রাজা হইবার জন্য ভ্রাতৃরক্তে হস্ত কলুষিত করিয়াছেন। দারা যে অনন্ত সাম্রাজ্যের রাজা হইয়াছেন, আপনি কোনদিন সেখানে যাইতে পারিবেন না।" সরমদের এই উত্তরে আওরঙ্গজেব অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি শরিয়ত বিরোধী সুফীগণকে ধ্বংস করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অত্যাচারে সুফীদের সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া গেল। বহু মরমী সুফীদেরকে নামমাত্র বিচারে হত্যা করা হইল। কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত সরমদের অঙ্গ স্পর্শ করেন নাই। উচ্চ-নিম্ন সর্ব শ্রেণীর লোকের উপর সরমদ্ একটা শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। সেই জন্য সরমদ্‌কে অপসারিত করা তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল না। আওরঙ্গজেব দরবারের ওলামাদের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। দারার হত্যার ব্যাপারে এইসব ওলামাগণই পরামর্শ দিয়াছিলেন। গোঁড়া মোল্লা সম্প্রদায় বলিলেন যে, সরমদ্‌কে নিম্ন কারণে কাফের ঘোষণা করিয়া বধ করা হউক:—(ক) সরমদ্ উলঙ্গ অবস্থায় অবাধে সর্বত্র ভ্রমণ করেন। তাঁহার এই আচরণ শরিয়ত সমর্থন করে না। (খ) সরমদ্ ইসলামের রীতিনীতি মানিয়া চলেন না এবং ইসলামের কলমা সম্পূর্ণটা উচ্চারণ করেন না। তিনি কেবল মাত্র 'লা এলাহা'টুকু উচ্চারণ করেন। ইহার অর্থ "আল্লাহ্ নাই।" (গ) সরমদ্ হজরত মহম্মদের সশরীরে মেরাজ বা স্বর্গ গমন বিশ্বাস করেন না। ইহার প্রমাণ-স্বরূপ সরমদের এই উক্তিটি উপস্থিত করা হইল,—"যে স্বর্গের রহস্য বুঝিতে পারে সে স্বর্গ অপেক্ষাও বিরাট ও মহান হইয়া পড়ে। মোল্লারা বলেন যে, আহমদ (অর্থাৎ হজরত মহম্মদ) সশরীরে স্বর্গে গিয়াছিলেন। আর সরমদ্ বলে যে, স্বর্গই আহমদের নিকট আসিয়াছিল।

"ধর্মদ্রোহিতা" সরমদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হইলেও আসলে সেই কারণে তাঁহাকে হত্যা করা হয় নাই। আওরঙ্গজেব দারার সঙ্গী ও বন্ধুকে সহজে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। সে যুগে সরমদের মত আরও অনেক সাধু ব্যক্তি উলঙ্গ হইয়া থাকিতেন। শরিয়ত বিরোধী উক্তি আরও অনেকে করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের বিচার হয় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সরমদ্‌কে হত্যা করিবার প্রধান কারণ রাজনৈতিক,—দারার সমর্থক কাহাকেও জীবিত রাখিব না, ইহাই ছিল আওরঙ্গজেবের সংকল্প।

সরমদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করিবার ব্যাপারে যিনি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি আর কেহ নহেন, স্বয়ং আওরঙ্গজেবের ওস্তাদ ও প্রিয় সভাসদ ইমদাদ খাঁ মোল্লা কাভী। এই মোল্লা খাঁ কাভী সম্রাটের প্রিয়পাত্র ছিলেন বলিয়া দিল্লীর অপরাপর ওলামাগণকে কোনও-রূপ শ্রদ্ধা করিতেন না। তিনি ইহা চাহেন নাই যে, দিল্লীতে তাঁহার অপেক্ষাও প্রভাবশালী ব্যক্তি কেহ জনসাধারণের সম্মান ও শ্রদ্ধা পাইবে। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে, কে এক উলঙ্গ ফকীরের নামে দিল্লীর লোক পাগল। তাহারা সমস্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা সরমদ্‌কেই অর্পণ করিতেছে। দিল্লীতে সরমদের উপস্থিতি মোল্লা কাভীর

প্রার্থী

॥ শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় ॥

আমি অতিদীনের মতো
তোমার কাছে এসে চেয়েছিলাম
দিনান্তে একটুক্‌রো প্রসাদ ঃ

সন্ধ্যার অবলীয়মান রক্তিম আভায়
তোমার মুখে একটি অভয় বাণী
স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিলো
তুমি কিন্তু ঈষৎ হেসে,
তোমার কালো কেশের গুচ্ছে
সে-বাণী আড়াল ক'রে নিলে,
আমি অন্ধকারের মধ্যে
দিশেহারা পথিকের মতো
তোমার নাম ধরে ডাকলুম,
তোমাকে পেলুম না,

প্রভাতের অজস্র শিশিরের শব্দে
শুনতে পেলাম তোমার
সে বাণী।

মর্যাদাকে একেবারেই লঘু করিয়া দিল। তাই তিনি আইনের আশ্রয় লইয়া সরমদ্‌কে অপসারিত করিবার জন্য কোন চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই।

সরমদ্‌ ধৃত হইলেন এবং যে আদালতের প্রধান বিচারপতি ছিলেন উক্ত মোল্লা কাভী সেই আদালতে তাঁহার বিচারের ব্যবস্থা হইল। সরমদ্‌ জানিতেন যে, এই বিচার একটা প্রহসন মাত্র। তিনি বীরের মত সমস্ত অভিযোগের উত্তর দান করিলেন। এবং দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন যে তিনি নির্দোষ। কেন তিনি সাধারণ লোকের মত জীবন যাপন করেন না তাহার উত্তর প্রদান করিলেন। তিনি স্পষ্টভাবে স্বীকার করিলেন যে, তাঁহার বস্ত্রের কোন প্রয়োজন নাই, সেইজন্য সত্যই তিনি উলঙ্গ হইয়া থাকেন। শাস্ত্র হইতে নজির দেখাইলেন যে, পয়গম্বর ইসায়া বৃদ্ধ বয়সে উলঙ্গ হইয়া বিচরণ করিতেন। একটি ফারসী শ্লোক দ্বারা তিনি তাঁহার মনোভাবটি বুঝাইয়া দিলেন—"ঈশ্বর পাপীকে তার পাপ আবরণ করিবার জন্য বস্ত্র দেন, কিন্তু যে আজন্ম নিষ্পাপ তাঁহাকে তিনি দেন উলঙ্গতার আবরণ।" আর একটি অভিযোগ তিনি শাস্ত্রসম্মত সম্পূর্ণ কলমা উচ্চারণ করেন না। ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন যে, সত্যই তিনি সম্পূর্ণ কলমা উচ্চারণ করেন না। কারণ তিনি এখনও সম্পূর্ণ সত্যটা পান নাই। ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে এখনও তিনি অন্ধকারে হাবুডুবু খাইতেছেন। যেদিন তিনি ঈশ্বরকে স্বচক্ষে দেখিবেন সেই দিন তিনি সম্পূর্ণ কলমা উচ্চারণ করিবেন। কোন কিছুর বাস্তব স্পর্শ না পাওয়া পর্যন্ত তাহার অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেওয়া মিথ্যা শপথ মাত্র। তাহা তিনি করিতে পারিবেন না। তৃতীয় অভিযোগের উত্তরে তিনি কি বলিয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে সম্ভবতঃ সুফীদের মত তিনি এই ধরণের কোন কথা বলিয়া থাকিবেন—ঈশ্বর প্রত্যেক স্থানে ও বস্তুতে সর্বদা বিদ্যমান। যাঁহারা এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা স্বর্গ-মর্ত্যের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন না। কারণ তাঁহাদের নিকট সবই এক। সুফীদের মতে, হজরত মহম্মদের মেরাজ সশরীরেই হউক অথবা স্বপ্নের মাধ্যমে হউক একই কথা। যিনি স্থান ও কালের সীমার মধ্যে নাই, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য হজরত মহম্মদকে কোথাও যাইতে হইবে না। সুফী শাস্ত্রে ইহারই নাম "ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ।"

পূর্বেই বলিয়াছি এই বিচার একটা ধাপ্পা মাত্র। আসল উদ্দেশ্য ছিল সরমদের সমর্থকদের চোখে বিচারের নামে ধূলি দিয়া তাঁহাকে পৃথিবী হইতে অপসারিত করা। সরমদের কথাগুলি যতই যুক্তিসম্মত হউক না কেন, তাবেদার বিচারকগণ তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। এবং মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন। একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে ধর্মের নামে হত্যা করা ইতিহাসে নূতন নহে। ধর্মান্ধতা ও মরমী ভাবের মধ্যে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে একটা বিরোধিতা। পূর্বে মহর্ষি মনসুর হাল্লাজ এই ভাবে নিহত হইয়াছিলেন। সেই একই অপরাধে সরমদ্‌ও নিহত হইলেন। কিন্তু সেই জন্যই সুফীদের গোষ্ঠীতে তিনি অমর হইয়া রহিলেন।

বিচারের আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি সমাপ্ত হইবার পর সরমদ্‌কে ফাসীর স্থানে লইয়া যাওয়া হইল। দারাকে গণ-আন্দোলনের ভয়ে রাত্রির অন্ধকারে হত্যা করা হইয়াছিল কিন্তু সরমদের হত্যার ব্যবস্থা হইল প্রকাশ্য দিবালোকে। ঘাতক প্রচলিত প্রথানুসারে সরমদের মুখ ঢাকিবার জন্য বস্ত্র লইয়া অগ্রসর হইল। কিন্তু সরমদ্‌ বলিলেন, মুখ ঢাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। অতঃপর তিনি একটি শ্লোক উচ্চারণ করিলেন। তাহার ভাবার্থ—"হে বন্ধু! তুমি উলঙ্গ তরবারি লইয়া আসিয়াছ। তুমি যে বেশেই আস না কেন, আমি তোমাকে চিনি।" তারপর আর একটি কবিতা আবৃত্তি করিলেন—"দূরে শুনিলাম একটা চীৎকার ধ্বনি; আর আমরা অনন্ত নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিলাম এবং দেখিলাম যে, ইহা পাপের রজনী, আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম।" ঘাতক যখন তাঁহার উপর মারাত্মক অস্ত্র তুলিতে উদ্যত ঠিক সেই সময় তিনি আবৃত্তি করিলেন—"ভালবাসার পথে উলঙ্গ দেহটা হইতেছে ধূলো। সেই দেহটাও তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল।" কথিত আছে যে, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে শাহ্‌ আব্দুল্লাহ নামক সরমদের একজন পরিচিত ব্যক্তি নিকটে আসিয়া বলিল, "এখনও বাঁচিবার সময় আছে। তোমার দেহের উপর একখণ্ড বস্ত্র রাখ, সমস্ত কলমা উচ্চারণ কর—তাহা হইলে আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিতেছি যে, তুমি মুক্তি পাইবে।" সরমদ্‌ ধীরভাবে তাহার দিকে তাকাইলেন, কোন কথা বলিলেন না। কেবল একটি শ্লোক উচ্চারণ করিলেন—"অনেক দিন হইল লোকে মনসুরের নাম ভুলিয়া গিয়াছে। আমি আবার ফাসীর মঞ্চ ও ফাসীর দড়ির প্রদর্শনী দেখাইতে আসিয়াছি।"

কথিত আছে যে, ঘাতক যখন তাঁহার মস্তকটি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য অসি উদ্যত করিয়াছে ঠিক সেই সময় তাঁহার মুখ হইতে সম্পূর্ণ কলমা উচ্চারিত হইল। যেন তিনি ঠিক মৃত্যুর মুহূর্তে সমস্ত সত্য উপলব্ধি করিতে পারিলেন। প্রচলিত প্রথানুসারে যে স্থানে তাঁহাকে বধ করা হইয়াছিল ঠিক সেই স্থানে তাঁহাকে সমাহিত করা হইল। আজিও তাঁহার সমাধিস্থলে একটি গম্বুজ বিদ্যমান আছে। আজ তাঁহার সমাধি তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার সমাধির উপর যে তৃণগুচ্ছ জন্মিয়াছে তাহা বৎসরের সকল সময় সবুজ হইয়া থাকে। লোকে বলে দ্বিতীয় মনসুরের ইহাও একটা অলৌকিকতা।

ঘাতকের হস্তে সরমদ্‌ শহীদ হইলেন। কিন্তু আওরঙ্গজেব তাঁহার প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিতে পারিলেন না। সরমদ্‌ একজন শ্রেষ্ঠ সুফীর মর্যাদা লাভ করিলেন। সরমদ্‌ ছিলেন স্বভাব কবি। তিনি মুখে মুখে বহু রুবায়েত রচনা করিয়াছিলেন। সে সব কবিতা লোকের মুখে মুখে দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। শরিয়ত-বিরোধী সংসার বিরাগী সুফীদের কবিতার মত সরমদের কবিতা আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ। সরমদ্‌ বিশ্বাস করিতেন যে, ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। তিনি মন্দিরে আছেন, মসজিদে আছেন, মক্কার কারাগৃহের কৃষ্ণ প্রস্তরে আছেন, আবার হিন্দুদের প্রতিমার মধ্যেও আছেন। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের অবস্থিতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি একটি কবিতায় বলিয়াছেন যে, —"তুমি ফুলের মধ্যে আছ, তুমি পর্বতে, মরুতে, উদ্যানে আছ। আবার কখনও তুমি আলোরূপে দেখা দাও, কখনও ফুলের সৌরভে আত্মপ্রকাশ কর। তুমি যেমন উদ্যানের নীরব কুঞ্জে বিরাজমান সেইরূপ তুমি জনবহুল সভা-মাঝেও দীপ্যমান।" তাই সরমদ্‌ বলেন—"আমি সত্যের সার সর্বত্র একই দেখি।" ঈশ্বর প্রাপ্তি জন্য একটা অন্তর্দৃষ্টি থাকা চাই। এই অন্ত দৃষ্টি ঈশ্বরের দান। সরমদ্‌ বলেন যে সদ্গুরুর সাহায্যে মানুষ তার অন্তর্দৃষ্টি সদ্ব্যবহার করিতে শেখে। তখন তাহার হৃদ স্বর্গীয় আলোকে বিভাসিত হয়। সরমদ্‌ পাপী দেরকে এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, "ঈশ্ব সর্বদাই ক্ষমাশীল। ঈশ্বরের ক্ষমা সম্বন্ধে হতাশ হইও না। পৃথিবীর সকল মানুষের পাপে সমস্ত বোঝা অপেক্ষা ঈশ্বরের ক্ষমা শক্তি অনে বেশী। ঈশ্বরের ক্ষমা মানুষের সমস্ত পাপকে লঘু করিতে পারে।" অন্যান্য সুফীদের মত সরমদ্‌ শরিয়তের উপর নির্ভর করিতেন না তিনি বলিতেন যে, সুফীদের পন্থাই সত্য পন্থা। এই পন্থাই মানুষকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে লইয়া যাইবে। তাই তিনি শরিয়তের পন্থা মানিয়া চলিতেন না। তিনি বলিতেন যে শরিয়ত একটা প্রদর্শনী মাত্র। তাঁহার মতে শরিয়ত পন্থীরা প্রেমের পথ জানেন না। আর প্রেমের পথই ঈশ্বরের পথ। বহু বিষয়ে সরমদের কবিতা কবি ওমর খাইয়ামের কবিতার অনুরূপ। কিন্তু সরমদের কোন পাশ্চাত্য ভাষ্যকার নাই। সেইজন্য পাশ্চাত্য দেশ তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। আনন্দের কথা যে সম্প্রতি শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী "সরমদের রুবায়েত" প্রকাশিত করিয়াছেন। বিশ্বভারতীর ইসলামিক ও উর্দু বিভাগের অধ্যাপক মৌলানা ফজল মহম্মদ আসিরি সাহেব এই গ্রন্থের সম্পাদনা করিয়াছেন। উদার ধর্মমত ও সর্ব ধর্মসমন্বয়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের বিষয় আলোচিত হওয়া খুবই দরকার। সেইদিক দিয় সরমদের জীবনদর্শন আলোচনার একটা সার্থকতা আছে। শহীদ সরমদ্‌ জিন্দাবাদ।

খয়েরি বিকেল মুছে সন্ধ্যার আস্তরে ওঠে চাঁদ
জলের পরীর মত। আবছা অরণ্যে বাতি জ্বলে
স্নিগ্ধ সাঁওতাল হাতে। মহুয়ার ছায়া-মখমলে
জোনাকির ফুল ঝরে, ওপাশে পাহাড়ী বক্র খাদ

রুপালি একটি নদী উপল-নূপুর পরে পায়
ঝিরিঝিরি হাওয়া লেগে উড়ু উড়ু ধীরে বহে যা
শব্দময় শুনি শুধু দূরতম ঢোলের আওয়াজ
রেশম-ঘাঘরা ফাঁকে দেহ তার তারার এস্রাজ।

বাহিরে দাঁড়াই এসে, প্রাঙ্গণে অপার গন্ধময়
নৈঃশব্দের মৃত্যু ধ্যান, কাঁপা কাঁপা পাহাড় শ্রেণী
বুকে যেন স্বপ্নে ঝরে জলঝর্ণা কাজল-বেণীর
আঁকাবাঁকা লক্ষ ঢেউ সম্মোহিত অখণ্ড হৃদয়॥

অ্যাটলাস সাইকেল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ
সোনপত - দিল্লীর নিকটে

রাষ্ট্রপালের এবং রাজ্যপালের কর্মচারীদের, পুলিশ, রেলওয়ে, ডাক ও তার বিভাগের এবং রাজ্যসমূহের সাইকেল সরবরাহকারী হিসাবে

মূল্যের অনুপাতে শ্রেষ্ঠ!

দীপক নস্য
জ্যোতি স্নাফ কোং মাদ্রাজ
৯৬, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা—৭

কালাপানির ডাক

(১৮ পৃষ্ঠার পর)

বান ভাববে। সম্ভবতঃ তার কাছ থেকে যা পাবে সেটা হচ্ছে কোলকাতা থেকে একটা টেলিগ্রাম। সে নিশ্চয়ই আমার কোন চিঠি দেয়নি। অবশ্য ওটা আমি কখনই আশা করিনি এবং চিঠি পাওয়াটা আশঙ্কার কথা। এটা ভয়ানক রকমের আশ্চর্যজনক ব্যাপার হয়ে উঠবে, কারণ আমি নিশ্চয়ই কিছু করে উঠতে পারব না কিন্তু মেঝের উপর গড়াতে থাকব এবং পরের ২।৩ ঘণ্টার জন্য আমাকে হাঁপাতে হবে। না, দেবতাদের অনুগ্রহ কামনা করতেও ভয় হয়। আমার মনে হয় তোমার চিঠি মনুকে দেওয়ার মত যথেষ্ট সামর্থ্য তার থাকবে, কারণ তাদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেক দিন দেখা হবে। মনুকে তার উত্তর দেওয়ার আগে কিছু সময় দিও। সেও বিনুরই ভাই। অনুগ্রহ করে বিনোর ঠিকানাটা আমায় জানিও। কারণ তার জন্য লেখা চিঠিটা কোথায় পাঠাতে হবে জানি না। আর, তুমি কি আমাকে Bari's English Composition বইটার গ্রন্থকারের নাম জানাতে পারবে? এই ধরণের গ্রন্থের আমার অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ এটা কেবল বাংলার জন্যই নয়, গুজরাটির পক্ষেও কাজে লাগবে। এখানে ঠিক ঐ ধরণের সুবিধামত বই নেই।

তুমি তোমার চিঠিতে লিখেছ এখানে সব ভাল আছে অথচ ঠিক পরের বাক্যেই আমি পড়লাম, "বারি জ্বরাক্রান্ত"। তোমার কি মনে হয় যে, 'বারি' বলতে কাউকেই বোঝায় না? হতভাগ্য বারি! মানবসত্তার তালিকা থেকে তাকে যে বাদ দেওয়া হবে তা ঠিক ও যথার্থ হলেও আদৌ তার অস্তিত্ব অস্বীকার করাটা কি কিছু নিষ্ঠুর হয়ে উঠবে না? আশা করি এটা একটা জ্বরের সামান্য আক্রমণ মাত্র। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। বাংলা থেকে আসার সময় যে স্বাস্থ্য-ভান্ডারটি সংগে এনেছি, আমার মনে হয় তা নিঃশেষ হতে কিছু সময় লাগবে। আমি আমার জন্মদিন ১৫ই আগস্টের পর থেকে ২২টি সুদীর্ঘ পথচিহ্ন অতিক্রম করে ভয়ঙ্কর রকমের বুড়ো হতে সুরু করেছি।

তোমার চিঠি থেকে অনুমান হচ্ছে যে, তুমি ইংরাজীতে বড় রকমের উন্নতি করছ। আমার ধারণা তুমি খুব তাড়াতাড়ি শিখবে। তাহলে আমি ঠিক যা বলতে চাই তা লিখতে পারব এবং যেভাবে আমি বলতে চাই সেইভাবেই পারব। ঐভাবে লেখা এখন আমার পক্ষে কষ্টকর কারণ তা তোমার বোঝার পক্ষে সুবিধা হবে কিনা বলতে পারি না।

ভালবাসা সহ
তোমার স্নেহময় ভ্রাতা
অরো

পুনশ্চ:—

আমার নামের নূতন বর্ণশুদ্ধি জানতে চাইলে বড় মামামহাশয়কে জিজ্ঞাসা কোরো।

"অ"

১৮৯৪ সালের ২৫শে আগস্টে বরোদা হইতে সাধারণ মানুষ দিদিকে লেখা বরোদার মহারাজার চাকুরে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের লিখিত এই পত্রের একটি বিশেষ মূল্য আছে। আমরা এইরূপ অকস্মাৎপ্রাপ্ত পত্রকে মূলধন করিয়া এত কথা ভাবিতেছি অথচ পন্ডিচারী আশ্রমে এরূপ রাশি-রাশি পত্র নিশ্চয়ই আছে—১৯১০ হইতে ১৯৪৯ অবধি নানা অবস্থায় নানা পরিস্থিতিতে নানাজনের লিখিত। শ্রীঅরবিন্দ মহাসাধক অবতারকল্প পারমার্থিক পুরুষ হইতে পারেন, কিন্তু এই দেবদুর্লভ মানুষটি যে একান্তই মানুষ, তাহা চাপা দিয়া তাঁহার মানবী উৎসমুখকে অস্বীকার করার একটা প্রয়াস চলে এই সব ক্ষেত্রে। শ্রীঅরবিন্দের ক্ষেত্রেও তাহা উৎকটভাবে ঘটিয়াছে, তাঁহার মানবাধারকে দিব্যান্তরে রূপান্তরের এই ব্যবসায়াত্মিকা দিকটির খাতিরে।

দিদিকে লিখিত ১৮৯৪ সালের আলোচ্য এই পত্রটির অপূর্ব সাহিত্যিক মুন্সিয়ানা লক্ষ্য করিবার বস্তু। নিতান্ত অবান্তর একটি পারিবারিক পত্রে এমন উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-সৃষ্টি একমাত্র মহাপন্ডিত সাহিত্যাচার্য অরবিন্দেই সম্ভব, যেমন আমরা দেখিতে পাই কবিগুরুর যে কোন অযত্ন-লিখিত টুকি-টাকির প্রতি ছত্রে ছত্রে।

একবার তাহার পশ্চিমবঙ্গ জনকল্যাণ সংঘের বাৎসরিক উৎসবে রামকানাই অধিকারী লেনে বিপ্লবী-পাগল শ্রীগৌরব বন্দ্যোপাধ্যায় বেচারী দিদিকে বক্তৃতা দিতে ধরিয়া আনিয়াছিল এবং শ্রীঅরবিন্দের সম্বন্ধে কিছু বলিতে ধরিয়া বসিয়াছিল। কমবক্তা বেচারী দিদি তো গলদঘর্ম! শেষটা ঠিক হইল—বোমার মামলায় শ্রীঅরবিন্দের গ্রেপ্তারের চাক্ষুষ দেখা কাহিনী দিদিকে বর্ণনা করিতে হইবে। তাঁহার হাতে লেখা সেই বিবরণীর খসড়া কাগজটি দিদির মৃত্যু আমাদের হাতে আনিয়া দিয়াছে। তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিলাম:

"শ্রীঅরবিন্দের ৪৮নং গ্রে ষ্ট্রীটের বাড়ীতে মাত্র ৩।৪ দিন আসার পরই শেষ রাত্র ভোর ৪টায় শোনা গেল কে যেন গেটেতে খুব জোরে জোরে ধাক্কা দিচ্ছে। আমাদের ছোট মাসিমা লজ্জাবতী বসু আমাকে ঘুম থেকে ডেকে বললেন, "কে যেন ডাকছে"। আমাদের চাকরের ঘুম ভাঙিয়ে খোঁজ নিতে বললাম। সে গেট খুলতেই পুলিশ (দল) একেবারে হন্নে হয়ে ঢুকে হুড়মুড় করে প্রথম দিকের উঠানের মধ্যে এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলো। পরে দলে দলে ভিতরের উঠানে এসেই উপরটা একেবারে ভর্তি হয়ে গেল। উঠানে পুলিশ দেখেই মাসিমা বললেন, "অরোকে ডাকো"। তাঁর ঘরে গিয়ে অনেক ডাকাডাকি করার পর তিনি উত্তর দিতেই বল্লাম—"পুলিশে বাড়ী ভর্তি হয়ে গিয়েছে।" তিনি শুনে উঠে বিছানায় চুপ করে বসে রইলেন। আমি ফিরে দাঁড়ালাম ঘরে যাবার জন্য, দেখি ছাদের উপরে আমার পিছনে অনেক সাহেব সার্জেণ্ট ও দেশী পাহারাওয়ালা অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং একজন ভদ্রবেশধারী সাহেব কোমরে ও হাতে পিস্তল বাগিয়ে ধরে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার চোখে চোখ পড়ায় তিনি পিস্তল নামিয়ে নিলেন। পরে শুনেছিলাম তিনি আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট। হয়তো তিনি মনে করেছিলেন—কে জানে হয়তো দুর্ধর্ষা বিপ্লবী—আমার কাছেও বম্ আছে। দেশী পাহারাওয়ালা-গুলোকে দুই ঘরের জানালার সামনে বন্দুক হাতে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল কিছুক্ষণ। পুলিশ শ্রীঅরবিন্দের ঘর সার্চ করে আমার ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল তাঁকে সঙ্গে নিয়ে। তিনি আমায় দরজা খুলে দিতে বললেন। সে ঘরে মাসীমা, সেজবৌদি ও আমি ছিলাম; দরজা খুলেই দেখলাম শ্রীঅরবিন্দ হাতে কড়া বাঁধা অবস্থায় দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন এবং সেই হাতকড়া বাঁধা অবস্থায়ই একটি গিনি আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমি তখন পুলিশের দিকে চেয়ে দেখলাম; যার দিকে চেয়েছিলাম তিনি পুলিশ ইনস্পেক্টর বিনোদ গুপ্ত। সে ঘরে সেজদা' এলে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—"তাঁকে নিয়ে গেলে আমরা কি করবো?" তিনি বলেছিলেন—ন'মেসো কৃষ্ণকুমার মিত্রকে খবর দাও, শ্যামসুন্দর বাবুকে খবর দাও।" পাশের বাড়ীর ছাদ থেকে সমবেত ভদ্রলোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন—'পুলিশ কেন সার্চ করছে?' আমরা উত্তর দিলাম, "কেন, জানি না।" তাঁরা জানতে চাইলেন কোন সাহায্য করতে পারেন কিনা, আমরা কৃষ্ণকুমার মিত্র ও শ্যামসুন্দর বাবুকে খবর দিতে অনুরোধ করলাম। তাঁদের বাড়ীর একটি ছেলে সাইকেলে করে গিয়ে খবর দিয়ে এলো। ন'মেসো মহাশয় অনারেবল শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসুকে সংগে নিয়ে এলেন। তখন পুলিশ শ্রীঅরবিন্দকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে, সংগে নিয়ে যাবে আড়বালিয়ার অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও শৈলেন্দ্রনাথ বসুকেও। তাঁরাও আমাদের সংগে সেই বাড়ীতে থাকতেন। ন'মেসোকে দেখে শ্রীঅরবিন্দ বললেন, "এরা আমার হাতে হাতকড়া দিয়েছিল।" সে-কথা শুনে রাগান্বিত অবস্থায় কৃষ্ণকুমারবাবু বিনোদ গুপ্তকে বললেন, "এ-সব কি, মশাই!" তিনি উত্তর দিলেন, "কৃষ্ণকুমারবাবু, মাপ করবেন। সাহেবরা ও'র হাতে হাতকড়া দিয়েছিল, আমিই খুলে দিয়েছি।"

অনেকে আমার নিকটে তখনকার কথা শুনতে চান। কিন্তু এখন সব মনে করে লিখতে বা বলতে পারবো না। আপনারা দেশবাসী, আমার সেজদাকে আজ সম্মান দিচ্ছেন, সেজন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমার বক্তৃতা দেবার অভ্যাস নাই, আর সে-সব কতকালের কথা, সব যথাযথ মনে নাই। আমার মহান সেজদার কথা আমি কি-ই বা বুঝি বা বলতে পারি!"

সরলমনা দিদির এই অনাড়ম্বর ভাষা ও কাহিনী সকল পাঠকেরই আজ স্বাধীন বাংলায় উপভোগ্য হইবে সন্দেহ নাই। দিদি বেচারী পরমার্থ জগতের ঐসব সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও দিব্য রূপান্তরের গূঢ় সংবাদ রাখিতেন না। বিশ্ববিখ্যাত এক বরেণ্য দেশ-নেতা ও মহাযোগেশ্বরের ভগ্নী হিসাবে তিনি সহসা একদিন জাতি ও দেশের সশ্রদ্ধ সমাদরের পাত্র হইয়া উঠিতে বড় কুণ্ঠিতা ও লজ্জিতা ছিলেন। এই গৌরবের দেয় কোন পুরস্কার বা মূল্য দিদি আমার কখনও কাহারও নিকট বা দেশবাসীর কাছে স্বপ্নেও চাহিবার চিন্তা করেন নাই। আমি অযাচিতভাবে পরবর্তীকালে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে লিখিয়া দিদির নিগৃহীতা রাজবন্দিনী হিসাবে একটি মাসিক ৫০্ টাকার বৃত্তি মঞ্জুর করাইয়া দিয়াছিলাম। তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামের নিগৃহীত কর্মীদিগকে তাঁহাদের অসামান্য ত্যাগ ও দুঃখ বরণের যৎসামান্য স্বীকৃতিস্বরূপ ঊর্ধ্বসংখ্যা মাসিক ১০০্ টাকা হইতে ৩০্ টাকা অবধি বৃত্তি দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আজ স্বাধীন ভারতের গৌরবোজ্জ্বল দশম বর্ষ চলিতেছে। বহু নির্যাতিত দেশসেবক সে বৃত্তি গ্রহণ করিতে তখন কুণ্ঠিত ছিলেন, বহু কর্মী আজ বার্ধক্যের চরম সীমায় বৃহৎ পরিবারের গুরুভার স্কন্ধে আমার ন্যায় আজও দুর্বহ বোঝ বহিয়া কষ্টে জীবনপথে কুব্জপৃষ্ঠ উষ্ট্রের ন্যায় ধুঁকিতে ধুঁকিতে চলিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয়, আজ মুক্ত স্বাধীন দেশের ও রাষ্ট্রের অর্জিত সকল সম্পদ ও গৌরব এই স[ ]নিস্পৃহ আত্মভোলা মুক্তিযোদ্ধাদিগেরই প্রকৃ[ ]প্রাপ্য। তাঁহারা কিন্তু ডাল নাড়া দিতেই আসিয়াছিলেন, তলার ফল কুড়াইতে যে দক্ষতা ও আহরণ লিপ্সা প্রয়োজন হয়, সে প্রেরণা ও শিক্ষা তাঁহাদে[র] আদৌ ছিল না। অতএব তাঁহাদের এ-বঞ্চনা [ ] দৈন্য প্রকৃতিরই দান। কানা, খোঁড়া, অক্ষম আতুরকে করুণার ও কৃতজ্ঞতার দান হিসাবে এ[ ] আত্মভোলা স্বভাবত্যাগীদের দেশ যদি আ[ ] যাচিয়া ডাকিয়া আনিয়া ব্যবহার করেন দেশ গঠনে এবং রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার কাজে তবে ইঁহাদের দেবতার ত্যাগপূত স্পর্শ জাতির জীবন-তীর্থ রচনার কাজে লাগে। তাহা তো কেহ করিতে[ ]ছেন না, অগ্নিদূত তাঁহারা, এখনও শত্রু-মিত্রের আতঙ্কের বস্তু।

দিদির সঞ্চয়ের ঝাঁপিতে ১৮৯৪ সাল হইতে ১৯৪৮ অবধি এই ৫০।৫৫ বৎসরের বহু নিদর্শন আছে। ১৯০৫ সালের ৪ঠা ও ৮ই নভেম্বরে

দুইখানি বরোদা হইতে লিখিত পোষ্টকার্ড পাওয়া গিয়াছে। তখন আমার ম্যালেরিয়া জ্বর চলিতেছে, দিদি তাই উদ্বেগে ছিলেন। তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য এই দুইখানি পোষ্টকার্ড লেখা হইয়াছিল।

৪ঠা নভেম্বর ১৯০৫ সালের পোষ্টকার্ডের যথাযথ বঙ্গানুবাদ—"প্রিয় দিদি, আমার সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইও না। আমি প্রতি সন্ধ্যায় প্রবল ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগি বটে কিন্তু সকালে সামান্য জ্বর থাকায় ভাল অবস্থায় চিঠিপত্র লিখিতে পারি। দু'মাসের জ্বর ভোগের ফলে দুর্বলতা যথেষ্টই হইয়াছে। কিন্তু এখন আমি একজন ভাল চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে থাকায় দু' হপ্তার মধ্যে ভাল হইয়া উঠিবার আশা রাখি। ভালবাসা লইও। সেজদাদা (শ্রীঅরবিন্দ) ভাল আছেন।"

৮ই নভেম্বরের পোষ্টকার্ডে আছে—

"প্রিয় দিদি, আমার এখন জ্বর ত্যাগ হইয়াছে। ডাঃ শেঠ নামে একজন এল-এম-এস আমার চিকিৎসা করিতেছেন। অবশ্য গত দু'মাসের রোগ ভোগের ফলে স্বভাবতঃই আমি অনেকটা রোগা হইয়া গিয়াছি। উদ্বেগের বিশেষ কোন কারণ নাই। প্রত্যহ তোমায় পত্র দেওয়া সম্ভব নহে। লক্ষ্মণ রাও এখানে নাই। সে আর বরোদায় ফিরিবে না। সেজদা নিজে এত কর্মব্যস্ত থাকেন। দুর্বলতা-বশতঃ আমার পক্ষেও প্রতিদিন পত্র দেওয়া সম্ভব নহে। তথাপি প্রতি সপ্তাহে দু'চার ছত্র কুশল সংবাদ দিতে চেষ্টা করিব। দাদা ও তুমি ভালবাসা লইও।"

এই দু'খানি পোষ্টকার্ড বরোদা হইতে বড়দাদা বিনয়ভূষণের ঠিকানায় ম্যানর লজ, দার্জিলিঙে লেখা। ইহার এক বৎসরের মধ্যেই দীপ্ত স্বদেশীয় আন্দোলনের উত্তাল স্রোতে ভাসাইয়া বন্দেমাতরম্ ও জাতীয় কলেজের কাজে শ্রীঅরবিন্দকে বাংলায় টানিয়া আনিয়াছিল।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২রা মে মাণিকতলা রোডে মাণিকতলার বোমার বাগান ঘেরাও করিয়া অগ্নি-যুগের কর্মীদল গ্রেপ্তার হন। এ-সব কাহিনী আমার লিখিত "বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী" (ডি এম লাইব্রেরী প্রকাশিত) ও "দ্বীপান্তরের কথা"-য় আছে। আলীপুর জেলে বিচারাধীন কালের নয়খানি জেল হইতে দিদিকে লিখিত আমার পত্র পাওয়া গিয়াছে। এই পত্রগুলি অমূল্য বস্তু, আমরা নিশ্চিত ফাঁসী ও দীর্ঘ দ্বীপান্তরদণ্ড প্রতীক্ষায় কি প্রকার মন ও ভাবনা লইয়া একপ্রকার নির্জন গুহাবাসেই কাটাইতেছিলাম, এই চিঠিগুলিতে তাহার আভাষ আছে। জেল কর্তৃপক্ষের সেন্সর করা এই চিঠি সে অবস্থার আভাষ মাত্র ছাড়া আর কি দিতে পারে? উপরিউক্ত মৎপ্রণীত দুইখানি পুস্তকের বিবরণ সপ্রমাণ করিতেছে বিচারাধীন এই প্রামাণ্য পত্রাবলী।

PRISONER'S LETTER

Alipur Jail Lockup
20th July, 1908.

Dear Sister,

We are all well here. So long we were kept separately in different cells. Now they have put us together in a large cell (ward হইবে) composed of four rooms. So life is more bearable now. Please don't fail to let me know how you are all doing. There are Rs. 300 left by Abinash in a box, the key of which is left with you. If you at all have to take out of it for Mother do so only when every other source for raising money fails. If we at all spend out of that money Sejadada will repay. You can very well imagine how difficult it will be for him to repay under the circumstances. My best love and respect for you all.

Yours affectionate
Barin

তাজ — কৃষ্ণা ঘোষ—

আলিপুর জেল বন্দীশালা,
২০শে জুলাই, ১৯০৮।

প্রিয় দিদি,

আমরা এখানে সকলে ভাল আছি। এতদিন আমাদের পৃথক পৃথক কারাকক্ষে (সেল্) রাখা হইয়াছিল। এখন আমাদের সকলকে চারটি কক্ষ-বিশিষ্ট বড় কারাকক্ষে রাখা হইয়াছে। সেজন্য এই একত্র বাসে জীবন এখন অনেকটা সহনীয় হইয়াছে। তোমরা সকলে কে কেমন আছ জানাইতে অন্যথা করিও না। একটি বাক্সে অবিনাশ ৩০০্ টাকা রাখিয়া আসিয়াছে, যাহার চাবি আছে তোমার কাছে। মায়ের খরচের জন্য এই টাকা থেকে যদি ব্যয় করার প্রয়োজন হয়, তবে টাকা সংগ্রহের সকল উপায় ব্যর্থ হইলে অগত্যা ইহা হইতে লইও। এই তহবিল হইতে খরচ করিলে সেজদাকে তাহা পূরণ করিতে হইবে। তুমি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পার, এ-অবস্থায় তাঁহার পক্ষে পূরণ করা কত কঠিন হইবে। ভালবাসা লইও, সকলকে শ্রদ্ধা জানাইও।

তোমার বারীন।

যুগান্তর কার্যালয়ে একটা ভাঙ্গা বাক্সে থাকিত অবিনাশ ভট্টাচার্যের নিকট সকল প্রাপ্ত অর্থ। এই ভাঙ্গা বাক্স চাবিসহ সে গ্রেপ্তারের সময়ে কোন কৌশলে দিদির কাছে দিয়া যায়। আমরা মজঃফরপুরে প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরামের বোমা ফাটিবার পরদিন বাগানে ধরা পড়ি। সেই একই রাত্রে শ্রীঅরবিন্দের হাতিবাগানের বাড়ীও ঘেরাও হয়। পৃথক পৃথক সেল্-এ একান্তে কারাবাস, সুতরাং চলিয়াছিল প্রায় গ্রেপ্তার হইতে আরম্ভ করিয়া দেড় মাস ধরিয়া। ইমার্সন সাহেব তখন আলিপুর জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, তিনি ছিলেন দেবতুল্য ব্যক্তি। তাঁহার সুপারিশেই আমাদের কারাজীবন সহনীয় করা হয় তিন রুমযুক্ত ওয়ার্ড-এ একত্র বাসের ব্যবস্থার মাধ্যমে। ইহার ফলেই ভবিষ্যতে কারাজীবনের কঠোরতার মাঝেও রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইয়ের হত্যা সম্ভব হইয়াছিল। তাহার ফলভোগ করিতে হইল জেলারবাবু ও ইমার্সন সাহেবের পদচ্যুতিতে ঐ দুইজন নিরীহ সহৃদয় উচ্চপদের রাজ-কর্মচারীকে।
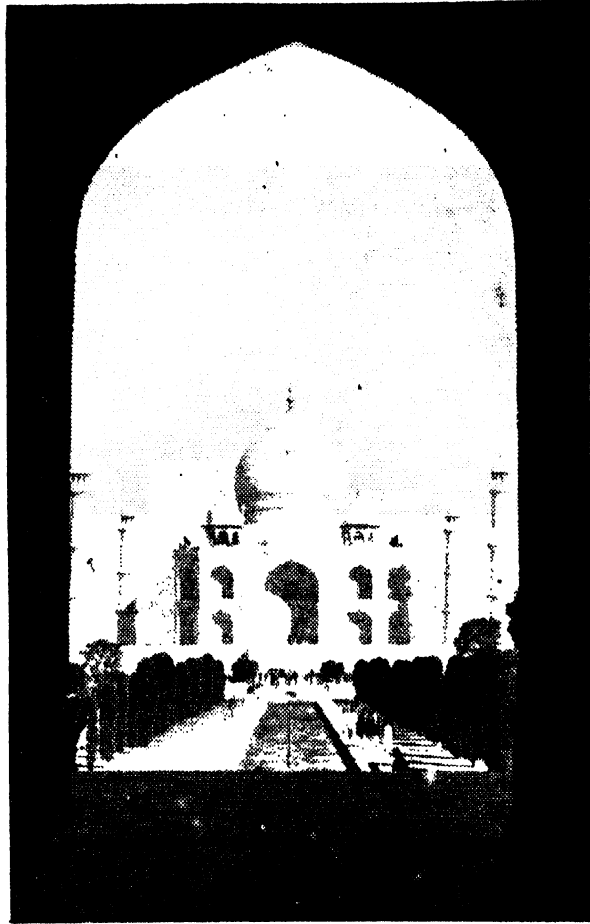
দ্বিতীয় পত্রটিতে দেখা যায়, আবার আমরা পৃথক সেল্-এ একান্তবাসে বন্দী হইয়াছি। নরেন গোঁসাই হত্যার ফলে জেল-জীবনে দুর্বিষহ কঠোরতা আমাদের সকলকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। অথচ এ-যন্ত্রণা অতি সহজেই এড়ানো যাইত, বার্লে সাহেবের আদালতেই অতি সহজেই নরেন গোঁসাইকে বধ করা সম্ভব হইত।

হিসাব-বুদ্ধি-বিবেচনা না করিয়া জেলে নরেন গোঁসাইকে গুলী করিয়া হত্যার বিষময় ফল আলিপুর রাজদ্রোহ মামলার এতগুলি বিচারাধীন

আসামীকে এবং জেলের তদানীন্তন জেলার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও ডাক্তার ডয়লী ও সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ইমার্সন সাহেবকে ভুগিতে হইল। এই সহৃদয় বাঙ্গালী জেলার, আইরিশ ডাক্তার সাহেব ও দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ ইমার্সন সাহেবের কথা আমার ডি এম লাইব্রেরী দ্বারা প্রকাশিত "বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী" ও আর্য পাবলিশিং হাউসের দ্বারা প্রকাশিত 'দ্বীপান্তরের কথায়' আদ্যোপান্ত আছে। মাথা-পাগলা হেমদা আমার ইহজগতে আর নাই। এখন তাঁহার ভুল-ত্রুটির কথা আর তাঁহাকে আঘাত করিবে না। এতগুলি প্রাণীর এত বড় নির্যাতন ও দুর্গতি এড়াইয়া কৌশলে কার্যোদ্ধার উপযোগী নেতৃত্বেই সম্ভব।

গোঁসাই হত্যার কি বিষময় ফল ও দুর্যোগ যে আমাদের মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল তাহার নীরব প্রমাণ বহন করিয়া আনিতেছে আলিপুর জেল হইতে আমার দিদিকে লিখিত ৩০শে ডিসেম্বর ১৯০৮ সালের পত্রে। দীর্ঘ চার মাস দশ দিন আর কোন পত্রালাপ দিদি ও আমার মধ্যে চলে নাই। আমাদের সহিত সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ তখন সন্দিগ্ধমনা বৃটিশ সরকারের কাছে ভয়াবহ ব্যাপার। সি আই ডি-র গুপ্তচর পরিবেষ্টিত পুলিশ ও গোরাসৈন্যের প্রহরায় সুরক্ষিত রাজবন্দীদিগের উপর কোন ক্রুর অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন ঘটে নাই— সে কেবল অপেক্ষাকৃত সুসভ্য বৃটিশ প্রভুদিগের কৃপায়। তাঁহাদের স্থলে ভারতে তখন জার্মাণ বা ষ্ট্যালিনবাদের রুশ লাল নেতৃত্ব থাকিলে কি হইত বলা যায় না! পরবর্তী কালে বাঘা যতীন ও সূর্য সেন আদি বিপ্লবীর কার্যকালে আমাদের বৃটিশ প্রভুরও প্রচণ্ড মারমূর্তি পরিগ্রহ দেশ প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

দিদিকে ৬নং কলেজ স্কোয়ারে লিখিত পরবর্তী ১১ই সেপ্টেম্বর ও ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯০৮ তারিখের পত্রদু'টি এখানে পর পর উদ্ধৃত ও অনুবাদ করিয়া দিলাম।

PRISONER'S LETTER

11th Sept, 1908.

Dear Sister,

Please send me few clean cloths soon. My Sessions case comes on next Monday. I believe. Want of clean suits will inconvenience me very much. Two pairs of dhuties, two underwears and two towels will do for the present. They are rather strict now-a-days about interviews. All the same you may come, only we have to talk from behind bars. You may have to submit to search for all I know. However, I hope you will bear that for my sake. Give respect and love to all. I am alright. I had slight fever for a day. We are in solitary cells, but this is good for me in one way. I am left all to myself the whole day and night and can live in Her—our divine Mother. More when we meet.

Your affectionate brother
Barin.

Passed: may be posted
G. A. Davis
for Superintendent.

Contents admissible
under the rules.
Illegible
Jailer.

আলিপুর জেলে হাসপাতালে সাক্ষাতের ও স্বীকারোক্তির ছল করিয়া নরেন গোঁসাইকে ভুলাইয়া আনিয়া দ্বিতলবারের গলীতে সত্যেন বসুর হত্যার চেষ্টা ও কানাইলাল দত্তের তাড়া করিয়া পলায়মান অবস্থায় হত্যার পর বৃটিশ চেলাচামুণ্ডা ও চেড়ী-বেষ্টিত জেল হইতে এই প্রথম ও দ্বিতীয় আমার দিদিকে লিখিত পত্র।

বন্দীর পত্র

১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৮।

প্রিয় দিদি,

শীঘ্র আমার জন্য কয়েকটি পরিষ্কার বস্ত্র পাঠাইও। আগামী সোমবারে আমার সেসন্স কোর্টে মামলা উঠিবে। পরিষ্কার কাপড়ের অভাবে বড় অসুবিধায় পড়িতে হইবে। দুই জোড়া ধুতি, দুইটি পিরান ও এক জোড়া তোয়ালে হইলেই আপাততঃ চলিবে। আজকাল কর্তৃপক্ষ সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে বড় কড়া। তাহা হইলেও তুমি আসিতে পার, কেবল আমাদের হয়তো গরাদের অন্তরাল হইতে কথা বলিতে হইবে। তোমাকে তালাসীর অসুবিধাও সহিতে হইতে পারে। যাহা হউক, আমার খাতিরে আশা করি এ-সকল সহ্য করিবে। আমার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা সকলকে দিও। আমি ভাল আছি। একদিনের জন্য সামান্য জ্বর হইয়াছিল। আমরা এখন একান্ত নিভৃতবাসে বন্দী আছি কিন্তু আমার পক্ষে ইহা এক হিসাবে ভালই হইয়াছে। দিবারাত্র আমি নিজের সহিত মুখামুখী থাকিতে পাই, দিব্য মহাশক্তির মধ্যে ডুবিয়া থাকিবার সুযোগ পাই। দেখা হইলে সব জানিতে পারিবে।

তোমার স্নেহের ভাই
বারীন।

মর্মার্থ নিয়মানুযায়ী	পাশ করা হইল, ডাকে
হস্তাক্ষর অপাঠ্য	দেওয়া যাইতে পারে
জেলার।	জি এ ডেভিস,
	ফর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

PRISONER'S LETTER

30th Dec., 1908.

Dearest Sister,

It is a long time since we have not met, I believe, it is the new order of things here that keeps you away. If you do not like to come here, you can see us in court. Our Judge Mr. Beachcroft is very kind in that way. I am sure he will see his way to grant the interview, and our father's friend the Court Inspector Mr. Rahim will be there to arrange it. So you need not feel frightened about it at all. I shall trouble you about a certain thing. Please write for me a letter to Sj. Rash Behari Bose, Judge, Tipperah enquiring after my step-mother's address at Benares. If he does not know his son Surendra is sure to know; so you can get Suren's address as well from his father. I should like to see mother once for the last time before the case is over and have got to arrange for her maintainance. More when we meet. My love for you and for all. I am sorry to hear about uncle's deportation, but the Government is sure to release him as soon as the country is quiet. May God keep you all happy and well. I am sure He will do the best for me as well.

Your affectionate brother
Barindra Ghose

Passed: may be posted.
M

Contents admissible
under rules.
. . . . . Hill
Jailer

Superintendent

পত্রটির বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল।

বন্দীর পত্র

৩০শে ডিসেম্বর, ১৯০৮।

প্রিয়তমা দিদি,

দীর্ঘদিন ধরিয়া আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ নাই। আমার মনে হয়, এখানকার নূতন ব্যবস্থাদি তোমাদিগকে দূরে রাখিবার কারণ। যদি এখানে না আসিতে চাও, কোর্টে দেখা-সাক্ষাৎ করিতে পার। আমাদের জজসাহেব মিষ্টার বীচক্রফট সেদিক দিয়া সদাশয় মানুষ। আমি নিশ্চিত জানি তোমাদের সাক্ষাতের দরখাস্ত তিনি সহজেই মঞ্জুর করিবেন এবং আমাদের পিতার বন্ধু কোর্ট ইনস্পেকটর মিঃ রহিম সুবন্দোবস্ত করিতে সেখানে আছেন। সুতরাং সে বিষয়ে ভীত হইবার কোন কারণই নাই। তোমাকে একটি কারণে বিরক্ত করিব। আমার জন্য ত্রিপুরার জজ শ্রীরাসবিহারী বসুকে আমার রাঙামায়ের বেনারসের ঠিকানা চাহিয়া একটি পত্র দিও। তিনি যদি ঠিকানাটি না জানেন তাঁহার পুত্র সুরেন্দ্র জানিবে। সুতরাং তাহার পিতার নিকট হইতে সুরেনের ঠিকানা জানিয়া লইতে পার। আমাদের মামলা সমাপ্ত হইবার পূর্বে শেষবারের মত আমার রাঙামাকে একবার দেখিতে চাই এবং তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের একটা ব্যবস্থা ঠিক করিয়া দিয়া যাইতে চাই। সাক্ষাতে অন্যান্য কথা বলিব। তুমি ও অন্যান্য সকলে আমার ভালবাসা লইও। মেসো মহাশয়ের নির্বাসনের সংবাদে দুঃখ পাইলাম, কিন্তু দেশের অবস্থা শান্ত হইলেই গভর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই তাঁহাকে মুক্তি দিবেন। ভগবান তোমাদের সকলকে সুস্থ ও সুখী করুন। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আমার তিনি মঙ্গল করিবেন।

তোমার স্নেহের ভাই
বারীন্দ্র ঘোষ।

পত্রের মর্ম নিয়মানুযায়ী	মঞ্জুর হইল; ডাকে
হিল	দেওয়া যাইতে পারে
জেলার	

M
Superintendent

তখন আমাদের সহৃদয় জেলার যোগেশবাবু বরখাস্ত হইয়াছেন এবং পরে মারা গিয়াছেন মনঃক্ষোভে। আলীপুরে মামলার সূত্রপাতেই আমাদের জেলে আসিয়া হাজির হইতে দেখিয়া যোগেনবাবু সখেদে বলিয়াছিলেন, "জানো, ভাই, তাল গাছের শেষ আড়াই হাত আর গজিয়ে উঠতে কিছুতেই যেন চায় না। আমারও হয়েছে সেই দশা। কোথায় ভালয় ভালয় অবসর নেব, না, তোমরা এসে হাজির হলে!" তিনি বরখাস্ত হইবার পর দীর্ঘাকৃতি জোয়ান প্রায় ছয় ফুট লম্বা হিল সাহেব জেলার হইয়া আসিলেন। তিনি মাত্র ৯২ পাউণ্ড ওজনের ক্ষীণকায় আমাকে শিশুর ন্যায় অবলীলা-ক্রমে কোলে তুলিয়া লোফালুফি করিতেন এবং সবিস্ময়ে বলিতেন, "ক্ষীণকায় এই তুমি কি করে ভারত থেকে ইংরাজকে তাড়িয়ে দেবার সাহস করলে!" সেই হিল সাহেবের সহি দেখিতেছি এই ১১ই সেপ্টেম্বরের পত্রে, তাঁহার নামের আদ্যক্ষর দুইটি অস্পষ্ট ও অপাঠ্য। এই পত্রখানিতে শেষ বিদায়ের এবং ফাঁসীমঞ্চে জীবন বিসর্জনের করুণ সুর বাজিতেছে।

বীচক্রফট সাহেবের সেসন কোর্টের রায়ে শ্রীঅরবিন্দ, দেবব্রত আদি সকলে মুক্তি পাইলেন। আমার ও উল্লাস দত্তের ফাঁসীর হুকুম হইল, বাকি হেমচন্দ্র দাস, উপেন্দ্রনাথ আদি কয়জনের দ্বীপান্তর দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইল। আমাদের মামলা শেষ বিচারের জন্য হাইকোর্টে গেল এবং আমরা কেহ কেহ মৃত্যু ও বাকি সকলে কালাপানি পারে যাইবার জন্য প্রহর গণিতে আলীপুর জেলে নির্জন কারাবাসে বন্দী হইলাম। এই অবস্থায় লিখিত কয়-খানি পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা পরে পরে উদ্ধৃত ও অনুবাদ করিয়া দিতেছি। আমার ও উল্লাস করের ফাঁসী কুঠুরীর পাশে আরও ফাঁসীর আসামী চারু, কানাই, সত্যেন বন্দী ছিল এবং একে একে তাহা-

দের আমাদের চক্ষের উপর ফাঁসী হইয়া গেল। তাহারা সহাস্যবদনে জোড়হস্তে নমস্কার করিয়া একে একে আমাদের কাছে বিদায় লইয়া ফাঁসীমঞ্চে অমূল্য প্রাণ বিসর্জন দিল দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের ব্রত উদ্‌যাপনে।

হাইকোর্টে বিচারাধীন সময়ের ৬ খানি দিদিকে আমার লিখিত পত্র দিদির সংগ্রহের ঝাঁপীতে পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে প্রথম পত্রখানির তারিখ ২২শে মার্চ, ১৯০৯ সাল। পত্রখানির উদ্ধৃতি ও বঙ্গানুবাদ নিম্নে যথারীতি প্রদত্ত হইল—

ALIPUR C. JAIL
Prisoner's Letter

22 March, 1909.
Sunday.

Dearest Sister,

The frame of my spectacles is broken. Please send me a fresh pair with stout steel frame. Gold or rolled gold will not do here, as it may get stolen. You know the number of my glasses, it is 7.50. You can send it to me either here through the Jail Superintendent, or at the Court through my Counsel. I met Bhupal Babu and know why you cannot come. It does not matter, I am happy beyond measures and bless you all from my blissful solitude. God in his infinite mercy has opened to me a world of joy. For the rest I do not care. My best love for you all.

Your affectionate brother
Barindra K. Ghose
Passed: may be posted

Contents admissible
under the rules.

......Hill — Jailer
M — Superintendent.

পত্রটির বঙ্গানুবাদ—

আলিপুর সি জেল।
বন্দীর পত্র

মার্চ ২২শে, ১৯০৯,
রবিবার।

প্রিয়তমা ভগ্নী,

আমার চশমার ফ্রেমটি ভাঙিয়া গিয়াছে। অনুগ্রহপূর্বক আমার জন্য একজোড়া মজবুত ষ্টীলের ফ্রেম পাঠাইও। সোনার বা রোল্ডগোল্ডের ফ্রেম এখানে চলিবে না, যেহেতু তাহা চুরি যাইতে পারে। আমার চশমার নম্বর জানো, তা হচ্ছে ৭-৫০। ফ্রেমটি জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মারফৎ এখানে পাঠাইও অথবা কোর্টে আমার কৌন্সিলীর মারফৎ দিও। ভূপালবাবুর সহিত দেখা হইলে জানিলাম কেন তুমি সাক্ষাৎ করিতে আসিতে পার না। তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমি পরম সুখে আছি এবং আমার আনন্দময় নির্জনতা থেকে তোমাদের প্রাণভরা আশীষ জানাই। ভগবান তাঁহার পরম কৃপায় আমার সম্মুখে এক আনন্দলোকের দুয়ার খুলিয়া দিয়াছেন। আর কিছুই আমি গ্রাহ্য করি না। সকলকে গভীর ভালবাসা দিও।

তোমার স্নেহের ভাই
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

পাশ করা হইল. ডাকে দেওয়া যাইতে পারে।

পত্রের মর্ম নিয়মানুযায়ী

হিল — জেলার
এম — সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

তখন আমি ফাঁসীর কক্ষে দৈনিক ১৭।১৮ ঘণ্টা করিয়া সাধনা করিতেছি। এই সময়ে অতর্কিতে পর পর দুই-তিনদিন পায়ের নখ হইতে আরম্ভ করিয়া মাথা অবধি ক্রমশঃ সর্বাঙ্গ হিম শীতল নিস্পন্দ নাড়ীর স্পন্দনহীন হইয়া মৃত্যু আসিয়াছিল। একদিন মনে হইয়াছিল—"স্বেচ্ছামৃত্যু কি প্রকার? তাহা আসিলে এই শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা কুকুর বিড়ালের মত আমাকে ফাঁসীতে লটকাইয়া মারিতে পারিবে না।" তাহার পরই এই ঘটনা, ইহার বিশদ বিবরণ "বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী"তে ও "দ্বীপান্তরের কথায়" আছে, তখন স্বতঃই প্রতিদিন নূতন নূতন রাজযোগ ও তন্ত্রের বহু সাধনা আপনি মনে আসিত ও সেই সেই প্রক্রিয়ায় সাধনা হইয়া চলিত। ফাঁসীর আতঙ্ক বা কারাযন্ত্রণা আমাকে আদৌ ভুগিতে হয় নাই, এক পরম রহস্য ও সত্যলোকের দুয়ার যেন আমার কাছে অবারিত হইয়া খুলিয়া গিয়াছিল। নিত্য নূতন অনুভূতি, নূতন নূতন রসাস্বাদ ও সূক্ষ্মলোকে বিচরণ।

ইহার কয়েকদিন পূর্বে লিখিত ৭ই মার্চেরও একটি পত্র আছে, তাহাও এইখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।

ALIPUR C. JAIL
Prisoner's Letter

Dearest Sister,

I am sorry to trouble you again about this wretched pair of spectacles. You were right after all, iron frame would not suit my nose. The sore is already appearing. You have got my old pair back. Please get those two glasses set for me in another stout rolled-gold frame and send it over to Counsel C. R. Das for handing to me in the court. Please do not delay as it would make the sore worse. Please write to mother all that you can about me and console her as best as you can. I am happy to see you begin looking to God for everything. This trouble had been a blessing in disguise teaching us to love Him more than anything else.

Your affectionate brother
Barindra Ghose
Passed: may be posted.

Contents admissible under
the rules.

Illegible — Jailer
M — Superintendent

আলিপুর সি জেল।

বন্দীর পত্র

আমার সেই অপদার্থ চশমাটার জন্য আবার তোমাকে বিরক্ত করিতে হইতেছে। তোমারই কথা ঠিক, আমার নাসিকামূলে লোহার ফ্রেম সহিবে না। আমার ঘা দেখা দিয়াছে। তুমি আমার পুরাতন চশমা জোড়া ফিরিয়া পাইয়াছ; সেই কাচ দুইটি একজোড়া শক্ত রোল্ডগোল্ড ফ্রেমে লাগাইয়া লইয়া শীঘ্র আমাদের কৌন্সিলী সি আর দাশ মহাশয়ের হাতে কোর্টে পাঠাইয়া দিও আমার হাতে দিবার জন্য। বিলম্ব করিও না, তাহাতে ঘা বাড়িয়া যাইবে। মাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিয়া যাহা কিছু সম্ভব লিখিও। তুমি সকল বিষয়ে ভগবানের শরণ নিতেছ দেখিয়া সুখী হইলাম। এই বিপদ পরম আশীর্বাদরূপে আসিয়াছে ভগবানকে পরমধন বলিয়া ভালবাসিতে শিখাইতে।

পত্রের মর্মার্থ নিয়মানুযায়ী
অপাঠ্য সহি
জেলার

তোমার স্নেহের ভাই
বারীন্দ্র ঘোষ।

পাশ করা হইল : ডাকে দেওয়া যাইতে পারে।

এম
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

PRISONER'S LETTER

Post Mark
16th July, 1909.

Dearest Sister,

Very happy to receive your letter. Debabrata knows some of my religious songs. If you like you can write to Sudhira, his sister, and she will write them out for you. I don't know whether you would like them though as they are about Radha and Krishna. Tell Sejadada I am very eager to know about his latest religious experiences. If he does not like to write about them, I shall have to wait till he finds time to come and see me. I am going through many marvellous yogic experiences. I cann't describe them in this letter as it will require many technical Sanskrit words to express them and in that case there may be trouble in getting this letter passed. However, I write about two of them for Sejadada. I am getting two kinds of Samadhi or superconscious state now. In one the mind becomes concentrated and the whole of consciousness becomes involved. In another it is gathered from all external things and kept inside in enjoyment of bliss and love. In this state also body sense dies and I feel a wonderful presence deep and infinite running through me and the world. This realisation when deep will bring on Chetan Samadhi. Accept my love, I would have liked very much to see dada. I am very happy and quite well.

Your affectionate brother
Barin

Contents admissible under
the rules.

......Hill — Jailer
Lt. C....... — Superintendent

বন্দীর পত্র

ডাকঘরের ছাপ
১৬ই জুলাই, ১৯০৯।

প্রিয়তমা দিদি,

তোমার পত্র পাইয়া বড় সুখী হইলাম। দেবব্রত জানে আমার কতকগুলি পরমার্থ গান। যদি ইচ্ছা কর তাহার ভগ্নী সুধীরাকে লিখিও, সে তোমাকে সেগুলি লিখিয়া পাঠাইবে। তুমি সেগুলি পছন্দ করিবে কিনা জানি না, কারণ সেগুলি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক। সেজদাদাকে বলিও তাঁহার সম্প্রতিকার পারমার্থিক-অনুভূতি জানিতে বড় ইচ্ছা হয় তিনি যদি সে সব লিখিতে ইচ্ছা না করেন, অগত্যা আমাকে অপেক্ষায় থাকিতে হইবে যতদিন না তিনি আমাকে দেখিতে আসিতে সময় পান। আমি নানা অত্যাশ্চর্য যোগ অনুভূতির মধ্যে দিয়া চলিয়াছি এই পত্রে সেগুলি বর্ণনা করিতে পারি না, কারণ তাহা বর্ণনা করিতে বহু সংস্কৃত পরিভাষা ব্যবহার করিতে হইবে এবং সে ক্ষেত্রে এই পত্র ডাকে দিবার জন্য জেল-কর্তৃপক্ষের দ্বারা পাশ করানো কঠিন হইবে। যাহাহউক, সেজদাদার জন্য দুইটি অনুভূতির কথা লিখিতেছি। আমি এখন দুই প্রকার সমাধি বা অতিমানসের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। একটি অবস্থায় মন একাগ্র হইয়া সমস্ত চেতনা অন্তর-মগ্ন হইয়া যায়। অন্য অবস্থাটিতে সকল বহির্বিষয় হইতে চেতনা অন্তরে গুটাইয়া আনন্দ ও প্রেমে ডুবিয়া থাকে। এ অবস্থায়ও দেহজ্ঞান লুপ্ত হ এবং এক বিস্ময়কর সত্তা জাগে গভীর অনন্তে

আমাকে ও বিশ্বকে অনুস্যূত করিয়া। এই অনুভূতি যখন গভীর হয়, তখন আনে চেতন-সমাধি। আমার ভালবাসা লইও। দাদাকে বড় দেখিতে ইচ্ছা হয়। আমি ভাল আছি এবং আনন্দে আছি।

তোমার স্নেহের ভাই,
বারীন।

পত্রের মর্মার্থ নিয়মানুযায়ী।
.........ছিল লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল......
জেলার। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

দিদি ব্রাহ্ম পরিবারে ও সংস্কারে মানুষ হইয়াছিলেন, তখন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নিরাকারবাদী শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্রের পরিবারে আছেন। তাই লিখিয়াছিলাম রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক গান তাঁহার হয়তো ভাল লাগিবে না। শ্রীঅরবিন্দও তখন সেসন্সের মামলায় মুক্তি পাইয়া ৬নং কলেজ স্কোয়ার হইতে ধর্ম ও কর্মযোগীন প্রকাশের চেষ্টায় আছেন। জেলে থাকাকালীন তাঁহার সর্বভূতে বাসুদেব দর্শনের অপূর্ব কাহিনী ইতিপূর্বে তিনি তাঁহার উত্তরপাড়ার বক্তৃতায় জনসাধারণে প্রকাশ করিয়াছেন। সাম্য প্রেসে বসিয়া তাঁহার চলিতেছে যোগস্থ হইয়া কর্মযোগীর অপূর্ব সাধনা ও পন্ডিচারী যাত্রার প্রস্তুতি। তখন মেজর মারে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে বদলী হইয়া গিয়াছেন, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়া আসিয়াছেন একজন লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল সাহেব। তিনি একদিন জেলের রাউণ্ডে আসিয়া আমাকে ধরিয়া বসিলেন—"আমাকে তোমার যোগসাধন শিখাও"। বার বার অনুরুদ্ধ হইয়াও আমি রাজী হই নাই, আমি তাঁহার আধারে যোগানুভূতির অনুকূল কিছু আছে বলিয়া মনে করি নাই, প্রতিকূল আধারে এ সাধনা তাঁহার অনিষ্ট করিতে পারে। এই সময় জেলের সেন্ট্রী লালা আমার গোপনপত্র লইয়া শ্রীঅরবিন্দের কাছে প্রায়ই যাতায়াত করে। সে আমার অদ্ভুত সমাধির অবস্থা দেখিয়া তাহার গুরুলাভ ও সাধনার অনুভূতির কাহিনী আমাকে বলে। সে সব কথা আনুপূর্বিক আমার জীবন-কাহিনীতে আছে।

তাহার পরের আমার লিখিত পত্রখানির পোষ্ট মার্কের তারিখ ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৯ সাল। নিম্নে তাহার উদ্ধৃত ও বঙ্গানুবাদ দিতেছি।

PRISONER'S LETTER

Dearest Sister,

Very glad to receive your letter. I am quite healthy and happy. Had slight fever twice, that was all. If you like you can send books provided there be time enough to read them before the end of our case. If you ask my brother or cousin Sukumar they will be able to suggest books which I would like to read. Very happy indeed to see you lean on God and his love. Not a leaf in this world moves without his will. Where is the good of complaining then or being sorry? He is infinite love and whatever he does is for the best. He has put me here and I wait till he takes me out of it. This body is his and I lay it down at his feet if he so wishes. W ite to grandmother all this, being the wife of Rishi Raj Narayan she ought to understand it better than me. None of you should fret or get anxious for me. Tell Sejadada that I am progressing very fast in my spiritual works. My best love to you, him and all our cousins. Tell Sejadada to try and get that money sent to my step-mother anyhow. Write to me now and then about you all.

Your affectionate brother
Barindra Ghose

Passed: may be posted
Contents admissible under
the rules.
Illegible Captain I.M.S.
Jailer Superintendent

বন্দীর পত্র

প্রিয়তমা দিদি, তোমার চিঠি পাইয়া সুখী হইলাম। আমি সুস্থ ও আনন্দে আছি। দু'বার সামান্য জ্বর হইয়াছিল, শুধু এইটুকু মাত্র। ইচ্ছা করিলে বই পাঠাইতে পার, যদি আমাদের মামলা শেষ হইবার আগে সে পুস্তক পড়িবার মত সময় থাকে। যদি সেজদাদা বা সুকুমারকে জিজ্ঞাসা কর তাঁরা বলিতে পারিবেন কি কি বই আমার ভাল লাগিবে। তোমাকে ভগবানে ও তাঁহার প্রেমে নির্ভর দেখিয়া সুখী হইলাম। তাঁহার ইচ্ছা—প্রেরণা ছাড়া এ জগতে একটি পাতাও নড়ে না। সুতরাং অভিযোগ করিয়া বা দুঃখ করিয়া লাভ কি? তিনি অনন্ত প্রেম, সুতরাং তিনি যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। তিনিই আমাকে এখানে রাখিয়াছেন, যতদিন তিনি আমাকে এ অবস্থা হইতে উদ্ধার না করেন, ততদিন এখানেই থাকিব। এই দেহও তাঁহারই দান, তাঁহারই চরণপ্রান্তে ইহা বিসর্জন দিব, যদি তিনি চাহেন। এইসব কথা দিদিমাকে লিখিও, ঋষি রাজনারায়ণের পত্নী হইয়া এসব কথা আমার অপেক্ষা তিনি ভাল বুঝিবেন। তোমরা কেহই আমার জন্য মন খারাপ করিও না বা উদ্বিগ্ন হইও না। সেজদাদাকে বলিও আমি আমার সাধনায় অতি দ্রুত অগ্রসর হইতেছি! তোমাকে, তাঁহাকে এবং সব ভাই-বোনদের আমার অন্তরের ভালবাসা জানাই। সেজদাদাকে বলিও তিনি যেন আমার রাঙামাকে ঐ টাকা কোনগতিকে পাঠান। মাঝে মাঝে তোমাদের সকলের কুশল সংবাদ দিও।

তোমার স্নেহের ভাই
বারীন্দ্র ঘোষ।

পত্রের মর্মার্থ নিয়মানুযায়ী।
সহি অপাঠ্য পাশ করা হইলে: ডাকে
জেলার। দেওয়া যাইতে পারে।
.........ক্যাপ্টেন আই এম এস
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

এই পত্র পাঠ করিয়া মনে হয় তখনও সেই সাধনপ্রার্থী দীর্ঘাকৃতি ক্যাপ্টেন সাহেবই আলিপুরে সেণ্ট্রাল জেলের অধিকর্তারূপে আছেন। দিন দিন ভাবী ফাঁসীর মুহূর্তটি ঘনাইয়া আসিতেছে, সেই ছন্দে গভীর সাধনায় আমারও অন্তর ভগবত প্রেমে নির্ভয়ে সমর্পিত হইয়া উঠিতেছে। তাহার পর আমার দিদিকে লিখিত ২১শে অক্টোবর, ১৯০৯ সালের পত্র। তাহা উদ্ধৃত ও অনুবাদ নিম্নে দিলাম—

PRISONER'S LETTER

Post Mark....21.10.1909.

My Dearest Sister,

Very happy to receive your letter, since the case is over, the judgement is sure to come soon. I am ready. Let His will be done. Yes, I received the books sent by Sejadada. I had been all along reading about Sri Ram Krishna, Chaitanya and the Upanishads. Very glad to know about mother and grandmother. Whenever you receive letters from me please don't fail to let grandmother know about me. I have not as yet received any answer either from you or my brother about that money which was to go to step-mother. I am very uneasy about it. Please tell Sejadada not to try and give it himself, it will be rather a heavy drains on the little that he earns. I told our pleader Sarat Babu where to look for it. That friend of mine if appealed to in my name will gladly give it. I hope Sejadada will now come and see me as soon as the judgement is out. I have not seen him ever so long. I am quite well, give my love to our cousins and respect to the elders. Accept my love yourself and Sejadada. I shall try and write once more sometime after the judgement.

Your affectionate brother
Barindra

Passed: May be posted.
Contents admissible under
the rules.
Signature Illegible Illegible
Jailer for Superintendent

বন্দীর পত্র

পোষ্ট মার্ক—২১-১০-১৯০৯

প্রিয়তমা দিদি,

তোমার পত্র পাইয়া বড় সুখী হইলাম, মোকদ্দমা যখন শেষ হইয়াছে তখন রায় নিশ্চয়ই শীঘ্র জানা যাইবে। আমি প্রস্তুতই আছি। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হউক। হ্যাঁ, সেজদাদার প্রেরিত বইগুলি পাইয়াছি। আমি সকল সময়ই শ্রীরামকৃষ্ণ ও চৈতন্য বিষয়ক বই ও উপনিষদগুলি পড়িতেছিলাম। মা ও দিদিমার সম্বন্ধে জানিয়া সুখী হইলাম। যখনই আমার নিকট হইতে পত্র পাও, তখন দিদিমাকে আমার সংবাদ দিতে ভুলিও না। যে টাকাটা আমার রাঙামাকে পাঠাইবার কথা ছিল, তাহার সম্বন্ধে সেজদাদা বা তোমার পত্রে উল্লেখ নাই। আমি ইহাতে বড় উৎকণ্ঠিত আছি। সেজদাদাকে বলিও তিনি যেন নিজে ও-টাকা দিবার চেষ্টা না করেন, তিনি যে সামান্য টাকা পান, তাহাতে বড় টান পড়িবে। আমি আমাদের উকিল শরৎবাবুকে বলিয়াছি এটাকা কোথা হইতে পাওয়া যাইবে। আমার সেই বন্ধুটিকে আবেদন করিলে সে সানন্দে তাহা দিয়া দিবে। রায় বাহির হইলেই আমি আশা করি সেজদাদা আমায় দেখিতে আসিবেন। কতদিন তাঁহাকে দেখি নাই! আমি ভালই আছি। ভাই-বোনেদের আমার ভালবাসা ও গুরুজনদিগকে শ্রদ্ধা দিও। তুমি ও সেজদাদা আমার ভালবাসা লইও। রায় বাহির হইলে আর একবার পত্র দিব।

তোমার স্নেহের ভাই
বারীন্দ্র।

নিয়মানুযায়ী পত্রের মর্মার্থ
সহি অপাঠ্য পাশ করা হইল : ডাকে
জেলার। দেওয়া যাইতে পারে।
স্বাক্ষর অপাঠ্য
ফর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

PRISONER'S LETTER

Post Mark....23.11.1909.

My Dearest Sister,

You have not written to me for some time now, I hope the judgement will now be soon out. All of you have been kept in suspense for six long months about it. Please don't be anxious. It is not a danger or evil to me, it is the voice of God. Do you remember that wonderful saying of Christ, "Who seeketh life loseth it but who loseth life for my sake saveth it?' This noble renunciation of everything worldly for

His love is also what our scriptures preach. Your letters show that you have prayed and are consoled. I hope you have still this peace and do not fret about me. My spiritual life has had a great push forward lately. Tell my brother that all his expectations about me are slowly being realised. I need not write any more about it, as from this much he will understand all. Give my love and respect to grandmother and mother when you write to them next. Also my love to brother, yourself and the rest. I hope you will not fail to write to me in a day or two. I am keeping good health. No fear of fever again, I believe, owing to the regular life here. Everybody is very kind to me and I very seldom remember that I am in jail. I have my spiritual work to keep me occupied.

Your affectionate brother
Barindra Ghose

Passed: May be posted.
Contents admissible under
the rules.

. . . . Captain I.M.S.
Jailor Superintendent

বন্দীর পত্র

পোস্ট মার্ক—২৩-১১-১৯০৯

প্রিয়তমা দিদি,

কিছুকাল হইল তুমি আমায় পত্র লেখ নাই। আমি আশা করি মামলার রায় শীঘ্রই বাহির হইবে। এই রায়ের জন্য তোমরা সকলে ৬ মাসকাল উদ্বেগে কাটাইয়াছ। ইহার জন্য আদৌ দুশ্চিন্তা করিও না। আমার পক্ষে ইহা বিপদস্বরূপ নহে, মন্দও নহে, ইহা আমার নিকট ভগবানের বাণী। তুমি যীশুখৃষ্টের সেই অপূর্ব বাণী স্মরণ করিতে পার,—"যে জীবন খোঁজে সবই হারায়, কিন্তু যে আমার জন্য জীবন সমর্পণ করে সে জীবন পায়"। ভগবানের প্রেমের জন্য জাগতিক সব কিছু বিসর্জন দিবার কথাই সকল শাস্ত্র প্রচার করে। তোমার চিঠিগুলিতে মনে হয় তুমি প্রার্থনায় মন ঢালিয়া দিয়াছ এবং সান্ত্বনা পাইয়াছ। আশা করি প্রাণে সঞ্চারিত সে শান্তি এখনও অটুট আছে এবং আমার জন্য ক্ষোভ করিবে না। ইদানিং আমার পরমার্থ জীবনে নূতন অগ্রগতি দেখা দিয়াছে। সেজদাদাকে বলিও আমার সম্বন্ধে তাঁর সকল আশা রূপ লইতেছে। অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই, কারণ এইটুকু বলিলেই তিনি সব কিছু বুঝিতে পারিবেন। এবার যখন মা ও দিদিমাকে চিঠি লিখিবে তখন তাঁহাদের আমার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা দিও। সেজদাদা, তুমি ও অন্য সকলে ভালবাসা গ্রহণ করিও। আশা করি দু' এক দিনে তুমি আমায় পত্র দিতে অন্যথা করিবে না। আমার স্বাস্থ্য ভালই আছে। এখানে জেল-জীবনে নিয়মিত স্নানাহারের জন্য জ্বর হইবার আশঙ্কা নাই। সকলেই আমার প্রতি প্রসন্ন এবং আমার কদাচিৎ মনে পড়ে যে, আমি জেলে আছি। আমার সাধনায়ই আমার সময় সুবহ হইয়া কাটে।

তোমার স্নেহের ভাই
বারীন্দ্র ঘোষ।

পত্রের মর্ম নিয়মানুযায়ী
সহি অপাঠ্য পাশ করা হইল, ডাকে
জেলার। দেওয়া যাইতে পারে।
ক্যাপ্টেন আই এম এস্,
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

তাহার পরের চিঠিই বিচারাধীন অবস্থার শেষে দ্বীপান্তর হইতে প্রথম চিঠি—

31 Dec., 1909.

Dearest Sister,

I reached safe, no sea-sickness on the way. I can write only once a year to you and also can receive one letter from you, I would have delayed writing this one, but thinking you might be anxious, I write so soon. Please send me a few books. I would like to have a copy of Ashtadash Upanishads annoted, Krishna Karnamrita, a collection of songs containing religious songs about Kali, Bue's French Grammar. Please send a parcel of books and letter by the same mail or better put the letter in the parcel and register the whole or if owing to postal irregularity one is delayed and then another they may be treated as two separate ones and one of them is returned. While sending books please do not forget those who are dependent on our family, but send them if you want separately through their families so that they as well may get letters and books together by the same mail.

My religious and Jogic progress is now at a stand still. Unless I get used to this new life here it will not begin. My love to all. Please put another pair of spectacles for me in the parcel of steel frame enamelled or of some metal which will not give sores on the nose. This pair may get stolen. Please see that the books are well bound. You need not be anxious for me. I am keeping good health and am kindly treated by my superiors. I am on light labour.

Your affectionate brother
Barindra Ghose

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯০৯।

প্রিয় ভগিনী,

আমি নির্বিঘ্নে পৌঁছিয়াছি। পথে সমুদ্রযাত্রাজনিত বমনাদি হয় নাই। বছরে আমি এখানকার নিয়মে একটি পত্র তোমাদের লিখিতে পারি এবং একবার উত্তর পাইবার আমি অধিকারী। এ-পত্র আরও বিলম্বে লিখিতাম, কিন্তু তুমি উদ্বেগে আছ ভাবিয়া এখনই লিখিলাম। আমাকে কয়েকটি পুস্তক পাঠাইও। ব্যাখ্যাসহ একখানি অষ্টাদশ উপনিষদ পাইলে ভাল হয়। আর কৃষ্ণকর্ণামৃত চাই, শ্যামাসংগীতসহ একটি সংগীত সংগ্রহ এবং এক কপি বুয়ের ফরাসী গ্রামার। একই ডাকযোগে পত্র ও পার্শেল পাঠাইও, অথবা চিঠিটি ঐ পার্শেলে ভরিয়া সবটা একসঙ্গে রেজিষ্ট্রি ডাকে দিলে ভাল হয়। ডাক-বিলির গোলযোগে নতুবা একটি এখানে বিলি হইতে পারে এবং অপরটি পৃথক ডাকের বলিয়া ফেরৎ যাইতে পারে। বই পাঠাইবার সময়ে অন্য সহবন্দীদের ভুলিও না, যাহারা আমাদের পরিবারের মুখ চাহিয়া এই সব পাইবার পথ চাহিয়া থাকে। তাহাদের পরিবারের সহিত যোগাযোগে একই ডাকে তাহাদের পুস্তকাদি আসিলে সুখের হইবে।

আমার পারমার্থিক ও যোগের অগ্রগতি এখন স্থগিত আছে। এখানে এই নূতন জীবনধারার সহিত পরিচিত না হওয়া পর্যন্ত সে রুদ্ধগতি আরম্ভ হইবে না। সকলকে ভালবাসা দিও। এনামেল করা ষ্টীলের ফ্রেমযুক্ত আর এক জোড়া চশমা পার্শেলে দিও বা এমন কোন ধাতুর যাহাতে নাসিকামূলে ক্ষত না হয়। এই জোড়াটি চুরি যাইতে পারে। বইগুলি যেন ভাল বাঁধানো হয়। আমার জন্য দুশ্চিন্তা করিও না। আমার শরীর ভাল আছে এবং কর্তৃপক্ষ আমার প্রতি সকলেই সদয়। আমাকে হাল্‌কা পরিশ্রমের কাজে রাখা হইয়াছে।

তোমার স্নেহের ভাই
বারীন্দ্র ঘোষ।

আন্দামানে সেলুলার জেলের এই কাহিনী আদ্যোপান্ত "দ্বীপান্তরের কথায়" বর্ণিত আছে। বইখানি উপযুক্ত প্রকাশের অভাবে এবং অর্থাভাবে এখন দুর্লভ ও out of print.

১৯০৮ হইতে ১৯২০ অবধি এই এগার-বার বৎসরের লিখিত বিচারাধীন ও আন্দামানের জীবনের পত্রগুলি পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থহেতু পরে পরে উদ্ধৃতির মাধ্যমে দিতেছি। সাগর পারের সেই দ্বীপান্তর জীবনেও বহু বিচিত্র সাধনানুভূতি পরে জানাইয়াছিলাম। "দ্বীপান্তরের কথা"য় তাহার উল্লেখ আছে। দিদির মৃত্যুর পর তাঁহার সংগ্রহের মধ্যে প্রাপ্ত এই পত্রগুলির প্রয়োজন আছে আমার আত্মজীবনীর ঘটনাবলীর প্রমাণ ও পাদপূরণ হিসাবে। এই সব উপকরণ লইয়া লিখিতে লিখিতে ৯।১০খানি আন্দামানের সেলুলার জেলের চিঠি হারাইয়া গেল। ইহা নিতান্তই অলংঘ্য ভবিতব্য। মহাকাল ধ্বংসের দেবতা, ব্রহ্মার নবসৃষ্টির জন্য তিনি শুধু পুরাতনকে মুছিয়া নিশ্চিহ্ন করিতেই ব্যস্ত, মানুষের ক্ষুদ্র চেষ্টায় ইতিহাস রচনার প্রয়াসের প্রধান শত্রু হইতেছেন এই রুদ্র ধ্বংসের নটরাজ।

আন্দামান সেলুলার জেল হইতে দিদিকে লিখিত ২৬শে মার্চ তারিখের পত্রটি পাওয়া গিয়াছে। রচনা দীর্ঘ না করিয়া ইংরাজি পত্র উদ্ধৃতি বাদ দিয়া শুধু বাংলা মর্মার্থই দিতেছি।

স্নেহের দিদি, তোমার স্নেহমাখা পত্র ও পুস্তক এবং কাপড়-চোপড়ের পার্সেলটি পাইলাম। ধুতি পিরানে এখন আমার আর প্রয়োজন নাই, কারণ আমি আবার সেলুলার জেলে ফিরিয়া আসিয়াছি। এ দুর্ভাগ্যের কথা কি বলিব? আমাদের নূতন চীফ কমিশনার কর্ণেল ডগলাস আমাদের জেলের বাহিরের গতিবিধির সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ পোষণ করেন। ইহার সঠিক কারণ বা স্বরূপ জানি না, তবে আমি বলিতে পারি ভগবানের চক্ষে আমরা সম্পূর্ণ নির্দোষ। বাহিরে কয়েদীদিগের মঙ্গলামঙ্গলের তিনি কর্তা, সুতরাং তিনিই ইহার প্রকৃত বিচারক। যাবজ্জীবনের বন্দী আমাদের পক্ষে আন্দামানের ন্যায় অস্বাস্থ্যকর স্থানে চিরজীবনই আটক থাকা কষ্টকর: এইটুকু তবু সুখের কথা—ভবিষ্যতে আমাদের উন্নততর ব্যবস্থার আশা সরকার দিয়াছেন।

গত বৎসরে ভারত হইতে একাধিক সরকারী পরিদর্শকের আগমন ঘটিয়াছিল। গত নভেম্বরে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের মেম্বর সার রেজিনাল্ড ক্র্যাডক আসিয়াছিলেন। তাঁহার অনুমতি লইয়া তাঁহার হস্তে আমি ভারত সরকারকে সদয় পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন লিখিতভাবে দিই। এই আবেদন হোম মেম্বারকে উদ্দেশ করিয়া লেখা ছিল, উহা ভাইসরয়ের হাতে যাহাতে পড়ে সেই আশা তাহাতে ব্যক্ত করা ছিল। সেই আবেদনে ছিল যে, সংস্কৃতি ও সভ্যতার আধার ভারত সরকার যেন আমাদের অপরাধ বিস্মৃত হইয়া রাজনীতিক মুক্তির ব্যবস্থা করেন, অথবা কোন স্বাস্থ্যকর ভারতীয় জেলে আমাদের সরাইয়া লওয়া হয়। হোম মেম্বার আমাদের স্বীকৃতি দিয়াছেন যে, জেলবন্দীর প্রাপ্য দণ্ড হ্রাসের সকল সুবিধা আমরা পাইব। স্থানান্তরের আদেশও পরে আসিতে পারে। জুন বা জুলাই মাস নাগাৎ আমাদের চীফ কমিশনার মহোদয়কে তুমি পত্রে জিজ্ঞাসা করিলে যথার্থ

সংবাদ পাইবে, তাহার অধিক বিলম্ব হইবার কথা নহে। তোমার প্রেরিত কাপড়-চোপড় গুদামে পড়িয়া থাকিবে যাবৎ আমাদের ভাগ্য পরিবর্তন ঘটে। তুমি শুনিয়া চমকিত হইবে, গত জুন মাসে আমি সংকটজনক মৃতকল্প টাইফয়েডে আক্রান্ত হই। দু' মাসের ম্যালেরিয়া জ্বর ক্রমশঃ টাইফয়েডে দাঁড়ায়। আমাদের মেডিক্যাল সুপার মেজর মারে তখন সিনিয়র মেডিক্যাল অফিসারের পদে উন্নীত হইয়া রস দ্বীপের রাজধানীতে আছেন। তিনি ও ডাঃ মণ্ডল আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করেন। দু' মাস আমার উত্থানশক্তি ছিল না। জেলের বাহিরে সযত্নে সেবায় আমাকে রাখা হইয়াছিল। আমার জন্য পুস্তকের আর প্রয়োজন নাই, আমি এখন শঙ্করাচার্যের গ্রন্থ ও যোগবাশিষ্ঠ ছাড়া অন্য কোন পুস্তক পড়ি না। সুতরাং বই পাঠাইয়া আর অর্থ নষ্ট করিও না। উপনিষদ গ্রন্থাদি অবশ্য পড়িতে পারি। কালবাদেবী রোড, বোম্বাই-এর জাবজী দাদার্স অথবা বরোদার কে জি দেশপাণ্ডেকে লিখিলে সর্বোত্তম সংস্করণ উপনিষদ সংগ্রহ পাইবে। দুর্গাচরণবাবুর গ্রন্থ যাহা পাঠাইয়াছ তাহাও ভাল, তবে তাহা এরূপে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া সম্পূর্ণ হইতে সময় লাগিবে। শ্রীরামানুজের শ্রীভাষ্য কিনিয়া ফেলিয়া থাক তাহা হইলে পাঠাইও, নতুবা প্রয়োজন নাই। অবশিষ্ট জীবন আমার এখানে না জেলে জেলে কাটিলে জুতা জামার প্রয়োজন পড়িবে না।

তুমি জানিতে চাহিয়াছ সেলুলার জেলের নিয়মানুসারে বছরে কয়বার আমি চিঠি লিখিতে বা পাইতে পারি। আমাদের ভবিষ্যৎ এত অনিশ্চিত ও অন্ধকার যে, এ বিষয়ে কিছু বলা আমার পক্ষে কঠিন। এ সম্বন্ধে চীফ কমিশনারকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পার। আমরা এখন ভারতীয় জেলের কয়েদী হিসাবে বৎসরে ৩টি চিঠি পাইবার ও লিখিবার অধিকারের যোগ্য। জুবিলি জনিত শাস্তি মকুব ও অন্যান্য দণ্ড হ্রাস গণনায় মনে হয় আমার জেলে আজ অবধি সাত বৎসর তিন মাস কাটিল। ভারতীয় জেলের নিয়ম ও হিসাব ধরিলে শাস্তি মকুব প্রভৃতি ধরিয়া আরও ছয় বৎসর অতিবাহিত করিতে পারিলে খালাস পাইবার সম্ভাবনা আসিবে। এইভাবে যদি চলে তাহা হইলে একদিন হঠাৎ উপস্থিত হইয়া তোমাদের আচম্বিতে দেখা দিতে পারি। তাহা না হইলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডাজ্ঞা শেষও হইবে না, দেখাও হইবে না।

শুনিয়া বড় সুখী হইলাম যে, বড়দাদা অবশেষে স্ত্রী লইয়া বিবাহিত জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। চিরকুমার বিনয়ভূষণের জীবনে এ অভাবনীয় ঘটনা ঘটিবে তাহা কল্পনারও অতীত ছিল! শুনিতেছি সেজদাদা (শ্রীঅরবিন্দ) ফ্রান্সে গিয়াছেন! ইহা কি সত্য? তাঁহার গন্তব্যস্থল অজ্ঞাত থাকার কারণ কি? তুমিও পত্রে সে সম্বন্ধে নীরব দেখিয়া আমার নানা সন্দেহ হয়। এই সব চিন্তা করিয়া আমার মনে হয় তিনি আবার রাজনীতির পথ ধরিয়াছেন এবং অজ্ঞাতবাসে অদৃশ্য হইয়া আছেন। আমার সন্দেহ ঠিক কি না আমাকে পত্রে জানাইও। সে সম্বন্ধে পত্রে উল্লেখ তাঁহার কোন ক্ষতির কারণ হইবে না। আমার মা ও দিদিমা সম্বন্ধে সকল কথা লিখিও। আমাদের দেওঘরের বাড়ীর কথা চিন্তা করিতে পারি না; সে-বাড়ী যেন শ্মশানভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এতগুলি মৃত পরলোকগত মুখের স্মৃতিজড়িত পূর্ব গৌরবহীন সে বাড়ী আজ শ্মশান বই আর কি? সত্যই এ সংসার স্বপ্নের মত অলীক! এ সংসারে সুখের ও আনন্দের স্মৃতিও বিষে পরিণত হয় পরিতৃপ্তির অভাবে আরও অধিক না পাইবার ব্যর্থ কামনায়। বুদ্ধ সত্য সত্যই প্রবুদ্ধ পুরুষ, কারণ তিনি এই মায়ার অলীকতা ভেদ করিয়া সত্যের ও আলোর পথে সব ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। ভগবানকে ধন্যবাদ এইজন্য যে, তিনি আমাকে চরম আঘাতে জাগাইয়া এই জীবন্ত কবরে আমায় আবদ্ধ রাখিয়াছেন। আমার সে উন্মত্ত রাজনীতিক-স্পৃহা হইতে আমি আজ নিরাময়! আজ আমি সত্যসন্ধানী বুদ্ধের পথের পথিক। আরও কয়েক বৎসরের পরমায়ু পাইলে আমি সত্য উপলব্ধির পথে সফলতা লাভ করিব। সুস্পষ্ট চিহ্ন ও লক্ষণের প্রকাশে মনে হয়, পূর্ণ সিদ্ধি দূরে নহে। আমার গুরু বিষ্ণু ভাস্কর লেলেজী এখন কোথায়? বোম্বাই-এর নিকট বান্দরার অনারেবল ভাণ্ডারকরজীর কাছে অনুসন্ধান করিও। তিনি সম্ভবতঃ বোম্বাই হাইকোর্টের জজ এবং কাউন্সিলের মেম্বার। তাঁহাকে লিখিয়া জানাইও—বারীন্দ্র আপনার কাছে পূর্ণ সিদ্ধিলাভের আশীর্বাদ চাহিতেছে। আমার রাঙামা কোথায় আছেন? তুমি তাহা না জানিলে ত্রিপুরার প্রধান জজ শ্রীরাসবিহারী বসুর কাছে সন্ধান লইও। দেবব্রত এখন বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী, তিনি আমার সহিত গ্রেপ্তার হন এবং শ্রীঅরবিন্দের সহিত বিচারে মুক্তি পান। দেবব্রত অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, আমার রাঙামাকে কোন মঠে আশ্রমে রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন। জিজ্ঞাসা করিও, তিনি কি তাহা করিতে পারিয়াছেন? বাবার রোগ ও মৃত্যুশয্যায় আমি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম রাঙামাকে কখনও ত্যাগ করিব না। কিন্তু এই রাজনীতিক উন্মত্ততা আমাকে সে অঙ্গীকার ভাঙাইয়াছে এবং এমন দুর্গম স্থানে আনিয়া ফেলিয়াছে। রাঙামায়ের জন্য কিছু করা হইয়াছে জানিলে আমি তবু কিছু সান্ত্বনা পাইব। রাসবিহারীবাবুর বড় ছেলে সুরেন্দ্রমোহন মায়ের দেখাশোনা করিত।

আর একটি কারণে আমি অশান্তি পাই। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র জ্ঞানের কাছে আমি ৫০ টাকা ঋণ লইয়াছিলাম। এই প্রথম আমি অর্থ সম্বন্ধে বাক্য রক্ষা করিতে পারি নাই। সে এখন তাহা লইতে না চাহিলেও তাহার ঋণ পরিশোধ পার তো করিও। বিভার কাছে (ডাঃ আশু মিত্রের কন্যা) বা সি আর দাশ মহাশয়ের কাছে এ-টাকা চাহিলে পাইবে। এ-সম্বন্ধে উত্তর দিতে ভুলিও না। আমার মাসতুতো ভাই সুকুমার মিত্র যেন তোমার চিঠির মধ্যে দু'-চার লাইন লেখে। সুপ্রভাত কাগজে মেসো মহাশয়ের লিখিত সন্ত নামদেবের জীবনী আমার মনকে বড় টানিয়াছিল। অপূর্ব প্রাণস্পর্শী সে লেখা। সুপ্রভাতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি নিরাশ হইয়াছি। কুমুদিনীকে বলিও, সুপ্রভাতকে উইলিয়াম ষ্টেডের রিভিউ অব রিভিউ কাগজের মত করিয়া যেন গড়িয়া তোলে। ভারতের মাসিকগুলি কোন জীবনের ব্রত ধরিয়া বড় হইয়া উঠে না। সেইজন্য তাহারা সাধারণ থেকে নগণ্য হইয়া পড়িয়া থাকে। ইজি চেয়ারের বিলাসিনীদিগের মনস্তুষ্টির কাগজ অনেক আছে, আর তাহার প্রয়োজন নাই। আমাদের কৈশোরের ভুলভ্রান্তি সে যেন ভুলিয়া যায় এবং দেশসেবায় জীবন নিয়োগ করে। ভারতে লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর দরিদ্র আছে, সমাজের আমূল সংস্কারও করিবার আছে।

৬ই মে, ১৯০৯ আমার কোর্টে দণ্ড পাইবার তারিখ, ঐদিন এই সালে আমার দ্বীপান্তরের পঞ্চম বর্ষ পূর্তির সময়। তাহার পর তুমি চীফ্ কমিশনারের নিকট এখানে আসার পাশ ও সাক্ষাৎকারের অনুমতির জন্য আবেদন করিতে পার। দাদা বা সুকুমারকে সঙ্গে লইয়া আসিতে পার এবং গভর্ণমেণ্টের সারকিট্ হাউসে অবস্থানের ব্যবস্থা সহজেই হইবে। কর্ণেল ডগ্‌লাস একজন অতিশয় উচ্চ রুচির ভদ্রলোক, এখানে কোন সম্ভ্রান্ত গৃহে তোমার থাকার ব্যবস্থা তিনি করিতে পারিবেন। অবশ্য তোমাকে ফিরতি মেলে আন্দামান ত্যাগ করিতে হইবে। সকালে জেলে সাক্ষাৎকারে আসিবে এবং কয়েকঘণ্টা আমরা কথা বলিতে পারিব। তুমি আসিলে মেরামতের জন্য দু'জোড়া চশমা তোমাকে দিব। গ্লাসগুলি ভাল আছে, ফ্রেমগুলি মাত্র ভাঙিয়া গিয়াছে। নূতন ফ্রেমে বসাইলে কয়েক সপ্তাহ যাইবে। এখানে নোনা হাওয়ায় ফ্রেম থাকে না, শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়।

এক কপি ভাল ভাষ্যসহ গীতা দিও।"

চিঠিখানি বেশ দীর্ঘ এবং স্থানে স্থানে জল পড়িয়া লেখা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

তদানীন্তন বেঙ্গলী কাগজে শ্রীঅরবিন্দের নিম্নের চিঠিখানি প্রকাশিত হইয়াছে:—

BABU AUROBINDO GHOSE'S LETTER

To The Editor of The Bengalee

Sir,—Will you kindly allow me to express through your columns my deep sense of gratitude to all who have helped me in my hour of trial? Of the innumerable friends known and unknown, who have contributed each his mite to swell my defence fund, it is impossible for me now even to learn the names, and I must ask them to accept this public expression of my feeling in place of private gratitude, since my acquittal many telegrams and letters have reached me and they are too numerous to reply to them individually. The love which my countrymen have heaped on me in return for the little I have been able to do for them, amply repays any apparent trouble or misfortune my public activity may have brought upon me. I attribute my escape to no human agency, but first of all to the protection of the Mother of us all who have never been absent from me but always held me in Her arms and shielded me from grief and disaster, and secondarily to the prayers of thousands which have been going up to Her on my behalf ever since I was arrested. If it is the love of my country which led me into danger, it is also the love of my countrymen which has brought me safe through it.

Aurobindo Ghose

6, College Square, May 14.

বাহুল্যের আশঙ্কায় শ্রীঅরবিন্দের এই কৃতজ্ঞতার ও দেশপ্রেমের পত্রখানির বাংলা অনুবাদ দিতে পারিলাম না। দিদির সংগ্রহের মধ্যে আমার বিলাতে ক্রয়ডনে জন্মের সার্টিফিকেটটিও পাওয়া গিয়াছে। অস্ত্র আইন ভঙ্গ হইতে বাঁচিবার জন্য এই বিলাতে জন্মের সার্টিফিকেট আমি ১৯০৭ সালের ৮ই জুলাই তারিখে আনাইয়া রাখিয়াছিলাম। বোমার বাগানেও ইহার এক কপি পাওয়া গিয়াছিল। সেইজন্য এত অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া সত্ত্বেও আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইন ভঙ্গের প্রয়োগজনিত শাস্তি ঘটে নাই। ১৯২০ সালের ডিসেম্বর বোধ হয় ৩০শে আমি মহারাজা জাহাজযোগে দেশের মাটিতে আসিয়া নামি। প্রথম মহাসমর শান্তি উৎসবে আমরা ৮০ জন মুক্তি পাইয়া দেশে আসি। এই অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্তি প্রাপ্তির আনুপূর্বিক ঘটনা আমার দ্বীপান্তরের কাহিনীতে আছে।

বিচার চলার কালে ইউরোপীয়ান সার্জেণ্টদিগকে মদ্য উপহার দিয়া আমার যে ফটো দিদি তুলিয়াছিলেন, তাহা 'ফাঁসীর প্রতীক্ষায় বারীন' বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার মূল কপি এই সঙ্গে দিদির দুর্লভ সংগ্রহে পাওয়া গিয়াছে।

বিষকন্যা

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

অমোঘ তৃষ্ণার তীর্থে সে দিয়েছে দ্রাক্ষা দুই মুঠি
আবেগে বিহ্বল তার মুগ্ধ আঁখিদুটি
পাখির মতন মেলে বলেছে, পথিক
তোমার পথের প্রান্তে প্রতীক্ষা করব, জেনো ঠিক।

এই তো যথেষ্ট হোল, আর
দেখবো না প্রত্যহ কেবা ফেননিভ কোমল শয্যার
নিকটে দাঁড়িয়ে থাকে; নীরব প্রশ্রয় পেয়ে কেবা
রাত্রির নির্জনে করে সঙ্গোপনে তার অঙ্গসেবা।
অন্য বাসনার মুখে সে কি মৃত উজ্জ্বল ইলিশ
হয়ে শুয়ে আছে, আর একপাত্র বিষ
রেখেছে আমার জন্য তার ম্লান শিয়রের কাছে?
তবু তো ভুলবোনা, শেষ প্রতিশ্রুতি আছে:
আমার সে ভালোবাসে,
ভালো সে বাসবে চিরকাল।
তাই আমি আসন্ধ্যাসকাল
শিখার মতন জ্বলি যৌবনের শাখায় শাখায়,
আমার উড্ডীন পতাকায়
সে অপূর্ব মিথ্যামন্ত্র
লেখা আছে জ্বলন্ত অক্ষরে:

আজ তুমি বলো সত্য ক'রে—
ভালোবাসা নয়, ভালোবাসার ভান
ভুলবে না, রাজকন্যা, ভুলবে না—তোমার সন্তান
আমার সন্তান নয়, তবুও ওদের কচি গায়ে
আমার রক্তের গন্ধ কোনোদিন যাবে না হারায়ে।
ঘৃণা যদি করে থাকি
ক্ষমা কোরো,—ভুলতে পারি না।
নিজে তো ভালোই জানো,
আর্ত আমি তোমার একটু স্নেহ বিনা;
তোমাকে হৃদয়ে রেখে জীবনের
কুরুক্ষেত্র বারবার জিতে নিতে পারি
বিষকন্যা, সে জয় তোমারই।।

আর কত কাল

শ্রীরাইহরণ চক্রবর্তী

দাবীর উপরে দাবী, দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা
স্বার্থ আর মহামারি দেশের উপর
কতকাল শূন্য করি মৃত্যুহীন সুধা
মানুষের উপহারে মহাশূন্য ঘর
রবে শুধু তৃপ্তিহীন। আকাশে-বাতাসে
কুয়াসার ছায়ারূপী ভাবের কঙ্কাল
অর্থগৃধ্নু পিশাচের প্রেতাত্মার নিশ্বাসে
ধরেছে বিকৃত রূপ। আর কতকাল
শুধু নাই নাই করি চাহিদা বাড়াই
দুঃখের অমৃত দান অন্তরে হারাই
প্রভুত্বের উগ্রতাপে। জনান্ধের দাবী
সত্য দেবতার ঋণ নাহি কভু মানি
বেড়ে যায় সব দিকে—নীতিহীন চাবি
খোলে তার ধনরত্ন ভক্ষকেরে টানি।

তোমার জন্যে

রথীন্দ্রকান্ত ঘটকচৌধুরী

তোমার জন্যে সারাদিন ঘাম-ঝরা
মনকে পাঠাই রাতের হাওয়ার দেশে,
তোমার জন্যে চৈত্র দিনের খরা
চোখ থেকে ঝেড়ে ফেলি ক্লান্তির শেষে।
তোমার জন্যে ক্ষুধার আকাশে জ্বলা
সূর্য নিবায়ে-তৃপ্তির তারা বুনি,
সোনার চাবিতে রুদ্ধ ঘরের তালা
খুলে কান পেতে বাতাসের গান শুনি।
কঠিন সড়কে ঘাসের স্বপ্ন খোলে
সবুজ তুলির ছোঁয়ায় কোমল পাখা,
তোমার জন্যে হাহাকারে চোখ তোলে
মাঠের ফসল সোনালি ইশারা আঁকা।
তোমার জন্যে কান্না-সাগর থেকে
খুশির মুক্তা মুঠি ভরে তুলে আনি,
পিছনে ঢেউয়েরা বার বার যায় ডেকে,
বাতাসে ঝড়ের প্রাণপণ হানাহানি।
তোমার জন্যে চৈত্র দিনের জ্বালা
চোখ থেকে ঝেড়ে, রাতের হাওয়ার দেশে
মনকে পাঠাই, রুদ্ধ ঘরের তালা
খুলে কান পেতে থাকি ক্লান্তির শেষে।

দুর্দশা

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

সবার—কি দুর্দশা আজ,
স্নানের টবে খোঁজে গাঙের মাছ।
আতর লাগি কাতর হয়
গোলাপ ফুলের গাছ।
ভালুক বলে, ভাই,
"চিরুণিটা দাও তো ব্রাদার
তেড়ি কাটতে চাই।"
গোরু বেরোয় গুঁড়ো দুধের খোঁজে
লজ্জা পেয়ে সাপেরা চোখ বোজে।

গান

শ্রীমতী মিনতি নাথ

ব্যথা লয়ে আজ ফিরে চলে যাই
দানের বদলে হেলা,
প্রিয়তম মোর কোন দুখ নাই
বিদায়ের এই বেলা।
মালার সুবাস যদি বা শুকায়
কাঁদিবে না মন তবু গো ব্যথায়
ঝরা নয়নের অশ্রু সায়রে
ভাসাবে নিয়ত ভেলা।
অন্তর প্রেম হবে মোর প্রিয়
ধূপেরে করিয়া ছাই,
ও রূপের আলো জেলে দেবে তাই
আঁধারেও রোশনাই।
ক্ষণিকের আলো যদি হয় শেষ
হৃদয় বীণায় বাজে সেই রেশ
ছিঁড়িয়া সে তার ভেঙে দিও প্রিয়
দু দিনের গড়া খেলা॥

চিত্রকূট

শ্রীহরেন্দ্রনাথ সিংহ

পাহাড় অরণ্য ঘেরা গ্রাম্য বনবীথি
দেউল মন্দির কোলে পূত "মন্দাকিনী",
পথিকে শুনায় আজো "রাম-সীতা" গীতি,
চলেছে "জানকী কুণ্ডে" মরাল গামিনী।
প্রকৃতির রাণী হেথা বিরহে বিহ্বল
"হনুমান ধারা" তারি নয়ন উচ্ছ্বাস,
স্মৃতির বেদনা লয়ে, অতীত সম্বল,
"রাম-সীতা লক্ষ্মণের" জানায় আভাস।
কবিতা মানস-লক্ষ্মী সাধনা বেদনা,
চিরসাথী ছায়া সম কাছে আছো প্রিয়ে।
জীবনে স্বপনে ধ্যানে তোমারি প্রেরণা,
তীর্থের সৌন্দর্যে লভি অন্তরে লুকিয়ে.
"চিত্রকূট" চিরদিন খ্যাত রামায়ণে,
বিস্ময়ে অপূর্ব শোভা হেরেছি নয়নে।

জিজ্ঞাসা

শ্রীমতী নীলিমা মুখোপাধ্যায়

আমার এ জীবনের স্বল্প পারাধতে, হে সুন্দর!
তোমার বিরাট রূপে বারে বারে করেছি দর্শন।
ধরিত্রীর প্রতি কোণে, মানুষের প্রেমে, প্রান্তরের
ক্ষুদ্র তৃণে, সাগরের ঊর্মিমালা মাঝে,
হে বিচিত্র, নব নব রূপে তুমি লভিয়াছ স্থান।

সংসারের যাত্রাপথে যাহা কিছু দেখেছি সুন্দর
উদার—তা' সবার মাঝে তোমার করুণা স্পর্শ
স্নেহভরে ছুঁয়ে গেছে আমার হৃদয়।
তোমারে দেখেছি আমি সন্তানের হাসিমুখ মাঝে,
মাতার স্নেহেতে আর দয়িতের প্রণয় কূজনে,
সর্ব আনন্দেতে—তুমিই পরমানন্দ, হে আনন্দময়!

তথাপি জিজ্ঞাসা এক রয়েছে আমার!
সংসারের বাঁকাপথে, দুঃখের তামসী নিশিতে
কেন নাহি হেরি তোমা শান্তিময় সান্ত্বনার সাজে?
কেন আছ লুকাইয়া বক্রমুখে
দয়াহীন অবহেলা ভরে
মানুষের কটুবাক্য মন্থন করিছে যবে
তীব্র হলাহল?
হায় প্রভু! মোর কাছে তুমি কি রহিলে বন্দী
সুখকারা মাঝে?

আশ্বিন

শ্রীভবানীপ্রসাদ ঘোষ দস্তিদার

আবার এসেছে আশ্বিন
শিউলি সুবাস ভরা শারদ বাতাস
আমাদের দিনগুলো করেছে রঙ্গিন;
গভীর প্রশান্তি ভরা হৃদয় আকাশ।
এবারেও যাবে আশ্বিন
রাতের শিউলি সম ঝরায়ে আশ্বাস
আমাদের দিনগুলো করিবে মলিন,
স্মৃতির বেদনা ভারে ফেলিব নিশ্বাস।

অজয় মিত্র

খেয়া

শিক্ষয়িত্রী হেনা সেন

শ্রীবিভূতিভূষন গুপ্ত
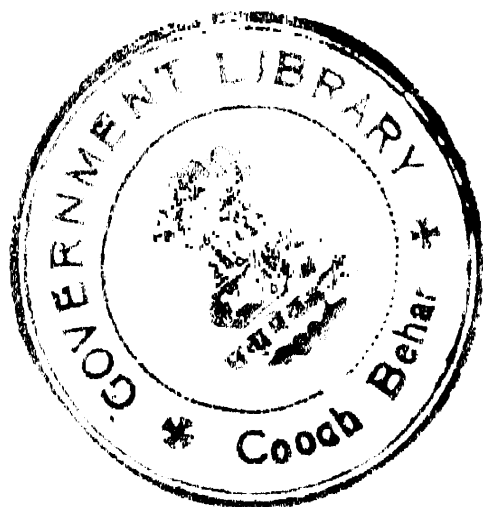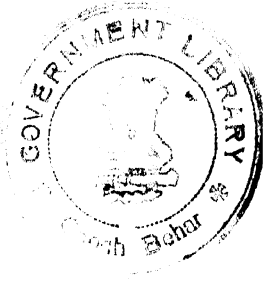
হেনা সেন এখানকার নারী বিদ্যামন্দিরের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী। সম্প্রতি বদলি হ'য়ে এসেছেন। ছোট-খাট মানুষটি। একটু বেশী রোগা আর একটু বেশী ফর্সা। আলাদা করে বিচার ক'রে দেখলে তাঁকে সুন্দরী বলা উচিত। কিন্তু তিনি সুন্দরী নন। নারীসুলভ কমনীয়তা তাঁর চলায়, বলায় কিংবা চেহারায় কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। কড়া ডিসিপ্লিনের বর্ম ভেদ করে আসল মানুষটির কাছে কেউ পেঁাছুতে পারে না। ফলে ছাত্রী এবং শিক্ষয়িত্রী সকলেই তাঁকে ভয় করে চলে। ভালবাসে না। আড়ালে আবডালে বিরূপ সমালোচনা করে।

হেনা সেনের কানে তার কিছু কিছু পেঁাছায়। তিনি এসব গ্রাহ্য করেন না। হয়তো কোনদিক থেকে আজ পর্যন্ত কোন প্রকার বাধার সম্মুখীন হননি ব'লেই একথা তিনি ভাবতে পারছেন। যাঁরা সত্য পথে চলেন সমালোচনা তাঁদের বিরুদ্ধে হবেই। হেনা সেন একথা বিশ্বাস করেন। সত্যকে ত্যাগ ক'রতে পারেননি বলেই নাকি আজ তাঁকে এই নিঃসঙ্গ জীবন বয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

সত্য, ন্যায়, আর নীতিবোধ হেনা সেনের চতুর্দিকে যে লৌহ বেষ্টনীর সৃষ্টি ক'রেছে তার আড়ালে থেকে থেকে ও'র কোমল বৃত্তিগুলি শুকিয়ে পাথর হ'য়ে গেছে। নবীনের কলহাস্য আর উচ্ছল চাপল্যকে তাই তিনি সহজ মনে গ্রহণ করতে পারেন না। বয়েসের স্বাভাবিক ধর্মকেও তিনি স্বীকার করতে চান না। এই নিয়েই আজ হেনা সেনকে একটা সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে। হয় তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচলিত থাকতে হবে নইলে এখান থেকে অন্যত্র চলে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে. কোন প্রকার মধ্যপন্থা মেনে নিতে হেনা সেন পারবেন না।

হেনা সেন চুপ করে তাঁর আরাম কেদারায় শুয়ে আছেন। একটা অপরিসীম চিন্তা এবং ক্লান্তিতে তিনি চোখ বুজে আছেন। মাথার কাছের খোলা জানালা দিয়ে রজনীগন্ধার সুমিষ্ট গন্ধ বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছে। ফুল বাগানের উপর তাঁর অত্যন্ত মমতা। নিজ হাতে রোজই তিনি গাছের পরিচর্যা করেন। কুঁড়ি থেকে ফুটে ওঠা পর্যন্ত আশ্চর্য অধীরতা নিয়ে প্রতীক্ষা করেন। তারপরে একটা গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে এক সময় আর একটার পানে দৃষ্টি ফেরান।

মিস রায় বাড়ী পর্যন্ত ধাওয়া করেছেন। এবং সেই দিকেই অঙ্গুলি সঙ্কেত করে তিনি বললেন, শুনতে পাই এই ফুল বাগানটির উপর আপনার আশ্চর্যরকম মমতা—

তাকে মৃদু বাধা দিয়ে হেনা সেন ততোধিক মৃদু কণ্ঠে বললেন, আপনার বক্তব্যটা আর একটু পরিষ্কার করে বলুন মিস রায়। মোদ্দা আপনি বলতে চাইছেন কি?

মিস রায় প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ করে জবাব দিলেন, অত্যন্ত স্পষ্ট মিসেস সেন—আপনার বাড়ীতে ফুলের বাগান অত্যন্ত বেমানান। ফুলের পরিচর্যা করবার আপনার কোন অধিকার নেই।

হেনা সেন সহসা সোজা হয়ে বসে কঠিন কণ্ঠে বললেন, আমি এখানকার প্রতিষ্ঠানের প্রধানা আর আপনি সহকারী একথা ভুলে না গেলে আমি খুশী হবো মিস রায়। আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কেউ উপদেশ দিতে এলে আমি সেটা পছন্দ করি না। আপনি দয়া করে আপনার আসল বক্তব্যটা কি আমাকে জানাবেন কি? আজ আমি বড় ক্লান্ত। আমার কিছুক্ষণ বিশ্রামের প্রয়োজন আছে।

মিস রায় মৃদু কণ্ঠে বললেন, তাহলে বরং এখন থাক। আমি কাল সকালেই আবার আসব।

হেনা সেন ভাবলেশহীন কণ্ঠে জবাব দিলেন, আপনার যা বলবার বলুন। আমি এখুনি শুনবো মিস রায়।

মিস রায় কোন প্রকার ভনিতা না করে সোজা ভাষায় বললেন, আপনার সিদ্ধান্ত কি কোনক্রমেই পাল্টান সম্ভব নয় মিসেস সেন?

হেনা সেন গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, সিদ্ধান্ত করে ফেললে তার রদবদল করা কি খুব সহজ না সম্ভব। না না মিস রায় আমি চুরিকে কোনক্রমেই প্রশ্রয় দিতে পারবো না। আমি একের জন্য বহুর ক্ষতি করতে নারাজ। এসব মেয়েকে স্কুল বোর্ডিং-এ তো নয়ই আমি স্কুলেও রাখবো না। আপনারা ভুলে যাবেন না যে, ক্ষমা সব সময় মঙ্গল করে না।

মিস রায় ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, কোন কোন সময় করেও মিসেস সেন। কিন্তু এসব তর্কের কথা। আমি তর্ক করতে আসিনি, শুধু বলতে এসেছি যে, আজকের ঘটনাটাকে অপরিণত বয়েসের একটি মেয়ের ছেলেমানুষী মনে করেও কি......

তাকে বাধা দিয়ে হেনা সেন জবাব দিলেন, ওতে ডিসিপ্লিন থাকে না মিস রায়। একটু থেমে তিনি তেমনি নির্লিপ্ত কণ্ঠে পুনরায় বললেন, তাছাড়া আমি ভাবতেই পারি না যে, এই শ্রেণীর একটি মেয়েকে নিয়ে আপনারা এতো বেশী মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? আমি শুধু আদর্শ শাস্তি দিয়ে আর সকলকে সাবধান করে দিতে চাই। তার ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেওয়া তো ইচ্ছে নয়।

মিস রায় জবাব দিলেন, আমাকে মাপ করবেন। মেয়েটিকে তাড়িয়ে দিয়ে আমাদের কর্তব্য শেষ না করে তাকে সংশোধন করবার দায়িত্ব নিতে পারলেই কি ভাল হয় না? এই মেয়ে যদি আপনারই হতো কি করতেন আপনি?

হেনা সেন কঠিন কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করলেন, তাহলে তার একটা আঙ্গুল অন্ততঃ আমি জখম করে ক্ষান্ত হতাম। সহসা তিনি যেন খানিকটা বিমনা হয়ে পড়লেন। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই সে ভাব কাটিয়ে উঠে তিনি অবিচলিত কণ্ঠে বললেন, এ সব অর্থহীন আলোচনা করে কোন লাভ নেই মিস রায়। মোট কথা আমি অপরাধীর চরম শাস্তির পক্ষপাতী। কথাটা আপনারা মনে রাখলে আমি আনন্দিত হবো।

এত কথার পরেও মিস রায় আর একবার তাঁকে বিবেচনা করে দেখবার অনুরোধ জানিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

হেনা সেন অপেক্ষাকৃত নরম সুরে বললেন, অন্যায়কারীকে ক্ষমা করায় মহত্ত্ব থাকতে পারে কিন্তু শিক্ষা কেন্দ্রের ন্যায়-নিষ্ঠার হানি হয়

এতে। ওরা অপরিণত বুদ্ধি ছেলেমানুষ বলেই আরও কঠিন হওয়া উচিত আমাদের। একের পরিণতি দেখে যাতে আর দশজনা সাবধান হতে পারে।

মিস রায় করুণা-পূর্ণ দৃষ্টিতে হেনা সেনের ভাবলেশহীন মুখের পানে খানিক চেয়ে থেকে লঘুপদে প্রস্থান করলেন।

সেই থেকেই হেনা সেন ভাবছেন আর অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। তার পরে এক সময় অন্যমনস্কভাবে তাঁর ফুল বাগানে এসে উপস্থিত হলেন। ভৃত্য তাঁর আরাম কেদারাটি বাগানে দিয়ে গেল। হেনা সেন একাগ্র দৃষ্টি মেলে দেখছিলেন কুঁড়ি আর ফোটা ফুলের স্নিগ্ধ সমারোহ। কিন্তু এতো সুন্দরের সমারোহের মধ্যেও তিনি আজ পরিপূর্ণ আনন্দের সন্ধান পাচ্ছেন না। গোলাপের সৌরভ তাঁকে যতটা না আনন্দ দিচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশী বেদনা দিচ্ছে তার কাঁটা। মনটা তাঁর থেকে থেকে বহু দূরে—তাঁর আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে চাইছে। হিসেব করে আর মেপে মেপে চলতে গিয়ে তিনি জীবনের কোন্ স্তরে এসে উপস্থিত হয়েছেন—কতটুকু পেলেন……কতটুকু দিলেন আর কতখানি তিনি খোয়ালেন এ প্রশ্নটা অত্যন্ত আকস্মিক-ভাবে তাঁকে বিহ্বল করে ফেলেছে।

সহসা হেনা সেনের চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল। অমন সুন্দর কুঁড়িটির বৃন্তের উপর বসে একটি কাল পোকা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে! তিনি উঠে গিয়ে যত্ন ও সাবধানতার সঙ্গে পোকাটিকে তাড়িয়ে দিয়ে পুনরায় তাঁর আরাম কেদারায় ফিরে এলেন। কুঁড়িটি অক্ষত রয়ে গেল। কিন্তু আঘাত লাগল হেনা সেনের মনোবীণার একটি সূক্ষ্ম তারে। তিনি বিস্মিত বিহ্বল হয়ে শুনতে লাগলেন ভারি মিষ্টি আর নরম একটি সুর। ভালই লাগছিল তাঁর। উদ্‌গ্রীব হয়ে কান পেতে রইলেন তিনি। এমন কতক্ষণ তিনি একান্তভাবে চুপ করে চোখ বুজে বসে ছিলেন তা তাঁর হুঁশ ছিল না। সহসা ভৃত্যের আহ্বানে সম্বিৎ ফিরে পেলেন।

অনেক রাত হয়েছে মাইজি—

সত্যিই অনেক রাত হয়েছে। আজকের সন্ধ্যাটা মিস রায় এসে গোলমাল করে দিয়ে গেল। তাঁর কর্মজীবনে এর চেয়েও বহু কঠিন আর জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছে এবং তার সমাধানও তিনি কঠিন হাতে করেছেন। কোন দিক দিয়ে স্পষ্ট বাধার সৃষ্টি কোন দিন কেউ করেনি। আজ সর্বপ্রথম এলো বাধা—যে বাধাকে তিনি বাইরের কাঠিন্য দিয়ে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করলেও ভিতর থেকে সায় পাচ্ছিলেন না। একটা পরম দুর্বলতা তাঁকে যেন চতুর্দিক থেকে চেপে ধরতে চাইছে। হেনা সেন আত্মসমর্পণ করলেন। আত্মসমর্পণ করে নিজের মনের সঙ্গে আর অনুভূতির সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য বিধান করতে যেন প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। অভ্যাস তাঁর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে তাই ভিতরে বাইরে দেখা দিয়েছে সংঘাত।

হেনা সেনের দৃষ্টি গিয়ে পুনরায় কুঁড়িটির পানে আবদ্ধ হলো। পোকাটা আবার বৃন্তের উপর আশ্রয় নিয়েছে।

হেনা উঠে গিয়ে প্রতিষেধকের টিনটি নিয়ে এলেন। তার থেকে খানিক ছড়িয়ে দিতেই পোকাটি বৃন্ত থেকে খসে মাটিতে পড়লো। ওর লোভের পরিসমাপ্তি হয়েছে।

হেনা ধীরে সুস্থে ঘরে ফিরে এলেন। ভৃত্যকে বিদায় দিয়ে তিনি শয়নঘরে ফিরে এসে শয্যার আশ্রয় নিলেন। মিস রায়ের কথাগুলি আর একবার নতুন করে তাঁর কানের পাশে ধ্বনিত হয়ে উঠলো।

ভৃত্য পুনরায় ফিরে এসেছে। হেনা সেনের মুখে পুনরায় কর্তব্যপরায়ণতার ভাব ফুটে উঠলো। তিনি বললেন, তোমাকে তো আমি খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়তে বলে এলাম রামদিন—

রামদিন সসংকোচে বললে, আপনার যে খাওয়া হয়নি মাইজি—

হেনা সেনের কণ্ঠস্বর অভ্যাসবশেই কঠিন হয়ে উঠলো, তোমাকে যে কথা বলা হয়েছে তাই করো রামদিন। আমার দরকার হলে পরে খাবো।

রামদিন কথা বাড়ালে না। সে সাহসও তার নেই। মনিবকে সে ভাল করেই জানে।

ভৃত্য চলে যেতে হেনা সেন পুনরায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। চুপ করে বসে থাকতেও তিনি পারছেন না। একটা প্রবল আলস্য তাঁকে যেন চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। তিনি চোখ বুজলেন। তাঁর চতুর্দিকের ইস্পাতের গণ্ডিটা মুহূর্তের জন্য সরে গেছে। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি ঘুম ভেঙে জেগে উঠতে চাইছে। বাঁধাধরা নিয়মকানুন আর শৃঙ্খলার বাইরে এসে চোখ মেলে চেয়ে চেয়ে দেখছেন। দেখবার চেষ্টা করছেন সময়ের গতিপথের বাস্তব সত্য ইতিহাসকে। সে থেমে নেই। দুর্নিবার বেগে এগিয়ে চলেছে। চলার পথে কত যে ভেঙেছে আর কত যে গড়েছে তার কতটুকু খবর তিনি রাখতে চেয়েছেন। নিজের বুদ্ধি আর বিবেচনার সিমেণ্ট দিয়ে তাঁর মত আর পথকে গেঁথে নিয়েছেন হেনা সেন। গোলাগুলীর যুগ শেষ হয়ে আজ অ্যাটম আর হাইড্রোজেনের যুগ চলেছে। সিমেণ্টের বেষ্টনীর আজ কতটুকু মূল্য আছে। মানুষ এগুচ্ছে না পিছিয়ে যাচ্ছে সে কথা কেউ ভাবছে না। অতীতের চিন্তাধারাও বর্তমানে অচল। এক হেনা সেন তাঁর পুরানো মত আর পথকে আঁকড়ে থেকে কতদিন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হবেন।

হেনা সেন তাঁর চিন্তার এই আকস্মিক গতি পরিবর্তনে একটু আশ্চর্য হলেন। আরও আশ্চর্যের কথা যে, তিনি তাঁর জীবন পথের বহু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘটনাকে এক স্থানে সযত্নে জড়ো করে গভীরভাবে তারই মাঝে ডুবে গেলেন। হেনা সেনের চোখের সম্মুখেই জন্ম নিল একটি চঞ্চল বালিকা—তারই চিন্তার রক্ত কণিকায় সৃষ্ট একটি গোটা মানুষ। সে নির্ভয়ে এসে বসলো। চোখে মুখে অর্থপূর্ণ হাসি।

হেনা সেন নিরস কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, কে চাও তুমি?

স্পষ্ট উত্তর পাওয়া গেল, অনেকদিন দেখা পাইনি তাই দেখতে এলাম।

হেনা সেন অবাক হয়ে গেলেন, বললেন, তুমি আমাকে দেখতে এসেছো! অথচ তোমা[কে] আমি চিনি না! কি চাও তুমি? তাছা[ড়া] আমি কি মরে গিয়েছিলাম যে দেখা পাওনি

মেয়েটি হাসলে। তার স্বচ্ছ দু'পাটি দাঁ[ত] ঝক্‌ঝক করে উঠলো। বললে, আমাকে ভু[লে] গেছো বলেই আসবার প্রয়োজন হয়েছে আমাকে কেউ চিনতে পারে না। চিনতে চ[ায়] না। তোমার মধ্যেও তার কোন ব্যতিক্র[ম] দেখছি না।

হেনা সেন সহসা গম্ভীর কণ্ঠে ধম[ক] দিলেন, মানুষকে তার প্রাপ্য সম্মান দিয়ে ক[থা] বলতে হয় এ কথাটাও কি তোমার মা বা[বা] শেখাননি?

মেয়েটি বিন্দুমাত্র লজ্জিত হলো না। [সে] হাসিমুখেই জবাব দিলে, দেবেন না কে[ন], হাজার বার দিয়েছেন কিন্তু মনে থাকে ন[া] ভুল হয়ে যায়।

হেনা সেন তেমনি গম্ভীর কণ্ঠেই পুনর বললেন, এই বয়েসে এতো ভুল হলে আমা[র] বয়েসে করবে কি?

মেয়েটি মিষ্টি হেসে জবাব দিলে, একেবা[রে] ভুলে যাব। মনে করিয়ে দিলেও স্মরণ কর[তে] পারবো না। ঠিক তোমার মত বেমালুম ভু[লে] যাব।

হেনা সেনের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলে[া] এই দুর্বিনীত মেয়েটার স্পর্ধা দেখে।

মেয়েটি সহজ কণ্ঠে স্মিতহাস্যে বললে[,] সত্যিকথা বললে সকলেই রাগ করে।

হেনা সেনের ঝিমিয়ে পড়া ইন্দ্রিয়গু[লি] আবার নতুন করে সজাগ হয়ে উঠেছে। তি[নি] গর্জন করে উঠলেন, চুপ করো ফাজিল মেয়ে-

কিন্তু ফাজিল মেয়েটা বিন্দুমাত্র ভয় পেলে না। খানিকটা দূরে সরে গিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে থাকে।

হেনা সেন বলতে থাকেন, তোমাদের মত মেয়েদের চাবকে সোজা করে দিতে হয়। প্রচণ্ড ক্রোধে তিনি ফেটে পড়লেন।

মেয়েটি সোজা ভাষায় জবাব দিলে, চাব[ক] মারলেই বুঝি সব সময় সোজা করা যায়! দেখ[ো] না আমার উপর দিয়েই পরখ করে। কতটু[কু] কি করতে পার।

উত্তর

॥ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ॥

আমারে যদি শুধাও তুমি—কেন
পাঠানু আমি এমন সযতনে,—
চয়ন করি ফাগুন-চাঁপা হেন
শিশিরে যাহা কাঁদিতেছিল বনে?
বলিব তবে তাহাতে, উত্তমে
সোহাগ কোথা অশ্রু বিনা জমে!

শুধাও যদি আমারে, কুসুমখানি
মলিন কেন—কেন এ পেল জরা?
শিথিল কেন, কেন এ অভিমানী—
শুধাও যদি, বেঁচে এ কেন মরা?
বলিব তবে তাহারি উত্তরে—
প্রেমেতে ভয় আছে যে চরাচরে!

———

হেনা সেনের চোখ দুটো আর একবার জ্বলে উঠলো। সম্ভব হলে সেই দৃষ্টির আগুনে মেয়েটাকে তিনি ভস্ম করে ফেলতেন। তীক্ষ্ন কণ্ঠে তিনি বললেন, কে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন? মিস্ রায় বুঝি?

এতক্ষণে মেয়েটির দৃষ্টিতে একরাশ বিস্ময় দেখা দিল। সে বললে, মিস্ রায় কে আমি জানি না, কিন্তু তুমি নিজেই আমাকে এখানে আসতে বাধ্য করেছ।

হেনা সেন স্বগতোক্তি করলেন, লোকে বলে আমরা এগোচ্ছি—আর এই সব বাচাল মেয়েরাই আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের মা হবেন—

মেয়েটি হঠাৎ খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো। বললে, অমনি সাধারণের মত বড় বড় কথা কইতে সুরু করলে? মহাজনদের পথ বেছে নিলে বুঝি...কিন্তু তোমার ঐ পচা অভিযোগের বন্যায় আমাকে ভাসিয়ে নিতে পারবে না। আমি তোমাকে আশ্রয় করেই তোমার কাছে থাকবো। তুমি কাহিল হয়ে পড়েছো হেনা সেন—

থাকাচ্ছি তোমায়...হেনা সেন সহসা বেত হাতে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু মেয়েটি ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আর হেনা সেন দাঁড়িয়ে আছেন পল্লীপ্রান্তের এক অতি নগণ্য গৃহস্থের গৃহ প্রাঙ্গণে।

হেনা সেন চমকে উঠলেন। পুরানো দিনের একটি অতি পুরাতন ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হঠাৎ তিনি লজ্জায় এবং বেদনায় বিবর্ণ হ'য়ে গেলেন। হাতের বেতখানি তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

অদূরে মেয়েটি তার ছোট ভাইয়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। দুটি অপরাধী চোখ শঙ্কিত দৃষ্টি মেলে পিতার মুখের পানে চেয়ে আছে। পিতা উত্তেজিত কণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠেছেন, শেষ পর্যন্ত তোমরা চুরি ক'রতে শিখেছ!...

চোখের পলকে হাতের বেত পিঠের উপর নেমে এলো। ওরা আর্তনাদ ক'রে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। ঘরের ভিতর থেকে ছুটে এলেন জননী। উদ্যত বেত এবং দুটি অপরাধী বালক-বালিকার মাঝে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বললেন, অন্যায় ক'রেছে শাস্তি দাও, তাই ব'লে খুন ক'রে ফেলবে? দেখ দিকি কি ক'রেছো তুমি?

ক্রুদ্ধ পিতা উত্তেজিত কণ্ঠে জবাব দিলেন, হ্যাঁ তাই ক'রবো। দুষ্টু গরুর চেয়ে আমার শূন্য গোয়াল ভাল। যে ভয়ে পুলিশের চাকরী ছেড়ে মাষ্টারী নিলাম—

মা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, থামো, নিজের অক্ষমতার কথা নিয়ে আর জাঁক ক'রো না। তিনি ছেলে-মেয়ের হাত ধরে দ্রুতপদে প্রস্থান ক'রলেন।

হ্যাঁ মনে পড়েছে হেনা সেনের—আপন অতীত জীবনের একটি ভগ্নাংশের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটতেই আরও ছোট বড় বহু ঘটনা একের পর এক বন্যার স্রোতের ন্যায় তার পানে ছুটে আসছে। হেনা সেন ভীত সন্ত্রস্তভাবে পালিয়ে এলেন আপন সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে। কিন্তু আশ্চর্য তাঁর মুহূর্তের অসাবধানতার সুযোগ নিয়ে একটি তরুণী এসে সেখানেও নিঃশব্দে বসে আছে। অপূর্ব সুন্দর মেয়েটি। হেনা সেন বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন মেয়েটিকে আর সেই সঙ্গে নিজেকে।

মেয়েটি কথা বলছে না কিন্তু মুখে তার স্নিগ্ধ অপরূপ হাসি লেগে রয়েছে। চোখ ফেরাতে পারছেন না হেনা সেন। একটা লুব্ধ আকুলতা নিয়ে ওর প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তিনি দেখছেন। আর একই সঙ্গে মেয়েটির পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন এখানকার নারী বিদ্যামন্দিরের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী হেনা সেন। আপন অজ্ঞাতে তাঁর বুক ভেদ ক'রে একটি নিঃশ্বাস বার হ'য়ে এলো।...

ঐ নরম আর সুন্দর দেহটির অধিকারী একদিন হেনা সেনই ছিলেন—আর ঐ দেহের অভ্যন্তরে যে মনটি তা ছিল বহু বর্ণ বৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল। কত মধুর কল্পনা সেখানে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে মনের স্তরে স্তরে সাজিয়ে রেখেছিলেন তিনি, কিন্তু সে সব বাইরে আলোর মুখ দেখবার সুযোগ পেল না...

হেনা সেন চমকে উঠলেন মেয়েটির প্রতিবাদে, মিথ্যে কথা—আর এমনি ক'রেই তুমি চিরকাল নিজেকে ঠকিয়ে আসছো। সুযোগ পেয়েও তুমি পায়ে ক'রে তাকে ঠেলে দিয়েছো। আর এই সত্য কথাটা স্বীকার ক'রতেও আজ তুমি লজ্জা পাচ্ছ।

হেনা সেনের কণ্ঠস্বর করুণ হ'য়ে উঠলো। তিনি ব'ললেন, হয়তো পাচ্ছি—

মেয়েটি হাসি মুখে বললে, সত্য কথা স্বীকার ক'রতেও এতো সঙ্কোচ! আর হবে নাইবা কেন—প্রত্যেক কাজে এই দ্বিধা দিনের পর দিন তোমাকে তাই এখানে নিয়ে এসেছে। আশ্চর্য তুমি কি এ কথাটাও অনুভব ক'রতে পার না?

হেনা সেনের কণ্ঠে আত্মপ্রত্যয় ফুটে উঠলো, আমার সে দ্বিধা ত' অকারণ নয়—যাকে আমি সত্য ব'লে জেনেছি তাকেই আঁকড়ে ধরেছি।

জবাব এলো, সত্য তুমি কাকে ব'লছো হেনা সেন? জীবনব্যাপী নিজের দেহের সঙ্গে, মনের সঙ্গে, বিবেকের সঙ্গে, আর পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করে যে বন্ধ্যা দিনগুলিকে পিছনে ফেলে এসেছো সেইটেই কি তোমার কাছে হ'লো সত্য? আর যে সম্ভাবনাময় দিনগুলিকে তুমি ন্যায় আর সত্য পালনের নামে আলোর মুখ দেখতে দিলে না সেইগুলি হ'লো মিথ্যে—না হেনা সেন এমনি ক'রে নিজেকে ঠকাবার এবং আর একজনকে বঞ্চনা ক'রবার তোমার কোন অধিকার নেই।

এ সব তোমার অন্যায় অভিযোগ, হেনা সেন মৃদু শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, বঞ্চনা আমি অপর কাউকে কোনদিন করিনি। আমার সত্য আমাকেই বরং বঞ্চিত করেছে কিন্তু তার জন্যে আমি একদিনের জন্যও খেদ করি নি—

মেয়েটি হেসে উঠলো। বললে, একমুহূর্ত আগেও কিন্তু তুমি খেদ জানালে। তুমি অস্বীকার ক'রলেও আমি ব'লবো, আমার কথাগুলিই তোমার মর্মকথা, আমার অনুযোগগুলিই তোমার অনুযোগ। হেনা সেন.. কঠিন পাথরও যেমন সত্য নরম মাটিও তেমনি সত্য কিন্তু পাথরে জীবনের রসদ ফলে না, ফলে মাটিতে···...এই কথাটাই তুমি স্বীকার ক'রে নিতে পারলে না। তোমার কঠিন যুক্তির আড়ালে সব চাপা পড়ে গেল। চাপা পড়ে গেল তোমার সংসার —অমন পরম নিষ্ঠাবান স্বামী।

হেনা সেন ক্লান্ত কণ্ঠে ব'ললেন, তাই বুঝি তুমি পাথরের বুকে মাটির প্রলেপ দিতে চাইছো?

কিন্তু তাতে কি আর ফসল ফলবে?

জবাব এল, এখনও তোমার অহঙ্কার না! রসদ হয়তো কোনদিনই সেখানে ফলা[illegible] কিন্তু তোমার বন্ধ্যাত্ব ঘুচবে, কলঙ্ক টু[illegible] হেনা সেন। পাথরের বুকে কোনদিন [illegible] ফুটতে দেখনি তুমি? সেখানেও কিন্তু [illegible] প্রাণের রস যোগাচ্ছে।

হেনা সেন তার এতক্ষণের ঝিমিয়ে [illegible] ভাবটা কাটিয়ে উঠে কতকটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী[illegible] ব'ললেন, দিব্যি টোলের পণ্ডিতের মত অ[illegible] বক্তৃতা দিতে সুরু ক'রেছো দেখছি কিন্তু [illegible] হচ্ছে বড় দেরীতে সুরু ক'রেছো। এতদিন [illegible] ক'রছিলে তুমি?

তোমার হাতে বেত এগোতে দেয়নি[illegible] জবাব এল।

হেনা সেন বললেন, বেত আজও [illegible] হাতে আছে।

কিন্তু তোমার হাত আজ দুর্বল হ[illegible] পড়েছে। মেয়েটি হাসলে, সেই জন্যেই তো[illegible] ডাকে সাড়া না দিয়ে পারি নি।

হেনা সেন খানিকটা অবজ্ঞা মিশ্রিত ক[illegible] বললেন, তোমার এ কথা সত্য নয়—

মেয়েটি তেমনি হাসি মুখেই জবাব দি[illegible] নিজেকেই আর একবার প্রশ্ন করো—সত্য মিথ[illegible] মীমাংসা হ'য়ে যাবে। কিন্তু মনে হ'চ্ছে [illegible] ভিতরে ভিতরে অসন্তুষ্ট হ'য়ে উঠেছো।

হেনা সেন ভাবলেশহীন কণ্ঠে বল[illegible] তোমার অনুমান সত্য কিন্তু রাগ তোমার উ[illegible] হয়নি, আমার নিজের উপর হ'য়েছে।

খানিকটা হাসি ভেসে এলো।

এ কথায় হাসির কি আছে? হেনা সেন প্র[illegible] ক'রলেন।

আছে বৈকি। তুমি আমি যে ভিন্ন [illegible] এ কথাটা ভুলে যাচ্ছ কেন? সময়ের ব্যবধা[illegible] সরিয়ে ফেলে একবার সাদা চোখে তাকিয়ে দে[illegible]লেই প্রশ্ন করবার প্রয়োজন মিটে যাবে।—জ[illegible] পাওয়া গেল মেয়েটির তরফ থেকে।

হেনা সেন জবাব দিলেন, তোমার ক[illegible] মধ্যে ফাঁক এবং ফাঁকী দুই আছে।

পুনরায় হাসি শোনা গেল। বললে, ফ[illegible] বুজিয়ে ফেল—ফাঁকী ধরা পড়'বে। ফাঁকা ক[illegible] নয়—কাজের দ্বারা।

হেনা সেনকে একটু চিন্তিত মনে হ'[illegible] তিনি ব'ললেন, জীবনের এতগুলি বছরের বিরাট ফাঁক আমি ত' শুধু কাজ দিয়েই ভর[illegible] রেখেছি। সেখানে তো কোন ফাঁকি ছিল না।

জবাব এলো, কিন্তু সে বিরাট ফাঁকটা তুমি যে শুধু বালি দিয়েই ভরাট ক'রেছো [illegible] সেন। সেই জন্যেই তোমার কাজে প্রাণ প্রতি[illegible] হয় নি। শুধু কাজই ক'রে গেছো, কা[illegible] আনন্দ তোমার ভাগ্যে জোটেনি। তোমার চ[illegible] পথের আশে পাশে কোনদিন কি চোখ মেলে [illegible] চেয়েও দেখো নি হেনা সেন? তোমার উ[illegible]স্থিতিতে উচ্ছ্বাস স্তব্ধ হয়ে গেছে, হাসি [illegible] গেছে আতঙ্কে আর দুর্ভাবনায়। যে হ[illegible] তোমায় আঘাত ক'রতে পেরেছে সেই হাতে [illegible] কিছু আদর ক'রতে পারতে তাহ'লে অপর[illegible] যতটা আনন্দ দিতে সক্ষম হ'তে তার চেয়ে [illegible] বেশী তুমি নিজে পেতে। জীব জগতের এই[illegible] প্রাণ-ধর্ম।

হেনা সেন কেমন যেন বিব্রত বোধ ক'রে[illegible] জবাব দিতে পারলে না।

চেয়ে দেখো হেনা সেন আমার মুখের পানে—মেয়েটি নরম গলায় ব'লতে থাকে, আমার এই ঢল ঢলে দুটো চোখ এই মিষ্টি কমনীয় দেহশ্রী... এর অন্তরালে লুকানো কত গোপন বাসনা আর কামনা ছিল—তারা সব তোমার নিষ্ঠুর প্রাণহীন যুক্তির কংক্রিটের আড়ালে বন্দী থেকে আজ তার কি পরিণতি ঘটেছে তাও কি তোমার চোখে পড়ে না! আমাকে তুমি "মমি"তে রূপান্তরিত করে ফেলেছো...আমি হাসতে ভুলে গেছি...কাঁদতে ভুলে গেছি..

হেনা সেনের বিহ্বল দৃষ্টির সম্মুখে মেয়েটির অমন সুন্দর চেহারার অতি দ্রুত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। হেনা সেন কথা ব'লতেও যেন ভুলে গেছেন, শুধু তাঁর কোটরগত চোখ দুটো যেন বাইরে ঠেলে বার হ'য়ে আসতে চাইছে...

তুমি ভয় পেলে বুঝি? আশ্চর্য! মেয়েটি পুনশ্চ বললে, নিজের চেহারা কি কোনদিন তুমি আয়নায় দেখো না হেনা সেন?.........

হেনা সেন চীৎকার ক'রে উঠলেন। তাঁর সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে সপ সপ ক'রছে। পাশের ঘর থেকে রামদিন ছুটে এসেছে।

মাইজি—

হেনা সেন খানিক চুপ ক'রে থেকে মৃদু কণ্ঠে বললেন, কিছু হয়নি আমার রামদিন। তুমি শুতে যাও।

রামদিন চলে গেছে। হেনা তেমনি স্থির ভাবে বিছানায় বসে আছেন। এক সময় তাঁর দৃষ্টি গিয়ে খোলা জানালার পথে আকাশের পানে নিবদ্ধ হ'লো। একটি নিঃসঙ্গ তারা দপ দপ ক'রে জ্বলছে। আকাশ থেকে দৃষ্টি তাঁর মাটিতে নেমে এলো। নেমে এলো তার ফুলের বাগানে। নানা জাতের ফুলের মনোরম সমাবেশ। দৃষ্টি তাঁর মমতায় কোমল হ'য়ে ওঠে।

হেনা সেন পা টিপে টিপে তাঁর বাগানে চলে আসেন। ঘরের চতুর্দিকের দেওয়ালগুলো যেন তাঁকে চেপে ধরেছে। মন তার আজ কি জানি কেন তলিয়ে যেতে চায়—হারিয়ে যেতে চায়। সৃষ্টির সমারোহের মধ্যে নিজেকে আবার নতুন ক'রে খুঁজে দেখতে চাইছেন হেনা সেন। মুগ্ধ স্নেহে তিনি একের পর এক ফুলগুলিকে স্পর্শ ক'রতে থাকেন। সন্ধ্যা বেলার সেই পোকায় আক্রান্ত ফুলটিও ফুটে উঠেছে। এতটুকু দাগ কোথাও চোখে প'ড়লো না তাঁর।

হেনা সেন পুনরায় ঘরে ফিরে এসেছেন। দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন। রাতের এই দীর্ঘ সময়টা তাঁর এক বিচিত্র অনুভূতির মধ্যে কেটেছে। বিছানায় গা ঢেলে দিতেই একটা অপরিসীম ক্লান্তিতে তাঁর দু'চোখ বুঁজে এলো।

নিজের আফিস ঘরে বসে একাগ্রতার সংগে কাজ ক'রে যাচ্ছিলেন হেনা সেন। মিস রায় ঘরে ঢুকেই কেমন থতমত খেয়ে গেলেন।

একটু হেসে হেনা সেন তাঁকে মৃদু আহ্বান জানালেন, আমি আপনাকেই মনে মনে চাই ছিলাম মিস রায়। ঐ চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসুন।

মিস রায়ের চোখে মুখে একরাশ বিস্ময়।

মুগ্ধ   ফোটো : প্রফুল্ল মিত্র

হেনা সেন তেমনি হাসি মুখেই পুনশ্চ ব'লেন, আমাকে নতুন দেখছেন না নিশ্চয়।

এতক্ষণে মিস রায়ের মুখে কথা যোগাল। তিনি বললেন, ঠিক বুঝতে পারছি না এ কেমন ক'রে সম্ভব হ'লো তাই ভাবছিলাম আমাদের বোঝারও যেমন শেষ নেই দেখারও বুঝি তেমনি শেষ নেই। নতুন পুরোনোর কথা আমি জানি না, কিন্তু আজ আপনাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে! এবং এতো—

কথা শেষ না ক'রেই মিস রায় থামলেন। এতোটা এগোন উচিত হ'লো কিনা এই ভেবেই তাঁকে মধ্য পথে দাঁড়ি টানতে হ'লো।

হেনা সেন ভিতরে ভিতরে একটু চাঞ্চল্য বোধ করলেও সে ভাব প্রকাশ না করে যথাসম্ভব সহজ কণ্ঠেই তিনি বললেন, খুব আশ্চর্য কথা শোনালেন আপনি কিন্তু—

মিস রায় তাঁকে থামিয়ে দিয়ে অন্য প্রসংগে এলেন, আমাকেই চাইছিলেন কেন সে কথা তো এখনও বললেন না।

সুর কেটে গেল।

হেনা সেন চমকে উঠে অকারণে খানিক নড়ে-চড়ে পুনরায় স্থির হয়ে বসলেন এবং মিস রায়ের চোখে চোখ রেখে শান্ত গলায় বললেন, আপনার গত কালের একটি কথা আমার বড় ভাল লেগেছে। সত্যিই শিক্ষা যদি না সংশোধন করতে পারে তবে তা শিক্ষাই নয়। তাই বলে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবার স্বপক্ষে কোন যুক্তি নেই। তাই আমি ঠিক করেছি মেয়েটিকে আমি হোস্টেলে থাকতে দেবো না।

মিস রায়ের মুখভাব কঠিন হয়ে উঠলো।

সেই দিকে চেয়ে একটু হেসে হেনা সেন বললেন, অপরাধের গুরুত্ব বোঝাবার জন্য তাকে এ শাস্তি নিতেই হবে। তাই বলে ওকে সংশোধন করবার কথাটা আমি ভুলিনি—আপনার পক্ষে এ গুরুভার বহন করা সম্ভব হবে কি?

মিস রায় একটু ইতস্ততঃ করে জবাব দিলেন, সম্ভব হলে আমি খুশী হতাম কিন্তু আমি নিজেই দাদার সংসারে থাকি—

হেনা সেন উঠে দাঁড়ালেন। দু'পা এগিয়ে গিয়ে পুনরায় পিছিয়ে এসে বললেন, মেয়েটিকে তাহলে আমার বাড়ীতেই পাঠাবেন। আমার ওসবের কোন বালাই নেই—

হেনা সেন আর পিছন ফিরে তাকালেন না। নিঃশব্দে হাতব্যাগটি তুলে নিয়ে মন্থর পদে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে এলেন।

মিস রায় কথাগুলি যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না এমনি এক বিচিত্র দৃষ্টিতে তাঁর চলার পথের পানে চেয়ে রইলেন।

দুই বর্ণ •

মানব জাতির মাঝে দুটি মাত্র বর্ণ
এক উত্তমর্ণ আর এক অধমর্ণ।

চার্লস ল্যাম্ব
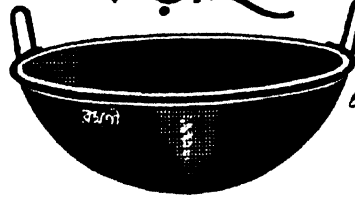
সাত নম্বর রিপন স্ট্রীটের বাড়ীটা পড়ো বাড়ীর মত নিঝুম নিরালা। মাঝে মাঝে মরা লনে এক বৃদ্ধ সাহেবকে পায়চারী করতে দেখা যায়। আর শোনা যায় খলখলে এক মেয়েলী হাসির তীক্ষ্ণ রেশ। সময় অসময় নেই, বাঁধ ভাঙ্গা সে হাসি একবার আরম্ভ হলে বহুক্ষণ ধরে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে। আশেপাশের লোকেরা বলে, বুড়ো সাহেব রবার্টসন আর তার পাগলা বউ এমিলিয়া থাকে ওখানে। বৃদ্ধ পাগল এমিলিয়া, রবার্টসন ওকে সর্বদা চোখে চোখে রাখে।

দোতলার প্রকাণ্ড হল ঘরে কোন এক স্বপ্নের ঘোরে এমিলিয়ার বন্দীজীবন কাটে। দিনরাত ঘরের মধ্যে পায়চারী করে আর থেকে থেকে হাত পায়ের নানা কসরৎ চালায়, মাংস-পেশী ফুলিয়ে ফুলিয়ে দেখে আর দমকা হাসিতে ফেটে পড়ে।

রবার্টসনকে দেখতে পেলেই এমিলিয়া এগিয়ে আসে। দু' চোখে ওর খুশি উপচে পড়ে। রবার্টসনের সামনে বুক চেতিয়ে দাঁড়িয়ে হাতের পেশী ফুলায়, পায়ের পেশী নাচায়। সোহাগে রবার্টসনের গলা জড়িয়ে বলে, বাবু, রিংএর কসরৎ শেখাবে? আমি ঠিক পারব। দেখোনা কেমন তৈরী হয়েছি—বলতে বলতেই এমিলিয়া পেশী ফোলানো শুরু করে।

একই কথা আর একই আব্দার বছরের পর বছর ধরে চলে আসছে। সবই বোঝে রবার্টসন। প্রথম প্রথম হিংসায় বুক ফেটে যেত, ক্ষোভে দুঃখে কান্না পেত। পাগলা গারদে ওকে ঠেলে দেবার কথাও যে না ভেবেছিল, তা নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন প্রতিশোধই নেওয়া হ'ল না। এমিলিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত এক জীবন মেনে নিল রবার্টসন।

দ্বিতীয় যুদ্ধপূর্ব যুগের কথা। মহকুমা-শাসক মিঃ রবার্টসন বিলেত থেকে বিয়ে করে নিয়ে এলো অপূর্ব রূপসী এক নারী। নাম তার এমিলিয়া।

ছোট্ট সহর, বৈচিত্র্যবিহীন জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত সহরবাসী চঞ্চল হয়ে উঠল এমিলিয়ার আগমনে। সহরের একমাত্র পীচ বাঁধানো রাস্তায় বিকেলে ভীড় জমে ওঠে নানা বয়সের পুরুষ ও নারীর আনা-গোনায়। উৎসুক নয়নে তারা তাকিয়ে থাকে এস ডি ও'র বাংলোর দিকে। প্রকাণ্ড একটা তুর্কী ঘোড়ায় পিঠে চেপে এমিলিয়া ভ্রমণে বেরোয়। জোর কদমে ঘাড় বাঁকিয়ে রাস্তা কাঁপিয়ে শক্তিশালী অশ্ব এগিয়ে যায় দূরে আরও দূরে সহর ছাড়িয়ে গাঁয়ের পথে, তারপর মুখে ফেনা উঠিয়ে টগবগিয়ে ফিরে আসে বাংলোয়।

...সাহেবের ঐ রোগাপটকা চেহারার সাথে বউটা একদম মানায়নি, অমন সুন্দরী কিনা মরতে এল শেষে এমন আঘাটায়। ...কম করে হলেও মেয়েটা বিশ বছরের ছোট হবে বরের চেয়ে। নিজেদের মাঝে বলাবলি করে সহর-বাসীরা ফিরে যায় যার যার ঘরে।

সত্যই রবার্টসনের সাথে একদম মানায়নি এমিলিয়াকে। চল্লিশের কাছে বয়েস রবার্ট-সনের। মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে। শুকনো শিরাবহুল লম্বা দেহ। তার উপর নাকটা খাঁড়ার মত ঝুলে পড়ায় ভাঙ্গা মুখটাকে আরও কঠিন কঠোর দেখায়। অথচ এমিলিয়ার দিকে তাকালে চট করে দৃষ্টি ফেরান যায় না। ছিপ্‌ছিপে আইভরি শুভ্র তনু। একমাথা চুল, যেন অসংখ্য স্বর্ণসূতোয় বোনা। প্রবালের মতো রক্তিম দুটি ঠোঁট, সর্বদা শিশুর মত আব্দারের ভঙ্গিতে ফোলা। নীল চোখে আকাশ আর সাগরের বিস্ময়।

পীচের রাস্তা শেষে যেখানে মেটে রাস্তার শুরু, সেখানে বিরাট একটা ব্যায়ামাগার। ঘোড়ার উপর নাচতে নাচতে এমিলিয়া দেখে ব্যায়ামরত ছেলেদের, ছেলেরাও তাকিয়ে দেখে মেমসাহেবকে। ব্যায়াম ছেড়ে অন্যদিকে তাকাতে দেখে মাষ্টারমশাই ধমকে ওঠেন ছাত্রদের।

গুরুর দিকে তাকিয়ে ছেলেরা আবার মনোযোগ দেয় ব্যায়ামে। শেখর কারুর ভুল ধরে.. কাউকে উপদেশ দেয়।

অধিকাংশ স্কুল-কলেজের ছাত্র। সন্ধ্যে হতেই তারা চলে যায়। ব্যায়ামাগারের আলো জ্বলে ওঠে। শেখর ব্যায়ামের পোষাক পরে নেয়। স্বাস্থ্য তার সম্পদ। দেহের প্রতিটি পেশী সুস্পষ্ট। নিখুঁত দেহ সুষমায় এপেলো দেবকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

বেড়িয়ে ফিরে আসে এমিলিয়া। ব্যায়ামা-গারের একটু দূরে থেকেই রাশটা টেনে ধরে। মন্থর হয়ে আসে ঘোড়ার গতি।

রিংয়ের উপর শেখর অভ্যেস করছে কঠিন কৌশল। পেশীর বন্ধনীগুলি যেন বিদ্যুৎ ছোঁয়ায় নেচে নেচে উঠছে, বিদ্যুতের আলো ঠিকরে পড়ছে। আড়চোখে এমিলিয়া তাকিয়ে দেখে। ওর দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে প্রশংসা ও বিস্ময়। অবুঝ ঘোড়া এগিয়ে যায়।

সহিসের হাতে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে লনে পায়চারী করে এমিলিয়া। থেকে থেকে হাতের ছড়ি বাতাসের বুকে মহা আক্রোশে লাফিয়ে উঠে শীষ তোলে।

এমনি করে দিন এগিয়ে যায়। প্রতি বছরের মত বিজয়া-উৎসবের দিনে ব্যায়ামাগারে মহা ধূমধাম। এস ডি ও সাহেব সপত্নী এসেছেন সভাপতিত্ব করতে। এলেন সহরের বহু গণ্যমান্য মানুষ। মাঠে লোক ধরে না। শেখরের ছাত্ররা নানা কসরৎ দেখায়। চোখের কোণায় মোটা লোহার রড বাঁকায়, বাঁমদায়ের উপর শুয়ে দোল খায়। মোটা মোটা লোহার পাত দুমড়োয়— আরও কতো কি।

বড় বড় চোখ করে এমিলিয়া তাকিয়ে দেখে। বিস্ময় ওর ধরে না। এ ধরনের শারীরিক কসরৎ দেখার সৌভাগ্য এর আগে ওর আর হয়নি।

সর্বশেষে আসে শেখর। বাঘছাল কোমরে জড়ান। পড়ন্ত রোদের সোনালী রশ্মি লুটিয়ে পড়েছে দেহে। অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। মাঠের একপাশে ঝোলানো রিংয়ের কাছে এগিয়ে যায় সে। অপূর্ব কায়দায় রিং দুটো হাতের মুঠোয় ধরে শূন্যে দেহটা তুলে ধরে। তারপর নানা জ্যামিতিক রেখায় দেহ স্থাপন করে খেলা দেখায়।

রিং-বারের সামনে কিছুটা ফাঁকা জায়গা, তারপর দর্শকের সারি, পেছনে অনন্ত আকাশ। শূন্যে শেখরের দেহ ছবির মত দেখায়। দুরূহ জটিল সব ভঙ্গিমা দেখাচ্ছে শেখর। প্রতিটি কায়দা শেষে বহুক্ষণ হাততালি চলছে। এমিলিয়ার দৃষ্টি নড়ে না, চোখের পলক পড়ে না। যেন সম্মোহিত হয়ে গেছে। হঠাৎ একটা কায়দা দেখাতে গিয়ে হাত ফস্কে নীচে পড়ে যায় শেখর। স্থানকাল ভুলে

ভয়ে আর্তনাদ করে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠে এমিলিয়া। অভিজ্ঞ দর্শকেরা শেখরের জন্য ভাবে না, কিন্তু কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকায় মেম সাহেবের দিকে। সামলিয়ে নিয়েছে এমিলিয়া। লজ্জায় লাল হয়ে 'ধপ' করে বসে পড়ে চেয়ারে। ওদিকে শেখর আবার রিংয়ে খেলা দেখাচ্ছে। রিং থেকে পড়ে যাওয়ায় শেখর লজ্জা পেয়েছে, সে লজ্জা ঢাকার জন্য সুন্দর সুন্দর সব কায়দা দেখাচ্ছে। দর্শকেরা মহা উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। রবার্টসনও ঘন ঘন হাততালি দিচ্ছে। কিন্তু এমিলিয়া সেই যে চোখ নামিয়ে বসে আছে, কিছুতেই চোখ তুলতে পাচ্ছে না। নিজের আর্ত চিৎকারের রেশটা কানের চারপাশে ঘুরছে, দর্শকদের কৌতূহলী দৃষ্টিগুলি নাচছে। উৎসব শেষে রবার্টসন আর এমিলিয়াকে কেন্দ্র বিন্দু করে ক্লাবের সভ্যরা গ্রুপ ফটো তুললে। রবার্টসনের চেয়ারের পেছনে দাঁড়ায় শেখর।

বাড়ী ফিরে এসে এমিলিয়া সহজ হতে চেষ্টা করে। ডিনার টেবিলে রবার্টসনকে এটা ওটা পরিবেশন করে। শোবার আগে রবার্টসনের হাতে হাত রেখে অনেকক্ষণ বাগানে বেড়ায়।

দু'দিন বাদে ব্যায়ামাগার থেকে এস ডি ও সাহেবকে গ্রুপ ফটোটা সুন্দর করে বাঁধিয়ে উপহার দিয়ে যায়। এমিলিয়াকে ডেকে রবার্টসন ফটোটা দেখায়। আঙুল দিয়ে শেখরকে দেখিয়ে প্রশংসা করে ওর স্বাস্থ্যের। এমিলিয়া চুপ করে থাকে। তোড়জোড় করে রবার্টসন ফটোটা ড্রয়িংরুমের দেয়ালে টাঙায়।

দিন এগিয়ে যায়। এমিলিয়ার জীবনে কেমন একটা ক্লান্তি এসে ভর করেছে। চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগে, ভাল লাগে উর্ধ্ব মুখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে।

আস্তাবলে বেকার তুর্কি ঘোড়া ছটফট করে, পা দাপায়।

সেদিন দুপুরে, নির্জন বাংলোর ঘরগুলিতে এমিলিয়াকে অস্থির পায়ে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। একটা অসহ অস্থিরতা সারা দেহ চিবিয়ে খাচ্ছে। বহুক্ষণ ছটফটিয়ে এমিলিয়া ড্রয়িংরুমের সেই ফটোটার কাছে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। রবার্টসন আর রবার্টসনের পেছনে দাঁড়ান শেখরের দিকে একটানা দৃষ্টিতে বহুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। ওর দৃষ্টিতে কেমন একটা বিহ্বল হারিয়ে যাওয়া ভাব।

ধীরে ধীরে দৃষ্টির ভাষা পাল্টায়। একটা জ্বালা ফুটে ওঠে দৃষ্টিতে। কিছুক্ষণ পর জ্বালা ঠেলে বেরোয় একটা তীক্ষ্ণ রুক্ষ কাঠিন্য। ভুরু কুঁচকে সে স্বামীর সাথে শেখরকে তুলনা করে। শেখরের সামনে রবার্টসনকে বড় কুৎসিত দেখাচ্ছে। মাথার টাকটা চকচক করছে, কানের দু'পাশের চুলগুলি বিবর্ণ, কপালে অসংখ্য বলিরেখা, জঘন্য মোটা মোটা ভুরুর নীচে কোটরগত চোখদুটি জ্বলছে, সর্বোপরি বে-ঢপ লম্বা দেহটা বকের মত চেয়ারে বেঁকে আছে।

দুঃসহ একটা যাতনায় মুক্তোদাঁতে প্রবাল ঠোঁট চেপে ধরে এমিলিয়া। টলতে টলতে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। দু'হাতে মুখ ঢেকে বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে পড়ে। বহুক্ষণ একই ভাবে বসে থাকে। এক সময় কান্নার ভারে শরীর কেঁপে ওঠে। বিয়ের পর ওর এই প্রথম কান্না।

.....অজানা অচেনা রবার্টসনের সাথে বিলেতে ওর একটা 'বারে' দেখা হয়েছিল। এক বান্ধবীর সাথে ওর দেখা করার কথা ছিল 'বারে'। বান্ধবীকে না দেখে সে ইতস্ততঃ করছিল। রবার্টসন টেবিলে আহ্বান করে এমিলিয়াকে। সেই থেকে আলাপ, আলাপ থেকে ঘনিষ্ঠতা। মাত্র কয়েকটা দিনের পরিচয়, কিন্তু এমিলিয়া রবার্টসনকে বিশ্বাস করে চলে আসে সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে ভারতবর্ষে। সেদিন রবার্টসনের বয়সের প্রশ্ন দাঁড়ায়নি মনে। ওর কুৎসিত অবয়বটাও অতো কুৎসিত লাগেনি। সেদিন একটু সুখে থাকার প্রতিশ্রুতিই ছিল এমিলিয়ার কাছে মস্ত বড় কামনা। ছিটগ্রস্ত মা, এক পা খোঁড়া বাপ,—সর্বদা খিটিমিটি লেগেই ছিল সংসারে। একটা পোষাক তৈরীর কারখানায় কাজ করত এমিলিয়া। সুখের কাঙালী মন হাঁপিয়ে উঠেছিল জীবনে......

......যা চেয়েছিল সবই পেয়েছে এমিলিয়া। প্রকাণ্ড বাড়ী, অসংখ্য দাসদাসী, বিশ্বাসী অনুগত স্বামী, আর আশাতীত সম্মান। কতো সুখ দিয়েছে রবার্টসন। ক্লাবে ওর টেনিসের জুটি হতে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়, নাচের আসরের ত কথাই নেই। গির্জায়ও প্রথম সারির প্রথম সিট দুটি ওদের জন্য সংরক্ষিত। কবে বাপের সাথে ঘোড়দৌড় দেখতে গিয়ে সখ হয়েছিল ঘোড়ায় চড়বার, মুখের কথা খসাতেই রবার্টসন এনে দেয় ঘোড়া। কোন্ সখটা ওর অপূর্ণ রেখেছে রবার্টসন?

ফুঁপিয়ে ওঠে এমিলিয়া। তবে কেন আজ সে খুঁটে খুঁটে রবার্টসনের খুঁৎগুলি বের করছে, তুলনা করছে অন্য এক যৌবনদৃপ্ত পুরুষের সাথে? রবার্টসনের যা নেই, তা খোঁজার কেন এত চেষ্টা? তাও একটা নেটিভের সাথে! তবে কি রবার্টসনকে ভালবাসা মিথ্যা?...না না... রবার্টসনের কাছে সে কৃতজ্ঞ, ভালবাসে সে রবার্টসনকে। ভাববে না আর এ সব কথা, কিছুতেই নয়—

...ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে আর যায় না এমিলিয়া। মন্থর পদক্ষেপে লনেই পায়চারী করে। ড্রয়িংরুম সযতনে এড়িয়ে চলে। কখনও বা রবার্টসনের কাছে কাছে থাকতে চায়, কখনও বা ওকে এড়িয়ে চলে। ক্লাবে যেতে চায় না, আবার গেলে হয়ত টেনিস কোর্ট থেকে সরানই মুস্কিল হয়ে পড়ে। সেটের পর সেট খেলে চলে। দর দর করে ঘাম বেরোয়, পরিশ্রমে কেমন পিটকেলে রং ধরে চোখে, শিরা উপশিরা ফুলে ওঠে। তবু একটা পাগলা নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে এমিলিয়া। মদের গ্লাস সাজাতে দেখে ছুটে যায়, টের উপর ঝুঁকে পড়ে, 'অগস্ত্য-পিপাসা!' আদব কায়দা রীতিনীতি ভুলে যায়। উন্মাদের মত পান করে। অবশেষে মাতাল হয়ে গোঙায় আর কাঁদে।

স্ত্রীর হঠাৎ এ পরিবর্তনে রবার্টসন শঙ্কিত। ভেবে পায় না কোন কারণ, এমিলিয়াকে সুখী রাখবার চেষ্টার ত' ত্রুটি নেই কোথাও।..

..একদিন রাতদুপুরে রবার্টসনের ঘুম ভেঙে যায় কান্নার শব্দে। 'ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কে যেন কাঁদছে। আবছা আঁধারে এমিলিয়ার বিছানার দিকে তাকায়। বিছানার উপর এমিলিয়া দু'হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে কাঁদছে। সন্ত্রস্ত রবার্টসন উঠে যায় ওর কাছে, জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে এমিলিয়া?

রবার্টসনের বুকে লুটিয়ে পড়ে এমিলিয়া। কান্না আর ওর থামতে চায় না। রবার্টসন বাধা দেয় না ওর কান্নায়। সস্নেহে বুকে চেপে বসে থাকে।

হৃদয়ে অবরুদ্ধ ক্ষোভ বুঝি কিছুটা ঝরে গেল। রুদ্ধ কণ্ঠে এমিলিয়া বলে স্বামীকে, এ নেটিভের দেশ থেকে আমাকে দেশে নিয়ে চলো জর্জ, এখানে আমি বাঁচব না...

চমকে যায় রবার্টসন। এতো বছরের চাকরি ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে হঠাৎ দেশে যাওয়া অসম্ভব, বিশেষ করে উন্নতির একটা চরম সুযোগ রয়েছে সামনে। তবু মুখে স্বীকৃতি জানায়। এমিলিয়ার সোনালী চুলে হাত বুলিয়ে ওকে সান্ত্বনা দেয়।

পরদিন থেকে এমিলিয়াকে অনেক স্বাভাবিক দেখায়। ঘুরে ফিরে সে বাড়ী-ঘর দেখে, বাগানে বেড়ায়, চাকর-দারওয়ানদের খোঁজ-খবর করে, ঘোড়ার আস্তাবলে যেয়ে ঘোড়াকে আদর করে বলে, আমি চলে যাচ্ছিরে—

ঘোড়া মনিবনীর হাতে নাক ঘষে আদর জানায়।

কিন্তু রবার্টসনের কোন তাড়াই নেই। যাবার কথা জিজ্ঞেস করলে রবার্টসন স্তোকবাক্যে এমিলিয়াকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে। সন্দেহ জাগে এমিলিয়ার। যাবার কথায় একদিন স্বামীকে চেপে ধরে। নানা কথায় ওকে ভোলাবার ব্যর্থ চেষ্টা শেষে রবার্টসন বলে, ক'দিনের জন্য চলো কোথাও বেরিয়ে আসি, নৈনী, দার্জিলিং, কলকাতা যেখানে খুশি—

এমিলিয়া চুপ করে থাকে, স্বামীর অতো কথার জবাবে একটি কথাও বলে না। স্ত্রীর মলিন মুখের দিকে চেয়ে রবার্টসন খুলে বলে আগামী প্রমোশনের কথাটা। হঠাৎ এভাবে চলে যাবার অবাস্তবতাটাও বুঝাতে চায়।

এমিলিয়া কি বুঝল সেই জানে, অন্য কোথাও যাবার কথায় মোটেই রাজী হ'ল না। কি যেন এক ভাবনায় ডুবে গেল।

দিনকয়েক বাদে সহিস চমকে উঠল মেমসাহেবের আদেশে, বহুদিন পরে ঘোড়া তৈরী করতে লেগে গেল।

এমিলিয়ার চোখের দৃষ্টি কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত, ঘোড়ার পিঠে চেপে উল্কার বেগে বেরিয়ে যায় রাস্তায়।

আচ্ছন্ন এমিলিয়া। শেখরের ব্যায়ামাগার অনেক পিছনে পড়ে থাকে, সহরও অনেক দূরে। ঘামে ধুলোয় জবজবে এমিলিয়া।

সন্ধ্যা পেরিয়ে চাপ চাপ আঁধার চার পাশ থেকে ঘিরে ধরতে এমিলিয়ার সম্বিৎ বুঝি ফিরে আসে। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে রাশ আলগা করে দেয়। বড় বড় ধাপে ঘোড়া দৌড়তে থাকে।

শেখরের ব্যায়ামাগার পেরিয়ে যায়। ঘোড়ার পিঠে নিশ্চল এমিলিয়া। কোনদিকে বুঝি দৃক্‌পাত নেই। কয়েক ধাপ এগিয়ে যেতেই এমিলিয়া চমকে উঠে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে। চোখ দুটো ওর জ্বলছে, সমস্ত শরীর থরথরিয়ে কাঁপছে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে দেয় এমিলিয়া। ব্যায়ামাগারের সামনা দিয়ে আবার ঘোড়া দৌড়ে যায়।

এমিলিয়া ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। রিং-এর উপর শেখর অভ্যেস করছে। এমিলিয়ার জ্বলন্ত দৃষ্টি নেচে ওঠে, হাতের মুঠো কাঁপে, বল্গা বুঝি খসে পড়বে। নিজের অজানিতেই ঘোড়াসুদ্ধ এমিলিয়া ব্যায়ামাগারে ঢুকে যায়। সম্মোহিত

(শেষাংশ ২৮৭ পৃষ্ঠায়)

কোণার্কের করুণ কিংবদন্তী

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

আজকাল সমুদ্র অনেক দূরে সরে গেছে। কিন্তু সাতশো বছর আগে সমুদ্র ছিল কাছে। একেবারে মন্দিরের পা ছুঁয়ে। মন্দির-সংলগ্ন ঘাট দেখলেই বোঝা যায়, সমুদ্র দূরে ছিল না। ঘাট আর কোথায়? ভাঙ্গা ভাঙ্গা পাথর, এধারে ওধারে ছড়ানো। অথচ, এগুলো দেখলেই মনে হয়, সমস্তটাই ঘাটের উপকরণ।

তাজ্জব লাগে, যখনই তলিয়ে ভাবা যায় ব্যাপারটা। নির্জন সমুদ্রসৈকতে আর কোনো মন্দির নেই, কোনো স্থাপত্য নেই। পুরী বা ভুবনেশ্বর তো অনেক দূরে। আজ না হয়, তাড়াতাড়ি চলার জন্যে মোটর গাড়ি কিম্বা বাস হয়েছে। কিন্তু সেই সাতশো বছর আগে? কি করে আসতেন রাজা এত দূরে?

কিছু ঝাউবন আর কিছু নারকেল গাছ। চারদিকেই বালি আর বালিয়াড়ি। এই নরম ভিতের ওপর অত বড় একটা স্থাপত্য কী করে যে শত শত বছর ধরে টিকে আছে, এটাই আশ্চর্য। কোণার্কের এত বড় মন্দিরটাকে সমুদ্র ভাসিয়ে নিয়ে গেল না। বরঞ্চ সমুদ্রই সরে গেল। যেমন করে সরে গেল যমুনা নদী। দিল্লী দুর্গকে অক্ষত রেখে যমুনাই তার ধারাকে দূরে সরিয়ে নিল।

ভুবনেশ্বর কিম্বা কোণার্ক কোথাও রাজপ্রাসাদের দম্ভ চোখে পড়ে না। চোখে পড়ে কেবল মন্দিরটা। ভুবনেশ্বরে তো প্রায় শ'খানেক মন্দির। মন্দির দেখতে দেখতে অবাক হয়ে ভাবতে হয়, প্রাচীন ওড়িয়ারা সকলেই শিল্পী ছিলেন। দিবারাত্র শুধু পাথরের কাজ নিয়ে ছেলে-বুড়ো সবাই মেতে থাকতেন।

কোণার্কের মন্দিরের কথায়ই আসা যাক। মন্দিরের অঙ্গনে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঘোড়া, হাতি, রথের চাকা। মন্দিরটাই যেন রথ। সূর্যের রথ টানছে সাতটি ঘোড়া। রথের চাকা যেন চলছে। রথে চড়ে সূর্য উঠবেন আকাশে। পূর্ব-সমুদ্রে তাঁর রক্তাক্ত উদয় দেখা যাবে। সাতটি ঘোড়া টানছে বারো জোড়া চাকার দ্রুতগামী রথ।

শিল্পীর কল্পনা সত্যিই কাব্যময়। একেবারে ঋগ্বেদ থেকেই হয়ত' কল্পনা নেয়া হয়েছে। সমুদ্রের পাড়ে এমন বিশাল কল্পনার শিল্পরূপ দেবার জন্যে শিল্পপতি রাজাকেও ধন্য ধন্য জানাতে হয়। বিশেষ করে যে উড়িষ্যায় বড় বড় মন্দিরের সঙ্গেই ধর্মানুষ্ঠান আর পান্ডার উপদ্রব আছে, সেখানে কোণার্ক একেবারে ব্যতিক্রম।

এখানে নির্জন সমুদ্রতীরে এসে দাঁড়ালে পুণ্যকে অতিক্রম করে কাব্যের রসলোকে ঢোকা যায়। রাজাও সম্ভবতঃ কোণার্কের শিখরে শেষ রাত থেকে দাঁড়িয়ে ঊষাকালে সূর্যোদয় দেখতেন। রক্তাক্ত সূর্য উঠছে—বঙ্গোপসাগরের জলকে রাঙিয়ে। পূর্ব দিগন্তে যদি অল্প অল্প মেঘ থাকে, তবে সেই মেঘও রক্তাক্ত। একটি নিঃসঙ্গ পাখী হয়ত ছায়ার মত উড়ে যাচ্ছে সমুদ্রের ওপর দিয়ে। সমুদ্রের নীলাভ জলে আশ্চর্য রং। রাণীর সঙ্গে রাজা এসে দাঁড়িয়েছেন কোণার্কের সূর্যমন্দিরের ওপর। নিচে ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে পুরুত ঠাকুর সূর্য বন্দনা সুরু করেছেন। আশে পাশে সেদিন হয়ত কোনো জনপদ ছিল, এখন যার চিহ্নমাত্রও চোখে পড়ে না। অধুনালুপ্ত সেই জনপদের জনকয়েক নরনারীও হয়ত' রাজাকে দেখতে সমুদ্রের তীরে এসে দাঁড়িয়েছেন।

এমন যে সূর্যমন্দির, এর স্থাপত্যের পেছনে কত কিংবদন্তীই না শুনেছি। রাজা কি তবে সূর্য উপাসক ছিলেন? অথবা, রাজার কোনো রোগ, কুষ্ঠ কিংবা কিছু হয়েছিল, যার জন্যে সূর্যের প্রসাদ ভিক্ষে করতেন রাজা? ঐতিহাসিকেরা প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দিতে পারেন না। যতটুকু তথ্য তাঁরা পেয়েছেন, তার চাইতে এক কণাও বেশি তথ্য তাঁরা পরিবেশন করতে নারাজ এবং বেশির ভাগ ঐতিহাসিকের মতে কোণার্কের সূর্যমন্দির রাজা নরসিংহদেব ১২৩৮—৬৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর রাজ্য বিজয়ের কীর্তি হিসাবে তৈরি করেছিলেন।

কিন্তু আমার মনটা কবির। নির্জন সমুদ্রতীরে অর্ধভগ্ন ঐ স্থাপত্যকে কেন্দ্র করে সে কেবলি আকাশে উড়তে চায়। মন্দিরের সামনে অর্ধ সমাপ্ত নাটমন্দির বা নাচ-মন্দিরকে কেন্দ্র করে অনেক দেবদাসীর অর্ধ-সমাপ্ত নাচকে সে মনশ্চক্ষে দেখে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা হস্তি, অশ্ব এবং রথ ও রথের চাকা দেখতে দেখতে তার মন কখনও বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষের বিয়োগান্ত দৃশ্যের দিবাস্বপ্ন দেখে।

ঐতিহাসিকরা রাজা-রাজড়াকে নিয়েই মাথা ঘামিয়েছেন। আমি কিন্তু মন্দিরকে মনশ্চক্ষে অন্য পথে পরিক্রমা করেছি। কোণার্কের কাছাকাছি আজকাল যত জনপদ আছে, সেগুলোতে দুদন্ড বিশ্রাম করে নানা কিংবদন্তী সংগ্রহ করেছি। সেই কিংবদন্তীর ঝুড়ি থেকেই আজ একটি গল্প পরিবেশন করব বলে কলম ধরেছি।

গল্পটি এই। সমুদ্র ঢেউয়ে ঢেউয়ে আছড়ে পড়ছে। সৈকতের এই বালিরাশির ওপর কোনো মন্দিরের ভিতকে টিকিয়ে রাখা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। অথচ, রাজা স্বপ্নাদেশ পেয়েছেন যে, তাঁকে ঐ সৈকতের ভঙ্গুর জমির ওপর বিশাল মন্দির গড়তেই হবে। স্বয়ং সূর্যদেব তাঁকে স্বপ্নে আদেশ দিয়েছেন।

উড়িষ্যার সেরা সেরা শিল্পীকে রাজা নরসিংহদেব ডেকে পাঠালেন। সমস্ত শিল্পীই রাজাকে বললেন, একাজ অসম্ভব। সমুদ্র তো সরোবর নয়, এমন কি চিল্কা হ্রদও নয়। হু হু করে যখন ঢেউ তেড়ে আসবে, তখন সমস্ত পাথরই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

রাজা অস্থির হয়ে পড়লেন দেখে শিল্পীরা বললেন যে, তাঁরা চেষ্টা করতে রাজী আছেন। অথচ, কেউই দায়িত্ব নেবেন না। দায়িত্ব নেবার মত যদি কোনো শিল্পী রাজী হন, তবে অন্যান্য শিল্পীরা সহযোগিতা করতে রাজী আছেন। সমস্ত দায়িত্ব কিন্তু ঐ দলপতির ওপরই থাকবে।

সেদিন রাজা কিন্তু অনেক বলে কয়েও কাউকে দায়িত্ব নিতে স্বীকৃত করতে পারলেন না। দুঃখে ও দুর্ভাবনায় রাজা থাকলেন আধমরা হয়ে। তাঁর সচিব উড়িষ্যার জনপদে জনপদে বার্তা পাঠিয়ে দিলেন। সারা উড়িষ্যায় এমন বাহাদুর শিল্পী কে আছো, বালির ওপর পাষাণকে দৃঢ় আর অক্ষয় করতে যে পারবে।

কয়েক দিনই নিষ্ফল কেটে গেল। কেউ আর এল না। রাজা মনের দুঃখে কারো সঙ্গে আর বড় একটা দেখাই করছেন না। উড়িষ্যার হাজার হাজার শিল্পীদের মধ্যে তাহলে এমন কোনো আশ্চর্য শিল্পী নেই, যিনি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন।

এরি মধ্যে একদিন ভোরবেলায় সূর্য যখন নীলাচল অরণ্য ছাড়িয়ে আকাশে খানিকটা উঠেছেন, তখন দৌবারিক অর্থাৎ দ্বার-রক্ষক এসে খবর দিল যে, সচিব একজন লোককে নিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

কী যেন কোনো একটা কারণে খুব ভোরবেলা থেকেই রাজার মনে হচ্ছিল যে, আজকের দিনটা সফল যাবে। সচিবের হঠাৎ এ সময়ে আসার খবর পেয়ে রাজার মনটা নেচে উঠল। তবে কি তাঁর স্বপ্নকে সার্থক করতে পারে এমন কোনো শিল্পীকে নিয়েই সচিব এসেছেন।

ঘটনাটা ঘটলও তাই! আন্দাজ বছর তিরিশের এক যুবক শিল্পীকে সঙ্গে নিয়ে সচিব এসে রাজাকে অভিবাদন জানালেন। সচিব বললেন—"মহারাজ, এই শিল্পী আপনার স্বপ্নকে রূপ দিতে পারবেন বলে তাঁর বিশ্বাস আর সঙ্কল্প জানিয়েছেন।"

এবং প্রায় সেদিন থেকেই জমজমাট প্রস্তুতির চাকাটা ঘুরতে লাগল। ঘোড়ার পিঠে, মানুষের পিঠে, গরুর গাড়িতে চলল পাথর আর পাথর। একদল লোক কাটতে লাগল পাথুরে পাহাড়, একদল লোক পাথর চালান দিতে শুরু করল, একদল লোক বয়ে নিয়ে চলল ঐগুলি, একদল শিল্পী দাঁড়াল এসে সমুদ্রের পাড়ে। হাজার হাজার মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা হয়ে গেল এবং মন্দির গড়বার জন্যে রাজকোষও রইল উন্মুক্ত হয়ে। প্রথমেই মাটি কাটা শুরু হল। মাটির অনেক নিচে থেকে তুলতে হবে ভিত। আজকাল হাল ফ্যাসানের কংক্রীটের অট্টালিকার যেভাবে মাটির অনেক নিচে থেকে ভিত তোলা হয়, সেদিনও শিল্পীর সে বুদ্ধি ছিল।

সমুদ্রের ঢেউয়ের মুখোমুখী দেয়াল দেয়া হল দাঁড় করিয়ে। ঢেউ যেন ভেতরে না আসতে পারে। জ্যামিতি এবং পরিমিতির শুরু হল হিসেব। সমান পরিমাণ ও আয়তনের পাথর সাজিয়ে সাজিয়ে চারদিকের উঠোন তৈরীর অক্লান্ত কাজ।

রাজা মাঝে মাঝে আসেন। একটি সাদা ঘোড়ার ওপর তাঁর রাজবেশী চেহারা। ঝাউবন আর নারকেল কুঞ্জ ছাড়িয়ে বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে তিনি আসেন।

●

প্রধানশিল্পীকে তিনি প্রশ্ন করেন,—"কতদিন লাগবে মন্দির গড়তে?"

"এ অনেক দিনের কাজ, মহারাজ।"

—"আমি বেঁচে থাকতে থাকতে দেখে যেতে পারবো তো?"

—"মহারাজ দীর্ঘজীবী হোন।"

—"সমুদ্র শাসন করতে পারবেন কি?"

—"এখনও তো পারিনি।"

মহারাজ চলে যান। ক্রমে তাঁর ঘোড়া অদৃশ্য হয়। পথের বাঁক ঘোরার সময় শেষবারের জন্যে তাঁর ঘোড়ার সাদা লেজটা দেখা যায়। মহারাজার ফিরে যাবার দৃশ্যটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখার কাজটা শিল্পী কোনদিনই ভোলেন না। মহারাজা পথের বাঁকে অদৃশ্যে হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কানে আসে সমুদ্রের গর্জন আর শিল্পীদের পাথরের ওপর হাতিয়ারের ঠুকঠাক শব্দ।

দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। হাজার হাজার শিল্পী খাটছেন ক্রীতদাসের মত। অথচ মুখে কি সুন্দর হাসি তাঁদের। যখনি শিল্পীরা পাথরের ওপর কোনো সূক্ষ্ম কারুকার্যের কাজ সুচারুরূপে শেষ করতে পেরেছেন, তখনি তাঁরা সফল কামনার হাসি হাসছেন।

প্রধানশিল্পী সব দেখেন শোনেন, তাঁর মুখের ওপর সঙ্কল্পের রেখা দিনে দিনে দৃঢ়তর হয়। তিনি বিখ্যাত হবেন, কোণার্কের প্রধানশিল্পী বলে সারা উড়িষ্যায় তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়বে। স্বপ্নটা কত যে মধুর! এই মধুর স্বপ্নের ভেতর তাঁর দিনগুলি কাটে। রোদ্রে, ধুলোবালিতে, ঝড়ে তাঁর চেহারা বছরের পর ব্রোঞ্জের মূর্তির চেহারা ধরে। মশাল জ্বালিয়ে এক প্রহর রাত পর্যন্ত যখন অন্যান্য শিল্পীরা কাজ করেন, তখন তিনি ক্রমাগত তদারক করেন। প্রত্যেকটি কাজের মধ্যেই তাঁর অনবরত উপস্থিতি আছে।

প্রধানশিল্পীর স্থাপত্যের পরিকল্পনাটিকে নিয়ে অন্যান্য শিল্পীরা সময়ে অসময়ে আলোচনা করেন। অনেক শিল্পীরই ধারণা যে, শেষ পর্যন্ত সমুদ্র এই মন্দিরকে ভাসিয়ে নেবে। প্রধান শিল্পী হাসেন। হাসিটা পরিপূর্ণ বিশ্বাসের। হাসতে হাসতে তিনি বলেন যে, মন্দিরের চূড়ায় একটি বিশাল পাথর বসিয়ে দেবেন। সেই বিশাল পাষাণের ভারে মন্দিরটা এক জায়গায়ই দাঁড়িয়ে থাকবে। মন্দিরকে ভাসিয়ে নিতে পারবে না সমুদ্র।

আরো দিন যায়। মন্দিরের কাজ এগোচ্ছে। রাজাও মাঝে মাঝে আসেন, আবার চলে যান। আসেন রাণী এবং রাণীর সখীরা। তাঁরাও চলে যান। দিন যায়। শিল্পীর বয়স বাড়ে।

ঘটনাটা এমন কিছু নয়। একদিন দুপুরের দিকে সাদাসিধে চেহারার একজন লোক এল প্রধান শিল্পীর কাছে। লোকটা শিল্পীকে দিল একখানি চিঠি আর একটি আয়না। চিঠিতে লেখা ছিল :

'তুমি কবে বাড়ি আসবে? সেই যে আমাকে ছেড়ে গেছ, আর তো আসোনি। তোমার অত কী কাজ? একবারও কি আসতে পারো না? একদিনের জন্যেও না? একটি আয়না পাঠালুম। আয়নাতে তোমার মুখটা একবার দেখবে। তাহলে বুঝতে পারবে, তোমার বয়েসটা বাড়ছে, কি কমছে।'

অর্ধ প্রৌঢ় শিল্পী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। চিঠি পাঠিয়েছে তাঁর স্ত্রী। সেই সুদূর গ্রাম থেকে। যদিও শিল্পীর এই মুহূর্তেই ইচ্ছে করছে, স্ত্রীকে একটিবার দেখে আসতে। কিন্তু উপায় নেই। মন্দিরের কাজ শেষ না হলে কোথাও যাবার উপায় নেই। তা তাঁর যতই বয়স বাড়ুক। আর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে চিঠিখানিকে ভাঁজ করে সমুদ্রের ঢেউয়ে ভাসিয়ে দিলেন তিনি।

হু হু করে দিন চলছে আর কাজ এগোচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ মুশকিল বাধালো একটি কুমারী মেয়ে এসে। বছর চব্বিশের একটি নারী। অঙ্গে তার অনন্ত সুষমা। অমন সুষমা না হলে দেবদাসী হওয়া যেত না।

নাচমন্দির বা নাটমন্দিরের দেয়ালে কি ধরণে কারুকার্য হবে, ঠিক এজন্যে কোনো উপদেশ দিতে নয়, এমনিই এসেছিল মেয়েটি। কেবল যে একলা এসেছিল, তাও নয়। একদল দেবদাসীর সঙ্গেই এসেছিল। দেবদাসীরা এসেছিল একটা গভীর ঔৎসুক্যের বশে। একদিন যে সূর্যমন্দিরে গিয়ে তাদের নাচতে হবে, সেই মন্দিরটা আগে ভাগে দেখার জন্যে প্রবল একটা কৌতূহল। তাই তারা রাজধানী থেকে এতদূর এসেছিল।

দেবদাসীরা ভগবানের দাসী। সুতরাং, তারা যখন চলে, তখন নির্ভয়ে এবং নিঃসংকোচে চলে। শিল্পীদের তারা মডেল স্বরূপ। কামগন্ধহীন মডেল। এই দেবদাসীদের বারংবার দেখেই না শিল্পীরা নানা মন্দিরের দেয়ালে দেয়ালে পাথরের নারীমূর্তি গড়তে সক্ষম হয়েছেন। দেবদাসীরা যখন নাচমন্দিরে মন্দিরা বাজিয়ে নাচে, তখন শিল্পীরা কাছে দাঁড়িয়ে নারী অঙ্গের ভাঁজগুলি দেখেন। তন্ময় হয়ে দেখেন। রক্তমাংসের নারীর দেহগঠনের সমস্তটা না জানলে কি করে পাথরের নারীর দেহ তৈরী করা যায়। হাঁ, বেশীর ভাগ শিল্পীর মডেলই দেবদাসী। হয়ত' কোনো কোনো শিল্পীর মডেল তাঁর স্ত্রী, কিংবা প্রেমিকা।

কোণার্কের প্রায় পূর্ণ সমাপ্ত মন্দিরের চত্বরে চত্বরে খিল খিল করে হেসে বেড়িয়েছে দেবদাসীরা। তারা রাজধানী থেকে দুপুর নাগাদ এসে পৌঁছেছিল। পৌঁছার পর থেকেই হৈ চৈ শুরু। পাথরের অচল ঘোড়ার পিঠে তারা চড়েছে, কুয়ো থেকে জল তুলে আঁজলা আঁজলা জল খেয়েছে, ঝাউবনে ছুটে গেছে, বালিয়াড়িতে গড়াগড়ি খেয়েছে, সমুদ্রের জলে নেমে কাপড় চোপড় ভিজিয়েছে।

সম্প্রতি মন্দিরের অতিথিশালা তৈরী হয়েছে। সুতরাং, দেবদাসীদের আজ আর ফিরে যাবার তাড়া নেই। তা ছাড়া আজ আবার জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নায় সমুদ্রকে দেখবার জন্যে দেবদাসীদের ইচ্ছে। কাজেই তারা একরাত্রির জন্যে থাকতেই এসেছে।

প্রধানশিল্পী যদিও দেবদাসীদের লক্ষ্য করেছেন, তবু তাদের সঙ্গে কথা বলেননি। তাঁর মাথায় কত দায়িত্ব। এখনো মন্দির চূড়োয় তিনি পাথর তুলতে পারেননি। তাঁর প্রিয় আরো দু'জন শিল্পী খাটতে খাটতে মন্দিরের চত্বরেই মারা গেছেন গত মাসে। কিন্তু কাজ বন্ধ করা হয়নি। অন্য শিল্পী এসে মৃতের দায়িত্বকে কাঁধে তুলে নিয়েছেন। কাজ বন্ধ করার ক্ষমতা কারো নেই। এমন কি রাজারও বোধ হয় নেই।

গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নায় দিগন্ত ছেয়ে আছে। সারাদিনের কাজকর্মের পর সমস্ত শিল্পী ঘুমিয়ে আছেন। প্রধান শিল্পীর চোখে কিন্তু ঘুম নেই। তিনি সমুদ্রের তীরে এসে দাঁড়ালেন। সামনেই ঝিকমিক করছে জলের বিস্তার। প্রধানশিল্পী প্রায়ই মাঝরাত পর্যন্ত জেগে থাকেন। যতই তাঁর সফলতা এগিয়ে আসছে, ততই তিনি জাগছেন। তিনি যে কোণার্কের প্রধান শিল্পী। তাঁর নাম দেশে দেশে ছড়িয়ে যাচ্ছে। যে কাজ অন্য কোনো শিল্পী করতে সাহস পায়নি, সেই কাজ করতে তিনি শুধু এগিয়ে আসেননি, সফলকামও যে হয়ে আসছেন। এ সফলতা শিল্পের সফলতা। এরি জন্যে সব ত্যাগ করেছেন তিনি। তাঁর যৌবনের মধুর স্বপ্ন, পারিবারিক জীবন, স্ত্রী-পুত্রকে। স্ত্রীকে তিনি কোণার্কে আসতে এমন কি নিষেধও করেছেন। পাছে তাঁর একাগ্রতা নষ্ট হয়।

অথচ এখনো বাকী আছে কাজ। মন্দিরের চূড়ায় বিশাল পাথর তুলতে হবে। পাথর এসেও গেছে। আশি মণের চাইতে বেশি ওজন ঐ পাথরের। ওকে চূড়ায় নিয়ে বসানো সাংঘাতিক কাজ। এ ছাড়া নাচমন্দিরের কাজও শেষ হয়নি। আরো যে কতদিন লাগবে, কে জানে!

"প্রধানশিল্পী দীর্ঘজীবী হোন, অমর হোন।"

সহসা চমকে উঠলেন শিল্পী। নির্জন, নিশুতি রাতে কোনো স্ত্রী-কণ্ঠের আওয়াজ যেন তিনি শুনেলেন। আওয়াজটা একেবারেই কাছে। সৈকতের যেখানটায় তিনি দাঁড়িয়েছেন, ঠিক সেখানটায়।

"যে দেবদাসীর দল আজ কোণার্কে এসেছে, আমি সেই দলের সর্বকনিষ্ঠা।"

শিল্পী চেয়ে দেখলেন, একটি নারী তাঁর কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। পূর্ণিমার ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় যতোটুকু আলো আছে, ততোটুকু আলোর সাহায্যে তিনি দেখলেন, দেবদাসীটি সুন্দরী। একটি দীর্ঘচ্ছন্দা, দীর্ঘবেণীধরা নারী। সাদা তার গাত্রবাস এবং ফর্সা তার মুখ। চোখ দুটি চাঁদের আলোয় ঝিকমিক করছে।

"এই নির্জনে এত রাত্রে আপনার সঙ্গে আমি দেখা করতাম না। কিন্তু কি জানেন, আমি ঘুমোতে পারলাম না। সামান্য ভুলের জন্যে পাছে অসামান্য ক্ষতি হয়, এই দুশ্চিন্তায় সমুদ্রকে দেখতে এসেছিলাম। সৈকতে এসেই দেখলাম, ছায়ার মত একব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন। ছায়াটি যে আপনার, তা আঁচ করতে পারলাম। দিনের আলোয় আজ বারংবার আপনাকে দেখেছি। সূর্যমন্দিরের প্রধান শিল্পীকে দেখবার লোভ কেইবা সামলাতে পারে।"

"আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।" শিল্পী বললেন।

"আপনি দীর্ঘজীবী হোন।"

"স্পষ্ট করে বিষয়টাকে বলুন।"

"কোণার্কের সূর্যমন্দিরকে ভাসিয়ে নেবার জন্যে সমুদ্র ষড়যন্ত্র করেছে। জ্যোৎস্নার পূর্ণ জোয়ারে যদি ভাসাতে নাও পারে, তবে অমাবস্যার অপূর্ণ জোয়ারে ভাসিয়েই নেবে হয়ত' প্রধান শিল্পীও ঐ সঙ্গে সমুদ্রে ভেসে যাবেন। নয়ত......।"

"থামলে কেন?"

"নয়ত পরিণামে মৃত্যু। সূর্যমন্দির ধূলিসাৎ হলে রাজার ক্রোধে শিল্পীও ধূলিসাৎ হবেন।"

"আপনি কি ঠাট্টা করছেন?"

"না। আমার সঙ্গে আসুন।"

হাতছানি দিয়ে দেবদাসীটি শিল্পীকে ডাকল। দেবদাসী চলল আগে আগে আর গভীর কৌতূহলে শিল্পী চললেন পেছনে। সমুদ্র

সৈকতে ঝিকিমিকি করছে ঝিনুক আর শঙ্খের টুকরো। জ্যোৎস্নায় আশ্চর্য সুন্দর রাত। বাতাসে সমুদ্রের একটা চিরপরিচিত সৌরভ। চরাচরে সমস্তই নিঃশব্দ। কানে আসে কেবল সমুদ্রের গান। চোখে পড়ে সমুদ্রের ফেনা ধুকটা। জোয়ারের দেরী নেই।

"এই দেখুন দেয়ালের এ জায়গায় মস্ত বড় ফাটল। মনে হচ্ছে, সকালের দিকে ফেটেছে। দুপুর বেলা যখন এদিকে এসেছিলাম, তখনি লক্ষ্য করেছি এটা। আমার বিশ্বাস, পূর্ণ জোয়ার এলে সমুদ্রের জল মন্দিরের চত্বরে ঢুকে পড়বে। তারপর যে কী হবে, সেটা নিশ্চয়ই শিল্পীকে বুঝিয়ে বলতে হবে না।"

"কি হবে? হয়ত কিছুই হবে না। মন্দিরকে যে দৃঢ় পাষাণের ওপরেই প্রতিষ্ঠা করেছি।"

"সামান্যকে অবহেলা করবেন না, শিল্পী। এই সামান্য ফাটলের ছিদ্রপথে সামুদ্রিক ঢেউয়ের সাপ অনন্ত ফণা বিস্তার করেই আসতে পারে।"

সহসা শিল্পী বিহ্বল হয়ে পড়লেন। এ বিহ্বলতার ভূমিকা রচনা করছিল জ্যোৎস্না। অনেকক্ষণ ধরেই থমথম করছিল সমুদ্রতট। বিহ্বল হয়ে পড়লেন শিল্পী। দেবদাসীর একটি হাত নিজের মুঠোয় টেনে নিয়ে বললেন—"মৃত্যুই তা হলে পরিণাম। অথবা পরিণামে উন্মত্ততা।"

দেবদাসী ধীরে ধীরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল—"আপনি তাহলে ঠাট্টা শুরু করলেন।"

"ঠাট্টা নয়। আপনি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছেন।" শিল্পীর মগজের মধ্যে সত্যি সত্যি ঝড় বইছিল। চারদিকে যখন চরাচর নির্জন, এবং নিশুতি রাতের জ্যোৎস্নায় একটি আশ্চর্য মডেলের মত সামনে তরুণী দেবদাসীটি। ঝড় বইবারই কথা। বিশেষতঃ তরুণীটি যখন বারংবার জীবনের পরিণামের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। সারা জীবনে কী পেলেন শিল্পী, সুনাম? কিন্তু তাও তো অর্থদাতা রাজা, অর্থাৎ শিল্পপতিই কেড়ে নেবেন। দেশে দেশে রাজার সুনামই ছড়াবে। ঐতিহাসিকরা বলবেন, অমুক রাজা এটা গড়েছেন। প্রধান শিল্পীর স্মৃতি কেবল সৈকতের বাতাসে তখন হু হু করে ভেসে বেড়াবে। তবে তিনি কী পেলেন? কিছু না। সব তিনি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছেন। স্ত্রী-পুত্র, প্রেম, সংসার। চোখের সামনে ভেসে উঠল তাঁর ছেলেটির মুখ। তখন শিশু ছিল। এখন সে কিশোর হয়েছে। কে জানে দেখতে কেমন হয়েছে। তিনি তো নজর দেননি ছেলেটির প্রতি। যেমন, নজর দেননি নিজের তরুণী স্ত্রীর প্রতি। বছরের পর বছর কেবল পাথরের স্ত্রী-মূর্তির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তিনি রক্ত-মাংসের নারীকে ভুলে গেছেন।

হাঁ, সেই রক্ত-মাংসের নারীইতো সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘচ্ছন্দা পরম রূপবতী একটি দেবদাসী। স্বেচ্ছায় যে এসেছে নিশুতি রাত্রে। এই মুহূর্তে যার চোখের মণিতে দেখা যাচ্ছে সামুদ্রিক জ্যোতি। দূর সমুদ্রের ঢেউ-এর মাথায় যে-জ্যোতি মিনিটে মিনিটে চমকায়।

বিহ্বলতায় থৈ থৈ করতে লাগল প্রধান শিল্পীর মগজ। রূপতৃষ্ণা প্রেমতৃষ্ণা তাকে বহুদিন পরে পেয়ে বসেছে। অথচ, এখন আর যৌবনের অমিত জ্যোতি নেই তাঁর চামড়ায়। তিনি প্রায় প্রৌঢ়।

সহসা তার মনের মেঘে বিদ্যুৎ খেলে গেল। মনে হল, সবটাই দেবদাসীর ছলনা। দেয়ালের ফাটল দেখিয়ে তাঁর মনের ফাটল ধরাতে চেয়েছে তরুণীটি। এই নিশুতি রাত্রে তার আবির্ভাবটাই প্রেমের একটা ষড়যন্ত্র। যে-মৃত্যুর কথা মেয়েটি বলছে, সে মৃত্যু হল দেবদাসীর সঙ্গে প্রেম। দেবদাসী যে দেবতার পায়ে সমর্পিতা একটি নারী। তার সঙ্গে প্রেমে আবদ্ধ হলে রাজা হয়ত' মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করতে পারেন।

"এতো কি ভাবছেন?" শুধাল দেবদাসী।

গভীর একটা আবেগে দেবদাসীর অবনত চিবুক তুলে ধরে প্রধানশিল্পী বললেন—"তুমি কী সুন্দর। আরো আগে যদি আসতে।"

"আবার ঠাট্টা। আপনি কি মন্দিরের পরিণামের কথা একেবারেই ভাবছেন না?"

"না। ভাবছি, শিল্পজীবনের পরিণামের কথা। দেয়ালের ফাটলের জন্যে অত চিন্তে নেই, ওটা কাল ভোরেই সারিয়ে নিতে পারব।"

"আশ্চর্য। একটু আগে আমিও ভাবছিলাম, আমার দেবদাসী জীবনের পরিণামের কথা।"

"শুধু ব্যর্থতা। তাই নয় কি?"

দেবদাসী কোনো জবাব দিল না। চাঁদের দিকে মুখ করে থাকল দাঁড়িয়ে। আর শিল্পী চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন তাঁর মডেলকে। সুডোল দুটি বাহু, নিটোল তার গাল, শরীরটা শিল্পের একটা ঢেউ তোলা ছন্দ।

"তোমার কি নাম? তোমার আদি নিবাস?"

"আমি দেবদাসী। অন্য পরিচয়ে কী প্রয়োজন?"

"ঠিক কথা। আমিও শিল্পী। আমারও অন্য পরিচয় নেই।"

"আপনি কোণার্কের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী। দেশে দেশে আপনার গুণমুগ্ধের অভাব নেই।"

শিল্পী হাসলেন। আবার তুলে ধরলেন তরুণীটির হাত। তরুণী এবার আর হাত ছাড়াল না। তাকে কাছে টেনে নিলেন শিল্পী। হৃদয়ের একান্ত কাছে।

"তোমাকে আমি পাষাণের মধ্যে অমর করে রাখব। কালই মন্দিরের চূড়ায় তোমার নাচের একটি রূপকে আমি শিল্পরূপ দেব।"

"কাল ভোরেই যে আমরা চলে যাব! দিনের আলোয় আমাকে না দেখলেও ঠিক ঠিক মূর্তি গড়তে পারবেন তো?" হাসল তরুণীটি।

"তোমাকে রাতের আলোয়, প্রাণের আলোয় যে দেখলাম। কিন্তু বড় দেরী করেই এলে।"

এরপর কিংবদন্তীগুলি ছাড়া ছাড়া, অর্থাৎ অস্পষ্ট। ইতস্ততঃ, বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন ফুলগুলি নিয়ে মালাগাঁথা এক দুষ্কর ব্যাপার। পাঠক-পাঠিকার ওপরেই আমি মালাগাঁথার ভার ছেড়ে দেব।

পরদিন ভোরেই দেবদাসীর দল রাজধানীতে চলে গিয়েছিল। পরদিন ভোর থেকেই প্রধান-শিল্পীর মনের একাগ্রতায় ফাটলের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। তাঁর মনকে প্রায় চুরি করে নিয়ে গেছে সর্বকনিষ্ঠা সুন্দরী দেবদাসী। কাজে আর তেমন মন বসে না প্রধানশিল্পীর। অন্যান্য হাজার হাজার শিল্পীও এ নিয়ে কানাঘুষা করে।

তরুণী দেবদাসীর সঙ্গে নির্জন সৈকতে রাত্রিযাপনের দৃশ্যটা হয়ত' কেউ চোখে দেখেনি। হয়ত' হাজার হাজার শিল্পীর মধ্যে কেউ চুপি চুপি দেখে থাকতেও পারেন। হয়ত অসাবধান মুহূর্তে কোনো শিল্পীকে প্রধানশিল্পী তাঁর

তোমার দেওয়া আঘাত সে-ও ভালো
অসংকোচে আঁকো গভীর ক্ষত,
তুমি না থাকো থাকুক জেগে তোমার দেওয়া ব্যথা
বেদনা বুকে জ্বলুক অবিরত।

না দিলে ভালোবাসার ফুলগুলি
যন্ত্রণায় বিধুর হোক এবার ফাল্গুন,
বেলা শেষের অন্ধকারে একাই বসে শুনি
প্রেমিক মৌমাছির গুন্ গুন্।

হাওয়া না হয় লাগুক চোখেমুখে
দু'হাতে ঢেকে রাখবো এই ক্ষত,
অশ্রুজল শুকাক, শুধু সুচির হোক ব্যথা
ভালোবাসার বদলে অন্তত।

প্রাণের কথা বলেই ফেলেছিলেন। মোটকথা, কিছুদিন যেতে না যেতেই রাজধানী থেকে খবর এল যে, সর্বকনিষ্ঠা দেবদাসীর চরিত্র-বিচ্যুতির অপরাধে প্রাণদণ্ড হয়েছে। দেবদাসী যে ভগবানের দাসী। মানুষের সঙ্গে তার প্রেমের পরিণাম মৃত্যু।

প্রধানশিল্পী সে খবর শুনলেন। কানাঘুষা যে তাঁকে কেন্দ্র করেই পল্লবিত, এটাও তিনি বুঝলেন। কী প্রতিবিধান তিনি আর করতে পারেন। নীরবে নীরবে কেবল তাঁর চোখের জল ফেলাই সার হ'ল। একটি সুন্দরী নারীর জীবনের জন্যে তিনিই দায়ী। তাঁর অনুশোচনার কশাঘাতে কশাঘাতে দিনের পর দিন তিনি উন্মনা হতে লাগলেন। অনুভব করতে লাগলেন যে, মৃত্যুর একটি অলিখিত, অকথিত পরোয়ানা তাঁর উপরেও জারী করেছেন রাজা। মৃত্যুটা দু'দিন আগে বা পরে। দণ্ডটা দেবদাসীর সঙ্গে প্রেমের জন্যে নাও যদিবা হয়, অন্তত কোণার্কের মত শিল্পসৃষ্টির জন্যেও হতে পারে। যে শিল্পী বেঁচে থাকলে আবার দ্বিতীয় কোণার্ক হতে পারে অন্য রাজ্যে, সে শিল্পীকে রাজা কি বাঁচতে দেবেন?

কাজকর্ম চলেছে বটে, কিন্তু ঢিমেতালে। তবু কাজ চলছে বৈকি। হাজার হাজার শিল্পী কাজ করে যাচ্ছে। রাজা ঘন ঘন তাগাদা দিচ্ছেন, তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে কাজ।

মন্দিরের ওপরে সারি সারি বিচিত্র ভঙ্গিমার নারীমূর্তি গঠনের কাজ শেষ হয়েছে। প্রধান-শিল্পী নিজেও একটি নারীমূর্তি গড়েছেন। তার হাতে মন্দিরা। কানে কর্ণাভরণ। সমুদ্রের দিকে উদাসদৃষ্টি। তার খোঁপায় ফুল কিংবা হার। সর্বাঙ্গে প্রস্ফুটিত যৌবন।

অন্যান্য শিল্পীরা কানাঘুষা করতে লাগলেন—

"এ যে দেখছি সেই দেবদাসী।"

"কিন্তু কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে।"

"পাথরের এত সুন্দর কাজ আমরা কিন্তু করতে পারলাম না।"

(শেষাংশ ২৮৭ পৃষ্ঠায়)

সেদিন শনিবার, মুখ গোমড়া ক'রে অমরদার আড্ডায় বসে আছি। ছাক্কার বিস্বাদ হলেও নেশার বস্তু যেমন মানুষ ছাড়তে পারে না, আমার অবস্থাও সেই রকম। বহুকালের পুরনো আড্ডা, প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় একবার ক'রে ঢুঁ না মারলে পেটের ভাতই হজম হবে না। পেশা চাকরি, নেশা আড্ডা—বাঙ্গালীর ছেলে কোনটাই ছাড়তে পারি না, তাতে গিন্নী মুখঝামটা দিক আর ছেলেমেয়েরা গোল্লায় যাক। নতুন নতুন বিয়ে হলে অমরদা দুঃখ করে বলেছিল, এবার আমাদের আসরের একটি উজ্জ্বল তারকা খসল।

আমিও নড়বড়ে তক্তাপোষটার ওপর সজোরে একটা কিল মেরে বলেছিলুম, খসল না আরও চেপে বসল। বাসরঘরে বসেও তোমাদের আসরের জন্য হাউ হাউ করে কেঁদেছিলুম, তাতো জানো অমরদা। শ্বশুরের জামাই হবার জন্য একটা শনিবার কামাই। এ যে কল্পনাও করতে পারি নি। তোমরা সবাই না থাকলে একটা কেলেঙ্কারী হয়ে যেত।

তারপর নবপরিণীতা উদ্ভিন্নযৌবনা তন্বী ললনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মনে যখন প্রেমের দানা সবে বাঁধতে সুরু ক'রেছে এমনি সময় একদিন শুভ্র জ্যোৎস্না নিশীথে প্রেয়সীর সুডোল হাতখানি হাতের মধ্যে নিয়ে হাসনো-হানা আর রজনীগন্ধার ঝাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে প্রেমমুদিত নয়নে, আবেগকম্পিত স্বরে বলে-ছিলুম, "প্রিয়া দেখ, চেয়ে দেখ কেমন প্রাণ-মাতানো, মন কাঁদানো জ্যোৎস্না।" উত্তরে প্রেয়সী কি বললে জানেন? সেই পিলে চমকানো জবাব শুনলে আপনাদের হার্টফেল করত। নেহাত আমি পোড় খাওয়া ছেলে, সহজে কাবু হই না।

সে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থেকে বলল "চাঁদের আর দ্যাহনের কি আছে, হ্যা তো রুজই দেহি।" আমিও এক ঝটকায় তার হাতটা ঠেলে দিয়ে, 'ধুত্তোর প্রেমের নিকুচি করেছে' বলে হন্‌হন্ করে ঘরে শুতে গেলুম।

আমার প্রেমের অপমৃত্যুর সেই করুণ কাহিনী আড্ডার সবাই জানে তবু ভোম্বল থেকে থেকে এসে খোঁচা দেয়, "ছাড় না একটা রসাল প্রেমের গল্প।" আমি যত বলি, "প্রেম প্রেম আমার ধাতে সয় না", ভোম্বল ততই বলে "সয়-সয়, শরীরের নাম মহাশয় যা সওয়াবে তাই সয়। কেন চেপে যাচ্ছ ব্রাদার, শেষে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গব সেটা কি ভাল দেখাবে?"

আমি মনে মনে বেশ শঙ্কিত হয়ে উঠি। পূর্ববঙ্গীয় গিন্নীর শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে একটু-আধটু এদিকে-ওদিকে প্রেমের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে করি না যে তা নয়; কিন্তু ভোম্বলটা কি টের পেয়ে যায়, না স্রেফ ধাপ্পা দেয় ঠিক বুঝতে পারি না। বেশি ঘাটাঘাটি না করে আমার দু'একটা ব্যর্থ প্রেমের অভি-যানের উপাখ্যান শোনাতেই হয়।

গিন্নীর জন্য টোপাকুল আর ডাঁশা পেয়ারা কিনে নিয়ে যাওয়ার ফরমাস ছিল, এমনি উদ্ভট ফরমাস নিত্যই লেগে থাকে, তাই ঠিক করেই এসেছিলুম বেশিক্ষণ আড্ডায় থাকব না; তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে গিন্নীর মনোরঞ্জন করতে না পারলে পেয়ারার শোকে এমন প্যান্ প্যান্, ঘ্যান্ ঘ্যান করতে আরম্ভ করবে যে সে রাত্রি ঘুমের বারটা বেজে যাবে। আড্ডা পুরো দমে চলছে। আণবিক অস্ত্র, রাজনীতি, সিনেমা জগৎ, বাজার দর, পরচর্চা কোনটাই বাদ যাচ্ছে না। তাল খুঁজছি কোন ফাঁকে কেটে পড়ব এমন সময় ভোম্বল কোথা থেকে হুট্ করে এসে আমার পিঠে আদর করে এমন জোরে একটা চড় বসাল যে একুশদিন লেগেছিল পাঁচটা আঙ্গুলের দাগ মেলাতে। বললে, খুব যে ডুবে ডুবে জল খাওয়া হচ্ছে।

পিঠের জ্বালায় মেজাজটা খচে গিয়েছিল, চড়া সুরেই প্রশ্ন করলুম, তার মানে?

ভোম্বল শ্লেষের সঙ্গে বলল, মানে বুঝতে পারলে না? ন্যাকা? বলি উত্তরপাড়ায় তোমার কোন্ সম্বন্ধী থাকে?

প্রশ্ন শুনে ভারি দমে গেলুম। গত রবিবারে উত্তরপাড়ায় গিয়েছিলুম বটে এবং বলা বাহুল্য উদ্দেশ্য মোটেই সাধু ছিল না। কিন্তু ভোম্বলের সেটা টের পাওয়ার কথা নয়। যখন ধরা পড়েই গিয়েছি তখন ওর হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। অগত্যা সুর নরম করে বললুম, "নেহাত সে দুঃখের কথা না শুনে যখন ছাড়বি না তখন চুপ করে বস্।"

আশা পত্রিকায় কয়েকমাস ধরে বিমলা রায়ের একটা ধারাবাহিক উপন্যাস বেরুচ্ছে দেখেছিস। তা দেখবি কেন? কেবল আড্ডা দেওয়া ছাড়া দুনিয়ায় আর কি শিখলি। সাহিত্যের কোন খবরই রাখিস না। যাই হোক, বিমলা দেবীর লেখাতে যথেষ্ট মৌলিকতা আছে। সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীর অনাবিল প্রেমের এমন একটি হৃদয়গ্রাহী আলেখ্য পাঠকের সামনে ধরেছেন যে পড়তে পড়তে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। আশা পত্রিকার বিল কলেক্টর অম্বিকাবাবুর খুড় শ্বশুরের নাতজামাইএর ছোট ভাই আমার বাল্যবন্ধু। তাকে ধরে পত্রিকা অফিসের ফাইল ঘেঁটে বিমলা দেবীর ঠিকানা জোগাড় করি।

তারপর সাতবার খসড়া ক'রে, অনেক কায়দা ক'রে গুছিয়ে একটা চিঠি লিখলুম বিমলা দেবীর কাছে। চিঠির বিষয়বস্তু ছিল তাঁর অর্ধ প্রকাশিত উপন্যাসটি সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত মতামত এবং পরিশেষে অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে জানিয়ে দিলুম যে আমি তাঁর একজন অনুরক্ত পাঠক। মনে মনে যথেষ্ট ভয় ছিল যে যদি ভদ্রমহিলা চিঠির জবাবে কড়া কথা শুনিয়ে দেন কিম্বা পেছনে ডালকুত্তা লেলিয়ে দেন।

কিছুদিন পরে চিঠির জবাব এল খুবই মামুলি—ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর উপন্যাস সম্পূর্ণ প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকতে অনুরোধ করেছেন। আমার কাছে সে চিঠি ছিল আশাতিরিক্ত। উপন্যাস শেষ হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার মত মনের অবস্থা আমার ছিল না। কত মাস ধরে সে উপন্যাস বেরুতে থাকবে কে জানে? আজ-কালকার লেখক-লেখিকারা আবার অল্পের মধ্যে কিছুতেই সারতে চান না। পাতা আর ফর্মাগুণে পারিশ্রমিক দিলে কে এমন আহাম্মক আজকালকার আক্রার বাজারে আছে যে অল্পে লেখা সারবে?

কয়েকদিন পরে আবার একখানা চিঠি লিখে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তাঁর দর্শন লাভের প্রার্থনা জানালুম। চিঠি পাঠিয়ে ভাবলুম এবার নিশ্চয় বিমলা দেবী আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন না। অবিমৃষ্যকারিতার জন্য নিজেকে বার বার ধিক্কার দিতে লাগলুম। দ্বিধা, সংশয় আর উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে কটাদিন

যে কি করে কাটিয়েছিলুম তা আর আজ বলে বোঝাতে পারব না। দরগা আর মন্দিরে মানত করলুম, এ বেলা ও বেলা পোস্ট্ অফিসে হত্যা দিতে লাগলুম।

অবশেষে এক শুভ লগ্নে বহু প্রত্যাশিত চিঠি এল। চিঠি হাতে পেয়ে বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পেটা সুরু হল। তিন গেলাস জল খেয়ে, ঠাকুর দেবতাদের নাম করতে করতে চিঠিটা খুলে ফেললুম। ছোট্ট চিঠি, দেবী প্রসন্না হয়েছেন—তিনি আমাকে যে কোনদিন সকালে দেখা করবার অনুমতি দিয়েছেন। আনন্দে ধেই ধেই ক'রে নাচতে লাগলুম। এত সহজে যে দেবীর দর্শন লাভ এবং তাঁর সঙ্গে আলাপের সুযোগ পাব তা কল্পনাতীত ছিল।

পরদিন রবিবার ভোরের অন্ধকারে তাড়াতাড়িতে নতুন ব্লেডে দাড়ি কামাতে গিয়ে কয়েক জায়গা কেটেই গেল। শ্বশুরের দেওয়া দামী সিল্কের জামা-কাপড় পরে গিন্নীর অলক্ষিতে তাঁর স্নো, পাউডার, সেন্ট পর্যাপ্ত পরিমাণে মেখে নিয়ে বাড়ী থেকে রওনা হলুম। নিউ মার্কেট থেকে একটা দামী ফুলের তোড়া কিনে নিলুম। পকেটের বিড়িগুলো রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে একটিন 'গোল্ড্-ফ্লেক্' সিগারেট কিনে ফেললুম। তারপর একটা ট্যাক্সি ডেকে সোজা হাওড়া স্টেশন। লোক্যাল ট্রেণে এয়ার কণ্ডিশন কম্পার্টমেণ্ট্ না থাকায় একটা ফার্স্টক্লাস টিকিট্ কেটে ট্রেণে উঠলুম।

উত্তরপাড়া স্টেশনে নেমে বিমলা রায়ের ঠিকানা অনুযায়ী বাড়ী খুঁজে বার ক'রতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে কায়দা করে প্রথমে একটা সিগারেট ধরালুম তারপর রুমাল দিয়ে জুতর ধুলোটা ঝেড়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বিমলা দেবীর বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেলুম।

একতলা পুরনো বাড়ী, এখানে-ওখানে ফাটলের মুখ থেকে অশ্বত্থ গাছ বেরিয়েছে। ছাদের আলসে থেকে ছেঁড়া কাঁথা কয়েকটা ঝুলছে। দেখে মনটা ভারি দমে গেল। এমন নোংরা পরিবেশের মধ্যে বিমলা দেবীর মত একজন উচ্চ শিক্ষিতা, প্রগতিশীলা সাহিত্যিক বাস করতে পারেন তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলুম না। তবে এই ভেবে আশ্বস্ত হলুম যে গোবর গাদায় পদ্মফুল ফোটে।

বাড়ীর সামনে রোয়াকের ওপর বসে একজন কালো, বেঁটে, মোটা, প্রৌঢ় ভদ্রলোক খালি গায়ে বসে বিড়ি ফুঁকছিলেন আর খবরের কাগজ পড়ছিলেন। আমি ভাবলুম এ ভদ্রলোক বিমলা দেবীর বাবা হতে পারেন, জ্যাঠা হতে পারেন আবার ঠাকুর্দাও হতে পারেন। তবে ইনি যাই হোন না কেন বিমলা দেবীর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের এবং নিভৃত আলাপের প্রতিবন্ধক না হলেই হল। ঐ মোষের মত ধুমুশো চেহারা দেখে বিশেষ ভরসাও পাচ্ছিলুম না।

নাচতে নেমে আর ঘোমটা টেনে লাভ কি? এত তোড়জোড় করে এতদূর যখন এসে পড়েছি তখন শেষ পর্যন্ত দেখেই যাব। আধ-পোড়া সিগারেট্টা ফেলে দিয়ে, ফুলের তোড়াটা পেছনে আড়াল করে ধরে, বেশ নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলুম, "ও মশাই, বিমলা রায় কি এই বাড়ীতে থাকেন?"

ঝড়ের মুখে — তপনকুমার সেনগুপ্ত

ভদ্রলোক কাগজটা নামিয়ে রেখে চশমার ফাঁক দিয়ে আমাকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "মশায়ের কোত্থেকে আসা হচ্ছে?"

আমি বললুম, "কোলকাতা থেকে।"

ভদ্রলোক পুনরায় ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মশায়ের প্রয়োজন?"

আমি একটু বিরক্ত হয়েই বললুম, "তাঁর সঙ্গে আমার সাহিত্য সম্পর্কে আলাপ করা প্রয়োজন। তিনি আমাকে আসতে লিখেছিলেন।"

ভদ্রলোক তখন সোজা হয়ে বসে বললেন, "ও আপনিই বুঝি ভূতনাথবাবু? তা বেশ, বেশ, বসুন এইখানে।"

তাঁর পাশে ধূলি-ধুসর স্বল্প পরিসর স্থানটুকুতে বসবার আগ্রহ আমার আদৌ ছিল না। ব্যস্ত হয়ে বললুম, "আর বসে সময় নষ্ট করব না, আমার আবার অন্য একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে হবে, আপনি একবার চট্ করে ওঁকে ডেকে দিন।"

ভদ্রলোক বিস্মিতকণ্ঠে বললেন, "কাকে ডেকে দেবার কথা বলছেন? ও হো আপনাকে এখনও আমার পরিচয়টা দেওয়া হয়নি ভূতনাথ-বাবু। তুমি আমার ছেলের বয়সী, তোমা আর 'আপনি' বলব কেন? তা বাবা, আ পত্রিকায় ঐ ধারাবাহিক উপন্যাসটা তোমার ব খুব মনে ধরেছে? ওটা আমারই লেখা। আম পুরো নাম শ্রীবিমলাচরণ রায়।"

আমি তখন চোখে সর্ষে ফুল দেখছি হাত থেকে কখন ফুলের তোড়াটা পড়ে গে টেরও পাইনি। অস্ফুট স্বরে ভদ্রলোককে বলেছিলুম মনে নেই। কোন রকমে টল টলতে স্টেশনের পথ ধরলুম। রাস্তার মো পোঁছে কানে গেল ভদ্রলোক হো হো ক হাসছেন। হাওড়া থেকে কোন রকমে একা ট্যাক্সি করে বাসায় পোঁছলুম। আমার ঘ দরজার সামনে এসে দেখি গিন্নীর হাতে বিম রায়ের লেখা দুখানি চিঠি। আপন মনে গিন্ন বলছেন, "আসুক মিন্সে বাড়ী, আমার চ ধুলো দিয়া ক্যামনে পার পায় দেহি—"

উঃ বড্ড দেরি হয়ে গেল রে ভোম্বল, চ ভাই, পেয়ারা আর টোপাকুল কিনে না নি বাড়ী ফিরলে আর রক্ষে থাকবে না।"

—

কোনাকের করুণ কিংবদন্তী

(২৮৪ পৃষ্ঠার পর)

"মনে হচ্ছে, ঐ মূর্তিটাই সবচাইতে দীর্ঘস্থায়ী হবে।"

শিল্পীরা কানাঘুষা করেন আর কাজ করেন। ইতিমধ্যে রাজার আদেশ এসেছে যে, মন্দিরের সামনে সমুদ্রের দিকে একটি বিরাট চুম্বক লোহার থাম লাগাতে হবে, যাতে বিদেশী বোম্বেটেদের জাহাজ সমুদ্র দিয়ে যেতে চুম্বকে আকৃষ্ট হয়। প্রধানশিল্পী এ কাজটি কিন্তু সুচারুরূপেই সম্পন্ন করছেন। যতোক্ষণ জীবন আছে, ততোক্ষণ রাজার আদেশ মানতে হবে বৈকি!

—"নাটমন্দিরের কাজ যে সম্পূর্ণ হল না।" একজন শিল্পী মন্তব্য করলেন।

আর একজন শিল্পী বললেন—"না, ওটা সম্পূর্ণ হবে না। প্রধানশিল্পী এটা সম্পূর্ণ করতে নারাজ।"

"ব্যাপার কি?" একজন শুধালেন।

জবাব এল—"হয়ত সেই দেবদাসীর ব্যাপার। নাচের ব্যাপারে প্রধানশিল্পীর মনে যে সাংঘাতিক ক্ষত হয়ে রয়েছে।"

আরো দিন যায়। দিন যায়, মাস যায়। সূর্য-মন্দিরের ওপর বিরাট গোলাকৃতি পাথরটাও উঠেছে। সে কী সাংঘাতিক ব্যাপার। হাজার হাজার শিল্পীর প্রাণান্ত পরিশ্রমের ফলে অতবড় পাথরটা মন্দিরের ওপর শেষ পর্যন্ত উঠল।

এরিমধ্যে একদিন বিকেলের দিকে একটি অপরিচিত কিশোর এসে প্রধানশিল্পীকে প্রণাম করল। প্রধানশিল্পী চমকে প্রশ্ন করলেন—'তুমি কে?"

"আপনার ছেলে। মা পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনাকে সাহায্য করতে।" প্রধান শিল্পীর চোখে জল এল। তাঁর মনে পড়তে লাগল ছায়াভরা একটি উঠোন, একটি নিকনো আঙিনা, যেখানে তাঁর জন্যে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অপেক্ষা করছে তাঁর বিরহিণী স্ত্রী।

'তুমি কোনো কাজ শিখেছো?"

"না। শিখব বলে এসেছি।"

প্রধানশিল্পী অপলকদৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন কিশোরের দিকে। কিশোর কোথায়, বালক। এখনো তার চোখে দুষ্টামীর স্বপ্ন। সে এসেছে কঠিন কাজে বাবাকে সাহায্য করতে।

"মা পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনাকে সাহায্য করতে।"

প্রধানশিল্পী সন্তোষের হাসি হাসেন। এই তাঁর ছেলে। তাঁর প্রতিভার উত্তরাধিকারী। তাঁর বংশের প্রদীপ।

আরো দিন যায়। রাজার আবার আদেশ এসেছে অবিলম্বে মন্দিরের চূড়ায় সোনার কলস বসাতে হবে। কাজটা বড় সোজা নয়। সম্ভবত সব চাইতে কঠিন কাজ। সোনার কলসকে এমন মজবুতভাবে বসাতে হবে, যাতে ঝড়ো হাওয়ায় পড়ে না যায়।

অবিশ্যি, সোনার কলস বসাবার পরিকল্পনাটা আগেই জানতেন শিল্পী। কিন্তু কাজের সময় এটা সাংঘাতিক কঠিন কাজ বলেই মনে হল। ঐ গোলাকৃতি পাথরের শীর্ষে বসে কলসকে দৃঢ়ভাবে বসানো বড়ই কঠিন কাজ। কে উঠবে ওখানে? কে করবে ঐ কঠিন কাজ উর্ধাকাশে বসে? এবং কলসকে বসালেও যে সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে যাচ্ছে। কলস ঠিক হয়ে বসছে না।

কাজটা তাড়াতাড়ি আর হয়ে উঠছে না। রাজা এদিকে প্রায় ক্ষেপে গিয়েছেন। শিল্পীদের দেরী আর সহ্য করতে না পেরে তিনি একদিন সাংঘাতিক আদেশ জারী করে বসলেন। কিংবদন্তী বলে যে, তিনি মৃত্যুদণ্ড জারী করলেন হাজার হাজার শিল্পীর ওপর। ঘোষণা করলেন, যদি বাঁচতে চাও তো সোনার কলস বসাও। না হয়, সকলের একসঙ্গে মাথা কাটা যাবে।

তারপর ঘটল আশ্চর্য ঘটনা। প্রধানশিল্পীর সেই কিশোর ছেলে তার বাবার কাছে এসে অনুমতি চাইল। বলল, সে পারবে এ কাজ।

হাজার হাজার নিস্তব্ধ শিল্পীর চোখের সামনে তরতর করে সে উঠে গেল আকাশে। নিচে দাঁড়িয়ে শিল্পীরা দেখলেন, আকাশের কোলে মন্দিরের চূড়ায় একরত্তি একটি ছেলে। তাকে দেখা যাচ্ছে একটি উজ্জ্বল বিন্দুর মত। হাতে তার সোনার কলস।

কিংবদন্তী বলে যে, ঐ একরত্তি ছেলেই শেষপর্যন্ত কলসটি ঠিক করে বসাতে পারল। মন্দিরের চূড়ায় নাকি লোহার গজাল ছিল। নিচের সেই বিশাল চুম্বকের থামের আকর্ষণে চূড়ার ঐ লোহার গজাল বেঁকে যাওয়াতেই কলস ঠিক ঠিক বসছিল না।

ছেলেটার জয়জয়কার পড়ে গেল বটে, কিন্তু রাজা ধিক্কার দিয়ে উঠলেন সমস্ত শিল্পীকে। তিনি নাকি ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন।

বল্লেন, "ছিঃ, ঐ একরত্তি ছেলেকে দিয়ে তোমরা ঐ কাজ করালে। নিজেরা পারলে না। তোমরা অপদার্থ। তোমাদের মৃত্যুদণ্ডই বাঞ্ছনীয়।"

চূড়ায় বসে বসেই ছেলেটি শুনলে ঐ কথা। হাজার হাজার শিল্পীদের মধ্যে তার বাবাও আছেন যে, সে চীৎকার করে রাজাকে বলল—"সমস্ত শিল্পীদের ক্ষমা করুন মহারাজ। আমিই বরঞ্চ আপনার দণ্ড মাথা পেতে নেব। আমার হাতে কলস বসানো যদি হাজার হাজার শিল্পীর পক্ষে অপরাধ হয়, তবে আমিই সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করব।"

সেদিন কোণার্কের মন্দিরের ওপর থেকে কিছুক্ষণের জন্যেও লজ্জায় ও দুঃখে সূর্যদেব আলো সরিয়ে নিয়েছিলেন কিনা, জানা নেই। পাষাণ স্বেচ্ছাচারী রাজার চোখে এক মুহূর্তের জন্যেও একফোঁটা চোখের জল বেরিয়েছিল কিনা, জানা নেই।

সেই একরত্তি ছেলে কী সাংঘাতিক কাণ্ডই না করে বসল। বাবার সাহায্যের জন্যে মা তাকে পাঠিয়েছেন দেশ থেকে। সেই বাবার প্রাণদণ্ড তো মা সহ্য করতে পারবেন না। ছেলেটি করল কি—লাফিয়ে পড়ল ঐ চূড়া থেকে। ঝাঁপ দিল মহাশূন্যে। একটি সাদা পায়রার মত লুটিয়ে পড়ল মন্দিরের চত্বরে। রক্তে ভেসে গেল তার তার মুখখানি।

সে বাঁচল না। কিন্তু বাঁচলেন হাজার হাজার শিল্পীরা।

কিংবদন্তী বলে যে, প্রধানশিল্পীও সেইদিনই রাতের সমুদ্রে ভেসে গিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। আর দরকারও ছিল না তাঁর বাঁচার। মন্দির তো তৈরী হয়েই গিয়েছিল। কেবল নাটমন্দির ছাড়া।

বিচিত্র জীবন

(২৮০ পৃষ্ঠার পর)

সে। যন্ত্রচালিতের মত ঘোড়াটাকে 'রিং-বারের' সামনে নিয়ে দাঁড় করায়। রিংএর উপর হতবাক্ শেখর। এমিলিয়া উর্ধমুখে তাকিয়ে আছে। নীলচোখের ভাষা স্তব্ধ, নিঃসাড় দেহ, শুধু ঠোঁট দুটি থরথর করে নড়ছে।

হঠাৎ নিদারুণ যাতনায় এমিলিয়ার সারামুখ ব্লটিং কাগজের মত সাদা হয়ে যায়, একফোঁটা রক্তের চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না সেখানে। যেন এক অদৃশ্য শত্রুর হাত থেকে বাঁচাতে হবে নিজেকে। চকিতে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে এমিলিয়া শুয়ে পড়ে ঘোড়ার পিঠে। অজানা বিপদের আশঙ্কায় ঘোড়াটা হাওয়ার আগে ছুটে আসে বাংলোয়।

সহিসের হাতে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে বাগানের একটা নিরিবিলি কোণ দেখে এমিলিয়া ছুটে যায়। সমস্ত মাথা জুড়ে অসহ্য যন্ত্রণা, বুঝি ছিঁড়ে পড়বে মস্তিষ্কের শিরা-উপশিরা।

চারপাশে ঘুটঘুটি অন্ধকার। বহুদিন বাদে এমিলিয়াকে বেড়াতে বেরোতে দেখে নিশ্চিন্ত মনে ক্লাবে গিয়েছে রবার্টসন। ঘাসের উপর বসে এমিলিয়া মাথা ঝাঁকায়। ছটফট করে। প্রাণপণে একটা চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হয়। হঠাৎ ওর দৃষ্টি আস্তাবলের উপর পড়ে ক্ষণেকের জন্য স্থির হয়ে যায়।

লাইটের আলোর নীচে ঘোড়াটা দুলছে। দেখতে দেখতে এমিলিয়ার চোখদুটি মহা এক উল্লাসে নেচে ওঠে। লাফিয়ে উঠে সে বাংলোর দিকে ছুটে যায়। একেবারে রবার্টসনের পড়ার ঘরে গিয়ে দাঁড়ায়। একটা বইয়ের আলমারীর হুকে রবার্টসনের বন্দুক আর গুলির বেল্ট ঝুলছে—। এমিলিয়া গুলির বেল্টটা মালার মত গলায় ঝুলিয়ে, বন্দুকটা কাঁধে ফেলে আস্তাবলের সামনে এসে দাঁড়ায়। তারপর একটানা চলল গুলির ঝড়। প্রথম গুলিতেই ঘোড়াটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। ভ্রূক্ষেপ নেই এমিলিয়ার। গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা হতে থাকে ঘোড়ার দেহ।

ব্যাপার দেখে সহিস, দরওয়ান প্রাণপণে দৌড়ে যায় রবার্টসনের ক্লাবে। ক্লাবটা একেবারে কাছে নয়। ওদের কাছে খবর পেয়েই রবার্টসন ছুটে আসে। এসে দেখে, এমিলিয়া বন্দুকের উপর হুমড়ি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, আস্তাবল ভেসে যাচ্ছে রক্তের স্রোতে। ......

চোখ বুঁজেও খাওয়া চলে
গাঙ্গুরামের দই মিষ্টি
গাঙ্গুরাম এণ্ড সন্স
ফোন : ৩৫-৩৩৫৯
১৫৯,সি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬,
২২/১, গড়িয়াহাট রোড (গোল পার্কের সামনে), কলিকাতা—১৯

ম্যালেরিয়ার
প্রতিরোধে—
'প্যালুড্রিন'
ICI
সবসময় খাওয়ার পর
এক গ্লাস জলের সঙ্গে
'প্যালুড্রিন' খাবেন।
ইম্পিরিয়্যাল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রীজ (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড

পথ-প্রদর্শন

শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়
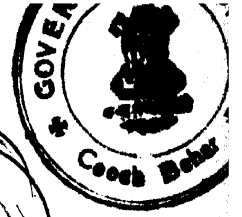
এই ছাব্বিশ বছরের জীবনের ইতিহাসে অনেক লোকের সংস্পর্শে এসেছে মণিকুন্তলা, ঘনিষ্ঠতাও করেছে অনেকের সঙ্গে কিন্তু এমন আশ্চর্য মানুষ দেখেনি সে শোভাময়ের মত। যে জীবন মণিকুন্তলার তাতে মানুষ নিয়েই তার বেসাতি। নিত্য নতুন লোক আসে আর যায়। বাসনা কামনাও মিটিয়ে নেয় প্রতি মুহূর্তেই। তারা অর্থ দেয় যেমন, আদায়ও কোরে নেয় তেমন। এই তার বেসাতি, সুতরাং মনে কিছু করবার নেই মণিকুন্তলার। ক্ষণিকের অতিথিকে যেমন সাদরে গ্রহণ করে হেসে, সঙ্গ দেয় ঘনিষ্ঠ হয়ে, তেমনি বিদায়ও কোরে দেয় অম্লানমুখে।

কিন্তু সেদিন অবাক হয়ে যায় মণিকুন্তলা। ক্ষণিকের অতিথি শোভাময় এসে দাঁড়ায় তার সামনে। তাকে গ্রহণ করে সে তেমনি হাসিমুখে। হাত বাড়িয়ে ধরতে যায় হাতখানি। কিন্তু পিছিয়ে যায় শোভাময়। একেবারে স্পর্শের বাইরে। একটু হেসে বলে, থাক, একেবারে অপটু নই আমি। যেতে পারব নিজেই। শুধু পথটা দেখিয়ে দাও কোনদিকে তোমার ঘর।

মণিকুন্তলা কেমন যেন হকচকিয়ে যায়। এমনটি সে দেখেনি এর আগে।

বেশীদিন থাকতে আসেনি শোভাময়। বলেছে, ভাল লাগে যে কদিন, আসবে। কাটিয়ে যাবে প্রতিদিন দু-ঘণ্টা কোরে। সন্ধ্যে সাতটা থেকে নটা। এ প্রস্তাবে রাজি হয় মণিকুন্তলা। সাধারণতঃ এ সময়টিতে বেকার থাকে সে। ভালও লাগে তার শোভাময়কে। এমন মার্জিত প্রিয়দর্শন যুবক সব মেয়েরই কামনার ধন।

শোভাময় আসে মণিকুন্তলার কাছে। নিয়মিতভাবেই আসে সে। ব্যতিক্রম নেই। থাকেও দু-ঘণ্টা, তারও ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু অবাক হয়, মানুষটা বাসনা-কামনা বর্জিত, লিপ্সাহীন। নারী মাংস লোভী নয়। মণিকুন্তলা অবাক হয়, তবু ভাল লাগে। শোভাময়ের ভদ্র-মার্জিত ব্যবহার বড় ভাল লাগে তার। তার যে জীবন, সে জীবনে এ ব্যবহার একেবারে নতুন। আবার সময় সময় বড় অদ্ভুতও লাগে তার। অস্থিরও হয়ে পড়ে নিজেই। এতখানি সংযম তবু কেন আসে! মণিকুন্তলা প্রলুব্ধ করতে চায় শোভাময়কে। সমস্ত সৌন্দর্যের পসরা খুলে দিয়ে সে জয় করতে যায় এই অপ্রলুব্ধকে। কিন্তু পারে না। এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটাতে পারে না সে শোভাময়ের ব্যবহারে। অভিমানে মাঝে মাঝে জলও আসে চোখে। কিন্তু মণিকুন্তলা সামলে নেয় নিজেকে। নিজের বিবেকহীনতায় এমন রত্নটিকে হারাতে চায় না সে। সময় সময় ও নিজেই লুব্ধ হয়ে ওঠে বড়। সমতলে তুলে নিতে চায় ঐ নিশ্চল অপদুদ্ধযোচিত হাত দুটিকে নিজের কোলের ওপর তার। লুকোতে চায় নিজের বাসনা মাখান মুখখানিকে ঐ শান্ত অচঞ্চল বুকখানিতে। কিন্তু পারে না কিছুই।

শোভাময় প্রশ্ন করে, তোমার বয়স কত, মণি?

—ছাব্বিশ। মণিকুন্তলা বয়স লুকোবার চেষ্টা করে না।

—মোটে! তাহলে তো ছেলেমানুষ তুমি।

—কেন, বেশী বলে মনে হয়? মণিকুন্তলা প্রশ্ন করে দুরুদুরু বুকে।

—না। আরও কম বললেও অবিশ্বাস করবে না কেউ।

মণিকুন্তলা হাঁফ ছাড়ে। স্মিতমুখে তাকিয়ে থাকে শোভাময়ের দিকে। প্রশ্ন শেষ হয়নি শোভাময়ের। প্রশ্ন করে আবার, আচ্ছা বলত, কত লোক এসেছে তোমার কাছে। আজও পর্যন্ত কত লোককে সঙ্গ দিয়েছ তুমি?

অদ্ভুত প্রশ্ন। মণিকুন্তলা হকচকিয়ে যায়! বিব্রতমুখে বলে, অনেক। গুণে রাখিনি কত।

—কেমন লোক সব তারা?

প্রশ্নের ধরণে মণিকুন্তলা হেসে ফেলে। মুখ নীচু কোরে হাসতে থাকে টিপে টিপে।

—হাসছ যে বড়! বল, লোক কেমন সব তারা?

—মন্দ কি। পাগলের দল।

—পাগলের দল! সব

মণিকুন্তলা ঘাড় নাড়ে, সব।

—বুঝলে কী কোরে?

—তাদের পাগলামি দেখে।

—পাগলামি! কী দেখলে?

মণিকুন্তলা সলজ্জ হাসি হাসে। বলে, এ দেখবার জিনিষ নয়। এ বোঝবার।

—কী বুঝলে?

—সকলেই চেয়েছিল আমায় রাণী করতে।

—তারপর?

—তারপর দেখতেই পাচ্ছেন, আপনার সামনে বসে আছি।

—রাণী করতে পারেনি কেউ?

—পাগল! নেশাখোরের দল, নেশা গেল ছুটে, অমনি রাজাগিরিতে ইস্তফা দিয়ে পড়ল সরে।

—তা হলে? আমিও পাগল বল? নেশাখোরদের একজন? শোভাময় প্রশ্ন করে স্মিতমুখে।

—না। আপনাকে পাগল আমি বলি না। অতোখানি দুর্মতি হয়নি আমার আজও।

—কেন?

—আপনি তো রাণী করতে চান নি আমায়। একদিন কেন, এক লহমার জন্যেও নয়। কিন্তু তারা চেয়েছিল সারাজীবনের জন্যে। তাই তারা দেয় চম্পট তাদের রাণীকে ফেলে রেখেই।

শোভাময় হাসে। বলে পৃথিবীর চাকা ঘুরে চলে ঠিক একই ভাবে। রাজাগিরিতে ইস্তফা দিয়ে একদিন আমিও দেব ছুট। তখন তুমি এমনি হেসেই আমাকেও বলবে পাগল।

—কক্ষণও না। প্রতিবাদের ভঙ্গীতে ভেঙে পড়ে মণিকুন্তলা। সবেগে মাথা দুলিয়ে বলে, আপনাকে বলব পাগল!

—তবে কী বলবে?

মণিকুন্তলা কিছুক্ষণ ভাবে। তারপর বলে, জানি না। তবে আপনার মত মানুষ আমি দেখিনি কখনও।

শোভাময় একটুখানি হাসে। কিন্তু এ হাসি একেবারে অমলিন নয়। কোথায় যেন বেদনার ছায়া। বলে একটা প্রশ্ন করব, মণি?

—বলুন?

—মানুষ কেন আসে এখানে?

মণিকুন্তলা মুহূর্তকাল নীরব থাকে। তারপর বলে, জানেন না? আসে তাদের পঙ্কিল বাসনা মিটিয়ে যেতে।

—তারপর?

—তারপর যেদিন বাসনা মিটে যায়, চলে যায় তারা।

—আমিও সেই পথ অনুসরণ করব মণি, বাসনা মিটে গেলে আমার। মণিকুন্তলা অবাক হয়ে যায়। অবাক হয়ে বলে, আপনিও চলে যাবেন? বাসনা মিটে গেলে আপনার? কিন্তু কী আপনার বাসনা? অপরের বাসনা বুঝি। কিন্তু আপনি? কী আপনার বাসনা জানি না। কী কামনা বুঝি না। দিন আমার ঝোলা পূর্ণ কোরে, কিন্তু নেন না ফিরিয়ে এতটুকু।

—তবু আমি পেয়েছি মণি, প্রচুর পেয়েছি তোমার কাছ থেকে।

—জানি না, কী পেয়েছেন আপনি। কী দিতে পেরেছি আমি। মনে ত পড়ে না কিছু।

মণিকুন্তলা তাকিয়ে থাকে শোভাময়ের হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে, ভাব-বিহ্বল দৃষ্টি মেলে।

থাকতে না পেরে কথাটা মণিকুন্তলাই তোলে একদিন। প্রশ্ন করে শোভাময়কে, আপনি এখানে কেন আসেন শোভাময়বাবু? এপথ তো আপনার নয়?

শোভাময় তাকায় মণিকুন্তলার মুখের দিকে। বলে, যদি বারণ কর আসব না।

মণিকুন্তলার মুখ শুকিয়ে যায়। বলে, আমি বারণ করি না। সে ক্ষমতা আমার নেই। তবুও কেমন যেন মনে হয় এ কথাটা আপনাকে দেখে।... এপথ আপনার নয়, সেই প্রকৃতিও আপনার নয়। মানুষকে আপনি অসম্মান করতে পারেন না।

শোভাময় বলে, আমাদের দেশের সত্যদ্রষ্টারা বলে গেছেন, ভগবান বাস করেন সব মানুষের মধ্যেই। তোমার মধ্যেও বাস করেন, আমার মধ্যেও বাস করেন—

—আমার মধ্যেও? আমার মধ্যেও ভগবান বাস করেন? মণিকুন্তলা চমকে ওঠে।

—নিশ্চয়ই করেন। তোমার ভগবানই তোমার আসল রূপকে আমার চোখে ধরিয়ে দিয়েছেন মণি। সেখানে তুমি তো হীন নও। সেখানে তোমার মূল্য অনেক।

মণিকুন্তলা বসে ছিল। শোভাময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অকস্মাৎ সে লুটিয়ে পড়ল। মুখ-খানিকে গুঁজে সে কেঁপে উঠল ফুলে ফুলে। সুবিন্যস্ত কবরী ভেঙে পড়ল কাঁধের ওপর, পাক খেয়ে। শাড়ীর আঁচল স্থানভ্রষ্ট হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

শোভাময় ডাকল মণি! মমতাঝরা কণ্ঠস্বর।

মণিকুন্তলা সাড়া দিল না। কিন্তু কান্না বেড়ে গেল।

শোভাময় ঝুঁকে পড়ে কানের কাছে মুখ এনে ডাকে, মণি, শোন, কেঁদ না। তোমাকে আঘাত দেবার জন্যে আমি বলিনি কিছু। লক্ষ্মীটি ওঠ। কথা শোন আমার।

মণিকুন্তলা মাথা তোলে। উঠে বসে মুখ নীচু কোরে। চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল গাল বেয়ে। কিন্তু সে মোছে না। স্তব্ধ হয়ে থাকে হাত দুটিকে কোলের ওপর জড়ো কোরে রেখে।

—ব্যথা পেয়েছ মণি! শোভাময় আবার বলে।

মণিকুন্তলা ঘাড় নাড়ে।

—তবে? চোখে জল কিসের?

মণিকুন্তলা হাসে। বড় মলিন হাসি। বলে, এ জিনিষ ব্যথার চেয়েও বড়। ব্যথা আমি সইতে পারি। কিন্তু এ পারি নি। অসামাজিক জীব আমরা—তাই সবাই করেছে আমাদের অনাদর, করেছে ঘৃণা। ঘৃণাটাই পেয়ে এসেছি আজীবন। তারও বাইরে যে কিছু পেতে পারি এ ভাবতে পারিনি কখনও।

—এখন পেরেছ?

—হয়ত পেরেছি, হয়ত না। তবে মনের মধ্যে আলোর রেখা যেন দেখতে পাচ্ছি কিছুটা। আপনি এখানে আসেন, আমায় জ্ঞান বিতরণ করেন। পৃথিবীর সর্বদেশের ইতিহাস, সর্বকালের ইতিহাস শোনান। সভ্যতার উত্থান-পতন, মানুষের অগ্রগতির কথা সবই জেনেছি আপনার কাছে। মেয়েদের কত কথাই শুনি আপনারই মুখে। লক্ষহীরা, বাসবদত্তা—এঁদের সবের কাহিনী বার বার বলেছেন আমায়। এঁরা ছিলেন সুন্দরীশ্রেষ্ঠা, বারাঙ্গনাশ্রেষ্ঠা। কিন্তু এইটাই যে তাঁদের আসল পরিচয় নয়—তাঁরা যে নারী, তাঁরা যে শিল্পী, মহীয়সী তাঁরা—এই পরিচয়টাই তাঁদের তুলে ধরেছেন আমার কাছে। তখন বুঝিনি, এখন বুঝেছি। কেন? কেন এত কোরে শোনান তাঁদের কথা আমাকে। কিন্তু তবুও আমি অস্পৃশ্য। আপনারও...।

শোভাময় হাসে। কৌতুক কোরে বলে, অয়ি লোভাতুরা! এ-ক্ষোভ মিটবে তোমার ও'দিন। তোমায় আমি অশ্রদ্ধা করি না, মণি। রূপে, রসে ভরা পরম রমণীয় তুমি। তোমার মধ্যে এমন জিনিষের সন্ধান পেয়েছি আমি, যা সহজলভ্য নয়, যা দুর্লভ অপরের মধ্যে।

মণিকুন্তলা তাকিয়ে থাকে শোভাময়ের মুখের দিকে উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে।

শোভাময় বলে, তোমার কথা যখন ভাবি, তখন বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাই। কিভাবে যে এ-পথে এলে তুমি, ভেবে পাই না। এ-জীবন তোমাতে শোভা পায় না মণি। কী কোরে এলে এ-পথে বলতে পার?

—হয়ত পারি। কিন্তু বিশ্বাস করবে কে? আমার মানসিক বিকৃতির সঠিক কারণটিকে যাচাই কোরে দেখবেই বা কে?

—আমি দেখব। তোমার কথা অবিশ্বাস করব না আমি।

মণিকুন্তলা নিরুত্তর।

শোভাময় তাড়া দেয়, চুপ করে রইলে যে?

—শুনলে বীতশ্রদ্ধ হবেন আপনি।

—এই পরিবেশে তোমায় পেয়েও শ্রদ্ধা যখন আছে অচঞ্চল, তখন অতীতের কোন ভুলের কাহিনী শুনে হঠাৎ সে চঞ্চল হয়ে উঠবে না জেন।

মণিকুন্তলা চকিতে মুখ নামিয়ে নেয়। তারপর নতমুখেই বলে, আপনাকে অবিশ্বাস করবার মত ধৃষ্টতা আমার নেই। তাই আপনার কাছে গোপন করব না কিছু। ছাব্বিশ বছর আগে আমাকে কোলে পেয়ে বাপ-মা হয়ত খুশী হয়েছিলেন খুব বেশী, তাই আজ দুঃখটাও তাঁদের তেমনিই বেশী। আদুরে মেয়ে ছিলাম বাপ-মা-এর, তাই সবাই নাম রেখে-ছিলেন আহ্লাদী।

—আহ্লাদী? খাসা নামটি তো! শোভাময় হেসে বলে।

মণিকুন্তলা বলে, ছেলেবেলায় চঞ্চল ছিলাম খুব। সেটা শাসন করতে শিখিনি তখন। বরং সুখ পেতাম বলে প্রশ্রয় দিয়েছি, আশ্রয়ও নিয়েছি গোপনে। ছেলেবেলার এ সব গোপনীয়তা অপ্রকাশ থাকে না বেশীদিন। তাই ধরা পড়ে গেলাম সকলের কাছে। বাপ-মা ক্ষমাশীল। তাঁরা পরামর্শ কোরে বিয়ের নামে পাচার কোরে দিলেন আমায় এক অজ পাড়াগাঁয়ে। সবাই জানত, পাত্র বনেদী বংশের ছেলে, জমিদার বংশের ছেলে। খেয়ে-দেয়ে গয়না-গাঁটি পরে সুখে থাকবে মেয়ে। কিন্তু হায়রে, জমিদারী আর জমিদার! বখা ছেলে। জীবনের মাঝপথেই যৌবনটিকে খুইয়ে বসেছেন নিঃশব্দে। নির্বাণ আগ্নেয়গিরি। শুধু নেশার জড়পিণ্ড একটা। বিয়ের পরেই সংযম শিক্ষা দিতে সুরু করলেন স্ত্রীকে। মিল হল না সুরুতেই। তার ওপর ইন্ধন যোগাল তার এক জ্ঞাতি ভাই। ছেলেটি মন্দ নয়। তার লোভ পড়েছিল আমার ওপর।

শোভাময় একটু হাসে। বলে, দোষ দিই না তাকে। এমন জিনিষে লোভ না পড়ে কার?

মণিকুন্তলা কটাক্ষ করে। বলে, তেমন লোক সংসারে একেবারে বিরল নয়। কিন্তু যাক, ছেলেটি ঘনিষ্ঠতা করল আমার সঙ্গে গোপনে। তারই মুখে প্রকাশ পেল সব। জমিদার বংশের ইতিবৃত্ত। শুনে জ্বালা ধরে গেল সারা দেহে। একটা প্রতিশোধস্পৃহা জেগে উঠল মনে। সেই জ্ঞাতি ঠাকুরপো বার কোরে নিয়ে এল আমায় একটি রাতের দুর্বলতায়। কিন্তু বলুন তো, দোষ আমার কোথায়?

জবাব না দিয়ে শোভাময় একটু হাসল শুধু।

মণিকুন্তলা বলে ওঠে, পাড়াগাঁয়ের সেই দূষিত দুর্গ ছেড়ে এসেছি বলে, আমি এতটুকু অনুতপ্ত নই শোভাময়বাবু। দাম্পত্য জীবনে পবিত্র আমরা ছিলাম না কেউ—না মনে, না দেহে। তার চেয়ে এই আমি স্বস্তিতে আছি অনেক।

শোভাময় বলে স্মিত শান্ত মুখে, এ যৌবনের স্বস্তি। কিন্তু এই যৌবন শেষে তোমার এ স্বস্তি থাকবে কোথায় মণি?

মণিকুন্তলা মাথা হেঁট করে।

শোভাময় বলে ধীরে ধীরে, প্রেমের পূজারী মেয়েরা। প্রেমময় জীবন তাদের। উপযুক্ত ক্ষেত্র পেলে এ প্রেম হয় অংকুরিত, মঞ্জুরিত, পুষ্পিত। না পেলে হয় বিপথগামী। তোমার অন্তরেও প্রেম ছিল কিন্তু ক্ষেত্র ছিল না। তাই অংকুরিত প্রেম মঞ্জুরিত হয়নি। তাই নিষ্ফলতা তোমার।

মণিকুন্তলা শিউরে ওঠে। বলে, হয়ত তাই। একটু থেমে প্রশ্ন করে শোভাময়কে, কিন্তু অংকুরিত প্রেম যদি ক্ষেত্র খুঁজে পায়?

—তাহলে সন্ধান পাবে পথের।

মণিকুন্তলার চোখ দুটি বুজে আসে ধীরে ধীরে। তারপর বলে ক্লিষ্টস্বরে, জানি না, ছাব্বিশ বছর পর আবার কী সুপথের সন্ধান পাব জীবনে।

তারপর এ ক'দিন আসেনি শোভাময়। এমন ব্যতিক্রম হয় না তার। মণিকুন্তলা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বিকাল থেকে প্রতীক্ষা কোরে কোরে ক্লান্ত হয়ে ওঠে। তারপর সময় যখন পার হয়ে যায়, ব্যথায় বুক ভেঙে পড়ে তার। শোভাময়ের দেখা নেই। অস্থির হয়ে পড়ে মণিকুন্তলা। আশংকায় কালো হয়ে ওঠে মুখ। অসুস্থ হয়ে পড়েন নি তো?

রাতের বাঁধা খদ্দের ছিল আরো মণিকুন্তলার। এখনো আছে। যাদের ওপর তার নির্ভর। যাদের নেকনজরের ওপর তার ভবিষ্যৎ। কিন্তু কি হয়েছে মণিকুন্তলার। এই ক'টি দিনে কোথায় যেন এক বিষম পরিবর্তন ঘটে গেছে ওর ভিতরে। রাতের অতিথি আর আমল পায় না। নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়। ভবিষ্যতের কথা ভাবে না মণিকুন্তলা, ভাবতে পারে না। ভাবতে গেলে ভয় হয়। তবু নিরাশ করে তাদের, ফিরিয়ে দেয়। আর ভাবে একজনের কথা। প্রত্যাশা নিয়ে বসে থাকে। মণিকুন্তলা ব্যাকুল। বুকের মধ্যে টিপ্‌টিপানির শেষ নেই।

দিনকতক পরেই এসে উপস্থিত হয় শোভাময়। মণিকুন্তলা ছুটে গিয়ে অভ্যর্থনা করে তাকে। বলে, এ ক'দিন আসেন নি কেন? আমি রোজই পথ চেয়ে বসে থাকি আপনার।

—জানি। শোভাময় হাসে।

—জানেন, অথচ আসেন না! কী নিষ্ঠুর আপনি! অভিমানে জল এসে যায় মণিকুন্তলার চোখে।

—সত্যিই নিষ্ঠুর আমি মণি। সব জেনেও আসতে পারিনি তোমার কাছে।

—কেন? দুঃখ দিতে চান আরও? দুঃখ দেওয়া স্বভাব বুঝি আপনাদের?

শোভাময় উত্তর দেয় না। মণিকুন্তলার মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু হাসে।

([illegible])

সমুদ্রে যাত্রী

॥ আশরাফ সিদ্দিকী ॥

ছোট দীঘি, ছোট নদী ছোট জলাটির ধারে ধারে
কেটে গেল সারাবেলা কত না সংকীর্ণ অভিনয়ে!
মদমত্ত যৌবনের প্রগলভ উচ্ছ্বাস শেষে আজ
বসে বসে গণে চলি কি পাথেয় হয়েছে সঞ্চয়।
কোথাও সঞ্চয় নেই! শুধু ধূলি—শুধু বালুচর—
চেয়েছি চন্দ্রের রশ্মি। চাইনি সূর্যের উপহার!
সমুদ্র সন্তান আমি—কি আশ্চর্য মায়াবী মায়ায়
মৃত্যু ঘুমে কেটে গেছে প্রজ্জ্বলন্ত গতির প্রহর!
সমুদ্রে চলেছি আজ। সমুদ্র ডেকেছে
আজ মোরে—
তোমাদের ছোট দীঘি—ছোট পথ মাঠ বন ছেড়ে
সমুদ্রে চলেছি তাই! যদি বাঁচি স্বর্ণ কুম্ভ ভরে
আনবো সমুদ্র বারি; ঢালবো সবার দ্বারে দ্বারে।
অন্য প্রাণ—অন্য কথা—অন্য গান—
অন্য এষণায়—
জরাজীর্ণ হে পৃথিবী—আজ আমি
নিলাম বিদায়॥

চেহারা ও চরিত্র

॥ নারায়ণ চৌধুরী ॥

ইংরেজীতে একটি কথা আছে—Appearances are deceptive. চেহারা দেখে মানুষের ভিতরকার চরিত্র বোঝা যায় না। কিন্তু সত্যই কি তা-ই? চেহারা, বিশেষতঃ মুখমণ্ডল, মানুষের প্রকৃত মনোভাব গোপনে সত্যই কি সমর্থ? আমার তো মনে হয় না। উপরের ইংরেজী আপ্তবাক্যের সারবত্তায় সন্দিহান আর একটি আপ্তবাক্য ইংরেজী ভাষাতেই আছে—face is the index of the mind. মুখ মনের দর্পণস্বরূপ। জগৎ সংসারের অভিজ্ঞতা থেকে এই কথার সত্যতা আমরা মোটামুটি মেনে নিতে পারি। তবে প্রথমোক্ত বাক্যের মধ্যে যদি কোন সত্য না-ই থাকবে তবে সে বাক্যের আদৌ উদ্ভাবন হবে কেন। এর পিছনেও নিশ্চয় মনুষ্যচরিত্র-অনুধাবনের অভিজ্ঞতার ফল সামান্য পরিমাণে হলেও গ্রথিত রয়েছে।

এ দুয়ের মধ্যে একটা সমন্বয় অসম্ভব নয়। দুটি বাক্যের অন্তর্নিহিত সত্যকে একত্র করে আমরা বলতে পারি—মানুষ যেখানে সচেতনভাবে এবং সক্রিয় অভিপ্রায়ের দ্বারা স্বীয় মনোভাব গোপন করার চেষ্টা করে তখন চেহারা চাতুর্য করতে পারে বটে, তবে সে রকম কোন অভিপ্রায় মনের ভিতর ক্রিয়াশীল না থাকলে সাধারণতঃ চেহারা কাউকে প্রবঞ্চিত করে না। মানুষের মুখে দ্যোতনাটাই হচ্ছে তার স্বভাবের। তার চোখ মুখ নাক ঠোঁট কপাল চিবুক গাল সবই তার অন্তর-প্রকৃতিকে বাইরের দিবালোকে উদ্‌ঘাটিত করে দেয়। যে ব্যক্তি অহংকৃত-মনোভাবসম্পন্ন, তার স্ফীত গণ্ডদেশের মধ্যে অহঙ্কারের ব্যঞ্জনা রয়েছে। দৃঢ় চরিত্র ব্যক্তির চাপা চিবুকে তাঁর সংকল্পের কঠিনতার পরিচয় পাওয়া যায়। হাস্যরস আর কৌতুকবুদ্ধি যে মানুষের ভিতর সহজাত, সে মানুষের বাঁকা ঠোঁটের ভঙ্গী দেখলেই তার স্বভাব কতকটা অনুমান করা যায়। ক্রোধী ব্যক্তির চোখ ক্রোধের অভ্রান্ত নিশানা। অভিমানীর (বিশেষ, অভিমানিনীর) অভিমান প্রবণতা নাসিকা গহ্বরের স্ফীতিতে অবধারিত মুদ্রিত থাকে। যে ব্যক্তি প্রেমিক, তার চোখের অতলতায় অতল রহস্যের সংকেত। তার পাতলা ঠোঁটের ডৌলেও তার হৃদয়মাধুর্যের সংবাদ অনভিব্যক্ত নয়। যে ব্যক্তি নেতৃত্ব প্রয়াসী, অর্থাৎ অনেকের উপর খবরদারী করতে পারাটাকে জীবনের চূড়ান্ত সার্থকতা বলে মনে করে, তার চোয়ালের মোটা হাড়ে আর গলার ভারী আওয়াজে সেই উচ্চাশার আমেজ পাওয়া যায় ইত্যাদি।

এই রকম আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। তবে চেহারার সঙ্গে মনোভাব বিশেষের সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টায় সকলে একই অভিমত পোষণ করবেন এমন আশা করা যায় না। আমার নিকট পুরু ঠোঁট লোভের প্রতীক, কেউ কেউ সেটাকে অনমনীয় ব্যক্তিত্বের পরিচায়কও মনে করতে পারেন। কারও কারও নিকট সেটা চরিত্রের স্থূলতার ইঙ্গিত। এই তিন বিকল্প অভিমতের মধ্যে কোনটি গ্রাহ্য সে বিষয়ে জোর করে কিছু বলা কঠিন। তবে প্রকৃত তথ্য বোধ হয় এই যে, এই তিনেরই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য স্থূল অধরোষ্ঠের মধ্যে একীভূত থাকা সম্ভব। যে ব্যক্তি বহু মানুষের যার কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা সবিশেষ পোক্ত হয়ে গেছে, মুখ দেখে চরিত্র অনুমানের তাঁর কেমন একটা সহজ পটুতা জন্মে যায়। হয়ত মুখাবয়বের যে কোন একটি বৈশিষ্ট্য-চিহ্ন থেকে একাধিক চরিত্র বৈশিষ্ট্য যুগপৎ আঁচ করে নেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন হয় না। তারপর সব জড়িয়ে মানুষটির স্বভাবের একটি হিসাব তার মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করে। সে রূপ একটা যৌগিক রূপ—অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যের সমবায়ে তার আকার। মানুষের স্বভাব যেমন বিচিত্র তেমনি বহির্লক্ষণ থেকে সেই স্বভাব অনুমান করতে হলেও বিচিত্র প্রক্রিয়ার শরণ নিতে হয়। মুখের ডৌল থেকে মনের দৌড় আঁচ করার মত কৌতূহলোদ্দীপক ব্যসন আর কিছু নেই। জগতে সকল প্রকার studyর মধ্যে character-studyই হল সবসেরা স্টাডি।

ওদেশের সাহিত্যের যে কোন উপন্যাস হাতে নিলেই দেখা যাবে, লেখক একপ্রস্থ চেহারার বর্ণনা ছাড়া কোন চরিত্রকেই পাঠক সমক্ষে উপস্থাপিত করেন না। সে এমন খুঁটিনাটি বর্ণনা যে, গল্পলোভী পাঠকের তাতে হাঁফ ধরে যায়। চোখের তারার ঈষৎ পীতাভা থেকে দন্তপংক্তির উচ্চাবচতা কিংবা চিবুকের তিল কিছুই লেখকের সাগ্রহ মনোযোগের আওতা থেকে বাদ যায় না। নাটকের কুশীলব উপস্থাপনেও একই প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়। সেখানে চেহারার খুঁটিনাটির প্রতি মনোযোগ যেন আরও বেশী মাত্রায় চোখে পড়ে। তার কারণও অবশ্য একটা আছে। নাটক মঞ্চস্থ হবার জন্য রচিত হয়। নাটকের প্রয়োগকর্তা নাট্যকারের এই সব বর্ণনা থেকে কুশীলবগণের সম্ভাবিত চেহারার একটা হদিস পান এবং সেইভাবেই কুশীলবদের সজ্জিত ও মঞ্চোপরি উপস্থিত করেন। এ সব আপাত অনাবশ্যক বর্ণনা পাঠে পাঠকের যতই বিরক্তির উদ্রেক হোক, খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে এ-জাতীয় আকৃতি বর্ণনার একটা বিশেষ উপযোগিতা আছে। ওই আকৃতির মধ্যেই চরিত্রগুলির প্রকৃতি নিহিত আছে। বর্ণিত পাত্র-পাত্রীসমূহের দেহাবয়বগত বৈশিষ্ট্য বিধিমতে অনুধাবন করলেই তাদের জীবন উপন্যাসে কিংবা নাটকে কোন্ পরিণামের অভিমুখী হবে তা বোঝা কঠিন নাও হতে পারে। লেখক অযথা এ সব বর্ণনার দ্বারস্থ হন না। তার সমস্ত কাজের পিছনেই একটা পরিকল্পনা থাকে। বর্ণনার বেশীর ভাগ মুখসংক্রান্ত, কিন্তু বর্ণনা মৌখিক হলেও লেখকের উদ্দেশ্যের আন্তরিকতায় সন্দেহ করবার এতটুকু অবকাশ নেই।

আমাদের সাহিত্যে নায়ক-নায়িকার কিংবা অন্যান্য পাত্রপাত্রীর চেহারার বর্ণনার তেমন দেওয়াজ নেই। অন্ততঃ ইউরোপীয় উপন্যাস-সুলভ সবিস্তার ও সাড়ম্বর বর্ণনা যে এখানে অনুপস্থিত সে অতি স্বতঃসিদ্ধ। হালে অবশ্য এই অবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু সব জড়িয়ে বলতে পারা যায় যে, পাত্রপাত্রীর আকৃতি বর্ণনায় আমাদের লেখকেরা অল্পবিস্তর উদাসীন। ঊনিশ শতকের উপন্যাসগুলিতে নায়ক-নায়িকার চেহারায় যে বর্ণনা সচরাচর দেওয়া হত তার মধ্যে তেমন বৈশিষ্ট্য ছিল না। সে সব বর্ণনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের সূত্র অনুসরণ করে চলত। নায়ক হলেই কেউ শালপ্রাংশু, মহাভুজ ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ হবে, নাসায় ব্যক্তিত্ব ঠিকরে পড়বে—এ যেন একেবারে অবধারিত ছিল। অন্যপক্ষে নায়িকার বর্ণনায়ও একই ধরণের কবিজন প্রসিদ্ধির সংস্কার অনুসরণ করা হত। নায়িকা হলেই তার দুধে-আলতার মত রঙ হবে, আজানুলম্বিত কেশপাশ থাকবে, মৃণাল-সদৃশ বাহু আর খঞ্জনীর মত নয়ন হবে,—এও সমান অবধারিত ছিল। তিল তিল সৌন্দর্য আহরণ করে বিধাতা যাকে তিলোত্তমা করে গড়েন নি, সে রকম কোন নারীর নায়িকার উচ্চ পদে প্রমোশন পাওয়ার কোনই সম্ভাবনা ছিল না আগেকার দিনের উপন্যাসাদিতে। অন্য পরে কা কথা, এমন যে বঙ্কিমচন্দ্রের মত দুর্ধর্ষ লেখক তিনিও নায়ক-নায়িকার রূপ বর্ণনায় মোটামুটি এই গতানুগতিক ধারারই অনুসরণ করেছেন। তিনি তৎকালীন অভিজাত সম্প্রদায়ের পরিধি থেকে তাঁর চরিত্রসমূহের আদল গ্রহণ করেছিলেন, সুতরাং তাদের চেহারায়ও একটা বিশেষ শ্রেণী-স্বরূপের ছাপ অমোচনীয়রূপে মুদ্রিত ছিল। এর সঙ্গে পুরাতন সংস্কৃত কবিদের ধারণার কতকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথে এসে বর্ণনার রীতিতে কিছু পরিবর্তন হয়েছে। তবে গোড়ার দিকের উপন্যাসগুলিতে তিনিও মোটামুটিভাবে সৌন্দর্যের লৌকিক মানকেই অবলম্বন করেছেন। শেষের দিকের লেখায় অবশ্য তিনি আর পূর্ব-অভ্যাসে স্থিত থাকেননি, বর্ণনার নূতন রীতি অবলম্বন করেছিলেন। এই নূতন পর্যায়ে ব্যক্তিত্ব রূপকে অনুসরণ করেনি, রূপ ব্যক্তিত্বকে অনুসরণ করেছে। অর্থাৎ বর্ণিত চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্বের দ্বারা রূপ নির্দিষ্ট হয়েছে। এ কথার প্রমাণ শেষের কবিতায় অমিত রায়ের রূপ ও সজ্জা বর্ণনা, 'ল্যাবরেটরী' গল্পে মোহিনীর সৌন্দর্য-ব্যাখ্যান। রবীন্দ্র-পরবর্তী উপন্যাসসমূহের ভিতর সৌন্দর্য বর্ণনার নূতন ধারাধরণ অনুসৃত হলেও সাধারণভাবে বলা যায় যে, নায়ক-নায়িকা কিংবা অন্যান্য চরিত্রের আকৃতি বর্ণনায় বাঙালী লেখকদের মধ্যে তেমন কোন তীব্র সচেতনতার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বোধ হয় এই ঔদাসীন্যের মূলে জাতীয় সংস্কার অনেকখানি পরিমাণে কাজ করছে। মানুষের দেহসৌষ্ঠবের প্রতি ঔদাসীন্য ভারতীয় স্বভাবের একটা বৈশিষ্ট্য বললেও চলে। আমরা মানুষের আকৃতি দেখি না, প্রকৃতি দেখি। মানুষের বহিরঙ্গ রূপের প্রতি আমাদের চোখ নেই, তার অন্তরঙ্গ সত্তায় আমরা নিবদ্ধদৃষ্টি। অবশ্য এ কথা বলার মানে এ নয় যে, আমরা অপরের মুখের শোভা দেখিনা। মুখের শোভাও দেখি, আর মুখের শোভা দেখে মনের ধাঁচও আঁচ করবার চেষ্টা করি। তবে লোকের অবয়বের বাহ্যিক পারিপাট্য অর্থাৎ বেশভূষা ধরাচূড়া ইত্যাদির প্রতি যে আমরা তেমন নজর দিই না সে কথা এক প্রকার প্রতিবাদের শঙ্কা না করেই বলা চলে।

আধুনিককালের সাহিত্যে শুধু রূপের খুঁটিনাটি বর্ণনা করেই লেখক তৃপ্ত হন না, সেই সঙ্গে রূপের বহির্বাস অর্থাৎ পোশাক-আশাক প্রসাধন ও মণ্ডনেরও সবিস্তার বর্ণনা থাকে। একালের লেখক এই প্রক্রিয়ার দ্বারা চরিত্রগুলির একটা আভাস পূর্বাহ্নেই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। পোশাকের সাহায্যে প্রবণতা বোঝা যায়, রুচির আদল পাওয়া যায়। প্রবণতা আর রুচির সঙ্গে আচরণের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। সুতরাং খতিয়ে দেখতে গেলে আচরণেরও একটা পূর্বাভাস এর ভিতর দিয়ে মেলে। আধুনিক কথা-সাহিত্যিক ও নাট্যকারগণ এই যে রূপ আর দেহসজ্জা বর্ণনায় প্রভূত যত্ন, উদ্যম আর মনোযোগ (এবং সেই সঙ্গে জায়গা) ব্যয় করে থাকেন সেটি আপাতদৃষ্টিতে প্রয়োজনাতিরিক্ত বলে মনে হলেও তার পিছনে একটা গূঢ় শৈল্পিক অভিপ্রায় প্রায় সব সময়েই ক্রিয়াশীল থাকে। এই খুঁটিনাটি পরায়ণতায় যেমন

অন্যায়—তবু উপায় ছিল না।

মানুষের কৌতূহল সময় সময় মানুষকে কতখানি যে বেহায়া করে তোলে তার প্রমাণ এই মুহূর্তেও অনুভব করছিলাম মর্মে মর্মে।

কিন্তু তবু আমার কোনো উপায় ছিল না। আমি বহুবার চেষ্টা করেছি অন্যমনস্ক হবার—বহুবার জানলা দিয়ে বাইরের দিকে আমার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। পরমুহূর্তেই আবার চোখ গিয়ে পড়েছে ঐ মুখখানির ওপর।

ভদ্রমহিলা যে অপরূপ সুন্দরী, তা নয়। বা তাঁর হাবভাবে এমন কিছু উৎকট ভাবভঙ্গী নেই যে তার জন্যে তাঁর দিকে বারে বারে আমাকে তাকাতেই হবে, তবু—

তবু কি যেন ছিল ওর মুখে। খুব একটা পরিচিত আদল।

ভদ্রমহিলা বসেছিলেন ওপাশের বেঞ্চিতে। পাশে স্বামী। এদিকে ভদ্রমহিলার কোলে মাথা দিয়ে পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে শিশুপুত্রটি। মুখটি বড় সুন্দর। ঠিক যেন একথোকা যুঁই।

ট্রেণ ছাড়বার এক মিনিট আগে গাড়ীতে উঠেছিলাম। শনিবার। দারুণ ভীড়। তারপর শ্রীরামপুর, চন্দননগর পার হয়ে গেলে ভীড় কমতে লাগল। কোন রকমে একটু জায়গা পেয়ে গেলাম এদিকের বেঞ্চিতে।

এতক্ষণ ভীড়ে ভাল করে লক্ষ্য করবার ফুরসৎ পাইনি, এই কিছুক্ষণ হল পেয়েছি।

প্রথম নজরেই বুকের রক্ত চমকে উঠল—কাজল না?

ওর ডাক নাম ছিল কাজল। ভালো নাম মালবিকা। অদ্ভুত সুন্দর ছিল ব জলের চোখ। সেই চোখ নিয়ে যতবার লুকিয়ে কাব্য করে ওকে চিঠি লিখেছি, ততবারই ও ধমক দিয়ে উত্তর দিয়েছে। উত্তর দিয়েছে এই বলে, দোহাই তোমার, বরঞ্চ পোষ্ট কার্ডে দু লাইন লিখে কুশল সংবাদ নিও, তবু সাড়ম্বরে স্তোক-গাঁথা গেঁথ না। ওটা বরদাস্ত করতে পারি না।

এটা ছিল আমাদের কলেজী জীবনের সময়ের কথা। তারপরও যোগাযোগ ছিল কিছু-দিন। তারপর? তারপর সব হারিয়ে গিয়েছে। শুধু হারায়নি দুটি জিনিস আমার কাছে,—তার লেখা চিঠিগুলি আর তার ঐ দুটি চোখের ভাষা।

অতর্কিতে আজ এই আজিমগঞ্জগামী ট্রেণের থার্ড ক্লাশ কম্পার্টমেন্টে বহুদিন আগের ঠিক সেই মানুষটিকেই পেলাম নাকি?

আজ আর প্রত্যাশা আমার কিছু নেই। ঘামের ছোপধরা মার্কিণের পাঞ্জাবী গায়ে শুকতলা ওঠা বিবর্ণ স্যাণ্ডেল পায়ে, হাতে চটের থলিতে দুটো সস্তা কপি, ময়লা লুঙ্গি, আর তেলচিটে গামছা নিয়ে বাড়ী চলেছি। সেখানে দুটি কন্যা এবং একটি পুত্র আকুল আগ্রহে আমার পথ চেয়ে আছে। তবু এই মুহূর্তে সব ভুলে গিয়ে কেবল ঐ একটিমাত্র চিন্তা আমাকে পেয়ে বসেছিল,—কাজল।

হাঁ, ও কাজল ছাড়া আর কেউ নয়। একদিন মোহাচ্ছন্ন যে চোখ তাকে আবিষ্কার করেছিল, আজ এতদিন পরেও সে চোখ তাকে চিনতে ভুল করেনি তাহলে!

মনটা খুসীতে ভরে উঠল এবং সেই মুহূর্তেই মনে হল কাজলের কাছ থেকেও অনুরূপ একটি প্রতিদান প্রয়োজন। আজ আর তার ওপর দাবী করবার কিছু নেই। তবু যদি সে আমায় চিনতে পারে—ভাবে-ভঙ্গীতে, আভাসে-ইঙ্গিতে সেই স্বীকৃতিটুকুই যদি ব্যক্ত করে তাহলেই যথেষ্ট। ছেলেবেলার মুখস্থ করা ছড়ার ভুলে-যাওয়া সব ছত্রের মধ্যে যদি একটা অসমাপ্ত ছত্রও মনে পড়ে।

কিন্তু মুশকিল, কাজলের সঙ্গে একটিবারও তো চোখোচোখি হচ্ছে না!

চোখোচোখি হচ্ছে না—এই কথাটা যখনই মনে হচ্ছিল, তখনই কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠছিলাম। কি করলে চোখোচোখি হতে পারে? বহুদিন আগে প্রথম যৌবনে তরুণী মেয়ের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে যতকিছু ছেলেমানুষী করেছি—আজ অকস্মাৎ এই প্রায় প্রৌঢ় বয়সে সেই সব সুচতুর স্মৃতি যেন জীবন্ত হয়ে আবার দেখা দিতে লাগল।

আমি এই চলন্ত ট্রেণের মধ্যে সহসা খুব মুখর হয়ে উঠলাম। কোনও কিছু নেই পাশের যাত্রীদের কথোপকথনের মাঝে ঢুকে পড়ে চেঁচিয়ে মতামত জাহির করতে লাগলাম। কখনো লোককে হাসাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে একান্ত অশোভন ভাবেই নিজেই হো হো করে হেসে উঠলাম। সামনের বেঞ্চের ভদ্রলোকের হাত থেকে খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে চলতি সিনেমার একটা বিজ্ঞাপনের ওপর তীব্র রসাত্মক মন্তব্য করে বসলাম। সিগারেট বা বিড়ি খাওয়ার অভ্যাস নেই, তবু হঠাৎ একটা পানওলা উঠতেই তার কাছ থেকে একটা সিগারেট কিনে অন্যের দেশ-লাইয়ের কাঠিতে ধরিয়ে নিয়ে টান দিতে দিতে একটি প্রেমের গান বেসুরো গলায় গুণ গুণ করে গাইতে লাগলাম।

কিন্তু তবু কাজল ফিরে তাকাল না।

তখন মন আমার আরও চঞ্চল হয়ে উঠল। ট্রেণ ছুটে চলেছে। কোন্ ষ্টেশনে না জানি ও নেমে যাবে। কিন্তু তার আগে ও শুধু একবার আমার দিকে তাকিয়ে যাক। ও আমায় চিনতে পারল কিনা এইটুকু জানতে পারলেও যথেষ্ট।

ট্রেণ এসে দাঁড়ালো ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে। ব্যাণ্ডেল জংসন। এখানে গাড়ী দাঁড়াবে দশ মিনিট। মনে মনে ভাবলাম, এই এক সুযোগ ওরা বসেছে দরজার কাছেই।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম দরজার কাছে হ্যাঁচকা টান দিয়ে দরজা খুলে লাফ দিে নামলাম প্ল্যাটফর্মে। এমন লাফিয়ে বহুদি নামিনি।

প্ল্যাটফর্মে নেমে একটু দূরে গি কাজলের দিকে তাকালাম। না, এবারও ও লক্ষ করেনি। স্বামীর সঙ্গে গল্পে মশগুল। এগি গেলাম আরও খানিকটা।

—এই চা!

এক ভাঁড় চা কিনলাম। বড্ড গরম। পা থেকে রুমাল বের করে ধরলাম। আস্তে আ ফু দিয়ে দিয়ে চা খেলাম। দেখা হয়ে বিনয়ের সঙ্গে। সুরু করল গল্প। হঠাৎ এ সময়ে গার্ডের হুইসল বাজল। চমকে উঠল দুজনেই। ওদিকে সিগন্যালও দিয়ে দিয়েছে

(শেষাংশ ৩০২ পৃষ্ঠায়)

কয়লা খাদের নীচে

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আলো আঁধারির আবছায়ায় ঝিমঝিম বৃষ্টির মাঝেই চুপি চুপি চোরের মত বেরিয়ে যাচ্ছিল গোরাচাঁদ। অনেকক্ষণ থেকেই ইয়ার বক্সীর দল শ্যামলাল, বাজবাহাদুর মহীউদ্দীন এদিক-ওদিক করছে। দু-একবার শিস্ দিয়েছে, ঢিল ছুঁড়েছে, ইশারাও করেছে গাছের আড়ালে লুকিয়ে। একে শনিবার, তায় হপ্তার দিন, ট্যাঁকে রেস্তও কিছু আছে। এমন-দিনে কানে কানে যদি দু-একটা রঙ্গীণ ফষ্টিনষ্টিই না হলো, যদি কবোষ্ণ তাড়ির ভাঁড়ের সাথে মৌতাতী মৌজই না জমলো তবে...। আর আজই কিনা বিলাসীর যত রঙ্গরসের দিন। আজ তাকে নিজের হাতে তোয়াজ করে তামাক সেজে খাইয়েছে বিলাসী, গরম গরম চানাচুরের সঙ্গে চা, আদর সোহাগ জানিয়ে আবদার ধরেছে সে, আজ তারা সিনেমায় যাবে—মহাপ্রভুর কথা না কি ছবিতে দেখাচ্ছে।

গোরাচাঁদ ফোড়ন কেটেছিল—তুই যে ভদ্দর লোকের ইস্তিরী বনে গেলি, সেজেগুজে শনিবারে চল্লি বায়োস্কোপে—

বাঃ তুমিই কি অভদ্রলোক নাকি, এমন একটা গোটা আস্তো জলজ্যান্তো মানুষ খাটুক না অসুরের মত ঐ বাবুমশায়রা। সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকায় বিলাসী গোরাচাঁদের পেশীপুষ্ট দেহের দিকে, প্রতিটি রেখায় যেন মাদকতা মাখানো আছে গা ঘেঁসে বসে ঘন হয়ে। তার মনের ইচ্ছে যে, আজ কিছুতেই গোরাচাঁদকে সে যেতে দেবে না। ওদিকে গোরাচাঁদ অনেকক্ষণ থেকেই উসখুস করছে।

বিলাসী বলে—যাবে ত ঠিক বলো, কাপড়টা ছেড়ে আসি, চুলটাও আঁচড়াতে হবে।

হুঁঃ সঙ্গে শুধু একটা শব্দ করে গোরাচাঁদ।

বিলাসী যেই ঘরে ঢুকেছে আর সেই অবসরে গোরাচাঁদ দিয়েছে চম্পট্।

আর শনিবারের ভরসন্ধেবেলায় চম্পট দেওয়ার মানে সেদিন সারারাতে ত তার ঘরমুখোই হবে না, পরের দিন কখন ফিরবে সেটাও অনিশ্চিত—তার উপর যদি জোরে ডিউটি বা ওভারটাইম থাকে তাহলে ত কথাই নেই, ফিরতে সেই বেলা তিনটে, প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার ধাক্কা।

গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করে বিলাসীর, মানুষটার শুধু ভিতরকার মনুষ্যত্বটাই নাজেহাল হবে না, বাইরের শরীরটাও যেন ধ্বসভাঙা পঙ্ক-কুণ্ড হয়ে উঠবে। আর তার কি কপাল, সেই মানুষটাকে নিয়েই তাকে চিরকাল ঘর করতে হবে—নিজের সাধেই ত গলায় ফাঁদ পরেছে সে।

শ্যামলাল গোরাচাঁদকে দেখেই বললে—সত্যি, তোর মত মেনীমুখো আর দেখিনি, আমাদের ঘরেও মেয়েছেলে আছে, সোমত্ত পুরুষ দেখলে তারাও গলে যায়, আদর যত্ন করে—হ্যাঁ, মেয়েমানুষ মেয়ে-মানুষের মতই থাকো, বেফাঁস কিছু বললেই মরদ্ কা বাত এক কোতকাতেই কাত।

বাজবাহাদুর পূর্ণিয়া জেলার লোক, হেসেই অস্থির, ভাঙা বাংলায় বললে—লছমী বোলে যে বিলাসী দিদি বহুত খাঁটি মেইয়ে, গোরাদাদাকে ভেড়া বনায় দিয়া—

মহীউদ্দীনই শুধু কিছু বললে না—রাবেয়ার শুকনো মুখ সে দেখে এসেছে, ছেলেটার গায়ে কি বেরিয়েছে—জোর জ্বর, তড়কা হচ্ছে, তার উপর তার নিজের এখন তখন হাঁসফাঁস করছে, ভাগ্যিস্ বিলাসী আছে পাশে তাই ভরসা।

আমাদের গোরাচাঁদ নামে গৌরচন্দ্র হলেও রূপে রংএ গৌরাঙ্গ ত নয়ই বরং ষণ্ডাগুণ্ডা কালো কালো একটা নওজোয়ান্ কালা পাহাড়েরই দ্বিতীয় সংস্করণ ছিল। কয়লা খাদের কুলিজীবন ত একেই বেপরোয়া ও ডাকাবুকো তারপর কাঠগোয়ার্তুমি গোরা-চাঁদের গোঁ ছিল ভীষণ। তবে মানুষটার মেজাজ ছিল দিলদরিয়া, বিশেষ করে তাড়ি বা পচাইএর মুখে আর কাজ করবার ক্ষমতা ছিল অসীম। আর একটা দোষই বলো বা গুণই বলো যে, সাদা-চোখে বউ বিলাসীকে সে বড়ই সমীহ করে চলতো। নেশাহীন চোখে বিলাসীই যে শুধু নেশার কাজ করতো তা নয়, ঐ শ্যামলা ময়লা রোগা কালো তেইশ বছরের মেয়েটার মধ্যে এমন একটা দীপ্তি আর শান্তি ছিল আর তার ব্যবহারে এমন একটা যাদুমন্ত্র যে অতবড় শক্তিমান গৌরচন্দ্রও কেঁচো হয়ে যেতো তার কাছে। আগে ত সন্ধ্যের পর শ্রীমানকে দেখতেই পাওয়া যেতো না—বেশী ভাগ দিনই হয় তাড়ির দোকানে, না হয় খালপারে নারী-মাংসের বাসি পণ্যের লোভে। বিলাসী আসার পর থেকেই সর্ষে দিয়ে ভূত ছাড়ানোর মত দ্বিতীয় রিপুটাকে সে প্রায় ছাড়িয়েছে কিন্তু প্রথমটাকে বাগে আনলেও মাঝে মাঝে বেতাল হয়ে যেতো না যে গোরাচাঁদ, তা নয়, যেমন আজকে।

গোরাচাঁদ পালাচ্ছে দেখেই বিলাসীও বেরিয়ে পড়েছিল। গাছকোমর বেঁধে শাড়ীটাকে জড়িয়ে নিয়ে হন্ হন্ করে এগিয়ে একেবারে পেছন থেকে তাকে জাপটে ধরলে সে—না যেতে পাবে না, কিছুতেই নয়, লজ্জা করে না রোজ রোজ মাতলামী করতে, রক্ত জল করে রোজগার করা পয়সাগুলো কি এতই সস্তা আর তোমরা ইয়ার-বন্ধুরা কি লোক গো—তোমাদের ঘরেও কি ছেলেমেয়ে, মা-বউ নেই।

এরকম অতর্কিত আক্রমণে হকচকিয়ে গিয়েছিল গোরাচাঁদ। অবাক্ হয়ে সরে পড়তে যায় মহীউদ্দীন আর বাজবাহাদুর। কেউ কিছু বলবার আগেই শ্যামলাল কিন্তু মুখ খুললে—যাও, যাও গৌরচন্দ্র, রাধারাণী একেবারে প্রেমে মত্ত হয়ে তোমায় জড়িয়ে ধরেছেন—মরে গেলে তমালের ডালে টাঙিয়ে রাখবেন, এতো বড়ো পিরীতি—আচ্ছা তুই কি একটা মরদ না গরু—যা, যা মুরোদ বোঝা গেছে—

গোরাচাঁদের আহত পৌরুষ পরুষ হয়ে উঠেছে ততক্ষণে—

কী, এত বড় আস্পর্ধা একটা মেয়ে মানুষের, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় সে বিলাসীকে, চেঁচিয়ে বলে— বেরো হতচ্ছাড়ী, আমার যেথায় খুশী যাবো, তোর কি, তুই কি আমার গুরুঠাকুর যে তোর পাদোদক খেয়ে তোর কথামত চলতে হবে?—

বিলাসীর গাল কেটে রক্ত পড়ে তারই ছোঁয়ায় ঠোঁটদুটো পর্যন্ত টুকটুকে লাল হয়ে ওঠে, ডাগর চোখদুটো বেয়ে জলের ধারা। হঠাৎ পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে গোরাচাঁদের মনটাও ছ্যাঁৎ করে উঠলো।

সঙ্গীরা হো হো করে হাসে। গোরাচাঁদের কানে সেটা বিশ্রী লাগে, সে চেঁচিয়ে ওঠে—থাম্।

ফিরে আসে বিলাসী, মনে মনে বলে—না এমন মানুষের ঘর করার চেয়ে সংসার না করাই ছিল ভাল।

পরম নিশ্চিন্তে ইচ্ছামত
ভ্রমণ
আর তার উপযোগী সব রকমের
সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য…
শরতের আবির্ভাবে—আর আসন্ন উৎসবের দিনগুলির কথা স্মরণ করে আমাদের মন কিছুদিনের জন্য খেয়াল-খুশীমত ছুটি উপভোগ করতে উন্মুখ হয়ে ওঠে। ঠিক এরই জন্য দরকার একটি "হিন্দুস্থান ট্রাভেলার"। চালাতে শুরু করলেই দেখবেন কি আশ্চর্য এর সাবলীল গতি, তা ছাড়া আপনার ইচ্ছেমত এই গাড়ী আপনাকে গন্তব্যস্থলে ঠিক সময়ে পৌঁছে দেবে। যখন যেভাবে খুশী আপনি স্বাচ্ছন্দ্যে ভ্রমণ করবেন আর আপনার ছুটির দিনগুলি হবে পরম উপভোগ্য!
হিন্দুস্থান
ট্রাভেলার
ছয়জন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ও তাহাদের লাগেজের জন্য উপযুক্ত স্থান।
পশ্চাদ্ভাগে ভাঁজকরা আসন থাকায় এ একটি হাল্কা ভ্যানের কাজ করে এবং এর সম্মুখভাগে আসন আছে তিনটি……
অথবা, ইচ্ছা করলে ভ্রমণ-শয্যা বিছিয়ে নেবার মত স্থান পাবেন। বাড়তি সরঞ্জাম হিসাবে শীর্ষদেশে লগেজ ক্যারিয়ার লাগান যেতে পারে।
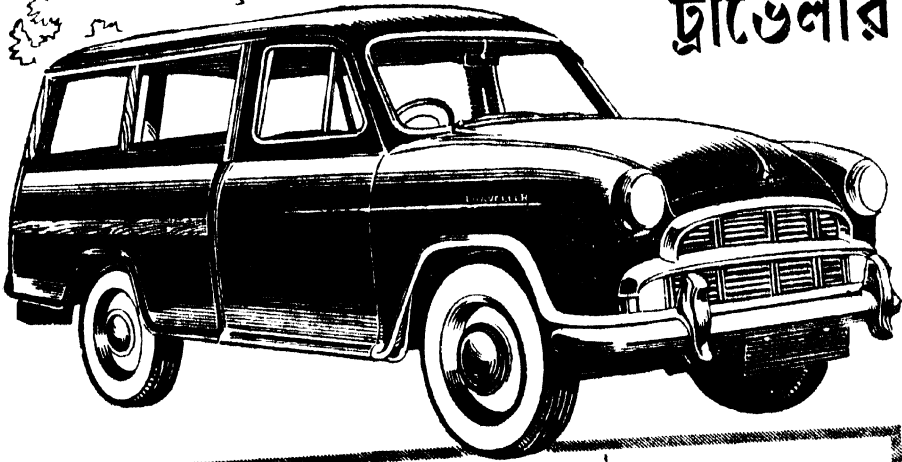
রাগে, অভিমানে, লজ্জায় সে গজরাতে থাকে। তারপরই মনে পড়ে তৃণের মত সুনীচ হতে হয়, তরুর মত সহিষ্ণু, তবেই রাধারাণী মনের মত বর দেন। বিলাসী ছিল বাউল বৈরাগীর মেয়ে। বোষ্টমী মায়ের ইতিহাস সে জানতো না—বড় হয়ে বুঝেছে সেটা কিছু সুখের বা গৌরবের নয়। বুড়ো বাপের সংগে নেচে-গেয়ে নাম বিলিয়ে মাধুকরী করে ঘুরতো সে গ্রামে গ্রামে—এ আখড়া থেকে ও আখড়া, এ মেলা থেকে ও মেলা। বাপ গাইতো—'কোথায় তোমার ছত্রদন্ড, কোথায় সিংহাসন, আজ যে দেখি সবার মাঝে পেতেছো আসন......

মেয়ে ধুয়ো ধরতো—'আজ তোমার ছত্রদণ্ড ধুলোয় লুটায়, পাতকীর চরণরেণু তাহে শোভা পায়—'

এই রকম করেই ওদের কোন রকমে চলে যেতো। তবে নামোপাড়ার একটা আখড়াই ছিল ওদের প্রধান আড্ডা—তার অধিকারী মশাই ওই চালাকচতুর চটপটে মেয়েটিকে একটু বিশেষ স্নেহের চোখেই দেখতেন, কিছু কিছু লেখাপড়াও শিখিয়েছিলেন মুখে মুখে, রামায়ণ, মহাভারত, চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি সুর করে সে পড়তে পারতো। বয়স হওয়ার সংগে সংগেই তেজী লকলকে লাউডগার মতই সে বেড়ে উঠেছিল, তাই দেখে চিন্তিতও হয়েছিলেন উদ্ধব ঠাকুর—হাজার হোক্ বয়সের ধর্ম আছে, সময়, কাল, পরিবেশও কিছু সুবিধের নয়। তাই সুযোগ পেলেই ওকে বলতেন—জানিস দিদি, রাধারাণীর রাজত্বে মেয়েদের কাজই হচ্ছে ভালোবেসে টেনে তোলা। আমাদের ঠাকুর সবার বুকে বসেই রাসকেলি করেন—জ্ঞানের অগম্য তুমি প্রেমে ভিখারী দ্বারে দ্বারে মাগো প্রেম নয়নেতে বারি। কোন মানুষই খারাপ নয়, শুধু ঠিক দিকটা দেখতে পেলেই ব্যস্—তাঁর কাজ তিনি করান, কিন্তু বাবা—

হ্যাঁরে হ্যাঁ, মেয়েরাই পারে, তারা যে রাধারাণীর সাক্ষাৎ অংশ—এতো ভালবাসতে আর কেউ পারে না—এ সরোবরের দুটো দিক, একটা পাঁকের একটা রসের—পাঁকে নামলেই দহে পড়তে হয়, চোরাবালি টানে—আর রসের দিকে এগিয়ে যা দিকিন দেহ, মন সব এক হয়ে যাবে, সবই মধুর, সবই বিধুর, রসে রসে রসময় মধুময়।

সত্যি—

হ্যাঁরে, পাগলী হ্যাঁ—মহাজন কি আর সাধে বলে—এ হচ্ছে দুনিয়ার দোকানদারীতে সবচেয়ে সেরা মহাজন টানছেন—লেনদেন তোমার সব দাও, তবেই সব পাবে। সত্যিকার ভালবাসতে পারলে সব করা যায়—

চোরকে সাধু করা যায়, মাতাল-লম্পটকে শোধরানো যায়—

যায় রে যায়—মনের মানুষকে সত্যিকারের টানতে পারলে সেও সংগে সংগে ওপরে ওঠে—

পুরোনো দিনের এই সব কথাই মনে মনে ভেসে ওঠে তার। লছমী এসে পাশে বসে, আস্তে আস্তে বলে—এই বিলাসী ভেবে আর কি করবি বোন, পুরুষগুলোই ঐরকম—তাইতো মেয়েরাও ক্ষর ক্ষর করে, ওরাই ত আমাদের খারাপ করে—তা মহীবাবু ত চলে গেলেন, ওদিকে রাবেয়ার ছেলেটা যে মরে—মুস্কিল আসানের জলপড়ায় কিছু কাজ হচ্ছে না। কলিয়ারীর বড় হাসপাতালের ডাক্তার সাহেবকে দেখিয়ে ভালো সুঁই দিলে বোধ হয় বেঁচে যেতো, তিন বছরে তিনটে হয়েছে, দুটো গেছে, ঐ ত শিবরাত্রির সলতের মত ধুক্ ধুক্ করছে, এটি—আবার নিজেরও ত এখন-তখন—ছি, ছি, কি ঘেন্না, তুই বাপু আছিস্ ভালো, কোলে কাঁকালে ওঠেনি...

সে কী—বলে দৌড়য় বিলাসী—

মা সে এখনও হয়নি বটে, জীবনে মায়ের আদরও পায়নি এবং ওদের হিসাবে মা হবার বয়স তার পেরিয়েছে সত্যি, তবু না আসা মাতৃত্বের স্বাদ আর মাধুর্য সে বুকের প্রতিটি দোলায় অনুভব করে। গোরাচাঁদের প্রবল বাহুবন্ধনে ধরা দিয়ে তার মনে হতো এই-তো একটা মস্ত বড়ো শিশু তার কোলে। সেই সবচেয়ে বড়ো মন্তরই তার বুক জুড়ে—মা বলে আসবে বাল গোপাল। 'যেদিন জনম সেদিন আমি দীক্ষা পেয়েছি, এক অক্ষর মন্ত্র মায়ের ভিক্ষা পেয়েছি।'

প্রায় সারা রাতই রাবেয়ার ঘরে রুগ্ন শিশুর পাশে সে কাটায়। একটু সুস্থ দেখে চলে আসে—হয়তো একটু ক্ষীণ আশা যদি গৌরচন্দ্র শেষ রাতে, দর্শন দেন, বলে আসে—কালই হাসপাতালে নিয়ে যাবে সে রাবেয়ার কোলেরটিকে দেখিয়ে আনবে নিজে।

ভোরের ভরা আলো ওঠার আগেই একটু গড়িয়ে নেয় বিলাসী। তারপর ঘুম-চোখেই অন্ধকার থাকতে থাকতেই উনুনে আগুন দেয়—যা হয় কিছু খাবার তৈয়ারী করে রাখবে, কয়েকখানা রুটী, একটু গুড়, কিছু তরকারী—জোয়ান্ মানুষটার সারা রাত পেটে তরল আগুন আর বাসি ফুলুরী ছাড়া কিছু পড়েছে কি-না সন্দেহ। অত্যন্ত যত্ন করে তৈয়ারী করে সে খাবার, গুণ্‌গুণ্ করে এক কলি গানও ধরে—'ওরে কাজলে আর করবে কত যদি নয়নে নজর না থাকে'—

না, সে যে রাধারাণীর দোর ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে ওর ঘরে ঢুকেছিল যে ওকে সত্যিকার মরমী মানুষ করে তুলবে—ওর স্বামী মদ খেয়ে মাতলামী করবে না, অন্য মেয়ের দিকে কুভাবে চাইবে না, ইতর মেয়েদের নিয়ে ঢলাঢলি করবে না, নিজের জোরে যা হয় রোজগার করবে, খাবে-দাবে, দু-এক বিঘে ধানজমি, দু-একটা বলদ-গরু, দুধ-বতী মা ভগবতী—যার শিং-এ আর কপালে নিজে সে সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দেবে, গা মুছিয়ে দেবে আঁচল দিয়ে। চালায় মাচান বেয়ে উঠবে লাউ-কুমড়ো-শসা—উঠোনে দাওয়ায় ছুটোছুটি করবে দু-একটা কালো কালো কোলভরা ছেলে-মেয়ে—আধো আধো টলতে টলতে বলবে—মা, খেতে দে, খিদে পেয়েছে। তার গা শিউরে ওঠে—হ্যাঁ সন্ধ্যে-বেলায় যাবে তারা সকলে মিলে কীর্তন শুনতে, না হয় ঠাকুর ভাসান্ দেখতে, না হয় ধ্রুব প্রহ্লাদের কথকতায়। সেই স্বপ্নে মজেইত গোরাচাঁদের ঘরে, সাত পাক ঘুরে নয়, শুধু কণ্ঠী বদল করেই সে এসেছিল—কিন্তু কোথায় গেলো তার স্বপ্ন—আধা সহরের ধোঁয়া আর জঞ্জালভরা কুলী ব্যারাকেই জীবনটা কাটবে না কি, কোলেও ত এলো না একটা—

কতদিন সে বলেছে গোরাচাঁদকে—চলো না গাঁয়ে গিয়ে বাস করি—

খাবি কি—

কেন চাষ করে, ধান ভেনে—

লবডঙ্কা—ঐ শিবের গীতই হবে—পেট-ভাত হবে না—

সে কী—

আজকাল আর এদেশে অন্ন জুটবে না চাষ করে—অন্নপূর্ণারা পালিয়েছেন—এখন যা করেন কলকারখানা।

না, সে এ-রকম করে থাকতে পারবে না—সে-ও অসহযোগ করবে—গোরাচাঁদের আদর-আবদারে ধরা দেবে না, কিন্তু মুস্কিল তাতেও আছে। এই-তো সেবার শ্যামলালের স্ত্রী আদুরী রাগ করে চার ছেলে-মেয়ে নিয়ে চলে গেলো ভায়ের বাড়ী—ভায়েরও চালচুলো নেই—নামেই গেরস্থ চাষী—নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। এর মধ্যে শ্যামলাল কি সব বিশ্রী রোগ বাধিয়ে মরো মরো। কতো মানত করে কাঁদতে কাঁদতে চলে আসতে পথ পায় না আদুরী, কতো রাত জেগে সেবা করে স্বামীকে সারিয়ে তোলে আর বদলে পায় শুধু প্রহার উপহার নয়, ঝিমিয়ে যাওয়া অসুখের ভাগও। শাস্ত্রে যে বলে স্ত্রী স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী—সব কিছুই সে আধাআধি ভোগ করবে। বিলাসীই জোর করে ক্লিনিকে নিয়ে গিয়ে তাকে সারায়, সুস্থ করে দাঁড় করিয়ে দেয়। কিন্তু শ্যামলাল সেই শাড়ু সুনাগর হয়েই কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরে বেড়ায় আজও। আর আদুরীর দুর্দশা ঘোচায় কে—শরীর ভেঙেছে, মন ভেঙেছে, মনে নেই উত্তাপ, দেহে নেই তার সাড়া—যৌবনেই এসেছে জরা—শুধু বলে—কপাল, কবে যে মরণ হবে, মা কালীই জানেন।

বিলাসী তাড়া দেয়—কপাল নয় দিদি, পুরুষের কাছে একেবারে ঢোঁড়া সাপ হতে নেই, মাঝে-মাঝে ফোঁসও করতে হয়—মেয়েমানুষ বলেই কি খেলনা হয়ে এসেছো যে, নিজের সখ্ মেটাতে যা খুশী করবে—

আদুরী বলে—মরণ আর কি—মেয়েমানুষে আর পুরুষ-মানুষে এক হলো, ভগবানই ত আমাদের মেরেছেন রে—

তার আগে নিজেরাই নিজেদের গলার টুঁটি টিপে ধরেছো বলে চলে গিয়েছিল বিলাসী।

পরিপাটী করে খাবার তৈরী করে বসে থাকে বিলাসী—কি জানি বাবু কখন ফেরেন এবং কি মূর্তিতে। একটু একটু করে পূবের আকাশে চাঁপার রং-এর ঢেউ খেলছে—সোনার মুকুটপরা জ্বলন্ত রাজকুমার সাতটি পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে এলেন যে ঐ। অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে সেই দিকে বিলাসী। ওর মনেও সেই আলোর দোল লাগে।

এমন সময় গোরাচাঁদের সঙ্গী সাধুচরণ খবর দিয়ে যায়—মিছামিছিই বসে আছিস বিলাসী, ওরা ওখান থেকেই খাদে গিয়ে নেমেছে—জরুরী ওভার-টাইমের কাজ—সর্দার তাড়িখানা থেকেই ধরে নিয়ে গেছে—আমিও যাচ্ছি।

সে কী দাদা—সারা রাত কিছু খায়নি যে—

আরে দিদি, সর্দার জানে যতক্ষণ পেটে ঐ আগুন থাকবে ততক্ষণ ওরা অসুরের মত খাটবে—তোর গোরাচাঁদ ত একাই একশো।

ছটফট্ করে বিলাসী—কি ভেবে বলে—সাধুদা, তুমি-ত এখনই খাদে নামবে—এই নাস্তাটা ওর জন্য নিয়ে যাও না—

তারপর একটু ভেবে বলে—একটু দাঁড়াও দাদা, আমার ভাগটাও দিয়ে দি, তোমরা পাঁচজনে আছো, যদি কয়েকখানা বেশী করে গড়তুম। দাঁড়াবে দাদা, আর কখানা তৈরী করে দেবো—দু'মিনিটে হয়ে যাবে।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে সাধুচরণ—এই দরদময়ী শ্রীমন্তী মেয়েটাকে সবাই পছন্দ করে—মেয়েরা একটু হিংসার চোখে দেখলেও তাদের কাজকর্মে, অসুখে-বিসুখে, আপদে-বিপদে এতো সাহায্য করে সে, মুখে কেউ কিছু বলতে পারে না—আর তাছাড়া সবাই জানে যে, পুরুষদের সাথে বেশী গলাগালিও করে না সে, সেইটেই তাদের সবচেয়ে বড় ভরসা।

দে, দিদি, দে—যা আছে তাই দে, পৌঁছে দেবোখন্—খাবার সময় পেলে হয়, যা বৃষ্টি নেমেছে—কদিন থেকেই দেখছি খাদে বেশ জল জমেছে। আর কিছু বললো না সাধুচরণ।

রাবেয়ার ছেলেকে হাসপাতালে দেখিয়ে এনে তার ব্যবস্থা করে স্নান সেরে আর এক প্রস্থ রাঁধতে বসলো বিলাসী। এতো খাটুনীর পর মানুষটা আসবে—গরীব হোক্ তারা, ভালো-মন্দ না জুটুক্, পেটভরা খোরাক ত চাই, যুঝবে কি করে। পোড়া-দেশে তাও কি হয়—রাধারাণীর রাজত্বে এতো তফাৎ কেন—সবাই খাটবে, সবাই খেতে পরতে পাবে এই-তো নিয়ম হওয়া উচিত। একটা ছোট বাটীতে খানিকটে সর্ষেতেলও ঢেলে রেখে দিলে সে। গরম করে মালিশ করে দেবে, গায়ে-হাতে-পায়ে, ব্যথা মরবে। আর লাউ দিয়ে কুঁচো চিংড়ী গোরাচাঁদের বড়ই প্রিয়—এক ফালি লাউ আছে ঘরে, কালকের কয়েকটা চিংড়ীও—রাঁধলে যত্ন করে।

গোরাচাঁদ ফিরে এলে তাকে নাইয়ে-খাইয়ে নিজে

খাবে ঠিক করে বিলাসী আঁচল পেতে দাওয়ায় শুয়ে পড়লো। সারা রাত ভাল ঘুম হয়নি, দিনেও কম ক্লান্তি যায়নি, কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল মনে নেই। হঠাৎ লোকজনের চীৎকার আর কান্নাকাটিতে বেলা তিনটে নাগাদ ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসলো সে। ততক্ষণে শ্যামলালের স্ত্রী আদুরী, তার শালী বিমলা, সাধুর ভাই মুক্তি, মহীর বউ রাবেয়া—সবাই চেঁচামেচি লাগিয়ে দিয়েছে। ব্যাপার কী—না জলের তোড়ে গোরাচাঁদের দল আটকে গেছে—লিফ্‌ট্‌ কাজ করচে না—এক্ষুনি উপায়—কর্তারা, মালিকরা, পুলিশ, পাম্প সব এসে পড়েছে বটে, কিন্তু ব্যাপার মোটেই আশাপ্রদ নয়।

বিলাসী শুনলে কাঠ হয়ে। তারপর উঠে গিয়ে ঘরে ঢুকলো—ঐ এক চিলতে ঘরের একপাশেই তার লক্ষ্মীর ঘট আর রাধাকৃষ্ণের যুগল-পট। আছাড় খেয়ে পড়লো সেখানে—রক্ষে কর ঠাকুর, রক্ষে করো মা রাধারাণী—সে-তো অন্য মেয়ের মত নয়—অন্য কারুর সঙ্গে লুকিয়ে বা প্রকাশ্যে ঢলাঢলি করেনি কোনদিন—ঐ এক পুরুষ ছাড়া কাউকে সে দেহ-মন দেয়নি—সংসারে যে যাই বলুক—সত্যিকার সতী সে—তার হাতের নোয়া, মাথার সিঁদুর যেন বজায় থাকে মা।

পাগলিনীর মত বেরিয়ে আসে সে ঘর থেকে—ছোটে খাদের মুখের দিকে, চেঁচিয়ে বলে—আমাকে নামতে দাও, আমাকে নামতে দাও। কে কার কথা শোনে। মহাশূন্যের কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়ে বহুজনের মিলিত রোদনের সঙ্গে একজনের অতি নিভৃততম ক্রন্দন নিবেদন।

ওদিকে পাতালপুরীর নিরেট অন্ধকারে গোর-চাঁদ, শ্যামলাল, মহীউদ্দীন, সাধুচরণ প্রভৃতি ওরা কয়েকজন একমনে কাজ করে যাচ্ছিল। নেশার জের কেটে গেছে, পেটও বেশ চুঁইচুঁই করছে, মন উসখুস।

গোরাচাঁদ হঠাৎ বললে—শালার জল বেড়েই চলেছে, ব্যাপার কী শ্যামদা—

শ্যামলাল একটা হাঁক দিলে অন্য শিফ্‌টের দিকে—কোন জবাব পেলে না। একটু হকচকিয়ে গেলো, আলোও হঠাৎ নিভে গেলো, সবাই চেঁচিয়ে উঠলো—খাদে জল ঢুকেছে, সবাই এক পাশে—

সাধুচরণ সাধু প্রকৃতির লোক, ডুকরে কেঁদে বললে—তারা ব্রহ্মময়ী একী করলি মা—

কোথায়ই বা পাম্প, কোথায়ই বা লিফ্‌ট্‌—পায়ের নীচে জল, আশে-পাশে চিরকালের কালো জমাট অন্ধকার, শুধু আস্তে আস্তে পা ফেলে বুঝে বুঝে আর চেঁচিয়ে এগিয়ে যাওয়া, যে দিকে মনে হচ্ছে বেরুবার পথ।

শ্যামলাল বলে—সুবিধে নয় গোরা,—

গৌরচন্দ্র ততক্ষণ ধাতস্থ, নেশার গোলাপী আমেজটুকু কেটে গেছে, জবাব দেয়—ইঁদুর কলে পড়েছো দাদা, কালে ধরেছে, আর তবে নাই বা কেন—ধর্মের কল বাতাসে নড়ে—কাল কি কাণ্ডটাই করলাম বল দিকিন্‌ তোমাদের পাঁচজনের পাল্লায় পড়ে। সতী-সাধ্বী বউ—তাকে রাস্তায় ঠেলে ফেলে দিয়ে কী বীরত্বটাই হোল—সত্যি আমাকে ছাড়া আর কাউকে জানে না—তোমাদের বোয়েরা তবু বয়সকালে এদিক-ওদিক যদিও বা করে, আর এতো কণ্ঠী বদল করা বউ—সাত প্যাক জড়ানো নয়—কি ভালোটাই বাসে—

চটে যায় শ্যামলাল, বলে—তোর কি আক্কেল গোরা, তোর পিরীতির কথা শিকেয় তুলে রাখ, আপনি বাঁচলে বাপের নাম—বেঁচে থাকলে অনেক বউ জুটবে, অনেক মেয়েছেলে কোল জুড়ে বসবে—উনি এলেন ও'র সেবাদাসীর গুণ গাইতে—রস-কেলি, রাসকেলি এখন রাখো বাপধন্‌—এখন যে বিপদে পড়া গেছে তার কথা ভাবো দিকিন্‌—কি করা যায়—

মহীউদ্দীন এতক্ষণ চুপ করেছিল, তার মনে পড়ছে রাবেয়ার কথা, যে ছেলেটার তড়কা হয়েছিল তার কথা। সে বললে—শ্যামদা তুমি থামো ত, সাধু ভাই তুমি এসো, কোথায় উঁচু জায়গা আছে দেখি, আর ঐ উত্তর-পূব কোণে একটা ফাটল আছে না—একটু হাওয়ার যাতায়াত না থাকলে দমবন্ধ হয়ে মরবো যে—কে আসবে আমার সঙ্গে, হাত ধরাধরি করে এসো, গাঁইতিটা তুলে নে গোরা, গোরাচাঁদ তার হাত ধরে বললে—মহী, তুই আর জন্মে ভাই ছিলি, ওরে বিলাসীর জন্য আমাকে বাঁচতেই হবে, তার বড় সাধ, আমায় সচ্চরিত্র করে তুলবে, নেশা ছাড়াবে, কোলে ছেলে দেবে, তাকে মানুষের মত মানুষ করবে।

বিলাসীর কথায় সাধুচরণ বললে—আরে, ভুলেই গেছিত, এই নে গোরা, বিলাসী তোর জন্য কিছু খাবার পাঠিয়ে দিয়েছিল, দেখ দিকিন, ঐ উঁচু মাচায় পুঁটলীটা রেখেছিলাম।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে পায় তারা সেই অমৃত ভাণ্ডটিকে। বুকে জড়িয়ে ধরে গোরা—তার বিলাসীর হাতে গড়া রুটী তরকারী। তার অতি প্রিয়তম মানুষের জন্য একটি মেয়ের সযত্নে তৈরী সামান্য কিছু আহার্য আজ অসামান্য হয়েই তাদের সামনে দাঁড়ালো।

গোরাচাঁদের চোখে জল এলো, বললে—দাদা, কি জানি কতদিন এই অন্ধকারের পেটে থাকতে হয়—সবাই মিলে একটু একটু করে রুটী কখানা চিবুবো এখন—

মহীউদ্দীন উৎসাহ দেয়—না, না এতক্ষণে জানাজানি হয়ে গেছে, শুধু কোম্পানী নয়, গভর্ণ-মেণ্ট থেকেও লোকজন এসে গেছে—আচ্ছা গোরা-ভাই, রাবেয়া নিশ্চয়ই কাঁদচে, এ সময়ে কিন্তু কাঁদাটা ভালো নয়—আর ছেলেটা বাঁচবে কি বলিস্‌—গোরাচাঁদ বললে—তা আর বলতে,

চুপ করে বসে থাকে ওরা, ঝিমোয়, কত ঘণ্টা কাটে কেউ বুঝতে পারে না।

খানিকক্ষণ পরে গোরাচাঁদ বলে—মহী ভাই, জেগে আছিস্‌—আচ্ছা ওপরের পৃথিবীতে এখন দিন, না রাত—

কি জানি—বলে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে মহী—

গোরা বলে—কি জানি বিলাসী কি করছে—এমন সব লক্ষ্মী মেয়েছেলে ঘরে থাকতে আমরা কিনা বামুণ্ডলে হয়ে বেড়াই—পুরুষগুলিই ত বেপরোয়া, বেলেল্লাগিরি করে,—ওরা ঘর গড়ে, আমরা ঘর ভাঙি—

শ্যামলাল রেগে উঠে বলে—প্যানপ্যানানি আর সহ্য হয় না, ওরা আগুন হয়ে ঘর জ্বালায় না—

সাধুচরণ বলে—আবার আলোও দেয়।

যা বলেছ সাধুদা—বলে গোরাচাঁদ—ঐ বিলাসীকে কত লোভ দেখিয়েছে কতজনে—আমার ঘরে আসবার আগে এবং পরে। ঐ যে মালবাবুর লক্কাপায়রাগোছের শালাবাবু হাজিরা বই লেখে, আর আমাদেরই রোজগারের পয়সা চুরি করে ইয়াকী মেরে বেড়ায়, এসেছিল এক গোছা নোট নিয়ে একদিন ভর-সন্ধ্যে বেলায়। ঠাস্‌ করে গালে এক চড় মেরেছিল বিলাসী, নিজের চোখে দেখা। কপাল ভাল, আমি সেদিন একটু সকাল সকাল ফিরছিলুম—তা নাহলে যা খারাপ মন্‌, নিজেও ত ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির নই—বিশ্বাস করতে পারতুম না। কি চোখেই আমাকে দেখেছিল মেয়েটা তাই ভাবি, ওর নখের যুগ্যি আমি নই, জন্মান্তরের সম্পর্ক কি আর সাধে বলে—কতো ভালো বিয়ে করতে পারতো, আর বিয়ে না করেও রাজার হালে থাকতো। খেতে দিতে পারি না, পরতে দিতে পারি না— মারধোর করি—মাটি-মায়ের মত সব সহ্য করে যায় হাসিমুখে, বলে—তুমিই আমার রাধারমণ, তোমায় পেয়েছি মা গোঁসাইয়ের স্থানে—তোমার বুকেই আমার হীরেমাণিক গাঁথা, তোমার কোলে শুয়েই আমার স্বর্গসুখ। বল না মহী, এমন করে যদি কোন যুবতী মেয়ে তোর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সত্যিকারের মায়ের ছেলে পারে কেউ স্থির থাকতে। তা গোরা ভাই, ওকে জোটালে কোথা থেকে—

বলিস্‌ কেন, গ্রহের ফের—অবশ্য গ্রহটা শুভই বলতে হবে—সেবার সোজা আসানসোল থেকে ঘোষ-পাড়ার মেলায় গিয়ে উঠেছি—আমাদেরও ত বৈরিগীর বংশ। যা তা খেয়েছি, যেখানে সেখানে থেকেছি—হঠাৎ রোগে ধরলো। যে মেয়ের ঘরে রাতটা কাটিয়েছি সে-তো দিলে দূর দূর করে তাড়িয়ে। ভোর বেলায় পুকুর ধারে পড়ে গোঁয়াচ্ছি, পেটে খাল ধরেছে—তেষ্টায় ছাতি ফাটছে—এই যে এতোবড়ো জোয়ান্‌ শরীরটা, মনে হচ্ছে যেন একেবারে খালি। ও এসেছিল জল নিতে—আমায় দেখে বললে—কি গো অসুখ করেছে বুঝি—আমি তখন প্রায় বেহুঁস—কাছে এসে দেখে বলে—ওমা, এ-যে কালসাপে কেটেছে গো, মেলায় এসেছো, টাঁকে নাওনি—কি হবে মা রাধারাণী—বলে লজ্জা সরম ভয়ের কোন বালাই না রেখে আমাকে আস্তে আস্তে একটা খালি কুঁড়ের ধারে নিয়ে গেলো, মাদুর পেতে শুইয়ে দিলে। তারপর কোথা থেকে কি দুটো হোমিওপ্যাথী ওষুধের বড়ি খাইয়ে দিয়ে বললে—ঘুমোবার চেষ্টা করো দিকিন্‌—মেলার ডাক্তার-বাবুকে খবর দিই—

তারপর কি ঘটলো না ঘটলো কিছুই জ্ঞান ছিল না। একটু সুস্থ হয়ে জানলুম, মেলারই ক্যাম্প হাসপাতালে আমায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং এই বিলাসীই আমাকে সেবা শুশ্রূষা করে বাঁচিয়েছে। তারপরে যা দেখছো তাই—

সাধুচরণ বললে—তোরা ত দিব্যি বউ-এর গপ্পেই বেশ মেতে আছিস্‌—ক'দিন হোল কিছু ঠিক আছে—জলও ত অথৈ—

শ্যামলাল ভাঙা গলায় হঠাৎ কেঁদে ফেলে—যমদূতরা এসে গেছে, বেশী দেরী নেই— কালো কালো ছায়াগুলো দেখতে পাচ্ছিস না—

সাধুচরণ চটে যায়, মারতে ওঠে—তুই শালাই ত যত নষ্টের গোড়া—রাজবাহাদুর গুম হয়ে থাকে, কথাও কয় না, নড়েও না।

গোরা আর মহীই ওদের থামায়। মহী বলে—কি হবে ভাই গোরা, কুলকিনারা ত দেখি না—পাগল হয়ে যাবো নাকি সবাই—

গোরা বলে—ভাবিসনি—আমার স্থির বিশ্বাস, আমরা মরবো না—আমার মন বলছে বিলাসী আমার জন্য খাদের উপর বসে আছে—আমি অন্ধকারের ভিতর দিয়েও দেখতে পাচ্ছি তাকে—খায়নি-দায়নি-ঘুমোয়নি—রাবেয়াও যাচ্ছে-আসছে, তোর আল্লাকে বল, আমার ঠাকুরকেও বলি—অবশ্য সবই এক্‌—তিনিই তিনি যে, এবারে বাঁচিয়ে দাও ঠাকুর ওদের মুখ চেয়ে—ওদের ভালবাসার মান রাখতে পারি যেন—

মহীউদ্দীন জবাব দেয়—ঠিক বলেছিস গোরা—চল ঐদিকে এগিয়ে ঐ শাফ্‌টের কাছে যাই, গাঁথি দিয়ে ঠুকে ঠুকে শব্দ করি,—জল নিশ্চয়ই পাম্প হচ্ছে—যদি কোন রকমে জানিয়ে দেওয়া যায় যে, আমরা এখনও বেঁচে আছি—

শ্যামলাল বলে—তাই যাও না বাপধনরা, ন্যাকামী রেখে—আছে কিছু নাকি পুঁটলীতে—খিদেয় যে নাড়ী-ভুঁড়ি পর্যন্ত শুকিয়ে গেলো—নেই—চালাকি পেয়েছো—শীগ্গীর দে বলছি—তা নাহলে গাঁতি দিয়ে তোদের গেঁথে ফেলবো—মহীকে সরিয়ে নিয়ে আসে গোরা। তখনও শ্যামলালের আস্ফালন চলেছে আর অকথ্য ভাষায় আক্রমণ—মাথা খারাপের বাকী নেই।

সাধুচরণ থেকে থেকে হো হো করে হাসে—বেখাপ্পা হাসি—বলে—পরীরা আর হুরীরা এক-সঙ্গে আসছে—বেহেস্তে নিয়ে গিয়ে কোলে বসিয়ে কালিয়া কোপ্তা কলিজার ঝোল খাওয়াবে—বিলাসীর শুকনো রুটী নয়, জানলি গোরা—

(শেষাংশ ৩০০ পৃষ্ঠায়)

সেনকো
জুয়েলারী ষ্টোর্স প্রাইভেট লিঃ
১৮৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোনঃ ৩৪-৪৬৬৮
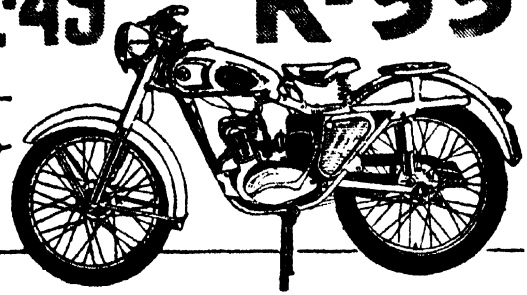
সোভিয়েট মোটর সাইকেল

কম খরচের দিকে নজর রেখে এই সাইকেলগুলি প্রস্তুত—ওজনে হালকা, মজবুত এবং এমন বহু বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত যার দরুণ বিবেচক ক্রেতাগণ বিশেষভাবে এদের পছন্দ করে থাকেন।

ইউ. জেড—৪৯—৩·৫ অশ্বশক্তি
কে ৫৫—১·২৫ অশ্বশক্তি

সোল এজেন্টস :-
সাইকেল হাউস
১৭৪এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : ২৩-১২০৫

হিমানী
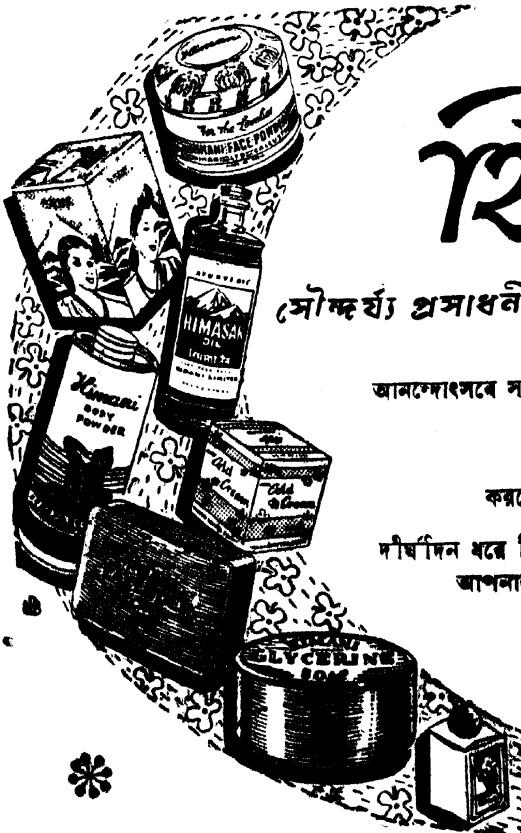
সৌন্দর্য্য প্রসাধনী আনন্দোৎসবে অপরিহার্য্য

আনন্দোৎসবে সাজসজ্জা যেমন চাই,
তেমন চাই সেই সাজসজ্জাকে সুন্দরতর
করতে সৌন্দর্য প্রসাধন সামগ্রী।
দীর্ঘদিন ধরে হিমানী প্রসাধন সামগ্রী
আপনার সৌন্দর্য সাধনায় সহায়তা করে আসছে।

হিমানী
কলিকাতা

মহা দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছেন গোবিন্দ ঘোষাল। না না, কন্যা দায় নয়, ছেলের ছাঁটাইও নয়। সমস্যা নিজেকে লইয়াই।

গতকাল ছুটির দিন ছিল। নিশ্চিন্ত আরামে কটি রবিবাসরীয় পত্রিকা হাতে শুইয়া সবে াকিয়াটা আঁকড়াইয়া কোলের কাছে টান দিয়াছেন —এমন সময় পান-মুখে গৃহিণী হাঁফাইতে ফাইতে সিঁড়ি ভাঙিয়া উঠিয়া আসিলেন— দা-সুবাসিত সুরে যা বলিলেন, তাহা একাধারে বেদন এবং আদেশ দুই-ই। পাশের বাড়ীতে এক ংকার আসিয়াছেন—অতীত-ভবিষ্যৎ তাঁহার াখে বর্তমানের সমান। তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ নি বালক, বৃদ্ধ এবং বনিতাদের সামনে উপ- াপিত করিয়াছেন। গোবিন্দবাবুর হাঁপানির রামটা যখন অতীত কাল হইতে চলিয়া াসিতেছে এবং বর্তমানেও অতিরিক্ত কষ্ট তেছে, তখন ভবিষ্যতে উহা আর কতদিন াগাইবে, তাহা জানিবার সুযোগ পাইয়া না নিয়া লওয়াটা চোখ বুজিয়া সূর্যপ্রকাশ অগ্রাহ্য ার তুল্য অপরাধ।

অতএব সে অপরাধ খন্ডন করিবার জন্য সহ- র্মিণী ধর্মোপদেশ শুনাইতে আসিয়াছেন। ণকঠাকুরকে নিমন্ত্রণ জানাইয়া আসিয়াছেন। তিনি আসিলেন বলিয়া। গোবিন্দবাবুকে আর কিছুই রিতে হইবে না, কষ্ট করিয়া একটু শুধু দক্ষিণ- াণি তুলিয়া ধরিলেই হইবে। রবিবারের দিবানিদ্রা াবে পন্ড হওয়ায় গণকঠাকুরের উপর শ্রদ্ধা ভাবতঃই কমিয়া গেল। তারপর গৃহিণী যখন ামীর কথাটা একবার স্মরণ করাইয়া দিলেন, খন জ্যোতিষশাস্ত্রের উপরেই আস্থা সম্পূর্ণ বিয়া গেল। তাকিয়া আড়াল করিয়া বিদ্রোহে বতীর্ণ হইতে যাইয়া গোবিন্দবাবু দেখিলেন, হিণীর স্থূলবপু সিঁড়ির বাঁকে অদৃশ্য হইয়া ইতেছে। অগত্যা হতাশায় দরজার দিকে পৃষ্ঠ র্শন করিয়া শুইয়া রহিলেন।

যথাসময়ে গণকঠাকুর আসিলেন। পাণিযুগল াড়ন করিয়া, গৃহিণীর বক্ষে শেল হানিয়া, াবিন্দবাবুকে ধনেপ্রাণে মারিয়া যথাসময়ে বিদায়ও ইলেন।

গৃহিণী ভুলুণ্ঠিতা হইয়া পড়িলেন। কর্তা াহত হইয়া বসিয়া রহিলেন। ঠাকুরমশায়ের বিষ্যদ্বাণী শ্রবণান্তে একবার জিজ্ঞাসা করিতে য়াছিলেন—"ঠিক বলছেন তো মশায়?" কিন্তু ্রানদে মেঘের খেলা ও বিদ্যুতের ঝলকানি খিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ঠাকুরমশায় শুদ্ধ- াষায় কথা বলেন—বিদায়বাণী রাখিয়া গেলেন— অনন্তর এই বাক্য বলি। প্রভুর ইচ্ছায় অসম্ভব ভব হয়"—অর্থাৎ সম্ভবটা এদিকেও হইতে পারে, বিপরীত দিকেও হইতে পারে। গোবিন্দবাবু আত্মরক্ষার্থে বিপরীত দিকটা ধরিয়া রাখিলেন আর গৃহিণী সহজ পথটি অবলম্বন করিয়া আক্রমণ চালাইতে লাগিলেন।

পুত্র-কন্যার সামনে লজ্জা-অপমানের একশেষ। গোবিন্দবাবুকে দেখিলেই তাহারা মুখ টিপিয়া হাসে। সই-কমরেডের দৌলতে তাহাদের ঘরের কথা পাড়াময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। ডালপালাও তাহার অনেক গজাইয়াছে। সমবয়সীরা পথেঘাটে গোবিন্দ- বাবুকে পাকড়াও করিয়া প্রশ্ন করেন—'কি শুনছি মশায়? শেষে এই বয়সে'—কানে হাত দিয়া দিয়া পালাইতে পথ পান না গোবিন্দবাবু। অবস্থা চরমে উঠিল যখন প্রতিবেশিনীরা গোবিন্দবাবুর স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতিতে বিগলিতা হইতে লাগিলেন। কেহ তাঁহাকে দিদি সম্বোধন করেন, কেহ বোন, কেহ মাসিমা ইত্যাদি ইত্যাদি। সম্ভাষণ যেরূপই হউক, বক্তব্য সকলেরই এক—পুরুষ মানুষকে কখনই বিশ্বাস করিতে নাই, বয়স তার যাহাই হউক। সবই বরাত। নয়তো গোবিন্দবাবুর মত খাঁটি মানুষেরই বা এমন দুর্মতি ধরিবে কেন, আর বাহান্ন বছর বিবাহিত জীবন যাপন করিবার পর তাঁহার স্ত্রীর ভাগ্যই বা এরূপ বিরূপ হইবে কেন?

সব শুনিয়া গৃহিণী সংসার-তরণীর হাল ছাড়িয়া দিলেন। আর সব দেখিয়া গোবিন্দবাবুর প্রাণ ছাড়ি ছাড়ি করিতে লাগিল। পুত্রবধূরা তটস্থা হইয়া গোবিন্দবাবুর পুত্রদের আগলাইতে লাগিল—"বুড়োরই যখন এমনি হালচাল—তোমরা জোয়ানমদ্দ, কোথায় কি করে বেড়াচ্ছ কে জানে।" পুত্ররা প্রতিবাদের ভাষা না পাইয়া প্রতিকারের উপায় খুঁজিতে লাগিল। জামাইদের ক্ষীর, লুচি, পোলাও, কালিয়া বন্ধ হইয়া গেল। কন্যারা তাহাদের গোবিন্দবাবুর কাছেই ঘেঁষিতে দেয় না। কি জানি ভীমরতিগ্রস্ত পিতা অস্থিরমতি তরুণ স্বামীদের কানে কি বুদ্ধি দেন! সামনে জামাই- ষষ্ঠী আসিতেছে, জামাইরা শঙ্কিত হইয়া উঠিল। শুধু তাই নয়, পল্লীর প্রতিটি বিবাহিত ব্যক্তি অর্ধাঙ্গিনীদের শ্যেন দৃষ্টির তলে শুকাইয়া যাইতে লাগিলেন এবং গোবিন্দবাবু মনে-প্রাণে এদের কলেরই অভিসম্পাত অনুভব করিতে লাগিলেন।

দুই সপ্তাহ এই তুমুল বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া কাটিয়া সেই প্রতীক্ষিত দিন প্রভাত হইল। সকাল হইতে কেহ না কেহ গোবিন্দবাবুকে পাহারা দিয়া বসিয়া রহিল। তাঁহার নিজের আর সেদিন উত্থানশক্তি নাই। তিনতলায় ছেলেরা, দোতলায় জামাইরা, একতলায় প্রতিবেশীরা জমায়েৎ হইয়াছে। অনেকে অফিস হইতে ছুটি লইয়াছে—যাহার চাকরী যাইবার ভয় আছে, সে প্রতিনিধি রাখিয়া যাইতে ভোলে নাই।

সকলেই পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতেছে— "খবর কিছু এল নাকি মশায়? জানতে পারলেন কিছু? বুড়ো নিজে বলে কি? গিন্নীরা তো যে- যার টোপ ফেলে বসে আছে মশায়—খবরটা একবার এলে হয়, অমনি গেঁথে তুলবে আমাদের।"

গোবিন্দবাবু ঘরে শুইয়া শুইয়া সব শোনেন আর ভীতিবিহ্বল নেত্রে মাঝে মাঝে দরজার দিকে তাকান—এই বুঝি কি নিদারুণ সংবাদ বহন করিয়া কে প্রবেশ করিল। দুপুর কাটিয়া বিকাল হইল। সন্ধ্যার ছায়া ঐ দেখা যায়। অফিস-ফেরৎ বাবুরা জলটল খাইয়া এ-বাড়ী আসিলেন। দিন তো প্রায় কাটিয়া যায় যায়—সকলের এতদিনের উৎকণ্ঠ- প্রতীক্ষা—শ্রদ্ধেয় গণৎকারের হাতযশ—পারিবারিক শৃঙ্খলা নাশ—পাড়ার সকল সৎকাজে অগ্রণী গোবিন্দবাবুর অপকীর্তি প্রচার—এতগুলি ঘটনার চাপ আর যেন জনতা সহ্য করিতে পারিতেছে না— অধীর আগ্রহে পথের দিকে চাহিয়া কার যেন অপেক্ষা করিতেছে। এমন সময় দেখা গেল।—

"ঐ যে—চেপে ধর ব্যাটাকে—ভদ্রলোকের ব্যবস্থা কি হয় না হয় পরে দেখা যাবে—এগিয়ে গিয়ে ধর না লোকটাকে—হয়ত ওর সঙ্গে যোগসাজস করা আছে। অন্য লোকের হাতে দিতে চাইবে না— জোর করে বার করে নিবি—যা যা, চলে যাবে যে লোকটা—কি জ্বালা!" যুবক সম্প্রদায়ের কয়েকজন ছুটিল—বেশীদূর যাইতে হইল না—পিওনটিই এদিকে আগাইয়া আসিতেছে দেখা গেল। সকলে প্রায় জড়াইয়া ধরিল তাহাকে—একপ্রকার কোলে করিয়াই বাড়ীর মধ্যে টানিয়া আনিল।

"চিঠি আছে? গোবিন্দবাবুর চিঠি? গোবিন্দ ঘোষালের নামে? বার কর তো দেখি? কোথা থেকে আসছে? কত তারিখের লেখা?" পিওন বিভ্রান্ত হইয়া চিঠির তাড়া হাকড়াইতে লাগিল—"আছে তো চিঠি। আপনারা এমন করছেন কেন? একজনের চিঠি আর একজন কেড়ে নিলে পুলিশ কেস হয় জানেন? অফিসে যেয়ে খবর দেব আমি। পথ ছেড়ে দিন। চিঠি বাক্সে ফেলে দিয়ে আমি চলে যাই।"

পথ সকলে ছাড়িল বটে, তবে চিঠি আর বাক্সে পেঁছাইল না—উপস্থিত জনগণের একজনেই গ্রহণ করিল। কিন্তু হাতে করিয়াই নাক সিঁটকাইল— "আঃ, রাম রাম, এর জন্যে ধুন্তোধুস্তি—ছোঃ! যা তো বাবা খোকন, জেঠামশায়ের অফিসের চিঠি এসেছে একটা, ঘরে যেয়ে দিয়ে আয় তো"—

সকলের হাতে ঘুরিতে ঘুরিতে একটি খোলা লম্বা লেফাফা—বুক পোস্ট—আন্ডার সার্টিফিকেট অব্ পোস্টিং, গোবিন্দবাবুর কোলের কাছে যাইয়া পড়িল। অর্ধমূর্চ্ছিত গোবিন্দবাবু অর্ধনিমীলিত নেত্রে খাম খুলিলেন। তাঁহার অফিসের পুরাতন

সহকর্মীদের কে একজন তাঁহার নামে লটারীর টিকিট কিনিয়া জিতিয়াছে—তাহারই রসিদ। বন্ধুটি লভ্যাংশের কিছুটা ভাগ অবশ্যই পাইবেন, কিন্তু গোবিন্দবাবু যে অংকের পরিমাণের অধিকারী হইবেন—সেটাও কিছু নগণ্য নয়।

ধীরে, ধীরে যেন তার চেতনা উদয় হইতে লাগিল। ক্রমে প্রভাত আকাশে প্রথম আলোক রেখার মত একটা মৃদু সংকেত মনে দোলা দিতে লাগিল। আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—কর্তাজনোচিত স্বরে হাঁক পাড়িলেন—"মেধো—বাবুরা যারা সব এয়েছেন এঘরে পাঠিয়ে দেতো! বলবি, দেরী করে না যেন, জরুরী দরকার!'

"যে আজ্ঞে" বলিয়া মেধো ছুটিল।

জনতাও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, ঘরে স্বস্তি নাই, এবাড়ীতে একটা বিশেষ কিছুর আশা করিয়া আসিয়াছিল, তাহাও ভেস্তে গেল—এখন যায়ই বা কোথায়, করেই বা কি? বার্তাবহের মুখে সংবাদ পাইয়া আর দাঁড়াইল না কেউ। হুড়মুড় করিয়া গোবিন্দবাবুর ঘরে ভাঙিয়া পড়িল।

গোবিন্দবাবু ততক্ষণে উঠিয়া বসিয়াছেন। বহু প্রতিষ্ঠানের তিনি যে প্রেসিডেণ্ট সেক্রেটারী উপদেষ্টা, তাঁহার মুখ-চোখের ভংগী দেখিয়া তখন আর তাহা বুঝিতে কারো বাকী থাকে না।

"সবাই এসেছেন তো? বেশ! আমি আপনাদের কাউকেই বসতে বলছি না আপাততঃ। কারণ, আমি চাই—আপনারা যাঁরা যাঁরা ইচ্ছুক আছেন, আমার সংগে এখনই বেরোবেন চলুন—"

"বেরোবেন স্যর?"

"এত রাত্রে?"

"কোথায় যাবেন, আজ্ঞে?"

"আমরা এতগুলো লোক সবাই যাব ত?"

"অত প্রশ্নের দরকার নেই—যে যে রাজী আছেন আসুন আমার সংগে। হ্যাঁ হে নগেন—সেদিন যে জ্যোতিষার্ণবটিকে পাঠিয়েছিলে এখানে, তার ঠিকানাটা জানা আছে তো? যাব আমরা সেখানেই।"

এতক্ষণে সকলের জ্যোতিষীর কথা মনে পড়িল। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাক্যের পরিণতি লইয়াই এযাবৎ সকলে বিব্রত ছিল—বাক্যের উৎপত্তি যেখানে সেখানেই যে কিছু গলদ থাকিতে পারে, তাহা এপর্যন্ত কারো মাথায় আসে নাই, গোবিন্দবাবুরও নয়। অন্ত লইয়া সকলে এত মশগুল যে, আদি পর্বটা সকলেই ভুলিয়াছিল। এখন গোবিন্দবাবুর কথায় সকলের হুঁস হইল। সোৎসাহে গোবিন্দবাবুর নেতৃত্বে অগ্রসর হইল সকলে।

যাত্রারম্ভে একজন বলিল—"একটা লাঠি সড়কি কিছু নিলে হোতো না, কাকাবাবু?" কাকাবাবু এমন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন যে, সে হাত কচলাইতে কচলাইতে পাশের লোকটির আড়ালে চলিয়া গেল। আর একজন পুলিশে খবর দেওয়া সম্পর্কে কি যেন বলিতে যাইতেছিল, গোবিন্দবাবুর কুঞ্চিত ভ্রূ দেখিয়া বিষম খাইয়া কথাটা সামলাইয়া লইল।

রাত এগারোটা নাগাদ সাধুভাষাভাষী জ্যোতিষ-শাস্ত্রীর গৃহে অভিযানকারীর দল পৌঁছাইল। প্রথমে উপর হইতে বামাকণ্ঠে জিজ্ঞাসিত হইল "কে?" উত্তর আসিল—"আমরা জ্যোতিষী মশায়কে খুঁজছি।" দ্বিতলের বারান্দায় একটি স্ত্রীমূর্তি দেখা গেল। তারপরেই শোনা গেল ভীত আর্তনাদ। এরপর দরজা খুলিল ভৃত্য। অগুণতি মাথা দেখিয়া সশব্দে সভয়ে সে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। অনেক সাধন আবাহনের পর স্বয়ং জ্যোতিষী মশায় আসিয়া জনসমুদ্রকে সম্ভাষণ করিলেন—

"বার্তা কি?"

একটি উদীয়মান ছোকরা মুখপাত্র হইয়া আগাইয়া আসিল—"বার্তা কি না বার্তাকু? একদম দরকচা মারা! কি বলে এসেছেন মশায় আপনি এই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে? পাড়ার সকলে তাঁকে একঘরে করবার জোগাড় করেছেন। এঁর স্ত্রী এঁকে প্রায় পরিত্যাগ করেছেন।"

গণকঠাকুর শিহরিয়া উঠিলেন। গোবিন্দবাবু ছাতার বাঁটটা শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিলেন।

"বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন।" গণকঠাকুর নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়াইয়া বলিলেন।

"ব্যাখ্যা? বলি মশায় ব্যাখ্যা করব আমরা, না আপনি? আপনি যা খুসী তাই লোকের বাড়ী বয়ে যেয়ে বলে আসবেন আর আমরা রাতের ঘুম নষ্ট করে তার ব্যাখ্যা করতে আসব আপনার বাড়ী?"

"অত ব্যাখ্যানায় কাজ নেই, আপনি এগিয়ে আসুন না এদিকে"—

"প্রতারণার অভিযোগে লোকটাকে ধরিয়ে দিলে কেমন হয়?"

"সারারাত বসে থাকব এখানে ধর্মের ঘট হয়ে যতক্ষণ না ও মাপ চায়—"

কেহ জামার আস্তিন গুটায়, কেহ মালকোঁচা মারে, কেহ কোমরের বেল্ট টানিয়া বাঁধে, কেহ রুমাল দিয়া রোয়াকের ধুলো ঝাড়ে। দরজার ঠিক এপিঠে গোবিন্দবাবু, ওপিঠে গণকঠাকুর। শূন্য ঘটিকা বাজিতেছে।

গোবিন্দবাবুর গর্জন শোনা গেল—"কি বলে এসেছিলেন আমাকে মনে আছে?"

ঢোঁক গিলিলেন ঠাকুরমশায়—"স্মরণ হইতেছে না।"

"ভূত-ভবিষ্যৎ আপনার নখদর্পণে, আর একটা ভদ্রলোককে কি বলে এসেছেন দু'হপ্তা আগে স্মরণ হচ্ছে না?"

"আজ্ঞে না!"

"আজ্ঞে না?"

"আজ্ঞে না!"

"ইষ্ট স্মরণ করুন তবে!"

"আজ্ঞে করিতেছি।"

"করেছেন? বেশ!" গোবিন্দবাবু ঘরের ভিতর একপদ অগ্রসর হইলেন।

"আজ্ঞে আর কি কি স্মরণ করিতে হইবে?"

"সব স্মরণ করাচ্ছি, কোনও ভয় নেই।" আর এক পা ঢুকিলেন গোবিন্দবাবু।

"মনে আছে বলেছিলেন—দু' সপ্তাহের মধ্যে আমার একটি পুত্র লাভ হবে? বলেছিলেন পুত্র আসার আগে আমার অনেক দুঃখ-দুর্দশা সইতে হবে? বলেছিলেন পুত্রলাভ হতে আমার মান এবং ধন বৃদ্ধি পাবে। কি স্মরণ হচ্ছে?"

"আজ্ঞে হইতেছে।"

"জানেন আমার বয়স আটষট্টি আর আমার স্ত্রীর বাষট্টি পেরিয়ে গেছে? জানেন আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র তিন বছর আগে তার কন্যার বিয়ে দিয়েছে? জানেন আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার নাতির অন্নপ্রাশন হয়ে গিয়েছে? জানেন আপনার গণনা শুনে আমার স্ত্রী এবং বাড়ীর সকলে তথা পাড়ার সকলে এবং সহরের সকলে ধরে নিয়েছে আমার নিশ্চয় উপপত্নী আছে এবং পুত্রটি তারই? জানেন—জানেন?" গোবিন্দবাবুর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল—ঘরের একেবারে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া একটা তক্তপোষে বসিয়া পড়িলেন। গণকঠাকুর সন্তর্পণে তাঁহাকে এড়াইয়া তক্তপোষের অপর প্রান্তে আলগোছে বসিলেন, যাহাতে দরকার বুঝিলেই উঠিয়া পড়িতে পারেন।

তারপর ধীরে ধীরে হাতটা বাড়াইয়া দিলেন। গোবিন্দবাবু নিজের হাত-পা সব গুটাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি চাই?"

দরজার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ঠাকুরমশায় সন্তর্পণে বলিলেন—"আপনার হাত।"

কিন্তু বাণ লক্ষ্যভেদ করিল। কথাটি বাহিরে যাইয়া পৌঁছাইল। জনতা ঘরে ঢুকিল।

"ও বোধ হয় হাতাহাতি করতে চাইছে স্যার!"

"না-না—তক্তপোষের শেষ প্রান্ত হইতে ভীত প্রতিবাদ আসিল।

"না-না?" তবে কি? হাত নিয়ে কি করা হবে? হাত নিয়ে লোকে করে কি?"

"আজ্ঞে দেখব!"

"এখনও হাত দেখার সখ মেটেনি?"

"লোকটা আচ্ছা ঢাঁটা তো!"

"হাত কতরকম দেখতে চায়, দেখাচ্ছি, ওকে'

কারো হাত মুষ্টিবদ্ধ, কারো অর্ধ[illegible] কারো চিৎ করিয়া পাশ ঘোরানো, কারো গাঁট্টাওয়[illegible] কারো চিমটি ধরা—নানাপ্রকার হাত আশেপ[illegible] শূন্যে ঘুরিতে লাগিল।

গোবিন্দবাবুই শেষ পর্যন্ত আড়াল করি[illegible] গণকঠাকুরকে।

"দেখুন"—

গণৎকার দেখিতে লাগিলেন।

"যা চিন্তা করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে

"কি?" দিগ্বিদিকে প্রতিধ্বনিত হ[illegible] লাগিল "হুঁ"………

"বৃদ্ধ হইয়াছি, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে—হ[illegible] রেখা সুস্পষ্টভাবে পাঠ করিতে পারি না এখন দেখিতেছি প্রমাদ ঘটিয়াছে—পুত্রস্থলে পঠিত হইবে"।

ঘরের অখণ্ড নিস্তব্ধতা ভংগ করিয়া "আ[illegible] সার্টিফিকেট অব পোষ্টিং" রসিদখানা গোবিন্দব[illegible] পকেট হইতে পড়িয়া লাফালাফি করিতে লাগিল

কয়লা খাদের নীচে

(২৯৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

এমনি করেই সময় কাটে ওদের—সবাই চিঁ[illegible] করে, তবু মনে ক্ষীণ আশা—

কদিন পরে গোরাচাঁদ বললে—আচ্ছা ভা[illegible] মহী,—এখন ওপরে রাত না দিন—আমার একা[illegible] বেশ তন্দ্রার মত এসেছিল,—ঘুমের ঘোরে এ[illegible] অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলুম জানলি,—বিলাসী খাদে[illegible] মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, বলছে যে, ঠাকুর ওর ধণ[illegible] মেনেছেন, ওর কথা শুনেছেন, বলেছেন যে, আ[illegible] দুদিন ওদের অপেক্ষা করতে বল—তারপর ওদে[illegible] উদ্ধারের ব্যবস্থা আমিই করছি—কিন্তু এর পরে ওরা যদি তোদের উপর অত্যাচার করে, না শোধরা[illegible] তাহলে ওদের এবার শুধু ডুবিয়ে নয়, পুড়ি[illegible] মারবো। বিলাসী আরো বললে—বাবেয়া ভা[illegible] আছে, তার কোলে আর একটি খুকী এসেছে-লাল টুকটুকে গোলগাল—আর কি বললে জানিস-আমি ব্রত নিয়েছি বামুনদের মেয়ের মত—এ[illegible] রকমের সাবিত্রী-ব্রতই—

সাধুচরণ চুপ করে শুনছিল আচ্ছন্ন হ[illegible] বললে—সত্যিই ওর সাবিত্রীর তেজেই জন্ম—

ভাই মহী, আমায় ভালো হতেই হবে, সেই জন্য[illegible] বাঁচতে হবে—

সত্যিই অদ্ভুতভাবে তারা বেঁচে গেলো। য[illegible] তাদের তোলা হোল তখন ভাবতেই পারেনি তারা আঠারো দিন আঠারো রাত তারা ঐ অন্ধকা[illegible] গর্তে না খাওয়া না দাওয়া করে কাটিয়ে[illegible] গোরাচাঁদকে যখন বাইরে নিয়ে এলো স্ট্রেচারে ক[illegible] সে দেখলো বিলাসী বসে আছে গাছতলায় বে[illegible] হয়ে—যেন ধ্যানমগ্না এক তাপসী—এক মনে ম[illegible] মৃত্যুঞ্জয়ের নাম জপ করছে।

সবাই চেঁচিয়ে বলে—এই সে গোরাকে এনে[illegible] বেঁচে আছে, বেঁচে আছে, বিলাসীর ঠোঁট শু[illegible] নড়লো, চোখটা একটু খুললো—আঃ, বেঁচে আ[illegible] ঠাকুর—তার পরেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলো সে।

ফোটোগ্রাফ

সন্দীপ গুপ্ত

রজত ও দীপক বাল্যবন্ধু। কিন্তু এক সময় একটি মেয়ে ওদের বন্ধুত্বে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছিল। মেয়েটির নাম মালা। মালার রূপ ছিল। রূপমুগ্ধ দুই বন্ধু পরস্পরের শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। হয়তো এই শত্রুতা কালক্রমে মারাত্মক আকৃতি ধারণ করতো, কিন্তু মালা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় তা আর হয়নি। তারপর গঙ্গানদীতে অনেক জল বয়ে গেছে। মালা এখন সিনেমার নটী। ওদিকে রজত-দীপক কর্মচক্রে পুনর্মিলিত।

রজতের একটা দোকান আছে ক্যামেরার। বিডন স্ট্রিটের মোড়ে। দোকানটা আপনারা দেখে থাকতে পারেন। চকচকে অক্ষরে আর্টিস্টিক কায়দায় সাইনবোর্ড : 'রজত অ্যাণ্ড কোং' 'কোং'টি অবশ্য শব্দের অপব্যবহার। রজতের অংশীদার কেউ নেই। রজত একাই দোকানের মালিক এবং পরিচালক। ক্যামেরা বিক্রী করে, ফোটো তোলে, ছবির নেগেটিভ তৈরী, প্রিণ্ট করা সমস্ত কাজই রজত একা করে। খালি ডার্করুমের জন্য একটি অ্যাসিস্টাণ্ট রাখতে হয়েছে। এইটুকু যা বাড়তি খরচ।

বিকেলের দিকে দীপক প্রায়ই আসে। দুই বন্ধু সুখ দুঃখের গল্প করে। সম্প্রতি দীপক একটা খবর এনেছে। মালার নাকি বিয়ে হচ্ছে, বোস্ ফ্যামিলির ছেলের সঙ্গে। খবরটা চমকপ্রদ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রজতের বিশ্বাস হচ্ছিল না। সে বললো, যাঃ, ঐ মেয়ে করবে বিয়ে? এই বয়েসে? আগে ওর তেত্রিশ বছর বয়েস হোক, রক্তের তেজ কমুক, জৌলুষ কমুক।

দীপক বললো নারে আমি খবর নিয়েছি। মালার সঙ্গে ইদানীং আমার দেখা হয়েছিল কিনা।

মালার সঙ্গে দেখা হয়েছিল!

হ্যাঁ। সে অনেক ব্যাপার। আমার দাদার এক বন্ধুর......

রজত বিবৃতিটা শুনলো। মুখে ঈর্ষার স্বল্প একটু কুঞ্চন কিছুক্ষণের জন্য দেখা গেল। মালা ফিল্মস্টার হবার পর থেকে রজত তার কোন নাগাল পায়নি। অথচ দীপকটা মালার সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়েছে। সে বললো, ইউ আর লাকি'

দীপক আত্মপ্রসাদে চেয়ারে বসে পা নাচাতে লাগলো।

রজতের বিমর্ষ ভাবটা বেশিক্ষণ কিন্তু স্থায়ী হোল না। একটা সিগারেট ধরিয়ে ভুরু কুঁচকে সে বললো, শ্যারে মালার একখানা ফোটো নেওয়া যায় না?

ফোটো? দীপক কথাটা ধরতে পারলো না। 'ফটো নিয়ে কি হবে!' বললো সে। 'কি হবে!' রজত মুখ ভেংচালো। 'শো-কেসে সাজিয়ে রাখবো। ও সব মেয়ের ফটোর বিজ্ঞাপন হিসেবে দাম কতো! ইট্ উইল্ অ্যাট্রাক্ট ইয়ংস্টার্স অ্যাণ্ড্ ওল্ড্-মেন।'

'হুঁ, কথাটা মন্দ বলিস্‌নি!' বললো দীপক। 'কিন্তু মালা কি রাজী হবে?'

তুই একবার বলে দ্যাখ্‌না। তোর সঙ্গে তো আলাপ হয়েছে।

আলাপ তো তোর সঙ্গেও ছিল। তুই নিজে গিয়ে অ্যাপ্রোচ্ কর।

তোকে ও ঢের বেশি পছন্দ করতো। তোর মনে নেই আমি একবার ওর ফোটো তুলবার চেষ্টা করেছিলুম? মানে, যখন আমাদের রাইভ্যালরি ছিল, সেই উনিশ শো বাহান্ন সালে! ও আমাকে কি বলেছিল জানিস্? 'ইউ আর এ ব্রুট্।'

দীপক হাসতে লাগলো। বললো : আমিও ওর ফোটো তুলবার চেষ্টা করেছিলুম রে উনিশ শো একান্ন সালে। আমার নিজের তো ক্যামেরা ছিল না। বললুম, চলো ডি রতনে তোমার আর আমার একটা ছবি নেওয়া যাক। ও ঠাশ্ করে আমার গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বলেছিল 'অসভ্য ছেলে।'

তাহলে এখন কি ও ফোটো তুলতে রাজী হবে?

দীপক বললো, দাঁড়া আমি একবার সাবজেক্টটা ব্রোচ্ করে দেখি। চেষ্টা করতে তো আপত্তি নেই। কি বলিস?

রজত নিরাশ্বস্তভাবে বললো, দ্যাখ, যদি পারিস্। তবে বলিস্‌নি যেন যে ছবিটা বিজ্ঞাপনের জন্যে চাচ্ছি। বল as an admirer।

দীপক বললো, আমাকে শেখাতে হবে না। আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেবো।

দিন দুই বাদে দীপক এসে খবর দিলো। বললো, মালা তোকে দেখতে চেয়েছে। কাল সকাল আট্‌টা নটার মধ্যে যাস্।

ফোটোর কথা বলেছিলি?

বলেছিলুম। ও বললে, রজতকে একবার দেখা করতে বলো আমার সঙ্গে।

রজত ঢোক গিলে বললো, গিয়ে কি কোন লাভ হবে?

চেষ্টা করে দেখ না। খেয়ে তো ফেলবে না।

বলা যায় না। রজত ক্ষীণস্বরে রসিকতা করবার প্রয়াস পেলো। দীপক পা দোলাতে লাগলো।

পরদিন যথাসময়ে রজত গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে এবং ক্যামেরার ঠ্যাংগুলি বগলদাবা করে মালার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হোল। তার চেহারাটা বেশ চকচকে। মালার কাছে যাচ্ছে এতো দিন বাদে। হোক ব্যবসায়িক প্রয়োজন, তবু অতীতের মিষ্ট স্মৃতির একটু মর্যাদা রাখতে ক্ষতি কি? তাছাড়া মালা তাকে দেখতে চেয়েছে, মালার চোখে তার স্বার্থপর রূপটা যেন প্রকাশ না হয়। মালা যেন ভেবে নেয় যে ওর নটী জীবনের খ্যাতিতে মুগ্ধ হয়ে রজত ছবি নিতে চাইছে : ছবিটা হবে যেন দোকানের আবরণ, বিজ্ঞাপন নয়।

গেটে দারোয়ান ছিল। রজত নিজের নাম লেখা একটুকরা কাগজ দরোয়ানের হাতে দিল। ওর জামা-কাপড়ের পারিপাট্যে আকৃষ্ট হয়ে লোকটা ওকে সসম্মানে বাহিরের ঘরে বসতে বললো।

বেশিক্ষণ রজতকে অপেক্ষা করতে হোল না। একটা সুঘ্রাণে আকৃষ্ট হয়ে মুখ ফিরোতেই সে মালাকে দেখতে পেলো। মালা বরাবর সুন্দরী। এখন যেন রঙ আর রূপ ফেটে পড়ছে।

রজত সেই হাসি হেসে বললো, চিনতে পারছো?

মালা স্বর্গীয় দুই পাটি দাঁত বের করে অর্থাৎ হেসে বললো, পারছি রজত। ভালো আছো?

আছি। তুমি কেমন আছো জিগ্যেস করবো না। জানি ভালো আছো।

মালা বললো, দীপকের মুখে শুনলুম, আমার ফোটো তুলতে চেয়েছ। কত সুন্দরী মেয়ে আছে বাংলা দেশে। আমার ফোটো তুলবার সখ হোল যে বড়?

তোমার চেয়ে সুন্দরী কেউ নেই কিনা!

যাও, মিথ্যে বোলোনা। কি করবে ফোটো নিয়ে? দোকানে ঝুলিয়ে রাখবে?

রজত কৃতার্থভাবে হাসলো।

মালা বললো, আমার ছবিটা তাহলে বিজ্ঞাপন হবে তোমার দোকানের, কি বলো?

'বিজ্ঞাপন নয়' রজত তাড়াতাড়ি শুধরে দিলো। 'ওটা তোমার একটা স্মৃতি থাকবে আর কি।'

'আমার স্মৃতি তো সিনেমা-পত্রিকার পাতা খুললেই দেখতে পাবে।'

'মানে, আমার নিজস্ব একটা ছবি—বুঝতে পারছো না?'

'বুঝতে পেরেছি' মালা স্বর্গীয়ভাবে হাসলো, যে হাসি বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের পাগোল করে দিয়েছে। বললো, 'তাহলে তুলবার ব্যবস্থা করো। হ্যাঁ, কাজের কথাটাও এই সঙ্গে বলে রাখি। আমার ফীস্ কিন্তু একটু বেশি।'

'ফীস্!' রজত অর্থটা ধরতে পারলো না।

হ্যাঁ, মানে আর পাঁচজন অ্যাকট্রেস যা নেয়, তোমাদের বিজ্ঞাপন পারপাসে, আমি তার চেয়ে

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায় [illegible])

হিন্দী লোকসঙ্গীতে বিরহ

মায়া গুপ্ত

বিরহের বর্ণনায় সর্বকালে এবং সর্ব ভাষায় মধুর কাব্য, গীত, কাহিনী প্রভৃতি রচিত হয়েছে। নারী ও পুরুষ উভয়ের রচনা এই ক্ষেত্রে সমতুল্য রূপে মর্মগ্রাহী ও মধুর। পদাবলী সাহিত্যে বিরহ বর্ণন, হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে রাগ-রাগিণীর সহিত বিরহ বর্ণন, সংস্কৃত কাব্যে বিরহ, ইংরেজী সাহিত্যের স্বর্ণযুগের বিরহ কাব্য, উর্দু কবিতা সাহিত্যের বিরহ দর্শন এবং অতি আধুনিক কবিতায় বিরহ এ সকলই চিরদিন পরম আদরে সুধী সমাজ দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছে এবং হবে। তেমনই লোকসংগীতের তথাকথিত অশিক্ষিত নর-নারী, বিশেষরূপে নারী রচিত গীতগুলি রসজ্ঞ সমাজে আদৃত হয়ে এসেছে। যদিও প্রচারের অভাবে সহর অঞ্চলে জনসমাজ লোকসংগীত হতে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন এবং বর্তমান সভ্যতায় বৈজ্ঞানিক সাধনগুলি সহজলভ্য হওয়ায় লোকসংগীত ও অপরাপর সাংস্কৃতিক সাধনগুলির ব্যবহার বিস্মৃত হয়েছেন।

যাই হোক এখনও গ্রামাঞ্চলে লোকসংগীত, নৃত্য প্রভৃতির যথেষ্ট আদর আছে এবং নিষ্ঠার সহিত সেগুলি নানাবিধ উৎসব, পর্ব ও সামাজিক অনুষ্ঠানে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

অজ্ঞাত নারীদের রচিত লোকসংগীতে বিরহের করুণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এর সংগীতগুলির ভাব পুরাতন কিন্তু চিরন্তন এবং ভাষা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গায়িকাদের মুখে কিছু কিছু পরিবর্তিত হয়েছে, বলে রাখা সংগত।

"বড়ে বড়ে বুনবারে
বরিসেলা সাবনবাঁ
অরে কেহু না কহেলা হমরা
হরি কে আবনবা রে।"

"শ্রাবণের বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে; হায় কেহই আমার প্রিয়তমের আগমনের কথা শোনায় না"।

মনে হয় বধূ লজ্জায় কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন না।

"জে মোরা কহিহে' রে
হরি কে আবনবাঁ রে
থাকে দেবো হাথ কে কংগনবা রে।"

অর্থ খুবই সহজ প্রায় বাংলা বলা যায়। ভোজপুরী ভাষায় রচনা।

"টুটহী মড়ইয়া বুনিয়া টপকই রে
কে সুধি লেবৈ হমার
জেঠা ছবাবঈ আপন বংগলা রে
দেওরা ছবাবই চউপারি
হমরা মুদিলবা কেন ছবহই' রে
জেকব পিয়বা বিদেশ।"

"আমার ঘরের চাল ফুটো হয়ে গেছে বর্ষার জল পড়ছে ঘরে; আমার খবর কে রাখে? ভাসুর নিজের বাড়ীর চাল ছাই-এ নিচ্ছেন, দেবরও নিজের ঘর। আমার প্রিয়তম বিদেশ, আমার ঘরের চাল মেরামত কে করে?"

"করা কৌন জতন অরী এ রী সখী
মোরে নয়নোঁ সে বরসে বদরিয়া
উঠী কালী ঘটা বাদল গরজে,
চলী ঠণ্ডী পবন মেরা জিয়া লরজে
থো পিয়া মিলন কী আস্ সভী
পরদেস গয়ে মোরে সাঁবরিয়া।
সব সখিয়া হিংজেলে ঝুলে রহংী,
খড়ী ভীজুঁ পিয়া তোরে আংগন মেঁ
ভর দে রে রংগীলে মন মোহন,
মেরী খালি পড়ী হৈ গাগরিয়া।"

"হে সখী কি করি? আমার নয়নে বাদল ঝরছে। বাহিরে কালো মেঘ গর্জন করছে, ঠাণ্ডা বাতাসে আমার বক্ষ কম্পিত হচ্ছে। প্রিয়তম মিলনের আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়ে কিন্তু তিনি তো প্রবাসে। অন্য সকল সখীরা আনন্দের দোলায় দুলছে। হে প্রিয়, আমি তোমার অংগনে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছি, আমার কুম্ভশূন্য, হে রসিক-নাগর সেটি পূর্ণ করে দাও।" গীতটি কাব্য সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ এ বিষয়ে দ্বিমত হবে না। সহজ সরল বিরহ ভাবের অভিব্যক্তি। বিরহে এবং অন্য সকল প্রকার কষ্টেই মানুষ নিজের অবস্থাকে তুলনা করেন অপরের সংগে, কিছুটা হিংসাও থাকে দুঃখের মধ্যে।

"বুঁদন ভীজৈ মোরী সারী মৈ কৈসে জাউঁ বালমা
এক তো মেহ ঝমাঝম বরসৈ, দুজৈ পবন
ঝকঝোর
জাউঁ তো ভীজৈ মোরী সুরংগ' চুন্দরিয়া,
নাহিত ছুটত সনেহ
সনেহ সে চুনরী হোইহৈ' বহুবরি,
চুনরী সে নাহিন সনেহ।"

"বৃষ্টিতে আমার সাড়ী ভিজে গেল হে প্রিয়তম মিলনে কি করে যাই? একে তো ঝমাঝম বৃষ্টি আর তার ওপর ঠাণ্ডা বাতাস। গেলে আমার এমন সুন্দর রঙ্গীন 'চুনরী' (সাড়ী বা ঘাঘরা) ভিজে বদরং হয়ে যাবে আর না গেলে প্রিয় মিলন হবে না, প্রেম শেষ হয়ে যাবে। ওগো বৌ প্রেম থাকলে চুনরী আবার হবে কিন্তু চুনরী প্রেম ফিরে দিতে পারবে না।"

গানটিতে অবশ্য বিরহের করুণ রস নেই, তার পরিবর্তে কিন্তু যথেষ্ট সাংসারিক বুদ্ধির পরিচয় আছে।

"ঘেরো ঘেরো আবে পিয়া কারী বদরিয়া
দৈয়া বরসৈ হো বড়ে বুঁদা বদরিয়া বৈরিন হো
সব লোগ ভীজৈ ঘর অপনে
মোর পিয়া ভীজৈ' পরদেশ
বদরিয়া বৈরিন হো।"

'কালো বাদল ঘিরে আসছে, মেঘ বর্ষণ করছে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা। মেঘ আমার বৈরী, সকলে নিজের ঘরে ভিজছে, কেবল আমার প্রিয়তম বিদেশে ভিজছেন—"অর্থাৎ বৃষ্টিতে ভিজছেন সকলেই, স্বগৃহে ভিজছেন ভাগ্যবানেরা, আমার প্রিয় যিনি তিনি প্রবাসে ভিজছেন তাঁর ভাগ্য অপ্রসন্ন। এখানে ভেজার বিরুদ্ধে নায়িকার অভিযোগ নেই, অভিযোগ স্বগৃহের বাহিরে ভেজায়!

গীতগুলি সবই প্রায় বর্ষার গীত। বর্ষায় গাওয়া হয় এগুলি; কাজরী ও 'বিরহা' এগুলির নাম। বর্ষায় কেন বিরহ গীত গাওয়া হয় সে প্রসঙ্গ এখানে নয়, তার বিচার আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ, মনবৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসকদের সম্মিলিত গবেষণার বিষয়।

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

একটু বেশিই চার্জ করি। বুঝতেই পারছো, আমার মার্কেট। মালা মিত্র নাম নিতে লোকে এখন অজ্ঞান। আমি যদি রেট্ কমাই, তোমাদের মত ব্যবসাদারেরা আমাকে তাহলে পাগোল করে ছাড়বে।

রজত তাকিয়ে রইল।

মালা বললো, ক্যামেরাটা তাহলে ঠিক করে নাও। একটু তাড়াতাড়ি কোরো, ভাই, আমাকে আবার বেরুতে হবে এখুনি।

রজত যন্ত্র চালিতের মত ক্যামেরার পাগুলি টানতে লাগ্লো। একবার সে মুখ তুললো, মনে হোল কিছু বলবে, কিন্তু কিছুই বললো না।

বিনিময়

(২৯৩ পৃষ্ঠার পর)

বিনয়ের গল্প শেষ হল না। ট্রেণ চলতে সুরু করল।

বিনয় ব্যস্ত হয়ে বললে—কোন্ গাড়ীতে উঠেছিস?

ছুটে যাচ্ছিলাম পেছনের দিকে। বিনয় খপ করে হাত ধরে ফেললে। —এইখানেই উঠে পড়। এই বলে লাফ দিয়ে ও সামনের একটা গাড়ীতে উঠে পড়ল। কিন্তু আমার ওঠা হল না। উঠলাম না ইচ্ছে করেই। আমার সেই গাড়ীতে উঠতেই হবে যে। একটা ষ্টেশনও এখন ছেড়ে থাকা উচিত নয়। কাজল—

ট্রেণ বেশ জোরে চলেছে। সেই অবস্থাতেই ছুটে উঠতে গেলাম আমার কম্পার্টমেণ্টে। অমনি প্লাটফর্মের লোক হৈ হৈ করে উঠল—কুলীর দল দুহাত তুলে ছুটে এল।

—চেন টানুন—চেন টানুন—! প্যাসেঞ্জাররা চেঁচিয়ে উঠল।

কিন্তু না—চেন টানতে হল না। কোন রকমে হ্যাণ্ডেলটা ধরে ফেলেছি। এবং আশ্চর্য হলাম, ভাগ্যগুণে ঠিক গাড়ীতেই উঠেছি।

দরজাটা খুললাম কোন রকমে। হাতটা কাঁপছে তখন থরথর করে। নিঃশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে। চুল এলোমেলো হয়ে গেছে।

পরাজিত নায়কের মত গাড়ীতে উঠে এলাম। অমনি অসংখ্য চোখের দৃষ্টি পড়ল আমার ওপরে। সে সব দৃষ্টির আঁচে আমার সর্বাঙ্গ পুড়তে লাগল।

—এখুনি তো হয়েছিল মশাই!

—আপনার কি মাথা খারাপ আছে? ঐ রকম চলন্ত গাড়ীতে উঠলেন!

——বয়েস কত হল?

—টিকিট কাটেননি বুঝি?

—মশায়ের যাওয়া হবে কতদূর?

এমনি মন্তব্য বর্ষণ হতে লাগল চারিদিক থেকে। মাথা নীচু করেই ছিলাম। কি মনে হল সব অপমান মাথায় নিয়ে একবার মুখ তুলে চাইলাম।

হ্যাঁ, কাজল আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কিন্তু তার সে চোখের দৃষ্টি এক অদ্ভুত রহস্যে ঘেরা। ঘৃণা কি তিরস্কার অনুকম্পা কি বিস্ময় সহসা বুঝতে পারলাম না।

কাজলের স্বামী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এই সময়—খোকনকে জাগিয়ে দাও। বংশবাটী এসে গেল।

মনে হল কাজল যেন একটু চমকে উঠল।

—এখুনি নামতে হবে?

—হ্যাঁ। ছোট্ট উত্তর দিল কাজলের স্বামী।

চেহারা ও চরিত্র

(২৯২ পৃষ্ঠার পর)

একটা একঘেয়েমির দিক আছে তেমনি একটা উদ্দেশ্যমূলকতাও আছে।

চেহারা আর চরিত্রের মধ্যে যে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে এবং এই সম্পর্কের অস্তিত্বে যে আমাদের আস্থা গভীর তার অন্যতম প্রমাণ পাওয়া যায় নাটকের ভূমিকা নির্বাচন ও বিতরণে। আমরা যখন রংগমঞ্চে কিংবা পর্দার গায়ে অভিনয় দেখি তখন প্রায়ই প্রয়োগকর্তাদের মানব-চরিত্র জ্ঞানের সূক্ষ্মতায় অবাক হয়ে যাই। দর্শকের সাধারণ অভিজ্ঞতা এই যে, যাকে যে ভূমিকাটি ঠিকমত মানায় নাট্য-পরিচালক তাকেই যেন সেই ভূমিকাটি অর্পণ করেন। যে অভিনেতার কার্তিকের মত চেহারা, গোলগাল মসৃণ শরীর আর প্রজাপতি-গোঁফ আর মধ্যবিভক্ত কোঁকড়ানো চুলে বেশ একটা দুলাল-দুলাল ভাব, দেখা যায় পরিচালক অবধারিতভাবে তারই উপরে যেন ধীরোদাত্ত নায়কের ভূমিকাটি ন্যস্ত করেন। আবার চোয়াড়ে চেহারা, ভাটার মত চোখ, রুক্ষ গাত্রাবরণ—অভিনেতাদের মধ্যে এরকম যদি কেউ থাকে তাকেই যেন নাটকের villain of the piece বা শয়তানী চরিত্র অভিনয়ের বরাত দেওয়া হয়। ইয়াগোর জন্যই এক ধরণের অভিনেতার প্রয়োজন, আবার ওথেলোর জন্যই অন্য; যে ব্যক্তিকে শকুনির ভূমিকায় মানায় নিশ্চয় তাঁকে অর্জুনের ভূমিকায় মানায় না। বিলাসীর ভূমিকা অভিনয়ের জন্য এক ধরণের অভিনেতা বাছাই করা হয়, আবার সাধু-সন্ন্যাসী-বৈরাগী ভক্তের ভূমিকার জন্য আর এক ধরণের চেহারার অভিনেতার প্রয়োজন হয়। প্রেমের মূর্তিময় আধার, শান্ত সুশীলা রূপবতী নায়িকার জন্য প্রযোজক এক ধরণের অভিনেত্রীকে নির্বাচিত করেন, আবার বিলোল-কটাক্ষী লাস্যময়ী বিলাসিনী নারীর ভূমিকা অভিনয়ার্থে তিনি ভিন্নবর্গের অভিনেত্রীর উপর তাঁর মনোনয়ন অর্পণ করেন। ক্রূর চরিত্রের অভিনয়ের জন্যই তাঁর এক ধরণের অভিনেতার প্রয়োজন হয়, আবার সরল-অন্তকরণ মানুষের ভূমিকা পরিস্ফুটনের জন্য তিনি ভিন্নধর্মী অভিনেতার সাহায্য গ্রহণ করেন।

কেন ভূমিকা নির্বাচনে নাট্য-পরিচালকের এই বিচার ভেদ? এর উত্তর স্পষ্ট। মানুষের আকৃতির দ্বারা তার প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়—এই বোধ নাট্য-পরিচালকের মনে ক্রিয়া করে বলেই তিনি ভূমিকার বন্টনে যে চেহারা যে ভূমিকায় মানায় তার উপর তাঁর পক্ষপাত ন্যস্ত করেন। তাঁর এই বিচারক্রিয়া প্রায়শঃ যথাযথ হয়; যাকে যে ভূমিকাটি দেওয়া দরকার, তাকেই যেন খুঁজে পেতে এনে সেই ভূমিকাটি দেওয়া হয়। এই নিয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে মন-কষা-কষি, অভিমান প্রভৃতি পর্যন্ত হতে দেখা যায়। সৎ-সাধু ভালো মানুষের ভূমিকা গ্রহণে সকলেই লোলুপ, কিন্তু শয়তান বা শয়তানীর ভূমিকার বেলায় তা নয়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে জীবিকার দাসত্বের কারণে অভিনেতার পক্ষে ওই ভূমিকা গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না, কিন্তু স্বেচ্ছায় খুব কম অভিনেতাই শয়তানের ভূমিকা অভিনয় করতে এগিয়ে আসেন। তাঁর এই অনিচ্ছার হেতু স্পষ্ট। যেহেতু আকৃতির সংগে প্রকৃতির চেহারার সংগে চরিত্রের মিল আছে বলে মানুষের বিশ্বাস, সেই হেতু সংশ্লিষ্ট অভিনেতার মনে অজ্ঞাতসারে—অর্ধজ্ঞাতসারে এই চেতনা ক্রিয়া করে যে, শয়তানী চেহারার সঙ্গে তাঁর চেহারার সাদৃশ্য আছে বলেই বোধ হয়, তাকে ওই ভূমিকার অভিনয়ের জন্য মনোনয়ন করা হয়েছে। এই চেতনা অস্বস্তি-কর, সময় সময় অতিশয় পীড়াদায়ক। মনের উপর এর ক্রিয়া সাংঘাতিক। সাধারণ অপরাধী শাস্তিপ্রাপ্ত হতে হতে যেমন দাগী অপরাধীতে পরিণত হয়, তেমনি ঠগ-জোচ্চোর-বদমাস প্রভৃতির ভূমিকা অভিনয় করতে করতেও সংশ্লিষ্ট অভিনেতার মধ্যে অনুরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য নয়। প্রযোজক কর্তৃক ভূমিকাবিশেষের জন্য অভিনেতাবিশেষ মনো-নয়নের মধ্যেই যেন সেই ভূমিকার স্বভাবের সঙ্গে অভিনেতার স্বভাবের সাদৃশ্যের suggestion রয়েছে। এ suggestion কোথাও প্রত্যক্ষ, কোথাও পরোক্ষ। যেখানে প্রত্যক্ষ, সেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর তার প্রভাব অতিশয় ক্ষতিকর। এ জিনিস মনকে কুরে কুরে খায় এবং এক সময় তার মন অবসাদে ভেঙে পড়াও আশ্চর্য নয়। 'ভ্যাম্পায়ার গার্ল' বা 'ইট' গার্লের অভিনয় করতে করতে অভিনেত্রী সত্যই অনুরূপ চরিত্রে পরিণত হয়েছে, এ রকম নজীরের বোধ হয় অসম্ভাব নেই।

কেউ কেউ বলতে পারেন, মেক-আপের দ্বারা অভিনয়ের চেহারার আমূল পরিবর্তন সাধন করা যায়। তা হয়তো যায়, তবে একটা বিশেষ দিকে অভিনয়ের প্রবণতা বা ক্ষমতা মেক-আপের উপরে নির্ভর করে না, শিল্পীর ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে। যে অভিনেতার মধ্যে শক্তিমত্তা ও নেতৃত্বের উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব নেই, সেই অভিনেতা দোর্দণ্ড প্রতাপ জমিদারের মেক-আপে অবতীর্ণ হলেও সেই ভূমিকার প্রতি সুবিচার করতে পারবেন, এমন আশা করা যায় না। অন্যপক্ষে, মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে যে অভিনেত্রীর নিজেরই মধ্যে matronly ভাব এসে গেছে তাঁর বেলায় মেক-আপ অবান্তর হয়ে ওঠে। আসলে শিল্পীর ব্যক্তিত্বটাই হচ্ছে আদত। তাঁর চেহারার দ্বারা তাঁর চরিত্র নিয়ন্ত্রিত হয়। মেক-আপের ফলে সেই মৌলিক কাঠামোর সামান্যই রদবদল হয়।

সার্থকতা

॥ অলকারাণী সিংহ ॥

ছন্দ-হারা জীবন মাঝে
আজ্‌কে কাহার গুঞ্জনে—
আন্‌ছে সাড়া আপন-হারা,
—লাগ্‌ছে দোলা মোর মনে?
আনন্দেতে হৃদয় মেতে
ঝর্‌ছে খুশির ঝর্ণা যেন,
সবার মাঝে হারিয়ে যাবো!
—বল্‌তে পারো আজ কেন?
জীবন-ভ্রমর, গুঞ্জনেতে
জাগাও সাড়া বিশ্বময়,
ফুলের জীবন ধন্য আজি,
—ব্যর্থতাতো তুচ্ছ নয়।
মহা কালের শূন্য ভালে
তাই আঁকি আজ জয়টীকা,
—হৃদয় বলে ধন্য আমি,
জ্বল্‌লো প্রাণের দীপ-শিখা।

পথ-প্রদর্শন

(২৯১ পৃষ্ঠার পর)

মণিকুন্তলা বলে, আজ আমার জন্মদিন। ছাব্বিশ বছর পূর্ণ হয়ে গেল। আজ যদি না আসতেন—। মণিকুন্তলা থেমে যায়। তার ব্যথায়-ভরা ডাগর ডাগর চোখ দুটি তুলে।

—আজ না এসে পারতাম না। আমি জানি তোমার জন্মদিন আজ। একথা তুমিই বলেছিলে আমায়। আজ তোমায় আমি আশীর্বাদ করব মণি।

—সত্যি? মণিকুন্তলার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

—সত্যি। তোমার কাছে গোপন করব না কিছু। আজ তোমায় আশীর্বাদ করব বলেই এ ক'দিন আসতে পারিনি তোমার কাছে।

—আঘাত দিয়ে প্রলেপ দেবেন বলে?

—না। তোমায় আর বেশী আঘাত দিতে মন চায় না। অনেক আঘাতই পেয়েছ তুমি জীবনে, অনেক ব্যথাই সয়েছ। এ ক'দিন আসিনি বটে, কিন্তু সাধনা কোরে চলেছিলাম শুধু তোমারই জন্যে। তোমার কাছে না এলেও জেন, সব সময়ে বসিয়ে রেখেছিলাম তোমাকে আমার পাশটিতে।

মণিকুন্তলা বুঝতে পারে না কিছু। শুধু তাকিয়ে থাকে ফ্যাল ফ্যাল কোরে।

শোভাময় বলে চলে স্মিতমুখে, আমি সাহিত্যিক। সাহিত্যই আমার নেশা। তোমাদের জীবনটাকে সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলব এই ছিল আমার ধ্যান, এই ছিল আমার সাধনা। তাই দিনের পর দিন এখানে এসে সাধনা কোরে গেছি আমি। তোমার মত বাড়ীতে আমারও সুন্দরী স্ত্রী আছে মণি। ফুটফুটে ছেলেও আছে একটি। তবুও তাদের মোহ ত্যাগ কোরে, তোমার সংগে নির্জনে কাটিয়ে গিয়েছি এখানে প্রতিটি সন্ধ্যা। সাধনা সার্থক হয়েছে আমার। তোমায় ফুটিয়ে তুলতে পেরেছি আমার সাহিত্যে। সাহিত্যের গণ্ডীর মধ্যে তোমায় রাখলাম আমি বেঁধে। সেই সাধনালব্ধ সাহিত্য তোমাকে উৎসর্গ কোরে আজ তোমায় আশীর্বাদ করছি আমি।

মণিকুন্তলা সরে আসে। প্রণাম করবার ছল কোরে একেবারে লুটিয়ে পড়ে শোভাময়ের পায়ের ওপর। চোখের জলে পা দুটিকে ভিজিয়ে দেয়। ও যেন সার্থক হয়ে উঠেছে। আর যেন ওর কোন খেদ নেই।

পূজা সংখ্যা সম্পাদনাঃ পরিমল গোস্বামী, ভূষণচন্দ্র দাস, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। অভিনয় জগৎঃ মহেন্দ্র সরকার। ক্রীড়াজগৎঃ অজয় বসু। পূজা সংখ্যা পাত্‌তাড়ি সম্পাদনায় "স্বপনবুড়ো" ও সাহায্যকারীরূপে হিমালয়নির্ঝর সিংহ।

গল্পচিত্রণঃ কালীকিংকর ঘোষ দস্তিদার, শৈল চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্র বল, রেবতী ঘোষ, সুধীর মৈত্র, সুধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল সেন, মৈত্রেয়ী দেবী, চুনী দত্তগুপ্ত। লাইন ও হাফটোন ব্লকঃ সরকার্স ক্রোমোটাইপ স্টুডিও।

সম্পাদক—**শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়**। পত্রিকা প্রেস, ১২নং আনন্দ চ্যাটার্জি লেন হইতে **শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন** কর্তৃক মুদ্রিত ও ২নং আনন্দ চ্যাটার্জি লেন হইতে প্রকাশিত।

পরম
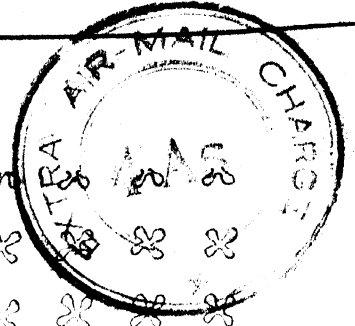
রমণীয়

উপহার

সোনায় পান্নায় বিজড়িত
উৎসবের দিনগুলি কী
সুন্দর! এমনি দিনেই তো
'দেওয়া আর নেওয়া'র
জন্য মন হয় চঞ্চল।
এই দেওয়া নেওয়ার
মাধুরীকে পূর্ণ করবে
'কোকোলা'— অনুপম
কেশ তৈল।

কোকোলা

সুরভিত কেশ তৈল

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া পারফিউম কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৩৪

ADC—J130

সূচীপত্র

কথা ও কাহিনী

সূচীপত্র

কথা ও কাহিনী

প্রবন্ধ

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

বিবাহে, উপহারে,
পূজাপার্বণে ও নিত্যব্যবহারে
রমা সিন্দুর
মনোরমা প্লাষ্টিক
কলিকাতা-১২

মিষ্টি নিয়ে
লুকোচুরি
চলে না
তাঁদের কাছে-
যাঁরা ভাল মিষ্টি চেনেন
গাঙ্গুরাম অ্যাণ্ড সন্স
ফোন
৪৭-২৩৭৭
লোকপ্রিয় মিষ্টান্ন পরিবেশক
ভবানীপুর ও কালিঘাট · কলিকাতা

শারদীয় যুগান্তর

সূচীপত্র

কবিতা

বিষয় লেখক পৃষ্ঠা

KIRON
উৎসবের
আনন্দ মুখরিত
প্রাঙ্গণে...
আলোকোজ্জ্বল
কিরণ
ল্যাম্প

পূজার সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন
সুন্দরের পূজারী....
আর, সি, দে
এণ্ড সন্স
অলঙ্কার-শিল্পী
১১, বহুবাজার স্ট্রীট · কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

কবিতা

সূচীপত্র

কবিতা

খেলাধুলা

অভিনয় জগৎ

ছোটদের পাততাড়ি

সূচীপত্র

ছোটদের পাততাড়ি

স্পুটনিক

মানুষের কণ্ঠে এক নতুন জিজ্ঞাসা
নতুন সবাক প্রশ্ন অবাক মনের ঃ
'তুমি স্পুটনিক?'
বিজ্ঞানের স্পর্ধা তুমি, আকাশের নতুন চ্যালেঞ্জ
পুরাতন পৃথিবীর তুমি একি নয়া উপদ্রব!
চাঁদেরে মারিতে চাও?
(চন্দ্রবদনার কোন নেই অভিশাপ?)
মঙ্গলেরে হানো অমঙ্গল?
গ্রহলোকে উপগ্রহ,
কী বার্তা এনেছ তুমি নয়া বার্তাবহ?

বীপ্ বীপ্ বীপ্!
মোরা বলি ধিক্ ধিক্ ধিক্।
সনাতন ঈশ্বরের সিংহাসনে কেন দাও হানা,
কেন ছিঁড়ে ফেলে দাও নিরুদ্দেশ স্বর্গের ঠিকানা?
ডানা নেই উড়িবার
নীড় বুঝি নেই কোন ভালোবাসিবার?
তবু নিয়ে এলে কোন নতুন নায়িকা
নাম তার 'শ্রীমতী লাইকা?'
লজ্জায় লুকালো মুখ যত ছিল উর্বশী মেনকা
ইন্দ্র সভা শূন্য হলো
ফুরাইল এতদিনে দেবতার যত পুণ্য ছিল!
আকাশ গড়ের মাঠ
পুড়িয়া চাঁদের মুখ হলো পোড়া কাঠ!

বুক বুঝি করে ঢিপ্ ঢিপ্
ধ্বনি শুনি বীপ্ বীপ্ বীপ্!
সহস্র যোজন যেন ছুটে চলে চক্ষের পলকে
পৃথিবীরে করে প্রদক্ষিণ
রাত্রি দিন
কী অদ্ভুত বেগে
ছুটিয়া চলেছে নিরুদ্বেগে।
এ চলার নাই কি বিশ্রাম?

লক্ষ লক্ষ বছরের ভেঙে গেল ঘুম
এলো গতি, এলো বেগ,
অগ্নিবাষ্প চক্র ও বিদ্যুৎ
কে ভাঙিল পরমাণু—
নিয়ে এলো নবযুগ বিপ্লবের দূত?
গ্রহ হতে গ্রহান্তরে উড়ে যাবে কুমার কুমারী
মহাব্যোমে ছড়াইবে প্রেম
শূন্যলোকে উড়াইবে মিথুন পতাকা,
মঙ্গলে বাসর শয্যা
চন্দ্রলোকে হবে 'হানিমুন?'

বীপ্ বীপ্ বীপ্!
হেথায় ফেলেছি মোরা ছিপ্
পুকুরের পাড়ে ধরি মাছ
মোদের গরুর গাড়ী চলে টুং টুং
তাড়াহুড়া নেই কিছু
গোবরে বানাই ঘুঁটে ধরাই উনুন!
যদিও হাঁড়িতে নাই চাল
আছে তবু স্বর্গলোক, আছে পরকাল।
দেওয়ালেতে আছে টিকটিকি
আর আছে পুরাতন পুঁথি, তারি পাতে দিনরাত লিখি
অদৃষ্টের নিগূঢ় বন্ধন!

হায়, ওরে স্পুটনিক,
ধিক্ তোরে ধিক্!
মানিলি না কোন ভূত, দেখিলি না কোন ভবিষ্যৎ
সূর্যলোকে ছুটাইছ রথ?
কিন্তু কতক্ষণ?
পুড়ে তুমি হবে ছাই
জীর্ণ খোলসের মত পথপ্রান্তে খসিবে রকেট,
যদিও মোদের ভাই, নিদারুণ শূন্য এ পকেট
তবু মোরা শুয়ে আছি চিৎ—
জানি জানি ভগবান আছেন নিশ্চিত!

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

আগমনী ও বিজয়া

শ্রীবাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

"আগমনী" ও "বিজয়া" শাক্ত পদাবলীর অন্তর্গত শাক্ত গীতি কবিতা। গিরিরাজ হিমালয় পত্নী মেনকা, কন্যা উমা, জামাতা ভোলানাথকে নিয়েই "আগমনী" "বিজয়ার" কাহিনী সৃষ্টি হয়েছে। এ কাহিনীর উপজীব্য চরিত্রগুলো সবই পৌরাণিক। কাহিনীর পটভূমিকাতেও পুরাণের স্থানই মুখ্য। কথিত আছে, পর্বতরাজ হিমালয় ও তাঁর পত্নী মেনকা কঠোর তপস্যা করে জগজ্জননীকে তুষ্ট করেছিলেন। তাঁদের ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে দেবী তাঁদের কন্যারূপে ধরাধামে অবতীর্ণা হবেন বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এই প্রিয় অঙ্গীকার হেতু দেবী গিরিরাজ গৃহে মেনকা গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

ত্রৈলোক্য জননী দুর্গা ব্রহ্মরূপা সনাতনী।
প্রার্থিতা গিরিরাজেন তৎপত্না মেনোয়াহপিচ।।
মহোগ্রতপসা পুত্রীভাবেন মুনিপুঙ্গব।
স্বয়ঙ্গো মেনকাগর্ভে পূর্ণ ব্রহ্মময়ী স্বয়ম্।।
(ভগবতী গীতা, প্রথম অধ্যায়)

এইভাবে যিনি পূর্ণ ব্রহ্মময়ী তিনি স্নেহের টানে স্নেহের দুলালীরূপে মাটির পৃথিবীতে মর্ত্যজননীর কোলে আবির্ভূতা হলেন। কি অপরূপ তাঁর রূপ। 'তরুণ অরুণ যেন চরণ দুখানি;' মুখখানি 'নিন্দিত কোটি শশধর।' যেন পুতুলী, স্নেহের দুলালী কন্যার নাম হল উমা।

দিনে দিনে দিন কেটে যায়। উমা অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করলেন। নারদের পরামর্শে উমা নিযুক্ত হলেন মহাযোগী মহেশ্বরের সেবায়। 'পঞ্চতপা' হয়ে তিনি মহাদেবকে সন্তুষ্ট করলেন। নারদের মধ্যস্থতায় মহাদেবের সঙ্গে উমার বিবাহ স্থির হল। গিরিরাজ বৃদ্ধ কপর্দকহীন মহাদেবের হস্তে অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাকে সম্প্রদান করে গৌরী দানের বিশেষ পুণ্য অর্জন করলেন। কিন্তু এ বিবাহে জননী মেনকা সুখী হতে পারলেন না। অতি বৃদ্ধ, সম্পদহীন মহাদেব জামাই তাতে ঘরে আছে সতিনী সুরধুনী; শিব তাকে মাথায় করে রাখেন। এ হেন বরে কন্যা দান করে কোন্ মা কবে সুখী হতে পেরেছে?

বিয়ের পর উমা পতিগৃহে যাত্রা করলেন। মেনকার আর দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। না জানি আদরিণী কন্যা কেমন থাকবেন শিবের ঘরে! সংবৎসরান্তে একবার মাত্র তিন দিনের জন্য শরৎকালে উমা পিতৃগৃহে আসেন। জননী মেনকা ব্যাকুল আগ্রহে সেই দিনটির জন্য প্রতীক্ষা করেন। শাক্ত সংগীতের 'আগমনী' অংশের প্রথমার্ধ কন্যা বিরহ-বিধুরা জননীর সংশয় প্রতীক্ষা অশ্রুবেদনার কাহিনী। শেষার্ধ কন্যা ও জননীর অশ্রু-মথিত আনন্দ বেদনার মিলন কাহিনী। 'বিজয়া' অংশ উমার কৈলাস যাত্রা বিষয় অবলম্বনে জননী মেনকার মর্মস্পর্শী দুঃখার্তির বর্ণনা।

অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী বর্ণ-হিন্দু সমাজে কৌলীন্য প্রথা ভালভাবে শিকড় গেড়েছিল। কুলীন পাত্রের হাতে কন্যাদান করাকে সমাজ প্রতিষ্ঠাবান্, অর্থবান্ ব্যক্তিগণ সৌভাগ্য বলে মনে করতেন। এই কুলীন পাত্রেরা প্রায়ই বিদ্যাহীন এবং গুণহীন হতেন। 'বিবাহ'ই এঁদের একমাত্র পেশা ছিল। কন্যার পিতা বহু মূল্যে পণদানে এই রকম দুর্লভ জামাতা সংগ্রহ করতেন। অনেক সময়ই মূর্খ, নির্গুণ দরিদ্র কুলীন সন্তান বংশ গৌরবের মহিমায় কন্দর্পের দরে বিক্রীত হতেন। অষ্টম-নবম বর্ষীয়া কন্যা কুলীন পাত্রে দান করে ধনবান পিতা 'গৌরী দান' পৃথিবী দানের ফল ভোগ করতেন এবং সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতেন। ধনীর দুলালী কন্যারা সপত্নী সংকুল নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করতেন। অনেক সময় ক্ষুধার অন্ন, অঙ্গের বসনই তাঁদের জুটতনা।

'আগমনী' গীতিকার মহাদেব এই প্রকারের কুলীন পাত্র। মহাদেব ভাঙ্গ ধুতুরা খান, ভিক্ষা অন্নে পরিবার প্রতিপালন করেন,—পার্থিব সুখের প্রতি তাঁর দারুণ অবজ্ঞা। মা মেনকার চোখের জল আর ঘোচেনা। তাঁর সংসারে অন্ন শিয়াল, কুকুরে খেয়ে শেষ করতে পারে না। আর একমাত্র কন্যা উমার উদরে অন্ন নাই। ক্ষীর-ননী-সর উমার মুখে রুচত না। আকাশের চাঁদ ধরবার যে বায়না করে, এমনি মেয়ে উমা স্বামীর ঘরে কত দুঃখেই আছে। তার উপর আছে 'গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।' সে তরঙ্গ দেখে স্বামী মহাদেব পর্যন্ত ত্রস্ত!

রাণী মেনকা স্বামীকে অনুনয় করেন মেয়ের তত্ত্ব নিতে—

"গিরি হে, তোমায় বিনয় করি আনিতে
গৌরী,
যাও হে একবার কৈলাস পুরে।"

স্বভাবতঃই মায়ের প্রাণ কোমল বেশী। সন্তানের দুঃখ মায়ের প্রাণেই বেশী বাজে। কিন্তু পিতাকে মায়ের মত চঞ্চল হলে চলে না। সমাজের নানা বিধান তাঁকে মেনে চলতে হয়। তাই তাঁকে ধৈর্য ধরতে হয় মায়ের চেয়ে বেশী। চোখের জল তাঁর দীর্ঘশ্বাস হয়ে বুক চিরে বেরিয়ে আসে। গিরিরাজ পত্নীকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে রাখেন। জামাই-এর প্রসঙ্গ তুলে বলেন "প্রাণের অধিক সে যে দেখে উমা মারে।" মেনকার মন তাতে প্রবোধ মানে না। পুনরায় কাতর হয়ে বলেন—

"কবে যাবে বল গিরিরাজ, গৌরীরে আনিতে!
ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে।।"
কখনো অনুযোগ করে রাজাকে বলে—
"গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, কেমনে রয়েছ ঘরে,
কি কঠিন হৃদয় তোমার হে।।"

গিরিরাজ আর ওজর আপত্তি দেখাতে পারেন না। মেনকার অশ্রু জলে আর স্থির থাকতে না পেরে হরপুরে গমন করেন। যেতে যেতে পথে নানা কথা ভাবেন। তাই তিনি "হরিষে, বিষাদে, প্রমোদ প্রমাদে, ক্ষণে দ্রুত চলে ক্ষণে চলে ধীরে।" মনে আশঙ্কা হয় "যেতে যদি কৃত্তিবাস না পাঠান উমা মায়ে।" কৈলাসে পৌঁছে হিমালয় সরাসরি শিবের কাছে উমাকে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করতে পারেন না। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের আশঙ্কায় তিনি উমাকে মাতৃ সন্দর্শনে যেতে অনুরোধ করেন—

"চল মা, চল মা গৌরী, গিরিপুরী শূন্যাগার।
* * *
তব মুখামৃত বিনে, আছে রাণী ধরাসনে;
অবিলম্বে চল অম্বে, বিলম্ব সহে না আর।
* * *
তোমার বিচ্ছেদানল, অন্তরে হয়ে প্রবল
সিন্ধুনীরে প্রবেশিল মৈনাক ভ্রাতা তোমার।"

এমন কথা শোন্‌বার পর কোন্ মেয়ে স্থির থাকতে পারে? উমা মায়ের কথা স্মরণ করে অস্থির হয়ে পড়লেন। কিন্তু গৃহকর্তা পতি দেবতার অনুমতি চাই তো? কৌশলে ভোলানাথের মন ভুলিয়ে মত আদায় করতে হবে তাই উমা বলছেন—

"গংগাধর হে শিবশংকর, কর অনুমতি হর
যাইতে জনক ভবনে।
ক্ষণে ক্ষণে মম মন হইতেছে উচাটন,
ধারা বহে তিন নয়নে।"

'উমানাথ' শিবশঙ্কর 'গঙ্গাধর'ও বটেন। উমার কাতর বচনে অনুমতি না দিয়ে কি পারেন? তবু মহেশ্বর দাম্পত্য জীবনের মধুর রসিকতাটুকু ত্যাগ করতে পারেন না—

"জনক ভবনে যাবে, ভাবনা কি তার?
আমি তব সঙ্গে যাব কেন ভাব আর।"

কন্যা ও দৌহিত্রদের সঙ্গে করে গিরিরাজ গিরিপুরে এলেন। প্রতিবেশীরা দৌড়ে এল তাঁদের আদরিণী উমাকে দেখতে। সখী জয়া ছুটল রাণীকে খবর দিতে।

"শুনে পাগলিনী প্রায়, অমনি রাণী ধায়,
'কই উমা' বলি 'কই।'"
অভিমানিনী কন্যা সহজে ধরা দিতে চান না
অভিমানে কাঁদি রাণীরে বলে—
"কই মেয়ে বলে আনতে গিয়াছিলে?
তোমার পাষাণ প্রাণ, আমার পিতাও পাষাণ
জেনে, এলাম আপনা হতে।"

মায়ের মুখে আর উত্তর জোগায় না। সুদীর্ঘ বিরহের পর মাতা কন্যার মিলন হল। 'আগমনী' গানের দ্বিতীয়াংশে স্নেহময়ী মায়ের সঙ্গে পতি গৃহাগতা কন্যার মিলনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। দীর্ঘ দিন বিরহতাপ সহ্য করে মেয়েকে বুকে তুলে নিয়ে মায়ের অঙ্গ শীতল হয়েছে। মনে মনে ফন্দী আঁটেন এবার জামাই এলে মেয়ে দেওয়া হবে না। বরং শিবকে তুষ্ট করে তাঁকেও ঘরজামাই করে রাখবেন। নয়নপুত্তলী প্রাণ প্রতিমা উমাকে তাহলে আর চোখের আড়াল করতে হবে না।

শিবপ্রিয়া শিবানী পরের ঘরে কেমন ছিলেন মায়ের প্রাণ জানতে চায়। তাঁর প্রাণনিধি উমা না জানি কত দুঃখ পেয়েছে সেখানে। তাই রাণী বলেন

"ও মা, কেমন করে পরের ঘরে
ছিলি উমা বল মা তাই।"

অভিমানিনী উমা এবার বুদ্ধিমতীর মত উত্তর করেন—

"ছিলাম ভাল জননী গো হরের ঘরে।"
সপত্নী সম্বন্ধেও মায়ের উৎকণ্ঠা দূর করেন—
"সত্য বটে সুরধনী, অগ্রজা সমান মানি,
সে দারা ভগিনী জিনি, অধিক যতন করে।"

মায়ের উদ্বিগ্ন চিত্ত একটু শান্তি পায়। এমনি করে আলাপে আদরে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর দিন কেটে যায়। নবমীর রাত্রে মেনকার মন আবার চঞ্চল হয়ে উঠে। নবমীর নিশি পোহালে উমা কৈলাসে যাত্রা করবেন।

উমার কৈলাস যাত্রার বর্ণনা নিয়েই 'বিজয়া' অংশ রচিত হয়েছে। আগমনীর মিলন দৃশ্যটি যেমন সুন্দর, তেমনিই মর্মস্পর্শী উমার বিদায় দৃশ্য। শাক্ত পদকর্তাগণ সহানুভূতির সঙ্গে সূক্ষ্ম তুলিতে মায়ের বেদনার্দ্র চিত্রখানি অঙ্কিত করেছেন।

(শেষাংশ ২৮০ পৃষ্ঠায়)

কর্দম মেখলা

পরশুরাম

পুষ্কর সরোবরের তীরে বিশ্বামিত্র আর মেনকা কাছাকাছি বসে আছেন। মেনকা তাঁর কেশপাশ আলুলায়িত করে কাঁকুই দিয়ে আঁচড়াচ্ছেন, বিশ্বামিত্র মুখ ফিরিয়ে আত্মচিন্তা করছেন।

অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর বিশ্বামিত্র কপাল কুঁচকে নাক ফুলিয়ে বললেন, মেনকা, তুমি সরে যাও, তোমার চুলের তেলচিটে গন্ধ আমি সইতে পারছি না।

ভ্রূভঙ্গী করে মেনকা বললেন, তা এখন পারবে কেন। অথচ এই সেদিন পর্যন্ত আমার চুলের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে। চুলে কি মাখি জান? মলয়গিরিজাত নারিকেল তৈলে পঞ্চাশ রকম গন্ধদ্রব্য মিশিয়ে ধন্বন্তরী আমার জন্যে এই কেশতৈল প্রস্তুত করেছেন। এর সৌরভে দেব দানব গন্ধর্ব মানব মুগ্ধ হয়, আর তোমার তা সহ্য হচ্ছে না! মুখ হাঁড়ি করে রয়েছ কেন, মনের কথা খুলেই বল না।

বিশ্বামিত্র বললেন, তুমি মূর্খ অপ্সরা, দ্রব্যগুণ কিছুই জান না। উত্তম গন্ধতৈলও আর্দ্রবায়ুর সংস্পর্শে বিকৃত হয়। স্ত্রী জাতির নাকের সাড় নেই, কিন্তু অন্য লোকে দুর্গন্ধ পায়।

— এতদিন তুমি দুর্গন্ধ পাও নি কেন?

— আমার বুদ্ধি ভ্রংশ হয়েছিল, লুব্ধ কুক্কুরের ন্যায় পূতিগন্ধকে দিব্য সৌরভ মনে করতাম, তোমার কুটিল কালসর্প সম বেণী কুসুমদাম বলে ভ্রম হত, তোমার ক্লিন্ন অশুচি দেহের স্পর্শে আমার আপাদমস্তক হর্ষিত হত। সেই কদর্য মোহ এখন অপসৃত হয়েছে। মেনকা, তোমাকে আমার আর প্রয়োজন নেই, তুমি চলে যাও।

মেনকা বললেন, ছ মাসেই প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল? আমি যখন প্রথমে তোমার এই আশ্রমে এসেছিলাম তখন আমাকে দেখেই তুমি সংযম হারিয়ে তপস্যায় জলাঞ্জলি দিয়ে লোলুপ হয়েছিলে। আমি কিন্তু নিষ্কামভাবে নির্বিকার চিত্তে অপ্সরার কর্তব্য পালন করেছি, তোমার কুৎসিত জটাশ্মশ্রু আর লোমশ বক্ষের স্পর্শ, তোমার দেহের উৎকট শার্দূলগন্ধ সবই ঘৃণা দমন করে সয়েছি। ওহে ভূতপূর্ব কান্যকুব্জরাজ মহাবল বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠের গরু চুরি করতে গিয়ে তুমি সসৈন্যে মার খেয়েছিলে। তখন তুমি বিলাপ করেছিলে—ধিগ্‌ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলম্‌। তার পর তুমি ব্রহ্মর্ষি হবার জন্যে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হলে। কিন্তু ইন্দ্রের আদেশে যেমনি আমি তোমার কাছে এলাম তখনই তোমার মুণ্ড ঘুরে গেল, তপস্যা চুলোয় গেল, একটা অবলা অপ্সরার কাছেও আত্মরক্ষা করতে পারলে না। এখন হয়তো বুঝেছ যে ব্রহ্মতেজের বলও অপ্সরার বলের কাছে তুচ্ছ, অনেক রাজর্ষি মহর্ষি ব্রহ্মর্ষি আমাদের পদানত হয়েছেন। যা বলি শোন,—ব্রহ্মর্ষি হবার সংকল্প ত্যাগ করে অপ্সরা হবার জন্যে তপস্যা কর।

বিশ্বামিত্র বললেন, কটুভাষিণী, তুমি দূর হও।

—তা হচ্ছি। আমার গর্ভে তোমার যে সন্তান আছে তার ব্যবস্থা কি করবে?

—স্বর্গবেশ্যার সন্তানের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না। যা করবার তুমি করবে।

—তুমি তো মহা বেদজ্ঞ আর পুরাণজ্ঞ। একথা কি জান না যে অপ্সরা কদাপি সন্তান পালন করে না? আমরা প্রসব করেই সরে পড়ি, এই হল সনাতন রীতি। অপত্যপালন জন্মদাতারই কর্তব্য, গর্ভধারিণী অপ্সরার নয়।

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্র বললেন, তুমি আমার তপস্যা পণ্ড করেছ, বুদ্ধি মোহগ্রস্ত করেছ, চরিত্র কলুষিত করেছ। পাপিষ্ঠা, দূর হও এখান থেকে, তোমার গর্ভস্থ পাপও তোমার সঙ্গে দূর হয়ে যাক।

পুষ্কর সরোবরের ধার থেকে খানিকটা কাদা তুলে নিয়ে মেনকা দুই হাতে তাল পাকাতে লাগলেন।

বিশ্বামিত্র প্রশ্ন করলেন, ও আবার কি হচ্ছে?

কাদার পিণ্ড পাকিয়ে সাপের মতন লম্বা করে মেনকা বললেন, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র, তোমার সন্তান আমি চার মাস গর্ভে বহন করেছি, আরও প্রায় পাঁচ মাস বইতে হবে। তোমার কুকর্মের ফল শুধু আমিই বয়ে বেড়াব আর তুমি লঘুদেহে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করবে তা হতে পারে না। তোমাকেও ভার বইতে হবে। এই নাও।

মেনকা তাঁর হাতের লম্বা কাদার পিণ্ড সবেগে নিক্ষেপ করলেন। বিশ্বামিত্রের কটিদেশে তা মেখলার ন্যায় জড়িয়ে গেল।

চমকে উঠে মুখ বিকৃত করে বিশ্বামিত্র বললেন, আঃ! সেই কর্দম মেখলা টেনে খুলে ফেলবার জন্যে তিনি অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তখন পুষ্করের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধুয়ে ফেলবার জন্যে দুই হাত

নদীর ধারে এসে গৌতমী বিশ্বামিত্রকে বললেন, নড়বেন না, তাহলে আরও ডুবে যাবেন...

শত রাজকন্যা তোমার সাথী হবে, সহস্র দাসী তোমার সেবা করবে...

দিয়ে ঘষতে লাগলেন, কিন্তু সেই কালসর্প তুল্য মেখলার ক্ষয় হল না, নাগপাশের ন্যায় বেষ্টন করে রইল।

হতাশ হয়ে বিশ্বামিত্র জল থেকে তীরে উঠে এলেন। মেনকাকে আর দেখতে পেলেন না।

বিশ্বামিত্র পুনর্বার তপস্যায় নিরত হবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু মনোনিবেশ করতে পারলেন না, কর্দম মেখলার নিরন্তর সংস্পর্শে তাঁর ধৈর্য নষ্ট হল, চিত্ত বিক্ষোভিত হল। তিনি আশ্রম ত্যাগ করে আকুল হয়ে পর্যটন করতে লাগলেন, হিমাচল থেকে দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত ভ্রমণ করলেন, নানা তীর্থসলিলে অবগাহন করলেন, কিন্তু তাঁর মেখলা বিগলিত হল না। এইভাবে সাড়ে পাঁচ বৎসর কেটে গেল।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন তিনি মালিনী নদীর তীরে উপস্থিত হলেন। নদীর কাকচক্ষু তুল্য নির্মল জল দেখে তাঁর মনে একটু আশার উদয় হল। উত্তরীয় তীরে রেখে বিশ্বামিত্র জলে নামলেন এবং অনেকক্ষণ প্রক্ষালন করলেন, কিন্তু তাঁর মেখলা পূর্ববৎ অক্ষয় হয়ে রইল। অবশেষে তিনি বিষণ্ণ মনে জল থেকে তীরে উঠতে গেলেন, কিন্তু পারলেন না, পাঁকের মধ্যে তাঁর দুই পা প্রায় হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল।

প্রাণভয়ে বিশ্বামিত্র চিৎকার করলেন। মালিনীর তটবর্তী বনভূমিতে তিনটি মেয়ে খেলা করছিল, একটির বয়স পাঁচ, আর দুটির সাত-আট। বিশ্বামিত্রের আর্তনাদ শুনে তারা ছুটে এল এবং নিজেরাও চিৎকার করে ডাকতে লাগল—ও পিসীমা দৌড়ে এস, কে একজন ডুবে যাচ্ছে।

পিসীমা অর্থাৎ গৌতমী লম্বা আঁকশি দিয়ে একটি প্রকাণ্ড অম্রাতক বৃক্ষ থেকে পাকা আমড়া পাড়ছিলেন। মেয়েদের ডাক শুনে ছুটে এলেন। নদীর ধারে এসে বিশ্বামিত্রকে বললেন, নড়বেন না, তা হলে আরও ডুবে যাবেন। এই আঁকশিটা বেশ শক্ত, পাঁকের তলা পর্যন্ত পুঁতে দিচ্ছি, এইটেতে ভর দিয়ে স্থির হয়ে থাকুন। এই অনু আর প্রিয়, তোরা দুজনে দৌড়ে যা, আমি যে চাঁচাড়ির চাটাই-এ শুই সেইটে নিয়ে আয়।

অনু আর প্রিয় অল্পক্ষণের মধ্যে ধরাধরি করে একটা চাটাই নিয়ে এল। গৌতমী সেটা পাঁকের উপর বিছিয়ে দিয়ে বললেন, এইবারে আস্তে আস্তে পা তুলে চাটাইএর উপর দিন, তাড়াতাড়ি করবেন না। আঁকশিটা পাঁক থেকে টেনে নিচ্ছি। এই এগিয়ে দিলাম, দু হাত দিয়ে ধরুন।

আঁকশির এক দিক বিশ্বামিত্র ধরলেন, অন্য দিক গৌতমী ধরে টানতে লাগলেন, মেয়েরা তাঁর কোমর ধরে রইল। বিশ্বামিত্র ধীরে ধীরে তীরে উঠে এসে বললেন, ভদ্রে, আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন। কে আপনি দয়াময়ী? এই দেবকন্যার ন্যায় বালিকারা কারা?

গৌতমী বললেন, আমি মহর্ষি কণ্বের ভগিনী গৌতমী। এই অনু আর প্রিয়—অনসূয়া আর প্রিয়ংবদা, এরা এই আশ্রমবাসী পিপ্পল আর শাল্মল ঋষির কন্যা। আর এই ছোটটি শকু—মহর্ষি কণ্বের পালিতা দুহিতা শকুন্তলা। আমার [illegible] আশ্রম এই মালিনী নদীর তীরেই। তোমা, আপনি কে?

—আমি হতভাগ্য বিশ্বামিত্র।

—বলেন কি, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র! আপনার এমন দুর্দশা হল কেন?

অনু আর প্রিয় নাচতে নাচতে বলল, ওরে বিশ্বামিত্র মুনি এসেছে, শকুর বাবা এসেছে রে, এক্ষুনি শকুকে নিয়ে যাবে রে!

শকুন্তলা ভ্যাঁ করে কেঁদে গৌতমীকে জড়িয়ে ধরল।

অনসূয়া আর প্রিয়ংবদাকে ধমক দিয়ে গৌতমী বললেন, চুপ কর দুষ্টু মেয়েরা, কেন ছেলেমানুষকে ভয় দেখাচ্ছিস!

বিশ্বামিত্র বললেন, খুকী, তোমার বাবা কে তা জান?

শকুন্তলা বলল, আমার বাবা কণ্ব মুনি, আর মা এই পিসীমা।

অনসূয়া আর প্রিয়ংবদা আবার নাচতে নাচতে বলল, দূর বোকা, সব্বাই জানে আর তুই কিচ্ছু জানিস না। তোর বাবা এই বিশ্বামিত্র মুনি আর মা—

গৌতমী দুই মেয়ের পিঠে কিল মেরে বললেন, দূর হ এখান থেকে। এই রাজর্ষির পরিধেয় ভিজে গেছে, তোদের বাবার কাছ থেকে শুখনো কাপড় চেয়ে নিয়ে আয়। আর তোদের মাকে বল, অতিথি এসেছেন, আমাদের আশ্রমেই আহার করবেন।

বিশ্বামিত্র বললেন, বস্ত্রের প্রয়োজন নেই, আমার অধোবাস আপনিই শুখিয়ে যাবে, আর আমার উত্তরীয় শুষ্কই আছে। আপনি আহারের আয়োজন করবেন না, আমার ক্ষুধা নাই। দেবী গৌতমী, এই বালিকাকে কোথায় পেলেন?

গৌতমী নিম্নকণ্ঠে জনান্তিকে বললেন, মেনকা প্রসব করেই মালিনী নদীর তটে একে ফেলে চলে যায়। মহর্ষি কণ্ব স্নান করতে গিয়ে দেখেন, এক ঝাঁক হংস সারস চক্রবাকাদি শকুন্ত পক্ষ বিস্তার করে চারদিকে ঘিরে সদ্যোজাত এই বালিকাকে রক্ষা করছে। দয়ার্দ্র হয়ে তিনি একে আশ্রমে নিয়ে আসেন। শকুন্ত কর্তৃক আরক্ষিতা, সেজন্য আমরা নাম দিয়েছি শকুন্তলা।

বিশ্বামিত্র বললেন, কন্যা, একবারটি আমার কোলে এস।

শকুন্তলা আবার কেঁদে উঠে বলল, না, যাব না, তুমি আমার বাবা নও, কণ্ব মুনি আমার বাবা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিশ্বামিত্র বললেন, ঠিক কথা। আমি তোমার পিতা নই, মেনকাও তোমার মাতা নয়, যারা তোমাকে ত্যাগ করেছিল তাদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক নেই। যাঁরা তোমাকে আজন্ম পালন করেছেন তাঁদেরই তুমি কন্যা। খুকী, তুমি কি খেলনা চাও বল, রূপোর রাজহাঁস, সোনার হরিণ, পান্না-নীলার ময়ূর—

অনসূয়া ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, ভারী তো। আমাদের আসল হাঁস, হরিণ, ময়ূর আছে।

প্রিয়ংবদা বলল, আমাদের হাঁস প্যাঁক-প্যাঁক করে, হরিণ লাফায় ময়ূর নাচে। তোমার হাঁস, হরিণ, ময়ূর তা পারে?

বিশ্বামিত্র বললেন, না, শুধু ঝকমক করে। শকুন্তলা, তুমি আমার সঙ্গে চল। শত রাজকন্যা তোমার সখী হবে, [illegible] দাসী তোমার সেবা করবে, স্বর্ণমণ্ডিত গজদন্তের পর্যঙ্কে তুমি শোবে, দেবদুর্লভ অন্ন ব্যঞ্জন মিষ্টান্ন পায়স তুমি খাবে, মণিময় চত্বরে সখীদের সঙ্গে খেলা করবে। তোমাকে আমি সুবিশাল রাজ্যের অধীশ্বরী করে দেব।

গৌতমী বললেন, কি করে করবেন? আপনার কান্যকুব্জ রাজ্য তো পুত্রদের দান করে তপস্বী হয়েছেন।

—তুচ্ছ কান্যকুব্জ রাজ্য আমার পুত্ররাই ভোগ করুক, তা কেড়ে নিতে চাই না। বাহুবলে আর তপোবলে আমি সসাগরা ধরা জয় করে আমার কন্যাকে রাজ রাজেশ্বরী করব। যতদিন কুমারী থাকে ততদিন আমিই এর প্রতিভূ হয়ে রাজ্য শাসন করব। তার পর অতুলনীয় রূপবান গুণবান বলবান বিদ্যাবান কোনও রাজা বা রাজপুত্রের হস্তে একে সম্প্রদান করে পুনর্বার তপস্যায় নিরত হব।

গৌতমী বললেন, কি বলিস শকু, যাবি এই রাজর্ষির সঙ্গে?

শকুন্তলা আবার কেঁদে উঠে বলল, না-না যাব না।

গৌতমী বললেন, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র, জন্মের পূর্বেই যাকে বর্জন করেছিলেন তার প্রতি আবার আসক্তি কেন? আপনার সংযম কিছুমাত্র নেই। বশিষ্ঠের কামধেনুর লোভে আপনার ধর্মজ্ঞান লোপ পেয়েছিল, মেনকাকে দেখে আপনি উন্মত্ত হয়েছিলেন, এখন আবার তার কন্যাকে দেখে স্নেহে অভিভূত হয়েছেন। এই বালিকার কল্যাণই যদি আপনার অভীষ্ট হয় তবে একে আর উদ্দীপন করছেন কেন, অব্যাহতি দিন, এর মায়া ত্যাগ করে প্রস্থান করুন।

বিশ্বামিত্র বললেন, শকুন্তলা, তোমার এই পিসীমাকে যদি সঙ্গে নিয়ে যাই তা হলে তুমি যাবে তো?

গৌতমী বললেন, কি যা তা বলছেন, আমি কেন আপনার সঙ্গে যাব?

—দেবী গৌতমী, আমি আপনার পাণিপ্রার্থী। আমাকে বিবাহ করে আপনি আমার কন্যার জননীর স্থান অধিকার করুন।

অনসূয়া আর প্রিয়ংবদা আবার নাচতে নাচতে বলল, পিসীমার বর এসেছে রে!

গৌতমী সরোষে বললেন, বিশ্বামিত্র, আপনি উন্মাদ হয়েছেন, আপনার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়েছে। আর প্রলাপ বকবেন না, চলে যান এখান থেকে।

বিশ্বামিত্র কাতর স্বরে বললেন, শকুন্তলা, একবার আমার কোলে এস, তার পরেই আমি চলে যাব।

গৌতমী বললেন, যা না শকু, একবারটি ওঁর কোলে গিয়ে বস। ভয় কি, দেখছিস উনি তোকে কত ভালবাসেন।

শকুন্তলা ভয়ে ভয়ে বিশ্বামিত্রের কোলে বসল। তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, কন্যা, সুরাসুর যক্ষ-রক্ষ তোমাকে রক্ষা করুন, বসুগণ তোমাকে বসুমতীর ন্যায় বিত্তবতী করুন, ধী শ্রী কীর্তি ধৃতি ক্ষমা তোমাতে অধিষ্ঠান করুন—

হঠাৎ শকুন্তলা লাফিয়ে উঠে বলল, ও পিসীমা রে!

[illegible] গৌতমী বললেন, কি [illegible]

বিশ্বামিত্র উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর কদ

স্মৃতিকথা

শ্রীকালিদাস রায়

শরৎচন্দ্রের বইগুলির সম্বন্ধে আমার মন্তব্য মাঝে মাঝে তাঁকে জানাতাম। বলা-বাহুল্য, প্রতিকূল মন্তব্য কোনদিন জানাইনি। তিনি একদিন বললেন, 'তোমাকে আমার সম্বন্ধে লিখতে হবে, তবে আমার জীবদ্দশায় নয়। আমার জীবদ্দশায় লিখলে স্বাধীন অপক্ষপাত-ভাবে লিখতে পারবে না। ব্যস্ত হবার দরকার নেই। আমার দিন ত ফুরিয়ে এলো।' আমি বললাম,—'না-না, আপনার শরীরে কোন রোগ নেই, ডায়াবেটিস নেই, ব্লাড প্রেসার নেই। চুল পাকা ছাড়া বার্ধক্যের কোন লক্ষণ নেই, কর্মক্ষমতা ও দৈহিক সামর্থ্য অটুট রয়েছে—দেখবেন, আশি বছর পর্যন্ত বাঁচবেন। এ ছাড়া কেউ কি বলতে পারে দাদা কবে কার দিন ফুরোবে?' তিনি বললেন,—'তা ঠিক, তবে তোমার সঙ্গে আমার বয়সের যে তফাৎ তাতে প্রত্যাশা করি, তুমি আমার কথা লিখবে সময় পাবে। রোগ-ভোগ করা আমার অভ্যাস নয় তাই বুঝতে পার না। আমার শরীরটা ভিতর ভিতর ভেঙ্গে গেছে। থাক সে কথা। এখন খবর কি বলো।'

শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশায় তাঁর সম্বন্ধে লিখতে হবে, তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার কিছু কিছু নোট রাখতাম। একদিন তাঁর সম্বন্ধে কিছু লেখার মুশকিল ছিল, কিছুতেই শরৎচন্দ্রকে সাহিত্য আলোচনায় নামাতে পারতাম না। যখনই কোন সাহিত্য প্রসঙ্গ তুলেছি তখনই বলেছেন, ও সব কথা ভাই—একটা গল্প বলো।

আমি বললাম—তা না হয় বললাম। কিন্তু আমাকে যে আপনার কথা লিখতে হবে, আপনি আপনার সাহিত্যের প্রসঙ্গ উঠলেই থামিয়ে দেন, লিখব কি করে?

তিনি বললেন, 'আমার যা কিছু বলবার, তার সবই আমার বই-এ আছে, আর কোন আত্মকথা ও অভিজ্ঞতার কথা কারো লেখার পাবে না। আমার কাছে গল্প ছাড়া, বাজে কথা ছাড়া কিছুই শোনবার নেই ভাই। আমার বই থেকে যদি কেউ আমার অন্তর্জীবনের সব কথা উদ্ধার করতে না পারে তাহ'লে সে আমার কথা লিখতে পারবে না। লেখকের জীবন কথার যা প্রকাশ-যোগ্য তা কি তার লেখার বাইরে বিশেষ কিছু থাকে? আর সাহিত্যালোচনা মানেই তর্ক বা বাদানুবাদ। তর্ক করার ক্লেশটা আমি এড়াতেই চাই।'

রস-চক্রের বৈঠকে তো সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা বা প্রশ্নের কোন অবকাশ থাকত না, কাজেই সপ্তাহে ২।৩ দিন অন্ততঃ তাঁর বাড়ীতে সকালবেলায় যেতাম। দেখতাম শরৎচন্দ্রকে চটিয়ে দিলে কিছু কিছু কথা বার করা যায়। শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্ব বেরোনোর পর একদিন বললাম—শ্রীকান্ত নিয়ে নানাজন নানা কথা বলছে। ভারতবর্ষে শ্রীকান্ত যখন বেরুতে শুরু হয় তখন এর নাম ছিল শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী। একজন সাহিত্যিক বলছিল—আপনার উদ্দেশ্য ছিল, আপনার ভবঘুরে জীবনের ভ্রমণ-কাহিনীই লিখবেন। অবশ্য পুরোপুরি তা হ'ল না, তবে বিশেষ ক'রে প্রথম পর্বটি অনেকটা ভ্রমণ কাহিনীই হয়েছে, ঠিক নভেল হয়নি। পিয়ারী না থাকলে পড়লে পুরো-পুরি ভ্রমণ কাহিনীই হ'ত। দেখলাম এতে শরৎচন্দ্র চটলেন না, হেসে বললেন—কেউ যদি তা বলে থাকে, তবে অন্যায় কিছু বলেনি। শ্রীকান্ত ভ্রমণ-কাহিনী ছাড়া আর কি? দেশে দেশে ঘুরেছিলাম তখন মানুষের মনে মনে ঘুরে বেড়িয়েছি ঢের। দেখ, শ্রীকান্ত নানা শ্রেণীর মানুষের মনোরাজ্যে ঘুরে বেড়িয়েছে। যা দেখেছে তাই লিখেছে। ভ্রমণ-কাহিনীই যদি হয়ে থাকে তাতেই বা ক্ষতি কি?

আমি—একথাও তো বলতে পারেন শ্রীকান্ত একজন মাতালের মত জীবন-পথে লক্ষ্যহীন হয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে পথের ধারে এক একটা সরাইখানায় বা মুসাফিরখানায় বিশ্রাম করছে আর নানা শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মেলামেশা করছে। একটি নারী কেবল তার পিছু নিয়েছে, মাঝে মাঝে তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হচ্ছে। পথে যেতে যেতে ব্যারাম-পীড়া হ'ল, সে কোথা থেকে আবার একখানা ছোট পাখার পাখা আর একটা চলের পর দিয়ে এসে জুটছে। এমনি করে চলতে চলতে তারা ভেরা বাঁধল এক জায়গায় গিয়ে। সেই পথের বৃত্তান্তই চতুর্থ পর্ব শ্রীকান্ত।' শরৎচন্দ্র একটু হাসলেন, হেসে বললেন,—তা যা হয় বলো। আর কে কি বলে?

আমি—কেউ কেউ বলে, শ্রীকান্ত আপনার স্মৃতি-কথা, ঠিক নভেল নয়। আপনি নিজেই লিখেছেন—'এই জীবনের অপরাহ্ন বেলায় একটি অধ্যায়ের কথা বলিতে গিয়া আমার কত কথাই মনে পড়িতেছে।'

শরৎচন্দ্র—একথা কে বলেছে? যখন শ্রীকান্ত প্রথম ভারতবর্ষে বেরোয় তখন কি আমার জীবনের অপরাহ্ন বেলা? জীবনের অপরাহ্ন-বেলা আমার নয়, শ্রীকান্তের।

আমি—যাই হোক সে একই কথা। শ্রীকান্তের মধ্যে আপনি ত অনেকটাই আছেন। তাই তারা একথা বলে।

শরৎচন্দ্র—তারাই বা অন্যায় কি বলেছে। সকল উপন্যাসই ত লেখকের স্মৃতি-কথা, ভিন্ন ভিন্ন কল্পিত চরিত্রের মুখে বসানো। সেই সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছে, জেনেছে তাদের কথাও থাকে। লেখক তার অভিজ্ঞতার বাইরের কথা কি উপন্যাসে ঠাঁই দেয়? ঠাঁই দিলে তা রূপকথা হয়, রোমান্স হয়, উপন্যাসের ছদ্মবেশে প্রবন্ধের বই হয়, উপন্যাস হয় না। আমি আমার স্মৃতি-কথা শ্রীকান্তের মারফতে—সবটা নয়, অনেকটা বলেছি বৈকি। এজন্যই সাধারণ পদ্ধতি ত্যাগ ক'রে Frist Person Singular Number-এর জবানিতে গোটা বই লিখেছি। এতে মাঝে মাঝে মন্তব্য করার সুবিধা হয়েছে।

গোড়াটা ত আমার ভাগলপুরের কৈশোর জীবনের স্মৃতি-কথা। তোমরা নিশ্চয়ই জানো ভাগলপুরে ছোটবেলায় পিসীমার বাড়ীতে থাকতাম।

আমি—হ্যাঁ, তাতো জানি। এবং সবাই জানে। ইন্দ্রনাথ তো দুরন্ত জল-জঙ্গলে জ্বলন্ত বালকই ছিল। একটু Emphasis দেওয়া আছে—হয়ত ঐ চরিত্রে।

শরৎচন্দ্র ঈষৎ কুপিত হয়ে বললেন—একটুও Emphasis দেওয়া নেই। তবে একাধিক রাত্রির গঙ্গাবক্ষের অভিযান হয়ত এক রাত্রিতেই দেখানো হয়েছে। ইন্দ্রনাথ যে কত বড় মানুষ ছিল, তা তোমরা কল্পনা করতে পারবে না—আমি তার চরিত্র পুরোপুরি এঁকে দেখাতে পারিনি, আমি তার আভাষ দিয়েছি মাত্র। তবে নতুনদাতে একটু Emphasis দেওয়া হয়েছে। নতুনদাও একেবারে কল্পিত পুরুষ নয়।

আমি—ইন্দ্রনাথের মাছ চুরিটা হয়েছে অন্নদা দিদির সঙ্গে Connecting link, অন্নদা দিদির সমাগমের অনিবার্য হেতু ছিল কি?

শরৎচন্দ্র—নিশ্চয়ই ছিল। বাপরে, স্মৃতি-কথায় তাঁকে বাদ দিতে পারি? এই বলে তিনি অন্নদা দিদির উদ্দেশে হাত জোড় করে নমস্কার করলেন।

আমি—অন্নদা দিদি তবে Real character. এরূপ চরিত্র তো সচরাচর দেখা যায় না, দাদা!

শরৎচন্দ্র—আমিও ঐ একটিই দেখেছি। কোন অত্যুক্তি নেই। তোমরা সভ্য সমাজের বাইরের মানুষের কতটুকু খোঁজ রাখ? সাপের সম্বন্ধে আমার কৌতূহল আর অভিজ্ঞতা অসাধারণ। সাপুড়েদের সঙ্গে আমি খুব ঘনিষ্ঠভাবেই মিশেছি। কোন জড়িবুটি মন্ত্র-তন্ত্র ওদের সত্যই আছে কিনা তা জানবার কৌতূহল ছিল আমার খুবই।

আমি—'বিলাসী' গল্পটাতেও আপনার সাপের সম্বন্ধে অসাধারণ অভিজ্ঞতা দেখা যায়, কি চমৎকার কি Pathetic গল্প!

শরৎচন্দ্র—সাপের সঙ্গে আমার কতবার যে দেখা তার ইয়ত্তা নেই, কতবার যে সাপের দাঁত থেকে বেঁচে গেছি তারও হিসাব নেই। তোমরা যে আমার পুরানো লাঠিটাকে ফেলে

মুখলা খসে গিয়ে মাটিতে পড়ে কিলবিল করতে লাগল।

প্রিয়ংবদা চিৎকার করে বলল, সাপ সাপ!

অনসূয়া বলল, ঢোঁড়া সাপ!

গৌতমী বললেন, জল ঢুণ্ডুভ। ওই দেখ, সড়সড় করে নদীতে নেমে যাচ্ছে।

বিশ্বামিত্র বললেন সাপ নয়, মেনকার অভিশাপ, এতকাল পরে আমাকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। কন্যা, তোমার পবিত্র স্পর্শে আমি পাপমুক্ত শাপমুক্ত সন্তাপমুক্ত হয়েছি। আশীর্বাদ করি, রাজেন্দ্রের রাজ্ঞী হও রাজচক্রবর্তী সম্রাটের জননী হও। দেবী গৌতমী, আমি যাচ্ছি, আপনাদের মঙ্গল হোক। আমার আগমনের স্মৃতি আপনাদের মন থেকে লুপ্ত হয়ে যাক।

দিতে বল্লো ঐ লাঠিটা দিয়ে আমি অনেক সাপ মেরেছি। সেজন্য ওটাকে ছাড়তে পারি না।

আমি—আচ্ছা, অন্নদা দিদিকে কোথায় দেখেছিলেন দেবানন্দপুরে—না ভাগলপুরে?

এই প্রশ্নে শরৎদাদা একটু চটে গেলেন—বললেন, তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য আমি বুঝেছি। তুমি কি মনে কর আমি ডায়েরি বা রিপোর্ট লিখছি যে স্থান, কাল পাত্র সম্বন্ধে কাঁটায় কাঁটায় ঘড়ি ধরে মিলিয়ে লিখব? স্মৃতি-কথার সূত্র এক, রিপোর্টের সূত্র আর। খন্ড খন্ড স্মৃতি চিত্রকে কথা সাহিত্যের সূত্রে artistically গাঁথতে হয়েছে। বেশি detail-এর দিকে কৌতুহলী দৃষ্টি চালিয়ো না।

আমি—অমাবস্যার রাতে শ্মশানে রাত্রি যাপন—এও কি আপনার নিজের অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু?

শরৎচন্দ্র—নিশ্চয়ই! মনে রেখ, শ্রীকান্ত ছিল ইন্দ্রনাথের বেপরোয়া চেলা। তার অসাধ্য কাজ কিছু ছিল না।

আমি—আমি ভেবেছিলাম— আপনার অসাধারণ প্রতিভার সর্বশক্তিমতী কল্পনার সৃষ্টিটাই সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছে। ভেবেছিলাম শ্মশানের অন্ধকার-পটটা রাজলক্ষ্মীর সংঘাত ও হৃদয়াবেগের একটা পট-ভূমিকা মাত্র।

শরৎচন্দ্র—সত্য না হলে ঐ চিত্রের গ্রন্থে ঠাঁই পাবার কোন দাবী ছিল না।

আমি—সখের সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আপনার আছে, তা জানি। কিন্তু ভবঘুরে জীবনের ওখানেই কি শেষ?

শরৎ—ভবঘুরে জীবন আমার সন্ন্যাসেই শেষ হয়নি। অনেক দিনই নানা দশা-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তা চলেছিল। কিন্তু শ্রীকান্ত বেচারাকে আর ঘুরুইনি। ৩য় পর্বে যে অগ্রদানী-বাড়ীর আতিথ্যের কথা আছে, সেটা আমার জীবনে ভবঘুরে অবস্থাতেই ঘটেছিল। পোড়ামাটি গ্রামের ডোমের বাড়ীর ঘটনাটার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আমার গ্রামেই ছোটবেলায়। গ্রাম্য জীবনের স্মৃতি সমস্ত বই-এ ছড়ানো আছে, ৪র্থ পর্বেই বেশি।

বেহারে বাঙ্গালী বালিকা বধূর শোচনীয় দশা সন্ন্যাস অবস্থাতেই স্বচক্ষে দেখা, একটুও অতিরঞ্জিত নয়।

আমি জানতাম পিয়ারীবাঈ সম্পূর্ণ কল্পিতা রমণী। ওপ্রসংগ তোলাও যায় না, তুলবার প্রয়োজনও ছিল না। আমি রাজলক্ষ্মীর প্রসংগ একেবারে না তুলে সটান সমুদ্রবক্ষে সাইক্লোনের দৃশ্যে চলে গেলাম।

আমি—সাইক্লোনের সঙ্কটের যে আপনি নিজে ভুক্তভোগী, সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। ডাঙ্গার কল্পনার পক্ষে সমুদ্রের ঐ দৃশ্য বর্ণনা অসাধ্য। ব্রহ্মদেশে তো আপনি ছিলেনই। ওদেশ সম্বন্ধে অনেক কথাই আপনার তিনখানা বই-এ আছে।

অভয়ার কথাও না তুলে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্রহ্মদেশে বাঙালীদের সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা মোটামুটি কি? কৌশলে অভয়ার কথা জানতে চেষ্টা করলাম।

শরৎচন্দ্র—ব্রহ্মদেশ তখন ছিল বাঙালী বেকারদের চাকরি সন্ধানের রাজ্য। বাঙালী পদস্থ লোকেরা বেকারদের চাকরি যোগাড় করে দিত। বাঙালীদের গা-ঢাকা দেওয়ার এমন জায়গা আর কোথাও ছিল না। বহু অপরাধীই ব্রহ্মদেশে পালাত। বাঙালী যুবকদের চরিত্র রক্ষা করা কঠিন হ'ত সেখানে, কেউ কেউ বর্মী, কেউ কেউ অন্য জাতির মেয়ে বিয়ে করত। বাংলা থেকে পরস্ত্রী (সধবা, বিধবা) নিয়ে ঐ দেশে কেউ কেউ পলাত, নিরুদ্দেশ অথবা পলাতক স্বামীর খোঁজেও কোন কোন কুল-বধূও ব্রহ্মদেশে যেত। বাঙালীদের অনেকে ওকালতি, ডাক্তারি ও চাকরি ক'রে ওদেশে গিয়ে বড়লোক হ'ত। নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে বাঙালী কাঠমিস্ত্রীর সংখ্যা ছিল খুব বেশি। নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে অনেকেই ছিল মুড়িওয়ালী ও ঘুটেওয়ালী। ও দেশে জাত বিচার ছিল না। ধর্মবিচারও ছিল না।

আমি—আচ্ছা দাদা শ্রীকান্তে একেবারে সম্পূর্ণ কল্পিত চরিত্র কি একেবারে নেই?

শরৎচন্দ্র—তা আবার নেই। তা না থাকলে অত বড় একখানা বই গড়ে ওঠে! কোন্ চরিত্রগুলো সম্পূর্ণ কল্পিত, তা তুমি নিজেই বুঝতে পারবে।

আমার বিশ্বাস ছিল পিয়ারী, সুনন্দা, কমল, গহর, রোহিণী, বজ্রানন্দ এসবই কল্পিত। একটি মুসলমান চরিত্র (গহর) শরৎচন্দ্র ইচ্ছা করেই বইএ সন্নিবিষ্ট করেছিলেন। এর একটা কারণও ছিল।

আমি—যেমন গহর,—

শরৎচন্দ্র—গহর পুরো কল্পিত নয়—প্রত্যক্ষদৃষ্ট চরিত্রের উপর রঙ চড়ানো ও রদান দেওয়া। কমললতাও তাই। যাক্ ও প্রসঙ্গ থাকুক। লোকে শ্রীকান্তকে নভেল বলে না?

আমি—সবাই একে পুরোপুরি নভেল বলে না।

শরৎচন্দ্র—কেন?

আমি—বলে—কতকগুলি চমৎকার চিত্র, কতকগুলি অপূর্ব ঘটনা, কতকগুলি জ্বলন্ত দৃশ্য, কতকগুলি চলন্ত চরিত্র শিথিলভাবে গাঁথা। এর ভিতর কোন সুনির্দিষ্ট প্লটের সংগতি নেই। এতে চরিত্রের উন্মেষসাধন করা হয়নি—ইন্দ্রনাথ, রাজলক্ষ্মী, কমললতা, বজ্রানন্দ, গহর, সুনন্দা ইত্যাদি সবই Ready made character. উত্তম পুরুষীয় জবানীতে গোটা বইখানা লেখা, সাব-প্লটগুলি মূল আখ্যানের সঙ্গে শ্লথভাবে গ্রথিত। অতএব নভেলের যে সব লক্ষণ সে সব এর সঙ্গে মেলে না।

তারা বলে নভেল না হলেও অপূর্ব সৃষ্টি—এর চিরন্তন মূল্যমর্যাদা আছে। কেউ কেউ বলে নভেলের জন্য ৪র্থ পর্বের প্রয়োজন ছিল না, ৩য় পর্বটাকে আর একটু বাড়ালেই চলত।

শরৎচন্দ্র—তাদের বোলো, খুব প্রয়োজন ছিল—যে বৈঁচিফলের বনে গল্পের যাত্রাপথের সূত্রপাত—সেই বৈঁচিফলের বনে ফিরে না এলে তার সমাপ্তি হতে পারে না। তিন পর্ব বাইরে বাইরেই কেটেছে, যে অঞ্চলের মানুষের জীবন-কথা সে অঞ্চলে তাদের ফিরিয়ে আনার দরকার ছিল,—আখড়ার গোঁসাই ঠাকুরের আশীর্বাদী ফুলেরও দরকার ছিল। আমি তোমাদের Nature-এর খুব ভক্ত নই, তবু বইখানাকে সম্পূর্ণাঙ্গ করার জন্য ওতে বাংলার Nature-কে স্থান দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, যদিও আমি কবি নই।

আমি—কবি নন? ৪র্থ পর্বে কি কবিত্বেরই না ছড়াছড়ি করেছেন। আমার তো মনে হয় আপনি যে একজন প্রথম শ্রেণীর বড় কবি তা জানাবার জন্যই ৪র্থ পর্ব লিখেছেন। ছন্দে না লিখলে কি কবি হওয়া যায় না? ৪র্থ পর্বে বৈষ্ণবের আখড়ার চিত্রটি ত একখানি অপূর্ব কাব্য। কমললতাকে তো রূপ গোস্বামীর নাটকের চরিত্র বললেই হয়। শুধু গদ্যে কবিতা লেখেননি—

একটি কবিকেও আমদানি করেছেন। গহর তো জীবন্ত কবিতা।—আর আউশফুলের গন্ধে ভরা যশোদা বৈষ্ণবীর পাড়োভিটের কথা?

শরৎচন্দ্র—আমিতো সেজন্যই ৪র্থ পর্ব বেরুলে তোমাকে একখানা বই উপহার দিয়ে বলেছিলাম,—অন্যের কেমন লাগবে জানি না—তোমার ভালো লাগবেই। যাক্—আর কে কি বলে বলো—

আমি—কেউ কেউ বলে—রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে শিকারের শিবিরে শ্রীকান্তের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আসল নভেল সুরু হয়েছে—বই এর বাকিটা রীতিমতো নভেল।

আবার কেউ কেউ বলে—শ্রীকান্তের [illegible] দৃষ্টিতেই সকল দৃশ্য, সকল ঘটনা, সকল [illegible] দেখানো। উত্তমপুরুষীয় জবানীতে [illegible] নভেল বিদেশে স্বদেশে আরো আছে। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন। রজনী, ঘরে-বাইরে এই ভঙ্গীতেই লেখা। Dickens-এর David Copperfield বই এই ভঙ্গীতে লেখা। [illegible] স্বপ্নমীও তাই। এটাই হল সর্বোৎকৃষ্ট [illegible] এই জবানীই বৈচিত্র্যের মধ্যে ওকে [illegible] সংগতি ও সামঞ্জস্য দান করেছে। এটা [illegible] টেকনিকে লেখা নভেল। বিবিধ চিত্র ও [illegible] কাহিনীগুলি এই নভেলের পরিবেশ [illegible] আবেষ্টনীর সৃষ্টি করে ওকে সম্পূর্ণতা দান করেছে—Vitality [illegible] এতে জীবনদর্শনেরও [illegible] চরিত্রের উন্মেষ একেবারে নেই [illegible] পাঠশালে প্রথমদেখা রাজলক্ষ্মী আর ৪র্থ পর্বের শেষে অগ্নিপরীক্ষায় পরিশুদ্ধা রাজলক্ষ্মী [illegible] ঢের তফাৎ। শ্রীকান্তের চরিত্রেও [illegible] বদল হয় নি। দেখে দেখে অনেকটা বেলা [illegible] গিয়েছে।

শরৎচন্দ্র—বুঝতে পারছি, এটা তোমার অভিমত। নভেল হোক, ভ্রমণ-কাহিনী হোক, স্মৃতি-কথাই হোক, কথা-সাহিত্য [illegible] একটা শ্রেণীতে ভর্তি না করলে পন্ডিতদের মাষ্টারদের স্বস্তি নেই, রসজ্ঞ পাঠকদের [illegible] কিছু যায় আসে না। কোন শ্রেণীতে না প[illegible] ওটা নিজেই একটা শ্রেণী তৈরি করুক না কে[illegible] কোন্ শ্রেণীতে পড়বে, সেকথা না ভেবেই [illegible] লিখেছি। সকলের পড়তে ভালো লাগলেই [illegible]

স্কুলে প্রথম দিন

ছেলে প্রথম দিন স্কুল থেকে ফিরলে মা জিজ্ঞাসা করলেন "কি শিখলে?" ছেলে বলল "বিশেষ কিছু না, আবার কাল যেতে হবে।"

ঋষি রাজনারায়ণের পরিবার [illegible]

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

জীবনের হাটে জনারণ্য চলছে। হাটের ধর্মই এই—হাটের পথের দু'পাশ ছেয়ে, মাঠ, বটতলা ও হাটের চালাঘর জুড়ে জনারণ্যে বেচাকেনার বিপণি ও ভিড় জমেছে। এই হাটে যাদের প্রয়োজন, যার কোন প্রয়োজন সদা সর্বদা নাই, সে-ও হাটের টানে এসে অপ্রয়োজনেই ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, নাগরদোলায় দোল খায়, চার পয়সার চানাচুর চিবোয়, শাখা-চিরুণী-লাল ফিতার সওদা করে। জীবনে হাট-বার কি অতীতে আর কি বর্তমানে লেগেই ছিল, আজও আছে। এই জীবনের হাটের স্মৃতি থেকে আজ বলি—তোমাদের ছবি দেখাই। আমাদের পাগলী মা—ঋষি রাজনারায়ণের জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্ণলতা এসিস্ট্যান্ট সার্জন ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষের ডাকসাইটে রূপসী স্ত্রী ছিলেন আমাদের মা। ঋষি রাজনারায়ণের পাঁচ কন্যা। দ্বিতীয়া হেমলতা—আমাদের মেজ মাসী ছিলেন জয়নগর-মজিলপুর হাই স্কুলের হেড মাস্টার শ্রীদীননাথ দত্তের স্ত্রী, কালো, রোগা কৃষ্ণকায় পুরুষ, নামী শিক্ষাব্রতী, জয়নগর-মজিলপুরের প্রাণ, সকল সামাজিক ও সাহিত্যিক অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ও কেন্দ্রীপুরুষ। মেজ মাসীকে এখনও মনে আছে, তার পাগলী মেয়ে নীরদা বা নীরিকে সব চেয়ে বেশি মনে পড়ে। পাগল বা প্রতিভার দীপ্ত মানুষ—অসাধারণকেই সর্বাপেক্ষা মনে রাখা সম্ভব, কারণ, তারা গড়ানুগতিক সাধারণের ভিড় ছাড়িয়ে বর্ণবৈচিত্র্যে গাঢ় রঙ ফেলে স্মৃতির পটে জ্বল জ্বল করে মনের ও স্মৃতির ফলকে দাগ কেটে বহু দিন অবধি থাকে জেগে। মেজ মাসীর বড় ছেলে অমূল্যকেই মনে পড়ে তবু কিছু মাত্রায়; তিনি ছিলেন মৌন, অল্প কথা ও মিঠে হাসির মানুষ, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম ও ধার্মিক প্রকৃতির। নীরিদি ছিল রোগা, শীর্ণ ও পাগল মেয়ে। মা নীরি ডাকলে আসতে তার দেরী হতো, কারণ পা গুণে গুণে সে চলতো; দুই পা এগিয়ে তিন পা পিছিয়ে তার ছিল একেবারে সন্তর্পণে চলার অদ্ভুত ধরণ। ভয়ে সদা সর্বদা কি যেন অঘটন ঘটার আতঙ্কে সে হাঁটতো, তাকে দেখলে মায়ায় করুণায় বুকটা মোচড় দিয়ে উঠতো। ঋষি রাজনারায়ণের বংশ ছিল এক অসাধারণ প্রতিভার ও পাগলের বংশ। সেই বংশে ও সেই দীপ্ত প্রতিভার কোলে জন্মেছিলেন ইংরাজী সাহিত্যের উচ্চাঙ্গের অসামান্য কবি মনোমোহন ঘোষ, আমার মেজদা, জগদ্বরেণ্য মহাযোগেশ্বর শ্রীঅরবিন্দ ও অগ্নিযুগের আদি পর্বের সংগঠক ও নেতা বারীন্দ্রকুমার। বড় বিনয়ভূষণও ছিলেন আমাদের সদাশিব মানুষ, বাবা কৃষ্ণধনের মত হাতখোলা দাতা ও গ্রীক, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ ও ইংরাজী ভাষায় বিদ্বান—কুচবেহার রাজকুমারদের গৃহশিক্ষক ও পরে কুচবেহার ষ্টেটের উচ্চ রাজকর্মচারী। দাদার দরাজ হাতে টাকা উড়তো খোলামকুচির মত; প্রাণখোলা হাসিতে মজলিশী বিনয়ভূষণ—কুচবেহার রাজপ্রাসাদের (উডল্যান্ডস) হর্তাকর্তা দরবারী বি ঘোষ এঁদের বড় বড় ষ্টেট ফাংশনের ছিলেন প্রাণস্বরূপ। পাগল মা, দিদি ও আমার খরচ দিতেন এই বড়দা ও মেজদা দুজনে মিলে। ঋষি রাজনারায়ণের ও দিদিমার কাছে ডাকে আসতো টাকা ও মাসের সওদা—চাল, ডাল, লবণ, মশলা, ঘি, তেল, চিনি, আটা ভারে ভারে তাঁরা কিনে পাঠাতেন পাগলী মায়ের কাছে রোহিণীর লালা তারিণীচরণের বাসায়। মা সেই গোটা মাসের সঞ্চিত রসদ থেকে রেঁধে আমাদের খাওয়াতেন যখন পাগল মাথা তাঁর ঠাণ্ডা থাকতো; ক্ষিপ্ত ক্রুদ্ধ অবস্থায় আমাদের প্রায়ই অনাহারে কাটতো। কোন কোন দিন কিছু চাল, ডাল, আলু হাঁড়িতে বার করে দিতেন মা, দিদি ও আমি ফুটিয়ে কোনগতিকে সেই ছেলেবেলা অর্ধপক্ব করে খেতাম।

আমার সেজ মাসীর জীবন ছিল বড় দুঃখের। তাঁর স্বামী ছিলেন ডাক্তার, তিনি সেজ মাসীকে কখনও নিজের কাছে নিয়েছেন বলে আমরা দেখিনি। তাঁর ছিল উচ্ছৃঙ্খল জীবন, তাঁর দেওয়া প্রমেহ আদি রক্তদুষ্টির ফলে শেষ বয়সে সুকুমারী সেজ মাসীর হয় কুষ্ঠ ব্যাধি, এই ব্যাধিতে শয্যাশায়ী মাসীমা বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের আশ্রয়ে বহুদিন ছিলেন। সেজ মাসীর এক পুত্র অবিনাশ ও এক কন্যা ঊষা—একে একে ১৭ বছর ও ৩০ বৎসর বয়সে মারা যায়। আমাদের মা-মাসীরা পাঁচ ভগ্নী। ছোট মাসী প্রসিদ্ধ কবি লজ্জাবতী বসু, তিনি ছিলেন চিরকুমারী। আমার আশ্রয়ে থেকে শেষ বয়সে রক্তাতিসার রোগে সার্কুলার রোড ও সুকিয়া স্ট্রীট জংসনের ক্যালকাটা হোমিওপ্যাথিক কলেজে মারা যান। কবি লজ্জাবতীর কিছু কিছু কবিতা এখনও আমার কাগজপত্রের মধ্যে দেখতে পাই। আমার পঞ্চম মাসীমা সঞ্জীবনী সম্পাদক প্রসিদ্ধ কৃষ্ণকুমার মিত্রের স্ত্রী ছিলেন গোঁড়া নিরাকারবাদী পৌত্তলিকতা ও প্রতিমাবিদ্বেষী। ন' মাসী—কুমুদিনী বসু, বাসন্তী চক্রবর্তী ও সুকুমার মিত্রের মাতা। এই মাসীমার ৬নং কলেজ স্কোয়ার ভবনে সাধনা প্রেসে ছিল আমাদের ও শ্রীঅরবিন্দের সদা ঘনিষ্ঠ যাতায়াত। এই কৃষ্ণকুমারের বাড়ীতে শ্রীঅরবিন্দ থাকতেন, জেল-ফেরৎ এসে এখানে থেকে ধর্ম ও কর্মযোগীন প্রকাশ করেন, এখান থেকেই সুকুমারের সক্রিয় সাহায্যে অজ্ঞাতবাসে যাত্রা করেন চন্দননগর হয়ে পাণ্ডিচেরী অভিমুখে—ডুপ্লে জাহাজযোগে ছদ্মনামে। এই হলো আমার মা স্বর্ণলতা ও তাঁর চার ভগ্নী হেমলতা, সুকুমারী, লজ্জাবতী ও লীলাবতীর জীবনের ইতিবৃত্ত। আমার জীবনের হাট কলরবে মুখর করে এঁরা বাল্য-কৈশোর জুড়ে ঘটনা বৈচিত্র্যের জমজমাট সমারোহের মাঝে দোল খেয়েছেন। ৬নং কলেজ স্কোয়ারের সাধনা প্রেস, সঞ্জীবনী অফিস ও দেওঘরে ঋষি রাজনারায়ণের বাড়ীই ছিল আমাদের প্রতি পুঞ্জাবকাশের ও যাতায়াতের কেন্দ্র। পিতা ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষের মৃত্যুর পর থেকে এই দুই বাড়ীই ছিল জীবনের প্রধান আকর্ষণ, যতদিন পর্যন্ত না স্বদেশী আন্দোলনের রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে জীবন আরও ঘোরাল ঘটনাসংকুল করে না তোলে। আমরা যখন গীতা ও অসি স্পর্শ করে শ্রীঅরবিন্দের কাছে শপথ না গ্রহণ করেছি, ততদিনও এই দুইটি বাড়ী ছিল জীবনের কৈশোরের প্রধান লীলাক্ষেত্র। পরেও স্বদেশী যুগে এই গোলদীঘির ধারের বাড়ীটি একটি ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি লাভ করে; ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ অবধি এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বাড়ী হয়ে উঠেছিল মহাত্মা গান্ধী, চিত্তরঞ্জন আদি নেতাদের কেন্দ্রস্থল। মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর স্ত্রী কলিকাতায় এলে এ-বাড়ীতে একবার পদার্পণ ও তীর্থ না করে অন্যত্র যেতেন না। আমি বিধানবাবুর দ্বারা এই বাড়ীটিকে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে কিনে পুনর্গঠিত করার বিশেষ চেষ্টা করেছিলাম। পরিকল্পনা ছিল,—পাঁচ থেকে সাততলা করে পুনর্গঠিত এই বাড়ীতে নীচের তলায় ও দ্বিতলে বড় হলে বসবে যত জাতীয় অনুষ্ঠান ও দ্বিতলে থাকবে অরবিন্দ স্মৃতি-মন্দির। এই বাড়ী থেকে তিনি অন্তর্ধান হয়ে তাঁর চরম সাধনার ক্ষেত্র পণ্ডিচেরীতে চলে যান। নিবেদিতা সংবাদ দেন—আবার তাঁর নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হয়েছে; নিবেদিতাই উপদেশ দেন যে, শ্রীঅরবিন্দকে এবার দীর্ঘ অন্তরীণে আবদ্ধ রাখার সম্ভাবনা আছে। কারাগারে আটক না থেকে তাঁর বৃটিশ কবল থেকে বিদেশী সরকারের আয়ত্তের বাহিরে কোথায়ও সরে থাকা ভাল, সেখান থেকে দেশের মুক্তি সংগ্রামও চালান সম্ভব হবে। শ্রীঅরবিন্দের নিছক রাজনীতিক মুক্তি সংগ্রামের কাজ শেষ হয়ে এসেছিল, তাঁর অন্তরে এসেছিল বৃহত্তের অপূর্ব ভূমার ডাক। সেই সুস্পষ্ট আহ্বান শুনে তিনি এ-পর্যায় শেষ করে চলে গেলেন মানবের দিব্য রূপান্তরের দুরূহ দুশ্চর সাধনায় সে সত্যকে রূপ দিতে—সম্ভব করে তুলতে। এই সূত্রে পশ্চিম বাংলার রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের নিকট আবেদন জানাই এই ঐতিহাসিক বাড়ীটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে। প্রথম ও দ্বিতীয় তলা বাদে বাকি চার-পাঁচ তলাকে তিন কামরার চার × চার এই ষোলটি ফ্ল্যাটে পরিণত করে ১৫০্ টাকা হিসাবে ভাড়া দিলে এই সম্পত্তি থেকে প্রচুর আয় হবে ও সমস্ত খরচ উঠে আসবে।

লীলাবতীর জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমুদিনী (রতন) ছিল আমার কৈশোরের বড় ভালবাসার বস্তু। কৈশোরে বহু কবিতা আমি এই রতনকে উদ্দেশ করে লিখেছিলাম। সে তার পিতামাতার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তার কর্মবহুল সমাজসেবার জীবনে পূর্ণ করে গেছে। এই হলো ঋষি রাজনারায়ণের পাঁচ কন্যার জীবনবৃত্তান্ত। তাঁর পুত্রের মধ্যে ছিলেন জ্যেষ্ঠ শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, মধ্যম পূর্ণ উন্মাদ শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু এবং কনিষ্ঠ দেওঘরের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ পালোয়ান ও কসিডগীর দুর্ধর্ষ শিকারী শ্রীমণি বোস। নিকটস্থ জাগল নামী গ্রামের নিরক্ষর চাষী মজুরদের নিয়ে তিনি এক নির্গুণীয়া সমাজ স্থাপন করেন, তারা সংগতে একদিন তার বেদীমূলে একত্র হয়ে তাঁরই রচিত

(শেষাংশ ২৮২ পৃষ্ঠায়)

"প্রেম, প্রেম, প্রেম! এদিকে ভিটেয় যে ঘুঘু চরবে সেদিকে খেয়াল নেই ব্যাটার।"

একা একা নিজের ঘরে বসিয়া উচ্চ কণ্ঠেই উক্ত উক্তিটি করিলেন বিনয়বাবু। তাহার পর বিস্ফারিত আরক্ত নয়নে সামনের দেওয়ালের দিকে চাহিয়া রহিলেন। দেওয়ালে একটি হাস্যমুখ যুবকের ছবি টাঙানো ছিল। বিনয়বাবুর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার হাসি এতটুকু ম্লান হইল না। বিনয়বাবু নির্নিমেষে ছবিটির দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর ড্রয়ার টানিয়া কাগজ বাহির করিলেন একটা। সেটা লম্বা খামে পুরিয়া ঠিকানা লিখিলেন। তাহার পর হাঁক দিলেন—"জগদীশ জগদীশ—"।

জগদীশ নামক ভৃত্যটি প্রবেশ করিল।

"এই চিঠিখানা রেজেষ্ট্রি করে পাঠাতে হবে। রেজেষ্ট্রি উইথ একনলেজমেণ্ট ডিউ। বুঝলি? খুব দরকারি চিঠি। কই সুখন তো আমাকে কফি দিয়ে গেল না এখনও।"

"দেখি"

চিঠি লইয়া জগদীশ চলিয়া গেল।

একটু পরে সুখন প্রবেশ করিল কফির ট্রে লইয়া। ট্রে-তে শুধু কফিরই সরঞ্জাম নাই—একটা প্লেটে কিছু আঙুরও রহিয়াছে। ব্র্যাণ্ডিতে-ভিজানো গরম আঙুর। জনৈক বিলাত ফেরত হেকিম তাঁহাকে আঙুর-ভোজনের এই বিশেষ কৌশলটি শিখাইয়াছিলেন। ব্যাপারটি ব্যয়সাধ্য, কিন্তু ইহা খাইবার পর হইতে বিনয়বাবুর স্নায়বিক দৌর্বল্য অনেকটা কমিয়াছে। খাইতেও বেশ। সুতরাং গত ছয় মাস হইতে ইহা তিনি চালাইয়া যাইতেছেন।

আঙুর সহযোগে কফি-পান শেষ করিয়া তিনি সুখনকে বলিলেন, "এইবার জিতুকে পাঠিয়ে দে—"

মিনিট দশেক পরে জিতু নামক কালো বালক ভৃত্যটি প্রবেশ করিল। কিছুকাল পূর্বে কোন এক যাত্রার দলে সে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করিত। এখন বেশী মাহিনার লোভে বিনয়বাবুর পদ-সেবা করে। শুধু পদ নয়, সমস্ত অঙ্গেরই সেবা করে সে, ইংরেজিতে যাহাকে 'মাসাজ' বলে। তিন রকম তেল দিয়া অঙ্গ মর্দনের পর বিনয়বাবু স্নান করেন। সুরু করেন খুব গরম জল দিয়া, তাহার পর ধীরে ধীরে জলের উত্তাপ কমাইতে থাকেন, শেষে খুব শীতলজলে অবগাহন করিয়া স্নান সমাপন করেন। তেল মাখিয়া স্নান করিতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা লাগে। যে চালের ভাত খান তাহা ভালো পেশোয়ারী চাল। ব্যঞ্জন সম্বন্ধেও বিলাসিতা কম নহে। মাছের ঝোল, ফ্রাই এবং অম্বল তাঁহার প্রত্যহ চাইই। এ সব ছাড়া দুই রকম ডাল ও নানারকম শাকসব্জি। রাত্রে সামান্য পোলাও, একটি গোটা মুর্গির রোষ্ট এবং একটি আপেল সিদ্ধ আহার করেন। চা-কফি সম্বন্ধেও তিনি খুব খুঁতখুঁতে। খুব উৎকৃষ্ট জিনিস ছাড়া ব্যবহার করেন না। গ্রীষ্মকাল পড়িতে না পড়িতেই তাঁহাকে প্রতি বৎসর হয় দার্জিলিং, না হয় সিমলা, না হয় মুসৌরি, না হয় রাণীক্ষেত যাইতে হয়। চৈত্র মাসের পর আর কলিকাতায় টিকিতে পারেন না।

সংক্ষেপে, তাঁহার জীবনযাপনের প্রণালীটি বেশ ব্যয়সাধ্য। চাকুরি করিতে হয় না, বড় ব্যবসা আছে। চট্টো-গঙ্গো নামক বিখ্যাত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানটির ইনি মালিক। কিন্তু তবু তাঁহাকে চিন্তিত হইতে হইয়াছে। ভাবিয়াং ভাবিয়া তিনি বেশ শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। এবং ইহার মূলে আছে প্রেম।

গোড়া হইতে ব্যাপারটি খুলিয়া না বলিলে আপনাদের বুঝিতে অসুবিধা হইবে। তাই গোড়ার কথাটাই আগে বলি।

২

বহু পূর্বে বিনয়কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং মণীন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এক সঙ্গে এক কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল তাঁহাদের। এক মেসে এক ঘরে থাকিতেন, এক সঙ্গে পড়াশোনা, খেলাধুলো, ওঠা-বসা সব হইত। একজন আর একজনকে ছাড়িয়া বেশীক্ষণ কোথাও থাকিতে পারিতেন না। লম্বা ছুটির সময় দুইজনই দুইজনের বাড়িতে আধা-আধি করিয়া অবকাশটা ভোগ করিতেন।

কলেজ জীবন এইভাবে অতিবাহিত করিয়া যখন তাঁহারা কর্মজীবনে উত্তীর্ণ হইলেন তখন বিচ্ছেদ আসন্ন হইয়া উঠিল। বিনয়কুমার একটা কলেজে চাকরি লইয়া কলিকাতা ত্যাগ করিলেন। মণীন্দ্রকুমার তখনও চাকরি জুটাইতে পারেন নাই, তিনিও বিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। মাস দুই পরে সেই কলেজের বার্ষিক উৎসবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আসিলেন সভাপতি-রূপে। তিনি যে বক্তৃতাটি দিলেন তাহার সার মর্ম, ব্যবসায় না করিলে বাঙালীর বাঁচিবার আশা নাই। বলিলেন, এম-এ পাশ করিয়া স্বল্প বেতনে প্রফেসারি করা অপেক্ষা, অথবা বি-এল পাশ করিয়া কাছারির গাছতলায় তলায় ঘুরিয়া বেড়ানো অপেক্ষা, বিড়ির দোকান করাও তিনি অধিক শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচনা করেন। বলিলেন, বাঙালীর ছেলের বুদ্ধি আছে, সে যদি তাহার সহিত চরিত্রবল যুক্ত করিতে পারে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে সে অজেয় হইবে। অল্প মূলধনে কত রকম ব্যবসা করা সম্ভব তাহারও আভাস দিলেন তিনি। পরিশেষে বলিলেন, ব্যবসায়ে আসল মূলধন টাকা নয়, আসল মূলধন চরিত্র।

ঠিক ইহার কিছুদিন পূর্বে মণীন্দ্রকুমারের এক নিঃসন্তান মাতুল মারা গিয়াছিলেন। উত্তরাধিকারী মণীন্দ্রকুমার হাজার পাঁচেক টাকা পাইয়া গেলেন। তখন দুই বন্ধুতে পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন গোলামী না করিয়া ব্যবসাই করা যাক। দুইজনে এক সঙ্গে থাকাও যাইবে, রোজকারও করা যাইবে। বিনয় যদি মূলধনস্বরূপ কিছু না-ও দিতে পারেন ক্ষতি নাই। তাঁহার চরিত্র-মূলধন যদি তিনি ব্যবসায়ে পুরাপুরি নিয়োগ করেন তাহা হইলেই লাভের অর্ধাংশ তাঁহাকে দিতে মণীন্দ্রকুমার আপত্তি করিবেন না। এইভাবেই চট্টো-গঙ্গো প্রতিষ্ঠানের প্রথম পত্তন হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর বিনয়কুমারও ব্যবসায়ে পাঁচ হাজার টাকা মূলধনস্বরূপ দিয়াছিলেন।

কাপড়ের ব্যবসায় শুরু করিয়াছিলেন তাঁহারা। আচার্য রায়ের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল, ব্যবসায়টি দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর দুই বন্ধু বিবাহ করিয়াছিলেন। বিনয়কুমারের বিবাহ প্রথমে হয়। মণীন্দ্রকুমার বিবাহ করেন বিনয়ের বিবাহের বছর চারেক পরে। স্বাস্থ্য অনুকূল ছিল না বলিয়া তিনি বিলম্বে বিবাহ করিয়াছিলেন।

বিনয়কুমারের একটি পুত্র হয়, মণীন্দ্রকুমারের একটি কন্যা। দৈবাৎ এই যোগাযোগ

হওয়াতে আর একটি সম্ভাবনার কথা তাঁহাদের মনে উদিত হইয়াছিল। মণীন্দ্রকুমার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন ভবিষ্যতে তাঁহার কন্যা দেবীর সহিত বিনয়ের পুত্র উন্মেষের বিবাহ দিবেন। বিনয়কুমারও সাগ্রহে সম্মতি দিয়াছিলেন ইহাতে। ইহা লইয়া আলোচনা করিতে করিতে তাঁহাদের হৃদয়াবেগ এত প্রবল হইয়া উঠে যে, শেষকালে তাঁহারা স্থির করিয়া ফেলেন যে তাঁহাদের এই শুভ-বাসনাকে আইনের বন্ধনে আবদ্ধ করিতে হইবে। বাল্য-বিবাহের বিরোধী বলিয়া তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ দিলেন না, কিন্তু উভয়ে মিলিয়া এমন একটি উইল করিবেন ঠিক করিলেন যাহাতে তাঁহাদের অবর্তমানেও তাঁহাদের পুত্রকন্যা তাঁহাদের এই সদিচ্ছার মর্যাদা রক্ষা করিতে বাধ্য হয়। ঠিক হইল এমন উইল হইবে যে দেবী এবং উন্মেষ যদি আইনত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহা হইলেই তাহারা সমানভাবে চট্টো-গঙ্গো প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধিকার লাভ করিবে। ইহাদের মধ্যে যদি কেহ অপরকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক না হয় তাহা হইলে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কোন অংশ পাইবে না। উভয়েই যদি বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করে তাহা হইলে উভয়েই বিষয় হইতে বঞ্চিত হইবে। তখন বিষয়ের মালিক হইবে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন। ব্যবসায়লব্ধ অর্থ মিশনের কাজেই ব্যয়িত হইবে। ইহাদের উকিল রজনীভূষণ কানুনগো দূরদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমাদের ছেলেমেয়েদের পছন্দ-অপছন্দের উপর এতখানি জবরদস্তি করা ঠিক হবে না। তাদের খানিকটা স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। তোমাদের বাবার নাম কি—"

বিনয়কুমার বলিলেন—"স্বর্গীয় মতিলাল চট্টোপাধ্যায়।"

মণীন্দ্রকুমার বলিলেন—"স্বর্গীয় শ্রীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।"

"আমার মতে যা হওয়া উচিত এবং সঙ্গত সেটা তাহলে লিখে দিচ্ছি দেখ—"

কানুনগো মহাশয় একটা কাগজে খস খস করিয়া লিখিয়া ফেলিলেন "শ্রীমতী দেবী গাঙুলী যদি স্বর্গীয় মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের বংশের কাহাকেও বিবাহ করিতে রাজি না হয় তাহা হইলে সে বিষয় হইতে বঞ্চিত হইবে। শ্রীমান উন্মেষ চট্টোপাধ্যায়ও যদি স্বর্গীয় শ্রীনাথ গাঙুলীর বংশের কোন কন্যাকে বিবাহ না করে তাহা হইলে বিষয়ের কোন অংশ পাইবে না। চট্টো-গঙ্গো প্রতিষ্ঠান তখন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের হাতে চলিয়া যাইবে।"

বিনয় এবং মণীন্দ্র ইহাতে আপত্তির কিছু দেখিলেন না, কারণ তাঁহারা উভয়েই পিতার এক পুত্র এবং তাঁহাদের পিতারাও তাঁহাদের পিতাদের এক পুত্র ছিলেন। সুতরাং এই উইল দ্বারা কার্যত দেবী এবং উন্মেষ আইনত আবদ্ধই থাকিবে।

কানুনগো মহাশয় তখন আইনের ভাষায় উক্ত উইলটি লিখিয়া ফেলিলেন এবং যথাসময়ে তাহা আইনত রেজেস্ট্রি হইয়া গেল। উইল করিবার এক বৎসর পরে মণীন্দ্রকুমার হঠাৎ মারা গেলেন। দেবীর বয়স তখন পাঁচ বৎসর। মণীন্দ্রের আর কোন সন্তান হয় নাই। বিনয়েরও আর কোন সন্তান হয় নাই, কারণ উন্মেষকে প্রসব করিবার কিছুদিন পরেই উন্মেষের মা মারা যান। বিনয়কুমার দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন নাই। নিজের পুত্র উন্মেষ এবং বন্ধুকন্যা দেবীকে ভালোভাবে মানুষ করিবার কাজে তিনি লাগিয়া পড়িলেন।

৩

ষোল বৎসর পরে পরিস্থিতি এইরূপ দাঁড়াইল।

দেবী এম-এ পড়িতেছে, উন্মেষ এখানকার পড়া শেষ করিয়া লণ্ডনে গিয়াছে। বিনয়কুমার ব্যবসায়ের সুনিশ্চিত লাভ অনায়াসে ভোগ করিতে করিতে ঘোর বিলাসী হইয়া পড়িয়াছেন। শুধু বিলাসে নয়, কোনও কোনও ব্যসনেও তাঁহার মতি গিয়াছে। ফাটকা খেলাতে, নানারূপ বাজে কোম্পানির শেয়ার কেনাতে প্রচুর অর্থ নষ্ট করিয়াছেন তিনি। তাঁহার পুত্র উন্মেষও খরচ সম্বন্ধে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। ফল যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা আশঙ্কাজনক। চট্টো-গঙ্গো প্রতিষ্ঠানের অডিটার কিছুদিন পূর্বে বিনয়কুমারকে জানাইয়াছেন ব্যবসায়ে তাঁহার লভ্যাংশের অতিরিক্ত টাকা তিনি প্রতি বৎসরই লইয়াছেন। তাঁহার ঋণের পরিমাণ এখন এত বেশী যে, তাঁহার অপর অংশীদার মণীন্দ্রকুমারের বিধবা পত্নী নীহারবালাই বলিতে গেলে ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ মালিক হইয়া পড়িয়াছেন। বিনয়কুমার এখন যাহা খরচ করিতেছেন তাহা নীহারবালার অংশ হইতেই ঋণস্বরূপ তাঁহাকে দেওয়া হইতেছে। বিনয়কুমার সংকুচিত হইয়া গেলেন। হইবারই কথা, কারণ খরচ করিবার সময় খেয়াল থাকে না, কিন্তু খরচ করিবার পরই সংকুচিত হইতে হয়।

বিনয়কুমার আত্মসম্মানী লোক ছিলেন। বন্ধুর বিধবার নিকট তিনি প্রত্যহই ঋণী হইতেছেন ইহাতে তাঁহার আত্মসম্মানে বড়ই আঘাত লাগিতে লাগিল। না জানি, নীহারবালা কি মনে করিতেছে এই চিন্তায় তাঁহার দুই রাত্রি ঘুম হইল না। শেষে ঠিক করিলেন একদিন তাঁহার সহিত এ বিষয়ে মুখোমুখি আলাপ করিবেন। উইলের কথাটাও তাঁহাকে বলিবেন। এতদিন উইলের কথা তিনি কাহাকেও জানান নাই। আজ যাইব কাল যাইব করিয়া কিন্তু তিনি বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে নীহারবালা হঠাৎ একদিন মারা গেলেন। নীহারবালার একমাত্র কন্যা দেবী-ই তখন বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইয়া পড়িল।

বিনয়কুমার একদিন গিয়া তাহার নিকটই উইলের কথাটি পাড়িবার চেষ্টা করিলেন।

দেবী বলিল, "আমি কাকাবাবু এখন পরীক্ষার পড়া নিয়ে ব্যস্ত। উইল-টুইল নিয়ে মাথা ঘামাতে পারব না। আমাকে ফার্স্ট ক্লাস পেতেই হবে—"

"এক মিনিট। উন্মেষকে বিয়ে করতে তোর আপত্তি আছে?"

"উনুদাকে?"

হঠাৎ সে হাসিয়া ফেলিল।

"এ কথা জিগেস করবার মানে?"

"মানে আছে। উনুকে তুমি যদি বিয়ে করতে রাজি না হও, তাহলে মণির উইল অনুসারে তুমি চট্টো-গঙ্গোর কোন অংশ পাবে না"

"কে পাবে তাহলে"

"উনু। সে যদি অবশ্য তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়—"

"আর সে-ও যদি না হয়? হবেই এমন কোন কথা নেই, আমি তো দেখতে কালো। উনুদা আমাকে কি বলত জানেন? তাড়কা। খুব সম্ভব সে রাজি হবে না। তাহলে কি হবে?"

"সে-ও পাবে না কিছু। বিষয় রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে চলে যাবে আমার মৃত্যুর পর।"

"যাক গে। ও নিয়ে অত ভাবছেন কেন এখন থেকে—"

"ভাবছি, কারণ আমার অংশের সব লাভ আমি খরচ করে ফেলেছি। এখন তোমার অংশ থেকে আমাকে টাকা নিতে হচ্ছে। বিবেকে বাধছে সেটা। তুমি যদি আমার পুত্রবধূ হও তাহলে বাধবে না। আর মণির সেইটেই ইচ্ছে ছিল—"

"বেশ আমার আপত্তি নেই। উনুদার কি মত আছে?"

"সেটা এখনও জানি না। তাকে চিঠি লিখেছি।"

৪

উন্মেষের উত্তর পাইয়া বিনয়কুমারের মাথায় বজ্র ভাঙিয়া পড়িল।

উন্মেষ লিখিয়াছে—

শ্রীচরণেষু,

আপনার চিঠি পেলাম। বিষয়ের লোভে আমি দেবীকে বিয়ে করতে পারব না। আমি লুসি নামে একটি মেয়েকে বিয়ে করব ঠিক করেছি। মেয়েটি খুব ভালো, দেখে আপনার নিশ্চয়ই পছন্দ হবে। তবে বিয়ের এখনও দেরি আছে। কারণ এর আগে তার আর একজনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। স্বামী-স্ত্রীর বনছে না। ডিভোর্সের জন্য দরখাস্ত করেছে। ডিভোর্স হয়ে যাবে ঠিক। তখন আমি তাকে বিয়ে করব ঠিক করেছি। আর মাসখানেকের মধ্যেই আমার পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে। পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে আমি বাড়ি ফিরে যাব। ডিভোর্সের ব্যাপার মিটে গেলে লুসিও আমার কাছে চলে যাবে বলেছে। ভারতবর্ষেই বিয়ে হবে। আপনার সম্মতি ও আশীর্বাদের অপেক্ষায় রইলাম। আপনি আমার প্রণাম জানবেন। ইতি—

প্রণত

উন্মেষ

উন্মেষের পত্র পাইয়া বিনয়কুমার কয়েকদিন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। একটি কথাই বার বার তাঁহার মনে হইতে লাগিল—শেষে কি ওই মেয়েটার নিকটই তাঁহাকে সারা জীবন ঋণী হইয়া থাকিতে হইবে? উন্মেষ কাপড়ের ব্যবসায়-সংক্রান্ত কাজ শিখিতেই বিলাতে গিয়াছিল, যাহাতে ফিরিয়া আসিয়া ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে পারে। কিন্তু দেবীকে বিবাহ না করিলে ব্যবসায়ই তো তাহার থাকিবে না। সে অবশ্য অক্সফোর্ডের কি একটা পরীক্ষা দিতেছে। ফিরিয়া আসিলে কোথাও একটা চাকরি পাইয়া যাইতে পারে। কিন্তু তিনি কি ওই লুসির সংসারে থাকিতে পারিবেন? অসম্ভব। অনেক ভাবিয়া তিনি অবশেষে পরামর্শ চাহিয়া তাঁহাদের উকিল রজনীভূষণ কানুনগোকে দীর্ঘ পত্র লিখিলেন একটি। সব

(শেষাংশ ২৮৬ পৃষ্ঠায়)

লাজবতী

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আবার ঐ কাণ্ড করেছে ভুমরা; ছেলেটা সন্ধ্যার সময় দোকানে সওদা করতে যাচ্ছিল, পয়সা-কড়ি সব কেড়ে নিয়ে নেশা করতে চলে গেছে। ছেলে কাঁদতে কাঁদতে এসে বলল।

সদ্য বিলাসী হাত-পা গুটিয়ে বসে ছিল, সবাই মরুক না খেয়ে, আজ কোন মতেই রাঁধবে না।—কুলি-লাইনের এ দিককার কোয়ার্টার থেকে একে একে কয়েকজন পিসী এসে উপস্থিত হোল, সুখলালের বৌ রুক্মিয়া, রৌদীর বৌ লাজবন্তী, ভদোইয়ের সৎমা সুরযমন, বুধুয়ার পিসী তিলোত্তমা। সবাই সেধাতে লাগল, পরামর্শ দিতে লাগল, এ রকম করে হাল ছেড়ে দিলে চলে? পুরুষ মানুষ, সে ওরকম একটু-আধটু বাউণ্ডুলেপনা তো করবেই, তারই মধ্যে মানিয়ে-সানিয়ে বশে এনে আবার সংসার ধর্ম করতে হবে। এইভাবে দুনিয়াটা চলে এসেছে, চলবেও। উঠুক, পয়সা বের করে দিক ছেলেকে। রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করুক।

এতক্ষণ রাগ করেই বসে ছিল বিলাসী, এতজনের সহানুভূতিতে কেঁদে ফেলল; বলল,— যতদিন মুলুকে ছিল এ রকম ছিল না। কালে ভদ্রে, পালে-পার্বণে কখনও দলে পড়ে একটু বেচাল হয়ে পড়ল, পরের দিনই আবার ঠিক হয়ে গেল। এ যেন নিত্যিকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে আগে হপ্তা পাওয়ার দিনই শুধু এ রকম হোত; ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে নেশার অবস্থাতেই রাত করে ফিরত। বিলাসী মুন্না কাক্কাকে বলে, সেই তো ওকে মুলুক থেকে আনিয়েছে। মুন্না কাক্কা সর্দারকে বলে কয়ে যেদিন থেকে বিলাসীর হাতে হপ্তা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে সেদিন থেকেই এই নূতন উপদ্রব হয়েছে সুরু। এই নিয়ে দু' হপ্তায় আজ পাঁচ দিন হোল। বিলাসীকে মারবে বলেও শাসাতে আরম্ভ করেছে, সেদিন না সুরু করে দেয়।

বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগল বিলাসী; বলল,—এবার ছেলের হাত ধরে মুলুকে চলে যাবে ও যা ইচ্ছে হয় করুক। না হয় মুন্না কাক্কাকে বলবে ছাড়িয়ে দিক ওর চাকরী, আপদ চুকে যাক, মুলুকে গিয়ে বসুক, যেমন ছিল এতদিন।

বুধুয়ার পিসী তিলোত্তমা প্রশ্ন করল,—মুলুকে গিয়ে খাবে কি করে?

'চরবাহা-হরবাহা হয়ে গেরু-মোষ চারবে, লাঙল ঠেলে, যেমন করে খাচ্ছিল। মেহরারু (স্ত্রী) ঘাস বেচুক, ঘুঁটে বেচুক। পর্দানশীন বিবি হয়ে হচ্ছেই বা কি?'—বেশ ঝাঁজের সঙ্গেই বলল কথাগুলো।

ভদোইয়ের সৎমা সব চেয়ে প্রবীণা, কুলি-লাইনেও সব চেয়ে পুরোনো, অনেক দেখেছে, অনেক শুনেছে, স্বামী মরার পর সৎ ছেলে সৎ বৌকে আনিয়ে নিয়ে নূতন করে সংসার পেতেছে। বিলাসীর পাশেই বসেছিল, পিঠে হাত দিয়ে বলল,—'অমন করে মেজাজ হারালে হয় কানিয়া? ঐ লোককেই পোষ মানিয়ে কাজ চালাতে হবে। তার হদিস আছে বাৎলে দেব। তুই ওঠ আগে, যা আনতে হবে আনিয়ে নে, ছেলেটাকে পাঠিয়ে দে দোকানে। অত গোসা করলে চলে?'

রৌদীর বৌ লাজবন্তী এতক্ষণ চুপ করে শুধু শুনছিল, হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে বলল,—'তা বলে অমন মিনমিনে প্যানপেনে হলেও চলে না। অসহ্যি!'

হন-হন করে বেরিয়ে গেল।

সুরযমনের মনুষা (মিনসে) লোটন মড়র এসেছিল সন ১৩৩৯-এর শ্রাবণে। পঁচিশ বছরের কথা। আগের সনে শুকো গেছে, এ সনেও শ্রাবণ পেরিয়ে যায়, বৃষ্টির নাম গন্ধ নেই, একদিন কাউকে কিছু না বলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল। কাউকে নয় মানে এক সুরযমন ছাড়া। রাত্রে ওর সঙ্গেই পরামর্শ হোল, সুরযমন হাতের কংনা দুটো খুলে দিল, বাঁধা দিয়ে পুরব চলে এল লোটন। মানত সুরযমনকে খুব: ওদের যুগে এটা ছিল, এখন কোথায়? মনসা যায় পূর্বে তো মেহরারু যায় পশ্চিমে, ঝাড়ু মারো এমন যুগের মাথায়!

তখন কাজও ছিল সস্তা, এসে দাঁড়ালেই হোল; সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে গেল লোটন। বিলাসীদের ঐ মুন্নাকাক্কা আছে, ওদের সহায় সম্বল কেউই ছিল না।

চিঠিপত্র নেই, এরা ভাবছে বুঝি বেলাপ্পাই হয়ে গেল। আটকে রাখতে তো পারলই না, বরং গয়না খুলে দিয়ে—সাহায্যই করল পালিয়ে যেতে, ঘরে-বাইরে গঞ্জনাও খেতে হচ্ছে সুরযমনকে, এমন সময় মাসের শেষে পোষ্টাফিসে শ্বশুরের নামে এক মণি অর্ডার। হবে না কেন? স্বভাব চরিত্রের তো কোন দোষ নেই, বাড়ী শুদ্ধ সব কণ্ঠিধারী, তাড়ি-পানি তো নামবার জো নেই গলা দিয়ে। অন্যদিক দিয়ে—বললে, গুমর করা হয়, সুরযমন-অন্ত প্রাণ ছিল ভদোইয়ের বাপের। তোমরা বলবে, হবে না কেন, দ্বিতীয় পক্ষ তো। বলা সহজ এখন, সে রঙের জলুস নেই, সে গড়ন-পিটন গেছে আলগা হয়ে, বলা সহজ বৈকি, তবে যখনকার কথা হচ্ছে, তখন পাড়ার মধ্যে ভদোইয়ের বাপের নূতন বৌয়ের রূপের-তারিফ ...

যাক সে সব বাজে কথা। মাসে মাসে নিয়ম-মাফিক টাকা এসে পড়ছে, পালে-পার্বণে বছরে কয়েকবার করে আসছেও ভদোইয়ের বাপ—হোলী, জুড়শীতল, ছট, তিলা-সংক্রাৎ—বছর সাতেক কেটে গেল—তার মধ্যে বোনের দ্বিরাগমন, ছেলের বিয়েও হয়ে গেল— বেশ চলছে, বেশ চলছে, তারপর সব হঠাৎ বন্ধ। না টাকা-কড়ি, না চিঠি, না কিছু। এই করে তিন মাস যখন কেটে গেল, খবর পাওয়া গেল বিগড়ুবার পথ ধরেছে ভদোইয়ের বাপ।

খবরটা পাওয়া গেল, পাঁচ গাছিয়ার বউয়ে ঝার কাছে। বউয়ে ঝা তখন এইখানেই থাকে, একটা পাঠশালা খুলেছে লাইনের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে, আর পুরুতগিরিও করে। বাড়ী এসেছিল শ্বশুর খোঁজ নিতে গেলে বলল,—এমন-তেমন নয়, বেশ ভালো করেই বিগড়েছে ভদোইয়ের বাপ।

মাঝখানের সে অনেক কথা। অনেক চিঠি-পত্র হোল, অনেক চেষ্টা হোল ওকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, শেষকালে একবার শ্বশুর এসে ফিরে গিয়ে বললেন,—নাঃ, আসবেও না, শোধরাবারও আশা দেখছি না, ও ছেলে বাতিল।

ছেলে বাতিল হয়ে যেতে পারে; সে সাত বছর ধরে কামিয়ে-কুমিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে সংসারটা, লোটনের বাপ বিহারী এখন গাঁয়ের

মধ্যে একজন মাতব্বর, কিন্তু মেহরারুর কাছে—তার খসম তো আর বাতিল হবে না। সুরযমন জোট করে বসল তাকে রেখে আসতে হবে, নৈলে দানা-পানি ত্যাগ করবে। মাঝখানে সে অনেক কথা, ওরাও পাঠাবার ব্যবস্থা করবে না, সুরয-মনও আর ওখানে থাকবে না, শেষকালে একদিন রাত্রে ঐ সৎ ছেলে ভদোইকে সঙ্গে ক'রে বেরিয়ে পড়ল বাড়ী থেকে। ভদোইয়ের তখন কতই বা বয়েস—দশ কি এগারো।

সুরযমন এসে দ্যাখে সত্যিই সাপিনী মাথায় দংশেছে একেবারে, তাগা বাঁধবে তার জায়গা রাখেনি।

অনেক চেষ্টা করল, অনেক কাকুতি-মিনতি, কান্নাকাটি, তুক-তাক, তাবিজ-মাদুলি, কিছুতেই কিছু হয় না, শেষকালে হারান ফিটারের মেহরারু মালতী একদিন বললে,—ওসবে কিছু হবে না, এ বড় কঠিন ব্যাধি, তুই এক কাজ কর, আমাদের বাঙ্গালী ঘরের বামুনে-মায়েদের বাড়ীতে সাবিত্রী ব্রত করে,—স্বামী বেহাত হ'লে তাকে ফিরিয়ে আনবার ওর মত আর কিছু নেই—সাবিত্রী খোদ যমের হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন, তুই সেই ব্রত কর। বড় কঠিন ব্রত, কেউ চার বছরের জন্যে নেয়, কেউ আরও বেশি, তুই এক বছরের জন্যে নিয়ে দেখ্। কারুর একটা সুই (ইনজেকশন) দিলেই সেরে যায়, কারুর পাঁচটা লাগে, তোর পুরুষের সঙ্গে তোর যেমন আটা ছিল শুনেছি, ঐ একটাতেই হবে।

তা, বললে বিশ্বাস করবে না, একটা বছর আধখানাও হয়নি, একেবারে মতি-গতি বদলে গেল ভদোইয়ের বাপের। বিলাসী সেই সাবিত্রীর ব্রত করুক, তুকও করতে হবে না, তাকও করতে হবে না, একেবারে ভেড়া হয়ে যাবে পুরুষ।

সুরযমনই করে দিল সব ব্যবস্থা। লাইনের পুরুত এখন বউয়ে ঝার ভাইপো পলটু ঝা; সুরযমনই তাকে ঠিক করে দিয়েছিল, সে যথা-সময়ে এসে পুজো আরম্ভ করে দিল ঘণ্টি বাজিয়ে।

ডুমরা এদিকে একটু বাড়াবাড়ি লাগিয়ে-ছিল। আগে আগে কাজের পর রাত্রেই নেশার আড্ডায় যেত, দিন কতক থেকে মাঝে মাঝে কামাই ক'রে যখন-তখন যেতে আরম্ভ করেছে। সেদিনও নেশা করে এসে কোয়ার্টারের দরজায় চুপ করে চোখ বুজে বসেছে, ভেতরে যাবে কিনা যাবে না ঠিক করতে পারছে না, এমন সময় মন্ত্রের সঙ্গে ঘণ্টির আওয়াজ উঠল। পলটু ঝা পুজো যাই করুক, ঘণ্টির ওপর খুব জোর দেয়, আর মন্ত্র যাই বলুক, বলে বেশ জোর গলায়, অনুস্বর বিসর্গ যেখানে নেইও সেখানেও ভরে দিয়ে দিয়ে। ডুমরা মাথাটা কোলে গুঁজে ভাবছিল ভেতরে যাবে কি যাবে না, মুখে একটু-একটু হাসি ফুটে উঠল; ওর হয়েছে কি, আজ যে বুধন ভাইয়ার আড্ডাকে কোয়ার্টার মনে করেছে? ঐ তো আড্ডার মধ্যে হীরু পাশমান গান ধরেছে আর সাধুবাবা চিমটে বাজিয়ে তাল দিচ্ছে তার সঙ্গে। নেশাটি বেশ জমে আসছে ডুমরার, হাসিটি মুখময় ছড়িয়ে পড়েছে, বার দুই মাথা দুলিয়ে বাহবাও দিল এমন সময় সাধুবাবার চিমটে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।.....ঘণ্টি বাজাবার একটা সীমাও আছে তো। হাতটা তো দম দেওয়া কল নয়।

একটু কান পেতে রইল ডুমরা, আওয়াজ ওঠে না দেখে বিড়বিড় করে উৎসাহ দিয়ে বলল,—অবশ্য ও মনে করল ভরাট গলাতেই বলছে, বজ্জল,—চলুক বাবাজী, থামলে কেন? .....কেউ সাধুবাবার গেলাসটা ভরে দে না রে!'......তবুও আওয়াজ ওঠে না দেখে নিজেই গিয়ে চিমটেটা ধরবার জন্য উঠল।

নেশাটা ভেঙে না গেলেও বেশ একটু চমকে গেল।...এতো দেখা যাচ্ছে কোয়ার্টারেই! কি করে এল এখানে? পুজোর মন্ত্র না? দরজাটা ভেজানো ছিল, ঠেলে টলতে-টলতে ভেতরে গিয়ে দাঁড়াল। পুজোই, কোয়ার্টারের বারান্দায় বেশ ঘটা করেই আয়োজন হয়েছে। অঙ্গনে পুরুত, একটু দূরে থেবড়ি খেয়ে বিলাসী বসে, দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে সুনরা।..... অবশ্য সবাই থ হয়ে গেছে, চেয়ে আছে ওর দিকে।

পুরুত যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে, চোখ দুটো চেপে একটু মনে করবার চেষ্টা করল ডুমরা তারপর প্রশ্ন করল—'বউয়ে ঝার ভাইপো পলটু ঝা না?'

উত্তর হোল—'হাঁ।'

'কি হচ্ছে এখানে?'

'পুজো করছি।'

'কি পুজো?'

'সাবিত্রীর।'

'কি হয় তাতে?'

পলটু চুপ করেই রইল, একবার বিলাসীর দিকে চাইল। বিলাসী বলল—'

'পুজো করলে ভালো হয় সবার, কি আর হবে?'

টলতে টলতেই ধমক দিয়ে উঠল ডুমরা, 'চোপ-রও। আমি কালে-ভদ্রে একটুখানি মেজাজটা দুরুস্ত করেনি, তা তুই চাস না।... ভালো হয়।'

আবার পলটু ঝার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—

'তুই বউয়ে ঝার ভাইপো না?'

'হাঁ।'

'বউয়ে ঝার মতন দশা করি চাস সেটা?'

'না।'

'তা হলে ওঠ। আমার ভালোর পুজো আমি নিজে করব।......সাবিত্রী বললি না। কি করেন তিনি?'

'যম মহারাজকে সরিয়ে দিয়েছিলেন।'

ডুমরা হাত দুটো বুকে জড়িয়ে একেবারে সামনা-সামনি হয়ে দাঁড়াল, দুলতে-দুলতে বলল,—'এই যম মহারাজ এসে দাঁড়িয়েছে। সরাতে পারবি?'

পলটু ঝা আসন পিঁড়ি থেকে উঁচু হয়ে বসেছিল, হাতে গামছাটা মুঠিয়ে নিয়ে বলল,—'না।'

'তাহলে ওঠ, আমি বসি।'

দরজার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল,—'অভি নিকলো।' পলটু ঝা গুটি-সুটি মেরে সুড়-সুড় করে বেরিয়ে গেল। বিলাসী ঘরের মধ্যে গিয়ে আছড়ে পড়ল। ডুমরা টলতে-টলতে বসে পড়ে নৈবেদ্যের থালাটা টেনে নিল, দুটো মিষ্টি মুখে পুরে দিল, তারপর একমুঠো সাপটে নিয়ে সুনরার দিকে হাতটা বাড়িয়ে ধরে বলল,—'নে ধর, বাবা ভালো, না মন্দ?'

সন্ধ্যার সময় সুখলালের বৌ রুনিয়া এল, রৌদীর বৌ লাজবতী এল, বুধুয়ার পিসী তিলোত্তমা এল। তিলোত্তমা হলদে, পাকা সোনার ফুলকাটা চাকতির মতো নাকছবিশুদ্ধ নাকটা কুঁচকে বলল,—'অমনি আধখানা পুজো না হ'তে হ'তে মতি-গতি বদলে গেল। কথার-কথা কিনা।......ঝগড়াটে মেয়ে মানুষ, কাজ কি, সেদিন আর কিছু বললাম না, কিন্তু বউয়ে ঝার কেচ্ছা কে না জানে? পুজো বসতে না বসতে ভদোই এসে আসনের ওপরই গোবেড়েল দিয়ে বে-হোস ক'রে দিলে না বউয়ে ঝাকে? দিয়ে জেল খাটল না-ছ মাস? ভাইপো কাকার নাম হতেই সে বিনা ওজরে আসন ছেড়ে উঠে গেল সে কেন? আমি জানতাম এই হবে, তবে মহাবীরজীর দয়া, অপর ওপর দিয়ে গেল।'

বিলাসী কাঁদতে লাগল বলল,—'কি হবে? দিন দিন যেন বেড়েই যাচ্ছে।'

'আছে উপায়। রাবণরাজা সায়েস্তা হয়ে গেল তো ডুমরু মাহতো! তুই এক কাজ কর কানিয়া, ঐ মহাবীরজীর পুজো দে। নতুন কলের কাছে নতুন মন্দির হয়েছে, স্বপ্ন দিয়ে এসেছেন মহাবীরজী, খুব জাগ্রত, যদি থাকে তো ওঁর কাছেই এ রোগের দাবাই আছে।

রুনিয়াও সমর্থন করল। তবে ঐ যে মনে করেছে এক সুইয়াস—রোগ সেরে যাবে তা হয় না, মতজাম মতজায় সেদিকে গেছে তো! অন্ততঃ একটা হাতা ধারে রোজ পাতে পাতিয়ে দিক।

লাজবতী কম কথা কয়, বসেই ছিল চুপ করে, কেউ-কেউ উঠে পড়ায় পড়ায় বলল,—'একটা [illegible] বলতে [illegible] এসে বসে, উনি আবার দাবাই [illegible] আছে, কিন্তু.....থাক বাবা, না [illegible] ওপর পড়া হয়ে [illegible]।'

মুখ গোমড়া করে [illegible] বেরিয়ে গেল।

তিলোত্তমার বিশ্বাস হইল না। মহাবীরের আরতি সন্ধ্যার সময়। তিনটে দিন পুজোটা পৌঁছে দিল সুনরা তারপর কি করে টের পেয়ে গেল ডুমরা। প্রথম দিন কেড়ে-কুড়েই নিল, তারপর দিন সহজে না দেওয়ায় মারপিট করল। সুনরা লাইন কাঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি এসে উঠল।

রুনিয়া এল আর এল লাজবতী। রুনিয়া বলল,—হোক, মহাবীরজী এমন ঠাকুর নয়, তবে পুজোটা তো পৌঁছুতেই পেল না... '

কাজ ছিল, বেশিক্ষণ বসতে পারল না। উঠে গেল।

লাজবতী নাক সিঁটকে বলল,—'নিজের পুজোটা একটু এগিয়ে নেবেন সে ক্ষমতা নেই, উনি না কি আবার সমুদ্র ডিঙিয়ে ছিলেন, উনি নাকি আবার দাবাই এনে দেবেন!'

হাপুস নয়নে কাঁদছিল বিলাসী, প্রশ্ন করল—"কোন উপায় নেই বহিন, আর তো পারি না।"

লাজবতীর মুখটা শক্ত হয়ে উঠল, বলল—"থাকবে না কেন? তবে এই নিজের হাতে।"

মোটা রুপোর কাঙনা পরা ডান হাতটা মুঠো করে কয়েকবার নেড়ে দিল।

লাজবতীর কালো, মোটা মোটা দুহাতে ভারি দশবারো করে এক একটা কাঙনা, তার

(শেষাংশ ২৭৪ পৃষ্ঠায়)

রবীন্দ্র সাহিত্য সঙ্গী প্রিয়নাথ সেন

শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত

বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ও রবীন্দ্র প্রতিভা উন্মেষের প্রথম যুগে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে যে কয়জন কবি ও সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটেছিল তার মধ্যে কবিবর প্রিয়নাথ সেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৩২৩ সালের ৮ই কার্তিক তিনি ৬২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। প্রিয়নাথ সেন যে সেকালের শুধু একজন প্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন তাই নয়, সে যুগে তাঁর মত সাহিত্য সমালোচক ও সাহিত্য রসগ্রাহী খুব অল্পই ছিল। তিনি রবীন্দ্র সাহিত্যের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। সাহিত্য সাধনার প্রথম অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথের নিকট থেকে প্রচুর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী ছাড়া রবীন্দ্রনাথ আর কারও কাছে এত অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন কিনা সন্দেহ। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর 'জীবন স্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন—"সন্ধ্যা সঙ্গীত রচনা দ্বারা আমি এমন একজন বন্ধু পাইয়াছিলাম যাঁহার উৎসাহ অনুকূল আলোকের মত আমাকে কাব্য রচনার বিকাশ চেষ্টায় প্রাণসঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। তিনি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন। ......তাঁহার কাছে বসিলে ভাবরাজ্যের অনেক দূর দিগন্তের দৃশ্য একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়: সেটা আমার পক্ষে ভারি কাজে লাগিয়াছিল। ......একদিকে বিশ্ব-সাহিত্যের রসভাণ্ডারে প্রবেশ ও অন্যদিকে নিজের শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস—এই দুই বিষয়েই তাঁহার বন্ধুত্ব আমার যৌবনের আরম্ভকালেই যে কত উপকার করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাঁহার আনন্দের দ্বারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে। এই সুযোগটি যদি না পাইতাম তবে সেই প্রথম বয়সের চাষ-আবাদে বর্ষা নামিত না এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত তাহা বলা শক্ত।"

এই সুযোগ সে কালে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আরও অনেক সাহিত্যিক লাভ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মথুর সেন গার্ডেন লেনে প্রিয়নাথবাবুর বাড়ী তখন সাহিত্যিকদের কাছে তীর্থক্ষেত্র ছিল। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি বিখ্যাত সাহিত্যিক সে তীর্থের নিত্যযাত্রী ছিলেন। যে কোনও ভাল সাহিত্যই ছিল প্রিয়নাথের জীবনে আনন্দস্বরূপ। সাহিত্য পাঠ ও আলোচনা, নিত্যনতুন রসের অন্বেষণ ও অনুশীলন তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি সাহিত্য ও সাহিত্যিক সৃষ্টির আনন্দে বিভোর থাকতেন।

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ কোনও নতুন রচনা লিখলেই তা প্রিয়নাথকে শোনাবার জন্যে অধীর হয়ে উঠতেন। "স্বপ্নপ্রয়াণ" প্রকাশের পর দ্বিজেন্দ্রনাথ একখানি পত্রে প্রিয়নাথকে লিখলেন,—

"প্রিয় বন্ধু,

আমার সাধের 'স্বপ্নপ্রয়াণ'টিকে তোমার ক্রোড়ে সঁপিয়া দিয়া আমি নিশ্চিন্ত। সমালোচনার কিরূপে গোড়া ফাঁদিয়াছ—আমার বড় দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। ধীরে সুস্থে যেমন চলচে চলুক; তুমি যখন আমার মানসপুত্রীটিকে সভারঞ্জন বেশে সাজাইয়া গুজাইয়া আসরে নাবাইবে—তখন দর্শকমণ্ডলীর আনন্দ কলরোল আমার শ্রবণে সুধাবর্ষণ করিবে—এই আশায় আমি কৌতূহলের বেগ সম্বরণ করিয়া দিন গুণিতেছি—Green Room-এ উঁকি দিয়া তোমাকে অপ্রস্তুত করিব না।

তোমার চিরানুরক্ত
চাতক-দ্বিজ"

দ্বিজেন্দ্রনাথ রচিত 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের সমালোচনা লেখেন প্রিয়নাথ সেন। এই সমালোচনা পাঠ করলে বোঝা যায় কাব্য বিশ্লেষণে তাঁর কি অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। সমালোচনার এক স্থানে প্রিয়নাথ লিখেছেন, "...সত্যের সঙ্গে সৌন্দর্যকে গ্রথিত করিয়া কবি কাব্যকে অশেষ এবং অসীমের দিকে প্রসারিত করিয়াছেন।......কবি সুনিপুণ চারণ বৈজ্ঞানিকের মত মানব হৃদয়কে বিশ্লেষণ করিয়া মানবজীবনের ক্ষেত্রের জটিলতা ও উচ্চতার গভীরতা দেখাইয়াছেন। বাস্তব জীবনের উপর—উদার অ-সীমাবদ্ধ সত্যের উপর এই কাব্যের ভিত্তি স্থাপিত। জীবনে যেমন ঠিক ঘটে তাহাই ঠিক বর্ণিত হইয়াছে—এবং সকলের উপর উজ্জ্বল কল্পনার উন্মাদিনী জ্যোৎস্না বর্ষিত। সেই কল্পনা তুলনারহিত ভাষায় ইন্দ্রধনুর ন্যায় বহুবিধ বর্ণে, শ্রুতিমধুর ছন্দে ও বিচিত্র শব্দ যোজনায় প্রকাশ পাইয়াছে।"

এই ধরণের উৎসাহব্যঞ্জক সমালোচনায় দ্বিজেন্দ্রনাথ, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত প্রেরণা লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য জীবনে প্রিয়নাথকে একমাত্র বন্ধু, সঙ্গী ও উপদেষ্টারূপে পরিগণিত করেছিলেন। কারণ রবীন্দ্রনাথ বেশ ভালভাবেই জেনেছিলেন প্রিয়নাথ সেন কাব্য ও সাহিত্যের একজন যথার্থ গুণগ্রাহী। কাব্যের সর্বপ্রধান গুণ যে তার রস, এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্য-কাব্যের সমালোচনায় ইহার যথার্থ উপলব্ধি করা যায়।

১৩১৬ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের লেখা এই 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্য-কাব্যটি নিয়ে সে যুগে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিকূল সমালোচনার একটা ঢেউ ওঠে। এই বিরুদ্ধ সমালোচকদের মধ্যে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ই ছিলেন প্রধান। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্যে'

(শেষাংশ ২৭৯ পৃষ্ঠায়)

কবিবর রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথকে 'গোড়ায় গলদ' প্রহসন পড়িয়া শুনাইতেছেন।

* স্মৃতি চিত্রণ *

শ্রীসজনীকান্ত দাস

[শ্রীপরিমল গোস্বামীর সদ্য প্রকাশিত আত্মকথার [illegible] নামটি আত্মসাৎ করিলাম এই ভরসায় যে, তিনি অনুজের অনাচার উপেক্ষা করিবেন।—লেখক।]

মেঘলা দিনে হঠাৎ আমার হালকা হতে মন
উল্টো স্রোতের উজান ঠেলে তোমায় খুঁজে মরি,
সুমুখ পানে চেয়ে দেখি—কঠিন আবরণ;
নিচে ডেলুজে জলের ঘায়ে ডুবল অনেক তরী।

কবে সে কোন্ প্রভাত বেলায় হাতটি তোমার ধরি
শীর্ণতোয়া গিরি-নদী হয়েছিলাম পার—
সেই তোমাকেই আজ অবেলায়
কেনই স্মরণ করি?

অতীত এসে দাঁড়ায় রুধে ভবিষ্যতের দ্বার।
আপন হাতে গেঁথেছিলে কুর্চি ফুলের মালা,
আদর করে আমার গলায় পরিয়েছিলে তাই—
বললে, "আমি দিলাম,
এবার তোমার দেওয়ার পালা,"
খতিয়ে হিসাব আজ দেখি যে
দেওয়া তো হয় নাই।

মনের মাঝে খুঁজে মরি তোমার ঠিকানা যে,
দেউলে হয়ে ভাবি এবার শুধতে হবে ঋণ—
বহু যুগের পরে বুকে তোমার দাবী বাজে,
তুমি কোথায় লুকিয়ে আছ কোন্ দিগন্তে লীন!
মেঘ ছাওয়া আকাশে আজ হঠাৎ দেখি চেয়ে
উঠল ভেসে শূন্য নীলে একটি ছোট মেয়ে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের ছুটি কাটে ঘন জামের বনে
ফলের ভারে আমার ভরে নুইয়ে পড়ে ডাল,
তুমি এসে জুটলে সেথা বিনা নিমন্ত্রণে,
মধ্যদিনের খরতাপে রাঙা তোমার গাল।

দুষ্টু ছেলের চড়ে আঁচল গাছ কোমরে বেঁধে
ছোট্ট দুটি হাত বাড়িয়ে বললে, "তুলে নাও।"
রাঙা গালের 'পরে পাকা জামের ঘায়ে, কেঁদে
বিষম রাগে গরগরিয়ে ফিরেই তুমি যাও।

চেয়ে চেয়ে বোকার মতো গেলাম গুটি গুটি
ভয়ে ভাবি, চোখের জলে তোমার নালিশ শুনে
কি শাস্তি যে দেবেন বাবা ধ'রে চুলের মুঠি
মা বলবেন, "দস্যি ছেলে সর্বনেশে খুনে।"
জানলা দিয়ে দেখি তুমি সাজিয়ে পুতুল বসে
আপন মনেই কেঁদে কেঁদে ফেলছ চোখের জল,
নিঝুম বাড়ি, গাছের পাতা পড়ছে খসে খসে
করছে বিরাজ সারা পাড়ায় শান্তি অবিচল।

যে মনটি মোর উঠেছিল কৃতজ্ঞতায় ছেয়ে
আজকে সে মন ফিরে পেলাম,
ওগো পাড়ার মেয়ে।

সেদিন ছিল কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোর রাত
শিউলি হেনার গন্ধে ছিল বাতাস ভরপুর,
পাড়ায় ঘুরি যে ঘরে যাই সাজিয়ে কলাপাত
সামনে ধরে চন্দ্রপুলি তিলকুটো খৈচুর।

ভর্তি পেটে যায় না খাওয়া, কোঁচড় গেল ভ'রে,
বাড়ি বাড়ি ঘুরে ক্রমে ভারী যে সম্ভার;
রাত্রি গভীর। বললে তুমি, "ফিরব কেমন ক'রে
জাদুড়ীদের বাগানখানা না যদি হই পার?"
বেহ্মদত্যির ভয় আমারো, তবু বীরের মতো
হিড়হিড়িয়ে টেনে তোমায় আসতে পুকুর পাড়ে
কি যে হল, হঠাৎ ভয়ে হলাম মূর্ছাহত—
কোঁচড় হতে ধুলোয় ফেলে সঞ্চিত সম্ভারে।
জ্ঞান ফিরতেই দেখি, তুমি বসে আমার কাছে
সাহস দিয়ে বলছ, "ওঠ, ভয় কি আমি আছি।

পড়ে গেছে আপদ গেছে, আমারটা তো আছে—
আপদ বালাই পালায় দুজন থাকলে কাছাকাছি।"
মোয়ার মায়া ভুলে গেলাম তোমার ছোঁয়া পেয়ে,
ভূতের ভয়ে মরি যে আজ, কোথায় তুমি মেয়ে?

বিকেল বেলায় ঘুড়ি ওড়াই দাঁড়িয়ে ন্যাড়া ছাদে,
পায়ের নীচে মন ছিল না, আকাশ পানে চেয়ে;
তুমি কখন এলে সেথায় মুড়ির থালা হাতে
ঘুড়ির কাছে মুড়ির টান—হায়রে বোকা মেয়ে!

প্যাঁচ লাগিয়ে ছাড়তে সুতো বেহুঁস হয়ে যবে
আলিসাহীন ছাতের শেষে বাড়িয়েছিলাম পা,
পড়তে তোমার হাতের থালা ঝন্ ঝন্ ঝন্ রবে
ফিরে তাকাই সমুখে বিপদ শিউরে ওঠে গা।

পাশের পাড়া থেকে তোমার বর এল ছোট;
নিমন্ত্রিত ছিলে, অনেক ভুগে রইল জোড়া নাম।
"খোঁড়া মেয়েই বৌ হবে মোর" বুড়ো জেঠার চোট
দিলেন কথা মাতা, দেবেন ছেলের প্রাণের দাম।

তোমার মনের কথা সেদিন পাইনি আমি টের,
আমার লোভী মনের ছিল অন্য অনেক আশা—
মায়ের কথা কথাই শুধু টানেনি তার জের
প্রতিবেশীর পরিচয়েই নকল ভালবাসা।
সেটুকুও টেকেনা চড়ায় কালের স্রোত বেয়ে,
সেই হারান কাহিনী মোর "এক যে ছিল মেয়ে।"

বদলি হলেন বাবা, স্টীমার কাঁপল নদীর জলে,
মুহুর্মুহু আকাশ চিরে বাজল বিদায় বাঁশি;
খালাসীদের গান হল শেষ নোঙর তোলার তালে,
একটু পরেই কাটবে তরী দড়াদড়ির ফাঁসি।

তোমরা ছিলে দাঁড়িয়ে পাড়ে, অবাক হয়ে দেখি
খোঁড়া পায়েই দৌড়ে তুমি উঠলে পাটাতনে
হৈহৈ রব উঠল, সবাই বলল, "পাগল এ কি?"
লজ্জা ভয়ে থমকে তুমি দাঁড়ালে এক কোণে।
ছুটে যেতেই আমি, তুমি বাড়িয়ে দিয়ে হাত
বললে, "আছে পুটুলিতে মুড়ি-চিঁড়ের মোয়া,
ভাল তুমি বাস খেতে, তাইতো জেগে রাত
মা করেছেন।" বাড়িয়ে হাত পেলাম
হাতের ছোঁয়া।

ততক্ষণে খালাসীরা মার-মূর্তি হয়ে
আসতে তেড়ে নামলে ছুটে সিঁড়ির দড়ি ধ'রে।
ছাড়ল জাহাজ কলের, পরে কালের জাহাজ ব'য়ে
তফাৎ হ'ল দুগাছি খড়—দূরেই গেল স'রে।

মেঘলা সাঁঝে কি হ'ল আজ, প্রভাতী গান গেয়ে
তোমায় শুধু শোনাতে চাই, শুনবে তুমি মেয়ে?

বাণীর সভা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

দেবী, তোমার সভায় আমার ঠাঁই নাই
সেথায় যাবার নিমন্ত্রণও পাই নাই
সেথায় আছেন জ্ঞানী গুণী
মনীষী আর ঋষি মুনি
তাঁদের ভয়ে ওদিক পানে যাই নাই
জানি তোমার সভায় আমার ঠাঁই নাই।

বীণাপাণির পুরে যাঁরা বরিষ্ঠ
অভ্রভেদী কণ্ঠ তাঁদের গরিষ্ঠ
সবাই শোনে তাঁদের কথা
নয়তো চপল বাচালতা
বাণী তাঁদের সঞ্জীবনী অরিষ্ট
বীণাপাণির পুরে যাঁরা বরিষ্ঠ।

আমার কথা কেউ না শোনে হায়রে
কণ্ঠে আমার জোর যে তেমন নাইরে
কণ্ঠ শুধু হালকা অতি
ছন্দ-বাঁধন আলগা অতি
অবজ্ঞা শুধু পাই যে ঘরে বাইরে
আমার কথা কেউ শোনে না হায়রে।

কিন্তু দেবি, শুধু তোমায় চাই যে
তুমি ছাড়া গতি আমার নাই যে
কণ্ঠে আমার গান জাগে না
শুধু যে মন মানে না
ভাঙা গলায় বেসুরো গান গাই যে
দেবি শুধু তোমায় আমি চাই যে।

দেবি, তোমার সভায় যাওয়া হয় নাই
নাইবা হল, মনে আমার ভয় নাই
লুকিয়ে কখন আমার ঘরে
আসবে তুমি ক্ষণেক তরে
সেই আশাতে ঘুম যে চোখে রয় নাই
যদিও মোর সভায় যাওয়া হয় নাই।

আমার ঘরে আসবে তুমি একলাই
বলব আমি—'বস, দেবি, গান গাই।'
গান শুনে মা বলবে হেসে—
'সুর কোথা রে সর্বনেশে?
ছিটিফোঁটা ছাড়া গলা যে তো বাজখাঁই
তবু আমি শুনব এ গান একলাই।'

আমি তখন বলব—'মা গো, তাই তো
সত্যি আমার গলাতে সুর নাই তো।
কিন্তু তাতে কী আসে যায়
মনের কথা বলব তোমায়
এইটুকু মা তোমার কাছে চাই তো
শুনবে তুমি—স্বর্গ আমার তাই তো।'

অলংকার, না
এস. সি. সরকার এণ্ড কোং
স্বর্ণশিল্পী ও মণিকার
১২৫ বি, বহুবাজার ষ্ট্রীট • কলিকাতা ১২
শাখা ১৬৭ বি, বহুবাজার ষ্ট্রীট • কলিকাতা ১২
ফোন ৩৪ ২৪৫৩
সার্থক সঙ্গীত.
আর রূপের আবেদন
সার্থক আমাদের
তৈরী অলঙ্কারের
অনুপম
শিল্প-সুষমায়।

মুখের
সৌন্দর্য্যে
বৃদ্ধি করে
Rerakashmir
রেকোকাশ্মীর
ফেস পাউডার
বিভিন্ন রকম হালকা
রংয়ের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়
রেভা কেমিক্যাল • কলিকাতা-১

ভক্তকবি মধুসূদনের পত্র

(মধুসূদনের জ্যেষ্ঠ জামাতা বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও জ্যেষ্ঠা কন্যা বাসন্তী দেবীকে লিখিত)

ও

কটক ২৪-৬-৮৮
রবিবার

মা আমার,

কোথায় আছিস? এ চক্ষু তোকে দেখিবার জন্য মুহুর্মুহু গৃহের চতুর্দিকে তাকাইতেছে। কিন্তু তোকে খুঁজিতেছি বলিয়া কাহাকেও বলিতে পারিতেছি না। এ কণ্ঠ সর্বদাই তোকে ডাকিতে চাহিতেছে, তবুও লোকে পাগল বলিবে বলিয়া ডাকিতে পারিতেছি না। তুমি কি আমার কাছে নাই মা, এ কেমন মোহ, এ কেমন ভ্রান্তি, এরূপ কেন মনে করিব? প্রাণের ধন আমার, হৃদয় বৃন্তের প্রথম ফুলটি আমার! তুই আমার কাছে নাই ইহা কখনই হইতে পারে না। প্রভু তোকে আমার প্রাণের ভিতর রাখিয়া দিয়াছেন। এখন হইতে প্রভুর পদতলে বসিয়া তোকে সেইখানে দেখিতে শিক্ষা করিব। এই আমার সান্ত্বনা, তুই কি দেখা না দিয়া থাকিতে পারিবি?

মা সেদিন তোর হস্তে অন্ন খাইবার সময় আমি কি অমৃত আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম, তুই কি তাহা জানিস? এমন অমৃত যেন পূর্বে কখনও খাই নাই। শৈশবে মায়ের হাতের অন্ন খাইয়া থাকিব, কিন্তু সে কথা কিছুমাত্র মনে নাই। তোর স্নেহ হস্তের অমৃত গ্রাস আর কবে পাইব?

* * *

তোর মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিস। সে গতকল্য কাঁদিতে কাঁদিতে তোকে কয়েক ছত্র লিখিয়াছে। পরশু রাত্রে আমি পৌঁছিবামাত্র কত কাঁদিল। তোর কাকী যাওয়ার পূর্বে তুই মা ও কাকীর কাছে বেশিক্ষণ বসিতে পারিলি না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। কুসন্ত, সরস্বতী, কৃষ্ণা, শান্তি তোর কাছে যাইতে চাহিতেছে। প্রশান্ত "দিদি গাড়ী" এই কথা শিখিয়া রাখিয়াছে। বোধ হয় সে তোকে শীঘ্র ভুলিয়া যাইবে।

"নির্জন বাস আমার অভ্যস্ত হইয়া আসিতেছে" তোর এই কথাগুলি পড়িয়া প্রাণ অত্যন্ত আকুল হইল। যাঁর আবির্ভাবে নির্জন সজন হয় তাঁহাকে সর্বদা স্মরণ করিয়া প্রফুল্ল থাকিবি।

যাঁর হাতে তোকে দিয়াছি, তিনি তোমাকে খুব ভালবাসেন ইহা বুঝিতে পারিয়াছি। তোমাদের সেদিনের প্রার্থনা শুনিয়া আমার দুঃখ ভয় ঘুচিয়া গিয়াছে। তোমরা তাঁর কোলে সুখে শান্তিতে থাকিবে। *

প্রার্থনার সময় আমাদিগকে স্মরণ করিবে।

তোর পাগলা বাবা

উড়িষ্যার ভক্তকবি মধুসূদন রাওয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা বাসন্তী দেবীকে (বিজয়চন্দ্র মজুমদারের পত্নী) লিখিত পত্র

কটক ১১-১০-৮৮
সপ্তমী, সায়ংকাল।

মা আমার,

তুই এখন বাঙ্গালী। বাঙ্গালার মহোৎসব দুর্গাপূজা আসিয়াছে। হিমালয়-কন্যা দুর্গা পিতৃগৃহে আসিয়াছেন। এই কল্পিত কথা অবলম্বন করিয়া আজ বঙ্গদেশের প্রতি গৃহ আনন্দে ভাসিতেছে। এই উৎসবের ভিতরে কি মধুর ভাব কি স্বর্গীয় ভাব রহিয়াছে। তাহা এখন তোকে বিদায় দিয়া বুঝিতে পারিতেছি। তুই আমার মা দুর্গা হইয়া কবে তোর পিতৃ-গৃহ আলো করিবি? কবে আমার প্রাণের দুর্গোৎসব হইবে? ধন্য বাঙ্গালীদের কোমল হৃদয়। তাঁহাদিগের এই মধুর দুর্গোৎসবের ভাব অনুভব করিলে বাঙ্গালী হইতে ইচ্ছা হয়।

কল্য আমরা ঈশ্বরের মাতৃস্বরূপের পূজা করিয়াছিলাম। চন্দ্রবাবু ও তাঁহার স্ত্রী সেই উপলক্ষে আসিয়াছিলেন। উপাসনায় প্রাণ অত্যন্ত বিগলিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিলে সব দুঃখ ভয় দূর হইয়া যায়।

বিশ্বজননী তোমাদিগকে তাঁহার প্রেম-ক্রোড়ে রক্ষা করুন।

মধুসূদন।

জন্মদিনের জন্য একখানি সাড়ী আজ পাঠাইলাম। আশা করি তাহা যথাসময়ে পৌঁছিতে পারিবে।

দয়াময় তোমাদিগকে নিরন্তর রক্ষা করুন।

শ্রীমধুসূদন।

জ্যেষ্ঠ জামাতা বিজয়চন্দ্র মজুমদারকে লিখিত—

কটক ১০-১১-৯৪

প্রাণপ্রতিমেষু,

বাবা,

তোমার পত্র পাইয়াছি। আগামী রবিবার খুকীর নামকরণ হইবে জানিয়া সুখী হইলাম। নামকরণ উপলক্ষে এই সংগীতটি লিখিয়াছি।

হেরি নাই চর্মচক্ষে হেরেছি প্রেমনয়নে,
তোমার করুণার দান মাগো তব কন্যাধনে।
আধ আধ ভাষা তার, শুনেনি কর্ণ আমার
(তবে) কি শব্দে মা বেজে ওঠে প্রাণতন্ত্রী
তার চিন্তনে।
সে কোমল তনুখানি ধরি নাই বক্ষে আনি
কিন্তু মা জুড়ায় প্রাণ যেন তার পরশনে।
এ কি মা অদ্ভুত লীলা দুঃখীজনে দেখাইলা
ধন্য ধন্য প্রীতি তব এ তব ভবভবনে।
কত আশা পুষি প্রাণে, চাহি তব ক্রোড় পানে,
মাগিতেছি করজোড়ে আশঙ্কা ব্যাকুল মনে,
সে শিশুরে রাখ তোমার প্রেমক্রোড়ে অনিবার,
সে শিশু যে পরিবারে এসেছে আশীষাকারে
জাগায়ে রাখ মা সেথা পুণ্য সুনীতি যতনে।

* * *

মঙ্গলময় বিধাতা তোমাদিগকে সুমতি এবং কল্যাণ প্রদান করুন।

শ্রীমধুসূদন।

বাসন্তী দেবীর প্রথম সন্তান (কন্যার) এক বৎসর চারি মাস বয়সে মৃত্যু হয়। তৎপরে একটি পুত্র সন্তানের সূতিকাগৃহেই মৃত্যু হয়। এই দুইটি সন্তানের জন্ম ও মৃত্যু কটকেই হইয়াছিল। বোধ হয় বৎসরখানিক পরে বিজয়-বাবু সম্বলপুরে যান। সেখানে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কন্যা সুনীতির জন্ম হয়। এই কন্যাটিকে বহুদিন পর্যন্ত মাতুল পরিবারের কেহ দেখিবার সুযোগ পান নাই। ইহারই নাম-করণ উপলক্ষে উপরোক্ত সঙ্গীতটি মধুসূদন রচনা করিয়াছিলেন। সুনীতি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের দৌহিত্র ডাক্তার বিজলী-বিহারী সরকারের পত্নী।

কটক
২।৬।০৪

মা আমার,

দেখিতে দেখিতে তোমার ৩০ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়া গেল। জুন মাসের ৫ই তারিখে তোমার জন্মদিন। ১৮৭৪ সালের ৫ই জুন আমার স্মৃতিপটে বিরাজিত থাকিবে। সেই-দিনই বিধাতা তোমাকে দিয়া আমাকে প্রথম পিতৃত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথম সন্তানের মুখদর্শনে কি যে অনির্বচনীয় ভাব মনে উদিত হইয়াছিল, তাহা কেবল অন্তর্যামীই জানেন। সেদিন জগৎ কেমন নূতন লাগিয়াছিল, তোমার মার কোলে তোমার ক্ষুদ্র শরীরখানির প্রতি অতৃপ্ত নয়নে কেবল তাকাইয়াছিলাম। কত কি আশা, কত কি ভাবনা, ভয় মনে জাগিয়াছিল, সেই সব কথা এখন কিয়ৎপরিমাণে স্মরণ করিতেছি। জগতে প্রত্যেক ঘটনাই রহস্যে পরিপূর্ণ বিশেষতঃ মানব গৃহে শিশুর জন্ম এক মহা রহস্য। তুমি মা হইয়া সে রহস্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কখনও কি বিধাতার দিকে বিস্ময়-স্তব্ধ হৃদয়ে তাকাও নাই? মা হওয়া, বাপ হওয়া কি অদ্ভুত ব্যাপার!

এ বৎসর তোমার জন্মদিনে তোমাকে দেখিতে পাইব না, আর কোন জন্মদিনে দেখিতে পাইব কিনা তাহাও জানিনা। কিন্তু তোমার জন্মদিনে আমরা উপাসনা করিব, তুমিও করিবে। তোমার জন্মদিনের জন্য একখানি সাড়ী আজ পাঠাইলাম, আশা করি তাহা যথাসময়ে পৌঁছিতে পারিবে।

দিদিমণি সুনীতির পত্র পাইয়া খুব খুসী হইয়াছি। তাহার অক্ষর অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়াছে এবং আমার হুকুম অনুসারে সে দুই পৃষ্ঠা লিখিয়াছে। আমি তাহার উত্তর আগামী কাল দিতে চেষ্টা করিব।

দয়াময় তোমাদিগকে নিরন্তর রক্ষা করুন।

শ্রীমধুসূদন

---

* মধুসূদনের প্রথমা কন্যা বাসন্তী দেবীর বিবাহ ৬ই জুন ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কটকে হয়। তৎপর তিনি স্বামীর কর্মস্থল পুরীতে যান। এ পত্র বাসন্তী দেবীর পুরী গমনের অব্যবহিত পরেই লিখিত।

(অবন্তী দেবীর সৌজন্যে)

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

পুরানো পোড়ো বাড়ীর দোতলার হল ঘরটি বেশ বড়। কড়িকাঠ, দেয়ালের নি প্রভৃতি দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় লে সৌখীন লোকের বাড়ী ছিল। কিন্তু : কাল আগের কথা। এখন পুরাতন ;ৃতির অগোচর। ছাদে কালিঝুলি ও জাল। দেয়ালের অনেক স্থানে টিয়া ইঁটের সারি দাঁত বাহির করিয়া দরজা জানলাগুলো আস্ত থাকিলেও র ডাকাতের ধাক্কা সহিবে না।

র চারদিক ঘিরিয়া বারান্দা। চার-জা ও জানলা, জানলার সংখ্যা অধিক। জা জানলা সব খোলা। পিছনের জানলার ফাঁকে একটা বেলগাছের দেখা যাইতেছে। এক নজরে দেখিলেই নাবাড়ী বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

নয়টা। তিথি অমাবস্যা। বাহিরের ক গাঢ়তর করিয়াছে মেঘের চাপ।

র মেঝেতে খানকতক সতরঞ্চ গোটাকয়েক তাকিয়া ছড়াইয়া দিয়া লোকের রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করা সেই সঙ্গে আছে গোটা দুই লণ্ঠন। লোতে ঘরটা সবটা প্রকট হয় না, তবে ইবার মতো আলো হইয়া খানিকটা জ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

এক কোণে একজন যুবক স্টোভে তৈ করিতেছে। আর চার পাঁচজন কেহ বা সতরঞ্চিতে উপবিষ্ট, কেহ বা দিক ঘুরিয়া দেখিতেছে।

আছে দুইজন বর্ষীয়ান পুরুষ। বয়স চল্লিশের উপর, আর একজনের নীচে নয়। তাঁহারা মুখোমুখী পাশে এক গাদা বই। একটু ঠাহর খিলে লক্ষ্য হইবে বিছানার উপর ই টর্চ বাতি, একটি টাইমপিস ও একটা ঘরের যে কোণে চা তৈয়ারি হইতেছে দেয়ালে ঠেস দেওয়ানো খানকতক পাকা লাঠি। সব লওয়াজিমা দেখিলে মনে উপায় নাই যে, সমস্ত ব্যাপারটাই একটা র। কিন্তু কিসের আশঙ্কা, চোর না আর কিছু?

শ বছরের লোকটি রামবাবু। পঞ্চাশ লোকটি মোতিবাবু। যুবকদের নাম মোদ, পাঁচু, অন্তা ও শেখর।

বাবু—কি হে, তোমাদের চা হ'ল? ।

তবাবু—এই চায়ের ব্যবস্থাটা রেখে খুব রেছেন। ওতে ঘুম ভাঙিয়ে রাখে।

বাবু—শুধু তাই! বলেছি প্রহরে দুধের মাত্রা কমিয়ে চা ক্রমে কড়া ক'রে

মোতিবাবু—সেটাও মন্দ পরামর্শ নয়।

রামবাবু—আর তাছাড়া নস্যি আছে, আছে এতগুলো বই। ঘুমকে আজ কিছুতেই কাছে ঘেঁসতে দিচ্ছিনে।

মোতিবাবু—যাক অন্ততঃ এই পরামর্শটি যে গ্রহণ করেছেন সেজন্য ধন্যবাদ। কিন্তু না আসলেই ভালো করতেন, বিশেষ এই কচি ছেলেদের নিয়ে।

অন্তা—কচিছেলে বলছেন কাদের? সেকালে হ'লে এতদিন আমরা গ্র্যান্ড-ফাদার হ'য়ে যেতাম।

মোতিবাবু—যার জন্যে বলছি সে হচ্ছে গ্র্যান্ড-ফাদারের ফাদার। হ্যাঁ রামবাবু, ছেলে-গুলোকে সব কথা খুলে বলে নিয়ে এসেছেন তো? শেষে না আবার ওদের বাপ-মায়ের কাছে জবাবদিহিতে পড়েন।

রামবাবু—এরা সব পাড়ার সেবা সমিতির সদস্য।

অন্তা—রামদা, খাটো করবেন না আমাদের, আমরা সেবা সমিতির কার্যকরী সমিতির সদস্য, রামদা সভাপতি, নবীন সহকারী সভাপতি। ও এবার অনার্স মিস ক'রে ডিস্টিংশন পেয়েছে।

নবীন—অন্তা চুপ করতো সেজো বকিসনে।

পাঁচু—এই নিন সব চা, রামদা আপনি এই পেয়ালা, মোতিবাবু আপনার এই পেয়ালা, এতে চিনি কম।

মোতিবাবু—আঃ ঠাণ্ডার মধ্যে চা-টি বেশ জমলো।

রামবাবু—এ কি করেছ পাঁচু, এ যে দুধ ঢেলে দিয়েছ।

পাঁচু—আপনার প্রেস্‌ক্রিপশন মতো দিয়েছি, প্রথম প্রহরে তিন চামচ, দ্বিতীয় প্রহরে দু-চামচ তৃতীয় প্রহরে এক চামচ, শেষ প্রহরে বিনা দুধে।

মোতিবাবু—এতগুলো লাঠি এনেছেন কেন?

অন্তা—শুধু কি লাঠি? এই দেখুন! (পিস্তলটা দেখাইল)। আর ও ছাড়া এই দেখুন হাতেরগুলি। স্যাণ্ডো কির সার। যাবেন একদিন আমাদের সেবা সমিতির ব্যায়ামাগারে। অতগুলো যুবককে একত্র ব্যায়াম করতে দেখলেও পুরানো ডিসপেপসিয়া সেরে যায়।

নবীন—অন্তা ফের। চুপ কর বলছি।

অন্তা—তার আগে বলো তোমার এ আদেশ সহকারী সভাপতির, না তোমার ব্যক্তিগত।

মোতিবাবু—বাবা অন্তা, লাঠি পিস্তল হাতের গুলিতে কি করবে বাবা! এখানে যে মহাপুরুষের বাস তিনি ওসবের অনেক উর্দ্ধে। ও-সব অনেক ক'রে দেখেছি কিছুতে কিছু হয়নি। তারপরে রোজা দৈবজ্ঞ শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কি না ক'রেছি। উনি এখান থেকে নড়বেন না। এত বড় বাড়ীটা অব্যবহারে খসে খসে পড়ছে। আজ এবাড়ীটা ভাড়া দিতে পারলে আমার টাকা খায় কে?

রামবাবু—আপনি নিজের চোখে দেখেছেন?

মোতিবাবু—না।

রামবাবু—কেন?

মোতিবাবু—সত্যি কথা বলতে কি সাহস হয়নি।

রামবাবু—আমিও সত্যিকথা বলি শুনুন, রোজা দৈবজ্ঞ তান্ত্রিক আপনাকে ঠকিয়েছে।

মোতিবাবু—তাদের লাভ?

রামবাবু—বারে বারে এসে ঐ উপলক্ষে টাকা নিয়ে যাবে।

মোতিবাবু—আর তো ডাকিনে।

রামবাবু—ইতিপূর্বে কতবার ডেকেছেন। শুনুন মোতিবাবু, জীবনে আমি এমন পঞ্চাশ-ষাটটা ভূতের বাড়ী, হানাবাড়ী, খানাবাড়ী দেখেছি, সারা রাত্রি যাপন করেছি। ভূত প্রেত দূরের কথা চামচিকে বাদুড়ও সর্বত্র দেখতে পাইনি।

মোতিবাবু—কেন?

রামবাবু—কেন কি! যা নেই তা দেখা যায় না।

মোতিবাবু—ছিঃ ছিঃ ওদের অস্বীকার করতে নেই। বলুন যে ওঁরা আপনাকে অনুগ্রহ করেন নি।

রামবাবু—আপনার বাড়ীটাতে যদি তাঁরা অনুগ্রহ করে থাকেন তবে দুঃখ করছেন কেন?

মোতিবাবু—দুঃখ আর কি! তবে বাড়ীটা পেলে সুবিধে হ'তো।

রামবাবু—তবে এবার পাবেন। অনেক দিন থেকে ছেলেরা এই বাড়ীটার কথা বলছে বলছে রামদা, চলুন মোতিবাবুর হানাবাড়ীতে এক রাত থেকে প্রমাণ করে দিই যে, সব বোগাস। আমি কান দিইনে। তারপরে সেদিন বাজারের মধ্যে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আপনার মুখে সব শুনলাম।

মোতিবাবু—আপনারা দয়া করে এসেছেন সুখের কথা। কিন্তু যদি আপনাদের কোন ক্ষতি হয়।

রামবাবু—তাহ'লে প্রমাণ হবে যে, ভূতপ্রেত বলে কিছু আছে।

মোতিবাবু—এখনো কি অবিশ্বাসের কারণ আছে?

রামবাবু—অন্ততঃ বিশ্বাসের কারণ এখনো ঘটেনি।

নবীন—আচ্ছা মোতিবাবু, সব রাতেই কি দেখতে পাওয়া যায়?

মোতিবাবু—নিজে তো দেখিনি বাবা, তবে শুনেছি শনিবার অমাবস্যা পড়লে দেখতে পাওয়া যাবেই।

রামবাবু—সেই জন্যেই আজ বেছে বেছে এসেছি, শনিবার অমাবস্যা।

অন্তা—তার উপরে দিকশূল, দক্ষিণে যোগিনী।

নবীন—আচ্ছা এ বাড়ীতে যা আছে তা কি? ভূত না প্রেত না আর কিছু।

মোতিবাবু—ও সবের অনেক উপরে বাবা, অনেক উপরে।

নবীন—খুলেই বলুন না কি?

মোতিবাবু এদিক-ওদিক দেখিয়া চট করিয়া বলিয়া ফেলিলেন।

মোতিবাবু—ব্রহ্মদৈত্য।

তার পরেই বলিয়া উঠিলেন,
রাম, রাম রাম, রাম,

অতঃপর গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন।

নবীন—দেখেছেন?

মোতিবাবু—দেখিনি, শুনেছি।

(উদ্দেশে প্রণাম করিলেন)

রামবাবু—তবে এমন বাড়ী কিনতে গেলেন কেন?

মোতিবাবু—জলের দর দেখে কিনে এখন চোখের জল ফেলছি।

নবীন—তাড়াবার চেষ্টা করেন নি কেন?

মোতিবাবু জিভ কাটিয়া

তাড়াবো কাকে—উনি যে মহাপুরুষ।

তার পরে ঈষৎ থামিয়া পুনরায়

মোতিবাবু—ঐ যে বললাম চেষ্টা কম করিনি। উনমাদ কুক্কুরকে শান্তিস্বস্ত্যয়ন কী না করেছি।

নবীন—তবু, শান্তি কি করেছেন?

অন্তা—ভয় করছে বুঝি নবীনবাবু?

নবীন—অন্তা চুপ কর। বলুন মোতিবাবু!

মোতিবাবু—বাড়ীটা কিনবার পরে যখন টের পেলাম যে, মহাপুরুষের বাস এখানে তখন বারাকপুর থেকে আলৌকিক আনন্দ বাবাকে আনালাম। তিনদিন তিন রাত্রি যাগযজ্ঞ করলেন তিনি এই বাড়ীতে।

নবীন—তারপরে?

মোতিবাবু—তারপরে আর কি, চতুর্থ রাত্রে মহানন্দ ঠাকুর গলা দিয়ে রক্ত উঠে মারা গেলেন।

অন্তা—আর মহাপুরুষ?

মোতিবাবু—যেমন ছিলেন তেমনি রইলেন। তারপরে লোকে পরামর্শ দিল রিষড়ের নুরু মিঞাকে আনো—অতবড় রোজা এ অঞ্চলে নেই। নুরু মিঞা যথাসাধ্য করলো, মহাপুরুষের কিছুই হল না। মাথা থেকে নুরু মিঞা পাগল হয়ে গেল। এখন রোজাগিরি ছেড়ে দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সেদিন দেখলাম লোকটাকে চড়কডাঙ্গার মোড়ে।

নবীন—আর কিছু করেন নি বুঝি?

মোতিবাবু—যুদ্ধের সময়ে এক গোরা সেনা খালিবাড়ী দেখে একটা মেয়েকে টেনে নিয়ে ঢুকেছিল। কিন্তু মুহূর্ত পরেই আবোল-তাবোল বকতে বকতে ছুটে বেরিয়ে এল।

অন্তা—কি বকছিল কিছু শুনেছেন?

মোতিবাবু—More terrible than Hitler, সে নাকি কি দেখেছিল।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকাইয়া তিনি সচেতন হইয়া উঠিলেন, বলিলেন ঃ

মোতিবাবু—ঈস, সাড়ে দশটা বাজে। আর থাকা নয়। চললাম। রামবাবু ছেলেদের নিয়ে সাবধানে থাকবেন। আর যাই করুন ঘুমোবেন না, আর ঐ বেলগাছের দিকের জানলাটা খুলবেন না। ওখানেই ওঁ'র...

বাক্য শেষ না করিয়াই রাম, রাম জপ করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত।

শেখর—দাঁড়ান মোতিবাবু, আপনাকে একটু এগিয়ে দিই। (প্রস্থান)

অন্তা—রামদা, শেখর সরে পড়লো—আর ফিরছে না।

রামবাবু—যত্ত সব আষাঢ়ে গপ্প শুনিয়ে গেলেন।

প্রমোদ—তবু দরজা জানলাগুলো বন্ধ ক'রে দেওয়া ভালো।

অন্তা—আর ঐ বেলগাছের দিকের জানলাটা।

রামবাবু—পাঁচু ভাই আর এক দফা চা করো।

পাঁচু চা করিতে ও প্রমোদ, অন্তা দরজা বন্ধ করিতে লাগিল।

নবীন—আচ্ছা রামদা, আপনি তো অনেক ভূতের বাড়ীতে রাত কাটিয়েছেন। কখনো কিছু দেখেছেন?

রামবাবু—দেখেছি বই কি, কখনো একটা নেংটি ইঁদুর, কখনো চামচিকে, কখনো বা ঐ রকম আর কিছু।

সকলে আসিয়া রামবাবুর কাছে ঘনিষ্ঠ হইয়া বসিল।

নবীন—আর শ্মশানেও তো ঘুরেছেন অনেক।

রামবাবু—তা ঘুরেছি বই কি।

নবীন—কিছু?

রামবাবু—কিচ্ছু না, এমনকি নেংটি ইঁদুর চামচিকেও নয়।

নবীন—তবে যে লোকে বলে—

রামবাবু—লোকে তো বলে' যে বাসুকির ফণার উপরে পৃথিবীটা আছে।

অন্তা—এক কথায় বলুন ভূত আছে কি নেই।

রামবাবু—না নেই।

এমন সময়ে একটি দরজায় ধাক্কা পড়িল। সকলের মুখ শুকাইল।

নবীন—(মৃদুস্বরে)

রামদা! (দরজায় পুনরায় ধাক্কা।)

রামবাবু—দরজা খুলে দে না।

(দরজায় ধাক্কা)

নবীন—মোতিবাবু যে বন্ধ করতে বলে গেলেন।

রামবাবু—তাই বলে কি দরকার হলে খুলতে হবে না? ও, ভয় পেয়েছিস বুঝি? আচ্ছা আমি যাচ্ছি।

সকলে রামবাবুকে নিরস্ত করিতে উদ্যত

রামবাবু—বোঝা গেছে কার কত সাহস। তোদের সঙ্গে আসাই ভুল হয়েছে।

রামবাবু—উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিতেই শেখর প্রবেশ করিল।

রামবাবু—দেখলি তো ভূত! সংসারে সব ভূতই এই রকম রে।

অন্তা—মহাপুরুষ হয়তো শেখরের মূর্তি ধরে এসেছেন।

সকলে হাসিয়া উঠিল, পাঁচু চা সরবরাহ করিল, সকলের চা পান।

রামবাবু—নে তোরা সকলে শুয়ে পড়।

অন্তা—যদি ঘুমিয়ে পড়ি?

রামবাবু—ঘুমোবে বলেই তো লোকে শোয়।

অন্তা—কিন্তু মোতিবাবু যে নিষেধ করে গেলেন।

রামবাবু—ভূত আছে ধরে নিয়ে নিষেধ করলেন। ভূত যখন নেই, ঘুমোতে বাধা কি?

অন্তা—আছে কি নেই এখনো তো প্রমাণ হয়নি।

রামবাবু—নাঃ, তোদের সঙ্গে আর বাজে বকতে পারিনে।

নবীন—তুমি ঘুমোবে না রামদা?

রামবাবু—না আমি জেগে থাকবো।

নবীন—পারবে সারারাত জেগে থাকতে?

রামবাবু—এমন কত রাত জেগেছি।

পাঁচু—মাঝে মাঝে উঠে চা ক'রে দেবো?

রামবাবু—দরকার হবে নারে। এই দেখ এক গাদা বই এনেছি, বসে বসে পড়বো।

অন্তা—তবে তাই হোক রামদা, তুমি বই পড়ো, আমরা শুয়ে পড়ি।

নবীন—তারপরে ঘুমিয়ে পড়ি।

অন্তা—রামনামের ভরসাতেই ঘুমোলাম রামদা, দেখো, শেষটায় বেঘোরে না মারা পড়ি।

সকলে শুইয়া পড়িল আর অল্পক্ষণের মধ্যে নিদ্রায় অভিভূত হইল। রামবাবু লণ্ঠন সতেজ করিয়া দিয়া বইগুলো বাছিতে বাছিতে অবশেষে একখানা বই তুলিয়া লইয়া পড়িতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন—

রামবাবু—নাঃ, বড় ঘুম আসছে। জোরে পড়া যাক, বিশেষ জোরে না পড়লে কবিতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় না।

রামবাবুর কবিতা পাঠ। কবিতাটির নাম আষাঢ় সন্ধ্যা।

রামবাবু—শতক্রতু হবনিষ্ঠ আত্মীবক মৃত্যু
ত্রিমাত্রিক সংকেতশূন্য দূরেক্ষণ পিতৃ
যৌগিক সংযুক্ত সাম্য আবর্ত প্রচ্ছায়া
অনার্দ্র নবায় ক্ষার কুণ্ডলিত জায়া।
সম্প্রচার উপকণ্ঠ অপাংক্তেয় আর
অস্মাত নিরুদ্দেশিত সন্নিক অন্তার।

বাঃ বাঃ আষাঢ় সন্ধ্যার মেঘগম্ভীর ভাবটি কেমন প্রকাশ করেছে।

আচ্ছা এবারে দেখা যাক নিশীথ রাত্রি নামে কবিতায় কবি কি বলছেন—

অদ্বৈত ও দ্বৈত
এ দুজন বইতো
অনবদ্য বুদ্ধি
বসো রে সং
এসো বইসো
অনুকম্পা শুদ্ধি
Et tu Brute
চলচ্চিত্র কী
মন্তেন ঝিঙে
ডাকতে ফিঙে
ছিঃ
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের মেঘ
দুচারটে Peg
ওড়ে চটপট
Jeu de mots
অমৃতস্য পুত্রাঃ
গেল বলো কুত্রা
Dieu avec nous
কোকিল ডাকে কু।

বাঃ, বাঃ বাঃ! কি ডিকশন। এই জন্যেই বুঝি বলে যে বাংলা সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যে পরিণত হয়েছে। শুধু বাংলা ভাষায় জ্ঞান আর আধুনিক বাংলা সাহিত্য বোঝা সম্ভব নয়! তা না বোঝা যাক, কিন্তু শব্দের কি জাঁদরেল। প্রত্যেকটি শব্দ মধ্যবিত্ত সংস্কারের

(শেষাংশ ২৮১ পৃষ্ঠায়)

সত্যমেব

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী
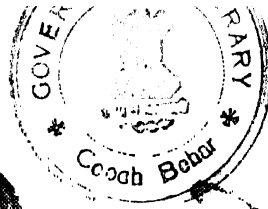
বৈঠকখানার বারান্দায় একখানা ছিন্ন-মলিন কম্বলের উপর লালবিহারী গালে হাত দিয়ে বসে ছিল। তখন কাল বেলা। নটাও বাজেনি। কাল রাত্রেই ...তাকে জানিয়েছিলেন, চাল বাড়ন্ত।

ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন নিয়ে পরিবারে ...কগুলি লোক। এখন শ্রাবণ মাসের মাঝা-...কি আউশ ধান উঠতে আশ্বিনের শেষ। দু-...ভূমে যদি অন্যদিন অপেক্ষা মাস ...বে, ...লেও আশ্বিনের মাঝামাঝি পর্যন্ত অপেক্ষা ...রতেই হবে। তৌড়ায়ে তো আর ধান পাকানো ...বে না।

...বিকটা আউশে কোনো রকমে কেটে ..., অগ্রহায়ণের গোড়াতেই লম্বা ধান উঠবে। ...টি কুড়িয়ে-বাড়িয়ে অমন ধান পেতে পারবে, ...ন, যে পরিমাণ জমি তাদের আছে, তাতে ...একটা মাস নিশ্চিন্তে কাটাতে পারবে। কিন্তু ...ই দুটো মাস চালাবে কি করে?

চিন্তার কথা বটে।

গ্রামে ধান বলতে ঘোষালদের ছাড়া আর ...কে বিশেষ নেই। অল্প কয়েকজনের হয়তো ...পাওয়া যাবে। কিন্তু অধিকাংশের তারই মতো ...অবস্থা। অথচ ঘোষালদের কাছে হাত পাততে ...কিছুতেই পারবে না। ছেলেমেয়েরা না খেয়ে ...গেলেও না।

সত্য কথা বলতে কি, ওদের যে এই দুরবস্থা ...তো ঘোষালদের জন্যে। ব্রজরাজ ঘোষাল ...সুরু করলেন লালবিহারীর পিতামহের ...।

সে একটা নয়, এক রকমেরও নয়। ...দেরই যথেষ্ট পয়সা। সুতরাং লাগল যখন ...ন দেওয়ানীতে ফৌজদারীতে অনেকগুলো ...লা এক সঙ্গে ঝুলতে লাগল। উভয়পক্ষের ...দের আর বাড়ির ভাত খেতে হয় না।

লালবিহারীর পিতামহ আরও কিছুকাল ...চে থাকলে কি হত, বলা যায় না। কিন্তু কয়েক ...র মামলা চালিয়ে হঠাৎ একদিন তিনি মারা ...লেন। সে মৃত্যুও রহস্যজনক। মহকুমা থেকে ...রবার পথে হঠাৎ ভেদবমি আরম্ভ হল। বাড়ি ...র্যন্ত কোনোক্রমে পৌঁছুলেন বটে, কিন্তু রাত্রি ...র পার হল না। সূর্যোদয়ের পূর্বেই মারা ...লেন।

অনেকে বিষপ্রয়োগে মৃত্যু বলে সন্দেহ করতে লাগল এবং এখনও সাধারণের বিশ্বাস তাই। কারণ ব্রজরাজের অসাধ্য কোনো কাজ ছিল না।

পিতামহের মৃত্যুর সময় লালবিহারীর বাবা নিতান্ত নাবালক। বোধ হয় তের চৌদ্দ বছরের বেশি নয়। তাঁর এক মামা এলেন ওদের জমি-জমা, সামান্য কিছু জমিদারী এবং মামলা-মোকদ্দমা দেখাশুনো করতে। তার পরে যা হবার তাই হল।

ঘোষালরা মামা-ভাগ্নে মিলে এমন অবস্থার সৃষ্টি করলে যে, দেখতে দেখতে কিছুই আর রইল না। জমিদারী নিলাম হয়ে গেল এবং জমি-জমাও টুকরো টাকরো হয়ে চলে গেল। অধিকাংশই কিনে নিলে এই ঘোষালরাই।

এবং সব যখন গেল, তখন মামলা-মোকদ্দমাও রইল না, মামাও অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর থেকে এই রকম অবস্থাই চলছে। লালবিহারীর বাবার আমলেও এবং লালবিহারীর আমলেও। ফসল ভালো হলে নমাস চলে, না হলে ছমাস। বাকি কয়েক মাস এমনি করে লালবিহারী গালে হাত দিয়ে বসে থাকে।

চিন্তা করে।

নিজের কথা, আর সেই সঙ্গে ঘোষালদের কথাও।

পিতামহকে লালবিহারী দেখেনি। তার কথা জানেও না। তবে যারা তাঁকে দেখেছে তারা বলে লোক তিনি মন্দ ছিলেন না। অত্যন্ত জেদী, ক্রোধী এবং বলিষ্ঠ প্রকৃতির লোক। কিন্তু শরীরে নাকি দয়া-মায়া ছিল। গ্রামের পাঁচজনের উপকার করতেন। অন্তত কারও অনিষ্ট করতেন না।

কিন্তু তিনি যাই থাকুন, নিজের পিতাকে লালবিহারী ভালো করেই জানেন। তাঁর পিতার জেদ তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু ক্রোধ নয়, বলিষ্ঠতাও নয়। বাইরে তিনি অত্যন্ত নিরীহ ছিলেন বটে, কিন্তু জেদ ছিল প্রবল। তর্ক করতেন না, কলহ করতেন না, কিন্তু মনে মনে যা সংকল্প করতেন তা অন্যের আপত্তি সত্ত্বেও করতেন। আর ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু। কখনও কারও অনিষ্ট মনে মনে চিন্তাও করতেন না এবং যে কাজে অন্যের অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকত, নিজের ক্ষতি সহ্য করেও তা তিনি পরিহার করে চলবার চেষ্টা করতেন।

অপর পক্ষে ব্রজরাজের তুলনা নেই। স্বার্থ ছাড়া কিছুই তিনি বুঝতেন না এবং সেই স্বার্থ সাধনের জন্যে কোনো দুষ্কার্যে তিনি পিছপা ছিলেন না। খুন, জখম, গৃহদাহ, নারীহরণ, এ সমস্ত তাঁর কাছে নিতান্ত সাধারণ কর্ম ছিল।

তাঁর ছেলেরা এখনও বেঁচে আছে। বাপের মতো কৃতকর্মা না হলেও তারা সাধ্যমত পিতৃ-পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবার চেষ্টা করছে, এ তো সবাই জানে।

লালবিহারী যখন নিজের দুঃখ দুর্দশার কথা ভাবে, তখন ঘোষালদের কথাও ভাবে।

'সত্যমেব জয়তি'। কই সত্যের জয় তো হচ্ছে না। ঘোষালরা তো দিব্যি আছে। প্রচুর জমি-জমা, জমিদারী, তেজারতি। এ গ্রামের অধিকাংশ লোকের টিকি তাঁদের কাছে বাঁধা। তারা উঠতে বললে ওঠে, বসতে বললে বসে। আড়ালে অনেকেই গালাগালি দেয় বটে, কিন্তু সামনা-সামনি সকলেই জোড়হস্ত। তাদের প্যাঁচে পড়ে কত গৃহস্থ যে সর্বস্বান্ত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই এবং এখনও হচ্ছে।

হরেকৃষ্ণর বাবা ব্রজরাজের কাছে একশো টাকা ঋণ করেছিল। এ পর্যন্ত সেই বাবদে দুশো টাকা দেওয়া হয়েছে। তার পরেও সেই ঋণের দায়ে হরেকৃষ্ণর মৃত্যুর পর তার নাবালক ছেলের নামে ব্রজরাজের ছেলেরা আরও তিন শো টাকা ডিক্রি করে তাদের জমিজমা মায় বসত বাড়ি পর্যন্ত নীলাম করে নিলে।

ঘোষালরা তো বেশ আছে।

লক্ষ্মণ হাজরা ছেলের বিয়ের সময় ঘোষাল-দের কাছে পঁচিশ টাকা ধার নিয়েছিল। আজ হাজরাও নেই, লক্ষ্মণও নেই। কিন্তু লক্ষ্মণের ছেলে এখনও ওদের বাড়ি বেগার খাটছে। দেনা তার শোধ হচ্ছে না।

ঘোষালরা তো ভালোই আছে।

রামপদ দত্ত শেষ জীবনে অভাবে পড়ে ওদের মুদিখানা থেকে দু'টাকা এক টাকার জিনিস ধারে নিত হয়তো। তার মৃত্যুর পরে দেখা গেল, বসত বাড়িটা তার ঘোষালদের নামে বিক্রি-কবালা হয়ে গেছে। সবাই বললে, দলিলটা স্রেফ জাল। রামপদর মেয়ে এসে কত কান্নাকাটি করলে। ঘোষালদের দয়া হল না। রামপদর মেয়ে নালিশ করেও হেরে গেল।

কই, ঘোষালদের তো কিছু হয়নি।

ভগবানের জয়টা না ছাই!

লালবিহারী উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়ায়। ধর্ম অধর্ম, ন্যায় অন্যায়, ভগবান টগবান সমস্ত বাজে!

জয় বিশ্বনাথ! জয় বাবা বিশ্বনাথ! সঙ্গে সঙ্গে চিমটের ঠং ঠং শব্দ।

সেই সন্ন্যাসী। মাথায় লম্বা লম্বা জটা আবক্ষলম্বিত দাড়ি, মুখে প্রসন্ন হাসি তার।

জয় বিশ্বনাথ! জয় বাবা বিশ্বনাথ!

লালবিহারীর বাপের আমল থেকে এই সন্ন্যাসী মাঝে মাঝে দর্শন দেন। একদিন এক-রাত্রি ওদের জীর্ণ নাটমন্দিরে আশ্রয় নেন। ধুনি জ্বলে। ঘি আসে, আটা আসে। লালবিহারীর বাবার আমলে তো আসতই, লালবিহারীর আমলেও এসেছে। সন্ধ্যাবেলায় ভজন হয়। অনেক রাত্রি অবধি বহু লোকের সমাগম হয়, বিশেষ করে বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকের। তারপর ভোর বেলায় কখন তিনি চলে যান, কেউ জানতেও পারে না।

পড়ে থাকে শুধু ধুনীর ছাই। লোকেরা ভক্তিভরে সেগুলো সংগ্রহ করে রাখে।

সন্ন্যাসীর আসার কোনো সময় নেই। কখনও হয়তো পাঁচ-সাত বৎসর পরে আসেন, কখনও দু'তিন বৎসর পরে। আবার কখনও বছর বছর এলেন। এবার এসেছেন বৎসর পাঁচেক পর।

সন্ন্যাসী বড় ভারী সন্ন্যাসী। কত যে তাঁর বয়স কেউ জানে না। কেউ অনুমান করে একশো পেরিয়েছে, কেউ বা দুশো। অথচ মাথার জটা অথবা মুখের দাড়িতে কচিৎ দু'চারটি পাকা চুল দেখা যায়। গ্রামের প্রবীণ লোকদের মতে আজীবন সবাই ওঁকে ওই একই রকম দেখে আসছে।

কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে এমন একজন সন্ন্যাসীকে দেখেও লালবিহারীর মুখ প্রসন্ন হল না।

পরিষ্কার বলে দিলে, এখানে সুবিধা হবে না বাবা। অন্য কোথাও দেখুন।

কিন্তু এত বড় কঠোর বাক্যেও সন্ন্যাসী কিছুমাত্র হতাশ অথবা ক্ষুণ্ণ হলেন বলে বোধ হল না।

হেসে বললেন, কাহে বাবা?

এবারে লালবিহারী দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠল: কাহে বাবা! ভিতরে একটি দানা চাল নেহি হ্যায়। উনুনে নেহি জ্বলতা হ্যায়। আপনি খেতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাক! ঘিউ-রোটি নেহি হোগা।

সন্ন্যাসী হেসে ভাঙা হিন্দিতে জানালেন, ঘিউ-রোটির কিছুমাত্র আবশ্যক নেই। আজ একাদশী, একাদশীর দিন তিনি কিছুই আহার করেন না।

বলে নিশ্চিন্ত মনে নাটমন্দিরে তাঁর অভ্যস্ত জায়গাটিতে ঝুলি-ঝাম্পা নামালেন, কম্বলটি যত্নে পাতলেন এবং তার উপর আসন গ্রহণ করে প্রসন্ন হুঙ্কার ছাড়লেন:

জয় বিশ্বনাথ! জয় বাবা বিশ্বনাথ!

ভিতর থেকে লালবিহারীর বৃদ্ধা মা বেরিয়ে এলেন তাঁর পাদ-প্রক্ষালনের জল নিয়ে। এবং পদধূলি প্রক্ষালিত হবার আগেই গল-লগ্নীকৃত বাসে প্রণাম করে হাত বাড়িয়ে পায়ের ধুলো নিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে একপাল ছেলের ভিড় জমে গেল চারিদিকে।

বৈঠকখানার দাওয়ার নিচে দাঁড়িয়ে হত-বুদ্ধির লালবিহারী দেখতে লাগল: ঝোলার কমণ্ডলুটি বের করে গুন গুন করে ভজন গাইতে গাইতে নির্বিকার সন্ন্যাসী গাঁজা সাজলেন। সেবান্তে আবার সরঞ্জামগুলি যথাস্থানে গুছিয়ে রাখলেন এবং বাবা বিশ্ব-নাথের নামে আবার একটা হুঙ্কার ছেড়ে স্নান করতে চলে গেলেন। পথ-ঘাট সবই তাঁর চেনা। সঙ্গীর আবশ্যক নেই। তবু কৌতূহলী ছেলের দল পিছু পিছু চলতে লাগল। স্নানের ঘাটে সন্ন্যাসী যখন মাথার জটা উন্মুক্ত করবেন, তখন সেই জটার দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে তারা অনুমান করতে পারবে।

তাদের আগে আগে আপন মনেই চলেছেন সন্ন্যাসী গুন গুন করে ভজন গাইতে গাইতে। আপন মনেই। যাওয়ার সময় লালবিহারীর দিকে একবার ফিরেও চাইলেন না।

লালবিহারী নিঃস্পন্দ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল:

তার মা এসে গঙ্গাজল দিয়ে নাটমন্দিরের বিশেষ একটি কোণ বেশ করে ধুয়ে মুছে দিয়ে কাঠ সাজিয়ে আগুন করে দিলেন।

একটু পরেই সন্ন্যাসী স্নান সেরে গুন গুন করে স্তোত্র আবৃত্তি করতে করতে ফিরে এলেন। মুখে সেই রহস্যময় প্রসন্নতা। বেড়ার উপর ডোরকোপীন এবং বস্ত্রখণ্ড মেলে দিলেন। লালবিহারীর দিকে একবারও দৃষ্টি-পাত করলেন না। আবশ্যকীয় কাজগুলি সেরে ধুনির সামনে গিয়ে বসলেন। কিসের জন্যে যেন একটুক্ষণ চেষ্টা করলেন। মুখে এবং সর্বাঙ্গে কয়েক মুহূর্তের জন্যে যেন একটু চঞ্চলতা খেলে গেল। কয়েক মুহূর্ত।

তার পরেই কঠিন, নিষ্পন্দ মূর্তি। বাহ্যজ্ঞানরহিত।

এ সমস্তই লালবিহারীর পরিচিত। তবু নতুন করে দেখলে কিছুক্ষণ। কেমন যেন অদ্ভুত লাগল তার। পরিচিত, অথচ নতুন বোধ হল।

একটা নতুন আছেও। অন্যবার এ সমস্ত হয় গভীর রাত্রে। নাটমন্দির নির্জন হয়ে গেলে। দিনে এরকম ধ্যান করতে লালবিহারী দেখেনি কখনও।

নটবর একটা ধামায় করে চাল নিয়ে তার সামনে দিয়ে ভিতরে চলে গেল। কে তাকে চাল দিতে বললে, কে জানে।

তার পিছু পিছু লালবিহারী ভিতরে গেল।

মাকে বললে, চালের ব্যবস্থা তো হল দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সাধুবাবার আটার যোগাড় কি করে হবে? যত্ন করে নাটমন্দিরে বসালে তো!

মা হেসে ফেললেন: আজ একাদশী। নিরম্বু উপবাস সমস্ত দিন। সন্ধের পরে একটু দুধ-গঙ্গাজল খাবেন।

লালবিহারীর মনে পড়ল, সাধুবাবা নিজেও একাদশীর কথাটা যেন বলেছেন একবার।

বললে, তবু অসুবিধা না হয় হবে না। কিন্তু যদি আজ একাদশী না হত, কি করতে?

মা হেসে বললেন, কি আবার করতাম! দু'খানা রুটির ব্যবস্থাও হত নিশ্চয়।

—কি করে হত? হাতে একটি পয়সা নেই। মুদির দোকানে অনেক বাকি, ধার দেবে না।

মা আবারও হেসে ফেললেন। বললেন, ওরে বোকা, ওঁদের কি আমরা খাওয়াই? ওঁদের খাবার ঠাকুর নিজে ওঁদের পিছু পিছু বয়ে বেড়ান। খাবার কথা ওঁরা নিজেরাও ভাবেন না, তুইও ভাবিসনে। গাই দোয়াতে লোক এল, বাছুরটাকে ধরগে যা।

দুধের কেঁড়েটা বড়-ঘরের দাওয়ায় নামিয়ে রেখে লালবিহারী আবার বাইরে এল।

নাটমন্দিরে এখন আর তেমন ছেলের ভিড় নেই। তারা সন্ন্যাসীর ভজন গানটা কিছু বোঝে। কিন্তু ধ্যানটা নয়। একটা মানুষ অগ্নি-কুণ্ডের সামনে নিঃস্পন্দ বসে। চোখ বন্ধ। নিশ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না। এ ব্যাপারটা ওদের কৌতূহলের সীমানার মধ্যে পড়ে না বোধ হয়। বোধ হয় ভয় ভয় করে। তারা একে একে সরে পড়েছে।

লালবিহারীর মনে হল, শুধু সন্ন্যাসী নয়, সমস্ত স্থানটাই যেন ধ্যানমগ্ন। জীর্ণ নাটমন্দির, তার সামনের ভাঙা মন্দির, দূরের বেলগাছটি, সমস্ত।

তাদের বাড়ির রাখাল গরু নিয়ে চলে গেল।

গরুর খুরের শব্দে সমস্ত স্থানটা একবার চঞ্চল হয়েই আবার ধ্যানের গভীরে ডুবে গেল। কোথাও কোনো স্পন্দনের চিহ্ন রইল না।

লালবিহারী নিজেও স্পন্দহীন দাঁড়িয়ে।

অত্যন্ত ক্ষীণ অস্পষ্ট একটা অনুভূতি তার মনের কোণে উঁকি দিলে, সে যেন একটা আবরণের মধ্যে ঢাকা রয়েছে। হাওয়ারই আবরণ। কিন্তু প্রতিদিন যে হাওয়ায় বিচরণ করে, সে হাওয়া নয়, অন্য হাওয়া।

ধ্যান ভাঙল সন্ধ্যার পরে।

আরও কিছুক্ষণ কাটল মোহমান অবস্থার মধ্যে। না চেতন, না অচেতন, এমনি একটা অবস্থা। গুনগুনিয়ে সুর উঠছে ভিতর থেকে। সেই সুর ধূপের ধোঁয়ার মতো সর্পিল গতিতে ঊর্ধ্বদিকে উঠে যাচ্ছে।

লালবিহারী সমস্ত জানেন। দুধ-গঙ্গাজল নিয়ে এক পাশে নিঃশব্দে বসে আছেন। তিনি

(শেষাংশ ২৭৭ পৃষ্ঠায়)

আর জন্ম

মনোজ বসু

এক বউমানুষকে দেখলেন? একজন কেন, কত যে তো আছে। স্টেশনের উপর সংসার পেতেছে। তাদের একটি। তিন নম্বর গেট দিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকাচ্ছিলাম ঠিক তার ডানদিকে। গাড়ি ছাড়ো-ছাড়ো। তবু দাঁড়াতে হল। বেশি নয় মিনিট দুয়েক ধরে দেখলাম ঘর-গৃহস্থালী। শেষঘণ্টা পড়তে ছুটতে ছুটতে এলাম। কামরার দরজা খুলে আপনি দাঁড়িয়েছিলেন—হাত ধরে ফেললেন, তাই উঠতে পেরেছি। নয়তো পরের ট্রেনে যেতে হত। বিকাল হয়ে যেত বিরাটি পৌঁছুতে।

সিগ্রেট ধরুন। আজকে আর নামছি না। বর্ডার যাচ্ছি। কদ্দূর নিয়ে যায় দেখি। সীমান্ত পার করে নিয়ে যাবে পাশপোর্ট-ভিসা ঠিক মতো যদি থাকে। তা সত্ত্বেও বিস্তর বখেড়া। বর্ডারের কর্তারা চোখ পাকাচ্ছেন, জোচ্চোর-বেআইনিরা ঢুকছে যেন তাঁদের দেশে। হরেক জিজ্ঞাসা। ব্যাগ খুলেছেন, পকেটে হাত ঢোকাচ্ছেন, কোমর টিপে দেখছেন। কাঠ হয়ে দাঁড়াই। যতক্ষণ ধরে যত রকমে খুশি দেখ। দেহে সাড় নেই। মনও তাই, সে মনে দাগ কাটে না।

ছাড় পেলেন অবশেষে। চলুন। অনেক অনেক দূরে আমাদের গ্রাম অঞ্চল। শেষ দুই ক্রোশ পায়ে হাঁটতে হবে। চেনা মানুষ দু-চারটি পথে দেখা হয়। চোখ ছলছল করে তাদের, গলা ধরে আসে সেকালের কথায়। আর দু-পাঁচ বছর, তারপরে এরাও মাটি নেবে। ষোল আনা বিদেশ তখন।

এসে পড়েছি, আর আধ ক্রোশ গিয়ে আমাদের বাড়ি। বাড়ি নয়, ইঁটের গাদা, সাপ-শিয়ালের আস্তানা। ঘর-বাড়ি ছিল বটে একদিন। এটা হল আমাদের পাশের গ্রাম—দুর্বাডাঙ্গা। ছাতা আড়াল দিন শিগগির। যা ভেবেছি, হিমে হালদার দেখে ফেলেছেন।

কারা যায়? মুখ দেখাচ্ছে না কেন? নাম বলো। বাড়ি কোথায় তোমাদের?

লাঠি হাতে মাঠের দিকে যাচ্ছেন। গরু তাড়িয়ে নিয়ে আসবেন গোয়ালে। সাড়া না দিয়ে জোরে পা চালাচ্ছি, তখন ছুটলেন এইদিকে। আপনি নতুন লোক, আপনাকে নয়—আমায় চিনে ফেলেছেন? লাঠি উঁচিয়ে আসছেন, মেরে পড়েন বুঝি বা।

অচ্ছা ছোকরা তুমি হে? বাড়ির উপর দিয়ে চোরের মতন চলে যাচ্ছ। ডাকলে জবাব দাও না।

বাড়ি কোথায়, এ তো পথ।

তাই তো বলছি। পথ দিয়ে যাওয়া হচ্ছে ছাতি আড়াল দিয়ে। বাড়ি ঘুরে যেতে কি হয়েছিল?

বলতে বলতে লাফ দিয়ে পগার পার হয়ে রাস্তার উপর। একেবারে সামনাসামনি। তবে নতুন লোক আপনার সামনে বলেই আজকের কথাবার্তা কিছু মোলায়েম।

কলকাতা থেকে আসছ? ডুমুরের ফুল হয়েছ, দেখাসাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। এদ্দিন পরে এলে, আমাদের বাড়ি হয়ে দুটো খবরা-খবর শুনিয়ে যাওয়া তো উচিত।

কতকাল পরে আসছি, বাড়ির জন্য মন উঠে না। কাল-পরশু একদিন আসা যাবে।

সে হয় না। ডাল-ভাত খেয়ে রাত্তিরটা শুয়ে থাক। সকালে উঠে চলে যেও।

কী সর্বনাশ, মোটে এই আধ ক্রোশ পথ—জ্বলে-পড়ে যাওনি তো।

তারপরে মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। ডাল-ভাত মানে ভেবেছ শুধুই ডাল, আর কিছু নয়? কাল হাটবার ছিল—কাটা-ইলিশ এনেছিলাম, ইলিশের ঝোল কাঁচকলা দিয়ে।

ইলিশ চাকা-চাকা করে কোটা, নুন-মাখানো, হাঁড়ি ভরতি হয়ে আসে সেই পদ্মা-মেঘনার অঞ্চল থেকে। সেই বস্তুর লোভে আমি বা আপনি আর এক-পা এগুবো না, হিমচাঁদ হালদার, তাই অকাটারূপে ধরে নিয়েছেন। কথা বলে তাকাচ্ছেন একবার আপনার মুখে একবার আমার মুখে। ষোল আনা ভিজেছি বলে মনে হয় না। তখন নরম সুরে বলেন, বাড়িটা ঘুরে চলো একবার বাবা। নইলে তোমার খুড়ি কথা বলবে না তেরাত্রি। সে যে কী জ্বালা—বিয়ে করোনি বাবাজি, সে তুমি বুঝবে না।

হিমচাঁদকে দেখছেন, পঞ্চাশের উপর বয়স, খুড়ো বলে ডাকি। কিন্তু মুখের আঁটঘাট নেই। নিজের মেয়ের সঙ্গেও ঠিক এমনি সব বলতে পারেন। বাড়িটা একবার ঘুরে যাওয়া ভাল। এ মানুষকে আর ঘাঁটিয়ে কাজ নেই, কি বলেন?

বাড়ি গিয়ে মেয়েকে ডেকে হয়তো বলবেন, কেমন সুন্দর বর জুটিয়ে আনলাম রে রেবতী। আপনাকে নয়, আমায় নিয়ে বলছেন। এমনি শতেকবার হয়ে গেছে। ফর্সা মেয়ে রেবতী। পাড়াগাঁয়ে এমন ফর্সা কম পাবেন। ছুটে বেড়ায়, হাঁটে না। বুঝি পারেই না হাঁটতে। হিমচাঁদের মা বেঁচে আছেন—ফোকলা দাঁত, শণের মতো চুল, মাজা পড়ে গিয়েছে। তিনিও বলেন নাতনিকে ডেকে, ও দিদি বিয়ে করবি এই ছেলেকে? কলকাতার ইস্কুলে পড়ে। জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হবে। দেখতেও কার্তিক।

রেবতী আড়চোখে তাকিয়ে লাল-টুকটুকে ভ্রূ নাচিয়ে বলে, লোহার কার্তিক!

রংটা কিছু ময়লা। তাই বলে এত দেমাক একফোঁটা মেয়ের। রাগ হয় কিনা, বলুন আপনি? রং-ই মানুষের সব নয়। তুমি ইংরেজি অক্ষরে নামটা লিখতে পার না, আমি ঝর-ঝর করে পুরো একখানা চিঠি লিখে ফেলি। তবে? এর পরে রোখ চাপে কিনা বিয়ে করবার জন্য বলুন। বিয়ে হয়ে গেলে জাঁক তখন কোথায় থাকে, দেখব।

এই রেঃ, আপনি অবাক হয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন।—মাঠ কোথা, যেদিক দিয়ে হিমচাঁদ এলেন? বাড়িই বা কোনদিকে, যেখানে আমাদের নিয়ে চললেন? ঝিমঝিম করছে চারদিক। হেড়াঞ্চির বন—যার অন্য নাম কালকপাটি। বেলা ডুবে গিয়ে দুটো করে পাতা এক সঙ্গে জুড়ে গেছে ঐ দেখুন—কপাট এঁটেছে। সকাল হলে খুলে যাবে। মেঘলা দিনে প্রহ্লাদ গুরু-মশায় বেলা বুঝতে পারতেন না, ঐ কাল-কপাটির গাছ ছিঁড়ে থুতু দিয়ে দুটো করে পাতা জুড়ে দেখাতাম, বেলা আর নেই, ছুটি দিয়ে দিন পাঠশালার। তা বনজঙ্গল কেন হবে না বলুন? দশ বছরে ক'টা মানুষ চলাচল করেছে ঐ মাঠে? এই পথের ধারে পাঠশালা-ঘর ছিল, বিশ্বাস করবেন আপনি?

পুকুর-ঘাট দেখিয়ে আনি। মাঠেরই এক-পাশে। জঙ্গল বড্ড ঘন এদিকটায়। সামাল হয়ে

(শেষাংশ ২৭৬ পৃষ্ঠায়)

একটি নতুন উত্তোলন

✳ পরিমল গোস্বামী ✳

আসলে এটি একটি পরিকল্পনা। কিন্তু এত সব নতুন নতুন পরিকল্পনার মধ্যে আমরা দিন কাটাচ্ছি যে, তার মধ্যে আবার এক নতুন পরিকল্পনার প্রসঙ্গ কারো মনেই কৌতূহল জাগাবে না জানি, কিন্তু তবু কর্তব্যবোধে কথাটা না তুলে পারা গেল না।

এটি একটি উত্তোলন পরিকল্পনা, এবং এর কাজ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গেছে। এ বিষয়ে দুটি সংবাদ আমি কাগজে পড়েছি, শেষটি পড়েছি যুগান্তরের ১২ই সেপ্টেম্বরের সংখ্যায়। ব্যাপারটি হচ্ছে খোঁপার সাহায্যে পুরুষদের পকেট থেকে ফাউন্টেন পেন উত্তোলন। শেষের খবরটি থেকে জানা যায় এক বাসযাত্রী ভদ্রলোকের পকেট থেকে তাঁর পেনটি এক কলেজের মেয়ের খোঁপায় উত্তোলিত হয়ে কলেজ পর্যন্ত চলে যায় এবং সেখানে যাবার পর আবিষ্কৃত হয় যে কলমটি বে-আইনিভাবে খোঁপায় ঝুলছে।

এ কি কলমের আত্মহত্যার চেষ্টা? অথবা অন্য কিছু? কিন্তু যাই হোক একবার যখন এটি ঘটতে আরম্ভ হল তখন একে আর ঠেকানো যাবে এমন বোধ হয় না।

পূর্বোক্ত খবর থেকে জানা যায় খোঁপার মালিক কলমটিকে কলমের মালিককে ফিরিয়ে দেবারই চেষ্টা করেছে; করেছে এ জন্য যে ঘটনা অনিচ্ছাকৃত। আপাতদৃষ্টিতে তো বটেই। কিন্তু অতঃপর যদি নিয়মিত এমন ঘটনা ঘটতে থাকে (ঘটবেই সন্দেহ নেই), তা হলে এর পিছনে কারো কোনো উদ্দেশ্যই নেই এমন কথা প্রমাণ

করা শক্ত হবে। অতএব এখন থেকে এর জন্য প্রস্তুত থাকা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

বহু রকম খোঁপা বাঁধা চলে আমাদের দেশে। আমি নিজেও এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে আসছি অনেক কাল থেকেই। খোঁপা-শাড়ী-অলংকার-শিল্পী শ্রীমতী বেলা দে একবার আমাকে বহু নতুন ধরনের (যা আমি আগে কখনো দেখিনি এমন) খোঁপা দেখার সুযোগ করে দিয়েছিল। তার পরিচিতা এক সেকালিনী এক শ জাতীয় বিভিন্ন খোঁপা বাঁধতে পারেন। তাঁরই হাতের রচনা খোঁপা সেদিন অনেকগুলো দেখেছিলাম,

ক্যামেরায় ধরেও রেখেছিলাম অনেকগুলো। বাটারফ্লাই, মথ, লোটাস ইত্যাদি কত রকম সে খোঁপা। কিন্তু তখন খোঁপার সাহায্যে ভবিষ্যতে সে এমন একটা চমকপ্রদ উত্তোলন (অথবা উন্নয়ন) পরিকল্পনা রূপায়িত হতে পারে তা ভাবতে পারিনি। তাই এতদিন সেই ফোটোগ্রাফগুলোর সৌন্দর্যদর্শন ভিন্ন তার যে অন্য কোনো ব্যবহারিক দিক থাকতে পারে তা দেখেও দেখিনি। এতদিন ওটিকে বিশুদ্ধ আর্টরূপে দেখতে চেষ্টা করেছি—অনেক সময় হয় তো বা তাকে ফুলের সগোত্র ভেবেছি।

ফুল ফোটে কেন বিজ্ঞানীরা তা ফুলের দিক থেকেই বিচার করেছেন। তার নিজস্ব জৈব কারণেই সে ফোটে, রঙীন হয়, সুরভি ছড়ায়। আমরাও যে তা উপরন্তু উপভোগ করি সেটা নিতান্তই একটা অ্যাক্সিডেন্ট। আমরা যে ফুল থেকে তার রং বা গন্ধ নিংড়ে নিয়ে কাজে লাগাই, ফুল ফোটার মূলে অবশ্যই সে উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু মানুষ প্রকৃতির সব জিনিসই নিজের ব্যবহারে লাগাবার চেষ্টা করে। ফুলের শ্রেষ্ঠ বস্তুটি শুধু যে নিংড়ে বা'র করে নেয় তাই নয়, গোটা ফুলটাই সে ভেজে খায়। এবং শুধু ফুল নয় পশুপাখীকে নিজের কাজে লাগায় এবং খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। পাঁঠা বা মুরগী—এরা কি শুধু কারি-কাটলেট হবার জন্য এ সংসারে এসেছে, না ওদের নিজস্ব কোনো উদ্দেশ্য আছে? কিংবা হয়তো প্রকৃতি স্বয়ং ব্যয়সংকোচ উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি বস্তু বা প্রাণীরই একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্ররূপে সৃষ্টি করেছে।

তাই পার্থিব সব জিনিসকেই মানুষের সম্পর্কে অল্পবিস্তর আত্মত্যাগ করতে হয়, এবং অনেক সময়েই এত বেশি যে মানুষকেও যে তাদের সম্পর্কে কিছু আত্মত্যাগ করতে হয়, তা তার তুলনায় একেবারেই তুচ্ছ। যে জিনিস যেখানে আছে সে জিনিস তার নিজ সীমানায় থাকতে পারে না, মানুষ তাকে জোর করে সরিয়ে দেয়, কাজে লাগায় এবং এই হল প্রকৃতি-জাত জিনিষের (আমাদের বিবেচনায়) ব্যবহারিক দিক।

কিন্তু খোঁপা প্রকৃতিজাত জিনিস নয়, চেহারায় প্রজাপতি বা ফুল হলেও তা মানুষের রচনা। খোঁপা রচনা একটি আর্ট এবং সৌন্দর্যের দিক দিয়ে তা অন্যান্য আর্টেরই সমশ্রেণীভুক্ত হওয়ার কিছু দাবী রাখে, বিশেষ করে আর্টের সেই বিভাগের, যার নাম ডিজাইন—যার অন্য অর্থ উদ্দেশ্য বা মতলব। কিন্তু শুধুই কি ডিজাইন?

ফুল যদি ডিজাইন না হয়, তাহলে খোঁপাও ডিজাইন নয়। ফুল আর্ট নয়, কারণ তা মানুষের সৃষ্টি নয়। খোঁপাও সে অর্থে আর্ট নয়, কারণ ফুলের উদ্দেশ্য আর খোঁপার উদ্দেশ্য এক। সে উদ্দেশ্য জৈব উদ্দেশ্য। ফুল ও খোঁপা দুয়েরই উদ্দেশ্য প্রলুব্ধ করা। কাকে? যাকেই হোক। মানুষের রচিত এই আর্ট প্রকৃতির উদ্দেশ্য সাধন করছে এটি আপাত অসঙ্গত কথা, কিন্তু এটি সত্য কথা। আজকাল ফাউন্টেন পেনকে প্রলুব্ধ করছে দেখে বিস্মিত হওয়া উচিত হবে না।

এতদিন পরে খোঁপার প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য কলম-পকেটমারের ভিতর দিয়ে প্রথম প্রকাশ্যে বেরিয়ে এলো, এটি একটি মস্ত বড় ঘটনা। সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন প্রচার হয়ে গেল, খোঁপার ইতিহাসে তারিখ ভুল হবার আর উপায় রইল না।

কৌতূহল তীব্র হওয়াতে পুরনো ফোটোগ্রাফগুলো আবার সামনে খুলে ধরেছি এবং ভাবছি কৌশলটা কোথায়। যতগুলো খোঁপার ছবি আমার সামনে আছে, তার একটিও এ কাজের উপযুক্ত বলে মনে হচ্ছে না। এর

কোনোটারই কলম উত্তোলনের মতো চেহারা নয়, তাই কোন্ খোঁপায় কলম ওঠে তা দেখার ইচ্ছে রইল। তাতে কি জাল থাকে? মায়াজাল?

আমি সেই পকেট-মার খোঁপা দেখতে চাই যা মানুষ-পকেটমারের প্রতিদ্বন্দ্বী (দেখতে) রূপে দেখা দিল। দেখতে চাই এ জন্য যে জানা থাকলে ভবিষ্যতে সাবধান হওয়া যাবে, যদিও

ভের্সাই শহরে মাইকেল মধুসূদন

শিবনারায়ণ রায়

'কত যে কি খেলা তুই খেলিস ভুবনে,
রে কাল, ভুলিতে কে তা পারে এই স্থলে?
কোথা সে রাজেন্দ্র এবে, যার ইচ্ছা-বলে
বৈজয়ন্তী-সম ধাম এ মর্ত্য-নন্দনে
শোভিল?........'

('ভরসেলস নগরে রাজপুরী ও উদ্যান')।

প্যারীর কাছে, ভের্সাই। এমন কিছু মস্ত শহর নয়, কিন্তু ভারী নাম ডাক। কারণ, ভের্সাই-এর প্রাসাদ।

ত্রয়োদশ লুই-এর আমলে এখানে ছিল একটা ছোটো ছিমছাম শাতো। 'সূর্য নরপতি' চতুর্দশ লুই ঠিক করলেন এমন এক প্রাসাদ গড়বেন যার তুলনা ফ্রান্সে কেন সারা ইয়োরোপে নেই। ভার পড়ল কলা-মন্ত্রী লা ব্রাঁ-এর ওপরে। তাঁর পরিচালনায় সে যুগের সেরা স্থপতি লা ভো এবং উদ্যান-বিশারদ লা নোত্র্ যে রূপ সৃষ্টি করলেন তার টানে আজো এখানে দর্শক সমাগমের অন্ত নেই। আমিও দেখতে গিয়েছিলাম।

নিয়ে গিয়েছিলেন ফ্রান্সে আমি যাঁদের অতিথি সেই মাদাম এবং মঁসিয় সুশে। সঙ্গে তাঁদের সাত বছরের মেয়ে মিমি। নীল আর সোনালী রেলিং-এর ফটক পেরিয়ে চত্বরে ঢুকে প্রথমটা এমন কিছু চোখ পড়ার মত ঠেকল না।

কিন্তু তারপর যখন প্রাসাদ পেরিয়ে বাগানের মধ্যে কিছুটা নেমে গেলাম, তখন বোঝা গেল কি কারণে এ প্রাসাদের জগৎজোড়া খ্যাতি। সতের শতকের ক্ল্যাসিক্যাল রীতির সঙ্গে বারোক রীতি মেশানো বিরাট প্রাসাদের সামনে ধাপে ধাপে বাগান, ফোয়ারা, হ্রদ আর তরু-বীথির দূর-প্রসারিত ল্যান্ডস্কেপ, মনে হয় দিগন্তের ফ্রেমে ধরা। প্রাসাদের সামনেই দু পাশে দুটো কৃত্রিম হ্রদ—তাদের কিনারা ধরে নানা ঢঙের ব্রোঞ্জ মূর্তি—এদের এক একটি ফ্রান্সের এক এক নদীর প্রতীক। তারপর যে ধারেই যাই ফোয়ারার পর ফোয়ারা, পাশে কোথাও বাগান, কোথাও কুঞ্জবন। সবচাইতে সুন্দর লাগল আপোলো-র ফোয়ারা; কৃত্রিম হ্রদের মাঝখানে জল থেকে রথে চড়ে উঠছেন সূর্যদেব। চতুর্দশ লুই বলতেন, 'রাষ্ট্র। সে ত আমি।' আর তাই নিজের প্রতীক হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন আপোলোকে। এই ফোয়ারার পরেই ক্রস-এর আকারে তৈরী গ্র্যান্ড ক্যানাল—চতুর্দশ লুই এখানে ভেনিসের এক খণ্ড প্রতিরূপ গড়তে চেয়েছিলেন। আমরাও নৌকোয় করে কিছুক্ষণ বিহার করলাম। তারপর দেখতে যাওয়া গেল বিচিত্র রঙের মার্বেল পাথরের তৈরী কলনাদ্ : মাঁসার্তের ডিজাইন অনুযায়ী গড়া এই অপরূপ থামের সারিতে বাস-রিলিফের অলংকরণ করেছিলেন কোয়াস ভোই।

ভের্সাই-এর দুই প্রধান আকর্ষণ হোল গ্র ত্রিয়ানন আর পেতি ত্রিয়ানন। ক্যানালের পূবে কিনারা থেকে 'রাণী-বীথি' ধরে প্রথমটিতে আসতে হয়। গোলাপী মার্বেল পাথরের এই একতলা বাড়ীটিতে এক সময়ে পিটার দি গ্রেট বাস করেছিলেন; রাজ-কার্যের অবসরে প্রথম নাপলিয়ঁ এখানে এসে মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতেন। বাড়ীর দুই অংশের মাঝখানে সুন্দর থামের সারি, সাজনো ফুলের বাগান, বাড়ীর রং-এর সঙ্গে মিলিয়ে ফুলের রং। এরি পূর্ব দিকের দুধরঙা বাড়ীটি পেতি ত্রিয়ানন। ষোড়শ লুই এটি মারী আঁতোয়ানেত্‌কে উপহার দিয়েছিলেন লুই এবং মারীর নানা স্মৃতি চিহ্ন এখানে রক্ষিত।

এরপর মূল প্রাসাদ বাড়ীর ভেতরটা দেখা গেল। ঘরের পর ঘরে ছবি, ট্যাপেস্ট্রি, আসবাবের বিচিত্র সমারোহ। একধারে বিরাট অপেরা হল, মস্ত মঞ্চ, এককালে রাজা-রাণী এবং অভিজাত-বর্গের জন্যে এখানে নিয়মিত অপেরা, ব্যালে, থিয়েটারের বন্দোবস্ত ছিল। এটির অলঙ্করণ করেছিলেন গেব্রিএল। লুই ফিলিপের আমলে অপেরা হলের চেহারার অনেক রদবদল হয়, কিন্তু প্রাসাদের মধ্যে প্রার্থনা-মন্দিরটির মূল রূপ আজো প্রায় অটুট আছে। শুধু এখানে নয়, ইয়োরোপের অন্য নানা সহরেও দেখেছি উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত বেশীর ভাগ শিল্পকর্ম ধর্মকে আশ্রয় করে যেমন সার্থকতা লাভ করেছে অন্য কিছুকে অবলম্বন করে সাধারণত তেমন সার্থক হতে পারেনি। খাঁটি বারোক রীতিতে পরিকল্পিত ভের্সাই প্রাসাদের

(শেষাংশ ২৮৪ পৃষ্ঠায়)

(৩০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

এ সাবধানতায় কোনো ফল হবে না জানি। কেননা ফল হয় না পকেটমারদের আঙুল চেনা থাকলেও। বাসের দরজায় যারা ভিড় করে তাদের মধ্যে চারপাঁচ জন অন্তত ভদ্রবেশী পকেটমার থাকে। স্থানটি সুবিধাজনক। তাদের সবারই আঙুল আর সবার আঙুলের মতো, দেখে বোঝবার উপায় নেই।

খোঁপাও হয় তো তাই। আমাদের দৃষ্টিতে যা সাধারণ, কলমের সঙ্গে যোগাযোগের সময় তাই যে অসাধারণ হয়ে ওঠে এ বিষয়ে আর সন্দেহ করে লাভ কি? কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়, এতদিন তো এমন ছিল না। ফাউন্টেন পেন বহু কাল থেকে পকেটে বহন করা হচ্ছে বহুকাল থেকে মেয়েরাও মাথায় খোঁপা বহন ক'রে আসছে, তবে এতকাল পরে এ ঘটনা ঘটছে কেন?

সন্দেহটা সেইখানে। আগেই বলেছি এটিকে আমি একটি বড় ঘটনার সূচনা মনে করি। অল্পদিনের মধ্যেই দেখা যাবে বাসের মধ্যে কোনো মা চিৎকার ক'রে উঠছে তার কোলের শিশুটি কোথায় গেল—হৈ হৈ ব্যাপার। দেখা যাবে নেমে-যাওয়া এক মহিলার খোঁপায় ঝুলছে শিশু। ঝুলছে এবং আনন্দে হাত নাড়ছে।

কলম উত্তোলনটা কয়েকদিন অভ্যাস হলেই পাঁচ ছ মাসের শিশু তুলতে আর কষ্ট হবে না। কাঁদে-ওঠা শিশু-কোলে মায়েরা সাবধান। এ শিশু তোলা মানে চাইল্ড লিফটিং, প্রচলিত অর্থে নয়, আক্ষরিক অর্থে। প্রচলিত অর্থে বাদ, আরম্ভ হবে আরো পরে, শিশু-উত্তোলনটা অভ্যাস হবার পরে। তখন বয়স্ক শিশু (বয়স্ক=সমবয়স্ক) উত্তোলনের পালা। আসল চাইল্ড লিফটিং। চাইল্ডরা সাবধান।

রবীন্দ্রনাথ খোঁপার এই ভবিষ্যৎ ভূমিকার ইঙ্গিত পেয়েই সম্ভবত গেয়েছিলেন—"শুধু শিথিল কবরী বাঁধিয়ো।" তাঁর এ বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে, উদ্দেশ্য-সাধনে কোনো মেক-আপেরই দরকার হয় না, এ কাজে ম্যাক্সফ্যাক্টর কোনো ফ্যাক্টরই নয়। তাঁর সময়ে অবস্থা অন্য রকম ছিল। সঙ্গে জাল নয়, কাজল নয়, একটু জল; ফুল নয়, চিরুনি নয়, কাঁটা নয়, হাতে শুধু একটি মুগুর (নির্দেশ : "কাজলবিহীন সজল নয়নে হৃদয় দুয়ারে ঘা দিয়ো") এবং ঐ গানেই, গলায় ফাঁস পরানোর জন্য শাড়ীর আঁচলের ব্যবহার নির্দেশ আছে, কিন্তু মুগুরের নির্দেশ নেই। কবিতার পক্ষে জিনিসটি স্থূল, তাই শুধু ইঙ্গিতে বুঝে নিতে হবে। কিন্তু

হায় রে কবে কেটে গেছে
রবি কবির কাল।

এখন মেয়েরা অন্দর থেকে পথে বেরিয়েছে, এখন কোনো শিথিল-কবরী চোখ-কাজল অথবা কাজলহীন মেয়ে হাতে মুগুর নিয়ে ট্রামে বাসে চলতে পারে না। তাই এখন ভঙ্গির বদল হয়েছে। সাহিত্যে শিল্পেও যুগে যুগে ভঙ্গির বদল হয়, কিন্তু উদ্দেশ্যের বদল হয় না। তা ভিন্ন চাইল্ড-লিফটিং এখন সমাজে অনেকটা চলে গেছে, মেয়েরা নিজেদের পছন্দ মতো চাইল্ড এখন নিজেরাই লিফট করে। তবে প্রথাটি এখনও প্রাথমিক অবস্থায় আছে এবং প্রকাশ্যে চালু হয়নি। প্রকাশ্যে আরম্ভ হয়েছে ফাউন্টেন পেন উত্তোলন দিয়ে। এর পর যখন এ প্রথা পরবর্তী ধাপটি পার হয়ে তৃতীয় ধাপে পৌঁছবে, তখন দেখা দেবে আসল সমস্যা। একবার কারো খোঁপায় শার্টের কলার আটকে গেলে তার আর উদ্ধারের আশা থাকবে না। তাই কলম তোলায় বিস্মিত না হয়ে এখন সেই চরম অবস্থার প্রতিকার চিন্তা করা দরকার। মনে হয় কলম তোলা বন্ধ করতে পারলে হয় তো বা সুফল ফলতেও পারে। ট্রামে বাসে কোনো মহিলার খোঁপা যদি বুক পকেটের দিকে এগিয়ে এসে গুঁতো মারার মতো অবস্থা হয় তখন সেখান থেকে সরে যেতে হবে, এবং খোঁপা যদি তখনও এগিয়ে আসতে থাকে তবে বাস থেকে সঙ্গে সঙ্গে নিচে লাফিয়ে পড়তে হবে, বুক পকেটে কলম থাক বা না থাক।

কিন্তু এটি একটি ইঙ্গিত মাত্র, কাজটি যদি পূর্বনির্দিষ্ট হয়ে থাকে তবে ফললাভ বহু সাধনা সাপেক্ষ। মানুষ প্রকৃতিকে কতটুকুই বা জয় করতে পেরেছে?

অভিনব কেশ তৈল

বিশুদ্ধ ও পরিস্রুত
নারিকেল তৈলের সহিত
কেশবর্ধক ক্যান্থারাইডিন সংমিশ্রণে
বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত।
ইহার গন্ধ মধুর ও দীর্ঘস্থায়ী।

রাঙ্গাজবা কেমিক্যাল, • কলিকাতা—৪০

শ্রীশ্রীগৌরনিতাই

॥ মাতৃত্ব ॥
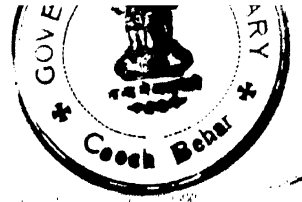
লিলিকা নাকোচ

অনুবাদক: পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

[গ্রীক লেখিকা লিলিকা নাকোচ ১৯০৩ সালে এথেন্স শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম গল্প ফরাসী পত্রিকা "ইয়ুরোপায়" প্রকাশিত হয়। তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস "লস্ট সোল"। বর্তমান গল্পটি "হার্ট অফ ইয়ুরোপ" (ইয়ুরোপের অন্তর) থেকে নেওয়া. গ্রন্থখানি ১৯৪৩ সালে রচিত।]

এক মাসের উপর হল ওরা মাসাইয়ে আছে। শহরের বাইরে আরমানি রেফিউজিদের ক্যাম্পগুলো দেখে মনে হয়, যেন ছোট গ্রাম গড়ে উঠেছে একখানা।

যে যেভাবে পেরেছে সে ভাবেই ডেরা পেতেছে। সংগতিপন্ন যারা, তারা বাস করছে তাঁবুতে, অন্য সবাই ভাঙা ঘরদোর অথবা নড়বড়ে ছাউনির তলে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু বেশীরভাগ কিছুই পায়নি, বড়জোর, চারটে ডাণ্ডা খাড়া করে একটা মোটা কাপড় টানিয়ে নিয়েছে মাথার উপর। চারপাশ ঘিরে দেবার মত কাপড় যার জুটেছে, সে তো নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে, নইলে এমন প্যাট্ প্যাট্ করে তাকিয়ে ওদের জীবনযাত্রা দেখে বাইরের লোকগুলো।

মোটামুটি সব গা সওয়া হয়ে গেছে। স্থিতিস্থাপক ব্যবস্থা হয়ে গেছে একটা। পুরুষেরা কাজ পেয়েছে, কি কাজ সে বিচার ওদের নেই। নিজেদের ক্ষুধার জ্বালা এড়ানো যায়, বাচ্চাকাচ্চাগুলোর মুখে কিছু তুলে দেওয়া সম্ভব হয়।

একমাত্র মিকালি কিছু করে না, করতে পারে না সে। পড়শীদের দেওয়া রুটিতে পেট ভরাতে হয় তাকে। মনে বড় লাগে, কারণ ছেলেটার বয়স হয়েছে চোদ্দ, বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যবান দেহ। ওকে কিনা পরমুখাপেক্ষী থাকতে হয়।

কিন্তু উপায় নেই। চব্বিশ ঘণ্টা যাকে নবজাত শিশু বয়ে বেড়াতে হয়, তার পক্ষে কাজের কথা চিন্তা করাও সম্ভব নয়।

শিশুটির জন্মের সময়ই তার মায়ের মৃত্যু হয়েছে, আর সেই দিন থেকে শুরু হয়েছে ওর ক্ষুধাকাতর ক্রন্দন। দিন-রাত পেটের জ্বালায় খালি কাঁদছে। কান্নায় অতিষ্ঠ হয়ে মিকালির দেশওয়ালিরা ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সারা রাত বাচ্চাটা ট্যাঁ ট্যাঁ করলে ঘুম আসে কি করে ওদের! এহেন মিকালিকে কাজ দেবে কে!

মিকালির নিজেরই মাথাটা ঝিম ঝিম করে মাঝে মাঝে বাচ্চাটার কান্নার ঠেলায়। মাথাটা তো একেবারে ফাঁকা, কিছু নেই ভিতরে, ভাবনাচিন্তার ক্ষমতাই হারি[illegible] চোখে ঘুম নেই, দেহ-মন ক্লান্ত। সেই কানে তালা-ধরানো বোঝাটাকে বয়ে বেড়াতে হচ্ছে চব্বিশ ঘণ্টা। কি কুক্ষণেই ওটা এসেছিল পৃথিবীতে, নিজের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে বয়ে এনেছে মিকালিরও পরম দুর্ভাগ্য।

বাচ্চাটার কান্নার আওয়াজ শুনলেই চটে ওঠে সবাই। এমনিতেই ঝঞ্ঝাটের অন্ত নেই। তার উপর কানের কাছে অবিরাম ওই আওয়াজ। মনেই আপদ চুকে যায়—ভাবে সবাই। ভাবনার সঙ্গে কারো কারো মনে হয় তো ব্যথার ছোঁয়া লাগে একটু।

তা কিন্তু ঘটবার লক্ষণও নেই। বেঁচে থাকবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস করে শিশুটা, আর ক্ষুধায় কাতর ক্রন্দন দিন দিন তীব্রতর হয়ে ওঠে।

মাতালের মত ঘুরে বেড়ায় মিকালি আর মেয়েরা কানে আঙুল দেয়। করবে কি ছেলেটা? একটা পয়সাও নেই ওর পকেটে যে দুধ কিনে দেবে। আর সারা ক্যাম্পে বাচ্চাটাকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারে এমন নারী নেই একজনও। এতেও যদি পাগল না হয় মিকালি, তাহলে পাগল করে কিসে?

সেদিন আর সহ্য করতে পারলে না। শহরের আর এক প্রান্তে যেখানে অ্যানাটোলিয়ানদের বাস, সেখানে এসে হাজির হল স্তন্যদায়িনীর খোঁজে। এই অ্যানাটোলিয়ানরাও এশিয়া মাইনর থেকে পালিয়ে এসেছে তুর্কীদের খুনখারাপির ত্রাসে। কে যেন মিকালিকে বলেছে, ওদের দলে একজন প্রসূতি আছে, বাচ্চাটার প্রতি তার দয়া হলেও হতে পারে।

অনেক আশা নিয়ে এসেছিল মিকালি কিন্তু এ ক্যাম্পেও সেই একই হাল—সেই অভাব ও দৈন্য। বুড়ীরা ছেঁড়া চাটাই পেতে বসে ঝিমুচ্ছে, নোংরা জলের খাদে বাচ্চাগুলো শুধু পায়ে খেলা করছে।

মিকালি এগিয়ে যেতেই জনকয়েক বুড়ী উঠে দাঁড়ায়। জিজ্ঞাসা করে, কি চাই। মিকালি কিন্তু এগিয়ে চলে। একটা তাঁবুর প্রবেশপথের বাইরে দেখতে পায় মাতা মেরীর প্রতীক টাঙানো আছে। থেমে যায় সেখানে। ভিতর থেকে একটা বাচ্চার কান্না শোনা যায়।

"যে মা মেরীর প্রতীক তোমরা তাঁবুর বাইরে টানিয়েছ," গ্রীক ভাষায় বলে মিকালি "তাঁরই নামে আবেদন করছি, এই মা-মরা বাচ্চাটাকে একটু দয়া কর, একটু দুধ দাও। আমি দীন আর্মেনিয়ান একজন।

মিকালির আবেদনে এক সুদর্শনা যুবতী বেরিয়ে আসে, কোলে তার শিশু, চোখ বুজে আনন্দে স্তন্যপান করছে।

"দেখি বাচ্চাটা, ছেলে না মেয়ে?"

আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে মিকালি। আশপাশের অনেক লোক এসে জমা হয়, কাছে এগিয়ে আসে। কাঁধ থেকে ঝোলাটা নামাতে মিকালিকে সাহায্য করে। সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ে দেখে।

ঝোলাটা পিঠ থেকে নামিয়ে ঢাকা খুলে দেয় মিকালি, আর সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠের সমবেত আর্ত চীৎকার জেগে ওঠে। মানুষের শ্রী এতটুকুও নেই—যেন দানবের বাচ্চা। মাথাটা হয়েছে বিরাট, আর এতটুকু ছোট্ট শরীরটা কুঁকড়ে কুঁচকে গেছে। এ কদিন ধরে বুড়ো আঙুলটা চোষা ছাড়া আর কোনই কাজ ছিল না ওর, সেটা তাই ফুলে এমন ঢোল হয়েছে যে, মুখে আর ঢোকে না। কি ভয়াবহ দৃশ্য! মিকালি নিজেই ভয়ে পিছিয়ে যায়।

"হায় মা মেরী!" বলে এক বুড়ী। "এটা তো রক্তচোষা বাদুড়ের ছানা, আসল রক্তচোষা। আমার বুকে দুধ থাকলেও ওকে খেতে দেবার সাহস হত না কোন দিন।"

"এটা তো খৃষ্টধর্মের দুশমন," বলে আর একজন। সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে বুকের উপর ক্রশ চিহ্ন এঁকে দেয়। "আসলে এটা তুর্কীর বাচ্চা।"

এক থুত্থুড়ে বুড়ী হাউমাউ করে এগিয়ে আসে, বাচ্চাটাকে দেখে আর্তনাদ করে ওঠে, "এই শয়তানের ছানাটাকে নিয়ে এসেছিস? বেরো এখান থেকে হতভাগা বেজন্মা কোথাকার!

([illegible])

বসুন্ধরা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ওয়ালটেয়ারের নির্জন প্রান্তে, আরো নির্জন হোটেলের দোতলায় ডেক-চেয়ারে বসে আমি সামনে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিলুম। তালবন আর বালিয়াড়ীর ওপারে সমুদ্র কালো হয়ে আসছে—পাথরে পাথরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের ফেনিল উচ্ছ্বাস এখান থেকেও চোখে পড়ছিল। আর দেখতে পাচ্ছিলুম বিশাখাপত্তন বন্দরের পাহাড়টার গায়ে আলোর সারি বুনো হাতির গায়ে জোনাকির মতো মিট্ মিট্ করে জ্বলে উঠছে।

সেই সময় নিচে একটা ট্যাক্সি এসে থামল। তার পরেই সিঁড়ি কাঁপিয়ে দোতলায় উঠে এল এল্-আই-সির সুবীর সেনগুপ্ত। আমি আগে চিনতুম না—এখানে এসে পরিচয় হয়েছে।

আমার পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ে সুবীর সেনগুপ্ত জিজ্ঞেস করল: এখনো বসে আছেন যে? বেড়াতে বেরুলেন না?

—অন্ধ্র য়ুনিভার্সিটি পর্যন্ত গিয়েছিলুম হাঁটতে হাঁটতে। ঠাণ্ডা লেগে একটু জ্বর জ্বর হয়েছে, তাই তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছি।

—তখনি তো বলেছিলুম, রাত্রে জানলা খুলে শোবেন না, তা কথা শুনলেন না!—সুবীর সেনগুপ্তের স্বরে অনুযোগ শোনা গেল: তা জ্বর বেশি হয়নি তো?

—না-না, সামান্য সর্দি মাত্র, ও কিছু নয়।—শারীরিক প্রসঙ্গটা থামিয়ে দিয়ে আমি বললুম, আপনি কত দূর ঘুরে এলেন?

—সীমাচলমে গিয়েছিলুম। ওয়ালটেয়ারে কতবার এসেছি কিন্তু সিংহ পর্বতের দেবতাকে আর দেখাই হয় না। এবার তীর্থদর্শনটা সেরে নিলুম।

—কিন্তু বিগ্রহের দর্শন তো পেলেন না। তিনি তো কয়েক মণ চন্দনের তলায়। অক্ষয়-তৃতীয়া ছাড়া তাঁর দেখা মেলে না।

—সেজন্যে দুঃখ নেই।—সুবীর সেনগুপ্ত একটু চুপ করে রইল। তার পর সমুদ্রের দিকে চোখের দৃষ্টিটাকে ছড়িয়ে দিয়ে বললে, আমি আজ শোভনা দাশগুপ্তকে দেখেছি। অবশ্য দশ বছর আগে সে দাশগুপ্ত ছিল, এখনকার পদবী আমি বলতে পারব না।

শোভনা দাশগুপ্তকে আমি চিনি না—হঠাৎ ওর প্রসঙ্গটা এভাবে তুলে ধরার অর্থ বুঝতে পারলুম না। আমি ওর কাছ থেকেই আরো কিছু শোনবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

সুবীর সেনগুপ্ত বললে, দশ বছর আগে যে প্রশ্নটা মনে এসেছিল আজ তার জবাব পেয়েছি।

আমি বললুম, আপনার ভূমিকাটা ভালো। আমার মনের একটা গল্প মনে পড়ছে।

—মনে তো হবে।—সুবীর সেনগুপ্ত হাসল: আমি মনের খুব ভক্ত নই। তবে সব গল্পই তো জীবন থেকে আসে। যা নিছক ঘটনা—তাকে ক্রিস্টালাইজ করলেই গল্প। শোভনা দাশগুপ্তের কাহিনীই শুনুন।

সুবীর সেনগুপ্ত বলতে লাগল।

আমরা তিন পুরুষ কটকে ডোমিসাইল্ড। আমার বাবা ওখানে খুব বড় উকিল ছিলেন। বছর চারেক হল বাবা মারা গেছেন, এখন বড়দা প্র্যাকটিস্ করেন—বাবার পশার তিনিও কিছু পেয়েছেন।

আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন হর্ষনাথ নিয়োগী। খুব দূর সম্পর্কের একটু আত্মীয়তাও ছিল।

হর্ষনাথ সিভিল্ কোর্টে সামান্য মাইনের চাকুরে। ডিস্পেপ্সিয়া আর দারিদ্র্য—দুয়ে মিলে তাঁর চেহারা ছিল কটকের ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়ার মতো, মেজাজ ছিল আরো কুৎসিত। বীভৎস তীক্ষ্ণ গলায় মধ্যে মধ্যে এমনভাবে চেঁচিয়ে উঠতেন যে, মনে হত এখুনি তাঁর গলা চিরে রক্ত বেরুবে।

গরিবের ঘরে এক রাশ ছেলেপুলে হবে—এ যেন গ্র্যাভিটেশনের মতো বাঁধা নিয়ম। আশা করি, তাঁর স্ত্রীর অবস্থা আপনি অনুমান করতে পারেন। এক সময় ভদ্রমহিলা রূপসী ছিলেন, ইদানীং তাঁকে দেখলে সিল্কের কাপড়ে জড়ানো একটা কঙ্কালের মতো মনে হত। আর তাঁর পায়ে-পায়ে বেড়ালের বাচ্চার মতো রাতদিন একপাল শিশু ঘুরে বেড়াত—তিনি তারস্বরে তাদের নেবার জন্যে যমের কাছে প্রার্থনা জানাতেন।

সুতরাং সংসারের ভার বইবার জন্যে একটি অনাথা শালী এল পাবনার এক নগণ্য গ্রাম থেকে। আপন শালী নয়—মাসতুতো-পিসতুতো একটা কিছু হবে। এই মেয়েটিই শোভনা দাশগুপ্ত।

বয়েস তখন ষোলো-সতেরো হবে। স্বাস্থ্যে সতেজ, শ্যামল চেহারা। সুন্দরী নয়—কিন্তু আমার তাকে বেশ সুশ্রী বলে মনে হয়েছিল। হয়তো সেই বয়েসে ওই রকমই চোখে রঙ ধরে। কারণ আমি তখন র‍্যাভেনশ কলেজে বি. এস-সি পড়ছি।

একে প্রতিবেশী, তায় আত্মীয়তা—দু বাড়ীতে আসা-যাওয়া ছিলই। কাজেই শোভনার সঙ্গে পরিচয় হতে দেরী হল না।

দেখলুম, আসবার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটি দু হাত বাড়িয়ে সংসারের সমস্ত ভার তুলে নিয়েছে। হর্ষনাথবাবুর কোর্টের ভাত দিতে শোভনা, ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে স্নান করাতে শোভনা, গোয়ালার হিসেব করতে শোভনা। বাড়ীর অশান্তি কমে এল—এমন কি একদিন দেখলুম স্ত্রীকে নিয়ে হর্ষনাথ সিনেমায় অবধি গেলেন। দশ বারো বছরের মধ্যে এমন অঘটন দেখেছি বলে মনে পড়ল না।

আর সেইদিনই আমি ওদের বাড়ীতে গিয়েছিলুম।

কেন গিয়েছিলুম আজ তা ঠিক বলতে পারব না। খুব সম্ভব বাবা একটা মামলার ব্যাপারে কয়েকটা কাগজপত্রের কথা হর্ষনাথবাবুকে বলতে বলেছিলেন।

গিয়ে দেখি, স্বামী-স্ত্রী সিনেমায় বেরিয়েছেন। আর বাড়ীর ভেতরের বারান্দায় মাদুর পেতে শোভনা পাঁচ-ছ'টি ছেলেমেয়েকে পাহারা দিচ্ছে। নেহাত বাচ্চারা মাদুরের এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে অসহায়ভাবে ঘুমিয়ে পড়েছে, দুটি দুই বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে শোভনার মুখের দিকে। অর্থাৎ গল্প শুনছে।

একটু দূরেই এক জোড়া কৃষ্ণচূড়া গাছ—তার ভেতর দিয়ে বারান্দায় ত্রয়োদশীর ঝিলমিল জ্যোৎস্না। লণ্ঠনটা ব[illegible] রয়েছে এক পাশে আর টুকরো টুকরো আলোয় ভারী সুন্দর, ভারী আশ্চর্য দেখাচ্ছে শোভনাকে। আমরা প্রত্যেক মানুষকে এই রকম এক-একটা বিশেষ মুহূর্তেই আবিষ্কার করি। আমিও যেন আজ ওকে প্রথম দেখলুম।

আমার পায়ে রবারের চটি ছিল, তাই বোধ হয় কোনো আওয়াজ পায়নি শোভনা। আর সাত-আট বছরের ছেলেমেয়ে দুটি এমন তন্ময় হয়ে গল্প শুনছে যে, আমাকে লক্ষ্য করবার মতো অবস্থা তাদের নয়।

আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম। শোভনা গল্প বলছে।

কী আর গল্প বলতে পারে? পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, লেখাপড়া জানে নামমাত্র। কাজেই পাবনার উচ্চারণে বলে চলেছে সেই রাজকন্যা আর রাক্ষসীর গল্প—যা বাংলাদেশের সব ছেলেমেয়ে চিরকাল ধরে শুনে আসছে।

—তারপরে রাজপুত্র যেই শিবমন্দিরের ভেতর থেকে বেরিয়েছে, অমনি হাঁউ মাউ করে ছুটে এসেছে রাক্ষসীটা। এই অ্যাত্তো বড় একটা হাঁ করে—

এইখানে আমি জুড়ে দিলুম: টপাং করে রাজপুত্রকে গিলে ফেলেছে।

ছেলেমেয়ে দুটো দারুণভাবে চমকে উঠল, তার চাইতেও বেশি করে চমকালো শোভনা। এক সঙ্গে যে চেঁচিয়ে ওঠেনি—সেইটেকেই আমার বরাত বলতে হবে।

আট বছরের ছেলেটাই সামলে নিলে প্রথম। ভারী বিরক্ত হয়ে বললে, ধেৎ, মণ্টু কাকা গল্পটা খারাপ করে দিচ্ছে।

আমি বললুম, মোটেই খারাপ করে দিইনি। আজকালকার রাক্ষসীরা রাজপুত্রকে পেলে আর ছাড়ে না। তক্ষুণি তাকে রসগোল্লার মতো গিলে খায়। তোদের মাসী জানেনা।

ওরা বোধ হয় আপত্তি করতে যাচ্ছিল। মেয়েটা বলতে যাচ্ছিল, রাজপুত্তুরের হাতে শিব ঠাকুরের দেওয়া তরোয়াল আছে—কিন্তু শোভনা তাকে থামিয়ে দিলে। লজ্জা জড়ানো গলায় বললে, বসুন মণ্টুদা।

আমি বললুম, কাজ আছে। হর্ষনাথদা কোথায়?

—দিদি জামাইবাবু বায়োস্কোপ দেখতে গেছেন।

বললুম, বায়োস্কোপ দেখতে? এটা একটা খবরের মতো খবর! তা তুমি গেলে না?

—আমি গেলে এদের সামলাবে কে?

—তা বটে। ভার বইবার জন্যেই তো তুমি আছো।

আমার কথাটাকে শোভনা কিভাবে নিলে জানি না। অল্প একটু হাসল। বললে, বসুন—চা করে দিই।

ছেলেমেয়ে দুটোর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মায়া হল। বললুম, রাজপুত্রকে হাঁ-করা রাক্ষসীর সামনে এনে দাঁড় করিয়েছ—বাচ্চাদের মনের অবস্থা বুঝতে পারছ না? এখন ওরা আমাকেই রাক্ষসী বলে মনে করছে। চা আর একদিন হবে—আমি চললুম।

চলে আসবার আগে আর একবার চেয়ে দেখলুম শোভনার দিকে। সেই টুকরো টুকরো জ্যোৎস্নার জন্যেই কিনা জানি না—ওকে আমার ভারী সুন্দর, ভারী ক্লান্ত আর ভারী অসহায় মনে হল। আর মনে হল: কী স্বার্থপর হর্ষনাথ দা! পঁয়তাল্লিশ পেরুনো ওই ডিস্‌পেপ্‌টিক লোকটার সখের অন্ত নেই আর এদিকে এইটুকু একটা মেয়ে দিনের পর দিন সংসারের জোয়ালে ঘুরে মরছে। সুখ নেই—আনন্দ নেই—কিছুই নেই!

কথাটা আরো বেশি করে মনে পড়ল শোওয়ার সময়। ফিজিক্সের কয়েকটা অঙ্ক মুখস্থ করবার ব্যর্থ পণ্ডশ্রম শেষ করে যখন বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছি সেই তখন। নিজের কথাটাই বারবার কানে বাজতে লাগল: ভার বইবার জন্যে তো তুমিই আছো।

রূপসী নয়, বিদ্যা নেই, দিদির সংসারে গলগ্রহ। আমি যেন শোভনার ভবিষ্যতের ছবিটা প্রত্যক্ষ দেখতে পেলুম। তিলে তিলে সংসারের জাঁতার চাপে ও পিষে যাবে—ওর শ্যামল চেহারা কালো কদাকার হয়ে যাবে, যতদিন খাটতে পারবে ততদিন সংসারে ওর আদর থাকবে। যেদিন শরীর ভেঙে পড়বে, সেদিন ওর ভাগ্য কোন্ অন্ধকারে ওকে ঠেলে নিয়ে যাবে কেউ জানে না। বিয়ে হওয়ার আশা নেই—যদি হয়ও ওর জন্যে একই ইতিহাস—একই পরিণাম।

আর নিথর রাত্রে—যখন কেউ জেগে নেই, কারও শোনবার সম্ভাবনা নেই—তখন ও একা বিছানায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকবে। মনে পড়বে সেই মাকে—পাঁচ বছর বয়েসের সময় যে ওকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

ওর সেই নিঃসঙ্গ কান্নার ছবিটা কল্পনা করে আমি অসহায় যন্ত্রণায় পীড়িত হতে থাকলুম। সেই থার্ড ইয়ারে পড়বার বয়েসে যেমন হয়। আমি কবি হলে সেই রাত্রে ওকে নিয়ে কবিতা লিখতুম একটা।

আর তা হলে আজ সেই কবিতাটা আমায় টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে হত।

[সুবীর সেনগুপ্ত মিনিট দুই চুপ করে রইল। সমুদ্রে জোয়ার এসেছে। ঢেউয়ের গর্জন আরো উতরোল। হোটেলের একতলার লাউঞ্জে রেডিওটা খুলে দিয়েছে কে[illegible]—গম্ভীর মন্দ্র অর্কেস্ট্রা বাজছিল একটা। সমুদ্রের গর্জনের সঙ্গে মিশে সুরটা যেন অনন্তে মিশে যাচ্ছিল। সুবীর সেনগুপ্ত আবার আরম্ভ করল।]

তারপর অনেকগুলো ছোটখাটো ডিটেলস্ বাদ দিচ্ছি। আসল গল্পের আরো কাছাকাছি আসা যাক।

একদিন ও-বাড়ী থেকে ফিরে এসে মা উত্তেজিতভাবে আমাকে বললেন, মেয়েটাকে ওরা মেরে ফেলবে।

অনার্সের নোট থেকে চোখ তুলে আমি বললুম, কাকে?

—ওই শোভনাকে।

আমার হৃৎপিণ্ড থমকে গেল।

—কী হয়েছে মা?

—দুটো বড় বড় বালতি করে জল নিয়ে বারান্দায় উঠছিল। অতটুকু মেয়ে অত ভার টানতে পারে কখনও? মুখ থুবড়ে পড়ে [illegible] কপাল কেটে একাকার। একদিন ওইভাবেই খুন হবে।

অনার্সের নোট কতগুলো দুর্বোধ্য রেখায় জড়িয়ে গেল। আমি পরিষ্কার দেখতে পেলুম শোভনাকে। সিঁড়ির নিচে জলের ঢেউ বইছে—উবুড় হয়ে পড়ে আছে শোভনা। ময়লা ডুরে শাড়ী ভিজে একাকার—কাটা কপালের থেকে রক্ত গড়িয়ে রুক্ষ চুলগুলোকে রাঙিয়ে দিচ্ছে। আমি যেন স্পষ্ট শুনতে পেলুম, জ্ঞান হারাবার আগে তার একটা আর্ত চিৎকার: মা—মাগো—

—ওকে হাসপাতালে পাঠায় নি মা?

—না, উঠে বসেছে এখন।—মা বললেন, তা যাই বলি, মেয়েটাও শক্ত আছে খুব। হয়তো একটু পরেই রান্নাঘরে গিয়ে হাঁড়ি চড়াতে বসবে।

ইচ্ছে হল, একবার খবর নিয়ে আসি, কিন্তু কেমন লজ্জা করতে লাগল। অথচ সেদিন কলেজে গিয়ে সারাক্ষণ আমি শোভনার কথাই ভাবলুম। লেকচারের একবর্ণ কানে গেল না—এলোমেলো নোট করলুম, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে গিয়ে অ্যাসিডে অ্যাপ্রন পুড়িয়ে ফেললুম। কলেজ ইউনিয়নের ইলেকশনে দাঁড়াবার কথা ছিল, উইথড্র করে নিলুম নাম—বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল।

রাত্রে খেতে বসে আমি মাকে বললুম, ওরা শোভনার বিয়ে দেয় না কেন মা? কেন এমনভাবে কষ্ট দেয়?

মা বললেন, কালো মেয়ে, লেখাপড়া জানে না—আপন বলতে কেউ নেই। তায় আমাদের বদ্যির ঘরে একরাশ টাকা পণ না হলে ভালো মেয়েই পার হয় না। কী করে বিয়ে দেবে ওর?

আমি কেমন নির্লজ্জের মতো বলে ফেললুম: আজকের দিনেও কি এমন উদার মনের কেউ নেই, যে ওকে উদ্ধার করতে পারে এই দুর্গতি থেকে?

কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন বড় বৌদি। হেসে ফেললেন।

—ঠাকুরপোর দেখছি খুব দরদ। তুমিই বুক ঠুকে নেমে পড়ো না ভাই—আমরা শাঁখ বাজিয়ে পাশের বাড়ী থেকে ছোট বৌকে বরণ করে আনি।

গলায় মাছের কাঁটা আটকে গেল আমার, মাথার মধ্যে রক্তের ঢেউ আছড়ে পড়ল একটা। ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল চোখমুখ। ঠিক এই কথাটাই কি আজ এক মাস ধরে আমারও চিন্তায় কল্পনায় গোপনে আনাগোনা করছে? তাই কি শোভনার দুঃখ বেদনা আমাকে এমন করে বাজে, সেই জন্যেই কি আমি সময়ে অসময়ে শোভনার কথা এত বেশি করে ভাবি?

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মার মুখে মেঘ নেমে এল।

—আমার ছোট ছেলের জন্যে আশিক্ষিত কালো মেয়ে আনব কেন বড় বৌমা? আর অমন হা-ঘরের মেয়েই বা আনতে যাব কোন্ দুঃখে? একবারও কি সাধ মিটিয়ে আমি ছেলের বিয়ে দিতে পারব না?

শেষ কথাটায় বৌদির মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। একটু খোঁচা ছিল ওর ভেতরে। বড় বৌদি কালো, ভালো লেখাপড়া জানেন না—তাঁদের সংসারের অবস্থা ভালো নয়।

বৌদি শীর্ণ গলায় বললেন, আমি কি সত্যি সত্যিই বলছি মা? ঠাট্টা করছিলুম।

মা আরো কঠিন মুখে বললেন, না—ও রকম ঠাট্টা করতে নেই বৌমা।

আমি জানতুম, মা ঠিক এই কথাই বলবেন—এ ছেড়ে আর কিছুই তিনি বলতে পারেন না। বাবা হয় তো একটু নরম হতে পারেন, কিন্তু মা'র কথা বজ্রের মতো অটল। বাবা কোর্টে নামকরা এ্যাডভোকেট—কিন্তু বাড়ীতে মা-র কাছে কোনো আর্গুমেণ্টে তিনি কোনো দিন জিতেছেন বলে আমার মনে পড়ে না।

তবু একটা অনিশ্চিত প্রত্যাশায় আমার বুক দুরু দুরু করছিল, নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করছিলুম। মা-র কথা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের ভেতরটা যেন ফাঁকা হয়ে গেল—খাবারের সমস্ত স্বাদ চলে গেল মুখ থেকে। থালা সরিয়ে আমি উঠে পড়লুম।

মা বললেন, ওকি—উঠে পড়লি যে?

বললুম, খিদে নেই।

জানি, মা-র কথা নড়বে না—তবু নিজের মনটাকে আমি ঠেকাতে পারলুম না। একটা রুদ্ধ বিদ্রোহ প্রায়ই চাড়া দিয়ে উঠত বুকের মধ্যে, ভাবতুম, যদি কখনো চাকরি বাকরি পাই দাঁড়াতে পারি নিজের পায়ে, তা হলে ওই শোভনাকেই আমি, বিয়ে করব। সুন্দরী বিদুষী বউয়ের জন্যে মা-র ভাবনা নেই—মেজদা তো আছেই। শোভনাকে নেবার মতো শক্তি যদি বাংলা দেশের কোনো শিক্ষিত পুরুষের না থাকে, তা হলে আমিই ওদের কলঙ্ক মোচন করব।

কিন্তু কথাটা একবার শোভনাকে জানানো দরকার। তাকে একবার বলা দরকার অন্ততঃ তার দুঃখ বোঝে, তার নির্জন কান্না শুনতে পায়, সংসারে এমন মানুষ আরো একজন আছে।

সুযোগ হ'ল প্রায় মাসখানেক পরে।

ছুটির দুপুর। জানলার কাছে চেয়ার পেতে একটা উপন্যাস নিয়ে বসেছি, হঠাৎ শোভনা এল আমার ঘরে।

আমার রক্ত চল্‌কে উঠল। সহজ হতে চেষ্টা করে বললুম, এই যে এসো। কি মনে করে?

—আপনার ঘর দেখতে এলুম। উঃ—কত বই! এত পড়েন কি করে?

দু চোখে সরল বিস্ময়। মুগ্ধ দৃষ্টি ঘরময় ঘুরছে।

বললুম, তোমার পড়তে ইচ্ছে করে না?

—ইচ্ছে করলেই বা কি হবে? পড়ব কখন? পড়াবেই বা কে?

বললুম, পড়ার জন্যে কারুর সময়ের অভাব হয় না। বলো তো আমিই পড়াতে পারি তোমাকে।

শোভনা একটু হাসল—অর্থাৎ আলোচনাটাকে এড়িয়ে গেল। তারপর বললে, ঘরটা কি সুন্দর সাজানো আপনার! বৌদি গুছিয়ে দেয় বুঝি?

আমি সগর্বে বললুম, না— আমি নিজেই সাজাই। আমার ঘরে কাউকে হাত দিতে দিই না। শোভনার সরল চোখ দুটো বিস্ময়ে আবার ভরে উঠল।

—আপনি পুরুষ মানুষ, পারেন এ-সব?

ওর কাছে নিজের মহিমা প্রকাশ করতে পেরে আমি আরো পুলকিত হয়ে উঠলুম মনে মনে। বললুম, সবাই হর্ষনাথদা নাকি?

শোভনা মাথা নেড়ে বললে, তা বটে। এমন অগোছালো মানুষ আমি দেখিনি। আর কোনো দিকে যদি এতটুকু খেয়াল থাকে! সেদিন পিকদানি ভেবে গেলাসেই পিক্ ফেললেন। আমি মেজে মরি।

শুনে, আমার গা ঘুলিয়ে উঠল—বমি বমি বোধ হতে লাগল। তৎক্ষণাৎ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, কোনো দিন আর ও বাড়ীতে আমি জল-গ্রহণ করব না।

বললুম, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোসো না।

—চেয়ারগুলো যে-রকম সাজিয়ে রেখেছেন, বসতেই ভয় করে।

আমি হেসে বললুম, তা সত্যি। যে-ভাবে ওগুলো রেখেছি তা থেকে কেউ একটু এদিক-ওদিক করলে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

শোভনার মুখের ওপর থেকে প্রসন্নতা মিলিয়ে গেল। হঠাৎ মনে হ'ল, কেমন ভয় পেয়েছে সে।

—তাহলে আমি এখন যাই।

—না-না বোসো একটু।—আমার মনে হল, আজকের মতো সুযোগ আর আসবে না। যে-কথা বলবার জন্যে অপেক্ষা করে আছি, সেটা এখুনি বলা দরকার। বললুম, বোসো, চা খাও। আমার ঘরে স্টোভ চা-দুধ-চিনি সব আছে।

মুহূর্তের জন্যে শোভনা খুশি হয়ে উঠল।

—আপনি খুব সংসারী লোক দেখছি তো। দাঁড়ান, আমি চা করে দিই আপনাকে।

আমি হেসে বললুম, উঁহু, ঐটি হচ্ছে না। এই দুপুর বেলা নিজের হাতে এক কাপ চা তৈরি করে না খেলে আমার তৃপ্তি হয় না। বোসো, তোমাকেও খাওয়াই।

শোভনা স্টোভের দিকে এগোচ্ছিল—থমকে দাঁড়ালো। আবার তার মুখে যেন ভয়ের ছাপ নেমে এসেছে। আমার দিকে বিহ্বল চোখ মেলে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে বললে, আমি যাই।

আমি চমকে বললুম, রাগ হল? আচ্ছা, তুমিই চা করো তবে।

—না, আমি যাই। দিদি হয়তো আমাকে ডাকছে।

শোভনা চলে গেল। আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম। কোথায় কিসের একটা সুর কেটে গেছে বলে মনে হ'ল। এখন বুঝতে পারছি, আজ যে গল্পটা শেষ হল, তার সূত্রটা ওইখানেই ছিল।

[একটা রহস্য কাহিনীতে ক্রমশ পড়বার মতো আবার মিনিট তিনেক চুপ করে রইল সুবীর সেনগুপ্ত, কান পেতে শুনল সমুদ্রের কলরোল, মগ্ন হয়ে রইল বুনো হাতীর পিঠে অসংখ্য জোনাকি জ্বালা ভাইজাগ বন্দরের পাহাড়টাতে। তারপর একটা জাহাজের গম্ভীর বাঁশিতে তার ধ্যান ভঙ্গ হ'ল। আবার সু[রু] করল বলতে।]

শোভনাকে আমি সেদিন বলতে পারি[নি] না—সেদিন নয়—দেড় বছরের মধ্যেও না। অ[থচ] প্রত্যেকদিন কথাটা আমি ভেবেছি, দুজনে[র] একান্ত মুহূর্ত আরো কয়েকবারই এসেছে—তবু কেন যে বলা হয়নি তা নিজেও বলতে পার[ি] না। কিম্বা মনে মনে এ আশাও হয়তো ছি[ল] যে আমি ছাড়া আর কেউই ওকে উপযাচক হ[য়ে] বিয়ে করতে আসবে না। হর্ষনাথবাবুর [...] পয়সা নেই—উদ্যমও না। আর খুব সম্ভ[ব] ইচ্ছেও নয়—কারণ সংসারের জোয়াল বইবা[র] সমস্যাটাকে স্বেচ্ছায় তিনি নিজের ওপরে টে[নে] আনতে চান না। অতএব শোভনা কেবল আমার জন্যেই অপেক্ষা করে আছে—অপেক্ষা করতে সে বাধ্য।

শোভনার জন্যেই কিনা জানিনা, বি এস-সি পরীক্ষায় অনার্স পেলুম না। এম এস-সিতে সীট পাওয়ার জন্যে তদ্বির করতে হবে কিনা ভাবছি, এমন সময় বাবার প্রভাবের ফলে ভদ্র-গোছের একটা চাকরি জুটে গেল লাইফ ইনসিওরেন্সে। বদলি করলে সম্বলপুরে।

মনে হ'ল, এইবার সময় হয়েছে।

ঠিক সেদিনের মতো আর একটি লগ্ন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সম্বলপুরে যাওয়ার দিন দুই আগে জানলা দিয়ে দেখলুম, বৌদি আর হর্ষনাথ দা রিকশায় উঠলেন। সিনেমায় চললেন ও'রা।

আরো দু ঘণ্টা আমি অপেক্ষা করলুম, অর্থাৎ সাড়ে আটটা পর্যন্ত। এক ঘণ্টা আমার সময় আছে হাতে। যথেষ্ট! আজকেও বারান্দায় তেমনি মাদুর পেতে লোহার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে আছে শোভনা। তার চারপাশে রূপকথালোভীর দল সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আকাশে চাঁদ নেই—তাই লণ্ঠনটা জোরালো। এলোমেলো হাওয়ায় অন্ধকার কৃষ্ণচূড়া দুটোর ডালপালা ভূতুড়ে নাচ নাচছে। আমার মনে হল, ভয়-জড়ানো চোখে সেদিকেই তাকিয়ে আছে।

ডাকলুম, শোভনা?

চমকে উঠে শোভনা হেসে ফেলল : কে—মণ্টুদা? ঈস—মানুষকে এমন ভয় দেখাতে পারেন আপনি!

প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, আজ আর ইনিয়ে বিনিয়ে কিছু বলব না। আমার হাতে মাত্র এক ঘণ্টা সময়। সাড়ে ন'টার ভেতরে হর্ষনাথ আর বৌদি ফিরে আসবেন।

মাদুরের কোণায় বসে পড়ে বললুম, পরশু আমি সম্বলপুরে চলে যাচ্ছি।

—জানি, ভালো চাকরি হয়েছে আপনার।

একবারের জন্যে দ্বিধা করলুম। তারপর সোজা প্রশ্ন করলুম : তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

শোভনা হেসে উঠল : বা-রে, আমাকে নিয়ে যাবেন কেন?

—যদি নিয়ে গিয়ে তোমাকে বিয়ে করি?

আশা করেছিলুম, লজ্জায়, কৃতজ্ঞতায়, দুঃখে শোভনা কেঁদে আমার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়বে। উপন্যাসে এ-রকম অনেক বিবরণ আমি পড়েছি। আর পাত্র হিসেবে বাংলা দেশে আমি কত লোভনীয়—সেও আমি জানি। অথচ কই—কোনো প্রতিক্রিয়াই তো হলনা শোভনার।

(ইহার পর ১৫৮ পৃষ্ঠায়)

কুঞ্জবিহারী ছিলেন আমার প্রতিবেশী। প্রতিদিন সকালে আসতেন। খবরের কাগজগুলো উল্টেপাল্টে দেখে এবং এক পেয়ালা চা পান করে চলে যেতেন।

বয়স হয়েছিল প্রায় পঁয়ষট্টি। কাজকর্ম বিশেষ করতেন না। সামান্য কিছু পেন্সন ছিল, তাতেই এক রকম করে দিন চলত। নিরিবিলি নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। বড়-একটা কথা-বার্তা বলতেন না। ভদ্রলোককে তাই ভালো লাগত আমার।

হঠাৎ একদিন হলদে মলাটের একখানা খাতা আমার হাতে এগিয়ে দিয়ে সসঙ্কোচে বললেন, আপনি ব্যস্ত মানুষ, বলতে খুব কুণ্ঠা হচ্ছে! তবু যদি সময় মতো এটা একটু পড়েন, তাহলে খুশী হব। লিখেছিলাম এক সময়ে, যখন যুবক ছিলাম!

এরকম স্থলে সাধারণত সময়াভাবের অজুহাতটাই দেখান সবাই। কেউ সবিনয়ে কেউ রূঢ়ভাবে, যাঁর যেমন ধরণ। কিন্তু কুঞ্জবাবুকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না। তাঁর ব্যবহারের মধ্যেই ছিল এমন একটা বিনম্র শালীনতা, যাকে মর্যাদা দিতে হয় সকলেরই!

বললাম, একটু দেরী হলে চলবে ত? এই ধরুন মাস দেড়েক।

স্বচ্ছন্দে, স্বচ্ছন্দে। দেড় মাস কেন, তিন মাস হলেও ক্ষতি নেই। আগামী বৈশাখ নাগাদ ওটা ছাপিয়ে ফেলব ঠিক করেছি। তার আগে আপনি একটু চোখ বুলিয়ে দেন যদি...

এই পর্যন্ত কথা। খাতাটি ফাইলবন্দী করে আলমারিতে তুলে রাখলাম। হঠাৎ একদিন খেয়াল হল, কুঞ্জবাবুকে যেন অনেক দিন দেখছি না। জিজ্ঞাসা করে শুনলাম হার্টের অসুখে কাবু হয়ে হাসপাতালে গেছেন!

মনটা খারাপ হয়ে গেল। রোজই সকালে আসতেন ভদ্রলোক। নিজের অলক্ষ্যেই গড়ে উঠেছিল কেমন একটু মমতার বন্ধন। ভাবলাম শনিবার বিকালে দেখে আসব একবার। কিন্তু শুক্রবার সকালেই কুঞ্জবাবুর ছোট ভাই দেবী-বাবু এসে খবর দিলেন, কুঞ্জবাবু মারা গেছেন।

বলা বাহুল্য, নিদারুণ ব্যথা পেলাম। তখন টেনে বের করলাম আলমারি থেকে কুঞ্জবাবুর খাতাখানা। এক খানা শ-দেড়েক পৃষ্ঠার ডায়েরী। ঝকঝকে পরিষ্কার অক্ষরে লেখা এবং বিস্ময়ের কথা, ঝরঝরে সুন্দর বাংলায়! কোথাও তাতে কাব্যরস, কোথাও কৌতুক। পড়তে পড়তে তিন ঘন্টায় শেষ হ'ল খাতাখানা। অবাক হয়ে গেলাম! যে কুঞ্জবাবুকে এত দিন জেনেছি, সেই আধ-ময়লা ফতুয়া গায়ে চটি পায়ে ঈষৎ শীর্ণ দেহ সাধারণ ভদ্রলোকটি, তাঁর মূর্তিটা যেন প্রতিভাত হতে লাগল আমার চোখে সম্পূর্ণ আলাদা রূপে।

এ কুঞ্জবাবু কবি, দার্শনিক, দিব্য দৃষ্টি-সম্পন্ন বিবাগী, মুক্ত পুরুষ! এত কাছে ছিলেন ভদ্রলোক, অথচ চিনি নি। আজ দূরে চলে গেছেন, আজ পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর পূর্ণ রূপটি। এ-ই হয় দুনিয়ায়।

কুঞ্জবাবুর এই ডায়েরীটা বই হিসাবে ছাপান উচিত। কিন্তু জানি কোন উৎসাহী ব্যক্তিই তা ছাপাবেন না। কারণ এমন অনেক কথা আছে এতে, যার ঝাঁজ বা ঝাল পরিপাক করা সহজ নয়। যথাসম্ভব নিরীহ ও নিরাপদ কয়েকটি অনুচ্ছেদ তুলে দিচ্ছি এখানে আপনাদের জন্যে!

জননী জন্মভূমিশ্চ

এই জন্মভূমিতে আমার কণামাত্র ভূমি নেই। ভাড়াটে বাড়ীতে থাকি, ইংরেজী বিদ্যা ভাঙিয়ে চাকরি করি। তাতে যা পাই, তাই দিয়ে সংস্থান হয় অন্ন-বস্ত্রের। আজ যদি চাকরি যায়, কাল অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় দেবে বাড়ীওয়ালা। এই সুজলা সুফলা দেশে নর্দমার জল আর বট নিম আশ্‌শ্যাওড়ার ফল ছাড়া প্রাণপাখীকে খাঁচায় জীইয়ে রাখার আর কোন সম্বল নেই। এই যেখানে অবস্থা, সেখানে চাকরি নিয়ে লণ্ডন, নিউইয়র্ক, তেহরাণ বা হংকং চলে গেলেই বা ক্ষতি হত' কি? স্বজাতি ও স্বভাষাভাষীদের পাব না? তা পাব না ঠিকই, কিন্তু এই স্বগোষ্ঠীর ব্যবহারে যে দৈন্য, ঈর্ষা ও ক্লৈব্যের পরিচয় পাই, তা-ও ত পাব না!

মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন

আমাদের দেশে সত্যকার জীবনচরিত লেখা হয় নি কারুর। সব চরিতই হয়েছে এদেশে চরিতামৃত। জীবনের কোন অধ্যায়ে একটা কিছু ভালো কাজ করে যিনি মহৎ হয়েছেন, তাঁর সবগুলি অধ্যায়কেই এদেশে মহত্ত্বের রঙে চুবিয়ে নেওয়া হয়। তাই দেখবেন, ছেলেবেলা থেকেই সমস্ত বিখ্যাত লোকের অসামান্য ধী-শক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে। সবাই দয়া, মানব প্রীতি, সত্যনিষ্ঠা ও বিদ্যানুরাগে ভূষিত ছিলেন! অথচ দলিল দস্তাবেজে দেখছি, অনেকে তাঁরা ফেলের স্রোত পাড়ি দিতে দিতে গেছেন স্কুল কলেজে। যাকে স্বভাব চরিত্র বলে, অনেকের তা ভালো ত নয়ই, চলনসইও ছিল না! তবু কেন এই অলীক মহত্ত্বের কাহিনী? তার কারণ খোলা চোখে সত্যের দিকে তাকানোর সাহস নেই আমাদের। মহৎ মানুষও যে মানুষ এবং সেই জন্যেই যে দোষ তাঁর কিছু-না-কিছু না থেকে পারে না, এ কবে বুঝব আমরা?

না ঘরকা না ঘাটকা

একদিকে চেঁচান হচ্ছে, বিজ্ঞান ও কারিগরী শিল্পের বিস্তার চাই। জড়তা, মূঢ়তা ও কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ চাই! বলা হচ্ছে, জীবনটা সত্যি, তার ক্ষুধা তৃষ্ণা সত্যি। বিজ্ঞানই এই বাস্তব অস্তিত্বের একমাত্র বন্ধু ও সহায়। অতএব তার অনুশীলন চাই। অন্য দিকে বলা হচ্ছে, জৈব অস্তিত্বটাই সব নয়। ওটা দু-দিনের। নিত্য কালের যে আত্মা তা জরা-মরণ বিজয়ী। ভারতবর্ষই বুঝিয়েছে মানুষকে তার স্বরূপ। দেখিয়েছে তাঁর সমুন্নতির উপায়। বিজ্ঞানের ভ্রান্ততায় সেই ভূমাকে ভুলে ঐহিকের নামে মাতামাতি করে যে, সে জড়বুদ্ধি। ভারতবাসী নামেরই অযোগ্য সে। ...এই যে দুটো দুই কিনারার [illegible], এর কোনটাতেই আস্থা নেই আমাদের। তাই একই সঙ্গে দু-পারে পা রেখে দাঁড়াতে চাইছি আমরা। কিন্তু তা কি সম্ভব?

ALL THAT GLITTERS

সব চেয়ে নীচু ধাপের মানুষ পর্যন্ত যদি কল্যাণের কিছুটাও পেঁছে দিতে পারি, তা'হলেই জানব দেশকে যথেষ্ট সেবা করেছি আমরা, এই কথা বলেছেন কোন বিখ্যাত নেতা। বেশ কথা, কিন্তু চিরদিনই ত আমরা নিজেরা দুধটা খেয়ে বাটিটা মাজার জন্যে নীচু ধাপের কাছে ঠেলে দিয়েছি। আজ আর একটু নূতন কিছু করলে হয় না? কল্যাণটা সমানভাবে বেঁটে নিলে হয় না? তাতে আমার দুধ হয়ত একটু কমবে, কিন্তু যার বরাতে কোন দিন দুধ জোটে না, সে ত পাবে খানিকটা!

যখন নিববে আলো

মৃত্যুর আগে যদি কঠিন অসুখ হয়, যতটা পারো ডাক্তারী চিকিৎসা করিও। শান্তি স্বস্ত্যয়ন, বটুক ভৈরবের স্তোত্র, চরণামৃত খাওয়ান, ও সবের প্রয়োজন নেই। মরার পর চোখে তুলসী পাতা, কপালে চন্দন দিও না। শবযাত্রায় কোন আওয়াজ থাকবে না। লরীতে উঠিয়ে ক্রিমেটোরিয়ামে নিয়ে যাবে। অশৌচ, শ্রাদ্ধশান্তি, জ্ঞাতিভোজন, ও-সবও করতে হবে না। এইগুলো কোন লাইব্রেরীকে দেবে। জামা-কাপড় দিয়ে দেবে গরীবদের। কদাচ স্বপ্নেও ভেবো না, আমি কৈলাসে বসে বাবা মহাদেবের সঙ্গে সিদ্ধির হালুয়া খাচ্ছি বা নন্দন বনে শ্রীমতী ঊর্বশীর সঙ্গে ফক্সট্রট নাচছি! যে মরে, সে নিঃশেষেই ফুরিয়ে যায়!

কুঞ্জবাবুর ডায়েরীর এই বিচ্ছিন্ন কয়েক টুকরো থেকেই আশা করি লোকটির সজাগ মননশীলতা ও ঋজু ব্যক্তিত্বের ছোঁয়া পেয়েছেন পাঠক-পাঠিকা। আরো অনেক নিদর্শন দিতে পারতাম। কিন্তু প্রথম ভয় পুলিশকে, দ্বিতীয় ভয় পরিমল গোস্বামীকে। তাই এই পর্যন্তই রইল।

অংক

প্রশ্ন : আচ্ছা, কোন ব্যক্তি ১৯০১ সালে জন্মালে, এখন তার বয়স কত!

উত্তর : ব্যক্তি পুরুষ না নারী?

অটুট বন্ধুত্ব

যেখানে দুজনের রুচির মিল, সেখানেই বন্ধুত্ব বেশী স্থায়ী হয়। এই সাইকেলের বেলাতেই দেখুন না!
র্যালে সাইকেলের উৎকর্ষ সম্বন্ধে সকলেই একমত। কারণ সুদৃশ্য ও নিখুঁত এই সাইকেলটি বছরের পর বছর ব্যবহারের পরেও সমান নির্ভরযোগ্য থাকে।

বিশ্ববিখ্যাত
বাইসাইকেল

SRC-59 BEN

মিসেস বোসের গানের স্কুল

আশাপূর্ণা দেবী
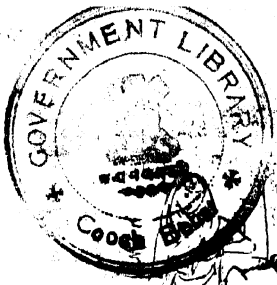
মিসেস বোসের গানের স্কুলটা উঠে গেল। প্রথমেই বলে রাখি মিসেস বোসের বয়েস চল্লিশ ছাড়িয়েছে, আর মিষ্টার বোস বিদ্যমান। কাজেই কেউ যদি স্কুল উঠে যাওয়ার সঙ্গে কোন রসকাহিনীর আশা করে বসেন তো, নিতান্তই নিরাশ হবেন। মিসেস বোসের স্কুলে না ছাত্রী না শিক্ষয়িত্রী কাউকে নিয়েই কোনদিন কোন মুখরোচক গল্প সৃষ্টি হয়নি।

এটা শুধু একটা খবর। শুধু সকলকে জানিয়ে দেওয়া মিসেস বোসের দোতলায় আজ বছর তিনেক ধরে যে গানের স্কুলটি পাড়ার কন্যাবতী মহিলাদের সন্তোষ সাধন আর কন্যাহীনদের কর্ণপীড়া বর্ধন করে বিরাজ করছিল, হঠাৎ সেটা বন্ধ হয়ে গেল।

গেল শুধু সেই একদিনের অসতর্কতায়। সেই যেদিন—

কিন্তু বিসর্জনের আগে যেমন আবাহন, উঠে যাওয়ার আগে তেমনি প্রতিষ্ঠা। সেই কথাটাই আগে বলে নিই।

নিঃসন্তানা মিসেস বোস প্রায় বছর চল্লিশ পর্যন্ত 'জীবনের অবলম্বনের' স্বপ্ন দেখে দেখে শেষ অবধি যখন নিশ্চিত হতাশ হলেন, তখন হঠাৎ একদিন বলে বসলেন, "দেখ একটা কিছু করা যাক।"

মিষ্টার বোস চমকে উঠলেন।

অনেক কিছু তো করা হলো, আবার কি!

না না সে সব কিছু নয়! লজ্জিত মুখে মিসেস বোস বলেছিলেন, "এতবড় বাড়ীটা, কত ঘর খালি পড়ে আছে, কিছু করা যায় না?"

মিষ্টার বোস হাসলেন। বললেন, "যাবে না কেন, কত করা যায়! বাইরের দিকের ঘরগুলো সব খুলে দিয়ে দোকান, ভাড়া দিতে পারা যায়। ধর বাড়ীর সামনেই একটা লণ্ড্রী, একটা পানের দোকান, একটা শাড়ী ছাপার কারখানা, একটা—"

"থামো তুমি। দোকানের কথাই যেন বলছি আমি।" মিসেস বোস বলেছিলেন, "কেন, একটা ইস্কুল খোলা যায় না?"

"ইস্কুল!"

"আহা আমি কি আর পাড়ার ইস্কুলের কথা বলছি?" মিসেস বোস এতক্ষণে যাকে বলে 'হৃদগত ইচ্ছা জ্ঞাপন', তাই করেন। বলেন "একটা গানের ইস্কুল অনায়াসেই করা যায়।"

মিসেস বোসের পরিচয়লিপিটা 'বোস-সাহেবের' সম্মানে বেশ গালভারী হলেও আসলে মানুষটা নেহাৎ সাদাসিধে দিশী। এখনও তিনি স্কুলকে বলেন 'ইস্কুল' এবং রাঁধুনীকে 'ঠাকুর', আর চাকরকে 'বাবা বনমালী' বলে ডেকে থাকেন। ছেলেবেলায় বিয়ে হয়েছিল, খুব একটা কিছু লেখাপড়ার সুবিধে হয়নি। নেহাৎ আগেকার কাল বলেই বোস সাহেবের মত এমন বর জুটেছিল। কাজেই পড়ালেখার স্কুল খোলার কথাটা তাঁর পক্ষে হাস্যকর! কিন্তু যে বিদ্যেটিকে সাধ্যমত অনুশীলন করে এসেছিলেন মিসেস বোস বিয়ের আগে আর বিয়ের পরে, সেটি নিয়ে মনের মধ্যে বেশ একটা আত্মতৃপ্তি ছিল তাঁর। তাই নিঃসন্তান জীবনের নিঃসঙ্গতা পূর্ণ করতে এই ইচ্ছেটিই মনের মধ্যে লালন করেছিলেন তিনি। একটা গানের ইস্কুল তো খোলা যায়। যখন এতবড় বাড়ী পড়ে। অবশ্য প্রাথমিক স্কুল মাত্র।

তবু ছোট ছোট পায়ের ওঠানামায় সিঁড়িটাতো মুখর হয়ে উঠবে। তাদের সুর ঝংকারে বাড়ীর বন্ধ বাতাসটাতো একটু প্রাণ পাবে! আর ছাত্রীদের সূত্র ধরে তাদের মায়েরাও তো বেশী বেশী আসবে।

আসে অবশ্য অনেকেই। 'বড়লোক' বলে ভয় করে না কেউ। 'অতিথি বৎসল' বলে সুনাম আছে বোসদম্পতীর। তবু বিনা প্রয়োজনে দৈবাৎ আসা, আর প্রয়োজনের খাতিরে নিশ্চিত আসা।

মিষ্টার বোসের শূন্যতা বোধ নেই, তিনি কাজের মানুষ। কিন্তু মিসেস বোস যে মানুষ-কাঙাল!' বাড়ী যখন তৈরী করিয়েছিলেন খোলামেলা ফাঁকার আশায় সহরতলীর সীমান্তে এসে করেছিলেন। কিন্তু বাড়ীর ভিতরটাও যে ফাঁকা রয়ে গেল চিরদিন! এত দূরে বলে আত্মীয়স্বজনও সহজে আসে না।

"তোমার স্কুলে মেয়ে দেবে কে?" বলেছিলেন মিষ্টার বোস।

"দেবে না মানে?" মিসেস বোস ঝেঁজে উঠেছিলেন, "ভাব কি তুমি? আমাকে—সব্বাই ভালবাসে।"

"বুঝলাম আমি বাদে সব্বাই ভালবাসে তোমাকে। তা হলেও নিজের মেয়ের চাইতে নিশ্চয়ই নয়? পয়সা খরচ করে মেয়েকে গান শেখাতে আসবে তোমার স্কুলে—'

'পয়সা খরচ করে!' আকাশ থেকে পড়েছিলেন মিসেস বোস, 'পাড়ার মেয়েদের কাছ থেকে পয়সা নেব আমি?'

'পয়সা নেবে না?' হো-হো করে হেসে উঠেছিলেন মিষ্টার বোস 'তাই বল? বিনি মাইনের স্কুল! কি নাম দেবে? 'দাতব্য সঙ্গীত বিদ্যালয়?'

মিসেস বোস কাঁদো-কাঁদো হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'আমি কি পয়সার অভাবে ব্যবসা করতে চাইছি?'

মিষ্টার বোস জানেন, এই থেকেই কোন কথা এসে পড়বে, তাই তাড়াতাড়ি আবার তখন তোয়াজ করতে সুরু করেন, 'আরে মুস্কিল, ঠাট্টা বোঝ না? তবে কি জানো, দাতব্যের জিনিষে মানুষের কখনো শ্রদ্ধা আসে না। তুমি এক রকম ভেবে মাইনে না নিয়ে চালাতে চাইবে, লোকে অন্য দৃষ্টিতে দেখে তাচ্ছিল্য করবে। যে জিনিসটার জন্যে যত মূল্য দিতে হয়, সে জিনিষটার প্রতি তত সমীহ আসে লোকের। মাইনের ব্যবস্থা না থাকলে কেউ 'স্কুলই বলবে না। নিয়মিত আসবেও না।'

মিসেস বোস একটু গুম্ হয়ে থেকে বললেন, 'বেশ! ঠিক আছে। মাইনেই নেব। তবে সামান্য কিছু নেব।'

অতঃপর সেইদিনই মিষ্টার বোসকে যেতে হ'ল সাইন বোর্ডের অর্ডার দিতে, আর মিসেস বোস লেগে গেলেনে চাকরকে দিয়ে ঘর খালি করাতে। সামনের দিকের সব চেয়ে ভাল ঘর দু'খানায় স্কুল বসল! কার্পেট পাতা মেজে, টেবিলে ফুলদানী, দেয়ালে দেয়ালে ভাল ভাল ছবি, আর মিসেস বোসের নিজের সখের হারমোনিয়ামটি!

আপাততঃ ওইটা দিয়েই কাজ চলুক, এরপর স্কুলের নিজের টাকাতেই কেনা যাবে দু'-একটা বাজনা। মাইনেই যখন নেওয়া হবে।

এরপর সাইন বোর্ড এল, বিল বই ছাপা হ'ল, দোরে মঙ্গল কলস বসিয়ে তোড়জোড় করে স্কুল খোলা হ'ল। স্কুলের নাম হল 'কল-ঝংকার', মাইনে ধার্য হ'ল মাসিক আট আনা।

মিষ্টার বোস বিল বই ছাপানোর সময় মুচকি হেসে বলেছিলেন, 'আট আনা? তা ওটা 'বাৎসরিক চাঁদা' করে দিলেও পারতে।'

মিসেস বোস রাগ-রাগ করে বলেছিলেন, 'অত ঠাট্টা করবার কিছু নেই। সকলেই ছাপোষা গেরস্থ লোক—'

মিষ্টার বোস জানালা দিয়ে নিউ আলিপুরের এই বর্ধিষ্ণু 'ব্লক'টির দিকে যতটা চোখ চলে তাকিয়ে দেখলেন। ছক্ কাটা রাস্তার দু ধারে ভাল ভাল নতুন বাড়ীর সারি, অনেকেরই বাড়ীর দরজায় গ্যারেজ, আত্মস্থ গৃহকর্তা, আর উন্নাসিকা গৃহিণী সম্বলিত এই পাড়াটিকে করুণা করাটা বাহুল্য উদারতা। তবু সেটা আর প্রকাশ করলেন না মিষ্টার বোস, ভাল মানুষের মত বললেন, 'তা বটে!'

ইস্কুল সুরু হল। প্রথম দিনেই সাতটা মেয়ে কম কথা না কি! ছাত্রীদের আর তাদের মায়েদের প্রথম দিনে প্রচুর সন্দেশ, সিঙ্গাড়া আর চা খাওয়ালেন মিসেস বোস, আর প্রত্যেককে অনুরোধ করলেন যেন তাঁদের অপর বান্ধবীদের অবহিত করিয়ে রাখেন মিসেস বোসের 'কল-ঝংকার' সম্পর্কে।

তা' কথা তারা রাখল।

এ 'ব্লক' পার হয়ে অন্য 'ব্লক' থেকে ছাত্রী এসে এসে ভর্তি হতে লাগল। সমস্ত সন্ধ্যাটা পাড়া মুখর করে চলতে লাগল গানের মহলা। ছাত্রীদের বয়েস প্রায়শঃই পাঁচ থেকে এগার-বারো, কাজেই আর যাই হোক গলা খুলতে লজ্জা পেতে দেখা যায় না তাদের। মিষ্টার বোস নিজের দোতলার 'পাঠ কক্ষ' ত্যাগ করে সন্ধ্যাবেলা নীচের তলায় গিয়ে বসতে সুরু করলেন।

কিন্তু সে তো সমুদ্রে বালির বাঁধ মাত্র।

'সা-রে-গা-মা—পা-ধা-নি-সা' ধ্বনিতে রোজ মাথা ধরতে সুরু করল তাঁর। ধ্বনি মাত্র তো নয়, ধ্বনি তান্ডব যে!

তবে মিসেস বোসের সাধের 'কল-ঝংকার' নামটা বড় বিশেষ গ্রাহ্য করল না কেউ, সকলেই বলে 'মিসেস বোসের গানের স্কুল।' তা বলুক, নামেতে কি আসে যায়? মিসেস বোসের প্রাণ তো ভরাট হয়ে উঠেছে!

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মেয়েদের সঙ্গে তাদের মায়েরাও আসে। আসবে না কেন সুবিধে রয়েছে যখন! সমস্ত সন্ধ্যাটা বনমালী চা তৈরি করতে করতে হিমসিম খেয়ে যায়, ওদিকে টফি লজেন্সের সম্ভার জোগাতে জোগাতে মিষ্টার বোস চিন্তিত।

শেফালী মিসেস বোসের সব চেয়ে অনুরক্ত একটি কর্মিতকর্মা পাড়াতুতো বোনঝি! ছাত্রী সংখ্যা বর্ধনের ব্যাপারে তার জুড়ি নেই। প্রায়ঃশই একটি করে মেয়ের হাত ধরে এসে দেখা দেয় সে। কিঞ্চিৎ লজ্জিত মুখে সপ্রতিভ হাসি টেনে এনে বলে, 'মাসীমা, এই আপনার আর একটি ছাত্রী বাড়ল।' তারপর গলা নামিয়ে বলে, 'তবে একটা কথা, এদের অবস্থা তেমন 'ইয়ে নয়' আমার কাছে অনুরোধ করছিল ওর মা, যদি ফ্রি হয়! আমি কিন্তু মাসীমা বড় মুখ করে বলে এসেছি—তার জন্যে কোন চিন্তা নেই।'

মিসেস বোস এক গাল হেসে বলেন, 'বাবাঃ শেফালী, এই সামান্যর জন্যে তোমার এত ভাবনা! লজ্জা কেন? ভর্তি করে নাও।'

ভর্তি করে নেওয়ার বিধি-নিয়মগুলি শেফালীরই রপ্ত বেশী। আর এ রকম 'ইয়ে' বিহীন অবস্থার ছাত্রীতে ঘর ক্রমেই ভরে উঠতে থাকে।

পাড়ায় ধন্য ধন্য পড়ে গেছে মিসেস বোসের আর মিসেস বোসের ইস্কুলের সুখ্যাতিতে। 'এমন মানুষ হয় না,' আর এমন যত্ন নিয়ে নাকি 'সত্যিকার স্কুলেও শেখায় না।

'এমন মানুষ হয় না' একথা লোকে শুধু আড়ালে বলেই ক্ষান্ত হয় না, দোহাত্তা সামনেও বলে। শেফালী, চামেলী, মাধবী, অপর্ণা, রেখা শিপ্রা, কেয়া, কমলা এবং আরো অনেকে। এরা ছাত্রী নয় অভিভাবিকা।

'সত্যি মাসীমা আপনার মত লোক সংসারে দুর্লভ।' 'যাই বলুন মাসীমা, আপনার ওপর আমরা যে দৌরাত্ম্যিটা করি,—অন্য কেউ হলে তাড়িয়ে দিত!!

অনেকে 'দিদিও' বলে। 'আচ্ছা দিদি, কি করে আপনি এত ভাল হলেন বলুন তো? আজকালকার দিনে তো এমন দেখি না।'........ 'আপনার কাছে আসার লোভে আমরা সকাল সকাল সংসারের কাজ সেরে নিই বাবা।'

লজ্জিত কুণ্ঠিত অথচ আনন্দে উদ্বেলিত মিসেস বোস তাদের প্রশস্তি বাক্যে বাধা দেন, 'কি যে বল ভাই, তোমরা আমার বাড়ীতে আসছ, আমার স্কুলে মেয়ে দিচ্ছ এতে আমারই কি কম আনন্দ?'

স্কুল ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখেন মিসেস বোস, চাঁদের হাট-বাজার একেবারে। দুখানা ঘরই প্রায় ভর্তি হয়ে উঠেছে। মিসেস বোসের পক্ষে একা সামলানো শক্ত হয়ে উঠেছে। তবু আবার যখন শেফালী কি চামেলী, মাধবী কি কমলা একটি মেয়ের হাত ধরে এসে দাঁড়ায়—'আবার একটিকে নিয়ে এলাম মাসীমা—' তখন সমান আগ্রহেই তাকে ভর্তি করে নেন মিসেস বোস। আর অপর পক্ষের লজ্জিত কৈফিয়তের উত্তরে ব্যস্ত হয়ে বলেন, 'তাতে কি? তাতে কি? এর জন্যে তো আর বাড়তি কিছু লাগবে না আমার? আলোও জ্বলছে, পাখাও ঘুরছে, চাকরও রয়েছে—, বিশজনের মধ্যে আর একজন না হয় এসে বসলই।'

মিসেস বোসের কণ্ঠে মধু ঝরে।

কিন্তু শিক্ষিকা আরও একটি আশু প্রয়োজন।

শিপ্রা, রেখা, কেয়া, অপর্ণা ওরা কজনেই কিছু না কিছু গান-বাজনা জানে, অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার কাজ চালিয়ে দিতে পারে। কুণ্ঠিত হয়ে সে অনুরোধ করেও ছিলেন মিসেস বোস, কিন্তু ওদের সময় কোথায়? সংসারের ব্যাপার খাটতে খাটতেই প্রাণ যাচ্ছে ওদের, আবার বাইরের ব্যাপার!

অতএব কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েই জোগাড় করতে হবে।

অগত্যা। আবার মিষ্টার বোস।

চিরদিনের পারের কান্ডারী!

মিষ্টার বোস বলেন, 'বেশ না হয় বিজ্ঞাপন দিয়ে জোগাড় আমি করে দিলাম। কিন্তু সে তো আর মিসেস বোসের মত বিনা মাইনেয় কাজ করবে না?'

'করবে না তা আমি জানি না যেন—' মিসেস বোস বকে ওঠেন, 'সম্ভবমত মাইনে তো দিতেই হবে।'

'তা' স্কুল ফান্ডে আছে তো সে রেস্ত?'

মিসেস বোস বোঝেন এ তাঁকে অপ্রতিভ করবার এক ছল স্বামীর। কারণ স্কুল ফান্ডে কি আছে না আছে মিষ্টার বোস জানেন না? মিসেস বোসের চাইতে বেশীই জানেন। ভারী অভিমান আসে তাঁর। বলেন, 'জানোনা কি তুমি আছে না আছে?'

'জানি বলেই তো চিন্তিত হচ্ছি। দেবে কোথা থেকে?'

'তা জানি না! সে তুমি যা হয় করো।'

'আচ্ছা এ কি অবুঝের মত কথা তোমার বলতো? এই সেদিন দু দুটো হারমোনিয়ম কেনা হ'ল ঘরের পয়সা দিয়ে।'

'বাঃ হারমোনিয়মের অভাবে কি অসুবিধেটা হচ্ছিল জানোনা যেন! কাজই চলছিল না।'

'কাজ চালানো মানে তো ওই বিনা মাইনের ছাত্রীদের—'

'আঃ কি হচ্ছে? চুপ কর। ও ঘরে অপর্ণা আছে।'

(ইহার পর ১৫৭ পৃষ্ঠায়)

দেশ সেনগুপ্তের চতুষ্পাখী

মেয়ে
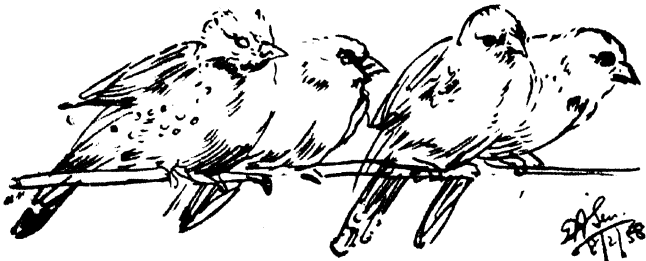
গজেন্দ্রকুমার মিত্র

অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা—এই ইংরেজী প্রবাদটি বোধ করি ভগবানের বেলায়ও প্রযোজ্য। এ সংসারের কাণ্ড-কারখানা দেখলে অন্তত সেই বিশ্বাসটাই দৃঢ় হয়। আসলে তাঁর সৃষ্টির কাজ ফুরিয়ে গেছে, এখন যেটুকু টুকটাক হচ্ছে সেটুকুর জন্যে তাঁকে আর দরকার হয় না, চালু কারখানার মত কতকটা আপনিই চলছে সে কাজটা—ফলে ভদ্রলোকের হাত একেবারে খালি। তাই এখন তিনি কেবল সদা-সর্বদা ফাঁকরে থাকেন—কোথায় কি অঘটন ঘটিয়ে দিয়ে মজা দেখতে পারেন। অর্থাৎ স্বভাবটা দাঁড়িয়েছে তাঁর কতকটা আমাদের প্রমথবাবুর মত। কোথাও একটা ছোটখাটো 'মিসচীফ্' বাধাতে পারলে আনন্দের আর অন্ত থাকে না। নইলে এমন সব কাণ্ড হবে কেন বলুন!

কেউ ছেলের জন্য মাথা কুটছে—তার ঘরে আসছে সার সার মেয়ে; আবার কেউ কেউ একটা মেয়ের জন্যে ব্যাকুল, তার ঘরে জন্মাচ্ছে সব কটিই ছেলে। যে খেতে দিতে পারে না, তার ভাগ্যে ঘটছে বছর বছর সন্তান লাভ আর দেখুন যে কত ধনী গৃহিণী নিদেন একটি কানা-খোঁড়া ছেলের জন্যেও হাহাকার করছেন, তাবিজ মাদুলী কবচে হাজার হাজার টাকা অম্লানবদনে তুলে দিচ্ছেন রাজ্যের ঠগ জোচ্চোরদের হাতে! তাও পাচ্ছেন না তিনি।

এই ত দেখুন না আমাদের হাতীবাগানের সরলবাবু। ভদ্রলোকের ঘরে লক্ষ্মী আসছেন যেন যেচে—দোর ঠেলে। এমন কিছু ব্যবসায় বুদ্ধি নেই, সে বুদ্ধির দাবীও করেন না—তবু বছর বছর দু'খানা করে বাড়ী কলকাতা শহরে কিনতেই হচ্ছে তাঁকে, নইলে অত টাকা করবেন কি? তবু কি তাঁর মনে সুখ আছে? একটুও না। কারণ টাকাও যেমন আসছে বন্যার স্রোতের মত, তেমনি মেয়েও আসছে বছর বছর। প্রতিবারেই ভাবছেন এবার ছেলে হবে—আর একটি ছেলে হয়ে গেলেই এ-পাট তুলে দেবেন একেবারে, আর প্রতিবারেই সব দৈবগণনা, আশা এবং অব্যর্থ মাদুলি ব্যর্থ করে আসছেন এক একটি কন্যা!

আবার ভবানীপুরের তারক দত্তের কথাই ধরুন। ঘর আলোকরা পাঁচটি ছেলে; ছেলে-গুলির বুদ্ধিসুদ্ধিও এই বয়সে যতটা বোঝা যায়—ভাল। অর্থাৎ মানুষ হবে বলেই আশা করা যায়, তবু মনে সুখ নেই তাঁদের। তারকবাবুর মা পর্যন্ত প্রতি শুক্রবারে সঙ্কটার ব্রত করছেন একটি মেয়ের জন্যে। মেয়ে না হলে নাকি তাড়াতাড়ি কুটুম হয় না, নাতি-নাতনীর সাধ আহ্লাদও মেটে না। তারক-বাবুর স্ত্রী জানলা ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন দু'বেলা পাড়ার মেয়ে-ইস্কুল বসবার ও ছুটি হবার সময়। দলবেঁধে মেয়েদের যেতে দেখেন এলোচুল কিংবা বেণী দুলিয়ে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। আহা, তাঁর যদি এমনি একটি মেয়ে থাকত! ছেলে ছেলে যতই করো—ওদের ডানা গজালেই পর। মেয়েদের মত বাপ-মার 'আত্ত-শো' কেউ হয় না।

এ ত গেল এই দুদিকের কথা।

আবার দুদিকই যার বজায় হয়েছে—ভগবান কি তার জন্যেও একটি কাঁটা তৈরী করে রাখেন না!

সেই জন্যেই ত বলছি—উনিও, হাতের কাজ ফুরিয়ে যাওয়ায় শয়তানী বুদ্ধিতে বেশ পাকা হয়ে উঠেছেন।

বলছিলাম বিপাশাদের কথা। বিপাশারও অনেক সাধের মেয়ে। ওর আবার ছেলে হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই মেয়ের শখ। প্রথমবার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার সময় ওকে ক্ষেপাবার জন্য ওর বোনেরা কিংবা ওর বৌদি 'মেয়ে হবে' বললে ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত, বলত 'তোমাদের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক বাবা, মেয়েই হোক।......আমি এখন ছেলে চাই না।'

তাতে কেউ বিস্ময় প্রকাশ করলে বলত, 'না বাপু, ছোটবেলা থেকেই আমার মেয়ের সাধ।......ছেলেরা যেন কেমন পর পর—ওরা মায়ের কাজে আসে না।...তা'ছাড়া একটু বয়স হলেই ইয়ার-বগ্‌গা হয়ে পড়ে, মাকে এড়িয়ে চলে। মেয়েরা বেশ কাছে কাছেই থাকে!'

অবশ্য সে সাধ ওর মেটেনি। প্রথম সন্তান ওর ছেলেই হয়েছিল। শুধু প্রথম নয়—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়—সব কটিই তাই। তৃতীয়টি হবার সময় বিপাশা ত প্রায় কেঁদেই ফেলেছিল—'এবারেও ছেলে! মেয়ে হল' না!'......এমন কি বিপাশার স্বামী নরেশও যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। বলেছিল, 'না, ছেলে হয়েছে ভালই, তা বলছি না।...তবে দুটি ছেলে একটি মেয়ে—এইটিই বেশ মানানসই।...একটা মেয়ে না থাকলে যেন বাড়ী মানায় না।...এখন অবশ্য তুমিই মানিয়ে নিয়েছ, কিন্তু তুমি যখন বুড়ো হয়ে পড়বে, তখন তোমার তরুণী মেয়ে বাড়ী আলো করে ঘুরে বেড়াবে, সেইটিই বাঞ্ছনীয় নয় কি? তুমি কি বলো?' এই বলে মুখ টিপে হেসেছিল সে!

'আহা, মেয়ের বুঝি ঐটুকুই সার্থকতা! পুরুষ জাতটা এমনিই বটে।' ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল বিপাশা।

কিন্তু সে অনেক দিনের কথা। ওদের আর ছেলেপুলে হবে না জেনে ওরা প্রায় যখন নিশ্চিন্ত হতে বসেছে—এবং অন্তত কত বয়সে বড় ছেলের বিয়ে দেওয়া যায় সেই সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করতে গিয়ে বিপাশা ধমক খাচ্ছে নরেশের কাছে—তখন হঠাৎ একদিন এল এই খুকী!

ধপধপে ফরসা, একমাথা কালো চুল—কোল-আলোকরা মেয়ে।

নরেশের ত আনন্দের সীমা রইল না, এমনকি নরেশের পিসীমা—তিনিই ওর মায়ের মত, মানুষ করেছেন ছেলেবেলা থেকে—যৎপরোনাস্তি খুশী হয়ে উঠলেন। রীতিমত ঘটা করে আটকৌড়ে ও ষষ্ঠীপুজোর আয়োজন করলেন এবং এমনভাবেই অন্নপ্রাশনের ফর্দ নিয়ে নিত্য আলোচনা শুরু করলেন যে, সেটা নরেশের মত মোটা মাইনের লোকের পক্ষেও একটা দুর্ভাবনার ব্যাপার হয়ে উঠল।

অর্থাৎ আমরা অনুমান করে নিতে পারি যে, এতদিনের পথ-চাওয়া কন্যারত্ন আসাতে ওরা সকলেই সুখী হয়েছে।

কিন্তু সেইখানেই একটু গোলমাল রয়ে গেল!

বিপাশা পুরোপুরি সুখী হ'তে পারল না। একটা কাঁটা ওর আনন্দের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে খচ্ খচ্ করে বিঁধতে লাগল অবিরত। অথচ সে কাঁটাটা যে কোথায়, তা-ও সে মুখ ফুটে বলতে পারলে না কাউকে। অন্তত অনেক দিন পর্যন্ত পারল না।

লজ্জা, সংকোচ, বিদ্রূপের ভয় এ-সব ত আছেই, তার সঙ্গে নিজেরও খানিকটা অবিশ্বাস—সব মিলিয়ে ওর মুখটা চেপে রইল। মনের কথাটা কাউকে বলতে পারল না খুলে।

অথচ, যে দারুণ সংশয়টি প্রথম দিন থেকেই কাঁটার মত বিঁধছে খচ্ খচ্ করে—সেটাকেও উড়িয়ে দিতে পারছে না কিছুতেই। বরং যত দিন যাচ্ছে, যত পূর্ব ইতিহাস নিয়ে মনের মধ্যে তোলপাড় করছে, ততই যেন সে বিশ্বাস দৃঢ়তর হচ্ছে।

ওর মনে হচ্ছে যে, ওর এই খুকী—কোল-আলোকরা রাঙা টুকটুকে খুকী, আসলে ওর দিদি অসিতা ছাড়া আর কেউ নয়!

ইহজীবনে চিরকাল জ্বালিয়ে গেছে, আবার মরেও নিষ্কৃতি নেই—পরজন্মে আরও ভাল করে জ্বালাতে একেবারে তার ঘরে এসে জেঁকে বসেছে।......

এই সংশয় বা বিশ্বাসের মূল কারণটা বড় বিচিত্র এবং বিপাশা ছাড়া অন্য সকলের কাছে ঈষৎ হাস্যকরও হয়ত।

অসিতা ওর আপন বোন নয়, বড় জ্যাঠ্‌তুতো বোন। রংটা ময়লা হলেও দেখতে মন্দ ছিল না এবং জ্যাঠামশাইয়ের পয়সার জোর ছিল বলে বেশ ভাল ঘরেই বিয়ে হয়েছিল। অসিতার স্বামী যোগেশবাবু পাশ করা ইঞ্জিনীয়ার, নিজেদের বাড়ী, শ্বশুর মোটা মাইনের চাকরী করেন—এককথায় বাড়বাড়ন্ত সংসার। কিন্তু মেয়েটারই বরাত খারাপ। বিয়ের বছর দুই পরেই শ্বশুর হঠাৎ মারা গেলেন; সরকারী চাকরী—তখন শুধু পেনসন ভরসা ছিল। কিন্তু পেনসন পেয়ে খানিকটা বেঁচে যেতে পারলেও না হয় কিছু হত—কিন্তু ঠিক রিটায়ার হবার মুখেই মারা গেলেন ভদ্রলোক। ফলে সেদিক থেকে এক পয়সাও এল না।

এদিকে বাপের মৃত্যুর পরই যোগেশবাবুর কেমন একরকম বৈরাগ্য দেখা দিল। তাঁর মনে হ'ল সংসার নেহাৎ মায়া, জীবন অনিত্য; সে জীবন বা সংসারের জন্য এত ছুটোছুটি করার কোন মানে হয় না। তিনি চাকরিটি ছেড়ে দিয়ে ঘরে এসে বসলেন। আর সহস্রজনের সহস্র অনুরোধেও কাজকর্ম করতে রাজী হলেন না। ও'দের ধনী আত্মীয়-স্বজনের অভাব ছিল না। অনেকেই উদ্যোগী হয়ে চাকরীর প্রস্তাব আনলেন—কেউ কেউ ব্যবসার প্রস্তাবও দিলেন। যুদ্ধের বাজারে চারিদিকে যখন অসংখ্য কারখানা খোলা হতে লাগল—তখনও অনেকে টানাটানি করেছে ওয়ার্কিং পার্টনার বা বেতনভোগী ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে কাজ করবার জন্য, কিন্তু যোগেশবাবু নির্বিকার। তিনি প্রসন্নমুখে বলেছেন, 'আর ক'দিন আছি ভাই, এ ক'টা দিন আর ও-সব ঝঞ্ঝাটে যেতে চাই না। মাকে ডেকে কাটিয়ে যেতে পারলেই খুশী!'

যদি কেউ প্রশ্ন করত, 'চলবে কিসে?' উত্তর আসত সঙ্গে সঙ্গে, 'তুমি আমি কি চালাবার মালিক?......ধরো আজ যদি আমি মরেই যাই, আমার বাচ্ছাকাচ্ছা কি না খেয়ে মরবে?..... না, না, অতটা অহঙ্কার ভাল নয় নরেন (কি 'বিপুল' কি 'ক্ষেত্র'—পাত্রবিশেষে), এ সংসারে নিজেকে কর্তা ভাবা কিছু না। তুমি আমি কে!'

অথবা বলতেন, 'আসলে সময় কৈ? এই ত ক'দিনের পরমায়ু, তা কেটার যদি সবটুকুই এই সব ঝঞ্ঝাট নিয়ে থাকব ত মাকে ডাকব কখন?'

কথায় কথায় ঠাকুর রামকৃষ্ণেরও উদাহরণ দিতেন, হাতের সিগারেটটাকে টাকার বিকল্প স্বরূপ দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলতেন, 'টাকা মাটি—মাটি টাকা!......এর বেশী কিছু নয়।'

এক্ষেত্রে সংসারের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। অসিতার শ্বশুরের যা সামান্য সঞ্চয় ছিল, তা ঘটা করে তাঁর শ্রাদ্ধ করতেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। থাকার মধ্যে শাশুড়ীর ও তার কয়েকখানা গহনা। সেগুলো শেষ হ'লে ফার্ণিচারে হাত পড়ল। তাতে অবশ্য দু'দিকেই সুবিধে হল কিছু কিছু। নগদ টাকাটা ত এলই, ঘরও খালি হ'ল। ঘর ভাড়া দেওয়া ছাড়া তখন আর গত্যন্তর ছিল না—সামান্য বেশী ভাড়ার জন্য ওপরের ঘর দুটোই ভাড়াটেদের ছেড়ে দিয়ে ওদের নিচের সংকীর্ণ এবং স্যাঁৎসেতে দুটি ঘরে আশ্রয় নিতে হল শেষ পর্যন্ত।

যোগেশবাবু অর্থের ব্যাপারে এবং খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে (এটা ওটা মুখরোচক খাদ্য সম্বন্ধে ছেলেমানুষের মত আব্দার করার ভঙ্গীতে) ঠাকুরকে আদর্শ করলেও বাকীটায় তা করার আবশ্যকতা বোঝেননি। অসিতার ছোট্ট ঘর, অসংখ্য ছেলেমেয়েতে কিল কিল করত। খাদ্যাভাবে শীর্ণ এবং রুগ্ন শিশুর পাল নিয়ে বেচারী পাগল হয়ে যেত দিনরাত! কান্না আর আব্দার—যতক্ষণ জেগে থাকত এই দুটি চলত অবিরাম। ঘুমও তেমনি কম। অসিতা রাগ করে বলত, 'পয়সা থাকলে সবকটাকে আফিং ধরিয়ে দিতুম, পড়ে পড়ে ঝিমোত, আমি বাঁচতুম!'

অসিতারা যদি দূরে কোথাও থাকত ত বিপাশার এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কারণ ছিল না। এমন ত কত দরিদ্র আত্মীয়ই আছে। কিন্তু সেই-খানেই হয়েছে আরও মুস্কিল। যাকে মেয়েলি কথায় বলে, 'কানের কাছে কানাইয়ের বাসা।' নরেশ যোগেশবাবুরই দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি ভাই এবং এই বিয়েতে অসিতার হাত ছিল অনেক-

অজন্তা ফ্রেস্কো ঃ রবি দত্ত

খানিই। অর্থাৎ বলতে গেলে সে-ই ঘটকালি করেছে। সম্পর্কটা দূর হলেও এ'রা থাকতেন কাছাকাছি—এ পাড়া ও পাড়া। হেঁটে গেলেও আট-দশ মিনিটের বেশী লাগে না। ফলে শুধু যে ওদের দুরবস্থার কাহিনী নিত্য শুনতে শুনতে মন খারাপ হয়, তাই নয়—দু'বেলা যখন তখন অসিতা-বাহিনীর আক্রমণও সইতে হয় এবং শুধু যদি সেটা খরচের ব্যাপারই হ'ত—তাহলেও অতটা দুঃখ ছিল না; অসিতা যে বিপাশার জা সে পরিচয়টা উহ্য হয়ে গিয়ে নরেশদের বাড়ীতে সে যে ওর নিজের জ্যাঠতুতো বোন, সেই পরিচয়ই প্রবল হয়ে উঠেছিল। আর সেজন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু বাক্যবাণ সইতে হ'ত বিপাশাকে।

ইদানীং দুঃখে পড়ে অসিতার স্বভাবটাও বড়ই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এ বাড়ীতে এসে এদের প্রাচুর্যের মধ্যে কেবলই যেন ছোঁক ছোঁক করত। ছেলেমেয়েগুলোকে যা হোক কিছু খেতে দিতে ত হতই—নইলে বায়না আবদারে পাগল হতে হ'ত নিজেদেরই—এছাড়া আনাজ-কোনাজ চালডাল থেকে শুরু করে তেজপাতা লংকা ফোড়ন ঘি তেল—মায় কাপড় জামা একটা না একটা কিছু চাইতই অসিতা অনবরত। ভিক্ষা নয়, যেন একটা দাবীর ভাবই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এত আছে তোমাদের—কেন দেবে না—এই ভাব। বিপাশার ছেলেদের জামাগুলো ছেঁড়া ত দূরে থাক—পুরোনো হতেও তর সইত না! দু'চারদিন পার হতে না হতে অম্লানবদনে 'ক্লেম' করে বসত অসিতা, 'এত পুরোনো হয়ে গেছে, এ আর ক'দিন পরাবি। দে না, আমার ছেলেগুলো পরে বাঁচবে। তোরা বড়লোক, তোরাও যদি এমন পুরোনো জামা পরাবি ছেলেদের ত আমাদের গতি কি হবে!'

আর এই খোঁচা—এ যেন ওর মুখে লেগেই থাকত। 'তোরা বড়লোক, তোদের অভাব কি!' 'তোদের কথা ছেড়ে দে, তোরা গরীবের দুঃখু কি বুঝবি!' 'তোরা কি আমাদের আত্মীয় বলে মনে করিস!' ইত্যাদি—

হিংসে করত অসিতা ওকে, ভীষণ হিংসে করত। সে মনোভাব ইদানীং গোপনও করতে পারত না, চেষ্টাও করত না। সে তীব্র ঈর্ষ্যার বিষে বিপাশা জর্জরিত হ'ত, সে আগুনে জ্বলেপুড়ে মরত কিন্তু কিছু বলতে পারত না। প্রথমতঃ তারই বোন। দ্বিতীয়তঃ অসিতাই বলতে গেলে ওর এই সৌভাগ্যের কারণ! কথায় কথায় শোনাত, 'পেতিস কোথায় এমন সুখের শ্বশুরবাড়ী—আমি না থাকলে! ঐ ত তোর অন্য বোনদেরও বিয়ে হয়েছে,—কৈ, তোর মত ঘর-বর পেয়েছে কেউ!...তোকে ভালবাসি বলেই এত কাণ্ড করে এনেছিলুম এখানে! তা—' এই অবধি বলে চুপ করে যেত অসিতা। সে নীরবতা সহস্র বাণীর চেয়েও স্পষ্ট। অবশ্য এই 'তা'-র পরে যা উহ্য থাকত তা বিপাশা জানে।

'তা তার খুব শোধ দিলি!' এই বলতে চাইত অসিতা।

অথচ এর চেয়ে কৃতজ্ঞতার ঋণ যে কি করে শোধ দিতে হয় তা বিপাশা জানে না। ওর আর্থিক ক্ষতি ছাড়াও ওকে যা সইতে হত তা কম নয়। অসিতার উঞ্ছবৃত্তি পাড়ায় বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল। লোকে বলত, চাওয়া যেন ওর

(ইহার পর ১৫৫ পৃষ্ঠায়)

*সফল

শ্রীদিলীপকুমার রায়
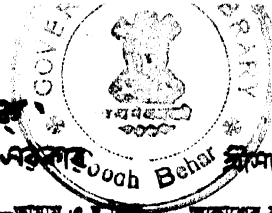
আমি এসেছি আজ দেখে সখী, ভুবন মোহনে!
সখী, দেখেছি সেই প্রিয়তমে আজকে নয়নে!
দেখেছি হৃদয়-রতনে!

তার শ্যামল বরণ, পীতবসন—রাধার সে মোহন
তার কমল নয়ন চলন বলন ঠমক অতুলন
আমি হারাই যে জ্ঞান সই, চেয়ে মুগ্ধ হ'য়ে রই,
মন-মোহন ছবি তার ছায়া প্রাণ আবেশ-লগনে!
দেখেছি হৃদয় রতনে!

যেই নামল তপন পাটে—মিলন মিলল বঁধুয়ার,
তার নূপুর-চরণ ছনন, ছনন বিছালো ঝঙ্কার
বেজে উঠল বাঁশরী মধুর সুরে নিঝরি'!
সেই তান অফুরান ছায় আজ প্রাণ
উছল মূর্ছনে!
দেখেছি হৃদয়রতনে!

ওরা বলে : "স্বপনমায়ায় সে মন
করলো গো চুরি"।
কিন্তু রূপান্তরি জীবন, মরি স্বপন-মাধুরী!
বাঁশি পুরাকাহিনী শোন্ শোন্ লো সঙ্গিনী!
মীরা জন্ম জন্ম দেখেছে এই অশেষ স্বপনে—
চেয়েছে হৃদয় রতনে।

---

* ইন্দিরা দেবীর সমাধিপ্রাপ্ত গানের অনুবাদ।

বিমূঢ় মানব

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

সুবিস্তীর্ণ পৃথিবীর
দু-প্রান্তের অধিবাসী তারা,
মধ্যে মহাসাগরের নিতান্ত দুস্তর ব্যবধান,
তবু নিরন্তর তারা
গেয়ে চলে বিদ্বেষের গান,
পরস্পর পানে চায়
রক্তচক্ষু ক্রুদ্ধ, আত্মহারা।
সহসা কি স্তব্ধ হবে
বিপুল উচ্ছল প্রাণধারা?
প্রলয় আসিবে নেমে—
নিয়তির এই কি বিধান?
হিংসা শেষে পূজা পাবে?
ব্যর্থ হবে জীবনের দান?
মুহূর্তের ভুলে হবে
সারা পৃথ্বী বিশুষ্ক সাহারা?

যে সভ্যতা গ'ড়ে উঠে
তিলে তিলে আর পলে পলে,
চিহ্ন মাত্র খুঁজে তার
কোথাও পাবে না চরাচরে।
মৃত্যু কি হবে জয়ী?
প্রাণ হবে আহুতি অনলে?
বীরত্ব কে বলে? জেনো,
ভীরু তারা অন্তরে অন্তরে।
সেই সন্ত্রাসের ছায়া,
দিকে দিকে হেরি জলে-স্থলে,
সে তো অমৃতের নয়,
মৃত্যুর তপস্যা তারা করে।

প্লে-ব্যাক্

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার

প্লে-ব্যাক্ প্লে-ব্যাক্ শুধু—তামাম এ দুনিয়া
তাজ্জব ব'নে গেনু দেখিয়া ও শুনিয়া।
সন্দেশ কাঁঠালের রসে আমসত্ত্ব—
রূপালী-পর্দা 'পরে শিখিনু এ তত্ত্ব।
ফুটিতেছে কুহুতান দাঁড়কাকী-কণ্ঠে,
কোকিল-কাকলি কাকী জমে জমে বণ্টে!

ফিলিম্ দেখিতে গেনু কৃষ্ণ-চরিত্র,
নারদ সেজেছে সেথা মন্মথ মিত্র।
গানের বালাই নাই মিত্রের বংশে,
তবু সে গাহিল গান নারদের অংশে।
নারদের গান শুনে চোখে এল অশ্রু,—
সে-গান গেয়েছে নাকি মাহ্‌মুদ খসরু!

প্লে-ব্যাক্ নহে তো শুধু নাটকের দৃশ্যে,
প্লে-ব্যাক্ কত না রূপে ঘটিছে এ বিশ্বে।
বাজারে চড়িলে দর নানাবিধ পণ্যে,
জানো কি প্লে-ব্যাক্ করে পশ্চাতে অন্যে?
তোমরা ও-দুটি চোখে দেখিবারে পাও না—
ওরা শুধু ঠোঁট নাড়ে, ওরা গায় গাওনা।

রাস্তায় ঘাটে আর ময়দানে পার্কে
চলেছে পুতুল-নাচ,—দেখে নাই আর কে?
নাচিতেছে তালে তালে, দুলিতেছে অঙ্গ,
কোথাও নাহিক ছেদ, নাহি যতিভঙ্গ।
চেয়ে দেখ—নির্বোধ, নাচিতেছে যাহারা—
আড়ালে প্লে-ব্যাক্ করি নাচাইছে কাহারা?

দুনিয়াতে এই নীতি হয়ে গেছে ধার্য,
সিকুরিটি কৌন্সিলে চলেছে এ কার্য।
চলেছে প্লে-ব্যাক্ দেখ অ্যাক্‌টে ও ট্যাক্‌টে—
ন্যাটো ও সিয়াটো আর বাগদাদ-প্যাক্‌টে।
প্লে-ব্যাকের ধ্বনি পুব-এশিয়ায় বাজছে—
মিশর সিরিয়া ইরাকেত্যাদি রাজ্যে।

সেকালে প্লে-ব্যাক্ ছিল—আছে মহাভারতে,
খুঁজিয়া দেখিতে পারো মহেঞ্জোদাড়োতে।
চিন্তিত রাজকুল আশঙ্কাকীর্ণ—
কি করিয়া পুন্নাম হবে উত্তীর্ণ।
সমাধান ক'রে দিত কৃপাকণা বর্ষি'।
প্লে-ব্যাক্ করিয়া কত মুনি ও মহর্ষি।

স্পষ্টই লেখা আছে হিন্দুর গ্রন্থে—
বেদ-উপনিষদের আদি থেকে অন্তে—
পরমপুরুষ নাকি প্রকৃতির সঙ্গে,
প্লে-ব্যাক্ করিছে সদা নানা লীলারঙ্গে।
মোরা হেথা হাত-পা ও চোখ-মুখ নাড়ছি,
উঠে, ব'সে, শুয়ে শেষ-নিঃশ্বাস ছাড়ছি!

—মর্যাল—

প্লে-ব্যাকের হাত থেকে নাই কারো নিস্তার—
তিন কাল ধ'রে এর ত্রিভুবন-বিস্তার।
প্লে-ব্যাক্ তোমারো শিরে ঝুলিছে অলক্ষ্যে :
একদা দেখিবে তুমি সচকিত চক্ষে—
গলা ক'রে কুটকুট খেয়ে গেল ওল কে,
গাজিকা খেল কেবা, হাতে তব কোল্কে!

অভিশপ্ত

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আকাশের যত তারা জ্বলে জ্বলে নিবে গেছে
কোন্ সে সকালে,—
তখন হয়ত তুমি কোনো এক গ্রামাঞ্চলে
ছায়াঢাকা আম্রকুঞ্জে সরুপথে চলিছ একাকী;
হয়ত নিকটে কোনো প্রোষিতভর্তৃকা
সারা রাত্রি জেগে জেগে ব্যর্থ প্রতীক্ষায়
মুক্ত বাতায়ন তলে পড়েছে ঘুমায়ে,
কেশ-বেশ অবিন্যস্ত;
অস্বস্তির কালিমার রেখা
নিমীলিত দুনয়নে, অভিমানে স্ফুরিত অধর
বিরহ-কাতর ব্যথা গুমরায়
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে—
সুন্দর এ কল্পনারে বর্ণবৈচিত্র্যের সমারোহে
যত পার কর লোভনীয়,
আশ্লেষচুম্বন সুধা পান কর দিবাস্বপ্নঘোরে।
মান অভিমান আর বিরহ মিলনে
যত সাধ যত আশা যত ব্যর্থ বিবশ বাসনা
কৃপণের মত তুমি রেখেছ সঞ্চিত
জীবনের স্তরে স্তরে
সন্তর্পণে অতি সংগোপনে,
শিহরিত বিশ্বাসে তাহার
অভিশপ্ত প্রেম আজি, উপেক্ষিত নব অনুরাগ।

সমুদ্র-কন্যা

বটকৃষ্ণ দে

সমুদ্র তোমার চোখে।
দূরগামী নাবিকের মতো
দৃষ্টির দিগন্ত দেখে,
পার হয়ে নীলের নিশানা
পেয়েছি দ্বীপের শান্তি,
অবশেষে। দূরে রেখায়িত
সবুজের শুভ স্পর্শ, জীবনের।
কতো সে অজানা
ঢেউ ঝড়, ভ্রূকুটির,
রাত্রির মেঘের বিদ্যুতে
(অপ্রেমের দুর্বোধ আভাসে!)
তবু হয়েছে তো যেতে,
নায়ক সাজিয়ে তুমি
যে প্রেমের নিষ্ঠুর খেলায়
আমাকে করেছ হৃত-সর্বস্ব,
তারি যে সাধনায়
পেয়েছি উত্তর আমি
তোমার সম্মতি আঁকা চোখে!
এই মেঘে বিদ্যুতের ডাক,
আর এই চন্দ্রিমার
খুশি ঝরোঝরো আলো,—
কারসাজি বলোতো এ কার?
তার, যে গোপনে আসে
সহসা দোঁহার মনোলোকে!
সমুদ্র তোমার চোখে—
আমি এক ডুবুরীর মতো
সে—অতল তল থেকে তুলে আনি
প্রেম-মুক্তা যতো।

দূরের মানুষ

বিজয়ভূষন দাশগুপ্ত

পোড়া সিগারেটটা কাঁচের জানালার ফাঁক গলিয়ে ফেলতে যাচ্ছিল নীরেন। হঠাৎ তার হাত চেপে ধরলেন থ্রকমর্টন সাহেব। 'করছো কি! পুলিশ এক্ষুণি ধরে নিয়ে যেতে পারে।' নির্জন পথ, জনমানবের সাড়া নেই, বাঁধানো রাস্তার দুই পাশে সবুজ ঘাসের সারি। রাস্তার বাইরে সেই ঘাসের মধ্যে একটুকরো পোড়া সিগারেট ছুঁড়ে ফেলাও অপরাধ!

কিন্তু ইংল্যাণ্ডের ধরণই ওই। নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া কোন আবর্জনা কোথাও তারা ফেলতে দেবে না। নিজেরাও ফেলবে না, অন্যকেও বাধা দেবে। তাই ঘরে বাইরে, পথে ঘাটে, পার্কে, খেলার মাঠে, পণ্যবিপণিতে, ড্রইংরুমে বা ডিনার হলে পরিচ্ছন্নতার একটা অপূর্ব শোভা ইংল্যাণ্ডের সর্বত্র অবিচ্ছিন্নভাবে বিরাজ করছে। ঘর-বাড়ী পুরানো হলেও তাকে ঘষে মেজে ধুয়ে মুছে চূণকাম করে এমন পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয় যে, দেখলে তা নূতন বলেই মনে হয়। অনেক খুঁজলে হয়তো একটা জীর্ণ বাড়ী পাওয়া যাবে, কিংবা পথের কোথাও হয়তো এক টুকরা ছেঁড়া কাগজও আবিষ্কার করা যেতে পারে, কিন্তু সেটা নিয়ম নয়, ব্যতিক্রম মাত্র। প্রথম দর্শনে ইংল্যাণ্ডের এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সামগ্রিক রূপটাই ভ্রমণকারীদের চিত্ত আকৃষ্ট করে। ইংরেজীতে প্রবাদ আছে যে, ঐশ্বরিক রূপের পরেই পরিচ্ছন্নতা। বৃটেনের অধিবাসীরা তাদের চালে চলনে পোষাকে পরিচ্ছদে তার প্রমাণ দিয়েছে।

মোটর চলছে অবিরাম, বাস ছুটছে মিনিটে মিনিটে, কিন্তু চমকভাঙ্গা হর্ণের চীৎকার কোথাও নেই। সারা বৃটেনে এক মাসে খুব কম করেও বারোশ' মাইল মোটরে ঘুরেছি, তার মধ্যে লণ্ডনের বাইরে মাত্র একবার নটিংহামে এক সেকেণ্ড মাত্র অতি মৃদু একটি হর্ণের শব্দ শুনেছি। টায়ার ঘষে মোটরের পথচলার শব্দ সর্বদা আছে, খচ্ করে থেমে যাওয়ার শব্দ আছে, কিন্তু হর্ণের চীৎকার একেবারেই নেই। প্রথম দুদিন লণ্ডন থেকে মনে হ'ল এ যেন এক নীরব সহর। চেঁচিয়ে কেউ কাউকে ডাকে না, সটান কাছে গিয়ে বক্তব্য নিবেদন করে, কথা বলে অনুচ্চ কণ্ঠে। খাবার টেবিলে গিয়ে হাঁক ডাক ক'রো না। চুপ করে বসে থাকো, বয় নোটবই নিয়ে এলে 'মেনু' বা সে বেলার খাদ্য-তালিকা দেখে বলে দাও কি খাবে। খাবার আসতে দেরী হ'লেও চেঁচানো চলবে না। টেবিলের সামনে বসে খেতে খেতে সবাই রহস্যালাপ করচে, হাসছে, কিন্তু তাতে হলের মধ্যে গুঞ্জন উঠছে না। লাউঞ্জে বসে বন্ধু-বান্ধব দর্শনার্থীদের সঙ্গে প্রয়োজন অপ্রয়োজনের কত কথা হয়, তবু শব্দ উঠে না।

মানবসভ্যতা বলে রেখেছে যে, যদি নিজের স্বাচ্ছন্দ্য চাও, অপরের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখো। বৃটিশ সভ্যতা যে একথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে নিয়েছে, তা তাদের আচার-আচরণ চলন-বলন ভাব-ভঙ্গী দেখলেই বুঝা যায়।

কেনসিংটনের এক পোষ্ট অফিসে ফরেন এয়ার মেল এনভেলপের জন্য ষ্ট্যাম্পসএর কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে উসখুস্ করছি। কাউণ্টারে ষ্ট্যাম্পস বিক্রয়কারী নেই। পাশের কাউণ্টারের সম্মুখে লাইনের দীর্ঘ সারি। জনৈকা মহিলা সেখান থেকে আমাদের লক্ষ্য করছিলেন। নিঃশব্দে কাছে এসে মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'ষ্ট্যাম্প কিনবেন? আমাদের সারিতে এসে দাঁড়ান।' লণ্ডনের অতি প্রশস্ত রাস্তার জেব্রা ক্রসিং বা সাদা দাগকাটা পথচারীদের অতিক্রম পথ বড় সতর্কতার স্থান। কোন পথচারী সেখানে মোটর চাপা পড়লে মোটরচালকের নিষ্কৃতি নেই। সব সময়েই দেখা যায় দু-দিক থেকে মোটর এসে পড়লেও তারা সবাই গাড়ী থামিয়ে বিব্রত পথ-চারীকে রাস্তা পার হ'তে মোটরের বাইরে হাত ঘুরিয়ে ইসারা করে। পথচারী নিরাপদ না হ'লে তারা গাড়ীতে ষ্টার্ট দেয় না। বাস ষ্টপে কেউ কাউকে ছাড়িয়ে সামনে দাঁড়াবে না। লাইন নিয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করবে।

সাতটা সাড়ে সাতটার পর থেকে সাড়ে ন'টা দশটার মধ্যে রাত্রির খাওয়া শেষ করতে হবে তারপরে ডিনার হলের দরজা বন্ধ হ'য়ে যাবে। ছ'টার পরে আর কোন দোকান খোলা পাওয়া যাবে না। এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে আমাদের পরিচালক সাহেব বললেন, কর্মচারীদেরও ত পরিবার আছে, তাদেরও বিশ্রাম, আমোদ আহ্লাদ সখ-সাধ আছে, দোকানে পাঁচটার পরে কিংবা হোটেলে দশটার পরে তাদের আটকে রাখলে, তাদের জীবনের রস শুকিয়ে যাবে। তাদের সুখ-সুবিধার কথা ভেবেই তারা নিজেদের অসুবিধাটুকু মেনে নিয়েছে। বাস, টিউব ট্রেন (মাটির নীচের ট্রেণ) চলে প্রায় রাত পৌনে বারোটা পর্যন্ত। সেখানেও সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্যের প্রশ্ন আছে। আজ যে রাতের দিকে তার ডিউটি করছে, কাল সে সকালের দিকে কাজ করবে, বিকেলের দিকে পাবে ইচ্ছামত ঘুরবার সুবিধে। সমগ্র ব্যবস্থার মধ্যেই অপরের সুবিধার দিকে লক্ষ্য প্রবল হ'য়ে আছে।

২১শে জুলাই নেদারফিল্ডে এক নাইলনের ফ্যাক্টরীতে দেখলাম একটি যুবক তার প্রণয়িনীর ফটো টেবিলের সামনে রেখে কাজ করছে। ব্যাপারটা একটু কেমন মনে হ'ল। এগিয়ে দেখলাম মেয়েদের দুই একজনও তেমনি করেছে। ব্যাপার কি! কাজের সময় প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর চিন্তা! ম্যানেজার সাহেব একটু হাসলেন। বললেন, আমরাও ওতে আপত্তি তুলেছিলাম, বলেওছিলাম, ওসব চলবে না। কিন্তু দেখা গেল তাতে অসন্তোষ বাড়ে, আন্দোলন সৃষ্টির উপক্রম হয়। পরে ভেবে দেখলাম, আমাদের কাজের ত কোন ক্ষতি হচ্ছে না, তবে কেন অবথা অসন্তোষের কারণ ঘটাই? তাই এমনি চলছে। এখানেও সেই অপরের সুখের প্রশ্ন।

উইন্টনে ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিস-এর নূতন বিরাট কারখানায় মিঃ ও, পি গ্রেণফেল সাহেবকে প্রশ্ন করেছিলাম, আপনাদের শ্রমিক-দের কোয়ার্টার কোথায়? তিনি বললেন, শ্রমিক দের কোন কোয়ার্টার নেই।

কেন? তবে এত লোক থাকে কোথায়? মিঃ গ্রেণফেল বললেন, কারখানার সংলগ্ন শ্রমিকদের কোয়ার্টার আমরা ইচ্ছে করেই করিনে। তাতে তারা মনে করতে পারে যে, মালিকরা তাদের বন্দী করে রেখেছে। মাইল দেড়েক দূরে যে টাউনসিপ দেখেছেন, সেখানেই তারা ঘর বাড়ী কিনে বা ইচ্ছামত ভাড়া ক'রে থাকে, এবং সেখান থেকেই তারা কারখানার কাজে আসে। স্বাচ্ছন্দ্য বা স্বাধীনতার কোন ব্যাঘাত হয় না। গভর্ণ-মেণ্ট টাউনসিপ করে দিয়েছেন, সেখানেই তাদের স্বাধীন ঘরবাড়ী। আমাদের কোন সম্পর্ক নেই অপরের সুখ সুবিধে নিয়ে। এই চিন্তার মধ্যেই ইংরেজের জাতীয় চরিত্র সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমরা যখন ইংল্যাণ্ডের নানা স্থানে ঘুরছি, তখন একদিন খবর এলো আমেরিকা ইরাকে এবং বৃটেন জর্ডনে যুদ্ধ জাহাজ পাঠিয়েছে। আমাদের উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের শেষ নেই, কিন্তু নিউ-ক্যাসেলের জনসাধারণকে দেখলাম, নির্বিকার! রোজকার মতো সকলেই খবরের কাগজ পড়ে নির্ভাবনায় কাজে বেরিয়ে গেল। নটিংহামে গিয়েও দেখি হোটেল রেস্তোরাঁ কোথাও তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। ইনফরমেশন অফিসার কারলেস সাহেবকে প্রশ্ন করলাম, আপনাদের রাজনীতি এসব ব্যাপারে এত উদাসীন কেন?

সাহেব বললেন, ও সব এদেশের জন-সাধারণের উত্তেজনার বিষয় নয়। গ্যাসের অভাব ঘটুক, জলের টান পড়ুক, মাংসের দাম বাড়ুক, বিদ্যুৎ সরবরাহে গড়বড় হোক, মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থার একটু এদিক ওদিক হোক, কিংবা ট্যাক্স বাড়ুক, তখন দেখবেন উত্তেজনা! স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ঘটলেই এদেশের লোকের চাঞ্চল্য। খাদ্য, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, বার্ধক্যের পেন্সন ইত্যাদি সম্পর্কে বৃটিশ সরকার সর্বদা সচেতন। আন্ত-র্জাতিক রাজনীতি পার্লামেণ্টের সদস্যদেরই চিন্তা বা উদ্বেগের বিষয়।

সপ্তাহে সপ্তাহে বেতন বা মজুরী মিলে, ঘরভাড়াও সাপ্তাহিক। শনিবার ছুটির চাঞ্চল্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। লণ্ডনের রবিবার যেন ভোঁ ভোঁ। পথঘাট জনবিরল, দোকানপাট বন্ধ। লণ্ডন থেকে একশ' মাইলের মধ্যে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা থাকায় অধিকাংশই পিকনিক, প্রমোদ-ভ্রমণ বা আনন্দ স্ফূর্তি করতে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। বৃটেনের সর্বত্রই কয়েক গজ পরে পরেই হোটেল বা রেস্তোরাঁ। যেখানেই যাও পার্ক, লেক, খেলার মাঠ, উদ্যান, বাগিচা আগন্তুকদের সাদর আহ্বান জানাচ্ছে। ইউরোপ প্রকাশ্য প্রেমের অবাধ লীলাভূমি। কোমর জড়িয়ে চলা, চলার পথে, পার্কের বেঞ্চিতে পারস্পরিক চুম্বন একটা সাধারণ দৃশ্য। তবে বিশেষত্ব এই যে, এ সব ব্যাপারে কেহ ভ্রূক্ষেপও করে না। কে কি করচে, না করচে তা দেখবার জন্য কেউ ফিরেও তাকায় না। আর মেয়েরা যেন রাজরাজেশ্বরী। বিবাহিতা নারীর জন্য তার স্বামীর কত তোয়াজ! সময়মত ঘরে না ফিরলে সে কি ভাববে, এক সঙ্গে না খেলে সে কখন বিরূপ হবে, কোন্ আচরণ তাকে খুশী

করবে, কোন্ ব্যবহারে সে দুঃখ পাবে, তাই নিয়ে কত সতর্কতা! দাম্পত্য-জীবনে পুরুষ অপেক্ষা নারীর দাবী যে প্রবল, আর পুরুষেরাই যে নারীর যত্নতুষ্টির জন্য অধিক ব্যস্ত, ঘরে-বাইরে একটু তাকালেই তা বুঝা যায়। আমাদের দেশের পুরুষেরা যদি নারীদের সম্পর্কে এর সিকি ভাগ বিবেচনাও রাখত তা হ'লে বোধ হয় এদেশে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের দরকারই হ'তো না। বৃটেনের নারী-পুরুষ ঘর করচেও, ভাঙচেও। তাতে তারা পরোয়া করে না বটে, কিন্তু জীবনে শান্তি আসে না। আধুনিক যন্ত্র বা বৈজ্ঞানিক যুগে ভোগ-সুখটাই বড় হ'য়ে উঠছে—তাই শান্তি কেবলই দূরে সরে যাচ্ছে। স্নিগ্ধতার চেয়ে উগ্র মাদকতাই তাদের বিহ্বল করছে।

তবু বৃটেনের নারীর অকুণ্ঠ কর্মপ্রাণতা ও শ্রমের একাগ্রতা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। সৌজন্য শিষ্টাচারে তারা অসাধারণ। কলে-কারখানায় তারা হাসিমুখে অক্লান্তভাবে কাজ করে যায়। মনে যত বিরক্তিই থাক, বাইরের আলাপে মধু ঢালা, যেন কত অন্তরঙ্গ। এ-ব্যাপারে শুধু নারী নয়, পুরুষেরাও শিষ্টাচারের প্রতিমূর্তি। আপত্তি প্রতিবাদের ভাষাও তাদের কখনও বাইরে রূঢ় বলে মনে হবে না। আমাদের প্রোগ্রামের বাইরে একস্থানে যাওয়ার কথা হ'তে সাহেব বল্‌লেন, বেশ ত—কিন্তু আপনাদের সময় হবে কি?

কেন, সন্ধ্যার পরে ত যাওয়া যায়।

বিশ্রাম করবেন না?

বাস ওই পর্যন্তই। তারপর বুদ্ধিমানকে বুঝে নিতে হয়।

নটিংহাম ও লণ্ডনের নটিংহাম হিলে বর্ণ-বিদ্বেষ নিয়ে দাঙ্গা হয়ে গেছে। আফ্রিকার নাইজেরিয়ার নিগ্রোরাই ছিলেন এই ঘটনার উপলক্ষ। লণ্ডনের পার্কে বা পথে আফ্রিকার কোন কোন লোক শ্বেতাঙ্গ রমণী নিয়ে প্রকাশ্যে যে আচরণ করেন, আমাদের পূর্বে যাঁরা ইংল্যাণ্ড গিয়েছেন, তাঁরাও তা দেখে একটু বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। আমাদের চোখেও যে কিছু না পড়েছে তা নয়। তবু বর্ণবিদ্বেষ নিয়ে কোন উত্তেজনা ইংল্যাণ্ডে যাতে প্রশ্রয় পেতে না পারে, সে জন্য বৃটিশ সরকার বিশেষ সতর্ক। হোটেল রেস্তোরাঁর মালিকদের তাঁরা জানিয়ে রেখেছেন যে অশ্বেত জাতিদের প্রতি কোন বৈষম্যমূলক আচরণ দেখালে বা তাদের প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণার ভাব প্রকাশ করলে তারা সরকারী সহানুভূতিতে বঞ্চিত হবেন। মনে বিদ্বেষ থাকুক না থাকুক, বাইরে অন্ততঃ তা এতদিন প্রকাশ পায়নি। বৃটিশ সাম্রাজ্য সংকুচিত হ'লেও, তাদের উপনিবেশ এখনও রয়েছে, কমনওয়েলথ-এর দেশগুলি আছে, কাজেই তারা এসব ব্যাপারে অতি সতর্ক ও সজাগ। তবু সমস্যা দেখা দেয় এবং বৃটিশ সরকার যথাসম্ভব দ্রুত তার সমাধানের চেষ্টা করে, নটিংহাম ও নটিং হিলের ব্যাপারেও সেই রকমই দেখা গিয়েছে।

বহুকালের রক্ষণশীল জাতি, তারা সহসা কিছু বর্জনও করে না, আবার অন্যান্য দেশের ন্যায় সহসা কোন ব্যাপারে বিগলিত হয়েও পড়ে না। তাদের প্রকৃতি নিজস্বতায় দৃঢ়। জনৈক ইংরেজ বলেছিলেন যে, ইংল্যাণ্ড পুরাতনকে বর্জন করে না বলেই তাদের স্থাপত্য শিল্পের প্রসার হচ্ছে না। সহর কিংবা গ্রামের বাড়ীগুলি প্রায় একই ধাঁচে নির্মিত। তাতে বৈচিত্র্য নেই। এক সহর যেন আর একটি সহরের প্রতিচ্ছবি, একটি কাউণ্টি যেন আর একটিরই সহোদর। তফাৎ কেবল সামান্য রঙে বা দরজা-জানালায়। নিউ ক্যাসেলের বাড়ীগুলি কালো কালো, নিউটাউনের বাড়ীগুলি এবং অনেক সহরের বাড়ীই লালচে রঙের। তবে আধুনিকতার ছাপ যে কোথাও পড়েনি, তা নয়। বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়নের বিশাল বাড়ীটি একেবারে আমেরিকার ধরণে নির্মিত হয়েছে। বিগত মহাযুদ্ধের বোমাবিধ্বস্ত এলেকায় যে সকল নূতন বিশাল পাঁচ-ছ' তলা বাড়ী নির্মিত হচ্ছে সেগুলিও আমেরিকার বাড়ীর ন্যায় বড় বড় কাঁচের খেলা। পুরুষের পোষাকেও এই রক্ষণশীলতার ছাপ সুস্পষ্ট। কালো রং-এর পোষাকেরই সেখানে আদর বেশী। না হয় যে-কোন গাঢ় রংয়ের। গাঢ় ছাই রং, গাঢ় আসমানী রং বা যে রঙের পোষাকই হোক তার অধিকাংশই কতকটা কালো ঘেঁষা। অবশ্য এর ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়। ব্যতিক্রম আছে তবে তা খুব বেশী নয়। নারীদের পোষাক স্বতন্ত্র বর্ণবহুল, তবু তাদের ধরণ এক, হাঁটুর কতটা নীচে পোষাক প্রলম্বিত থাকবে বা কতটা উপরে উঠবে, বছর বছর তারই পছন্দ, অপছন্দ। পুরুষের পোষাকে নেকটাইটা ইংল্যাণ্ডে সার্বজনীন, ইউরোপের অন্য কোন দেশে ফ্রান্স, ইটালী, জার্মাণী বা সুইজারল্যাণ্ডে এর এত বাড়াবাড়ি দেখিনি। ইংল্যাণ্ডে টুপীর আদর কমে যাচ্ছে। আমাদের মতো খালি মাথায় এখন অসংখ্য লোক চলাফেরা করে, তাতে পোষাকী ভদ্রতার কোন ব্যত্যয় ঘটে না, তবে টুপী ছাড়েনি এমন লোকও অনেক আছে। ইংরেজী ভাষা ইংরেজদের নিকট শিখলেই যে ভাল হয়, তা ওখানে গেলে বুঝা যায়। শব্দের উচ্চারণে বিশেষ স্থানে জোর দিয়ে তারা কথা বলে, তা বুঝতে বা আমাদের ইংরেজী উচ্চারণ তাদের বুঝাতে উভয়েরই একটু মনোযোগের প্রয়োজন হয়। তবে চাকুরি, শাসন, যুদ্ধ বা ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে যারা দেশ-বিদেশ ঘুরেছে, তাদের আমাদের উচ্চারণ বুঝতে অসুবিধা হয় কম। ইংরেজী ভাষার প্রসার শুধু ইউরোপে নয়, অন্যান্য দেশেও বেড়ে যাচ্ছে, বিশেষভাবে আমেরিকার প্রভাবে। ইউরোপে ফরাসী ভাষার প্রসার বেশী ছিল, কিন্তু খোদ প্যারিসেই হোটেলের সামনে লেখা দেখেছি—"English is spoken" ভ্রমণকারী বা বিদেশী পর্যটক আকর্ষণের জন্যই এই বিজ্ঞাপন। এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া—ইংরেজী জানলে কোথাও ভ্রমণের অসুবিধা হয় না। বাঙালী আমাদের একথা মনে রাখবার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বৃটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশন বা বি, বি, সি'তে বিচিত্রা প্রোগ্রামে আমাদের একটা কথোপ-কথনে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, আপনারা এখানে কি দেখলেন? বলেছিলাম, 'দেখেছি সভ্যতার সুষমা। মানুষের শিক্ষা ও সভ্যতা যে তাকে কত উন্নত করতে পারে বৃটেন তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও নরনারীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এরা যে কি করেছে সত্যিই তা দেখবার মতো। আমাদের গ্রামের দৈন্যদশা দেখে ইংল্যাণ্ডের গ্রামের অবস্থা দেখবার সাধ হয়েছিল। কিন্তু গ্রাম খুঁজে পেলাম না। যে-গুলোকে তারা গ্রাম বলে অভিহিত করে, তাও সহরেরই নব সংস্করণ। বিদ্যুৎ, গ্যাস, জল সরবরাহ, বিদ্যালয়, ডাকঘর, বাজার, সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন, থিয়েটার, খেলার মাঠ, পাবলিক হল ইত্যাদি সহরের যে কোন সুবিধা সুযোগই গ্রামে আছে। রাস্তাঘাটের সুব্যবস্থার ফলে ট্রেণ, বাস, মোটরের অবাধ চলাচলের সুবিধা থাকায়, কোথাও যাতায়াতের কোন অসুবিধা নেই। দৈনিক, সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সহর বা মফঃস্বলে অজস্র আছে। সংবাদপত্রের পাঠক সংখ্যাও ঘরে ঘরে। সকালবেলা লণ্ডন বা সহরের সংবাদপত্র, বৈকালে স্থানীয় সংবাদপত্র স্থানীয় সংবাদের জন্য সকলেই পড়ে। দুধ, মাখন, রুটি এই তিনটি জিনিস ছাড়া ইংল্যাণ্ডের প্রায় সব জিনিসের দাম অত্যধিক। কিন্তু সুদূরে পল্লীর একটি রাখাল বালকেরও বেতন যেখানে মাসিক তিনশত টাকা, সাপ্তাহিক প্রায় সাত পাউণ্ড, সেখানে তারা দুর্মূল্যতার পরোয়া করে না। কাজের জন্যও তাদের দুশ্চিন্তা নেই, অর্থের চিন্তাতেও তাদের বিভীষিকা দেখতে হয় না। সহর হোক, গ্রাম হোক বৃটিশ সরকারের সুচিন্তিত পরি-কল্পনাতেই এটা সম্ভব হয়েছে। নূতন নূতন সহর পরিকল্পনার সঙ্গে, তারা নূতন নূতন শিল্প-বাণিজ্যও গড়ে তুলছে। বেকার সমস্যা তাই তাদের বিব্রত করতে পারে না। বেকারের জন্য আলাদা বরাদ্দ থাকে। ছেলে-মেয়েদের শিশুকাল থেকেই তাদের মনের ঝোঁক বুঝে বিভিন্ন রকমের বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয়, বড় হয়ে তারা খুসী মতো কাজে ভর্তি হয়ে জীবিকা অর্জন করে।

বৃটিশ পার্লামেণ্টের সিঁড়িতে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য যিনি দাঁড়িয়েছিলেন তিনি সেখানকার ট্রেজারী বেঞ্চের একজন বিশিষ্ট সদস্য। লণ্ডনের দক্ষিণ কেনসিংটনের নির্বাচিত প্রতিনিধি। কিন্তু তাঁর আরও পরিচয় আছে। ১৯৪৭ সালে তিনি ভারতের সর্বপ্রধান বিচারপতি ছিলেন। তাঁর নাম স্যার পেট্রিক স্পেন্স। কলিকাতা সম্পর্কে, শ্রীযুক্ত এস আর দাশ সম্পর্কে (বর্তমান ভারতের সুপ্রীম কোর্টের চীফ জাষ্টিস) নানা সংবাদ জানতে চাইলেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস-এর যুগ থেকে বৃটিশ পার্লা-মেণ্টে ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল বহু সদস্য বরাবরই ছিল এবং এখনও আছে। পার্লামেণ্টেই মধ্যাহ্ন ভোজনে ভারতীয় খাদ্যের আয়োজন হয়েছিল। বিদায়কালে পার্লামেণ্টের আর এক-জন সদস্য স্যার প্লামার হাতচেপে ধরে বল্লেন, জেনে যান, আমাদের রাজনীতিতে যে কোন পরি-বর্তনই ঘটুক, বা যে দলের হাতেই শাসন ক্ষমতা থাকুক, ভারতের বন্ধু বৃটেনে আছে। মাত্র ঘণ্টাখানেকের আলাপ-পরিচয়, তবু কথাটা এখনও কানে বাজছে।

সব সময়ে নয়

অর্থ অনর্থের মূল সন্দেহ নেই, কিন্তু অর্থ থাকলে অনেক অনর্থ সহনীয় হয়।

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
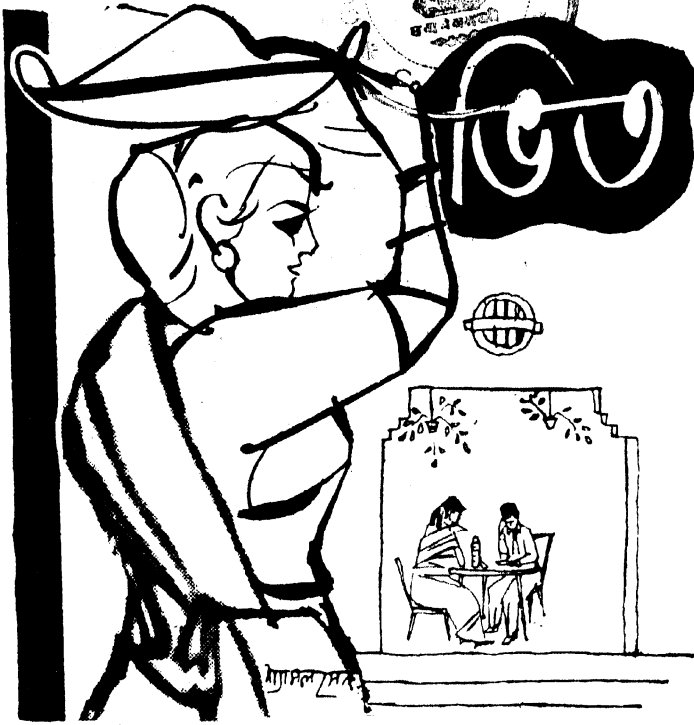
প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সিমেণ্ট শুকিয়ে যাবার পর ঘরের মেঝে ঘষে ঘষে ঝকঝকে করে দিয়েছে জগু আর সুবাসী। এখন ইলেকট্রিক মিস্ত্রীরা মই নিয়ে ঠুক ঠুক করে শব্দ করে সারাদিন। আলো আর পাখা ঠিক করে। কাল দুটো বড় বড় গেট ফেলে রেখে গেছে এঞ্জিনীয়ার সাহেব। আজ লোক আসবে। গেট দুটো বসানো হবে বোধ হয় সকাল থেকেই।

গেটের কাছ থেকে সিঁড়ি অবধি পাকা রাস্তা হবে। সেটুকু হয়ে গেলেই কাজ শেষ। তখন আবার ঠিকাদার যেখানে ঠেলে দেবে সেখানে যেতে হবে জগুকে। সুবাসী যাবে কিনা কোন ঠিক নেই। ঠিকাদার কাকে কখন কোথায় পাঠায় বলা যায় না। তার হাতে এখন অনেক কাজ।

জল দিয়ে কড়াইএ সিমেণ্ট গুলতে গুলতে সুবাসী জিজ্ঞেস করে, আর কদিন এর কাজরে জগু?

হপ্তাখানেক তো বটেই। এই রাস্তাটা বানানো হয়ে গেলেই কাজ খতম, আধপোড়া বাড়িটা কানে গুঁজে জগু বলে, তোকে কিছু বলে নাই ঠিকাদার?

বলবে আবার কি? ঠিক মতো কাজ করলে বলাবলির অবসর পায় নাকি মানুষ?

কর্নিক দিয়ে ইঁটের ওপর সিমেণ্ট মাখাতে থাকে জগু। মাথা তুলে হাসে। সুবাসী তার কথার অর্থ বুঝতে পারে না। তাকে আবার বলবে কি ঠিকাদার। হাতুড়ির বাড়ি মেরে গাড়ি গাড়ি ইঁট ভাঙতে পারে সে। হাত চালিয়ে মশলা বানায় কড়াই কড়াই। সন্ধ্যে অবধি সমানে খাটে। বেহারি মেয়েদের হার মানিয়ে দেয় সুবাসী। এখন কথা হল, জগু জানতে চায়, এরপর যেখানে কাজ হবে, অর্থাৎ পদ্মপুকুরের পাশে সেই পোড়ো বাড়িটায়, সেখানে জগুর সঙ্গে সুবাসীকেও আবার কাজে বহাল করবে কিনা ঠিকাদার।

বসে বসেই কোমরের গামছাটা আরও শক্ত করে বাঁধে জগু। ফিক ফিক করে হেসে বলে, না রে না, সেকথা বলি নাই আমি। কাজের তোর খুঁত ধরবে কে-রে?

চোখ ঘুরিয়ে সুবাসীও হাসে, তবে?

বলছিলাম কি, জগু তাকিয়ে নেয় এদিক-ওদিক, এখানকার কাজ চুকলে যাবি কোথায়?

তুই যাবি কোথায়?

হুই পদ্মপুকুর।

হাতে খালি কড়াইটা নাচিয়ে হালকা সুরে সুবাসী বলে, আমি যাব—হুই মনোহরপুকুর। হাত চালারে জগু, কাজে তোর মন নাইরে দেখি। বলি খালি কথা কয়েই মজুরি নিবি?

তুই দিলি কই মজুরি?

দূর—সুবাসী চলে যায় একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সিমেণ্ট গোলা দিয়ে আবার কড়াই ভর্তি করতে। যেতে যেতে ইচ্ছে করেই একবার পিছন ফিরে তাকায়। জগুর কথার মানে যেন এতক্ষণ পর আরও ভাল করে বুঝতে পারে। আর ঠিক তখন খুব জোরে দুবার মোটর গাড়ির হর্ন বাজে।

এঞ্জিনীয়ার সাহেব এসে গেছে। আসবেই। রোজ না হোক, সপ্তাহে চার-পাঁচদিন বাড়ি তদারক করতে আসে সাহেব। এদিক-ওদিক তাকায়। দেয়াল পরখ করে। কোন কোনদিন ঠিকাদারকে জোরে জোরে তাড়া দেয়। তারপর বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে মেমসাহেবের সঙ্গে কাজ দেখতে দেখতে গল্প করে অনেকক্ষণ। একটার পর একটা সিগ্রেট খায়। গাড়ি থেকে চায়ের ফ্লাস্ক আর কাপ এনে দেয় জগু। এঞ্জিনীয়ার সাহেব তখন চা খেতে খেতে মেমসাহেবের সঙ্গে গল্প করে। হা-হা করে হাসে।

হাসি শুনে সিমেণ্টের কড়াই মাটিতে শব্দ করে ফেলে সুবাসী মাথা তুলে তাকিয়ে দেখে। সাহেবের পিঠে হাত রেখে মেমসাহেবও তখন হাসছে। হাসাহাসিটা ভালই লাগে সুবাসীর। বড় ভাব ওদের দুজনের। কোন কাজ না থাকলেও কড়াই মাথায় নিয়ে আড়-চোখে সাহেব আর মেমসাহেবের দিকে তাকাতে তাকাতে বারান্দার কাছ দিয়ে সে একবার ঘুরে যায়। কড়া আতরের গন্ধ, সিগ্রেটের নীল ধোঁয়া, সাহেবের ভারী গলার স্বর আর মেম-সাহেবের মিষ্টি মুখ—সুবাসী বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, জগুর কাছে এসে ফিসফিস করে কথা বলে।

সাহেবের বউ না রে?

কোন্ সাহেবের?

ওই যে—

দূর। আসল সাহেবের বউ ওই মেম-সাহেব। সেই সাহেবেরই তো বাড়ি। মেম-সাহেব নিজের পছন্দসই ঘর বানাবে বলে শলা-পরামর্শ দেয় এঞ্জিনীয়ার সাহেবকে।

কথাটা সহজে বিশ্বাস করতে পারে না সুবাসী। জগুর অনেক কথাই সে বিশ্বাস করে না। তাই হাসে কথা শুনে। ওদিকে মেমসাহেব তখন উঠে দাঁড়িয়েছে সাহেবের সঙ্গে। বেতের টেবিলের ওপর চায়ের খালি কাপ আর ফ্লাস্ক পড়ে আছে। আর বোধ হয় সেদিনকার খবরের কাগজ। রাস্তার পাশের ঘরে এসে জানলা দিয়ে বাইরে তাকায় মেম-সাহেব। আস্তে আস্তে কি বলে সাহেবকে। সুবাসী শুনতে পায় না।

সে কিন্তু এবার বেশ জোরে জোরেই কথা বলে জগুর সঙ্গে, যার বাড়ি সেই সাহেব কই?

এসেছে বটে দু-চারবার। সাহেব কাজের মানুষ। সময় নাই মোটে। একেবারে বসবাস করতেই আসবে—দেখিস তখন।

জগুর কথাটা বোধ হয় সুবাসী শুনতে পায় না। ঘুরে ঘুরে মেমসাহেবকে দেখে। এঞ্জিনীয়ার সাহেবকেও। জানলার শিক পরখ করছে সাহেব। মাঝে মাঝে হাতও টানছে মেমসাহেবের। মেমসাহেব হাসছে। দেখছে সুবাসীকে। কিন্তু দেখেও দেখছে না তাকে। একটা চিরুণি দিয়ে সাহেবের চুল ঠিক করে দিচ্ছে।

ফেকন—ঠিকাদারের নাম ধরে এঞ্জিনীয়ার সাহেব একটু জোরেই ডাকে।

ফেকন ছুটে এসে বলে, হুজৌর।

মশলা তৈরির ঘেরা জায়গাটার দিকে আঙুল দেখিয়ে এঞ্জিনীয়ার বলে, আজকেই

ওসব সরিয়ে ফেলবে ওখান থেকে। গ্যারাজ বানাতে হবে। বাকী ইঁট আসবে কবে?

ফেকন মাথা চুলকে বলে, আজই এসে পড়বে হুজোর। ঠিক হ্যায়, যেমন বলে দিয়েছি তেমন করে ইঁট সাজাও। আমরা এখন যাচ্ছি। বিকেলের দিকে আর একবার আসব, সিগ্রেটে শেষ টান মারে এঞ্জিনীয়ার, পাম্পটা আজকেই বসিয়ে দিতে হবে—

ফেকন শুধু বলে, হুজোর।

জুতোর মস-মস শব্দ করতে করতে এঞ্জিনীয়ার নামে। মেমসাহেব আসে পাশে পাশে। চারপাশে তাকায়। হাসে। জগুর কার্নিকে তখন ভিজে সিমেণ্ট। সাবধানে পাশ কাটিয়ে ঘাসের ওপর দিয়ে চলে ওরা। জগু কার্নিক রেখে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে। আবার মোটরের শব্দ হয়। হর্ন বাজে। বড় রাস্তা ধরে গাড়িটা সোজা বেরিয়ে যায়।

কি জাতরে? তখনও রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে সুবাসী। মুখ দেখে বুঝিস না? এ দেশের লোকই তো।

যাঃ, আঁচলের গিঁট খুলে একটা পান মুখে দিয়ে সুবাসী বলে, বিলাতি মেমসাহেব।

আর তখন ঠিকাদার ফেকন এসে গজ-গজ করে, এত টাইম লাগে কেনরে? সিমেণ্ট ঢালতে বেলা কাবার করলি—এ সুবাসী, এমন করলে কাম নেহি চলবে—

কথা বলে না সুবাসী। শব্দ করে পান চিবোয়। কড়াই মাথায় নিয়ে জগুর কাছে গট-গট যায় আর আসে। হাতুড়ি দিয়ে ইঁট ভাঙে খট-খট। যা ইঁট আছে তাই দিয়ে গ্যারেজের কাজ শুরু করবে ফেকন। ওগুলো ভাঙতে কতক্ষণ আর সময় লাগবে সুবাসীর। বড় জোর দুঘণ্টা।

বেলা বারোটা নাগাদ খেতে যায় ফেকন। এ পাড়ায় কাছাকাছি তার বাড়ি। আর অন্য বেহারী মিস্ত্রীরা মশলা বানাবার ঘরের পাশে টিনের থালায় ছাতুর তাল নিয়ে বসে। জল এখনও আসেনি এ বাড়িতে। ওরা রাস্তার ওপারে টিউবওয়েল থেকে ছোট বালতিতে জল এনে মুখ ধোয়।

পান্তা আর কাঁচা লংকা আনে সুবাসী। একটু দূরে ছায়ায় বসে। জগু ঠিক তার পাশেই সুযোগ বুঝে জায়গা করে নেয়। তেলেভাজা কিনে আনে শালপাতায়। দুটো ফেলে দেয় সুবাসীর পাতে। আর একটা দিতে গেলেই থালা উঠিয়ে চোখ রাঙায় সুবাসী।

চকচক করে কলাই করা গেলাসে চা খায় জগু। ছোট একটা ভাঁড়ে সুবাসীকেও একটু দেয়। সে আপত্তি করে না। জগুর জন্যে পান্তা খেয়ে চা খাওয়া অভ্যেস হয়ে গেছে তার। রোদ্দুর আসে। মাছি ওড়ে নাকের ওপর। আর একটু সরে বসে জগু। ওদের নিজের হাতে তৈরী করা নতুন বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে। দোতলা সাদা বাড়ি। ওপরে দুটো ঘর আর নিচে তিনটে। ওপরের একটা শোবার ঘর। আর একটাতে সাহেবের বই থাকবে—পড়বার ঘর। চার পাঁচ হাজার বই নাকি আছে সাহেবের। নিচে বসবার ঘর, খাবার ঘর আর বন্ধু-বান্ধব এলে থাকবার ঘর। কালো নক্সা কাটা ঝকঝকে মেঝে। চকচকে মেঝে পা পিছলে যায় সুবাসীর। মেম-সাহেবের মতো জানলায় দাঁড়িয়ে সে উদাস চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুরে। আকাশে চিল ওড়ে। পাঁচিলের ওপারে ফাঁকা বড় জমিতে দুটো গরু সমানে ঘাস খায়। রাস্তা কাঁপিয়ে লোক বোঝাই বাস যায়। সাইকেল রিক্সার ঘণ্টা বাজে ক্রিং ক্রিং। হিমের মতো ঠাণ্ডা নতুন ঘরের দেয়াল। ঠেস দিয়ে বড় আরাম পায় সুবাসী।

জগু হাত ধরে টানে ওর, করিস্ কি? দেয়ালে দাগ লাগিয়ে দিলি! ইস্—সুবাসীকে সরিয়ে দিয়ে জগু গামছা দিয়ে দেয়াল ঘসে, ঠিকাদার কাম খতম করে দেবে তোর—

ঠোঁট উল্টে সুবাসী বলে, হুঃ।

বাইরে কড়কড়ে রোদ হলেও ঘরটা খুব ঠাণ্ডা। হাওয়া আসছে হু-হু করে। তিনটে বড় বড় জানালা বানানো হয়েছে এ ঘরের। সুবাসী চোখ ঘুরিয়ে ভাল করে দেখে সারা ঘরখানাকে। মাথার ওপর ফুটো করে একটা বড় লোহার ডাণ্ডা ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। হাত তুলে লাফালেই সুবাসী ছুঁতে পারে সেটা।

এটা কি রে জগু?

পাখা। হোথায় পাখা টাঙাবে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি—

পাখা কি হবে? এ জানলার শিক ছেড়ে ও জানলায় গিয়ে দাঁড়ায় সুবাসী, হাওয়ার কিছু কমতি আছে নাকি ঘরে?

নাই? এ ঘরে শোবে সাহেব—মেমসাহেব। বাইরের হাওয়া কমতি হলে হাঁস ফাঁস করতে হবে না রাত-বেরাতে? তোর আমার মতো গরিব নাকি রে ওরা?

কেন, বাতাস নাই তোর ঘরে?

নাই? উড়িয়ে নিয়ে যায় মানুষকে—

রসিকতার সুরে সুবাসী বলে, বটে?

হঠাৎ গলার স্বরটা অন্যরকম শোনায় জগুর। চোরা চাউনি দেয় এদিক-ওদিক। সুবাসীর আরও কাছে সরে আসে। ঘরে চুনের গন্ধ। বাইরে হাওয়ায় লাল সুরকি উড়ছে। পাশের ঘরে জোরে জোরে গান গাইছে ইলেকট্রিক মিস্ত্রীরা। আর একটু পরেই ফেকন ফিরে আসবে। উঠোনে পড়ে থাকা গেট দুটো টানাটানি করে বসাবে এঞ্জিনীয়ার সাহেবের নতুন লোক। সুবাসীর কপালের ঘাম নিজের গামছা দিয়ে মুছে দেয় জগু।

এত দরদ কেন রে?

কে আছে রে তোর সুবাসী?

কেন?

জানবার ইচ্ছা হয়।

উদাস শুষ্ক স্বরে সুবাসী বলে, কেউ নাই।

আমারও কেউ নাই, কান থেকে আধপোড়া বিড়িটা নিয়ে আবার নতুন করে ধরায় জগু, আমার ঘরে যাবি?

ধ্যেৎ—সুবাসী মিটি মিটি হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে মাটি ফাটা রোদ্দুরে। ছেঁড়া ময়লা শাড়ির প্রান্ত মাথায় তুলে ক্ষিপ্র হাতে সিমেণ্ট গোলে। আর জগু লেবেল-পাটা নিয়ে আবার বসে যায় রাস্তার মাঝখানে। রোদের ঝাঁজ এখন আর তত জোরালো মনে হয় না ওর।

বিকেল বেলা এঞ্জিনীয়ার সাহেব আবার আসে মেমসাহেবের সঙ্গে। মুখে হাসি নেই। রাগ রাগ ভাব। মেমসাহেবেও মেজাজ খুব। বেতের টেবিলে জোরে চাপড় মেরে কথা বলে। হাতের ধাক্কায় চায়ের ফ্লাস্কটা ছিটকে পড়ে মেঝের ওপর। গড়িয়ে গড়িয়ে বারান্দা থেকে নেমে আসে মাটিতে। ফেকন ছুটে গিয়ে তাড়াতাড়ি সেটা তুলে আবার রাখে টেবিলের ওপর। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে। গ্যারাজের গাঁথুনি কি ভাবে হবে ঢোক গিলে জানতে চায়।

জোর ধমক দেয় এঞ্জিনীয়ার সাহেব, নিকালো!

মেমসাহেব তাল মিলিয়ে বলে, তোড় দেও মোকাম!

অপরাধ বুঝতে না পেরে মাথা চুলকোতে চুলকোতে ঠিকাদার নেমে আসে। মেজাজের হদিস পায় না এঞ্জিনীয়ার সাহেবের। ওদিকে ঘরের সব আলোগুলি জ্বালাচ্ছে আর নেভাচ্ছে বিজুলি বাতির লোকেরা। বিদ্যুৎ এসে গেছে নতুন বাড়িতে।

মেমসাহেব আর এঞ্জিনীয়ার সাহেব এদের কারুর সঙ্গেই কথা বলে না। কিছু বোঝায় না—কৈফিয়ৎ চায় না কোন কাজের। অনেকক্ষণ সেই বারান্দায় বসে জোরে জোরে নিজেদের মধ্যে কথা বলে শুধু। এরা মাঝে মাঝে মুখ তুলে তাকায়। ফেকন খৈনি ডলে হাতের মধ্যে। মিস্ত্রীরা খুশি মতো মাপে মাপে গেট দুটো বসিয়ে দেয় ঠিক। জলের নতুন পাম্পটা ঘরের মধ্যে থেকে আজ আর কাউকে বাইরে নামিয়ে আনতে বলে না এঞ্জিনীয়ার সাহেব।

ঠেলা গাড়িতে এ বাড়ির মালিক আসল সাহেবের মালপত্র আসতে আরম্ভ করে পরদিন থেকে। সঙ্গে আসে বুড়ো বেয়ারা। আর একটা ছোকরা চাকরের সঙ্গে ধরাধরি করে জিনিস নামায়। সাজিয়ে রাখে ঘরের মধ্যে।

ছুটে এসে ফেকন জিজ্ঞেস করে, এঞ্জিনীয়ার সাহেব কই? পাম্প বসাবে না?

বিরক্ত হয়ে বুড়ো বেয়ারা বলে, আমি কি জানি? সাহেব আসবে এখুনি তখন জিজ্ঞেস করিস।

বুড়ো বেয়ারা পাকা লোক। মনের মতো করেই ঘর সাজায়। মেঝেয় কার্পেট পাতে। বড় বড় ছবি টাঙায় দেয়ালে। গদিওলা চেয়ার সাজিয়ে রাখে ঠিক মতো। সুবাসী চলতে চলতে উঁকি মেরে দেখে মাঝে মাঝে। শোবার ঘরে দুটো খাট পাতা হয়ে গেছে। কী পুরু গদি! পাখা চলছে বনবন করে। বেয়ারা নিজে হাওয়া খাবার জন্যে ইচ্ছে করে খুলে রেখেছে বোধ হয়। এইবার আসবে সাহেব—মেমসাহেব। মনের সুখে বসবাস করবে এ বাড়িতে। তখন অবশ্য সুবাসীর কাজ শেষ হয়ে যাবে। ওদের দেখতে পাবে না সে। তবে মেমসাহেবের রূপটা বড়ই মনে ধরেছে তার। তার দিকে তাকিয়ে থাকলে সে কাজের কথাই ভুলে যায়। মোটর গাড়ির আওয়াজ শুনলেই মাথা তোলে সুবাসী। ওই বুঝি ওরা এল।

মোটরগাড়ির আওয়াজ হয় বটে। ঠিক একটু পরেই সেই গাড়িটাই এসে দাঁড়ায় গেটের সামনে। মেমসাহেব নেই আজ, এঞ্জিনীয়ার সাহেবও নেই। এ বাড়ির মালিক, যাকে সুবাসী আগে কখনও দেখেনি, সে নামে গাড়ি থেকে

"মহৎ কাজের প্রচেষ্টা থেকেও
আনন্দ ও সুখ উৎসারিত হয়"
— জওহরলাল নেহেরু

আনন্দের উৎস

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
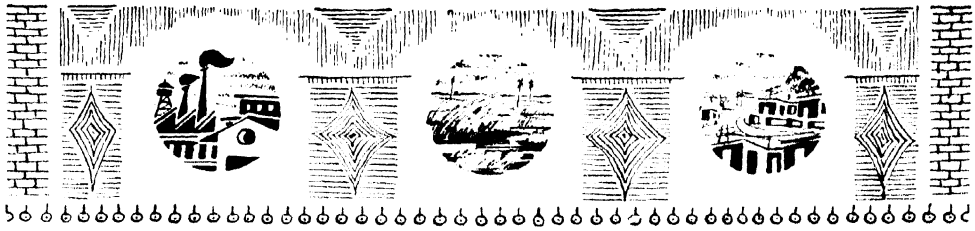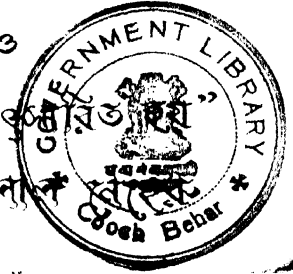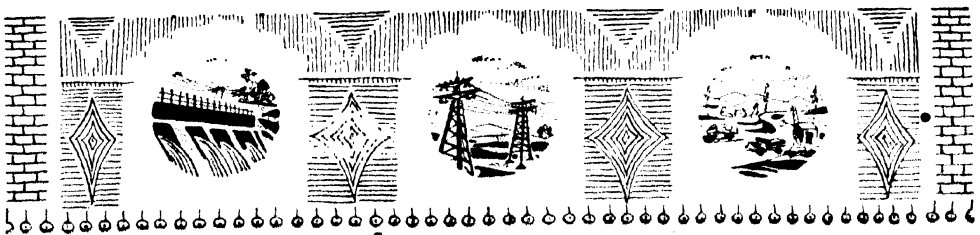
সঙ্গে আরও একজন সাহেব। যেমনি লম্বা তেমনি মোটা।

সুবাসীর মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে যায়, এ আবার কে?

চুপ চুপ, কাজে বেশি করে মন দেয় জগদু, এই সাহেবেরই তো বাড়ি—ঢ্যাঙা মানুষটারে দেখি নাই আমি। কিন্তু সেই ঢ্যাঙা মানুষটাই কথা বলে ফেকনের সঙ্গে। লোক লাগিয়ে বাইরে আনে জলের পাম্প। অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে। তারপর বসিয়ে দেয় চানের ঘরের পাশে। ঘন ঘন সিগ্রেট খায় সেই সাহেব। নতুন এঞ্জিনীয়ার। ফেকন চেহারা দেখেই বুঝে নিয়েছে। বাড়ির মালিক চেহারা কিছু দেখে না। কথা বলে না কারুর সঙ্গে। চশমা ঠিক করে বারান্দায় সেই বেতের চেয়ারে মোটা একটা বই খুলে বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আজ থেকে এখানেই বাস করবে বাড়ির মালিক।

আবার একবার ঢোঁক গেলে ফেকন, এঞ্জিনীয়ার সাহেব আসবেন না? গ্যারাজের গাঁথুনি—

বই পড়তে পড়তে মাথা তুলে বাড়ির মালিক গম্ভীর স্বরে বলে, এই যে, নতুন এঞ্জিনীয়ারকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, এবার থেকে ইনিই আসবেন—

জী হুজোর, আবার একটা লম্বা সেলাম ঠোকে ফেকন। গ্যারেজ কেমন করে তৈরী হবে সেকথা বুঝিয়ে দেয় বটে নতুন লম্বা এঞ্জিনীয়ার। ফেকনের মাথা ঠিক, সে বুঝেও নেয় এক মিনিটেই সব ব্যাপারটা। কিন্তু পুরানো সাহেবকে কেন বরখাস্ত করল মালিক ঠিক কাজ শেষ করবার আগে আগে, শুধু সেকথাটা সে ভেবে পায় না।

এ বাড়ির আসল সাহেব যাকে অনেক দিন থেকে দেখবার ইচ্ছে ছিল সুবাসীর, তাকে সে দেখল শেষ অবধি। সাহেব আছে এ বাড়িতেই। আলো জ্বলে, পাখা চলে, বোঁ শব্দ করে জলের পাম্প—মোটর গাড়ি যায় আর আসে। কত চেয়ার, টেবিল, খাট, আলমারী, বড় বড় আয়না আর বাসনপত্তর! সবই দেখেছে সুবাসী গালে হাত দিয়ে হাঁ করে কাজের কথা ভুলে। শুধু মেমসাহেবকে আর দেখতে পারল না সে। বাড়ি শেষ হল কিন্তু মেমসাহেব গেল কোথায়? জগদু বলে, সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে মেমসাহেবের। মেমসাহেব গিয়ে উঠেছে এঞ্জিনীয়ার সাহেবের বাড়ি। তাই রাগে তাকে বরখাস্ত করে দিয়েছে সাহেব। বুড়ো বেয়ারার মুখ থেকে এসব কথা শুনে ফেকন বলেছে জগদুকে।

কিন্তু তবুও জগদুর কথা বিশ্বাস করে না সুবাসী। ঝগড়া করে গেছে বটে এখন মেমসাহেব কিন্তু তার মনে হয়, আবার দুদিন পরে ফিরে আসবে ঠিক। দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমন সুন্দর পাকা বাড়ি করাল মেমসাহেব—এখন নিজে সেখানে বাস করতে আসবে না—তা কি হতে পারে! জগদুটা কিছু জানে না বুঝি!

ফেকনের কাছ থেকে শেষ দিনের মজুরি নিয়ে ভিজে দৃষ্টিতে জগদু তাকায় সুবাসীর দিকে। এ বাড়ির কাজ আজ শেষ। আবার কবে নতুন কাজ পাবে ওরা জানে না। আর সুবাসীও কোথায় যাবে ঠিক নেই। ফেকনের মতিগতি বোঝা ভার। জগদু আস্তে ডাকে, এ সুবাসী?

কি?

যাবি?

কোথায়?

আমার ঘরে।

খাওয়াবি কি?

জগদু হেসে বলে, হাওয়া।

কোমরে আঁচল জড়িয়ে সন্তর্পণে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে গেট খুলে বাইরে আসে সুবাসী। পিছনে পিছনে জগদুও। ঠিকাদার দেখছে কিনা কে জানে। দেখলে দেখুক। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় তখন গাছের কচি পাতা নড়ে ওঠে।

একটু এগিয়ে গিয়েই বস্তি। মাটির ঘর। তুলসী গাছ একটা আছে বটে জগদুর ছোট উঠোনে। সুবাসী তাকায় এপাশে ওপাশে। অন্ধকারে। ভিজে চোখে। মাটির দেয়াল। পাতলা তারে ঘেরা জানলা। দেশলাই বের করে ঝুল ধরা একটা লণ্ঠন জ্বালায় জগদু। টিনের থালায় দুটো নাড়ু বের করে দেয় সুবাসীকে। আর তখন কাছাকাছি কোথাও এক সঙ্গে অনেক শেয়াল ডেকে ওঠে।

তোর ঘরে আর যাবার দরকার নাই সুবাসী—ওখানের পাট তুলে দে—

ধোৎ—

কেন? আমি মন্দ লোক নাকি রে?

তুই জানিস। আমাকে লোকে মন্দ বলবে না?

উঃ—মাথায় সিন্দুর দিলে লোকে মন্দ বলে? জগদু হাসে, চল, যাবি কালীঘাটে?

আবার সুবাসী বলে, ধোৎ!

কিন্তু এবার লণ্ঠনের মিটমিটে আলোয় জগদুর ঘরটা ভাল করে দেখে নেয় সুবাসী। মেঝেতে বড় গর্ত হয়েছে একটা। দেয়ালে মস্ত ফাটা দাগ। একদিক ধ্বসে পড়েছে। পড়ুক। যেন সুবাসী ইচ্ছে করলেই হাত বাড়িয়ে সোজা করে দিতে পারে ওটা। জগদুর পায়াভাঙা তক্তপোষে বসে হঠাৎ মনে অনেক জোর পায় সে। মিটি মিটি লণ্ঠনটাও যেন জোর পায়। আর বাইরের হাওয়াও জোর করে ঢুকতে চায় ঘরে মাটির ফাটা দেয়াল আর তার বসানো এক ফালি জানলার বাধা না মেনেই।

'চলি সমুদ্র পানে'

কনক দত্ত

অপ্রমেয়

মৈত্রেয়ী দেবী

যুগান্তরের কাছ থেকে অনুরোধ পেয়েছি স্মৃতির ঝুলি থেকে কিছু গল্প জোগাড় করতে হবে। আমাদের স্বল্প-পরিসর অকিঞ্চিৎকর অভিজ্ঞতায় উল্লেখযোগ্য স্মৃতি বেশী কিছুই নেই। শুধু একটি আছে—আমরা রবিজ্যোতির উদ্ভাস দেখেছিলাম। জানি সে কথাই অফুরান হয়ে আজও বলা চলে, আজও শোনবার ইচ্ছুক কান আছে এবং বলবার মত দু-চারজন অবশিষ্ট আছে। যদিচ সম্প্রতি নবযুগের একটি যুগধর্ম বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে মহামানবদের জীবনী ও জীবনের ঘটনা অবলম্বনে বিশ্লেষণী রচনা লিখতে অনেক লেখক তথ্য বা সত্যের উপর নির্ভর করতে বিশেষ ইচ্ছুক নন। হয়ত তাঁরা এ বিষয়ে কবির মতানুবর্তী—'ঘটে যা তা সব সত্য নহে কবি তব মনোভূমি রামের জন্মস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।'...কিন্তু যে সব কল্পনার দৌড় শুধু নিজেকে প্রদক্ষিণ করে পাক খাচ্ছে তাদের সেই অপ্রমেয় মনকে ধারণা করবার দক্ষতা ও পুনঃ সৃষ্টি করবার উপযোগিত্ব কোথায়?

যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে দীর্ঘদিন ধরে অতি নিকট থেকে দেখেছেন, তাঁকে বুঝবার চেষ্টা করেছেন, তাঁরা জানেন তাঁর মনের পরিমাপ মনের গতি। ইচ্ছা অনিচ্ছার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দোলন, সুকুমার স্পর্শকাতরতা অত সহজে বোধগম্য হবার নয়। এ সম্বন্ধে বর্তমান যুগের কোনো একজন লেখক আমাকে সহজ বিশ্বাসে বলেছিলেন—'আমিও তো কবিতা লিখি কাজেই রবীন্দ্রনাথ কী মনে করে কী লিখেছেন বা তাঁর কোন কবিতার প্রেরণা জীবনের কোন ঘটনায় তা সহজেই বুঝতে পারি।' এর সহজ উত্তর এই ছিল—আপনারা উভয়েই কবি বটে তব, কবিতায় কবিতায় পার্থক্য তো আছে—তেমনি আপনার মন দিয়ে রবীন্দ্র মানসকে গ্রেপ্তার করতে পারবেন না। জানি কাব্য সত্তাতেই কবির প্রধান প্রকাশ। তবু কবিতা দিয়েই কবিকে চেনা যায় না। কবিতা জীবন নয়, জীবন রস। সে রস আহরণ করতে পারি, যেটুকু পাত্রে ধরে পান করতে পারি কিন্তু তাই বলে তার বিশ্লেষণের ল্যাবরেটরিটি তোমার আমার এর ওর তার মনে বসান নেই। রবীন্দ্রনাথের কাব্য দৃষ্টির সেই রহস্য কুঠরীতে তার কাব্যের পথ বেয়ে চলতে চলতে একেবারে সুতো ধরে গিয়ে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়। মানুষ রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা কিছুমাত্র জানতেন না 'তাঁরাও যদি কেবলমাত্র নিজ নিজ চিত্তবৃত্তির অভিঘাতে মনস্তত্ত্বের প্যাঁচ কষে বা কোনো থিয়োরীকে প্রতিপন্ন করবার জন্য বাহ্যিক ঘটনার স্বেচ্ছাচারী সন্নিবেশ ও অসার্থক বৃত্তান্তের মধ্যে সে জীবনকে নূতন করে গড়বার চেষ্টা করেন সে শুধু উপন্যাস রচনা হয়—। রবীন্দ্র কাব্যকে তাঁর জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করবার আন্দাজি চেষ্টায় নানা অপকৃষ্ট ব্যাখ্যা যখন দেখি তখন মনে হয়, মহামানবকে বা যে-কোনো মানুষকে নিয়ে বটতলার উপন্যাস রচনার স্বাধীনতা কি ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্তর্গত? শুনেছিলাম নিতান্ত অতিষ্ঠ হয়ে কোনো একব্যক্তিকে তাঁর চিঠির উত্তর দিয়ে কবি সই করেছিলেন "ইতি নিষ্কৃতিপ্রার্থী রবীন্দ্রনাথ।" তাই ভাবি এই সব ক্ষুদ্র মুষ্টির চাপে তাঁর বিপুল সত্তা আজও বেধহয় নিষ্কৃতি প্রার্থনা করে!

তবে এও ঠিক যে নিখুঁত তথ্য পঞ্জিকায়ও জীবনরূপ ধরা পড়ে না। সৌন্দর্যের স্বরূপ যেমন নন্দনতত্ত্বে নেই আছে তার জ্যোতিউদ্ভাসে, অন্য মনের উপর তার প্রতিফলনে, তেমনি সেই অনন্যসাধারণ জীবনকে তার প্রত্যক্ষতার মধ্যে দেখলে তবেই জানা যায় যেন খণ্ড খণ্ড করে সাইকোঅ্যানালিসিসের প্রচেষ্টা কঙ্কালে লাবণ্য খোঁজার মতই মূঢ়তা মাত্র। যাঁরা কবির মানবী-সত্তার সৌন্দর্যবিকাশ দেখেছিলেন তাঁরা জানেন কোনো শ্রেষ্ঠ শিল্পের চেয়ে তা কম ছিল না—সেই ব্যক্তিত্বের যে আনন্দস্পর্শ বই-এর পাতায় তার লাবণ্যছায়া পড়বে না সে শুধু ধরতে পারে মানুষের মন, স্মৃতি, অনুভব। অনেক সময় তাই ভেবেছি যাঁরা তাঁকে নিকট থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁদের কাছ থেকে তাঁদের মনের মধ্যে সেই মহামানবের কী আকৃতি বিধৃত আছে জেনে নেব। তাঁর বহুমুখী ও বিচিত্র ভাবের দ্যুতিলীলা সমগ্রভাবে প্রতিফলিত হবার মত চিত্তভূমি দুর্লভ, তাই অনেকজনের অনেক অভিজ্ঞতার একটা মালা গাঁথবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সফল হল না। বিঘ্ন অনেক। প্রথমতঃ স্মৃতি দুর্বল। তারপর স্মৃতি সত্যের অনুকল্প নয়। অনুসন্ধান করতে গিয়ে এও দেখেছি শিক্ষিত বিচক্ষণ নামী ও বিশিষ্ট মানুষের মধ্যেও অনেকেই মনের ধারণাগুলি স্পষ্ট করে আকার দিতে পারেন না। স্মৃতি তাঁদের আবছায়ার ঘোমটা পরানো অনুভূতির তীক্ষ্ণতা নেই। আমার প্রশ্নের উত্তরে এই সেদিন একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি বললেন—প্রথম কবে তাঁকে দেখেছি আমার মনে পড়ে না। তবে সম্ভবতঃ সেটা ১৯২২ সাল। কবি তখন সাউথ কেনসিংটনে থাকতেন সে সময়ে আমি ও অমূকবাবু প্রায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। তিনি কী বলতেন আমার কিছুই মনে পড়ে না। শুধু এইটুকু মনে আছে যে, বিশ্বভারতীর সাফল্য কল্পনা কখন তাঁর মনে আসছে সর্বদা সেই কথাই কেবল বলতেন। বিশ্বভারতীর সৃষ্টি কল্পনা তখন তাঁর কাছে স্পষ্ট বাস্তব ও সত্য ছিল খুব। তিনি ঐ বিষয় ছাড়া যেন আর কিছু ভাবতেন না। কিন্তু আমরা তখন সে সব কথা বিশেষ আগ্রহ করে শুনতাম না, কারণ সবটাই ভারি আজগুবি মনে হত। বাংলাদেশের একটা গণ্ডগ্রাম বোলপুরে। সেখানে এমন একটা জায়গা সৃষ্টি হবে যে, দেশ-বিদেশের পণ্ডিতরা গিয়ে উপস্থিত হবেন—ইয়োরোপের জ্ঞানী-গুণীরা গরুরগাড়ীতে চড়ে সেই খড়োমাটির ঘরে গিয়ে বসবাস করবেন, বোলপুরের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াবেন ও পড়বেন। এ সব কল্পনা এত অবাস্তব মনে হত যে, আমরা হাসতাম। কবির এই কল্পনার ছায়াছবি মন দিয়ে লক্ষ্যই করতাম না সেইজন্যই কবির তখনকার স্মৃতি আমার মনে স্পষ্ট নয়।

আরো অনেকের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, নিজ নিজ চিন্তার ক্ষুদ্র গণ্ডীতে অনেক উজ্জ্বল তথ্য তাৎপর্যভ্রষ্ট হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। তখন এই উঞ্ছবৃত্তি ত্যাগ করলাম। কারণ কোন কথা তিনি কি মনে করে বলতেন, কোন ভাব তাঁর মনে কী তরঙ্গ তুলত তার গভীরতা ও ব্যাপকতার সম্বন্ধে সাধারণতঃ অনুমান করা ছিল দুঃসাধ্য। অতি সামান্য ও তুচ্ছ ঘটনা হয়ত তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিত, আবার অনেক বড় বড় দুঃখ বেদনার আঘাতেও থাকতেন অস্পর্শিত। তার ভাবলোকের খেলাঘরে ঢুকবার সাধ্য ছিল না অনেকেরই।

রবীন্দ্রমানসের অপ্রমেয়তার কথা চিন্তা করতে গিয়ে আমার হঠাৎ একটি অদ্ভুত ঘটনা মনে পড়ল—জানিনা এ ঘটনার আর কোথাও কখনো উল্লেখ করেছি কিনা। সেটা সম্ভবতঃ ১৯২৯ সাল। একজোড়া রুশ স্বামী-স্ত্রী থটরিডিং বা মেসম্যারিজমের খেলা দেখিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁরা কলকাতায় গ্লোব থিয়েটারে উপর্যুপরি কয়েকদিন বিমুগ্ধ নাগরিকদের তাজ্জব খেলা দেখালেন। ভদ্রমহিলা কালো পোষাক পরে চোখ বেঁধে এসে স্টেজে দাঁড়ালে তার স্বামী দর্শকদের মধ্যে নেমে এসে প্রশ্নকারীর নাড়ী টিপে ধরতেন। তখন সেই ব্যক্তির অনুচ্চারিত প্রশ্ন ও তার বেশ রসাল উত্তর ভদ্রমহিলা উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠতেন এবং তা সঠিক হত। যেমন বললেন—তুমি জিজ্ঞাসা করছ তোমার পকেটের দেশলাইর বাক্সে ক'টি কাঠি আছে? আমি বলছি বাহাত্তর। গুণে দেখা গেল, সত্যই তাই। সেই রাশিয়ান পরিবারের সঙ্গে আমাদের বেশ পরিচয় হয়ে গেল। তাঁরা আমাদের বাড়িতে এসে চা সহযোগে অনেক আশ্চর্য খেলা দেখালেন—কঠিন সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ করে মনের কথা পড়বার আশ্চর্য ক্ষমতার নিঃসংশয় প্রমাণ দিলেন। সেই সময় কবি দু'একদিনের জন্য শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় এসেছিলেন, আমরা তৎক্ষণাৎ গিয়ে তাঁকে এই অদ্ভুত খবরটি পল্লবিত করে বর্ণনা করলুম। কবির জিজ্ঞাসা ও অফুরাণ আগ্রহ কোনোদিকেই বিমুখ ছিল না। বিশ্বাসের কোনো গোঁড়ামীও তার কৌতুহলকে পাথরচাপা দিতে পারত না। উদার উন্মুখ সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিয়ে বিশ্বের অনন্ত রহস্যে তাঁর চলত অনুসন্ধান। তিনি বললেন, তাদের এখানে আনো একবার

পরীক্ষা করে দেখি। রুশ দম্পতী তো এই অচিন্ত্যপূর্ব সুযোগ পেয়ে মহানন্দে সেজেগুজে আমাদের সঙ্গে রওনা হল। ঠাকুরবাড়ির সামনে পেঁছে তারা নমস্কার করে বলে—এ বাড়িতে ঢুকব কখনো কল্পনা করিনি। দোতলায় যে ঘরকে বলা হয় 'পাথরের ঘর' যে ঘরে কবির শেষনিঃশ্বাস পড়েছিল সেই ঘরে তারা এসে বসল। কবি তেতলার ঘর থেকে নেমে এলেন। আজও আমার সে দিনটি স্পষ্ট মনে পড়ে। তখনও বার্ধক্যে ন্যুব্জ হয়নি দীর্ঘ দেহ—চলাফেরা কষ্টসাধ্য নয়—ঘোরান সরু কাঠের সিঁড়ি দিয়ে অনায়াসে ওঠানামা করেন। নূতন কিছু দেখবার আগ্রহে উদ্দীপ্ত চোখে মুখে সহাস্য অভ্যর্থনা নিয়ে এসে বসলেন। আমাকে আগেই তিনি বলেছিলেন কী তিনি ভাববেন তা আমাদের কখনই বলবেন না, কারণ আমরা যে রকম ওকালতী করেছি তাতে কে জানে আমরা ওদের চর কিনা। যাহোক তারপর মেয়েটি বললে—আপনি একটা কিছু চিন্তা করুন—তার স্বামী এসে সাগ্রহে তার নাড়ী টিপল। মেয়েটি চেষ্টা করতে লাগল। চেষ্টা করতে করতে তার মুখ রক্তিমবর্ণ হল, তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। সে কাতর হয়ে বল্লে—আজ আমার কী হল। There is a wall before me! তার অবস্থা দেখে কবি কিছুটা দয়ার্দ্র হয়ে কিছুটা বা ব্যাপারটা দেখার আগ্রহে বললেন—আমি তোমায় সাহায্য করে করছি। আমি কথাটা খুব সহজ করে ভাবি ও কাগজে লিখি। কবি কাগজে লিখলেন ও খুব আগ্রহভরে অপেক্ষা করে রইলেন, যেন সে পারে অসম্ভবের খেলাটা যেন মাটি না হয়। কিন্তু সে মেয়ে পারল না। অদম্য ও প্রাণপণ চেষ্টায় তার শরীর উত্তেজিত হয়ে উঠল—সে ঘরময় পায়চারী করতে করতে বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে চোখে হাত ঢেকে দ্রুত হাঁটতে লাগল—তারপর There is a wall before me এই কথাটা বারবার বলতে বলতে আমাকে আমার বাবাকে আর তার হতবুদ্ধি স্বামীকে ফেলে দৌড়ে নীচে নেমে রাস্তা দিয়ে ছুটে চলে গেল। তার স্বামী—ও চাপা পড়বে ও গাড়ী চাপা পড়বে বলতে বলতে বৌর পিছন পিছন দৌড়ল। তারপর আমরা পিতা-পুত্রী অনেক ঠাট্টা শুনলুম। কবি স্পষ্টই বললেন আমাদের বোকা বানিয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর জানেন ওরা প্রতিদিন হাজার হাজার লোকের থটরিডিং করত!

কেন ঐ রুশ যাদুকরীর অমন অবস্থা হল তা নিয়ে অনেক জল্পনা হয়েছে আমাদের বাড়িতে অনেক দিন। তার চেয়ে বড় মনের কাছে কি তার পরাজয় হল? সম্ভবত সে এই বিরাট ব্যক্তিত্বের সামনে এসে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের একটি বিশেষত্ব ছিল এই যে, অন্য চিত্তের উপর তাঁর প্রভাব যুক্তিতর্কের অপেক্ষা রাখত না। তিনি কি করেছেন, কি লিখেছেন, তাঁর মতামত গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য, ভালো কি মন্দ কিছুই জানা না থাকলেও শুধু তাঁর উপস্থিতিই যে প্রতিভার দ্যুতি বিকীর্ণ করত তাকে কেউ অস্বীকার করতে পারত না। আমরা অনেকেই যখন তাকে প্রথম দেখে চমৎকৃত হয়েছি, তখন

স্কেচ — দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
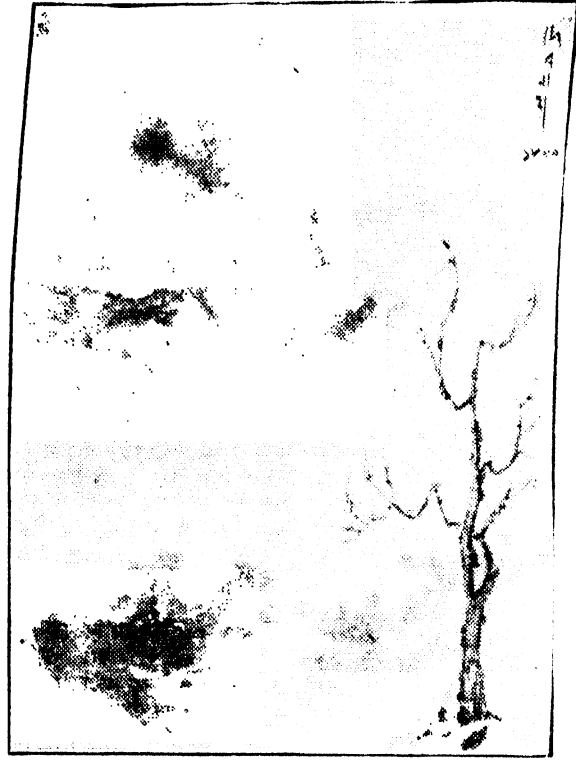
তাঁর কাব্য পড়ে বিশারদ হইনি আমাদের শৈশবে, বাল্যকালে অর্বাচীন মূঢ় মনে। ভোরের আলোর মত সেই অরুণোদয়। আলো যেমন সকল প্রশ্নের অতীতরূপে নিঃসংশয় চক্ষুষ্মানের চোখের সামনে উদ্ভাসিত, তেমনি তাঁর প্রতিভার ইন্দ্রিয়ানুভব সহজ ও নিঃসংশয় ছিল। সেজন্য তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শনের কথা যে কেউ লিখেছেন তা উচ্ছ্বাস বা কবিত্বে পরিণত হয়েছে। কারণ সৌন্দর্যের প্রতিরূপই শিল্প। এ সম্বন্ধে বিদেশের দুটি অজ্ঞাত মানুষের মনোভাব লিখছি। ১৯১৩ সালে জেসপার স্মিথ নামে এক ব্যক্তি ইংল্যান্ডের একটি খবরের কাগজে লিখছেনঃ—

"গত গ্রীষ্মকালে আমাদের মধ্যে একজন মানুষ এসেছিলেন, আমাদের মধ্যে বাস করেছিলেন, আমাদের এই লণ্ডনের রাস্তায় হেঁটে ছিলেন। যাঁকে হঠাৎ দেখলে মনে হয় তিনি এ যুগের মানুষ নন—হয় তিনি সুদূর অতীতের। নয় তিনি অনাগত ভবিষ্যতের—এই বর্তমানের নয়। তিনি আমাদের কাছে সাগর পার হয়ে এসেছিলেন—কিন্তু তাঁকে দেখলে মনে হত শুধু সাগরের নয় বহু যুগের ওপার থেকে তিনি আমাদের কাছে এসেছেন। সেই দীর্ঘ ঋজু দেহ, বিলম্বিত শ্মশ্রু উন্নত মস্তক, রাজকীয় ভঙ্গী, দীপ্ত নির্ভীক দৃষ্টি—যদিও কোমলতা জড়ান সে চোখ দেখলে মনে বিশ্বাস হয় যেন তিনি নিশ্চয়ই সেই আর্থারের যুগ থেকে উঠে এসেছেন, যখন সবল দুর্বলকে সেবা করতে লজ্জা পেত না। যখন জ্ঞানী অজ্ঞানীকে শিক্ষা দিত, ছলনা করত না এবং যখন নাইটহুড বা বীরত্বের উপাধির মহিমা ছিল, খেতাব জোগাড় করায় নয়, যোগ্যতায়।"...

লস এঞ্জেলস-এর একটি ভদ্রমহিলা ১৯১৬ সালে তাঁর বন্ধুকে লিখছেন—"আমি যখন সুন্দর স্প্যানিশ প্রাঙ্গণে খাবার টেবিলে বসেছিলাম চারদিকে পাম গাছের পাতা আর স্প্যানিশ রংগীন পাতাকাগুলি থর থর করছিল—মাঝে মাঝে মত্ত কোকিল এখানে ওখানে ডেকে উঠছিল—স্প্যানিশ মেয়েরা হলুদে জামা পরে আর জাপানী ছেলেরা রঙগীন সাজে ঘুরে বেড়াচ্ছিল—আর আমাদের মাথার উপরে ভাসছিল ক্যালিফোর্ণিয়ার নীলাকাশ—তখন আমার ঠিক পাশের টেবিলে পূর্ব দেশের পোষাক পরিহিত রবীন্দ্রনাথকে বসে থাকতে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি নিশ্চয় ঐ মরুভূমি পার হয়ে একটা সাদা উটে চড়ে এখানে এসে পেঁছেছেন। তাঁর সেই বাহন যেন বাইরেই অপেক্ষা করে আছে! কারণ তিনি যে সেই মাজিদের একেবারে নিখুঁত প্রতিমূর্তি তাঁকে দেখে মনে হল তিনি যেন সেই বেথলেহামের তারকা অনুসরণ করে যাত্রা করেছেন এবং আমাদের এই সুন্দর পান্থশালায় একটুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করতে এসেছেন।"

এই বর্ণনাগুলি নিঃসন্দেহে কবিত্ব। তবু কবির জীবনালেখ্যর এরা উপাদান। তথ্যের চেয়েও সত্যোদ্ভাস। মনোবিকলন করে, বা ঘটনার বিশ্লেষণ করে তালিকা লিখে জ্যোতির্ময় মনঃস্বরূপকে বোঝা যায় না। মনেই তার প্রতিফলন প্রয়োজন, কারণ—"সে অন্তরময় অন্তর মেশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়—"

শুভ্র ত্বক
ব্রন
মেচেতা
Basant
Malati
রূপ প্রসাধনে
অপরিহার্য
বসন্ত
মালতী
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২
১, টাকার্স লেন, রডওয়ে, মাদ্রাজ—১
সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

সোনার ময়ূর
হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

ঘাটের দেয়াল :
ফাটল ধরেছে ভিতে,
শ্যাওলার কোলে বর্ষার জলধারা—
ধস্‌ধারা যেন বধূবরণের রাতে, নীরবে নেমেছে
পাশাপাশি অনুরাগে—
প্রেম ও পিপাসা মিলন-পিয়াসী মন!
স্মৃতির ঝরণা!
খিড়কির পথে আগাছা উঠেছে ভরে,
পায়ে-চলা পথ ঘনদূর্বার ফাঁকে :
আঁকা-বাঁকা মন—এলোমেলো ত্রয়োদশী,
আধো-ঢাকা তনু, আধো অবয়ব খোলা,
আনমনে যেন চলেছে স্নানের ঘাটে!
শেওলা জমেছে পানাড়ির আশে পাশে;
পানকৌড়ির ডানায় শুকনো জল—
তীরে আশা তার ডুবেছে শতেকবার
জেগেছে শঙ্কাভরে—তন্দ্রা-অলস আঁখি।
পা-দুটি ডুবায়ে জলে, তন্বী রূপসী
শান-বাঁধা-ঘাটে রাণার কিনারে বসি
দেখেছে অঙ্গ নিভৃত প্রহরে একা,
চকিত নয়ন মেলি,
পিছনের পানে চেয়ে বারবার,
জলের আরশি ভরেছে অঙ্গ ঢালি।
কস্তুরী মৃগ আপন গন্ধে
আপনি উঠেছে মাতি :
নবযৌবনা—যৌবন ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

ঝুম্‌কোলতার পাপড়ি পড়েছে ঝরে,
পাতায় পাতায় শুঁয়োপোকাদের ভিড়!
ফুল নাই, আছে পলাশ রঙের দাগ,
কাঁটা-ভরা বনে
স্তব্ধ দুপুরে বেলা—
কাঠ-ঠোকরার সাড়া : ধ্বনিত প্রতিধ্বনি।
মন ভেসে যায় দূরে,
আকাশের কোলে ভাসে যেথা ওই
শঙ্খচিলের ডানা।
বাধা নাই—নাই মানা।
চকিত নয়ন চকিতে হয়েছে থির
বাতায়ন তলে কুলুঙ্গিটার কোণে!
এখনও রয়েছে সেথা—নীরব সাক্ষী
লোহার কাজললতা!
মরচে ধরেছে,
অনাদর অভিমানে—ক্ষীয়মাণ তনু,
ম্রিয়মাণ দুটি আঁখি
নিথর দৃষ্টি মেলি, চেয়ে আছে মুখপানে!
এলো যৌবন অঙ্গে অঙ্গে বহে,
নামিল লজ্জা নম্রপদে ধীরে
ত্রস্ত চপল নয়নের তীরে তীরে,
বসি বাতায়নে
আনমনে একা একা,
সরু কাজলের রেখা
এঁকেছে নয়নে বৈকালী প্রসাধনে;
অধীর প্রতীক্ষায়।
তৃতীয়ার চাঁদ আকাশের ঘন নীলে
বন্দী হয়েছে বন্ধন রেখা-ডোরে।
স্তব্ধ চকোর!
তৃষ্ণাতুর নিশা......
পলে পলে চঞ্চল!

প্রশ্ন
শ্রীবাসবী বসু

যে সন্ধ্যা গিয়েছে মিশে রাতের আঁধারে,
ভেসে গেছে কালের পাথারে—
তারি কোন সুরেরেশ
কণাটুকু অবশেষ
আজও কি তোমার মনে ভাসে?
কোনদিন শান্ত অবকাশে
শিহরায় মনের তলায়?
তুমি যারে ছেড়ে এলে জীবনের পথের চলায়।
সেদিনের হারানো চেতনা
ঝরে যাওয়া শেফালীর করুণ বেদনা
ছড়ায় কী, ভরায় কী, তোমার ও বুকে
স্তবকে স্তবকে
ফেলে আসা রজনীর রজনীগন্ধা আজো জাগে
পুরনো দিনের অনুরাগে—
দুলে ওঠে রাতের হাওয়ায়?
নাকি আকাশের গায়
ওরা শুধু ভেসে গেল মেঘের মতন।
সেদিনের অরূপ রতন
দুজনার সোনালী স্বপন
করিনু কি আকাশে বপন?
নিঃশেষে মিলায়ে গেল পথের ধূলায়?
স্বপ্নপাখী হারাল কুলায়?
বলে যেও তুমি তার
কি দিয়েছো দাম?
আমি যারে তোমারে দিলাম।

ঝড় বয়ে গেছে নিশিগন্ধার বনে।
তারপর?
তারপর এলো নূতন বন্যা ধারা
শ্রাবণ প্লাবনে দিশেহারা মন,
জোয়ারে তুলিয়া সপ্তডিঙার পাল :
নূতন বেসাতি
সোনার ময়ূর—ময়ূরপঙ্খী নায়ে,
অঙ্গ নিঙাড়ি অনঙ্গ-মধুরিমা
এলো সে যে কোন্ সোনার স্বপন-ছায়া,
নব চম্পক-কলি!
নয়ন হইতে কাজল মুছিয়া গেল।
উলঙ্গ নারী ঢাকিল লজ্জা তার
কাজল আড়ালে বাঁধিয়া নূতন আঁখি।

পলাশ ঝরিয়া গেছে,
কাঁটা-ভরা বনে কাঠঠোকরার সাড়া
স্তব্ধ দুপুরে ধ্বনিয়া তুলিছে যেন!
দুটি আঁখি দিশেহারা
খুঁজিয়া মরিছে অতীত দিনের স্মৃতি।
ইতিহাস।
ইতিহাস শুধু লেখা আছে তার
কাজললতার বুকে।
সোনার ময়ূর শঙ্খচিলের সাথে
মিলালো আকাশে কোন দূর নীলিমায়!
মরচে ধরেছে কাজললতার গায়ে,
স্মৃতি আছে শুধু—
রিক্ত পর্ণপুট!............কাজলের রেখা নাই।

তুমি ও আমি
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

যৌবন যদি গিয়ে থাকে প্রিয়ে,— যাক্‌না।
তুমি আর আমি আজও মেলিয়া পাখ্‌না
চলেছি—ডানায় অস্তরবির দীপ্তি।
ঝঞ্ঝারে হেরি করি নাই মোরা শঙ্কা,
খর-রোদ্দুরে বাজায়েছি জোর ডঙ্কা;
মরম-ঝাঝারে মরু বিজয়ের তৃপ্তি।
নীড় গেছে? ভালো। স্বল্পে ছিল না সুখতো!
ভীড়ের মধ্যে দুজনেই আজ মুক্ত।
ভবিষ্যতের স্বপ্ন দোঁহার চক্ষে।
মৃত-অতীতের কবরে থাকিনি বন্দী,
অত্যাচারের সাথে করি নাই সন্ধি,
অনুরাগ ছিল সর্বোদয়ের লক্ষ্যে।
প্রাণ চাহিয়াছি—চাহিনি ক্ষুদ্র শান্তি;
কোটর-জীবনে শুধু দুঃসহ ক্লান্তি,
নিজেদের লয়ে তাই থাকি নাই মগ্ন।
ঝাঁপায়ে পড়েছি অজানায় নিঃশঙ্ক,
আঁধারে, ঠাকুর, শুনেছি তোমারই শঙ্খ,
ঘোর দুর্দিনে আশা হয় নাই ভগ্ন।
চক্ষু রাঙায়ে এসেছে শত্রুসৈন্য,
হেনেছে আঘাত ভ্রূকুটীকুটীল দৈন্য,
তুমি কাছে ছিলে—ভয় এতটুকু পাইনি।
বাধার সঙ্গে সংগ্রামে সে কী স্ফূর্তি!
পার্শ্বে তোমার অটল মৌন মূর্তি;
অকূলে গিয়েছি-তীরে তীরে তরী বাইনি!

জীবন-সূর্য নামে পশ্চিমপ্রান্তে
সব-হারাদের স্বর্গ মর্তে আনতে
করেছি কত না যুদ্ধের পরে যুদ্ধ!
সাধ ছিল নাকো হইতে লক্ষ্মীমন্ত;
একথা সত্য—দুখের ছিল না অন্ত;
তবু গৃহস্বার রাখিনি আমরা রুদ্ধ।
পেরিয়ে এসেছি কত না সাগর-বক্ষ,
কত গিরিনদী!—আজ কি ক্লান্ত পক্ষ?
অনেক কষ্ট সহেছো এখন আর না।
এখন শান্তি। খুলে রাখো প্রিয়ে বর্ম,
ঘনায় সন্ধ্যা—সমাপ্ত হোক কর্ম,
আঁধারেতে বসি শোনো গান গায় ঝরণা!

অধিকার
• বাসব ঠাকুর •

শক্তিমদ গর্বে ওরা উঠিয়াছে মাতি
গোটাকয় জাতি,
ঈর্ষার তরঙ্গ ছায়
সভ্যতার ইতিহাস দগ্ধ ক'রে
মুছে দিতে চায়।
কিন্তু যারা এ ধরায় চাহে না মরিতে,
তাহাদের অধিকার, কোন্ অধিকারে তারা
চাহে গো হরিতে?
ওরা যদি অন্য গ্রহে যেতে চায় যাক
অথবা আয়ন স্তরে থাক ঘূরপাক,
দুঃখ নাই কোনো।
আসিবে তুষার যুগ বিজ্ঞান কহিছে
শোন শোন,
শোন শোন শক্তিস্বর্গবাসী,
তোমাদের আস্ফালনে মহাকাল
হাসে অট্টহাসি।

বর্ষাকালে যখন আপনারা একটা বদ্ধ বসবার ঘরে আটকে পড়েন, তখন মনের ভাব কেমন হয়? কিছুই করবার নেই বসে, কাজ-কর্মের অভাব নেই বাইরে। কিন্তু কি হবে?

পায়ের তলার কার্পেট, দরজা-জানালার পর্দা, দেওয়ালের ছবি বারে বারে দেখা হয়ে গেলে কি করণীয়? কফি চলছে, অন্য পানীয়ের অভাব নেই। ধূমপানের বিরতি নেই। তবু সময় কাটে না আর।

কোন এক বর্ষার দিনে আমরা কয়েকজন বন্ধু বিরাম মুখার্জির বসবার ঘরে আটক পড়ে গেলাম। দুই-একজনের গাড়ীও আছে। কিন্তু, ছাতা মাথায় ফুলের বাগান পার হয়ে গাড়ীতে উঠবার কষ্ট স্বীকারে প্রত্যেকেই বিরত।

'ওহে এস না, একটা গল্প চালানো যাক।' বিরাম মুখার্জি বার্মা চুরুট দাঁতে চেপে প্রস্তাব দিল।

ললিত সাহার একটু সাহিত্যিক খ্যাতির লোভ আছে, সে সাগ্রহে বলল, 'বেশ তো। আগাগোড়া গল্পটা লিখে কোন পত্রিকায়—'

অধ্যাপক ডাঃ আলি হেসে বললেন, 'প্রমথ চৌধুরীর 'চার ইয়ারীর কথা' পেয়েছ না কি?

রঞ্জিৎ কর হেসে উঠল, 'বর্ষার দিনে জগতে যত সাহিত্যিক ভাবাপন্ন ব্যক্তি গল্প গেঁথে বেড়ায় এবং প্রসিদ্ধ হয়। অতএব আমরাও সেই পথেই চলি না কেন?'

বিরাম মুখার্জি বললেন, 'তথাস্তু, নিজের জীবনের কোন কাহিনী বলা সুরু কর তোমরা।'

সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল একবার।

রঞ্জিৎ আবার হেসে উঠল, 'এখন সবাই নীরব দেখা যাচ্ছে। কেউ কথা বলতে রাজী নয়।'

কোণে বসে কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে বিরামের মাসতুতো ভাই কুণাল প্রশ্ন করল, 'কেমন গল্প চাই? বর্ষার দিনে জমবে শুধু ভূতের গল্প আর প্রেমের গল্প।' ললিত বলল, 'ভূত আমরা দেখিনি, প্রেম দেখেছি বহু। অতএব যেটা সত্য, সেইটাই বলা উচিত।

ডাঃ আলি বললেন, 'যেটা দেখিনি, সেটাই কি মিথ্যা? বিশ্ব সাহিত্যে আজকাল ভূত না হোক, দৈব বা সুপার ন্যাচারাল বলে একটা বস্তু এসে যাচ্ছে। তোমরা অবিশ্বাসী।' বিরাম বলল, আচ্ছা, এমন একটা গল্প আমি জানি যেটা দৈব এবং প্রেম মিশ্রিত একসঙ্গে। নিজের গল্প কেউ যখন বলবে না, তখন অন্যের গল্পই শোন।

'আমার মামা বীরেন্দ্র চৌধুরীর জীবনের একমাত্র ভুল মামীকে বিবাহ। সুললিতা সান্যাল জীবনে কখনও গুরুত্ব আরোপ করতে শেখেনি। চিরকাল যেভাবে চলা তার ইচ্ছা, দায়িত্বজ্ঞান শূন্যভাবে চলেছে সে। বীরেন মামা বড় শিকারী, কিন্তু নিজেই শিকার হয়ে গেলেন।

বহু সাধাসাধনার পর সুললিতা সান্যাল চৌধুরী হতে সম্মত হ'ল। মামা তাঁর পৈত্রিক আমলের বিরাট অট্টালিকা নূতন করে সাজিয়ে পত্নী প্রতিষ্ঠা করলেন।

তারপর সেখানে আরম্ভ হল—অভিযান। সমগ্র সহরের যত তরুণ আছে, সবাই না কি মামীর বন্ধু। তারা সেখানে অভিযান সুরু করল প্রত্যহ সকাল-বিকেলে। কতই যে দেখলাম মামীর কৃপায়। বেকার, কর্মী, সুশ্রী, কুশ্রী, লাজুক, বেহায়া সকলে মামার বসবার ঘরে চা, সিগারেট ধ্বংস করে যেতে লাগল। ছবির মত মামী সেজে বসে তাদের গল্প শুনতেন, একটু একটু হাসতেন। তাঁর নাকি আবাল্য অভ্যাস এমনি আড্ডা জমানো।

মামা শিকারে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াতেন। যখন গৃহে থাকতেন তখন মামীর পুরুষ বন্ধু নিয়ে আড্ডা জমানো দেখে দাঁতে দাঁত পিষতেন এবং একমনে একটার পর একটা বন্দুক পরিষ্কার করে যেতেন। আমরা দেখে ভয়ে শিউড়ে উঠতাম। কিন্তু, মামী মা কি প্রাগ বিবাহ যুগের অভ্যাস সমস্ত বজায় রাখবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে তবেই মামাকে গ্রহণ করেছেন।

মামীর বহু অভ্যাস ছিল, যথা গুরুজনদের প্রণাম না করা, বেলা দশটায় ঘুম থেকে ওঠা, মামা বিদেশে গেলে তাঁর চিঠিপত্রের উত্তর না দেওয়া, দুহাতে টাকা খরচ করা ইত্যাদি। কিন্তু কোনটাই প্রথমোক্তটির মত মারাত্মক নয়। অথচ, লক্ষ্য করে দেখলে এক অভ্যাস ছাড়া এর মধ্যে দূষণীয় কেউ কিছু পায় না। সুতরাং সহ্য করা ভিন্ন মামার উপায়ন্তর ছিল না।

একদা মামা কয়েক পেগ হুইস্কী সেবনান্তে সাহস সঞ্চয় করে মামীকে কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, এত বাজে ছেলে-ছোকরার সঙ্গে দিন-রাত মিশে কি পাও তুমি?'

মামী চোখে অপার্থিব দৃষ্টি এনে বল্লেন, 'বাজে! কি যে বল তুমি? তুমি জন্তু-জানোয়ার নিয়ে কারবার কর, মানুষ চিনতে শিখলে কবে? এরা সমাজের সম্পদ।'

মামা মিনমিন করে কোন মতে—আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু তুমি এদের চিনতে চাও কেন?'

মামীর হরিণ চোখে স্বপ্ন নেমে এল, চাঁপার কলি আঙ্গুলে আঙ্গুরে দোলানো চুলের স্তবক সরিয়ে গানের গলায় তিনি বললেন, 'আমি খুঁজে বেড়াই কে আমাকে প্রকৃত ভালবাসে।'

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল যেন ঘরের ভেতর ভূমিকম্প হল। সেই ভূমিকম্পের ধাক্কায় যেন আমার ছয় ফিট মামা কুঁকড়ে বেঁটে হয়ে গেলেন। চোখ তাঁর বসে গেল, চোয়াল জেগে উঠল এক লহমায়। শুকনো ঠোঁট চেটে ভাঙ্গা গলায় বল্লেন, 'তাহলে আমি আছি কেন?'

মামী শরীরে লাবণ্যের ঢেউ তুলে ঘর ছেড়ে যাবার সময়ে অবহেলার সঙ্গে বলে গেলেন, 'তুমি তো স্বামী।'

মামা তারপর চুপ করে গেলেন। কিন্তু শ্যেনদৃষ্টি মেলে মামীর গতিবিধি দেখে যেতে লাগলেন। শিকারে বাইরে যাওয়া ছেড়ে দিলেন। বলতে লজ্জা করে, ঝি-চাকর, আত্মীয়-বন্ধুদের সহায়তা পর্যন্ত নিতে লাগলেন গোপনে। কিন্তু মামীর চরিত্র খারাপ হবার সামান্যতম লক্ষণ পেলেন না।

তখন মামা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন মামীর মাথা প্রকৃতিস্থ নেই বিবেচনায়। আবার তিনি শিকারে যেতে লাগলেন যথানিয়মে। মামীর পাগলামীকে স্নেহের চক্ষে দেখতে লাগলেন।'

ধৈর্য ধরে গল্পটা আমরা শুনছিলাম। হঠাৎ রঞ্জিৎ বলে উঠল, 'এর মধ্যে দৈব কোথায়?'

ললিত সাহা বলল, 'প্রেমই বা কোথায়? বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের গল্প মাত্র।'

বিরাম বলল, 'চুপ করে শোনই না শেষ পর্যন্ত। তারপর একদিন মামা মামীর জন্য

একটি বিচিত্র উপহার আনলেন তিব্বত শিকার থেকে। প্রতিটি শিকারে মামীর জন্য জিনিষপত্র আনতেন উনি, বাঘের চামড়া, ভালুকের মাথা, কুমীরের ল্যাজ। মামী সেগুলো কখনও ছুঁতেন না ঘেন্নায়।

এবার এল নূতন বস্তু—ছাইদান। কালো কাঠের খোদানো পেচক একটি গুরু-গম্ভীর-ভাবে বসে আছে। সম্মুখে তার সিগারেট রাখবার, দেশলাই রাখবার পাত্র আর ছাইদান। কিন্তু প্যাঁচার একটি চোখ কাঁচের আধারে জ্বলছে, অন্য চোখ আঁকা আছে ঠিক, কিন্তু কাঁচটা নেই। সুতরাং চোখ নিভন্ত।

মামা সবিনয়ে বল্লেন, 'তোমার বন্ধুদের জন্যে এটা আনলাম। বসবার ঘরে রেখে দাও।'

বন্ধুদের কথা শুনে মামী সুখী হলেন।

মামা বল্লেন, 'এর মধ্যে একটা রহস্য আছে। প্যাঁচাটার একটা মাত্র চোখ, তবু অনেক দাম দিয়ে কিনে আনলাম। এক তিব্বতী লামার সম্পত্তি ছিল এটা। অলৌকিক শক্তি আছে এর। যার কাছে যখন থাকে, তখন তাকে কোন লোক যদি প্রকৃত ভালবাসে, সেই লোক এখানে মুখ থেকে সিগারেট রাখলেই পাখীটার অন্য চোখ জ্বলে উঠবে। প্রেম অন্ধ, কিন্তু চক্ষুষ্মান হ'লে তবেই প্রকৃত প্রেমিককে চেনা যায়।'

মামী মুক্তা দন্তে হেসে বললেন, 'ওমা, তাই নাকি! ভারী মজার তো। আচ্ছা, যদি সে লোক সিগারেট না খায়, তবে?'

মামা বোকার মত মাথা চুলকে বল্লেন, 'ওহো, তা তো জানি না। তবে হ্যাঁ, সিগারেট খাইয়ে দেখতে পার সবাইকে।'

মামীর বসবার ঘরে সেই পেচক অধিষ্ঠিত হ'ল। বোধহয় কাঠের হ'লেও লক্ষ্মী প্যাঁচার জাত, মামীর অলক্ষ্মীপনা যেন কমে যেতে লাগল। প্রত্যেকটি লোকের সিগারেট খাবার পরে মামী নিয়মিত ছাইদান পরীক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু হায়, সেই পেচক তো চক্ষুষ্মান হল না। ফলে লোকগুলির উপর মামী বীতরাগ হয়ে উঠলেন। তাদের যাতায়াত কমে গেল।'

ডাঃ আলি এবার টিপ্পনী দিলেন, 'মেয়েরা আধুনিক হলেও যে সংস্কারমুক্ত হয় না তার প্রমাণ তোমার মামী।'

ললিত বলল, 'মামাই বা কম কি? অত দাম দিয়ে তিব্বত থেকে ওটা অলৌকিক বলে আনলেনই বা কেন?'

ডাঃ আলি বললেন, 'প্রাণের দায়ে, হে সাহা, প্রাণের দায়ে। বিবাহ কর আগে, তারপরে বুঝবে।'

বিরাম বলল, 'এই রেটে তোমরা টীকা-টিপ্পনী কাটলে গল্প শেষ হবে না। আমি চুপ করলাম।'

রঞ্জিৎ বলল, 'সে কি কথা? সবে দৈব দেখা দিয়েছে মাত্র; জমে উঠেছে গল্প। বল, বল। আমরাই চুপ করছি।'

বিরাম বলতে লাগল—

এমনিভাবে দিন চলতে লাগল। মামীর বসবার ঘর প্রায় ফাঁকা, অথচ মামীর প্রকৃত ভালবাসা দেখা দিল না। ফলে মামী একটু খিটখিটে হয়ে পড়লেন। মামা গোপনে একজন সাইকো-অ্যানালিস্টকে বন্ধু বলে পরিচয় দিয়ে মামীর সম্মুখে উপস্থিত করলেন।

কাটখোট্টা তরুণ একটি, শার্ট সার্ট পরা, তবে ধারালো। ধার শানানো ছুরির প্রথায় মামীকে কেটে কেটে সেই লোক পরীক্ষা সুরু করল। ক্রমে ক্রমে মামীর মধ্যে যেন একটা স্বাভাবিক সারল্য দেখা দিল।

এইবার অলৌকিক রহস্যের কথা বলতে হয়। মামীর বসবার ঘরের দিকে আগে মামা ভ্রমেও যেতেন না, গেলেই রাগ হ'বে বলে। মনস্তাত্ত্বিক নিযুক্ত করার পরে আড়াল থেকে মধ্যে মধ্যে কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে দেখতেন মামীর কতদূর উন্নতি হচ্ছে।

সেদিন অপরাহ্নে চা খাবার পরে সিগারেটটি ধরিয়ে মামা একটু বিষয় সম্পত্তির তদারকে যাচ্ছিলেন। কেমন খেয়াল হল ঘুরে ঢাকা বারান্দা ধরে মামীর বসবার ঘরের জানালায় পোঁছলেন।

ঘরের মধ্যে সাইকো-অ্যানালিস্ট মামীকে প্রশ্ন করছে, 'তোমার দুঃখটা কি তবে?'

মামা চমকিত হলেন। তাঁর স্ত্রীকে ভাড়া-করা মনস্তাত্ত্বিক কবে থেকে তুমি বলছে! তারপরে ধরে নিলেন এটা হয়তো চিকিৎসারই অঙ্গ।

মামী বলছেন, 'তোমাকে বলেছি বহুবার, ভূপেশ।'

মামা আবার চমকিত হলেন। ভদ্রলোকের নাম 'ভূপেশ' তিনি জানতেন না।

ভূপেশ নীচু গলায় কি যেন বলল। মামী করুণ কণ্ঠে কথা বলে চললেন, 'আমাকে কেউ ভালবাসে না ভূপেশ।'

সাইকো-অ্যানালিস্ট গলা ঝাড়া দিল, হাজার হলেও মামার টাকা যাচ্ছে তো, অগত্যা বলল, 'তোমার স্বামী তোমাকে ভালবাসেন। দেখ না তোমাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন কত!'

এই কথায় সুললিতা মামী দপ করে জ্বলে উঠলেন। ওঁর করুণ কোমল ভাব এক নিমেষে অন্তর্ধান হল। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মামী রাগের মাথায় ক্ষোভিত, বুঁচীর মত স্বামী নিন্দা করতে লাগলেন। মামার সম্পর্কে মামীর ধারণা ভাল নয় মামা জানতেন, কিন্তু এত খারাপ যে তা জানতেন না।

মামী কর্কশ গলায় রুক্ষমুখ ভাবে বলে চললেন, 'স্বাধীনতা! স্বাধীনতা সেই দেয়, যে ভালবাসা দিতে পারে না। ভারী আমার ভাল-বাসার স্বামী রে! কাঠ-গোঁয়ার একটা। মাসের মধ্যে অর্ধেক দিন জানোয়ারের পেছনে জংগলে ধাওয়া করে বুনো কোথাকার!'

মামা মরমে মরে কাঠের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। মামী পাগলের মত হাত নেড়ে বলতে লাগলেন, 'কি রে আমার ভালবাসা! যে ভালবাসে, সে কখনও স্ত্রীকে ফেলে বুনো জন্তু নিয়ে থাকে? ওর মধ্যে কি কোন মনুষ্যত্ব আছে?'

ভূপেশ বলে উঠল, 'স্বামীর প্রতি তোমার এমন ধারণা তা তো কোনদিন জানাওনি, সুললিতা!'

মামী রুখে উঠলেন, 'জানাবার কি আছে, শুনি? দেখলেই তো বোঝা যায়। লোকের মধ্যে আমার মুখ দেখানো দায়।'

'তার মানে?'

মানে আবার কি? যে লোক একটুও ভালবাসে, সে কখনও স্ত্রীকে দশজনের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বনে-বাদাড়ে বন্দুক ঘাড়ে বেড়ায়? তার ঈর্ষ্যা হয় না? দিনের পর দিন হাজারটা পুরুষের সঙ্গে ও-ে দেখিয়ে দেখিয়ে আড্ডা দিয়েছি পরীক্ষা করবা-জন্যে। একেবারে গাড়োল একটা।'

ভূপেশ আবেগের সঙ্গে বলে উঠ-'আমারও তাই মনে হয়। ওর মনে প্রেম নেই নেহাৎ কাটখোট্টা। তুমি যদি ভালবাসা চা-তাহলে আমাকে একটা সুযোগ দাও, সুললিতা আমি তোমাকে সুখী করতে পারব—'

এই পর্যন্ত শুনে মামা ক্রুদ্ধ জানোয়ারের মতই বসবার ঘরে ঢুকে পড়লেন—'এত বড় আস্পর্ধা তোমার, আমার স্ত্রীকে তুমি এই সব কথা বলতে সাহস পাও? দূর হয়ে যাও। গেট আউট স্কাউণ্ড্রেল কোথাকার। দেখি, পিস্তলটা কোথায়।'

মামা হাতের জ্বলন্ত সিগারেট ছাইদানে রেখে পিস্তল খুঁজতে গেলেন। ইতিমধ্যে সাইকো-অ্যানালিস্ট উধাও হল।

পরের দিন সকালে মামা মামীকে ডেকে দেখালেন, তিব্বতীয় ছাইদানে পেচকের নিভন্ত চোখ একখণ্ড কাঁচে জ্বলে উঠেছে। ছাইদানে মামার মুখের সিগারেট আধ খাওয়া পড়ে আছে। জীবনে প্রথম মামা ওই ছাইদান ব্যবহার করলেন। আশ্চর্য! অলৌকিক!

মামা ভূপেশকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে পিস্তল খুঁজতে যাবার পর থেকেই মামীর মেজাজ মোলায়েম হয়ে গিয়েছিল। তিনি শুধু মধুর সলজ্জ হাসির উত্তর দিলেন।

তারপর? মামা-মামী বসবার ঘরে দুজনে মাত্র বসতে লাগলেন। মামীর আড্ডা দেওয়ার অভ্যাস মামাকে নিয়েই সীমাবদ্ধ রইল। মামা শিকারে যাওয়া ছেড়ে দিলেন।'

বিরাম চুপ করলে আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম 'এটা না হয় প্রেমের গল্প হ'ল, দৈব বা অলৌকিক কই?'

'কেন, প্যাঁচাটা যে চোখ পেল?'

রঞ্জিৎ বলে উঠল, 'তার ব্যাখ্যা যে, তোমার মামা রাত্রে প্যাঁচার চোখে এক খণ্ড কাঁচ লাগিয়ে সকালে তোমার মামীকে দেখিয়েছেন, নিজের প্রেম সম্বন্ধে স্ত্রীর সন্দেহ দূর করতে—কি বল?'

বিরাম হেসে বলল, 'এর উত্তর ডক্টর আলি আগেই দিয়ে রেখেছেন। তোমরা অবিশ্বাসী।'

স্বর্গাদপি গরীয়সী

শিক্ষিকা প্রশ্ন করলেন, "তোমরা কে কে স্বর্গে যেতে চাও?" একটি ছোট ছেলে ছাড়া সবাই হাত তুললো।

শিক্ষিকা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি স্বর্গে যেতে চাও না কেন?"

ছেলেটি বলল, "মা আমাকে বলেছেন সোজা স্কুল থেকে বাড়ী যেতে।"

সুলেখানুরাগীদের প্রতি

বন্ধুগণ,

সুলেখা কালির বর্তমান জনপ্রিয়তার পশ্চাতে একদিকে রহিয়াছে ইহার ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষ, অন্যদিকে রহিয়াছে আপনাদের ঐকান্তিক সহযোগিতা। আজ কৃতজ্ঞচিত্তে সেকথা স্মরণ করি।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, সুলেখার এই জনপ্রিয়তার সুযোগ লইয়া কতিপয় অসাধু ব্যক্তি বাজারে জাল কালি চালাইতেছে। এজন্য আমরা অবশ্য ক্রমে ক্রমে জাল-নিরোধক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছি।

এদিকে আবার কিছুদিন হইল, আর-এক শ্রেণীর অসাধুতা দেখা দিয়াছে। হুবহু সুলেখার কার্টন, দোয়াত, লেবেল, ছাপা — মনে হইবে যেন সুলেখা কালি-ই। কিন্তু লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন, সুলেখা নয়, অন্য কোন নামের কালি। অথচ সুলেখার সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্যযুক্ত। প্রতারণার আর এক অভিনব পন্থা।

সুলেখানুরাগী সকলকেই এ সম্বন্ধে সজাগ করিয়া দিতে চাই। সেই সঙ্গে জানাইতে চাই, যে-সকল শিল্প দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ দৃঢ় করিতে সচেষ্ট তাঁহাদিগকে এই সকল দুর্নীতির হাত হইতে রক্ষা করা দায়িত্বশীল ব্যক্তিমাত্রেরই অন্যতম কর্তব্য।

আপনাদের
শ্রী[illegible]
ননীগোপাল মৈত্র
ডাইরেক্টারস, ম্যানেজিং এজেন্টস্,
সুলেখা ওয়ার্কস্ লিমিটেড

সুলেখা পার্ক
কলিকাতা ৩২
মহালয়া, ১৩৬৫
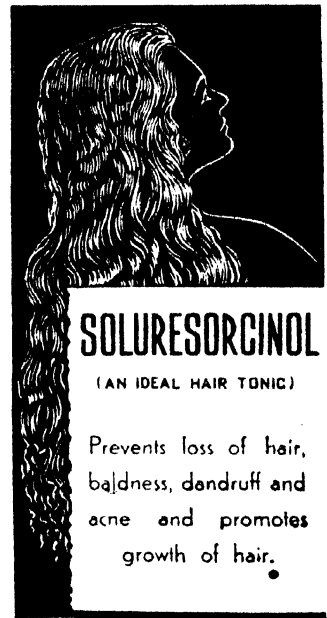
PASTEUR LABORATORIES
PRIVATE LTD.
2, CORNWALLIS STREET,
CALCUTTA-6

PHONE : 34-2674

আল্‌বেরুনী ও জনৈক পন্ডিত

॥ রেজাউল করীম ॥

[কলিকাতায় অবস্থিত "ইরান সোসাইটি'র উদ্যোগে ১৯৫২ সালের ২৩শে মার্চ এই ক্ষুদ্র নাটিকাটি অভিনীত হয়েছিল। এর লেখকের নাম ভি কুর্তোআ (V. Courtois)। বাঙ্গলা নাটিকাটি তাঁর সেই ইংরাজি নাটিকার মর্মানুবাদ। আল্‌বেরুনীর "তাহ্‌কিক্‌মালিল্‌ হিন্দের" দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ অবলম্বন করে এই নাটিকা রচিত। এই পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় হ'চ্ছে, "ভারতীয় হিন্দুদের ঈশ্বরে বিশ্বাস"। নাটিকায় উল্লিখিত পাত্র, স্থান, কাল, পরিবেশ—এ সবের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই—নিছক কাল্পনিক। তবে তত্ত্বালোচনাগুলি আল্‌বেরুনীর পুস্তক থেকে গৃহীত। নাটিকাতে কোন প্লট নাই—আছে একটি দৃশ্য। ভারতের পন্ডিতগণের সঙ্গে আল্‌বেরুনীর যে সব আলোচনা হ'য়েছিল তারি একটা আভাষ পাওয়া যাবে এই নাটিকায়। তিনি ভারতের বহু পন্ডিতের সঙ্গে ধর্মালোচনা করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে মেলা-মেশা করেছিলেন। তিনি তাঁদের নিকট ভারতীয় দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র শিক্ষালাভ করেছিলেন। কল্পনা করা যাক যে, তিনি ভ্রমণ করতে করতে একজন পন্ডিতের পাঠশালার নিকট উপস্থিত হ'লেন। দেখা গেল যে, একজন মহান পন্ডিত ছাত্রদের শিক্ষা দিচ্ছেন। ইতিমধ্যে গ্রামে আল্‌বেরুনীর আবির্ভাবের সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। সাধারণ লোকের ধারণা তিনি একজন গুপ্তচর। অথবা মুসলিম সেনাবাহিনীর অগ্রদূত। কিন্তু একজন বণিক তাঁকে জানত। সেই বণিকের মাধ্যমে পন্ডিতজীর সঙ্গে আল্‌বেরুনীর পরিচয় হ'ল। আল্‌বেরুনীর সদ্ব্যবহার, নম্র কথাবার্তা ও ভারতের প্রতি আগ্রহ—এই সব পন্ডিতজীর সন্দেহ দূর করেছিল। এই নাটিকা থেকে দেখা যাবে যে, পন্ডিতজী পাতঞ্জলীর যোগসূত্র অনুসরণ করে চলেন। পাতঞ্জলী, ভগবদ্গীতা ও সাংখ্য-দর্শন—এই তিন গ্রন্থ থেকে নানা তত্ত্ব তাঁদের কথোপকথনের মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে। আমাদের এই লৌকিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয় ও মিত্রতা স্থাপনের পক্ষে এই ধরণের ধর্মালোচনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এতে মনের দ্বিধা দূর হ'বে, দেখা যাবে যে, সব ধর্ম মূলতঃ একই সত্য থেকে উদ্ভূত। মিলন, ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই এই নাটিকাটি বাঙ্গালী পাঠকের নিকট উপস্থিত করা গেল। এটাকে অভিনয়ও করা যেতে পারে।]

"প্রথম দৃশ্য"

[পর্দা যখন উঠলো, তখন একজন সম্ভ্রান্ত পন্ডিতকে দেখা গেল। তিনি একটি বৃক্ষ অথবা কুটিরের নিকট একটু উঁচু স্থানে বসে আছেন। ১৪ থেকে ১৬ বছরের তিন চারটি বালক তাঁর সম্মুখে আসন পিঁড়ি হয়ে বসে আছে। নিকটেই একজন শিক্ষক দাঁড়িয়ে আছেন।]

পন্ডিত—(একটি বালককে সম্বোধন করে) ঋষি পাতঞ্জলীর একটি পুস্তক লও। এবং ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি কি বলেছেন, সেটা উচ্চৈঃস্বরে ও সুললিত কন্ঠে পাঠ কর।

প্রথম বালক—বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় পাতঞ্জলীর প্রথম পরিচ্ছেদের ২৪, ২৫ এবং ২৬ সূত্রগুলি পড়ল।

(১) ক্লেশ কর্ম বিপাকাশয়ৈর পরামৃষ্টঃ
পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ (২৪)

(২) তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞত্ব বীজম (২৫)

(৩) স এষা পূর্বেষাম অপি গুরুঃ
কালেনান বচ্ছেদাৎ (২৬)

"দ্বিতীয় দৃশ্য"

[কতকগুলি বালকের উত্তেজিত শব্দ শোনা যাচ্ছে। "আমরা নিশ্চয় পন্ডিতজীকে বলব, হাঁ তাড়াতাড়িই তাকে বলব, কেননা তাঁর এ সব কথা জানা অবশ্যই দরকার।"—ওদের কথা শুনে পাঠরত প্রথম বালকটি পড়া বন্ধ করল। এইদিকে যেসব বালক আসছিল তাদের পানে সকলেই কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। সেই বালকগণ প্রবেশ করেই জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল।]

পন্ডিত—এত উত্তেজনা কিসের জন্য? ব্যাপার কি?

নবাগত বালকগণ—(এক সঙ্গে) গ্রামের মধ্যে..... উত্তর দিক থেকে, অপরিচিত লোক এসেছে। তারা মুসলমান। তাদেরকে ভয়ানক লোক বলে মনে হ'চ্ছে।

পন্ডিত—থাম, থাম, ধীরে ধীরে বল, সকলে এক সঙ্গে নয়। (বয়স্ক বালকদের দিকে লক্ষ্য করে) কি ঘটেছে, সব কথা খুলে বল।

সেই বালকটি—ভগবান্‌, নূতন ধর্মের একজন লোক এই গ্রামে এসেছে। তাকে দেখে গুপ্তচর বলে মনে হচ্ছে। সেই লোকটির মাথায় একটি টুপী আছে।

আর একটি অল্প বয়স্ক বালক—হাঁ কাল কাঠালের মত একটি বড় টুপি।

অপর একটি বালক—হাঁ আর দেহে আছে কাল রঙের আলখাল্লা।

আর একটি বালক—সে লোকটা অপরের সঙ্গে আমাদের ভাষায় কথা বলছে। কিন্তু এটা সুনিশ্চিত যে, লোকটা পাহাড়ের অপর অঞ্চলের একজন বিদেশী।

আর একজন বালক—সে নানাপ্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে।—কে তোমাদের রাজা? সে রাজা কোথায় থাকে? ওখানে কি কোন মন্দির আছে? এখানে কি কোন পন্ডিত আছেন?

অন্য একটি বালক—ভগবান, মনে হয় সে আপনাকেই চায়। কিন্তু সে ভাল লোক নয়। নিশ্চয় এর পরে সৈন্যদল আসবে। তারা আমাদের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে দিবে। আমাদের উচিত বাবাকে মাকে সাবধান করে দেওয়া।

"তৃতীয় দৃশ্য"

[যখন বালকগণ এইভাবে কথা বলাবলি করছ তখন একটা বৃদ্ধ ভিখারী সেখানে উপস্থিত হ'ল। সে সহাস্যমুখে ওদের কথা শুনছিল। তার হাতের মুঠায় একটা মুদ্রা ছিল। তার দিকে লক্ষ্য করল। সেই মুদ্রাটিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। মুদ্রা দেখে আকৃষ্ট হ'য়ে একটি বালক আগ্রহের সঙ্গে সে মুদ্রা দেখতে লাগল।]

পন্ডিত—এটা দেখছি নূতন মুদ্রা।

একটি বালক—ভগবান দেখুন এর উপর কি সব লেখা আছে।

পন্ডিত—একদিকে আরবী ভাষার মত মুসলমানদের ভাষা।

[তিনি মুদ্রাটিকে উলটিয়ে দেখলেন। অপর দিকে সংস্কৃত অক্ষরে শুদ্ধভাবে লেখা আছে। এমন মুদ্রা এর আগে আর কোথাও দেখিনি। (তারপর সহকারীকে মুদ্রা দিলেন ও বল্লেন পড়ত কি লেখা আছে।)

সহকারী শিক্ষক—[ধীরে ধীরে পাঠোদ্ধার করতে লাগলেন—"অব্যক্তম্‌ একম্‌ মহম্মদ অবতার। অব্যক্ত নাম। অয়মৃতঙ্কো মহম্মদ পুরে ঘাটে আহাতা। নৃপতি মামুদ জিয়ান সম্বৎ, ৪১২।"

পন্ডিত—আমার মনে হয়, আরবী লেখার অর্থ হবে এরূপঃ—"ঈশ্বর এক। এটা সুলতান মাহ্‌মুদের টাঁকশালে তৈরী হ'য়েছে। আমি এমন মুদ্রা পূর্বে দেখিনি। আমি ভেবে ছিলাম যে, এই সব বিদেশীগণ আমাদের ভাষা শিখতে আগ্রহান্বিত নয়।"

"চতুর্থ দৃশ্য"

[একটি বালক দেখতে পেল যে, একজন অপরিচিত ব্যক্তি এগিয়ে আসছেন। তাঁর সঙ্গে আছে একজন যুবক, সে তাঁর শিষ্য। তাঁদের পরিধানে খোরাসানী পোষাক। তাঁদেরকে দেখে বালকটি বিস্ময়ের সঙ্গে চীৎকার করে উঠল "দেখ! দেখ! ঐ ওরা এদিকে আসছে! এ সেই লোক! অপর ছাত্রগণ নীরবে পন্ডিতজীর পাশে এসে দাঁড়াল এবং নবাগতকে দেখতে লাগল।

ভিক্ষুক—(ব্যস্তভাবে)—মেরা টাঙ্কা। কাঁহা মেরা টাঙ্কা? [মুদ্রা পেয়ে সে বিড়বিড় করতে করতে চলে গেল।

[আল্‌বেরুনী ও তাঁর সঙ্গী প্রবেশ করলেন। উদারভাবাপন্ন একজন ধনবান বণিক তাঁদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন।

বণিক—(আল্‌বেরুনীকে লক্ষ্য করে)—আমরা এইখানে উপস্থিত হ'য়েছি। উনিই হচ্ছেন আমাদের পন্ডিত। ইনি খুবই শিক্ষিত আর আমার বিশেষ বন্ধু।

আল্‌বেরুনী—[হিন্দু মতে অভিবাদন করলেন তারপর বল্লেন]—কুশলম্‌! [সকলে সন্দেহের চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। বালকগণ তাঁকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।]

বণিক—[বালকগণকে লক্ষ্য করে]—কেন তোমরা সকলে এমনভাবে ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছ আগন্তুক কি তোমাদেরকে খেয়ে ফেলবে [তারপর পন্ডিতজীকে লক্ষ্য ক বললেন] পন্ডিতজী ইনি, খোরাসান থে এসেছেন। খুব পন্ডিত ব্যক্তি। আমার বিশেষ বন্ধু। ইনি তালওয়ার হাতে আ নি—ইনি এসেছেন কলম নিয়ে। বি

পূর্বে এ'র সংগে মুলতানে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছে। আমি দেখলাম যে, পণ্ডিতজীর সংগে আলাপ করবার জন্য এ'র খুবই আগ্রহ। আমি এ'কে বল্লাম যে, আমাদের পণ্ডিতজী খুবই বিদ্বান ব্যক্তি।

আল্‌বেরুনী (পণ্ডিতজীকে)—আমিও শুনলাম যে, আপনি প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রগুলির সুন্দর ব্যাখ্যা করিতে পারেন। আপনার বিজ্ঞতা-পূর্ণ বাণী শুনবার জন্য আজ এখানে এসেছি।

পণ্ডিতজী—[প্রশংসা দ্বারা প্রীত হয়ে একটু হেসে] আমার যা জ্ঞান তা এই সব পবিত্র গ্রন্থ থেকে। আপনার কথাগুলি কি মধুর?

আল্‌বেরুনী—আমার হৃদয় হচ্ছে মৌচাকের মত। আমি মধুমক্ষিকার মত সর্বত্র উৎকৃষ্ট ফুলের জন্য ঘুরে বেড়াই। আমাদের পয়গম্বর—নিশ্চয় আপনি তাঁর নাম শুনেছেন—হজরত মহম্মদ (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলেছেন, "জ্ঞানানুসন্ধান কর—সেজন্য যদি চীন দেশ যেতে হয় তবুও।"

পণ্ডিত—হ্যাঁ, ই ঠিক কথা। জ্ঞানই মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে। আর অজ্ঞানতা আত্মাকে নীচে বেঁধে রাখে। আমার গুরু পাতঞ্জলী বলেন, "আবরণের মধ্যে চাউলের মত আত্মা অজ্ঞতার দ্বারা বাঁধা পড়ে।

আল্‌বেরুনী—আমি আপনার নিকট এসেছি হিন্দুদের বিজ্ঞান শিখবার জন্য। উদ্দেশ্য এই যে, সেই জ্ঞান আবার নিজেদের দেশের লোকদেরকে শিক্ষা দিতে সক্ষম হব। তবেই ত তারা আপনাদের মহৎ ও প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় পাবে। পরস্পরের মধ্যে যদি বুঝাপড়া হয় তবে উভয় সম্প্রদায়ের উপকার হবে।

পণ্ডিতজী—আপনার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত মহৎ। প্রার্থনা করি আপনি যেন কৃতকার্য হন। আপনার উদ্দেশ্য যদি সিদ্ধ হয়, তবে বিজেতার তরবারি আর রক্তপাত করবে না। ভূসম্পত্তি আর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে না।

বণিক—পণ্ডিতজী, এই নবাগত শেখ আবু রাইহাম জ্ঞানের সমুদ্র। আমাদের দেশের উত্তর অঞ্চলের পণ্ডিতগণ বলেন যে, তাঁর মন অত্যন্ত তীব্র, মন তাঁর সেই তীব্র জলের মত, যার কাছে সির্কাও মিষ্টি বলে মনে হয়।

পণ্ডিতজী (আল্‌বেরুনীকে)—আপনি যদি জ্ঞান অনুসন্ধান করতে চান তবে আমাদের মধ্যে বাস করুন। আসুন, আজ আমাদের পাঠটা অভ্যাস করি।

আল্‌বেরুনী—হ্যাঁ, আমি খুব খুশী মনেই তা করব। [তিনি একটা বড় পাথরের উপর বসলেন। বালকগণ তাদের পাঠ আরম্ভ করলে পূর্বের মতই আসনপিঁড়ি হয়ে বসে।]

বণিক—[পণ্ডিতজীকে চুপে চুপে] পণ্ডিতজী, আপনাকে একটা কথা বলব। আপনি কি সুলতান মাহমুদের নূতন মুদ্রা দেখেছেন?

পণ্ডিতজী—একটু আগে একজন ভিখারীর হাতে দেখেছি।

বণিক—বেশ,—নিশ্চয় আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন যে, মুদ্রার একদিকে সংস্কৃত আর অপর দিকে আরবী অক্ষরে লেখা আছে। যা লেখা আছে তা মুসলমানগণ পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত করে—"লাইলাহা ইল্লাল্লাহ"—অথবা ঐ ধরণের কিছু একটা। আমরা যেমন রাম রাম বলি, এটাও তাদের নিকট সেইরূপ। বোধ হয় তারা ওটাকেই সংস্কৃত ভাষায় মুদ্রার উপর লিখেছে যেন আমরা বুঝতে পারি। আপনি জানেন কি, কে এ কাজ করেছে? লোকে বলে এই লোকটিরই কাজ। কারণ কেবলমাত্র এই লোকটিই আমাদের ভাষা জানে।

আল্‌বেরুনী—[তিনি বণিকের কথাগুলো শুনে ফেলেছেন। বিজ্ঞের মত হাসি তাঁর মুখে] যদি আপনি অনুমতি দেন তবে এইখানে একটু বসতে চাই। এটা ঠিকই যে, ভারতে যে মুদ্রা ব্যবহৃত হবে তাতে এমন ধরণের প্রতীক (Symbol) থাকা উচিত, যা দেশের লোক বুঝতে পারে। আমির মাহমুদের এটা বুঝতে দেরী হয় নি। [তারপর পণ্ডিতকে লক্ষ্য করে বললেন] আমি প্রস্তুত।

পণ্ডিত—আপনি যখন এখানে আসেন, তখন আমরা মহান একেশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধে পাঠ করতে উদ্যত হয়েছিলাম। তিনি পূর্ণ জ্যোতি, তাঁকে পূজা করলে আশীর্বাদ পাওয়া যায়।

[পণ্ডিতজী প্রথম ছাত্রকে বললেন]—তোমার পড়াটা ধীরে ধীরে ও পরিষ্কারভাবে পড় যেন আমাদের সম্মানিত অতিথি তোমার কথা বুঝতে পারেন।

প্রথম বালকটি ধীরে ধীরে পরিষ্কার কণ্ঠে পড়ল—

ক্লেশকর্ম বিপাকাশয়ৈর পরামৃষ্টঃ
পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ

আল্‌বেরুনী—(যেন নিজেই এই শ্লোকের অনুবাদ করলেন) প্রভু হচ্ছেন পুরুষ, যাকে দুঃখ, কর্ম ও ফল স্পর্শ করতে পারে না।

প্রথম বালক—

তত্র নিরতিশয়ম সর্বজ্ঞানবীজম

আল্‌বেরুনী—তিনি সর্বজ্ঞ এক

প্রথম বালক—স এষাপূর্বেষা অপি গুরুঃ
কালেনানবচ্ছেদাৎ

আল্‌বেরুনী—গুরু বা প্রাচীনদের শিক্ষক, সময় বা কালের দ্বারা সীমিত নন।

[তারপর পণ্ডিতজীকে বললেন—"যদি আমি ভুল করি, তবে দয়া করে সংশোধন করে দিবেন]

পণ্ডিত—বাস্তবিকই আপনি ঋষিদের ভাষায় সুপণ্ডিত। কোথায় আপনি সংস্কৃত ভাষা শিখেছেন?

[বালকগণ তাঁকে যেন বুঝতে পেরেছে এবং শ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে উঠলো]

আল্‌বেরুনী—সে অনেক দিন আগেকার কথা। আমার দেশ খোরাসান। কিন্তু যখন আমির মাহমুদ খোরাসান জয় করলেন তখন আমাকে জামিন (Hostage) রূপে নিয়ে এলেন। সেখানে কয়েকজন ভারতীয় পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হল। তাঁদের নিকট যা পেয়েছি তাই শিখেছি।

পণ্ডিত—কিন্তু দেখছি যে আপনি সুপণ্ডিত হয়ে গেছেন।

আল্‌বেরুনী—আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সংস্কৃত শিক্ষা খুবই দরকার। কারণ ভারতবর্ষ ও তার মানুষ সম্বন্ধে আমি চোখে দেখা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা চাই। কেবল শুনা কথা আমাকে বিরক্ত করে। বিকৃতি ও অসত্য বর্ণনা দেখলে আমার ক্রোধ হয়। আপনি হয়ত এটা জানেন না, কিন্তু আমি দেখেছি যে, প্রাচীন ঋষিদের শিক্ষা সম্বন্ধে বহু ভুল বিবরণ পেয়েছিলাম। সেইজন্য তাঁদের বিরুদ্ধে ও আপনার বিরুদ্ধে বহু কথাকে পরীক্ষা না করেই সত্য বলে ধরে নিয়েছিলেম। আমার শিক্ষাগুরু আবু সহলও এই কথা বলেন। বস্তুতঃ তাঁরই প্রস্তাবক্রমে আমি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে পুস্তকাদি পড়তে লাগলাম। [আল্‌-বেরুনীর পুস্তকের ভূমিকার সপ্তম পৃষ্ঠা] (কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকলেন তারপর) আমার ভয় হচ্ছে যে, আমি যেন আমার প্রধান লক্ষ্য ভুলে যাচ্ছি। যে অংশটা এখনই পড়া হল তার লেখক ঠিক কি বলতে চেয়েছেন? পরম পূজনীয় ঈশ্বরের প্রকৃতি কি হতে পারে এ সম্বন্ধে তিনি কি বুঝেছেন?

পণ্ডিত—সেই পরমপূজনীয় একসত্তা অনন্ত ও অদ্বিতীয়। তিনি কোন মানুষের কর্মের প্রয়োজনের উপর নির্ভর করেন না। কর্মের পরিণতি দুই প্রকার হয়—আরামপূর্ণ শান্তি অথবা উদ্বেগপূর্ণ অস্তিত্ব। চিন্তা দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায় না, কারণ তিনি বর্ণনার অতীত, তিনি মহান্‌। তাঁর নিজস্ব সত্তা দিয়ে তিনি সর্বকাল থেকেই সর্বজ্ঞ।

আল্‌বেরুনী—এইগুলি কি ঈশ্বরের সমস্ত গুণ?

পণ্ডিত—এইগুলি প্রধান গুণ। তিনি সমস্ত স্থানকে অতিক্রম করে ব্যাপ্ত, কারণ তিনি যে কোন স্পেস-এ সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে মহান্‌।

আল্‌বেরুনী—আপনি বললেন যে, তিনি তাঁর, নিজস্ব সত্তার দ্বারা সব কিছুই জানেন।

পণ্ডিত—তিনি পূর্ণজ্ঞান। তিনি ভ্রান্তি ও অজ্ঞতা থেকে মুক্ত।

একটি বালক—ভগবান! সেই সর্বজ্ঞসত্তা কি কথা বলতে পারেন?

পণ্ডিত—নিশ্চয়। তিনি সবই জানেন, তিনি কথাও বলেন।

অপর একটি বালক—তাহলে তিনি বিরাট পণ্ডিতের মত।

পণ্ডিত—হাঁ তা বলতে পার। কিন্তু পার্থক্যটাও খুব বিরাট, বৎস, এই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষিগণের এমন অবস্থা ছিল যখন কিছুই জানতেন না, কোন কথা বলতেন না। তাঁরা কালের সীমার মধ্যে শিখেছেন ও কথা বলেছেন। তাঁদের জ্ঞান অর্জন ও কথা বলা দুইই কালের মধ্যেই সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ঐশ্বরিক বিষয়ের সংগে কালের কোন সম্পর্ক নাই। ঈশ্বর অনন্তকাল থেকেই সর্বজ্ঞ—ও কথা বলে আসছেন।

আল্‌বেরুনী—আপনি বললেন যে, তিনি কথা বলতে পারেন। তিনি কি সত্যি কারও সংগে কথা বলেন?

পণ্ডিত—তিনি ব্রহ্মার সংগে কথা বলেন এবং আদিপুরুষের সঙ্গে তিনি বিভিন্ন উপায়ে কথা বলেন। কাউকে তিনি গ্রন্থ দিয়েছেন, আবার কারুর জন্য তিনি দরাজ দারোয়াজা খুলে দিয়েছেন—এইভাবে তাঁর সংগে যোগাযোগ করা হয়। তৃতীয় ব্যক্তিকে তিনি অনুপ্রাণিত করেন—ঈশ্বর তাকে যা দেন তা তিনি ধ্যান দ্বারা প্রাপ্ত হন। আমরা পবিত্র গ্রন্থে পড়ি—"তাঁর প্রশংসা কর, প্রশংসা ও গুণকীর্তন কর তাঁর--যিনি বেদের কথা বলেছেন।" সুতরাং যিনি ব্রহ্মার নিকট যে বেদ প্রেরণ করেছেন সেই বেদেই তিনি কথা বলেছেন।

প্রথম বালক—কেমন করে তিনি এত জ্ঞান লাভ করলেন?

পণ্ডিত—শুন বালক, তিনি জ্ঞান অর্জন করেননি। তাঁর জ্ঞান অনাদি কাল থেকে চিরকাল একইরূপ। 'নাজানা' অবস্থা তাঁর কখনও ছিল না, তিনি নিজেই নিজেকে জানেন। কোন জ্ঞান পূর্বে ছিল, অথচ তিনি জানেন না এমন কথা তাঁর জন্য বলা চলে না।

অপর একটি বালক—সেই চিরপূজ্যকে আমি দেখতে চাই।

পণ্ডিত—হায় বালক, সেই অব্যক্ত 'ব্রহ্ম' জ্ঞানের নিকট প্রচ্ছন্ন, তা জ্ঞান দ্বারা অনুভূত হবার জিনিষ নয়। কিন্তু আত্মা তাকে অনুভব করতে পারে। আর চিন্তা তাঁর গুণাবলী উপলব্ধি করতে পারে। ধ্যানের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায়। এই ধ্যান আর তাঁকে পূজা করা একই কথা। নীরবে কর্মের তাড়না সত্ত্বেও অবিরুদ্ধ ও অবিচলিত হয়ে ধ্যান করলে মানুষে তাঁর দিকে এগিয়ে যেতে পারে। পুনঃ পুনঃ অব্যাহত ধ্যানের সাহায্যে মোক্ষ পাওয়া যাবে।

আল্‌বেরুনী—আপনাদের ঋষিদের কি এটাই সাধারণ শিক্ষা?

পণ্ডিত—এটাও একটা শিক্ষা যা আমরা অনুসরণ করি। ভগবদ্গীতাতেও এই শিক্ষা পাবেন। গীতা আমাদেরকে বলে অর্জুনের অভিজ্ঞতা ও সত্যানুসন্ধানের কাহিনী।

গীতা থেকে একটি নির্বাচিত অংশ তিনি একটি বালককে পড়িতে বলিলেন। এই অংশটা পড় (২—২০ প্রথম বালক সেই অংশটি মূলে সংস্কৃত ভাষায় পড়ল:

১ ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্‌
২ নায়ং ভূত্বা ভবিতাবা ন ভূয়ঃ
৩ অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
৪ ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।

পণ্ডিতজী তার অনুবাদ করলেন:

"তিনি কখনও জাত নহেন, তিনি কখনও মরেন না। তিনি দেহে আসেননি পরেও আসবেন না। তিনি অজাত, স্থায়ী, অনন্ত, প্রাচীন, তার দেহ হত হলেও তিনি হত হন না। পাতঞ্জলীর গ্রন্থে যে শিক্ষা পাই, এ শিক্ষাও সেই একই বস্তু। তিনি মানুষের মত জাত নন ও মানুষের মত মৃত্যুর দ্বারা নিঃশেষ হন না, এইভাবে গীতায় ঈশ্বরকে দেখান হয়েছে। ঈশ্বর যা করেন তা কোন প্রতিদান পাবার জন্য করেন না। তিনি অপর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা। তিনি কোথাও বলেছেন, "আমি বিশেষ কোন শ্রেণীর অন্তর্গত নই, একজনের বন্ধুই নই ও আর একজনের মিত্রও নই। প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর জন্য যা যথেষ্ট তাকে আমি তাই দিয়েছি। এইভাবে যে কেহ আমাকে জানবে এবং কামনাকে কর্ম থেকে পৃথক রেখে, যে কেহ আমার মত হতে চাইবে, তারি শৃংখল মুক্ত হবে, সে সহজেই রক্ষা পাবে এবং মুক্ত হবে।

আল্‌বেরুনী—আমি কি এই বুঝব যে, কামনা মাত্রই অন্যায়।

পণ্ডিত—অপ্রতিহত কামনা কর্মের দিকে আকর্ষণ করে, এবং যতই কামনা করবে, ততই কর্মের দিকে আকর্ষণ বাড়বে। এরূপ করলে আত্মা আত্মজ্ঞান থেকে পৃথক হতে অপারগ হবে এবং সেই জন্য ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতেও অপারগ হবে।

আল্‌বেরুনী—তবুও আমি দেখেছি যে বহু লোক মন্দিরে যাচ্ছে, পূজা করছে এবং কোন না কোনভাবে ঈশ্বরের নিকট তাদের কামনা জানাচ্ছে। আর এই দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত হচ্ছি।

পণ্ডিত—এটা সেই কামনা। যা নিজের অভাব পূরণের জন্য মানুষকে ঈশ্বরের শরণ নিতে বাধ্য করে। কিন্তু কম লোকই নিজেই ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করে, আবার ততোধিক কম লোক আত্মজ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করে এবং আরও কম লোক ঈশ্বরের সংগে এক হতে পারে।

আল্‌বেরুনী—আপনি কি এই বলতে চান যে, এর কারণ আত্মজ্ঞান ও ঈশ্বর জ্ঞান সম্বন্ধে মানুষের অজ্ঞতা।

পণ্ডিত—ঠিক কথা বলেছেন। তারা আছে একটা মায়া বা ভ্রান্তির মধ্যে—কিন্তু তাদের অজ্ঞতা তাদেরকে এটা বুঝতে দেয় না। আপনি যদি সূক্ষ্মভাবে অধিক-কাল মানুষের বিষয় বিবেচনা করেন তবে দেখতে পাবেন যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে খাঁটি জ্ঞান থেকে তারা অনেক দূরে অবস্থিত। কারণ প্রত্যেকের কাছে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ অনুভূত নন। সে তার সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিয়ে ঈশ্বরকে অনুভব করতে পারে না। সুতরাং সাধারণ মানুষে তাকে জানে না। কতক লোক আছে যারা বহিরিন্দ্রিয় অতিক্রম করে আরও একটু অগ্রসর হতে পারে না। তারা প্রকৃতির জ্ঞানের সীমায় এসে থেমে যায়। তারা এটা শিখে না যে, তাদের উপরে আর একজন আছেন, যিনি জন্ম দেন না, বা জাত হন না—যাঁর অস্তিত্বের মৌলিকত্ব কোন মানুষের জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি হয়নি।—অথচ পৃথিবীর সব কিছুর উপর তার জ্ঞান বিস্তৃত।

আল্‌বেরুনী—এই উচ্চাংগের শিক্ষা যদি শাস্ত্রের অন্তর্গত হয় আর আপনি যদি এই সব বিষয় শিক্ষা দেন, তবে এটা কেমন করে সম্ভব হয় যে, আমরা আপনার বহু অনুবর্তীকে দেখেছি যাঁরা ঈশ্বরের সম্বন্ধে এমনভাবে কথা বলেন, যেন তিনি একজন মানুষ—মানুষের মত একই প্রকার আবেগ ও ব্যর্থতার দাস। এমন কি তারা ঈশ্বরকে এমনভাবে চিত্রিত করে যা অনভ্যস্তকে আহত করে।

পণ্ডিত—এ উচ্চ শিক্ষা সাধারণের জন্য নয়। হয়ত তাদের এতে কোন দোষ নাই। এ ধারণা অজ্ঞতার ফলস্বরূপ। যদি সাধারণ লোককে বলি যে, ঈশ্বর হচ্ছেন একটা বিন্দু—এ কথার অর্থ এই যে, দেহের গুণ তাঁর প্রতি প্রযুক্ত হতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরকে বিন্দু বললেই সংগে সংগে জন-সাধারণ কল্পনা করে নেবে যে, ঈশ্বর ঠিক একটা বিন্দু মাত্র। অথবা যদি তাদেরকে বলি যে ঈশ্বর সারা বিশ্বে ব্যাপ্ত। এর অর্থ এই যে, তাঁর নিকট কিছুই প্রচ্ছন্ন নয়। কিন্তু জনসাধারণ কল্পনা করবে যে, ঈশ্বরের এই সর্ব ব্যাপকতা চক্ষুর দৃষ্টি দ্বারা দেখা সম্ভব হয়। আর চক্ষুদৃষ্টি কেবল চক্ষুর দ্বারাই হতে পারে। আর এ কথা সকলেই জানে যে, একটি চোখ অপেক্ষা দুটি চোখ ভাল। সুতরাং তার ফলে সাধারণ লোক ঈশ্বরকে বর্ণনা করবে এমন একজন ব্যক্তিরূপে, যার আছে হাজার চোখ। "ঈশ্বর সর্বব্যাপী" এই কথাকে তারা এইভাবে বর্ণনা করবে।

আল্‌বেরুনী—আপনি যা বল্লেন তা বাস্তবিকই খাঁটি কথা। সাধারণ লোকের যে প্রবণতার কথা আপনি বল্লেন তা মনুষ্য প্রকৃতির মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে আছে। এটা কেবল যে ভারতীয়দের মধ্যে আছে তা নয়, আমার নিজের দেশের লোকের স্বাভাবিক প্রবণতাও একই প্রকার। যদি মানুষ কল্পনা ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিভ্রান্ত হতে না চায় তবে তার জন্য সর্বদাই আত্মার আলো ও পরিচালনার প্রয়োজন আছে। আমি গুরগানে আলনোজারের শিষ্যদের দেখেছি। তিনি মুসলমানদের মধ্যে একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁর শিষ্যদেরকে বলা হয় নাজ্জারিয়া। তারা এই শিক্ষা দেন যে, ঈশ্বর মানুষের সমস্ত কর্মকে সৃষ্টি করেন। তারা ঈশ্বরকে মানুষের পর্যায়ে নামিয়ে দেয়—নিশ্চয়ই এটা একটা বিপজ্জনক পন্থা।

[আল্‌বেরুনী—ও পণ্ডিতের এই কথোপকথনের মধ্যে বণিকটি ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ তার নাক ডাকা আরম্ভ হল। বালকগণ হেসে উঠল। দু একজন হাততালি দিল। এতে বণিকটি জেগে উঠল এবং তাকে দেখে মনে হল যেন সে একটু হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে।]

বণিক—বেশ পণ্ডিতজী আমি কি বলিনি যে এই আগন্তুক একজন শিক্ষিত ব্যক্তি, একজন প্রকৃত শাস্ত্রী?

"পঞ্চম দৃশ্য"

[সংগীতের মত একটি শব্দ ভেসে আসছিল। সংগে সংগে যন্ত্রবাদন—মনে হচ্ছে যেন একদল লোক মন্দিরের দিকে যাচ্ছে। বণিকটি তাদেরকে ডাকলো।]

বণিক—এস, এস ভাই। এখানে একজন বিদেশী এসেছেন, যিনি তোমাদের কথা শুনতে ভালবাসেন। তোমরা এদিকে এস এবং ঈশ্বরের মহিমাসূচক একটি ভারতীয় সংগীত এঁকে শুনিয়ে দাও।

[একটি গান শুনান হল। সেই সংগে একটি ধর্মমূলক নৃত্যও দেখান হল।]

আল্‌বেরুনী—পণ্ডিতজী এবং অপরাপর বন্ধুগণ, আপনাদের আতিথেয়তা এবং

(ইহার পর ৬৪ পৃষ্ঠায়)

ভাইনো-মল্ট

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ

SOCKS
are good!

একেবারটি তিন নম্বরে যাওয়া চাই-ই। একটা চক্ষুলজ্জাও নেই। তিপ্পান্ন চুয়ান্ন বছর বয়স হোল, অথচ না চেহারায় না আচরণে তার ছাপ দেখা যায়। ঘুর ঘুর কোরে ঘুরে বেড়ান যেন পঁয়ত্রিশ বছরের যুবক। এদিকে ঐ কাঞ্জিলালের দাদা সারা জীবন ধর্মকর্ম কোরে, ঐ একই বয়সে একেবারে পঙ্গু হোয়ে পড়েছে! ভগবানের বিচারটা দেখলেন তো?

নেপালবাবুর স্ত্রী এ সব নিয়ে বাড়িতেও অশান্তি করেন না, বাইরেও কিছু বলেন না। শুধু অনন্তর কথার ঝুড়ি নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ান আর নেপালবাবুর সঙ্গে অতি প্রয়োজন না হোলে কথা বলেন না। তপতীকে বলেন, "বাবা, ছেলেপুলে না হোয়ে বেঁচে গেছি! দিব্যি সুস্থ শরীরে, মনের শান্তিতে আছি। কারো জন্য ভাবনা চিন্তাও নেই, জ্বলুনি পুড়ুনিও নেই। সংসারে সেরকম আসক্তিও নেই, ধর্মের দিকে একটু মন দিতে পারি।" বলে নতুন গয়না দেখান।

তপতীরা ভেতরের সব কথাই শুনেছে। শুনেই গেছে শুধু। পরচর্চা মিলন পছন্দ করে না। তবে তাই নিয়ে দুজনার মধ্যে একটু কথা কাটাকাটিও হোয়ে গেছে। তপতীর মনে হোয়েছে পুরুষমানুষদের দুর্বলতার প্রতি মিলন যে শুধু ক্ষমাশীল তাই নয়, রীতিমতো প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। বলেছে, "রাঙ্গাদিকে দেখলে কষ্ট হয়, টাকা পয়সা অঢেল দেন নেপালবাবু, ওঁদের গোটা বাড়িটা রাঙ্গাদির ইচ্ছে মতো চলে। 'সব দেন,' 'সব দেন', তবে আবার কি?"

"সব দেন, কিন্তু নিজে থাকেন বাইরে।" মিলন হেসে বলে, "নিজেকে আবার দিতে হয় নাকি? একি ভিখিরিকে পয়সা দেওয়ার মতো সহজ ভেবেছ? নিজেকে যে দেবে, তা নেবার লোক কোথায়? তোমার রাঙ্গাদি?"

তপতী রেগে যায়। "নেবার লোকটিকে পাড়ার মধ্যে না রেখে একটু তফাতে রাখলে তো খানিকটা সুরুচির পরিচয় পাওয়া যেত।" মিলন বুঝিয়ে বলে, "আহা দূরে যাতায়াত করবার ওঁর সময় কোথায়? আর তোমার রাঙ্গাদিটিও তো আচ্ছা মেয়ে! যা দিয়ে ওঁর কোনো প্রয়োজন নেই, এমন কি যার অভাবে ওঁর কোনোই অসুবিধে হোচ্ছে না, তাও ঐ মেয়েটাকে দিতে পারেন না? পাঁচ জায়গায় কাঁদুনি গেয়ে বেড়ান!"

"কাঁদুনি গান না রাঙ্গাদি, কিছুই বলেন না। বলবার মতো কথা থাকলেও, শোনবার লোক নেই ওঁর।"

রাগ কোরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে, তপতী ভাবে এক আধটা ছেলেপুলে থাকলে, এতদিনে ঘরে নাতি নাতনী এসে যেত রাঙ্গাদির আর কোনো দুঃখ থাকতো না। অমন কোরে স্বাধীন মেয়েদের নাম শুনলেই জ্বলে উঠতেন না।

পরদিন বিকেলে এলেন রাঙ্গাদি, একটু যেন খুসি খুসি মনে হোল। চেয়ারে বসেই বললেন, "একটা মোড়া দে না তপতী, পা-দুটো তুলি। চা করিস তো আজ দিস আমাকেও এক পেয়ালা।" নেপালবাবুর স্ত্রীকে এত হাসিখুসি দেখে তপতী অবাক হয়। চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে রাঙ্গাদি বললেন, "নেলি মুখার্জিকে চিনিস? বড় রাস্তার কাছে তিন নম্বরের ঐ দোতলা [illegible]"

তপতী বলে তাকে না চিনলেও দেখেছে কয়েকবার। গত বছর পুজোর সময় গাড়ি জাম হোয়েছিল, কাছাকাছি অনেকক্ষণ ধরে দেখেছে তখন।

"কেমন দেখতে বল দিকিনি?"

কি বলবে তপতী? বলে, "বেশ দেখতে।"

"না, ওতে হবে না, খুঁটিয়ে বল্। আমার চাইতে ফর্সা? আমার চাইতে ভালো মুখচোখ?" তপতী রাঙ্গাদির গৌরবর্ণ মুখের দিকে, তিল-ফুল নাসার দিকে, টানা চোখের দিকে চেয়ে মাথা নাড়ে।

"না, রাঙ্গাদি, ফর্সা নয়, উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ বলা যায়।" এমন কিছু সুন্দরীও নয় সে, তবু কি যেন একটা আছে চেহারার মধ্যে, পাৎলা ছিপছিপে, হাত পাগুলো ফুলের মতন। একটা ঘন নীল সুতির সাড়ি পরেছিল, সোনালী পাড়; গলায় একছড়া ছোট ছোট মুক্তোর মালা ছিল; দু হাতে দু গাছি মোটা সোনার বালা মাথায় কাপড় ছিল না, কানে সোনার মাকড়ি, কোঁকড়া চুলগুলো দিয়ে হাতে জড়িয়ে খোঁপা বাঁধা। ভারি ভালো লেগেছিল তপতীর।

ভয়ে ভয়ে তাকায় রাঙ্গাদির দিকে। রাঙ্গাদি খুসি হয়ে বলেন, "ছিপছিপে আর নেই সে, তপতী, তার ছেলে হবে। নেলি মুখার্জি বাঁচে কি না সন্দেহ; জানিস, অমন সরু যাদের কোমর হয় তারা ছেলে হোতে অনেক সময় মরেই যায়। কাল রাত থেকে তো শুনছি টানাটানি চলছে।"

চমকে তপতী রাঙ্গাদির মুখের দিকে চায়। রাঙ্গাদি উঠে পড়েন, "যাই, আজ পায়েস পিঠে করব বোলে, বেশী কোরে দুধ রেখেছি।" তপতীর মন খারাপ হোয়ে যায়। নিজের ছেলের সর্দি কাশি, কি জানি কেমন ভয় ভয় করে, বারে বারে থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর দেখে, ছেলে রেগে ওঠে। সন্ধেটা যেন আর কাটতে চায় না। বুধবার মিলন একটু সকাল সকাল বাড়ি আসে; দশটার সময় জামা খুলতে খুলতে বলে:

"মোড়ের কাছের ঐ দোতলা বাড়ির মেয়েটি বাঁচল না, তপতী, মেলা লোকজন দেখলাম সেখানে। এতক্ষণে নিয়েও গেছে।"

তপতী বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। দুজনার কারো খাওয়াতে রুচি থাকে না, যা হয় চারটি মুখে দিয়ে, তপতীর হাত থেকে পান নিয়ে মিলন বলে, "কাঞ্জিলালের সঙ্গে ঐখানেই দেখা বড্ড কথা বলে, কাঞ্জিলাল। নাকি নেপাল-বাবু সব ব্যবস্থা কোরে দিয়েছেন, তবে সঙ্গে যান নি। আর নেপালবাবুর স্ত্রী নাকি বারে বারে চাকর পাঠিয়ে ওঁকে ডাকাডাকি করিয়ে-ছেন।"

শুকনো গলায় তপতী বলে, "আর ছেলেটা? সেও বাঁচল না?" তপতীর গলার স্বরটা অস্বাভাবিক শোনায়, মিলন আস্তে ওর কাঁধে হাতখানি রেখে বলে, "নেবে তুমি ঐ ছেলেটাকে? আছে সাহস?" কণ্ঠ রোধ হোয়ে আসে তপতীর, শুধু বলে "আছে।"

সেই রাত্রেই যায় দুজনায় তিন নম্বরের বাড়িতে। অন্ধকার নিঝুম পুরী, অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর চাকর এসে দরজা খুলে দেয়। বলে পাড়ার কে গিন্নীমা এসে নাকি ছেলে নিয়ে গেছেন। ঝি সঙ্গে গেছে।

তপতীর বুক থেকে একটা বোঝা নেমে যায়, হঠাৎ মনটা হাসিখুসিতে ভরে যায়। বলে, "বড্ড খিদে পাচ্ছে, পানুর দোকান থেকে কচুরী আলুর দম নিয়ে যাই চল।" পানুর দোকান সিনেমা বন্ধ অবধি খোলা থাকে।

কাঞ্জিলাল নেপালবাবুর কারখানাতেই কাজ করে, ছিল সে ওখানে অনেক রাত্ত অবধি, দেখেছিল সবই। পর দিন তার বৌ এসে তপতীর কাছে বাঁধাকপি প্যাটার্ণ শিখতে শিখতে বলে,

"আশ্চর্য না, বৌদি? সারাটি বিকেল রাঙ্গাদি কম পক্ষে দশবার দানুকে পাঠিয়ে ছিলেন ও বাড়ি থেকে নেপালবাবুকে ডাকতে। দানু দেখে দেখে ফিরে গেছে, ডাকতে সাহস পায় নি। রাত্তে সব চুকেবুকে গেলে পর, নেপালবাবু তখনো তক্তোপোসের কিনারায় থুম হোয়ে বসে আছেন, কচি ছেলেটা পাশের ঘরে খালি কাঁদছে, গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না, শুধু চাঁচাচ্ছে। এমনি সময় ঝড়ের মতো মুখ কোরে রাঙ্গাদি নিজে গিয়ে উপস্থিত। সবাই মনে করল এবার একটা খণ্ডপ্রলয় না হোয়ে যায় না! রাঙ্গাদি এক দণ্ড দাঁড়িয়ে দেখলেন। তারপর পাশের ঘরে গিয়ে ছেলেটাকে টপ কোরে বুকে উঠিয়ে নিয়ে, নেপালবাবুকে হাত ধরে তুলে বাড়ি নিয়ে গেলেন মজার খবর না?"

তপতী অন্যমনস্ক হোয়ে যায়, প্যাটার্ন ভুল হয়, দিনের আলোটাকে ভালো লাগে। কাঞ্জি-লালের বৌ বলে,

"গেছিলাম সকালে একবার মজা দেখতে। ছেলেটি ঘুমুচ্ছে আর রাঙ্গাদিতে আর ঝিতে মিলে কাঁথা সেলাই হোচ্ছে। কত দেখব দুনিয়াতে, ভাই! আচ্ছা, এ জায়গাটা এরকম হোয়ে গেল কেন, ভুল হয় নি তো?"

আল্‌বেরুনী ও জনৈক পণ্ডিত

(৬০ পৃষ্ঠার পর)

প্রাণখোলা উদারতার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আমি কতভাবে অনুভব করছি যে, ভারতবর্ষ যেন, আমার নিজের বাড়ীর মত হয়ে গিয়েছে। আমরা উভয়ে যে ঈশ্বরের পূজা করি; তিনি যেন আমাদেরকে সেই আদর্শের প্রতি অনুরক্ত করে রাখেন যা তাঁকে সন্তোষ দিয়ে থাকে। আসুন আমরা সেই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে এমন শিক্ষা দেন, যার বলে আমরা মিথ্যা ও নিরর্থক বস্তুর স্বরূপ বুঝতে পারি, গম থেকে তুষ যেমন ফেলে দেওয়া হয়, সেইভাবে যেন মিথ্যাকে দূর করতে পারি। তিনি সর্বমঙ্গলময়, সমস্ত মঙ্গল ও শুভ তাঁর নিকট থেকেই আসে। তিনি তাঁর দাসের প্রতি পরম দয়ালু। সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতির উদ্দেশে সহস্র প্রশংসা কীর্তন করি।

[এই কথাগুলি আল্‌বেরুনীর 'তাহ্‌কিক্ মালিল্ হিন্দ' গ্রন্থের উপসংহার থেকে গৃহীত।]

ালী স্পুটনিক — পরিমল গোস্বামী

হাসি ও অশ্রু

নেপাল মুখোপাধ্যায়

নগেন্দ্রনাথের
হিমকল্যাণ
বিশুদ্ধ
আয়ুর্ব্বেদীয় কেশ তৈল
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস (প্রাইভেট) লিঃ
কলিকাতা-৪

বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের উপরে একটি তেতলা বাড়ীর তিন তলায় একটি অফিস। অফিসটি দেখিলে বেশ বড়ই মনে হয়। অনেকগুলি বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী। অফিসের নাম লেখা কোট-পরা অনেকগুলি বেয়ারা ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতেছে। অফিসে অনেকগুলি মহিলা কাজ করেন। কোন কোন টেবিলে অফিসারদের পাশেই মহিলাদের চেয়ার। আবার কয়েকটি টেবিলে শুধু মহিলারাই বসিয়া কাজ করেন।

এবাড়ীতে লিফট্ নাই। সকলকেই সিঁড়ি ভাঙিয়া তেতলায় উঠিতে হয়। অনেকেই উপরে উঠিয়া হাঁফাইতে থাকেন। কিন্তু উপায় নাই। এ কষ্টটা অন্যান্য অনেক প্রকার কষ্টের সহিত গা-সহা হইয়া গিয়াছে।

সেদিন বেলা প্রায় সাড়ে দশটা। অনীতা ধীরে ধীরে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছে। একতলা পর্যন্ত উঠিয়াই এমন হাঁফাইতে আরম্ভ করিল যে, তাহার মনে হইল যে, আর এক ধাপও সে উঠিতে পারিবে না। তাহার এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সেই অফিসেরই আর একটি মেয়ে সুপ্রভা তাড়াতাড়ি নীচে হইতে সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া আসিয়া বলিল, ইস্, এখনও তোমার অসুখ সারেনি তো। কেন এলে অফিসে? আরো ক'দিন ছুটী নিলেই পারতে।

আর কত ছুটী নেব? পুরো মাইনের ছুটী ফুরিয়ে গেছে। অর্ধেক মাইনের ছুটীও প্রায় শেষ। এরপর ছুটী পাব কি না, জানিনে। পেলেও হয়তো বিনা মাইনেতে কিছুদিন পেতে পারি। কিন্তু মাইনে না পেলে—

অনীতা তখনও হাঁফাইতেছে। সুপ্রভা বলিল, সবই বুঝতে পারছি। কিন্তু এমন করে ক'দিন চলবে?

কি করব, বল? সবই তো জান তুমি।

সুপ্রভার কাঁধে ভর দিয়া অনীতা আবার ধীরে ধীরে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। দোতলায় উঠিয়া আবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিল। তারপর সুপ্রভার সংগেই আবার ধীরে ধীরে তেতলায় উঠিয়া অফিসে ঢুকিয়া তাহার নিজের চেয়ারে গিয়া বসিল। সুপ্রভা তাহার নিজের টেবিলে গিয়া বসিল।

একটু পরে একটি ফাইল হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই অনীতার বুকের মধ্যে একটা দুঃসহ ব্যথা উঠিল এবং সংগে সংগে মাথাটাও ঘুরিতে লাগিল। চেয়ারের হাতল ধরিয়াও নিজেকে স্থির রাখিতে পারিল না। কাত হইয়া চেয়ার সুদ্ধ মাটিতে পড়িয়া গেল। অফিসের অন্যান্য লোকেরা, বিশেষতঃ মেয়েরা দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে মাটিতেই ভাল করিয়া শোয়াইয়া দিল। জলের ছিটা ও ইলেকট্রিক পাখার বাতাসে একটু যেন সুস্থ হইয়া উঠিল। পাশের একটি মেয়েকে বলিল ভাই, আমার ব্যাগের মধ্যে ছোট্ট একটা শিশি আছে। তার থেকে একটা বড়ি বের করে দাও তো।

বড়ি খাইয়া কতকগুলি জড়ো করা ফাইলের উপর মাথা রাখিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। অফিসের কর্তার ফোন পাইয়া একজন ডাক্তার আসিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গেলেন এবং বলিয়া গেলেন, ঘণ্টা তিনেক ভালভাবে বিশ্রাম করবার পর ট্যাক্সি করে বাড়ী পাঠিয়ে দেবেন, আর বলে দেবেন, যেন অন্ততঃ পনের দিনের মধ্যে বাড়ীর বাইরে না যান।

অফিসের সকলেই স্ব স্ব স্থানে গিয়া বসিল। সুপ্রভা তাহার উপরস্থ কর্মচারীর অনুমতি লইয়া অনীতার পাশেই বসিয়া রহিল।

ট্যাক্সিতেও সুপ্রভা অনীতার সংগে গেল। ট্যাক্সি বাড়ীর নিকটে আসিতেই অনীতা বলিল, এই ড্রাইভার, এখানেই থামো।

সুপ্রভা বলিল, এখানে কেন? বাড়ী পর্যন্তই চলুক না।

না। এখানেই নামব। এই পার্কের মধ্যে একটু বসব। এখনই বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে আমার ইচ্ছে করছে না।

ট্যাক্সি চলিয়া গেল। ইহারা দুইজনে পার্কে ঢুকিয়া অপেক্ষাকৃত নির্জন একটি বেঞ্চিতে গিয়া বসিল।

(২)

কয়েক মিনিট উভয়েই চুপ করিয়া রহিল। সুপ্রভা বলিল, এখন বাড়ী গেলেই বোধ হয় ভাল করতে।

অনীতা ধীর স্বরে বলিল, বাড়ীত গেলেই আবার বৌদিরই সামনে পড়তে হবে, আর হুল বিঁধানো কথা শুনতে হবে। মা যাবার পর থেকে বাবা প্রায় অথর্ব হয়ে পড়েছেন। কোন শক্তি নেই কিছু করবার। দাদা সারাদিন এক অফিসে খেটে সামান্য যা পান, তাতে সংসার চলে না। তিনটি ছেলেমেয়ে তাঁর। জানই তো আমার এই পোড়া অসুখের জন্যই বি-এটা দিতে পারলুম না। বড় ইচ্ছে ছিল এম-এটাও পড়ব। কিন্তু বাধ্য হয়ে চাকরি নিতে হ'ল।

সুপ্রভা বলিল, তোমাদের কথা সবই জানি। কিন্তু ঠিক যে এতটা তা জানতুম না। যাই বল, তোমার আর শীঘ্র অফিসে যাওয়া হবে না। আচ্ছা, বিমলের খবর কি?

কি জানি ভাই। আজ ছয় মাস তার কোন চিঠি পাইনি।

এর মানে কি?

মানে, সাধারণতঃ যা ঘটে থাকে, তাই হয়তো ঘটেছে। লজ্জায় লিখতে পারছে না। উঃ, তিন বছর ধরে কত চিঠি, কত কথা—

সুপ্রভা জিজ্ঞাসা করিল, কবে ফিরবে, জানিস?

কি করে বলব? শেষ চিঠি ম্যানচেস্টার থেকে লেখা। তাতে লিখেছিল, আর ছয় মাস পরেই দেশে ফিরব। এই ছ'মাস নানা স্থানে ঘুরতে হবে। হয়তো নিয়মমত চিঠি দিতে পারব না। কিছু মনে করো না। নানা স্থানে ঘুরতে হবে বলে চিঠি দিতে বাধা কি হ'ল।

তুমি চিঠি লেখ?

কোন ঠিকানাই আমাকে দেয়নি।

তাইতো। একটু ভাবনার কথাই বটে।

অনীতা বলিল, এদিকে আবার একটা নূতন বিপদ হয়েছে।

কি হ'ল?

বৌদির এক সম্পর্কীয় আত্মীয় আমাদের

বাড়ীতে মাঝে মাঝে আসে। কোন একটা অফিসে কাজ পেয়েছে। মাইনে এখন বেশি নয় তবে উন্নতির নাকি আশা আছে। তার নাকি আমাকে ভয়ানক পছন্দ হয়েছে। এখনই বিয়ে করতে চায়।

সুপ্রভা বলিল, তোমার শরীরের এই অবস্থার কথা শুনেও?

সেই তো আশ্চর্য! বৌদির কাছে সব শুনেছে, তবু—

একটু আশ্চর্যই মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ, প্রায়ই বাড়ীর ছেলেমেয়েদের নাম করে এটা-সেটা নিয়ে আসে। বেশ বুঝি, তাতে আমারও ভাগ আছে। বিস্কুট, মাখন, স্যানাটোজেন, আঙুর এই রকম কত কি। একে আমার বুকের এই অবস্থা, তারপর এই দোটানা, আমি যেন আর সইতে পারছি নে।

পার্কের পথে একটি চীনাবাদামওয়ালা যাইতেছিল। সুপ্রভা তাহাকে ডাকিয়া এক ঠোঙা চীনাবাদাম লইয়া অনীতাকে বলিল, এই নাও, চীনাবাদাম খেতে খেতে গল্প করা যাক।

আমার এ গল্প গল্প নয় ভাই।

তবু, গল্প বই কি। এমন অবস্থায় একটু মন খুলে কথা বললে মনের ভার কমে।

অনীতা বলিল, কি করি ভাই? বাড়ীতে যতক্ষণ থাকি, বৌদি কেবল সরোজের কথা বলবেন—এই ছেলেটির নাম সরোজ—আর বলবেন, আর রাজপুত্তুরের আশায় না থেকে মন ঠিক করে ফেল। আমি বাবাকে বলেছি, তোমার দাদাকেও বলেছি। তাঁদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু—

সুপ্রভা বলিল, তাইতো, ভারি ভাবনার কথা।

ক্রমশঃ ঠোঙার চীনাবাদাম শেষ হইল। অন্ধকারও ঘনাইয়া আসিতেছে। পার্কের ভিতরকার আলোগুলি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। নানা বয়সের পুরুষ ও নারী ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাঁটিতেছে। কতকগুলি তরুণ ও তরুণী হাসিয়া হাসিয়া কলরব করিয়া গল্প করিতে করিতে চলিয়াছে। পাশে একটি বেঞ্চিতে বসিয়া কয়েকটি যুবক গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিয়াছে। অনীতা শুধু ভাবিতেছে, ইহাদের মনে কত আনন্দ। সকলেই কেমন আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শুধু তাহারই মনে এ যাতনা কেন?

সুপ্রভা বলিল, আজ আর ভেবো না। এখন বাড়ী যাও, খেয়ে দেয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়। আমি কাল অফিসে যাবার সময়ে তোমার কাছ থেকে ছুটীর চিঠি নিয়ে যাব।

(৩)

বৌদি, তুমি আর আমাকে বকো না।

এই কথা কয়টি বলিয়া অনীতা চুপ করিল।

দুপুরবেলা আহারাদির পরে অনীতা শুইয়া পড়িয়াছে। যে কয়দিন ছুটী আছে, একটু ভাল করিয়া বিশ্রাম করিয়া লইবে। একটু পরে তাহার বৌদি তাহার পাশে আসিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, এই নাও, পান খাও। আচ্ছা, কেন তুমি এমন করে একটা মিথ্যে আশায় বসে আছ? সরোজ কালও আমাকে বলেছে, অনীতা কি বলে? তোমার এই জেদ কি ভাল হচ্ছে?

বৌদি, তুমি বোধ হয় ঠিকই বলছ, কিন্তু—

এই কিন্তুই তোমাদের অশান্তির কারণ। আমার যখন বিয়ে হয়, আমি তখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ি। তখন মনে হ'ত কলেজের কেউ কেউ বুঝি আমাকে খুব ভালবাসে। ভাগ্যিস, গা মাখিনি, শেষে যার সঙ্গে বিয়ে হ'ল, তাকে আগে কখনো চোখেও দেখিনি।

তুমি তো আর কাউকে ভালবাসনি।

বিয়ের পরের ভালবাসাটা বুঝি ভালবাসা নয়? তাছাড়া ইংরেজিতে একটা কথা আছে, তুমি যাকে ভালবাস, তার চেয়ে যে তোমাকে ভালবাসে, তাকে বিয়ে করাই ভাল।

কিন্তু ওর চিঠিগুলো তুমি যদি দেখতে!

যাই বল, এই ছ' মাস চুপ করে থাকাটা আমার কাছে একেবারেই ভাল মনে হচ্ছে না। সরোজ কাল বলছিল, তাকে শিগ্‌গিরই মন ঠিক করতে হবে। বাড়ীতে সবাই ব্যস্ত হয়েছে। সম্বন্ধও নানা যায়গা থেকে আসছে। সত্যিই তো, কতদিন আর এমন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে থাকবে?

উঃ, কি মুস্কিলেই আমি পড়েছি!

মুস্কিল মোটেই নয়। আমি বলছি, সরোজকেই বিয়ে করা তোমার উচিত। ছেলেটি কত ভাল। তোমার এই রকম শরীরের অবস্থা জেনে শুনেও বিয়ে করতে এগুবে, এ কথা আমিও ভাবতে পারিনি। বিমল যদি ওখানে কোন গোলমাল নাও করে থাকে, তবু দেশে ফিরে এসে তোমার স্বাস্থ্যের এই অবস্থা দেখলে কিছুতেই বিয়ে করতে রাজি হবে না, একথা জোর করে আমি বলতে পারি। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি নে, কেন তুমি মন স্থির করতে পারছ না। আমরা অতি সাধারণ দরিদ্র গৃহস্থ। আমাদের স্বামীরা ধনী নাই বা হলেন। দারিদ্র্যটাও নিয়তির বিধান। বিলাত-ফেরতদের সম্বন্ধে একটু ভয়ও কি নেই? এই ছ' মাস চিঠি না দেওয়া একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় কি? কয়েক বৎসর ওদেশে বাস করবার পর অভ্যাস ও মতিগতির কত পরিবর্তন হয়, তা কি দেখনি? বহু বিলেত-ফেরতের পারিবারিক জীবন যে অভিশপ্ত, তাও দেখেছি। আমি বলছিনে, বিমল একেবারে বদলে গেছে। কিন্তু অনিশ্চিতের ভয় কি একেবারে নেই?

অনীতা ভাবিতে ভাবিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বলিল, বৌদি, তুমি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী। তোমার কথা আমি একেবারে ফেলে দিতে পারিনে। তবু—তবু—আমাকে আর একটু ভাবতে দাও।

দুই বোন প্রণব মুখোপাধ্যায়

দুই তিন দিনের মধ্যে কিন্তু শেষ উত্তর চাই।

চেষ্টা করব, বৌদি, তুমি আর আমাকে বকো না।

ক্লান্ত হইয়া অনীতা ঘুমাইয়া পড়িল।

(৪)

অনীতা মত দিয়াছে।

অনীতার বৌদি খুসী হইয়াছেন। সরোজ খুসী হইয়াছে। বিবাহের দিন সম্পর্কে গবেষণা চলিয়াছে। সরোজ একটু বেশি ঘন ঘন অনীতাদের বাড়ী যাতায়াত করিতেছে। এটা-সেটা হাতে করিয়া আনা একটা অভ্যাসের মত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য, এখনও সরোজ আর অনীতার মধ্যে বাক্যালাপ হয় নাই। সরোজের ইচ্ছা খুবই, কিন্তু অনীতা একটু যেন সরিয়াই থাকে। দেখা অবশ্য হয় কারণ অনীতা লুকাইয়া থাকে না। সহজ ভাবেই বাড়ীর মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। এক একদিন হয়তো চা খাবার নিজে করিয়া ছোট ভাইপোর হাত দিয়া পাঠাইয়া দেয়। সরোজ তৃপ্তির সঙ্গেই খায়, এদিক-ওদিক চায়, কিন্তু অনীতা সামনে আসিয়া সঙ্কোচের আড়াল ভাঙিয়া দেয় না। এবিষয়ে বৌদির সঙ্গে কথা যে না হয়, তা নয়। কয়েকবার বৌদি বলিয়াছেন, এখন আর কেন সঙ্কোচ?

অনীতা প্রায় ধরা গলায় বলে, ভয় করে। যদি আবার—

বৌদি বলেন, আচ্ছা, বাপু, আমি আর কিছু বলব না। সরোজের কাকার খুব অসুখ। তিনি সুস্থ হলেই বিয়ের দিন ঠিক করে ফেলা যাবে।

অনীতা অফিস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শরীরও একটু ভাল হইয়াছে। বান্ধবী সুপ্রভা বলে, বিয়ে ঠিক হতেই বুঝি শরীর মন ভাল হয়ে গেল!

যাও, কি যে সব বল। আমার এখন আর কোন আনন্দ উৎসাহ নেই।

নাঃ, কিছু নেই। আমরা আর কিছু বুঝি নে কি না।

বোঝই যদি, তবে আর জিজ্ঞাসা কর কেন?

সুপ্রভা বলে, আচ্ছা, চল একবার ক্যান্টিনে যাই। আজ আমি হোস্ট।

কথা বলিতে বলিতে উহারা দুজনে ধর্মতলার মোড়ের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। এমন সময়ে একখানি সাদা এয়ারওয়েজের বাস আসিয়া রাস্তার লাল আলো দেখিয়া থামিয়া গেল। সুপ্রভা এবং অনীতা সবিস্ময়ে দেখিল, এই বাসের একটি জানালার পাশে বসিয়া আছে বিমল। বিমলও অনীতাকে দেখিয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই সে বাস হইতে নামিয়া পড়িল। ড্রাইভারকে বলিল, আমার জিনিষপত্র তোমাদের ডিপোতে নিয়ে যাও। আমি সেখান থেকে নিয়ে আসব। সবুজ আলো পাইয়া বাস চলিয়া গেল।

বিমলকে অনীতার কাছে আসিতে দেখিয়া সুপ্রভা চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। অনীতা বলিল, পালাচ্ছ কেন? একটু দাঁড়াও না।

নাঃ, আমি চললুম। পরে দেখা হবে।

এই কথা বলিয়া সুপ্রভা চলিয়া গেল।

অনীতা এবং বিমল রাস্তার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। সেখানে অনেকগুলি ক্যালেণ্ডার

এবং হাতে আঁকা ছোট ল্যান্ডস্কেপ ছবি বিক্রয়ের জন্য সাজান রহিয়াছে। পাশে একটি ভিখারী কাপড় পাতিয়া বসিয়া রহিয়াছে। তার পাশেই এক জুতো পালিশওয়ালা এক ভদ্রলোকের পায়ের জুতায় কালি লাগাইতেছে। ফুটপাথের উপর দিয়া নানা শ্রেণীর মানুষ চলিয়াছে।

বিমল অনীতার পাশে গিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া বোধ হয় শেকহ্যান্ড করিতে গেল। কিন্তু অনীতা ত্রস্ত হইয়া হাত সরাইয়া লইল। অনীতা যেন কেমন হইয়া গেল। কথাও বলিতে পারে না, নড়িতে-চড়িতেও পারে না। বুকের মধ্যে হঠাৎ সারিয়া-যাওয়া ব্যথাটা আবার যেন বাড়িয়া উঠিল। সে হঠাৎ পাশের দেওয়াল ধরিয়া যেন বসিয়া পড়িতে গেল। বিমল তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া একটি ট্যাক্সিতে তুলিল এবং অনীতার বাড়ীর দিকেই চলিতে লাগিল। গাড়ীতে কিছুক্ষণ বসিবার পর অনীতার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিয়াছে। অতি নিকটে বিমলকে দেখিয়া একটু সরিয়া বসিয়া বলিল, এ তুমি কি করলে? আমাকে নিয়ে ট্যাক্সিতে কোথায় চলেছ?

তোমাদের বাড়ীতেই যাচ্ছি।

না, আমাদের বাড়ীতে যেও না। সেখানে আর তোমার যাওয়া উচিত নয়।

কেন?

উঃ, কেন? কি উত্তর দেবো এর! তুমি কেন এতদিন চিঠি লেখনি?

কেন? আমিই বা কি উত্তর দেবো?

কেন, কি হয়েছে, বলই না।

যা হয়ে থাকে, তাই হয়েছে। তাই লজ্জায় আর চিঠি লিখতে পারিনি।

অনীতা একটু সোজা হইয়া বসিল। তাহার শরীরে ও মনে যেন একটা নূতন বলের সঞ্চার হইয়াছে। ড্রাইভারকে ডাকিয়া বলিল, এই ড্রাইভার, বাঁদিকে থামো।

ট্যাক্সি থামিলে অনীতা বলিল, এখানেই নামা যাক।

উহারা নামিয়া পড়িল। বিমল বলিল, এখুনি বাড়ী যাবে?

কেন?

এতদিন পরে দেখা হ'ল, একটু সুখ-দুঃখের কথা বলতে বা শুনতে ইচ্ছে করে না? চল, পাশের ওই ছোট চায়ের দোকানটায় গিয়ে একটু বসি।

অনীতা যেন অগত্যাই সঙ্গে গেল। প্রকৃতপক্ষে বিমলের সর্বশেষ সংবাদ শুনিবার জন্য কৌতূহলও কম হয় নাই।

একটি খালি টেবিলে বসিয়া চায়ের অর্ডার দিয়া বিমল বলিল, আমি তোমার কাছে অত্যন্ত অপরাধী। আমাকে ক্ষমা কর।

ক্ষমা আমি আগেই করেছি, বিমল। তোমার খবরটা একটু ভাল করে শুনতে পারি কি?

খবর আর কি?

একা যে?

তিনি ইণ্ডিয়ায় আসবেন না।

তাহলে তুমি আবার বিলেত যাচ্ছ? কবে রওয়ানা হচ্ছ?

আমার ওখানে থাকা সম্ভব নয়। অত খরচপত্র—

মানেটা বুঝতে পারছি নে। তিনি

চাষের মাঠে — সমরেন্দ্রনাথ মিত্র

ইণ্ডিয়ায় আসবেন না। তুমিও ইংলণ্ডে যাবে না। অথচ—

মানে, আপাততঃ চিঠিপত্র চলবে, আর মাসে মাসে টাকা পাঠাতে হবে।

আর তিনি সেখানে খাবেন, বেড়াবেন, নাচবেন। এ ব্যবস্থা বেশ ভালই হয়েছে, কি বল?

আমি ভাবছি—

কি ভাবছ?

ডাইভোর্স করব।

চা শেষ হইয়া গিয়াছে। বিমল আরো এক কাপ করিয়া চায়ের অর্ডার দিল, সঙ্গে দুটো কাটলেট।

অনীতা বলিল, আমি কাটলেট খাব না।

আমিই না হয় খাব। আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।

অনীতা বলিল, এরই মধ্যে ডাইভোর্স?

হ্যাঁ, তা হতে পারে। আমার কাছে থাকতে স্বীকার না করলে—। তবে,-হ্যাঁ, একটু সময় লাগবে। আইনের ব্যাপার কিনা।

অনীতা নিস্পৃহভাবে বলিল। মহা ফ্যাসাদে পড়েছ দেখছি। তোমার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে।

আচ্ছা অনীতা, তুমি আমায় ক্ষমা করতে পারবে? ডাইভোর্সটা হয়ে গেলেই আমাদের বিয়েতে আর বাধা থাকবে না।

আচ্ছা, ডাইভোর্স হোক তো আগে। তারপর আর কোন বাধা থাকবে কি না, তখন দেখা যাবে।

(৫)

বিমল একখানি চিঠি পাইল।

"প্রিয় বিমল, আমি বাড়ী বদলেছি। উপরের ঠিকানায় আগামী রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার সময়ে আমার সঙ্গে চা খেলে বিশেষ সুখী হ'ব। অবশ্য আসবে। ইতি

অনীতা"

পত্র পাইয়া বিমল একটু খুসী না হইয়া পারিল না। অনীতা তাহাকে এখনও ভোলে নাই মনে করিয়া একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করিল।

যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হইল। সেদিন সে একটু পরিপাটি করিয়াই স্যুটটা পরিয়াছে। সকালে দাড়ি কামাইয়াছে। তৎসত্ত্বেও বিকালেও আর একবার দাড়ি কামাইয়াছে।

অনীতার বাড়ীতে পৌঁছিয়া বাহিরের ঘরে গিয়া বসিয়াছে। ছোট পরিচ্ছন্ন একখানি ঘর। সরোজ আসিয়া তাহাকে আপ্যায়ন করিল। কুশল প্রশ্নাদি হইল। একটি চাকর আসিয়া দুইজনের সামনে দুইটি টিপয় পাতিয়া দিল। আর একখানি গদি আঁটা চেয়ারের সামনে আর একটি টিপয় রাখিয়া গেল।

খাবার আসিল, তিন প্লেট। বিমল খাবারে হাত দিতে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া সরোজ বলিল, আরম্ভ করুন, উনি এখনই আসবেন।

বিমল অনীতার অপেক্ষায় এদিক-ওদিক চাহিতেছে। ধীরে ধীরে খাবারের প্লেটে হাত দিয়া ভিতরের দরজার দিকে চাহিতেই চমকাইয়া উঠিল। এ কে? এই কি সেই অনীতা। সর্বাঙ্গে গহনা, মাথায় সিঁদুর! অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, এই যে, আসুন।

চা খাওয়া এবং কথাবার্তা চলিতে লাগিল। আবহাওয়া অনেকটা স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে।

চা খাওয়া শেষ হইলে যখন বিমল ইহাদের নিকট বিদায় লইতেছে, তখন অনীতা জিজ্ঞাসা করিল, ডাইভোর্সের কতদূর হ'ল?

এখনও কিছুই করতে পারিনি।

অনীতা বলিল, আপাততঃ তাহলে চিঠি লেখা আর টাকা পাঠান ছাড়া আর কর্তব্য নেই। কি বল?

বিমল ধীরে ধীরে রাস্তায় পা বাড়াইল।

—

ছোট মেয়েটা কাঁদিতেছে।

কাঁদুক। এখন তাহাকে গিয়া ধরিবার মত তিলমাত্র সময় নাই নন্দরাণীর। আটটা বাজে। নটার মধ্যে তাড়াহুড়া পড়িয়া যাইবে তাঁহার। স্বামীর ফার্স্ট পিরিয়ড। দুই মেয়ে আর এক ছেলের কলেজ। তাহার পরের কটির স্কুল, এই সময়টাতে তাঁহার নিঃশ্বাস ফেলিবারও অবকাশ থাকে না, একা-হাতে সংসার, মেয়েদের তিনি পড়া ফেলিয়া সংসারের কাজে আসিতে দেন না, ঠিকা ঝি সকালবেলার বাসি পাট সারিয়া উনানে আঁচ দিয়া চলিয়া যায়। তারপর সমস্তই তাঁহার। ডাল চাপাইয়া দিয়া মশলা বাটিয়া নেন, ডাল নামাইয়া ভাত চাপাইয়া তরকারি আর মাছ কুটিতে বসেন। স্বামী জানেন তাঁহার বাহিরের কাজ, আর বাড়িতে থাকিলে চেনেন বই—সংসারের সাহায্য তাঁহার কাছে আশা করিয়া লাভ নাই। আশা নন্দরাণী করেনও না, বরং তিনি যে এদিকের কোন কিছুতেই মাথা গলাইতে আসেন না সেইটাই তাঁহার স্বস্তি, আসিলে সাহায্য কিছুই হইত না, বরং বিড়ম্বনা বাড়িত, ভাগ্যে একটি থাকে বাড়িতে—চাকরি করে। সেইটাই ভরসা—বাঁজার করার দায়টা তাহার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন নন্দরাণী।

ভোরবেলায় উঠিয়া মানুষগুলোর প্রাভাতিক ভাণ্ডার আর প্রাতরাশ সারিয়া দেন, তাহারা যে যাহার কক্ষপথে ফিরিয়া যায়, নন্দরাণী নিজের নিত্যকর্মে মগ্ন হইয়া যান। তখন অন্যদিকে মন বা কান দিবার মত অবস্থা তাঁহার নয়, তথাপি কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে ছোট মেয়েটার ডাক কানে আসিয়া তাঁহাকে অকস্মাৎ উন্মনা করিয়া তোলে।

অন্য সন্তানদের লইয়া তাঁহার এ জ্বালা পোহাইতে হয় না, সংসারের কর্মচক্র তখনও একই ছিল—এখন ছেলে আর মেয়ে। তখন দেবররা কলেজে যাইত। তাঁহার ভাগ্যে ফার্স্ট পিরিয়ডের ভাত যোগানোর কাজ চিরদিনই। কিন্তু তখন বয়স কম ছিল এবং শাশুড়ি বাঁচিয়া ছিলেন। শিশুদের লইয়া তাই নন্দরাণীর সমস্যা ছিল না, তাহাদের তৈল ক্ষুধা মিটাইয়াই তিনি অব্যাহতি পাইতেন, সঙ্গ ক্ষুধা মিটাইতেন তাহাদের ঠাকুরমা। অন্য ছেলেমেয়েরা এমনিও তাঁহার সঙ্গ বিশেষ প্রত্যাশা করিত না, তাঁহার কাছে বিশেষ ঘেঁষিত না, নেহাৎ স্তন্যপানের বয়সটা কোনক্রমে পার হইয়াই তাহারা ঠাকুরমার শয্যায় চালান হইয়া যাইত, নন্দরাণীর শয্যা ততদিনে পরবর্তী সন্তান আসিয়া দখল করিয়াছে। এই কর্মচক্রেরই নিয়মিত আবর্তন চলিয়াছে পনের-ষোলটি বছর ধরিয়া। ইহাকেই তিনি সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছিলেন।

এইভাবেই চলিয়া চলিয়া ক্রমে বয়স আসিয়া পৌঁছিয়াছে চল্লিশের ধারে। এখন মাঝে মাঝে হঠাৎ কেমন যেন হাঁপ ধরে। হঠাৎ যেন একবার মুখ ফিরাইয়া অতীত জীবনটার দিকে তাকাইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে।

ছোট মেয়েটা অন্যদের তুলনায় রুগ্ন, অসুখ-বিসুখ ঠিক নয়, তবু যেন কেমন দুর্বল, কেমন অসহায়। অন্যগুলো ছিল দামাল দুরন্ত। তাহাদের লইয়া দুর্ভোগ ছিল, দুশ্চিন্তা ছিল না। দুশ্চিন্তা যে এটাকে লইয়াও বিশেষ করিতে হয় তাহা নয়। তবু ওদের তুলনায় ইহাকে কেমন যেন ক্ষীণজীবী বলিয়া মনে হয়। সকালবেলার আহার সারিয়া গোটাকতক পুতুল হাতে দিয়া তাহাকে খাটের উপরে বসাইয়া দেন নন্দরাণী। রেলিং দেওয়া খাট, পড়িবার ভয় নাই, অত উঁচু খাট হইতে নিজে নিজে বাহিয়া নামিতেও সে পারে না—নিশ্চিন্ত। নামিবার চেষ্টাও করে না, একা-একাই খেলা করে। কিন্তু খেলায় যেদিন মন বসে না সেদিন বসিয়া বসিয়া মাকে ডাকিতে থাকে।

সে এক অদ্ভুত ডাক। কান্না নয়, শুধু করুণ সুরে ডাকা, আর মিনতি। দেড় বছর বয়স পার হইয়াছে কি হয় নাই। মুখে যেন খই ফোটে মেয়ের। পা ছড়াইয়া বসিয়া, মৃদু-স্বরে বলিতে থাকে—অ মা, একটু নামিয়ে দাও না, আমি কোলে উঠতে চাইব না, তোমার কাজ নষ্ট করব না, শুধু বসে বসে থাকব, তোমার কাজ করা দেখব।

কাজ নষ্ট করিতে নাই, কোলে উঠিতে চাহিতে নাই, তাহা সে বুঝিয়া লইয়াছে। কাছে আসিলে যে দুষ্টামি কিছু করিবে তাহাও নয়। একটি পিঁড়ি পাতিয়া বসাইয়া দিলে সত্যি স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবে, চুপ করিয়া বসিয়া তাঁহার কাজ করা চাহিয়া চাহিয়া দেখিবে। কিন্তু তবুও তাহাকে নামাইয়া আনিতে পারেন না নন্দরাণী। দুটো জ্বলন্ত উনান, সদ্য রাঁধা ভাত-ডালের পাত্র, তাহারই সঙ্গে শিল-নোড়া আর বঁটি—এই হট্টগোলের মধ্যে তাহাকে আনিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না, বারবার তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিতে হয় সে ঠিক আছে কিনা, কাজে বিঘ্ন ঘটে। তাহার দুইটি নীরব চক্ষু তাঁহার প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালনাকে একাগ্র দৃষ্টিতে অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছে, সেই দৃষ্টির মধ্যে বঞ্চিত শিশু হৃদয়ের যে নিঃশব্দ ক্রন্দন পুঞ্জীভূত, তাহাকে অনুভব করিয়া তাঁহার মন অশান্ত হইয়া উঠে। তার চেয়ে এই ভাল, তাহাকে দূরে বসাইয়া রাখা।

বড় মেয়ে চারু হঠাৎ রান্নাঘরে চলিয়া আসিল, কহিল, মা, কে এসেছেন।

বাহির হইতে একটি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ শোনা গেল, ননী কইরে, ও ননী!

ননী!

বহুদিন বিস্মৃত নাম, নিজেও প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এ নামে ডাকিবার মত কেহ কি আজও বাঁচিয়া আছে?

চারু কহিল, কে মা?

বলিতে বলিতে অভ্যাগতা সেই রান্নাঘরেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন, কিরে, ডাকলে সাড়া দিসনে কেন? বড়লোক হয়েছিস, চিনতে পারিস্ নে?

চোখের সম্মুখ হইতে বিশ বৎসরের একখানি পুরু পর্দা ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। কুন্ঠিত মৃদু হাস্যে নন্দরাণী কহিলেন, তুই! আয় বোস, চারু পিঁড়ি দে একটা।

থাক্ থাক্ পিঁড়ি দিতে হবে না মা, ভেঙে যাবে।

বলিয়া অভ্যাগতা সেইখানে মেঝের উপরেই বসিয়া পড়িলেন। সঙ্গে একটি কিশোরী মেয়ে, চারুরই বয়সী, তাহার দিকে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, পিঁড়ি বরং দিতে পার এঁকে, খুকিকাকে, ভাঙবার ভয় থাকবে না।

মেয়েটি কৃশ। মায়ের কথায় হয়তো একটু অপমান বোধ করিল, সে ভাবটাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া কহিল, কাজেই তেমন বসেও সুখ নেই। বলিয়া পিঁড়ি একটা নিজেই পাড়িয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। ভদ্রমহিলা নিজেও যে খুব পিঁড়ি ভাঙবার মত বিপুলা তাহা নয়, তবে মোটের উপর স্বাস্থ্যবতী, কহিলেন, তা বেশ, তবু বসা ভাল, নইলে ননীর হয়তো মেয়ের বিয়ে হবে না। কটা ছেলেমেয়ে রে তোর? এইটি বড়?

নন্দরাণী ক্ষিপ্রহস্তে হাতের কাজটুকু সারা করিয়া হাত ধুইবার সুযোগ করিয়া লইতেছিলেন, কহিলেন, হ্যাঁ, বড় মেয়ে, ছেলে আরও বড়।

চারুকে চোখের ইঙ্গিত করিলেন, সে আসিয়া প্রণাম করিল। নন্দরাণী কহিলেন, মাসীমা।

অভ্যাগতা কহিলেন, দাঁড়াও বাবা, অত ব্যস্ত হতে হবে না। আমি যে ঠিক কে, সেটা শুধু দু অক্ষরের 'মাসী' দিয়ে বোঝা যাবে না। মানে এককালে আমরা দুটোতে ছিলুম এ-ওর

সপত্নী সচিবর সখী মিথ

সহচরী মার্কটে কলাবিধৌ—

—সে রকম ক্লাস ফ্রেণ্ড তোদের একালে জন্মায় না। কি পড়িস্ রে তুই, মেয়েটা?

চারু কিছু শঙ্কস্বরে কহিল, থার্ড ইয়ারে।

এই মরেছে! তুইও আবার মেয়েকে কলেজে পড়াচ্ছিস? সব ভুলে গেলি? মানে, বুঝলি রে মেয়েটা—কি নাম তোর?

—চারু।

বেশ—এই নন্দরাণী বোস, আর নিভাননী বোস দুজনে এককালে বেথুনে—সমুদ্র মন্থন করে বেড়াতাম।

নন্দরাণীর হাত ধোওয়া হইয়া গিয়াছে। আঁচলে হাতটা মুছিতে মুছিতে কহিলেন, চল বসবি ওঘরে।

—তোর হেঁশ্‌স্যাল?

—ও ঠিক আছে।

এ ঘরে আসিয়া, অতিথিকে বসাইয়া কহিলেন, তারপর, আগে বল এমন আচমকা এলি কোত্থেকে, এলি কি করে?

—ফেল করে।

—মানে?

—মনে নেই? তুই এসে ভর্তি হলি বেথুনে, দূর থেকে দেখে তোকে ভালো লেগে গেল। পরের বারে ইচ্ছে করে ফেল করে তোর সঙ্গে এসে জুটে গেলুম? এবারও তাই।

—ধুৎ। পাগলামো আর গেল না তোর।

—পাগলামো নয়, একদম সত্যি। মানে, চলেছি কলকাতায়।

কর্তা তেড়ে চাকরি করছেন। ফুরসৎ নেই। আর ও চাকর-বাকর লোক নিয়ে পথ চলা পোষায়ও না আমার।

অতএব সকন্যা একাই স্টীমারে চেপে-ছিলুম। কুয়াশার ঠেলায় স্টীমার লেট হয়ে গেল। এখানে এসে দেখি ট্রেন নেই, আর ট্রেন সেই বিকেলে। ইতিমধ্যে একটা হোটেল দরকার। তাই খুঁজে খুঁজে এসে জুটে গেলাম।

—কিন্তু, আমি এখানে আছি তাই বা জানলি কি করে?

ওহে বালিকে, ফুল, ছুঁচো, আর কবি কখনো লুকিয়ে থাকতে পারে না গন্ধেই ধরা পড়ে যায়। তোমার কর্তাটি এখানে ছেলে ঠেঙিয়ে থাকেন। সে খবর আমরা গোলা লোকরাও মাঝে মাঝে শুনতে পাই। সে যাক, বল এবার তোর সব খবর শুনি। ছেলেমেয়ে কটি?

—চার ছেলে চার মেয়ে।

—Large-scale f...tory বল, করেছিস কি? মরে যাবি যে, এখনও হচ্ছে?

নন্দরাণী উত্তর দিলেন না। কহিলেন,

—তোর?

—আমার ভাই ঐ এক কন্যা, শ্রীমতী নীলমণি। পুত্রও আছেন অবশ্য একজন, মেডিক্যাল পড়ছেন। তোর ছোটটা কই দেখি?

নন্দরাণী কহিলেন তাই তো। এতক্ষণ তার সাড়া নেই কেন, চারু দেখে আয় তো।

চারু চলিয়া গেল, এবং তাহাকে লইয়া ফিরিয়া আসিল, মেয়েটাকে লুফিয়া লইয়া নিভাননী কহিলেন, বাঃ, চমৎকার হয়েছে তো। কথা কয়?

নন্দরাণী মৃদু হাসিয়া কহিলেন, ওকেই জিজ্ঞেস কর না।

—ওকে? সেকি কথা। হ্যা রে ব্যাং। কথা কইতে পারিস?

মেয়েটা কহিল, আমি তো ব্যাং না, আমি কমলা।

—কমলা? ধেৎ। তুই রাণী।

—না কমলা।

—তবে তোর প্যাঁচা কই, ঝাঁপি কই!

এ কথার উত্তর কমলার যোগাইল না।

সে নিঃশব্দে শুধু মোচড় খাইয়া তাঁহার কোল হইতে নামিয়া পড়ার চেষ্টা করিতে লাগিল। নিভাননী তাহাকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিলেন। কহিলেন, আহা থাক না রে শাশুড়ি। তোকে কি আমি চিমটি কাটছি?

কমলা কহিল, ছেড়ে দাও না।

দেব না ছেড়ে, তোর সঙ্গে আমার শাশুড়ি হ'ল, তুই আমার শাশুড়ি, আমি তোর শাশুড়ি, বল শাশুড়ি।

কমলা কহিল, না। বলিয়া আবার নামিয়া যাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

নন্দরাণী একটুক্ষণ চাহিয়া দেখিলেন, তারপর কহিলেন, দে ভাই ছেড়ে ওটাকে। এক্ষুণি কান্না জুড়ে দেবে।

—দিলেই হ'ল? কাঁদ তো, দেখি তোর কত বড় সাধ্য।

টিপিয়া পিষিয়া চটকাইয়া মেয়েটাকে তিনি অস্থির করিয়া তুলিলেন, মেয়েটা কাঁদিল না, হাসিল না, কি রকম অদ্ভুত হতভম্ব হইয়া রহিল এবং মাঝে মাঝে শুধু বিপন্ন দৃষ্টিতে মাতার দিকে চাহিতে লাগিল। যেন তাঁহাকে বলিল, উদ্ধার কর।

উদ্ধার করিল নিভাননীর কন্যা। কহিল, ও ঘাবড়ে গেছে মা, এবার ছেড়ে দাও, বলিয়া মার হাত হইতে প্রায় টানিয়া লইয়াই তাহাকে চারুর হাতে সমর্পণ করিল।

নন্দরাণী কহিলেন বোস তোরা, মুখ হাত ধুয়ে নে। আমি ওপাশের চেহারাটা একবার দেখে আসি।

নিভাননী কহিলেন যার চেহারা দেখতে এলাম তিনি কই, তোর কর্তা?

নন্দরাণী কহিলেন বেরিয়েছেন। আসবেন এক্ষুণি। খেয়ে কলেজে যাবেন। চারু, চানের ঘরটা দেখিয়ে দে মাসীকে।

যে যাহার মত স্কুলে কলেজে চলিয়া গেল, দুপুরের পাট সারিয়া দুই সখী একত্রে শুইয়া পড়িলেন। ছোট মেয়েটা এক পাশে শুইয়া ঘুমাইতেছে। নিভাননীর কন্যা অন্য ঘরে। সে বইর আলমারি হাতে পাইয়াছে।

তারপর সারা জীবনের সঞ্চিত গল্প। এককালে ছুটির দুপুরে কলেজ হোস্টেলের খাটে—এইভাবে পাশাপাশি শুইতেন দুইজনে—সে কতকালের কথা? কুড়ি বছর? না কুড়ি যুগ? তারপর কত কি ঘটিল নন্দরাণীর জীবনে। অতীত সেদিনের ছবি তাঁহার স্মৃতির কোনখানে টিকিয়া আছে একথা তাঁহার কখনও মনেও হয় নাই। দেখা গেল, আবার সবই মনে পড়ে। ক্লাসের মেয়ে, ক্লাসের রুটিন, ক্লাসের টিচার লইয়া সে কত রকম কাহিনী, কত রকম উচ্ছ্বাস।

নিভাননী কিছু বড়। সেকেণ্ড ইয়ারে পড়িত। নন্দরাণী আসিয়া ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হইল। কদিন পরে দেখা গেল নিভাননী হঠাৎ নাম কাটাইয়া ফার্স্ট ইয়ারে আসিয়া ভর্তি হইয়াছে। সেই হইতে এক ক্লাসে, হোস্টেলের এক ঘরে দুইজনের চারিটি বছর কাটিয়াছে। বন্ধুত্বের রেজিস্ট্রেশন হিসাবে ইহারা পরস্পরে নামের অর্ধাংশ বিনিময় করিয়াছিল।

—নিভার নামের 'ননী' হইল নন্দর ডাক নাম। নন্দ নিভাকে ডাকিল 'রাণী।' দেখাদেখি অন্য মেয়েরাও কেহ কেহ ইহাদের এই নামে ডাকিতে চাহিত। ইহাদের তাহাতে প্রবল আপত্তি, দুজনে একত্রে থাকিত। একত্র খাইত, শুইত, কলেজ ইউনিয়নে একত্র লড়িত এবং ক্লাশ ফাঁকি দিবার প্রয়োজনে একত্রে জ্বর বাধাইত।

এইভাবে কলেজে চার বছর কাটিয়াছে। তারপর জীবনের স্রোত দুইজনাকে দুইদিকে ভাসাইয়া লইয়া গেল, নন্দর বাবা অসুস্থ হইয়া পড়ার ফলে তাহার বি-এ পরীক্ষা দেওয়া হইল না এবং তাহার পরই হঠাৎ একদিন তাহার বিবাহ হইয়া গেল, স্বামী মফঃস্বল কলেজের তরুণ অধ্যাপক। বার দু-চার কর্মস্থল বদলাইয়া এই শেষের সহরটিতে আসিয়া স্তব্ধ হইলেন। জীবনের গত দশ-বারোটা বৎসর এইখানেই কাটিয়াছে নন্দরাণীর, এই কলেজের একই কোয়ার্টারে।

মধ্যবিত্ত এবং জনবহুল সংসারে, কর্মব্যস্ত দিবস দেখিতে না দেখিতে কাটিয়া যায়। একটি দিনের কাজ সারা করিতে করিতে পরবর্তী দিনের কর্মসূচী মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। বহু দূর অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করার অবসরও মেলে না। উৎসাহও থাকে না। সেদিনের সেই দিনগুলি যে সত্যই কোনদিন ছিল, তাহাও যেন সংশয়ের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে এখন।

হঠাৎ আজ সেই অতীত একেবারে অতর্কিতে আসিয়া সজীব হইয়া দেখা দিল। স্মৃতির আর বিস্মৃত-কাহিনীর প্লাবনে তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়া দিল। নিভাননীর বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নাই এই বিশ বছরেও, সে এখনও আগেরই মত স্বাস্থ্য ও প্রাণশক্তিতে উচ্ছলিত। তাহাকে দেখিয়া নন্দরাণীর হঠাৎ মনে হইল তিনি যেন কি দারুণ বড়ো হইয়া গিয়াছেন। নিভাননী তাহাকে চীৎকার করিয়া 'ননী' বলিয়া ডাকিতেছেন। কই তিনি তো পারিলেন না তাহাকে সেই রকম প্রমত্ত উল্লাসে 'রাণী' বলিয়া জড়াইয়া ধরিতে?

নিভাননীর পাশে শুইয়া, তাহার সঙ্গে নিজেকে পাশাপাশি মিলাইয়া দেখিলেন নন্দরাণী। জীবনের গত কুড়িটা বৎসর তাহার কাটিয়া গিয়াছে। সংসারের কর্মচক্রে পাক খাইয়া খাইয়া। তৃপ্তি, আনন্দ তাহার মধ্যে ছিল না—এমন নয়, সংসারের গৃহিণী নন্দরাণী নিজেকে পরিপূর্ণ বলিয়াই জানিতেন। হঠাৎ কেন তবে মনে হইতেছে, তৃপ্তি তিনি পান নাই, যাহা পাইয়াছেন সে শুধু আত্মপ্রবঞ্চনা?

অথচ, সত্যই ইহা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। একথাও তো সত্য নয়। স্বামী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়-পরিজন লইয়া তাহার এই সুসম্পূর্ণ গৃহ, তিনি এই রাজ্যের সম্রাজ্ঞী। স্বামী সুস্থ, ছেলেমেয়েরা পড়াশোনায় ভাল, শাশুড়ি কোনদিন অযত্ন করেন নাই। তাঁহাকে গৃহের প্রত্যেকটি ভার প্রত্যেকটি অধিকার সানন্দে ও স্বচ্ছন্দে বুঝাইয়া দিয়া প্রসন্ন মনেই সংসার হইতে বিদায় লইয়াছেন তিনি। তবে? পরিপূর্ণ সংসারে নন্দরাণীর অভাব তো কিছুই নাই!

কিন্তু, সত্যই নাই কি? নাই, তবে কেন হঠাৎ তাহার এমন খারাপ লাগিতেছে, কেন মনে হইতেছে যেন নিভাননী যেখানে তিনি তাহার অনেক তলায়; অনেক নীচে পড়িয়া আছেন?

চারু কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিল, তাহাদের প্রফেসর অনুপস্থিত, আগে ছুটি হইয়া গিয়াছে। নিভাননী কহিলেন, আয় তো মেয়েটা, তোকে দেখি। তখন তো ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধে চলে গেলি, দেখতেই পেলাম না ভালো করে। আমারটি গেল কোথায়?

চারু কহিল, পড়ছে।

—এই মরেছে। বিদেশী কন্যা আমার। যা তো, ডেকে নিয়ে আয়।

নিভাননীর মেয়ে শুইয়া শুইয়া বই পড়িতেছিল। আলমারি হাতের কাছে পাইয়া সে একসঙ্গে খান দশেক বই নামাইয়া লইয়াছে। সেগুলো তাহার চারিপাশে ছড়ানো।

চারু দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিল, নীলমণি!

মেয়েটি উত্তর দিল না।

চারু একটু ক্ষুব্ধ বোধ করিল। তবুও বিরক্তি চাপিয়া আবার ডাকিল, নীলমণি। মাসীমা ডাকছেন তোমাকে।

এবার মেয়েটির খেয়াল হইল। বই নামাইয়া চারুর দিকে তাকাইয়া কহিল, আমাকে বলছেন?

চারু কহিল, হাঁ, মাসীমা ডাকছেন।

মেয়েটি কহিল, চলুন।

চারু কহিল, 'চলুন' নয়, 'চল'।

বয়সে বোধ হয় বড় হব, দিদি বলে ডাকতে

—নীলা কেন?

—কেন, তাই তো নাম তোমার? মাসীমা যে বললেন নীলমণি?

—ওঃ হরি। তাই আমি ডাক শুনতে পাই নি। নীলমণি নাম হবে কেন।

আমার নাম সুনন্দা।

—তবে যে মাসীমা—?

—মা—? তাঁর ওটা স্টাইল, সবকিছু উল্টে বলা। তুমি বোঝোনি, তোমার মা দেখো ঠিক বুঝে নেবেন।

—আমার মাকে চিনতে তোমরা?

—আমরা কোত্থেকে চিনবে। মার মুখে নাম শুনেছি।

কি শুনেছ?

—সে অনেক, দুষ্টুবুদ্ধিতে নাকি ও'দের জুড়ি ছিল না। হস্টেল আর কলেজ উতল-পাতল করে রাখতেন দুজনে। অথচ, আমার মা'টির সম্বন্ধে একথা বিশ্বাস করি, তোমার মাকে দেখে তো মনেই হয় না তিনি খুব চঞ্চল ছিলেন।

চারু কহিল, কি জানি।

এ ঘরে আসতেই নিভাননী কহিলেন আসুন মহারাণী, চেহারাখানা দেখি। ক'খানা বই গিললি?

সুনন্দা কহিল, একখানাও নয়। ঘুমুচ্ছিলাম।

—আহা বলই-না, পরের বাড়ি, এখানে বসে ও আর বকতে পারব না। বলবি নে! যাক গে। তুই আয় তো ননীর মেয়েটা। একটা গান কর শুনি।

চারু বিপন্ন হইয়া কহিল, আমি তো গান জানিনে।

—গান জানিসনে? তুই? ননীর মেয়ে?

চারু কথাটার অর্থ বুঝিল না। সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

'আমি কোথায়?' দীপ্তি ভট্টাচার্য

নিভাননী আবার কহিলেন, ওরে, ননীর মেয়ে গান জানে না; এ কি রকম কথা হল? ননী, তুই বল না! সত্যি বলছে, না ডাঁট করছে মেয়েটা?

নন্দরাণী মৃদুস্বরে কহিলেন, সত্যিই জানে না।

—কেন?

চারু কহিল, জানতেই বা হবে কেন?

নিভাননী কহিলেন, বলে, কেন! ওরে কোথায় ছিলি তোরা। যেদিন এই নন্দরাণী বোসের গান শোনবার জন্যে কলকাতার লোক হেদিয়ে থাকত, জলসার হ্যান্ডবিলে নাম থাকলে টিকিটের ব্ল্যাক মার্কেট হত? জানিস্, এই গান শুনেই তোর বাবা—

নন্দরাণী কহিলেন, আঃ, থাম্ না।

নিভাননী কহিলেন, থামব কেন? মিথ্যে বলছি না, চুরিও করছি না।

নন্দরাণী কহিলেন, চুরি না করলেই প্রাণপণে চাঁচাতে হবে সব কথা নিয়ে।

—এই মরেছে। চটিস কেন বাবা। আমি চিরদিনই একটু চাঁচাই। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা কি সারাদিনই ঘুমোবে পড়ে পড়ে?

নন্দরাণী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, ওকে তুলিসনে, কাঁচা ঘুম ভাঙালে ভীষণ জ্বালাবে।

—জ্বালাবে বলেই তো ঘুম ভাঙানো।

চারু সুনন্দাকে কহিল, কুল খাবে? বল।

সুনন্দা কহিল মা, যাই?

নিভাননী কহিলেন, মা হয়ে কি বলতে পারি 'যাও'? এসো গে। কিন্তু মা, কুল খাওয়াই যদি কাজ হয়, সেটা মা-বাপকে না জানিয়ে করা ভাল।

সন্ধ্যার পর ট্রেন, যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন। কলেজের গেটে স্টেশন, নিজেই গিয়া ইঁহাদের ট্রেনে তুলিয়া দিয়া আসিলেন নন্দরাণী।

বাড়ীতে ফিরিয়া মনটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগিতে লাগিল। বেশ ছিল, একটা একটানা নিশ্ছিদ্র জীবন। ইহার যে কোথাও ফাঁক আছে, ইহারও যে ব্যতিক্রম হয়, সে কথাটা যেন ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আকস্মিক ভূমিকম্পের মত আসিয়া একটা দোলা লাগাইয়া দিয়া গেল মনটাকে, সে আর কিছুতেই সুস্থির হইতে পারিতেছে না।

চারু কহিল, তোমরা একসঙ্গে পড়তে মা?

নন্দরাণী কহিলেন হ্যাঁ। পড়তুম শুধু না, খেলাধুলো করতুম, দুষ্টামি, বজ্জাতি সব করতুম। কেমন লাগল তোর মাসীকে?

চারুর মুখ গম্ভীর দেখাইল। কহিল, কি জানি, বড় বেশী চঞ্চল। দেখলে না। মেয়ের সঙ্গে কথা বলবেন তারও কোন বাধাবন্ধ নেই।

নন্দরাণী উত্তর করিলেন না, কিন্তু কথাটা মনে গাঁথিয়া রহিল। রাত্রে শুইয়া ভাল ঘুম হইল না। মেয়ের কথাটা মনের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল।

মেয়ে বলিয়াছে নিভাননী অতিরিক্ত চঞ্চল। মুখ খুলিয়া বলিতে পারে নাই কথাটা, বোধ হয় বলিতে চাহিয়াছিল ছ্যাবলা। কিন্তু সত্যই কি তাই? নন্দরাণীকেই দেখিতে অভ্যস্ত তাহার পুত্র-কন্যারা। তাহার সঙ্গে নিভাননীর বৈসাদৃশ্য তাহাদের ভাল লাগে নাই। কিন্তু, আসল কথাটা কি—নিভাননী অতিরিক্ত চঞ্চল, না: নন্দরাণী অতিরিক্ত গম্ভীর? নিভাননী হৈ-হৈ হাসি-

তাহাই ছিল। সে যুগে নন্দরাণীও ঐ রকমই ছিলেন, বরং হয়তো বেশীই চঞ্চল ছিলেন। নিভাননীর চেয়ে অন্তত... মেজেনের মতে. নিভাননী বদলান নাই। বদলাইয়াছেন নন্দরাণী নিজে। নিভাননীর লঘু পরিহাস তাহাদের ভাল লাগে নাই, কারণ এই বস্তুটাই তাহাদের অজানা। স্বামী অধ্যাপক, অতিরিক্ত গম্ভীর প্রকৃতি' একদা যে এই গম্ভীর-প্রকৃতির অধ্যাপকই জলসায় গান শুনিয়া আসিবার পরদিন তাঁহার পিতার কাছে তাঁহার পাণি-প্রার্থনা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, নিজের আত্মীয়-স্বজন ও গুরু-জনদের ঠিক অমতে না হোক অন্তত স্বচ্ছন্দ অনুমোদন ছাড়াই তাঁহাকে বধূ করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন।

সে কথা আজ বিস্মৃত স্বপ্ন।

আত্মীয়-স্বজনের অবাঞ্ছিতা বধূ, এ বাড়ীতে আসিয়াই নন্দরাণী স্থির করিয়াছিলেন, নিঃশব্দ সেবার দ্বারা সকলকে জয় করিয়া লইবেন। তাঁহার চাল-চলনে কোথাও যেন এমন কিছু না থাকে যাহাতে ইহারা কোন খুঁৎ ধরিবার খোঁটা দিবার সুযোগ পায়। তাঁহার সহজ জীবনে বিড়ম্বনা সৃষ্টি করিবার অবসর পায়। নিজের প্রকৃতিকে চাপা দিয়া নিছক অভিনয়কে সম্বল করিয়া সে এক অদ্ভুত যুদ্ধ।

সে যুদ্ধে জয় হইয়াছে তাঁহার। সেই জয়েরই কামনায় নিজেকে সর্বপ্রকারে অবলুপ্ত করিয়া চলিয়াছেন তিনি সারা জীবন।

চলিতে চলিতে ক্রমে সেই অভিনীত চরিত্রটাই যেন প্রকৃতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গান গাওয়া লইয়া খোঁটার সৃষ্টি হইবে বুঝিয়াছিলেন, কিছু কিছু বক্র মন্তব্য কানেও আসিয়াছিল। অতএব গান গাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আশৈশব অভ্যাসের বশে প্রতি মুহূর্তে গলার মধ্যে অজ্ঞাতেই গুঞ্জরণ করিয়া উঠিত গানের সুর, ক্রমাগত নিষেধের বেড়া দিয়া দিয়া তাহাকে এমন করিয়াই চাপিয়া মারিয়াছেন, এখন আর চেষ্টা করিয়াও কোন গানের সুরকে মনে ধরিতে পারেন না। সংসারের যুদ্ধে জিতিয়াছেন নন্দরাণী, কিন্তু কি নিদারুণ মূল্যে!

পুত্র কন্যাকে পালন করিয়াছেন। আদর করেন নাই কোনদিন, তাহাদের লইয়া কোনরূপে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন নাই, পাছে সেইটাই তাহাদিগকে কাহারও অপ্রিয় করিয়া তোলে। নেহাৎ যে কটি দিন কাছে না রাখিলে নয়, সেই কটা দিন রাখিয়াছেন, তাহার পরই তাহাদিগকে জোর করিয়া নিজের কোল হইতে নির্বাসিত করিয়াছেন, যেন তাহারা সংসারের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, তাঁহার একার হইবার বিড়ম্বনা ভোগ না করে, এই-ই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। এই ব্রত পালন করিতে নিজের বক্ষ-পঞ্জর প্রতি মুহূর্তে বিচূর্ণ হইয়াছে। নন্দরাণী তবু টলেন নাই। করিতে করিতে এইটাই অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে যে অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক কিছু আছে এমন কথাও আর মনে হইত না।

আজ মনে নাড়া লাগিয়াছে, মনে হইতেছে, কোথায় যেন প্রকাণ্ড একটা ফাঁকি থাকিয়া গেছে। তাঁহার ছেলেরা মেয়েরা খায়-দায় থাকে, একত্র খেলাধূলা করে। মারামারিও করে। কিন্তু পরস্পরকে লইয়া স্নেহ বা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে না। করাটাকেই যেন অস্বাভাবিক বা অভিনয়

চাষীর বাড়ি — শিবানী চট্টোপাধ্যায়

বলিয়া মনে করে। কিন্তু এইটাই কি স্বাভাবিক? এইটাই কি কাম্য? নিভাননীর আদরে কমলা বিরত, বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। উচ্ছ্বসিত আদর তাহার অচেনা বস্তু। কিন্তু আদর পাইতে শিখিল না সে, পাইলেও চিনিল না। ভয় পাইয়া গেল—ইহাই কি সার্থকতা?

রাত্রে ঘুম হয় নাই, ঘুম ভাঙিল বেলায়। জাগিয়া দেখিলেন, আলো হইয়া গিয়াছে। কমলা তাঁহার নাকে মুখে হাত চাপড়াইয়া বলিতেছে, মা, অ মা, তোমার জ্বর?

চারু আসিয়া কহিল, মা তুমি উঠবে না?

কমলা কহিল, না, মার জ্বর।

—সে কি?

—না-না। জ্বর নয়, নন্দরাণী উঠিলেন, মায়ের দেরি দেখিয়া সকালবেলার পাট চারুই খানিকটা সারিয়া রাখিয়াছিল। বাকিটুকু ক্ষিপ্র-হস্তে সারিয়া লইলেন। স্নান করিয়া রান্নাঘরে গেলেন।

কমলাকে সেদিন আর খাটে বসাইয়া রাখিলেন না। নিজের কাছে একটা পিঁড়ি পাতিয়া বসাইয়া দিলেন, এটা তাঁহার কাছে প্রায় পর্বদিনের ব্যাপার। সে মহা আনন্দে নিজে নিজে ছড়া ও কাকলি চালাইতে লাগিল। মুহূর্তে, মুহূর্তে মনের সকল রকম কথা মাকে শুনাইতে লাগিল। নন্দরাণী কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাহাকে কোনটার বা উত্তর দিলেন কোনটার বা উত্তর দিলেন না। কহিলেন, একটু চুপ করে বোস তুমি। আমি কাজ করছি দেখছ না?

ভাতের হাঁড়ি চাপাইয়া দিয়া নন্দরাণী তরকারি কুটিতে বসিলেন। কমলা চুপ করিয়া দেখিতে লাগিল। তারপর ধীরে ধীরে কহিল, মা, তোমার জ্বর হয়েছে?

—না তো!

—তোমার কবে জ্বর হবে মা?

হঠাৎ নন্দরাণীর কথাটা মনে পড়িয়া গেল। ভোরবেলায়ও ঠিক এই প্রশ্নটাই কমলা করিয়াছিল।

প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝিলেন নন্দরাণী। মাসখানেক পূর্বে একবার জ্বর হইয়াছিল তাঁহার। তিন-চারটা দিন শুইয়া কাটিয়াছিল, সেই তিন-চারদিন কমলা সারাদিন তাঁহার বিছানায় কাটাইয়াছে। কমলা জানে মার কাছে বেশীক্ষণ থাকা যায় না। তাঁহার অনেক কাজ। কিন্তু জ্বর হইলে মা শুইয়া থাকেন। তখন তাঁহার কাছে থাকা যায়। মাতৃসঙ্গবঞ্চিত—মাতৃসঙ্গপিপাসু শিশু তখন হইতেই দিন গণিতেছে আবার কবে সেই সুযোগ আসিবে। আজ সকালে জাগিয়া তাঁহাকে তখনও ঘুমাইতে দেখিয়া সেই আশাই তাহার মনে জাগিয়াছিল। তাহার বহু পূর্বে নন্দরাণী উঠিয়া যান। মাকে শুইয়া থাকিতে কমলা কখনও দেখে না। সেই জন্যই তাহার আশা জাগিয়াছিল। এখনও সেই আশাটাকে সে একেবারে বর্জন করিতে পারিতেছে না।

কমলার ব্যগ্র দুইটি চোখের দিকে অনেক-ক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন নন্দরাণী। তারপর হঠাৎ, মুখ ঘুরাইয়া চকিত দৃষ্টিতে চারিদিক দেখিয়া লইলেন, কেহ কোথাও আছে কিনা! কুড়ি বছর পূর্বের নন্দরাণী আবার জাগিয়া উঠিল, চোখে-মুখে একটি মিষ্ট হাসি ফুটিয়া উঠিল।

মুহূর্ত পরে নন্দরাণীর তীক্ষ্ন আহ্বান শুনিয়া চারু ছুটিয়া আসিল, কহিল, ইঃ মা, এমন কাটলে কি করে?

নন্দরাণী ডান হাতের তালু বাঁ হাতে চাপিয়া ধরিয়া ছিলেন, কহিলেন, বঁটিতে।

চারু ছুটিয়া গেল, ঔষধ আনিল, ন্যাকড়া আনিল, তখনও রক্ত ছুটিতেছে জোর করিয়া চাপ দিয়া হাতটা বাঁধিয়া দিল। কহিল পুরো দশ দিনের ধাক্কা।

নন্দরাণী কহিলেন, রান্নাটা সেরে তোল, আমার ভীষণ মাথা ঘুরছে বলিয়া বাঁ হাতে কমলাকে তুলিয়া লইলেন, কহিলেন, চল আমরা শুয়ে থাকি।

• •

শ্রীনাম কীর্তন

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

পল্লীগ্রামের ডাক্তারখানা। ছোট একখানা ঘর। কম্পাউন্ডার নাই। ডাক্তার নিজেই রোগী দেখিয়া আসেন। নিজেই ঔষধ তৈরী করিয়া দেন। বসিয়া আছি। হঠাৎ একজন ভদ্রলোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আর্সেনিক আছে? ডাক্তার অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, না নাই। ভদ্রলোক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—আর্সেনিক খেলে কি হয় বলতে পারেন? ডাক্তার বলিলেন, শুনেছি মানুষ মরে যায়। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, দেখাতে পারেন? ডাক্তারবাবু উত্তর দিলেন—না মহাশয় দেখাতেও পারি না, আপাততঃ দেখবারও ইচ্ছা নাই। ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন। ডাক্তার বলিলেন লোকটীর মাথা খারাপ। আমি বলিলাম নিশ্চয়, যে আপ্তবাক্য মানে না, অভিজ্ঞ লোকের কথায় বিশ্বাস করে না, অবশ্যই তাহার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছে।

(২)

অতি শৈশবে একজন পাগল দেখিয়াছিলাম —লোকে বলিত মধু পাগল। ডাকনাম ছিল জোলাম ক্ষ্যাপা। জাতিতে মুসলমান। প্রায় মেলাতেই তাহাকে দেখিতাম। মাঝে মাঝে আমাদের গ্রামেও দেখিয়াছি। গুড় চাহিত। কিন্তু মেলায় গেলে নোন্তো চাহিত না, তেলে ভাজা চাহিত না। মিষ্টান্নের দোকানে গিয়া বলিত একটা রসগোল্লা দাও দেখি। তখনকার দিনে রসগোল্লার সের ছিল চারি আনা। এক পয়সায় একটা বড় রসগোল্লা মিলিত। রসগোল্লাটী দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া খাইয়াই জোলাম বলিত, বাঃ বেশ মিষ্টিতো, এক পয়সায় দিও না। দোকানী পয়সা চাহিলে পাশের লোকে বলিত পাগল, পয়সা চাহিও না। যাহারা চিনিত মেলার লোকেও দুই-এক পয়সা দিত। আবার চেনা দোকানদারও ডাকিয়া তাহাকে মিষ্ট দ্রব্যই খাওয়াইত। নিকটবর্তী মঙ্গলডিহি গ্রামে 'রাসযাত্রার মেলায়, 'জয়দেব কেন্দুলীর মেলায়, 'বক্রেশ্বরের মেলায় কতদিন তাহাকে দেখিয়াছি। মনে হয় প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে সে বেহেস্তে গিয়াছে। আমাদের গ্রামের পাশেই মাখড়া গ্রামে তাহার বাড়ী ছিল। শুনিয়াছি সে চাষবাস কিছু করিত না। গ্রামে গ্রামে মৌচাক ভাঙ্গিয়া মধু সংগ্রহ করিত, এবং সেই মধু বিক্রয়ের পয়সাতেই তাহার জীবিকা নির্বাহ হইত। মধু খাইতেও সে অত্যন্ত ভালবাসিত। প্রবাদ আছে অতিরিক্ত মধুপানেই নাকি সে প্রমত্ত হইয়া উঠে। তারপর যাহা ঘটে, লোকে বলিত সে পাগল।

(৩)

প্রথম কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ আমার দু চক্ষের বিষ ছিলেন। আমার এক বন্ধু কলিকাতার কলেজে পড়িতেন। তাঁহার বিবাহে তাঁহারই এক সহপাঠী নববধূকে একখানি পুস্তক উপহার দেন। অজিতনাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের কবিতা সংগ্রহ "চয়নিকা"। বাঙ্গলা খবরের কাগজ পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মতামত গড়িয়া লইয়াছিলাম। কত বিরুদ্ধ সমালোচনা, কত বিদ্রূপাত্মক ছবি। আবার নিজেও কবিতা লিখিতাম বলিয়া রবীন্দ্রনাথের উপর আরো খড়্গহস্ত ছিলাম। সে যাহাই হউক, পল্লীগ্রামের কয়েকজন বন্ধুর নিকট আমার কবি বলিয়া একটা খ্যাতি রটিয়া গিয়াছিল। সুতরাং বিবাহিত বন্ধুটী চয়নিকাখানি আমার হাতে দিয়া বলিলেন—"বৌ যদিও লেখাপড়া কিছু জানে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বুঝিবার শক্তি তার নাই। তুমি তো যখন তখন রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ সমালোচনা কর। চয়নিকাখানা একবার পড়িও।"

চয়নিকাখানি পড়িলাম। পড়িলাম তো নয়, গোগ্রাসে গিলিলাম। একবার নয়, বারবার পড়িলাম। সর্বনাশ। এই কবির আমি বিরূপ সমালোচনা করিয়াছি। এ যে একটা পৃথক রাজ্য। বৈষ্ণব কবিগণের কাব্যরসে আমি তখন আকণ্ঠ নিমগ্ন। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যে তলাইয়া গেলাম। তুলনা করিতেছি না, তথাপি অসঙ্কোচে মুক্তকণ্ঠে একথা বলিতেছি যে, বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ কেহ আছেন বলিয়া মনেই হইল না। বৈষ্ণব কবিগণের অতি অল্পসংখ্যক কবিতাই রবীন্দ্র কাব্যের সঙ্গে তুলিত হইতে পারে। অবশ্য বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে এমন দুই-একটি কবিতা আছে যাহা রবীন্দ্রকাব্যে নাই। তথাপি একথা বলিব যে রবীন্দ্রনাথ কবিশ্রেষ্ঠ।

অজিত চক্রবর্তীর চয়নিকাখানি হারাইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার অনেক কবিতাই মনে আছে। সেই চয়নিকায় একটী কবিতা ছিল "পরশ পাথর"। এক ক্ষ্যাপা পরশ পাথর খুঁজিয়া বেড়াইত তাহারই কাহিনী। কিন্তু ক্ষ্যাপা কোথায় পরশ পাথর খুঁজিত অজিতনাথ সে স্থানটার কথাই বাদ দিয়াছিলেন। পরবর্তী সংখ্যা রবীন্দ্রনাথ সঙ্কলিত চয়নিকাতে ক্ষ্যাপার সেই স্থান নির্বাচনের বিবরণটি আছে। পাঠক পড়িয়া দেখিবেন। ক্ষ্যাপা হইলে কি হয়, তাহার জায়গা বাছিবার বাহাদুরী আমাকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল।

ক্ষ্যাপার বাতিক ছিল সে পরশ পাথর খুঁজিত। পরশ পাথর চিনিবার জন্য তাহার কাঁকালে একটা লোহার শিকল ছিল। সে নুড়ি কুড়াইত, ঠন্ করিয়া শিকলে ঠেকাইত। আর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিত। হায় হায় সে কখন পরশ পাথর ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছে! ক্ষ্যাপা পরশ পাথর দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু তাহার কটিবন্ধের লোহার শিকল সোনা হইয়া গিয়াছে।

একদা শুধালো তারে গ্রামবাসী ছেলে।
সন্ন্যাসী ঠাকুর একি কাঁকালে ও-কি ও দেখি
সোনার শিকল তুমি কোথা হতে পেলে।

গ্রামবাসী ছেলের কথায় সন্ন্যাসীর চেতনা ফিরিল। সে দেখিল সত্যইতো লোহার শিকল কখন সোনা হইয়া গিয়াছে। আঁখি কচালিয়া বার বার সে দেখিল না এ স্বপ্ন নয়, মিথ্যা নয়। সত্য সত্যই লোহার শিকল সোনা হইয়া গিয়াছে। তখন আর সে করে কি? অনুতপ্ত পাগল—

অর্ধেক জীবন খুঁজি কোন্ ক্ষণে চক্ষু বুজি
স্পর্শ লভেছিল যার এক পলভর।
বাকী অর্ধ ভগ্নপ্রাণ আবার করিল দ
খুঁজিয়া ফিরিতে সেই পরশ পাথর॥

(৪)

রসনায় তো কত রকমের নুড়িই কুড়া
একবার কৃষ্ণ নামের গৌর নুড়ি কুড়াও ন
নুড়ি কুড়াইও, কিন্তু মনের শিকলে ঠেকাই
নুড়িতো নয় মধু ভান্ড! ছেলেবেলায় বাউ
মুখে গান শুনিয়াছিলাম "বাঁশীতে কতই ম
আজব যাদু মলেম লাজে"। কৃষ্ণনাম গে
নামের নুড়ি একবার রসনায় ঠেকাইলে সে গ
মজিয়া যাইবে আর ছাড়িতে পারিবে না।

গান শোন নাই—
পরশ ছুঁইলে হয় সোনা।
আমার গৌরাঙ্গের গুণে গাহিয়া নাচিয়া গ
পরশ হইল কত জন॥

জিহ্বায় নাম নুড়ি কুড়াইয়া মনের শিক
ঠেকাইয়া যদি ফেলিয়াই দাও, মন তো তো
সোনা হইয়া যাইবে। তখন আর গ্রামবা
ছেলের অভাব ঘটিবে না। তোমার জ
জন্মান্তরের সুকৃতিবশে কোন না কে
ছদ্মবেশে একজন না একজন সজ্জন আ
তোমার বাড়ীতে উপস্থিত হইবেন। এ
ক্ষণসঙ্গদানে তোমার কুল পবিত্র এবং জন
কৃতার্থতাদান পূর্বক মন যে তোমার সো
হইয়াছে সে কথা জানাইয়া যাইবেন। ভা
কথাতো বলা যায় না, যদি কৃষ্ণনামের সাধ
সিদ্ধ না-ই হও, এজীবনে প্রাপ্তি যদি না-ই ঘ
যদি দেখ—

যদি সন্ধ্যা হয়ে আসে সূর্য যায় পাটে।
পথ নাহি দেখা যায় জনশূন্য মাঠে॥

যদি দেখ—

আকাশ সোনার বর্ণ সমুদ্রগলিত স্বর্ণ
পশ্চিম দিগ্‌বধু দেখে সোনার স্বপন॥

কিছুমাত্র ভয় পাইও না। বিন্দুমাত্রও নিরা
হইও না। তুমি কি জানো এই ভাগবত ধ
স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও মহাভয় হই
পরিত্রাণ করে। জীবন প্রভাতে দেখি
"শুচিনাং শ্রীমতাং" গৃহে আবির্ভূত হইয়া
এবং তোমার অসমাপ্ত পাঠ সুরু হই
গিয়াছে। তখনকার দিনে বিদ্যাসাগর মহাশয়
বর্ণপরিচয়ের মূল্য ছিল এক আনা। আমার এ
বন্ধু সেই এক আনার প্রথম ভাগ পর প
তাঁহারা তিনভাই পড়িয়া বর্ণপরিচয় আর
করিয়াছিলেন। আর আমার অ আ ক খ চিনি
এক টাকার অর্থাৎ ষোলআনা বর্ণপরিচয়ে
একবর্ণও অবশিষ্ট ছিল না। ব্যাপারটা আন্দা
করিতে পার?

শ্রীগীতায় শ্রীভগবান চারিশ্রেণীর ভক্তে
কথা বলিয়াছেন। আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এ
জ্ঞানী। যে বিপদে পড়িয়া শ্রীভগবানকে ডাকে
সেও আর্ত। আবার যে পাইয়া হারাইয়াছে সে
আর্ত। তুমি যে মুহূর্তে পরশ পাথর হারাইয়াছ
যে শুভক্ষণে জানিতে পারিয়াছ মন তোমা
সোনা হইয়া গিয়াছে, আর তোমাকে পায় কে?
তুমি ভক্তের পংক্তিতে গিয়া দাঁড়াইয়াছ। যত
পিছনে থাক ভক্ততো, আর্তভক্ত। নিশ্চয়ই
শ্রীভগবানকে পাইবে। কায়মনোবাক্যের যু
বেণীতে অবগাহন পূর্বক শুচিশুদ্ধ হইয়া
একবার বল—

"যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে আমার প্রাণ"
তোমার আর বিনাশ নাই। তুমি অমর।
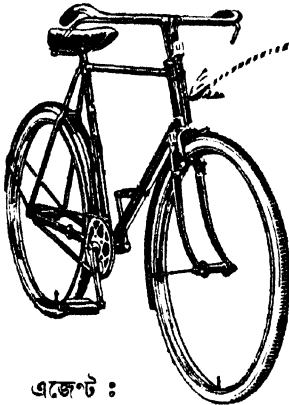
জয় পরাজয়

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়
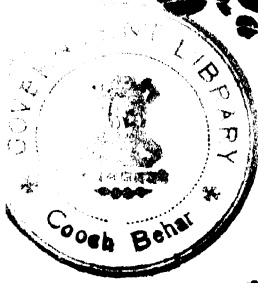
ব্যাপারটা তিন দিন দেখলেন সুরপতি। দেখে বিস্মিত হলেন, মুগ্ধ হলেন তার চেয়েও বেশী। আজকালকার দিনে এমন দেখা যায় না। চব্বিশ পঁচিশ বছরের স্বাস্থ্যবান যুবক—বেশবাসে আধুনিক-চালচলনে দিব্য সপ্রতিভ ভাব—দেব দুয়ারে হাত জোড় করে মাথা নুইয়ে ভক্তি নিবেদন করছে...অবশ্য সব ক্ষেত্রে এটা অপ্রত্যাশিত নয়। দেবতার সামনে আসন্ন পরীক্ষার্থী কিশোরের চোখে মুখে এমনি একাগ্রতা দেখে আশ্চর্য হননি, চাকরি-সন্ধানী যুবকদের গদ্‌গদ ভাবও বহুবার লক্ষ্য করেছেন, লটারির টিকিটখানা দেবদুয়ারে ছুঁইয়ে সভক্তি প্রণাম নিবেদন করে যায়, এমন যুবকও বিরল নয়—আবার রোগ মুক্তির আশাতেও দেবদুয়ারে স্তুতিনতি অপ্রত্যাশিত নয়, কিন্তু অবস্থাপন্ন, স্বাস্থ্যবান, সুশ্রী আধুনিক ফ্যাসান দুরস্ত ছেলেরাও যে এমন হতে পারে—এটা ভাবতেও কেমন লাগে। ছেলেটিকে ভাল করে জানবার আগ্রহ হ'ল সুরপতির।

দু'দিন চেষ্টা করেও আলাপ করতে পারলেন না, কেমন বাধ বাধ ঠেকল। অপরিচিত বয়োবৃদ্ধকে সম্মান না দেখাক দৃষ্টিতে সম্ভ্রমবোধ থাকা উচিত ছিল; কিন্তু দৃষ্টিই ওর উঁচুদিকে। দেবস্থান বলেই কি দেবতা জুড়ে বসেছেন দৃষ্টির সবটুকু, অথবা এ মানুষের প্রতি উপেক্ষা? পাশাপাশি হাঁটু গেড়ে বসে করজোড়ে নাট-মন্দিরের মেঝেয় মাথা ঠেকিয়ে তিনিও কি দীর্ঘক্ষণ ধরে ভক্তি নিবেদন করেননি এবং তারই ফাঁকে লক্ষ্য করেননি ছেলেটিকে? লক্ষ্য করে বিস্মিত হননি—মুগ্ধ হননি? আর সমধর্মী ভেবে এর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে ওকে ভাল করে জানবার জন্য ব্যাকুল হননি?

অবশ্য তাঁর সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত না হওয়ার স্বপক্ষে ছেলেটির দিক থেকেও একটি জোরালো যুক্তি আছে। সেটি হল—এমন দৃশ্য ওর চোখে নূতন নয়, অপ্রত্যাশিত নয়। বৃদ্ধেরা দেবমন্দিরে আসবেন, ভক্তিমান হবেন—হাত জোড় করবেন, মাটিতে মাথা ঠেকাবেন, মুখে স্তবমন্ত্র উচ্চারণ করবেন, চোখের কোল ভিজে উঠবে গলার স্বর গদ্‌গদ হবে—এ সবই যেন প্রকৃতি-নিয়মে ঘটতে বাধ্য। বয়স বাড়লে দেহের শক্তি কমে, মন নরম হয়, মাথা আপনি নুয়ে পড়ে এবং চোখেও জল আসে। তখন আর সমস্যার জাল বুনতে ভাল লাগে না—একটা সহজ সরল গতিতে এগিয়ে যেতে পারলেই স্বস্তি।

অথচ চাইলেই স্বস্তি মেলে না। সুরপতিও অশান্তি ভোগ করছেন—তিনি যে মেয়ের বাপ। অনূঢ়া কন্যার সমস্যা তাঁকে বুঝিয়ে দিচ্ছে—নিজ সংসারের মানুষগুলি পরমাত্মীয় হলেও এই সমস্যার জাল ছাড়াতে এতটুকু সাহায্য করে না, উল্টে জালের ফাঁস-গুলিতে গিঁট দিয়ে দিয়ে জটিল করে তোলে।

স্ত্রী তো প্রায়ই বলেন, তোমার জন্যেই অমন ভাল সম্বন্ধটা হাতছাড়া হয়ে গেল। নিজের গোঁ নিয়েই রইলে।

কি করবো বল—নাস্তিকের হাতে মেয়ে তুলে দিতে পারিনে। উত্তর দেন সুরপতি।

কেমন করে বুঝলে ছেলেটি নাস্তিক? চোখে তো দেখলে না ওকে একটিবার—পরিচয় করলে না......

জানি—জানি আমি। তুমি কি ভাব, কোন সন্ধান নিইনি আমি? ছেলেটি স্বাস্থ্যবান, পোষ্ট গ্রাজুয়েট, বিত্তবান—কিন্তু ঘোরতর নাস্তিক। সমরেশের কথা ভাব।

কেমন করে জানলে ও নাস্তিক? অবোধের মত স্ত্রী আবার বলেন।

অকাট্য প্রমাণ আমার কাছেই আছে। যাক ও সব কথা। প্রসঙ্গটা চাপা দেন।

বন্ধু বিমল স্পষ্টই বললে একদিন এ ভক্তির মানে কি জান সুরপতি—তোমাদের ফ্যামিলিটাই ব্যাকডেটেড। তোমরা চাও ছেলেটি বিলেত ফেরৎ হবে আবার মা-কালীর সামনে মাথা নোয়াবে'

অপ্রতিভ সুরপতি আমতা আমতা করে জবাব দিলেন, না—অতটা ঠিক নয়, তবে হাল-ফ্যাসানের রীতিটা পছন্দ করতে পারি না ছেলে বিয়ে করে হনিমুনে যাবে—

তাই যায় নাকি বাঙ্গালী ছেলেরা! বাঙ হাসিতে ভরে উঠল বিমলের মুখ। তবে হাঁ বিয়ে করে একটু আলাদা থাকতে চায়—সে কিছু অন্যায় নয়। নতুন বয়সে অমন স সবারই হয়—ওটা মারাত্মক নয়।

না-না-তা কেন, সংসারে থেকে যা খুশি করুক না—

সংসারে থেকে যা খুসি করা যায় না বলে ছেলে বিদেশে চাকরি নেয়—আর তারপর বৌমাকে নিয়ে যায় সেখানে।

সেটা কি ভাল। প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বললো সুরপতি।

ভাল মন্দ জানি না—তবে এই এ কালের রীতি। তা এতে তোমারই বা আপত্তি কেন?

ওটা সহ্য করতে পারিনে। সমরেশের কথাটা মনে কর ভাই।

তা হোক—সে তোমার একমাত্র ছেলে নয়।

ভুল বুঝেছ ভাই। শুধরে দেবার চেষ্টা করেন সুরপতি। সমরেশ আমার একমা ছেলে নয়—বড় ছেলে যদিও। ওর ব্যবহারটা শক্ত আঘাত দিয়েছে আমাদের—তাই চেষ্টা করছি, যাতে অমনি আঘাত আর না পাই।

সে বলা বড় কঠিন। একটু থেমে বিমল বলল, তুমি যা খুঁজছ সোনার পাথর বাটি পাবে কি?

ওর ব্যঙ্গ স্বরে ক্ষুব্ধ হননি সুরপতি—মনোমত পাত্রের অন্বেষণ করে চলেছেন যথা সাধ্য। দু'বেলায় প্রার্থনা করছেন দেব দুয়ারে, হে মা কালী—আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর—

অবশেষে মা মুখ তুলে চেয়েছেন।

*

বেশ কান্তিমান—স্বাস্থ্যবান ছেলে। চোখ মুখের দীপ্তি দেখে মনে হয়, বিদ্যা ও বুদ্ধির ভাণ্ডারও পরিপূর্ণ। আনন্দ হল

হ হল ওর পরিচয় জানতে। কিন্তু কেমন প্রথমেই বলবেন, শুনুন—

যাকে দেখে স্নেহে বিগলিত হচ্ছে চিত্ত তাকে মুনে বলে সম্বোধন! আবার স্নেহ সম্বোধনেও ভয় হয়—যদি অভদ্র মনে করে ছেলেটি? রোজই চেয়ে থাকেন ওর দিকে—ছেলেটি ও'র চোখের প্রশ্ন বুঝতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য ছেলে—দেবতার মন্দিরে—দেবী-মূর্তিতেই ওর দৃষ্টি জুড়ে থাকে, আশে-পাশে দৃষ্টি ফেলে না একবারও।

একদিন একই সঙ্গে প্রণাম সেরে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে চোখাচোখি হয়ে গেল। নীরব চাহনির অর্থটা যেন বুঝল ও। ঘাড় ফিরিয়ে বলল, কিছু বলবেন কি?

হাঁ—মানে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয় আপনাকে।

করুন। কিন্তু আমাকে আপনি বললে লজ্জা পাব।

ঠিক ঠিক। উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন সুরপতি। বয়সে ছোট হলেও অপরিচিত তো তাই—না-না, একটুও রাগ করব না আমি। বরং যা প্রাপ্য না পেলেই দুঃখ হয়।

তোমার কথা শুনে ভারি আনন্দ হল বাবা। আশীর্বাদ করি—দীর্ঘজীবী হও। কণ্ঠে আরও কিছু বলতে চাইলেন সুরপতি, স্বর ফুটল না। ক্ষণিক চুপ করে থেকে বললেন, তোমার ভক্তি দেখে ভারি খুশী হয়েছি—

কি বলবেন বলছিলেন যেন। ছেলেটি ওর কথায় বাধা দিল।

ও—হাঁ, তা সে এমন কিছু নয়। শুধু জানতে ইচ্ছে হল। মানে তোমার বাড়ীতে কারও কি কোন অসুখ?

অসুখ। না না—সবাই বেশ সুস্থ আছেন।

ঈষৎ অপ্রতিভ হলেন সুরপতি। বললেন, পড়াশুনো সব শেষ করে—

হাঁ, ডিগ্রী কোর্স শেষ হয়েছে বছর দুই।

বেশ, বেশ। চাকরীর চেষ্টা করছ বুঝি বাবা?

আজ্ঞে না—দু' বছর হ'ল সার্ভিস পেয়েছি, গভর্নমেন্ট ও লাইন—অ্যাপেরে উন্নতি আছে।

বেশ, বেশ। তাহলে কি বিষয়-সম্পত্তি কোন গোলযোগ—তাড়াতাড়ি নিজের অপ্রতিভ ভাব কাটাতে চাইলেন।

না—বিষয়-সম্পত্তি তেমন কিছু নেই। যা আছে ভোগ-দখলে বাধা নেই।

বেশ, বেশ। হাসবার চেষ্টা করলেন।

কাজকর্ম যাই কর বাবা—স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখবে। স্বাস্থ্য হ'ল অমূল্য সম্পত্তি।

আজ্ঞে—স্বাস্থ্য আমার মোটামুটি মন্দ নয়। পুষ্ট হাতখানা উপরে তুলে হাসল ছেলেটি।

একটু অসন্তুষ্ট হলেন সুরপতি। এত জেরা করেও দেবস্থানে আসার প্রকৃত উদ্দেশ্যটা জানা গেল না।

ছেলেটি যেন ও'র মনোভাব বুঝে জবাব দিল। এখানে আসি ভাল লাগে বলে, ভারি শান্তি পাই।

হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন সুরপতি, তা বটেক বাবা—তোমাদের মত ছেলে—

উচ্ছ্বাস শেষ হবার আগেই ছেলেটি অন্তর্হিত হয়েছে। সুরপতি ঈষৎ ক্ষুব্ধ হয়ে ভাবলেন, ছেলেটি কি আমার দুর্বলতাকে ব্যঙ্গ করে গেল!

*

ক্ষত একটু ছিল মনের মধ্যে। সমরেশের বিবাহ প্রণয়ঘটিত ব্যাপার। কলেজে পড়ার জের ও যে বাড়ীতে টেনে আনবে—সে তো কোন দিনই ভাবতে পারেননি। মনে অবশ্য সাধ ছিল—শিক্ষিতা একটি মেয়েকে বধূ করবেন—এবং সে নির্বাচন থাকবে তাঁরই হাতে। ঘটল অন্যরূপ। বিয়ে করে দূর দেশে চাকরী নিলো সমরেশ—পৃথক হয়ে গেল পরিবার থেকে। আঘাতটা গুরুতরই হয়েছিল এবং সতর্কও হয়েছিলেন যাতে অন্য ছেলেদের বিবাহে এমনটি না ঘটে। দুর্ঘটনা ঘটেনি, মনও কিন্তু ভরেনি। বারবার মনে হয়েছে যা চেয়েছিলেন—এ তো ঠিক তা নয়। ছেলেরা উচ্চশিক্ষিত হয়নি, বধূরাও শিক্ষিতা নয়। আধুনিককালকে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন—সফল হয়েছেন এবং অপযশও কিনেছেন। পরিবারটি প্রগতিশীল নয়—শিক্ষার আলো জ্বলেনি ওদের ঘরে—এমন মন্তব্য পরোক্ষে শুনতে হয়েছে। শুনে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছেন—শেষ মেয়েটির বিবাহ এমন পাত্রে দেবেন—যে পাত্র দেবদ্বিজে ভক্তিমান—আর শিক্ষার আলোতেও উজ্জ্বল। আধুনিককালের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করার মত একটি চরিত্র—যা পাড়াতে একটিও নাই। দেশেও লাখে এক।

অবশেষে এমনই একটি পাত্রের সন্ধান পেলেন। ভাল ঘর, সম্পদ আছে বিদ্যা আছে—জেলার মধ্যে বড় বললেও অত্যুক্তি হয় না। সম্বন্ধটি পাকা হলে বংশের যা কিছু অপযশ মুছে যাবে।

কিন্তু এমনই অদৃষ্ট—সন্ধান করতে করতে খুঁত বার হল।

স্ত্রী বললেন, খুঁতখুঁতে স্বভাবটা ছাড়। কম্বলের রোঁয়া বাছতে বাছতে কম্বলে থাকে কি।

তাই বলে সমরেশ যা করে গেল—তাই প্রশ্রয় দেব!

আজকাল এই সবই চল হয়েছে। এত যদি—মেয়েকে কলেজে পাঠাবার কি দরকার ছিল!

কলেজে পাঠিয়েছি বলে তো স্বেচ্ছাচার করতে বলিনি। কত ভাল ভাল মেয়ে কলেজের শিক্ষা পেয়ে চমৎকার সংসারধর্ম করছে। এই চৌধুরী বাড়ীতেই দেখ না—

ও যার যেমন ভাগ্য। তবে সুমি আমাদের তেমন নয়—

তেমন মেয়ে নয়! আপন মনে ব্যঙ্গ ভরে উচ্চারণ করে ফিসফিস করে বললেন, এদিকে পাড়ায় কান পাতা যাচ্ছে না—সবাই বলছে ওদের মধ্যে ভাব, ভালবাসা না হলে ছেলে এমন ধনুকভাঙা পণ করবে কেন!

আ—মরিরে মরি কথার শ্রী দেখ না। বলি ভাব ভালবাসা কি আশমান থেকে হলো? কলেজের প্রিন্সিপাল যা কড়া লোক—গার্জেনের চিঠি ছাড়া বাইরের কোন পুরুষ—

বাধা দিয়ে বললেন সুরপতি, তা বুঝি জান না! সুমির বন্ধু অনিলার গার্জেন হ'ল অলক। অলক অনিলার দাদা—প্রায়ই হোস্টেলে আসত বোনের সঙ্গে দেখা করতে—

তা এতে আর দোষ কি—অলকের মত ছেলে ও জেলাতে খুঁজলেও দুটি নাই—ভাল চাকরীও পেয়ে গেছে—

সবই ভাল, যদি না নাস্তিকের শিরোমণি হত! ভাগবতের আসরে পণ্ডিত মশাইকে কি বলেছিল জান!

স্ত্রী কথাটি উড়িয়ে দেবার ছলে বললেন, ও বয়সে তর্ক করার বাতিক হয়ই—সব কিছু উড়িয়ে দেবার বাতিক। তাই বলে ওটাই সত্যি মনে করছ কেন!

থাক-থাক, যত সব বাজে কথা! উষ্ণ হয়ে উঠলেন সুরপতি। মোট কথা—ওই নাস্তিক ছেলেটার সঙ্গে কোন মতেই সুমির বিয়ে দেব না—ও ছেলে গুরুজনদের শ্রদ্ধা-ভক্তি করে ভেবেছ!

জানি না।

স্ত্রীর স্বরে অভিমানের আভাস পেয়ে বললেন, আহা—এটা বোঝ না কেন—শুধু বিদ্যা নিয়ে তো মানুষ নয়—আচার ব্যবহার রীতি-চরিত্র ধর্ম মতি এই সব না থাকলে কিসের মানুষ!

গলার স্বর নামিয়ে বললেন, সুমির মুখে কিছু শুনেছ?

কি শুনব?

এই আজকাল যেমন শোনা যায় ওকে না হলে—

ছি-ছি-ছি—তুমি হ'লে কি! মেয়ে কলেজে পড়ছে বলে কি এতটাই বেহায়া হয়েছে!

না হলেই ভাল—না হলেই ভাল। দেখো—আমি ওর বিয়ে দেব খুব ভাল ঘরে। ছেলেটি চাকরী করে, বিদ্বান, সচ্চরিত্র, ধার্মিক—

দেখ খুঁজে পাও যদি!

ও—ঠাট্টা করছ! দেখ পাই কিনা। পেলে কি হারাবে বল? রসিকতা করবার চেষ্টা করলেন সুরপতি।

হেরে তো আছিই। যেদিন থেকে—

বাস-বাস, এক মাসের মধ্যে তেমন পাত্তর যদি না আনতে পারি—

থাম, একটা দিব্যি করে বসো না যেন!

*

সেইদিন থেকে কেমন রোখ চেপে গেল সুরপতির—ওই ভক্তিমান ছেলেটিকে ও'র চাই। যেমন ভক্তিনম্র মুখ, তেমনি স্বাস্থ্যসুন্দর দেহ। উঁচু ঘর—চাকরীও করে উঁচু দরের। কথায় কথায় জানতে পারলেন ভারত সরকারের কোন দপ্তরে অফিসার র‍্যাঙ্কে প্রমোশন পাবার চান্স আছে। যা স্মার্ট ছেলে—উঠবেও উপরে। হয়তো পৃথিবীতে একদিন ছড়িয়ে পড়বে ওর নাম।

কথাটা জেনে মনটি দমেও গেল। অত উঁচুতে উঠলে ওর পরিজনরা কি ওর নাগাল পাবে! গ্রামের বড় বলে সবাই গর্ব করবে, কিন্তু গ্রামে আসবে না ও। খ্যাতির সূর্য কিরণে যে জমি ঝকঝকে হয়ে উঠবে—তার রং আলাদা—গোত্র আলাদা। অসাধারণরা সেই জগতেরই মানুষ—যে জগতের ঘটনা পড়ে দৃষ্টান্ত নিয়ে সাধারণরা প্রেরণা পায়।

তা হোক, তাই বলে চাইব না তাকে। সকলের কাছে দেখিয়ে গৌরব ভাগী হব বলেই তো হীরেটা আংটিতে পরি। ছেলেটিকে যেমন করে হোক চাই।

সুরু হ'ল গোয়েন্দাগিরি।

*

একদিন স্ত্রী তো চটেই আগুন। বলি বুড়ো বয়সে এত অনিয়ম সইবে শরীরে? তিন পো

বেলা উৎরে গেল—নাওয়া-খাওয়া হবে কখন?

আরে রেখে দাও তোমার নাওয়া-খাওয়া! যেটা ধরেছি শেষ না করে......আজ এক জায়গায় গিয়েছিলাম একটা খবর জানতে, জেনে ভারি আনন্দ হলো।

কিসের খবর?

আছে-আছে—বলব পরে। জেনে রেখো যে ছেলের হাতে মেয়ে দেব—তার লক্ষ্মীশ্রীটাও দেখা দরকার—

তোমার সবই আকাশ-কুসুম—

না গো না—আজ দেখে এলাম পাত্রের বাড়ী।

আর কি দেখলে?

কর ঠাট্টা—যদি এইখানে লাগাতে পারি—আচ্ছা-আচ্ছা—খাবে এসো।

খেতে খেতে বললেন সুরপতি, রূপে-গুণে, চরিত্রে এমন ছেলে দুর্লভ।

স্ত্রী হেসে বললেন, তুমি তো ছেলের রূপ-গুণে মুগ্ধ—ছেলে যদি পাত্রী দেখে পছন্দ না করে—

ইস্—সুমি কি দেখতে খারাপ?

তোমার আমার চোখে সুন্দরী বলে কি—

নিশ্চয়—সবাই-এর চোখেই সুন্দরী। আচ্ছা স্নেহের খাদটুকু বাদ দিয়েই ধর।

তা কি করে হবে—খাদ কি বাদ দেয়া যায়!

আচ্ছা-আচ্ছা। ছেলে যা নম্র—যা ভক্তিমান তাতে মনে হয় না অভিভাবকদের পছন্দ ঠেলবে ও কখনই মেয়ে দেখতে চাইবে না।

সেটা কি ভাল!

থাম-থাম। অসহিষ্ণু কণ্ঠে সুরপতি বললেন, খুঁত ধরব বললে কার না খুঁত বা'র হয়। কন্দর্প দেবকেও কুৎসিত করে দেখা যায়।

স্ত্রী মনে মনে হাসলেন। শুধু বললেন, দেখা যাক তোমার কেরামতি।

*

পরের রবিবারও ফিরতে দেরী হল। গৃহিণী পরিহাস করে বললেন, আজ বুঝি পাকা দেখার ব্যবস্থা করে এলে?

এলামই তো। হর্ষোৎফুল্ল স্বরে জবাব দিলেন সুরপতি।

কবে?

পরশু বুধবারে আমরা ছেলে আশীর্বাদ করে আসব। ঠিকুজি কোষ্ঠীর মিল হয়েছে রাজ-যোটক—ছেলের বাড়ীর সবাই মেয়ে দেখেছেন—অপছন্দ নয়।

গৃহিণী আকাশ থেকে পড়লেন, মেয়ে আবার কোথায় দেখলেন? কেমন করে দেখলেন?

তা আমি কি জানি—দেখেছেন যেমন করে হোক। ও'দের মেয়েও ওই কলেজে পড়ে কিনা—তার সঙ্গে হয়তো কোনদিন ও'দের বাড়ী গিয়েছিল—কিংবা সিনেমায়—নেমন্তন্ন বাড়ীতে—বলি মেয়ে তোমার অসূর্যম্পশ্যা নয়।

গৃহিণীর মুখে হাসি ফুটল। বললেন, বিয়েটা কি—

এই ফাল্গুনেই সারতে চান ও'রা, আমিও পাকা কথা দিয়ে এলাম আজ।

*

পাকা দেখার আগের দিনও এলো ছেলেটি—পাশাপাশি হাঁটু গেড়ে বসে প্রণাম করল দেবীকে। অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করলেন দু'জনে।

আজ সুরপতির মন ভরে উঠেছে—দীর্ঘ-দিনের একাগ্র কামনা শুনেছেন দেবী। কৃতজ্ঞ ভক্তিতে মন ছলছলিয়ে উঠেছে, চোখও ছলো-ছলো। অনেকক্ষণ পরে মাথা তুললেন। বুকের ভার নেমে গেছে—প্রসন্ন কিরণে চারিদিক উজ্জ্বল।

আশ্চর্য, ছেলেটিও আজ অন্যদিনের চেয়ে উজ্জ্বল, স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যেও যেন অপরূপ। দৃষ্টির সঙ্গে কি স্নেহের খাদ মিশল। না হলে ওর মুখখানি অমন নরম কেন? মুদিত দু' চোখে কেন অশ্রু আভাষ? দীর্ঘদিন তপস্যা অন্তে ও কি লাভ করেছে বরদায়িনীর দাক্ষিণ্য

ছেলেটি চোখ চাইল। ঠিক-ঠিক কোন ভু নাই, ওর চোখ দু'টিও ছলোছলো।

একসঙ্গে পইঠে দিয়ে নামছিলেন—হঠা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, দেখ বাবা একটি ক তোমাকে জিজ্ঞাসা করব। তুমি কি আপি কোন হায়ার গ্রেড পেয়েছ?

না তো।

তবে বুঝি লটারিতে—

না-না—লটারির টিকিট আমি কিনি নে।

একটু একটু করে মনের প্রসন্নতা নষ্ট হ যাচ্ছিল। আচ্ছা ছেলে তো—কোন মতেই মনের দুর্বলতা প্রকাশ করবে না?

মরিয়া হয়ে প্রশ্ন করলেন, তাহলে ক কি কোন মনোমত কন্যার সঙ্গে সম্বন্ধ দি হয়েছে?

এবার সরাসরি অস্বীকার করল ছেলেটি। ওর মুখখানা মুহূর্তের জন্য ক হয়ে উঠল বুঝি। তাড়াতাড়ি ঘাড় ফিরিয়ে কে মতে বলল, সেইজন্যই তো রোজ—

সেই মুহূর্তে সুরপতির মুখখানা ছাই-এ মত সাদা হয়ে গেল। কোন কথা বলবার আ ছেলেটি পথে নেমে এসেছে।

তাড়াতাড়ি ওর পাশে এসে দাঁড়া সুরপতি। রুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, তোম নামটি কি বাবা?

আমার নাম দেবু। ওটা অবশ্য ডাক না আসল নাম অলক বসু।

সুরপতি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন পথে মনে হল একলাই দাঁড়িয়ে আছেন—অনেকক্ষ দাঁড়িয়ে আছেন। চার পাশে কেউ নেই, কি নেই—না মানুষজন, না শব্দ কোলাহল।

একখানা ছ্যাকড়া গাড়ীর শব্দে সম্বিৎ ফি এলো—তাড়াতাড়ি পথ চলতে লাগলেন।

বাড়ী এসে বাক্স খুলে দুখানা নীল লেফা টেনে বা'র করলেন।

অংগুষ্ঠ ও তর্জনীর সাহায্যে প্রথম চি খানা খানিক টেনে বা'র করে আবার ঠে দিলেন লেফাফার ভিতরে। ও পত্রের আদ্যোপা তিনি জানেন—লেখকের নামও জানেন। লে কি প্রার্থনা করেছেন তাও ভোলেননি।

দ্বিতীয় লেফাফায় তাঁর কয়েকটি প্র প্রত্যুত্তর। প্রথম পত্রের প্রার্থনায় কয়েকটি প্র করেছিলেন লেখককে। লিখেছিলেন, আ একটি মাত্র প্রশ্ন আছে—সেটির সদুত্তর পেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি ভগবানে বিশ্ব কর কি?

নীল পত্রখানিতে অতি সংক্ষিপ্ত উ এসেছিল, না। যারা দুর্বল তাঁদেরই তা ভগবান। ইতি অলক বসু।

জবাবে লিখেছিলেন তিনি, দুঃখ করো ন তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করতে পারলাম ন নাস্তিকের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চাই আমি—কন্যা সম্প্রদান তো দূরের কথা।

পত্র দুখানা বাক্সে বন্ধ করে চেয়ারে এ বসলেন সুরপতি। অতঃপর মনে মনে হিস করতে লাগলেন, জয় হ'ল কার? তাঁর, অলকের?

কিশোর : চিত্তরঞ্জন সাহা।
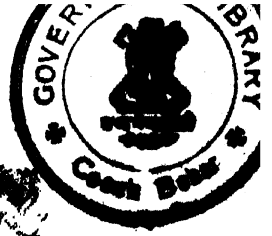
কুমুদপুর পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার আর পিয়ন দুজনেই ম্যালেরিয়ায় কাত। একটি পিয়ন সঙ্গে নিয়ে অবিলম্বে সেখানে পৌঁছনো দরকার।

অসুবিধা এমন কিছু নয়। এর আগেও এ ধরণের কাজ করতে হয়েছে। গোকুলকে বললাম, তৈরী হ'য়ে নাও, আজ রাত আটটায় গাড়ী।

—এবার কোথায় গো বাবু?

—কুমুদপুরে। ভেলাগড়ে নেমে সাত মাইল গরুর গাড়ী। পৌঁছতে কাল সন্ধ্যে।

গোকুলেরও আপত্তি নেই। তিনকুলে কেউ নেই। সম্বলের মধ্যে ছিল একটি বৌ তাও বছর দুয়েক আগে বাচ্চা হবার সময় চোখ বুজে গোকুলকে নিষ্কৃতি দিয়ে গেছে। আমার অবস্থাও তথৈবচ। মা দেশে। এখানে মেসে থাকি। পিছটানের বালাই নেই। মদনপুরে থেকে মদনপল্লী যেখানে হোক যাওয়া চলে। মাত্র ঘণ্টা কয়েকের নোটিশে।

সন্ধ্যার ঝোঁকেই গিয়ে পৌঁছলাম। শরীর ক্লান্ত কিন্তু মন চাঙ্গা হ'য়ে উঠল।

একপাশে পুকুর, অন্যপাশে বাঁশের ঝাড়। মাঝখানে পোস্ট অফিস। মাটির দেয়াল, টালির ছাদ। ঝকঝকে, তকতকে। অজ পাড়াগাঁয়ে এমন পোস্ট অফিস বরাতে জুটবে ভাবিনি।

পুরনো পিয়ন বৃন্দাবন ম্যালেরিয়ায় ধুঁকতে ধুঁকতে এসে কোনরকমে তালাটা খুলে দিল। পায়ের কাছে নিচু হ'য়ে প্রণাম করে বলল, এই নিন চাবির গোছা। সব দেখে শুনে নেবেন। ছটা বেজে গেছে, এই সময় থেকেই চেপে আসেন, আর দাঁড়াতে পারছি না। মাস্টার মশাইয়ের অবস্থা আরো খারাপ। তিনি তাঁর দিদির বাড়ী বোষ্টমপুরে গেছেন। বলি হুজুর, যদি কাল থাকি তো কাল একবার আসব।

কাজ এমন কিছু নয়। সারাদিনে বড় জোর খান দশেক চিঠি। গোটা দুয়েক মণি অর্ডার। রেজিস্টার্ড চিঠি মাঝে মাঝে। মাইল তিনেক দূরে এক স্কুল আছে, তার হেড মাস্টারের নামে।

পাশের ছোট ঘরটায় থাকবার বন্দোবস্ত করলাম। পুরনো কাঠাল কাঠের এক তক্তপোষ ছিল আর এক মাটির জালা। গোকুলই দাওয়ার ওপর তোলা উনুন জেলে সকাল বিকাল রান্নাটা করে নিত। চিঠিপত্র নিয়ে গোকুল বেরিয়ে গেলেই টেবিলের ওপর পা তুলে একটু ঘুমিয়ে নিতাম। অসুবিধা নেই, হঠাৎ যে ওপরওলা ভদারকে আসবেন এমন আশঙ্কাও নেই।

একদিন ঘুমটা বেশ গাঢ় হ'য়ে এসেছে, এমন সময় খুটখাট আওয়াজে চোখ মেলে চাইলাম। ভেবেছিলাম কাঠবিড়ালী কিংবা ইঁদুরই হবে, চোখ খুলেই অবাক হলাম।

দাওয়ার খুঁটি ধরে ফুটফুটে একটি বাচ্চা মেয়ে, ডুরে শাড়ীটা প্যাক দিয়ে কোমরে জড়ান। রুক্ষ একমাথা চুল দুচোখের ওপর এসে পড়েছে। কাল তীক্ষ্ণ দুটি চোখ।

তাড়াতাড়ি পা নামিয়ে সোজা হ'য়ে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, কে তুমি?

—আমি ফুলু, মেয়েটি নির্ভীক দ্বিধাহীন গলায় বলল। তারপর একটু থেমে মাথাটা বাঁকিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করল, তুমি কে?

—আমি, আমি পোস্ট মাস্টার।

ধ্যাৎ, মেয়েটি অবিশ্বাসের হাসি হাসল, তুমি কেন পোস্ট মাস্টার হ'তে যাবে। তার বলে কি রকম বড় বড় গোঁফ।

ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। মেয়েটি আগের পোস্ট মাস্টারকে দেখেছে। তাঁর বোধ হয় বড় বড় গোঁফ। তাই গোঁফহীন লোকটাকে পোস্ট মাস্টার বলে মানতে রাজী নয়।

হেসে বললাম, আমি এখানকার নতুন পোস্ট মাস্টার। আগের পোস্ট মাস্টার মশাইয়ের অসুখ করেছে কিনা, তাই আমি তাঁর বদলী এসেছি।

মেয়েটি কি বুঝল কে জানে। পায়ে পায়ে সরে এসে আমার টেবিল ধরে দাঁড়াল। সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে আমার আপাদমস্তক দেখে বলল, এখন থেকে সব চিঠি বুঝি তোমার কাছে আসবে।

—হ্যাঁ, ঘাড় নেড়ে মেয়েটিকে কাছে টেনে নিলাম, কেন বল তো?

—আমার বাবার কোন চিঠি এসেছে কিনা দেখবে?

—তোমার বাবার চিঠি? কি নাম তোমার বাবার?

—বাবার নাম? একটু চিন্তার ভাব দেখিয়ে ঝাঁকড়া চুলের গোছা দুলিয়ে ফুলু বলল, কি জানি, বাবার নাম তো জানি না। আমার নাম ফুলমণি চক্রবর্তী। চিঠি এলে তো আমার নামেই আসবে?

—তাতো নিশ্চয়। মেয়েটির কথায় সায় দিলাম। তোমাদের বাড়ী কোথায়?

মেয়েটি পিছন ফিরে দূরের খেজুরগাছের ঝোপের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, উই যে, ওদিক পানে।

—তোমাদের বাড়ীতে কে কে আছে?

সাগরের উৎস খুঁজে
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

সাগরের উৎস খুঁজে আরো
যাই অদৃশ্য গভীরে
যেখানে জলের ঘূর্ণি ক্রোধে
ফোঁসে। ক্ষোভে সারাক্ষণ
যেখানে অদৃশ্য বাঁক ভাঙে
দুই পাড়। চায় ফিরে
চৈতন্যের শূন্য দ্বীপে সৃজনের ক্ষিপ্র সঞ্চরণ

ভীরুতার গ্লানিকে তাড়িয়ে।
আজো শহরে ও গাঁয়ে
অযুত ব্যাকুল চোখ শূন্যতায় ভরা। চোখ নেই:
বোবামুখ। যখনি সবেগে হাঁটে দ্যাখে পায়ে-পায়ে
স্বস্তিহীন বাধা। আর দৃঢ় এক অদৃশ্য তারেই

কে যেন নাচায় যতো অসহায় মূঢ় আকাঙ্ক্ষাকে।
রুদ্ধশ্বাস ঢেউ ভাঙে যেহেতু শতাব্দী উদ্বেলিত
কণ্টকিত জিজ্ঞাসায়। মূঢ় যতো সংস্কার বল্লমে
দীর্ণ করে সুস্থির অন্বয়।
হাড় আর কঙ্কালের ফাঁকে
সাগরের উৎস খুঁজে চমকে দাঁড়িয়ে দেখি স্ফীত
নদীর নতুন পাড়ে সৃজনের নবাঙ্কুর জমে।।

অগ্নি মরালী
আমি উড়ে গিয়েছিলাম
কেনিয়ার কান্নায় কান্নায় ভরা
টানা নদীর কোমর জড়িয়ে সবুজ
সবল সিডার গাছের বিষণ্ণ শোভায়
গাবরীর ছায়া তিমিরে।

অধীর মরালী
উড়ে গিয়েছিলাম আবার,
নীল নদের জলে ছায়া ফেলে,
টাইগ্রীসের দুপার দেখতে দেখতে
যেখানে বিভাস গেয়ে ভৈরবী
এবার আশাবরী শুরু করবে।

শান্ত মরালী
এখন উড়েছি আকাশে
শুধু চাঁদের হৃদয়কে দেখতে নয়,
আলোকবর্ষের দূরত্বে যে তারা আছে,
লুব্ধক কিংবা কালপুরুষের কাছাকাছি,
উড়ে চলেছি।

মুগ্ধ মরালী
এখন হৃদয় কম্পিত,
আমাকে রোমাঞ্চিত করেছে বিজ্ঞান,
এই সৌরলোকের আমি অধিবাসী,
আমি উড়ে চলেছি
স্থান ও কালের সীমানা ছাড়িয়ে।

একটি আকাশ একটি তারা
জগন্নাথ চক্রবর্তী

একটি জীবন, একটি আকাশ একটি তারা
সৌরলোকের জ্যোৎস্নাপাড়ায় আলোর সাড়া:
ফাল্গুনে বন হঠাৎ যখন সৌরভিত
কলঙ্কী চাঁদ ছায়ায় ভীত,
লজ্জা রাখে মেঘের ফাঁকে।
এপার থেকে ওপার থেকে অহর্নিশ ডাকাডাকি
লজ্জা দিয়ে লজ্জা কাড়া প্রকাশ করে ঢাকাঢাকি—
একটি জীবন একটি আকাশ একটি তারা।

* * *

আবেগ যেন তারে বাঁধা
টেলিফোনের অপর প্রান্ত
কেবল বাজে কেবল বাজে অবিশ্রান্ত।
দীঘল চোখে ডোবে যে-মন
প্রাণে যে মন প্রাণবন্ত
ফুরোয় না তার জ্যোতিস্ফুরণ
রাগিণী তার অফুরন্ত।
একটু গোপন হৃদয়কম্প
রঙীন-স্মৃতির চমক বিন্দু।
একটু বোবা জলের ছায়ায়
অন্তবিহীন আকাশ-সিন্ধু।
একটুখানি ঘাসের ডগায়
অবাক সাড়া অবাক সাড়া
ঘাস যেন নয়, একটি আকাশ একটি তারা।

* * *

কার গলাতে সেধেছি গান বেঁধেছি গান
কার দুহাতে দিয়েছি প্রাণ হরিণ-মনা—
ঘূর্ণী মেঘের দুরন্ত সে
কোকিল মাসের অফুরন্ত
আগুন-চেরা স্ফুলিঙ্গ সে
চাঁপার ঘ্রাণে ঘ্রাণবন্ত।
জীবন-মুগ্ধ একটি জীবন,
এই পৃথিবীর নিমেষহারা
সেই তো আমার একটি আকাশ,
সেই তো আমার একটি তারা।

বৈকালী
সুনীল বসু

এই তো বিকেল তুমি
আর আমি জলে মুখোমুখি
আমিও উদাস তোমারই মতন তাই এত সুখী।
এত রঙ্ ছিল গোলাপে সোনায়,
তোমার আমার জাফরান বুকে
সেও তো ক্ষণিক প্রসাধন কলা
গতায়ু দিনের মাটি রঙ্-মুখে!
সব রঙ মোছে জলের রেখায়, তারায় তারায়—
সব কারসাজ মোছে হে বিকেল সান্ধ্য ছায়ায়।

এই তো বিকেল বিধবার মত
তুমিও পরলে সন্ধ্যার থান,
আমিও হলাম বিগত প্রেমের শূন্য শ্মশান।।

কাক-জ্যোৎস্না
শ্রীকৃষ্ণধন দে

শিশির ভেজানো রাত
চাঁদ বুঝি ডোবে নি এখনো
তবু আকাশের রঙ ফিকে হয়ে যায় ঘন ঘন,
নারিকেল পাতাগুলো থেকে থেকে
কাঁপে ঝিক্‌ঝিক্
বাতাসে জড়ানো নেশা,
ভোর বুঝি হয়ে এল [illegible]
মন তবু চায় রাত আরো যেন বড় হয়ে যাক্,
তোমার ও দুটি হাত আমার এ বক্ষ জড়াক্,
—ও সব পুরানো কথা,
কাব্যলোক শুধু মায়াজাল
আবার দুর্বহ দিন, এখনি যে আসিবে সকাল।
ক্ষণিকের দেখা-পাওয়া এই রাত, এই আধ ঘুম
অজানা ফুলের গন্ধে স্নায়ুজাল
নিঃসাড় নিঃঝুম
তোমার নিঃশ্বাস আর মৃদুবাজা হাতের কাঁকন
থমথমে শেষ রাতে আনে চোখে ভুলের স্বপন।
পড়ন্ত জ্যোৎস্না নিয়ে
নিভে আসে শিশিরের রাত
তারি মাঝে কথা কয় তপ্ত ক্ষীণ একখানি হাত।

হেনরিয়েটা
চিত্তরঞ্জন মাইতি

সে এক বাংলার বধূ কাকচক্ষু
সরসীতে কলস ডোবায়
নিত্য শঙ্খে সুর তুলে তুলসীর
মঞ্চে জ্বালে সন্ধ্যার প্রদীপ
ললাটে কল্যাণময়ী স্বামীর মঙ্গলে
আঁকে সিন্দুরের টিপ
এ কন্যা সবার চেনা এ বধূ
নিয়ত ব্যস্ত সংসার সেবায়।

আর এক বধূ আছে, সন্ধ্যা দীপ
জ্বালে না সে গৃহের কল্যাণে
কখনো কোমল করে মাঙ্গলিক
শঙ্খ তুলি দেয়নি ফুৎকার
শোভেনি সিন্দুর বিন্দু সীমন্ত
সীমায় তার দৃপ্ত কাননে
তবু তার দিন কাটে, নিশিদিন
কল্যাণের শুভ অনুধ্যানে।

প্রচন্ড ঝড়ের মাঝে ভগ্নপক্ষ
পাখিদের পরাভূত প্রাণ
এ বধূ রেখেছে বুকে, নিরন্ধ্র
আঁধার রাতে বিভ্রান্ত পথিক
এরই জ্বালা প্রদীপের আলোকেতে
পেয়ে গেছে আকাঙ্ক্ষিত দিক
ভগ্ন তরী যাত্রীদের সিন্ধুতীরে
বাতিঘর দিয়েছে সন্ধান।

এই বধূ বিদেশিনী, কন্যা নয়
আমাদের বঙ্গ জননী
তবু নিত্য প্রাণব্রতে—কন্যা
জায়া জননী সে বিমুগ্ধ পৃথিবীর।

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

সিগারেট

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

সকালে কাগজ-কলম নিয়ে বসেছিলাম। একটি গল্প আসি আসি করছে কিন্তু কিছুতে সশরীরে আবির্ভূত হচ্ছে না। যে দেহ সে নিতে চাইছে তা আমার মনঃপূত নয়। ফলে লেখার বদলে কাগজের ওপরে রেখাপাত করে চলেছিলাম, দরজা ঠেলে একজন অভ্যাগত ঘরে ঢুকলেন।

আমি বললাম, 'আরে বিজয়দা যে। আসুন আসুন।' বিজয়দা আমার টেবিলের ওপর একটু চোখ বুলিয়ে বললেন, 'লিখছিলে নাকি? তাহলে থাক তাহলে আর বসব না। ডিস্টার্ব করব না তোমাকে।'

রেখাসংকুল সাদা কাগজটা লুকোবার মত করে সরিয়ে রেখে আমি বললাম, 'আরে না-না। বসুন বসুন। কতদিন পরে এলেন।'

বিজয়দা আর আপত্তি করলেন না। আমার পাশের ইজিচেয়ারটায় ঠেস দিয়ে বসে একটু হেসে বললেন, 'তোমরাই বেশ আছ।'

আমি কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে বললাম, 'কি রকম?'

বিজয়দা বললেন, 'মানে তোমাদের পেশার কথাটা বলছি। বেশ মজার পেশা।'

হেসে বললাম, 'কি করে?'

বিজয়দা বললেন, 'এই ধর তোমার কারবারে ক্যাপিটালের চিন্তা নেই, এসটাবলিশমেণ্ট খরচা নেই পার্টনার পালাবার ভয় নেই। বেশ আছ।'

ও সব অসুবিধা না থাকলেও লেখকের বৃত্তিটা অবিমিশ্র সুখের কিনা তা নিয়ে তর্ক করলাম না। কিন্তু বিজয়দার ব্যবসায়িক পরিভাষাগুলি শুনে কিছু কৌতুক বোধ করলাম। আমি যতদূর জানি বাণিজ্য দিয়ে লক্ষ্মীকে বাঁধবার জন্যে বার তিনেক চেষ্টা করেছিলেন বিজয়দা। প্রথমে গিয়েছিলেন প্রেস আর পাবলিশিং-এর দিকে। অত টাকা কোত্থেকে জুটিয়েছিলেন তিনিই জানেন। খাড়া করলেন লিমিটেড কোম্পানী। নিজে হলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর। সে ব্যবসা দু বছরের বেশি টেঁকেনি। তারপর ও সব ছেড়ে একেবারে কাঁচা মালের দিকে নজর দিলেন। মৎস্যাশী মাছের চাষ বাঙালীকে যদি মাছের লোভ দেখানো যায় লাভের টাকা গুণে শেষ করা যাবে না। কোম্পানী খুললেন ভেরি কিনলেন গোটা কয়েক। তারপর দু-তিন বছরের মধ্যে সবই গেল। মাছের খোঁজ মিলল না।

জলাশয়গুলি জলের দরে ছাড়তে হল। শুনেছি মহাজনেরা নাকি এখনো ওঁর পিছু ছাড়েননি। তৃতীয়বার বিজয়দা ফের ডাঙার দিকে তাকালেন। কলকাতার পূর্বাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের কথাটা মাথায় এল তাঁর।

একটি বড় রকমের কলেজ খুলতে পারলে অনেক ছাত্র-ছাত্রীর সেখানে জায়গা হয় নিজেদের হাতেও দু পয়সা আসে। কিন্তু প্ল্যানটা কাগজ-পত্রের গণ্ডী আর পার হতে পারেনি।

যে সব লোকের টাকা বিজয়দা নষ্ট করেছেন তাঁরা তাঁর নামে নানা ধরণের অপবাদ দিয়ে থাকেন। চোর,জোচ্চোর বলতেও দ্বিধা করেন না। কিন্তু আমি বিজয়দার পারিবারিক অবস্থার কথা জানি। তাঁর ঘরদোর, স্ত্রী-পুত্রের চেহারা দেখে অনুমান হয় না যে পরস্ব হরণ করে তিনি নিজের ব্যাঙ্কের একাউণ্ট স্ফীত করেছেন। তাঁরও যথাসর্বস্বই গেছে। তাঁর চরিত্রে দোষের অভাব নেই। খামখেয়ালী, বদমেজাজী। যতখানি বাকপটু তার সিকি পরিমাণও কর্মক্ষম নন। তাঁর মাথায় বড় বড় আইডিয়ার সম্পদ প্রায় সব সময় থাকে। বিপদ বাধে সেগুলিকে কাজে লাগাতে গিয়ে। তিনি হিসাব করতে ভালোবাসতেন না এবং ব্যয় বাহুল্যকে আভিজাত্যের নিদর্শন বলে মনে করতেন। ব্যবসায়ে নেমে তাঁর এই অতি ব্যয়ের অভ্যাস আরো বেড়ে গেল। অফিসের জন্য বড় বাড়ী ভাড়া করলেন, দামী দামী আসবাবপত্র এল। যেখানে একজন লোক রাখলে হয় সেখানে তিনজনকে লাগালেন। দরকার হল লেডি স্টেনোগ্রাফারের। দেখে-শুনে আমার তখনই মনে হয়েছিল বিজয়দা ব্যবসায়ে নামেননি, বিলাসিতায় মেতেছেন।

আমি বলেছিলাম, 'বিজয়দা এত খরচ করছেন কেন?

বিজয়দা জবাব দিয়েছিলেন 'তুমি বুঝবে না কল্যাণ প্রেস্টিজটা হল বিজনেসের সেরা ক্যাপিটাল। বাঙালীরা কোনদিন অ-বাঙালীর মত ভিখিরী সেজে বিজনেস করতে পারবে না। করতে গেলে সব নষ্ট করবে! বাঙালীদের জাত আলাদা, ধাত আলাদা, তাদের ব্যবসার টেকনিকও তাই ভিন্ন রকমের।'

টেকনিকের মধ্যে দেখতাম গাড়ী ছাড়া বিজয়দা চলেন না, দামী স্যুট ছাড়া পরেন না, আর অগ্নি-মুখ গোল্ড ফ্লেক তাঁর দু আঙুলের ফাঁকে অনির্বাণ জ্বলে।

তারপর গত দশ-পনের বছরের মধ্যে সবই গেছে। সব চেয়ে বেশি গেছে সুনাম। তাঁর বন্ধুর দল বিজয় চক্রবর্তীর নাম শুনতে পারেন না। দেখলে এড়িয়ে যান। পাছে ধার চেয়ে বসেন বিজয়দা। ইদানীং ওই অভ্যাসটিও হয়েছে। যা ধার করেন তা আর শোধ দেন না। দু-একবার চাকরী-বাকরির চেষ্টা করেছিলেন। ঢুকেও ছিলেন কোন কোন অফিসে। কিন্তু দু-চার মাসের বেশি কোথাও টিঁকেছিলেন বলে জানিনে। এমনি করে পঞ্চাশ পার করে দিয়েছেন বয়স। দেখতে আরো বুড়ো দেখায়। যৌবনে সুপুরুষই ছিলেন। আকারে দীর্ঘ, বর্ণে গৌর। সে চেহারার প্রায় কিছুই নেই। দু-পাটি থেকেই

সামনের দিকের দু-তিনটি করে দাঁত পড়েছে। এখনো বাঁধিয়ে নেননি। তাঁর মত সৌখীন মানুষের এই বৈদান্তিক ঔদাসীন্য কেন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'আর দাঁত। নখই যখন গেছে, দাঁত দিয়ে আর কি হবে।'

বিজয়দার সঙ্গে আমার জানা-শোনা ছেলেবেলা থেকে। একই মফঃস্বল সহরের আমরা বাসিন্দা ছিলাম। অল্প বয়স থেকেই তাঁর মনে ভূমার আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল। তাঁর কোন কথাই দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ছোট ছিল না। পৃথিবীর সব খোঁজ-খবর তিনি রাখেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব শাখা-প্রশাখা থেকেই তিনি ফল আহরণ করেছেন। তাঁর কথা আমরা সবাই অবাক হয়ে শুনতাম। স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন ঘরের সুদর্শন ছেলের মুখে কিছুই বেমানান লাগত না। স্কুলের ডিবেটিং ক্লাবে তাঁর জুড়ি ছিল না। ম্যাট্রিকুলেশনে দশ টাকার একটা স্কলারশিপও পেয়েছিলেন। পরে অবশ্য ক্যারিয়ার আর তত ভালো হয়নি। কিন্তু ওঁর মধ্যে বড় হবার যে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে সে কথা তিনি শুধু নিজেই বিশ্বাস করতেন না তাঁর বাপ-মা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের মনেও তা সঞ্চারিত করতে জানতেন। তিনি পরীক্ষায় খারাপ করলে অসুখ-বিসুখ কি প্রতিকূল গ্রহ-উপগ্রহের দোহাই দেওয়া হত। ব্যবসা-বাণিজ্যে লোকসান হলে দোষ চাপত পার্টনারের ঘাড়ে। বিজয়দা যেন কোন অন্যায় করতেও পারেন না, ভুল করতেও পারেন না। তাঁর চরিত্র নির্দোষ, বুদ্ধি নির্মল। হয়তো তাঁর অসাধারণ বাক-বৈদগ্ধ্য এই ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করে থাকবে। তাঁর চেহারা আর চাল-চলনের আভিজাত্যও তাঁকে সেই মোহ বিস্তারের কাজে অনেকখানি সাহায্য করেছিল। কিন্তু যতদূর জানি এখন আর সে সব নেই। সেই ইন্দ্রজাল টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে পড়েছে। বিজয়দার ভাইরা সব আলাদা হয়ে গেছেন, বন্ধুরা বিচ্ছিন্ন। স্ত্রী আর পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে নারকেলডাঙ্গার ষষ্ঠীতলা লেনে পুরোন বাড়ীর একতলায় দুখানা ঘর ভাড়া নিয়ে বিজয়দা সেখানে বাসা বেঁধেছেন। বড় ছেলে দুটির কলেজের পড়াশুনো চালাতে চালাতে বন্ধ হয়েছে। চাকরী-বাকরির কোন সুবিধে হয়নি। মেয়েটির এখন বিয়ে দিলেই হয়। কিন্তু পণ, যৌতুকের সংস্থান নেই। আগে আগে বৌদির সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে আমার আলাপ-আলোচনা হত। উপন্যাস পড়া এবং তা নিয়ে সমালোচনা করায় তাঁর দারুণ উৎসাহ ছিল। এখন আর সে সব কিছুই নেই। এখন গেলেই নানা রকম অভাব, অনটন, অশান্তি অভিযোগের কথা ওঠে। আগে আগে স্বামীর দোষ চাপতে চেষ্টা করতেন বৌদি। এখন আর করেন না। এখন স্পষ্টই বলেন, 'ওঁর জন্যেই সব নষ্ট হল।'

বিজয়দার মত মানুষ যে এই বয়সে এই অবস্থায় এসে বিশ্ব সংসারের উপর বিরূপ হবেন, আর সাহিত্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি, রাজনীতিকে বিদ্রূপ করবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আমি বিস্মিত হইনে বিশেষ কোন বাদ-প্রতিবাদও করিনে। তাঁর কথা শুধু শুনে যাই মাঝে মাঝে দু-একবার হাঁ-হুঁ করি। বিজয়দার পক্ষে তাই যথেষ্ট। তিনি নিজেই বাদী নিজেই প্রতিবাদী। বিপক্ষের সম্ভাব্য যুক্তিগুলি তিনি নিজেই খাড়া করেন। তারপর আরও ধারাল অস্ত্রে কচু গাছের মত সেগুলি কুচি কুচি করে কেটে দিগ্বিজয়ীর উল্লাস বোধ করেন। আমি শুধু তাঁকে বসবার আসন দিই, আর ফাঁকে-ফাঁকে চা আর ধূমপানের ব্যবস্থা করি।

অবশ্য সিগারেটের প্যাকেট তাঁর প্রায় পকেটেই থাকে। এখনো তাঁর আধ ময়লা পাঞ্জাবীর পকেটের ভিতর থেকে তাঁর উজ্জ্বল গোল্ড ফ্লেকের বাক্স বেরিয়ে আসে। সব সময়েই যে তিনি দামী সিগারেট খান তা নয়। কম দামীও চলে। কিন্তু গোল্ড ফ্লেক যে এখনো কি করে জোটে তা ভেবে আমি মাঝে মাঝে অবাক হই।

বিজয়দা এসে বসবার সঙ্গে সঙ্গে আমি ছোট টিপয়টা তাঁর সামনে টেনে দিলাম আর উঠে গিয়ে সংগ্রহ করে আনলাম ছাইদানিটি। এই বস্তুটির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ সম্পর্কের দরকার নেই। বিজয়দারও যে বিশেষ সম্পর্ক আছে তা তাঁর ধরণ-ধারণ দেখে মনে হয় না। কারণ ছাইদানি থাকুক আর না থাকুক তিনি আমার লেখার ঘরখানিকেই একটি ভস্মপাত্র মনে করে যত্রতত্র ছাই ছিটাতে থাকেন। তিনি উঠে চলে যাওয়ার পর খালি প্যাকেট, সিগারেটের টুকরো আর ছাই জীবন আর জগৎ সংসারের অকিঞ্চিৎকরতার সাক্ষী হিসাবে পড়ে থাকে।

সব জেনেও অ্যাসট্রেটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিলাম। কিন্তু অবাক কাণ্ড। চেইন স্মোকার বিজয়দা সঙ্গে সঙ্গে সিগারেট ধরালেন না ছাইদানিটির দিকে তাকিয়ে মৃদু একটু হাসলেন। যেন জাতিস্মর পূর্বজন্মের কোন স্মারক দ্রব্যকে হঠাৎ দেখতে পেয়েছেন।

বললাম, 'কি ব্যাপার বিজয়দা? সিগারেট ফুরিয়ে গেছে বুঝি? আনিয়ে দেব?'

তিনি বললেন, 'না ভাই তার আর দরকার নেই।'

বললাম, 'কেন বলুন তো। আজ হঠাৎ এত সংকোচ কিসের আপনার?'

বিজয়দা বললেন, 'সংকোচ নয়, প্রয়োজনই ফুরিয়েছে। সিগারেট আমি ছেড়ে দিয়েছি।'

আমি একটু কাল বিস্মিত হয়ে থেকে বললাম, 'সে কি আপনি, শুনেছি, তের-চৌদ্দ বছর বয়সে সিগারেট ধরেছিলেন।'

তিনি বললেন, 'ঠিকই শুনেছ।'

আমি বললাম, 'তাহলে ছাড়লেন কেন? ডাক্তার বারণ করেছেন?'

বিজয়দা একটু হেসে বললেন, 'মহা ডাক্তারও আমার কিছু করতে পারত না যেমন মহা-মাষ্টার মানে হেড মাষ্টারও পারেননি। স্কুলে তখনও বেত মারা চালু ছিল। প্রথম যেদিন ধরা পড়ি, পিঠখানা একেবারে লাল করে ফেলেছিলেন। কিন্তু বুক তাতে দমেনি। মাষ্টারদের পর বাবা আর কাকাও আমার ধূমপানে কম বাধা দেননি। কিন্তু তাঁদের সব চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে। তারপর সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছিলেন তোমার বৌদি। গোড়ার দিকে সকলের মত আমাদেরও নতুন প্রেমে নতুন বধূ আগাগোড়া কেবল মধু। মুখের কাছে মুখ এলেই সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পাশ ফিরে শুয়েছিল। বলেছিলাম 'কি হল?'

সে আপত্তি জানিয়ে বলেছিল, 'তোমার মুখে ভারি গন্ধ।'

বলেছিলাম, 'মদের গন্ধ নয়, সিগারেটের গন্ধ।' সে হেসে বলেছিল 'জানি গো জানি। অ আর আমাকে বলে দিতে হবে না। কিন্তু কেন অত সিগারেট খাও বল তো।'

জবাব দিয়েছিলাম, 'খাই মুখের আঁশটে গন্ধ ঢাকবে বলে। মদ যেমন খারাপ আসলে মুখমদও তেমনি। দেখতে ভালো শুনতে ভালো, শুঁকতে ভালো নয়।'

সে বলল, 'তার জন্যে পান খেলেই হয়।'

আমি বললাম, 'পানটা মেয়েদের জন্যে, তামাকটা পুরুষের। আমাদের ভোজ্য এক কিন্তু পেয় আলাদা। মেয়ে আর পুরুষের স্বভাব-চরিত্র এত বিপরীত বলেই তাদের মধ্যে বৈষ্ণব-কবিদের ভাষায় 'পীরিতি' এত বেশি।'

কথায় আমি কারো কাছে হারিনি আর স্ত্রীর কাছে হারব : অন্ততঃ তখন হারতাম না।

তারপর আমার স্ত্রীর নাকেও সিগারেটের গন্ধ সহনীয় হল। ছাই ওড়ানো সয়ে গেল চোখে। আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম মদ খেয়ে যে মাতাল হয় না আর সিগারেট খেয়ে যে ঘর নোংরা করে না, বিছানার চাদর আর মশারি পোড়ায় না সে ঠিক জাত নেশাখোর নয়, তার নেশা সখের নেশা। সে নেশায় সুখ নেই। আসলে সিগারেটের আগুন পুরুষের প্রেমের আগুনের প্রতীক।

সে হেসে বলেছিল, 'আর সিগারেটের ছাই?'

জবাব দিয়েছিলাম, 'সেগুলি শত্রুর মুখে দেওয়ার জন্যে।'

আমার স্ত্রী তখন আমার সব কথা মানত। কারণ আমার কথার অর্থগৌরব ছিল। শুধু কাঁচা টাকাই নয়, ভরি ভরিতে পাকা সোনাও দিয়েছি। তারপর আমিও দত্তাপহারী মধুসূদনের নকল করতে লাগলাম। যা দিয়েছিলাম তার সবই চেয়ে নিলাম, তার বেশি কেড়ে নিলাম। তারপর আর দেওয়ার মত কিছু বাকি রইল না। আমার দিক থেকে দেওয়ার মত ধন, মান, যৌবন, অনেক আগেই শেষ হয়েছিল। শুধু মনকে আমার স্ত্রী আর গ্রহণযোগ্য মনে করল না। বাড়তে লাগল শুধু জন। আমাদের দুজনেরই ইচ্ছার বিরুদ্ধে। কিন্তু এসব পুরাকালের কথা বেশি বলে লাভ কি। এবার একালের কথায় আসি।

পঞ্চাশের আগেই আমি বনে ঢুকেছিলাম। সে বন আমার ঘর। সে বনের বাঘিনী আমার স্ত্রী। আর ব্যাঘ্রশাবকেরা আমাকে আস্ত একটি মোষ ছাড়া যে কিছু মনে করে না তা তাদের চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। এখন বাঘে মোষে লেগে গেলেই হয় আর কি। আমি তাই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতাম। কিন্তু পালাবইবা কোথায়। ঘরেও পাওনাদার, বাইরেও পাওনাদার। ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর। আমার দিন কাটে রাস্তায় রাস্তায়, সস্তা রেস্তরার কোণে সিগারেটের ধোঁয়ার আড়ালে। ঘরে ফিরি অনেক রাত্রে। শুধু ঘুমোবার জন্যে। সেখানে যে বিয়ের তৃতীয়দিনের মত আমার জন্যে ফুলশয্যা পাতা থাকে না তা তো বুঝতেই পার। ঝগড়া করে করে ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত কারোরই ঘুম আসে না। ঘুমের যে এমন একটি মহৌষধ আছে কে জানত। ঘুম ভাঙবার পর আবার শুরু হয়। কিন্তু আলাপটা ভালো করে জমবার আগেই আমি পালাই।

সেদিন তোমার বৌদি কী [illegible] হঠাৎ কোমল ধরল। একটু ইতস্তত করে বলল,

'দেখ, তোমার কাছে কি গোটা তিনেক টাকা হবে?'

একটু অবাক হলাম। ইদানীং সে আমার কাছে কিছু চায় না। দুটি ছেলের একটি টিউশনি ফিউশনি কি যেন করে। পঞ্চাশ ষাট টাকা বোধহয় হয়, কি তাও হয় না। সব টাকা সব মাসে আদায় করতে পারে না। ছোটটি অল্পদিন হল কলেজ স্ট্রীটের এক স্টেশনারী দোকানে সেলস্‌ম্যানের কাজ নিয়ে ঢুকেছে। এখনো শিক্ষানবিশীর পালা শেষ হয়নি। ট্রাম-বাসের খরচা বাদে বিশেষ কিছু যে ঘরে আনতে পারে মনে হয়না। টিউশনি করে মেয়েও পনের বিশ টাকা আনে। কিন্তু মাসের পনের দিন যেতে না যেতে বারিবিন্দুর মত সবই মিলিয়ে যায়।

আমি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'টাকার কি দরকার পড়ল।'

এমন একটি অসম্ভব প্রশ্নেও সে কিন্তু আজ চটলো না। শান্তভাবেই বলল, 'খুবই দরকার। ঘরে আজ কিছু বলতে কিছু নেই। মাছ তরকারির তো কোন কথাই ওঠে না, দু'সের চাল যে কিনব তার পর্যন্ত জো দেখছিনে। অমু-শ্যামুর কাছে যা ছিল সব ওরা ধরে দিয়েছে। হাত খরচা, বাসভাড়াটা পর্যন্ত। সব কাল ফুরিয়েছে। আজ আর কোন গতি নেই। হবে তোমার কাছে কিছু?'

'দেখি' বলে পকেটে হাত ঢুকালাম। একটি আধুলি আর একটি পুরো জিনিস বেরিয়ে এল। পুরোন সিগারেট কেসটা। নতুন এক পার্টির সন্ধান পেয়ে আগের দিন বেশ একটু সাজসজ্জা করেই বেরিয়েছিলাম। সিগারেট ভরা কেসটি হেসে খুলে ধরেছিলাম সামনে। কিন্তু শিকার ধরতে পারিনি।

কেসে আরও কয়েকটা সিগারেট ছিল। সেগুলি বের করে নিয়ে টেবিলের ওপর রেখে কেসটা স্ত্রীর হাতে দিয়ে বললাম, 'দেখ এটা দিয়ে যদি কোন কাজ হয়।'

অনেকদিন পরে আমার স্ত্রীর মুখে এক ফোঁটা হাসি দেখলাম। ঠোঁট দুটি একেবারে শুকনো। কপালের সঙ্গে গাল-দুটোও যে এমনভাবে ভেঙেছে এতদিন চোখে পড়েনি।

আমার স্ত্রী বলল, 'পোড়া কপাল, তোমার এ সিগারেট কেস এখানে কে নেবে।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা দাঁড়াও, দেখি কেউ নেয় কিনা।'

কেসটা তাঁর হাত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সিগারেটগুলি আর ভরে নিলাম না। দু-তিন জায়গায় চেষ্টা করবার পর এক বন্ধুর কাছ থেকে দশটাকা ধার পেলাম। কিন্তু সেও কেসটা বন্ধক রাখতে চাইল না। সে হেসে বলল, 'ওটা নিয়ে আর কী করব, ও তুমি নিয়ে যাও।'

কেসটা সোনার নয়। রোল্ড-গোল্ডের। সেটা আর ফিরিয়ে নিয়ে গেলাম না। রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেলাম।

রোজগার করা নয়, ধার করা দশটা টাকা স্ত্রীর হাতে তুলে দিলাম। তার ভাব দেখে মনে হল সে যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছে।

একটু বাদে আমার সেই ফেলে রাখা সিগারেটগুলি একখানি রুমালে করে সে আমার সামনে এসে দাঁড়াল, বলল, 'নাও। এখনো বোধহয় নষ্ট হয়নি। আমি সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে রেখেছিলাম।'

আমি তার হাত থেকে সিগারেট শুদ্ধু রুমালখানা নিলাম। তারপর সে রান্নাবান্নার কাজে চলে গেলে সবাইকে লুকিয়ে জানলা দিয়ে সিগারেটগুলি খোলা ড্রেনে ফেলে দিলাম। আরো খানিকক্ষণ বাদে আমার স্ত্রী ফের এসে দাঁড়াল। আঁচলে ভিজে হাত মুছতে মুছতে বলল, 'কী ব্যাপার, আজ যে বেরোলে না। পুবের সূর্য পশ্চিমে উঠল নাকি।'

আমি বললাম, 'উঠছে না, অস্ত যাচ্ছে।'

সে বুঝতে না পেরে বলল, 'তোমার যা কথা। এই ভরদুপুরে অস্ত যাবে কি? চুপচাপ বসে আছ। সিগারেটগুলি খেয়ে শেষ করেছ নাকি?'

বললাম, 'হুঁ'।

সে বলল, 'স্মোকার বটে!' তারপর আরো কাছে এগিয়ে এসে অন্তরঙ্গ সুরে বলল, 'আমার আঁচলে খুচরো পয়সা আছে। আনিয়ে দেবো দুটো?'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'না না, এখন না দরকার হলে তোমাকে পরে বলব।'

সন্ধ্যার পর ছেলেরা ঘরে এল। মেয়েরাও বসল কাছে ঘেঁষে। আমাকে এ সময় ওরা পায় না, কোন্ সময়েই বা পায়?

হঠাৎ বড় মেয়ে বীথির চোখেই প্রথম ধরা পড়ল। সে বলল, 'বাবা তুমি সিগারেট খাচ্ছ না?'

তার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম 'না মা। সিগারেট আমি ছেড়ে দিয়েছি।'

বীথি বলল, 'সে কি বাবা!'

বীথির মা বলল, 'তুমি কি রাগ করে...।'

আমি বললাম, 'রাগের তো কোন কথা হয়নি।' এর আগে মাঝে মাঝে সিগারেটের জন্য খোটা শুনেছি। পুড়িয়ে নাকি সব ছাই করে দিলাম। কিন্তু সেদিন তো সত্যিই ওকথা কেউ বলেনি। অমু আর শ্যামুও আপত্তি করে বলল, 'এতদিনের হ্যাবিট একেবারে হঠাৎ ছেড়ে দিলে অসুখ করবে যে?'

ছোট দুই মেয়ে রিতা আর মিতা দাদাদের প্রতিধ্বনি করল, 'তোমার যে অসুখ করবে বাবা।'

অসুখ কথাটির মধ্যে যে এত সুখ ভরা কই এর আগে তো কোনদিন ধরা পড়েনি।

আজ সাতদিন ধরে সিগারেট খাচ্ছিনে। জীবনের বাকি কটা দিনও খাবনা ঠিক করেছি। প্রথম দু'একটা দিন একটু অসুবিধা হয়েছিল কিন্তু সে খুব সামান্য। সাঁইত্রিশ বছরের নেশা। সে তুলনায় অস্বস্তি প্রায় কিছুই হয়নি। সিগারেট খাওয়া আমি অনেক কমিয়ে এনেছিলাম। ইদানীং তো প্রায় চেয়ে চিন্তেই চলত। সিগারেটের বদলে কটা টাকাই বা বাঁচবে। নিজের স্ত্রী-পুত্রের জন্যেই এর চেয়ে বড় ত্যাগ, বড় সংগ্রাম আমি করেছি।

কথটা তা নয় কল্যাণ। সেদিন সেই সন্ধ্যায় আমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়ের মধ্যে বসে যা আমি অনুভব করেছিলাম তার বর্ণনা করলে তুমি হাসবে। আমার সেদিন মনে হয়েছিল একটি সিগারেটের ফুলকি নিভে গিয়ে যেন আমার চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ আশার দীপ জ্বলে উঠেছে। সেই দীপাবলী অবিচ্ছিন্ন অনির্বাণ। আমার মনে হয়েছিল যেন আমি আমার নিজের স্ত্রী-পুত্রের জন্যে সামান্য একটি নেশার বস্তু ত্যাগ করিনি, যেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্যে যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছি। অন্ততঃ বিলিয়ে দিতে পারি, বিলিয়ে দেওয়া কঠিন নয়। আজ সেকথা শুনে তুমিও হাসবে, আমিও হাসি। কিন্তু সেদিনের সেই মুহূর্তটিকে একেবারে হেসে উড়িয়ে দিতে চাই না।'

ছাইদানিটি টেনে নিলেন বিজয়দা। তারপর অন্যমনস্কভাবে পকেটে হাত দিয়ে কি যেন হাতড়াতে লাগলেন। একটু বাদে খেয়াল হওয়ায় নিজেই ফের হেসে উঠে বললেন, 'দেখ কান্ড।'

আমি চেয়ে দেখলাম তাঁর চোখের কোণে দুফোঁটা জল গোপনে কখন যেন এসে আসন নিয়েছে।

সুখ স্বপ্ন — সমীর বসু

সংসারে ধাপ্পা ও জালিয়াতি কোথায় নেই? আজকালকার দুর্দিনের বাজারে অনেকে এদের অর্থোপার্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছে। তবে আমরা প্রায় সকলেই জালিয়াতি না করলেও নিছক আমোদের উদ্দেশ্যে কখনো কখনো ধাপ্পা দিয়ে থাকি। এ জাতীয় ধাপ্পায় কারো ক্ষতি হয় না; কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ হাসতে পারা যায়।

জীবনের অন্যান্য বিভাগের মতো সাহিত্যের ক্ষেত্রেও চুরি, জালিয়াতি ও ধাপ্পার অভাব নেই। অবশ্য কপিরাইট আইন বলবৎ হবার পর প্রকাশ্য চুরি ও জালিয়াতি প্রায় বন্ধ হয়েছে। লেখকদের ধাপ্পা দেবার অভ্যাসটাও বর্তমান শতকে উল্লেখযোগ্যরূপে হ্রাস পেয়েছে। অর্থোপার্জনের জন্য যারা জালিয়াতি করে বা ধাপ্পা দেয় তাদের কথা ভুলে যেতে আমাদের দেরী হয় না। শাস্তি হলেও আদালতের নথিপত্রে তাদের পরিচয় হারিয়ে যায়। কিন্তু লেখকদের ধাপ্পা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান লাভ করে; আমরা তাদের ভুলি না।

সাহিত্যিক ধাপ্পার দৃষ্টান্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, লেখকরা সাধারণতঃ অর্থের লোভে ধাপ্পার আশ্রয় গ্রহণ করে না। লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করাই তাদের ধাপ্পা দেবার উদ্দেশ্য। অর্থ উপার্জনের জন্য এক শ্রেণীর লোক নকল প্রথম সংস্করণ তৈরি করে চড়া দামে বিক্রি করে। এরা প্রায় কেউ লেখক নয়; সুতরাং এদের কথা এখানে আলোচনা করব না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নতুন লেখকদের প্রতিষ্ঠা লাভ করতে বেশ বেগ পেতে হত। তখন কোনো লেখকের প্রশংসা প্রচার করবার মতো বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্র ছিল না। নতুন লেখকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করানো কঠিন ছিল। এই দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অনেক লেখক ধাপ্পার সহায়তা গ্রহণ করত। এই ধাপ্পা কি রকম? যেমন ডিফো (১৬৫৯-১৭৩১) "জার্ণাল অফ দি প্লেগ" বের করলেন বে-নামে। নামপত্রে লিখে দিলেন: "প্লেগের সময় লণ্ডনে অবস্থানকারী একজন নাগরিকের রচিত।" প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাওয়া যাবে বলে পাঠক সমাজে এ-বই সমাদৃত হবে এই আশায় ডিফো ধাপ্পা দিয়েছেন। ১৬৬৫ সালের প্লেগ মহামারীর সময় ডিফোর বয়স মাত্র দু'বছর। সুতরাং তিনি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ তো আর লিখতে পারেন না!

স্কট (১৭৭১-১৮৩২) "রব রয়" উপন্যাসের ভূমিকায় লিখেছেন যে, কাহিনীর খসড়াটা তিনি পেয়েছেন এক অপরিচিত পত্র-লেখকের কাছ থেকে। কিন্তু পরবর্তী এক সংস্করণে তিনি জানিয়েছেন যে, একথা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। ভলটেয়ারের (১৬৯৪-১৭৭৮) "ক্যানডিড" বেরিয়েছিল বেনামে। ভূমিকায় লেখা হয়েছিল যে, জার্মাণ লেখক ডঃ রালফের বইয়ের ফরাসী অনুবাদ এই "ক্যানডিড।" বলা বাহুল্য, জার্মাণ ভাষায় এ বইয়ের অস্তিত্ব ছিল না।

হোরেস ওয়ালপোল (১৭১৭-৯৭) তাঁর "ক্যাসল্ অব ওট্রান্টো" ছাপিয়েছিলেন বে-নামে। ভূমিকায় বলা হয়েছিল যে এটি প্রাচীন ইতালিয়ান গ্রন্থের অনুবাদ। বইটি এক প্রাচীন ক্যাথলিক পরিবারে অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হয়েছে।

এইভাবে মূল লেখকের নাম গোপন করে পাঠকের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করাই ছিল লেখকের ধাপ্পা দেবার উদ্দেশ্য।

পাশ্চাত্যের সাহিত্যে ধাপ্পার যত প্রাচুর্য, আমাদের দেশে তেমন নেই। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে প্রথম ধাপ্পার প্রবর্তন করেন রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১)। বালক রবীন্দ্রনাথ ষোলো বছর বয়সে বৈষ্ণব কবিদের ভাষা ও ভাবের সফল অনুকরণ করে লিখলেন "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী।" এগুলি যে বৈষ্ণব মহাজনদের রচিত আসল পদাবলী নয় তা পণ্ডিতরাও ধরতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ চ্যাটারটনের কাহিনী শুনে এরূপ ধাপ্পা দেবার প্রেরণা পেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন যে, লোকে যদি জানে যে এগুলি বালকের রচিত তা হ'লে তারা মুরুব্বীর চালে পিঠ চাপড়িয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের সম্ভাবনার কথা শোনাবে। কিন্তু "তাহাদের (লেখকদের) যদি বল, এসকল একটি প্রাচীন কবির লেখা, তাহারা অমনি লাফাইয়া উঠিবে, ভাবে গদগদ হইয়া বলিবে, এমন লেখা কখনো হয় নাই, হইবে না, এরূপ অবস্থায় একজন যশোলোলুপ কবি বালক কি করিবে?"

বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-'৯৪) বাঙলা-সাহিত্য সম্বন্ধে বে-নামীতে একটি ইংরাজী প্রবন্ধ লিখেছিলেন "ক্যালকাটা রিভিউতে।" তৃতীয় পক্ষ সমালোচকের মতো তিনি নিজের উপন্যাস সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন। সে মন্তব্যে অসত্য উক্তি কিছু না থাকলেও পাঠকের ধোঁকা লাগবার পক্ষে যথেষ্ট।

এদেশের সাহিত্যিক ধাপ্পার কথা বলতে গেলে প্রথম যে দৃষ্টান্তটি মনে পড়ে তা এই: এক যুবক কাগজে লেখা পাঠিয়ে প্রকাশকদের পাণ্ডুলিপি দিয়ে কোনো সুবিধে করতে পারল না, কেউ তার লেখা ছাপতে রাজী নয়। অথচ সাহিত্যিক হবার তার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। তখন সে নিরুপায় হয়ে ধাপ্পার আশ্রয় গ্রহণ করল। যুবক নিজের হাতে মিলটনের (১৬০৮-'৭৪) 'Samson Agonistes" নকল করে নতুন নাম দিল "Like a Giant Refreshed.' তারপর একে একে নামকরা প্রকাশক ও সম্পাদকদের নিকট পাঠাতে সুরু করল তার নকল পাণ্ডুলিপি। কিছুদিন পর থেকে সে জবাব পেতে আরম্ভ করল। অনেক প্রকাশকই লিখল, বইটি ভালো, তবে ভাষা পুরনো ধাঁচের। একজন প্রকাশক জানাল, বইটি চমকপ্রদ 'উপন্যাস'! আর একজন বইটি প্রকাশ করতে রাজী হল; কিন্তু শ' পাঁচেক টাকা লেখককে দিতে হবে ছাপার খরচা হিসাবে। মিল্টনের বিখ্যাত বইটি কেউ চিনতে পারেনি। সকলে পাণ্ডুলিপি দেখেওনি। দেখলে "সামসন অ্যাগোনিষ্টিসকে" উপন্যাস বলতে পারত না।

যাই হোক, লেখক যশঃপ্রার্থী যুবক সম্পাদক ও প্রকাশকদের চিঠিগুলি পেয়ে উপকৃত হল। সে তার পাণ্ডুলিপির ইতিহাসের সঙ্গে এই চিঠিগুলি যোগ করে একটি প্রবন্ধ লিখল। প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিল "সেণ্ট জেমস গেজেটে।" ছাপার হরফে এই তার প্রথম লেখা, এবং বোধহয় শেষ। ওয়ালশের "হ্যাণ্ডবুকে" ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে।

নিছক কৌতুকের উদ্দেশ্যে ধাপ্পা দেবার সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। কবি আলেকজাণ্ডার পোপ (১৬৮৮-১৭৪৪) তাঁর সদ্যরচিত ব্যঙ্গ কাব্য (Rape of the Lock) সুইফটকে পড়ে শোনাচ্ছেন। ডাঃ পার্নেল ঘরের এক কোণে বসে পোপের কাব্যপাঠ অলক্ষ্যে শুনছিলেন: তাঁর উপস্থিতির কথা কেউ জানত না। ডাঃ পার্নেলের স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। তিনি বাড়ী এসে পোপের কাব্যের একটি সর্গ ল্যাটিনে অনুবাদ করে পুরনো কাগজে ছাই রঙের কালি দিয়ে লিখে রাখলেন। কিছুদিন পরে একটি বৈঠকে পোপ যখন আবার "রেপ অব দি লক" পড়ছিলেন তখন পার্নেলও উপস্থিত ছিলেন। কাব্যপাঠ শুনে পার্নেল মন্তব্য করলেন এটা তো ল্যাটিন থেকে অনুবাদ। পোপ লাফিয়ে উঠলেন। অনুবাদ! এমন সাধনার মৌলিক কাব্যকে বলছে অনুবাদ! পোপ তখন ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। এরূপ অন্যায় মন্তব্যে তিনি ক্রুদ্ধ হলেন। প্রমাণ দাবি করলেন তিনি। পার্নেল প্রমাণ উপস্থিত করে বললেন। এক প্রাচীন খৃষ্টান মঠে একটি ল্যাটিন কাব্যের টুকরো টুকরো অংশ পাওয়া গেছে। তার একটি অংশ তিনি পেয়েছেন। পোপ তো তাঁর কাব্যাংশে সঙ্গে পুরনো পাণ্ডুলিপির হুবহু মিল দেখে হতবাক। কিছুতেই তিনি ভেবে পেলেন না এমন মিল কি করে হতে পারে। পার্নেল যতদিন পর্যন্ত দয়া করে রহস্য ভেদ করেননি, ততদিন তাঁর মন এ ব্যাপারে ভারাক্রান্ত ছিল।

বার্ক (১৭২৯-'৯৭) একবার বাজি ধরে লিখেছিলেন Vindication of natural Society. বাজির সর্ত ছিল এই যে, ভাষা ও রচনারীতি এমন হবে যে পাঠকরা মনে করবে বইটি পরলোকগত বোলিঙব্রোকের লেখা। বইয়ে লেখকের নাম ছিল না; নামপত্রে উল্লেখ ছিল: "by a late Noble writer." বার্ক বাজি জিতেছিলেন। দীর্ঘকাল যাবৎ অভিজ্ঞ সমালোচকরাও বুঝতে পারেননি যে বইটি প্রকৃতপক্ষে বার্কের রচনা।

প্রস্পের মেরিমে (১৮০৩—৭০) তাঁর প্রথম রচিত নাটকগুলি নিজের নামে প্রকাশ করেননি। নাটক-সংগ্রহের ভূমিকায় বলা হয়েছিল যে, জিব্রলটারের ক্লারা গাজল নামে এক মহিলা এই নাটকগুলির লেখিকা। স্প্যানিশ ভাষা থেকে নাটকগুলি ফরাসী ভাষায় অনুবাদের দায়িত্ব পর্যন্ত মেরিমে গ্রহণ করেননি। একজন কাল্পনিক অনুবাদকের নাম বইয়ে ছাপা হয়েছিল। এই কল্পিত লেখিকার এক সুবিস্তৃত জীবনী নাট্যগ্রন্থাবলীর ভূমিকার সহিত যোগ করা সত্ত্বেও ক্লারা গাজলকে কেউ খুঁজে পায়নি। যদিও একজন "বিজ্ঞ" সমালোচক তথাকথিত অনুবাদ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন যে, অনুবাদ

ভালো হলেও "মূলের" তুলনায় নিকৃষ্ট। কোথায় মূল স্প্যানিশ লেখিকার রচনা? মেরিমি ধাপ্পা দিলেন; তার উপরে আবার সমালোচকের ধাপ্পা!

জোনাথান সুইফটের (১৬৬৭—১৭৪৫) ধাপ্পা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর "গালিভার্স ট্র্যাভেলস্" প্রথমে বেরিয়েছিল বে-নামে। প্রকাশকের নিবেদনে বলা হয়েছিল যে, মিঃ লেমুয়েল গালিভার পুস্তকের সম্পাদকের বহুদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মিঃ গালিভার জীবিত আছেন এবং থাকেন নিউইয়র্কে। পাঠকদের বিশ্বাস উৎপাদন করবার জন্য গালিভারের একটি ছবি ও স-তারিখ নাতিপত্র চিঠি ছাপা হয়েছিল। বই বের হবার পর অনেক পাঠক নিউইয়র্কে গিয়ে বৃথাই গালিভারের খোঁজে ঘুরে এসেছে।

বই শেষ করবার পর সুইফটের আশংকা হয়েছিল যে, এমন আজগুবি ভ্রমণ কাহিনী পাঠকরা হয়ত সম্পূর্ণ উদ্ভট বলে গোড়াতেই বাতিল করে দেবে। তাই তিনি সত্য কাহিনী হিসাবে চালাবার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করেছিলেন।

কবি শেলী (১৭৯২—১৮২২) প্রথম যৌবনে একবার ধাপ্পা দিয়েছিলেন। The Posthumous Fragments of Margaret Nicholson. নামে একটি পুস্তিকা তিনি প্রকাশ করেছিলেন। পুস্তিকার সম্পাদক হিসাবে ছাপা হয়েছিল মার্গারেটের এক কল্পিত ভাইপোর নাম। মার্গারেট ছিল এক বিকৃত-মস্তিষ্ক ধোবানী। ইংলণ্ডের সম্রাট তৃতীয় জর্জকে হত্যা করবার চেষ্টা করায় তাকে পাগলা গারদে দেওয়া হয়েছিল। এই পাগলীর মুখ দিয়ে এমন সব কথা বলানো হয়েছিল যে, রাজদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হবার আশঙ্কায় নিজের নাম গোপন রেখেছিলেন।

বিখ্যাত ফরাসী লেখক আলেকজান্দার দুমা (১৮২৪—১৮৯৫) নাকি মোট প্রায় বারোশ গল্প, উপন্যাস ও নাটক লিখেছিলেন। একজনের পক্ষে কি এত লেখা সম্ভব? বাজারে তাঁর লেখার খুব চাহিদা; দুমার নাম থাকলে যে কোনো লেখা হুহু করে বিক্রি হয়ে যায়। দুমা অর্থোপার্জনের এই লোভ ছাড়তে পারেননি। ভাড়াটে লেখকের লেখা নিজের নামে প্রকাশ করেছেন বলে অভিযোগ আছে তাঁর বিরুদ্ধে। অধিকাংশ লেখক নিজেদের লেখা অন্যের বলে চালিয়ে ধাপ্পা দিয়েছেন; এখানে তার উল্টো। দুমা অন্যের লেখা নিজের বলে ভক্ত পাঠকদের ধাপ্পা দিয়েছেন। গল্প আছে, দুমা একদিন তাঁর ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আমার শেষ লেখাটা পড়েছ?' ধূর্ত ছেলে তৎক্ষণাৎ প্রতিপ্রশ্ন করল, 'তুমি নিজে পড়েছ তো?'

ইংরেজী সাহিত্যের তিনজন বিখ্যাত ধাপ্পাবাজ লেখক জেমস্ ম্যাকফারসন, টমাস চ্যাটারটন ও উইলিয়াম হেনরি আয়র্ল্যান্ড। এদের জালিয়াতও বলা যায়। কারণ ধাপ্পা দেবার জন্য এরা জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছিল।

জেমস্ ম্যাকফারসন (১৭৩৬—১৭৯৬) ছিলেন স্কুলের শিক্ষক। প্রাচীন গেইলিক উপজাতির (স্কটল্যান্ডের পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দা) কতকগুলি কবিতা সংগ্রহ করে ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করবার পর ম্যাকফারসনকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আরো গেইলিক কবিতা সংগ্রহের জন্য অর্থ সাহায্য করা হয়। স্কটল্যান্ডের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে কিছুকাল ঘোরাঘুরির পর তিনি ঘোষণা করলেন যে, কিংবদন্তী-প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ও কবি ওসিয়ানের রচিত একটি কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তিনি আবিষ্কার করেছেন। ওসিয়ানের পিতা ফিংগালের জীবনকাহিনী এই কাব্যের বিষয়-বস্তু। ম্যাকফারসন গেইলিক ভাষা থেকে এই কাব্যের ইংরেজী "অনুবাদ" প্রকাশ করেন। আসলে এটি মস্ত বড় ধাপ্পা। ম্যাকফারসনই কাব্যের রচয়িতা। মূল পাণ্ডুলিপি কেউ চেষ্টা করেও দেখতে পায়নি। ম্যাকফারসনের তথাকথিত "অনুবাদ" প্রকাশিত হবার পরেই ডাঃ জনসন সন্দেহ প্রকাশ করেন। ম্যাকফারসন আর প্রাচীন গেইলিক কবিতা আবিষ্কারের ধাপ্পা দেননি। এরপর থেকে তিনি ইতিহাস ও রাজনীতির চর্চা করেছেন।

ম্যাকফারসনের "ওসিয়ান" গোটে শিলার শাতোব্রিয়াঁ প্রভৃতি বিখ্যাত য়ুরোপীয় লেখকদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। গোটের Sorrows of Werther-এ দেখতে পাই ভেটার তার দয়িতা লোটিকে ওসিয়ান পড়ে শোনাচ্ছে।

ম্যাকফারসন শুধু ধাপ্পাবাজই ছিলেন না, কবি প্রতিভারও অধিকারী ছিলেন। টমাস চ্যাটারটনের (১৭৫২—'৭০) কবি প্রতিভাও প্রখর ছিল। কিশোর চ্যাটারটন ঘোষণা করলেন যে, তিনি ব্রিস্টলের এক গির্জায় পুরনো কাগজপত্রের মধ্য থেকে টমাস রাউলি নামে পঞ্চদশ শতাব্দীর এক কবির কাব্য আবিষ্কার করেছেন। বলা বাহুল্য, এ সবই ধাপ্পা, কবিতাগুলি চ্যাটারটনেরই লেখা। কিন্তু কিশোর কবি পঞ্চদশ শতাব্দীর ভাব, ভাষা ও পরিবেশ এমন নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন যে পাঠকের মনে কাব্যের যাথার্থ্য সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

চ্যাটারটন অনেক চেষ্টা করেও টমাস রাউলির কবিতা প্রকাশের জন্য কোনো প্রকাশক পেলেন না। তখন তিনি সাহায্যের আশায় পাণ্ডুলিপি পাঠালেন হোরেস ওয়ালপোলকে। পূর্বেই বলেছি, ওয়ালপোল নিজেই 'দি ক্যাসল অব ওত্রান্তো' সম্পর্কে ধাপ্পা দিয়েছিলেন। কিন্তু ওয়ালপোল প্রথমে চ্যাটারটনের দাবিকে যথার্থ বলে ভেবেছিলেন; তারপরে যখন বুঝলেন এটা ধাপ্পা, তখন উপদেশ দিয়ে চিঠি লিখলেন চ্যাটারটনকে। চ্যাটারটন বারবার অনুরোধ করেও ওয়ালপোলের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি ফেরৎ পাননি।

রাউলি ও তার কবিতার কথা ভাবতে ভাবতে চ্যাটারটনের মানসিক রোগ হল। তিনি নিজেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর খৃষ্টান সন্ন্যাসী বলে মনে করতেন; জীবনযাত্রার ধরণও হয়ে গেল খৃষ্টান সন্ন্যাসীদের মতো। কবিতার যথাযোগ্য মর্যাদালাভ না করতে পারার বেদনায় এবং দারিদ্র্যের জ্বালায় চ্যাটারটন ১৭৭০ সালে বিষ পান করে আত্মহত্যা করলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো। মৃত্যুর পরে ওয়ালপোল চ্যাটারটনের কবিপ্রতিভার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তাঁর সব রচনা এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। অশ্লীলতার জন্যই নাকি অপ্রকাশিত রচনাগুলি ছাপানো যায় না।

চ্যাটারটনের করুণ কাহিনী আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। ধাপ্পার কথা মনে থাকে না।

ম্যাকফারসন ও চ্যাটারটন নিঃসন্দেহে কবি প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু উইলিয়াম হেনরি আয়র্ল্যান্ডের (১৭৭৭—১৮৩৫) সাহিত্য প্রতিভার তুলনায় জালিয়াতির প্রতিভা ছিল বেশী। আয়র্ল্যান্ডের সুবিধা ছিল এই যে, তাঁর বাবা বইয়ের ব্যবসা করতেন; সুতরাং ছেলেবেলা থেকে পুরনো বই দেখবার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। সাত বছর বয়সে তিনি একবার স্ট্র্যাটফর্ড-অন-অ্যাভন-এ বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেই থেকে শেক্সপীয়ার সম্বন্ধে তিনি খুব আগ্রহান্বিত হয়ে পড়াশোনা করতে আরম্ভ করেন। চ্যাটারটনের বোনের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় ধাপ্পা দেবার কথা তাঁর মনে হয়।

প্রথম প্রথম তিনি শেক্সপীয়ারের স্বাক্ষর, একটা সনেট বা নাট্যাংশ নকল করে লোকের মনে কিছুটা বিশ্বাস উৎপাদন করলেন; তিনি জানালেন শেক্সপীয়ারের স্বহস্তে লিখিত এই কাগজগুলি এক ভদ্রলোকের বাড়িতে পুরনো কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গেছে। সাহস বেড়ে গেল। আয়র্ল্যান্ড এবার একটি সম্পূর্ণ নাটক লিখে শেক্সপীয়ারের নামে চালিয়ে দিলেন। নাটকটির নাম "Vortigern and Rowena"; হলিনশেডের "ক্রনিকল্"-এর উপর ভিত্তি করে রচিত। আয়র্ল্যান্ডের বয়স তখন মাত্র আঠারো। এই নাটক রচনা করতে তাঁর দুমাস সময় লেগেছে। আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে শেক্সপীয়ারের লেখার ছাঁদ, ভাষা ইত্যাদি অনুকরণ করেছেন। এলিজাবেথান যুগের বই থেকে শাদা পৃষ্ঠা সংগ্রহ করে এক বিশেষ ধরণের কালি দিয়ে নাটকটি এমনভাবে লেখা হয়েছিল যে, বিশেষজ্ঞরাও কোনো ত্রুটি আবিষ্কার করতে পারেননি।

শেক্সপীয়ারের নতুন নাটক আবিষ্কৃত হয়েছে জেনে ইংলণ্ডে হৈচৈ পড়ে গেল। প্রিন্স অব ওয়েলস নিজে তাদের বাড়ি এসে আয়র্ল্যান্ডকে অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন। বিখ্যাত নাট্যকার শেরিডানের প্রযোজনায় এই নতুন নাটকটি ড্রুরি লেন থিয়েটারে ১৭৯৬ সালের ২রা এপ্রিল অভিনীত হল। প্রসিদ্ধ অভিনেতা কেম্বল্ নিয়েছিলেন নায়কের পার্ট। আয়র্ল্যান্ড রয়েল্টি হিসাবে পাঁচ হাজার টাকা পাবেন চুক্তি হয়েছিল।

অভিনয় জমেনি, কারণ নাটকটি কাঁচা। তবু দীর্ঘকাল লোকে ভেবেছে এটি বোধহয় শেক্সপীয়রের প্রথম জীবনের রচিত নাটক; তাই অপরিণত। তারপর আয়র্ল্যান্ডই এক স্বীকারোক্তি প্রকাশ করে সকল রহস্য ফাঁক করে দেন।

আজকাল সমালোচকের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়েছে, তাদের সংখ্যা বেড়েছে। তাছাড়া প্রকাশক ও গ্রন্থাগারিকরা বই সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী। তাই এখন ধাপ্পা দেওয়া সহজ নয়। তথাপি সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর সাহিত্যিক ধাপ্পা হল লামা লপসাং রাম্পার 'দি থার্ড আই।' একজন তিব্বতী লামার আত্ম-জীবনী হিসাবে এ বই গত বছর প্রকাশ করা হয়েছে। বইয়ের মধ্যে তিব্বতের পরিবেশ নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন লেখক। কিন্তু পরে জানা গেল লেখক লামা নয়, তিব্বতবাসীও নয়। কিন্তু প্রকাশকের বিশেষজ্ঞ সম্পাদকমণ্ডলী ধাপ্পা ধরতে পারেনি।

একটি অভিশাপ

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মিথিলার সমীপস্থ বনে এক আশ্রম। ঘন সবুজের নির্জন সমারোহ-তটে আর একটুখানি ছন্দোবদ্ধ সবুজের মত। সমস্ত তমসার অবসান লেখা সেই তপোবনের রূপে। পুষ্প-ফল-সমন্বিত পুণ্য আশ্রম।

আশ্রমে বাস করেন ত্রিকালদর্শী মুনি মহাযশা গৌতম। মানুষের আচার-কলা-নিষ্ঠার নিয়ামক। মানুষের নীতি, মানুষের রীতির সংহিতাকার। স্থির চিত্ত, স্থিরবুদ্ধিরসংযুত জ্যোতির্ময় পুরুষ।

আর থাকেন এক নারী। ত্রিভুবনের আকাঙ্ক্ষা দিয়ে গড়া সেই নারী। বিধাতার যত্নে সৃজিত, নিদ্রা-জাগরণ-স্মরণপথের মায়াময়ী মনোহারিণী অগ্নিশিখার মত বর্ণমদির, ভাস্বরদোহিনী, অনন্তযৌবনা।

কিন্তু সেই অপরূপার মর্মস্তলে বর্ষণোন্মুখ মেঘের মত একখানি সংগোপন বেদনা পুঞ্জীভূত। পূর্ণচন্দ্র প্রভার মত তাঁর দীপ্ত রূপও যেন সেই বেদনাভারে তুষারাবৃত। অতি দীর্ঘ কৃষ্ণ তারা সজল-চঞ্চল দু' চোখ মেলে সেই রমণী ঋষিকে দেখেন। তাঁর প্রিয় ঋষিকে দেখেন চেয়ে চেয়ে। মহাতেজা তপোমগ্ন ঋষি। কখনো শিষ্য পরিবৃত জ্যোতির্জ্ঞানদানে রত। কখনো বা মানুষের রীতি-নীতি, আচার-কলা-নিষ্ঠার সংহিতা রচনা করে চলেন। চলেন বটে, কিন্তু এ পৃথিবীর সামগ্রীর প্রতি দৃষ্টি নেই, অন্তরীক্ষে কি দেখার আনন্দে যেন স্থিরচিত্ত।

রমণী ভাবেন, এ কি অমোঘ নিয়মে বন্দী তাঁর প্রিয় ঋষি! রমণীর মন কি নিয়মের বাইরে? নিয়মের বাইরে রমণী মনের রীতি-নীতি? একটা দিনের জন্যেও মর্ত্যের তৃষ্ণা, মর্ত্যের আকুতি দেখলেন না তাঁর প্রিয় ঋষির অচপল সন্ধানী ওই চোখের তারায়। দিন আসে সূর্য ওঠে। রাত্রি হয় চাঁদ হাসে। আষাঢ়ের তপোবনে নেমে আসে নীল মেঘের ছায়া। শীত অবসানে প্রকৃতির তনুতে দেখা দেয় সবুজের আভাস। বসন্তের সৃষ্টি-সজ্জার সমারোহে সেজে ওঠে মহাবীর্যবতী বসুন্ধরা। মর্ত্যের এই কাল-চক্রাবর্তে বাঁধা পড়েননি শুধু এক মর্ত্যের মানুষ, যিনি রচনা করেন মর্ত্যের রীতি-নীতি, নিয়ম-নিষ্ঠার সংহিতা। মানুষ নন, ঋষি। প্রিয় ঋষি।

এক নিস্পৃহ সম্পূর্ণতার সমাধিবেষ্টনে অচঞ্চল, অচপল। মর্ত্যের এতটুকু ফাঁক নেই কোথাও। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন রমণী, পরিপূর্ণতার ডালি নিয়ে ফিরে যান। কুটির মধ্যে চলে যান বাতান্দোলিত লতার মত সৌন্দর্যের তনুভার নিয়ে।

এমনি করেই দিন গেছে, বছর গেছে, সহস্র বৎসর উত্তীর্ণ প্রায়।

না তারও অনেক, অনেক আগে থেকে দেখে এসেছেন এই জ্যোতিঃসিদ্ধ অচঞ্চল মূর্তি। রমণী তখন শুধু কুটিরবাসিনী। কুটির সীমন্তিনী নন। আর ওই মহাতপা জিতেন্দ্রিয় ঋষি তখনো হননি প্রিয় ঋষি।......কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, হয়েছিলেন কি না।

সেদিনের কথা বিমনা হয়ে ভাবেন রমণী। কেন শুধু প্রজা সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হলেন না পিতা ব্রহ্মা? কেন অস্তিত্বের নিঃসীম সৌন্দর্য আহরণ করে করে এই দেহতটে এনে বন্দী করলেন তাঁকেও? সেই অনির্বাণ রূপে কোনো হল নেই, কোনো বিরূপতা নেই বলেই খেয়ালী স্রষ্টা অহল্যা নামে বিভূষিত করেছিলেন তাঁকে। প্রাণ-চেতনায় দু' চোখ মেলে দেবতাদেরও চাঞ্চল্য উপলব্ধি করেছিলেন অহল্যা। মুগ্ধ কামনায় অধীর প্রশ্ন জেগে উঠেছিল তাঁদের দেব নেত্রে। কার জন্য এই মনোমোহিনী সৃষ্টি? কোন দেবতার ভোগ্যা হবেন?

কিন্তু পিতা ব্রহ্মার বিচিত্র রীতি।

এই আশ্রমে, এই কুটিরে, এই ঋষির কাছে গচ্ছিত রেখে গেলেন তাঁকে। বলে গেলেন, শুধু সযত্নে লালন কোরো আমার মানসী কন্যাকে।

সযত্নে শুধু লালনই করেছিলেন ঋষি। তার বেশি কিছু মাত্র নয়। গচ্ছিত ধনকে আগলে রেখেছিলেন শুধু, কিছুমাত্র নয় তার বেশি। ভুবনমোহিনী নারীর অতি দীর্ঘ কৃষ্ণ তারা কত সময়ে আবদ্ধ হয়েছে ওই জ্যোতির্ধ্যানী মুখের ওপর। কিন্তু না। কোনো ব্যতিক্রম দেখেননি অহল্যা। ওই বক্ষ অশান্ত হতে দেখেননি এক মুহূর্তের জন্য। তপশ্চর্যায় বিঘ্ন ঘটেনি এক দণ্ডের জন্য। মানুষের রীতি-নীতি, আচার-সংহিতা রচনায় ছেদ পড়েনি একটি দিনের জন্যও।

• •

দিন গেছে, বছর গেছে, শত শত বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছে।

তারপর সহসা একদিন ডাক পড়েছে তাঁর। ঋষি ডেকেছেন। সে আহ্বান যেন একটি স্পর্শ হয়ে বিহ্বল করে ফেলেছে তাঁকে। ধড়মড়িয়ে উঠেছেন অহল্যা।

ঋষি ডেকেছেন, এসো।

কিন্তু এ ডাক যেন হিমগিরির নিঃসৃত একটা শব্দ ধ্বনি মাত্র।

তবু অহল্যার বিস্মিত নেত্রে একটুখানি জিজ্ঞাসার আশা।

ঋষি বললেন, তুমি গচ্ছিত ছিলে, এতদিনে সময় হয়েছে যাঁর কাছ থেকে এসেছিলে তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার।

নিষ্প্রাণ বহুমূল্য একখানি গচ্ছিত রত্নকেই যেন নিরাসক্ত চিত্তে ঋষি প্রত্যর্পণ করলেন ব্রহ্মার কাছে। দেবতারা সাধু সাধু করে উঠলেন ঋষির জিতেন্দ্রিয় সিদ্ধির মাহাত্ম্য দেখে। কিন্তু অহল্যা দর্শনে দেবতাদের বাসনা তীক্ষ্ম হয়ে উঠল আবার। এবারে কোন দেবতাকে অর্পণ করবেন ব্রহ্মা এই মূর্তিমতী মাধুর্যময়ীকে? দেবগণের রুদ্ধ-শ্বাস, কম্প্রবক্ষ, স্থির নেত্র।

কেবল সুরপতি ইন্দ্র ছাড়া। তিনি জানেন সুরশ্রেষ্ঠ তিনি। যোগ্যতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ব্রহ্মা নিঃসন্দেহে স্বপ্নদৃষ্ট ত্রিভুবনমোহিনী অহল্যাকে অর্পণ করবেন তাঁরই কাছে। অনঙ্গ নিপীড়িত মৃদু হাস্যে রমণীর রূপলেহন করেন সুরপতি ইন্দ্র।

কিন্তু মর্ত্যের এই ঋষির প্রতিই দৃষ্টিপাত করলেন ব্রহ্মা। পুরস্কৃত করলেন তাঁকেই। বললেন, এবারে এই রমণীকে তুমি গ্রহণ করো।

শুনে দেবগণ হতাশাস্পৃষ্ট, সুরপতির আনন ভ্রূকুটিকুটিল।

আবার সেই বন-বীথিকার আশ্রম, আর সেই ঋষি। কিন্তু এক নয় ঠিক। অহল্যার প্রিয় কুটির, আর প্রিয় ঋষি। আশা-আকাঙ্ক্ষা ভরা গভীর দুটি চোখ মেলে অহল্যা আবারও চেয়ে চেয়ে দেখেছেন তাঁর প্রিয় ঋষিকে। ঋষি আনন্দিত। কিন্তু অহল্যা নির্বাক, সে আনন্দ সিদ্ধিলাভের, প্রাপ্তির নয়। এতকাল না পাওয়ার বেদনা যাঁকে স্পর্শ করেনি, এই পাওয়ার মাঝেও তিনি ঠিক তেমনি নির্বিকার। এই প্রাপ্তিতে মর্ত্যের কামনা, মর্ত্যের তৃষ্ণার চিহ্ন মাত্র নেই।

তেমনি এক মনে, এক ধ্যানে মানুষের রীতি-নীতি, নিয়ম-নিষ্ঠার সংহিতা রচনা করে চলেন ঋষি। অহল্যা এই নিয়মের অঙ্গীভূত হয়েছেন শুধু। যোগীর রসভাবে সহবাস থেকে বঞ্চিত হননি তিনিও। কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ যিনি, কোনো রসের তৃষ্ণা নেই যাঁর মধ্যে, তাঁর কাছে এই পরিপূর্ণতার ডালি তো শুধু শুষ্ক নিবেদন মাত্র।

দিন যায়, বছর যায়, সহস্র বৎসরের অবসান হয়ে আসে আবার।

ঋষির দিকে চেয়ে চেয়ে মর্ত্যের অসম্পূর্ণতা অনুসন্ধান করেন অহল্যা। মর্ত্যের তৃষ্ণার প্রতীক্ষা করেন।

ওদিকে কামনায় অধীর হয়ে উঠেছেন সুরপতি ইন্দ্র। ক্রুদ্ধ, অসহিষ্ণুতায় মর্ত্যে নেমে আসতে হয়েছে তাঁকে। দেবতারা জানেন, তাঁদের রাজ্য নিরঙ্কুশ করার জন্যেই মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়েছেন ইন্দ্র। ঋষি গোতমের মহা-সাধনায় বিঘ্ন না ঘটালে সুরপতির আধিপত্য নিঃশেষ হবে, রূপান্তর ঘটবে স্বর্গের রীতির। তাই গোতমের শিষ্য হয়েছেন সুরপতি ইন্দ্র। ছলনাগূঢ় কৌশলে প্রিয় শিষ্য হয়ে উঠেছেন। ঋষির অভিশাপগ্রস্ত হলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে স্বর্গের—ঋষির পক্ষে সে তো স্খলনেরই নামান্তর। দেবতারা নিজের গরজে ইন্দ্রকে রক্ষা করবেন অভিশাপ থেকে, উপায় নির্ধারণ করবেন কিছু। ইন্দ্র নিশ্চিন্ত তাই।

কুটির-সীমন্তিনী অহল্যা একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা উপলব্ধি করেন শুধু। কার অজ্ঞাত কামনার আঁচ লাগে, রোমাঞ্চ জাগায়। এই আঁচ, এই রোমাঞ্চ কাম্য। প্রিয় ঋষির দিকে চেয়ে থাকেন নির্নিমেষে। কিন্তু না। তেমনি ঊর্ধ্বলোকে, অন্তরীক্ষ পথে অনুপস্থিত তাঁর দৃষ্টি।

একদিন।

মহাকালের চক্রধারা থেকে যেন বিচ্ছিন্ন ওই একটি দিন। অহল্যা বিমনা হয়ে পড়ছেন বারবার। এক অজ্ঞাত শিহরণের অনুভূতি চোখের কোণে অশ্রু হয়ে জমে উঠছে থেকে থেকে। মনে হচ্ছে কিছু যেন ঘটবে আজ। কালান্তক কিছু। এ কি তাঁর প্রিয় ঋষির অমঙ্গলের সূচনা কোনো? অহল্যা আনমনা হয়ে পড়েন আবার।

ঋষি নদীতে গেছেন উপাসনা স্নানে। পুণ্যস্নানে অন্তরলোক শুদ্ধির মার্জনায় মর্ত্যের আকর্ষণ শিথিল হবে আরো একটু।

কুটিরের মধ্যে সহসা সচকিত হয়ে ওঠেন অহল্যা। নির্জন বন-পথের শুষ্ক পত্র মর্মরে কার পদধ্বনি কানে আসে? পদধ্বনি অচেনা নয়। কিন্তু যেন চেনাও নয় ঠিক। প্রায় সঙ্গীতের মত লাগছে সেই ত্বরিত পদধ্বনি। প্রিয়া-বিরহক্লিষ্ট তৃষাতপ্ত আর্তি নিয়ে আসছেন যেন কেউ। প্রিয় ঋষি আসছেন। কিন্তু এই আসার মধ্যে মর্ত্যের সুর বাজছে কেমন করে? তাছাড়া এরই মধ্যে তো তাঁর ফেরার কথা নয়!

কিন্তু তবু আসছেন তিনি সন্দেহ নেই।

তাড়াতাড়ি কুটির আঙিনায় এসে দাঁড়ালেন অহল্যা। ঋষি এলেন। হাতে কমণ্ডলু। সদ্য-স্নাত। কিন্তু সে স্নান অসমাপ্ত বোঝা যায়। সর্বাঙ্গে তাঁর ব্যাকুল প্রত্যাশা, দুই চোখে মর্ত্যের কামনা, মর্ত্যের তৃষ্ণা!

অর্ধ বিস্ময়ে, অর্ধ বিশ্বাসে অহল্যা স্তব্ধ ক্ষণকাল। মৃগী চোখের ক্ষণ বিহ্বলতায় চেয়ে থাকেন ঋষির দিকে।

ঋষি হাসছেন মৃদু-মন্দ। সেই হাসিতে মর্ত্যের আমন্ত্রণ, মর্ত্যের নিবিড়তা। বহু যুগের প্রবাস অবসানে নির্নিমেষ বিহ্বলতায় দেখছেন যেন আপন প্রিয়াকে। চন্দ্রকর আর পুষ্প সৌরভকে শরীরী করে গড়ে তোলা নারীকে দেখছেন প্রথম দর্শনের নির্বাক ব্যাকুলতায়।

সেই অবকাশে ঋষিকে নিবিড় করে পর্যবেক্ষণ করে নিলেন অহল্যা।...ঋষি, তাঁরই প্রিয় ঋষি বটে। তাঁরই বহু প্রত্যাশিত মর্ত্যের তৃষ্ণা নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু এমন লাগছে কেন? ওই কুন্দ-ধবল ঋষি অঙ্গে কোথায় দেখা এক পিঙ্গল জ্যোতির আভা জাগছে কেন? নিরাভরণ কর্ণদ্বয়ে যেন চেনা দুটি মণিময় কুণ্ডলের দ্যুতির আভাষ কেন? ঋষি আননের দিকে চেয়ে চেয়ে চেনা একটা কণ্টক পাশের ছায়া চোখে ভাসছে কেন? কমণ্ডলু ধরা হাতে কেন দেখছেন বজ্রায়ুধের গোপন্ত শক্তি? ঋষিবেশে প্রচ্ছন্ন দেখছেন কেন এক যুদ্ধনিপুণ, ঝটিকা-প্লাবন প্রাকৃতিক অধিষ্ঠাতার ছদ্ম সাজ? আর ওই প্রণয়াভিলাষী দুই চোখের গভীরে কেন অমরাবতীর সোমাসক্ত আবেশ?

কিন্তু সামনে দাঁড়িয়ে ঋষি। অহল্যার প্রিয় ঋষি। যাঁর চোখে মর্ত্যের চাতক-তৃষ্ণা। অহল্যার সহস্র বৎসরের প্রতীক্ষিত।

সহসা সচেতন হলেন অহল্যা। স্ফুরিত-বিম্বাধরে হাসির ঝলক দেখা দিল। নিবিড় কটাক্ষপাত করলেন ঋষির প্রতি। সেই বিদ্যুদ্দামস্ফুরণচকিত কটাক্ষ, অপাঙ্গ অর্ধ-দৃষ্টি, যোগী-মুনি-যুবা-বৃদ্ধ-বিভ্রমী ওষ্ঠ দর্শনের পুলকিত শিহরণে ঋষির মর্ত্য কামনা উদ্বেলিত।

অহল্যা বললেন, এমন অসময়ে ফিরলে?

ঋষি বললেন, স্নান সম্পন্ন হল না, তোমার সহস্র বৎসরের ব্যর্থ প্রতীক্ষা হঠাৎ যেন শুনতে পেলাম ভরা নদীর হাহাকারে। পয়স্বিনীর ঢেউ বারবার আমাকে ঠেলে দিতে লাগল এই কুটিরের দিকে। আজ ধন্য আমি, নতুন দৃষ্টিতে দেখতে পেলাম তোমাকে, আমাকে বিমুখ কোরো না।

অহল্যা হাত ধরলেন তাঁর। ডাকলেন এসো।

তারপর প্রকৃতির রুদ্ধ বাতাসে তপোবনের পল্লব মর্মর নিথর হয় কিছুক্ষণের জন্য। শিরিষ শাখায় ফাগুন স্তব্ধ হয়ে থাকে। শাল-তাল-তমালের মূক ছায়া দীর্ঘতর হয়ে অসময়ে কুটির প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

ঋষি বহির্গমনের জন্য প্রস্তুত হলেন। অসমাপ্ত স্নান সমাপন করতে যাবেন এবার। কিন্তু অন্তস্তলের এক গোপন উল্লাস ঋষি অঙ্গে সেই চেনা পিঙ্গলের আভা ছড়াচ্ছে। অহল্যার দীর্ঘায়ত নেত্র-পল্লব ঋষির মুখে স্থির সংবদ্ধ। শান্ত মুখে প্রশ্ন করলেন, তৃপ্ত হয়েছ বাসব?

বাসব! শোনামাত্র দারুণ বিস্ময়ে চমকে উঠলেন বজ্রাহত ঋষি। আবার নতুন করে দেখলেন যেন চম্পকদাম-বর্ণ ফুল্লেন্দীবরতনু-চক্ষু নারীকে। বিহ্বল প্রশ্ন করলেন ফিরে, আমাকে চিনেছিলে তুমি?

চিনেছিলাম বাসব।

ঋষিবেশী বাসবের সোমাসক্ত নেত্রদ্বয় নারীতনুহরণের আনন্দ-স্মৃতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ঈষৎ বক্রকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, চিনেও আমাকে গ্রহণ করেছ?

অহল্যা বললেন, তুমি চতুর বাসব! আমার প্রিয় ঋষির মূর্তিতে সহস্র বৎসরের প্রতীক্ষার রূপ নিয়ে এসেছ তুমি। আমিও তৃপ্ত। কিন্তু তুমি চলে যাও বাসব, ঋষির প্রত্যাবর্তনের সময় হল, তাঁর কোপ থেকে নিজেকে রক্ষা করো।

দ্রুত প্রস্থানোদ্যত হলেন ঋষিরূপী বাসব।

কিন্তু বিলম্ব হয়ে গেছে। আশ্রমের আঙিনায় এসে পড়েছেন অমিত বীর্যবলের আশ্রয়নিবন্ধন দেবগণেরও দুর্ধর্ষ দীপ্ততেজ ঋষি গোতম। পুণ্যতীর্থ সলিলে সিক্ত দেহ, আজ্যাসিক্ত অনলের মত রুদ্র-নেত্র গোতম। হাতে কুশ ও সমিধ। আশ্রমের দিকে দ্রুত ধেয়ে আসছেন। যথার্থই আজ পুণ্য স্নান সমাপন হয়নি তাঁরও। যথার্থই আজ পুণ্যপয়স্বিনীর ঢেউ অসময়ে তাঁকে ঠেলে দিয়েছে এই কুটিরের দিকে।

গোতমের অভিশাপ নিয়ে নতশির বিষণ্ণ-বদনে প্রস্থান করলেন সুরপতি ইন্দ্র।

তারপর রুদ্ধ রোষে ঋষি তাকালেন ভার্যা অহল্যার দিকে। শত সহস্র বৎসরের ধ্যানী স্থৈর্য ধূলিসাৎ হল এক মুহূর্তে। বজ্রকণ্ঠে

(ইহার পর ৯২ পৃষ্ঠায়)

যাঁর কথা বলছি তিনি ছিলেন এক আশ্চর্য মানুষ। ছেলেবেলা থেকেই জানতাম যে, এই মানুষটি আমাদের সকলের থেকে আলাদা দরের। ঠিক মামুলী জাতের নয়।

যাকে বলে শতায়ু, অর্থাৎ একশো বছরের পরমায়ু, আমার ঠাকুরদাদার পিসিমার সম্বন্ধে প্রায় সেই কথাই বলা যায়। যদিও তিনি পুরো ঠিক একশো বছর পর্যন্ত পেঁছিতে পারেননি, কিন্তু নব্বুই পার ক'রে আরো দু-চার বছর তিনি বেঁচে ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। আমরা তাঁর মৃত্যুর পরে সেটা হিসেব ক'রে দেখেছি।

জ্ঞান হওয়া অবধি তাঁকে আমরা একভাবেই দেখে এসেছি। যখন ছোটো ছিলাম তখনও যেমন দেখতাম, যখন বড়ো হয়ে উঠলাম তখনও ঠিক তেমনি। সেই রোগা শীর্ণ ফর্শা ছোট্টো মানুষটি, সেই কোমরটাকে অত্যন্ত বেঁকিয়ে কুঁজো হয়ে লাঠির উপর ভর দিয়ে চলা, হাতে রয়েছে লাল রঙের ছোটো একটি জপ করবার কুঁড়োজালির থলি; মাথার সাদা চুলগুলো সমানে কদমছাট করে ছাটা; দন্তবিহীন মুখে লেগে আছে সদা প্রসন্নতার হাসিটুকু। সে মুখখানি কেমন অসাধারণ রকমের কমনীয়, এখনও যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। চোখের চারিপাশে আর মুখবিবরের দুইপাশের চামড়াটা যেন হাজার কুঞ্চনে কুঁচকে গেছে, হাসতে গেলে তা আরো বেশী কুঁচকে যায়, চোখ দুটো তখন প্রায় দেখাই যায় না। কিন্তু তাতেই সে চোখের দৃষ্টি এমন স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যে, দেখলেই মনে হয় এর ভিতর থেকে যে মনটি উঁকি মারছে তা কতই মিষ্টি। পাকা আম যেমন মিষ্টি হয়। আর তাঁর দাড়িটা, অর্থাৎ থুতনিটা দেখতে আরো মজার; মুখ থেকে ঠেলে অনেকখানি সামনে বেরিয়ে এসেছে, কোনো কথা বলতে গেলে সেটাই সবচেয়ে বেশী নড়ে। দেখলেই এমনি ধরণের থুতনি বের করা ও তুবড়ে যাওয়া পাকা তোতাপুরী আমের কথা মনে পড়ে।

এই থুতনিতে আরো একটা মজার জিনিস ছিল, পাকা পাকা কয়েক গাছা দাড়ির চুল, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। ঘন সন্নিবদ্ধ নয়, ফাঁক ফাঁক হয়ে এক একটা সাদা চুল এদিকে ওদিকে ঝুলছে। আবার কানেও তেমনি দাড়ি, অর্থাৎ এপাশ-ওপাশ থেকে হঠাৎ এক একটা পাকা চুল ঝুলছে। মাঝে মাঝে মাথার চুল ছাটার সময় এগুলোকেও তিনি ছেঁটে ফেলতেন কিন্তু আবার তাড়াতাড়ি সেগুলি গজিয়ে উঠত। আমরা ঠাট্টা ক'রে বলতাম—"ঠাকুর-পিসিমা, তোমার দাড়ি কামাও না কেন?"

আমরা তাঁকে ঠাকুর-পিসিমা বলেই ডাকতাম। বাড়িসুদ্ধ সকলেই তাঁকে ঐ বলে ডাকতো। ঠাকুরদাদার পিসিমা, তাই তিনি ঠাকুর-পিসিমা।

ঠাকুর-পিসিমা হেসে বলতেন—"আমার তো কামাবার দাড়ি নয়, হাতের ভুলের জন্যে এই দাড়ি।"

"সে আবার কি? কার হাতের ভুল?"

"যিনি শিব গড়তে বাঁদর গড়েন। তিনি আমাকে মেয়েছেলে গড়ে হঠাৎ ভুল ক'রে ভাবলেন যে, পুরুষ বেটাছেলে গড়েছেন, তাই মুখে দাড়ি লাগিয়ে দিলেন। তারপর যখন চোখ চেয়ে খেয়াল হলো যে বড্ড ভুল হয়ে গেছে, তখন তাড়াতাড়ি দাড়িগুলো মুছে দিলেন, কিন্তু তবু যে কয়েকগাছা বাকি রয়ে গেল তা আর পোড়া নজরে পড়ল না।"

"সে কি পিসিমা, তুমিই যে ভুল বলছ! জন্মাবার সময় কি তোমার দাড়ি ছিল?"

"ছিল রে ছিল, আমার মায়ের মুখে শুনেছি, দাড়িতে কয়েকগাছা চুল ছিল।"

আমরা তাই শুনে খুব হাসতাম। ভারি আশ্চর্যের কথা।

ঠাকুর-পিসিমার দাঁত একটিও নেই, তবু অষ্টপ্রহর সেই ফোকলা মুখে তিনি মিসি কিংবা গুল দিতেন। সে পদার্থ নাকি খড় পোড়ানো ছাই নিয়ে এবং তার সঙ্গে আরো কি কি সব মিশিয়ে তৈরি করা হতো। একটি গোল টিনের কৌটোর মধ্যে তা থাকতো, কৌটোটি থাকতো তাঁর জপের থলির মধ্যে। কৌটো খুলে অতি সন্তর্পণে খানিকটা কালো গুঁড়ো আঙুলের ডগার উপর চাপিয়ে তারপর নীচেকার ঠোঁ[illegible] ফাঁক করে সেখানে সেটুকু গুঁজে দিতে[illegible] তাই খেয়ে খেয়ে ঠোঁট দুখানা কালো হ[illegible] গিয়েছিল।

পিসিমার চোখে সর্বদাই থাকতো অ[illegible] পুরু কাচের চশমা। লোহার ফ্রেমটা তার [illegible] সুতো দিয়ে জড়ানো। পিসিমার চোখে ছা[illegible] পড়েছিল, সেই ছানি কবে কাটানো হয়েছিল, তারপর থেকে তিনি এই মোটা চশমা পরতে[illegible] কিন্তু এতেও বোধকরি ভালোরকম দেখ[illegible] পেতেন না, আবছা আবছা দেখতেন। [illegible] আমরা বুঝতে পারতাম তাঁর আচরণ দে[illegible] আশেপাশে কোনো বেড়াল না থাকলেও মা[illegible] মাঝে তিনি লাঠি উঁচিয়ে কাল্পনিক বেড়া[illegible] তাড়াতেন। রোয়াকে তিনি তাঁর কাস[illegible] শুকোতে দিতেন, তার কাছে ঠ্যাং ছড়িয়ে [illegible] মাঝে মাঝে তিনি লাঠি উঁচিয়ে কাল্পনিক [illegible] তাড়াতেন "হুস্ হুস্" ক'রে। কাসুন্দি ছি[illegible] তাঁর একমাত্র মুখরোচক। সেই কাসুন্দি [illegible] মাস তোলা থাকতো, একটু একটু ক'রে [illegible] পাতে দেওয়া হতো।

আরো একটি জিনিস তিনি [illegible] ভালোবাসতেন—মধু। কিন্তু ঐ প্রচলিত না[illegible] বদলে তিনি বলতেন—চাকভাঙা। মধুর [illegible] অদ্ভুত নামকরণের কারণ কি তা আম[illegible] বুঝতাম না। একদিন জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম ঐ নাম কোনো এক গুরুজনের, উচ্চারণ করতে নেই। কে এমন গুরুতর গুরুজন? আমাদে[illegible] গোষ্ঠীর মধ্যে ও নাম কারো নেই। পিসিমা[illegible] জিজ্ঞাসা করাতে তিনি একটু হেসে বললেন, এ বাড়ির নয়, সে তোরা চিনবি না। হেঁয়ালি[illegible] রয়ে গেল।

খাওয়াটি ছিল তাঁর ধরাবাঁধা। দুপুরে [illegible] একবেলা খেতেন আতপ চালের ভাত আ[illegible] সিদ্ধ কাঁচকলা বা ডালভাতে আলুভাতে। ঠাকুমা প্রত্যহ এটি নিজের হাতে রেঁধে দিতেন। ভাতে দেওয়া হতো খানিকটা গাওয়া ঘি। পাতের একপাশে থাকতো এক বাটি দুধ, তারমধ্যে একটি পাকাকলা। এই ছিল তাঁর

দৈনিক আহারের বরাদ্দ। আর কোনো কোনোদিন সন্ধ্যার পরে তাঁকে মুড়ি চিড়ের গুঁড়ো খেতেও দেখেছি। হামানদিস্তের মধ্যে মুড়ি বা চিড়ে বা ছোলাভাজা গুঁড়িয়ে দেওয়া হতো, তিনি তাই পাকলে পাকলে খেতেন।

কিন্তু চোখে ভালো দেখতে না পেলেও তিনি কেমন ক'রে তাঁর পুঁথিগুলো পড়তেন সেকথা বলতে পারি না। হাতেলেখা তাঁর অনেকগুলি পুঁথি ছিল, শুনেছি তাঁর নিজেরই হাতের লেখা। হয়তো সেগুলো তাঁর অনেকটা মুখস্থই ছিল, তাই আন্দাজে পড়ে যেতেন, আপন মনে বিড়বিড় ক'রে। চেঁচিয়ে পড়ে শোনাতে বললে তাও একটু-আধটু শুনিয়ে দিতেন। আমরা মিলিয়ে দেখতাম ঠিকই পড়ছেন।

পিসিমার বাবা খুব পণ্ডিত ছিলেন। তিনি অনেক পুঁথি লিখেছিলেন, এবং মেয়েকে দিয়ে সেগুলি কপি করিয়েছিলেন। তিনি পয়ার ছন্দে রামায়ণ রচনা করেছিলেন, তাঁর নিজস্ব রচনা কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাছাড়া অনেক সংস্কৃত পুঁথিও তাঁর ছিল। পিসিমাকেও তিনি সংস্কৃত ভাষা শিখিয়েছিলেন। পিসিমা যে সব লম্বা লম্বা স্তব আবৃত্তি করতেন, গলার স্বর কাঁপলেও তার উচ্চারণ হতো বিশুদ্ধ, আমাদের দেশের পণ্ডিতদের মতো। অবশ্য শেষের দিকে তিনি এ-সব কিছুই করতে পারতেন না, আমরা আগে আগে আমাদের ছেলেবেলাতে যেমন দেখেছি তাই বলছি।

একটি কাজ কিন্তু তিনি শেষ বয়স পর্যন্তই নিপুণভাবে করতেন। বিশেষ কিছু নয়, প্রদীপের সলতে পাকানো। কিন্তু সেই সলতে এমনই নাকি কাজের হতো যে, আশপাশের বাড়ির লোকেরা তাই পিসিমার কাছে চেয়ে চেয়ে নিয়ে যেতো, আবার ছেঁড়া ন্যাকড়া প্রভৃতি এনে দিতো সলতে পাকাবার জন্যে। আরো একটি কাজ ছিল, টেকোতে পৈতের সুতোকাটা। সে সুতো অতি সূক্ষ্ম হতো, হাতের আন্দাজেই তার সূক্ষ্মতা বুঝে নিতেন। আর তা এমনই মজবুত হতো যে লোকে আগ্রহ করে চেয়ে নিতো, আগের থেকে ফরমাস দিতো। অনেকেরই বাড়িতে কাপাস তুলোর গাছ হতো, সেখান থেকে কাপাসের কোয়া সংগ্রহ করা হতো।

পিসিমার কাছে তেলের প্রদীপই জ্বলতো। লণ্ঠনের আলো কিংবা বাতির আলো তিনি মোটে সহ্য করতে পারতেন না। একবার দাদামহাশয় শখ ক'রে এক দশ ডালের ঝাড়লণ্ঠন কিনে পিসিমার দালানে টাঙিয়ে দিয়েছিলেন। তার পরেরদিনই সেখান থেকে সেটি খুলে ফেলে অনাত্র স্থানান্তরিত করতে হলো। পিসিমা তার ঝকমকে আলোতে খুবই আপত্তি করেছিলেন।

পিসিমা চিরদিন সেই নীচেরতলার দালানেই থাকতেন, দালানেই শুতেন। ঘরের ভিতর তিনি থাকতে পারতেন না, বলতেন যে, ঘরের দরজা ভেজালেই যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। বাড়ির ভিতরকার রকের পাশেই লম্বা একটি দালান ছিল, তার পাশে সারি সারি ঘর, কিন্তু তিনি থাকতেন সেই দালানের এককোণে। তাই সমস্ত দালানটাকেই বলা হতো পিসিমার দালান। সেখানেই তাঁর বসা, সেখানেই তাঁর শোয়া। সেখানেই বসে বসে জপ করতেন। শীতের দিনে বাইরে রকে বসে রোদ পোয়াতেন। সারাক্ষণ রোদে বসে জপ করতেন।

বাড়ি আমাদের ছেলেবেলাতে একতলাই ছিল। তারপর সেটা দোতলা করা হলো। দোতলা তৈরি হয়ে গেলে দাদামশায় বললেন, শুভদিন দেখে গৃহপ্রবেশ করতে হবে। পিসিমাই সকলের শ্রদ্ধেয়, বয়োজ্যেষ্ঠ অতএব তাঁকে দোতলায় নিয়ে গিয়ে অন্ততঃপক্ষে একটা দিনও বাস করানো চাই। কিন্তু তিনি সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে পারবেন না, একটা চেয়ারে বসিয়ে তাঁকে ওপরে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো। ওপরে গিয়ে কিছুক্ষণ পর্যন্ত তিনি সেখানকার দালানে চুপ করে বসে রইলেন, জানলা দিয়ে নীচের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকলেন। তারপরেই বললেন, আমি আর এখানে থাকতে পারছি না, আমাকে নীচে নিয়ে চল। জানলা দিয়ে নীচেরদিকে চাইলেই মাথা ঘুরে যাচ্ছে।

এই বাড়িতেই তাঁর জন্ম, এই বাড়িতেই একাদিক্রমে একশো বছরের জীবনযাপন, আর এই বাড়িতেই তাঁর মৃত্যু। জীবনে তিনি এ বাড়ি ছেড়ে একরাত্রির জন্যেও অন্য কোথাও বাস করেননি।

তবে কি তাঁর বিবাহ পর্যন্ত হয়নি! তা হয়েছিল বৈকি। সে গল্প আমরা তাঁর নিজের মুখেই কতবার শুনেছি।

ছেলেবেলায় আমরা একটু অতিরিক্ত ফাজিল ছিলাম। পিসিমাকে যতটা সমীহ করা উচিত তা কেউই আমরা করতাম না। তাঁকে যখন যা খুশি তাই বলতাম, কোনো কথা বলতেই মুখে আমাদের বাধতো না। তিনিও কিন্তু সেটা পছন্দ করতেন। বিরক্ত কখনই হতেন না। কোনোরকম দুষ্টামি করতে দেখলে তিনি ডেকে আমাদের কাছে নিয়ে বসাতেন। বলতেন—"ওরে তোরা শোন শোন, আমার কাছে সবাই চুপ ক'রে বোস দেখি, আমি গল্প বলি শোন।"

আমরা দুষ্টামি ছেড়ে তাঁকে ঘিরে বসতাম, গল্প শোনার নামে সমস্ত দুষ্টবুদ্ধি তখনকার মতো দূরে হয়ে যেতো। পিসিমা তখন রামায়ণ মহাভারতের গল্প শুরু ক'রে দিতেন। আমরা একটু মাত্র শুনেই বিরক্ত হয়ে বলতাম—"ওসব শুনতে চাই না, একটা ভূতের গল্প বলো।"

তখন তিনি শুরু করতেন তাঁর ছেলেবেলাকার শোনা যত সব আজগুবি ভূতের গল্প, এখনকার দিনে যে সব গল্প ছাপার অক্ষরে বেরোয় তার চেয়ে অনেক বেশী আজগুবি। পিসিমার বাবা ছিলেন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, প্রায়ই দূর দূর গ্রাম থেকে বিদায় দ্রব্যাদি নিয়ে আসতেন। একবার এক শ্রাদ্ধবাড়ি থেকে তিনি প্রকাণ্ড একটি মাছ নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে পড়েছিল মস্ত এক তেঁতুলগাছ। যেমনি সেখান দিয়ে পার হয়ে আসবেন অমনি গাছের উপর থেকে লাফ দিয়ে পড়লো এক মামদো ভূত। তার মুখচোখ মস্ত এক হাঁড়ি দিয়ে ঢাকা। সে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে খোনা গলায় বললে—"ঠাকুর মাছটা আমাকে দিয়ে যাও, নইলে ঘাড় মটকাবো।" পিসিমার বাবা কিছুতে সে মাছ তাকে দেননি, অনেক ধস্তাধস্তির পরে খুব চেঁচিয়ে রাম নাম করতেই ভূতটা তখন পালিয়ে গেল।

কলুদের বাড়ির গরুটা একদিন দড়ি ছিঁড়ে কোথায় পালালো, তার আর কোনো খোঁজই মিলল না। লোকের কাছে শোনা গেল, গরুটা মরে ভাগাড়ে পড়ে আছে। মাসখানেক পরে তার গোভূতটা এসে কলুদের বাড়ির দরজায় ঢুঁ মেরে দাপাদাপি করতে শুরু করলে প্রত্যহ রাত্রে। অনেক লোক তা নিজের চোখে দেখেছে। ভয়ে কলুরা সারারাত জেগে বসে থাকতো, সন্ধ্যার পর থেকে বাড়ির দরজা খুলতো না। অনেক শান্তি স্বস্ত্যয়ন করবার পরে গোভূতের অত্যাচার থামল।

এসব গল্প পিসিমা মিথ্যা ক'রে বানিয়ে বলতেন না, আগেকার দিনে যেমন শুনেছেন তেমনি বলেছেন।

তাঁর মুখে তাঁর বিয়ের গল্পও শুনেছি, সেকথা আগেই বলেছি।

আমার জাঠতুতো বড়ো বোন ছিল একটু অতিরিক্ত রকমে জ্যাঠা (এখন যদিও কতকগুলি ছেলেপুলের মা হবার পর থেকে সে বেচারা একেবারে বদলে গেছে, এমনকি তার সব চেয়ে বাচ্চা চ্যাংড়া ছেলেটা মায়ের মুখের ওপর রেডিওর লাউডস্পীকারের মতো চেঁচিয়ে যখন গেয়ে ওঠে "শোনো বন্ধু শোনো, শহরের ইতিকথা",—তখন তার মা নেহাৎ গোবেচারার মতো ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে)। কিন্তু তখনকার দিনে তাঁরই কত দাপট ছিল। তাঁর বাবার শখ ছিল তাঁকে ইংরেজী লেখাপড়া শেখাবেন। কলকাতায় মামার বাড়িতে থেকে মিশনারি হাইস্কুলে সে পড়তো, ছুটির সময় বাড়ি আসতো। পাড়াগাঁয়ের সুঁড়িপথ দিয়েও সে হাই হীল জুতো পরে' ঘুরে বেড়াতো, কুঁচিয়ে রঙীন কাপড় পরা, গায়ে টাইট ব্লাউজ, মাথায় ঝুলতো বেণী। গাঁয়ের লোকেরা হাঁ ক'রে চেয়ে থাকতো।

ঐ জাঠতুতো বোনের মুখে কোনো আঁট ছিল না। সে হঠাৎ পিসিমাকে জিজ্ঞাসা ক'রে বসতো—"হাঁ পিসিমা, তোমার গায়ের চামড়া কি আমাদের বয়সেও অমনি তোবড়ানো ছিল?"

পিসিমা হেসে বলতেন—"নারে, বয়স কালে আমি খুব সুন্দরী ছিলাম, তোর চেয়েও বেশী। পাড়ার গিন্নিরা আমায় দেখে বলাবলি করতো, অতি বড়ো সুন্দরী না পায় বর।"

সে জিজ্ঞাসা করতো—"পিসিমা, তুমি সধবা না বিধবা?"

পিসিমা বলতেন—"বিধবা হতে যাবো কেন, আমি বরাবরই সধবা।"

'তবে তুমি মাছ খাওনা কেন?"

"খাবো কেমন ক'রে, তোর মতো কি আমার দাঁত আছে?"

আমরা বিরক্ত হয়ে বলতাম, ওসব কথা থাক, তুমি তোমার বিয়ের গল্প বলো।

তখন তিনি বলতে শুরু করতেন।

নয় বছর মাত্র বয়সে পিসিমার বিয়ে হয়েছিল এক নৈকষ্য কুলীনের সঙ্গে। তখনকার দিনের এই ব্যবস্থাই ছিল, কোথায় ভালো কুলীন পাত্র আছে খুঁজে এনে তাকে গৌরীদান করা হতো। পিসিমার বাবা অনেক খুঁজেপেতে বহু দূর দেশ থেকে এই পাত্রটিকে যোগাড় করেছিলেন। পাত্র এলো নৌকোয় চড়ে। সকলে গিয়ে অভ্যর্থনা ক'রে তাঁকে বাড়িতে আনলে। ঢাক-ঢোল সানাই বাজিয়ে পিসিমাকে পাত্রস্থ করলে। পিসিমা তখন ভালো ক'রে শাড়ি পর্যন্ত পরতে পারেন না, পরিয়ে দিতে হয়। পিসিমা দেখলেন তাঁর বরটি দেখতে খুব ভালো, যদিও বয়সে তাঁর চেয়ে অনেক বড়ো।

গোঁফ-দাড়ি আছে। টক্‌টক্‌ করছে গায়ের রঙ। বেলের আঠা দিয়ে মাজা ধব্‌ধবে সাদা পৈতে ঝুলছে গলায়। হাসি হাসি মুখখানা, দেখলেই ভক্তি হয়। তেমন সুন্দর সুপুরুষ চেহারা নাকি আজকাল দেখতেই পাওয়া যায় না।

বেশ ঘটা ক'রে বিয়ে হয়ে গেল। পাত্রকে কুলীন মর্যাদা দিতে হলো কর্‌করে চারটি মোহর। বিয়ের পরে কয়েকদিন তিনি এই বাড়িতেই ছিলেন। তারপরে একদিন অনেক জিনিষপত্রে নৌকা বোঝাই ক'রে বিদায় হলেন। যাবার সময় পিসিমার দাড়িতে হাত দিয়ে আদর ক'রে বললেন—"আবার আমি আসবো তোমার কাছে।"

মিথ্যা বলেননি তিনি। তখনকার দিনে অনেক তোড়জোড় ক'রে তবে কুলীন জামাইকে বাড়িতে আনাতে হতো। এলেই তাঁকে তাঁর উপযুক্ত কুলীন মর্যাদা দিতে হবে। তিনি জানতেন যে, আবার তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনা হবে।

কয়েক বছর পরে পিসিমা যখন ডাগর হয়ে উঠেছেন তখন তাঁর বাবা জামাইকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনবার ব্যবস্থা করলেন। অনেক দিন আগের থেকে লোক পাঠিয়ে চিঠিপত্র দিয়ে সমস্ত ঠিকঠাক করা হলো, জামাইএর আসবার দিন স্থির হয়ে গেল। সবাই উৎসুক হয়ে রইল, অমুক মাসের অমুখ তারিখে জামাই আসবে।

কিন্তু ইতিমধ্যে দেশে ওলাউঠার মড়ক সুরু হয়ে গেল। ঘরে ঘরে বিস্তর লোক মরতে লাগলো। বাবা অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন. গ্রামের সকলেই বললে, এসময়ে বিদেশের মানুষকে এখানে এনে গ্রামে থাকতে দেওয়া উচিত হবে না, নিশ্চয় তাকে ওলাউঠায় ধরবে। জামাইএর নৌকা যখন ঘাটে এসে ভিড়ল, তখন খবর পেয়ে পিসিমার বাবা নিজে গিয়ে তাঁকে নৌকা থেকে নামতে নিষেধ করলেন, বললেন যে, দেশে মড়ক লেগেছে, তুমি এখন ফিরে যাও। পরে সময় ভালো হলে আবার তোমাকে আনবো। পিসিমার বর ঘাটে এসে আবার ফিরে গেলেন। পিসিমা একবার তাঁকে চোখেও দেখতে পেলেন না।

বছরখানেক পরে পিসিমার বাবা নিজে গেলেন জামাইকে আনতে। সেখানে গিয়ে শুনলেন, তিনি ভিটেমাটি ছেড়ে এ জেলা থেকে অন্য জেলায় গিয়ে বাস করছেন। সেখানেও তাঁর একটি বিবাহ হয়েছিল, শ্বশুরের বিষয়-সম্পত্তি পাওয়াতে এদেশ ছেড়ে সেখানেই চলে গেছেন। ভিটে ঘর সামান্যই যা ছিল তা প্রতি-বেশীকে বেচে দিয়ে গেছেন।

সে যে কোন দেশ তার আর কোনো খোঁজ করা হয়নি। সে নাকি অনেক দূরে। অতএব তারপর থেকে পিসিমার স্বামীর কোনো খবরই আর মেলেনি। মারা গেলে একটা চিঠিও তো আসতো, কিন্তু তাও আজ পর্যন্ত আসেনি।

অতএব পিসিমা যেখানে ছিলেন সেখানেই রয়ে গেলেন। কালক্রমে তাঁর বাবা মারা গেলেন। তখন থেকে তিনি আমার ঠাকুরদার সংসারেই আছেন। কিন্তু নিতান্ত আশ্রিতের মতো নয়, সকলেই তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করতো। ঠাকুরদাদা তাঁকে নিজের মায়ের মতো দেখতেন, পিসিমার পরামর্শ না নিয়ে কোনো কাজই তিনি করতেন না। পিসিমা ছিলেন বুদ্ধিমতী. সকল বিষয়েই তিনি সৎপরামর্শ দিতেন। পিসিমার মতে চলেই নাকি তাঁর অবস্থা ফিরে গিয়েছিল। ঠাকুরদা প্রায়ই বলতেন যে, তাঁর যা কিছু উন্নতি হয়েছে তা পিসিমার আশীর্বাদে। বলতে গেলে পিসিমাই ছিলেন বাড়ির কর্ত্রী. বাড়িতে দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি সব কিছুই হতো তাঁর ইচ্ছাতে।

পিসিমাকে কখনই কোনো রোগে ভুগতে দেখা যায়নি। লাঠি ধরে নিজে হেঁটে গিয়ে প্রত্যহ তিনি গঙ্গাস্নান করে আসতেন। কিন্তু আশী পেরিয়ে নব্বুই-এর কাছাকাছি যখন পৌঁছলেন তখন আর তা পারতেন না। ইদানীং তিনি গুটিয়ে আরো যেন ছোটো হয়ে যেতে লাগলেন। চোখ বুঁজে সর্বক্ষণই বসে জপ করতেন। চোখে কিছুই আর দেখতে পেতেন না। কানেও শুনতেন কম, জোরে চেঁচিয়ে বললে তবে শুনতে পেতেন। কিন্তু হাসিটি মুখে লেগেই থাকতো, আর অনুভবশক্তি বেশ তীক্ষ্ণই ছিল। হাত দিয়ে একবার স্পর্শ করে সকলকেই তিনি চিনে নিতে পারতেন।

তাঁর কাছে কোনো কথা বলতে গেলে আগে চেঁচিয়ে নিজের পরিচয়টি দিতে হতো। কিন্তু তাতেও তাঁর স্মরণে কিছু জাগতো না, তিনি তখন হাতটি বাড়িয়ে দিতেন। আগন্তুকের গায়ের স্পর্শটি পাবামাত্রই তাঁর সমস্ত কথা স্মরণ হয়ে যেতো, তখন বুঝতে পারার হাসিটি মুখে ফুটে উঠতো।

আমার জাঠতুতো বোনের তখন বিবাহ হয়ে গেছে, প্রথম ছেলেটি সবে জন্মেছে। পিসিমার হাত ধরে সেই নবজাত শিশুর গায়ে স্পর্শ করিয়ে দিয়ে দুষ্টামি ক'রে জিজ্ঞাসা করতো—"ঠাকুর পিসিমা, বলোতো এটি কে?"

পিসিমা এক গাল হেসে বলতেন—"ওটি? ও যে আমার বুকের ধন, আমার স্বর্গের বাতি, আমার নাতির নাতি। ওর জন্যেই তো আমি বেঁচে আছি, ও এসে বাতি না ধরলে কি আমি যেতে পারি?"

আমরা তখন সবাই মিলে একে একে নিজেদের গায়ে তাঁর হাত চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করতাম—"বলোতো আমি কে?"

পিসিমা তেমনি একগাল হেসে কাউকে বলতেন—"তুমি আমার চোখের মণি, অমুকের সন্তান।" কাউকে বলতেন—"তুমি আমার বুকের পাঁজর অমুকের ছেলে।" বলেই কিন্তু তৎক্ষণাৎ চোখ বুঁজে নির্লিপ্তভাবে নিজের জপ শুরু ক'রে দিতেন।

জাঠতুতো বোন জ্যাঠামি ক'রে জিজ্ঞাসা করতো—"পিসিমা, যখন তুমি চলে যাবে তখন আমার জন্যে কি রেখে যাবে?" পিসিমা তেমনি হেসেই বলতেন—"তোমাদের জন্যে? আমার যা কিছু সোনাদানা সব তোমাদের জন্যেই রইল, তোমরাই যে আমার সোনাদানা। এমন সোনা-মাণিক কি আর কারো ঘরে জন্মায়?" বললেন বটে এত কথা, কিন্তু তার পরেই চোখ বুঁজে জপ শুরু ক'রে দিলেন।

শেষকালে পিসিমার একদিন জ্বর হলো। তিনি সেদিন কিছু খেলেন না, শুধু একটু গঙ্গাজল খেয়ে শুয়ে রইলেন। পিসিমার জ্বর! শুনে আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমি তখন ডাক্তারিবিদ্যা শিখছি, ফোর্থ ইয়ারে পড়ছি। রোগ সম্বন্ধে নতুন নতুন জ্ঞানলাভ হচ্ছে, কারো অসুখ দেখলেই ডাক্তারি করতে হাত নিশপিশ করে। আমি বললাম ডাক্তারকে ডেকে এখনই একটা ইন্‌জেকশন দেবার ব্যবস্থা করা হোক। ঠাকুরদাদা আমাকে নিষেধ করলেন।

আমি কিন্তু দমলাম না। নিজে গিয়ে পিসিমার কানের কাছে চেঁচিয়ে বললাম, তোমার রোগ হয়েছে, ওষুধ খেতে হবে।

পিসিমার জ্ঞান ছিল। তিনি আমার কথা বেশ বুঝতে পারলেন। একটু হেসে বললেন—"তোর হাত দুটো আমার বুকে বুলিয়ে দিতে পারিস? তাতেই আমার সব সেরে যাবে।"

আমি তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দিলাম। তিনি যেন খুবই আরাম পেয়ে বললেন—"আঃ, বাঁচলুম।" তার পরেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

সে ঘুম আর ভাঙলো না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি মারা গেলেন। ঘুমিয়ে থাকতে থাকতে কখন যে তিনি নিঃসাড়ে দেহত্যাগ করেছেন, জানতেই পারা গেল না।

পিসিমা সধবাও হয়েছিলেন, বিধবাও নিশ্চয় হয়েছিলেন, কিন্তু তবু আজীবন তিনি কুমারীই ছিলেন। জীবনের এই সুদীর্ঘ কাল, পুরোপুরি প্রায় শতাব্দীকাল তিনি একই বাড়িতে থেকে একইভাবে কাটিয়ে গেলেন। কিন্তু এতকাল থেকেও তিনি তাঁর নিজের কোনো চিহ্ন রেখে যাননি।

তাঁর হাতের লেখা পুঁথিগুলো দালানের এক পাশে একটি উঁচু তাকের উপর জড়ো করা থাকতো। এবার পূজোর সময় দেশে গিয়ে দেখি, তার একটিও আস্ত নেই. উঁই লেগে সমস্তই একেবারে নষ্ট ক'রে দিয়েছে।

কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে আমি এই কথা ভাবি, প্রায় একশো বছর তিনি কাটিয়ে গেলেন, তাঁর কোনো কিছুই কি এখানে রইল না!

একটি অভিশাপ

(৮৮ পাতার শেষাংশ)

অভিশাপ দিলেন, তুমি অস্থিরচিত্ত অনন্তরূপ যৌবনসম্পন্না—সকলের অদৃশ্য, শুধু বায়ুভুক পাষাণের স্থিরতায় বন্দী হয়ে থাকো।

মূক বেদনায় নিস্পন্দ আচ্ছন্ন বন-তপোবনে স্থির অচঞ্চল পাষাণময়ী অহল্যা দু চোখ মেলে তাকালেন প্রিয় ঋষির দিকে। অনেকক্ষণ। অস্ফুট প্রশ্ন করলেন, এ অভিশাপের কি অবসান হবে কখনো?

অভিশাপ বাণী উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মর্ত্যের বিরহ যেন স্পর্শ করছে মানুষের নিয়ম-নিষ্ঠা, রীতি-নীতি-সংহিতাকার ঋষি গোতমের অন্তরে অন্তরে। অহল্যার কণ্ঠস্বর আজ এই প্রথম যেন একটা অনুভূতি হয়ে প্রবেশ করল তাঁর মর্ত্য হৃদয়ের গভীরে। কণ্ঠস্বরে অশ্রুর ছোঁয়া লাগল নিজের অজ্ঞাতে। বললেন, আজ থেকে সহস্র বৎসর পরে শ্রীরামের পুণ্যপদ স্পর্শে তোমার মুক্তি।

সর্ববিরূপতামুক্ত অহল্যার শান্ত অচপল দৃষ্টি তেমনি নিবদ্ধ ঋষির মুখের ওপর। জিজ্ঞাসা করলেন, সে-মুক্তির পর আবার কি মিলন হবে?

গোতমের অন্তস্তল উদ্বেলিত হয়ে উঠল আবারো। ক্ষুব্ধ জবাব দিলেন, হবে, আমি প্রতীক্ষা করব।

যুক্ত করে প্রণাম-আনত হয়ে অভিশাপ গ্রহণ করলেন অহল্যা। অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, তোমার সে প্রতীক্ষা যেন এই মর্ত্যের প্রতীক্ষা হয় প্রিয় ঋষি।

দশরথ মাহাতো

সুশীল রায়

সেই সকাল থেকে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে মানুষটা। কি সে বলতে চায়, কোনো অভিযোগ তার আছে কি না, কোনো আবেদন সে করতে চায় কিনা—কিছুই বোঝা যায় না ওর রকম-সকমে।

একটা কোড়া থান-ধুতিতে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে সে বসে আছে চুপচাপ—সেই সকাল থেকে।

বহু দিন আগের কথা হয়তো এখন মনে পড়ছে তার। পঁয়তাল্লিশ বছর আগের কথা। হাজারীবাগ জেলার ঝুমরিতেলাইয়া থেকে এসেছিল এক নওজোয়ান। খুঁজতে এসেছিল তার ভাগ্য। শক্ত শরীরটা নিয়ে কঠিন মূর্তিতে সে ঘুরেছে অনেক জায়গায়—খুঁটিনাটি করে সে সব কথা ভাবতে আজ ভালো লাগছে না দশরথের।

ভাগ্যের সন্ধানে এসে সে এই শহর কলকাতাতে পড়ল চরম দুর্ভাগ্যের মধ্যে। সে সব করুণ কাহিনীর কথাও আজ সে নূতন করে ভাবতে চায় না।

আসল কথা, যা অতীত হয়ে গিয়েছে সে সব কথা চিন্তা করায় এখন তার মন নেই। এখন সে বুঝি ভাবতে চায় তার বর্তমানের কথা এবং সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের কথাও।

সারা শহরে কোনো নকরি না পেয়ে সে গিয়েছিল শহরের বাইরে। এখানে এসে সে পেয়ে গেল এক চাকরি।

সে তো অনেকদিনের কথা হয়ে গেল। আঙ্গুলের কড় গুণতে জানে না সে, সে গোণে পুরো আঙ্গুল—গুণে গুণে সে দেখে, সে যে পঁয়তাল্লিশ বরষ হয়ে গেল।

যে নওজোয়ান এসেছিল সেদিন, এখন তার উপর আর কত? বিশ-বাইশ কি পঁচিশ।

প্রিন্সিপালের ঘরের দরজার কাছে ব'সে সে ভাবতে থাকে এই সব কথা। সেই সকাল থেকে সে বসে আছে এখানে, প্রিন্সিপাল তো আসবেন বেলা বারোটার আগে না।

সে কি তাঁর কাছে বিদায় নেবার জন্যেই এখানে বসে আছে এভাবে?

আজ তার বিদায়ের দিন। কিছুদিন থেকেই সে ভাবছে এই দিনটির কথা। কিন্তু আজ যখন সেই দিনটি এসে পৌঁছল, তখন তার সারাটা মন ভিতর ভিতর কেমন হু-হু করে উঠল যেন।

পা[illegible]টির এই জুবিলী-কলেজের বয়সও পঁয়তাল্লিশ হল। করোগেটের কয়েকটি আট-চালা-ঘর বাঁধা হয়েছিল এক বিরাট মাঠের মাঝখানে, পাঁচ-ছয়জন অধ্যাপক ও ষাট-সত্তরজন ছাত্র নিয়ে আরম্ভ হয় এই কলেজ।

এই দরিদ্র কলেজের একমাত্র দারোয়ান হয়ে কাজে বহাল হয়েছিল ঝুমরিতেলাইয়ার এই দরিদ্র মানুষটি। বেতন খুবই সামান্য, কিন্তু তাতে ক্ষোভ করার কিছু ছিল না, সে সেদিন পেয়ে গিয়েছিল একটি আশ্রয়।

কলেজটি তখন একেবারেই শিশু, কিন্তু তার তদারকের ভার যার উপর পড়ল সে শক্ত সমর্থ এক নওজোয়ান।

অধ্যক্ষ ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় ছিলেন জীর্ণ-শীর্ণ চেহারার মানুষ। নিজের স্বাস্থ্যটা অত দুর্বল বলেই সম্ভবত তাঁর সম্ভ্রম হল লোকটার ওই বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের উপর।

বললেন, 'বেশ। নোকরি খুঁজছ? নাও এই নোকরি। খোলা মাঠের মধ্যে বসেছে এই কলেজ, তুমি হও এর পাহারাওলা। চেয়ার, টেবিল বেঞ্চ, আলমারি, দরজা-জানালা—কিছু যেন খোয়া না যায়। চারদিকে এমন—তেমন লোক আছে অনেক।'

শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল সে, 'সমঝ্ গিয়া।'

ধ্রুবজ্যোতিবাবু একটু হেসে বললেন, 'সমঝ্ তো গিয়া। কিন্তু তুম ভাগে গা নেই, এ আশিয়োরেন্স কোন্ দে গা?'

'কেয়া বাবুজি?'

'বলছি, তুমি ভাগবে না তো? কথা দিচ্ছ।'

হ্যাঁ। কথা দিচ্ছে সে। তাকে যদি ভাগানো না হয়, তা হলে সে কখনো ভাগবে না। সব জিনিষের জিম্মা নিচ্ছে সে।

তরুণ অধ্যাপক সদাশিবের দিকে একটু চেয়ে ধ্রুবজ্যোতিবাবু বললেন, 'দেখা যাক।'

গঙ্গার কিনারে ঠিক না, একটু তফাতে, বাবলা-বনটার ওপারে বসেছে এই জুবিলী-কলেজ। দুপুরে ঘণ্টা তিনেক এখানে ক্লাস হয়, দিনের বাকি ঘণ্টাগুলো খাঁ-খাঁ করতে থাকে আটচালা-ঘরের ভিতর, হু-হু করে হাওয়া বয় আটচালার বাইরে।

এই বিশাল নির্জনতার মাঝে অটল মূর্তির মত বসে থাকে একটি প্রাণী—দশরথ মাহাতো।

দশরথ যখন এখানে আসে তখন কলেজটি ছিল শিশু, সে ছিল নওজোয়ান। আজ বদলে গিয়েছে সব। এখন নওজোয়ান হয়ে উঠেছে এই জুবিলী কলেজ—উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরাও করা হয়েছে এর বিরাট চৌহদ্দি, মাঝখানে উঠেছে বড় বড় দালান—আর, তৈরি হয়েছে কেমিক্যাল ও ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরী। কিন্তু দশরথের দশা এখন আলাদা।

তার দশা আলাদা, এই জন্যে সে সেই সকাল থেকে বসে আছে প্রিন্সিপালের দরজায়।

আজ তার বিদায়ের দিন।

বেলা প্রায় বারোটা নাগাদ এলেন প্রিন্সিপাল। পায়ে ভারি বুট, পরনে কোট আর প্যাণ্ট, মাথায় হ্যাট। পুরু কাঁচের চশমার ভিতর দিয়ে চেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আজ যাচ্ছ বুঝি?'

উঠে দাঁড়াল দশরথ, সোজাসুজি তাকাতে পারল না প্রিন্সিপালের দিকে, মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে কি-যেন বলল।

'হোয়াট, হোয়াট?'

ঢং-ঢং শব্দে বেজে উঠল ঘন্টা। সঙ্গে সঙ্গে কলরবে মুখর হয়ে উঠল সমস্ত কলেজ। ছাত্রেরা আর ছাত্রীরা দলে দলে বেরিয়ে পড়ল ক্লাস থেকে, সিঁড়িতে শব্দ করতে করতে ওরা কেউ উপরে চলল, কেউ বা নেমে আসতে লাগল নীচে।

দশরথের কথার কোনো উত্তর না পেয়ে প্রিন্সিপাল ঢুকে গেলেন তাঁর কামরায়।

তাকে চলে যেতে হবে এখান থেকে, একথা বিশ্বাস করতে তার বুঝি কষ্ট হচ্ছে ভীষণ। কিন্তু কষ্ট হলে হবে কি, আজ আর তার শক্তিও নেই, সামর্থ্যও নেই—স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছে একেবারে, কাজের বা'র হয়ে গিয়েছে সে। কত অধ্যাপক এসেছেন এখানে, কত অধ্যক্ষ এসেছেন—দশরথের চোখের সামনে তাঁরা এলেন, তার চোখের সামনে থেকে চলে গেলেন তাঁরা। আর, সে বছরের পর বছর এখানে থেকে সেই করোগেট-টিন থেকে আরম্ভ করে এখন এর প্রত্যেকটি ইঁট পাহারা দিয়ে চলেছে।

এই প্রিন্সিপাল এসেছেন গত বছর। এঁর মেজাজ একটু কড়া। ইংরাজি পড়ান ব'লে দারোয়ানের সঙ্গেও ভুল করে ইংরাজিতে কথা বলে বসেন মাঝে-মাঝে। বেশি মেশেন না কারোর সঙ্গে, তাই দশরথকেও বুঝি ইনি ভালো করে চিনতে পারেননি। এ যে কবেকার লোক, আর কোথাকার মানুষ—সে খবর রাখেন না তিনি।

সংস্কৃতের অধ্যাপক প্রতীপচন্দ্র ভাদুড়ি একটু নরম প্রকৃতির লোক। তিনি মাঝে-মাঝে খোঁজ নেন দশরথের।

প্রিন্সিপালের দরজার কাছ থেকে সরে এসে সে তাকাতে লাগল কলেজ-বিল্ডিং-এর চারদিকে। এতদিনের যা চেনা, যা গড়ে উঠল তার চোখের সামনে, আজ, এ কি, তা এমন নতুন আর অচেনা বলে মনে হচ্ছে কেন তার? কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী থেকে গ্যাসের গন্ধ ভেসে আসছে, এই চেনা গন্ধও তার কাছে মনে হচ্ছে অদ্ভুত।

আগেরকালের ছাত্ররা তাকে ডাকত দশরথদা বলে, এখন তাকে সকলে নাম ধরে ডাকে, কেউ কেউ হয়তো তার নামও জানে না, ডাকে—দরোয়ান। কিন্তু সেজন্যে তার কোনো আক্ষেপ নেই, অনুযোগও নেই। তার আক্ষেপ অন্যত্র।

আবার ঢং-ঢং শব্দে বেজে উঠল ঘন্টা। দশরথের বুকের ভিতরে কে-যেন কাঠের হাতুড়ি পিটল বলে মনে হল তার। সত্যিই যেন ব্যথা করে উঠল তার বুকটা।

ওদিকে তাকাতেই দেখল প্রতীপ ভাদুড়ি আসছেন, আর তাঁর সঙ্গে ভাইস-প্রিন্সিপাল ফুল্লরা নন্দী।

তাঁরা দু জনে কথা বলতে বলতে আসছেন। দশরথ বারান্দার অন্য কিনারে গিয়ে দাঁড়াল।

দূরে দশরথকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন প্রতীপচন্দ্র। ইশারা করে তাকে ডাকলেন।

থান-কাপড়ে সর্বাঙ্গ জড়ানো ছিল, সেই-জন্যে প্রথমে বুঝি চেনা যায়নি। দশরথ গুটি-গুটি পায়ে এগিয়ে এল কাছে।

'কি রে, অসুখ নাকি দশরথ? কোথায় হয়েছে?'

মাথা নাড়ল দশরথ।

'তবে?'

দু চোখ বুঝি ছলছল করে উঠল তার, বলল, 'আজ আমি চলে যাব!'

'কোথায় যাবি?'

'কেয়া মালুম!'

ফুল্লরা নন্দী একটু হাসলেন, বললেন, 'রিটায়ার করলে তো আহ্লাদের কথা। কাজের দায় থেকে ছুটি পাওয়া যায়।'

ফুল্লরা দেবীর হাসির সঙ্গে যোগ দিলেন প্রতীপ ভাদুড়িও।

এঁরা হাসলেন বটে, কিন্তু সে হাসিতে যোগ দিতে পারল না দশরথ।

লোকটার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন ফুল্লরা। এমন মুষড়ে পড়েছে কেন ও, কিছু যেন বুঝতে পারলেন না। বললেন, 'দেশে গিয়ে কি করবে এবার? চাষ-আবাদ?'

উত্তর দিল না দশরথ। এ কথার কোনো উত্তর দেবার কথাও বুঝি নেই তার।

ওঁরা চলে যাচ্ছিলেন। একটু দাঁড়িয়ে ফিরে চেয়ে বললেন, 'দশরথ, শোনো।'

এই কলেজে পড়েছে, এখান থেকে পাশ করেছে, এমন অনেকেই অধ্যাপক হয়ে এসে-ছিলেন এখানে। তাঁরাও এখন কেউ নেই। তাই কারো কাছ থেকে দয়া-মায়া বা মমতা আশা করে না দশরথ। সে যে এখানকার শুধু-মাত্র একটি দরোয়ান নয়, একথা সে কেমন করে বোঝাবে, কাকেই বা বোঝাবে?

প্রিন্সিপালের দরজার কাছে সে সকাল থেকে বসে ছিল, হয়তো কিছু বলার ইচ্ছে ছিল তার। কিন্তু তিনি এমনভাবে এলেন, এমনভাবে তাকে প্রশ্ন করলেন যে, তাতেই তার হারিয়ে গেল সব কথা।

লাইব্রেরী ঘরে এসে বসেছেন প্রতীপ ভাদুড়ি ও ফুল্লরা নন্দী। অদূরে মেঝেতে উবু হয়ে বসল দশরথ।

নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগলেন তাঁরা। সে তার পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে নিয়েছে কিনা, তার তবিয়ত আচ্ছা আছে কিনা, কত বছর আন্দাজ তার কাজ করা হল এখানে, দেশে আছে কে কে, ছেলেরা কত বড় হল, কি করে তারা।

একে একে উত্তর দিচ্ছিল সে, শেষের দিকে সে উঠে দাঁড়িয়ে দেয়ালের দিকে তাকালো। দেয়ালে অনেকগুলো তেল ছবি টাঙানো। সেই-দিকে চোখ রেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল সে।

ফুল্লরা দেবী ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন ঐ দিকে, এমন মনোযোগ দিয়ে কি দেখছে লোকটা? দশরথ দেখছে ঐ ছবিটা। ছবিটার নীচে কি লেখা আছে তা পড়তে পারছে না দশরথ, কিন্তু ফুল্লরা দেবী তা পড়তে পারলেন লেখা আছে শ্রীধ্রুবজ্যোতি মুখো-পাধ্যায়—জুবিলী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম অধ্যক্ষ।

দশরথ বলল, 'ঐ বাবু আমাকে বহাল করেন এই কাজে। তারপরে আর যাইনি আ… মুলুকে। মুলুকের হালচাল জানি না।'

যেন চমকে উঠলেন প্রতীপ ভাদুড়ি… বললেন, 'সে কি হে, সে যে অনেক দিনের ক… হয়ে গেল—'

'নিয়ার্লি ফিফটি ইয়ার্স'—হাফ এ সেঞ্চুরী!' বিস্মিত গলায় বললেন ফুল্লরা নন্দী, 'তারপ… আর যাওনি দেশে? এতদিন কাটা… কোথায়?'

'এখানে, এই কলেজে।' মাথা নীচু ক… বলল দশরথ।

প্রতীপ ভাদুড়ি নড়ে বসে বললেন, 'ত… মানে বিয়ে-সাদীও করা হয়নি বুঝি?'

ভাগিয়ে না দিলে সে ভাগবে না—ক… দিয়েছিল সে ধ্রুবজ্যোতিবাবুকে। এত… এখানে থাকতে থাকতে তার কি-যেন হয়েছে, … এই কলেজ—

'ছাড়তে ইচ্ছে করছে না বুঝি?'

এ কথারও উত্তর দিল না দশরথ। সে স্ত… হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলছে ন… সব চুপচাপ। ওদিকে মাথা নীচু করে ব…

(শেষাংশ ৯৬ পৃষ্ঠায়)

প্রশ্ন

অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়

উষার ললাটে শুকতারা শোন শোন
জান কি স্বপ্ন সত্যি হয় কখনও?
আঁধার আকাশে দুধসাদা ছায়াপথে
কল্পনাগুলে ভাবনার মায়ারথে
কতবার করে পৃথিবী পরিক্রমা
তুমি কি তাদের গোণ?

ওগো শুকতারা এখনি যেওনা এস
আজিকে না হয় না হ'ল রজনী শেষ
আকাশের ঐ অতল নিথর বুকে
তারাগুলি সব ঘুমিয়ে থাকে কি সুখে,
প্রভাত রবির আলো পারাবার পারে
আছে কি আঁধার রেশ

শোন শুকতারা জীবনের ভাঙাগড়া
দুঃখ সুখের তরঙ্গ ওঠাপড়া
জীবন ভেলায় প্রাণ সমুদ্রে পাড়ি
মিলন বিরহ কাছে আসা ছাড়াছাড়ি
মহাঙ্গনের অকূলে কিনারে বসি
দেখেছ আকুল করা।

জান শুকতারা শিশিরের দিন এলে
লাল কমলের দলগুলি ঝরে গেলে
মনে হয় বুঝি বসন্ত বড় দূরে
শুকতারা জান, স্বপ্নেরা সুমধুরে
ভয় হয় বুঝি বিফল হ'ল কি শেষে
চাইনি নয়ন মেলে।

শুকতারা আজি স্বপ্ন সফল মোর
নয় মোহ, নয় মায়া, নয় ঘুমঘোর,
হৃদয় প্রদীপে জ্বলেছে অমর শিখা
ভাগ্যের ভালে বিধাতার লিপিলিখা
মুছে দিয়ে যাব কঠিন কোমল করে
রাত বুঝি হ'ল ভোর।

'আজও তো—'

অমরেন্দ্র ঘোষ

প্রাণ নেই অথচ টিকটিক করছে দেয়াল ঘড়িটা। মিনিটের কাঁটাটা সাড়ে তিনটার ওপর আসতেই একটা শব্দ। চমকে উঠে লেখা বন্ধ করে প্রণব। একটা কি যেন অনুভূতি, কি যেন ব্যঞ্জনা রয়েছে ঐ যান্ত্রিক শব্দে। আসবে, আজ অবশ্য আসবে, এসে পড়বে এক্ষুণি—নইলে খুব দেরী হলেও আধঘন্টা। কাগজ কলম গুটিয়ে কান পেতে রাখে প্রণব রায়। সিঁড়িতে অনেক স্যান্ডালের আনাগোনা হবে একটু বাদে, কিন্তু এক জোড়ার শব্দ তার একান্তই চেনা। বহু দূর থেকে ট্রামে-বাসে অনেক ধাক্কাধাক্কি করে আসবে। সঙ্গে থাকবে একটা ব্যাগ বোঝাই অনুকোটি পর্ব। বই, পাউডার, সাবান অন্ততঃ চারটা কমলালেবু, আসা মাত্র সীতাকে তো বসতে দিতে হবে।

ওয়ার্ড বয়! ওয়ার্ড বয়!

একটিরও জবাব নেই। স্ট্রাইক করে এদের মাইনা বেড়েছে বটে, কিন্তু সেই অনুপাতে কর্তব্যজ্ঞানটা যদি বাড়ত! সমস্ত মেসিনটাই নষ্ট হয়ে গেছে! জোড়াতালি দিয়ে নিস্তার নেই।

প্রণব উঠে দাঁড়ায় একটা লাঠিতে ভর করে। অতি কষ্টে টেনে নিয়ে আসে একখানা লোহার চেয়ার। একটু দেরী হলে এ-ও ভাগে জোটা কঠিন। চমৎকার হয়েছে দুনিয়াদারী! যেখানে হাত দেবে শুধু তফাৎ যাও বুলি।

প্রায় আড়াই মাস ধরে প্রণব এই হাসপাতালে ফ্রি বেডে। মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করছে রাত-দিন। কখনো মনে হয় সে জিতল, কখনো মনে হয় মৃত্যুই পয়েন্ট পাচ্ছে বেশি। ইদানীং দেখা যাচ্ছে ওষুধে-ডাক্তারে কাজ হচ্ছে না মোটেই। সপ্তাহান্তে ব্যালেন্স বলছে দু-আউন্স কমলে কিন্তু। এই তোমার ওয়ার্নিং নোটিশ।

মস্ত এক ঝুরি টাইটেলয়ালা ভিজিটিং প্রফেসর বলেন, অমন হিস্ট্রি দেখেছি কত। এর জন্য চিন্তার কিছু নেই।

হ্যাঁ একেবারে নিশ্চিন্ত হতেই এখানে এসেছে প্রণব। সীতাও যে একেবারে এ আশঙ্কা করে না, তা-ও নয়। তবু রোজ বিকাল চারটা হতে না হ'তেই হাজির।

কিন্তু গতকাল হঠাৎ গেছে কামাই। কারণটা প্রণবের কাছে অজানা নয়। তবু একটা চাপা অভিমান ভিতরে ভিতরে গুমরে মরেছে। কি যেন বাদ গেছে জীবনের পেয়ালা থেকে একটা দিন।

হেন রোগ নেই, যা না আছে প্রণবের। জ্বর, ঘোর অনিদ্রা, কাশি এবং সেই সঙ্গে রক্ত। ফর্দ দিলে অশ্রুপাত। এটা অতিরঞ্জন নয়—কৌতূহলী পাঠক ইচ্ছা করলে সাত নম্বরের হিস্ট্রি সিটটা খুলে দেখতে পারো। অনেকগুলো গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী লিখেও যার জীবন-ইতিহাস কোথায়ও ছিটেফোঁটা বার হয়নি, তারই পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা রয়েছে ওখানে। প্রণব হাউস সার্জনকে দেখলেই হাত জোড় করে সবিনয়ে বলে, আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। ইতিহাস স্বীকার না করলেও আপনি আমার ঐতিহাসিক বন্ধু—বসওয়েল।

এই অবস্থায়ও প্রণব মরিয়া হয়ে লিখতে চেষ্টা করছে একটা সাল তামামির হিসাব; সাল তামামিও নয়, জীবন তামামির কৈফিয়ৎ। এতকাল এ সমাজের কাছ থেকে যা পেয়েছে, তার বদলে দিয়েছে কি?

সীতা প্রণবের লেখার সহজিয়া সমঝদার। প্রণব খানিকটা পড়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, এ কি আমার অহংকারের প্রকাশ?

না গো। তুমি প্রচুর সহানুভূতি পেয়েছ এবং আজো পাচ্ছ—এখন পর্যন্ত দেখছি সেই ঋণ শোধেরই নৈতিক আকুতি।

কিন্তু তবু শোধ করা যায় না সীতা। মায়ের শ্মশানে পঞ্চরত্ন তুলে কি তাঁর দুধের একটি ধারারও দেনা শোধ করা সম্ভব? তবু নিরুপায় মানুষ তা করে, যে কিছু পারে না, সে অন্ততঃ শ্মশানঘাটের দেয়ালে কাঠ-কয়লা দিয়ে বারবার লেখে মাতৃপিতৃ নাম। চোখের জল মোছে আর লেখে। সীতা!—বাইরের জানালাটার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে প্রণব আবার ডাকলে, সীতা?

কোনো জবাব নেই—সীতার মুখ অন্যদিকে ফেরান।

একটু অপেক্ষা করে সামলে নেয়ার সুযোগ দিলে প্রণব। যখন সীতা ফিরে তাকাল তখন প্রণব দেখলে তার গলাটা একেবারে খালি।

সীতা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলে, কি?

এবার প্রণব নীরব। সীতা তার সংসার সাজিয়েছে, সন্তান দিয়েছে, যৌবন দিয়েছে—এত অভাবের মধ্যেও কখনো ফণা তোলেনি কিন্তু এত খেটে সে পেয়েছে কি? একছড়া সোনার হারও তো তাকে দিতে পারলে না প্রণব। কুড়ি টাকার সোনা এখন না হয় একশ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

পর পর চারটার শব্দ শেষ হতে পারে না দেয়াল ঘড়িটায়। এর মধ্যেই পরিচিত স্যান্ডালের আওয়াজ। প্রায় চুয়াল্লিশে পা দিয়েছে সীতা, তবু স্বাস্থ্যের সর্বশ্রী।—কেমন আছো?

অনেক প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার সুবিধার জন্য প্রণব শুধু একটি কথা বলে, ভালো।

কাল আর কিছুতেই আসা হয়ে উঠল না। খেতে খেতে বেলা সাড়ে চারটা। তারপর এক ঘন্টার জার্নি—সে কি আর হয়। ট্রাম-বাসের একটু এদিক-ওদিক হলে শুধু আসা-যাওয়া।

এত কি রান্না যে খেতে খেতে শেষ বেলা?

বড় মেয়ে বীণার ছুটি হয়েছে নার্সিং হোম থেকে। তাকে সামলান, তার চারটি কাচ্চা-বাচ্চা। বড় জামাইও এখানে—সে এসে খেলে যখন দুটো। তারপর বীণার টুকিটাকি কাজ, সে তো নড়তে পারবে না দু সপ্তাহ।

কেমন আছে বীণা?

ভাল?

জামাই?

সেও? আজ হয়ত একবার আসবে এখানে। নানা ঝামেলায় আছে, কখন আসে ঠিক নেই?—মুখে কথা বলতে বলতে মিটকেজের ওপর নানান জিনিষ গুছিয়ে রাখে সীতা। টুথব্রাস, তেলের শিশি, একটু গোলমরিচের গুঁড়ো।—একটা পান খাবে? বাড়ি থেকে সেজে এনেছি।

প্রণব চুপি চুপি বলে, দুটো হলে খেতে পারি, একটা যদি তুমি খাও।

বর্ষীয়সী সীতা লাল হয়ে ওঠে। পড়ন্ত রোদের একটা উত্তাপ এসে যেন লাগে প্রণবের বুকে।—এতবড় একটা অপারেশন হল শুধু আমি জানলাম না।

সবই জানো তুমি, কেবল নির্দিষ্ট তারিখটা বলিনি। মিছেমিছি তোমাকে ভাবিয়ে লাভ কি?

এখন তো সুস্থ হয়ে এসেছে মেয়ে। ছুটি হলেই গিয়ে দেখবে।

প্রণব বলে, আর ছুটি হয়েছে! এমনি করেই একটা লোক ধীরে ধীরে বাতিল হয়ে যায়!

সীতা কথার মোড়টা ঘুরিয়ে দেয়।—আজ একটা মনি অর্ডার এসেছে সাহায্যের—পঁচিশ টাকা। কুপনে লিখেছে, আপনার সাহিত্য আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে, জাগ্রত করেছে—আপনার মৃত্যু নেই।

প্রণব হতাশার ভাব কাটিয়ে উঠে বসে বারবার কুপনখানা পড়ে। তারপর বলে, আরো খানিকটা লিখেছি, শুনবে?

নিশ্চয়—পড়ো।

তোমার কি আমার কিশোরী বন্ধু হারুর কথা মনে আছে?

বারবার তার কথা শুনেছি, কেন ভুলে যাবো? তা ছাড়া জানোই তো নারী জাতি বড্ড হিংসুটে।

প্রণব পড়তে সুরু করে—

টেরাই অঞ্চল, মহান হিমালয়ের পাদদেশ। একদিন ঘুম ভেঙে দেখি অজস্র সোনা গলে গলে পড়ছে একটা পাহাড়ের চুড়া বেয়ে। জাহাজ ভরে নিলেও শেষ নেই। এত সোনা এলো কোথেকে?

আজ যদি হারুকে পাওয়া যেত! কত গোলেবাখালি কন্যার যে গল্প শুনেছি ওর মুখে, দীঘির জলে ডুব দিয়ে কত যে আয়না-মোহর খেলা! সঙ্গিনীকে যে আজ কত দূরে ফেলে এসেছি! একখানা গ্রুফ ফটো আছে আমাদের, সেই কিশোর বেলার স্মৃতি। আমার পাশটিতে হারু। গায় একখানা ঝিকমিকে ওড়না। এই ওড়নারই হয়ত বর্ণনা দিয়েছি এক উপন্যাসে—ভরন্ত যৌবনে নায়িকা মেহেদি যখন দর্পিতা। বেশি হাইপোতে ডুবিয়ে, অল্প ধুয়ে হারুর ফটোখানা মাটি করেছে ফটো আর্টিষ্ট। ঝলসে বিবর্ণ হয়ে গেছে রঙ। চেনা যায় না সেই মুখখানা। কিন্তু জীবন শিল্পী আছে বৃদ্ধ যুবা কিশোর সকলেরই বুকে। একবার চেয়ে দেখো সে কি আশ্চর্য ছবি এঁকে রেখেছে!

একদিন তুই না মেয়ে একছড়া সোনার হারের জন্য কত না বিরক্ত করেছিলি তোর মাকে—ফটো তুলব না, তুলবানা, তুলবানা।

সব শুনে আমিও বেঁকে দাঁড়ালাম।—ও না এলে ফটো তোলা থাক।

আমার মা মীমাংসা করতে চেয়েছিলেন এক ছড়া সোনার হার দিয়ে হারুকে সাজিয়ে। কিন্তু তা হল না। স্বীকার করলে না সে মেয়ে। তবু শেষ পর্যন্ত কি করে যেন ফটো তোলা হল, অত খুঁটিনাটি এখন মনে নেই।

সীতা কৃত্রিম গাম্ভীর্যে বলে, লেখকের বলতে লজ্জা করছে, তবে আমি বলি পাঠক শোনো—গোপনে পায় ধরে।

একটু হেসে প্রণব বলে, যদি ঠাট্টা করো তবে আমি।

না, না সত্যি—পড়ো, থেমো না লক্ষ্মীটি।

প্রণব আবার সুরু করে—

আজ বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে বলি, ঐ দেখ কত সোনা। চল দেখি মনের মেয়ে কত পরবি গয়না!

দশরথ মাহাতো

(১৪ পৃষ্ঠার পর)

পড়ছে কয়েকটি ছেলে। নিঃশব্দ পদপাতে ছাত্র-ছাত্রীরা যাতায়াত করছে।

তাঁর হাতের তেলোর মধ্যে থুৎনি ডুবিয়ে বসে অনেকক্ষণ ধরে কি-যেন ভাবতে লাগলেন ফুল্লরা নন্দী।

বুঝি মায়া হল তাঁর, বুঝি তিনি বুঝতে পারলেন লোকটার অবস্থা এর আর কোনো সহায় নেই, সম্বল নেই, আশ্রয় নেই। তাই বললেন, 'এক কাজ কর দশরথ। চল আমার বাড়ীতে। সেখানে তুমি থাকবে।'

এবার সত্যিই জল গড়িয়ে পড়ল দশরথের গাল বেয়ে, বলল, 'বহুত মেহেরবানি। লেকিন—'

'লেকিন আবার কি হে?' প্রতীপ ভাদুড়ি বললেন।

দশরথ জানাল তার আবেদন, বলল, প্রিন্সিপালবাবুকে বলে কয়ে যদি তাকে এই কলেজের তার সেই ছোট কুঠুরিটায় থাকতে দেওয়া হয়, আর বেশি দিন না, আর বেশি দিন সে বাঁচবে না।

'জায়গাটা ছাড়ার ইচ্ছে নেই বুঝি? যদি প্রিন্সিপাল রাজি না হন, তবে? তবে যাবে কোথায়?'

শূন্যে দুটি হাত উল্টে দিয়ে দশরথ বলল, 'কেয়া মালুম!'

প্রতীপ ভাদুড়ি বলল, 'কেন মিসেস নন্দীর ওখানে থাকবে না?'

উত্তর দিতে পারল না দশরথ, দুই হাত দিয়ে নিজের মাথা ধরে উবু হয়ে বসে পড়ল।

লোকটা কাঁদছে নাকি? ফুল্লরা দেবী উঠে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালেন তার পাশে।

যত ছুটি তত মনে হয়, আর একটু এগুলেই সোনার পাহাড়। ঐ তো কয়েকটা ঝোপ ঝাড়—বড় জোর একখানা গ্রাম, না হয় একটা নদী।

তারপর কত যে সাগর পেরুলাম? একে একে সব সঞ্চয়ের কড়ি শেষ হল, কালো হল স্বাস্থ্যের সোনা ভাঙা রঙ, তবু কি সোনার পাহাড় পেলাম? আজো আমার অন্তরলক্ষ্মী নিরাভরণ। কিন্তু আমার বিশ্রাম নেই। শ্মশানের শিখায়ও তো মালা হয়। না হয় শেষ পালায় ঐ মালাই পরিয়ে যাবো। আমার যত্নের বিরাম নেই।

প্রণব থামতে না থামতে গুটি দশেক ছেলে মেয়ে যুবক বৃদ্ধ এসে ঢুকলেন ভিতরে—এইটা কি সাত নম্বর বেড?—হাতে তাদের রজনী গন্ধার গুচ্ছ ও মালা। একটু বিস্মিত হয়ে প্রণব বললে, হ্যাঁ। কাকে খুঁজছেন?

সাহিত্যিক প্রণব রায়কে।

নমস্কার, বসুন—আমার নাম প্রণব রায়।

সীতা চেয়ার ছেড়ে সরে যায় একপাশে। ফুলের গন্ধে যেন হাসপাতালের গন্ধ পালটে যায়। প্রণব বুক ভরে নিঃশ্বাস টেনে ভাল করে উঠে বসে বেডে। কতদিন যে সে এ ফুল দেখেনি! শুধু বেলেডোনা, এ্যাজমার সিরাপ, ট্রিপেল কার্ব।

একটি মেয়ে প্রণবের গলায় মালা পরিয়ে দেয়। আর একজন চন্দনের টিপ। সুমুখের

শান্তি চাই

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

আমাকে শান্তিই দাও;—
শান্তিটুকু ভরে দাও মনের গভীরে,
তোমাকে পেয়েছি বলে
রাতের অতল চোখে দূরে সমুদ্রের
নীলিমা লীলায় দেখি
অপূর্ব আশার যেন হৃদয় নিবিড়ে
আমাকেই শান্তি দিলে
স্বাদ নিয়ে লোনা জল দূরে সমুদ্রের।

আমি তো জেনেছি মনে,
যখন আমার মন কোন মন চায়
পাখির বুকের ঢাকা
নরম পালকে ভিড় স্মৃতিতে জড়ায়,
হাজারো স্বপ্নের রাত
সহস্র চোখের জলে শুধু ঢেউ তোলে
বুকে বুকে ঢেউ তোলে,
ঢেউ তোলে আরো কত আশার অনলে।

তখন আমাকে যদি
হৃদয়ের তীরে তীরে পলি মাটি ভার
ফেলে ফেলে চলে যেতে হয়
শুধু সুদূরের ডাক শুনি শুনি,
প্রথম বর্ষার মেঘ হালকা
হাওয়ায় ভাসা মনটুকু আর
জীবনের একটুকু
জ্যোতির বিদ্যুৎ রেখা কতই না গুণি।

প্রাণের প্রকাশ চেয়ে
হৃদয়ের শান্তি চাই, শান্তি চাই মনে
অতল গাম্ভীর্য নয়
গহন উচ্ছ্বাসে আর কামনার বনে।

বৃদ্ধ বলেন, আমরা সাহিত্য বাসরের তরফ থেকে কিছু অর্থ সংগ্রহ করেছি আপনার আরোগ্য কামনা করে। হে যশস্বী কথাশিল্পী আপনি এ সামান্য সংগ্রহ গ্রহণ করে ধন্য করুন।

প্রণব অভিভূত হয়ে হাত পাতে।

সীতা থাকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে।

কে একজন যেন মন্তব্য করেন, এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মুখে উনি শুনিয়েছেন শান্তির ললিত বাণী। উনি অমর হয়ে থাকবেন সাহিত্যে।

ছটা বেজে গেছে। একে একে বুঝি চলে গেছেন সবই।

প্রণব চেয়ে দেখে সীতা তখনো এক কোণে দাঁড়িয়ে। বড় বড় চোখ দুটো তার জল বোঝাই। গলাটা প্রতিদিনের মতই খালি। প্রণব তার গৌরবের মালাটা সীতার হাতে তুলে দিতে গিয়ে দেখে, বড় জামাই কখন যেন এসে দাঁড়িয়েছে, বড় জামাইর হাতে মালাটা দিয়ে প্রণব বলে, বীণাকে দিও, ও বড় ফুল ভালোবাসে।

সীতা ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায়। প্রণবের হঠাৎ মনে হয়, এই কি তার কাব্য লক্ষ্মী? আজো তো মালা পরান হ'ল না।

ডাক্তারগণ ইহাই ব্যবস্থা দেন
শ্রী তাল মিছরী
যাবতীয়
শ্বাস কাসে
ঔষধ ও পথ্
আবিষ্কারক— কবিরাজ শ্রীবলাই চাঁদ শ্রীমা
এজেন্ট:—বি, কে, পাল এম, ভট্টাচার্য্য।

আধুনিক
অলঙ্কার
নৈপুণ্যে...
ফোন • ৩৪-৩৮৫২
রাজলক্ষ্মী শিল্প মন্দির
প্রখ্যাত স্বর্ণশিল্পী ও মণিকার
১০১-বহুবাজার স্ট্রীট • কলিকাতা-১২

সৌন্দর্য্যের উৎস
ফোন৩৪-৪৮৫৭
পাইওনিয়ার জুয়েলারী হাউস
৯৯এ, বহুবাজার স্ট্রীট • কলিকাতা-১২

ার গেট, রেডফোর্ট, দিল্লী

ধ্রুবনারায়ণ চৌধুরী

ঘাটশিলা

মদন দত্ত

সাধ ও সিদ্ধি
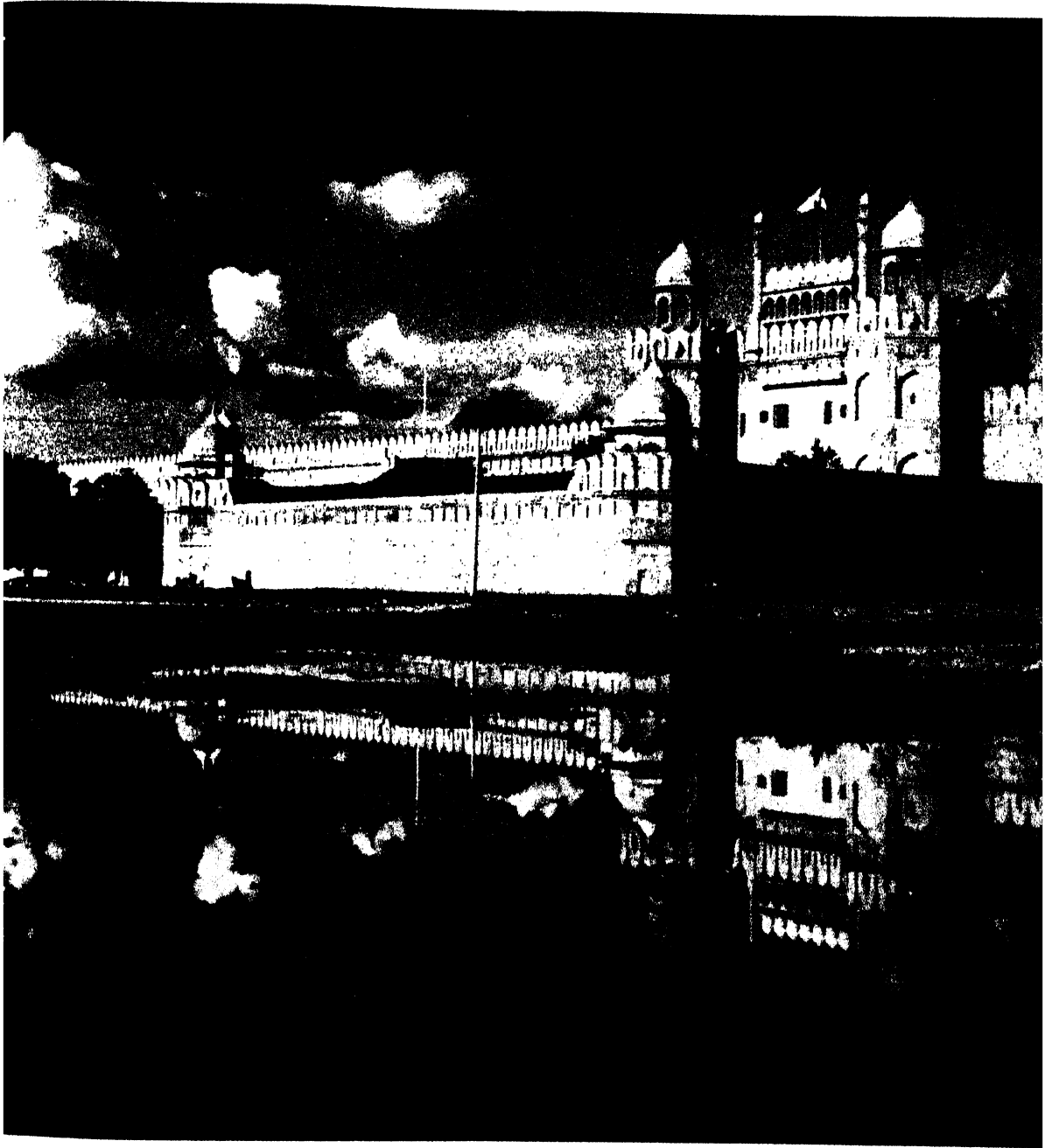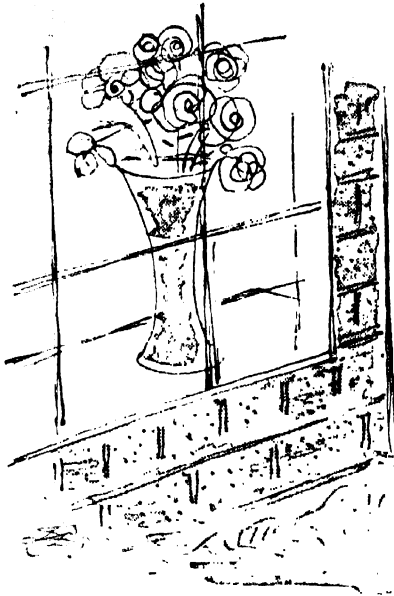
শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

বছর বার বয়সের মরা ছেলেটিকে বিধবা বিশাখার কোল থেকে ছিনিয়ে নিতে হয়েছিল। তখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল সে। প্রতিবেশীদের শুশ্রূষায় পরে চেতনা ফিরে এলেও সম্পূর্ণ জ্ঞান হয়নি তার। কোলের মেয়েটার আধো আধো 'মা' মা' ডাকেও এ কদিন তেমন সাড়া দেয়নি সে। স্বাভাবিক স্বচ্ছ দৃষ্টি তার চোখে ফিরে এল দিন সাতেক পরে। ওদের বস্তির ঠিক বিপরীত দিকে প্রায় নিঃসঙ্গ ছোট একতলা বাড়ীখানি এবং ওর তিন দিকের ফাঁকা মাঠে উৎসবের সমারোহ দেখেই বিশাখার মনে স্বাভাবিক কৌতূহল সেদিন মাথা তুলে জেগে উঠল।

অসাধারণ যোগাযোগ। রমলা সেবা মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হল সেদিন।

কোন মহীয়সী মহিলার স্মৃতিপূজার উপকরণ নয়, লক্ষপতির রাজকীয় দান থেকেও উৎপত্তি হয়নি ওর। যে প্রেরণা থেকে ওর উদ্ভব তার উৎস শোক। একমাত্র শিশুকন্যা রমলাকে হারিয়ে বিপত্নীক শোকসন্তপ্ত পিতা ডাক্তার রসময় দত্ত সেবাধর্মের অনুশীলন দ্বারা কন্যা ও স্ত্রী উভয়কেই মনের মধ্যে ফিরে পাবার জন্য স্বয়ং কপর্দকশূন্য হয়েও অসীম সাহসে ঐ হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা করলেন।

ইতর-ভদ্র প্রতিবেশীর মুখে ঐ সূক্ষ্ম তত্ত্ব মোটা কথায় শুনলে বিশাখা। মোটামুটি ডাক্তার দত্তের জীবনকাহিনীও শুনলে সে। আগে নাকি খুব টাকার খাঁই ছিল ডাক্তারের। সেই পাপেই প্রথমে তাঁর স্ত্রী ও পরে তাঁর মেয়ে মারা যায়। ওদের শোকে বিবাগী হয়ে বৎসরখানেক নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। ফিরে এসে খুললেন এই হাসপাতাল। স্ত্রী নেই, সন্তান নেই—সংসারে আর মনই নেই তাঁর। তাই এই হাসপাতাল খুলেছেন—কিছু একটা নিয়ে ভুলে থাকতে হবে তো।

আরও মোটা কথা কানে এল বিশাখার—প্রায় অলৌকিক কাহিনী। কোন সন্ন্যাসী নাকি ডাক্তারকে বলেছেন যে, বিনা পয়সায় গরীব রোগীর সেবা করে তাঁর আগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলে তার মেয়ে রমলা আবার জীবন্ত তাঁর কাছে ফিরে আসবে।

তা হয় নাকি গো, মা?—একদিন জিজ্ঞাসা করলে বিশাখা পাড়ার সব চেয়ে বনেদী যে ঘরে সে পরিচারিকার কাজ করে সেই ঘরের প্রবীণা গৃহিণীকে।

বিশাখার দুঃখের কথা জানা ছিল মহিলার: আশ্বাসের স্বরেই তিনি উত্তর দিলেন, সাধু-সন্ন্যাসীর আশীর্বাদে সবই হতে পারে, বাছা। আর মরা মানুষ ফিরে যদি নাও আসে পুণ্যের কাজ করলে মনে একটু শান্তি পাওয়া যায় বইকি। এই ডাক্তারকেই তো দেখছি। মেয়ের শোকে পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলেন। এখন তো দেখছি হাসছেনও।

ঠিক পথের এ পার আর ও পার। নিজের ঘরের দোর গোড়ায় বসেই ওদিকের দাতব্য চিকিৎসালয়ে ডাঃ দত্তকে কাজ করতে দেখা যায়। পর পর কয়েকদিন বিশাখা নিরীক্ষণ করেই দেখলে তাঁকে। তেমন বয়স হয়নি ডাঃ দত্তের—বিশাখার চেয়ে ছোটই হবেন তিনি। বেশ সুপুরুষ। মুখখানা গম্ভীর, কিন্তু তাকিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, রোগী দেখে আনন্দ পান তিনি।

রোগী বা তাদের আত্মীয়দের মুখে রোজই ডাঃ দত্তের প্রশংসা শোনে বিশাখা। তারপর একদিন সে তাঁর কথাও শুনলে। ঠিক কথা নয়, বক্তৃতা। সেদিনও ডিসপেন্সারীর সামনে খোলা মাঠে সভা হচ্ছিল। সমবেত জনতার পিছনে দাঁড়িয়ে ডাঃ দত্তের বক্তৃতা শুনলে বিশাখা—ভিক্ষা চাচ্ছেন তিনি; বালগোপালের সেবা, নরনারায়ণের পূজার জন্য ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, স্ত্রী-পুরুষ সকলের সহযোগিতা ও সাহায্য প্রার্থনা করছেন। চোখের সামনেই দেখলে বিশাখা—রমলা সেবা মন্দিরের জন্য অনেকেই কিছু কিছু দান করলে, দুচারজন ধনী লোক মোটা টাকা দান করবার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করলে।

পরদিন তার বুক কেঁপেছিল, পা চলতে চায়নি। তথাপি সে ডিসপেন্সারীতে ডাঃ দত্তের সামনে গিয়ে বার দুই ঢোক গিলবার পর অস্ফুট কণ্ঠে বলেছিল, মোকে আপনার কাজে লাগাবেন ডাক্তারবাবু?

কাজ!—বিস্মিত হয়ে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কি কাজ করবে তুমি?

রোগীর সেবা করব।

কেন?—বলতো!

চোখ নামিয়ে আবার ঢোক গিলতে গিলতে থেমে থেমে উত্তর দিয়েছিল বিশাখা, মোরও একটি খোকা ছিল বাবু। তার যত্ন করতে পারিনি আমি। বোধ করি সেই জন্যই রাগ করে সে আমায় ছেড়ে গিয়েছে।

শুনতে শুনতে ডাক্তারের মুখের উপর থেকে বিস্ময় ও সন্দেহের ঘোর কেটে গেল। কোমল কণ্ঠেই তিনি বললেন, এ তো আউট-ডোর ডিসপেনসারি—রোগী আসে, ওষুধ নিয়ে চলে যায়। এখানে সেবা করবার সুযোগ তো তেমন নেই।

তথাপি প্রত্যাশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল বিশাখার মুখ, সে বললে, এখন না থাকলেও পরে তো হবে। এখন যা পাই তাই করব—পুণ্যের কাজ শুনেছি অল্প করলেও লাভ।

হেসে ফেললেন ডাক্তার, জিজ্ঞাসা করলেন, কত চাও তুমি?

ছিঃ!—দাঁতে জিভ কেটে উত্তর দিলে বিশাখা, গরীবের উপকারের জন্য এত করছেন আপনি—আপনার কাছে কি মাইনে চাইতে পারি!

• •

আর হাসেননি ডাঃ দত্ত। কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিশাখার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করেছিলেন।

তখন সবে ত্রিশের কোঠায় পা দিয়েছে বিশাখা। শক্ত, সমর্থ মেয়েছেলে। আজন্ম কঠোর

পরিশ্রম করার জনাই অটুট স্বাস্থ্য রয়েছে তার। অভিজ্ঞ ডাক্তারের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ধরা পড়ল তা। একটু পরে তিনি বললেন, বেশ, কাল থেকেই এসো তুমি। কিছু মাইনেও পাবে। নইলে তোমার চলবে কিসে?

মাইনেটা উপরি। কাজ পেয়েই হাতে যেন স্বর্গ পেল বিশাখা।

তন্দ্রার ঘোরটা হঠাৎ কেটে গেল বিশাখার, চলতি গাড়ী কোন একটা ষ্টেশনে এসে থামতেই তার স্বপ্নের গতিতেও অমনই একটা ছেদ পড়ল যেন। চমকে চোখ মেলতেই তার নিষ্প্রভ চোখের আচ্ছন্ন দৃষ্টিতেও আবছায়া রকমে ধরা পড়ল—অনেক যাত্রী নেমে যাচ্ছে, উঠছে সংখ্যায় অনেক বেশী। বিশাখা যেখানে শুয়ে ছিল নবাগতদের কয়েকজন সেই দিকে এগিয়ে এল।

জরাজীর্ণ দেহ বিশাখার। সর্বাঙ্গে তার রোগের কালিমা। ভিতরে যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছে সে তারই সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি তার চোখে-মুখে। তথাপি তৃতীয় শ্রেণীর যে কামরাতে সোজা হয়ে দাঁড়াবার জায়গাটুকুও পাওয়া যায় না সেখানে তার শুয়ে থাকার দৃশ্যটা অসহ্য। নবাগত যাত্রীদের কে একজন রূঢ় স্বরে বললে, এই বুড়ী, উঠে বস শীগগির। নইলে—

আহা, থাক,—বললে পুরাতন যাত্রীদের একজন, বুড়ীর শক্তিই নেই উঠে বসবার। কতটুকুই বা আর পথ—হাওড়া তো এসেই গেল। ঠিক টাইমে সকাল সাতটার আগেই পৌঁছে যাবে গাড়ী।

ততক্ষণে গোমো প্যাসেঞ্জার আবার চলতে শুরু করেছে। চোখ দুটি বুজে এল বিশাখার। সঙ্গে সঙ্গেই যেন খুলে গেল তার মনের চোখ। স্বপ্ন নয়, স্মৃতির রোমন্থন চলছে বিশাখার মনে। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বের অতীত জীবন আবার নূতন করে যাপন করছে সে।

(২)

স্বর্গই হাতে পেল বিশাখা।

কাজটা যে নূতন তা নয়—সেই ঘরমোছা, বাসন মাজা, ছেলেধরা। কিন্তু ঐ অজানা কাজেরই নূতন ব্যাখ্যা শুনেছে সে। সুতরাং কাজ করতে করতে কেমন যেন একটা নূতন উত্তেজনা অনুভব করলে বিশাখা তার প্রত্যেকটি স্নায়ুতে; আনন্দ যা পেল তা অনাস্বাদিতপূর্ব।

গোড়ার দিকেই একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেদিন দুপুরের দিকে ডিসপেনসারির ঘরটা খালি পেয়ে ঠিকা জমাদারের হাত থেকে ঝাড়ু কেড়ে নিয়ে বিশাখা নিজেই কাজে লেগে গেল। দেখতে দেখতে চেহারাই ফিরে গেল ঘরখানির। খানিক পর ডাঃ দত্ত এ ঘরে এসে নিজেও যেন চমকে উঠলেন। প্রশংসমান চোখদুটি কুণ্ঠিতা বিশাখার মুখের উপর গিয়ে পড়তেই কারণটাও বুঝতে পারলেন তিনি। হেসে বললেন, বেশ করেছ, মোতীর মা। আজ থেকে তুমিই এই সেবা-মন্দিরের মেট্রন।

অবোধ্য শব্দ। ভয়ে কালো হয়ে গেল বিশাখার মুখ। ওর কারণও আন্দাজ করে হো হো করে হেসে উঠলেন ডাক্তার; হাসতে হাসতেই বললেন, কথাটা বুঝতে পারলে না বুঝি? ওর মানে হল গিয়ে—এই ধর—গিন্নী। হ্যাঁ, আজ থেকে তুমিই গিন্নী হলে এখানকার।

সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল বিশাখার—সে আর থামতে চায় না।

কম্পাউণ্ডার মুখ টিপে হাসল। বুঝি সে রসের স্বাদ পেয়েছিল ঐ ডাকটার মধ্যে। পরেও হাসি হাসি মুখে গিন্নী বলেই সে বিশাখাকে সম্বোধন করতে থাকল। তার মুখ থেকে ওটা নিয়ে নিলে রোগীরা। ধীরে ধীরে কান-সওয়া হয়ে গেল ডাকটা, চালু হয়ে গেল বিশাখার ঐ অভিধা। পরিহাসের সম্বোধন মর্যাদার স্বীকৃতি হয়ে রমলা সেবা মন্দিরের নিত্যব্যবহার্য শব্দ-সম্ভারের ভান্ডারে টিকে রইল।

হ্যাঁ, মর্যাদাই পেয়েছিল বিশাখা। রোগী অনেক, ডাক্তার একজন। সহকারী বলতে একটি মাত্র কম্পাউন্ডার নিজের কাজ করেই সময় পায় না। সুতরাং ডাক্তারকে সাহায্য করতে ডাক পরে বিশাখার। আর ডাক্তার তাকে ডাকলেই যেন কৃতার্থ হয়ে ছুটে আসে বিশাখা। সুযোগ পেয়ে শুশ্রূষার মোটামুটি কাজগুলি খুব তাড়াতাড়িই শিখে ফেললে সে। বিস্মিত হলেন ডাঃ দত্ত, খুশী হলেন আরও বেশী। বৎসরখানেক পর একদিন বিশাখাকে তিনি বললেন, শুনছ গিন্নী, তোমাকেই নার্স বলে চালাব এখানে। কিন্তু তোমার সাজ-পোষাকটা একটু বদলাতে হবে। যারা নার্স তাদের ধোপার ধোওয়া ধপধপে শাদা কাপড় পরতে হয়।

সায়া-ব্লাউজ-শাড়ী নিজেই তিনি কিনে এনে দিলেন বিশাখাকে। আরও কিছুদিন পর ডাক্তার তাকে বললেন, তুমি গেরস্থ বাড়ীর কাজ ছেড়ে দাও, মোতীর মা। আমি একটা মতলব করেছি। রাতদিন এখানেই কাজ করতে হবে তোমাকে।

মতলব যে কি তা ধীরে ধীরে জানতে পারলে বিশাখা। আরও দুটি ছোট ছোট ঘর ছিল ঐ দালানেই। সে দুটির সংস্কার সাধন করে দুটি মাত্র শয্যার অন্তর্বিভাগ খোলা হল। রান্না ইত্যাদি কাজের জন্য আর একজন পরিচারিকা এবং সব সময়ে থাকবার সর্তে এক-জন মেথরাণী নিযুক্ত হল। যথাসময়ে এল দুটি রোগী—দুজনেই শিশু।

বিশাখাকে বুঝিয়ে বললেন ডাক্তার দত্ত, ইন-ডোর ওয়ার্ড না থাকলে শুধু আউট-ডোর ডিসপেনসারিকে কেউ হাসপাতাল বলে মানতে চায় না। আর ঐ মানটুকু আগে না এলে তেমন টাকা-পয়সাও আসবে না।

হেসে কথাটা শেষ করেছিলেন ডাক্তার, এই-বার পুরোপুরি গিন্নী হলে তুমি। দেখো, সংসারে যেন বিশৃংখলা না হয়।

অমনি করেই ধীরে ধীরে রমলা সেবা-মন্দিরের বৃদ্ধি হয়েছে। নিজের চোখেই প্রত্যক্ষ করছে বিশাখা সেই বীজ থেকে মহীরূহ হবার সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া,—সেবাব্রতী ডাক্তার রসময় দত্তের ঐকান্তিক নিরলস কর্মযোগ সাধনার ফলে হাসপাতালের বিস্ময়কর, প্রায় অবিশ্বাস্য ক্রমবিবর্তন।

গোড়ায় উন্নতির গতি তত দ্রুত ছিল না। তখনও ঠাকুর দেবতার মন্দিরে বার মাসে তের পার্বণের মত ঐ সেবামন্দিরে সভা, উৎসব ইত্যাদির মারফতে প্রচার ছিল, কিন্তু আড়ম্বর ছিল কম; যশ ছিল, ঐশ্বর্য ছিল না। তখনও রোগী আসত ঝাঁকে ঝাঁকে, কিন্তু টাকা আসত দুটি একটি করে। অভাব রোজই লেগে থাকত তখন—এমন যে বিশাখাও বেশ বুঝতে পারত। তথাপি বেশ ছিল সেবামন্দিরের প্রথম জীবনের সেই বৎসরগুলি। তখন কাজ ছিল বেশী, করবার লোক ছিল কম; দায়িত্ব ছিল বিশাখার, কারও সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। কাজ দিয়ে ঠাসা দিনগুলি তখন কোথা দিয়ে যে কেটে যেত তা যেন বিশাখা টেরও পেত না। তা হোক, তবু বড় মধুর নেশা ছিল সেই কাজের—নিজের হাতে বোনা গাছের গোড়ায় জল ঢেলে ঢেলে ওকে বাড়িয়ে তোলার যে নেশা সেই নেশা তখন পেয়েছিল বিশাখাকে। বুঝি তার চেয়েও মধুর—নিজের আর একটি সন্তানকেই যেন পরিচর্যা করে মানুষ করছে সে।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। খুব বিশ্বাস করতেন তাকে দত্তসাহেব। অবসর পেলে নিজের আদর্শ, স্বপ্ন ও পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করে বোঝাতেন তাকে। অনেক কথাই বুঝতে পারত না বিশাখা। কিন্তু চোখ বড় করে সাগ্রহে সব কথাই শুনত সে। নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি অনুসারে মন্তব্যও করত—যেন পরামর্শ দিচ্ছে ডাক্তার দত্তকে—বুঝি বা আবদারই করছে তাঁর কাছে।

তারপর কেমন যেন ওলোট-পালোট হয়ে গেল সবই।

আর্তনাদ করে উঠল বিশাখা। তার কাছে বসে যে সদাশয় সহযাত্রীটি ভীড়ের আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করছিল সে তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে, কি হল গো তোমার?

নিষ্প্রভ চোখেও ভীত, সন্ত্রস্ত দৃষ্টি—ঘুরে ঘুরে ভয়ের কারণকেই খুঁজছে যেন। শেষ পর্যন্ত প্রশ্নকর্তার মুখের উপর এসে নিশ্চল হল তা। অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত হয়েই যেন শুকনো জিভ দিয়ে ততোধিক শুকনো ঠোঁট দুটি বার দুই লেহন করবার পর বিশাখা বললে, একটু জল দেবে?

জল খেয়ে আবার চোখ বুজতেই পুনরায় অতীতে ফিরে গেল সে।

(৩)

রমলা সেবা মন্দিরের বিচিত্র ঘটনাবহুল জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হল ডাঃ দত্তের স্বর্গীয়া স্ত্রী উত্তরবালার নামাঙ্কিত একেবারে নূতন বিরাট অট্টালিকায় অন্তর্বিভাগের স্থায়ী শিশু ওয়ার্ডের উদ্বোধন দিয়ে।

পুরাতন দাই-কুলীদের সাহায্যে ওয়ার্ড সাজাচ্ছিল বিশাখা। এমন সময় আরও তিনটি নারীকে সঙ্গে নিয়ে ডাঃ দত্ত ভিতরে এসে ঢুকলেন। নবাগতাদের দুজন কাঁচা বয়সের মেয়ে, তৃতীয়জন রীতিমত বর্ষীয়সী মহিলা আর অস্বাভাবিক রকমের মোটা। তারই মুখে ওয়ার্ডের সাজসজ্জার একটি বিরূপ সমালোচনা শুনে বিশাখা প্রতিবাদ করলে।

শুনেই মহিলাটি ঘুরে তার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কে?

মেট্রন।

ফস্ করে বেরিয়ে গিয়েছিল বিশাখার মুখ থেকে—পরে সে নিজেই ভেবে ঠিক করতে পারেনি কেন। কিন্তু তার উত্তর শুনেই মহিলাটির মুখের ভাব অদ্ভুত রকমে বদলে গেল।

কি বলছ তুমি!—বললে মহিলাটি, ঘুরে ডাঃ দত্তের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে সে, ইনি, স্যার, কি বলছেন?

ডাঃ দত্তের মুখের চেহারাও বদলে গিয়েছে মনে হল বিশাখার। কেমন যেন অপরাধীর মত উত্তর দিলেন তিনি এবং তাও বিশাখার অবোধ্য ইংরাজী ভাষায়। উত্তর শুনে তিনটি মেয়েই

আমাদের অগণিত পৃষ্ঠপোষক, বন্ধু আর লক্ষ লক্ষ ক্রেতাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সকলের সকল শুভপ্রচেষ্টার পথ আলোকিত হউক।
'দীপ্তি' মার্কা জিনিষ যে ভাল তা আজ আর নূতন করে বলবার প্রয়োজন নেই, দীপ্তি লণ্ঠন হাজার হাজার গ্রামের লক্ষ লক্ষ গৃহ প্রতিদিনই আলোকিত করছে। 'দীপ্তি' মার্কা সাইকেল এক্সেসারিসও অল্পদিনের মধ্যে তার বৈশিষ্ট আর গুণের দ্বারা সমাদৃত হচ্ছে। ইস্পাত আর পেতলে তৈরী সুন্দর আর সুমিষ্ট ধ্বনির সাইকেল বেল। সুদৃশ্য আর টেকসই সাইকেল পাম্প, উজ্জ্বল সাইকেল ল্যাম্প, ঝাঁকানিতেও যার আলো নিষ্প্রভ হয় না। অত্যন্ত মজবুত সুদৃঢ় গঠন ইস্পাতে তৈরী সাইকেল ফর্ক যা যে কোন সাইকেলে ব্যবহার করা চলে।
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
শারদীয় সম্ভাষণ
KALPANA
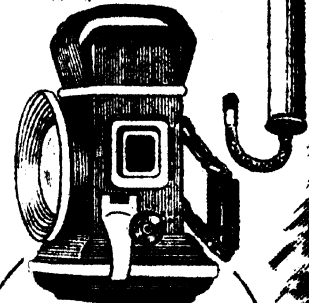
হেসে উঠল; হাসি থামলে মহিলাটি বিশাখাকে বললে, তুমি বাছা, গিন্নী আছ, গিন্নীই থাক। বড় হাসপাতালের মেট্রনকে একটু মোটাসোটা হতে হয়—এই ধর আমার মত।

বৈকালে ডাঃ দত্ত বিশাখাকে নিজের আপিস ঘরে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে বেশ গম্ভীর স্বরেই তাকে বলেছিলেন, আজ যাদের দেখলে, মোতীর মা, তারা এবং তাদের মত আরও কয়েকটি মেয়ে একে একে এখানে কাজ করতে আসবে। ভাল লেখাপড়া, ভাল কাজ জানা সেবিকা ওরা। আমরা—মানে ডাক্তারেরা—ওদের ডাকি সিস্টার—মানে, দিদি—বলে। এখন থেকে ওদের কথামত কাজ করবে তুমি। বুঝলে?

না বুঝেও যন্ত্রচালিতের মতই ঘাড় নেড়েছিল বিশাখা। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি কিছুই! তখন সেবা মন্দিরের পরিবর্তন হচ্ছে বন্যার বেগে। বিশাখা ওর স্রোতের মুখে ক্ষুদ্র তৃণখণ্ড মাত্র।

বেড়ে চলল হাসপাতাল, বেড়ে চলল ডাঃ দত্ত আর বিশাখার অভ্যন্তরের দূরত্বও। আর নববিধানকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েও নবাগতাদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ এড়াতে পারল না বিশাখা।

বিশাখার হাতের পরিচর্যা মনঃপূত হত না সুশিক্ষিতা বিশেষজ্ঞা সেবিকার। মেট্রনের কাছে নালিশ হত তার বিরুদ্ধে—সে কুপথ্য খাইয়েছে কোন রোগীকে বা লাই দিয়েছে ওয়ার্ডের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে। গোড়ায় বিশাখারও পছন্দ হত না পাস করা সেবিকার হৃদয়ের সংস্পর্শহীন যান্ত্রিক সেবা নৈপুণ্য, অসহ্য লাগত ঝি, আয়া মেথরাণীদের ফাঁকি দেওয়া। নিতান্ত অভ্যাসের বশেই প্রতিবাদ করত সে। সঙ্গে সঙ্গে তুমুল কলহ শুরু হয়ে যেত।

ভাষার অদলবদল হলেও কলহের ধারাটা এক—মূলে সুরটি তো বটেই। দাই কি মেথরাণীকে বিশাখা বলত, এ কি কাজ হল? রোজই ফাঁকি দিচ্ছ তুমি।

উত্তর হত ঝাজখাই গলায়, আমরা তো আর দত্তসায়েবের গিন্নী নই। অত কম মাইনেতে এর চেয়ে ভাল কাজ হয় না।

নার্স বা মেট্রনের ভাষা অনেক বেশী মার্জিত। তথাপি তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মতই বিশাখার মর্মভেদ করত তাদের মন্তব্য।

—তোমাকে দিয়ে বাছা এ ওয়ার্ডের কাজ হয় না। বাচ্চা রোগীদের যত্ন করতে জান না তুমি।

প্রথমে যেদিন এই রকম অভিযোগ শুনতে হয় তাকে সেদিন চটে গিয়েছিল বিশাখা। উত্তরে সেও খোঁচা দিয়ে বলেছিল তরুণী, কুমারী নার্সকে, আমি বাচ্চাদের যত্ন জানিনে? দু-দুটি যে আমি পেটেই ধরেছি, সিসটার দিদি!

তীক্ষ্ণকণ্ঠে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত উত্তর হয়েছিল, সে তো কুকুর বেড়ালেও ধরে—এক একবারেই দুটিরও বেশী।

একেবারে মর্মান্তিক আঘাত। বিশাখার দুই বিস্ফারিত চোখ জ্বালা করে জলে ভরে উঠেছিল। সে ছুটে গিয়ে নালিশ করেছিল ডাঃ দত্তের কাছে। কিন্তু প্রতিকারের পরিবর্তে সে পেয়েছিল কিছু অযাচিত, অনাবশ্যক উপদেশ।

সেদিন খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিল বিশাখা। কিন্তু কালক্রমে মহা-সয়-শরীরে সয়ে গেল সবই—এক কাজ থেকে অন্য কাজ, এক ওয়ার্ড থেকে অন্য ওয়ার্ডে বদলি হওয়া; সব রকম লোকের হুকুম মেনে চলা, প্রথম দিকের ঈর্ষার খোঁচার মত শেষ পর্বের তাচ্ছিল্য ও উপেক্ষাও সয়ে গেল তার। রূপ ও দৈহিকসামর্থ্যের ক্রমক্ষীয়মাণ দীপ্তির শেষ রেখাকয়টির মত একে একে সবই গেল বিশাখার কেবল তার অন্তঃসারশূন্য 'গিন্নী' অভিধাটি ছাড়া। সয়ে গেল সবই—বয়সের ভার, কাজের চাপ আর পদ্ধতির জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে মনটাই বুঝি বা মরে গেল বিশাখার।

কিন্তু সেই মনটাও তার বেঁকে বসেছিল, সাপের মত ফোঁস করে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছিল যেদিন বড় জমাদার তার কাছে এসে তাকে জানিয়ে দিলে যে তাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

ঘটাং—ঘট্!

হাবড়া ষ্টেশনে গাড়ী থামল। পথের বন্ধু জিজ্ঞাসা করলে বিশাখাকে, কোথায় যাবে তুমি?

রমলা সেবামন্দিরের নাম করলে বিশাখা। ওরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল, খোঁজ নিল রেল কোম্পানীর কর্মচারীদের কাছে; তারপর বিশাখাকে বললে, সে তো শুনেছি অনেক দূরে। কাছাকাছি তো আরও ভাল হাসপাতাল আছে।

তা থাকুক, উত্তর দিলে বিশাখা, তোমরা মোকে একটি রিক্সাগাড়ীতে তুলে দাও। রমলা মায়ের মন্দিরেই যাব আমি—ঐ তো মোর ঘর। মরণকালে ওখানেই তো মোকে যেতে বলেছেন দত্তসায়েব।

সত্যই বলেছিলেন ডাঃ দত্ত—সেই যেদিন চাকরি গিয়েছে শুনে রেগে-মেগে অনেক দিন পর, অনেক লোকের ভীড় ঠেলে, অনেকের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে দত্তসাহেবের ঘরে গিয়ে হামলা করেছিল বিশাখা।

প্রথমে বিরক্ত হয়েছিলেন দত্তসাহেব, তারপর বিব্রত। শেষ পর্যন্ত অপ্রস্তুত ভাবটাকে গোপন করে হেসেই বলেছিলেন তিনি, অনেক দিন তো কাজ করেছ, মোতীর মা—এখন তোমার ছুটি পাওয়া উচিত।

বিরক্ত নয়, কাতর কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল বিশাখা, ছুটি দিয়ে কি করব বাবু? ছুটি নিয়ে যাব কোথায় আমি?

কেন—তোমার বাড়ীতে যাবে, তোমার মেয়ে মোতীর কাছে।

তার তো বিয়ে দিয়েছি সেই এক যুগ আগে, উত্তর দিলে বিশাখা, মনে নেই আপনার?—বরকনেকে জোড়ে আপনার কাছে নিয়েও এয়েছিলাম আপনার পায়ের ধুলো নেওয়াতে।

মনে ছিল না ডাক্তারের। কিন্তু ওটা অবান্তর কথা। বিশাখার আসল যা বক্তব্য তাই বুঝে অপরাধীর মত চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন তিনি; বলেছিলেন, তোমাকে ভাল বকশিশ দিতে বলে দিয়েছি, মোতীর মা। ঐ টাকা নিয়ে বাড়ীতেই ফিরে যাও তুমি। হাজার হলেও সে তো তোমারই বাড়ী।

কিন্তু বড় অবুঝ বিশাখা। সে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে বললে, এই মন্দিরকেই তো আমি বাড়ী মেনে নিয়েছিলাম বাবু। দেশের খালি বাড়ীতে কার কাছে যাব আমি? মরণকালে কে মোকে দেখবে?

নাছোড়বান্দার জিদেই কেবল নয়, বড় মর্মস্পর্শী ঐ আবেদন। শেষ পর্যন্ত ডাক্তারকে আশ্বাস দিয়ে বলতে হল, তেমন অসুখ-বিসুখ হলে এখানেই তুমি চলে এসো, মোতীর মা। এত লোকের চিকিৎসা হয় এখানে, আর তোমার হবে না!—

গভীর অন্ধকারের মধ্যে ঐ আশ্বাসই ছিল একমাত্র আলোকশিখা। ওকেই আশ্রয় করে দেশে ফিরে গিয়েছিল বিশাখা। গ্রামের লোকে জানত তার ঐ শেষ নির্ভরের সন্ধান। তাই তার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে দেখে তারাই উদ্যোগ করে বিশাখাকে কলকাতার গাড়ীতে বসিয়ে দিয়েছিল।

(৪)

রিকসাওয়ালা রমলা সেবামন্দিরের সামনে বিশাখাকে নামিয়ে দিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল বিশাখা। আরও বড় হয়েছে রমলা সেবামন্দির। নূতন রংকরা দালানগুলি সকালের রোদে ঝক ঝক করছে। সিংহদ্বারে ফুল-পাতা আর লাল শালু কাপড়ের ভারি সুন্দর সাজ চোখে পড়ল বিশাখার। অনুমান করলে সে যে কোন একটি উৎসবের উদ্যোগপর্ব চলছে।

অত চেনা জায়গা, তবু কেমন যেন নূতন, অচেনা মনে হয়। বহির্বিভাগে সবই অচেনা মুখ। চেনা কেবল ঘরখানি, ওর ভিতরে রোগীর ভীড় আর অনেক মানুষের দেহের ভাপসা দুর্গন্ধের সঙ্গে অনেক রকম ওষুধের বাস মিশে যার সৃষ্টি হয়েছে সেই বিশিষ্ট গন্ধটা।

ডাক্তার যে ঘরে বসে রোগী দেখছিলেন ওতে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেল বিশাখা। বেয়ারা প্রায় ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে তাকে, তোমার টিকেট কোথায়, বুড়ি?

থমকে দাঁড়িয়ে বিশাখা বললে, মোরও টিকেট লাগবে নাকি?

কেন লাগবে না? লাটসায়েবের বিবি নাকি তুমি?

তীরের মতই কথাটা বুকে গিয়ে বিঁধল বিশাখার। কিন্তু গুটি গুটি ফিরে গিয়ে টিকেটই করলে সে। তারপর দাঁড়াল লাইনে।

ডাক্তারও অচেনা। গম্ভীর মুখ, রোগী দেখছে যেন কলের মত। সে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলে বিশাখাকে, কি কষ্ট তোমার?

জিজ্ঞাসা তো নয়, যেন ধমক। থতমত খেয়ে বিশাখা উত্তর দিলে, বড় কষ্ট, ডাক্তারবাবু। বড় ব্যথা।

কোথায়?

বিশাখা হাত দিয়ে দেখাল—প্রথমে পেট, তারপর বুক। লক্ষ্য করে হাসল ডাক্তার—হাঁ, বিশাখাকে অবাক করে দিয়েই মুচকি হাসল সে; বললে, মাথায় নয়?

রোগীর পরীক্ষাও শুরু হল সঙ্গে সঙ্গেই। ডাক্তার বিশাখার নাড়ী দেখলে, পেট টিপলে, বুক ও পিঠ পরীক্ষা করলে; তারপর একখানা ছাপা কাগজের উপর খস্ খস করে দুছত্র লিখে কাগজখানা বিশাখার দিকে ঠেলে দিয়ে বললে, ওষুধটা বাজার থেকে কিনে নিয়ে যাও, দিনে দুবার খেয়ো।

বিহ্বল হয়ে বিশাখা বললে, মোকে ভর্তি করবেন না, বাবু?,

উত্তর হল, মরবার জায়গা তো এটা নয়, সারবার মত রোগ যাদের হয় কেবল তাদেরই ভর্তি করা হয় এখানে—তাও যদি জায়গা থাকে।

শুনে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল বিশাখা; বললে, মোর যে এখানেই মরবার সাধ বাবু। এই তো দত্তসায়েব মোকে শেষ কালে এখানেই আসতে বলেছেন।

একটু যেন বিস্মিত হল ডাক্তার; বিশাখার মুখের দিকে চেয়েই সে জিজ্ঞাসা করলে, দত্ত-সাহেবকে চেন নাকি তুমি?

ওমা!—আমি চিনিনে তাকে তো কে চিনবে!—উত্তর দিলে বিশাখা. এই মন্দিরের শুরু থেকেই যে এখানে কাজ করেছি আমি। এ যে আমারও নিজের হাতেগড়া জিনিস, বাবু।

মুখ ফিরিয়ে নিলে ডাক্তার; একটু বিলম্বে হলেও সঙ্কল্পের দৃঢ় স্বরেই সে বললে, তাহলে দত্তসাহেবের কাছেই যাও তুমি। আমি তোমাকে ভর্ত্তি করতে পারব না।

শক্ত আঘাত। কেবল মনের উপর নয়, দেহেও আঘাত লেগেছিল বিশাখার যখন বেয়ারা তাকে একরকম ধাক্কা দিয়েই ঘর থেকে বের করে দেয়। বাইরে গিয়ে সিঁড়ির উপর অর্ধমূর্ছিতের মত পড়ে ছিল সে; চেতনা যখন তার সম্পূর্ণ ফিরে এল তখন বহির্বিভাগ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

গ্রীষ্মের দুপুর। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ, খাঁ খাঁ করছে বিশাখার বুকের ভিতরটাও। আর জ্বলছে তার পেট—অত ব্যথা যে পেটে তাও আবার ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলে।

বিপরীত দিকে একটি মিষ্টান্নের দোকান। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে বিশাখা, দুধ আছে—গরম দুধ?

উত্তরে দোকানদার পাল্টা প্রশ্ন করলে, তোমার পয়সা আছে?

কিছু পয়সা ছিল বিশাখার। দুধের দাম পেয়ে মুখ ও দিল দুইই খুলল দোকানদারের। সহানুভূতির স্বরেই সে জিজ্ঞাসা করলে বিশাখাকে, হাসপাতালে ভর্ত্তি হতে এসেছিলে বুঝি?

হ্যাঁ, বাবা, উত্তর দিলে বিশাখা।

পারলে না ভর্ত্তি হতে?

না।

তা তো আগেই বোঝা উচিত ছিল তোমার, দোকানী তিক্ত কণ্ঠে মন্তব্য করলে, বড় লোক না হলে আজকাল কেউ হাসপাতালে ভর্ত্তি হতে পারে?

সে কি গো! এ মন্দির তো হয়েছিল গরীবের সেবার জন্যই।

সে যখন হয়েছিল তখন, দোকানদার ঠোঁট বেঁকিয়ে উত্তর দিলে, এখন হয়েছে, ফেল কড়ি মাখ তেল। রোগী ধরবার ফাঁদ, ডাক্তারদের তালুক।

এ যেন তারই সন্তানের নিন্দা নিজের কানে শুনতে হচ্ছে বিশাখাকে। তবু প্রতিবাদ করবার মত জোর নেই বিশাখার মনে। আশাভঙ্গের বেদনায় একেবারে মুষড়ে পড়েছে তা।

কিন্তু সেই মনই তার আশায় ও আনন্দে নেচে উঠল যখন কথায় কথায় দোকানীর মুখ থেকেই জানতে পারলে সে যে ঐ দিন অপরাহ্নে রমলা সেবা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার রসময় দত্তের অশীতিতম জন্মদিনে তার সুদীর্ঘ জীবনের নিঃস্বার্থ ও নিরলস সমাজ সেবার স্বীকৃতি হিসাবে নগরবাসীদের পক্ষ থেকে তাঁর সম্বর্ধনা হবে। সেবামন্দিরের ঐ সাজসজ্জা সেই উৎসবেরই আয়োজন।

লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল বিশাখা—দত্ত-সাহেবের দেখা যখন পাওয়া যাবে তখন আর ভয় নেই তার। তাঁরই কাছে নালিশ জানাবে সে. নৈরাশ্য ও অপমানের পুঞ্জীভূত বেদনা তাঁরই পায়ে নিবেদন করে শান্তি ও আশ্রয় অর্জ্জন করবে সে।

অনেক বাধা অতিক্রম করে, অনেকের তোষা-মোদ করে সভামণ্ডপের এক কোণে রবাহুত-দের সঙ্গে বসবার স্থান পেল বিশাখা।

নিজের সুদীর্ঘ কর্মজীবনে এই প্রাঙ্গণেই কত অনুষ্ঠান দেখেছে সে। কিন্তু স্বস্তিবাচন থেকে শুরু করে সমাপ্তি সঙ্গীত পর্যন্ত যে সুদীর্ঘ ও সাড়ম্বর অনুষ্ঠান সেদিন সে প্রত্যক্ষ করলে তেমন সে আগে আর কখনও দেখেনি। বেদমন্ত্রে উদ্বোধন, আরতি, বরণ, মাল্যদান, প্রশস্তিকীর্তন কত কি! অনুষ্ঠান অনেক, লক্ষ্য এক—যেন পূজা হচ্ছে দত্তসাহেবের। এক সময়ে সব ছেড়ে বিশাখার চোখ দুটি শুধু সেই দত্ত-সাহেবকেই দেখতে লাগল।

বৃদ্ধ হয়েছেন ডাক্তার—মাথার চুল দুধের মত সাদা। তবু বড় সুন্দর তাঁর মুখ। ওতে ছাপ যা পড়েছে তা বয়সের, জরার নয়। রোগের কালিমা স্পর্শও করেনি সে মুখ, শোকের ছায়াও আর সেখানে দেখা যায় না। উজ্জ্বল সে মুখ-মণ্ডল—অপরিমেয় প্রাপ্তি, পরিপূর্ণ সার্থকতার আনন্দে উদ্ভাসিত।

আনন্দের বান ডাকল বিশাখার মনেও। তার দত্তসায়েবের এর সম্মান আজ—হ্যাঁ, তারও ঐ দত্তসাহেব। দুজনে তারা এক সঙ্গে কাজ করেছে এই সেবা-মন্দিরে, সেকালের দুঃখ দারিদ্র্য দুজনে ভাগ করে সয়ে ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছে এই প্রতিষ্ঠান। তাকে তিনি ভর্ৎসনা করেছেন, প্রশংসা করেছেন তার চেয়ে অনেক বেশী। সেই দত্তসায়েবেরই বিপুল সার্থকতার সাড়ম্বর স্বীকৃতির সঙ্গে এমন রাজকীয় সম্বর্ধনা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করছে সে!—

চোখে জল এল বিশাখার—দুঃখে নয়, আনন্দে। দত্তসাহেবের গৌরবে অকস্মাৎ সে নিজেও যেন গরবিনী ও দত্তসাহেবের মহিমায় নিজের কাছে নিজেও সে মহিমময়ী হয়ে উঠল।

মনের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল বিশাখা, তার উপর আবার চোখে জল। কখন যে অনুষ্ঠান শেষ হল, সভা ভেঙ্গে গেল, তা বুঝতেই পারলে না সে। পরিবেশ সম্বন্ধে যখন সম্পূর্ণ সচেতন হল বিশাখা, তখন দত্তসাহেব চলে গিয়েছেন।

সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে সবই ফিরে এল বিশাখার—ব্যর্থ জীবনের হাহাকার, অপমানের স্মৃতি, আশা ভঙ্গের বেদনা, নিরাশ্রয়ের অসহায়-বোধ, আর সেই সঙ্গেই তার পেট না বুকের ব্যথাটাও।

যারা আলো নিবিয়ে সতরঞ্চ গুটাচ্ছিল তারা হাঁকিয়ে দিলে বিশাখাকে। একটু হেঁটে গিয়ে সে একটি ওয়ার্ডের রকে বসবার উপক্রম করতেই প্রায় মার মার করে ওর দিকে ছুটে এল দুটি হাসপাতালের কুলি। তাড়া খেয়ে রাজ-পথেই ফিরে যেতে চেয়েছিল বিশাখা। কিন্তু চেনা পথও তার ভুল হয়ে গেল। ঘুর পথে সে চলে গেল আরও ভিতরের দিকে। কিন্তু খানিকটা গিয়েই থমকে দাঁড়াতে হল তাকে।

সামনেই ছোট মতন একটু বাগান। তাতে থোকে থোকে ফুল বা পাতাবাহারের গাছ। নীচু, কিন্তু চেষ্টা করলে ওর আড়ালে আত্মগোপন করা যায়। তাই করলে বিশাখা—এ যেন শাপে বর হয়েছে তার।

খুব জোরালো না হলেও আলো জ্বলছে চারিদিকেই। কিছুক্ষণ চেষ্টা করে জায়গাটাকে চিনতে পারলে বিশাখা। আগে জায়গাটা ফাঁকা পড়েছিল। কাজকর্ম না থাকলে হাসপাতালের কুলি মেথরেরা ওখানে আসত আড্ডা দিতে। শেষের দিকে করত তাদের মিটিং।

ততক্ষণে বিশাখার স্মৃতি আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। একটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর একটি ঘটনা সহজেই মনে পড়ে যাচ্ছে তার। মিটিং-এর কথা স্মরণ হতেই বিশেষ একটি ঘটনার স্মৃতি তার মনে জেগে উঠল।

হ্যাঁ, ঠিক এই জায়গাটিতেই যুদ্ধ শুরু হবার বছর খানেক পর দত্তসাহেবকে ঘেরাও করেছিল হাসপাতালের দাই-কুলি-মেথরেরা তাদের মাইনে বাড়িয়ে নেওয়াবার জন্য। কি দুর্দশাই না সেদিন হয়েছিল ডাক্তারের!

কথায় কথায় বলেছিলেন দত্তসাহেব, তোমরা মাসে মাসে মাইনে পেয়েও এত অভিযোগ করছ। কিন্তু দেখ তো ডাক্তারবাবুদের। এত বড় বড় সব ডাক্তার—তবু একটি পয়সাও কেউ নেন না।

কর্মীদের ভিতর থেকে একজন উত্তর দিয়েছিল, তাঁরা মাইনে না নিয়েও কাজ করতে পারেন, কারণ এখানে তাঁদের উপরি রোজগার আছে।

বিরক্ত হয়ে ডাঃ দত্ত বলেছিলেন, উপরি রোজগার তোমাদের নেই? রোগীদের কাছ থেকে বকশিশ আদায় কর না তোমরা?

সে তো আনি-দু আনি। ডাক্তারবাবুদের উপরি আয়ের সঙ্গে কি ওর তুলনা চলে, স্যার?

একটু থেমেই অধিকতর রুক্ষ কণ্ঠে সেই লোকটিই আবার বলেছিল, ও কথা থাক। আসল কথা বলুন। পনর-কুড়ি টাকা মাইনেতে এদের কাজে বহাল করেছেন আপনি। তারপর এক পয়সাও মাইনে বাড়াননি কারও। চারদিকে খোঁজ নিয়ে দেখুন তো, এমন কোন্ প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে এই মাগ্গির বাজারে মজুরের মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হয়নি?

উত্তরে ডাঃ দত্ত বলেছিলেন, তাদের সঙ্গে কি এই হাসপাতালের তুলনা চলে? এ তো কারবার নয়, এ যে সেবা-প্রতিষ্ঠান।

কিন্তু অমন কথা শুনেও দমেনি লোকটি; বরং আরও বেশী উদ্ধত স্বরে সে বলেছিল, যাকে আপনি কারবার বলছেন, তাও আসলে সেবা-প্রতিষ্ঠানই। ওষুধ যারা তৈরি করে বা বেচে, তারাও রোগীর সেবা করে। ওরা কাজ না করলে এক দিনও আপনার রোগীর সেবা চলবে?

ডাক্তার বলেছিলেন, তাহলেও ও সব হল গিয়ে কারবার। ওতে লাভ হয়।

আপনারও হয়।

লাভ?

লাভ বই কি! ডাক্তারবাবুদের যে হয় তা তো আগেই শুনলেন। আপনার নিজের অর্থলাভ না হতে পারে। কিন্তু যশ, প্রতিপত্তি, কর্তৃত্ব—এ সবও তো লাভ ডাক্তারবাবু।

মনে পড়ল বিশাখার, শুনে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল দত্তসাহেবের মুখ। ছুটে পালিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

সেই রাত্রেই শুনেছিল বিশাখা যে, যে

বন্দী — সনৎকুমার রায়চৌধুরী
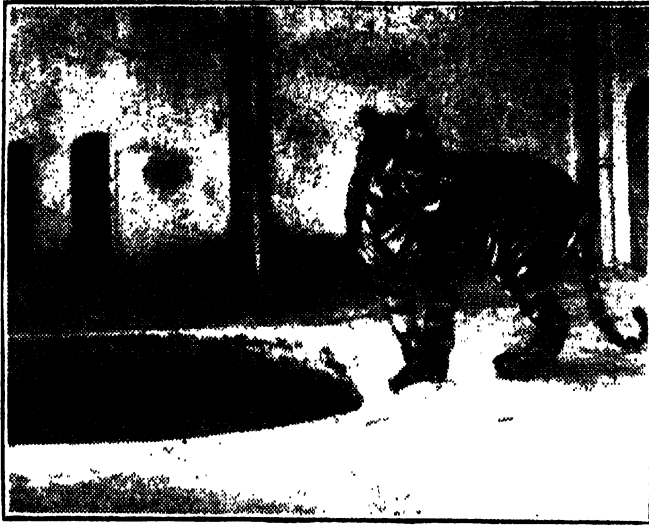
লোকটি দত্তসাহেবকে অমন কড়া কথা শুনিয়েছে সে নাকি হাসপাতালের কর্মী নয়, বাইরের লোক। তথাপি খুবই খারাপ হয়ে-গিয়েছিল বিশাখার মন—যেন তারই দোষ। দত্তসাহেবের জন্য দুঃখও হয়েছিল তার মনে। পরদিন ভোরেই সে দত্তসাহেবের বাড়ীতে গিয়ে নিজের সঞ্চিত অর্থ থেকে পঞ্চাশটি টাকা ডাক্তারের পায়ের কাছে রেখে অনুনয় করে বলেছিল, দশজনের কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে এনে তবেই তো ওদের বাড়ীতে মাইনে দেবেন আপনি। তা আমার এই টাকা কটিই নিন। সেবা-মন্দিরে থাকলেই আমার সব থাকল।

নিয়েছিলেন দত্তসাহেব তার সে সামান্য দান,—না নেন নি? সঠিক মনে করতে পারলে না বিশাখা। মাথাটা কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে তার—টুকরো টুকরো অসংখ্য স্মৃতি কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

শরীরটা আরও বেয়াড়া। একটু আগেই সেটা চলতে চলতে বসতে চাচ্ছিল, এখন বসতে পেয়েই শুতে চাচ্ছে।

(৫)

নিদ্রা নয়, তন্দ্রার ঘোর লেগেছিল বিশাখার চোখে। হঠাৎ একটি হুঙ্কার শুনে তা কেটে গেল,—কে রে ওখানে?

যমদূতের ডাক নাকি? ধড়মড় করে উঠে বসল বিশাখা।

কিন্তু না। হাতে একগাছা লাঠি থাকলেও যমদূতের মত চেহারা নয় লোকটির। একটু আশ্বস্ত হল বিশাখা। আর সে যে বৃদ্ধা তাও বুঝতে পেরে লোকটি মোলায়েম সুরেই আবার বললে, ওখানে কি করছ তুমি? চুরি করবার মতলব নাকি?

না, বাবা,—বলতে বলতে একবার ঢোক গিলল বিশাখা,—ভর্তি হতে এয়েছি।

এই কি তার সময়? না এইটে ভর্তি হবার জায়গা?

ঠিক জায়গায়ই গিয়েছিলাম বাবা,—সকাল বেলায়ই এয়েছিলাম। কিন্তু ভর্তি করলে না ডাক্তার চিনলেই না মোকে।

হেসে ফেললে লোকটি। বিদ্রূপের হাসি, কিন্তু খুব তীক্ষ্ণ নয়। হাসতে হাসতেই বললে, চেনবার মত লোক নাকি তুমি?

এককালে সকলেই তো চিনত। আর খুব বেশী দিনের কথাও নয় তা।

অপ্রতিভের কণ্ঠস্বর মোটেই নয়, বরং অভিমানের রেশ আছে সুরে। তাই বুঝেই তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল লোকটির দৃষ্টি; সে বললে, বল কি! দেখি তো কেমন চেনা মানুষ তুমি।

সঙ্গে সঙ্গেই টর্চের তীক্ষ্ণ আলোক পড়ল বিশাখার মুখের উপর। অভিনিবেশ সহকারে কিছুক্ষণ তাকে দেখবার পর আলো নিভিয়ে ঈষৎ সংশয়ের স্বরে বললে লোকটি, চেনা চেনাই যেন লাগছে। তুমি কি মোতীর মা?

হাউ মাউ করে উঠল বিশাখা; বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতই মুখ তুলে কাঁদবার মতই সে বললে, সত্যই তুমি চিনলে নাকি মোকে? কেমন করে চিনলে? আমার আমলে ছিলে নাকি তুমি এখানে? কে তুমি?

আমি হৃদয়—হিদে মণ্ডল গো। আপিসের ছোকরা হয়ে ঢুকেছিলাম, এখন চৌকিদার হয়েছি। আমাকে চিনতে পারছ না তুমি?

চোখে আর তেজ নেই বাবা,—বলতে বলতে চোখ মুছল বিশাখা—তবু চেনা চেনাই লাগছিল তোমাকে, তাই তো তোমায় দেখে ডর লাগে নি মোর।

হাসল হৃদয়—কৃতার্থের হাসি, তবু একটু লজ্জারও মিশাল আছে তাতে। বললে, ভাগ্যিস এক ঘা লাঠি বসিয়ে দেই নি তোমার পিঠে। তা তুমি এখানে কেন, মাসী? কাণ্ডখানা কি?

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, চোখের জল মুছবার ফাঁকে ফাঁকে সব কথা, অনেক কথাই বললে বিশাখা। শুনতে শুনতে গম্ভীর হল হৃদয়ের মুখ। বিশাখা থামলে, সে ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললে, অমনি হয়েছে আজকাল। আমরা যারা এখানে চাকরি করছি তাদেরই ওরা ভর্তি করতে চায় না। তুমি তো কত দিন হল কাজ ছেড়ে গিয়েছ।

কিন্তু একটু থেমেই হঠাৎ হাতের লাঠিখানা সশব্দে মাটিতে ঠুকে বেশ দৃঢ় স্বরেই সে আবার বললে, ভাবনা করো না মাসী। কাল তোমাকে ভর্তি করিয়ে নেব আমরা। আর না-ও যদি ভর্তি করে তাতেও পরোয়া নেই। আমার বাসায় নিয়ে রাখব তোমাকে।

কৃতার্থ ও আশ্বস্ত হয়ে বললে বিশাখা, তাহলে বাবা, বাকি রাতটুকু এইখানটাতেই শুয়ে থাকি আমি, কি বল?

আলবৎ—

বলেও কিন্তু পরক্ষণেই যেন মুষড়ে পড়ল হৃদয়; মুখ ম্লান করে ক্ষুণ্নকণ্ঠে সে আবার বললে, তা তো হবে না, মাসী। যা কড়া কানুন হয়েছে আজকাল। সুপারবাবু রোঁদে বেড়িয়ে তোমায় এখানে দেখতে পেলে আমাদের সব ক'জন চৌকিদারের চাকরি যাবে।

তাহলে, বাবা, কোথায় যাব আমি?

তাই-তো! —

বলেই পরক্ষণেই আবার যেন চাঙ্গা হয়ে উঠল হৃদয়; হাতের লাঠিখানা পুনরায় মাটিতে ঠুকে দৃঢ়স্বরে সে বললে, কুছ পরোয়া নেই, মাসী। ওঠ তুমি। এস আমার সঙ্গে। আউট ডোরের কাছে চোরাকুঠুরির মত একটা জায়গা আছে। সেখানেই লুকিয়ে রাখব তোমায়।

দৃঢ় কণ্ঠের নির্ভরযোগ্য আশ্বাস। বুকের ভিতরটা হঠাৎ যেন দুলে উঠল বিশাখার। মুহূর্ত মধ্যেই জীবনের স্বাদটাই বদলে গেল যেন, বদলে গেল পরিবেশের রূপটাও। শাখানেক আলো যেন এক সঙ্গে জ্বলে উঠেছে। এতক্ষণ বিশাখা সব কিছুই দেখছিল যেন ছায়া ছায়া—হঠাৎ প্রত্যেকটি দৃশ্যই অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠল। ভাস্বরই কেবল নয়, রঙে রঙিন। বড় চেনা ঘরবাড়ী সব—তারই হাতে গড়া, মনের রঙে রাঙানো সেবা-মন্দির। মধ্যাহ্নের খর রৌদ্রেও তারই চোখের সামনে গভীর অন্ধকারের মধ্যে যা হারিয়ে গিয়েছিল তাই এখন লক্ষ সূর্যের স্বর্ণ কিরণে উদ্ভাসিত হয়ে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। নিষ্প্রভ চোখ দুটি তার অকস্মাৎ বিস্ফারিত হল, থর থর করে কেঁপে উঠল তার দেহ।

হৃদয় অসহিষ্ণুর মত আবার বললে, ও গিন্নী, উঠছ না যে!—

সেকালের সম্বোধন। কানে যেন মধুবর্ষণ হল বিশাখার। শীর্ণ, কম্পমান ডান হাতখানা হৃদয়ের দিকে প্রসারিত করে বিশাখা বললে, একটু ধরে তুলবি বাবা?

হাত বাড়িয়ে বিশাখার হাত ধরলে হৃদয়। কিন্তু একটু আকর্ষণ করতেই ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল বিশাখার দেহ।

কি হল, মাসী?—উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলে হৃদয়।

উত্তর পাওয়া গেল আধ ঘণ্টা পর এমার্জেন্সি ওয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারের মুখে—স্বাভাবিক কারণেই বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে।

রমলা সেবা-মন্দিরেই মরবার সাধ পূর্ণ হয়েছে মোতীর মা'র।

নিছক গল্প

শ্রী নবগোপাল দাস

পরেশবাবু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—ভালভাবে যাচাই না ক'রে ভবিষ্যতে কোন লেখা আর 'অনুভা'য় ছাপ্‌বেন না। একদিকে নবাগত লেখক-লেখিকাদের উপদ্রব, অপরদিকে তথাকথিত লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকদের বিদ্রূপাত্মক ব্যবহার উভয়ই যেন শালীনতার সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে।

অবশ্য সম্পাদকের অস্ত্রশালায় অস্ত্রের অভাব নেই, যা' প্রয়োগ করা যায় এই সব অনম্র উদ্ধত আবেদনকারী এবং আবেদনকারিণীদের প্রতি। কিন্তু ঐখানেই ত পরেশবাবুর মুস্কিল, কটু কথা তিনি মোটেই বল্‌তে পারেন না।

এই ত সেদিন এক অশীতিপর বৃদ্ধ এসে-ছিলেন তাঁর কাছে, তাঁরই এক আত্মীয়ের পরিচয়পত্র নিয়ে। উদ্দেশ্য, তিনি স্বদেশী যুগের বিপ্লব সম্বন্ধে স্মৃতিকথা লিখ্‌বেন এবং পরেশবাবুকে তা' ছাপতে হবে তাঁর 'অনুভা' পত্রিকায়। ......যখন পরেশবাবু তাঁকে প্রশ্ন করে জানলেন যে আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল খুবই সামান্য, তখন নিরুপায় হয়ে বললেন, দেখুন, দেশ আজ স্বাধীন হয়েছে অনেকদিন, কাজ'নীযুগের কাহিনী বাংলাদেশের বর্তমান জনসাধারণ শুনতে চায় না মোটেই!

ভবতারণবাবুর সে কি রাগ! বললেন, আপনারা সম্পাদকেরা বসে আছেন বিরাট ক্ষমতা হাতে নিয়ে, সেই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার হবে লোকে আশা করে। ......জনমত সৃষ্টি হবে কি করে যদি আপনারা সকলের সামনে তুলে না ধরেন ইতিহাসের অনুশাসন? আজ কি হচ্ছে এবং আগামীকাল কি হবে সেটা যেমন জানানো দরকার, তেমনি জানানো দরকার গতকাল কি হয়েছিল।

ভুলটা পরেশবাবুরই। ভবতারণবাবু স্মৃতিকথা কেন ছাপানো চল্‌বে না তার আসল কারণ যদি তিনি খোলাখুলি বলে দিতেন তাহ'লে হয়ত এই তর্কের মধ্যে প্রবেশ করতে হ'ত না। কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলতে পরেশবাবু নিতান্তই অক্ষম।

আরেক দিনের কথা। পরেশবাবু নিবিষ্ট মনে পরবর্তী সংখ্যার প্রুফ দেখছেন, হঠাৎ চোখ পড়ল দরজার দিকে। দেখলেন, আধা বয়সী এক মহিলা দাঁড়িয়ে র'য়েছেন।

—আপনি? আপনি কে? এখানে ঢুকতে আপনাকে কে অনুমতি দিল;......বিরক্তির সঙ্গে পরেশবাবু প্রশ্ন করলেন।

মিহি সুরে আগন্তুকা জবাব দিলেন, আপনার বেয়ারার দোষ নেই, সে বাধা দিয়েছিল। আমি তাকে বলেছি, আপনার সঙ্গে আমার অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে, কাজেই আপত্তি করবার কোন কারণ সে পেল না।

মহিলার স্পর্ধা দেখে পরেশবাবু অবাক!

—আপনি রাগ করবেন না, চিঠি লিখেও আপনাদের কাছ থেকে কোন জবাব পাওয়া যায় না, আর যদিই বা জবাব আসে তা' এত সংক্ষিপ্ত যে তা' থেকে কিছুই বোঝা যায় না। তাই ভাব্‌লাম সোজা গিয়ে হাজির হই সম্পাদক-মশায়ের সাম্‌নে।

—আপনি আমার কাছে চিঠি লিখেছিলেন, জবাব পান্‌নি?......

পরেশবাবু প্রশ্ন করলেন।

—প্রথম চিঠির জবাব পাইনি, দ্বিতীয়খানার জবাব পেয়েছি, কিন্তু জবাবটা সন্তোষজনক নয়।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ আর কিছুই নয়, জবাবটা অত্যন্ত কাঠখোট্টা।......সে কাহিনী বল্‌বার আগে পরিচয় দিয়ে নি; আমি হচ্ছি শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী।

পরেশবাবুর একবার মনে হ'ল নামটা পরিচিত, কিন্তু তিনি কিছুতেই স্মরণ করতে পারলেন না কি প্রসঙ্গে শকুন্তলা দেবীর সঙ্গে তাঁর পত্র-বিনিময় হয়েছিল।

শকুন্তলা দেবী বলে চল্‌লেন, আমি আপনাদের গত পুজো সংখ্যায় প্রকাশের জন্য তিনটি কবিতা পাঠিয়েছিলাম, আপনারা তার একটিও ছাপেননি।......আমার কবিতা প্রকাশ হবে এই আশায় নগদ চারটি টাকা দিয়ে এক সংখ্যা কিনলাম, টাকাটা নেহাৎ জলে গেল!...... আপনারা এমন অভদ্র যে কবিতাগুলো ফেরতও পাঠালেন না। তখন ভাব্‌লাম স্থানাভাবে হয়ত পুজো সংখ্যায় ছাপতে পারেননি; পরে নিশ্চয়ই ছাপবেন। কিন্তু পর পর দু' মাস যখন অতিক্রান্ত হয়ে গেল তখন আমার ধৈর্য আর রইল না, আপনাদের কাছে চিঠি লিখ্‌লাম। তার কোনই জবাব পেলাম না। অবশেষে রেজিস্টারী পোস্ট-এ দ্বিতীয় চিঠি লিখ্‌লাম, তার জবাব এল আপনাদের ছাপান পোস্টকার্ডে, তার মধ্যে সব কথাই আগে থেকে ছাপান রয়েছে, শুধু 'মহাশয়'-কে করে দিয়েছেন 'মহাশয়া', আর 'প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা' এসবের মধ্যে 'কবিতা' কথাটুকু অক্ষত রেখে বাকী সব কেটে দিয়েছেন।......আর নীচে 'সম্পাদক'-এর উপরে কে একজন হিজিবিজি করে দস্তখত করেছেন, বোঝাই যায় না স্বাক্ষরকারী মানুষ না বনমানুষ!

ব'লে শকুন্তলা দেবী পোস্টকার্ডখানা পরেশবাবুর নাকের ডগার সাম্‌নে তুলে ধরলেন।

পরেশবাবু পড়লেন, ছাপান হরফে লেখা:

'মহাশয়া, অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি আপনার প্রেরিত কবিতা আমাদের পত্রিকায় প্রকাশ করিতে আমরা অসমর্থ। নমস্কার জানিবেন।—ইতি, সম্পাদক।'

আম্‌তা আম্‌তা করে বল্‌লেন, এটা নিশ্চয়ই ভুল করে আপনার কাছে গিয়েছিল, আমাদের অপরাধ মার্জনা করবেন।

শকুন্তলা দেবী একটু শান্ত হ'লেন। বল্‌লেন, আমিও একবার তাই ভেবেছিলাম।... যদিও এই প্রথম আপনাদের কাছে আমার কবিতা পাঠিয়েছি, আমি কবিতা লিখ্‌ছি গত কুড়ি-একুশ বছর যাবৎ, একখানা বইও ছাপিয়েছি, তাই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আপনাদের এই জবাব দেখে!

অপ্রিয় সত্য বলতে অপারগ পরেশবাবুকে পরের সংখ্যায় ছাপতে হ'ল শকুন্তলা দেবীর একটি কবিতা, তবে যাতে পাঠকদের নজরে সহজে না পড়ে সেজন্য সেটা স্থান পেল একটি কোণে।

শকুন্তলা দেবী স্বল্পে সন্তুষ্ট। বাকী কবিতা দুটো প্রকাশ করা সম্বন্ধে তিনি এ পর্যন্ত পরেশবাবুকে কোন আবেদন জানাননি, এমন কি টেলিফোনও করেননি।'

আপনাদের এই দুটো খণ্ড কাহিনীর কথা বল্‌লাম আজকের গল্পের একটা পট-ভূমিকা সৃষ্টি করতে। যে গল্প এখন বল্‌ব তার সঙ্গে ভবতারণবাবু বা শকুন্তলা দেবীর কোনই সংস্রব নেই, তবে তিনটি কাহিনীরই কেন্দ্র হচ্ছেন আমাদের 'অনুভা' সম্পাদক পরেশবাবু, ভবতারণবাবু এবং শকুন্তলা দেবী হচ্ছেন তাঁর সেই সব লেখক লেখিকার প্রতিনিধি যাঁরা অনেক চেষ্টা করেও অনুভার পৃষ্ঠায় স্থান পাননি।' এর জন

তাঁরা দায়ী করেছেন পরেশবাবুর আত্মম্ভরিতাকে। সম্পাদকের তাকিয়ায় আরামে ঠেসান দিয়ে ব'সে 'অমনোনীত' স্লিপ পাঠানো খুবই সহজ, কিন্তু কত নুন-জল-কাঠ খুইয়ে প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, কবিতা কলম থেকে বার হয় তা' বোঝবার মত ক্ষমতা এবং ঔদার্য ক'জন লোকের আছে?

পরেশবাবুরও মাঝে মাঝে মনে হ'ত সত্যি বুঝি তিনি এই শ্রেণীর লেখক-লেখিকাদের প্রতি অবিচার করছেন।...... হিটলার এবং মুসোলিনী শিখিয়ে দিয়ে গেছেন যে মিথ্যাকে বারবার প্রচার করলে লোকে একদিন তা' সত্য ব'লে মেনে নেবে।......অকৃতকার্য এই লেখক-লেখিকাদের পুঞ্জীভূত তিরস্কার শুনতে শুনতে পরেশবাবুরও অবশেষে ধারণা হ'তে সুরু করেছিল যে অপরাধটা প্রধানতঃ তাঁরই, অপর পক্ষের নয়।

তবু তিনি হয়ত আরও কিছুকাল সানন্দে সম্পাদনার কাজ করতেন, যদি না রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হতেন আমাদের শ্রীকৃপাময় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারই বিদুষী আধুনিকা পত্নী শ্রীমতী রুবি।...... নাম দুটো হয়ত একটু বেমানান হয়ে গেল, কৃপাময়ের স্ত্রী রুবি এটা হয়ত আপনাদের রুচির সঙ্গে মিলছে না, কিন্তু অপরাধটা আমার নয়। এই অসঙ্গতির জন্য দায়ী, প্রথমতঃ কৃপাময়ের জনক-জননী এবং দ্বিতীয়তঃ রুবির কলেজের বন্ধুর দল।

অবান্তর কথায় সময় নষ্ট না করে এবার কাহিনী সুরু করা যাক্। এককালে গল্প এবং উপন্যাস লিখে কৃপাময় বেশ খানিকটা সুনাম অর্জন করেছিল। তখন তার বিয়ে হয়নি, সবেমাত্র য়ুনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে কল্‌কাতার পথে পথে চাকুরীর চেষ্টা করছে। চাকুরীর প্রতিশ্রুতি পেয়েছে অজস্র কিন্তু প্রতিশ্রুতি কাগজে-কলমে নিয়োগপত্রের রূপ ধরে তার কাছে আসেনি অনেকদিন। সময় কাটে না, চাকুরী না পাওয়া পর্যন্ত বিয়ের কথা ভাবতেই পারে না (যদিও বিয়ের জন্য প্রাণে আকাঙ্ক্ষা প্রচুর), সে সুরু করল প্রাণপণে গল্প, উপন্যাস লিখতে। তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রকাশ বলেই হোক্ বা ভাষার একটা সাবলীল স্বচ্ছতার জন্যই হোক্, কিছুদিনের মধ্যেই সম্পাদক-মহলে তার বেশ একটা প্রতিপত্তি হ'ল। পুজো সংখ্যায় কৃপাময়বাবুর লেখার জন্য অনেক সম্পাদকই উন্মুখ হ'য়ে থাকতেন, কারণ একবার তার লেখা প্রকাশ না হওয়ায় পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে সম্পাদকদের দপ্তরে অগুণ্তি চিঠি এসেছিল, কৃপাময়বাবুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন প্রশ্ন সহ।...... বই আকারে কতকগুলো গল্প এবং একটি উপন্যাসও ছাপা হয়েছিল, যদিও সেগুলো প্রথম সংস্করণের বেশী এগোয়নি।

তারপর চাকুরী হ'ল—প্রফেসারি। অর্থ সমস্যাও ঘুচল, অন্ততঃ সাময়িকভাবে। কৃপাময় বিয়ে করল।

বিয়ে সকলেই করে, কিন্তু কৃপাময় যে বৌকে বরণ করে নিয়ে এল তাকে বে-সরকারী কলেজের অধ্যাপকের ঘরের চেয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টারের বাংলোতেই বোধহয় মানাত বেশী। স্ত্রী রুবি শুধু অসামান্যা রূপসী এবং আধুনিকা নয়, বিদুষীও বটে।

রুবি কৃপাময়কে কেন বিয়ে করল কারণ তার একটা (বা তারও বেশী) কারণ ছিল, কিন্তু আজকের কাহিনীর জন্য সেটা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। আপনাদের শুধু এইটুকু জানিয়ে রাখি যে বিয়ের কিছুদিন পরেই রুবির মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল যে কৃপাময় তাকে ভয়ানকভাবে ঠকিয়েছে।

কিন্তু রুবি বুদ্ধিমতী, নিজের পরাভব সে বাইরের কাউকে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দিল না, কৃপাময়ের কাছ থেকেও সে লুকিয়ে রাখল ক্ষোভের প্রতিক্রিয়া।

বাইরের লোকে কৃপাময়ের একটা বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করল। গল্প, উপন্যাস লেখা সে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করল। সম্পাদকদের উপরোধ-অনুরোধ, পাঠক-পাঠিকাদের স্তুতি-মিনতি—কিছুতেই সে বিচলিত হ'ল না।

তাই পরেশবাবু আজ খুবই অবাক হয়ে গেলেন যখন বেলা দশটার ডাকে কৃপাময়ের রেজিষ্টারি একখানা চিঠি পেলেন, একটি বড় গল্প সহ। কৃপাময় লিখেছে যে, প্রায় দশ বছর অবকাশ ভোগের পর সে আবার রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হচ্ছে, প্রশস্তি করতে চায় 'অনুভা'র পাতায়! সে নিজেই পরেশবাবুর দপ্তরে আস্‌ত, কিন্তু বিশেষ একটা জরুরী কাজে তাকে ভাগলপুরে চলে যেতে হচ্ছে, সেখান থেকে ফিরে এসে সে নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে দেখা করবে।...... আর সে মনে করে যে দশ বছরের অনভ্যাসেও তার দক্ষতা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়নি, (একবার সাঁতার শিখলে কেউ কি তা ভুলে যায়?), কিন্তু তবু নিজের অভিমতের চেয়ে পরেশবাবুর অভিমতকেই মূল্য দেবে বেশী।

গল্পটা পরেশবাবু পড়লেন। চমৎকার লিখেছে, কৃপাময়বাবুই যে লেখক তা তার লেখার সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তারা চোখ বুজে ব'লে দিতে পারবে। আর নায়িকার যে ছবি এঁকেছে তা'ও পারফেক্ট—মনে হয় গৌরী (নায়িকার নাম), হাল ফ্যাসানের আধুনিকা, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে নাক সিঁট্‌কে বলছে, কি নরকের মধ্যে বসে আপনি কাগজ চালান, পরেশবাবু!

নাঃ—পুজো সংখ্যায়ই এটা ছাপতে হবে, যদিও তার এখন অনেক দেরী আছে। সাধারণ সংখ্যায় ছাপালে অনেকের নজরে পড়বে না। কৃপাময়বাবুর প্রত্যাবর্তন, এটা বহুল প্রচারের উপযোগী একটা খবর বই কি!

নীল পেন্সিলে গল্পের শীর্ষে 'পুজো সংখ্যার জন্য' লিখে পরেশবাবু সযত্নে সেটা ড্রয়ারে বন্ধ করে রাখলেন।

সপ্তাহ দুই পরে কৃপাময় পরেশবাবুর অফিসে এসে উপস্থিত। পরেশবাবু প্রথমে তাকে চিন্‌তেই পারেননি, দু'এক বছর নয়, পুরো দশটি বছর পর এই সম্ভাষণ। কৃপাময় আর পাৎলা ছিপ্‌ছিপে যুবক নেই, প্রৌঢ়ত্বের ছাপ এসে পড়েছে মুখে এবং সর্বাঙ্গে। বেশ খানিকটা মেদও জমেছে তার গ্রীবাদেশে, চিবুকের নীচে এবং উদরের চতুষ্পার্শ্বে।

—এই যে পরেশবাবু, ভাল আছেন ত? চিন্‌তে পারছেন না? আমি কৃপাময়......

—ওঃ, কৃপাময়বাবু, আসুন, বসুন...... কতদিন পরে দেখা। আপনার হাতের মুন্সীয়ানা কিন্তু আগেরই মত অক্ষুণ্ণ রয়েছে।... গল্পটা পুজো সংখ্যায় ছাপব স্থির করেছি।

—গল্পটার কথাই বল্‌তে এলাম।...ওটা ফেরৎ নিতে এসেছি।

—ফেরৎ? কেন?..... সবিস্ময়ে পরেশবাবু প্রশ্ন করলেন।

—কারণ আছে। গল্পটা বহুদিনের পুরানো—দশ এগারো বছর আগে লিখেছিলাম।

—তাতে কি হয়েছে? পুরানো হ'লেও অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়নি নিশ্চয়ই?...... আমরা খুব আনন্দের সঙ্গে ওটা ছাপব, কৃপাময়বাবু। কতদিন আপনার লেখা আমাদের পাঠক-পাঠিকারা দেখেনি। আমি ভেবেছি যে ছোট একটা ফুট্ নোটে সকলকে জানিয়ে দেব যে গল্পের এই লেখক আমাদের সাহিত্য-গোষ্ঠীর একজন পুরাতন সভ্য, এতদিন ছিলেন আত্ম-নির্বাসনে, এবার আমাদের অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে ফিরে এসেছেন।...... জিনিষটা কেমন ড্র্যামাটিক হবে, নয় কি?

—আপনাদের অনুগ্রহের সীমা নেই, কিন্তু ওটা ছাপান চল্‌বে না।......দৃঢ়স্বরে কৃপাময় বল্‌ল।

পরেশবাবু একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। বল্‌লেন, লেখা আপনার, আপনি যদি ফেরৎ নিয়ে যেতে চান্ তাহ'লে আমরা জোর করতে পারিনে। কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

তারপর একটু সন্দিগ্ধ স্বরে প্রশ্ন করলেন, আর কোথাও পাঠাবার মতলব নেই ত আপনার?

—না-না, সে সব কিছুই নয়। আসল কারণটা হচ্ছে এই যে গল্পটাকে একটু বদলাতে চাই। তারপর আপনার কাছেই নিয়ে আসব, যদি তখনও আপনার পছন্দ হয়, আপনাদের 'অনুভা'য় প্রকাশের জন্য রেখে যাব!

—যদি বদ্‌লাতে চান্ নিয়ে যান। আমার কিন্তু মনে হয় এমনিই বেশ ছিল, নূতন করে লিখ্‌তে গিয়ে কি দাঁড়াবে বলা ত যায় না।

—সে রিস্‌ক্ ত আমি নিচ্ছি, অর্থাৎ আপনার দিক থেকে কোন বাধ্যবাধকতা থাকল না। নূতন পরিচ্ছদ যদি আপনার পছন্দ না হয় নিঃসঙ্কোচে আমাকে ফেরৎ দিয়ে দেবেন।

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে পরেশবাবু কৃপাময়ের হাতে গল্পটি প্রত্যর্পণ করলেন।

—খুব বেশী দেরী হবে না, পরেশবাবু। এ মাসের শেষাশেষিই ফেরৎ পাবেন।

মাস অতিক্রান্ত হ'ল না, কয়েকদিনের মধ্যেই নূতন পোষাকে সজ্জিত গল্পটি নিয়ে কৃপাময় আবার 'অনুভা' অফিসে এসে হাজির হ'ল।

...এই নিন্, রেখে দিন্। এক্ষুণি আপনার মতামত জানাবার প্রয়োজন নেই, অবসর মত পড়ে আমাকে একটা টেলিফোন করে জানাবেন আপনার পছন্দ হয়েছে কিনা।......আবার আপনাকে বলছি, অপ্রিয় মন্তব্য শুন্‌লে আমি এতটুকু দুঃখিত হ'ব না, কারণ আমি জানি এত বছরের অনভ্যাসে লেখার ক্ষমতা কমে যাওয়াটা অপরাধ ত নয়ই, বরং স্বাভাবিক।

পরেশবাবু নূতন গল্পটি আদ্যোপান্ত পড়লেন। নাঃ, কৃপাময়বাবুর লেখনশক্তি দুর্বল হয়ে যায়নি, বরং আরও যেন সহজ, সাবলীল হয়ে উঠেছে। উচ্ছ্বাসের স্থানে এসেছে শান্ত

গাম্ভীর্য, সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে জীবনের শুধু একটা দিক দেখার বদলে দেখতে শিখেছে তার প্রাচুর্য এবং দারিদ্র্য উভয়ই।... আর বুঝেছে যে জীবনটা শুধু লীলা নয়, একটা পরিহাসও বটে!

সব চেয়ে তাঁর বিস্ময় লাগ্‌ল গৌরীর বেশ পরিবর্তনে। একি সজ্জায় সাজিয়েছেন কৃপাময়-বাবু তাঁর গল্পের নায়িকাকে? কোথায় গেল সেই কায়দাদুরস্ত আধুনিকা যার চটুল হাসি এবং চোখের প্রহার পরেশবাবুকেও করে দিয়েছিল একটু চঞ্চল, একটু অন্যমনস্ক? যে গৌরীকে কৃপাময়বাবু এবার সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গে দশ বছরের পুরানো গৌরীর এতটুকু সাদৃশ্যও যে নেই!...... নবাগতা গৌরীর হাসি ক্ষীণ ও অর্থহীন, কটাক্ষে রং আছে, কিন্তু সৌন্দর্য নেই।

অথচ এটা স্বীকার করতেই হবে যে এই বেশ পরিবর্তনে গল্পের প্রবাহ এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি' গৌরীর ছবিও অসম্পূর্ণ থাকেনি। বরং লেখকের তীক্ষ্ণ অনুভূতির তরণী বেয়ে গৌরী যেন পৌঁচেছে সার্থকতার উপকূলে!

পরেশবাবু টেলিফোনটা তুলে কৃপাময়-বাবুকে জানিয়ে দিলেন যে গল্পটা চমৎকার হয়েছে, পূজো সংখ্যায় ছাপান হবে।

চব্বিশ ঘণ্টাও কাট্‌ল না। পরের দিন পরেশবাবুর টেলিফোন বেজে উঠ্‌ল, ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং......

—হ্যালো......

—আমি কৃপাময়বাবুর বাড়ী থেকে বল্‌ছি।...... মেয়েলি গলা।

—বলুন......

—আমি ওঁর স্ত্রী, আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

—কেন, বলুন ত?......পরেশবাবু সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন।

—সাক্ষাতে বল্‌ব।... কখন আসতে পারি?

—আপনি কষ্ট ক'রে কেন আস্‌বেন? আমিই যাব আপনার কাছে.........

—না-না, আমার কোনই কষ্ট হবে না, আমিই আস্‌ব। আপনি একটা সময় দিন......

পরেশবাবু কিছুতেই রাজী হলেন না যে কৃপাময়বাবুর স্ত্রী তাঁর অফিসে আস্‌বেন। অবশেষে স্থির হল পরেশবাবুই যাবেন কৃপাময়-বাবুর বাড়ীতে পরের দিন বেলা বারোটায়।

শ্রীমতী রুবি উন্মুখ আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল পরেশবাবুর আগমন। টালিগঞ্জের উপকণ্ঠে ছোট্ট একটি একতলা বাড়ী, পথের নির্দেশ রুবি আগে থেকেই দিয়েছিল, পরেশ-বাবুর খুঁজে বার করতে কোন কষ্ট হয়নি।

নমস্কার বিনিময়ের পর শ্রীমতী প্রশ্ন করল, গল্পটা নিয়ে এসেছেন ত? ......তার কন্ঠস্বরে উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তার নিবিড় পরিচয়।

—গল্প? কোন্ গল্প?

—কেন, আমার স্বামীর লেখা গল্পটা, যেটা তিনি পরশু দিন আপনার কাছে দিয়ে এসেছেন।

—আপনি ত আমাকে গল্পটা আন্‌তে বলেননি। তাছাড়া গল্পের সঙ্গে কি সম্পর্ক বুঝ্‌তে পারছি না!

একটু লজ্জিত, একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে শ্রীমতী বল্‌ল, আমারই ভুল হয়ে গেছে। কাল এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম যে আপনাকে ডাকবার কারণটাই বল্‌তে ভুলে গিয়েছি।...... গল্পটা আপনি কিছুতেই ছাপ্‌তে পারবেন না। ওটা আমাকে ফেরৎ দিতে হবে।

শ্রীমতীর কন্ঠস্বর গম্ভীর, দৃঢ়তাব্যঞ্জক, অথচ বেদনার একটা চিহ্নও যেন সেখানে লুকিয়ে আছে।

—কারণটা আমাকে খুলে বলুন, মিসেস্...

—আমার নাম রুবি, আমাকে রুবি দেবী ব'লে সম্ভাষণ কর্‌তে পারেন।

গল্পটা ত আপনার লেখা নয়, রুবি দেবী, আপনার স্বামীর লেখা। আপনাকে হঠাৎ ফেরৎ দিতে যাব কেন?

—দাবী করছিনে পরেশবাবু, অনুনয় কর্‌ছি।...সকাতরে রুবি বলল।

—কিন্তু কেন?

—কেন? কেন তা কি আপনিও বোঝেন নি?...আপনি না সম্পাদক, অসংখ্য নর-নারীর লেখা নাড়াচাড়া করাই না আপনার ব্যবসায়?

তার কন্ঠস্বরে বেশ খানিকটা উষ্মা উত্তেজনা।

—তবু আমি বুঝ্‌তে পারছি না, রুবি দেবী!

—চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে আপনি কিছুতেই বুঝ্‌বেন না দেখ্‌ছি। (পরেশবাবু তিরস্কারটা নীরবে হজম করলেন।) ......আপনি ওঁর আগের গল্পটা পড়েননি? সেটার সঙ্গে এখনকার গল্পের প্রভেদ কোথায় তা' আপনার নজরও এড়িয়ে গেল?

প্রভেদ পরেশবাবু লক্ষ্য করেছেন বই কি! কিন্তু কি তাৎপর্য তাতে?

পরেশবাবুকে নীরব দেখে রুবি বলে চল্‌ল, নায়িকা গৌরীকে উনি যে ছাঁচে এখন ঢেলেছেন তার সঙ্গে আমার সত্যি কোন সাদৃশ্য আছে কি?......আপনি নিরপেক্ষ, বিবেচক, আপনি বলুন।

তার কণ্ঠে একটা করুণ আকুলতা। সময়ের স্রোত বৃহৎ জীবনযাত্রার দিকে এগিয়ে চলেছে, কত বড় বড় নৌকোর আনাগোনা এই স্রোতে, তার মধ্যে ছোট্ট একটি তরণী কোথায় কিভাবে যাচ্ছে কে তার সন্ধান রাখে? কি বা প্রয়োজন সন্ধান রাখার?

রুবি বল্‌তে লাগল, দুটো গল্পই উনি লিখেছেন আমাকে রঙ্গমঞ্চে রেখে। প্রথম গল্পটাতে তিনি আমার প্রতি, অর্থাৎ গৌরীর প্রতি, কোন অবিচার করেননি, কিন্তু দ্বিতীয় গল্পটার কথা একবার ভেবে দেখুন দেখি!

—কিন্তু কেন মনে করছেন গৌরীকে কৃপাময়বাবু এঁকেছেন আপনাকে মডেল করে? অন্য কেউও ত হ'তে পারে। অথবা...

অথবা কি? ওঁর অন্য কোন মডেল নেই, অন্ততঃ বিয়ের পর অবধি।... গৌরী আর কেউ নয়, গৌরী আমি।

—কল্পনার মডেলও ত হ'তে পারে।...... পরেশবাবু বল্‌লেন।

নিজের কাছেই এই ওকালতি যেন ফাঁকা, প্রাণহীন শোনাল।

দৃঢ়কন্ঠে রুবি বল্‌ল, কল্পনা নয় পরেশ-বাবু। এতখানি কল্পনা শক্তি ওঁর নেই। এটা আপনারা জানতে না পারেন, এই দশ বছর ঘর করে আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি।...তাছাড়া কল্পনা যে নয় তা আপনি ওঁর দ্বিতীয় গল্পের প্রথমাংশ দেখেও বোঝেননি?

সত্যি-সত্যি পরেশবাবু রুবি দেবীর চোখ দিয়ে গল্পটাকে বিচার করেননি। এখন মনে হ'ল তার অভিযোগের মধ্যে খানিকটা সঙ্গতি, খানিকটা যুক্তি বোধহয় আছে!

রুবি বলে চল্‌ল, বিয়ের আগের গৌরীর ছবি হুবহু আমার ছবি। এককালে আমি ঐরকমই ছিলাম, পরেশবাবু! জীবনের প্রতি ছিল গভীর আসক্তি, পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিষ প্রত্যেকটি মানুষ আমাকে দিত আনন্দ, আর সেই আনন্দের প্রকাশ পেত আমার হাসিতে, আমার কথাবার্তায়, আমার আচার ব্যবহারে।...... অনূঢ়া গৌরীকে কেন্দ্র ক'রে উনি সৌন্দর্যের যে স্তুতিগান করেছেন তার মধ্যে এতটুকু অতিরঞ্জন নেই। বিশ্বাস না হয়, আমার সেই সময়ের ফটো এবং স্ন্যাপ্ আপনাকে দেখাতে পারি।

শশব্যস্তে পরেশবাবু বল্‌লেন, আহা, আপনাকে অবিশ্বাস কর্‌ব কেন? কিন্তু একটা ভুল কর্‌ছেন আপনি। গৌরীর যে পরিণতি কৃপাময়বাবু তাঁর দ্বিতীয় গল্পে দেখিয়েছেন তার সঙ্গে আপনার কোনই মিল নেই, না দেহের প্রকাশে, না মনের অভিব্যক্তিতে।

ব'লে সপ্রশংস চোখে পরেশবাবু রুবি-দেবীর দিকে তাকালেন। রুবি বোধ হয় একটু লজ্জিত বোধ কর্‌ল, কারণ সত্যি দশ বছরে তার শরীরের কোন পরিবর্তন ত হয়ইনি', মনও বোধহয় আগেরই মত উচ্ছল, দুরন্ত রয়েছে। যাঁরা ক্ষণিকের জন্যও রুবিদেবীর সম্মুখীন হয়েছেন তাঁরাই অনুভব করেছেন তার যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ।......আজ এই কয়েক মিনিটের মধ্যে পরেশবাবুর মত রসশূন্য লোকও তা' উপলব্ধি কর্‌লেন।

—ঐখানেই ত আমার অভিযোগ, পরেশ-বাবু! উনি যদি শেষ পর্যন্ত গৌরীকে আমার ছাঁচেই রাখ্‌তেন আমি হয়ত এতটুকু আপত্তি কর্‌তাম না। কিন্তু আমাকে ব্যঙ্গ ক'রে উনি যে ছবি এঁকেছেন তা' আমি নির্বিবাদে মেনে নেব কি ক'রে, শেষের দিকের বিগতযৌবনা গৌরীর ব্যর্থ প্রয়াস বয়সের স্রোতকে আট্‌কে রাখ্‌বার, এবং সেই প্রয়াসের ফলে যে হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে আমি রীতি-মত অপমান বোধ কর্‌ছি।......আমাকে নিয়ে এইভাবে ছিনিমিনি খেল্‌বার ওঁর কোনই অধিকার নেই!

রুবি আরও কিছু হয়ত বল্‌ত, কিন্তু এই সময় কৃপাময় সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল।

—ওকি, পরেশবাবু যে? কি মনে ক'রে? আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে দেখি! তারপর?

কৃপাময়ের কন্ঠে প্রতিদ্বন্দ্বীকে যুদ্ধে আহ্বান কর্‌বার সুর বেজে উঠ্‌ল।

পরেশবাবু কোন কথা বল্‌বার আগেই রুবি বলে উঠ্‌ল, আমিই ওঁকে ডেকেছি। ওঁর সঙ্গে আমার গোপনীয় কথা আছে, তুমি একটু বাইরে যাও।

• •

কৃপাময় হঠ্‌বার পাত্র নয়। বল্‌ল, পরেশ-বাবুর সঙ্গে তোমার এমন কি গোপনীয় কথা থাক্‌তে পারে, রুবি, যা' আমি, তোমার স্বামী, শুন্‌তে পাব না?

মরিয়া হয়ে রুবি জবাব দিল, বেশ, তোমার সম্মুখেই খোলাখুলি কথা হোক্। আমি

পরেশবাবুকে ডেকেছি তোমার শেষ গল্পটা সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলতে।

পরেশবাবু অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন। "অনুভা"র সম্পাদক হিসেবে ইতিপূর্বে এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন তিনি হননি। বললেন, আজ আমি আসি রুবি-দেবী, কৃপাময়বাবু। আরেকদিন কথা হবে।

ব'লে তিনি উঠবার প্রয়াস করলেন।

রুবি এবং কৃপাময় প্রায় সমস্বরে বলে উঠল, আরেকদিনের জন্য অপেক্ষা করবার প্রয়োজন নেই, পরেশবাবু। যে কথাটা উঠেছিল সেটা আজই শেষ হয়ে যাক্।

অগত্যা পরেশবাবুকে বসতে হ'ল।

রুবি স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, আমি ওঁকে বলছিলাম, তোমার এই দ্বিতীয় গল্পটা উনি ছাপতে পারবেন না, আমি ও'কে ছাপতে দেব না।

—কেন? কোন্ অধিকারে?......কৃপাময় শ্লেষের সঙ্গে প্রশ্ন করল।

—স্ত্রীর অধিকারে।...তোমার এই দ্বিতীয় গল্পে নায়িকা গৌরীর যে ছবি তুমি এঁকেছ সেটা কি ভদ্রোচিত হয়েছে? লিখবার ক্ষমতা তোমার আছে স্বীকার করি, কিন্তু ক্ষমতার অপব্যবহার করা কোন লেখকেরই উচিত নয়।

—তুমি দুটো ভুল করছ, রুবি। প্রথম, যেদিন তোমাকে গল্পটা পড়ে শোনালাম সেদিন থেকেই তোমার একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে নায়িকা গৌরী আর কেউ নয়, তুমি।...... আত্মপ্রত্যয়ের দাম আছে মানি, কিন্তু কে তোমাকে বলল যে তোমাকে অবলম্বন ক'রে আমি গৌরীকে সৃষ্টি করেছি? নিজেকে এতখানি প্রাধান্য দিও না, রুবি!

—আর দ্বিতীয় ভুলটা কি?......রুবি প্রশ্ন করল।

—দ্বিতীয় ভুলটা হচ্ছে এই যে, লেখকের যা' অধিকার তা' তুমি বেমালুম অস্বীকার করতে চাচ্ছ।...আমি হচ্ছি সৃষ্টিকর্তা, যেভাবে আমার সৃষ্টি করতে ইচ্ছে হয় আমি সৃষ্টি করব, তাতে তুমি বা আর কেউ বাধা দেবার কে?

—কিন্তু তাই ব'লে তুমি সকলের সামনে আমাকে উপহাসের বস্তু ক'রে তুলে ধরবে? আমি না তোমার পরিণীতা বধূ, ভালবাসার সামগ্রী?

—একটা কম্প্লেক্স তোমার মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, রুবি। তোমার সঙ্গে গৌরীর সাদৃশ্য যদি খানিকটা এসে থাকে তাহ'লে সেটা নিতান্তই আমার অজ্ঞাতে এসে পড়েছে। কোন গূঢ় অভিসন্ধি নিয়ে আমি আমার প্রথম গল্পের রূপ পরিবর্তন করিনি।

—কিন্তু প্রথম গল্পে গৌরীর যে ছবি তুমি এঁকেছিলে সেটা বদ্লাবার কি প্রয়োজন ছিল? সে গল্পটাও ত খারাপ হয়নি, তুমিই ত আমাকে বলেছিলে যে পরেশবাবু সেটা "অনুভা"র পূজোসংখ্যায় ছাপাবার জন্য মনোনীত করেছিলেন।

—আবার ভুল করছ রুবি। প্রথম কথা, লেখকের স্বাধীনতা, যার জন্য আমি আজীবন যুদ্ধ করেছি, তা আমি খর্ব হতে দেব না কিছুতেই।......সম্পাদকেরা মনে করেন আমরা তাঁদের হাতের ক্রীড়নক। আমি অনুভব করতে চাই আমরা তা' নই. আমাদেরও একটা সত্ত্বা, একটা ব্যক্তিত্ব আছে। যেভাবে খুসী আমরা লিখব। ওঁদের বা পাঠক-পাঠিকাদের মুখের দিকে তাকিয়ে নয়। ওঁদের পছন্দ না হয়, ওঁরা ছাপবেন না, আমরা এখন তৈরী করব আমাদের নিজেদের গোষ্ঠী, বার করব আমাদের নিজেদের মুখপত্র।

পরেশবাবু এবার বললেন, আপনি আমাদের প্রতি অবিচার করছেন, কৃপাময়বাবু। আমরা, সম্পাদকেরা, অত্যাচারী ডিক্‌টেটার নই, হ'তে পারি না। আপনাদের নিয়েই আমাদের কারবার, আপনাদের বাদ দিলে আমরা দাঁড়াব কোথায়?

কৃপাময় এর কোন জবাব দিল না। রুবির দিকে তাকিয়ে ব'লে চলল, আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের এই স্বাধীনতা কোন বন্ধন মানবে না। সম্পাদকের নাগপাশ যদিও বা এড়াতে পারলাম, তার পরিবর্তে পরতে হবে গৃহের এবং গৃহিণীর নাগপাশ? কিছুতেই নয়! আমাদের কল্পনা হচ্ছে তৃপ্তিহীন, সুপ্রশস্ত। কল্পনার তুলিতে আমরা যদি খানিকটা অতিরঞ্জন করেই ফেলি, সেটা অপরাধ নয়। Pierre Louys-এর সেই গল্প পড়োনি', যেখানে তিনি দেখিয়েছেন Balzac কি নির্মমভাবে এঁকেছিলেন কুমারী Esther Van Godseck এর ছবি? পৃথিবীর Esther প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু Balzac তাঁর কল্পনার Estherকে এতটুকু বদলাননি, যার ফলে পৃথিবীর Estherকে নেমে আসতে হয়েছিল কল্পনার Esther এর সোপানে। অবশেষে Balzac-এর নিয়ন্ত্রিত বিষ খেয়ে এই দুই Esther এর হ'ল সমন্বয়, সামঞ্জস্য।

—অর্থাৎ তুমি চাও যে আমি তোমার কল্পনার গৌরীর মত গড়ে উঠি এবং অবশেষে আমার জীবনের পরিসমাপ্তি হয় আত্মহত্যায়?

—অন্যায় অপবাদ দিয়ো না, রুবি। আমার গল্পের গৌরী আত্মহত্যা করেনি। তবে, হ্যাঁ, তার আশেপাশে যারা ছিল তাদের আনন্দের খোরাক জুগিয়েছে।...লেখকের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে পাঠক-পাঠিকাকে আনন্দ দেওয়া। রসহীন এই জীবনে, যেখানে কত দীনতম অবজ্ঞাত দুর্ভাগার দল বাস করে, আমরা যদি খানিকটা পুলকের সঞ্চার করতে পারি তবেই না আমাদের লেখার সার্থকতা!

—আমার অভিযোগ আমি করবই। নিজের স্ত্রীর অসম্মান করে, পাঠক-পাঠিকাদের এই-ভাবে পুলকদানের অধিকার তোমার নেই। এটা হচ্ছে চরম নীচতার পরিচায়ক।

—আবার তোমার কম্প্লেক্স এর জালে নিজের বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলছ, রুবি।... গল্পকে গল্প ব'লে মেনে নাওনা কেন? আমরা ফোটোগ্রাফ তুলি না, ছবি আঁকি।

কৃপাময় পরেশবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি ঘাবড়াবেন না পরেশবাবু। গল্পটা নিশ্চয়ই ছাপবেন—আপনাকে সম্পূর্ণ অনুমতি দিচ্ছি আমি। আর এই কলহের যে পরিচয় আজ পেলেন এটা হচ্ছে নিতান্তই ঘরোয়া এবং অত্যন্ত লঘু। ছাপা হলে আমার স্ত্রী কত খুসী হবেন দেখে যে কৃপাময় বন্দ্যোপাধ্যায় আবার ফিরে এসেছে রণক্ষেত্রে। আচ্ছা, নমস্কার.........

ঘর থেকে বার হবার সময় পরেশবাবু শুনলেন, রুবিদেবী তার স্বামীকে বলছে, আমিও তোমাকে বলে রাখছি, এই গল্পই হবে তোমার শেষ গল্প।...আমি যতদিন তোমার ঘর করছি তোমাকে আর গল্প লিখতে দেব না, অন্ততঃ যতদিন তোমার এই স্বভাবের পরিবর্তন না হয়।

"অনুভা"র পূজোসংখ্যায় যথারীতি কৃপা-ময়ের গল্প ছাপা হ'লো।...তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী ফুট্‌নোট্‌টি দিতেও পরেশবাবু ভোলেন্‌নি'।

আমার এই গল্প হয়ত এখানেই শেষ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এটা যে নিছক গল্প সেটা প্রমাণ করবার জন্যই বাকী এই অধ্যায়টুকু জুড়ে দিতে হচ্ছে। পরেশবাবু গল্পটা ছাপলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনটা কেমন খচ্‌খচ্ করতে লাগল একটা অহেতুকী অনুশোচনায়। অবশেষে গৃহবিচ্ছেদের কারণ হলেন তিনি?

ভাবলেন রুবিদেবীকে টেলিফোন করবেন এবং আরেকবার তাকে বোঝাতে চেষ্টা করবেন যে পাঠক-পাঠিকারা কৃপাময়ের গৌরীর সঙ্গে অপর কারোর সাদৃশ্য খুঁজবে না, তারা গল্প পড়েই সন্তুষ্ট। টেলিফোন্‌টা তুলে কৃপাময়ের বাড়ীর নম্বর ডায়াল করলেন। এমন সময় হয়ে গেল ক্রস্-কানেকশন্। শুনলেন, রুবি-দেবী কার সঙ্গে কথা বলছে।...পরেশবাবু চুপ করে শুনতে লাগলেন।

একটু পরেই বুঝতে পারলেন যার সঙ্গে কথা বলছে সে আর কেউ নয়, কৃপাময় নিজে। কলেজ থেকে কথা বলছে।

কৃপাময় বলছে, তুমিই বাজিটা হেরে গেলে, রুবি! এবার ক্ষতিপূরণ করতে হবে, বাপের বাড়ী যাওয়া চলবে না।

—বাঃ রে, ঐ সর্ত বুঝি ছিল'. সর্ত ছিল অন্যরকম, আমি হেরে গেলে তুমি আমাকে গড়িয়ে দেবে একটা ব্রেস্‌লেট্।...আমি ত আগে থেকেই জানতাম যে হেরে যাব!

—এ ত ভারী মজার ব্যবস্থা, রুবি! হারলে তুমি, আর ক্ষতিপূরণ করতে হবে আমায়? চমৎকার!

—এটা হচ্ছে নতুন যুগের কায়দা গো! স্ত্রীরা হেরে গেলে আজকাল স্বামীকেই আদর করতে হয় বেশী।

—কিন্তু অভিনয় আমরা দু'জনেই ভাল করেছিলাম, কি বলো রুবি? সম্পাদকগুলো বড্ড বোকা, জীবনের সঙ্গে পরিচয় নেই এতটুকু। নইলে আমাদের এই কলহ যে নিছক অভিনয় তা' বুঝতে পারল না একবারও।

পরেশবাবু আর শুনতে চাইলেন না, পারলেন না। "অনুভা"র স্তম্ভে কৃপাময়ের গল্প তিনি ছেপেছেন, কিন্তু আর নয়, এই শেষ।...সম্পাদককে নিয়ে এতবড় বিদ্রূপ তিনি আর সহ্য করবেন না!

রাস্তার ওপার

মাতাল: পাহারাওয়ালা, রাস্তার ওপার কোন্ দিকে?

পাহারাওয়ালা: ঐ যে সামনে, চলে যান।

মাতাল: হতেই পারে না। ঐ দিকে একজন লোক এই দিক দেখিয়ে দিলে যে?

পাথুরেঘাটার ঠাকুরেরা

কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

নোকে-কানা পারবে। ও ছাড়া এ কাজ করার যোগ্যতা কোন দ্বিতীয় পুরুষের নেই। এ কাজে ওই হ'ল উপযুক্ত ব্যক্তি। চির-জয়ী, অপরাজিত, দুর্দমনীয়। যেমনই সুচতুর, তেমনই সুনিপুণ। যেমন করে হোক, যত টাকা লাগে লাগুক, এ কাজ ওকে দিয়ে করানো চাই।—

মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়ে গেল একবাক্যে।

সূর্যের সঙ্গে চিরকালের বিরোধ যে গলির, সেই অপরিসর, নোংরা, ঘিঞ্জী গলিটা হঠাৎ ভরে উঠল একাধিক মণি-মাণিক্যখচিত পাল্‌কীতে, তার এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো বুকে পড়তে লাগল বহু পাইক-বরকন্দাজদের পদস্পর্শ, অনেকগুলো মশালের চোখ-ধাঁধানো আলোয় তার অন্ধকার হ'ল দূর। এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো গলির মধ্যে একটি ভাঙাচোরা বাড়ী। ভাঙাচোরা বাড়ীর মধ্যে একটি রঙচটা-ঘর। যে ঘরে ঢোকবার আগে রামা-শ্যামার দলও সাতবার কাশে, ভাবে, শিরায় শিরায় অনুভব করে বমনের অনুভূতি—সেই অন্ধকূপের মধ্যেই আসন পাতলেন শহর কলকাতার অভিজাত সমাজের পুরুষপ্রধানরা।

আদেশ নয়, অনুজ্ঞা নয়, হুকুম নয়, আজ করযোড়ে মিনতি, অনুনয়, অনুরোধ। নোকে যেন আজ আর তাঁদের বেতনভুক নয়, আজ্ঞাবাহী নয়, দাসানুদাস নয়, নোকেই যেন আজ তাঁদের একমাত্র গতি, সব কিছুর আশা, অন্ধকারে আলো। সকলেরই এক কথা—নোকে, বাঁচাও!
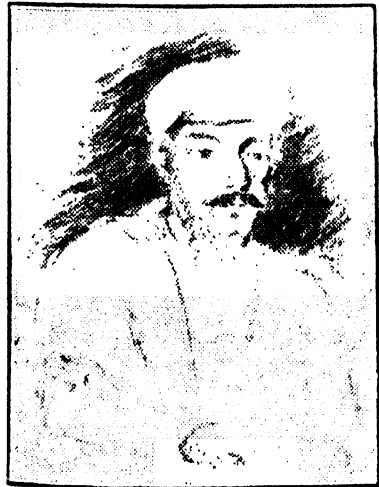
গোপীমোহন ঠাকুর

তারপর তোমার কোন ভাবনা নেই। আমরা আছি।—হ'লে হবে কি! নোকে রাজী হয় না, তারও সনির্বন্ধ আবেদন—এ কেমন করে হয় হুজুর, আমি আপনাদেরও যেমন নেমক খাই, তাঁরও তেমনই নেমক খাই, আপনাদের সঙ্গে আমার যা সম্বন্ধ, তাঁর সঙ্গেও যে ঠিক তাই। হুজুর, মনিবের বিরুদ্ধে গান বাঁধব কি করে? কাচ্চাবাচ্চার মুখে আজও দু'বেলা যে অন্ন উঠছে তাতে আপনারদের দানও যতখানি—তাঁর দানও যে ততখানি। না হুজুর, অধীনকে মাপ করতে হয়। নয় তো নেমকহারামীর পাপে পরকালে যে অনন্ত দুর্গতি। এরাও নাছোড়-বান্দা। শেষে সব সাল্‌সা যেখানে ব্যর্থ সেইখানেই রজত সাল্‌সার সার্থকতা। এ ক্ষেত্রেও তার হয় নি ব্যতিক্রম। অভিজাত মহল থেকে আশ্বাস এল—তোমার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত চাঁদিতে মুড়ে দেব লক্ষ্মী, তোমার কাজ তুমি করে যাও। তুমি শুধু কষে এমন একখানি গান বাঁধ যেটি শুনে বাছাধনকে আর দাঁত ফোটাতে না হয়। সঙ্গে সঙ্গে বায়না হিসেবে পাঁচ শ' টাকায় গেঁথে ফেলা হ'ল লক্ষ্মীকে। ঐ পাঁচ শ' টাকা দিয়েই যেন বাঁধা হ'ল গণ্ডী, তার মধ্যে রইল এদের আদেশ আর লক্ষ্মী নিজে, বাইরে রইল লক্ষ্মীর ধর্মজ্ঞান, বিবেক আর মনুষ্যত্ব।—ঠিক হ'ল সংক্রান্তির দিন......র বাড়ীতে বসবে সান্ধ্য-আসর, সকলের মত গোপীমোহন ঠাকুরকেও করা হবে নিমন্ত্রণ আর সেইখানেই সকলের সামনে গানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ্যভাবে গোপীমোহন ঠাকুরের ভূত ভবিষ্যৎ উদ্ধার করবে লক্ষ্মী।

সম্মত না হওয়ার উপায় লক্ষ্মীর আর রইল কই?

পরম নিশ্চিন্ততায় পাল্‌কিতে চড়ে বসলেন শহরপুরুষরা।

অনেকগুলো পাল্‌কী আবার একসঙ্গে এগোতে লাগল বড় রাস্তার দিকে লক্ষ্য রেখে।

দেড় শো বছরেরও আগেকার কলকাতার বাবু-সম্প্রদায়ের গায়ের জ্বালা হয়ে উঠলেন গোপীমোহন ঠাকুর। হয়ে উঠলেন কালকূট বিষ—যাঁর প্রতিষ্ঠার ছাপ বাবু-সম্প্রদায়ের সর্বগাত্রে খোরাক জোগাল দুঃসহ বেদনার। পুত্র-কন্যার মঙ্গলকামনার থেকেও এঁরা অধিকতর শক্তিতে করতে লাগলেন গোপীমোহনের পতন কামনা। সমাজজীবনে গোপীমোহন তখন শীর্ষ পুরুষ। বিদ্যার প্রাচুর্যে, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে তাঁর সমকক্ষ এঁদের মধ্যে একজনও ছিলেন না। বাণিজ্যের মাধ্যমে করলেন নিজের অচল-অটল প্রতিষ্ঠা। ব্যবসায়-দক্ষতায় বাঙলা কেন, সারা ভারতে তিনি ছিলেন অনন্য-সাধারণ পুরুষ। কুবেরের ঐশ্বর্য তাঁর করায়ত্ত। সমাজ সেবায়, শিক্ষাবিস্তারে, পরোপকারে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। দেশের দুঃখ মোচনে তিনি কৃতসংকল্প। সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানে তাঁর দান অগ্রগণ্য। প্রতিপক্ষদের বুকে হিংসার আগুন তো জ্বলবেই। গোপীমোহনের পতন না হলে তাঁদের যেন শান্তি নেই, সেইজন্যেই তো লক্ষ্মীকে নিয়োগ যার জন্যে অকাতরে অর্থব্যয় ও এই সঙ্ঘবদ্ধ আয়োজন। এঁরা সকলেই সেই বিদ্যালয়ে পাঠ নিয়েছেন যে বিদ্যালয়ে শেখানো হয়—"তোমরা নিজেরা কখনও গান গেও না—আর যদি কেউ গায় তো তাকেও গাইতে দিও না।"

সকলের সামনে সাদর অভ্যর্থনায় বসানো হ'লো সানুচর ক্রোড়পতি গোপীমোহন ঠাকুরকে। একটু যেন বিশেষ খাতির, বিশেষ পরিচর্যা, বিশেষ আপ্যায়ন। লক্ষ্মীর সঙ্গে রফা হয়েছিল হাজার, আদ্ধেক প্রথম দিনই পেয়েছে, বাকী আদ্ধেকও সেই দিনই পেয়ে গেল। চুক্তি রক্ষা করল লক্ষ্মী। চন্দনচর্চিত, মাল্যবিভূষিত হয়ে দেবদেবীর উদ্দেশে ভক্তিঅর্ঘ্য দিয়ে, পিতৃ-পিতামহের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করে, সমাগত সুধীবৃন্দকে নমস্কার জানিয়ে গান শুরু করল লক্ষ্মী। শেষ হ'ল গান। ভয়ে ঠকঠক ক'রে কাঁপছে লক্ষ্মী, মুখে-চোখে তার ভীতির কুঞ্চন-রেখা। বাবুদের ওষ্ঠযুগল ভরে উঠেছে চাপা হাসিতে, ভাবখানা যেন সেই "অদ্যই শেষ রজনী" জাতীয়। সমস্ত মুখমণ্ডল এক সুগভীর প্রশান্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে গোপীমোহন ঠাকুরের। বিরাট আসর একেবারে নিস্তব্ধ। একটি লোকের মুখে এতটুকু শব্দ নেই। কল-কোলাহলপূর্ণ সান্ধ্যআসর যেন নিষ্প্রাণ। আসন পরিত্যাগ করলেন গোপীমোহন ঠাকুর, এগিয়ে গেলেন লক্ষ্মীর দিকে, প্রগাঢ় বাহুবন্ধনের মধ্যে তাকে করে ফেললেন বন্দী—বেনিয়ানের মধ্যে থেকে দুটো এক শ' গিনির তোড়া লক্ষ্মীর হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন—সাবাস—লক্ষ্মী! সাবাস—এত মধু কোথায় পেলে যা দিয়ে পুরো গলাটি ভরিয়ে ফেলেছ, এত দরদ তোমার কণ্ঠে—আগে তো জানতে পারি নি—এমন সুরের খেলা—কই লক্ষ্মী আগে তো কখনও শোনাও নি। নিজের হাত থেকে বহুমূল্যের হীরকাঙ্গুরীয় খুলে তা পরিয়ে দিলেন লক্ষ্মীর হাতে। পাঁচটি করে অনুচর এই সব সান্ধ্য-আসরে সকল সময়ে থাকত গোপীমোহনের সঙ্গে। প্রত্যেকের কাছেই এক শ' গিনির দুটি করে তোড়া গোপীমোহন রেখে দিতেন। এক-কথায় তারা ছিল গোপীমোহনের ধনবাহী অনুচর। ধীর পদক্ষেপে ঘরের দরজায় এসে

চন্দ্রকুমার ঠাকুর

দাঁড়ালেন গোপীমোহন। অনুচরদের কাছ থেকে তোড়াগুলি নিয়ে নিলেন। তারপর সেই দশটি তোড়া এক-এক করে ছুঁড়তে লাগলেন বাবু-সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে। গুণগ্রাহী গোপীমোহন ঠাকুরের কাছে যথাপ্রাপ্য মর্যাদা পেলেন শিল্পী লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস। এই পর্যন্ত বললেই ইতিহাস থেমে গেছে, এর পরের ঘটনা নিয়ে ইতিহাস

মাথা ঘামায় নি। ইতিহাসের স্বভাবসিদ্ধ ধারাই এই। ঠিক যে জায়গায় মানুষ চায় তার বেগবান অগ্রগমন ঠিক সেইখানেই তার রথের চাকা লাভ করে বৈকল্য। এদিক দিয়ে ইতিহাস একেবারে বেরসিক। এই ধরণের বেয়াড়া-বেমক্কা জায়গায় ইতিহাস থেমে যায় বলেই তো সাহিত্যিকের কল্পনার সৃষ্টি। ইতিহাস যে সব জায়গার ছায়া মাড়াতে পারে না—সে সব জায়গাকেও বহু পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে যায় কল্পনা। কল্পনার চোখেই দেখতে পাচ্ছি সর্বপ্রথম যে বাবুটির মুখ থেকে লক্ষ্মীকে চাঁদি দিয়ে মুড়ে দেবার কথাটি বেরিয়েছিল হয়তো তাঁরই কপালে সজোরে আঘাত করেছিল গোপীমোহনের ছোঁড়া প্রথম তোড়াটি। সুকুমার অঙ্গ সহ্য করতে পারে না গিনির আঘাত। দু' গাল বেয়ে হয়তো ভেসে চলে রক্তের ধারা। আর লক্ষ্মী—লক্ষ্মী তখন কি করছে? হয় তো মনে মনে বলছে—তুমি তো শুধু গোপী-মোহনই নও, তুমি যে মনো-মোহনও।

শুধু মাত্র উদ্যমী-কর্মী পুরুষ বলে গোপীমোহনকে ঠিক অভিহিত করা যায় না—তাঁর চরিত্রের উপযোগী যে বিশেষণটি তাঁর নামের সঙ্গে সবচেয়ে ভাল মানায় তা হ'ল বিচিত্রপুরুষ। বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়েই ঘটত গোপীমোহনের দৈনন্দিন জীবনের বিকাশ। এক বিচিত্র-বৈচিত্র্যের আধার ছিলেন তিনি। তাঁর গোটা দিনটা ছিল ত্রিধারায় বিভক্ত। দিনটা কাটত গদীতে, ব্যবসার মধ্যে, চুলচেরা হিসেব নিকেশের ভিতর দিয়ে, একটি আধলার ফাঁকি সেখানে থাকবে না। সন্ধ্যা কাটত কাব্যোৎসাহিতায়, বিদ্যোৎসাহিতায়, শিল্পোৎসাহিতায়, সাঙ্গীতিক পরিবেশে, বিভিন্ন মজলিসে, রাত কি ভাবে কাটত? এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে জাগবে। গভীর রাত, নিবিড় জঙ্গল, অমাবস্যার আকাশ মাথার উপরে সাক্ষী, ও কি—ও কার সঙ্গে কথা কইছেন গোপীমোহন? ও কিসের উপর আসন পেতে বসেছেন? ও কার মুখে একটু-একটু করে গুঁজে দিচ্ছেন পাঁচ ভাজা?

বিচিত্র পুরুষ গোপীমোহনের মেজ ছেলে আশ্চর্য পুরুষ চন্দ্রকুমার। চলনে-বলনে, আহারে-বিহারে, বিলাসে-ব্যসনে সব কিছুর মধ্যেই তাঁর ছিল একটা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য যার সঙ্গে পরিবারের আর কারোর মিল ছিল না। নেশায় বিভোর হয়ে থাকতেন চন্দ্রকুমার। সুরার নয়—ভারতীয়তার, নারীর নয়—দাবার। সাতাম বছর বয়েসে গোপী-মোহনের দেহান্তের (১৮১৮) পর তাঁর পরিবারের প্রধান হলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সূর্য-কুমার (রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের মাতামহ)। মাত্র দু'বছর পরে (১৮২০) অকালে ছাত্রিশ বছর বয়েসে চিরদিনের জন্যে চোখ বুজলেন সূর্যকুমার। তারপরেই পরিবার-প্রধান হলেন চন্দ্রকুমার। তখন তাঁর বয়েস চৌত্রিশ চলছে। এর মধ্যেই গোপীমোহনের জীবদ্দশাতেই চন্দ্রকুমারের চারিত্রিক বিশেষত্ব-গুলির নিদর্শন পাওয়া গেছে। পরিবার-প্রধান হিসেবে দেশ ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে চন্দ্রকুমার তাঁর বাবা ও দাদার সুনাম ও যশ নষ্ট তো করা দূরের কথা বরং তা বর্ধিতই করেছেন বহুগুণে।

একটি অদ্ভুত ধরণের সখ ছিল চন্দ্রকুমারের। জন পাঁচ ছয় করে লোক ডাকাতেন—ডাকিয়ে সে-দিনকার সংবাদপত্রগুলি তাদের দিতেন পাঠ করতে, যে যত সুন্দরভাবে, সুমধুরভাবে, সুললিতভাবে তা পাঠ করে তার মনোরঞ্জন করতে পারত সঙ্গে সঙ্গে সে পারিতোষিক পেত নগদ এক শো' টাকা। এ রকম প্রতিযোগিতা মাসের মধ্যে অন্ততঃ বার চারেক তিনি করাতেনই।

গোপীমোহনের ও সূর্যকুমারের মত বংশের মর্যাদার ধারা অনুযায়ী দেশের কাব্যচর্চা সঙ্গীতচর্চা-শিল্পচর্চা চন্দ্রকুমারের কাছ থেকে কম অনুপ্রেরণা পায় নি—এ ছাড়াও আর একটি বিশেষ শিল্প চন্দ্রকুমারের স্নেহচ্ছায়ায় হয়েছে পুষ্ট, পেয়েছে কদর, লাভ করেছে সম্মান—রন্ধনশিল্প। রান্না নিয়ে রীতিমত গবেষণা করতেন তিনি। আজ যে সব খাদ্য আমাদের সুপরিচিত এবং অতি প্রিয়—কে বলতে পারে হয় তো এদের মধ্যে অনেকেই চন্দ্রকুমারের মস্তিষ্ক-কল্পনা-চিন্তাজাত। শুধু দেশীয় রান্না নিয়েই তৃপ্ত হবার লোক তিনি ছিলেন না। দেশীয়-বিদেশীয় এবং বিভিন্ন দেশীয় রন্ধন নিয়ে ছিল তাঁর কারবার। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তিনি আনাতেন রন্ধনশিল্পী। তাদের কাছ থেকে রন্ধনবিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করতেন বলে ঠিক দীক্ষাগুরুর সম্মান দিয়ে তাদের পরিচর্যা করতেন। বাড়ীতে (৬৫ পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীটের) লম্বা-টানা দক্ষিণের বারান্দায় পাশাপাশি অসংখ্য উনুন সাজানো হোত। এতে যে আয়োজন হোত কোন উৎসবের আয়োজনও তার কাছে লজ্জা পায়। পাশাপাশি অতগুলি উনুনের একেকটিতে একেকটি দেশের খাদ্য প্রস্তুত হচ্ছে। বিভিন্ন সূপকার তাদের তদারক করছেন, তাঁদের সাহায্যার্থে বহু লোক সরবরাহ করেছেন চন্দ্রকুমার। বারান্দার মধ্যস্থলেই এক জায়গায় পাতা হোত মছলন্দ—সেই মছলন্দে শোভা পেতেন স্বয়ং চন্দ্রকুমার। পাশাপাশি অতগুলি দেশকে দেখে হয় তো কারুর মনে হোত যেন সারা পৃথিবীটাকে ছোট করে নিয়ে এই বারান্দার মধ্যে ধরে এনেছেন চন্দ্রকুমার। এ সব যেদিন-যেদিন হোত সেদিন স্নানটান সব বন্ধ, খেয়ালই নেই সে সব দিকে। ক্রোধ আর বিরক্তির সীমা থাকে না চন্দ্র-জায়ার।

বিভিন্ন দেশের খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে পরিচিত হলেও নিজের ভারতীয়তাকে বিন্দুমাত্র হারান নি কখনও, কোনও কারণে। তখনকার কলকাতার ইংরেজ-মহলে চন্দ্রকুমার ছিলেন একজন প্রভাব-শালী পুরুষ। ওতপ্রোতভাবে মিশতেন তাদের সঙ্গে কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশীয় মনোভাব কোন-দিনই তিনি হারান নি। আগেই বলেছি ভারতীয়তা চন্দ্রকুমারের নেশার মত ছিল। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন পাল্কী করে কিম্বা জুড়িতে চড়ে দেখলেন শ্বেতদ্বীপের কোন অধিবাসীকে। সঙ্গে সঙ্গে পাইক-বরকন্দাজদের দিয়ে তাকে তুলে নিলেন গাড়ীতে। স্বেচ্ছায় না এলে বল-প্রয়োগ করেও এমন কি দরকার হলে তাকে দু'চার ঘা দিয়েও। বাড়ীতে নিয়ে আসতেন সোজা। স্যুট-ফুট খুলিয়ে দিতেন, চার-পাঁচজন চাকরকে দিয়ে আচ্ছা করে তেল-টেল মাখিয়ে সাহেবকে চান করাতেন, তারপর গরদের জোড় পরাতেন, কপালে মাখাতেন চন্দন, গলায় পরাতেন ফুলের মালা, হাতে গুঁজে দিতেন পুষ্পস্তবক, পায়ে পরাতেন দেশীয় পাদুকা। সাহেব হয়তো মনে মনে ভাবছে—পলি টলি দেবে নাকি? তারপর নানাবিধ দেশীয় গান-টান শুনিয়ে খাবার সময় হলে বাঙলাদেশের সম্পূ[র্ণ] নিজস্ব যে সব খাদ্য সেই সব খাদ্য সাহেবকে খাওয়াতেন রীতিমত আসন পেতে হাঁটু মুড়ি[য়ে] মাটিতে বসিয়ে। কাঁটা-চামচ তার ত্রিসীমানা[য়] দেখা যেত না। অনভ্যাসের ফোঁটা—প্রায়ই দে[খা] যেত সাহেবের জামা-কাপড় ঝোলে-তরকারীতে একাকার, সাহেবের ঠোঁটের উপর সাদা রঙে একখানি দই-এর গোঁফ তৈরী হয়েছে। পাতলা ঝোলের ধারা হয়তো হাত থেকে যারো আঙু[ল] উঁচুতে উঠে গেছে। ভোজনপর্বের পর প্রীতি নিদর্শনস্বরূপ বহুমূল্য নানাবিধ উপহার দি[য়ে] নিজে ফটক পর্যন্ত এসে তাকে গাড়ীতে তুলে দিতেন। বিদায়কালে সেকহ্যাণ্ডের জন্যে য[দি] বা কোন সাহেব হাত বাড়াত—মৃদুহাস্যে চন্দ্র-কুমার তাকে অভিবাদন জানাতেন করযোগে নমস্কারের ভঙ্গীমায়, বিশুদ্ধ ভারতী[য়] প্রথায়।

নেশার মত নেশা চন্দ্রকুমারের ছিল দাবার। একজন প্রথম শ্রেণীর দুর্ধর্ষ দাবা-খেলোয়াড় ছিলেন তিনি। দাবার প্রতিটি চালে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। দাবা নিয়ে মাতামাতি তি[নি] অসম্ভব রকমেরই করতেন চিরকাল তবে তা ... চেয়ে চরমে পৌঁছেছিল তাঁর মারা যাবার বছর দুয়েক আগে (সময়টা অনুমান সাপেক্ষ)। এমনই সাধারণভাবে বছরে দু'বার করে বাড়ী[র] উঠোনে দাবার বৈঠক বসত। অংশ গ্রহণ করতে[ন] শহরের নামী দাবা-খেলোয়াড়রা। বিজয়ীদে[র] জন্যে সেরা পুরস্কারের ব্যবস্থাও ছিল এক প্রস্থ করে হাতীর দাঁতের দাবার ছক ও বত্রিশটি বিভি[ন্ন] আয়তনের ঘুঁটি। মনে করে নেওয়া যেতে পারে যে, আজকাল "টুর্নামেন্ট" বলে যে প্রথার সৃষ্টি হয়েছে—এ হয়তো তারই আদি পুরুষ। যে কথা আগে বলছিলুম, দাবা খেলা চরমে উঠেছি[ল] চন্দ্রকুমারের, তাঁর শেষ জীবনে একবার। সেবারে শুধু বাঙলাদেশের খেলোয়াড় নয়, সারা ভারতে দূত পাঠালেন চন্দ্রকুমার। তাদের সাহায্যে ভারতের নানা অঞ্চল থেকে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন দাবা-খেলোয়াড় আনালেন তিনি। রাজকীয় মর্যাদায় তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা হ'ল। আলাদা লোকজন নিযুক্ত করা হ'ল তাঁদের সেবাকার্যে। আলাদা নহবতের ব্যবস্থা হ'ল তাঁদের মনোরঞ্জনার্থে দিনে দু'বার করে, সকালে বেদ গীতা-চণ্ডী পাঠের ব্যবস্থা হ'ল তাঁদের জন্যে তাঁদের তৃপ্তিবিধানের জন্যে সন্ধ্যায় বসানো হোত নাচের আসর। তাঁদের সম্বর্ধনার জন্যে দেশের শীর্ষ পুরুষদের আমন্ত্রণ জানানো হোত মিলন-সভায়। প্রায় চার মাস ধরে সমানে চলেছিল এই আসর আর সেই চার মাস ধরে নাগাড়ে চলেছিল অতিথিদের সেবা-যত্ন। প্রত্যহ খেলা চলত অন্ততঃ ছ'সাত ঘণ্টা করে। এঁদের সম্মানার্থে কোন কোন সন্ধ্যায় বাজী-পোড়ানোর অনুষ্ঠানও হোত। সেরা বাজীকরেরা চন্দ্রকুমারের আদেশ ও পরিকল্পনানুযায়ী বাজী তৈরী করে দিত। সাধারণ বাজারের চলতি বাজীতে চন্দ্রকুমারের মন ভরত না। খেলার শেষে অতিথিরা যখন যে যার দেশে ফিরে গেলেন প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ তাঁদের প্রত্যেককে তিনি দিলেন ঘুঁটি শুদ্ধ এক প্রস্থ করে হাতীর দাঁত দিয়ে তৈরী দাবার ছক, গরদের জোড়, ঢাকাই মসলীন মুর্শিদাবাদী রেশম, নগদ হাজার টাকা, তা ছাড়া বাঙলাদেশের বিভিন্ন এলাকার নিজস্ব বিশেষত্বপূর্ণ নানাবিধ

(ইহার পর ১১২ পৃষ্ঠায়)

ওগো কালো মেয়ে

কালীপদ চট্টোপাধ্যায়

খবরের কাগজে কাজ করি। এ সপ্তাহে পড়েছে রাতের কাজ। কাজ তো রাত দুটো পর্যন্ত। তারপরে অফিসের বিছানায় ঘুম। সেদিন ঘুমটা ভোরবেলাই ভেঙেগ গেল। বেরিয়ে এসে দেখি, মোড়ের মাথায় একেবারে প্রথম বাসটাই ছাড়বার অপেক্ষায় ঝিমোচ্ছে।

সাড়ে পাঁচটাও তখনও বাজেনি। পেঁাছে গেলাম আমাদের শহরতলীর গ্রামে। রাস্তায় তখনও লোক চলাচল শুরু হয়নি। কাপড়কলে যখন পৌনে ছ'টার সিটি বেজে উঠবে, তখন দলে দলে লোক ছুটতে শুরু করবে।

কাঁচা রাস্তার মোড়ের মাথায় ঝোপের কোলে ওসব কী! ডালা-মেলা একটা চামড়ার সুটকেস অসহায়ভাবে পড়ে আছে, তার চারদিকে মাটির উপর ছড়ানো অনেক কাগজপত্র। ব্যাপারটা স্পষ্ট। কারও বাড়িতে চুরি হয়েছে। চোরে সুটকেসটা চুরি ক'রে এনেছে, এই ঝোপের আড়ালে বসে সেটা খুলে তার ভিতরকার দামী জিনিষগুলো নিয়ে গেছে এবং অ-দামী জিনিষ-পত্র সমেত আধারটি এখানে ফেলে রেখে গেছে।

একটু ঝুঁকে দেখলাম। না, সুটকেসটা আমাদের বাড়ির নয়, পরিচিতও নয়। আমার পরিচিত সব বাড়ীর সুটকেসও আমার পরিচিত হবে তার কী মানে আছে? তবু, কাগজপত্র-গুলো থেকে তো সন্ধান পাওয়া যেতে পারে—আমার চেনা কোন বাড়ীতে চুরি হয়েছে কিনা। কিন্তু ওসব জিনিসে হাত দিলেও আবার কোন পুলিশী ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়তে হবে কে জানে! কৌতূহল দমন ক'রে চ'লেই আস-ছিলাম, কিন্তু একটি জিনিস আমার দৃষ্টিকে একেবারে টেনে ধরল: আমি যে কাগজে কাজ করি, তারই নাম ছাপানো বড় আকারের একটি পিঙলা রঙের খাম। শূন্যেগর্ভ নয়—প্রচুর কাগজপত্রে বেশ ভারি। ত্বরিত দৃষ্টিতে চারদিক চেয়ে নিলাম: না, কেউ নেই। ছোঁ মেরে খামটা তুলে নিয়ে আমার কাঁধ থেকে ঝুলন্ত থ'লের আড়ালে অদৃশ্য ক'রে ফেললাম। বাড়ির দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। লম্বা পা ফেলে ঝোপের ওদিকটাও দেখে নিলাম: না, কেউ লুকিয়ে ব'সে নেই।

বাড়িতে এসেই নিজের ঘরে খামটা নিয়ে বসলাম। খামের উপর পাশের পাড়ার ঠিকানা। যার নামের নিচে সেই ঠিকানা লেখা, তাঁকে চিনি না। হয়তো চিনি, নাম জানি না। একটা বক্স-নম্বর! ও! এই বক্স-নম্বরের অন্তরালে এই ভদ্রলোক কোন বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন খবরের কাগজে; তারই জবাবে যে সব চিঠি এসেছে, খবরের কাগজের অফিস থেকে সেগুলো বিজ্ঞাপনদাতার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এই খামে ক'রে।

'পাত্রী চাই' বিজ্ঞাপন। ভদ্রলোক তো বেশ গোছালো—বেশ নথিদুরস্ত। একটা ট্যাগএ গাঁথা কতকগুলো চিঠির তাড়া। প্রত্যেকটি তাড়া আলাদা ক'রে পিন দিয়ে আঁটা। সবার উপরে একটা কাগজের মাঝখানে আঠা দিয়ে আঁটা রয়েছে বিজ্ঞাপনটার কাটিং: 'শিক্ষিত সংস্কৃতি-অনুরাগী ব্রাহ্মণ সরকারী চাকুরে লেখক পাত্রের জন্য সুশ্রী অধ্যাপিকা গুণী পাত্রী চাই। দাবি বা বর্ণবাধা নাই।' এরপর বক্স নং এবং সংবাদপত্রটির নাম। প্রকাশ-তারিখটাও উপরে লেখা রয়েছে।

তার নীচে পিন-আঁটা একটা তাড়ায় অনেক চিঠি। পরে গুনে দেখেছি, আটত্রিশখানা। বিজ্ঞাপনটির জবাবে বিভিন্ন পাত্রীপক্ষ থেকে লেখা চিঠি। প্রত্যেকটি চিঠির উপরে লাল পেন্সিলে লেখা—'বাতিল।' তার নীচে পরপর সতেরোটি তাড়া। প্রত্যেক তাড়ার উপরে রয়েছে বিজ্ঞাপনদাতার লিখিত পত্রের নকল, তার নীচে সেই পত্রের জবাবে পাওয়া পাত্রীপক্ষের চিঠি, তার নীচে আবার সেই চিঠির উত্তরে লিখিত পাত্রপক্ষের পত্র—এইভাবে সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো। অর্থাৎ, এই সতেরোখানা চিঠি অ-বাতিল—গৃহীত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছে। এগুলোর উত্তর দিয়েছেন পাত্রপক্ষ, তার জবাবে আবার চিঠি গেছে, তার আবার উত্তর এসেছে—এমনি ক'রে কিছুদূর এগিয়ে থেমে গেছে। তা হলে, এর মধ্যে কোথাও কি বিয়ে ঠিক হয়নি? হয়তো হয়নি। অথবা হয়তো হয়েছে, সেই চিঠির তাড়া আলাদা কোথাও রাখা হয়েছে।

মজার ব্যাপার! এ সব থেকে এদেশের মেয়েদের বিবাহ সমস্যার একটা প্রাঞ্জল চিত্র আমি পেতে পারি এবং তা নিয়ে ভাল একটা বিরাট প্রবন্ধ লিখতে পারি। চাই কি, ভাব-গম্ভীর চিত্তগ্রাহী ভাষায় ছোট ছোট প্রবন্ধ লিখে, তার সংকলনে একটা বই বের ক'রে ফেলতে পারি এবং সেই বই হয়তো আমাকে প্রখ্যাত ক'রে তুলতে পারে।

বিজ্ঞাপনের সাহায্য না নিয়ে আমি যাঁকে চব্বিশ বছর আগে বিয়ে করেছি, তিনি বারবার তাগিদ দিচ্ছেন। চিঠিগুলো প'ড়ে প'ড়ে লেখ্য-বস্তু উদ্ধার করতে বেশ সময়ও লাগবে। কাজেই প্রাতঃকৃত্য সেরে, চা-টা খেয়ে, আবার বসলাম।

বিজ্ঞাপনদাতাই খোদ পাত্র। কিন্তু এ নামের লেখকের কোন লেখা কোথাও পড়েছি ব'লে তো মনে করতে পারছি না। অবশ্য, ভাল লাগা লেখাগুলোরও লেখকের নাম কি আমরা ফের পাতা উলটিয়ে দেখি! আগেকার দিনে লেখার শেষে লেখকের নাম ছাপা হত—সেটাই ছিল ভাল। এমনও হতে পারে যে, ইনি ছদ্মনামে লেখেন। আজকাল তো ছদ্মনামের ছড়াছড়ি, তাই সে সব বিচিত্র নামও মনে থাকে না বড় একটা।

ওই সতেরোখানা মনোনীত চিঠির মধ্যে একখানা চিঠি স্বয়ং পাত্রীর লেখা! চিঠিখানা 'বাতিল' নয়—অথচ বাতিল না হবার কোন কারণ নেই। সেই চিঠি বাতিল করতে পারেননি লেখক পাত্র। আমিও এর আগের চিঠিগুলো শুধু উল্টে-পাল্টে দেখেছি, পড়ার মত পড়িনি, পরে পড়া যাবে ব'লে সব চিঠির একটু একটু স্বাদ নিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এ চিঠি আমার দৃষ্টিকে টেনে ধ'রে রাখল। গোটা গোটা স্পষ্ট

হাতের লেখা। বিজ্ঞাপনটির উত্তরে পাত্রী লিখেছে,

'সবিনয় নিবেদন,'

'......পত্রিকায় আপনার বিজ্ঞাপনটি প'ড়ে আপনাকে যথার্থ শিক্ষিত এবং উদারচেতা মনে হয়—তাই আমার জীবনের একটি অশ্রু সজল কাহিনী আপনাকেই জানাতে প্রয়াসী হলাম।

'আমি বাংলাদেশের এক অভাগিনী মেয়ে। সব মেয়েদের মত আমিও স্বামীর সহধর্মিণী, অনুগামিনী হয়ে আমার জীবন-যৌবন তাঁরই পায়ে সমর্পণ করার স্বপ্ন দেখে আমার অতীত জীবন কাটিয়েছি। অকুণ্ঠিত সেবাধর্মে, অনালস্যে, শিক্ষায়-দীক্ষায়, আচরণে, গৃহকর্মে আমি নিজেকে সহধর্মিণীর গৌরবময় পদে অধিষ্ঠিত করার জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত করেছি। লোকে বলে আমি নাকি যথার্থ গুণী—আমার আন্তরিকতায়, স্বভাবের মাধুর্যে তারা মুগ্ধ হয়। কিন্তু আমি যে স্বপ্ন দেখেছি তা তো কই সত্য হ'ল না? নারীর জীবনের বিকাশ বিবাহে, সার্থকতা মাতৃত্বে—আমার জীবনে এ কি শুধু আকাশ-কুসুম? আমার জীবনের পঁচিশটি বসন্ত অতীত হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত তো সে শুভ লগ্ন এল না! শুধু কালো ব'লে আমি প্রত্যাখ্যাতা হলাম। রূপের মোহ ক্ষণস্থায়ী, রূপ ভগবানের দান। আমার রূপ নেই তাই কি আমি নারী জীবনের সকল সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হব? বাংলাদেশে কি আজ আর গুণের কোন আদর নেই? হৃদয়ের কোন মূল্য নেই? আপনি তো লেখক, লিখুন না একটা গল্প, বাংলাদেশের কালো মেয়েকে নিয়ে—যার হৃদয়ে অফুরন্ত আশা কিন্তু ভাগ্য বিড়ম্বিত—যার জীবনে সব থেকেও কিছু নেই, যে শুধু রূপহীনা ব'লে নিজের জীবনকে ধিক্কার দেয়।

'আপনি লেখক, আমার একান্ত শ্রদ্ধার পাত্র—আপনাকে পত্র লেখার ঔদ্ধত্য মার্জনা করবেন।'

'বিনীতা
অভাগিনী'

"'It is not Beauty that we prize
Like a summer flower it dies.
But Humility will last
Fair and sweet, when life be past.
"Think of these lines before you
Choose your Bride."

এইখানে চিঠি শেষ। চিঠি পড়া হয়ে গেলে বেশ খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থাকতে হল আমাকে। রুলটানা খাতার চার পৃষ্ঠার চিঠি। চতুর্থ পৃষ্ঠা উল্টোতেই দেখি লেখক পাত্র এ চিঠির উত্তর লিখেছেন। হ্যাঁ, লেখকই বটে!

প্রথমে সম্বোধন লিখেছেন 'অপরিচিতা অভাগিনী' লিখে কেটে দিয়েছেন। তারপরে লিখেছেন 'অভাগিনী ছদ্মনামের অন্তরাল-বর্তিনী,' লিখে তাও কেটে দিয়েছেন। তার নীচে লিখেছেন, 'ওগো কালো মেয়ে।'

লেখক পাত্র লিখেছেন,

'ওগো কালো মেয়ে.'

'এ চিঠি তুমি আমায় কেন লিখলে? লেখকের অন্তর সংবেদনশীল জেনেও তুমি এ পত্র লিখেছ শুধু আমায় দুঃখ দিতে। দুঃখের স্পর্শ অনেক পেয়েছ—তার পরিচয় তোমার লেখার প্রতিটি অক্ষরে, তবু অপরকে দুঃখ দেবার এ চেষ্টা কেন তোমার, গুণময়ী? এ তোমার কী গুণ? বিজ্ঞাপনে আমি চেয়েছি 'সুশ্রী অধ্যাপিকা গুণী পাত্রী।' 'বর্ণবাধা নাই'—এতে একটি শব্দের সাহায্যে দুটো অর্থ বোঝাতে চেয়েছি আমি, উদ্দেশ্য, বিজ্ঞাপনের খরচ কমানো। অর্থাৎ, পছন্দমত পাত্রী পেলে জাতিগত বর্ণের দিক দিয়ে ব্রাহ্মণ না হলেও তাকে বিয়ে করতে আমার বাধা নেই। দ্বিতীয় অর্থ, মনের মত পাত্রী পেলে তার গায়ের বর্ণ ফরসা কি কালো তা আমি দেখব না। সুতরাং, বিশেষ ক'রে কালোর কথায় বেদনাক্ত ক'রে কেন তুমি এ চিঠি অমায় লিখলে?

'বর্ণের কথা আলাদা লিখেছি। 'সুশ্রী' অর্থে বলেছি দেহসৌষ্ঠব বা স্বাস্থ্যশ্রীর কথা। যে কোন রুচিবান লোকই কি তা চায় না? লোকে তোমায় যথার্থ গুণী বলে—আমিও তাই চেয়েছি। কারও কারও মনে এক-একটি বিশেষ ধরণের আঘাতের ক্ষত থাকে, আমারও আছে; আমার দৃঢ় ধারণা, একমাত্র অধ্যাপিকা পাত্রীই সেই ক্ষতের নিরাময়-প্রলেপ। কোন কোন পাত্রীর জন্য যেমন ডাক্তার বা ব্যবসায়ী অথবা অমনি কোন বিশেষ ধরণের পাত্র চাওয়া হয়, আমিও তেমনি অধ্যাপিকা পাত্রী চেয়েছি। কিন্তু তুমি ত জানাওনি তুমি অধ্যাপিকা কিনা। সবচেয়ে অবিচার করেছ, তোমার ঠিকানা দাওনি, নামটিও না। এমনও তো হতে পারত যে, তোমার গুণের তোমার অন্তর মাধুর্যের পরিচয় পেলে, আমার অধ্যাপিকার পণ গৌণ হয়ে দাঁড়াত। ক্ষেত্র অনুকূল হলে আমি হয়তো এমনও মনে করতে পারতাম যে, এ মেয়েকে আমি অধ্যাপিকা তৈরী করে নেব আমার সকল শক্তি দিয়ে। কিন্তু নিজেকে একান্তভাবে অন্তরালে রেখে, তোমার বেদনবাণটি তুমি নিক্ষেপ করেছ আমার বক্ষ লক্ষ্য ক'রে।

'তোমার সরলতার পরিচয়টিই পেয়েছি সবার আগে। 'পাত্র-পাত্রীর' বিজ্ঞাপন সাধারণত পাত্র বা পাত্রীর অভিভাবকই দিয়ে থকেন। তার উত্তরে যে সব চিঠি আসে, সেগুলো অভিভাবকের হাতেই পড়ে। তুমি কি ক'রে ধ'রে নিলে যে, এ-বিজ্ঞাপনটি দিয়েছে স্বয়ং পাত্র এবং তোমার চিঠি ঠিক তারই হাতে এসে পড়বে? মাঝখানে যদি অভিভাবক থাকতেন, তবে এ চিঠি প'ড়ে তিনি নিশ্চয়ই আমার হাতে দিতেন না; কেন না, একথাও ভাববার দায়িত্ব অভিভাবকেরই যে, এ চিঠি অযথাই আমাকে দুঃখ দেবে। হয়তো তুমি আন্দাজেই এ চিঠি লিখেছ, কিন্তু মাঝখানে কোন রক্ষাফলক নেই ব'লে, তোমার অন্ধকারে হানা তীর ঠিক আমারই বুকে এসে বেজেছে। তোমার আন্তরিকতায় আমি বিমূঢ় হয়ে গেছি।'

'তুমি শিক্ষিতা, অথচ বাংলাদেশের কালো-মেয়ে হয়ে এ শিক্ষা তুমি কী ক'রে গ্রহণ করলে যে, 'নারীর জীবনের বিকাশ বিবাহে, সার্থকতা মাতৃত্বে?' আমাদের এখানকার বিরাট হাসপাতালে পরিবেবিকাদের মধ্যে অনেকেই কালো; তার মধ্যে সবচেয়ে যে কালো, যার মুখের গঠনে সৃষ্টিকর্তাকে প্রশংসা করবার মত তিলমাত্র কারু-কর্ম নেই, সেই মেয়েটি কী অপরিসীম মাতৃত্বে সার্থকতার কোন্ পূর্ণতার লোকে বিরাজ করছে, তা যে তাকে দেখেনি সে বুঝতে পারবে না। সেখানে সে সকলেরই মা। তার সম্বন্ধে সেখানকার প্রবীণ প্রধান চিকিৎসক আমায় বলেছেন, 'নার্সদের বলা হয় সিস্টার—ভগ্নী, কিন্তু এ মেয়েটি হচ্ছে মা; আমিও একে মা বলেই ডাকি।'

তুমি বলবে দেহজাত সন্তানের মাতৃত্বের কথা। কিন্তু আজ দেশে সন্তানের কী মর্যাদা? চারিদিকে উঠেছে আজ জন্ম-নিয়ন্ত্রণের রব। একটি মাত্র সন্তানকেও মানুষের মত মানুষ ক'রে তোলা আজকের দিনে মধ্যবিত্ত মানুষের সাধ্যাতীত। আর বিবাহ? বিবাহে কী মর্যাদা পাচ্ছে নারী? দরিদ্রের ঘরে স্ত্রী তো শুধু দুর্বহ দুঃখভার বহনের সঙ্গিনী মাত্র। আর ধনীর ঘরে? সেখানে স্ত্রী একটি জীবন্ত আসবাব। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী আমরা মায়ের জাত ব'লে, গৃহকর্ত্রী ব'লে, অবিরত স্ত্রীর তোষামোদ ক'রে চলেছি সংসারের শৃঙ্খলাটা বজায় রাখবার জন্যে, আসলে স্ত্রী হচ্ছে সংসারের ঝি—খাওয়া-পরা আর বাসস্থানের বিনিময়ে সে একাধারে ঝি, রাঁধুনী, সর্ব-উপদ্রব-সহা সর্বংসহা। আর সকল স্তরের স্বামীর শয্যায় স্ত্রী হচ্ছে শ'-এর কথায় আইন-সম্মত গণিকা। আমার সংসার আমায় বাধ্য করছে বিয়ে করতে, এখানে আমি যদি শুধু আমার হতাম, তা হলে বিবাহ করার বিরুদ্ধে আমার প্রবল অভিমতটা অবশ্যই জয়ী হত। তা যখন হতে পারেনি, তখন এ নিয়ে বাগবিস্তার ক'রে লাভ নেই।

তুমি বলবে যে, এর বেশির ভাগ কথাই বলছি আমি অর্থনীতির দিক থেকে। কিন্তু অর্থের চক্রেই তো আজকের জীবনযান চলছে। সেইজন্যেই তো এ চিঠি তোমাকে লিখতে হয়েছে। তুমি কালো ব'লে, তোমার রূপ নেই ব'লে তোমার বিয়ে হচ্ছে না, একথা সত্য নয়। আসল কথা, তোমার অর্থবল নেই। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, এদেশের বিয়ের বাজারে ফরসা আর কালোর মধ্যে পার্থক্য সামান্য। মাত্র এক বছরের মধ্যেই আমার দুটি মামাতো বোনের বিয়ে হয়েছে আমারই হাতের উপর দিয়ে। একটি বোন খত ফরশা, অপর বোনটি তত কালো। ফরশাটির বিয়েতে নগদ পণ দিতে হয়েছে এক হাজার এক টাকা আর কালোটির বিয়েতে তেরোশ' একান্ন টাকা। গয়না যৌতুক আর সবই সমান। ফরশা আর কালোর মধ্যে তফাৎ শুধু সাড়ে তিনশ' টাকার। মজা হচ্ছে, কালোটির বর কোন দিক দিয়েই মন্দ তো নয়ই, বরং কোন কোন দিক দিয়ে ফরশার বরের চেয়ে ভাল। বাঙলাদেশে সবই তো কালো আর শ্যামলা মেয়ে, ফরশা আর ক'টি? শতকরা পাঁচটিও বুঝি নয়। কিন্তু ক'টি কালো মেয়ের বিয়ে হতে বাকি থাকছে? বরং অনেক কালো-কুশ্রী মেয়েই দেখছি কার্তিকপানা বরকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়। অনেক গরিব বাপের ফরশা মেয়ে এদেশে বিয়ের আশা বিসর্জন দিয়ে চাকরি ক'রে বুড়ী হয়। আসল কথা রূপ নয়, আসল কথা রূপো—অর্থ।

"গুণের আদর শুধু বাঙলাদেশে কেন এবং আজ কেন, সর্বদেশে সর্বকালেই আছে। কিন্তু বিয়ের বাজারে গুণকে তুলছে কে? গুণ সেখানে গৌণ। সে বাজারে মুখ্য আদর রূপের আর রূপোর। পাত্রপক্ষ পাত্রী দেখতে যাচ্ছে, দেখছে, মেয়েটি সুন্দরী কিনা আর মেয়ের বাপ কত টাকা দেবেন? আর গুণের পরিচয়? মেয়ে রাঁধতে জানে? হ্যাঁ।

কেতোতেই লংকা দিতে হয়? না। শেলাই ান? হ্যাঁ। হাতের কাজ? এল একগাদা তের কাজ—কা'র হাতের তার ঠিক নেই। ইতে জান? হ্যাঁ। গাও তো? লজ্জা করে। চতে? হ্যাঁ। নাচো দেখি? নাচের বাজনা া চাই। হয়ে গেল গুণে পরীক্ষা। এ সবই কি গুণ? কিন্তু এদিকে রূপের পরীক্ষা তাক্ষ আর রূপোর পরীক্ষা তো আসল থা—বিয়েতে পাত্রী না হলেও চলে, কিন্তু ণ চাইই। গুণের পরিচয় কি এক আসরের খায় আর প্রশ্নোত্তরেই হয়ে যায়?

"বিখ্যাত অধ্যাপক অমিয় ঘোষের স্ত্রী মন কালো, তেমনি কুরূপা তেমনি গুণী ার মধুরা। অমিয় ঘোষ রূপে কন্দর্প-ান্তি। কী ক'রে তিনি বিনা পণে বিয়ে রলেন, ওই কালো কুরূপা করুণা দেবীকে। য়ের আশা জন্মের তরে বিসর্জন দিয়ে কোন ফিসে দশটা-পাঁচটা করছিলেন কুমারী রুণা। একদিন অফিস-ফিরতি ভিড়ের ট্রামে তিনি ব'সে আছেন মহিলাসনে, তাঁর পাশের য়গাটি খালি, তার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন. ার অচেনা লোক অধ্যাপক অমিয়কান্তি। রুণা বললেন, "বসুন।" সেই সূত্রপাত রিচয়ের। অতি সাধারণ ঘটনা। তারপরে ঝে মাঝে দৈবাৎ দেখা হয়ে গেলে দু'জনের মস্কার-বিনিময়। ক্রমে আলাপ। ক্রমশঃ রিচয়। তারপর প্রায়ই নিয়মিত দেখা—টেই দৈবাৎ নয়। ক্রমে গুণ পরিচয়ের রে। তারপর মাঝে মাঝেই এ'র বাড়িতে র যাওয়া এবং ও'র বাড়ীতে এ'র। দিনে নে এ'র আর ও'র গুণে উনি আর ইনি ধ। তারপর দেখা গেল, পাত্রের পরিবারে. ত্রী এবং পাত্রীর পরিবারে পাত্র তো বটেই. কান্ত বাঞ্ছনীয় বরণীয় হয়ে উঠেছেন। রপরে বিয়ে—একেবারে বিনা পণে। গুণকে নের পেটিকায় কুলুপ এঁটে রেখে দিলে তো বে না, তাকে সৌরভের মত ছড়িয়ে দিতে বে। তোমাকে যারা প্রকৃত গুণী ব'লে. কৃতই ভালবাসে, তাদের লোকে এখনও াসল লোকটির আবির্ভাব হতে বাকি। ড়িয়ে চল তোমার সৌরভ—সেই মানুষটি াকৃষ্ট হবেই। তোমার নাম-ঠিকানা পেলে, ামিই আকৃষ্ট হতাম কিনা কে বলতে পারে? ক বলতে পারে যে. তোমার গুণের সমুদ্রের তলে আমার অধ্যাপিকা-পণ তলিয়ে যেত া? রণভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভেঙে চুরমার য়েছে, আমি তো তুচ্ছ। আর, জীবনই তো ুধক্ষেত্র, আমার মধ্যেই তো ভগবান।

"তাই ব'লে, পথেঘাটে আজকাল যে তথা-থিত 'প্রেম' দেখা যায়, আমি তোমায় বলছি সেই প্রেম-বাজারে পসরা খুলতে। সেটা ণ পরিচয়ের ক্ষেত্র নয়, সেটা মোহের লোক. সখানেও অবশ্য রূপেরই প্রাধান্য এবং ুপোরও। আমাদের এদেশটা 'লভ'এর অর্থে প্রেমের দেশ নয়, এ হচ্ছে অনুরাগের দেশ। সই প্রেম আর অনুরাগের মধ্যে কী পার্থক্য. সটা শিক্ষিত লোকের অবোধ্য নয়। তুমি তা শিক্ষিত।

"গুণের আদরের আরও একটি দৃষ্টান্ত শান। আমার এক কাকা—বাবার পিসতুতো াই—বেশ ফরশা। বাপের পণের খাই মটাবার জন্যে এবং বাপের অবাধ্য হবার ক্ষমতা নেই ব'লে. তাঁকে বিয়ে করতে হয়েছিল একটি কালো মেয়ে। কাকার সংকল্প ছিল, বিয়ের পরেই গৃহত্যাগ ক'রে জব্দ করবেন বাপকে। কিন্তু বিয়ের পরেই তিনি বাঁধা পড়ে গেলেন সেই কালো মেয়ের গুণের বাঁধনে। শুধু গুণের নয়, রূপেরও। কালো মেয়ের এমন রূপ আমি আর কোথাও দেখিনি। নিটুট স্বাস্থ্য, নিখুঁত গঠন—সৃষ্টি কর্তা যেন একান্ত সাধনায় কষ্টিপাথর কেটে কেটে গড়েছেন। জীবনে আমি দুটি কালো মেয়ের পায়ের তলায় মাথা লুটিয়ে দিয়েছি—তার একটি হচ্ছে বাঙালীর প্রাণের দেবী কালিকা, আর একটি আমার সেই কাকিমা। সেই কাকিমা শুধু মুখে হাসেন না. চোখেও হাসেন. সারা দেহে হাসেন, সে হাসিতে কোন প্রগলভতা নেই; সেই হাসি চাঁদের আলোর মত, মায়ের মহিমার মত স্নিগ্ধ, অমৃতময়। সেই হাসিতে আমার পিসে-পরিবারের অর্ধশত লোক ওঠে আর বসে। অথচ সেই কাকিমার উপরে আছেন তাঁর দুই বড়জা, আছেন শাশুড়ী-শ্বশুর, আছেন ভাশুরেরা। কিন্তু তাঁরা সমেত সারা বাড়িটা ওই কাকিমার হাসিভরা ইচ্ছা অনিচ্ছার দিকে চেয়ে আছে—পরিতুষ্ট পরিতৃপ্ত অন্তরে। আমি সুশ্রী বলতে সেই কাকিমার শ্রীকেই বুঝি—তার সঙ্গে গায়ের রঙের কোন সম্পর্ক নেই। তোমায় বলছি, কালো মেয়ে. আমি তেমন একটি কালো মেয়ে চাই, আমি শ্বেত পাথরের রূপসী চাই না।

"আমি লেখক জেনে তুমি আমাকে বলেছ বাঙলাদেশের কালো মেয়েকে নিয়ে একটা গল্প লিখতে। কিন্তু এই কালো মেয়ের দেশে কালো মেয়ের গল্প অনেক লিখেছেন আমাদের লেখকেরা। রবীন্দ্রনাথের 'সাধারণ মেয়ে'র অনুরোধের ছায়াপাত হয়েছে তোমার এই অনুরোধের উপর। ভালই। রবীন্দ্রনাথ তুমি পড় এবং এমন করেই পড় যে. তোমার কথা তাঁর কথায় অনুভাবিত—এই উচ্চ সংস্কৃতির প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু 'সাধারণ মেয়ে'র অনুরোধ যাঁর উদ্দেশ্যে ব্যক্ত, সেই কথা-সাহিত্য সম্রাটই কি কালো মেয়ের গল্প কম লিখেছেন? আমি প্রবন্ধ লেখক, গল্প লিখতে জানি না। জানলেও তোমাকে নিয়ে গল্প আমি লিখব না। কেননা, তুমি আমার মনে বিশেষ হয়ে উঠেছ। অসংখ্য গল্পের কালো মেয়ের তালিকায় আমি তোমায় যদি মিশিয়ে দিই, তা হলে যে এই বৈশিষ্ট্য থেকে তোমাকে বিচ্যুত করে ফেলা হবে। তা আমি পারব না।

"হৃদয়ের মূল্য? হৃদয়ের মূল্য দিয়ে দিয়েই তো বাঙালী জাতটা ফতুর হয়ে গেল—নিঃস্ব হয়ে গেল। তাই তো এ জাতটা ব্যবসায়ীর জাত না হয়ে কবির জাত হয়ে মরছে। তুমি অধ্যাপিকা নও জেনেও, তোমার হাতে কোনদিন এই চিঠি পৌঁছবে না জেনেও আমি কাল অফিস কামাই করার ঝুঁকি নিয়ে আজ সারা রাত জেগে যে এই চিঠি লিখছি, কেন? তোমার হৃদয় অপরিসীম মূল্যে আমার হৃদয়ে অমূল্য হয়ে উঠেছে বলেই নয় কী? এর জন্য আমি তোমার কৃতজ্ঞতা দাবি করছি না। তোমার হৃদয়ের মূল্য দিয়েই আমার হৃদয় ধন্য।

"আমি অখ্যাত লেখক।...যে মুষ্টিমেয় লোক আমাকে লেখক ব'লে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার লেখার সাধনাকে কৃতার্থ করেছে, তুমি তাদের তালিকায় রইলে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে।"

এখানেই এ চিঠি শেষ হয়েছে।

তার কিছুদিন পরের এক তারিখ দিয়ে আর একখানা চিঠি—

"ওগো কালোমেয়ে,

"তোমার ঠিকানা পাবার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করিনি। অনেক রকম প্রয়াসের মধ্যে একটার কথা বলি। ভেবেছিলাম ওই পত্রিকাতেই আর একটা বিজ্ঞাপন দেব এই রকম—'...তারিখে....পত্রিকায় প্রকাশিত, বক্স নং......এর অধীন বিজ্ঞাপনের উত্তরে 'অভাগিনী' ছদ্ম নামে যিনি পত্র লিখেছেন, দয়া করে তিনি নিজের নাম-ঠিকানা জানালে বাধিত হব।'

"কিন্তু ভেবে দেখলাম, এ রকম বিজ্ঞাপন দিলে, অন্ততঃ ওই পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিভাগের কর্মচারীরা আমার নাম নিয়ে হাসাহাসি করবেন; তা থেকে ক্রমে হয়তো আমার অতি তুচ্ছ লেখক-খ্যাতিটুকুও বিপন্ন হতে পারে। আর, তোমার আত্মমর্যাদাবোধ প্রবল হয়ে উঠলে, তুমি হয়তো আমার এ বিজ্ঞাপনের উত্তরে কোন চিঠিই লিখবে না।

"তারপর একদিন ওই কাগজে এ বিজ্ঞাপনটি দিয়েছি—"

এর নিচে যে ছাপা-বিজ্ঞাপনের কাটিং আঁটা, তা হচ্ছে—"শিক্ষিত সংস্কৃতি-অনুরাগী ব্রাহ্মণ সরকারী চাকুরে লেখক পাত্রের জন্য উচ্চ-শিক্ষিতা গুণী মধুরা সুশ্রী কৃষ্ণাঙ্গী পাত্রী চাই, পণের দাবি নাই।"

বিজ্ঞাপনটির কাটিং-এর নিচে আবার চলেছে লেখক পাত্রের চিঠি—

"কিন্তু, কালোমেয়ে, তোমার চিঠি আর পেলাম না। অনেক অভিভাবকের চিঠি পেয়েছি। তার মধ্যে বেছে বেছে অনেকের চিঠির জবাব দিয়েছি। অনেকের বাড়িতে গিয়েছি। কিন্তু কোথাও তোমার সন্ধান পেলাম না। অবশেষে, তোমাকে স্মরণ ক'রে, তোমার হৃদয়ের মূল্য দেবার জন্য, তোমাকে মর্যাদা দেবার জন্য এক পাগলামি করলাম। একটি খুব কালো মেয়ে পাওয়া গেল, সে আবার এক কলেজের অধ্যাপিকা। সুশ্রী নয়। তবু কালো ব'লে তোমার মর্যাদা রইল আর অধ্যাপিকা ব'লে আমার পণ রইল ভেবে তাকে আমি নির্বাচন করলাম। আমার পণের দাবি নেই, তবু তারা মোটা টাকার যৌতুক দেবেই। আর তারই মত মেয়ে কী করল জান? সেই কুশ্রী কৃষ্ণা অধ্যাপিকা তার এক ইঞ্চি মোটা অধর উলটিয়ে, তার থ্যাবড়া নাক কুঁচকিয়ে আমাকে বাতিল করল—কেন? না, আমার চোখ ছোট, আমার গায়ের রঙ নাকি হলদে, আমার মুখের নাকি মঙ্গোলীয় ছাঁদ!

"না, এতে আমার দুঃখ হয়নি। করুণা হয়েছে মেয়েটির উপর। অনেক যুবক তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদেরই প্রতীক হিসেবে আমার উপর দিয়ে সেই জ্বালা সে মেটাল। কিন্তু তার একটা আশা ছিল। আশা ছিল সে, তার বাপের মোটা টাকার যৌতুকের লোভে ছুকে

পাবার জন্যে আমি খুব সাধ্যসাধি করব। আমি তা করিনি।

"আমার শুধু একটু অভিমান হয়েছে—তোমার উপর। অতি আপনজনের উপরই মানুষের অভিমান হয়। আশ্চর্য, এরই মধ্যে কখন তুমি আমার এমন আপন হয়ে পড়েছ যে, তোমার উপর আমার অভিমান হচ্ছে!"

আরও কিছুদিন পরের এক তারিখের নিচে লেখক পাত্রের তৃতীয় চিঠি—

"ওগো কালোমেয়ে,

"দু' সপ্তাহ আগে আমার বিয়ে হয়ে গেল। আমার প্রথম বিজ্ঞাপনের সূত্রেই এ বিয়ে ঠিক হয়েছে। পাত্রী কালো নয়, শ্যামলা নয়, ফরশাও নয়। যে রঙকে আপন লোকে ফরশা বলে আর অপর লোকে বলে উজ্জ্বল-শ্যাম, তার গায়ের রঙ তাই। সুশ্রী এবং স্বভাবমধুরা, এরই মধ্যে সে আমাদের বাড়ির সব লোককে বশ ক'রে ফেলেছে। সবচেয়ে বড় কথা, সে এক নামজাদা কলেজের অধ্যাপিকা—ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর এম-এ। তাকে আমার খুব ভাল লেগেছে। এরই মধ্যে তাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। তাকে তোমার সব কথা বলেছি আমি। তোমার চিঠি তাকে দেখিয়েছি। তোমাকে আমি যে চিঠি লিখেছি, তাও দেখিয়েছি। তাকে কি আমার কোন কথা গোপন করা চলে? তার সঙ্গে তোমার কথা অনেক আলোচনা হয়েছে। প্রায়ই ওঠে তোমার কথা। আর, আশ্চর্য, সেও তোমায় ভালবেসে ফেলেছে।"

আরও প্রায় দু'মাস পরের যে তারিখ দিয়ে লেখক পাত্র চতুর্থ চিঠি লিখেছেন, সেই তারিখটি গত-কালকের। লিখেছেন—

"ওগো কালোমেয়ে,

"আমার ঘরে ব'সে তোমায় চিঠি লেখা আর চলবে না। কালই এই চিঠির তাড়াটি আমার অফিসের টানায় নিয়ে রাখতে হবে। তোমাকে এর পরে চিঠি লিখব আমার অফিসে ব'সে। ভেবেছিলাম, স্ত্রীর কাছে কোন-কিছুই গোপন করব না; কিন্তু তা বুঝি আর চলল না। কী অশান্তি দেখ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন ব্যাপারই গোপন থাকা কি ভাল? অথচ আমি নিরুপায়।

"কাল রাত্রে এক কান্ড হয়ে গেছে। সকাল-রাতেই খাওয়া সেরে আমি অনেক রাত পর্যন্ত লেখাপড়া করি। ইতিমধ্যে স্ত্রীর ঘুম পেলে সে ঘুমিয়ে পড়ে। কাল রাত্রেও সে আমার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি লেখাপড়া সেরে আলো নিবিয়ে, ঘরের নীল আলোটি জেলে, বিছানায় গিয়ে উঠেছি। নীল আলোয় অপূর্ব দেখাচ্ছিল অধ্যাপিকাকে। এরূপ দেখার সুযোগ তো এর আগেও অনেক গভীর রাতেই ঘটেছিল, তবু এই মোহাচ্ছন্ন রূপটি কেন ধরা দেয় নি! আমার চোখের আয়তন ছোট ব'লে দৃষ্টিক্ষমতায় তো কোন ত্রুটি থাকা উচিত নয়। আমি বিছানায় উঠে অপলক দৃষ্টিতে সেই নীলার দিকে চেয়ে রইলাম। কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই। এরই মধ্যে সে কখন জেগে গেছে, লক্ষ্য করিনি। সে চোখ মেলে আমাকে সেই অবস্থায় দেখে একটু হাসল। তারপর উঠে জল খেল। তার পরেও ব'সে রইল এবং হেসে নয়, আমার অচেনা এক স্বরে সে আমায় জিজ্ঞেস করল, কী দেখছিলে?"

"হেসে বললাম, 'নীল আলোয় ভারি চমৎকার দেখাচ্ছিল তোমাকে।'

"বলল, 'শ্যামলা রঙটা কালো দেখাচ্ছিল?'

"বললাম, 'না—না, ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল।'

"বলল, 'আমিও তো সেই কথাই বলছি। কালোই তো তোমার মনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে—তোমার চোখে সবচেয়ে সুন্দর হয়ে উঠেছে কালো। তাই নীল আলোর কালোতে তুমি আমার মধ্যে দেখছিলে তোমার সেই কালো মেয়ের রূপ—আমার মধ্যে খুঁজছিলে সেই কালো মেয়েকে!"

"কী সুস্পষ্ট ঈর্ষা তার ঘুমভাঙা অকপট কণ্ঠে!

"আমি সেই ভাবটাকে চাপা দেবার জন্যে হো-হো ক'রে হেসে উঠলাম। কিন্তু সে হাসল না।

"ঘরে ব'সে তোমাকে চিঠি লেখা আর চলবে না গো, কালোমেয়ে।"

পাথুরেঘাটার ঠাকুরেরা

(১০৮ পৃষ্ঠার পর)

শিল্পকার্যখচিত বহুবিধ দ্রব্য, তৈজসপত্র, ফল-মূল, মিষ্টান্ন ইত্যাদি।

বাঙলাদেশের এক প্রাচীন রাজপরিবারের বহুমানভাজনা এক বধূ। দাবা খেলায় তিনিও না কি একাই এক শো। চন্দ্রকুমারের এই দাবা-যজ্ঞের সংবাদ সেই অন্তঃপুরচারিণীর কানেও পৌঁছেছিল সিংহদ্বার, নাচঘর, বৈঠকখানা অতিক্রম করে। দাবায় তিনি আহ্বান জানালেন চন্দ্রকুমারকে। সাদরে গ্রহণ করলেন চন্দ্রকুমার সেই আমন্ত্রণ। গেলেন তাঁদের প্রাসাদে। রাজবধূ অসূর্যম্পশ্যা। একটি ঘরে তিনি রইলেন, তার পরের ঘরে পাতা হ'ল দাবার ছক, তার পরের ঘরে বসানো হ'ল চন্দ্রকুমারকে। শুরু হ'ল খেলা আগাগোড়াই শুনে শুনে চাল বলে যাওয়া অর্থাৎ দাবার ছকটি তো দু'জনের একজনও দেখতে পাচ্ছেন না—তাঁদের দু'জনের হয়ে নির্দেশ অনুসারে চেলে দিচ্ছেন ঐ পরিবারের পুরুষেরা। তিনটি সন্ধ্যা ধরে চলল এই খেলা, কেউ জিতলেনও না, কেউ হারলেনও না। খেলা চটে গেল। আড়াল থেকেই দুজনে ভাই-বোনের সম্পর্ক পাতালেন। এরপর বোন দাদাকে প্রণামী পাঠালেন পঁচিশ থালা মিষ্টান্ন আর নগদ হাজার টাকা আর দাদা বোনকে আশীর্বাদী পাঠালেন এক শ' থালা মিষ্টান্ন আর নগদ পাঁচ হাজার টাকা।

আস্তে আস্তে চন্দ্রকুমারের দাবা-খেলার খ্যাতি বাঙলার তদানীন্তন ছোট লাটের কানে গিয়ে পৌঁছল। শোনা গেল দাবা-খেলায় তাঁর দেশে তিনি নাকি অপরাজেয়। তাঁর কাছ থেকেও আহ্বান এল। তুড়ি দিয়ে তাঁকে হারিয়ে দিলেন চন্দ্রকুমার। একবার নয়, দু'বার নয়, বারংবার। আসবার সময় তাঁকে বলে এলেন—সাহেব, তোমাদের হারাবার জন্যে গাদা গাদা সৈন্য-সামন্ত, ভূরি-ভূরি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহ করার কোন দরকার হয় না বাঙালীর, ইচ্ছে করলে বাঙালী ঠিক এই রকম করে খেলার ছলে-খেলতে খেলতে তোমাদের হারিয়ে দেবে। সে ক্ষমতা বাঙালীর বাহুতে রীতিমত আছে।

মাত্র ছেচল্লিশটি বছর বেঁচেছিলেন চন্দ্রকুমার ঠাকুর। ১৮৩২ সালে হয় তাঁর দেহান্ত।

বিদূষক

আনন্দ বাগচী

যন্ত্রণায় ফিরে আসে প্রতিটি রঙের গূঢ় রেখা
কড়িতে কোমলে মিশে, প্রেম তার অবাস্তব মুখে
যে হাসি ফোটায় রোজ বুকে বেদনার পত্রলেখা;
প্রদীপের শিখা জ্বলে পতঙ্গের মতই অসুখে।
সংগীতের আত্মা সেও স্বরবিদ্ধ, যে প্রাণ যৌবনে
নগ্ন শিমুলের মত জ্বলে, তার অসংখ্য কবিতা
চিন্তার প্রহার মাত্র, স্বপ্ন প্রতিনায়ক হননে,
রূপকে ভয়ের জন্ম, উপমাও কি অপমানিতা!

সুন্দর চোখের জল, বেদনা পরমরমণীয়,
তৃষ্ণার জটিল চিত্র প্রেম, সব জানি সব জানি :
মনে-রেখ অন্ধকারে প্রথম কদম ফুল ফোটে,
রেখার তরঙ্গে আঁকা বাঁকা মুখে প্রিয় হতে প্রিয়;
অন্ধকারে ফিরে যেতে ভয় নেই, আলোর জবানী
সে তো এই অন্ধকার তার অনির্বচনীয় ঠোঁটে।

ভুলেছি যেহেতু আমি বিদূষক সময়ে সময়ে
নিন্দায় ভরেছে দিন, রাত্রি পেয়ে হারানোর ভয়ে।

এখন সমস্ত মুখে আলো
ফেলে চমকে দিতে পারি।।

আজকের দিনে স্বাধীনতা পাবার পরেও কোন সাহেবকে ধুতি-পাঞ্জাবী পরা দেখলে আমাদের বিস্ময়ের অবধি থাকে না, কোন সাহেবকে মাটিতে বসে ডাল-চচ্চড়ি খেতে দেখলে তো আমাদের মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম। কোন বাঙালীকে সাহেবি জীবনধারায় চলতে দেখলে আমাদের কাছে তা মনে হয় স্বাভাবিক অথচ কোন সাহেবকে আমাদের মত দেখলে আমরা অবাক হয়ে যাই। দেশীয় জীবনধারার প্রতি এই তো আমাদের সম্মানবোধ। অথচ সেই সোয়া শ' বছর আগে পুণ্যশ্লোক রাজর্ষি রামমোহনের যুগে শত-কোটি প্রণামভাজন বাঙালী চন্দ্রকুমার ঠাকুর যেভাবে ধরে ধরে সাহেবদের দিয়ে বাঙালীর জীবনধারা গ্রহণ করিয়েছিলেন তার খবর পরবর্তীকালের ক'জন বাঙালী রেখেছে? বিশেষ বিশেষ জাতীয় দিনগুলিতে ক'জন বাঙালী স্মরণ করে তাঁর নাম? জাতির নবগঠনের ইতিহাসের পাতায় ক'জন ঐতিহাসিক লিখে রেখেছে তাঁর কথা, স্মরণ করে তাঁর কীর্তি প্রচার করে তাঁর কাহিনী দিক থেকে দিগন্তরে? না রাখুক, না লিখুক, না করুক, ভুলে যাক তাঁকে ঐতিহাসিকের দল—কিন্তু ইতিহাস তাঁকে কোনদিনই ভুলবে না। ইতিহাস থেকে মুছে যাওয়ার, সরে যাওয়ার, মিলিয়ে যাওয়ার মত অত দুর্বল তাঁর অলোকসামান্য জীবনেতিহাস নয়, ইতিহাসের মধ্যে চিরকালের মত বন্দী হয়ে রইলেন চন্দ্রকুমার ঠাকুর এবং তাঁরই মতন শ্রদ্ধার আধার অথচ আজকের দিনে উপেক্ষিত অবহেলিত বিস্মৃত বাঙলার বরেণ্য সন্তানের দল।

যুগ [illegible] ক্তিরূপিণী দেবীকে
তাঁর ভক্তবৃন্দরা বহুনামে ডেকে
এসেছে, যেমন—
মহিষাসুরমর্দিনী
দুর্গা
দশভুজধারিণী
মহাকালী
চামুণ্ডেশ্বরী
সিংহবাহিনী
পার্বতী
ইত্যাদি আরও কত কি
এবং যে কোন একটি
নাম ধরে ডাকলেই
মা সাড়া দেন।

কিন্তু........

একমাত্র এবং অদ্বিতীয় স্বাভাবিকভাবে চুল
কালো করার তেল লোমার কোনই বিকল্প নেই।

বিশ্ববন্দিত চুল কালো
করার তেল

একমাত্র এজেন্ট : এম্ এম্ খাম্বাটাওয়ালা, আমেদাবাদ—১
পরিবেশক : সি, নরোত্তম এণ্ড কোং, বম্বে—২

MPS

কলিকাতার এজেন্ট : ১২৯, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শা বভিস এণ্ড কোং

দুষ্টু হাসি — পান্না সেন

আর বল্‌ব না — অচিন্ত্যকুমার সিংহ

বাঃ কি মজার? — সন্তোষ দত্ত

শিকারী — শম্ভুনাথ লাহিড়ী

সমান্তরালে

নীলিমা সেন
(গঙ্গোপাধ্যায়)

মণির ঠিক জলহীন মাছের মতই অবস্থা; উজ্জ্বল আলোর নীচে সমস্ত ঘরটা ঝলমিল করছে। ঘরের এক কোণে ক্রিসমাস্ ট্রিতে ছোট ছোট ইলেক্ট্রিক বাল্ব্ লাগানো—কৃত্রিম ম্যান্টল পীসের উপর সারি সারি সাজানো রং-বেরঙের কার্ড। বৎসরের শেষ দিন আজ। রেডিওগ্রামে একটা ওয়ালজ্ বাজছে· অনেক ছেলেমেয়ে সুন্দর, অসুন্দর; কত রকমের ইভনিং স্যুট আর ডিনার জ্যাকেট. কত বিচিত্র গাউন! মেয়েদের গয়নার ডিজাইন কি রকম চোখ ঝলসান—আসল, নকল হীরে, মুক্তো একাকার হয়ে গেছে। ওয়াল্জের তালে তালে ডান্স হচ্ছে।

গ্লোরিয়া মণির কথা বোধ হয় ভুলেই গেছে। প্যাট রবিন্সনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে তাকে ছোট্ট একটু শেরি অফার করে মিলিয়ে গেছে জনতার মধ্যে। মধ্যে মধ্যে দেখা যাচ্ছে নীকর গায়ে প্রায় মিশে গিয়েই গ্লোরিয়া নাচছে। চোখে মুখে 'পৃথিবী থেকে অনেক দূরে'—এই রকম একটা ভাব! অথচ এই প্যাটের কথা শুনিয়ে শুনিয়ে গ্লোরিয়া মণির কান পচিয়ে দিয়েছিল প্রায়! কত সহজে প্যাটকে ফেলে আর একজনকে হৃদয়ে স্থান দিয়ে ফেলল।

এই প্রথম মণি শেরিতে চুমুক দিল—ভাবল এদের হৃদয়ের কোন মানে নেই। একটা বিজাতীয় অনুভূতি শিরশিরিয়ে নেমে গেল—কপালের শিরা থেকে প্রবাহিত হয়ে পায়ের নখের ডগা পর্যন্ত।

প্যাট রবিন্সনের টাই লাগানো স্মার্ট চেহারা। স্মিত মুখে বলল,—'মিস চ্যাটার্জি'র কি অবাক লাগছে এ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের কাণ্ড-কারখানা দেখে!' মণির চোখের সামনে লাল, নীল, কালো, সবুজ, অন্ধকার জমে উঠেছিল—কথার আঘাতে মিলিয়ে গেল। বললো,—'হ্যাঁ মিঃ রবিন্সন—গ্লোরিয়ার বাড়ী এই প্রথম আমি এলাম।'

'এসে কি দেখলে—এরা ইংলিশও নয় বাংলাও নয়।' হো-হো করে হেসে উঠল প্যাট নিজেরই কথায়। মণির হাত ধরে বলল,—এসো নাচি।'

শেরিটাতে শেষ চুমুক দিয়ে মণি উঠতে গেলো—পাটাতে জোর নেই—চোখ দুটোও বোধ-হয় ঝাপ্‌সা! প্যাটের হাতটা ছাড়িয়ে নিল—সবেগে মাথা নেড়ে বলল,—'না—ক্ষমা কর! আমি নাচতে জানি না।'

আবার প্যাটের সাজানো দাঁত বেরিয়ে গেলো মণির কথায়। ব্রাউন চোখ দুটি কোমল হয়ে এল। মণিকে যেন ও ছাড়বে না আজ। পাশে বসল বেশ গুছিয়ে।

'মিস্ চ্যাটার্জি', তুমি সত্যিই অবাক করলে—লরেটোর মেয়ে ডান্স করতে জানো না!' ঠোঁট উল্টে মণি বলল,—'শুধু লরেটোর কেন—ইংলণ্ডের মেয়েও বলতে পারো। সেখানে জন্মেছি—সেখানে পড়েছি ছ' বছর বয়স পর্যন্ত; তাছাড়া আমার মা ইংলিশ।'

'ও'—! প্যাটের চমৎকার দাঁতগুলি আবার আত্মপ্রকাশ করল—'তোমার মা ইংলিশ আর তোমার বাবা বাংলার মানুষ! তাহলে তুমি তো আমাদেরই স্বজাতি!'

চকিতে মণি লাল হয়ে উঠল; এই শীতেও যেন গরমে গা জ্বালা করছে—'তার মানে, এ্যাংলো ইন্ডিয়ান! কি বললে?' প্যাটের চেহারার দিকে আচমকা রুক্ষ চাউনি দিল; কালো চুল, ঢেউ খেলানো, বাদামী চোখে বাঙালীর কোমলতা। নিজের চেহারাটাও ভাবল মণি—নীল চোখ, সোনালী চুল—না ইংলিশ—না বাংলা। প্যাটের কথাটা কানের কাছে রিণ্-রিণ্ করছে! দাঁড়িয়ে উঠল উত্তেজনায়। তারপর প্রায় চেঁচিয়েই বলল,—'মোটেই না— আমি তোমাদের স্বজাতি হবো কেন, আমি বাঙালী!'

বাড়ী ফিরে এসে নিজেকে ফিরে পেলো মণি। হাঁফাচ্ছে একটু একটু। দাঁতটা ঠোঁটে চেপে অস্ফুটে উচ্চারণ করল—'এ্যাংলো ইন্ডিয়ান! ওদেরই নাকি স্বজাতি শ্রীমতী মণিকা চ্যাটার্জি'। ভবানীপুরের বিখ্যাত চাটুয্যে পরিবারের মেয়ে কিনা এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান!' সোনার তারের মত চুলগুলো উত্তেজনায় মুঠো করে ধরল।

রাত্রে বাবা খেয়েছেন কিনা খোঁজ নেওয়া হয়নি। ও যে ফিরে এসেছে এ খবরটাও দেওয়া হয়নি। মনে হতেই শান্ত হয়ে গেল মণিকা। মা যাবার পর সংসারের দায়িত্বটা ওরই। পনেরো বছর বয়সটা গিন্নীপনায় ভারী হয়ে উঠেছে।

বাবার কাছে যেতেই মনটা আশঙ্কিত হয়ে উঠল। নিমীলিত চোখে কি জল আছে নাকি? একটা চিঠি এগিয়ে দিলেন। অতি বিস্ময়ে প্রায় নির্বাক হয়েই মণি চিঠিটা নিল। অমঙ্গল নিয়ে এসেছে মনে হয়; পাতাবাহারের মত থরথর করছে মণির হৃদয়। শেরিতে চুমুক দিয়ে চোখে যেমন ঘোর লেগেছিল; চিঠিটা পড়ে ঘুরতে লাগল পৃথিবী! একটু আগে হৃদয় কেঁপেছিল, এখন সমস্ত শরীরটাতেই শিহরণ খেলে গেল বিদ্যুতের মত! বাবার দুই হাঁটু জড়িয়ে বসে পড়ল। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল মহাসাগরের মত এক বিশাল অশ্রু স্থির হয়ে রয়েছে। ভাঙ্গা সুরে বলল,—'বাবা কি হবে?'

'কি হবে মণি, তাই তো ভাবছি!—চাটুজ্যে বাড়ীর বউ—সে কেন এমন হবে?' বললেন মণির বাবা সুধীরেন্দ্র চ্যাটার্জি'!

কি যেন ভাবল মণি। বাবার হৃদয়ের ব্যর্থতার বেদনা অনুভব করতে পারল যেন! এই সময় একটু সান্ত্বনা দেওয়া কর্তব্য বোধ হয় বাবাকে! বলল,—'তাই ভাল বাবা! যে যার নিজের জায়গায় যাওয়াই ভাল। না এদিক, না ওদিক হলে কি সুখ পাওয়া যায়!'

চুপ করে মেয়ের চুলে হাত বোলাতে লাগলেন সুধীরেন্দ্র। 'আচ্ছা বাবা আমিও তো চাটুয্যে বাড়ীর মেয়ে—তবে কেন লোকে আমাকে এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বলে?'—

'বলে নাকি? বলুক! সকলকে কি খুশী করা যায়? তুমি হচ্ছ—চাটুয্যে বাড়ীর মেয়ে—সদ্বংশজাতা!'

আজকের রাত্রি বিনিদ্র হয়ে শেষ হবে। জানলার ফাঁকের আকাশের তারার আলোর মধ্যে কোন মন্ত্র নেই যা ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে ঘুমের প্রশান্তিতে; কালো রাত্রি বয়ে এনেছে অগণিত দুঃস্বপ্ন। একটি একটি করে মুহূর্ত পার হয়ে যাবে। আর মণি অশ্রান্তভাবে চিন্তা করে যাবে আগামীকালের প্রভাত কখন

আসবে রাত্রির পাহাড় পেরিয়ে। কখন উঠবে সূর্য এই মৃত্যুর মতো ঠান্ডা অন্ধকার ছিঁড়ে।

মুখ ঢেকে মণি নিঃশব্দে কেঁদে উঠল। এমন কথা কেউ কি কখনও শুনেছে—মা বিয়ে করবেন? মেয়ের বিয়ের কথাই তো মণি জানে! কিন্তু মায়ের বিয়ে? এ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে তফাৎ রইল কোথায়? সুধীরেন্দ্র চ্যাটার্জি যে চিঠিটা মণিকে পড়তে দিলেন—তাতে এই সংবাদই দুর্ঘটনার মতো কাঁপিয়ে দিয়েছে আজকের রাতকে।

মাকে ভালো করে কাছে পায়নি মণি কোনদিন। জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত দেখছে—যেন একটা অশান্তি বাবা আর মাকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। আর বুঝেছে ভবানীপুরের বিখ্যাত চাটুয্যে বাড়ীতে সবই আছে, নেই শুধু শান্তি।

মেলেনি। দুজন মানুষের আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি, কিছুতেই মিলল না। সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে এসে মিসেস গার্ট্রুড চ্যাটার্জির অন্তরাত্মা বারে বারে জানতে চেয়েছে—দেশ, ধর্ম ত্যাগ করে এই কি পাওয়া? এর বেশী কেন নয়? কেন এই গম্ভীর নিঃশব্দে থিতিয়ে যাওয়া? যে রাজার ঐশ্বর্য কল্পনা করে এসেছিলেন—বিধ্বস্ত হয়ে গেছে নেমে আসা রাজ-পরিবারের অন্ধকার মূর্তি দেখে। ধন নেই আড়ম্বর নেই, ডান্স নেই, ডিনার নেই—আছে শুধু অহমিকা। অসন্তোষ জমেছে একটু একটু করে।

সুধীরেন্দ্র চ্যাটার্জি ধুতি ছেড়ে ধরলেন ডিনার জ্যাকেট; বাংলা বুলি যথাসম্ভব এড়িয়ে চললেন। বৃদ্ধা মাতাকে কাশী পাঠিয়ে ধরলেন সুরা। বাড়ীতে পার্টি দিতে সুরু করলেন; আর নির্জন মুহূর্তটিতে একমাত্র শিশু কন্যাকে জড়িয়ে ধরে ভাবতে লাগলেন—এই ছোট্ট মেয়েটির মা এই সময় যদি কপালে সিঁদুরের টিপ পরে ব্যস্ত হয়ে সংসারের কাজে ছুটো-ছুটি করতেন—কি রকমটি হতে পারত?

নীল চোখ, আগুনের মতো চুল, আপেলের মত ফেটে পড়া রং যে মেয়ের—সমুদ্র পেরিয়ে এসে ভাবল—নিজের দেশের একটি ছেলেকে পেলে হয়তো জীবন ভরে উঠত মাধুর্যে। হয়ত এ রকম ভেঙ্গে পড়া আভিজাত্যের দুর্গের অন্ধকার দেয়াল হাতড়ে বেড়াতে হত না মুক্তির উপায় খুঁজতে! ত্যাগ আর কত করা যেতে পারে! স্বজন, স্বদেশ আরও? আরো চায় চাটুয্যে পরিবারের কঠিন ছেলেটি। তার শিক্ষা, তার দীক্ষা চুরমার করে দিতে হবে। তার বিলিতি মনের গঠন দুমড়ে ফেলতে হবে। কিন্ত তা কি করে সম্ভব কিছুতেই বুঝতে পারল না বিলিতি হৃদয়। ভারতের নতুনত্ব ভাঙ্গাতে কতটুকুই বা সময় লাগল! স্বপ্নের ঘোর ভেঙ্গে তাকিয়ে দেখল পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছিটকে এসেছে, সূর্য থেকে খসে পড়া আলোর কণার মত। ইংলন্ডের মানুষ তাকে কত সুখের সংসার দিতে পারত! এই আফশোসে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে গিয়ে দেখে এক ভারতীয় সন্তানের মাতা সে!

দুটি অনুভূত বিভিন্নমুখী মনের সংঘর্ষের মধ্যেই বড়ো হল আর একটি শিশু মন।

ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরল মণিকা চ্যাটার্জি। এই জন্যেই অপেক্ষা করছিল গার্ট্রুড। অবুঝ শিশুমনকে কাঁদিয়ে যেতে চায়নি। অপেক্ষা করেছে অতিরিক্ত ধৈর্য নিয়ে কবে মণি বড়ো হবে— বুঝবে তার মায়ের বেদনা। বছরের পর বছর কেটে গেল সেই প্রতীক্ষায়। আস্তে আস্তে বোঝাতে লাগলেন মণিকে। দীর্ঘ দশ বছর ধরে ভারতে থেকে অসন্তোষ ছাড়া কিই বা সংগ্রহ হয়েছে! মেলাতে পারল না নিজের জীবনকে।

মণি সব বুঝল। ও যেন বহু পূর্বেই উপলব্ধি করেছে, সুধীরেন্দ্র চ্যাটার্জি আর গার্ট্রুড চ্যাটার্জির মাঝে যে উত্তাল সমুদ্র আছে তার সেতু হতে সে পারেনি। সে শুধু এ বাড়ীর মেয়ে।

মায়ের দুঃখ মণিকা বুঝেছে। বাবার বেদনাতেও হৃদয় সাড়া দিয়েছে। পনেরো বছর বয়সটাতে অনেক বেশী এগিয়ে গেছে মণিকা। মায়ের সমবয়সী। গার্ট্রুডের কষ্ট হয়েছিল মেয়েকে ছেড়ে যেতে। তবু মণি এখন বড় হয়েছে। এই বয়সটা আসারই অপেক্ষা করেছিল। মণি জানে, পক্ষীমাতা চিরকালই তার সন্তানদের ডানার তলায় রাখে না। ছোট্ট পাখীর গায়ে ডানা বেরোয়, সে উড়তে শেখে। তারপর উড়ে যায় কোথায় কে জানে কেউ আফশোষ করে না; মাও নয়—সন্তানও নয়।

বিলিতি মায়ের মেয়ে হয়েও মণি কেমন যেন নিখাদ বাঙালী। বাবাকে তার মা যে কেন বুঝলেন না—এর মীমাংসা করতে হাঁফিয়ে উঠল মণিকা। এই ভালো হল হয়ত। চিরজীবন অশান্তির বোঝা টেনে চলার চেয়ে যেখান থেকে হোক সুখ ডেকে আনাই ভাল। এই সান্ত্বনা ছাড়া মণি নিজেকে আর কিছু দিয়ে বোঝাতে পারল না।

পুঞ্জে পুঞ্জে অন্ধকার ঘরের কোণায় কোণায় জমে রয়েছে। রাত তিনটে বেজে গেছে এখনও ঘুম এলো না। এতো রাত ধরে একটি কথাই মনে হচ্ছে—মায়ের বিয়ে। কেউ কি কখনও শুনেছে? তবে এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সমাজে হয়। মনে হতেই দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে অস্ফুটে উচ্চারণ করল—এ্যাংলো ইন্ডিয়ান! মুখ বিকৃত করে চোখ বুজিয়ে প্যাট রবিন্সনের চেহারাটা ভেবে নিল। ঐ সুন্দর ছেলেটার জন্যই গ্লোরিয়া পাগল হয়েছিল। এখন কত অবলীলাক্রমে তাকে ছেড়ে আর একজনকে হৃদয় দিয়ে ফেলল—এইটুকু বয়সেই। কত হাল্কা ওদের মন। এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সমাজটা মায়ের বিয়ের সংবাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে উন্মত্তের মত ছুটোছুটি করে দিয়েছে যেন সমস্ত ঘরটাতে। গ্লোরিয়াদের সমাজের মতো তার মায়ের বিয়ে?

মা ওকে ছেড়ে চলেই গেছেন—আর আসবেন না। তবু মা যে মিসেস ডিটন হতে চলেছেন এ মারাত্মক সংবাদ আসার আগে কেন মৃত্যু হল না মণিকার! মৃত্যু আসে নি।

ঘুমও এলো না। উঠে পড়ল লেপের তলা থেকে। টেবিল ল্যাম্পটা জেলে গীতার অনুবাদ খুলে বসল। মন যখন অশান্ত হয় তখন নাকি গীতা পড়লেই শান্তি আসে—বাবার মুখে মণি বহুবার একথা শুনেছে। মা চলে যাবার দিনটিতেও বাবাকে গীতা পড়তে দেখেছে। কাল সন্ধ্যার নতুন খবর পেয়ে বাবাও হয়তো গীতা খুলেই বিনিদ্র রজনী কাটাচ্ছেন।

ইজিচেয়ারে শুয়েই রাত কাটলো। ঘুমিয়েছিল বোধ হয় কিছু। জানলা দিয়ে সকালের রোদ এসে পড়েছে। উঠে বসল মণি। গত কালের উত্তেজনা ঝিমিয়ে পড়েছে। চিপপারে পায়ে দিয়ে এগুলো ও। বারান্দায় বাবা বসে আছেন বেতের চেয়ারে। চোখের পাতা ভিজে।

মণি ডাকল—'বাবা!'

—এসো মণি! —ডাকলেন সুধীরেন্দ্র চ্যাটার্জি চোখের পল্লব খুলে।

মণি জুতো খুলে রাখ!

কেন বাবা?

তোমার মা নেই!

মা নেই? কেন?

বুঝতে পারছে না মণি।

গতকালের সন্ধ্যার মতো একটি টেলিগ্রাম এগিয়ে দিলেন তিনি মণির দিকে। আবার কেঁপে উঠল অন্তর দুরু দুরু করে। টেলিগ্রামটা ধরতে হাতের পাতাও কাঁপছে। ঝাপসা চোখে পড়ল মণি। মাতামহী পাঠিয়েছেন—; গার্ট্রুড নেই; তিনি আত্মহত্যা করে ঈশ্বরের কাছে মিলিত হতে গেছেন।

হয়তো ইন্ডিয়ার মিসেস চ্যাটার্জি হয়ে যে সুখ তিনি পান নি—ইতালীর মিসেস ডিটন হয়েও পাবেন না। ইতালীর কাছে আত্মসমর্পণ করে আর একটা পরীক্ষা করার সুযোগ নিজেই ভেঙ্গে দিলেন। হয়ত অহরহ অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত হয়েছেন।

এত কথা মণিকা জানে না। টেলিগ্রামটা ওর ভাবনার তুলনায় কত পরিমিত। আলগা হয়ে পড়ে গেল কাগজটা। বাবার কোলে মুখ গুঁজে দিল। কান্নাটা গলার মধ্যে এসে আটকে গেছে। তার মা কবেই তো চলে গেছেন—নতুন করে মা হারানোর অনুভূতিটা ঠিক খুঁজে পেল না মণি। যত অশান্তি, যত অমিল—মানুষেরই সমাজে। ঈশ্বরের কাছে তো জাতি নেই—ধর্ম নেই, ইংলিশ নেই, বাংলাও নেই। —কত আকাশ পার হয়ে এই সংবাদটি এল আশীর্বাদের মতো।—অন্ধকারের স্বপ্ন থামানো সূর্যের পল্লবের মতো।

সংলাপ

সুনীল ভট্টাচার্য

অর্জিত সংস্কার নিয়ে
অবশেষে তুমি কাছে এলে
অনুভবে ক্লান্তি নাই, শ্রান্তি
নাই শ্রাবণী সংলাপে
সুদক্ষ শিল্পীর মত তুলি টেনে কল্পিত ইজেলে
ছবি আঁকলে কতবার রূপমুগ্ধ রৌদ্রের তাপে
বারো মাস ছয় ঋতু বর্ষা আর বসন্তের ডাকে
বৃষ্টির বিবর্ণ রঙে হাস্নুহেনা পলাশ ফোটালে।

আমি সে পলাশ ফুল।
অরণ্যের প্রগল্ভ বিলাসে
রাত্রির দ্বিধায় ব্যাপ্ত ছলনা-নদীর দুই পারে
আলেয়া-আগুনে জেবলে লক্ষ
দীপ দেউলের পাশে
দুরন্ত আবেগে দুলি। অপহৃত উত্তরাধিকারে
সংলগ্ন মন্দিরে বুঝি মখমলের শুভ্র বিছানায়
নিপুণ নিষ্ঠুর সেই পাথরের দেবতা ঘুমায়।

খন আর গা ঝাঁম ঝাঁম করে না। হাস-পাতালের ওষুধের গন্ধে আর দম বন্ধ হয়ে আসে না মিনতির।

আজকাল বরং যেন একটু মাদকতারই ছোঁয়া লাগে তার দেহ-মনে। মিনতি ভাবতেই পারে না সেই এক বছর আগের কথা। এক বছর আগে বড়দিমনি প্রথম যেদিন তাকে ঠেলে হাসপাতালে পাঠিয়েছিলেন সেদিনের শংকা-সংকোচের কথা মনে পড়লে আজ সত্যি তার হাসি পায়।

চার বছরের ছেলে বিশু। মা'র শাড়ির আঁচল এমনি করে সে টেনে ধরেছিলো সে দিন তা ছাড়িয়ে নেওয়া মোটেই সহজ ছিলো না মিনতির পক্ষে। বারবারই চোখ তার জলে ভরে উঠছিলো। ছেলের চোখে জল দেখে বিশুকে কোলে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলো সে। আদরে আদরে ভুলিয়ে ফেলতে চেয়েছিলো তাকে। কিন্তু সে কি অতো সহজে ভোলবার ছেলে? মা যে তার অনেক দূর চলে যাচ্ছে তা বেশ বুঝতে পেরেছিলো বিশু। তাইতো তার অমনি কান্না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার যেন শেষ নেই।

শেষ পর্যন্ত মহেন্দর সিং দারোয়ানের এক ধমকে থমকে গিয়েছিলো বিশু। মা'র কোল থেকে সুর্ সুর্ করে নেমে পড়ে সে তার নুপিসির গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। সেই সুযোগেই সামনে দাঁড়ানো বাসটায় গিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়েছিলো মিনতি। আর একটু দেরী হলেই সে বাসটা মিস্ করতে হতো তাকে।

কিন্তু বাসে উঠে পড়ে মনের তার যে অবস্থা হয়েছিলো সেদিন আজও তা অবর্ণনীয়। সেও যেন গ্রাম ছেড়ে চলে আসার মতোই আর এক তীব্র বেদনা। সেই যে বিশুর বাবাকে একা গাঁয়ে ফেলে রেখে তারা চলে এলো আর দশজনের সঙ্গে, আর তো কোনো খোঁজ খবরই পাওয়া গেলো না তার। জমি-জমার বিলি বন্দোবস্ত করে, গরু-মোষ বেচে পরিষ্কার হয়ে তিনিও এ পারে চলে আসবেন, এমনি কথাই তো ছিলো তার বিশুর বাবার সঙ্গে। কিন্তু তিনি তো আর এলেন না!

বিশুকে ফেলে যেতেও মিনতির তাই এতো ভয়, এতো দুশ্চিন্তা। স্বামীহারা মিনতি সন্তান-ছাড়া হয়ে যে থাকতে পারে না!

শহরের হাসপাতালে এতো সহজে নার্সিং শেখার সুযোগ মিলে যাবে তা কিন্তু ভাবতে পারেনি মিনতি। বড়দিমনির কথায় সে একটা দরখাস্ত করে দিয়েছিলো, বাস্ ঐ পর্যন্ত। ছেলেটা আর একটু বড়ো হলে না হয় কথা ছিলো, কিন্তু বিশু যে বড্ড ছোটো। ওকে ছেড়ে কী করে সে সারা দিন কাটাবে, নার্সিং শিখতে শহরের হাসপাতালে যাবার প্রথম দিন বাসে বসে বসে এই ছিলো মিনতির একমাত্র ভাবনা। পরেও অনেকদিন ধরে এ ভাবনা তার মন জুড়ে থাকতো। নার্সিং শিখতে এসে শহরের হাস-পাতালে যখন নাইট ডিউটি পড়তো তখন আরো মন খারাপ লাগতো বিশুর জন্যে।

এক এক করে সব বিভাগের কাজই শিখেছে মিনতি। এমারজেন্সি ও-টিতে অনেকদিন ডিউটি দিয়েছে সে। কিন্তু সেখানে মোটেই ভালো লাগেনি তার। বিশ্রামের মুহূর্ত মাত্র অবকাশও মেলে না সেখানে।

শিল্পাঞ্চলের শহুরে হাসপাতাল। দুর্ঘটনার কেস লেগেই আছে। অপারেশনের পর অপারেশন চল্‌ছে। তা ছাড়াও অন্যান্য জরুরী কেসতো আছেই। বিশ্রামের ফুরসুৎ পাওয়া যাবে কি করে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা কন্ কন্ করে, কোমরের শিরা-উপশিরা টাটিয়ে ওঠে। তবু মুখ ফুটে কথা বলার উপায় নেই।

প্রচণ্ড শীতেও গ্যাসের মুখে স্টেরিলাইজারটার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামে মিনতি। তবু সেখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তাকে। একটু এদিক-ওদিক হলে সিস্টার-মেট্রনের বকুনিতে বাপ-ঠাকুর্দার নাম ভুলতে হবে যে! তাই একদম দম-দেওয়া কলের পুতুলের মতোই হাসপাতালে নড়াচড়া করতে হয় নার্সকে, বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের।

এমনি করেই সব বিভাগের কাজ শিখে নিয়েছে মিনতি। রোগীকে নাওয়ানো খাওয়ানো, জ্বর দেখা, ওষুধ দেয়া, স্টিচ্ কাটা, এ্যান্টি-সেপ্টিক ড্রেসিং করা এবং এক বেড থেকে আর এক বেডে ট্রলি ঠেলে ঠেলে নিয়ে গিয়ে আরো কতো কি কাজ, ছ'মাসের মধ্যে সবই মোটামুটি জানা হয়ে গেছে তার।

স্বাধীন উপজীবিকায় একটা বিশেষ আনন্দ আছে বৈ কি! শহরের হাসপাতাল থেকে নার্সিং শিখে এসে ক্যাম্প হাসপাতালে কাজ নিয়েছে মিনতি। সরকারী ডোলের ওপর আর সে নির্ভর করে না, নিজের চাকরির টাকায় সে এখন তার সংসার খরচ চালায়। এ কি বড়ো কম ইজ্জতের কথা! বড়দিমনির পরামর্শেই এ কাজ শিখেছিলো মিনতি। সেজন্যে কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই তার বড়দিমনির কাছে।

ছোট্ট হাসপাতাল বসেছে উদ্বাস্তু মহিলা ক্যাম্পের অদূরে। এই হাসপাতালেই কাজ করছে এখন মিনতি। সরকার কোলকাতা থেকে বড়ো ডাক্তার পাঠিয়েছেন। সেই ডাঃ রমেন মল্লিকই এই নতুন হাসপাতালের ইন-চার্জ। ক্যাম্পের পুরোনো ডাক্তার নন্দী সাহেব তাঁর সহকারীর কাজ করছেন।

এক হিসেবে লোক্যাল লোকই বলা চলে ডক্টর নন্দীকে। তেঘরা থেকে সাত আট মাইল দূরে তাঁর বাড়ি। একেবারে আসানসোল শহরের গা ঘেঁষে। সপ্তাহে একদিন যেয়ে তিনি ঘুরে আসেন বাড়ি থেকে। সাইকেলে আসা-যাওয়া, কতোটুকুই বা আর সময় লাগে!

তেঘরা উদ্বাস্তু মহিলা ক্যাম্পে দুর্গত মানুষের সেবায় বেশ একটা তৃপ্তি বোধ করেন

ডাঃ নন্দী। উপার্জন তেমন বেশি না হলেও তাঁর কোনো ক্ষোভ নেই সেজন্যে।

নতুন ডাক্তার সাহেব গ্রাম-জীবনের সঙ্গে অপরিচিত। তার ওপর এ আবার একেবারে উদ্বাস্তু পল্লী। প্রথম দিন থেকেই কেমন একটা অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করছেন ডাঃ মল্লিক এই উপনিবেশ সম্পর্কে।

বাস্তবিকই উদ্বাস্তু জীবনের সমস্ত অন্ধকার যেন এই উপনিবেশটিকেই ঘিরে রয়েছে. এখানে উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তেমনি কথা মনে হয়েছিলো ডাঃ মল্লিকের। অন্ধকারে যে হাঁপিয়ে ওঠে সারা অন্তর। আলো ছাড়া আনন্দ ছাড়া কী করে প্রত্যাশা করা যায় উজ্জ্বল পরমায়ু!

তেঘরা মহিলা উদ্বাস্তু ক্যাম্পের প্রথম অভিজ্ঞতার কথা ঘুরেফিরেই মনে পড়ে ডাঃ মল্লিকের।

আলো-ঝলমল আসানসোল স্টেশন। জনারণ্য। রাত এগারোটা বারোটার প্রায় মাঝামাঝি। তেঘরায় যেতে মধ্যরাত গড়িয়ে যাবারই কথা।

সারি সারি বাস দাঁড়িয়ে। কণ্ডাক্টরদের চিৎকারে বাতাস খান খান্। আইয়ে রাণীগঞ্জ কে নগর—আইয়ে বাবুজী বোগরা, তেঘরা ক্যাম্প। তোরন্ত আইয়ে মাইজী!

বাসের সারির গা ঘেঁষেই এগিয়ে যান ডাঃ মল্লিক। তেঘরায় বাসে যাওয়া অনেক সময়-সাপেক্ষ। তা'ছাড়া মাঝে মাঝে কণ্ডাক্টারদের বিকট হাঁকাহাঁকি এক দুঃসহ ব্যাপার। সাত আট মাইল পথ ধরে ঐ চিৎকার সহ্য করে যাওয়া তার পক্ষে সত্যি সত্যি অসম্ভব।

আর কীইবা এমন দরকার বাসে যাবার? ট্যাক্সিরও তো কোনো অভাব নেই। স্ট্যান্ডে উপস্থিত হতেই পাশাপাশি দু'খানি গাড়ি থেকেই দু'জন ড্রাইভার ডাকাডাকি সুরু করে ডাঃ মল্লিককে। মল্লিকের আর বুঝতে বাকি থাকে না যে, কোলকাতার মতো কুলীন নয় আসানসোলের ট্যাক্সি। ভাগে ভাড়া খাটে এরা সব।

কিন্তু ওসব ঝামেলার মধ্যে নেই ডাঃ মল্লিক। ভাগাভাগি মানেই বদারেশন। ট্যাক্সিতে যাবে, অথচ একটু গা এলিয়ে আরাম করে বসতে পারবে না, তেমন ট্যাক্সিতে চড়ার কোনো মানে হয়? তা'ছাড়া একটা ইজ্জতের প্রশ্ন আছে না?

ডাঃ মল্লিক একাই একখানি ট্যাক্সি নিয়ে যাত্রা করেন তেঘরা মহিলা ক্যাম্পে। শহর পেরিয়ে জি টি রোড ধরে খানিক দূর যেতেই গা-টা যেন ছম্ ছম্ করে ওঠে ডাক্তারের। অচেনা, অজানা পথ, কী নিঃসীম নিস্তব্ধ পরিবেশ! দু'একটা ডাকাতের গল্প তুলে ড্রাইভারটা আরো বেশি করে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে ডাক্তারের মনে। সত্যি তো, গাড়িটাকে অসদুদ্দেশ্যে অন্য কোনো পথে নিয়ে গেলে, কীইবা আর করতে পারেন তিনি.

জি টি রোডের দু'ধার জুড়ে বিস্তীর্ণ অন্ধকার মাঠ। হঠাৎ এক-একটা গাড়ির হেড-লাইট যেন অজুর দিয়ে যায় মাঝে মাঝে। দূর থেকে অবশ্য বার্ণপুরে কারখানার ফারনেস সত্যিকারের এক পাহারার কাজ করছে আকাশ-ছুঁই-ছুঁই বিরাট অগ্নি-মশাল উঁচিয়ে ধরে রেখে। সে আলো সত্যি সত্যি এক পরম ভরসা। বাস্তবিক পক্ষে সারাক্ষণ ঐ আলোর দিকে চেয়ে চেয়েই পথ এগিয়েছেন ডাঃ মল্লিক।

মিনিট পঁয়ত্রিশের মধ্যেই পথের শেষ। হ্যাঁ, একটা লোকালয়ের সামনে এসেই গাড়িটা থেমেছে। প্রাণে যেন জল এলো ডাঃ মল্লিকের। সত্যি সত্যি তাঁর কণ্ঠনালিটা যেন একেবারে শুকিয়েই আসছিলো ভয়ে।

ক্যালভার্টের ওপর বসে বসেই বোধ হয় ঝিমুচ্ছিলো দারোয়ান মহেন্দর সিং। ট্যাক্সির হেডলাইটটা মুখের ওপর এসে পড়তেই সচকিত হয়ে ওঠে সে বেচারা। একলাফে এগিয়ে আসে গাড়ির সামনে ইয়া লম্বা এক লাঠি হাতে। আজ যে বড়ো ডাক্তার সাহেবের আসার কথা কোলকাতা থেকে। সে কথাটা বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলো মহেন্দর। বহুৎ ভাগ্যি তার, সাহেব বুঝতে পারেননি কিছু।

ভাড়াটা মিটিয়ে দিতেই ড্রাইভার ট্যাক্সিটা হুস্ করে ঘুরিয়ে নিয়ে মুহূর্তে উধাও। হঠাৎ যেন নিবিড় অন্ধকারে প্রজ্বলিত একমাত্র প্রদীপটা কে নিভিয়ে দিলে। মহেন্দর সিং-এর হাতে কালিঝুলিপড়া হ্যারিকেনটার মধ্যেও যে একটা আলো জ্বলছে সে দিকে নজরই পড়েনি ডাঃ মল্লিকের।

আইয়ে সাব, মেরা সাথ সাথ আইয়ে।—হ্যারিকেন উঁচিয়ে মহেন্দর সিং সাহেবকে এই অনুরোধ জানাতেই ডাঃ মল্লিক বুঝতে পারেন যে, তাঁকে যথাস্থানে নিয়ে যাবার জন্যেই দারোয়ান এসেছে আলো নিয়ে। দারোয়ানকে অনুসরণ করেই চলেন সাহেব।

পথের দু'ধারে সারি সারি তাঁবু। সেই সব তাঁবুর মধ্যে থেকে অন্ধকারের নীরবতা ভেদ করে ওঠে প্রশান্ত ঘুমের নাক ডাকার শব্দ ডাঃ মল্লিক ভাবেন, এ সব বন্ধ তাঁবুর মধ্যেও এমন ঘুম আসে।

একটা টিনের ঘরে এনে ডাক্তার সাহেবকে বসিয়ে দিয়ে বড়দিমনিকে খবর দিতে চলে যায় দারোয়ান। মাঝখানের দু'খানা ঘর পরেই বড়দিমনির কোয়ার্টার এবং অফিস। খবর পেয়েই দু'তিন মিনিটের মধ্যেই তিনি চলে আসবেন। বড়দিমনি তেঘরা মহিলা ক্যাম্পের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। ডাঃ মল্লিক অন্ততঃ প্রথম দিনের জন্যে তাঁরই অতিথি।

আচ্ছা, ওদিকের খাটটায় কে যেন কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে মনে হচ্ছে না।—ডিম করে দেওয়া হ্যারিকেনের স্বল্প আলোয় ঠিকই চোখে পড়ে ডাঃ মল্লিকের। আর এক ধারে দু'টি আলমারিতে নানারকমের ওষুধ বিষুধ। তবে কি এটাই ডিস্পেন্সারী না কি এই ক্যাম্পের!

ভাবতে ভাবতেই বড়দিমনি এসে হাজির।

নমস্কার!

নমস্কার!

ডাঃ নন্দীর শরীরটা খারাপ যাচ্ছে দু'দিন ধরে। কেমন একটু জ্বর জ্বর। তাঁরই স্টেশনে যাবার কথা ছিলো আপনাকে রিসিভ করতে কিন্তু জ্বরটা থামলোই না মোটে। তাই স্টেশনে যেতে না পেরে তিনি ভারি দুঃখিত।

কার কথা বলছেন আপনি?—ডাঃ মল্লিক জিগ্যেস করেন বড়দিমনিকে।

কেন, ডাঃ নন্দীর কথা। ঐ যে শুয়ে রয়েছেন তিনি ওখানে।

বড়দিমনির গলা শুনতে পেয়েই ধড়মড়িয়ে উঠে বসেন ডাঃ নন্দী।

আপনি, আপনি? এতো রাতে আপনি এখানে? বড়ো রকমের কোনো অসুখ বিসুখ হয়নি তো কারো?—অনেকটা ঘুমের ঘোরের মধ্যেই যেন প্রশ্ন করে চলেন নন্দী সাহেব।

না, না কোনো অসুখ বিসুখের ব্যাপার নয় এই যে ডাঃ মল্লিক এসে পড়েছেন, দেখছেন না।

নমস্কার, নমস্কার স্যার। স্টেশন থেকে ক্যাম্পে আসতে কোনো অসুবিধে হয়নি তো স্যার?—মল্লিক সাহেবের কথা শুনেই ঘুমের ঘোর কেটে যায় ডাঃ নন্দীর।

না, না কোনো অসুবিধেই হয়নি আমার আসানসোল থেকে সরাসরি চলে এসেছি একটা ট্যাক্সি নিয়ে।

আচ্ছা ডাঃ মল্লিক, আপনি কি আজই আপনার কোয়ার্টারে যাবেন না আজকের রাতটা এখানেই থাকবেন? সব ব্যবস্থাই পাকা করে রাখা হয়েছে কোয়ার্টারে। খাওয়া দাওয়াটা সেরে নিয়ে সাত আট মিনিটের পথ হেঁটে গেলেই সেখানে গিয়ে থাকতে পারেন আপনি।

না, আজ আর কোথাও যাবার ইচ্ছে নেই। এখনি তো প্রায় একটা। বাকি রাতটুকু এখানেই কাটিয়ে দেবো। এতো রাতে খাওয়ার ঝামেলা আর নাইবা করলেন।—তাড়াতাড়ি ডাঃ নন্দীর ঘরেই শুয়ে পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন ডাঃ মল্লিক। শুধু রাত বেশি হয়েছে বলেই না, প্রথম রাতেই একা একা গিয়ে কোয়ার্টারে থাকতে বেশ যেন ভয় ভয়ও লাগছে মনে। তাই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রশ্নের এমনি জবাব।

বড়দিমনির প্রচুর আয়োজনের অতি সামান্য মুখে দিয়ে রাত্রির খাওয়া শেষ করে এলেন ডাঃ মল্লিক। শ্রান্ত দেহে ঘুমও এসে গেলো তাড়াতাড়ি। অনভ্যস্ত পরিবেশ। তবু তেমন কোনো অসুবিধে বোধ হলো না, এতে মল্লিক সাহেব নিজেই আশ্চর্য। পরদিন অবশ্য ঘুম ভাঙলো খুব সকাল সকাল। বাজারের মধ্যে কতোক্ষণই বা আর ঘুমানো চলে?

সত্যি সত্যি তেঘরা ক্যাম্পের মধ্যে এ একটা বাজার অঞ্চল। ক্যাম্পের প্রধান রাজপথের ওপরই এই উদ্বাস্তু মহিলা উপনিবেশের অফিস। আর তারই পাশাপাশি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বড়দিমনি, তাঁর সহকারী ঘোষবাবু এবং ডাঃ নন্দী প্রভৃতি স্টাফ কোয়ার্টার। অবশ্য ডাঃ নন্দীর কোয়ার্টার মানেই তাঁর ডিস্পেন্সারি। প্রায় সারা রাত-দিন এখানেই কাটান তিনি। এই যে তাঁর সাধনার ক্ষেত্র। এ ছাড়া কোথায় আর যাবেন তিনি? আর একটু দূরেই দারোয়ান মহেন্দর সিং এবং মালী মদনগোপালের দু'খানি ঘর। সপরিবারেই থাকে ওরা ওই ঘর দু'খানায়। প্রধান রাজপথের এ অংশটা বেশ খানিকটা বেশি চওড়া এবং প্রধানত তারই জন্যে এখানটাতেই তরি-তরকারি মাছ-মাংসের ক্রেতা-বিক্রেতাদের নিত্য ভিড় একেবারে ভোর না হতেই।

এতো কোলাহল কিসের? বাজার নাকি?—ঘরের দোর খুলে বাইরে আসতেই সত্যি সত্যি বাজার বসেছে দেখে একটু বিস্ময়ই বোধ করেন ডাঃ মল্লিক।

বাজারটা ঠিক এখানেই না বসালে কি চলতো না। বলিহারি যাই রুচির! মল্লিক সাহেবের মনে কেমন যেন একটা ঢেউ জেগে ওঠে বিরক্তি এবং অশ্রদ্ধার।

মল্লিক সাহেব বেরিয়ে পড়েন। একা একাই পথচলা সুরু করেন বাজারের মধ্য দিয়ে। সে চলার মধ্যে কেমন একটু ভয় ভয়। কোথায় আবার কোন্ অনিয়ম ঘটে বসে, সেই ভয়।

অসহায় উদ্বাস্তু মেয়েদের কলোনী এবং তিনি নিজে এখানে আনকোরা নতুন, নিয়ম-কানুন সবই তার অজানা। তাই খুব সতর্ক।

দু'একটা জায়গায় ছোট ছোট ভিড় চোখে পড়ে চলতে চলতে। হাঁড়ি-কলসী নিয়ে সব বৌ-মেয়েদের এক একটি দল দাঁড়িয়ে এক এক জায়গায়।

বুঝতে আর বাকি থাকে না ডাঃ মল্লিকের কিসের জন্যে এ সব ভিড়। কিন্তু তিনি অবাক হয়ে যান এদের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে। কুয়োয় জল নিতে এসে এমনি ধারা ঝগড়া বাধিয়ে বসবে মেয়েরা, সে আবার কেমন কথা!

একটু জানবার ইচ্ছে জাগে মল্লিক সাহেবের। পালা করে জল তোলার ব্যাপারটার রকম সকমও যেন একটু বিচিত্র। তা দেখবার জন্যেও ইচ্ছে হয়। ডাঃ মল্লিক এগিয়ে যান একটা কুয়োর দিকে। কুয়োর মধ্যে ঝুঁকে পড়ে দেখেন, জল কোন্ অতলতলে, খালি চোখে তার সন্ধান পাওয়াই ভার।

জন চার বৌ-মেয়ে প্রকাণ্ড একটা মোটা দড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে অনেক দূর, আবার এগিয়ে আসছে কুয়োর কাছে। কুয়োর জল বন্দী হয়ে আসে ঐ দড়ির টানে। অজ্ঞাত অতল থেকে এমনি করে জল টেনে তোলা কি সহজ!—মনে মনে ভাবেন ডাঃ মল্লিক। কারো মন পাওয়ার মতোই যেন এখানে জল পাওয়াটাও একটা সুকঠিন ব্যাপার। অন্যের মনকেও তো এমনিভাবেই টেনে কাছে আনতে হয়, তবে এমনি মোটা দড়ি দিয়ে নয়—সূক্ষ্ম সুতোয়। মন যে জলের চেয়েও নরম। আবার সবচেয়ে বেশি তার ওজন। সেই ভারে বার বার সূক্ষ্ম সুতো ছিঁড়ে যাবার ভয়।

জল তোলার দৃশ্য দেখতে দেখতে এমনি কথাই ভাবছিলেন ডাঃ মল্লিক। তাঁর সমুখ দিয়ে জলের ঘড়া বা কলসী কাঁখে নিয়ে চলছে চারটি বৌ-মেয়ে। শেষের জনটি একটি বৌ। তার মাথায় কাপড়। তার শাড়ির আঁচল ধরে গায় গায় লেগেছে ছোট্ট একটি ছেলে। ছেলেটির জন্যেই এ বৌটি একটু পিছিয়ে পড়েছে তার সঙ্গিণী-দের থেকে। তবে খুব বেশি নয়, সামান্য।

তাকেই গভীর সহানুভূতির সঙ্গে ছোট্ট করে বল্লেন ডাঃ মল্লিক—উঃ, এমনি করে রোজ জল নিতে হয় কুয়ো থেকে? তাহলে ভারি কষ্ট তো তোমাদের।

তা'ছাড়া আর উপায়ই বা কি বলুন! হাজার লোকের এই ক্যাম্পে তিনটি মাত্র এমনি আধ-শুকনো কুয়ো। কিন্তু তৃষ্ণা তো মেটাতে হবেই, তা না মিটিয়ে পারে মানুষ?

ও মিনতি, তুই আবার পথের মাঝখানে গল্প শুরু করে দিলি! থাক, তুই গল্পই কর তা'হলে। আমরা যাই।—দলের বয়স্কা মহিলার হাঁক শুনে দ্রুত পদেই এগোবার চেষ্টা করে বৌটি। কিন্তু সঙ্গের ছেলেটি যে অন্তরায়। তাকে পথের মাঝখানে ফেলে রেখে তো আর যাওয়া যায় না।

বৌটির নাম তাহলে মিনতি। বেশ নামটি। কথাগুলোও বেশ বলছিলো কিন্তু! 'কিন্তু তৃষ্ণা তো মেটাতে হবেই, তা না মিটিয়ে পারে মানুষ? খুব খাঁটি কথা। ক্ষুধা আর তৃষ্ণা নিবারণ, দেহ-ধারণের পক্ষে এই তো হলো প্রথম এবং প্রধান প্রয়োজন—মল্লিক সাহেব মনে মনে বিশ্লেষণ করেন এই ধারায়। এমনি ভাবতে ভাবতেই ঘরে ফিরে আসেন।

আরো কিছুদিন পরের কথা। ডাঃ মল্লিকের এখন আর বোধ হয় তেমন খারাপ লাগে না তেঘরা। হাবভাবে বরং মনে হয় ভালোই লাগছে এখন। ছোট্ট হাসপাতাল এলাকায় তাঁরই পূর্ণ কর্তৃত্ব। নিজের কোয়ার্টারে তাঁকে একা থাকতে হলেও, স্টাফরাও তো সব কাছাকাছিই রয়েছে। তিন-চার মিনিটের পথের মধ্যেই সবাই। অবশ্য সংখ্যায় তারা তেমন বেশি নয় এবং ডাঃ নন্দী আর মিনতি তো আগে থেকেই ক্যাম্পের বাসিন্দে। তবু যারা কাছে রয়েছে, তাদের সবাইকে নিয়ে তেঘরা হাসপাতালটিকে মনে হয়, এ যেন মল্লিক সাহেবেরই সংসার।

এ হাসপাতালে কাজ করতে মিনতিরও ভারি আনন্দ। ক'জনই বা আর রোগী এখানে। মিনতি ইনডোরের নার্স। আউটডোরের নার্স রমলা। আউটডোরেই বরং বেশি খাটুনি। অনেক রোগীর তদারক। ভিড়ের মধ্যে ডাক্তারকে এ্যাসিস্ট করতে গিয়ে হাঁপিয়ে পড়তে হয় এক এক সময়। তা ম্যানেজ করে উঠতে রমলাই পারে কোনো রকমে। কোলকাতার হাসপাতালের নার্স সে। তার অভ্যাস রয়েছে এমনি দৌড়-ঝাঁপ করে কাজ করার। তা'ছাড়া অভিজ্ঞতাও তার বেশি। তাই সে একা সব দিক বেশ সামলে উঠতে পারে।

শুধু এই উদ্বাস্তু ক্যাম্পেরই তো রোগী নয়, তেঘরার আশপাশের গ্রাম থেকেও আসে বিস্তর কেস। মিনতির সে সব নিয়ে ভাববার কিছু নেই। তার ইনডোরে পাঁচটি মাত্র বেড। দু'একটি বেড খালিও থাকে অনেক সময়। খুব বাড়াবাড়ি না হলে গাঁয়ের লোক হাস-পাতালে এসে থাকার কথা ভাবতেও যে পারে না সহজে। তাই অল্প কয়জন রোগী নিয়েই মিনতির কারবার। খাটুনিও তাই খুব গায়ে লাগে না তার। নাইট ডিউটি পড়লে যা একটু কষ্ট, তাও তো আবার সুধার সঙ্গে ভাগাভাগি। ইনডোরে মাসের আধাআধি অদল-বদল করে ডিউটি দেয় সুধা আর মিনতি। কাজেই কীইবা এমন কষ্ট! তবে রাত্রিবেলা ছেলেটার জন্যে কেমন একটু মন কাঁদে, এই যা।

ডাঃ মল্লিককে প্রথম প্রথম খুবই ভয় ভয় লাগতো মিনতির। কিন্তু এখন আর তেমন ভয় লাগে না তো! মল্লিক সাহেবের কাছ থেকে অভয়ের আস্কারা পেয়েই ভয়টা কেটে এসেছে তাড়াতাড়ি। তা' না হলে হাসপাতালে প্রথম দিন ডিউটি দিতে এসে ডাঃ মল্লিকের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি যখন জিগ্যেস করলেন, তোমায় যেন কোথায় দেখেছি দেখেছি মনে হচ্ছে, তখন অতি কষ্টে কোনো রকমে নিজের নামটা বলা ছাড়া আর কোনো কথাই বলতে পারেনি মিনতি। ভয়ে তার দাঁতে দাঁত লেগে এসেছিলো এমনি অবস্থা। কিন্তু কোথায় গেলো সেই ভীতি, কোথায় গেলো সেই আতংক!

এমনি ধারা চলতে থাকলে ভয় ডর বলে আর কিছু থাকে কখনো? ঐ তো সেদিন যা হয়ে গেলো তাতে আর জানাজানি হতে বাকি থাকে কিছু?

রোগী দেখতে এসে নার্স-এর গা ঘেঁষে দাঁড়াতে হবে কেন? রমেন ডাক্তার মানে মল্লিক সাহেব সেদিন ইনডোরে একটা আধ-মরা আফিম-খাওয়া রোগীকে দেখতে গিয়ে একেবারে মিনতির গায়ে হেলান দিয়েই দাঁড়িয়েছিলেন যেন। তারপর আবার বলছিলেন—দেখো না মিনতি, যে ব্যাটার বেঁচে থাকার মুরদ নেই তার আবার প্রেম করার সখ। বলি, ভোগের জন্যেই তো প্রেম, তার জন্যে বেঁচে থাকা দরকার। আফিম খেয়ে মরে গেলে তাতে প্রেমের কোন্ সুরাহাটা হবে শুনি। দেখছো তো জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্যে মেরে মেরে ব্যাটাকে কেমন ফ্ল্যাট করে ফেলে রাখা হয়েছে। এদেরই বলে আহাম্মক প্রেমিক।

এই বলতে বলতে কেমন একটা মাতাল দৃষ্টিতে যেন মিনতির দিকে তাকাচ্ছিলেন ডাঃ মল্লিক। আর ঠিক ঐ সময়েই রমলা যাচ্ছিলো ইনডোরের বারান্দা দিয়ে। রমলার হঠাৎ চোখে পড়ে গিয়েছিলো সে দৃশ্য। সে কথাই সেদিন সন্ধ্যায় বলছিলো রমলা। চালাক মেয়ে, ধরেছিল কিন্তু সবই ঠিক। তবে মিনতির ধারণা, রমলা শুনতে পায়নি মল্লিক সাহেবের কোনো কথা। শুনলে কী লজ্জারই না হতো। তা'ছাড়া দুপুরে তো ডাঃ মল্লিকের ইনডোরে আসার কথা নয়। আসলে রোগী দেখার ব্যাপারটা নেহাৎই ছল।

ঐ ব্যাপারটা নিয়ে মিনতি খুবই ভাবনায় পড়েছিলো সেদিন। নিজের মনের দিকে বার বার তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন দেখছিলো। নিজেকেই দেখা। যাকে বলে আত্মদর্শন।

কিন্তু মনের মধ্যে এতো জট কিসের? মিনতি ঠিক করে ফেলে, এ জটগুলো সব ছাড়াতে হবে তাকে। এ জন্যে বড়দিমনির সাহায্য নেবে সে। তাঁকে সব কথা খুলে বলবে। তার প্রতি বড়দিমনির স্নেহ অপরিসীম। তিনি ভালো পরামর্শই দেবেন, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই তার।

সকালের ডিউটি শেষ করে দুপুরে বাসেই ঘরে ফিরে মিনতি। হোক না এক স্টপের রাস্তা, পায়ে হেঁটে গেলে তো মিনিট দশেক পথ। তালুফাটা ১১৭ ডিগ্রী গরমে দশ মিনিট পথ হেঁটে যাওয়া কি সহজ কথা?

ক্যাম্প। বাস এসে থামে ক্যাম্প গেটে। সমস্ত চিন্তাগুলো যেন সঙ্গে সঙ্গে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে ভেতর থেকে। মিনতি তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে।

হাসপাতাল থেকে মা'র ফেরার সময়টা ভালো করেই জানে বিশু। সে এসে তাই রোজই এ সময়টা ঘোরাঘুরি করে গেটের সামনে। ওদের তাঁবু যে গেটের খুবই কাছে।

মাকে বাস থেকে নামতে দেখেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে তাকে বিশু। এক বাস ভদ্রমূর্তি লোকের সামনে ছেলেটার এই বাড়াবাড়িতে একটু সংকুচিত হয়ে পড়ে মিনতি। তা'ছাড়া ক্যাম্পের লোকও তো বড়ো কম নাগে না এখানে। তাদের চোখের ওপর কাপড়-চোপড় উথাল-পাথাল হয়ে গেলে কারই বা ভালো লাগে।

বুক থেকে সরে যাওয়া শাড়ির আচলটাকে টেনে দিয়ে মিনতি কষে এক চড় মেরে বসে ছেলেটাকে। কিন্তু চড় খেয়ে ছেলেটা কেঁদে উঠতেই তাকে আবার কতো আদর! মায়ের মনও যে কেঁদে ওঠে সন্তানের কান্নার সুরের সঙ্গে সঙ্গে! বিশুকে কোলে তুলে নিয়েই তাঁবুতে ফেরে মিনতি।

প্রায় বছর দুই ধরে এই তাঁবুটুকুই মিনতিদের পৃথিবী। নার্সিং-এর ট্রেনিং নিতে শহরে গিয়ে, কিংবা নতুন হাসপাতালে কাজ নিয়ে প্রথম প্রথম মুহূর্তের জন্যেও মিনতির

মন থেকে মুছে যেতে পারতো না এই ছোট্ট ভাঁবুটির ছবি। তার সমস্ত স্নেহ-প্রীতি এই তাঁবুর মধ্যেই যে সঞ্চিত রয়েছে এতোদিন, সে তা ভুলবে কি করে? কিন্তু অন্য সব চিন্তা এসে মাঝে মাঝেই সেই ছবিটিকে মন থেকে সরিয়ে দিয়ে যায়, তাই বা কি করে সম্ভব? আত্ম-জিজ্ঞাসায় অধীর হয়ে ওঠে মিনতি। ক'দিন ধরে ক্যাম্পে এলেই মনটা যেন বিষিয়ে ওঠে তার। চারদিকের এতো লোকের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্থিরতা বোধ করে সে।

বেলা গড়িয়ে গড়িয়ে সন্ধ্যার কালোছায়া নামে আকাশ জুড়ে। বিকেলের ডিউটিটা একটু তাড়াতাড়িই সেরে আসে মিনতি। মনটা ভালো নেই বলে তাই।

সারি সারি তাঁবুগুলো অন্ধকারে প্রায় সব একাকার। প্রদীপই হোক, আর লণ্ঠনই হোক, সব আলোই এক রকম নিবু নিবু। উদ্বাস্তু জীবনে আলো কোথায় যে আলোর জন্যে তারা তেল পোড়াবে। আর গ্রীষ্মের সন্ধ্যা-রাত, বাইরে বাইরেই তো সব। টুকরো টুকরো সব জটলা এখানে ওখানে। স্টাফেদের বারান্দায় পড়ুয়াদের ছোট্ট মেলা। সেখানে একটা গ্যাসের আলো।

বড়দিমনিও তাঁর কোয়ার্টারের বারান্দায় হ্যারিকেনের আলোটাকে 'ডিম' করে দিয়েই ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছেন। সারা দিনের খাটা-খাটুনির পর একটু বিশ্রাম। ঠিক এমনি একটা সুযোগই পেতে চেয়েছিলো মিনতি। এমনি সময়েই বড়দিমনির অফিসিয়াল মেজাজটা একটু নরম হয়ে আসে। আসল মানুষটার সংগে কথা বলা যায়।

রাতের কালি একটু গায়ে মেখেই বড়দি-মনির পিছন দিকে আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়ায় মিনতি। মৃদুকণ্ঠে ডাকে, বড়দিমনি!

ও, মিনতি এসেছ, কিছু বলবে?—ডাক শুনেই সোজা হয়ে বসে সহজ গলায় জিগ্যেস করলেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

আর একটু কাছে সরে আসে মিনতি। তারপর খুব নিচু সুরে বলে—ভাবছি, আর হাসপাতালের কাজে যাবো না আমি।

কথা শেষ করেই ম্লান আলোতেও বড়দিমনির হাবভাবের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে মিনতি। দৃষ্টিতে তাঁর অনুগ্র উত্তেজনা। তীক্ষ্ণভাবেই তিনি প্রশ্ন করলেন—কেন, ঝগড়া করেছ নাকি?

না, তবে মোটেই আর ভালো লাগছে না।—মিনতি মাটির দিকে চেয়ে শান্ত গলায় উত্তর দেয়। উত্তর ওখানেই শেষ নয়। একটুখানি থেমেই আবার সে বলতে সুরু করে:

জানেন বড়দিমনি,......আসল কথাটা কি, ঐ যে ডাঃ মল্লিক বলে নতুন ডাক্তার এসেছেন না, বড়ো ডাক্তার হলেও তিনি বড়োই যেন কেমন। তাঁকে ভালো লাগে না আমার। আর রমলাও কি সব যা তা বলে।

ও, তাই বলো!—বড়দিমনি এতোক্ষণে ব্যাপারটি স্পষ্ট করে বুঝে নিলেন। মনে মনে একটু খুশিও হলেন মিনতির আত্ম-সম্মান-বোধের পরিচয় পেয়ে। এতো দুঃখ-কষ্ট, এতো সংগ্রামের মধ্যে সে বোধকে অক্ষুণ্ণ রাখা নিশ্চয়ই শক্ত ব্যাপার।

গালে হাত দিয়ে বড়দিমনি ভাবলেন একটু, তারপর বললেন—এক কাজ কর, কাল থেকে পনেরো দিনের সিক লিভ্ নিয়ে নাও। আমি বরং একটা দরখাস্ত এবং তার সংগে একটা চিঠি লিখে দেবো। কাল এসে আমার অফিস থেকে দরখাস্ত আর চিঠিটা নিয়ে যেও।

আচ্ছা যাই বড়দিমনি।—বলেই নমস্কার জানিয়ে নিজের তাঁবুতে ফিরে আসে মিনতি। পাশের তাঁবুতে ঝুনু পিসির কাছে বিশু। বিশু ঘুমিয়ে পড়েছে ততোক্ষণে। ঝুনুই ওকে দু'খানা রুটি খাইয়ে ঘুম পারিয়ে রেখেছে। ঝুনু বড়ো ভালোবাসে বিশুকে। নিজে না খেয়েও ওকে খাওয়ায়। ওর একটু অসুখ-বিসুখ হলে ঝুনু অস্থির হয়ে পড়ে একেবারে। আশ্চর্য!

নিকটতম প্রতিবেশীর বয়স্থা মেয়ে ঝুনু। বিধবা মা পাত্রস্থ করতে পারেনি মেয়েকে। মিনতির প্রায় সমবয়সী সে। খুব বেশি ভাবও তাই মিনতির সংগে। বিশুকে স্নেহ-আদরের মধ্যে অপ্রত্যক্ষভাবে মাতৃত্বের আনন্দ-স্বাদ লাভ করে ঝুনু পিসি। তাই তো বিশুর ওপর তার এতো আকর্ষণ!

দু'মুঠো মুখে দিয়েই বিশুকে পাশে নিয়ে শুয়ে পড়ে মিনতি। কিন্তু একটা অবর্ণনীয় অস্বস্তি অস্থির করে তোলে তাকে। মনের এ অবস্থায় ঘুম আসতে পারে কখনো? গুমোট গরমটা যেন ক্রমেই বেড়ে চলেছে মনে হয়। চিন্তার ছায়ামিছিল ছায়াচিত্রের মতোই দৌড়ে চলে।

না, যতোই ভালোবাসুন না কেন ডাঃ মল্লিক, এতো নিন্দা-কুৎসা সহ্য করে এখানে আর কাজ করতে পারবে না সে। তার চেয়ে পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে অন্য কোথাও কাজের চেষ্টা দেখাই ভালো।—শুধুমাত্র চিন্তা নয়, এবার একেবারে পাকাপাকি সিদ্ধান্তই করে ফেলে মিনতি। ভালোভাবে চেষ্টা করলে শহরের হাসপাতালেই হয়তো একটা কাজ জুটে যাবে তার। মোটামুটি প্রায় সবাই তো তার চেনা সেখানে। তাছাড়া বড়দিমনি নিজেও তার জন্যে জোর তদ্বির সুপারিশ করবেন, সে ভরসাও আছে তার। এসব ভাবতে ভাবতেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ঘুমিয়ে পড়ে মিনতি। ক্লান্ত দেহ-মনের অবসন্ন সে ঘুম।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙতেই মনে পড়ে মিনতির—আজ আর ডিউটিতে যাবার তাড়া নেই তার। যে কোনো এক সময় গিয়ে ছুটির দরখাস্তটা দিয়ে এলেই হবে। আর তার নিজেরই বা যাবার কী দরকার। মহেন্দর সিংকে দিয়েই বরং এক ফাঁকে দরখাস্তটা পাঠিয়ে দেবে। তাই ভালো।

এর পরেই আস্তে আস্তে ঘরের কাজ সুরু করে দেয় মিনতি। ঘরদোর গোছায়। অবশ্য ঘরদোর বলতে তো তার ঐ এক রত্তি তাঁবু, এবং তাকেই বেশ একটু পরিপাটি করে নেয় আর কি। রান্নাটাও সেরে ফেলে এক এক করে। খেয়ালে খেয়ালে আজ দু'একটা জিনিষ বেশিই রান্না হয়ে গেছে। তবে এ রান্নার আবার কম তার বেশি। শাকপাতা আর তাঁবুর চার ধারে যেটুকু তরিতরকারি করে উঠতে পারা যায় তাই তো আসল সম্বল। তার ওপর বিশেষ করে ছেলেটার জন্যে যে দু'এক টুকরো মাছের জোগার করা হয় সেও মাসে দু'এক বারের বেশি নয়। চচ্চড়ি আর চালতার টকটাই আজকের বাড়তি রান্না। তবে লাউ বাকলের চচ্চড়ি আর গাছ তলায় কুড়োনো চালতার টক দুই-ই উপরি ব্যাপার। এর জন্যে খরচই তো নেই, যা একটু মেহনৎ।

বেশ বেলা হয়ে গেলো কিন্তু দেখতে দেখতে। বিশুকে স্নান করিয়ে খাইয়ে দাইয়ে নিজেও ও বালাই সেরে নেয় মিনতি। এরই মধ্যে যে দু'চারজন এসে খবর নিয়ে যায়নি মিনতির তা নয়, তবে সবাইকেই সে বিদায় দিয়েছে শরীরটা আজ তার ভালো নয়—তাই কাজে যাওয়া হয়নি বলে।

এবার বড়দিমনির কাছ থেকে চিঠিটা আনতে যেতে হয় তাহলে। আগে বড়দিমনির কাছে যাবে না আগে মহেন্দর সিংকে বলে রেখে আসবে। মহেন্দরকে বলে আসার জন্যেই আগে পা বাড়ায় মিনতি।

কিন্তু পা এগোয় না কেন মিনতির? তবে কি নিজের সংগেই তার বোঝাপড়া হয়নি এখনো ভালো করে? তাহলে মনই বা সরতে চাইবে না কেন?

কাল রাতে যে দৃঢ়তা নিয়ে বড়দিমনির সংগে কথা বলেছিলো মিনতি, শুয়ে শুয়ে যে সংকল্প সে নিয়েছিলো তার কিছুই যেন আর খুঁজে পাচ্ছে না এখন। কাজের ভিড়ের মধ্যে মাঝে মাঝেই যেন হাসপাতালটা হাতছানি দিয়ে ডেকেছে তাকে। ক্যাম্পের চারদিকের হট্টগোলের মধ্যেও হাসপাতালের শান্ত নির্জন পরিবেশ যেন তার মনকে সর্বক্ষণ ঘিরে রয়েছে।

আরো কতো ঘটনা পর পর স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে মিনতির। তবে সেদিন ডাঃ মল্লিকের রোগী দেখার সময়কার ঐ ব্যাপারই সব ঘটনাকে ছাপিয়ে ওঠে বার বার। বার বার মিনতি জোর করে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে সে চিন্তাকে। কিন্তু পারেনি। সে চিন্তায় কেমন যেন একটা আনন্দ-শিহরণও অনুভব করে মিনতি—সে যেন অনুভব করে, মনের গোপন পর্দায় সে শিহরণ তার ভালো লাগে। সচেতন মন থেকে সরিয়ে দিলেও সেই স্মৃতিকে অবচেতন মন দিয়ে দু'হাতে যেন জড়িয়ে ধরে সে।

না, যাওয়া হবে না আর মহেন্দর সিং-এর কাছে—বড়দিমনির কাছেও নয়।

আস্তে আস্তে আবার নিজের তাঁবুতে ফিরে আসে মিনতি। বিকেলের ডিউটির সময় হয়ে এলো যে। ও বেলায় কামাই করায় কে কি মনে ভাবছে কে জানে। ডাঃ নন্দী কারো সাতে পাঁচে নেই, সুধাদিও সোজা মানুষ। কিন্তু মল্লিক সাহেব এবং রমলা তো আর তা নয়। রমলার রীতিমতো চার চোখ আর চার কান। সত্যি সত্যি ডবল করে দেখে এবং ডবল করে শোনেও রমলা। ওর চোখ কানকে ফাঁকি দেবে কার সাধ্য। ওকেই বেশি ভয়।

সাজগোজ করে তবু মিনতি বেরিয়ে পড়ে হাসপাতালের দিকে। যাবার সময় বিশুকে রোজ রোজই যা বলে—ঝুনু পিসির কাছে গিয়ে শুয়ে থেকো, আমি কাল সকালে আসবো।

বিশুর মুখখানা যেন চুপসে এলো মায়ের কথায়। সে বল্লে—তুমি না মা বলেছিলে আর যাবে না হাসপাতালে!

ছেলের কথায় হেসে ফেলে মা। তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে আবার বলে—তা কি হয় পাগল! দেখো কাল তোমার জন্যে কেমন ভালো বিস্কুট নিয়ে আসবো।

অনেকটা খুশি মনেই এবার বিশু চলে যায় তার ঝুনু পিসির ঘরে। মিনতি চলে আসে হাসপাতালে।

না, যে ভয় সে করেছিলো তার তো কোনো পরিচয় পাচ্ছে না মিনতি। কেউ তো কোনো-রকম সমালোচনা করছে না তার। বরং সবাই তার শারীরিক কুশল বার্তাই জানতে চেয়েছে।

সবচেয়ে আশ্চর্য, রমলা বলেছে—শরীর খারাপ হয়েছে, দু'একটা দিন না হয় ছুটিতেই থাকতে। আমরাই চালিয়ে নিতাম যা হোক করে। কাল থেকে তো আর একজন নতুন নার্স আসছে। কাজেই কাজ তো এমনিতেই অনেক হাল্‌কা হয়ে আসবে।

রমলার কথাগুলো খুবই ভালো লেগেছে মিনতির। অন্য সময় যতোই চোখা চোখা কথা বলুক না সে, এতো সত্যি সহানুভূতির কথা। এমনিভাবে কথা বললে ভালো না লেগে পারে কখনো? আর সত্যি কথা বলতে কি, গোটা হাসপাতালটাকেই যেন আজ মিনতির অত্যন্ত ভালো লাগছে। কালকের ঐ আসবো না ভাবটা নিশ্চয়ই তা'হলে মনের অভিমান।

মল্লিক সাহেবের সঙ্গে হাসপাতালের বারান্দায় মুখোমুখি হয়ে পড়ে মিনতি। বড়ো ডাক্তারের সঙ্গে এমনি হঠাৎ সাক্ষাতে একটু হকচকিয়ে ওঠে সে। কিন্তু ডাঃ মল্লিক যেভাবে কাছে এসে হাসতে হাসতে তার খবরাখবর জিজ্ঞেস করলেন, এক আধটুকু ঠাট্টাবিদ্রূপও করলেন, তাতো মোটেই খারাপ লাগলো না তার। মিনতি নিজেই তাই বিস্ময় বোধ করে তার মতের এই আকস্মিক পরিবর্তনে।

পরদিন সকাল বেলার কথা। হাসপাতাল থেকে ক্যাম্পেই ফিরছে মিনতি। বাসেই ফিরছে। বাস থেকে নামতেই বড়দিমনির সঙ্গে দেখা। বড়দিমনি শহরে যাচ্ছেন। মিনতিকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন হাত-ঘড়িটায় চাবি দিতে দিতে—তুমি যে বলছিলে এ হাসপাতালে আর যাবে না। আমি তো তোমার ছুটির দরখাস্ত এবং একটা চিঠিও লিখে রেখেছিলাম। তা'ছাড়া ভেবেছিলাম, শহরের হাসপাতালে তোমার কথাটা আজই বলে আসবো।

না, থাক। ভাবলাম, পুরোনো জায়গা, তা'ছাড়া ঘরের কাছে, এখানেই ভালো।—চোখ না তুলেই উত্তর দেয় মিনতি।

অভিজ্ঞা সুপারিন্টেন্ডেন্ট বড়দিমনি। মনে মনে একটু সন্ত্রস্ত হলেও হেসেই বল্লেন—বেশ তো ভালোই, সবই তোমার নিজের ওপরই নির্ভর করছে।—এই বলেই বাসে গিয়ে উঠলেন তিনি।

মিনতির দিন কাটে। তবে এখনকার দিন-গুলো ঠিক আর আগের মতো নয়। ক্রমশই যেন দিনগুলো তার একটু সচ্ছল হয়ে উঠছে।

ডাঃ মল্লিকের ডান হাত আজকাল মিনতি। নতুন নার্স মিস্ সন্ধ্যা আসার পর মিনতি মল্লিক সাহেবেরই একরকম বাধা সহকারিণী। তাকে ছাড়া এখন আর চলেই না ডাঃ মল্লিকের। সত্যি সত্যি হাসপাতালের কাজে একান্তভাবেই তিনি এখন মিনতি-নির্ভর।

আজকাল মিনতিরও কিন্তু কাজে খুব আনন্দ। এখন আর মল্লিক সাহেবের কোনো কথায় কোনো আচরণে মনে কোনোরূপ বৃশ্চিক দংশন অনুভব করে না মিনতি। তবে কেমন যেন তার একটু ভয় ভয় করে বড়দিমনি আর বিশুর সান্নিধ্যে এসে। কী যেন আছে ওদের চোখে!

হঠাৎ পনেরো দিনের ছুটি নিলেন কেন ডাঃ মল্লিক? কোনো কাজেই আর মন বসে না মিনতির। তার চেয়ে বরং তার ছুটি নেওয়াই ভালো ছিল। শুধু কাজের জন্যে কাজ করা, আর মনের আনন্দে কাজ করা, এ দু'য়ে অনেক তফাৎ। ডাঃ নন্দীর মতো নীরস লোকের সঙ্গে কাজ করায় কোনো আনন্দ আশা করা যায় কখনো? মনকে বনবাসে দিয়ে শুধু হাত-পায়ের একটি মেশিন হয়ে কাজ করতে হয় তাঁর সঙ্গে। এ আর সহ্য করতে পারছে না মিনতি। নার্স বলে সে তো আর কলের পুতুল নয় সত্যি সত্যি! সেও ছুটিই নেবে—মিনতি ঠিক করে ফেলে মনে মনে।

অকস্মাৎ একটা চিৎকার ওঠে পাঁচ নম্বর বেডের দিক থেকে। হ্যাঁ, ঐ মেয়েটারই চিৎকার। একটা বার্ণ কেস। কাল সন্ধ্যায় এসেছে হাস-পাতালে। উঃ কী সাংঘাতিক ঘটনা! মিনতি ছুটে যায় মেয়েটার কাছে এবং নিজের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে মেয়েটির কথাই ভাবে।

মেয়েটির বয়েস মাত্র পনেরো ষোল। বাপ নেই। জ্যাঠা-জ্যেঠির সঙ্গে থাকে মাকে নিয়ে। নাম সুরেশ্বরী। দেখতে ভারি সুন্দরী। জ্যাঠা মোটর ড্রাইভার। মেয়ের বিয়ে দিয়ে আট শ' এক টাকা পণ পাবে, এ ভালো সম্বন্ধ বৈ কি! কিন্তু কী বিপদ, এমন সম্বন্ধেও মন ওঠে না সুরেশ্বরীর। সে একেবারে দু' হাতে না বলে চলেছে—এ বিয়ে হবে না, হবে না, হতে পারে না। আর এই নিয়ে জ্যাঠা-জ্যেঠির সঙ্গে মেয়ের ভীষণ ঝগড়া। মেয়ের পক্ষ নিয়ে মা যে দু'একটা কথা বলবে, তাও অসম্ভব। কারণ দু'বছর ধরে তাদের জন্যে যে খরচটা বহন করতে হচ্ছে তার অন্তত কিছুটা তো তুলতেই হবে কোনো রকমে—একবার দু'বার নয় অনেকবারই একথা শুনেছে সুরেশ্বরীর মা। তারপরে এ বিয়ের বিরুদ্ধে আর কোনো কথা সে বলতে পারে? কিন্তু ক্রমেই অত্যন্ত জটিল হয়ে ওঠে অবস্থা এবং তারই পরিণতি হিসেবে ঝলসানোদেহ আধমরা মেয়েটাকে নিয়ে আসতে হয় হাসপাতালে।

বাস্তবিকই ভারি কষ্ট হয় সুরেশ্বরীর জন্যে। মিনতির দগ্ধ মনও সহানুভূতিতে ভরে ওঠে। খাটের সঙ্গে ছই লাগানো অবস্থায় কী ছট্‌ফটই না করছে মেয়েটা!

খুব যন্ত্রণা হচ্ছে পোড়া ঘায়ে, তাই না?—মিনতি জিজ্ঞেস করে রোগিণীকে।

ও পোড়া ঘায়ের যন্ত্রণা নয় দিদি, ও পোড়া মনের বিষম জ্বালা।—বেশ কষ্ট করেই উত্তর দেয় সুরেশ্বরী। সে উত্তর শুনে মিনতির মনের মধ্যেও যেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। সে আবার প্রশ্ন করে—কাউকে ভালোবেসেছিলে বুঝি?

সেই ভালোবাসার আগুনেই তো পুড়ে ছাড়খার হয়েছে দেহ-মন। উঃ, ও যে কী আগুন!—পেট্রোলের আগুনের ছোঁয়ায় পা থেকে বুক পর্যন্ত কুঁচকানো চামড়ার দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে কোনোরকমে জবাব দেয় সুরেশ্বরী। তারপরেই দু'চোখ বুজে চুপ করে যায়।

আর ঠিক তখুনি কোথা থেকে হঠাৎ মিনতির পাশে এসে দাঁড়ান মল্লিক সাহেব।

আপনি এখানে! এদ্দিনের ছুটি নিয়েও কোলকাতা যাননি, এতো আশ্চর্যের কথা।

আশ্চর্যের কিছু নয় মিনতি, দেখছিলাম তুমি কতোটা ভাবো আমার জন্যে। যাক্ ও সব কথা, এ মেয়েটার সেলাইন পড়ছে তো ঠিক মতো?

হ্যাঁ, ডাঃ নন্দী বার বার এসে দেখছেন। হাতের শিরার ভেতর সেলাইন ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে যাচ্ছেন।—এ উত্তর দিতে গিয়ে মিনতির দু'চোখ জল-টস্ টস্ হয়ে ওঠে কেন হঠাৎ। সুরেশ্বরীর দুই গণ্ড বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে দেখে? ঠিক তা নয়, তবে ঐ দু'জোড়া চোখের অশ্রু-প্লাবনের গোড়ায়ই রয়েছে মল্লিক সাহেবের একটি কথা—'দেখছিলাম তুমি কতোটা ভাবো আমার জন্যে'। সুরেশ্বরীর অনন্তও কয়েকদিন আগে বলেছিলো তাকে—'দেখবো তুমি কতোটা ভাবো আমার জন্যে'। ডাঃ মল্লিকের কথায় অনন্তের সেই জবানীই মনে পড়ে গিয়েছিলো সুরেশ্বরীর। তাই এ অশ্রুপাত। অগ্নি-পরীক্ষার শেষ নেই প্রেমের জগতে।

একটা ঘুমের পিল খাইয়ে দাও না মেয়েটাকে। বড্ড কষ্ট পাচ্ছে।—সুরেশ্বরীর মুখ-বিকৃতি লক্ষ্য করে ডাঃ মল্লিক বলেন মিনতিকে।

যাবার সময় মল্লিক সাহেব আরো বলে যান—আজ সন্ধ্যায় আমার বাংলোয় তোমার নিমন্ত্রণ ভুলো না যেন!

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে মিনতি। অদৃশ্য মল্লিক সাহেবকে দেখবার জন্যেও কী ব্যগ্রতা তার দৃষ্টির। ভালোবাসা সত্যি মানুষকে পাগল করে। ভালোবাসার জন্যে মানুষ কী না করতে পারে!—চোখ ফিরিয়ে সুরেশ্বরীর দিকে চাইতেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে মিনতির।

সন্ধ্যার আর কতো দেরি? ডিউটি থেকে ফিরে আসা অবধি ঐ একই চিন্তা মিনতির। এমনি হয় কেন? কখনো কখনো সময় অত্যন্ত দ্রুতগতি। এক এক সময় আবার সময় যেন কাটতেই চায় না কিছুতেই। মিনতি ভাবে, বিস্মিত হয়, কিন্তু সঠিক যুক্তি দিয়ে নিজেকে বুঝিয়ে নেবার মতো কোনো ক্ষমতা নেই তার। বিশেষ করে একটা সাময়িক অস্থিরতা সম্পূর্ণ ভাবে যেন ওলটপালট করে দিয়েছে তার সমস্ত চিন্তাশক্তিকে।

ক্রমাগত তিন দফা ডিউটি দিয়ে দুপুরে বাড়ি ফিরেছে মিনতি। বিকেলে তাই ছুটি। [illegible] জেনেই বুঝি আজ সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ করেছেন ডাঃ মল্লিক! কিন্তু কি করে তা জানবেন তিনি! সবারই তো ধারণা ছিলো তিনি এখানে নেই, কোলকাতায়। কাজেই এ কয়দিন কেউই যায়নি তাঁর কাছে এবং তিনিও একটিবারও আসেন নি হাসপাতালে। অবশ্য হঠাৎ করে তাঁর বাংলোয় যাবার সাহসই নেই কারোর। আগে থেকে এন্‌গেজমেন্ট না করে সেখানে যাওয়া নিষেধ।

বাড়িই হোক আর বাংলোই হোক, কর্মব্যস্ত অফিস-জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ একটু শান্তি পেতে চায় বাড়িতে বা বাংলোয় ফিরে। এ বিষয়ে ডাঃ মল্লিকের যেন একটু বেশী কড়াকড়ি। তাঁর বাংলোর শান্তি অবাঞ্ছিতভাবে কেউ নষ্ট করে, এ হতে দিতে তিনি নারাজ। আ

...াংলোতেই কিনা আজ সন্ধ্যায় মিনতির ...ণ!

...সাধনের দিকে আজ একটু বিশেষ নজরই ...হ মিনতি। খাওয়া-দাওয়া যেমনই হোক ...জের বিধি-ব্যবস্থাটা রাখতেই হয় মোটা- ...নার্সের চাকরি, এমনিতেই ফিটফাট না ...উপায় নেই। এক কৌটো পাউডার, একটা ...র শিশি ঐ তাঁবুরই এক কোণে সব সময় ...থাকে। আরো এটাওটা থাকে অনেক কিছু: ...পালে সিঁদুর পরতে নেই নার্সদের। ...তেও তেমন নয়, তবে দু'এক বিন্দু ...তে ছুঁইয়ে নিয়ম রক্ষা করে অনেকে। ... মিনতির সিঁথির সিঁদুরের পাট তো ...ম ঘুচেই গেছে বিশুর বাবা নিখোঁজ হবার ...সঙ্গে। তবু মাঝে মাঝে যেদিন ইচ্ছে হয় ...চোরায় সে লুকিয়ে ছাপিয়ে, হাস- ...রে কারোর নজরে না পড়ে ...ভাবে।

...জ কিন্তু খুব বেশি ইচ্ছে হচ্ছে মিনতির ...করে সিঁদুর পরতে। অনেকদিন না পরার ... পরিপূর্ণ পরিশোধ করতে চায় সে এক ...।

...ই সে করে। সিঁথিতে বেশ ভালো করে ...র টেনে দিয়ে কুমকুমের সুন্দর একটি টিপ ...সে তার জোড়া ভুরুর মাঝামাঝি একটু ...র দিকে। সযত্নে তুলে রাখা গোলাপী রঙ- ...শাড়িটা বার করে বেশ একটু টেনে জড়িয়ে ...নেয়। তারপর মুখে, ঘাড়ে, গলায় পাউডার ...বে বারকয়েক ঘষে আপন জলুষ ...র চেষ্টা করে। বাস্তবিকই এই সামান্য ...সাজেই আজ যেন ভারি সুন্দর লাগছে ...র নিজেকে। আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে ...রে দেখে খুবই খুশি বোধ করে সে।

...ন্তু গুমোট গরমটার ওপর তার ভরি ...। হাত তুলে কানের পাশের একগোছা ...বল চুলকে ঠিক করতে গিয়ে মনে মনে ... ওঠে মিনতি। এরই মধ্যে ঘামে ব্লাউজটা ... উঠেছে খানে খানে। কী বিশ্রী!

...ক আর করা। এদিকে সন্ধ্যা হয় হয়। সব ...সামলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে মিনতি। এখন ...বাসের হুড়োহুড়ির মধ্যে যাওয়া চলে না। ...তো সব মাটি হয়ে যাবে তা'হলে। পায়ে- ...পথ সেদিক থেকে নিরাপদ। হেঁটেই চলে ...।

...মিনতিকে দেখে কে আজ বলবে, তেঘরা ...। শিবিরের উদ্বাস্তু সে—থাকে সে তাঁবুতে, ...জল এলে বড়ো জোর স্টাফ কোয়ার্টারের ...দায়। বাস্তবিকই, মূল্যবান শাড়ি-গয়না না ...যেরূপ পরিচ্ছন্ন সাজে আজ সেজে ...ছে মিনতি তাতে উদ্বাস্তু বলে কোনো- ...ই মনে করা চলে না তাকে।

...নসা আর সন্ধ্যাই মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলো ... হাসপাতালের বারান্দায় রেলিং-এর ওপর ...র করে গল্প করছিলো ওরা দু'জন। ...কে দূর থেকে লক্ষ্য করেই হয়তো ফিরে ...। হাসপাতালের পাশের রাস্তাটুকু পার ...গিয়ে এ দৃশ্য চোখে পড়ে মিনতির। ওদের ...ই আজকাল ঈর্ষা তাকে নিয়ে। ডাঃ ...কের বলিষ্ঠ জোরদার চেহারাটার ওপর ... বুঝি ওদের সবারই। কিন্তু লোভ করলেই ...তার সব কিছু সহজ-লভ্য হয় না। রূপের ...পাল্লায় ওরা যে তার অনেক নিচে!—

মিনতি বেশ একটু অহংকারের সঙ্গেই এ অনুভূতিকে উপভোগ করে।

করে করুক ঈর্ষা। যারা ঈর্ষা করে তারাই জ্বলেপুড়ে মরবে। মিনতি আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবে না ঠিক করে ফেলেছে।

ঐ তো মল্লিক সাহেবের বাংলো। হাস-পাতাল আর বুড়ো শিবতলার মাঝামাঝি বাগান-ঘেরা সুন্দর বাড়ি।

গেটের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই দূরে থেকে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে বেল্টবাঁধা কুকুরটা। মিনতি থমকে দাঁড়ায়। বুকটা তার দুরুদুরু করতে থাকে। কুকুরের কামড়ে নাকি পাগল হয়ে যায় মানুষ। কামড় না খেয়েই তো পাগল পাগল মিনতি। তাই ঘেউ ঘেউ শব্দে ভয়টা তার এতো বেশি। তবে ভয় অনেকটা কেটে যায় ডাঃ মল্লিককে আসতে দেখে।

হাউ লাভলি মিনু—কাছে এসেই মিনতিকে জড়িয়ে ধরেন মল্লিক সাহেব। সাদরে ঘরে নিয়ে যান তাকে। সে ঘরে আবেশে বিহ্বল মিনতি।

তিন রাত্রি আর ক্যাম্পে ফেরেনি মিনতি। হাসপাতালেও আসেনি। মল্লিক সাহেবের বাড়িতে খবর দিতে গিয়ে জানা গেলো সাহেব নিজেও অনুপস্থিত—তিনি কোলকাতায়। কোলকাতা যাবার কথাই মালীকে বলে গিয়েছেন ডাঃ মল্লিক।

বিশুকে বাগ মানিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠেছে ঝুনু পিসির। তার কথা বিশ্বাস করেই বার বার সে ছুটে গিয়েছে শহর-ফেরৎ বাস গুলোর দিকে। আর একবার ফিরে এসে সে ঝুনু পিসিকে বলেছে—পিসি, কই মা এলো না তো! তুমি বল্লে, মা শহরে গিয়েছে, আসবে!

আসবে বাবা, মা তোর ঠিক আসবে। আর একটু বাদেই আসবে।—এমনি ভাওতায় আর কতোবার ভুলানো চলে মা-ছাড়া শিশুকে। ফাঁকি ধরতে পেরে কাল থেকে তাই কেঁদেকেটে তাঁবু ভাসিয়ে ফেলছে বিশু।

যথাসময়ে বড়দিমনির কাছেও খবর পৌঁছেছে, মিনতি নিখোঁজ। প্রথম দিন তিনি ভেবেছিলেন, বেড়াতে বেড়াতে হাসপাতালে গিয়েই হয়তো মিনতি আটকে গেছে কাজের চাপে। দ্বিতীয় দিন নিজেই কাজের চাপে ফাঁপর, তেমন আর কিছু মনে হয়নি। তা'ছাড়া মিনতির ওপর বড়দিমনির যে একটু বেশি বিশ্বাস! এই ক্যাম্পে মিনতিই একমাত্র ম্যাট্রিক পাশ মেয়ে। তার দৃষ্টিতে, কথাবার্তায় এবং চালচলনে একটা দৃঢ়তার ছাপও সুস্পষ্ট। তাই দু'রাত ক্যাম্পে তার না আসাটা তেমন কোনো ভাবনার বিষয় বলেও মনে হয়নি।

কিন্তু বড়দিমনি সত্যি সত্যি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন তৃতীয় রাত কেটে যাবার পরদিন। হাস-পাতালের দারোয়ান এসে যখন জানালো, আগের রাতেও মিনতি ডিউটিতে যায়নি, সুপারি-ন্টেন্ডেন্ট হিসাবে তাঁর তো মাথায় হাত দিয়েই বসার কথা।

নিজেকে তা'হলে বাঁচাতে পারেনি মিনতি: এই কি তা'হলে চিরাচরিত পরিণতি!—ভাবতে ভাবতে আপনা থেকেই যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে সমস্ত রহস্য।

সেদিনই সন্ধ্যা-বিদায়ে হ্যারিকেনের কমানো মৃদু আলোয় বড়দিমনির ঘরে এসে দাঁড়ায় মিনতি। অবিন্যস্ত বেশ, চুলগুলো সব এলো-মেলো। কি যেন বলতে এসেছে সে? একটু ভেবে নেয়। তারপর ডাকে—বড়দিমনি, ভালো-বাসাটা ছল, মিথ্যে। তাই না?—ক্লান্ত গলায় আর কোনো কথা সরে না মিনতির। দু'চোখ জলে ভরে ওঠে।

আরে মিনু যে! বসো, বসো।—বড়দিমনি নিজে উঠে মোড়াটা এগিয়ে দেন মিনতিকে। তারপর ধীরে ধীরে সমস্ত কথা বার করার চেষ্টা করেন তার কাছ থেকে।

কাউকে কিন্তু কিছু বলতে পারবেন না বড়দিমনি!—আগে থেকেই প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেয় মিনতি। তারপর বলতে সুরু করে—মিথ্যে করে আমায় ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে মল্লিক সাহেব তারপর বল্লেন কিনা, আমায় বিয়ে করা সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। তিনি বিবাহিত। তিন রাত পর এই কথা! আজই তাই কোলকাতা থেকে পালিয়ে এলাম আমি।

বলেই অঝোরে কান্না সুরু করে দেয় মিনতি। আরো কি যেন বলতে গিয়ে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসে তার।

থাক্, থাক্ এখন যাও। কাল সকালে এসো, তখন বাকিটা শুনবো।—অবস্থা বুঝে বড়দিমনি থামিয়ে দেন মিনতিকে। তাঁরও যে মনটা কান্নায় ভরে উঠেছে এরই মধ্যে!

ধীরপদে বেরিয়ে যায় মিনতি। সেই পদক্ষেপের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলেন বড়দিমনি। এ যেন রংগমঞ্চে অভিনয়। পুরোনো স্মৃতিগুলো যেন অভিনেতা-অভিনেত্রীর মতোই এসে ভিড় করে দাঁড়ায় তাঁর সামনে।

ঠিক মিনুর মতো করেই তো আমাকেও একদিন পালাতে হয়েছিলো আর একজনের কবল থেকে। আমার পালানো ছিলো আরো কঠিন। কারণ আমি আরো অনেক বেশি এগিয়ে গিয়ে-ছিলাম মিনতির চেয়ে। দিগিন বিশ্বাসের কী যে সেই দুর্নিবার প্রলোভন! আজ মনে হয় দুঃস্বপ্নের মতো। তার সঙ্গে বিয়েও হয়ে গিয়ে-ছিলো আমার রেজিস্ট্রি করে। কিন্তু বিবাহিত জীবনের সুরুতেই দেখলাম, স্বামী আমার মাতাল, লম্পট, দুরাচার। তাই শান্তির আশায় অনেক কষ্টে নিষ্কৃতি পেতে হলো সেই ভালো-বাসার জনের কাছ থেকে। মিসেস্ বিশ্বাসের কথা আজ আর কারোর মনে থাকার কথা নয়। মিস্ ভৌমিকের জীবন ইতিহাসের একটি ছেঁড়া পাতায় কোথায় উড়ে গিয়েছে মিসেস্ বিশ্বাসের সেই কাহিনী! দূরে সরে এসেই আমি বেঁচেছি। মিনতিকেও বাঁচতে হবে দূরে সরে গিয়েই। তাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করবো আমি। কিন্তু কাল সকালে কী উত্তর আমি দেবো তার প্রশ্নের?—মিনতি চলে যাবার পর একান্তে বসে ভাবনার তরংগে ভেসে চলেন বড়দিমনি।

ভালোবাসাটা ছল, মিথ্যে। তাই না?—সত্যি এ ভারি কঠিন প্রশ্ন। সারা রাত ধরে খুঁজেও বড়দিমনি বার করতে পারেন না এর উত্তর, এর কোনো সমাধান।

কিন্তু ভালোবাসা মিথ্যেই যদি হবে তা'হলে ছেড়ে-আসা সেই দিগিন বিশ্বাসের জন্যে এতোদিন পরেও বড়দিমনির মন এক এক সময় ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠে কেন?

অভিমানী
গোপাল ভৌমিক

আমি জানি সে যে কত অভিমানী।
দু'হাতে যেমন ছড়ায় সে ধন
তেমনই শস্যপাণি
হতেও সে পারে প্রয়োজন যদি আসে;
তোমার আমার চেয়েও সে বেশি
নিজেকেই ভালবাসে,
এ সত্য যদি ভুলি
মিছে প্রমাণিত হবে যে রঙ ও তুলি।
নিজেকে ভালবেসেও সে একথা জানে
পাবে না সে খুঁজে জীবনের কোনখানে
ফুলের মতন
যদি তাকে তুলে না ধরে সবার মাঝে;
তাইতো ব্যস্ত থেকেও সকল কাজে
সংগলিপ্সু তার মত লোক কম।
অথচ বেদম
লজ্জায় নতমুখী
হয় সে, যখন পরম অসুখী
হয়ে ওঠে কোন অযাচিত অপমানে,
তখন নিজের স্বার্থের পানে
তাকায় না, তাও জানি—
যেহেতু সে বড় একগুঁয়ে, অভিমানী।

নয় সে টবের ডালিয়া বা জেসমিন :
চোখে চোখে তাকে রাখবে রাত্রি দিন
এবং আদর করবে ইচ্ছামত
তাই যদি চাও হবে তুমি বিব্রত।
হবে সে হয়তো কাঠমল্লিকা
রবে ফুটে বন-জঙ্গলে;
সহজে ফোটার অহমিকা
তার সহজাত, তাই কৌশলে
বশ্য সে নয়।
পেতে যদি হয়
তার শর্তেই রাজি হয়ে যেতে হবে,
নতুবা তোমার গর্বের বৈভবে
পুড়ে গিয়ে বনফুল
উলটো আঘাত
তোমাকেই দেবে জানি—
সে যে একা আর খুব বেশি অভিমানী।

সমুদ্রকে মনে এঁকে
শচীন দত্ত

পেছনে ডুবেছে সূর্য হাওয়ায় বিচিত্রবর্ণ ছড়া
পটভূমি রাত্রিচর অসম্পূর্ণ অতৃপ্তির ছায়া
ঘুমন্ত আকাশ ঘিরে; বিস্তীর্ণ বিবর্ণ পথরেখা
সম্মুখে, ছুটেছি তবু—
অন্তহীন জিজ্ঞাসার চোখ।

এ-পৃথিবী জাদুঘর :
স্মৃতির পিঞ্জরে বন্দী তুমি
নিশাচর যাত্রী আমি কাঁটায় বিক্ষত হবো জানি,
চড়াই উৎরাই ধু-ধু মরু ভেঙে নীল উপকূল
কতটুকু পথ বলো মনে যদি সমুদ্রকে আঁকি।

যেথা এই চৈত্রের শালবন
—কৃষ্ণ ধর—

তুমি যেন বসন্তের কোটাফুল, বৈশাখের
ঘুমন্ত বকুল,
তোমাকে যতই খুঁজি পাইনে তো কূল।
জীবনের পথে পথে, শ্রাবণের অশান্ত বর্ষণে
বিদ্যুতে বজ্রের ডাকে দেখা দাও তুমি ক্ষণে ক্ষণে।
তারপর নিরুদ্দেশ, সংগীহারা মেঘের মতন
তুমি যেন অরূপ রতন।

পদ্মার বিস্তীর্ণ জলে, রৌদ্রের অজস্র প্রণামে
তোমার স্বাক্ষর খুঁজি, বাংলার গ্রামে
যেখানে প্রদীপ জেলে শান্ত এক সন্ধ্যার কুলায়ে
মানুষেরা দিন শেষে ফিরে আসে স্মৃতিরে ভুলায়ে
প্রতিদিন জন্মদিনে, তোমাতেই খোঁজে সার্থকতা
তুমি যেন মহানদী সমুদ্রের নীল স্বপ্নকথা।
এনেছো জীবনতটে, মুখর উপল ঘেরা দেশে,
বারংবার আপনারে মেলে দিলে অনন্ত আকাশে।
প্রত্যহ তোমাকে ভাবি, জননীর অশ্রুজলে ভাসি
বনগাঁ ও বেতিয়ায়, জীবনের অশ্রুমাখা হাসি
রক্তে যেন ভেসে গেছে, তোমাকে ডেকেছে তাই মন
নির্জন ঘুমন্ত দিনে যেথা এই চৈত্রের শালবন॥

চৈতালী ঝড়
শ্রীমতী কনক মুখোপাধ্যায়

চৈতালী ঝড় শূন্যে উধাও—
আকাশে মাটিতে শান্তি উধাও
মেঘের পলকে বিদ্যুৎ জ্বালা
তারার গুচ্ছ মুহ্যমান।

বসুন্ধরার আঁচলের গিঁঠে
লুকানো যতনে মুঠো মুঠো সোনা
সে খবর জানে চৈতালী ঝড়

দুরন্ত গতি চৈতালী ঝড়
বাঁধন মানে না
ছোটে উদ্দাম, সৃষ্টির নেশা
দু' হাতে ছড়ায় সোনা বীজ যত
দিগন্ত ছোঁয়া প্রান্তরে বনে।
সংঘাত ঘন গর্জন রোষে প্রলয়-পাগল
রাত্রির বুক
দীর্ণ,
আমরা যাত্রী
এই পথে অবতীর্ণ।

সকালে ছড়ানো সোনা রন্দুরে
সৃষ্টি পাগল মর্ত্যের মাটি
মাতে উদ্দাম ফসলের গানে।

চৈতালী ঝড় শূন্যে উধাও,
রাত্রির জাল
ছিন্ন
আমরা যাত্রী
সেই পথে উত্তীর্ণ।

ময়নামতী
আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন

জানি না কেন দখিনদেশী মেয়েটা এত বো
মনটা তার মজেছে ফুটপাথে,
হয় না আজো নতুন হয়ে নতুন ঘরে ঢোকা
সন্ধ্যাদীপ জ্বলে না তার হাতে।

পড়ে না মনে কোথায় কোন্ নদীর তীরে
পাখির দেশে মনের নীড় ছিল
চোখের জলে গোপনে গেঁথে গজমোতির হ
ময়নামতী কী যেন চেয়েছিল।
দুঃখ তার কখনো নাকি ওপারে ডালে ডালে
পলাশ হয়ে আকাশে হতো গান,
আশারা তার রসিক হয়ে দিক হারানো পা
সখী-নদীর ভাঙাতো অভিমান।
দিনের শেষে মন্ত্র প'ড়ে সারারাতের মন
প্রদীপ হয়ে জ্বলতো নাকি ঘরে,
হায়রে যেন ঝরাফুলের হারানো গুঞ্জন—
ঝাপ্সা সবই আবছা মনে পড়ে!

কী যেন আসে আকাশ ভেঙে,
পা ফেলে কালো
পালিয়ে যায় ময়নামতী আশার হাত ধ'রে।

সে নাকি শোনে এখানে এই পাথরে পেতে
সমুদ্রের গর্জন দিনেরাতে,
চোখের মাথা খেয়েছে ব'লে হয়নি আজো স
সমুদ্রকে দেখেনি সাক্ষাতে!
অথচ দ্যাখে হাজার চূড়া স্বর্ণ ভেঙে নাচে
আকাশ নেই তবুও তারা জ্বলে;
বুঝলো না সে সমুদ্রের তটেই বসে আছে
সামনে ঢেউ, তুফান তারই কোলে!
প্রতি পলেই ছোঁড়াচটির রক্ত দাঁড় ঠেলে
জাহাজ চলে, দেখেও দেখছে না;
লবণ হাওয়া জ্বলছে চোখে, মনের দিশা
চোখের ভুল তবুও ভাঙছে না।

জানি না কেন ময়নামতী মেয়েটা এতো বো
মনটা তার মজেছে ফুটপাথে,
হলো না আজো নতুন হয়ে নতুন ঘরে ঢোক
সন্ধ্যাদীপ জ্বলে না তার হাতে।।

বুড়ো
॥ নবনীতা দেব ॥

"কী আর করবো, যদি ভেঙে যায় বালির চূড়ো
—বলেও, দু'হাতে মন্দির গড়ে দরাজ প্রাণে
চোখের আড়ালে-আবডালে সেই পাগল বুড়ো
আমাকে নাচায় খেয়াল-খুসির সুতোর টানে

স্বীকার করছি খেয়াল-খুসির সুতোয় বাঁধা
আমার যা-কিছু চলন, বলন, করণ, খেলা—
হাসি কি কান্না সবই একসুরে রয়েছে সাধা,
যদিও বুড়োর বালি নেড়েচেড়ে গড়ায় বেলা।

তোমরা বকবে, বলবে : "এ বাপু কেমন ধা
পুতুল না হ'লে, পুতুল হ'বার ভণিতা টানা"
আকাশে, সাগর, সিংহ, পাহাড়, দেখেছে যারা
বুড়োর পুতুল হ'বার সাধনা তাদের জানা॥

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ একদিন তাজ-মহলের কবি দিল্লীশ্বর সাজাহানের সম্বন্ধে বলেছিলেন

চলে গেছ তুমি আজ
মহারাজ
রাজ্য তব স্বপ্ন সম গেছে ছুটে
সিংহাসন গেছে টুটে
তব সৈন্যদল
যাদের চরণভরে ধরণী করিত টলমল
তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে
উড়ে যায় দিল্লীর পথের ধূলি পরে
বন্দীরা গাহে না গান
যমুনা কল্লোল সাথে নহবত মিলায় না তান
তব পুরসুন্দরীর নূপুর নিক্কণ
ভগ্ন প্রাসাদের কোণে
মরে গিয়ে ঝিল্লি স্বনে
কাঁদায় রে নিশার গগন"

কিন্তু আশ্চর্য বেণুবনচ্ছায়াঘন সন্ধ্যায় ...ীর ছবি বাঁশরীর সর্ব শেষ সুরে আজও ...য়নি। দিল্লী মরেনি। জীবনের মাল্য হতে প্রাণবীণায় তার অফুরন্ত সুরের ঝঙ্কার, ...নো দ্রুত, কখনো লয়ে বিলম্বিত, কখনো ...মিত, কখনো চাঞ্চল্যে ভরা। তার বীজ অমর ...ুরের সন্ধান পেয়েছে। ভোজবাজির সাহায্যে ...বারে সে তার যৌবনকে নিয়েছে রাঙিয়ে, ...নের জারকরসে দিয়েছে জারিয়ে। কালের ...েতে মোহের বশে আমরা ভুলে যাই বিশ্ব-...র সেই অতিপরিচিত কথা—দেশ মাটিতে ...রী নয়—ভৌগোলিক সীমা পেরিয়ে আছে ...লোকের মহিমা, মানুষে মানুষে মিলিয়েই ...র চেহারা, মানুষের পরিচয়েই তার ...হাস। সেই ধারা অনাদ্যন্তবান, শুধু অতীত ...র কাহিনী নয়, বর্তমানের পটভূমি, ...ষ্যতের ভিত্তিভূমি। পতন অভ্যুদয় বন্ধুর ...র মধ্য দিয়ে সেই মণিগণে সূত্র সন্ধানী। ...গণমন ঐতিহ্যবিলাসী হয়ে যুগে যুগে ...ত। ইতিহাসকার তার মধ্যে খুঁজেছেন ...র্ণ, নিয়ম, রীতি, স্বন্দ্ব, ছন্দ, চ্যালেঞ্জ, ...পন্স। স্তব্ধ মহাকালের উপর নৃত্যশীলা ...তীতা রূপমোহিনীর চরণচিহ্ন শুধু পড়ে ...ছ।

এই সেই দিল্লী যে শুনেছে সামবেদের গান, ...দের স্তব।

"মা নো মর্তা অভিদ্রুহন্ তনূনামিন্দ্র ...ণঃ ঈশানো ধবয়া বধং" মৃত্যুর শক্তি যেন ...দের রূপায়ণের উপর না এসে পড়ে......... শক্তিমান, ব্যাহত কর সকল আক্রমণ। এই-...নই একদিন দেবশিল্পী ময়দানব ইন্দ্রজালের ...ধনুচ্ছটায় ইন্দ্রপ্রস্থকে গড়ে তুলেছিল ...প ও সৌন্দর্যে, স্ফটিকে বৈদূর্যে, হীরা-...মাণিক্যের ছটায়। এরি বহিরঙ্গনের চারি পাশে একদিন সমবেত যুযুৎসবরা অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী নিয়ে ভারত যুদ্ধে মেতেছিল, বীর দিয়েছিল প্রাণ, সতী হয়েছিল পতিহীন, মাতা পুত্রহীনা। গান্ধারীর আবেদন হয়েছিল বিফল। এরি মাঝে পাঞ্চজন্যের সাথে, গাণ্ডীবের টঙ্কারের সঙ্গে তিনি শুনিয়েছিলেন অমৃতকথা, দিয়ে-ছিলেন চরম ও পরম আশ্বাস—বারে বারে আমি আসবো, যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত—সেই মানুষ শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন অর্জুনকে, সত্যসন্ধ সব্যসাচীকে জানিয়েছিলেন অব্যভিচারিণী ভক্তির কথা, অবিচলিত জ্ঞানের কথা, নিষ্কাম কর্মের কথা—তুমি হও নিমিত্ত মাত্র—সমর্পণ করো নিজেকে।

এইখানে অশোকের বাণী আজও উৎকীর্ণ। তথাগতের করুণা ও মৈত্রীর পতাকা হস্তে যিনি ধর্মবিজয়ে পাঠিয়েছিলেন তাঁর অনুগামীদের—সর্বসম্প্রদায়ের স্বার্থই ছিল যার স্বার্থ, পঞ্চশীলে যিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠিত।

এই দিল্লীই দেখেছে হূণশক কুশানদের, গুপ্তদের, মৌখরীদের, বর্ধনদের, চৌহানদের। 'দিল্লী চলো', 'দিল্লী চলো' তাই আজকের কথা নয়—যুগ যুগ ধরে ভারতের ইতিহাসে এই মন্ত্র ধ্বনিত হয়েছে—কবিরা গেয়েছে গান, কর্মীরা তুলেছে তান, লোকেরা ছুটেছে— দিল্লী বহুত্ দূর। তুষার-শীর্ষ হিমগিরি অধিত্যকা পেরিয়ে, তরঙ্গ-চুম্বিতা সাগর লঙ্ঘন করে এসেছে বণিক, সৈনিক, রাজাপ্রজা, আমীর ওমরাহ, সুলতান, বেগম-বাঁদীর দল—ইরাণ তুরাণ হতে, মহাচীন হতে, আরব তুর্কিস্থান হতে, সাতসমুদ্র তেরোনদী পার হয়ে, পাহাড় ডিঙিয়ে, মরুভূমি অতিক্রম করে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দিল্লী শুনেছে কতো বুকফাটা কান্না, কতো অশ্বের হ্রেষাধ্বনি, হস্তীর বৃংহতি, তরবারির ঝন্ঝন্ কামানের গর্জন, শকুনির উল্লাস, আর্তের চীৎকার, ঐশ্বর্যের মদমত্ত দৃপ্ত পদক্ষেপ, তবু দিল্লী মরেনি। আবার শুনেছে যমুনার ধারে কলতানের সহিত বেদধ্বনি, মন্ত্রের উচ্চারণ, মুয়েজ্জীনের কণ্ঠে আল্লাহর জয়গান, পণ্ডিতের বিচার, জ্ঞানীর আলাপ, রসিকের রসচর্চা, কবির কয়েৎ, উৎকণ্ঠিতা নায়িকার মৃদু ভাষণ। কতো মড়যন্ত্র বিপ্লববিদ্রোহের গুপ্ত প্লাবনে প্রাসাদে প্রাসাদে নেমেছে সন্ধ্যা, আজকের বাদশাহ্ হয়েছেন কালকের ফকীর, কতো রাজপুত্রী বিরহ আগুনে পুড়েছেন, কতো বাঁদীর কামনার পিছল স্রোতে ডুবে গেছে কতো শাহ্জাদা, মনসব্দার, সুবেদার। তবু এই বাহ্য... এও দিল্লী বটে কিন্তু দিল্লীর সব নয়। তার অমর আত্মা শুধু তৃষিত চাতকই নয়, নৈঃশব্দ্যে ডুব দিয়েছে বারে বারে। তার দৃষ্টি চলে গেছে সৃষ্টিলোকে, দূরলোকে, মরতার দুর্গ ভেদ করে অমরতার দুর্গেশনন্দিনীর দিকে। বেদব্যাস বৈশম্পায়ন সৌতিসনকের দিন হতে রাজসূয় অশ্বমেধ সভাপর্ব উদ্যোগ পর্ব সে দেখেছে, শুনেছে মীয়া কী মল্লার দরবারী কানাড়া, আমির খসরুর তান, গালিবের গান। আজও জুম্মা মসজিদের ছায়ায়, কুদসিয়া উদ্যানের পাশে, রিজের ধারে দিল্লীবাসী আঁকছে পুঁথি, নক্সা করছে, সূক্ষ্ম শিল্পের জরীর কাজ চালাচ্ছে।

তাই দিল্লীর গল্প শুধু আজকের দিল্লীর কথা নয়, কালকের দিল্লীর কাহিনী নয়—নয়া-দিল্লী ও পুরানো দিল্লী নিয়েই তার যাত্রার সীমা সূত্রে এসে থামেনি। পুরানো দিল্লীর কঙ্কালের নীচে ইন্দ্রপ্রস্থের যে 'অস্থি' পাওয়া গেছে সে যে দধীচির হাড়। তা থেকে আজকের 'আনক্লেভ্ ডিপ্লোমাটিকে' ইতিহাসের পারম্পর্য বহু যুগের ওপারে হলেও কালসমুদ্রের পুরোগামিনী গতিতে একই অবিচ্ছিন্ন ধারায় স্তব্ধ। রায়-পিথোরার লাল কিল্লা, কুতব ও ইন্দরপথ, ফিরোজাবাদ ও কোটলা, তুঘলকাবাদ ও সুরয-কুণ্ডু, সাহাজানাবাদ ও টিমারপুর, বিনয়নগর ও মানসগর দিল্লীর বহু যুগের বহুমুখী প্রকাশ। আজ অতিথিদের অতিকায় মোটরগুলি বিজ্ঞান ভবন উদ্যোগ ভবন থেকে চলে যায় নীতিমার্গ, ন্যায়মার্গের পথ বেয়ে পঞ্চশীলের মসৃণ রাস্তার উপর দিয়ে অশোক হোটেলে।

তাই বলি দিল্লীর কথা ও কাহিনী সব যুগের, সব লোকের, সব সময়ের। এ শুধু যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ের কথা নয়, অনঙ্গপাল বা তোমরদের গল্প নয়, পৃথ্বীরাজ চৌহান বা সংযুক্তার কাহিনী নয়। এরি দেহলীতে যোগিনীপুর মিশেছে, মিহিরপুর বেঁচে আছে মেহেরৌলিতে। এইখানেই মিলিয়ে গেছে চেঙ্গিস, তৈমুর, ঘোরীর দল, তুঘলক, খিলজী, লোদি সৈয়দরা। কিন্তু মিলিয়ে যায়নি কুতুবশাহী মিনার, ইলতুতমিস্, রাজিয়ার স্বপ্ন। কান পেতে শুনলে আজও শুনতে পাওয়া যেতে পারে 'হোরি হ্যায়', 'ফাগুন মে হোরি মচাও'। হয়তো দিল্লীর হাওয়ায় আজও ভেসে বেড়ায় আলা-উদ্দীন পদ্মিনীর কথা, লাজহরণ জহরব্রতের গল্প, বৈজুবাওরার তান্, সেলীম চিস্তির আশীর্বাদ। তথত্ তাউস, ইমারৎ জহরৎ রাজ্য-সাম্রাজ্যের লোভে রক্তের ফোয়ারা বয়েছে এইখানে সত্য, এসেছেন বাবর ব্যাঘ্রঝম্পনে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী শুনেছে গহরসাদের কবিতা, মীর সৈয়দ আলীর তুলির স্বপ্ন, নিজামীর কাব্য, সাদির গুলিস্তান। এইখানেই লেগেছিল শেরশাহে হুমায়ুনে দ্বন্দ্ব, কিন্তু দেখি সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে বেরুলো মস্ত বড় রাস্তা। আবুল-ফজল, তোডরমল, বদোনীর কাহিনীতে আগ্রা ফতেপুরসিক্রীর পাশে দিল্লীরও প্রাণস্পন্দন পাই, জগজ্জ্যোতি সম্রাটের ইবাদত্খানার দীন ইলাহির কথা শুনি। সন্তু নিজামুদ্দিনের সমাধি ধারে দীন আচ্ছাদনে দেখেছি জাহানারার কবর—এক টুকরো ঘাসের মাঝে সবুজ হিল্লোলে দুলে প্রাণের প্রকাশ।

বেগায়র সবজা না পোশাদ কসে মাজারে মরা
...কে কবর পোষে গরিবান হামিন গিয়াহ বসন্ত
একমাত্র ঘাস ছাড়া আর কিছু যেন

না থাকে আমার সমাধির উপরে। আমার মত অন্ত্যজনের সেই শ্রেষ্ঠ আচ্ছাদন। এইখানেই রূপকুমারীরা হোরী খেলেছে, রাজপুতানী রাখীবন্ধ ভায়ের কাছে রাখী পাঠিয়েছে, কেশবতীর কেশের আড়ালে বিদ্যুৎ চমকেছে, নকীব হেঁকেছে দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা, স্তব্ধ নহবতে গভীর রাতে হঠাৎ বিলম্বিত তালে দ্রুত বেহাগ উঠেছে, বিরহী রামকেলির ঠাট্ কামকলার ইন্ধন জুগিয়েছে। সাধু দরবেশ অভিশাপ দিয়েছিলেন—দিল্লী হনোজ দূর অস্ত। দারা শিকোহর দার্শনিকতা, এইখানেই পেয়েছিল তার বিকাশ—নবী আলমগীরের দারুল-ইসলামের মাঝে পেয়েছিল সমাধি। যে আলমগীর পিতা সাজাহানকে বলেছিলেন—

কর্দা এ খেশ, আয়েদ পেশ
জিয়াদা-হদ্দ-ইআদব

যেমন কর্ম তেমনি ফল, বেশী লেখা বেয়াদবী। হতভাগ্য পিতা শুধু বলেছিলেন যে, আগ্রা দুর্গের জল সরবরাহ ব্যবস্থাটা নষ্ট করে দিয়োনা।

বাবা-ই-মন্, বাহাদুর-ই-মন্
দিরোজ সাহিব ই নওলাখ
সওয়ার বুদেম
ইমরোজ বা এক আরদার মুহতাজ।
আফ্রিন্ বর হিন্দ দর হরবার
মুর্দা মে দায়েম জানেম আব্
আ পেসর তু আজল মুসলমান-ই
জিন্দা জানেম আব্ ন্যা র সানি।

বাবা আমার, বীর আমার,
কাল আমি ন' লাখ সওয়ারের অধীশ্বর ছিলাম
আজ আমার একজন জল দিবার
ভৃত্যেরও অভাব।
হিন্দুদের তারিফ্ করি
তারা মৃতকেও জলদান করে
হে আমার পুত্র তুমি অদ্ভুত মুসলমান
জীবিত পিতাকেও তুমি জলদানে
বঞ্চিত করেছো।

দিল্লীর রাজপথে সেদিন এই পিতার আরেক পুত্রই হেঁটমুখে ঘোড়ার দিকে পিছনে ফিরে অপমানিত হয়ে বাহিত হয়েছিলেন সেকথা কি দিল্লীর সুষুপ্ত আত্মা আজও স্মরণ করে! ভুল করে বলেছিলেন সম্রাট্—মর্ত্যের বেহেস্ত আছে এইখানে, ভুলেছিলেন স্বর্গ জন্ম নেয় মাটিমায়ের কোলে, রাজার বিলাসভবনে নয়। তার কিছুদিন পরেই যখন দিল্লীর প্রাসাদকূটে কাথতাই মুঘলদের নাভিশ্বাস ঘনিয়ে এলো, তখন মর্মরের মরা মিছিলের ময়ূর সিংহাসনে বসে, দিনান্তের তিমির নিবিড় সন্ধ্যায় সনাতন দিল্লীর আসন্ন অধীশ্বর কী আসন্ন পট-পরিবর্তনের কথাই ভেবে হাসছিলেন! মহম্মদ শাহ রঙ্গিলা তখন গজল ও নৃত্যে মেতে আছেন। নাচের আসরে ব্যর্থ ঝঙ্কারে লালসা বিলসিত সর্পিল বাসনায় কামকার্মুক টঙ্কার দিচ্ছে, হানা দিচ্ছে মারাঠা জাঠ্, শিখ রোহিলারা, পশ্চিম থেকে নামছে নাদীর আবদালীর রক্তপায়ীর দল, দক্ষিণে নিজাম-শাহীর স্বাধীন পতাকা, পূবে সুবে বাংলার রাজস্বাটুকুই সম্বল। আছে শুধু বাদশাহী পাঞ্জার লড়াই, দেওয়ানীর দাবী, খেসারত্ ক্ষতিপূরণ, ফারমান্। হারিয়ে গেছে তখতের জোর, তরবারির তীক্ষ্ণতা, হুকুমতের তেজ। তখন দিল্লীর মসনদ ছেড়ে ভারতলক্ষ্মী নীলাম্বরী পরা লবণাম্বুরাশির ধারে তালীবন শ্যামোপকণ্ঠে ভাগীরথী মোহনার চলে এসেছেন। পর্তুগীজ ফরাসী ওলন্দাজ ইংরাজ সবাই এসে জুটেছে সেখানে, আসছে ভিন্ দেশী জাহাজ হর-জটাভ্রষ্ট গঙ্গার উপকূলে, যৌবনের পতাকা নিয়ে তারুণ্যের প্রতীক দুঃসাহসিক বৈদেশিক—যারা দেশ-দেশান্তরে চলে, পেরু থেকে বেঙ্গালা, তারা শুক্তি মুক্তা প্রবাল সুগন্ধির বেসাতী করে, অমলিন মসলিনের যারা ক্লেদাক্ত বাণিজ্যের অধ্যায়ে ভোগবতীর ভৃঙ্গার ভরতে জানে। ওদিকে দিল্লীর সাথে সাথে আরাবল্লীর পথে ঘাটে মাঠে রাজপুত জীবন সন্ধ্যাও নেমেছে, যদিও দিল্লীর পথে ঘাটে হর হর মহাদেওর রব শোনা যেতো, তবু মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত প্রচণ্ড মধ্যাহ্নেই মিলিয়ে বুঝি যায়। এই দুর্যোগের দিনেও ক্লান্ত দিল্লীর অবিনাশী আত্মার স্ফুরণ দেখি মাঝে মাঝে। শাহ আলম তখন নামেই সম্রাট—তাঁর বাদশাহীর সীমানা দিল্লী থেকে পালম—তাঁকে যখন রোহিলাদের নায়ক অন্ধ করে দিয়ে ক্রূর হাস্যে জিজ্ঞাসা করলে—জাঁহাপনা, এখন কি দেখছেন—তখন তার মধ্য দিয়েই সনাতন দিল্লী জবাব দিলে—দেখছি আমি পবিত্র কোরাণকে তোমার ও আমার মাঝে। এক মুহূর্তে যা ছিল নিষ্ঠুরতার, নির্মমতার এক হিংস্র প্রকাশ, তার মধ্যেই ফুটে উঠলো নিষ্ঠার, ত্যাগের, সহনীশক্তির এক অপূর্ব মহিমা। বাহাদুর শা বললেন, নিজের গালেই নিজে চড় মেরে বসে আছি—হামা আজ দস্তে গায়ের নালা কুনান্দ। সাতশো সালাতিন তখন গড়গড়া টানছে, ঠাণ্ডি পোলাও খাচ্চে ঘুড়ি ওড়াচ্চে, বুলবুলির নাচ দেখচে, জলসা শুনচে। তারা সব সৌখীন ইমানদার লোক, বাদশার আত্মীয় ও মেহ্মান্। এমনি দিনেই বুঝি গালিব গেয়েছিল—

দিল্হী তো হৈ ন্ সঙ্গায়া খিশ্ৎ
দর্দ সে ভর্ ন আয় কিও'
রুয়েঙ্গে হম্ হজারো বার
কোই হমে মনা কিও

আমার হৃদয় ত ইট-পাথর নয়—বেদনায় ভরে উঠবে না কেন—আমি হাজারবার কাঁদবো, আমাকে কেউ বাধা দেবে কেন?

সেদিন সত্যই কিল্লা ই মুয়েল্লায় দিল্লীর আত্মা কেঁদে উঠেছিল, ছাপ্পান্নো বাজার আর ছত্রিশ মণ্ডীতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়েছিল, খুনী দরওজায় লাল রক্তের ছাপ আজও মিলায়নি। সেদিনের নিদাঘতপ্ত মে দিনে ন'জন বীর ইংরাজের কথা আজও দিল্লী বলাবলি করে—নিকলসন্ লরেন্স চলেছে বীরদর্পে। মূর্ছিত লাঞ্ছিত দিল্লী লুটিয়ে পড়ে ধুলোয়, কিন্তু মরে না। ইংরাজকেও দরবার করতে হলে আসতে হয় লাল কেল্লায়, দেওয়ান-ই-খাসে, দেওয়ান-ই-আমে। ১৮৫৭র ষাট বছরের মধ্যেই ফিরে আসে দিল্লীর হৃতগৌরব মান। রাজ অনুজ্ঞায় দিল্লী আবার হয় রাজধানী। লুটেনস্ নূতন দিল্লীর পত্তন করতে বসেন। হার্ডিঞ্জ, চেমস্ফোর্ড আরুইন্, উইলিংডনরা নবপর্যায়ের নব দিল্লীশ্বর হয়ে বসেন। জগদীশ্বর হয় তো এবারও হাসেন। ঝকঝকে তকতকে কনট প্লেস গড়ে ওঠে, পার্লামেণ্ট সড়কে চলে বড় বড় মোটর। নিজাম, গাইকোয়াড়, পাতিয়ালা, জয়পুরের প্রাসাদে প্রাসাদে দিল্ল রৌদ্রতপ্ত খোলা মাঠ যায় ভরে। পর প দুটো বিশ্বযুদ্ধ এগিয়ে দেয় ভারতের আ জিজ্ঞাসাকে, আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নকে। ক্রিপ ফিরে যায়, মহাত্মাজী বসেন আমরণ ধ্যানে, লা কেল্লায় হয় বিচার জয় হিন্দ মন্ত্রের, জেগে ও ভারতের অবিনাশী আত্মা। ১৫ই আগ ১৯৪৭ শুধু দিল্লীর ইতিহাসে, ভারতবর্ষে প্রাণে আনে এক নূতনতম দিন, কিন্তু তার দাম দিতে হয় রক্তে, বেদনায়, ঝঞ্ঝায়। উৎপাটি ছিন্নমূল মানবের দল ছুটে আসে দিল্লী কোলে। নিজের জীবন দিয়ে শুধু নয়, স চেয়ে বড়ো মূল্য দিয়ে চলে গেলেন সে কটিবস্ত্র পরিহিত ছোট্ট মানুষটি, একা মহাত্মা—যিনি সুদুর্লভ—রাম নাম মনে দী হাতে, রঘুপতি রাঘব রাজা রামের মন্ত্র মুখে রাজঘাটে সেই অমর যোগী মানুষটির স্ম আজও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—'জীবন যখ শুকায়ে যায় করুণা ধারায় এসো।'

দিল্লী আজ আর দূরে নয়।

'দীপ্ত দুপুরে হে চির-নগরী
তপ্ত ধুলার বোরকা টানি
ত্রিরিশ হাজারি বাগিচার ছায়
আনমনে কি বা ভাব না জানি
মাসে মাসে আর নাহি খুশ রোজ
নও রোজ নাই নববরষে
মোদা-হাওদায় বাদশাজাদীরা
চলে না দোলায়ে দিল হরষে।

অতুল বিরাট বিপুল দিল্লী
শত সম্রাট প্রেয়সী অয়ি
গজমোতিগুঁড়া তব পথধুলা
মোহিনী রূপসী মহিমময়ী
তুমি চিররাণী, চিররাজধানী
চিরযৌবনা উর্বশী যে
ইন্দ্রের তুমি মর্ত্যবিলাস
ইন্দ্রপ্রস্থ তুমি যে নিজে।'

(সত্যেন দত্ত)

অধরা

বিজা সরকার

আজন্ম খুঁজেছি যারে
তবু যাঁর পাইনি সন্ধান
তাঁহারেই সঁপিলাম
স্বপ্নছানি রচি এই গান।
নিদাঘ মধ্যাহ্ন মাঝে
কাঁদায়েছে যে জন্ম উদাসী
বৃষ্টির নূপুর মাঝে
বিনা কাজে তাঁরে ভালবাসি।
অমাবস্যা অন্ধকারে
যেবা পারে রাখিতে পরশ
পূর্ণিমার পূর্ণকলা
রচি দেয় তাঁহারই দরশ।
সকল ঐশ্বর্য হারা
সে আমার আঁধারে মাণিক
সে অতলে ডুবি আজ
হৃদি মোর কুম্ভ ভরে নিক।

কালো রাত

অনন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

একটি দিন!

না—না—একটি রাত!

এই একটি প্রার্থিত রাতের তপস্যা করেছে ফজল আলি। স্বপন দেখেছে কতদিন—সম্ভব আজগুবি স্বপন...ফতিমার নরম উষ্ণ ...স্নিগ্ধ দেহসৌরভ। স্বপন ভেঙে গিয়ে গত আট বছর ধরে মাথা নেড়ে বলেছে—না—হয়না—হয়না—হতে পারে না হওয়া চিত......" থেমে গেছে আফজল আলি—হওয়া চিত নয় একথা সে মানতে রাজী নয়। বরং উচিত নয় তাই ত ঘটেছে আট বছর আগে আর আট বছর তারই গ্লানি বয়ে বেড়াচ্ছে আফজল। ফতিমাও কি? ...আজ রাতে ফতিমার লজ্জানত মুখখানা নিজের বুকের পর টেনে নিয়ে এই প্রশ্নেরই জবাব সবচেয়ে আগে জেনে নেবে। ফতিমা হয়ত স্পষ্ট করে কছু বলবেনা, বাহুবেষ্টন আরো নিবিড় করে বুকের মধ্যে মাথা গুঁজবে। তা হোক সেই ত' তার জবাব।

চোখের পাতার উপর সোনার কাঠি দিয়ে সুরমার রেখা টেনে দিল আফজল। হাত কাঁপছে পা কাঁপছে অথচ এক ফোঁটা সরাবও আজ গলায় ঢালেনি। ফতিমা অপেক্ষা করছে জীবন পানপাত্র নিয়ে—আর না, সরাবের প্রয়োজন তার ফুরিয়েছে। বুটিদার মিশরী রেশমের পাঞ্জাবীর উপর আসলি জরির কাজ করা গাঢ় নীল মখমলের মিরজাই পরে নিল আফজল আশ্চর্য উপকার করেছে দোস্ত মোহম্মদ আরাবল্লীর চল্লিশ ক্রোশ বন্ধুর পথে একটানা ঘোড়া ছুটিয়ে তাকে খবর দিয়েছিল—আলি আকবর ফতিমাকে তালাক দিয়েছে—তিন তালাক। তাই না সে ঠিক সময়ে পৌঁছুতে পেরেছে।

নেহাত দুর্মতি হয়েছিল আলি আকবরের—না হলে ফতিমার মত স্ত্রীকে কেউ একটা তুচ্ছ পারিবারিক কারণে তালাক দেয়। দুর্মতি নয়, জোর করা অধিকার আর কতদিন ধরে রাখবে আলি আকবর। ভুল করেছে--ভুল করেছে, তাই মুক্তি দিয়েছে পিঞ্জরের বুলবুলকে—তার ফতিমাকে। জোরই ত' প্রচুর অর্থের লোভ দেখিয়েছিল ফতিমার বাপ দরিদ্র মিয়াজানকে; আর প্রচুর দানমোহরের প্রতিশ্রুতি ছিল চৌদ্দ বছরের নাবালিকা ফতিমার জন্য। তাইত আট বছর আগের একটা আলোকোজ্জ্বল উৎসবের রাত শুধু আফজলকেই যেন অন্ধ করে দিয়ে গেল মাথায় খুন চেপেছিল তার। ইচ্ছে হয়েছিল তার সবল মুঠির মধ্যে চেপে সারা দুনিয়াটা গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলবে। পারেনি—তাই নিজেই নিজেকে শুধু চুরমার করেছে। চুরমার করেছে তার সমস্ত কোমল বৃত্তি, তার ন্যায়-নীতি মমত্ববোধ। নারীদেহ নিয়ে লোফালুফি করেছে আফজল এই আট বছর—এতটুকু করুণা বেদনা অনুভব করেনি কোনদিন। রাজপুতানার মরুভূমির নিঃস্ব ভয়ঙ্কর রূপের যে দাহ তার বুকের মধ্যে, তার পিঙ্গল নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে তার প্রকাশ হয়েছে বারবার। যে খোদাতালা বিনা অপরাধে তার সুখের বেহেস্ত চুরমার করে দিয়েছে, তার সৃষ্টিতে সুখের মূলোচ্ছেদ করে দিয়ে যাবে আফজল। তাই আরাবল্লীর পাহাড়ে পাহাড়ে গোপন দস্যুদল নিয়ে আট বছর ঘুরে বেড়িয়েছে, সুযোগ পেলেই একটু হাসি এতটুকু আনন্দকে তার বোঁটা থেকে ছিঁড়ে এনে নোখ দিয়ে চিরে চিরে দেখেছে।

বড় আয়নার সামনে নিজেকে নানা দিক থেকে দেখলে আফজাল—প্রচণ্ড গ্রীষ্মের শেষে জলভরা মেঘের ছায়ার মত তার নিজের গাঢ় চোখ-দুটোকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। এ যেন সেই আট বছরের আগের ফেলে যাওয়া আফজলকে কুড়িয়ে পেয়েছে আট বছর পরের আফজল।

আলি আকবর কিন্তু মুক্তি দিতে চায়নি ফতিমাকে। গত আট বছর ধরে বিত্তবান মুসলমান পরিবারে যাকে একক ঘরণীর সম্মান দিয়ে এসেছে তাকে তালাক দেবে আলি আকবর! তাই ঐ সর্বনাশা কথাগুলো উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ও নিজেকে একটা জীর্ণ পরিত্যক্ত কবরখানার ভয়াবহ শূন্যতার মাঝে আবিষ্কার করে আর্তনাদ করে উঠেছে। দু'হাত দিয়ে কাজী জিয়াউদ্দিনের হাঁটুদুটো জড়িয়ে কেঁদে উঠেছে—"আমায় বাঁচান কাজী সাহেব—আমায় বাঁচান।"

মেহেদির রং-করা দাড়ীর মধ্যে আঙ্গুল চালাতে চালাতে কাজীসাহেব শান্ত কণ্ঠে বলেছেন—"তা হয়না আলি আকবর মুসলমানের জবান ফেরান যায় না। ফতিমা বিবির ইদ্দৎ সুরু হয়েছে।"

ধক করে জ্বলে উঠেছিল আলি আকবরের চোখ—"কখনই নয় মানব না এ আদেশ—ফতিমা আমার, কবরের উপর মাটি চাপা দেবার আগে পর্যন্ত আমার।"

—"তোমার খুশী আলি আকবর তুমি প্রতিষ্ঠাবান, হয়ত সমাজকে শাসন করতে পারবে. কিন্তু মুসলমানের আইনে ফতিমা হবে তোমার উপপত্নী—তার ভবিষ্যৎ সন্তান—জারজ।"

শক্ত হয়ে উঠেছিল আলি আকবরের মুখ—ইচ্ছে হয়েছিল, সাঁড়াশী দিয়ে উপড়ে নিয়ে আসে কাজী জিয়াউদ্দিনের জিভ। পারেনি

অসহায় ভয়ার্ত কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এসেছিল—"উপায়!"

মেহেদির রং করা দাড়ীর উপর আবার হাত বুলালেন কাজীসাহেব—"উপায় পুনর্বিবাহ।"

—"প্রস্তুত।" আশ্বাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আলি আকবরের দু-চোখ।

"এত সহজ নয় আলি আকবর"—মৃদু হাসলেন কাজী জিয়াউদ্দিন।

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ তোমার পুনর্বিবাহের পূর্বে অন্য পুরুষের সঙ্গে ফতিমার পুনর্বিবাহের প্রয়োজন হবে—তার সেই বিবাহের পর সেই পুরুষ যদি ফতিমাকে তালাক দেয়, কিংবা তার মৃত্যু হয়, তবেই ইদ্দাতের শেষে ফতিমাকে তুমি আবার বিবাহ করতে পারবে।"

আলি আকবর মাটির দিকে চেয়ে মুখ নীচু করে বসে রইল। ফতিমার কাছে এ প্রস্তাব পেঁাছাল না।

আত্মদ্রোহের শেষে অনেকক্ষণ পরে মুখ তুললে আলি আকবর। সর্বহারার বিহ্বল দৃষ্টি তার চোখে, "তাই হবে কাজীসাহেব আপনি সেইমত ব্যবস্থা করুন। ফকির মহম্মদ অর্থের বিনিময়ে নিশ্চয়ই এ প্রস্তাবে রাজী হবে।"

—"ফকির মহম্মদ! অশীতিপর বৃদ্ধ ফকির মহম্মদ! ভুল বুঝেছ আলি আকবর। শরিয়তের শাসনে এ বিবাহ সহবাসসিদ্ধ না হলে তোমার পুনর্বিবাহের অধিকার থাকবে না, আলি আকবর।" বেরিয়ে গেল কাজী জিয়াউদ্দীন।

ইদ্দাৎ ফুরিয়ে আসছে ফতিমার—সারা আজমীর চঞ্চল। একটা পঙ্কিল ঔৎসুক্য সকলের চোখে চোখে ফিরছে। কি করবে আলি আকবর? বংশের ইজ্জৎ! মুহূর্তের উত্তেজনার ভুলের মাশুল! নির্মম আত্মঘাতী প্রায়শ্চিত্ত! কিংবা জন্মান্তের বিচ্ছেদ! আলি আকবর রাজী হয়েছে। এই খবর নিয়েই দোস্ত মোহম্মদ আরাবল্লীর দুর্গম পাহাড় ডিঙিয়ে আফজলের কাছে পেঁাছেছিল। ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নামতেই একমুখ ফেনা নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল ঘোড়াটা, আর ওঠেনি। মুঠো মুঠো মোহর ছুঁড়ে দিয়েছিল দোস্ত মোহম্মদের দিকে —"ঘোড়া কিনো, জায়গীর কিনো দোস্ত মহম্মদ সাবাস্" তারপরই আরাবল্লীর পাথরে পাথরে অশ্বক্ষুরের চকিত ধ্বনি তুলে আজমীরের পথে ঘোড়া ছুটিয়েছিল আফজল সর্দার।

আফজল জানে সে আগুন নিয়ে খেলতে নেমেছে। আলি আকবর ফতিমার একটি রাতের পুরুষকে নেকড়ে বাঘের মত অপূর্ণ লালসা নিয়ে তার হারেমের চারিদিকে ঘুরতে দেবে না নিশ্চয়ই। নিঃশব্দে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে। কিন্তু আফজল দুর্বল নয়—রাত্রির অন্ধকারে ফতিমাকে নিয়ে আরাবল্লীর দুর্গম গিরিবর্ত্মে ফিরে যাবার আয়োজন তার ত্রুটিহীন, নিরঙ্কুশ, আর অসংখ্য অনুচর নিরাপত্তার গোপন পাহারা দিচ্ছে। সেখানেও যদি আলি আকবর তাকে অনুসরণ করে, দুর্ভাগ্য আলি আকবরের! নিকার পরের দিনই তালাকের প্রতিশ্রুতি!—হা-হা-হা—প্রতিশ্রুতি পালন করেছে ফতিমার বাপ মিয়াজান—প্রতিশ্রুতি পালন করেছে ফতিমা —আফজলের ভাবনা ধাক্কা খেলে। অনেক চেষ্টা করেও ফতিমার কথা জানতে পারেনি। আশ্চর্য মনে হয়েছে। নারীদেহটাকে আসবাবের মত ব্যবহার করবার এই অসম্মানজনক প্রস্তাব সেই বা কেমন করে মেনে নিলে। এই ত রাজপুতানার দেশ—এই মাটির মেয়েরাই ত নিজেদের সম্মান রাখতে দলে দলে জহরব্রত করেছে, হোক না সে মুসলমানী! না-না ফতিমা বোধহয় জানত আফজলই আসবে তার আট বছরের ব্যর্থ জীবনকে কলঙ্কমুক্ত করতে—ঈদের চাঁদ আফজল। কে জানে, দোস্ত মোহম্মদকে সেই হয়ত পাঠিয়েছিল। আজ সকালের মজলিসে বোরখা পরা ফতিমাকে সে দেখেছিল। কাজীর প্রশ্নে তার বিবাহ প্রস্তাবে সম্মতিও সে দিয়েছিল—কিন্তু তার উদ্বেল হৃদয়ের আবেগ বোরখার পরিধি অতিক্রম করতে পারেনি—যেমন শান্তচরণে এসেছিল, তেমনি ধীরপদক্ষেপে বেরিয়ে গিয়েছে। তার এই নিস্পৃহ নিরুচ্ছ্বাস ভঙ্গীটি বড় ভাল লেগেছিল আফজলের। এই শান্ত সমাহিত জীবনের প্রীতিচ্ছায়ে সে এবার তার ক্ষুব্ধ জীবনের বাকী দিনগুলি কাটিয়ে দেবে।

আজমীরের বড় মসজিদে রাত্রির আজান শুনলে আফজল। গত আট বছর সে এক দিনও নামাজ পড়েনি—আজ তার হাঁটু দুটো হঠাৎ কেন মুড়ে আসতে চায়। আকাশে এক আকাশ তারা ঝকঝক করছে—নিচের বাগিচা থেকে মিশ্রিত ফুলের গন্ধ। আতরদান থেকে খানিকটা আতরও মেখে নিলে আফজল, জরির নাগরা পায়ে গলিয়ে নিলে।

নিজের বুকের উত্তাল শব্দ শুনতে পেল। তার হাজার হাজার নর্মবিলাসের রাত তার বলিষ্ঠ বুক ত এমন তোলপাড় করে ওঠেনি। কেমন যেন ভয় হচ্ছে তার—কাকে ভয়? আলি আকবরকে! সম্ভাব্য বিচ্ছেদকে! অনিশ্চিত জীবন রহস্যকে! না—না—দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেবে না আফজল। একটি সীমিত রাত্রির মধ্যে তার অনেক কাজ। এতটুকু মোহ তার বাকী জীবনকে—যদি জীবন তখনও থাকে কবরখানায় রূপান্তরিত করবে।

ফতিমার শয়নকক্ষের দরজা অল্প ঠেলতেই খুলে গেল। মৃদু আলোয় স্বল্পালোকিত ঘরখানা—ফুলের ও আতরের গন্ধে ভরে উঠেছে। বিস্তৃত শয্যার একপাশে খাটের বাহুর উপর মাথা রেখে পেছন ফিরে বসে আছে ফতিমা। সলমা চুমকী ছড়ানো আসমানি রংএর ওড়নাখানা তার দেহ, তার কবরী বেষ্টন করে ঝিকমিক্ করছে। পা টিপে টিপে পিছন থেকে চোখটা চেপে ধরবে আফজল? —সেই আট দশ বছর আগের পুরানো খেলা।

পা টিপে টিপেই এগিয়ে গেল আফজল—দু' হাত বাড়িয়েওছিল—হাত দু'খানা সরিয়ে নিলে। একি! ফুলে ফুলে কাঁদছে ফতিমা। সেই রুদ্ধ আবেগের তালে তালে সলমা-চুমকীগুলো নিভছে জ্বলছে। কিন্তু কেন—কেন কাঁদছে ফতিমা—এ ত তার জীবনের পরম উৎসবের রাত! কেমন এক ধরণের বিফলতা বোধ করছে আফজল। কথা বলতে গেল—গলা শুখিয়ে গেছে—শুধু ডাকলে "ফতিমা"। কেঁপে উঠল কি ফতিমা—না—না—বোধ হয় মসলিনের ওড়নাখানা বাতাস লেগে কাঁপছে। আফজল হাল্কা করে ফতিমার পিঠের উপর তার হাতখানা রাখলে—আশ্বাসের হাত নির্ভয়ের হাত। 'ভয় কি তোমার আমি এসেছি'—তার প্রীতিস্পর্শে এই কথাই জানা[illegible] চাইলে আফজল। একঝটকায় ওর হাতখানা[illegible] অশুচিবোধে সরিয়ে দিয়ে ঘুরে বসল ফতিমা[illegible] "কেন কেন এসেছ আফজল—চলে যাও, চ[illegible] যাও—চলে যাও এখান থেকে—আমি পার[illegible] না, পারব না—না—না—না—" নিচের ন[illegible] কার্পেটের উপর লুটিয়ে পড়ল।

আফজল সরে দাঁড়াল। তার সব গোলম[illegible] হয়ে গেছে—সর্বনাশের আসন্ন মুহূর্তে মা[illegible] যেমন করে তার বোধ না হারায় এও তেমনি[illegible] ফতিমা কি যে বললে—তাও যেন ভুলে গেল[illegible] শুধু নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল ঐ দেহটা[illegible] দিকে—সেই দেহখানা ফুলে ফুলে যে তরঙ্গ[illegible] তুলছে—সে তরঙ্গ সারা ঘরখানায় ছড়িয়ে[illegible] পড়ল—দেওয়ালে দেওয়ালে ধাক্কা খেলে—তার[illegible] পর আফজলের নিজের দেহটা, তার গ[illegible] পর্যন্ত, তার মাথা পর্যন্ত ডুবিয়ে দিলে—[illegible] বন্ধ হয়ে আসছে আফজলের।

তার সম্বিত ফিরে এলো। তার [illegible] বছরের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে—শুধু তাই ন[illegible] আর স্বপ্ন দেখবে না আফজল আলি। [illegible] দস্যু, নির্মম পিশাচটা ওর মধ্যে মাথা [illegible] দাঁড়াল। ওই কমনীয় নারী দেহখানা[illegible] দেওয়ালে ঝোলান খাপ থেকে ঝকঝকে ছু[illegible] খানা টেনে নিলে—ধার পরীক্ষা করতে [illegible] আঙুল কেটে গেল—দু' পা এগিয়ে গেল[illegible] তারপর ছুরিখানা ফেলে দিল এক কো[illegible] ছুরির চেয়ে ধারাল কণ্ঠে বললে—ফতিম[illegible] আজ সকালের নিকায় তোমার সম্মতি ছিল[illegible]

ফতিমার কান্না ধাক্কা খেলে—আফজলের[illegible] কণ্ঠ গর্জন করে উঠল—"উত্তর দাও।"

ফতিমা ঘাড় নাড়লে।

—"আজ এই মুহূর্তে তুমি আমার ধ[illegible] পত্নী একথা অস্বীকার কর ফতিমা।"

ফতিমা চুপ করে রইল।

"আমি জবাব চাই ফতিমা—" আ[illegible] তীক্ষ্ণ হল, অসহিষ্ণু হল তার কণ্ঠস্বর[illegible] ফতিমা নিরুত্তর।

"আজ আমার অধিকারকে অস্বীকা[illegible] করতে পারবে ফতিমা।" আগুন ঠিকরে প[illegible] আফজলের দু'চোখে। নিষ্ঠুর উল্লাসে নি[illegible] বলিষ্ঠ বাহুর মধ্যে নিপীড়ন করে ফতিমা[illegible] একেবারে নিঃশেষ করে দিতে চাইছে।

এবার ফতিমা উঠে বসল। "না—না—না[illegible] কিন্তু কেন আফজল, কেন? আমার জীবন[illegible] সবচেয়ে বড় সর্বনাশ এড়াতে গিয়ে একটা [illegible] সর্বনাশকে মানতে চেয়েছিলুম—কিন্তু সে [illegible] এত অসম্ভব জানতুম না। আমায় ক্ষমা [illegible] আফজল" কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল ফতিমা।

—"ক্ষমা?" আফজলের তীক্ষ্ণ বী[illegible] হাসিতে ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র ঝমঝম ক[illegible] উঠল। —"আট বছর ধরে দস্যুতা করে [illegible] করবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি ফতিমা। আ[illegible] জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়াকে বিলিয়ে দি[illegible] মুসাফির হয়ে বেরিয়ে যাবার মূঢ়তা আ[illegible] নেই—তৈরী হয়ে নাও ফতিমা—আমা[illegible] যেতে হবে।"

"কোথায়?"—সবিস্ময়ে ফিরে চাই[illegible] ফতিমা।

—আরাবল্লীর পাহাড়ে পাহাড়ে—যে[illegible] সুখ নেই, শান্তি নেই, নিজের পাঁজরের [illegible]

(ইহার পর ১২৮ পৃষ্ঠায়)

নিন্দা-প্রশংসার ঊর্ধ্বে

নারায়ণ চৌধুরী

[পু]রাতন শাস্ত্রকার ও মনীষী ব্যক্তিগণ বলে গেছেন, নিন্দা-প্রশংসাকে সমজ্ঞান করবে, নিন্দার দ্বারা যেমন উত্তেজিত হবে না [ত]েমনি প্রশংসা-বাক্যের দ্বারাও অভিভূত হবে [না]। নিন্দা-প্রশংসাকে সম-দৃষ্টিতে বিচার করে [তা]র ঊর্ধ্বে উঠবার সাধনাই হল মনুষ্যত্বের [সা]ধনা।

কিন্তু মহাজনকথিত এই নির্দেশের [য]থার্থ্য সম্পর্কে নানা জনের নানা মত আছে। [কে]উ নিন্দাকে মোটে গায়েই মাখতে চান না; [আ]বার কারও আত্মসম্মানবোধ এত প্রবল ও [স্প]র্শকাতর যে, সামান্য নিন্দার কথাতেই তিনি তেলে-[বেগু]নে জ্বলে উঠেন, এমন কি কখনও-কখনও [নি]ন্দাকারীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের [কর]তেও কসুর করেন না।

প্রশংসা-বাক্য সম্বন্ধেও প্রশংসিত ব্যক্তির [মধ্যে]ও এইরূপ বিপরীত মনোভাবের সাক্ষাৎ [পা]ই। কেউ আছেন যিনি যে কোন প্রশংসাকে [তাঁ]র পাওনা বলে মনে করেন এবং প্রশংসাকারীর [প্রতি] ও তজ্জন্য মোটেই কৃতজ্ঞতাবোধ করেন না, [কৃত]জ্ঞতা প্রকাশ তো আরও পরের কথা; কেউ [আ]বার সদাশিব আশুতোষের মত সামান্য [প্রশ]ংসাতেই খুশী হয়ে ওঠেন এবং সেই খুশীর [অভিব্য]ক্তিকে কথায় ও আচরণে প্রকাশ করতেও [কুণ্ঠি]ত হন না। কারও মনোভাব উল্টো। আত্ম-[মর্যাদ]ার চেতনা তাঁর ভিতর এতই বদ্ধমূল যে, [কেউ] প্রশংসা করলে তিনি ধরেই নেন যে, ওই [ব্যক্তি] কোন স্বার্থ সাধনের আশায় তাঁর [প্রশ]ংসা করে তাঁকে তুষ্ট করবার চেষ্টা করছে, [ফলে] ওই ব্যক্তির প্রতি তাঁর মনোভাব সূচনাতেই [বির]ূপ হয়ে যায়। প্রশংসা করলেও বিপদ, না [করলে]ও বিপদ! কেউ প্রশংসা শুনতে স্বতঃই [ভাল]বাসেন, কেউ প্রশংসাকে তোষামোদ ছাড়া [আ]র কিছু ভাবতে পারেন না। শেষোক্ত ক্ষেত্রে [প্রশ]ংসাকারী ব্যক্তি প্রায়শঃ দোটানায় পড়েন এবং [অ]নেক সময় প্রশংসা করতে উদ্যত হয়েও পাছে [খোশা]মুদে লোক বলে গণ্য হন এই আশঙ্কা[য়] উদ্গত প্রশংসা-বাক্যের মুখে পাথর চাপা [দিয়ে] নীরব থাকেন। পরকে বড় করতে গিয়ে [নিজে] ছোট কেউ হতে চায় না। অবশ্য যারা [স্ব]ার্থোদ্ধারের জন্যই তোষামোদ করে, সেই সব [মোসাহেব] ক্যান্টের মজ্জাগত পার্শ্বচরদের কথা [আলা]দা।

লোকে বলে, আত্ম-প্রশংসা শুনতে কে না [ভাল]বাসে? স্বয়ং মহাদেব পর্যন্ত প্রশংসায় [তুষ্ট] হন, মর্ত্যবাসী সাধারণ মানুষের কথা তো [ছে]ড়েই দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সত্যি, এমন একজন বিরল লোকের দেখা কখনও-সখনও [মে]লে, যাঁরা আত্ম-প্রশংসা শুনতে গিয়ে রীতি-[মত ঘ]েমে ওঠেন এবং যে পর্যন্ত না সেই [প্রশ]ংসা বাক্যে ছেদ টানা হয় ততক্ষণ অবধি [ফাঁস]ফাস করতে থাকেন। অবশ্য এই রকম [ন]িরোগ্য বিনয়ীর সংখ্যা সংসার ক্ষেত্রে [ক্রম]শঃ কমে আসছে, বিশেষতঃ নগর জীবনের ব্যবহারিক ও লৌকিক স্তরে ওরকম মানুষের দেখা পাওয়াই বোধ হয় ভার; কিন্তু সত্যিকার জ্ঞানী-গুণী সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও চেষ্টা করলে হয়ত এ রকম দু'টি-একটি আশ্চর্য মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে। বর্তমান যুগ প্রচারের যুগ। এখন শুধু পর-প্রশংসাতেই মন ওঠে না, আত্মমুখে আত্মরটনা করে ঘাটতি পূরণ করতে হয়। যে যত নিজের অনুকূলে ঢাক্কা নিনাদ করতে পারে তার তত প্রতিষ্ঠা। জয়ঢাকটি কেউ পরের পিঠে বেঁধে তাতে কাঠি চালনা করে, কেউ সেটি নিজের কাঁধেই ঝুলিয়ে নেয়।

শাস্ত্রকাররা বলেন, বিদ্বানরা নাকি স্বভাবতঃ বিনয়ী। এর চেয়ে সত্যের অপলাপ বোধ হয় আর কিছু হতে পারে না। বিদ্বানরা বিনয়ী তো ননই বরং তাঁদের মধ্যেই শক্তির দম্ভ বেশী চোখে পড়ে। এবং যে অনুপাতে তাঁদের মধ্যে শক্তির দম্ভের প্রকাশ, সেই অনুপাতে তাঁদের ভিতর প্রশংসা-লোলুপতা দেখা যায়। বিদ্বান শ্রেণীর মধ্যে প্রচার ও প্রশংসার কাঙালপনা দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপেই প্রকট। বিদ্বান শ্রেণীর এই যে চিত্ত-দারিদ্র্য এই যে অসার শক্তির তত্ত্বে বিশ্বাস—এ আমার নিকট একটা হেঁয়ালি বলে মনে হয়। 'বিদ্যা বিনয়ং দদাতি' এ তো আমাদের শাস্ত্রবাক্যেরই কথা। অথচ কার্যতঃ তার উল্টো নিয়মটাই যেন সংসারে—সমাজে বেশী প্রত্যক্ষ করতে হচ্ছে। কেন এমন হয়। এই বাবদে আমার মনের খটকা কিছুতেই দূর হতে চায় না। পরে অনেক ভেবে-চিন্তে অনেক যুক্তিবুদ্ধি প্রয়োগ করে এর একটা সমাধান আমি আবিষ্কার করতে পেরেছি বলে মনে হচ্ছে। সেই কথাই বলি।

ভেবে দেখলাম, এ যুগের বিদ্যা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সংসারজীবনের কোন-না-কোন বিভাগকে কেন্দ্র করে নৈপুণ্য অর্জনের বিদ্যা মাত্র, জীবিকা অর্জনের বিদ্যা মাত্র। এ বিদ্যা পরা বিদ্যা নয় বা প্রজ্ঞা সাধনা নয়। এর সঙ্গে learning এর সম্পর্ক থাকতে পারে কিন্তু wisdom-এর সম্পর্ক নেই। সুতরাং এ জাতীয় বিদ্যায় শক্তির চেতনা জাগ্রত হওয়াটাই স্বাভাবিক, সত্যিকার বিনয়ের বোধ এ থেকে আসতে পারে না। আজকের দিনে ঐশ্বর্য কিংবা লোকবল কিংবা শারীরিক শক্তি কিংবা সংঘবলের মত বিদ্যাও হল একটি লৌকিক বল। এ বলে মত্ততা অনিবার্য। আর এ মত্ততা থেকেই প্রশংসা প্রচার ও আত্মরটনার স্পৃহা কান টানলে মাথা টানার মত অবধারিত-ভাবেই এসে পড়ে। বিদ্বান অথচ আত্ম-সচেতন নন কিংবা প্রশংসামনস্ক নন, এমন ব্যক্তি আজ সারা দেশ চুঁড়লেও দু-চার-পাঁচজনের বেশী পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

যাক প্রশংসার তত্ত্ব। নিন্দার কথাটাই বলি। নিন্দার সমস্যা প্রশংসার তুলনায় অনেক বেশী গভীর, অনেক বেশী অস্তিত্ব মন্থনকারী। প্রশংসায় অবিচলিত থাকা যায় কিন্তু নিন্দায় অবিচলিত থাকা সুকঠিন ব্যাপার। নিন্দায় অচল-অটল থাকার যৌক্তিকতা বিষয়ে পুঁথি-পত্রে অনেক সদুপদেশ লাভ করা যায়, কিন্তু সেই সদুপদেশ অনুযায়ী কার্য করা মোটেই সহজ নয়। নিন্দা-পরিবাদ মানুষের অনুভূতি ও আবেগকে এমন প্রগাঢ়ভাবে জাগ্রত করে যে অতি কঠিন আত্ম-সংযমের বর্মের দ্বারা সুরক্ষিত না হলে ধৈর্য হারানো আশ্চর্য নয়। নিন্দাকারীকে সমুচিত শিক্ষাদানের স্পৃহাও ওই আবেগের পথ অনুসরণ করেই আসে। অকারণ তথা ভিত্তিহীন নিন্দায় মানুষের আত্মসম্মানবোধ প্রবলরূপে বিপর্যস্ত হয়, তার সমগ্র সত্তার মধ্যে একটা প্রচণ্ড জ্বালা-ধরানো আলোড়নের সূত্রপাত হয়। এই অবস্থায় সহিষ্ণুতা রক্ষা করতে পারেন শুধু তিনিই যাঁর বিশেষ সংযমের সাধনা আছে, উপরন্তু এক উদার কৌতুক রসবোধের দ্বারা পৃথিবীর সব কিছু তিক্ততাকে সহনীয় করে তুলতে যিনি জানেন। এক কথায় যিনি জ্ঞানী অথচ রসিক। Sense of humour ব্যতিরেকে এই পদে-পদে ক্রূরতা ও নিষ্ঠুরতা পীড়িত সংসারে টিঁকে থাকাই বোধ হয় মুস্কিল।

জ্ঞানী ও রসিকের কথা আলাদা। নিন্দার প্রশ্নে আমরা সমাজের সাধারণ দশজন আমরা কি মনোভাব অবলম্বন করব? আমরা কি নিন্দায় উদাসীন থাকব, নাকি নিন্দার প্রতিকারে সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট হব? এটি একটি মূলগত প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নে নানা জনের নানা মত থাকাই স্বাভাবিক। অন্ততঃ প্রশ্নটির সর্ব-স্বীকৃত একটি মাত্র সদুত্তর মিলবার যে আশা নেই সে কথা জোর করেই বলা চলে। ধরুন রামবাবু যদি শ্যামবাবুর অসাক্ষাতে শ্যামবাবুর বিরুদ্ধে অযথা কটূক্তি করেন এবং কোন প্রকারে শ্যামবাবুর তা কর্ণগোচর হয়, সে ক্ষেত্রে শ্যামবাবুর কি করণীয় হবে? তিনি কি এই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য উঠে পড়ে লাগবেন, না কি নিন্দাটুকু সিগারেটের ছাইয়ের মত গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে যেন কিছু হয়নি এইরূপ ভাব দেখিয়ে নীরবতা অবলম্বন করবেন? প্রতিকার করতে গেলে জল ঘুলিয়ে ওঠাই স্বাভাবিক, সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ প্রায়শঃ শেষোক্ত পন্থারই আশ্রয় নিয়ে থাকেন। আর কিছুর জন্যে না হোক, 'সীন ক্রিয়েট' করার ভয়েই তাঁরা চুপ করে যান। কিন্তু যেখানে নিন্দা নিন্দামাত্র নয়, তা সুস্পষ্ট মানহানির পর্যায়ে গিয়ে পড়ে, কোন ব্যক্তিকে সমাজের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করাই যেখানে নিন্দার পরিকল্পিত উদ্দেশ্য, সে স্থলেও কি চুপ করে থাকা উচিত?

এ সম্বন্ধে সর্বসম্মত কোন পথের দিশা মেলে না। এক-একজনের মান-অপমানবোধ এক-এক রকমের। দুর্বলের নিন্দা পরিবাদে সবল বিচলিত বোধ করে না, তবে সমানে-সমানে লড়াই হলে তাঁর আত্মাদর ভীষণভাবে মথিত হয়ে উঠতে পারে। এ সম্বন্ধে বাস্তবিকই কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সংবাদপত্রে মানহানির মামলার যে সকল বিবরণ প্রকাশিত হয় সেগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, তার কতকগুলি অতিশয় তুচ্ছ কারণে দায়ের করা হয়, কতকগুলির পিছনে সংগত কারণ থাকে। কারণের এই ঔচিত্যানৌচিত্যের বোধ সম্পূর্ণই নির্ভর করে যাঁর মানহানির চেষ্টা করা হয়েছে

তাঁর মানসিক গঠনের উপর। নিন্দা তিনি উড়িয়েও দিতে পারেন আবার সাধ করে গায়েও মাখতে পারেন। নিরাসক্তি ও নির্বেদের কোন্ স্তরে তিনি অবস্থান করছেন তারই উপর সবকিছু নির্ভর করছে। তিনি যদি গীতোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের আদর্শে আস্থাশীল হন তবে তিনি কিছুতেই বিচলিত হবেন না; নিন্দা প্রশংসা সুখ-দুঃখকে সমজ্ঞান করে আপনার নির্দিষ্ট ধর্ম ও কর্মাচরণে অনড় থাকবেন। কিন্তু তিনি যদি তীব্র মান-অপমানবোধযুক্ত মানুষ হন, স্থিতধী ও স্থিত-প্রজ্ঞের আদর্শ যদি তাঁর মন না কেড়ে নিয়ে থাকে, তবে কোন্ না তিনি আত্মসম্মান রক্ষার্থ মানহানিকারীর বিরুদ্ধে আদালতের শরণ নেবেন? পূর্বেই বলেছি, এ সম্বন্ধে সকলের পক্ষে সমান গ্রাহ্য সাধারণ কোন নীতিসূত্র আবিষ্কার করা কঠিন। পাত্র ও অবস্থা ভেদে এক-এক জায়গায় এক-এক রকম ঘটাই সম্ভব।

দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটি আরও পরিষ্কার হবে। যেমন মনে করুন, মহামানব মহাত্মা গান্ধীর জীবৎকালে তাঁর বিরুদ্ধে, তাঁর আদর্শের বিরুদ্ধে দেশের ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা সংবাদপত্রে কত রকমের নিন্দা-কটূক্তিই না বর্ষিত হয়েছে, কিন্তু তাতে তিনি এতটুকু বিচলিত হননি। সমস্ত নিন্দাবাদ ও সমালোচনা হাসি-মুখে সহ্য করে তিনি তাঁর স্বীয় সাধনায় অটল থেকেছেন। উপদেশ ও সদ্বাক্যের দ্বারা তিনি তাঁর নিন্দাকারীদের মনোভাবের শোধনের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদের ক্ষুদ্র অঙ্গুলিটুকুও উত্তোলন করেননি। যে যাই করুক সকলের প্রতি তিনি ক্ষমার মনোভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিলেন। এমন কি ইংরেজের বিরুদ্ধেও তাঁর মনে কোন বিদ্বেষ ছিল না। অথচ গান্ধীজীরই সুপরিচিত ভক্ত-শিষ্য এবং তাঁর কর্মধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে সংশ্লিষ্ট চক্রবর্তী শ্রীরাজগোপালাচারী বৎসর খানেক আগে মাদ্রাজের একটি সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে সামান্য একটি ব্যাপারে মানহানির মামলা দায়ের করে দেশবাসীকে অবাক করে দিয়েছিলেন। সাধারণের বিস্ময়বোধের কারণ, চক্রবর্তী রাজগোপাল স্থিতধী একজন রাজনীতিক; ভারতের প্রবীণ জন-নায়কদের মধ্যে তাঁর মত জ্ঞানী ব্যক্তি বোধহয় আর কেউ নেই। অথচ ক্ষুদ্র একটি ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিগত মান-অপমানবোধ কি সাংঘাতিকভাবেই না সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠল! তাই বলছিলাম, এ সকল বিষয়ে সর্বজনগ্রাহ্য কোন নিয়ম প্রতিষ্ঠা করার অসুবিধা আছে। শাস্ত্রের বচন শাস্ত্রেই তোলা থাকে। খুব কম মানুষই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তদনুযায়ী কার্য করতে প্রবুদ্ধ হয়।

পর-চর্চা পর-নিন্দা একটি রকমফের। এটিকে নিন্দার একটি শোধিত রূপ মনে করা যেতে পারে। যেখানে পাঁচ-সাতজন লোক বিশ্রম্ভালাপ মানসে একত্র মিলিত হয়েছে সেখানে পর-চর্চা এড়ানো কঠিন। আড্ডা বা বৈঠক-জাতীয় জমায়েতে পর-চর্চা একটি মুখরোচক ব্যসন। বিশেষ জমায়েতটি যদি ধনী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের গিন্নীবান্নী শ্রেণীর মহিলাদের আপরাহ্নিক বৈঠক হয় তবে তো পর-চর্চা অবধারিত। পর-চর্চা সব সময়েই যে বিদ্বেষ বা অসূয়া-প্রসূত হবে তার কোন কথা নেই। বরং বিদ্বেষের মালিন্য পর-চর্চায় খুব কমই থাকে বলা যায়। পর-চর্চা তারিয়ে তারিয়ে সময় কাটাবার একটি ফলপ্রদ উপায় মাত্র। ও না হলে আড্ডা অল্পতেই পানসে হয়ে ওঠে। আড্ডাসুখই যেখানে সংকল্পিত লক্ষ্য, সেখানে দার্শনিক—আধ্যাত্মিক—ধর্মীয় বা ওই জাতীয় গুরু-গম্ভীর কোন আলোচনার কচ্‌কচির ভিতর প্রবেশ না করে নির্দোষ পর-চর্চায় মেতে ওঠা এমনই বা কি মন্দ ব্যাপার? পর-চর্চাকে নির্দোষ বলায় কেউ কেউ আপত্তি করতে পারেন, কিন্তু পরের ক্ষতি করা যে প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য নয়, নিজে আমোদ পাওয়াটাই মূল লক্ষ্য, তাকে নির্দোষ ছাড়া আর কি বলা যায়? পর-চর্চা তো পরের কথা, এমন যে কুখ্যাত নিন্দা, তাও অনেক সময় অসূয়াবিমুক্ত হতে দেখা যায়। নিন্দাকারী মাত্রই যে বিদ্বেষী ব্যক্তি এমন মনে করবার হেতু নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পর-নিন্দা নিবন্ধে লিখেছেন, তিনি এমন একাধিক পর-নিন্দায় উৎসাহী ব্যক্তিকে জানেন যাদের তুল্য ভাল মানুষ হতে পারে না। আমাদের অভিজ্ঞতাও অনুরূপ। নিন্দাকারী মাত্রই নিন্দাযোগ্য নয়। কে কি উদ্দেশ্য নিয়ে নিন্দা করে সেইটি বিচার করে তবে এ বিষয়ে রায় দেওয়া সমীচীন হয়। আসল কথা হচ্ছে নিন্দার ভিতরকার অভিপ্রায়। কেউ নিন্দা করে স্বীয় ব্যর্থতার বোধ থেকে, কেউ নিন্দা করে অন্যায়ের প্রতিবিধান কামনায়, কেউ নিন্দা করে খ্যাতনামা ব্যক্তির চারিত্রিক অধোগতি লক্ষ্য করে, কেউ কোনরূপ দৃশ্য কারণ ছাড়াই নিছক সময় কাটাবার অছিলায় পর-নিন্দায় প্রবৃত্ত হয়। এ সব ক্ষেত্রে নিন্দা তত মারাত্মক নয় কিন্তু অপরকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করবার পূর্ব-পরিকল্পিত উদ্দেশ্য নিয়ে যেখানে নিন্দা এবং যে নিন্দায় সত্যের উপর কয়েক পোঁচ মিথ্যার রঙ চড়ানো হয়, রঙ চড়ানো হয় ওই অপ-উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই, সেখানে নিন্দা একটি গর্হিত অপরাধ। এমনতর নিন্দা শাঁখের করাতের মত দুদিকেই কাটে—অহেতুক নিন্দার পাত্রটির যেমন এতে ক্ষতি হয় তেমনি নিন্দুকেরও আত্মিক অধঃপতন ঘটে। তাছাড়া সামাজিক আবহাওয়াও এর দ্বারা নানাভাবে ঘুলিয়ে ওঠে। এ রকম উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নিন্দার বিপদ সম্পর্কে সকলেরই সজাগ থাকা দরকার।

কালো রাত

(১২৬ পৃষ্ঠার পর)

হাত চেপে অতন্দ্র প্রহর কাটিয়ে দিতে হয়—”

“তার মানে—কাল তুমি আমায় তালাক দেবে না।”

“হা—হা—হা—” হেসে উঠল আফজল—“আলি আকবরের মত আমি বেকুফ নই ফাতিমা।”

“—তবু আজ সকালে তুমি এই প্রতিশ্রুতিই আমায় দিয়েছিলে আফজল” ফাতিমার কণ্ঠে ভয়ার্ত কাতরতা।

—“আট বছর আগে তোমার প্রতিশ্রুতি তোমার বাজানের প্রতিশ্রুতি মনে পড়ে ফাতিমা—”

“—আমি ছোট ছিলুম আফজল—আমি জানতুম না—তারপর আমি জীবনে সব পেয়েছি—স্বামী, সংসার, ভালবাসা—মুহূর্তের ঝড়ের সর্বনাশ থেকে আমায় বাঁচাও আফজল।”

“—আমিও তোমায় সব দোব ফাতিমা—”

“না—না—না—তা হয় না আফজল। এই নিষ্ঠুর সামাজিক নির্যাতন সহ্য করে আলি আকবর আমার জন্য অপেক্ষা করছে, আমায় ফিরে যেতে দাও আফজল।”

ঘরের কোণ থেকে ছুরিখানা উঠে এসে আফজলের বুকখানা যেন ঝাঁঝরা করে দিলে। তার ইচ্ছে হল একবার বলে—আলি আকবরের উদ্যত ছুরি উপেক্ষা করে আমিও ত এসেছি ফাতিমা—কিন্তু বলতে পারল না সে কথা। শুধু নিস্পৃহ বিদ্রূপের সুরে প্রত্যেক কথাটাকে যেন ওজন করে বললে—“কিন্তু আমার কাছে না এসে তুমি ফিরবে কি করে ফাতিমা।”

আহত নাগিনীর মত ফণা তুলে উঠে দাঁড়াল ফাতিমা—“জানোয়ার, জানোয়ার কোথাকার—এই দেহখানার উপর এত লোভ—চলে এসো—” দূর করে ফেলে দিলে ওড়নাখানা—ক্ষিপ্তের মত নখ দিয়ে ছিঁড়ে ফেললে তার বক্ষবাস। ক্রুদ্ধ আক্রোশে বুকটা ফুলে ফুলে উঠছে। উন্মুক্ত অনমনীয় শুভ্র যৌবনের সামনে দাঁড়াল আফজল। তার পা দুটো কেঁপে উঠল। ফাতিমার ক্রুদ্ধ আহ্বানে বাসরযামিনীর বিহ্বলতা নেই—বধ্যভূমির আহ্বান বলে মনে হল। বাঁ হাতে নিজের চোখ দুটো চাপা দিলে—ডান হাতে জয়পুরী পাথরের ফুলের রেকাবখানা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলে আলোর ঝাড়ের উপর—বেলোয়ারী কাঁচ ঝমঝম করে পড়ল একরাশ অন্ধকার নিয়ে। ফাতিমা সেইখানে বসে পড়ল।

মনে হল আলি আকবর কালো অন্ধকারের মত ফাতিমার চারিদিকে দুর্ভেদ্য অবরোধ সৃষ্টি করেছে—তাহা অতিক্রম করবার সাধ্য নেই আফজলের।

পাথরের মূর্তির মত বসে রইল ফাতিমা—পাথরের মূর্তির মতই দাঁড়িয়ে রইল আফজল। কালো অন্ধকারের মধ্যে নারীদেহের সূক্ষ্ম দেহসীমার দিকে চেয়ে দস্যু আফজল—লম্পট আফজল এই প্রথম আবিষ্কার করলে ফাতিমা তার কামনা নয়—ফাতিমা তার প্রেম। যে মানস লোকে সে চিরকালের মত হারিয়ে গেছে, তার বাইরের আবরণ ঐ তুচ্ছ দেহখানা স্পর্শ করাও যায় না। গত আট বছরের অনেক উপেক্ষিত কান্না যেন ওর গলা পর্যন্ত ঠেলে এলো—আফজল ঘর থেকে শান্ত পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল।

লিখে দিলে ওর তালাকনামা—সংবাদে স্বীকৃতি লিখে জানাল কাজীকে। বিশ্বস্ত অনুচরের হাতে পাঠিয়ে দিল আলি আকবরের কাছে।

ফাতিমা কিছুই জানল না—শুধু নিস্তব্ধ রাত্রির বুকে অশ্বক্ষুরের চকিত শব্দ শুনে কান পেতে।

পূর্ণকুম্ভ

রতন দাসগুপ্ত
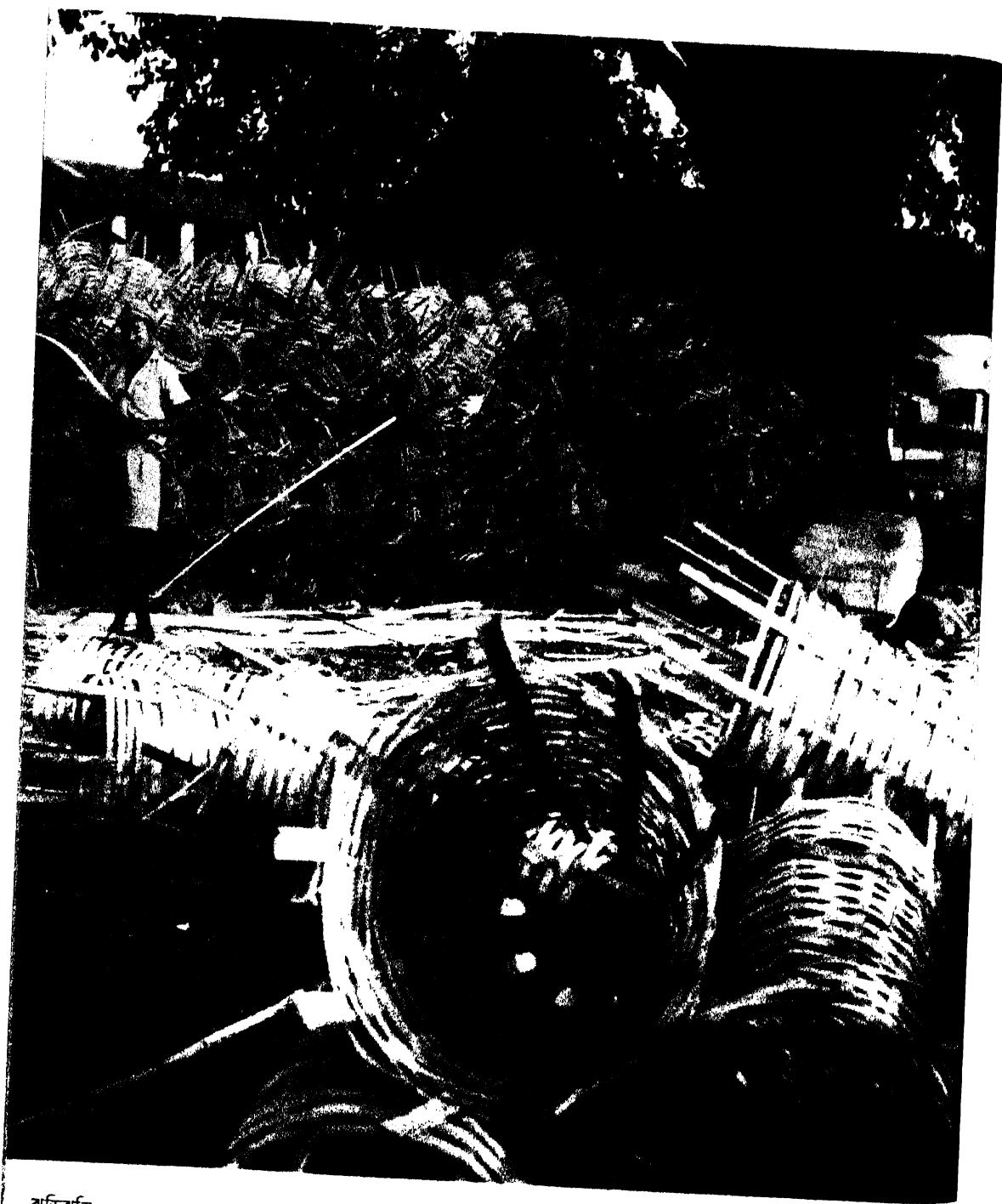
ঝুড়িঝুড়ি

শ্রীঅমলেন্দু সেনগুপ্ত

তখন সবে মাত্র ভোরের আলো ফুটেছে। সিঁদুর-লাল মেঘ উদয়-দিগন্তে। ঠাণ্ডা বাতাসে কনক চাঁপার সুরভি। রাস্তায় জল বর্ষণের কাজ চলেছে তখন, হোস্ পাইপের পট-পট শব্দ শোনা যায় অস্পষ্ট। বস্তীর চালায় মোরগ ডাকাডাকি করছে, গেরস্থকে জাগিয়ে। দিকচক্রে ছাড়া ছাড়া চিমনীগুলো থেকে ধোঁয়া উঠছে এঁকে-বেঁকে—কল-কারখানার নাভিশ্বাস উঠছে যেন। ময়লা-ফেলা লরী ছোটাছুটি করছে পথে পথে—এক থেকে অন্য ডাস্টবিনে গিয়ে থেমে পড়ছে। লরীর চাকা আর ইঞ্জিনের ঘর্ঘর ধ্বনিতে একেকটা পল্লী কেঁপে কেঁপে উঠছে। দুধওয়ালা আর খবর কাগজের পিওনদের তীর-গতি সাইকেলের সাবধানী ঘন্টার ক্রীং-ক্রীং আওয়াজে রাস্তার কুকুরের পাল বিরক্ত হয়ে আছে যেন।

কান পাতলেন একবার মাধবীলতা, বালিশে মাথা রেখেই। চোখে তন্দ্রাজড়তা। সারা দেহে আলস্যের অবসাদ। গুমোট গরমে সুখ-নিদ্রায় হয়তো ব্যাঘাত হয়েছে: বিজলী পাখার হাওয়া অসহ্য ঠেকেছে। সজাগ কানে মাধবীলতা শুনলেন, ছেলে তাঁর পড়ছে কি পড়ার টেবিলে! সূর্য উঠতে না উঠতে দিলীপ বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে প্রত্যহ। মুখে চোখে জল দিয়ে পড়া মুখস্থ করতে বসে একাগ্র মনে। পাশের ঘর থেকে শোনা যায় ছেলে পড়ছে, মাধবীলতা তখন নিশ্চিন্তায় আর এক ঘুম দেওয়ার চেষ্টায় থাকেন। আজ দিলীপের কন্ঠস্বর কিছুতেই যেন কানে আসে না। ছেলে কি তবে ঘুমিয়ে আছে এখনও! ছেলের ঘুম ভাঙ্গাতে নিজেই তিনি উঠে পড়লেন শয্যা ছেড়ে। খুব সাবধানে, অতি সন্তর্পণে। পাশেই দিলীপের বাবা নিদ্রামগ্ন, নাক ডাকছে ঘন-ঘন! হাইকোর্টের নামজাদা এ্যাডভোকেট দীপক মজুমদার—এখন কেমন শান্ত সুবোধের মত ঘুমিয়ে আছেন অকাতরে। মামলা, মকদ্দমা আর মক্কেল—এই ত্রিমকারের সাধনায় মিঃ মজুমদার আত্মমগ্ন। গভীর রাত পর্যন্ত পড়া-শুনা করেন, নথিপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেন। মক্কেলের সত্যপাঠ রচনা করেন—এ্যাফিডেভিট্ লিখতে হয় পার্টির পক্ষ থেকে। হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীতে মিঃ মজুমদার যেন অলৌকিক। তাঁর পসার অন্যের পক্ষে হৃদয়বিদারক। কয়েক হাজার মক্কেলের একমাত্র আশ্রয় তিনি। মামলার নথিপত্র দেখতে দেখতে আর জবাব লিখতে লিখতে একের পর এক সিগারেটের সংগে এক এক চুমুকে স্কচ্ হুইস্কি বিনা মিঃ মজুমদার এক কলমও লিখতে পারেন না। অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে যেন। মধ্য রাতের মৃদু-মন্দ নেশাটা যেন ঠিক এই ভোরের দিকেই জমাট বাঁধে। মিঃ মজুমদার একটু বেলায় ওঠেন তাই। ঘন্টাখানেকের মধ্যে স্নানাহার সেরে হাইকোর্টে চ'লে যান তাঁর ষ্ট্রীমলাইনড গাড়ীতে। গত সালে হাল্ ফ্যাশনের গাড়ী কিনেছেন আয়কর ফাঁকিয়ে। বিশাল বপু মোটর—স্টুডি বেকার, প্রেসিডেন্ট মডেল।

দুয়োর ঠেলতেই খুলে যায়। মাধবীলতা দেখলেন, ছেলে উঠেছে বিছানা থেকে, কিন্তু পড়ছে না। খোলা বই এক পাশে প'ড়ে আছে অনাদরে। দিলীপ টেবিলে মাথা রেখে ব'সে আছে, না ঘুমিয়ে আছে যেন বোঝা যায় না। তার মাথায় একরাশ কোঁকড়া চুল, পাখীর বাসার মত দেখায় যেন।

—দিলীপ। দিনের প্রথম আহ্বান-কথা। মাধবীলতার কথার সুরে মাতৃস্নেহের স্নিগ্ধ কোমলতা। এক ডাকে সাড়া মেলে না। আবার ডাকলেন,—দিলীপ।

মাথা তুললো ছেলে। নীল সার্টের আস্তিনে ঘুম-ঘুম চোখ মুছলো। কপাল থেকে সরিয়ে দিলো অবিন্যস্ত চুল। মা লক্ষ্য করলেন, ছেলের চোখ দু'টি লাল। মুখখানি যেন থম থম করছে। বললেন,—'পড়া যে বন্ধ আজ, কেন? রাতে ঘুম হয়নি!'

লজ্জা আর অপ্রস্তুততার ক্ষীণ হাসি দিলীপের রাঙা মুখে। বললে,—ঘুমিয়ে প'ড়েছি কখন, মনে নেই। কথার শেষে খানিক থেমে থেকে আবার বললে, কেমন মিহি কণ্ঠে,—জানলা দু'টো বন্ধ ক'রে দিয়ে যাও না মা। যেন শীত-শীত করছে। আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে যাও।

দিনে আলো জ্বলবে! মাধবীলতা ছেলের কথায় কান দেন না, ছেলের কপালে হাত রাখলেন ধীরে-ধীরে। মাতৃকরস্পর্শ কপালে, নরম ঠাণ্ডা হাত মাধবীলতার। তিনি কেমন আশঙ্কিত হয়ে উঠলেন যেন। বললেন,—তোমার কি জ্বর হয়েছে? কপাল যে গরম ঠেকছে আমার।

—না-না কিছু হয়নি। বেশ ভাল আছি আমি। কথা বলতে বলতে খোলা-বই সামনে টেনে নেয় দিলীপ, অবশ হাতে। বলে,—মাথায় শুধু একটু বেদনা, আর কিছু নয়।

—পড়তে হবে না তোমাকে, শুয়ে থাকো বিছানায়। কপালে হাত রেখে বললেন মাধবী-লতা। দুশ্চিন্তার রেখা ফুটেছে তাঁর চোখে-মুখে। ব্যথাহত কথার সুর।

—কিছু হয়নি, তবুও শুয়ে থাকতে হবে! বিরক্তির সঙ্গে প্রশ্ন করে দিলীপ। কেমন যেন খিট-খিটে মেজাজে কথা বলে!

—না দিলীপ, তোমার বেশ জ্বর হয়েছে। আমি ডাক্তারকে ডাকতে পাঠাই। কথা বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মাধবীলতা। অন্য দিন সকালে কত প্রসন্ন থাকেন, আজ যেন তিনি কেমন ব্যস্ত আর চিন্তিত হয়ে থাকলেন। কথায় কথায় অনাবিল হাসি আজ আর নেই।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো দিলীপ। দক্ষিণের জানালা দু'টো বন্ধ ক'রে দেয় একে-একে। চাকর কখন খবরের কাগজ দিয়ে গেছে পড়ার টেবিলে, খেয়াল হয়নি। একবার শুধু মুখে প্রথম পাতার শীর্ষে চোখটা বুলিয়েছে। সংবাদের শিরোনাম। চোখে পড়েছে, বড় বড় কালো অক্ষরে ছাপা: No alliance with the west—যার বাংলা-নুবাদ 'পশ্চিমের সংগে কোন আঁতাত নয়।' গণ-চীনের প্রতিভূ মাও-সে-তুং এই উক্তি ক'রেছেন। ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে বিছানায় আশ্রয় নেয় দিলীপ। মাথাটা দপ্-দপ্ করছে কেমন। গায়ে যেন বেদনাবোধ।

মায়ের মন। স্নান-ঘর থেকে বেরিয়ে পরিচ্ছন্ন পোষাকে আজ আর পূজা-ঘরে গেলেন না মাধবীলতা। ক'বার মনে মনে ইষ্টমন্ত্র আউড়ে নিলেন। কপালে দুই হাত ছুঁইয়ে প্রণাম জানালেন আকাশ-প্রান্তে নতুন সূর্যকে। ছেলের ঘরে গেলেন অন্য কাজ ফেলে। আস্তে-আস্তে দুয়োর খুলতে দেখলেন, দিলীপ শুয়ে আছে খাটের বিছানায়। আবক্ষ ঢেকে দিয়েছে চাদরে। মাধবীলতা এক লহমায় দেখলেন, ছেলের মুখ যেন সাদা, রক্তহীন। চোখের চাউনিতে যেন জোর নেই। দিলীপ তাকিয়ে আছে খাটের কারু-কাজে। অপলক একদৃষ্টে দেখছে, কিন্তু দেখছে না কিছুই। জ্বরের উত্তাপে হয়তো স্বভাব-শক্তি হারিয়ে ফেলছে প্রতি ক্ষণে।

—ডাক্তারকে টেলিফোন ক'রেছি। কথার শেষে ছেলের শিয়রের কাছে এসে দাঁড়ালেন

মাধবীলতা। দিলীপের কপালে ঠাণ্ডা হাত রাখলেন। সদ্যস্নাতা তিনি, সুগন্ধ তেল আর সাবানের মেশানো এক মৃদু গন্ধের আভাষ আসে তার সঙ্গে সঙ্গে। বললেন,—লক্ষ্মী ছেলের মত চুপটি করে শুয়ে থাকো। লেখা-পড়া থাক।

দিলীপের বিছানার আশেপাশে পাঠ্য বই—ফিজিক্স আর কেমিষ্ট্রির নানা রকমের বই। অঙ্কের আর গ্রাফের খাতায় হরেকরকমের নক্সা। কলেজের নোট।

দরজা খোলার শব্দ হ'তেই ফিরে তাকালেন মাধবীলতা। দেখলেন সেই ফুটফুটে মেয়েটা এসেছে সাতসকালে। পাশের বাড়ীর মেয়ে। কুমারী কিশোরী।

—মাসীমা, কি হয়েছে দিলীপের? ঘরের অসুস্থ আবহাওয়া দেখে শুধালো তনিমা। মা আর ছেলেকে দেখলো ব্যগ্রচোখে। বললে,—অসুখ না কি?

—হ্যাঁ মা, মনে হচ্ছে জ্বর হয়েছে। ডাক্তারকে তো ডেকেছি। মাধবীলতা কেমন যেন মনমরা সুরে বললেন। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন,—তনিমা, তুমি এসেছো ভালই হয়েছে। দিলীপকে গল্পের বই পড়ে শোনাও, যদি ওর ভাল লাগে। আমি যাই তোমার কাকাবাবুর খাওয়ার ব্যবস্থাটা সেরে আসি। কোর্টের টাইম তাঁর আবার।

বইয়ের দেরাজের কাছে এগিয়ে যায় তনিমা। সারি সারি বই এক এক তাকে। দেশী আর বিদেশী লেখকের লেখা। আড়া-আড়ি দৃষ্টিতে বইয়ের নাম পড়তে থাকে তনিমা। দেখতে দেখতে বলে,—কি বই পড়বো, তুমিই বল।

যে শুনবে তার যেন শোনার ইচ্ছা নেই। সামান্য কৌতূহলের সঙ্গে দিলীপ চোখ ফিরিয়ে দেখলে তনিমাকে। আজ কেমন দেখতে হয়েছে তনিমাকে। কোন্ রঙের শাড়ী পরেছে। দেখলো, তনিমার আলুথালু চুল, আলগা খোঁপা পিঠে ঝুলছে। ঘুমভাঙা চোখ যেন তনিমার।

তনিমা বললে,—নেপোলিয়নের জীবনী শুনবে? সেক্সপীয়রের নাটক? চার্লস ডিকেন্সের উপন্যাস?

—উঁহুঁ। এপাশে ওপাশে মাথা দোলায় দিলীপ। অসম্মতি জানায়। অবশ হাতে, এক মনে চাদরের এক কোণ পাকাতে থাকে। চোখের দৃষ্টি যেন শক্তিহীন।

—রবীন্দ্রনাথের কবিতা? শরৎচন্দ্রের কোন গল্প?

—না।

—তবে কি বই শুনবে? জেমস জীন, এইচ্ জি ওয়েলস্, এডিসনের জীবনী?

—হ্যাঁ। তোমার যদি ইচ্ছা হয় পড়ে শোনাও।

তনিমা এক ঝলক খুশীর হাসি হাসলো। একটা বাঁধাধরা সুরে আর গতিতে পড়তে শুরু করলো বৈজ্ঞানিক এডিসনের জন্ম-বৃত্তান্ত। পাতা দুই পড়ার পর বই থেকে চোখ তুলে তনিমা দেখলো, শ্রোতা অন্যমনা। কেমন যেন অনাসক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অন্যদিকে। দিলীপের চোখের তলায় কালি। পাংশু বর্ণ।

—ভাল লাগছে না শুনতে? তনিমা জিজ্ঞাসা করলো। বললে,—বই রেখে মাথায় হাত বুলিয়ে দেবো?

হ্যাঁ কিম্বা না কিছুই বলে না দিলীপ। আচ্ছন্নের মত মুক্ত চোখ বন্ধ করলো। মাথার বেদনা কি কষ্টকর আর অসহ্য! অন্য দিনে তনিমাকে দেখলে আনন্দে কথা হারিয়ে ফেলে। আজ আর চোখ নেই তনিমার দিকে। সে যেন অপরিচিতা।

তনিমার বুক দুরদুর করে এলোমেলো ভাবনায়। ভয় ভয় করে কি এক আশঙ্কায়। নিশ্চুপ ব'সে থাকে সে রোগীর মুখে চোখ রেখে।

—ডাক্তারবাবু এসেছেন।

দুয়োর ঠেলে ঘরে ঢুকলেন মাধবীলতা। তাঁর পেছনে ডাক্তার আর মিঃ মজুমদার। দিনের প্রথম চুরুট ধরিয়েছেন এ্যাডভোকেট সাহেব। তাঁর স্লিপিং গাউনের রেশমী কোমর-বন্ধ শিথিল হয়ে আছে। ঘন ঘন ধোঁয়া ছাড়ছেন তিনি। দামী চুরুটের গন্ধ ভাসছে সারা বাড়ীতে।

জ্বর পরীক্ষা করলেন ডাক্তার। রোগীর মুখের ভেতরে খানিক মিটার রেখে কাচকাঠি আলোয় তুলে ধরলেন।

মাধবীলতা বললেন ব্যগ্র-আকুল সুরে,—কি দেখলেন? জ্বর আছে?

ওপরে নীচে মাথা দোলালেন ডাক্তার। বললেন,—হ্যাঁ, জ্বর আছে। প্রায় একশো দুইয়ের কাছাকাছি। তবে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আমি তিন রকম ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি। এক এক ঘণ্টা অন্তর এক একটা খাবে। লিখে দিচ্ছি কখন কোন্‌টা খেতে হবে।

কথা বলতে বলতে ডাক্তার চামড়ার হাত-ব্যাগ খুললেন। তিন রকমের শিশি থেকে প্রায় এক ডজন ক্যাপসুল বের ক'রে দিলেন। তিন রঙের ওষুধ, তিনটি ছোট খামে ভ'রে দিলেন। তারপর নিজের নাম আর রেজিঃ-নম্বর ছাপা প্যাডে নির্দেশ লিখতে থাকলেন অপাঠ্য হস্তাক্ষরে। লিখতে লিখতে বললেন,—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে। কিছু ভয়ের নেই। জ্বর একশো চার ডিগ্রী উঠলেও ভয় নেই। তবে এ রোগ ছোঁয়াচে, তাই সাবধান হ'তে হবে।

তিন রকমের তিন রঙা ক্যাপসুল। একটিতে জ্বরের মাত্রা কমবে, একটি পেটের জন্য জোলাপ, একটি অম্লনাশক।

ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে মিঃ মজুমদার আর মাধবীলতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। যদি কোন' গোপন কথা থাকে ডাক্তারের, মাধবীলতা ব্যাকুল হয়ে থাকেন। যদি একটা খারাপ কিছু বলেন। কোন অমঙ্গলের আভাষ শুনিয়ে যান যদি।

—আজ আর খেতে দেবেন না ওকে, ডাক্তার করিডরে বেরিয়ে বললেন। মিঃ মজুমদার দর্শনীর দক্ষিণাটা ডাক্তারের এক পকেটে রেখে দিলেন। যেন তাঁর নিজেরই পকেট।

প্রথম ওষুধ খাইয়ে দেয় তনিমা। জল আর ওষুধ। একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বিছানার পাশে বসে। অনেক চেষ্টাতেও মুখের ভয়ার্ত ভাব যেন কাটিয়ে উঠতে পারে না। তবুও ঢাকতে চেষ্টা করে। তার হাসি-উচ্ছলতায় যদি সাড়া দেয় দিলীপ। একটু যদি হাসে অন্য দিনের মত।

—তুমি এখন যাও। কথা বললে দিলীপ, ক্ষীণ কণ্ঠে। মুখে যেন তার চরম অনাসক্তি।

—কেন? তনিমা শুধালে শঙ্কিত হয়ে। বললে,—আমি যাবো কেন? কোথায় যাবো?

—বাড়ী ফিরে যাও। এখানে আর থেকো না। শুনলে না, ডাক্তার বললেন, এ অসুখ ছোঁয়াচে। কথা বলতে যেন কষ্ট হয় দিলীপের। ঘরের কড়িকাঠে চোখ তুলে চেয়ে থাকে।

—তা হোক। আমি যাবো না এখন মাসীমা যতক্ষণ না আসছেন। তুমি এখন ঘুমাও, লক্ষ্মীটি।

—ঘুম যে আসছে না। কেবল আজেবাজে ভাবনা আসছে মনে। দিলীপ বিরক্তির সঙ্গে বললো। চাদর টেনে ঢেকে ফেললো পা থেকে বুক।

—ভাবনা ছেড়ে ঘুমিয়ে পড়। তোমার অসুখ, ভারী বিশ্রী লাগছে আমার। কিছু ভাল লাগছে না। তনিমা মিহি মিষ্টি সুরে কথাগুলি বলতে বলতে দুয়োরে চোখ ফেলে বার বার। পাছে কেউ শোনে তার মনের কথা।

—আর কত দেরী আছে? কেমন অনর্থক প্রশ্নটা, করুণ চোখে তাকিয়ে বলে দিলীপ। সে কি বলতে চায়, যেন বোঝা যায় না ঠিক।

—কিসের দেরী? কি বলছো তুমি? সভয়ে বলে তনিমা, কাঁপা কাঁপা সুরে।

—আমি হয়তো আর বাঁচবো না।

—ছি, এমন কথা বলতে নেই।

দিলীপ শুনেও শোনে না। কথার শেষে চোখ দুটিকে বন্ধ করলো অতি ধীরে ধীরে।

মাধবীলতা আবার ঘরে আসেন বিষণ্ণ মুখে। ডাক্তার অভয় দিয়ে গেলেন বৃথাই। মনে মনে দেবদেবীদের নাম স্মরণ করেন। একমাত্র ছেলে তাঁর, বংশের উত্তরাধিকারী—ভয়ে কেঁপে সারা হয়ে যান মাধবীলতা। ছলছল চোখে বললেন, কি বলছে দিলীপ?

তনিমা বললে শোনা কথা কটা। দিলীপের মুখের কথা। শুধু একটু অমঙ্গলের কথা শুনে মাধবীলতা গালে হাত দিলেন।

—মৃত্যু এত সহজে আসে না। মিঃ মজুমদার কখন এসেছেন, কথা বললেন পিছন পাশ থেকে। বললেন,—মৃত্যুর পদক্ষেপ অতি ধীরে ধীরে। অনেক অপেক্ষা, অনেক প্রতীক্ষার পর মরণ আসে চুপি চুপি। আমি তোমার বাবা এখনও মলাম না যে।

—ওগো, থাক এ সব কথা। মাধবীলতা কথা বললেন কম্পিতকণ্ঠে। বললেন,—দিলীপ এমন কত বাজে কথা বলে যখন তখন, ছেড়ে দাও ওর কথা।

বাবার কথায় মন যেন সায় দেয় না ছেলের। বীতস্পৃহের মত ফ্যাল ফ্যাল তাকিয়ে। খাটের পায়ার দিকে নিবদ্ধ চাউনি। দেহযন্ত্রণার চিহ্ন ফুটেছে মুখে। কি যেন ভাবছে। দুর্ভাবনা।

—তোমরা এখান থেকে যাও। একা থাকতে দাও আমাকে। অসুখ যে ছোঁয়াচে। দিলীপ কথা বললে কারও দিকে না ফিরে। খাটের পায়া দেখছে তো দেখছেই এক নজরে।

তনিমার বুক দুরু দুরু করে। বিজলীর ক্ষীণ আঘাতের মত দুঃখের একটা বিশ্রী অনুভূতিতে কেঁপে কেঁপে ওঠে তার সর্বদেহ।

(ইহার পর ১৫৯ পৃষ্ঠায়)
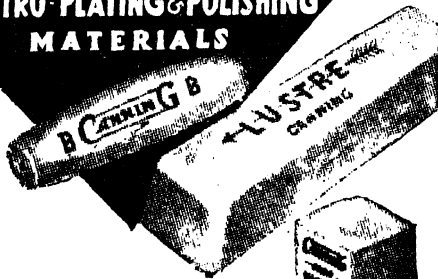
ছেলেটির উৎসাহে প্রোজ্জ্বল মুখখানির দিকে চেয়ে সস্নেহে হাসলেন তিনি। বললেন—কাল সকালেই যাব। তুমি আর আমি।

—শুধু আমরা দু'জন? আর কেউ থাকবে না?

—তুমি কি চাও, আরো কেউ থাকুক?

—আপনি পথ চেনেন?

এক সময় এমনি ধারা বনে জঙ্গলেই দিন-রাত কেটেছে আমার। চাটগাঁর হিল-ট্র্যাক্টস। বিষ্টিতে ভেসে আসছে সাপ, জোঁক, ম্যালেরিয়া। পেছনে পুলিশ। তখন কিন্তু আমি বিপদের ভয় করিনি।

এই বিখ্যাত মানুষটির মুখের কথা শুনতে শুনতে শ্রদ্ধায় বিগলিত হলো তরুণ ছেলেটির হৃদয়। বললো—আজ তাহলে বিশ্রাম করি। কেমন?

ছেলেটি শুতে গেল পাশের ঘরে। তার গুন্‌গুন্‌ গান শুনতে শুনতে তিনি ঘুমের ওষুধ খেলেন। এমনি গান গলায় আসে কখন? যখন মানুষ তরুণ থাকে। তারুণ্যের আত্মবিশ্বাস-ই এই গানের উৎস।

চাকর মাসাজ করে গিয়েছে। সিল্কের পাজামা পরে পালঙ্কের বিছানায় শুয়ে আছেন তিনি। সম্মানী অতিথি। সমাদরেও তাই রাজসমারোহ। কোনও ত্রুটি রাখেননি চা-বাগানের মালিকটি। তবু ঘুম আসতে দেরী হলো। ঘুম বড় মূল্যবান তাঁর কাছে। এবং দেশবাসীর কাছে-ও। কাল দুপুরে যাবেন গ্রামমন্ডলীর গ্রন্থাগার উদ্বোধন করতে। বিকেল তিনটের প্লেন ধরবেন। তিন ঘন্টার ব্যাপার। রাত আটটায় হোটেলে বিদেশী অতিথিদের সম্বর্ধনা সভা। রাত দশটায়? শর্মিলা তালুকদারের ঝকঝকে হাসিটা মনে পড়লো। শর্মিলার সঙ্গে তাল দিতে দিতে রাত এগারোটা বাজবে। তাঁকে ভর করে সাংস্কৃতিক জগতে পা বাড়াবার ইচ্ছে হয়েছে শর্মিলার। দুটি ছেলে দেরাদুনে পড়ে। স্বামী গিয়েছেন ফ্রান্সে। ভারত সরকারের প্রতিনিধি হয়ে। তাঁর চেহারা দেখে, ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে শর্মিলা তালুকদার ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন।

তবু ঘুম এলো না। তাঁর ঘুম চুরি করেছে ঐ তরুণ আদর্শবাদী ছেলেটি।

নিজেকে তিনি তরুণদের দলেই ফেলেছেন। তাই ছেলেটি যখন দেখা করতে এলো, আশ্চর্য হননি। না হয় সোনামুড়া থেকেই আসছে। তাঁর সঙ্গে একবার আলাপ করবার জন্যে, বা কথা কইবার জন্যে। কলকাতায়ই কি মানুষে কম কষ্ট করে?—ব্যক্তিপূজার দিন বিগত।—এ কথা বলে তিনি নিজেও কতবার বক্তৃতা দিয়েছেন। তবু, অস্বীকার করতে পারেন না, তিনি নিজের বিষয়ে ব্যক্তিপূজার উৎসাহী সমর্থক। সচেতন মনে ব্যাপারটাকে স্বীকার করতে বেধেছে। ওরা আসে, ওরা উৎসাহ চায়, ওরা শ্রদ্ধা করতে চায়—এই সব বলেছেন আশপাশের মানুষকে। প্রথমে মনে বিঁধতো। মনে হতো প্রবঞ্চনা করছি। নিজেকে এবং পরকে। আজ আর বাধে না। ক্রমে ক্রমে কথাগুলোকে বিশ্বাস করতে শিখেছেন।

ছেলেটি কিন্তু এলো সম্পূর্ণ অন্য বক্তব্য নিয়ে। বললো—কথা আছে আপনার সঙ্গে। অনেক প্রশ্নের জবাব চাই।

—রিপোর্টার? এখানে-ও?

—প্রতিনিধি বলতে পারেন।

—কাদের?

—অনেক মানুষের। যারা আপনাকে বিশ্বাস করেছে, সমর্থন করেছে,—আর আজকে যাদের আপনি বিভ্রান্ত করেছেন।

এ ধরণের কথা শুনতে তিনি অভ্যস্ত নন। দীর্ঘছন্দ দেহটি ঈষৎ ঝুঁকিয়ে, কপালের রুক্ষচুলটি সরিয়ে তিনি মোটা কাঁচের চশমার ভেতর থেকে তীক্ষ্ন নজর করলেন। কে হতে পারে? কি নাম? চা-বাগানের মালিক ভদ্রলোকটি বললেন,—কে তোমাকে আসতে দিলো? আবার এসেছো তুমি?

—ওর সঙ্গে দেখা করতেই হবে আমার।

—উনি সামান্য বিশ্রামের জন্যে এসেছেন।

—তোমার এই সব আবোল-তাবোল বকুনি ...তিনি হাসলেন। বললেন,—

—কি নাম ভাই তোমার?

—অমলচন্দ্র বসু।

সাধারণ নাম। সাধারণ ছেলে। তিনি আবার সুন্দর হাসলেন। বললেন,

—সান্যাল মশাই, আপনি ঘুরে আ[সুন]। আমি আলাপ করি অমলের সঙ্গে।

ঘাড় ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লেন সান্যাল। তাঁর চা-বাগানে গোলমাল হয়েছে। কমিশন আসছে তদন্ত করতে। তাঁদের আনতে যেতে হবে। বলে গেলেন,

—পুরোদিনটা রইলো আপনার। বিশ্রাম করবেন কিন্তু। কাল আপনার অনেক কাজ।

বাংলো ছেড়ে বাগানে নেমে এলেন তিনি। ঝাউগাছের নিচে বেতের চেয়ার ছড়ানো। কাঁচের চৌবাচ্চায় অনেকগুলো মাছ খেলা করছে। ঠিক খেলা করছে না। বড় মাছটা বেগে ছোটগুলিকে তাড়া করছে। মালীটা খাবার পোকা ছড়াচ্ছে। লাল, সোনালী, কালো মিশমিশে পাংলা ডানাওয়ালা মাছ। দেখে দেখে কে বলবে ওদের মধ্যে চলেছে অদ্ভুত এক মারণনীতি। ছোট মাছগুলি প্রাণভয়ে ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, আর দর্শকজনের মনে হচ্ছে সুন্দর লীলায়িত এই সফরীখেলা। কাঁচের বেড়া টপকে চলে এসেছে বড় মাছটা। তার রাক্ষুসে হাঁ-টা দেখেও নির্দোষ এক গীতছন্দ ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না। এই যে পরস্পরকে সংহার করে সামঞ্জস্য রক্ষা করছে জীবজগৎ, এ সম্পর্কে ছেলেটিকে কিছু বলতে চাইলেন তিনি। এখানে-ই তাঁর বৈশিষ্ট্য। এমনি সব ছোট ছোট জিনিষ নিয়ে এমন সুন্দর কথা কইতে পারেন! সে কথা শুনতে-ই বা কতো লোকের আগ্রহ।

কিন্তু ছেলেটি তো শুনতে চায় না। বলতে চায়। নিঃশ্বাস ফেলে সিগারেট হাতে বেতের চেয়ারে ডুবে গেলেন তিনি। ছেলেটি কথা কইতে সুরু করলো। অনেকদিনের বক্তব্য জমেছিলো বোধ হয়। সুন্দর সুন্দর সাজানো মনরাখা কথা নয়। আবেগে জড়িয়ে গেলো গলা। উৎসাহে কেঁপে উঠলো কখনো। আন্তরিকতায় উত্তপ্ত কথাগুলি তাঁর মনের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো। শুনতে শুনতে মনে হলো, তাঁর মনের অনেক ভিতরে সে-ই যে একজন ঘুমিয়েছিলো, সে-ই জেগে উঠছে। সে কি তিনি? সেই মানুষটার টাকাপয়সা ছিলো না। ছিলো নিষ্ঠা, প্রেম, আবেগ। দীপ্ত আদর্শবাদের বাণী হৃদয়ে বহন করে সেই মানুষটি কতো দুর্গম ও বন্ধুর পথে, বনে,

জঙ্গালে ঘুরে ঘুরে কাটিয়েছে। কারাবরণ করেছে। দশজনের দুঃখ ভাগ করে নিয়ে এগিয়ে গিয়েছে সংগ্রামের পথে। সেই মানুষ এমনই লম্বা ছিলো। রোগা, ফর্সা, আধময়লা জামাকাপড় পরে সে ফুটপাথ আর বেঞ্চিতে শুয়েও কাটিয়েছে কতো রাত। সে কি তিনি? ছেলেটি বলে চললো.

......আপনাকে আমরা বিশ্বাস করেছি। ভালোবেসেছি, আপনি ছিলেন দল আর গোষ্ঠীর বাইরে। স্বার্থ-চিন্তাকে আপনি ঘেন্না করতেন। হুজুরীমল লেনের বাসায় যখন আপনি আর শঙ্কর দত্ত ছিলেন...শঙ্করের টি-বি হলো...সেই যে কাগজে লিখলেন...লেখক নন। তবু প্রয়োজনে ত' চিরকালই আপনি কলম ধরেছেন......

সব কথা তাঁর কানে যায় না। ঊনিশ-শো ত্রিশ না একত্রিশ সে-টা? শঙ্কর...শঙ্কর...সেই মেয়েটির কি হলো? শঙ্করের যাকে বিয়ে করবার কথা ছিলো? কি যেন নাম ছিলো তার? বীণা! শঙ্কর-কে যে দেখতে আসতো হাসপাতালে? শঙ্কর মরলো বলতে গেলে বিনা-চিকিৎসায়। চল্লিশ টাকা! চল্লিশটা টাকা সেদিন তাঁর কাছে ছিলো স্বপ্ন। বড় সুন্দর দেখতে ছিলো বীণা। আর মস্তো প্রতিভা ছিলো শঙ্করের। নেধানো ভাল ছিলো! একটি সুন্দর মেয়ের প্রেম আর বন্ধুবান্ধবের সেবা. কিছুতেই বাঁচানো গেল না শঙ্করকে। তারপরে বীণা তাঁর কাছে কতোবার এসেছে! আজ তাঁর কাছে চাল্লিশ টাকার কোন দাম-ই নেই।

অমলের কথা শুনতে শুনতে তাঁর মনে হয় বুকে যেন আবার ধাক্কা লাগলো। এতদিনের কথা শুনে তাঁর কেন মন খারাপ হলো? তাঁর হলো, না পঁচিশ বছর আগেকার সেই মানুষটির হলো মন খারাপ? না কি তিনি আর সে একই মানুষ?

অমল বলে .... এমন করে আপনাকে বলবার কোন মানেই না কি হয় না' ওরা বলে আমি নাকি পাগল। মাথায় আমার ছিট আছে। হয়তো আছে। বুঝি না। তবু মনে হয়, একটা মানুষ, যে ছিলো আমাদের মুখপাত্র, যাকে আমরা বিশ্বাস করতাম, তাকে কিছুতেই হারাতে পারবো না। আপনি-ও এর-ওর তার মতো স্বার্থ ছাড়া কিছু ভাববেন না—নীতির বালাই রাখবেন না—সুবিধে মতো দল বদলাবেন—তা কিছুতেই হতে পারে না। টাকা...অনেক টাকা ত' করেছেন...বলুন, টাকাই কি সব?

মোটা কাঁচটা মুছে নিয়ে তাকান তিনি। ঘাড় নেড়ে জানান, না। টাকা সব নয়। অমল এগিয়ে আসে। বলে,

—আমাকে ওরা বলে পাগল। আপনাকে এ সব কথা এমনভাবে বলবার কোন মানেই হয় না। সত্যিই কি আমি পাগল? আমার মনে হয়, আপনি যে ভুল করছেন তা যেন আপনি নিজেও জানেন না। জানলে কি ভুল করতেন?

উস্কোখুস্কো চুল। ঘাম চিক্‌চিক্ করছে মুখে। অমল বলে,

—চারিদিকে শুধু বিশ্বাসঘাতকতা। এ ওকে ঠকাচ্ছে...ও তাকে ঠকাচ্ছে...দেখে দেখে যে কি রকম লাগে। মনে হয় অন্যায়ের সঙ্গে এত আপোষ করে মানুষ বাঁচে কি করে?...

এখন, এই রাত দুটোয়, সিল্ক নেটের মশারির ভেতর শুয়ে শুয়ে ছেলেটির কথা মনে করতে করতে সামান্য ঘুম নামলো চোখের পাতায়। ওষুধের নেশায় চোখ বুজে আসছে। তবু মনটা কি ঘুমোচ্ছে? না তো। মনে যেন ভয়। কাকে ভয়? ঐ ছেলেটিকে। একটা আধাক্ষ্যাপা ছেলেকে? হ্যাঁ, তাকেই। কেন? কেন না সে তাঁর ফাঁকি ধরে ফেলেছে। তাঁকে দেখে যারা বিভ্রান্ত হয়, ও তাদের দলে নয়। ওর চোখে তিনি নিজের পরাজয় দেখতে পাচ্ছেন। এমনি অনেক মানুষ তাঁকে অবিশ্বাস করে। অশ্রদ্ধা করে। লোকের শ্রদ্ধা আর বিশ্বাসই তাঁর পুঁজি। সেখানেই যখন ফাঁকি ঢুকলো তখন তাঁকে খুব তাড়াতাড়ি অবহিত হতে হবে। সেই ছেলেটার মুখ কি রকম যেন? তাঁর পঁচিশ বছর আগেকার চেহারাটার মতো। সেই মানুষটা তাঁর মন ছেড়ে যেন বেরিয়ে এসেছে। বেরিয়ে এসে একটা বেতের চেয়ারে বসেছে। বসে তাঁকে কি বলছে। সেই ছেলেটার মতো ঝুঁকে ঝুঁকে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁকে বলছে...বাঁচবার উপায় হলো মাথাঝাড়া দিয়ে ওঠা। মেরুদণ্ড তুলে দাঁড়ানো। চোরা কণ্ট্রাক্‌টগুলোর লোভ ত্যাগ করা। একটা অকৃতদার মানুষের পক্ষে যা দরকার তার অনেক বেশী তুমি পেয়েছো। শেষ কটা দিন সুন্দরভাবে বাঁচতে চেষ্টা করো। সমুদ্রের ধারে চলে যাও। পাহাড়ে যাও। দেশে দেশে ঘোর। যা হয় করো।

সেই কথাগুলো তিনি শুনেছেন কি? না বোধ! শুনতে শুনতে তাঁর চোখ চলে যাচ্ছে সেই মাছটার দিকে। যে কাঁচের দেয়াল পেরিয়ে ছোট মাছগুলোকে গিলে চলেছে। সুন্দর ও শোভনভাবে একটা হিংস্র কাজ করছে।

একটা ভয়াল মাছের মতোই হাঁ করে অশান্ত অন্ধকার এসে তাঁকে গ্রাস করলো। ঘুমোলেন তিনি। কিন্তু ঘুমের মধ্যেও অস্বস্তির অনেক কাঁটা বিঁধতে লাগলো তাঁকে। এই নিরন্ধ্র আঁধারটার মুখের মধ্যে যেন ঘুমোচ্ছেন তিনি, আর বিঁধছে তারই অদৃশ্য সব দাঁতে।

সকাল হয়েছে অনেকক্ষণ। ঘন সবুজ গাছের ছায়ায় ছায়ায় সুঁড়িপথ ধরে তাঁরা দুজন চলেছেন। অনেক কথা হয়েছে। অমলের মন এখন খুব প্রসন্ন। তার কাছে কথা দিয়েছেন তিনি। আর এমন করে আলেয়ার পেছনে ছুটবেন না। ফিরে আসবেন। আগের মতো হবেন। কেমন করে যে হবেন, কোথা থেকে যে সুরু করবেন সে সব কথা হয়নি। হয়েছে শুধু হৃদয়ের কথা। সেখানে আবেগটাই বড়ো। সত্য ভাষণই আসল কথা। অমলের মনে হচ্ছে মনটা তার হালকা হয়ে গেল। শেষ অবধি যে তার শুভবুদ্ধির জয় হলো, সে জন্য নিজের ওপর বিশ্বাস তার ফিরে এসেছে।

তাঁকে খুব চিন্তাকুল দেখাচ্ছে। বুড়িয়ে গিয়েছেন যেন। এ সব পথ নেহাত খুব জানা, তাই এগিয়ে চলেছেন নিশ্চিত পদক্ষেপে।

ছেলেটি বলে—আর কতদূর?

জবাব দেন না তিনি। বন্যজন্তু যেমন জলের গন্ধ ঠাহর করে করে পিপাসার সময়ে এক লক্ষ্যে চলে, তেমনই এগোচ্ছেন তিনি। যা খুঁজছেন, এখনো পাচ্ছেন না। আর কত দূর? না কি বিশ পঁচিশ বছরের ব্যবধানে সবই বদলে গেল?

না। পাওয়া গেছে নদীটা। আজ সারা সকাল শুধু তাঁর যৌবনের দিনগুলির গল্প হয়েছে। সেই দিনগুলির সঙ্গে নদীর এই জায়গাটুকুর অনেক স্মৃতিই জড়ানো। এখন আবার সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি নিঃশ্বাস নিলেন বুক ভরে। বললেন—দেখ।

ছোট নদী। এখানে এসে পাথরে পাথরে প্যাক খেয়ে ঢালুর দিকে নামছে গমগম শব্দ করে। নদীর ওপর ঝুঁকে পড়েছে জামগাছের ডালপালা। অমলের চোখে হয়তো একান্ত পরিচিত এ দৃশ্য। আবার নতুন করে সে মুগ্ধ হলো। তিনি যখন মুগ্ধ হচ্ছেন, তখন তাঁর চোখ দিয়ে অমল আবার দেখলো। সেও বললে—চমৎকার!

এখন প্রত্যেকটি পদক্ষেপ তাঁকে মেপে মেপে ফেলতে হবে। জলে নামলেন তিনি। অল্প জল। দুরন্ত স্রোত। জামগাছটার ডালটা হাতে ধরে অমলকে বললেন—ওপারে যাই চলো।—বলতে না বলতে পা পিছলে গেল। অস্ফুট আর্তনাদ আর মুখের ভয়ার্ত ছবি দেখে আর কিছু ভাবলো না অমল। সেও লাফিয়ে নামলো জলে। আর এই শ্যাওলা পেছল পাথরে লাফিয়ে নামাই বেয়াকুবি। সেই ভুলই করলো অমল। চীৎকার করবারও সময় হলো না। বে-কায়দায় পা পিছলে জলের সঙ্গে পাকাতে পাকাতে একেবারে সাত ফিট নিচে; আর ওরকম জায়গায় সাত ফিট উচ্চতাটাও মারাত্মক।

জামগাছের ডাল ধরে কোন মতে ওপরে এসে ঘাসের ওপর পড়ে গেলেন তিনি। সাঁতার জানে না, তবু যে অমল লাফাবেই তাঁকে বাঁচাতে, তা তিনি জানতেন এবং তাই জেনেই চেঁচিয়েছিলেন। তবু ঘামতে লাগলেন দরদর করে। ভেজা গা দিয়েই ঘাম বেরুতে লাগলো। তারপর উঠে ছুটতে সুরু করলেন। গাড়ী ছিলো অনতিদূরে। ড্রাইভার ছিলো টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে চাকর ছিলো। তারা ছুটে এলো। আরো আরো মানুষ এলো। তোলপাড় হলো জল। পাথরের আঘাতের চেয়ে অনেক মারাত্মক জলের একটা চোরাপাক।

—এ অঞ্চলে ও চোরাপাক বিখ্যাত। তবু ছেলেটি নামলো কেন?

—আমাকে বাঁচাবে বলে।

—পাগল, না বোকা?

—চিরকালই ক্ষ্যাপাটে।

তিনি এত ভেঙে পড়লেন যে, তাঁকে সামলাতে সান্যালমশাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কোথায় কে আছে ছেলেটির? আত্মীয়স্বজন? মুঠো মুঠো টাকা দিলেন বের করে। যা হয় কিছু একটা করা হোক। একটা সিমেন্টের ফলক। একটা কিছু। অমলের মৃত্যুর দুই ঘণ্টার মধ্যেই এ সব ব্যবস্থার কথা শুনতেও খারাপ লাগলো ডাক্তারের। তবু অভিভূত হলেন। যিনি চলেই যাবেন সন্ধ্যার কলকাতা—তাঁর এ রকম দূরদর্শিতা, সহৃদয়তা,—আবার মনে হলো, এই সব গুণের জন্যেই তো তিনি বিখ্যাত! একটি মানুষের মধ্যে এতখানি মহত্ত্ব—কেমন করে যে সম্ভব হয়। অমলের জন্যে তাঁর শোকই বা কি নিদারুণ! সাধারণ ছেলে অমল, তাঁর মুখের টুকরো টুকরো কথায় হয়ে উঠলো

([illegible] ১৫৯ পৃষ্ঠায়)

মুগ্ধ হয়ে গেছে মৃণ্ময়।

বনলতার রূপ আছে সত্য। কিন্তু রূপে সে অনন্যা নয়। অনন্যা প্রেমে। এমন করেও কি কোন মেয়ে পুরুষকে ভালবাসতে পারে! মৃণ্ময়ের বিস্ময় বাড়ে যত—মুগ্ধতা ততই।

এই মুগ্ধতা যে কী—তা অনেক করে ভেবে দেখেছে মৃণ্ময়। না, ফুল ছেঁড়ার টান এ নয়—এ শুধু ফুল দেখার—সুবাস পাবার অভিলাষ। তাই সপ্তাহের একটি বিশেষ দিনের পথ চেয়ে সে থাকে—যেদিনে বনলতার কাছে সে যাবে। তাকে সংগে নিয়ে যাবে সেই হাসপাতালে। আর উন্মুখ হয়ে থাকবে—যদি একটু কোন কাজে লাগে বনলতার। সংগোপনে সে এগিয়ে রেখেছে নিজেকে একটু ক্ষীণ ইসারার লোভে—যদি বনলতা বলে,—আমার ঐ কাজটা এখনো বাকি, সময় পাচ্ছি না। মৃণ্ময় কৃতার্থ চিত্তে সেই বাকি কাজটুকুর দায় ঘাড় পেতে নেবে। ব্যস্—ঐটুকুই। বনলতাকে নিয়ে মৃণ্ময়ের আর কোন চাওয়াই নেই। তার বেশী চাওয়া কল্পনায়ই আসে না।

খুব কম দিনই চিনেছে বনলতাকে। চিনেছে, এক অভাবনীয় ঘটনার ভেতর দিয়ে। আর যাকে কেন্দ্র করে বনলতার দেখা মিলেছে—সে এক তাজ্জব মানুষ।

একই হোটেলের একই ঘরের সহবাসী মৃণ্ময়ের। তবু লোকটার নাম ছাড়া আর কিছুই জানা ছিল না তার। জানান দেয় নি কখনো,—তাই। মৃণ্ময় নিজে স্বল্পবাক্। কাজের মানুষ—অফিসের কাজে গোটাদিন তার ভরাট। বাকি সময়টুকু ক্লান্তিজড়ানো। তখন দুটো কথা বলার মত মানুষ হাতের কাছে পেলে হয়ত কথা বলে। আর না হলে,—চুপ। কিন্তু হিমাদ্রির মত নির্বাক মানুষ সে দেখে নি। গোড়ার দিকে কৌতূহল ঘনিয়ে আসতো—লোকটার কথা ভেবে। কী কাজ সে করে—সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কোন্খানে তার সময় কাটে। পুরু কাঁচের চশমা পরে—রাত জেগে—টেবিল আলোর তলায় ঐ মোটা মোটা কী বই ও পড়ে? দু-একবার তার অজান্তে কয়েকখানা বইয়ের পাতা মৃণ্ময় উল্টে দেখেছে। মৃণ্ময়ের লেখাপড়া বেশীদূর নয়। তাই বেশী দূর যেতে পারে নি—থেমে যেতে হয়েছে প্রথম আঘাতেই। দিন কেটে যায়। একঘরে থেকেও হিমাদ্রি সম্বন্ধে কিছু জানতে না পেরে পেরেই জানার আগ্রহটা হারিয়ে গেছে একসময়। সয়ে গেছে হিমাদ্রি। আসে-যায়—বই পড়ে—থাকে পাশের সিটে—না থাকারই সামিল।

তারপর একদিন যখন হিমাদ্রিকে জানা গেল—তখনই তো বনলতার দেখা পেল মৃণ্ময়। সে আর কদিনের কথা? মাস দুই হবে।

এক রাত্রি। আর পাঁচটা রাত্রির মতই সাধারণ—স্বাভাবিক। শোবার আগে মৃণ্ময় দেখলো হিমাদ্রি নিবিষ্ট চিত্তে বই পড়ছে। ঘুমজড়ানো চোখে মৃণ্ময় কয়েকবার চেয়েও দেখেছিল তার মুখের দিকে। নাকটা ফুলে ফুলে উঠছে—কেন নিঃশ্বাসটা বড় বিক্ষুব্ধ। কী পড়ছে ও অমন করে? ভাবতে গিয়েই মৃণ্ময় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ঘুম ভাঙলো এক উন্মাদ আর্তনাদে। জীবনে এমন বিহ্বল আর কখনো হয়নি মৃণ্ময়। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বিছানায়। হিমাদ্রি দুহাতে মৃণ্ময়কে ধরে টানাটানি করছে—আর বলছে আকুল উৎকণ্ঠায়,—চলুন, চলুন—পালিয়ে যাই—আর দেরী নেই—

—কেন কী হয়েছে! ত্রাসে কম্পিত স্বর মৃণ্ময়ের।

দেখছেন না—মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে—আকাশে আগুন লেগেছে—পৃথিবী দুলছে—শেষ—চলুন—চলুন—পালাই—

ছিটকে পড়লো বিছানা থেকে মৃণ্ময়—বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত। স্খলিত চরণে কোনমতে হিমাদ্রির কাছে গিয়ে বলে রুদ্ধকণ্ঠে,—চলুন—

—এ্যা!—থমকে যায় হিমাদ্রি,—কোথায় যাবো! ঠাঁই নেই—পালাবার ঠাঁই নেই,—এলিয়ে পড়ে মৃণ্ময়ের কোলের ওপর—নিঃসাড়।

নিমেষে একটা হিমস্তব্ধতা নেমে আসে। সেই অবকাশে মৃণ্ময় চারিদিকে চেয়ে নেয়। সম্বিত পায়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। পরক্ষণেই আবার নতুন করে ভয় পায়—হিমাদ্রিকে নিয়ে। চীৎকার করে ওঠে—ডাকে হোটেলের চাকর-ম্যানেজার—আর আশপাশের সবাইকে।

তারপর ভিড়। এ্যাম্বুলেন্স। হাসপাতাল।

রোগীর নিকটবর্তী ব্যক্তি হিসাবে মৃণ্ময়কে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হলো। কিন্তু সে যতটুকু জানে—তার বেশী খবর না দিতে পেরে ম্যানেজারকে এগিয়ে দিল। ঠিক সময়ে মাসের মাস টাকা পাওয়ার ফলে হিমাদ্রি ম্যানেজারের তীক্ষ্ণ নজরের বাইরে পড়ে গিয়েছিল। তাই হিমাদ্রির পুরো নাম এবং স্বর্গত পিতার নাম ছাড়া আর কোন খবরই দিতে পারলো না। কিন্তু হিমাদ্রির আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ যে চাই।

ঘরে ছুটে এলো মৃণ্ময় সেই রাত্রেই। হিমাদ্রির জিনিসপত্র তোলাপাড়া করলো—যদি কোন চিঠিপত্র থাকে যাতে তার আপনজনের ঠিকানা মেলে। হ্যাঁ, পেল,—একটা চিঠি—খামের চিঠি।

ভোরের আভাস ফুটে উঠেছে তখন আকাশের গায়ে।

এক নিঃশ্বাসে পড়লো চিঠিখানি। অল্প কথার চিঠি।

চিঠি লিখে জবাব পাই না—ল্যাবোরেটরীতে গিয়ে দেখা হয় না। আমি যে কী করবো ভেবে পাই না। কেমন আছ তুমি—এই খবরটুকুও যদি না পাবো—তবে আর এত ধরাধরি করে আসানসোল থেকে এখানে বদলি হয়ে এলাম কেন?

এই 'কেন'র সন্ধান করার সময় নেই মৃণ্ময়ের। প্রয়োজনও নেই। ঠিকানা কোথায়? চিঠির লেখক অথবা লেখিকার নাম-ঠিকানা চাই। খবর দিতে হবে তাকে যে, হিমাদ্রিবাবুর মাঝ রাতে...........। হ্যাঁ, পেয়েছে নাম—চিঠির শেষে,—আর সুরুতে রয়েছে ঠিকানা।

বনলতাকে মৃণ্ময় সেই প্রথম দেখলো। দেখলো,—এক নিটোল স্বাস্থ্য যুবতী। বছর পঁচিশ হয়ত বয়স। আঁটসাঁট ভারী খোঁপা কাঁধ ছুঁয়ে আছে। প্রায় উজ্জ্বল বর্ণ। বর্ম আঁটা যৌবন। চোখের দুই দীর্ঘ পল্লবে উৎকণ্ঠার কালো ছায়া।

হাসপাতালের ডাক্তার বললে,—রোগী আপনার কে হন?

—আমার,— মানে—বনলতার দৃষ্টি আনত হয়ে এল। দেখলো মৃণ্ময়।

বনলতাকে লম্বা চোখে একবার দেখে নিল ডাক্তার। তারপর বললে,—রোগীর খবরাখবর অর্থাৎ গার্জেন হিসেবে কে দেখাশোনা করবে?

—আমি,—জবাব দিল বনলতা তৎক্ষণাৎ।

—ব্যস্, তবে আপনার ছুটি,—মৃণ্ময়কে বললে ডাক্তার। তারপর বনলতাকে ডাকলো,—আসুন আমার সংগে।

ছুটির কথায় মনটা যেমন নিমেষে ছুটে দেয় মৃণ্ময়ের কিন্তু তেমন হলো না। তবু পা

বাড়ালো মন সাড়া না দিলেও। বনলতা একবার তাকালো। তারপর কী ভেবে এগিয়ে এসে বললে।—আপনি এক্ষুনি যাবেন?

তখুনি জবাব দিল।—যদি দরকার মনে করেন, আমি থাকবো।

—আপনি একটু অপেক্ষা করুন।—বনলতা সংকোচ কাটিয়ে বললে। বললে অনুনয়ের সুরে। খানিকটা অসহায়তা যেন কানে বাজলো মৃন্ময়ের। মৃন্ময় বনলতার অপেক্ষায় রইলো।

কদিন বাদেই আবার দেখা ঐ হাসপাতালেই।

বনলতা বললে,—ও'র ব্রেণএ কম্‌প্লিকেসন্‌স্‌ দেখা গেছে। মেণ্টাল হসপিটালে ভর্তি করাতে হবে। এখানে নাকি একটা হাসপাতাল আছে—ডাক্তার বললেন।

কথাগুলো যত সহজভাবে বলতে চেয়েছিল বনলতা তত সহজ শোনালো না। গলার আওয়াজে একটা ভেঙেপড়া ভাব। মৃন্ময় সান্ত্বনা দিয়ে বললে,—অত মুষড়ে পড়বেন না—ঠিকমত চিকিৎসা করালে অল্পদিনেই সেরে যাবে।

—হ্যাঁ, ডাক্তারও সেই কথা বলেন,—একটা দীর্ঘশ্বাস বেয়ে কথাটা বেরিয়ে এল। বনলতা এগোলো ধীর পায়ে নীরবে। মৃন্ময় অনুসরণ করলো। হাসপাতালের বাইরে এসে বনলতা হঠাৎ বলে,—জানেন, কোলকাতায় চলাফেরা এখনো আমার খুব অভ্যেস নেই। পথঘাট ভাল চিনি না,—তাই—

থেমে গিয়ে আবার বলে,—তাই ভাবছি, ওঁকে ভর্তি করার জন্যে মানসিক হাসপাতালে তো একবার যেতে হবে, কিন্তু একলা কি করে যাবো!

মৃন্ময়ের মুখের দিকে চেয়ে কথাটা শেষ করলো। মৃন্ময় জবাব দিল,—বেশ তো, দরকার মনে করেন তো আমি সংগে যাবো।

বনলতা সলজ্জ কৃতজ্ঞতায় বললে,—আপনাকে অনেক ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হচ্ছে—জানি না মনে মনে হয়ত কী আপনি—

শেষ করতে দেয়নি মৃন্ময়। বাধা দিয়ে বলে,—হ্যাঁ, মনে মনে আমি শুধু ভাবছিলুম—যে একলা আপনি কি এসব পারবেন! তাই এই ঝঞ্ঝাট পোয়াবার জন্যেই প্রস্তুত হচ্ছিলুম।

সত্যিই তাই। এই সংকটের মাঝখানে বনলতাকে দেখে মৃন্ময়ের মায়াই লেগেছিল প্রথম। তাই ডাক্তার যখন বলেছিল—এবার আপনার ছুটি তখনও সে অবিকলের ছুটি নিতে পারেনি।

দুমাস কাটলো। মানসিক হাসপাতালে সেই যে বনলতার সংগে এসেছিল—সেখানেই সেই সংগে আসা বন্ধ হয়নি। প্রতি রবিবারই আসে। এইটেই যেন নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে কারো ডাকওয়ার অপেক্ষা না রেখেই। ঠিক সময়টিতে এসে মৃন্ময় ঠিক জায়গাটিতে দাঁড়ায়—বনলতা আসে। তারপর সোজা হাসপাতাল। সেখান থেকে আবার সোজা ফিরে আসা। আর এই যাওয়া-আসার সারা পথটিতেই নিশ্চুপ—শুধু নিতান্ত দু-একটা প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া—তাও কদাচিৎ।

এই দুমাস মৃন্ময় বনলতার আর এক রূপ দেখেছে। যে রূপ দেখে তার প্রথম মায়া লেগেছিল—এ তা নয়। এ এক তাপসী নারী—প্রণয়ীর রোগমুক্তিসাধনে এক মহা যজ্ঞাগ্নিতে নিজেকে আহুতি দিতে উন্মুখ। তার ধেয়ানে হিমাদ্রি ছাড়া দুনিয়া অগোচর। মৃন্ময় মুগ্ধ হয়ে গেছে। এমন করেও কোন নারী পুরুষকে ভালোবাসতে পারে! মনের গহনে দু-একবার ঝিলিক দিয়ে উঠেছে—ঈর্ষা। ঐ উন্মাদ মানুষটাকে মৃন্ময়ের হিংসা করতে ইচ্ছে জেগেছে। পরক্ষণেই তা বিলীন হয়ে গেছে বনলতার শুদ্ধস্নিগ্ধ দৃষ্টির নৈরঞ্জনায়।

কিছুদিন থেকে মৃন্ময় আরো লক্ষ্য করছে যে বনলতার দেহখানি একটা ক্লিষ্টতার ভারে যেন ক্রমেই নুয়ে পড়েছে। শুধু কি তাই? বেশবাসের দৈন্যও চোখ এড়ায় না। অনেক প্রশ্ন মনে এসে পড়ে, কিন্তু মৃন্ময় শেষ পর্যন্ত চুপ করেই থাকে। কেবলি মনে পড়ে বনলতার সেই সংকল্প-আঁটা দুখানি ঠোঁটের অভিব্যক্তি—যখন ঐ উন্মাদ আশ্রম থেকে জিগেস করেছিল—রোগীর ব্যয়ভার কে গ্রহণ করবে—বনলতা বলেছিল—আমি।

কিন্তু ব্যয় তো কম নয়! মৃন্ময় ভাবে—বনলতা তো একজন শিক্ষিকা—কতই বা তার আয়! কী করে এই গুরুভার সে বহন করে!

সেদিনও যথারীতি বনলতা হিমাদ্রিকে দেখে যখন ফিরে এল মৃন্ময় হাসপাতালের বাইরেই দাঁড়িয়েছিল। তার একটি মাত্রই প্রশ্ন—যার জবাবও তার জানা—'কেমন আছেন হিমাদ্রিবাবু'। জবাব—'ভালই'। তারপর চুপ। এই নিয়মের আজ কিছু ব্যতিক্রম। বনলতা বললে—ভালই আছেন,—একটা চিঠি লিখে দিয়ে বলে দিলেন ওয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টার-এর কাছে পৌঁছে দিতে। মৃন্ময় তৎক্ষণাৎ জিগেস করলে,—চিঠিটায় কী লিখলেন—তা দেখেছেন? বনলতা ব্যাগ থেকে চিঠিখানি বার করে মৃন্ময়ের হাতে দিল। সে একবার আদ্যোপান্ত পড়ে নিয়ে বনলতাকে ফেরৎ দিল। বনলতা বললে—বুঝলেন কিছু?

—না।

—আমিও কিছু বুঝলাম না। কি করে বুঝবো—সাংকেতিক কথাবার্তা—কোন ফরমুলো টরমুলো হবে হয়ত।

মৃন্ময় চুপ করে রইলো। বনলতা কিছুক্ষণ পরে যেন আপন মনেই বলে উঠলো।—হ্যাঁ ঐ করে করেই মাথাটা গেল।

মৃন্ময় কি বলবে ভেবে না পেয়ে বললে—ওটাতো পৌঁছে দেওয়া দরকার। নিশ্চয়ই কিছু জরুরী কথা লেখা রয়েছে যা আমরা বুঝি না।

—হ্যাঁ, পৌঁছে তো দিতে হবে—কিন্তু কখন যে যাই! সারা সপ্তাহ একটুও সময় পাই না।

—বেশ, তবে আমায় দিন—আমি পৌঁছে দেব।

বনলতা কাচুমাচু হয়ে বললে,—আপনাকে আর কত খাটাই?

—আমাকে যদি না খাটাতে চান—তাহলে আপনাকে খাটতে হবে। নিতান্তই সৌজন্যের হাসি মিশিয়ে মৃন্ময় কথাকটি বললে। চিঠিখানি এগিয়ে দিল বনলতা। তার স্বস্তির নিঃশ্বাসটুকু কিন্তু মৃন্ময়ের নজর এড়ালো না। আবারও মনে হলো—বনলতাকে যেন বড় বেশী অবসন্ন দেখাচ্ছে।

পথ চলতে চলতে মৃন্ময় ভাবে—হিমাদ্রি আর বনলতা—ওরা দুজনেই যেন কুহেলি রাজ্যের মানুষ। ওদের সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছে হয় —কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে বাধে। তাই চুপ করেই থাকে।

বাসস্টপে এসে বনলতা থামলো। মৃন্ময়ও। বাসের ভিড় দেখে বনলতা ক্লান্ত স্বগত স্বরে বলে—কি করে উঠবো! শুনতে পায় মৃন্ময়। আর শুনেই বা কি করতে পারে ভেবে পায় না। এই মুহূর্তে সে ওকে ঐ ভিড় ঠেলার দায় থেকে অব্যাহতি দিতে পারে। কিন্তু বনলতা কি রাজী হবে? যে মেয়ে বাসের ভাড়াটা দিতে গেলে বাধা দেয়। পরের বাসটা চলে গেল— তার পরেরটাও। বনলতা দাঁড়িয়ে আছে শ্রান্ত দেহটা তার এলিয়ে দিয়ে লাইটপোস্টটায়। আলো তখনো জ্বলে নি।

সেই আলো-না-জ্বলা সন্ধ্যায় মৃন্ময়ের মাথায় একটা ভাবনা খেলে গেল। বললে কতকটা ব্যস্তভাবে,—আমার একটু তাড়াতাড়ি রয়েছে—যাবো এক জায়গায়—চলুন আপনাকে নিকট দিয়ে যাই। বলেই ট্যাক্সির সন্ধানে চারিদিকে চাইল। একটা দৃষ্টি কিন্তু রইলো বনলতার দিকেই।

ট্যাক্সি পেতে দেরী হলো না। মৃন্ময় দরজা খুলে বললে,—আসুন।

—আমি বাসেই যাবো। আপনি বরং যান—তাড়াতাড়ি রয়েছে যখন—আপত্তি জানালো বনলতা। কিন্তু যথেষ্ট জোর যেন ছিল না—তাই জোর দিয়ে বললে মৃন্ময়,—না, না, কী দরকার—ঐ দিকেই যখন যাবো—তখন শুধু শুধু কেন আর—আসুন—

বনলতা এলো। ট্যাক্সি ছুটলো।

বনলতার আঁটসাঁট খোঁপাটা খুলে পড়েছে কাঁধ বেয়ে। বসে আছে নিশ্চেতন দেহ- এলিয়ে—মাথা হেলিয়ে। অস্পষ্ট আলোয় মৃন্ময় দেখলো—বনলতার চোখ বোজা। ট্যাক্সি চলেছে।

এক সময় মৃন্ময় আর চুপ করে থাকতে পারলো না। বলে ফেললো নিজের অজান্তেই—আপনার শরীরটা কিন্তু খুব খারাপ হয়ে গেছে। বনলতা সচকিত হয়ে সোজা হয়ে বসলো। তারপর একটু হেসে বললে—আপনি তবু বললেন, আপনার বন্ধু কিন্তু বলেন না—কোনদিনই না।

মৃন্ময় বুঝলো এ অভিমান। এর কোনদিক টেনে কথা বলা ঠিক—আর কোনদিকটা বেঠিক—তা খুঁজে পেল না। অথচ চুপ করে থাকতেও মন চাইছে না। তাই অন্য দিক দিয়ে কথা সুরু করলো।—আমার বন্ধু বলে যাঁর কথা আমা- বলছেন তাঁর সংগে আমার বন্ধুত্ব হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ছমাস এক ঘরে এক সংগে থেকেও তা হয়নি। তবে দু কদম একসংগে চললে যখন সংগীকে বন্ধু বলার বিধান আছে সে হিসেবে হিমাদ্রিবাবুকে আমার বন্ধুই বলতে হবে। মৃন্ময় একটু হাসলোও। বনলতা কিন্তু হাসলো না।

বললে,—মানুষটা অমনিই। কোনদি- খেয়াল নেই। দিবারাত্র মশগুল। একটু য- চোখ চেয়ে দেখতেন—তাহলে আর ক- ছিল কী?

মৃন্ময় বনলতার কথা যখন হতে পেলে আজ্ঞ: [illegible] বললে—হিমাদ্রিবাবুর ব-

মা কোথায়—তাঁদের খবর দিলে—বাবা-মা থাকলে কি আর অমনি উদাসীন হয়ে থাকতে পারতেন—কবেই,—

ট্যাক্সিটা একটু থমকে গিয়ে বাঁক ঘুরলো। ভেতরটা আঁধার হয়ে আছে। পাশেই বনলতা—তবু অস্পষ্ট। বলতে সুরু করলো আবার।

—ওঁর বাবা মারা যাবার সময় আমাদের বলে গেলেন 'তোমরা দুজনে দুজনার ভার নিও'। ভার নেবার কী মানে উনি বুঝলেন তা বোঝা ভার। প্রতিমাসে টাকা পাঠানোই বুঝি ভার নেওয়া! যখন আমি ছাত্রী ছিলাম তখন না হয় মানে ছিল। কিন্তু যখন পাশ করে চাকরি করা সুরু করলাম তখন বললাম, চিঠি লিখেও জানালাম—টাকা পাঠানোর দরকার নেই আর। তবু বিরাম নেই। যা করেন সব রুটিন মাফিক। রুটিনের বাইরে যে কিছু থাকতে পারে তা খেয়ালই নেই। এমন মানুষের কী ভার আমি নেব! শুধু তাঁর টাকা তাঁর নামেই জমিয়ে রাখি।

অন্ধকারের ভেতর থেকে কথাগুলি যেন জোনাকীর মত ফুটে উঠছে। বনলতা আড়ালেই রয়ে গেল।

বনলতার কথা মৃন্ময়কে কেমন পেয়ে বসেছে। পাছে কথার স্রোত রুদ্ধ হয়ে যায় তাই সে বিনম্রস্বরে জিগেস করলে,—আপনার বাবা-মা?

—বাবা আছেন নিজের মা নেই। যিনি আছেন তিনি বাবাকে আমার দায়মুক্ত করার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। তখন থেকেই তো মেসোমশাইয়ের কাছে কাছে মানুষ। হিমাদ্রির বাবা আর আমার বাবা ছোটবেলাকার বন্ধু। মেসোমশাই আমায় শান্তিনিকেতনে ভর্তি করে দিলেন—তখন তো হিমাদ্রি সেখানকার ছাত্র। তারপর সেখান থেকে উনি কোলকাতায় এলেন গবেষণার কাজে।

—হিমাদ্রিবাবু কিসের গবেষণা করছেন?

—কী জানি, বিজ্ঞানের কিছু হবে। কয়েকটা থীসিস্ লিখেছিলেন—তিন জায়গা থেকে ডক্টরেট্ পেয়েছেন। এত অল্প বয়সে অত ট্যালেণ্টেড খুব কম দেখা যায়—তা' মানি। কিন্তু অমন মানুষে নিয়ে সংসারে কী করে চলে! কিছু বুঝবেন না—ল্যাবোরেটরী ওর সব—এদিকে একটা মানুষ যে—

বনলতার কথাগুলো ঝাপ্সা হয়ে এলো। একেবারেই আত্মগত। চৌরংগীর চলন্ত বাস-ট্রামের আওয়াজে তলিয়ে যায় তার কন্ঠস্বর। শুধু তার মুখের ওপর বাইরের বিজলী আলো ঝিলমিল করে ওঠে। মৃন্ময় সেদিকে চেয়ে থাকে—কিন্তু তার মনের ভেতরে তখন হিম দিট আনাগোনা করছে। মানুষটার ওপর তার একটা শ্রদ্ধা এলো। মনে পড়ে গেল সেই মধ্যরাত্রির এস্তবিকট আর্তনাদ হিমাদ্রির। ওর চরিত্রের সংগতি আজ মৃন্ময় খুঁজে পাচ্ছে।

......সেরে উঠলেও কি ওঁকে নিরস্ত করা যাবে! বনলতার একটুকরো কথা মৃন্ময়ের কানে এলো। মৃন্ময় দেখলো—বনলতা হিমাদ্রিকে বিলীন—একেবারে—আর একটুখানি ফাঁকও অবশিষ্ট নেই। মৃন্ময়ের এক বুক নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসতে গিয়েও থেমে গেল।

থামালো ট্যাক্সি।

নেমে এল বনলতা। চোখ ঝল্সানো আলোর তলায় বনলতার মুখখানি বড় বেশী পাংশু দেখাচ্ছে। চোখে তবু একটা আবেগ—একটা ঘোর।

মৃন্ময় একটু ইতস্তত করে বললে,—দেখুন, বিকেলে আজ চা খাওয়া হয়নি—চলুন একটু চা খেয়ে যাই,—বলে পা বাড়ালো। বনলতা বিনাবাক্যে অনুসরণ করলো।

যে ফরমাস মৃন্ময় দিল তার ভেতর চায়ের স্থানটাই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। দুই হাতের তালুতে মুখ ডুবিয়ে অন্যমনে বসেছিল বনলতা। মুখ তুলে বললে,—এত কে খাবে?

—আমি,—মৃন্ময় জবাব দিল। বনলতা আবার চুপ। তার চোখের কোল জুড়ে যেন কালির প্রলেপ পড়েছে। মৃন্ময় থাকতে পারলো না। বললে—আপনাকে দেখলে মনে হয় যেন অসুস্থ। অসুখ বিসুখ করেনি ত?

বনলতা ক্ষণিক মৃন্ময়ের দিকে চেয়ে রইল। তারপর একটু হেসে জবাব দিল—না। কাল রাত জাগার ফলে বোধ হয়—রাত জাগতে কেন গেলেন? ওতে যে শরীর বড় খারাপ হয়।

—না জেগে উপায় কি? পরীক্ষার খাতা দেখা অনেক বাকি। রাত্রে ছাড়া কখন দেখবো? সকাল বেলা টিউশন—স্কুলের পর টিউটোরিয়াল—সন্ধ্যা বেলায়,—

থেমে গেল বনলতা। মৃন্ময় ধরিয়ে দিল,—সন্ধ্যাবেলায়?

—সন্ধ্যাবেলায় খাওয়া থাকার বদলে চারটে ছেলেমেয়ে পড়ানো—সময় কই?

—হোস্টেল ছেড়ে দিয়েছেন?

—হ্যাঁ, ষাটটা টাকা বাঁচলো।

মৃন্ময়ের মনটা এক অব্যক্ত বেদনায় উদ্বেল হয়ে উঠলো।

—এত পরিশ্রম করলে যে শেষ পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়বেন। গলার আওয়াজটা নিজের কাছেই কেমন যেন ভিজে ভিজে মনে হলো। কিন্তু উদ্গত আবেগকে মৃন্ময় চাপা দিতে চেষ্টা করলো না—করার ক্ষমতাও ছিল না।

বনলতা নিরুত্তরে একবার শুধু ওর দিকে চেয়ে হাসলো। কান্নার মতই করুণ সে হাসি। ব্যাগটা টেবিলের এ পাশ থেকে সরিয়ে ওপাশে রাখলো। ছাইদানিটা টেনে নিয়ে তার কারুকার্য পরীক্ষা করলো। তারপর সেটা রেখে দিয়ে—এক গ্লাস জল ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে নিল।

মৃন্ময় অস্বস্তি বোধ করে। একটু লজ্জা পায়। বয় এল।

মৃন্ময় ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ওঠে,—এই যে এনেছ—দাও, দাও—

তারপর অত্যন্ত ক্ষুধার তাগিদেই যেন খাওয়া সুরু করলো। বনলতা সেই অবকাশে ধাতস্থ হয়ে সহজস্বরে বললে,—পরিশ্রম না করে উপায় কি? হাসপাতালের খরচ তো কম নয়।

মৃন্ময় যেতে যেতেই ফস্ করে বলে ফেললো,—কেন, হিমাদ্রিবাবুর, টাকা তো রয়েছে আপনার কাছে।

—তাঁর টাকায় তাঁকে চিকিৎসা করবো!

মৃন্ময় মুখ তুলে চাইল, বনলতার দিকে। তার দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট দু'খানির দিকে চেয়ে মৃন্ময় বুঝলো—একটু বেশী দূর বলা হয়ে গেছে। ঐ কথাটুকুর রেশ মুছে ফেলার জন্যে টেবিল কেতায় বেশ সরগরম করে বলে ওঠে,—কই আপনি খাচ্ছেন না যে—সুরু করুন। বনলতা চমকে ওঠে।

আবার বলে—সুরু করুন—বলে নিজে খেতে লাগলো যেন বনলতাকে উৎসাহ দিতেই।

সুরু করলো বনলতা। কিন্তু থামলো মৃন্ময়। দুজনের মাঝখানে একটা নৈঃশব্দ নেমে এল। বনলতার দিকে চেয়ে আছে মৃন্ময়। একমনে খেয়ে চলেছে। সামনে একটা পুরুষ—আধচেনা পুরুষ বসে আছে তারই দিকে চেয়ে সে হুঁসও নেই। মৃন্ময় খুসী হলো—সার্থক বোধ করলো এই ভেবে যে ওকে হোটেলে নিয়ে আসাটা নিরর্থক হয়নি। প্রয়োজন ছিল বনলতার। আর তা যে মৃন্ময় বুঝতে পেরেছিল তাতেই আনন্দে বুকটা ভরে উঠলো। কেৎলি থেকে কাপে চা ঢেলে চিনি মেশালো মৃন্ময়। এতক্ষণে বনলতার প্লেট নিঃশেষিত হয়ে গেছে। কাঁটা দিয়ে প্লেটের ওপর হিজিবিজি কাটতে কাটতে হঠাৎ বলে উঠলো—আজ আপনাকে অনেক কথাই বলা হয়ে গেল,—

একটু থেমে আবার বললে,—মানে, কথা বলা হয়ে ওঠে নাতো, তাই বোধ হয় বলতে সুরু করে আর থামতে পারিনি। লজ্জারঙীন মুখখানি গোপন করার জন্যে মাথা নীচু করলো।

বিক্ষুব্ধ হাওয়াটা স্বাভাবিক স্তরে ফিরে এসেছে বুঝে মৃন্ময় বললে,—না এমন কি আর আপনি বলেছেন। আর যা বলেছেন তাতে আপনার প্রতি শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি আমার বাড়লো বৈ কমলো না। সেই সংগে বড় একটা কর্তব্য আমার ওপর এসে পড়লো।

কী কর্তব্য? কৌতূহলী হয়ে জিগ্যেস করলো বনলতা।

—তা জবাব কথায় নয়—কাজে। হিমাদ্রিবাবু ভাল হয়ে ফিরে না এলে তো হাত দিতে পারছি না। —চায়ের কাপটা এগিয়ে দিল মৃন্ময়। বনলতার মুখের ওপর দিয়ে একটা আলোর ঝলকানি বয়ে গেল।

টেবিলের ওপর দৃষ্টি পড়তে সচকিত হয়ে বললে,—ওমা, আপনি খেলেন না যে—।

—খেয়েছি—সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে চায়ে চুমুক দিল মৃন্ময়। বনলতা একটুক্ষণ চুপ থেকে অত্যন্ত কুণ্ঠার সংগে বললে,—আমার জন্যে এ খরচ করার কোন অর্থই ছিল না।

কোন জবাব মৃন্ময়ের মুখে জোগালো না। বনলতার মুখটা যেন একটু রুক্ষ হয়ে উঠলো। আবার বললে,—আপনার না তাড়া ছিল যার জন্যে ট্যাক্সি হাঁকিয়ে এলেন!

এবারও উত্তর খুঁজে পেল না মৃন্ময়। ধরা পড়ে যাওয়ার মৌনতা। বনলতা স্থাণুর মত বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর দুরন্ত ব্যস্ততায় চায়ের কাপে কয়েকটা চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বললে,—চলুন—

মৃন্ময় দেখলো বনলতার চা তখনো অসমাপ্ত।

● ●

সেদিনকার বিনিদ্র রাতে মৃন্ময় একটা সত্য যেন আবিষ্কার করলো যে, হৃদয়ের সহজ দরদটুকু প্রকাশের পথও এ দুনিয়ায় ব[illegible] বন্ধুর। প্রতি পদে বাধা—বিড়ম্বনা পেয়ে পেয়ে বুঝি তার উৎস রুদ্ধ হয়ে গেছে মানুষের মনে। বনলতার প্রতি এই দরদবোধ যে কোন্ মুহূর্তে

তার মনে জেগে উঠেছে সে খেয়াল তার নেই। আজকের বিকেলের প্রতিটি মুহূর্তের উন্মেষেই তা বিকশিত হয়ে উঠতে চেয়েছে। গণিতের সতর্ক সিঁড়ি ভেঙে তা এগোতে পারে নি হয়ত—তাই বনলতার শেষ সম্ভাষণ ভর্ৎসনা হয়ে উঠলো।

মৃন্ময় শাসন করলো নিজেকে—এমন করে আর হৃদয়কে মেলে ধরো না যেখানে তার ছায়া পড়ে না আরেক হৃদয়ে।

দিনের আলোয় স্বচ্ছ বুদ্ধিতে সে বুঝলো—বড় বেশী গায়েপড়া হয়ে গেছে। স্থির করলো—এখানেই দাঁড়ি টেনে দেওয়া যাক্।

দিন কাটছে—কিন্তু বনলতার রেশ কাটে না। এ এক মহাসমস্যা—এর পার কোনখানে?

হ্যাঁ, পারের হদিস পেয়ে গেল—সপ্তাহ শেষের এক খবরে। মৃন্ময়ের বদলি হয়েছে পুণায়—শুধু বদলি নয়—প্রমোশন সমেত। ভাবলো—এ ভালই হয়েছে। কিন্তু তবু যেন কী হয়ে গেল! শেষপর্যন্ত আবেদন জানালো যে, অন্ততঃ একমাস সময় তাকে দেওয়া হোক। জানে—তাতে ক্ষতি তার—হোক্ ক্ষতি।

রবিবার এসে পড়লো আবার। হাসপাতালে যাবার টান। কিন্তু দুস্তর বাধা। অবশেষে ঠিক করলো—সে যাবে এবং নির্দিষ্ট জায়গা থেকে দূরে দাঁড়িয়ে বনলতাকে একবার নিরীক্ষণ করবে। করলোও তাই।

বনলতা হন্ হন্ করে এলো। হাতে তার খাবারের একটি বাক্স—হিমাদ্রির উদ্দেশে প্রতিদিন সে দ্বারিকের দোকান থেকে যেমন কিনে নেয় যাবার আগে আজো ঠিক তেমনি। ঠিক জায়গাটিতে এসে বনলতা থমকে দাঁড়ালো। এদিক-ওদিক চাইল। হাতঘড়িটার দিকে তাকালো। একটুখানি হাটাচলা করলো এপাশ-ওপাশ।

মৃন্ময় এসে দাঁড়ালো কাছে। বনলতা তাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে বললে—চলুন। ঠিক যেমনটি সে এতদিন বলে এসেছে—একেবারে ছকবাঁধা নিয়মে।

তারপর পথ চলা।

সারাপথ মৃন্ময় ভাবে যে, গেল রবিবারের সেই পরিচ্ছেদটুকু কি বনলতা বিস্মৃতির আস্তাকুঁড়ে ঠেলে ফেলেছে? তার চোখেমুখে এমন একটা নতুন রেখাও তো মৃন্ময় খুঁজে পায় না—যাকে সেই সন্ধ্যার স্মারক বলে ধরে নেওয়া যায়। হ্যাঁ, ভুলেই গেছে। তা-ই স্বাভাবিক। মৃন্ময় যা মনে মনে বড় করে তুলেছে এই সাতদিনে—তা জীইয়ে রাখবার মত জায়গা নেই বনলতার মনে। সেখানকার এ কোণ থেকে ওকোণ পর্যন্ত হিমাদ্রিতে ভরপুর—আচ্ছন্ন। মৃন্ময় ভাবে—প্রেম বুঝি এমনি করেই সব তুচ্ছ ভাবনাকে মন থেকে নির্বাসন দেয়। নতুন করে মুগ্ধ হয় বনলতাকে দেখে। এমন করেও ও ভালবাসতে জানে! অনেক বড় হয়ে ওঠে বনলতা—মৃন্ময়ের চোখে।

হাসপাতাল থেকে ফিরে এল।

—কেমন আছেন হিমাদ্রিবাবু?—ভাল। তারপর চুপ।

যে কথাটা আজ সে বলবে ইচ্ছে করেছে তার একটু ভূমিকা যেন চাই। তাই বললে আবার—উনি কিছু বললেন?

—বললেন—মিষ্টি আর এনো না—ভাল লাগে না।

—ও, আচ্ছা, উনি কতদিনে ছুটি পাবেন?

এক মাস।

—তাহলে হিসেবটা ঠিকই হয়েছে।

বনলতা মৃন্ময়ের মুখের দিকে চাইল। একটু একটু করে তবে কথাকটি বললে মৃন্ময়। বনলতা বিব্রতস্বরে বললে,—তা এই যে একমাস পিছিয়ে দিলেন—এতে তো আপনার ক্ষতি হলো। কেন জেনে শুনে এমন ক্ষতি—

—অজান্তে কত ক্ষতিই তো মানুষের হয়ে যায়—তাও তো মানুষ মেনে নিতে পারে।

বনলতা সেদিকে কান না দিয়ে অনুনয় করে বললে,—না, না, অমন কাজ করবেন না। আপনি চলেই যান। একটা দিন আমি একলাই আসা-যাওয়া করতে পারবো।

—সে আপনি অবশ্যই পারবেন—জানি,—মৃন্ময় একটু হেসে আবার বলতে লাগলো,—আর এও জানি যে, আমি থেকেও আপনার কোন কাজেই লাগি না।

বনলতা কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে বললে আপনি অনেক করেছেন আমার জন্যে। হিমাদ্রির কাছেও আমি তা বলেছি। তিনি মন দিয়ে সব শুনেছেন। বলেছেন যে, আপনি খুব ভাল লোক। সত্যিই আপনি অনেক করেছেন, তার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে কেমন বাধো বাধো ঠেকেছে।

মৃন্ময় ক্ষুণ্ণ স্বরে বলে—অনেক করার ভেতর এইটুকুই করেছি—যে, আপনার কষ্টের ভারটা শুধু চোখ মেলে দেখেই গেছি, লাঘব করতে পারিনি একটুও।

—ও-ই তো অনেক—আর কী আপনি করতে পারতেন,—বনলতা বললে স্নিগ্ধ হেসে।

—কী করতাম তা এখন আমি বলতে পারি না। অনেকই হয়ত করতে পারতাম যদি শুধু একটু সুযোগ দিতেন।

বনলতা চুপ।

তারপর সেই বাসের ভিড় ঠেলে ফিরে আসা। কাজের তাগিদে ট্যাক্সি ডাকা নেই,—বিকেলে চা না খাওয়ার অজুহাত নেই। একেবারে নিক্তি মেপে চলা—বাকি ক'টা দিন।

এমনি করে একটা রবিবার এলো। বনলতা হাসপাতাল থেকে বেড়িয়ে এসে বললে হাসি হাসি করে—সামনের রবিবারে হিমাদ্রি ছাড়া পাবেন। আমি একলাই এসে নিয়ে যাবো। এবারে আপনার ছুটি।

একটা বেদনার ঝংকার যেন শুনতে পেল মৃন্ময় হৃদয়ের প্রত্যন্তদেশে। এমনি করে প্রথম দিনের ডাক্তারও তো তাকে বলেছিল—এবার আপনার ছুটি। তখন কেন সে ছুটি নেয়নি? মৃন্ময় ভাবলো—জীবনে ছোট ছুটি পেতেও যার সংশয়, বড় ছুটির ডাক তাকেই কাঁদায় বেশী।

ফেরার পথে বাড়ীর দরজায় বনলতা মৃন্ময়কে দুই হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে বললে—আপনাকে অনেক কষ্ট দিলুম।

প্রতি-নমস্কার করেই মৃন্ময় চলে এল।

যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগলো মৃন্ময়—ভেতরে বাইরে। স্থান বদলের উদ্যোগে এত টুকরো কাজ ভিড় করে আসে যে, একটার সঙ্গে আর একটা যেন থাকে জড়িয়ে। শেষ নেই।

সপ্তাহটা কেটে গেল কোন্‌খান দিয়ে তা সে ঠিক পেল না। অবশেষে শনিবার সন্ধ্যায় তার হাত খালি হলো—মনটাও। তখনই সে অনুভব করলো—মনে যখন অবসরের অভাব ঘটে, আবেগ তখনই হয় মুমূর্ষু। বনলতার কথা মনে এলো। সেই সঙ্গে এও মনে হলো যাবার আগে কেবলমাত্র সৌজন্যের খাতিরে একবার বনলতার সঙ্গে দেখা করে যাওয়া উচিত। দেখা না করাটা শুধু অর্থহীনই নয়—অন্যায়।

জামা পরলো।

একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। মৃন্ময় মিষ্টি করে জিগেস করলো—আচ্ছা খোকা বনলতা দেবী বাড়ীতে আছেন?

ছেলেটি মহাখুসীতে বললে—কে, লতামাসী? হ্যাঁ আছেন। আজ পড়া নেই। লতামাসী ছুটি দিয়েছেন।

সেও ওর সুরে সুর মিলিয়ে বললে—আমারও ছুটি মঞ্জুর হয়েছে—তাই তো তোমার লতামাসীর সঙ্গে একটু দেখা করতে এলুম।

—লতামাসীর সঙ্গে দেখা করবেন? চলুন—এখুনি নিয়ে যাচ্ছি,—ব'লে হাত ধরলে মৃন্ময়ের।

বনলতা অন্ধকার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো। মৃন্ময় দেখলো—বাইরে একটা কাকাতুয়া দাঁড়ে বসে পায়ের শেকলটাকে ঠোকরাচ্ছে প্রাণপণে। ওখান থেকেই ছেলেটি বললে—লতামাসী দ্যাখো কে এসেছেন—।

ঘরে আলো জ্বলে উঠলো। দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো বনলতা। এমন বিভ্রান্ত বিস্রস্ত চেহারা তার আর কখনো দেখেনি মৃন্ময়। কিছু বলার আগেই বনলতা বলে উঠলো,—আপনি! আসুন—না এলে আমিই যেতুম—।

মৃন্ময় ঘরে ঢুকে উৎকণ্ঠিত হয়ে বললে, কেন, হিমাদ্রিবাবুর কোন—

—না তিনি ভালই আছেন। কাল তো আসবেন। আপনি বসুন, আপনার জন্যে চা করে আসি—বলে তৎক্ষণাৎ ছেলেটির হাত ধরে নিয়ে চলে গেল। হতভম্ব হয়ে গেল মৃন্ময়। বনলতার এই ব্যস্তত্রস্ত ভাব—কথা বলা—কোনটাই যেন স্বাভাবিক বলে মনে হলো না।

মৃন্ময়ের তো আসার কথা ছিল না। তবে সে না এলে বনলতাই যেত—কেন? চা খাওয়ানোর জন্যে? সেই সন্ধ্যার ঋণ শোধ আর সেই সঙ্গে গুটিকয়েক তির্যক কথার দক্ষিণা! মৃন্ময় নিঃসংশয় হলো—বনলতা এই জন্যেই যেত তার কাছে যদি না সে আসতো। না, এখুনি চলে যাবে সে। উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু এসে আবার না বলে চলে যাওয়াটা কেমন? আসুক সে—না হয় চা না খেয়েই চলে যাবে। কিন্তু চায়ের কথা বলতে এত সময় লাগে?

অধৈর্য হয়ে ঘরের এ-পাশ থেকে ও-পাশ কয়েকবার আনাগোনা করলো। চারিদিকে চাইলো। দ্যাখে—একখানি খাট—নিতান্ত সাদা-সিদে বিছানা। মাথার কাছে টেবিল। সেখানে ধূপদানিতে দুটি ধূপকাঠি—একটি জ্বলছে—অন্যটি নিভে গেছে কিছুক্ষণ আগে। পাশে একখানি খাম। খামের ওপর লেখা—শ্রীহিমাদ্রি
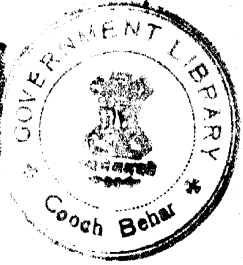
(ইহার পর ১৫২ পৃষ্ঠায়)

শিক্ষা ও সাধনা

শ্রীতেজেশ সোম

অতীতকে জানার প্রয়োজন বর্তমানকে সুন্দরতর করে তোলার জন্য—আর বর্তমানকে জানার প্রয়োজন ভবিষ্যৎকে সুন্দরতর দেখার জন্য। পরিবর্তনের গতি নির্ধারণের জন্যও প্রয়োজন অতীতকে জানার। কারণ, অতীত, সে অলক্ষ্যে কাজ করে বলে মানুষের মনে আজ বিংশ শতাব্দীতেও অনেকে অতীত দিনের ক্রীড়া-ব্যবস্থার কথায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। আমিও একজন বিগত দিনেরই খেলোয়াড়—আধুনিক বিচারে একটি 'ফসিল' (Fossil)। কিন্তু আমি সেই ব্যবস্থাকে আজ আর মনে-প্রাণে কুণ্ঠাহীন প্রশংসা করতে পারি না—যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে বিগত দিনের ক্রীড়া-প্রণালী প্রশংসার দাবী করতে পারে।

আজকাল অনেককেই বলতে শোনা যায় যে, বর্তমানে ফুটবল খেলা শিক্ষণের জন্য এত তোড়জোড় করা হচ্ছে কিন্তু আমাদের সময় এই সমস্ত ছিল না। আর তাছাড়া সেকালের খেলোয়াড়রা বর্তমানের তুলনায় ভাল ছাড়া খারাপ খেলত না—যাঁরা বলেন, তাঁরা ভুলে যান যে, জগৎ পরিবর্তনশীল, কালের প্রভাবে নিত্যই সবকিছুতে পরিবর্তন ঘটে। ফুটবল খেলাও কালের প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারেনি—তাই তাতেও এসেছে বহুলে পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের ও অগ্রগতির সঙ্গে আমরা সমতালে না চলতে পারলেই পিছিয়ে পড়ব। যে-কোন বিষয়েই সাফল্য অর্জন করতে গেলে তার জন্য প্রয়োজন সাধনার। ফুটবল তো তার ব্যতিক্রম নয়।

১৮৮৮ খৃঃ 'ভারতীয় ফুটবল এসোসিয়েশন'-এর প্রতিষ্ঠা, মিলিটারী ও ভারতীয় অন্যান্য শ্রেষ্ঠ দলগুলিকে আকর্ষণ করবার জন্য শীল্ড খেলার প্রবর্তন এবং কলকাতার দেখাদেখি ভারতের অন্যান্য শহরগুলিতে ফুটবল খেলার প্রসার, এমন কি বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই যখন এই খেলা সহরের গণ্ডী পেরিয়ে সুদূর পল্লীতে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল, তখনও প্রকৃতপক্ষে ফুটবল শিক্ষণ-ব্যবস্থা অবহেলিতই রইল। সেকালে খেলোয়াড়রা কেউবা জন্মগত প্রতিভার জোরে আবার কেউবা পরের খেলা দেখে শেখবার, খেলবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু খেলা দেখে শেখবার প্রয়াস প্রকৃতই পরিশ্রমসাপেক্ষ। কারণ, তাতে দৈহিক ও মানসিক শক্তির অপচয় বটে বেশী। কিন্তু যদি সুশৃঙ্খল ও সুপরিকল্পিত উপায়ে শিক্ষণ-ব্যবস্থার আয়োজন করা যায়, তাহলে আর এই অপচয় ঘটে না। এক সময় খেলোয়াড়রা পায়েরই তলার সাহায্যে বলটিকে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করত। কিন্তু বর্তমান কালে শিক্ষার ফল হিসেবে দেখা গেছে যে, শরীরের যে-কোন অংশের দ্বারাই বলটিকে আয়ত্তে আনা যায়।

বর্তমানে আমাদের দেশে দুই ব্যাক ও কোন কোন জায়গায় তিন ব্যাক প্রথায় খেলা হচ্ছে কিন্তু পৃথিবীতে যে-সমস্ত রাষ্ট্র ফুটবল খেলায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছে, তাদের প্রায় সকলেই তৃতীয় ব্যাক প্রথায় খেলতে অভ্যস্ত। এই তিন ব্যাক প্রথায় খেলতে অভ্যস্ত হবার জন্য তারা পরিশ্রমও করেছে যথেষ্ট। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, দুই ব্যাক প্রথার চেয়ে তিন ব্যাক প্রথায় খেলা সুসংবদ্ধ ও কার্যকরী কিনা। আমার মতে, অফসাইড আইনে পরিবর্তন সাধনের পর দুই ব্যাক প্রথায় খেলা 'ভাবের ঘরে চুরিরই সামিল'। কারণ, সে-প্রথায় প্রত্যেকেই দায়িত্ব এড়াতে ব্যস্ত—কারণ, দায়িত্ব কারুর নয়। কিন্তু তিন ব্যাক প্রথায় খেলোয়াড়ের দায়িত্ব যেমন সামগ্রিক, তেমনি স্বতন্ত্র। কারণ, একটি দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়কে নিজের নির্দিষ্ট অঞ্চলে বিপক্ষের প্রতিটি খেলোয়াড়ের উপর সদা-জাগ্রত দৃষ্টি রাখতে হয়, যাতে স্বক্ষেত্রে বিপক্ষের কোন খেলোয়াড় বিপদের সূচনা না করতে পারে। তবে এইরূপ সুসংবদ্ধ ও কার্যকরী প্রণালীতে খেলতে গেলে প্রতিটি খেলোয়াড়কেই একটি বিশেষ নিয়মের অধীনে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কারণ, এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে দৈহিক ও মানসিক উন্নয়নের সমন্বয় ঘটিয়ে খেলোয়াড়ের দক্ষতা বাড়ান।

'ট্যাকলিং' বা বিপক্ষকে প্রতিহত করা নিয়মিত শিক্ষা সাপেক্ষ।

কিছুদিন আগেও বাংলাদেশে খালি পায়ে ফুটবল খেলা হত। খালি পায়ে খেলার দরুণ যত সহজে বল আয়ত্তে আনা যেত, বুট পায়ে প্রথম প্রথম তত সহজে বল আয়ত্তে আনা যায় না। কিন্তু শিক্ষার্থী যদি প্রকৃত শিক্ষা পায়, তাহলে [illegible] পায়ের চেয়েও বুটপায়ে সহজভাবে বল আয়[illegible] আনতে সমর্থ হয়।

ফুটবল খেলার প্রধান বিষয় হচ্ছে বল [illegible] আনা এবং ঠিক ঠিকভাবে বল জোগান এবং [illegible] করা। তবে বল আয়ত্তকরণ ও ঠিক ঠিকভাবে [illegible] করতে শেখার জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞ শিক্ষ[illegible] অধীনে অনুশীলন করা।

বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে ফুটবল শিক্ষ[illegible] ব্যবস্থা বহুদিন ধরেই অবহেলিত। আর [illegible] অবহেলার ফলস্বরূপে ভারতবর্ষ আন্তর্জাতি[illegible] ক্ষেত্রে জয়ের গৌরব লাভের বদলে লাভ ক[illegible] পরাজয়ের গ্লানি। ভারতবর্ষকে যদি আগামী দি[illegible] আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক[illegible] হয়, তবে অচিরে ফুটবল শিক্ষণ-ব্যবস্থার [illegible] নজর দিতে হবে।

ভবিষ্যতের দিকে নজর রেখে এ-কথা [illegible] বলতে পারি যে, বর্তমান অবস্থায় শিক্ষণ-কে[illegible] গোড়াপত্তন করা উচিত স্কুল ও কলেজে। স্কুল [illegible] কলেজ থেকে যে সমস্ত কিশোর, তরুণ খেলোয়া[illegible] সংগৃহীত হবে, তারাই ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্য[illegible] স্কুল ও কলেজের তরুণ খেলোয়াড়দের প্রাথমি[illegible] শিক্ষণভার প্রত্যেক স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষকদের উপর[illegible] অর্পণ করা যায়। আর যদি প্রকৃতই শিক্ষকের [illegible] অনুভূত হয়, তাহলে ক্রীড়া শিক্ষকদের শিক্ষা দে[illegible] জন্য কয়েকটি শিক্ষণ-কেন্দ্রের উদ্বোধনই বাঞ্ছনী[illegible] এই সমস্ত শিক্ষকদের শিক্ষা দেবার পথে বি[illegible] কোন প্রতিবন্ধক আছে বলে আমার মনে হয় [illegible] যে সমস্ত খেলোয়াড় খেলার অধ্যায় প্রায় শেষ [illegible] এনেছেন, তাঁদের সাহায্যেই এই সমস্ত শিক্ষ[illegible] ব্যবস্থা সংগঠিত হতে পারে।

এগিয়ে যাওয়া সব দেশেই খেলা শিক্ষার [illegible] বিভিন্ন ক্লাবে, স্কুল-কলেজে ব্যবস্থা আছে[illegible] পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বড় বড় ক্লাবে কিশোর ও তরু[illegible] খেলোয়াড়দের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। [illegible] সমস্ত দেশের বড় বড় ক্লাবগুলি কিশোর ও তরু[illegible] খেলোয়াড়দের শিক্ষায় সচেষ্ট। তাদের যশস্ব[illegible] খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলবার সুযোগ দেয়। কার[illegible] তাঁদের আশা এই যে, এই সমস্ত শিক্ষার্থী[illegible] ভবিষ্যতে তাঁদের ক্লাবের পক্ষে খেলবে [illegible] সর্বোপরি দেশের গৌরব আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষে[illegible] অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে। এই ধরণের শিক্ষার্থীদে[illegible] বলা হয় 'কোল্টস্' (Colts) বা টাট্টু। আমাদে[illegible] দেশে এই ধরণের শিক্ষা-ব্যবস্থা মোটেই দে[illegible] যায় না।

অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশে সবচে[illegible] বেশী ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু প্রতিযোগিতার অনুপাতে শিক্ষা-ব্যবস্থা নেই-ই। আমাদের দেশে বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন আকৃতি[illegible] ছেলেদের এক ধরণের প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা যায়। এই খেলা আমি বিশেষ মনো[illegible]

(শেষাংশ ১৪৭ পৃষ্ঠায়)

মুষ্টিযুদ্ধের ইতিকথা

শ্রীশঙ্করবিজয় মিত্র

মুষ্টিযুদ্ধের আদি বৃত্তান্ত বলতে গেলে এই কথাই বলতে হয়, বর্তমানের আইনসম্মত মুষ্টিযুদ্ধ খুব বেশী দিনের কথা নয়। কিন্তু হাতিয়ারবিহীন মানুষ সৃষ্টির সূত্র থেকেই তার সবল দুই বাহু ও মুষ্টিবদ্ধ হস্তের (এবং পায়ের) সাহায্যেই নিজেকে সর্বপ্রকার বিপদ থেকে রক্ষা করবার প্রয়াস পেয়েছে। আত্মরক্ষায় সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই মানুষ মুষ্টিযোদ্ধার মতই দাঁড়িয়ে মুষ্টির আশ্রয় নিয়ে এসেছে। যুগে যুগেই মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি বহু অস্ত্রশস্ত্র ও আত্মরক্ষার বিবিধ উপায় আবিষ্কার করেছে। কিন্তু সেই আদিম যুগের মত আজও একক ও নিরস্ত্র অবস্থায় তাকে সেই বাহু ও মুষ্টির সাহায্যে আত্মরক্ষা করতে হয়। ক্রীড়া বা যুদ্ধাদি হিসাবে মুষ্টির ব্যবহার মানুষ বহু পরে আবিষ্কার করেছে এবং ধাপে ধাপে মুষ্টিযুদ্ধের পদ্ধতি পরিবর্তিত ও সংশোধিত হয়েছে। মুষ্টিযুদ্ধের আবিষ্কর্তা প্রকৃতপক্ষে কে বা কোন্ জাতি, ইতিহাস তার সঠিক হদিস দিতে পারে না। কারণ, দেখা যায় যে, প্রাচীন সভ্য দেশমাত্রেই কোন-না-কোনরূপে এর প্রচলন ছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতেই ইংলণ্ডে আধুনিক বিধিবদ্ধ মুষ্টিযুদ্ধের প্রবর্তন হয়। এ কারণ ইউরোপে আধুনিক মুষ্টিযুদ্ধের প্রবর্তক হিসাবে ইংলণ্ডের নাম করা হয়ে থাকে। কিন্তু ইউরোপ ভূখণ্ডে প্রাচীন গ্রীস-ই বোধ হয় মুষ্টিযুদ্ধের জন্মভূমি। গ্রীসের রাজা ইগাসের যুবক পুত্র থেসাস-ই সম্ভবতঃ মুষ্টিযুদ্ধের প্রবর্তক। অবসর বিনোদনের জন্যে থেসাস যে পদ্ধতির আশ্রয় নিতেন, আজকের যুগে তাকে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড বলে মনে হবে। ইগাসের সেনাবাহিনী থেকে এক এক জোড়া সুদেহী সৈন্য বেছে নেওয়া হত। চওড়া প্রস্তরখণ্ডের ওপর এই দুজন মুষ্টিযোদ্ধা মুখোমুখী প্রায় নাকে নাক ঠেকিয়ে বসতো। এদের হাতের মুঠি চামড়ার দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হত। রাজপুত্রের ইঙ্গিতে তারা পরস্পরকে বদ্ধ মুষ্টি দিয়ে আঘাত করতো। এর পরিসমাপ্তি ঘটতো এই দুই যোদ্ধার একজনের মৃত্যুতে। একের মুষ্ট্যাঘাতে অন্যে যখন ধরাশায়ী হতো, তখনও সমানে চলতো মুষ্ট্যাঘাত বর্ষণ, কারণ, একের প্রাণ না গেলে অপরকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করতেন না

(শেষাংশ ১৪৬ পৃষ্ঠায়)

আধুনিক কালের মুষ্টিযুদ্ধ

অবসর বিনোদন

শ্রীমতী লীলা দে

আজকাল আমাদের দেশে নানা বিভাগে নানা রকম পরিকল্পনা তৈরী হচ্ছে, দেশের ও দশের উন্নতির জন্য। শরীর ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য অবসর-বিনোদনের পরিকল্পনা করবারও এখন সময় হয়েছে। যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের সকলের জন্যই 'অবসর বিনোদনের' পরিকল্পনা কথাটা চালু করা হয়েছে। জীবিকা অর্জনের জন্য যে সব পেশা, ব্যবসা মানুষ করে, এমন কি গৃহস্থালীর নিত্য-নৈমিত্তিক কাজও তার মধ্য থেকে বাদ যায় না, সেই সব কাজের মধ্যে একঘেয়েমী এসে গেলে মানুষের কর্মশক্তি হ্রাস পায়—মনের আনন্দ নষ্ট হয়ে যায়। আনন্দের মধ্যেই আছে প্রাণের বিকাশ। যে মানুষ কাজ করবে, তার আনন্দই যদি নষ্ট হয়ে যায়—তবে তার কাজ হবে নিষ্প্রাণ। এই একঘেয়েমীর জন্যই মানুষ হারিয়ে ফেলে স্বাচ্ছন্দ্য—তার কর্মশক্তিতে আর কোনো উদ্দীপনা থাকে না।

মানুষের কর্মশক্তি ও স্বাস্থ্য জাতির সবচাইতে বড় মূলধন। মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি না হলে মানুষ ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলে তার কর্মশক্তি। সুতরাং দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য যেমন নানা-রকম স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় পরিকল্পনা রচিত হয়ে থাকে—মানসিক উন্নতির জন্যও তেমনি পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়েছে।

দৈনন্দিন কার্যের একঘেয়েমী দূর করতে হলে অবসর বিনোদনের জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনা থাকা দরকার। কাজের একঘেয়েমীর ব্যতিক্রম ঘটানো যায়, মনের মত কাজ দ্বারা। সংসারের নানা জটিল সমস্যা, কর্মস্থলের বিবিধ চিন্তা ও ভাবনা থেকে কিছুক্ষণের জন্য মনকে মুক্ত রাখা প্রয়োজন।

মনস্তত্ত্বের কতকগুলি বৈজ্ঞানিক সূত্রের উপর ভিত্তি করে বাছাই করা কতকগুলি বিষয় নিয়ে, অবসর বিনোদনের কর্মসূচী প্রস্তুত করা উচিত। মানুষের মনে সহজে আবেদনশীল বিষয়গুলি অবসর বিনোদনের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। অবশ্য এই কর্মসূচীর কিংবা কর্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির বয়স, কাল, পাত্র-পাত্রী, রুচি এবং পেশাভেদে কিঞ্চিৎ অদল-বদল হতে পারে। কিন্তু, লক্ষ্য একই—সেটি হচ্ছে কাজের একঘেয়েমী দূর করা এবং আনন্দ পাওয়া।

আমাদের দেশের জনসাধারণকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়। একদল কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবিকার্জন করেন—আর একদল বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা কলম চালিয়ে জীবিকার্জন করেন। অবসর বিনোদনের কর্মসূচীও এই দুই দলের জন্য একটু বিভিন্ন হবে। কায়িক শ্রমের দ্বারা যাঁরা জীবিকার্জন করে থাকেন, তাঁদের কাছে সহজে সংবেদনশীল হয়ে থাকে— মোটামুটি সহজ বুদ্ধির খেলাধুলো এবং চক্ষু ও কর্ণের আনন্দ ও তৃপ্তিদায়ক নাচ গান ও অভিনয়। যাঁরা বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জন করে থাকেন—তাঁদের কাছে খেলাধুলো (Indoor & Outdoor) শরীরচর্চা, শিল্পী-মনের উপযুক্ত সংগীত, নৃত্য, অভিনয় ও সাহিত্যচর্চা ইত্যাদি হয় আকর্ষণীয়।

এবারে একটি অবসর-বিনোদন (Recreation) সংঘ গঠন করা সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই। প্রথমতঃ একটি 'অবসর-বিনোদন' সংঘ গঠন করতে হলে জনগণ, সরকার এবং কর্মীদের কর্তৃপক্ষের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার মনোভাব বিদ্যমান থাকা উচিত। কর্মীদের মধ্যে আনন্দ সঞ্চার করতে পারলে কর্তৃপক্ষ তাঁদের কাছ থেকে অনেক বেশী কাজ পাবেন। প্রত্যেক কর্মীর কর্মশক্তি বাড়ানো মানে জাতীয় মূলধন বাড়ানো। সুতরাং এই তিনের পূর্ণ সহযোগিতা ও সাহায্য সংঘের পক্ষে অপরিহার্য।

সংঘের নিজস্ব একটি 'গৃহ' থাকা আবশ্যক। গড়ে যত কর্মীর উপস্থিতি আশা করা যায়, সেই সংখ্যক কর্মীদের স্থান সংকুলান হতে পারে, গৃহের আয়তন এরূপ হওয়া চাই। গৃহটির স্থান-নির্বাচনে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, গৃহটি যেন সকলেরই (অর্থাৎ যাঁরা ব্যবহার করবেন) আসা-যাওয়ার সুবিধার আওতায় থাকে।

সংঘের একটি কার্যনির্বাহক সমিতি থাকবে। বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তিতে বেশীর ভাগ সভ্যই কর্মীদের মধ্য হতে নির্বাচিত হবে। নির্বাচনে সমিতির সভ্যগণের ক্ষমতা, গুণ ইত্যাদি বিশেষভাবে বিবেচনা করা উচিত। সব সময়ে মনে রাখা উচিত যে, কাজ যাতে ভালভাবে করা যায়—তার জন্যই এই সমিতি। সুতরাং যাঁরা এই সমিতিতে নির্বাচিত হয়ে আসবেন, তাঁদের যোগ্যতাই তাঁদের নির্বাচনের মাপকাঠি হবে। সমিতিতে কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি থাকাও বাঞ্ছনীয়।

সংঘের কর্মতালিকা অনুযায়ী সাজ-সরঞ্জাম কিনতে হবে। কর্মতালিকা অনুযায়ী কাজ করাবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষিত নায়কের প্রয়োজন। এইরূপ শিক্ষিত নায়কের (Trained Leader) অভাব হলে যাতে শীঘ্র এ অভাব দূর করা যায় সেজন্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে শিক্ষা দিয়ে আনতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে ঐ শিক্ষিত নায়কের তত্ত্বাবধানে আরও নায়ক তৈরী করতে হবে। খেলাধুলো সম্বন্ধে উপরোক্ত শিক্ষিত নায়কের প্রয়োজন খুব বেশী। এ ছাড়া বিশেষ বিভাগ যেমন গ্রন্থাগার, নাটমঞ্চ, ফোটোগ্রাফী ইত্যাদি সম্বন্ধেও শিক্ষিত নায়কের প্রয়োজন আছে।

অর্থনৈতিক দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের এবং সংঘের সভ্যাদিগেরই বহন করা উচিত। সংঘের সময় নির্ধারিত থাকবে। ছুটীর পর প্রত্যহ তিন ঘণ্টা এবং রবিবার দিন, সকালে, দুপুরে ও বিকেলে সংঘ খোলা রাখার দরকার। প্রতিদিনের জন্য এক একটি বিশেষ কর্মতালিকা তৈরী থাকবে। তার মধ্যে সংঘের সভ্যদের রুচি অনুযায়ী কিছু-না-কিছু বিষয় থাকবে।

তিনমাস পর পর এক একটি বিশেষ অনুষ্ঠান করা উচিত। এই সব বিশেষ অনুষ্ঠানের কর্মসূচী কর্মীদের নিজস্ব চেষ্টা, প্রতিভা এবং অবদান দ্বারা রচিত হবে। অবসর বিনোদনের অপর একটি বড় উদ্দেশ্য মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ করা। তাই শিল্প, সংগীত, কলা, খেলাধুলো ইত্যাদি বিষয়ে কর্মীদের অবদানই বিশেষভাবে গণ্য করা হবে।

এবারে সংঘের কর্মতালিকা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। এইরূপ সংঘের কর্মতালিকাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হবেঃ—

১। **নানা রকম বুদ্ধির কসরত**ঃ—যেমন অঙ্কের ধাঁধা শব্দ তৈরী, কবিতা রচনা, ম্যাজিক দেখানো হাতে লেখা পত্রিকা সম্পাদন, কবির লড়াই তাসখেলা ইত্যাদি।

২। **নাটকাভিনয়**ঃ—নাটক নির্বাচন, সংঘের সভ্যগণ কর্তৃক অভিনয়, নাটকের উপযোগী গহনা পোষাক, সাজসজ্জা, মেক-আপ প্রস্তুত করা মঞ্চ নির্মাণ, আলোকসজ্জা, আলোক নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি নাটমঞ্চ সংক্রান্ত কাজ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা।

৩। **যাত্রা ও কথকতা**ঃ—যাত্রা, কথকতা, কবিগান প্রভৃতির প্রচলন করা। উপযুক্ত উৎসাহী কর্মীবৃন্দকে এই সব বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখা। পুতুল নাচের প্রচলন ও শিক্ষাদান।

৪। **গ্রন্থাগার**—গ্রন্থাগার গঠন করা। গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়ে উৎসাহী সভ্যগণকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা।

৫। **একত্রীভোজন**ঃ—সকলে একত্রে মিলে-মিশে রান্না ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা। এই উপলক্ষে প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি সম্ভব হয় এবং প্রকৃতির সঙ্গে যোগ স্থাপিত হয়।

৬। **সংগীত ও নৃত্যের জলসা**ঃ—প্রধানতঃ সভ্যগণ কর্তৃক নিজস্ব জলসার ব্যবস্থা করা। কখনও কখনও বাহিরের গুণী সমাবেশে জলসার ব্যবস্থা করা।

৭। **খেলাধুলো**ঃ—ফুটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, টেনিকয়েট, টেবিলটেনিস এবং লুডো, ক্যারাম, তাস ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা ও সভ্যদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

৮। **ব্যায়াম**ঃ—শরীর সুস্থ রাখার জন্য প্রাত্যহিক মিলিত ব্যায়ামের ব্যবস্থা রাখা।

৯। **ভাষা শিক্ষা**ঃ—আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা আছে। কর্মীদের মধ্যে নানা অঞ্চল হতে আগত বিভিন্ন ভারতবাসীর মধ্যে পরস্পর ভাষার বিনিময়ের দ্বারা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা।

(শেষাংশ ১৪৫ পৃষ্ঠায়)

সুদেহী প্রদর্শনী

শ্রীমনোহর আইচ

বাল্যকাল থেকেই আমি শরীরচর্চা বা বিভিন্ন প্রকারের ব্যায়াম ক্রীড়া কৌশলের প্রতি আগ্রহশীল। বিভিন্ন দেশের ব্যায়াম চর্চার পদ্ধতি, মল্লযোদ্ধাদের কাহিনী, চাঞ্চল্যকর ক্রীড়া-কৌশল ও শক্তিমান পুরুষদের ইতিহাস সংগ্রহে আমার চিরদিন ঔৎসুক্য ছিল।

সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বলতে পারি যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শক্তিশালী মল্লবীর, মুষ্টিযোদ্ধা ও জিমনাস্টের আবির্ভাব ঘটেছে। অনেকক্ষেত্রে এই সব ব্যায়ামবীর শক্তি অপেক্ষা কৌশলের খেলা দেখিয়ে দর্শকদের মন জয় করতেন। অধুনা কৌশল দেখিয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করার রেওয়াজ কমে এসেছে, তবে একেবারে বন্ধ হয়নি।

আজকাল অনেকে শক্তিবর্ধক ব্যায়াম অনুশীলনের সঙ্গে দেহটিকে সুন্দর, সুগঠিত করে গড়ে তুলতেও মনোযোগী। শক্তি অর্জনের সঙ্গে সুদেহ গঠনের প্রবৃত্তির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে বলেই আঞ্চলিক তথা আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে দেহশ্রী-সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। ঠিক এই জাতীয় আয়োজন পূর্বেকার কালে ছিল না। অবশ্য প্রাচীন গ্রীসে যে অনুরূপ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা একেবারেই ছিল না তা মনে করার কারণ নেই। গ্রীকরা সুন্দর দেহের ভক্ত ছিল, গ্রীসের শিল্পকলার মধ্যে সুঠাম প্রতিমূর্তির স্থান রয়েছে এবং সুদেহী হারকিউলিসকে গ্রীকরা চিরদিন সুঠাম, সম্পূর্ণ মানব ও শক্তি-সৌন্দর্যের প্রতীক বলে মনে করে এসেছে।

মনতোষ রায়

মনোহর আইচ

যাই হোক, মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে, দেহকে সুঠাম, পেশীবহুলরূপে গড়বার জন্যে নিয়মিত ব্যায়াম চর্চার প্রচলন যে কালেই হয়ে থাকুক না কেন, দেহশ্রী প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সুদেহী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হচ্ছে সাম্প্রতিক-কালে, বিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদে।

দেহশ্রী প্রতিযোগিতার উদ্ভব হয় পাশ্চাত্যে, যাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রচারিত ও সর্বপ্রধান হলো 'মিঃ ইউনিভার্স' প্রতিযোগিতা, আমাদের দেশে যা 'বিশ্ব-শ্রী' নামে খ্যাতিলাভ করেছে। আনুষ্ঠানিক-ভাবে ১৯৪৭ সালে আমেরিকায় এই প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছিল এবং সেবারের আয়োজনে বিশ্ব-শ্রেষ্ঠ ভারোত্তোলক আমেরিকার স্টিভ স্টেকো বিশ্বশ্রী আখ্যায় অভিনন্দিত হয়েছিলেন। পরের বছর বিশ্বশ্রী প্রতিযোগিতার আসর বসে লণ্ডনে। যুদ্ধোত্তরকালে ১৯৪৮ সালে লণ্ডনেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল অলিম্পিক ক্রীড়া। অলিম্পিক অনুষ্ঠানের প্রায় সমসাময়িককালে বিখ্যাত 'হেল্থ এ্যাণ্ড স্ট্রেংথ' পত্রিকার পরিচালনায় এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা **হলে আমেরিকার ব্যায়ামবীর জন গ্রিমেক লণ্ডনে** বিশ্বশ্রী আখ্যা পান। **আগের বছরের তুলনায়** আটচল্লিশ সালের **অনুষ্ঠান অপেক্ষাকৃত** সুপরিচালিত এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়েছিল।

১৯৪৯ সালে বিশ্বশ্রী প্রতিযোগিতা হয়নি তবে ১৯৫০ সাল থেকে নিয়মিতভাবেই ন্যাশনাল এ্যামেচার বডি বিল্ডিং এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ইংলণ্ডেই এই প্রতিযোগিতা হয়ে আসছে। ১৯৫০ সালে আমেরিকার স্টিভ রিজ বিশ্বশ্রী আখ্যা পান। সে বছরেই প্যারিসে বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আন্তর্জাতিক ভারোত্তোলন ফেডারেশনের উদ্যোগে একটি দেহ-সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল যার নাম 'মিঃ ওয়ার্ল্ড' প্রতিযোগিতা এবং সেই প্রতিযোগিতা জয় করেন আমেরিকার জন্ ফারবার্টানিক। 'মিঃ ইউনিভার্স' ও 'মিঃ ওয়ার্ল্ড' প্রতিযোগিতার মূল পার্থক্য হলো এই যে, প্রথমোক্ত প্রতিযোগিতায় সুদেহীরা প্রাধান্য পান আর শেষোক্ত অনুষ্ঠানে ভারোত্তোলকেরা। শ্রেষ্ঠ ভারোত্তোলকদের মধ্যে যাঁর দেহ সর্বাপেক্ষা সুগঠিত তাঁকেই 'মিঃ ওয়ার্ল্ড' আখ্যা দেওয়া হয়।

১৯৫১ সালে ইংলণ্ডে বিশ্বশ্রী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলে রেজ পার্ক শ্রেষ্ঠের সম্মান পান। ভারতের মনতোষ রায় ও মনোহর আইচ এবারের প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন এবং প্রতিযোগিতার তৃতীয় বিভাগে শ্রীযুক্ত রায় প্রথম ও
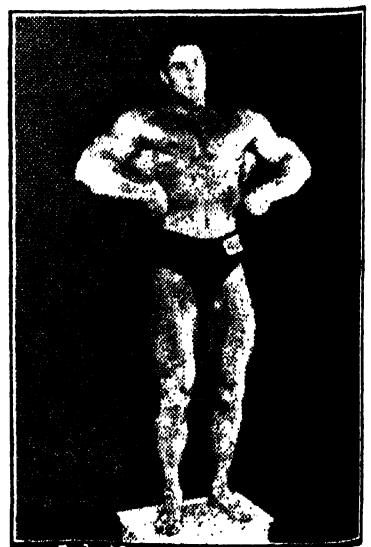
রেজ পার্ক

লেখক দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিলেন। ১৯৫১ সালে আন্তর্জাতিক ভারোত্তোলন ফেডারেশন পরিচালিত 'মিঃ ওয়ার্ল্ড' প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয়নি।

১৯৫২ সালে আবার ইংলণ্ডেই বিশ্বশ্রী প্রতিযোগিতার আসর পাতা হলে অনুষ্ঠানটিকে দুভাগে বিভক্ত করা হয়। একটিতে পেশাদারেরা এবং অপরটিতে অপেশাদারেরা যোগ দেন। পেশাদারী বিভাগে স্পেনের জনফেরো এবং অপেশাদারদের নির্দিষ্ট আয়োজনে মিশরের মহম্মদ নাসের 'বিশ্বশ্রী' আখ্যা পান। এবার ভারত থেকে যে দুজন এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে লেখক পেশাদারদের তৃতীয় গ্রুপে প্রথম হন। ১৯৫২ সালেও 'মিঃ ওয়ার্ল্ড' প্রতিযোগিতা হয়নি। ১৯৫৩ সালে বিশ্বশ্রী প্রতিযোগিতায় পেশাদারদের বিভাগ ইংলণ্ডের আরনল্ড ডাইসন ও অপেশাদারদের অনুষ্ঠান আমেরিকার বিল পার্ক জয় করেছিলেন। তবে এবারেও 'মিঃ ওয়ার্ল্ড' প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান স্থগিত থাকে। ১৯৫৪ সালে পেশাদার জিম পার্ক (আমেরিকা) বিশ্বশ্রী আখ্যা পান আর আমেরিকারই এরিকো টমাস অপেশাদারদের বিভাগে শীর্ষস্থান পান। ভারতশ্রী কমল ভাণ্ডারী দ্বিতীয় বিভাগে ষষ্ঠ এবং অপর ভারতীয় শান্তি চক্রবর্তী তৃতীয় বিভাগে পঞ্চম স্থান পেয়েছিলেন। অনেক দিন পর আন্তর্জাতিক ভারোত্তোলক ফেডারেশনের উদ্যোগে ১৯৫৪ সালে ভিয়েনায় আবার 'মিঃ ওয়ার্ল্ড' প্রতিযোগিতা হলে আমেরিকার বিখ্যাত ভারোত্তোলক টমি কোনো সে আখ্যা অর্জন করে নেন।

পরের বছর মিউনিকে 'মিঃ ওয়ার্ল্ড' প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলে আবার টমি কোনো সে আয়োজনে শ্রেষ্ঠের সম্মান পান। ভারতের কমল ভাণ্ডারী এবং শান্তি চক্রবর্তী মিউনিকের আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন। সেই বছরে ইংলণ্ডে আয়োজিত বিশ্বশ্রী প্রতিযোগিতার পেশাদার বিভাগে জয় করেন কানাডার লিও রবার্ট আর অপেশাদার বিভাগ মিকি হেরিগেটে। লেখক তাঁর নিজের বিভাগ ছেড়ে এবার উচ্চতর বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে বিচারকেরা তাঁকে এই বিভাগে তৃতীয় স্থান দেন।

১৯৫৬ সালে আমেরিকার দুজন ব্যায়ামবীর বিশ্বশ্রী প্রতিযোগিতার উভয় বিভাগ জয় করেন। জ্যাক ডিলিঞ্জার পেশাদারদের এবং রে সাকার অপেশাদারদের বিভাগে শীর্ষস্থান পান। 'মিঃ ওয়ার্ল্ড' প্রতিযোগিতা হয়নি। তবে গত বছরে

জন গ্রিমেক

তেহরানে 'মিঃ ওয়ার্ল্ড' প্রতিযোগিতার পুনরনুষ্ঠান হলে আবার টমি কোনো সে প্রতিযোগিতা জয় করেন। সে বছরে অর্থাৎ ১৯৫৭ সালে বিশ্বশ্রী প্রতিযোগিতায় পেশাদারদের মধ্যে প্রথম হয়েছিলেন ফ্রান্সের আর্থার রবিন এবং অপেশাদারদের মধ্যে ইংলণ্ডের জন লিজ।

এবার ন্যাশনাল এ্যামেচার বডি বিল্ডিং এসোসিয়েশন পরিচালিত ইংলণ্ডের বিশ্বশ্রী প্রতিযোগিতার বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করলো। বিচারের ভার থাকে সাতজন বিচারকের ওপর। প্রতিযোগীদের উচ্চতা অনুযায়ী তাঁদের তিনটি বিভাগে (প্রথম গ্রুপ ৫' ৯" উপর, দ্বিতীয় গ্রুপ ৫' ৬" থেকে ৫' ৯"-র মধ্যে এবং তৃতীয় গ্রুপ ৫' ৬" নীচে) বিভক্ত করা হয়। পেশাদার ও অপেশাদার উভয় ক্ষেত্রেই এই নিয়ম অনুসরণ করা হয়।

বিভিন্ন গ্রুপের বিচার স্বতন্ত্রভাবে করার পর তিনটি বিভাগের বিজয়ীদের নিয়ে আবার বিচার চলে এবং শেষ পর্যন্ত এই তিনজনের একজন বিশ্বশ্রী আখ্যা পান। আমাদের দেশে দেহ-সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতার বিচারকালে প্রতিটি মাংসপেশীর গঠন-পদ্ধতি বিচার করে নম্বর দেওয়া হয়, কিন্তু লণ্ডনের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। বিশ্বশ্রী প্রতিযোগিতায়
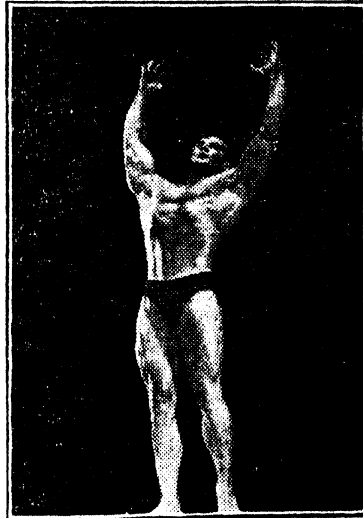
স্টিভ্ রিভস

১৯৫১ সাল পর্যন্ত নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে বিচার করে নম্বর দেওয়া হয়েছে:—(১) শরীরের বিভিন্ন মাংসপেশীর আকার ও গঠন, (২) পেশী চালনার সঙ্গে প্রতিযোগীদের দাঁড়াবার বিভিন্ন ভঙ্গী এবং (৩) প্রতিযোগীদের শরীরের সহজ স্বাচ্ছন্দ, গতিবিধি ও ক্ষিপ্রকারিতা দেখা। এই তিনটি বিষয়ে স্বতন্ত্র বিচার করে অর্জিত নম্বরের যোগফল অনুসারে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হোতো।

কিন্তু ১৯৫১ সালের পর থেকে বিচার পদ্ধতি বদলানো হয়েছে। বর্তমানে প্রতিযোগীদের শরীরের বিভিন্ন মাংসপেশীর গঠন, আয়তন ও ভঙ্গী, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন অংশের সমতা, পেশী-চালনার সঙ্গে দাঁড়াবার ভঙ্গী, শরীরের সহজ, স্বাচ্ছন্দ্য ভাব, চর্মের মসৃণতা এবং সর্বাঙ্গীণ সৌন্দর্য—এই সমস্ত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে বিচারকেরা পৃথক পৃথকভাবে গ্রুপের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় জন বেছে নেন; তারপর সাতজন বিচারকের বিচারফল একসঙ্গে করে বিভাগীয় নির্বাচন তথা চূড়ান্ত নির্বাচন সম্পাদন করা হয়। সংশোধিত বিচার পদ্ধতি উন্নততর হয়েছে এবং বিচারকালে পক্ষপাতিত্বমূলক মনোভাবকে বাতিল করাও সম্ভবপর হচ্ছে।

জয়ান ফেস্তা

অবসর বিনোদন

(১৪২ পৃষ্ঠার পর)

উপরোক্ত কর্মতালিকা ছাড়া অন্য বিষয়ও চাহিদা অনুযায়ী কর্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। কিন্তু সর্বদা লক্ষ্য রাখা উচিত যে, বিষয়গুলি যেন সুনির্বাচিত ও সংবেদনশীল হয়। সিনেমা কিংবা ছায়া-ছবির মাধ্যমে চিত্ত-বিনোদনের ব্যবস্থার বিকল্পেই এই অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা। সুতরাং সিনেমা সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা অনাবশ্যক।

আমাদের মহিলাদের অবসর বিনোদনের ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাঁদের জন্য পাড়ায় পাড়ায় ছোট ছোট সংঘ গঠন করা উচিত। সরকারের সমাজ-কল্যাণ বোর্ড ও সামাজিক শিক্ষা বিভাগের দৃষ্টি এদিকে আছে। সরকার এ বিষয়ে সাহায্যও দিয়ে থাকেন। এজন্য অনেক বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। সেই সব বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যেই অবসর বিনোদন সংঘের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হতে পারে। এই সব কেন্দ্রে একজন করে শিক্ষিকা থাকেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে অবসর বিনোদন কেন্দ্রের কাজ চলতে পারে। অবসর বিনোদন বিভাগে চারুশিল্প, সীবনশিল্প, খেলাধূলো, অভিনয়, পুতুল তৈরী শিক্ষা, সংগীত শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মাঝে মাঝে সংবাদপত্র আলোচনা, নানারকম গৃহ-সমস্যা সম্বন্ধে মতামত, রকমারী পুষ্টিকর খাদ্য তৈরী শিক্ষা, সন্তান পালন, রোগীর শুশ্রূষা ও প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ের অবতারণা এবং শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

মহিলাদের জন্য উপরোক্ত বিষয়গুলি সবই ঐচ্ছিক বিষয় হবে। অবসর বিনোদনের সঙ্গে সঙ্গে মহিলারা ইচ্ছা করলে কর্মসূচীতে আরও অন্যান্য চিত্তাকর্ষক বিষয়েরও অবতারণা করে আনন্দ লাভ করতে পারেন।

মুষ্টিযুদ্ধের ইতিকথা

(১৪১ পৃষ্ঠার পর)

[illegible]। এই ধরণের যুদ্ধ রোমানদের কিন্তু বেশী দিন ভাল লাগলো না। রক্তলোলুপ এই যোদ্ধাদের মধ্যে একে অপরকে ধরাশায়ী করতে বহু সময় লাগতো। তাই রোমানরা চামড়ার পটিতে ধাতুর খোঁচা জুড়ে দিলেন। ফলে, আর লড়াইয়ের বেশী প্রয়োজন হতো না। কয়েকটা আঘাতেই একজন অপর একজনের প্রাণ অল্প সময়ের মধ্যেই নিয়ে নিতে পারতো।

এইভাবে সারা রোম ও গ্রীসে মুষ্টিযুদ্ধের বহুল প্রচলন ঘটে। গ্রীসের দেখাদেখি ইটালীতেও রোমানরা ক্রীড়া হিসাবে মুষ্টিযুদ্ধের প্রচলন করলো। রোমীয়দের মধ্যে তখন পাশবিক আনন্দ উপভোগের যুগ। এই নির্মম প্রবৃত্তি থেকেই রোমের রাজারা তখন এম্ফিথিয়েটারের প্রচলন করেছেন। নিরস্ত্র মানুষকে হিংস্র বন্য পশুর মুখে ছেড়ে দিয়ে তাদের মরণপণ যুদ্ধ দেখে আনন্দ উপভোগ করতেন তাঁরা। গ্রীসের এই মুষ্টিযুদ্ধের ক্রীড়াটিকে তাঁরা আরও নিষ্ঠুর করে নিলেন অত্যন্ত হিংস্র ধরণের চর্ম-বন্ধনী আবিষ্কার করে। মুষ্টিতে এই বন্ধনী পরে মুষ্টিযোদ্ধারা যখন দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হতো, তখন আঘাতে আঘাতে সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত ও জর্জরিত হতো এবং অল্প কালের মধ্যে বিজিতের প্রাণবিয়োগ ঘটতো।

রোমানরা গ্রীকদের সব বিষয়ে নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করবার এক উন্মাদ প্রচেষ্টায় মেতে উঠেছিল। দলে দলে তারা মুষ্টিযোদ্ধা পাঠাতো গ্রীসে। সঙ্গে দিয়ে তাদের সেই প্রাণঘাতী চর্ম-বন্ধনী যার সাহায্যে তারা অবলীলাক্রমে গ্রীসের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের পরাজিত ও পর্যুদস্ত করতো। এইভাবে গ্রীসের মুষ্টিযোদ্ধাদের তারা প্রায় নির্মূল করেই ফেলে। তখন প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ হয় স্বদেশের যোদ্ধাদের মধ্যেই। কাজেই রোমীয়রা তখন মুষ্টিযুদ্ধের নিয়মাবলীর আমূল পরিবর্তন করে।

রোমে বা গ্রীসে সেকালে মুষ্টিযুদ্ধ এত প্রসার লাভ করে যে, প্রায় উৎসব, পালা-পার্বণ, এমন কি মৃতের সৎকারেও মুষ্টিযুদ্ধের ব্যবস্থা না করলে যেন এই সব অনুষ্ঠানে অঙ্গহানি ঘটে বলে লোকের ধারণা জন্মে যায়। আর এই সকল মুষ্টিযুদ্ধের বিজয়ী যোদ্ধাদের এত সম্মান ও উপহার ইত্যাদি দেওয়া হতো যে, শক্তিশালী তরুণ যুবকরা এই ক্রীড়াটির প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হতো। বহুদিন এইভাবে চলবার পর খৃষ্টজন্মের কিছু পূর্বে জনৈক রোম-সম্রাট এর অপকারিতার বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠেন এবং আইন দ্বারা মুষ্টিযুদ্ধ বন্ধ করে দেন। সেই থেকে ধীরে ধীরে এর প্রসার ও প্রভাব লুপ্ত হয়ে যায়। তারপর শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে গেছে, গ্রীস ও ইটালীর প্রাধান্যের পর এসেছে প্রুশীয়, জার্মাণ, ফরাসী ও ইংরাজ প্রাধান্যের যুগ। মুষ্টিযুদ্ধ ইতিহাসের প্রাচীন কাহিনী রূপে পরিগণিত হয়েছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডে পুনরায় এর অভ্যুত্থান হলো। ইংলণ্ডে তখন শিভালরি ও নাইট হুডের যুগ। বাদ-বিসম্বাদ, তর্কাতর্কি, প্রণয়ঘটিত কলহ, এই সমস্ত মীমাংসার জন্য তরুণদের মধ্যে 'ডুয়েল' বা দ্বন্দ্বযুদ্ধের রেওয়াজ তখন জোর চলেছে। এরই হাত ধরাধরি করে এলো মুষ্টিযুদ্ধ। তর্কের মীমাংসা বা বাজী জেতার জন্য তখন যত্রতত্র কোন বীরপুঙ্গবদ্বয়কে মুষ্টিযুদ্ধে মত্ত অবস্থায় মাঠে-ময়দানে বা রাস্তার ধারে, এমন কি ক্লাব বা রেস্তোরাঁতে দেখা যেতো। এই যুদ্ধপদ্ধতি অনেকটা আমাদের দেশের মল্লযুদ্ধের রীতিতেই চলতো। প্রথমে বাহুযুদ্ধ, তারপর ধস্তাধস্তি এবং অবশেষে দুজনের মধ্যে যে অপরজনকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ঠেসে ধরে রাখতে পারতো, জয়ী হতো সে-ই। এই যুদ্ধের রীতি বা নিয়মের প্রবর্তক কে, তা' জানা যায় না। তবে এই পদ্ধতিকে অবলম্বন করেই ইংলণ্ডের খ্যাতনামা এথ্‌লিট জেমস্ ফিগ এই আধুনিক যুগের খালি হাতে মুষ্টিযুদ্ধের প্রবর্তন করেন। জেমস্ ফিগ একজন চৌকশ এথ্‌লিট ছিলেন। তিনি অসিযুদ্ধ ও মল্লযুদ্ধ উভয় বিষয়েই সমান পটু ছিলেন।

রকি মার্সিয়ানো
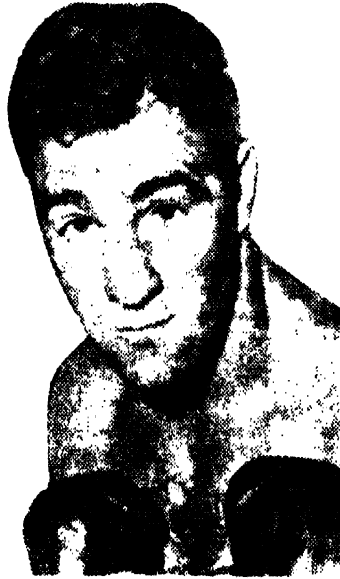
সম্ভবতঃ মল্লযুদ্ধকালে তিনি মুষ্ট্যাঘাত প্রয়োগ করে সমধিক ফল লাভ করেছিলেন এবং সেই অভিজ্ঞতার দ্বারা মুষ্টিযুদ্ধকে একটি স্বতন্ত্র ক্রীড়া-পদ্ধতিতে উন্নীত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। শুনা যায়, মল্লযুদ্ধের অন্যান্য যোদ্ধাদের মত তিনি বহুক্ষণ পায়তারা পছন্দ করতেন না। প্রতিদ্বন্দ্বীর অত্যন্ত নিকটে গিয়ে, তাকে জাপটে ধরতেন এবং মুহূর্তমাত্র সময় না দিয়ে সজোরে মুষ্ট্যাঘাত শুরু করতেন।

নিজে শিক্ষক হয়েও ফিগ কোনদিন ভুলে যাননি যে, তিনি একজন মুষ্টিযোদ্ধা এবং সুযোগ এলেই তিনি মুষ্টিযুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন। ১৭২০—৩০ সাল পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মুষ্টিযোদ্ধার সহিত লড়েছেন, কেউ তাঁকে পরাজিত করতে পারেন নি। অপরাজেয় বীররূপে ১৭৩০ সালে ৩৬ বৎসর বয়সে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে ৪০ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

ফিগের প্রবর্তিত মুষ্টিযুদ্ধে প্রতিযোগীদের জয়-পরাজয়ের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত একটানা লড়তে হতো, মাঝখানে কোন বিরাম বা বিরতি দেওয়া হতো না। ১৭৪৩ সাল পর্যন্ত এই নিয়মই ইংলণ্ডে চালু ছিল। এই বৎসর ইংলণ্ডের অন্যতম খ্যাতনামা মুষ্টিযোদ্ধা জ্যাক্ ব্রাউটন পুরাতন নিয়ম সংশোধন করে নূতন নিয়মাবলীর প্রচলন করেন। ব্রাউটনের নিয়মাবলী 'লণ্ডন প্রাইজ রিং রুল' নামে পরিচিতি লাভ করে। প্রায় শত বৎসরকাল 'লণ্ডন প্রাইজ রিং রুল' অনুসারেই সমস্ত মুষ্টিযুদ্ধ পরিচালিত হতো। তারপর মার্কুইস্ অফ কুইন্সবেরী এই নিয়মের পরিবর্তন সাধন করে খালি হাতের পরিবর্তে দস্তানা আবৃত হস্তে লড়াই-এর ব্যবস্থা করেন। মার্কুইস্ অফ কুইন্সবেরী ১৮৬৫ সালে এই নিয়মের সংস্কার করে তিন মিনিট স্থায়ী রাউণ্ডের প্রবর্তন করেন। পূর্বের কুস্তি, ঠেলাঠেলি ইত্যাদি প্রকৃত মুষ্টিযুদ্ধ-বহির্ভূত কৌশলগুলি বর্জিত হয়। তাঁহার প্রবর্তিত নূতন নিয়মে প্রথম মুষ্টিযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় ১৮৭২ সালে এবং সেই সময়ে দৈহিক ওজন অনুযায়ী মুষ্টিযোদ্ধাদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। ১৪০ পাউণ্ড পর্যন্ত মুষ্টিযোদ্ধাদের লাইট ওয়েট, ১৪১—১৫৮ পাউণ্ড পর্যন্ত মিড্‌ল ওয়েট এবং ১৫৮ পাউণ্ডের ঊর্দ্ধে ওজনের মুষ্টিযোদ্ধাদের হেভি ওয়েট বিভাগে লড়াইবার ব্যবস্থা হয়।

এর পর ইংলণ্ড হতে মুষ্টিযুদ্ধ আমেরিকাতে প্রসার লাভ করে। কিন্তু আমেরিকাতে এর প্রচলনে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়। ইংলণ্ডের বিভিন্ন মুষ্টিযোদ্ধা আমেরিকায় গিয়ে দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করলেও, মুষ্টিযুদ্ধকে সরকারী অনুমোদন পেতে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। আমেরিকার নিউইয়র্কে ১৮৯৬ সালে সর্বপ্রথম আইনসম্মত ক্রীড়া হিসাবে মুষ্টিযুদ্ধ অনুমোদন করা হয়। নিউইয়র্কের পর ১৮৯৭ সালে নেভাদা রাজ্যে এবং সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২০ সালে মুষ্টিযুদ্ধকে স্বীকৃতি দিয়ে ওয়াকার বিল পাশ করা হয়। আইন পাশ হওয়ার পরেই ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনকে মার্কিন মুষ্টিযুদ্ধের স্বপ্নরাজ্যরূপে তৈরী করা হয়।

এই ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনকে বিশ্ববিখ্যাত বহু মুষ্টিযুদ্ধের তীর্থক্ষেত্র বলা যেতে পারে। অতি বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে যাত্রা আরম্ভ করে মুষ্টিযুদ্ধ এখন মার্কিণ মুলুকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণীয় ক্রীড়া। এখানে যে-কোন পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ ডলারের লেনদেন চলে। এই মার্কিণ মুলুকে বিশ্বের সর্বকালের যে সকল শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে জ্যাক জনসন, জ্যাক্ ডেম্সি, জেনি টুনি, জো লুই প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আজ মুষ্টিযুদ্ধ কেবল গ্রেট বৃটেন বা আমেরিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই এর চর্চা হয়ে থাকে। অন্যান্য ক্রীড়ার মত মুষ্টিযুদ্ধেও পেশাদারী ও অ-পেশাদারী বিভাগ রয়েছে। বিভিন্ন দেশে এখন বিভিন্ন চ্যাম্পিয়নশিপ প্রবর্তিত হয়েছে। বিশ্ব অলিম্পিকেও মুষ্টিযুদ্ধ এক বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত। তবে অলিম্পিক নিয়মানুযায়ী কোন পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা এতে অংশ গ্রহণ করতে পারে না। বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় প্রতিনিয়তই এর নিয়মাবলীর সংশোধন ও সংযোজন হচ্ছে। অতীতের নির্মম মুষ্টিযুদ্ধে বহু যোদ্ধাকে অকালে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। আজকের পরিচালকমণ্ডলী সেই কথা স্মরণ রেখে মূল্যবান প্রাণগুলি যাতে অকালে বিনষ্ট না হয়, তার জন্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চলেন।

বিশ্বখ্যাতি অর্জন করতে হলে ক্রীড়াবিদদের একনিষ্ঠ সাধনার সঙ্গে সুস্থ ও সবল দেহ গঠনের জন্যে শরীর চর্চার একান্ত প্রয়োজন। এর জন্যে মুষ্টিযুদ্ধের ক্ষেত্রে যে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়, দরিদ্র ভারতের মুষ্টিযোদ্ধাদের সে সামর্থ্য নেই। তাই প্রতিভার অভাব না থাকলেও, বিশ্বমানের নিরীখে ভারতীয় মুষ্টিযোদ্ধারা অনেক পিছিয়ে আছে। ভারত সরকার এ্যাথ্‌লেটিকস্ ও খেলা-ধূলার অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় করছেন। কিন্তু মুষ্টিযুদ্ধের ক্ষেত্রে তাঁদের কার্পণ্য দুঃখজনক। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায়, পাশ্চাত্যের দেশগুলির ন্যায় স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে মুষ্টিযুদ্ধের প্রবর্তন হোক, আমরা এই আশাই করবো।

অবিস্মরণীয় অপরাহ্ণ

(১৪৩ পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু প্রতিবাদে, সমালোচনায় যা' করবার ক্ষমতা ছিল না কারুর, তাই অকপট অভিনন্দনে জেসি ওয়েন্সকে স্বীকার করতেও তাঁরা ছিলেন কুণ্ঠিত। দর্শকেরা সাদা চোখে এক প্রতিভাধর ক্রীড়াবিদের কার্যকলাপ দেখছেন কিন্তু ফুয়েরারের তর্জন-গর্জনের আতংকে মুখ ফুটে সে ক্রীড়াবিদের প্রশংসা করতে পারছেন না। সে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। এমন সময়ে এলো ব্রডজাম্প ফাইনাল দিন। লক্ষ জোড়া চোখের সামনে ব্রডজাম্প ফাইনাল জিততে এলেন নিগ্রো তরুণ জেসি ওয়েন্স আর জার্মানীর প্রধানতম আশা লুজ লং।

দুজনেই মস্তো এ্যাথলিট, চূড়ান্ত পর্যায়ে দুজনের মধ্যে প্রাধান্যের লড়াইও তীব্র হয়ে বেঁধে উঠলো। জেসি লাফালেন ২৫ ফুট, লুজ লং জবাব দিলেন ২৫ ফুট ৫½ ইঞ্চি লাফিয়ে। জেসি এবার লাফালেন সাড়ে পঁচিশ ফুট, কিন্তু লুজ লং আরও বেশী, স্বচ্ছন্দে অতিক্রম করে গেলেন ২৫ ফুট ৯ ইঞ্চি। ধাপে ধাপে দুজন এগিয়ে চলছিলেন। দর্শকদের মনের উত্তেজনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিনিয়তই। হঠাৎ পায়ের পেশী সংকুচিত হওয়ায় আহত লং মাটিতে বসে পড়লেন।

জার্মানীর আশা, হিটলারের আর্য শ্রেষ্ঠত্বের যোগ্যতম বাহক লুজ লং আহতাবস্থায় মাটি নিয়েছেন। একি বিপর্যয়! উৎকণ্ঠিত দর্শকদের শংকা বেড়েই চলেছে। কিন্তু সে শংকা দূর করলেন জেসি ওয়েন্স নিজেই এবার। লুজ লংয়ের অসুবিধা বুঝে জেসি ওয়েন্স নিজের মালিশের তেল নিয়ে লংয়ের পাশে বসে তাঁর পা মালিশ করে দিতে লাগলেন। লুজ লং অচিরে সুস্থ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং পরের বার লাফিয়ে অতিক্রম করলেন ২৫ ফুট ১০ ইঞ্চি। অবশ্য লুজ লংয়ের প্রচেষ্টায় সেইখানেই দাঁড়ি পড়ে গিয়েছিল, আর এগিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি, কিন্তু জেসি ওয়েন্স পরবর্তী দুবারের চেষ্টায় অতিক্রম করেছিলেন যথাক্রমে ২৬ ফুট ২½ ইঞ্চি ও ২৬ ফুট ৫¼ ইঞ্চি।

প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে চূড়ান্ত পরীক্ষার ক্ষেত্রে নিজের স্বার্থের প্রতিকূলে সাহায্য করার এমন দৃষ্টান্ত সহজে মেলে না। এক লক্ষ দর্শকে ঠাসা বার্লিন স্টেডিয়াম লুজ লংয়ের সাহায্যকারী জেসি ওয়েন্সকে দেখে মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই মৌনতা ছিল আশু ঝড়েরই পূর্ব-লক্ষণ মাত্র। ঝড় এসেছিল চোখের পলকেই। লক্ষ দর্শকের রুদ্ধ আবেগ এবার স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনে ফেটে পড়লো। হিটলারের জার্মানী অনার্য প্রতিনিধি নিগ্রো জেসি ওয়েন্সের জয়ধ্বনি তুলে মুহূর্তের জন্যে আধা-দেবতা ফুয়েরারকে ভুলে গেলো। সে জয়োল্লাস ফুয়েরারের পাষাণ-প্রাসাদের প্রাচীর ফুটো করেছিল কিনা জানি না কিন্তু এক 'খেলোয়াড়ের' বিজয়-বার্তা যে সেদিন জার্মানীর জনচিত্তে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ হিটলারের জার্মানীও ওয়েন্স সম্পর্কে প্রকাশ্যে আর বিরুদ্ধ মন্তব্য করেনি।

এই খেলোয়াড়টিকেই ষোড়শ অলিম্পিক অনুষ্ঠানের সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার তাঁর নিজস্ব শুভেচ্ছার বাহক ও ব্যক্তিগত দূত হিসেবে মেলবোর্ণে পাঠিয়েছিলেন। ক্লিভল্যাণ্ডের এক গরীব চাষীর ছেলে যিনি জীবিকা অর্জনে এক সময় নিজে পরের জুতো পালিশ করে দিতেন, তাঁকেই উত্তরকালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট সর্বোচ্চ সম্মানে অভিহিত করেছেন। খেলোয়াড়দের কাছে জেসি ওয়েন্সের মহান জীবনই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী।

জেসি বলেন যে, সাধনাই সিদ্ধিলাভের একমাত্র পথ। আঠারো বছর বয়সে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ছত্রিশ সালে যখন বার্লিন যান তখন তিনি সন্তানের জনক। দাম্পত্য জীবন জেসির সাধনার পথে কোনো বাধা খাড়া করতে পারেনি, দারিদ্র্যের কোনো সমস্যাও নয়। ষোল বছর বয়সে স্কুলে থাকতে থাকতেই তাঁকে জীবিকা অর্জনে প্রতিদিন ষোল মাইল পথ ঘুরে এসে অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করতে হোতো।

কৈশোরে জেসির কোচ ছিলেন ফেয়ার মাউন্ট জুনিয়ার হাইস্কুলের চার্লি রিলে, কলেজ জীবনে ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যারি স্নাইডার। পিতৃস্নেহে এঁরা জেসিকে লালন পালন করেছেন। খ্যাতির তুঙ্গে উঠেও জেসি এঁদের ভোলেন নি। বার্লিন থেকে দেশে ফিরে হাজারো দেশবাসীর সস্নেহ আলিঙ্গন পাশ এড়িয়ে জেসি সর্বপ্রথমেই ঝাঁপিয়ে পড়েন কোচ চার্লি রিলের বুকের মধ্যে, বৃদ্ধ রিলের চোখের পাতা সেদিন ভিজে এসেছিল। সকলকে শুনিয়ে কৃত্রিম আক্ষেপে তিনি বললেন, "ছেলেটা এতটুকু বদলালো না।"

জেসি ওয়েন্সের দৌড়বার বা লাফাবার ভঙ্গীতে কোনো খুঁত ছিল না। সে ভঙ্গী ছিল নয়নাভিরাম। বিশেষজ্ঞরা বলেন, জেসি ওয়েন্স তো দৌড়োতেন না, তিনি যেন ট্র্যাকের ওপর দিয়ে উড়ে যেতেন। ডেকাথলনে তিনি অংশ নিতেন না, কিন্তু ইচ্ছে থাকলে বোধ হয় তিনি সর্বকালের অন্যতম সেরা চৌকশ এ্যাথলিট হিসেবে স্বীকৃত হতে পারতেন। কারণ দৌড়, ব্রডজাম্প, হার্ডল রেস ছাড়া স্কুলে পড়ার সময় তিনি হাইজাম্পও করতেন। মাত্র পনেরো বছর বয়সেই ছফুট হাইজাম্প করে বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বয়সকালে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টিকারী তালিকায় জেসি ওয়েন্সের নাম এক-আধবার নয়, মোট এগারোবার মুদ্রিত ছিল।

বিংশ শতাব্দীর সেরা এ্যাথলিট কে? এ-প্রশ্নে ক'দিন আগে আমেরিকায় এক গণভোটের ব্যবস্থা করা হলে গণ-রায় নিগ্রো এ্যাথলিট জেসি ওয়েন্সের মাথায় মুকুট তুলে দিয়েছিল। জেসি ওয়েন্স নিজে এখন আর প্রতিযোগী নন, কিন্তু আগামী দিনের সম্ভাব্য প্রতিযোগীদের তিনি আজ হাতে করে গড়ে তুলছেন। যুক্তরাষ্ট্রে যে ক'জন সুদক্ষ এ্যাথলেটিক কোচ আছেন, জেসি ওয়েন্স তাঁদেরি অন্যতম, তাঁর শিক্ষার্থীরা সব স্কুলের কিশোর ছাত্র।

শিক্ষা ও সাধনা

(১৪০ পৃষ্ঠার পর)

যোগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি। এদের খেলায় মৌলিক দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় না বরং খেলোয়াড়দের আচরণে নানা রকমের ভুলভ্রান্তি থেকেই যায়। এই ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটিপূর্ণ খেলাই যে একদিন তাদের খেলার জগৎ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে, এ-কথা তারা ভাবেও না। তাই তারা যখন পরবর্তী কালে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক কোন খেলায় যোগদান করে, তখন আর তাদের পক্ষে ঐ দোষত্রুটি শুধরে নিয়ে খেলা সম্ভব হয় না। এই সমস্ত খেলা দেখে তাই আমার মনে হয়েছে যে, কিশোর তরুণদের কেবল টুর্ণামেণ্ট খেলালেই চলবে না—তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা চাই আগে। এই ধরণের খেলায় তারা কখনই দক্ষতা অর্জন করতে পারে না, যদি না তাদের যথাযথভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়। আমাদের দেশে স্কুল-কলেজে কোন ফুটবল শিক্ষার ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। যদি প্রকৃতই ফুটবল ক্রীড়ামানের উন্নতি করতে হয় এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতকে গৌরবের আসনে বসাতে হয়, তাহলে প্রয়োজন স্কুল-কলেজে সুপরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করা।

বল আয়ত্তে আনা ও ফুটবলের অন্যান্য কৌশল রপ্ত করার কোচ নির্দেশিত পথে সাধনার প্রয়োজন

নিকোবর দ্বীপমালা

শ্রীনিখিল মৈত্র

পো র্টব্লেয়ার থেকে ১৫০ মাইল দক্ষিণে নিকোবর দ্বীপমালার সর্বোত্তম দ্বীপ কার নিকোবরে চলেছি পুরাতন রাজা জাহাজে। বিকেল চারটেয় র্টব্লেয়ার চ্যাথাম জেটি ছেড়েছি, র দিন সকাল আটটায় নিকোবরে ছোবার কথা। সেই আমার প্রথম কার যাত্রা। পোর্টব্লেয়ারে নিকোবরের রণ সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি। বিশেষ হয়নি। দক্ষিণের দ্বীপবাসীদের সম্বন্ধে কাহিনী শুনেছি, কিন্তু সেখানে বসবাস ছে এমন লোকের সন্ধান পাইনি। তাই, ... ভাবে থাকবো এরকম কথাই মনে হচ্ছিল। জাহাজ ধীর, গতিতে মাদ্রাজের পথে চলেছে। পথে ক ঘণ্টার জন্যে কার নিকোবরে থামবে।

দক্ষিণ আন্দামান দ্বীপের পূর্বতটরেখার নিয়ে জাহাজ চলেছে। আন্দামান দ্বীপ-র ওপারে সূর্য অদৃশ্য হয়ে গেলো। পক্ষের দ্বিতীয়া কি তৃতীয়ার রাত্রি। ক্ষণ পরে যখন চাঁদ উঠলো তখন দক্ষিণ মান ছাড়িয়ে এসেছি। পশ্চিমে কালো দৈত্যের মতো লিটল আন্দামান দ্বীপের শৈলশ্রেণী দেখা যাচ্ছে। জাহাজে অল্প দুলুনিও আরম্ভ হয়েছে। প্রবীণ যাত্রিদল ছলেন যে, জুলাই মাসে দক্ষিণ-পশ্চিমী মী বাতাসের তাণ্ডব আজ যেন অস্বা-ক ভাবেই স্তিমিত। এরকম শান্ত সমুদ্র রর এই সময়ে বড় একটা দেখা যায় না। রাত্রি থেকে অবশ্য আমরা অশান্ত দশডিগ্রী লে পড়বো এবং তখন দুলুনি আরও বে বলে হুঁশিয়ারীও করে দিলেন। সে ঘুম হয়নি। ডেকের উপর রেলিং-এর বসে কালো জল আর আকাশে তারার দেখেছি। সীমাহীন সমুদ্রের মাঝ থেকে দিগন্ত রাঙিয়ে সূর্যোদয় হলো। ক্ষণ পরেই জাহাজের এক নাবিক চক্রবালের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে লো "ঐ, দূরে নিকোবরের তটরেখা দেখা ছ।" আমি অবশ্য কিছুই দেখতে পেলাম

আস্তে আস্তে সমুদ্রের গাঢ় নীল জল-র মাঝ থেকে নিকোবর দ্বীপ ভেসে লো। এখানে স্বাভাবিক কোনও পোতাশ্রয় জেটি নেই। তট থেকে মাইল খানেক দূরে সমুদ্রের মধ্যে জাহাজ নোঙ্গর দিল। রে যেতে হবে মোটর বোট এবং ক্যানোতে।

এই দ্বীপমালায় একটানা পাঁচ বছর বসবাস ছি। নিকোবরি জীবনের অতি সান্নিধ্য রও সুযোগ ঘটেছিল এবং আমিও তাদেরি জন হয়ে তাদের মধ্যে ছিলাম। তবুও, পরিচয়ের প্রতিটি ছোট বিবরণও স্মৃতিপটে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। মোটর বোট-এ গ্যাঙ্গওয়ের সিঁড়ি দিয়ে নেমে উঠা যথেষ্ট শক্ত ব্যাপার। অশান্ত সমুদ্রের উপর ছোট বোট এক একবার উপরে উঠছে, মুহূর্তের জন্যে সিঁড়ির শেষ ধাপের কাছে গিয়ে ঠেকছে আবার আছড়ে নিচে পড়ছে। ঠিক সময় বুঝে বোটে পা ফেলা দরকার। নতুন আগন্তুক ইতস্ততঃ করছে দেখে নিকোবরি বোট নাবিক শক্ত হাতে তুলে নিয়ে বোটে রাখলো। তারপর মোটর বোট দাঁড় দিয়ে আর থানাতিনেক মালবাহী নৌকো বেঁধে নিয়ে তটরেখার ধারে চললো ধীর গতিতে। মিনিট কুড়ি পরে মোটর বোট ছেড়ে দিয়ে অগভীর সমুদ্র পথটুকু পার হতে হলো ক্যানোতে করে। ছোট নৌকো, পাশে সমতারক্ষার জন্যে ভাসমান কাঠ বাঁশ দিয়ে বাঁধা রয়েছে। তটের কাছে তরঙ্গের উচ্ছ্বাসও বেশি। জলের ঝাপটায় জামাকাপড় ভিজে গেলো। সেদিকে তখন লক্ষ্য করার সময় ছিল না। দেখছিলাম নিকোবরিদের, কিভাবে তারা চালের বস্তা আর বড় বড় বাক্স নিয়ে নামাচ্ছে বোট থেকে এবং অক্লেশে ঘাড়ে করে নিয়ে চলেছে তীরে। সবাই কাজ করছে না। সাঁতার এবং জলের মধ্যে কুস্তি সমান-ভাবে চলেছে। সবারই মুখে হাসি। বুঝলাম আদিম সমাজের মধ্যে এসেছি। তীরে নেমেই ডাবের জলে তৃষ্ণা নিবারণের আমন্ত্রণ।

নিকোবর দ্বীপমালার প্রাকৃতিক পরিচয়

উনিশটি ছোট ও মাঝারি দ্বীপমালা নিয়ে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, তার মধ্যে সাতটি দ্বীপে কোনও জনমানব নেই। উত্তর অক্ষরেখা ছয় ও দশ ডিগ্রীর মধ্যে এবং পূর্ব মধ্যাহ্নরেখার ৯২ ও ৯৪ ডিগ্রীর মধ্যে নিকোবর দ্বীপমালার অবস্থিতি। দ্বীপপুঞ্জের সর্বোত্তর দ্বীপ কার নিকোবর থেকে পোর্টব্লেয়ার-এর দূরত্ব দেড়শো মাইল এবং কলিকাতা ও মাদ্রাজের সঙ্গে ব্যবধান প্রায় ৮০০ মাইল। গ্রেট নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সর্বদক্ষিণ দ্বীপ এবং এই দ্বীপ ও সুমাত্রার মধ্যে একশো মাইল

নিকোবরি স্ত্রীলোক

সমুদ্রের বাধা। দ্বীপমালার মোট আয়তন ৬৩৫ বর্গ মাইল; সর্বদক্ষিণ দ্বীপ গ্রেট নিকোবরের আয়তনই ৩৩৩ বর্গমাইল, যদিও '৫১ সালের আদম সুমারীতে সেখানকার জনসংখ্যা মাত্র ১৬১।

নিকোবর এবং আন্দামান দ্বীপমালার মধ্যে আড়াই হাজার ফিট গভীর দশ ডিগ্রী চ্যানেল দুস্তর বাধার ব্যবধান রচনা করেছে এবং সম্ভবতঃ দুই দ্বীপমালার ভিন্ন উৎপত্তি যুগের সাক্ষ্য দিচ্ছে। প্রাচীন যুগে এই অঞ্চল সমুদ্রগর্ভে অধুনা নিমজ্জিত ভূখণ্ডের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এক অংশ ছিল কিনা তাই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে নিকোবরের পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করার। চাওড়া, পুলো মিলো এবং কার নিকোবর দ্বীপের একাংশ সম্পূর্ণভাবে প্রবালদ্বীপ। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্য দ্বীপ আন্দামানের মতো পাহাড়ে ঘেরা, কোথাও বা তটরেখার ধারে সঙ্কীর্ণ সমভূমি, আবার কোথাও দুই অনুচ্চ শৈলশ্রেণীর মাঝখানে সামান্য, অপরিসর নিচু উপত্যকাভূমি। আন্দামান বনভূমিতে পাডুক এবং গর্জন মহীরুহের স্পর্ধিত শির যেভাবে সূর্যরশ্মিকে অবরোধ করে রাখে, নিকোবর দ্বীপমালার সীমিত অরণ্যে শক্ত কাঠের (হার্ড উড) ঐ রকম বড় গাছ না থাকলেও, ছোট বড় গাছ, লতাগুল্ম দ্বীপমালাকে অপরূপ শ্যামলিমার আচ্ছন্ন করে রাখে।

দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব দুই মৌসুমী বাতাসেই এখানে প্রচুর বর্ষণ হয়, গড়ে প্রায় ১১০ ইঞ্চির কাছাকাছি বৃষ্টিপাত বছরে হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম বাতাস বইতে আরম্ভ করে মে মাস থেকে এবং সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি তার গতিবেগ স্তিমিত হয়ে আসে। নভেম্বর থেকে আরম্ভ হয় উত্তর-পূর্ব বাদলের মাতন। হাওয়ার গতিপথ পরিবর্তনের সময় সাইক্লোন উঠে বাতাস এবং জলের প্রলয়ঙ্কর মল্লযুদ্ধ সৃষ্টি করে। এ অঞ্চলের নাবিকেরা তাকে বলে হাতী তুফান। একান্ত অতর্কিতে শান্ত সমুদ্রের নির্মল আকাশে মেঘের রাশি জমা হয় এবং পবনদেব হয়ে উঠেন মদমত্ত। সাগর এবং পবনের শক্তি পরীক্ষায় নরবলিও পড়ে। ঋতু দুটি বর্ষা এবং স্বল্পস্থায়ী শান্ত গ্রীষ্ম। দীর্ঘ পাঁচ বছর বসবাস করার সময়ে তিন কি চারদিন রাত্রে শীতবস্ত্রের প্রয়োজন হয়েছিল। উত্তর থেকে হিম বাতাস সাগরের বাধাকে পরাজিত করে দ্বীপে অনধিকার প্রবেশ করেছিল। জোয়ার ভাটায় জল উঠা-নামা করে খুব কম। সপ্তমী, অষ্টমীর দিন ভাল করে না দেখলে জোয়ার ভাটা বোঝা যায় না। তটরেখার ধারে সমুদ্রের জল ফিকে সবুজ, একটু দূরে গেলেই জলের রং গাঢ় নীল।

নিকোবরিদের আদিকথা ও ইতিহাস

অতীতে কখনও নিকোবরিরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোনও দেশ থেকে এসেছিল এ সম্বন্ধে সবাই একমত। ভাষাবিদ পণ্ডিতরা বলেন যে, নিকোবরি ভাষার সঙ্গে বর্মার দক্ষিণ কোণে মারগুই দ্বীপমালার তালাইঙদের মন ভাষা ও কাম্বোডিয়ার ক্ষমের ভাষার সঙ্গে বিশেষ মিল আছে। আসামের খাসী ও লুশাই আদিবাসী গোষ্ঠীর সঙ্গে নিকোবরিদের শরীর গঠন এবং ভাষার সাদৃশ্য সম্বন্ধে পণ্ডিতরা মন্তব্য করেছেন। এবারে গণতন্ত্র দিবসের লোকনৃত্য উৎসবে নিকোবর তরুণ-তরুণীরা দিল্লীতে এসেছিল। টালকোটরা উদ্যানে সারা ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে আগত নাচিয়ের দলের সঙ্গে নিকোবরিরা ঐখানে ছিল। বেশ কয়েকদিন ধরে নিকোবরি ও লুশাই যুবক যুবতীরা এক সঙ্গে মেলামেশা করেছে। দূরে থেকে তাদের দেখলে কে নিকোবরি আর কে লুশাই তা' আমার পক্ষেও বলা শক্ত হতো। নিকোবরি নাচিয়েরা সবাই আমার কাছে স্কুলে পড়েছে এবং পাঁচ বছর ধরে তাদের সবাইকে দেখেছি।

নিকোবরি লোককথায় আছে যে পেগু রাজকুমারীর অন্যায় আচরণে পিতা রুষ্ট হয়ে কন্যাকে নির্বাসিত করেন। রাজকন্যাকে ভেলায় চড়িয়ে সমুদ্রপথে ছেড়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে খাদ্য ও পানীয় দিয়ে দেওয়া হয়। উত্তর-পূর্বী বাতাসের অনুকম্পায় সেই ভেলা এসে উপস্থিত হয় কার নিকোবর দ্বীপের চুক-চু-চা গ্রামে। সেই থেকে নিকোবরিদের বাস এই দ্বীপমালায়। কুকুর থেকে নিকোবরিদের জন্ম হয়েছে এরকম কিম্বদন্তীও আছে। অনেকে এই মতের স্বপক্ষে প্রমাণ দিতে গিয়ে বলেন যে, কার নিকোবরিরা কুকুরের বড় ভক্ত এবং সাধারণতঃ কুকুরকে লাঠি বা অন্য কিছু দিয়ে আঘাত করা অন্যায় বলেই লোকে মনে করে। অবশ্য এই সঙ্গে বলা প্রয়োজন যে নিকোবর দ্বীপমালার ঘন-বসতিপূর্ণ দ্বীপ চাওড়াতে কুকুরের কাবাব বানিয়ে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে লোকে ভোজন করে।

ভারতের পূর্বতট থেকে পূর্বগামী সমুদ্র তরণী বঙ্গোপসাগরের অশান্ত জলরাশির বাধা ভেদ করে যাবার সময় জল, জ্বালানি ও খাদ্যের সন্ধানে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে যে নিকোবর দ্বীপমালায় আসতো এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই নেই। ক্লডিয়াস টলেমি, চীনা পরিব্রাজক ই-সিঙ, আরব নাবিকরা এবং মারকো-পোলো সবাই এই দ্বীপপুঞ্জের কথা জানতেন। অনেকে বলেন যে, তাঞ্জোর শিলালিপিতে নিকোবরিদের উল্লেখ আছে। নিকোবর নাম সম্ভবতঃ নেকাভরম (অর্থাৎ নগ্ন) শব্দের অপভ্রংশ। রাজেন্দ্র চোলের দিগ্বিজয়ে কার দ্বীপ এবং নাগ দ্বীপে নিজের জয়কেতন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কার নিকোবর সম্ভবতঃ কার দ্বীপে এবং নাগ দ্বীপের বর্তমান নাম গ্রেট নিকোবর। '৫১ সালের আদম সুমারীর রিপোর্টে শ্রীশিশিরকুমার গুপ্ত রামায়ণে বর্ণিত বানরসেনারা যে নিকোবরি তা' প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। নিকোবরি কৌপিনের একটা অংশ পেছনে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকে, অনেকটা লেজের মতো। শ্রীগুপ্তের মতে ঐটি গোলাঙ্গুল এবং কপিদের মতো নিকোবরিরা সতত অস্থির চিত্ত।

আন্দামানের সঙ্গে সমুদ্রপথগামী নাবিকদের পরিচয় থাকলেও, সেখানকার হিংস্র নেগ্রিটো জাতির খর্বাকৃতি, কৃষ্ণকায় আদিম মানুষের আক্রমণের ভয়ে পাশ্চাত্য শক্তি কোনও উপনিবেশ গড়ার চেষ্টা গোড়ার দিকে করে নি। বাইরের জগতের কাছে পণ্য বিনিময় করারও তখন আন্দামানীদের কোনও প্রব্যসম্ভার ছিল না। নারকেল, সুপারী, বেত প্রভৃতির সন্ধানে নিকোবর দ্বীপে বাইরের নাবিকদের যাতায়াত বহুদিনের। ষোড়শ শতাব্দীতে নিকোবর দ্বীপমালার উপর কর্তৃত্ব দাবী করে পর্তুগীজরা। মালক্কার রাজপ্রতিনিধির নির্দেশে পর্তুগীজ মিশনারীরা মধ্য নিকোবরের নান-কোরি-কামোর্টা-ত্রিংকেট দ্বীপে ঘাঁটি তৈরি করে। তারপর আসে ফরাসী জেসুইট মিশনারীর দল, তারা আরও উত্তরে তরাসা এবং বোম্পক দ্বীপবাসীদের মধ্যে ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করে। ১৭৫৬ থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত ডেনমার্ক সুদূরে নানকৌড়ি দ্বীপমালাকে কেন্দ্র করে বঙ্গোপসাগরে তাদের এক উপনিবেশ গড়ার চেষ্টা করে। ম্যালেরিয়া, স্থানীয় আদিবাসীদের অসহযোগিতা, যাতায়াতের অসুবিধা এমনি বহু কারণে ডেনদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। আজও অবশ্য কামোর্টা দ্বীপের কালাটাপু গ্রামে সমুদ্রের ধার থেকে বড় বড় গাছে ঘেরা যে পথ এঁকে বেঁকে পাহাড়ের উপর উঠে গিয়েছে তা সেই ডেনিশ মিশনারীদের কর্মপ্রচেষ্টার সাক্ষ্য দেয়। ঐ দ্বীপের বনে-জঙ্গলে রয়েছে মিশনারীদের গরু-মোষের সন্তান-সন্ততি। গৃহপালিত পশু এখন হয়ে গিয়েছে সম্পূর্ণ বন্য এবং দুর্দান্ত। অস্ট্রিয়ার সম্রাটও এখানে রাজ্য স্থাপনার চেষ্টা করেন এবং প্রাশিয়ার রাজদরবারেও দ্বীপমালার উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জল্পনা-কল্পনা হয়।

এরই সঙ্গে অবশ্য নানকৌড়ির অতি মনোরম প্রাকৃতিক পোতাশ্রয়ের আশে-পাশে জলদস্যুদের বড় আড্ডা গড়ে উঠে। কাহাল দ্বীপ এবং কামোর্টা দ্বীপের বন্দর খাড়িতে মালয়, চীনা এবং পাশ্চাত্য দেশের জলদস্যুদের জাহাজ আনাগোনা করতো। সুযোগ পেলেই জলদস্যুরা দক্ষিণে সমুদ্রপথগামী পণ্যতরণীর উপর চড়াও করে লুঠপাট করতো। দুএকজন নিকোবরি গ্রামবৃদ্ধ এখনও অস্পষ্টভাবে সে সব কাহিনী বলে। তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে এসব কাহিনী বহুদিন আগে তারা শুনেছিল। আন্দামানে ১৮৫৮ সাল থেকে বন্দী শিবির স্থাপনার পর ইংরাজ সরকার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ডেন সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন নিকোবর দ্বীপমালার কর্তৃত্বভার স্থানান্তরিত করা নিয়ে। আনুষ্ঠানিকভাবে এই দ্বীপপুঞ্জের উপর ইংরাজ সার্বভৌমত্ব সূচিত হয় ১৮৬৯ সালে এবং তারপর উনিশ বছর ধরে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত বিপজ্জনক অপরাধী বন্দীদের নিয়ে এখানে উপনিবেশ গড়ার চেষ্টা চলে। বিভিন্ন কারণে সরকার এখান থেকে বন্দীদের আবার আন্দামানে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। নিকোবরিদের অপার সৌভাগ্য যে কারা শিবিরের সান্নিধ্যের অভিশাপে আন্দামানের বৃহত্তম মিত্রভাবাপন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী বেঞ্জো প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, সেই মর্মান্তিক সম্ভাবনা থেকে তারা মুক্তি পেয়েছে।

কার নিকোবর দ্বীপবাসী

নিকোবর দ্বীপমালার মোট জনসংখ্যা প্রায় বারো হাজার। তার দুই-তৃতীয়াংশই বাস করে ৪৯ বর্গমাইলের কার নিকোবর দ্বীপে এবং দ্বীপপুঞ্জের প্রশাসনিক কেন্দ্রও এইখানে। সমুদ্রের ধারে কোথাও বা ধবধবে মোটা দানার বালির রাশি, কোথাও প্রবাল পাথরের মেলা। বন্য কেতকী, বিলাতিবাদাম এবং নানা রকম ঝোপ
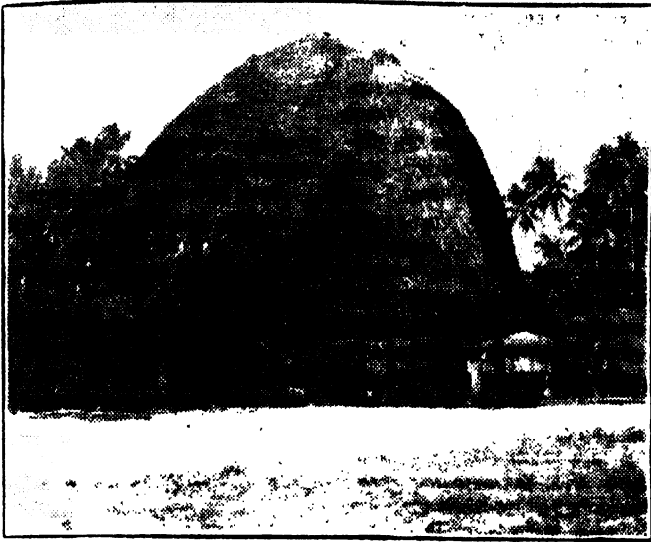
নিকোবরের মৌচাক গৃহ

...পাকে বেষ্টন করে রেখেছে। বনের ...বাতাসের বেগকে প্রশমিত করে। নারকেল ...ও সমুন্নত শীর্ষে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে ...ছে। প্রবাল দ্বীপের মাটির রস এবং ...দ্রের লোনা হাওয়া আর বর্ষণের প্রাচুর্য সব ...লে নারকেল গাছকে দিয়েছে অসম্ভব ...নী শক্তি। সারি সারি গাছ সমুদ্রের ধার ...ক চলে গিয়েছে দ্বীপের মধ্যে; দ্বীপের ...মাঝখানে সামান্য কিছু জঙ্গল অবি...ষ্ট রেখে দিয়েছে নিজেদের প্রয়োজনে ...ঠের জন্যে। মাঝে মাঝে ঘর ছাইবার জন্য বড় বড় ...সের জমিও রয়েছে। কেরালার থেকে নাবিকরা ...ফ্রুট বা বিলেতী কাঁঠাল গাছ নিয়ে এসে ...গিয়েছিল। এখন প্রতিটি গ্রামে সবুজে শাখা-...শাখা বিস্তার করে বিলেতী কাঁঠাল গাছও ...র ফল দেয়। সুপারীরও ফলন খুব ভাল। ...কিছুকে হার মানায় কিন্তু কলা ও পেঁপে। ...যত্নে এখানে-ওখানে এই সব গাছ হচ্ছে ...তার ফলই বা কি প্রচুর! সিঁদুরে লাল ...টা কলা, চাঁপা, কাঁঠালি, চিনে, জাহাজী বা ...গাপুরী, তরকারি (কাঁচা) কত রকমের ...নাই না সেখানে আছে! পেঁপে গাছ বড় ...কেউ যত্ন করে লাগায় না। মানুষ ও ...খির খাওয়া বীজ থেকে যেখানে-সেখানে ...পেঁপে গাছ গজিয়ে ওঠে।

নিকোবরিরা সাধারণতঃ ফল, মূল, ...রেই জীবনধারণ করে। সভ্য-মানুষের ...সংস্পর্শে এসে ভাত, রুটি খাওয়া শিখেছে। ...ও, এখনো অধিকাংশ নিকোবরিদের পক্ষে ...খাওয়া অনেকটা আমাদের পোলাও-...বিরিয়ানী খাওয়ার মতো, কদাচিৎ কালে ভদ্রে ...কী বা কেউড়ী (প্যান্ডানাস্) সারা ...বছরই ফলে। সেই পাকা ফলের কোয়া কেটে ...বারো ঘণ্টা ধরে জলে সেদ্ধ করার পর, ...শাঁস ঝিনুক দিয়ে কুরে, ভাপে অনেক-...ক্ষণ রেখে শক্ত শক্ত কাই তৈরী হয়। খেতে ...কটা কাস্টার্ড পুডিং-এর মতো লাগে, ...ও মিষ্টি কম। এছাড়া কলা, মানকচু, মেটে

আলু, মিষ্টি আলু, সেদ্ধ পেঁপে, পাতি লেবু, পাকা কলা, ডাবের মালাই প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে খায়। শুয়োর প্রতি গৃহস্থই রাখে এবং কোনও উপলক্ষ পেলেই পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে সবাই বরাহ ভোজনে অংশ নেয়। মুরগী, ছাগলও আছে। এছাড়া, সমুদ্রের মাছ, অক্টোপাস, কাঁকড়াও নিকোবরিদের প্রিয় খাদ্য। ভূমি ও জলের দুরকম কাঁকড়াই নিকোবরিরা খায়। মাছ, মাংস ঝলসে বা সেদ্ধ করেই খাওয়া নিয়ম, তবে কাঁচাও একটু আধটু খেতে কেউ আপত্তি করে না। বাইরের মানুষের সান্নিধ্যে এসে কোনও কোনও নিকোবরি পরিবার ঝাল, ঝোল তৈরী এবং রান্নায় মশলার ব্যবহারও শিখেছে। রান্নায় তেল-এর ব্যবহার নেই বললেই চলে, যদিও নিকোবরিরা আদিম কায়দায় সুন্দর নারকেল তেল তৈরী করে। তা' ছাড়া শুয়োরের চর্বির অভাবও নেই; অনেক সময় প্রদীপ জ্বলে শুয়োরের চর্বিতে।

নিকোবরি আহারের সঙ্গে পর্যাপ্ত পানীয়ের বন্দোবস্তও আছে। নারকেলের তাড়ি বা কা-য়ুট প্রতি পরিবারই সকাল ও বিকেলে নিজেদের বাড়ির কাছের গাছ থেকে সংগ্রহ করে। উৎসব দিনে পানপাত্রের প্রয়োজন হয় সকাল থেকে। সমস্ত দিনরাত্রি ধরে চলে পান ভোজনের পালা, নেশার উন্মত্ততা কখনও দেখিনি এবং নিকোবরিদের সুস্থ অবস্থায় অপরিমিত পানের ক্ষমতা বিস্ময়কর। অবিবাহিত যুবক-যুবতী বা অপরিণত বয়স্কদের তাড়ি পান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেতকীর পাতায় তামাক মশলা জড়িয়ে নিকোবরিরা বিড়ি তৈরী করে। চালানি বিড়ি, সিগারেট-এরও চল হয়েছে। গরু বা মোষ পালন করার রেওয়াজ নেই। শিশুকে প্রয়োজন হলে কচি ডাবের মালাই খাওয়ায়। কার নিকোবরে কোনও রকমও দুগ্ধ ছাগল পোষে। তবে, দুধের চেয়ে ছাগ মাংসই বেশি প্রিয়। চা'য় প্রচলন হওয়ায় ফলে দুধের

সরবরাহ হয়েছে। গুঁড়ো দুধ পেলে তাই দিয়ে চা হয়, নইলে লাল চাই খেতে হয়।

কার নিকোবরি সমাজ বিগত অর্ধশতাব্দীরও উপর বহিরাগত মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছে। তাদের কথ্য ভাষা রোমান হরফে লিখিত রূপ পেয়েছে। শতকরা দশ জনেরও বেশি লোক পঠন-পাঠনক্ষম। প্রায় প্রত্যেক বালক-বালিকাকেই কয়েক বছরের জন্য প্রতি গৃহস্থ স্কুলে পাঠায়; যদিও এ-সম্বন্ধে কোনও বিশেষ নিয়ম নেই। বিগত মহাযুদ্ধে এখানে বিরাট এক জাপানী সেনাবাহিনী মোতায়েন ছিল। নিকোবরি জীবনের শান্ত ছন্দ তার ফলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কয়েকজন শিক্ষিত নিকোবরিকে জাপানীরা হত্যা করে, অন্য কয়েকজনকে বন্দী করে এবং নানা রকম নির্যাতনের অভিযোগও শোনা যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে কার নিকোবর দ্বীপকে বাইরের জগতের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে সংযুক্ত করে দেয়। কার নিকোবর দ্বীপের হাওয়াই আড্ডা বঙ্গোপ-সাগরের উপরে উড্ডয়ন বিমানের একমাত্র অবতরণ স্থল। দ্বীপের প্রশান্তির মাঝখানে বাইরের কর্মব্যস্ত এবং হিংস্র মানবের আনাগোনা বেশি করেই আরম্ভ হয়েছে। যেমন জাপানী অধিকারের আগে কার নিকোবর দ্বীপের চোদ্দটি গ্রাম পরিক্রমা করতে দু' তিন দিন সময় লাগতো। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে হেঁটে যেতে যেতে হতো। বহিরাগত ব্যাপারীদের গরুর গাড়ি বা টাটু ঘোড়া ছিল। ভাল পথের অভাবে মন্দগতি শকট আরও ধীর গতিতে চলতো। জাপানী যুদ্ধের মোটর সাইকেল, গাড়ি, জীপ, সাঁজোয়া গাড়ির প্রয়োজনে সমুদ্রের ধারে ধারে চৌদ্দখানি গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাল পাথর আর চুনের তৈরী বাঁধানো সড়ক চলে গিয়েছে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে, জাপানী অধিকারের কথা দুঃস্বপ্নের মতো নিকোবরিরা মনে করে। কিন্তু, সেই রাস্তায় আজও মোটর আর সাইকেল চলছে। সমস্ত দ্বীপ পরিক্রমা করতে লাগে কয়েক ঘণ্টা মাত্র।

কার নিকোবরের প্রায় সবাই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। অথচ, নিজেদের অতীত জীবনধারাকে পরিত্যাগ করে নি। নিজেদের পুরাতন উৎসব, অনুষ্ঠান এখনও তেমনি উৎসাহ নিয়ে করে। খৃষ্টান নাম জন, জোসেফ, রুথ, মেরি, এ্যানজেলিনা হয়েছে। ভাল নাম খুঁজে হয়তো কাউকে হ্যালিফক্স, চেম্বারলেন এবং থিও-ফিলাস বলে অভিহিত করা হয়। তবে এসব পোষাকী নাম। নিজেদের মধ্যে পুরাতন নিকোবরি নামই চলে। আর খৃষ্টান হবার আগে নিকোবরিরা সভ্য মানুষের কাছ থেকে নামকরণ করাতো এবং আজও করায়। জাহাজের ইংরাজ নাবিক হয়তো কোনও নিকোবরিকে কক রবিন, মেরী ইংল্যান্ড বলে ভূষিত করেছিল। আবার ভারতীয় নাবিক কাউকে এ ফেলিম বানিয়েছিল। এখনও রাষ্ট্র-ভাষাভাষীদের সম্পর্কে এসে নিকোবরি যুবক নিজেদের পরিচয় দেয় মুস্তাফা, কালীমা বা কুদির বলে।

বাইরের মানুষের কাছ থেকে শিক্ষা, ধর্ম, কায়দা, রীতি প্রভৃতি নিয়েও কার নিকোবরিরা যে নিজেদের [illegible] নি, তার জন্যে

সব থেকে বেশী করে কৃতিত্ব কার নিকোবারি বিশপ জন রিচার্ডসনের। প্রথম যুগে মিশনারী প্রচেষ্টায় কার নিকোবরে মাদ্রাজী শিক্ষক-ধর্ম-প্রচারক মিস্টার সোলোমন যখন প্রথম পাঠশালা খোলেন বিশপ রিচার্ডসন এস্থানেই লেখাপড়া আরম্ভ করেন। তার পর বার্মার মিশন স্কুলে পড়তে যান। সেখান থেকে ফিরে এসে নিজের মানুষের সেবায় সারা জীবন অতিবাহিত করেছেন এবং এখনও তিনি যে পরিশ্রম করেন তা' সত্যিই বিস্ময়কর। স্কুল মাস্টার, কম্পাউন্ডার, ডাক্তার, ধর্ম-প্রচারক, তহশিলদার, শাসক-বিচারক প্রতিটি কাজই তিনি করেছেন। বাইরের জগতের শিক্ষা তাঁকে নিজের মানুষের আরও কাছে নিয়ে গিয়েছে। অন্য যে-কোনও নিকোবারির মতো তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ক্যানোতে করে মাছ ধরতে যান। বাগিচা তৈরী করার কাজও তিনি ভাল করেই জানেন।

কার নিকোবরে সামাজিক জীবন গড়ে উঠেছে তু-হেটকে কেন্দ্র করে। এক বা একাধিক পরিবার নিয়ে তু-হেট সংগঠিত. তু-হেট-এর পরিচালক নির্বাচিত হয় সেই সংগঠনের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-পুরুষের মতামত নিয়ে। এই পদে অধিষ্ঠিত হবার আগে শুয়োরের রক্ষণাবেক্ষণ, তু-হেট বাগিচার খবরদারি প্রভৃতি কাজের মধ্যে দিয়ে প্রধান পদপ্রার্থীকে নিজের যোগ্যতা সপ্রমাণ করতে হবে। স্ত্রীলোকের পক্ষেও তু-হেট প্রধানা হতে কোনও বাধা নেই। তু-হেট জ্যেষ্ঠরা মিলে গ্রামবৃদ্ধ কে হবে তা' স্থির করেন। সাধারণতঃ সঙ্গতিপন্ন তু-হেট থেকেই বংশানুক্রমিক ভাবে গ্রামবৃদ্ধ (বা মা পানাম্) নির্বাচিত হন। বিভিন্ন গ্রামবৃদ্ধরা মিলে দ্বীপ জ্যেষ্ঠ পরিষদ (আইল্যান্ড এলডারস কাউন্সিল) তৈরি করেন এবং সরকারী শাসক তাঁদের মতামত নিয়েই শাসনকাজ পরিচালনা করেন। অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় না বললেই চলে। দণ্ডিত কোনও অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে মাঝে মাঝে কারুর শাস্তি হয়। তখন তাকে কয়েদের কয় মাস শাসনকেন্দ্রে এসে বসবাস করতে হয় এবং সেখানে তাকে সামান্য কিছু কাজ দেওয়া হয়। নিজেদের মধ্যেও নিকোবরিরা সরাসরি ঝগড়া করে না। এখন মাঝে মাঝে চুরি মিথ্যাভাষণ হচ্ছে বলে শোনা যায়। তবে, তাও খুব সামান্য।

চাওড়া-তেরাসা-বোম্পক দ্বীপমালা

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সবথেকে ঘনবসতি চাওড়া দ্বীপে। আয়তন মাত্র তিন বর্গমাইল, জনসংখ্যা এক হাজারেরও বেশি। কারনিকোবর দ্বীপ থেকে চল্লিশ মাইল দক্ষিণে প্রবালের সৃষ্টি চাওড়া। চারদিকে তটরেখা গভীর সমুদ্রগর্ভে অকস্মাৎ বিলীন হয়ে গিয়েছে। সমুদ্র এখানে প্রায়ই অশান্ত, অস্থির। জোয়ার-ভাটার জল নামা ওঠার সময় বিপরীত দিক থেকে জোরে হাওয়া বইতে আরম্ভ করলে পর্বতপ্রমাণ ঢেউ প্রায় গগন স্পর্শ করতে চায়। সমুদ্রের গর্জন গান শোনে চাওড়া শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে। শিশুর সঙ্গে সমুদ্রের পরিচয় করিয়ে দেয় আরও ঘনিষ্ঠভাবে জননী। তারপর যৌবনের প্রেম ও পরিণয় হয় সমুদ্রকে সাক্ষী রেখে। এত যার ঊর্মিমালার সঙ্গে নিবিড় পরিচয়, সে কি সমুদ্রের রহস্যময় হাতছানিকে উপেক্ষা করতে পারে! সমুদ্রের পরপারে অজানা দেশের সন্ধানে সে বেরিয়েছিল বহুদিন আগে তার ক্যানোতে করে। আজও নিকোবর দ্বীপমালার সবথেকে সাহসী, বিচক্ষণ নাবিক চাওড়াবাসী। বাতাস এবং জলের টান, আকাশে তারার চিহ্ন, ঋতু এবং তিথিতে সমুদ্রের পরিবর্তনশীল রূপ সব সে বহুদিন ধরে লক্ষ্য করেছে এবং সেই অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে অজানা সাগরের পথে ক্যানোতে করে ৫০।৬০ মাইল পথ অক্লেশে পার হয়। না আছে তার কাছে সমুদ্রপথের নক্সা, না কোনও কম্পাসের সাহায্য নেবার সে প্রয়োজন অনুভব করে। সম্প্রতি চাওড়াতে লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে। অধিকাংশ লোকই অক্ষর পরিচয় জ্ঞানহীন। অথচ, সমুদ্রের মতিগতি সম্পর্কে তারা কত ওয়াকিবহাল। সবথেকে আশ্চর্য লাগে জলের টান বোঝার অপূর্ব ক্ষমতা। গতিপথ ঠিক করে নিয়ে ক্যানো চালালেও, অকূল সমুদ্রের মাঝে জলের টান তাকে অতি সহজেই পথভ্রষ্ট করতে পারে। গন্তব্যস্থল ছোট দ্বীপ মেঘমুক্ত পরিষ্কার দিনেও মাইল কুড়ি এদিক ওদিক হয়ে গেলে কিছুই দেখা যাবে না। বর্তমান বৈজ্ঞানিক সমস্ত উপকরণ নিয়েও যন্ত্রচালিত বড় জলযানকে ছোট দ্বীপের চারপাশে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি, দ্বীপের যথাযথ অবস্থিতি ঠিক হদিশ করতে পারেনি। ক্যানোর নাবিকদের পথভ্রম হলে মৃত্যু অবধারিত। অঘটন যে না ঘটে তা' নয়, তবে কদাচিৎ কখনও।

চাওড়াবাসীদের জীবন-সংগ্রাম অতি কঠিন। নিজেদের দ্বীপে ভাল খাবার জল নেই, জ্বালানি কাঠও আনতে হয় বাইরের দ্বীপ থেকে। সবাই দ্বীপে থাকলে জীবিকার সংস্থানও মুস্কিল। তাই, সমুদ্রপথে পাড়ি দেয় জীবন ও জীবিকার সন্ধানে। মাইল দশবারো দূরে তরাসার থেকে জ্বালানি কাঠ এবং কখনও খাবার জল সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। বৃষ্টির জল সঞ্চয় করার ভাল ব্যবস্থাই আছে। কুয়োর জলে স্নান, ধোয়া-মোছার কাজ হয় এবং উপায় না থাকলে বিস্বাদ সেই লবণাক্ত জল খেতেও হয়। তরাস, বোম্পক এবং নানকোড়ী দ্বীপমালায় বাগিচার মজুর হিসেবে কাজ করতে চাওড়াবাসীরা যায়। তবে, অন্য দ্বীপে স্থায়ীভাবে কেউ বসবাস করতে পারে না। চাওড়া সমাজ-প্রধানদের অনুশাসন এখানে বড় কঠোর। মাটির পাত্র নির্মাণেও চাওড়াবাসীরা খুব দক্ষ। আগে চাওড়াদ্বীপেই এইজন্য প্রয়োজনীয় মাটি ছিল, এখন তরাসা দ্বীপ থেকে মাটি নিয়ে আসে।

নিকোবর দ্বীপমালায় চাওড়াবাসীরাই কেবল মাটির পাত্র তৈরি করার অধিকারী। বাইচ খেলার বা দূরে দ্বীপে যাবার বড় ক্যানো তৈরি করতেও চাওড়ার লোকেরা খুব পটু। এরজন্য ৮০।৯০ মাইল দূরে লিটল বা গ্রেট নিকোবরেও তারা যায়। সেখানে বড়, মজবুত গাছ কেটে বহু পরিশ্রমে বিরাট ক্যানো তৈরি করে। নানকৌড়ী দ্বীপমালায় বা কারনিকোবরে এই ক্যানো বিক্রি করে। বিনিময়ে হাজার টাকার কাপড়, দা, মাছ ধরার সরঞ্জাম, লোহার যন্ত্রপাতি, নারকেল, শুয়োর প্রভৃতি দিতে হয়। কারনিকোবরিরা অনেক সময় নিজেরাই অন্য দ্বীপে গিয়ে ক্যানো তৈরী করে, তবে নজর হিসেবে চাওড়াবাসীকে মোটা রকমের উপঢৌকন দিতেই হয়। আগেকার দিনে চাওড়ার ইন্দ্র[illegible] শক্তি সম্বন্ধে নিকোবারিরা সবিশেষ স[illegible] ছিল। এখনও তারা মনে করে যে চাও[illegible] ক্যানোর নজরআনা না দিলে তরীর অক[illegible] হবে।

ভারতবর্ষের পথে-প্রান্তরে ঘুরতে [illegible] পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন গ্রাম দেখেছি। কৃষ্ণার [illegible] বাঁহকায় বর্ধিষ্ণু অন্ধ্র পল্লী, উত্তরপ্রদে[illegible] পশ্চিম অঞ্চলে জনবহুল গ্রাম, অবিভক্ত পাঞ্জা[illegible] নহর এলাকার সমৃদ্ধ বসতি, কেরলের [illegible] লেগুন বা ঢেউখেলানো পাহাড়ের [illegible] নারকেল আর গোলমরিচ লতায় স[illegible] বিচ্ছিন্ন কুটিরসমষ্টির মাঝে শান্ত [illegible] লক্ষ্মীশ্রী দেখেছি। কিন্তু, চাওড়া দ্বীপ [illegible] সুন্দর এবং পরিচ্ছন্নভাবে প্রকৃতি ও [illegible] মিলে সাজিয়েছে এমন পরিপাটি ভাব [illegible] কোথাও দেখিনি। তিন বর্গমাইল আয়[illegible] ছোট দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব কোণায় এক[illegible] আকস্মিকভাবে ছোট পাহাড় মাথা তুলে [illegible] পথযাত্রীদের কাছে দ্বীপের অস্তিত্ব [illegible] করছে। এছাড়া, বাকি অংশ একে[illegible] সমতল। সারাটি দ্বীপেই গ্রামের ছড়া[illegible] মাঝে মাঝে কলা, বাতাবি, কমলা, [illegible] গাছ। আর ফলেরও কি প্রাচুর্য। [illegible] আছে, কিন্তু মনে হয় শোভাবর্ধনের [illegible] মানুষের খাদ্য এবং পানীয়ের প্রয়োজন [illegible] মেটে না। নিকোবারি কায়দায় শক্ত, মানুষ[illegible] খুঁটির উপর শুকনো ঘাস দিয়ে ছাওয়া ম[illegible] চক্রের মতো গোলাকার কুটির। নীচে বসা [illegible] শোওয়ার জন্য লম্বা চৌকি আর তারি [illegible] পরিপাটি করে সাজানো ছোট ছোট জ্বালা[illegible] কাঠের আঁটি। কাঠ কাটার সময় ঠিক একভা[illegible] কেটেছে, একটু বড় ছোট করেনি। অতি[illegible] পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। এতটুকু আবর্জনা কোথা[illegible] থাকার উপায় নেই।

অতিথি অভ্যাগতদের জন্যে সমুদ্র [illegible] এল-পানাম আমন গ্রাম। সারি সারি [illegible] দ্বীপবাসীরা তৈরি করেছে আগন্তুকদের জ[illegible] উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বাতাসের প্রকোপ প্র[illegible] হলে, কারনিকোবর থেকে ক্যানো করে [illegible] আসে চাওড়ায়। প্রতিটি তু-হেট-এর মিত্রবা[illegible]

(ইহার পর ২৩৩ পৃষ্ঠায়)

ছুটি

(১৩৮ পৃষ্ঠার পর)

চৌধুরী। কাকাতুয়াটার শেকল ঠোকরানো[illegible] আওয়াজ আসছে কানে।

পায়ের শব্দে ফিরে দাঁড়ায় মৃন্ময়।

বনলতা। যেন এই মাত্র ঝড় পেরিয়ে এ[illegible] হতবুদ্ধি হয়ে মৃন্ময় তার দিকে চাইল। তার[illegible] কোনমতে শুকনো গলায় বললে,—আজই [illegible] চলে যাচ্ছি—তাই—

—না,—বললে বনলতা স্পষ্ট স্বরে।

—ট্রেণের সময় যে,—কথাটি শেষ না হ[illegible] যা ঘটে গেল তা যে ঘটতে পারে, মৃন্ম[illegible] কখনো কোন ইচ্ছাবিলাসেও ভেবেছিল! [illegible] কণ্ঠে কী যে কথাকটি বনলতা বলে চলেছে—[illegible] মৃন্ময়ের কানে পৌঁছেও পৌঁছতে পারছে [illegible] বাইরের ঐ কাকাতুয়াটার অবিরাম আর্তনাদে[illegible]

উৎসবের আনন্দে
কে, হোড়ের
মনোরম প্রসাধনী

কে, হোড় এণ্ড কোং

গৌরমোহন দাস এণ্ড কোং
ফোন: ২২-৬৫৮০ • ২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট • কলি-১

বিকেল থেকে রাত্রি
হরপ্রসাদ মিত্র

বিকেলের জনস্রোত ফুলে ওঠে
মিনিটে মিনিটে
পাঁচটায় আপিস ভাঙে।
তারপরে পথের আহ্বান—
অনেক যুবক, বৃদ্ধ, মহিলা, বালিকা
জীবনের ঘাম, ধুলো, শ্রান্তি, জয়গান—
রূপের বিচিত্রা, আর, কালের প্রয়াণ।

প্রাণের ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার পানীয়
এবং দুষ্পাচ্য তাও সহজে যা জানি বর্জনীয়,
ঘরের বাবুই বায়।—কল্পনার ঈগল ও শোন,
কতো স্থূল ব্যবহার, কতোনা অদৃশ্য কেনলেন,
সময়ের শান্ত ধ্যান, ক্ষণের বিবাদ—
সব নিয়ে বেলা যায়—
তারপরে, রাত!
সত্তার গভীর সত্যে এ-জন্মের শ্বাস—
সব ছায়া ছায়া নয়,
সব শূন্য নয়তো আকাশ!

দূর-সান্নিধ্য
আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

হঠাৎ অমনি যদি, মনে পড়ে
তোমাকে এবং সেই সাবেক কালকে,
হয়ত দেবে দোষ, কেনবা টানি
গোছানো সংসারে পুরানো মনকে।

আমিতো ভুলিনি, ভুলবো কেমনে
রেখেছি তুলে চিঠি, দিয়েছ যত,
মনেরই চিতাতে অগ্নিশিখারা
অনাহতভাবে এখনো উদ্যত।

তোমার পরিবেশে, মরাই-এ কত ধান
সোনালী রঙে প্রাণ ভোলে,
উঠানে মাচায় বাঁধা সতেজ তরুলতা
হাওয়াতে হেসে বুঝি দোলে।

এখানে বালুচরে ফসল নেই
সবুজ শুকিয়ে আসে ক্রমশঃই,
মিলিত কল্পনা ছিল তো অল্প না,
এখন স্মৃতি ছাড়া অন্য জমা কই!

আমার মা
পরিমল চক্রবর্তী

স্নেহময়ী আমার মা সহনের দীপশিখা ...
ছড়ান অম্লান আলো প্রত্যেকের অন্ধকার ...
প্রতিদিন প্রতিরাত; অন্তহীন কল্যাণের ...
আমরা সকলে তাই বন্দী তার হৃদয়-বন্ধ...

আমাদের জীবনের যন্ত্রণার ধু-ধু সাহারায়
তিনিই তৃষ্ণার জল; পান করে অঞ্জলি ...
জুড়োই প্রাণের দাহ। তার পথে সকলেই ...
সবাই পবিত্র হই তার পূত চোখের ধারায়

আমার কাজল চোখে মেখে নিয়ে যখন ...
ম্লান হেসে আমাদের দিকে, কিম্বা বলেন ...
তোদেরই শান্তির স্বপ্নে আমার এ জাগি ...
অকারণে ভয় পায়, হাসে, কাঁদে, ফের ...
তখন সবারি মনে জেগে ওঠে আনন্দ ...

আমি দেখি তার স্নিগ্ধ দুনয়নে
স্নেহের ...

ফোঁটায় ফোঁটায়
সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

সরে এসে অন্ধকারে
কয়েক পা এগুলেই তোমাকে পাওয়া যাবে
অনুভূতি বলে উঠল
পেশী সঙ্কুচিত হল
আবার ছড়িয়ে পড়ল

তোমাকে ছাড়িয়ে গেলে
তোমাকে পাওয়া যায়
অনুভূতি বলে উঠল
পেশী সঙ্কুচিত হল
আবার ছড়িয়ে পড়ল

ফোঁটায় ফোঁটায় দেহের দীপ্তি ভরে উঠল
ভালোবাসায়-ভরা তোমার চোখ
পাহাড় থেকে বর্ষার ঢল নামে
তোমার বুকে কিসের শব্দ

সরে এসো অন্ধকারে
বলে উঠল আলোকের শঙ্কা
পেশী সঙ্কুচিত হল
আবার ছড়িয়ে পড়ল॥

দুরাশা
শ্রীমতী নীলিমা মুখোপাধ্যায়

কৈশোর ও যৌবনের মধুসন্ধিক্ষণে,
মোর কানে কানে
রূপ রস গন্ধ ভরা সুন্দরী এ ধরা
বলেছিল মৃদু গুঞ্জরণে—
ভালো সবি ভালো; ধরণীর ধূলিকণা
করিয়াছে আলো
শুধু প্রেম শুধু প্রীতি শুধু ভালবাসা।
মানুষের আশা
পূর্ণতার পথে শুধু গান গেয়ে ফেরে
স্বপ্নভরা মধুক্ষরা গীতিকাব্য সম।

পার হল কত ঋতু, কত বর্ষ মাস
মেঘে মেঘে ঢেকে গেল মনের আকাশ।
নয়নে যে মাখা ছিল মোহের অঞ্জন,
হৃদয়ে রাঙ্গান ছিল যে কল্পনার রং
হতাশার কালি দিয়ে মুছে দিল সব—
কঠিন বাস্তব!

সে এসেছে শাসনের দণ্ড হাতে লয়ে,
আমার হৃদয়ে
তার রুদ্র পদধ্বনি দিবস যামিনী,
স্মরণ করায়ে দেয়
সাথে লয়ে নিরানন্দ কর্তব্যের ভার
অপেক্ষা করিছে এই নিষ্ঠুর সংসার।
ক্ষমাহীন, স্নেহহীন বিদ্বেষের বিষবাষ্পে ম্লান
বিরাট সাহারা এযে—কোথা মরূদ্যান
খুঁজে খুঁজে ফিরি। তবু আজিও দুরাশা
একদিন মিটে যাবে সকল তিয়াষা।
সুন্দরের করস্পর্শ শান্ত করি দিবে
অশান্ত বাসনারাশি। পূর্ণ প্রস্ফুটিত হবে
আজন্মের কল্পনার রাঙা শতদল।

পাহাড়ী ঝর্ণা
শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়

উদ্দাম, চঞ্চল
পাহাড়ী ঝর্ণা
পাহাড়ী মেয়ে সে
বিচিত্র বর্ণা
টলমল টলমল,
হেসে কুটি খলখল,
উপল খণ্ডে সে
দিতেছে ধর্ণা।
ঝোপ, ঝাড় ঝঞ্ঝায়
বাহিরিতে মন চায়,
অনুখন সঙ্গীতে
অনন্ত ভঙ্গীতে
যৌবন উচ্ছল
বিদ্যুৎপর্ণা!

একটি বৃষ্টিঝরা রাত
[illegible] চৌধুরী

শর্বরী সিক্ত বর্ষণধারে,
ঝিল্লীর গুঞ্জন অন্ধকারে।
পল্লী বিহঙ্গেরা নিদ্রিত সবে,
স্তব্ধতা বিঘ্নিত পেচকের রবে॥

একটি সকাল
কমলা চট্টোপাধ্যায়

সোনালী স্বপ্নের মতো একটি সকাল
যে সকালে হয়েছিল তোমার আমার প...
আজও তার স্মৃতি ছোঁয় মনের দেওয়া...
ঢেউ যেন, ছুঁয়ে যায় বালুকা বেলায়।
তাইতো হয়নি শেষ অশ্রুতীরে
ঝিনুক কুড়ানো
সাগরের ঢেউএ ঢেউএ কেঁপে ওঠা
ব্যথার আবেগ...
স্তব্ধ করে দিয়েছে যে কল্পনার
ফানুস ওড়ানো
জীবনের আকাশেতে ঘনিয়ে তুলেছে শ...
ব্যর্থতার মেঘ...

মেয়ে

(৩২ পৃষ্ঠার পর)

টা রোগে দাঁড়িয়ে গেছে। দিন-রাতই দেহি হ! এর চেয়ে সোজাসুজি ভিক্ষে করাও ত ছিল!

অসিতার যে উপায় ছিল না তা অবশ্য াশা জানত। একপাল ছেলেমেয়ে, বুড়ো ুড়ী, শিশুর মত দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বামী। আট দশ কাপ চা চাই তাঁর, অন্ততঃ দু ্কেট সিগারেট। ভরসার মধ্যে ওপরতলার ঐ টা ঘরের ভাড়া। সুতরাং ভদ্রভাবে ভিক্ষা ছাড়া তার উপায় কি? তবু—পাঁচ-সাতটা লমেয়ে সঙ্গে নিয়ে দুর্ভিক্ষ অবতারের মত হ ক'রে লোকের বাড়ী চড়াও হওয়া—দূরে ক দেখলেও মাথাকাটা যেত বিপাশার। কিন্তু কী করবে? কী করতে পারে। মাঝে মাঝে শকে তবু বলত, 'চলো এ বাড়ী বিক্রী ক'রে কোথাও চলে যাই।' তবে সে যে সম্ভব তা তার চেয়ে বেশীও কেউ জানত না। নকার দিনে এমন মনের মত বাড়ী পাওয়া অত সহজ!

অসিতার যে বিশেষ করে তার ওপরই কেন ঈর্ষ্যা, তার কারণ বিপাশা জানত বৈকি! অসিতার ছোট বোন, এককালে নিজের ভাল স্যার সস্নেহ অধিকারেই প্রিয় বোনটিকে জের মত স্বচ্ছল ও সম্পন্নঘরে এনেছিল টা তদ্বির করে—এখন সেই বোনই ওর চেয়ে তে চলে গিয়েছে, তার কাছে মাথা হেঁট করে সাহায্য চাইতে হয় এর চেয়ে কষ্টকর কি ছে! অসিতা সব বোনদের মধ্যে বিপাশাকেই ী ভালবাসত, এটা বিপাশাও অস্বীকার তে পারে না। সেইজন্য বলতে গেলে পাড়ে খেতে হয় তাকে! জোর ক'রে কিছু বলতে হ না। কোথায় একটা সংকোচে বাধে।

কিন্তু মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকে সতার কথাবার্তা ভাবভঙ্গী থেকে জ্বালাটা চলে গিয়েছিল; সে জায়গায় দেখা দিয়েছিল টা সকরুণ ঈর্ষ্যা। অনেকদিনই ভুগেছিল সতা, বছরখানেক ধরে প্রায়। অসংখ্য সন্তান র্ভ ধারণ করেছে অথচ পুষ্টিকর খাদ্য পায়নি টুও, তার ওপর হাড়ভাঙ্গা খাটুনি—সবটা ড়িয়ে শরীর ওর ভেঙ্গে পড়েছিল বহুদিন গেই। তবু শুধুমাত্র যেন ইচ্ছাশক্তিতেই ও নর সঙ্গে যুঝল এই এক বছর। ছেলে-য়েদের মুখ চেয়েই এত করে বাঁচতে চেয়েছিল চারী, কিন্তু তা অসম্ভব বলেই পারল না।

ইদানীং এদের বাড়ীতে এসে বলত—গুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে, 'যদি তোদের ই ঘরে এসেও ক-টা মাস থাকতে পারতুম শুধু, ত আমার শরীর সেরে যেত!'

এক্ষেত্রে ভদ্রতা ক'রে বলা উচিত ছিল ত যে, 'তা থাক না।' কিন্তু আশঙ্কায় টকিত বিপাশার গলা দিয়ে সে কথাটা বেরুত ! চুপ ক'রে থাকত সে।

অথবা, হয়ত কোনদিন খাওয়াদাওয়ার য় এসে পড়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে টখুটে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলত, 'ভাবিসনি যে নজর দিচ্ছি পিশু—কিন্তু কতকাল যে এমনভাবে পাঁচ ব্যঞ্জন দিয়ে খাইনি! পেটভরে ভাত খাওয়া, তা-ই ত ভুলে গেছি।'

এসব ক্ষেত্রে বিপাশা বলত হয়ত, 'তা তুমি ত খেয়ে গেলেই পার!'

'না রে। তা আর হয় না। ছেলেপুলেরা রইল টাঙ্গিয়ে—আমি কোন্ লজ্জায় এসব জিনিস মুখে তুলব বল্‌ত। আর ঐ পঙ্গপাল নিয়ে খেতেও চাওয়া যায় না।'

তারপর একটা বড়রকম নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌ত, 'এ জন্মে আর কিছু হ'ল না—আসছে জন্মে সুদসুদ্ধ উশুল করব।...মরে আবার আমি জন্মাবই—এই বলে দিলুম!'

একেবারে মরবার কিছুদিন আগে থেকে বলতে আরম্ভ করেছিল এই কথাটা, 'তোর বড্ড মেয়ের শখ পিশু, তা তুই ভাবিস নি, আমি মরে তোর পেটেই আসব। তোর এই ঘরদোর, এই খাওয়াদাওয়া—আমার বড্ড পছন্দ। ইহজন্মে ভোগ হ'ল না, এই বাড়ীতে জন্মে ভোগ করব।'

কিংবা বলত, 'সাধ আহ্লাদ ত বলতে গেলে কিছুই মিটল না এ জন্মে, আসছে জন্মে সব মেটাতে হবে।...কোথায় আর যাব, তোর কাছেই আসব। তুইই মেটাস বাপু।...আর বলাও বাজে—তখন ত আর ফেলতে পারবি না। গরীব দিদি নয় যে খেলা করবি, পেটে ধরলে নিজের টানেই বস্ত্র করতে হবে।'

কথাগুলো শুনত আর শিউরে উঠত বিপাশা।

নরেশও রাগ করত। কথাগুলো ওর কানে গেলে বলত, 'তোমার দিদি যা নজর দেয় বাপু তোমার সুখসৌভাগ্যে—একটা আপদবিপদ না হ'লে বাঁচি!—এ কী বদভ্যেস!'

অপমানে রাগে দুঃখে বিপাশার চোখে জল এসে যেত। কিন্তু সে করবেই বা কী তা বুঝতে পারত না। যত রাগই হোক,—মৃত্যুপথযাত্রিণীকে তিরস্কার করতে কি কটুকথা বলতে মুখে বাধত! হাত-পা ফুলে গেছে, জলসুদ্ধ হজম হয় না—কটা দিনই বা বাঁচবে?

অসিতা মারা গেল আষাঢ় মাসে। বিপাশার খুকী জন্মাল চৈত্রে। তা-ও প্রথমটা মেয়ে হওয়ার আনন্দে ওর অতটা খেয়াল হয়নি। ওর ঝি সুশীলাই প্রথম কথাটা মনে করিয়ে দেয়, হাসতে হাসতে বলে, 'ওমা, মাসীমা বাপু যা বললে তাই করলে নাকি? এ যে ঠিক দশ মাসের মাথাতেই তোমার মেয়ে হ'ল দেখছি!... সত্যিই তোমার আদর খেতে এল বুঝি দ্যাখগে!'

বিপাশার ছ্যাঁৎ ক'রে উঠেছিল মনের মধ্যে—কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে।

সামান্য একটি কাঁটা। ভাল ক'রে বুঝি অনুভবও করা যায়নি তখন।

কিন্তু ধীরে ধীরে কথাটা পেয়ে বসল বিপাশাকে। যতই মন থেকে কথাটা তাড়াতে চেষ্টা করে, ততই ঘুরে ফিরে অসিতার কথাগুলো মনে পড়ে আর ওটা যেন পেয়ে বসে ওকে। ধমক দেয় মনকে, এই বিংশশতাব্দীতে কথাটা বিশ্বাসযোগ্য ত নয়ই—চিন্তামাত্রও হাস্যকর, মনকে একথাটাও বোঝাতে চেষ্টা করে কিন্তু কোন ধমক কোন তাড়নাতেই কথাটা যায় না মন থেকে।

একদিন নরেশকে বলতে গিয়েছিল কিন্তু সে গায়ে মাখেনি। মেয়েকে আদর করতে করতে বলেছিল, 'বেশ ত, যদি তাই হয়—মন্দ কি; তবু ত মেয়ে একটা পেলাম! গত জন্মে কি ছিল তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই—এ জন্ম আমার কাছে এসেছে তাই ভাল।'

কিন্তু নরেশ যত সহজে কথাটা উড়িয়ে দেয়—বিপাশা তত সহজে ওড়াতে পারে না।

অসিতা মানেই সেই ঈর্ষ্যা, সেই লোলুপতা, সেই উঞ্ছবৃত্তি! অসিতার স্মৃতি ওর মনের মধ্যে আগাগোড়া একটা অপ্রীতিকর, অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত। অবিরাম জ্বালা! জ্বালা আর অপমান।

সেই অসিতা আবার এল কায়েম হয়ে! তাকে আদর করতে হবে, নাচাতে হবে, সাজাতে হবে—চিরদিন সইতে হবে?

তা ছাড়া—ইহজন্মেও যদি তেমনি বরাত নিয়ে এসে থাকে? ভাবতেও শিউরে ওঠে বিপাশা।

কথাটা পিস্‌শাশুড়ীর কাছেও পাড়তে যায় সে। তিনি হেসে বলেন, 'পাগলীর কথা শোন একবার। বেশ বাপু, তা-ই যদি হয়ে থাকে, মানলুম তোমার সে দুঃখিনী দিদিই না হয় এসেছে—এ জন্মেও ভগবান তাকে দুঃখ দেবেন একথা ভাবছ কেন। আগের জন্মে কি মহাপাপ করেছিল, এ জন্মে তার শোধ হল। তা শোধও ত সে ষোল আনার ওপর আঠারো আনা দিয়ে গেছে বাপু, আবারও কি ভগবান তাকে দুঃখ দেবেন!'

কিন্তু এ সব কথাতে বিপাশা সান্ত্বনা পায় না। এরা যদি জোর করে বলত যে, এ সব হয় না, জন্মান্তর বাজে কথা—তাহলে হয়ত তবু কিছু আশ্বাস পেত সে। সে কথা ত কেউই বললেন না জোর করে। তাহ'লে কথাটা অবিশ্বাস্যও নয়, অসম্ভবও নয়।

তা হ'লে?

সত্যিই কি অসিতা এল ওকে জ্বালাতে? এ জীবনে এত জ্বালিয়েও আশ মেটেনি তার? এত বিষ মনে ছিল?

ওর যেন কান্না পায়! ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করে!......

যা সামান্য অস্বস্তি, সামান্য কাঁটা মত হয়েছিল গোড়াতে গোড়াতে—যা সহজেই মুছে যাবে আশা করা গিয়েছিল—তা-ই ক্রমশঃ বিস্তার লাভ ক'রে শাখা-প্রশাখা পল্লবে আচ্ছন্ন করে ফেললে বিপাশাকে। চিন্তাটা মনের মধ্যে স্থির অবিচল এবং প্রধান হয়ে উঠল।

বরং বলা চলে সমস্ত সহজাত চিত্তবৃত্তিকে ছাড়িয়ে গেল।

অত সাধের মেয়ে তার, সেই মেয়ে যেন বিষ হয়ে উঠল ওর কাছে। মেয়ে আর মেয়ে নয়—দিদি অসিতা।

'হাড় জ্বালাতে এসেছে আমাকে। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করতে এসেছে। এক জন্মে শত্রুতা করে শোধ হয়নি—ভাল করে শত্রুতা করতে এসেছে—হয়ত মেয়েকে স্তন্যদান করতে করতে অস্ফুট কণ্ঠে বলে বিপাশা।

ওর মনে যে এই অত্যন্ত তুচ্ছ এবং হাস্যকর কথাটা এত প্রবল হয়ে উঠেছে, পিসীমারা তা সন্দেহ মাত্র করতে পারেন না। আর তা পারেন না বলেই ওর আচার আচরণ দুর্বোধ্য লাগে ও'দের কাছে।

নরেশও অবাক হয়ে যায় ওর ভাবগতিক লক্ষ্য ক'রে। মেয়েটাকে যে অবহেলা করে বিপাশা—সেটা দিবালোকের মতই স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে ক্রমশঃ। অথচ কোন কারণ বুঝতে পারে না নরেশ। অনুযোগ করলে বিপাশা চুপ করে থাকে, বেশী বললে রাগ করে।

সময়ে খাওয়ায় না মেয়েটাকে। সময়ে ঘুম পাড়ায় না। খালিগায়ে হয়ত জলের ওপর কিংবা ভিজে কাঁথায় পড়ে আছে—দেখেও দেখে না। কেঁদে ককিয়ে গেলেও কোলে তোলবার কথা মনে হয় না ওর। মার চেয়ে ওর ব্যবহারে বিমাতার লক্ষণই যেন প্রকাশ পায়।

অবশেষে নরেশ ও পিসীমার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে ওর আচরণ। একদিন নরেশের সংগে তুমুল ঝগড়াই হয়ে গেল। আর সেই ঝগড়ার মুখে বিপাশা স্বীকার করলে ওর মনের আসল কথাটা, 'হ্যাঁ, ঐ কালসাপকে আমি দুধ কলা খাইয়ে বড় করব! দায় পড়েছে আমার।⋯ শত্রুর এসেছে জ্বালাতে-পোড়াতে সে-ত জানিই, যতই যা করো ও মরবে না, আমাকে জ্বালিয়ে শেষ করে তবে যাবে। ওকে অত আদর যত্ন করব কিসের জন্যে! ডাইনী রাক্ষুসী! ও জন্মে আমার সুখের ঘরে বিষ ছড়িয়ে শান্তি হয়নি—এ জন্মে এসেছে বাড়াভাতে ছাই দিতে!'

কথাটা নরেশের মাথায় ঢুকতে তবুও দেরী হয়েছিল বৈকি! তারপর যখন গেল তখন অত রাগারাগির মধ্যেও হেসে ফেললে সে। না হেসে পারলে না। 'ও হরি! তুমি সেই একটা কুসংস্কারের বশে পেটের মেয়েটাকে মারতে বসেছ। কী তুমি! ছেলেমানুষ না পাগল! তুমি সত্যিই ঐ সব বাজেকথা বিশ্বাস ক'রে বসে আছ! অনেক ক'রে বোঝায় নরেশ, পিসীমাও তিরস্কার করেন, কিন্তু তাতে রাগারাগিই সার হয় শুধু। আর কোন ফল হয় না।

বিপাশার বিশ্বাস বটগাছের মতই ওর মনের মধ্যে বহুদূরে পর্যন্ত মূলে বিস্তার করেছে। তার স্থানচ্যুতি আর সম্ভব হয় না কিছুতেই।

নরেশের মুখে খবর পেয়ে বিপাশার মা একদিন ছুটে এলেন। মেয়েকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলেন, বকাবকিও করলেন কিছু কিছু। কিন্তু ফল হল একেবারে উলটো। প্রথমটা ঘাড় গোঁজ ক'রে থেকে হঠাৎ খুব কড়া কথা শুনিয়ে দিলে মাকে, 'হুঁঃ! মার চেয়ে ব্যেথিনী, তারে বলে ডান।...বলি ওকে পেটে ধরেছে কে, তুমি না আমি? আমার সন্তান—আমি বুঝব। ছেলে তিনটেকে কি তুমি মানুষ করেছিলে এসে—না অপর কেউ এসে করতে গেছে?'

মা তখনই কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী চলে গেলেন। এ অকারণ অপমানের দায়িত্ব তারই—মনে ক'রে নরেশও যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। এই উপলক্ষে প্রায় একপক্ষকাল স্বামী-স্ত্রীর কথা বন্ধ রইল।

কিন্তু নরেশ ও তার পিসীমার সব আশংকা এবং সম্ভবতঃ বিপাশার সব আশা ব্যর্থ করে মেয়েটা টিকেই রইল। আজও বেঁচে আছে সে, বড়ও [illegible]। সুশ্রী ও শান্তস্বভাব মেয়ে। বাবা আর ঠাকুমা ত বটেই—আত্মীয়-স্বজন সকলকারই প্রিয়। শুধু মা-ই তার বহু আকাঙ্ক্ষার ধন এই মনের-মত মেয়েটিকে নিয়ে সুখী হতে পারে না। সন্তানের প্রতি সহজাত স্নেহ এবং বদ্ধমূল সংস্কার—এই দোটানায় পড়ে সে-ই শুধু ক্ষতবিক্ষত হয়। অকারণ অর্থহীন এবং একান্ত হাস্যকর এই অশান্তিতে তারই সমস্ত জীবনটা যেন মরুভূমি হয়ে যায়।

সেই অশান্তির আগুন নরেশকেও লাগে। তাই মাঝে মাঝে তারও মনে হয়, মেয়েটা না হলেই ভাল হ'ত। এতদিন বেশ ছিল সে।

—

মাতৃত্ব

(৩৩ পৃষ্ঠার পর)

আর কখনও এ-মুখো হবি না। আমাদের সর্বনাশ করে দেবে একেবারে।"

সবাই মিলে দূরে দূরে করে তাড়িয়ে দেয় মিকালিকে, ভয় দেখায়। চোখের জলে বিদায় নেয় মিকালি। বাচ্চাটাকে নিয়ে পথ চলতে সুরু করে। পেটের খিদেয় প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে সেটা। মিকালি নিরুপায়। আর কিছু করার নেই ওর। না খেয়ে মরবে শিশুটা—এই ওর নিয়তি। নিজেকে একান্ত অসহায় ও নিরুপায় মনে হয় মিকালির। ভয়ে শিরদাঁড়া শির্ শির্ করে ওঠে, একি দানবের বাচ্চা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে ও পিঠে!

একটা ছাউনির ধারে ছায়ায় এসে বসে পড়ে মিকালি। তখনও বেশ গরম। সামনে ধূসর মাটি, গাছপালা কিছু নেই, এখানে সেখানে আবর্জনার স্তূপ। সেদিকে ফ্যাল্ ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

কোথায় যেন দুপুরের ঘণ্টা বেজে ওঠে। মনে পড়ে যায়, আগের দিন থেকে ওর নিজেরই কিছু খাওয়া হয়নি। পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে, হোটেলখানার চারপাশে ঘুর ঘুর করতে হবে—যদি কেউ কিছু না খেয়ে ফেলে গিয়ে থাকে, নয়তো অস্তাকুড় ঘেঁটে দেখতে হবে কুকুরেও খায়নি এমন মনুষ্য খাদ্য কিছু পড়ে আছে কি না। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা বিভীষিকা জেগে উঠল মনে। হাত দিয়ে চোখ মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে চোখ তুলে যখন তাকিয়েছে, দেখে একটা লোক সামনে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে আছে। মিকালি ওকে চিনতে পারে। লোকটা চীনে। ওদের ক্যাম্পে প্রায়ই যাওয়া-আসা করে, কাগজের তৈরী এটা-সেটা এবং তুকতাক বিক্রী করতে; কিন্তু কেউ কোনদিন কিছু কেনেনি ওর কাছ থেকে। বরং প্রায়ই টিটকিরি দিয়েছে ওকে, ওর গায়ের রং আর চোখের অদ্ভুত গড়নের জন্য। ছোট ছেলেমেয়েরা তেড়ে এসে চীৎকার করেছে, "চীনেমন্দ, গায়ে বোঁটকা গন্ধ।"

মিকালি চেয়ে দেখে লোকটা ওরদিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ঠোঁট দুটো একটু নড়ছে, যেন কথা বলতে চায়। কথা বললেও শেষ পর্যন্ত অতি মৃদু ভীতস্বরে, "ছিঃ খোকা, কেঁদো না। আমার সংগে এসো।"

মিকালি কোন জবাব দিতে পারে না, অস্বীকারের ভংগীতে ঘাড় নাড়ে শুধু। ওর মন রয়েছে পালানোর তালে। পুবদেশের লোকেদের সম্বন্ধে অনেক ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার কাহিনী ও শুনেছে। ক্যাম্পের লোকগুলো এমন কথা পর্যন্ত বলে যে, ইহুদিদের মত চীনেরাও বাচ্চাছেলে চুরি করে নিয়ে হত্যা করে রক্তপান করবার জন্য।

লোকটা কিন্তু নড়েও না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। অগত্যা নিরুপায় হয়েই মিকালি ওর সংগ নেয়। আর কি বেশী বিপদ ঘটবে ওর!

এত দুর্বল হয়ে পড়েছে মিকালি যে চলতে চলতে হোঁচট খেয়ে পড়-পড় হয়। এত দুর্বল, তায় বাচ্চাটার বোঝা। চীনে লোকটা এসে ওকে ধরে। বাচ্চাটাকে নিজে নিয়ে নেয়, সস্নেহে বুকে চেপে ধরে এগিয়ে চলে।

অনেকগুলি নির্জন-পাড়া পার হয়ে তারপর ঢুকে পড়ে একটা গলিতে। গলিটা যেখানে শেষ সেখানে একটা কাঠের ঘর, চারপাশে বাগান।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে চীনা লোকটা দুবার হাতে তালি দেয়। ঘরের ভিতর থেকে কয়েক লঘুপদক্ষেপ, তারপরই ছোট্ট এক মানুষ খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে।

সামান্য স্বাগত-বাণী প্রকাশ করে রমণীটি। মিকালি কিন্তু দোর গোড়ায় নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে। কি করবে কিছুই বুঝতে পারে না। চীনা লোকটি বলে, "ভেতরে এসো, না, ভয় কি! এ তো আমার স্ত্রী।"

ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে মিকালি। ঘরটা বেশ বড় বলেই মনে হয়। মাঝখানে রঙিন কাগজের পর্দা দিয়ে দুভাগ করা। পরিষ্কার, গোছানো! কিন্তু দীনতা প্রকট। ঘরের কোণে চোখে পড়ে একটা বেতের দোলনা।

"ওটি আমার বাচ্চা", বলে তরুণী মাথা উঁচু করে চোখ ফেরায় সেদিকে সগর্ব ভংগীতে, মৃদুহাসি ফুটে ওঠে মুখে। "রক্তি ছেলে, কিন্তু কি সুন্দর, দেখো এসে।"

কাছে এগিয়ে যায় মিকালি। চুপ করে দেখে। আর সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। গোলগাল শিশুটি মাতৃদেহের অন্ধকার থেকে সবে মুক্ত পেয়েছে। সোনালী বোকেড টুকরোয় ঢাকা ঘুমন্ত শিশুটিকে যেন রাজার মত দেখাচ্ছে।

এবার স্বামী স্ত্রীকে নির্দেশ দেয়। এক চাটাইয়ের উপর বসে মা সেই অনাহারী বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নেয়, গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। চোখেমুখে বিস্ময় ও বেদনা।

আবরণ সরাতেই চোখে পড়ে এক কংকাল-সার বিভীষিকা, আর্তনাদ করে ওঠে নারী। সে আর্তনাদ বেদনার ও করুণার। সংগে সংগে বুকে চেপে ধরে শিশুটিকে। একটি স্তন মুখে পুড়ে দেয়।

হঠাৎ সম্বিত ফিরে আসে। লজ্জায় দুগ্ধপুষ্ট স্তনের উপর অংগবাসের এক প্রান্ত টেনে দেয়। রাক্ষুসে খিদে প্রাণপণে যে হতভাগাটা স্তন্য শোষণ করছে তার মুখটাও ঢাকা পড়ে।

—

মিসেস্ বোসের গানের স্কুল

(৪০ পৃষ্ঠার পর)

মিষ্টার বোস পরামর্শ দেন 'এক কাজ কর. নে কিছু বাড়িয়ে দাও! আট আনাটা এক া করে দাও অন্ততঃ। আর যারা ফ্রি রয়েছে দেরও বল—'

'তাই কখনও পারা যায়?' মিসেস বোস রক্ত মুখে বলেন, 'অসম্ভব কথা বলছ কেন?'

'তোমার কথাটাও কিছু সম্ভব ঘেঁসা নয়। থেকে খরচ দিয়ে মাষ্টার রাখবে তুমি?'

মিসেস বোস অনুনয়ের সুরে বলেন, ই আর লাগবে? ওটা আর তুমি দিয়ে দিতে রবে না আমার জন্যে?'

অতএব বিজ্ঞাপন দেওয়া হল 'আনন্দ-বার, যুগান্তর, অমৃতবাজার, হিন্দুস্থান ্ডার্ডে'।

আর সে বিজ্ঞাপনে কাজও হ'ল।

কিন্তু ক্রমশঃই যেন ডুবতে বসেছেন মিসেস স! কারণ নতুন দিদিমণি এসে হেসেই খুন! ন শেখানো হচ্ছে, তবলচি নেই!'

শুনে লজ্জায় লাল হলেন মিসেস বোস।

দের আমলে এতো তবলচির রেওয়াজ ল না। ঘরের মেয়েরা-বৌরা গান শিখছে, তার তবলচি সঙ্গত দেবে এটাই বরং নিন্দনীয়। তাদের কাছে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত শিখতে যাও লাদা কথা। না হলে এমনি 'রবীন্দ্রসঙ্গীত, মা সঙ্গীত, ভজন-টজন' ওতো শুধু রমোনিয়মেই চলে। সেইভাবেই স্কুল সুরু রছিলেন তিনি।

কিন্তু এখন আর সেভাবে চলে না।

'নতুন মাষ্টারণী তো আমায় মুস্কিলে লল।' হতাশ হয়ে এসে বসলেন মিসেস বোস. চ্ছে দু ঘরে দু' জোড়া বাঁয়া তবলা চাই, আর লচি চাই।'

'চাই বললেই তো হয় না।'

বিরক্ত হয়ে বললেন, মিষ্টার বোস।

সত্যি বিরক্ত হবার কারণও ছিল তাঁর।

এক তো স্কুল স্কুল করে স্ত্রীর সাহচর্য প্রায় রিয়েছেন। যখন যেটুকু কথা বলেন, মিসেস স সে ওই স্কুল সম্বন্ধেই। তাছাড়া—বেচারা সেস বোসের ভালোমানুষী আর ভদ্রতা-ধের সুযোগে যে পাড়াশুদ্ধ সকলে সুবিধে দায় করে নিচ্ছে, এতেই ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে চ্ছে তাঁর।

স্বরলিপি লিখতে সামান্য একখানা করে তা. তাও মেয়েরা বাড়ী থেকে আনতে চায় . নিত্য টাল-বাহানা। অতএব আর কি করা? ক রাশ খাতা কিনে রেখে দেওয়া।

ভারীতো খাতা! কতই আর যাচ্ছে ওতে? ' যাচ্ছে না সত্যি, কিন্তু মেজাজটা তে। চ্ছে।

বাঃ! না হলে যে চলবে না বলছে।' লেন মিসেস বোস!

'চলবে না তো উঠে যাক স্কুল।'

'বেশ যাক তবে' বলতে না বলতেই স্রেফ দে ফেল্লেন মিসেস বোস। স্বামীর কাছে নবরত আবেদন করতে করতে লজ্জা তাঁরও না? কিন্তু কি করবেন! ওরা যে টাকা-কড়ির পারে একেবারে বোবা-কালা। মাইনে বাড়ানর থা অবশ্য মুখ ফুটে বলতে তিনি পারেননি, কিন্তু—আর্থিক টানাটানির কথা তো কিছু কিছু জানাচ্ছেনই।

কিন্তু ওরা সে সব গ্রাহ্যই করে না। যেন এটা একটা হাসির কথা। মিসেস বোসের আবার অভাব!

কান্না দেখে অবশ্য অপ্রস্তুত হলেন মিষ্টার বোস। তাড়াতাড়ি এটা-ওটা বলে থামিয়ে, তবলচির ব্যবস্থা করবেন সে প্রতিশ্রুতিও দিয়ে বসলেন।

কিন্তু সব খরচাই কি মিষ্টার বোসকে দিতে হবে? কিছুও তো স্কুল দেবে? কত উঠছে মাসে?

উঠছে? কত উঠছে?

সে আবার উল্লেখ করা যায় না কি? তিন ভাগ মেয়েই তো অমনি শেখে।

'তোমাকে ওরা বোকা পেয়ে ঠকাচ্ছে' বলেন মিষ্টার বোস।

এ অপমান সহ্য করা শক্ত। মিসেস বোস রেগে ওঠেন, 'ঠকানোর দিকটাই শুধু চোখে পড়ল তোমার! ভালোবাসাটা কিছুই নয়? ওরা সকলে আমাকে কত ভালোবাসে তা জানো?

'ভালোবাসে তো তোমার হিত দেখা উচিত ওদের।'

'অত জানি না। ওরা ভাবে আমাদের তো টানাটানি নেই।'

'সেইটি বুঝিয়ে রেখেই তো—মুস্কিল করেছ তুমি। ভেবে দেখ ওরাও তো সত্যি আর—অভাবগ্রস্ত নয় কেউ? অথচ সামান্য আট আনা মাইনে, তাও দিতে চায় না। দু আনার একখানা খাতা, তা' দেবে না। অর্থাৎ বুঝেছে—এর সবটাই তোমার গরজ। ওরা যে দয়া করে তোমার স্কুলে মেয়ে দিচ্ছে—এতেই ধন্য করে দিচ্ছে তোমাকে।'

'কক্ষনো না।' মিসেস বোস বলেন, 'সব্বাই বলে এখানে যে রকম যত্ন নিয়ে শেখানো হয়, তেমন যত্ন ভালো ভালো স্কুলেও হয় না।'

'বেশ তো তাই যদি হয়, ওরাই বা স্কুলটা সম্বন্ধে একটু যত্ন নিতে রাজী হয় না কেন? দাতব্যের জিনিষ বেশীদিন চলে না, এটা তো বোঝা উচিত। এটা স্পষ্ট বলে দিও ওদের।'

মিসেস বোস এবার একটু চুপ করে যান।

তারপর ভাবতে থাকেন, মিষ্টার বোস খুব একটা অন্যায় কথা বলেননি। ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছেন তো তিনি নিজেও। প্রথম দিকে যে আনন্দ ছিল, এখন আর তা নেই। স্কুল এখন রীতিমত দায় হয়ে উঠেছে। একদিকে স্কুলের চাহিদা, অপর দিকে স্বামীর অসন্তোষ! দুটো সামলাতে সামলাতে প্রাণ কন্ঠাগত হয়ে আসছে।

অথচ কি করেই বা 'স্পষ্ট' বলে দেবেন ওদের? এত ভালোবাসে ওরা মিসেস বোসকে, আর এত 'ভালো' ভাবে তাঁকে। সংকল্প করলেন লুকিয়ে দু'-একখানা অলঙ্কার বিক্রী করে আপাততঃ বাঁধ দেবেন।

কিন্তু আপাততের বাঁধ কদিন থাকে?

গহনা বেচার টাকায় কদিন চলে?

অথচ রেট কমিয়ে ফেলতে পারেন না। টফি লজেন্স সরবরাহ বন্ধ করা যায় না। অভিভাবিকাদের আপ্যায়ন বহাল রাখতেই হয়, খাতা, পেন্সিলের জোগাড় রাখতেই হয়, তবলচি আর, দিদিমণিটির মাইনে জোগাতেই হয়, মাঝে মাঝে 'ফাংশান'ও করতে হয়। দিশে-হারা হয়ে পড়েন মিসেস বোস। আবার স্বামীর ওপর অভিমানও আসে, ইচ্ছে করলে কি আর উনি এ অভাব মিটিয়ে দিতে পারতেন না? এত কষ্ট পাচ্ছেন মিসেস বোস।

তা নয় খালি কথার মধ্যে কথা 'ওদের স্পষ্ট বল।'

'স্পষ্ট কথা বলা যে মিসেস বোসের পক্ষে কত কষ্টকর সে কি উনি জানেন না? জীবন ভোর যিনি দেখছেন মিসেস বোসকে?

'স্পষ্ট বলবার ইচ্ছে—যদি বা মনে উদয় হয়, পরিবেশ যে কিছুতেই সৃষ্টি হয় না। বরং আসে উল্টো পরিবেশ। ঠিক যেদিন ভাবছেন মাইনে বাড়ান সম্পর্কে কিছু বলবেন হয়ত হঠাৎ সেইদিনই অপর্ণা প্রস্তাব করে বসল 'এবার আমাদের এখানে 'বর্ষা উৎসব' হোক না মাসীমা! সব গানের স্কুলেই হয়।'

'হয় তো—কিন্তু' নিজের মুখ রাখতে সব দোষ মিষ্টার বোসের ঘাড়ে চাপান মিসেস বোস, 'তোমাদের মেসোমশাই যে আমাদের সব কিছুতেই খাপপা। এখুনি বলবেন, 'খরচ রে পত্র রে—'

অপর্ণা হেসে গড়িয়ে পড়ল।

যেন এটা 'মাসীমার একটা সৌখীন মনো-বিলাস।

অতএব বর্ষা উৎসব হ'ল। হ'ল আর একখানা ছোটখাট গহনার বিনিময়ে। কারণ স্বামীর ওপর অভিমান!

যখন উৎসব হয়, তখন যেন সব সার্থক। নাচ হয়, গান হয়, সভানেত্রী, প্রধান অতিথিরও ত্রুটি হয় না সৌখীন একটু বক্তৃতাও হয়, এবং সম্পাদিকার পক্ষ থেকে শেফালী যে রিপোর্ট পড়ে তাতে—স্কুল প্রতিষ্ঠাত্রী মিসেস বোসের—'স্নেহ, প্রীতি, মমতা, ভালবাসা, দয়া, দাক্ষিণ্য' ইত্যাদির এমন ভূয়সী প্রশংসা করতে থাকে যে, তারপর আর মাস দুই অন্ততঃ 'স্পষ্ট কথা' বলবার কথা চিন্তাও করা চলে না।

তবু ঘটে গেল সেই বিপর্যয়!

হঠাৎ এক মুহূর্তের অসহিষ্ণুতায় প্রলয় ঘটে গেল! যার প্রতিক্রিয়া হল প্রথম পৃষ্ঠার সেই খবরটা।

ক্ষণকাল আগেই স্বামীর সঙ্গে কথা কাটা-কাটি হয়ে গেছে, স্বামী তাঁকে 'নির্বোধ' বলে ব্যঙ্গ করেছেন, তাই নিতান্ত ম্রিয়মাণভাবে বসে আছেন মিসেস বোস, এমন সময় মাধবী এসে দাঁড়াল একটি মেয়ে সঙ্গে করে। একগাল হেসে বলল, 'আপনার আর একটি পুষ্যি বাড়ল মাসীমা। এর মার ভারী সখ আপনার স্কুলের ছাত্রী করে দিতে—'

মুহূর্তে কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল!

অভ্যাস বহির্ভূত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস বোস, 'বিনি মাইনের বোধহয়? এই জন্যেই বলে কাঙালকে শাকের ক্ষেত—' থেমে গেছেন মিসেস বোস, নিজেরই কথার ধাক্কায়।

হঠাৎ কি ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হল?

যার বিদ্যুতাঘাতে কাঠ হয়ে গিয়েছে এ ঘরের 'বিনি মাইনের ছাত্রীগুলি আর তাদের উপস্থিত অভিভাবিকাবর্গ।

আর স্বয়ং স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী?

বিদ্যুতের শিখা নয়, যেন পুরোপুরি বাজটা তাঁর মাথাতেই পড়েছে।

এ কি করলেন তিনি, এ কি করে বসলেন।

এত লোকের মাঝখানে এভাবে অপমানিত হয়ে মাধবীর মুখটা আগুনের মত হয়ে উঠল।

'মাপ করবেন মাসীমা, ভুল হয়েছিল আমার' বলে মেয়েটার হাত ধরে গট-গট করে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু এ অপমান তো একা মাধবীর গায়েই লাগেনি, লেগেছে অনেকের গায়েই অতএব গায়ের জ্বালায় ছটফট করতে করতে বেরিয়ে গেলেন তাঁরা।

পরদিন থেকে মিসেস বোসের দোতলার ঘর স্তব্ধ হয়ে গেল।

শেফালী, চামেলী, মাধবী, রেবা, শিপ্রা, কমলা পাড়ায় পাড়ায় বলে বেড়াতে লাগল, 'মানুষ চেনা সোজা নয়, দেখাতেন যেন কতই উদার ভেতরে ভেতরে এই প্যাঁচ!'.........বলতে লাগল 'এতই যখন ইয়ে, আগে বললেই পারতেন, এভাবে পাঁচজনের সামনে অপমান করবার দরকার কি ছিল? আসল কথা—এক ঢিলে অনেক পাখী মারবার মতলব নিয়েই বসে-ছিলেন।'......বলতে লাগল 'কে ওঁর ইস্কুলে মেয়ে দেবার জন্যে মরছিল? নেহাৎ একটা জায়গায় আটকে রাখবার সুবিধে হচ্ছিল তাই রাখা! গোড়ায় তো লোকের খোসামোদ করে করে মেয়ে জোগাড় করেছেন।.....

অতঃপর এ কথাও ছড়াতে লাগল, 'বড়-লোকের গিন্নীতো, অহঙ্কারে যেন মটমট করতেন, আমরা তেমন ধরতাম না তাই।'

অবশেষে কিছুদিনের মধ্যেই পাড়ায় রটনা হয়ে গেল, মিসেস বোসের মত দাম্ভিক, উন্নাসিক কটুভাষিণী এবং অভদ্র মহিলা অন্ততঃ এ অঞ্চলে আর নেই।

অনেক কিছুই কাণে আসে, যে কাণ একটা মিথ্যা আশার ছলনায় প্রতিনিয়ত উৎকর্ণ হয়ে থাকে। এমন এতটুকু মমতা কি কোন ছোট্ট হৃদয়েও সঞ্চিত ছিল না, যে মমতা ওপর-ওলাদের শাসন এড়িয়ে লুকিয়ে একটু উঁকি দিয়ে যায়?

চুপ করে বসে থাকেন স্কুল উঠে যাওয়া ফাঁকা ঘরটায়।

চিরদিনের অন্তরের সংগীর কাছে—অন্তরের ব্যথা উজাড় করে ধরবার মুখও যে বন্ধ! বরাবরই স্বামীর কাছে বড় গলায় বলে এসেছেন, 'যাই বল তোমার মনটা বড় সংকীর্ণ। সংসারে টাকাটাই কি সব? ভালোবাসাটা কিছুই নয়? ওরা আমায় কত ভালবাসে তা জানো?'

স্বামী তাঁকে 'নির্বোধ' বলে উপহাস করেন, তা নির্বোধ বৈকি তিনি। চিরদিন সন্তানহীন স্বল্প পরিসর সংসারের মধ্যে স্বামীর স্নেহ-চ্ছায়ায় লালিত হয়ে এসেছেন, কখনও কারো সংগে স্বার্থের সংঘাত তীব্র হয়ে ওঠেনি। তাই সংসারের সত্যরূপটাও কখনো উদঘাটিত হয়নি তাঁর সামনে! সদ্য আঘাতপিষ্ট সেই নির্মল মনের মধ্যে এই প্রশ্নটাই তোলপাড় করতে থাকে, 'মানুষের সংগে মানুষের সম্পর্কটা কি শুধু নিক্তির পাল্লায়? ক্ষণিকের অসতর্কতায় নিক্তির কাঁটার এতটুকু এদিক-ওদিকে হৃদয়ের সমস্ত সম্পর্ক ধূলিসাৎ হয়ে পড়ে?'

আজীবনের যত কিছু সঞ্চয় মিথ্যা হয়ে যায়, সত্য হয়ে ওঠে শুধু মুহূর্তের বিচ্যুতি-টুকু? বিস্মিত হয়ে এ কথা কেউ বলল না 'আজ ওঁকে বুঝতে পারলাম না।' অনায়াসে বলে বেড়াতে লাগল 'এতদিন ওকে বুঝতে পারিনি!'

বসুন্ধরা

(৩৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

শোভনা হেসেই চলল: কী যে বলেন ছেলেমানুষের মতো ঠিক নেই।

আমার সমস্ত আবেগের ওপর একটা ঠাণ্ডা বরফের স্তূপ এসে পড়ল। কী অদ্ভুত মেয়ে! মন বলে কি কিছুই নেই!

তবুও আমি বললুম, ঠাট্টা নয়। আমি তোমাকে বিয়ে করব।

—পাগল নাকি? এ কখনো হয়? সবাই আপত্তি করবেন।

—কারো আপত্তি আমি গ্রাহ্য করি না।

তেমনি সহজ সরল গলায় শোভনা বললে, গ্রাহ্য না করলে চলে? ছিঃ ছিঃ—আপনি এখন বড় হয়েছেন—আপনার ওপর ওঁদের কত আশা। কেমন টুকটুকে বউ আসবে আপনার ঘরে। কত আনন্দ করে দেখতে যাব আমরা। তার বদলে আমার মতো পেত্নীকে আপনি পছন্দ করলেন? ভাবতেই আমার হাসি পাচ্ছে।

তবু শেষ চেষ্টা করলুম আমি। দাঁতে দাঁত চেপে বললুম, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

—কী বিপদ, খামোকা আমাকে আপনি কেন ভালোবাসবেন? না-না, এসব বলতে হয় না। মাথা ঠাণ্ডা করে বসুন—আমি আপনাকে চা দিই।

এরপরে চা খাওয়ার প্রবৃত্তি আমার আর ছিল না। অপমানে, গ্লানিতে পুড়তে পুড়তে আমি ফিরে এলুম। আজও সারারাত আমার ঘুম এল না। সত্যিই তো, এত নীচে আমার রুচি নেমেছিল কী করে? শিক্ষা নেই, রূপ নেই—হৃদয় নেই। অনুভূতি হয়তো বা কোনো দিন ছিল—আজ হীনমন্যতার চাপে তা পিষে মরে গেছে। যদি দৈবাৎ আমার কথায় ও রাজী হত—তা হলে সারা জীবন কী অসহ্য একটা জগদ্দল পাথরকেই না বয়ে বেড়াতে হত আমাকে!

সারারাত পরাজয়ের যন্ত্রণায় আমি জ্বলতে লাগলুম। আর ভাবতে লাগলুম, এই দু বছরের মূঢ়তার জন্যে নিজেকেই আমি ক্ষমা করব কেমন করে!

ছ' মাস পরে বড় বৌদির চিঠিতে জানলুম, শোভনার বিয়ে হচ্ছে। বিয়ের প্রায় সব খরচ মা-ই দিচ্ছেন।

বুঝতে পারলুম কেন মা-র এত গরজ, এত তাড়া। সন্দেহ করেছিলেন। কিন্তু আমার হাসি পেল। ব্যস্ত হওয়ার কোনো দরকার ছিল না মা-র। শোভনা দাশগুপ্তের জন্যে পৃথিবীতে কাউকেই ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই।

দু বছর পরে আমি বিয়ে করলুম। রূপসী, বিদুষী স্ত্রী। রেকর্ডে গান আছে—রেডিয়োতে প্রোগ্রাম করেন। আমার চাইতেও অনেক প্রখর রুচিবোধ। ঘরে একটি মাত্র জাপানী ছবি রেখেছেন, ফুলদানির কালার কম্বিনেশনে একটু এদিক-ওদিক হলে সইতে পারেন না।

শোভনা দাশগুপ্তকে ভুলে গিয়েছিলুম। আগে মধ্যে মধ্যে মনে পড়ত। ভাবতুম, সত্যিই কি ওর হৃদয় ছিল না? সত্যিই কি একটা প্রা হীন যন্ত্র হয়ে গিয়েছিল? তবু ঠিক বিশ্বাস হত না। মনে হত, কোথায় কী এক রয়ে গেছে—কী যেন একটা সত্যকে আ বুঝতে পারিনি।

তারপর আজ আমি বুঝেছি। এই বৎসর পরে।

সীমাচলমের মন্দিরে নারকেলের প দিয়ে নেমে আসছি। সামনে এক হাজার সিঁ ওঠবার সময়ই বুক ফেটে যাচ্ছিল—নামতে খুব আরাম লাগবে না।

ঠিক সেই সময়েই দেখলুম।

আধবুড়ো একটি শীর্ণ মানুষ সিঁ ধাপে বসে হ্যা-হ্যা করে হাঁপাচ্ছে। চোখ বেরিয়ে এসেছে—মুখ টকটকে লাল—দেখ মায়া হয়। এই এক হাজার ধাপ পাহাড় ভে ওপরে ওঠা কি এত রোগা মানুষের কাজ!

তার পাশেই দাঁড়িয়ে শোভনা। হয়েছে, লম্বা হয়েছে, কালো হয়েছে। দেখলুম শোভনা সত্যিই কুরূপা।

আমার রক্ত চমকে উঠেছিল। কিন্তু শো তেমনি সহজভাবেই হাসল।

—মণ্টুদা যে! উঃ—কতদিন পরে হল!

আমিও জোর করে সহজ হতে চাইলু হ্যাঁ—অনেকদিন পরে। তা ইনি কে?

—আমার স্বামী। হাঁপানির রোগী, হয়েছে। ভিজিয়ানাগ্রামে ভাইয়ের এখানে ছিলেন, সখ হয়েছে সীমাচলমে নরসিংহ দ করবেন। তা এই পাহাড়ে ওঠা কি ওঁর কা একটু উঠেই বসে পড়েছিলেন। শেষে আ ধরে ধরে, কাঁধে ভর চাপিয়ে ওঁকে আনলুম। তীর্থ দেখতে এসে ফিরে যাবে পথও বাপু তেমনি—যেন স্বর্গের সিঁড়ি কিছুতেই আর ফুরোয়না। আমারই প্রাণ ধড় করছে। সে যাক। অনেক দিন কটকের খ পাইনি, আপনারা সবাই ভালো তো?

—ভালোই আছি—

সংক্ষেপে জবাব দিয়ে আমি নেমে এলু তেঁতুল গাছের ছায়ায় ছায়ায়, ঝর্ণার শুনতে শুনতে আর পাহাড়ের গায়ে আনারস ক্ষেতের ওপর মেঘের আলো-ছায়া দেখ দেখতে আমার মনে হল, এইবারে আমি হয় বুঝতে পেরেছি শোভনাকে। আমার ম সাবধানী, পরিচ্ছন্ন, স্বাবলম্বী মানুষকে দি ও কী করবে? ও আশ্রয় পেতে চায় না—আ দিতে চায়। ভার হতে চায় না—ভার বইতে চা তাই আমার মতো মানুষকে গ্রহণ করবার ক ও ভাবতেও পারেনি। অথর্বপ্রায়, এই জরাজী স্বামীকে হাজার সিঁড়ি ভেঙে ওপরে টে তোলার মধ্যে যে চরিতার্থতা ও পেয়েছে, আত্মপ্রসাদের আলো জ্বলে উঠেছে ওর চোখে মুখে—সেকি কোনোদিন আমি ওকে দি পারতুম?

সুবীর সেনগুপ্ত থামল। সমুদ্রে অবিশ্রান্ত গর্জনের মধ্যে কান পেতে নিজে কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে চাইছে ব মনে হল।

সোনালী মাছ

(১৩৩ পৃষ্ঠার পর)

অসামান্য! তার সামান্যকে অসামান্য করলেন যিনি, সেই তাঁর দিকে চেয়ে অভিভূত ডাক্তার নিজেকেই মাথা নাড়লেন।

অমল নেই। একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আর তাঁর কোন ভয় নেই। এবার আর কেউ এসে তাঁকে অস্থির করে তুলবে না। এখন তিনি আবার আগেকার মতোই নিশ্চিন্ত হয়ে চলেফিরে বেড়াতে পারবেন।

কলকাতায় কদিন বাদে এক বাদলে রাতে মিসেস তালুকদারের ছাদের ঘরে উঠতে খুব ভালো লাগলো তাঁর। ঘুমের কষ্টটা একেবারে নেই। বেয়াড়া সব প্রশ্ন করে বিব্রত করে তুলেছিলো অমল। তাই ঘুম হতো না। ছোঁড়া! দারিদ্র্য আর আদর্শবাদের ভারে মানুষ যে কি করে ফেলে! শর্মিলাকে সেই কথা বললেন।

শর্মিলা আজ কি রকম সেজেছে! [illegible] পোষাক, কটা চুলে উদ্ধত খোঁপা। [illegible]

[illegible] শর্মিলা তালুকদার মাথা হেলিয়ে [illegible] সোফায়। বললো, —এবার সেই [illegible] ছেলেটির কথা বলো!

—ফ্রিকুপাত্রের কেস, আর কি!

—বলো! তোমার আপন ভাষায় বলো! [illegible] তোমার জন্যে আমি নতুন করে [illegible]

—বলছি!

[illegible] থামলেন তিনি। সামনের জানলায় [illegible] ক্যাকটাস। ঘনসবুজ। আঁকাবাঁকা। [illegible] মুগ্ধ ও ঈষৎ ভয়ার্তভাবে তাকিয়ে [illegible]। তারপর বললেন,

—ঐ কুৎসিত জিনিষটা সরাও?

[illegible] সরিয়ে নিলো টবটা। এবার মুখ [illegible] করে খোঁপা ঠিক করলো শর্মিলা। তিনি বললেন,—

—কি বলছিলাম?

—কি বলছিলে?

মানুষের মন জটিল। দুর্গম অরণ্যের মতোই দুর্ভেদ্য তার প্রবেশপথ। ঐ গাছটা দেখে ক্ষণিকের জন্য তাঁর বিভ্রম হয়েছিল। মনে হয়েছিলো বুঝি বা গাছটা অরণ্যের সাক্ষী, আর তাঁর মিথ্যাভাষণ সে ধরে ফেললো।

সে আত্মবিভ্রম-কে তিরস্কার করলেন তিনি। স্পন্দিত হৃদয়কে শাসন করলেন। বললেন,

—বলছি। সেই দুর্ঘটনার কথা।

সত্যিটুকু ঢেকে সুন্দর ভাষায়, অননুকরণীয় ভঙ্গীতে চমৎকার করে তিনি বলতে শুরু করলেন। তাঁর ভাষণে অমলের কথা রইলো না। তাঁর নিজের কথা রইলো না। [illegible] অন্ধভক্ত একটি মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত হতভাগ্য তরুণের শোচনীয় [illegible] কথা তাঁর মুখে হয়ে দাঁড়ালো চমৎকার একটা গল্প। সে গল্প শুনতে শুনতে মুগ্ধ [illegible] শর্মিলা আরো কাছে এলেন। বললেন,

—বলো, আরও বলো...

উৎসাহিত হয়ে উঠলেন তিনি আর শর্মিলা শুনতে লাগলো তাঁর কথা। এ ঘর নিরাপদ। এখানে কোনও ভয় নেই। এই নিরাপদ পরিবেশে নিজের গল্পটা নিজেই বিশ্বাস করতে সুরু করলেন তিনি। তাঁর চমৎকার গল্পটি সত্যি হয়ে উঠতে লাগলো। আর এতদিনে যেন সত্যি সত্যি মরলো অমল।

পিত্যেশ মিছা

(১৩০ পৃষ্ঠার পর)

দিলীপের একটা একটা কথায় যেন শক্ পায় সে।

—কেন এমন কথা বলছো দিলীপ? মা বললেন অনুযোগের সুরে। ছেলের মাথায় হাত রেখে বললেন,—এখন কোন কথা নয়, তোমাকে ঘুমোতে হবে।

—ঘুম যে আসছে না। [illegible] চিন্তা আসছে মাথায়।

—দুশ্চিন্তা দূর করতে হলে মনকে সংযত করতে হয়। মিঃ মজুমদার মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে কথা বললেন, ভারী গলায়। খানিক থেমে থেকে আবার কথা বললেন,—ওষুধ কটা ঠিক ঠিক খায় যেন। আমি যাচ্ছি, কোর্টের টাইম এগিয়ে আসছে। কথা বলতে বলতে ছেলের একখানি অবশ হাত নিজের হাতে ধরলেন। বিদেশী কর মর্দনের ভঙ্গীতে হাত নাচিয়ে নাচিয়ে বললেন,—দিলীপ [illegible] চীয়ার আপ্। ফাইট আউট ডামন্ [illegible] ডোন্ট ফরগেট, মৃত্যু বা মরণ [illegible] নয়। ইচ্ছামৃত্যু কথাটা পৌরাণিক, [illegible] সাইকোলজিক্যাল।

হাইকোর্টের দণ্ডাধারী, সমস্ত সংকেত [illegible] যেন এ্যাডভোকেট সাহেবের, ঘরের ইদিক সিদিক ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চুরুটের ধোঁয়া ভাসিয়ে কক্ষ ত্যাগ করলেন।

—মাসীমা, আপনি যান। [illegible] আছি দিলীপের কাছে। কাকাবাবু কোর্টে যাবেন এখনই। তনিমা কথা বলতে বলতে বিছানার এক তীরে বসে পড়লো। বললে,—আর একবার ওষুধ খাওয়ার সময় হয়ে গেছে।

মাধবীলতা নিরুপায়, অসহায়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। দুয়োর পেরিয়ে বললেন,—ঘুমোতে চেষ্টা করো দিলীপ। খানিক ঘুম হলেই জ্বর-জ্বালা কমে যাবে।

এক পেয়ালা জল আর ওষুধ এগিয়ে ধরে তনিমা রোগীর মুখের কাছে। এক ঝলক হাসির সঙ্গে বললে—খেয়ে নাও লক্ষ্মী ছেলের মত।

বেশী বলতে হয় না। দিলীপ ওষুধ আর জল খেয়ে কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ থাকে। চোখে যেন অপ্রসন্ন দৃষ্টি। ধীরে ধীরে কথা বললে,— ওষুধে কি ফল পাওয়া যাবে!

—নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তনিমা সতেজকণ্ঠে বললে, দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে।

খুশী হয় না যেন দিলীপ। মুখখানি বিকৃত করে দেহকষ্টে। খাটের পায়ার দিকে চোখ রেখে বললে,—আর কতক্ষণ দেরী আছে? কখন আমি মরবো?

—না না না। তনিমার চোখ ছলছল করে। বলে,—এ সব কথা কেন ভাবছো তুমি? ইনফ্লুয়েঞ্জায় মরে না কেউ।

কাগজে দেখেছি, গত সপ্তাহে প্রায় পঞ্চাশজন মরে গেছে। দিলীপ শক্তিহীন ক্ষীণ সুরে কথা বলছে। মৃত্যুর খতিয়ান খোঁজায়।

মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিনটি গুণতে থাকে দিলীপ। মরণ বরণের অধীর প্রতীক্ষা তার। মৃত্যুর প্রত্যাশায় দিন আর রাত্রি কেটে যায়। [illegible] আসে না তবু।

পরের দিন সকালে ছেলের ঘরে আসেন মিঃ মজুমদার। উচ্ছ্বসিত হাসি তাঁর মুখে। গতকাল একটা বিরাট মামলার রায় [illegible] [illegible] মক্কেলের জিৎ হয়েছে, সেই আনন্দে [illegible] তিনি।

ছেলে ক্লান্তমুখে শুয়ে আছে বিছানায়। মাধবীলতা মিটার দিয়ে দেখেছেন, ছেলের জ্বর [illegible]।

মিঃ মজুমদার বললেন, দিলীপ, তুমি তো আজ ভাল আছো।

নেতিবাচক [illegible] দোলায় ছেলে। অস্বীকার করে যেন। বিরক্তি প্রকাশ করে। ছেলের অজ্ঞানে হাসি পায় এ্যাডভোকেট সাহেবের। [illegible] শব্দে হেসে উঠলেন তিনি।

মাধবীলতা বললেন,—মা দুর্গার কৃপায় জ্বরটা যা হোক তবু কমেছে। অনিয়মে [illegible] সারা।

চুড়ির রিনিঝিনি ভাসলো ঘরে। স্নো-পাউডারের সৌগন্ধ বহন করে আনলো কে যেন। তনিমা ঘরে আসে। সাগ্রহে বলে,—মাসীমা, কেমন আছে দিলীপ?

—আজ একটু ভাল আছে মা। জ্বর কমের দিকে। মাধবীলতার মুখে অনাবিল মৃদু মৃদু হাসি।

—আগে আমার পালা। আমি আগে যাবো, তারপর অনেক অনেক পরে তোমার যাওয়ার পালা আসবে। তার অনেক দেরী। মিঃ মজুমদার মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে কথা বলছেন। বললেন,—লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মাইলের পথ পেরিয়ে মৃত্যুকে আসতে হয়, তাইতো এত দেরী, এত বিলম্ব। 'দেয়ারফোর ডু নট ওয়ারি মাই বয়।'

মাধবীলতার আঁখিপ্রান্ত চিকচিকিয়ে উঠলো যেন। এ্যাডভোকেট সাহেবের বিজ্ঞ কথাগুলি যেন ভাল লাগে না। তাঁর ইচ্ছা, স্বামীর আগে তিনি যাবেন।

অন্যদিন তনিমাকে দেখলে আনন্দের আতিশয্যে লেখাপড়া স্থগিত রাখে দিলীপ। তনিমাকে দেখে অপলক চোখে। আজকে যেন তনিমাকে দেখেও দেখলো না। ফিরেও তাকালো না। একরাশ বিরক্তি আজ দিলীপের মনে। কৈ, মৃত্যু আসে না কেন?

পরীক্ষা

সিদ্ধার্থ গঙ্গোপাধ্যায়

মাছের দাম কমাতে হবে!

ভগবতীশঙ্কর দে

ছোটদের পাততাড়ি
পূজোর চিঠি
বাদল ঝরা শেষ হয়েছে, শরৎ রানী আসে —
নীল আকাশের হাল্‌কা হাওয়ায় জল হারা মেঘ ভাসে!
সারা ভুবন পুলক-পাগল, কোথায় বাজে বাঁশী ?
শিউলী বনে সুবাস জাগে, শুনি কাশের হাসি !
ফুল-পরীরা বেড়ায় উড়ে তেপান্তরের মাঠে
পূজোর পোষাক পেয়ে তোদের—আনন্দে দিন কাটে!
দেশ-ভ্রমনে চল্লো কেরে পুঁটলী কাঁধে নিয়ে ?
পূজোর দিনে তুষ্‌বি কারে রঙীন পুঁথি দিয়ে ?
শারদীয়ায় হাজার মজা, তুলনা তার নাই —
নানা রঙের গল্প দিয়ে মনটা তুষি তাই !
খোকা খুকু, খুলে দিলাম— স্বপনবুড়োর ঝুলি-
মনের মতো সওদা এবার নিজ হাতে নাও তুলি ॥
তোমাদের বন্ধু
স্বপনবুড়ো
শারদীয়া
১৩৬৫ ।
পরিচালক / স্বপনবুড়ো
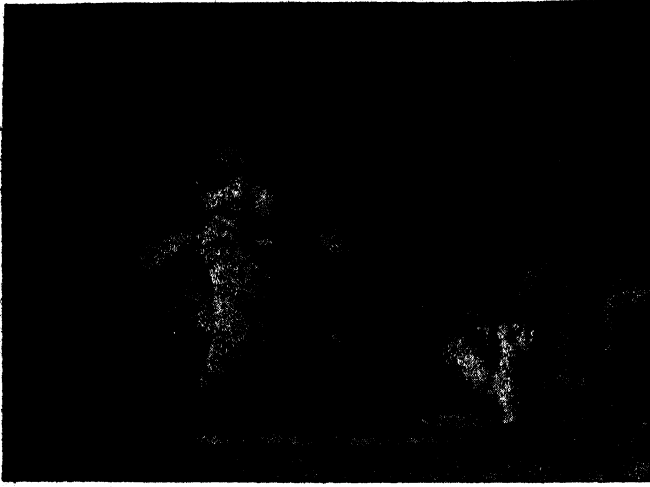
আমার এ খেলাঘরে সব কিছু পাবে গো—
ক্ষিদে পেলে বেমালুম খেলনাই খাবে গো!

ফটো—অনিলকুমার বসু।
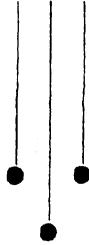
আছে হাসি, আছে গান
আরো আছে খোলা প্রাণ॥

ফটো—অঞ্জলী
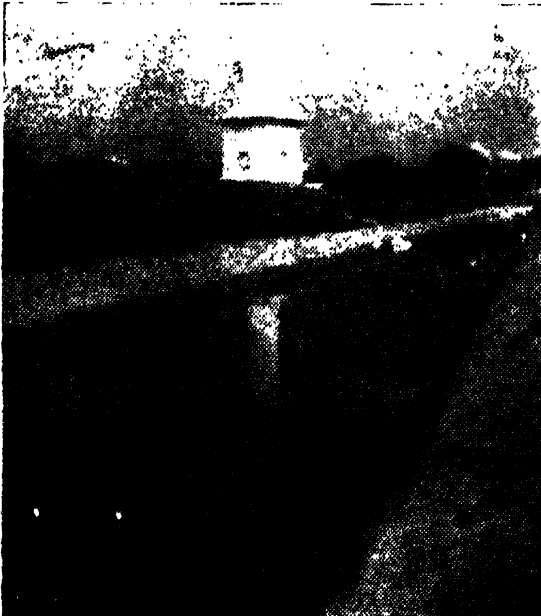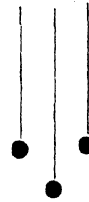
মিনার তুলেছে মাথা আকাশের গায়
[illegible]

এক্ষুণি আসবে যে ঝম ঝম বৃষ্টি—
ছাতা না খুললে ভাই নাশ হবে সৃষ্টি!

৩
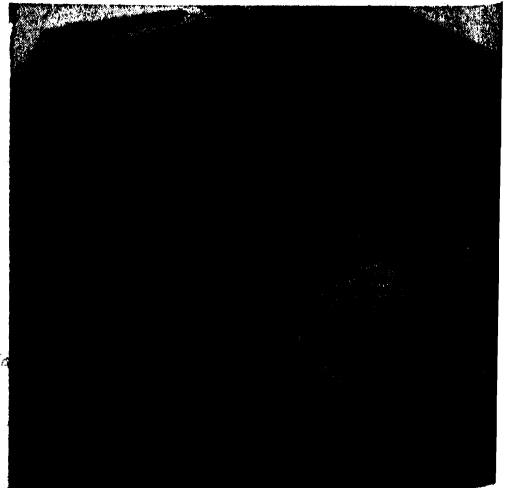
(১) বর্ষায় সাবধান—ফটো—রবি দত্ত; (২) কনে বৌ—ফটো—মায়া দে; (৩) অভিনয়ের আগে—ফটো—অমিয় পাল; (৪) বলি ত হা না—ফটো—রেবা বল; (৫) খেলার সাথী—ফটো—পান্না সেন; (৬) বল্‌ব ছড়া?—ফটো—অঞ্জনা সিংহ; (৭) তুল্‌বে ফটো?—ফটো সমীরেন্দ্র সিংহ রায়; (৮) মেঘের দেশে—ফটো—আরতি সেনগুপ্ত; (৯) ভাব করবি? ফটো—ভগবতী দে (১০) একেবারে আ ফটো—মদন দত্ত।

অনেক পুরাকালের কথা। কল্মাষপাদ নামে খুব পরাক্রমশালী
রাজা ছিলেন। একদিন তিনি মৃগয়ায় বেরিয়েছেন। সমস্তদিন
য়া করে মৃগয়ালব্ধ জিনিস নিয়ে এক অতি সংকীর্ণ পথ দিয়ে
ছেন, এমন সময় মহামুনি বশিষ্ঠদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র শক্তির সঙ্গে
া। শক্তিও সেই পথ দিয়ে আসছিলেন। রাজা বললেন,—আমার
থেকে সরে যাও। শক্তি বললেন,—ব্রাহ্মণকে পথ ছেড়ে দেওয়াই
ার ধর্ম—আমি পথ ছাড়বো কেন? পথ ছাড়লেন না দেখে রাজা
নেক রেগে গিয়ে শক্তিকে কশাঘাত করলেন। শক্তি ক্রুদ্ধ হয়ে
ভশাপ দিলেন,—তুমি নরমাংসভোজী রাক্ষস হও। সর্বনাশ হোল।
বিষণ্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। অমনি আর এক বিপদ উপস্থিত।
ষ্ঠের শত্রু বিশ্বামিত্রের আদেশে কিংকর নামে এক রাক্ষস এসে
ার দেহে আশ্রয় নিলে। রাজার মনে রাক্ষসভাব এসে গেল।

রাজা চলেছেন বিমর্ষ হয়ে। এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা।
ণ বললেন,—আমি ক্ষুধার্ত। আমাকে কিছু মাংস ও খাদ্য দিন।
তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে ঘরে গেলেন। ঘরে গিয়ে পাচককে
লেন,—কিছু খাদ্য ও মাংস দিয়ে এসো ঐ ব্রাহ্মণকে। পাচক
লে,—মাংস নেই। রাজা বললেন,—মাংস নেই? তবে নরমাংস
য় যাও। রাজা হয়ে গেছেন রাক্ষসভাবের, তাই এই কথা
বসলেন।

পাচক নরমাংস সংগ্রহ করলে, এবং তা অন্নের সঙ্গে পাক করে
ণের কাছে নিবেদন করলে। ব্রাহ্মণ ছিলেন তপস্বী, তিনি
তে পারলেন। জানতে পেরে মহা ক্রুদ্ধ হয়ে রাজাকে দিলেন
শাপ,—যে নৃপাধমের এই কীর্তি, সে হোক্ নরমাংস
জী।

দুজনের অভিসম্পাত লাগলো রাজার উপর। কিংকর রাক্ষসও
য় নিয়েছিল তাঁর দেহে। এবার রাজার ইন্দ্রিয় সকল বিকৃত হয়ে
। তিনি হয়ে গেলেন এক রাক্ষস। রাক্ষস হয়েই শক্তিকে দেখেই
লেন,—তুমি শাপ দিয়েছ, এবার আমি তোমায় খাব। এই বলে
কে খেয়ে ফেললেন। এদিকে বশিষ্ঠ-শত্রু বিশ্বামিত্র রাজাকে
ল প্ররোচনা দিতে লাগলেন। রাজা তখন এক এক ক'রে বশিষ্ঠের
শত পুত্রের সকলকেই খেয়ে ফেললেন। সর্বনাশ হোল বশিষ্ঠের।
পুত্রদের জন্য মহা শোকগ্রস্ত হলেন। শোকগ্রস্ত হয়ে আত্ম-
ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যু হোল না। তখন তিনি দেশ
ণ বার হলেন।

তারপর, দেশ ভ্রমণের পর আশ্রমে ফিরে আসছিলেন, এমন
পিছন থেকে বেদপাঠের ধ্বনি শুনতে পেলেন। বশিষ্ঠ জিজ্ঞাসা
লেন,—কে আমার অনুসরণ করছে? এক নারী উত্তর দিলেন,—
অদৃশ্যন্তী, শক্তির বিধবা পত্নী। আমার গর্ভে যে পুত্র
সে-ই করছে বেদপাঠ।

বংশের সন্তান তবে জীবিত আছে? খুব আনন্দ হোল বশিষ্ঠের। তিনি পুত্রবধূকে নিয়ে আশ্রমের দিকে চললেন।
রাস্তায় কল্মাষপাদের সঙ্গে দেখা। বশিষ্ঠকে আর

(শেষাংশ পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

খাম খেয়ালী রামশর্মা
প্রত্যহ সে প্রত্যুষে
খেয়াল গাহে, বে-রসিকের
মস্ত বড় শত্রু সে।
তানপুরোটি আঁকড়ে কাঁধে—
হাঁকড়ে গলা নানান ছাঁদে,
গান ধরে সে ভৈরবীতে,
সুর ধরে সে মল্লারে—
লোকরা মুখে তোমরা ভাবো—
করছে গাধা হল্লারে।

সুরের যখন বন্যা ছোটে,—
গিটকিরি দেয় ভাবের চোটে,
টিটকিরি তায় দেয় যদি কেউ,
গাঁট্টা মারে, চড় মারে,
যারাই শুধু গানের রসিক,
বুঝতে পারে শর্মারে।
কণ্ঠে তাহার রাগ-রাগিণী
গর্জে যেন বাঘ-বাঘিনী,
ধ্রুপদগুলো চতুষ্পদের
মূর্তি ধরে দঙ্গলে,
খেয়ালগুলো শেয়াল সম
ডাকতে থাকে জঙ্গলে।
উচ্চ ঢংয়ের গীতের ধারা
সহজ তো নয় বুঝতে পারা,
আনাড়ী সে বুঝবে কিসে—
কানাড়া সে দরবারী,—
সত্যিকারের গুণীর সভায়
রামশর্মার দর ভারী।
মান পত্র (পাতা কচুর)
খ্যাতির তরে পায় সে প্রচুর,
অনেক মেডেল (ঘুঁটে মাটির)
পেয়েছে রামশর্মা সে,
তোমরা যদি গাইতে বলো,
গাইবে না গান ফরমাসে।

গোড়ার কথা ঃ

তোমরা রামায়ণ পড়েছো, কাজেই জানো যে, হনুমানের মুখ পুড়ে কালো হয়েছিল, লংকায় রাবণ রাজার হুকুমে তার ল্যাজে আগুন লাগবার ফলে। বেচারী তখন সীতাদেবীকে বলেছিল এ পোড়া কালো মুখ নিয়ে কি করে ফিরে যাবো মা ঃ সব বানরের মুখ রাঙা......আর আমার মুখ কালো। তখন সীতাদেবী বলেছিলেন হনুমানকে—তুমি গিয়ে সেখানে দেখবে, না পুড়লেও সব বানরের মুখ কালো।

এবং হনুমান ফিরে গিয়ে দেখেছিল দলের সব বানরের মুখ কালো।

সেই থেকে সব বানরের মুখ ছিল কালো। আমরা যাদের বলি —রূপী বানর তাদের মুখ রাঙা......কালো নয়।

যে-সব বানরের মুখের রঙ আজ দেখছি রাঙা তাদের আদি পুরুষ এমন একটি কাজ করেছিল—যার জন্য তার আর তার বংশের সব বানরের রঙ আজ হয়েছে রাঙা।

কি করে রাঙা হলো,—তা জানতে পারবে এই চীনা গল্প থেকে, তা জানার সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু নতুন কথা জানবে। এখন শোনো সে কাহিনী বলি ঃ

শেয়াল...শুধু কি ধূর্ত? মিথ্যা ধাপ্পাবাজি আর ফন্দী-ফান্দীতেও তার জোড়া নেই কোনো জানোয়ার ঃ কত জানোয়ার তার ধাপ্পায় ভুলে কত বিপদে পড়েছে, তবু শেয়ালের ধাপ্পায় আজ তারা ভোলে। জানোয়াররা বসে মিটিং করে, সে মিটিংয়ে সকলে প[ণ] করে শেয়ালের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবে না—তাকে একঘরে ক[রে] রাখবে,—কিন্তু ধূর্ত শেয়াল এমন ধাপ্পা চালায় যে, জানোয়ারদে[র] সে পণ আর রক্ষা হয় না।

গাছের ডালে বসে বসে এক বানর এসব দেখে। রাগে তার [হাত] নিশপিশ করতে থাকে—শেয়ালের উপরে রাগ, জানোয়ারদের উপরে রাগ। জানোয়ারদের উপরে তার রাগ বেশী—তাদের বলে, ওরে বোক[া] দল,—বারবার শেয়ালের ধাপ্পায় ভুলে হায়রাণ হচ্ছিস, তবু আ[বার] তার কথায় কাণ দিস! বলা কিন্তু হয়না...জানে, বলা মিথ্যা...ব[লে] বুঝিয়ে উপদেশ দিয়ে কাকেও বুদ্ধি জোগান যায় না।

সে ভাবলো, ধূর্ত শেয়ালটাকে সে করবে জব্দ...তাকে এ[মন] শিক্ষা দেবে, যে তারপর থেকে, হ্যাঁ! ভেবে ভেবে বানর মত[লব] ঠাওরালো। মতলব ঠাউরে সে নামলো গাছ থেকে—গাছের তল[ায়] এক খরগোশ বসে পুচ্ছ তুলে ফল খাচ্ছিল, তাকে ডেকে বানর ব[ললে] —শেয়ালটাকে জব্দ না করলে আর চলছে না—ওর শয়তানী দিনে দি[নে] বেড়েই চলেছে—কোনো জানোয়ারকে সে কেয়ার করে না! আ[মি] ওকে জব্দ করবো! লম্বা দু-কাণ খাড়া করে খরগোশ শুন[লো] বানরের কথা। শুনে খরগোশ বললে—কি করে? বানর তাকে বল[লে] মতলব যা করেছে, সেই মতলব।

শুনে খরগোশ বললে—তুমি পাগল হয়েছো! শেয়ালের [যে] বুদ্ধি! শেয়াল তোমার কথা বিশ্বাস করবে কেন?

বানর বললে—আলবৎ করবে। জানো, যার বেশী বুদ্ধি আবার একটুকুতেই বেকুব বনে। তুমি এসো আমার সঙ্গে...তো[মায়] কিচ্ছু করতে হবে না—শুধু বসে তুমি মজা দেখবে।

খরগোশকে নিয়ে বানর এলো শেয়ালের গর্তের কাছে। খরগোশকে বললে তুমি ঐ ঝোপের আড়ালে চুপটি করে বসে থাক[বে] টু-শব্দটি নয়।...আমি ডাকবো শেয়ালকে...ডেকে—

খরগোশ গিয়ে বসলো ঝোপের আড়ালে আর বানর গি[য়ে] ডাকলো—শেয়াল বলি ও শেয়াল ভাই......

—কে ডাকে? বলে' শেয়াল এলো তার গর্ত থেকে বেরিয়[ে]

বানর বললে—একটা কথা মনে হলো যাচ্ছিলুম এখান দি[য়ে] মনে হলো, শেয়াল ভাইয়ের অনেক বুদ্ধি...তাকে এক[টা] জিজ্ঞাসা করি!

শেয়াল বললে—কি কথা?

বানর বললে—আচ্ছা, তুমি তো কত জন্তু-জানোয়ার-পা[খীর] মাংস খেয়েছো—বলো দিকিনি কোন্ জানোয়ারের কোন্ জায়[গার] মাংস সবচেয়ে ভালো খেতে?

হঠাৎ গর্ত থেকে ডেকে বার করে' এনে বানরের এ কি ক[থা!] শেয়াল বললে—চট্ করে বলা শক্ত। যখন যে মাংস খেয়েছি, [তখন মনে] হয়েছে এই মাংসই সবচেয়ে ভালো।

বানর বললে আচ্ছা শেয়ালভাই তুমি কখনো ঘোড়ার পি[ছনের] পায়ের মাংস খেয়েছো? জ্যান্ত ঘোড়ার পিছলি-পা?

শেয়াল বললো—না।

বানর বললে—আঃ, অমন মাংস আর নেইরে ভাই। আমি [এই] এক খাবলা সে মাংস খেয়ে আসছি!......খাওয়া শক্ত...ঘো[ড়া] যে রকম চাট্ ছোড়ে!

নিশ্বাস ফেলে শেয়াল বললে—তাহলে ?

কপাল কুঁচকে বানর যেন ভাবছে, এমনি ভাব দেখালে[া] শেয়াল ঠায় চেয়ে আছে বানরের পানে—বানর বললে—মানে, [ঘোড়ার] ল্যাজের সঙ্গে নিজের ল্যাজ বেঁধে তারপর খাওয়া...ঘোড়া তয় [...]

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

অদৃশ্যন্তীকে দেখেই রাক্ষস কল্মাষপাদ বললে,—এবার তোমাদের আমি খাব। বশিষ্ঠ হুংকার দিয়ে রাক্ষসকে থামালেন। রাক্ষসটা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। বশিষ্ঠ তখন তার গায়ে মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে দিয়ে তাকে শাপমুক্ত করলেন। আশ্চর্য কান্ড ঘটে গেল।

কল্মাষপাদ তাঁর পূর্ব প্রকৃতি ফিরে পেয়ে মানুষভাবাপন্ন হলেন। বশিষ্ঠ বললে,—রাজা, তুমি নিজের রাজ্যে ফিরে গিয়ে রাজ্য শাসন কর, আর কখনো ব্রাহ্মণের অপমান কোরো না। কল্মাষ-পাদের সুমতি এসেছে। তিনি হাত দুটি জোড় ক'রে সবিনয়ে বললেন,—আমি আপনার আজ্ঞাধীন হয়ে থাকবো, আর ব্রাহ্মণদের সেবা করবো।

বশিষ্ঠের পুত্রবধূ অদৃশ্যন্তী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। পুত্রটির নাম হোল পরাশর। মহামুনি পরাশর হলেন মহাতেজস্বী। তাঁর সে গল্প স্বতন্ত্র।

ছোটে যদি, ছুটুক—ল্যাজের বাঁধন তো খুলতে পারবে না তুমি মজাসে তার পিছলি পায়ের মাংস খেতে খেতে যাবে।

শেয়াল বললে—কিন্তু ঘোড়ার ল্যাজের সংগে আমার ল্যাজ বাঁধবো কি করে? প্রচন্ড উৎসাহভরে বানর বললে আমি যেমন করে' আমার ল্যাজ বেঁধে ছিলুম।—মানে চমৎকার একটা ঘোড়া...... চার পা মুড়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল...পা টিপে টিপে আমি গিয়ে তার ল্যাজের সঙ্গে বাঁধলুম নিজের ল্যাজ...বেঁধে তার পিছলি পায়ে—একেবারে তার ল্যাজ ঘেঁষে একটি কামড়...ভয় পেয়ে ঘোড়ার ঘুম ভেঙ্গে গেল—যেমন ভাঙ্গা, ঘোড়া উঠে দে ছুট্...একেবারে তীরের বেগে ছুট্...তার ল্যাজে বাঁধা আমার ল্যাজ...দুলতে দুলতে আমি মারি কামড়ের পর কামড়...কিন্তু কত খাবো! তার আগে কলাবাগানে ঢুকে দু-কাঁদি মর্তমান কলা খেয়েছিলুম—তার উপর ছোট পেট...... খানিক খেয়ে ল্যাজের গেরো খুলে লাফিয়ে পড়লুম।...কিন্তু মাংসর স্বাদ যা ওঃ, একেই তো মাংস বড় বেশী খাই না, তবু ঠিক করেছি, ঐ ঘোড়ার পিছলি পা'র মাংস ছাড়া আর কোনো জানোয়ারের মাংস খাবো না—হাতী, গণ্ডারের মাংস পেলেও...না!

কথা শুনে শেয়ালের জিভে নাল পড়লো। শেয়াল বললে—কাছাকাছি আছে নাকি কোনো ঘোড়া শুয়ে?

—আছে, আছে। বানর বললে—এখানে আসতে দেখলুম, খাশা একটা ঘোড়া—কী মাংস তার গায়ে। দেখে লোভ হলো খুব কিন্তু উপায় নেই পেট এমন দম্‌শম্‌ হয়ে আছে তার উপর ঘোড়াটা এখনো জেগে আছে—এখনি বোধ হয় ঘুমোবে।

শেয়াল বললে—যাবে বানর ভাই—ঘোড়াটাকে একবার দেখি। তার কথা শেষ হবার আগেই বানর বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ তাইতো তোমার পর্ট দেখে তোমার কথা মনে হলো। ভাবলুম, শেয়াল ভাই মাংস খাবার যম...তাকে দিই খবর। সেই জন্যেই তো তোমাকে জিজ্ঞাসা করলুম—সবচেয়ে খেতে ভালো কোন্ জানোয়ারের মাংস?

শেয়াল বললে—বেশ, বেশ, তাহলে চলো, এখনি চলো ঘোড়াটাকে দেখিয়ে দাও।

একটা ঘোড়া সত্যই পথে আসতে বানর দেখেছে...বেশ তেজী ঘোড়া...তবে ঘোড়াটা ঘুমোচ্ছে না...চরে চরে ঘাস খাচ্ছে সেই ঘোড়াকে দেখেই বানরের মাথায় জেগেছে এ মতলব।

শেয়ালকে নিয়ে বানর এলো...ঘোড়া দেখালো। শেয়াল দেখলো, হ্যাঁ খাশা শাঁসালো ঘোড়া বটে। লোভ হলো,—কিন্তু ভাবে-ভঙ্গীতে এতটুকু তার সে লোভ প্রকাশ পেলো না। গম্ভীর মুখে শেয়াল বললে, দেখলুম তোমার ঘোড়া, ওর গায়ে শাঁস-মাংস আছে, মানি কিন্তু কোন্ জানোয়ারের মাংস সবচেয়ে খেতে ভালো—তা চট করে বলা যায় না! ভেবে দেখবো—তুমি মোদ্দা একথা আর কাকেও বলো না চুপচাপ থেকো!

এ কথা বলে ল্যাজ নেড়ে শেয়াল গেল চলে—বানরও গেল চলে। শেয়াল কিন্তু তখনি ফিরলো...নিঃশব্দে ফিরলো...ফিরে গাছ-পালার আড়াল থেকে ঘোড়াটিকে আবার দেখলো—দেখলো, ঘোড়ার খাওয়া হয়ে গিয়েছে...চারপা মুড়ে সে শোবার উদ্যোগ করছে।

শেয়াল সরে' এলো সেখান থেকে...এসে চারিদিকে তাকালো, বানরটি কোথাও আছে কিনা?...না, বানরকে দেখলো না!...বাঁচা গেছে...ভাগীদার থাকবে না। একা রাজভোগ খাবে।

তখন বার্ বার এসে এসে দেখা—ঘোড়া ঘুমোলো কিনা...!

শেষে ঘোড়া ঘুমোলো...বেশ গাঢ় ঘুম—ঘোড়ার নাক ডাকছে। পা টিপে-টিপে এসে শেয়াল তখন নিঃশব্দে নিজের ল্যাজ বাঁধলো ঘোড়ার ল্যাজের সঙ্গে—টাইট গেরো। তার পর ঘোড়ার পিছলি পায়ের উরুতে বসালো একটি কামড়।

(ইহার পর ১৬৫ পৃষ্ঠায়)

কাকের ছানা

সুখলতা রাও

আকাশ ঘিরে মেঘ করেছে। যেখানে মাঠের শেষে নীল গাছের রেখা যেন আঁকা, তারি উপরে, দেখা যায় কালো মেঘের নীচে সাদা আকাশ। ঐখানে ঝড় উঠেছে। বারাণ্ডায় বসে মণ্টি চেয়ে আছে সেই দিকে। ভারি ভাল লাগছে দেখতে। বাতাসটা ঠান্ডা, কাল একটু জ্বর হয়েছিল, তাই একখানা কালো আলোয়ান সে গায়ে জড়িয়েছে।

বারাণ্ডার সামনে বাগান। বাগানে একটু দূরে বড় একটা আম গাছ। গাছের ডালে পাতার আড়ালে কাকের বাসা। ঝড় আরম্ভ হতে, মা-কাক গিয়ে বাসায় বসেছে, ছানাটিকে ডানার নীচে ঢেকে। বাবা-কাক পা দিয়ে শক্ত করে গাছের ডাল ধ'রে বসেছে। এক একবার বাতাস ঝাপটা দেয় আর ছানা-কাকের মুখ হাঁ হয়ে যায়; মুখের ভিতরটা লাল দেখা যায়; পালকগুলো ফুরফুরে হয়ে যায়। ছানা বলছে, "মা, এ কেমন হাওয়া? এ রকম ত কখনো দেখিনি?" মা তাকে বলছে, "ঝড় হচ্ছে বাবা। সাবধানে বাসার নীচটা আঁকড়ে থাক। নইলে পড়ে যেতে পার।"

"পড়ে গেলে কি করব?"

"কি আর করবে। দেবতা-কাক তোমাকে তুলে এনে দেবে।"

"দেবতা-কাক কি রকম?"

"আমাদের মতন, কিন্তু প্রকাণ্ড বড়; গাছের চেয়ে বড়, মেঘের চেয়েও বড়।"

ছানা-কাক চুপ করল। হঠাৎ বাসাটা দুলে উঠল, তারপর পড়ল কাৎ হয়ে। ছানা বেচারা টাল সামলাতে না পেরে একেবারে ধপ করে পড়ে গেল নীচে—মাটিতে। ডানায় চোট লেগেছে তার। দেখতে দেখতে, মা-কাক আর বাবা-কাক কিছু ভাববার আগেই, একটা গোদা চিল ঝপ করে এসে পড়ল ছানাটার সামনে।

মণ্টি বারাণ্ডা থেকে দেখছিল, 'হেই-হেই' ক'রে চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে ছুটে এল গাছের তলায়। তখনও জোরে বাতাস দিচ্ছে, তার কালো আলোয়ানখানা ফড়-ফড় ক'রে উড়ছে। সে তাড়াতাড়ি ছানাটাকে তুলে নিয়ে গেল বাড়ীর ভিতর। মণ্টির যত্নে কিছুদিনে কাকের ছানার ডানা ভাল হয়ে গেল। সে উড়ে গেল বাসায়।

মা-কাক ও বাবা-কাক কত রকম ক'রে, কত প্রশ্ন করছে,—কা-কা, ক-ক্কক, কাওয়া-কাওয়া বলে। ছানা বলল, "একজন খুব বড়, কালো ডানাওলা কে ভয়ানক পাখীটাকে তাড়িয়ে দিল, আর আমাকে তুলে নিয়ে গেল।"

মা তাতে আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল, "দেবতা-কাক হবে।"

একটুখানি ভেবে ছানা বলল, "দেবতা ত অনেক অনেক মস্ত,—আকাশের সমান। ও বোধহয় দেবতার ছানা।"

দুটি ভাই-বোনে বসে গল্প করছিল। সদাই হাসিমুখ দু'জনের।

ভাইটির নাম—হসন্ত। বোনটির নাম—হসন্তিকা। তারা পিঠো-পিঠি ভাই-বোন। বয়সে হসন্তিকাই বড়। হসন্ত ছোট। একজন পনেরো পেরিয়ে ষোলয় পা দিয়েছে, আর একজন চৌদ্দয় পৌঁছেচে।

ভাই-বোনে খুব ভাব। অল্প অল্প ঝগড়া যে মাঝে মাঝে হয় না তা নয়, কিন্তু সেটা কলহ হয়ে ওঠে না কখনো। দিদিকে হসন্ত ভালবাসে। খুবই অনুগত সে দিদির। কিন্তু, দিদিকে সে 'দিদি' না ব'লে 'হাসিদি' বলে। আর হসন্তিকা ভাইটিকে ডাকে 'হাসুভাই' বলে।

একদিন কিসের একটা ছুটিতে স্কুল বন্ধ ছিল। ওরা ভাই-বোন দুজনে মিলে দুপুর বেলা মায়ের ঘরে বসে গল্প করছিল। মা তখন একখানা গল্পের বই পড়তে পড়তে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

হাসু বইখানা মার কাছ থেকে তুলে নিয়ে নামটা পড়ে বললে, 'এটা কি বই বলো দেখি'—হাসিদি? না পড়ে বলতে হবে কিন্তু।

হসন্তিকা বইখানির দিকে না চেয়েই বললে রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ', দ্বিতীয় খণ্ড।

হাসুর চোখে-মুখে একটা বিস্ময় ফুটে উঠলো। হাসু বললে, কি করে জানলে হাসিদি? তুমি কি না পড়েই বইয়ের নাম বলতে পারো, কোনটা কি বই?

হসন্তিকা হেসে বললে, 'দূর বোকা! বইখানা মার কথা মতো আমিই যে আলমারি থেকে বার করে এনে দিয়েছি। কিন্তু, তুই আমাকে আর 'নাম' ধরে 'হাসিদি' বলে ডাকবিনি হাসু ভাই।'

হসন্ত অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'তবে কি বলবো?'

হসন্তিকা বললে, 'কেন? শুধু 'দিদি' বলবি। আমি এখন বড় হয়েছি। দেখিস না আর ফ্রক পরি না। শাড়ী পরি। ঠিক যেমন মা পরেন। আমায় এখন থেকে শুধু 'দিদি' বলবি, বুঝলি হাসুভাই?'

হসন্ত ঘাড় নেড়ে বললে, 'উহুঁ! তুমি যখন বড়ই হয়েছো, তখন শুধু দিদি বললে ভুল বলা হবে। আমি তোমাকে আজ থেকে 'বড়দি' বলবো, কেমন?'

হসন্তিকার এই 'বড়দি' নামে ডাকাটা বেশ পছন্দ হল। কিন্তু, কি যেন একটু ভেবে বললে, 'তা তুই বলতে পারিস। কিন্তু, একটু মুস্কিলে পড়বি যে—।

হাসু ব্যস্ত হয়ে উঠে জানতে চাইলে, 'এতে আবার মুস্কিলে পড়তে হবে কেন?'

হসন্তিকা বেশ গম্ভীর হয়ে বললে, 'ভেবে দেখ হাসুভাই, আমায় যদি তুই 'বড়দি' বলিস, তাহলে 'মেজদি' বলবি কাকে? 'সেজদি' হবে কে? 'নদি', 'রাঙাদি' তুই কোথায় পাবি। আর 'নতুনদি', 'ছোড়দি' এদেরই বা জোটাবি কোথা থেকে? তোর তো আমি ছাড়া আর দিদি নেই?'

হাসু বললে,—তুমি 'বড়ো' হয়েছো না কচু। তুমি ছাড়া আমার আর দিদি নেই মানে? তুমি তবে তোমার ক্লাসশুদ্ধ মেয়েকে আমায় 'দিদি' বলতে শিখিয়েছো কেন? ওই টুনুদি, বেলাদি, শকুন্তলাদি কৃষ্ণাদি, মালুদি, মন্দিরাদি ওরা বুঝি কেউ 'দিদি' নয়?

হসন্তিকা অপ্রতিভ হয়ে বললে, হ্যাঁ ওরাও তোর দিদি, কিন্তু হাসুভাই, তুই ওদের মধ্যে কাকে 'মেজদি' বলবি? কাকে 'সেজদি' বলবি? কি করে ঠিক করবি? কার কত বয়স? কে কার আগে, পরে জন্মেছে? এ সব খবর তো তোর জানা নেই?

হাসু বেপরোয়ার মতো বললে, 'নাই বা থাকলো; আমি ওদের নাম আর চেহারা মিলিয়ে দেখে দেখে 'মেজদি', 'সেজদি' ঠিক করে নেব। ঠিক তুমি যেমন করে ওদের সঙ্গে রকম রকম সব সেকেলে নাম পাতিয়েছো—সেই দেখন হাসি, আতর, গোলাপ, গঙ্গাজল।

হসন্তিকা শুনে একটু সংশয় প্রকাশ করে বললে, 'অত সহজ নয় হাসুভাই! আচ্ছা, তুই 'মেজদি' বলবি কাকে? বলতো শুনি? হসন্তিকা জানতে চাইলে।

হাসু একটু ভেবে বললে, 'ঠিক হয়েছে! ওই যে তোমাদের ক্লাসের সেই বেগুনী রংয়ের মেয়েটা; যার নাম মঞ্জুলিকা মজুমদার! সেই যে, যার সঙ্গে তুমি 'ম্যাজেণ্ডার' পাতিয়েছো! ফর্সাও নয়, কালোও নয়, মোটাও নয়, রোগাও নয়, বেশ মাঝামাঝি চেহারা—তাকে বলবো আমি মেজদি?

আচ্ছা বেশ! 'ম্যাজেণ্ডার' না হয় মেজদি হল, আর সেজদি? হসন্তিকা হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলে—'সেজদি কে হবে?'

হাসু বললে, কেন? তোমাদের ওই সেজুতি সেন বলে মেয়েটি! যার সঙ্গে তুমি 'সজনে ফুল' পাতিয়েছো! সত্যিই, দিদি, সজনে ফুলের মতো ম্লান সাদা—অথচ, নরম মেয়েটি বেশ! সাঁঝের বাতির মতোই মৃদু মনে হয় যেন ওর চোখের আলো! ওকেই আমি 'সেজদি' বলবো!

হাসু ভাইয়ের মুখে সে তার ক্লাসের বন্ধুদের সেই কবির মতো রূপ বর্ণনা শুনে অবাক হয়ে গেল। একমুখ হেসে জানতে চাইলে, 'নদি' কে হবে? সেঁজুতি—থুড়ি 'সজনে ফুল'কে সেজদি বেশ মানাবে। কিন্তু ন'দি নিয়েই ভাবনা—

হাসু হেসে উঠে বললে, 'ভাবনা কিসের? নদি আমার ঠিক হয়ে গেছে। ওই যে ওপাশের নন্দীদের বাড়ীর ভূগীর মতো মেয়েটা গো; স্কুলে যার নাম 'নদী নন্দী'—আর বাড়ীতে ডাকে 'নাদু' বলে। বেশ বেঁটে-খেঁটে মোটাসোটা মেয়েটা, নদীর মতই কূলে কূলে ভরা চেহারা!—রাস্তা দিয়ে চলে যখন মনে হয় যেন পূর্ববঙ্গের কোনও বর্ষার বন্যায় উপচে পড়া নদী বয়ে চলেছে। ওই হবে আমার 'নদি'! কেমন?

হসন্তিকা হেসে লুটোপুটি খেয়ে বললে, 'বেশ বলেছিস হাসুভাই! চমৎকার! চমৎকার নদি হবে। আচ্ছা, এইবার 'রাঙাদি' কে হবে বল?

হাসু বললে, কেন? তোমাদের ক্লাসের সেই ছিপছিপে পাতলা বেশ লম্বা মেয়েটি, খুব ফর্সা রং, মুখখানিও যেন তুলি দিয়ে আঁকা! যার নামটা শুনলে উৎকৃষ্ট গ্রীণ লেভেল চায়ের প্যাকেটের মোড়ক মনে পড়ে যায়—

-কে বলতো? হসন্তিকা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে।

আরে ওই যে তোমাদের 'রাঙতা রায়' গো! তুমি যার সঙ্গে 'রাঙা-জবা' পাতিয়েছো! সে হবে আমার 'রাঙাদি!'
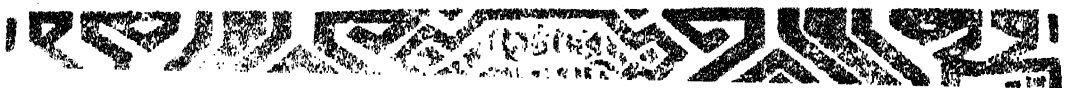
হসন্তিকা হেসে উঠে বললে, 'সুন্দর হবে! এইবার হাসুভাই, তোমার 'নোতুনদি' কে হবে বলো?

হাসু একটু ভেবে বললে 'নোতুনদি?' তাইতো! 'নোতুনদি' কাকে করা যায় বলোতো?......হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে! তোমাদের ক্লাসে সেই যে একটি হৃষ্টপুষ্ট সুস্থ সবল সুন্দরী অবাঙালী মেয়ে পড়ে, যাকে দেখলে রাজপুত মেয়ে বলে মনে হয়? ঠিক যেন চিতোরের রাণী পদ্মিনী। কি নাম তার বলোত? সেই যে কি—নাথুনী নোতোনিয়া না? সেই মেয়েটাকে বলবো 'নতুনদি!' কেমন? ঠিক হবে না!

উঃ! তোর কী বুদ্ধি! খুব ঠিক হবে! ভারি চমৎকার হবে' হসন্তিকা খুশী হয়ে এক মুখ হেসে বললে, 'এইবার তোর 'ছোড়দির পালা!' কাকে 'ছোড়দি' করবি বল?

ফুঃ! ছোড়দির আবার ভাবনা! তোমাকে যখন 'বড়দি' বলতে হবে, তখন 'ছোড়দি' একটা ঠিক করেই বলবো। আচ্ছা, তোমাদের ক্লাশে একটা মেয়ে আছে না, শ্যামবর্ণ গায়ের রং, একরত্তি ক্ষুদে চেহারার ছোট একটা মেয়ে যার নামটা কিন্তু খুব ভারি—কুমারী ষোড়শী হোড়! —হাঃ! হাঃ হাঃ তোমার যেমন বুদ্ধি দিদি, তার সঙ্গে প্যাতিয়েছো কিনা 'খেজুর-ছড়ি!' তোমার পাতানো উচিত ছিল ওর সঙ্গে 'বাঁশের-কোঁড়!'

হসন্তিকা হেসে লুটিয়ে পড়লো।

হাসু গম্ভীর হয়ে বললে, 'থাক! কি আর হবে? তুমি যখন ওকে 'খেজুর-ছড়ি' বানিয়ে ফেলেছো, তখন ওই হবে আমার 'ছড়ি-দি' অর্থাৎ কিনা—'ছোড়দি!'

হসন্তিকা হাসি থামাতে না পেরে বিষম খেয়ে গেল! বললে, বাঃ কী সুন্দর! ভারি চমৎকার বলেছিস হাসু ভাই, তোর দেখছি পেটে পেটে বুদ্ধি! যত ছোট আমরা মনে করি, তত ছোট তুমি নও! একেবারে বড় জ্যাঠামশাই বললেই হয়!

ছেলেমেয়ের হৈ হল্লায় এই সময় মায়ের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি উঠে বসে বললেন, কি হয়েছে? এত হাসি কিসের?

হসন্তিকা বললে, 'তোমার এই ছেলে মা আমার ক্লাশের সমস্ত মেয়ের নাম-ধাম চেহারা মায় পদবী পর্যন্ত মুখস্ত করে রেখেছে! এমন কাব্য করে তাদের বর্ণনা দিচ্ছে—যে আমি ওকে ফুল মার্ক দিয়েছি আজ।

মা বললেন, 'শুধু ফুল মার্ক দিলে হবে কেন বাছা? একটা ভাল দেখে 'প্রাইজ' দাও!

'হুররে! ঠিক বলেছো মা-মণি! প্রাইজ কই? প্রাইজ দিতে হবে।' হাসু চেঁচিয়ে উঠলো।

হসন্তিকা বললে, 'কাল তোকে আমি 'জু-গার্ডেন' দেখাতে নিয়ে যাবো হাসু ভাই!

হাসু ঘাড় নেড়ে বললে, 'ফুল মার্ক' পেয়েছি আমি ও কনসোলেশান প্রাইজ নেব কেন? জু-গার্ডেন? নো! নেভার' 'জু-গার্ডেনে' আমি জীবনে ঢুকবো না—

কেনরে! এ আবার কোন্ একটা নতুন জন্তু এসেছে মনে করে, পাছে জু-গার্ডেনওয়ালারা তোকে খাঁচায় পুরে ফেলে এই ভয়ে বুঝি?' হসন্তিকা জিজ্ঞাসা করলে—

'ধ্যেৎ!' বলে হাসু উঠে একছুটে সে ঘর থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই, হসন্তিকা তাকে খপ করে ধরে ফেলে বললে, উহুঁ পালালে চলবে না। কেন জু-গার্ডেনে যাবি না—বলে যেতে হবে। নিশ্চয় সেখানে বাঘ সিংহের গর্জন শুনে তোর ভয় করে—

না না, ভয়টয় আমার নেই! সে একটা অন্য ব্যাপার!

হসন্তিকা ঘাড় নেড়ে জোর ক'রে বললে, কখনো না। নিশ্চয় ভয় করে তোর। আমারই ভয় করে এখনো! আমি কেমন হাতী দেখলে ভড়কে যাই! উঃস! কী প্রকাণ্ড চেহারা! নাকটা বাড়তে বাড়তে একেবারে লম্বা শুঁড় হয়ে মেঝেয় ঠেকে গেছে! দাঁত দুটো দু' পাশে গজিয়েছে যেন মুলোর মতো! কান দুটো কুলোর মতো, পেটটা ঝুলে পড়েছে! পাগুলো যেন সেনেট হাউসের থাম! কেমন যেন এক কিম্ভূতকিমাকার চেহারা!

হাসু উৎসাহিত হয়ে উঠে বললে, 'আমি ছোট্‌কা'র সঙ্গে সেবার গেছলুম,—সেবার জু-গার্ডেনে একটা মেয়ে হিপো-পোটামাসকে হাঁ করতে দেখে ভয়ে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল! ভেবে-ছিল তাকেই বুঝি জন্তুটা রাক্ষসের মতো গিলে ফেলতে আসছে।

হসন্তিকা বললে, 'বুঝিচি তোমারও সেই ভয়।'

হাসু জোর প্রতিবাদ করে বললে—আমি কি মেয়ে? যে ভয় পাবো? সেজন্য নয়! ওই ছোটকাটার জন্যই যাওয়া বন্ধ করেছি। আমাকে সেবার সাপের ঘর, বাঘের ঘর, জিরাপ, হায়না, হিপো দেখিয়ে পাখির ঘর হ'য়ে যখন বাঁদরের ঘরে নিয়ে গেল, সেখানে ওকেই বললেন, 'ব্যস! নিশ্চিন্ত! এইবার খোকোনবাবু! তোমার বন্ধুদের সঙ্গে একটু প্রাণ খুলে সুখ-দুঃখের আলাপ করো! অনেক দিন তো ওদের দল ছাড়া হয়ে রয়েছো?' ছোটকার এই কথা শুনে, বুঝলে দিদি, সে ঘরের সমস্ত লোক, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বড়রাও পর্যন্ত এমন হো হো করে হেসে উঠলো যে আমি পালাতে পথ পাইনি। জু-গার্ডেনে আর না! মা ও দিদি ভীষণ হেসে উঠতেই—হাসু ভাই সে ঘর থেকে দে ছুট।

কি করে' হলো

(১৬৩ পৃষ্ঠার পর)

সে কামড়ে ঘোড়ার ঘুম ভাংগলো...। চমকে সে উঠে দাঁড়াতে ...পিছলি পায়ে তখন শেয়ালের দাঁত! ঘোড়া ভাবলে হলো কি! কাঁটা ফুটলো, না বিছে কামড়ালো! ভয়ে ঘোড়া ছুটলো...ছুটলো তীরের বেগে...।

ঘোড়ার সে দৌড়ের বেগে শেয়াল তার মাংস খাবে কি, দুলতে দুলতে, ঝুলতে ঝুলতে সে নিজেকে সামলাতে পারে না! ঘোড়া ছুটেচে তো ছুটেচে—শেয়াল ল্যাজে বাঁধা...ঝুলছে, ঝুলছে...ঘোড়ার পিঠে উঠে বসবে, সাধ্য কি তার!

বানর ওদিকে উঁচুগাছের ডালে বসে ঘোড়দৌড় দেখছে...তার ভারী মজা লাগছে—তারপর ঘোড়ার জোর দৌড়ের বেগে ল্যাজ ছিঁড়ে শেয়াল পড়লো ছিটকে...দড়াম্‌সে একেবারে বড় একটা পাথরের গায়ে...সঙ্গে সঙ্গে শেয়ালের দুখানি পা ভাংগলো।

গাছের ডালে বসে মজা দেখতে দেখতে বানরের কী আনন্দ...... আনন্দে সে দুই বাহু তুলে ডালেই তার ধেই-ধেই নৃত্য...নাচের দমকে বানর পড়লো হুমড়ি খেয়ে গাছ থেকে নীচে...মুখ থুবড়ে পড়লো—সঙ্গে সঙ্গে দু গালে চোট লেগে রক্ত জমে দু গাল টকটকে লাল। খরগোশ ছিল গাছতলায়—সেও দেখলো শেয়ালের দুর্গতি... দেখে মজা পেয়ে খরগোশ এমন অট্টহাস্য হাসলো যে হাসির চোটে তার ঠোঁট গেল চড়াৎ করে' চিরে!

সেই থেকে বানরের দু গাল হয়ে আছে টুকটুকে রাঙা... খরগোশের ঠোঁট সেই থেকে চেরা...আর শেয়াল? সেই থেকে ঘোড়া দেখলে শেয়াল সেদিক থেকে একশ হাত দূরে সরে থাকে আর বানরকে একদম বিশ্বাস করে না—বানরজাতের উপরে শেয়ালের ভয়ানক রাগ!

স্কুলের উঁচু ক্লাসের পড়া ইংরাজী বই-এর একটা লাইন মনে পড়ছে Man is a featherless biped—তখন কথাটাকে খাঁটি বলে মনে হয়েছিল আর সে কথা মনে করে এখন ভাবি কি ছেলেমানুষ না ছিলুম। মানুষের গায়ে পালক থাকলেই তার সঙ্গে পাখীদের আর কোনো তফাৎ থাকবে না একথা ভাবতে পারো কি?

তফাৎ তো আছেই—কিন্তু মানুষে আর পাখীতে যত-ভাব প্রাণী জগতের আর কোনো দু'টি প্রাণীর মত অত ভাব ঘনিষ্ঠতা দেখা যায় না। বয়সে পাখী মানুষের চেয়ে বড় অর্থাৎ পাখীর যখন জন্ম হয়েছিল তখন মানুষের আবির্ভাব ঘটেনি। পৃথিবী মায়ের কনিষ্ঠ সন্তান মানুষ—কিন্তু বড় ভাইদের কাছে থেকে মানুষ প্রথম থেকে যে রকম ব্যবহার পেয়েছিল সেটা মোটেই ছোটর প্রতি বড়র ব্যবহার নয়। তাই প্রথম থেকেই অন্যান্য জীব-জন্তুর সঙ্গে মানুষের চলেছিল বিরোধ, কিন্তু পাখীরা মানুষের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে একেবারে অসহযোগ ঘোষণা করে চলেছিল।

জল আর ডাঙায় বাস করতে গেলে বিরোধ হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু ডানা ভর করে খোলা আকাশের গায়ে ভেসে বেড়ানোতে যাদের আনন্দ তাদের সঙ্গে মাটির মানুষের বিরোধের সম্ভাবনা কোথায়? তাছাড়া সত্যি সত্যি এরা উভয়েই দু'পাওয়ালা জাতি। আকাশের বুকে ভেসে বেড়ায় বটে কিন্তু থাকবার মত আশ্রয় তার প্রয়োজন আর সেই আশ্রয় খুঁজতে হয় মাটির বুকে, গাছের কোটরে কিম্বা মানুষদের বাড়ীর আনাচে- কানাচে। তাই তো এরা যুগ-যুগান্তের প্রতিবেশী।

রামায়ণে জটায়ু আর তার দাদা সম্পাতির কথা পড়েছ তো? জটায়ু নিজে প্রাণ দিয়ে সীতাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল—আর সম্পাতির কাছে খোঁজ-খবর পেয়েই তো রামচন্দ্র তাঁর দলবল নিয়ে লঙ্কায় যাত্রা করেছিলেন। মানুষেই শুধু পাখীর সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা করেছিল তা নয়, দেবতারাও তাদের কদর জানতেন। ভগবান বিষ্ণু বেছে বেছে তাঁর বহন করেছিলেন গরুড় পাখীকে। লক্ষ্মীদেবীর বাহনটির কথা কে না জানে বল!

এ সব তো গেল দেবতাদের কথা আর ত্রেতাযুগের কথা—এ যুগেও মানুষে আর পাখীতে বন্ধুত্ব একটুও কমেনি। কথাটা বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না? বলবে এই তো খবরের কাগজে দেখলুম চড়াই পাখী মারবার অভিযান চলেছে চীন দেশে। সে কথা ঠিক কিন্তু এটা ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়। আসলে মানুষে পাখীতে এখনও মিতালী চলছে। প্রাচীন যুগের সংস্কৃত কবি আর নাট্যকারেরা পাখী নিয়ে অনেক শ্লোক রচনা করেছেন। পাখীর দুঃখে মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল বলেই তো আদি কবি বাল্মীকি পুরো রামায়ণখানা লিখে ফেলেছিলেন। শুক-সপ্ততি নামে সংস্কৃত ভাষায় লেখা একটা সুন্দর গল্পের বই আছে, গল্পকার একটি শুক পাখী। আধুনিক যুগের কবিরাও পাখীকে তাদের কাব্যের বিষয়ীভূত করতে ইতস্তত করেননি। পক্ষী মানবের কথা বলে গিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়— ব্যবহারিক জীবনেও পাখীকে—মানুষ নানা প্রয়োজনে লাগাবার চেষ্টা করেছে। প্রাচীন এবং মধ্যযুগে শিক্ষিত পারাবতের সাহায্যে চিঠিপত্র পাঠানো হত—এ খবর আমরা সবাই জানি। আধুনিক যুগে শিক্ষিত পাখীরা এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। যুদ্ধের সময় শত্রুর অবস্থান গতিবিধি জানবার কাজে এদের সাহায্য নেওয়া হয়। এদের পায়ে বাঁধা থাকে ছোট কিন্তু শক্তিশালী ক্যামেরা আর তাইতে ছবি তুলে এরা ছাউনিতে ফিরে আসে এমনি ঘটনা গত মহাযুদ্ধে অনেক ঘটেছে।

বছর তিরিশের ঘটনা, আমেরিকার ইণ্ডিয়ানা ও ওহিও প্রদেশে একবার পক্ষীমেধ যজ্ঞ সুরু হয়েছিল। পাখীদের সংখ্যা কমাবার জন্য এই যজ্ঞের ব্যবস্থা। যথারীতি যজ্ঞ শেষ হলো, কিন্তু বছরের শেষে দেখা গেল ষাট লক্ষ বিঘা জমিতে গমের ফসল হয়নি। অনুসন্ধানের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করা হলো, তারা বল্লেন যে কীট আর ইঁদুরের উৎপাতেই ফসলের সর্বনাশ হয়েছে। কীট আর ইঁদুরের দৌরাত্ম্য পাখীদের অভাবেই সম্ভব হয়েছিল—সুতরাং সে দেশের সরকার পাখী হত্যা শুধু নিষিদ্ধই করলেন না নূতন নূতন পাখী সংগ্রহ করার দায়িত্বও গ্রহণ করলেন। পানামা খাল কাটবার সময় এক প্রকার বিষাক্ত কীটের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল আর সেইজন্য কেউ সে অঞ্চলে কাজ করতে রাজী হতো না, ফলে খালের কাজ বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড় হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত এই বিপদ থেকে কর্তৃপক্ষ উদ্ধার পেলেন পাখীদের সাহায্যে।

মানুষে পাখীতে মিতালী সৃষ্টির চেষ্টা সেই আদিকাল থেকে চলে আসছে। পাখীদের হাবভাব চাল-চলন দেখে মানুষ অনেক বিপদ এড়াতে পারতো—প্রাচীন ইতিহাস তার সাক্ষী। রোমের গণৎকাররা পাখীর গতিবিধি লক্ষ্য করে ভবিতব্য বলতেন। আর পাখীদের চলাচল লক্ষ্য না করার দরুণে অত বড় দিগ্বিজয়ী সম্রাট নেপোলিয়ানের জীবনে দেখা গেল চরম বিপর্যয়। ১৮১১ সাল—নেপোলিয়ানের সঙ্গে রুশ সম্রাট আলেকজাণ্ডারের বিরোধ চলছে। রুশ সীমান্তে দু-চারবার দুই পক্ষে শক্তি পরীক্ষা হয়ে গেছে তাতে ফরাসীরাই জয়ী হয়েছে। নেপোলিয়ান তাতে পরিতৃপ্ত নন। তিনি সৈন্যাধ্যক্ষদের ডেকে পাঠিয়ে বল্লেন, 'আমি মস্কো অভিযান করবো।' সেনাপতিরা বিস্মিত হলেন। ক'দিন থেকে তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে দলে দলে সারস পাখীরা উত্তর থেকে দক্ষিণে উড়ে যাচ্ছেন। সারসদের এই গতিবিধি দেখে তাঁরা বুঝতে পারছিলেন এবার প্রচণ্ড শীত আসন্ন। সম্রাটের আদেশে তাঁরা বিচলিত হলেন। এই দুরন্ত শীতে উত্তরাঞ্চলে অভিযান চালনা যুক্তিযুক্ত হবে না বলে তাঁদের ধারণা কিন্তু ফরাসী সম্রাটের আদেশের বিরোধিতা করা ফরাসী সেনাপতিদের কল্পনার বাইরে। মস্কো অভিযানের ব্যর্থতা নেপোলিয়ানের জীবনকে দুরপনেয় কলঙ্ক দ্বারা চিহ্নিত করেছিল। সারসদের গতিবিধি যদি ফরাসী সেনাপতিদের মত নেপোলিয়ানের চোখে কিছুক্ষণের জন্যও ধরা পড়তো—তাহলে বোধহয় ইতিহাসের গতি অন্য রকম হতো।

পাখীকে আমরা সবাই ভালবাসি কিন্তু পাখী সম্পর্কে যতটুকু মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন ততটুকু আমরা আজো হইনি। সব পাখীর নামও আমরা জানি না। আমাদের আশে-পাশে ঘুরছে ফিরছে অথচ তাদের নাম জানা নেই আমাদের এটা পাখী তত্ত্বের প্রতি আমাদের ঔদাসীন্য প্রকাশ করে। বাংলাদেশে কোলকাতা ছাড়া

(শেষাংশ পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)
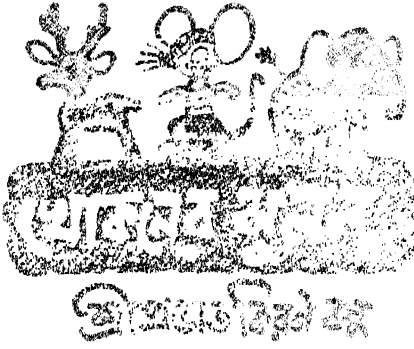
সাজায় খোকন ঝুলন মেলা চৌকি ক'রে ভর্তি।
পাহাড় করে। ঝর্ণা ঝরে, কল থেকে জল সত্যি!
তিনতলা সব বাড়ী করে, মাঠ থাকে তার পাশটায়;
ঘাস থাকে সব সবুজ সবুজ, পিচ্ থাকে লাল রাস্তায়।
হঠাৎ আলো উঠ্‌বে জ্বলে এদিক-ওদিক চারদিক।
ছুটবে মোটর দম লাগানো, যতই তারা সার দিক।
বন্দোবস্ত সমস্ত ঠিক্। ঝুলন মেলা খুললো।
ছেলেমেয়ের দল এসে সব কাঁপিয়ে পাড়া তুললো।
আসল কথা বল্‌তে গেলে ভীষণ ব্যাপার ঘটবে!
চট্‌বে খোকন, বাচ্চা যত দর্শকেরাও চট্‌বে।
বাড়ীগুলো তিনতলা তো? তার সমানই ট্রামটা!
দাঁড়িয়ে পুলিশ, হাঁটুর কাছে শেষ যে বাড়ীর থামটা!
গয়লানী এক আসছে, তার কাঁধটা পাহাড় ছাড়িয়ে!
চলছে হাতী পায়ের ফাঁকে, এই বুঝি দেয় মাড়িয়ে!
সামঞ্জস্য কোথাও তো নেই, ইঁদুর, হরিণ সব সমান।
ওদের মধ্যে কৃষ্ণ-রাধা কদমতলায় বর্তমান!
সকাল থেকে দুপুর এবং দুপুর থেকে সন্ধ্যে
খাটছে খোকন তৃপ্তি দিতে মনেরি আনন্দে।
আনন্দ পাও, সেই তো ভালো, সেইটি শুধু সত্যি।
ঝুলন মেলা সাজায় খোকন চৌকি ক'রে ভর্তি।

গল্প বলে গোবর্ধন আজগুবী চাল মেরে,
প্যাঁচের মত পেঁচিয়ে মুখ শুনছে বসে পচা।
ঘুঘুর মত ঘোৎনা এসে ঘনার ঘড়ি কেড়ে,
বস্‌লো সেথা, কর্‌বে বলে হরেক রকম মজা।
গোল বাধিয়ে তুল্‌লে গুপে হঠাৎ ঢিল ছুড়ে,
পট্‌কা মেরে পট্‌লা পাল কাঁপিয়ে তোলে কুঁড়ে।

পুজোর পাঁঠা পালিয়ে গেল গলার দড়ি ছিঁড়ে,
দোলার থেকে পড়্‌লো দুলু আঁৎকে উঠে ভয়ে।
ঢেবির হাতে লাগ্‌লো ঢেঁকি কুটতে গিয়ে চিঁড়ে,
গালগল্প গোবর্ধনের রইলো গাড়ু হয়ে।
এই সুযোগে ঘুরিয়ে ঢৌরি গলা খ্যাঁকার দিয়ে,
খ্যাঁদন হেসে বল্‌লে,—'গোবর' নেইকো তোর টিঁকে—

গুলের রাজা গোবর্ধনের মাথায় মেরে চাঁটি
ঢাক বাজাতে চল্‌লো খ্যাঁদা ক্ষুদিরামের সাথে।
চটি খুঁজতে দেখ্‌লো পচা রয়েছে এক পাটি,
কোথায় গেল আর এক পাটি?—দাঙ্গা বুঝি বাধে!
সেই পাটিটা ঘোৎনা ঘোষের পিঠে প্রয়োগ করে,
ছিনিয়ে ঘড়ি চল্‌লো ঘনা বাইকে তার চ'ড়ে।

মাইকে শোনা যাচ্ছে তখন—'গোল করো না আর!'
পাঁঠার খোঁজে পাণ্ডারা সব করছে ছুটোছুটি।
বেড়ায় ঘুরে গোবর্ধন মুখটি করে ভার,
পট্‌লা গুপে খ্যাঁদন হেসে হচ্ছে লুটোপুটি।
পুজোর দিনে ক্ষেপিয়ে তুলে বল্‌ছে সবে কারে?
'—গুলের রাজা ঘোল খেয়েছে হারিয়ে পাখীটারে।'

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

র কোথাও aviary (পাখীর আশ্রম) আছে বলে আমার না নেই। আমাদের ছোটরা স্কুলে যে সব বই পড়ে তাতেও খীদের সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা বড় একটা দেখতে পাওয়া য় না। ন্যাচারাল হিষ্ট্রির অভাব সম্পর্কে অভিযোগ বহুকালের—ন্তু সে অভিযোগ দূর করার কোনো প্রয়াস হয়নি। রাজ্য সরকার প্রতি বন-মহোৎসবের দিকে তাঁদের দৃষ্টি দিয়েছেন—এটা আশার া। বনের প্রসার এবং গাছের সংখ্যা বাড়লে পাখীদের সংখ্যা ড়বে এবং তাদের প্রতি আমরা আরো বেশী সচেতন হয়ে বো—এটা আশা করা যায়। তোমরা যারা ছোট, কবিতার বইতে চয় পড়েছ—

কোথায় ডাকে দোয়েল, শ্যামা
ফিঙে গাছে গাছে নাচে—
সে আমাদের বাংলা দেশ
আমাদেরই বাংলা রে।

এ কবিতা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে যে সব পাখীর নাম করা হয়েছে সে সব পাখীর ছবি যেন ভেসে ওঠে তাদের চোখের উপর। দোয়েল, শ্যামা, ফিঙে, কোকিল যেন শুধু নাম মাত্রই না হয়—তাদের আকৃতি-প্রকৃতি যেন জীবন্ত হয়ে ছোটদের মনে রেখাপাত করে।
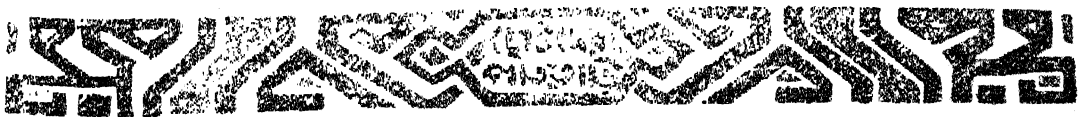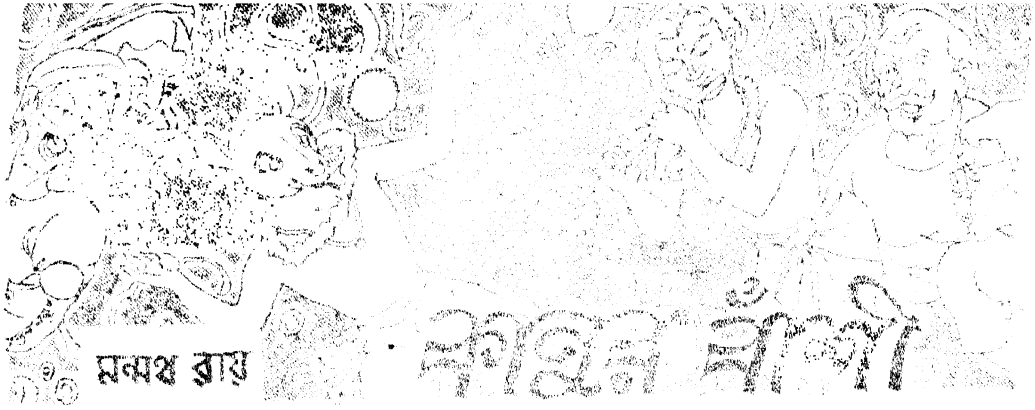
(নাটিকা)

প্রথম দৃশ্য

[গাঁয়ের মোড়লের বাড়ী]

মোড়ল ।। হায়-হায়-হায়, এ কি হলো দায়। এত বড় একটা গাঁয়ের মোড়ল আমি, শেষে কিনা ইঁদুরের কাছে আমাকে হার মানতে হচ্ছে! রাজ্যের ইঁদুর এসে যেন জড়ো হয়েছে আমার ঘরে। এদ্দিন হিসেবের খাতাপত্র, দলিল-দস্তাবেদ কেটে টুকরো টুকরো করছিল, সিন্দুকে পুরে রাখতে তা' যদি বা রক্ষা পাচ্ছে, এখন ধান চালের গোলায় দিয়েছে হানা, গ্রাহ্য করে না লাঠির মানা। ভাতে মারবে এবার আমায়। হায়-হায়-হায়!

[মোড়ল গিন্নীর প্রবেশ]

গিন্নী ।। ওগো, বসে বসে কি ভাবছো? ইঁদুরের জ্বালায় গেল যে সব, তাকি কিছু দেখছো? গাঁয়ের মোড়ল বলে কত না তোমায় দেমাক। আমি দেখছি সে শুধু মিথ্যে জাঁক। ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ করেছ কত লোক। সেই পাপে ঘরে ঢুকেছে আমার ইঁদুর। খাতাপত্র খাচ্ছিল, খাক। এবার হানা দিয়েছে ধানের গোলায়, ভাঁড়ারে আর রান্না ঘরে। বল দেখি মোড়ল মশাই, বাঁচি কি করে!

মোড়ল ।। কেন, ইঁদুরে মারা কল, সহর থেকে আনলাম কিনে তাও কি হ'লো বিফল?

গিন্নী ।। কলে না হয় মরছে দু'-দশটা। একটা ধেড়ে, একটা নেংটি, আর কিছু তার কাচ্চা-বাচ্চা। কিন্তু এ যে দেখছি রাবনের বংশ, কে করবে তা' নির্বংশ!

মোড়ল ।। কল যদি হয় বিফল, নাই কি ঘরে লাঠি?

গিন্নী ।। আছে বটে লাঠি। শুধু কি লাঠি! কুড়ুল আছে, কোদাল আছে, মাছ কোটার বঁটি আছে। সব মেনেছে হার, কি বলবো আর?

[মোড়লের দুই ছেলে। ব্যাং ও চ্যাং। দুটি বড় লাঠি হাতে তারা ছুটে এলো।]

ব্যাং ।। চুপ, চুপ, চুপ!

চ্যাং ।। মস্ত একটা ধেড়ে ইঁদুর।

ব্যাং ।। মনে হচ্ছে পালের গোদা।

চ্যাং ।। আমাদের তাড়া খেয়ে হয়েছে এবার হাঁদা।

ব্যাং ।। পালিয়ে এসেছে হেথা, চুপ! বলো না কেউ কথা।

[সকলে চুপ করল। ইঁদুরটি বের হলেই মারবে বলে ব্যাং এবং চ্যাং লাঠি বাগিয়ে ধরে ওঁৎপেতে হাঁটু গেড়ে বসে রইল। একটি ধেড়ে ইঁদু(ইঁদুরের মুখোস পরা একটি ছো ছেলে) ব্যাং-এর পেছন দিক থেকে যে ছুটে এসেছে অমনি ব্যাং এবং চ্যা লাঠি মারলো। কিন্তু ইঁদুরের গায়ে সে লাঠি না পড়ে পড়লো পরস্পরে মাথায়। ব্যাং, চ্যাং, মোড়ল এব মোড়ল-গিন্নী আর্তনাদ করে উঠলো।

ব্যাং ।। গেলাম, গেলাম, গেলাম!

চ্যাং ।। মলাম, মলাম, মলাম!

মোড়ল ।। বাপরে বাপ, বাপরে বাপ!

গিন্নী ।। হায় হায়, এ কি পাপ!

[ধেড়ে ইঁদুরটি এদের চারদি নাচ্ছিলো।]

ধেড়ে ইঁদুর ।। হাঃ হাঃ হাঃ!
হোঃ হোঃ হোঃ!
হিঃ হিঃ হিঃ!
কুটুস্ কুটুস কুটুস
হুস হুস্ হুস্!

[নাচতে নাচতে পালিয়ে গেল]

গিন্নী ।। ওরে বাবা ব্যাং, ওরে বাবা চ্যাং, চল্ বা বা বা চল মাথায় দিবি জল।

ব্যাং ।। মাথাটা কি আর আছে?

চ্যাং ।। মান ইজ্জত গেছে। কি হবে আর বেঁচে!

গিন্নী ।। (মোড়লকে) হাঁ করে কি দেখছো? ধনে-প্রাণে যে গেলাম এবার ইঁদুরকে করে সেলাম, ভিটে-মাটি, সব ছাড়ো, য শিগ্‌গীর পারো। আয় বাবা তোরা আয়, মাথায় দিবি জল।

মোড়ল ।। হ্যাঁ, ঢালো। ওদের মাথায় জল আর আমার মাথায় ঘোল

[ব্যাং ও চ্যাংকে নিয়ে গিন্নীর প্রস্থান অন্য দিক দিয়ে মোড়লের গোমস্তা প্রবেশ।]

গোমস্তা ।। মোড়ল মশাই মোড়ল মশাই, আছেন দেখছি বাড়ী কিন্তু মুখখানা কেন এমন হাঁড়ি?

মোড়ল ।। এই যে ভাই গোমস্তা। জানো না তো আমার অবস্থা সেই যে বলেছিলাম ইঁদুর কিছুতেই করতে পারছিনে দ বাড়াবাড়ি তাদের এত বেড়েছে, এখন ধনে-প্রাণে মারছে। ব দেখি গোমস্তা, কি আছে রাস্তা।
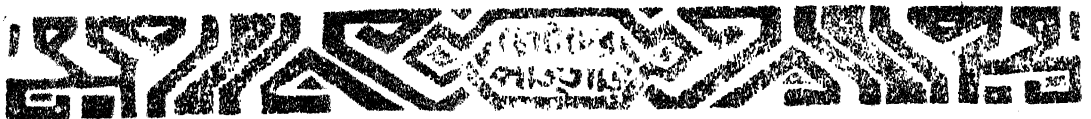
গোমস্তা ।। আমারো তো ঐ একই অবস্থা। আমার গিন্নী বলে দিল—মুখের ওপর বলে দিল; তাড়াতে না পারো যদি ইঁদুরে, আমরাই হচ্ছি দূরে। হয় যাচ্ছি বাপের বাড়ী, নইলে দিচ্ছি গলায় দড়ি।

মোড়ল ।। কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ঘর করি, এখন বল দেখি এসব নিয়ে কোথায় সরি'!

গোমস্তা ।। ইঁদুরের তাড়ায় ভিটে-মাটি ছাড়লে লোকেই বা কি বলবে?

মোড়ল ।। মান ইজ্জত যায়, হায় হায় হায়!

[গ্রাম্য চৌকিদার কানু ও তার কিশোর পুত্র কানুর প্রবেশ। কানুর হাতে একটি বাঁশের বাঁশী]

চৌকিদার ।। মোড়ল মশাই, গোমস্তা মশাই, দণ্ডবৎ হই। সেই সংগে গাঁয়ের লোকের দুঃখের কথাও কই। লোকের ঘরে ধান-চাল যা ছিল, ইঁদুরে সব খেলো। মানুষের রাজত্ব গেল, ইঁদুরের রাজত্ব এলো।

গোমস্তা ।। (চৌকিদারকে) থাম্ বেটা থাম। এখন কর দেখি একটা কাম। সাপুড়িয়াদের সব ডাক, ঘরে ঘরে ছেড়ে দিক সব সাপ।

চৌকিদার ।। সাপ! বাপরে বাপ!!

মোড়ল ।। যে ঘরে করবো বাস, সেই ঘরে সাপ! সে হবে এক রংগ, কিনা, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভংগ! এ সব বুদ্ধি ছাড়ো—অন্য পথ ধরো। শোন্ চৌকিদার শোন, মন দিয়ে শোন। ঢ্যাঁটরা দিয়ে বল, কারুর যদি জানা থাকে এমন কোনো কল, যাতে ইঁদুর হবে নাশ, দূরে হবে ত্রাস, তাকে দেব হাজার টাকা বকশিশ, সেই সঙ্গে প্রাণ ভরা আশিস।

চৌকিদার ।। এটা দেখছি জবর এক ঘোষণা! এখান থেকেই সুরু, হোক তবে রটনা। মোড়ল মশাইয়ের পণ, কে কোথায় আছিস বাপু শোনু। কারুর যদি জানা থাকে এমন কোনো কল, এক্ষুণি এসে বল—যাতে ইঁদুর হবে নাশ, দূর হবে ত্রাস। মোড়ল দেবেন তাকে হাজার টাকা বকশিশ, আর মিলবে গাঁয়ের লোকের আশিস।

কানু ।। সত্যি বাবা, সত্যি!

চৌকিদার ।। মোড়ল মশাই, সত্যি!

মোড়ল ।। সত্যি বাবা সত্যি। করছি আমি তিন সত্যি।

কানু ।। মনে হচ্ছে কাজটা আমি পারবো। পারি আর না পারি গুরুর কৃপায় পরখ করে দেখবো।

গোমস্তা ।। হাতি, ঘোড়া গেল তল, ভেঁড়া বলে কত জল!

মোড়ল ।। কে এই ছোকরাটা! দেখ দেখি স্পর্ধাটা!

চৌকিদার ।। এটা আমার পুত, আস্ত একটা ভূত। নাম রেখেছি কানু, চরায় আমার ধেনু। বাজায় শুধু বাঁশী, ঢাক, ঢোল আর কাঁশি। কি করে তুই মারবি ইঁদুর!

গোমস্তা ।। দূর, দূর, দূর!

মোড়ল ।। ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার।

কানু ।। কিন্তু আছে আমার বাঁশী। এই বাঁশীর সুরে ইঁদুরকে দেব ফাঁসি।

মোড়ল ।। কোথাকার এক পুঁচকে ছোঁড়া, স্পর্ধা দেখছি আকাশ জোড়া!

কানু ।। গুরুর নামে দিয়ে জয়, ধরছি বাঁশী, দেখ না কি হয়! আয় ইঁদুর আয়, হেসে হেসে আয়, নেচে নেচে আয়। ধেড়ে, বুড়ো, নেংটি ইঁদুর, যে যেখানে আছিস আয়, আমার কাছে আয়। কাছে আছে গংগা নদী, নাইতে তোরা যাবি যদি, আয় তোরা আয়! আমার বাঁশীর সুরে আয়, নেচে নেচে আয়। হেসে হেসে আয়, সময় ব'য়ে যায়।

[কানু বাঁশী বাজাতে লাগলো। অপূর্ব এক দৃশ্যের অবতারণা হলো। ধেড়ে, বুড়ো, নেংটি ইঁদুর, যে যেখানে ছিল, একে একে নাচতে নাচতে আসতে লাগলো। কানু বাঁশী বাজাতে বাজাতে চলে গেল, ইঁদুরেরাও তার পিছু পিছু লাইন ধরে চলতে লাগলো। (ছেলেরা ইঁদুরের মুখোস পরে আসবে। তাদের লেজও থাকবে। চার-পাঁচটি ছেলেই ইঁদুর সেজে নাচতে নাচতে চলে যাবে এবং সিনের পশ্চাদ্দেশ ঘুরে পুনরায় আসবে এবং যাবে। এইভাবে চার-পাঁচটি ছেলেই অজস্র ইঁদুরের সমাবেশ দেখাতে পারবে। বলা-বাহুল্য, বাঁশীর সুরটি নেপথ্যে বেশ জোরালো থাকবে এবং অবশেষে দূরতর হতে থাকবে)।]

মোড়ল ।। অবাক কাণ্ড।

গোমস্তা ।। তাতে নেই কোনো সন্দ।

মোড়ল ।। চল, চল দেখি। [ছুটে চলে গেল।]

গোমস্তা ।। ইঁদুরগুলো গংগার জলে ডুবে মরবে নাকি!

[ছুটে চলে গেল]

চৌকিদার ।। জয় গুরু! জয় গুরু! বুকটা আমার করছে দুরু দুরু। ইঁদুরগুলো যদি জলে ডুবে মরে, আমার কানু ব্যাটা হাজার টাকার বকশিশটা তবে মারে।

[ছুটে চলে গেল]

যবনিকা নামলো।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(মোড়লের বাড়ী। মোড়ল, গোমস্তা, চৌকিদার এবং কানু।)

কানু ।। ইঁদুরের বংশ হয়ে গেছে নির্বংশ। গংগা জলে গেছে মারা, স্বর্গে এখন গেছে তারা।

মোড়ল ।। হাঃ-হাঃ-হাঃ—স্বর্গে ঢুকেছে ইঁদুর, দেবতাদের বুক দুর-দুর। বেঁচে গেলাম আমরা, যার যার ঘরে যাও তোমরা।

কানু ।। আমার হাজার টাকা বক্‌শিশ?

মোড়ল ।। এটা তুই কি বলছিস? ওরে ছোঁড়া, এটা তুই কি বলছিস?

গোমস্তা ।। ইঁদুর মেরে বক্‌শিশ! তুই কি ছোঁড়া স্বপ্ন দেখছিস?

চৌকিদার ।। তিন সত্যি করেছিলেন, বেমালুম ভুলে গেলেন? এরই নাম ঘোর কলি। আয় কানু, বাড়ী চলি।

কানু ।। হাজার টাকা নেব, তবে বাড়ী যাবো।

মোড়ল ।। হাঃ-হাঃ-হাঃ—হাজার টাকা! তোর চোদ্দপুরুষে দেখেছে কেউ! টাকার কথা ছেড়ে দিচ্ছি, হাজার পয়সা—তাই কি দেখেছিস বাপ-বেটা তোরা কেউ?

গোমস্তা ।। ছোট মুখে বড় কথা। এসব তোরা শিখলি কোথা?

চৌকিদার ।। ঘোর কলি, ঘোর কলি, তাই কানু তোকে বলি, ছেড়ে দে টাকার আশা, শেষ হোক এই তামশা।

কানু ।। তামশা, তামশাই বটে। কিন্তু অনেক তামশা এখনো আছে আমার ঘটে।

মোড়ল ।। বটে!
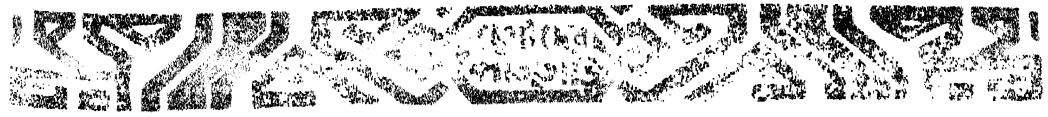
কানু ।। বটে। কলিকালের খেলা, দেখাবো এই বেলা। আমার বাঁশীতে আছেন কল্কি, দেখুন এবার ভেল্কি। বাজরে বাঁশী বাজরে, খোকা-খুকুরা আয় রে। নেচে নেচে আয় রে, হেসে হেসে আয় রে, গান গেয়ে আয় রে। চল্‌রে—চল্‌রে—গঙ্গা নাইতে চল্‌রে— [বাঁশী বাজানো সুরু করলো]

মোড়ল ।। খোকা খুকুদের ডাকছে। তারাও যেন ইঁদুরে, বোকাটা এই কথাটাই ভাবছে!

গোমস্তা ।। কিন্তু কারা যেন আসছে, কলরব শুনেছি।

চৌকিদার ।। বাঁশীর সুরে যাদু আছে, খোকা খুকুরা আসছে কাছে। ভয় জাগছে প্রাণে, যদি মা গঙ্গা টানে।

মোড়ল ।। ছোঃ। ছোঃ। আমাদের খোকাখুকু, নয়কো তারা ইঁদুর।

গোমস্তা ।। (চৌকিদারকে), তোমার ছেলেটি আস্ত একটি বাঁদর। ইচ্ছে হয় মারি একটি থাপ্পড়।

[বাঁশীতে আকৃষ্ট হয়ে ইঁদুরের মতই এক দল খোকা-খুকু নাচতে নাচতে, এলো। বাঁশী বাজাতে বাজাতে কানু গঙ্গার দিকে চললো, খোকা-খুকুরাও কানুর পিছু নিলো।]

মোড়ল ।। একি! একি! একি! বাচ্চারা যে সব চললো! বাঁশীর যাদুতে ধরলো! খবরদার কেউ যাবিনে, বাঁশীর ডাক শুনিবিনে। ফিরে আয় ঘরে, নইলে মরবি বেঘোরে।

গোমস্তা ।। কে কার কথা শুনছে? বাচ্চারা সব গেল। মা গঙ্গা ওদের টানছে। বংশটা মোদের গেল।

[ছুটিয়া মোড়ল-গিন্নীর প্রবেশ]

গিন্নী ।। হায় হায় হায়! ছেলে-মেয়ে যে সব যায়! (মোড়লের প্রতি) ওগো তুমি দেখছো কি? কানুকে আর দিও না ফাঁকি। বোঝ মোদের ব্যথা, রাখো তোমার কথা। হাজার টাকা ফেল, নইলে যে সব গেলো!

মোড়ল ।। (চৌকিদারকে) ওরে ভাই চৌকিদার, খুব শিক্ষা হলো আমার। কানুকে গিয়ে থামা, দিচ্ছি টাকা এক ধামা।

চৌকিদার ।। যাচ্ছি আমি যাচ্ছি, ফিরিয়ে ওদের আনছি। জোগাড় রেখ হাজার টাকা, নইলে ওকে যাবে না রোখা।

[চৌকিদার ছুটে চলে গেল]

মোড়ল ।। হাজার টাকা! হাজার টাকা! একি চারটিখানি কথা?

গোমস্তা ।। একশ' টাকা দাও, গোলমালটা থামাও।

গিন্নী ।। সেই সঙ্গে কানমলাও খাও।

[বাঁশী বাজাতে বাজাতে কানুর প্রবেশ। পশ্চাতে চৌকিদার]

কানু ।। মোড়ল মশাই, মোড়ল মশাই, কি বলবে বলো! বাজে কথা না বলে হাজার টাকা ফেল।

মোড়ল ।। বাচ্চাদের ফেলে, একলা কেন এলে!

গিন্নী ।। আমাদের বুকের ধন রইলো কোথায়? তুমি কেন বাবা একা হেথায়?

কানু ।। নাচছে তারা সব গঙ্গাতীরে, যদি পাই টাকা, তবে সব আসবে ফিরে।

মোড়ল ।। একশ' টাকা দিচ্ছি, কানমলা খাচ্ছি। ঘরের ছেলে সব ঘরে ফিরুক, আমার ওপর আর হয়ো না বিরূপ।

কানু ।। তিন সত্যি করেছিলে হাজার টাকা দেবে, কথা দিয়ে রাখছো না কথা, সেটা দেখ ভেবে। তোমরাও তবে চলো, নেচে নেচেই চলো, গঙ্গাতীরে চলো, ছেলে বুড়ো এক সাথেই সব বলো হরি বলো।

[কানু বাঁশী বাজাতে লাগলো। এক অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা হলো। মোড়ল-গিন্নী, গোমস্তা এবং চৌকিদার নাচতে সুরু করে দিল। একে একে গ্রামের আরো লোকজন নাচতে নাচতে এসে এখানে জমলো। বাঁশীর উদ্দাম সুরে এদের নাচও ক্রমশঃ উদ্দাম হয়ে উঠলো। সকলে শেষে হাঁফাতে লাগলো।]

মোড়ল ।। গেলাম, গেলাম, গেলাম!

গিন্নী ।। মলাম, বাবা, মলাম!

গোমস্তা ।। থামাও বাঁশী থামাও।

মোড়ল ।। প্রাণটা মোদের বাঁচাও।

চৌকিদার ।। ওরে কানু থাম্‌। সারা গায়ে ঝরছে ঘাম।

মোড়ল ।। হায়, হায়, হায়! বেঘোরে প্রাণটা যায়।

গিন্নী ।। যেমন কর্ম তেমনি ফল, নড়েছে আজ ধর্মের কল। হাজার টাকা আমিই দিচ্ছি, মোড়লের কথা আমি রাখছি।

[মোড়ল-গিন্নী নাচতে নাচতে গা থেকে সব গয়নাগুলো খুলে একে একে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো। এর ফলে বাঁশীর উদ্দাম সুরসৃষ্টিও ক্রমশঃ শান্ত হতে লাগলো। যখন শেষ গয়নাটি মাটিতে পড়লো, তখন বাঁশীও থেমে গেল। নাচ থেমে গিয়ে সকলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। মাটিতে বসে পড়ে সবাই হাঁফাতে লাগলো। কানু গয়না-গুলি জড়ো করে মোড়ল-গিন্নীর সামনে এসে নতজানু হয়ে বসলো।]

কানু ।। গিন্নী-মায়ের জয়। আর নেইকো ভয়। রক্ষা হলো ধর্ম, ফুরোলো আমার কর্ম। নাও ফিরে মা গয়না, এ ছেলের এই বায়না।

[কানু গয়নাগুলো মোড়ল-গিন্নীর হাতে ফিরিয়ে দিল।]

কানু ।। ওরে আমার সব ভাই বোন, আয়রে তোরা সব ফিরে। নাচতে নাচতে ফিরে আয়, চলে যা' যে যার ঘরে।

মোড়ল ।। ওরে বাবা কানু, শোনো বাবা শোনো, আমাদের আর নাচতে না হয় যেন।

কানু ।। আচ্ছা আচ্ছা তাই হবে, এবার বাচ্চাদের নাচই আপনারা দেখুন সবে। আমার কাজটি ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়োলো।

[কানু বাঁশী বাজাতে লাগলো। পূর্বোক্ত ছেলে-মেয়ের দল পূর্বোক্ত নির্দেশমত নাচতে নাচতে এলো, গেল, আবার এলো আবার গেল। এমনি করে, যেন বহু ছেলে মেয়ে নাচছে, এমনি পরিবেশ সৃষ্টি হলো। দর্শকরা মহা আনন্দিত হয়ে এই দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলো। ধীরে ধীরে পর্দা নামলো।]

যবনিকা
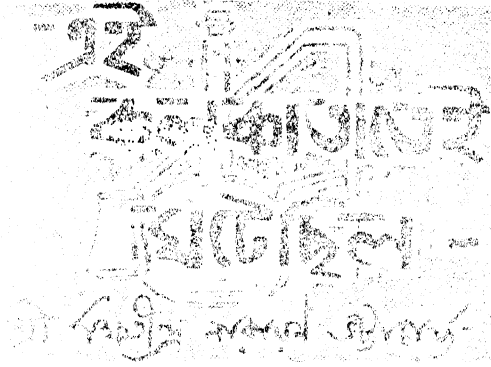
আন্দামান।

সমুদ্রের মাঝখানে পাহাড়ঘেরা দ্বীপ। সমুদ্রের ঢেউ দিবারাত্র হড়ে এসে পড়ছে তার গায়ে। জলের ধার ঘেঁষে বড় বড় নারকেল গাছ। তারপর আর একটু এগিয়ে এলেই ঘন জংগল। নানা জাতের গাছপালার সমারোহ সেখানে।

আজ থেকে প্রায় ৭০।৮০ বছর আগেকার কথা বলছি। একটি বিদেশী যুবক প্রায়ই সেই সমুদ্রের ধারে আপন মনে ঘুরে বেড়াত। কখনও বা ছিপ নিয়ে মাছ ধরত, আবার কখনও বা মুগ্ধনেত্রে চেয়ে থাকত দূরের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের পানে।

দেখলেই মনে হত লোকটি কবি। শুধু কবি নয়, সাহিত্যিকও হয়তো। যখন-তখন গড় গড় করে কবিতা আওড়াচ্ছে, আবার বই খুলে জোরে জোরে আবৃত্তি করছে, আবার কখনও বা খাতা নিয়ে বসে গেছে লিখতে। লিখবার জায়গাটাও কবিজনোচিত। সমুদ্রেরই ধারে, গাছের তলায় কোন একটা পাথর-টাথর খুঁজে নিয়ে, তারই ওপর বসে লিখে চলেছে একমনে।

লিখতে লিখতে একখানি পুরো উপন্যাসই লেখা হ'য়ে গেল একদিন। বইটার কি নাম? সেও রাখা হল ঐ জায়গার সংগে খাপ খাইয়ে। "মহাসাগরের শিশু" দি চাইল্ড অব দি ওশান্।

কিন্তু আন্দামানে বসে এই রকম কবিত্ব করলে পেট ভরবে কি? প্রাকৃতিক শোভা ওখানকার যাই হোক, উপার্জনের জায়গা ওটা নয়। কিন্তু যুবকটির তা নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। স্বভাবে কবি হলেও আসলে সে হচ্ছে একজন ডাক্তার, ইংল্যাণ্ডের পাশ করা ডাক্তার। ভারত সরকারের সামরিক বিভাগে ডাক্তারের চাকরী নিয়েছে আর সেই সূত্রেই তাকে আন্দামানে বদলী করে আনা হয়েছে। তবু মনে হচ্ছে, ডাক্তারীর চাইতে সাহিত্যের দিকেই তার ঝোঁকটা অতিরিক্তভাবে বেশী। কে এই তরুণ ডাক্তার?

রোনাল্ড্ রস্, হ্যাঁ, পরবর্তী যুগে ইনিই স্যর রোনাল্ড রস, বিশ্বযোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

রোনাল্ড রসের বাবা স্কটল্যাণ্ডের লোক, মা ইংরেজ। লেখা-পড়াও তিনি করেছেন ইংল্যাণ্ডেই। কিন্তু তাঁর জন্মস্থান হচ্ছে ভারতবর্ষ, পাহাড়ঘেরা আলমোড়া। আর কর্মক্ষেত্র হিসেবেও তিনি বেছে নিয়েছিলেন ভারতবর্ষ। রসের বাবাও ছিলেন ভারতীয় সমর বিভাগের একজন কর্ণেল।

সরকারী চাকরীতে কিন্তু রস্ সুখী ছিলেন না। প্রথমতঃ সামরিক বিভাগের এই চাকরী ছিল একেবারেই "খাঁটি চাকরী", কোন রসকষ ছিল না এর মধ্যে। তার ওপর সে আমলে ওখনকার কর্তাওয়ালারা এত রকম অন্যায়, অবিচার করতে অভ্যস্ত ছিলেন যে রসের কাছে রুটিন মাফিক কাজকর্মগুলোও যেন নিতান্তই প্রাণহীন মনে হত। যেখানে রসের প্রমোশন পাওয়ার কথা, সেখানে হয়তো তাঁকে বঞ্চিত করে খাতিরের লোককে তাঁর ওপরে তুলে দেওয়া হল! এরকম পর পর কয়েকবার হওয়ায় যে আশা নিয়ে রস্ চাকরীতে ঢুকেছিলেন তা সফল হবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

কবি স্বভাব রস্ প্রথমটা এদিকে ততটা আমল দেননি, বরঞ্চ নিজেও একটা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে বনে-জংগলে ঘুরে বেড়িয়ে সময় কাটিয়ে দিতেন। তাঁর ছিল শিকারের সখ, আর সাহিত্য-চর্চার সখের কথা তো আগেই বলেছি, কিন্তু যখন বিয়ে করলেন, সংসার হল, তখন আর এদিকে নজর না দিয়ে উপায় রইল না।

রস্ বুঝলেন, চাকরীতে বড় হতে হলে নিজেকেও বড় করে তুলতে হবে, এবং তা সম্ভব হতে পারে যদি ডাক্তারী নিয়ে গবেষণার কাজ করতে পারেন। সাহিত্যের পথ হয়তো তাঁর জন্য নয়।

এর কিছু আগে ইয়োরোপে পাস্তুর জীবাণুবিজ্ঞান নিয়ে হুলস্থূল বাঁধিয়ে তুলেছেন। আমাদের যত অসুখ-বিসুখ সবেরই মূলে যে রয়েছে নানা রকম অদৃশ্য জীবাণু এ সত্যও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই রস্ যে এই নতুন জীবাণুবিজ্ঞানের দিকে সহজেই আকৃষ্ট হবেন তাতে আর বিচিত্র কি? হলও তাই, জীবাণুবিজ্ঞান নিয়ে রীতিমত পড়াশোনা চর্চা সুরু করে দিলেন তিনি।

এই সময়ে আফ্রিকা আর ভারতবর্ষে ম্যালেরিয়া রোগ ভীষণভাবে জাঁকিয়ে উঠেছে। রোগের কারণ কি কেউ জানে না, কিন্তু এই ভারতেই এক বছরে এই রোগে মৃত্যুসংখ্যা দেখা গেল প্রায় ৫০ লক্ষ। সাধারণতঃ জলা জায়গায়—যেখানে জল বেরোবার পথ পায় না, পচা পুকুর আর ঝোপঝাড়ের সংখ্যা যেখানে বেশী, এই রোগের উৎপাতও সেইখানেই বেশী। গরম দেশে—বিশেষ করে আবার বর্ষার পরে এ রোগ বাড়তে দেখা যায়, কাজেই স্বভাবতঃই মনে করা হত যে এই রকম জলা জায়গার কোন দূষিত বাতাস বা গ্যাস থেকেই এই রোগ ছড়ায়।

রস্ এই ম্যালেরিয়ার বিষয়ই চিন্তা করতে লাগলেন।

ঠিক এর কিছু আগে লাভেরাঁ নামে এক ভদ্রলোকও আফ্রিকায় বসে ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ তিনি ঐ রকম রোগীর রক্তে এক রকম নতুন ধরণের জীবাণু লক্ষ্য করলেন। রক্তের মধ্যেই ঐ জীবাণুর বাস, রক্ত থেকেই নিজেদের পুষ্টি সংগ্রহ করে ওরা, আর তার মূল্য হিসাবে রোগীর দেহে ছড়িয়ে দেয় ম্যালেরিয়া রোগ। রস্ তখন ইংল্যাণ্ডে ছুটী কাটাচ্ছেন। রসের কাছেও খবরটা পৌঁছল। যদিও তখন পর্যন্ত পণ্ডিত মহলে লাভেরাঁর এই আবিষ্কার ঠিকমত গৃহীত হয়নি, কিন্তু রস্কে খুবই বিচলিত করল এই আবিষ্কার। তিনি তখনই ছুটলেন ডাঃ ম্যানসনের কাছে। ম্যানসনই তখন ধরতে গেলে ইংল্যাণ্ডে এ বিষয়ে সবচেয়ে বিশেষজ্ঞ। ফাইলেরিয়া রোগ নিয়ে গবেষণা করে তিনি বিখ্যাত হয়েছেন। ফাইলেরিয়ার জীবাণু আবিষ্কার করেছেন এবং সে জীবাণু যে এক রকম মশার কামড় থেকেই সংক্রামিত হয় এ তথ্যও তিনিই আবিষ্কার করেছেন।

ম্যানসন এই তরুণ ডাক্তারের আগ্রহ দেখে ভারী খুসী হলেন। দেখতে দেখতে দু-জনার মধ্যে অন্তরঙ্গতা বেড়ে গেল এবং রস্ ম্যানসনকে গুরু বলে মেনে নিলেন, গুরুরও শিষ্যের প্রতি দেখা গেল প্রবল টান। বলতে কি রসের জীবনের যা কিছু বড় কীর্তি তার সবেরই মূলে ছিলেন ম্যানসন। ম্যানসন না থাকলে রসের কথা ক'জন জানত বলা কঠিন।

ম্যানসনের পরামর্শেই রস্ ভারতে ফিরে এসে ম্যালেরিয়া নিয়ে গবেষণা সুরু করলেন। কি করে জীবাণু পরীক্ষা করতে হয়, তিনতে
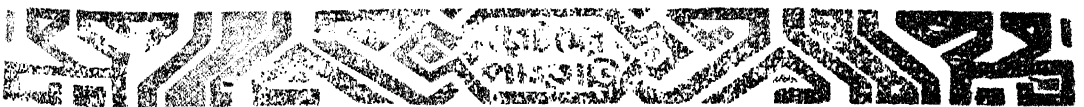
হয়, বাছাই করতে হয় ইত্যাদি নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে ম্যানসনের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করলেন তিনি। শুধু তাই নয়, ম্যানসন তাঁর মাথায় আর একটা সম্ভাবনার কথা ঢুকিয়ে দিলেন। ম্যালেরিয়ার জীবাণু না হয় মানুষের রক্তে আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু কোথা থেকে সে জীবাণু এল আর কেমন করে ছড়াল তা তো জানা যায় নি। কাজেই গবেষণা করতে হবে এই নিয়ে। আর যে সব জায়গায় ম্যালেরিয়ার উপদ্রব দেখা গেছে, সে সব জায়গায় দেখা গেছে মশারও উপদ্রব খুব। কাজেই এই মশা নিয়েও ভাল করে পরীক্ষা করতে হবে। ম্যানসন নিজে মশার কামড় থেকে ফাইলেরিয়া রোগের কারণ বার করেছিলেন বলে হয়তো মশা সম্বন্ধে তাঁর একটা দুর্বলতা ছিল। কে জানে, ঐ থেকেই হয়তো তাঁর মনে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধেও ঐ রকম একটা সম্ভাবনার কথা এসে থাকবে।

যাই হোক, ভারতে এসে রস্ তাঁর কবিতার বই আর উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি আলমারীতে বন্ধ করে পুরোপুরি বিজ্ঞানীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। এখন আর অবসর সময় কাটাবার জন্য তাঁকে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরতে দেখা যায় না। মাছধরা, শিকার এসব সখ শিকেয় তোলা রইল। এমনকি মাঝে মাঝে গুন্ গুন্ করে মুখে আওড়ানো ছাড়া কবিতা চর্চাও বন্ধ রইল। ইতিমধ্যে রস্ নিজেও একবার ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়লেন। অবশ্য সে যাত্রা তাঁকে বেশী ভুগতে হয়নি, কিন্তু এ থেকে এই প্রমাণ হল যে, পচা-পুকুরে স্নান না করলেও ম্যালেরিয়া হতে বাধা নেই। বিষাক্ত গ্যাসের দরুণই ম্যালেরিয়া হয় এ ধারণা তা হলে ঠিক নয়।

রস্ তখন সেকেন্দ্রাবাদের সামরিক হাসপাতালে কাজ করছেন। এখানে ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। মশারও উপদ্রব যথেষ্ট। কাজেই দুদিক দিয়েই তাঁর সুবিধা হল। কিন্তু ঠিকমত পরীক্ষা করতে হলে মশা ধরে তাকে দিয়ে রোগীকে কামড় খাইয়ে সেই মশা এবং মশার-কামড় খাওয়া রোগীর রক্ত দুই-ই পরীক্ষা করা দরকার। রস্ প্রথমে মশা ধরার কাজে লাগলেন। জ্যান্ত মশা ধরে বড় বড় বোতলে পোরা শুনতে সহজ হলেও, খুব একটা সহজসাধ্য কাজ নয়। তার ওপর তাঁর ওপরওয়ালারা এসব ব্যাপারকে অত্যন্ত ছেলেমানুষী মনে করতেন। কাজেই অপর কারো সাহায্য পাবার আশা ছিল না, যা করতে হয় একলাই করতে হত। রস তাই নিজেই মশা ধরতেন, বোতলে পুরতেন, তারপর সেগুলোকে জিইয়ে রাখবার ব্যবস্থা করতেন—সেও নিজেই।

এইবার আর এক মুশকিল হল। কোন রোগীই সাধ করে মশার কামড় খেতে রাজী নয়। তাদের তো আর রসের মত জীবাণু আবিষ্কারের জন্য মাথাব্যথা নেই। বরঞ্চ রকম-সকম দেখে তাদের কেউ কেউ ওঁর মাথায় ছিট আছে এমন সন্দেহও করতে লাগল। কিন্তু রস্ এর ওষুধ জানতেন সর্বদেশে সর্বকালে যে ওষুধ সমানভাবে কাজ দেয়। অর্থাৎ যাকে বলা যায় "চাঁদির ওষুধ"। রস্ ঘোষণা করলেন—যে মশার কামড় খেতে রাজী হবে সে পাবে সঙ্গে সঙ্গে এক আনা করে পয়সা—একেবারে নগদা-নগদি। পুরো এক আনা পয়সা! ব্যস্, আর কথাটি নেই, বীর সিপাহীরা বীরত্বের সঙ্গে একে একে মশার কামড় খাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। বিজ্ঞানের জন্য? ছোঃ, বিজ্ঞানের জন্য থোড়াই কেয়ার করে তারা। কিন্তু নগদ এক আনা পয়সা—সে আমলে ওর প্রলোভন কম ছিল না।

নিজের ধরা বিশেষ এক-একটি মশাকে দিয়ে রোগীকে কামড় খাওয়াতে লাগলেন রস্। তারপর সেই রোগীর রক্ত আর সেই বিশেষ মশাটিকে নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন—পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। শেষের কাজটি খুব সহজ নয়। অতটুকু একটা প্রাণী, তার দেহের ভিতরকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে কাটাছেঁড়া করে পরীক্ষা! হোক না অণুবীক্ষণের তলায়! অসীম ধৈর্যের কাজ এটি।

কেষ্ট খুড়োর কষ্ট—এ কি ছিষ্টি ছাড়া রোগ।
জ্যোতিষী কন—'দেখছি পুরো শনি-রাহুর যোগ।
হোম করে দেই বোগ-মাদুলী, দেখুন পরে গলায়,
তেরাত্তিরে যম ব্যাটা ঠিক পালায় কি না পালায়।'
এলোপ্যাথিক ডাক্তার এসে চোঙ্টি ঠুকে ঠুকে
গেলেন বলে—'স্লেট নেওয়া চাই, দোষ হয়েছে বুকে।'
হোমিওপ্যাথ্ সুধোন—'লাগে মিষ্টি কি না থুথু?
হাসি পায়, না, কান্না, দিলে আস্তে কাতুকুতু?'
বৈদ্য বলেন,—'দেখছি চড়া পিত্ত, কফ আর বায়ু,
কায়কল্প করুন দেখি, হবেন সহস্রায়ু।'
'দাঁতের পোকা বার করি'-ও ফুঁ দেয় এসে দাঁতে,
ভুলোর মাঝে ব্যামোর পোকা দেখায় এনে হাতে।
কেষ্ট খুড়োর ঠানদি ছিলেন দরজা আড়াল করে
সুধান তারে—'কষ্টটা কি, বল্ দেখিরে মোরে?'
কেষ্ট খুড়ো বলেন,—'এ তো বলাই অসুবিধে,
ঘুমের সময় ঘুম পায় মোর, খিদের সময় খিদে।'

কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। দিনের পর দিন ধৈর্যের প্রায় শেষ সীমায় এসে দাঁড়াল তাঁর।

তারপর একদিন। এক এক করে অনেকগুলি স্লাইড পর করে হতাশ হয়েছেন তিনি। আর একটিমাত্র স্লাইড বাকি। হলেই আজকের মত কাজ শেষ। আর যা প্রচণ্ড গরম পড়েছে করে কার সাধ্য?

কিন্তু একি! এই মশাটির পেটে পাকস্থলীর গায়ে যে তারই মধ্যে ছোট্ট একটা কি দেখা যাচ্ছে না? ঠিক যেন ম্যালে বীজাণুর মতই দেখতে! চমকে উঠলেন রস্। হ্যাঁ, ঠিক তাই। কিন্তু...তার পরের ব্যাপার? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, যেমন অ ছিল তেমনি অন্ধকার!

রস্ তাঁর গুরু ম্যানসন্‌কে সব লিখে জানালেন। ম্য প্রচুর উৎসাহ দিলেন। লিখলেন—শুধু মশা হলেই তো হবে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখ কোন্ জাতের মশা। কুকুর, হ পাখী, এমন কি মানুষের মধ্যেও যেমন নানা রকম জাত আছে, ম মধ্যেও আছে তেমনি। এদের মধ্যে সব জাতই হয়তো ম্যালে বাহক নয়। কোন্ জাত এই কর্মে পটু তাই বার করতে হবে।

এবার নতুনভাবে পরীক্ষা সুরু হল। বিভিন্ন জাতের বাছাই করতে লাগলেন রস্। আলাদা আলাদা পাত্রে তাদের পাড়ার ব্যবস্থা করে, সেই ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা বার করে তাদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করতে লাগলেন। বিভিন্ন জাতের মশা নিয়ে আ আলাদা রোগীকে আলাদা আলাদা করে কামড় খাওয়ানো লাগল। তখন দেখা গেল, বাস্তবিক অনেক জাতের মশাই ম্যালে কোন ধার ধারে না। অনেক কেন, কেবল একটি জাতের ছাড়া

[অ]ন্য জাতের মশাই নয়। ঐ বিশেষ একটি জাতের মশার মধ্যেই [কে]বল এই ভয়ঙ্কর জীবাণু পাওয়া যায়। এখানে আর একটা মজার [খব]র বলি। ম্যালেরিয়ার জীবাণু কিন্তু পাওয়া যায় শুধু মেয়ে মশার [শ]রীরে, পুরুষ মশায় নয়। পুরুষ মশারা সবাই সাত্ত্বিক প্রকৃতির—[নি]রামিষাশী। তারা কেউ রক্ত খায় না—খায় গাছের রস। পাতার রস [ফ]লের রস। যত হিংস্র হচ্ছে ঐ মেয়ে মশার দল।

১৮৯৭ সালে রস্ এই যুগান্তকারী তথ্য উদ্ঘাটিত করলেন [সে]কেন্দ্রাবাদের হাসপাতালে বসে। তারপর এ নিয়ে একটি তথ্যবহুল [প্র]বন্ধ পাঠিয়ে দিলেন বিলেতের এক বিখ্যাত ডাক্তারী পত্রিকায়।

কিন্তু এর পরেই দেখা দিল এক মস্ত বাধা। রস্ যে [ম্যা]লেরিয়া নিয়ে এই রকমভাবে সময় নষ্ট করছেন তাঁর এখানকার [সাম]রিক ওপরওয়ালারা তা কোনদিনই সুনজরে দেখেননি। তাঁরা [বোধ] হয় মনে করতেন এ সব নেহাৎই ছেলেমানুষী, রস্‌ও বোধ হয় [তাঁ]দের গ্রাহ্য করতেন না। ফলে, তাঁরা ভাবলেন—আচ্ছা, রোস; কি [ক]রে তোমায় শিক্ষা দিতে হয় তা আমরাও জানি। হঠাৎ তাঁকে এমন [এ]ক জায়গায় বদলী করে দেওয়া হল যেখানে ম্যালেরিয়া নিয়ে কাজ [কর]বার কোন সুবিধেই নেই। প্রবল প্রতিবাদ জানিয়ে রস্ নতুন [জা]য়গায় চলে এলেন; চাকরী ছেড়ে দেবার ভয়ও দেখালেন কিন্তু [কে]উ শুনবার নয়।

[এ]মনি তাঁর গুরু ম্যান্‌সন এলেন সাহায্যে। বিলেতে [চি]কিৎসক এবং বৈজ্ঞানিক মহলে তাঁর প্রভাব প্রচুর। আর এখানকার [সাম]রিক বড়কর্তারা এখানকার ... [তাঁ]দেরই চেষ্টায় বিলেত থেকে হঠাৎ হুকুম এল—রসকে যেন [অন্ত]ত ছ' মাসের জন্য ম্যালেরিয়ার বিশেষ গবেষক হিসাবে নিযুক্ত [ক]রা হয় এবং নিজের ইচ্ছেমত কাজ করতে দেওয়া হয়।

[আ]শ্চর্য খবর! রস্ নিজেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন [না।]

[যা]ই হোক, কলকাতার প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে [(এ]খন যাকে বলা হয় পি, জি, হাসপাতাল) রসের গবেষণার জন্য [বি]শেষ বন্দোবস্ত করে দেওয়া হল। সুসজ্জিত ল্যাবরেটরী, যন্ত্রপাতি, [কে]রানী, পিওন, মায় মশা জন্মাবার জন্য একটি পচা ডোবা [প]র্যন্ত। রস্ মানুষ ছাড়াও পায়রা প্রভৃতি পাখীর ওপর পরীক্ষা [চা]লাতে লাগলেন।

অবশেষে একদিন, এই কলকাতারই হাসপাতালে বসে [ম্যা]লেরিয়ার সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটন করলেন তিনি। কি করে [অ্যা]নোফিলিস্ নামে বিশেষ এক জাতের মশা রোগীকে কামড়ে রক্ত চুষে [নে]য় সেই রক্তের সঙ্গে ম্যালেরিয়ার জীবাণু মশার শরীরে চলে [আ]সে; তারপর কি করে তা ঐ মশার পাকস্থলীর দেয়ালে কোষের [ভে]তর গিয়ে আশ্রয় নেয়; কি করে সেগুলো সেখানে সংখ্যায় বাড়তে [থা]কে এবং নানা পরিবর্তনের পর টিসু আর শিরার ভিতর দিয়ে [অব]শেষে মশার বিষগ্রন্থির মধ্যে এসে জড় হয়, আর সেখান থেকে [লা]লার সঙ্গে হুলে গিয়ে ঢোকে। তারপর সেই হুল যার গায়ে [বি]দ্ধ হয় তারই দেহের রক্তে সংক্রামিত হয় ঐ ভয়ংকর রোগের বিষ। [সব] কিছু জলের মত পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করলেন তিনি।

সেটা ১৮৯৮ সাল। আজ থেকে ঠিক ষাট বছর আগে।

ইংল্যাণ্ডে যখন এই খবর পৌঁছল তখন বিজ্ঞানী-মহলে প্রচণ্ড [উত্তে]জনা দেখা দিল। চারদিকে জয়জয়কার পড়ে গেল রসের। কিন্তু, [আশ্চ]র্যের বিষয়, ভারতের সামরিক কর্তারা একটু কাষ্ঠহাসি হাসা [ছা]ড়া বিশেষ কোন গুরুত্বই দিলেন না ওর ওপর। এমন কি, [ম্যা]লেরিয়ার কারণ জানার পর, কি করে ঐ রোগ তাড়ানো যেতে [পা]রে এ সম্পর্কে রসের পরিকল্পনাও নাকি তাঁরা অবহেলার সঙ্গে [না]কচ করে দিলেন। অথচ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এ নিয়ে তুমুল সাড়া দেখা দিল। রস্ আর এমন জায়গায় চাকরী করতে রাজী হলেন না। চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে মাত্র ৪২ বছর বয়সেই পেন্‌শন্ নিয়ে চলে গেলেন ইংল্যাণ্ডে। সেখানে লিভারপুলে একটা অধ্যাপকের কাজ জুটিয়ে নেওয়া তাঁর পক্ষে কষ্টকর হল না। পরে তিনি সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রপিকাল মেডিসিনের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। এর পর তিনি এলেন লণ্ডনে এবং তারও পর তাঁকে করা হল সুবিখ্যাত রস্ ইন্‌স্টিটিউটের অধ্যক্ষ।

পরে অবশ্য রস্ তাঁর প্রাপ্য সম্মান পেয়েছিলেন। লণ্ডনের বিখ্যাত রয়্যাল সোসাইটির সদস্যপদ, রাজসম্মান হিসাবে 'নাইট' উপাধি এবং তার চেয়েও ঢের বড়—বিশ্বের অন্যতম সেরা সম্মান—নোবেল পুরস্কার।
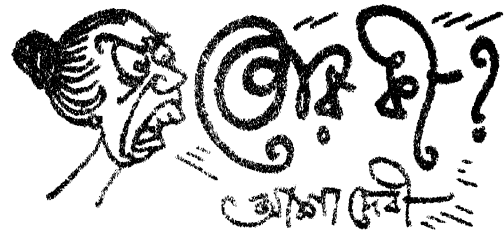
আমার ছেলের হাত কেটেছে—
 কাটুক না হাত—তোর কী!
উনি এলেন ওষুধ দিতে
 দরদ যত ওঁর কি!
ভেঙেছে আমার ক্ষেতের আগল
ঢুকেছে যদি দুমদো ছাগল
খায় যদি সে লাউয়ের ডগা
 তাড়াস কেন তোর কি?—তোর কী
তোদের বাড়ীতে আমার হাঁসে
 ডিম পেড়েছে—বেশ তো!
ডিম এনেছিস? নেই যে দোষ
 আদিখ্যেতার শেষ তো!
আমার ছাদে বানর এলে
কেন তাড়াস তোরাই ঢেলে
আসুক বানর খিঁচুক না দাঁত—
 নাচুক না সে চড়ুকি—তোর কি?
আমার গরু দড়ি ছিঁড়ে
 লাজ তুলে যায় পালিয়ে—
ধরতে তোকে চাকর পাঠাস?
 ভিটকিলেমি খালি এ!
সিঁদ কাটে চোর আমার ঘরে
 তোরা কেন মারিস ধরে—
দে ছেড়ে দে—এক্ষুণি ছাড়
 তোদের বাড়ীর চোর কি?—তোর কি?

ভগবান বুদ্ধ একদিন জেতবনবিহারে বসে আছেন। চারধারে শিষ্যমণ্ডলী। সব শান্ত, নীরব। এমন সময়ে বুদ্ধশিষ্য আনন্দ এসে বললেন, 'ভগবন। এক শ্রেষ্ঠী আপনার দর্শনপ্রার্থী।'

বুদ্ধ জিগ্যেস করলেন, 'কারণ?'

আনন্দ বললেন, 'কোন বিষয়ে তিনি আপনার উপদেশ লাভ করতে চান।'

'নিয়ে এস।'

আনন্দ চলে গেলেন এবং কিছু পরে শ্রেষ্ঠীকে বুদ্ধের সম্মুখে আনলেন।

শ্রেষ্ঠী এসে বুদ্ধের চরণে প্রণিপাত করে বললেন, 'ভগবন। একটি বিষয়ের জন্য আমি আপনার চরণে শরণ নিলাম।'

বুদ্ধ বললেন, 'বিষয়টি কি, বল।'

শ্রেষ্ঠী বললেন, 'ভগবন! আমার সাতঘড়া স্বর্ণমুদ্রা আছে। আমি নিঃসন্তান, বৃদ্ধ হয়েছি, এই ধনরাশির সদ্ব্যবহারে ইচ্ছুক। আপনি বলে দিন কিভাবে এই অর্থের সদ্ব্যবহার করতে পারি।'

শুনে বুদ্ধ মৃদু হাস্য করলেন। বললেন, 'তোমার কামনা কি? তুমি কিভাবে এই ধনরাশি সদ্ব্যবহারে ইচ্ছা করেছো?'

শ্রেষ্ঠী বললে, 'ভগবন! আমার ইচ্ছা আমি দীন-দরিদ্রকে পেটভরে খাওয়াই, বস্ত্র দান করি এবং যার ধনে প্রয়োজন তাকেও দান করি। এইভাবে লোকমধ্যে বিতরণ করে অর্থগুলির সদ্ব্যবহারে তাদের অভাব মোচন করি।

বুদ্ধের শান্ত মুখমণ্ডলে আবার হাসি ফুটে উঠলো। বললেন, 'শ্রেষ্ঠিন্! জগতে কোটি কোটি মানুষের বাস। তাদের অন্তরে অসংখ্য কামনা। তাই মানুষের অভাবের অন্ত নেই। তোমার এই ধন দ্বারা তার কতটুকু পূরণ হবে? দেখ, শরীর ধারণের জন্য প্রত্যহ খাদ্যের প্রয়োজন। তোমাকে প্রত্যহ তার আয়োজন করতে হয়। বস্ত্র কিছুকাল পরে জীর্ণ হয়ে যায়। আবার নূতন বস্ত্রের সংগ্রহের প্রয়োজন হয়। তোমার এই ধনরাশি দানে তার কতটুকু মিটবে?'

বুদ্ধ শান্ত দৃষ্টি মেলে শ্রেষ্ঠীর দিকে তাকালেন।

শ্রেষ্ঠী বললে, 'তবে আপনিই বলে দিন কাকে দান করলে এই ধনরাশির সদ্ব্যবহার হবে?'

বুদ্ধ ধীর, কোমল কণ্ঠে বললেন, 'দেখ, জগতে দুটি দান শ্রেষ্ঠ। তার একটি বিদ্যাদান। তুমি যদি বিদ্যাদান কর তাহলে যে তা গ্রহণ করবে সে উপকৃত হবে। আবার, ঐ দানে গ্রহিতা সমৃদ্ধ হয়ে অপরকেও বিদ্যাদান করবে। এইভাবে দানটি জনসমাজে ক্রমে বিস্তৃত হয়ে লোকের পরম কল্যাণের কারণ হবে।

'অপর দানটি স্বাস্থ্যদান। পণ্ডিত হোক, মূর্খ হোক, শিশু হোক, বৃদ্ধ হোক বাল্ধ হোক বা তরুণ হোক রোগাক্রান্ত হলে সকলেই অসহায়। সকলেই অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। স্বাস্থ্যহীন যে সে কর্মে অক্ষম। স্বাস্থ্য মানুষের চিত্তে আনন্দ, কর্মে উৎসাহ সঞ্চার করে। কাজেই বিদ্যায়তন, রোগমুক্তির আলয় নির্মাণে, ওই দুটির ব্যবস্থায় দান করলে ধনের সদ্ব্যবহার হয়।' বলে বুদ্ধ নীরব হলেন।

শ্রেষ্ঠী বললে, 'ভগবন! আপনার উপদেশ আমার শিরো আমি ঐ দুটি কর্মেই আমার স্বর্ণরাশি দান করতে চললাম।' বলে বুদ্ধের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে সানন্দে চলে জেতবনবিহারে তেমনি প্রশান্তি বিরাজ করতে লাগলো।

সিপাহী যুদ্ধের যুগ।—

মহারাজা কুমার সিংহ ইংরাজ সৈন্যদলকে প্রায় অবরুদ্ধ করে ফেলেছে। রাতারাতি একটা মাটির পাঁচিল তুলে দিয়ে তার পিছনে ইংরাজরা আত্মরক্ষা করছে বটে, কিন্তু ছোট্ট একটি টিলার উপর থেকে কুমার সিংহের সেনাদল সুবিধা পেলেই এমনভাবে গোলাবর্ষণ করছে যে, ইংরাজ বাহিনীর স্বস্তি নেই। পাঁচিলের পিছনে প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের শেষে কয়েকখানি বাড়ী, কিন্তু পাঁচিলের আড়াল থেকে বাড়ীর মধ্যে যোগাযোগ রাখা বিশেষ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে, উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ পার হবার চেষ্টা করলেই অব্যর্থ গুলির আঘাতে নিশ্চিত ধরাশায়ী হতে হবে। একজন সাহেব ও দুজন সিপাহী সে চেষ্টা করতে গিয়ে প্রাঙ্গণে ধরাশায়ী হয়েছে, তাদেরকে একপাশে সরিয়ে এনে শুশ্রূষা করার সুবিধাও হয়নি। কোথায় কেমন আঘাত লাগলো তাও দেখা গেল না। যে যাবে তাকেই আহত হতে হবে। সন্ধ্যার অন্ধকার না হওয়া অবধি কোন উপায় নেই। মাঝে মাঝে ওদের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে, কিন্তু সকলে বধির হয়ে বসে আছে পাঁচিলের আড়ালে, হাতে এক একটি বন্দুক।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে। তারপর টিলার উপর থেকে সট্ সট্ করে বন্দুকের গুলি ছুটে আসে। পিছনে বাড়ীর দেয়ালে এসে লাগে, এসে লাগে বন্ধ জানালার গায়। অজস্র গুলির দাগের সংগে আরো গুলির দাগ মিশে যায়। ওই বাড়ীগুলির পিছনেই কয়েকখানি কুটির, তারপর সবুজ শালবন। সেই শালবনের পানে তাকিয়ে মাঝে মাঝে সিপাহীদের মনে হয় দৌড়ে চলে যায় ওই শালবনে। ওখানে বন্দুকের বুলেট নেই, জীবনমৃত্যুর এতো ঝামেলাও নেই। কিন্তু যাবার কোন পথ নেই। সামান্য এই প্রাঙ্গণটুকু পার হওয়া আজ সারা জীবন পেরিয়ে যাবার মত। ওই শালবনের শান্ত স্তব্ধতা আজ স্বর্গবাসের মতই দুর্লভ।

সহসা প্রাঙ্গণে চাঞ্চল্য জাগলো। যে সাহেব এতক্ষণ আহত হয়ে প্রাঙ্গণে পড়েছিল, সে বোধ হয় এতক্ষণ অচেতন ছিল, এবার তার চেতনা এলো, চোখ মেলেই সে নিজের অবস্থাটা বুঝতে পারলো, একবার হাতে ভর দিয়ে সে উঠে বসলো, কিন্তু তখনই সট্ সট্ করে দুটি বুলেট এসে লাগলো তার পাশে ঘাসের উপর। সাহেব আবার শুয়ে পড়লো। তারপর সে গড়াতে গড়াতে এগিয়ে আসতে লাগলো পাঁচিলের দিকে। পাঁচিলের আড়ালে যারা ছিল, সকলের দৃষ্টি পড়লো সাহেবের পানে, রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে সকলে সাহেবের আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

ধীরে অতি ধীরে সাহেব এসে পড়লো পাঁচিলের কাছে। কয়েকজন সাহেব উল্লসিত হয়ে উঠলো, চীৎকার করে উঠলো—ব্রেভো, রিচার্ড! ব্রেভো!

তারা ছুটে এলো রিচার্ডের পাশে। রিচার্ডের ডানদিকে উরুতে গুলি লেগেছে। প্যান্টে ও মোজায় রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে। গুলিটি ভিতরেই রয়ে গেছে। কিন্তু তখন সেখানে অপারেশন করে গুলি বের করে দেওয়ার কোন কথাই নেই। কয়েকখানি রুমাল দিয়ে তাড়াতাড়ি ক্ষতস্থানটা বেঁধে দেওয়া হলো। রিচার্ড বললো—একটু জল দিতে পার, এক চুমুক জল খাব!

সেনাবাহিনীর মধ্যে জলেরই অভাব। প্রত্যুষে পাঁচিলের পাশে যখন তারা এসে বন্দুক ধরে দাঁড়িয়েছিল তখন জলের কথা কেউ ভাবেনি। রোদ যত বাড়ে জলাভাব ততো বেশী করে অনুভূত হয়। কিন্তু জল আনবে কে? জল আনবে কেমন করে? নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাবে কে? উন্মুক্ত প্রান্তরে শত্রুপক্ষের বন্দুক সদাই সজাগ আছে।

সট্ সট্ করে কয়েকটি গুলি এসে লাগলো বাড়ীর দেয়ালে। জানালার খড়খড়িতে গুলি লেগে ঝন্ ঝন্ করে উঠলো। সকলে সেদিকে তাকালো।

রিচার্ড সামনের সাহেবকে দেখে বললো—নিকল, একটু জল।

নিকলসন চারিপাশের সিপাহীদের মুখের পানে তাকালো। কাকে বলবেন জল আনতে। অবশ্য এখানকার কর্তৃত্ব তাঁর। সিপাহীরা তাঁর অধীনস্থ। যে হুকুম করবেন, তাই তারা পালন করতে বাধ্য। তবে যাকে পাঠাবেন তাকেই মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হবে। অবশ্য তখনকার দিনে একজন দেশী সিপাহীর মৃত্যু সম্পর্কে কোন সাহেবের মাথা ঘামতো না। কোন ভালো সাহেব ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরী নিয়ে সাতসমুদ্দুর তেরো নদী পার হয়ে এদেশে আসতো না। নিকলসনও ভদ্র সাহেব ছিলেন না। মানুষের প্রতি, বিশেষ করে ভারতীয়দের প্রতি তার দরদ ছিল না কিছুই। কিন্তু এই দুর্যোগের দিনে একজন সিপাহীরও বন্দুক ধরার দাম আছে, তাই তিনি কোন সিপাহীকে মৃত্যুর মধ্যে ঠেলে দিতে চান না। নাহলে তার কাছে আহত রিচার্ডকে এক চুমুক জল পান করাবার মূল্য যে কোন দেশী সিপাহীর জীবনের মূল্যের চেয়ে বেশী।

পাশে দুজন জমাদার দাঁড়িয়েছিল, নিকলসন তাদের পানে তাকিয়ে বললেন—জলের তো দরকার।

তখনকার দিনে যারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরী করতো তাদের কাজের কৃতিত্ব যতটাই থাক, তার চেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল খোসামোদ করার। যার স্তাবকতায় সাহেবরা যত বেশী খুসি হতো তার পদোন্নতি হতো ততো শীঘ্র, দু-চার টাকা বেতনও বাড়তো। তখন মোগল সাম্রাজ্য ভাঙার যুগ, সে যুগে দু'চার টাকার মূল্য বড় কম ছিল না, কারণ সে সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একজন সাধারণ দেশী সিপাহীর মাইনে দিত মাসিক সাত সাতটি টাকা। খোসামোদ করে উপরে উঠতে পারলে সেই মাইনেই শেষ পর্যন্ত ত্রিশ টাকায় গিয়ে পৌঁছাতো। সেই জন্য একদল খোসামুদে কর্মচারী সব সময়েই সাহেবদের পাশে পাশে থাকতো। নিকলসনের পাশেও ছিল। জমাদার রাজকিশোর বললো—এখনি আমি বলছি জল নিয়ে আসতে।

নিকলসন তখনই বললো—বলছি কেন? তুমি নিজে পার তো নিয়ে এসো। সব সময়েই একজনকে হুকুম করতে চাও কেন?

রাজকিশোর একবার নিকলসনের মুখের পানে তাকালো, একবার তাকালো কুয়ার পানে, তারপর বললো—বেশ হুজুর, আমিই জল এনে দিচ্ছি।

নিকলসন তৎক্ষণাৎ বললো—এইতো মরদের মত কথা। জল যদি আনতে পার, আমি তোমাকে পাঁচ রুপেয়া বকশিষ দেবো।

এক গেলাস জলের জন্য পাঁচ টাকা বকশিষ, এ-যে তাঁর সাত দিনের মাইনে! রাজকিশোরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। চলুক না
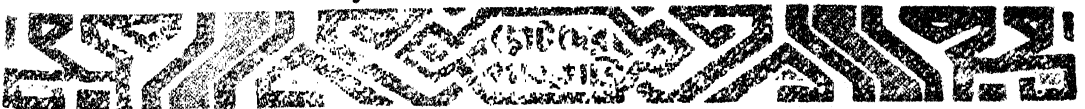
কত গুলি চলবে, ওর মধ্যে দিয়ে সে ঠিক জল নিয়ে আসবে। বললো—কিন্তু কিসে জল আনবো হুজুর?

নিকলসনের কাঁধে ঝুলছিল চামড়ার থলি, নিকলসন সেই থলিটা দিয়ে দিল রাজকিশোরের হাতে। রাজকিশোর থলিটা কোমরে বেঁধে নিলে। নিকলসনের কি যেন মনে হলো, বললো—সাবধানে যেও!

—ঠিক আছে হুজুর, আপনি ভাববেন না—বলে রাজকিশোর, হামাগুড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে কুয়াতলার দিকে অগ্রসর হলো। দশোজন সিপাহীর চারশো চোখের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো তার উপর।

কোন এক সময় লাইনের মধ্যে ফিস্‌ফিস্ করে সাড়া জাগলো—ভারী বোকা! সাহেব জল খাবে তার জন্য জীবন বিপন্ন করতে হবে? আমাদের সকলেরই তো তেষ্টা পেয়েছে, আমরা কি মানুষ নই?

—সাহেব বকশিষ দেবে!

—বেঁচে ফিরে এলে তবে তো বকশিষ!

—চুপ! চুপ! এসব কথা শুনলে তোকেই এখনি ফাঁসী দেবে!

সব স্তব্ধ হয়ে গেল। শুধু তাকিয়ে রইল রাজকিশোরের পানে।

রাজকিশোর অগ্রসর হলো। সামনে কুয়া, পিছনে দেয়াল, চারিপাশে ফাঁকা মাঠ। আরো পিছনে টিলার উপর কুমার সিংহের সৈনিকেরা বসে আছে, তাদের বন্দুক সজাগ, সট্ সট্ করে গুলি আসছে। এখনি হয়তো একটা গুলি এসে তাকে শেষ করে দেবে! অবশ্য সিপাহীদের জীবন এইভাবে মরার জন্যই। তবু কি যেন মনে হয়, অতি ধীরে ধীরে রাজকিশোর অগ্রসর হয়।

ওরা বোধ হয় রাজকিশোরের চলমান দেহটিকে দেখতে পায়। একটা গুলি এসে লাগে একেবারে রাজকিশোরের ডান হাতের পাশে। খানিকটা মাটির চাপড়া সট্ করে রাজকিশোরের হাতের পাশ দিয়ে চলে যায়। সে চমকে ওঠে,—গুলিটা কি তারই হাতে লাগলো নাকি! কয়েক লহমা সে স্তব্ধ অনড় হয়ে যায়। তারপর আবার চলতে সুরু করে।

কুয়াটা এবার অনেক কাছে এসেছে। আর একটু—আরও একটু! রাজকিশোর এসে পড়লো কুয়াতলায়। কুয়াটার ওপাশে সে ঘুরে গেল, কুয়ার পাড়ের আড়ালে সে উঠে বসলো। হাঁটুতে ধুলো লেগেছে, হাতে ধুলো লেগেছে। সেদিকে নজর দেবার মত অবসর রাজকিশোরের ছিল না। জলের থলিটা সে কোমর থেকে খুললো। তারপর মাথাটা তুলে সে দেখলো, কুয়ার পাশে লম্বা কাঠখানার সঙ্গে দড়ি দিয়ে একটি বালতি ঝুলছে। হাত বাড়িয়ে সেই দড়িটা সে ধরলো। ধীরে ধীরে নামিয়ে দিল, ধীরে ধীরে জল পূর্ণ হলো, রাজকিশোর জলের বালতিটা তুলে নিল, হাত কাঁপছে। প্রথমে জলের থলিটা ভরে নিল, তারপর বাকী জলটুকু আকণ্ঠ পান করলো। শরীরটা স্নিগ্ধ হলো। চোখেমুখে খানিকটা জল দিল। তারপর থলিটা কোমরে ঝুলিয়ে সে চারিপাশ দেখে নিয়ে আবার ফিরে আসার উদ্যোগ করলো।

কুয়ার আড়াল থেকে বেরিয়েই পূর্ণোদ্যমে রাজকিশোর হামা দিয়ে ছুটলো, পাঁচিলের দিকে। খানিকটা আসতেই সামনে পড়লো, দুজন সিপাহী পড়ে আছে। ওরা জল আনতে এসেই গুলি খেয়েছে। রাজকিশোরকে দেখেই একজন মাথা তুললো, বললো—জল, একটু জল দাও!

—না না, আমি জল দিতে পারবো না।—রাজকিশোর তাড়াতাড়ি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে হামা দিয়ে এগোলো। কিছুটা গিয়েই রাজকিশোরের কি যেন মনে হলো, একবার মুখ ফিরিয়ে তাকালো, লোকটা তখনও মাথা তুলে দেখছে। রাজকিশোরের মনে হলো, সে মুখকে সে চেনে। কে? কে? এবার মনে হলো, ও যে তারই সঙ্গী, বাদশা বাহাদুর শাহের বাহিনীতে ওরা দুজনে যে এক সঙ্গে কাজ করেছে। ওর নাম বোধ হয় রামলাল,—হাঁ, রামলাল সিং!

রাজকিশোর থামলো। ফিরলো। তাড়াতাড়ি এলো। রামলালের মাথার কাছে এসে পড়লো। রামলাল চোখ বুজেছে। রাজকিশোর ডাকলো—রামলাল! রামলাল।

রামলালের মাথাটা সে তুলে ধরলো, বললো—জল খাবে, জল এনেছি!

রামলাল চোখ চাইল, হাঁ করলো। রাজকিশোর তার মুখে জল দিল। জল মুখের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো। রাজকিশোর তার মুখে খানিকটা জলের ছিটে দিল, কিন্তু রামলালের দিক থেকে আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। নিরুপায়ভাবে রাজকিশোর কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল রামলালের মুখের পানে।

সট্ সট্ সট্ সট্!

এক ঝাঁক গুলি এসে পড়লো রাজকিশোরের চারিপাশে। রাজকিশোর সচকিত হয়ে উঠলো। আবার সে চলতে সুরু করলো পাঁচিলের পানে।

সট্ সট্ সট্!

রাজকিশোর আর হামাগুড়ি দিতে সাহস পেল না। দাঁড়িয়ে উঠে একবারে দৌড় দিল। এক ছুটে এসে পড়লো পাঁচিলের সিপাহীদের মাঝে। সবাই এক সঙ্গে কোলাহল করে উঠলো—জিতা রহো! সাবাস!

নিকলসন এগিয়ে এলো, বললো—দাও, জল দাও!

রাজকিশোর জলের থলিটা এগিয়ে দিল।

নিকলসন রিচার্ডের কাছে গেল, বললো—এই নাও, জল খাও।

রিচার্ড হাঁ করলো। নিকলসন থলি ধরলো তার মুখে—জল কই, জল তো নেই!

জল নেই! থলি দেখে নিকলসন ক্ষেপে গেল। চোখমুখ লাল করে হাঁক দিল—জমাদার!

—হুজুর!

—পানি কাঁহা?

রাজকিশোর বিহ্বল হয়ে পড়লো—জল নেই!

—আমাদের সঙ্গে দিল্লাগি, সব জল তুমি ওই কুত্তাকে খাইয়ে এলে আমার সঙ্গে দিল্লাগি করতে?

'কুত্তা' মানে আহত রামলাল। তখনকার দিনে সিপাহী যুদ্ধের আমলে একজন ইংরাজের কাছ থেকে এর চেয়ে ভদ্রতা সিপাহীরা আশা করতো না। কুত্তা, হারামজাদা, এই গালি ছিল অতি সাধারণ কথার মাত্রা মাত্র।

রাজকিশোর কিছু বলার আগেই, নিকলসন বললো—তুম নিকাল্ যাও, ওকে বের করে দাও এখান থেকে।

আর দুজন জমাদার পাশেই ছিল, রাজকিশোরের হাত থেকে বন্দুকটি কেড়ে নিয়ে, তারা বললো—যাও!

—কোথায় যাব?

নিকলসন বললো—পাঁচিলের ওদিকে ওকে ফেলে দাও, এখানে ওর স্থান নেই।

জমাদার দুজন রাজকিশোরকে বাগিয়ে ধরে পাঁচিল টপকে ওপাশে ফেলে দিল। রাজকিশোর এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াতেই, সামনের টিলা থেকে এক ঝাঁক গুলি এসে পড়লো। রাজকিশোর তখনই ঘুরে পড়ে গেল। সিপাহী যুদ্ধের অগণ্য মৃত্যু সংখ্যার সঙ্গে আরেকটি মৃত্যু যোগ হলো।
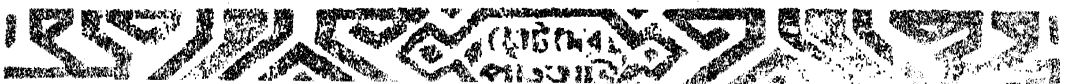
তোমাদের মধ্যে যারা লেখ, মানে—গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি লেখা যাদের সখ, এ গল্প তাদের জন্যেই লেখা; আর যারা লেখ না তাদেরও পড়া দরকার এই জন্যে যে, এ থেকে লেখক না হয়ে তারা কিছু অন্যায় করেনি তা ভাবতে পারবে। গল্পটা বলি এখন শোন :

আমি তখন এক কলেজে পড়াই আর সাহিত্য করি। সাহিত্যিক হিসাবে আমার বেশ নাম হয়েছে, অনেক কাগজেই আমার লেখা ছাপা হয়, অনুরোধও আসে অনেক জায়গা থেকে। কাগজের বিশেষ সংখ্যাগুলিতে আমার লেখা থাকবেই থাকবে। মানে, আমি তখন বেশ নামকরা লেখক হয়ে গেছি আর কি! ছোটখাটো নতুন লেখকরা আমার কাছে আসে লেখা ছাপিয়ে দেবার জন্যে সুপারিশ করার জন্যে সম্পাদকদের কাছে। অনেকের ধারণা যেহেতু আমি বড় লেখক, আমার অনুরোধ সকলেই রাখবেন।

এই সময় এই লেখা নিয়ে একটি প্রাক্তন ছাত্রের সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায়। অসাধারণ অধ্যবসায়ী ছেলে, কিন্তু সে কেবল এই সাহিত্যের ব্যাপারে। গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা অনবরত লিখে যাচ্ছে আর নতুন কিছু একটা লিখলেই এসে হাজির হয় আমার কাছে। মাঝে মাঝে আমি বিরক্ত হয়ে বলিও : 'প্রণব, তুমি কাজকর্মের চেষ্টা করো, দিনরাত সাহিত্য নিয়ে পড়ে থাকলে ভবিষ্যতে বিপদে পড়বে।' প্রণবদের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না বলে এই অনর্থকরী কাজ থেকে তাকে ভিন্নমুখী করার জন্যে আমি মাঝে মাঝে শক্ত কথাও দু' একটা বলতুম। কিন্তু কে কার কড়ি ধারে!—যথা পূর্বং তথা পরম্! সে দু'চারদিন গা-ঢাকা দিত, তারপর আবার যথানিয়মে লেখা নিয়ে এসে হাজির হ'ত। মনে মনে এই অধ্যবসায়কে অবশ্যই আমি তারিফ করতুম, কিন্তু মুশকিল হত লেখা ভাল বললে। কোনটাই লেখাও যে তার ভাল ছিল না তা নয়, কিন্তু ভাল বললেই উত্তেজিত হয়ে উঠত, আর তার সঙ্গেই উঠত ছাপিয়ে দেবার অনুরোধ। এই ব্যাপারটিকেই আমি ভয় করতুম সব চেয়ে বেশী।

একবার একটি গল্পের একটু বেশী প্রশংসা করায়, প্রণব একটি সাপ্তাহিক কাগজের নাম করে ধরে বসল : 'স্যার বড় সাধ আপনি দয়া করে ঐ কাগজে আমার এই লেখাটি ছাপিয়ে দেন। আপনার ওপর সম্পাদকের তো খুবই খাতির আছে, আপনার কথা তিনি নিশ্চয়ই ঠেলবেন না।'

ছেলেটি যাকে বলে একেবারে নাছোড়বান্দা। অনেক রকমের আবদারই শিক্ষকদের করতে হয় ছাত্রদের জন্যে; কাজেই এ ব্যাপারে অনুরোধ আমি রক্ষা করবই স্থির করলুম। তা ছাড়া যে লেখাটি ছাপার জন্য ওর এই আগ্রহ, সে লেখাটি ঐ কাগজে ছাপলে কাগজের মানহানীর কোন সম্ভাবনা ছিল না। একদিন আমি প্রণবকে সঙ্গে নিয়ে, সেই কাগজের অফিসে গিয়ে, সম্পাদকের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিলুম। লেখাটির প্রকাশন করে ছাপবার জন্যও অনুরোধ করলুম আন্তরিকভাবে। সম্পাদক মশাই যথেষ্ট খাতির-যত্ন করলেন এবং হেসে বললেন, 'আপনি যখন বলছেন তখন আর কথা আছে! তাছাড়া ভাল লেখা আমরা নিত্য পাচ্ছি কোত্থেকে বলুন?'......

এরপর সম্পাদকের সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার দেখা হলেও, ও-প্রসঙ্গ আমি আর তুলিনি কোনদিন। প্রণব বার কয়েক লেখাটি বেরুচ্ছে না বলে অভিযোগ জানালেও, আমি তাকেই গিয়ে সম্পাদককে তাগিদ দিতে বলেছি—নিজে আর কিছু করতে পারিনি।

এরপর আবার সময়ের চাকা গড়িয়ে গেছে অনেক দূর, মন থেকে মুছে গেছে ও-কথা। প্রণবও আসেনি আর। তার সেই লাজুক নম্র মুখখানি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে বহুদিনের অদর্শনে।

সাহিত্যিক হিসাবে একটু নাম হলেই তার সঙ্গে এসে দেখা দেয় আর এক উৎপাত—সভাপতিত্ব করা। একবার এমনি এক মিটিং-এর ব্যাপারে আমায় যেতে হয় পাটনায়। ভোরের দিকে ষ্টেশনে নেবে আমাকে যাঁদের নিতে আসার কথা তাঁদের খুঁজছি, এমন সময় সুট-পরা স্মার্ট-লুকিং এক ভদ্রলোক হঠাৎ এসে পায়ের ধুলো নিয়ে হাসি হাসি মুখে সামনে দাঁড়াল।

আমি চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনি কি আমায় নিয়ে যেতে এসেছেন?'

তিনি বললেন, 'আপনি আমায় চিনতে পারেননি স্যার—আমি প্রণব।'

প্রণব!—একটু ভাবতেই মনে পড়ে গেল সাত-আট বছর আগের সেই প্রাক্তন ছাত্র-লেখক প্রণবের কথা। আমি তাকে জড়িয়ে ধরে বললুম, 'প্রণব, তোমার চেহারা একেবারে বদলে গেছে কিন্তু—চেনবার জো নেই!—তা এখন করছ কি?'

উত্তরে প্রণব বললে, 'আমি স্যার এখানে একটি বিলেতী ফার্মের ম্যানেজার।'

যে বিলেতী ফার্মের নাম করল সে, তার ব্রাঞ্চ-ম্যানেজারের মাইনে যে সাত-আটশ' টাকার কম নয়, তা সহজেই অনুমান করে নিয়ে, আমি হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে বসলুম, 'তা তোমার সেই লেখাটেখার সখ আর নেই?'

—ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন স্যার, সে সখ ত্যাগ করতে পেরেছিলুম বলেই তো এই চাকরি! আপনার মনে আছে বোধ হয় সেই সাপ্তাহিক কাগজে লেখা ছাপানোর ব্যাপারটা? দেড় বছর ঘুরেছিলুম সেই লেখা ছাপাবার জন্যে। বার বার নিরাশ হয়ে হয়ে ধিক্কার এসে গিয়েছিল নিজের উপর। ধুত্তোর বলে চিরদিনের মত যা কিছু লেখাপত্তর ছিল পুড়িয়ে দিয়ে, চাকরির চেষ্টায় মন দিয়েছিলুম। এই কাজ তারই পরিণতি। এদিক থেকে ঐ কাগজের সম্পাদকের উপর আমার কোন রাগ দুঃখ নেই স্যার—তিনি আমার ভালই করেছেন। আপনি যেমন আমার শিক্ষা-জীবনের গুরু, তিনিও তেমনি আমার কর্মজীবনের গুরু—দেখা হলে তাঁকেও আমার প্রণাম দেবেন।

কথাটা প্রণব রহস্য করে বলল কিনা ভাববার আর অবকাশ ছিল না; ইতিমধ্যে আমাকে নিতে লোক এসে গিয়েছিল। আমি হাঁটতে হাঁটতে তাদের সঙ্গে প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে পড়লুম। বিদায় নেবার আগে প্রণব আর একবার পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, 'আবার দেখা হবে স্যার।' *

* সত্য ঘটনা হিসাবে খ্যাতনামা সাহিত্যিক [illegible] কাছ থেকে শোনা।

পরীরাও নামে এই মর্ত্যে। মৃত্যুর সময় নাকি দূত আসে মানুষের আত্মাকে নিয়ে যেতে। এরকম গল্প প্রায় সব দেশেই প্রচলিত আছে। যারা ধার্মিক ও মহৎ তাদের জন্য ঈশ্বর দূত পাঠান স্বর্গ থেকে, আর যারা অসৎ অধার্মিক তাদের নিয়ে যেতে আসে যমের দূত। স্বর্গ থেকে যে সব দূত আসে, তাদের জ্যোতির্ময় সুন্দর মধুর মূর্তি, আর যমদূতদের নাকি অতি ভয়ংকর ভয়াবহ চেহারা। যাই হোক এই ধরনের একটি ঘটনা আমি শুনেছি আমার এক নিকট আত্মীয়ার কাছে। আমার আত্মীয়াটি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মশীলা, সেবাব্রতিনী এবং সত্যবাদিনী। তিনি নিজের চক্ষে যেমন দেখেছিলেন এবং ঘটনাটি যেমন আমার কাছে বলেছিলেন আমি ঠিক সেইভাবেই তোমাদের কাছে কাহিনীটি বলছি শোন :—

প্রথমেই কল্পনা করো—পাহাড়ের গায়ে একখানি ঝকঝকে সুন্দর বাড়ী। তার চারদিকে বিরাট কালো আর ধূসর রং-এর পাহাড়, আশেপাশে ঘন পাইনের বন আর ইউক্যালিপটাস গাছ। দূরে পাহাড়ের উপর চূড়ার মাঝোমাঝে রূপোর পাতের মত বরফ পড়ে থাকে। সেই বাড়ীর সামনেই একটি ছোট্ট বাগান। বাগানে নানা রঙের ফুলের ফোয়ারা ছড়ান। ছোট ছেলেমেয়েরা এখানে সকাল বিকাল খেলা করে বেড়ায়।

নভেম্বর মাস থেকে এই পাহাড়ে বরফ পড়া সুরু হয়। এই বাড়ীটিতে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক থাকেন, তাঁর স্ত্রী ও পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে। কাছে পিঠে আরও অনেক বাড়ী আছে, দু' একঘর [illegible] সবাই প্রায় বাঙ্গালী। সকলেই সরকারী চাকুরে।

ডিসেম্বর মাস প্রায় শেষ হতে চলেছে, বরফে চারিদিক ঢাকা। এমনি একটি কনকনে শীতের রাতে পাহাড় অঞ্চলের এই বাড়ীটিতে মা তাঁর ছোট্ট দুটি ছেলেমেয়েকে দু'পাশে নিয়ে লেপ কম্বল চাপা দিয়ে ঘুমিয়ে আছেন। ঘরের সব জানলা দরজা বন্ধ, শুধু সিলিং-এর উপর থেকে মাঝ বরাবর দেওয়াল পর্যন্ত মস্ত একটি জানলা। জানলাটি খুব কাঁচের। জানলার মাঝখানে একটি মোটা দড়ি বাঁধা আছে, দড়িটি একটি বড় লোহার হুকের সঙ্গে বাঁধা। খোলবার জন্য দড়িটি [illegible] দেওয়া হয়, আর বন্ধ করতে হলে দড়িটা খুলে দিতে হয়। একে বলে 'স্কাই লাইট' বা আকাশের আলো। সত্যিই তাই, এই জানলা দিয়ে শুধু আকাশ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। আলো-বাতাস আসার জন্যই এই ব্যবস্থা।

সেই রাত্রে স্কাই-লাইট দিয়ে হঠাৎ একটা হুস্ করে দমকা হাওয়া আসতেই মায়ের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চেয়ে দেখেন কি স্কাই-লাইট দিয়ে দুটি অপূর্ব সুন্দর পরী ঘরের মধ্যে এসে ঢুকছে। তাদের শরীর থেকে যেন চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ছে —আকাশও যেন আলোয়-আলো হয়ে গেছে!

পরী দুটি তাদের সাদা ধবধবে ডানা মেলে ক্রমে জানলা থেকে নেমে মায়ের মুখের সামনে এগিয়ে এলো।

মহিলাটি তখন ভয়ে চোখ বন্ধ করে, তাড়াতাড়ি তাঁর দুটি ছেলেমেয়ের গায়ে দুটি হাত রাখলেন, পাছে ছেলেদের কোন ক্ষতি হয়; তারপর আধবোজা চোখে দেখতে লাগলেন পরীরা কি করে।

দুটি পরী তাঁর দু'দিকে এসে ভাল করে তাঁর মুখখানা দেখল একবার, তারপর তারা দু'জনেই এক সঙ্গে বলে উঠল : 'এ-নয়। এ-নয়!'

তাদের গলার স্বর এত মিষ্টি যে তার তুলনা হয় না। মহিলাটি যতদিন বেঁচেছিলেন সে মধুর স্বর তিনি ভুলতে পারেননি। যাক্ তারপর কি হল বলি :

পরী দুটি যেমন এসেছিল ঠিক আবার সেই রকমভাবে স্কাই-লাইট দিয়ে হুস্ করে হাওয়ায় ভেসে আকাশে মিলিয়ে গেল।

এইবার মহিলাটি চোখ খুলে ভাল করে চারিদিক চেয়ে তাঁর স্বামীকে ডেকে বল্লেন, 'শীগগীর উঠে এস, আমি বড্ড ভয় পেয়েছি।'

স্বামী শুয়েছিলেন সেই ঘরেই। তিনি ধড়মড়িয়ে উঠে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিসের ভয়?'

মহিলাটি সব তাঁর স্বামীকে বললেন।

স্বামী শুনে বল্লেন, 'ও কিছু না, তুমি স্বপ্ন দেখেছো!'

স্ত্রী বল্লেন, 'না না, তা হতেই পারে না—মোটেই স্বপ্ন নয়, আমি সজ্ঞানে স্পষ্ট দেখেছি।'

রাত প্রায় ভোর হয়ে এসেছিল। স্বামী-স্ত্রীর কথার মাঝে হঠাৎ তাঁদের বাড়ীর দরজায় কড়া নড়ে উঠল।

তারপরেই চাকর এসে খবর দিলে যে, 'বাবু, জ্যোতিবাবু আপনাকে এখনি ডাকছেন, তাঁর মা হঠাৎ মারা গিয়েছেন।'

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি ওভার-কোট গায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

মহিলাটি ভাবতে লাগলেন : তবে কি পরী দুটি জ্যোতিবাবুর মার আত্মাকে নিয়ে যেতে এসেছিল। এবং ভুলক্রমে আমাদের বাড়ীতে ঢুকে আমাকে দেখে বললে, 'এ-নয়! এ-নয়!'

নিশ্চয় স্বর্গের দূত এরা—কারণ, এই জ্যোতিবাবুর মা ছিলেন অত্যন্ত ধর্মশীলা ও মহীয়সী মহিলা। বেশীর ভাগ সময় তিনি ঈশ্বরের সাধন-ভজন নিয়ে থাকতেন আর বাকি সময়টা কাটাতেন সংসারের কাজকর্মে ও সকলের সেবা যত্ন করে।

আমারও মনে হয়, ঈশ্বর তাঁর প্রিয় সন্তানকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবার জন্যে তাঁর দূতদের পাঠিয়েছিলেন। মহিলাটি যা দেখেছিলেন তা অলৌকিক হলেও স্বপ্ন নয়, সত্য।

আমার যাদুজীবনে পৃথিবীর নানাদেশ পরিক্রমা করে দেশ-বিদেশের ছেলেমেয়েদের সান্নিধ্যে এসে যে সামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তার থেকে এই সব কথা বলতে যাচ্ছি। আমাদের দেশে যেমন বড় বড় পত্রিকাতে ছোটদের বিভাগ খোলা হয়েছে—বিদেশে অনেক বড় বড় পত্রিকাতেও ঐরূপ শিশু-বিভাগ আছে। আমাদের যেমন 'স্বপনবুড়ো' আছেন—ওদেরও তেমনি এক-একজন 'কাকাবাবু' আছেন, দাদুমণি আছেন বা গল্পবুড়ো, গল্পদাদু আছেন। ছেলে-মেয়েদের জন্য জাপানে সব চাইতে বেশী এবং উন্নত ধরণের 'ছোটদের মহল' আছে দেখেছি। তারা ছোটদের জন্য যে সমস্ত চমৎকার মাসিক পত্রিকা বের করেন আমাদের দেশের ছোটদের বার্ষিকীর চাইতেও সেগুলি মহামূল্যবান জিনিষে সমৃদ্ধ। আমি ছেলেমেয়েদের ভালবাসি, যুগান্তর পাততাড়ির সভ্য-সভ্যাগণ আমার খুবই প্রিয়—স্বপনবুড়ো আমার বিশেষ বন্ধু আর আমি তার খুবই অনুরক্ত। কাজেই যেখানে এই সব কথা যুগান্তর পাততাড়িতে লিখে জানাই। ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া সব জায়গা থেকেই আমি আমার লেখা 'যুগান্তর পাততাড়ি'তে পাঠিয়েছি।

কিছুদিন আগে আমি যখন অষ্ট্রেলিয়ায় ছিলাম তখন ওদেশের পত্রিকায় ছোটদের মহলের সঙ্গে আমার খুবই ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার দুইজন নামজাদা সাংবাদিক একজন (Uncle John) জন কাকা, অপরজন (Uncle B0b) বব কাকা নামে পরিচিত এঁরা ছোটদের বিভাগ পরিচালনা করেন। এদেরও সভ্য সংখ্যা হাজার হাজার (অবশ্য পাততাড়ির সভ্যদের মত অত দুই লক্ষ নয়)। এরা ছোটদের আনন্দ দানের জন্য নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার করে থাকেন। ওদেশে আমি যখন খেলা দেখাচ্ছিলাম—তখন করাত দিয়ে মানুষ কাটার খেলাটা খুবই হুলস্থূলের সৃষ্টি করেছিল। একদিন ওদেশের দু'টা খুব বিখ্যাত পত্রিকার তরফ থেকে 'জন কাকা' আর 'বব কাকা' এসে হাজির হলেন—তাঁরা করাত দিয়া মানুষ কাটার খেলা দেখাবেন। আমার রঙ্গমঞ্চে একদিন দিনের বেলায় আমরা যখন 'রিহার্সাল' দিচ্ছিলাম তখন তাঁরা আমাকে বললেন যে, তাঁদের পাততাড়ির সভ্যদের জন্য তাঁরা আমার বৈদ্যুতিক করাত দিয়ে এই খেলা করবেন। ওদেশের পাততাড়ির ছেলেমেয়েরা জিজ্ঞাসা করেছিল যে 'জন কাকা' কি ঐ খেলা দেখাতে পারেন? 'জন কাকা' কিন্তু আমাদের স্বপনবুড়োর মতনই সবজান্তা, তিনি দুনিয়ার সব কিছুই কর্তে পারেন—যেন তিনিও একজন 'সুপারম্যান'। তিনি সব কিছুর উত্তর দিয়ে দেন, সব কাজ কর্তে পারেন—দুনিয়ার সব কিছুর খবর রাখেন আর এই বৈদ্যুতিক করাত দিয়ে মানুষ কাটার খেলা দেখাতে পারবেন না, এটা অসম্ভব! একদিন তিনি সত্যি সত্যি এটা দেখাবার জন্য এলেন। 'বব কাকা' টেবিলের উপর শুয়ে পড়লেন, আমার [illegible] মেয়ে সহকারী তার মাথা ধরে রইলো, আমি পাশে দাঁড়িয়ে মজা দেখছি আর 'জন কাকা' আমার করাত ধরে বব কাকাকে কাটতে গেলেন। যেই বনবন করে করাত ঘুরতে আরম্ভ করলো—দুজনেই ভয়ে অস্থির, আর কাটা হল না!!! ওদেশের পত্র-পত্রিকার লোকেরা ছবি তুলে নিয়ে গেল—আর বড় বড় চার কলমব্যাপী সংবাদ বের করা হল 'জন কাকা বব কাকাকে করাত দিয়ে প্রায় দু'টুকরা করে ফেলছিলেন'। Uncle John nearly cut me in half—uncle B0b' ওদেশের কাগজে যখন এই ছবিটি ছাপা হল ছোটদের মহলে তখন কি বিরাট উত্তেজনা। সবাই ভুলে গেল যে জন কাকা বা বব কাকা এ খেলা দেখাতে জানেন না। পি সি সরকারের টেবিলের উপর বব কাকাকে শুইয়ে রেখে জন কাকা সেই বৈদ্যুতিক করাত দিয়ে কেটে ফেলছিলেন,—পি সি সরকারের স্টেজে তাঁর সঙ্গে (অকাট্য প্রমাণসহ) ছবি তাদের কাগজে বের হয়েছে, আর কি চাই। ভেবে দেখ, আজ যদি নিউ এম্পায়ার স্টেজে স্বপনবুড়ো পি সি সরকারের করাত কাটার টেবিলের উপর মৌমাছিকে শুইয়ে রেখে দুই টুকরা করে কেটে দেন—তখন 'যুগান্তর পাততাড়ি' আর 'আনন্দমেলা'র সভ্য-সভ্যারা তাদের পাতায় এই বিরাট ছবি দেখে যেমন কৌতূহল বোধ করবে, মজা পাবে, এও ঠিক সেই রকম। সেদিনের এই ব্যাপার শুধু পত্রিকায় সংবাদ ও ছবিতেই শেষ হয় নাই। ওদেশের রেডিয়োতে এই ব্যাপারের বিস্তারিত কথা 6IX (বানানটাও লক্ষ্য করার মত—ছোটরা এতেও মজা পায়) প্রোগ্রামে ফলাও করে প্রকাশ করা হয়। সব দেশের ছেলেমেয়েরাই মজার মজার ব্যাপারে আগ্রহশীল। ছোটখাট মজার জিনিষের ভিতর দিয়া নির্মল আনন্দ দান আর শিক্ষা দেওয়া এটাই হচ্ছে সকলেরই লক্ষ্য। সব দেশের গভর্ণমেণ্টও এই জাতীয় প্রচেষ্টায় সব রকম সহায়তা করে থাকেন—রেডিও টেলিভিশন কোম্পানীও খুবই সহায়তা করে থাকেন।

ছোটকালে যখন মন অনুভূতিপ্রবণ, অনুকরণশীল থাকে যখন চরিত্র গঠন করা এবং ভবিষ্যতের কাঠামো তৈরী করার প্রয়োজন হয় তখন এই জাতীয় আন্দোলন খুবই সহায়তা করে। এতে আত্ম-প্রত্যয়, জাতীয়তাবোধ, কর্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণ অতি সহজেই আসে। তাই ত দেশে দেশে আজ এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ ছোটদের আন্দোলন দেখা যায়।

ছোটরা পৃথিবীর সব দেশেই এক। জাপানে-আমেরিকায় ইংলণ্ডে-ফ্রান্সে কোন দেশেই ছোটদের মনের তফাৎ নেই। সবাই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, সবাই দেশকে, নিজের জাতিকে বড় দেখতে চায়, দুঃখীকে সাহায্য করতে চায়—অন্যায়কে ঘৃণা করে। অসম্ভব অলৌকিক জিনিষ দেখলে সবাই অবাক হয়। তাইত আমরা পৃথিবীর সকল দেশে যাদুবিদ্যা দেখিয়ে এত আরাম পাই। গানবাজনার একটা অসুবিধা আছে—ভাষা জানা না থাকলে বা জনৈদেশীয় ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত না থাকলে অন্য দেশের আদব-কায়দা এমন কি নাচ

পর্যন্ত ভাল না লাগতে পারে। তাই ইংরাজী গান বা ইংরাজী নাচ হয়ত আমাদের কানে ও চক্ষে ভাল নাও লাগতে পারে কিন্তু যাদুবিদ্যা সর্বদেশে সমানভাবে আদৃত। করাত দিয়ে মানুষ কেটে জোড়া লাগান হলে লণ্ডন, নিউইয়র্ক, টোকিও, কলিকাতা, সিডনি হংকং সব জায়গাতেই সমানভাবে বিস্ময় সৃষ্টি করে। তাইত যাদুবিদ্যা আজ পৃথিবীর সমস্ত দেশে সমস্ত সমাজে আধিপত্য করতে পেরেছে। এই অদ্ভুত অলৌকিক ব্যাপার আর তার গল্প পৃথিবীর সকল দেশের ছেলেমেয়েদের মনে আনন্দের খোরাক জোগায় —সেজন্যই রূপকথার গল্প ব্যাঙ্গমা বেঙ্গমী, সোনার কাঠি, রূপার কাঠি, মায়াবী আয়না, পিটার প্যান, সিণ্ডারেলা প্রভৃতি পৃথিবীর সব দেশের ছেলেমেয়েদের মনে আনন্দ জোগায়। ছেলেমেয়েরা ভালবাসে বিষ্ণুশর্মার গল্প, ভালবাসে যখন সোনার পাখী, হাঁস-মুরগী, বানর, দৈত্যদানব কথা বলে। যখন ধর্মের জয় হয়, অধর্মের নিধন হয়। রামায়ণ মহাভারত ভাল লাগে তাতে অলৌকিক ঘটনার প্রাচুর্য আছে—যেখানে হনুমানের কথা, ইন্দ্রজিতের মেঘের আড়ালে যাওয়ার কথা, সোনার হরিণের কথা অবাস্তর মনে হয় না। সেখানে একটা সম্মোহন বানে সমস্ত কৌরব সৈন্য ঘুমিয়ে পড়ে—একালের জনতা সম্মোহনেরই মত।

ছেলেরা যখন একটু বড় হয়, স্কুলে বড় বড় বই পড়তে থাকে—কলেজে যায়, তখন এই সব দৈত্যদানা, রাজপুত্র, পক্ষীরাজ ঘোড়া, হীরার গাছ, মতির ফুল বিশ্বাস করতে চায় না। তখন তারা 'প্রাক্টিক্যাল' হয়ে পড়ে, স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করতেই চায় না কিছুই। 'ম্যাজিক' তখনও তার আধিপত্য নিয়ে আছে। জগতের যা কিছু অসম্ভব, যা কিছু অবিশ্বাস্য, যাদুবিদ্যার সাহায্যে সেই সবই দেখানো হয়। লোকদের চোখের সামনে ঘড়ির সময় পরিবর্তন হয়, আমের আঁঠি পুঁতে ফলসহ আমগাছ তৈরী হয়, দড়ি বেয়ে লোক শূন্যে উঠে, মানুষ কেটে জোড়া দেয়, চক্ষের সামনে মোটর গাড়ী অদৃশ্য হয়, চারিদিক থেকে জ্বলন্ত-জীবন্ত নরকঙ্কাল (ভূত) আবির্ভূত হয়, অদৃশ্য মানুষের মত হয়ে যাদুকর রঙ্গমঞ্চ থেকে তিন তলায় চলে যান—এসব দেখে শিক্ষিত সমজদার লোকেরাও অবাক হতে থাকেন!

পৃথিবীর সব দেশের ছেলেমেয়েরাই অবাক হয়ে যাদুকরের খেলা দেখেন, পৃথিবীর সব দেশের ছেলেমেয়েরাই 'অটোগ্রাফ' বই নিয়ে তাতে তাদের প্রিয়জনের (hero)র 'সহি' রাখতে চায়। একদিন অন্য সবাই এদের মত তাদেরও 'সহি' নেবার জন্য ভীড় করবে, তারাও বড় হবে—পৃথিবীখ্যাত হবে, এটা সবাইর ইচ্ছা। ভবিষ্যতে উন্নতি করবো, বড় হবো, পৃথিবী-খ্যাত হবে—দেশবিদেশ ঘুরে মান-সম্মান পাবে—দেশের উন্নতি করবো—এটাই ত সকলের মনোগত ইচ্ছা। এই ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করতেই দেশবিদেশের ছেলে-মেয়েরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে—আর করবেও চিরকাল। ছোটদের জয় হোক।
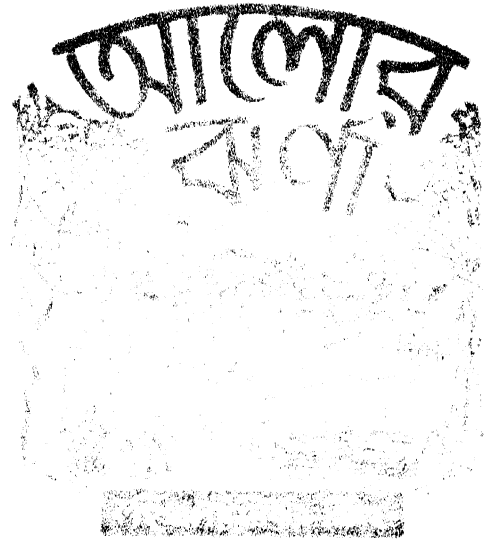
সোনালী আলোর ওই ঝর্ণা......
শরতের নীলাকাশে
আজ মৃদু মৃদু হাসে
খুশির আবেশে গান ধর্ না।
দুষ্টুমি হাসি হাসে রুন্দুর,
—ডেকে বলে যাবি ভাই কন্দুর?
পাখীরা মধুর গানে
বলে যায় কলতানে
: সুদূরে আকাশে যাবো,—আর্ না
ডাকিছে আলোর ওই ঝর্ণা॥

গাছের শাখায় ফুল নৃত্যে
মৃদু মৃদু ছন্দে
আজি কী আনন্দে
শিহরণ দোলা দেয় চিত্তে।
খুশির তপন আজ জাগ্‌লো,
মনের আকাশে রঙ্ লাগ্‌লো;
শরতের এ প্রকৃতি
জাগায় মধুর স্মৃতি
—মন বলে আনন্দ কর্ না,
ডাকিছে আলোর ঐ ঝর্ণা॥

শরতে শারদা এলো বঙ্গে,
অর্চনা করি তাঁর
বলি আজি বারে বার—
: দুর্গতি নিয়ে যা মা সঙ্গে।
তুই মা জননী-দেবী যার,
কেন গো আহার নেই তার?
কেন এতো ম্লান মুখ—
কেন দেশে নেই সুখ?
: বাঙ্গালীর দুখভার হর্ না........
আন্ মা আশিস-আলো-ঝর্ণা॥

[এই গল্পটি বিজাপুরের সুলতান আলি আদিল শাহ এবং বিজয়নগরের রাজা রামরাজার প্রীতি বন্ধনের কাহিনী। ঘটনাটি ষোড়শ শতাব্দীর হিন্দু-মুসলমান নৃপতির অপূর্ব মিলন ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের চিত্র।

ষোড়শ শতাব্দীতে বিজাপুরের সুলতান ছিলেন আলি আদিল শাহ। রাজত্ব করেন ১৫৫৭-১৫৬৪ সাল পর্যন্ত। তাঁর আদর্শ ছিল 'আলি এন্ ওয়ালি আল্লা' আলি ঈশ্বরের বন্ধু। আলি মানুষ মাত্রকেই ভালবাসিতেন। সবার উপরে মানুষ সত্য এ বিশ্বাস লইয়া করিতেন রাজ্যশাসন।, ভালবাসিতেন ছোট-বড় সকল প্রজাকে. তাহারাও ভালবাসিত সুলতানকে। সুলতানের ন্যায়পরায়ণতা ও মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হিন্দু-মুসলমান সকল প্রজারা তাঁহাকে করিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি।

আলি আদিল ছিলেন মহা পণ্ডিত ব্যক্তি। নানা-শাস্ত্রে ছিল তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান। শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন নানা দেশের বিখ্যাত মোলানা ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের নিকট। সংস্কৃত সাহিত্যেও তাঁহার জ্ঞান ছিল। ধর্মবিশ্বাসে ছিলেন তিনি সুফি। আচার ব্যবহারে ছিলেন কোয়ালান্দার অর্থাৎ সংসার ত্যাগী ফকিরের মত। খাদ্য ছিল অতি সাধারণ। তাঁহার বিরাট রাজপ্রাসাদে কোনরূপ জাঁকজমক ছিল না। কোনরূপ বিলাস তাঁহার ছিল না। আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং আরবী অক্ষরে লেখাপড়া করিতেন।

আলি আদিল শাহ যখন সিংহাসনে বসিলেন তখন দুই-হাতে বিলাইলেন বিপুল অর্থ আকাশ হইতে যেমন বৃষ্টির ধারা ঝরিয়া পড়ে, তেমনি তাঁহার অর্থ সৈন্যদের বিজ্ঞ মৌলবি মোলানা ও হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের, কবিদের, দরিদ্র প্রজাদের এবং শিক্ষার জন্য বিলাইয়া দিয়াছিলেন দুই-হাতে। তাঁহার পিতা সুলতান ইব্রাহিমের রাজ-ভাণ্ডারে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ছিল সঞ্চিত,—আলি আদিল নদীর স্রোতের ধারার মত সেই অর্থ বিলাইয়া দিয়াছিলেন রাজ্যের বিবিধ কল্যাণ কার্যে। ফকির দরবেশ ও রাজ্যের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করিতেন। সর্বদা তাঁহার চিত্ত ছিল প্রসন্ন, ধর্মে, বিবিধ সৎকার্যে কোন জাতিবর্ণ বা হিন্দু-মুসলমান বলিয়া কোন প্রভেদ ছিল না—মানুষকে ভালবাসাই ছিল তাঁর ধর্ম।

দীন দরিদ্রের কুটিরে পণ্ডিত মৌলবির গৃহ-অঙ্গনে ছিল তাঁর অবাধ গতি। দেশ-বিদেশের জ্ঞানী পণ্ডিতেরা আসিতেন তাঁর দরবারে! রাজ্য, সিংহাসন, অর্থ, বীরত্ব গৌরব প্রভুত্ব বিভব কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না। রাজ্য শাসনের বিচারের ভার ছিল শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, আইনজ্ঞ ব্যক্তিদের উপর। তাঁহারাও অতি সুন্দরভাবে এই সুধু সত্যনিষ্ঠ ধার্মিক সম্রাটের আদর্শে ন্যায়-পরায়ণতার সহিত করিতেন রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা।

অনেক সময় সম্রাটকে দেখা যাইত তাঁহার মন্ত্রী ও সভাসদ-গণের গৃহে, আশ্চর্য হইতেন সকলে সুলতানের এইরূপ বিনয়-নম্র ব্যবহারে। ঘন্টার পর ঘন্টা চলিত আলাপ ও আলোচনা, বিদায়কালে সুলতান বলিতেন : ক্ষমা করবেন আপনারা, আমি অযথা বাক্যালাপ করে আপনাদের অনেকটা সময় নষ্ট করেছি। এমনি ছিল সুলতানের সৌজন্য। এইরূপ ব্যবহারের জন্যই তিনি রাজ্যের লোকের চিত্ত জয় করেছিলেন। মন্ত্রী, উজীর ও অন্যান্যদের বলিতেন—আসুন আমরা এমন কাজ করি, যাতে দেশের হয় পরম মঙ্গল, নিরক্ষর প্রজারা পায় শিক্ষা, ধন-ভাণ্ডারের অর্থের হয় সদ্ব্যবহার। আবার আমাদের দেখা হবে। তখন জনহিতকর বিবিধ বিষয়ের আলোচনা করবো।

সুলতানের বদান্যতা, মধুর আচরণ, ন্যায়পরায়ণতার কথা দিকে দিকে প্রচারিত হইয়া গেল! আশ্চর্যই মানুষের মন আশে-পাশের অনেক রাজারা মনে করিতেন, আদিল শাহ পাগল নইলে এমন করিয়া রাজ-ঐশ্বর্য প্রভুত্বকে হেলা করে! এই সব অর্বাচীন রাজারা মাঝে মাঝে তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্যদল পাঠাইতে লাগিলেন—কিন্তু বিচক্ষণ আলি আদিল নিকটবর্তী কয়েকজন প্রতাপশালী নৃপতিদের সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব-প্রধান ছিলেন সেকালের বিজয়নগরের শক্তিশালী নৃপতি রামরাজা। তাঁহার দলে অন্য কোন দেশের নৃপতিরাই তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হইতে পারে নাই। এইভাবে দুই প্রতিপত্তিশালী রাজার সহিত হইল বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ।

—দুই—

এসময়ে সংবাদ পাইলেন সুলতান, রামরাজার প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। এই শোক-সংবাদ পাইয়া মর্মাহত হইলেন আলি আদিল শাহ এবং বিজয়নগরের রাজা রামরাজার নিকট দূত পাঠাইয়া পত্র দিলেন : আপনার পারিবারিক দুঃসংবাদে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। আমার একান্ত ইচ্ছা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আমার শোক-বেদনা প্রকাশ করি। আশা করি ইহাতে আপনার কোন আপত্তির কারণ হইবে না। আপনার বন্ধুত্বপ্রার্থী...

—আলি আদিল শাহ

সদাশয় রামরাজা মহা সন্তুষ্ট হইয়া উত্তর দিলেন :

ভ্রাতা! আপনি আমার সাদর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। রাজ্যের জনসাধারণ এবং আমার পরিবার পরিজন সকলে আপনাকে সাদরে আহবান করিতেছে। আসুন সুলতান! সুস্বাগতম্! •
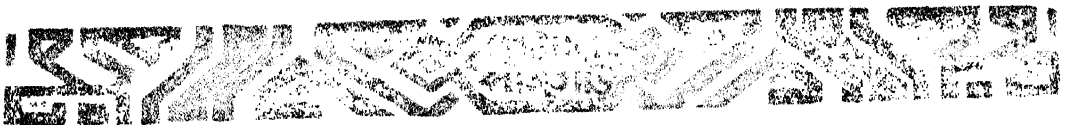
রামরাজা রাজ্যের সর্বত্র প্রচার করিয়া দিলেন সুলতানকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আয়োজন করিতে। রাজ্যের সকলে আশ্চর্য হইল একি কথা। বিজাপুরের সুলতান আসিবেন বিজয়নগরে! এমন অভাবনীয় ঘটনা ত কখনও হয় নাই।

বিজয়নগর নানাভাবে সুন্দর সাজে সজ্জিত হইল। কোথাও যেন সামান্য ত্রুটিও না হয়, সেরূপ ব্যবস্থা করিলেন রামরাজা। কদলীতরু রাজপথের দুই পাশে শোভা করিল। পূর্ণকুম্ভ আম্র পল্লবে শোভিত হইল! পুষ্পসজ্জায়, আলোকমালায় সজ্জিত নগরী ধারণ করিল অপূর্ব শোভা। রামরাজার আদেশে রাজপথ, তোরণ, বাজার, উদ্যান, ফুলসাজে নানা বর্ণের পতাকায় হইল শোভিত। সৈন্যদল নব সাজে রণবেশে সাজিল। নাগরিক নাগরিকারা পরিল নব নব বিবিধ বর্ণের সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ। ধরায় যেন হইল নূতন গৌরবোজ্জ্বল নগরের সৃষ্টি। নহবৎ হইতে বাজিতে লাগিল কত বাঁশী, কত বাজনা।

এইভাবে অপরূপ রূপ সজ্জায় সজ্জিত নগরতোরণে আনন্দ-ধ্বনির মধ্যে আসিলেন সদলবলে মহা প্রভাবশালী মহানুভব সুলতান আদিল—নগর হইতে একটি তোরণ সন্নিধানে।

তুঙ্গভদ্রার তীরে বিস্তৃত সমতল ভূমিতে বিরাট মণ্ডপ তলে সুলতানকে রামরাজা ও তাঁহার সভাসদগণ, রাজ্যের প্রধানগণ করিলেন সাদর অভ্যর্থনা। তুঙ্গভদ্রা নদী বহিয়া চলিয়াছিল কল কল ছল ছল রবে, প্রবল উচ্ছ্বাস ভরে শিলার পর শিলার বুকে লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সে কি কলরোল। চারিদিকে শ্যামল তরুলতাগুল্মে সজ্জিত শোভিত পর্বত শ্রেণী! দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন সুলতান।

রামরাজা অবশেষে আসিলেন রাজবেশে সজ্জিত হইয়া হীরা-মণি কাঞ্চন শোভিত রাজমুকুট পরিয়া—অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বিরাট সৈন্যদল ও প্রধান প্রধান মন্ত্রী, সভাসদ বেষ্টিত হইয়া সুলতানকে জানাইতে তাঁহার সাদর সম্ভাষণ। হাত বাড়াইয়া দিলেন সুলতানের দিকে, প্রীতি নমস্কার জানাইয়া সুলতানও হাত বাড়াইয়া দিলেন, তারপর দুইজনে গাঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন। সুলতান শোক-জ্ঞাপক কৃষ্ণবর্ণ পোষাকে সজ্জিত হইয়া রামরাজাকে তাঁহার পুত্র বিয়োগের শোকে জানাইলেন অতি করুণ কণ্ঠে সমবেদনা।

তারপর রাজপ্রাসাদে বসিল এক বিরাট দরবার। রাজপ্রাসাদের দরবার গৃহও অতি সুন্দর রূপ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছিল। অভ্যর্থনা সঙ্গীত গীত হইল। তারপর সুলতান আদিল সঙ্গে করিয়া যে মূল্যবান পরিচ্ছদ আনিয়াছিলেন তাহা রামরাজাকে পরাইয়া দিলেন এবং দুইজনে আবার দৃঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন। দুইজনে নানা প্রীতিকর সৌহার্দসূচক আলাপ-আলোচনা হইল—সুলতান রামরাজাকে ষোল লক্ষ মুদ্রা দিলেন উপহার—সঙ্গে দিলেন হীরা-মণি-মুক্তা। হস্তী, অশ্ব, উট এবং তাহাদের মূল্যবান সাজসজ্জার উপযোগী পোষাক দিলেন। মিশর, ইটালি, চীন দেশের রেশম বস্ত্র ও অন্যান্য মূল্যবান রত্নমালা—উপস্থিত সকলের চক্ষু ঝলসিয়া গেল! এমন একটি মূল্যবান হীরক আদিল দিলেন রামরাজাকে যাহার ওজন ছিল আঠারো 'মিসকোয়াট'।

রামরাজা শোকবিহ্বলচিত্তে করুণ কণ্ঠে কহিলেন, "সুলতান, আপনার মাতা—এ রাজ্যের রাণীমাতা আপনাকে সুমঙ্গল বার্তা জানাইতে ইচ্ছুক! এ উপলক্ষে রাজ মহিলারাও আপনাকে দেখিয়া আনন্দ পাইবে।

আদিল সম্ভ্রম শ্রদ্ধার সহিত রাণীমাতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া ধীরে ধীরে চলিলেন রাজঅন্তঃপুরে—সুসজ্জিত সুন্দর অলিন্দ পথে—শঙ্খ বাজিল, লাজ বর্ষিত হইল, রাজঅন্তঃপুরে-মালিনীরা পুষ্পমালা-পুষ্পগুচ্ছ তাঁহার অঙ্গে নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

অন্তঃপুরের দরবারকক্ষে একখানি স্বর্ণখচিত সিংহাসনে রাজ-পুরনারীরা রাজকুমারীরা এবং পুরমহিলারা পরম আদরে সুলতানকে সিংহাসনে বসিতে বলিলেন। রাণীমাতা ছিলেন রাজস্থানের বিখ্যাত নরপতি অজিত সিংহের বংশোদ্ভব-তেজস্বিনী মহিলা।

রাণীমাতা রাণীর বেশে নব সাজে সজ্জিত হইয়া আদিলের কাছে আসিয়া তাঁহার ললাটে পরাইয়া দিলেন চন্দন তিলক, শিরে দিলেন ধান্য-দূর্বার মঙ্গল আশীর্বাদ। তারপর রাণীমাতা সুলতান আদিলের পারিবারিক কুশল, রাজ্যের মঙ্গল সংবাদ প্রভৃতি নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন—পুত্র, আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তোমরা দুই ভাই অগ্রজ ও কনিষ্ঠ একসূত্রে মন বাঁধিয়া ভারতের কল্যাণ কর, হিন্দু-মুসলমানের প্রীতির বন্ধন কর দৃঢ়বন্ধ। সাধন কর ঐক্যমন্ত্র। তুমি একথা নিশ্চয় জেনো—তোমার বিপদে তোমার দাদা তোমাকে সাহায্য করবেন, আর আমাদের আপৎকালেও তোমার সাহায্য ও সহযোগিতা রাজ্যের বিপদ করবে দূর। তুমি নিশ্চয় জেনো, আমার স্বামী (রামরাজা) তাঁর প্রতিজ্ঞা হতে কখনও ভ্রষ্ট হবেন না। আলি আদিল বলিলেন—'মা, তোমার আদেশ, তোমার স্নেহের আশীর্বাদ সে যে আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আমি যতদিন বেঁচে থাকবো, অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো জননী তোমার এ অনুরোধ বাক্য।

বিদায়কালে রাণীমাতা সুলতানকে উপহার দিলেন মূল্যবান মণি-রত্নখচিত স্বর্ণ নির্মিত বিবিধ উপহার এবং একখানি সুবৃহৎ স্বর্ণ থালা মণি-মুক্তা, হীরা-জহরৎ মরকত মণি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া দিলেন সুলতানের হাতে তুলিয়া!

সুলতান নতমস্তকে গ্রহণ করিলেন সেই দান। তারপর রাণীমাতা পুত্রস্নেহে আদিলকে তাঁহার দেওয়া পোষাক পরাইয়া শিরশ্চুম্বন করিয়া আবার আশীর্বাদ করিয়া বলিলেনঃ—বৎস, তোমার কল্যাণ হউক।

আদিল সাহেব রাণীমাতার এইরূপ স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে বিচলিত হইলেন। কোমল প্রাণ সুলতান বলিলেন—'জননী, তুমি পুত্রহারা হয়েছ বলে দুঃখ করো না। মা আমি তোমার পুত্র। অমনি আদিল শাহের দুই চক্ষু বাহিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল।

রাণীর নয়ন যুগলও অশ্রুসিক্ত হইল।

এইভাবে সমাদর ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া আলি আদিল রাজঅন্তঃপুর হইতে আবার রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া চলিলেন। আগেরই মত শঙ্খ বাজিল, পুষ্পমালা বর্ষিত হইল। বাজনা বাজিল।

—তিন—

আলি আদিল যখন নিরাপদে তাঁহার বিশ্রাম স্থানে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গিগণ, সভাসদগণ ও সৈন্যগণ তাঁহার নিরাপদে পৌঁছার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। তাঁহারাও রাজ্যের দীন-দুঃখীদের মধ্যে অর্থ বিতরণ করিলেন। বিদায়ের প্রাক্কালে মহানুভব নৃপতি রামরাজা এবং রাজ্যের প্রধানগণ উপস্থিত হইয়া আলি আদিলের আমির-ওমরাহদের মধ্যেও পদমর্যাদা অনুরূপ মণি-মাণিক্য উপহার মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছদ দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যতদিন পর্যন্ত আলি আদিল শাহ বিজয়নগরে ছিলেন—ততদিন কেবল যে রামরাজাই সুলতানের ব্যবহারে মুগ্ধ এবং মূল্যবান যৌতুকে সম্মানিত হইয়াছিলেন, তাহা নহে—বিজয়নগরের এমন

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

[ফটো—[illegible]]
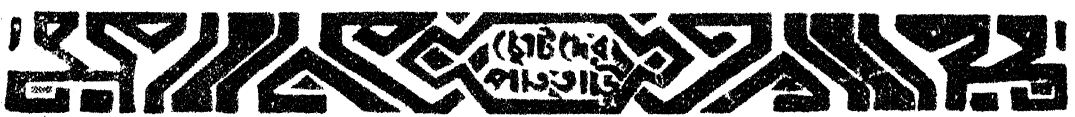
আমার চেহারাটা দেখেই তোমরা খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠোনা যেন!

আমারও একটা ইতিহাস আছে—একটা জীবন কাহিনী আছে। তাই আজ তোমাদের জানাবো।

তোমরা অনেকে বলে থাকো যে, সকালবেলা আমার নাম নিলে নাকি খাওয়া জোটে না। সেটা যে কত বড় ভুল—এ বৈজ্ঞানিক যুগে কি সে কথা নতুন করে বলতে হবে? পৃথিবীর সব কিছু জন্তু-জানোয়ার, কীট-পতঙ্গ ভগবানের তৈরী। তার থেকে অকারণ কাউকে দোষারোপ করা নীচু মনের পরিচায়ক। যাদের মন উদার,—সারা ভুবনের প্রাণী—তাদের কাছে আপনার জন।

সেই একটি আপনজনের কথা তোমরা আজ শুনে রাখো।

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

একটি দীন প্রজাও ছিল না যে সুলতানের দান হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। বিজাপুরের ধন ভাণ্ডার মুক্ত হইয়াছিল। এ কয়দিনও তাহার অন্যথা হয় নাই।

বিদায়েরকালে রামরাজা ও আদিল শাহ পরস্পর আলিঙ্গন-বদ্ধ হইলেন রাজোচিত মর্যাদা সহকারে। আদিল শাহ বলিলেন—দাদা! আমায় আশীর্বাদ করিবেন। রামরাজা উত্তর দিলেন—তুমি যে আমার ভাই সুলতান।

ভাই ভাইয়ে কি কখনও বিভেদ হতে পারে। উভয়ের প্রতিশ্রুতি উভয়ে পালন করিয়াছিলেন। সে কথা ইতিহাস পাঠক-মাত্রেরাই জানেন।

আমার জন্ম হয়েছিল কোথায় জানো? মথুরার সেই বিখ্যাত যমুনার ঘাটে। আমি যখন খুব ছোট—সেই সময় মথুরা সহরে দারুণ বন্যা হয়। আমি যমুনা নদী থেকে উঠে—হাঁটিতে হাঁটিতে অনেক দূরে গ্রামের পথে চলে গিয়েছিলাম। এক শ্রেষ্ঠী আমায় কুড়িয়ে নিয়ে তার বাড়ীর ছোট পুষ্করিণীর মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন। সে আজ পাঁচশ বছর আগের কথা।

তোমরা শুনে হয়ত আঁৎকে উঠছ। পাঁচশ বছর আবার কারো বয়েস হয় নাকি? কচ্ছপের বয়েস পাঁচশ বছর থেকে আটশ বছর পর্যন্ত হতে পারে। সেই শ্রেষ্ঠী একটি তামার কবচ আমার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে শ্রেষ্ঠীর নাম আমার বয়স সব কিছু লেখা ছিল।

মথুরার সেই শ্রেষ্ঠীর পুকুরে আমি মাত্র কুড়ি বছর ছিলাম। তারপর সেই শ্রেষ্ঠী আমায় নিয়ে গিয়ে অবশ্য যমুনার জলে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

শ্রেষ্ঠী কিছুদিন বাদেই মারা গিয়েছিলেন—আর সেই যমুনার তীরেই তাকে দাহ করা হয়েছিল।

এইবার আমার কথাটা তোমাদের কাছে বলে নি। আমি ত মহা-নন্দে মথুরার যমুনায় ঘুরে বেড়াই। নানা দেশ থেকে এসে কত যাত্রী যমুনার ঘাটে খাবার ছড়িয়ে দেয়। সেই সব রোজ খেয়ে খেয়ে আমার শরীর আরো ভালো হয়ে উঠল।

এরই মধ্যে যে কত বছর কেটে গেল তার আর কোনো হিসেব নেই।

আমার গায়ে শ্যাওলা জমে গেল। সে শ্যাওলা কত [illegible]
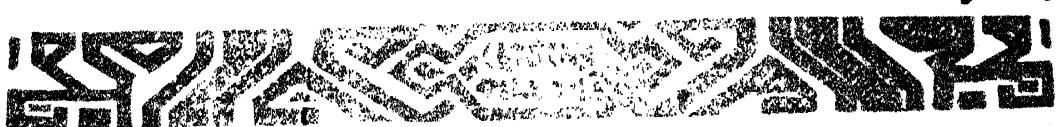
পুরোনো সেটা ঠিক করতে হলে বড় বড় নামজাদা পণ্ডিতের প্রয়োজন হবে।

এমন সময় আমেরিকা থেকে এলো এক বিশ্ব-ভ্রমণকারী। এই টুরিস্ট যখন মথুরা শহর দেখতে গেল—যমুনা তীরে আমায় দেখে ওর ভারী পছন্দ হয়ে গেল।

যমুনার জল থেকে কচ্ছপ ধরার ত কোনো নিয়ম নেই। কিন্তু সেই বিশ্ব-ভ্রমণকারী চালাক মানুষ। একটা জেলেকে প্রচুর টাকা ঘুষ দিয়ে আমায় ধরে ফেল্লে। আমিও ভাবলাম, দেখা যাক না—মজাটা কতদূর গড়ায়। না হয় আমেরিকাই ঘুরে আসব।

সেই টুরিস্ট লোকটা আমার গলায় সেই কবচ দেখে কাকে দিয়ে পড়িয়ে যেন আমার বয়েস ঠিক করে ফেল্লে। মথুরার শ্রেষ্ঠীর লাগানো সেই কবচ তখনো আমার গলায় ঝুলছিল। শ্রেষ্ঠী মরে গেছে কবে—কিন্তু তার লাগানো আমার সেই পরিচয় কবচ অক্ষয় হয়ে আছে!

এই খবরটা জনসাধারণের মধ্যে চালু হতে হৈ-হৈ রৈ-রৈ পড়ে গেল।

খবরের কাগজে আমার বিবরণ দিয়ে ছবি ছাপা হল। সবাই দাবী জানালো ভারতবর্ষের এই পুরোনো জন্তুটিকে কিছুতেই আমেরিকায় যেতে দেয়া হবে না।

কাগজে কাগজে আন্দোলন।

আমার ব্যাপার নিয়ে বিরাট মিছিল বের করা হল—ভারতবর্ষের নানা শহরে। সেই মিছিলের পুরোভাগে শোভা পেতে লাগলো আমার ছবি।

কেমনা কোনো জ্যোতিষী খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখে বসল। আমিই নাকি আদি ও অকৃত্রিম কূর্মঅবতার।

আমার দর্শন করবার জন্যে কেবলি ভীড় বাড়তে লাগল। একদল সন্ন্যাসী জুটে গেল—তারা আমার নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করবে।

প্রচুর টাকা উঠতে লাগলো চারদিক থেকে। আর একদল স্বার্থ-সন্ধানী ব্যক্তি গুজব ছড়িয়ে বেড়াতে লাগল যে, আমার পিঠের খোলাধোয়া জল খেলে সকল রকম রোগ-বালাই সেরে যায়।

উন্মাদ রোগ, যক্ষ্মারোগ, বাত রোগ, চোখের ব্যামো, কিছু আর থাকবে না। মামলা জেতা যাবে আমার পিঠের খোলাধোয়া জল খেলে।

এই সংবাদ যখন ছড়িয়ে পড়ল—তখন উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম থেকে মিছিল করে নানা জাতীয় লোক এসে মথুরার আশে পাশে ভীড় জমাতে লাগলো।

হেঁটে, গরুর গাড়ীতে করে, মোটরে, ট্রেণে, নৌকায়, বিমানে ক্রমাগত শুধু মানুষ ছুটে আসছে। শুধু কালো কালো মাথা।

মহামারী সুরু হয়ে গেল সেই অঞ্চলে।

তখন সেই মহামারী দূর করবার জন্যে নানা 'সেবা-সংঘ', 'সেবক সমিতি' প্রভৃতি আসতে লাগল অষুধ-বিষুধ, ইনজেকশান প্রভৃতি নিয়ে। বিরাট এক মেলা যেন দিন রাত্তির গম্ গম্ করতে লাগলো। খালি কালো মাথা চারিদিকে, আর কিছু চোখে পড়ে না! মনে হতে লাগলো ত্রিভুবন এইখানে এসে সমবেত হয়েছে। মানুষ মরতে লাগলো পোকার মত।

অবশেষে সরকারের টনক নড়ল। জিপে চড়ে সরকারী কর্মচারীর দল এসে হাজির হল সেই অঞ্চলে। এত পুলিশ পাওয়া যাবে কোথায় যে সবাইকে গ্রেপ্তার করে? মহা বিভ্রাট! সে জায়গা ছেড়ে কেউ নড়তে চায় না।

তখন সরকার বাহাদুর আমায় উদ্ধার করে নিয়ে এলেন আলিপুর চিড়িয়াখানায়।

আমি এখন বহাল তবিয়তে সেইখানেই বসবাস করছি।

ছোটবেলায় মার মুখে শুনেতাম একটা ছড়া। বেশ ম পড়ে। ভুলিনি।
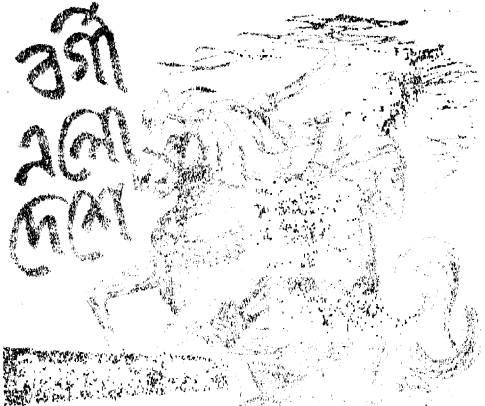
কি হবে গো, কোথা যাবো গো বর্গী এলো দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে।।

বর্গীর খাজনা। খাজনাই বটে। পরে জেনেছি ঐ খাজনার আসল নাম হচ্ছে বর্গীর চৌথ।'

বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব আলীবর্দী খাঁ সা উড়িষ্যার বিদ্রোহ মিটিয়ে মনের আনন্দে যখন আবার এক এক পা করে রাজধানীর পথে ফিরে আসচেন। যুদ্ধ শেষ হয়ে বেশীর ভাগ সৈন্যদেরই ছুটি দিয়ে দিয়েচেন—তারা সব রাজধা মুর্শিদাবাদ ফিরে গিয়েছে। এমন সময় মেদিনীপুরে পৌঁছে এ দুঃসংবাদ পেলেন।

পঞ্চকোটের পার্বত্য পথ দিয়ে চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী সৈ নাকি বর্ধমানের পথে বাংলার দিকে আসচে। তাদের দলপ মহারাষ্ট্রীয় বীর সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত।

রঘুজী ভোঁসলার হুকুমে নাকি তারা বাংলাদেশে চৌথ আ করতে আসচে।

খবরটা পেয়েই নবাবের ত মাথাটা ঘুরে গেল। কিন্তু মু সেটা প্রকাশ করলেন না তিনি। এবং পাছে তার অধীনস্থ লোকে ভয় পায় তাই বললেন, বেশ ত আসুক না। তরোয়াল দিয়ে কে কুচি-কুচি করে কামান দেগে উড়িয়ে দেবো।

কিন্তু মুখে যাই তিনি বলুন না তাড়াতাড়ি সৈনা-সাম নিয়ে তিনি বর্ধমানের দিকেই ছুটলেন। বর্ধমান পৌঁছে শুনতে তাঁর আসবার আগেই নাকি দুর্ধর্ষ বর্গীর দল বর্ধমান লুঠতর করে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েচে নবাবের আসবার খবরটা ব সর্দার আগেই পেয়েছিল তারা চট্‌পট কিছু দূরে সরে গেল।

তারপর দুই দলে হলো শুরু যুদ্ধ। প্রত্যহ ভোরবেলা দ পক্ষ যুদ্ধ শুরু করে তারপর সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলেই যে য শিবিরে আশ্রয় নেয়। এইভাবেই কিছুদিন চললো।

বুদ্ধিমান বর্গী সর্দার ভাস্কর পণ্ডিত দেখলো, এভাবে যু চলতে থাকলে কেউ কাউকে পেরে উঠবে না সহজে তাছাড়া লোক মরবে। তাই সে মনে মনে কিছু টাকা আদায় করে সরে পড়ব মতলবে নবাবকে বলে পাঠালো, দশ লক্ষ টাকা পেলেই তা বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাবে।

নবাব আলীবর্দী ভাস্করের ঐ প্রস্তাবে সম্মত হওয়া অপম বোধ করলেন। তাই তার প্রস্তাবে তিনি কানই দিলেন না।

ফলে আগের মতই দু দলে যুদ্ধ চলতে লাগলো।

বর্গীদের যুদ্ধ নীতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ছোট ছোট ঘোড়ায় চড়ে তারা যুদ্ধ করতো। আড়াল থেকে অতর্কিতে তারা শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বিপক্ষকে বিপর্যস্ত করে তুলতো। যে যুদ্ধকে বলা হয় গেরিলা যুদ্ধ। বাংলাদেশের সৈন্যরা আবার ঐ যুদ্ধ নীতিতে অভ্যস্ত নয়। কাজেই নবাব ঠিক করলেন তার সমস্ত সৈন্য বাহিনী নিয়ে এবারে তিনি বর্গীদের আক্রমণ করবেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য নবাব জানতেন না যে ইতিমধ্যে তার সৈন্য দলের মধ্যে এদেশের চিরন্তনী বিশ্বাসঘাতকতায় ভাঙ্গন ধরেছিল। তার অধীনস্থ আফগান সেনাপতিরা বেঁকে বসেছে।

যা হোক পরদিন, তো নবাবের পূর্ব কল্পনা মতো যুদ্ধ শুরু হলো। চারিদিক থেকে নবাব বর্গীদের আক্রমণ করলেন। নিজে অশ্বপৃষ্ঠে থেকে সৈন্যদের চালনা করতে লাগলেন, সেদিনের যুদ্ধে তার আদেশ ছিল, ভারবাহীর দল ও ভৃত্যরা সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করবে না। ফলে যুদ্ধ যখন প্রচণ্ডভাবে চলছে শত্রুদের আক্রমণের ভয়ে ঐ সব ভৃত্যরা ও ভারবাহীর দল নবাবের আজ্ঞা অমান্য করে যে যেদিক থেকে পারলো হুড়মুড় করে গিয়ে সৈন্যদের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়লো, ফলে ঐ সব অকর্মণ্যদের ভিড়ে সৈন্যরা থমকে দাঁড়িয়ে গেল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে পঙ্গপালের মত হাজার হাজার বর্গীরা চারদিক থেকে নবাবকে দলবল সহ একেবারে ঘিরে ফেললো দেখতে দেখতে। নবাব সৈন্যরা প্রাণপণে যুদ্ধ করেও কিছু করতে পারে না। এবং এ ডামাডোলের মধ্যেই নবাব প্রায় তাঁর স্বজনদের নিয়ে শত্রুর হাতে বন্দী হতে হতেও কোন মতে সৈন্যাধ্যক্ষ মুসাহেব খাঁর নৈপুণ্যে বেঁচে গেলেন। ঐ সময়ই আলীবর্দী লক্ষ্য করলেন আফগান সেনাপতিরা নিষ্ক্রিয় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এদিকে দিন শেষে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে দেখে সেদিনকার মত যুদ্ধ বিরতি হলো। নবাব বর্ধমান রাণী দিঘীর পূর্ব শিবিরে এসে রাতের মত আশ্রয় নিলেন।

যুদ্ধের গতি দেখেই নবাব বুঝেছিলেন জয়ের আশা সুদূরপরাহত। তাই তিনি বর্গী দলপতিকে বলে পাঠালেন, দশ লক্ষ টাকা দিতেই তিনি প্রস্তুত।

কিন্তু সুযোগ বুঝে ভাস্করও বললো, ওতে হবে না, এক কোটি টাকা চাই।

ওদিকে নবাবের সৈন্য দলের মধ্যে অনেকেও বিপক্ষের দলে যোগ দিতে শুরু করেছে, তখন নবাব অত্যন্ত চিন্তায় পড়ে গেলেন।

শেষে আর ভেবে আর কোন উপায় না দেখে সেই রাত্রেই গোপন অন্ধকারে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার ভাগ্য বিধাতা তার প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র বালক সিরাজদ্দৌলার হাত ধরে আফগান সেনাপতি মুস্তাফা খাঁর শিবিরে গিয়ে ঢুকলেন।

এ কি! খোদাবন্দ্ আপনি, এত রাত্রে? মুস্তাফা খাঁ সসম্মানে উঠে দাঁড়ালো।

হাঁ খা সাহেব, অনন্যোপায় হয়েই এখানে আমাকে আসতে হলো। আমার উপরে সত্যিই যদি তোমরা বিরক্ত হয়ে থাকো তো আমাকে শেষ করবার জন্য এত কষ্টের প্রয়োজন নেই। এই আমার প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র সিরাজ, একে আমি তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি— একে আর আমাকে এক তরবারীর আঘাতেই শেষ করে নিশ্চিন্ত হও। আর যদি পূর্ব উপকারের কথা এতটুকুও আজও তোমাদের মনে থাকেতো তবে আমি তোমাদের কাছে যে অপরাধই করে থাকি না কেন, সেটা মার্জনা করে এ বর্গীদের দমন করে দেশের শত্রুকে বিনষ্ট কর।

লজ্জায় আফগান সেনাপতিরা মাথা নত করলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন তারা বর্গীদের দমন করতে প্রাণ পর্যন্ত দেবেন। বললেন, খোদাবন্দ আপনি শিবিরে ফিরে যান। এখনো আমরা তিন হাজার অশ্বারোহী জীবিত আছি—আমরা নিশ্চয়ই তাদের উচিত শিক্ষা দিতে পারবো।

সেই রাত্রেই আফগান সেনাপতিরা তাদের সৈন্য নিয়ে হৈ-হৈ করে বিশ্রামরত বর্গীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল আবার সেই রাত্রেই। এবং সে রাত্রের সেই ভয়াবহ আক্রমণের মুখে বিরাট বর্গী বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারলো পালালো।

নবাব যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

ভোরবেলা নবাব বিপক্ষ দলের শিবির ভেদ করে অমিত বিক্রমে মার্চ করে কাটোয়ার দিকে অগ্রসর হলেন। পিছন দিক থেকে অগ্রগামী নবাব সৈন্যদলকে বর্গীরা উত্যক্ত করতে করতে চললো।

কিন্তু বিশেষ কোন ক্ষতি তাদের করতে পারলো না।

নবাবের সৈন্য দল এগিয়ে চলেছে। পথশ্রমে ও যুদ্ধে ক্লান্ত। এবং পথের অশেষ ক্লেশ সহ্য করে তিন দিনের দিন সকলে এসে কাটোয়ার পৌঁছালো।

কাটোয়ায় পৌঁছুবার পর মুর্শিদাবাদ থেকে নূতন সৈন্য ও খাদ্য সম্ভার এসে পৌঁছালো। ওদিকে তখন বর্ষাকাল এসে গিয়েছে।

বর্ষাকালে সুবিধা হবে না দেখে বর্গীরা তখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরামর্শ আঁটিতে শুরু করে দেয়। ঐ সময় বিশ্বাসঘাতক মীর হবিবের পরামর্শে ভাস্কর নবাবের কাটোয়ায় উপস্থিতির সুযোগে রাজধানী মুর্শিদাবাদ আক্রমণ ও লুন্ঠন করে প্রচুর অর্থ পেল।

নবাব যখন রাজধানীতে গিয়ে পৌঁছালেন তার আগেই ভাস্কর লুঠ করে রাজধানী কাটোয়ায় আবার ফিরে গিয়েছে।

কাটোয়ার উত্তরে অজয় পারে সাঁকাই নামে এক গ্রামে একটা নবাবী আমলের মাটির দুর্গ ছিল, বর্ষাকালটা ভাস্কর সেখানেই থাকবেন মনস্থ করলেন।

ক্রমে বর্ষাকাল কেটে যেতেই নবাব আবার বর্গীদের আক্রমণ করতে অগ্রসর হলেন কাটোয়ার দিকে।

নৌ-সেতু নির্মাণ করে নবাব কাটোয়ার উত্তর দিকে গঙ্গা পার হলেন। এবং শত্রুদের বুঝবার কোন অবকাশ না দিয়েই তাদের উপর গিয়ে স্ব সৈন্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

বেগতিক দেখে ভাস্কর পার্বত্য পথ দিয়ে স্বদেশের দিকে যাত্রার আয়োজন করলেন। এবং উড়িষ্যার পথে তাড়া খেয়ে তারা সেবারের মত দেশে ফিরে গেল।

কিন্তু বর্গীর হাঙ্গামা ঐখানেই শেষ নয়।

১৭৪৩ খৃঃ রঘুজী ভোঁসলে নিজে এলেন স্ব-সৈন্য বাংলাদেশে আবার। ঐ সময় বালাজী রাও বাদশাহের ফরমান চিঠি নিয়ে 'চৌথ' আদায় করতে এলো।

রঘুজী যখন বর্ধমান এসে পৌঁছালেন সেই সময় বালাজী রাও মুর্শিদাবাদের কাছাকাছি এসে গেছেন। চারিদিক থেকে বর্গীদের চাপে বিব্রত হয়ে শেষ পর্যন্ত নবাব বহু টাকা খেসারৎ দিয়ে বালাজীর সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। এবং উভয়ে মিলিত হয়ে রঘুজীকে তাড়াবার পরামর্শ হলো।

রঘুজী বেগতিক দেখে পালালেন।

বালাজীও সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে গেলেন।

পর বৎসরও আবার রঘুজীর সুদক্ষ সেনাপতি ভাস্কর বাংলাদেশে এসেছিল।

কিন্তু সেবার আর তাকে দেশে ফিরে যেতে হয়নি।

আলীবর্দীর চক্রান্তে তাকে নিহত হতে হয়েছিল।

প্রত্যেক বছরের মতো এবারও 'স্বপনবুড়ো' দাদা অনুরোধ জানিয়েছেন তোমাদের জানবার মতো সাধারণ জ্ঞানের খবর কিছু লিখে পাঠাতে। কী নিয়ে যে লিখি তাই ভেবে পাচ্ছিলুম না। বসে বসে কলমটা নিয়ে কাগজের ওপর আঁচড় কাটছিলুম। হঠাৎ আমার ছোট্ট বন্ধু, টুবলু এসে হাজির—হাতে একটা শীষভাঙা পেনসিল।

ঘরে ঢুকেই হুকুম হলো "এখুনি আমার পেনসিলটা কেটে দাও। আমি ছবি আঁকবো।"

টুবলুর ছবি আঁকার তাড়া পড়েছে। পেনসিল না কেটে দিয়ে কি রক্ষা আছে!

ছুরিটা নিয়ে পেনসিল কাটতে বসলুম। টুবলু খুব খুশি। খুব মুরুব্বিয়ানা চালে বললে—"জানো তুমি পেনসিলের শীষটা সীসের তৈরি বলেই ওটাকে 'লেড পেনসিল' বলে। সীসের ইংরেজী হলো 'লেড্' (Lead) কিনা তাই!"

আমিতো অবাক ওর কথা শুনে। বললুম—"তুমি এত খবর কার কাছে পেলে টুবলু?"

"বারে! টুনুদি যে বললে। আমি কি ইংরিজি জানি?" জবাব দিলে টুবলু বেশ যেন একটু ঘাবড়িয়ে গিয়ে।

আমি বললাম টুনুদি তোমার কিচ্ছু জানে না, ভুল বলেছে খবরটা দিতে। টুনুদি খবর পেয়েই আরও দু-চারজন সংগীসাথী ঠিক খবর জেনে যায়।"

টুবলু লাফাতে লাফাতে দৌড়ে চলে গেল টুনুদিকে খবরটা দিতে। টুনুদি খবর পেয়েই আরও দু-চারজন সঙ্গীসাথী জুটিয়ে নিয়ে ঢুকলো ঘরে। রীতিমতো হৈ-হল্লা করে।

"কীরে কী ব্যাপার! এতো হৈ-হল্লা কিসের তোদের?"

ওরা সবাই জবাব দিলে—"টুবলু যে বললে তুমি পেনসিলের গল্প বলবে। বললে লেড-পেনসিলে নাকি লেড্ বা সীসে নেই। সত্যি নাকি মৌমাছি!"

"সত্যি! একেবারে খাঁটি সত্যি! 'লেড পেনসিলের শীষটা সীসের নয় মোটেই, ওটা আসলে গ্রাফাইট'. একেবারে বিশুদ্ধ কার্বন। গ্রীক ভাষায় grapheia কথাটার মানেই হলো 'লেখা'। যে কার্বন দিয়ে তারা লিখতে পেরেছিল তার নাম দিয়েছিল তারা তাই 'গ্রাফাইট'। আসলে "গ্রাফাইট" বস্তুটির আবিষ্কার হওয়ার আগে পর্যন্ত রোমান আর গ্রীকরা সীসে ধাতুর সাহায্যেই আঁচড় কেটে লিখতো, ছবি আঁকতো। সীসেটাকেই তাই তারা বলতো 'গ্রাফাইট'। কিন্তু আসলে 'গ্রাফাইট' আবিষ্কার হলো ১৪০০ শতকের কাছাকাছি। তখন সীসের বদলে এটাকেই লেখা ও আঁকাজোকার কাজে লাগানো হলো।

এরও প্রায় দেড়শো বছর পরে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের [illegible] বলে একটা জায়গাতে প্রচন্ড ঝড়ে একটা প্রকান্ড [illegible]।

গাছের শিকড়ের সংগে মাটি ছিটকে ছড়িয়ে পড়ে যে গর্তটা হলো তার ভেতর পাওয়া গেল কালো কাদার তালের মতো এক চাঙড় খাঁটি গ্রাফাইট। কুমবেরল্যান্ডের মেষপালকেরা ঐ গ্রাফাইট-এর টুকরো সংগ্রহ করে তাদের ভেড়াগুলোর গায়ে দাগ দিয়ে চিহ্নিত করার কাজে লাগালে। ইংলণ্ডে গ্রাফাইট আবিষ্কারের গোড়ার ইতিহাস এই।

টুনু জিজ্ঞেস করলো, "তাতো হলো কিন্তু পেনসিল তৈরি করে বাজারে ছাড়ার ব্যবস্থা প্রথম কবে হলো?"

এই পেনসিল তৈরি করে বাজারে ছাড়ার ব্যাপারে নেপোলিয়ান বোনাপার্টির হাত ছিল অনেকখানি যে সেটাও জানা গেছে।

ইংলণ্ডের লোক গ্রাফাইট দিয়ে লিখছে শুনে তাঁর টনক নড়লো। কিন্তু ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জর্জ আইন করে অন্য দেশে গ্রাফাইট পাঠানো বন্ধ করেছিলেন বলে—সে বস্তুটি পাওয়া নেপোলিয়নের পক্ষে সম্ভব হলো না। যাই হোক ফরাসী দেশেও কিছু নিরেস ধরণের 'গ্রাফাইট' পাওয়া গেল, তাতে লেখা ভালো হচ্ছে না দেখে নেপোলিয়নের মন উঠলো না। তিনি নিকোলাস কোঁতে বলে এক বিজ্ঞানীকে তলব করে নিরেস ফরাসী গ্রাফাইটকেই কিভাবে ভালো লেখার কাজে লাগানো যায়, সেই গবেষণার ভার দিলেন।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক কোঁতে (Conte) বহু গবেষণার পর ভালো লেখার উপায় খুঁজে পেলেন। তিনি সূক্ষ্ম পরিশুদ্ধ গ্রাফাইটের গুঁড়োর কাদা মিশিয়ে সেটাকে বেশ করে গনগনে আঁচের ভাটিতে পুড়িয়ে নিলেন। দেখা গেল তা দিয়ে আগের চেয়ে ভালোই লেখা যাচ্ছে।

ঠিক এই সময়েই জার্মাণীতে কাস্পার ফাবের গ্রাফাইটের গুঁড়োর সংগে গন্ধক, অ্যানটিমনি আর রজন মিশিয়ে নূতন ধরণের পেনসিল শীষ তৈরী করলেন। সেটাকে কাঠের খোলের মধ্যে আধুনিক যুগের পেনসিলের পূর্ব পুরুষকে তিনিই প্রথম রূপ দিলেন। জার্মাণরাই প্রথম পেনসিল তৈরি করার বাহাদুরী পেয়ে গেল। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় প্রথম পেনসিল তৈরি করতে সমর্থ হন উইলিয়াম মনরো নামে এক আসবাব নির্মাতা।

আমার কথা শেষ না হতে হতেই পট করে বুকাই প্রশ্ন করে বসলো, একটা পেনসিলে কত লেখা হয় গো মৌমাছি?

অমন বিদ্ঘুটে প্রশ্ন তোমাদেরও মনে হয় তো জাগে। তাই বুকাইকে যা-যা বললুম, তা তোমাদের শুনিয়ে রাখি।

'সাধারণ একটা পেনসিলের মাপ হচ্ছে ৭" ইঞ্চি। এতে যে শীষটুকু থাকে তার সবটুকু যদি লাইন টানার কাজে লাগাও তাহলে মোট টানা লাইনটার মাপ হবে ৩৫ মাইল। আর শুধু যদি নানান শব্দ লিখে শীষটা ফুরোতে চাও, তাহলে ৩৫ হাজার শব্দ লিখতে হবে।'

মন্টু পাশ থেকে জিজ্ঞেস করলো—'আচ্ছা বলতো একটা পেনসিল কতবার কাটি আমরা?'

'কে কবার কতখানি নষ্ট করে পেনসিল কাটো সেটা আমার জানার কথা নয়। তবে হিসেব করে পেনসিল কাটলে গড়ে ১৬।১৭ বার পর্যন্ত একটা পেনসিলকে বেড়ে বা কেটে নিয়ে কাজ চালানো যায়।

শন্টু ওদের দলের মধ্যে বড়ো কিনা, তাই তার প্রশ্নটাও বেশ বুদ্ধিমানের মতো। শন্টু জিজ্ঞেস করলে—হার্ড পেনসিল, সফ্‌ট্ পেনসিলের শীষটা অমন বেশি কালো, কম কালো কি করে হয়?'

যে পেনসিলের শীষে গ্রাফাইটের পরিমাণটা বেশী, সে পেনসিল [illegible] বা নরম, অর্থাৎ দাগটা বেশি কালো হয়। আর কাদা ও

হয়েছে সর্দি-জ্বর, খাওয়াও ও দীপাকে,
সে-কাজ সহজ নয়, পড়ে যাবে বিপাকে।
অসুখ সে ছোঁবে না,
কিছুরই সে লোভে না,
বাপ-মা পড়েছে তার ভাবো দেখি কী-পাকে।

সন্দেশ দাও খেতে, ভাবে—বুঝি 'পাথ্য',
দাঁতে মোটে কাটবে না—হোক এক রত্তি।
বোঝাবে বা কে একে?
কি করি এ মেয়েকে?
শুনতে চায়না কিছু, বললেও সত্যি।

'মিট-সেফে' চাবি দিতে ভুলে যাই তাই না,
রোগীর খাদ্য রাখি, আমরা যা খাই না।
তারপরে তাইরে
চলে যাই বাইরে,
ফিরে আর 'মিট-সেফে' খুঁজে কিছু পাই না।

অন্যান্য মাল-মশলা যত মেশানো হয়, ততই পেনসিলের শীষটা শক্ত হবে।'

বুড়ু বলে উঠলো 'আচ্ছা মৌমাছি, কাগজে লেখার জন্যেই বুঝি পেনসিল তৈরি হয়েছে?'

জবাব দিলাম, আজকাল নানা রকমের জিনিষে লেখবার জন্যে নানান রকমের পেনসিল তৈরি হয়েছে। প্ল্যাষ্টিক বা কাঁচের ওপর লেখার জন্যে পেনসিল আছে। কসাইদের মাংসের ওপর লেখবার জন্যে পেনসিল আছে। ডাক্তারবাবুরা অপারেশন করবার সময় রোগীর চামড়ার ওপর দাগ দিয়ে নেন আলাদা ধরণের পেনসিল দিয়ে। এমনি নানান ধরণের পেনসিল তৈরি হচ্ছে আজকাল। তবে সব পেনসিলেই 'গ্রাফাইট' থাকে না কিন্তু! তোমাদের লেড-পেনসিলেই গ্রাফাইটের কেরামতী।

টুনু বললে—'পেনসিল কি করে তৈরি হয় বল না মৌমাছি?'

'সে কথা আজ আর বলার সময় নেই। অত কথা বলতে গেলে আপিস যেতে দেরী হয়ে যাবে। হাজিরা খাতায় লাল পেনসিলের দাগ পড়ে যাবে।' বলেই উঠে পালালাম। তোমাদের কাছেও সেইটুকুই লিখে পাঠালাম।

এসো ছবি আঁকি। দেখবে, ছবি আঁকার কি মজা। কিসের জন্যে, তোমাদের ভেতর যারা ছোট তাদের।

সত্যি ঐ বয়সে যে ছেলেমেয়েরা ছবি আঁকে—নিজের নিজের খেয়ালে আঁকে। আবার সেই ছবিতে তারা যখন রঙ দেয়—তখন তাদের কি আনন্দ, কৌতূহল ও মনোযোগ!

অথচ ছবি আঁকার আগে—কোন ভাবনা, ভয় অথবা কি নিয়মে যে আঁকতে হয়, তার ধার ধারেনা কেউই। তবুও দেখো, সেগুলোও কিন্তু ছবি। আর দেখতেও বেশ চমৎকার!

তবে, ছবি আঁকার প্রতিপদে যে বাধা, অর্থাৎ যত সব নিয়ম ও কানুন, তা যদি এদের মানতে হতো—তাহলে, কোন শিশু কি আর মনের আনন্দে ছবি আঁকতো?

তাই বলে, তোমরাও যদি কোন নিয়ম না মেনে—এ বয়সেও সেই ছবিই আঁকো, তবে পাবে না কোন বাহবা বা নিজের মনে কোন তৃপ্তি। কেননা, ছোটবেলায় যে সামান্য মানুষ এঁকে তোমরা হয়ে যেতে আনন্দে আটখানা, কিন্তু আজকের বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়ে তোমরা দেখছো—মানুষের বিচিত্র রূপ। আর সেই রূপটি ঠিকমত আঁকতে না পারলে মনে আসে না আনন্দ।

কাজেই এবার মুখ চোখের ও প্রতি অঙ্গের হাবভাব ফোটাতে হয়তো তোমাদের অনেকেই নাজেহাল। অথচ কি করে যে আঁকতে হবে, সে নিয়ম তোমাদের অজানা।

আবার সেই নিয়মের ব্যাকরণ এত নীরস যে, একদিনে সব বোঝাতে গেলে—ছবি আঁকার উৎসাহটি যাবে চলে।

অতএব, একদা যে শিশুবয়সে মায়ের কোলে থেকে—অবাক বিস্ময়ে জগতের প্রতিটি জিনিষ লক্ষ্য রেখে, শব্দ শুনে, কথা শিখছো, ছবি এঁকেছো—ঠিক তেমনি আগ্রহ নিয়ে মানুষের চোখ, মুখ, নাক, কান দেখে দেখে আঁকো—আর তারই সঙ্গে হাবভাব লক্ষ্য করে মনে রাখো, তাহলেই দেখবে আজেবাজে ছবি না এঁকে তোমাদের মন টানবে আর্টের পূর্ণ রস গ্রহণ করতে।

শেষে, তোমাদের চোখে দেখা এবং আঁকার খাতায় ধরে রাখা, বিভিন্ন সব মানুষের স্কেচ থেকেই—মনে জাগাবে কল্পনা। আর তাই সাজিয়ে, তোমাদের হাতেই সৃষ্টি হবে সুন্দর সব ছবি। অপরূপ যার ভাব এবং স্বপ্নময় তার রঙ।

এক যে ছিলো শেয়াল পণ্ডিত, তার ছিলো এক পাঠশালা। সেই পাঠশালাতে দেশের যতো পশু আর পাখীর ছানারা লেখাপড়া শিখে মানুষ হতো। এই পণ্ডিত এবং তার পাঠশালার কথা দেশ-বিদেশের সবাই জানতো। এমন কি তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো জানেনে থাকবে কি বলো? হ্যাঁ, একটা কথা তোমাদের এখানে বলে রাখছি—এই শেয়াল পণ্ডিতকে যেন আবার আমাদের 'পাততাড়ির' শেয়াল পণ্ডিত ভেবে ভুল করে ফেলো না কেউ। এর কাণ্ড-কারখানাও অবশ্যি আমাদের 'পাততাড়ির' পণ্ডিতের মতোই দেখতে পাবে—কেন না, এই শেয়াল পণ্ডিত আমাদের 'পাততাড়ির' শেয়াল পণ্ডিতেরই মাসতুতো-ভাই কি না?

এই পণ্ডিতের পাঠশালাও কিন্তু, তোমাদেরই পাঠশালা বা স্কুলের মতো এগারটায় বসতো এবং চারটায় ছুটি হতো। পুজো-পার্বণের ছুটিও থাকতো ঠিক তোমাদেরই মতো। তবে, হ্যাঁ—তোমরা কথায় কথায় আজকাল যেমন ধর্মঘট বা স্ট্রাইক করে বসো—তা অবশ্যি তাদের করার উপায় ছিলো না। ওরে বাপ্‌স্! স্ট্রাইক? পণ্ডিতকে দেখলেই তো পড়ুয়াদের পিলে চমকে যেতো আতঙ্কে! ছাগলছানা, কুকুরছানা, মুরগীছানা, শেয়ালছানা, ভেড়াছানা, খরগোস-ছানা, ইঁদুরছানা সবাইকেই চুপচাপ বসে মন দিয়ে পড়াশুনা করতে হতো। টুঁ-শব্দটি করবার কারুর উপায় ছিলো না। কেউ তা করেছো কি—খপ্! তারপরে কড়মড়। শেষটায় কোঁৎ! বাস, খতম্!

পণ্ডিতের এই পাঠশালা থেকে সামান্য কিছু এগিয়ে গেলেই একটা সেকেলের পুরনো নদী। এই নদীতে বাস করতো এক কুমীর পরিবার। কুমীর তার গিন্নী এবং সাত-সাতটি বাচ্চা নিয়েই ছোট্ট একটি সংসার। কিছুদিন হলো, কর্তা আর গিন্নীতে চলছে জোর মন কষাকষি। সেদিন হঠাৎ রাগে ফেটে পড়ে কুমীর-গিন্নী বললে,—বলি,—ছেলেপুলেগুলো যে গো-মুখ্যু হয়ে রইলো—তার কোন খবর রাখো কি? আমি কদ্দিন ধরে বলছি—এদের পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি করে দিয়ে এসো—লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে আসুক। গিন্নীকে সকাল বেলাই চেঁচামেচি করতে দেখে, কুমীর-মশাই শান্ত কণ্ঠে বললো, রেগে গিয়ে এমন চেঁচামেচি করছো কেন? আমাদের চৌদ্দপুরুষেরই কেউ যে কখনো লেখাপড়া শেখেনি—তাতে কি [illegible] বলতো? কুমীরছানাদের লেখাপড়ার দরকার কি বলতো? কুমীর-গিন্নী তার চোখ ঘুরিয়ে হাত-মুখ ন[illegible] বললো,—আজ আর সেই যুগ নেই—এটা জ্ঞান-বিজ্ঞানের যু[illegible] এ যুগে লেখাপড়া না শিখলে কাউকে মুখ দেখানো চলে [illegible] কুমীরছানারাও মায়ের কথায় সায় দিয়ে পণ্ডিতের পাঠশা[illegible] পড়ার আনন্দে অধীর হয়ে উঠলো। ছানাদের উৎসাহ দেখে, কুমী[illegible] মশাইও শেষ পর্যন্ত গিন্নীর কথায় রাজি হয়ে গেলো।

বেলা তখোন প্রায় বারোটা। পণ্ডিতের পাঠশালায় [illegible] পড়ুয়াদের পড়াশুনার হট্টগোলে জমজমাট! শেয়াল পণ্ডিত[illegible] দেখলেই যেমনি আতঙ্কে তার পড়ুয়াদের পেটের পিলে চমকে [illegible] তেমনি, শেয়াল পণ্ডিতেরই পেটের পিলে চমকে উঠলো—দু[illegible] বিরাটকায় এক কুমীরকে তার পাঠশালার দিকে আসতে দেখে। কি[illegible] কুমীরের পেছন পেছন যখন তার সাত-সাতটি বাচ্চাকেও দেখ[illegible] পেলো—তখন তার আশঙ্কা দূর হয়ে গেলো।

কাছে আসতেই পণ্ডিতমশাই বলে উঠলো—আসুন! আসু[illegible] এই গরীব পণ্ডিতের পাঠশালায় আপনার মতো এমন টাকার কুমী[illegible] পায়ের ধুলো এ আমার পরম সৌভাগ্য! কুমীরমশাই পণ্ডি[illegible] অভ্যর্থনায় খুশি হয়ে বললো—আর বলো কেন ভাই—আমার গিন্[illegible] তাগিদে—ছানাগুলোকে মানুষ করার জন্যে তোমার কাছে [illegible] এলাম। এদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে দিও। শেয়াল পণ্ডি[illegible] কুমীরমশাইকে কথা দিলো তার সাত-সাতটি ছানাকে খাঁটি মা[illegible] করে দেবে।

ছানাদের জোর পড়াশুনা চলছে। পণ্ডিতমশাই খুব যত্ন নি[illegible] তাদের লেখাপড়া শেখাচ্ছে। প্রতি রোববার কুমীরমশাই নিজে এ[illegible] ছেলেদের দেখে যায়। সে ছেলেদেরই শুধু দেখতে আসে না—পণ্ডি[illegible] মশাইর জন্যে নিয়েও আসে প্রচুর উপহার। ইলিশ মাছের দিনে ইঁ[illegible] মাছ, রুইমাছ, চিংড়িমাছ, কাঁকড়া, এমন কি কচ্ছপ অবধি। [illegible] আর সব পড়ুয়াদের অভিভাবকেরাও উপহার দেয় বটে,—কি[illegible] কুমীরমশাইর মতো এমন প্রচুর পরিমাণে উপাদেয় উপহার কেউ এনে দেয়নি কোনদিন। এতো সব পেয়েও কিন্তু, নধরকান্তি কুমী[illegible] ছানার লোভ পণ্ডিত মশাইকে পাগল করে তুললো। কুমীরের হা[illegible] প্রাণ যাবার ভয়েই শুধু এতকাল কিছু সে করতে সাহস করেনি।

অনেক ভেবে ভেবে শেষে পণ্ডিতমশাই মনে মনে একটা ফ[illegible] এঁটে ফেললো।—তারপরে সুরু হলো প্রতিদিন একটি করে কুমী[illegible] ছানা দিয়ে তার সকালের জলযোগ। কুমীরমশাই এসে তার ছানা[illegible] দেখতে চাইলে,—পণ্ডিতমশাই হিসেব দিয়ে বলতো—একটি গে[illegible] সিনেমায়, একটি গেছে বেড়াতে, একটি গেছে খেলতে, এক[illegible] ঘুমোচ্ছে। আর যে কটি জ্যান্ত ছিলো তাদেরই কুমীরমশাইকে দেখি[illegible] দিতো। এমনি করে দেখতে দেখতে পণ্ডিতমশাই ছয় ছয়টি কুমী[illegible] ছানাকেই সাবাড় করে ফেললো। এখন বাকী শুধু একটি। সেদি[illegible] কুমীরমশাই এসে জিজ্ঞাসা করলো, কি হে পণ্ডিত! তোমার পড়ুয়া[illegible] মানুষ হতে আর কতো দেরী? পণ্ডিতমশাই তার হাত-দু[illegible] কচলিয়ে ঘাড় কাৎ করে বিনয়ের সঙ্গে বললো,—স্যার, এরা প্র[illegible] মানুষ হবো হবো হয়ে উঠেছে। আপনি আগামী রোববার এলে এদের খাঁটি মানুষ করে আপনাকে দেখাতে পারবো। পণ্ডিতের ক[illegible] শুনে কুমীরমশাইর মনে আনন্দ আর ধরছে না। এ শুভ সংব[illegible] গিন্নীকে দেবার জন্যে তখনই সে রওনা হলো সটান বাড়ীর দিকে।

এদিকে শেয়ালপণ্ডিতের গিন্নীর মনে কিন্তু উদ্বেগের আ[illegible] আর সীমা নেই। সে পণ্ডিতকে বললে,—সবাইকে নিয়ে যদি প্রা[illegible] বাঁচতে চাও, তবে চলো এখনই আমরা সরে পড়ি। নয় তো কুমীর[illegible] মশাই এসে যখন দেখবে যে, তার সাত-সাতটা ছানাকেই তুমি সাবা[illegible] করে দিয়েছো তখন আমাদের সবকটাকেই আস্তো গিলে ফেলবে[illegible] পণ্ডিতমশাই মুচকি হেসে বললো,—আমরা পালাতে যাবো কেন[illegible] আমাদের সাতপুরুষের এই পাঠশালা—আমরা পণ্ডিতী করে খাই

দেবকুমার এবার চাইল জানালার দিকে, দেখল, জানালার নিকট একটা পাকা দাড়িওয়ালা মোটা লোক দাঁড়িয়ে [illegible]। সে বলছে, পাখী নেবে, নেবে ভাই, পাখী।

পাখীর নাম শুনে দেবকুমার লাফিয়ে উঠল। দরজা খুলে বাইরে এসে বলল, দাও পাখী দেব?

দাড়িওয়ালা বলল, এসো দিচ্ছি। বলেই খপ্ করে দেবকুমারকে ধরে থলির মধ্যে ভরে দিল। দেবকুমারের সে কি কান্না। দেবকুমারকে নিয়ে দাড়িওয়ালা তার বাড়ীতে এলো। দেবকুমারকে একটা ঘরে বন্ধ করে দিয়ে দাড়িওয়ালা বলল, এখানে থাক।

দেবকুমার বলল, আমার ছেড়ে দাও, আমি মার নিকট যাব। শুনে, দাড়িওয়ালা হা-হা করে হেসে উঠল। সংগে দেবকুমার শুনল, কা-কা। চেয়ে দেখে দাড়িওয়ালার ঘরময় কেবল পাখী। কাক আছে, ময়ূর আছে, টিয়া আরো কতরকম পাখী আছে তার ঠিক নেই। এ যেন সেই চিড়িয়াখানা।

দেবকুমারকে বন্ধ করে রেখে দাড়িওয়ালা চলে গেল। কাক সংগে সংগে হেসে উঠল—কা-কা—কেমন জব্দ। বেশ হয়েছে দেবকুমার।

দেবকুমার বসে বসে ভাবছে, কেমন করে মার নিকট সে ফিরে যাবে। এমন সময় সে শুনল, কু-কু-কু। দেবকুমার এদিক-ওদিক চাইল। দেখল, ছোট একটি কালো পাখী ডাকছে কু-কু-কু—পাখীটির ঠোঁট দুটি হলদে। দেবকুমার সেদিকে তাকিয়ে রইল।

কালো পাখী বলছে, খোকা, তুমি কেঁদ না—তোমার পালাবার পথ করে দিচ্ছি—তুমি পালিয়ে যাও।

দেবকুমার সাহস করে বলল, কে। তুমি?

আমি কোকিল, তোমার কান্না দেখে বড় কষ্ট হল তাই। তুমি বসো—তোমার পালাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। বলেই কোকিল চলে গেল। একটু পরেই সে একটা বড় পাখীকে সংগে করে নিয়ে এল। পাখীটা ক্যাক্ ক্যাক্ করে উঠল, বলল, ও তোমাকে ধরে এনেছে দেখছি। বুড়োর কাজই ঐ। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের ভুলিয়ে ধরে আনে—এই তার কাজ।

দেবকুমার বলল, তুমি কে? তোমাকে চিনি চিনি বলে মনে হচ্ছে।

চিনবে বইকি। আমি কাকাতুয়া—আমার রং সাদা—মাথায় ঝুঁটি—এই দেখেই আমাকে চেনা যায়।

তুমি আমাকে মার নিকট দিয়ে আসবে?

কাকাতুয়া বলল, সেই জন্যইতো এলুম, এসো। আমার পিঠে উঠে এসে বসো। তোমাকে নিয়ে আমি উড়ব।

দেবকুমার ভয়ে ভয়ে বলল, যদি পড়ে যাই?

কাকাতুয়া ক্যাক্ ক্যাক্ করে বলল, না পড়বে না। আমার গলা জড়িয়ে বসে থাকো।

দেবকুমার উঠে বসলো। কাকাতুয়া উড়ল। জানালা দিয়ে বাইরে চলে এলো। নীল আকাশ—ফুর ফুর করে হাওয়া বইছে। দেবকুমারের আনন্দ ধরে না। সে শক্ত করে কাকাতুয়ার গলা জড়িয়ে ধরে বসে রইল। কোকিলও সংগে সংগে চলল।

দেবকুমারের পড়ে যাবার ভয় ধীরে ধীরে চলে গেল। মনে মনে আনন্দ হলো প্রচুর। ঐ, ঐতো বাড়ীর ছাদ দেখা যাচ্ছে। আর একটু গেলেই বাড়ী। উপরে নীল আকাশ হাসছে, চারিধারে সাদা সাদা মেঘ ভেসে ভেসে চলছে—তাদের ভিতর দিয়ে ছুটছে তার কাকাতুয়া। বেশ মজা লাগছে দেবকুমারের—

এমন সময় কোকিল কু-কু করে বলল, সর্বনাশ—কাকের পিঠে চড়ে দাড়িওয়ালা বুড়ো আসছে। শীগগীর পালাও।

দেবকুমার চেয়ে দেখে সত্যিই ত, এসে গেছে দাড়িওয়ালা বুড়ো। দেবকুমার চেঁচিয়ে উঠল, বলল, চল্ চল্ জলদি চল—
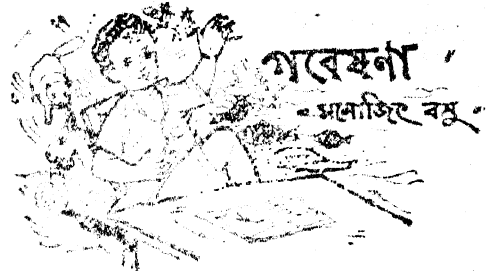
টিক্‌টিকি যেন ঠিক কুমীরের বাচ্ছা,
ঘোড়া আর গর্দভ মাসতুতো ভাই—
বাঁদরেরা হয় কি না, তুই বল আচ্ছা,
ছোট ছোট শিম্পাঞ্জির বড় দাদাভাই?
কে-আছ খল্‌সের হয় যে খুড়ি,
ফলুই সে চিতলের ভাইপো হবে;
নিকট সে আত্মীয় ল্যাঠা ও পুঁটী
জেনে রাখ্ এই কথা সবাই কবে।
খয়রা সে বড় হ'লে হবে যে ইলিশ,
ভিটামিন খেয়ে বাটা একেবারে রুই—
ট্যাংরার জ্যাঠা আড়, তুই কি বলিস্?
এক বুঝি নয় কিরে লেজ-ছাড়া দুই!
সুপারির মাতামহ বুনো নারিকেল
পাতিনেবু বাতাবির যেমন নাতি,
মিল কত চোখে পড়ে সকাল-বিকেল—
বেজী আর ছুঁচোরা কি হয় না জ্ঞাতি?
কাঁঠালের নাতিপুতি লিচু-কাঁকরোল,
আমড়া ও জলপাই ভায়রা নাকি?
ধর্মভাই যে তারা—পাখোয়াজ-খোল!
কাকের সে বৌ হয় কোকিল-কাকী।
বক আর সারসেরা ভাগ্নে-মামা,
বিড়াল বাঘের মাসি সবাই জানে।
ভেবে দেখ্ হাঁদারাম, মাথাটা ঘামা—
'গবেষণা' কাকে বলে, তার কী মানে!!

কাকাতুয়া ভাই। কাকাতুয়া প্রাণপণ শক্তিতে উড়ে চলেছে। [illegible] ছুটছে পিছু পিছু। আর একটু—আর একটু—এগুলেই বাড়ী[illegible] ছাদ। দাড়িওয়ালা বুড়োও এসে পড়েছে।

দেবকুমার ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল—মা! মা! বাঁচাও-ও—ধরল। [illegible] লাফ মেরে ছাদের উপর পড়ে গেল। সংগে সংগে দাড়িওয়ালা বুড়ো[illegible] লাফ মেরে পড়ল দেবকুমারের ঘাড়ে। হঠাৎ দেবকুমারের ঘুম ভেঙে গেল,—ঘামে সর্বশরীর ভিজে গেছে। দেখছে—মা হাসছে—[illegible] কোলের মধ্যেই শুয়ে আছে দেবকুমার।

পরদিন প্রাতে দেখা গেল, খাঁচা চড়ুই নেই। দেবকুমার [illegible] দিয়েছে।

মা বললেন, ছাড়লি যে খাঁচা কিনেছিলি-নি।

দেবকুমার শুধু বলে—না।

শুনে মা হাসল। দেবকুমার ভাবে—এ সব [illegible] তাই [illegible]

আলপনা—   মিণ্টু লাহিড়ী

পাততাড়িতে যাঁরা অর্ঘ্য সাজিয়েছেন ঃ—

—লেখায়—
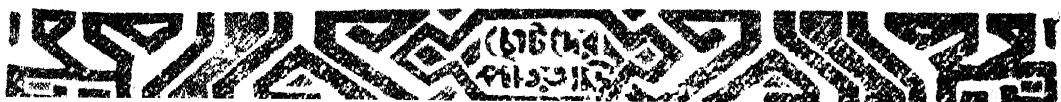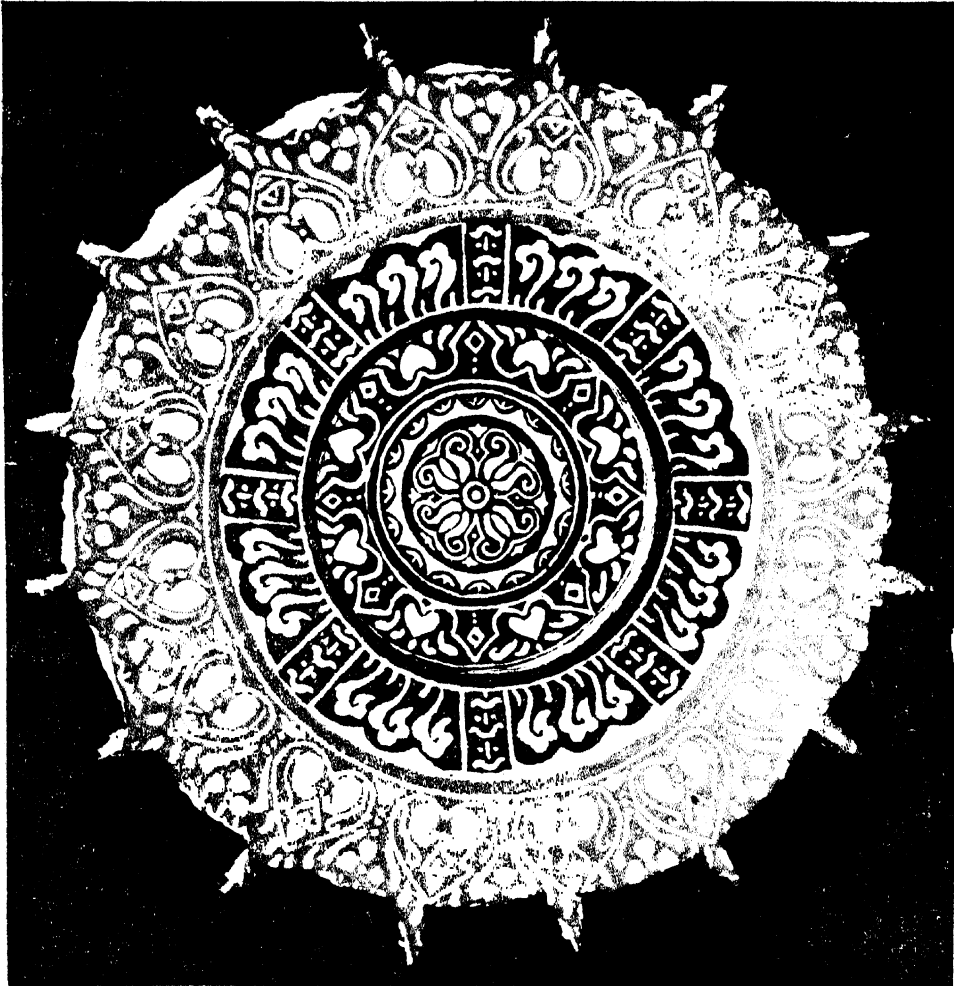
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; যামিনীকান্ত সোম; সুনির্মল বসু; শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়; সুখলতা রাও; নরেন্দ্র দেব; ইন্দিরা দেবী; শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু; শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য; শ্রীমন্মথ রায়; শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য; শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত; আশা দেবী; শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়; পুষ্প বসু; যাদু সম্রাট পি সি সরকার; হিমালয়নির্ঝর সিংহ; শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত; শ্রীমতী প্রতিমা দেবী; নীহাররঞ্জন গুপ্ত; শ্রীবিমল ঘোষ ('মৌমাছি'); শ্রীধীরেন বল; শ্রীসমর দে; হরেন ঘটক; শ্রীশিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়; ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত; মনোজিৎ বসু ও স্বপনবুড়ো।

—রেখায়—

শ্রীপ্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীসিদ্ধেশ্বর মিত্র; শ্রীধীরেন বল; শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী; শ্রীনরেন মল্লিক; শ্রীসমর দে; অরুন্ধতী ঘোষ; শ্রীবিরাজ সেনগুপ্ত; শ্রীরেবতীভূষণ ঘোষ; শ্রীরঞ্জনকুমার দাস; শ্রীশ্যামদুলাল কুণ্ডু; শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত; শ্রীঅনিল মুখোপাধ্যায়; শ্রীমিণ্টু লাহিড়ী ও কাফি খাঁ।

—আলোকচিত্রে—

শ্রীরবি দত্ত; শ্রীমায়া দে; শ্রীঅমিয় পাল; শ্রী[illegible]; শ্রী[illegible] সেন; শ্রী[illegible] সিংহ; শ্রী[illegible] সিংহ রায়; শ্রীআরতি সেনগুপ্ত; শ্রী[illegible] দে; শ্রী[illegible] দত্ত ও শ্রী[illegible] ঘোষ।

চলতি পথে

অবনী চক্রবর্ত্তী

নীরদ রায়

ফতেপুর সিক্রির জাল
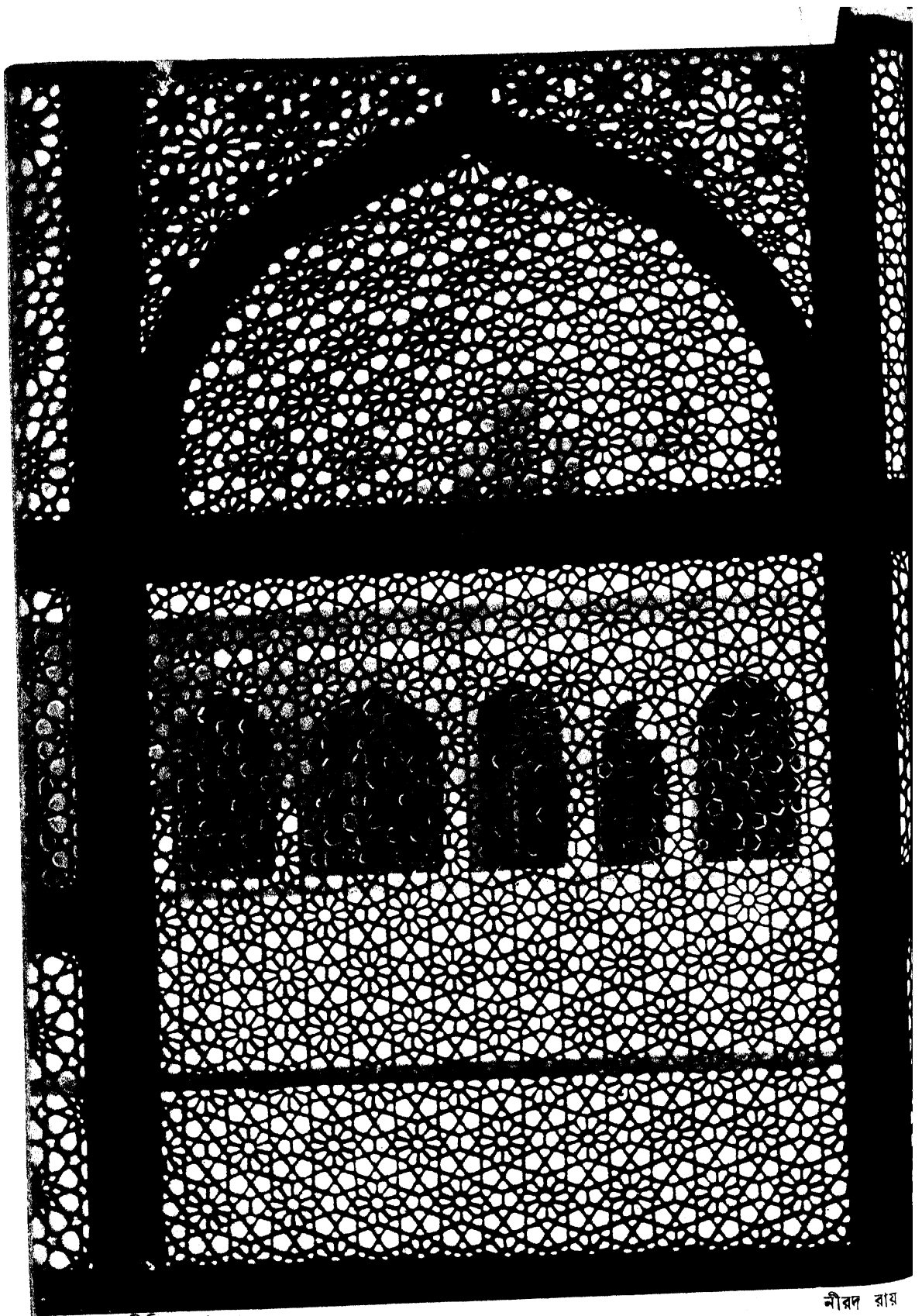
Osram

রেস্তোরাঁ, হোটেল, পার্টি, নাচের আসর, রংগমঞ্চ, বিপণি, শো-কেস খৃষ্টমাস-ট্রি, দেওয়ালী বা যে কোনও উৎসব অনুষ্ঠানকে নয়নাভিরাম করে তুলতে অসরামের রঙিন আলো অপরিহার্য।

অদ্বিতীয়

দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিঃ

দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী লিঃ অব ইংলণ্ড-এর প্রতিনিধি L 52 B

অলঙ্কার শিল্পে চিরন্তন ভাবধারা
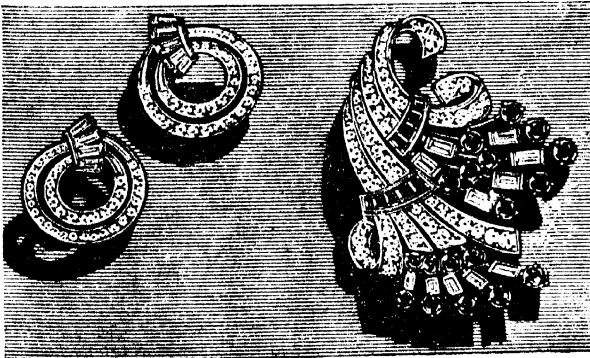
যুগান্তের ঐতিহ্যই গ'ড়ে তোলে
শিল্পীর নিখুঁত নির্মাণ কৌশল।
ভারতীয় অলঙ্কার শিল্পের সুনিপুণ কুশলতা
সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের মূর্ত প্রতীক।

পি, বি, সরকার এণ্ড সন্স

সন্ এণ্ড গ্রাণ্ডসন্স অব্ লেট বি. সরকার
৮৯, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-২০, ফোন—৪৭-৩০৯৩

মুকুর

রমেশচন্দ্র সেন

আয়নায় নিজের মুখ দেখে শিউরে ওঠে ইভা। কি ছিল আর কি হয়েছে। সত্যি সত্যিই মানুষ কি অসহায়!

কিন্তু শুধুই কি তাই? আয়নায় ভেসে ওঠে আর একটা লেখা, সেই লেখার সম্মুখীন হতে সে চায় না। ঘৃণা হয় নিজের উপর, বিশ্বের উপর। সারা দুনিয়াকেই সে ঘৃণা করে। এক এক দিন ছুঁড়ে ফেলে দেয় আয়নাখানা। ঝনঝন করে কাঁচ গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যায়।

এমনি করেই তার সুখ-স্বপ্নও গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গেছে। ভেঙে খানখান হয়ে যাওয়াই স্বপ্নের স্বভাব। অনেক মানুষের জীবনেই এইরূপ ঘটে। কিন্তু তার স্বপ্ন ভাঙার কাহিনী যেমন বিচিত্র তেমনই মর্মান্তিক।

বন্ধু সমাজে, শিল্পী সমাজে যে রূপের, যে মুখশ্রীর অত সুখ্যাতি ছিল, অনেক কবি সাহিত্যিক যার স্তুতি গেয়েছেন সেই মুখে পড়ল কালো ছাপ, চামড়া কুঁচকে কুঁকড়ে গেল, চোখের পাতা ও ভুরু হল সাদা। নাকের নীচ পর্যন্ত ঘোমটা নামিয়ে দিতে হল। পুরোপুরি এক আধুনিকাকে লুকোতে হল অবগুণ্ঠনের আড়ালে।

ব্যথা পায় সে তবু মধ্যে মধ্যে আয়নায় মুখ দেখা তার চাই-ই। পারা মাখানো কাঁচে জীবন-ইতিহাসের প্রতিফলন দেখার আকর্ষণ ইভার কাছে দুর্বার।

কিন্তু একই বৈঠকে সে সবটা দেখতে পারে না, চায়ও না দেখতে। একটু দেখেই হাতের আয়না ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়।

ছেলেবেলা থেকেই সে গান গাইতে পারত, শুনে শুনেই গান ধরত। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই শক্তির আশ্চর্য রকম স্ফুরণ হতে লাগল। তার জীবনে এলেন জ্ঞাতি এক দাদার বন্ধু, বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরশিল্পী সত্যশরণ ঘোষ। তিনি ইভাকে খেয়াল থেকে আধুনিক পর্যন্ত সকল গানে বেশ রপ্ত করে তুললেন। আহ্বান জানালেন। এই সব আহ্বানের পিছনে ছিল সত্যশরণের নীরব প্রয়াস। ছাত্রীকে বড় করে তুলবেনই তিনি। তাঁর শিক্ষা ও ইভার সহজাত শক্তি—সংযোগ হল মণি-কাঞ্চনের। মধুর কণ্ঠের জন্য সাধারণের মধ্যে তার নাম হল বুলবুল।

তাকে দেখে, তার গান শুনে এক ইঞ্জিনীয়ার বিয়ের প্রস্তাব করল। বয়স তেমন বেশী নয় তবে দোজবর এবং কিঞ্চিৎ মেদস্বী, কিন্তু মোটা মাইনের চাকুরে, নামী বংশ তাই ইভা রাজী হল। তাকে পালন করেছিলেন তার মাসিমা। সামাজিক হিসাবে তিনিই তার অভিভাবিকা। তিনি শুধু সম্মতিই দিলেন না খুসী হয়ে বললেন, বরাত করে এসেছিলি বটে, যেমন রূপ তেমনি গলা। সোয়ামীও জুটলো মোটা রোজগেরে। চর্বি একটু বেশী বটে, তা হোক বাড়ী, গাড়ী পাবি, নিত্যি আইসক্রীম খাবি। ভগবান করুন আমার ঝুমকোর বরাতও তোর মতন হোক।

ঝুমকা তার চার বছরের মেয়ের ডাক নাম। ভাল নাম বাসবী।

বিয়ে হয়ে গেল। স্বামী প্রথম প্রথম ইভাকে গানে উৎসাহ দিত, বন্ধুদের কাছে স্ত্রীর গল্প করত, গর্ব করত। তারা তাকে ঠাট্টা করত ঐ নিয়ে।

বছর দুইর মধ্যেই সঙ্গীত রসিক মহলে বুলবুলের নাম হল প্রচুর। সে জলসায় বা কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গেলে প্রেক্ষাগৃহের সামনে ভীড় জমে, তরুণ-তরুণীরা ছুটে এসে অটোগ্রাফ নেয়, ফুল ছোঁড়ে। অনেক সময় ইঞ্জিনীয়ার সঙ্গে থাকে। কেউ তাকে চেনে না, আমল দেয় না। চিনলে বড়জোর বলে, ইভের আদম, ইভকা আদমি।

টিপ্পনী করে, দেহখানি তো তিন মণ।

হবে না? বসে বসে বউর রোজগার খায়।

প্রথম প্রথম শুধু ইঞ্জিনীয়ারের ভ্রূ-কুঞ্চিত হত। শেষটায় হত রাগ। সে সভার ও জলসায় যাওয়া বন্ধ করল।

ফিরতে রাত হয়। স্বামী তার প্রতীক্ষায় দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। রাত বেশী হলে বিরক্তি প্রকাশ করে। বলে, মেয়েদের সম্পর্কে হিটলারী নীতি ঠিক, ব্যাক-টু কিচেন।

ক্রমে ক্রমে বাইরের লোকেও এর ঝাঁজ পেতে লাগল। তারা তাকে পৌঁছে দিতে এসে ইঞ্জিনীয়ারের টিপ্পনী শোনে—আশ্চর্য, সভা-সমিতি সার্বজনীন হৈ-হল্লার উপর টেকে বসে না।

রাধা ও গোপিনীরা ত নাচল, কি পেল কতটা?

রামমোহন, বিদ্যাসাগরের বাংলায় লেখা-পড়া গেল চুলোয়, স্বভাব-চরিত্র গেল, সংস্কৃতি এসে ঠেকেছে ছোঁড়া-ছুঁড়িদের গান আর ধেই-ধেই নৃত্যে।

তারা চলে গেলে ইভা বলে, ওরা কি ভাবলেন বল দেখি।

ইঞ্জিনীয়ার বলত, ভাবুক, যত সব লোফার ঐ করে দুটো পয়সা হাতড়ায় তা নিয়ে সিগারেট ফোঁকে, মদ খায় আর সিনেমা দেখে।

তাদের পাড়ায়ও সার্বজনীন পূজা, রবীন্দ্র জয়ন্তী ও নেতাজী জন্মোৎসব হয়। উদ্যোক্তারা ইঞ্জিনীয়ারের টিপ্পনী শুনে রাগ করে না, বুলবুলদির জন্য সেটা হাসি-তামাসার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

ইভা গিছল বালিগঞ্জের 'হৃদ' ... বসন্ত উৎসবে। ফিরল রাত একটায়। ... তাকে পৌঁছে দিতে এসেছিলেন ... ইঞ্জিনীয়ার তার সামনেই বেশ বাড়াবাড়ি করল। ইভার সভা-সমিতিতে যাওয়া বন্ধ হল সেই থেকে। আহ্বায়কদের সোজাসুজি সে 'না' বলতে পারে না, ফিরিয়ে দেয় নানা অছিলায়।

তার চেয়েও যেন বেশী দুঃখিত হলেন সত্যশরণ। বললেন, ইঞ্জিনীয়ার প্রতিভার গলা টিপে মারল। স্বামী জাতটাই এই রকম।

ইভা বলত, আমি বাড়ীতে বসেই আপনার সহায়তায় সাধনা করব।

তা করবে কিন্ত প্রতিভার স্ফুরণের প...
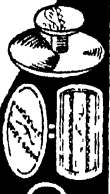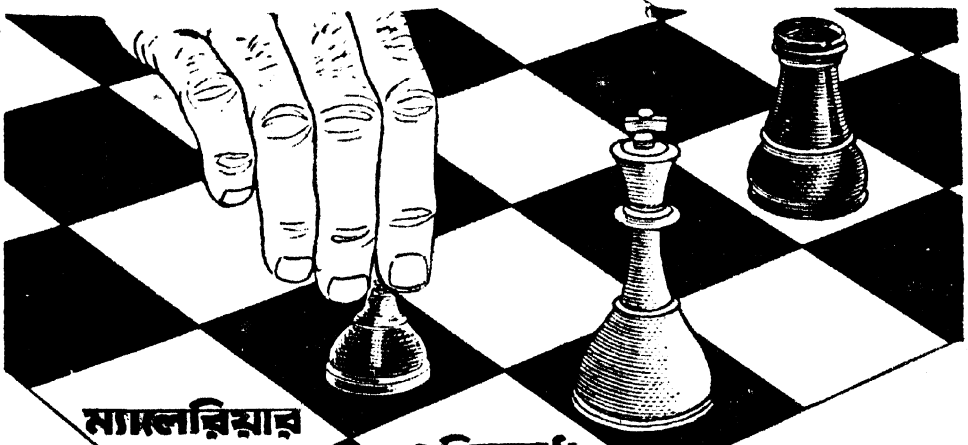
উদ্ভিদ বাঁচে না, বাইরের স্বীকৃতি না পেলে প্রতিভারও তেমনি অপমৃত্যু ঘটে।

ইভা বলল, কোন কোন গাছ ত আলো ছাড়াই বাঁচে।

সে উদ্ভিদের জাতই আলাদা। তুমি হলে ট্রপিক্যাল দেশের চারা। অফুরন্ত শক্তি তোমার কিন্তু তা স্ফুরণের জন্য চাই প্রচুর আলো প্রচুর বাতাস।

সে আলো ত আপনিই।

সত্যশরণ ম্লান হাসি হেসে বললেন, সেদিন ফুরিয়ে গেছে।

নিজের অজ্ঞাতেই বোধহয় তাঁর চোখ পড়ল সামনের আয়নার উপর। দেখলেন গলার চামড়া ঝুলে পড়েছে, জুলফিতে দু-চার গাছা পাকা চুল।

ইভার সাধনা চলতে লাগল। আগের চেয়েও বেশী সাহায্য করতে লাগলেন সত্যশরণ। ছাত্রীকে প্রথম শ্রেণীর শিল্পী করে গড়ে তোলার প্রেরণা পেলেন। এটা হল যেন তাঁর জীবনব্রত।

'গীতিকার' বার্ষিক উৎসব। এই সঙ্গীত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সত্যশরণ, তিনি এর প্রাণ। তিনি ইভাকে বললেন, উৎসবের উদ্বোধন হবে তোমার গান দিয়ে।

স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও সত্যশরণকে সে 'না' বলতে পারল না। যে স্নেহ ও নিষ্ঠা দিয়ে তিনি তাকে বড় করে তোলার চেষ্টা করছেন 'না' বললে সেই নিষ্ঠার অমর্যাদা করা হবে। 'গীতিকায়' যাওয়া নিয়ে স্বামীও হয়ত রাগ করবেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুমতি না নিয়েই সে চলে গেল।

হিংস্র প্রাণী শিকারের জন্য যেমন ওৎ পেতে থাকে, ইঞ্জিনীয়ার তেমনি স্ত্রীর অপেক্ষায় দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। সে ফেরামাত্রই ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। গলা টিপে দেয়ালে মাথা ঠুকে দিয়ে বলল, আবার সভায় গেছিস আমাকে অমান্য করে! খুন করে ফেলব তোকে।

শিষ্যাকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েই সত্যশরন ফিরে যাচ্ছিলেন, এই নাটকের কিছুটা অংশ তার শ্রুতিগোচর হল। নিজের দায়িত্বের কথা ভেবে লজ্জিত হলেন তিনি। দুঃখিতও হলেন।

এরপর বাড়ীতে গান গাওয়ার জন্যও চলল বাস্তুকারের কটূক্তি।

সারাদিন হাড় ভাঙ্গা খাটুনির পর তোমার জন্য একটু চোখ বোজার উপায় নেই।

সংসার চুলোয় গেল; তেল, কয়লা পুড়ছে পাঁচ গুণ আর তুমি কিনা মশগুল খেউর টপ্পা নিয়ে।

ইভা সাধারণতঃ প্রতিবাদ করত না, একদিন প্রতিবাদ করায় স্বামী তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করল হান্টার দিয়ে।

ইভার মনে হল লোকটা উন্মাদ। সে তার আশ্রয় ছেড়ে অকূল পাথারে ভেলা ভাসিয়ে দিল। সত্যশরণ হলেন সেই ভেলার কাণ্ডারী। তিনি আশ্রয় স্থান ঠিক করে দিলেন, গানের টিউশানির যোগাড় করলেন। কিছুদিন পরে ব্যবস্থা হল সিনেমায় পর্দার আড়াল থেকে গান গাওয়া। নারীর শুধু অর্থ হলেই চলে না, চাই অভিভাবক, সেই স্থানও তিনিই পূরণ করলেন।

এই সময়ে ইভার শৈশবের পালয়িত্রী বাসবী এসে আশ্রয় নিল ইভার কাছে। সে তাকে কলেজে ভর্তি করিয়ে দিল, 'গীতিকায়' দিল গান শেখার জন্য। যত্ন করত খুব।

বছরখানেকের মধ্যেই ইভার কাছে চলচ্চিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব এল। তার ভয় ছিল পারবে না, সঙ্কোচ ছিল তবু রাজী হল। সিনেমায় টাকা এবং খ্যাতি দুই-ই প্রচুর কিন্তু শুধু সেইজন্য নয়, সে চলচ্চিত্রে নামল স্বামীকে ব্যথা দেওয়ার জন্য। অপরের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করবে, তার মুখের দিকে মুখ এগিয়ে দেবে, বুকে মাথা লুকোবে। ছবির পর্দায় তা দেখে স্বামী জ্বলে পুড়ে মরবে ভেবেই ক্রূর আনন্দ বোধ করতে লাগল।

প্রথম বই-এ নামল তরুণ অভিনেতা বাহিন-কুমারের পত্নীরূপে। অভিনয় করল বেশ। নাম হল। সাধারণতঃ ভাল অভিনেত্রীরা গান গাইতে পারেন না, তাকে দিয়ে সেই অভাব পূরণ হল। ঘন ঘন ডাক আসতে লাগল। এক বছরের মধ্যে শুধু বাহিনকুমারের সঙ্গেই অভিনয় করল আরও তিনখানা ছবিতে।

ইঞ্জিনীয়ার সেই সব ছবি দেখেছে কিনা, দেখে জ্বলে পুড়ে মরেছে কিনা ইভা সে খবর রাখেনি। রাখার সময়ও ছিল না। সে তখন ব্যস্ত বাহিনকে নিয়ে। বাহিন তার কাছে গান শেখে, বাহিনর কাছে সে শেখে অভিনয়।

বাহিন তার মুখের দিকে তাকিয়ে হারমোনিয়মের রিড টেপে আর 'সারে গামা' বলে চেঁচায়। ইভা কখন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, কখনও বা তার কাঁধে হাত রেখে বলে, ভাই, ও রকম করে নয়, বল সা-রে-গা-মা।

অভিনয়ের মহড়ার সময় বাহিন সংশোধন করে দেয়, ওভাবে প্রিয়তম বলবেন না দিদি, তাকান আমার দিকে বলুন প্রিয়তম।

'প্রিয়তম'—বলে ইভা তার মুখের দিকে একটু বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকে।

একদিন সত্যশরণ বললেন, বাহিন ছোঁড়াটাও তানসেন হবার চেষ্টায় আছে দেখছি।

ইভা বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বলল, তানসেন ত আমরা সবাই। আমারই কি গান হয়।

তুমি আর ও! তুমি এসেছ সহজাত শক্তি নিয়ে আর ও একটা গোলা লোক।

ও তোমার স্নেহের কথা।

স্বামী ত্যাগের পর থেকেই ইভা সত্যশরণকে 'তুমি' বলে।

স্নেহ শরণ ঘোষের শিল্প বিচারকে কখনও ঘোলাটে করতে পারে না।

আর কোথাও না হোক ইভার বেলায়—

এই সময় বাহিনর আবির্ভাব তাদের আলোচনায় ছেদ টেনে দিল।

সত্যশরণ এসেছিলেন ওস্তাদ আবুল কাশেমকে নিয়ে। কাশেম ইভার সঙ্গে তবলা সঙ্গত করবেন। সঙ্গত হল সন্ধ্যা থেকে রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত। আগে থেকেই বলা ছিল কিন্তু ইভা তাদের জন্য নিয়ে এল দু কাপ চা আর দুটো করে সেঁকা পাঁউরুটি।

সাধারণতঃ এরূপ করে না। অভ্যাগতদের আপ্যায়নে সে বেশ মুক্তহস্ত। সত্যশরণ অবাক্ হয়ে গেলেন। ইভা তাকে একান্তে ডেকে বলল, লুচি, মাংস আর আইসক্রীম করেছিলুম আর এলে না, সে সব বাহিনকে দিলুম। স্টুডিও থেকে এসেছিল ক্ষুধার্ত হয়ে।

সত্যশরণ বললেন, ভালই করেছ। জন্য আমাদের মিনিট পনের দেরি হয়েছে— শাস্তি ত পাবই।

বাহিন রোজই ইভার বাড়ীতে ট্রাউজার পরে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বেড়ায়। গুন-গুন করে সিনেমার হাল্কা গায়। আসে সকালে, যায় হয়ত রাত নটার

ইভা প্রতি শনিবার শনি পূজা পূর্ণিমায় ও সংক্রান্তিতে সত্যনারায়ণের দেয়। গরদ পরে বাহিন ইভার সঙ্গে শনি পূজার যোগাড়ে লেগে যায়। সিন্নি ঘোঁটে, সঙ্গে চলে সিনেমার পার্ট আবৃত্তি।

সত্যশরণ একদিন তাকে শুনিয়ে ভক্ত বটে।

বাহিন রেগে গেল। চপল মান পালা।

সত্যশরণ এসেছিলেন নূতন সুর দিতে। বললেন, আজ কাল একবার এসো আমার ওখানে।

ইভা বলল, এসপ্লানেডে আমার সেখান থেকে পথ চিনে ত যেতে পারবে

সত্যশরণ বললেন, এখনো বেশ রপ্ত হয়ে ওঠেনি দেখছি।

কথাটা গায়ে মাখল না ইভা।

'গীতিকার' রবীন্দ্র-জয়ন্তী। সঙ্গীত গাইবে। ভীড় জমেছে প্রচুর দেখা নেই। সত্যশরণ গাড়ী করে পাঠালেন। সে ফিরে এসে বলল, পারল না, তার ভয়ঙ্কর মাথা ধরেছে।

কি করছে সে?

ছাদে বেড়াচ্ছে।

একা?

না, বাহিনদাও আছে।

বেশ, ভালো।

ইভার বদলে সভায় গান গাইল

পরদিন সত্যশরণ ইভাকে বললেন, করতে করতে সত্য সত্যই শেষটায় ধরা দিলে?

কথাটা বললেন, ইভার বাড়ীর পার্কে বসে। সে এইজন্য প্রস্তুত ছিল না উঠল, না-না এ তোমার ভুল, মস্ত ভুল

শরণ বললেন, ভুল নয়।

নিশ্চয় ভুল—ইভা উঠে পায়চারি লাগল। খানিকটা ঘুরল আবার এসে বসল শরণের পাশে। তাঁর হাত ধরে বলল, একথা বললে দাদা? এক যুগ ধরে আমায়। আমি হিন্দু সধবা, স্বামী ডাইভোর্স হয়নি আমাদের।

সত্যশরণ মৃদু হাসলেন।

ইভা বলল, হাসছ যে?

তোমরা মেয়েরা কি মিথ্যাই পার!

আর—তোমরা পুরুষরা পার অযথা অপমান করতে।

অযথা নয়, নিজের অজ্ঞাতে দিয়েছ অনেকবার।

ইভা জানত না কিন্তু টুকরো টুকরো মধ্য দিয়ে নিজের মনের রূপটাকে

নেও দেখা দিয়েছে নূতন এক পুলক, ভাব কদম্ব।

দুজনে উঠে একত্রে বেড়াতে লাগলেন। ইভা বলল, যাকে তুমি প্রেম বলছ, সেটা প্রেম নয়, স্নেহ। ছোট ভাইয়ের প্রতি দিদির ভালবাসা।

সে ভালবাসার জাত আলাদা। তাতে উচ্ছ্বাস থাকে না। আর তুমি দুকূল ছাপানো নদীর মত উথলে উঠেছ।

তা নয় দাদা, ছেলেটি বড় অসহায়, বড় মাহীন।

কেন?

মা পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী, বাপ পাগল।

বাপকে পাগল বলেছে বুঝি?

কেন নাকি তুমি তাদের? এতদিন ত বলনি।

সত্যশরণ সে কথার কোন জবাব করলেন না।

বাদ-প্রতিবাদ চলল কিছুক্ষণ। একজন মত জোর দিয়ে বলেন, আর একজন ততই জোর দিয়ে অস্বীকার করে।

শেষটা ইভা বলল, আমায় একটু ভেবে দেখতে দাও।

বহ্নির প্রতি তার আকর্ষণের কথা তুললেই ইভা বিরক্তি প্রকাশ করে, বলে, ওতে আমি অপমান বোধ করি।

কিন্তু সত্যশরণ পর পর কয়েকদিন বহ্নির প্রসঙ্গ উত্থাপন না করলে হাস্য-কৌতুকের মধ্যে নিজেই ইভা তার নাম করে। নাম করে আনন্দ পায়। একদিন করল পাল্টা অভিযোগ—ছিল না কিছু। কিন্তু বলে বলে তুমিই হয়ত প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত করবে।

বেশ, তার শাস্তি দাও আমাকে।

হয়নি, হতে পারে। হলে শাস্তি দেব।

শাস্তি সত্যশরণ এমনিই পাচ্ছিলেন। ইভার প্রেমের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও আবিষ্কার করে ফেলেছেন তিনি। ব্যথা পেয়েছেন।

আগুনের আঁচের খুব কাছের জিনিষে যেমন একটা পোড়া দাগ পড়ে, ইভা সত্যশরণের মনেও সম্পর্কেও সেরূপ একটা দাগ পড়ল।

বাসবী সবই লক্ষ্য করছিল। বহ্নির প্রতি দিদির আকর্ষণ, সত্যশরণের বেদনা—কিছুই তার নজর এড়ায়নি। কিন্তু সে ভাবত সুশ্রী, সুবেশ যুবক অভিনেতাকে দিদি বঁড়শিতে গেঁথেছে তারই জন্য। এরূপ আভাষও সে দিয়েছে দিদিকে।

একদিন ইভা বলে, বহ্নির সঙ্গে তোর বিয়ে হলে খাসা হয়। তাই না?

দোলা লাগে বাসবীর মনে।

ইভা একদিন সত্যশরণকে বলল, বাসবীর বেশ টান দেখছি বহ্নির উপর।

সত্যশরণ হেসে বললেন, বহ্নির মধ্যে অনেক কিছুই দেখছ। দেখবে।

ইভা বলল, বহ্নি ওকে ভালবাসে।

ভাল ও কাউকে বাসে না। ছেলেটা ny Lothario টাইপের। সুস্থ বাপকে পাগল বানিয়ে যে নারীর সহানুভূতি আকর্ষণ করে সে একটা ক্যাড।

রাগে ফেটে পড়ল ইভা। বলল, ভীমরতি ধরেছে তোমার।

মুখ নীল হয়ে গেল সত্যশরণের।

একদিন ইভা বলল, বাসবীর সঙ্গে বহ্নির বিয়ে দেব ভাবছি।

ভুল করবে তাহলে।

কি রকম?

জ্বলে পুড়ে মরবে। শুধু নিজেই জ্বলবে না, ছোট বোনটাকেও জ্বালাবে।

ক্রোধে আত্মহারা ইভা সত্যশরণকে বাড়ী থেকে একরকম বার করে দিল। জিদ চেপে গেল তার, বহ্নি বাসবীর বিয়ে দেবেই।

মনে মনে সে হয়ত ভেবেছিল বহ্নি 'না' বলবে। কিন্তু কথার মারপ্যাঁচ দিয়ে কদিন খেলিয়ে শেষটায় সে সম্মতি দিল।

বাসবী প্রথমটায় একটু ইতস্ততঃ করেছিল, শেষটায় ভাবল বহ্নির প্রতি দিদির আকর্ষণের রূপটাই স্বতন্ত্র। নইলে তাদের বিয়ের কথাই সে তুলতে পারত না।

বহ্নি বাসবীর বিয়ে হয়ে গেল ধুমধামের সঙ্গে। বড় একটা কিছু করার তৃপ্তিতে ইভার মন ভরে রইল কয়েকদিন। নিজেকে সে মনে করল ত্যাগী মহৎ। বিশেষ করে সত্যশরণের সামনে নব-দম্পতির প্রতি বেশী স্নেহ, বেশী সহানুভূতি দেখাতে লাগল।

সত্যশরণ মনে মনে বললেন, Vanity of Vanities.

বহ্নি বাসবীকেও সুখী দম্পতি বলেই মনে হল। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই ইভার বুকে কেমন যেন সূঁচ ফুটল। এই জিনিষ ও সে চায়নি। চেয়েছিল আর কিছু, সেটা যে কি নিজেও তা বুঝতে চায় না। সত্যের মুখোমুখি হতে লজ্জা পায়। রাগ হয় বহ্নির উপর। এতদিন তা হলে সে শুধু অভিনয়ই করেছে। বলেছে বাসবী আর তুমি। দেখতে তোমাকে ওর চেয়েও ছোট দেখায়। আর রূপ গুণে—সে কথা ছেড়েই দাও।

ইভা খুসী হত আর বহ্নি ঐ নিয়ে হাসাহাসি করত বন্ধুদের সঙ্গে, বলত, মেয়েটা কি বোকা। নিজের রূপ আর বয়স নিয়ে ওরা বুঝি এই রকমই হয়।

ইভার এক এক সময় মনে হয় বাসবীর সঙ্গেও ছোঁড়াটা অভিনয়ই করছে। তা করুক।

মাস কয়েক যেতে না যেতেই সে কিন্তু রীতিমত লড়াই-এ নামল তার বিশ বছরের ছোট বোনের সঙ্গে। শুরু হল মাসিমার ঋণ শোধ পর্ব।

সাজ-সজ্জা হাসা-লাস্য সঙ্গীত ও বাক-চাতুরি, লুচি ও আইসক্রীম হল এই লড়াই-এর হাতিয়ার। লুচি খেতে খুব ভালবাসে বহ্নিকুমার।

অনভিজ্ঞা বাসবী ধীরে ধীরে হটে যেতে লাগল। সে দেখল কি ভুলই না করেছে দিদি—পাতা ফাঁদে পা দিয়ে। আগেই বোঝা উচিত ছিল।

একদিন দেখল দিদির কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে বহ্নিকুমার। দিদি কপালে হাত বুলোচ্ছে। বাসবীকে দেখে 'মাথাটা বড্ড ধরেছে' বলে বহ্নি ধড়মড় করে উঠে বসল।

ইভা মুখে লজ্জা-ম্লান একটু হাসি টেনে এনে বলল, কমল ভাই?

বাসবী নীরবে কাঁদল। সেই বাষ্প আর ভিতরের ধূমায়িত আগুনে যেন পাগল করে তুলল তাকে।

একদিন ভর সন্ধ্যায় কে যেন ইভার মুখে এসিড ছুঁড়ে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। ঝলসে গেল মুখখানা, যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল সে।

আবার সত্যশরণ এগিয়ে এলেন। চিকিৎসা করালেন। জননীর মত সেবা করলেন। ইভা সেরে উঠল বটে কিন্তু তার মুখ কুঁকড়ে-মুচকে বীভৎস হয়ে গেল।

শয্যাশায়ী অবস্থায় একদিন সে সত্যশরণকে বলল, তুমি আমার মা, বাপ, ভাই, বোন, স্বামী—সবই তুমি।

একটু থেমে তার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, তোমার বয়স যদি একটু কম হত।

প্রৌঢ় ইভার হাতে একটু জোরে চাপ দিলেন।

সেইদিনই এল আর এক সংবাদ। বহ্নি নাকি বলেছে, বেশ শিক্ষা হয়েছে বুড়ির। মেয়ের বয়সী বোনের সঙ্গে প্রেমের লড়াই! কি ফাঁদটাই না পেতেছিল।

আয়নার সামনে বসে বসে ইভার মনে পড়ে এই সব কথা। সিনেমার পর্দার মত কাচের উপর টুকরো টুকরো ছবিগুলো ভেসে ওঠে।

এক এক দিন দেখে বড় বড় হরফে লেখা—'ভাল তুমি কাউকে বাসোনি, বাসতে জান না। জান শুধু ছিনিমিনি খেলতে।'

মিথ্যে—মিথ্যে কথা বলে ইভা আর্তনাদ করে ওঠে। আয়নাখানা ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

শীতে : ভাগলপুর

শতদল গোস্বামী

আমার আনন্দ আজ বেদনায় পায় বুঝি শেষ
কুয়াসা-চাদর গায়ে শীতে কাঁপে গঙ্গার চর
পাতাঝরা নিমগাছ, গান শুনি ক্লান্ত ঘুঘুর
বসন্তের স্বপ্নে মগ্ন শীতোচ্ছ্বাস এ ভাগলপুর।

কর্মক্লান্ত 'ক্লীভ-ল্যাণ্ড',
কোথা গেল জনতার ভিড়?
বাতাসে হিমের স্পর্শ, ওঠে তাই বনের নীড়
ধ্যানমৌন দ্বিপ্রহর : তালগাছ উঁচে তুলে শির
সীমান্তে জটলা করে, রোদে বসে ঝিমায় প্রহর।

বিষণ্ণ বিকেল রিক্ত, বন্ধ্যা-পার্ক ফেলে দীর্ঘশ্বাস
আকাশে বিবর্ণ সূর্য মেঘে [illegible] শিহরণ [illegible]
সীমাহীন শূন্য মাঠ, শূন্যতারে ঢাকিয়াছে ঘাস
শান্ত-নম্র অন্ধকারে হিমস্তব্ধ গোধূলি-আকাশ।

ধীরে পায়ে রাত্রি আসে,
মৃত্যু তারে দেয় আলিঙ্গন
বঞ্চিত শীতের রাত্রি হতাশায় হয় আনমনা?
পরিশ্রান্ত পাণ্ডুর চাঁদ, তন্দ্রাতুর, দেখে দুঃস্বপন।
গলিত শবের মতো ঝরে পড়ে শিশিরের কণা।

দীঘার চিঠি
সুনীলকুমার লাহিড়ী

সুরমা, এখানে এসো যদি তুমি সাগরতীরে
এই নির্জন দীঘার-বেলায়—তোমাকে ফিরে
পাই যদি পাশে, তাহলে দেখাই—
মুক্তি পাবার কোন বাধা নাই—
আকাশে সাগরে দূর-দিগন্তে ছড়ানো নীল,
ইটের খাঁচার পোষা প্রাণটারও খুলবে খিল।

বালুতীরে বসে দু'চোখ অবাধ সামনে ছোটে—
ফেন-বালুমাখা ঢেউগুলি ওঠে—আবার লোটে!
বনরাজিনীলা-দিগন্ত-রেখা
আকাশ সাগর সংগমে লেখা—
নীলের প্লাবন নীল-নির্জনে দু'চোখে মেখে,
গেরুয়া রঙেরই ছাপ ধরে মনে আপনা থেকে!

সুরমা, এখানে সাগর-বেলার অন্ধকার
কী যে নাচ নাচে—হরেক রকম ছন্দ তার!
নিশিডাকে পাওয়া মনটাকে টানে,
ধু-ধু-বালু-হাওয়া সমুদ্র-গানে:
ঊর্ধ্বে ছড়ানো মুক্তোপলোও ঢেউ তুলে নাচে
আকাশগায়,
গৃহস্থালীর গাঁটছড়া ছিঁড়ে অসীমে ডুবতে
মনটা চায়।

ফুল আবার ফুটবে
রাণা বসু

সব হারিয়ে রিক্ত নিঃস্ব ন্যাড়া গাছটা
আকাশের দিকে করুণ চোখে চেয়ে আছে।
শীতের হাড়-কাঁপানো দুরন্ত কনকনে হাওয়া
তার সব পাতাগুলো কেড়ে নিয়ে
তাকে পল্লীর ষোড়শী বিধবার সাজে সাজিয়েছে।
তার এ দুর্দশায় বারংবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে
আহা করলে কিচ্ছু হবে না :
এ ব্যথা যে তাকে সইতেই হবে।

স্বামী হারানোর শোক সাধ্বী-স্ত্রী যেমন সয়,
বাপ-হারা প্রিয় সন্তানের মুখ চেয়ে
নীরবে চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়িয়ে
খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে,
তাকে যেমন চলতে হয় :
তপ্তশ্বাসে জড়ানো কাঁপা দিনগুলো গুণে গুণে
আবার নিষ্কলঙ্ক শুভ্র জুঁই
হাসি ফোটাতে হয়—
তেমনি, রূপমুগ্ধ এক-কুঁড়ি
মানব পতঙ্গের জন্যে :
সুন্দরী মাধবী, তুমি হাসবে না?

বসন্তের দেরি নেই :

দূরের চিঠি
লাবণ্য পালিত

তোমার চিঠিখানি করেছে কানাকানি
মনের গভীরে সে চিরন্তন......।
বিকাশে লেখনীতে কি কথা বল চিতে,
নয়ন ভরা যেন আকিঞ্চন......।
রাত্রি ছিল ঢাকা, কালিমা যেন মাখা,
কৃষ্ণা তিথি ওগো বিরাট মেঘ,
বুঝি বা সেইক্ষণে লিখেছ সংগোপনে,
রাখিতে পারনি যে হৃদয়াবেগ।
ভাষার আনাগোনা, আশার জানাশোনা,
হৃদয় হয়নিকো বিকল বল,
মনের গানখানি কেমনে বাঁধা জানি,
আপনি লেখা হয়ে করিছে ছল...।
এ লেখা থাকে থাক আঁখিতে দিয়ে যাক
হাজার সুধামাখা স্বপন ঘোর
নীরব বীণা সুরে বাজুক বহু দূরে,
মনের মণি কোঠা বাঁধুক ডোর।

পূর্ণতা
পারুল ঘোষ

জল ভরা নদী তীরে
ধান ভরা মাঠে
আলো ভরা সকালের
ভীরু ছায়া হাঁটে।

ফুলভরা ঝোপ ঝাড়ে
প্রাণ ভরা সুরে
বুক ভরা গান গেয়ে
পাখী যায় উড়ে।

চারিদিক ভরপুর
নবারুণ রাগে,
ভরা প্রাণে চেয়ে দেখা—
এ-ও ভালো লাগে।

হৃদয় ঘুমাতে চায়
জয়ন্তী সেন

হৃদয় ঘুমাতে চায়—দুপুরের স্তব্ধ দীর্ঘ পরে
শিরীষের ছল ছল ছায়াখানি স্বপ্ন হয়ে ঝরে
হাওয়ায় রোদের ছোঁয়া—।
আকাশের ধু ধু সাহারায়
নীল বালুকার কণা ক্লান্ত
চিল মেখেছে ডানায়,
ধূসর দিনের বুকে সময়ের সবুজ সোনালী,
এলোমেলো পাতা ওড়ে,
ঝরে যূথি বকুল নেহালি
নিস্তেজ মৃত্তিকা পরে। অবসন্ন অবচেতনায়
পাখির পালক দোলা কোমলতা নয়নে জড়ায়।
হৃদয় ঘুমাতে চায়—রৌদ্রদগ্ধ ধূলির জগতে
তোমার উজ্জ্বল স্বপ্ন মরীচিকা কেন আচম্বিতে
আমাকে চঞ্চল করে—কক্ষচ্যুত তারকার মন
নিঃসঙ্গ দহনে জ্বলে নিদ্রাহীন বেদনার ক্ষণ।
ঘুমের পিপাসা জাগে—তুমি দূর দিগন্তের মত

হে দেবতা
অনিল ভট্টাচার্য্য

হে দেবতা তুমি নহ অকরুণ
জানি জানি প্রিয়তম।
তোমারি আশীষ কল্যাণ ধারা
নামুক শ্রাবণ সম।।

ভৈরব তব অভিশাপ আজ
মহা তাণ্ডবে নাচে
শত নর-নারী শুষ্ক কণ্ঠে
তোমারি করুণা যাচে
সকলের মাঝে শোনো শোনো প্রভু
ক্ষুদ্র মিনতি মম।।
যুগে যুগে তুমি শত অপরাধ
করেছো এদের ক্ষমা
তাই ত বিশ্ব হয়নি নিঃস্ব
রূপে-রসে নিরুপমা।

এই ধরণীর শত লাঞ্ছনা
মানবের অপমান
তোমারি পরাণে বেজেছে জানি গো
হে দেবতা ভগবান
তবু ফিরে লও এই ধরণীর
অভিশাপ নির্মম।।

বেকার
শ্রীসুলেখা ঘোষ

সময়ের রথচক্র ছুটে যায় অসীমের পানে,
চেয়ে থাকি অনিমেষে নিদ্রাহীন অলস বেলায়,
জীবনের স্বরলিপি বাজে বুঝি সকরুণ তানে
শঙ্খচিল কেঁদে মরে আকাশের ঘন নীলিমায়।

মাঠে মাঠে চড়ে ধেনু, মধ্যাহ্নের প্রচণ্ডতা মাঝে
হেঁকে যায় ফিরিওলা, নীরবতা যেন ভগ্ন করি,
পরিশ্রান্ত পান্থ যায় যে যাহার আপনার কাজে
কোথায় ভাসাই ভাবি, আপনার ভাবনার তরী।

কর্ম নাই, আছে শুধু জীবনেতে মিথ্যা কোলাহল
আর আছে বিশ্ব মাঝে অন্তহীন অসীম জিজ্ঞাসা
নিরুৎসাহ হৃদয়ের বেদনার যত আঁখি জল
সবই বুঝি মিথ্যা হবে, শূন্য হবে অফুরন্ত আশা।

কি আছে? কিছুই নাই জীবনের সঞ্চয়ের পাতে
সবার অবজ্ঞা দৃষ্টি কুড়ায়ে চলেছি বারো মাস,
ভাবনার ঢেউ যেন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে দিনে-রাতে
কলুষিত করে মোরে নিখিলের বিষাক্ত নিঃশ্বাস।

অভাবের নগ্নরূপ জ্বালা তোলে সহস্র দংশনে,
সংগ্রাম করিয়া চলি অহর্নিশ রিক্ততার সাথে,
বাঁচিবার ব্যর্থ চেষ্টা তবু কেন আসে কো স্মরণে

শ্বশ্রূ-চরিত-কথা

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আলু তিন প্রকার : গোল আলু, রাঙা আলু এবং শাঁকালু। শাশুড়ীও তিন শ্রেণীর : নবীনা, প্রবীণা ও পাত্তানে। আলুর বিভিন্ন উপজাতি আছে, যেমন দেশী নৈনিতাল গোহাটি মাদ্রাজী অথবা মেটে আলু চুপড়ি আলু। এদের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে স্বাদের তারতম্য ঘটে। তবে আমার মতে শেষোক্ত দুই পদার্থ মূল বা কন্দ-বিশেষ। তাদের আলু বলা যুক্তিসঙ্গত হবে না।

দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে শাশুড়ী জাতির মধ্যেও অনেক উপজাতি থাকতে পারে, যেমন মাসি শাশুড়ী, খুড় শাশুড়ী, মামী শাশুড়ী অথবা গ্রাম ও পাড়ার সম্পর্কে শাশুড়ী। এগুলি খাঁটি জিনিস নয়।

কিন্তু অকৃত্রিম গোল আলুর যে খাদ্যসার, আস্বাদ বা মুখরুচি, তা অন্য আলুতে সম্ভব নয়। তেমনি আদি ও অকৃত্রিম শাশুড়ীর মহিমা অতুলনীয়। মানে, প্রকৃত এবং অর্জিত শাশুড়ী। গায়ে পড়ে শাশুড়ী পাতানো কিংবা কন্যা বা কন্যাস্থানীয়াকে শাশুড়ী সম্বোধন, এগুলো বাঙালী আদিখ্যেতা। অর্থাৎ শাশুড়ীর সম্মান ও আদরকে প্রীতিসম্ভাষণে কল্পনায় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা।

ঐতিহ্যের দিক থেকে শাশুড়ীর গৌরব বোধ হয় আলুর চেয়ে বেশি। প্রাচীন যুগে মিশরে ও মেসোপটেমিয়ায় আলুর চাষের সন্ধান পাওয়া যায়নি। কিন্তু বন্য গমের অস্তিত্ব ছিল, পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা এ কথা বলেছেন। আলুর বীজ কে ও কবে আমদানি করল, তা নিয়ে অনেক গবেষণা আছে। কিন্তু আলু যে উদ্ভিদ হিসেবে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। অপর পক্ষে বন্য শাশুড়ী প্রাগৈতিহাসিক জীব। বিবাহ-বিধি প্রচলন হবার ঢের আগেও বীজ-শাশুড়ীর অস্তিত্ব নিঃসংশয়। পথে কুড়িয়ে পাওয়া, জোর করে ধরে নেওয়া অথবা চুলের মুঠি ধরে টেনে আনা যে ধরণের সঙ্গিনী হোক, তার গর্ভধারিণী একজন ছিলই। অতএব জননী হওয়ার দাবিতেই শাশুড়ী-পদের সৃষ্টি, স্বীকৃতই হোক্ আর অস্বীকৃতই হোক্। অতএব হামেসাই যে শাশুড়ী শব্দের ব্যবহার করি, ভেবে দেখা উচিত তার প্রাক্-ইতিহাস কত সহস্রাব্দী জুড়ে রয়েছে।

সুতরাং শাশুড়ী হেলা-ফেলার বস্তু নয়। সভ্যতার বিবর্তনে, বিবাহ প্রথার প্রবর্তনে শ্বশুরের আবির্ভাব। কিন্তু শাশুড়ী কদাচ প্রক্ষিপ্ত নয়। মাতৃতন্ত্র সমাজে শাশুড়ীর পদ-মর্যাদা কি, তা আমরা জানি। আরও জানি বরফের যুগে শাশুড়ী জমে যায়নি, গুহাবাসের যুগে শাশুড়ী কাঁচা মাংস সংরক্ষণ আর যাদু-বিদ্যা জানত। পিকিং-জাভা, প্যালিও-বা-নিও-লিথিক, আর্য-অনার্য বর্বর-অর্ধ বর্বর এবং পুরোপুরি মানব-সমাজে যখন শাশুড়ী বর্তমান ছিল, তার উপকারিতাও নিশ্চয়ই জানা ছিল। অতএব শাশুড়ীর ইংরেজি অথবা বাঙালি সংস্করণে পার্থক্য যাই থাকুক, তার ঐতিহ্য মূল ফসিল পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছয়।

ছোটবেলায় যিনি আমাদের সংস্কৃত পড়াতেন, তিনি পন্ডিত মশাইদের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী যেমনি ভালো শেখাতেন, তেমনি খাস্তা খিঁচোতেন। যে কোনও শব্দ বা ধাতুরূপ জিজ্ঞাসা করার মধ্যে অন্যায় কিছু নেই। কিন্তু হঠাৎ অসতর্ক মুহূর্তে প্রশ্ন করলে আপত্তির বিষয় এই যে, মনে-মনে আওড়ে জবাব দেবার সময় পাওয়া যেত না। ওয়ান, টু, থ্রি—ব্যাস্। এর মধ্যে উত্তর দিতে না পারলে ক্লাস থেকে আপনিই সসম্মানে বেরিয়ে গিয়ে ছাদের কোণে রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে থাকাই ছিল অলিখিত রীতি।

একবার এই সেকেন্ড পন্ডিত মশাই আমাদের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াচ্ছেন, মানে আগেকার সিক্স্‌থ ক্লাস। একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শ্বশুর এক দুই......?' প্রশ্নটা গোল-মেলে, শুনলে মনে হয়, শ্বশুর একজন না দু'জন। কিন্তু তিনি ঐ রকম সংক্ষেপে প্রশ্ন করতেন। ওর অর্থ হচ্ছে, 'শ্বশুর' শব্দের প্রথমা বিভক্তির দ্বিবচনে কি হবে? তাই, এক দুই। সোজা জবাব দিল ছেলেটি, শ্বশুরৌ। বললেন, বেশ। কিন্তু দু'টি শ্বশুর ছাড়া কথাটার অন্য অর্থ কি হতে পারে?' কঠিন প্রশ্ন, সুকুমার ছাত্রদের পক্ষে। তাই নিজেই ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন, শ্বশুর ও শাশুড়ী। সমাসের ফলে শাশুড়ী লোপ পেল। শ্বশুর নিজেই দ্বিবচনান্ত হয়ে গেল, যেমন মাতা ও পিতা—সমাসবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল 'পিতরৌ'। বললেন ভারিক্কে গলায়—'একে বলা হয় একশেষ দ্বন্দ্ব। মনে রাখবি সবাই, ভুললে মেরে একশেষ......'

ঈষৎ আমোদ অনুভব করে স্মিতমুখে বসে আছি, এমন সময়ে প্রশ্নবাণ হানলেন আমার দিকে—'শ্বশুরের স্ত্রীলিঙ্গে কি পদ হবেরে?' সহজ প্রশ্ন, জবাব দিলাম শ্বশ্রূ। বললেন, 'ওঠ্। বোর্ডে গিয়ে লেখ্...' উঠলুম, কিন্তু কি জানি কেন, অমার্জনীয়ভাবে লিখে ফেললুম—শ্মশ্রু। তারপর পণ্ডিত মশাই হাত ধরে টেনে এনে ক্লাস শুদ্ধ ছেলের সামনে উচ্চৈঃস্বরে এবং সরব হাস্যে ঘোষণা করলেন, 'তোর শাশুড়ীর দাড়ি থাকবে নির্ঘাৎ—দেখিস্।' মরমে মরে গেলুম, বলা বাহুল্য। শাশুড়ী সম্পর্কে আমার সেই প্রথম লজ্জাকর অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, মানুষটির প্রতি একটা সংস্কৃত কৌতূহল জাগল। এবং কৌতুকও।

কথাটা হয়তো ভালো শোনাচ্ছে না। যেহেতু, শ্বশ্রূঠাকুরাণী পরম-আরাধ্যা মাতৃসমা। সহ-ধর্মিণীর জন্মদাত্রী, অতএব আপন জননীর চেয়ে তাঁর মর্যাদা বেশি। শ্বশুরের দাড়ি থাকতে পারে কিন্তু শাশুড়ীর পায়াভারী। পুরানো বাংলা উপন্যাসে এবং গৃহস্থ সংসারে একদা যেরকম ফাঁদি নথপরা ভাগা-হাতের শাশুড়ীর দেখা পাওয়া যেত, আজকাল আর সেদিন নেই। কোনও পুত্রবধূ, কোনও জামাই হাজার পাড়া-গাঁয়ের লোক হলেও এধরণের শ্বশ্রূ-মূর্তি কল্পনা করতে পারে না। কি ছেলে কি মেয়ে, সকলেই আপ-টু-ডেট শাশুড়ী পছন্দ করে। অবিশ্যি মেয়েরা কি চায়, বলা শক্ত। মুখে শুনেছি, ননদ-শাশুড়ী ভরা জাজ্বল্যমান সংসার নাকি বিবাহযোগ্য কন্যার জন্য সন্ধানের সামগ্রী বলেই এককালে গণ্য হত।

কিন্তু বর্তমানে এটা অনুসন্ধানের বিষয়-বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। বড় সংসারের সুখ-সুবিধা এখন বোধ হয় কাম্য সম্পদ বলে ধরা চলে না। কারণগুলো স্পষ্টই সামাজিক এবং আর্থিক। যৌথ সংসারের দায়িত্ব যূথপতির পক্ষেও বহন করা আর সম্ভব নয়। একান্ন-বর্তিতার যে নিশ্চিন্ততা, তার চেয়ে দুশ্চিন্তা ও মনোবেদনা অনেক বেশি। তাই বিবাহের পূর্বে একপক্ষের রাইটস্ যেমন খতিয়ে দেখতে হয়, অপর পক্ষের লায়েবিলিটিস্ তেমনি হিসেব

করতে হয়। বলা বাহুল্য, শাশুড়ীর বর্তমান বাজার-দর পড়ে গেছে, খুবই অনিশ্চিত। শ্বশুরের মোটা অঙ্কের মাইনে অথবা ভারি পেনসান থাকলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। আর থাকলেও তিনি কিছু চিরঞ্জীব শর্মা নন। তাঁর অনুপস্থিতিতে অনেক কিছু ঘটতে পারে, দুর্বিপাকের সৃষ্টি হতে পারে। স্বামী দুর্বল রকমের কর্তব্যপ্রিয় হতে পারে, চাইকি খাওয়ার সময়ে মায়ের শারীরিক উপস্থিতি কামনা করতে পারে। কিংবা ঘরে ফিরে এসে কচি খোকার মত মা-মা করে হাম্বা রব ছাড়তে পারে। অথবা বেড়াতে বেরোবার সময়ে মার ঘরে ঢুকে জানিয়ে যেতে পারে। শ্বশুরবাড়ীর কথা কিংবা শয্যা-সঙ্গিনীর পার্শ্বমন্ত্রণা পেট-আলগার মতো ফাঁস করে দিতে পারে। নানা অস্বস্তিকর সম্ভাবনা যেমন—তীর্থযাত্রা, পুজোর কাপড় দেওয়া নেওয়া, ভাই-বোনদের সম্বন্ধে বেশি মাত্রায় সচেতনতা এবং 'কাশীবাসের অভিমান-ভঞ্জন কিংবা 'তিনি থাকতে যেরকম হত' সেই রকম ঠাট বজায় রাখার অন্যায় ইচ্ছা ইত্যাদি প্রভৃতি।

তা ছাড়া, শ্বশ্রূর সঙ্গে অশ্রুর যে ঘনিষ্ঠ অন্বয়, সেটা শুধু অনুপ্রাস নয়। নিতান্ত বাস্তব সত্য। বৈধব্যের নাকীকান্না সহনাতীত পাপ। আবার এমনও হতে পারে, কোনও কোনও শাশুড়ীর কাছে অশ্রুপাতের চেয়ে অশ্রু পাতনটাই আরও চিত্তাকর্ষক। স্ত্রী-সভ্যতার এই টেক্‌নিকের দখল আর প্রয়োগ নিয়ে 'ইতরেতর দ্বন্দ্ব' প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অথবা অহিংস অসহযোগে পরিণত হওয়া তখন বিচিত্র নয়। তা হলে দেখা যাচ্ছে, শ্বশ্রূ আর বধূর পারস্পরিক সম্বন্ধটি আপাতমধুর এবং বাহ্যতঃ প্রীতি-শ্রদ্ধাপূর্ণ হলেও তার মূল রসটি হচ্ছে পাঁচনের।

বহু দূর গ্রামাঞ্চলে অথবা অশিক্ষিত স্বার্থপর পরিবারে মাঝে মাঝে দজ্জাল শাশুড়ীর সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমান কালে আইন-আদালতের যুগে শাশুড়ীর পক্ষে দারুণ অত্যাচারী হবার সুযোগ খুব কম। বরঞ্চ মনে হয়, শাশুড়ীর নিজের অস্তিত্বই এখন পরনির্ভর, ক্ষীণ ও অনুমতি-সাপেক্ষ হয়ে আসছে। কারণ অত্যাধুনিককালের মেয়েরা বিবাহের আগেই আত্মঅধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হয়ে ওঠে এবং বিবাহের বছরখানেকের মধ্যেই আপনার রুচি ও অভিমত খুব ভদ্র অথচ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে পারে। শাশুড়ীকে তখন পথ দেখতে হয়। পথটা অবশ্য জানাই ছিল, যে পথ দিয়ে তিনি নিজে ঢুকেছিলেন তাঁর শাশুড়ীকে ঝুল কাটিয়ে। এখন বেরিয়ে যাবার জন্য সেই পথটাই আস্তে আস্তে চোখে পালিশ-করা মোলায়েম আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়।

শাশুড়ী হওয়া এবং হতে পারা কম কথা নয়। ওটা রীতিমত শিক্ষার ব্যাপার। প্রথম কথা, তাঁকে জানতে হবে যে নাড়ী-ছেঁড়া পুত্রসন্তানটি তাঁর নিজস্ব সম্পদ হলেও চিরস্থায়ী সম্পত্তি নয়। হলেও তামাদি হয়ে গেছে। দ্বিতীয় কথা, মেনে নিতে হবে জননীর চেয়ে স্ত্রীর নাড়ী-জ্ঞান আরও বিচক্ষণ। তৃতীয় এবং সর্বশেষ কথা, ভেবে নিতে হবে, যে-কৌশলে পড়ে শ্বশুর শাশুড়ীর কাছে কবলিত হয়েছিলেন, ঠিক সেই কৌশলে এবং যথোচিত বৈজ্ঞানিক দক্ষতায় পুত্রবধূর অঞ্চল-ছায়ায় পুত্র তার আশ্রয় লাভ করবেই। প্রথম দিকে খানিকটা প্রতিরোধের চেষ্টা থাকলেও, শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণটাই পুরুষের দাম্পত্য জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এ সরল সত্যটুকু জেনেও যে শাশুড়ী গৃহিণীপনা ও চাবি ছাড়তে অযথা দেরী করেন, তাঁর আচরণ অমার্জনীয়। অবশ্য, বিলম্ব হলে তার অন্য দাওয়াই আছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে সেটা মন্থর অথচ সূক্ষ্ম শল্য-চিকিৎসায় বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

শাশুড়ী ভাল-মন্দ যাই হোক, জীবিত থাকলে কি রকমটি হলে চলনসই হয়, তা নিয়ে সকলেই জল্পনা-কল্পনা করে থাকে। কেউ পছন্দ করে আধুনিক ছিম-ছাম সংস্করণ, কেউ বা সনাতন লৌকিকতায় পটু 'ওল্‌ড এডিশ্যন'। অবশ্য পাত্র-পাত্রীর বয়স ও রুচিভেদে শ্বশ্রূ-ধারণা আলাদা হয়ে থাকে। ছেলেরা যে ধরণ পছন্দ করে, মেয়েরা তাকে ন্যাকা বলে বাতিল করতে পারে। আবার মেয়েদের যে রকম শাশুড়ী কামনা, ছেলেদের কাছে সেটা গেঁয়োমি মনে হতে পারে। তবে মোটামুটি দুটো দল বা মত ঃ নবীনা ও প্রবীণা। নবীনা শাশুড়ী বেশ সুরসিকা, বাক্‌-চাতুর্যে ঝলমল, সিনেমা-গামিনী এবং জামাইকে অথবা পুত্রবধূকে অচিরেই বশীভূত করে ফেলেন। জামা-কাপড়ে, আসবাবে, অলঙ্কারে তাঁর রুচি তারিফ করবার মতো। যদি কন্যাটি প্রথম সন্তান হয় এবং মাতা কিঞ্চিৎ বেশি সুহাসিনী ও সুদর্শনা হন, তা হলে জামাই, জামাই-বন্ধু এবং কুটুম্বদের মধ্যে প্রৌঢ় ব্যক্তিরাও সপ্রশংস দৃষ্টি দিয়ে বলেন, 'অমুকের কপাল ভালো......একখানা দেখবার মতো শাশুড়ী বটে!' কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্ত্রী ও শাশুড়ীর মধ্যে ভগিনী-ভ্রম লজ্জাকর অস্বস্তিরও সৃষ্টি করে। আবার স্বামীর জননী যদি বধূকে কন্যার অধিক যত্ন, প্রিয়-বান্ধবীর মতো সখ্য এবং অতি-পরিচিতার বিশ্বাস-প্রীতি অর্পণ করেন, তাহলে সেটা গল্প কথার অবিশ্বাস্য আদর্শ বলেই মনে হয়। কিন্তু এমন টাইপ যে মেলে না, তা নয়। বিবাহের আগে অভিভাবিকারা শাশুড়ীর রীতি-গতি চাল-চলনের খোঁজ নেন, অথবা আলাপ করে বাজিয়ে নিতে চান। কারণ ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নির্ভর করে ঐ অজ্ঞাতচরিত্র মানুষটির ওপর।

কিন্তু স্বল্প আলাপে চেহারা দেখে সব সময়ে ধরা যায় না। পাকা জহুরী অবশ্য আবছা আলোতেও রত্ন চেনে। তবে পান্তুয়ার মতো চেহারা হলেই হাসি-খুশি খোস-মেজাজ হবে, কিংবা কুমড়োর মতো গোলগাল হলেই অলস ও ভালো মানুষ শাশুড়ী হবে, একথা বলা যায় না। স্বচক্ষে দেখেছি, শুকনো পাট-কাঠির মতো চেহারা, ছোট-খাটো দেহ নিয়ে এক এক মহিলার এমন দাপট যে পুত্র, কন্যা, বধূ ও কেরাণী-স্বামী ভয়ে থরহরি, শ্লেষের জ্বালায় কম্পমান। তার ওপর শুচিবাই থাকলে তো রীতিমত জমাট ব্যাপার! তাই মনে হয়, বাড়ীর আবহাওয়াটা দেখে কাজে এগুনো উচিত। যদি দেখেন, চারদিকে একটা চাপা গুমোট, কেমন যেন থম্‌থমে ভাব, কর্তা ঘন ঘন অন্দরে চোখ ফেরাচ্ছেন, ছেলেমেয়েদের মুখে-চোখে নিষ্প্রিয় সকরুণ স্পর্শ, তাহলে অনুমান করতে হবে যক্ষপুরীতে কোনও কাল-নাগিনীর নিঃশ্বাস বইছে। 'আসছে শনিবার সন্ধ্যায় আবার আসছি' বলে কেটে পড়বেন। কেন না, ফর্দ ... বা সামলানো যায়, উহ্য শাশুড়ীর অনু... প্রত্যাশা কথনোই মিটবে না।

শাশুড়ীর প্রত্যাশা, চলিত কথায় যাই অসীম। পুত্রবধূ অথবা জামাই আজ পর্যন্ত পুরোপুরি মনোমত হতে পেরেছে, ইতিহাসে লেখা নেই। কি ইঙ্গ কি বঙ্গ দেশে এই কারণেই শ্বশ্রূর অনুসন্ধিৎসু ও সমালোচনী দৃষ্টি ভয়ের বস্তু। ছেলের অথবা মেয়ের বোল ... সেবাযত্ন হচ্ছে না বা অভ্যস্ত আরাম-বিধানে ত্রুটি থেকে যাচ্ছে, এই কথাটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জানানোই হল শাশুড়ীর আদিম দায়িত্ব। ... মেয়ের চেয়ে বেশি আর জামাই ছেলের অধিক আপন, এ উক্তিগুলোয় আস্থা স্থাপন করা চলে না। কেন না, বউ বউ-ই এবং জামাই শত কর্তব্য হাসিমুখে পালন করলেও সে অপর ... থেকেই যায়। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। টলস্টয়ের মতো ঋষিতুল্য ব্যক্তি শাশুড়ীর ... দুর্বলতার সূক্ষ্ম চিত্র এঁকে গেছেন। ... কথা, খুব নিকটে আসার বিপক্ষে ... সামাজিক অন্তরায় রয়েছে। পূর্ব ধারণাগুলোই বাধা এবং সে বাধা আজও দূর হয়নি। ... মৌখিক ভদ্রতা ও সৌজন্য বাড়লেও আন্তরিকতার অভাব সংস্কারের আড়ালে লুকিয়ে আছে।

এমন শাশুড়ী নিশ্চয়ই আছেন যাঁরা প্রকৃতপক্ষে ভালো মানুষ অর্থাৎ দোষে-গুণে ভালোয়-মন্দয় যতটা ভালো হওয়া সম্ভব। নবীনা শাশুড়ী কিংবা বয়সের অনুপাতে মাত্রাধিক আধুনিকতা-দেখানো শাশুড়ী, কি জানি কেন, সন্দেহ সৃষ্টি করেন। মনে হয় এঁদের কাছে ফর্ম্যালিটিটাই বড়। সহজ সরল প্রকাশের চেয়ে সাড়ম্বর আত্মবিজ্ঞাপনটাই এঁরা পছন্দ করেন বেশি। এঁদের মুখ সর্বদাই মিষ্টি মোলায়েম, কথায় কথায় বলেন—'বড় আনন্দ হল'। অথচ আনন্দের আন্তরিক চিহ্ন কিছুই নেই হৃদয়ে। আর একদল শাশুড়ী আছেন যাঁরা স্থির গম্ভীর, বয়সের চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ ও বৃদ্ধ সেজে থাকেন, লৌকিকতায় যাঁদের অনায়াস দক্ষতা। এঁরা তত্ত্ব-তাবাস খুবই পছন্দ করেন আর জামাই বাড়ীতে পদার্পণ করলেই এক থালা মিষ্টি নিয়ে মেদবাহুল্যে মন্থরগতিতে এগিয়ে আসেন।

সব জিনিসেরই মাঝারিটা ভালো। তাই আমার সুচিন্তিত অভিমত যে, আদর্শ শাশুড়ী তিনিই, যিনি হরদম শিষ্ট কথার ফাঁকে ফাঁকে এক-আধটা মনোরম মিথ্যা বলেন, সিনেমা-থিয়েটার দেখার আগ্রহ অকপটে স্বীকার করেন এবং জিনিসপত্তর দেওয়া-নেওয়া সমান ভালোবাসেন। যিনি নিজের ছেলে-মেয়ের বয়স চুরি করেন না, পিতৃগৃহ বা শ্বশুরালয়ের অকারণ গৌরব কীর্তন করেন না। যিনি বৌকে ব জামাইকে আকণ্ঠ খাওয়াবার জন্য ব্যাকুল হন, সমালোচনার কৌতুক সহ্য করেন, তরকারীতে লুকিয়ে ঝাল দিয়ে ধরা পড়লে বলেন, 'ও কিছু নয়—গাছের লঙ্কা।' যাঁর মাথার কাপড় খালি খালি খুলে যায় আর দোষত্রুটি, বেফাঁস কাণ্ড দেখিয়ে দিলে হেসে ফেলেন, রাগেন না।

এককথায়—স্পোর্ট। দুর্লভ শ্বশ্রূ!

পশ্চিমের সহপাঠিনী

দেবেশ দাশ
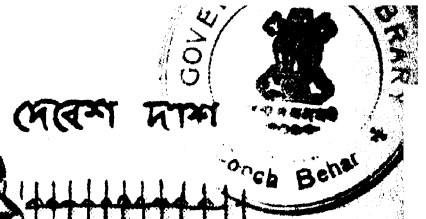
রূপে একেবারে চমক লাগিয়ে দিল। মনে মনে একটা ইংরেজী বর্ণনা আউড়ে গেলাম। পীচ ফল আর সরে মাখান বছর চল্লিশ। নধর হলদে রাঙা পীচ ফল, তার উজ্জলে সর পড়েছে। বেলা গড়িয়ে এসেছে। যৌবনের অপরাহ্ণ। বিলেতী পাকা পীচের রঙে রাঙান। তায় নারীর কমনীয়তা ভরা।

লিফ্‌ট দিয়ে নামতে নামতে নিজের মনে হাসলাম। উপমাটা একেবারে বিলেতী হয়ে গেল। যেন ইংরেজী ভাষায় স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু যে দেশে রয়েছি, যে দেশের লোকের সঙ্গে সব সময় উঠতে বসতে হাসতে কাশতে হচ্ছে, তাদের ভাষায় না হয় একটু স্বপ্নই দেখলাম। মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

কিন্তু জেগে স্বপ্ন দেখার সময় হল না। লিফ্‌টের বোতাম টিপছেন সেই মহিলাটিই। অতোমাটিক চালু লিফ্‌ট থামিয়ে ওকে তুলে নিলাম নির্জন পথে নয়, জ্যোৎস্না নিশীথেও নয়, কিন্তু আমরা দুজনে যাত্রী।

হোটেলের তের তলা থেকে নামছি। সারা পৃথিবীটাই এখন দূরে, অনেক দূরে।

পীচের দেহসৌরভ ভেসে আসতে লাগল। দেবর লক্ষ্মণের মত নয়নজোড়া একেবারে নত করে রাখলাম। কিন্তু সেখানেও একজোড়া চরণ-কমল নাইলনের টলটলে স্বচ্ছতা ভেদ করে ফুটে রয়েছে।

কাজেই সোজাসুজি চোখ তুলে ওর দিকে তাকালাম।

মামুলী সুপ্রভাত জানালাম। নেহাৎ ভদ্রতার বাঁধা বুলি। কিন্তু—সত্যি কথাটা স্বীকার করতে দোষ নেই—শুধু ভদ্রতা নয়। ভদ্রমহিলার শোভন কান্তি মনে একটু ধাক্কা দিয়েছে। গুড্‌ মর্ণিং কথা দুটো শুধু দুটো কথাই নয়। গলার স্বরে অনেকখানি স্বাভাবিক সহজ সুর ফুটে উঠল। সে সুর প্রথম যৌবনে, কলেজের দিনগুলোতে সহজ ছিল। সে সুর কাজ আর ভদ্রতার বেড়াজালে আটকিয়ে প্রায় ধামাচাপা পড়ে গেছে এতদিনে।

ওহ্‌, ইজ দ্যাট ইউ, ডক?

ডক, ডক। ডক অর্থাৎ ডক্টর।

ডক্টরেটের জন্য পড়ছিলাম না। তাতে বিলেতী ইউনিভার্সিটির ছাত্রজীবনের সবটুকু পাওয়া যায় না। সে জন্যে ডক্টরেটের জন্য মুখ বুজে থিসীস লেখার অধিকার স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলাম। বিলেতের কলেজের শিক্ষা পুরোপুরি নিতে হবে। তার জন্য নতুন করে গ্র্যাজুয়েট হতে হবে। গরীব পরাধীন ইন্ডিয়া থেকে লোকে আসে সব চেয়ে বড় খেতাব আর ছাপ নিয়ে যেতে। নিছক লেখাপড়া শিখতে নয়। সবারই মনে আমার এই ব্যাপারটা নাড়া দিয়ে গেল। আচ্ছা, ও না হয় ডক্টরেট করছে না। কিন্তু আমরা সবাই প্রীতি দিয়ে ওকে ডক্টর অর্থাৎ সংক্ষেপে ডক বানিয়ে দিলাম।

বছর বিশেকের পর। এক নিঃশ্বাসে ঝড়ো হাওয়াতে উড়ে গেল।

সামনে হাসি মুখে, বিস্ময় ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পেনী। পেনিলোপী, মার্কিণ মেয়ে, কিংস কলেজের সহপাঠিনী। মাত্র এক পেনী, ব্যাড পেনী, হে পেনী (আধ পেনী) কত কিছুই না ওকে ডাকত সহপাঠীরা। ও যখন সব সহপাঠীদের টিউটোরিয়াল পরীক্ষায় হারাতে আরম্ভ করল তখন সবাই বিরক্ত হয়ে সব ডাক নামই ছেড়ে দিল। ডাক নাম হচ্ছে আদর করে ডাকার নাম। যে মেয়ে সব ছেলেদের হারিয়ে দিয়ে নীল জাম্পারের তলায় স্কার্টের পাশের বাঁধন জিপ ফাসেনারটা টানতে টানতে মেয়েদের আলাদা কমনরুমে চলে যায় তাকে আবার আদর করে ডাকব কেন? সে যখন সহপাঠীদের এমন তুরুশ্চু করে তখন সে আর ব্যাড পেনীও নয়, হে-পেনীও নয়। শুধু সাদামাঠা পেনী। আর কিছু নয়। এই ঘরের চারটে দেওয়াল আর এই মোম বাতীর নীচে বিলেতী কায়দায় হলপ করে বলছি আমরা, সব ছেলেরা, যে ও মেয়ে শুধু পেনী ছাড়া আর কিছু নয়।

লণ্ডন অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজের মত পুরাণোপন্থী নয়। এখানে কলেজে ছেলে-মেয়েরা এক সঙ্গে পড়ে। মেয়েদের আলাদা কলেজও আছে; কিন্তু নিরুপায় না হলে সেখানে ছাত্রীরা যায় না। কলেজগুলিতে অবশ্য মেয়েদের আলাদা কমন-রুম আছে, বিশ্রামের গোছান জায়গা আছে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের এক সঙ্গে ব্যবহারের কমনরুমও আছে। প্রথম কলেজে ঢুকে ছাত্রীরা মেয়েদের কমনরুমেই চলে যায়। তার পর আস্তে আস্তে কেমন করে না জানি নিজেরই অজান্তে পা চলে আসে অন্য কমনরুমটার দিকে। হয়ত সঙ্গে থাকে ক্লাশে নতুন পরিচয় করা কোন ছাত্র। হয়ত মনে জাগে নতুন মানুষদের পরিচয় পাবার ঔৎসুক্য। মোট কথা কয়েক মাসের মধ্যেই ছাত্রদের ঘরটাই গুলজার হয়ে ওঠে। একে একে প্রায় সব ছাত্রীই এসে জোটে সেখানে। এল না শুধু পেনী। ব্যাড পেনী।

আস্তে আস্তে সব গা-সওয়া হয়ে গেল। পেনী অন্য জগতের, থুড়ি অন্য ঘরের লোক। সে নেহাৎ একমনে পড়াশোনা করে। এমন কি যে সময়টা কমনরুমে গা ঢেলে দিয়ে লোকে বিশ্রাম নেয়—তখনো। এরকম অন্যায্য সুবিধা যারা নেয়, যারা কলেজের মাইনে দিয়ে টাকার আঠার আনা উশুল করে নেয় তারা মোটেই স্পোর্ট নয়। তাদের আমরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনি না। নেহাৎ পরীক্ষার সময় নামটা উপরের দিকে থাকে বলে সমঝে চলতে হয়। তবু ওর সুন্দর মুখখানা সবাই ভুলাতে চেষ্টা করল।

যে ফুল বাগানের দেওয়ালের ওপারে আড়ালে ফুটে আছে তার জন্য ওদেশে কোন মাথাব্যথা হবার দরকার নেই।

ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে দেশ; আনন্দে মাতাল হাওয়া বয়ে যাচ্ছে অবারিত। মা… গানে হাসির ঝঙ্কারে কারো মনকে আঁধা… থাকতে দেবে না; চোখকে রাখবে না পিপাসিত…

সহপাঠী বন্ধু 'সু' দুঃখ করছিল পেন… আমাদের কমনরুমে আসে না বলে। হেসে … কথা উড়িয়ে দিলাম। বললাম আম…

মতবাদটা। কিন্তু সে একমত হল না। বরং সমালোচনা করল যে, আমি বিলেতের সব কিছুকেই উজ্জ্বল দেখি। এই আলো আমায় ধাঁধিয়ে রেখেছে।

আবার হেসে উঠলাম। বললাম দুঃখকে কেমন করে বুড়ো আঙ্গুল দেখাতে হয় সে বিদ্যা এরা বেশ রপ্ত করে রেখেছে।

—বটে, সব খবরই রাখ দেখছি এদের।

—তা কিছু কিছু ত রাখি। এই দেখ না, এই মাত্র একজন ইটালিয়ান পাঁচালী কবির ছড়া পড়ছিলাম। বেশ দুঃখের হতাশা কবিতা। কিন্তু পড়ে কেমন দুঃখের সঙ্গে মজাও লাগে শোন একবার। ভেনোসার রাজপুত্র ডন কার্লো জেসয়াল্ডো তিনশো বছর আগে গাইত :—

একটা ছোট্ট মশা
আমার দুখ জাগানিয়ার
বক্ষে জাগায় হাহাকার
বেঁধে সেথায় বাসা;
দুঃসাহসী মশা।

সামনের চুল্লীতে গমগমে আগুন জ্বলছে। তবু তাতে আরো দুটো কয়লার চাঙড় ঢুকিয়ে দিলাম। তারপর "সু"র দিকে এগিয়ে এসে বললাম—বলি, ব্যাপার কি ? পেনী এঘরে আসে না বলে এত আফশোশ কেন? মশা কামড়াচ্ছে না কি ?

—ধ্যেৎ, তুমি ভারী অসভ্য।

"সু"র পাকা ভারতীর রঙে একটু বিলেতী আমেজ লাগল কি না তা নজর করতে পারার আগেই দুমদাম করে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরীক্ষার সময় এগিয়ে আসছে। "সু"র কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ছিল না। এমন কি পেনী যখন এ ঘরে যাতায়াত সুরু করল তখন তার দিকে পর্যন্ত কেউ নজর দিল না। পরীক্ষার সময় পরীক্ষা। কাজের সময় কাজ। তা ছাড়া ততদিনে সহশিক্ষার চমকটাও চলে গেছে। পাশে বসে যে প্রফেসারের বক্তৃতা থেকে নোট টুকছে সে জন না জিন সে খবর আর কেউ নেয় না।

শুধু খবর নিয়েছিলাম যখন ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় দেখলাম পেনী খারাপ করেছে। প্রফেসার অবাক হলেন; আমরা সবাই মাথা নাড়লাম। কে যেন ফিসফিস করে চায়ের কাপের আড়ালে বলল যে, পেনী গভীর প্রেমে পড়েছিল। সেই জন্যেই ওর এই দুর্দশা। পেনী নাকি বলেছে যে, জীবনে আর কখনো সে ধাক্কা সামলাতে পারবে না।

সেই পেনী। রূপে, সমৃদ্ধিতে সাফল্যে ঝলমল করছে। প্রাণ যেন উছলিয়ে পড়ছে। কানায় কানায় ভরা এক পাত্র প্রাণ। আজ বিশ বছর পরে বললাম তাকে সে কথা। সে কথায় তার জ্যোৎস্নার সাগরে বান ডাকল। পুরোনো কথার আর শেষ হয় না। দু-তিনদিন এক টেবিলে ব্রেকফাস্ট খেলাম। একদিন খানিকটা আলাপের পর সে-ই আহ্বান করল—চল, শনিবার বিকেলে কলেজে বেড়াতে যাওয়া যাক। উই শ্যাল ওয়াক ইন মেমোরিজ গার্ডেন। স্মরণের কাননে আমরা বিচরণ করব।

স্মরণের কাননেই বটে। যুগ যুগ ধরে কত জ্ঞানীর স্বপ্ন আর স্মৃতিতে ঘেরা কলেজ। কিন্তু তাদের কথা যেন কত দূরের কথা। তার চেয়ে অনেক ছোট কিন্তু অনেক কাছে হচ্ছে আমাদের কথা, এই সেদিনের আশা-ঘেরা অনিশ্চয়তা ভরা ছাত্র জীবন। পাশে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে টেমস নদী। কলেজের বাগানটা সবুজে ফুলে ভরা, নরম সবুজ ঘাসে ছাওয়া। সেখানে আমরা বসলাম। বেঞ্চিতে নয়, ঘাসে। শুধু বসলাম না; আমি একটা টিউলিপ ফুলের ঝাড়ের পাশে শুয়ে পড়লাম।

কি ? শুয়ে পড়লে যে। কবিতা লিখবে বলে ভয় দেখাচ্ছ মনে হচ্ছে।

পেনীর ঠাট্টায় বিচলিত হলাম না। যা উত্তর দিলাম সোজা কথায় তার মানে হচ্ছে এই যে—অয়ি মার্কিণ অভদ্রে, তোমার এই ঔদ্ধত্যের জন্য ক্ষমা করলাম। তুমি জান না, এ হেন একটা ঠাট্টা করে তুমি বিশ্বকে একটা বড় প্রতিভার দান থেকে বঞ্চিত করলে।

বটে ? বটে ? জানতাম না যে পুরোনো কলেজে এসে লোকে এ যুগেও কবি হয়ে ওঠে। ইণ্ডিয়াতে সরকারী অফিসে লোকে যে নোট লেখে তা বুঝি গানের নোটেশন (স্বরলিপি) ?

খুব গাম্ভীর্যভাবে বললাম,—আমায় ঠাট্টা করতে পার। কিন্তু নিশ্চয়ই জান যে, যে গানটা পৃথিবী জুড়ে সর্বত্র সব চেয়ে বেশী হাঙ্গামি চালু হয়েছিল সেটা এমনিভাবে কলেজের মাঠে বসে লেখা? আর আমারি মত একজন ভূতপূর্ব ছাত্রের কীর্তি ?

উৎসুক হয়ে সে জিজ্ঞেস করল,—কোন গানটা ?

চ্যালেঞ্জ করে বললাম,—তুমিই আন্দাজ করবার চেষ্টা কর।

গুনগুন করে অনেক গানের সুর সে ভাজল। ঠিক এমন একটা জিনিষ আমাদের দেশে সহজে পারতাম না। কারণ এখানে গান হচ্ছে শুধু গাইয়ের সাধনা। শুনিয়ের মনে তান তুলতে পারে, কিন্তু তার গলায় গুনগুনোনি এনে দেবে না। কয়েকটা গানের সুরে ভাজা হবার পর বললাম,—আচ্ছা, একটু সংকেত দিচ্ছি। সেই ছাত্রটি এই একটা গানের রেকর্ডের রয়্যালটি থেকে এ যাবৎ কামিয়েছে পনের লক্ষ টাকা। তোমাদের দেশের রচনা। পৃথিবীতে আর কোথায় এমনভাবে দুহাতের সাধনা হয় বল ?

সঙ্গে সঙ্গে পেনী সুরটা ধরে ফেলল। ষ্টার ডাস্ট। তারার গুঁড়ো। আমেরিকায় একটি কলেজের ছাত্র অনেকদিন পরে আমারি মত পুরোনো কলেজে বেড়াতে এসেছিল। বেড়াতে বেড়াতে সে কলেজের মাঠে শুয়ে পড়ে। গুন-গুন করতে করতে মনের খুসীতে তার গলায় গান এসে গেল।

কাননে দেওয়াল পাশে
যেথায় উজলি' রহে তারা
তুমি বাঁধা বাহু পাশে,
রূপকথা গাহে পাপিয়ারা;
স্বরগের গান ওঠে
যেথায় গোলাপ ফোটে,
বৃথা স্বপ্ন দেখি হায়
নিতি রহ এ হিয়ায়
তারার গুঁড়ায় গান ভরে
প্রেমের স্মৃতির আখরে।

অনেকগুলি গানের কলি আর সুরে পেনীর মনে মনে ঝঙ্কার দিয়েছে এতক্ষণ ধরে। বন্যার স্রোতের মত তারা ঢেউ তুলে গেছে একটার পর একটা। আমাদের গরম দেশে নরম মনে তার প্রতিঘাত হয়ত কিছু নাড়া দিয়ে যেত। ফাল্গুনের আগুন ভরা রাতে কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে হয়ত একটা তোলপাড়ও উঠতে পারত। কিন্তু এই ঠাণ্ডা দেশের হিসাবদুরস্ত আবহাওয়াতে নারী আর পুরুষের অবাধ মেলামেশার সমাজে আগুন আর ঘিয়ের উপমা অত সহজে খাটে না। একটি ছেলে আর একটি মেয়ের বন্ধুত্ব চট করে প্রেমে জমে ওঠে না। তায় আবার পেনী হচ্ছে মার্কিণী মুলুকের মেয়ে। সে দেশে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ হচ্ছে নাকি অত্যন্ত যাকে বলে বৈষয়িক অর্থাৎ ম্যাটার অব ফ্যাক্ট। তার উপর মিসেস পেনিলোপী আর্মষ্ট্রং নিজেই প্রকাণ্ড "ফারের" ব্যবসা চালায়। সেই ব্যবসায় আমদানী রপ্তানীর জন্যই সে ইংলণ্ডে এসেছে। "ফারে"র দাম সৌন্দর্যে যারা প্রিয়াকে সাজাতে চায় তেমন পুরুষ, আর যারা তাই পরে সবার প্রশংসার দৃষ্টি কুড়োতে চায় তেমন নারীর সঙ্গেই ওর কারবার। অতএব গোটা কয়েক মায়ায় ভরা সুরের পরশে ওর মনে ভাপে ভরা ফানুস জ্বলে ওঠার কোন ভয় নেই।

কিন্তু হঠাৎ পেনী চুপ করে আছে কেন। কি হল ওর? ওর চোখে কি বিকেলের রোদে টেমস নদীর বুকের ঝলমলে আলোর ছায়া ? না, কনে-দেখা আলোতে মার্কিণ ম্যাক্স ফ্যাক্টরের প্রসাধন আই-শ্যাডো অর্থাৎ চোখের ছায়ার মায়া ?

একটু ভাবনায় পড়লাম। পেনী যদি কোন কারণে বেসামাল হয়ে থাকে ? এখন আমার একটু রাশ টানাই বোধ হয় ভাল। একটু ফর্মালভাবে চলতে হবে। গেল দু-তিনটে দিন সকালে ব্রেকফাষ্ট টেবিলে গল্প-গুজব একটু বেশীই বোধ হয় করা হয়েছিল।

যেন ও-পাশের ঘর থেকে আলগোছে আমায় ডাকল,—ডক।

লেপাপোছা গলায় সাড়া দিলাম,—ইয়েস মিসেস আর্মষ্ট্রং, য়্যাট ইয়োর সার্ভিস।

এ হেন উত্তরের ভঙ্গির জন্য সে তৈরী ছিল না। আমিও না। হঠাৎ এ কি করে বসলাম। পেনী কিন্তু চোখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিজে আবার সহজ হয়ে বসল।

তারপর মুখটা একটু কঠিন করে সে বলল,—আমায় তুমি ঠাট্টা করছ, ডক ?

গম্ভীরভাবে বললাম—যাক, তবু বাইশ বছর পরে সেটা বুঝতে পারলে।

আরো কঠিন হয়ে সে বলল—ইউ সিলি ডক। তবে তোমায় দোষ দেব না। ইংলণ্ডের বসন্তকালে বিকেলের আলোয় লোকে বোধ হয় বোকাই হয়ে ওঠে।

এবার গাম্ভীর্যের মুখোস খসিয়ে ফেলে জবাব দিলাম,—ঠিকই বলেছ। আমরা তোমায় তখন প্রায়ই এই বিকেলী আলোতেই কলেজ থেকে বেরিয়ে যেতে দেখতাম।

যেন দড়াম করে ধাক্কা খেয়ে সে উঠে পড়ল।

সুর কেটে গেল। বোকার মত আমিও উঠে পড়লাম। মাটির নীচে সুড়ঙ্গ-পথে টিউব ট্রেণে যেতে যেতে অবশ্য কোন লোককে কিছু বুঝতে পারল না। ওদেশের সভ্যতার গুণই এই। মুখ দেখাচ্ছি না মুখোশ দেখাচ্ছি তাতে বাইরের লোকের দরকার কি ?

মনের আগল না হয় বন্ধই হল, মুখে তালা পড়বে কেন ?

পূর্বপুরুষদের দান

তখনো ইতিহাস লেখা হয়নি। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে মানুষ যে ফসল প্রথম ফলাতে সুরু করেছিল তা হচ্ছে বার্লি। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। খৃষ্টজন্মের তিন হাজার বছর আগেকার মিশরের মিনারে যে ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে যে শস্যের নিদর্শন রয়েছে তা বার্লি বলেই পণ্ডিতেরা বলেন। তাছাড়া, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালী ও স্যাভয়ের প্রাচীন সভ্যতার যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতেও বার্লির প্রাচীনত্বের প্রমাণ মেলে। খৃষ্টজন্মের ২৭০০ বছর আগে সম্রাট সেংস্থুঙ্‌ এর চাষ সুরু করেছিলেন চীনে।

আমাদের সংস্কৃত পুরাণ ও শাস্ত্রাদিতে যবের উল্লেখ রয়েছে। মহেঞ্জোদড়োয় সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারের মধ্যেও জানা গেছে যে বার্লির ফলন খৃষ্টজন্মের ৩০০০ বছর আগে ভারতবর্ষে ছিল। বেদে যবের উল্লেখ থেকে আরো মনে হয় ধান বা গম চাষের অনেক আগেই ভারতবাসীর প্রধান খাদ্য ছিল বার্লিশস্য। আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা বার্লির পুষ্টিকর গুণগুলির কথা জানতেন। পালা-পার্বণ ও উৎসবে এবং প্রাত্যহিক আহার্য ও পানীয় হিসেবে বার্লির ব্যবহার ছিল। এই কারণে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে বার্লিশস্য একাত্ম হ'য়ে আছে।

আজো বার্লি মানুষের একটি বিশিষ্ট খাদ্য। বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষে অসংখ্য মানুষ বার্লির পানীয় দিয়েই জীবনধারণ করে। বার্লি-শস্য থেকে উৎপন্ন পার্ল বার্লি ও গুঁড়ো বার্লি সহজে হজম হয় এবং শারীর ক্রিয়ার সহায়ক ব'লে রুগ্নদের জন্যেই এর বহুল ব্যবহার।

শস্য উৎপাদন পদ্ধতি ও যান্ত্রিক উন্নয়নের ফলে বার্লির চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলেছে। 'পিউরিটি বার্লি' প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিঃ-এর সর্বাধুনিক কারখানায় উঁচুজাতের বার্লিশস্য থেকে স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে বার্লি তৈরী হয়। এই জন্যেই 'পিউরিটি বার্লি' রুগ্ন, শিশু ও প্রসূতিদের ব্যবস্থা দেওয়া হয়। যুবা ও বৃদ্ধরাও এই বার্লি খেয়ে উপকার পান।

অ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিঃ (ইংল্যাণ্ডে সংগঠিত)

PTY 3004

রাতে ডিনারের সময় ওর টেবিলের দিকে লক্ষ্য রাখলাম। অবশ্য খাবার ঘরে ঢুকেই নিয়ম মাফিক হেসে শুভ-সম্ভাষণ করে গিয়েছিলাম। কিন্তু বেশী কথা কইতে সাহস হয়নি। আমার মনে ছিল অনুতাপ। কে জানে, ওর মনে কোন্ তাপ ?

ওর উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমিও উঠলাম। যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে দুয়েকটা কথা কইতে কইতে হাজির হলাম টেলিভিসন ঘরের দরজায়। হঠাৎ দরজাটা খুলে একটু মাথা হেলিয়ে আহ্বান জানাতেই সে খুব খুসী হয়ে উঠল। ধন্যবাদ দিয়ে ঘরে ঢুকল। কেউ নেই সে ঘরে। "টি. ভি"র চাবী টিপে দিতেই সেদিনকার ফুটবল খেলার ছবি দেখান সুরু হল। বাঁচলাম। ফুটবলটার মার্কিণ দেশে কদর নেই।

তাই দিয়ে কথা সুরু করলাম। আস্তে আস্তে দুজনের মাঝখানের বরফ গলতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত খুব দুঃখ জানিয়ে বিকেলের ব্যবহারের জন্য মাপ চাইলাম। বললাম যে কোন মার্কিণ মহিলা এইটুকু ঠাট্টায় যে আঘাত পাবে তা কখনো বুঝতে পারিনি। সত্যি বড়ই, বড়ই দুঃখিত আমি।

আমার দুঃখ দেখে ওর হাসি এল। বলল— আচ্ছা, ডক এই নিয়ে আজ বোধ হয় পনেরবার শুনলাম যে আমি আমেরিকান। কিন্তু বলত, হোয়াটস আমেরিকান অ্যাবাউট আমেরিকা ? আমেরিকার মধ্যে মার্কিণত্বটা কি ?

সুবিধা হয়ে গেল। এমন একটা বিষয় এসে গেল যা নিয়ে অনেকক্ষণ কথা বলা যাবে। আস্তে আস্তে ওর মনের ব্যথাটা ধুয়ে যাবে। তখন আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে শুভরাত্রি জানিয়ে চলে যাব।

বেশ জমিয়ে বসে সুরু করলাম।

আমেরিকানত্ব যে ঠিক কি তা বলা বড় শক্ত। এই দেখ না, সবাই তোমাদের বলে ঘোর বস্তুতন্ত্রবাদী, অথচ এক একটা আদর্শের জন্য আমেরিকা কি না করল। এমনভাবে ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই করে অন্য দেশের অন্য বর্ণের নিগ্রোদের দাসত্ব উঠিয়ে দিতে আর যে কারা পারত জানি না। এদিকে দেখ, ওদের আইন-মতে সব অধিকার দিয়েও সমাজ হিসাবে বঞ্চিত করে রেখেছ।

ও একটু উসখুস করতে লাগল। তাই বিষয়টা বদলে ফেললাম।

সবাই বলে তোমরা নিজেদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নিয়ে ব্যস্ত, অথচ মার্কিণে মার্কিণে ধুলে পরিমাণ; এমনি তোমরা দল বাঁধতে পার। গুরুজনকে তোমরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আন না, অথচ "মম" অর্থাৎ মা-মণি বলতে অজ্ঞান।

হেসে উঠল পেনী।—বাঃ বেশ ত দেখছি কলেজের রচনা তৈরী করে যাচ্ছ। "এসে" লিখেছিলে বোধ হয় এ বিষয়ে ?

—প্রায় সে রকমই। তবে তোমাদের বিশেষত্ব হচ্ছে কি কি জান ? নিউ ইয়র্কের আকাশের রেখা, মোটর গাড়ী, জ্যাজ বাজনা আর চিউইং গাম।

—চিউইং গাম ? অবাক করলে।

—শোনই না ছাই। আগে আমায় মুখ চালাতে দাও, পরে চিবোবার জিনিষে আসা যাবে।

চুপ করে পেনী ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে রাখা লিপস্টিক প্রভৃতির দিকে নজর দিল। নারী, একেবারে আশার অতীত ভাবে নারী। হোক না কলেজের পড়ুয়া, হোক না স্বাধীনা ব্যবসায়ী।

পৃথিবীর সব চেয়ে বড় সাইজের দেশ-গুলির অন্যতম। ভারতবর্ষের তিনগুণ সাইজ। কিন্তু আমেরিকা তেড়ে ফুড়ে আকাশের দিকে ধাওয়া করেছে। মনের বা রুচির দিক দিয়ে ওই আকাশ-আঁচড়া ইমারৎগুলোর কোন মানে হয় না। পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই উঁচু উঁচু বাড়ীগুলো পাগলামীর চিহ্ন সেজে বসে আছে। কিন্তু সব শুদ্ধ মিলিয়ে কি খাসা দৃশ্যই না হয়েছে। গতি, আরো বেশী গতি, আরো উঁচুতে গতিবেগ দেওয়ার মন্ত্রে ওরা বিভোর। সংসারাতীত ওপরওয়ালার খবরে মন না থাকতে পারে; সংসারের উপরের দিকে সর্বদাই ধাওয়া করছে।

হেসে বাধা দিল পেনী।—তোমার চিবুনে রবারেও সেই গতির মন্ত্র আছে নাকি ?

—রসিকে, রসো একটু। আমার বক্তব্যটা জমতে দাও। মোটরের কথা না হয় বাদই দিলাম। জ্যাজ বাজনাটার কথাটা বলি। পশ্চিম ইয়োরোপের সঙ্গীতের সঙ্গে জ্যাজের চেহারার পর্যন্ত মিল নেই। মাতোয়ালা ছন্দ তার, কিন্তু কখন কোথায় যে মনগড়া পরিবর্তন হয়ে যাবে তার ঠিক নেই। শুধু গতিবেগটুকুই আছে তার ঠিক। এ বাজনার ক্লাইম্যাক্স নেই, আছে অবসান। ঠিক তোমাদের স্কাই স্ক্রেপার-গুলোর মত।

—ওঃ ডক, তোমার কথাগুলোও স্কাই স্ক্রেপারের মত মাথা ফুড়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে।

—কথাগুলো আমার নয়। অন্যেরাও একথা বলে। শিল্প হচ্ছে জমাটবাঁধা সঙ্গীত। আর এ যুগের সব চেয়ে বড় স্থপতি লে কর্‌বুসিয়ে বলেছেন যে, আমেরিকার ইমারৎ-গুলো হচ্ছে লোহা আর পাথরের গরমাগরম জ্যাজ।

সত্যি সত্যি ওর ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা চিউইং গাম বের করে মুখে দিল। দিয়ে বলল—এবার বল চিউইং গামের কথা।

—ওই যে চিবিয়ে চলেছ এটাও একটা গতি। মুখ চালিয়ে চল অন্ততঃ, আর যদি কিছু না চলে। ও পদার্থটি তুমি খেয়ে ফুরিয়ে ফেলবে না, গিলে শেষ করবে না। শুধু অর্থহীনভাবে নৈর্ব্যক্তিকভাবে চিবুতে থাকবে। মুখের মধ্যে ঘুরে-ফিরে বেড়াবে এই চিবুনে বস্তু, ঠিক যেরকম—

ঠিক কি রকম বলতে পারছিলাম না। বলার তোড়ের সঙ্গে ভাবার গতি তাল সামলাতে পারেনি। চট্ করে বলে ফেললাম—

—ঠিক তোমাদের মেট্রোপলিটান অপেরার সেই প্রিয় সোপ অপেরার (সাবানের ফেনার মত হাল্কা চটকের গীতিনাট্য) গানটার রেশের মত ঃ

কবে দেব তোমা' মোর প্রেম ?
শুধু জানি, তাহা ত জানি না।
হয়ত দেব না কভু প্রেম;
হয়ত কালই দেব, জানি না।

এই গানটা আউড়ে যাবার সময় কিছু ভাবিনি। কিন্তু হঠাৎ মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি চাপল। গানটার মধ্যে একটা বড় রকম সম্ভাবনা আছে। দেব নাকি একটা ডেপথ চার্জ ?

বিকেলে অমন করে ওর চোখের তারা কি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল শুধু শুধু ?

যেন কোন লুকোনো মানে নেই আমার প্রশ্নে। নেই কোন ইসারা। এমনি একটা ভাব দেখিয়ে খুব সহজভাবেই জিজ্ঞেস করলাম,— তোমাদের দেশে এত ইনিয়ে-বিনিয়ে প্রেমের গান রচনা হচ্ছে। কি করে সেটা সম্ভব? এটা ত আমেরিকান পদার্থ নয়।

চোখ বড় বড় করে সে বলল,—নয় ? তুমি কি করে জানলে ?

খুব নিরীহের মত মুখ করে শুধোলাম— সেই জন্যেই ত জিজ্ঞেস করছি। তুমি প্রেমের কথা কি জান ?

পেনী, আমাদের কলেজের সেই বাচ্চা পেনী হঠাৎ বলে বসল,—তুমি সারা জীবনে যতটা জানতে পারবে তার চেয়েও বেশী কথা আমি ভুলে গেছি।

এরি মধ্যে।...

টেলিভিসনের প্রোগ্রাম বন্ধ হয়ে গেছে ততক্ষণে। তার পর্দাটায় ছবি আর আওয়াজ শেষ হয়ে গেছে। শুধু বিজলী আলোর একটা প্রতিফলন, ইস্পাতের রঙের প্রতিফলন, আঁকা বাঁকা রেখা এঁকে যাচ্ছে পর্দার বুকে।

উঠে গিয়ে যে সুইচটা বন্ধ করে দেব তা মন চাইছে না। পেনী এমন নিস্তব্ধতার সাগরে ডুব দিয়েছে যে তার ধ্যান ভঙ্গ হবে।

জানি যে পশ্চিম জগতে কেউ ব্যথার ভারে নুয়ে বসে থাকে না সারা জীবন। শুধু মন ভাঙ্গা নয়, ঘর ভাঙ্গা, ইহকালের বাসা ভাঙ্গা পর্যন্ত ওদের দমিয়ে রাখতে পারে না বেশীদিন। যে মন থেকে বিচ্ছেদ ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে না সে-ও গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে ঠিকই।

"জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই"

কিন্তু নৌকোরও ত অভাব নেই। ঘাটে ঘাটে বাঁধা তরণী। তীরে না হয় নীরে—সব ঠাঁই তুমি পাবে হৃদয়হরণী। যদি সে সম্পদ তুমি কাউকে দিতে চাও।

মনে পড়ল উইলিয়াম জেমসের লেখা। অত্যন্ত আমেরিকান এই দার্শনিক জেমস। তিনি তাঁর বোনকে বোঝাচ্ছিলেন যে তাঁর বাড়ীটা সব চেয়ে আরামের বাড়ী। কারণ এর চোদ্দটা দরজা; আর সবগুলোই বাইরের দিকে খোলে।

এ যুগে সব চেয়ে বেশী যার মতবাদ লোকের মনে নাড়া জাগাচ্ছে সেই জাঁ পল সার্ত্রের কথাও মনে পড়ল। নিউইয়র্ক সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে, এর সব রাস্তাই এত লম্বা আর সোজা যে মানুষের বসবাসের খাঁচা গুলোকে বন্ধ বলে মনেই হয় না। একটা অসীমতায় তারা ধাওয়া করে চলেছেন। অশেষ তার আস্বাদ আছে তাতে।

সত্যিই ত। সত্যিকারের আমেরিকার মধ্যে আছে এই ধেয়ে চলা, এই অশেষের পানে পরিণতি। আমাদের পেনীর মনেও আজ তারি ছোঁয়া, তারি আশ্বাস।

কিন্তু পুরোপুরি তা না-ও হতে পারে। ওরা আজ প্রণয়ী—এবং তার চেয়ে বড় কথা বিয়ের জুড়ী ঠিক করতে আরম্ভ করেছে যখন

(শেষাংশ ২০৮ পৃষ্ঠায়)

বরদাত্রী

•• বিমল চন্দ্র ঘোষ ••

স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা
ভবেৎ।"—উজ্জ্বল নীলমণি।

ভীর যন্ত্রণার সুমেরু শীতল স্তব্ধতায়
ার স্পন্দন অনুভব করি;
-তুষার জমিয়ে জমিয়ে
করি তোমার নক্ষত্র মূর্তি।
মুখী শিল্পের ব্যঞ্জনায়
আকাশে ঝলমল ক'রে ওঠে
ার মনোময় স্বচ্ছতায়
প্রসন্ন-রূপালি আবির্ভাব।

কর্মপথের অবিমৃষ্য অন্ধকারে
সত্তার বহুমুখী তামসপথ
!
স!
র!
রেমা প্রলোভনে জীবনকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে।

দিগ্‌ভ্রান্তির পথে
বারে বারে তুমি পথ দেখাও
ার তেজস্বী প্রেমের দীপ্তিতে।
কালের বিশৃঙ্খলাকে
পুড়িয়ে ছাই ক'রে দাও
বরদাত্রী শিখায়।
নিরবয়ব উচ্চাশারা কায়ারূপ ধরে;
পরীক্ষার শতছিদ্র কলস
পূর্ণ করো
নায়িকার কলঙ্ক মোচনে;
চিনতে আমার একটুও ভুল হয়নি
বিভীষিকার সংসারে।

শূন্যতার বুকভরা শুভস্পতির আলোয়
স্বাতি তুমি
আমার অহঙ্কারে অহঙ্কৃতা!
পাতালমুখী প্রাণের অসংখ্য শেকড়
করো তোমার নিঃশব্দ নারায়ণী স্রোতে।
কাঠিন্য-কাঁপানো গান গাও
ঝঙ্কারে
জোৎস্না-সমুদ্রে কেঁপে ওঠে
তরঙ্গিত কোটি কোটি তারা।
প্রাণের কল্পবৃক্ষে ফুটিয়ে তোলো
না-জানা রাগিণীর জ্যোতির্মুকুল।

শিখরবিজয়িনী স্বাতি তুমি,
ার হৈমকান্ত চেতনার
বিন্দু বিন্দু অমৃত সিঞ্চনে
ায় সমুদ্রশঙ্খ
যার দিকদিগন্তে উৎসারিত।
ায় কোটি কোটি কীটকঙ্কালের প্রবাল
যার নিশান্তিক সূর্যের
লাবণ্যকেও নিষ্প্রভ করে।
ায় নীলাভরক্তিমশুভ্র মুক্তা
ার সামুদ্রিম প্রেমের রাগরক্তিম শুক্তিতে।

এই গম্ভীর
মনোলোকের চৈতন্যশিখরে
ার হৃদয়-তুষার খোদাই ক'রে
করেছি তোমার নক্ষত্রমূর্তি!
আমার বহিরঙ্গ
কাব্য-চেতনার প্রাঞ্জল আকাশে
হীনা স্বাতি।

কুয়াশা

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

সমুদ্র উদ্বেল হয়, মনের উত্তাল আবেগে
হঠাৎ জোয়ার আসে,
সবুজ পতাকা নাড়ে—বহুক্ষণ-পড়ে-থাকা
ভাগ্যহত কোনো এক প্যাসেঞ্জার গাড়ী
পথ পায়। তেমনি কি কাঁকণের ধ্বনি
ক্রাচে-ভর-করে হাঁটা পংগুদেহ খোঁড়ার হৃদয়ে
সুর তোলে, নরম আদরে ছোট
লজ্জানত হাতের ইসারা—
আগাছার বনে তবু দু-চারটে বেল কিম্বা যুঁই
ফুটে ওঠে? হঠাৎ উদ্দীপ্ত হয় মনের আবেগ,
হঠাৎ জোয়ার জাগে সাগরে সাগরে,
হৃদয়ের তটে তটে অশ্রান্ত কল্লোল?

যখন কুয়াশা ঢাকে—এই ম্লান সহরীকে তবু
কুলবধূ মনে হয়, রেশমী গুণ্ঠনে ঢাকা
ব্রীড়াবতী, কুণ্ঠার আড়ালে ধরা
প্রেমে প্রাণে যেন এক অনবদ্য নারী—
যেন এক অনবদ্য নারী খেলা করে!
ফুল ছোঁড়ে, কাছে ডাকে, সোহাগ জানায়!
ধুলো ও ধোঁয়ার রূপ স্বপ্নময়, বিমুগ্ধ ধূসর
জীর্ণদীর্ণ রুক্ষতাও ঢাকা পড়ে যায়—
ময়লা গেঞ্জিকে ঢেকে
ওপরে চড়ানো যেন পাটভাঙা সুন্দর পাঞ্জাবি।

তেমনি একেক দিন—জীবনের সাগরে জোয়ার
হঠাৎ উদ্বেল হলে, কুয়াশার মায়া জাগে,
মনের বেদনা ঢাকে,
ফুল খেলে,
ছড়ায় কৌতুক।
তোমাকেও কাছে পাই, জীবনের সকল অলিন্দে
ধুলোতেও রঙ ধরে, গান জাগে!
হঠাৎ কিসের মন্ত্রে পিতলকেও সোনা মনে হয়,
মরুভূমি মরূদ্যান ভাবি?
কুয়াশা কি যাদু জানে?

কুয়াশা কি শুধু কুয়াশাই?
অথবা দুর্দশা-আতুর মনে প্রীতিরঙের ছোপ,
জীবন-জাগরে তার উদ্বেল জোয়ার ডেকে
সোহাগ জানানো?

অপ্রত্যাশিত

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য

এও কি আনন্দ নয় যখন কান্নায়
পান্নার কুঁচিরা কত ঝিকিমিকি আলো
ছড়িয়ে ছড়িয়ে এত দিগন্ত ভরায়!
সংজ্ঞাহীন বদ্ধ হাওয়া, রূপহীন কালো
নতুন রঙেতে আর নতুন নামেতে
ডানা মেলে মেলে ওড়ে বাসন্ত আবেগে
প্রতিটি ধ্বনির ছন্দে কাণ পেতে পেতে
সুরের মালঞ্চ বাঁধে দিনে রাতে জেগে!
কোথায় সবুজ স্নেহ ঘুণধরা গাছে:
শিকড়েরা রসাভাবে তৃষ্ণায় কাতর।
কাকবন্ধ্যা মাটি নীচে কাঁকরে পাথরে
জবু থবু মুখ গুঁজে আছে বেঁচে মরে!
সহসা কাণেতে বাজে মধুর মর্মর
পাতায় ভরেছে শাখা, এসেছ যে কাছে!

বদ্‌ভাব-কণ্টক

শ্রীমনোমোহন ঘোষ (চিত্রগুপ্ত)

কিছুটা খাঁটি মাল কিছুটা মেকি
এ নিয়ে দিনগুলো যেতেছে কাটি
জগতে এর চেয়ে অধিক দেখি
চাহিলে হয়ে যায় সকলি মাটি।

যে যার ঝঞ্ঝাটে হারায়ে দিশা
সিঁটায়ে নাক আর কুটায়ে ভুরু
করিছে আঁকুপাঁকু মিটাতে তৃষা;
মানিতে জ্ঞান নেই লঘু কি গুরু।

পথেতে দেখা হলে রয়েছে বাঁধা,
'কেমন আছ ভাই'—পুছিতে বিধি,
তা শুনে শুরু কেউ করিলে কাঁদা—
শুনিতে বিধি নেই খুলিয়া হৃদি।

সময় আছে কার শুনিতে পারে—
জবাব খুঁটিনাটি?—তাই ত হাসে
এক হাতে এক পায় ভ্রমণ সারে—
কী মজা ঝুলে ঝুলে ট্রামে ও বাসে।

তোমাকে দেখলাম

মনিমালা দাশগুপ্ত

তোমাকে দেখলাম—
গেটওয়ালা বাড়ীটার সামনে।
উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিটাকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে
দিয়েছো মেলে।
সব কাজ নাকি নিয়েছো সেরে, অনেক আগেই।
ধোয়া শাড়ীটাকে তাড়াতাড়ি করে পরে,
চুলটা বেঁধেছো, দিয়েছো সিঁদুর,
সোজা সিঁথিখানা জুড়ে।
আমাদের মন উশখুশ্ করে।
চাকরী দিয়েছি। মূল্য দিচ্ছি ধরে।
থাকতে দিয়েছি ঘরের কোণটা জুড়ে
তাই বা কম কি!
ভাবখানা তবু এতো ছাড়াছাড়া—,
বলি যদি, হবে কথাগুলো কড়া।
তাই বলি নাই। আজকে বলবো।
রোজ দিন কেন উদাস দৃষ্টি, উড়ু উড়ু মন,
কি অনাসৃষ্টি!
গেটের কাছেতে ফের হোলো দেখা,
চোখ ছলোছলো, জলে ভরাভরা। হঠাৎ-
সামনে দৃষ্টি কাঁপলো। একটি যুবতী—,
হেঁটে চলে গেলো। আমাকে দেখেই?
হবেও বোধ হয়। শুনলাম আজ, মেয়েটি ওরই।
আর এক বাড়ীর রাঁধুনীর কাজে হোয়েছে বহাল।
ওরই মতো তারও কপাল!
তাই প্রতিদিন, ভেবে মরে মন। আকুলতা ভরা
চোখে দেখা-ক্ষণ।—একটি খবর—,
তোলপাড় করে প্রাণের ভিতর।
ফেলে আসা দূরে, হারায়েছে যা
গুমরিছে বুকে, ও যে এক মা॥

দ্বাদশ শতাব্দীর হাসপাতাল

ডাঃ পূর্ণেন্দু কুমার চট্টোপাধ্যায়

কম্বুজরাজ সপ্তম জয়বর্মার আরোগ্যশালা

খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে প্রাচীন কম্বুজ রাজ্যে সপ্তম জয়বর্মা রাজত্ব করতেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং প্রজাহিতৈষী। তাঁর কীর্তিমান জীবনের বহু পরিচয় তিনি অনেক শিলালিপিতে রেখে গেছেন। ইন্দোচীনের তা প্রোম প্রভৃতি অনেক জায়গায় প্রাপ্ত শিলালিপিতে তাঁর কীর্তির সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। এই বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ১১৮২ খৃস্টাব্দে সপ্তম জয়বর্মদেব কম্বুজের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি যেমন অস্ত্র দ্বারা শত্রু ধ্বংস করে দেশকে রক্ষা করেছিলেন তেমনি আয়ুর্বেদশাস্ত্রবিশারদ বৈদ্যবীরদের দিয়ে এবং ভেষজরূপ অস্ত্র দ্বারা দেশের রোগও দূর করেছিলেন—(আয়ুর্বেদাস্ত্রবেদেষু বৈদ্যবীরৈর্বিশারদৈঃ। যোধাত্রযদ্ রাষ্ট্ররুজো জঘান ভেষজায়ুধৈঃ।।)। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে ১০২টি আরোগ্যশালা স্থাপন করেছিলেন। এছাড়া বহু (১৮৯টি) ধর্মমন্দির এবং আশ্রমও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

জয়বর্মদেবের এই সব কীর্তির ধ্বংসাবশেষ শ্যাম ও ইন্দোচীনের বহু জায়গায় আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রজাদের রোগ দুঃখ দূর করবার জন্যে তাঁর বিরাট পরিকল্পনা কতটা সুচিন্তিত নিখুঁত ও সম্পূর্ণ ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় এই সব ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে। জয়বর্মার ১০২টি আরোগ্যশালার মধ্যে ৮টির ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর প্রত্যেকটিতেই একই রকম শিলালিপিও পাওয়া গেছে। শিলালিপিগুলি একএকটি চৌকোণা পাথরের চারপাশে সংস্কৃত শ্লোকে খোদিত। ৮টি শিলালিপির মধ্যে চারটিতে শ্লোকগুলি হুবহু একরকম। অন্য চারটিতেও বেশীরভাগ শ্লোক একরকম, কিছু শ্লোক ভিন্নরকম।

শ্লোকগুলিতে প্রথমেই ভগবান বুদ্ধকে এবং সূর্যবৈরোচন ও চন্দ্রবৈরোচন নামক জিনদ্বয়কে প্রণাম জানান হয়েছে। তারপর রাজা জয়বর্মদেবের প্রশস্তির পর আরোগ্যশালা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য লিখিত হয়েছে। এরপর আরোগ্যশালায় কি কি কর্মচারী কতজন করে থাকবে, রোগীদের বাৎসরিক খাদ্য ও ঔষধ পথ্যাদির বাবদ কি কি জিনিষ কোন্ কোন্ সময় রাজভাণ্ডার থেকে নিতে হবে তার নির্দেশ আছে।

তারপর আরোগ্যশালার সংশ্লিষ্ট দেবালয়ের জন্যে ধর্মযাজক, গণক ইত্যাদি নিয়োগের এবং তাদের জন্যে রাজভাণ্ডার থেকে প্রাপ্য বস্ত্র, চন্দন ও অন্যান্য সামগ্রীর তালিকা আছে। তারপর আরোগ্যশালা রক্ষা করা ও চালানর জন্য দেশের অন্যান্য রাজাদের কাছে এবং প্রজাদের কাছে আবেদন আছে। আরোগ্যশালা পরিচালনা করার জন্যে রাজমন্ত্রী ও রাজকর্মচারী নিয়োগের কথা এবং এই সব কর্মচারীদের অন্যান্য রাজকার্য হতে অব্যাহতি দেওয়ারও নির্দেশ আছে।

তা প্রোম শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, এই সব আরোগ্যশালা, ধর্মমন্দির ও আশ্রম ইত্যাদির ব্যয় বহন করবার জন্যে রাজা জয়বর্মা ৮০৮৪টি গ্রাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন।

আধুনিক যুগে জনসাধারণের জন্যে হাসপাতাল বলতে আমরা যা বুঝি প্রাচীন যুগেও ভারতবর্ষে সে রকম প্রতিষ্ঠান ছিল বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু ভারতবর্ষে এরকম প্রাচীন কোন হাসপাতালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইতিহাসগ্রাহ্য কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কাস্টিল্যানি ও চামার্স তাঁদের ট্রপিক্যাল মেডিসিন গ্রন্থে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেছেন যে, সিংহলে অনুরাধাপুরের নিকট খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কথা জানা গেছে। সম্রাট অশোকের অনুশাসনে প্রজাদের চিকিৎসা ও পশুচিকিৎসার ব্যবস্থার কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যে কি কি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল তার বিবরণ পাওয়া যায় না। কম্বুজে প্রাপ্ত শিলালিপিতে হাসপাতালের যে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়, তাই থেকে তখনকার দিনের জনসাধারণের জন্যে প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসালয় সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করা যায়। কম্বুজে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম এবং সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাও ভারতবর্ষ থেকেই প্রসারলাভ করেছিল। জয়বর্মদেবের শিলালিপিতে আয়ুর্বেদশাস্ত্রবিশারদ বৈদ্যদের কথাই উল্লেখ আছে। এই থেকে এরকম অনুমান করা যেতে পারে যে, দ্বাদশ শতাব্দীতে কম্বুজে হাসপাতাল সংস্থাপন ও তার বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে যে প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতবর্ষেও তার অনুরূপ ব্যবস্থা তার অনেক আগেই ছিল।

প্রত্যেক আরোগ্যশালার সঙ্গে একটা করে দেবালয় ছিল এবং তাতে ভৈষজ্যসুগত নামে বুদ্ধমূর্তি এবং বৈরোচনাজিন পুত্রদ্বয় সূর্য ও চন্দ্রের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সুগতালয় বা দেবালয়ের চারদিক ঘিরেই আরোগ্যশালা ছিল। এখানে বর্ণনির্বিশেষে সকলেরই চিকিৎসার অধিকার ছিল। এই আরোগ্যশালায় যারা ভর্তি হত তাদের পূর্বকৃত কোন দণ্ডনীয় অপরাধ থাকলেও তারা শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেত। কিন্তু প্রাণিহিংসা অপরাধের মার্জনা করা হত না।

আরোগ্যশালার কর্মচারী

শিলালিপিতে আরোগ্যশালার জন্যে সর্বসমেত ৯৮ জন কর্মচারী নিয়োগ করার কথা লেখা আছে। কিন্তু বিভিন্ন কর্মচারীর যে তালিকা দেওয়া আছে তাতে ঠিক ৯৮ জন মেলান যায় না। কর্মচারীদের নাম, সংখ্যা ও তাদের কাজ সম্বন্ধে এইরূপ নির্দেশ আছে:

চিকিৎসক থাকবেন দুইজন। আর একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক একত্র 'স্থিতিদান' করবেন। এঁরা চিকিৎসক না তাঁদের সহকারী ঠিক বোঝা যায় না। সম্ভবত এঁরা হাসপাতালেই সর্বদা বাস করবেন (রেসিডেন্ট ফিজিসিয়ান) এইরূপ ব্যবস্থা ছিল।

দুইজন থাকবেন নিধিপাল। এঁরা পুরুষ হবেন এবং এঁরা ভেষজসমূহ শ্রেণী বিভাগ করবেন এবং ব্রীহি কাষ্ঠাদি সংগ্রহকারীদের নিকট থেকে সেই সব গ্রহণ করবেন।

পুষ্প ও দর্ভ আহরণ, দেবালয় পরিষ্কার করার জন্য ও পাকের জল ও কাষ্ঠ আনবার জন্য দুইজন পুরুষ পাচক থাকবে। আরও দুইজন পুরুষ থাকবে যজ্ঞহারী, পত্রকার ও পত্রশলাকা দানকারী। ভৈষজ্য পাকের ইন্ধন আহরণ করবার জন্যও দুইজন পুরুষ নিযুক্ত থাকবে।

রোগীদের ওষুধ দেবার জন্যে স্ত্রী-পুরুষ মিশিয়ে ২২ জন নিযুক্ত হবে। এবং এদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক ও একজন পুরুষ একসঙ্গে 'স্থিতিদান' করবে, অর্থাৎ সব সময় উপস্থিত থাকবে। জলগরম ও ঔষধ পেষণ কার্যের জন্যে ছয়জন স্ত্রীলোক থাকবে আর শস্য পেষণ করবার জন্যে আরও দুইজন, মোট আটজন থাকবে।

৩২ জন পরিচারিকা থাকবে। এদের মধ্যে কিছু আরোগ্যশালাতেই অবস্থান ও আহার গ্রহণ করবে।

১৪ জন পুরুষ নিযুক্ত থাকবে আরোগ্যশালা সংরক্ষণের জন্যে।

ধর্মচারী দুইজন যাজক ও একজন গণক এই তিনজন শ্রীবিহারের (? কোনও কেন্দ্রীয় শিক্ষালয়) অধ্যাপক দ্বারা নিযুক্ত হবে বলে নির্দেশ আছে। এঁরা সম্ভবত দেবালয় সংক্রান্ত কাজের জন্যে নিযুক্ত ছিলেন।

রোগীদের খাদ্য ও ঔষধের বরাদ্দ

প্রতিদিন দেবপূজার অংশ এক দ্রোণ পরিমাণ তণ্ডুল ও যজ্ঞের প্রসাদ রোগীরা পেত। এছাড়া বৎসরে তিনবার প্রত্যেক রোগীর জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি রাজভাণ্ডার থেকে দেওয়া হত। —লালবর্ণের জালবস্ত্র (? গামছা)—১টি ও ধৌত বস্ত্র—৬টি, গোভিক্ষা (?)—২টি, তক্র (ঘোল)—৫ পল, কৃষ্ণা (পিপুল, কালজিরা অথবা পর্পটি)—৫ পল, সিক্থ—দীপ (মোমবাতি)—৫ পল পরিমিত—১টি ও ১ পল পরিমিত —১টি, মধু—৪ প্রস্থ, তিল—৩ প্রস্থ, ভৈষজ্য ঘৃত—১ প্রস্থ, পিপুলীরেণু—১ প্রস্থ, দীপাক (আজমোদা)—১ প্রস্থ, পুন্নাগ (নাগকেশর)—২ পাদ, কর্পূর—৫ বিম্ব, শর্করা —২ পল, দণ্ডদণ্ডস নামক জলচর—(?) স্থানীয় কোনও মাছের নাম—৫টি, শ্রীবাস (তার্পিন) চন্দন—১ পল, ধান্য—১ পল, শতপুষ্প—১ পল, এলা (এলাচী)—২ পল, নাগর (শুণ্ঠি), কঙ্কোল (?) ও মরিচ—২ পল করে, প্রচীবল ও সর্ষপ—২ প্রস্থ করে, ত্বক (দারচিনি)—দেড় মুষ্টি, পথ্যা (হরীতকী)—৪০টি, দার্বী (দারুহরিদ্রা) ও ভিদা (?)—দেড় [illegible], কন্দণ্ডইলা (?) জনসাঙ (?) ও দেবদারু। মিশ্রদেব—সোয়াপল। মধু ও গুড়—৩ কুড়ব, সৌবীরনীর (একপ্রকার কুল)—১ প্রস্থ।

এই সমস্ত দ্রব্য প্রতিবৎসর চৈত্র পূর্ণিমাতে

শ্রাদ্ধ ও উত্তরায়ণ দিবসে রাজভাণ্ডার থেকে নিতে হবে। এগুলি অধিকাংশই আয়ুর্বেদীয় দ্রব্যগুণ বিষয়ক গ্রন্থে ঔষধ হিসাবে ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়। কয়েকটা জিনিষের পরিচয় পাওয়া গেল না। কয়েকটি শব্দ, যেমন—কন্দগুহলা, জনস্যঙ ইত্যাদি সম্ভবত স্থানীয় ভাষায় কোন কোন ওষুধের নাম। রোগীদের খাদ্য হিসাবে দেবপূজার ও যজ্ঞের প্রসাদ ছাড়া আর কিছুর উল্লেখ নাই। তবে কর্মচারীদের মধ্যে ব্রীহি সংগ্রহক ও পেষণকারীর ব্যবস্থা থেকে মনে হয় যে, শস্যচূর্ণ থেকে রোগীদের জন্যে পৃথক খাদ্য প্রস্তুত হত।

আরোগ্যশালায় কতজন রোগীর থাকার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল সে বিষয়ে শিলালিপিতে কোনও উল্লেখ নাই। কাজেই রোগীর অনুপাতে চিকিৎসক ও অন্যান্য সেবক-সেবিকাদের সংখ্যা কিরূপ ছিল বোঝা যায় না। ঔষধের বরাদ্দ রোগীদের মাথাপিছু নির্দিষ্ট ছিল। তাতে অনুমান হয় যে, রোগীর সংখ্যা কিছু নির্দিষ্ট ছিল না।

চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্বন্ধে শিলালিপিতে কোনও নির্দেশ নাই। ঔষধের বিস্তৃত তালিকা থেকে মনে হয় যে, চিকিৎসায় ঔষধের ব্যবহারই বেশী হত। তবে রোগীনির্বিশেষে সকলের জন্যে একই ঔষধের নির্দিষ্ট বরাদ্দ কেন তার কারণ পরিষ্কার নয়। যে সকল ঔষধের তালিকা সম্ভবত রোগীদের পুষ্টি ও সাধারণ স্বাস্থ্যো-ও মাথাপিছু পরিমাণ লেখা রয়েছে সেগুলি হ্রতির জন্যে সকলেরই অবশ্যসেব্য ছিল। এছাড়াও রোগ অনুযায়ী অন্যান্য বিশেষ ঔষধ চিকিৎসকরা হয়ত ব্যবস্থা করতে পারতেন।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় অস্ত্র ব্যবহারের অথবা শল্য চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এই আরোগ্যশালার শিলালিপিতে শল্য চিকিৎসার জন্যে কোনও অস্ত্রের আভাষ পাওয়া যায় না। হাসপাতালে ব্যবহার্য অন্য কোনও সরঞ্জামের কিছু উল্লেখ নাই।

আরোগ্যশালার কর্মচারীদের বেতন বা পারিশ্রমিক সম্বন্ধেও কিছু নির্দেশ নাই। তবে ধর্মযাজক ও গণকদের জন্যে কাপড় চাদর ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। প্রতিবৎসর এদের প্রত্যেকের জন্যে বরাদ্দ ছিল—তিনটি বৃহতী (চাদর), দশ জোড়া দশ হাত বস্ত্র, ১৫ জোড়া নয় হাত বস্ত্র, দুইটি কটিক (? মাদুর), তিনটি ত্রাপুষপাত্র (? টিন নির্মিত পাত্র) এবং ১২ খারী চাল, তিন পল পিকৃথতক্ক (মোমবাতি), আর ছয় পল কৃষ্ণা।

হাসপাতালের কর্মীরা হয়ত বেতনভুক্ ছিলেন বলে তাঁদের জন্যে খাদ্যবস্ত্রের ব্যবস্থা ছিল না। তবে এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আরোগ্যশালায় আহার পেতেন (পণ্ডিত) এরকম মনে হয়, বিশেষত যখন তাঁদের সব সময় উপস্থিতি দিতে হত।

সমস্ত আরোগ্যশালার কার্য নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্যেও ব্যবস্থা পরিকল্পিত ছিল। শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে, এই কাজের প্রবৃত্তির জন্যে রাজধানীতে একজন মন্ত্রী নিযুক্ত থাকবেন। তাঁর অধীনে স্থানীয় কর্মচারী ছিল। আরোগ্যশালার কাজ দেখা-শোনার জন্যে যে সব স্থানীয় কর্মচারী ছিল তাদের কর আদায় অথবা অন্য কোন রাজকার্যে প্রেরণ করা

রাজা এতবড় পরিকল্পনা কার্যকরী করেও এই সব আরোগ্যশালার ভবিষ্যৎ পরিচালনার জন্যে বোধহয় সন্দিহান ছিলেন। সেইজন্যে তিনি শিলালিপির উপসংহারে কম্বুজের অন্যান্য সব নৃপতিদের কাছে বিনীতভাবে সাহায্য ভিক্ষা করছেন। আরোগ্য-শালার প্রতিষ্ঠার সুকৃতি দ্বারা তাঁর নিজের যে পুণ্যলাভ হল, যাঁরা তাঁর এই সুকৃতি রক্ষা ও বৃদ্ধি করবেন তাঁদের এর চাইতেও বেশী পুণ্যলাভ হবে বলে তিনি সকলকে আশ্বাস দিচ্ছেন।

আধুনিক যে কোনও হাসপাতালের বিধি-ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে, প্রায় আটশ' বৎসর আগেকার এই সব আরোগ্যশালার ব্যবস্থার মূলগত কোনও পার্থক্য নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, সাধারণের চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নতি ও সম্পূর্ণতার দিক দিয়ে ভারতীয় সভ্যতার আদি যুগেই যে উৎকর্ষলাভ করেছিল, ক্রমোন্নতির পথে আধুনিক যুগে তার পরিসমাপ্তি না হয়ে বহু আগেই তা ধ্বংসে বিলীন হয়ে গেল। আবার আমাদের সেই সবই বাইরে থেকে শিখতে হল।

পশ্চিমের সহপাঠিনী

(২০৪ পৃষ্ঠার পর)

দিয়ে। বিশ্বাস হচ্ছে না ? অবিশ্বাসের কথাই বটে। আমেরিকান টেলিভিশনে বিজলী আলোর চকমকি ঠুকতে ঠুকতে, অনেক সংখ্যা হিসাবের কারবার, অনেক গানের সুর শোনানর মধ্যে দেখান হল বিরাট একটা ইলেকট্রনিক মস্তিষ্ক। বত্রিশ দফা প্রশ্ন লোকদের কাছে পাঠান হয়েছিল। তাতে জাতিধর্ম রাজনীতি, প্রিয় নেশা, এমন কি একজনের মাপের বিছানা পছন্দ না দুজনের মাপের এমন সব দরকারী প্রশ্ন তাতে ছিল। যে কোন ছেলে আর মেয়ে বিয়ে করতে চাইলে এ সব প্রশ্নের উত্তর পাঠিয়ে দিতে পারে। এই কল কনে আর বর বাছাই করে দেবে সে সব উত্তর যাচাই করে দেখে।

ততক্ষণে পেনী আবার নিজেকে সামলে নিয়েছে। নিজের ধাতে ফিরে এসেছে। হেসে বলল,—কি, খুব ঘাবড়ে গেছ নাকি কথাটা শুনে ?

তাড়াতাড়ি ব্যস্ত সমস্ত ভাব দেখালাম। যেন মোটেই চিন্তায় পড়িনি, ওর এমন করে বেফাঁসভাবে নিজেকে খুলে দেখানতে। বললাম,—না, না। আমি ভাবছিলাম তোমাদের দেশের কলের পুষ্পধনু সাহেবের কথা।

ওর খুব কৌতূহল হল। ব্যাপারটা বললাম। শুনেই বুঝতে পারল,—ও তুমি সেই রেমিংটন র‍্যাণ্ডের মেশিনটার কথা বলছ ? ওটা টেলিভিশনে আমিও দেখেছি। তবে একেবারে হেসে উড়িয়ে দেবার কথা নয়। আমাদের দেশে নিঃসঙ্গ-হৃদয়দের ক্লাব আছে, তা জান বোধ হয় ?

উত্তর দিলাম—না জানলেও মানতে রাজী আছি। তবে নিঃসঙ্গ-হৃদয় হবে কেন ? সাথীর অভাব অনেকেই ওখানে সাকী দিয়ে পূর্ণ করে।

প্রতিবাদ করল সে,—না, অত সহজে মন ভরে না। আমাদের আঠার কোটি লোকের মধ্যে প্রায় দেড় কোটি লোক এই সব ক্লাবের মেম্বার।

শুনে তাজ্জব বনে গেলাম। সে আরো বলল,—কলের কিউপিড শুনে তুমি হাসছ। কিন্তু ভেবে দেখ, তোমাদের দেশে সম্পূর্ণ অজানা ছেলে-মেয়েদের বিয়ে হয়। হয়ত বাপ মা বেছে দিয়েছে, হয়ত বা কয়েক দিন দেখা শোনাও হয়েছে। আমাদের দেশে অনেক দিন জানা-শোনা হয় বটে। তবুও প্রথম থেকে সুরু হয় অজানা রুচি, অভ্যাস, মতিগতি এসবের ঝুক্কি নিয়ে। এ সব ব্যাপারে মিল হতে পারে, এমন সব খোঁজ-খবর কাগজে কলমে জেনে নিয়ে সুরু করলে, তার পরের বিয়েটা মোটমাট টেকসই হবার আশা থাকে বলেই ত মনে হয়। অন্ততঃ এই ভরসাতেই সেদিন একটি মেয়ে তার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে কলের বাছাই করা প্রণয়ীকে পছন্দ করে নিয়েছে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। সামনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে বেশ খাতির করে বললাম—কিন্তু পেনী, তুমি নিশ্চয়ই অতখানি আমেরিকান হতে পারনি। তুমি ত এই আটলাণ্টিকের এপারেই লেখাপড়া শিখেছ।

একটু থেমে যোগ করে দিলাম—এবং প্রথম যৌবন কাটিয়েছ।

পেনীও উঠে পড়ল। দরজার দিকে এগোতে এগোতে ক্লান্ত স্বরে বলল,—এবং এখানে যে ধাক্কা খেয়েছি, সেটাই সবচেয়ে বড় ধাক্কা। তুমি ঠিকই বলেছ; আমেরিকানিজম হচ্ছে একটা চলমান প্রক্রিয়া। শুধু চলে চলে চালু থাকে। তার ছোঁপ পেয়েছিলাম বলেই এত সবের সত্ত্বেও নিজেকে হারাইনি। তা না হলে চল্লিশ পাতা চিঠির ধাক্কা সামলিয়ে উঠতে পারতাম না।

আচ্ছা, শুভরাত্রি ডক।

শুভরাত্রি, শুভরাত্রি, পেনী। এবং সুখ-স্বপ্ন।

মিলে গেল, মিলে গেল কাহিনীটা। সেই বাইশ বছর আগে 'সু'ও এই চিঠিটার ধাক্কা সামলাতে পারেনি। যাকে ভালবেসে-ছিল, সেই বিদেশিনী সহপাঠিনীকে যেন সে বিয়ে না করে এহেন কাতর কান্না ভরা চল্লিশ পাতার চিঠি সে দেশ থেকে পেয়েছিল। তাতে অনুরোধ ছিল যেন চিঠিখানা সেই বিদেশিনী তরুণীকেও দেখান হয়।

কে যে সেই বিদেশিনী এতদিন জানতাম না।

প্রেমের গল্প লিখে থাকি, কাজের ফাঁকে ফাঁকে। সত্যের এক ফোঁটার সঙ্গে মিথ্যার এক বোতল, আর বাকীটা সব কল্পনা। এই ত মামুলী অনুপান। একজনের প্রেমের সত্য ঘটনাবলী না হয় নাইবা জানলাম।

বিলম্বিত রাগ

সুমথনাথ ঘোষ

সুপ্রকাশের ধারণা, জীবনটা একটা গণিতের অঙ্কের মত। যেন টাকা, আনা, পাইয়ের 'সরলকর'। শুধু তফাতের মধ্যে এই যে শুভঙ্করীর অঙ্ক যেমন মিলে যায়, হাতে-হাতে ফলও পাওয়া যায়, জীবনের ক্ষেত্রে সে সুযোগ তেমন অস্পষ্ট। ফল হাতে পাওয়া দূরে থাক, দূর থেকে চোখেও দেখা যায় না! আয় ও ব্যয়ের মাঝে যেন বিরহের এক অকূল সমুদ্র! এ সাগরে পার হয়ে উভয়ে প্রণয় মিলনে আবদ্ধ হতে না পারা পর্যন্ত জীবন ব্যর্থ, সংসারের সব কিছুই অর্থহীন! সে ইকনমিকস-এর ছাত্র—সে জানে আজকের দিনে সব মিলনের সেরা এই অর্থনৈতিক মিলন। সুখ, শান্তি, প্রেম, ভালবাসা—এ জগতে যা কিছু শ্রেয় ও প্রেয়, এর অভাবে বাষ্পের মত কোথায় যেন সব মিলিয়ে যায়! দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে যে প্রেমের স্থান নেই, একথা সুপ্রকাশের চেয়ে বেশী কেউ জানে না। তাই নিজের অবস্থা যতদিন না স্বচ্ছল হয়, ততদিন বিয়ে করবে না, এই তার প্রতিজ্ঞা! এই স্বচ্ছলতা সম্বন্ধেও সুপ্রকাশের ধারণা খুবে স্পষ্ট। কবির কল্পনাবিলাস বা অতিরঞ্জিত অবাস্তব কিছু নয়। প্রত্যেক ভদ্র, শিক্ষিত যুবকের মনের যে বাসনা, তার অতিক্রমও নয়। বিবাহিত জীবনটা যেন একটু সুখে-শান্তিতে কাটে। মেস-এর একটা ঘরের এক-চতুর্থাংশের মালিকানা স্বত্ব কেরাসিন কাঠের তক্তাপোষে শুয়ে দীর্ঘদিন উপভোগ করে সে ক্লান্ত। এ জীবন থেকে মুক্তি নিয়ে সুপ্রকাশ শুধু নীড় বাঁধতে চায়। ভাড়াকরা ছোট্ট কোন একটা ফ্ল্যাট বাড়ীতে। দুখানা ঘর এক টুকরো কার্পেট, সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মার্কেট থেকে কেনা সোফা কাউচের একটা সেট। ঘরের কোণে টিপয়ে স্ত্রীর হাতে বোনা লেসের ঢাকার উপর একটি রেডিও, রাঁধুনী ও চাকরের মিলিত সংস্করণ শুধু একটি মাত্র কম্‌বাইণ্ড হ্যাণ্ড—এর বেশী কিছু আশা করে না সুপ্রকাশ। এছাড়া স্ত্রী যেদিন তাকে সঙ্গে নিয়ে সিনেমায় যেতে চাইবে সেদিন যেন পকেটের শূন্যতার কথা ভেবে শরীর খারাপের দোহাই না পাড়তে হয় কিংবা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ কোন দোকানের কাঁচের শো' কেসের ভেতরে ভাল একখানা শাড়ী দেখে স্ত্রীকে পরাবার সখ হ'লে অভাবের শাসনে মনকে দমন করতে না হয়। মোট কথা স্ত্রী যেদিন আসবে সেদিন সংসারে যেমন কোন অস্বচ্ছলতা থাকবে না তেমনি তার মনের দিক থেকেও কোন দৈন্য না প্রকাশ পায়—শুধু এইটুকু তার কামনা! জেনে শুনে যে তার স্ত্রী, তার জীবনসঙ্গিনী, তাকে দারিদ্র্যের মধ্যে বরণ ক'রে আনবে না সে কিছুতেই, এই তার পণ! কত প্রেমের মুকুল ঝরে গেছে দারিদ্র্যের স্পর্শে, কত বিবাহিত জীবন অভিশপ্ত হয়েছে অর্থের অভাবে—সুপ্রকাশ তা জানে। চোখের সামনে এ রকমের বহু ঘটনা ঘটতে সে দেখেছে—নিজের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের পরিবারে। তাই সুদিনের অপেক্ষায় কেবল নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকে না সুপ্রকাশ, এবেলা-ওবেলা ছেলে পড়িয়ে অতিরিক্ত উপার্জন করার চেষ্টা করে!

কিন্তু তার এই সদ্‌ইচ্ছার বিকৃত অর্থ ক'রে বন্ধু-বান্ধবরা তাকে নানা রকম ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। সুপ্রকাশ যে সব গ্রাহ্য করে না। তার মুখে সব সময় ওই এক কথা, 'নিজেই খেতে পাই না, আবার পরের মেয়েকে এনে কষ্ট দেবো!'

মেসের বন্ধু ঘোষ খোঁচা মেরে বলে, কেন, আমরা কি বিয়ে করিনি, না আমাদের ঘরে বৌরা সব উপোষ করে আছে। তোমার স্ত্রী তোমার ঘরে কালিয়া পোলাও খেতে আসছে না—সে জেনেই আসবে যে তুমি বাঁধা মাইনের সরকারী কেরাণী আর কত টাকা মাইনে পাও!

অপিসের দাদু সেকেলে লোক। একটু রস দিয়ে কথা বলা তাঁর স্বভাব। সুপ্রকাশকে দেখে বলে ওঠেন, বাবা জোয়ারে নৌকো বাইতে পারলে না, ভাটায় কি পারবে? গুণ টেনে টেনে মরবে যে! এখনো সময় আছে, বুড়োর কথা শোন নইলে একদিন কাঁদতে হবে মনে রেখো! বলে একটু থেমে এক টিপ নস্যি নাকের গর্তে ঠেসে দিতে দিতে আবার শুরু করেন। আজকালকার ছেলেদের এই একটা ফ্যাশন হয়েছে। লেখা-পড়া শিখে ভাল ভাল সব চাকরী করছে অথচ মুখে তাদের এই এক বুলি বিয়ে করবো না! কেনরে বাবা? বলে মুখটা একটু বন্ধ করে দাদু পকেট থেকে ময়লা একখানা রুমাল বার করে টেনে নাকটা মুছতে মুছতে বল্লেন রাগ করিসনি ভাই, সত্যি করে বল দেখি তুই বা উপায় করিস ক'টা ছোকরা তা করতে পারে, তা বলে কি তারা কেউ বিয়ে না করে সংসার-ধর্ম করছে না?

সুপ্রকাশ জবাব দেয়, সকলের জীবনের আদর্শ ত এক নয় দাদু!

সঙ্গে সঙ্গে দাদুর গলা এক পর্দা চড়ে ওঠে। বলেন, তুই থাম্, ও সব বড় বড় বুলি আমার কাছে আওড়াসনি! এই বয়েসে আমি ঢের দেখলুম। সবাই প্রথম এমনি কথাই বলে তারপর একদিন শেষে খানায় পা দেয়! তাই বলছি তোর বাপ-পিতামহ মুখ্যু ছিল না। যদি সুখ-শান্তি চাস ত, তাঁরা যে পথে গেছেন সেই পথে চল্।

সুপ্রকাশ দুটো আঙ্গুলে দিয়ে টাকা বাজাবার ভঙ্গী করে বলে, দাদু ভুলে যাচ্ছেন কেন, এ যুগের সুখ-শান্তি সব এর ওপর নির্ভর করে!

মারমুখী হয়ে ওঠেন দাদু তুই থাম্ ওই এক কথা শিখেছিস তোরা পয়সা আর পয়সা! আরে বাবা কত পয়সা লাগে তোর! ওই টাকার ক্ষিদের কি অন্ত আছে? যার হাজার আছে সে লাখ চায় আবার যার লাখ আছে কোটির জন্যে তার দিনে-রাতে ঘুম নেই।

সেকেলে লোকেদের জীবনাদর্শের সঙ্গে একালের আকাশ-পাতাল তফাৎ! তাই বৃথা দম খরচা না করে চুপ করে যায় সুপ্রকাশ!! একবার তার ঠোঁটের ডগায় জবাবটা এলো যে দাদুকে বলে আপনারা বিয়ে করতেন সংসারের দাসী আনবার জন্যে আর একালের ছেলেরা জীবন-সঙ্গিনীর জন্যে। যে শুধু তার দুঃখের অংশ গ্রহণ করবে না—সকল সুখেরও হবে সাথী! তার সঙ্গে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে পা মিলিয়ে চলবে!

পছন্দ মত ফ্ল্যাট ভাড়া [illegible] ঘরদোর সাজিয়ে-গুছিয়ে বসতে বেশ কিছুকাল অপেক্ষা করতে হলেও সুপ্রকাশের মনে কিন্তু এই বিলম্বের জন্যে কোন ক্ষোভ ছিল না। সে জানতো, আজকাল বিয়ের বাজারে পাত্রের বয়েস কতটা বেড়েছে না দেখে সবাই আয়ের হাল

বুদ্ধিটাই যাচাই করে। প্রেমের স্থান যে স্বচ্ছলতার মধ্যে একথা তার মত বিশ্বাস করে সব মেয়েই! তাই নূতন ঘর করতে এসে অনুকণার চোখে যাতে কোন অভাব বা ত্রুটি-বিচ্যুতি না লাগে কেবল তার ব্যবস্থাই করেনি সুপ্রকাশ। চাকরটাকে পর্যন্ত তিন-চার মাস আগে থেকে তালিম দিয়ে সব শিখিয়ে পড়িয়ে রাখলে। নতুন মার সংগে কি রকম ভদ্র ও বিনীত আচরণ করতে হবে থেকে শুরু করে প্রতিদিন ফার্নিচার ঝাড়া, মোছা ঘরদোর ডেটলের জলে পরিষ্কার করা, বাইরের কাজ করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে তবে খাবারের জিনিষ ছোঁয়া রান্নার সময় সর্বদা পরিষ্কার তোয়ালে ব্যবহার করা, জল খেতে চাইলে যাতে গ্লাসের মধ্যে জলে নখ না লাগে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা ইত্যাদি ইত্যাদি। এছাড়া মাংসের পোলাও, মুরগীর রোষ্ট, মাছের ফ্রাই, চিংড়ীর কাটলেট প্রভৃতি এক একদিন এক একটা রান্না করতে বলে, মদনের হাতটা তৈরী করে রাখলে। রান্না থেকেই যাতে অনুকণা অনুমান করতে পারে তার সাংসারিক স্বচ্ছলতা! অনুকণা শুধু শিক্ষিতা, বি-এ পাশ করেনি কলকাতার এক উচ্চ বুনেদী বংশের মেয়েও বটে। বাপের অবস্থা পড়ে গেছে নইলে সুপ্রকাশের গলায় মালা না দিয়ে গাড়ী-বাড়ী-ওলা কোন ধনীর ঘরে আদরের বধূরূপে বিরাজ করতো। অনুকণাকে দেখতে-শুনতেও ভাল। ছিপ-ছিপে একহারা চেহারা বয়সের তুলনায় মুখটা অনেক কচি। গায়ের রং যদিও ফর্সা নয় শ্যামবর্ণ তবু সাজগোজ করলে রাত্রের বৈদ্যুতিক আলোয় সুন্দরী বলেও কখন কখন দৃষ্টিভ্রম হয়! অনুকণার জন্যে সুপ্রকাশ নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করে। তাই কোথাও এতটুকু অসুবিধা বোধ না করে যাতে তার জন্যে প্রাচুর্যে ঘর ভরিয়ে তুললে।

কিন্তু প্রথম দিন রাত্রে বিছানায় শুতে গিয়ে সুপ্রকাশকে দুটি প্রশ্ন করলে অনুকণা। মদনের কত মাইনে, আর ফ্ল্যাটটার ভাড়া কত?

মদনের পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনে তার ওপর খাওয়া-পরা শুনে চোখ দুটো বড় বড় করে অনুকণা বললে, টুমাচ—খাওয়া-পরা নিয়ে এই বাজারে তাহলে একটা চাকরের পেছনেই তোমার একশো টাকার বেশী পড়ে যাচ্ছে।

সুপ্রকাশ বলে, তেমনি সব কাজই ত ওকে করতে হয় জুতো সেলাই থেকে চণ্ডী পাঠ!

অনুকণা জবাব দেয়, দুটো প্রাণী তার কাজ ত ভারী! তারপর একটু থেমে বললে, আমি ভাবছি কি জানো আমাদের এক এক জনের পেছনে চাকরের জন্যে পঞ্চাশ টাকা করে খরচা পড়ছে! এটা কি খুব বেশী নয়?

এরপর বাড়ী ভাড়ার কথাটা মুখ দিয়ে সুপ্রকাশ উচ্চারণ করতেই যেন আঁৎকে উঠলো অনুকণা। বললে, এ্যাঁ, একশো পনেরো টাকা বল কি? এর অর্ধেক ভাড়ায় যে আমাদের বাগবাজার অঞ্চলে বাড়ী পাওয়া যায়! সুপ্রকাশ বললে, এটা বালিগঞ্জ—বাগবাজারের সংগে বালিগঞ্জের আকাশ-পাতাল তফাৎ ভুলে যেয়ো না অনু! তাছাড়া এর আগে এই ফ্ল্যাটটায় যে মাদ্রাজী ভাড়া ছিল, তারা একশো পঁয়ত্রিশ টাকা করে দিতো, আমার এক উকিল বন্ধুর সুপারিশে তবু ওইটুকু কমাতে পেরেছি? দুজনের জন্যে এত খরচটাও আমি বাহুল্য মনে করি। তোমার চাকরী স্থল যখন ড্যালহৌসী স্কোয়ার তখন বেলেঘাটাতে থাকাও যা বালিগঞ্জে থাকাও তাই। দূরত্ব সমানই। তবে মিছিমিছি এখানে থেকে এ টাকা অপব্যয় করার কোন অর্থ হয় না। তার চেয়ে এটা ব্যাঙ্কে রাখলে ঢের বেশী উপকারে আসবে।

সুপ্রকাশের ইচ্ছা হলো বলে, ছেলেবেলা থেকে অনেক দুঃখ-কষ্ট সয়েছি এখন তাই দুটো দিন একটু আরামে হাত-পা মেলিয়ে থাকতে চাই কিন্তু মুখ দিয়ে সেটা কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারলে না। পাছে স্ত্রীর কাছে নিজের দারিদ্র্য প্রকাশ পায় তাই কথাটা ঘুরিয়ে এইভাবে বললে, তুমি স্বাচ্ছন্দে থাকবে, তোমার যাতে এতটুকু কষ্ট না হয়, সেটাই আজ আমার কাছে টাকার চেয়ে অনেক বড় অনু!

অনুকণার কণ্ঠে প্রতিবাদ জাগে। বলে, স্বাচ্ছন্দ্য মানে ত অপব্যয় নয়! আমার মনে হয় হিসাব করে চলার মধ্যেই সত্যিকারের স্বাচ্ছন্দ্য আছে!

সহসা স্ত্রীকে বক্ষে আকর্ষণ করে সুপ্রকাশ বলে, ঠিক বলেছ। আমি ভুলেই গিয়েছিলুম যে তুমি অনেক লেখাপড়া শিখেছো এ সব বিষয়ে তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি আমার চেয়ে অনেক বেশী! তাই আজ থেকে তোমার সংসার তোমার হাতে তুলে দিলুম যেমন ভালো বোঝো করো!

তিন-চার দিন পরে অফিস পালিয়ে সুপ্রকাশ সকাল সকাল বাসায় ফিরলো অনুকণাকে নিয়ে লেকে হাওয়া খেতে যাবে বলে। কিন্তু ঘরে পা দিয়েই সে চমকে উঠলো। দেখে কোমরে আঁচল জড়িয়ে একটা ঝাঁটা হাতে নিয়ে ঘরদোর সাফ করছে অনুকণা!

ছিঃ অনু, এ সব কাজ তুমি করছো কেন? মদন কি? অনু ......শিগগীর ঝাঁটা ফেলো আমি বলছি! সুপ্রকাশের কণ্ঠে সোহাগ গড়িয়ে পড়ে।

করবো না ত কি! এমনি করে নোঙরার মধ্যে মানুষ বাস করতে পারে? তোমার গুণধর চাকরের কীর্তি দেখো! এই এত সব ধুলো-বালি, ময়লা সে জমিয়ে রেখেছিল ঘরে। কার্পেটের তলা, খাটের নীচ, সোফা কাউচের পাশগুলো ঝাঁট দিয়ে বার করেছি। আরো কোথায় কত কাণ্ড করে রেখেছে তা কে জানে! বলে রাগে গড়গড় করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল!

এরপর একদিন অফিস থেকে ফিরে সুপ্রকাশ দেখে অনুকণা বাড়ী নেই। কোথায় গেছে মদনও বলতে পারলে না। কিন্তু একটু পরেই অনুকণা কাশ্মীরী কাঠের কাজ করা ফ্রেমে-ঝোলানো ব্যাগটা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। সুপ্রকাশ বললে, তুমি বাজারে গিয়েছিলে কেন? মদন আজ বাজার করেনি?

করেছিল, ছাই আর পাঁশ! কতকগুলো হাজা পটল, শুকনো বেগুন, আর আলতা মাখানো কাটা পোনা মাছ। সেগুলো নর্দমায় ফেলে দিয়ে নিজেই তাই বাজারে গিয়েছিলুম! ব্যাটা যে এই কাণ্ড করে রোজ তা কে জানে। নিজেই বাজার করে এনে কুটে ধুয়ে বেশী করে তেল, ঘি আর পিঁয়াজ বাটা দিয়ে রেঁধে দেয় আমরা বুঝতে পারি না খেয়ে। ভাগ্যিস আজ ওর হাত জোড়া ছিল বলে আমি মাছ আর তরকারি কুটে দিতে গিয়েছিলুম! নইলে আমরা জানতেও পারতুম না। এই গরমের সময় চারিদিকে কলেরা লেগেছে ওই খেয়ে কবে কি হতো কে জানে!

ঠিকই ত! দাঁড়াও ব্যাটা গেল কোথায়। ও এইভাবে বাজার থেকে পয়সা চুরি বার করে দিচ্ছে বলে যেমন রেগে উঠলো সুপ্রকাশ অমনি তার মুখে হাত চাপা দিয়ে অনুকণা বললে, চুপ করো এখন কিছু বলো না। আমি ভেবেছি এই কটা দিন নিজেই বাজার করবো তারপর মাসকাবার হলে ওকে তাড়িয়ে দেবো!

সুপ্রকাশ তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, তারপর আবার লোক পাবে কোথায়! জানো আজকাল এদিকে মাথা খুঁড়লে একটা চাকর মেলে না!

দরকার নেই লোকের। ভারী ত দুজনের সংসার। ও আমি নিজেই চালিয়ে নেবো! তুমি কিছু ভেবো না!

না-না তা হয় না। তুমি ঝিয়ের মত এঁটো বাসন মাজবে আবার হাত পুড়িয়ে ওই আগুন তাতে রান্না করবে, এ আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারবো না! তাছাড়া তোমার মা-বাবাই বা কি মনে করবেন।

আমার মা-বাবার এতে মনে করার কি আছে বুঝি না। আমার সংসার আমি যদি নিজের হাতে গুছিয়ে করি, তাহলে কার বলার কি আছে! কেবল দৃঢ়কণ্ঠে অনুকণা স্বামীকে একথা জানিয়ে দিলে না, একটু থেমে মুচকি হেসে বললে, তোমার এই চাকরের দরুণ যে টাকাটা বাঁচিয়ে দিলুম, এতে বরং আমার গয়না গড়িয়ে দিয়ো!

এমনি করে একটা মাস যেতে না যেতে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিলে অনুকণা।

রান্নাঘরে ঢুকে প্রথমেই শুরু থেকে সংস্কারে সে মন দিলে। অল্প পাতা দিয়ে হালকা চা তৈরী করে দিলে সুপ্রকাশকে। বললে, দিনে সাত-আট কাপ খাবে, ঘন লিকার দিয়ে নিজে হাতে তোমার মুখে বিষ তুলে দিতে আমি পারবো না! চাকর-বাকরের হাতে এতদিন খেতে, তোমার লিভার রইলো কি গেল তাতে তাদের কি মাথা ব্যথা পড়েছে!

সুপ্রকাশ যদিও ঘন চা, ভাল করে রসিয়ে খেতে পচ্ছন্দ করে তবু ওই কথা শোনার পর আর অনুকণার মুখের ওপর কিছু বলতে পারলে না। বরং তার স্বাস্থ্য নিয়ে এই প্রথম একজনকে মাথা ঘামাতে দেখে ভেতরে ভেতরে খুশিই হলো!

এবার আস্তে আস্তে অনুকণা বন্ধ করে দিলে সব রকম মোগলাই রান্না। মাংসের পোলাও, ফাউল রোষ্ট, কাটলেট, ফ্রাই প্রভৃতি। সুপ্রকাশকে সে বললে, এতে কেবল যে খরচ কমে তাই নয়, তার চেয়ে বড় কথা হলো এই বয়সে তোমার ওসব একেবারেই খাওয়া উচিত নয়। ব্ল্যাড-প্রেসার হতে পারে। তাই আগে থেকে সাবধান হওয়া উচিত আমারই। যখন আমার হাতেই তোমার খাবার দায়িত্ব!

দীর্ঘদিন মেস-এ হিন্দুস্থানী ঠাকুরের হাতে খেয়ে সুপ্রকাশ ভাল জিনিষের আস্বাদ এক রকম ভুলেই গিয়েছিল ভেবেছিল বিয়ে করে নিজে সংসার পাতলে, এ সাধটা অন্ততঃ

(ইহার পর ২২৪ পৃষ্ঠায়)

ব্রিটিশ এমব্যাসিতে একটা টি-পার্টি ছিল সাংবাদিকদের। ভোজনের আয়োজন প্রচুর—নিমন্ত্রিতের সংখ্যাও কম নয়। পরিচিত অপরিচিত অনেকের সঙ্গেই দেখা হোলো—আলাপ হোলো। বেশ খুসি-খুসিই লাগছিল।

কিন্তু ফিরতি পথে সব ছাপিয়ে যেটা মনের মধ্যে ওঠাপড়া করতে লাগল সেটা কেক্, পেস্ট্রী, সন্দেশ, সিঙ্গাড়া, ক্রিসপ্, ডালমুট ও নয়—ইউ-পি-আই, রয়টার, স্টেটসম্যান, অমৃত-বাজার, আনন্দবাজার বসুমতীও নয়—সেটা হোলো সদ্য নিয়োজিত ব্রিটিশ ডেপুটি হাই-কমিশনারের ভাষণে বহুবার ব্যবহৃত একটি শব্দাংশ। নানা উপলক্ষে উপস্থিত জনকে সম্বোধন করে তিনি ধন্যবাদ জানাচ্ছেন, নূতন দেশে নূতন ব্যাপারে আনন্দ প্রকাশ করছেন। পাশে তাঁর স্ত্রী দাঁড়িয়ে। নিজের কথা অনেকবারই বলতে হচ্ছে, কেন না তাঁরই উদ্দেশে আজকের বৈঠক। কিন্তু নিজেকে কখনও 'আমি' বা গৌরবে 'আমরা' বলে উল্লেখ করতে শুনলাম না—বরাবরই বলতে লাগলেন—'মাই ওয়াইফ এ্যান্ড আই'—'আমার স্ত্রী এবং আমি'—।

প্রথমটায় কানে যেতে কেমন যেন একটু সঙ্কুচিত বোধ করলাম—মনে মনে কল্পনা করতে চাইলাম আমার স্বামী একঘর অপরিচিত লোকের সামনে বারবার 'আমার স্ত্রী আমার স্ত্রী' বলে চলেছেন। কথাটা মনে করতেই লজ্জা পেলাম।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এই রাজসম্মানিত দম্পতির দিকে চাইলাম। কিন্তু নব-বিবাহিতের উচ্ছ্বাস বা স্ত্রৈণ পুরুষ অথবা স্বামী প্রেমে গদগদ স্ত্রী কিছুই দেখলাম না—সংসার অভিজ্ঞ প্রাচীন কিন্তু সাধারণ দুটি মানুষ। বুঝলাম পুনঃ পুনঃ 'আমার স্ত্রী' বলাটা কোনো ভাবালুতার বহিঃ-প্রকাশ নয়—তাহলে স্বামীর কন্ঠে একটু আবেগ থাকত, স্ত্রীর মুখে থাকত একটু গর্বের হাসি আর দিশি-বিদেশী নিমন্ত্রিতেরাও অনুভব করতেন কিছুটা কৌতুক।

কিন্তু তার কোনোটিই নয়। বুঝলাম—এটি অভ্যস্ত রীতি—বক্তা যে সমাজের মানুষ সে সমাজের প্রচলিত সংস্কার। যজ্ঞ সম্পন্ন করতে যেমন স্ত্রীকে পাশে লাগতই এদেরও তেমনই লৌকিক আচার অনুষ্ঠানে স্ত্রীকে অর্ধেক আসন ছেড়ে না দিলে চলে না। শুধু তাই নয়, 'লেডিজ ফার্স্ট' নীতি অনুসারে 'আমি' বলার আগে 'আমার স্ত্রী' কথাটা বলে নিতে হয়। এইজন্যই এদের দেশে স্ত্রীকে 'উত্তমার্ধ' বলে থাকে।

কথাটা ভেবে দেখবার মত, গর্ব বোধ করবার মত। স্ত্রীর মর্যাদা আমাদের দেশে এখনও যে অবস্থায়ই থাক—অনেক স্বদেশিয়ানা সত্ত্বেও আমরা যে পাশ্চাত্ত্য দেশকে সামনে আদর্শ রেখে এগিয়ে চলেছি—তাদের সমাজে যে সে মর্যাদা এতখানি সহজ স্বাভাবিক হয়ে রয়েছে সেটাই কি আমাদের পক্ষে কম আনন্দের বা আশ্বাসের কথা? জ্ঞান-বিজ্ঞান সব দিকেই যখন আমরা দ্রুত পশ্চিমী শক্তির কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছি, এ বিষয়ে কতদিন আর পিছিয়ে থাকব? নারীকে সামনে রেখে পুরুষ গৌরব বোধ করবে সেদিনের আর বেশী দেরী আছে কি? প্রকৃত নারীর সম্মান কাকে বলে এই বৃদ্ধ সাহেবটির কথায় যেন পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠল।

নারী গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে মনভরা তৃপ্তি নিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম।

হা হতোস্মি—এক ফুৎকারে সব তৃপ্তি নিভে গেল। ঘরে ঢুকতেই ঠাকুরটা একটা খোলা টেলিগ্রাম এনে হাজির হোলো—বাপ জরুরী তার করেছে ছেলের বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে, অবিলম্বে যেন চলে আসে। ঠাকুরের মুখে একটু সলজ্জ হাসি—চোখে একটু মিনতি মাখা আবেদন।

ব্রিটিশ এমব্যাসির কসমপলিটান আব-হাওয়াটা তখনও মাথায় ঘুরছে। উড়িষ্যার কোন অখ্যাত গ্রামে এক স্বল্প-শিক্ষিত সঙ্কুচিত দরিদ্র যুবক নূতন ঘর বাঁধবার জন্য ছুটি চাইছে—এ চিন্তা মনে বিশেষ কোনো রেখাপাত করতে পারল না সেই মুহূর্তে। না পারলেও কর্তব্য ফেলে রাখা চলে না। ঠাকুরকে ছুটি দিতে হোলো।

কর্তা সাড়ে সাতটায় অফিস যান, ছেলে-মেয়েরা সাড়ে আটটায় স্কুলে যায়। তারপর ঘরে তালাচাবি লাগিয়ে আমি স্বয়ং যাই বাজারে। কিন্তু বেশী দিন আর যেতে হোলো না। বাজার থেকে বেরোতে গিয়ে কলার খোসায় পা পিছলে পড়লাম যেয়ে একরাশ জঞ্জালের উপর। চোখে বিঁধে গেল একটুকরো ভাঙ্গা কাঁচ। বাড়ী আর ফেরা হোলো না। সোজা চলে গেলাম হাসপাতালে।

দিনের পর দিন যায়। চোখে ফেট্টি বেঁধে অন্ধকারের রাজ্যে পড়ে থাকি। বাড়ীর লোকেরা আসে, হাতড়ে হাতড়ে তাদের অনুভব করি, চোখ বুজে আলাপ করি। কিন্তু সে তো দুটি ঘন্টার জন্য। বাদ বাকী সময়টা কাটে নার্স আর প্রতিবেশী রোগিণীদের সঙ্গে গল্প করে। আমার পাশেই আছে একটি বৌ—নাম বীণাপাণি—আড়ালে সবাই বলে তেলি-বৌ। বাইশ বছর বয়সেই বেচারার চোখে ছানি পড়েছে। একটা চোখ গত বছর কাটিয়ে গেছে—কিন্তু দৃষ্টি সেটির ফিরে পায়নি। আর একটি এ বছর কাটাতে এসেছে।

দেখলে দুঃখ লাগে। এই বয়সেই চোখের আলো নিভে এসেছে। একটা চোখ গেছে বলে আর একটার জন্য ভয় বেশী। স্বামী রোজ আসেন, এটা-ওটা গল্প করেন। ঐটুকু সময়ই—যা বৌটাকে একটু হাসি-খুসি দেখায়—নয়তো সারাদিনই মন খারাপ করে থাকে—কথা বলতে গেলেই নিজের ভাগ্য নিয়ে হাহুতাশ করে।

দু'দিন ভিজিটরস আওয়ারসে বীণার বেডটা যেন চুপচাপ মনে হোলো—চোখে তো ঠুলি আঁটা, কাণে শুনে যতটা বোঝা গেল। তৃতীয় দিন বেলা এগারোটায় সময় ওর ছোট্ট দুটি ননদ অনেক খাবারদাবার নিয়ে এসে হাজির—দুদিন কেউ আসতে পারেনি, তারই ক্ষতিপূরণ স্বরূপ।

বিকেলবেলা আবার চুপচাপ, কেউ এল না। সন্ধ্যেবেলা ভিজিটররা চলে যাবার পর চারদিকে কেমন যেন একটা ফিসফাস্ কাণাঘুষার আভাষ পেতে লাগলাম—তেলি-বৌ নামটাও কয়েকবার কাণে এল। তাকে সবাই যেন এড়িয়ে চলতে চাইছে, এটুকু বুঝলাম। ভাবলাম বাড়ীতে বোধ-হয় কিছু বিপদ-আপদ ঘটেছে—ওর কাছে গোপন করছে সকলে। আমার পাশেই ওর বেড—কাজেই ওর কাণ বাঁচিয়ে অন্যদের কাছে যে খবর নেব তাও সাহস পেলাম না।

চুপ করেই রইলাম—যথাসময় সমাচারটি কর্ণগোচর হবেই জানি। খানিকটা বাদে, রাত্রের ষ্টাফ নার্স এসে সব পেসেন্টদের খবরাদি সংগ্রহ করতে করতে বীণাপাণির বেডের পাশে এসে দাঁড়ালেন। আমিও কাণ খাড়া করলাম—কিছু যদি জানা যায়।

'চৌদ্দ নম্বর! কেমন আছেন? মুখ তুলুন কান্নাকাটি করবেন না—চোখে স্ট্রেইন হবে!'

আর দেখতে হোলো না! হাউমাউ করে উঠল চৌদ্দ নম্বরের তেলি-বৌ—

'দিদি! আমার কি হবে! আমি কোথায় যাব? দশ বছরে এ বাড়ীর বৌ হয়ে এসিছিলাম, কোন্ পাপে আমার এ শাস্তি হোলো! ও দিদি আমার চোখ এমনি থাক, আমায় ছেড়ে দাও এক্ষুনি বাড়ী চলে যাই—'

ব্যাপারটা কি? 'ও দিদি! আমি কোথায় দাঁড়াব? কোথায় যাব?' কেবল এই কথা বলে আর কাঁদে। কিছুই বুঝি না। নার্স নানা রকম সান্ত্বনার বাণী শোনাচ্ছে বটে, কিন্তু কথা'র পিছনে যে বিশেষ জোর নেই তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

'ব্যবস্থা একটা হবেই, কান্নাকাটি করে কি করবেন? নিজেরই ক্ষতি করছেন—চোখট' একেবারেই যাবে যে। যখন আপনি জানতেন আপনার স্বামী এ রকম প্রকৃতির লোক তখন হাসপাতালে আসার আগেই আপনার এ বিষয়ে সাবধান হয়ে আসা উচিত ছিল। বাপের বাড়ীর লোকের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখুন। যাবার জায়গা আপনি একটা পাবেনই, চিকিৎসা করতে এসেছেন, সেটা আগে শেষ করুন, তারপরে তো আবার কথা'—এ সব কথায় বৌটি বিন্দুমাত্র আশ্বস্ত হোলো বলে মনে হোলো না, কারণ তার ফুঁপিয়ে কান্না চলতেই থাকল।

ষ্টাফ নার্সের সময় অল্প, সে আমার বেডের পাশে এসে দাঁড়াল। এক এক করে সব বেড ঘুরে তার কাজ শেষ করে বাইরে বেরোতেই—প্রাইভেট নার্স আর চলমান রোগিণীর দল এসে ছেঁকে ধরল চৌদ্দ নম্বরকে—সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও।

কাহিনীটি এবারে জলের মত প্রাঞ্জল হোলো। অপারেশন করেও যখন গত বছর একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেল, তখন দ্বিতীয় চোখটি যে কাটিয়ে এবার ভাল হবে সে আশা কম অতএব বীণাপাণির স্বামী আর অনিশ্চয়তার মধ্যে না থেকে পরশু দিন একটি দ্বিচক্ষুষ্মতী তরুণীর পাণিগ্রহণ করেছেন। ননদ দুটি আজ সকালে নূতন বৌদির বিয়ের সন্দেশ এনে পুরোনো বৌদিকে মিষ্টিমুখ করিয়ে গেছে। বীণার একটু কেমন কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল—পরে অন্য বেডের একটি পেসেন্টের ভিজিটর, ওদেরই পাড়ার লোক, পাড়ার ঘটনা হিসাবে ব্যাপারটা বিবৃত করে গেছে। কাণে হেঁটে হেঁটে কথাটি ক্রমে বীণার কাণে এসে পেঁাছেছে।

রাত্রি দশটায় হলের বাতি নেভা পর্যন্ত এ নিয়ে অনেক আলোচনা, পর্যালোচনা, গবেষণা চলল। সব ছাপিয়ে আমার কাণে কিন্তু বাজতে লাগল একটা প্রায় ভুলে যাওয়া কথা—'মাই ওয়াইফ এ্যান্ড আই'—স্ত্রীর মর্যাদার পরাকাষ্ঠা।

অদূরভবিষ্যতে ভারতীয় নারীর গৌরবোজ্জ্বল আসন সম্বন্ধে আমার স্বপ্ন যেন দপ্‌দপ্ করে জ্বলতে লাগল। দপ্‌দপ্ করতে লাগল মাথার ভেতরটাও। বারো বছরের বিবাহিত স্ত্রী যদি অন্ধ হয়ে যায় এই ভয়ে স্বামী আগে থেকেই আর একটি দু' চোখ-ওয়ালা স্ত্রী ঘরে এনে প্রতিষ্ঠা করে রাখলেন। চোখটা যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেও ভরসা পেলেন না।

বহু বিবাহ ব্যবস্থা রদ করে এ সব ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়তো বন্ধ করা যাবে কিন্তু এ সব মানুষের মনোবৃত্তি কি পাল্টানো যাবে? যদি না যায়, তবে স্ত্রীর মর্যাদা কে দেবে? কোথা থেকে আসবে? 'আই'-এর আগে 'মাই ওয়াইফ' কবে এসে বসবে?

এ সব ভাবতে ভাবতে আরও কটাদিন কেটে গেল। চোখে আবার আলো এসে লাগল। চাইলাম দেখলাম উঠলাম হাঁটলাম। ফিরে এলাম নিজের বাড়ীতে।

ঠাকুরটি ইতোমধ্যে বিবাহাদি সেরে আবার হেঁসেলে ঢুকেছে। আমায় ভক্তি ভরে নমস্কার করল, বিপদে সহানুভূতি জানালো, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দুটো উপদেশ দিল। আমিও তাকে কুশল প্রশ্নাদি করে বিয়ে কেমন হোলো জিজ্ঞেস করতে ভুলিনি। লজ্জাবনত মুখে ঘাড় নেড়ে জানালো—'ভাল'—বউ কেমন হয়েছে জিজ্ঞেস করাতে মাথাটা আরও নীচু হয়ে গেল কিন্তু গলায় স্বর ফুটল—'খু-উ-ব ভাল!' শুনে আমারও ভাল লাগল—এত ভাল মনে স্ত্রীকে যখন গ্রহণ করেছে, আশা করতে দোষ কি যে সে স্ত্রীর অযত্ন কখনও এ মানুষটি করবে না!

বিয়ে করে খুসী হয়েছে, খুসী মনেই ঠাকুর আমার ঘরের কাজ সামলাতে লাগল। নিশ্চিন্ত হোলাম। হাসপাতালের ধাক্কা কাটতে কয়েকদিন লাগবে তো! ওর মধ্যেই হাল্কা কাজের ফাঁকে, নব-বিবাহিত ঠাকুরের সঙ্গে হাল্কা দুটো গল্প করি। একদিন হঠাৎ খেয়াল হোলো ঠাকুরের বৌয়ের সব খবর নিয়েছি, মায় বয়স পর্যন্ত—কিন্তু নামটা তো জিজ্ঞেস করা হয়নি।

তাড়াতাড়ি ভুলটা শুধরে নিলাম—'ঠাকুর! তোমার বৌয়ের নামটি কি বলতো?'

পরোটার ময়দা ঠাসতে ঠাসতে থেমে গেল ঠাকুর। চোখের দৃষ্টি বিস্ময়াহত কুন্ঠিত।

'নাম? তা তো জানি না মা!'

'জান না? কি জান না?' আমার বিস্ময় ঠাকুরের বিস্ময়ের মাত্রা ছাড়াল।

সোজা চোখে চেয়েই ঠাকুর বলল—'ঐ যে নামের কথা জিজ্ঞাসা করলেন!'

'নাম জান না? বৌয়ের নাম জান না? নিজের বিয়ে করা বৌ? বিস্ময়ের ঘোর আমার আর কাটে না!

'কি করে জানব মা?'

'সে কি গো! বৌ তোমাদের বাড়ী রয়েছে বললে না?'

'রয়েছেই তো!'

'তার নাম কেউ জানে না?'

'কেউ জানে কিনা বলতে পারি না—তবে আমি জানি না!'

'কাউকে জিজ্ঞেস করে নাওনি কেন?'

এবারে ঠাকুর ময়দার থালার উপর ঝুঁকে পড়ল—

'সে কি করে জিজ্ঞেস করব? করা যায় না!'

'আহা! বৌকেও তো জিজ্ঞেস করতে পার'

'ছি-ছি! বৌ মানুষকে নাম জিজ্ঞেস করব কি—'

আমার হাতের কাজ থেমে গেল। কমাস আগে লব্ধ মন্ত্রটি ঝঙ্কার দিয়ে উঠল কাণে—মাই ওয়াইফ এ্যান্ড আই!'

স্ত্রীর মর্যাদার প্রকৃত স্বরূপটা তাহলে কি হোলো? সবগুলো ধারণা একসঙ্গে যেন গুলিয়ে গেল।

'দেবাং বন্দামি মহানন্দং'—রবীন সেনগুপ্ত

ভারতীয় নাট্যরূপ

শ্রী ধীরেন্দ্র নারায়ন রায় (লালগোলা রাজা)

কাব্য দুই প্রকার—দৃশ্য ও শ্রব্য। নাটক দৃশ্যকাব্যের অন্তর্গত। একাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বলেছেন—

গীতবাদ্য নৃত্য ত্রয়ং নাট্যং তৌর্যত্রিকঞ্চ তৎ
সঙ্গীতং প্রেক্ষার্থেঽস্মিন্ শাস্ত্রোক্তে
নাট্যধর্মিকা।

সঙ্গীত অর্থাৎ গীত, বাদ্য, নৃত্য এবং নাট্য প্রভৃতি প্রেক্ষণীয় হলেই তাকে শাস্ত্রে নাট্যধর্মী বলা হয়েছে।

সাহিত্যদর্পণেও দেখা যায়, নাটক অভিনেয় দৃশ্যকাব্য। পদার্থকে অভিমুখে নিয়ে আসাই অভিনয় এবং অভিনেয় দৃশ্য কাব্য দ্বিবিধ—রূপক ও উপরূপক। রূপক দশ প্রকার ও উপরূপকের সংখ্যা আঠারো। প্রাচীন ভারতে সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নাট্যশাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল এবং এ সম্বন্ধে ভরতমুনি থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী বিভিন্ন নাট্যকার যে বিস্তৃত গবেষণা ও নাটকের বিভিন্ন রূপ ও লক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন—এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়।

আমরা দেখতে পাই, চার হাজার বছর আগেও নটের ব্যবহার বৈদিক সময় হতেই ভারতে প্রচলিত—শতপথ ব্রাহ্মণে নটসূত্রকার শিলালির নাম পাওয়া যায়। বৌদ্ধদের প্রাচীন গ্রন্থেও নাট্যরঙ্গের উল্লেখ আছে। যে সময় ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহে উপস্থিত, মৌদ্গাল্যায়ন ও উপতিষ্য নামে তাঁর দুই শিষ্য সর্বসমক্ষে অভিনয় করেছিলেন। মহাভারতেও দেখা যায় বিরাট রাজার ভবনে নাট্যশালা ছিল।

সুতরাং যাঁরা বলেন, গ্রীস দেশেই নাটকের জন্ম, আমার মনে হয়, তাঁদের মত সমর্থনযোগ্য নয়। যে সব গ্রীক নাট্যকারগণ বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত নাটক লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে এস্কাইলাস, সফোক্লিস, ইউরিপিডিস্, সেনেকা, এরিস্টোফেনিস প্রভৃতি সুবিখ্যাত। যীশুখৃষ্টের বহু পূর্বে এঁদের আবির্ভাব হলেও, বৈদিক যুগের বহু পরবর্তী, একথা সকলেই স্বীকার করেছেন। শুধু স্বকীয়তা ও প্রাচীনত্বে নয়, ভাবে ও বিন্যাসে, আঙ্গিকে ও পরিচর্যায় ভারতীয় নাট্যশিল্প বহু বিষয়েই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে প্রাচ্যবিদ্যা পারদর্শী (Professor Wilson) একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, ভারতীয় নাটক ভারতবাসীর নিজস্ব নাটক সম্বন্ধে হিন্দুগণ অপর কোনও জাতির কাছে ঋণী নয়।

"The nations of Europe possessed no dramatic literature before the fourteenth or fifteenth century at which period the Hindu drama had passed into its decline."

বহু প্রাচীনকালে ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের যে বিপুল আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়, শুধু নাট্যরচনায় নয়, নাট্যবিধি ও আলংকারিক প্রণালীর যে সুবিস্তৃত গবেষণা হয়েছে, তত্ত্ব ও তথ্যের ক্ষেত্রে তা' সত্যিই বিস্ময়কর। নাটকের পাত্রপাত্রী, নাট্যবস্তুর নির্দেশ, রঙ্গভূমি নির্মাণ যবনিকা, বৃত্তিভেদে অভিনয়, নাটক লক্ষণ, নায়ক, প্রবেশক, বিষ্কম্ভক, পূর্বরঙ্গ, প্রস্তাবনা, প্রহসন, বীথি, নালিকা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনায় ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র এত সমৃদ্ধ যা পৃথিবীর আর কোনও দেশে দেখতে পাওয়া যায় না।

ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে যে-সব নিয়ম শৃঙ্খলার বর্ণনা আছে, যা নাটকের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে রাখে—স্থান, কাল, পাত্র ভেদে এবং মানুষের রুচির পরিবর্তনে তার মধ্যে কিছুটা শিথিলতা দেখা গেলেও—মূল নিয়ম থেকে নাটকের বিচ্যুতি হওয়ার উপায় ছিল না। এ বিষয়ে ভারতীয় নাট্যকারগণ নিষ্ঠাবান ছিলেন এবং অলংকারদুষ্ট কোনও রচনায় তাঁদের প্রবৃত্তি ছিল না। তবে বর্তমানের মত নাট্যশালায় নাটকের প্রয়োজন হত না। প্রাচীন গ্রীকদের ন্যায়, হিন্দুদের অভিনয়ও সাধারণতঃ পূর্ণিমা তিথিতে, রাজার অভিষেকে, মেলায়, ধর্মসম্বন্ধীয় উৎসবে, লোকসমাগমে অথবা বিবাহোৎসবে অনুষ্ঠিত হত। পঞ্চাঙ্ক নাটক, সপ্তাঙ্ক নাটক, অথবা দশাঙ্ক নাটক রচিত হলেও, একটি বিষয়ে প্রাচীন নাটকও আজকালকার মত প্রহরের অর্থাৎ তিন ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই তা' অনুরাগের বিষয় ও আনন্দদায়ক বলে বিবেচিত হত। নাটক সুদীর্ঘ হওয়া উচিত নয়—প্রাচীন নাট্যকারগণ এ বিষয়েও সজাগ ছিলেন। শেক্সপীয়রের নাটকে যেমন দেখা যায়, এক নাটকের মধ্যেই পাত্রপাত্রীগণের দ্বারা অপর এক অভিনয়ের দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে, প্রাচীন ভারতীয় নাটকেও সেরূপ নাটকাবতার পাওয়া যায়। ভবভূতির উত্তর রামচরিতে এরূপ নাটকাবতারের সংস্থান আছে।

সঙ্গীত দামোদরে রঙ্গমঞ্চের বিবরণ, নায়ক, গায়িকা, গায়ক প্রভৃতির অবস্থান, বাদ্যস্থান, যবনিকা, নেপথ্য প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ের বিবরণ আছে, যেগুলি যথোপযুক্তভাবে অনুসরণ করলে, আমাদের বর্তমান নাট্যশালাগুলিও উপকৃত হবে।

মুসলমান আমলের পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষে নাট্যশাস্ত্রের আলোচনা এবং নাটকাভিনয় যে সুপ্রচলিত ছিল—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু মুসলমানগণ, নৃত্য, গীত, বাদ্য, অভিনয় প্রভৃতি তাদের ধর্মনীতির বিরোধী বলে, এই কলাবিদ্যার উপর বিরূপ ছিল—ফলে, ভারতবর্ষে নাটকাভিনয়ের গতি রুদ্ধ হয়ে পড়ে। সম্রাট আকবর এ বিষয়ে কিছুটা উদার ছিলেন বটে, কিন্তু সকলেই জানেন, সম্রাট আওরঙ্গজেব নৃত্যগীতাদির উপর অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। দেশের রাজশক্তি যদি কোনও সুকুমার শিল্পে উৎসাহ না দেয়, সেই শিল্পের ধ্বংসের পথে যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নেই। সুতরাং যেভাবেই হোক, বিজাতীয় শাসনাধিকারে, যখন দেশের প্রাণশক্তি ক্রমাগত নিপীড়িত হয়ে পড়ল জাতির সংস্কৃতিক্ষেত্রেও দেখা দিল এক গভীর অন্ধকারময় যুগ—যেমন এসেছিল একদিন ইংলণ্ডের ইতিহাসে পিউরিটান অভিভাবক ক্রমওয়েলের আমলে। কিন্তু মানুষের মন চিরদিন বাধা নিষেধের দুর্ভেদ্য প্রাচীরকে অগ্রাহ্য করে ছুটে চলে যেখানে সে পায় তার অন্তরের খোরাক। ভারতের জনগণও সেই দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। তাই মাঝে মাঝে, অপূর্ব জীবনালোকে সেই প্রাণশক্তি নিজেকে ব্যক্ত করেছে—কিন্তু সর্বাপেক্ষা বেশী দেখা গিয়েছিল, ধর্মভূমি ভারতবর্ষের ধর্মের প্রতি অন্তরাত্মার আকুল আবেদন। তাই, রামানন্দ, রামানুজ, কবীর, নানক, চৈতন্যের আবির্ভাবে, ধর্মের তত্ত্বানুশীলনে ভারতের নরনারী আবার বেঁচে উঠল। কিন্তু, জাতীয় সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহকরূপে নাটকের পরিচর্যায় দেশবাসীর বিক্ষিপ্ত বিপর্যস্ত অন্তরে তেমন কোনও উন্মাদনা দেখা দেয় নাই।

বাংলা দেশ চিরদিনই ভাবে ভোলা কবির দেশ। বহু সংঘাত, বহু উত্থান পতনের মধ্যে দিয়েও সে জীবনের জয়গান করেছে। তার প্রাণশক্তিকে সে কখনও নির্জিত হতে দেয় নাই। তাই, জাতির চূড়ান্ত একাগ্রতা জন্ম নিয়েছিল শ্রীচৈতন্যদেহে—তিনি প্রেমের বন্ধনে ধনী, নির্ধন—সৎ আর অসৎকে এক নাম-মন্ত্রে বন্ধন করে, এই ভাব-বন্ধনের হাত থেকে মুক্তির উপায় বলে দিয়েছেন।

দেশে যখন নাটকাভিনয়ের সুযোগ নাই—তখন মানুষ ধর্মের কাহিনীগুলি অবলম্বন করে, কৃষ্ণযাত্রা কথকতা, কবিগান, পাঁচালী, পালা কীর্তন প্রভৃতির মধ্যেই নিজেদের আনন্দের খোরাক সংগ্রহে মন দিয়েছিল।

বহুদিন হতেই বাংলা দেশে যাত্রাগানের সমাদর। পৌরাণিক পাত্রপাত্রী নির্বাচন এবং আমাদের প্রাচীন নাট্যসাহিত্য থেকে যাত্রার উপযোগী পালাগান রচিত হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং পার্ষদবর্গের সঙ্গে কৃষ্ণলীলা অভিনয় করতেন। এইভাবে নাটকাভিনয়ের দিকে দেশের জনসাধারণ ক্রমে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এই পালাগানগুলিকে শাস্ত্রসম্মতভাবে নাটক না বলে নাটকের ছায়া বলা যায়। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে কলিরাজার যাত্রা, তারপর ভদ্রার্জুন নাটক এবং ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসুন্দর অভিনীত হয়েছিল। যাত্রাগানে বহু পাত্র পাত্রী, সময়ও বহুক্ষণ ব্যাপী, রঙ্গমঞ্চের সুযোগ সুবিধাগুলি পাওয়া যায় না—কিন্তু নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করা এবং সঙ্গীতের সহযোগিতায় নাট্যবস্তুর প্রদর্শনে যাত্রাভিনয়ের অবদান আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সামান্য নয়। এখন পর্যন্তও বাংলাদেশের প্রাণস্বরূপ পল্লী অঞ্চলে কৃষ্ণযাত্রা এবং অন্যান্য পৌরাণিক যাত্রাভিনয় বর্তমানের পাশ্চাত্য রীতির অনুকরণপ্রিয় থিয়েটার অপেক্ষা বেশী আদর পেয়ে থাকে। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা এই যে, বাংলা দেশে যাত্রাগানের যথেষ্ট সমাদর হলেও, যাত্রাগান থেকে বাংলা নাটকের উদ্ভব হয় নাই; বরঞ্চ বঙ্গীয় নাট্যশালায় বাংলা নাটকের অভিনয়ই যাত্রাগানের রূপান্তর ঘটিয়েছে, যার ফলে আমরা পেয়েছি থিয়েট্রিকাল যাত্রা পার্টি,

ড্রামাটিক যাত্রা পার্টি প্রভৃতি যাত্রাগানের আধুনিকতম রূপ।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা বাংলাদেশের নাট্যশিল্পের কথায় এসে পড়েছি। প্রথমেই বলা দরকার, বাংলাদেশে বর্তমানে যে নাট্যালয় ও নাটকাভিনয় হয়ে থাকে, তার গোড়াপত্তন হয়েছিল বিদেশীর দ্বারা এবং বিদেশীয় নাটকের রীতি নীতি অবলম্বন করেই। পাশ্চাত্য নাট্য শিল্পে যেসব অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদি গুণার্থক, ভারতীয় নাট্য-শাস্ত্রে সে সব বর্জন করে চলার উপদেশই অনেকস্থলে দেওয়া হয়েছে। ইউরোপীয় অভিনয়ে ট্যাব্‌লো ভিবান্টের প্রচলন আছে। আমাদের যাত্রাগানেও সেইরূপ সঙ' সাজবার রেওয়াজ দেখা যায়। কলিরাজার যাত্রায় এই ধরণের সঙ আছে। এরপরই বাংলা দেশে এক নূতন ধরণের যাত্রার প্রচলন হয়। নন্দবিদায় যাত্রাভিনয়ে সর্বপ্রথম পুরুষ ও স্ত্রী এক সঙ্গে অভিনয় করে। যাঁরা অভিনয় করেছিলেন, তাঁরা সবাই ভদ্রশ্রেণীর।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও বাঙালী জীবনের উপর পুরাতনের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণেই দেখা যায়। তাঁরা যাত্রা, পাঁচালী, কবি-গান, হাফ-আখড়াই নিয়েই সন্তুষ্ট। কিন্তু ইংরেজী নাট্য-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী সেই পূর্বের ধারায় সন্তুষ্ট থাকতে পারে নি। তাদের এই ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষা পূরণের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হ'ল এবং সম্পূর্ণ আকস্মিক-ভাবেই রাশিয়ান হিরেসিম লেবেডফ্ নিজে বাংলা ভাষায় একখানি ইংরেজী নাটকের অনুবাদ করে ডোমপাড়ায় নাট্যশালা তৈরী করিয়ে অভি-নয় করান। বইখানার নাম 'The Disguise' সুতরাং প্রথম বঙ্গীয় নাট্যশালা বিদেশীর কীর্তি। কিন্তু দেশের লোকের সঙ্গে তার কোনও যোগ না থাকায় সেটি স্থায়ী হয় নি। নিজেদের নাট্যশালা নেই—নাটক নেই—শিক্ষিত বাঙালী মনে মনে একটা গভীর অভাব অনুভব করল। অবশেষে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে শেক্‌স্‌-পীয়রের ইংরেজী নাটক ও ভবভূতির নাটকের ইংরেজী অনুবাদ নিয়ে জন্ম হ'ল হিন্দু থিয়েটারের। এইভাবে বাংলা দেশে সখের থিয়েটার গড়ে উঠল এবং সর্বপ্রথম বাঙালীর উদ্যোগে বাংলা নাটকের অভিনয় হয়েছিল শ্যাম-বাজারের নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ীতে এক সখের থিয়েটারে। এখানেও স্ত্রী ও পুরুষে একসঙ্গে অভিনয় করেছিল। সাতুবাবুর বাড়ীতেও বাংলা নাটকের অভিনয় হয় এবং ক্রমে জোড়াসাঁকো নাট্যশালা, বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ, বেলগাছিয়া নাট্যশালা, পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয় শোভা-বাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটি, বহুবাজার বঙ্গ নাট্যালয় প্রভৃতি নাট্যশালার উদ্ভব হয় এবং শিক্ষিত সমাজে বিশেষ আন্দো-লনের সৃষ্টি করে।

নাট্যশালার উদ্ভব হলেও, অভিনেয় নাটক কোথায়? ইংরেজী নাটক এবং সংস্কৃত নাটকের ইংরেজী অনুবাদ অভিনয় করে কী আর তৃপ্তি আসে? [illegible] হতে লাগল যেন আমাদের নিজে-দের বুঝি কিছুই নেই। অবশেষে দেখা দিলেন বাংলা ভাষায় লিখিত, বাঙালীর ভাবধারায় অনু-প্রাণিত, বাংলার জনগণের সুখ-দুঃখের কাহিনী নিয়ে বাংলার প্রকৃত

কিষাণ

জহর ঘোষ

কুল সর্বস্ব" অভিনয় হতেই বাংলা ভাষায় রচিত নাটকের দিকেই লোকের বিশেষ আগ্রহ দেখা দিল। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে দেখা দিলেন মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর প্রথম অবদান শর্মিষ্ঠা নিয়ে। তারপর আরও কয়েকখানা নাটক ও "একেই কী বলে সভ্যতা" এবং "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" ইত্যাদি রঙ্গমঞ্চে সু-অভিনীত হয়েছিল।

ক্রমে দেখা দিলেন বিশিষ্ট নাট্যকারগণ—তাঁদের বিশদ বিবরণ আমি এখানে দিতে চাই না—শুধু একটিমাত্র কথা বলেই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের ছেদ টানতে হবে।

বাংলা দেশের রঙ্গমঞ্চের শৈশব অবস্থা থেকে আজ পর্যন্ত বহু জ্ঞানী ও গুণিজন রঙ্গমঞ্চকে জনসাধারণের কাছে প্রিয় করে তোলার কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। বৈদেশিক ধারায় আমাদের রঙ্গালয়ের জন্ম ও পরিচালনা হলেও নাট্যের বিষয়ে আমাদের একটি সুষ্ঠু ও সাবলীল দৃষ্টিভঙ্গী থাকা চাই। একদিকে যেমন যুগোপযোগী দৃশ্যপট ও আলোক সংস্থান ইত্যাদির অবকাশ রয়েছে, অপরদিকে আমাদের নাটক রচনায় যেন শুধুমাত্র বৈদেশিক ভঙ্গী ও আঙ্গিকের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে না থাকে। প্রাচীন ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের বিরাট ভান্ডারে যে মণি-মুক্তারাজি সজ্জিত আছে, সেগুলিও আহরণ করে আনা চাই। আমাদের দেশের কথা, দেশের মানুষের কথা, আমাদের জল মাটি আকাশ, অরণ্য, আমাদের ভাবধারায় যেমন মিশে থাকে, তেমনি আমাদের সুপ্রাচীন নাট্যসূত্রকার-গণ যেসব বিধি নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন, সে বিষয়ে অবহিত হলে আমাদেরই গৌরব বেড়ে যাবে। এইটুকু জানাবার জন্যেই প্রাচীন ভারতীয় নাট্য পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বাংলার বর্তমান নাট্যশিল্পের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা গেল। এই প্রসঙ্গে একথাও বলা নিতান্ত প্রয়োজন যে, বাংলার নাট্যধারায় রবীন্দ্রনাথের দান নাট্য-সাহিত্য, রঙ্গালয় ও অভিনয়ক্ষেত্রে যে মৌলিকতা এনে দিয়েছে, তার ফলেই আমরা পেয়েছি গীতি-

বিকাশ। রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি প্রতি[illegible] আমাদের দেশে গীতিনাট্যের প্রথম প্র[illegible] সুরের মাধ্যমে মনের গভীরতম ভাবর[illegible] কাব্যলোক সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে কবিগুরুর [illegible] অবদান আমাদের জাতীয় নাট্যশিল্পে ও না[illegible] সাহিত্যে চিরন্তন সম্পদ হয়ে আছে।

নাটকের মূল বস্তুটি কি, এই নিয়ে ব[illegible] বাদ বিতর্ক আছে—কিন্তু একটি বিষয়ে আ[illegible] কার সকলেই একমত যে, স্থান, কাল ও পা[illegible] সমন্বয় এবং নাটকীয় বিষয়বস্তুর প্রতি এ[illegible] সুষ্ঠু অনুরোগই সর্বদেশের ও সর্বকালের না[illegible] প্রধানতম লক্ষণ বলে মেনে নেওয়া হ[illegible] শিক্ষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, ধন, সমৃদ্ধি যে[illegible] একটি জাতির পরিচয় বয়ে আনে, তেমনি [illegible] সংস্কৃতিগত জীবনে নাটকের প্রভাব সা[illegible] নয়। নাটকের সর্বপ্রধান অঙ্গই হ'ল না[illegible] এবং ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে নায়কের যে ধীরোদ[illegible] ধীরললিত, ধীরোদাত্ত এবং ধীরপ্রশান্ত [illegible] বর্ণিত হয়েছে, দর্শকের প্রাণেও জাগে [illegible] প্রতিচ্ছবি। নাটকের মধ্য দিয়েই রূপায়িত। জাতীয় চরিত্রের বিশিষ্ট গুণরাশি; অতী[illegible] পরিপ্রেক্ষিতে, বর্তমানের রূপসজ্জায়, ভবিষ্য[illegible] স্বর্ণোজ্জ্বল স্বপ্ন তার মধ্যেই সার্থকতায় [illegible] ওঠে। তাই বিদেশীয় ভাবধারাকে আম[illegible] জাতীয় চিন্তাধারার সঙ্গে মিশ খাইয়ে নি[illegible] হবে—অনুকরণ বৃত্তিকে পরিহার করে [illegible] দিতে হবে একটা নূতন রাসায়নিক রূপ—[illegible] নাট্যশিল্পের মাধ্যমে আনন্দ ও কল্যাণ আমা[illegible] চিত্তলোকে অভিষিক্ত হয়ে জীবনকে অভিনা[illegible] করে তুলবে।

প্রেমের সীমা

প্রিয়তমাকে লেখা চিঠি। '........অ[illegible] তোমার জন্য পারি না এমন কোন কাজ নে[illegible] আগুনে ঝাঁপ দিতে পারি, উত্তাল সম[illegible] লাফিয়ে পড়তে পারি........কিন্তু আজ তো[illegible] কাছে যেতে পারছি না বৃষ্টি পড়ছে যে।'

ই সমুদ্রে মোতির সাধের ঘর ভাঙল।
বিশ বছর আগে মোতির ঘর আর একবার ভেঙেছিল। এবার ভাঙল সমুদ্র: সাগরের এই তুফান, ভীষণ সমুদ্র।

এক মাস পর পর জাহাজ আসে পোর্ট ...র। জাহাজের নাম এম্ ভি নিকোবর।
এবারও 'নিকোবর' জাহাজ এসেছে। এই ... চাথাম জেটিতে ভিড়েছে।

পোর্ট ব্লেয়ারে জাহাজ আসার দিনের সবানন্দ ...দ। জাহাজ হ'ল ভারতের মেইনল্যাণ্ডের ... বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপের ...যোগ রাখার একমাত্র বাহন। জাহাজ আসার ...ন পোর্ট ব্লেয়ারে চাঞ্চল্য বাড়ে, ব্যস্ততা বাড়ে। ...তারামা, পাহাড়গাঁও, মোগুলটৌন—দূরে দূরে ...-বস্তী-জঙ্গল থেকে দলে দলে মানুষ চ্যাথাম ...টিতে এসে জটলা পাকায়। আন্দামানের ঢিমে- ...তালা জীবনের বেগ মেইনল্যাণ্ডের খবর ...র আগ্রহে, উদ্বেগে অস্থির হয়ে ওঠে।

'নিকোবর' জাহাজ এসেছে। যথারীতি ...ন জেটির জটলা হল্লায় সোরগোলে তুমুল ... উঠেছে।

সকলের সঙ্গে মোতিও এসেছে জেটিতে। ...পর দিন হ্যারবার্টাবাদের 'রিফ্যুজি সেটেল- ...ট' থেকে পাহাড়-জঙ্গল-সড়ক ভেঙে পোর্ট ...র এসেছিল। পোর্ট ব্লেয়ারের সাদীপুরের ... পাঠান ধরমবাপের কুঠিতে রাতটা কাটিয়ে ...লে উঠেই জেটিতে চলে এসেছে। মোতির ...া সঙ্গে পাঠান ধরমবাপ মোহর খানও ...ছে।

জেটির ক্যাপস্টানে কাছি দিয়ে 'নিকোবর' ...জকে বাঁধা হ'ল; গ্যাংওয়ে লাগানো হ'ল।
কাঠের জেটিতে ট্রলির লাইন। লাইনের ...র দাঁড়িয়ে, শুধু পায়ের আঙুলে ভর রেখে ...তিপাতি করে খোঁজে মোতি। উদ্বেগে ...কণ্ঠায় চোখ দুটো চকচক করে।

চার পাশে মানুষের জটলা: হল্লা। নানান ...ী মানুষ: পাঠান, পাঞ্জাবী, কারেন, মোপলা ..., মাদ্রাজী, মালাবারী। হরেক মানুষ, হরেক ...া, হরেক সাজ। এত মানুষ, এত ভাষা, এত ...র মধ্য থেকে সেই মানুষটাকে, সেই অদ্ভুত চেহারার, শিচের সাজের চেনা মানুষটাকে খুঁজে বার করতে পারল না মোতি।

অস্ফুট, উদ্বিগ্ন গলায় মোতি বলল, 'তারে যে দেখি না বাবা'—

পিছনে মোহর খান দাঁড়িয়েছিল। মেহেদী মাখা হাত, পাকা ভুরু, ঈষৎ লালচে চুল। এত বয়স হয়েছে মোহরের, তবু পরনে ঢিলা সিলওয়ার, রেশমী কুর্তা। কানের আতরমাখা তুলো থেকে মৃদু খুসবু যুগপৎ তার রুচি এবং সৌখিনতার পরিচয় দিচ্ছিল।

মোহর খান বলল, 'কি বলি বেটি?'

'তারে যে দেখি না বাবা; আর আর বার জাহাজ আসলেই সগলের (সকলের) আগে সে নেমে আসত। আমার লগে দেখা করত।'

'একটু সবুর বেটি; জরুর সে এসেছে। এই তো সবে গ্যাংওয়ে লাগানো হ'ল। থোড়া সবুর'—

'কিন্তুক বাবা, মন যে কুডাক ডাকে। মন যে বুঝ মানে না। এইবার সমুদ্দরে (সমুদ্রে) যাওনের আগে সে কইছিল, আর ফিরব না।'

মোহর খান জবাব দিল না।

পাঠান মোহর খানের সঙ্গে ফরিদপুরের জেলার 'রিফ্যুজী' মোতির কেমন করে বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে ধরমবাপ আর ধরম-বেটির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, সে কাহিনী অন্য। মোতির ভাষাও পুরোপুরি বোঝে না মোহর। কিন্তু তার দিলের যন্ত্রণার কথা ঠিকই বুঝতে পারে। এত বড় পৃথিবীতে এত মানুষ, এত দেশ, এত ভাষা: কিন্তু মানুষের দিলের ভাষা সব জায়গায় এক। সে ভাষা দেশ, কাল, পাত্রের বাধা মানে না।

গ্যাংওয়ে বেয়ে যাত্রীরা কাঠের জেটিতে নেমে আসছে। বেশির ভাগই অন্ধ্র প্রদেশের কুলীকামিন, রাঁচী কুলী আর মালাবারী সেট্‌লার। মানুষের সঙ্গে লটবহর, বোঁচকা-বুঁচকি, বাক্সপ্যাঁটরা—হরেক কিসিমের মাল নামছে।

এই দ্বীপের প্রবাসীরা ভারতবর্ষকে বলে মেইনল্যাণ্ড! সেই মেইনল্যাণ্ড থেকে নানা চেহারা নমুনার মানুষ এসেছে এই জাহাজে; কিন্তু কতকালের চেনা সেই মানুষটার চেহারা কোথাও চোখে পড়ছে না। মোতি অস্থির হয়ে উঠল। অদ্ভুত এক আশংকায় বুকের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়েছে। তবে কি এই দ্বিপদে সমুদ্র থেকে মধু আর কোনদিনই ফিরবে না!

মোতি ডাকল, 'বাবা'—

পিছন থেকে মোহর খান বলল, 'কিছু বললি বেটি?'

'কপাল আমার বুঝি ভাঙল বাবা! মনে কুডাক উঠছে; বিশ বছর পর আন্ধারমানে (আন্দামানে) তারে নিয়া যেদিন সাধের ঘর বানলাম (বাঁধলাম); সেদিনই বুক কাঁপছিল। বুকের কাঁপ নিয়া কি সাধের ঘর বান্ধা যায় বাবা! সেই দিনই বুঝছিলাম, ঘর আমার ভাঙব। ঘর বুঝি আমার সত্যই ভাঙল বাবা।'

মোতি উতলা হয়ে উঠল।

মোতির কথা পুরোপুরি বোঝে না মোহর খান। কিন্তু তার দিলের বেদনাটা অনুভব করতে পারে। মোতির মাথায় একখানা হাত রেখে মোহর খান বলে, 'সবুর বেটি, থোড়া সবুর'—

একে একে যাত্রীরা গ্যাংওয়ে বেয়ে জেটিতে নামে। জেটি থেকে হ্যাডো, ডিলানিপুর, সাদী-পুর, ফোনিক্স বে, এবারডীন, দূরে দূরে গাঁও বস্তীর পথ ধরে। জেটির জটলাটা ফাঁকা হয়ে আসতে থাকে। কিন্তু মধুকে কোথাও দেখা যায় না।

এক পা এক পা করে জাহাজের কাছে এগিয়ে আসে মোতি। জাহাজের ফাঁক ফোকরে দৃষ্টি চালিয়ে মধুকে তল্লাস করে। কিন্তু না, মধু কোথাও নেই।

হঠাৎ মোতির চোখে পড়ল, গ্যাংওয়ে বেয়ে পল নেমে আসছে। পরনে ডাংরি, মাথায় নীল টুপি। পল 'নিকোবর' জাহাজের খালাসী। মাদ্রাজী খৃস্টান। মধুর সঙ্গে বার দুই সে হ্যারবার্টাবাদের 'রিফ্যুজী সেটেলমেন্টে' গিয়েছিল।

উৎকণ্ঠায় একরকম ছুটেই গ্যাংওয়েটার সামনে এসে পড়ল মোতি।

পল সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল, 'আরে ভাবীজী: তবিয়ত কেমন? দিল মর্জি আচ্ছা তো?'

মধুর কাছে শুনে শুনে জাহাজী ভাষায় ... 'কিছুটা রপ্ত হয়েছে মোতির।' যতখানি সে বোঝে, তার চেয়ে অনেক বেশি অনুমান করে নেয়। মোতি বলল, হু, সগল (সকল) ভালই।'

এতক্ষণে জেটিতে নেমে পড়েছে পল।

মোতির কাছে এসে বলে, 'ভাবীজী, জাহাজী খানা গিলে গিলে জিভটা নালায়েক হয়ে গিয়েছে। সেইবার যেমন ম্যাকরেল মাছের সুরুয়া পাকিয়েছিলে, এবারও কিন্তু তেমন পাকাতে হবে। বহুৎ আচ্ছা পাকাও তুমি।'

'আচ্ছা, যা খাইতে চাও খাওয়ামু।' দ্রুত, কাঁপা স্বরে মোতি বলে, 'মান্দ্রাজী ভাই, একখান বাত কমু?'

'কি বাত?'

'তোমার দাদারে যে দেখি না! জাহাজ থিকা সে যে এখনও নামল না!'

মাথার চুল খামচা মেরে ধরে পল বলে, 'মধু শালে; ওর বাত আর বল না। ও শালের কি মাটি ভাল লাগে! দশ বরষ ধরে দেখছি, দরিয়ায় যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ মর্জিমেজাজ খোশ থাকে। ডাঙায় নামলেই দিল বিগড়ে যায়। দরিয়াই ওর ঘর। ঘর না তো; মধুরে চোখে দরিয়াই হল আওরত। শালে যেন দরিয়ার সঙ্গে মহব্বতিতে পড়েছে।'

অদ্ভুত এক আশঙ্কায় মোতি অস্থির হয়ে ওঠে। বলে, 'তোমার দাদার বাত কও মান্দ্রাজী ভাই, জলদি কও।'

'কি বাত আর বলব ভাবীজী, দরিয়ার পানি যার চোখে পড়েছে, ডাঙায় কি তার দিল বসে! দরিয়া কি একদণ্ড ঘরে টিকতে দেবে! দশ বরষ জাহাজীর কাম করছি আমরা। দরিয়ার সঙ্গে দোস্তি মহব্বাত পাকা হয়ে গিয়েছে! তার হাত থেকে ছাড়ান নেই।' একটু থেমে দম নিয়ে পল আবার বলে, 'জাহাজী ঘরের আওরতের নজর ছাড়তে পারে, লেকিন দরিয়া ছাড়তে পারে না ভাবীজী।'

মোতি এবার পলের দুটো হাত চেপে ধরে। ভাঙা ভাঙা, থর থর গলায় বলে, 'তোমার দাদা আসে নাই?'

মাথাটা নীচের দিকে ঝুঁকিয়ে ধীরে ধীরে নাড়ে পল। মুখে বলে, 'না; মধু ব্যাংক লাইনে কাজ নিয়ে চলে গিয়েছে!'

'ব্যাংক লাইনে? সে কোনখানে?'

'বড় বড় দরিয়ায়। প্যাসিফিকে, অতলান্টিকে—মধু শালে তামাম দুনিয়া ঢুঁড়বে।' পলের চোখদুটো চকচক করে। হঠাৎ স্বরটা গভীর খাদে নামিয়ে পল বলে, 'দুজনে একমাস কোশেসিস করেছিলাম; ব্যাংক লাইনে ওর কাম মিলল। আমাকে শালে এই আন্দামানের দরিয়াতেই জিন্দগী কাটাতে হবে।'

পলকে বিষণ্ণ, বিমর্ষ দেখায়।

পলের কোন কথাই শুনছিল না মোতি। অদ্ভুত এক যন্ত্রণায় বুকের মধ্যে সেই বিশ বছরের ক্ষতমুখ থেকে রক্ত ঝরছে। চামড়া ফেটে যে রক্ত ঝরে, সে তো সবাই দেখে। বুকের মধ্যে সকলের অগোচরে যে রক্ত ঝরে, তা দেখার চোখ ক'জনের?

ভাঙা ভাঙা, কাঁপা অস্ফুট গলায় মোতি বলে, 'মান্দ্রাজী ভাই, তোমার দাদা ফিরব কবে?'

'দু বরষ হতে পারে, দশ বরষ হতে পারে। আবার না-ও ফিরতে পারে। বড় দরিয়ার স্বাদ পেয়েছে; দরিয়া ছাড়লে তো সে ফিরবে।' একটু ছেদ। পল আবার শুরু করল, 'ইয়াদ রেখো ভাবীজী, ম্যাকরেল মাছ তেমন করে পাকিয়ে খাওয়াতে হবে। দু এক রোজের মধ্যে তোমার ঘর যাব।'

দেখছে না। একটা অদম্য কান্নার বেগ গলার নলটাকে ভেঙে চুরে ফাটিয়ে হু হু করে বেরিয়ে পড়ল।

চ্যাথাম দ্বীপের কাঠের জেটিতে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে মোতি। এইমাত্র তার এত বড় একটা সর্বনাশ ঘটে গেল।

পল চলে গিয়েছে। পিছন থেকে মোহর খান মোতির মাথায় হাত রাখল। সস্নেহ, গাঢ় গলায় বলল, কাঁদিস না বেটি, কাঁদিস না—'

'কাঁদুম না বাবা; কাঁদার লেইগাই তো জন্মাইছি। বিশ বছর কাঁদছি; মাঝে কয়টা সুখের দিন পাইছিলাম। আবার কাঁদন শুরু হইল। বাকী জনম কাইন্দা কাইন্দা (কেঁদে কেঁদে) শেষ হইব।'

কাঁদতে কাঁদতেই জেটি থেকে বাঁয়ে করাত কল, ডাইনে দেশালাই কারখানা রেখে টিলার গায়ে আকাবাঁকা পথ বেয়ে হ্যাডোতে এসে পড়ে মোতি। পিছনে পিছনে মোহর খান।

ভিজে ভিজে, কান্নাভরা বিচিত্র স্বরে মোতি বলে, আমি জানতাম, এই সমুন্দর আমার ঘর ভাঙব। এই সমুন্দর বিশ বছর আগে একবার আমার ঘর ভাঙছিল, এইবার আবার ভাঙল। সমুন্দর তো জল না, ও আমার সতীন। সোয়ামী একা আমার কাছে থাকব, আমি একা তারে ভোগ করমু, এ কি সতীনের পরাণে সয়?'

একটু থামে মোতি। আবার ডুকরে ওঠে, ঘরই যদি ভাঙব; তবে তার লগে বিশ বছর পর আন্দামানের জাহাজে দেখা হইল ক্যান? এই শয়তানী সমুন্দরই তো তার লগে আমার দেখা করাইয়া দিল। আমার ঘর জোড়া দিয়া রঙ্গ করল। আমার কপাল ভাঙল।' দুই হাতে কপাল চাপড়াতে থাকে মোতি।

বাঁকের পর বাঁক, চড়াই উতরাই পথ, দু পাশে কাঠের ঘরদুয়ার। ডাইনে পথটা ঘুরে টিলার মাথায় পাক খেয়ে খেয়ে গোল ঘর, সেল লাইনের দিকে গিয়েছে। বাঁ দিকে ডিলানিপুর, ফুংস চাউঙ, ফোনিক্স বে, এবারডীন।

একটা টিলার মাথায় এসে পড়েছে মোতি। পিছনে মোহর খান। এখান থেকে 'মেরিনের' নীল উপসাগরটাকে কি আশ্চর্যই না দেখায়। অশান্ত উপসাগরে জাহাজ আর মোটরবোটগুলি মৃদু মৃদু দোল খায়। মাস্তুলের ডগা ঘিরে এক ঝাঁক সিন্ধুশকুন সমানে চক্কর দেয়।

কোন দিকে লক্ষ্য নেই মোতির। উপসাগর, জাহাজ, সাগরপাখী—কিছুই সে দেখছে না। মুখে কাপড় গুঁজে একটা তীব্র অদম্য কান্নার বেগ সামলাচ্ছে। অবরুদ্ধ কান্নায় শরীরটা থর থর কাঁপছে।

অস্ফুট, কাতর স্বরে মোতি বলল, 'ঘরই যদি ভাঙব, তবে বিশ বছর পর তার লগে ক্যান দেখা হইল? বিশ বছর তারে না দেইখ্যা শোক ভুলছিলাম, দুঃখু ভুলছিলাম। ভাবছিলাম, সমুন্দর একবার তারে আমার বুক থিকা ছিনাইয়া নিছে। সমুন্দর তো জল না; ও হইল সতীন। মনেরে বুঝাইছিলাম, সোয়ামী কোনদিন ফিরব না। সতীন কি সোয়ামীর ভাগ দেয়! কিন্তু বিশ বছর পর আন্ধারমানের (আন্দামানের) জাহাজে ক্যান দেখা পাইলাম তার, ক্যান আবার সাধের ঘর

হ্যাডো থেকে ডিলানিপুরে এসে পড়েছে দুজন।

বিশ বছর আগের একটা দিনের কথা মনে পড়ল মোতির; যেদিন প্রথম তার ঘর ভেঙেছিল! বুকের মধ্যে প্রচণ্ড থাবায় কে যেন নিঃশ্বাসটাকে চেপে ধরেছে। একটা অবোধ্য, অসহ্য যন্ত্রণা স্নায়ু শিরাগুলিকে বিকল করে দিতে লাগল। মুখে কাপড় গুঁজে যে কান্নাটাকে থামাচ্ছিল মোতি, এবার সেটা শতমুখে ফেটে বেরুল। হাউ হাউ, অদ্ভুত শব্দ করে মোতি কাঁদছে।

পিছন থেকে মোহর খান সান্ত্বনা দেয়, 'কাঁদিস না বেটি, মধু জরুর ফিরব; জরুর ফিরব।'

কিছুই শুনছে না মোতি। বিশ বছর আগের সেই দিনটার কথা ভেবে কেঁদে কেঁদে মরছিল সে, যেদিন সদর আদালত থেকে খবর বেরুল, নারীহরণের জঘন্য অপরাধে মধুর দশ বছরের দ্বীপান্তর দণ্ড হয়েছে। মধুকে কালা পানি যেতে হবে।

সেই দিনটা থেকেই কালাপানি সম্বন্ধে অদ্ভুত এক ধারণা হয়েছে মোতির। যেদিন মোতিকে শেষ দেখা দেখে মধু দ্বীপান্তরের জাহাজে উঠেছিল, সেদিন মোতির মনে হয়েছিল, সদর আদালতের রায় না, সমুদ্রের কালা পানিই তার বুক থেকে মধুকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। সমুদ্র তো সমুদ্র না, তার ঘরভাঙা সতীন। সেদিন মোতি কাঁদে নি। [illegible] এক যন্ত্রণায় বোবা মেরে গিয়েছিল।

যাওয়ার সময় মধু বলেছিল, 'দশটা বছর পর আবার ফিরুম মোতি। মনে দুঃখ রাখিস না। দেখতে দেখতে দিনগুলি কাইট্যা যাইব।'

দশ বছরের সবগুলি দিনই কেটেছিল। কেমন করে কেটেছিল, মোতিই শুধু জানে। যার সোয়ামী দশ বছরের দ্বীপান্তরী সাজা নিয়ে কালাপানি যায়, তার দিন যে কেমন করে কাটে, সে-ই বোঝে।

একটা একটা করে দিন গেল, মাস ফুরাল, বছর ঘুরল। একে একে দশটা বছর গেল। এই দশ বছরে দ্বীপান্তরী মধুর কোন খবর মেলে নি। দুঃখজর্জর, নিষ্করুণ এক-একটা দিন কেমন করে যে কাটিয়ে দিয়েছে, মাঝে মাঝে ভেবে অবাক হয়েছে মোতি।

দশ বছর গিয়েছে। এবার মোতির সুদিনের কাল। কালাপানি থেকে মধু ফিরে আসবে। অধীর আগ্রহে দিন গোণে মোতি। উত্তেজনায়, উদ্বেগে দিন কাটে তো, রাত কাটতে চায় না মোতির। রাত যায় তো, দিন আর ফুরাতে চায় না।

দশ বছরের পর আরো কত দিন গেল। মধু ফিরল না। মোতির মনে যে কুডাক উঠেছিল তাই বুঝি ঠিক হল। মধু আর ফিরবে না। সমুদ্রের কালাপানি তার সাধের ঘর, সুখের ঘর চিরকালের মত ভেঙে দিয়েছে।

প্রথম প্রথম ডাক ছেড়ে কাঁদত মোতি। কালে কালে দুঃখটা সয়ে গেল। ব্যথাটা একই ছিল, কিন্তু মোতির ব্যথার বোধটা কেমন ভোঁতা হয়ে আসতে লাগল। ব্যথাটা এখন আর তেমন বাজে না। ঘরের দুয়ারে যোমটা খসিয়ে উদাসিনীর মত বসে থাকত মোতি।

একদিন সেই উদাসীন ভাবও কা[illegible]

...র। কালের এমনি গুণ; এমনি মাহাত্ম্য। ...ের সংসারে এল মোতি।

দুঃখিনী উদাসিনীর দিনও কাটে। ...ের সংসারে মোতির দিনও কাটছিল। এই পৃথিবীর দিনও যথারীতিই, যথা ...েই কাটছিল। আচমকা কোথায় যেন তাল ...ল। মাটির কোথাও দাগ পড়ে নি, তবু ... দেশখান দু ভাগ হয়ে গিয়েছে। ...দুস্থান আর পাকিস্থান।

প্রথমে গাম ছাড়ল বামন কায়েতরা: তার- ...েলী, বাড়ই, যুগী, একে একে সকলে ...নদী পাড়ি দিয়ে কোন্ দিকে চলে যেতে ...ল! শেষ পর্যন্ত ভাইয়ের সঙ্গে ফরিদপুরের ...ার সেই ছোট্টগ্রাম সুখচক ছেড়ে কলকাতায় ...মোতি। মাসকতক উদ্বাস্তুদের ক্যাম্পে ...প কাটল। হঠাৎ খবর এল কালাপানি ...র ঘর-বসত, জমি-জমা হালহালুটি—সব ...রে।

কালাপানি! কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ...র মধ্যে অদ্ভুত এক চমক খেলে গিয়েছিল ...তির। অনেক দিন, কত দিন পর যেন ... শুনল মোতি। বিশ বছরের ব্যথা- ... দুঃখ এবং উদাসীনতার স্তূপের নীচে ...টি মানুষ একটু একটু করে হারিয়েই ...ছল। আচমকা এতদিনের সব স্তূপ ...য়ে সব বাধা টুটিয়ে সেই মানুষটা বেরিয়ে ... অসহ্য উত্তেজনায় মোতি যেন উন্মাদ ...সে। যে সমুদ্র তার বুক থেকে মধুকে ... নিয়ে গিয়েছে, তার সুখের ঘর, ... ঘর ভেঙেছে, সেই সতীনকে সে একবার ...বে।

একরকম জিদ ধরেই ভাইকে নিয়ে একদিন ...মানের জাহাজে উঠল মোতি।

জাহাজের নাম এম. ভি. নিকোবর। একশ' ...স্তু পরিবার নিয়ে 'নিকোবর' জাহাজ ...গসাগর পাড়ি দিল।

জাহাজের খোলের মধ্যে লোয়ার ডেকে ...না গেড়েছে মোতিরা। লোয়ার ডেকে মন ...না মোতির। পোর্ট হোলের কাচ জলের ... ডুলিয়ে গিয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে ...ার ডেকে উঠে এসেছিল মোতি। সে সমুদ্র ...বে; যে সমুদ্র তার সতীন; যে সমুদ্র বিশ ... আগে তার সুখের ঘর ভেঙেছিল।

উত্তেজনায়, উৎকণ্ঠায়, অদ্ভুত উদ্বেগে ...থর হয়ে রইল মোতি। কিন্তু সমুদ্র ...থায়? প্রথম দিনটা হুগলী নদীর গৈরিক ...দেখল মোতি। দুই তীরের বাঁধনে আকাশটা ... মাপের দেখাচ্ছিল। সেদিন আকাশে শীতের ... ছিল, বাতাসে হিম মিশে ছিল, দুই ...ের মাথায় কুয়াশার স্তর ছিল। এই আকাশ, ...নদী, এই কুয়াশা, এই শীতের স্বাদ—সবই ...চেনা। প্রথম দিনটায় সমুদ্র দেখা আর হল মোতির।

তারপর একটা রাত্রির কারসাজিতে এমন ...টা বিস্ময় ঘটে গেল। কোথায় পড়ে রইল ...রক জলের হুগলী নদী, দুই তীর, আকাশ, ...রপাখী; কোথায় রয়ে গেল রূপনারায়ণের ...না আর সাগরদ্বীপ! নদী কখন সংগমে ...ল, গৈরিক জল কখন সবুজ হ'ল, সবুজ ...ন নীল হ'ল, নীল কখন কালাপানি হয়ে নিঃসীম সমুদ্র হয়ে গেল—কাল রাত্রে কি একবারও টের পেয়েছিল মোতি!

বিরাট বিরাট ঢেউ-এর মর্জিতে 'নিকোবর' জাহাজটা একবার উঠছিল, একবার নামছিল। আপার ডেকের চার নম্বর হ্যাচের উপর বসে ক্রুর, ভীষণ, জ্বালাজ্বালা চোখে সমুদ্র দেখছিল মোতি।

এর নাম কালাপানি, সমুদ্র। সমুদ্র—গভীর, গম্ভীর, অফুরন্ত। বিশ বছর আগে এই সমুদ্রই মধুকে তার বুক থেকে ছিনিয়ে এনেছিল।

একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে তাকিয়েছিল মোতি। চোখে পাতা পড়ে না। কালাপানি দেখতে দেখতে মোতির বুকে বিচিত্র ভয় ঘনিয়ে এল। মনের মধ্যে বুঝিবা সঙ্গোপন সাধ ছিল, মধুকে হয়ত সে ফিরে পাবে। সমুদ্র যদি মধুকে ফিরিয়ে না দেয়, তার সঙ্গে যুঝবে। সতীনের সঙ্গে যুঝে যুঝে সোয়ামীর উপর নিজের দখল প্রতিষ্ঠা করবে মোতি।

সমুদ্র দেখতে দেখতে মোতির মনে হয়, গোপন সাধটা এ জীবনে আর মেটার নয়। এত প্রবল যে, এত শক্তি যে ধরে, সেই বিপুল ব্যাপক সমুদ্রের সঙ্গে দুটি দুর্বল হাতে কেমন করে যুঝবে মোতি! সমুদ্র যে কোথায় মধুকে লুকিয়ে রেখেছে, কে বলবে? মোতি দিশা হারায়। ভয়ে, আতঙ্কে চোখ বুজে ফেলে। সমুদ্র কোনদিনই মধুকে ফিরিয়ে দেবে না। সতীন কি সতীনকে সহজে সোয়ামীর ভাগ দেয়!

আচমকা কে যেন ডাকল, 'ভইন (বোন)'—

মোতি চোখ মেলল। দেখল, ছোট ভাই বিনোদ এসে দাঁড়িয়েছে।

বিনোদ আবার ডাকল, 'ভইন (বোন)'—

উদাস গলায় মোতি বলল, 'কি কইস?'

'এই দেখ কারে আনছি, এইদিকে দেখ—'

মাথা ঘুরিয়ে তাকাল মোতি। বিনোদের পাশে আর একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাথায় নীল নেভী টুপি, পরনে ডাংরি। খালাসী খালাসী চেহারা। পোড়া তামাটে মুখ, ঘোলাটে চোখ; নেভী টুপির নীচ দিয়ে কাঁচাপাকা চুল বেরিয়ে এসেছে। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে, স্থির চোখে তাকিয়ে রইল মোতি। কোথায় যেন কতকাল আগে দেখেছে। সেই মানুষই কি? চেনাও নয়, অচেনাও নয়! সেই মানুষ! বুকের মধ্যে সেই বিচিত্র যন্ত্রণাটা পাকিয়ে পাকিয়ে ফিরতে লাগল। হঠাৎ তীক্ষ্ণ তীব্রস্বরে মোতি কঁকিয়ে উঠল, 'কে? কে রে বিনোদ?'

'চিনতে পারলানা ভইন (বোন)?'

ডাংরিপরা সেই মানুষটা বলল, 'আমাকে চিনতে পারলে না মোতি। আমি মধু?'

'তুমি!' অসহ্য, অস্ফুটস্বরে একমাত্র শব্দটা উচ্চারণ করতে পারল মোতি। গলা কাঁপছে; শরীর টলছে; আকাশ, সমুদ্র, এই জাহাজ মোতির মনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অস্থির, অধীর।

'হ্যাঁ আমি, আমি মধু—'

এতক্ষণে অনেকটা ধাতস্থ হয়েছে মোতি। অস্থির, আকুল ভাবটা কেটে যেতে শুরু করেছে। হঠাৎই মোতির মনে হল, এই সমুদ্র যত নির্দয়, তত নিষ্ঠুর নয়। সমুদ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল তার।

•দুরাশা•

মানিক চৌধুরী

সূর্যের সমুদ্রে ডুবি, সায়াহ্ন সরণী
আলোর ব্যথায় কাঁদে, কোথায় ঘরণী
প্রদীপ শিখার মত জ্বলে যার টিপ?
আমার মনের বাতি ভাঙা, নিষ্প্রদীপ।

বনের জোনাকি যদি আসে পথ ভুলে
আলোর ঘোমটা খোলে হৃদয়ের কূলে;
দেহের অনেক কাছে এসে বলে, শোনো—
কি হবে হারালে সূর্য? আমি আছি জেনো।

অথবা অরণ্যরাতে মেঘেদের সাথে
যদিবা ভীষণ সেই বাজেরাও মাতে,
তখন জানাতো কোন রাত জাগা পাখী
—তোমার নেইতো কেউ, আমি হই সাকী।

এমন হয়না কেন কোন এক দিন
আমিতো রেখেছি খুলে মন-দূরবীণ!

বিনোদ অনেক আগেই চলে গিয়েছে। মোতির পাশে এসে বসল মধু। বলল, বিশ বরষ বাদ তোমার সঙ্গে আন্দামানের দরিয়ায় দেখা হ'ল। বহুত তাজ্জবের বাত!'

মধুর দিকে তাকাল মোতি। বিশ বছরে চালচলন, কথাবার্তা, পোষাক-আষাক সব বদলে গিয়েছে। বিস্ময়কর মানুষটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বিশ বছরের আকণ্ঠ তৃষ্ণা যেন আর মেটে না মোতির।

মধু নিজের কথা বলে। দশ বছর দ্বীপান্তরের সাজা খেটে জাহাজে খালাসীর কাজ নিয়েছে। এই দশ বছরে কত জাহাজে সে কাজ করেছে, তার হিসাব দেয়। 'মহারাজা', 'এলফিনস্টোন', 'মুরি' নানা জাহাজ ঘুরে হালে 'নিকোবর' জাহাজে এসেছে।

মোতি বলে, 'কতদিন পর দেখা হইল—'

'সবই দরিয়ার মর্জি।'

দরিয়া! অর্থাৎ সমুদ্র। সমুদ্রের নাম শুনলেই যেন বুকের মধ্যটা কেমন করে ওঠে মোতির। সমুদ্রই যেন করুণা করে তার সঙ্গে মধুর দেখা করিয়ে দিয়েছে। সমুদ্রের মনে কি আছে, কে জানে?

মোতি বলে, 'তুমি পুরুষ মানুষ, নিঠুর পাষাণ! দশ বছর তুমি ছাড়া পাইছ। এই দশ বছরে একবার ভাবছ আমার কথা! ভাবছ, কেমন কইরা আমার দিন কাটছে! সূর্য উঠছে, সূর্য ডুবছে, চান্দ (চাঁদ) উঠছে, চান্দ ডুবছে: আমার পিরথিমীই খালি আন্ধার। আমার পিরথিমীতেই খালি সূর্য চান্দা নাই।'

মুখে কাপড় গুঁজে কাঁদে মোতি। চোখ বেয়ে হুহু করে জল ঝরে।

ঈষৎ বিরক্ত হয়ে মধু বলে, 'ও বাত ছোড়। শালে আওরতের প্যানপ্যানানি আমার ভাল লাগে না। শোন্, অনেকবার আমি ভেবেছি, তোর কাছে ফিরে যাব। লেকিন একটা কথা ভেবে যেতে পারি নি।'

'কি কথা?'

ধীরে ধীরে মধু বলে, 'দশ বছর কালাপানির কয়েদ খেটেছি। মুলুকে ফিরলে লোকে ঘেন্না করবে। গায়ে থুক (থুথু) দেবে।'

'এখানে দিব না?'

মোতির অজ্ঞতায় মধু হাসে। বলে, 'কালাপানিতে সবাই কয়েদী, এখানে কে কাকে ঘেন্না করবে?' একটু থামে মধু। তারপরেই অদ্ভুত স্বরে বলে ওঠে, 'তাছাড়া খালাসীর কাজ নিলাম; এই দরিয়া আর ফিরতে দিল না।'

অনেকটা সময় কাটল। বিরাট একটা কুকারী মাছের মত জল কেটে কেটে এগিয়ে চলেছে এম, ভি, নিকোবর। জাহাজের পাশে লবণ দরিয়া গেঁজে ওঠে। উড়ুক্কু মাছগুলি রূপালী ডানা মেলে খানিক দূরে ছুটে গিয়েই সমুদ্রে অদৃশ্য হয়।

প্রথমে মোতিই কথা বলল, 'তুমি কোনখানে থাক?'

'এই দরিয়ায়, জাহাজে। জাহাজই আমার কুঠি।'

একটু ইতস্ততঃ করে মোতি। তারপর বলেই ফেলে, 'আর বিয়া সাদী করছ?'

মধুর দুই চোখে রহস্যময় হাসি খেলে। মিটি মিটি চোখে মোতির দিকে সে তাকায়। চাপা, লুব্ধ স্বরে বলে, করেছি। এই দরিয়ার সঙ্গে আমার সাদী হয়েছে।'

বুকটা ধক করে ওঠে মোতির। মনের কুডাকটাই কি শেষপর্যন্ত সত্য হ'ল? সমুদ্র শেষপর্যন্ত সতীনই হ'ল মোতির?

আরো খানিকটা সময় কাটে। লবণ সমুদ্র অবিরাম গর্জায়; জাহাজের ধকধক মুহূর্তের জন্য থামে না। শীতের রোদে বিপুল সমুদ্র, যতদূরে চোখ ছোটে, শুধু জলতেই থাকে।

আচমকা মোতি আকুল হয়ে উঠল। জাহাজের এই অংশটা নির্জন। একটা ডেরিক, জাহাজীদের কেবিন ছাড়া আর কিছুই নেই। মধুর দুটো হাত আঁকড়ে ধরে মোতি বলল, 'আমার কথা শোন এইবার—'

'সব শুনেছি বিনোদের কাছে।'

'দ্যাশ থিকা রিফুজী হইয়া কইলকাতায় আসছিলাম। সেথান থিকা আন্ধারমান (আন্দামান) চলছি। জমীন পামু, হাল-বলদ পামু, নয়াঘর বান্ধুম। এতকাল পর তোমারে পাইলাম, তোমারে আর ছাড়ুম না। শেষ জীবনে একটু সুখ আমারে দাও।

কি যেন এক মুহূর্ত ভাবে মধু। তারপর বলে ঠিক ছায়, দশ বছর তো দরিয়ায় দরিয়ায় কাটাইলাম, এবার মিট্টিতে তোর সঙ্গে নয়া ঘর বাঁধব।

সত্যি পোর্ট ব্লেয়ার এসে মোতিকে তাজ্জব করে দিল মধু। জাহাজের কাজ ছেড়ে সিধা হারবার্টাবাদের রিফুজী সেটেলমেণ্টে চলে এল।

জঙ্গল সাফ করে সেটেলমেণ্ট বানানোর কাজ চলেছে। সরকারী চেইনম্যান, পাটোয়ারীরা মাপজোক করে বাঁশের টুকরা পুঁতে পুঁতে জমির সীমানা ঠিক করে দিয়ে গেল।

অন্তত এক ঘোরের মধ্য দিয়ে কয়েকটা টিলার মাথায় বেতপাতার চাল, আর বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘর তুলল মধু।

বিশ বছর আগে যে সমুদ্র মোতির ঘর ভেঙেছিল, সেই সমুদ্রই বিশ বছর পর আন্দামানের মাটিতে আবার তাকে ঘর দিল; বড় সাধের বড় সুখের ঘর। বিশ বছরের সব যন্ত্রণা সব দুঃখ নতুন পিরীতির তানে কোথায় যে হারিয়ে গেল।

মোতি বলত, 'আমার সব দুঃখু ঘুচল, আবার ঘর পাইলাম। সেই ঘরে হাজার মাণিকা জ্বলল।'

মধু জবাব দেয় না। দুই হাতে মোতির মুখটা তুলে ধরে সোহাগ করে, কিন্তু মোতি কি জানত, সমুদ্র যে ঘর দিয়েছে তার পরমায়ু কদিন?

দুটো মাস সোহাগে আহ্লাদে কেটে গেল। তারপরই নিশির ডাক শুনল মধু। নিশি না, দরিয়ার ডাক।

হারবার্টাবাদের এই রিফুজী সেটেলমেণ্ট থেকে সমুদ্র দেখা যায় না। চারপাশে পাহাড়ী টিলার মাথায় গহন অরণ্য। সেই দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে বসে থাকত মধু। প্রথম প্রথম উদাস, তারপর উন্মনা, উদভ্রান্ত হয়ে উঠল।

মধুর ভাবগতিক দেখে মোতির বুকের সেই আগের কাঁপুনি ধরল। শুকনো গলায় সে বলল, কি হইছে?

'চাষ-আবাদ ঘর ক্ষেতিবাড়ি আর ভাল লাগে না মোতি। দশ বছরে পুরা দু-মাস কোথায় এক জায়গায় কাটাই নি। ভাবছি, আবার জাহাজের কাজে যাব। দরিয়ার স্বোয়াদ যে একবার পেয়েছে, তার কি মাটিতে দিল বসে!'

মোতি ককিয়ে উঠল, 'কি কও?'

'দরিয়ায় না গেলে জিন্দগী আমার বেচাল হয়ে যাবে। ভাবছি, এবার বড় দরিয়ায়, ব্যাঙ্ক লাইনে যাব।' পোর্টব্লেয়ার গিয়ে একদিন সত্যিই জাহাজের কাজ নিয়ে নিল মধু। ভয়েজে যাওয়ার আগে মোতি জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আবার কবে ফিরবা?'

'দরিয়ার যেদিন মর্জি হবে।'

সমুদ্রই একদিন রঙ্গ করে মধুকে মোতির কাছে এনে দিয়েছিল, আবার তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

এবার দরিয়ায় কাজ নেবার পর 'নিকোবর' জাহাজে দু-চারবার পোর্টব্লেয়ার এসেছিল মধু। জেটিতে জাহাজ ভিড়বার সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসত সে। মোতির সঙ্গে দেখা করত। কিন্তু এবার সে এল না। মোতি জানত, একদিন আর মধু আসবে না। সেই একদিন যে এত তাড়াতাড়ি এসে পড়বে, তা কি কোনকালে ভেবেছিল মোতি?

ডিলানিপুর, ফুঙ্গি চাউঙ, এবারডীন বাজার পেরিয়ে সাউথ পয়েণ্ট কয়েদখানার কাছাকাছি এসে পড়েছে মোতি। পিছন পিছন মোহর খান। এতক্ষণ ডুকরে ডুকরে কাঁদছিল মোতি। চোখ-দুটো লাল, ফুলে উঠেছে, শরীরটা থরথর কাঁপছে।

কেন?

• গৌরীপদ দত্ত •

অন্ধকার অন্ধকার মজা দীঘির
জলের মতো কালো
এখনো যদি বন্ধ দ্বার কখন তবে কখন তবে
ধান কাটব বলো?
রুক্ষ তোমার চুলের মতো ধূসর মরু মাঠে
লাঙ্গল ফলা আঙ্গুল দিয়ে মনের মমতায়

সজল কালো চোখের মতো ফসল জেগে ওঠে
এখনো কেন অন্ধকার রুদ্ধদ্বার কেন?

কখন তবে কাটব ধান? তুলব ঘরে বলো
অনেক রাতে থমকে চাওয়া আকাশ [illegible]
বন কাঁপিয়ে আলোর সুরে মাতাল করে [illegible]
তবুও এত আঁধার কেন তোমার চোখে [illegible]
শীর্ণ দীপশিখার মত অশ্রু ছলছল,

ঘরের যত দেওয়াল আমি দিয়েছি সব ভেঙে
আমি ত বুক দিয়েছি পথে মাটির মতো [illegible]
গভীর রাতে ফিরেছি বনে গ্রামে গ্রামান্তরে
তবুও এত দুঃখ কেন তোমার মনে [illegible]
দীঘির কালো জলের মত মাথায় টলমল।

—

দেওয়ালে অদ্ভুত আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ে দূরে সমুদ্র, ভীষণ, বিপুল নিঃসীম লালায়িত।
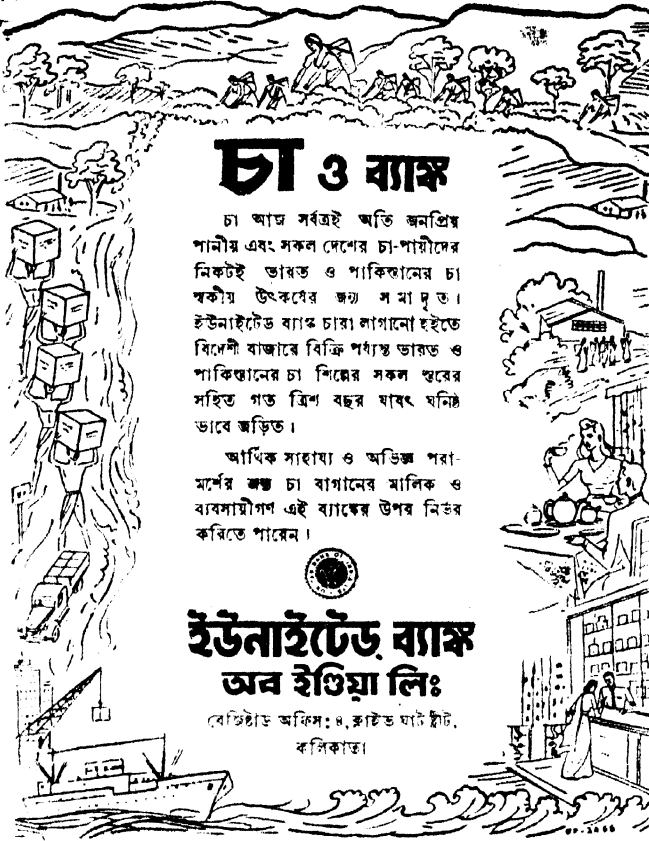
হঠাৎ সমুদ্রের দিক থেকে দৃষ্টিটা নিজের উপর এনে ফেলল মোতি! অনেকক্ষণ নিজের যাচাই করল। বুঝি বা মোতির মনে এই মুহূর্তে সমুদ্রের সঙ্গে নিজের তুলনা করবার বোধটাই জন্ম নিল। কি আছে তার! যৌবন খুইয়ে সোয়ামীকে নিয়ে সে ঘর বাঁধতে চেয়েছিল! সোয়ামী কেন বশ মানবে!

এবার সমুদ্রের দিকে তাকাল মোতি। সমুদ্র: তার সতীন! কি নেই তার! সমুদ্রের যৌবন কি কোনকালে ফুরায়!

মোতি ভাবল, তার ভাবনাটা বুঝি অনেকটা এই রকম। অফুরন্ত যৌবন যে সমুদ্রের, তাকে ছেড়ে কি তার মত যৌবন হারানো নিঃস্বের মধ্যে কি মজা পাবে মধু! কি সুখ পাবে!

মোতি ভাবল; ভাবতে ভাবতে জ্বলে পুড়ে খাক হতে লাগল। সেই বিচিত্র যন্ত্রণাটা বুকের মধ্যে পাকিয়ে পাকিয়ে মোচড় দিতে লাগল।

আন্দামানের সমুদ্র বিশ বছর আগে পরে মোতির সাধের ঘর দু-বার ভাঙল।

—

চা ও ব্যাঙ্ক
চা আজ সর্বত্রই অতি জনপ্রিয় পানীয় এবং সকল দেশের চা-পায়ীদের নিকটই ভারত ও পাকিস্তানের চা স্বকীয় উৎকর্ষের জন্য সমাদৃত। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক চারা লাগানো হইতে বিদেশী বাজারে বিক্রি পর্য্যন্ত ভারত ও পাকিস্তানের চা শিল্পের সকল স্তরের সহিত গত ত্রিশ বছর যাবৎ ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত।
আর্থিক সাহায্য ও অভিজ্ঞ পরামর্শের জন্য চা বাগানের মালিক ও ব্যবসায়ীগণ এই ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর করিতে পারেন।
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
রেজিষ্টার্ড অফিস: ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা
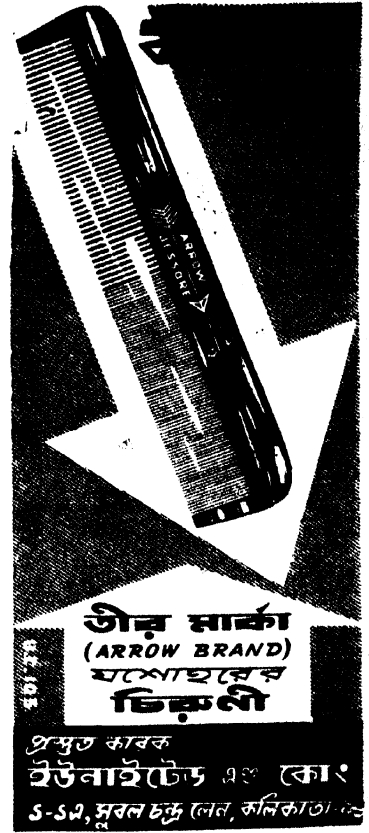
তীর মার্কা
(ARROW BRAND)
যশোহরের
চিরুণী
প্রস্তুত কারক
ইউনাইটেড এণ্ড কোং
১-১এ, সুবল চন্দ্র লেন, কলিকাতা

চেনা অচেনা

শ্রীমতী মায়া বসু

চিঠিটা পেয়ে লাবণ্য স্তম্ভিত হয়ে গেল। যদিও ঠিক প্রেমপত্র পর্যায়ে একে ফেলা চলে না, তবুও একটু কেমন কেমন নয় কি?

মুখে যতই অস্বীকার করুক সে, কিন্তু মন? মনে মনে কি বলে লাবণ্য?

না, লাবণ্য সুন্দরী যুবতী বা তরুণী কিশোরী কোনটাই নয়। সাধারণতঃ যাদের অধিকার আছে প্রেমপত্র পাবার। বহুদিন হল সে সময় সে কালকে ফেলে এসেছে সে। একরকম বৃদ্ধার পর্যায়ে তাকে সহজেই ফেলা চলে। অন্ততঃ প্রৌঢ়া তো বটেই। বহুদিন হল সে তার যৌবনকে ফেলে এসেছে। সেকি আজকার কথা! মনেও পড়ে না কবে সে একটি লাবণ্যবতী সুন্দরী কিশোরী অথবা তরুণী ছিল? আজ তার অবশিষ্ট কিছুই নেই—শুধু আছে স্মৃতি। যা বয়ে আনে হারানো অতীতে একটি সুমধুর সঙ্গীতের রেশ মাত্র। সে গানের ভাষা গেছে হারিয়ে, শুধু একটি গুঞ্জন-ধ্বনি জেগে আছে মাত্র!

নাকের ওপর চশমাটা ভাল করে ঠিকমত বসিয়ে আবার চিঠিখানা পড়লো লাবণ্য। বার বার পড়লো। না ঠিকই আছে। তাকেই লেখা হয়েছে এ চিঠি। আর যে এ চিঠি লিখেছে, লাবণ্য আজিও তাকে কি করে ভুলতে পারেনি সেও এক রহস্য। সেই সমীর, সেই প্রথম প্রেমের করুণ ব্যাকুলতা, সেই সমীরণ রায়!

একটু একটু করে ভাঙগা স্মৃতি জোড়া দিতে লাগল লাবণ্য। একটি অস্পষ্ট ছবি ভেসে উঠল তার চোখের সামনে—হোক তা ঝাপসা কিন্তু চিনতে বুঝতে একটুকুও অসুবিধা আজো হয় না লাবণ্যর। সেই তার জীবনের প্রথম প্রেম! তার আর সমীরের। বাল্য আর কৈশোরের যুগ-সন্ধিক্ষণে সেই মন দেওয়া-নেওয়া, লুকিয়ে লুকিয়ে সবার চোখের আড়ালে কত না অর্থহীন কথা—যার কোনও মানে হয় না—তাতেই কত না সময় কেটে গেছে কোনদিকে দুজনের, কেউ টেরও পায় নি।

দু'চোখ বন্ধ করে লাবণ্য ভাবতে লাগলো। তার মন চলে গেল অতীতের স্মৃতির অগাধ সমুদ্রের তলায়! সেই সমীর চিঠি লিখেছে তাকে! সবি কি ভুলে গেছে লাবণ্য? কিছুই কি যদি মনে থাকে, তবে লাবণ্য যেন অতি অবশ্য অমুক পার্কের উত্তর-পূর্ব কোণের হাত-ভাঙা লোহার বেঞ্চটায় সোমবার সন্ধ্যার সময় একবার আসে। সমীর বহুদিন পরে কলকাতায় এসেছে জরুরী কাজে, আবার তার পরদিনই হয়ত তাকে চলে যেতে হবে, থাকবার উপায় নেই কোন-মতেই। যাবার আগে একবার দেখা করতে চায় সে। তার শরীর ভাল নয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যাধি—হার্টের ট্রাবল। হয়ত এই শেষ কলকাতায় আসা আর শেষ দেখাও বটে। তাই তার এই অনুরোধ। লাবণ্য মেয়েদের বোর্ডিংয়ে থাকে সমীর খবর নিয়েছে। সেখানে দেখা করার হয়ত অসুবিধা হতে পারে তাই এই ব্যবস্থা—। সমীর তার জন্যে প্রতীক্ষা করবে—লাবণ্য যেন আসে।

সমীর দিল্লীতে থাকে। বাঙ্গালী মহল্লায় ডাক্তারী করে। কলকাতায় আসতে পারে না। প্রাকটীসের ব্যাঘাত হয় তার। সুনাম আর পসার দুটোই সমান। তার আর লাবণ্যের বাল্য-কৈশোর একসঙ্গে বাঙ্গলাদেশের এক অখ্যাত পাড়াগাঁয়ে কেটেছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসা গভীর হতে গভীরতর হয়ে উঠেছিল দুজনের। তারপর এলো ছাড়াছাড়ির পালা। দু'জনেই পাশ করলো, দু'জনেই পড়তে গেল দুই শহরে। তবে সমীর কলকাতায় আর লাবণ্য তার মাসীর কাছে বহরমপুরে। সমীর ডাক্তারী পাশ করলো। লাবণ্য বি-এ পাশ করলো। সমীর দিল্লীতে ভাল কাজ পেয়ে চলে গেল। লাবণ্য কলকাতায় এলো একটি মেয়ে-স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হয়ে। কিন্তু কেন যে তারা কেউ কাউকে বিয়ে করতে চাইল না, সেটাই এক আশ্চর্য ব্যাপার। নিস্তরঙ্গ নদীর মতন দু'জনের জীবন কেটে গেল। তারপর এক সময় চিঠিপত্রও বন্ধ হয়ে গেল। কিছুই অস্বাভাবিক মনে হল না কারুর। অনিবার্যকে তারা সহজভাবেই মেনে নিল দুজনে। দিনের পর দিন কেটে গেল, মাসের পর মাস—বছরের পর বছর। কত রাজ্য ভাঙ্গল গড়ল, সমুদ্রে কত ঢেউ উঠল পড়ল, কত নদী মরে গেল সময়ের দীর্ঘনিঃশ্বাসে। কেমন করে দু'জনেই এই জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়লো। আজ বহুদিন পরে হঠাৎ এই চিঠিখানা পেয়ে যেন লাবণ্যর এই, পুরানো জীবনধারা লণ্ডভণ্ড হয়ে

একটি দিন, তারপর সমীরের সঙ্গে তার দে- হবে কত বছর বাদে! নেশাগ্রস্তের মত সে দিন কেটে গেল। রাত্রে শুয়ে শুয়ে কত কি ভাবতে লাগলো লাবণ্য তার ঠিক নেই। এত পরে হঠাৎ কেন এলো সমীর? তাকে কি চিন- পারবে সমীর? সেই কি পারবে? চমকে উ- লাবণ্য! কতদিন কত বছর সে সমীরকে দে- নি। বহুদিন আগেকার সেই তরুণ সমী- মুখ বার-বার স্মরণ করতে চেষ্টা করল লা- কিন্তু কিছুতেই আজ যেন তা স্পষ্ট করে ম- পড়তে চাইল না। স্মৃতির বিশ্বাসঘাতক- চমকে উঠল সে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সব ক- স্মৃতিও কি মুছে যায়? সমীর তাকে চিন- পারবে না ভেবেছিল সে, কিন্তু লাবণ্যই কি তা- চিনতে পারবে? নিশ্চয় পারবে। কিন্তু—কি- যদি না পারে? উত্তেজনায় অধীর হয়ে উ- সে। একটু বিরক্ত বোধ হল তার। বেশ ক- কেটে যাচ্ছিল ভাঁটার টানে জীবনের নৌক- সমীরের চিঠি হঠাৎ সেখানে ঝড় এনে সব ও- ওলট-পালট করে দিল। জীবনের অপরাহ্ন। সে- আর কেন নূতন করে পেছন ফিরে তাকানে- কী হবে? মিলবে কি কিছু নূতন ক- শুধুই দুঃখ ছাড়া স্মৃতি ছাড়া দেবার-নে- আর তো কিছুই নাই এখন। সমস্ত রাত অ- জাগরণে নানা ভাবনায় কেটে গেল। রবি- একটি মাত্র ছুটির দিন সপ্তাহে। সম- সপ্তাহের কাজ সে রবিবার করে। আজ- বসল না কাজে, তার সহজ জীবনযাত্রা ব- পেয়েছে। সমস্ত দিন অন্যমনস্ক হয়েই ক- গেল।

সোমবার সুরু হল সেই পুরানো প্রাত- জীবনযাত্রা। সেই স্কুল আর সেই পড়ানো খাতা কারেক্ট করা এইসব। তাও শেষ হল ও- সময়ে। বিকালে ফিরে এসে নিজেকে অত- দুর্বল মনে হতে লাগলো। কোনমতে হাত-মু- ধুয়ে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল কোনমতে শাড়ীটা বদলে অন্য একটি সাধা- সাদা শাড়ী পরলো। চিরুণী হাতে নিয়ে আয়ন- সামনে চুলটা ঠিক করে নিতে গিয়ে থম- দাঁড়ালো লাবণ্য। প্রত্যেক দিনের যে লাবণ্য- দেখে তার চোখ অভ্যস্ত, আজ যেন সে লাবণ- ছায়া ওতে পড়েনি। এক কুৎসিত বৃদ্ধার ম-

ক্লান্তা নারীর প্রতিমূর্তি ব্যাকুল হয়ে লাবণ্যর দিকে চেয়ে আছে। সাদা-কালোয় মেশানো স্বল্প চুলে কপাল ঢাকাও পড়েনি। মাথার সামনেই চুল উঠে পাতলা হয়ে আছে। কুঞ্চিত মুখের রেখায় রেখায় বার্ধক্যের চিহ্ন সুস্পষ্ট-ভাবে ফুটে উঠেছে, কোনো ক্রীম পাউডারেই তা আর ঢাকা পড়বে না। সেই তন্বী-শ্যামা-শিখরী-দশনা লাবণ্য কবে মরে গেছে, কত যুগ আগে। কিছুই অবশিষ্ট নাই তার—যা আছে তা ধ্বংসাবশেষ মাত্র। তাকে কোনমতেই সেই লাবণ্য বলে চিনতে পারবে না সমীর। কত দিন, কত দিন আগে সে নারী ছিল? সেই হারানো অতীত হারানো যৌবন মাথা কুটে মরলেও তো ফিরে আসবে না। সেই যদি ফিরে ডাক দিল সমীর, তবে কেন আরও আরও আগে ডাক দিল না? হুহু করে কেঁদে ফেললো লাবণ্য। এই চেহারায় চিনতে পারবে না সমীর তাকে, সেও ধরা দেবে না লাবণ্য বলে। শুধু একবার শেষ দেখা দেখে চলে আসবে। সমীরের মনের মণিকোঠায় সে তরুণী সুন্দরী লাবণ্য চিরায়মানা হয়ে আছে, সেই লাবণ্যই সেখানে তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থাকুক; এই লাবণ্য নয়।

সন্ধ্যার ছায়া ঘনতর হয়ে এলো, পার্কের ভাঙা-ভাঙা বেঞ্চটায় লাবণ্য বসে রইল। নিওনের ম্লান বিষণ্ণ আলোয় সমস্ত পার্ক যেন মায়াচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। এক এক করে সবাই ফিরে চলে যাচ্ছে সান্ধ্য ভ্রমণ শেষ করে—আস্তে আস্তে নির্জন হতে লাগল পার্ক। নিজের ভাবনায় মগ্ন লাবণ্য চেয়ে দেখলো—তারই বেঞ্চের একপাশে একজন বয়স্ক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে বসেছেন।

ভুল নয়, কোন দ্বিধা নয়। এই তো সমীর, কত কি পরিবর্তন! সময় তো শুধু তার ছাপ লাবণ্যর দেহের উপরই ফেলে যায়নি। সমীরকেও সে রেহাই দেয়নি তার হাত থেকে! তা বলে এতটা সে ভাবেনি, নিজের ভাবনায় সে এত মগ্ন ছিল যে, অপর দিকটার কথা বড় বেশী ভাবতে পারেনি।

ভদ্রলোকটি একটু ইতস্ততঃ করে লাবণ্যকে উদ্দেশ করে বললেন "আচ্ছা, কিছু মনে করবেন না, আপনি কি লাবণ্য দেবী?"

লাবণ্য চমকে উঠল। না, সমীর তাকে তাহলে চিনতে পারেনি। দ্বিধাহীন কণ্ঠে উত্তর দিলে, "না, আমি লাবণ্য নই, তার বন্ধু রেখা দত্ত। সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তাই আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে সমীরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। আপনিই তো সমীরবাবু?"

ভদ্রলোকটি স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "না, আমি সমীরবাবু নই। হঠাৎ একটি আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম পেয়ে সমীরকে চলে যেতে হয়েছে দিল্লীতে। সে আসতে পারবে না— এই কথা লাবণ্য দেবীকে এইখানে জানিয়ে যেতে আমায় অনুরোধ করেছিল। দিল্লীতে আমি যখন ছিলাম, চিকিৎসা সূত্রে তার সঙ্গে আমার গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল। অত্যন্ত দুঃখিত সে এ জন্যে। দেখছি লাবণ্য দেবীও আসতে পারেন নি। আপনি দয়া করে লাবণ্য দেবীকে এই কথাটি জানিয়ে দেবেন সমীর তাকে ভোলে নি।"

লাবণ্যের বুক ভেদ করে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো। সমীর তাকে ভোলে নি? না, সমীর

ঘরোয়া — সুধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

তাকে চিনতে পারল না কোন্‌টা সত্য? যাক্‌ সে যা চেয়েছিল তাই হয়েছে। আর সত্যই তো সেই পুরাতন দিনের লাবণ্যকে কি দিয়ে সমীর চিনবে? কিন্তু সেতো ভোলেনি? এত বছর পার হওয়া সত্ত্বেও সমীরকে চিনতে পেরেছে! থাক এই ভাল। নিজে থেকে যখন চিনতে পারে নি, কি হবে ভুল ভেঙে দিয়ে। মাটির প্রতিমার রং, আবরণ ধুয়ে গেছে সব, শুধু খড় জড়ানো কাঠামো দিয়ে আর কি কাজ হবে! তার চেয়ে সমীরের মনে যে চির-যৌবনা সুন্দরী লাবণ্য রয়ে গেছে সেই চিরদিন সেখানে থাকুক। কি হবে ভুল ভেঙে? জীবনের তো শেষ হয়ে এসেছে, তবে কেন কয়েকটি দিনের জন্যে স্বপ্ন ভাঙা? কী লাভ তাতে? যা গেছে, তা আর ফিরবে না,—কিছুতেই না।

সমীরের দিকে চেয়ে একটি নমস্কার করে উঠে দাঁড়ালো লাবণ্য। "আপনিও বলবেন সমীর বাবুকে, লাবণ্য তাকে ভোলেনি, আচ্ছা তবে উঠি।"

চলে গেল সে আত্মসংবরণ করে। অনেক কাজ পড়ে আছে। অনেক খাতা, অনেক ভুল তাকে সংশোধন করতে হবে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কাজ করার ক্ষমতাও কমে আসছে। শরীরও অসুস্থ হচ্ছে, দেরী করলে চলবে না।

আর তার ক্লান্ত বিলীয়মান মূর্তির দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো সমীর। না, লাবণ্য তাকে চিনতে পারেনি, অথচ সে তো তাকে ঠিকই চিনতে পেরেছিল! কত কথা ছিল, বলা হল না। কোনদিনই হবে না। কোনদিনই জানতে পারবে না লাবণ্য যে সমীরই তার প্রতীক্ষায় বসেছিল, তার বন্ধু নয়। কিন্তু যখন লাবণ্য তাকে চিনতে পারল না, কি হবে তার ভুল ভেঙে! তার চেয়ে এই ভাল। এই ভাল জীবনের হয়ত শেষ দেখা, ছলনা দিয়েই ভরে রইল। লাবণ্যর দোষ কি? যে তরুণ সমীরকে লাবণ্য ভালবেসেছিল একদিন হৃদয়-মন দিয়ে, আজ তার কোন চিহ্নই তো খুঁজে পাবে না এই সমীরের মধ্যে! বহু যুগের ব্যবধান তাদের কত পরিবর্তন এনে দিয়েছে দেহে আর মনে—? সেই সমীর আজ হারিয়ে গেছে এক অসুস্থ বৃদ্ধের মধ্যে।

কিন্তু তবু তো মনে আশা ছিল লাবণ্য তাকে ভোলেনি, নিশ্চয় তাকে চিনে নিতে পারবে। বুকের ভিতর থেকে একটি কাঁটা যেন সমীরের হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকে, সে যে লাবণ্যকে চিনতে পেরেছে এই কথাটা কেন সে জানাতে পারল না? কেন? কেন? কেন সে মুখ ফুটে বলতে পারল না, "লাবণ্য, আমি সমীর"?

তবে কি লাবণ্য তাকে চিনতে পেরেছিল? তবে সে কেন অস্বীকার করল? কেন সে নিজেকে লুকিয়ে রাখলো? কেন?

ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজলো। রাত আটটা। চমকে সমীর উঠে পড়লো। [illegible] তো রাত্রেই দিল্লী মেল ধরতে হবে। তাড়াতাড়ি না [illegible] হয়ত গাড়ী তাকে ফেলেই চলে যাবে—যেমন চলে গেছে তার সমস্ত জীবনের অনেক কামনা-বাসনা—হয়ত বা তারি দোষে।

যেমন চলে গেলো লাবণ্য।

— রাণু ভৌমিক —

বিহারের ছোট শহরে ছোট সংসার। নরেশ ও রমা। স্বামী-স্ত্রী এবং তিন ছেলে এক মেয়ে।

আর পাঁচটি সংসারের মত নিতান্তই স্বাভাবিক তাদের জীবনযাত্রা। শুধু মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে নরেশের ভ্রূর তীক্ষ্ণতা। এক একবার রমা চেঁচাবেই—খেটে-খেটে মরে গেলুম—আর পারি না বাপু—আর তখনই দুটি ভ্রূ এবং কপালের কুঞ্চিত রেখায় একটি অনাকৃষ্ট স্পৃহা ফুটিয়ে তুলবে নরেশ—কিই বা এমন কাজ!

এ নিয়ে বন্ধুমহলেও আলোচনা চলে। নরেশ বলে, ঐ তো সংকীর্ণ ওদের জগৎ। বাইরের সমস্যা, বাদ-বিতণ্ডার কোন খবরই রাখে না ওরা। তাই......

তাচ্ছিল্যভরে ঠোঁট উল্টেই বক্তব্য শেষ করে নরেশ।

—কত কঠিন বিরক্তিকর কাজ আমরা করি, আরেকটি বন্ধু যোগ দেয়, কিন্তু কোন অভিযোগ কি শুনতে পেয়েছে কেউ আমাদের কাছ থেকে? করতে হতো আমাদের মত কাজ.....

গোল হয়ে উঠতে থাকে সিগারেটের ধোঁয়া এবং সমবেত বক্তব্যে স্থির হয় যে, মেয়েদের মত নির্বোধ জীবরাই সংসারের সামান্য কাজ নিয়ে এভাবে গোলমাল করতে পারে এবং পুরুষরা নিতান্ত বুদ্ধিমান বলেই প্রতিবাদ করে না।

—একটু প্ল্যানডভাবে চলা, নরেশ বলে, ব্যস আর কিছুই না। এক ঘন্টায় সমস্ত কাজ করে ফেলা যায়। কিন্তু তা না করে সমস্ত দিন খুটখাট। কি করবো সংসারের কাজে হাত দেবার জো নেই, নইলে দেখিয়ে দিতুম।

সুযোগ মিললো। সেদিন বাড়ী ফিরে নরেশ দেখে স্ত্রী যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। ছেলেরা কেউ চোখে জল, কেউ সহানুভূতি, কেউ বা দুষ্টুমি ভরে বসে আছে মায়ের পাশে। দু বছরের মেয়ে মিলি আপন মনে হাসছে। নিজের পৃথিবী নিয়েই সে বিভোর।

ডাক্তার এসে বললেন, এ্যাপেণ্ডিসাইটিস।

কথা শুনে স্ত্রীর যন্ত্রণাকাতর চীৎকারও থেমে গেল। শঙ্কায় আকুল হয়ে উঠলো মুখ।

—আজকাল এত চমৎকার অপারেশন হয়েছে, সান্ত্বনা দিয়ে নরেশ বলে।

—আমি গেলে সংসার কি করে চলবে? হতাশাভরা কণ্ঠে উত্তর দেয় স্ত্রী।

—আমাকেই ছুটি নিয়ে থাকতে হবে বাড়ীতে।

—তুমি? তুমি চালাবে সংসার? স্ত্রীর কণ্ঠে মূর্তিমতী অবিশ্বাস ও সংশয়।

—সেই চিরন্তন নারী......, দাঁতে দাঁত চেপে নিঃশব্দে বলে নরেশ।

এদিকে রমা অবিরত কথা বলে যাচ্ছে। এতদূরে চাকরী নেবার জন্য তিরস্কার, ভাগ্যের প্রতি দোষারোপ, নরেশের ভাইঝিকে না আনবার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অনুযোগ ইত্যাদি আরও অনেক কথা ঝর্ণার মত ঝরছিল...

—তুমি এত ভাবছ কেন? মাত্র তো কয়েকটা দিনের ব্যাপার! আমার খুবই ভাল লাগবে। বলে নরেশ।

—খু...ব...ভা...ল...লা...গ...বে..., হঠাৎ হেসে ওঠে রমা পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বলে,—আচ্ছা, তবে তাই হোক।

নরেশ ছুটি নিয়ে উৎফুল্ল চিত্তে বাড়ীতে ফেরে। প্রথমেই একটা রুটীন করে ফেলে ও।

অফিসে সাত ঘন্টা কাজ করে দুশো দশ টাকা মাইনে পেত, কাজেই সংসারে দুই ঘণ্টার বেশী কাজ কোনমতেই করা যায় না।

নরেশ সাধারণতঃ সাতটায় ওঠে। উঠেই চা চাই। তাই সে ভোরে উঠেই উনুন ধরিয়ে এক কাপ চা করে নেবে ঠিক করলো। তারপর বাচ্চাদের ডেকে তুলে মুখ ধোয়াতে-ধোয়াতে দুঘণ্টা হয়ে যাবে। তখন ওদের জল-খাবার খাইয়ে রান্না করতে যাবে সে। রান্না করে বড় দুটিকে খাইয়ে স্কুলে পাঠিয়ে নিজে খেয়ে নেবে। বেলা দশটায় সব শেষ।

কিন্তু...দশটা! তিন ঘন্টা। যাকগে বিকেলে না হয় কম খাটবে। সব মিলে পাঁচ ঘন্টা হল। বিরক্তির হাল্কা ছায়া ভেসে যায় নরেশের চোখে।

পরদিন ভোরে সাতটায় ঘুম ভাঙ্গলো ওর। চোখ বুজেই ও আশা করে এক পেয়ালা চায়ের। প্রত্যাশিত মুহূর্ত কেটে যায়। আর তখনই.. মনে পড়ে কর্তব্যের কথা।

তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে যায় সে। উনুনে সাজানো ছিল। চট করে কতগুলি কাগজ তলায় দিয়ে আগুন দিয়ে দেয়। তারপরে ডাকতে যায় বাচ্চাদের।

পাশের ঘরেই শুতো ছেলেমেয়েরা এবং রমা যাবার সময়ও পূর্বের ব্যবস্থা বহাল রেখে গেছে। পরিচিত একটি ঝিকে বলেছে রাত্রে শুতে। কর্তব্যে ত্রুটি হচ্ছে জেনেও আপত্তি করেনি নরেশ—রাত্রে না ঘুমিয়ে থাকতে পারে না সে!

বেরুবার সময় ততটা খেয়াল করেনি এখন দেখলো যাবার পথে চিড়ে-মুড়ি, চিনির আস্তরণ। কি ব্যাপার?

বেশীক্ষণ ভাবতে হয় না—প্রত্যক্ষদর্শনের সুযোগ মেলে। নরেশের তিনটি পুত্রই ঘুম থেকে উঠেছে বহুক্ষণ এবং প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে নিজেদের ব্যবস্থা করে নিয়েছে নিজেরাই এবং মাতৃদ্রব্যকে ধূলিবৎ জ্ঞান করে ছড়িয়েছে সমস্ত ঘরে।

ধমকে ওঠে নরেশ—তোমরা এভাবে খাবার নিয়েছ কেন? বড় দুজন মুখ নীচু করে। শুধু ছোটটি কাছে এসে আস্তে আস্তে বলে, খিদে পায় যে।

—খিদে পেয়েছিল তা আমার কাছে চাইলেই পারতে..., বলতে যায় নরেশ—কিন্তু ওদের অবাক চোখের চাহনীতে থমকে গিয়ে লাল হয়ে ওঠে মুখ।

ঐ মুখের অবাক ভাব না মোছাতে পারলে শান্তি নেই—অনেকক্ষণ কথা বলে বুঝিয়ে সন্তান ও পিতার সঙ্কোচের গণ্ডী অতিক্রম করতে চায় নরেশ।

—জানো বাবা, মেজ ছেলে বলে, দাদা চিনির জারটা ভেঙ্গেছে।

—আমি শুধু একা ভেঙ্গেছি, খেঁকিয়ে ওঠে নীলু, তুই তো বিস্কুটের [illegible]

—ঠিক আছে। দুজন দুটো ভেঙ্গেছে—কাটাকাটি হয়ে গেল—ছোট ছেলে হাততালি দিয়ে লাফাতে থাকে।

বড় দুজনও এমনভাবে তাকায় [illegible] ব্যাপারটার সন্তোষজনক মীমাংসা হয়ে গেল। কেউ কারও নামে নালিশ [illegible] না—

ধ্যস। কারণ, ওদের জগতে নালিশ করতে না পারাটাই সব চেয়ে বড় কথা।

কিন্তু, নরেশের তো তা নয়। সে জানে তার স্ত্রীর কাঁচের জারের উপর প্রীতি অত্যধিক। কাজেই ফিরে এসে এই ক্ষণভঙ্গুর জিনিষ-গুলিকে ভাঙ্গা অবস্থায় দেখলে—সে শুধু পত্নী নয়, পিত্র অবস্থাও সঙ্গীন করে তুলবে।

ও ঘরের অবস্থা দেখে মাথা ঘুরে উঠলো তার। চিড়ে, চিনি, বিস্কুট সব মিলে যেন এক শ্রীক্ষেত্র!

তারপর—?

সেই সমস্ত জিনিষ গুছিয়ে তুলতে তুলতে নটা বাজলো। তখন মনে হল উনুনের কথা। এতক্ষণ জ্বলে জ্বলে আঁচ কমে গেছে—যা হোক এক কাপ চা।

রান্নাঘরের সামনে গিয়ে আর এক দফা চুপ করে দাঁড়াবার পালা। উনুন ধরেইনি।

নীলু পিতার পিছু পিছু এসেছিল। সে বলে, বাবা, আমি উনুনে আগুন দিয়ে দেবো?

—তুই পারবি? আশা, নিরাশা, হতাশাভরা কণ্ঠ নরেশের।

এমন সময় ওপরে চীৎকার। আদুরে ছোট মেয়ের কান্না আজ সাইরেণের মতই লাগলো নরেশের কানে। ছুটে ওপরে গেল সে।

মিলি নিতান্তই শিশুজনোচিত একটি কাজ করেছে। কিন্তু সেই এক ঘন্টা দারুণ পরিশ্রমের মধ্যে একটি কথা শুধু নরেশের মনে বাজতে থাকে—বাচ্চাদের জামা বদলানোর চেয়ে কোন কঠিন কাজ পৃথিবীতে আছে কি?

একটু অবসর পেয়ে চায়ের পেয়ালায় প্রথম চুমুক দিতেই ঘড়ি বেজে ওঠে—টং, বাজতেই থাকে, থামে না। নরেশের মনে হয় পৃথিবীর সবগুলি ঘড়ি ঐকতানে উপহাস করছে তাকে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল—এগারটার কাঁটায় স্থির হয়ে চোখ মটকে তাকিয়ে আছে ঘড়িটা।

আর ঘড়ির দিকে তাকায় না নরেশ। ঘন্টার শব্দও শোনে না। কাজ করে যায় একমনে। রান্না শেষ হতে বেলা দুটো বাজে।

এইবারে একটু আরাম করে ধূমপান করতে হবে। সিগারেট ধরিয়ে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে নরেশ। সবে দুটি টান দিয়েছে কি না পাশের ঘরে দারুণ কোলাহল। ছোট ছেলেটি মাটিতে পড়ে গেছে—এই পড়ে যাওয়ার ব্যাপারে বড়টির কতটুকু হাত আছে এবং মেজটি কেন হাসলো—এই সমস্ত দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা করতে করতে প্রায় পনের মিনিট কেটে যায়—

পনের মিনিট পরে জ্বলন্ত সিগারেটের খোঁজ করবার কোন মানেই হয় না। দুঃখিত মনে নরেশ আর একটি সিগারেট বের করে—এবারে অগ্নি সংযোগের পূর্বেই চীৎকার। কনিষ্ঠতমা মিলি।

পিতাকে দেখেই মিলি স্বর্গীয় হাসি হেসে দু হাত বাড়িয়ে দেয়। ওই হাসির দিকে তাকিয়ে গা জ্বলে ওঠে নরেশের। কিন্তু সে ভণ্ড বিনীত কৃতার্থ হাসি হেসে এগিয়ে যায়। কারণ, মিলি ছোট্ট হলেও নারীজাতির প্রধান দুটি বিশেষত্ব [illegible] করেছে। অনাদরের রূপ সে সহজেই চেনে এবং প্রচণ্ড অভিমানিনী।

কোলে উঠেই মিলির ফরমাস হয়—দানু। গান? কি সর্বনাশ কিন্তু অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার সময় নেই। ক্ষুদে প্রভুর ঠোঁট ফুলে উঠেছে।

লাইন মনে পড়ে তাই একসঙ্গে মিলিয়ে গেয়ে যায় নরেশ।

জনগণ মন অধিনায়ক...রাম গরুড়ের ছানা...

দিল্লী অনেক দূর...জানালার ধারে...

ইত্যাদি........

আস্তে আস্তে গাইলে চলবে না...কারণ মিলি চায় স্বরের উচ্চতা এবং সুরের অবিরাম গতি।

পিতাকে এভাবে চেঁচাতে শুনে পুত্রেরা একটুক্ষণ অবাক হয়ে থাকে। তারপর তারাও সমানে সুরু করে। তিন পুত্র এবং পিতার চীৎকারে বাড়ী মুখরিত হয়ে ওঠে। হঠাৎ মিষ্ট একটু হাসি। কোণের ছোট ফটোটা হাসছে। নরেশের দিকে তাকিয়ে।

বিকেলে আবার সেই সকালেরই পুনরা-বৃত্তি। হঠাৎ নীলু এসে বলে, বাবা, এটা কি দরকারী? নরেশ তখন উনুনে ডাল, স্টোভে ভাজা চড়িয়ে, বোতলে দুধ ভরবার প্রাণান্ত প্রয়াস করছিল। তাকিয়ে দেখে সেই রুটীন লেখা কাগজটা।

—না-না, দরকারী নয়, ফেলে দে ওটা—অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে নরেশ। নীলু ভয়ে কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে পালিয়ে যায়। দুধের বোতল নামিয়ে রেখে নরেশ কাগজটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে।—

—সংসারটা পলাশ ফুলের মত—দূরে থেকেই দেখতে ভাল—নিজের মনেই বলে নরেশ। কাগজের ছেঁড়া টুকরোগুলিও ওর চারি পাশে উড়তে থাকে—পলাশ ফুলের মত টুকরো [illegible] ছড়িয়ে।

বিলম্বিত রাগ

(২১০ পৃষ্ঠার পর)

মিটিয়ে নেবে চূড়ান্তভাবে। কিন্তু নিজের স্ত্রী যে এমনভাবে তাতে বাদ সাধবে এটা সেদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি! মোগলাই খেতে বড় ভালবাসে সুপ্রকাশ তাই ক্ষীণ কণ্ঠে শুধু একটু প্রতিবাদ করলে কিন্তু আমার শরীর ত খুব সুস্থ। কোন অসুখ নেই অনু!

নেই কিন্তু হতে কতক্ষণ! ঠিক তোমার মত ছিলেন আমার বড় দাদাবাবু। মোগলাই খানা, মাছ, মাংস ছাড়া আর কিছুই বুঝতেন না শেষে ওই খাওয়াই কাল হলো! বেয়াল্লিশ বছর বয়সে ব্লাড-প্রেসারে মারা গেলেন!

সুপ্রকাশ এরওপর আর কোন কথা না বলে চুপ করে যায়। কিন্তু লোভ সামলাতে না পেরে দৈবাৎ যদি অফিসের ক্যান্টিন থেকে কোনদিন মাংসের কাটলেট বা রোস্ট জাতীয় কিছু মোগলাই খেয়ে আসে, তাহলে মুখে পিঁয়াজ বা রশুনের গন্ধ থেকে ধরা পড়ে গেলে মহা অশান্তি করে অনুকণা! বলে তোমার স্বাস্থ্যের সঙ্গে আমার ভাগ্য জড়ানো নইলে এত করে তোমায় নিষেধ করার কি দরকার ছিল আমার! তোমার একটা ভালো-মন্দ কিছু হলে আমার মুখ চাইবার কে আছে, তাকি জানো না!

সুপ্রকাশ অনুতপ্ত হয়। অনুকণা তখন থেকে অফিসে খাবার জন্যে টিফিন তৈরী করে দেয়। একটু ছানা, কিছু ফল, ঘরে তৈরী নারকেলের সন্দেশ প্রভৃতি! তেল, ঘি ও মসলাযুক্ত রান্নাও বন্ধ করে দেয় অনুকণা। কাঁচা মাছ সিদ্ধ, মাছের স্টু, বয়েলড ভেজিটেবল্ ছাড়া আর কিছু রাঁধে না। বলে শরীরটা যাতে তোমার ভাল থাকে, সকলের আগে সেইটাই আমায় চিন্তা করতে হবে ত!

টিফিন রুমের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে শশা, কলার টুকরোর সঙ্গে নারকেল নাড়ু খেতে খেতে যখন হঠাৎ ক্যানটিন থেকে হাওয়ায় ভেসে আসে কাটলেট ভাজার গন্ধ, তখন একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বুকের মধ্যে চেপে নিয়ে সুপ্রকাশ ভাবে, এতদিন অপেক্ষা করে স্বচ্ছল অবস্থায় বিয়ে করে কি লাভ হলো তার!

দুটো বছরও গেল না। একদিন অফিস থেকে ফিরে সুপ্রকাশ দেখে ড্রয়িং রুমের সোফা কাউচগুলো সব বাইরের বারান্দায় [illegible] রয়েছে।

ব্যাপার কি! এ সব বার করেছো কেন? জিজ্ঞেস করতে অনুকণা বললে, মিছিমিছি ঘর জুড়ে এগুলো পড়ে আছে কতটুকু সময় [illegible] পাই মুখোমুখি বসে গল্প করবার! তুমি [illegible] আর ছেলে পড়ানো নিয়ে যেমন ব্যস্ত [illegible] তেমনি তোমার সংসারের [illegible] সেলাই [illegible] চণ্ডী পাঠ নিয়ে মেতে আছি অথচ ওদের [illegible] মোছা করতে আমার প্রতিদিন [illegible] হয় না! তাই ওগুলোকে বিক্রী করে [illegible] ভেবেছি।

বিস্মিত কণ্ঠে সুপ্রকাশ প্রশ্ন করে, [illegible] তোমার খেয়াল!

গলার স্বরটা নামিয়ে এবার অনুকণা বললে, এ খেয়ালটা মিছিমিছি হয়নি। ওই ঘরটা ত পড়েই রয়েছে তাই ভাড়া দেবো স্থির করেছি। আমার এক পিসতুতো ভাই কাল থেকে পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকবে এখানে। একশো ত্রিশ টাকা মাসে মাসে দেবে বলেছে! এই পর্যন্ত বলে একটু থেমে হঠাৎ হেসে উঠে সে আবার বললে, ভাল করিনি?

সুপ্রকাশ কোন জবাব না দিয়ে কি যে ভাবছিল। অনুকণা তার হাতে একটা ধাক্কা দিয়ে বললে, একখানা ঘরেই আমাদের যথেষ্ট কুলিয়ে যাবে। আর বাচ্চা যেটা আসছে সে ত আমার বুকেই থাকবে তবে এত কি ভাবছো?

তখনো স্বামীকে নিরুত্তর থাকতে দেখে হঠাৎ অনুকণার কণ্ঠ কান্নায় ভরে উঠলো। বললে, এই টাকাটা জমিয়ে যাদবপুরে কি বেহালার দিকে একটুকরো মাথা গোঁজবার মত জায়গা কিনবো স্থির করেছি। এত বয়সে বিয়ে করলে, আর আগে থাকতে গোটা কতক ভারী ভারী ইনসিওর পর্যন্ত যে করোনি [illegible] কেমন করে জানবো! এদিকে তোমার যে ছেলে মেয়েরা আসছে তাদের কি করে মানুষ করবো সেই চিন্তায় রাত্রে আমার চোখে ঘুম আসে না। তুমি বাপ হয়ে উদাসীন থাকতে পারো কিন্তু মা হয়ে আমি কি করে চুপচাপ থাকি! তাই ভাবলুম জমিটা হলে, যা হোক একটা টিনের ঘর তুলে সেখানে আমরা বাস করতে পারবো। তাহলে আমাদের এই বাড়ী ভাড়াটা পর্যন্ত বেঁচে যাবে! বলো ঠিক করিনি? শেষ কথাটি বলার সময় তার কণ্ঠটা আরো বেশী করুণ হয়ে উঠলো।

সুপ্রকাশ একটা গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে শুধু বললে, হ্যাঁ, ভালই করেছো!

হাস্যময়ী

৩ রৌদ্র — পান্না সেন
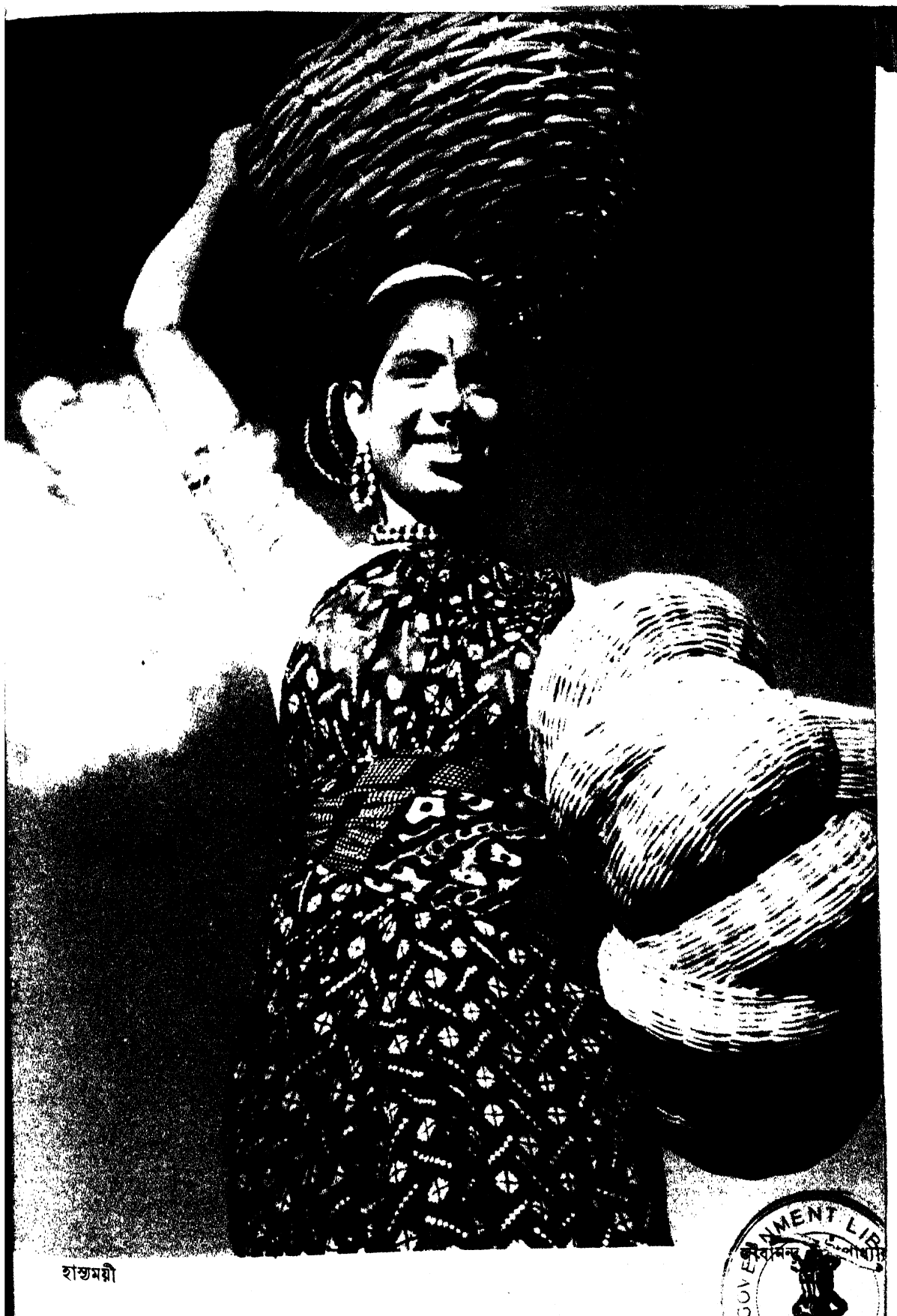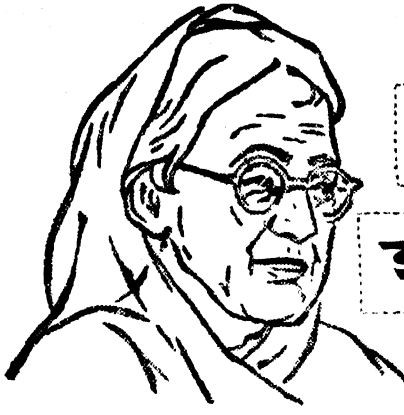
গহনা

উমা দেবী

সুবাসিনী সবে বাসিপাট সেরে চায়ের গেলাস নিয়ে বসেছিলেন—এমন সময় একটি গাড়ী এসে থামল।

—দেখ তো পিণ্টু, কে এলো?—সুবাসিনী চেঁচিয়ে বললেন।

পিণ্টু তখন তারস্বরে বারান্দায় বসে নামতা মুখস্থ করছিল—সে উঠল না, মুখ নীচু ক'রে নামতার বইতে রবার ঘষতে লাগল। বিরক্ত হ'য়ে চায়ের গেলাস সরিয়ে তিনি নিজেই উঠে দাঁড়ালেন। জানলা দিয়ে উঁকি দিতেই দেখলেন জামাই মনমোহন নামছে—পেছনে ঘোমটা-টানা একটি বউ—কোলে তার বাচ্চা মেয়ে। বুঝতে দেরি হলো না—ওটি মনমোহনের নতুন বৌ।

তাঁর মেয়ে মারা গেলে দু'মাস যেতে না যেতে জামাই আবার বিয়ে করেছে। ছোট নাতনিটিকে তিনি কাছে এনে রেখেছিলেন কিন্তু এমনই কপাল তাঁর যে বছর না ঘুরতে উটকো অসুখে মারা গেল—চিকিৎসাও তেমন ক'রে করতে পারেন নি। মেয়ের গায়ের গয়না আর নাতনির গায়ের টুকি-টাকি সোনার হার বালা—সবই তোলা আছে। প্রাণ ধ'রে বিক্রি করতে পারেন নি। শিকড়টুকুতে যদি কালে পাতা গজায় তখন তো এ সব লাগবেই—বিয়ে তো দিতেই হবে নাতনির। কিন্তু সে আশাও ভেঙে গেল তাঁর।

সেই সব পুরোনো দিনের কথা আজও তাঁর মনে পড়ে। তাঁর মেয়ে বিরজা রোগা-ভোগা ছিল। কিন্তু তাইতে কি সে শুয়ে বসে দিন কাটিয়েছে? যতদিন বেঁচেছিল দু-বেলা হেঁসেল ঠেলতে ঠেলতেই প্রাণ বেরিয়ে গেছে। ঐ হেঁসেলঘরেই একদিন মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। খবর পেয়ে সুবাসিনী ছুটে এসেছিলেন। কিন্তু মেয়ের আর জ্ঞান ফেরেনি।

হাত-গলা কান থেকে সব গয়না তাঁকেই খুলতে হয়েছিল। জামাই চোখের জল মুছতে মুছতে শাশুড়ীকে বলেছিল—ও সব জঞ্জাল আপনিই রাখুন মা, আর দেখুন যদি এটাকে বাঁচাতে পারেন—আর শাশুড়ীর কোলে তুলে দিয়েছিল মেয়েকে। কিন্তু সেই ঠাকুরাণীকেও তো ধ'রে রাখতে পারলেন না। এতদিন পরে জামাই কি মনে ক'রে এলো? আর সঙ্গে ওরাই বা কেন?

ওরা এতক্ষণ নেমে পড়েছে। জ্বল জ্বল ক'রে তাকাচ্ছে কোলের মেয়েটা। কাজল থেবড়ে গালে লেপটে রয়েছে—বড় বড় চোখে ঘুমের লেশমাত্র নেই। একহাতে বোতল ধ'রে আর এক হাতে মেয়ে ধ'রে সামলে-সুমলে নীরজা কোনোমতে ঘরে এসে ঢুকল—সুটকেশটা ধরে পেছন পেছন এল মনমোহন।

সুবাসিনী বললেন—বেঁচে বর্তে থাকো বাবা—থাক থাক—এখন আর বেল-কাপড়ে ছুঁয়ো না মা—চা-টুকুন খেতে পার না—তৈরি চা জল হ'য়ে গেল—

নীরজা লজ্জা পেল। বলল—আমি বুঝতে পারিনি মা—থাক থাক—মাদুরের দরকার নেই—এই তো পরিষ্কার মেজে—এইখানেই বসছি—

পিণ্টু এতক্ষণে বই-খাতা ফেলে উঠে এসেছে। খাটের পায়া ধরে বড় বড় চোখে রাজ্যের অবাক মেখে সে তাকাচ্ছিল নতুন যারা এসেছে তাদের দিকে, আর কোলের ঐ ছোট্ট মাংসপিণ্ডটার দিকে।

একটা আঙুলে খুকুমণি মুখে পুরে দিয়েছে আর জ্বল-জ্বল ক'রে তাকাচ্ছে পিণ্টুর দিকে। তারপর পিণ্টুকে সে চিনতে পেরেই যেন হেসে ফেলল—সঙ্গে সঙ্গে একরাশ লালা গড়িয়ে পড়ল মুখ থেকে।

আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে নীরজা বুকে চেপে ধরল—এটাকে কোথায় একটু শোয়াই মা—বলুন তো—

সুবাসিনী ঠিক তাল পাচ্ছিলেন না। এতদিন পরে এ ভাবে আসবার মানেই বা কি! জামাই নতুন বিয়ে করবার পর সামাজিকতার অনুরোধে তিনি লোকমুখে খবর পাঠিয়েছিলেন আসতে। কিন্তু জামাই-বৌ কেউই আসেনি। এখন তো তাদের কথা আর মনেই পড়ে না। তবে হঠাৎ এতদিন পরে আবার কেন আসা!

নীরজা আবার জিজ্ঞাসা করল—এটাকে কোথায় শোয়াই—

সুবাসিনী বললেন—ঐ মাটিতেই দেয়ালের ধার ঘেঁসে শোয়াও মা—খাটে শোয়ালে পড়ে যেতে পারে—

এ দিক ও দিক তাকিয়ে নীরজা হঠাৎ বলে উঠল—বাঃ, কি সুন্দর ছোট্ট দোলা—ঐ তো—ঐতেই চলবে—

সুবাসিনী বিরক্ত হলেন। ওটি তাঁর মরা নাতনীর দোলা—প্রাণ ধরে বেচতে পারেন নি—কারুকে দিতেও পারেন নি। বেতের তৈরী দোলাটা কড়িকাঠ থেকে দড়ি-বাঁধা অবস্থাতেই তাকের ওপর তোলা ছিল। কোণ থেকে একটা ছাতা তুলে নিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে অপূর্ব কৌশলে মুহূর্তে নীরজা নামিয়ে নিল। আঁচল দিয়েই ঝেড়ে-ঝুড়ে কাঁথা পেতে রেখে মেয়েকে বুকের দুধ খাওয়াতে বসল।

মনের বিরক্তিটা সুবাসিনী ছেলের ওপর দিয়েই প্রকাশ করলেন—এই হতভাগা পিণ্টু, কোথায় গেলিরে—দৌড়ে দোকানে যা না—কিছু খাবার নিয়ে আয় না—

নীরজা বলল—আপনার জামাই গরম জিলিপি খেতে ভালোবাসে মা—কিছুটা আনিয়ে দেবেন—আর খুকুর জন্যে কয়েকখানা বিস্কুট—বলেই নীরজা মেয়েকে কোলের উপর দাঁড় করিয়ে গুন গুন ক'রে ছড়া বলতে সুরু করল—

খুকু আমাদের সোনা
সেকরা ডেকে মোহর কেটে—
গড়িয়ে দেবো দানা—
তোমরা কেউ করো না মানা।

গেলাশের চা-টুকু নর্দমায় ঢেলে ফেলেন সুবাসিনী। পিণ্টুর হাতে একটা টাকা দিয়ে যা যা আনতে হবে ব'লে কলঘরে ঢুকলেন। মাথা দিয়ে যেন আগুন ছুটছে। কি বেহায়া বৌটা—যেন সব কেড়ে-কুড়ে নিতে রাক্ষুসীর মত হানা দিয়েছে। বলিহারি জামাইয়েরও আক্কেল। না ব'লে কয়ে বৌকে নিয়ে এই বাড়ীতে ঢুকলি কেন? চক্ষুলজ্জা ব'লেও তো একটা জিনিষ আছে! থাবড়ে থাবড়ে এই সাত সকালে অনেক জল তিনি মাথায় ঢাললেন—তারপরে চেঁচিয়ে উঠলেন—হারামজাদী ঝি মাগী পথের ওপর বাসনগুলো রেখে গেল গা—এখন কোথা দিয়েই বা যাই—

নীরজা ঘর থেকে উঁকি দিয়ে বলল—কেন মিথ্যে চেঁচাচ্ছেন মা—বাসনগুলো তো সিঁড়ির এক ধারে জড়ো করা—এ পাশ দিয়ে আসুন না—

—এ পাশ দিয়ে আসুন না—যেন নীরজার নিজের বাড়ী—গিন্নী হুকুম করছেন—মনে মনে খিঁচিয়ে উঠলেন সুবাসিনী। মুখে বললেন—ও মা, তাইতো, পোড়া চোখের মাথা খেয়েছি—তুমিই বা আর কতক্ষণ বসে থাকবে বাছা, চান ক'রে কাপড়-চোপড়গুলো কেচে ফেল—তারপর মুখে একটু জল দাও—

নীরজা বলল—বড্ড খিদে পেয়েছে—আপনার জামাই কাল সারারাত ট্রেণে কিছু খায় নি। যে ধকল—মানুষটারই বা দোষ কি—মাছি নড়বার জায়গা নেই—তা সে মানুষ নামবে কি!

সুবাসিনী বললেন—তবে মুখ হাত ধু

কাপড়খানা ছেড়ে ফেল—বাসি-কাপড়ে বাসি মুখে কি কিছু দিতে আছে গো—

নীরজা বলল—সে সব পড়ে হবে মা. স্টেশনে নেমেই মুখ ধুয়েছি, আর ধোয়ার দরকার নেই। তেষ্টায় গলা ফেটে যাচ্ছে—খিদেয় চোখে ধুলো পড়ছে—আপনার জামাইকে দিন—

বলতে বলতেই পিন্টু এসে হাজির হল মাঝারি গোছের একটা ঠোঙা হাতে নিয়ে। পিন্টুর হাত থেকে ঠোঙাটা নীরজাই তুলে নিল। তারপর তা থেকে একখানা সিঙারা আর দুখানা জিলিপি তুলে পিন্টুর হাতে দিয়ে বলল—যা ভাই লক্ষ্মীটি, একটা ডিস কি বাটি যা হয় নিজে নিয়ে আয়, আমি গুছিয়ে দিই—তোর জামাই-বাবুকে দিয়ে আয়—

পিন্টুর ভারি ভালো লেগে গেছে নীরজাকে আদর ক'রে নীরজা তাকে কোলে বসিয়েছে—তোরঙ্গ খুলে একটা নতুন জামা তার গায়ে পরিয়ে দিয়েছে—আর দুটো বড় বড় রঙিন লাট্টুও দিয়েছে। পিন্টু প্রথমে বলেছিল নীরজা। দিদি—নীরজা শিখিয়েছে শুধু দিদি। নীরজার ছোট্ট বাচ্চাটাকেও পিন্টুর খুব ভালো লেগে গিয়েছে। সর্বক্ষণ সে নীরজা আসা পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে।

জল-টল খেয়ে একটু সুস্থ হলো নীরজা। তারপর পিন্টুকে কোলে টেনে বসাল। তার চুলের ওপর আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে খুব সুন্দর একটি গল্প শোনাল আর সব চেয়ে যেটা পিন্টুর ভালো লেগে গেল—তা হচ্ছে ঐ ছোট্ট তুলতুলে বাচ্চাটাকে পিন্টুর কোলে বসিয়ে দিল। আর সেই বাচ্চাটা উঃ ভাবতেও কি ভীষণ মজা লাগে—পিন্টুর দিকে কাজল-ধ্যাবড়ানো চোখ মেলে তাকিয়ে তাকিয়ে মুখে আঙুল পুরে দিয়ে সকাল বেলার মতন আবার হেসে ফেলল।

মনমোহন এতক্ষণ ঘরে এসে বসেছে চৌকির ওপরে।

নীরজা বলল—যা ভাই পিন্টু, লাট্টু ঘোরা গে যা— ডাকলেই আসবি কিন্তু!

আস্তে আস্তে এদিক ওদিক তাকিয়ে চাপা সুরে মনমোহন বলল—পাবে বলে তো মনে হচ্ছে না— সব বেচে-বুচে খেয়েই ফেলেছে হয় তো—

চোখ মুখ ঘুরিয়ে নীরজা বলল—তুমি থাম তো, গয়নাগুলো হাতছাড়া করবার সময় মনে ছিল না? অমনভাবে সব কিছু শাশুড়ির হাতে তুলে দিতে গিয়েছিলে কেন?

মনমোহন হাসল। বলল—তখন কিছু মাথার ঠিক ছিল গো—

—এখনই কি কিছু ঠিক আছে—কটাক্ষপাত করল নীরজা। যাই বল না কেন—আমার ভালো লাগছে না। মা কি মনে করবেন? এখনই কি কিছু টের পাচ্ছেন না ভেবেছ—ও গুড়ে বালি শেষ পর্যন্ত—বলে দিলুম।

মনমোহন চুপ করে রইল। বলল—একটা বালিশ দাও—একটু জিরোই—কাল বড় ধকল গেছে। এখন সর্বরক্ষে হ'লে হয়, ট্রেণ খরচা বড় কম ...নি।

...দুপুর গড়িয়ে এল। সুবাসিনী নিরামিশ যা রেঁধেছিলেন নীরজা আর মনমোহন তাই খেয়েছে। পিন্টুকে আধ পোয়াটাক মাছ আনতে দিচ্ছিলেন, নীরজা বারণ করল—আর কেন মা এসব—এ বেলা হেঁসেলে যেতে পারব না—আপনি কেন আর ওসব রাঁধবেন।

সুবাসিনী অবাক হলেন—সে কি মেয়ে. তোমার হেঁসেলে যাবার কথা কি করে ওঠে বাছা—আমারি হয়েছে মরণ—

মরা মেয়ের নাম ধরে তিনি কাঁদতে বসলেন। নীরজা তাড়াতাড়ি তাঁর দু'হাত ধরে বলতে লাগল—কাঁদবেন না মা, তিনি সতীলক্ষ্মী ছিলেন তাই মাথায় সিঁদুর নিয়ে গেছে। আমি তো আপনার আর এক মেয়ে—আমার মুখের দিকে তাকান মা—

সুবাসিনী হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন—কাঁথা-নেতা-ছোঁয়া কাপড়ে আমাকে ছুঁলে বাছা—আবার এই অবেলায় চান করিগে—

নীরজা বলল—কাপড়খানা যদি ছাড়তেই হয় ছেড়ে ফেলুন—কেচে দিচ্ছি, এখন আর গায়ে জল ঢালবেন না—মানুষের শরীরে কি সব সময়ে সব সহ্যি হয়?

পিন্টু এসে পেছন থেকে নীরজার গলা জড়িয়ে ধরল—দিদি, ও দিদি—আমাকে একটা রঙিন বল কিনে দেবে? আর একটা পতুল বাড়িতে ক'রে বিক্রি করতে এনেছে।

নীরজা বলল—পতুল কি রে! তুই না বেটা ছেলে!—বলেই হেসে ওঠে নীরজা। তারপর পিন্টুকে হঠাৎ জড়িয়ে ধরে কোলে টেনে নেয় আর মুখে মাথায় কয়েকটা চুমু খেয়ে বলে—গয়না পরবি পিন্টু—গয়না? সেকরা ডেকে মোহর কেটে গড়িয়ে দেবো দাদা?

পিন্টু বলে—ধোৎ—

—তবে পতুল খেলবি কি করে?

—খেলব না?

—কিচ্ছুই খেলবি না?

—বল খেলব দিদি—

আঁচল থেকে একটা সিকি খুলে নীরজা পিন্টুর হাতে দিয়ে বলে—যা কিনগে যা—

সুবাসিনীর চোখের ওপর দিয়েই পিন্টু নাচতে নাচতে চলে গেল।

কি জানি কেন—সুবাসিনী আর চান করতে কল ঘরে ঢুকলেন না।

খেতে বসে নীরজা কথাটা পাড়ল। বলল —মা, দিদির গয়নাগুলো আপনার জামাই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান—

ভাতের দলাটা বুঝি সুবাসিনীর গলাতেই আটকে গেল। বাঁহাতে জলের ঘটি তুলে ঢকঢক ক'রে খানিকটা জল গলায় ঢেলে ফেললেন।

নীরজা আবার বলল—ওসব তো দানের জিনিষ মা, ওসব ধর্মত আপনি রাখতে পারেন না—আপনার জামাইয়েরই পাবার কথা—

এতক্ষণে সুবাসিনী তাকালেন স্থির দৃষ্টিতে নীরজার দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বললেন—এই জন্যই বুঝি তোমরা এয়েছ বাছা—

নীরজা জিভে একটা ছোট্ট কামড় খেয়ে বলল—সে আপনার জামাইয়ের কথা আপনি বলতে পারেন। আমি এসেছি মা পেতে—সেই ছোট্ট বেলায় মা হারিয়েছি—মায়ের মুখ মনেও পড়ে না—

পিন্টু নতুন কেনা লাল বলটা হাতে নাচাতে নাচাতে ফিরল।

নীরজা জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁরে—বাচ্চাটা কি করছে রে—

পিন্টু বলল—ঘুমোচ্ছে—তোমরা আর কতক্ষণ খাবে?

খেয়ে উঠে নীরজা হাত পেতে বলল—মা, —পানের পাট তো নেই বাছা—

পিন্টু বলল—পয়সা দাও—এনে দিই সাজা পান—ঐ সমীরদার দোকানের কাছে একটা নতুন দোকান খুলেছে—

ভাত-ঘুম ঘুমোল অনেকক্ষণ নীরজা—এলিয়ে, মেজেয় আঁচল পেতে—একপাশে বাচ্চা আর এক পাশে পিন্টু। ঘুম—ঘুম—ঘুম—জামাই বাইরের ঘরে মাদুর পেতে হাতপাখা নিয়ে শুয়েছে নীরজা ভেতরের ঘরে মেজেতে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে—তার নিঃশ্বাসে ওঠা-নামায় গলার খাঁজে খাঁজে জমা ঘাম-জল গড়িয়ে পড়েছে বুক বেয়ে। চুল এলো—মুখ হাঁ—পান-খাওয়া দাঁতের গোলাপি রঙ চিকচিক করছে। তাকিয়ে তাকিয়ে সুবাসিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তাঁর মেয়ে আজ বেঁচে থাকলে এই বয়সেরই হতো।

নীরজাকে দেখে বার বার ঘুরে ফিরে সেই নিরজার কথা মনে পড়তে লাগল সুবাসিনীর আর ছোট্ট বয়স থেকে সুরু করে বড় বয়স পর্যন্ত নানান সুখ দুঃখের অনুভূতি ঐ একটি মেয়েকে ঘিরে কেমন করে তাঁর যৌবনকালকে ভরিয়ে রেখেছিল তারই নানান স্মৃতি কতো ঢেউয়ের মতন তাঁর মনের তটে বিচিত্র সুরে আছড়ে পড়তে লাগল। পিন্টু তো হয়েছে অনেক বয়সে—কপালে ছিল—তাই হয়েছে. হলে ও বয়সে আর কেউ নতুন ক'রে ছেলে মানুষ করতে চায় না। আর তা ছাড়া যদি কপালেও তো পড়লো পিন্টু হবার পরে না হলে পিন্টুর বাপের কি মরবার বয়স ... ছিল? থাক্—সে সব কথা—

হঠাৎ সুবাসিনীর মনে একটা প্রবল ইচ্ছে জেগে উঠল মেয়ের গয়নাগুলি দিয়ে নীরজাকে একবার সাজিয়ে দেখতে। সেই ... বেনারসীটি পরিয়ে দিয়ে মুখে কনে চন্দন দিয়ে সাজিয়ে একবার মুখখানি তুলে ধরতে—দেখা যে সে মুখে নিজের মেয়ের কোনো ছায়া পান কিনা! পর মুহূর্তেই মনকে শাসন করলেন তিনি—গয়নাগুলো তা হলে আর ... পারবেন না!

কিন্তু রাখবারই বা কি অধিকার ... আছে? যে জিনিষ তিনি দান করে দিয়েছেন সে জিনিষ রাখবার ইচ্ছে কেন? হরি—হরি সুবাসিনী ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করলেন তাঁর পিন্টুর যেন কোনো অকল্যাণ না হয় গয়না তিনি নীরজাকে দিয়েই দেবেন।

বুঝি বা মেয়ের কথাই ভাবছিলেন সুবাসিনী—কখন যে ঘুম ভেঙে নীরজা ... দিকে তাকিয়ে আছে লক্ষ্যও করেন নি। নীরজা ঘুম ভাঙতেই দেখল—সুবাসিনী চোখ ... বসে আছেন—দু'চোখ দিয়ে অশ্রুজলের ... বইছে।

নীরজা ডাকল—মা, ও মা, মা—

সুবাসিনী তখন স্মৃতির অকূলে ভাসছেন তাঁর মনে হল সেই সমুদ্রের অনেক দূরের ... থেকে তাঁর মেয়ে তাঁকে ডাকছে—মা, ওমা—মা

শোকাচ্ছন্ন স্মৃতির সুখে বিভোর হ'... চোখ বুজেই ছিলেন সুবাসিনী—কোনো জবাব দিলেন না। নীরজা উঠে ভয়ে ভয়ে গায়ে হাত দিয়ে ডাকল—মা, ওমা—মা

সুবাসিনী যেন তাঁর মেয়ের হাতের স্পর্শ [illegible]

ন্দুর পেরিয়ে তাঁর গায়ে হাত দিয়ে ডাকছে—
মা—ওমা—মা

তিনি চোখ খুললেন। নীরজা দম ছেড়ে বলল—বা—বা, বাঁচলাম—কি ভয়ই না হয়েছিল।

নীরজার মুখে ভয়ের আভাস দেখে কি জানি কেন সুবাসিনীর এখন আর আদিখ্যেতা বলে মনে হল না। তিনি দু'হাতে নীরজাকে বুকে টেনে ধরে ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেললেন।

সন্ধ্যেবেলায় পিণ্টুকে নিয়ে নীরজা দাওয়ায় বসে গল্প করছিল, আর ঠাকুরের প্রদীপের জন্যে সলতে পাকাচ্ছিল। ইতিমধ্যে সুবাসিনী বাইরের ঘরে নিজের ও পিণ্টুর বিছানা পেতে রেখে ভেতরের ঘরটিতে মেয়ে-জামাইয়ের বিছানা পেতে রাখলেন। রাতের রান্না আছে—এদিকে কাজ না সারলে ওদিকে যেতে পারবেন না। নীরজার জন্যে মনের মধ্যে একটু স্নেহকাতর হয়ে পড়েছেন—মেয়েটা কেমন যেন লাপড়া বেহায়া। কিন্তু তবু ভালোই লাগে। পিণ্টুকে কেমন আপন করে নিয়েছে—শুধু যদি গয়নার ব্যাপারটা না থাকত—ঐতেই কেমন যেন কাঁটা খচখচ করতে থাকে। যাকগে—ভগবান যে মায়া কমিয়ে দেন ততই ভালো। ইষ্টনাম স্মরণ ক'রে সুবাসিনী কপালে হাত ঠেকায়।

অনেক রাত্রে মনমোহনের সঙ্গে নীরজার দেখা হল। মায়ের পায়ে গরম তেল মালিশ ক'রে হাতের গাঁটগুলো টিপে টিপে আরাম ক'রে দিয়েছে সে, সুবাসিনী জল হ'য়ে গেছেন। মনে মনে ভেবেছেন—আহা যদি এটিও তাঁর মেয়ে হত—আর নয়ই বা কিসে—মেয়েরই তো সতীন—সেও মেয়েরই তুল্য। তবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন—বলেন—এবার শুতে যাও মা—সতীলক্ষ্মী হ'য়ে বেঁচে বর্তে থাক—

অনেক রাত্রে শোবার ঘরে যখন এল—তখন মনমোহন খাটে বসে পা দোলাচ্ছে। এবেলাও দুটো পান আনিয়ে রেখেছিল নীরজা, তারই একটা তুলে মুখে দিল।

বাচ্চাটার পাশে খেলা করতে করতে পিণ্টু ঘুমিয়ে পড়েছে, হাতে তার বলটা ধরাই আছে। ঘরে তেল-বাতি জ্বলছে—বারান্দার একপাশে লণ্ঠনটা কমানো শলতেয় মিঠে মিঠে জ্বলছে। পিণ্টুর রোগা-রোগা মুখের দিকে তাকিয়ে নীরজার মনে ব্যথা আর স্নেহ জেগে উঠল। আহা বেচারা—মায়ের তো ঐ শরীরের হাল—তারপর?

মনমোহন বলল—মাকে বলেছিলে?

—বলেছি।

—কি বললেন—উৎকণ্ঠায় ভেঙে পড়ল মনমোহন।

নীরজা চাপা গলায় বলল—তোমার লোভ দেখে আমার ঘেন্না করছে। মরা মেয়ের স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে আছেন তিনি—

মনমোহন বলল—কি বললে? ঘেন্না করছে? গয়নার লোভটা কার ছিল? অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিলে আমায়—মেয়েমানুষ এমনি বেহায়া বটে—এখন লজ্জা করে না ঘেন্নার কথা তুলতে—

নীরজার মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল। কিছু না ব'লে পিণ্টুকে জড়িয়ে ধরে মাটিতেই শুয়ে পড়ল সে।

মনমোহন আস্তে আস্তে বলল—নিচেয় কেন, চৌকিতে উঠে এসো—

—যাচ্ছি গো যাচ্ছি—পান-ঠাসা ফুলো গালে খানিকটা দোক্তা ফেলে সে উঠে দাঁড়াল—

ফুঁ দিয়ে মনমোহন তেলবাতি নিভিয়ে দিল।

পরদিন সকালে উঠে মনমোহন সুবাসিনীকে বলল—আজ আমাকে যেতে হবে—আমি যে কেন এসেছি সে কথা নীরজার মুখে নিশ্চয়ই শুনেছেন—

—শুনেছি বাবা—ধরা-ধরা গলায় সুবাসিনী বললেন—মেয়েকে যদি নিঃস্বত্বে হাতে সঁপে দিতে পারি—তার জঞ্জালগুলো কি আর পারব না?

মনমোহন উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল। এত সহজে কাজ সমাধা হবে এ কথা ভাবতেও পারে নি। এক সময়ে নীরজাকে আড়ালে পেয়ে হঠাৎ তার গালটা টিপে দিয়ে বলল—কি কায়দাই করেছ মণি ধন্যি অভিনয়—চালিয়ে যাও—না আঁচানো পর্যন্ত কারুকে বিশ্বাস নেই—

নীরজার মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠল। এই লোভের কুশ্রীতা আর হীন চক্রান্ত তার সমস্ত মনটাকে যেন বিষিয়ে দিল।

মনমোহন বলল—ও কি, মুখে মেঘ কেন?

নীরজা চুপ ক'রে রইল।

সকাল বেলাটা কেটে গেল টুকিটাকি গুছিয়ে নিতে। এর মধ্যে দশবার সুবাসিনী এসেছেন। সাগুদানা বেঁধে জুড়িয়ে বোতলে ভরে দিয়েছেন। দুধ জ্বাল দিয়ে রেখে গেছেন। চিনিটুক, মিছরিটুকু, দুখানা বিস্কুট, লজেঞ্চুস, একটু আমসত্ত্ব এনে দিয়েছেন—

নীরজা হেসে ফেলল—মা কি করছেন—ঐটুকু বাচ্চা কি আমসত্ত্ব খেতে পারে?

সুবাসিনীও হাসলেন—পারে গো পারে—আমার মেয়েকে কত খাইয়েছি—সলতের মত জড়িয়ে মুখে ধরলে চুষে চুষে খাবে—

—তাহলে আমাকেও কিছু আমসত্ত্ব দিন—নীরজা হেসে হেসে বলল—আর খানিকটা হোক কাসুন্দি—

দুপুরের রান্নায় সুবাসিনী কিছুতেই নীরজাকে যেতে দিলেন না। শেষকালে রফা হলো আঁশ রান্নাটা নীরজা করবে।

—আঁশের কি দরকার মা—রাগ ক'রে নীরজা বলল—একদিন দু'দিন কি নিরামিষ খাওয়া যায় না?

সুবাসিনী বললেন—কী যে বল বাছা—সধবা মেয়ে আঁশ মুখে না দিয়ে কি শ্বশুর-বাড়ী যায়?

তারপর পিণ্টু যখন মাছ এনে ফেলল—তখন সুবাসিনী নীরজাকে মাছটুকুও ছুঁতে দিলেন না। বললেন—এদিকের রান্নাতো সব হয়েই গিয়েছে—ভাত চাপিয়েছি উনুনে, এদিকে কাঠের জ্বালে মাছটুকু আমিই করে দিই। তুমি গোছগাছ করগে—দুপুরের গাড়ী খেয়ে উঠে আর জিরোতে সময় পাবে না। —বলেই হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছে ধরা-ধরা গলায় বললেন—মা আমার কি ভালোই বাসত আমার হাতের আঁশরান্না খেতে। আর সেই মাছ কি আজ পিণ্টু এনেছে—এ আমি আর কারুকেই রাঁধতে দিতে পারব না। —বলে আর একবার চোখের জল মুছলেন সুবাসিনী।

দু'টোর গাড়ী—খাওয়ার পর যাত্রার উদ্যোগ করিয়ে নিলেন। নীরজা বলল—তেরাত্তির পেরোয় নি—যাত্রার কি দরকার—

তোমার প্রাণের গান

সুবীর বসুঠাকুর

অসংখ্য মৃত্যুতে পুষ্ট এই বিশ্ব
মৃত্যুকেই করে অস্বীকার;
নিস্তব্ধ কবর নীচে, ওপরে আকাশ
স্পন্দিত প্রাণের রাজ্যে শব্দময়
চাঞ্চল্যে অপার
ঈপ্সার বিনীত সুখ। এক হাতে এ-আকাশ,
অন্য হাতে নিস্তব্ধ কবর,—
এক মৃত্যু, অন্য প্রাণ।
দু'হাতের খঞ্জনীতে চিরন্তন সৃষ্টির সন্ধান।

বিস্ময় তোমার প্রাণের গান বাজে
আজ তার এক হাতে,
মৃত্যুতে উত্তীর্ণ হ'লে একই গান বাজাবে
সে অন্য এক হাতে॥

সুবাসিনী তার চিবুকে আঙুল ছুঁইয়ে মুখে চুকচুক শব্দ করে বললেন—একদিনের চেনা—তবু মনে হচ্ছে কত কালের চেনা—

পিণ্টু ইতিমধ্যে গাড়ী ডেকে এনেছে। মনমোহন ব্যাগ থেকে দু'টি টাকা বার ক'রে তার হাতে দিল—মিষ্টি খেতে। তারপর শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে বলল—এবার তো যেতে হয়—

—হ্যাঁ বাবা, এই যে এনে দিই—সুবাসিনী ধরা-ধরা গলায় কথাটা বলে ঘরে ঢুকে তোরঙ্গ খুলে একটা ছোট্ট বিস্কুটের টিনের বাক্স বার ক'রে নিয়ে এলেন। মনমোহনও নোটবই খুঁজে একটা চিরকুট বার করে বলল—একটু মিলিয়ে নেবো—

বারান্দার কোণে জলচৌকিটা রেখে গয়না-গুলো বার করলেন সুবাসিনী। একটা টিকলি শুধু মিলল না। সুবাসিনী বললেন—নাতনীর চুলে ওটা বেঁধে দিতুম—একদিন আর পাওয়া গেল না

ঘোড়ার গাড়ীর দরোয়ান তাগাদা দিতে লাগল। মনমোহন বিস্কুটের টিন থেকে গয়না-গুলি তুলে নিয়ে একটি রুমালে বেঁধে সুটকেশে ভরল। তারপর স্ত্রীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল—কই গো—পিণ্টু কই?

—পিণ্টু গাড়ীতে মাল তুলতে গেছে—

পিণ্টু কখনো পারে? মনমোহন বলল।

ঠোঁট উলটে নীরজা বলল—কীই বা মাল—একটা সুটকেশ আর একটা ছোট বিছানা—

সুবাসিনী ধরা-ধরা গলায় বললেন—বেঁচে থাক বাবা, সুখী হও—আমার শেষ স্মৃতির চিহ্নটুকুও তোমাদের হাতে তুলে দিলুম—আপদে বিপদে তাকাবার মতন সম্বলটুকুও আর রইল না। যদি অসময়ে চোখ বুজি—আমার পিণ্টুকে একটু দেখো মা—বলতে বলতে ঝরঝরিয়ে সুবাসিনী কেঁদে ফেললেন।

পায়ের ধুলো নিয়ে মনমোহন এগিয়ে গেল, গাড়ীর মধ্যে বসে নীরজার দিকে তাকিয়ে বলল—কই গো এসো—

বাচ্চাটাকে সুবাসিনীর কোলে দিয়ে নীরজা মনমোহনের পায়ের ধুলো নিল। তারপর হেসে বলল—মায়ের শরীরের হাল দেখছ তো—এ সময়ে তাঁকে ছেড়ে যাই কি করে—পৌঁছে কুশল সংবাদ দিও।

ঝাউয়ের কান্না

অনিলবরণ ঘোষ

নবাবী সড়ক। দু'পাশে ঝাউগাছের সারি। তারি পাশে পাশে অসংখ্য উঁচু নীচু ঢিপি। মজে গেছে জনপদ, ধ্বসে গেছে অতীত। শুধু উঁচু উঁচু ঝাউগাছের পাতার বুকে কি এক দীর্ঘশ্বাস থেকে থেকে কান্নায় ফেটে পড়ে। অদ্ভুত বুক-চাপা সে কান্না। অসহ্য যাতনার কারুণ্যে অব্যক্ত ব্যথায় আতুর। সে কান্না শুনে নতুন পথিক ভয় পায়, পুরনো মানুষ মুখ তুলে তাকায়।

জায়গাটা অলোকের বড় ভাল লাগে। বাড়ী করে বউকে নিয়ে আসে। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যায়, ওরা বারান্দা ছেড়ে নড়ে না। সকাল পেরিয়ে আসে দুপুর, তারপর নামে সন্ধ্যা। ওদিকে ঝাউয়ের কান্না অশ্রান্ত ......থর থর। অলোক তবু মাঝে মাঝে চুরুট ধরায়, শব্দ করে ধোঁয়া টানে, ধোঁয়ার কুন্ডলী পাকিয়ে খেলা করে। শেলার ওটুকু চাঞ্চল্যও নেই। একেবারে নিস্পন্দ ...নির্বাক। বহুক্ষণ পর শুধু চোখের পাতা দুটি নড়ে, আর প্রায় নিঃশব্দে ধিক্ ধিক্ করে হৃদপিন্ড।

একসময়ে ঝি এসে শেলার চাকা লাগান চেয়ারটা ঠেলে ঠেলে নিয়ে যায় ভেতরে। নিদারুণ অসহায়ে শেলার দেহ নড়বড় করে নড়ে। সেদিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে অলোক। আধ খাওয়া চুরুটটা ফেলে একটা নতুন চুরুট ধরায়। নিঃশব্দে বাহাদুর একটা ক্রাচ্ এগিয়ে দেয়। ক্রাচে ভর করে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায় অলোক।

একটা দম্কা হাওয়া ছিটকে যায়, ফুঁপিয়ে ওঠে ঝাউয়ের কান্না। কান পেতে দাঁড়িয়ে পড়ে অলোক। শিহড়ায় দেহ। কাঁপে তামাক পোড়া দুটি ঠোঁট। টলতে টলতে আবার সে বসে পড়ে চেয়ারে।

দূরের রেল লাইনে নানা ছন্দে মল বাজিয়ে মালগাড়ী চলে যায়। বহুক্ষণ ধরে অনুরণিত হতে[illegible] রেল লাইনের ঐক্যতান।

ধীরে ধীরে অলোকে দৃষ্টিতে জাগে কী এক দুঃসহ জ্বালা। একটা অসুস্থ অস্থিরতায় সে ছটফট করে। বাতাসে কান পেতে থাকে কোন প্রত্যাশায়। চমকে চমকে তাকায় ঝাউ-গাছের মাথায়।

হঠাৎ গোঙিয়ে ওঠে অলোক। ব্যথাতুর দৃষ্টিতে ঝাউয়ের দিকে তাকিয়ে আপন মনে বিড় বিড় করে বলে, কান্না থামাও লিন্ডোয়া, আর যে সহ্য করতে পারছি না। সঙ্গী-সাথী-হারা নিঃসঙ্গ জীবনে হাঁপিয়ে উঠেছ। কিন্তু কি করব বল, শেলাকে ফেলে কি করে যাব তোমার কাছে, আমি ছাড়া ওর আর কে আছে, কে ওকে দেখবে। তুমিত সবই বোঝ। এখন ঘুমোও লক্ষ্মীটি। রাত শেষ হয়ে এসেছে। চাঁদ ডুবে গেছে সারারাত দপ্ দপ্ করে দাপিয়ে আকাশের তারাগুলিও যন্ত্রণায় পান্ডুর, ঘুমে ঢুলু ঢুলু। ভয় কি, পাহারায় আমি জেগে রইলাম। শেলা ঘুমিয়ে আছে, তুমিও ঘুমোও। দুই বন্ধু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপন দেখো, স্বপন দেখে হাস। আমি তোমাদের হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকি ....।

হাওয়া পড়ে গেছে। ঝাউয়ের পাতা নড়ে না, কান্না স্তব্ধ। বুঝি অলোকের কাকুতিতে ঘুমিয়ে পড়েছে লিন্ডোয়া। কিন্তু অলোকের চোখে ঘুম নেই। অনেকদিন ধরেই রাতে ঘুমোয় না অলোক। ঘুমোতে পারে না। একেবেঁকে অদ্ভুত ভঙ্গিমায় চেয়ারের উপর কাৎ হয়ে আছে। দৃষ্টি ঝাউয়ের মাথায় নিবদ্ধ। ঠোঁটের কোণ থেকে সিগারটা ঝুলছে। আগুনে নিভে গেছে অনেকক্ষণ, ধরাবার তাড়া নেই।

আজকের এই মরদহ গ্রামের খঞ্জ অলোক, আর সেদিনের কুলকৃতা ক্লাবের 'ডনজোয়ান' রঙিলা অলোক রায়, দুই জীবনের ফারাকটা যেন দিন আর রাত্রির মত স্পষ্ট। ভাবতে বসে আঁৎকে উঠতে হয়, ভয় করে। ভয় করে শেলার দিকে তাকালেও। ঘোড়ার বল্গায় আর মোটরের স্টিয়ারিংয়ে দু'আঙুলের বেশী তিন আঙুল ছোঁয়ায়নি যে শেলা সেহাগল। দুর্দম গতি আর দুরন্ত পুরুষপনায় যার ছিল জীবনের আনন্দ। সেই বঙ্গিনী শেলা আজ জড়ীভূত একতাল মাংসের ডেলা, একটু নড়তেও পারে না। তবু দু'জন বেঁচে আছে, আরও হয়ত কিছুদিন বেঁচে থাকবে। অলোকের সিগার, ক্রাচ আর বাহাদুর, শেলার চাকা লাগান গাড়ী আর ভুটিয়া ঝি, শেষদিন পর্যন্ত ওদের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকবে। উঃ, এ ধরণের বাঁচার যন্ত্রণা থেকে শেলা রে[illegible] পেয়েছে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত মস্তিষ্ক অস্থিরো[illegible] সমাহিত কিন্তু অলোকের পঙ্গুদেহের [illegible] মস্তিষ্ক স্মৃতির জ্বালায়, বেঁচে থাকার যন্ত্[illegible] কঁকিয়ে কঁকিয়ে হতাশায় নিরাশায় অর্ধোন্ম[illegible] শুধু শেলা নয়, শুধু নিজের পঙ্গু জী[illegible] নয়, শেলার বান্ধবী লিন্ডোয়ার দুঃসহ স্মৃ[illegible] একটা অক্টোপাসের মত ওর চেতনাকে গ্রাস [illegible] নিয়েছে। তাই ওর আবিল দৃষ্টি ঝাউ[illegible] মাথায় স্থির হয়ে আছে। লিন্ডোয়া যে ঘুম[illegible] ওখানে—। অথচ দু'বছর আগের কথা একে[illegible] অন্যরকম। সেদিন ছিল এমনই এক শর[illegible] সোনা রোদে ভরা শীত শীত সকাল।

গাড়ীর গতির মধ্যেই পকেট [illegible] লাইটার বের করে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় সিগা[illegible] ধরিয়ে নেয়। ঘাড় ফিরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে [illegible] দৃষ্টি ওর স্থির হয়ে যায়। উষ্ণ উত্তাপে অ[illegible] ধোঁয়া বুকে গুমড়ায়।

শিশির ছোঁয়া গাছে, শিশির ধোয়া ঘ[illegible] সূর্যের আলো চমকাচ্ছে। ঘোড়দৌড়ের মা[illegible] সাজান বাগান তদারক করছে মালীর [illegible] বাজীর ঘোড়া দৌড়বার রেলিং ঘেরা সংকী[illegible] পথের পাশ দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে দৌড়[illegible] কয়েকটি পুরুষ ও নারী। দলের মধ্যে এ[illegible] মেয়ে ছুটছে সবাইর আগে। ঘাড় বাঁকিয়ে [illegible] বড় ধাপে কালোঘোড়া ওর দৌড়চ্ছে। সে[illegible] রেকাবের উপর দাঁড়িয়ে আছে মেয়ে[illegible] ক্রীমলেপা মসৃণ কপালে, গালে, ঘাড়ে সূ[illegible] আলো চিক চিক করছে। কদমের তালে না[illegible] সর্বশরীর। আটসাট পোষাক বুঝি ফেটে প[illegible]

মুগ্ধ দৃষ্টিতে অলোক তাকিয়ে থা[illegible] ক্ষুধার্ত একটা জানোয়ারের মত অলো[illegible] গাড়ীটা নিঃশব্দে এগিয়ে যায়। শিকার [illegible] নজরের বাইরে না যায়।

পুলিশ বাধা দেয়। ট্র্যাফিকে বাধা স[illegible] করছে অলোক। বাড়ী এসে সে গুম মেরে [illegible] থাকে। মদের আর দরকার নেই। নতুন নে[illegible] ধরেছে। বুঁদ হয়ে ভাবছে শুধু মেয়ে[illegible] কথা। অদ্ভুত প্রাণবন্ত, মধুর সুষমামণ্ডি[illegible] সমস্ত দলটির মধ্যে যেন জ্বলছিল।

কিন্ত কি করে ওর সান্নিধ্যে যাওয়া যা[illegible]

র বাজিতে চলবে না। শীতের মধ্যে সকালে ঘোড়ায় দৌড়নটাই কি সম্ভব। পথ ঠিক চ আরও কয়েকটা দিন কেটে যায়। কিন্তু ল সকালে সিঁদুররাঙা মোটরটাকে রোজই যায় ঘোড়দৌড়ের মাঠের পাশে রাস্তার ন বাঁচিয়ে ঘোরপাক খেতে। মেয়েটির পূর্ণতা অলোককে পাগল করেছে। মুগ্ধ ঙ্গর মত অলোকের চেতনা মোহগ্রস্ত। সিদ্ধান্তে এসে যায় সে। চেক বইতে । মোটা অঙ্ক বসে। অশ্বারোহীদের দলে ও একটি সংখ্যা বাড়ে। সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে অলোকের ঘোড়া। বহু রূপেতে অলোক কিনেছে দুধ রঙের সাদা । টগবগিয়ে ঘোড়া পেছন থেকে সামনে য়ে যায়। ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় মেয়েটি। কালোচোখে বিদ্যুতের চমক। কানের দুটো সূর্যের আলোয় ধ্বকধ্বকিয়ে ওঠে। বহ্নিময়ী। —বিমুগ্ধ অলোকের আত্মায় শিহরণ ......, শত কামনার গুন-গুনানি। ফিরিয়ে নেয় মেয়েটি। জোর হাতে রাশ ধরে। কালোঘোড়া ওর চমকে উঠে ছোটে। ং-এর পোস্টগুলি পাশ দিয়ে যেন উড়ে য়ে যায়। রোমাঞ্চের আভাষ পেয়ে পেছন চিৎকার করে উৎসাহ দেয় অশ্বারোহীর

ঘোড়ার গতিতে সন্তুষ্ট নয় মেয়েটি। র পেটে রেকাব ঠোকে। প্রাণপণে ঘোড়া য়। কিন্তু আগেও নয়, পিছনেও নয়, ঠিক পাশাশি ছুটছে অলোক। হাসি হাসি চোখে য়ে দেখছে মেয়েটিকে।

অনেক দূর এগিয়ে এসেছে দুজন। অনেক নে পড়ে আছে অশ্বরোহীর দল। হঠাৎ টেনে ধরে মেয়েটি। শিষ্-পা ঘোড়া গতি লায় নেয়। অলোকও থেমে গেছে। বড় নিঃশ্বাস টানছে মেয়েটি। হাপড়ের মত র পাঁজর উঠছে নামছে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে ক তাকিয়ে দেখে ওর নিটোল বুকের গড়ন আর গ্রীবার সৌন্দর্য।

ফিক্ করে হেসে ফেলে মেয়েটি। হিংসুকের তে অলোকের ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে বলে, সুন্দর দৌড়য় আপনার ঘোড়া, হিংসে হয়

আসুন বদল করে নিই। হাসিমুখে অলোক দেয়।

ইস্! আমি নোব কেন? অভিমানে ফুলিয়ে উত্তর দেয় মেয়েটি।

পাশাপাশি ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে আসে । মাঝপথে অশ্বারোহীর দল ওদের ঘিরে জিজ্ঞেস করে কার জিত হল শেষ ত?

মাথা নুইয়ে অলোক উত্তর দেয়, আমার হার ছ।

মাথা ঝাঁকিয়ে বাধা দেয় মেয়েটি। মিছে আমি হেরেছি।

য়কজোড়া কৌতূহলী চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ওঠে। প্রচন্ড হাসিতে ঘোড়ার পিঠে প্রায় য় পড়েন একজন বৃদ্ধ জার্মান। আর ন মধ্যবয়সী ইংরেজ অলোকের দিকে য়ে ঠাট্টার সুরে বলেন—ডনজোয়ান......

ডনজোয়ান......, সবাই সশব্দে হেসে ওঠে। ব্যর্থ শিকারী অলোক নয়। গেঁথে তোলে সেহাগলকে। পাঞ্জাবের মেয়ে, ভয়ঙ্কর বাস্তববাদী। কবিতা টবিতা একটু কমই বোঝে। অলোকের মোটরে চড়ে রেস্টুরেন্টে ঘুরেই সন্তুষ্ট নয়। বিয়ের দলিলটা পাকা করেই থামে।

অলোকের নির্বান্ধব পুরী শেলার কলকন্ঠ আর দাপাদাপিতে টলমলিয়ে ওঠে। দুর্বার প্রাণবন্ত শেলা। বাল্যকাল কেটেছে টেক্সাসদের দেশে। কৈশোর ইয়াঙ্কিদের সাথে; যৌবনের শুরু ভারতে। বিকেলে হাওয়া খেতে বেরিয়ে শেলার হাতে গাড়ী ছেড়ে দিলে, সে গাড়ী গিয়ে থামে আসানসোল। স্পীড-মিটারের কাঁটা সত্তরের নীচে কখনই নামাতে রাজী নয় শেলা। ট্র্যাফিক পুলিশের আদেশ অমান্যে ওর মহা আনন্দ। পুলিশের সঙ্কেত দেখলেই গ্যাসের চাবি টেনে ধরে। স্পীড-মিটারের কাঁটা আরও দশ মাইল এগিয়ে যায়। নম্বর নেয় পুলিশ। কুন্দ দাঁত বের করে হি হি করে হাসে শেলা। আর প্রতি মাসে অনেকগুলি করে জরিমানা দেয় অলোক।

তিন মাসে চারটে গাড়ী পাল্টায় শেলা, দুটি নতুন ঘোড়া কেনে। একটা মোটর বাইক কিনেও কয়েকদিন দৌড়য়। মোটর বাইক ওর ভাল লাগে না। এর চেয়ে ঘোড়াই ভাল। ফ্লাইং ক্লাবের মেম্বার হয়ে কয়েকদিন আকাশে ওড়বার চেষ্টাও করেছে। কিন্তু যুত হয় না। অসীম শূন্যে চারপাশটা বড় ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। মাটির উপর দাপাদাপিতেই আনন্দ।

শেলার সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে ডনজোয়ানও মাঝে মাঝে আঁৎকে ওঠে। কিন্তু একটা দুর্বার নেশায় শেলা অলোককে ডুবিয়ে রেখেছে। আটসাঁট ছোট পুরুষে সার্ট পরে শেলা যখন অলোককে ঠিক পুরুষের মতই আলিঙ্গনে চেপে ধরে চুমু খায়, সেই মুহূর্তে অলোক ভুলে যায় দুনিয়া। একটা নতুন অভিজ্ঞতা আর অদ্ভুত শিহরণ অনুভব করে বুকে।

অদ্ভুত সব সখ শেলার। মুহূর্মুহুঃ পাল্টাচ্ছে সে সব সখ। আবার চরমে না পৌঁছে কিছুতেই নিস্তার নেই। কদিন মহা আড়ম্বরে পোষা শুরু হল বেড়াল। কিছুদিন পরই আমদানী হল কুকুর। এখন বাগানে বাঘের খাঁচা তৈরী হচ্ছে। বাঘ পুষবে শেলা। ঠাট্টা করে অলোক জিজ্ঞেস করে, বাঘতো হল, এবার কয়েকটা সাপ নিয়ে এলে হয়না......।

খুশিতে ডগমগিয়ে ওঠে শেলা। কলকন্ঠে বলে, 'দ্যাট্স দি আইডিয়া',—কি সুন্দর হবে বল দেখি। শোবার ঘরে খাটের পাশে কাঁচের কেসে থাকবে তাজা সাপ। একটু শব্দেতে ইয়া ফণা তুলে ল্যাজের উপর দাঁড়িয়ে উঠবে, দুলবে আর নাচবে। ভাল কথা মনে করিয়েছ ......।

সশব্দে অলোককে চুমো খেয়ে সে দরওয়ানকে ডাকে তাড়স্বরে। সাপের খোঁজ এক্ষুণিই চাই। বাঘের আগেই আসবে সাপ।

শেলার বন্ধুবান্ধবীর অবধি নেই। ওরা বেড়াতে আসে, শেলার ঘর সংসার দেখে তারিফ করে, উৎসাহ দেয়। আর উদ্ভট সব সখে কৌতূহল দেখায়। একে মা মনসা, তায় ধোঁয়া......।

বান্ধবীদের মধ্যে প্রায়ই আসে লিন্ডোয়া শার্লি। খাসিয়া মেয়ে। চাঁদপনা মুখে হাসি ওর ধরেনা। সর্বদা হাসছে মেয়েটা। শেলার

ঝরনা
কবিতা বসু

আমি চঞ্চল, আমি উন্দাম, আমি গিরি নন্দিনী
কঠিন শিলার বক্ষ পাঁজরে আমি নহি বন্দিনী
পাষাণের বুকে জনম আমার
তবু প্রাণে মোর স্নেহরসধার
কোমল পরশে পাষাণের বুকে
সুর তুলি রিনিঝিনি।
আমি চঞ্চল, আমি উন্দাম, আমি গিরি নন্দিনী॥
বনহরিণীর তৃষিত হৃদয় আমারে জপিছে মনে
আমি সে বালার তৃষ্ণা মিটাই অধরের চুম্বনে
তপনের রোষে মৃত তৃণতীরে
শীতল পরশে প্রাণ দিই ফিরে
তপ্ত পৃথিবী প্রাণ ফিরে পায়
মোর স্নেহ সিঞ্চনে।
বনহরিণীর তৃষিত হৃদয় আমারে জপিছে মনে॥
সুধাকর পাশে শর্বরী যাপে মায়াবিনী তারাদল
তন্বী নিশার নীল অঞ্চল করে ওঠে ঝলমল
তারি ছায়া মোর শ্বেত অঞ্চলে
আমি বহে যাই কল-কল্লোলে
যৌবন মোর দুকূলে ছাপায়ে বহে যায় টলমল।
সুধাকর পাশে শর্বরী
যাপে মায়াবিনী তারাদল॥
মায়া অঞ্জন আঁকিয়া নয়নে অজানা সুদূরে দেশে
আমি বহে যাই মোর প্রিয়তম সাগরের উদ্দেশে
পিছে ফিরিবার সময় যে নাই,
উন্দাম স্রোতে শুধু বহে যাই,
সাগর স্বপন হৃদয়ে ভরিয়া অচিন বধূর বেশে।
মায়া অঞ্জন আঁকিয়া নয়নে
অজানা সুদূর দেশে॥

পাগলামো দেখে হাসে, আর অলোকের সাহসের তারিফ করে।

একেবারে শেলার বিপরীত চরিত্র লিন্ডোয়া। শেলা উন্দাম, লিন্ডোয়া শান্ত। শেলা বারমুখো, লিন্ডোয়া ঘরকুনো। শেলার আনন্দ গতি আর উদ্ভট সব কল্পনায়। লিন্ডোয়া স্থির, বাসনা সীমিত। এম, বি পাশ করে আরও কি সব নিয়ে লিন্ডোয়া পড়ছে। বোর্ডিং হাউসে বাস। ছুটিছাটা পেলেই ছুটে আসে শেলার কাছে, নয় ত শেলা-ই ধরে নিয়ে আসে। দুজনের অদ্ভুত বন্ধুত্ব। কোন নতুন প্ল্যান লিন্ডোয়ার কাছে না বলা পর্যন্ত শেলার সোয়াস্তি নেই। ওর অনর্গল বকুনির মধ্যে লিন্ডোয়া শুধু হু-হু করে মুখে শব্দ তুলে মাথা ঝাঁকিয়ে কর্তব্য সারে আর হাসে। [illegible]

ওদের দুজনকে তাকিয়ে দেখে অলোক [illegible] ওদের দুই বন্ধুর অন্তরঙ্গতার ধার ঘেঁষে [illegible] সে পৌঁছাতে পারেনি, মনে মনে স্বীকৃতবার বাঁচিয়ে[illegible]

গ্যারেজ, আস্তাবল, বাঘের [illegible] ব্রহ্মার বাবারও [illegible] করে শেলা, আর শেলার ঘর চিত্ত গ্রহা [illegible] যায় লিন্ডোয়া। মোটর, ঘো[illegible] খোঁজ খবর নিতেই [illegible] করে উঠল,- [illegible] লিন্ডোয়া এসে অস্থিরদা ঠাকুর। তুমি না দেখলে [illegible] নতুন নতুন প্লেট স আর কে আছে? বোর্ডিং-এ ফিরে এসে মুখে বিদ্রুপের কি করুণা[illegible] ভাবতে লিন্ডোয়া ঘুরল, বুঝা গেল না। তিনি[illegible] শেলা আর [illegible] লোক পেলি না রামী! এই[illegible]

সামা ভৃপ্তিশেখর দত্তরায়

রাজপথ

হিরন্ময়ী বসু

পড়ে আছে একখানি পথ,
বিসর্পিল গতি বেয়ে চলিয়াছে রথ।
কোলাহল মুখরিত মানুষের দল,
সারা পথ জুড়ে শুধু করে কোলাহল।

দিন কাটে, রাত কাটে, কাটে পথ চলা,
মনোমত কথা মোর হয়নি তো বলা।
পথ চলা পথিকের আকুল আহ্বান,
শুধু মোরে করিয়াছে পাণ্ডু ম্রিয়মাণ।

হে পথিক ফিরে চাও,
পথ ফেলে কোথা যাও?
জীবনের অনুরাগ ভালবাসা যত,
বার বার তোমারে যে রাঙায়েছে কত।

পথ চলা কোনদিন হবে নাকো শেষ,
আলো রাঙা রাজপথে নেই কোন ক্লেশ।
পথ যদি কোনদিন হয় সাথী হারা,
তুমি আছ আমি আছি আছে গ্রহ তারা।

কাল্‌ হারামজাদাটার সঙ্গে ঘর করতে গেলি? যা, যা, ন'সিকে পুজো দিয়ে যাস। নবগ্রহে শিকেটা ঝরে পড়বে কি না!

ভেতর থেকে কাকীমা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন,—হ্যাঁ, পরের ভাল করতেই আছ। ঘরের রোগ-বা‌ই সারবে কি করে। লোকের যত পাপ ডেকে ডেকে পাঁচসিকে ন'সিকের বদলে ঘরে নিয়ে আসছে। হায়রে, আমার কপাল। ছেলেটা তিনদিন জ্বরে বেহুঁস। সেদিকে খেয়াল নেই।

গোকুলকাকা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। ঘন ঘন হুঁকোয় টান মারেন; কিন্তু ততক্ষণে সবই ভস্ম হয়ে গেছে। ধোঁয়া আর বের হয় না। হুঁকোটা একপাশে রেখে বললেন,—দে বাবা সন্তু! আর এক কল্কে সেজে।

এদিকে ভেতর থেকে অভিযোগ উঠছে,—হ্যাঁ, এর বেলা আর কথাটি নেই। বলি, ছেলেটা কি শুধু আমার? বল না গো তোমরা, এর কি কোনো পিরতিকার নাই?

গোকুলকাকা আরো উত্তেজিত সুরে বললেন,—কি করব আমি? যার কপালে যা আছে। কিং কুর্বন্তি গ্রহা সর্বে?

ভেতর থেকেও উত্তেজিত সুরে জবাব এ'ল,—বেশ, তার কি কোন কাটান নেই? দিচ্ছি আমি পাঁচসিকে, ন'সিকে যা চাও। দাও না রোগটা সারিয়ে।

গোকুলকাকা বললেন,—আরে, তাই কি আমি বলছি। পয়সা নিয়ে কি হবে? কিং কুর্বন্তি গ্রহা সর্বে? ছেলের আমার কি করবে বেটারা? বুঝলে রামী!—যস্য কেন্দ্রী বৃহস্পতি।

রামী বেগতিক বুঝে বললে,—তাইত দা'ঠাকুর! ভোগান্তি কপালে যা আছে, তার আর তুমি কি করবে? তবু ডাক্তার বদ্যি দেখাতে হয়।

গোকুলকাকা উত্তর দেন,—তার কি কসুর আছে রামী! ডাক্তার-বদ্যি কি করবে? ওষুধ দিচ্ছে বটে পরাণ কবরেজ। কিন্তু বুঝলে কি না,—বুধের আট, মঙ্গলের ছয়; তবে যদি রোগের শান্তি হয়। অর্থাৎ একুনে চৌদ্দদিন। মহামুনির বাক্য মিথ্যা হবার নয়। ডাক্তার-বদ্যির মাথার ঘিলু খাইয়ে দিলেও সারবে না।

অবজ্ঞার হাসি হেসে গোকুলকাকা আমার দিকে তাকালেন। আমিও হুঁকোটা তাঁর হাতে তুলে দিলাম। কাকীমা এবার দরজার কাছে এগিয়ে এসে বললেন,—দেখে যা বাবা! একবার নিজের চোখে দেখে যা তোরা! জন্ম থেকে রোগ আর রোগ। পাঁচ পাঁচটাকে খাইয়েছি—।

কাকীমা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদতে লাগলেন,—বলি, এর কি কোন পিরতিকার নেই? পরাণ কবরেজ ছাড়া কি আর ডাক্তার-বদ্যি নেই?

গোকুলকাকা বললেন,—থাকবে না কেন? এইত রয়েছে আশু ডাক্তার। কিন্তু ম্লেচ্ছ হয়ে গেছে। দেবদ্বিজে কি আর ভক্তি আছে। শুধু টাকা আর টাকা! রোগ সারুক আর না সারুক বাড়ীতে পা দিলেই করকরে চারটে টাকা বের করে দিতে হবে। তারপর দেবে প্রিস্‌কিপসিন না কি বলে, বাবা! পৈশাচিক ফর্দ—নাও ঠেলা।

কাকীমা বললেন,—তাই বল, তুমি পয়সা খরচ করবে না।

গোকুলকাকা জবাব দেন,—খরচটা কোন্‌-খানটায় করছি না! বাজে খরচ করে কি হবে। চৌদ্দ দিন সবুর কর। ছেলে ঠিক সেরে উঠবে। কিং কুর্বন্তি।

কাকীমা বললেন,—আচ্ছা দেখব। আমি নিজেই যাচ্ছি আশু ডাক্তারের কাছে। আমার চুড়ি বাঁধা দিয়ে ডাক্তারের টাকা দেবো।

গোকুলকাকা শুধু বললেন,—হুঁম! কাকীমা অদৃশ্য হলে তিনি যেন নিশ্চিন্ত হলেন। আমাকে বললেন,—বুঝলি সন্তু! দুদিন সবুর কর। মনটা স্থির নাই; তারপর তোকে সব বলে দেবো।

রামী বললে,—আসি দা'ঠাকুর! ও-বেলায় দিয়ে যাব টাকাটা।

গোকুলকাকা বললেন,—দিয়ে যাস কিন্তু! শুভদিনটা কেটে গেলে তখন আর আমায় বলতে পাবিনে।

রামী বললে,— তাই দোব গো! রামীর কোনোদিন কথার খেলাপ পেয়েছ দা'ঠাকুর!

গোকুলকাকা বলেন,—আচ্ছা! বেশ, বেশ! যা, ওবেলা আসিস।

রামী চলে গেল। মনে মনে ভাবলাম,—সবারই সব হচ্ছে আমার বেলাই শুধু সবুর কর আর সবুর কর। এদিকে ত রোজ দু'চার কল্কের তামাক জোগাতে হচ্ছে। গোকুলকাকা বললেন,—কি ভাবছিস সন্তু? তোকেই সব শিখিয়ে দেবো রে, সময় আসুক। ছেলে মানুষ কি না, ফাঁস করে দিলেই বিদ্যাটা নষ্ট হয়ে যাবে। আর কোন কাজে লাগবে না।

গোকুলকাকার কথা শুনে লোভ হয়। রোজই দু'একবার করে যাই। গোকুলকাকার মুখে লেগেই আছে— কিং কুর্বন্তি। দিব্যি আরামে হুঁকোয় দম দেন গোকুলকাকা। সবই করেন, পাড়ায়ও ঘুরেন। শুধু আমার বেলায়ই সবুর কর। এদিকে কিন্তু গোকুলকাকার সেই রুগ্ন ছেলেটা বাদ সাধলে; বুধের আট মঙ্গলের ছয় কেটে গেলেও ছেলেটা সেরে উঠল না। গোকুলকাকাও যেন কেমন মনমরা হয়ে পড়লেন। দু-চারদিন তাঁর মুখে আর সেই কিং কুর্বন্তিও শুনতে পাইনি।

একদিন বিকট কান্না শুনে ছুটে গিয়ে দেখি, পাড়ার অনেকে জড় হয়ে গোকুলকাকার ছেলেটিকে ঘিরে রয়েছে। কাকীমা চীৎকার করে ছটফট করছেন। তাঁকে সামলানো যাচ্ছে না। চীৎকার করে তিনি বলতে লাগলেন,—"তুমি যে বলেছিলে গো! কিছু হবে না; কিং কুর্বন্তি।"

কাকীমার কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। গোকুলকাকা মাথায় হাত দিয়ে দাওয়ায় বসে আছেন। তাঁরও চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। আমায় দেখে গোকুল-কাকা বলে উঠলেন,— এসেছিস সন্তু! তুই ত সাক্ষী আছিস বাবা! বলেছি ত কিং কুর্বন্তি গ্রহা সর্বে? তারা কি করতে পারে? আসলে বৃহস্পতিই যে নেই। স্ত্রী-বুদ্ধি কি না, বুঝবে কি করে?

হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন গোকুলকাকা। আমারও চোখে জল এসেছিল। মনে হ'ল, গোকুলকাকা যেন এরকমই বলেছিলেন। তাঁর জ্যোতিষী বিদ্যার মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করে সেদিন কিশোর বয়সে কাকীমার স্ত্রী-বুদ্ধির উপর রাগই হয়েছিল।

কিন্তু আজ? ছাপার পুঁথি আমার সামনে; মানেটাও পরিষ্কার করে লেখা আছে। আজ হাসির সঙ্গে দু' ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। গোকুলকাকার দোষ নাই। যখন যেমন, তখন তেমন কাজে লাগিয়েছেন গোকুলকাকা! অদৃষ্টের বিরুদ্ধে কিং কুর্বন্তি মানবাঃ,—শ্লোকটা পাল্টে দিতে হবে।

নিকোবর দ্বীপমালা

(১৫২ পৃষ্ঠার পর)

আছে চাওড়াতে। তাদের জন্যে নানারকম নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী এবং শুয়োর, নারকেল প্রভৃতি উপহার নিয়ে আসে কারনিকোবারিরা। ফেরার সময় মাটির হাঁড়ি নিয়ে যায়। বিনিময় ঠিক উচিত মূল্যে হলো কিনা একথা কারুর মনে উঠে না। চাওড়াবাসীরা অতিথিদের জন্যে বিশেষ নাচগানের অনুষ্ঠান করে। অন্ধকার রাতে নারকেলমালার প্রোজ্জ্বল আলোকে সমুদ্রের ধারে বসে নাচের এ অনুষ্ঠান দেখেছি। সমুদ্রের গর্জন অপূর্ব ঐকতান সৃষ্টি করে। সেই জন্যই বোধ হয় নিকোবারিরা কোনও বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন অনুভব করেনি। পুরুষ-স্ত্রীর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, মাঝে মাঝে শুধু হাতে তালি আর সমবেত-কণ্ঠে গীত সমস্ত পরিবেশকে অপরূপ আনন্দমুখর করে তুলেছিল।

চাওড়ার মানুষ যেমন পরিশ্রমী, তাদের গ্রাম যেমন পরিচ্ছন্ন, ঠিক তার উল্টো প্রতি-বেশী তেরাসাদ্বীপবাসী। গত আদম সুমারীর সময়ে জনগণনার কাজে ওখানে গিয়ে কিছুদিন থাকতে হয়েছিল। কুটীরের চারপাশে আবর্জনার স্তূপ, মাছির ভনভনানিতে স্থির-ভাবে বসা মুস্কিল। সারাটা দিন যে সব লোক কুটীরের মধ্যে নিদ্রাসুখ উপভোগ না করছে, তারাও ঝিমোচ্ছে। নানা রকম ব্যাধির প্রকোপও আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে এখানে বাইরাগত চীনা, বর্মী ব্যাপারীদের আড্ডা ছিল। হলদি, আদা, আনারস প্রভৃতির চাষ-আবাদ তারাই আরম্ভ করে। এইখানে গ্রামের নাম লক্ষ্মী ও বঙ্গালী থেকে অনেকে অনুমান করেছেন যে প্রাচীন ও মধ্যযুগে এ অঞ্চলে ভারতের নাবিকদের যাতায়াত ছিল। বোম্পারু দ্বীপ আয়তনে মাত্র ৪ বর্গ-মাইল এবং মোট জনসংখ্যা একশোর কম। সমুদ্রের ধার থেকে সাড়ে সাতশো ফিট উঁচু তৃণাবৃত পাহাড় উঠেছে। দেখলে মনে হয় যেন জলদৈত্য দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নানকৌড়ী ও দক্ষিণের দ্বীপমালা

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চৌহদ্দির মধ্যে সব থেকে রমণীয় এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ, সুগভীর পোতাশ্রয় নানকৌড়ী, কামোর্ত্তা, ত্রিংকেট এবং নানকৌড়ী দ্বীপের ত্রিভুজের মধ্যে গভীর সমুদ্র শাখা প্রবেশ করেছে। প্রবেশদ্বার দুটি। তটরেখার ধারেই খাড়ি সুগভীর এবং বাইরে যত ঝড়ঝাপটাই হোক না কেন পোতাশ্রয়ের মধ্যে জলধারা স্থির, শান্ত। বোম্বাই বা বিশাখাপত্তনেও সমুদ্র এতো প্রশান্ত নয়। খাড়ির জলে প্রবালের মেলা। কয়েক বছর আগে মেঘমুক্ত দিনে প্রখর সূর্যা-লোকে এরোপ্লেন থেকে নানকৌড়ী পোতা-শ্রয়কে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। মানচিত্র প্রণয়নের জন্যে ডাকোটা হাওয়াই জাহাজ থেকে ফটোগ্রাফ তোলা হচ্ছিল। ডাকোটার মেঝেতে ফটোর ক্যামেরা এবং ভালভাবে নিচে দেখার জন্যে বিশেষ বন্দোবস্ত। অনেকক্ষণ ধরে পোতাশ্রয়ের উপর এরোপ্লেন ঘোরাফেরা করে-ছিল। অনেক নিচে শান্ত জলরাশির মধ্যে দিয়ে অপরূপ প্রবালের মেলা দেখেছিলাম। ফিকে সবুজ জলের নিচে শুভ্র বালুর মেঝে এবং তার উপরে ধাপে ধাপে সাজানো রং-বেরঙের প্রবালের তোড়া নিচ থেকে তুলে নিয়ে এলে মনে হয় কেউ বুঝি সমুদ্রের তলায় বসে প্রবাল দিয়ে পুষ্পস্তবক রচনা করেছে।

নানকৌড়ী দ্বীপমালার আদিবাসী সমাজের বর্তমান প্রধানা হচ্ছেন শ্রীমতী লছমী। সবাই তাঁকে সম্মান করে রাণী বলে। কয়েক বছর তাঁর মা রাণী ইসলোনের মৃত্যু হয়েছে। রাণী ইসলোনের মতো বুদ্ধিমতী নেত্রী আদিবাসী-দের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। প্রথম মহা-যুদ্ধের সময় জার্মাণ যুদ্ধ জাহাজ এমডেন ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগরে বিভীষি-কার সৃষ্টি করে। তখন নানকৌড়ী দ্বীপমালার কোনও রক্ষা ব্যবস্থাই ছিল না। পাল জাহাজ এবং পোর্টব্লেয়ার থেকে কখনও বাষ্পীয় পোত মারফৎ বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে অনিয়মি ও অতি সামান্য সংযোগের ব্যবস্থা ছিল। রাণী ইসলোন খবর পেয়েছিলেন যে জার্মাণীর সঙ্গে লড়াই শুরু হয়েছে এবং চারদিকে একটু হুঁশিয়ার দৃষ্টি রাখতে হবে। তবে, তাঁর কাছে ঢাল, তরোয়াল কিছুই ছিল না। একদিন দূর থেকে দেখতে পেলেন যে যুদ্ধ জাহাজ পোতাশ্রয়ের দিকে আসছে। রাণী নির্দেশ দিলেন যে শাসন কেন্দ্রের শৈল-শীর্ষে পতাকাস্তম্ভে ইউনিয়ন জ্যাক উড়াতে। আর, অন্য পথ দিয়ে ব্যাপারীর পণ্যবাহী পাল-তোলা জাহাজ পাঠিয়ে দিলেন পোর্টব্লেয়ারে খবর দিতে। এমডেন জাহাজ পোতাশ্রয়ের প্রবেশদ্বার দিয়ে কিছুদূর এসে ফিরে যায়। সম্ভবতঃ দূরে থেকে শাসন কেন্দ্রের উপর পতাকা দেখে মনে করে যে এখানে সশস্ত্র ইংরাজ সৈন্যবাহিনী আছে। পরে, রাণী ইসলোনকে এভাবে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ-জাহাজের মোকাবেলা করার জন্যে শাসকদের পক্ষ থেকে ভূয়সী প্রশংসা করা হয়।

নিকোবর দ্বীপমালার সব থেকে উর্বর দ্বীপ কাহাল। আয়তন ৫৮ বর্গ-মাইল, জন-সংখ্যা প্রায় সাতশো। দ্বীপের মাঝখানে মেরু-দণ্ডের মতো বনাচ্ছাদিত অনুচ্চ শৈল। দুদিকে পাহাড় নিচে নেমে গিয়েছে, তীরের কাছে জল একেবারে চৌরশ। নারকেল আর সুপুরীর কি অসম্ভব ফলনই না এখানে দেখেছি। দ্বীপের প্রধান হচ্ছেন রাণী চাঙ্গা। তাঁর নিজের গ্রাম নিচে কাহাল বা কাছাল দ্বীপের পশ্চিম খাড়ির পার্শ্বে। খাড়ির তিন-দিক ঘিরে কাহাল দ্বীপ, অপরিসর সমুদ্র শাখা ভেতরে সুন্দরী বনের বাধা ভেদ করে বহুদূর চলে গিয়েছে। এইখানে মেছো কুমীর আছে। আর জঙ্গলে কাঁপকুলেরও যথেষ্ট উপদ্রব। পশ্চিম কাহাল খাড়িতে সার্ডিন বা তারিণীর মাছের ঝাঁক জল কালো করে আসতে দেখেছি। পেছনে বড় সুরমাই বা কুকারি মাছ তাড়া করে। ভীত সার্ডিনের পাল লাফিয়ে ডাঙ্গায় উঠে আসে। বিনা আয়াসে মৎস-ভোজের আমন্ত্রণে গ্রামের যত কুকুর এসে জোটে খাড়ির ধারে। যুদ্ধের আগে এখানেও বহু চীনা ব্যবসায়ীর যাতায়াত ছিল। তাদের পাতাবাহার ও মালয়ার নানারকম ফলের গাছ এখনও কাহাল দ্বীপের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছে। দ্বীপের পূর্ব থেকে পশ্চিমতটে যাবার রাস্তাও তখন তৈরি হয়েছে। কারনিকোবর ছাড়া কাহাল দ্বীপেও সাইকেল চলে।

নানকৌড়ী ছেড়ে দক্ষিণের পথে যাত্রা করলে দ্বীপমালার জনসংখ্যাও কমে যায়। নিকো-বারিদের দৈহিক গঠন অনেকটা মালয়বাসীদের মতো, একটু খর্বকায়। দক্ষিণের দ্বীপে চীনা সংমিশ্রণের ভাব পরিস্ফুট। মেয়েরা সারঙ্গ পরে এবং চীনাদের অনুকরণে আঁটসাঁট জামা। কারনিকোবারি মেয়েদের সাজসজ্জা বর্মী রমণীর মতো। পুরুষের বস্ত্রাবরণ অতি সীমিত। কারনিকোবর ছাড়া অন্য দ্বীপে এখনও ছোট কৌপিন পরেই অনেকে লজ্জানিবারণ করে। গ্রেট নিকোবর দ্বীপের ভেতরে শোমপেন নামে অনগ্রসর এবং ভিন্ন এক আদিবাসী গোষ্ঠীর বাস। তাদের উপদ্রব, অত্যাচার সম্বন্ধে নানা কাহিনী উপকূলবাসী নিকো-বারিরা বলে; তবে, তার মধ্যে যথেষ্ট অতি রঞ্জনের আভাস পাওয়া যায়। কয়েক বছর আগে গ্রেট নিকোবরের প্রাকৃতিক তথ্য অনু-সন্ধানের জন্যে যে সরকারী দল দ্বীপে অভ্যন্তরে গিয়েছিলেন, তাঁদের মতে শোমপেন হিংস্র বা নরঘাতক নয়। তাদের সঙ্গে এখন কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। গ্রে নিকোবর এবং লিটল নিকোবর দ্বীপের মাঝে অর্ধ বর্গমাইল আয়তনের কোণ্ডুল দ্বীপ ভারতবর্ষের সর্বদক্ষিণ শাসন কেন্দ্র। সা দ্বীপ পরিক্রমা করতে মিনিট কুড়ির বেশি স লাগে না। বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত সরকা কর্মচারী, ব্যবসায়ীর লোকজন এবং সাম কয়েকজন আদিবাসী ঐ ছোট দ্বীপে বি জীবন যাপন করে। চারদিকে সমুদ্র প্র অশান্ত, তার উপরে বর্ষার ক-মাস এখ বৃষ্টিপাতও হয় প্রচুর। ছোট দ্বীপের অব জীবন যে কিরকম একঘেয়ে হতে পারে

মিছিল

শ্রীমতী প্রভা দত্ত

লৌহ প্রাচীর আজও খাড়া হয়ে আছে ঃ
মিছিল চলেছে, মিছিলের শেষ নেই,
য়্যাটম পৃথিবী হুঙ্কার ছাড়ে আজও,
শান্তি যুদ্ধে শক্তিহীনেরা মরে।

আকাশে এখনও কোয়াক পাখীর ভীড়
বলাকা শাখায় সন্ধ্যার অবকাশ ঃ
দূর হতে দেখে কোন্ সে তীরন্দাজ—
মধুর হাসিতে মৃত্যুর ছোঁওয়া লাগে।

নতুন করে কি বাঁচবার সাড়া জাগে ঃ
সংকেত তার ঝড়ো আকাশের বুকে,
অথবা জীবন নিঃসাড়ে হবে শেষ
কোন কথা বুঝি নিষ্ফল হবে বলা।

মিছিল চলেছে, মিছিলের শেষ নেই
স্বস্তি মেলায় নাটকের অভিনয়—
কুরু পাণ্ডবে মারামারি হবে জানি ঃ
বলাকা শাখায় মৃত্যুরই গান শুনি।

ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যের পক্ষে বোঝা অসম্ভব। চাওড়ার থেকে আয়তনে অনেক ছোট হলেও, কোণ্ডুলের কুয়োতে পরিষ্কার, মিষ্টি জল পাওয়া যায়। ছোট ঝরণাও আছে। নিকোবর দ্বীপমালার কোথাও কোথাও দেখেছি যে, জোয়ারের সময় সমুদ্রের ধারে ছোট কুয়োতে জল থাকে, আবার ভাটার সময় জল নেমে যায়। পূর্ণিমা, অমাবস্যায় ভাটার টানে কুয়ো একেবারে শুকিয়ে যায়। অথচ, সেখানকার জল খেতে বিস্বাদ লাগে না।

নিকোবরের জনবিরল দক্ষিণ দ্বীপমালায় এখনও গোপনে চীনা নাবিকরা মোটর বোটে করে যাওয়া-আসা করে। সামুদ্রিক শামুক-টারবো, ট্রকাস—সংগ্রহ করে কখনও গ্রামবাসীদের কাছ থেকে, আবার অধিকাংশ সময় নিজেরাই ডুবুরি নিয়ে আসে এবং শামুক ধরে নিয়ে যায়। মাঝে মাঝে ধরাও পড়ে। একবার জাপানী নাবিকরা সাম্পান এবং মোটর বোট নিয়ে ধরা পড়ে। বহু জিজ্ঞাসাবাদের পর জানতে পারা যায় যে, তারা এসেছিল সুদূর ওকিনাওয়া থেকে। এ অঞ্চলের সমুদ্র ও খাড়ির পথ সম্বন্ধে এত গভীর এবং নির্ভুল ধারণা তাদের কিভাবে হয়েছিল, তার অবশ্য কোনও জবাবই তারা দেয়নি। বিভিন্ন মহল থেকে এরকম অভিযোগ শোনা যায় যে, অবাঞ্ছিত আগন্তুকের দল দ্বীপবাসীদের অনিষ্টকর উপঢৌকন দিয়ে লেন-দেন চালায়। এই সূত্র থেকেই লিটল আন্দামানের ওঙ্গি আদিবাসীদের মধ্যে আফিম দেওয়া হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। সম্প্রতি শক্তিশালী মোটর বোট দিয়ে এই দীর্ঘ তটরেখা টহল দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

নিকোবারিদের সামাজিক জীবন

নিকোবারি সমাজ জীবনের মূলকথা হচ্ছে পরস্পরের সহযোগিতা। গৃহনির্মাণ, ক্যানোর বাইচ খেলা, নতুন বাগিচা তৈরি, নারকেল বাগান পরিষ্কার করা—প্রতিটি কাজেই প্রতি গৃহস্থ অন্যের সক্রিয় সহযোগ পায়। কাজের শেষে বিরাট ভোজের মধ্যে দিয়ে গৃহস্থ সমস্ত কর্মীদের আপ্যায়িত করেন। নারকেল গাছে চড়া এবং ক্যানোতে লম্বা পাড়ির বৈঠা চালানো ছাড়া, মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সব কাজই করে। নাচে, গানে, উৎসব অনুষ্ঠানে নারীদের স্থান বিশেষ করে দেওয়া হয়।

নিকোবারিদের সততা, সত্যবাদিতা এবং হাস্যময় অনাড়ম্বর জীবনের কথা বহু আগন্তুকই বলেছেন। আগেই বলেছি যে, সমাজ গড়ে উঠেছে তু-হেটকে কেন্দ্র করে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে ছোট বিছানা, সামান্য পরিধেয় বস্ত্র এবং প্রসাধন উপাদান। বাগান-বাগিচা, কুটীর, ক্যানো সবই যৌথ সম্পত্তি। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তার বেচা-কেনা নিষিদ্ধ। তু-হেট প্রধান নিজের গৃহস্থালীর প্রয়োজন মিটোবার জন্যে শুকনো নারকেল শাঁস বা কোপরা, সুপুরী প্রভৃতি বিক্রি করে কাপড়, লোহার যন্ত্রপাতি, তামাক, দেশলাই এবং, সাবান এবং কখনও কিছু চাল, আটা কেনেন। তাই সবাই ভাগ করে নেয়।

স্বগোত্রের বাইরে যুবক-যুবতী নিজেদের জীবনসাথী নির্বাচন করে এবং প্রধানদের সে সংবাদ জানিয়ে দেয়। একই গ্রামের বর এবং কন্যা হলে গ্রামবৃদ্ধেরা মিলে স্থির করবেন যে কোন তু-হেটএর জমি-জায়গা বেশি এবং লোকের প্রয়োজন কার বেশি। সেই অনুসারে ঠিক হয় যে বর বা কন্যা কোথায় গিয়ে স্থায়ী-

নিকোবর সুন্দরীরা — শ্রীমতী বীথি সরকার

ভাবে বসবাস করবে। মেয়ে স্বামীর ঘরে বা বর স্ত্রীর তু-হেটএ গেলে সেখানকারই একজন হয়ে তাকে থাকতে হয়। আগেকার গৃহস্থালীর সঙ্গে তার আর কোনও সম্পর্কই থাকে না। কার নিকোবরে মিশনারী প্রভাবে বিবাহ-বন্ধনের মধ্যে যথেষ্ট দৃঢ়তা এসেছে। অন্য দ্বীপমালায় এখনও বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং নতুন করে বিবাহ খুব সহজেই হয়। যে কোনও পক্ষ অবনিবনার অভিযোগ করলেই, গ্রামবৃদ্ধরা তাদের বিবাহবন্ধন ছিন্ন করার অনুমতি দেন। তবে, একসঙ্গে দুই স্ত্রী রাখার অধিকার সমাজ স্বীকার করে না। বাল-বিবাহ একেবারে অচল, বিধবা বিবাহ সম্পূর্ণ সমাজ-স্বীকৃত। বিবাহের জন্যে অথ্ষ্টান নিকোবারিদের কোনও বিশেষ রীতি বা আচার নেই। ভোজের আয়োজন করে প্রতিবেশী, আত্মীয়-বন্ধুদের বিবাহ সংবাদ দিলেই চলে।

নিকোবারিদের নিজস্ব কোনও ধর্ম ছিল না এবং আজও তাদের কিছু লোক ধর্মের বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না। সিয় বা শয়তান সম্বন্ধে প্রচুর ভীতি আছে। শয়তানের কারসাজি থেকে মুক্তি দেবার জন্যে ত-মি-লু-য়োনো বা মি-লু-য়োনো (ওঝা পুরোহিত) কোনও কোনও গ্রামে আছে। ঝাড়ফুঁক করা উপলক্ষে নাচ-গানের আসর বসে এবং তা চলে মাস মাসের ধরে। নানকৌড়ী দ্বীপমালায় এইরকম নাচের অবিরাম মহড়া চলে ঘরের মধ্যে। কাঠের মেঝে নাচিয়েদের উদ্দাম পদক্ষেপে ফেটে যায়। সেই ভাঙ্গা মেঝে জোড়া দিতে যেটুকু সময় লাগে, সেই হলো অহোরাত্র উৎসবের বিরতি। চাওড়া দ্বীপে এখনও সমাজ-বিরোধী অপরাধীকে শাস্তি হয় শয়তান বলে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। পূর্বজদের পূণ্যাস্থি খুঁড়ে বের করে বিশেষ সমারোহ করে ভোজন-পান এবং নাচ-গানের অনুষ্ঠান হয়। সর্ব্বাতিপন্ন গ্রাম প্রধান কয়েকনার মৃতাস্থি নিয়ে এই উৎসব করে। নানকৌড়ী এবং দক্ষিণের দ্বীপমালায় বড় বড় কাঠের পুতুল তৈরি করে ঘরে রাখা হয় শয়তান বিতাড়নের জন্যে। শয়তানের ভীতি সমস্ত গ্রামকে অভিভূত করে ফেলে যেদিন কারো মৃত্যু হয়। কারনিকোবরে আমার নিকোবারি পাচক নিষ্ঠাবান খৃষ্টান হয়েও এরকম দুর্ঘটনার সংবাদ পেলেই রাত্রি হবার আগেই আমাকে ফেলে রেখে পালাতো। ধমকানি, অনুরোধ, আশ্বাস কোনও কিছুই তাকে ভূতভীতিমুক্ত করতে পারে নি। পরের দিন সকালে কাজ করতে এলে, আমার দিকে দেখিয়ে বলেছি যে, শয়তান কি করতে পারে। আর মিথ্যা ভয়ে পালিও না। নিকোবারি জবাব দিয়েছে,—বহিরাগত (তা-ওই) তুমি, তাই শয়তান তোমাকে উত্যক্ত করবে না। কিন্তু, আমি যে তারিক (নিকোবারি বা মানুষ)। আমার শিক্ষা আছে সি-অর হাতে পড়লে।

—
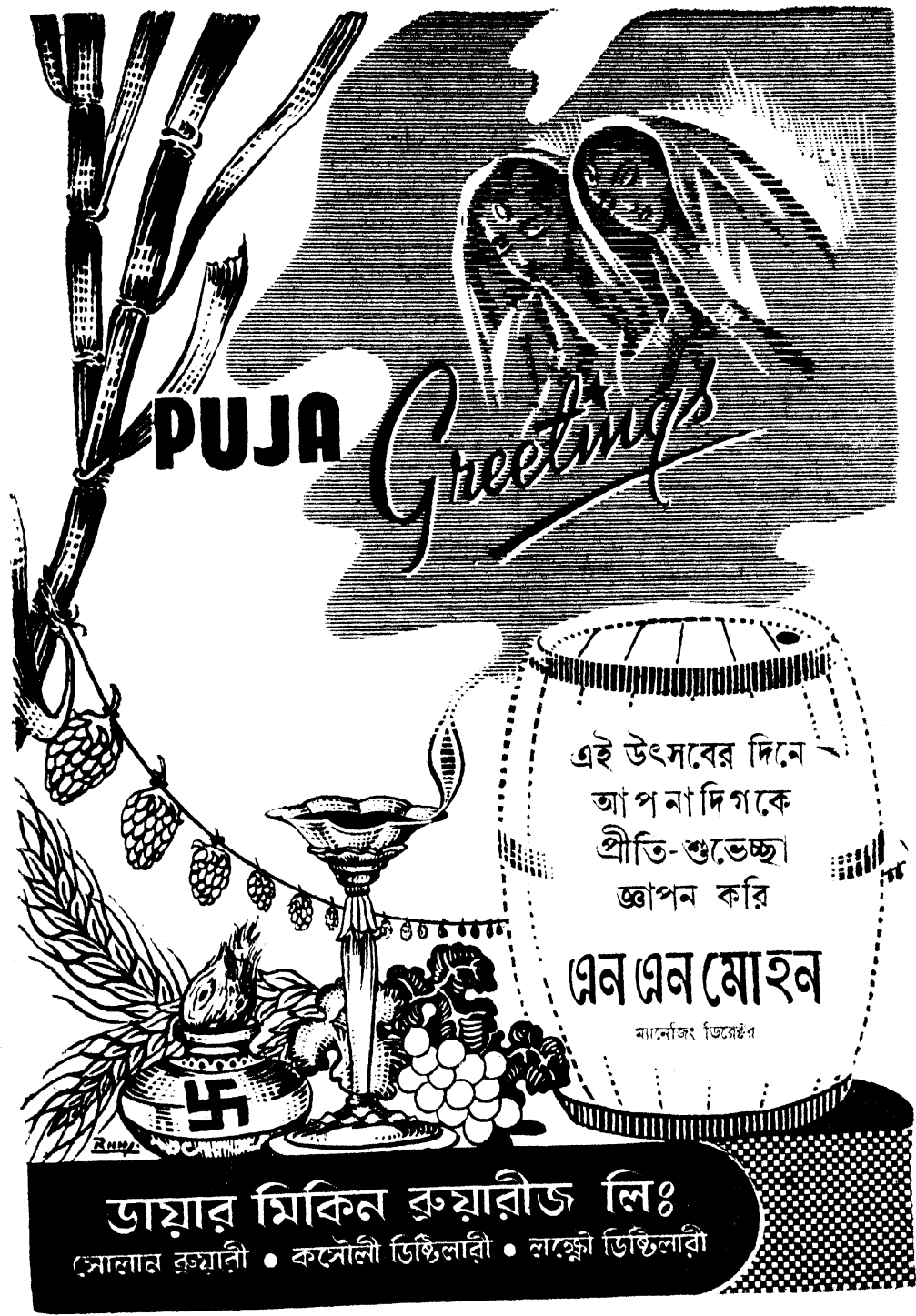
PUJA Greetings
এই উৎসবের দিনে
আপনাদিগকে
প্রীতি-শুভেচ্ছা
জ্ঞাপন করি
এন এন মোহন
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডায়ার মিকিন ব্রুয়ারীজ লিঃ
সোলান ব্রুয়ারী • কসৌলী ডিষ্টিলারী • লক্ষ্ণৌ ডিষ্টিলারী

হায়না

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

স সকলেই ভেবেছিল ভাতুয়া মরবে। কিন্তু সে মরলো না। তার দেহের নীচের অংশটিকে ভেঙে দিয়ে মৃত্যু বিদায় নিল। ভাতুয়া তিনবার মেঝেতে থুতু ফেলে অশ্লীল গালমন্দ ক'রে মৃত্যুদেবতাকে। এমনি করে বেঁচে থাকাও পাপ। শালা যম ঠাকুরের কি আক্কেল দেখেছিস ক্ষীরিয়া—

ভাতুয়ার জোয়ান বৌ ক্ষীরিয়া মুচকি হেসে বলে, তোকে নিয়ে যায়নি ব'লে বুঝি ঠাকুর তোর শালা হ'লো?...

নয়তো কি—ভাতুয়া চীৎকার ক'রে ওঠে, ব্যাটার কোন আক্কেল নেই। একটুও বিচার নেই। আমাকেও খতম ক'রেছে তোকেও আধমরা ক'রে রেখেছে। তোর এই কাঁচা বয়েস......

ভাতুয়ার দু'চোখ ক্ষুধার্ত হায়েনার মত জ্বলে জ্বলে একসময় অক্ষমতার হতাশায় করুণ হ'য়ে ওঠে।

ক্ষীরিয়া সবরকম দেখে, হাসতে গিয়েও ফুঁকিয়ে উঠলো। বললে, তুই কি পাগল হ'য়ে গেলি ভাতুয়া? তুই বেঁচে গেছিস্ সেই আমার কপালজোর। আবার ঠাকুর দেবতাকে গাল পারিস!

ভাতুয়া আর একবার মেঝেতে থুতু ফেলে হুঙ্কার ছাড়লে, ও শালা নেইরে ক্ষীরিয়া— ভাতুয়ার দু'চোখ একটা অব্যক্ত বেদনায় বুজে আসে।

ক্ষীরিয়া ভাতুয়ার সান্নিকটে এগিয়ে যায়। ওর চুলগুলি মুঠোর মধ্যে নিয়ে মৃদু আকর্ষণ ক'রে বিমর্ষকণ্ঠে বলে, তুই এমন ক'রে ভেঙে পড়লে আমি বাঁচব কেমন ক'রে ভাতুয়া!

কণ্ঠস্বরের এই পরিবর্তন ভাতুয়ার কানেও ধরা পড়ে। সে স্ত্রীর একখানি হাত শক্ত ক'রে চেপে ধরে। ক্ষীরিয়া বাধা দেয় না। খানিক চুপ ক'রে ব'সে থেকে একসময় ভাতুয়ার মুঠি থেকে নিজের হাত মুক্ত ক'রে নিয়ে ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়। মাথার ভিতরটা তার দপ্ দপ্ ক'রছিল। বাইরের খোলা হাওয়ায় ওর ভিতরের উত্তাপ অনেকখানি প্রশমিত হয়। ভাতুয়া জেনে-শুনেও যে কেন এমন করে!···...

ক্ষীরিয়া বহুক্ষণ ধরে তার চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দেয়। তারপর এক সময় দাওয়ার উপর এসে বসে। নিজের বর্তমান অবস্থাটা তার বারে বারে মনে পড়ে। সে চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু নিজের কথা ভাববার সময় তার কোথায়? এই বেলা প্রস্তুত না হ'লে টাইমে পৌঁছুতে পারবে না। রোজ কাটা গেলে রুটি মিলবে না।

এখুনি হয়তো লছমিয়া এসে পড়বে। মেয়েটা যাবার পথে রোজই তাকে ডেকে যায়।

ক্ষীরিয়া পুনরায় ঘরে প্রবেশ করলে। ভাতুয়াকে খাইয়ে দাইয়ে রোজকার মত উপদেশ দিয়ে যাবার উদ্যোগ করতেই সে তাকে আহ্বান করলো, এবারের হপ্তা পেয়ে তুই একটা কাপড় আর একটা ঝুলো কিনে নিস ক্ষীরি।

কাপড়টা তার শতচ্ছিন্ন হয়েছে—কুর্তাটাও কিছু অবশিষ্ট নেই। সর্দার বুড়োর জোয়ান ছেলেটাও ঐ দিকেই সব সময় আঙুল দিয়ে দেখায়। বলে, তুই কেন এমন ক'রে বেড়াস ক্ষীরি। বলিসতো তোর ঘরের মরাটাকে দু'জনে মিলে রেল লাইনে তুলে দিয়ে আসি। যেটুকু আছে শেষ হ'য়ে যাক...তারপরে...কথাটা শেষ না ক'রে সে বিশ্রীভাবে হাসতে থাকে।

ক্ষীরিয়া তার কাপড়-চোপড় সামলাতে গিয়ে আরও হাস্যাস্পদ হয়।

মরদটা বলে, তোর জন্য কাপড় কিনে রেখেছি—নিবি ক্ষীরি?

ক্ষীরিয়ার চোখে জল এসে পড়ে, কিন্তু সে দমে না। ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, ঐ কাপড় গলায় বেঁধে তুই মরগে যা।

ক্ষীরিয়ার এ তিরস্কার সে গায় মাখে না। হাসতে হাসতে চলে যায়। ক্ষীরিয়া কিন্তু তখনি চলে যেতে পারে না। মরদটা দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়ার অপেক্ষায় বহুক্ষণ তাকে একই স্থানে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।......

ক্ষীরিয়ার তরফ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে ভাতুয়া পুনরায় কথা ক'য়ে উঠলো, আমার কথাটা কি শুনতে পাসনি ক্ষীরি?...

ক্ষীরিয়া এতক্ষণে জবাব দিলে, শুনবো না কেন! হপ্তার টাকায় সাড়ী আর ঝুলো কিনলে খাবো কি ব'লতে পারিস?

ভাতুয়া যেন আর্তনাদ ক'রে উঠলো, তাই ব'লে তুই এই ছেঁড়া কাপড় পরে রোজ রোজ খাদে যাবি!

ক্ষীরিয়া অন্যমনস্কভাবে ব'লতে থাকে, তুই যখন দিতে পারতিস তখন যেতাম না ভাতুয়া। এখন দেবার লোক নেই তাই যেতে হ'চ্ছে।

কিছু একটা জবাব দেবার জন্যই ভ মুখ তুলেছিল। সহসা বাইরে থেকে লছ আহ্বান শোনা গেল, চলরে ক্ষীরি—

ক্ষীরিয়া মুহূর্তে বাইরে চলে এল। ব ভাল করে বন্ধ ক'রে দিয়ে লছমিয়ার এগিয়ে চললো।

আজ ছ'মাস ধরে ঠিক একই নিয়মে দিন চলছে। ক্ষীরিয়ার উদয়াস্ত পরিশ্রমের যা ঘরে আসে তাতেই ওদের কোনরকমে যায়।

স্বামী স্ত্রী একটু "হাঁড়িয়ার" স্বাদ কিংবা বুনো শুয়োরের মাংস খাওয়া এক ভুলেই গেছে। ভাতুয়া মিথ্যে বলে না মরেই গেছে—আর ক্ষীরিয়া মরে বেঁচে আ

পথ চলতে চলতে লছমিয়া বারে ক্ষীরিয়াকে দেখছিল। তার ছিন্ন বস্ত্র ফাঁকে ফাঁকে নিটোল দেহের উঁকি- লছমিয়াকে শঙ্কিত করে তুলেছে। ওর মর নাকি ভাতুয়ার বাড়ীর আনাচে-ক ঘোরাঘুরি সুরু করেছে। মরদগুলোর আর কি··...

লছমিয়ার দৃষ্টিকে অনুসরণ ক'রে এ খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে ক্ষীরিয়া। তোকেও বুঝি ভুলুয়ার বেমারীতে ধ ভুলুয়াকে তাড়িয়ে দিয়েছি, কিন্তু তোকে না। কথাটা শেষ ক'রে আর একদফা হেসে সে লছমিয়াকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে।

লছমিয়া ধীরে ধীরে নিজেকে মু নিয়ে বলে, তুই মর রাক্ষুসী......

সন্ধ্যার কিছু পূর্বেই ক্ষীরিয়া এসেছে। ঘরের কাছে এসেই সে শঙ্কিত উঠলো। তার নিজের হাতে বন্ধ করা ঝাঁপ পড়ে আছে। শালবনের প্রায় গা ঘেঁষেই কুঁড়েখানি। কাছে পিঠে আর কেউ বাস না। ভীত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। ক্ষী পায়ের গতি দ্রুত হ'য়ে উঠলো। ঘরে প্রবেশ সে থমকে দাঁড়াল। ঘরময় মাংসের ছড়িয়ে আছে। আর ভাতুয়ার ঠিক পাশেই হ'য়ে পড়ে আছে পচাই'র হাঁড়ি একটা। চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে শিব-নেত্র হ'য়ে। মান বিশৃঙ্খলা। ক্ষীরিয়ার মুখভরা কাঠি উঠলো। খানিক চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কেমন নিঃশব্দে সে ঘরে প্রবেশ ক

...নি নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে দাওয়ায় এসে উপস্থিত হলো।

একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে আছে ...রিয়া। কোথা থেকে এলো "পচাই" কোথা থেকে এলো ঝলসানো মাংস, এখবর সে জানে ... কিন্তু কি জানি কেন একটা অকারণ ...শংকায় ওর বুকের ভিতরটা দুর-দুর ক'রে উঠলো।

কখন যে সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে, কখন যে ম্লান জ্যোৎস্না চতুর্দিকের গাছপালা আর পাহাড়ের ...য়ে ছড়িয়ে পড়েছে তা পর্যন্ত এতক্ষণ লক্ষ্য ...রেনি ক্ষীরিয়া। কাছাকাছি কোথাও মাদল বেজে ...তে সেও যেন ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। ...শেপাশের এই স্নিগ্ধ সুন্দর পরিবেশ আর ...র থেকে ভেসে আসা মাদলের মৃদু শব্দ ...ক্ষীরিয়ার বুকের মধ্যে একটা সুরের ...মাদনা নিয়ে এসেছে। কণ্ঠ তার গুনগুনিয়ে ...ঠলো। কিন্তু স্বপ্নের এ মোহ কেটে যায় ...পন কন্ঠস্বরে। তার কাছে জীবন্ত সত্য আজ ...তুয়া—অক্ষম বিকলাঙ্গ একটি মানুষ। ...দিও ছ'মাস পূর্বে সে এমন ছিল না। প্রকাণ্ড ...রীর আর প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী ছিল ...তুয়া—যে শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ ...রে বিশ্বসংসার ভুলে থাকতো সে। ...মান সুন্দর জ্যোৎস্না রাত দাওয়ায় ... তারা কাটায়নি কোনদিন। এক ...তে বল্লম আর হাতে ক্ষীরিয়াকে বেষ্টন করে ...সম্মুখের ঐ শাল বনের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে ...তো তারা। শক্তির গর্বে ভাতুয়া কোন ...কেই গ্রাহ্য করেনি কোনদিন। ভুলনের ...ঠির মধ্য থেকে কেড়ে নিয়েছিল ক্ষীরিয়াকে। ...শেষ পর্যন্ত লছমিয়াকে সাদি করে ঘর ...বেঁধেছে। কিন্তু যে শক্তির অহংকারে সে বুক ...ফুলিয়ে বেড়াতো, কয়লা খাদের ধ্বস চাপার ... থেকে তা কি ওকে বাঁচাতে পেরেছে। যে ... ফিরে পেয়েছে তা মৃত্যুর চেয়েও ...র বেশী মর্মান্তিক, ঢের বেশী ভয়াবহ।

ক্ষীরিয়ার মনটা ধীরে ধীরে নরম হ'য়ে এল। ...র্বের সঙ্গে বর্তমানের তুলনা করতে বসলেই ... যেন মনটা ওর একদিকেই ঝুঁকে পড়ে। ...তুয়ার শিশুর মত অসহায় অবস্থার কথা ...ভবে ক্ষীরিয়া তার নিজের সুখ দুঃখকেও ভুলে ...বার চেষ্টা করে।

ক্ষীরিয়াকে উঠতে হ'লো। বহুক্ষণ সে ...কারণে নষ্ট ক'রেছে। ঘর দুয়ার সব এক ঠাঁই ...য়ে আছে। তাকেই সব মুক্ত করতে হবে। ...বারে আর ক্ষীরিয়া নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করলে ... অনাবশ্যক একটা শব্দ ক'রে ঝাঁপটা আরও ...নিকটা সরিয়ে দিলে। ভাতুয়া তার আরক্ত চোখ ...মেলে তাকাল। ক্ষীরিয়াকে ঘরে প্রবেশ করতে ...দেখে একমুখ হেসে জড়িত কণ্ঠে বললে, আজ ...খেয়েছি...... তোর জন্যেও রেখে দিয়িছি। ...শালা ভুলন কি রাখতে চায়.........

ক্ষীরিয়া স্থির দৃষ্টিতে ভাতুয়ার মুখের ...পানে চেয়ে থাকে—কোন কথা বলে না।

ভাতুয়া তেমনি আড়ষ্ট কণ্ঠে ব'লতে থাকে, ...ষ্টীর ব'লছি ক্ষীরি... শালা তোকে খুব ভয় ...করে।

ক্ষীরিয়া তেমনি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে। ভাতুয়া নিজের খেয়ালেই বলতে থাকে, ...শালা সারাদিন এখানে বসে টেনেছে। তোর ...বসে আসবার সময় হ'তেই পালিয়েছে...

ক্ষীরিয়া তথাপি কোন জবাব দেয় না। কি জবাব সে দেবে। ভাতুয়ার দীর্ঘদিনের উপবাসী মন আর পেট ভুলনের কৃপায় ভরেছে। সেই আনন্দেই ও বিভোর। কেন নিয়ে এলো 'পচাই', কেন এলো ঝলসানো শুয়োরের মাংস সে খবর ও জানতেও চায় না।

সহসা ক্ষীরিয়ার দৃষ্টি গিয়ে বাইরে থমকে দাঁড়াল। কিছু পূর্বের ম্লান জ্যোৎস্নাটুকু হঠাৎ ভেসে আসা একখণ্ড কাল মেঘে ঢেকে ফেলেছে। অন্ধকার হ'য়ে গেছে চতুর্দিক। আর সেই অন্ধকারে ঘোরা-ফেরা করছে জোড়ায় জোড়ায় ক্ষুধার্ত চোখ। ক্ষীরিয়া সেই জ্বলন্ত চোখের আগুনে আড় চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে তার উদ্ধত যৌবন-দীপ্ত দেহটাকে আর দেখে ভাতুয়াকে—জড় এক-তাল মাংস পিণ্ডকে.........

সহসা ভাতুয়ার চীৎকারে ক্ষীরিয়া সচমকে দু'পা এগিয়ে গেল তার দিকে। ক্লান্ত গলায় বলে, অত চেঁচাচ্ছিস কেন—

তোর নেড়ি কুত্তার কাজ...... ভাতুয়া বলতে থাকে, ভুলন খাচ্ছিল, আমি খাচ্ছিলাম আর হারামজাদী ঘরের বাইরে ছোঁক ছোঁক ক'রছিল। একটা টুকরোও দিইনি আমি...আর তোর ভাগ-টাই খেয়ে গেল আর দ্যাখ দ্যাখ ক্ষীরি হাঁড়ি উলটে পচাইটুকুও চেটে-পুটে খেয়েছে। ভাতুয়া বার কয়েক খেদোক্তি করে পুনরায় নিস্তেজ হ'য়ে পড়লো।

ক্ষীরিয়া এত কথার একটিও জবাব না দিয়ে ঘর-দোর পরিষ্কার ক'রতে লেগে গেল। ভাতুয়া তার কুকুরটাকে যতই গালমন্দ করুক ও কিন্তু মনে মনে খুশীই হ'য়েছে। ঐ পচাই আর মাংস সে হাতে তুলে মুখে দিতে পারতো না।

হাতের কাজ শেষ ক'রে ক্ষীরিয়া তার নিজের জন্য দুটো ফুটিয়ে নেবার ব্যবস্থা ক'রতে বাইরের দাওয়ায় এসে উপস্থিত হ'লো।

কাল মেঘ ইতিমধ্যে সরে গিয়েছে। নরম আর মিষ্টি জ্যোৎস্নায় স্নান ক'রে আশে-পাশের সব কিছুই স্বপ্নময় হ'য়ে উঠেছে। ক্ষীরিয়া তার দৃষ্টি আর মনকে ফিরিয়ে আনলে ঘরের দাওয়ায়। গোটা কয়েক শুকনো পাতা আর ডাল গুঁজে দিলে চুলোর মধ্যে। ভাতটা সবে ফুটতে আরম্ভ ক'রেছে।

কুকুরটাও দাওয়ার একপাশে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। ক্ষুধার নিবৃত্তি হ'য়েছে রাজসিক আহার্যে, তাই আজ আর ক্ষীরিয়ার পায় পায় ঘুরে বেড়াবার প্রয়োজন বোধ ক'রছে না।

বেশ রাত হ'য়েছে। ভাতটাও নেমেছে। ক্ষীরিয়ার পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠছে। ফ্যানে আর ভাতে খানিক নুন ছড়িয়ে দিয়ে গিলছে সে। ... কুকুরটা নিঃশব্দে ঘুমাচ্ছে...ঘুমাচ্ছে ভাতুয়া। জেগে আছে আকাশের তারাগুলি। ঝিকমিক করছে। কাঁপছে। কোন দিকে খেয়াল নেই ক্ষীরিয়ার। দ্রুত হস্তে সে তার আহার-পর্ব শেষ ক'রতে ব্যস্ত।

খাওয়া শেষ করে ঘরে এসে সে ঝাঁপটা টেনে দিলে। কলসী থেকে এক লোটা জল গড়িয়ে নিয়ে ঢক্ ঢক্ ক'রে শেষ ক'রে তার ছেঁড়া মাদুরটা পেতে শুয়ে পড়লো। এই সময়টুকু ক্ষীরিয়ার একরকম ভালই কাটে। নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায়।

ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে ফালি ফালি জ্যোৎস্না এসে ঘরের মধ্যে পড়েছে। নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে ক্ষীরিয়া তার ছেঁড়া মাদুরে একখানা হাতকে মুড়ে উপাধান ক'রে। এই মাত্র মাটি কাঁপিয়ে বোম্বাই মেইল চলে গেল। ভাতুয়া জেগে উঠেছে। চোখ মেলে তাকিয়েছে সে। এ প্রান্তে ভাতুয়া ও প্রান্তে ক্ষীরিয়া। ব্যবস্থাটা ক্ষীরিয়ার। অকারণে মন আর দেহকে পীড়ন ক'রে লাভ নেই।

বাইরের জ্যোৎস্নার একফালি ক্ষীরিয়ার মুখের আর বুকের উপর এসে থেমে আছে। ভাতুয়া চেয়ে চেয়ে দেখছিল। আজ সে নেশা করেছে প্রাণ ভরে। রক্তের মধ্যে অনুভব ক'রছে একটা পরিচিত উন্মত্ত নর্তন। ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠেছে ভাতুয়ার নির্জীব পেশীগুলি। দুর্জয় আবেগে উঠে বসতে গিয়ে কাত হ'য়ে পড়ে গেল ভাতুয়া। ওদের নেড়ি কুকুরটার মত লোলুপ হ'য়ে উঠেছে তার দুটো চোখ। বুকে হেঁটে এগিয়ে আসছে ভাতুয়া একটা সরীসৃপের মত। বিষ দাঁত আর কোমর ভাঙ্গা একটা ক্ষুধার্ত সরীসৃপ।

ক্ষীরিয়ার মুখে হাসির প্রলেপ। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই সে হাসছিল। হয়তো সে স্বপ্ন দেখছিল। সুন্দর সম্পূর্ণ একটি স্বপ্ন।......

বুকে হেঁটে এগিয়ে আসছে ভাতুয়া এক দুর্নিবার শক্তিতে......ধীরে অতি সন্তর্পণে। দৃষ্টি দিয়ে সে লেহন ক'রছে ক্ষীরিয়ার অসম্বৃত যৌবনকে... ।

একটা গরম নিঃশ্বাস মুখের উপর অনুভব করল ক্ষীরিয়া। ঘুমের ঘোরেই একখানা হাত উঠে এসে ভাতুয়ার কন্ঠলগ্ন হ'য়ে থেমে গেল। ভাতুয়া হাঁপাচ্ছে। ক্ষীরিয়া জেগে উঠেছে। স্বপ্নের ঘোর তখনও তার কাটেনি। চোখ মেলে সে চাইছে না। যতক্ষণ এই ঘোরটুকু লেগে থাকে থাক......

ভাতুয়ার নিঃশ্বাসের উত্থান পতন দ্রুত আর ভারী হ'য়ে ওঠে। ক্ষীরিয়া চোখ মেলে তাকায়। ভাতুয়ার কাণ্ড দেখে ও আশ্চর্য হ'লেও কোনপ্রকার বাধা দিল না। কেমন যেন মায়া লাগছিল।

বাইরে কখনও মৃদু কখনও জোরে বাতাস ব'য়ে চলেছে। ঘরের মধ্যের জ্যোৎস্নাটুকুও আর অবশিষ্ট নেই। ভাতুয়া তার অক্ষমতার লজ্জা নিয়ে পুনরায় বুকে হেঁটে নিজের বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। ক্ষীরিয়া উঠে গিয়ে চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দিয়ে আবার এসে তার ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে পড়েছে।

নিয়মের কিছুটা ব্যতিক্রম হয়েছে আজ। ক্ষীরিয়ার ঘুম ভাঙ্গতে দেরী হ'য়ে গেছে। বাইরের আঙিনায় তখন কাঁচা রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। ভাতুয়া তখনও ঘুমাচ্ছে। কুকুরটারও কোন সাড়া নেই।

ক্ষীরিয়া দ্রুত তার নিয়মিত কাজগুলো ক'রে চলেছে। যার একটিও বাদ পড়লে চলবে না। ঘর নিকানো থেকে ভাতুয়াকে খাওয়ানো পর্যন্ত।

খেতে ব'সবার পূর্বে ক্ষীরিয়ার দিকে একটা কাগজের মোড়ক এগিয়ে দিয়ে খানিকটা সঙ্কোচ আর খানিকটা ভয়ে ভয়ে সে ব'ললো, একটা সাড়ী কাপড় আছে ওতে। খাদে যাবার আগে ওটা পরে যাস—

ক্ষীরিয়া নির্লিপ্ত নিরস কন্ঠে বললে, এবার বুঝি তোর হাত দিয়ে ভুলন পাঠালো—

ওর হাত থেকেই তুই একদিন আমায় ছিনিয়ে নিয়েছিলি ভাতুয়া......

ভাতুয়ার মুখে বোকার হাসি।

ক্ষীরিয়া একটু হেসে পুনরায় বললে, ওদের ছোট সাহেবও দুবার পাঠিয়েছিল। ফিরিয়ে দিয়েছি। ভয় দেখিয়েছে আমার নকরী কেড়ে নেবে—।

ভাতুয়া আর্তনাদ ক'রে উঠলো। নকরী গেলে খাবো কি ক্ষীরি—।

ক্ষীরিয়া খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো। বললে, তুই উপোস করবি আর আমি মজা ক'রে খাবো। এখন তোর হাত দিয়ে পাঠিয়েছে এবার নিজে হাতে দিয়ে যাবে। পচাই খাব ...... মাংস খাব......কাপড় আর ঝুলো পরবো ... মর...মর তুই শিগগির শিগগির মর...

... একবার মত আজও লছমিয়ার আহবান ... গেল। ক্ষীরিয়া আর দাঁড়াল না। দ্রুত ... বার হয়ে এলো। ভুলনের দেওয়া কাপড়টা ... আনতেও সে ভুললো না। পথ চলতে ... এক সময় কাপড়টা লছমিয়ার হাতে দিয়ে ... জিজ্ঞেস ক'রলো, কেমন হয়েছে রে লছমিয়া?

... ব'ললো, খুব ভালো। কিনলি ... পরে এলি না কেন?

ক্ষীরিয়া ব'ললে, কিনিনি। তোর মরদ ... এসেছে ভাতুয়ার কাছে। তুই ফিরিয়ে ... ।

লছমিয়া বাঁকা জবাব দিলে, তোকে দিয়েছে আমি ফিরিয়ে দেবো কেন, তুই পারিস।

ক্ষীরিয়া ঝংকার দিয়ে উঠলো। মরণ...... ... কাপড়খানা সে লছমিয়ার পানে ছুঁড়ে ... ।

লছমিয়া ভালমানুষটির মত কাপড়খানা ... নিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললো, তুই রাগ ... না, ক্ষীরি। ঐ কাপড় পরে তুই ... না হয় মর, ... আর দশটা কাচা ... চাঁইয়ে যাসনি।

ক্ষীরিয়া হেসে গড়িয়ে পড়ে। বলে, আমি ... যে তোকেও সেই সঙ্গে মরতে হবে ... ।

লছমিয়া একটা অবজ্ঞাসূচক হুংকার দিলে।

ছুটির পরে ক্ষীরিয়া আজ আর লছমিয়াকে ... পেল না। তাকে একলাই ফিরতে ... । লছমিয়া হয়তো ইচ্ছে ক'রেই আগে চলে ... । ক্ষীরিয়া একটা জনবিরল পথ ধরে ... ফিরছিল। বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই ... ভুলুয়ার সঙ্গে দেখা। ও অকারণেই ... হয়ে উঠলো। ভুলুয়া ততক্ষণে একমুখ ... ওর গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল।

ক্ষীরিয়া উত্তপ্ত কণ্ঠে বললে, আবার কেন ... তুই।—

ওর কথার ধরণে সে দু'পা পিছিয়ে গেল। ... তুই সব সময় অমন রাগ ক'রে থাকিস ... ক্ষীরি?......

ক্ষীরিয়া জবাব দেয়, তোরা সব সময় আমার পিছু নিস্ কেন?

এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে ভুলুয়া পাশ কাটিয়ে গেল। বললে, আজও ভুজন এসেছিল—

ক্ষীরিয়া খেঁকিয়ে উঠলো, তুই আমার বাড়ীতে দিনরাত আড়ি পেতে থাকিস কেন?.. ... ... সে আসবে তাতে তোর কি রে কুকুর কোথাকার।

ভুলুয়া বললে, ও শালা ছোট সাহেবের লোক......

ক্ষীরিয়া চুপ ক'রে থাকে।

ভুলুয়া সাহস পেয়ে পুনরায় বলে, তোর জন্যে একটা ফুলেল তেল এনেছিলাম ক্ষীরি...

ক্ষীরিয়া একটু হেসে বললে, তুই কার লোক রে ভুলুয়া? ...

ভুলুয়া উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো। বললে, বলেছে কোন্ শালা—

ক্ষীরিয়া হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, আমিই জিজ্ঞেস ক'রছিলাম।

ভুলুয়া নিস্তেজ গলায় ডাকলে, ক্ষীরি—

ক্ষীরিয়া হাত পেতে ব'ললে, দে তোর ফুলেল তেল...

ভুলুয়া সানন্দে তেলের বোতলটি ওর হাতে তুলে দিল। ক্ষীরিয়া হেসে উঠলো। ভুলুয়ার বুকটা দুরু দুরু ক'রে ওঠে। ওর এই ধরণের হাসির সংগে তার পরিচয় আছে। সে ভীত কণ্ঠে বললে, আবার তোর কি হ'লো ক্ষীরি?...

ক্ষীরিয়ার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠলো। সে ব'ললে, যদি নিতেই হয় তবে তোদের কাছে নেব কেন—ছোট সাহেবের ঠেঙেই নেব। কথাটা শেষ ক'রে সে তেলের বোতলটা দূরে ছুঁড়ে ফেললো। একখণ্ড পাথরের উপর পড়ে তা ভেঙে টুকরো টুকরো হ'য়ে গেল।

বোতল ভাঙার শব্দের সংগে সমান বেগে ক্ষীরিয়া হেসে উঠলো। ভুলুয়া ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু ক্ষীরিয়া তখুনি চলে যেতে পারল না। বরং কোন এক অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে গেল ভাঙা ফুলেল তেলের বোতলটার কাছে। চমৎকার একটা মিষ্টি একটা গন্ধ তার নাকে এল। ভুলুয়ার দেওয়া ফুলেল তেলের গন্ধ।

সামান্য মজুর ভুলুয়া। সামান্যতম তার উপহার। কিন্তু স্নিগ্ধ গন্ধটি সামান্য নয়। ক্ষীরিয়া সহসা সেখানে বসে পড়ে মাটি থেকে খানিক তেল তুলে তার মাথায় দিলে। তারপরে একসময় নিঃশব্দ চরণে ঘরে ফিরে এল ক্ষীরিয়া।

আজও ঝাঁপটা তেমনি খোলা পড়ে আছে। ... কুকুরটাও শুয়ে আছে—ঘুমে আচ্ছন্ন। নতুনের মধ্যে চোখে পড়লো আর একটি কুকুরকে। লেড়িটার গায়ে গা লাগিয়ে শুয়ে রয়েছে। ক্ষীরিয়ার ঠোঁটের কোণে খানিক হাসি ফুটে উঠলো।

আজ আর রান্না করতেও ভাল লাগছে না। একটা অপরিসীম ক্লান্তিতে তার দু'চোখ বুজে আসছে। নড়তে চড়তেও আলস্য লাগছে। ক্ষীরিয়া দাওয়ায় একটা বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে চুপ ক'রে বসে আছে। ফুলেল তেলের সুগন্ধ ওকে নাড়া দিয়েছে। তাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে অনেকদিন আগেকার জীবনে। যে জীবনে ছন্দ ছিল, সুর ছিল, বেগ ছিল।

ঘুমে ওর দুটি চোখের পাতা বুজে এল। এক সময় সে ঘরের মধ্যে উঠে এসে তার ছেঁড়া মাদুরে আশ্রয় নিল। এখানে শুয়েই সে মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে। আজও হয়তো দেখছিল। তবে তা অতীতের নয়—বর্তমানের। যে বর্তমান একটা নরম আর মিষ্টি সুগন্ধে মাখামাখি হয়ে তার মনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে ঘুমের মধ্যেও হয়তো ক্ষীরিয়ার অবচেতন মনের সংগে জড়িয়ে আছে ভুলুয়ার দেওয়া ফুলেল তেলের সৌরভ। মাটি থেকে যা ওর মাথায় উঠেছে।

ক্ষীরিয়া খিল খিল করে হাসছিল। তার পরেই শোনা গেল একটা চাপা আর্ত গোঙানি।

বোম্বাইগামী ট্রেণখানি চলে যাবার সংগে সংগেই ভাতুয়ার সমস্ত স্নায়ুগুলি সজাগ হয়ে উঠেছে। জেগে উঠেছে ভাতুয়া একটা পাশবিক উত্তেজনায়। আজ আর ঘরের মধ্যে জ্যোৎস্নার আবির্ভাব ঘটেনি। আন্দাজে এগিয়ে আসছে ভাতুয়া এঁকে-বেঁকে যেখানে ক্ষীরিয়া ঘুমে অচেতন হ'য়ে আছে। ওর দৃষ্টি তার পা থেকে ধীরে ধীরে উঠে এলো মুখের উপর। ধীরে অতি ধীরে নিজেকে টেনে নিয়ে এলো আরও নিকট সান্নিধ্যে। তার পরেই ছিটকে সে দূরে সরে গেল। এক দুর্দমনীয় ঈর্ষার বিষে জ্বলছে ভাতুয়া।

ভাতুয়ার হাতের পেশীগুলি কঠিন হয়ে উঠেছে। চোখে দেখা দিয়েছে আগুনের শিখা। দাঁতে দাঁত ঘষছে একটা নিষ্ফল ক্রোধে। ... সে পিছিয়ে গিয়েছিল তার চেয়ে ঢের বেশী

উপসংহার

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

শেষ দৃশ্যে গেল ঝুলে ড্রামা,
লঙ্কাকাণ্ডে নাটকের বেজেছে দামামা।
এর পরে জানকীর রসাতলে যাওয়া,
মাংসের পর যেন সুক্তোনি খাওয়া।
সাগর-লঙ্ঘন সিনে, সব চেয়ে পেল হাততালি,
অতএব হনু ভাই, এ টেম্পো বজায় রাখা—
তুমি পার খালি।
নাটকের রাখিতে মেরিট, সাগর লঙ্ঘন হনু
করিবে রিপিট।
সকলে সমস্বরে, বলে, হোক তাই,
আসল কথাটা হ'ল ড্রামা জমা চাই।
এই শুনে হনুমান হতবাক হ'ল!
সামান্য আর্টিষ্ট সে যে, কি করিবে বল!

নাটক জমেছে নাকি, হাউসেতে
জায়গা নাহি ধরে,
সীতা গেল রসাতলে, রাম কেঁদে মরে।
তারপর গেল ছুটে সাগরের কূলে
সেথায় দেখিল রাম, হনু ল্যাজ তুলে
'মা' বলিয়া লাফ দিল। আর ফিরিল না'।
এইখানে ড্রপ পড়ে। আর উঠিল না।
দর্শক হতভম্ব, নির্বাক রহিল,
ধন্য, ধন্য, ধন্য ধন্য ক্রিটিক কহিল।
অদ্ভুত ডাইরেকশন, নব দৃষ্টিকোণ,
হনুর পারস্পেকটিভে হ'ল রামায়ণ।
যদিও নাটক শেষ হনুর লম্ফনে,
কল্পনার রেশ তবু রেখে যায় মনে—
বিজন অশোক বন, ঘুঘু ডাকে দূরে,
সেইখানে হনু একা কাঁদে ঘুরে ঘুরে,
'মা-মা' বলি ডাক ছাড়ে সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে,
হনুর ট্র্যাজিডি কাঁপে লঙ্কার আকাশে।
বাল্মীকি ভাবেন বসে রত্নাকর হবেন আবার
ডাইরেক্টর ইত্যাদিকে লাঠ্যাঘাতে
করিতে সাবাড়?

এগিয়ে এলো এক দুর্নিবার শক্তিতে। তারপরে দু'হাতে ক্ষীরিয়ার কণ্ঠনালি চেপে ধরলো।

ঘুম ভেঙ্গে গেছে ক্ষীরিয়ার। ভাতুয়ার হাতের চাপে ওর চোখ দুটো ঠিকরে বেড়িয়ে আসতে চাইছে।

বিস্ময়ে ভয়ে খানিক স্তব্ধ হ'য়ে থেকে সে তার নিজের অবস্থাটা উপলব্ধি ক'রতে পারল। তারপরেই আচমকা ধাক্কা মারলে ভাতুয়াকে। ভাতুয়া দূরে গিয়ে ছিটকে পড়লো।

ক্ষীরিয়া ততক্ষণে উঠে ব'সেছে। আর ভাতুয়া অশ্লীল গালাগালি দিতে সুরু ক'রেছে, তোকে আমি খুন ক'রব হারামজাদী।

একটা অসহনীয় ক্রোধে আর ঘৃণায় ক্ষীরিয়ার দুচোখ জ্বলছে। মুখে অবশ্য সে একটি কথাও ব'ললে না।

ভাতুয়া আঘাতপ্রাপ্ত সাপের মত ফুলছে আর গর্জন ক'রছে. তাই ভুলনের দেওয়া কাপড় তোর পছন্দ হয়নি বজ্জাত কোথাকার—

ক্ষীরিয়ার ধৈর্যের আর সংযমের বাঁধ এতক্ষণে ভেঙ্গে পড়লো। সে বদ্ধ মুষ্ঠিতে ভাতুয়ার পানে এগিয়ে গেল। তার পরে কি ভেবে খানিক থুথু ওর মুখে ছিটিয়ে দিয়ে তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে ঘর ছেড়ে বাইরের দাওয়ায় এসে উপস্থিত হলো।

নেড়িটা তখনও নিঃসারে ঘুমাচ্ছে—নবাগত কুকুরটা তার গা চাটছে। ক্ষীরিয়া সবেগে সেই-দিকে এগিয়ে গিয়ে সজোরে লাথি মেরে কুকুরটাকে দাওয়া থেকে উঠানে ফেলে দিলে। আকাশ ফাটান চীৎকার ক'রে জন্তুটা ছুটে পালাল। ক্ষীরিয়া স্বগতোক্তি ক'রলে, ওরে আমার সোহাগ রে......

ক্ষীরিয়া চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে আকাশের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে। একটা বড় তারা ঠিক তার মাথার উপরে দপ দপ ক'রে জ্বলছে। ক্ষীরিয়া তার আপন হৃৎপিণ্ডের উত্থান পতনের শব্দটাও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। সর্দার বুড়োর জোয়ান ছেলেটা ঠিকই বলে ছিল। মরাটাকে টেনে নিয়ে রেল লাইনে ফেলে দেওয়াই উচিত ছিল। অনেক ঝুট ঝামেলা—অনেক দুর্ভাগ্যের হাত থেকে অব্যাহতি পেতো।

ভোর হ'তে খুব বেশী দেরী নেই। আকাশের পানে তাকিয়ে ক্ষীরিয়া অনুমান ক'রে নেয়। একসময় সে ব'সে পড়ে। তার পা টলছিল। মাথার ভিতরটা একেবারে যেন খালি হ'য়ে গেছে। ইতরটা তাকে এতবড় কথা বলে— তাকে খুন ক'রতে চায়! আর ওরই জন্য সে উদয়াস্ত কঠিন পরিশ্রম ক'রে চলেছে দিনের পর দিন। নিজের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, সাধ আহ্লাদ কোন কিছুকে প্রশ্রয় দেয়নি! ভাতুয়া মরে গেছে ব'লে সেতো আর মরেনি......

ক্ষীরিয়া সহসা চমকে উঠলো। অদূরে শাল বনের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল একজোড়া জ্বলন্ত লোলুপ চোখ......তারপরে পর পর আরও দুজোড়া। চোখগুলি হায়নার। চিনতে তার একমুহূর্ত বিলম্ব হ'লো না। চোখগুলো এগিয়ে আসছে সতর্ক গতিতে।

ক্ষীরিয়া তার তীর ধনুক পেড়ে নিয়ে প্রস্তুত হ'লো। চোখগুলি মিলিয়ে গেল। আপন মনে খানিক হেসে সে পুনরায় ব'সে পড়লো।

রোজকার মত আজও ক্ষীরিয়া খাদে চলে গেল। লছমিয়ার আহ্বানের অপেক্ষাও সে করল না—ভাতুয়াকে খাইয়ে দাইয়েও গেল না। ঝাঁপটাও সে ইচ্ছে ক'রেই বন্ধ করে দিল না। কিসের দায় তার। উপোস ক'রে মরে গেলেও সে আর ফিরে তাকাবে না।

পথে যেতে যেতে ভুলুয়াকে একলা পেয়ে ডেকে তার সঙ্গে কথা ব'ললে। তার ফুলেল তেলের অনেক সুখ্যাতি ক'রলে। বললে, তুই চলে যেতে জমিন থেকে একখাবলা তুলে মাথায় দিয়েছি। এই দ্যাখ। মাথাটা সে ওর নাকের ডগার কাছে নিয়ে এলো।

ভুলুয়া হি হি করে হেসে বিগলিত কণ্ঠে বললে, তবে ফেলে দিলি কেন ক্ষীরি......

চঞ্চল দৃষ্টি হেনে হাসি মুখে সে জবাব দিলে, তোকে পরখ ক'রবার জন্য। এই সাহস নিয়ে তুই পরের বউর সঙ্গে মিশতে যাস। ক্ষীরিয়া খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে।

ভুলুয়া ভয় পেয়ে এদিক ওদিক তাকায়।

ক্ষীরিয়া তার দেহটাকে নৃত্যের ভঙ্গীতে আন্দোলিত ক'রে বলে,—এ খাদের কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য খাদে যাবি ভুলুয়া। ভিন্ দেশে।

ভুলুয়া শঙ্কিত কুণ্ঠার সঙ্গে বললে, তুই কি ভাতুয়াকে ছেড়ে যেতে পারবি ক্ষীরি?......

ক্ষীরিয়া এক বিচিত্র দেহভঙ্গী করে ব'ললে, তুই আমার কথার জবাব দে ভুলুয়া—

ভুলুয়া স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ক্ষীরিয়ার পানে চেয়ে সহজ গলায় ব'ললে, তুই ভুলনের দেওয়া কাপড় পরেছিস কেন ক্ষীরি?......

ক্ষীরিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিলে, তোর ফুলেল তেল মাথায় দিতে পারলে ভুলনের কাপড় দোষ করল কি—ক্ষীরিয়া হেসে উঠলো।

ভুলুয়া অনুযোগের ভঙ্গীতে ব'ললে, তুই ভাল না ক্ষীরি.....

ওরে আমার ধম্মপুত্তুর রে......ক্ষীরিয়া রুখে দাঁড়াল।

ভুলুয়া আর কোন কথা না ব'লে দ্রুত সম্মুখের পানে এগিয়ে চললো। ক্ষীরিয়া পাগলের মত হাসতে থাকে।...

ক্ষীরিয়া সত্যই যেন আজ পাগল হ'য়ে গেছে। ছুটির পরে ও সোজা এসে উপস্থিত হ'লো ছোট সাহেবের খাস কামরায়। বললে, তোর কথা ভুলন আমাকে ব'লেছে সাহেব; আমাকে তুই নিয়ে চল্। আমি কাপড় পরবো, ঝুলা পরবো আর গয়না পরবো। বিলাতি মদ আর মাংস খাব। তোর সব কথায় আমি রাজী সাহেব।

কি মেঘই আজ ক'রেছে। চতুর্দিক অন্ধ-কারে ঢেকে ফেলেছে। এত অন্ধকারে নিজেকেও ঠিক চিনতে পারছে না ক্ষীরিয়া। কোন কিছুই চোখে পড়ছে না তার।

গভীর রাত্রে ছোট সাহেবের গাড়ীতে করে ক্ষীরিয়া ঘরে ফিরে এলো। গাড়ী থেকে নেমে সে স্থির হ'য়ে দাঁড়াতে পারছিল না। পা টলছিল। সর্বাঙ্গ তার কঁকিয়ে উঠেছে এগোতে গিয়ে। একটা অপরিসীম ক্লান্তি আর অবসাদে দাঁড়াতে পারছে না সে। কষ্টে নিজেকে সে টেনে নিয়ে এলো দাওয়ার উপর এবং সেখান থেকে ঘরের মধ্যে। ঝাঁপটা তেমনই খোলা পড়ে আছে। দু পা অগ্রসর হ'য়েই কিন্তু ক্ষীরিয়া থমকে দাঁড়াল পায়ের তলায় একটা তরল পদার্থ অনুভব করে। ওর অবসন্ন অনুভূতি কি যেন ইঙ্গিত ক'রল, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তবুও ক্ষীরিয়া [illegible] উঠলো। আন্দাজে হাত বাড়িয়ে সংগ্রহ ক[illegible] দিয়াশলাই আর লম্ফ। অন্ধকার দূরে হ'লো [illegible] বিস্ময়ে আর আতঙ্কে ওর বাক্ রোধ [illegible] গেছে। চোখ দুটো ঠেলে বেড়িয়ে আ[illegible] চাইছে। মেঝেতে রক্তের স্রোত ব'য়ে চলেছে তার মধ্যে মরে পড়ে আছে তাদের কুকুরটা। ভাতুয়া——তাকে চিনবারও উপায় নেই [illegible] ক'রে খুবলে খুবলে খেয়ে গেছে তা[illegible] ক্ষীরিয়া কিছুই যেন বুঝতে পারছে না। [illegible] তার বিহ্বল দৃষ্টি গিয়ে অদূরে শালবনের [illegible] স্থির হ'য়ে রইলো। ঐ পথেই গত রাত্রে এ[illegible] এসেছিল জোড়া জোড়া উজ্জ্বল আর ক্ষু[illegible] চোখ।......

ক্ষীরিয়ার দৃষ্টি সহসা নিজের পানে [illegible] এল। দুখানি হাত সে আলগোছে তুলে [illegible] এলো তার গালের উপরে, ঠোঁটের উপরে, বুকের উপরে। সর্বাঙ্গ তারও জ্বলে যা[illegible] পুড়ে যাচ্ছে। ও আর দেখতে পা[illegible] না, সইতে পারছে না এ বী[illegible] দৃশ্য। ফুঁ দিয়ে সে লম্ফটা নি[illegible] দিল। অন্ধকার হ'য়ে গেল ঘর—আর নিরন্ধ্র অন্ধকারে জীবন্ত হ'য়ে উঠলো দুটো হিংস্র আর ক্ষুধার্ত চোখ, আগুনের নিঃশ্বাস......আর......আর......

স্তব্ধ রাত্রির গাম্ভীর্যকে বিদীর্ণ [illegible] আর্তনাদ করে উঠলো ক্ষীরিয়া।

অমর নাথের পথে

শ্রী হরেন্দ্রনাথ সিংহ

কে আমারে নিয়ে গেল "কাশ্মীরে" টানিয়া
কা'র লাগি এ-অন্তর হইল ব্যাকুল
কে যে সেই প্রিয়জন ভাবিয়া আকুল
আমারে "পহাল গামে" ফেলিল আনিয়া।

প্রকৃতির সনে হেথা নিত্য-নিরজনে
কে শুনালো নিশিদিন নির্ঝরিণী গান
এ'বার লভিব বুঝি তাঁহারি সন্ধান
উপলব্ধি করে মন কী যেন জীবনে।

বরফ ঝর্ণায় ঘেরা বিচিত্র পাহাড়
হিমালয় স্নিগ্ধ ক্রোড়ে মিশে যায় মন।
সফল হইল বুঝি আশার স্বপন
"চন্দন ওয়ারী" দৃশ্যে হেরি ছবি তাঁর।

"শেষ নাগে" যাত্রা পথ হোলো নাকো শেষ
"পাঁচ তরণীর" পথে সর্বত্র তুষার
বরফের মাঝে দেহ হোলোনা অসাড়
জীবনে নূতন শক্তি করিল প্রবেশ।

পাহাড়ের শেষ উচ্চে পৌঁছিয়া গুহায়
তুষারের দীর্ঘ মূর্তি করিনু প্রণাম
"অমর নাথের" স্পর্শে পূর্ণ মনস্কাম
প্রিয়জন স্পর্শ সুখ যেন না ফুরায়।

বরফ গলিয়া শৃঙ্গে ঝরে স্নিগ্ধ বারি,
গলেনা তুষার লিঙ্গ মাহাত্ম্য নেহারি।

বিবেকের কষাঘাত

অমল ঘোষ

বাঙলা দেশের যাত্রাগানে আগের দিনে যে দুটি বর্ড়তি চরিত্রের দর্শন পাওয়া যেত, তার একটি নিয়তি, অন্যটি বিবেক। রাজায় রাজায় লড়াই, দেব-দানবে বিবাদ, সাধারণ-অসাধারণে সত্য-মিথ্যার সংঘাত, যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রেম-ভালোবাসায় সর্বত্র নিয়তি ও বিবেকের উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য।

অভিনয়ের মধ্যে মধ্যে নিয়তির অকস্মাৎ আবির্ভাব, বিবেকের হঠাৎ উপস্থিতি ও উদ্দেশ্য-মূলক গান দর্শকদের অন্য এক জগতে নিয়ে হাজির করতো; যেখানে সব কিছুই যেন নিয়তি ও বিবেকের নিয়ন্ত্রিত, সকলেই যেন ওই দুই অদৃশ্য পরমশক্তির অধীন। ফলে বাড়তি হলেও চরিত্র দুটি প্রধান হয়ে দাঁড়াত।

আমাদের মহাকাব্যেও বিবেক ও নিয়তির দর্শন দুর্লভ নয়। রামায়ণের মহানায়ক যে শ্রীরাম, কোথায় যৌবরাজ্যে অভিষেকের পরে সিংহাসনে আরোহণ করবেন; না—সেই মহা-মুহূর্তে হঠাৎ পিতা দশরথ প্রিয়তম পুত্রকে "তাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয়া তরুণী ভার্যা পাপাশয়া কৈকেয়ী"র কথায় চোদ্দ বছর বনবাস দিলেন। এ ঘটনাকে শ্রীরামের নিয়তি ছাড়া আর কি বলা চলে। কিন্তু পুত্রকে বনবাসে পাঠিয়ে দশরথের রামের শোকে দেহত্যাগ কেবলমাত্র "অল্প বয়সে শব্দভেদ করতে গিয়ে" অন্ধমুনির পুত্রবধের পাপেরই প্রতিফল নয়, বিবেকের নির্মম কষাঘাতেরও চরম প্রকাশ।

মৃত্যুকালে দশরথের মুখ দিয়ে যে অনুশোচনা শোনা যায়, তাতে প্রকাশ পায়ঃ

"যদি রাম আমাকে একবারও স্পর্শ করে এবং ধন ও যৌবরাজ্য নেয় তবে আমি বাঁচতে পারি। আমার চিত্ত মোহগ্রস্ত ও হৃদয় অবসন্ন হচ্ছে, শব্দ স্পর্শ কিছুই আমার অনুভব হচ্ছে না।"

বিবেকের নিষ্ঠুর চাবুকের এত চমৎকার চিত্র এর আগে আর কোথায় পাওয়া গেছে!

বিবেকের প্রভাব মানুষের উপরে অদ্ভুত কাজ করে এসেছে সেই সুপ্রাচীন পুরাণের যুগ থেকে। বিবেকশীল চিরকালই আমাদের দেশে প্রশংসা পেয়েছে; মানুষের নমস্য হয়ে কাব্য-ইতিহাসে স্থান লাভ করেছে কালে কালে।

মানুষের রাজ্যে বিবেক বস্তুটি বেঁচে থাকার চরম দুঃখ কষ্ট অক্লেশে সহ্য করা যেমন সহজ তেমনি মনুষ্যত্বকে উজ্জ্বল কোরে তোলা তার পক্ষে সম্ভব। রামায়ণে জন্মদুঃখী সীতাদেবীর বিবেকবোধের সুন্দর একটি নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় যুদ্ধকাণ্ডের শেষ দিকে। তখন দশানন শ্রীরামের হাতে নিহত হয়েছেন। রাঘব পুরুষের পবিত্র ধর্ম অনুসারে পত্নীহরণ-কারীর পাপের দণ্ডবিধান নিজের হাতে সম্পন্ন করবার পর মহাবলী হনুমানকে অশোকবন থেকে সীতাকে আনবার ভার অর্পণ করেছেন।

সে সময়

সীতা সমীপে উপস্থিত হয়ে হনুমান বললেন, "দেবী এই সকল ঘোররূপা ক্রূরপ্রকৃতি রাক্ষসী তোমাকে তর্জন করত, যদি অনুমতি দাও তো মুষ্টিপ্রহারে বা পদাঘাতে বা দংশন কোরে বা নাশাকর্ণ ভক্ষণ কোরে বা কেশাকর্ষণ কোরে এদের হত্যা করি।"

সীতাদেবীর বিবেকবুদ্ধি মহান উদার। তিনি বললেন, "বানরশ্রেষ্ঠ, এরা রাজার আশ্রিত ও বশীভূত দাসী মাত্র, এদের উপর কে ক্রুদ্ধ হতে পারে?"

জনকনন্দিনীর বিবেকবুদ্ধি অন্যরকম হলে মহাবীর হনুমানের হস্তে অশোকবনে সেদিন চেড়িমেধযজ্ঞ সম্পূর্ণ হোতো।

মহাকাব্য মহাভারতেও বিবেকের বিস্ময়কর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। সূতপুত্র কর্ণকে দুর্যোধন রাজ্যদান কোরে বন্ধুত্ব বন্ধনে বেঁধে ফেলার পর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে একদিন যখন কর্ণ জানতে পারেন, তিনি সূতপুত্র নন, পাণ্ডব অগ্রজ; যখন তাঁর সামনে প্রলোভন আসে প্রবল আকর্ষণ নিয়ে তাঁকে পাণ্ডবদের দলে ভিড়াবার মন্ত্র শোনাতে; একমাত্র বিবেকবোধের প্রবণতায় তখন কর্ণ ওই প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করতে সক্ষম হন।

একদিকে কর্ণের এই বিবেকবোধ অন্যদিকে কুমারী মাতা কুন্তীর বিবেকের কষাঘাত প্রমূর্ত দেখতে পাওয়া যায় মহাকাব্যের কাহিনীতে। সে কাহিনীর সুন্দর রূপায়ণ মহাকবি রবীন্দ্র-নাথের "কর্ণকুন্তী সংবাদ"-এ দীপ্যমান।

সন্ধ্যাসবিতার বন্দনায় রত কর্ণ সমীপে মাতা কুন্তীদেবী যখন জাহ্নবীর তীরে আপন মনোবাঞ্ছা নিবেদন করতে গেছলেন, তখন কর্ণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,

"কোথা লবে মোরে।"

মাতা কুন্তী কুমারীজীবনের অশেষ বেদনার ধন কর্ণকে পাণ্ডব শিবিরে বরণ কোরে নিতে চাইলে কর্ণের মুখে যে ক্ষোভ-বিহ্বল বেদনার প্রশ্ন ফুটে ওঠে তাতে ব্যক্ত হয়;

"কহিয়ো না কেনো তুমি ত্যজিলে আমারে।
বিধির প্রথম দান এ বিশ্বসংসারে
মাতৃস্নেহ, কেনো সে দেবতার ধন
আপন সন্তান হতে করিলে হরণ,
সে কথার দিও না উত্তর, কহো মোরে,
আজি কেনো ফিরাইতে আসিয়াছ ক্রোড়ে।"

কি নিদারুণ ভর্ৎসনা! কর্ণ কোনো গোপন সত্য জানতে চান না, জানতে চান না মাতা কুন্তী কোন্ কারণে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রকে চিরদিনের মত অবজ্ঞার স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। কেনোই বা ভ্রাতৃকুল হতে চিরনির্বাসন ব্যবস্থা কোরে-ছিলেন। কেবল জানতে চান, এমন কি প্রয়োজন পড়েছে আজ যে, পুত্রনির্বাসনকারিণী অর্জুন-জননী ছুটে এসেছেন ত্যাজ্যপুত্রকে কোলে ফিরিয়ে নিতে। এমন অসহায়তার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিলে, স্বতই বিবেকের কষাঘাত অসহনীয় হয়ে ওঠে।

এতেও শেষ নয়। মাতা কুন্তী এসেছিলেন কর্ণকে পঞ্চভ্রাতার মধ্যে ফিরিয়ে নেবেন বোলে। তাঁর মনে আশঙ্কা ছিল, পাছে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে কর্ণ[illegible] প্রচণ্ড শক্তির কাছে অর্জুন পরাভব মেনে নি[illegible] বাধ্য হয়—সময় থাকতে সে আশঙ্কার এক চ[illegible] নিষ্পত্তি করতে চেয়েছিলেন তিনি কর্ণকে প[illegible] পাণ্ডবের অগ্রাধিকারে প্রতিষ্ঠিত কোরে। সেজ[illegible] কত প্রলোভন, কত মিষ্টভাষ।

কিন্তু কর্ণ তো ভুলবার নন। তাঁর বিবে[illegible] আরো স্বচ্ছ আরো পবিত্র নির্মল। তাই তি[illegible] বলতে পারেন,

"সুত জননীরে ছাড়ি
আজ যদি রাজজননীরে মাতা বলি
কুরুপতি কাছে বদ্ধ আছি যে বন্ধনে
ছিন্ন করি—ঠাই যদি রাজ সিংহাসনে
তবে ধিক মোরে।"

এই "তবে ধিক মোরে"—বিবেকের কষা[illegible] ঘাতের অনাগত শিষ বই তো নয়। এ যে চা[illegible] চামড়া কেটে বসবার আগের তীব্র হুঁশিয়ার[illegible]

কিন্তু আসল চাবুক নেমেছে এসে কুন্তীদেবীর অন্তরকে দীর্ণ কোরতে। বিবেক[illegible] কষাঘাত আর্তচীৎকার তুলেছে মাতা কুন্তী[illegible] মর্মভেদী ভাষণে:

"তোমার ধর্ম এ কি সুকঠোর
দণ্ড এব!"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বিবে[illegible] কষাঘাত বারে বারে মাথা তুলেছে। 'গান্ধার[illegible] আবেদন'-এ মাতা গান্ধারীর বিবেক সকল প[illegible] স্নেহে মুগ্ধ মাতৃহৃদয়কে অধর্মাশ্রয়ী সন্তা[illegible] প্রতি নূতনতর মাতৃকর্তব্য পালনে উদ্ব[illegible] কোরতে চেয়েছে বল্লেও অত্যুক্তি হবে না।

দেশী বিদেশী সাহিত্য-নাটকে বিবে[illegible] কষাঘাতের অত্যাশ্চর্য সুন্দর সুন্দর পরি[illegible] পাওয়া যায়। ভিক্টর হুগোর জগৎবিখ[illegible] উপন্যাস "লে মিজারেবল"-এর নায়ক পাঠক[illegible] মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরে থাকে, বিবে[illegible] কষাঘাতকে সকল ব্যক্তি-স্বার্থের উপরে স্থা[illegible] দিয়ে মনুষ্যত্বের মহান বিজয় ঘোষণায় উদ্[illegible] হয়েছে বোলে।

কেবলমাত্র সাহিত্যে নাটকে বিবে[illegible] কষাঘাত প্রাধান্য বিস্তারে ক্ষান্ত হয়নি। যু[illegible] বিগ্রহ, বিপ্লবেও কখনো কখনো বিবে[illegible] কষাঘাত প্রভাব ফেলেছে। উনিশ শ' স[illegible] সালের রুশ বিপ্লবের সময় বিপ্লবী[illegible] বিবেকের বিচিত্র বিকাশের পরিচয় পাওয়া [illegible] খুব ছোট্ট একটি ঘটনা থেকে।

ওই সময় একদল বিপ্লবী নবজীবনের [illegible] গাইতে গাইতে পথ চলছিল। চলার পথে হ[illegible] এক জায়গাতে জালে ঘেরা একপাল মাছ দে[illegible] তাদের মুক্ত ছন্দে বাধা পড়ল। অমনি ছু[illegible] গিয়ে মাছগুলিকে তারা মুক্ত কোরে দিলো।

তাদের বিচারে সেদিন ওইটি ছিল সব[illegible] বেশি বিবেকশীলতার কাজ। কারণ যে পর[illegible] সে মানুষ হোক, কিংবা মাছই হোক; ব[illegible] দশায় দেখে চুপ থাকতে পারে, তার মু[illegible] অধিকার কি কোরে বিবেকের অনুভব[illegible] জন্মানো সম্ভব? তাই কি সে-সময় [illegible] বিপ্লবীরা বিশ্ব-বিপ্লবের মনোরম স্ব[illegible] দেখেছিলেন; যে স্বপ্নে ছিল, বিশ্ববা[illegible] বন্ধন মুক্তির আশা-অনুরাগ মাখা রাম[illegible] আঁকা। কিন্তু পরবর্তীকালে সে বিবেক[illegible] বিপ্লবী নেতা লেনিনের সঙ্গে সঙ্গে বি[illegible] হয়েছে বোলে বহুজনে আশঙ্কা করছেন।

তবুও বিবেকের কষাঘাতের আধুনিকতম মাণ পাওয়া গেছে সদ্য সদ্য ভারতের কমিউ-ন্ট পার্লিয়ামেণ্টারী গ্রুপের কাছ থেকে। গত মহত্তর বিশ্ব যুদ্ধকালে এদেশের মিউনিষ্টরা তারস্বরে চীৎকার কোরে গলেছিল, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ফ্যাসিস্টদের লাল। দীর্ঘকাল তাদের ওই চীৎকারে দেশ-সীর কর্ণ বিদীর্ণ হবার পর, এই মাত্র সেদিন রা লোকসভায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কখানি প্রতিকৃতি সংরক্ষণের জন্য ভারত রকারকে অনুরোধ জানিয়েছে। এ যদি বেকের কষাঘাতের জন্যে সম্ভব হয়ে থাকে ভ লক্ষণ বলতে হবে।

রাজনীতি, যুদ্ধ ও প্রেম পৃথিবীর কোথাও কোনো নিয়ম নীতি মেনে চলে না। দুনিয়াতে ত যুদ্ধবিগ্রহ ঘটেছে, প্রতিক্ষেত্রে নীতি-নিতার প্রবলতাই প্রাধান্য পেয়েছে! তবে, ার মধ্যে মধ্যে বীর অর্জুন অস্ত্র ফেলে ুখে দাঁড়ায়নি এমন নয়। কেবল সেকালের অর্জুন কেনো, একালেও যে-বৈজ্ঞানিকেরা এটম বোমা আবিষ্কারে সাহায্য কোরেছিলেন, তাদের কেউ কেউ বিবেকের কষাঘাতে জর্জরিত বোলে শোনা যায়। অবশ্য, প্রথম এটম বোমা িরোশিমায় ফেলবার নির্দেশ যাঁরা দেন, তাদের বিবেক পাথর হয়ে যাওয়ায়, তাঁরা কোনোরূপে অনুতাপের অবকাশ পেয়েছেন ক না সন্দেহ!

প্রেমের ক্ষেত্রেও কোনো কোনো সময় বিবেকবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠতে দেখা যায়। বৃটিশ াম্রাজ্যের সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড ও মিসেস িমসনের কাহিনী একালের ইতিহাস অলঙ্কৃত রেছে। শ্রীমতী সিমসনের জন্য বৃটিশ াম্রাজ্যের সিংহাসন ত্যাগ অষ্টম এডওয়ার্ডের বেক ভোঁতা হলে কখনই সম্ভব হোতো না। ামাদের দেশের সাহিত্যেও প্রেমের অভিসারে বেকের কষাঘাত নির্মম আত্মপ্রকাশে সুন্দর য় উঠেছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পরিশোধ" কবিতাকে দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থিত রা যেতে পারে।

'পরিশোধ' কবিতার নায়িকা শ্যামা সুন্দরী-ধানা। সে যখন "মহেন্দ্রনিন্দিত কান্তি উন্নত শান" বজ্রসেনকে রাজকোষে চুরির অপরাধে গরপাল হস্তে হস্তপদ লোহার শিকলে বন্দী বস্থায় দেখলে, সঙ্গে সঙ্গে শ্যামার মধ্যে ভূত পরিবর্তন দেখা দিল্লো। সুন্দরী শ্যামার নুরোধে নগররক্ষী বন্দী বজ্রসেনকে দুটি াত্রি বাঁচিয়ে রাখতে সম্মত হলে দ্বিতীয় রাত্রির শেষে যে ঘটনা ঘটল, কবির ছন্দে তারই কাশ:

"রমণীর কটাক্ষ-ইঙ্গিতে
রক্ষী আসি খুলি দিল শৃঙ্খল চকিতে।"

যে-বন্দী বধ্যভূমিতে মৃত্যু বরণের জন্যে স্তুত হয়ে প্রহর গুণছিল কারাপ্রাচীরের ন্তরালে, তার মুখে অকস্মাৎ মুক্তি লাভের ানন্দ উচ্ছ্বাস শোনা গেলো, যে উচ্ছ্বাস ুন্দরীপ্রধানা শ্যামার বন্দনায় মুখর:—

"মুমূর্ষুর প্রাণরূপা মুক্তিরূপা অয়ি,
নিষ্ঠুর নগরীমাঝে লক্ষ্মী দয়াময়ী।"

কিন্তু এত বিরাট বন্দনার ভার বুঝি নের শক্তি ছিল না শ্যামার। তাই বুঝি সে সহসা বিবেকের কষাঘাতে অট্টহাসে ফেটে পড়লো।

"আমি দয়াময়ী।"

প্রচন্ড অট্টহাসের পর ভেঙে পড়ল কান্না। বিবেকের বিস্ময়কর বিকাশ ফুটে উঠল সুন্দরী শ্যামার ওই বুকভাঙা কান্নায়।

"এ পুরীর পথ মাঝে যত আছে শিলা
কঠিন শ্যামার মতো কেহ নাহি আর।"

তারপর শ্যামার মধ্যে বিবেকের ক্রূর দংশন তেমন দেখা যায় না অনেকক্ষণ। প্রেমিক বজ্র-সেনের বাহুপাশে নিবিড়ভাবে বন্দী হয়ে নৌকায় ভেসে চলে সে। বহু রঙ্গরসে মত্ত প্রেমিকযুগল জীবনের তরল ছন্দে আনন্দের পাল তুলে দিয়ে ভেসে বেড়ায় শরতের মেঘের মতন। মধ্যে মধ্যে বজ্রসেন জিজ্ঞাসা করে:

"কহো মোরে প্রিয়ে,
আমারে কোরেছ মুক্ত কি সম্পদ দিয়ে।"

উত্তর করে বিলাসিনী শ্যামা;

"সে কথা এখন নহে।"

কিন্তু বজ্রসেন শুনবেই। অদম্য তার কৌতূহল। আরো কাটে কাল। শ্যামার মনে বুঝি বিবেকের উদয় হয় হঠাৎ মেঘ ফেটে জাগা সূর্যের আলোর মত। সেও বুঝি মুক্ত হতে চায় পাষাণকায়া মেঘভার হতে। তাই বুঝি অস্ফুট কণ্ঠে বলে;

"প্রিয়তম,
তোমা লাগি যা করেছি কঠিন সে কাজ—
সুকঠিন, তারো চেয়ে সুকঠিন আজ
সে কথা তোমারে বলা।"

তারপর সংক্ষেপে বলে যায় শ্যামা;

"বালক কিশোর,
উত্তীয় তাহার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর
উন্মত্ত অধীর, সে আমার অনুনয়ে
তব চুরি অপবাদ নিজ স্কন্ধে লয়ে
দিয়েছে আপন প্রাণ।"

এ কাজ যে শ্যামার মতন সুন্দরী রূপ-বিলাসিনীর পক্ষেও সর্বাধিক পাপ, সেটুকু বিবেকবোধ শ্যামাকে পরিত্যাগ না করায়, এই নিষ্ঠুরতম নগ্ন সত্য জগতের সামনে আত্ম-প্রকাশের সুযোগ পেয়েছে।

এতক্ষণে বজ্রসেনের চৈতন্যম্বার খুলে যায়। রূপবিলাসিনী নারীর সবল বাহুবন্ধন অসহ্য মনে হয়। তাই সে বলে ওঠে:

"এ আমার প্রাণে
তোমার কি কাজ ছিল? এ জন্মের লাগি
তোর পাপমূল্যে কেনা মহাপাপভাগী
এ জীবন করিলি ধিক্কৃত।"

এরই নাম বিবেকের কষাঘাত। যে কষাঘাত পাপমূল্যে বিলাসিনী সুন্দরীপ্রধানার প্রেমের প্রয়োজনে কেনা জীবনকেও আপন বলে দাবী করতে ভয় পায়। বিবেকের চাবুকের তাড়নায় নিজেকে ধিক্কৃত করেও স্বস্তি পায় না। বিবেকের ক্রূর দংশনের বলিষ্ঠ কবল থেকে পরিত্রাণ খুঁজে ফেরে প্রাণপণে প্রতি পলে পলে।

সমাজ, সামাজিক মানুষ তথা সাহিত্যের জগতে আজকাল ক্রমশ যেন বিবেকবোধের প্রভাব কমে আসছে। যাত্রার দলের বিবেক, কাব্য-জগতের বিবেকবোধ, ব্যক্তিজীবনে বিবেকের শুভ প্রভাব ও নির্মম কষাঘাত আজকাল তেমন বলিষ্ঠভাবে আর আমাদের কৃষ্টিতে স্বীয় প্রতিষ্ঠা দাবী করতে পারে কিনা সন্দেহ! এই সঙ্কটময় মুহূর্তে বাংলা সাহিত্যে ইদানীং কোনো কোনো সাহিত্যিক যে দুটি মনের আমদানী করেছেন, "এ-মন" এবং "আরেকটি-মন" পরিচিতিতে; এ কালের বিবেক সেখানে দূরু দূরু বুকে উপস্থিত হয়েও যেন অনুপস্থিত!

কিন্তু সমাজ থেকে, সভ্যতা থেকে বিবেকের কষাঘাত মুছে গেলে পৃথিবীর ভয়ানক বিপদ আশঙ্কা অনস্বীকার্য। বিবেক যেখানে অসাড়, মানুষের কাছে সেখানে নীতি-অনীতি, সত্য-অসত্য, ন্যায়-অন্যায়, সুবুদ্ধি-কুবুদ্ধি, ভালো-মন্দ সবই একাকার এবং পশুশক্তিই ন্যায়-নীতি। নির্বিচারে "এটম" ও "হাইড্রোজেন" বোমাই মানুষকে সায়েস্তা করবার একমাত্র হাতিয়ার।

এই অবিবেকী শক্তির তথাকথিত শক্ত-ন্যায় পৃথিবীতে বারে বারে সভ্যতার বুকে অন্ধকার ডেকে এনে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে যুগে যুগে। মানুষের বিবেক ও বিবেকের কষাঘাত সম্মিলিতভাবে সে চেষ্টাকে প্রতিহত করে সমাজ ও সভ্যতাকে ছন্দ ও দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে স্বীয় মর্যাদায় এগিয়ে নিয়ে এসেছে সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত।

এ সম্ভব হয়েছে ব্যক্তি-মানুষের জীবনে বিবেকের প্রভাব চিরদিনই অসীম বলে।

তাই দেখতে পাওয়া যায়, আজও অকস্মাৎ এমন ঘটনা ঘটে, যা ক্ষুদ্র হয়েও—ক্ষুদ্র নয় যেমন সামান্য ট্যাক্সি ড্রাইভার বহু মূল্যবান অলঙ্কারসহ ফেলে আসা সুটকেস মালিককে

(শেষাংশ ২৮৭ পৃষ্ঠায়)

মনের শহর

কালিদাস দত্ত

মনের ধূসর মাটিতে সন্ধ্যা নামছে ক্লান্ত পদে,
গোধূলি তারার কম্পন সুরু নয়নের ছোটো হ্রদে।
এখানে হলুদ সূর্যরশ্মি ঝাউগাছে চিকমিক
এখুনি থামিয়ে কুজ্ঝটিকায় ঢেকে দেবে চারদিক।

তারপর সুরু মেকি আলো দিয়ে
চোখ ধাঁধানোর পালা
মহোৎসবের রোশনচৌকি বহ্নিবলয় জ্বালা।
কাজেই এ মনে অনাবশ্যক ত্রুটি নেই কোনদিকে
এখানে অভাব মেটানো হচ্ছে প্রাচীর-পত্র লিখে।
তবুও এ মনে ভুলের বেসাতি।

মেকি দিয়ে ঘর ঠাসা,
এখানে ঠুনকো প্রেমের বীজাণু
বেঁধেছে চড়ুই-বাসা।
এখানে এখন মধ্যরাত্রে মুখরিত পানশালা
যদিও সকালে জঠরাগ্নির উনুন হয়নি জ্বালা।

এ মনের আশা বিগত আজকে।
উর্দ্ধ-আকাশে চোখ
অতন্দ্র রেখে চেয়ে আছি তাই,
এ রাত প্রভাত হোক।
এ রাতের মেকি মিথ্যে বেসাতি
ধুয়ে মুছে যাক ভাই,
সোনালী দিনের স্বচ্ছন্দ সবুজ রাত্রি চাই॥

CAPS\6.8
দিল্লী, কোলকাতা, বোম্বাই অথবা মাদ্রাজ নয়, পিকিং অথবা মস্কো, লণ্ডন অথবা নিউইয়র্ক, কোনটাই নয়, কিন্তু সে একটা দেশ। ধরা যাক, দেশটির নাম হযবরল। এখানকার অধিবাসিরা বাঙালী। পোষাকে, আচারে, ব্যবহারে, সব কিছুতেই তারা ঘোর বাঙালী। দেশটা ছোট, খুব ছোট। কিন্তু শৃংখলার বদলে এখানের বিশৃঙ্খলা পর্বতপ্রমান। নীতিবিহীন স্বৈরাচারী শাসন এখানে সদাই বিরাজমান।
এখানকার নিয়মকানুন এমনই বিচিত্র যে কোন সুস্থ, সামাজিক ও নীতিজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সহ্যাতীত। তাই রাজধানীতে এই সম্পর্কে অভিযোগ পৌঁছেছে। তাঁরা তদন্তের জন্য একজন বিশেষ পদমর্যাদা-সম্পন্ন ব্যক্তিকে হযবরলতে পাঠানোর মনোস্থ করেছেন। তাঁর আসার পর যে সমস্ত অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটলো তাই নিয়েই:
ছায়া চিত্রম্-এর
রাজধানী থেকে
গোপাল রচিত 'ইনস্পেক্টার জেনারেল' অবলম্বনে
চিত্রনাট্য মৃণাল সেন পরিচালনা নির্মল মিত্র
সঙ্গীত নচিকেতা ঘোষ
শ্রেষ্ঠাংশে উৎপল দত্ত · কালী বন্দ্যো · মঞ্জু দে · মঞ্জুলা বন্দ্যো
জহর · জীবেন · হরিধন · শ্যামলাহা · অমর · মানি শ্রীমানী
· পরিবেশনা · সুপার পিকচার্স ·

বাংলাদেশে 'গিরিশচন্দ্র' একটি সুপরিচিত বা অতি-পরিচিত নাম। এমন কি যাঁরা তাঁর অভিনয় দেখেননি বা নাটক পড়েননি তাঁরাও তাঁকে কীর্তিমান বলে মেনে নিতেন; নজীর দেখাতে হলে গত যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মাসিকপত্রিকার সম্পাদক স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কথা উল্লেখ করা যায়।

কিন্তু একালের নিছক সাহিত্যের ভক্তরা গিরিশচন্দ্রকে আমল দেন বলে মনে হয় না। গিরিশচন্দ্রকে বলা হয় সাধারণ রঙ্গালয়ের অন্যতম জন্মদাতা এবং সেখানকার সর্বপ্রধান নট-নাট্যকার। অথচ তাঁর অবদান নিয়ে আমাদের আধুনিক সাহিত্য পত্রিকায় কোন আলোচনাই চোখে পড়ে না। তাঁর সম্বন্ধে মাঝে মাঝে দুই-একখানি চলনসই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু নিছক সাহিত্য-জগতে সেগুলি প্রায়ই উপেক্ষিত হয়ে থাকে। সেখানে আবার এমন সব উন্নাসিক সমালোচকেরও অভাব নেই, গিরিশচন্দ্রের প্রতিভাকে যাঁরা স্বীকার করতেই প্রস্তুত নন। বিচার না করেই তাঁরা হয়েছেন বিচারক।

কিন্তু গিরিশচন্দ্রের প্রতিভাকে ঠিকমত বুঝতে গেলে কয়েকটি দিকে আমাদের নজর রাখতে হবে। প্রথমতঃ দেখতে হবে, নিজের ক্ষেত্রে তিনি পূর্ববর্তীদের ছাড়িয়ে কতদূর অগ্রসর হতে পেরেছেন?

গিরিশচন্দ্রের পূর্ববর্তী বলে বেশী লোকের নাম করা যায় না। আধুনিক বাংলা নাট্য-জগতের কাজ সুরু হয় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে, সাতুবাবুর ভবনে, নন্দকুমার রায়ের দ্বারা অনূদিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটক নিয়ে। তারপর এখানে কিছুদিন ধরে চলে রামনারায়ণ তর্করত্নের যুগ। কিন্তু তিনি ছিলেন সংস্কৃত নাটকের আদর্শ অনুসারী সেকেলে পণ্ডিত, ইংরেজী সাহিত্যের ভক্ত নব্য বাঙালীরা তাঁর রচনায় নিজেদের হৃদয়স্পন্দন অনুভব করতে পারেনি। তখনকার আর একজন প্রবীণ নাট্যকার কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্বন্ধেও ঐ কথাই বলা যায়। তারপর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে 'শর্মিষ্ঠা' নাটক নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে মাইকেল মধুসূদন স্পষ্টভাষায় বললেন—'আমি তাঁদের জন্যেই এই নাটক রচনা করছি পাশ্চাত্ত্য ভাব ও চিন্তার ধারার সংগে যাঁরা সুপরিচিত।' মধুসূদনই হচ্ছেন ইংরেজী-নবীশ নব্য বাঙগালীদের প্রথম নাট্যকার এবং তারপর তাঁর সংগে একে একে যোগ দেন দীনবন্ধু মিত্র, মনোমহন বসু ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। এঁরাই ছিলেন আধুনিক বাঙগালীদের প্রবীণ নাট্যকার।

মাত্র চারজন নাট্যকারকে নিয়ে সৌখীন বাংলা রঙগালয়ের কার্যারম্ভ হয়। তারপর এখানে পেশাদার সাধারণ রঙগালয়ের প্রতিষ্ঠা। সেখানেও দেখা গেল প্রধান অংশ গ্রহণ করেছেন ঐ চারজনই। কিন্তু এই যৎসামান্য মূলধন সম্বল করে একটা জাতির সাধারণ রঙগালয় বেশী দিন চালানো যায় না। কাজেই দায়ে ঠেকে হাত বাড়াতে হল উপন্যাস ও কাব্যের নাট্য-রূপের দিকে। কিছুদিন পরে দেখা গেল, তবু রঙগালয়ের ক্ষুধা মেটে না, বিপুল তার জঠর।

তখন গিরিশচন্দ্র কেবল অভিনেতারূপে নয়, নাট্যপরিচালকরূপেও প্রখ্যাত হয়েছেন এবং রঙ্গালয়ে নাটক জোগান দেবার দায়িত্বও ছিল তাঁর উপরেই। তিনি 'মহিলা' কাব্যের বিখ্যাত কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারকে সাহিত্য-জগৎ থেকে টেনে আনলেন নাট্যজগতে এবং তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেল 'হামির' নামে ঐতিহাসিক নাটক। রচনা হিসাবে 'হামির' ছিল অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর এবং তার নিখুঁত অভিনয়ও পেয়েছিল উল্লেখ্য অভিনন্দন। কিন্তু বরাবর যা হয়ে থাকে, এক্ষেত্রেও হল তাই—অর্থাৎ মঞ্চ-নাটক হিসাবে 'হামির' হল না জনপ্রিয়। ফাঁপরে পড়ে গিরিশচন্দ্র রঙ্গালয়ের বিজ্ঞাপনে উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করলেন। কিন্তু ব্যর্থ হল সে চেষ্টাও।

গিরিশচন্দ্র যখন বুঝলেন রঙগালয়ের বাহির থেকে নাটক পাবার আর কোন সম্ভাবনাই নেই, তখন নিরুপায় হয়ে নাটক রচনার জন্যে নিজেই লেখনী ধারণ করলেন। বলা বাহুল্য, সেটা তাঁর অনধিকার-চর্চা হয়নি। কারণ, কোন্ কোন্ গুণ থাকলে মঞ্চ-নাটক সার্থক হয়, দীর্ঘকাল নাট্যানুশীলনের ফলে সে গুপ্ত কথা তিনি জানতে পেরেছিলেন। যৌবন-সীমা পার হয়েও তখনো পর্যন্ত তিনি মৌলিক নাটক রচনায় হাত দেননি বটে, কিন্তু বাংলা রঙ্গালয়ের জন্মের পর থেকেই বহু উপন্যাস ও কাব্যকে বার বার নাটকে পরিণত করে তাঁর হাত রীতিমত পরিপক্ক হয়ে উঠেছিল।

তখন গিরিশচন্দ্রের বয়স আটত্রিশ বৎসর—অর্থাৎ তিনি প্রৌঢ়। ১২৮৮ সালে তিনি প্রথমে রচনা করলেন নামে ঐতিহাসিক কিন্তু আসলে কাল্পনিক নাটক 'আনন্দ রহো'। সে নাটকও দর্শকরা গ্রহণ করলে না দেখে গিরিশচন্দ্র বুঝতে পারলেন, বাঙগালীর জাতীয় ভাব না থাকলে এদেশে মঞ্চ-নাটকের দিকে জনসাধারণ আকৃষ্ট হবে না। এই সত্য উপলব্ধি করে ১২৮৮ সালেই তিনি রচনা করলেন তাঁর প্রথম পৌরাণিক নাটক 'রাবণ বধ'। ফল পাওয়া গেল হাতে হাতেই—সে যেন মন্ত্রশক্তি! পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ থেকে প্রশস্তি অর্জন করে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র অপূর্ব প্রেরণা পেয়ে ঐ বৎসরেই পরে পরে লিখে ফেললেন আরো চারখানি সফল ঐতিহাসিক নাটক—'সীতার বনবাস' 'অভিমন্যু বধ', 'লক্ষ্মণ বর্জন' ও 'সীতার বিবাহ'। প্রত্যেক নাটকই হল জনপ্রিয় এবং তারই ফলে বাংলা নাট্য-জগতে

(শেষাংশ ২৫৬ পৃষ্ঠায়)

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে অসিত সেন পরিচালিত 'দীপ জেলে যাই' চিত্রে সুচিত্রা সেন।

দৃঢ় কণ্ঠে বলি—না, গো না। নাটুকে প্রবন্ধ আর লিখবো না।

যাঁদেরকে বলি, তাঁরা খালি হাসেন। হেসে হেসেই বলেন—তাও কি হয় দাদা! যতদিন আছেন আমাদের মাঝে, জ্বালাতন করবই। পিত্তি জ্বলে যায়। দীর্ঘকাল বেঁচে আছি বলে মাশুল দিতে হবে শতবার বলা-কথা আরো শতবার বলে!

এককালে মানুষ, মানে লিখিয়ে আর পড়িয়ে মানুষ মেনে নিয়েছিল, কানু বিনা গীত নাই। অর্থাৎ জীবনে সত্যের যে উপলব্ধি হয়, তাই প্রকাশ করবার তাগিদ থাকা চাই কিছু লিখতে হলে। বাংলা কাব্যের উৎপত্তি, নাটকেরও উৎপত্তি হয়েছিল ওই থেকে। কিন্তু আবিষ্কৃত হোলো, ওই কানু লোকটি ছিল আসলে রোমান্টিক; কারু কারু মতে একেবারে ফিলাণ্ডারার, মানে অ্যান্টি-সোস্যাল! ও-গান আখড়ায় চলে চলুক, সাহিত্যের আসরে কি বাসরে অচল।

রোমান্টিসিজম নয়, আইডিয়ালিজম চাই। বেধে গেল রাম বড় না রহিম বড়, তাই নিয়ে মাথা ফাটাফাটি, কথা কটাকাটি; সত্যও রইল না, সুন্দরও রইল না। তাই শিবও সরে গেলেন। তার অপসৃতির সঙ্গে সঙ্গে কুমারসম্ভবম্-এর সম্ভাবনাও লোপ পেল, নটরাজের জটাও ববড্ হোলো, শিংগলড হলো। রোমান্সও রইল না, আইডিয়ালও তলিয়ে গেল, শুধু তার ন্যাজটা আইডিয়ালিজম-এর 'ইজম'টাই ফণা তুলে নাচতে লাগল। তারই আস্ফালন হলো সৃষ্টি-স্থিতির বড় কথা। এ-বলে আমি বড়, ও-বলে আমি বড়। তুমুল তোলপাড়। হঠাৎ চেতনা হোলো 'ইজম' তো আসলে ন্যাজ। ওর ধড়টা কোথায়? সেটা ছাড়া 'ইজম' বাস্তব রূপ পাবে কি করে? কিন্তু কোন কিছুর বাস্তব রূপ দিতে হলে বস্তুর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবেত। কিন্তু বস্তুটিই বা কি, আর তার অস্তিত্বই বা কোথায়? সে ত ফিজিক্যাল সায়েন্সের ভাববার কথা। তবে কি সাহিত্য আর নাটক রোমান্টিসিজমে ফিরে যাবে? সেই কানুর যুগে? তাহলে আর প্রগ্রেসটা হোলো কি? তাও বটে! কিন্তু রোমান্সকে যদি ইন্টেলেকটের ভিয়েনে ফেলে ঘি দিয়েই হোক্ আর ডালদা দিয়েই হোক, বেশ কড়া করে নেওয়া যায়, তাহলে সেকেলেদের মাথায় হাত বুলিয়ে একেলেও হওয়া যায়, চিরকালীনও হওয়া যায়। তাতে করে কুমারসম্ভবমের রসটা রেখে স্পিরিটটাকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে, কানুর সেই এক ফুটোওয়ালা বাঁশীটাকে বাতিল করে পরকীয়া প্রীতিটা সাইকোলজি আর লজিকের ভিয়েনে খেলিয়ে খেলিয়ে ছেঁকে তোলা যাবে। আসল আনন্দই ত' খেলায়! তাই করা হোক্। আর তার নাম দেওয়া যাক্ নিয়ো-রোমান্টিসিজম।

মানুষ কিছু আর্টিস্ট হোলো না। আর্টিস্টদের সাহিত্য-শিল্পের খেলায় তারা রস কিছু পেল, কিন্তু বস্তুও চেয়ে বোসল। আর্টিস্ট বল্ল—'বস্তু চাও যদি বাপু, বাজারে যাও। আর রস চাও যদি শান্ত হয়ে বোস।' মানুষ বল্ল, 'আমরা রসও চাই, বস্তুও চাই। তাইত আমরা রসগোল্লা আর পানতুয়া খেয়ে পরিতৃপ্ত হই, শুধু মধু জিভে মাখিয়ে আরাম পাই না, বিনামূল্যে সিধু জুটলেও চারটে পয়সা ট্যাঁকে গুঁজে চাটের দোকানে ছুটে যাই। 'তাই যাও হতভাগারা'—রেগে মুখ ঘুরিয়ে বোসল আর্টিস্ট। কিন্তু একা বসে সৃষ্টি করে সে যে আনন্দ পায়, তাতেও যেন কি অপূর্ণতা থেকে যায়। তার মনে হয় মানুষের সঙ্গে ভাগে ভোগ করতে না পারলে আনন্দ উথ্‌লে উঠে না তাই তার ইচ্ছে হয় সব মানুষকে ডেকে আনে, সকলের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করে তার নিজেরই সৃষ্টি। কিন্তু মানুষ যে বস্তু চেয়ে বসবে। সে তার সৃষ্টিতে খাদ মেশালে। মানুষকে ডেকে দেখালে। কিছু মানুষ বল্লে, বেশ, বেশ! কিছু মানুষ বল্লে, ও ছাই-ভস্ম আমাদের কোন্ কাজে লাগবে? তারা চলে যায়। আর্টিস্ট বলে, যাক্‌গে ওই অরসিক, অবুঝ, অন্ধ মানুষগুলো! আমি ত' আর একা নই এখন! আমার ভক্ত জুটেছে, প্রতিপত্তি বেড়েছে, আমার অভাব কি? কিন্তু একদিন সেও অভাব অনুভব করে। ওরা কেন আসবে না? কেন আমার সৃষ্টির তারিফ করবে না? আমাকে অগ্রাহ্য করে কেন আমারই আঙিনা দিয়ে অপর বাড়ী যাবে ওরা? আমাকে উপেক্ষা করে ওরা প্রমাণ করে দেবে যে, আমার চেয়ে ওরা বড়? ওদের আনতে হবে টেনে। কিন্তু ওরা কোন্ বস্তু চায়? আসে বস্তুর বিচার, রিয়ালিজম-এর সঙ্গে সঙ্গে। তাই এসে দাঁড়ায় আইডিয়ালিজম, আবার শুরু হয় ইজম-এর লড়াই আর্টিস্টের সৃষ্টির মাঝে, দর্শকদের মাঝে, সমালোচকদের মাঝে। প্রত্যেকেই প্রমাণ করতে চায় তার সৃষ্টিই সৃষ্টি, তার দৃষ্টিই দৃষ্টি, তার বিচারই বিচার। এক সমালোচক এ-পক্ষ নেয় ত' অপরে অন্য পক্ষের সমর্থন করে। এর দর্শক ওর বাড়ী যায় না, ওর দর্শক এর বাড়ী আসে না। প্রত্যেকেরই প্রতিপক্ষ গড়ে ওঠে। উকিল, মোক্তার, সাক্ষী, সাবুদ, আসামী, ফরিয়াদী সমস্বরে শুধুই চেঁচায়—এ কিছু নয়, ও কিছু নয়, তা কিছু নয়! সেই কোলাহলের মাঝেই চলে প্রগ্রেস। ঠাট্টা করছি না কিন্তু। আর্টের ইতিহাসটা স্থূল-বুদ্ধি দিয়ে যা বুঝেছি, তাই বল্লাম। অতীত ভারতের নাটক টেকনিককে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে, আবার একেবারে টেকনিক-সর্বস্ব যাতে না হয়, তার জন্য রস-সৃষ্টিকেই আদর্শ করেছে। তাই থেকেই হয়েছে লোকধর্মী নাটক, ফোক্ প্লে।

আমার মনে হয় লিখে নাটক সৃষ্টি করা যায় না; অভিনয় করেও তা যায় না। নাটক আপনি সৃষ্ট হয়। লেখকের রচনা, অভিনয় আর প্রয়োগ-কৌশলের দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে দর্শকের ভিতর-কার অজানা অথচ গুমরে গুমরে মরা অবরুদ্ধ আবেগকে বাইরে টেনে এনে যখন একটি রস-ঘন মুহূর্ত সৃষ্টি করে সংশ্লিষ্ট সকলকেই সমভাবে অবাস্তব এক আনন্দলোকে তুলে ধরে, তখনই হয় নাট্য-সৃষ্টি। তার কোন রূপ নেই, ফর্ম নেই, কনটেন্ট নেই, স্থায়িত্ব নেই। প্রেক্ষাগৃহে আলো জ্বলে উঠলেই দীর্ঘশ্বাসের মতোই তা হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

ওই নাট্য-সৃষ্টির জন্য অনেক কিছুরই প্রয়োজন হয়। প্রথমেই রচনার কথা বলি। রচয়িতা অবশ্য তাঁর কল্পনাকে রূপ দেবার উপযোগী বিষয় নিজেই বেছে নিবেন, ভাষা এবং ভাষার প্রয়োগ (ষ্টাইল) অবশ্যই তাঁরই নিজস্ব হবে। কিন্তু দর্শকের কথাও তাঁকে ভাবতে হবে, যেমন ভাবতে [illegible] কথা। যে রচনার ভাষা

গোগল রচিত 'ইন্সপেক্টর জেনারেল' অবলম্বনে ছায়া চিত্রম্ নিবেদিত ও নির্মল মিত্র পরিচালিত 'রাজধানী থেকে' ছবিতে উৎপল দত্ত।

অভিনেতৃদের অভিনয় সহজ করে দেবে না তারা-ক্রান্ত করবে, অথবা যা শ্রোতাদের কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে আলোড়ন সৃষ্টি করবে না, সেই রচনা সম্পূর্ণরূপে অভিনীতই হবে না, ঈপ্সিত নাটকও সৃষ্টি করতে পারবে না। আবার একই রচনা-শৈলী সর্ববিষয়ক নাটকে প্রয়োগ করে সৃষ্টিকে সার্থক করা যাবে না। কি করে তাঁর রচনা তাঁর কল্পনাকে সার্থক সৃষ্টিতে নিযুক্ত করা যাবে, তাঁর ভাষার কি গুণ থাকলে তা দর্শকদের অভিভূত করতে পারবে, তা রচয়িতাকে নিজেকেই আবিষ্কার করতে হবে। জন-মনকে, জাতির ঐতিহ্যকে কিছুটা না জানলে কিছুটা অভিজ্ঞ না হলে, অথবা প্রতিভার স্পর্শ না পেলে রচয়িতা তা জানতে, বুঝতে, ফলিয়ে ধরতে পারেন না। তা ছাড়া বিষয়-বস্তু নির্ণয়ের সময়েও তাঁকে জন-মন সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে। যে বিষয়-বস্তু শ্রোতৃদের একেবারে অজানা, অথবা যে বিষয়-বস্তুর প্রতি শ্রোতৃদের তেমন আগ্রহ নেই অথবা রীতিমত বিতৃষ্ণা বা বিরক্তি রয়েছে সে বিষয়-বস্তু নির্বাচন নিরাপদ নয়। পৃথিবীর বহু নাট্যকার সে অনিশ্চয়তাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা পৌরাণিক, ঐতিহাসিক অথবা কিম্বদন্তী-মূলক গল্প ও কাহিনী বেশী মনোনয়ন করেছেন, সমসাময়িক পরিবেশ থেকেও উপাদান সংগ্রহ করেছেন। সম্পূর্ণ অজানা বিষয়ের এবং অত্যন্ত প্রত্যক্ষ বিষয়ের চেয়ে আধা-জানা এবং আধা-অজানা বিষয়ই নাট্য সৃষ্টির সহায়ক। নাটক-রচয়িতাকে এ সব বিষয়ে অবহিত থাকতে হবে। নাটক-রচয়িতাকে এবং নাটকের অভিনেতৃগণকে শিল্পী বলা হয় সর্ব দেশে। কেবল আমাদের দেশেই নাট্যকারকে শিল্পীর সম্মান দিতে অনেকের বাধে। শিল্পীর স্বধর্ম হচ্ছে নিজেকে বহুর মধ্যে এবং বহুকে নিজের মধ্যে পাওয়া। তাই দৃশ্য এবং শ্রব্য সকল শিল্পেরই দর্শক এবং শ্রোতার প্রয়োজন হয়। সে প্রয়োজন কেবল অর্থোপার্জনেরই প্রয়োজন নয়, সে-প্রয়োজন সার্থকতার, পরিণতির, অপরিহার্য প্রয়োজন। শ্রোতা এবং দর্শক বাদ দিয়ে, অথবা তাদের সম্বন্ধে উদাসীন থেকে, দৃশ্য এবং শ্রব্য শিল্প সার্থক হয়না।

নাটক যখন রাজসভায় অভিনীত হোতো, তখন তাঁর শ্রোতৃ এবং দর্শকরা সাধারণত বিদগ্ধ এবং অভিজাতরাই থাকতেন। তাঁদের মনের গঠন, জীবনের প্রয়োজন, বৈদগ্ধ্য, রুচি, সাধারণ মানুষের থেকে পৃথক ছিল। তাই তাঁদের সঙ্গে একাত্ম হবার সময় নাটক রচয়িতারা বিশেষ ধরণের নাটক লিখে গেছেন। রাজনীতির এবং আভিজাত্যের যেমন যেমন পরিবর্তন হয়েছে, নাটকের রচনা বিষয়-বস্তুও তেমন তেমন পরিবর্তিত হয়েছে। এ যে কেবল আমাদের দেশেই হয়েছে, তা নয়, সকল দেশেই হয়েছে। তার ফলে পৃথিবীতে কত বিভিন্ন ধরণের নাটকই না হয়েছে। কতগুলি লুপ্ত হয়ে গেছে। কতগুলিকে মানুষে লোপ পেতে দেয় নি, পুনঃপ্রকাশে [illegible]

দ্রুত নির্মাণরত

আর্ট এণ্ড কালচার পিকচার্সের অবিস্মরণীয়

অগ্নি-সম্ভবা

পরিচালনা • সুশীল মজুমদার
কাহিনী • শান্তি দাশ গুপ্তা
চিত্রনাট্য ও সংলাপ • মনোজ ভট্টাচার্য
সঙ্গীত পরিচালনা • কালোবরণ

চরিত্রচিত্রণে :—
মঞ্জুলা ব্যানার্জী
ছবি বিশ্বাস
নির্মল কুমার
কালী ব্যানার্জী
নৃপতি চ্যাটার্জী
আশা দেবী

তরুণ কুমার
কল্যাণী চৌধুরী
অজিত চ্যাটার্জী
প্রীতি মজুমদার
মনোরমা • শিবানী
মাঃ তিলক • মাঃ দেবাশিস
কুমারী জয়ন্তী

চিত্রশিল্পী
অনিল গুপ্ত
শব্দযন্ত্রী
বাণী দত্ত

আর্ট এণ্ড কালচার পিকচার্স প্রাঃ লিঃ, ১০, ওয়াটারলু স্ট্রীট, কলিকাতা—১

মুক্তি প্রতীক্ষায়—

সুচিত্রা • বসন্ত অভিনীত

দীপ জ্বেলে যাই

বাদল পিকচার্সের নিবেদন

কাহিনী : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

পরিচালনা
অজিত সেন
সুর
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

ডি, আর পিকচার্স রিলিজ

শারদীয়ার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত
তারাশঙ্করের

জলসাঘর

রাধা পূর্ণ প্রাচী
চলিতেছে

চিরনূতন চিত্রাবলী
পৌরাণিক

প্রহ্লাদ
জয়দেব
হরিশ্চন্দ্র

আন্তর্জাতিক খ্যাতিতে উজ্জ্বল

পথের পাঁচালী
অপরাজিত
পরশ পাথর
অযান্ত্রিক

উত্তম • সুচিত্রা অভিনীত

ওরা থাকে ওধারে
সদানন্দের মেলা

নিউ থিয়েটার্সের

মহাপ্রস্থানের পথে
রামের সুমতি

অরোরা পরিবেশিত

তা মাটির ঘরের তাকের উপরই হোক, কি পণ্ডিতদের পুঁথি-পত্রের ভিতরেই হোক। কালের গ্রাস থেকে যেগুলি রক্ষা পেয়েছে, সেগুলি যে সর্বকালে অভিনীত হয়েছে বলেই বেঁচে আছে তা কিন্তু নয়, লিখিত সাহিত্য হিসেবেই বেঁচে আছে। যুগ-যুগান্তরে কালে-ভদ্রে, যখন তা অভিনীত হয়েছে, তখনো তা নাটক সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে তার সাহিত্যিক সম্পদের জন্য, অর্থাৎ দর্শকের মনের অবরুদ্ধ আবেগকে আলোড়িত করবার গুণের জন্য। আজকাল ইউরোপে শকুন্তলা, অভিনয়ের ধুম পড়ে গিয়েছে, সংস্কৃতে নয়, তাঁদের নিজ নিজ ভাষায়। মাঝে মাঝে আমাদের আকাডেমীতে দেশ-দেশান্তর থেকে অনুরোধ আসে ওর নাট্যধর্মী আর লোক-ধর্মী অংশগুলির সামঞ্জস্য কেমন করে করা যায়, অভিনয়-রীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার আসবাব কেশবিন্যাস প্রভৃতি কেমন হবে তাই জানাতে। আমরা বেশ বিপদে পড়ি। পণ্ডিতদের কাছে, আঁকিয়েদের কাছে ছুটো-ছুটি করে যা পাই, তা আমাদেরই মনে ধরেনা। অভিনয় কেমন করে হোতো আমরা জানিনা। রথ থাকবেনা অথচ বোঝাতে হবে রাজা এলেন রথে চড়ে, নামলেন, রথ নিয়ে সারথি চলে গেল, অন্দর-বাহির, পথ-আশ্রম, কানন-কান্তার যা কিছু দরকার সবই অভিনয় দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে, সংগে সংগে সংলাপেরও সহায়তা নিয়ে নাটকও যাবে এগিয়ে। সংলাপ না থাকলেও সবটাই নৃত্যে অভিনয় করা যেত। কিন্তু তাতে করে কালিদাসকে শ্রদ্ধা দেওয়া যেতনা। চীন এই অভিনয় পদ্ধতি জানে। পিকিং অপেরায় তা দেখেছি। পিকিং শকুন্তলা অভিনয় করেছে। তার ডিরেক্টর তা মঞ্চস্থ করবার আগে ভারতেও এসেছিলেন। পিকিং-এ অভিনীত শকুন্তলার সুখ্যাতি পড়েছি। জার্মানীতে ডেন-মার্কেও শকুন্তলা অভিনীত হয়েছে, এবং পাড়িচি দর্শকদের খুব ভালো লেগেছে। বাংলায় শকুন্তলা বার বার অভিনীত হয়েছে সেই ১৮৫৭ থেকে, কিন্তু সফল হয়নি একবারও। তারই বা কারণ কি?

তার কারণ যাই হোক, এটা দেখা গেল যে, অভিনয়ের পদ্ধতি এক না হলেও রচনা তার নিজস্বগুণে জন-সংযোগ করে নাটক সৃষ্টি করতে পারে। ডেনমার্কে জার্মানীতে তা করেছিল, যদিও তা ভারতীয় শকুন্তলা হয়েছিল কিনা তা বলতে পারিনা। দিল্লীতে বসে হিন্দুস্থানী এক শকুন্তলা দেখেছিলাম। তা কিন্তু ভারতীয় বলে মনে করতে পারিনি। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, কেবল অভিনয়ের জন্যই কি দেশে-দেশে শুধু শকুন্তলাই নয়, সংস্কৃত নাটক অভিনয়ের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে, অথবা একটা প্রয়োজন বোধ জাগ্রত হচ্ছে? দুটোই কারণ হতে পারে।

প্রশ্নটা অনেক দিন থেকেই আমার মনকে নাড়া দিচ্ছে। তাই এবার, গত জুলাই মাসে লেনিনগ্রাড ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিটিউটে একটি পণ্ডিতের সংগে আলাপ হতেই যখন জানতে পারলাম তিনি 'মুদ্রারাক্ষস' নাটক রুশীতে অনুবাদ করেছেন হালে, তখন প্রশ্ন করে বসলাম—ও নাটক অনুবাদ করবার প্রেরণা পেলেন কোথা থেকে—আপনাদের নাট্যধারার সংগে ওর সমান্তরাল সম্বন্ধই বা কি, বৈষম্যই বা কি? শকুন্তলা রুশীতে অনূদিত ও অভিনীত হয়েছিল বিপ্লবেরও আগে। কিছুদিন আগে আপনারা মৃচ্ছকটিকা অভিনয় করেছেন। আপনাদের এখনকার নাটকে আদর্শের সংগে বস্তুগত বৈষম্য কি কিছুই নেই?"

ভদ্রলোক সাফ বলে দিলেন—আমিও নাটকে লোক নই, তাই আপনার এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারলাম না। আমার নিজের কাজ সম্বন্ধে এই বলতে পারি যে, আমাদের ইনস্টিটিউট ঠিক করেছেন যে ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত নাটক অনুবাদ করবেন। মুদ্রারাক্ষস অনুবাদ করবার ভার আমার উপর পড়েছিল। আমি তা করিছি।"

আমার মনে হোলো ভদ্রলোককে প্রশ্নটা করা ঠিক হয়নি। সত্যিই ত ভদ্রলোক স্কলার, নাটকে নন্ তো।

আমাদের দেশে যাঁরা বিদেশী নাটকের সংগে আমাদের নাটক তুলনা করে বলেন, আমাদের দেশে নাটক হয়নি, তাঁরাও বলেন—হ্যাঁ, হয়েছিল খানকতক সংস্কৃত নাটক।" কিন্তু সংস্কৃত নাটকের সংগে বাংলা নাটকের তফাৎ কি তুলনায় বাংলা নাটকের ত্রুটি কি, তা জিজ্ঞেস করলে তাঁরা এড়িয়ে যান। তাঁদের অনেকেই না পড়েছেন সংস্কৃত নাটক, না পড়েছেন বাংলা নাটক। বিদেশী নামকরা কিছু কিছু শিল্পী কিছু কিছু বাংলা নাটক দেখেছেন। তাঁরা খুব নিন্দে করেন নি। নাটকেরও নয়, অভিনয়েরও নয়। অথচ তাঁদের নাটক থেকে, তাঁদের অভিনয় থেকে আমাদের নাটকের এবং আমাদের নাটকের পার্থক্যটা বড় কম নয়।

রবীন্দ্রনাথের নাটক বাংলা নাটক ত বটে। তা বিদেশে অভিনীত হয়েছে। আর কোন নাটক হয়নি। কিন্তু হবার সম্ভাবনা রয়েছে। রুমানিয়া থেকে গত বছর একটি কালচুরাল ডেলিগেশন এসেছিল। তাদের নায়ককে আর তাঁদের র্যাম-বাসাডারকে আমি রঙমহলে অভিনীত তারা-শঙ্করের 'কবি' দেখাই। তার কারণ, নায়কটিও যেমন তেমন র্যামবাসাডারটিও পল্লী-গীতির বিশে-ষজ্ঞ। 'কবি' দেখে তাঁরা খুবই খুসি হন এবং ওর গানগুলি আমি রেকর্ড করিয়ে দিতে পারি কিনা জানতে চান। আমি বলি, চেষ্টা করব। কিন্তু আমার চেষ্টাকে ফলবতী করতে পারি না। নায়কটি দেশে ফিরে আবার তাগিদ দেন, আমাকে তাঁদের কিছু বইও পাঠিয়ে দেন, এবং জানান আমি কবির' ইংরেজী তর্জমা যদি পাঠিয়ে দিতে পারি, তাঁরা খুব খুসি হবেন।

কবির অনুবাদ আর গান পাঠাতে পারিনি বলে আমি লজ্জিত রয়েছি। এ সব এক ব্যক্তির চেষ্টায় হয় না। এর জন্য অর্গানাইজেশন চাই। সাহিত্য আকাডেমী অনুবাদ করছেন কিন্তু নাটক এখনো একখানাও প্রকাশিত হয়নি। মাইকেল দিয়ে শুরু হবে। কিন্তু আধুনিক নাটকেরও চাহিদা হয়েছে। এইখানেই শোনা যায়—নেই! নেই!

গত বছর দিল্লীতে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের দশ দিনব্যাপী উৎসব হয়। তাতে সোভিয়েট থেকে কয়েকজন ফ্রেটার্নাল ডেলিগেট আসেন। উৎসব-অন্তে তাঁরা ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের কিছু নাট্যাভিনয় দেখে যান। কোলকাতায় তাঁরা বিশ্ব-রূপায় বিধায়ক রচিত ক্ষুধা দেখে যান। এবার মস্কো গিয়ে বিনয় রায়ের মুখে শুনলাম মলি থিয়েটার ওই নাটকখানি অভিনয় করতে চায়, বিনয়কে অনুবাদে হাত দিতে বলেছে। বিনয় আই-পি-টি-এর অন্যতম স্রষ্টা। তিনি মস্কো রেডিওতে কাজ করেন। রুশী তিনি যেমন আয়ত্ত করেছেন, তেমন খুব কম বিদেশীই নাকি আয়ত্ত করতে পেরেছেন,—নীরেন রায়ও নন। বিনয় বল্লেন, ওদেশে নাটকের অভাব দেখা দিয়েছে।

ক্ষুধা আমি দেখিনি, পড়িওনি। কবির নাট্য-রূপ আমার ভালো লাগেনি। কিন্তু বছর কয়েক আগে পর্দায় ওর যে রূপ দেখেছিলাম, তাই দেখে লিখেছিলাম ওতে যে রস-সৃষ্টি হয়েছে, তার একটা আন্তর্জাতিক আবেদন আছে। ওই জন্যই আমি রুমানিয়ান শিল্পীদেরকে কবি দেখাতে এনেছিলাম। তাঁদের ভালো লেগেছে বলে আমি এই জন্যই খুসি হয়েছি যে, পাশ্চাত্য নাট্যরীতি থেকে পৃথক হয়েও ত্রুটি সত্ত্বেও, বাংলা নাটক পাশ্চাত্য শিল্পীদের খুসি করতে পারে।

আমার সিরাজদ্দৌলার বিলেতে আট-দশটি অভিনয় হয়েছে। রেডিওখ্যাত নীলিমা সান্যাল উদ্যোগী হয়ে ভারতীয় ছেলে-মেয়েদেরকে নিয়ে সে অভিনয় করেন, ইংরেজীতে নয়, বাংলায়—এবং একটি ভূমিকা উর্দুতে অনুবাদ করিয়ে। দর্শক সবকটি অভিনয়েই ওদেশের লোকেরাই। তাঁরা ওতে রসের সন্ধান পেয়েছিলেন, তা কেবল নীলিমার মুখেই শুনিনি, ও-দেশের একজন শিল্পীর মুখেও শুনেছি।

এ-সব কথা লিখছি এই জন্যই যে, বাংলার পেশাদার নাট্যশালাগুলি যে-সব নাটক প্রতিষ্ঠা করেছেন, এবং এখনো করছেন, সেগুলিকে সকলে বাজে মনে করেন না—না এ-দেশের সংখ্যাগুরু দর্শকরা, না বিদেশ থেকে আগত নাট্য-শিল্পীরা। অভিনয় সম্বন্ধেও ওই কথা। যাঁরা বলেন সব বাজে তাঁদের আমি নিন্দা করিনা। তাঁরা অগ্রগামী দাবী তাঁরা অবশ্যই করতে পারেন। কিন্তু এ কথাও আমি মনে করি যে, এ সমগ্র একটা জাতিকে তুচ্ছ করে জাতীয়-নাটক রূপে পরিগ্রহ করতে করতে পারেনা। বাংলা নাটক ও নাট্যশালার সম্যক বিচার আজও হয়নি—অহমিকা-বিবর্জিত বিচার, কু-সংস্কার বিবর্জিত বিচার, জাতীয় দৃষ্টি থেকে বিচার। তাও করা আবশ্যক। দর্শক স্পর্টোনিক করছে। নাটক করতে পারছে না। কেবল নাটক লিখিত হবে, অভিনীত হবে। তার সাফল্য যেমন, ব্যর্থতাও তেমন, তার উন্নতির সহায়ক হবে। কিন্তু অভিনয়টা হবে কোথায়? কোলকাতার চল্লিশ লক্ষ নর-নারীর প্রয়োজন পূর্ণ করবার দায়িত্ব নিয়েছে মাত্র তিনটি থিয়েটার মালিকানা প্রয়াসে প্রতিষ্ঠিত থিয়েটার কোন সভ্য জাতি এই সম্বল নিয়ে সাংস্কৃতিক প্রগতির গৌরব করে না, লজ্জিত হয়। সত্য, হালে কয়েকটি মঞ্চ কোলকাতায় এবং দিল্লীতে তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু তার একটিও নাটক অভিনয়ের উপযোগী করে গড়া হয় নি। অথচ প্রচুর টাকা খরচ করে ও-গুলি তৈরী হয়েছে সব কটাই আবার ভেঙে গড়তে হবে! এমন হয় কেন? জবাব দেবার কেউ নেই। যে-দেশের প্রধানতম মন্ত্রী এবং শ্রেষ্ঠতম মন্ত্রী দশ বছর রাজত্ব চালিয়ে অম্লান বদনে বলতে পারেন যে, খাদ্য-সমস্যা যে এমন গুরুতর, আগে আমি তা বুঝতে পারিনি, সে-দেশে সাংস্কৃতিক সমস্যা সম্বন্ধে দৃষ্টি পাবে কেমন করে? যুগটাই চলেছে উত্তম পুরুষের যুগে। আমি উত্তম, আমার ব্যর্থতাও উত্তম। বাকি সবাই সব কিছুই অধম!

মানুষ আমিত্ব বিহীন হয় না। কিন্তু সেই 'আমি'র বহু হবার ব্যাকুলতা এবং বহুকে, বহুর আনন্দ-বেদনাকে, আপন বুকে নিয়ে আমিকে গৌরবান্বিত করাই পরিপূর্ণতার সাধনা, সংস্কৃতি আর্ট। বিশিষ্ট হয়ে থাকবার লালচ তা নয়। বাংলা নাটক চিরদিনই বহুকে পেতে চেয়েছে, যুগে বিশিষ্টবাদীরা নানা টেকনিকের নিগড়ে তাকে বাঁধতে চেয়েছেন। তাই বাংলা নাটক আজও ক্ষীণ-স্রোতে বয়ে চলেছে। কিন্তু কখনো দুকূল ছাপায়নি, এ-কথা ইতিহাস বলে না।

পৌনে তিন কোটি লোকের দেশ এই পশ্চিম বাংলা। মাত্র চল্লিশ লক্ষ লোক ছাড়া সবাই থাকে পল্লীতে। দেশের অর্ধেক লোকের মাথাপিছু দৈনিক আট আনার বেশী ব্যয়-ক্ষমতা নেই। সে দেশে নাট্যশালা গড়ে উঠবে কেমন করে? কোন দিনই ওঠেনি। নাট্যশালা হয়েছে খড়ের চালা, চণ্ডী-মণ্ডপ, অথবা প্রাঙ্গণ, পথ। তাই এদেশে সহুরে লোকের নাটকই একমাত্র ভাববার কথা। টেকনিক, ডেকরই কেবল সন্ধানের বিষয়। সন্ধানের বিষয় হচ্ছে ব্যয়বহুল সব-কিছুর উপর নির্ভরশীল না হয়েও নাটকের মাধ্যমে জনগণকে কেমন করে রসাপ্লুত করা যায় তাই! তারই সন্ধান পেলে নাটক জীবনেরও সন্ধান পাবে।

কিন্তু জীবন কোথায়? পল্লীতেই কি আছে? নেই ত! তবে? তবে কি নাট

(শেষাংশ ২৫৬ পৃষ্ঠায়)
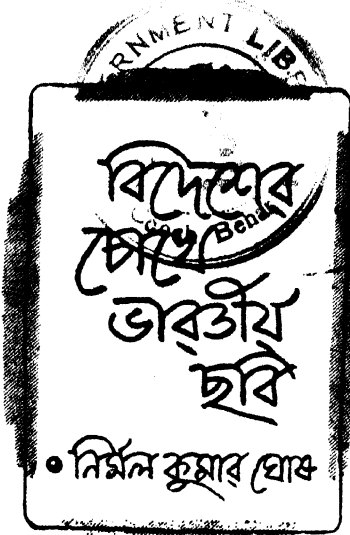
ন্তর্জাতিক মহামিলনের মধু পান
করে বিশ্ব-উৎসবের মুক্ত প্রাঙ্গণে
চলচ্চিত্রের মণিমেলা প্রচুর জাঁকজমকের
বসাচ্ছি আমরা অর্থাৎ বিশ্বের মহাজাতিরা,
বছর কয়েক ধরে। প্রতীচ্য ও
র ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় আদর্শ ও ঐতিহ্যকে
রণ করে সেই সব উৎসবের আয়োজন স্বকীয়
। তারই আনন্দের কলগান সাত-সমুদ্রের
থেকে ভেসে এসে যাদের বক্ষতটে
রের ঢেউয়ের মতো আঘাত করে তীব্র
নার সঞ্চার করতো কিছুকাল ধরে, আমি
ই একজন।

এই সব আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব সম্বন্ধে
দশজন চলচ্চিত্রানুরাগীরই মতো আমারও মনে
কৌতূহল ও আগ্রহ যথেষ্ট পরিমাণেই জমে
। ভারত সরকারের অপ্রত্যাশিত আমন্ত্রণ যখন
এক নাটকীয় পরিবেশে (হাতে নয়) কানে
পৌঁছুল টেলিফোনের তারের যোগসূত্রে,
র যে ইন্দ্রধনু সঙ্গে সঙ্গে আমার
আকাশে বিচিত্র বর্ণসুষমার সমারোহে ফুটে
তার সম্যক বর্ণনা করি সে-ভাষা
নেই। শুধু মনে পড়ে, অকস্মাৎ
হঙ্গের পাখা যেন এই বহু পরি-
অতি পুরাতন আবেষ্টনীর বিবর্ণ, প্রায়ান্ধকার
কোণ মুহূর্তে ত্যাগ করে দাঁড়কাটা পাখীর
মেলে সরল নিজেকে সেই কল্পনার ইন্দ্র-
র অভিমুখে।

চলচ্চিত্র মহোৎসবে আমি সামান্য সমালোচক,
তে নিজের কাছে অসামান্য হয়ে উঠলুম,
গৌরবে বুক নিশ্চয়ই ভরে ফুলে উঠল।
না করব কেন? ভারতের প্রতিনিধিত্ব
জয়টিকা কপালে পরে যাব বিশ্বের দরবারে,
লিনে, যাব কার্লোভি ভা-রীতে, এমন কি
একটিতে আমি হবো সেই বিশিষ্ট গোষ্ঠীর
সভ্য যাদের ছেঁকে আনা হবে সব দেশের
থেকে, যাদের হাতে সমস্ত যোগদানকারী
প্রতিযোগী ছবিগুলোর জীয়ন-কাঠি মরণ-
থাকবে উদ্যত দণ্ডের মতো। আর দশ-
টি লোকের সঙ্গে আমারও মত নেওয়া হবে
চিত্র বা শিল্পীদের নির্বাচনে কিম্বা নির্বাসনে:
আবার ভারতের পক্ষ থেকে। মনে মনে কতোবার
মজ্জা ঘটলো মনে নেই আজ। অগণিত
ও শুভানুধ্যায়ীদের উচ্ছ্বসিত শুভকামনা মালা
যখন আমার কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরল, তখন,
পড়ে আমার মনের ভাব নির্বাক আনন্দ
গলে পড়ল চোখের কোণ বেয়ে। কর্তৃপক্ষের
শস ও অকুণ্ঠ সহায়তা বুকে নতুন উন্মাদনা
। সকলের মিলিত শুভেচ্ছা, 'বাঙলার,
র মুখ রেখো' এই বাণীকে মহামন্ত্ররূপে
করে যেদিন উড্ডীন হলাম খপোত পৃষ্ঠে,
টির কথা ভুলব না। বন্ধুদের হাত ক্ষীণ
মিলিয়ে গেল। পায়ের তলার মাটি সরে
রইলাম আমি আর অগণিত বায়ুতরঙ্গের
বহমান ক্রুদ্ধ এঞ্জিনের একটানা নির্ঘোষ।...
এর পর সেই আমার বহু সাধের চলচ্চিত্র-
পেরীর তীর্থ পরিক্রমা ঘটল একটি মাস
কতো তার আয়োজনের বহর, কতো সেই
উদ্‌যাপনের আনন্দলীলা। বিশ্বের নাগ-
দের সঙ্গে কতো ভাবায় কতো ছবির তোড়ে
যাওয়া। কতো সভা, কতো সমিতি। নতুন
ও ভাষার ব্যঞ্জনা দিয়ে এই সব আয়োজনের
নীতির কতো তাৎপর্য ব্যাখ্যা।
এই সমস্ত আনন্দমেলাকে মধু-মক্ষিকার
আঁকড়ে ধরে লক্ষ লক্ষ নর-নারীর কতো
ন। তারকা, প্রযোজক, পরিচালক ও
দিকদের সেই মহামিলন ক্ষেত্রের এলোমেলো
না ও আনন্দস্রোতের প্রবাহে গা ভাসিয়ে

(ও অতি ভয়ে ভয়ে বলি 'গা বাঁচিয়ে') অবশেষে
একদিন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলাম, ঐ আনন্দ-
নাড়ুর বিচিত্র আস্বাদন লাভ করে। আবার মাটি
ফিরে পেলাম যেন পায়ের তলায়। অবশ্য হয়তো
নবলব্ধ জ্ঞানের ভারে বিব্রত অনেক-
খানি সে পদক্ষেপ।

দেশে ফিরে এসে উত্তেজনা কেটে
যাওয়ার পর ভাবছি এই আন্তর্জাতিক উৎসবের
ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব দান ও স্থান।
তবে কি এ-কথার এই মানে করবেন যে, এই সব
বিরাট চলচ্চিত্রোৎসবের সাড়ম্বর অনুষ্ঠানে আমি
কোন সার বস্তু খুঁজে পাইনি? ভারতের
যোগদানের বিপক্ষে আমি? মোটেই এ-কথা
আমার বক্তব্য নয়। আমি চিন্তা করছি আমাদের
নিজস্ব দৈন্যের কথা। এই আন্তর্জাতিক আয়ো-
জনের মহিমাকে আমি আদৌ ক্ষুণ্ণ করতে
চাইছি না। বরঞ্চ আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আমার দুই
নিমন্ত্রণকারী দেশের ও তাদের সরকারের কাছে
আমার এই সুন্দর আয়োজনে অংশ গ্রহণের
সুযোগলাভের জন্য। তাদের নির্দোষরূপে সুন্দর
আয়োজন, নিখুঁত অভ্যর্থনা ও আন্তরিক আতিথি
সেবার উষ্ণ সান্নিধ্য আমার মনের গভীরে
আসীন রইল চিরকাল। এ একটা দেখবার মতো,
দেখাবার মতো জিনিষ সন্দেহ নেই। ফিরে এলাম
সেখান থেকে মনের মধুভাণ্ডে অনেকখানি সুধা-
সঞ্চিত করে, আর অবাক বিস্ময়ে দু'চোখ ভরে
দেখে—যে কোন একটা আয়োজন করতে গেলে
আয়োজনকারী জাতিকে কতোখানি নিরলস শ্রম,
কতোখানি দায়িত্ব স্বীকার করতে হয়, ও করে
কতোখানি নিঃশব্দ কর্মদক্ষতায় প্রারব্ধ কার্য ব্রত-
সাধনের মতো নিষ্পন্ন করা যায় কতো শৃঙ্খলার
সঙ্গে। তুলনায় সেই সঙ্গে মনে পড়ে আমরা যে
একটি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-এর অনুষ্ঠান করেছিলাম
বছর কয়েক আগে তার অপটুত্বের কথা। আর সেই
সঙ্গে নিয়ে এলাম একটি প্রশ্ন মনের মধ্যে পুরে
যার জবাব আমি এখনো খুঁজছি, সব দিক থেকে
উল্টে-পাল্টে বিচার করবার চেষ্টা করছি। এই সব
আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রকৃত তাৎপর্য
ও নিছক সার্থকতা ভারতের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ
থেকে কোথায় বা কতো টুকু? অবশ্য আমি এর
আন্তর্জাতিক আবেদন, বাহ্য-সৌন্দর্য বিরাট
অর্থকরী দিক বা এর সার্থক আয়োজনের
দিকটার কথা বলছি না। আমি শুধু সেই
বহু সুন্দরালঙ্কারভূষিতার চোখ ধাঁধিয়ে
দেওয়া সৌন্দর্যের অন্তরালে তার আত্মিক
সৌন্দর্যের কথা চিন্তা করছি আপাতঃ মধুর

ভাবালুতা ত্যাগ করে। চিন্তা করছি এই বিদেশী
চিত্র-উৎসবের আমন্ত্রণে নিয়মিত যোগ দিয়ে
ভারতবর্ষের চলচ্চিত্র শিল্প কতোখানি উপকৃত
হ'তে পারে? কি উপায়ে সেই সম্ভাব্য উপকারকে
অর্জন করা যেতে পারে? ভারতের সম্মানের মান
কতোখানি উন্নীত করা যায় তার মাধ্যমে এবং
কী তার পথ? যে বিশেষ কর্মপদ্ধতিতে এই
সব উসবের কর্মকর্তারা তাঁদের কর্মসূচী পালন
করেন, তাতে ভারতের তথা বাঙলা ছবির যোগসূত্র
কিভাবে স্থাপন করা যায় এবং কিভাবে ও কতো-
খানি শিল্পোন্নতির সম্ভাবনা ঘটে আমাদের? কতো-
খানি সত্যিকারের সুযোগ ঘটে, নিজেদের একান্ত
ভারতীয় ভাবধারা ও শিল্প-রস ধারার দ্যোতনাকে
বিদেশীর চোখে দেখিয়ে আমাদের ছবির আত্ম-
প্রতিষ্ঠা লাভের? আমাদের ভাব-রসে তাঁদের
উদ্বুদ্ধ ও উত্তীর্ণ করবার?

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, এই প্রশ্ন বিশেষ
ক'রে আজই মনে জাগবার একটা বিশেষ কারণ
আছে। সেটা হচ্ছে এ বছরে বিশ্বের দরবারে প্রায়
সর্বত্রই ভারতীয় ছবির করুণ অসাফল্য। কান্‌-এ
বলুন, বা বার্লিন-এ বলুন। কি কার্লোভি ভারী,
কি ভেনিস্‌। তবু আমাদের অনেকখানি আশা ছিল
এদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া আমাদের ছবিগুলির
সম্বন্ধে। সেই বিশেষরূপে সঞ্জীবিত আশা-তরুটির
মূল কোথায় ছিল? সে মূল ছিল গত বৎসরে প্রায়
প্রতিটি উৎসবক্ষেত্রে আমাদের ছবির অদ্ভুত সাফল্য।
গ্রাঁ প্রি-র জয়মাল্য ছিনিয়ে আনলুম আমরা দু-
দুটো জায়গায় বিশ্ব-প্রতিযোগিতার আসর থেকে।
তারও আগে পথের পাঁচালী-র অসামান্য সাফল্য
থেকে,—অন্যত্র উৎসবে। যার পর থেকে ভারতের
ছবি ও ভারতের সত্যজিৎ রায়—এঁদের জয়গানে
সমস্ত পৃথিবীর আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে
উঠল।

গত বছরের এই বিশেষ পটভূমি মনে রেখে
ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে এ বৎসরে আমাদের
ছবির ব্যর্থতার বেদনা আমাদের কতোখানি লেগেছে
বুকে। এবং অবশ্যই সে ব্যথা আমারও বুকে
সমান লেগেছে। বলা যায় যুক্তির খাতিরে যে আমরা
তো পুরোপুরি ব্যর্থ নই। বার্লিন-এ আমাদের
ছবির একটা বিশেষ পুরস্কার ঘটেছে ক্যাথলিক্‌
সমাজ থেকে। তার উত্তরে বলবো—সে পুরস্কার
শিরোধার্য ক'রে যে, সে বিশেষ সম্মান আন্তর্জাতিক
উৎসবের বিচারকমণ্ডলীর পুরস্কারধন্য নয়।
বলা যেতে পারে যে, আমাদের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী
নার্গিস্‌ কারলোভি ভারী-তে গত বছরের বিশ্ব-
চলচ্চিত্রে সেরা অভিনেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। হ্যাঁ,
এইটেই আমিও বলব আমাদের এ বছরের একমাত্র
যোগ্য সম্মান। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও বলতে
হয়, এ সম্মান ঠিক আমাদের ছবির সম্মান নয়,—
তারই মাধ্যমে আমাদের একজন শিল্পীর ব্যক্তিগত
সম্মান। তাতে আমাদের বুক ঠিক পুরো ভরল না।
তার আমাদের সবচেয়ে বড়ো ক্ষোভের কথা—কান্‌-
এ সত্যজিৎ-এর তৈরী চিত্ররসের অপরূপ আলেখ্য
'পরশ পাথর'-এর ব্যর্থতা। এর স্রষ্টা অবশ্য তার
নিজস্ব সুচিন্তিত মত দিয়েছেন এ-সম্বন্ধে,
যাতে তিনি বলেছেন যে, কান্‌-ফেস্টিভ্যাল-এর
জন্য এ ছবির নির্বাচনই ভুল। একশো বার স্বীকার্য।
যেমন ভুল বলব—কার্লোভি ভারীতে বৃটিশ
কমেডি চিত্র "BARNACLE BILL" এর
বা আমাদের নিজস্ব আঁধারে-আলোর নির্বাচন।
আমি অবশ্য জানিনা অন্য কোন্‌ উৎসবে এই দুটো
ছবির উজ্জ্বল সম্ভাবনা ছিল পুরস্কারের মধ্য-
মণি লাভ করার। হয়তো বার্লিন-এ সত্যজিৎ-এর
ছবির অনেকখানি ছিল। অথবা ছিল কার্লোভি-
ভারীতে 'ডাক হরকরার'। বা ভেনিস্‌-এ আঁধারে-
আলো-র। এই থেকে সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন ওঠে
আমাদের বিদেশের প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে ছবি
পাঠাবার যোগ্যতম নির্ধারণ রীতি কী; কোথায়

শৈল মজুমদার পরিচালিত আর্ট এণ্ড কালচার-র 'অগ্নিসম্ভবা'-র নায়িকারূপে মঞ্জুলা ব্যানার্জি।

র ভুল; কিভাবে, কী নীতিতে সে নির্বাচন হওয়া উচিত। কিন্তু তবুও কি এ প্রশ্ন ওঠে না যে প্রকৃত রসী ও রসবোদ্ধা বিচারকেরও উচিত প্রত্যেক ভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতিমূলক ছবি বোঝবার জে আয়াস বরণ করা যাতে তার মধ্যে তিনি শ্রেণী ধরাতে পারেন।

ইয়োরোপের যে-কোনো স্থানে অনুষ্ঠিত জাতিক উৎসবে ছবি পাঠানোর জন্য যে আমন্ত্রণ লেভেন্স পাচ্ছি, সে আমন্ত্রণকে উপেক্ষা করবার থা আমি মুহূর্তের তরেও চিন্তা করছি না। চিন্তা করছি এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ষ্টিকোণ থেকে। আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে মি যেটুকু বুঝলুম, দেখলুম,—তাতে আমার নে এই প্রশ্ন জেগেছে যে, এই ছবি পাঠানোর পারে শুধুমাত্র আমাদের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের রা প্রভাবান্বিত না হ'য়ে আমরা যদি ভিন্ন ভিন্ন আন্তর্জাতিক উৎসবকে তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কীয় ভাবধারার আলোকপাত দিয়ে বিশ্লেষণ রে সেইমত ছবি পাঠাই তবে বোধ করি আমাদের ব্যাপারে পদক্ষেপ হবে অনেকখানি বাস্তব। দি আমরা যদি আমরা বুঝি কোন বছরের বিশেষ উৎসবে পাঠাবার মতো যোগ্য ছবি—অবশ্য তাদের চির মাপকাঠিতে মেপে—আমাদের কিছু নেই তবে আমাদের পক্ষে বুদ্ধির কার্য হবে স্থানে আমাদের সম্মানভূষিত যে-কোন ছবি পাঠানো থেকে বিরত হওয়া, শুভতর সুযোগের অপেক্ষায়।

এর পরের কথাটায় হয়তো আমার পক্ষে আরো অর্থার বা অভিমানের সুর বাজবে কারু কারুর নে। সেটা এই, আমার মনে হ'ল দেখে শুনে আমরা বোধ করি এই আন্তর্জাতিক পুরস্কারের উন সুধাপান ক'রে অনাবশ্যক রকম উত্তেজনায় অভিভূত হ'য়ে উঠেছি, এর অভিনবত্বের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আমাদের নিজস্ব শিল্প বিচার বোধকে বৃথা পীড়ন করছি বিদেশী চিত্রমানের কল্পিত বা অজানিত শিল্পনৈপুণ্যের সঙ্গে সহযাত্রী হবার অলীক কল্পনায়। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের জাতীয়-শিল্প স্বদেশে প্রদর্শনের ক্ষেত্রে। দেশের শিল্প নিজের অঙ্গনে মার খাচ্ছে আজ।

এ' কথা বললে আজ হয়তো খুব অত্যুক্তি হবে না যে, আজ ছোট বড় প্রায় প্রতি নবীন চিত্রশিল্পী, পরিচালক, নতুন ছবির মানস-কাঠামো গড়নার সময় বিশ্বের দরবারে সম্মানের জয়তিলক অর্জনের রঙীন স্বপ্নেই বিভোর হন, এবং সেই স্বপ্নের অঞ্জন চোখে মেখে নানাবিধ অদ্ভুত সব প্রয়াস চালান তাঁদের ছবিতে—প্রযোজকের কাঁধে ভর করে। যারা ছেলে ধরতেই শিখলো না, তারা কেউটে ধরতে গেলে কি বিভ্রাট ও বিপদের সঞ্চার হতে পারে তা কি বোঝানোর জিনিষ? আর এই মরীচিকার পেছনে ছোটার ফল শিল্পের দিক থেকে এই দুর্দিনে কি পরিমাণ মারাত্মক হতে পারে সেটাও কি আজ ভেবে দেখবার জিনিষ নয়?

আমার মনে হয় আমাদের নতুন অভিযাত্রিকদের মনে এই যে নতুন মোহের সঞ্চার হয়েছে এর মূলে আছে আমাদের নবযুগস্রষ্টিকারী সত্যজিতের সার্থক রসোপহার—পথের পাঁচালীর অন্ধ অনুকরণ-প্রবৃত্তি। পথের পাঁচালীর যে প্রভাব নতুন প্রভাতের স্নিগ্ধ সূর্যকিরণের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত জাতির মনের মণিকোঠায়, উদ্ভাসিত করে তুলেছিল দশদিক তার অপরূপ সারল্যে-মাখা দিব্য বিভাতে, তাই কাল হয়ে দাঁড়ালো অনেক অযোগ্য অনুবর্তীদের। তাঁরা ভাবলেন—ধরে ফেলেছি সাফল্যের গুপ্ত মন্ত্র! সুরু হলো বহির্দৃশ্যমূলক চিত্রের ব্যাপক বিস্তার। সুরু হলো প্রকৃতির কোলে পটভূমি স্থাপনের কাড়াকাড়ি। যা-কিছু ছিল কাল পর্যন্ত ভাল ছবি করবার নাট্যরসপুষ্ট মাল-মশলা বলে গণ্য, যা কিছু ছিল জানা ছায়াচিত্র টেক্‌নিক্-এর কুশলতা বলে পরিগণিত, যা কিছু ছিল নাট্য-নৈপুণ্য বা পরিচালনা-নৈপুণ্য বা চিত্র-নাটকীয় রচনা বলে সমাদৃত, অকস্মাৎ তা গেল রাতারাতি বাতিল হয়ে। High Tension-মূলক নাটক বর্জিত হয়ে গেল, সত্যজিতের শক্তিশালী সৃষ্টি-বৈভবের জ্যোতিতে অনেক চোখ ধাঁধিয়ে গিয়ে অনেক ব্যর্থ অনুসরণকারীর জন্ম হল। এ'দের মধ্যে শক্তি কারু নেই এমন কথা বলি না। কিন্তু তাঁরা আর যাই হোন, চিত্ররসের ক্ষেত্রে তাঁরা পথিকৃৎও নন, রসের ভাণ্ডারীও নন, বড়জোর খুচরো কারবারী। এই সত্য বিস্মৃত হয়ে অনেক ক্ষুদ্রতর প্রতিভা অনেক

অগ্রদূত প্রযোজিত ও পরিচালিত আবেগধর্মী 'লালু-ভুলু' ছবির একটি দৃশ্যে কমলা মুখার্জি ও মাঃ সুভাষ

দেবকীকুমার বসু পরিচালিত 'সাগর সংগম' চিত্রের একটি আকর্ষণীয় চরিত্রে ভারতী দেবী।

অনিষ্ট সাধিত করেছেন,—নিজেদেরও বটে, শিল্পেরও বটে।

আমার মনে হয় এই নতুন জোয়ারে ভেসে যাওয়ার বিপদ সম্বন্ধে আমাদের শিল্পের চিন্তা-নায়কদের গভীরভাবে ভেবে দেখবার দিন এসেছে। আলেয়ার আলোর পেছনে ছোটা ত্যাগ করে, যা অনেকখানি পরিচিত বা নিশ্চিত বলে জানি তাকে করায়ত্ত করবার সাধনাকে মনে করি সমস্ত শিল্পের মঙ্গলদায়ক। একটা Swallow পাখী একটা সুখঋতু আমদানী করতে পারে না। একটা সত্যজিতের একান্ত নিজস্ব সৃষ্টিনৈপুণ্য, একটা গোটা শিল্পের ধারা-প্রবর্তক হতে পারে না। সত্যজিৎরা বাড়ি বাড়ি আসেন না। এ কথাটা আজ বলা দরকার।

এবার আসি 'আন্তর্জাতিক' প্রতিযোগিতার গোড়ার কথায়। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে মনে করি,—এই বিশেষ শব্দচয়নের মধ্যে একটা মূলগত গলদ রয়েছে। আয়োজন যতই বিরাট ও ব্যাপক হোক, তার দ্বারা কখনোই একটি বিশেষ স্থানের প্রতি, বিভিন্ন দেশের প্রতি, বিভিন্ন ভাষায় রচিত ছবির যথার্থ রসানুধাবন ও সম্যক বিচার সত্যিই সম্ভব নয়। আর প্রধান প্রতিবন্ধক--ভাষার কাঁটাতার। দ্বিতীয়, এবং বোধ করি তার চেয়েও বড় কারণ,—এক জাতির সম্পূর্ণ নিজস্ব সংস্কৃতি, শিক্ষা, শিল্প-রসানুভূতির আদর্শ ও নাট্যবোধ খুব কমক্ষেত্রেই অপরের সঙ্গে মেলে। তাই আমার কাছে যা শাশ্বত রসে উত্তীর্ণ, অপরের কাছে তা অতি সাধারণ। আবার আমার কাছে যার আবেদন ফিকে হয়ে গেছে, অপরের কাছে তা রূপে-রসে উৎফুল্ল। তাই আমার মনে হয়, আমার আদর্শ, আমার শিল্পবোধ, আমার ভাবধারাকে সাব-টাইটেল্স'এ মুড়ে, গান কেটে বা নিষ্ঠুর কাঁচি চালিয়ে, অপরের অজানা চাহিদা ও রসজ্ঞানের সমতুল করতে যাওয়ার মতো বিড়ম্বনা আর কিছুই নেই। আমার আত্মসমীক্ষা দিয়ে অপরকে বুঝতে যাওয়া বা মাপতে যাওয়া—যে অপরের সঙ্গে আমার রীতিতে, নীতিতে, ভাষায়, জাতিগত আচার-আচরণে কোন দিক থেকে বিন্দুমাত্র মিল নেই—এবং সেই কল্পিত ছাঁচে নিজের রসবস্তু গড়তে যাওয়া অত্যন্ত অবাস্তব ব্যাপার।

(শেষাংশ ২৮৭ পৃষ্ঠায়)
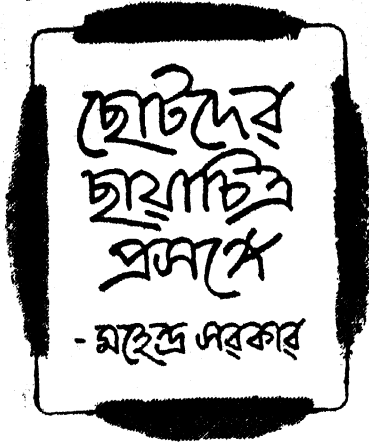
অপ্রিয় হলেও একথা সত্য, ছোটদের ছবি বা শিশুচিত্র বলতে আমাদের বিশেষ কিছু নেই। শিশুচিত্র যথেষ্ট মর্যাদাও পায়নি আমাদের দেশে। উৎকৃষ্ট শিশু-সাহিত্য খুব বেশী নেই, তাই ছোটদের ছবিও হচ্ছেনা—এ অতি অসার যুক্তি। আসল কারণ অন্যত্র। প্রথমতঃ জনসাধারণ এ-বিষয়ে নিরুৎসাহ। সরকারেরও তেমন জোরালো চেষ্টা নেই। এমন কি ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পে—কয়েকটি সম্মানিত ব্যতিক্রম ছাড়া—ছোটদের ছবির ব্যাপারে চিত্রনির্মাতারা যা করেছেন সেও এক করুণ চিত্র।

অথচ এই সঙ্গে যদি আমরা ইউরোপ-আমেরিকার দিকে তাকাই তাহলে বিপরীত দৃশ্য দেখে বিস্মিত হব। কেবল ইউরোপ বা আমেরিকা কেন, সব দেশেই ছোটদের উপযোগী ছবি তৈরীর ব্যাপারে কিছু না কিছু করা হচ্ছে। কারণ সমাজকল্যাণীরা এখন বুঝে নিয়েছেন, কিশোর-তরুণদের পঠন ও পাঠন এবং তাদের সুস্থ মানসিকতা গড়ে তোলার পক্ষে ফিল্ম এক বিশিষ্ট ভূমিকা অভিনয় করতে পারে।

এ প্রসঙ্গে প্রেসিডেণ্ট রাজেন্দ্র প্রসাদের কথাই উল্লেখ করি এখানে। চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটির প্রথম নিবেদন 'জলদীপ' ছবিটির উদ্বোধন উৎসবে তিনি বলেন: বর্তমানকালে অগ্রগামী দেশগুলিতে ফিল্ম শিশু-শিক্ষার জন্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহনরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সারা বিশ্বের প্রধান প্রধান শিক্ষাবিদরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা এ-বিষয়ে এখন একমত—ছোটদের শিক্ষা ও মানসিক ক্রমোন্মেষের পক্ষে বই-পড়া ও লেখা ইত্যাদি প্রচলিত ধারা অপেক্ষা নির্দিষ্ট ফিল্মের সাহায্যে শিক্ষাদান অনেক সহজ, অনেক বেশী কার্যকর।

তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে শিশুচিত্র নির্মাণে সংস্কৃতি ও রুচিভেদে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। মত এবং পথও তাদের স্বতন্ত্র। যেমন আমেরিকা ও বৃটেন। পরীক্ষা ও গবেষণার পর কিশোর-তরুণদের উপযোগী ছবি তৈরীর ব্যাপারে আমেরিকা যে পথে চলে, বৃটেনের পথ তা থেকে ভিন্ন। মতও তাদের আলাদা। আমেরিকার লক্ষ্য থাকে ছোটদের জন্য তৈরী ছবিটি আমুদে হ'ল কি-না সেই দিকে, আর বৃটেন দেখবে—ছবিতে জানবার মত, শিখবার মত কিছু থাকল কিনা।

প্রথমে এ-বিষয়ে যারা খুব বেশী অগ্রসর সেই আমেরিকার কথাটাই আলোচনা করা যাক।

কিছুকাল পূর্বে একদল শিক্ষক প্রতিনিধি

সেখানে ক্লাসে পড়ানোর সময় শতকরা আশিটি স্কুলেই ফিল্ম নিয়মিতভাবে প্রদর্শিত হয়। তাঁদের বিস্ময় আরও বাড়লো যখন তাঁরা শুনলেন, খাস হলিউডের তৈরী হাজারখানেক ছবি ব্যবহৃত হয় এ-কাজে।

ক্লাসের পড়ায় হলিউডের ছবি? শিশু-কিশোর-নবীনদের শিক্ষার জন্য ক্লার্ক গেবল্, বেটি ডেভিস বা গ্যারি কুপারের অভিনয়? সে আবার কী রকম শিক্ষা!—এই ধরনের কিছু প্রশ্ন করে বসলেন অতিথিরা। তারপর শুনে আশ্বস্ত হলেন: শ্রবণ ও দর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যাপারে ফিল্ম ও-দেশে অভাবনীয় সাফল্যলাভ করেছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার জন্য হলিউডের পুরনো কাহিনী-চিত্রগুলো থেকে বিশেষ বিশেষ ছবি তৈরী করে নেওয়া হচ্ছে এখন।

কেমন করে এই আশ্চর্য কাণ্ড সম্ভব হ'ল তার ইতিহাস খুঁজতে গেলে দু' যুগেরও উপর পেছিয়ে যেতে হয়। সে এক চমকপ্রদ ঘটনা।

জনকয়েক উদ্যমী শিক্ষাব্রতী একদিন হঠাৎ গিয়ে উঠলেন নিউইয়র্কের ফিল্ম-নেতাদের দপ্তরে। পরিচয় ও পারস্পরিক সৌজন্য বিনিময়ের পর তাঁরা যে বক্তব্যটি পেশ করলেন কর্তাদের কাছে, তা এইরূপ:

আপনাদের কোম্পানীর অজস্র ছবি পড়ে রয়েছে গুদামের যত্রতত্র। ছবিঘরে ওগুলোর দেখানোর আয়ুও শেষ হয়ে গিয়েছে। আর এখন হয়তো রাশি রাশি ধুলোই জমছে। দিন না, ওর থেকে কিছু আমাদের, ছেলেদের লেখাপড়ার কাজে লাগাই?

বলা বাহুল্য, পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে এ-ধরনের একটা প্রস্তাব শুনে শিল্প-কর্তারা অবাক হয়ে গেলেন। কেন না কৌলীন্যের বিচারে তখনো ফিল্মের স্থান নীচের তলায়। আর্ট তো দূরের কথা, শিল্প হিসেবেও তেমন মর্যাদা পেতোনা ফিল্ম।

যদিও বিক্ষিপ্তভাবে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল তখন এদিকে ওদিকে এবং তার ফলও পাওয়া যাচ্ছিল; তবে বড় রকমের কোন কাজ হয়নি। অধিকাংশ শিক্ষক কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না সে সুযোগ নিতে। তাঁরা মনে করতেন, শিক্ষার ব্যাপারে প্রমোদ-চিত্র ও শিক্ষামূলক ছবির মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। এ যুক্তি যাঁরা মানলেন না, বিদ্রোহ করে বেরিয়ে এলেন তাঁরা। আজ যে

তারাশঙ্কর রচিত ও সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'জলসাঘর' চিত্রে ছবি বিশ্বাস।

ফিল্ম পাঠ্যপুস্তকের পাশে স্থান লাভ করেছে তা ওই বিদ্রোহীরাই সম্ভব করেছেন।

আবার আগের কথায় ফিরে আসি। শিক্ষাব্রতীদের প্রস্তাবে কাজ হ'ল। ছোটদের কপাল খুলে গেল। এরপর ফিল্ম কোম্পানীগুলি শিক্ষার কাজে ব্যবহারের জন্য পুরোনো ছবিগুলো তো দিলেনই, তাছাড়া একটি আলাদা প্রতিষ্ঠান গড়ে শিক্ষকদের পরিকল্পনায় সাহায্য করতে লাগলেন। 'টিচিং ফিল্ম কাস্টোডিয়ান' নামে এই প্রতিষ্ঠান আজ অসামান্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছে ওদেশে।

টিচিং ফিল্ম কাস্টোডিয়ান—ফিল্ম-শিল্পের সক্রিয় সহযোগিতায় পুষ্ট। কিন্তু এর পরিচালনা ও নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে আমেরিকার নয়জন শিক্ষাবিশেষজ্ঞের উপর।

পুরোন ছবি থেকে যখন প্রোগ্রাম তৈরী চলতে লাগলো, তখন প্রথমে বড়দের জন্য

নির্মীয়মান ছোটদের ছবি 'হারানো খোকার কাণ্ড'-র একটি দৃশ্যে তিলক, চন্দন, ভাস্কর, বরুণ,

তৈরী খণ্ডচিত্রগুলির উপর দৃষ্টি দেওয়া হল বেশী এবং এ-বিষয়েও সাহায্য করলেন শিক্ষা-ক্ষেত্রের বিশিষ্টরা। ভ্রমণ কাহিনী, প্রামাণ্য ঘটনা, নিসর্গ দৃশ্যাবলী, ঐতিহাসিক আখ্যান, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের শত শত ছোট ফিল্ম গুদোমের কোণ থেকে টেনে বার করা হ'ল, আর ব্যবহার করা হতে লাগলো স্কুলের ক্লাসে। ছেলেমেয়েরা পরমানন্দে ছবির সাহায্যে পাঠ শিখতে লাগলো। শিক্ষকের কাজ হয়ে পড়ল সহজ। খণ্ড-চিত্রের এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে শিক্ষকরা এরপর দৃষ্টি দিলেন কাহিনী-চিত্রগুলির উপর। শতাধিক জগৎ বিখ্যাত নির্বাচিত কাহিনী-চিত্রের অংশ উদ্ধৃত ও বিশেষভাবে সম্পাদিত করে ক্লাসে দেখানো চলতে লাগলো। অবশ্য নব্বই মিনিটের ছবিকে দাঁড় করানো হ'ল বড় জোর বিশ-তিরিশ মিনিটে।

এইভাবে ফিল্মের গুদোম থেকে বেরিয়ে এলো ট্রেজার আইল্যান্ড, ডেভিড কপারফিল্ড, দি ক্রুসেডস্, দি লাইফ অফ এমিল জোলা প্রভৃতি বহু-প্রশংসীত ছবি। এক মজার ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল গানের ছবির প্রদর্শনীর সময়। 'ওয়ান নাইট অফ লাভ', 'দি গ্রেট ওয়াল্টজ' বা 'সং অফ সংস' ছবি যখন চলেছে তখন একটি আসনও ফাঁকা যায়নি। অবশ্য জানা দরকার, এ-সব ছবি ব্যবসাগতভাবে দেশ-বিদেশে দেখানো শেষ হওয়ার আগে ছোটদের প্রয়োজনে পাবার উপায় নেই।

বর্তমানে আমেরিকার প্রায় আশি হাজার স্কুলে ফিল্মকে এইভাবে শিক্ষার কাজে লাগানো হয় এই পরিকল্পনা কী বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেছে তা এখন আর কারো অজানা নেই। ইউনাইটেড স্টেটস্-এ এখন বোধ হয় এমন একজনও শিক্ষক বা শিক্ষাব্রতী নেই যিনি স্বীকার করবেন না যে, মোশান পিকচার শিক্ষার ব্যাপারে এক অপরিহার্য অংশ। অবশ্য এমন একটা বিশ্বাস বড় সহজে আসেনি। বহু অক্লান্ত শ্রম ও পরীক্ষা রয়েছে এর পেছনে। পরীক্ষায় জানা গেছে, ফিল্মের সাহায্যে যে-সব ছাত্রদের পাঠ শেখানো হয়েছে তারা বেশী শিখেছে, সহজে বুঝেছে, বেশী মনে রেখেছে এবং আলোচনার সময় তারাই জোরালো ভাষায় তাদের বক্তব্য পেশ করতে পেরেছে। এক কথায় শিক্ষার দিক থেকে ফিল্ম এক নতুন জীবন এনে দিয়েছে ওদেশে শিক্ষণে-পঠনে।

বর্তমানে শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে তৈরী প্রায় পঁচাত্তর হাজার ছবি বিনে পয়সায় বিভিন্ন স্কুল-কলেজে দেখানো হয় এবং প্রায় চার কোটি ছেলে-মেয়ে এইসব ছবির সাহায্যে শিক্ষালাভ করে। তাই আমেরিকার চলচ্চিত্রশিল্প ও-দেশের ছেলে-মেয়েদের কাছে এক গৌরবের সম্পদ।

আমেরিকার চিত্রশিল্পের এই বদান্যতার উল্লেখে স্বয়ং ডক্টর মে'র মত বিশ্ববিশ্রুত ব্যক্তিও বলেছেন : বহু ব্যবহৃত ফিল্ম-এর গুদোমঘরগুলোর দরজা উন্মুক্ত করে দিয়ে আমেরিকার চিত্রশিল্প শিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

আমেরিকান মোশান পিকচারের অন্তর্ভুক্ত টিচিং ফিল্ম কাস্টোডিয়ান ছাড়াও ছোটদের উপযোগী চলচ্চিত্র নির্মাণে আর যাঁরা নিযুক্ত আছেন, তাঁদের দানও কিছু কম নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে এঁদের এই মিলিত দান ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

ছোটদের ছায়াচিত্রের ব্যাপারে বৃটেনের ইতিহাসেও কম বৈচিত্র্যময় নয়। গ্রেট বৃটেন ও আয়ার্ল্যান্ডসহ গোটা দেশটার লোকসংখ্যা পাঁচ কোটির উপরে নয়। কিন্তু প্রতি শনিবারে ছোটদের জন্য ওঁরা যে বিশেষ প্রদর্শনীগুলির আয়োজন করেন, হিসেব নিয়ে দেখা গিয়েছে, তাতে ক্ষুদে দর্শকদের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় নয় লাখের কাছাকাছি। কিন্তু অনেকের ধারণা আরও অনেক বেড়ে যেতো এতদিনে এই সংখ্যা, যদি কতকগুলো অসাধু পত্র-পত্রিকা উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য এবং গরম সংবাদ পরিবেশনের মোহে পড়ে কতকগুলো যা-তা ছবি ছাপিয়ে অভিভাবকদের মন বিষিয়ে না দিত।

সে প্রায় বছরদশেক আগের কথা। কয়েকটি পত্র-পত্রিকা শিশু চলচ্চিত্রের প্রদর্শনীকালে গৃহীত এমন কতকগুলো ছবি ছাপিয়ে দিলে, যা দেখে অভিভাবকরা আঁতকে উঠলেন। সেই কাগজে ছাপানো ফটোতে তাঁরা প্রত্যক্ষ করলেন : যে-ছবিটি দেখানো হচ্ছিল ছোটদের, তা দেখে ওরা কেউ ভয়ে

পেস পিকচার্সের 'শশীবাবুর সংসার'-এ মনোরমারূপে সাবিত্রী চ্যাটার্জি।

জড়সড় হয়ে চেয়ারের পেছনে লুকিয়েছে, কেউ বা পাশেরটিকে জড়িয়ে ধরেছে ভয়ে।—এই ছবি দেখে গার্জেনরা ক্ষেপে গেলেন। অনেকে বন্ধ করে দিলেন ছেলে-মেয়ের ছবি দেখতে যাওয়া।

বলেছি তো এ প্রায় দশ বছর আগের ঘটনা। তখন বৃটেনের শিশুজগতে আমেরিকান 'সিরিয়াল' দেখানো হত। উক্ত প্রদর্শনীতে যে-ছবিটি দেখানো হয়েছিল, সেটিও ছিল একটি আমেরিকান 'সিরিয়াল'।

এরপর শিশু-চিত্র প্রদর্শনীতে ক্রমেই দর্শনাকাঙ্ক্ষীর ভিড় কমে যেতে লাগলো। উদ্যোক্তাদের মাথায় বাজ পড়ল তখন। তাঁরা আস্তে আস্তে ছোটদের উপযোগী ছবির তৈরীর ও প্রদর্শনীর গোটা ধারাটাই পাল্টে দিলেন। এল নব যুগ। ছোটদের ক্লাব ও শনিবারের প্রদর্শনীগুলিতে ওঁরা নিজেদের তৈরী ছবি পরিবেশন করতে লাগলেন। এই ধারাই চলছে এখনো ও-দে...

বৃটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট কৃত এবং চিল... ফিল্ম ফাউন্ডেশন এবং এই প্রতিষ্ঠানের ... উদ্দেশে নিবেদিত ওই সব 'সিরিয়াল ... প্রাসঙ্গিক অংশ ছোটদের প্রোগ্রামের মাধ্যমে ব... ন্যাশনাল থিয়েটারেও প্রদর্শিত হয়। ফাউন্ডেশ... তৈরী ছবির মধ্যে বর্তমানে রয়েছে ... কাহিনী-চিত্র, প্রায় চল্লিশখানি খণ্ড চিত্র এবং ... গল্পসমন্বিত চারখানি সিরিয়াল। এর ... ছোটদের জন্য তৈরী ছবি যেমন রয়েছে ... সার্বজনীন আবেদনসম্পন্ন ছবিও আছে। যথাস... কম খরচের মধ্যেই করা হয় এ-সব ছবি ... এগুলো জনপ্রিয়তা লাভ করে। কারণ সহজ ... সহজতর করে বলা হয় ছবিতে, সংলাপ যথ... বর্জন করা হয়।

সংক্ষেপে এই হ'ল বৃটেন ও আমেরিকার দু'টি বিশিষ্ট দেশের শিশু-চলচ্চিত্রের ইতিহাস...

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশের কথা ভা... অবাক হতে হয়। দেখা ও শোনার যুগ এটা। ... ও দর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার উপরেই জোর দে... হচ্ছে এখন বেশী। চোখে দেখে, কানে শুনে ... শেখা যায়, আর কিছুতেই তেমন নয়। ... ছত্রিশ কোটি লোকের বিশাল এই ভারতে চলচ্চি... সুরু থেকে আজ পর্যন্ত ছোটদের জন্যে ক'খানা ... করতে পেরেছি আমরা? সে-সংখ্যা ... আঙুলেই গোণা যায়।

ভারতীয় শিশু-চিত্রের এই দীনতায় ... ধনী ও বহু পৃষ্ঠপোষিত হিন্দী জগতের অবস্থা ... সব চাইতে লজ্জাকর। সত্যেন বসুর ... (হিন্দীরূপ), এ ভি এম-এর রাষ্ট্র-পুরস্কারপ্রা... 'হাম্ পন্ছি এক ডাল্ কে' ও চিলড্রেন্স ফি... সোসাইটির 'জলদীপ' ছাড়া আর কোন উল্লেখযো... ছবির নামই মনে পড়ে না ... মারাঠী ভাষাতেও কিছু চেষ্টা হয়... তবে বলবার মত কিছু নয়। ... সে তুলনায় গরীব হলেও, চারুকলা... বাংলার কৌলীন্য কিঞ্চিৎ বেশী। কিন্তু ... জনসংখ্যার বিচারে তারই সংখ্যা যা ক... বালি-বিন্দুর মত নয় কি?

ছোটদের ছবি কেমন হবে? এ-সম্বন্ধে অনে... অনেক রকম ধারণা। বিশেষজ্ঞরা যা বলেন, ... মর্মার্থ হ'ল : যে-ছবি ছোটদের মনে দোলা ... তা-ই ছোটদের ছবি। আসল কথা, আনন্দের ... দিয়ে শেখানো। ছবির গল্পের মধ্য দিয়ে ছোটদে... মনে দয়া, উদারতা, মমতা, পরের দুঃখ মোচন ... প্রবৃত্তি ইত্যাদি বিষয়ে ছোটদের মনে চে... জাগিয়ে তোলা। আর সব চেয়ে বড় কথা, ... শিশু-চলচ্চিত্রের কোন বাঁধাধরা গণ্ডী থাকবে ... ছোটদের মত বড়দেরও ভাল লাগবে সে-সব ছবি।

অনেকে বলেন, ছোটদের ছবিতে পয়সা ... নামও নেই—তাই ছোটদের ছবি হচ্ছে না এ-দেশে ... কেন, 'পরিবর্তন' পয়সা পায়নি? 'জন্মতিথি' ... পায়নি? 'কাবুলিওয়ালা' সম্মান ও অর্থ উভ... পায়নি? আর অর্থই কি একমাত্র কাম্য, ... সেবার চলচ্চিত্রের কী কোন দায়িত্ব নেই?

নিশ্চয়ই আছে। চলচ্চিত্রের যেমন দায়িত্ব আ... সমাজের প্রতি, সমাজেরও তেমনি দায়িত্ব রয়ে... চলচ্চিত্রের প্রতি।

প্রযোজকরা ছবি করে শুধু মুনাফা শিকার... জন্য—এই রকম একটা একটেরে ধারণা ... অনেক অভিভাবকের। এটা মোটেও বাঞ্ছনীয় ... প্রযোজকরা যে তাঁদেরই জন্য ছবি করছেন ... বোঝেন ক'জন?

শিশু-চিত্র নির্মাণে উৎসাহ দেবার জন্য, আ... বড় কথা, ছবির ভেতর দিয়ে ছেলে-মেয়েদের ... বিজ্ঞান শেখাবার জন্য, অভ্যাস গড়ে তুলতে ... ছোটদের ছবিগুলো দেখতে। দর্শকদের মধ্যে ...

(শেষাংশ ২৮৭ পৃষ্ঠায়)
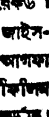
গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা

(২৪৫ পৃষ্ঠার পর)

দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে পৌরাণিক নাটকের মহোৎসব।

কিন্তু কেবল জনসাধারণ নয়, তখনকার সম্ভ্রান্ত সাহিত্যিকবৃন্দও গিরিশ-প্রতিভার এই বিস্ময়কর উন্মীলন দেখে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা না জানিয়ে পারেন নি। পুরাতন সাহিত্য-পত্রিকাগুলির (এমন কি সর্বশ্রেষ্ঠ 'ভারতী' পত্রিকারও) পাতা ওল্টালেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। সাহিত্যক্ষেত্রে তখনও উন্নাসিকের অভাব ছিল না, তবে সেই সংগে ছিলেন বহু গুণগ্রাহী সমজদারও—একালে যাঁদের দেখা পাওয়া দুর্লভ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু গিরিশ-প্রতিভা কেন জনতার তথা মনস্বীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল? মাইকেল মধুসূদন প্রমুখ নাট্যকাররা পাশ্চাত্য আদর্শে বাংলা নাটক রচনা করতেন এবং গিরিশ-চন্দ্রও নিজের মুখেই বলেছেন: 'মহাকবি সেক্ষ-পীরই আমার আদর্শ। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছি।' তাই যদি হয়, তবে পূর্ববর্তীদের সংগে গিরিশচন্দ্রের পার্থক্য কোথায়?

এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাবে গিরিশচন্দ্রেরই এই উক্তিতে: 'প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতের সাহিত্য সেই দেশের ভাব-রসে পুষ্ট ও বর্ধিত হয়। ... ... মহাকবি কালিদাস, ভবভূতি এঁদেরও আমি অনাদর করি না।'

অন্যত্র আবার বলছেন: 'নাটকে আমার আদর্শ সেক্ষপীর। কিন্তু তাই বলে কি তাঁর অনুকরণে ম্যাকবেথ, কিং লিয়ার আঁকতে যাব—যেখানে রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য আছে। যে দেশে ব্যাস, বাল্মীকি, কাশীরাম, কৃত্তিবাস আছে, সে দেশে কি বিলেতী আদর্শ দেশকে দিতে যাব?'

গিরিশ-প্রতিভার আর এক নূতন দান হচ্ছে, পৌরাণিক নাটকের উপযোগী ভাষার জন্যে ভাংগা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত বোদ্ধা, পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞও 'ভারতী' পত্রিকায় লিখেছিলেন: 'আমরা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের নূতন ধরণের অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিশেষ পক্ষপাতী। ইহাই যথার্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দ। ইহাতে ছন্দের পূর্ণ স্বাধীনতা ও ছন্দের মিষ্টতা উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। কি মিত্রাক্ষরে কি অমিত্রাক্ষরে অলংকার শাস্ত্রোক্ত ছন্দ না থাকিয়া হৃদয়ের ছন্দ প্রচলিত হয়, ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা ও ইহাই আমরা করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। গিরিশবাবু এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করাতে আমরা অতিশয় সুখী হইলাম।'

সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মত প্রকাশ করেছিলেন: 'এতদিনে নাটকের ভাষা সৃজিত হইয়াছে।'

সেই সাবেককালে রচিত পৌরাণিক নাটকে গিরিশচন্দ্রের দ্বারা ব্যবহৃত ভাংগা অমিত্রাক্ষর ছন্দ যে এখনো কতখানি শক্তি ও সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে হাল-আমলে যাঁরা 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' পালায় শিশিরকুমারের অনবদ্য অভিনয় দেখেছেন তাঁরাই পেয়েছেন তার জ্বলন্ত পরিচয়।

তারপর গিরিশচন্দ্রের গদ্য ভাষা। আমাদের দৈনন্দিন অলংকার ও বাহুল্য-বর্জিত কথাবার্তার ঘরোয়া ভাষাকেই নিজের নাটকে তিনি গ্রহণ করেছেন স্বাভাবিকতার অনুরোধে। এখানেও পূর্ববর্তীদের সংগে তাঁর মিল নেই। মধুসূদন ও দীনবন্ধু প্রভৃতির দু-চারখানি ক্ষুদ্র প্রহসনের কথা ছেড়ে দিলে দেখা যাবে, তাঁদের নাটকগুলির ভাষা এতটা কৃত্রিম ও পল্লবিত যে, অল্পদিনের মধ্যেই প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' ও 'হারানিধি'ও সেকেলে সামাজিক নাটক, কারণ, প্রায় সত্তর বৎসর আগে তা রচিত হয়েছে। অথচ আজকের দিনেও ঐ নাটক দুখানির কথোপকথনের ভাষা একটুও না বদলে অনায়াসেই অভিনয় করা চলে। এদেশে গদ্যে ও পদ্যে নাটকের ভাষায় গিরিশ-প্রতিভার এই অগ্রগতির তুলনা নেই।

বিশেষজ্ঞ ইংরেজ সমালোচকরা বলেন, যুগধর্ম অবহেলা করে মঞ্চ-নাটক লিখলে সফলতা অর্জন করা যায় না। এ সত্যও ছিল গিরিশচন্দ্রের নখ-

অসীম পাল পরিচালিত সুলতা পিকচার্সের 'শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর'-র একটি দৃশ্য।

দর্পণে। বাংলাদেশে যখন যে সামাজিক বা রাজ-নৈতিক বা ধর্মনৈতিক আন্দোলন জেগেছে, তাঁর সর্বতোমুখী নাট্যপ্রতিভা তার কোনটাকেই ত্যাগ করেনি।

নব নব চরিত্রসৃষ্টির শক্তি প্রতিভাধর নাট্যকারের অন্যতম প্রধান লক্ষণ। গিরিশচন্দ্রের সর্বব্যাপী কল্পনায় সৃষ্ট নাট্যজগতে যে বিপুল জনতা দেখা যায়, তার মধ্যে আছে কত শ্রেণীর, কত প্রকৃতির চরিত্র-বৈচিত্র্য। সেখানে এমন সব কুশীলবও আছে, যারা হয়তো মঞ্চে দেখা দিয়ে দু-এক পংক্তির বেশী কথা কয়নি, কিন্তু তারাও নাটকীয় ক্রিয়াকে কিছু-না-কিছু এগিয়ে দিয়েছে বলে নাটকের মধ্যে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

পুনশ্চ নাটকে প্রলাপ

(২৪৮ পৃষ্ঠার পর)

জীবন-রস বিদেশ থেকেও আমদানি করতে হ... যেমন করে ষ্টীল-প্ল্যাণ্ট করা হচ্ছে? ক্ষতি কি... চিরদিনই ত তাই হয়েছে। গ্রীক নাটক থে... প্রেরণা নিয়েছে রোম, রোম থেকে নিয়েছে বৃটে... ফ্রান্স থেকে নিয়েছে জার্মানী, রাশিয়া, স্ক্যা... নেভিয়া। ভারত থেকে নিয়েছে বর্মা ইন্দোচী... ইন্দোনেশিয়া, চীন, জাপান, কোরিয়া। তা নি... প্রত্যেকেই নিজ-নিজ সমাজকে প্রতিফলিত ক... নিজেদের নাটকে প্রাণের সঞ্চার করেছে। বর্তমা... বাংলা নাটকও তাই-ই করেছে। কিন্তু এ-কথ... শেষ কথা নয়। নিষ্প্রাণ দেশে প্রাণ সঞ্চার করা... সব দায়িত্ব নাটকের নয়। কিন্তু গোড়ার দা... নাটকের। তা হচ্ছে বিশ্বাস জাগিয়ে তোলা, ... অটুট রাখা, নিষ্ঠাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া। শ্রীচৈতন্য... ওই প্রয়োজন-বোধ থেকেই নাটকের মাধ্যমে গঙ্গা... বইয়ে দিয়েছিলেন। নিষ্প্রাণ দেশ প্রাণব... হয়েছিল।

গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী কোন কোন সুপ্রসিদ্ধ... অত্যন্ত লোকপ্রিয় নাট্যকারের রচনায় দেখা যা... এক একখানি নাটকের মধ্যে একাধিক আখ্যান... স্থান পেয়ে মূল সূত্রটি ছিঁড়ে ফেলে নাটকী... ক্রিয়াকে অবাধে চরম পরিণতির দিকে অগ্রসর হ... দেয়নি। গিরিশচন্দ্রের রচনায় নেই এমন গুরু... ত্রুটি।

নাট্যকাররূপে গিরিশচন্দ্র কাজ করেছিলেন মা... ত্রিশ বৎসর, কিন্তু তার মধ্যেই লিখে ফেলেছিলে... শতাবধি নাটক-নাটিকা! গোষ্পদে সমুদ্রকে ধরা যা... না, এখানে স্বল্প-পরিসরে এমন বৃহৎ না... প্রতিভারও সম্যক পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নয়। ... বক্তব্য শেষ করবার আগে আর একটি কথা ব... দরকার।

গিরিশচন্দ্র ছিলেন অনন্যসুলভ শিল্পী, কি... নিজের সূক্ষ্মতর প্রতিভার বিশেষত্ব দেশকে দি... যেতে পারেন নি। কারণ, তিনি ছিলেন রংগালয়ের... বৈতনিক কর্মচারী, স্বত্বাধিকারীর ইচ্ছার বিরু... কিছুই করতে পারতেন না। মঞ্চ-নাটকে যে উচ্চত... রস নিবেদন করবার সুযোগ নেই তা জেনেও তাঁ... মঞ্চ-নাটক নিয়েই নিযুক্ত থাকতে হত। তাই কর... স্বরে আক্ষেপ করেছেন: 'আমার হাত-পা বাঁধা!'

অন্যত্র আমি দেখিয়েছি, রুসিয়ার অমর লেখ... লিওনিদ আন্দ্রীভ যে 'প্যান-সাইকি' বা আত্মাশ্র... নাটকের কথা বলেছেন, তাঁরও আগে গিরিশচ... নিজেই ঐ শ্রেণীর নাটক রচনার ইচ্ছা প্রকাশ করে... ছিলেন। বাইরের ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়ে মনে... বিশ্লেষণ নয়, অন্তরাত্মাকে অবলম্বন কা... নাটকীয় ক্রিয়া দেখাতে তিনি চেয়েছিলেন, কি... সর্বহর মৃত্যু এসে তাঁকে সে ইচ্ছা পূর্ণ করতে... দেয়নি।
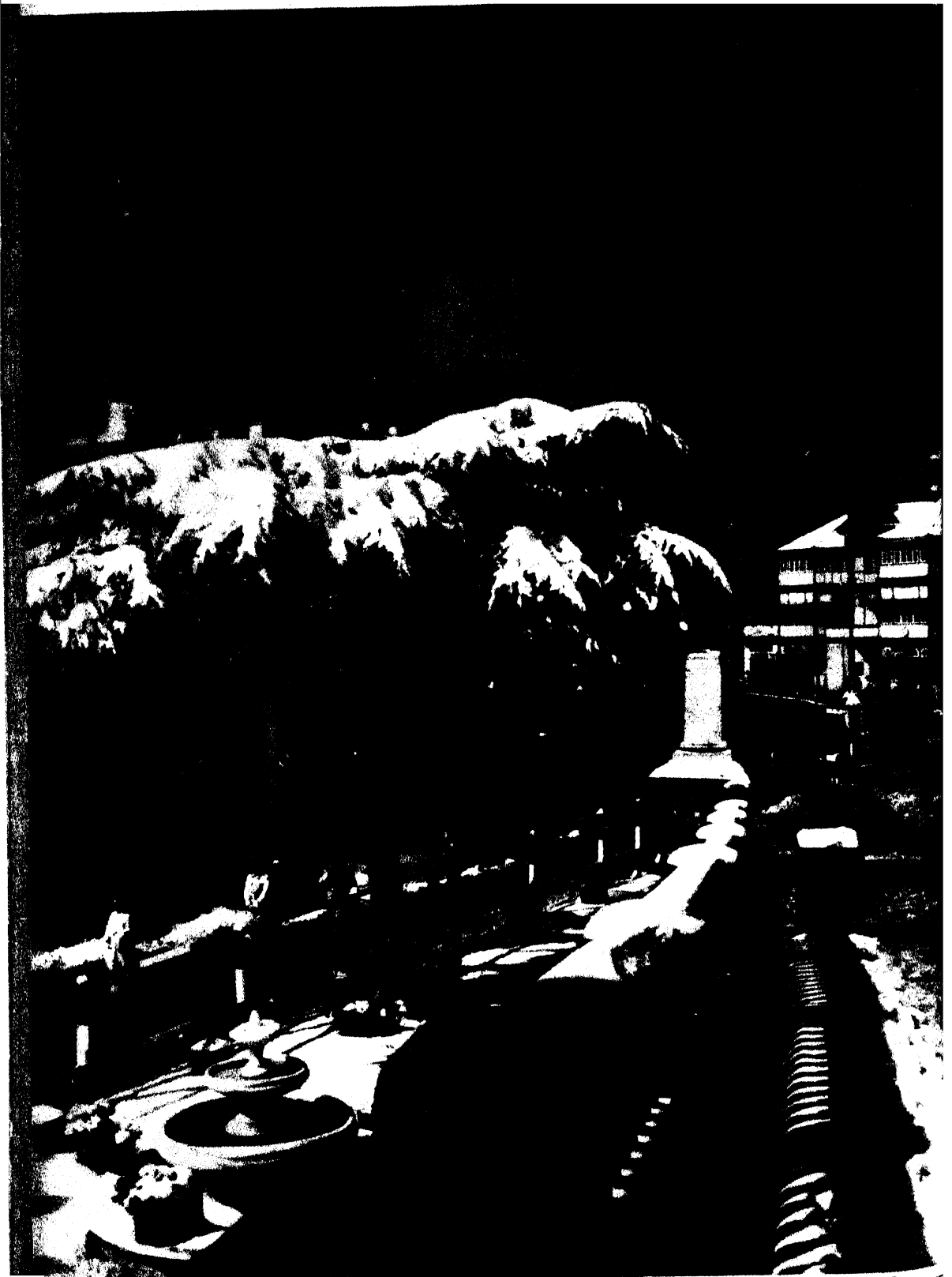
সুনীল জানা

শীতার্ত শহর অমিয় তরফ

পূজোর
প্রীতি-সম্ভাষণ
গ্রহণ করুন
ডি সি এম্
রিটেল ষ্টোর্স
দি দিল্লী ক্লথ এণ্ড জেনারেল মিলস কোম্পানী লিঃ, দিল্লী

বেলা দে

সৌন্দর্য সম্বন্ধে প্রধান কথা অবশ্যই মনের সৌন্দর্য এবং প্রকাশভঙ্গীর মাধুর্য—আর তা ছাড়া শরীর তো বটেই, তার স্বাস্থ্য এবং শক্তিকে সচেষ্টভাবে চর্চা করা। প্রসাধনের প্রধান উদ্দেশ্য রূপকে সুন্দর করে তোলা, বসনভূষণ কেশের কারুকার্য ইত্যাদি দিয়ে নিজেকে সাজাবার চেষ্টা করা। কবির কথায়—

"তোমায় সাজাব যতনে কুসুমে রতনে
কেয়ূরে ও কঙ্কণে কুমকুমে চন্দনে।"

সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের আকর্ষণ জন্মগত। তবে রুচিসম্মতভাবে সাজগোজ করার মধ্যে একটা নৈপুণ্য আছে যা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে চোখে পড়ে না। কারণ খুব সুন্দর ও দামী জিনিষও ভুলভাবে ব্যবহার করলে তার কোনো ফল হয় না, আবার খুব সাদাসিদে জিনিষ দিয়েও মোটামুটি চেহারাকে সুরুচিপূর্ণভাবে সাজালে তার চেহারা দেখায় অন্যরকম।

প্রথমেই শাড়ী নির্বাচনের কথা। প্রধানতঃ শরীরের গঠন ও গায়ের রংয়ের উপর শাড়ী নির্বাচন নির্ভর করে। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায়, শাড়ী কেনবার সময় যে রংটি চোখে সুন্দর লাগলো সেইটিই কেনা হয়। অথচ শাড়ীটা কে পরবেন সে কথা চিন্তা করা হয় না। কাজেই শাড়ীর রং বেছে নেবার আগে কার জন্য কেনা হচ্ছে আগে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। আমাদের ধারণা ময়লা ও শ্যামবর্ণ মেয়েদের ফিকে রংয়ের শাড়ীই ভালো মানায়, কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল। ফিকে রং না পরিয়ে গাঢ় রংয়ের শাড়ী পরাবেন, যেমন পাউডার ব্লু, শ্যাওলা সবুজ, মেরুণ এইগুলিই বেশী মানাবে। এ ছাড়া অবশ্যই গোলাপী, চাঁপাফুলে, হলদে ইত্যাদি মাঝে মাঝে পরা যায়। সাদা শাড়ীতে সকলকেই মানায়, এতে একটা স্নিগ্ধভাব আছে, তবে আমার মনে হয় যাদের রং বেশ ময়লা, তারা বেশি সাদা শাড়ী ব্যবহার করবেন না। যাদের রং উজ্জ্বল তাঁরা সময় বিশেষে সব রংয়ের শাড়ী পরতে পারেন। কেবলমাত্র উগ্র লাল রংয়ের জামা কাপড় কারুর পক্ষেই বেশি ব্যবহার করা উচিত নয়। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশে। কালো রংয়ের শাড়ীর জন্য ফর্সা রংয়ের দরকার হয় না, বার্ধক্যেরও নয়, বিজ্ঞভঙ্গিরও নয়—সচেতন মনের। কাজেই কালো শাড়ীও যখন-তখন ব্যবহার করতে নেই, ওটা রাতের পোষাক হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

তারপর আজকাল পাড়বিহীন শাড়ীর প্রচলন খুব বেশী হয়েছে। তাতে অবশ্য চলাফেরা করার পক্ষে সুবিধা আছে তবে পাড়বিহীন শাড়ী একটু গাঢ় রংয়ের হলেই ভালো। এখন ব্লাউস পরার কথা। শাড়ীর সংগে রং মিলিয়ে ব্লাউস, পেটিকোট ইত্যাদি পরা রুচি আধুনিকতার পরিচয় এবং যাঁদের সুবিধা আছে তাঁরা এদিকে দৃষ্টি দিলে ভালো হয়। প্রথমতঃ শাড়ীর যে রং হবে সেই রংয়ের কোনো গাঢ় রংওলা ব্লাউস করা উচিত। আর ছাড়া শাড়ী যদি খুব জমকালো [illegible]

ব্লাউস যথাসম্ভব সাদাসিদে হবে। আর ব্লাউস যদি খুব জমকালো হয় তবে শাড়ী হবে সাদা-সিদে। এছাড়া টিস্যু ইত্যাদি জরীর কোনো শাড়ীর সঙ্গে ঐ রংয়ের সিল্ক বা জর্জেট বা সাটিনের ব্লাউসই ভালো দেখায়। কারণ দুটোই জমকালো পরলে কোনটারই বাহার হয় না। সাদাসিদে শাড়ী পরতে হলে কালোপাড় শাড়ীর সংগে লাল বা হলদে অথবা সাদা ব্লাউস, লালপাড় শাড়ীর সংগে কালো ব্লাউস বা লাল ব্লাউস বেশ মানায়। কিন্তু সারা গায়ে যদি ছাপা শাড়ী পরেন, তবে ব্লাউস পরবেন এক রংয়ের। এই সংগে আর একটা কথা বলি সেটা হল বাড়ীতে কাজকর্ম করবার সময় বা বাড়ীতে একটা দিন কাটাবার সময় কিভাবে নিজের সৌন্দর্য রক্ষা করা যায়। চুলটাকে যা হয় করে একটা এলো খোঁপা বেঁধে নিলেন। খোঁপা হয়তো বার বার খুলে পড়ছে আর এলোমেলো চুল দেখাচ্ছে বিশ্রী। যে ব্লাউস পরেছেন তার সংগে গায়ের মাপের যেন কোনো সম্পর্ক নেই, হয়তো বোতামের অভাব পূরণ করবার জন্য সরাসরি পিন্ এঁটে দেওয়া হয়েছে। যা হোক একটা শাড়ী পরা আছে। মুখটা তেল চুকচুকে, চলাফেরা সাজ-পোষাক, সবেতেই যেন একটা এলোমেলো

ভাব! এর কি সত্যিই কোনো দরকার আছে? এর মধ্যে কি সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা যায় না? পুরুষেরা যখন কাজ করতে যান তখন তাঁরা কি ঐভাবে থাকেন? অনেকে হয়তো বলবেন পুরুষদের কাজ অফিসের ডেস্কে। আর মেয়েদের ঘর পরিষ্কার, রান্নাকরা, আরো কত কি এই ধরণের কাজ! এতে কি আর পদে পদে সৌন্দর্য বজায় রেখে চলা যায়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও মেয়েরা মোটামুটি এই সব কাজই করে থাকেন—নিজেরাই বাজার করা, কাপড় কাচা, ইস্ত্রি করা, আবার চাকরীও করতে যান তবুও সব সময় নিজেদের পরিচ্ছন্ন রেখে আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখেন, উজ্জ্বল রাখেন। আমি বলি চুলগুলো খুলে না রেখে একটু [illegible] করে বেঁধে একটা পিন দিয়ে আটকে [illegible] যেতে পারে, তাহলে চুলগুলো এলোমেলো হয় না। শাড়ীর আঁচলটা জড়িয়ে নিন কোমরে, যাতে হাত দুটো সহজে কাজ করবার জন্য মুক্ত থাকে; শাড়ীটা পরুন যত্ন করে, ধোওয়া ইস্ত্রি করা শাড়ী পরে তার উপর একটা [illegible] ঝুলিয়ে দিন। সামান্য এক টুকরো পরো মোটা কাপড়কে কাঁধ থেকে যাতে [illegible] এমন করে ঝুলিয়ে দিয়ে পিছনে ফিরে [illegible] দিন। এতে শাড়ী নষ্ট হবে না। [illegible] রান্নাঘরের কাজের সময় ব্যবহার করবেন।

আজকাল স্বাধীন দেশের [illegible] আমাদের বেশভূষায়ও বেশ একটা [illegible] ভাবের সাড়া পড়ে গেছে। অবশ্য বলতে [illegible]

(শেষাংশ ২৭২ পৃষ্ঠায়)

ওয়ালটেয়ারে — অমিয় পাল

বাংলার সমাজ ও বাঙ্গালী ব্যবসায়ী

।। শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ।।
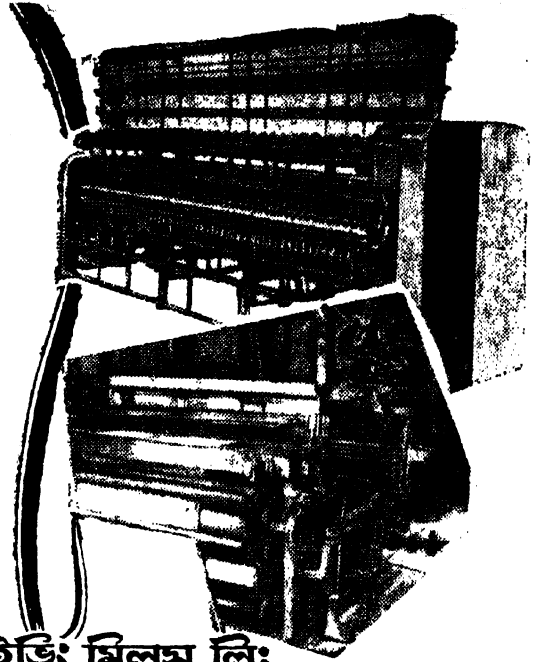
ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর আকর্ষণ কম কেন, কেন তাহার কাছে ব্যবসা অপেক্ষা চাকুরী অধিকতর প্রিয় ইহা একটি মৌলিক প্রশ্ন। ইহার পিছনে ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নানা কারণ রহিয়াছে। ঐ সকল জটিল কার্য-কারণের সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ এখানে অসম্ভব। উপস্থিত আমি শুধু এই বিপর্যয়ের সামাজিক কারণটি নিয়াই আলোচনা করিতে চাই। বলা বাহুল্য, আজিকার সামাজিক মনোভাবও কোন একক বা সর্ব-সম্পর্কচ্যুত বস্তু নয়। উহাও নানা প্রাকৃতিক এবং ঐতিহাসিক উপাদানে গঠিত। ঐ সকল উপাদান নির্ণয়ও আমার উদ্দেশ্য নয়। আপাততঃ আমি আমাদের সমাজ ও ব্যবসায়ীদের পারস্পরিক সম্পর্কটিই শুধু অনুধ্যান করিতে চাই।

এই কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার আগে প্রথমেই আমাদের উচিত হইবে বাংলা দেশের বর্তমান সামাজিক কাঠামোর দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে আমাদের সমাজ আজিও প্রধানতঃ প্রাচীন বর্ণাশ্রম আদর্শের ভিত্তিতেই গঠিত। বল্লাল সেন বহুদিন বিগত হইয়াছেন সত্য, তথাপি আজিও এই সমাজে কুলীন-অকুলীনের প্রশ্ন দিব্যদেহে বিরাজিত। ইতিহাসের নির্মম চাপে আজ অবশ্য বর্ণের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। রক্ত পরীক্ষা করিয়া কৌলীন্য নির্ণয়ের চেষ্টাও আজ আর কেহ করিতে বসেন না। কারণ তাহা নিতান্তই উন্মাদের কাজ। যেমনই উদ্ভট, তেমনি হাস্যকর। কারণ আজ জাত-পেশা বলিয়া কোন বর্ণেরই নিজস্ব কোন পেশা নাই। উদরান্নের সন্ধানে এক বর্ণের লোক অন্য বর্ণের আঙ্গিনায় আসন পাতিতেছে। জ্ঞান-চর্চায় ব্রাহ্মণ আজ একক নন, ব্যবসা বৈশ্যদের একচেটিয়া নয়। তাঁহাদের অনেকেই আজ বৃত্তিচ্যুত হইয়া চাকুরীর উমেদারীতে ঘুরিতেছেন। ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধবিদ্যা পরিহার করিয়া মাছিমারা কেরাণীতে রূপান্তরিত হইতেছেন। সমাজে আজ বিপুল বেগে ভাঙ্গাগড়া চলিয়াছে। কোন স্তরেই স্থিতি নাই, কোন বর্ণেই পূর্বেকার সংহতি নাই।

কিন্তু লক্ষণীয় এই, এই প্রবল পরিবর্তনের মধ্যেই আজ আবার নিত্য নূতন শ্রেণী এবং কুলের আবির্ভাব ঘটিতেছে। পূর্বেকার বর্ণ-বিভাগ ভাঙ্গিয়া নূতন বিভাগ সৃষ্টি হইতেছে। কৌলীন্য নির্ণয়ে নব্যপন্থা অনুসৃত হইতেছে। আজ আর বাঙ্গালীর পরিচয় ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় হিসাবে নয়, তাহার কুল-চিহ্ন—ব্যবসায়ী, বৃত্তিজীবী (আইন ব্যবসায়ী, চিকিৎসক প্রভৃতি) কেরাণী, চাষী অথবা শ্রমজীবী। তাহাদের কৌলীন্য আজ আর জন্মসূত্র ধরিয়া স্থির হয় না, বৃত্তি দ্বারা সাব্যস্ত হয়।

আরও লক্ষণীয় এই, যদিও এই বিভাগ-গুলি নিতান্তই কাঁচা, তথাপি ইহাদের মধ্যে গোঁড়ামীর কোন অভাব নাই। বরং কোথায়ও কোথায়ও এই গোঁড়ামী বল্লালী কাঠামোকেও হার মানাইয়াছে। ডাক্তারবাবু আজ কেরাণীবাবু হইতে নিজেকে স্বতন্ত্র ভাবেন। সেই স্বাতন্ত্র্যবোধ কায়স্থ এবং বৈদ্যের স্বাতন্ত্র্য বোধ অপেক্ষাও অনুদার। ডাক্তারবাবুর ধারণা, যেহেতু তাঁহার পেশা অধিকতর আধুনিক এবং বিজ্ঞানানুমোদিত, সেইহেতু তিনি ব্যারিষ্টারবাবু অপেক্ষা উচ্চস্তরের বুদ্ধিজীবী। কেরাণী এবং ব্যবসায়ীর মধ্যেও এমনি কুলীন-অকুলীনের ধারণা রহিয়াছে। এমনকি, কেরাণীরা নিজেরাও সরকারী কেরাণী, বে-সরকারী কেরাণী, জ্যেষ্ঠ-কেরাণী, কনিষ্ঠ কেরাণী ইত্যাদি নানা গোত্রে বিভক্ত। কখনও কখনও এই বিভাগ এত প্রবল যে ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক দুইটি ভিন্ন বর্ণ বা গোত্রের সম্পর্ক মনে না হইয়া দুইটি বিরুদ্ধ-বাদী ধর্ম সম্প্রদায়ের সম্পর্ক বলিয়া মনে হয়।

সে যাহা হউক, সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর বিন্যাস এবং তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্কই যে সমাজ লক্ষণ এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ এই বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রিয়া-কাণ্ড, ধ্যান-ধারণাই সমাজের প্রকৃতি, সমাজের গতি। তাহার সামগ্রিক যোগ-ফলই সামাজিক মন। ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে আমাদের সমাজের এই মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীটি কি তাহাই আমাদের বিবেচ্য।

।।২।।

বাঙ্গালী সমাজের বর্তমান ভাঙ্গাগড়ার মধ্যেও ব্যবসায়িগণ রহিয়াছেন। তাঁহাদের পূর্বতন শ্রেণীও আজ আর নাই, নিত্য নূতন যোগ এবং বিয়োগের ফলে তাহা নূতন আকার ধারণ করিয়াছে বটে, কিন্তু ব্যবসায়ী বিলুপ্ত হইয়া যান নাই। কারণ সমাজ থাকিলে ব্যবসা থাকিলেই। ব্যবসায়ীও থাকিবেন। তাঁহাকে বাদ দিলে সমাজ হয় না, রাষ্ট্র হয় না, দেশ থাকে না।

এখানে ব্যবসায়ী বলিতে আমি উৎপাদন এবং বণ্টন ব্যবস্থার সঙ্গে সংশিলষ্ট আমাদের সমাজের বিশেষ শ্রেণীর সভ্যগণকেই বুঝাইতেছি। চিকিৎসক এবং আইনজীবীও বিশেষ অর্থে ব্যবসায়ী। কিন্তু আমি এখানে তাঁহাদের বৃত্তিজীবী আখ্যা দিয়াছি। যাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনের উদ্যোক্তা এবং বণ্টনের সহায়কর্মে নিযুক্ত আমি এখানে শুধু তাঁহাদেরই ব্যবসায়ী বলিয়াছি। কারখানার মালিক এবং এজেন্সী ফার্মের কর্তা হইতে সুরু করিয়া পাড়ার মুদিওয়ালা, মোড়ের পানওয়ালাটি পর্যন্ত আমার এই সংজ্ঞা প্রসারিত।

অন্যান্য দেশ এবং সমাজের মত বাঙ্গালী সমাজেও এই শ্রেণীর বিলক্ষণ অস্তিত্ব রহিয়াছে। বাঙ্গালী তাহার অভাব যতখানি নিজে পূর্ণ করিতে পারে নাই—সেইটুকু অবাঙ্গালীকে দিয়া পূর্ণ করিয়া নিয়াছে। কারণ ব্যবসায়ী না হইলে তাহার চলে না। কোনদিন চলিবে না। ভবিষ্যতে রাষ্ট্র যদি উৎপাদন এবং বণ্টনের সাকুল্য দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেন তাহা হইলেও ব্যবসায়ী বিলুপ্ত হইয়া যাইবে না; তাহার রূপ বদলাইবে মাত্র। তখন ব্যবসায়ীর স্থান গ্রহণ করিবেন সরকার এবং সরকারী কর্মচারী। ব্যবসায়ী তখন সরকারী ভৃত্য হইবে মাত্র।

তাই বলিয়া তখন ব্যবসারূপ কর্মটি উদ্দেশ্য কিছু ভিন্ন হইবে এরূপ মনে করিবা কোন হেতু নাই। সরকারী ব্যবসায়ীও ম উৎপাদনে উদ্যোক্তার (Entrepreneur ভূমিকাটুকু পালন করিবেন এবং ব্যক্তিগত ন হইলেও দলগত কিম্বা দেশগত লাভ-স্পৃহ তাঁহাদের ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যরূপে গৃহী হইতে বাধ্য। নচেৎ ব্যক্তিগত লোকসানী কার বারের মতই সরকারী কারবার বেশি দিন চলিবে না। এমন কি শ্রমিকেরাও যদি নিজেরাই ব্যবসায়ের সর্বপ্রকার ক্ষমতা এবং সুযোগ অধিকার করেন তাহা হইলেও তাঁহাদের পক্ষে এতদ্ভিন্ন—নান্য পন্থাঃ। নিজেদের মধ্য হইতে তখন তাঁহাদের কাহারও হাতে উদ্যোক্তার (Entrepreneur) দায়িত্ব দিয়া দিতে হইবে এব অতঃপর তাঁহাদের এবং ঐ ব্যক্তির মধ্যে সম্প পূর্বতন শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে রূপান্তরি হইবে। বস্তুত সোবিয়েত রাশিয়ায় তাহা ঘটিয়াছে। হয়ত কারখানা পরিচালক এ শ্রমিকের মধ্যে ঐ দেশে সম্পর্ক আরও উদার আরও অভিপ্রেত কিন্তু ইহারা ভিন্ন দুই শ্রেণী। তাহাদের দায়িত্ব ভিন্ন, কাজ ভিন্ন জীবনও ভিন্ন। শ্রমিক হইলেও পরিচালকেরা উদ্যোক্তা, তাঁহারা ব্যবসায়ী। জিলাস (Djilas তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থে ইঁহাদের সেই আখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার মতে ইঁহারা ব্যবসায়ী এব নিকৃষ্ট ও বিকল ব্যবসায়ী।

ইঁহাদের সমালোচনা আমার বর্তমা প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের আলোচনা এইটুকু তথ্যই যথেষ্ট যে শ্রেণীহীন সমাজে ব্যবসায়িগণ বর্তমান। অন্যান্য সমাজের ম সেখানেও তাঁহারা সমাজদেহের একটি বিশি অঙ্গ। নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের বাসনায় তাঁহারা দেশে দেশে উৎপাদনের নিত্যনূতন কল কৌশল উদ্ভাবন করেন। শিল্প-বিপ্লবে তাঁ দের স্থান সর্বজনবিদিত। আজ এমন অনে জিনিষ এই পৃথিবীতে প্রচলিত আছে যাহ মনুষ্য জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে ব্যবসায়ীরাই তাহা উদ্ভাবন করিয়া আবশ্যকে তালিকায় আনিয়াছেন। এক কথায় বলি গেলে তথাকথিত বৈশ্যযুগই মনুষ্য ইতিহাসে দ্রুততম যুগ। এ যুগেই সমাজজীবনে গ আসিয়াছে সর্বাধিক। আজও পৃথিবীতে বৈশ গণই অন্যতম উদ্ভাবক শ্রেণী, নূতন নূত উদ্ভাবনের তাঁহারাই প্রথম পৃষ্ঠপোষক।

এই দিক হইতে ব্যবসায়িগণ সমাজে অন্যতম সৃজনশীল শ্রেণীও বটে। ভারতবর্ষে কথাই ধরা যাউক। এ দেশে আমাদের স্বদেশী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু আগে টা কোম্পানী ভারতবর্ষে বিজ্ঞান চর্চার ব্যবস্থা করিয়াছিল এই কথাটি আমাদের মনে রাখিতে হইবে। আধুনিক ভারতবর্ষের পিছনে ইংরে বণিকদের পরোক্ষ দানও কম নহে। অ বাংলাদেশের সুবর্ণ বণিকেরা যে শুধু বাটখারা ধরিয়াই বসিয়া থাকেন নাই নরেন্দ্র লা মহাশয়ের "সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্তি" বইখা পাঠ করিলেই তাহার কিঞ্চিৎ ধারণা পাও যাইবে।

॥৩॥

সেই সব ব্যবসা ব্যতিরিক্ত কথা বাদ দিতেছি। ব্যবসায়িগণ যে সমাজের অপরিহার্য উপাদান ইহা নিয়া বোধহয় বিরোধ নাই। কিন্তু তাহার প্রতি সমাজের অন্যান্য অংশের মনোভঙ্গী কি?

যদি নিরপেক্ষভাবে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই; তবে বলিতে হয় বাঙ্গালী সমাজে সামাজিক মর্যাদার দিক হইতে ব্যবসায়ীদের স্থান সর্বনিম্নে। জানি, অনেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন না। তাঁহারা দুই চারিজন মান্য ব্যবসায়ীর উদাহরণও হয়ত আমাকে দেখাইবেন। কিন্তু আমার বক্তব্য দুই চারিজন ব্যবসায়ী সম্পর্কে দুই দশজন কেরাণী কিম্বা টুইশনবাবুর অভিমত নয়। আমি সমগ্র ব্যবসায়ী শ্রেণী সম্পর্কে অবশিষ্ট বাঙ্গালী সমাজের মনোভাবের কথা বলিতেছি।

এই সামাজিক মনোভাব রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনে খুঁজিলে চলিবে না। সমাজে কোন বিশেষ শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা অলিখিত অথচ সতত ব্যক্ত সামাজিক মনোভাব দ্বারাই ব্যক্ত হয়। গ্রীস একদিন একদা সভ্যতার শীর্ষে উঠিয়াছিল। তখন তাহার সমাজে শিল্পীদের স্থান ছিল উচ্চে। ইহার সত্যতা পরীক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান সন্ধান অনাবশ্যক, একখানি ঘটনাই যথেষ্ট।

একবার একজন শিল্পী একটি দাস যুবকের উপর বর্বরোচিত অত্যাচার করেন। তাহার ফলে যুবকটির মৃত্যু হয়। এথেন্সে দাসপ্রথা চালু থাকিলেও মানুষের প্রতি এবম্বিধ অত্যাচার ছিল গুরুতর সামাজিক অপরাধ। ফলে ঐ শিল্পীকেও নর-হত্যার দায়ে বিচারকদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে হইল। তিনি তখন একটি সুন্দর মর্মর মূর্তি আনিয়া বিচারকদের দেখাইয়া বলিলেন যে, এই মূর্তিটি জীবনানুগ করিতেই আমি নর-হত্যায় বাধ্য হইয়াছি। বিচারকরা মূর্তিটি দেখিলেন। সত্যিই ইহা অপূর্ব! তাঁহারা আর বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়া শিল্পীকে ছাড়িয়া দিলেন। রেনেশাঁসের ইউরোপে এবং তাহারও আগে, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের চীন দেশেও শিল্পীর এমনি সমাদর ছিল। এই সামাজিক মর্যাদার জন্যেই তখন ঐ সব দেশে শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। কারণ সামাজিক মর্যাদা অপেক্ষা মানুষের কাছে শ্রেষ্ঠতর কোন সম্মান নাই।

আজিকার বাঙ্গালী সমাজে ব্যবসায়ীদের তুল্য মর্যাদা আছে কি? নর-হত্যার দায়ে ব্যবসায়ীদের অব্যাহতি দেওয়ার কথা বলিতেছি না, সামাজিক সম্মানের আসনে অন্যান্য শ্রেণীর মত প্রাপ্য সম্মানটুকুর কথাই বলিতেছি। আশ্চর্যের বিষয় এ সমাজের ব্যবসায়ীরা তাহাই আজ পান না।

ব্যবসায়ীদের এই সমাজে কোন ক্ষমতা নাই—এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। তাঁহারা বাঙ্গালী সমাজে অবশ্যই অন্যতম ক্ষমতাবান শ্রেণী। কারণ তাঁহারা এই দারিদ্র্য-পীড়িত দেশে গড়ে সর্বাপেক্ষা বিত্তবান শ্রেণী। অর্থ বর্তমান সমাজে যতখানি ক্ষমতা মানুষকে দিতে পারে ব্যবসায়ীদের অবশ্যই তাহা আছে।

কিন্তু তাহা কাঞ্চন মূল্যে কেনা ক্ষমতা মাত্র। সামাজিক সম্মান অর্থের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে। টাকা দিলে এককালে 'স্যার' খেতাব পাওয়া যাইত, 'রায় বাহাদুর', 'খান বাহাদুর' হওয়াও খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল না—তাহার ফলে সমাজে প্রতিপত্তিও হয়ত কিঞ্চিৎ বাড়িত, কিন্তু তাহা স্বতঃস্ফূর্ত সম্মান নহে। একজন রিক্ত দেশকর্মী সেইদিন সমাজে মানুষের যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রণাম লাভ করিতেন ইঁহারা তাহা পাইতেন না। আজও একজন দরিদ্র সাহিত্য-জীবী এই দেশে যে সমাদর পান, একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর ভাগ্যে তাহা জুটে না। বাঙ্গালী জানে, বৃত্তি হিসাবে ব্যবসা কোন নিকৃষ্ট বৃত্তি নয়, বরং নানা দিক দিয়াই ইহা কেরাণীগিরির অপেক্ষা সম্মানজনক বৃত্তি, কিন্তু তবুও সে ব্যবসায়ীকে সম্মান দিতে চায় না, দেয়না। বহু লক্ষ টাকা 'পাবলিক ফাণ্ডে' (Public Fund) বিতরণ করিলে ব্যবসায়ী-দের নামে চতুর্দিকে যে 'ধন্য ধন্য' রব শোনা যায়—অনেকে ইহাকে সম্মান বলিয়া ভুল করেন। আসলে ইহা সম্মান নয়, সৌজন্য মাত্র। সম্মান দান-দাতব্যের অপেক্ষা রাখে না। তাহা হইলে এককালে এই দেশে দরিদ্র ব্রাহ্মণগণ সেই সম্মান লাভ করিতে পারিতেন না। আজও তাহা বাংলার অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীর ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরেই থাকিয়া যাইত।

॥৪॥

অর্থকৌলীন্য থাকা সত্ত্বেও বাংলার ব্যবসায়ীরা যে বাঙ্গালী সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মান হইতে বঞ্চিত দুই-একটি প্রত্যক্ষ উদাহরণ দিলেই তাহা বোঝা যাইবে।

সরকারী আফিসে কেরাণীবাবুদের নিকট হইতে ব্যবসায়ীরা আচরণে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন তাহার কথা বাদই দিচ্ছি। সমাজের নিজস্ব বৈঠকখানার কথাই বলি। আজ বাংলা-দেশে যদি কোন সম্পন্ন এবং শিক্ষিত ব্যবসায়ী কোন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী পরিবারে শিক্ষিতা পাত্রীর সন্ধান করেন তবে তিনি নিরাশ হইবেন। অন্য কোন ব্যবসায়ী পরিবার ভিন্ন এ ক্ষেত্রে তাঁহার গতি নাই। কারণ, অধিকাংশ শিক্ষিত এবং তথাকথিত অভিজাত পরিবারের কাছে ব্যবসায়ী কুলীন পাত্র নয়। কারণ এককালে বাংলাদেশে ব্যবসা যাহাদের জাতিগত পেশা ছিল আমাদের বর্ণ-ধর্ম তাঁহাদের আমাদের কাছে নীচু বলিয়া পরিচিত করাইয়াছে। সেই পরিচয় তাঁহারা এখনও ভুলিতে পারেন নাই। ব্যবসা এখনও বৃত্তি হিসাবে তাঁহাদের কাছে হীনবৃত্তি। তাই তাঁহাদের লক্ষ্য ঃ—বিলাত-ফেরত ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার কিংবা ব্যারিষ্টার। নিদেন পক্ষে একটু উচ্চবর্গের কেরাণী হইলেও চলিবে, কিন্তু ব্যবসায়ী অচল। এ বিষয়ে ব্যবসায়ীদের প্রতি বিরূপতার দ্বিতীয় কারণ, ব্যবসায়ীর জীবনে মাসকাবারী নির্ভরতা কম।

এই নির্ভরতায় কেরাণীবাবু অদ্বিতীয়। তাই কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মত কলিকাতা সহরের বাড়ীর মালিকগণও কেরাণী ভাড়াটিয়া খোঁজেন। এই সহরে কোন ছোট বা মধ্যম প্রকারের দোকানী বা ব্যবসায়ীর বাড়ী ভাড়া করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। মাস শেষে বাড়ী-ওয়ালা নিশ্চিত ভাড়ার প্রতিশ্রুতি চায়। চাকুরি-জীবী তাঁহাকে সেই প্রতিশ্রুতি দিতে সক্ষম। ব্যবসায়ী প্রতিশ্রুতি দিলেও তাহাতে আস্থা কম; কারণ ব্যবসায়ে উত্থানের মত পতনও আছে। সুতরাং বাড়ীর মালিক কেরাণী খোঁজেন। সরকারী কেরাণী তাঁহার সব চেয়ে পছন্দ।

এগুলি বাস্তব উদাহরণ। অনেক ব্যবসায়ীর প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা। এদিকে সমাজের যাঁহারা মাথা বলিয়া গণ্য সেই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর কাছে ব্যবসায়ীর কি স্থান, তাহা ভাবিয়া দেখিলেও অনুরূপ সত্যই প্রকাশিত হইবে।

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সামাজিক চেহারা ও চরিত্রের খুঁটি-নাটি তাহাতে প্রতিফলিত হয়। এককালে উঁকি দিয়া দেখিলে ব্যবসায়ীদেরও এই মুকুরে দেখিতে পাওয়া যাইত। চাঁদ সওদাগরকে বাঙ্গালী কবি সেইদিন বাংলা সাহিত্যের নায়ক করিয়াছিলেন। সাত গাঁয়ের বিহারী দত্তকেও বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক তাঁহার কাহিনীতে প্রাপ্য স্থানটুকু দিতে ভুলেন নাই। রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্রের মত সওদাগরপুত্রের বিচিত্র কাহিনীও সেদিন বাঙ্গালী শিশুর মন ভুলাইত, বাঙ্গালী যুবককে রোমাঞ্চকর জীবনে উদ্বুদ্ধ করিত। 'জাতকে'র কাহিনীতে বুদ্ধদেব বণিকের ঘরেও জন্মিয়াছিলেন জানিয়া বণিকেরা সেইদিন আনন্দিত ছিলেন, ফেরীওয়ালা নিজেদের দলের মধ্যেই সেইদিন সিদ্ধার্থের প্রতিবিম্ব সন্ধান করিতেন।

কিন্তু আজ? আজ বঙ্গ সাহিত্য উন্নতির শীর্ষে উঠিয়াছে। দেশ-বিদেশে এ সাহিত্যের কৃতিত্ব স্বীকৃত। কিন্তু তাহার মধ্যে বাঙ্গালী ব্যবসায়ী কোথায়? পাতার পর পাতা খুঁজিলেও তাহাকে আজ পাওয়া যাইবে না।

কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র তথা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সুরু হইতেই বাংলা সাহিত্যে বাঙ্গালী ব্যবসায়ী অপাংক্তেয় হইয়া আছেন। সাহিত্যে তাঁহাদের স্থান নাই। ইংরেজী শিক্ষার দৌলতে, নব্য জীবন-দর্শনের প্রভাবে অতঃপর বাঙ্গালী সাহিত্যিক তাঁহাদের ভিন্ন রূপে দেখিতে শিখিয়াছেন। এখন আর ইঁহারা সমাজের অন্যান্য মানুষের মত রক্ত মাংসের মানুষ নন, বাঙ্গালী সাহিত্যিকের কাছে ইঁহাদের একমাত্র পরিচয় ইঁহারা ব্যবসায়ী। ইঁহারাও যে পিতার সন্তান, স্ত্রীর স্বামী কিংবা পুত্রের জনক, ইঁহারাও যে এই রূপ-রসে পরিপূর্ণ বিচিত্র পৃথিবীর মানুষ সহসা তাঁহারা একেবারে ইহা বিস্মৃত হইলেন। ভুলিয়া গেলেন সওদাগর-পুত্রও মানব সন্তান। তাহার জীবনেও রোমাঞ্চ আছে, ইতিবৃত্ত আছে, কান্না-হাসি আছে। ফলে তাঁহাদের কাছে সওদাগরেরা বর্ণহীন, প্রাণহীন কৌতুকে পরিণত হইলেন। বাঙ্গালী সাহিত্যিকের নায়ক এখন আর সওদাগর নয়, সওদাগর আফিসের কেরাণী; নায়িকা,—তাহারই উল্টা দিকে বসা টাইপিষ্ট মেয়েটি। সওদাগর নিজের ঘরে বন্ধ। তিনি কখনও তাহাদের রূপকথায় আসেন না।

দৈবাৎ কখনও আসিলে তিনি আসেন রাক্ষসরূপে, রাবণ হইয়া। দুই-চারিটি গল্প কাহিনীতে ব্যবসায়ীদের আমি যেরূপে চিত্রিত দেখিয়াছি তাহাকে রাক্ষস রূপ ভিন্ন অন্য কিছু বলা চলে না।

বাংলা গল্পের অধিকাংশ ব্যবসায়ীই কালো ঘোড়া (Black Horse-এর আক্ষরিক অর্থে)। অজ্ঞাত কুলশীল ভাগ্যবাদী স্প্যাকু-লেটার। সহসা যাদুবলে কিংবা কালো পথে তিনি অফুরন্ত ধন সম্পদের মালিক হইলেন, তারপর ব্যাভিচারী হইয়া উৎসন্নে গেলেন। এখ

সঙ্গে অর্থের মূল্যে দিয়া গেলেন আরও দুই-চারিটি সুকোমল নর-নারীর ইঙ্গিত। অধিকাংশ সওদাগরের কাহিনীর উপসংহারেই এবম্বিধ।

ইহার কারণ কি? সত্যই কি কৃষ্ণবর্ণ ছাড়া ব্যবসায়ীর জীবনে অন্য কোন রং নাই।

অন্যান্য দেশের সাহিত্য পাঠ করিলে ত তাহা মনে হয় না। ইংলণ্ডে এবং আমেরিকায়ও ব্যবসায়ীরা আমাদের দেশের মতই সামাজিক জীব হিসাবে গণ্য। এই স্বীকৃতি তাঁহাদের সাহিত্যের পাতায়ও স্পষ্ট। ব্যবসায়ীদের বিচিত্র জীবনের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ঐ সব দেশে সাহিত্যিকদের কাছে এক নূতন উপাদান। তাঁহারা ইঁহাদের নিয়া অনেক অনেক গ্রন্থ প্রতি বছর লিখিতেছেন; পাঠকেরা পড়িতেছেন। যেহেতু ব্যবসায়ীর কাহিনীও জীবনেরই কাহিনী, সেই হেতু গোয়েন্দা কাহিনীর মতই পাঠকদের কাছে আকর্ষণীয় এবং উপভোগ্য।

কিন্তু আমাদের দেশে তাহার সুযোগ নাই। কারণ এই দেশে সেই কাহিনীর লেখক নাই। নাই,—তাহার জন্য দায়ী আমাদের শিক্ষা। প্রাচীন শিক্ষা বৈশ্যদের হীন বলিয়া ভাবিতে শিখাইয়াছিল। নব্য শিক্ষা পুরাতন ধারণাকে মুছিয়া—কেরাণীগিরিকে মোক্ষ বলিয়া মুখস্থ করাইয়াছে। ফলে—এই দেশে কেরাণী-মাহাত্ম্য আজ সর্বাধিক। যে শিক্ষা এই দেশে কেরাণী তৈরি করে, সেই শিক্ষাই এই দেশে বুদ্ধিজীবী গড়ে। তাই আমাদের লেখকেরা জীবিকায় কেরাণী না হইলেও জীবনের দৃষ্টি-ভঙ্গীতে কেরাণী। তাঁহারাও কেরাণী জীবনকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন এবং লেখায় তাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করেন। কেরাণীরা তাহা পড়িয়াই তাঁহাদের সাধুবাদ জানায়।

আমার মনে হয় বাংলা সাহিত্যের এক-মুখতার ইহাই অন্যতম কারণ। শিক্ষার দোষেই আমাদের অন্য জীবনে আকর্ষণ কম। ফলে বাংলা সাহিত্যে পাহাড়ে উঠার কাহিনী নাই, সমুদ্রে ডুবার কাহিনী নাই, বনের গল্প নাই, ব্যবসায়ের গল্প নাই। বাংলা সাহিত্য এই বৈচিত্র্যহীন কেরাণী সাহিত্য।

ইহা ছাড়া ব্যবসায়ীদের এই সাহিত্যে বাদ পড়ার অন্য কোন সংগত কারণ আমার চোখে পড়ে না। সাহিত্যিকরা তাহা ভাবিয়া দেখিতে পারেন।

॥ ৫ ॥

বাংলা সাহিত্যে ব্যবসায়ীর এই অনাদরের কারণ স্বরূপ কেহ কেহ বলিতে পারেন: ব্যবসায়ীর জীবন রোমাঞ্চকর হইলেও লোভের জীবন। তাহাকে আদর্শ হিসাবে সমাজে অনুপস্থিত রাখাই মঙ্গলজনক। আর যদি স্থান দিতেই হয়, তবে তাহার লোভ বা লাভ-স্পৃহাকে বাদ না দিয়াই গ্রহণ করা সংগত। এক্ষেত্রে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। সামাজিক মানুষের মধ্যে ভাল মন্দ সকল শ্রেণীতেই রহিয়াছে। ব্যবসায়ীদের মধ্যেও সকলেই মানুষ হিসাবে আদর্শ এ কথা আমি যেমন বলি না, তেমনই ব্যবসায়ী ছাড়া সমাজের অন্যান্য সকল মানুষই উৎকৃষ্ট এমন তত্ত্বও আমি স্বীকার করি না।

যদি কেহ বলেন,—ব্যবসায়ের প্রেরণা লাভ, এবং লাভ-চিন্তার কাছে কোন ন্যায় নাই, নীতি নাই—তবে তাহাতেও আমি আপত্তি করিব। সাধারণের মধ্যেও ব্যবসায়ীর ধর্ম (Business-man's Ethics) নামে একটা নীতিবাদের কথা শুনা যায়। তাহার মর্মার্থ এই যে, ব্যবসায়িগণও এক শ্রেণীর নীতিবাদী মানুষ। তাঁহারা নিজেদের মধ্যে কতকগুলি ন্যায় নীতি মানিয়া চলেন। গোঁড়া ব্যবসায়ীর মত, যথার্থ ব্যবসায়ী প্রাণপণে তাহা অনুসরণ করেন। একটু খতাইয়া দেখিলেই সমালোচকেরা দেখিবেন এই (Ethics) বা ন্যায়, সামাজিক ন্যায় অপেক্ষা ভিন্ন কিছু নহে। যদি বলেন : ব্যবসায়িগণ এই সব সু-উচ্চ নীতি শুধু স্ব-শ্রেণীর গণ্ডীর মধ্যেই পালন করেন, শ্রেণীর বাহিরে তাঁহারা সর্বপ্রকার নীতিবর্জিত তবে বলিব—সকল ব্যবসায়ী সম্পর্কে একথা সত্য নয়। আর সত্য হইলে সকল শ্রেণী সম্পর্কেই তাহা প্রযোজ্য।

আমার বক্তব্য ব্যবসায়ীরাও মানুষ। যে লোভ-স্পৃহার অপরাধে তাঁহাদের দায়ী করা হয়, তাহা সকল মানুষেরই আদিম রিপু। কেহ কেহ এই রিপুর বশবর্তী হইয়া খাদ্যে ভেজাল দিতে পারেন, কিন্তু তাহার জন্য একটা সমগ্র বৃত্তি দায়ী হইবে কেন? বস্তুতঃ হিসাব নিলে দেখা যাইবে মাত্রার দিক হইতে তারতম্য থাকিলেও অ-ব্যবসায়ীরাও লোভের অপরাধে তুল্য অপরাধী। এমনকি সোবিয়েত দেশে পর্যন্ত লোভের বশবর্তী হইয়া শ্রমিকেরা সামাজিক সম্পদ চুরি করে। অন্যান্য নাগরিকরা আরও গুরুতর অপরাধ (criminal offence) করে। অথচ লোভী-শ্রেণী বলিয়া কথিত শ্রেণীসমূহের অস্তিত্ব আজ ঐ দেশে নাই।

সত্য বলিতে গেলে, আমার মনে হয় সমাজ ব্যবসায়ীদের তথাকথিত লোভ-স্পৃহার ফলে যতখানি কলঙ্কিত বা কলুষিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি কলুষিত হইয়াছে অ-ব্যবসায়ী শ্রেণীগুলির হাতে। মধ্য যুগের ধর্মনিয়ামকদের কথা স্মরণ করুন, কিংবা এই যুগের নীতিবিগর্হিত রাজনৈতিক পুরুষদের কথা ভাবিয়া দেখুন, দেখিবেন অনেক সামাজিক অপরাধেরই কারণ তাঁহারা। একা হিটলারের হাতে যত লোক নিহত হইয়াছে, ইউরোপের সমস্ত দাস ব্যবসায়ীরা মিলিত-ভাবেও এত লোকের কারবার করিতে পারেন নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস।

তথাপি আমরা তথাকথিত ধর্মের জয়গান গাহিয়াছি, কুটিল রাজনৈতিক নেতাদের 'জিন্দা-বাদ' ধ্বনিতে আকাশ মথিত করিয়াছি। তবুও ব্যবসায়ীদের নাম আমাদের মুখে আসে না। তাঁহাদের কথা লিখিতে গেলে আমাদের কলম আটকাইয়া যায়।

যদি কেহ স্বীয় প্রতিভাবলে সফল অধ্যাপক কিংবা ব্যারিষ্টারে পরিণত হন—তবে আমরা তাহার প্রশংসা করি। ইহা উত্তম কথা। যদি কেহ পাঁচ টাকা মূলধন লইয়া যাত্রারম্ভ করিয়া এক সিঁড়িতে তিনবার ঠেকিয়া অবশেষে পাঁচ হাজার টাকার মালিক হন, তবে কিন্তু আমরা প্রকাশ্যে কখনও তাঁহার প্রশংসা করি না। বরং তাঁহাকে 'ক্যাপিটালিষ্ট' বলিয়া গালি দিই।

ইউরোপীয় শিক্ষার ফলে ব্যবসায়ীমাত্রই আজ বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীর কাছে—ক্যাপিটালিষ্ট। পাঁচশত টাকা মূলধনের কারবারী পাড়ার মুদিওয়ালাও তাহার এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। বঙ্গদেশে ইহা এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহার পরিণতি আজ ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। কারণ সমাজের গাল-মন্দ এড়াইবার জন্য আজ বাঙ্গালীরা যখন কেরাণীশালার দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিতেছে, তখন অন্যান্য প্রদেশের ব্যবসায়ীরা তাহার ফাঁকা জায়গায় ক্রমেই আসন পাতিতেছে। ইহাদের উপস্থিতিকে অস্বীকার করার ক্ষমতা আজ বাংলাদেশের নাই। 'ক্যাপিটালিষ্ট' হইলেও তাহাদের দোকানে বাঙ্গালীকে সওদা কিনিবার জন্য যাইতে হইতেছে, তাহাদের কারখানায় বাঙ্গালী ছেলেকে হাতুড়ি পিটাইতে হইতেছে। সুতরাং সমাজে 'ক্যাপিটালিষ্ট' বলিয়া মৌখিক যাহাদের আমরা বর্জন করিতেছি, তাহাদের কথা চিন্তা করার দিন আজ আগত।

॥ ৬ ॥

ক্যাপিটালিষ্ট কথাটার অর্থ পুঁজিবাদী। ইহা উনিশ শতকের প্রথম দিককার কথা। যাহাদের সম্মুখে রাখিয়া এই কথাটির উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহারা আমাদের পাড়ার হরিহর মুদিওয়ালা, এমনকি হুগলীর চটকল-ওয়ালারাও নহে। উহারা একটি শ্রমবিমুখ উদ্যমবিমুখ, পরশ্রমভোগী, অত্যাচারী এক আয়েসী সম্প্রদায়। তখন পৃথিবীতে দাস শ্রম ছিল, মনোপলি (Monopoly) বা জবরদস্তিমূলক একচেটিয়া ব্যবসা ছিল, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ অন্যরূপ ছিল এবং আধুনিক সমাজতন্ত্রের আদর্শ তখনও পুঁথিগত ব্যাপার। সেই পৃথিবী ভিন্ন, তাহার রাষ্ট্রীয় চেহারা ভিন্ন, আইনকানুন, ধ্যান-ধারণা ভিন্ন।

আজিকার দৈনিক দুই টাকা লাভ করে যে মুদিওয়ালা তাহার পৃথিবীর সহিত উহার কোন সংস্রব নাই। এমনকি সহস্র আইন-শাসিত, সর্বক্ষমতা রহিত বিংশ শতকের কল-ওয়ালার সহিতও সেই দিনের ক্যাপিটালিষ্টদের কোন তুলনা হয় না। বিশেষতঃ ভারতবর্ষ ইউরোপ বা আমেরিকার মত সেই পরিপূর্ণ ক্যাপিটালিজম (Capitalism) কোন দিন দেখে নাই। এদেশে ক্যাপিটালিজমের উত্থানের পক্ষে শৈশবে প্রধান বাধা ছিল ইংরেজের সুসংগঠিত বণিকতন্ত্র, দ্বিতীয় হিমালয়তুল্য বাধা আমাদের গণতন্ত্র। ইহার সহিত ভারতীয়দের ধর্মবোধ, পাপ-পুণ্য বোধও যুক্ত হইতে পারে। তাহাকে না হয় বাদই দিলাম।

তাহা হইলেও ইহা নিঃসন্দেহে অবশিষ্ট থাকিয়া যায় যে আজ গণতন্ত্রের যুগ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপের উনিশ শতকী ক্যাপিটালিজম কথাটি আজ নিঃসন্দেহে এ দেশে একেবারেই অচল। কারণ এখানে মূলধন বিনিয়োগ আজ গণতান্ত্রিক সরকারের সম্মতি ভিন্ন অসম্ভব। এখানে ইচ্ছা করিলেই

(শেষাংশ ২৭৩ পৃষ্ঠায়)

COSSIMBAZAR
কর্ম্মহীনে
কর্ম্মদান
সেবা
বেকারীর অবসানই আজ দেশের সমস্যা : অগণিত কর্ম-উন্মুখ নরনারী কর্ম-সংস্থানে ব্যর্থ হয়ে জীবনে বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছে। 'মণীন্দ্র মিল' এ সমস্যার সমাধানে যথাসাধ্য সহায়তা করছে এবং বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি ও অধিকতর সংখ্যক লোকের কর্ম-সংস্থানের উদ্দেশ্যে মিলে যন্ত্রপাতির সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে।
মণীন্দ্র
মিলস
লিমিটেড
অন্যতম ডি, এন, চৌধুরী
শিল্প প্রতিষ্ঠান
হেড অফিস—
পি-৪৯, বি, কে, পাল এভেন্যু, কলিঃ-৫
মিল—কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ জেলা।

শারদীয় যুগান্তর

অলকে কুসুম না দিও

ডক্টর শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ গানে গানে বলেছেন **অলকে কুসুম না দিও....এস এস বিনা ভূষণেই।** কি ভেবে তিনি বলেছিলেন 'দোষ নেই, তাতে দোষ নেই' তা আমার জানা নেই, বাস্তবিকপক্ষে দেখা যায় সে রকম বড় রবীন্দ্রানুরাগিণীরাও কিন্তু শুধু শিথিল কবরিকে সম্বল করে কোথায়ও নির্ভাবনায় পা বাড়াতে সাহস করছেন না। সত্যিই যদি হৃদয়-দুয়ারে ঘা দিতে হয় (সাফল্যের কথা স্মরণ রেখে) তাহোলে বলা বাহুল্য যে নিজের যেটুকু জন্মাবধি আছে, তার উপর আরও কিছু চড়াবার প্রয়োজন আছে। নইলে সব আশা হরেকরকম্বা। নিজেকে মনোরম করে তোলার চেষ্টা হোলো মেয়ে-মহলের সহজাত প্রবৃত্তি। কে একজন নাকি অনেক হিসেবপত্তর করে ঠিক সিদ্ধান্তে এসে পেণছেছিলেন যে, আজও অঘটন ঘটে তার কারণ মেয়েরা বেশি এস্থেটিক। এই দস্তুরের কারণ দেখাতে গিয়ে মেয়েদের দেহের ভিতরকার পিটিউটারী গ্ল্যান্ডকে সকল কাজের গোড়া বলে ঠাওরান হয়েছে। সাইজে মটরশুঁটির মত হোলেও তার কেরামতি অনেক। মহাভারতের আমলে যেমন, এখন স্বাধীন ভারতের আমলেও তেমন, সমানভাবেই পিটিউটারী নারীদেহে কাজ করে চলেছে। এই আত্মসচেতনার মূল থেকে এসেছে যত বেশবাস ও সুবাসমুখীনতা। ধুতি আর শাড়ী হচ্ছে মস্তবড় ফ্যাসানের সিম্বল। ধুতি, তা মিল দেশী কিম্বা শান্তিপুরে হোক না কেন, তাদের মধ্যেকার জমি কখনও চিত্র-বিচিত্র দেখা যায় না, স্রেফ প্লেন। কিন্তু সে তুলনায় শাড়ীর জমিটা ফ্যাসানের ঠিক যেন রঙিন বাগান। বিচিত্ররূপিণীদের অঙ্গবাস তাদের রামধনুমনের সাক্ষী, সেখানে সাত রঙের বিভিন্ন রূপায়ণ। যিনি দেখলেন তিনি যেমন খুসী দেখুন, কিন্তু 'বিনা ভূষণে' তাদের আসতে বলা, নৈব নৈব চ।

কালা হোক, ধলা হোক, হলদে হোক, সর্বদেশে সর্বকালে ললনাকুলই স্নিগ্ধছটা ছড়িয়ে থাকে, কারণ রমণীয়তার তারা প্রতিমূর্তি। কিন্তু জীবজীবনের মধ্যে এমন সমাজ আছে, সেখানে পুরুষরাই রম্যতা বিলিয়ে নারীর অন্তরে ধাঁধা লাগাচ্ছে। চিত্রাঙ্গদার যেমন নারী হয়েও পুরুষ সাজা, এখানে ঠিক তার উল্টো, পুরুষরা পুরুষ হোয়েও মোহিনী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব যে সমাজের কথা সেখানকার স্ত্রী-পুরুষের বিরহমিলনের সুর সচরাচর আমাদের কানে এসে পেণছয় না। কিন্তু একটু কান করে শুনলেই কানে নয় একদম প্রাণে গিয়ে—বেশ লাগবে।

'ও আমার নীড়ের পাখী' এই সম্বোধন কাদের মানুষের সমাজে কাদের বোঝায় তা বোধহয় বলে দিতে হবে না। মনের নয়, বনের পাখীদের কথা দিয়েই সুরু করা যাক। সাধারণভাবে মেয়ে পাখীরাই তাদের দোসরদের অপেক্ষা পালকের বেশভূষা, চাকচিক্য ও পারিপাট্যে নীরেস হয়। মেয়ে-পাখীদের সাজ নেহাত ছিমছাম, সাদামাটা কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষ পাখীদের রঙের চটক অত্যধিক। পাখী-সমাজে পুরুষদের গায়ে যে রঙের প্রাচুর্য থাকে তা দেখিয়ে মেয়ে-পাখীদের মন ভুলান সম্ভব হয়।

স্বর্গে কি হয় তা জানা নেই। তবে পারিজাত পাখীদের রকম-সকম বেশ মজার। পরিণত বয়সে পুরুষদের কুচকুচে কালো-মাথায় সৌখীন ধরণের উঁচু কালো চুড়ো থাকে বাকী শরীর ধবধবে সাদা। পারিজাত পাখীদের মাথায় চুড়ো থাকলেও শরীরের রঙ সাধারণতঃ উজ্জ্বল বাদামী। পুরুষেরা শিশু বয়সে তেমনটি থাকে, কিন্তু পরে বদলে যায়। তাছাড়া পুরুষ মাত্রেই লেজের বাহার বেশী। শেষে দশ ইঞ্চি প্রমাণ লম্বা একজোড়া সাদা ফিতে থাকে। মেয়েদের লেজে এমন অতিরিক্ত নিশানার বালাই নেই। দেখতে পুরুষদেরই যেন বেশি ভাল। কিন্তু ফিতে দুলিয়ে গান করে কর্তা পারিজাত পাখীরা গিন্নি পারিজাত পাখীদের মন পাওয়ার জন্যে হন্যে হয়ে যায়। ময়ূর-কুমারীদের পায়ে ঘুঙুর বেঁধে দিলেও তারা নাচের ব্যাপারে ময়ূর-কুমারদের ধারে কাছে আসতে পারবে না। তার কারণ ময়ূরী নয়, ময়ূরই নৃত্যে পটু। উদয়শংকরের শিষ্যত্ব গ্রহণে তাদের কোন বাধা নেই। আর তাছাড়া ময়ূরই নয়নাভিরাম, তার পেখমের উচ্ছলবিস্তার আছে, ময়ূরীর পেখম বলতে কিছু নেই। পাখীদের মধ্যে যত আর্টিষ্ট তারা বেশীরভাগই পুরুষ সম্প্রদায়ের। নাচিয়ে ছাড়া তারাই ভাল গাইয়ে হয়। অবশ্য এসব গান কোন মার্গসঙ্গীতের আসরে বসে গাওয়ার জন্যে নয়। পুরুষ পাখীর কণ্ঠস্বর তার সঙ্গিনীর কানে পৌঁছে দেবার জন্যে। পুরুষ পাপিয়া তার প্রিয়াকেই ডাকে—পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা। পুং কোকিলও সুর করে ডাকে তার কোকিলাকে। কপোতের যত বকবকম তা কপোতীর উদ্দেশেই।

বাবুই পাখী সত্যিই পাখীর মধ্যে বাবু। তাদের আচার-ব্যবহার দেখলে অবাক হতে হয়। বাবুই সমাজে বিয়ের ব্যাপারে পুরুষদের হাঁ না বলার কোন বালাই নেই। মেয়েরাই পছন্দ-অপছন্দ করছে, তাদের মেজাজ-মর্জির ওঠা-নামার উপর বিয়ে ঘটছে কি ভাঙছে, কার ঘরে কে আসছে বা কে আসবে না এসব বিষয় স্থির করতে মেয়েরাই সক্রিয়। ব্যাপারটা আরও একটু পরিষ্কার করে বলা যাক। ডিম পাড়ার আগে পুরুষ বাবুই পাখীরা গাছে গাছে সারি সারি বাসা তৈরী করতে থাকে। তখন তাদের সে কি উদ্যম। বাসা বাঁধা সাঙ্গ হোলে, যাদের জন্যে বাসা বাঁধা সেই মেয়ে বাবুই-এর ঝাঁক তখন এসে পড়ে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেয়ে পাখীরা প্রত্যেকটি পুরুষের তৈরী বাসার ভেতর পরীক্ষা করে। অর্থাৎ হাঁড়ির খবর নেয়, জায়গা কতটুকু, মজবুত কি-না, এখানে ডিম পাড়লে বাচ্চা তিষ্টবে কি-না।

এইসব সাতসতেরো ভেবে তখন মেয়েরা নিজেদের পছন্দমত এক একটি করে বাসা বেছে নেয়। যার ভাল বাসা, তারই জন্যে ভালবাসা আর যে পুরুষের বাসা ভাল নয়, তার জন্যে কোন ভালবাসাই নয়। সে পুরুষের তখন স[illegible] হারাবার সংশয় জাগে। বেচারার সাথী মেলে না। সেইজন্যে প্রায়ই দেখা যায় যখন পুরুষ পাখীরা বাসা তৈরীর জন্যে প্রাণপণ মেহনত করছে তখন কোন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষ পাখী এসে অন্য পাখীর বাসা তচনচ করে দিতে চেষ্টা করে। মেয়েদের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে বেশি হয়। এবং দেখা যায় পুরুষ পাখীরা এক বসন্তে তিনটে করে বিয়ে করছে। বাসা তৈরী করতে পারলেই সেখানে প্রবেশের জন্যে মেয়ে বাবুইরা এসে হাজির। প্রতি বছর দেখা যায় এক একই পুরুষ পাখী তিনটে পর্যন্ত বাসা তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে, বাসার বদলে ব[illegible] পেল বাবুই—টাক-ডুমা-ডুম-ডুম।

বাবুই ছাড়া অন্য পাখীদের মধ্যে দেখা যায় পুরুষদের বেশ-বিন্যাস, সাজ-সজ্জার ঘটা অনেক বেশি। মোরগরা বেশি সুন্দর হয়, মাথায় তাদের ঝুঁটি থাকে ; গলা উঁচু করে দাঁড়ায়। এসব কিছুই মুরগীদের মধ্যে দেখা যায় না। মুরগী-দের নিজের এমন কিছু নেই যা দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। বসন্তের সময় কমবেশি প্রায় সব পুরুষ পাখীর জন্যে প্রকৃতি বরাদ্দ করে রেখেছে। মেয়ে পাখীর জন্যে তেমন দামী নববেশ কিন্তু নেই।

পাখী ছেড়ে সিংহীদের এলাকায় আসা যাক। ভারতীয় কোন সিংহীর চোখে কেশর ছাড়া সিংহ, এমন ভাবাই যায় না। পশুরাজের এই বিশেষ ভূষণটি পশুরাণীর কাছে পৌরুষের চিহ্নস্বরূপ। ব্যাঙ সম্প্রদায়ের পুরুষদের গলায় ভোকাল স্যাক থাকে। বর্ষাকালে ব্যাঙের ঘ্যাঙর ঘ্যাং রব যখন আমাদের কানে এসে পৌঁছয় তখন পুরুষ ব্যাঙদের এই রবে সাড়া দেবার জন্যে পুকুর ধারে যুবতী ব্যাঙদের ছুটোছুটি পড়ে যায়। মেয়ে ব্যাঙদের কিন্তু এমন করে পুরুষ ব্যাঙদের ডাকবার উপায় নেই।

পুং জায়েন্ট সিল্ক মথদের ঝক্কি আরও বেশি। স্ত্রী মথদের চেয়ে তাদের অ্যানটেনা ব[illegible] ও পাতলা। তার আসল তাৎপর্য হোলো পুরুষ মথদের বেলা এটি দোসর খুঁজে বার করবার সময় আঘ্রাণ নেবার কাজ করে। এই তল্লাশ করতে পুরুষ মথগুলি কখনও কখনও দে[illegible] যায় কয়েক যোজন পার হয়ে চলে এসেছে। এ[illegible] অ্যানটেনা তাদের না থাকলে পুরুষ মথদের জন্যে বউ জুটত না।

রেশম কীট বর্মাবিক্স মোরী ও মে ফ্লা[illegible] জাতীয় কতকগুলি পুরুষ পতঙ্গের দেহে এ[illegible] জোড়া করে 'অধিকন্তু চোখ' দেখতে পাওয়া যায়। যাতে তারা ভাল করে দেখে তাদের পার্টনারদের সহজে খুঁজে বার করতে সক্ষম হয়। তার কারণ এই সব স্ত্রী পতঙ্গদের দেখা স্কেল-এর মত, খুঁজে পাওয়া নেহাৎ সো[illegible] নয়। অধিকন্তু চোখটি ঠিক যেন তাদের দি[illegible] দৃষ্টি জোগায়। রাত্রিবেলা যখন ঝিঁঝি[illegible] কলরব ওঠে, তখন কেউ কেউ বা ভাবছেন বুঝি সহরের মানুষকে তাদের কনস[illegible]

গানাবার পালা কিন্তু আসলে এ হোলো তাদের প্রিয়জনদের সঙ্গে মিলবার আকুতি—mating call। অবশ্য এই শব্দটিকে কণ্ঠস্বর বললে ভুল হবে। প্রত্যেক পুরুষ ঝিঁঝি তাদের ডানার ডানা ঘষে এই আওয়াজ বার করে—রাত্রিবেলা মেয়ে ঝিঁঝি পোকাদের আহ্বান করবার উপায়।

জিপসি মথ নামক যে পতঙ্গটি আছে তার স্ত্রী মথটি নড়তে পারে না। কিন্তু পুরুষ মথটি এরোপ্লেনের বেগে উড়বার গতিসম্পন্ন। উড়ে এসে বধূবরণ করে চলে যায়।

হরিণ সম্বন্ধে হরিণীর বড় দুর্বলতা দুটি। একটি হোলো হরিণের মৃগনাভির সৌরভ আর দ্বিতীয়টা তার বাহারে সিং। হরিণীর অতল চোখে এই দুটি জিনিষ বাসনা হয়ে ঘুরেঘুরে মরে। তেমনি গজপত্নী পতির গজদন্ত ছাড়া আর কিছুই সৌন্দর্যের কল্পনা করতে পারে না।

অক্টোপাস জাতীয় জীবদের এমনি নাম শুনলে আতঙ্ক হয়, সব কিছুকে বুঝি তারা জড়িয়ে ধরল। পুরুষ অক্টোপাসের আলিঙ্গনের বহর এমনি যে, তাদের নিজেদের একটি বাহু এই অবসরে ছিঁড়ে দোসরের কাছে রয়ে যায়। এমন করে ছিঁড়ে যাওয়ার রীতিকে বলে হেকটোকটিলাইজেসন (hectocotylization)। অবশ্য নতুন করে আবার বিচ্ছিন্ন অঙ্গটির পুনরাবির্ভাব ঘটে।

মাকড়সার আপন দেশে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেকার নিয়ম-কানুন সর্বনেশে। যখন মোহিনী মায়া এলো গোপন পদসঞ্চারে সেই সময় শৃঙ্গারের উন্মত্তায় স্ত্রী-পুরুষের নাচ শুরু হয়। নৃত্যের পর মিলন। মিলনের পরমুহূর্তে স্ত্রী মাকড়সাটি এতক্ষণের অত অন্তরঙ্গ পুরুষটিকে খপ করে ধরে টুকরো টুকরো করে সাবাড় করে দেয়। এমন পীরিতের রীতি। এই মাকড়সার এমন নিষ্করুণ কাজের জন্যে নাম দেওয়া হয়েছে ব্লাক উইডো।

পেঙ্গুইনের বিয়ে হয় খোলা আকাশের নীচে সমুদ্রকে সাক্ষী মেনে। পুরুষ পেঙ্গুইনরা সমুদ্রের ধার থেকে নুড়ি কুড়িয়ে এনে সার সার করে সাজিয়ে ডিম পাড়ার গোল গোল গর্ত করে রাখে। স্ত্রী পেঙ্গুইনরা এসে ডিম পাড়ার জায়গাগুলি ভাল করে পরীক্ষা করে। যার যে গোলটি পছন্দ হোলো, সে সেখানকার পুরুষটির বউ হতে রাজি হয়ে গেল। পেঙ্গুইনরা এমনিতে চুরি-জুয়াচুরির ধারে-কাছে যায় না। কিন্তু যখন মেয়ে পেঙ্গুইনরা নুড়ির গর্ত পরীক্ষা করতে আসে, সেই সময় কোন কোন পুরুষ পেঙ্গুইন পাশের পুরুষটির সাজান নুড়ি থেকে আচমকা একটা-দুটো লুকিয়ে সরিয়ে এনে নিজের গর্তের পাশে আনে। তখনকার মত পুরুষ পেঙ্গুইনদের ভাবধারাটা অনেকটা হয়ে ওঠে nothing is unfair in love and war। তাও যাদের ফস্কে যায়—তারা নেহাৎ ভাগ্যহত। পুরুষরাই এখানে গর্তের প্রলোভন দেখিয়ে মেয়েদের মায়াজালে বাঁধে।

সীলদের দোসর পছন্দ অপছন্দ তয় এক বুক জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে। মেয়ে সীলটি জলের মধ্যে ওমনি করে দাঁড়িয়ে থাকে আর একটি পুরুষ সীল তার চারপাশে মালার মত ঘুরে এসে সামনে জল থেকে অনেকখানি হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে। জল ছেড়ে কতটা লাফান সম্ভব হোলো, সেই দেখে মেয়ে সীলটির মর্জি না-মর্জি হয় তাকে স্বামী করার বা না করার। যদি লাফান জুতসই না হয়, স্ত্রী সীলটি তৎক্ষণাৎ অন্যত্র সরে চলে যায় এবং আর একটি নতুন পুরুষ সীল তার সামনে এসে ভেল্কি দেখায়। যে পুরুষটি হেরে গেছে সে আর এই স্ত্রী সীলের পিছু নেয় না। এখানে বরের লাফানর কৃতিত্বের উপর পছন্দ অপছন্দ নির্ভর করছে। স্ত্রী সীল এই লম্ফঝম্পের মধ্যেই যত মায়া আর মতিভ্রম খুঁজে পেয়েছে!

রঙের এই ভোজবাজিতে সবাই ভোলে, কেউ আগে, কেউ পরে। রঙের ব্যাপারে সবাই ছদ্মবেশী, তলায় তলায় রয়েছে কত ছলনা। ত্রিভুবনে রঙের নেমন্তন্নের দরজা খোলা এখানে, সেখানে, ওখানে; সাড়া দিয়েছে। কি মায়ামরীচিকার ফাঁদে পড়েছ। বৈজ্ঞানিকরা এই রঙের বায়োলজি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা বলছেন এ পৃথিবীতে দুরকম রঙের নিশানা দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম নম্বর হোলো আত্মগোপনের জন্যে যে রঙ ব্যবহার করা হয়। যাকে বলা হয়েছে কনসিলিং বা ক্রিপটিক কালার। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, মেরু প্রদেশের জীবরা বরফের সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে নিয়ে থাকে বলেই তারা সাধারণতঃ সাদা দেখতে হয়। মরুভূমির প্রাণীরা পীতাভ। এ ছাড়া দ্বিতীয় পর্যায়ের যে রঙ ব্যবহার হয় তার মহিমা আত্মগোপনে নয়, আত্মপ্রচারে—সিমাটিক কালার। অনেক অবিষাক্ত সাপের গায়ে এমনি রঙের ছড়াছড়ি দেখা যায়—অকারণে ভয় পাইয়ে দেবার উপায়। তাছাড়া মনুষ্য সমাজে মুখে, চোখে, কপালে যে রঙের ফন্দীফিকির দেখতে পাওয়া যায় তাও আত্মপ্রচারের জন্যে—আত্মগোপনের জন্যে নয়। কখনও কখনও প্রকৃতিতে দেখা যায় যে কোন একটি জীব অপর কোন জীবকে কিম্বা অন্য কোন জিনিষকে হুবহু অনুকরণ করছে। এই অনুকরণ করার নাম হলো মিমিক্রি। যে অনুকরণ করে তাকে বলা হয় মিমিক, আর যার অনুকরণ করা হয় তাকে মডেল। এই বিষয়ের সব চেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হোলো এক রকমের প্রজাপতি—ক্যালিমা প্যারালেকটা। এত বড় মিমিক বোধহয় আর পৃথিবীতে কেউ নেই। নিজের চেহারাকে এমন অসাধারণভাবে বদলে ফেলেছে যে, জ্যান্ত অবস্থায় ক্যালিমাকে দেখলে একটা শুকনো পাতার মত মনে হবে। তাই একে বলা হয় ডেড লিফ বাটারফ্লাই। আর ছোট-বড় মিমিক্রির কাজ আমরা নিজেরাই কত না করছি। ভণ্ড সাধুর গেরুয়া বেশ ধারণটা মিমিক্রি ছাড়া আর কি? সম্প্রতি অনেক ফ্যাশানেবল লেডিরা নিজেদের মাথার চুল কি রকম উঁচুতে তুলে কেমন ফাঁস দিচ্ছেন—যা দেখতে ঠিক Pony tail-এর মতন। এও এক রকম ঘোড়ার লেজের অনুকরণে চুলের মিমিক্রি।

কিন্তু মানুষের বেলায় রঙের চেগ ঢঙ যেন বেশি। নিজেকে রঙ করার নাম মেক্‌আপ্। গ্রীক আমল থেকে 'kosmetik'এর প্রচলন। 'Kosmetik' বললে বুঝতে Skilled in decoration and adoration ছাগলের চর্বি ও ছাই দিয়ে তার সুরু। নিজেকে রসবিগ্রহ করে তোলার সচেষ্ট রীতিও এদেশে বহুদিনের পুরাতন ব্যাপার। দুধ, সর, তেল আর মেহেদিপাতার রঙের ব্যবহার এদেশে আজকের নয়। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে সৌন্দর্যচর্চার ব্যাপারটা এমন ফাঁকির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে রূপের অস্তিত্ব নেই দেহে, সেই সৌন্দর্য দেহে সঙ্কলন করা সম্ভব হচ্ছে। যার যা খুঁত আছে তা প্রলেপ দিয়ে চাপা দেওয়া হচ্ছে। নকল মুক্তার চাষের মত মেকি লাবণ্যের চাষ নয় কেন? যার যেমন রঙ সেই বুঝে গায়ে পোঁচ বুলোলে চলে। লিপস্টিকের রঙেরই তো অনেক আছে—ম্যাজিক পিঙ্ক, কোরাল স্প্রে, গোল্ডেন ফ্লেম, ওয়াইল্ড অর্কিড, ব্রাইটার রেড, রাইডিং হুড রেড, চেরি ও ব্লু রেড। এ সবই লাল, তবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোন অকেসনে কোন জামার সঙ্গে কোন লালটি যাবে! রূজেরও শেডের তারতম্য আছে—ক্লিয়ার রেড, ব্লু রেড, রোজ রেড, ফ্লেম ও পিঙ্ক। শুধু লাল নয় কালোরও দরকার। চোখের পল্লব যদি ভ্রমর কালো নাই হয় তো হোক, তাও রঙ করা চলবে। মাসকারা দিয়ে কত মসকরা। চুমকাম করা মানে শুধুই রঙ করা নয়, অনেক টালটোল, ব্যাঁকা-চোরা গর্ত বুজানর কৌশল এতে নিহিত আছে।

রঙের ছেড়ে কেউ কথা বলে না। রঙে অধীর করার জন্যে নানান বিজ্ঞাপন দেখবেন। যেমন একটি লাল রঙ মাখলে ফল কেমন হবে সেই কথা শুনিয়ে বলা হয়েছে—Slightly dangerous, very well red, makes twice lovely overnight। আরও যাদের মুখশ্রী একটু কম তাদের আশ্বাস দিয়ে আর একটি বিজ্ঞাপনে দেখেছি—Stays lovely longer, veils tiny imperfections, looks naturally flawless। অতএব ভাবনার কোন কারণ নেই। নয়ন ভুলানর যত উপায়। পিগমেন্টের অপ্রাচুর্যে ফর্সা বলে মনে হয়। পিগমেন্টহীন মেয়েদের নিজেদের আবর্ষিত করে তোলার মোহ বেশি। বিলেতে সম্প্রতি এক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পর্ব চালাবার পর একথা প্রমাণ হয়েছে যে, ব্লণ্ডরা যত সহজে বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পড়ে ব্রুনেটরা তত নয়। রঙ এবং সাজ-গোজের প্রলোভন ব্লণ্ডদেরই অধিক। যেখানে ৯৫ জন ব্লণ্ড লিপস্টিক ব্যবহার করে যেখানে ব্রুনেটদের ১৩ জন মাত্র। চক্ষের কটাক্ষকে তীক্ষ্ণ করার জন্যে যেখানে ২৩ জন ব্লণ্ডরা আই ল্যাস পেনসিল ব্যবহার করে থাকে, সেখানে ব্রুনেটদের ১৩ জনের বেশী নয়।

ফর্সা আর কালো মেয়েদের মধ্যে সৌন্দর্য বোধের প্রভেদ সুপ্রতিষ্ঠিত। তেমনি সমগোত্রীয় পুরুষদের ভিতর কি হয় তা বোধ হয় মহিলারাই ভাল জানবেন। অবশ্য পুরুষ মানুষের সৌন্দর্য তদারকি নেহাৎ গদামেয়। দাঁত পড়লে নকল দাঁত নেওয়া, চুল পাকলে কলপের শরণাপন্ন হওয়া, এই সব কাজ দেহসৌন্দর্য বজায় রাখার নামে করতে হয়। হয়তো বাঙালী পুরুষের একমাত্র শৌখীন সাজ বলতে, গিলে করা পাঞ্জাবী বুঝায়, তাও সেখানে রঙ নেই, একদম সাদা।

দুপক্ষের সাজগোজের পরিপাটি রঙের ব্যাপ্তি, তার উপলক্ষে নিয়ে অনেক জ্ঞানী গুণী

(শেষাংশ ২৭৩ পৃষ্ঠায়)

হ্রদ মেখলা উদয়পুর

স্বর্ণপ্রভা ভাদুড়ী

আরাবল্লী পর্বতমালার সুদৃঢ় বেষ্টনী আর বনরাজির তরঙ্গায়িত শ্যামল সুষমা। তারই অঙ্গে-অঙ্গে অষ্টোপাশের মত জড়িয়ে আছে উদয়পুরের সৌন্দর্য ও ঐতিহ্যময় জনপদ। রণশ্রান্ত রাজপুত সেনাদের ললাটস্থ স্বেদবিন্দুর মত সহরের প্রাণ কেন্দ্রে টলমল করছে স্ফটিক নীল হ্রদগুলি। ইতিহাস এখানে চিত্রময় হয়েছে কালের অনুলিপিতে। উদয়পুরকে রমণীয় করে তুলছে এই মনোরম হ্রদগুলি।

রাত্রি আটটার পর আমরা যখন উদয়পুর ষ্টেশনে নামলুম তখন প্রবল বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে রাজপুতানার মরুভূ মাটি। টাঙ্গাওয়ালা গফুর আমাদের সেই বৃষ্টির মধ্যে থেকে এনে আশ্রয় সংগ্রহ করে দিল ফতে মেমোরিয়ালে। এটি বেশ ভালো পান্থশালা। গফুর না থাকলে হয়ত সেই বৃষ্টির রাতে আমাদের সেই রাজসিক আরামের আশ্রয় মিলতো না। তার কারণ তখন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ দু-একদিনের মধ্যে আসছিলেন উদয়পুরে পরিদর্শনে। সেইজন্য দেশ-বিদেশের গণ্যমান্য অতিথি আর সাধারণ মানুষে ভরে গেছে এখানকার সব পান্থশালা। একজনের নাম লেখানো ঘর গফুর আমাদের দুই রাত্রির জন্য খালি করিয়ে দিল। এই জন্য সেই বর্ষণ সন্ধ্যার বন্ধুটিকে আমরা চিরদিন পরম স্নেহে স্মরণ করবো।

পরের দিন ভোরবেলা গফুর আমাদের প্রথম নিয়ে গেল স্বরূপ সাগর হ্রদের ধারে। তার কিছু পরেই ফতেসিং হ্রদ। হ্রদের তীরের বাঁধানো পথ দিয়ে আমাদের টাঙ্গা চলেছে। ভোরবেলার সোনার মত সুন্দর আলোয় জল ছলছল করছে। এই জলধারা আরাবল্লীর পাদদেশ ঘুরে-ঘুরে গিয়ে পিশোলা হ্রদের সঙ্গে মিশেছে। জলের ধারে পাহাড়ের চূড়ায় ভগ্নাবস্থায় এখনও দাঁড়িয়ে আছে রাণা প্রতাপের দুর্গ ও প্রাসাদ। চিতোর হস্তচ্যুত হবার পর মহারাণা এই দুর্গে কিছুদিন বাস করেছিলেন। এখানে প্রতি বছর সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় প্রতাপ-জয়ন্তী। কিছু দূর গিয়ে পাহাড়ের উপর আবার দেখা গেল একটি পুরাতন দুর্গ। এর নাম সজ্জনগড়। এটি ফতে সিং-এর পিতার দুর্গ। উদয়পুরে, চিতোরগড়, আজমীঢ় ও জয়পুরের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে রাজপুত জাতির ঐতিহ্যময় ইতিহাস। উদয়পুর আসার সময় পথে দেখেছি দোবারী দুর্গের ভগ্নাবশেষ। আরাবল্লী পর্বতের চূড়ায় ও কন্দরে, অরণ্যে ও মাটিতে ছড়িয়ে রয়েছে, আনন্দ আর দুঃখের কত না কীর্তি কাহিনী। মেবারের রাজধানী উদয়পুর সহরটি চতুর্দিক থেকে প্রাসাদ প্রাচীরে বেষ্টিত। সহরে প্রবেশ করার জন্য পাঁচটি সুবৃহৎ তোরণ-দ্বার আছে। এই পাষাণ দ্বারগুলি বেশ প্রকাণ্ড ও কারুকার্যময়।

ফতে সিং হ্রদ থেকে আমরা এলুম সহেলী-বাগে। এটি একটি মনোরম সুষমাময় নিভৃত প্রমোদ উদ্যান। এর স্থানীয় নাম বাঁদীবাগ। মনে হয় রাজ অন্তঃপুরিকাদের জন্য একদা নির্মিত হয়েছিল এই বাগান। একে একটি ফোয়ারার প্রদর্শনীও বলা চলে। চতুর্দিকে নানা রং-এর, নানা ঢং-এর শুধু ফোয়ারা। সাদা পাথরের পায়রা, আর সবুজ টিয়ার লাল ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে যখন ঝরে পড়ে জলের ধারে চারিদিক দিয়ে, তখন মন বিহ্বল হয়ে প্রশ্ন করে, 'কে এই কলাকার? কতদিন লেগেছে তার এই পাথরের বুকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে? এখানে একজাতের লেবু গাছের ঝাড় আছে। লেবুগুলি দেখতে ঠিক আমলকীর মত কিন্তু খোসা ছাড়ালে ভিতরে কমলা লেবুর মত ছোট্ট সুন্দর কোয়া আছে। গন্ধ খুব সুন্দর হলেও খেতে ভীষণ টক। ভাদুড়ী, ছন্দা আর পাঁপড়ীর হাতে লেবু ভরে উঠল। এতে গফুরের উৎসাহ খুব। একটি সরোবরে মর্মরাসনে বসে বিশ্রাম করে আমরা এলুম জগদীশ মন্দিরে।

জগদীশ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন নারায়ণ। বিগ্রহ ঠিক পুরীর জগন্নাথ দেবের মত। এখানে একটি গরুড়ের চমৎকার মূর্তি আছে। গরুড়ের শিল্প-কর্মে মহারাজা খুশী হয়ে শিল্পীকে তার আজীবন ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে দেন। মন্দির দেখে ফিরে এসে ছন্দা, পাঁপড়ী বললে, আগে তারা শ্বেত ময়ূর আর রক্ত চন্দনের গাছ দেখবে। গফুর তাইতেই রাজী। দিল্লী গেট পেরিয়ে উটের সারি পিছনে ফেলে আমরা এলুম পশুশালায়। কোলকাতার চিড়িয়াখানার থেকে অনেক বড় প্রকাণ্ড বাগান। কিন্তু পশু-পক্ষী কিছু কম। বাঘ, সিংহ, হাতী, উল্লুক, ভালুক সবই আছে। খাঁচা আলো করে বসে আছে প্রকাণ্ড দুটি শ্বেত ময়ূর। পুচ্ছ লুটিয়ে আছে মাটিতে। বসার ঢং দেখে মনে হয় এখনই বুঝি উঠে নাচবে। ছন্দা, পাঁপড়ীর শ্বেত ময়ূর দেখে ভীষণ আনন্দ। আমার কিন্তু ভালো লাগল এখানকার উদ্ভিদ-শালাটি। এখানে অনেক নতুন গাছ দেখলুম। হিমালয়ে বেশী গোলাপ দেখিনি। কিন্তু খাসিয়া-জয়ন্তিয়া ও নীলগিরিতে গোলাপের যে অজস্রতা দেখেছি আরাবল্লীতেও দেখলুম গোলাপের সৌন্দর্যের ও প্রাচুর্যের সেই রকম অজস্র সমারোহ। দেখলুম রক্ত চন্দনের গাছ। বেশ বড় অনেকটা লিচু গাছের মত পাতা। কাণ্ড ও শাখা, কৃষ্ণাভ লাল। আমার ইচ্ছা ছিল রক্ত চন্দনের একটু কাঠ নেওয়ার। কিন্তু শুনলুম এই জঙ্গলে ভয়ানক সাপ আছে। এখানে একটি বন মানুষের বাচ্চা ঠিক মানুষের বাচ্চার মত অবিরাম চিৎকার করে চলেছে। এত লোক আসে যায় কেউ ওর ভাষা বোঝেনা। শুধু ওর সঙ্গে ঠাট্টা ও ব্যঙ্গ করে চলে যায়।

হ্রদের দেশ উদয়পুর। সহর থেকে চল্লিশ মাইল দূরে জয় সমন্দ হ্রদ। এই জলাশয়টি আয়তনে চল্লিশ স্কোয়ার মাইল। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে মানুষের হাতে কাটা কৃত্রিম হ্রদ এইটেই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সৌন্দর্যময়। এই হ্রদের মধ্যে অনেকগুলি বাঁধ আছে। আর সেখানে মন্দিরগুলি ঠিক ছবির মত দেখায়। হ্রদের আশে-পাশে ছড়িয়ে আছে প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। যদিও সেখানে আজ সৈন্য-সামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র কিছুই নেই, তবুও আরাবল্লীর গহীন অরণ্যানীর বক্ষ পিঞ্জরে আজও যেন গুমরে কাঁদে অতীত মেবারের শৌর্য-বীর্যময় দিনগুলি। সন্ধ্যার সময় দেখা যায় পাহাড় থেকে নেমে আসছে একটি ধূলির ঝড়। হঠাৎ মনে হবে যেন একদল সৈনিক আসছে কুচকাওয়াজ করে। কিন্তু তা নয়। আরাবল্লীর অরণ্যে অনেক হিংস্র জন্তু আছে। তারা সন্ধ্যাবেলায় পাহাড় থেকে নেমে আসে হ্রদের ধারে। এখানে তাদের খাদ্য দেওয়া হয়। এরা দলবদ্ধ হয়ে কৃষকদের ফসল নষ্ট করতো বলে রাজ্য সরকার থেকে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে পশু সংরক্ষণ ও মানুষের জীবিকা, উভয়েরই সংহতি রক্ষা হচ্ছে। এই সময়টি আরাবল্লী ঘেরা জয়সমন্দের নিভৃত প্রান্তরটি পশুদের সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য। মানুষ থাকে অনেক উপরে, অনেক নিরাপদ স্থানে। তাহলেও জয়সমন্দ হ্রদের তীরে বিছানো আছে শীতল পাটি। আমলকী বনের ছায়া নীল চোখে মাখানো আছে স্বপ্নাঞ্জন।

উদয়পুরের প্রাণকেন্দ্র হোল পিশোলা হ্রদ। এর জলে ও স্থলে ঝলমল করছে মেবারের রাজৈশ্বর্য। এটি রাজপুরীর একটি বিশিষ্ট জলপথ। পিশোলা হ্রদের মধ্যে অনেকগুলি ছোট ও বড় দ্বীপ আছে। তাইতে গড়ে উঠেছে রাজপ্রাসাদ মার্বেল প্যালেস মন্দির ও প্রমোদ উদ্যান। তাকে ঘিরে রয়েছে আরাবল্লীর উন্নত সুশ্যাম শিখর-রাজি। তার অরণ্যের অসীম অন্ধকারের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে রাজপুতানার কত না অলিখিত ইতিহাস। হ্রদের শ্বেতাভ্র নীলা স্বচ্ছ জলে প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠে সেই সত্য। জলের হিল্লোলে আকুলি-বিকুলি করে তার আবেগানুভূতি। এই অদৃশ্য প্রাণসত্তা প্রকাশ করতে চায়, কেউ বোঝে না।

হ্রদের তীরে প্রকাণ্ড মর্মর প্রাসাদে বর্তমান রাজমাতা থাকেন। আমরা প্রথমে গেলুম রাণা প্রতাপের রাজপুরী ও দুর্গ দেখতে। সেই প্রাচীন ঐতিহ্যময় সুরম্য রাজপ্রাসাদ। সিংহ-দ্বারের শীর্ষদেশে স্বর্ণ নির্মিত প্রকাণ্ড সূর্য মূর্তি। সেই হস্তী, অশ্ব ও অস্ত্রশালা। দুর্ভেদ্য রাজ অন্তঃপুর। মাইলের পর মাইল ঘিরে শুধু মহলের পর মহল, প্রাচীন রাজৈশ্বর্য। একটি মহলের ভবন গাত্রে শুধু, সোনা আর প্রবাল রং-এ চিত্রিত করা হয়েছে সমস্ত ভারতবর্ষের ছবি। এইখান থেকেই মেবারের রাজপুরুষ ও অন্তঃপুরিকারা করতেন ভারতের সমস্ত তীর্থ দর্শন। সামান্যর মধ্যে সমগ্রতাকে ফুটিয়ে তোলা শিল্পীর অপূর্ব দক্ষতা। এই সত্যটি সেই চিত্রময় ভবনে চমৎকার ফুটে উঠেছে। এর মধ্যে আমার মাণিক মহল সব চেয়ে ভালো লাগল। এই ভবনটির আসমান জমীন সব আয়নায় ঢাকা। সেই স্ফটিকাধারকে বেষ্টন করে আছে গাঢ় সবুজ পাথরের বেষ্টনী।

(শেষাংশ ২৭২ পৃষ্ঠায়)

হানিমুন

শ্রীমতী সুষমা দেবী

এই শীতের রাত্তিরে অন্ধকার নির্জন পাহাড়ে জায়গায় কারা এল বলোত? পাশের বন্ধ বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। সামনের ঘেরা বারান্দায় বসে গায়ে ড্রেসিং গাউন চড়িয়ে ছোট কার্ডটেবলের ওপর ঝুঁকে তাসগুলো সাজাতে সাজাতে মনীষী জবাব দিল—যেই হোক না, তুমি অত মাথা ঘামাচ্ছ কেন? খুকী চলে এসোনা. একটু স্ক্যাবল খেলি।

বারান্দায় ঝুঁকে যূথিকা যতখানি পারল গলা বাড়িয়ে বলল—থামো, থামো, আগে দেখি। মালিকে ডাকছে, মালি ত এ সময়ে বসে আছে।......এই শীতে কতক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবে? তার চেয়ে আমাদের এখানে আসতে বলি, কি বলো?

কে কোথাকার তার ঠিক নেই, এখনই তাকে নেমন্তন্ন করে আনতে হবে! তোমার সব তাতে বাড়াবাড়ি। ছেড়ে দাও ওসব, চলে এসো, খেলা যাক—ভ্রূ কুঁচকে লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরাতে ধরাতে মনীষী বলল।

স্বামীর কথার উত্তর না দিয়ে যূথিকা নীচে নেমে গেল। একই হাতার ভেতর দুখানা বাড়ি। এটা বড়, আর পাশেরটা ছোট বাঙলো। বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাতার মধ্যে এসে যূথিকা মালিকে ডাকতে লাগল। ভূপেন বেয়ারা বেরিয়ে এসে বলল—মালিকে কোথায় পাবেন, মেম সাহেব? সেত শহরে গেছে সওদা কিনতে, বলে গেছে আজ ফিরবে না. আসতে কাল সকাল হবে।

সে কি? ও বাড়িতে লোক এসেছে তাকে আগে খবর দেয়নি? জানে না? কখন থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছে! মুটে দুটো শুধু জিনিষ-গুলো মাঠের মাঝখানে নামিয়ে চলে গেছে। ভূপেন, তুমি যাও, ওদের কাছে গিয়ে আমাদের এখানে ডেকে আনো। এমন সময়ে এই জন-মানবহীন জায়গায় কোথায় যাবে? হোটেল আছে, না থাকবার অন্য কোন আস্তানা রয়েছে? মনে মনে যূথিকা গজ গজ করতে লাগল।

বলার প্রায় সংগে সংগেই ও-বাড়ির দরজা থেকে একটি তরুণ আর তরুণী তার সামনে এসে দাঁড়াল। থমকে গিয়ে তাদের আপাদ-[illegible]

হাত তুলে ছোট্ট নমস্কার করে বলল—এখানে আসবেন সে কথা কি মালিকে জানাননি আপনারা? সেত চলে গেছে। আজ তাকে পাওয়া যাবে না। এ অবস্থায় কি করবেন?

ছেলে-মেয়ে দুটিরই মুখ শুকিয়ে গেল, প্রথমে কোন কথাই তারা বলতে পারল না। শেষে ছেলেটি বলল—কেন, মালি কি চিঠি পায়নি? তাকে ত আগেই দেওয়া হয়েছে। আমরা গিরিডি থেকে আসছি। প্রকাশবাবুর বাঙলোত এটা? তিনি ত জানিয়েছিলেন, সব ঠিক থাকবে?

প্রকাশবাবু? নাত। এত ফ্রেজার সায়েবের বাড়ি।

যূথিকার কথা লুফে নিয়ে ছেলেটি বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রকাশবাবু তাঁরই বন্ধু, তিনিই সব বন্দোবস্ত করেছেন। মালিকে পাচ্ছি না, খুব মুস্কিলে পড়লাম ত। এমন জানলে—

আজ তাকে পাবেন না আপনারা। তার চেয়ে আজকের রাতটা না হয় এখানেই কাটিয়ে দিয়ে সকালে ওখানে যাবেন।

এখানে?—মেয়েটির চোখ দুটি বিস্ফারিত হল। অস্পষ্ট স্বরে সে বলল—তা কি-করে হবে? তার চেয়ে আমরা বরং স্টেশনেই ফিরে যাই।

এত রাত্তিরে এই জঙ্গলা-পথ দিয়ে ফিরে যাবেন? তাহলেই হয়েছে! বাঘ-ভালুকের, নয়ত সাপের মুখে পড়বেন।

চারদিক চেয়ে মেয়েটি শিউরে উঠল, ছেলেটির আরও কাছে এসে দাঁড়াল।

যখন অন্য কোন উপায় নেই আর ইনি দয়া করে আমাদের রাখতে চাইছেন এখন এঁর কাছেই ওঠা যাক, মিলি। তুমি আর ইতস্তত কোরো না।—ছেলেটি জুতোর শব্দ করে যূথিকার সঙ্গে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। অগত্যা মেয়েটিও তাদের সংগে চলল।

ওপরে উঠে ঘেরা বারান্দায় এসে যূথিকা স্বামীকে বলল—এঁরা বিপদগ্রস্ত। আজ আমরা স্থান না দিলে বাঘ-ভালুকের খোরাক জোগাতেন।

বসুন, বসুন, ঐ চেয়ার দুটোয়। ভূপেন, শীগগির কফি করে আনো, আর সুধীরকে [illegible], এঁরাও আমাদের সঙ্গে খাবেন।

উঠে দাঁড়িয়ে যূথিকা বলল—যাই ও[illegible] ঘরখানা ঠিক করে দিই।.....হ্যাঁ, [illegible] আপনাদের সংগে ল্যাগেজ কী আছে [illegible] ওখানে কী নামানো রয়েছে?

বিছানা? আজ্ঞে সে রকম [illegible] আনিনি। ঐ সুটকেসের ভেতরই 'রাগ' আছে

সে কি? ক'দিনের জন্যে এসেছেন শীতের রাত—অবাক হয়ে যূথিকা [illegible] দিকে চাইল।

মেয়েটি আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল. মুখে [illegible] নেই।

আমরা এখানে-সেখানে প্রায়ই ঘুরে বেড়াই কিনা, ও-সব অভ্যেস আছে। আপনি [illegible] না, মিসেস—বলে ছেলেটি থেমে গেল।

আমি মিসেস মিত্র। আপনাদের [illegible] পরিচয় ত কিছু পেলুম না? দেখলে ত মনে [illegible] অনেক ছোট, বোধ হয় আমার ছেলে [illegible] বয়সী, 'আপনি' বলতে বেধে যায়।

বেশত, তুমিই বলবেন। আমরা আপনাদের ছেলেমেয়ের বয়সী হবই। [illegible] আমরা হলাম গাঙ্গুলি. আমার নাম ধীরেন গাঙ্গুলি, মাইকা মাইনে কাজ করি। [illegible] ঘুরে বেড়াতে হয়—বলে ভারি ওভার[illegible] খুলে ধীরেন টেবলের ওপর রাখল।

মনীষী এতক্ষণ তাদের চেয়ে [illegible] দেখছিল। ধীরেন থামতেই সে প্রশ্ন করল—কতদিন কাজ করছেন? দেখলে ত মনে [illegible] সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছেন। কোন্ কলেজে পড়েছেন?

ছেলেটি ঘাবড়ে গেল। মেয়েটি তার [illegible] জবাব দিল—উনি শিবপুর বি-ই কলেজে, [illegible] আমি বেথুনে।...আপনাদের বাড়ি এত নির্জ[illegible] কেন? ছেলেমেয়ে কেউ বুঝি নেই?

আমাদের মেয়ে কলকাতায় শ্বশুর বাড়ি[illegible] আছে। আর ছেলের শরীর ভালো নেই ব[illegible] আগেই শুয়ে পড়েছে। সে কলেজে পড়ে।

তাই বুঝি?—বলে মিলি চুপ করল।

যূথিকা ফিরে এসে তাদের বলল—তোম[illegible] এসো, কোথায় থাকবে দেখিয়ে দিই। ছোট বা[illegible] দুটো আগেই আমি আনিয়ে নিয়ে তোমাদে[illegible] ঘরে জ্বালিয়ে এসেছি।

(২)

অর্ধেক রাত্রে যূথিকার ঘুম ভেঙে যেতেই ীর গায়ে ঠেলা দিয়ে সে বলল—কিসের শব্দ হল? চোর-টোর নয়ত?

উঠে দ্যাখোনা?

হ্যাঁ, এই হাড়কাঁপানো শীতে মরছি, এখন ছেড়ে উঠি আর কি!

যদি চোর হয়?

না বাবু, দরজা খুলতে পারব না।—একটু করে থেকে লেপটা আরও ভালো করে য় টেনে নিয়ে যূথিকা বলে উঠল—শুনছ ত? যেন ফিস ফিস করছে।

হয়ত তুমি যাদের আদর করে এনে ঘরে ন দিয়েছো তারাই! জানা নেই, শোনা নেই, ানা কোথাকার কে? ধরো যদি চোর-কাতেই হয় তখন করবে কী? যদি ডাকাত করে দেয় বাড়িতে?

ভয়ে যূথিকার সারা অঙ্গ শির শির করে ল। স্বামীর মুখে হাত চাপা দিয়ে সে ল—তুমি থামো দেখি? যত সব অলক্ষুণে া! চোর ডাকাত হতে যাবে কেন? স্বামী-ী, বোধ হয় নতুন বিয়ে হয়েছে, হ্যানিমুন রতে এসেছে। নইলে কেউ আবার এমন করে সে?

আবার শব্দ পেয়ে লেপ ফেলে অত ীতেও যূথিকা উঠে বসল। কে জানে—লকের শরীর আবার বেশী খারাপ হল কিনা। ই ওঠেনি ত? ছেলের শরীর খারাপের শঙ্কায় যূথিকা স্থির থাকতে পারল না, ঠে দরজা খুলে সামনে দালানের দিকে ইল। মিট মিট করে লণ্ঠন জ্বলছে একধারে, ঐ আলোতে সে কিছুই দেখতে পেল না। রও এগিয়ে গেল, আরও খানিক। তারপরই চোখে পড়ল, ও-পাশের সরু বারান্দায় মানুষের । এই শীতের রাত্তিরে কে ওখানে বসে? থিকা আঁতকে উঠল। ভূত নয়ত? এত ন্ডার ঐ খোলা বারান্দায় আবার কেউ থাকতে রে নাকি? দূরে ফেউ ডেকে উঠল। যূথিকার ক ধড়াস করে উঠল। হয়ত বড় জানোয়ার রিয়েছে শিকারের খোঁজে! হ্যাঁ, ঠিক ওদের ঘরের সামনেই ত। সে পা টিপে টিপে এগিয়ে ল। আধো আলো আধো অন্ধকারে তাদের দৃষ্টি গেল না ওর ওপর। যূথিকার কানে ল—শোবে চলো মিলি। এই ঠাণ্ডায় হিমে এমন করে থাকলে নির্ঘাত ইনফ্লুয়েঞ্জা হবে। নারাত্মক অসুখ চারদিকে ছেয়ে গেছে।

হোক গে, আমি তোমার সঙ্গে—এক সঙ্গে কিছুতেই শোবনা। তা পারব না, কিছুতেই পারব না।

তবে এলে কেন? এ আসার মানে আছে? তই যদি ভয় হয়, সে কথা আগে ভাবা উচিত ছিল।

ভাবতে সময় দিলে কই? না, না, তুমি সরে যাও—মেয়েটি ধীরেনের দিকে চেয়ে বলে উঠল চাপা স্বরে—তোমার ও চোখের দৃষ্টি ক্ষুধায় ভরা, দেখেই আমার ভয় করছে। যাব না আমি তোমার কাছে। যাও, যাও, চলে যাও এখান থেকে। কেন আমায় নিয়ে এলে? আমি এখন কি-করে ফিরে যাব?

তার মানে? এতদিন ধরে আমায় খেলিয়ে এ পথে টেনে এনে শেষকালে বুদ্ধি বিবেক ফিরে পেলে? কিন্তু তা হয় না মিলি, সাপকে নিয়ে খেললে তার ছোবল খেতে হয়।

টুক করে একটা শব্দ হল, তারা এক সঙ্গেই ফিরে চাইল। যূথিকা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পায়ের কাছে একটা টিনের ঢাকনা পড়েছিল, সে দেখতে পায়নি। তারই শব্দ।

ধীরেন বলল—আপনি উঠে এসেছেন, মিসেস মিত্র?

শব্দ পেয়ে। আমার ছেলের শরীর বেশী খারাপ হল কিনা দেখতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু মাঝপথে তোমাদের দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছি।

হ্যাঁ, এই দেখুন না, মিলির কাণ্ড। নতুন জায়গায় এসে কিছুতেই ওর ঘুম আসছে না। মাথা গরম হয়ে গেছে, তাই বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। চলো, চলো, শুতে যাই।—মিলির একটা হাত ধরে টেনে ধীরেন তাকে ঘরে পুরে দরজাটা যূথিকার নাকের সামনে বন্ধ করে দিল।

(৩)

প্রাতরাশ শেষ করে ভাঁড়ার দিয়ে যূথিকা বসবার ঘরে এসে অলককে দেখে প্রশ্ন করল—কেমন আছিস?

ভালোই, কিন্তু ওরা কারা এসেছেন মা? তোমার কেউ আপনার লোক বুঝি? বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, 'জানি না'। বেয়ারা বলল, তাঁরা ভোর বেলায় চা খেয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন, খাওয়াও হয়নি এখনও।

আমার আবার কে হবে? কেউই নয়। রাস্তায় রাত কাটাবে বলে এনেছিলুম, বিদেয় করতে পারলে বাঁচি এখন।......মালিকে ডেকে পাশের বাঙলোখানা সাফ করতে বলে দে।

যূথিকা কথা বলতে বলতেই তারা এসে হাজির। গাঙ্গুলি বলল—বড্ড খিদে. কিছু খেতে দিন।

উত্তর দিতে ভুলে গিয়ে যূথিকা তাদের চেয়ে দেখছে। সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না, সত্যি না মিথ্যে। দুয়ের দ্বন্দ্ব মনেতে উঁকি মারছে। ঐত মেয়েটির সিঁথিতে টুক টুক করছে সিঁদুরের রেখা? তবে কেন রাত্রে ওসব ধরণের হেঁয়ালি কথা সে শুনলে? মেয়েটির বাঁ হাতের দিকে নজর দিয়ে যূথিকা দেখল, সেখানেও একটি লোহা রয়েছে। তাহলে হয়ত স্বামী-স্ত্রীই হবে।

মিলি বলল—আমি কিন্তু আপনাকে 'মাসীমা' বলব। ঐ বুঝি আপনার ছেলে? নমস্কার, কাল কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি।

না, আমি তার আগেই শুয়ে পড়েছিলাম। মা, এঁরা যে খেতে চাইছেন!

যাই, বলে দিই—বলে যূথিকা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

তারা খেয়ে এসে দাঁড়াতেই যূথিকা বলল—আজ দুপুরে খেয়েই তোমরা ও-বাড়ি যেও। ঘর খুলিয়ে ধুইয়ে-মুছিয়ে দিয়েছি।

আমার কিন্তু যেতে ইচ্ছে করছে না, মাসীমা। যদি বলি, 'যাব না, আপনার কাছে থাকব', তাহলে তাড়িয়ে দেবেন?

এ কী প্রশ্ন? যূথিকা জবাব দিতে পারল না প্রথমে, শেষে বলল—তা দোব কেন? তবে তোমরা এসেছ আমোদ-আহ্লাদ করতে, এখানে থাকবে কেন? পাশে রইলে. যখন যা দরকার এসে জানিও।

আমি রান্না করতে জানি না, আর ঘর-সংসার মনে হলেই ভয় করে। ও-সব পারব না। খেতে না দিন, শুতে দেবেন ত?

ধীরেন বলে উঠল—কী পাগলামি করছ মিলি? চলো, আমরা বাজার করে আনিগে। নতুন গৃহস্থালি পাততে অনেক জিনিষের দরকার।—অলকের দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করল—আপনি বলুন ত, কোথায় গেলে সব পাব?

তবেই হয়েছে!—মুখ টিপে হেসে যূথিকা সেখান থেকে চলে গেল।

আমি ও-সব জানি না, মাকে জিজ্ঞেস করুন। আমি এতদিন কলকাতায় ছিলাম, মাত্র ক'দিন এসেছি।

মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ অলক বলল—আমি যেন আপনাকে কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে।

আমাকে?—নিজের বুকে হাত দিয়ে মিলি হেসে উঠল।—কোথায় আবার দেখলেন? নিশ্চয় সিনেমা কি রেস্তোরাঁয়......

না, তা নয়,—বলে অলক চুপ করে কী ভাবতে লাগল।

মেয়েটি কথা ঘুরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল—সত্যিই কি এখানে রাত্রে বাঘ বেরোয়? কাল কিন্তু আমি বাঘের আওয়াজ পেয়েছি। সকালে পাহাড়ের উত্তর দিকের ঐ টিলার ওপর উঠেছিলাম, এই বড় বড় পায়ের ছাপ, দেখে ভয়ে সেখান থেকে দে চম্পট।......জায়গাটি কিন্তু ভারি চমৎকার, না ধীরেন? কেবল বড্ড ফাঁকা। বাড়ি-ঘর নেই বললেই হয়। যেন বনবাস মনে হয়।

একটু ইতস্তত করে অলক প্রশ্ন করল—আচ্ছা, আপনি কি নিউ এম্পায়ারে শখের থিয়েটার রক্তকরবীতে প্লে করেছিলেন? তপেশ আমার বন্ধু আপনার সঙ্গে ছিল।

আমি? আমি?...না ত? আপনি অন্য কাউকে দেখে থাকবেন। ও নামের কোন লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। তা ছাড়া ওসব জিনিষ আমার আসেই না।—মিলি খিল খিল করে হেসে উঠল।—চলো—ধীরেন, দেখিগে বাজারে কী পাই—বলে মিলি আগের পা চালিয়ে বেরিয়ে গেল।

(৪)

বারান্দায় বসে মনীষী কাগজ পড়ছে, যূথিকা গম্ভীর হয়ে বাজারের হিসাব দেখছে।

তোমার কথা নেই কেন? ওদের বাঙলোয় পাঠিয়ে মন কেমন করছে বুঝি?

দূর, তা কেন? কিন্তু ওদের ব্যাপার আমি কিছু বুঝতে পারছি না। কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে।

কিসের?

তা বলতে পারব না। আমায় ধাঁধায় ফেলেছে।......হঠাৎ বাঙলোর দিকে চেয়ে যূথিকা বলল—দ্যাখো ওরা রান্নাও করেনি, আর বিছানাও নয়। মোমবাতি জেলে দুটোতে বসে আছে।

না করে, তাতে তোমার কী? তবে তোমার যদি এতই দয়া হয় তাহলে [illegible]বেলা খাবার করে পাঠিয়ে দাও। 'মাসীমা'ত বলেইছে।

চুপ করো, তোমার ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।—আবার উঁকি মেরে দেখে যূথিকা বলল—অলক দেখছি ওখানে গেছে।

ওকে যেতে বারণ কোরো। ওসব ধরণের লোকের সঙ্গে মেশে এ আমি চাই না।

তুমি না চাইলেই ও শুনবে? আজকালকার ছেলেমেয়েদের এ ধরণের কথা বললে তারা বিরক্ত হয়।—একটু থেমে সে বাঙলোটার দিকে চেয়ে রইল। তারপর বললে—কী করব গো? খাবার করে পাঠিয়ে দোব? না-খেয়ে যে উপোস করে থাকবে দুজনে।

আমায় জিজ্ঞেস করা বৃথা। যা ইচ্ছে হয় করোগে। কোন্ বিষয়ে আমার মতে তুমি চলো?

হু হু করে গাছপালা নাড়িয়ে পাহাড়ের ওপার থেকে হিমেল হাওয়া আসছে, হাড়ের ভেতর কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে। আকাশের দিকে চেয়ে ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আনাগোনা দেখতে দেখতে হিসেবের খাতা টেবলের ওপর রেখে যূথিকা বলল—হয়ত রাত্তিরে বিষ্টি নামবে। তাহলে ঘরে আগুন করতে হবে।...এমন বুদ্ধি কোথাও দেখেছ? বিছানা-পত্তর শুদ্ধু সঙ্গে নেই! বাড়ি থেকে বেরিয়েছে।

তা তুমি দিলেই পারো। বাড়ি থেকে পালিয়ে এলে বিছানা ফেলেই আসতে হয়। তুমি সে সব জানবে কি-করে?

তা কেন? আমিও তাই ভেবেছিলুম, কিন্তু বিয়ের চিহ্ন রয়েছে দেখতে পাওনি?

হুঁ, কোথায় বাড়ি, কার ছেলেমেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলে?

না, তা করিনি। আমার দরকার কী?—বলে যূথিকা উঠে গেল।

(৫)

রাতে খেতে এসে যূথিকাকে না দেখে মনীষী রেগে গেল, বলল—অলক, তোমার মা কোথায় গেলেন? সুপ যে ঠাণ্ডা হল, আমরা বসে আছি।

মা, মা, এসো, আমরা যে খেতে পাচ্ছি না?

ছুটতে ছুটতে এসে চেয়ারে বসে সুপের চামচ টেনে নিয়ে যূথিকা বলল—কী করব? দুটোতে উপোস করে থাকবে? তাই লুচি, ভাজা আর আলুর দম করিয়ে পাঠিয়ে দিয়ে এলুম।

অত হাঙ্গামার দরকার কী ছিল? তার চেয়ে বাড়িতে এনে রাখলেই পারতে। এতই যখন দয়া!

বাড়িতে রাখব কেন? কিন্তু জোয়ান ছেলে মেয়ে দুটো না-খেয়ে থাকবে, সেইটে দেখে চুপ করে থাকাই বুঝি ভালো ছিল?

তারা নিঃশব্দে সুপ খেতে লাগল। অলক শেষ করে বলল—ও'রা যে রান্না করবেন সে রকম ত কিছু মনে হল না। গিয়ে দেখি দুজনে ঝগড়া করছেন। আমায় দেখে সামলে গেলেন।

কোথায় ওদের বাড়িঘর তুমি কিছু অলক জানতে পারলে?

না বাবা, ও'রা বললেন না, কেমন যেন পাশ কাটালেন। ভদ্রলোকটিকে আমার ভালোই মনে হল, মেয়েটি কিন্তু সুবিধের নয়।

কি করে বুঝলে?

আমার বন্ধু তপেশের সঙ্গে ও'কে বেড়াতে দেখেছি।

তুমি আর ওদের ওখানে যেও না, অলক। আমার ইচ্ছে নয়।

না বাবা, যাব না।

(৬)

শীতের রাত, ভোর হলেও এখনও অন্ধকার, কুয়াসায় চারদিক ছেয়ে আছে। বরফের মতো কনকনানি ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। যূথিকা উঠি উঠি করেও বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছে না। মালি ওপরে এসে হাউ-মাউ করে কে'দে চীৎকার করে উঠল—মে-ম-সা-হে-ব মে-ম-সা-হে-ব।

আলুথালু বেশে শাড়িটা গায়ে জড়াতে জড়াতে যূথিকা দরজা খুলে দালানে এসে দাঁড়াল।—কি হয়েছে মালি, কাঁদছ কেন?

খুন, মে-ম-সা-হেব, খুন হয়েছে!

সে আবার কি?

আমি ভোরে উঠে ফুল তুলতে গিয়ে দেখি ফটক খোলা, বাঙলোর দরজা খোলা, ভিতর থেকে গোঁ-গোঁ শব্দ আসছে। বাইরে দাঁড়িয়ে 'মা-মা', করে ডাকলাম। সাড়া না পেয়ে ঘরে গিয়ে দেখি চৌকির উপর বাবু পড়ে আছে, তার গা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। মা কোথাও নেই।......

বলো কি? সর্বনাশ! এখন আমি কি করি?—উঠিত-পড়ি করে যূথিকা অলকের ঘরে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে মালির কাছে শোনা ঘটনা জানিয়ে বলল,—ডাক্তারকে এখনই খবর দাও, দেখুক ভদ্রলোক বেঁচে আছে কিনা। কি ক্ষণেই এবার বাড়ী থেকে যাত্রা করেছিলুম, শেষে খুনের দায়ে পড়লুম! এখন পুলিশ এসে যদি আমাদের সন্দেহ করে?—আবার ছুটে সে স্বামীকে জানাতে গেল।

(৭)

সন্ধ্যা বেলা তিনজনে বসবার ঘরে বসে আছে। মনীষী তাস হাতে নিয়ে আপন মনে সাজাচ্ছে আবার ভাঙছে। অলক নভেল পড়ছে। যূথিকা ভাবছে। চোখের কোণে তার জল।

ক্রমশঃ সন্ধ্যার অন্ধকার চারদিকে ছেয়ে গেল। দূরে পাহাড়ের মাথায় বনে আগুন লেগেছে। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে যেন আলোর মালা গোটা পাহাড়ের মাথা বেড়ে আছে।

মুখ তুলে মনীষী প্রশ্ন করল—অলক, লোকটার বাঁচবার আশা আছে, না নেই? ডাক্তার এ বেলা কি বললেন?

হয়ত বেঁচে যাবেন বাবা, কারণ আঘাত এমন কিছু গুরুতর নয়, শুধু একটু বেশী রক্ত পড়েছে। ওবেলা নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলেন, শুনলাম এবেলা নাকি অনেকটা ভালো আছেন। ভাগ্যক্রমে ফিরিঙ্গি মেয়েটার মোটর-খানা পাওয়া গিয়েছিল, তখনই হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল, নইলে কি হত কে জানে! হাসপাতাল ত কাছে নয়, এখান থেকে ন' মাইল দূরে।

বেঁচে গেলেই বাঁচি, নইলে খুনের দায়ে আমরা আবার না জড়াই! আমি ত সেই ভয়েই মরছি। কি কুক্ষণেই বাড়ীতে জায়গা দিয়েছিলুম! তখন কি ভাবতে পেরেছিলুম ওরা ঐ রকম লোক?—একটু চুপ করে থেকে যূথিকা জিজ্ঞাসা করল,—পুলিশ গিয়েছিল হাসপাতালে? মেয়েটার কোন পাত্তা পেয়েছে? গেল কোথায় সকলের চোখে ধুলো দিয়ে?

ডাক্তার বাবুর কাছে শুনলাম পুলিশ নাকি গিয়েছিল। তাঁর বাড়ীর কথা, বাবার কথা জিজ্ঞেসও করেছে, কিন্তু তিনি নাকি উত্তরে কিছুই বলেননি। মেয়েটার কোন খবর পেয়েছে বলে ত শুনলাম না। ও সব খুনে মেয়ে, ওদের অসাধ্য কাজ নেই।

(৮)

কাঁচের ভেতর দিয়ে যূথিকা ড্রইং রু থেকে পাশের বাঙলোটা চেয়ে চেয়ে দেখছে। অন্ধকারে প্রায় কিছুই দেখা যায় না, শুধু ছাদের মাথাগুলো দৈত্যের মতো মুখ মেলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে দেখতে তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ভেতরের সিঁড়ির দিকে চাইতেই যূথিকা যে পাথর হয়ে গেল। আস্তে-আস্তে যে উঠে আসছে তাকে যে দেখতে পাবে, আজই এ সন্ধ্যা রাতে, সে ভাবতেও পারেনি। খালি তার চোখ দুটো বড়, ক্রমশ আরও বড় হয়ে উঠল।

ঘরের সামনে এসে দরজা ফাঁক করে মিলি ডাকল— মাসীমা, মাসীমা আমি একবার আপনার কাছে আসতে চাই, আমায় আসতে দিন?—বলে সে মুখে হাত চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

তিনজনেই স্তব্ধ, কারও মুখে কথা নেই। এমনিভাবে মিনিট পাঁচেক কাটবার পর যূথিকা সম্বিৎ ফিরে পেল, উঠে গিয়ে মিলির হাত ধরে তাকে ঘরে এনে সামনের দরজার খিল দি বলল,—তুমি কেন আমার এখানে এলে মিলি? নিজে খুনে জড়িয়ে আমাদেরও জড়াতে চাও? জানোনা পুলিশ তোমায় খুঁজছে? তোমাকে ভালো করতে গিয়ে আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে! চলে যাও এখান থেকে। নিজেও মরবে আমাদেরও মারবে।

মিলি হাউ-হাউ করে কেঁদে যূথিকার পা দুটো জড়িয়ে ধরল।— সত্যি যা, তা শু আমায় পুলিশে ধরিয়ে দিন, মেরে ফেলুন আর আমি সহ্য করতে পারছি না। আমার পা আমি নিজের মুখে বলে এ পৃথিবী থেকে চলে যাব।

শুনে আমার কি লাভ মিলি? আমি তোমার কেউ নই, কোন দিন কেউ ছিলুমও না মাত্র তিন দিনের পরিচয়। কাজেই তোমার কো কিছুই শোনবার আগ্রহ বা ইচ্ছে নেই। তুমি এত ছেলেমানুষ, তবে তোমার কেন এ দুর্মতি হল? সেদিন যা শুনেছিলুম তাহলে সত্যিই তাই?—বলে যূথিকা স্বামী-পুত্রের দিকে চাইতেই দেখল ইতিমধ্যে কখন তা নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

কি শুনেছিলেন তা ত জানি না মাসীমা। মিলির আলুথালু বেশ, রুক্ষ চুলের গো কপালে চোখে এসে পড়ছে। চুলের কয়েক গোছা চোখের জলে ভিজে গালে জড়িয়ে গেছে মলিন শুকনো মুখ, এক রাত্রের মধ্যেই তা যেন কত দিনের রোগী মনে হচ্ছে। অজানা অচেনা মেয়েটার মুখখানা দেখে হঠাৎ যূথিকা বুকটা বেদনায় কন-কন করে উঠল। সে ভাব কি করে এ মেয়ে মানুষ খুন করতে গিয়েছিল কি ভীষণ এর প্রকৃতি! অথচ বাইরে দেখে ক নিরীহ মনে হচ্ছে।

তোমার বাবা-মা নেই?

আছেন, সকলে আছেন।

ও কি তোমার স্বামী নয়?

না, কোন দিনও ছিল না। আমার বি হয়নি। ওর সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিলাম, বি করব বলে।

(শেষাংশ ২৭২ পৃষ্ঠায়)

প্রদীপবাবু আর অশোকবাবু দুই বন্ধু, আবার দূর সম্পর্কে ভায়রাভাই। প্রদীপবাবু ধনী ব্যবসায়ী, নিজের বাড়ী গাড়ী আছে; একটি ছেলে, ইংরেজী স্কুলে পড়ে। অশোকবাবু পাকা সরকারী কর্মচারী, ভাড়া বাড়ীতে থাকেন, ছেলেমেয়ে অনেকগুলি আছে। প্রদীপবাবু ধর্মভীরু আর অশোকবাবু নাস্তিক। প্রদীপবাবু মোটা, হার্টের অসুখ আর অম্বলে ভুগছেন এবং অশোকবাবু রোগা কিন্তু ভোজন বিলাসী। এত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দুই ভায়রাভাইতে বেশ হৃদ্যতা আছে।

প্রদীপগিন্নী দিনরাত অনুযোগ করেন, অশোকবাবুরা কত সুখে আছে, মাস গেলে বাঁধা মাইনে, ছুটিছাটা বিস্তর, দিন নেই রাত নেই টাকার ধান্দায় ঘুরতে হয় না, সামাজিকতা রক্ষা করবার সময় পায়, ব্যবসায় ক্ষতির জন্য মুখ গোমড়া করে থাকতে হয় না, কোন ভাবনা চিন্তা নেই, ইত্যাদি। এদিকে আবার অশোকগিন্নী উঠতে বসতে ঠেস দিয়ে বলেন, প্রদীপবাবুকে নাকেমুখে গুঁজে দশটা পাঁচটা করতে হয় না, নিজের গাড়ী নিজেই চালায়, যখন খুশি বেরিয়ে যায়, যখন খুশি বাড়ী ফেরে, কারও হুকুমের চাকর নয়; চাকুরেদের মত হিসেব করে খরচ করতে হয় না, নিউ মার্কেট থেকে এটাসেটা প্রায়ই কিনে আনে, কত দামী দামী শাড়ী, গয়না আরও কত কি। তাছাড়া প্রদীপগিন্নী মোটা মানুষ আদৌ হাঁটতে পারেন না এবং অশোকগিন্নী ভীষণভাবে মোটার ভক্ত।

স্ব স্ব গৃহিণীদের কাছ থেকে ক্রমাগত এই রকম প্যানপেনে অভিযোগ শুনতে শুনতে দুই বন্ধু একেবারে নাজেহাল হয়ে পড়েছেন। সভ্য সমাজে গৃহিণী বদল করার রীতি এখনও তেমন চালু হয়নি, নইলে দুর্বিষহ যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এতদিনে একটা ব্যবস্থা তাঁরা করেই ফেলতেন। এই বয়সে যে তাঁরা নিজের নিজের পেশা বদলে ফেলবেন তাও সম্ভব নয়। অগত্যা সংসার একইভাবে চলতে লাগল।

ইদানিং অশোকগিন্নী বায়না ধরেছেন প্রদীপবাবুর মত একটা মোটর গাড়ী আর একটা এ্যালসেসিয়ান কুকুর চাই। অশোকবাবু বহুবার চেষ্টা করেছেন কথাটা এড়িয়ে যাওয়ার কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। একদিন অশোকবাবু অফিস ফেরত চলে গেলেন প্রদীপবাবুর দোকানে। একথা সে কথার পর আমতা আমতা করে তাঁর গৃহিণীর বাসনার কথা প্রদীপবাবুকে জানিয়ে ফেললেন। প্রদীপবাবু হো হো করে হেসে উঠে বললেন, এ আর ভাবনা কি। একটা গাড়ী আর একটা কুকুর খুব সহজেই জোগাড় হয়ে যাবে। আমি কালই একটা ব্যবস্থা করে দেব।

অশোকবাবু বাধা দিয়ে বললেন, আরে অত তাড়াহুড়ো করতে হবে না। তুমি হলে গিয়ে মহাপুরুষ ব্যক্তি, হাত ঝাড়লেই পর্বত বগল ঝাড়লেই সূর্য। আমার যা মাইনে, তাতে ঘুরিয়ে আনতে ফুরিয়ে যায়। একটু সস্তা-টস্তায় কিস্তিবন্দিতে ব্যবস্থা করে দিতে পার ত দেখ।

প্রদীপবাবু সব কথা ভালো করে না শুনেই বললেন, আরে সে জন্য কিছু ভেব না। একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ভালো গাড়ীই তুমি পাবে। আর পেডিগ্রীর ওপর যদি খুব বেশি ঝোঁক না থাকে ত খুব সস্তাতেই কুকুর হয়ে যাবে। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে রমাকে (অশোকগিন্নী) বল গিয়ে সামনে রোববারেই তার গাড়ী আর কুকুরের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

অশোকবাবু বাড়ী এসে গৃহিণীকে কিছুই বললেন না, ভাবলেন রবিবার দিন একেবারে তাকে তাক লাগিয়ে দেবেন। তারপর যথানিয়মে রবিবার এলো। সকালবেলা অশোকবাবু তাঁর বাসায় নিচের তলায় বৈঠকখানা ঘরে ধূমায়িত চায়ের কাপ এবং খবরের কাগজ নিয়ে সবে বসেছেন, এমন সময় একজন সিল্কের লুঙ্গি পরা গুণ্ডা প্রকৃতির লোক একটি বিরাট এ্যালসেসিয়ান কুকুর নিয়ে সোজা ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, আপনার নাম অশোক সেন?

অশোকবাবু চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে বেশ বিরক্তির সঙ্গেই বললেন, আমার নাম শ্রীঅশোককুমার সেন।

লোকটি পানদোক্তায় ছোপধরা দাঁত বার করে একগাল হেসে বলল, ঐ একই কথা। ল্যান কর্তা আপনার কুকুর।

অশোকবাবু বললেন, ওটা আমার কুকুর নয়, ওটাকে তুমি ভাল করে ধরে রাখ, কামড়ে টামড়ে দিতে পারে।

কুকুরটা ততক্ষণে অশোকবাবুকে আগাপাস্তলা শুঁকতে আরম্ভ করে দিয়েছে আর অশোকবাবু ক্রমশঃ ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে পড়ছিলেন। লোকটি 'টাইগার' বলে হুঙ্কার দিতেই কুকুরটা সুড় সুড় করে তার পায়ের কাছে এসে শুয়ে পড়ল। তারপর অশোকবাবুর দিকে তাকিয়ে লোকটি বলল, আজ্ঞে কর্তা ঐ একই কথা। আমার কুকুর ত আপনারই হবে। ওটা আমার ছেলের খাড়া, কাছ ছাড়া করতে কলজে ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু নাচার, নিজেরাই দুবেলা পেট ভরে খেতে পাই না, আর ওর হাতির খোরাক জোগাব কোত্থেকে। খুব সস্তায় করে দিচ্ছি বাবু নিয়ে ল্যান।

অশোকবাবু মনে মনে গজরাতে লাগলেন, প্রদীপটার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, সাতসকালে এক ধুমসো গুণ্ডাকে লেলিয়ে দিয়েছে। কোথায় একটু নিজে দেখেশুনে ব্যবস্থা করে দেবে তা না—আমি কুকুরের কি বুঝি?

ঠিক সেই সময় এক এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান প্রৌঢ়া মহিলা একটি বিরাট এ্যালসেসিয়ান নিয়ে ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং তাঁর ঠিক পেছন পেছন কোটপ্যাণ্ট পরা এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক আর একটি ঐ জাতীয় জাঁদরেল কুকুর নিয়ে উঁকি মারলেন। অশোকবাবু তাঁদের ঘরের মধ্যে ডেকে বসালেন। কুকুর তিনটি গোঁ গোঁ করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। মেমসাহেব এবং অপর ভদ্রলোকটি যখন স্ব স্ব কুকুরের বংশ পরিচয় ও অন্যান্য গুণাবলী ব্যাখ্যান করছেন, তখন আর [illegible]টি ভদ্রলোক দুটি কুকুর নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

ছোট বৈঠকখানা কুকুর আর মানুষে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। এদিকে পাঁচ দশ মিনিট অন্তর

(শেষাংশ ৩০১ পৃষ্ঠায়)

হ্রদ-মেখলা উদয়পুর

(২৬৬ পৃষ্ঠার পর)

তার মনোহর শিল্পকলা মনকে আনমনা করে দেয়। শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে মন খুঁজে বেড়ায় শিল্পীকে। এই প্রাচীন দুর্গের পাশেই নির্মিত হয়েছে আধুনিক মহারাণার রাজপ্রাসাদ। তার সুদৃঢ় লৌহকপাট ঘোষণা করছে এই যুগ-পরিবর্তনের। রাণা প্রতাপের দুর্গের আস্তাবলে এখনও পড়ে রয়েছে একটি ঘোড়া টানা প্রকাণ্ড গাড়ী এবং অনেক তার ধ্বংসাবশেষ।

দুর্গ থেকে আমরা নৌকাযোগে এলাম জল মহল বা ওয়াটার প্যালেসে। একে একটি ঐশ্বর্যময় স্ফটিক শিল্পের প্রদর্শনী বলা যায়। কুঞ্জ বিতান ও তরুরাজি বেষ্টিত প্রকাণ্ড মর্মর প্রাসাদ। এখানে রাজা মাঝে মাঝে সপরিবারে এসে অবসর যাপন করেন। এই ভবনের সমস্ত মহলে আসবাবপত্র যেমন খাট, আলমারি সোফা আলনা থেকে সুরু করে গৃহ সজ্জার সামগ্রী সমস্তই কাঁচের। এই কাঁচের বিলাস উপকরণগুলি সত্যই ভারী চমৎকার। এই মহামূল্যবান কাঁচের আসবাবগুলি আনা হয়েছে পশ্চিম প্রান্তের সুদূর বেলজিয়াম দেশ থেকে। নীচের মহলটি বর্তমান মহারাণার পিতার। আর উপরের মহল খাস মহারাণার।

রাজস্থানের প্রমোদ উদ্যানগুলিতে দেখেছি অন্তঃপুরিকাদের খেলা-ধূলা করার জন্য লতা-কুঞ্জের মধ্যে বেশ বাঁধানো ছককাটা খেলার প্রাঙ্গণ তৈরী করা আছে। এই উদ্যানের চার পাশে থরে থরে ফুটে আছে লতানো গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, আর করবী। আরও অনেক নাম-না-জানা ফুলে বর্ণে, গন্ধে পুষ্প বিতানটিকে আলো করে রেখেছে। ছন্দা পাঁপড়ী সেই ছক-কাটা পুষ্পকুঞ্জে খেলায় মেতে উঠেছে।

প্রাসাদের বহির্মহলের অলিন্দের প্রাচীরগাত্রে কতকগুলি মূল্যবান চিত্র সংরক্ষিত আছে। ভাদুড়ী গাইডের সঙ্গে দেখছিলেন সেই ছবিগুলি। বহু বর্ণানুরঞ্জিত এক একটি চিত্র মূল্যবান সোনার সুদৃশ্য ফ্রেমে বাঁধানো। কিন্তু সেই এক একটি ছবির নিপুণ শিল্পকর্মের মধ্যে ফুটে উঠেছে অনেকগুলি রূপ ও অনেক রকমের ভাব। একই চোখের দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে প্রেম, করুণা, উৎকণ্ঠা একই সঙ্গে। অন্য চোখে ক্রোধ, হিংসা ও কুটিলতা। একটি জন্তুকে নানা দিক দিয়ে দেখলে দেখা যাবে তার একাধিক পশুরূপ। এর মধ্যে বর্ণ সমাবেশের বৈচিত্র্যও বিশেষ লক্ষণীয়। কে এই শিল্পী? এক স্থানে লেখা আছে শিল্পী ঠাকুর সিং। আমার চোখে শিল্পী ঠাকুর সিং। যাহোক এখানে তবু শিল্পীর নাম পাওয়া গেল। আর পেয়েছিলাম জয়পুরে অম্বর দুর্গ নির্মাণের দুই প্রধান শিল্পীর নাম, মোহন আর তুলারাম। দুটো বাগানের নামকরণের মধ্যে দিয়ে তাঁদের নামদুটিও অমরতা পেয়েছে। কিন্তু আর কই? সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে রয়েছে এত প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শন, সমস্তই তার সাফল্যের পাদপীঠে। শিল্পীর নাম কই? উদয়পুরের সমস্ত হ্রদগুলির কল্পনা মাঝে শিল্পকলার মধ্যে আমি শুনেছি শিল্পী মনের প্রকাশের সেই আরণ্য ব্যাকুলতা।

হানিমুন

(২৫০ পৃষ্ঠার পর)

তাই যদি হয় তবে কেন ওকে খুন করতে গেলে মিলি? যাকে ভালবাসে, মানুষে তার প্রাণ নিতে পারে?

হয়ত বাসিনি মাসীমা, মোহের ঘোরে বেরিয়ে এসেছিলাম। কলকাতার এক পাড়াতেই আমাদের বাড়ী। জাতে আমরা এক নই সেজন্যে এ বিয়ে হতে পারে না বলে আমাদের বাবা-মা'রা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই ধীরেনের জেদ বেড়ে গিয়েছিল। আমায় অনেক বুঝিয়ে সে বার করে এনেছিল বিয়ে করবে বলে। কিন্তু তার আগেই ও আমাকে চেয়েছিল। আমি......আমি তা পারিনি, মাসীমা......সংস্কারই বলুন আর যাই বলুন, মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। এসে অবধি এই নিয়ে ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া চলছিল। আমি ঠিক করেছিলাম, আজ সকালেই বাড়ী পালিয়ে যাব আমার মা-বাবার কাছে। কিন্তু, কিন্তু রাতে ধীরেন আমার আপত্তি শুনতে চায় না, জোর করে সে আমায় চেয়েছিল। সেইজন্যে আমি জ্ঞান শূন্য হয়ে তরকারি কাটবার জন্যে যে ছুরিটা কাল সকালে কিনেছিলাম সেটা সামনে দেখে তুলে নিয়ে ওর পেটে ফুটিয়ে দিয়েছি। করেছি আমি দোষ, স্বীকার করছি মাসীমা, আমায় পুলিশে দিয়ে দিন আপনারা। কি করব? পারিনি, পারিনি নিজেকে এমনি করে দান করে দিতে। ভেবেছিলাম দোব, এসেছিলাম ওর সঙ্গে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব আটকে গেল।......

ঝর-ঝর করে যূথিকার চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ল।—এ কি বুদ্ধি তোমার? আগে এ সব না ভেবে ঘর ছেড়ে এলে কেন? নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে যে ধূলো গায়ে মাখলে তার দাগ কি কোন দিনও তোমার গা থেকে উঠবে?

সেই জন্যেই ত বলছি মরণই আমার ভালো। আমার বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন সকলে জানবেন মিলি নেই, সে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। তার নিজের দুর্বুদ্ধির জন্যে সে এই শাস্তি স্বইচ্ছায় তুলে নিয়েছে।

চোখের জল মুছে যূথিকা প্রশ্ন করল—সারাদিন কোথায় ছিলে? আমি ত ভেবেছিলুম চলে গেছ।

না, যাইনি, কোথায় যাব? তখন যে আমার যাবার অবস্থা ছিল না মাসীমা। ধীরেনের রক্ত দেখে আমি ভয়ে আত্মহারা হয়ে আপনাদের মুরগীর ঐ ছোট ঘরটায় সারাদিন পড়েছিলাম।

সেখানে ছিলে? সেটা নোংরায় ভর্তি সাপ-খোপের বাসা। ছোট্ট এতটুকু দরজা, ঢুকলে কি করে?

কোনও রকমে।

এ বাঙলোয় এলে কি করে? আগে কি জানা ছিল তোমাদের?

না, কিছুমাত্র নয়। নির্জন ষ্টেশন দেখে নেমে মুটেদের জিজ্ঞেস করে ধীরেন এসেছিল এখানে।— কেঁদে উঠল মিলি—মাসীমা পুলিশে ধরিয়ে দিন আমায়, আমি খুনী, আমি ধীরেনকে খুন করেছি।—কান্নায় সে ভেঙে পড়ল।..... আমি কোথাও যাব না, কারও কাছে মুখ দেখাতে পারব না।

চুপ করো মিলি, স্থির হও। আমি তোমায় বাঁচাব। আমি নিজে তোমাকে নিয়ে গিয়ে তোমার মা-বাবার কাছে রেখে আসব। ভয় নেই ধীরেন বেঁচে উঠবে। তুমি উঠে মুখ-হাত ধুয়ে এসো, কাল প্রথম যে ট্রেণ পাব তাতে তোমাকে নিয়ে কলকাতায় যাব। যাই, টাইম টেবলটা দেখিগে।

সাজগোজ

(২৫৮ পৃষ্ঠার পর)

দেশের জিনিষ দেশী মেয়েদের যেমন মানায় তেমন কোনো দিনই বিদেশী জিনিষ মানাতো না। যেমন মনে করুন পাশের বাড়ীর মীনা দেশী ধরণের একখানি ঢাকাই শাড়ী পরেছে, হাতে নিয়েছে বেতের একটি ব্যাগ, পায়ে হালকা একজোড়া চটি জুতো আর গহনা পরেছে কটকের রূপোর কাজ করা দু'-একখানি। বললো বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে যাচ্ছি। চোখের তৃপ্তি হয় এমন সাজগোজ দেখলে। কাজেই এই ধরণের পরিষ্কার ছিমছাম সাজ-পোষাকই তো ভাল। তবে চুলে ফুল পরলে কিন্তু চমৎকার মানায়। কারণ আমাদের দেশে ফুলের অভাব নেই কাজেই মাথায় এক গুচ্ছ ফুল বা শুভ্র সুগন্ধি ফুলের মালা চুলে পরলে মনে হবে যেন সবটাই এক মুহূর্তে এসে ধরা দিল। তবে বিরাট শহরের ট্রামে বাসে বা নোংরা রাস্তায় মাথায় ফুল বিশেষ শোভা পায় না। বিশেষ করে দিনেরবেলায়। সন্ধ্যার দিকে মহফিলে যখন অলস হয়ে পড়ে সেই সময় ফুলের সৌন্দর্য সহরেও মধুর মনে হবে। কাজেই ফুল ব্যবহার করলে আপনার সৌন্দর্য বাড়বে। সাজগোজ যখন করবেন তখন বাহুল্য বিহীন করে যাতে সৌন্দর্য ও রুচি বজায় রাখতে পারেন সেই দিকে লক্ষ্য রাখবেন।* ফ্যাসান বা নিত্য নতুন রুচির পিছনে ঘুরে বেড়ান ভাল নয়—যাঁদের রুচিবোধ আছে তাঁরা অল্প ব্যয়ে অল্প পরিশ্রমে সাজগোজ নিখুঁত না করতে পারলেও সুন্দর হতে পারবে। তবে এমনভাবে সজ্জিত হতে হবে, যাতে অন্যের দৃষ্টিকে ঔৎসুক্যে উজ্জ্বল না হয়ে শান্ত সম্ভ্রমে নমিত হতে পারে। আমাদের সাজগোজে পোষাক পরিচ্ছদে যেন সহজ শ্রীটুকু মহিমান্বিত জাগ্রত মর্যাদাবোধ প্রতিভাত হয়।

* অবশ্য আমি যা বলছি তাতে যেন কেউ মনে না করেন যে, এই সৌন্দর্যচর্চার জন্য ধনী হওয়া আবশ্যক। আদৌ তা নয়। লেখাটি মনোযোগ দিয়ে পড়লে বুঝতে পারবেন আমি সকলের জন্যই লিখছি।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব

[গোস্বামী কবি বিশ্বরূপের রচনা হইতে উদ্ধৃত]

ড় মণ্ডল মাঝে নদীয়া নগর সাজে
স্বপ্রকাশ ধাম চিন্তামণি,
যার প্রান্তস্থলে উছলি উছলি চলে
গরবিণী সুরতরঙ্গিনী।

ধনে পরিপূর্ণ দারিদ্র্যের নাহি চিহ্ন
অতুল ঐশ্বর্য করি দান,
য়ো সহস্র বাধা কমলা রক্ষেন যথা
কমলাকান্তের প্রিয় স্থান।

জগন্নাথ মিশ্র নাম শুদ্ধ-সত্ত্ব-গুণধাম
সর্বপরিচিত মহামতি,
র শ্রীহট্ট হতে আসি এই নদীয়াতে
বহুদিন করিছেন স্থিতি।

র সহধর্মিণী নাম শচী ঠাকুরাণী
মহাসাধ্বী ভক্তিপরায়ণা,
র্মে রাখিয়া মতি প্রত্যহ করেন সতী
পতিসহ বিষ্ণু আরাধনা।

কন্যা একে একে গিয়াছে পরমলোকে
ছিঁড়ি দম্পতির স্নেহজাল,
রূপ নামে পুত্র অবশেষে একমাত্র
রয়াছে বংশের দুলাল।

য় বর্ষ মাস সুখে গঙ্গাতীরে বাস
করিছেন ব্রাহ্মণ দম্পতি
অবশেষে সাধ্বী শচী পতিব্রতা
পুনঃ হইলেন গর্ভবতী।

গর্ভসঞ্চার দৈবে হইল এবার
না হইল প্রকৃত নিয়মে
হতে অত্যদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড যত
আরম্ভ হইল ক্রমে ক্রমে।

হয়ে কাতর রহিলেন মিশ্রবর
দৈবে এক নিস্তব্ধ নিশিতে—
ছিলেন মগন দেখিয়া অদ্ভুত স্বপন
চমৎকার মানিলেন চিতে।

পিণ্ডাকৃতি অত্যুজ্জ্বল এক জ্যোতিঃ
নিজ অঙ্গে করিল প্রবেশ,
তাঁর অঙ্গ হতে বাহিরিয়া সচকিতে
শচীদেহে প্রবেশিল শেষ।

অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ হ'য়ে না বুঝেন রঙ্গ
যে ঘটিল স্বপনের ঘোরে,
বুঝিলেন অতি— স্থির কোন মহামতি
পুত্ররূপে আসিবেন ঘরে।

পল্লী নিবাসিনীগণ হেরি গর্ভ সুলক্ষণ
প্রসূতির পুরাইল সাধ.
প্রসব না হ'ল হায় দশ মাস গিয়া প্রায়
দ্বাদশ মাসেও যায় বাদ।

মিশ্র হয়ে চমৎকার ভাবেন একিপ্রকার
এতো অতি অদ্ভুত ঘটন,
দ্বাদশ হইল গত ত্রয়োদশ সমাগত
তবু নাহি প্রসব লক্ষণ।

চক্রবর্তী নীলাম্বর মিশ্রের শ্বশুরবর
সাধ্বী শচী দেবীর জনক.
অতঃপর মিশ্র তাঁরে সংবাদ পাঠায়ে ঘরে
আনিলেন আগ্রহপূর্বক।

তিঁহ মহাজ্যোতির্বিদ তর্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত
বসতি করেন নবদ্বীপে,
শুনি সব যথাযথ গণিলেন ভবিষ্যৎ
বসি নিজ কন্যার সমীপে।

কহিলেন নীলাম্বর পুত্র হবে সুসত্বর
উচ্চ লগ্নে পেয়ে শুভক্ষণ,
প্রসবে না হবে ক্লেশ অন্য হেরি সবিশেষ
যোগ-যাগ মহাসুলক্ষণ।

এত শুনি জগন্নাথ শচীসহ প্রণিপাত
করিয়া বিদায় দিয়া তাঁর—
দিবা ষোড়শোপচারে গৃহদেব দামোদরে
পূজি কাল যাপেন নিষ্ঠায়।

তবে হ'ল পূর্ণকাল ভেদিতে সংশয়জাল
শুভে ফাল্গুনের পূর্ণিমায়,
পেয়ে মহাশুভক্ষণ গর্ভ হতে ভগবান
অবতীর্ণ হলেন ধরায়।

নগরের যত লোকে ধায় সবে একমুখে
ভাগ্যবান্ মিশ্রের ভবনে,
সংকীর্তন সম্প্রদায় কত আসে কত যায়
কি আনন্দ শচীর অঙ্গনে।

করি কর ধরাধরি দাদা বিশ্বরূপে ঘেরি
নাচে গায় বালকমণ্ডলী,
ঈশান নামেতে ভৃত্য সেও সেথা হয়ে মত্ত
নৃত্য করে হরিবোল বলি।

তস্কর লম্পট দুষ্ট কি মদ্যপ কি পাপিষ্ঠ
তারাও যে জন্ম-মহোৎসবে,
মিশ্রের ভবনে আসি মহানন্দ পরকাশি
হরি বলে সংযত স্বভাবে।

স্বর্গ হতে দেবীগণ করে পুষ্প বরিষণ
দেবগণ ধরি ছদ্মবেশ,
লোকের সংঘট্ট ঠেলি নাচে গায় হরি বলি
মিশ্রালয়ে করিয়া প্রবেশ।

এদিকে অদ্বৈতচাঁদ করিছেন সিংহনাদ
একান্তে বসিয়া শান্তিপুরে,
সঙ্গেতে শ্রীহরিদাস কি এক পেয়ে উল্লাস
নৃত্য করে ঘিরিয়া তাঁহারে।

যে যেথায় কায়মনে রহে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে
সে সেথায় রহিল বিভোর,
সবে হয়ে পুলকিত কাটাইল সে মুহূর্ত
হেনমতে এল চিতচোর।

শচীর বাড়িল সুখ প্রসবের যত দুখ
তাহে মাতা তিল নাহি গণি,
ভাসি আনন্দাশ্রুজলে বাহু প্রসারিয়া কোলে
তুলিলেন হৃদয়ের মণি।

হাসে প্রভু চেয়ে চেয়ে বাৎসল্যে সদয় হয়ে
ফিরে আজ জননীর পানে,
শচী হয়ে উন্মাদিনী হৃদে ধরি চিন্তামণি
চুম্ব দেন সুধাংশু-বদনে।

—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে

অলকে কুসুম না দিও

(২৬৫ পৃষ্ঠার পর)

জন মাথা ঘা... ...দের মধ্যে অন্যতম। তখনকার দিনে তিনি মনে করেছেন এই সব রঙের বাহার ভেল্কি আর স্ত্রী-পুরুষের প্রভেদ শুধুমাত্র যৌন নির্বাচনের জন্যেই। এসব দুজনে দুজনাকে আকৃষ্ট করা এবং মিলন ঘটানর সহায়ক। কিন্তু ক্রমে ক্রমে স্ত্রী-পুরুষের এই পার্থক্যগুলির অন্য সার্থকতা সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিছক সেক্স-এর মাধুর্য ছাড়া এই সব পার্থক্যের সাজসজ্জা রঙ বেরঙ-এর মধ্যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের কৌশলও আছে।

তাই এখন সব দিক দেখে মনে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ যখন অলকে কুসুম না দেবার কথা বলেছিলেন, তখন তাঁর ভিতরের দুনিয়া রঙে রঙে আর ফুলে ফুলে নিশ্চয় ভরপুর ছিল। বাইরের আড়ম্বর ছাড়াই তিনি নিজের ভিতরের ঐশ্বর্য নিয়ে সাজাতে পেরেছিলেন। এত রঙত আর কারুর অন্তরে ছিল না।

বাংলার সমাজ ও বাঙ্গালী ব্যবসায়ী

(২৬২ পৃষ্ঠার পর)

কেহ শ্রমিকদের উপর যদৃচ্ছ আচরণ করিতে পারে না, ইচ্ছামত সঞ্চয় বা ধন বৃদ্ধির কথাও আজ অবান্তর। অথচ ঊনবিংশ শতকের ক্যাপিটালিজমের সঙ্গে এই 'যদৃচ্ছ' কথাটার যোগ ছিল অত্যন্ত গভীর।

তবুও আমরা আজও ব্যবসায়ীমাত্রকেই ক্যাপিটালিস্ট আখ্যা দিই এবং তাহাকে সমাজের শত্রু বলিয়া গণ্য করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করি না। একবার ভাবিয়া দেখা আবশ্যক বোধ করি না যে ইঁহাদের আবির্ভাব সমাজের স্বাভাবিক ধারাতেই সম্ভব হইয়াছে। ইঁহারা কোন স্বয়ম্ভূ কৃত্রিম শ্রেণী নহেন কিংবা ইঁহাদের বৃত্তি কোন সমাজ-বিরোধী কর্ম নহে। ইঁহাদের অস্তিত্ব সমাজের মতই পুরাতন ঘটনা সত্য এবং অপরিহার্য। ইঁহারা আর পাঁচটা সামাজিক শ্রেণীর মতই সঙ্গত এবং অভিপ্রেত শ্রেণী। কোন সঙ্গত কারণেই ব্যবসা হীনতর বৃত্তি নহে এবং ব্যবসায়ী হীন বৃত্তির মানুষ নহেন।

বাঙ্গালীকে ব্যবসা বৃত্তির দিকে আজ আকৃষ্ট করিতে হইলে সর্বাগ্রে এই চেতনাই তাহার মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। যতদিন ব্যবসা এবং ব্যবসায়ী সম্পর্কে আমরা এই সত্যটি মনেপ্রাণে গ্রহণ না করিতে পারিব যতদিন ব্যবসায়ীকে তাহার প্রাপ্য সামাজিক সম্মান দিতে ইতস্ততঃ করিব ততদিন ভদ্র এবং শিক্ষিত বাঙ্গালী ব্যবসাকে এড়াইয়া চলিবে।

এতকাল তাহাকে সেই শিক্ষাই আমরা দিয়াছি। বাঙ্গালী সমাজে [illegible] আজ বোধ হয় তাহার পরিবর্তন আবশ্যক।

লাজবতী

(২০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ওপর বালিয়া তার ওপর চুড়ি, সব ঐ অনুপাতে, সব নিরেট। ওপর হাতে বাজু; গলায় এমুড়ো-ওমুড়ো একছড়া টাকার হার, তার সঙ্গে একটা ভরি চাল্লিশের হাঁসুলি, কানে ভরি দশ করে ঢেলা, পায়ে ত্রিশ ভরি করে দুটো নিরেট রুপোর 'কাড়া' অর্থাৎ মল। লম্বা-চওড়া, মুখখানা এতখানি, পুরুন্ত গড়ন, কোনখানে একটু খামতি নেই। ভালো খায়দায়, ভালো গয়না পরে। লাজবতী সৌভাগ্যবতী বলে নাম কিনেছে।

ওরা এখানে নতুন। মাস পাঁচেক হোল ভদ্রেশ্বর জুট মিল থেকে এখানে এসেছে। বোদী লোকটা ভালো মানুষ, গলায় তুলসীর কন্ঠী, নেশাভাঙের দিকে একেবারেই যায় না। সারীর লাজবতীর চেয়ে একমুঠো ছোট, বয়সের দিক থেকে দু'বছর।

যা বলল লাজবতী তার টীকাও করল।...

না, আরে রাম! মারধোর করে কখনও? ছিঃ, স্বামী সে এক মুঠো ছোট হ'লেও দেবতা, বড় হলে তো কথাই নেই। তবে ওর মধ্যে একটা তত্ত্ব কথা আছে—ভগবান পুরুষ মানুষকে শক্ত করে পাঠিয়েছেন, তা সেকি শক্ত থাকবারই জন্য? গেহুঁকেও (গমকেও) তো তিনি শক্ত করে পাঠিয়েছেন, তাকে জাঁতায় পিষে জল দিয়ে ভালো করে ঠেসে নিতে হবে না?

বোদীই কি চিরকালটা এই রকম ছিল নাকি? ভদ্রেশ্বরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসুক না বিলসী।

না, মারধোর নয়, তবে একটু, কি সে বলে......

আর কেউ নেই, সমস্ত কথাটা বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দিল লাজবতী।

আর লুকোচুরি নয়।

পুজোর দিন বাছা হয়েছে রবিবার। সকালে বোদীর হাতে চায়ের গেলাস তুলে দিয়ে বিলসী বলল—"আজ একটু বাড়িতেই থেকো। বেরুবে নাকি?"

অতিরিক্ত হয়ে গেলে যেমন হয়ে থাকে, অনিয়ম অত্যাচারে শরীরটা একটু ভেঙে এসেছে বোদীর, সেরকম নিয়মতো আর যেতে পারে না আড্ডায়, সেইজন্যই বোধ হয় একটু রুখে উঠে বলল—"বেরুব না, তোর হুকুম?"

"হুকুম নয়। পুজো আছে।"

"আবার পুজো? এবার কার? সাবিত্রী, মহাবীরজী দু'জনেই তো ফেল মারল।"

"এবার ঝাড়ন বিবির।"

"ঝাড়ন বিবি! সে আবার কে?"

"আছেন একজন।...তোমার যা করবার ইচ্ছে তা করো। কেউ যখন শোধরাতে পারলে না। তবে এতো সোজাসুজি নয়। তোমার শরীরটা এদিকে ভেঙে পড়ছে তো। জিগ্যেস করেছিলাম, পুরুত ঠাকরুণ বললেন..."

"ঠাকরুণ! মেয়ে পুরুত নাকি?"

"হ্যাঁ, খুব ঝাড় ফুঁক জানেন, বললেন—'কোনরা, পুরুষ তোর খাচ্ছে-দাচ্ছে, তোকে রয়েছে, অমন পালিয়ে যাচ্ছে কেন? ওর ওপর নিশ্চয় চুড়েলের নজর পড়েছে।"

"তারপর?"

"বললেন—তুই ঝাড়নবিবির পুজো দে। খুব জাগ্রত ঠাকুর। পুজো দিয়ে বারকয়েক একটু ঝাড়ফুঁক করলেই দেখবি ছেড়ে যাবে চুড়েল, শরীর যাবে ঠিক হয়ে, তোর পুরুষ আবার যেমন ফুর্তি করে বেড়াচ্ছিল সেইরকম বেড়াবে।"

"ঝাড়ফুঁকটা করবে কে? তোর পুরুত-ঠাকরুণই তো?"

"একবার পুজোটা হয়ে গেলে যে-কেউ করতে পারে, আমিই করব। যখন ভর হবে তোমার ওপর তখনই তো। বে-হোঁস হয়ে পড়ে থাকবে, কথা জড়িয়ে যাবে, সেই সময়। পুরুত ঠাকরুণ বললেন সেই সময় চুড়েল শরীরের ভেতর ঢুকে বুকের রক্ত চুষে খায়। তাই জন্যেই তোর পুরুষের এই রকম দশা হয়ে যাচ্ছে।... অবিশ্যি, পুজোর সময়ও যদি ভর করে থাকে তো উনি নিজেই একচোট ঝেড়ে দিয়ে যাবেন।"

একটু হতভম্ব হয়ে গেছে ডুমরা, পুরুত থেকে নিয়ে সবই তো নতুন ধরণের; তবু, সাহস দেখিয়েই বলল—"বটে? তা একবার দেখতে হচ্ছে তো তোর পুরুত ঠাকরুণকে।"

দেখল।

ছুটির দিন, ভেবেছিল আড্ডার দিকেই একবার যাবে। কিন্তু কি ভেবে আর গেল না। রাত্রে একটু বাড়াবাড়ি হওয়ায় দেহটাও ঢিলে ছিল, খানিকটা এদিক-ওদিক করে ফিরে এল, কেমন একটা কৌতুকও লেগে রয়েছে।

সুনরা দোর গোড়ায় দাঁড়িয়েছিল, ওকে দূর থেকে দেখেই ভেতরে চলে গেল। বোদী এসে দেখল, পুজো সাজানো, পুরুত ঠাকরুণ বোধ হয় তার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন, ভেতরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আসনে এসে বসলেন।

চওড়া করে পাতা কালো কম্বলের আসনটা যেন ভরে গেল। ইয়া মাল, কাল কুচকুচে রং, কপালে মোটা করে মেটে সিঁদুরের ফোঁটা, সিঁথিতেও চওড়া করে লেপা মেটে সিঁদুর জ্বল জ্বল করছে। গায়ে সব মিলিয়ে বোধ হয় দেড়শো ভরির রুপোর গয়না।

ঢুকেই অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ডুমরা।

পুরুত ঠাকরুণ বললেন—"ওখানে এসে বসতে হবে।"

আঙুল দিয়ে একটা জায়গা দেখিয়ে দিলেন। ডুমরা মন্ত্রচালিতের মতো আস্তে আস্তে উবু হয়ে বসল।

পুরুত ঠাকরুণ একমুখ ঝকঝকে দাঁত বের করে একটু হেসে বিলসীর দিকে চেয়ে বললেন—"যেতে পারে না তো আজ, আমি ডাকিয়ে আনলাম কিনা মন্তর বলে।"

ডুমরা হাঁটুর মাঝখানে হাত দুটো একত্র করে নিয়ে ভালো করে বসে একদৃষ্টে চেয়ে রইল ফ্যাল ফ্যাল করে।

পুজো যেমন হয়ে থাকে—দক্ষিণা মন্ত্র—ফল—চন্দন—ধূপ-ধূনোর, তেমন করেই হোল।

শেষ হলো পুরুত ঠাকরুণ ডুমরাকে বললেন—"এবার ঝাড়ন বিবিকে প্রণাম করতে হবে, মা খুব ভক্তি আনো।" বিবির পুরুত দেখে অর্ধেক হয়ে গেছে ডুমরার, শুকনো মুখে প্রশ্ন করল—"কোথায় তিনি?"

একটি হলুদে ছোপানো কাপড় ঢাকা থেকে বিবি এতক্ষণ তার মধ্যেই ঢেকে নিচ্ছিলেন, বেরুলেন—

নারকেল কাঠির নয়, বাঁশের বাখারি শক্ত শরু করে চিরে, চেঁচেছুলে গোছা বেঁধে যেরকম তোয়ের হয় তাই একগাছি। বেশ ওজনদার, মুঠিটা তার দিয়ে শক্ত করে বাঁধা।

মুঠির কাছে খানিকটা ছেড়ে প্রত্যেকটি কাঠি ভালো করে সিঁদুর মাখানো আগাগোড়া।

প্রণামপর্ব হয়ে গেলে পুরুত ঠাকরুণ বিলসীকে ডেকে বিবিকে তার হাতে তুলে দিলেন। বললেন—"বেশ জোর দিয়ে ঝাড়া চাই; যত বে-হোঁস হয়ে থাকবে তত বেশি জোর; আপনি বাপ বাপ করে ছেড়ে যাবে চুড়েল।"

আর কিছু না বলে গয়নার আওয়াজ তুলে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন।

* *

চুড়েল আর আসেওনি।

দ্বিতীয় চিন্তা
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

জলচারেক বসতে পারে তবু আমরা দশজন অন্তত
ঘিরেছি চারিদিকে: গল্প অট্টহাসি;
পাবো অন্যলোকে
পাশে অন্যলোক
হ-হুঁশ ভাবুক—ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবো
উপেক্ষার মত—
দশজন নায়ক আমরা স্ত্রীচরিত্রবর্জিত নাটকে।
এন্তার গমাক পড়েছে: দগ্ধবাসনার কুণ্ডলী
ভালোবাসা কিংবা ভালো না-বাসার অদ্ভুত যন্ত্রণা
সবাই শরিক আমরা, এক দুঃখে প্রত্যেকই জর্জর
একত্রে মাতাল হই দশ পেয়ালা কফি খেয়ে
পাগল দশজন।

ঠিক সেই রাহুলগ্নে রূপবতী উজ্জ্বল মহিলা
কুটিল কটাক্ষে তার ছুড়ে দিল ঘৃণার প্রহার;
বিদ্রূপ শাণিত রেখে মৃদু হেসে বললাম, উনিশ
যতই যক্ষের মত আগলে রাখ যুগ্মস্তনভার
আমরা দেখেছি তোর ওষ্ঠপ্রান্তে ব্যাকুল প্রণয়
সত্বর পাগারে, নইলে ক্ষ্যাপারা নিশ্চিত ছুটে যাবে
শীতল হিংসার হাত ধরবে ক্ষীণ মুষ্টিমেয় কটি
তারপর পরমানন্দে তোকে নিয়ে ডুগডুগি বাজাবে
কেমন নটীর বেশে আমাদের দুঃখের সংসারে
আরেক ভিক্ষুক আসে,
দেখিনা—চিনিনা; দিশাহারা
অন্ধ নীলিমার বালক শূন্য চক্ষু মেলে
ভাবে, অহঙ্কারে
আরেকটু বসতে পাবে, শিশু যৌবন হয়ত
এইমাত্র চায়।

আর জন্ম

(২৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

চন্দন। একটুকু নাবাল জায়গা পেলেন এইবার। কাঠশোলা আর হোগলার ঝাড়—ঠাহর করে দেখুন, জলও একটুখানি চিকচিক করছে ওর মাঝে। মাঠের পুকুর ডাকনাম। নিচু হয়ে দেখুন ভাল করে, না হয় ঘাসের চাপড়ায় জুতো ঠুকে দেখুন। ইঁট আছে, পাতলা পাতলা ইঁটের গাঁথুনি। কোদাল এনে খুঁড়ে ফেলেন যদি, ঘাটে নামবার পুরো সিঁড়ি পাবেন। সিঁড়ির পাশে নারকোল-ছোবড়ার মাজুনিও পড়ে আছে হয়তো বা। সকালবেলার পাড়ার গিন্নিরা বাসন মাজতে এসেছিলেন। থালা-বাটি, হাতা-খুন্তি গামলা-কড়াই। গাঁয়ের সমস্ত খবর এই ঘাটে। কি রান্না হয়েছিল দিদি? ডুবো তেলে গোটা কয়েক বড়ি ভেজে তাই গুঁড়িয়ে দিও, তার হবে দেখো লাউয়ের ঘণ্টর। বাড়ির বুড়ো কর্তাকে নিয়ে পারা যায় না; হাটের সময় তেলের কথা বলেছ তো—দেখি, ভাঁড়টা দেখি। তেলের ভাঁড় ছুঁড়ে দিলেন, ভেঙে চুরমার। তেল অবিশ্যি একটু বেশি খরচ হয়েছে, আরও একটা দিন চলবার কথা। কিন্তু, বিবেচনা করো, এতগুলো মাথায় মাখছে, ভাজাটা পোড়াটা তাতেও তেল লাগে—আঁকে—মুখের অত হিসাব চলবে কেন? বুঝবেন না কিছুতেই বুড়োকর্তা, ভাঁড় ভাঙবেন। ভেঙে রাগ দেখিয়ে আবার খানিক পরে সেই মানুষই হিসাব করে তেলের দাম দেবেন, সেই সঙ্গে নতুন ভাঁড় কেনবার পয়সা। এই মাসে কতগুলো ভাঁড় যে গেল!

এ হল সকালবেলার কথা। আর এই সন্ধ্যাকালে—সরে আসুন, সরে আসুন, মেয়ে-বউরা বুঝি গা ধুতে আসে। হিমচাঁদ বড় ছেলের বিয়ে দিয়েছেন, বাড়িতে সে বউ ভিজে-বেড়ালটি। ঘাটে এসে এখন অন্যরকম। সমবয়সী অনেক মেয়ে জুটেছে, ননদ সম্পর্কের। ওরমধ্যে রেবতী তো আছেই—রেবতীর সাহসেই নতুন বউ ডানপিটে হয়ে উঠছে এমনি। চোখ-মুখ নাচিয়ে কথা বলছে—কখনো গলা উঁচু, কখনো ফিসফিসানি। অবাধ্য চুলের গোছা এসে পড়ে মুখের উপর, বাঁ-হাতে তুলে দেয়, আবার এসে পড়ে। রাতের খবর জানতে চায় মেয়েগুলো—কারো এদের বিয়ে হয়েছে, কারো বা হবো-হবো, কথাবার্তা চলছে। রেবতীর গুরুজন, দাদা-বৌদির ব্যাপার—সে কিছু বলে না, হাঁ করে গিলছে কিন্তু সব কথা। বলিসনে, বলিস নে। এমন বদরাগী পুরুষ। ক্ষেপে যায়। কিন্তু আমি কি করব বল দেখি। হাট থেকে ফেরা হল ঐ রাত্রে। তারপরে মাছ-তরকারি কোটা-ধোওয়া রাঁধা-বাড়া। বেটাছেলের আর জনমনিষদের খাওয়ানো, এঁটোপাড়া—এত সব করে তবে তো নিজেরা দুটো মুখে দেবো! বলে, অতক্ষণ ধরে কি খাও? বল-না ভাই, হাত তো একটা বই দশখানা নয়—সকলে একসঙ্গে বসেছি। ঠাকুরপুজো কি সন্ধ্যা-আহ্নিক নয়, মু...জেই বা থাকি কেমন করে? অন্য সকলে খাচ্ছে, আমি আগে-ভাগে উঠে আসতে পারিনে। মিছামিছি দুষবে আমায়। ঘরে ঢুকে দেখি, পুরুষ মানুষ আলো কমিয়ে দিয়ে উল্টোমুখ করে আছেন, পাশ-বালিশটা মাঝে দিয়েছেন। আমিও তেমনি—আর একটা পাশ-বালিশ তার পাশে দিয়ে একেবারে সেই মুড়োয় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুমও এসেছে। তারপরে অনেক রাত্রে সাড় হলে দেখি, মাঝের ডবল বালিশ সরে গেছে কখন। কই ভাই, আমি তো কাউকে সাধতে যাইনি। সেই যখন আপনা-আপনি রাগ ভাঙতে হবে, তবে মানুষ রাগ করতে যায় কেন? বল্ না ভাই। ঘুম এসে গেলে আমার যে কোন হুঁশ থাকে নি। অত সহজে হত না তবে। আরও ঢের নাকানি-চুবানি হত—

খিল খিল হাসি, ফষ্টিনষ্টি ঝপাঝপ ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে। কলহাসি জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে মিলে মিশে যায়।

বড়রা আসেন কলসী কাঁখে। ও মা, জল ঘুলিয়ে দই-দই করেছে—কলসী ভরি কোথায়? আচ্ছা সব হয়েছে। মেয়েছেলে তো নয়, দস্যি এক একটা।

গোলমাল শুনে হিমচাঁদের মা বুড়িও ঐ দেখুন এসে পড়েছেন।

সোমত্ত মেয়ে, ভয় করে না গা? বোধন-গাছের বেম্মদত্যি চুল ধরে টেনে তুলবে এক একটা করে, ডালের সঙ্গে চুলের গোছা বেঁধে ঝুলিয়ে দেবে। হবে সেই সময়।

অনেক পায়ের দাপাদাপি জলের উপর, কানে শোনবার জো আছে? মিছাই বুড়ো মানুষ চেঁচিয়ে মরছেন।

বউ পরের মেয়ে, দল ছাড়া হয়ে সেই কেবল ঘাটের দিকে আসছে। বুড়ির নজর পড়েছে: নতুন বউ এর মধ্যে, ওমা আমার কি হবে! তুমিও জল দাপাচ্ছ?

রেবতী কর কর করে ওঠে: তোমার মতন হাতে-পায়ে যখন বাত ধরবে ঠাকুরমা, তখন আর জল দাপাবে না, শুয়ে শুয়ে তেল মালিশ করবে।

তা বলে ঝি'র যা চলে, বউয়েরও তাই? পাড়ার লোকে বলবে কি? উঠে আয়, বাড়ি চলে আয়—

বউ প্রায় তো ঘাটে এসে পড়েছে। রেবতীর কান্ড দেখুন—সাঁ-সাঁ করে জল কেটে এসে বউয়ের পা ধরে দিল টান। জোর করে তাকে আবার মাঝপুকুরে নেবে। বুড়িরও মাথায় বুদ্ধির প্যাঁচ খেলে। উঁ, আসতে দিবি নে? রেবতীটা হয়েছে পালের গোদা, ও-ই সব খারাপ করে দিচ্ছে—

মাঠে চাষ দিয়েছে, বড় বড় মাটির ঢিল। ঢিল ছুঁড়ছেন ঠাকুরমা, কুপ-কুপ করে জলে পড়ে। বুড়োমানুষের হাতের জোর কতটুকু, ঢিল ঘাটের উপরে পড়ছে, ওরা সবাই কত দূরে। আসুন না, ঢিল এগিয়ে দিই। কিম্বা আমরাই ছুঁড়ি দূরের থেকে। বজ্জাত মেয়ে রেবতীকে জব্দ করতে হবে। ঢিল গিয়ে পড়ে, আর ডুব মারে সে জলের নিচে। ডুব-সাঁতার দিয়ে খানিকটা দূরে ভুস করে ভেসে ওঠে। আবার মারলেন, তক্ষুণি সে ডুবেছে। লুকোচুরি খেলার মতো। ঠাকুরমা টের পেয়ে রুখে উঠলেন আমাদের উপর: এই ঢিল মারবিনে বলছি। ভর সন্ধ্যেয় জলের উপরে রয়েছে; কান্ড ঘটাবি নাকি?

তুমি তো মারছ!

আমি আর তোরা? আমি দেখেশুনে মারি। তোদের মতন?

এবারে ঠাকুরমা কাতর হয়ে বলছেন, উঠে আয় বাছারা। ঢের হয়েছে। বাড়ি চলে আয়।

বাড়ি? তাইতো, বাড়ি কোথা দেখাই আপনাকে? ভাঁট-কালকাসুন্দে-নাটা-শেয়াকুলে চতুর্দিক ছেয়ে আছে। বাড়ি দেখবেন তো লম্বা একটা ডাল ভেঙে নিন হাতে, জন্তু-জানোয়ার বেরিয়ে পড়তে পারে। এই যে সেই জামগাছ: বারোয়ারি কালীপুজো হত, কালীঘরের পাশে এই গাছ। রেবতীর বিয়ের পরদিন পাশাপাশি এইখানে তিনটে পালকি রেখেছিল। দুটোয় যাবে বরবউ, আর একটায় পুরুত ঠাকুর। বেলাবেলি রওনা হয়ে পড়বে, সমস্ত ঠিকঠাক। যাত্রামঙ্গল পড়ানো হবে, কিন্তু বউ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আচ্ছা কান্ড, গেল কোথায় হতভাগা মেয়ে?

সকলে খুঁজছে। আমিও। বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে এসে আটকে পড়েছি। ব্যস্তসমস্ত হয়ে যাচ্ছিলাম পুকুরঘাটের দিকে। কি যেন লাগে এসে গায়ে—জাম ছুঁড়ে মারল কে? কোন দিক থেকে? এদিক-ওদিক দেখছি। আবার এসে পড়ে। এ আপনাদের গুণনিধি রেবতী ছাড়া কেউ নয়। গাছের উপরে তাকাই—বিয়ের কনে, কী জানি গাছে চড়েই বসল বা! পুনশ্চ এসে পড়ে একটা। দেখেছি—মাঝের পালকির দরজা বন্ধ দু-দিকে। আমি দেখলাম—একটা দরজা একটু ফাঁক হয়ে হাত বেরিয়ে এসেছে। তলায় জাম পড়ে ছড়িয়ে আছে—ঐ হাতে এক একটা জাম কুড়িয়ে মারছে। এবারে দেখি, জাম না কুড়িয়ে হাতছানি দিচ্ছে হাতের আঙুল নেড়ে।

ঝুঁকে পড়ে বলি, সারা গায়ে খোঁজ খোঁজ পড়ে গেছে—কী সর্বনাশ!

ভালই তো! আগে-ভাগে এসে আমি পালকি চড়ে বসে আছি।

পাগলামির আর সময় পেলে না! বেরে... কানাচের দিক দিয়ে টিপিটিপি ঘরে গিয়ে ওঠো। সদর-উঠানে কুটুম্বেরা—ঐ দিকে নয়।

রেবতী বলে, তুমি বোসো একটুখানি পালকির পাশে। দুটো কথা বলে নিই। ... আমি বসে পড়তে পারি অমনি ভাবে? লোকে দেখলে কি ভাববে?

কি বলবে বলো, শুনতে পাচ্ছি।

হঠাৎ রেবতী বলে, আমার বর দেখতে কেমন? যেমন কালো তেমনি নাকি ষণ্ডা।

দেখ নি তুমি?

উঁহু শুভদৃষ্টির সময় চোখ বুজে ছিলাম। বাসরঘরে, সবাই বেরিয়ে গেলে, একবার ইচ্ছে হল দেখি তাকিয়ে। তা ভয় হল বড্ড। কী জানি কি দেখব! যদি দেখি একটা মোষ পড়ে রয়েছে পাশে!

বিয়ে-থাওয়া হয়ে গেল, এখন এই সব ... বুঝি! হাসি-স্ফূর্তি করে চলে যাও।

যমপুরী যেতে হাসি আসে নাকি?

জোর দিয়ে আবার বলে, যমপুরী তো ... চেয়ে ভাল জায়গা। যা শুনলাম—নোনারাজ্য তেপান্তরের বিল। ধানবনের মাঝে টিলার উপর এক একটা পাড়া।

তোমার সুবিধে। ছুটে বেড়াবে, জলে ঝাঁপাবে—

ছুটোছুটি কি চিরকাল লোকের ইচ্ছে করে!

রেবতী ফোঁস করে এক নিশ্বাস ফেললো, সে নিশ্বাস আজও যেন শুনলাম। বলে

জান ত ভাই আমি হচ্ছি
জলচরের জাত,
আপন মনে সাঁতরে বেড়াই
ভাসি যে দিনরাত।
রোদ পোহাতে ডাঙগায় উঠি,
হাওয়াটি খাই চোখবুজে,
ভয়ে ভয়ে কাছে এগোই
তেমন তেমন লোক বুঝে।
গতিক মন্দ দেখলে আবার
ডুবি অগাধ জলে।
এমনি করে দিনটা কাটাই
লুকোচুরির ছলে।
তুমি কেন ছিপ ফেলেছ
শুকনো ডাঙগায় বসে?
বুকের কাছে বিঁধ করে
টান মেরেছ কসে।
আমি তোমায় জলে টানি
তুমি ডাঙায় টান',
অটল হয়ে বসে আছ
হার ত' নাহি মান।
* *
আর কেন ভাই ঘরে চল
ছিপ গুটিয়ে নাও,
রবীন্দ্রনাথ ধরা পড়েছে
ঢাক পিটিয়ে দাও।"

রবীন্দ্রনাথের কবি-মনের খবর ঠিকভাবেই ধরা পড়েছিল সাহিত্যরসিক প্রিয়নাথের কাছে। তাই রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গ্রন্থের আলোচনার দ্বারা তিনি কবির সেই বিচিত্র ভাবধারাটি জনসাধারণের মধ্যে প্রথম প্রকাশ করেন। এই কাজে তিনি অসামান্য দক্ষতা ও নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যদিয়ে প্রিয়নাথ মানুষের জীবন-ধর্মের মধুময় দিকটি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন।

হাজার কথা লিখেও যে ভাব ব্যক্ত করা যায় না, তা কেমন সহজ সরল অল্প কথায় রবীন্দ্রনাথ মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেছেন সে পরিচয় প্রিয়নাথ কবির "মানসী" কাব্য আলোচনায় ব্যক্ত করেছেন।

আলোচনার এক স্থলে প্রিয়নাথ রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাংশটি উদ্ধৃত করেছেন—

"তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি
শতরূপে শত বার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার!
চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছি গীত-হার,
কতরূপ ধরে পরেছ গলায়
নিয়েছ সে উপহার।
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।
যত শুনি সেই অতীত কাহিনী,
প্রাচীন প্রেমের ব্যথা,
অতি পুরাতন বিরহ-মিলন-কথা,
অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে
দেখা দেয় অবশেষে
কালের তিমির রজনী ভেদিয়া
তোমারি মূরতি এসে,
চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুব তারকার বেশে।"

এই উদ্ধৃত কবিতাটির আলোচনা প্রসঙ্গে প্রিয়নাথ লিখেছেন,—"কোনকালে কেহ যাহা বলিতে পারিবে না, তাহা এই কতিপয় অলঙ্কার-শূন্য সাদাসিধা, অতি সরল, অতি সহজ, অতি সামান্য পদে কি চমৎকার, কি প্রাণভরা উক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। শেষ চরণ পাঠে চক্ষের উপর কত জন্ম কত যুগে ঘুরিয়া যায়। কত সুদূর বৎসরের বিশাল মেঘরাশি ঠেলিয়া প্রাণ কোথায় ভাসিতে থাকে। অতীতের অনন্ত বিস্মৃতি চক্ষের সম্মুখে খুলিয়া যায়। কত অন্ধকার কত আলো আসিয়া প্রাণে পড়ে।"

কবিতার মতই সুন্দর ছিল প্রিয়নাথের কাব্য সমালোচনা। তিনি নিজে একজন কবি ছিলেন বলেই তাঁর কাব্য আলোচনা এত মাধুর্যমণ্ডিত হতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথ সে যুগে কবিতা লিখে যে সুন্দর ফুলগুলি ফুটিয়ে গেছেন প্রিয়নাথ তার সুমধুর আলোচনায় তারই পাশে আর এক সারি সুন্দর ফুল ফুটিয়েছেন।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের পথে প্রিয়নাথ সেনের রসগ্রাহিতার সাহায্য দান অসামান্য; সাহিত্যসৃষ্টির পথে ইন্ধনের মত রবীন্দ্রনাথ যা কাজে লাগাতে পেরেছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে কবি ও সমালোচক—দুয়েরই সমান প্রয়োজন। তা না হলে রস জমে না।

পাণিনি বলেছেন,—"সাহিত্যং অধীতে ইতি সাহিত্যিকঃ, সাহিত্যং রক্ষতি ইতি সাহিত্যিকঃ।" সে কারণে আমরা প্রিয়নাথ সেনকেও একজন গুণী সাহিত্যিকের মর্যাদা দান করবো। বাঙগলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি শুধু সাহিত্য রচনাকারীদের দ্বারাই ঘটেনি আমরা ভালভাবে জানতে পারি প্রিয়নাথ প্র[illegible] আলোচনায়। যদিও আরও বহু সাহিত্য স[illegible]লোচক বাঙগলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধির প[illegible] সহায়তা দান করেছেন, তবু প্রিয়নাথের দ[illegible] আমরা সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করবো।

বাঙ্গালীর ও বাঙগলা সাহিত্যের [illegible] রবীন্দ্রনাথের বিরাট সাহিত্যসৃষ্টির প[illegible] কুসুমাস্তীর্ণ করেছেন কবি প্রিয়নাথ [illegible] এ কারণে তিনি বাঙগলা সাহিত্যের ই[illegible] অক্ষয় আসনের অধিকারী।

নবজীবনের তীর্থে

শ্রীনরেন্দ্র বসু

সর্পিল মৃত্যুর স্রোতে বহমান জীবনের দোল,
বিলয় স্বপ্নের কোলে
বিকাশের আদিম ইঙ্গিত!
মর্মের মর্মরে মোর মিশিল যে ধূলোর কল্লোল
ধরিত্রীর ছন্দে বাঁধা সে কি
সেই "ইভের সঙ্গীত?"
* * *
অশান্ত কালের চক্র; সময়েরা উন্মনা, অস্থির
নিয়মের গ্রন্থি লয়ে ঘূর্ণমান গ্রহ-তারকারাঃ
ক্ষুব্ধ ও ক্ষুধিত বিশ্বে
লভিনু যে ধ্বনি শতাব্দীর
সে কি সেই তৃপ্তিহীন প্রান্তরের অদ্যতনী সাড়া?
* * *
চিন্তা, ব্যথা, কল্পনায় জীবনের পরিপূর্ণ করি
মৃত্যু-সাগরের বুকে গেঁথে চলি লহরীর মালা;
তরঙ্গে, তুফানে, প্রেমে
নিঃশঙ্ক-হৃদয় আমি ভরি
আর্ত্ত প্রকৃতির ভালে হেরি
কার কল্প-দীপ জ্বালা?
* * *
এ্যাটম-স্পন্দন-মত্ত জাগতিক বৃত্ত বর্তমান,
ভবিষ্য শাশ্বত-লোকে তোলে
মোর স্পন্দিত হিয়ায়;
ধ্বংসের আঁধার ভেদি আসে
যেন আলোক অম্লান
হে অদৃশ্য, অনাগত!—রতি
আমি তোমার আশ্রয়।
* * *
দীর্ণ করি ধরিত্রীর দীর্ঘায়িত বঞ্চনার রাত।
নব জীবনের তীর্থে আনো
তব ঈপ্সিত সাক্ষাৎ।

আগমনী ও বিজয়া

(১০ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

পতিগৃহে কন্যার যাত্রাকালে আসন্ন বিচ্ছেদ বেদনায় পিতা-মাতা শোকাকুল হয়ে পড়েন। সর্বাপেক্ষা শোকাচ্ছন্ন হন জননী। এ অবস্থায় জননীর মর্মবেদনা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। এ তিন দিনে মা কতবার বলেছেন "এসেছিস্ মা—থাকবো উমা দিনকত।" উমা 'আজ এসেই কাল যেতে চায়', মায়ের মন কি তা বোঝে? নবমীর রজনীকে মা মিনতি করেছেন—

"রজনী, জননী, তুমি পোহায়োনা ধরি পায়,
তুমি না সদয় হলে উমা মোরে ছেড়ে যায়।"
কখনো ব্যাকুল হয়ে বলছেন—
"আমার ঐ ভয় মনে, বিজয়া দশমী দিনে
অকালে ভাসাইয়ে যাবে শিবে শিব-ভবনে।"

কিন্তু মায়ের সকল আবেদনই ব্যর্থ হয়। অকরুণ নবমী রজনী প্রভাত হয়। বাঙ্গালীর দশমীর প্রভাত যেন কালান্তক যম, সে জননীর স্নেহাঞ্চল থেকে হৃদয় নিধিকে ছিনিয়ে নিয়ে আসে—

"বিছায়ে বাঘের ছাল দ্বারে বসে মহাকাল
বেরোও গণেশ মাতা ডাকে বারে বারে।"

মহাকালের ডাক শুনে জননীর অন্তর আর্তনাদ করে উঠে। কেঁদে রাণী বলে উঠেন, "উমা আমি পাঠাব না।" "জয়া! বলগো পাঠান হবে না।" কিন্তু না পাঠিয়ে উপায় নেই। কন্যা পরের ধন। তখন অন্তরে স্থৈর্য এনে মা [illegible] করেন "তুমি নাই যথায় এমন স্থান আর কো[illegible] প্রিয়ের রত্ন সিংহাসন তো অন্তরের [illegible] কোঠাতেই। তাই উমার মুখে মিষ্টি, [illegible] দিয়ে মা মেনকা অমঙ্গল অশ্রু গোপন [illegible] জন্য চোখে আঁচল দেন। অশ্রুনিরুদ্ধ কন্যার কানে কানে বলেন "এবার যাও, [illegible] তোমায় আনব মা।"

মোটামুটিভাবে এই হচ্ছে [illegible] "বিজয়ার" আলোচ্য বিষয়। অষ্টাদশ শ[illegible] বাঙ্গালী সমাজে কন্যার [illegible] বিভীষিকাপূর্ণ ছিল। কোন মা-ই [illegible] শিশুকন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাতে [illegible] না। তাদের বিরহ মিলনের হাসি কান্না [illegible] দিয়ে গাঁথা মালা "আগমনী বিজয়ার" [illegible] রূপ নিয়েছে। জগজ্জননী প্রতি গৃহে [illegible] জন্ম নিয়ে স্নেহরস উপভোগ করছে[illegible] বাঙ্গালী মনে প্রাণে এ সত্য বিশ্বাস ক[illegible] তাই দশ প্রহরণধারিণী দুর্গা প্রতি [illegible] তাদের পতিগৃহাগতা কন্যারূপে পূজা[illegible] এসে দেখা দেন।

ব্রহ্মদৈত্য

(২৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

...দিয়ে দমাদ্দম আঘাত করছে—জাতীয় চেতনা কেঁপে কেঁপে ওঠে।

আচ্ছা এবারে দেখা যাক কাকুৎস্থ নামে ...তারা কি বলছেন :—

মুঠো মুঠো আকাশেরা
খড়কুটো হানে
রাঙা আলু রাঙা মেয়ে
নামিয়াছে স্নানে
ও মেয়ে ও মেয়ে বলে
Cuckoo কালোস্বরে
...হতে শাঁওনিয়া
লালা ঝরে পড়ে
ঝিরি ঝিরি চলে নদী
যেন জল সিঁড়ি
ফাঁসীর আসামী সম
চুষী খায় ক্ষীরি।

উঃ কি passion! ফাঁসীর আসামীর মতো ...কা ক্ষীরি খাচ্ছে! ক্ষীরিটা বোধ হয় ক্ষীর।... ...কে। ফাঁসীর আসামীর ব্যাকরণ মানলে ... সময় অল্প, ক্ষীরিটা শেষ ...হবে তো! 'রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ...sion-এর অভাব, তাঁর কবিতায় ...sion যেন এগার হাত বস্ত্রের মধ্যে ...দেশী শাড়ী। আর আমাদের ...কবিদের কবিতা passion-এর ...। একটুখানি জায়গার মধ্যে ...জড়িয়ে রয়েছে। অবশ্য ...প্রবেশ দুরূহ কিন্তু আছে সব ঠিক! ...থেকে রবীন্দ্রনাথ সব বরবাদ! এবারে ...যাক আন্তর্জাতিক নামে কবিতায় কবি ...লিখছেন :—

টিনিক টোনিক হও
লাল হও লাঠি,
...আকাশে দেখো
খেলিছে কপাটি।
...আলো লাল হয়ে
হইল ঘোলাটে
কফির বনেদী ক্ষেতে
...গোলালু।

...কার! এক লাইনে মধ্যবিত্ত আভিজাত্যকে ...শেষ করে দিয়েছে—'কফির বনেদী ক্ষেতে ...গোলালু।' তার মানে সামন্ততন্ত্রের ...প্রতিষ্ঠিত হল সর্বহারা! গ্র্যান্ড ...সমবাবি পড়ে গিয়ে হল

arc lamp
...দেখি শুধু
রিফিউজি camp!

এমন সময়ে বাহিরে একটা বুক ফাটা ...নাদ ধ্বনিত হইল, যেন কেহ মর্মান্তিক ...কাৎরাইতেছে—

রামবাবু—ওটা আবার কিসের শব্দ! যাক ...সচেতন পাঠককে বাইরের দিকে কান ...চলে না।

আবার পাঠ—

আড়াই পয়সায় কিনলেন
দেড় পয়সায় বেচলেন
হাতে থাকলো কি?
একটা মাকুরীর
আর—

বাইরে আবার পূর্ববৎ আর্তনাদ!

রামবাবু—কে আবার এলো এখানে গলা ফাটিয়ে আর্তনাদ করতে। একটু যে নিরিবিলি বসে কাব্যচর্চা করবো তার উপায় নেই। এতও ঝামেলা।

উঠিয়া জানলার দিকে গমন।

রামবাবু—এই দিক থেকেই বোধ করি শব্দটা আসছে। দেখি একবার।

এমন সময়ে মুহূর্তে মধ্যে বিনা বাতাসে ঘরের দরজা-জানলা সব খুলিয়া গেল। রামবাবু চমকিয়া উঠিলেন।

রামবাবু—এ কি! দরজা-জানলা খুলে গেল কেন? কে খুললো? কে?

এমন সময় তিনি দরজার দিকে তাকাইতে দেখিতে পাইলেন—চৌকাঠের কাছে এক বিকট মূর্তি। দশাসই এক বৃদ্ধ, খালি গা, খাটো ধুতি পরা, পায়ে খড়ম, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, স্কন্ধে উপবীত, কপালে রক্ত চন্দনের তিলক, মাথা ভরা টাক। মুখমণ্ডলে বিরক্তি করুণ ভাব। গলায় গামছা দিয়া যুক্তকরে দণ্ডায়মান। রামবাবুর ভীত হওয়া উচিত ছিল কিন্তু হইলেন না, স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন।

রামবাবু—আপনি কোত্থেকে?

ব্রহ্মদৈত্য—আজ্ঞে আমি এই বাড়ীতেই থাকি।

রামবাবু—এই বাড়ীতেই থাকেন! তা এতক্ষণ দেখিনি কেন, কোথায় ছিলেন?

ব্রহ্মদৈত্য—আজ্ঞে ঐ বেলগাছটার উপরে...

রামবাবু—আপনিই বুঝি......

ব্রহ্মদৈত্য—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনারা যাকে ব্রহ্মদৈত্য বলে থাকেন আমি তাই।

রামবাবু—উত্তম। তা আমার কাছে কেন?

ব্রহ্মদৈত্য—একটা অনুমতি প্রার্থনার উদ্দেশ্যে।

রামবাবু—কি অনুমতি?

ব্রহ্মদৈত্য—এই বাড়ী ত্যাগের অনুমতি।

রামবাবু—কিছুই বুঝতে পারছিনে। বাড়ী অপরের, যাবেন আপনি, আমি অনুমতি দেবার কে?

ব্রহ্মদৈত্য—যার বাড়ী তাকে তো থোড়াই ভয় করি। আর কাকেই বা আমার ভয়? ভয় আমার আপনাকে করে!

রামবাবু—কি আশ্চর্য! আমাকে ভয় কেন? আমি তান্ত্রিক, না রোজা?

ব্রহ্মদৈত্য—তা জানিনে। কিন্তু দেখছি যে আপনি তাদের বাবা।

রামবাবু—মানে?

ব্রহ্মদৈত্য—মানে বুঝতে পারলেন না! অনেক রোজার ইকড়ি-মিকড়ি সহ্য করেছি, অনেক শালা তান্ত্রিকের 'অং-বং' সহ্য করেছি, অনেক ব্যাটা সাহেবের 'ড্যাম-ড্রুম' সহ্য করেছি। ভেবেছিলাম কিছুই আমার অসহ্য নয়। কিন্তু হায়, হায়, আজকে দেখলাম সব জানা হয়নি। অসহ্য আপনার মুখের ভূতের মন্ত্রগুলো।

রামবাবু—আপনি বুঝি এ সব ভূতের মন্ত্র ভেবেছেন? না না, এ সব ভূতের মন্ত্র নয়, এ সব হচ্ছে কবিতা!

ব্রহ্মদৈত্য—মশায়, ভূতের মন্ত্র তো কবিতাকারেই রচিত হয়। শুনবেন একটা?

ইকিড়ি মিকড়ি বলে যা
বাড়ীর ভূত চলে যা,
ডাকিনী যোগিনী পিশাচ আদি
শাকচুন্নি ব্রহ্মদৈত্য ইত্যাদি
এই মুহূর্তে চলে যা
ডাল নাড়িয়ে বলে যা
স্বয়ং কালীমায়ের আজ্ঞা
ভাগো, ভাগো, অভি ভাগ যা।"

রামবাবু—ও যে বোঝা গেল ও আবার কবিতা নাকি? শুনুন কবিতা কাকে বলে—

নিরঞ্জন আশ্রাবব অনার্দ্র জলীয়
বিবাহী কোকিল দাহ্য হিন্দুল জলীয়
...কম্পে নিষিদ্ধ স্বাদ প্রতীক সন্ততি
স্পন্দন গ্রহণবিদ্যা যৌনতা গলিত।

রামবাবুর পাঠের সময়ে ব্রহ্মদৈত্যের মুখে ব্যথার ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল, এবারে আর্তনাদ করিয়া উঠিল ব্রহ্মদৈত্য।

ব্রহ্মদৈত্য—মলাম, মলাম। শীগগীর থামুন!

রামবাবু—কি হল।

ব্রহ্মদৈত্য—ওঃ একেবারে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে।

রামবাবু—কেন?

ব্রহ্মদৈত্য—কেন? মানুষে তাই বুঝতে পারছেন না, আমার মতো প্রেতযোনি হলে বুঝতেন কি নিদারুণ ঐ ভূতের মন্ত্র।

রামবাবু—মশায়, ভুল করছেন, এগুলো আধুনিক কবিতা।

ব্রহ্মদৈত্য—হবেতো দেখছি আধুনিক ভূতের মন্তর প্রাচীন ভূতের মন্তরের চেয়ে অনেক বেশি অব্যর্থ। বাংলা দেশে ভূত আর থাকতে পারলো না? হাঁ মশায় এসব লেখে কারা? ছেলেরা বুঝি?

রামবাবু—ছেলে বয়সে সবাই তো যা লেখে তা বেশ বোধগম্য। ক্রমে বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সে ত্রুটি সংশোধন হয়ে যায়—কবিতাগুলো আধুনিক হয়ে ওঠে।

প্রসঙ্গ এনেট

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

ধেনো খেয়ে শেষ ট্রামে বেকার যুবক
ঘরে ফিরে চলে, তার কাছে মনে হয়
চলমান পৃথিবীর সবি মধুময়,
সবাই সজ্জন হেথা, নহে প্রবঞ্চক
বাড়ীওলা মুদি-গয়লা আর যে ইন্সপেক্টর
কাজের আশায় তাকে বৃথা মাস কয়
ঘুরিয়েছে, আহা আজ সে লোকও সদয়

দুনিয়া সত্যি মিষ্টি, নয় মোটে টক!
দুপাটের নেশানীল এই মধুরাত
বিয়ের রাত্রির চেয়ে অনেক মধুরে।
তুচ্ছ যেন এর কাছে লক্ষ কোহিনূর,
এর খোঁজ পেতে হলে চাই যে বরাত;

বেকার যুবক তাই পেয়ে ভাবে মনে
বেঁচে থাকা মহাভাগ্য সুন্দর ভুবনে॥

ব্রহ্মদৈত্য—এমন আধুনিক কবি কতজন আছেন?

রামবাবু—অসংখ্য, অগণ্য, দেখুন না এই বইগুলো।

ব্রহ্মদৈত্য—সব—ব-ভূতের মন্তর!

রামবাবু—সব আধুনিক কবিতা।

ব্রহ্মদৈত্য—তবে আর রক্ষা নেই। (আর্তনাদ)

রামবাবু—অমন চেঁচাবেন না, ছেলেরা জেগে উঠবে।

ব্রহ্মদৈত্য—যে কবিতা শুনলে স্বয়ং কুল-কুণ্ডলিনী জাগ্রত হন তাতেও যখন ওদের ঘুম ভাঙেনি, আমার সামান্য চীৎকারে........তা এরা কি সবাই আধুনিক কবি?

রামবাবু—আধুনিক কবিরা বুঝি রাতে ঘুমোয়? কবিতা লেখে।

ব্রহ্মদৈত্য—আর দিনের বেলায় বুঝি ঘুমোয়?

রামবাবু—না, দিনের বেলায় কবি সম্মেলন করে।

ব্রহ্মদৈত্য—ওদের বুঝি ঘুমের দরকার হয় না? পাগলদেরও হয় না।

রামবাবু—যাক, আপনার সঙ্গে বাজে বককার অবসর আমার নেই। আপনি আসুন।

এই বলিয়া রামবাবু বই লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

> Libido কোরক চমৎকার
> চেতন শর্মা গণৎকার
> পুজোবিদ্যা, ঝনৎকার
> To be or not to be that is
> the question:
>
> জগৎ অকার
> শ-কার, ব-কার
> দলে দলে আসে খনৎকার
> ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽস্মিন্।

এতক্ষণ ব্রহ্মদৈত্য পীড়ার ভাব প্রকাশ করিতেছিল, এবারে বলিল—

ব্রহ্মদৈত্য—মশাই ব্রাহ্মণ হয়ে আপনার পায়ে ধরছি, ব্রহ্মদৈত্য হয়ে সামান্য মানুষের পায়ে ধরছি, ছেড়ে দিন আমাকে, ছেড়ে দিন—আর বুকে তপ্তশূল হানবেন না। সত্যি কথাই বলছিলেন—আমার এ সামান্য মৃদুলীন মৃগ-শরীরে আধুনিক ভূতের মন্ত্রের বজ্রাঘাত করবেন না। একবার অনুমতি করুন, বাড়ী ছেড়ে চলে যাই। (স্বগতভাবে) যখন সত্তর বছর আগে বাড়ীটায় এসে আশ্রয় নিলাম, ভাবলাম আর ছেড়ে যাবো না, বেশ দক্ষিণ খোলা বাড়ী। তারপর থেকে কত বেটা না তুক তাক তন্ত্রমন্ত্র করেছে তাড়াবার জন্যে! ছোঃ! আজ রাত্রিবেলা বেলগাছের মগডালে বসে হাওয়া খাচ্ছি খাচ্ছিতো খাচ্ছিই আর সেই সব পুরানো দিনের কথা ভাবছি এমন সময়ে হঠাৎ বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল—একবার ভাবলাম সেই পুরানো ফিকের ব্যথাটা আর একবার ভাবলাম গতকল্য একজন একটু বেশী ভোগ চড়িয়ে গিয়েছিল তারই দরুণ বুঝি পেটে মোচড় দিল। কিন্তু সন্দেহ বেশিক্ষণ থাকলো না—আপনার প্রতিটি ছত্র যেন বৃশ্চিক দংশন সুরু করে দিল। বুঝলাম, উঠল এখানকার বাস, ভাবলাম যাবার আগে একবার অনুমতিটা নিয়ে যাই। ওটা আমাদের রীতি কিনা!

রামবাবু—তা এবারে কোথায় যাবেন?

আলেয়া

হরপদ চট্টোপাধ্যায়

> ওদিকে আমার জীবনে মৃত্যু নামে,
> ওদিকে আবার বাঁচবার হাতছানি;
> আশার খবর পাঠাও কথার খামে,
> তবু দেবেনাকো ক্ষুধায় অন্ন জানি।
> রূপকথা শোনা যেইদিন থেকে বন্ধ
> সেদিন থেকেই শুরু হলো বঞ্চনা;
> সেদিন থেকেই রূপের দুনিয়া অন্ধ—
> একটানা শুধু জৈব প্রশ্ন গোণা,
> একটানা শুধু জৈব প্রশ্ন গোণা—
> আর শ্বাসটানা শ্মশানের বায়ুবিষে
> আশা-নিরাশায় মরীচিকা-জাল বোনা,
> অথচ জানিনা বাঁচার মন্ত্র কিসে।

ব্রহ্মদৈত্য—ভেবেছিলাম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নূতন তৈরী সেক্রেটারিয়েটের চিলা কুঠুরিতে গিয়ে আশ্রয় নেবো—অনেকদিন থেকেই ইচ্ছা ছিল; কেবল পুরানো আশ্রয়ের মায়ায় নড়তে পারছিলাম না। বেশ দক্ষিণ খোলা, সম্মুখেই মা গঙ্গা। কিন্তু না, দেশের মায়া কাটাতে হ'ল।

রামবাবু—কেন?

ব্রহ্মদৈত্য—এই তো বললেন বাংলাদেশে ভূতের মন্তর লিখিয়ে আধুনিক কবির সংখ্যা অসংখ্য, অগণ্য।

রামবাবু—তবে যাবেন কোথায়?

ব্রহ্মদৈত্য—তাইতো ভাবছি কোথায় যাবো! আগে বাংলার বাইরের ভূত সমাজে বাঙালী ভূতের খুব আদর ছিল। বাঙালী ভূত নিয়ে ওদের মধ্যে টানাটানি প'ড়ে যেত। এ বলতো আমাদের দেশে আসুন, ও বলতো না আমাদের দেশে। আজ আর সে সমাদর নেই বাঙালী ভূতের। এখন দেখছি বাংলা দেশেও স্থান নেই বাঙালী ভূতের—আধুনিক ভূতের মন্তরের অত্যাচারে। তবু বাংলার বাইরেই যাবো—এই তপ্তশূলের আঘাতের তুলনায় অবাঙালী ভূতের বাঁকা কটাক্ষ অনেক মধুর। যাই দেখি মাথায় পাগড়ী জড়িয়ে অবাঙালী ভূতের মধ্যে কোন রকমে ভিড়ে পড়তে পারি কিনা। একবার অনুমতি দিন।

রামবাবু—আচ্ছা তবে যান।

ব্রহ্মদৈত্য—অশেষ ধন্যবাদ—চললাম। বুকের মধ্যে এখানে এখনো জ্বালা করছে! উঃ কী ভীষণ মন্তর এরা আবিষ্কার করেছে।

(দ্রুত প্রস্থান)

অন্তা জাগিয়া উঠিয়া

অন্তা—রামদা, আমি জেগে জেগে সব শুনেছি।

রামদা—ভয় পাসনি।

অন্তা—ভয় পাবো কেন? আমি যে আধুনিক কবিতা লিখি।

রামবাবু—আমি ভাবছি সত্যি তবে ব্রহ্মদৈত্য বলে কিছু আছে।

অন্তা—ব্রহ্মদৈত্য, না আধুনিক কবিতার কোন সমালোচক ব্রহ্মদৈত্যের ছদ্মবেশে দুটো কড়া কথা শুনিয়ে গেল?

রামবাবু—ঠিক বলেছিস—সেটা অসম্ভব নয়। ব্রহ্মদৈত্য থাকতেই পারে না।

এমন সময়ে জানলার পাশের বেলগাছটার

ঋষি রাজনারায়ণের পরিবার গোষ্ঠী

(১৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

হিন্দী পারমার্থিক ভজন গান করতেন। ... ও মামা যোগীন বোস সরকারী চাকরী করেন নাই, আজীবন বেঙ্গলী, ইণ্ডিয়ান মিরর, অমৃতবাজার প্রভৃতি কাগজে রাজনীতি ... দিয়ে মাসে আড়াই শত তিন শত টাকা উপার্জন করতেন। তিনি ছিলেন চিরকুমার। ঋষি রাজনারায়ণের অন্তরঙ্গ বন্ধু সার হেনরী কটন বহু অনুরোধ উপরোধ করেও তেজস্বী ইংরাজ-বিদ্বেষী যোগীনকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণ করাতে পারেন নাই। পাগলা বন্ধ উন্মাদ মতো মামাও ছিলেন অপূর্ব অঙ্কনশিল্পী। এক টানে ... অষ্টভুজা দেবী মূর্তি এঁকে দিতেন ... এমন নৈপুণ্যে কেটে খোদাই করে দিতেন ... কালি লাগলেই কাগজে অনবদ্য ... প্রতিমার ছবি উঠতো।

ঋষি রাজনারায়ণের বাড়ীটিকে কেন্দ্র করে কেটেছিল আমার কৈশোরের পাঠশালা। ... বাঁধানো চত্বরে কৌমুদীস্নাত ... আমাদের নিয়ে বসতো ঋষি রাজনারায়ণের উপাসনা সভা। এই উপাসনায় ... সুমিষ্ট ব্রহ্ম সংগীত কৈশোর প্রাণে ... কি যে প্রগাঢ় প্রলেপ দিয়ে গেছে, ... জীবনের যোগসাধনা ও অপূর্ব সব ... ভিত্তি ছিল সেই ভিত্তির উপর ... উদাসীন হয়ে গৃহত্যাগী ইন্দুভূষণ ... গীতটি যাতে এই উপাসনা ... বসন্তলীলার গান গাইতেন।

> সে কোন জোছনা দেশ ...
> যেথা অগণন চকোর মধুপানে ...
> নাহি জানে নিত্য সুখ নাই ...
> পাষাণ ভেদিয়া ফুটে জীবনের ...
> প্রাণময়ী ভাষা যথা নাহি তায় ...
> যে দেশের অভিধানে দুঃখ মানে ...
> তুমি বিনা আমি নই নই রে ...

একটা ডাল মড়মড় শব্দে ভাঙিয়া পড়ে সেই শব্দ শুনিয়া।

রামবাবু—ওটা কিসের শব্দ?

অন্তা শয্যা ত্যাগ করিয়া জানলার কাছে গিয়া।

অন্তা—না, রামদা, ব্রহ্মদৈত্যই বটে—নেওয়ার চিহ্নস্বরূপ বেলগাছটার একটা ডাল ভেঙে রেখে গেল।

রামবাবু—যাক, তবে বাড়ীটা মুক্ত হল ব্রহ্মদৈত্যের কবল থেকে।

অন্তা—রামদা, একটা মতলব এসেছে মাথায়। আধুনিক কবিতার প্রতিক্রিয়া দেখলেন। চলুন এবারে এক কাজ করি যেখানে যত ভূতের বাড়ী আছে সেই ভূত তাড়াবার ব্যবসা সুরু ... দিই—আধুনিক কবিতা পড়ে। বেশ দুপয়সা রোজগার হবে কি বলেন?

রামবাবু—মন্দ বলিসনি। ভূতের উপর আধুনিক কবিতার প্রতিক্রিয়া খুব ... আহা, মানুষের উপর যদি এমনটি হ'ত!

অন্তা—তবে আর বাংলা দেশে কবি থাকতো না, সর্বত্র ঘুঘুর বাসা হ'তো।

ভের্সাই সহরে মাইকেল মধুসূদন

(৩১ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

এই প্রার্থনা মন্দিরটি সত্যিই অনেক সময় ধরে দেখার মত।

তবে ভের্সাই-এর বাদশাহী মেজাজ সব চাইতে প্রত্যক্ষ এ-প্রাসাদের শিশমহলে বা Galerie des Glaces-এ। ল্য ব্রঁ নিজে এর সিলিং অলংকরণের ভার নিয়েছিলেন। প্রাসাদের সামনে পার্ক, বাগান, ফোয়ারা, হ্রদ, কুঞ্জবনের যে ল্যান্ডস্কেপ, তার অপরূপ চেহারাটি এখান থেকেই সব চাইতে ভাল দেখা যায়—প্রথমে এই হল ঘরের বাতায়ন পথে এবং তারপর দেয়াল ঘেরা আয়নাগুলোর মধ্যে। ঘরের আসবাবে-অলংকরণে সূক্ষ্ম রুচির স্বাক্ষর স্পষ্ট। ফ্রান্সের মত মুখ্য রাজকীয় উৎসব অনুষ্ঠান তার অধিবেশন এক সময়ে এই ঘরেই হোত। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে ভের্সাই-চুক্তির আলাপ-আলোচনা এ ঘরেই হয়েছিল।

চতুর্দশ লুইয়ের স্বপ্ন ভের্সাই প্রাসাদ এখন ইতিহাসের যাদুঘর মাত্র। তবে রূপবান যাদুঘর। সেই রূপ তাকে বিস্মৃতির হাত থেকে রক্ষা করেছে।

দুই

কিন্তু প্রাসাদ-সীমানার বাইরে যে ভের্সাই সহর তা নেহাৎই সাদামাটা। তার পথঘাট বাড়ী-ঘর, জীবনযাত্রা প্রায় মফঃস্বলী। পারীর তুলনায় অনেক শান্ত এবং মোটামুটি সস্তা। হয়ত সেই কারণেই এখানে বিদেশী, বিশেষ করে ইংরেজদের, একটা বড় উপনিবেশ গড়ে উঠেছে।

এই শহরে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি এসে ডেরা বাঁধলেন প্রাক্ রবীন্দ্র যুগের সেরা বাঙালী কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সঙ্গে স্ত্রী আঁরিয়েত্তা, কন্যা শর্মিষ্ঠা এবং পুত্র মিল্টন। বছর খানেক আগে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে কোলকাতায় রেখে তিনি লন্ডনে এসে ব্যারিস্টারী পড়ার জন্য Gray's Inn-এ ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পত্তনিদার ঠিকমত টাকা না দেওয়ায় আঁরিয়েত্তা ছেলেমেয়ে নিয়ে ১৮৬৩র মে মাসে লন্ডনে চলে আসেন। কুয়াশামোড়া লন্ডন আঁরিয়েত্তার সইল না: তাছাড়া দেশ থেকে টাকা আসা বন্ধ হওয়ায় কবির পক্ষে রাজধানীর খরচা চালানোও শক্ত হয়ে উঠল। বাধ্য হয়ে তিনি সপরিবারে এসে আশ্রয় নিলেন ভের্সাইতে।

ভের্সাইতে মাইকেল বছর দুই বাস করেছিলেন, ১৮৬৩-র মাঝামাঝি থেকে ১৮৬৫-র প্রায় শেষ পর্যন্ত। এই দু'বছর তাঁকে যে কি পরিমাণ দুঃখ-লাঞ্ছনা সইতে হয়েছিল, তাঁর জীবনীর পাঠক-মাত্রেই সে কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত। এখানে তাঁর একটি কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়ে মারা গেছেঃ

"We had a beautiful daughter born here, but she didnot live long". (গৌরদাসকে লেখা চিঠি। ২৬-১০-১৮৬৪)। অর্থাভাবে তাঁকে মাঝে মাঝে দিনের পর দিন সপরিবারে অর্ধাহারে, এমনকি অনাহারে কাটাতে হয়েছে। আসবাবপত্র, বই, পোষাক-আষাক, মায় স্ত্রীর গয়না বাঁধা রেখেও সব সময়ে ঠিকমত বাড়ী ভাড়া পর্যন্ত দিয়ে উঠতে পারেননি। ধার শুধতে না পারায় বউ-ছেলে-মেয়েকে নিয়ে সাময়িকভাবে পারীর জনারণ্যে কখনো কখনো গা-ঢাকা দিয়েছেন; প্রতিবেশী-দের দাক্ষিণ্যে পরিবারের দু'বেলা আহার সংস্থান হয়েছে। বাকী-ভাড়ার দায়ে জেলে যাবার সম্ভাবনা পর্যন্ত ঘটেছে; কোনো ফরাসী তরুণীর দয়ায় রক্ষা পেয়েছেন। ভের্সাই-এর কোনো ইংরেজ কার্জম্যানের দারিদ্র-ভান্ডার থেকে দু-পাঁচ টাকা ভিক্ষে পর্যন্ত নিয়েছেন। এ অবস্থায় তাঁর মত পুরুষের যে আত্মঘাতী হবার ইচ্ছে হবে, এটা স্বাভাবিক; কিন্তু অসহায় বউ-ছেলেমেয়ের কথা ভেবে সে লোভ দমন করতে হয়েছে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ১৮ই মে তারিখে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একটি চিঠিতে লিখেছেন :

If I hadn't little helpless children and my wife with me, I should kill myself, for there is nothing in the instrument of misery and humiliation, however base or low, which I have not sounded!"

দেশে তাঁর বিষয়-সম্পত্তি কম ছিল না; কিন্তু যে পত্তনিদার এবং বন্ধুর ওপরে নিয়মিত টাকা পাঠাবার ভার ছিল, তারা তাদের দায়িত্ব পালনে অমনোযোগী হওয়ায় তাঁকে বিদেশে এই দুরবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। "My heart", তিনি বিদ্যাসাগরকে লিখেছেন, "is full of bitterness, rage and despair". এবং আর এক পত্রে (১১-৭-১৮৬৪) :

"I must work my way back to India to commit one or two murders—wilful, premeditated murders and then be hanged!"

এই ভয়াবহ দশা থেকে কবিকে উদ্ধার করেন বিদ্যাসাগর। তিনি প্রথমে নিজের সঞ্চয় থেকে, পরে কর্জ করে এবং শেষ পর্যন্ত মাইকেলের সম্পত্তি বন্ধক রাখার ব্যবস্থা করে কবিকে প্রয়োজনীয় টাকা পাঠান। অবশ্য তাতেও মাইকেলের পুরো প্রয়োজন মেটেনি—তাঁর বেহিসাবী ব্যয়ের কথা কে-না জানে—কিন্তু এই সাহায্যের ফলে তিনি ১৮৬৫-র শেষে লন্ডনে ফিরে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৬৭-র গোড়ায় কোলকাতায় ফিরতে সক্ষম হন। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে রেখে আসেন ভের্সাইতে। তাঁরা কোলকাতায় ফেরেন আরো দু'বছর পরে ১৮৬৯-র মে মাসে।

তিন

কবিরা সাধারণ মানুষ থেকে একটু আলাদা জাতের জীব, কেননা যে জগতে তাঁরা বাস করেন, তাছাড়াও তাঁদের নিজেদের একটা আলাদা জগৎ আছে। বোদলেয়ারের ভাষায় তাঁরা মেঘ-লোকের যুবরাজ, ঝড়ে তাঁরা ডানা মেলেন, শিকারীদের শর সেখানে পৌঁছায় না। ভের্সাই-এর দুঃখ-দারিদ্র্য লাঞ্ছনার মধ্যে বাস করে মাইকেল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুচ্ছ রচনা করেছিলেন : তাঁর চতুর্দশপদী কবিতা-বলী। কি করে যে তা সম্ভব হয়েছিল, চতুর্দশপদী কবিতাবলীর ৭৩ সংখ্যক সনেটে সেকথা তিনি স্বয়ং ব্যক্ত করে গেছেন :

"কি কাজ বাজায়ে বীণা; কি কাজ জাগা
সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে?
কি কাজ গরজে ঘন কাব্যের গগনে
মেঘ-রূপে, মনোরূপ ময়ূরে নাচায়ে?
স্বতরিতে তুলি তোরে বেড়াবে কি বায়ে
সংসার-সাগর-জলে, স্নেহ করি মনে
কোন জন? দেবে অন্ন অর্ধমাত্র খায়ে,
ক্ষুধায় কাতর তোরে দেখি রে তোরণে?
ছিঁড়ি তার-কুল, বীণা ছুঁড়ি ফেল দূরে
কহে সাংসারিক জ্ঞান—ভাবে বৃহস্পতি।
কিন্তু চিত্ত ক্ষেত্রে যবে এ বীজ অঙ্কুরে,
উপাড়ে ইহায় হেন কাহার শকতি?
উদাসীন-দশা তার সদা জীব-পুরে
যে অভাগা রাঙা পদ ভজে, মা ভারতি।
(সাংসারিক জ্ঞা

পরিবেশের নিয়ন্ত্রণকে লঙ্ঘন করে স্
মধ্যে নিজেকে মুক্তি দেওয়ার যে সামর্থ্য, তা
মানুষকে জীবজগতে বিশিষ্টতা দান করে
এ সামর্থ্য-সম্পদে কবিদের তুলনা
ভের্সাইতে মাইকেলের জীবন তার অ
প্রমাণ।

বাংলা ভাষায় মাইকেল প্রথম সনেট লে
কোলকাতা থাকতেই, ১৮৬০ খৃষ্টা
সম্ভবতঃ সেপ্টেম্বর মাসে। তারপর অন্য পরী
নিরীক্ষার মধ্যে সনেট-চর্চা চাপা পড়ে
১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ভের্সাইতে বসে
আবার সনেট লেখা সুরু ক
এবং ভের্সাই থেকে পাঠান মোট ১
সনেট—আরো কয়েকটি কবিতার স
"চতুর্দশপদী কবিতাবলি" নামে ১
খৃষ্টাব্দের ১লা অগষ্ট গ্রন্থাকারে কোল
থেকে প্রকাশিত হয়। এই তাঁর শেষ কাব্য
এবং যদিচ "মেঘনাদ বধ" তাঁর সবচা
বিস্ময়কর রচনা, তবু রসিক পাঠকমাত্রই
হয় স্বীকার করবেন যে, এই সনেটগুচ্ছের
মাইকেলী কবি-প্রতিভার পরিণততম
ঘটেছে।

ভের্সাই-এর দু'বছর সনেট রচনা ছা
মাইকেল তাঁর বন্ধু-বান্ধব এবং পরিচি
দের প্রচুর চিঠিপত্র লিখেছিলেন। চতুর্দশ
কবিতাবলি এবং এই সব চিঠিপত্রের
তাঁর কবিমানস এবং ব্যক্তিত্বের বি
লক্ষণগুলি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়ে
অভাব-অনটন এবং অসম্মানের জ্বালায়
কখনো আত্মহত্যার কথা ভেবেছেন, ক
প্রতিশোধস্পৃহা তাঁর মনে তীব্র হয়ে উঠে
কিন্তু তার ফলে নিজের কবিপ্রতিভা
তাঁর মনে অপ্রত্যয় দেখা দেয়নি। স
ঝড়ঝাপ্টার মধ্যে কোজাগর সাধনায় তিনি
প্রতিভার শিখাকে জ্বালিয়ে রেখেছেন
প্রতিভা "যম-দমী।"

আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ, যার আজ্ঞা মানে,
অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা বলে ;
... ...

মরুভূমে—তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে
বহে জলবতী নদী মৃদু কলকলে। ("কবি"

দৈনন্দিনতার স্তরে তাঁর জীবন
দুর্ভাবনায় যখন কন্টকিত, তখনো
লোকে কখনো তাঁকে নিঃসঙ্গতা বা
ভুগতে হয়নি। কারণ সে-লোকে তাঁর
ছিলেন বাল্মীকি-ব্যাস-কালিদাস,

ন্তে-মিল্টন, জয়দেব-কৃত্তিবাস-কাশীরাম দাস-কবিকঙ্কণ, সমকালীনদের মধ্যে "ভিক্তর য়্যুগো" এবং আলফ্রেড্ টেনিসন। বাসন বাঁধা থেকে চিঠি পাঠাবার ডাকটিকিটের পয়সা জোগাড় করতে হলেও তিনি ভোলেন নি স্বভাবসূত্রে তিনি অভিজাত। দেশে থাকতে বন্ধু রাজনারায়ণকে তিনি একদা লিখেছিলেন :

"These men, my dear Raj, little understand the heart of a proud, silent, lonely man of song! They regret his lack of popularity, while, perhaps, his heart swells within him in visions of glory, such as they can form no conception of."

এই আত্মপ্রত্যয়, এই স্বপ্ন, ভের্সাইয়ের এত দুঃখের মধ্যেও তাঁর সাধনাকে শিথিল-সমাধিত্ব থেকে রক্ষা করেছে। আর তাই অনুদিন অবক্ষয়ের মধ্যে নিঃশেষিত না হয়ে তিনি একাধারে গভীর অধ্যবসায়ে একটির পর একটি ভাষা আয়ত্তে এনেছেন—ইতালিয়ান, ফরাসী, জার্মাণ—এবং অন্য ধারে সেই স্বদেশের দ্বারা পরিপুষ্ট তাঁর প্রেরণা নিত্য-নূতন সনেটে নিজেকে সার্থকায়িত করেছে, আর তাঁর ফলে সমৃদ্ধতর করে তুলেছে বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে।

এই প্রসঙ্গে একটি ব্যাপার লক্ষণীয়। মাইকেল যখন ভের্সাইতে তার কিছু পূর্ব থেকেই ফরাসী কাব্যে এক নতুন মেজাজ গড়ে উঠছিল; এই মেজাজ থেকেই পশ্চিমী কবিতার ইতিহাসে আধুনিক যুগের সূচনা। এই মেজাজের প্রথম এবং সম্ভবতঃ সব-চাইতে প্রতিভাবান কবি হলেন শার্ল বোদ্‌লেয়ার। বোদ্‌লেয়ার-এর Les Fleurs du mal কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৬১-তে। ১৮৬৭-তে বোদলেয়ার মারা যান। পরবর্তীকালের প্রধান ফরাসী কবিরা প্রায় সকলেই কমবেশী বোদ্‌লেয়ার-এর উত্তরসাধক। কিন্তু ফরাসী সাহিত্যে অনুপ্রাণিত হয়েও এবং কাব্যাদর্শের এই কালান্তরের যুগে ফরাসী দেশে দু-বছর কাটানো সত্ত্বেও মাইকেল এই মেজাজের দ্বারা কিছুমাত্র প্রভাবান্বিত হননি। মেজাজের দিক থেকে তিনি ছিলেন রেনেসাঁসী কবি সাহিত্যিকদের নিকট আত্মীয়; বোদ্‌লেয়ারী অন্তর্দ্বন্দ্বের আর্তি তাঁকে স্পর্শ করেনি। দান্তে-পেত্রার্ক-তাসো-মিল্‌টন—এ'রাই তাঁর গুরু। তিনি জার্মান ভাষা শিখে গোয়েটে এবং শিলায়ের কাব্য পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু হাইনে তাঁকে আকৃষ্ট করেননি। আর তাই স্বয়ং রাজতন্ত্রের সমর্থক এবং সাধারণতন্ত্রের বিরোধী হয়েও এই বীর্যবান এবং প্রত্যয়ী বাঙালী কবি সমকালীন ফরাসী সাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রদ্ধা-নিবেদনের উপযুক্ত পাত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন নির্বাসিত রাজদ্রোহী কবি ভিক্তর উগোকে।

চার

ভের্সাইতে মাইকেল যে বাড়ীতে বাস করতেন তার ঠিকানা হোল ১২নং র্যু দে শাঁতিএ (12, Rue-des chantiers)। এখানেই তাঁর সনেটগুচ্ছ রচিত হয়েছিল। পারীতে পৌঁছবার কয়েকদিন পরেই মঁসিয় এবং মাদাম সুশ'কে সঙ্গে করে এই বাড়ীর খোঁজে বেরোনো গেল।

র্যু দে শাঁতিএ বেশ চওড়া শড়ক। বারো নম্বর বাড়ীটি চারতলা। বড় ভাড়াটে বাড়ী, অনেকগুলি পরিবার এখন এখানে বাস করে। বাড়ীর চেহারার মধ্যে কোনো শ্রী নেই; ভেতরের দেয়ালগুলো মলিন, কোথাও কোথাও চুন-বালি খসে পড়েছে। বাসিন্দাদের দেখে মনে হল নিম্নমধ্যবিত্ত স্তরের লোক। বাড়ীর চেহারা দেখে মনে হয় না একশ বছর আগেও এখানে অন্য স্তরের লোক বাস করত। বাড়ীর এক-তলায় যে মেয়েটি বাড়ীর দেখাশুনো করে তার কাছে খোঁজ করা গেল, এ বাড়ীর পুরোনো বাসিন্দাদের বিষয়ে কোনো কাগজপত্র রক্ষিত আছে কিনা। মেয়েটি এ সম্বন্ধে কিছু জানে না। তার কাছে ঠিকানা নিয়ে বাড়ীর মালিকের কাছে পরে খোঁজ করি; কিন্তু সেও কোনো হদিশ দিতে পারল না।

যাই হোক মাইকেল যে ভের্সাইতে ১২ র্যু দে শাঁতিএতে বাস করতেন এবং তাঁর সনেটগুলি যে এখানে বাস করার সময়েই রচিত হয় এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। ভের্সাই থেকে লেখা চিঠিপত্রই তার অকাট্য প্রমাণ। * অথচ এতবড় একটা স্মরণীয় ঘটনার কোনো চিহ্ন আজ এখানে বর্তমান নেই। আগে না হয় এ ঔদাসীন্যের কারণ ছিল, কিন্তু এখন ত ভারত স্বাধীন দেশ। অন্যধারে শিল্পী সাহিত্যিকদের কদর করতে যদি কোনো দেশ জানে, তবে সে দেশ নিঃসন্দেহে ফ্রান্স। পের লাশেজ অথবা মঁ পারনাস-এর সমাধিক্ষেত্রের কথা ছেড়ে দিয়েও শ্রেফ পারী শহরের পথঘাটের নাম থেকেই ফরাসী সাহিত্যের দিকপাল থেকে চুনোপুঁটি বেশীর ভাগের নাম শেখা যায়। আর সেই দেশেই কিনা আধুনিক ভারতের প্রথম মহাকবি দু-বছর কাটিয়ে গেলেন, অথচ তাঁর কোনো চিহ্ন রইল না?

সরকারী কর্মচারীদের আমি চিরকাল এড়িয়ে চলি, কিন্তু এই ব্যাপারটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে ফ্রান্সে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সর্দার পানিক্কর-এর সঙ্গে দেখা করতে হোল। পানিক্কর শুধু রাষ্ট্রদূত নন, তিনি একজন বিদগ্ধ ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গে পূর্বে কিছু পরিচয় ছিল। আমার নিবেদন শুনে তিনি বললেন যে আমি যেন এ বিষয়ে তাঁকে একটি পত্র লিখি। আমি তখন তাঁকে চিঠিতে মাইকেলের ভের্সাই-বাস বৃত্তান্ত জানিয়ে অনুরোধ করি যে ১২নং র্যু দে শাঁতিএ-তে মাইকেলের বাস এবং কাব্য রচনার উল্লেখ করে ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ থেকে যেন একটি মর্মর স্মৃতিফলক লাগানো হয়। তার উত্তরে তিনি লেখেন :

Ambassade de l'Inde
Paris.
July 27, 1957.

Dear Mr. Ray,

I have your letter regarding some kind of a memorial or inscription at the place where Michael Madhusudan Dutta lived at Versailles. I think its an excellent proposal and I shall take the matter up as soon

তাকেই খুঁজো

॥ শংকর চট্টোপাধ্যায় ॥

তাকেই খুঁজো, হালকা খুশির চেনা দিনে
আপন বুকে
অশ্রুমুখে, সে যে গোপন লুকিয়ে আছে।
ফেলে দিও, ঘরে ফেরার ময়লা ঝুলি
নতুন পাওয়া
সূর্য সওয়া, পোড়ো ভিটের বকুলগুলি।
সাড়া দিও, ডাক পাঠালে বসুন্ধরা
শোকচ্ছবি
ময়লা সবি, মৃত্যু গালা প্রাণপসরা।
মিলিয়ে নিও, আয়ুর কাঁপা ঘরে ঘরে
ধন্য প্রাণে
জন্মক্ষণে, রক্তমাখা সুন্দরের রূপাক্ষরে।
তাকেই খুঁজো, স্বপ্ন থেকে জাগরণের মধ্যখানে
আপন বুকে
অশ্রু মুখে, সে যে গোপন লুকিয়ে থাকে।

as possible. Unfortunately, during the rest of the month I shall be tied up with some special work outside Paris, and I do not think there is much chance of my being able to meet you this month.

Yours sincerely,
K. M. Panikkar

এর পর আগষ্ট মাসের গোড়ায় আমি জার্মানী চলে যাই এবং সেখান থেকে ফিরে সেপ্টেম্বরে আমাকে আমেরিকার দিকে রওনা হতে হয়। কিন্তু তাহলেও আমি পানিক্কর সাহেবকে ফ্রাঙ্কফুর্ট, লণ্ডন, নিউইয়র্ক এবং শিকাগো থেকে আমার অনুরোধ স্মরণ করিয়ে কয়েকবার চিঠি লিখি। তাছাড়া আমি পারীতে থাকাকালে UNESCO-র বিশিষ্ট ভারতীয় কর্মচারী অধ্যাপক বলদুলেন খিংড়া-র সঙ্গে দেখা করে তাঁকেও আমার অনুরোধ জানাই। কিন্তু তার পরে এক বছর কেটে গেলেও আজো যে ভারতীয় দূতাবাস অথবা ইউনেস্কো এবিষয়ে কিছু করেছেন, আমি তা শুনিনি।

বাংলা দেশে যাঁরা সাহিত্য অনুরাগী, এদেশের সাংস্কৃতিক সম্পদ নিয়ে যাঁরা গর্ব অনুভব করেন, এবার সেই সুধীজনদের কাছে আমার প্রস্তাব আমি পেশ করলাম। তারি সঙ্গে আরো একটা সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে রাখি। এদেশে যাঁরা বাংলা সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করছেন, তাঁদের মধ্যে কোনো যোগ্য ব্যক্তি যদি ফ্রান্সে কিছুকাল বাস করে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে তত্ত্বতল্লাস করেন তবে হয়ত মাইকেলের অপ্রকাশিত কিছু ফরাসী রচনাও আবিষ্কৃত হতে পারে। যদি সাহিত্যানুরাগ থেকে না হয়, ডক্টরেটের লোভেও কি কোনো উদ্যোগী ব্যক্তি এ সম্ভাবনার প্রতি আকৃষ্ট হবেন না?

* পরে লণ্ডন থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে দেশে ফেরার পথে ভের্সাই থেকে মাইকেল যে চিঠি লেখেন তার ঠিকানা ছিল ১৫, র্যু দ্য মোরেপা। (বিদ্যাসাগরকে লেখা চিঠি, ১-১২-১৮৬৬) এখানে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা রেখে তিনি একা কোলকাতা প্রত্যাবর্তন করেন।

উইল

(১৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

কথা খুলিয়া লিখিলেন। লিখিয়া মনে হইল বাহিরের লোককে পারিবারিক সব খবর জানানো কি ভালো? বিশেষতঃ নিজের অসংযত বিলাস-ব্যসনের কাহিনী কানুনগোকে জানাইয়া লাভ কি! কয়েকদিন মনঃস্থির করিতে পারিলেন না, পত্রটি ড্রয়ারেই রাখিয়া দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে মনঃস্থির করিতেই হইল ভাবিয়া দেখিলেন আইন-কানুন সংক্রান্ত ব্যাপারে কানুনগো ছাড়া গতি নাই। জগদীশ চিঠিটি রেজেষ্ট্রি করিয়া তাঁহার হাতে রসিদটি আনিয়া দিল। তিনি অধীর আগ্রহে কানুনগোর উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

৫

দেবীর পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। খুব ভালো পরীক্ষা দিয়াছে সে। অপ্রত্যাশিত রকম ভালো। ঠিক করিয়াছে এইবার বেশ লম্বা একটা বেড়াইয়া আসিবে। কাশ্মীর যাইতে হইলে কোথায় কি কি করিতে হয় এইসব লইয়াই সে মাথা ঘামাইতে লাগিল। এমন সময় সে হঠাৎ একদিন উন্মেষের খবরটা শুনিল। উন্মেষ নাকি দেশে ফিরিয়াছে এবং বিনয়কুমার নাকি তাহাকে বাড়ি হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন। দূর করিয়া দিবার কারণ সে বিলাতী এক মেমসাহেবকে বিবাহ করিবে ঠিক করিয়াছে। খবরটা শুনিয়া সে মুচকি হাসিল একটু। সেই তাহা হইলে এখন চট্টো-গঙ্গোর সম্পূর্ণ মালিক। তাহার পর সহসা উন্মেষের মুখখানা তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। টকটকে ফরসা রং, সরু গোঁফ, জেদি-জেদি মুখের ভাব। বেশ অহঙ্কারী। এম-এস-সিতে ফিজিক্সে ফার্স্টক্লাস পাইয়াছিল বলিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিত! সে-ও এবার ফার্স্টক্লাস পাইয়া দেখাইয়া দিবে সে-ও কম নয়। শুধু ফার্স্টক্লাস নয়, সে হয়তো ফার্স্টই হইবে। উনুদা কোথা আছে এখন? তাহার কাছে একবারও তো আসিতে পারিত! দুয়ারের কড়াটা খুব জোরে জোরে নড়িয়া উঠিল। তাহার হঠাৎ মনে হইল উনুদা আসিল নাকি। তাড়াতাড়ি গিয়া কপাট খুলিয়া দেখিল, উনুদা নয়, পিওন। একটি চিঠি লইয়া আসিয়াছে, রেজেষ্ট্রি চিঠি, উইথ্ একনলেজ্‌মেন্ট ডিউ। বিনয়কুমারের চিঠি। অবাক হইয়া গেল সে। রেজেষ্ট্রি চিঠিতে কি লিখিয়াছেন কাকাবাবু? তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুলিয়া পড়িল।

"কল্যাণীয়াষু,

তুমি এ চিঠি পেয়ে খুব আশ্চর্য হয়ে যাবে। কিন্তু অনেক ভেবেও এ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ দেখতে পেলাম না। উন্মেষ বিলেত থেকে ফিরেছে। সে ঠিক করেছে এক মেমসাহেবকে বিয়ে করবে। তোমাকে বিয়ে করবে না। তাকে আমি বাড়ি থেকে দূর করে' দিয়েছি। তোমার বাবা আর আমি দুজনে মিলে যে উইল করেছিলাম তার কপি এই সঙ্গে পাঠালাম। পড়ে' দেখলে বুঝতে পারবে আমার পিতা স্বর্গীয় মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের বংশের যে কোনও লোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে আমাদের বিষয়টা রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে যাবে না। আমার ইচ্ছে নয় যে প্রতিষ্ঠান আমরা দুই বন্ধুতে গড়ে' তুলেছিলাম তা আমাদের পরিবারের বাইরে চলে যায়। উন্মেষের সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'লে সব দিক থেকেই সুখের হ'ত। কিন্তু সে কুলাঙ্গার, বংশের মান মর্যাদার কোনও মূল্য নেই তার কাছে। আমাকে এখন কতদিন বেঁচে থাকতে হবে জানি না। অডিটারের হিসাব থেকে এটা বোঝা গেছে আমি যে পরিমাণ খরচ করে' ফেলেছি তাতে কার্যতঃ এখন তোমার কৃপার ভিখারী হয়েই আমাকে বাকী জীবনটা কাটাতে হবে। খুব হিসেব করে' দীনভাবে থাকলে হয়তো শেষ জীবনে আমার ঋণটা শোধ হ'তে পারে। কিন্তু এ বয়সে আমার জীবনের ধারা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। যে সব বিলাসে আমি এতদিন অভ্যস্ত হয়েছি তা বর্জন করা আমার পক্ষে এখন খুবই শক্ত। এইসব নানাদিক ভেবে আমি আমাদের উকিল কানুনগো মশাইকে চিঠি লিখেছিলাম। তিনি আমাকে লিখেছেন—আমিই যদি তোমাকে বিবাহ করি তাহলে সব সমস্যার সমাধান হয়। তাই আমি এই পত্র দ্বারা তোমার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করছি। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা হাস্যকর মনে হলেও বে-আইনী নয়। তুমি যদি রাজি হও তাহলে সব দিক রক্ষা হয়। এটাও মনে রেখ রাজি না হলে বিষয়ে তোমার আর কোন অধিকার থাকবে না।

ব্যাপারটা ভালো করে' ভেবে আমাকে একটা উত্তর যত শীঘ্র সম্ভব দিও। আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর। ইতি—"

দিন সাতেক পরে বিনয়কুমার দেবীর উত্তর পাইলেন। দেবী লিখিয়াছে—

শ্রীচরণেষু,

কাকাবাবু, আপনি যা লিখেছেন তাতে রাজি হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আপনি যে সমস্যার কথা লিখেছেন তা আমি অন্যভাবে সমাধান করে' দিলাম। সমস্ত বিষয়টা আপনাকেই দান করে' দিচ্ছি। ডীড্ অফ্ গিফ্‌ট্ রেজেষ্ট্রি করে পাঠালাম। উনুদাকে বিয়ে করতে আমি রাজি ছিলাম, এখনও আছি। সুতরাং ভবিষ্যতে আমিই বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী উইল অনুসারে। আমার সেই উত্তরাধিকারের সমস্ত স্বত্ব আপনাকে দান ক'রে দিলাম। আমার বাড়িটা আমি ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি। আপনি ওটার যা হয় ব্যবস্থা করবেন। আমার প্রণাম নিন। ইতি—

প্রণতা দেবী।

৬

দুই বৎসর পরে বিনয়কুমার দেবীর নিকট হইতে আর একটি পত্র পাইলেন।

শ্রীচরণেষু,

কাকাবাবু, আশা করি আপনি ভালো আছেন। একটি সুখবর দেবার জন্যে আপনাকে এই চিঠি লিখছি। আমি এখানকার কলেজে প্রফেসারি নিয়ে এসেছিলাম। দিনকতক উনুদা-ও এই কলেজে এসে হাজির হ ফিজিক্সের প্রফেসার হ'য়ে। লুসিন উনুদার বিয়ে হয়নি। কারণ তার স সঙ্গে মিটমাট হয়ে গেছে, ডিভোর্স হয় মাস ছয়েক আগে উনুদা আমাকে কি ব জানেন? 'দেখ দেবী তোমাকে আমি ঠিক করতুম, কিন্তু বিষয়ের লোভে বাধ্য তোমাকে বিয়ে করতে হবে এইটে আমার খারাপ লেগেছিল! লুসি মেয়েটাকেও ভ লেগেছিল তখন। তাই তোমাকে বিয়ে ক রাজি হই নি। এখন আর তোমার কাছে বি প্রস্তাব করবার মুখ নেই আমার। কিন্তু হচ্ছে তোমাকে পেলে জীবনে আমি হতাম'। কি কান্ড দেখুন। আমি কিছুতেই রাজি হই নি। কিন্তু ও কি জেদি ছেলে তা জানেন তো। ঘুরিয়ে ফি রোজই ওই এক কথা বলতে লাগল। আমি রাজি হয়ে গেলুম। মাস তিনেক আমাদের বিয়ে হ'য়ে গেছে। নদীর ধারে বাংলোটা আমরা ভাড়া করেছি সেটা চমৎ আপনি একবার এসে বেড়িয়ে যাবেন? আ আসবার খবর পেলে দোতলার ফ্ল্যাটটা আ জন্যে ঠিক করিয়ে রাখব। আমার জানবেন। ইতি—প্রণতা দেবী।

নাই নাই, তবু পাই

দিলীপ দাশগুপ্ত

হে অরণ্য কথা বলো। বলো মোর সেই ইতি
প্রতি পৃষ্ঠা ঘিরে যার ক্লেদাতীত জীবনানি
আকাশেরে নীল করি' পৃথিবীর সবুজ প্রা
স্নেহচ্ছায়া বিছায়েছে; রত্নগর্ভা সমুদ্রকে স্ম
যেখানে আদিম আমি রেখে গেছি প্রথম প্র
হে অরণ্য, বলো দেখি মুছে ফেলা সেই মোর
কতো তারা ফুটেছিলো, কতোটুকু পুষ্প-প
পূর্ণিমাকে ব্যঙ্গ করি' অমারাতে
করিতে প্রোজ্জ্ব
সাক্ষীরূপে ছিলো নাকি? জ্যোতির্মিত্র
সে কোন রমণী
প্রথম পৃথিবী-কাব্য ছুঁয়েছিলো নয়নের
আমার পঞ্জরদীর্ণ জ্যোতির্মিত্র সহস্রের
ফুল-ফুল খেলা শেষে ঘুমিয়েছে
আমারই কৌতুকে

হে অরণ্য, বলে দাও তোমার সে নিস্তব্ধ প্র
প্রথম কোন সে আমি অকস্মাৎ প্রস্তরের
সভ্যতার অগ্নিরাগে জ্বালায়েছি
যুগোক্রান্ত দীপ্
অবলার বাসরেতে আকাশের ভালে স্বর্ণটী
দেখে যবে উচ্চকিত আমি লিখি আদিম ক
যাযাবর এই মর্নবিহারিণী বনিতা ও মিত
মনমিত্র হয়ে দিলো পুষ্পাঞ্জলি প্রতিভার
কখন কোথায় তুমি হে অরণ্য বলো নিরালা
বলিবে কি কানে কানে, বিস্মরণে যে মানস
দূরান্তবর্তিনী সৌক প্রেরণায় লেখায় কবি

বিবেকের কষাঘাত

(২৪৩ পৃষ্ঠার পর)

...রিয়ে দিয়ে যায়, লোভ সম্বরণ কোরে। অথবা কোনোদিন ভয়ঙ্কর অভাবে পড়ে চুরি ডাকাতি করলেও পরবর্তী জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে র ডাকাতির টাকা সুদে আসলে ফেরৎ পাঠায়। কিংবা অন্যায় ভাবে হঠাৎ কারো ক্ষতি করলেও রে আত্মদংশনের অনুশোচনায় সে ক্ষতি ...পূরণ করে পূরণ করতে না-পারা পর্যন্ত ...শ্চিন্ত হতে পারে না। এমনি ভাবেই কোনো ...নো সরকারী বিভাগ হঠাৎ যে টাকা-পয়সা ...অথচ প্রেরকের নাম বা পাত্তা পান না, সেও ...না ঘটনা হয়েও সামান্য নয় মোটেই।

...জীবনে এই প্রকারের ছোটখাট ঘটনার ...ও খুবই বেশী। এ ঘটনাগুলিই প্রমাণ করে ...মানুষের চামড়ায় ঢাকা দেহের তলে বিবেক ...টি এখনো মরেনি। সে যদি মরত, এই ছোট- ...ঘটনাগুলি একদমই ঘটত না।

...কালের যাত্রাপথে একথাও অনস্বী- ...যে, বিবেকের কষাঘাত ক্রমশঃ যেন ...হবার পথে। বিবেক যেন একালে এক ...ঘরের দাঁড়িয়ে বসে আছে। তারই প্রতিফলন ...তে পাওয়া যাচ্ছে, প্রকটভাবে পৃথিবীর ...শক্তিগোষ্ঠীতে বিবস্ত্র আত্মপ্রকাশ প্রয়াসী। ...তাদেরই কাজ-কর্মের ছাপ পড়ছে শক্তি- ...দের পদাপিষ্ট জাতির ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের প্রাত্যহিক আচার আচরণ ও চারিত্রিক ...।

...বিবেকহীনতার কলংক ছাপ আমাদের দেশের ...চরিত্রেও আজকাল খুবই সুস্পষ্ট। ...দের জাতীয় মহাকবি রবীন্দ্রনাথ, জাতির ...মহাত্মা গান্ধী জাতিকে বিবেক মন্ত্রে দীক্ষা দেবার আজীবন আপ্রাণ চেষ্টা করে- ছিলেন। এ যেমন সত্য, তেমনি মহাকবি ও ...র প্রস্থানের পর থেকে দেশবাসী যে ...বিবেকের কষাঘাত পর্যন্ত ভুলতে চলেছে: ...অত্যুক্তি মাত্র নয়। ব্যাপকভাবে মানুষের ...দুঃখ-বেদনাকে মূলধন করে মুষ্টিমেয় লোকের ...বিবেকহীন পন্থায় সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা, ...কীর মহাজনীতে মহামানবের পদাঙ্ক অনু- ...রণের ভাঁওতা, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে ন্যায়- অন্যায়ের পরোয়া না-কোরে কার্যসিদ্ধির প্রয়াস ...মান সমাজে দিন দিনই ক্রমবর্ধমান। পাপ- পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, সুনীতি-দুর্নীতি, সুন্দর- কুসুন্দরের বাছ বিচার একালে তছনছ কোরে ...ছে একদল বলদর্পী, বিত্তগর্বীতে যেমন, ...আর একদল জনগরিষ্ঠ গলাবাজীতে তেমনি। উভয়পক্ষই ধরে নিয়েছে, পন্থা যতই নিকৃষ্ট হোক, অপবিত্র হোক না কেনো; স্বার্থ- সিদ্ধি হলেই হোলো।

মাঝখানে পড়ে এখনো যাঁরা বিবেকের পূজারী তাঁরা যাঁতাকলে পিষ্ট হতে বসেছেন। ...দলের চাঁইরা চতুর্দিক থেকে অট্টহাসিতে ওই বিবেকবানদের উপহাস করে চলেছে মর্মান্তিক ঔদার্যে।

সুতরাং আশঙ্কা হচ্ছে এতদিনে সভ্যতার দরবারে এদেশেও বিবেক বস্তুটি যাত্রাগানের ...চরিত্র হিসাবে একদম ছাঁটাই পর্যায়ে এসে দাঁড়াল বুঝি! তাই বিবেকের অনুশাসন যাঁরা মানেন তাঁদের শেষ কথা:—

"বল মা তারা দাঁড়াই কোথা"; অবিবেকী অযুত কানে করুণ আর্তনাদের মতো শোনাবে বৈ তো না!

বিদেশের চোখে ভারতীয় ছবি

(২৫১ পৃষ্ঠার পর)

সর্বপ্রথমে আমি মনে করি ভাষার বিভেদমূলক বিড়ম্বনা। ইয়োরোপে আমি যতোটুকু বুঝেছি, ওর আট-ন'টা দেশ ঘুরে, সেখানে আমাদের ছবির সাফল্যের যদি কোন সম্ভাবনা থাকে তা হচ্ছে একমাত্র সেই ছবির যার সংলাপ প্রায় শূন্যের ঘরে ফেলা যায়, অন্ততঃ যার মুখ্য ও গৌণ রসের আবেদন— উপভোগের পথে সংলাপের আদৌ কোন সহায়তা নেই বিদেশীর চোখে। এবং গল্পটি একান্তরূপে স্থান-কাল-নিরপেক্ষ। যেমন ধরুন, পথের পাঁচালী, যেমন অপরাজিত। যেখানে ঘটনায় ও নাট্য-স্থাপনার নিবিড় মর্মরসটাকে বুঝলেই যথেষ্ট। কিন্তু বর্তমান যুগে কটা ছবিকে বুকে হাত দিয়ে বলা যায় এমন- ভাবে নিছক মানবতার ছাঁচে গড়া, এমন রসের আধারে সিঞ্চিত? অধিকাংশ ছবিই একটি নিজস্ব দৃষ্টিভংগী দিয়ে গড়া, অধিকাংশই অত্যধিক ডায়ালোগ-ধর্মী, তার ডায়ালোগের ডালপালাকে নির্মম কুঠারচালনা করে যা থাকে তার করুণ চেহারা আমি দেখেছি। আর যতোটুকু রাখা যায় সেই ডায়ালোগ—আমাদের মনে বিচিত্র আবেদন কিছুতেই ভুলতে পারি না সেইখানে—তা ওদের দর্শকমণ্ডলী বা বিচারকমণ্ডলীর ওপরে যেমন সম্পূর্ণ নিরর্থক ও এমন কি বিরক্তিব্যঞ্জক হয় তার ফল—সেই চিত্র- নাটকের মৃত্যু। ওদের দেশের বা ভিন্ন ভাষাভাষী যে কোন দেশের সাব-টাইটল রচনাকারীর সাধ্যও নেই সেই ডায়ালোগের প্রাণধর্মকে রসায়ত্ত করা ও ফুটিয়ে তোলা। তাই আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ নাটকীয় মূল- সম্পদ—রবীন্দ্র ও শরৎ রচনাবলী ওদের ছায়াছবি- দর্শক ও বিচারকের নিরিখে সম্পূর্ণ অর্থহীন কথার জাল। এমন ক্ষেত্রে আমাদের ছবির ভিত্তি হবে কি? ওদেরই গল্প, ওদেরই ধারা, ওদেরই চমক চুরি করে ওদেরই পুরস্কার আহরণ করবো কি তবে?

এ' ছাড়া আছে ওদের ও আমাদের জীবনের ভংগীর মধ্যে, গতির মধ্যে, ছন্দের মধ্যে মারাত্মক রকমের প্রভেদ। আমাদের প্রতি পদক্ষেপের ধীর- মন্থর মন্দাক্রান্তা ছন্দের সংগে ওদের বিভ্রান্তকারী চপল গতিবেগ না মেলে সমে, তালে, মাত্রায়। তাই আমাদের ছবির গতিও ওদের কাছে শামুকের গতির মতো। ওদের গতিতে আমাদের যানবাহন চললে একটি দিনে আমাদের পথের চেহারা যা হবে তা রবীন্দ্রনাথ-উল্লিখিত বিনুর কলিকাতা নগরীর স্বপ্নদর্শনের চাইতেও করুণ হবে। তাই আমাদের জীবন-দর্শন ও আত্মদর্শনের গতিবেগ, তা সে বিস্তারেই হোক বা গভীরেই হোক, ওদের কাছে মৃতের শবযাত্রার মতো প্রতিভাত হবে। যদি কোনদিন এমন হয়—আমাদের ছবির টেক্‌নিকের মুকুরে ওদের গতিচ্ছন্দ, ওদের চিন্তাবিক্ষেপ-এর মূল সুর একতারে বাজে তবে সেদিন হয়তো আমাদের ছবির পক্ষে অনেকখানি সহজ হবে ওদের জয়মাল্য অর্জন করা। কিন্তু তাতে আমরা হারাবো নাকি স্বকীয় সত্তা? আর সবচেয়ে আমি যেখানে শঙ্কিত, ও ব্যথিত বোধ করেছি সেটা এই যে, আমাদের ছবির মনের গভীরে প্রবেশ করবার, আমাদের বিশিষ্ট চিন্তাধারার গতি বা বিন্যাসের রূপ উপলব্ধি করবার জন্য অতিরিক্ত প্রয়াস বা আগ্রহ আমি ওদের দেশে ভিন্ন ভাষাভাষী, ভিন্ন ভাবান্বিত বিচারকদের মধ্যে দেখিনি এতটুকু। ও'রা ভাবেন, এটা আমাদের কর্তব্য, ও'দের বোঝবার মতো মালদার ছবি করা। ও'দের করণীয় নেই কিছু। যদি কেউ এর ব্যতিক্রম থাকেন, তিনি কোটিকে গোটিক। তিনি প্রণম্য।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব সম্বন্ধে সব কথা, বিচারকের দৃষ্টিকোণ থেকে, একটি নিবন্ধের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে উল্লেখ-আলোচনা সম্ভব নয়, বা সব বিষয়ে উচিতও নয়। আমার মনে হয় এ ব্যাপারটার ভালোমন্দ সবকিছু, সম্ভাবনা বিশেষরূপে চিন্তা করে, বিশ্লেষণ করে আমাদের কর্মকর্তাদের এ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ কর্তব্য নির্ণয় ও পথনির্দেশ করা উচিত। এবং সেইভাবেই আমাদের ভবিষ্যৎ চিত্রোৎ- সবে যোগদানের কার্যপন্থা স্থির করা বা চিত্র- নির্বাচন করা উচিত। আর সে ব্যাপারে আজ পর্যন্ত যাঁরা বিদেশে গেছেন, এই সম্পর্কে তাঁদের উপদেশ মূল্যবান হতে পারে। এই দিকে জাতির অবদান আজ প্রয়োজন। এখানে বিলম্ব করলে চলবে না।

ছোটদের ছায়াছবি প্রসঙ্গে

(২৫৪ পৃষ্ঠার পর)

ছেলেমেয়েদের সংখ্যা যত বাড়বে, ছবির সংখ্যাও তত বাড়বে দিনকে দিন।

সর্বশেষে আসছে জাতীয় সরকারের কথা। সরকার অতি সাম্প্রতিককালে শিশু-চলচ্চিত্রের প্রতি সানুগ্রহ দৃষ্টি দিয়েছেন। পুরস্কৃত করাই শুধু নয়, নগদ কাঞ্চন মূল্যে তাঁরা উৎসাহ দিচ্ছেন প্রযোজক-পরিচালকদের। তাছাড়া চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটির মাধ্যমে 'জলদীপ' ছাড়াও, কিছু ছবি সরকার করেছেন।

'জলদীপ' ছবিটি আমি দিল্লীতে দেখেছি। চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটি সম্পর্কে তথ্য ও বেতার সচিব ডাঃ বি ভি কেশকার যে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন, তা' আমি স্বকর্ণে শুনেছি। এমন কি বৃটিশ বিশেষজ্ঞ মিস্ মেরী ফিল্ড যিনি চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটিকে উপদেশ দেবার জন্য গত ১৯৫৬ সালে ভারতে এসেছিলেন, সোসাইটির নির্মিত ছবিগুলো সম্পর্কে ব্রাসেলস্-এর প্রদর্শনীতে প্রদত্ত তাঁর সুপরিকল্পিত মন্তব্যও পাঠ করেছি সেদিন। সোসাইটির অন্যান্য ছবির কথা জানি না। 'জলদীপ' ছবিটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনায় প্রবিষ্ট না হয়েও বলতে পারি, আমাদের ছেলে-মেয়েরা ছবিটি নেয় নি। এরপর সোসাইটির তৈরী ছবি যদি কখনো ছোটরা নেয়ও, তা'হলেও কী এই বিরাট সমস্যা মেটে? আর ওই সোসাইটির ক্ষমতাই বা কতটুকু? অতএব দায় এসে পড়ছে অবশেষে সেই চিত্র-প্রযোজকদেরই ঘাড়ে। তাঁরা কি আগের মত নিরুৎসাহ হয়ে বসে থাকবেন এখনও?

মহিলার বয়স

বিচারক : আপনার বয়স কত?

মহিলা সাক্ষী : ২০ বছর কয়েক মাস।

বিচারক । কত মাস?

মহিলা সাক্ষী : ১২১ মাস!

সূচী-পত্র

কথা ও কাহিনী

সূচী-পত্র

কথা ও কাহিনী

সূচী-পত্র

কথা ও কাহিনী

প্রবন্ধ

সূচী-পত্র

প্রবন্ধ

কবিতা

সূচী-পত্র

বিবিধ

সূচী-পত্র

কবিতা

পূজা পাততাড়ি

সূচী-পত্র

পূজা পাততাড়ি

ভ্রম-সংশোধন

পূজা পাততাড়ির ১৮০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত "স্বপনবুড়োর সফরের" ছড়া রচনা করেছেন শ্রীহেমন্তকুমার সাহা, মুদ্রাকর প্রমাদে নামটা ছাপা হয়নি। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্যে আমরা দুঃখিত। —স্বপনবুড়ো

খেলাধূলা

অভিনয় জগৎ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত

হাজার বছর পর

হাজার বছর পর কি ঘটিবে, কে বলিতে পারে?
হাজার বছর আগে ছিল যারা পৃথিবীর বুকে
তারা কি ভেবেছে কেউ একদিন আকাশে আকাশে
ভেসে যাবো, উড়ে যাবো? বিদ্যুতের বেগের বিস্ময়
ধরা দিবে মানুষের হাতে?

মহাকাশ যাত্রী মোরা,
ব্যোমে ব্যোমে মহাঊর্ধ্বে আমাদের নব পরিক্রমা।
গ্রহের ক্রন্দন আর নক্ষত্রের নিগূঢ় বেদনা
রাত্রির আকাশে যেন বিচ্ছেদের সঙ্গীতের মত
পৃথিবীর বুকে বাজে। সূর্যগ্রহ ডাকে বুঝি তারে,
অজস্র রৌদ্রের কণা বিন্দু বিন্দু অমৃতের মত
ঝরে পড়ে ঘাসে ঘাসে এ মাটীর শিশিরে শিশিরে,
আমার বুকের মাঝে শুনি তার গভীর স্পন্দন,
কোন্ দূরে গ্রহের ক্রন্দন?

হাজার বছর পর
কি ঘটিবে, কে বলিতে পারে? পৃথিবী কি শূন্য হবে?
নভোলোকে নতুন শহর? মঙ্গলে শনিতে চন্দ্রে
বিচিত্র জীবন, আর কোটি কোটি নতুন কলোনি
গড়িয়া তুলিবে কারা? এ মাটির পৃথিবীর মত
সেদিনও কি জীবনের মরণের হবে টানাটানি?

হাজার বছর পর
বায়ুভূত নিরাশ্রয় দেখা দিবে নতুন মানুষ?
জরা নাই, মৃত্যু নাই, ক্ষুধা নাই, নাইকো হতাশা,
জয়-পরাজয় কিম্বা প্রিয়জন আর ভালোবাসা
কিছু নাই,—আছে শুধু মঙ্গলে শনিতে চন্দ্রে
উদাসীন অনন্ত সময়, গতিহীন জীবলোক,
নিরানন্দ আনন্দের ব্যথাহীন জীবন বেদনা!

তারপর কবে একদিন—হাজার বছর পর
চন্দ্রলোকে সভা হবে, মঙ্গলেতে জনতার ভীড়
মহাকাশে হট্টগোল, বিজ্ঞানীরে বলিবে হাঁকিয়া—
'ফিরে দাও, ফিরে দাও মোদের সে হারানো পৃথিবী!'
হাজার বছর পর
কে জানে কোথায় হবে মানুষের ঘর?

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

দাঁড়কাগ

পরশুরাম

কাঞ্চন মজুমদার অনেক কাল পরে তার বন্ধু যতীশ মিত্রের আড্ডায় এসেছে। তাকে দেখে সকলে উৎসুক হয়ে নানা-রকম সম্ভাষণ করতে লাগল। —আরে এস এস, এতদিন কোথায় ডুব মেরে ছিলে? বিদেশে বেড়াতে গিয়েছিলে নাকি? ব্যারিস্টারিতে খুব রোজগার হচ্ছে বুঝি, তাই গরীবদের আর মনে পড়ে না?

প্রবীণ পিনাকী সর্বজ্ঞ বললেন, বে-থা করলে, না এখনও আইবুড়ো কার্তিক হয়ে আছ?

কাঞ্চন বলল, কই আর বিয়ে হল সর্বজ্ঞ মশাই, পাত্রীই জুটছে না।

উপেন দত্ত বলল, আমাদের মতো চুনো পুঁটি সকলেরই কোন কালে জুটে গেছে, শুধু তোমারই জোটে না কেন? অমন মদনমোহন চেহারা, উদীয়মান ব্যারিস্টার, দেদার পৈতৃক টাকা, তবু বিয়ে হয় না? ধনুকভাঙা পণ কিছু আছে বুঝি? এদিকে বয়স তো হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। চুল উঠে গিয়ে ডিউক অভ এডিনবরার মতন প্রশস্ত ললাট দেখা দিচ্ছে, খুঁজলে দু-চারটে পাকা চুলও বেরুবে। পাত্রীরা তোমাকে বয়কট করেছে নাকি?

—বয়কট করলে তো বেঁচে যেতুম। ষোল থেকে বত্রিশ যেখানে যিনি আছেন সবাই ছেঁকে ধরেছেন। গণ্ডা গণ্ডা রূপসী যদি আমার প্রেমে পড়তে চান, তবে বেছে নেব কাকে?

উপেন বলল, উঃ, দেমাকের ঘটাখানা দেখ! তুমি কি বলতে চাও গণ্ডা গণ্ডা রূপসীর মধ্যে তোমার উপযুক্ত কেউ নেই? আসল কথা, তুমি ভীষণ খুঁতখুঁতে মানুষ। নিশ্চয় তোমার মনের মধ্যে কোনও গণ্ডগোল আছে, নিজেকে অদ্বিতীয় রূপবান গুণনিধি মনে কর, তাই পছন্দমত মেয়ে কিছুতেই খুঁজে পাও না। হয়তো তোমার বোলচাল শুনে মেয়েরাই ভড়কে যায়।

—মিছিমিছি আমায় দোষ দিও না উপেন। বিয়ের জন্য আমি সত্যিই চেষ্টা করছি, কিন্তু যাকে তাকে তো চিরকালের সঙ্গিনী করতে পারি না। হঠাৎ প্রেমে পড়ার লোক আমি নই, আমার একটা আদর্শ, একটা মিনিমম স্ট্যান্ডার্ড আছে। রূপ অবশ্যই চাই, কিন্তু বিদ্যা বুদ্ধি কালচারও বাদ দিতে পারি না। সুশিক্ষিত অথচ শান্ত নম্র মেয়ে হবে, বিলাসিনী উড়নচণ্ডী বা উগ্রচণ্ডা খাণ্ডারনী হলে চলবে না। একটু আধটু নাচুক তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু হরদম নাচিয়ে বউ আমার পছন্দ নয়। মনের মতন স্ত্রী আবিষ্কার করা কি সোজা কথা? এ পর্যন্ত তো খুঁজে পাই নি।

—পাবার কোনও আশা আছে নাকি?

—তা আছে, সেই জন্যেই তো যতীশের কাছে এসেছি। আচ্ছা যতীশ, গণেশমুণ্ডা জায়গাটা কেমন? তুমি তো মাঝে মাঝে সেখানে যেতে। শুনেছি এখন আর নিতান্ত দেহাতী পল্লী নয়, অনেকটা শহরের মতন হয়েছে।

যতীশ বলল, তোমার নির্বাচিত প্রিয়া ওখানেই আছেন নাকি?

—নির্বাচন এখনও করি নি। শম্পা সেন ওখানকার নতুন গার্ল স্কুলের নতুন হেড-মিস্ট্রেস। মাস চার-পাঁচ আগে নিউ আলীপুরে আমার ভাগনীর বিয়ের প্রীতিভোজে একটু পরিচয় হয়েছিল। খুব লাইকলি পার্টি মনে হয়, তাই আলাপ করে বাজিয়ে দেখতে চাই।

পিনাকী সর্বজ্ঞ বললেন, শম্পা সেনও তো তোমাকে বাজিয়ে দেখবেন। তিনি তোমাকে পছন্দ করবেন এমন আশা আছে?

—কি বলছেন সর্বজ্ঞ মশাই! আমি প্রোপোজ করলে রাজী হবে না এমন মেয়ে এদেশে নেই।

উপেন বলল, তবে অবিলম্বে যাত্রা কর বন্ধু, তোমার পদার্পণে তুচ্ছ গণেশমুণ্ডা ধন্য হবে। গিয়ে হয়তো দেখবে তোমাকে পাবার জন্যে শম্পা দেবী পার্বতীর মতন কৃচ্ছ্র সাধনা করছেন।

—ঠাট্টা রাখ, কাজের কথা হোক। ওখানে শুনেছি হোটেল নেই, ডাকবাঙলাও নেই। যতীশ, তুমি নিশ্চয় ওখানকার খবর রাখ। একটা বাসা যোগাড় করে দিতে পার?

যতীশ বলল, তা বোধ হয় পারি, তবে তোমার পছন্দ হবে কিনা জানি না। আমার দূর সম্পর্কের এক খুড়শাশুড়ী মেয়েকে নিয়ে ওখানে থাকেন, মেয়ে কি একটা সরকারী নারী-উদ্যোগশালা না সর্বাত্মক শিল্পাশ্রমের হেড। নিজের বাড়ি আছে, মা আর মেয়ে দোতলায় থাকেন, একতলাটা যদি খালি থাকে তো তোমাকে ভাড়া দিতে পারেন।

—বেশ, আজই একটা প্রিপেড টেলিগ্রাম কর। আমি তিন-চার দিনের মধ্যেই যেতে চাই। একটা চাকর সঙ্গে নেব, সেই রান্না আর সব কাজ করবে। উত্তর এলেই আমাকে টেলিফোনে জানিও। আচ্ছা, সর্বজ্ঞ মশাই, আজ উঠলুম, যাবার আগে আবার দেখা করব।

উপেন বলল, তার জন্যে ব্যস্ত হয়ো না। তবে ফিরে এসে অবশ্যই ফলাফল জানিও, আমরা উদ্গ্রীব হয়ে রইলুম। কিন্তু শুধু হাতে যদি এস তো দণ্ড দেব।

কাঞ্চন মজুমদার চলে যাবার পর পিনাকী সর্বজ্ঞ বললেন, ওর মতন দাম্ভিক লোকের বিয়ে কোনও কালে হবে না, হলেও ভেঙে যাবে। কাঞ্চনের জোড়া ভুরু সুলক্ষণ নয়। বিষবৃক্ষের হীরা, চোখের বালির বিনোদ বোঠান, ঘরে বাইরের সন্দীপ, গৃহদাহের সুরেশ, সব জোড়া ভুরু। তারা কেউ সংসারী হতে পারে নি।

উপেন বলল, সন্দীপ আর সুরেশের জোড়া ভুরু কোথায় পেলেন?

—বই খুঁজলেই পাবে, না যদি পাও তো ধরে নিতে হবে। শম্পা সেনের যদি বুদ্ধি থাকে তবে নিশ্চয় কাঞ্চনকে হাঁকিয়ে দেবে।

যতীশ বলল, শম্পা সেনকে চিনি না, সে কি করবে তাও জানি না। তবে অনুমান করছি গণেশমুণ্ডায় দাঁড়কাগের ঠোকর খেয়ে কাঞ্চন নাজেহাল হবে।

উপেন প্রশ্ন করল, দাঁড়কাগটি কে?

—সম্পর্কে আমার শালী, যে খুড়শাশুড়ীর বাড়িতে কাঞ্চন উঠতে চায় তাঁরই কন্যা। তারও জোড়া ভুরু। আগে নাম ছিল শ্যামা, ম্যাট্রিক দেবার সময় নিজেই নাম বদলে তমিস্রা করে। কালো আর শ্রীহীন সেজন্যে লোকে আড়ালে তাকে দাঁড়কাগ বলে।

উপেন বলল, তা হলে কাঞ্চন নাজেহাল হবে কেন? কোনও সুন্দরী মেয়েই এ পর্যন্ত তাকে বাঁধতে পারেনি, তোমার কুৎসিত শালীকে সে গ্রাহ্যই করবে না। এই দাঁড়কাগ তমিস্রার হিস্টীর একটু শুনতে পাই না? অবশ্য তোমার যদি বলতে আপত্তি না থাকে।

—আপত্তি কিছুই নেই। ছেলেবেলায় বাপ মারা যান। অবস্থা ভাল, বীডন স্ট্রীটে একটা বাড়ি আছে। মায়ের সঙ্গে সেখানে থাকত আর স্কটিশ চার্চে পড়ত। স্কুল-কলেজের আর পাড়ার বজ্জাত ছোকরারা তাকে দাঁড়কাগ বলে খেপাত, কেউ কেউ সংস্কৃত ভাষায় বলত, দণ্ডবায়স হংস। এখানে সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, আই. এস-সি পাস করেই মায়ের সঙ্গে মাদ্রাজ চলে যায়। সেখানে ওর চেহারা কেউ লক্ষ্য করত না, খেপাতও না। মাদ্রাজ থেকে বি, এস-সি আর এম. এস-সি পাস করে, তার পর পিতৃবন্ধু এক সেবী মন্ত্রীর অনুগ্রহে গণেশমুণ্ডোয় নারী উদ্যোগশালায় চাকরি পায়। খুব কাজের মেয়ে তমিস্রা নাগের বেশ খ্যাতি হয়েছে। মিষ্টি গলা, চমৎকার গান গায়, সুন্দর বক্তৃতা দেয়, কথাবার্তায় খুব ব্রিলিয়ান্ট। ওর দাঁড়কাগ উপাধিটা এখানেও পৌঁছেছে, হিন্দীতে হয়েছে কৌআ-দিদি। গুণগ্রাহী অ্যাডমায়ারারও দু-চারজন জুটেছে কিন্তু কেউ বেশী দূর এগুতে পারে নি। নিজের রূপ নেই বলে পুরুষ জাতটার ওপর ওর একটা আক্রোশ আছে, খোঁচা দিতে ভালবাসে।

কাঞ্চন গণেশমুণ্ডোয় এল। তাকে স্বাগত জানিয়ে তমিস্রা বলল, কোনও ভাল জায়গায় না গিয়ে এই তুচ্ছ গণেশমুণ্ডোয় হাওয়া বদলাতে এলেন কেন? আমাদের এই বাড়ি অতি ছোট, আসবাবও সামান্য, অনেক অসুবিধা আপনাকে সইতে হবে।

কাঞ্চন বলল, ঠিক হাওয়া বদলাতে নয়, একটু কাজে এসেছি। আমার অসুবিধা কিছুই হবে না। একটা রান্নার জায়গা আমার চাকরকে দেখিয়ে দেবেন আর দয়া করে কিছু বাসন দেবেন। যতীশকে যে টেলিগ্রাম করেছিলেন, তাতে তো ভাড়ার রেট জানান নি।

—যতীশবাবু আমাদের কুটুম্ব, আপনি তাঁর বন্ধু, অতএব আপনিও কুটুম্ব। ভাড়া কেন দেবেন? রান্নার ব্যবস্থাও আপনাকে করতে হবে না, আমাদের হেঁশেলেই খাবেন। অবশ্য বিলাতের রিৎস-কার্লটন বা দিল্লীর অশোক হোটেলের মতন সার্ভিস পাবেন না, সামান্য ভাত ডাল তরকারিতেই তুষ্ট হতে হবে। মাছ এখানে দুর্লভ, তবে চিকেন পাওয়া যায়।

—না না, এ বড়ই অন্যায় হবে মিস নাগ। বাড়ি ভাড়া নেবেন না, আবার বিনা খরচে খাওয়াবেন, এ হতেই পারে না।

তমিস্রা স্মিতমুখে বলল, ও, বিনামূল্যে আতিথ্য হলে আপনার মর্যাদার হানি হবে? বেশ তো, থাকা আর খাওয়ার জন্যে রোজ তিন টাকা দেবেন।

—তিন টাকায় থাকা আর খাওয়া কুলোয় না, আমার চাকরও তো আছে।

—আচ্ছা আচ্ছা, পাঁচ সাত দশ যাতে আপনার সংকোচ দূর হয় তাই দেবেন। টাকা খরচ করে যদি তৃপ্তি পান তাতে আমি বাধা দেব কেন। দেখুন, আমার মায়ের কোমরের ব্যথাটা বেড়েছে, নীচে নামতে পারবেন না। আপনি চা খেয়ে বিশ্রাম করে একবার ওপরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন, কেমন?

—অবশ্যই করব। আচ্ছা, আপনাদের এই গণেশমুণ্ডোয় দেখবার জিনিস কি কি আছে?

—লাল কেল্লা নেই, তাজমহল নেই, কাঞ্চনজঙ্ঘাও নেই। মাইল দেড়েক দূরে একটা ঝরনা আছে, ঝম্পাঝোরা। কাছাকাছি একটা পাহাড় আছে, পঞ্চাশ বছর আগে বিপ্লবীরা সেখানে বোমার ট্রায়াল দিত। তাদের দলের একটি ছেলে তাতেই মারা যায়, তার কংকাল নাকি এখনও একটা গভীর খাদের নীচে দেখা যায়। ওই যে মাঠ দেখছেন, ওখানে প্রতি সোমবারে একটা হাট বসে, তাতে ময়ূর হরিণ ভালুকের বাচ্চা থেকে মধু মোম ধামা চুবড়ি পর্যন্ত কিনতে পাবেন।

—আর আপনার নিজের কীর্তি, মহিলা উদ্যোগশালা না কি, তাও তো দেখতে হবে। গাড়িটা আনতে পারিনি, হেঁটেই সব দেখব। আপনি সঙ্গে থেকে দেখাবেন তো?

—দেখাব বই কি। আপনার মতন সম্ভ্রান্ত পর্যটক এখানে কজন আসে? বিকেলবেলায় আমার সুবিধে, সকালে দুপুরে কাজ থাকে। যেদিন বলবেন সঙ্গে যাব।

তিন রকম লোক ডায়ারি লেখে—কর্মবীর, ভাবুক আর হামবড়া। কাঞ্চনেরও সে অভ্যাস আছে। রাত্রে শোবার আগে সে ডায়ারিতে লিখল—শ্রীযুক্ত তমিস্রা নাগ, তোমার জন্য আমি বিশেষ সরি। যে রকম সতৃষ্ণ নয়নে আমাকে দেখছিলে তাতে বুঝেছি তুমি শরাহত হয়েছ। কথাবার্তায় মনে হয় তুমি অসাধারণ বুদ্ধিমতী। দেখতে বিশ্রী হলেও তোমার একটা চার্ম আছে তা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু আমার কাছে তোমার কোনও চান্সই নেই, এই সোজা কথাটা তোমার অবিলম্বে বোঝা দরকার, নয়তো বৃথা কষ্ট পাবে। কালই তোমাকে ইঙ্গিতে জানিয়ে দেব।

পরদিন সকালে কাঞ্চন বলল, আপনাকে এখনই বুঝি কাজে যেতে হবে? যদি সুবিধা হয় তো বিকেলে আমার সঙ্গে বেরুবেন। এখন আমি একটু একাই ঘুরে আসি। আচ্ছা, শম্পা সেনকে চেনেন, গার্লস স্কুলের হেডমিস্ট্রেস?

তমিস্রা বলল, খুব চিনি, চমৎকার মেয়ে। আপনার সঙ্গে আলাপ আছে?

—কিছু আছে। যখন এসেছি তখন একবার দেখা করে আসা যাক। বেশ সুন্দরী, নয়? আর চার্মিং। শুনেছি এখনও হার্ট-হোল আছে, জড়িয়ে পড়েনি।

—হ্যাঁ, রূপে গুণে খাসা মেয়ে। ভাল করে আলাপ করে ফেলুন, ঠকবেন না।

স্কুলের কাছেই একটা ছোট বাড়িতে শম্পা বাস করে। কাঞ্চন সেখানে গিয়ে তাকে বলল, গুড মর্নিং মিস সেন, চিনতে পারেন? আমি কাঞ্চন মজুমদার, সেই যে নিউ আলীপুরে আমার ভগিনীপতি রাঘব দত্তর বাড়িতে বিয়ের ভোজে আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল! মনে আছে তো?

শম্পা বলল, মনে আছে বইকি। আপনি হঠাৎ এদেশে এলেন যে? এখন তো চেঞ্জের সময় নয়।

—এখানে একটু দরকারে এসেছি। ভাবলুম, যখন এসে পড়েছি তখন আপনার সঙ্গে দেখা না করাটা অন্যায় হবে। মনে আছে, সেদিন আমাদের তর্ক হচ্ছিল গেটে বড়, না রবীন্দ্রনাথ বড়? আমি বলেছিলুম, গেটের কাছে রবীন্দ্রনাথ দাঁড়াতে পারেন না, আপনি তা মানেন নি। ডিনারের ঘণ্টা পড়ায় আমাদের তর্ক সেদিন শেষ হয় নি।

—এখানে তারই জের টানতে চান নাকি? তর্ক আমি ভালবাসি না, আপনার বিশ্বাস আপনার থাকুক, আমারটা আমার থাকুক, তাতে গেটে কি রবীন্দ্রনাথের ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না।

—আচ্ছা, তর্ক থাকুক। আমি এখানে নতুন এসেছি, দ্রষ্টব্য যা আছে সব দেখতে চাই। আপনি আমার গাইড হবেন?

—এখানে দেখবার বিশেষ কিছুই নেই। কোথায় উঠেছেন আপনি?

—তমিস্রা নাগকে চেনেন? তাঁদেরই বাড়িতে থাকি।

—তমিস্রাকে খুব চিনি। সেই তো আপনাকে দেখাতে পারবে, আমার চাইতে ঢের বেশী দিন এখানে বাস করছে সব খবরও রাখে। আমার সময়ও কম, বেলা দশটার সময় স্কুলে যেতে হয়।

—সকালে ঘণ্টাখানিক সময় হবে না?

—আচ্ছা, চেষ্টা করব, কিন্তু সব দিন আপনার সঙ্গে যেতে পারব না। কাল সকালে আসতে পারেন।

আরও কিছুক্ষণ থেকে কাঞ্চন চলে গেল। দুপুরবেলা ডায়ারিতে লিখল—মিস শম্পা সেন, তোমাকে ঠিক বুঝতে পারছি না। এখানে আসবার আগে ভাল করেই খোঁজ নিয়েছিলুম, সবাই বলেছে এখনও তুমি কারও সঙ্গে প্রেমে পড় নি। আমি এখানে এসে দেরি না করে তোমার কাছে গিয়েছি, এতে তোমার খুব ফ্ল্যাটার্ড আর রীতিমত উৎফুল্ল হবার কথা। তুমি সুন্দরী, বিদুষীও বটে, কিন্তু আমার চাইতে তোমার মূল্য ঢের কম। রূপে গুণে বিত্তে আমার মতন পাত্র তুমি কটা পাবে? মনে হচ্ছে তুমি একটু অহংকেরে, মানুষ চেনবার শক্তিও তোমার কম।

কাঞ্চন প্রায় প্রতিদিন সকালে শম্পার সঙ্গে আর বিকালে তমিস্রার সঙ্গে বেড়াতে লাগল। গণেশমুণ্ডোয় একটি মাত্র বড় রাস্তা, তারই ওপর তমিস্রাদের বাড়ি। একটু এগিয়ে গেলেই গোটাকতক দোকান পড়ে, তার মধ্যে বড় হচ্ছে রামসেবক পাঁড়ের মুদীখানা আর কহেলিরাম বজাজের কাপড়ের দোকান। এই সব দোকানের সামনে দিয়েই কাঞ্চন আর তার সঙ্গিনী শম্পা বা তমিস্রার যাতায়াতের পথ। দোকানদাররা খুব নিরীক্ষণ করে ওদের দেখে।

একদিন বেড়িয়ে ফেরবার সময় তমিস্রা রামসেবকের দোকানে এসে বলল, পাঁড়েজী, এই ফর্দটা নাও, সব জিনিস কাল পাঠিয়ে দিও। চিনিতে যেন পিঁপড়ে না থাকে।

রামসেবক বলল, আপনি কিছু ভাববেন না দিদিমণি, সব খাঁটী মাল দিব। এই বাবুসাহেবকে তো চিনছি না, আপনাদের মেহমান (অতিথি)?

—হ্যাঁ, এখানে ইনি বেড়াতে এসেছেন।

—রাম রাম বাবুজী। আমার কাছে সব ভাল ভাল জিনিস পাবেন, মহীন বাসমতী চাউল, খাঁটী ঘিউ, পোলাওএর সব মসালা, কাশ্মীরী

জাফরান, পিস্তা বাদাম কিশমিশ। আসেটিলীন বাত্তি ভি আমি রাখি।

কাঞ্চন বলল, ও সবের দরকার আমার নেই।

—না হুজুর, ভোজের তো দরকার হতে পারে, তখন আমার বাত ইয়াদ রাখবেন।

দোকান থেকে বেরিয়ে কাঞ্চন বলল, লোকটা আমাকে ভোজনবিলাসী ঠাউরেছে।

তমিস্রা হেসে বলল, তা নয়। ডিকেন্সএর সারা গ্যাম্পকে মনে আছে? তার পেশা ধাইগিরি আর রোগী আগলানো। সদ্য বিবাহিত বর-কনে গির্জা থেকে বেরুচ্ছে দেখলেই সারা গ্যাম্প তাদের হাতে নিজের একটা কার্ড দিত। তার মানে, প্রসবের সময় আমাকে খবর দেবেন। গণেশমুণ্ডার দোকানদাররাও সেই রকম। কুমারী মেয়ে কোনও জোয়ান পুরুষের সঙ্গে বেড়াচ্ছে দেখলেই মনে করে বিবাহ আসন্ন, তাই নিজের আর্জি আগে থাকতেই জানিয়ে রাখে।

—এদের আক্কেল কিছুমাত্র নেই। আমার সঙ্গে আপনাকে দেখে—

—এমন ভুল বোঝা ওদের উচিত হয় নি, তাই না? কি জানেন, এরা হচ্ছে ব্যবসাদার, সুরূপকুরূপ গ্রাহ্য করে না, শুধু লাভ লোকসান বোঝে। ভেবেছে, আমার মায়ের বাড়ি আছে, অন্য সম্পত্তিও আছে, আমি একমাত্র সন্তান, রোজগারও করি, অতএব বিশ্রী হলেও আমি সুপাত্রী। আপনি যে মস্ত ধনীলোক তা এরা জানে না।

—এরা অতি অসভ্য, এদের ভুল ভেঙে দেওয়া দরকার।

—আপনি শম্পাকে নিয়ে ওদের দোকানে গেলেই ভুল ভাঙবে।

পরদিন সকালে শম্পার সঙ্গে যেতে যেতে কাঞ্চন বলল, আমার একজোড়া সক্‌স দরকার।

শম্পা বলল, চলুন কহেলিরামের দোকানে।

কহেলিরাম সসম্ভ্রমে বলল, নমস্তে বাবুসাহেব, আসেন সেন-মিসিবাবা। মোজা চাহি? নাইলন সিল্ক পশমী সুতী—

কাঞ্চন বলল, দশ ইঞ্চি গ্রে উলন একজোড়া দাও।

মোজা দিয়ে কহেলিরাম বলল, যা দরকার হবে সব এখানে মিলবে হুজুর। হাওআই বুশশার্ট আছে, লিবার্টি আছে, ট্রাউজার ভি আছে। জর্জেট ভয়েল নাইলন শাড়ি আছে, বনারসী ভি আমি রাখি, ভেলভেট সাটিন কিংখাব ভি। ভাল ভাল বিলায়তী এসেন্স ভি রাখি। দেখবেন হুজুর?

দোকান থেকে বেরিয়ে কাঞ্চন সহাস্যে বলল, বর-কনের পোশাক সবই আছে, এরা একেবারে স্থির করে ফেলেছে দেখছি।

বিকালে কাঞ্চনের সঙ্গে তমিস্রা রামসেবকের দোকানে এসে এক বাণ্ডিল বাতি কিনল। রামসেবক বলল, দিদিমণি, একটা ছোকরা চাকর রাখবেন? খুব কাজের লোক, আপনার বাজার করবে, চা বানাবে, বিছানা করবে, বাবুসাহেবের জুতি ভি বুরুশ করবে। দরমাহা বহুত কম, দশ টাকা দিবেন। এ মুন্নালাল, ইধর আ।

তমিস্রার একটা চাকরের দরকার ছিল, মুন্নালালকে পেয়ে খুশী হল। বয়স আন্দাজ ষোল, খুব চালাক আর কাজের লোক।

রাত্রে কাঞ্চন তার ডায়ারিতে লিখল, শম্পা, তোমার কি উচ্চাশা নেই, নিজের ভালমন্দ বোঝবার শক্তি নেই? আমাকে তো কদিন ধরে দেখলে, কিন্তু তোমার তরফ থেকে কোনও সাড়া পাচ্ছি না কেন? এদিকে তমিস্রা তো আমাকে খুশী করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। যাই হক, আর দুদিন দেখে তোমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করব।

তিন দিন পরে বিকালে তমিস্রা চায়ের ট্রে আনছে দেখে কাঞ্চন বলল, আপনি আনলেন কেন, মুন্নালাল কোথায়?

তমিস্রা সহাস্যে বলল, সে শম্পার বাড়ি বদলী হয়েছে।

—আপনিই তাকে পাঠিয়েছেন?

—আমি নয়, তার আসল মনিব রামসেবক পাঁড়ে, সেই মুন্নাকে ট্রান্সফার করেছে, এখানে তাকে রেখে আর লাভ নেই।

—কিছুই বুঝলুম না।

—আপনি একেবারে চক্ষুকর্ণহীন। শম্পা, আমি, আর আপনি—এই তিনজনকে নিয়ে গণেশমুণ্ডার বাজারে কি তুমুল কাণ্ড হচ্ছে তার কোনও খবরই রাখেন না! শুনুন।—মুন্নালাল হচ্ছে রামসেবকের স্পাই, গুপ্তচর। ওর ডিউটি ছিল আপনার আর আমার প্রেম কতটা অগ্রসর হচ্ছে তার দৈনিক রিপোর্ট দেওয়া। যখন সে জানাল, কুছ ভি নহি, নথিং ডুইং, তখন তার মনিব তাকে শম্পার বাড়ি পাঠাল, শম্পা আর আপনার ওপর নজর রাখবার জন্যে।

—কিন্তু তাদের তাতে লাভ কি?

—আপনি হচ্ছেন রেসের গোল-পোস্ট। শম্পা আর আমি দুই ঘোড়া। কে আপনাকে দখল করে তাই নিয়ে বাজি চলছে। রামসেবক বুক-মেকার হয়েছে। প্রথম কদিন আমারই দর বেশী ছিল, থ্রী-টু-ওআন কৌআ-দিদি। কিন্তু কাল থেকে শম্পা এগিয়ে চলছে, ফাইভ-টু-ওয়ান সেন-মিসিবাবা। আমার এখন কোনও দরই নেই।

—উঃ, এখানকার লোকরা একেবারে হার্টলেস, মানুষের হৃদয় নিয়ে জুয়ো খেলে! নাঃ, চটপট এর প্রতিকার করা দরকার।

—সে তো আপনারই হাতে। কালই শম্পার কাছে আপনার হৃদয় উদ্‌ঘাটন করুন আর তাকে নিয়ে কলকাতায় চলে যান।

পরদিন সকালবেলা শম্পা বলল, আজ আর বেড়াতে পারব না, শুধু কহেলিরামের দোকানে একবার যাব।

কাঞ্চন বলল, বেশ তো, চলুন না, সেখানেই যাওয়া যাক।

শম্পার ওপর কহেলিরাম অনেক টাকা বাজি ধরেছিল। দুজনকে দেখে মহাসমাদরে বলল, আসেন আসেন বাবুসাহেব, আসেন সেন-মিসিবাবা। হুকুম করুন কি দিব।

শম্পা বলল, একটা তাঞ্জোর শাড়ি চাই, কিন্তু দাম বেশী হলে চলবে না, কুড়ি টাকার মধ্যে।

—আরে দামের কথা ছোড়িয়ে দেন, আপনার কাছে আবার দাম! এই দেখুন অচ্ছা জরিপাড়, পাঁয়ত্রিশ টাকা। আর এই দেখুন, নয়া আমদানী চিদম্বরম সিল্ক শাড়ি, আসমানী রঙ, নকশাদার জরিপাড়, চওড়া আঁচলা, বহুত উমদা। এর আসলী দাম তো দো শও রুপয়া, লেকিন আপনার কাছে দেড় শও লিব।

শম্পা মাথা নেড়ে বলল, কোনওটাই চল[...] না, অত টাকা খরচ করতে পারব না। থাক, [...] শাড়ি চাই না, আসছে মাসে দেখা যাবে।

কাঞ্চন বলল, এই চিদম্বরম শাড়িটা [...] মনে করেন?

শম্পা বলল, ভালই, তবে দাম [...] বলেছে।

—আচ্ছা, আপনি যখন নিলেন না [...] আমিই নিই।

কহেলিরাম দন্তবিকাশ করে শাড়ি [...] সযত্নে প্যাক করে দিল।

শম্পা বলল, কাকেও উপহার দেবেন [...] কলকাতায় কিনলেন না কেন?

শম্পার বাসায় এসে কাঞ্চন বলল, শম্[...] এই শাড়িটা তোমার জন্যেই কিনেছি, তু[...] পরলে আমি কৃতার্থ হব।

ভ্রূ কুঁচকে শম্পা বলল, আপনার দেওয়া শাড়ি আমি নেব কেন, আপনার সঙ্গে [...] কোনও আত্মীয় সম্পর্ক নেই।

—শম্পা, তুমি মত দিলেই চূড়ান্ত সম্পর[...] হবে, আমার সর্বস্ব নেবার অধিকার তুমি পা[...] বল, আমাকে বিবাহ করবে? আমি ফেলনা [...] নই, আমার রূপ আছে, বিদ্যা আছে, [...] গাড়ি টাকাও আছে। তোমাকে সুখে [...] পারব।

—থামুন, ও সব কথা বলবেন না।

—কেন, অন্যায় তো কিছু বলছি [...] আমার প্রস্তাবটা বেশ করে ভেবে উত্তর দাও।

—ভাববার কিছু নেই, উত্তর যা দেব [...] দিয়েছি। ক্ষমা করবেন, আপনার প্রস্তাবে রা[...] হতে পারব না।

অত্যন্ত রেগে গিয়ে কাঞ্চন বলল, এ কেমন [...] সরাসরি প্রত্যাখ্যান? মিস সেন, আপ[...] ঠকলেন, কি হারালেন, এর পর বুঝ[...] পারবেন।

সমস্ত পথ আপন মনে গজ গজ কর[...] করতে কাঞ্চন ফিরে এল। ডায়ারিতে লেখব[...] চেষ্টা করল, কিন্তু তার সোনালী শার্প[...] কলম থেকে এক লাইনও বেরুল না। সমস্ত[...] দুপুর সে অস্থির হয়ে ভাবতে লাগল।

বিকালবেলা তমিস্রা তার কর্মস্থান থে[...] ফিরে এসে কাঞ্চনকে দেখে বলল, একি মিস্টা[...] মজুমদার, চুল উস্ক-খুস্ক, চোখ লাল, মু[...] শুখনো, অসুখ করেছে নাকি?

কাঞ্চন বলল, না, অসুখ করেনি। তমি[...] এই শাড়িটা তুমি নাও, আর বল যে আমা[...] বিয়ে করতে রাজী আছ।

তমিস্রা খিলখিল করে হেসে উঠল, [...] শূন্য বালতির ওপর কেউ কল খুলে দি[...] তারপর বলল, এই ফিকে নীল শাড়িটা নিশ্চ[...] আমার জন্যে কেনেন নি, শম্পাকে দি[...] গিয়েছিলেন, সে হাঁকিয়ে দিয়েছে তাই আমা[...] দিচ্ছেন। মাথা ঠাণ্ডা করুন, রাগের মা[...] বোকামি করবেন না।

—তমিস্রা, আমি কলকাতায় ফিরে গি[...] মুখ দেখাব কি করে? বন্ধুদের কি বল[...] তারা যে সবাই দুও দেবে। তুমি আমা[...] বাঁচাও, বিয়েতে মত দাও। আমি যেন সবাই[...] বলতে পারি, রূপ আমি গ্রাহ্য করি না, শ[...] গুণ দেখেই বিয়ে করেছি।

—আপনি যদি অন্ধ হতেন তা হলে

রঙ্গমঞ্চের যাদুকর

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

মেছুয়াবাজারে জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীদের বাড়ীতে একটা ফুটবল-ক্রিকেটের ক্লাব ছিল। সেই ক্লাবে শিশির আসত. আমরাও যেতুম। আমরা তখন বালক। শিশির ছিল জ্ঞানাঞ্জনের বন্ধু।

শিশিররা সে সময়ে রমানাথ মজুমদার স্ট্রীটে থাকত। এই গলিতে নব-বিধান সমাজের ... আড্ডা ছিল। সেখানে জ্ঞানাঞ্জন যাতায়াত ... এবং সেই সূত্র ধরে শিশিরের সঙ্গে তার ...প হয়।

শিশিরের ফুটবল খেলায় খুব উৎসাহ ...। আমার যতদূর মনে পড়ে সে বঙ্গবাসী ...জিয়েট স্কুলে পড়ত। কিছুদিন পরে ...রা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। সে এন্ট্রান্স পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে সুরু করল।

এই প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে পড়তেই শিশির ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে যোগ দেয়। কলকাতা শহরে বিভিন্ন কলেজের মিলনস্থল ছিল এই ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট। শিশির ছিল প্রিয়দর্শন মিষ্টভাষী আর তার ব্যবহারও ছিল অতি মধুর। এইসব গুণের জন্য সে

লেখক ও শিশিরকুমার

ফটো: পরিমল গোস্বামী

কিছুদিনের মধ্যেই ইনস্টিটিউটের একজন চাঁই হয়ে উঠল।

সে সময়ে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ ডক্টর হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র সেন প্রভৃতি কোনো না কোনোভাবে এই ইনস্টিটিউটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এঁরা সকলেই শিশিরের গুণে তাকে পছন্দ করতেন। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র সেন তাঁর সততা, সত্যবাদিতা ও চরিত্রমাধুর্যে শিশিরকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিলেন। বিনয়বাবুর অকাল-মৃত্যুতে শিশির অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিল। মৃত্যুকাল অবধি সে বিনয়বাবুকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করত।

মৃত্যুর পাঁচ-ছ' বছর আগে শিশিরের বন্ধু পরলোকগত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী একবার বিনয়-বাবুর স্মৃতিসভায় শিশিরকে বিনয়বাবু সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। বক্তৃতার শেষাংশে শিশির বলেছিল—বিনয়বাবু যদি আরো কিছুকাল জীবিত থাকতেন তাহলে আমার জীবন-নদী অন্য খাতে প্রবাহিত হত। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগ দেওয়া হয়তো আমার পক্ষে একেবারেই সম্ভব হত না।

প্রথম মহাযুদ্ধের কয়েক বছর আগে কলকাতায় বাঙালী যুবকদের মধ্যে অভিনয় করবার খুব একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ টড সাহেবকে বধ ক'রে রাজপুত-কাহিনী নিয়ে যেসব নাটক রচনা করতেন—বাঙালীদের মধ্যে তা খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। স্বদেশী যুগে পুলিশে চাপা দেওয়া বাঙালী যুবকদের দেশপ্রেম এই অভিনয়ের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। গলিতে গলিতে অ্যামেচার ক্লাব, প্রত্যেক ছেলেই এক এক জন বীর। তারা রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে আবৃত্তি করতে থাকে মার-মার, কাট-কাট। তখন সাধারণ রঙ্গমঞ্চগুলিও—যেমন মিনার্ভা, ন্যাশনাল, কোহিনুর, ষ্টার ইত্যাদি—হৈ-হৈ করে চলেছে।

এই সময়ে আমাদেরও একটা ক্লাব ছিল। এই ক্লাবে আমরা দানীবাবু, থাকো বাড়ুজ্জে, মুস্তফী সাহেব প্রভৃতি—যাঁরা সাধারণ রঙ্গ-মঞ্চের বড় বড় অভিনেতা ছিলেন—তাঁদের নিয়ে আসতুম ও তাঁদের কাছ থেকে অভিনয় শিক্ষা করতুম। সে সময়ে অ্যামেচারদের মধ্যে ফ্রেণ্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়নের ভূপেন বাড়ুজ্জে, ইভনিং ক্লাবের হরিদাস চাটুজ্জে, প্রমথ ভট্টাচার্য, ভবানী-পুর ক্লাবের তিনকড়ি চক্রবর্তী প্রভৃতি ভালো অভিনয় করতেন। এঁরা ছিলেন আমাদের চেয়ে বয়সেও বড়। কাজেই আমরা মনে করতুম এঁদের বয়স বাড়লে আমরা অভিনয়ে এঁদের ছাড়িয়ে যাব। এমন সময় শোনা গেল—যে যতই ভালো অভিনয় করুক, ইনস্টিটিউটের শিশির ভাদুড়ি যা অভিনয় করে তার তুলনা হয় না।

চেষ্টা করে একদিন শিশিরের অভিনয় দেখতে যাওয়া গেল। ওরা গিরিশবাবুর কি একখানা পৌরাণিক নাটক অভিনয় করছিল। প্রথমেই চোখে পড়ল শিশিরের চেহারা। তাকে চমৎকার মানিয়েছিল। তার লম্বা-চওড়া সুপুষ্ট

...রাজী হতুম। কিন্তু চোখ থাকতে কতদিন ...লাগকে সইতে পারবেন? শম্পা আর আমি ...কি মেয়ে নেই? যা বলছি শুনুন। কাল ...ের ট্রেনে কলকাতায় ফিরে যান। আপনি ...নী লোক, প্রেমে পড়ে বিয়ে করা আপনার ...নয়, সেকেলে পদ্ধতিই আপনার পক্ষে ভাল। ...লাগিয়ে পাত্রী স্থির করুন। বেশী যাচাই ...বেন না, তবে একটু বোকা-সোকা মেয়ে ...ই ভাল হয়, অন্তত আপনার চাইতে একটু ...ী বোকা, তবেই আপনাকে বরদাস্ত করা পক্ষে সহজ হবে।

দেহে সেই পোষাক খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল। কিন্তু অভিনয় দেখে মনের মধ্যে খুব একটা দাগ পড়ল না। অবশ্য তার কন্ঠস্বর এবং সুর ক'রে বলবার ভঙ্গি ভালোই লাগছিল। তবে তুলনাহীন বলে কখনই মনে হয়নি।

এরই কিছুদিন পরে কোথায় কি একটা অনুষ্ঠানে শিশিরের আবৃত্তি শুনেলুম। সে আবৃত্তি শুনে মনে হল এর পূর্বে এমনটি আর শুনিনি—এর কোনো তুলনা নেই। সে সময়ে পরলোকগত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্স্টিটিউটের জ্ঞানপ্রিয় মিত্র এবং আরো অনেকে আবৃত্তি করতেন। এঁরা প্রধানতঃ রৌদ্র, করুণ ও হাস্যরসকে কন্ঠস্বরে ফুটিয়ে তুলতেন। কিন্তু শিশির এই কন্ঠস্বরের সঙ্গে আনল ভঙ্গি এবং অভিনয়। সেদিন সে রবীন্দ্রনাথের বন্দীবীর আবৃত্তি করছিল। দেখলুম—কন্ঠস্বরের উপর তার কি আশ্চর্য নিয়ন্ত্রণী শক্তি! সে শক্তি দুর্লভ সাধনার অপেক্ষা রাখে! কবিতার প্রত্যেকটি পংক্তির ভাবকে সে ভঙ্গিমার ব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তুললে। যখন সে বললে—'ছুরি বসাইল বুকে'—তখন সে ভঙ্গিমায় এবং ছুরি কথাটি উচ্চারণের বিশেষ কায়দায় মনে হল যেন সত্যই একটা ছুরি এসে বসল। আমরা লক্ষ্য করেছি শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অনেকেই বুকে হাত বুলোচ্ছে।

এরপর এম-এ পাস করে শিশির কলেজের অধ্যাপনার কাজ নিলে। সে সময়ে ছাত্র-সমাজের উপর সে যেন একটা ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইন্স্টিটিউটে ও তার বাইরে দলে দলে ছাত্র তার অনুগত হ'য়ে পড়ল। সে সময়ে আমাদের মস্ত একটা আড্ডা ছিল বাইশ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটের ওপরে। লোকে এটাকে ভারতীর আড্ডা বলে জানত। বোধহয় ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ই একদিন শিশিরকে আমাদের আড্ডায় নিয়ে এলেন।

শিশির প্রথম দিনেই বেশ জমিয়ে ফেললে। আড্ডার প্রধান ব্যক্তিদের লেখার সঙ্গে সে পূর্ব থেকেই পরিচিত ছিল। সত্যেনবাবুর কবিতা সে আবৃত্তি করল। তার ওপরে প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আওড়াতে লাগল। আমরা বলামাত্র সে বন্দীবীর কবিতাটি আবৃত্তি ক'রে শুনিয়ে দিলে। অতি পুরাতন সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে বাংলা সাহিত্যের অতি-আধুনিক কবিদের কবিতাও তার ভালো রকম পড়া ছিল। সে নিজে ছিল বিদগ্ধজন তাই বিদগ্ধ-সমাজে নিজেকে খাপ খাওয়াতে তার মোটেই বিলম্ব হল না। এরপর থেকে সে আমাদের ভারতী আড্ডার একজন নিয়মিত আড্ডাধারী হ'য়ে দাঁড়াল।

শিশিরের ছিল অনিদ্রা রোগ। বেচারীর রাতে ঘুম হত না, তাই সে সর্বদাই রাত জাগবার ফন্দী খুঁজে বেড়াত! সে সময় সে বৌবাজারের ওল্ড ক্লাবের সভ্য ছিল। ওল্ড ক্লাবের হ'য়ে দু-তিনবার সে অভিনয়ও করেছে। সেখানে কয়েকজন সভ্য রাত্তিরে ঘুমোতে আসত। সঙ্গী পাবার জন্য শিশির কতদিন ওল্ড ক্লাবে শুয়েছে, আমরা কতদিন রাত-দুপুরে ঢুকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে এসেছি—তার ঠিকানা নেই। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে গজেন্দ্র চন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে বিরাট একটি আড্ডা ছিল। সেখানে সাহিত্যিক, অভিনেতা, হাস্য-কৌতুকাভিনেতা, গাইয়ে, বাজিয়ে, প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, চোর-জোচ্চোর, সাধু-সন্ন্যাসী—সব রকমের লোক আসত যেত। সকাল আটটা থেকে রাত্রি দুটো অবধি আড্ডা চলত। গজেনদার কাছে সবাই ছিল—'লোকটি বেশ'। শিশিরও সেখানে নিয়মিত আড্ডা দিতে আসত। গজেনদা প্রায়ই বলত—ওহে কাল যখন শিশির এল তখন রাত্রি একটা।

হেদুয়ার উত্তর-পূর্ব কোণে মানসী-মর্মবাণীর অন্যতম সম্পাদক বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মশায় বাস করতেন। দোতলায় থাকতেন প্রভাতদা আর তেতলায় থাকত শিশির। মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলা আমরা জনচারেক—আমি, শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়, কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভাতদার ওখানে গিয়ে জুটতুম। সেখানে সাহিত্য সমাজ ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনায় পরমানন্দে সময় কেটে যেত। শিশির থিয়েটারের পর কোনো কোনোদিন আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিত এবং অনেক রাত্রে আড্ডা সেরে বাড়ী যাবার জন্যে উঠলে শিশির বলত—'এরি মধ্যে চললে?'

ম্যাডান কোম্পানির একটা থিয়েটার ছিল—কোরিন্থিয়ান থিয়েটার। তাঁরা স্থির করলেন বাংলা থিয়েটার করবেন। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে তাঁদের একটা সিনেমা শো-হাউস ছিল, সেটাকে তাঁরা বাংলা থিয়েটারে রূপান্তরিত করলেন। সে সময়ে আগা হিস্‌সার কাশ্মীরী নামে এক উর্দু কবি কোরিন্থিয়ানের জন্য নাটক লিখতেন। আগা সাহেব খুব নামজাদা নাট্যকার ছিলেন এবং হিন্দী-উর্দু মহলে তাঁর খুবই সুনাম ছিল। ম্যাডানের কর্তৃপক্ষ তাঁদের বাংলা থিয়েটার পরিচালনার ভার দিলেন এই আগা সাহেবকে।

বাংলার রঙ্গালয়গুলির তখন প্রায় ভগ্ন অবস্থা। নৃপেন বসু, সত্যেন দে, মনোমোহন গোস্বামী, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, হীরালাল দত্ত, গোপালদাস ভট্টাচার্য ও অভিনেত্রীদের মধ্যে কুসুমকুমারী, বসন্তবালা প্রভৃতি ম্যাডান থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলেন। মহাসমারোহে আগা সাহেবের পরিচালিত 'হত্যাকারী কে' নাটক আরম্ভ করা হল। কিন্তু কয়েক রাত্রি যেতে না যেতে ম্যাডান কোম্পানি বুঝতে পারলেন যে, তাঁদের হিন্দী-উর্দু রৌদ্র-করুণ রসের প্যাঁচ বাঙালী দর্শকের কাছে হাস্যরসের উদ্রেক করে। সে সময়ে শিশিরকুমার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চন্দ্রগুপ্ত নাটকে চাণক্যের অভিনয় করে দিগ্বিজয়ী হ'য়ে পড়েছে। ম্যাডান কোম্পানি খুঁজে খুঁজে শিশিরকুমারকে তাঁদের এই বাংলা থিয়েটারের পরিচালনার ভার দিলেন। শিশির আমাদের বললে—অধ্যাপনায় কোনোদিনই পেট ভরবে না। অভিনেতা হিসাবে আমার যখন বাজারে চাহিদা আছে, আমি কেন সে সুযোগ গ্রহণ করব না।

এখানে বলা যেতে পারে যে, অধ্যাপনা পরিত্যাগ ক'রে পেশাদার রঙ্গালয়ে যোগদান ক'রে শিশির একটি নতুন রেকর্ড স্থাপন করল। যাই হোক—শিশিরের তখন পিতৃবিয়োগ, পত্নী-বিয়োগ দুই-ই হ'য়ে গেছে। থিয়েটারে যোগ দিতে তার কোনো বাধাই হল না।

ম্যাডান থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ নাটক লেখবার জন্যে পন্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদকে স্থায়ীভাবে রেখেছিল। ক্ষীরোদবাবুকে দিয়ে শিশির নতুন নাটক লেখালে—আলমগীর।

আলমগীর যেদিন খোলা হয় সেদিনকার কথা, আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। ইংলন্ডের রাজপুত্র ভারতবর্ষে আসায় সমস্ত ভারতবর্ষ নানাভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করছিল। সেইদিন তিনি কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। চৌরঙ্গী অঞ্চলে ও সাহেবপাড়ায় ফুটল আলোর জৌলুষ আর দিশি পাড়ায় রৈল অন্ধকার। রাস্তায় একটিও গ্যাস জ্বলছে না। কোথা থেকে অ্যাসফেল্টের চাঙড় তুলে এনে সমস্ত কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট জুড়ে ট্রামের লাইনের ধারে ও ওপরে সারি সারি করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফুটপাথের কোণের ডাস্টবিন রাস্তার মধ্যখানে এসেছে। গাড়ী নেই, ট্রাম নেই—ঘুটঘুটে অন্ধকার—রাস্তায় লোকজনও বিরল। আমরা সন্ধ্যে থেকে জনকয়েক গজেনদার আড্ডায় বসে আছি। আলো জ্বালালেই দলে দলে ছোকরারা এসে বাতি নিভিয়ে দিতে বলছে। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে ম্যাডান থিয়েটারের কাছে খুব মারামারি চলেছে। যতদূর মনে পড়ছে—বোধ হয় হেমেন্দ্রকুমার ও মণিলাল সত্যমিথ্যা জানবার জন্যে ম্যাডান থিয়েটারের দিকে চলে গেল। কিন্তু পরে শোনা গেল—বিশেষ কিছু গোলমাল হয়নি, তবে দর্শকও সামান্যই হয়েছিল। এইভাবে আলমগীরের প্রথম রজনী অভিনীত হল।

কয়েকদিন পরে আমরা গুটিকয়েক বন্ধু, দুপুরবেলার শোতে আলমগীর দেখতে গেলুম। নির্দিষ্ট সময়ের আধঘণ্টা পৌনে এক ঘন্টা আগে গিয়েও দেখলুম প্রেক্ষাগৃহ একেবারে জনপূর্ণ। কর্তৃপক্ষ কিন্তু তখনও টিকিট বেচতে ছাড়েন নি। আমরা—সত্যেন দত্ত, মণিলাল, হেমেন্দ্রকুমার, সুরেশ, বাড়ুজ্জে ইত্যাদি কয়েকজন কোনোরকমে দাঁড়ে বসার মত একটু একটু জায়গা করে বসলুম। কর্তৃপক্ষ নির্বিকার—তখনও টিকিট বেচে চলেছে—দলে দলে লোক ঢুকছে। যাই হোক ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে যবনিকা উঠল।

প্রথম দৃশ্যেই শিশির এমন চমক লাগিয়ে দিলে যে দর্শক সাধারণ বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে পড়ল। তারপরে দৃশ্যের পর দৃশ্য চলতে লাগল। সমস্ত ষ্টেজখানা জুড়ে কেবল শিশির আর শিশির। অন্যান্য অভিনেতা ও অভিনেত্রী আসছে যাচ্ছে কিন্তু লোকে উদ্‌গ্রীবভাবে প্রতীক্ষা করছে শিশিরের। মনে হ'তে লাগলে যেন এক অতুলনীয় শক্তিশালী যাদুকর তার মায়াজাল বিস্তার করেছে। প্রেক্ষাগৃহের প্রত্যেকটি লোক সে মায়ায় মুগ্ধ বিস্ময়ে নির্বাক হ'য়ে আছে।

আশ্চর্য কন্ঠস্বর! অদ্ভুত সে কন্ঠস্বরের ব্যঞ্জনা! অপূর্ব স্বরনিয়ন্ত্রণী শক্তি। আলমগীর নাটকের শেষ দৃশ্যে সম্রাট ঔরঙ্গজেব যখন রাণা রাজসিংহের কৌশলে দোবারীর গিরিবর্ত্মে সসৈন্যে আটকা পড়েছিলেন সেই সময় কয়েকদিনের অনাহারে তৃষ্ণায় কন্ঠতালু শুষ্ক অবস্থায় শিশিরের সেই কন্ঠস্বরের অভিব্যক্তি বোধ হয় পৃথিবীর যে কোনো অভিনেতার পক্ষে গৌরবের কথা।

আমি হেনরি আরভিং, স্যার বীরভোম ট্রি বা কাচালফের অভিনয় দেখিনি কিন্তু আমাদের সময়ের সেক্সপীরীয় নাটকের সব থেকে বড় অভিনেতা মাথিসন ল্যাং-এর হ্যামলেট, শাইলক

(শেষাংশ ২৪৭ পৃষ্ঠায়)

শব্দ মাহাত্ম্য

বনবিহারী মুখোপাধ্যায়

নয়ন ভরিয়া পল্লীর শোভা দেখিতেছি। দেখিতেছি 'সবুজে' তাহার 'দোব্জাখানি' বিছাইয়াছেন, পানাভরা পুকুরে, জঙ্গলভরা উঠানায়, শেওলাধরা দেয়ালে এবং ছাতাধরা জলের হাঁড়িতে। দেখিতেছি, চতুর্দিকে সবুজ প্রাণের প্রাচুর্য,—নাকের সামনে মাকড়সার বোনা সূতায় ঝুলিতেছে একটি শুঁয়া পোকা; পায়ের কাছে কেঁচো চলিয়াছে অশ্ব, এক রেল লাইনের উপর সান্টিং করিতে করিতে এবং উঠানে, ঘাসের ডগায় ডগায় জোঁকেরা দেখাইতেছে ভরত নাট্যের লীলা।

কেহ কেহ পল্লী দেখিয়াছেন, ট্রেনের জানালা হইতে; কেহ দেখিয়াছেন, মামার বাড়ী, মাসীর বাড়ী, বেড়াইতে আসিয়া; কেহ বা ভাল করিয়া দেখিয়াছেন, ছিপ হাতে, খালে-বিলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কিন্তু আমার মত পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা পল্লীকে উপভোগ করা কম লোকেই করিয়াছেন। পল্লীমাতার কোমল অঙ্কে আপাদ নিমজ্জিত করিয়া, একটু শুকনো ডাঙার সন্ধানে দৃষ্টিকে প্রেরণ করিয়াছি দিকে-দিগন্তে; রোপ ডান্সিং করিতে করিতে একটি বাঁশের উপর দিয়া নাতিশীর্ণ জলপ্রবাহ পার হইয়াছি,—জলের গন্ধে মুখ ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছি চতুর্মুখের ন্যায়; পথচারীর চরণোৎক্ষিপ্ত কর্দম বিন্দুগুলি পদ্ম লেখার ন্যায় বক্ষে ধারণ করিয়াছি; মাথা পাতিয়া লইয়াছি বাঁশ ঝাড়ের লাজ বর্ষণ; এবং আস্বাদন করিয়াছি পংক পরিস্রুত পানীয়।

পল্লীকে বরণ করিয়াছি কোন প্রাণের টানে নয়, নাড়ীর টানে, অর্থাৎ পেটের দায়ে।—এখানে একটি চাকুরী সংগ্রহ করিয়াছি। চাকুরীটি অতি ছোট। পরিচয় দিতে স্বর নামাইতে হয়। অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া জানাইতে হয় যে, আমি এখানকার স্কুলের পণ্ডিত।

আমি টোলের ছাত্র। কাব্যতীর্থ পাশ করিয়াছি। কাব্যতীর্থের পণ্ডিত হওয়া ছাড়া কি পথ আছে? যদি ফেল করিতাম ত আমার মধ্যে থাকিত মুক্ত অগ্নিশিখার অসীম সম্ভাবনা। পাশ করিয়া কিন্তু চিমনী-চাপা হইয়া গিয়াছি। এখন বিদ্যার আলোক দান ছাড়া আমার আর কিছু করিবার নাই। জেটীকুলি, বা মিউনিসিপ্যাল কমিশনার বা মিল মালিক কিছুই হইতে পারিব না।

বিদ্যাদান করিয়া কিছু কিছু দক্ষিণা পাইয়া থাকি—যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্যং। টাকার অঙ্কটা আর জানাইলাম না। জানাইতে 'সরমে বাধিল।'

বেতন যাহা পাইতাম, তাহার অর্ধেকটা যাইত চাল কিনিতে।

উদারচরিত ভারতবাসী—লোককে প্রাপ্যের অধিক দিতেই অভ্যস্ত;—ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দেন, জিনিষ বেচিয়া ফাউ দেন। চালের সহিত উপরন্তু কিছু দিবেন না, এমন হইতেই পারে না। আমরা উপরন্তু যাহা পাইয়াছিলাম, সেগুলি জমাইয়া রাখিলে, এতদিনে রোয়াকের সিঁড়িটা সিমেন্ট-কনক্রীটে বাঁধাইতে পারিতাম।

কিন্তু অগোছলো সংসারের অমিতব্যয়িনী গৃহিণী চাল বাছিবার সময় মুঠো মুঠো কাঁকর-গুলি এদিকে ওদিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছেন।

ডালের সহিত কাঁকর পাইতাম। কিন্তু কতটা, ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। কারণ, সিদ্ধ করিলে দেখা যাইত, সবটাই হাঁড়ির তলায় পড়িয়া আছে। এর মধ্যে কোনটি ডাল, আর কোনটি কাঁকর বলা শক্ত। দাঁতে কাটিয়াও তফাৎ বুঝিবার উপায় নাই।

যাহা হউক, ডালে আমাদের প্রয়োজন ছিল না। আমরা মহাজন বাক্য অনুসরণ করিয়া, শাকের দ্বারাই উদর পূর্তি করিতাম।

পূজার সময় মাংসের গন্ধ পাওয়া যাইত। মাছ ত হাতের কাছেই—তিন মাইলের মধ্যে,—হাটে,—বৃহস্পতিবার, মিলিত। মাছও নানা জাতীয়,—লেঠা, পুঁটি ইত্যাদি আশ-পাশের খানা-খন্দেও মাছ কিল্‌বিল্‌ করিত। ধরিয়া লইলেই হয়।

আমি একদিন একটা কুঁচা চিংড়ি গামছা দিয়া ধরিয়াছিলাম। সেদিন গৃহিণী খুব ঘটা করিয়া লাউ-চিংড়ি রাঁধিয়াছিলেন। মাছ মাংসের অভাব কিন্তু ভগবান পূরণ করিয়াছিলেন, নানা জাতীয় প্রোটিন ফুড সরবরাহ করিয়া। ডালের মধ্য হইতে উচ্চিংড়ে, শুক্তোয় গুটিপোকা, ডালনায় আরসুলো এবং জলের ঘড়ায় বেঙাচি, মাঝে মাঝে পাইতাম। এগুলি আমরা খাইতাম না। ভগবান কিন্তু এগুলি রীতিমত জোগাইয়া যাইতেন। তাঁহার কার্পণ্য ছিল না।

(২)

পণ্ডিত হিসাবে আমার সুনাম ছিল। আমার ক্লাসে, ছেলেরা মন দিয়া পড়াশুনো করিত,—হৈ হল্লা করিত না। ছেলেদের মধ্যে কোন গোলযোগ উপস্থিত হইলে, আমারই ডাক পড়িত, তাহাদের শান্ত করিবার জন্য। এবং আমার কথায় তাহারা শান্ত হইত।

স্কুল ছাড়িবার পরেও অনেক ছাত্র আমার সহিত যোগাযোগ রাখিত। এবং কেহ দেশে আসিলে আমার সহিত দেখা বা আলাপ না করিয়া ফিরিয়া যাইত না।

গভর্নিং বডিও আমাকে সুনজরে দেখিতেন।

স্কুলের কয়েক ঘণ্টা আমি নব-যৌবন লাভ করিতাম এবং সংসারের দুঃখ-দৈন্য ভুলিয়া থাকিতাম।

(৩)

একদিন স্কুলে আসিয়া দেখি, মহা হৈ-চৈ কাণ্ড। লাল, সবুজ কাগজ কাটিয়া গেটে মালা ঝোলানো হইতেছে, ডাব পাড়া হইয়াছে ময়রাকে মিষ্টান্নের অর্ডার দেওয়া হইতেছে এবং ছেলেদের বলা হইতেছে 'তোমরা কাল ধোপদুরস্ত জামা-কাপড় পরিয়া আসিবে। এ আজ সকলে মিলিয়া ঝুলে ঝাড়িয়া ও ঝাঁটাইয়া, তবে বাড়ী যাইও।'

(শেষাংশ ২৮৩ পৃষ্ঠায়)

চন্দ্র-সূর্য

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সে অনেক দিনের কথা।

এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে একটা দুশ্ছেদ্য মনোমালিন্য দেখা দিয়েছিল। অথচ এই অতি শোচনীয় দ্বন্দ্বটি দেখা দেবার পূর্বে উভয়ের মধ্যে একপক্ষ থেকে অকৃত্রিম স্নেহের এবং অপরপক্ষ থেকে প্রভূত শ্রদ্ধার অন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রকাশ প্রচুর পরিমাণে বর্তমান ছিল।

এর বিপর্যয় ঘটতে পেরেছিল উভয় পক্ষের, কোনও নয়, দুই একদের কান-ভাঙানির অপ প্রভাবে।

প্রতিভাবান ব্যক্তিরা স্বভাবতঃ একটু কাঁচা কানের হয়। তারা যা শোনে সহজে তা অবিশ্বাস করে না, বিশেষতঃ আত্মনিন্দা শুনলে অতি সহজে উত্তেজিত হয়ে উঠে। কেবল একদল কান-ভাঙানিতেই তাদের কান ভারী হয়। দুষ্টলোকেরা শক্তিধনীয় ব্যক্তিদের পরিবারের মধ্যে তাদের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের উপায় খুঁজে পায়।

সকলেই জানেন যে কথাবার্তায় লোকে ততটা সংযত হয়ে কথা কয় না,—সময়ে সময়ে তার মধ্যে দু-একটা কথা এসে পড়া অসম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ ঘরোয়া বৈঠকে শরৎচন্দ্রের কোনো লেখা সম্বন্ধে একটু বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, অমনি এক তৎপর ব্যক্তি জোড়াসাঁকোর বৈঠক থেকে উঠে পড়ে শিবপুরের অশ্বিনী দত্ত রোডের উদ্দেশে রওনা হলেন। জোড়াসাঁকোর তিল বালিগঞ্জে পৌঁছতে পৌঁছতে তালে পরিণত হল। ফলতঃ, সেই তালের চোটে শরৎচন্দ্রের কর্ণমূল লাল হ'য়ে উঠল। পক্ষান্তরে, মাঝে মাঝে বালিগঞ্জের তিলও তাল হ'য়ে উঠে রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছে তাঁর কান ভারি করত।

সময়ে সময়ে বালিগঞ্জ থেকে তিলের পরিবর্তে একেবারে তালই নির্গত হোত। তার কারণ, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাক্যে যতটা সংযত এবং সাবধানী ছিলেন, শরৎচন্দ্র ততটা ছিলেন না। তা ছাড়া, শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কোনো উক্তি করতে হ'লে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তার একটা বাস্তব ভিত্তির প্রয়োজন থাকত; শরৎচন্দ্র সব সময়ে বাস্তবের তোয়াক্কা রাখতেন না, নিজের অপূর্ব-পটু সৃজনীশক্তির প্রভাবে কল্পিত কাহিনী রচনা করে শর নিক্ষেপ করতেন। সত্যমূলক উক্তি অপেক্ষা কল্পিত কাহিনী অধিকতর অভীষ্টপ্রদ হোত। সত্যের সীমা আছে, কল্পনার নেই।

একটা নমুনা দিই।

তখনো অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়ি হয়নি। শরৎচন্দ্র সামতাবেড়েয় বাস করতেন এবং কাজে-কর্মে কলকাতায় এসে সময়ে সময়ে বহালায় মণীন্দ্রনাথ রায়ের গৃহে উঠতেন। বিকালে কলকাতা থেকে সাহিত্যিক এবং বন্ধু-বান্ধবেরা বেহালায় গিয়ে আড্ডা জমাতেন; বিকালে শরৎচন্দ্র প্রয়োজনীয় কাজ কর্ম সারতে কলকাতায় আসতেন।

একদিন বেলা দশটা আন্দাজ বেহালায় উপস্থিত হয়ে দেখি শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র করে দশ-বারো জনের আড্ডা একেবারে জমজমাট।

আমাকে দেখামাত্র শরৎচন্দ্র বললেন "উপীন, শুনেছ?"

ফরাসে উপবেশন করে বললাম, "কই, শুনিনি ত।"

"রবীন্দ্রনাথ আর রামানন্দবাবুর মধ্যে মুখ দেখাদেখি নেই,—একেবারে কথাবার্তা বন্ধ!"

কথাটার একান্ত অসম্ভাব্যতা থেকে বুঝতে বিলম্ব হ'ল না যে, সহজ কথায় যাকে বলে গল্পমারা, শরৎচন্দ্র সেই কার্য করতে উদ্যত হয়েছেন। নিজেও রসের কারবার করি, সুতরাং রসভঙ্গ করা একটা অপরাধ হবে। কপট বিস্ময়ের সুরে বললাম, "বল কি! কি ব্যাপার বল ত?"

শরৎচন্দ্র বলতে আরম্ভ করলেন।

ইয়োরোপ ভ্রমণের পর দেশে ফিরে রামানন্দবাবু স্থানে স্থানে বলে বেড়াচ্ছেন, ইয়োরোপে তাঁকে সভাসমিতিতে বক্তৃতা করতে দেখে অনেকে রবীন্দ্রনাথ বলে ভুল করেছিল। সংবাদপত্রে এই খবর পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ চিন্তিত এবং বিরক্ত হয়ে রামানন্দবাবুকে ডাকিয়ে এনে বললেন, "আবার আপনি কোনো দিন বিদেশে গিয়ে কোথায় কি বলে বসবেন, আর লোকে মনে করবে আমি বলছি,—এ ত ভাল কথা নয়! এ বিভ্রান্তি হ'তে পেরেছে আপনার দাড়ির জন্যে। আমাদের দুজনেরই দাড়ি সাদা আর লম্বা। আপনি দাড়ি কামান।"

রামানন্দবাবু অসম্মত হয়ে বললেন, "তা আমি পারব না। এ আমার বহুদিনের সযত্ন-বর্ধিত দাড়ি। এর প্রতি আমার যথেষ্ট মমতা।"

তাতে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "আচ্ছা, একান্ত যদি না কামান ত ছেঁটে ফেলুন।"

ছোপানতেও রামানন্দবাবু রাজি না হওয়ায় উভয়ের মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হ'য়ে গেছে।

এই উদ্ভট গল্প শুনে বৈঠকীরা সকলেই হেসে অস্থির হয়েছিলেন। কিন্তু বিস্মিত হতাম না যদি শুনতাম, তাঁদেরই মধ্যে একজন জোড়াসাঁকোয় উপস্থিত হয়ে আরও কিছু রঙ চড়িয়ে গল্পটা বলে রবীন্দ্রনাথের কান ভারি করেছেন।

এইভাবে সত্য, অর্ধ সত্য এবং কল্পনার নানা কথা ও কাহিনী উভয় দিক থেকে বাহিত ও প্রতিবাহিত হওয়ার ফলে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মনের আকাশ মেঘে মেঘে মলিন হয়ে উঠল। অবশেষে এমন হল যে, দৈবাৎ কোনো সভায় অথবা বৈঠকে উভয়ে একত্র হয়ে পড়লে রবীন্দ্রনাথ যদি মুখ ফিরিয়ে থাকতেন উত্তর দিকে ত শরৎচন্দ্র থাকতেন দক্ষিণ দিকে।

আমি তখন 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করছি। উভয়েই আমার পত্রিকার মান্য লেখক। আমার অসুবিধা হোত যথেষ্ট, দুঃখও কম হ'ত না। অবশেষে একদিন বরানগরে শ্রীপ্রশান্ত মহলানবিশ মহাশয়ের বাসায় কথাটা রবীন্দ্রনাথের কাছে পাড়লাম। বললাম, "দেখুন, আমাদের সাহিত্য আকাশের আপনি সূর্য আর শরৎ চাটুজ্যে চন্দ্র। আপনাদের উভয়ের মধ্যে প্রসন্ন ভাব না থাকলে আমরা, যারা উভয়েরই ভক্ত, মনে কষ্ট পাই।"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "তা আমি কি করব! ও আমার নামে যেখানে-সেখানে যা-তা বলে বেড়ায়!"

বললাম, "ও কোথায় কি বলে বেড়ায় তা আমি জানিনে; কিন্তু এ কথা জানি, ওর মতো আপনার ভক্ত খুব বেশি নেই। আমি আপনার একজন বড় দরের ভক্ত বলে গর্ব করি, কিন্তু শরতের ভক্তির কাছে আমার ভক্তিও ম্লান হয়ে যায়। বাকল্যাণ্ড ব্রিজের গল্পটা শুনলে এ কথা আপনি বিশ্বাস করবেন।"

রবীন্দ্রনাথের কৌতূহল উদ্রিক্ত হল, বললেন, "সে আবার কি গল্প?"

গল্পটা বলতে আরম্ভ করলাম,—

সে অনেক দিনের কথা। প্রিন্স অফ ওয়েলস ভারত পরিদর্শনে আসছেন। স্বয়ং দেশবন্ধু কলকাতায় বসে রাজকুমারের আগমনের প্রতিবাদ স্বরূপ একদিন সাধারণ হরতালের ব্যবস্থা করেছেন। আমি তখন বিশেষ কারণে শরৎচন্দ্রের বাসার কাছে বাজে শিবপুরে বাস করছি।

একদিন শরৎচন্দ্র খালি পায়ে আমাদের বাসায় এসে উপস্থিত। বিস্মিত হয়ে বললাম, "একি শরৎ! খালি পা?"

শরৎ বললেন, "কেন, মনে নেই আজ হরতাল? শুনেছি হাওড়া স্টেশনের অবস্থা সাংঘাতিক। গাড়ি গাড়ি যাত্রী এসে পড়ছে; যানবাহনের অভাবে মেয়েরা বাড়ি যেতে পারছে না; শিশুরা দুধের অভাবে কান্নাকাটি লাগিয়েছে; বৃদ্ধেরা চা-খাবারের অভাবে অবসন্ন হয়ে পড়ছে। যাবে হাওড়া স্টেশনে? যদি কিছু সাহায্য করতে পারা যায়?"

বললাম, "চল"।

খালি পায়ে দুজনে গল্প করতে করতে হাওড়া স্টেশনের দিকে রওনা হলাম। হাওড়া স্টেশনের পাশে বাকল্যাণ্ড ব্রিজে উপস্থিত হয়ে শরৎচন্দ্র আমাকে প্রশ্ন করলেন।

"আচ্ছা, বল ত, আমাদের দেশের লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান কি? প্রথম, না দ্বিতীয়, না অষ্টম, না নবতিতম, না আর কিছু?"

একদিক দিয়ে কিছুমাত্র না ভেবে-চিন্তে চোখ বুজে উত্তর দেওয়া চলে 'প্রথম'। কিন্তু শরৎচন্দ্র যখন প্রশ্ন করেছেন কোন্ স্থান, তখন উত্তর অত সহজ নিশ্চয় হবে না। ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে বললাম, "প্রশ্ন কঠিন। উত্তর দিতে

(শেষাংশ ২৬৪ পৃষ্ঠায়)

যবনিকা তোলো তোলো

শ্রীসজনীকান্ত দাস

ওগো মহাকাল, কালো যবনিকা তোলো,
পিছু ফিরে চেয়ে দেখার সময় হ'লো।
পালা-অভিনয় কখন হয়েছে শুরু,
মঞ্চ ছাড়িয়া বসেছি পাকিয়ে ভুরু,
প্রেক্ষা-গৃহেতে, কাঁপে বুক দুরু দুরু—
কোন্ অঙ্কের কোন্ দৃশ্য যে খোলো!
অতীত, পতিত যবনিকা তোলো তোলো॥

ওগো নটরাজ, পিছন ফিরিয়া কভু
তুমি তো চাওনা, সুমুখেই চল প্রভু।
মোরা দুর্বল ছেড়ে-আসা পথখানি
চাহে আমাদের নিত্য রাখিতে টানি,
পারে না যদিও তবু দেয় হাতছানি,
কেঁদে কেঁদে বলে, পথিক, মোরে না ভোলো।
ওগো নটরাজ, যবনিকা তোলো তোলো॥

নিজ অভিনয় রুপোলি পর্দা 'পরে
হেরে অভিনেতা জানি কৌতুক ভরে।
জীবন-নাট্য হায়, ছায়াছবি নয়,
দৃশ্যান্তর—তবু ব্যথা বুকে রয়,
সব হারিয়েও শেষ হারাবার ভয়—
'ডুয়েটের' আশা গাহিতে গাহিতে 'সোলো'!
মঞ্চ-অধিপ, যবনিকা তোলো তোলো॥

মদনভস্মী তৃতীয় নেত্রটিরে
মুদিয়া হে হর, চাহতো পিছন ফিরে!
হেরিবে মঞ্চে উমার পূজার থালা,
শূন্যে গড়ায় ধুলোয় ধুতুরা-মালা;
কামের মদিরা তীব্র তাহার জ্বালা—
কত যুগ গেল, আজিও হয়নি জোলো!
ওগো মহাকাল, যবনিকা তোলো তোলো॥

*　*　*　*

হেরিতেছি—ধীরে বয়ে চলে কাঞ্চন,
উদাস বাতাসে মর্মরে ঝাউ বন
যেমনটি ছিল চারিটি দশক আগে:
ফিরিয়া দেখিতে তবু ভয়-ভয় লাগে
হয়তো দেখিব মঞ্চের পুরোভাগে
কিশোরী প্রিয়ারে, বয়স মাত্র ষোল!
ওগো ভোলানাথ, যবনিকা তোলো তোলো॥

সন্ধ্যা আঁধার ঘনাইছে ধীরে ধীরে,
সোনালীর ছোঁয়া সবুজ বনের শিরে।
"রাত হয়ে গেল"—কৌতুক কলভাষে
ব'লে, কে দাঁড়াল ঘনিষ্ঠ হয়ে পাশে,
প্রত্যাশা ভরে দুটি চোখ বুজে আসে
—মুখর কোকিল হারায় মধুর বোল-ও।
কাল-যবনিকা আরেকটু তোলো তোলো॥

তারপর শুরু ছায়া-ধরাধরি খেলা,
শেষ না হতেই ভাঙে দু'দিনের মেলা।
ট্রেণ ছুটে চলে পিছে প'ড়ে থাকে মন,
কালো হ'য়ে আসে আম-কাঁঠালের বন
খল খল হাসি হেসে ছোটে কাঞ্চন,
তীরের শ্মশানে সব আশা পুড়ে ম'ল।
হে শ্মশানচারী! যবনিকা তোলো তোলো॥

কোথায় প্রতাপ, কোথায় শৈবলিনী
দেখাও হয়েছে, ভেবেছি ওরে কি চিনি!
ললাটে তাহারও ফোটেনি স্মৃতির রেখা,
আমি একা নই, সেও তো ছিল না একা;
পরের দৃশ্যে আবার যখন দেখা
ভূমিকা বদলে বদলে গিয়েছে ভোলও।
সতী হ'ল উমা—তবু যবনিকা তোলো॥

*　*　*　*

খর যৌবন, প্রখর তপন-তাপে
পাষাণ-পুরীর পাটগলি পথ কাঁপে।
জনতা-মরুতে ক্ষণিকের মরীচিকা,
মুখর আঁধারে নীরব হাসির শিখা।
সামরির ত্রিয়ালে রায় যেন হ'ল লিখা—
ফাঁসী রজ্জুতে আসামী এবার ঝোলো।
তাণ্ডবনাথ, যবনিকা তোলো তোলো॥

খর যৌবন, উদ্দাম লালসায়
শান্তির নীড় ঝড়ে ভেঙে উড়ে যায়।
কখন ধূসর হ'ল যে সবুজ লন,
সহসা ভাঙিল খেলা ব্যাডমিণ্টন,
পাহাড়তলীতে ঘোড়া ছোটে বনা বন্,
মাতালের দলে আমি খেলিতেছি পোলো।
সীন-শিফটার দোসরা দৃশ্য তোলো॥

পরের দৃশ্যে কার ঘরে পড়ে আছি,
ভেঙেছে কোমর, ছিঁড়ে গেছে মালাগাছি।
নেশা ছুটে গেল প্রমত্ত কলরবে,
আয়েষা তো নয়—বুঝি সাবিত্রী হবে;
সেবাপরায়ণা রূপে ধরি বুঝি তবে
ভাগ্যে আমার তুমিই তেঁতুল গোলো
ওগো মহাকাল, যবনিকা তোলো তোলো॥

কাঞ্চন-সখী, পাহাড়তলীর মিতা,
অতি-পরিচিত তবুও অপরিচিতা।
শূন্য আকাশে সহস্র স্পুটনিক,
উড়িবে উড়ুক, ধ্রুবতারা রবে ঠিক,
সিন তুলে তুলে আমারে কোরো না দিক্,
হর-গৌরীর মহিমা সবারে বোলো।
থামো মহাকাল, মিছে যবনিকা তোলো॥

থার্ড ক্লাস কামরায় অসম্ভব ভীড় সেদিন। অনেকেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমার ভাগ্য ভালো ছিল কারণ আমি বেঞ্চের এক কোণে বসবার জায়গা পেয়েছিলুম। কিন্তু জীবনে কোন সৌভাগ্যই নিরঙ্কুশ হয় না, গোলাপ ফুলেও কাঁটা থাকে। আমার পাশেই যে লোকটি বসেছিল তার চেহারা বিশ্রী রকম মনে হচ্ছিল। মাথা ভর্তি বড় বড় চুল, মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি, দাঁতগুলো কালো, চোখের কোণে পিঁচুটি। সর্বাঙ্গ থেকে কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধও ছাড়ছিল। পরনের জামাকাপড় বেশ ময়লা। অত্যন্ত নোংরা লোকটা। এর উপর আর এক বিপদ, ক্রমাগত ঢুলছিল সে। ঢুলে ঢুলে আমার দিকে ঢলে পড়ছিল। মাথা ঠোকাঠুকি হ'য়ে গেল দু'-একবার। কামরায় জায়গা থাকলে অন্য জায়গায় সরে যেতুম। কিন্তু সরবার উপায় ছিল না। আড়ষ্ট হ'য়ে বসে রইলুম। রাগে ক্ষোভে ভিতরটা রি রি করছিল। কিন্তু প্রতিকারের উপায় কি! হঠাৎ একটা উপায় মিলে গেল শেষে, দৃষ্টিভঙ্গী বদলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। এতক্ষণ লোকটাকে জানোয়ার, অসভ্য মনে হচ্ছিল, মনে মনে তাকে জীবন্ত আস্তাকুঁড়ের সঙ্গে উপমিত করছিলুম। কিন্তু তার মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখবার পরই মনটা বদলে গেল। মনে হ'ল লোকটি অত্যন্ত ক্লান্ত, বোধ হয় গরীবও খুব। বয়সও হয়েছে, গোঁফ দাড়ির অনেক চুল পাকা, চুলও কাঁচা-পাকা। চোখে মুখে কেমন একটা অসহায় অসহায় ভাব। হঠাৎ আমার বাবার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বুড়ো বয়সে আপিঙ ধরেছিলেন, সন্ধ্যার সময় এমনি ঢুলতেন বসে' বসে'। মা খুব বকতেন তাঁকে। কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে কোনও প্রতিবাদ বেরুত না কখনও, অপরাধীর মতো চুপ করে' থাকতেন। মাঝে মাঝে শংকিত মৃদু হাসি হাসতেন অপ্রতিভের মতো।

"শুনছেন?"

"কি"

"আপনি এক কাজ করুন। আমার কাঁধের উপর মাথাটা রেখে ঘুমোন।"

"অমন সুন্দর জামাটা মাটি হয়ে যাবে যে আমার মাথার তেল লেগে।"

"তা যাক। আপনি ঘুমিয়ে নিন খানিকক্ষণ।"

বেশী অনুরোধ করতে হল না, সে আমার কাঁধের উপর মাথা রেখে ঘুমোতে লাগল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ঘুমোল সে। ইতিমধ্যে যাত্রীও নেমে গেল অনেক, একটা বেঞ্চ প্রায় খালিই হয়ে গেল। ইঞ্জিনের একটা হ্যাঁচকা টানেই ঘুম ভেঙে গেল তার।

"অনেকক্ষণ ঘুমুলুম। কষ্ট হয় নি তো।"

"না, তেমন আর কি।"

"এইবার তুমি শুয়ে পড়। তুমি বলছি বলে' কিছু মনে কোরো না। আমার বড় ছেলের বয়সী তুমি। কত বয়স হয়েছে তোমার?"

"কুড়ি বছর—"

"আমার বিনুর বয়সও কুড়ি বছর হবে। তুমি এবার লম্বা হয়ে শুয়ে পড় ওই বেঞ্চিটাতে। আমি তোমার জিনিসপত্রগুলো পাহারা দিচ্ছি। কোনগুলো তোমার জিনিস?"

"ওই ট্রাঙ্কটা। আর কিছু নেই।"

"বেশ আমি পাহারা দিচ্ছি ওটা। তুমি শোও।"

আমারও ঘুম পাচ্ছিল বেশ। শুয়ে পড়লাম সামনের বেঞ্চিটায়। আমার ঘুম খুব গাঢ়, তাই সাধারণত আমি ঘুমুই না ট্রেনে। কিন্তু লোকটির উপর কেমন বিশ্বাস হ'ল, ঘুমিয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না, হঠাৎ একটা বড় ষ্টেশনের গোলমালে ঘুমটা ভেঙে গেল। সামনেই দেখি একটা খাবারওলা খাবার ফেরি করছে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কিছু লুচি, তরকারি আর মিষ্টি কিনলাম। ক্ষিধে পেয়েছিল খুব। ট্রেণটাও সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিলে।

কামরায় তখন আর কোনও লোক নেই।

লোকটি আমার দিকে চেয়ে বললে, "বেশীক্ষণ তো ঘুমুলে না। আমার উপর বিশ্বাস হ'ল না বুঝি"

খাবার একটু বেশী করেই কিনেছিলাম। অর্ধেকটা তাঁকে দিয়ে বললুম—"খান—"

"আমার জন্যেও কিনেছ না কি"—তারপর একটু ইতস্ততঃ করে' হেসে বললে—"ভালই করেছ। খুব ক্ষিধে পেয়েছে আমারও।"

অভদ্রের মতো গাঁউ গাঁউ করে' খেতে লাগল। দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল সব।

"আর একটু নেবেন?"

"না। ওটা তুমি খাও।"

খাওয়া দাওয়া চুকে যাবার পর মুখ হাত ধুয়ে বসলাম দুজনে মুখোমুখি।

"কোথা থেকে আসছ?"

"হাজারিবাগ থেকে।"

"কি কর সেখানে?"

"কলেজে পড়ি। ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছি।"

তখন আমিও পরিচয় নিতে অগ্রসর হলাম।

"আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

"হাজারিবাগ থেকেই। আমারও ছুটি হয়েছে, ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছি।"

"আপনি কি ওখানে চাকরি করেন?"

"না। আমি জেলে ছিলাম। কাল ছাড়া পেয়েছি।"

হঠাৎ মনে হ'ল কোনও দেশ নেতা বোধ হয়। হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারে কোনও অশোভন আচরণ করে' ফেলেছি ভেবে মনে মনে অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়লাম একটু।

"জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন? জেলে গিয়েছিলেন কেন?"

"চুরি করে'। আমি চোর।"

"চোর?"

বজ্রাহতবৎ বসে রইলাম তার দিকে চেয়ে। পর্বতের উচ্চ শিখর থেকে গভীর গহ্বরে পতন হ'লে মনের যে অবস্থা হয়, আমারও তাই হ'ল। মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরুল না, নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম কেবল।

"হ্যাঁ, আমি চোর। ওই আমার পেশা। সবসুদ্ধ তিনবার এই নিয়ে আমার জেল হয়েছে। ছাড়া পেয়ে কিছু দিন বিশ্রাম নিই, তার পর চুরি করি, আবার জেল খাটি। এই আমার জীবন।"

"চুরি করেন কেন?"

মনের মুকুর

……মনীশ ঘটক……

মনের মুকুর বোঝো?
আরসী জাদুর?
যেখানেতে জারিজুরী
খাটে না চাঁদুর?
মুখে যতো ঝাল ঝাড়ো,
ভয়েতে কুকুর,
তারি ছবি তুলে ধরে
মনের মুকুর।

সাপের ছানার মতো
বিষধর সাধ,
ফাঁক পেলে ভেঙে ফেলে
নিষেধের বাঁধ;
ধামা চাপা দাও, পড়ো
মন্ত্র মধুর,
ভুলো না, ভোলে না তাতে
মনের মুকুর।

শাক দিয়ে যতো ঢাকো
বাসি পচা মাছ,
মুখোসের আবরণে
আদিম পিশাচ—
ছলা কলা বঞ্চনা
সব করে দূর,
চটপট তুলে ধরে
মনের মুকুর।

তুমি যার ভয়ে মরো,
করো না স্বীকার,
ত্রস্ত অহঙ্কারে
টুঁটি টেপো যার,
মরেও মরে না সে যে
পরম চতুর,
চকিতে তারেও আঁকে
মনের মুকুর।

সঞ্চিত কতো ত্রাসে
ভরা অন্তর,
বঞ্চিত কতো আশে
চিত জর্জর।
ভাষাহীন বিভীষিকা
বড়ো নিষ্ঠুর,
নির্মম হাতে আঁকে
মনের মুকুর।

সদম্ভে কতো দেশ
করে এলে জয়,
ভুলে গেছ দলে এলে
কত না হৃদয়!
ভাঙাবুক সরে যায়
দূর হতে দূর,
তারো ছবি এঁকে রাখে
মনের মুকুর।

দিনের আলোতে ভাবো
হলে নির্ভয়,
রাতের কালোতে জমে
যতো পরাজয়!
স্বপন সফল—তবু
স্বপন সুদূর,—
আঁকে তারি হাহাকার
মনের মুকুর॥

"প্রথমবার সংগদোষে পড়ে' করেছিলাম। মেয়ের বিয়ের জন্য টাকারও দরকার পড়েছিল কিছু। হাজার বিশেক টাকা চুরি করেছিলুম। আমার বখরায় পাঁচ হাজার পড়েছিল। মেয়েব বিয়েটা দিতে পেরেছিলুম। দু বছর জেল হয়েছিল এজন্যে। জেলে বসে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম আর চুরি করব না। কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে দেখলুম প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা শক্ত। আমি দাগী হয়ে গেছি, ভদ্রলোকের সমাজ আমাকে এক ঘরে' করেছে। কেউ কাজ দেয় না, কথা বলে না পর্যন্ত। এ রকম বেকার এক ঘরে' হ'য়ে মানুষ কত দিন থাকতে পারে। সুতরাং আবার চুরি করতে হল। চুরি করে যা পেলুম পরিবারের হাতে দিয়ে জেলে চলে এলুম। বাইরেও খেটে খেতে হয়, জেলেও তাই। বসিয়ে কেউ খেতে দেয় না। জেলখানার সুবিধেও আছে অনেক। চাকরির জন্যে 'কর্মখালি'র বিজ্ঞাপন দেখতে হয় না। সেখানে বাঁধা কাজ, রোজ করতে হয়। নানা রকম কাজ শেখাও যায়। নানা দেশের লোকের সঙ্গে আলাপ হয়। অসুখ হ'লে ডাক্তার আসে, বিনা পয়সায় চিকিৎসা হয়। পাকা ঘরে শুতে পাই। আমোদ আহ্লাদের ব্যবস্থাও আছে, নাচ গান থিয়েটার সব হয়। আর ভালভাবে থাকলে জেলারবাবুরা বেশ ভালো ব্যবহার করেন। জেলে কোনও কষ্ট হয় না। তাছাড়া বাইরে থাকবার উপায় তো নেই, একবার পা পিছলে গেলে সমাজ আর ক্ষমা করে না। স্পষ্ট করে' মুখে না বললেও আকারে ইংগিতে বুঝিয়ে দেয়, তুমি চোর তফাতে থাক।"

এক টানা বলে গেল লোকটা। মনে হল যেন মুখস্থ বলে গেল। আমি নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম তার মুখের দিকে। একটি কথাও বেরুল না আমার মুখ দিয়ে। আমার কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল। যদিও সে নিজের সম্বন্ধে যা যা বললে এতক্ষণ, তাতে তার প্রতি আমার ঘৃণা হওয়া উচিত ছিল না কিন্তু দুঃখ হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল লোকটা চোর! চোর! কতক্ষণ এমনভাবে বসে' থাকবে আমার সামনে।

"তুমি আমাকে তোমার খাবারের ভাগ দিলে, আমারও তোমাকে কিছু খাওয়াতে ইচ্ছে করছে। তুমি আমার বিনুর বয়সী। জেল থেকে বেরুবার সময় কয়েকটা টাকা পেয়েছিলাম। কিন্তু টিকিটের পয়সাটি রেখে বাকি পয়সায় মদ খেয়েছি, জেল থেকে বেরিয়ে প্রত্যেক বার আমি মদ খাই, তখন তো জানতাম না যে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। দেখা হবে জানলে কিছু পয়সা বাঁচিয়ে রাখতুম।"

করুণ মর্মান্তিক একটা হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

চুপ করে' রইলাম। কি আর বলব। সেও ফ্যাল ফ্যাল করে' চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। অন্ধকার ভেদ করে' যেন দুটো চোখ, আমরা পরস্পরের দিকে চেয়ে [illegible] আছি।

"একটা উপকার কিন্তু তোমার করতে পারি"—হঠাৎ বলে' উঠল সে—"আমি যা বলছি তা যদি কর তাহলে তোমার বাড়িতে চুরি হবে না কখনও। আমি পাকা চোর হয়ে গেছি তো, এ বিষয়ে কিছু উপদেশ দেবার অধিকার আমার হয়েছে।"

আমি চুপ করে' রইলুম।

"বলব?"

"বলুন।"

"আমি অবশ্য সিঁধেল চোর, সিঁধেল চোরদের কথাই বলব। আমরা যে বাড়িতে সিঁধ দিই সে বাড়িটা দশ-পনেরো দিন আগে থেকে লক্ষ্য করি। বাড়ির আলো কখন নেবে, বাড়িতে রাত বারোটার পর লোকের যাওয়া আসা আছে কি না, অনেক বাড়িতে নাইট-ডিউটির লোক থাকে কি না। তার পর লক্ষ্য করি সে বাড়িতে কুকুর আছে কি না, থাকলে কি রকম কুকুর আছে, খাবার দিয়ে তার মুখ বন্ধ করা যায় কি না। কুকুর থাকলে আমরা প্রায় তার সঙ্গে দিনের বেলাই ভাব করতে চেষ্টা করি খাবার দিয়ে দিয়ে। তিন-চার দিন খাবার খাওয়ালেই ভাব হয়ে যায়। তার পর দেখি রাত বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে বাড়িতে এলার্ম ঘড়ি বাজে কি না। অনেক বাড়িতে লেখকরা বা পড়ুয়ারা রাত দুপুরে উঠে পড়াশোনা করে। সে সব বাড়িতে সিঁধ দেওয়া অসম্ভব। তারপর আর একটা জিনিসও দেখতে হয় আমাদের। যদি দেখি গেরস্ত খুব সাবধানী লোক, শুতে যাবার আগে টর্চ ফেলে ফেলে বাড়ির চারিদিক দেখে বেড়াচ্ছে তাহলে সে বাড়িতেও আমরা পারতপক্ষে যাই না। সুতরাং তুমি এই কটি জিনিস রোজ কোরো। নম্বর ওয়ান, শুতে যাবার আগে টর্চ ফেলে ফেলে বাড়ির চারদিকটা দেখে তবে শুয়ো। নম্বর টু—এলার্ম ঘড়িতে রাত একটার সময় এলার্ম দিয়ে শুয়ো। নম্বর তিন—যদি কুকুর থাকে তাহলে তাকে বেঁধে রেখো, আর নিজের হাতে খেতে দিও। কিছুতেই বাইরে ছেড়ে দিও না তাকে। কেবল শুতে যাবার আগে খুলে দিও। মনে থাকবে তো?"

"থাকবে—"

(শেষাংশ ২৪৭ পৃষ্ঠায়)

"L.L"

(এল্-এল্)

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ওদিকে কাজ থাকার এখন আমি কিছুদিন থেকে কলকাতায় বাসা ভাড়া করে রয়েছি। বাসাটা মৌলালী থেকে খানিকটা আরও দক্ষিণে গিয়ে একটা ফিরিঙ্গি পাড়ায়। গোবরাকে লিখেছিলাম, কাছাকাছি থাকে, ওই ঠিক করে দিয়েছে। আমায় লিখল, আপনি সাহিত্যিক মানুষ। জায়গাটা নিরিবিলি হবে, তা ভিন্ন এরা আপনাকে সভাপতি হতে বলবে না, একটু স্থির হয়ে বসে সভাপতি হওয়ার মতো কাজ করতে পারবেন।......সুবিধে পেলেই আমার জীবনের এ দিকটা নিয়ে খোঁচা না দিয়ে ছাড়ে না।

বাড়িটি ছোটখাট, কিন্তু বেশ পরিচ্ছন্ন আর ছিমছাম; ওপরে-নীচে তিনখানি মাঝারি সাইজের ঘর। নীচে আর একখানি একটু বড়; স্টোরের কাজ করে। সামনে ছোট্ট টালি-পাতা লনটা দেয়াল দিয়ে ঘেরা, রাস্তায় বেরুতে এক জোড়া গেট। এদের প্রায় সব বাড়ির মতোই কিছু, কিছু ফুলের গাছ, লতা, ফার্ণ অর্কিড টবেও রয়েছে। অপর দিকে, শ্লোগান, মিছিল, লাউড স্পীকার নেই। একলা মানুষ, একটু বেশি নিরিবিলি বোধ হয় এক এক সময়, তবু ভালোই আছি। সন্ধ্যার পর প্রায় নিয়মিতভাবেই গোবরা আসে। গল্পগুজব হয় খানিকটা। একলাই আসে, তবে দু' একজনকে সঙ্গেও আনে কখনও কখনও। কিন্তু যেন সর্ত করে আনে সাহিত্য বা সংস্কৃতি নিয়ে কোন কথা হবে না, কিম্বা হয়তো এমন সঙ্গীই বাছে যাদের ও-সবের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

একলাই এল সেদিন। আমি দোতলার সরু বারান্দাটিতে একটা আরাম চেয়ারে বসেছিলাম, বেশ একটু অন্যমনস্ক থাকায় টের পাই নি কখন গোবরা উঠে এসেছে. সিঁড়ির মাথায় থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল—"সন্ধান পেয়ে গেলে নাকি দাদা?

একটু চকিত হয়ে উঠে বললাম,—"না, সে সব কিছু নয়।"

"তবে?"—বলে তখনই সামলে নিয়ে বলল—"থাক না হয় যদি তেমন কিছু হয়তো। আমি বলছিলুম—আমার এক্তিয়ারের মধ্যের যদি কিছু হোত। ...পাড়ার এদের কোন উপদ্রব নেই তো দাদা?"

জানালাম,—না, সে সব কিছু নয়।

আবার সে একটু চুপচাপ যাচ্ছিল তার মধ্যেই গোবরা উঠে পড়ল এক সময়। বললাম—"উঠলে কেন? বোস।"

"বোধ হয় পাকড়াও করেছে দাদা, কথা সাজাচ্ছেন মনে মনে। ডিস্টার্ব করব না।"

বসিয়ে বললাম কথাটা।

আমার বাল্যবন্ধু রমেশের হঠাৎ চাকরিটি যাওয়ায় বড় বিপন্ন হয়ে পড়েছে। টেলিগ্রাম করে দিয়েছি আসতে, আসছে। কিন্তু রুজি গেলে বসে খাওয়ার মতো সঞ্চয় নেই তো, বেশ একটু বিব্রত হয়ে পড়েছে মনে হোল।

গোবরা প্রশ্ন করল—"কি কাজ করেন দাদা?"

বললাম—"মাষ্টারি। বেহারের একটা প্রাইভেট স্কুলে।"

"গ্রাজুয়েট?"

বললাম—"বি-এস-সি, বি-টি। বয়েস হয়েছে, আর বেশি দিন চাকরি করা দরকারও হবে না, দুটি ছেলে, দুটিই প্রায় তোয়ের হয়ে এল, তবে ওদের বের করে আনতে একলার উপার্জনে এমনিই বেশ স্ট্রেন যাচ্ছিল, তার ওপর এই হঠাৎ চাকরি যাওয়া।"

"কেন গেল চাকরি দাদা। যদি আপত্তি না থাকে তো......"

"একটু সিধে মানুষ। প্রাইভেট স্কুলের রাজনীতি—সবার মন জুগিয়ে না পারলে তো..."

গোবরা হেসে বলল—"দুই বন্ধুর একই রোগ দেখছি। হেঁটুর বয়সীও নয় আপনাদের, কিন্তু দুনিয়াটাকে চিনতে কসুর করিনি দাদা। এমন মন যোগাব সবার যে এ-ওর বাপন্ত না করে জল খাবে না। মাঝখান দিয়ে নিজের কাজ জলের মতন এগিয়ে যাবে।......তাঁরও লেখা রোগ মানে তিনিও লেখেন-টেকেন নাকি?"

আমি উত্তর দেওয়ার আগে নিজেই কথা উল্টে নিয়ে বলল—"থাক, আদার ব্যাপারী, আমার অত খোঁজে দরকার কি? আসতে বলেছেন, আসুনইনা আগে। ভগবান সিধা মানুষ করে তোয়ের করেছেন বলে এতই কি মুখ ফিরিয়ে থাকবেন? হবেই কোন উপায়।

অন্য কথা পেড়ে এটা চাপা দিয়ে দিল।

একটানা পাঁচ দিন অনুপস্থিত থেকে আবার এক দিন হঠাৎ ঐ সময় এসে পড়ল গোবর। প্রশ্ন করল—"আসেন নি উনি দাদা?"

বললাম—"না, সমস্ত সংসারটা আবার ঠাঁই-নাড়া করে গুছিয়ে-গাছিয়ে রেখে আসতে হবে তো। আর এখানে আসা সেতো কয়েক দিনের জন্যে মাত্র; মনটা চঞ্চল হয়ে রয়েছে, ছেলেবেলার বন্ধু, আমিই জোর করে আসতে লিখেছি।"

একটা চেয়ার বের করে নিয়ে এসে বসতে যাচ্ছিল, থেমে গিয়ে একটু যেন নিরাশ হয়ে বলল—"তাহলে আমি মিছিমিছি এত খেটে মরতে গেলুম কেন!"

বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করলাম—"বুঝলাম না তো। খেটে মরা কি?"

"তাও আপনার গিয়ে সাহিত্য রচনা দাদা, চোদ্দ পুরুষে যা করেনি কখনও।...সে কথা থাক; আসা মাত্র সদ্য সদ্য রুজি পেয়ে গেলেও থাকবেন না?"

"কি রকম রুজি?"

"বাংলা জানেন তো? পড়াতে পারবেন?"

"বেহারের প্রাইভেট স্কুলের বাঙালী মাষ্টার, উঁচু ক্লাসগুলোতে ওকেই বাংলা সাহিত্য পড়াতে ..."

"চুলোয় যাক সাহিত্য..."

—কথাটা বলে ফেলেই জিভ কামড়ে একটু লজ্জিত হয়ে গিয়ে বলল—"বলছিলুম মাথায় থাকুন সাহিত্য। অ-আ, ক-খ পড়াতে পারবেন? আর সেলেটে দেগে দেবেন, ওরা বুলুবে। আপাতত এই... "

"কি বলছ তুমি? খুবই বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, —"রমেশ অ-আ পড়াবে!"

"ক্ষতি কি দাদা? ঘণ্টায় পঞ্চাশ টাকা করে আমার ফি, তুমি অ-আ পড়বে কি সাহিত্য পড়বে কি সায়েন্স পড়বে, সে তোমার অভিরুচি।"

" তা পড়াতে বাধা আছে এমন বলছি নে তো, কিন্তু বসে পড়েছিল চেয়ারে একটু যেন চাঙ্গা হয়ে উঠে পড়ল, বলল—"দাঁড়ান দাদা। এত অন্যমনস্ক থাকেন, গোবরা হতভাগা এল এত দিন পরে, একটু চা-টোস্টও " .

নেমে গিয়ে ব্যবস্থা করে এসে বসতে বসতে বলল—"তাহলে হবেন রাজি? বাঁচালেন। আমি মনে করলুম সব বুঝি পণ্ডশ্রম হলো। আচ্ছা দাদা, কে কি রকম উদ্দেশ্য নিয়ে লেখাপড়া শিখতে আসছে, সং কি অসং—তাও কি আমারই ভাবতে হবে?"

বললাম—"জ্ঞান অর্জন—তা কি অসং হতে পারে গোবর?"

"এই তো আমারও কথা তাই দাদা। মাষ্টার জানে ছাত্র এসেছে জ্ঞান অর্জন করতে; টাকা পাচ্ছে, বেচারি সময় দিয়ে পড়াচ্ছে। এখন ছাত্রের পেটের মধ্যে কি আছে..."

"ছাত্রটি কে?"—খানিকটা রহস্য রেখে কথা বলা অভ্যাসই গোবরের; আমি পরিষ্কার করে নেওয়ার জন্য প্রশ্নটা করলাম।

"একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান দাদা!"

"এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান! তার হঠাৎ বাংলা পড়ার ঝোঁক যে!"

মুহূর্ত খানেকের জন্য যেন আটকে গেল উত্তরটা গোবরার, তাহার পর বেশ সহজভাবেই বলল—"কি করে জানব দাদা? আমায় শুধু বললে, মিষ্টার গোবর, আমার বাংলা শেখবার বড় ইচ্ছে হয়েছে, একজন ভালো মাষ্টার যদি জোগাড় করে দিতে পার। আপনার বন্ধুর কথা জানাই ছিল, বলতে একেবারে হামড়ে পড়ল। বলে স্কুলে সাহিত্যের মাষ্টার, তবে তো খুব অল্প সময়েই আমায় তোয়ের করে দিতে পারবেন। আজই নিয়ে চলো তাঁর কাছে। বললুম দাঁড়াও সায়েব তিনি আসুন আগে।"

রমেশ সেই দিনই গোবর চলে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়ল। সকালে গোবরকে ডাকিয়ে পাঠালাম। এসে সব ঠিকঠাক করে গেল এবং সেই দিনই সন্ধ্যার পর নিয়ে এল রমেশের ছাত্র। নাম মিষ্টার কে টেলর।

প্রায় ষাট পঁয়ষট্টি বছর বয়স, রোগা, একটু ঝুঁকেও পড়েছে, তবে বেশ ফিটফাট, যেমন ওরা এ বয়সেও সাধারণত থাকেই। মুখে একটা বর্মা চুরুট, হাতে একটা সিং দিয়ে বাঁধানো সৌখীন ছড়ি। ওদিকে গোবরের হাতে একটা স্লেট আর একটা প্রথম ভাগ।

গোবর আগে বয়সের কোন আন্দাজই দেয় নি। ছাত্রই যখন, একটা আন্দাজ করে আমারও জিগ্যেস করা দরকার মনে করিনি একটু হকচকিয়ে গিয়েই সামলে নিলাম কোন রকমে।

মিণ্টার টেলর বেতের টেবিলে ছড়িটা রেখে আমাদের দু'জনের সঙ্গে করমর্দন করে সামনের চেয়ারটায় বসলেন। গোবর আমাদের মানা করে দিয়েছিল পড়া নিয়ে কোন কথা তুলতে, আমরা আর কৌতূহল দেখালাম না। সাধারণভাবে একটু পরিচয় আর অন্য দু'একটা কথা হোল। মিণ্টার টেলর রেলওয়ে গার্ড ছিলেন, অবসর গ্রহণ করে বাড়িতেই আছেন. ঘোরার অভ্যাস. কখনও কখনও একটু বেরিয়েও পড়েন দিন কতকের জন্য, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এক সময় বই আর স্লেট নিয়ে রমেশের সঙ্গে নীচে নেমে গেলেন। হলঘরে পড়ার জায়গা হয়েছে।

বেশ বিস্মিত হয়েই গোবরকে প্রশ্ন করলাম —"কি হে, ব্যাপার কি বল দিকিন?"

হাত একটু চিতিয়ে গোবর বলল—"কি জানি স্যার? ভাঙে না তো কিছু। টাকা আছে. বোধ হয় খেয়াল একটা। উত্তর মেরু ছুটেছে কেন. দক্ষিণ মেরু ছুটেছে কেন, মঙ্গলগ্রহে রকেট পাঠাবার কি দরকার বলুন না? সেই বিদ্‌কুটে জাতই তো? না হয় একটু কি যে বলে..." ব'লে হাসল।

মিণ্টার টেলরের শিক্ষকতা আরম্ভ হয়ে গেল। দু' ঘন্টা করে পড়াবে, দেবে একশত টাকা।

তিন দিন গোবর আর এল না। চতুর্থ দিনে সন্ধ্যার পর এসে বলল—"রমেশবাবুর যে ভয়ানক নাম বেরিয়ে গেছে দেখছি ফিরিঙ্গি পাড়ায়। এক্ষুণি ফোন দিয়ে আসছি, ব্রাউন সায়েব বেরিয়ে এসে টেনে নিয়ে গেল।—মিস্টার গোবর, কে একজন মিণ্টার মিত্র এসেছেন আমাদের পাড়ায়, নাকি খুব ভালো কোচ্ Coach একজন, খুব তাড়াতাড়ি বাংলা শিখিয়ে দিচ্ছেন. আমায় যদি একটু ব্যবস্থা করে দাও. খুবই বাধিত হব।...বললুম বাধিত হওয়ার কি আছে সায়েব? তুমি টাকা দেবে, তিনি মেহনৎ করে পড়াবেন। তবে তাঁর সময় হবে কিনা খোঁজ নিতে হবে।

তা দাদা. ও'র অভাব তো সময়ের নয় এখন. খাড়া মানুষ, সে দিক দিয়ে যথেষ্টই দিয়েছেন ভগবান; রাজি হবেন?"

রমেশ নীচে পড়াচ্ছিল, বললাম—"ডাকিয়ে এনে জিগ্যেস করি ওকে?"

জিভ বের করে হাত নেড়ে উঠল গোবর, বলল—"আরে রাম! অমন ভুল করে! প্রথমভাগ তাও এখন অ-আ চলছে. চৌষট্টি বছরের বুড়ো. ক'দিন চলবে কিছুই বলা যায় না। মাষ্টারের মেহনতের মধ্যে শুধু বসে থাকা, ঐতেই তো যশ, উঠে আসতে আছে কখনও? হবেনই রাজি। ওটা ব্রাউনকে একটা ভাঁওতা দিলুম মাত্র। এর সময়, সকালে ব্রেকফাষ্ট সেরে সাতটায় আসবে, ঘড়ি ধরে ঠিক নটায় ঘরের ছেলে ঘরে চলে যাবে।"

প্রশ্ন করলাম—"এ বুঝি ছেলে মানুষই তা হলে? বয়স কত হবে?" "টেলরের চেয়ে দু'চার বছর বেশি হবে মনে হয়। তবে দেখায় যেন ঐ বয়েসেরই, এর মতন খেঁকুরে নয় তো. শরীরটা একটু হাড়ে-মাসে।'

তারপর দিন যথাসময়ে ব্রাউন সায়েব গোবরের সঙ্গে এসে উপস্থিত হোল. গোবরের হাতে একটা নূতন স্লেট আর একটা নূতন প্রথমভাগ।

এর পর দিন চারেক যেতে না যেতে গোবর আরও দু'জনকে টেনে তুলল, রবার্টসন আর মার্টিমার। একজন ইঞ্জিন ড্রাইভার, একজন একটা ইঞ্জিনীয়ারিং ফারমের ফোরম্যান; দু'জনেই চাকরি থেকে অবসর নিয়ে বসে আছে। সময় ঠিক হোল একটা থেকে তিনটে, আর চারটা থেকে ছটা।

প্রশ্ন করলাম—"কিন্তু এ কি ব্যাপার গোবর?—সব এই বয়েস আর রিটায়ার্ড হ্যান্ড। এদের হঠাৎ এরকম বাংলা পড়বার ঝোঁক হোল কেন বুঝছি না যে!"

গোবর হেসে বলল—"এই দেখুন. আপনি সোজা কথাটা বুঝছেন না দাদা! আমাদের হ'লে বলত—তিনকাল গিয়ে চারকালে ঠেকল. এইবার হরিনামের মালা নিয়ে বসা যাক আর কি! ওদের তো তা নয়। আর একটা লক্ষ্য করবেন দাদা. সবাই হাতুড়ি পিটে কিম্বা গাড়ি চালিয়ে জীবনটা নষ্ট করেছে। এখন বোধ হয় ঐ আপনি যা বললেন জ্ঞানার্জন— তাই একটু করে নিতে চায়।...আরও আসতে চায় দাদা! কিন্তু থাক্, বেশি লোভে কাজ নেই. কি বলেন?"

বললাম—"সময়ও তো নেই আর, এক যদি এক সঙ্গে পড়তে রাজি হয়।"

গোবরা প্রায় শিউরেই উঠল—"না দাদা. অমন কাজ করবেন না, একেবারেই রাজি হবে না তাতেই...ওদের দেখছেন তো. সব ছাড়া-ছাড়া, ছিম-ছাম। একগাদা বিয়ে করে গাদা-খানেক কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে যেমন ঘর করতেও চায় না; আর বিয়েও যদি করলে একটা তো স্ত্রী ব্যাঙ্গালোরে, নিজে কলকাতায়।—না, ওতে কোনমতেই রাজি হবে না।"

খুব বেশি রকমই যেন জোর দিল কথাটায় গোবর।

নীচের ঘরটা যেন একটা পাঠশালা হয়ে পড়ল। "স্বোড়ে-অ", "স্বোড়ে-অ"...দিন কতক পরে "অজ-আম, অচল-অধম" তারপর "জোল পোড়ে, পাটা নোড়ে"...একজন যায় তো একজন এসে যেন ধুয়ো ধরে। রমেশ বলে—"ওহে, কী ব্যাপার ভাই? অবিশ্যি টাকা পাচ্ছি—ওদেশে যেমন বলে 'ছাপ্পর-ফোড়কে', দেন ভগবান, এও তাই। কিছুই করতে হচ্ছে না, কিন্তু এই না করাটাই যে অসহ্য হয়ে উঠেছে..."

তিনটে মাস কেটে গেল।

কঠিন পরিশ্রম করছে। আরও আধ ঘণ্টা করে বাড়িয়ে নিয়েছে, টেলর পুরোপুরি এক ঘণ্টা। দ্বিতীয় ভাগে এসে পড়েছে সবাই; ওপর থেকে শুনি—"টক", ডুগ'ম, ডীর্ঘ', মহার্ঘ'... চিক্কণ, টিক্কার"...কিম্বা—"এ সকোল গুণ ঠাকিলে কি হয়, মাডবের একটি মহট ডোষ ছিল..."

—যে যতটা এগুতে পেরেছে। উৎসাহ বজায় রাখবার জন্য চারজনেই একটু করে সুরা পান করে আসে। একজনেরই পাঠশালা, কিন্তু গলা ছেড়ে দেয়, ভারী, মোটা সায়েবী গলা, ছোট্ট বাড়িটা যেন গম গম করতে থাকে।

রমেশ বলে—"ও শৈলেন আর তো পারি না ভাই।...আর কিছু বুঝেও তো উঠতে পারছি না, এক একবার মনে হয় কেটে পড়ি। বেশ কিছুই তো এলো হাতে। বাড়ি গিয়ে ভালো ক'রে চেষ্টা করি দিন কতক।"

তারপর হঠাৎ একদিন দুর্ভোগটা কাটল। দরখাস্ত ছাড়ছিল চারিদিকে, পাটনার একটা স্কুল থেকে জবাব এল। ভালো পোষ্টই, টেলি-গ্রামে ডেকে পাঠিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল রমেশ। বলল— "গোবরকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে বোল ভাই। ওদের বলে যেতে হলে চারজনে এসে টানাটানি সুরু করবে. সে এক হাঙ্গামা। একশ-দেড়শ টাকায় দ্বিতীয় ভাগ পড়াবার লোক পেতে দেরি হবে না কলকাতা সহরে। গোবর দেবে জোগাড় করে।"

বিকালের টুইশনের পরই টেলিগ্রাম এসেছিল, গোছগাছের হাঙ্গামা নেই; ঘণ্টা-খানেকের ভেতরই বেরিয়ে পড়ল। ও যাওয়ার পরই কয়েক মিনিটের মধ্যে গোবর এসে পড়ল। আমি ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। সব কথা বললাম।

এতটুকু নিরাশ হওয়া, কি বিরক্ত হওয়া কি বিস্মিত হওয়া, কিছু নয় একেবারে। অগ্রিম মাইনের যে কটা টাকা ফেরৎ দিয়ে গেছে রমেশ, হাতে নিয়ে শুধু বলল—স্কুল-এ ক'টা দিন থাকতে পারত না?"

বললাম—"সময়ের কথা বলছ?—ওদের ক্ষতি হবে? তা একজন লোক ঠিক করে দেও —সে আর এমন কি?..."

গোবর মাথাটা নেড়ে জিভ কামড়ে বলল— "আরে ছিঃ! আবার! এবার বাড়াতে গেলে যে অধর্ম দাদা। এ, নেহাৎ একটু দরকার পড়ে গিয়েছিল তাই..."

"কী ব্যাপার বলতো গোবর? একটা কো রহস্য রয়েছেই, কাটাতে চাইছ না; হঠাৎ একদল বুড়ো..."

"বলতেই হবে যে দাদা, না-না করে তো খানিকটা পাপ স্পর্শ হোলই—আমার কথা বলছি—আপনারা তো আগুনের মতন নিষ্পাপ কিছুই জানেন না। না বললে তো শুদ্ধ হতে পাচ্ছি না।"

টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে আঁক কাটতে কাটতে মাথা হেঁট করে বলছিল, হঠাৎ মাথা তুলে বেশ একটু ঘৃণা আর বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠল—"কিন্তু কী বজ্জাৎ দেখুন আবার বেটারা, ওদের এতেও কি প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে মনে করেন?—বেটারা কি না..."

"ব্যাপারটা কি?" একটু খুলে না বললে..."

গোবর লজ্জিতভাবে হেসে আবার চুপ করে মাথা নীচু করল। তাগাদা দিতে আরও সঙ্কুচিত হয়ে বলল—"আপনার সামনে কী করেই যে মুখ দিয়ে বের করি? বজ্জাৎগুলো আমার আর লজ্জা সরম বলে কিছু থাকতে দিলে না। ইয়ে —মানে, সবটুকুর গোড়ায় L. L (এল-এল) দাদা।"

আরও সঙ্কুচিতভাবে মাথা নীচু করল। আমি প্রশ্ন করলাম—"L. L 'টা বুঝলাম না তো?"

"আপনার কাছে সেদিন রমেশবাবুর কথা শুনে যাচ্ছি, মনটা খুবই খারাপ দাদা, আপনার বন্ধু, অথচ গোবরা হতভাগা কিছুই করতে পারবে না? যাচ্ছি ভাবতে ভাবতে এমন সময়... তাকে দৈব না বলে কি বলি দাদা?"

"জিনিসটা কি?"—আমি প্রশ্ন করলাম।

"গলির মাঝখানে একটা গোলাপী খাম। প্রায় মাড়িয়েই ফেলেছিলুম. নিজের খেয়ালেই যাচ্ছিলাম তো. তুলে দেখি ঠিকানা লেখা— মিস্টার কে, টেলার অমুক গলি, এত নম্বর

মাতৃচরণে

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার

(সংস্কৃত কবিতার মতো লঘু-গুরু বর্ণের উচ্চারণে কবিতাটি পঠিতব্য।)

ধনজনবলসুখদায়িনি! দুর্গে!
স্বাগত শারদ বঙ্গে,
কার্তিক-গণপতি-বাণী কমলা—
সকল সুতাসুত সঙ্গে।
সমর-সুসজ্জিত সাজে
স্বাগত আহব মাঝে
মৃগেন্দ্র-মূষিকময়ূর-পেচক
কমল-সহিত কলহংসে,
বিপুল বলী পশুপাখীর যানে
মহিষাসুর-বিধ্বংসে।

অসুরনিকর-পরিবেষ্টিত পৃথ্বী
তব শুভ আশিস যাচে,
বল-দর্পিত মদ-উন্মাদ তন্ত্রে
নিখিল দাস বনিয়াছে।
সজ্জন দুর্লভ আজি
তব সন্ততি সব পাজি,
সমুখে বান্ধব, ভিতরে বৈরী—
বাচন লম্বা লম্বা।
পূর্ণ-হলাহল কুম্ভ পয়োমুখ
মানব সব, জগদম্বা।

পিত্রালয় তব হিমাদ্রি অঞ্চল
সব জানিত তব, ভীমা-
কৃষ্ণ-পীত-উভজনপদ-ভূমি
ম্যাকমেহন পরিসীমা।
সজ্জিত সাঙ্গোপাঙ্গে
রক্তাম্বর পীতাঙ্গে

জবরদখল-রত চৈনিক সৈনিক
বন্দুক-কন্দুক বর্ষে!
এ-কী কুক্ষণ ললাট-লেখন
অহিংস ভারতবর্ষে।
ভাই ভাই বলি যে-জন কণ্ঠে
পরানু প্রেমজ মালা,
সে-জন তিব্বত-রাজধানীতে
উল্টে কহিছে "—"!
বড়ই বিপর্যয় ভাগে,
তবু বলি—'যাক্‌গে, যাক্‌গে',
তথাপি মালা ভুজঙ্গরূপে
দংশে, মা হররামা!
কাল-কুচক্রে জাতির কণ্ঠে
মালা উল্টে লামা।

সতত সশঙ্কিত আপন গেহে
অশান্তি ভরিয়া গেছে,
আপন-লাঙ্গুল-অগ্নির দহনে
সব সম্পদ পুড়িতেছে।
রক্তবরণ-শিখ বহ্নি—
তরুণ সহিত কত তন্বী
উদ্গতপক্ষ পিপীলিকারাজি
মরণ-বরণ-অভিলাষী।
নিজ-কর-কর্তিত পল্বল-মাঝে
নক্রানয়ন-পিয়াসী!
গ্রাম-উপেক্ষিত আপনি মণ্ডল
সহসা সমুদিত কুব্র—
বিশুষ্ক গোধন-পুরীষ-পিষ্টক
সংগ্রাহিকার পুত্র।

বন্যা-বিরচন বচনে,
উত্তেজন-রব-খচনে,
অহরহ দূষিত গন্ধ-হিল্লোলে
উৎকট বিষাক্ত বায়ু:—
নিঃশোষিত জন-গণ-সুখ-সম্পদ
নিঃশোষিত পরমায়ু।
সংকট-কণ্টক-কীর্ণ-সমস্যা
সঙ্কুল বিপন্ন জাতি,
অবিরত কত শত মহিষাসুরকুল
বিহরণ-রত দিবারাতি।
নিশুম্ভ-শুম্ভ বিচরিছে,
চণ্ড-মুণ্ড সুখ হরিছে,
দানব-দৈত্য-বিদলনী মাগো,
জাগো অসুর বিনাশে,
শান্তি-সুখে কর পূরিত বসুধা
মহাশক্তির উদ্ভাসে।

তব চরণে মম মর্ম-নিবেদন
কহিনু অকুণ্ঠিত চিত্তে,
রকমসকম সব করি দরশন মা,
জননী সমর্পিত পিত্তে।
মার্জনা করি মা, ভিক্ষা,
নাহিক শিক্ষা-দীক্ষা,
ওষ্ঠাধর-কর্তিত মুখ-নিঃসৃত
অসভ্য ভাষণ-মগন
জনক-বিতাড়িত জননি-খিদায়িত
নন্দন তব পদলগন।

বাড়ি! কোনও উজবুকের পকেট থেকে পড়ে গেছে বোধ হয় কিছু বের করতে গিয়ে—রাত্তিরে ওরা আবার একটু বেহেড্ থাকে তো; বোধ হয় ক্লাব থেকেই টেনে-টুনে ফিরছিল।... ভুরভুর করছে বিলিতী এসেন্সের গন্ধ, আর খামের বাঁ কোণে একটা উড়ন্ত ঘুঘু চিঠি নিয়ে যাচ্ছে, আমাদের যেখানটায় থাকে প্রজাপতি। একটা যে লভ্ লেট্... (love let,)

গোবর হঠাৎ থেমে গিয়ে জিভ কামড়াল। সামলে নিয়ে বলল—"নির্ঘাৎ একটা যে ইয়ে চিঠি তাতে কোনই সন্দেহ নেই। ভাবলাম—মরুকগে, L. L-ই হোক বা যাই হোক আমার তাতে কি?...হাতে হাতে দেওয়া চিঠি। ঠিক করলাম কাল একখানা টিকিট মেরে পোষ্ট করে দেওয়া যাবে। পকেটস্থ করে বাড়ি চলে এলাম। এসে দেখি, যা ভেবেছিলাম তাই দাদা।"

প্রশ্ন করলাম—"পড়লে তুমি?"

গোবর একটু ঝুঁকে ডান হাতটা বাড়িয়ে বলল—"পায়ে হাত দিয়ে বলতে পারি দাদা, আপনি গুরুজন—কোন রকম পাপ মনে নিয়ে পড়া নয়। ভাবলাম যদি খাঁটি না হয় তাহলে মাঝখান থেকে আমি গরীব মানুষ দু' আনা পয়সা খরচ করে মরি কেন নাহক!...তা যেটা ভয় করা সেটাই কি ফলতে হবে? স্ত্রী কোথায়? কে একজন ছোকরা..."

আমি বললাম—"স্ত্রী নয় কি করে জানলে? পদবী টেলর সেটা দেয়নি। বড় একটা দেয় নাও তো। ক্রিশ্চান নামটাই দেয় চিঠিতে।"

"চিঠির একটা ঢংও তো আছে দাদা।...থাক্ একটু সংক্ষেপই করে দি, গুরুজনের সামনে কী লজ্জাতেই ফেললে আবাগের বেটা!...স্ত্রীর যে নয় সেটা পরেও প্রমাণ হয়ে গেল কি না।"

"কি রকম?"—আমি প্রশ্ন করলাম।

সমস্ত রাত ঘুম নেই, একে রমেশ দাদার ভাবনা, তার ওপর এই নতুন উপদ্রব। শেষে মাথা খেলিয়ে খেলিয়ে একটা ঠিক করে ফেলা গেল: লাগে তো তুক্, না লাগে, তাক্। দুটো দিন বাদ দিলাম, তারপর একটু রাত হলে কপাল ঠুকে বেরিয়ে পড়ে টেলরের গলিটা বের করে নম্বরের ওপর চোখ রেখে আস্তে আস্তে এগুতে লাগলাম। নির্জন গলি, আলোর ব্যবস্থাও ভালো নয়, কাছাকাছি এসে নম্বরের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে যেন নিজের কাজেই এগিয়ে যাচ্ছি, এদিকে বুকটা ধড়ফড় করছে, ওর বাড়িটা থেকে দু-পা এগুতে না এগুতে গেটের কাছ থেকে ডাক পড়ল—"হ্যালো! আপনি কি বাঙালী?" ......ঘুরে দেখে বললাম—"আজ্ঞে হ্যাঁ, কেন বলুন তো?" গোবর থেমে গিয়ে একটু লজ্জিতভাবে হাসল, বলল—"এত শীগ্গির যে কাজ হাসিল হবে

(শেষাংশ ২৮৪ পৃষ্ঠায়)

সেকালের যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ফরমাস হয়েছে, আমাকে সেকেলে কথা বলতে হবে। এমন ফরমাস শুনলেই প্রথমটা মনে চমক লাগে। আমি তো 'অ্যাটম' যুগেই বাস করছি এবং তরুণদের সঙ্গে বসে চায়ে চুমুক দিতে দিতে স্বাধীন ভারতের অতি-আধুনিক সমস্যা নিয়ে দস্তুরমত মাথা ঘামাচ্ছি। সেকেলে কথা বলবার যোগ্যতা আমার আবার হয়েছে নাকি? পরক্ষণেই স্মরণ হয়, আমি যে ছেলেবেলায় কলকাতার দোকান থেকে কড়ির বিনিময়ে মুড়ি-ফুলুরি কিনেছি, একালের কয়জন লোক এমন জাঁক করতে পারেন?

হ্যাঁ, আমি জন্মেছি সেই যুগে, তার পরে যখন তামার পয়সার বদলে কড়ি ফেলেও কোন কোন জিনিস কেনা চলত। এই জন্যেই এখনো কড়ি না চললেও 'টাকাকড়ি' কথাটা অচল হয় নি। সুতরাং আমি যখন সচল কড়ির যুগে দুনিয়ায় প্রথম 'ট্যাঁ' শব্দ উচ্চারণ করেছি, তখন সেকেলে কথা বলতে পারব না কেন?

কিন্তু সেকেলে কথা আছে তো বিস্তর, একটি মাত্র নিবন্ধে তা বলবার চেষ্টা একেবারেই ব্যর্থ হবে, তাই সে চেষ্টা করব না। তবে সেকেলে সাহিত্যের বাজার থেকে দু-চারটে খবর এখানে দাখিল করলে মন্দ হবে না।

খুব সহজেই মনে পড়ে তখনকার এক বৈঠকের কথা। বোধ হচ্ছে ১৯১১ কি ১৯১২ খৃষ্টাব্দের কথা—সাহিত্যক্ষেত্রে তখনও "রামের সুমতি", "পথনির্দেশ" ও "বিন্দুর ছেলে" নিয়ে আত্মপ্রকাশ ক'রে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাজার সরগরম ক'রে তোলেন নি।

সেই সময়ে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে "জাহ্নবী" নামে একখানি ছোট মাসিক পত্রিকার কার্যালয় ছিল। অর্ধশতাব্দীরও কিছুকাল আগে প্রকাশিত স্বর্গীয় নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের দ্বারা সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা "জাহ্নবী"র সঙ্গে আমিও সংশ্লিষ্ট ছিলুম, এ "জাহ্নবী" সে "জাহ্নবী" নয়। নলিনীবাবুর পত্রিকা উঠে যাবার কয়েক বৎসর পরে সুধাকৃষ্ণ বাগচী নামক এক সাহিত্যিক ভেকধারী তরুণ ঐ "জাহ্নবী" নামেই একখানি নূতন পত্রিকা প্রকাশ করে, আমি তারই কথা বলছি। সেখানেই আমরা কয়জনে মিলে একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্য বৈঠকের পত্তন করি। সেই বৈঠকের কথা ভাবতেও আমার আনন্দ হয়, কারণ ওখানকার নিয়মিত সভ্যদের প্রত্যেকেই এখন সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও শিল্পের ক্ষেত্রে প্রভূত যশের অধিকারী হয়েছেন—যেমন আধুনালুপ্ত দৈনিক "ভারত" সম্পাদক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, "মিউনিসিপ্যাল গেজেটে"র প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীঅমল হোম, "মৌচাক" সম্পাদক শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, ঔপন্যাসিক শ্রীপ্রেমাংকুর আতর্থী ও চিত্রশিল্পী শ্রীচারুচন্দ্র রায়। আর সুরেন্দ্রনাথের "বেঙ্গলী" পত্রিকার সহকারী সম্পাদক পর্যন্ত হয়ে সরকারি চাকরি পেয়ে সাংবাদিকতার মায়ার বাঁধন ছেদন করেছেন। আরো কেউ কেউ আসতেন, তবে নিয়মিতভাবে নয়।

সে ছিল দিবাস্বপ্ন দেখার দিন। আমরা সকলেই স্বপ্ন দেখতুম—আর সে যে কত রকমের স্বপ্ন, তামাম দুনিয়াটাই কোথায় তলিয়ে যেত তার মধ্যে! অবশ্য তার মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করত সাহিত্য আর ললিতকলাই। কেবল বাংলা সাহিত্য নয়, তখনকার অতি-আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্য ও ললিতকলার আলোচনাও ছিল আমাদের প্রত্যেকের প্রধান আলোচ্য বিষয়। সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে উত্তেজিত উচ্চকণ্ঠে তর্কাতর্কি ও বাগাড়ম্বরও এমন গুরুতর হয়ে উঠত যে, পাড়া-প্রতিবেশী ও পথচারী পথিকরা পর্যন্ত সচকিত না হয়ে পারত না।

কিন্তু আমরা সাহিত্যিক কর্তব্য পালনের চেষ্টাও করতুম সর্বদাই। অন্ততঃ একটি চেষ্টার কথা উল্লেখযোগ্য। তা হচ্ছে আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে এদেশী জনসাধারণের পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়া।—আমি তো পরিণত বয়স পর্যন্ত এ কাজে কোন গাফিলতি করি নি।

কিন্তু আমাদের সেদিনকার সেই ছোট বৈঠকটি ছিল উত্তরকালের একটি প্রখ্যাত, অতুলনীয় ও সুবৃহৎ বৈঠকের বীজাঙ্কুরের মত। কারণ ধীরে ধীরে আমাদের সেই ছোট দলটি ধাপে ধাপে উপরে উঠে শেষটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, তারই একটি রেখাচিত্র দেওয়াই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

রবীন্দ্রনাথ তখন প্রায় একাই একশো হয়ে অশ্রান্তভাবে গান, কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক ও বিচিত্র সব প্রবন্ধ রচনা ক'রে সাহিত্যের সর্ববিভাগ পরিপূর্ণ ক'রে রেখেছেন। ছোটগল্পে প্রধান ছিলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর সঙ্গে দেখা দিয়েছেন তিন-চারজন উদীয়মান লেখক। আর ছিলেন তিন-চারজন উদীয়মান কবি। দ্বিজেন্দ্রলাল তখন হাসির গান ও কবিতা রচনা ছেড়ে থিয়েটারি নাটকের দিকে বেশী ঝুঁকে পড়েছেন—এদেশে যা বৈধ সাহিত্যের অন্তর্গত নয়। উপন্যাসের ক্ষেত্রে একজনমাত্রও উল্লেখযোগ্য লেখক ছিলেন না। কিন্তু আচম্বিতে বিনা মেঘে বৃষ্টির মত সেখানে আবির্ভূত হয়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সকলকে রীতিমত বিস্ময়-চকিত ক'রে তুললেন।

শরৎচন্দ্রের প্রথম কয়েকটি রচনা যখন ফণীন্দ্রনাথ পাল সম্পাদিত "যমুনা"য় প্রকাশিত হচ্ছে, সেই সময়েই (বোধ করি ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে) সম্পাদকের আহ্বানে আমিও ঐ পত্রিকায় যোগদান করি এবং অপ্রকাশ্যে পত্রিকা সম্পাদনার ভার পড়ে আমারই উপরে। সঙ্গে সঙ্গে "জাহ্নবী"র আর সকলেই সেখানকার (এখন যেখানে ডি রতন কোম্পানির ষ্টুডিয়ো) আসরে এসে হাজিরা দিতে সুরু করলেন এবং সেখানে দেখা গেল শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও কবি মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতির সঙ্গে আরোও কয়েকটি নূতন মুখ। কয়েক মাস যেতে না যেতেই সেখানে এসে দস্তুরমত আসর জাঁকিয়ে বসলেন রেঙ্গুন থেকে আগত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

তার অল্পদিন পরেই ঐখানেই খোলা হয় নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় ও পণ্ডিত অমূল্য বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকা "মর্মবাণী" (আমি ছিলুম তার সহকারী সম্পাদক)। দেখতে দেখতে সেখানে বৈঠকধারীদের দল আরো ভারি হয়ে উঠে, প্রায়ই আসরে এসে যোগ দিতে লাগলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, গল্প লেখক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু সাহিত্যিক।

তারপর মণিলাল "ভারতী" হাতে পেয়ে সুধীরচন্দ্র সরকার ও আমাকে জানালেন সাদর আমন্ত্রণ এবং আমরাও সদলবলে তাঁর আমন্ত্রণ রক্ষা করতে বিলম্ব করলুম না। তারপর "ভারতী"র সমৃদ্ধ আসরে সাহিত্যোৎসবের যে বিচিত্র অনুষ্ঠান দেখা যায় বাংলাদেশে আজও তা বিখ্যাত হয়ে আছে, কারণ সেখানকার বৈঠকধারীদের মধ্যে যাঁরা প্রাধান্য অর্জন করে ছিলেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁদের নাম চিরদিন লেখা থাকবে আগুনের অক্ষরে—যেমন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী ও দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি। মাসিক পত্রিকার কার্যালয়ে তেমন বৃহৎ সাহিত্যিক সম্মেলন এদেশে আর কখনো হয়েছে বলে শুনি নি। কিন্তু সে সম্মেলনে মাত্র তাঁরই প্রবেশাধিকার থাকত, যিনি রবীন্দ্রবিদ্বেষী নন।

এই হচ্ছে আমাদের ছোট দলের বিপুল পরিণতি।

স্তব্ধরাতে শুনিয়াছি তোমার বাঁশরী,
অন্ধকার ধরাবক্ষে ফিরিছে সঞ্চারি
অর্ধস্ফুট সুখস্বপনসম। বনে বনে
তাহার মেদুর সুর গোপনে গোপনে
উদ্বোধিয়া তুলিতেছে প্রাণ-চঞ্চলতা,
ফুলের হাসিতে প্রাতে শুনি সে বারতা।
কতমুগ্ধ স্বপনের তৃপ্তিহীন শেষে
অধীর হয়েছে প্রাণ সে সংগীত রেশে,
দুর্লভ বাসনা কত হয়েছে সফল।
শর্বরী পোহালে তবু মেলি আঁখিদল
আলোকের অহংকারে করি অপমান
স্তব্ধ রজনীর সেই সুগম্ভীর গান।

যে সুরে কুসুমকীর্ণ বনের অঞ্চল
মোদের অন্তর তাহে সন্দেহ চঞ্চল।

বিচিত্র সংলাপ

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

বিক্রমাদিত্য ॥ কালিদাস ॥

বিক্রমাদিত্য : কবিবর আমাকে আশ্রয়দান করো।

কালিদাস : একি মহারাজ যে! কিন্তু এ এমন পরিহাস, আমিই যে আপনার আশ্রিত।

বিক্রমাদিত্য : যেদিন আমি ছিলাম সিংহাসনে, তুমি ছিলে আমার রাজসভায় সেদিন ছিলে তুমি বটে আমার আশ্রিত।

কালিদাস : আর আজ?

বিক্রমাদিত্য : কোথায় সে সিংহাসন, কোথায় সে রাজসভা, কোথায় বা সেই গুপ্ত-সাম্রাজ্য!

কালিদাস : শ্রুতিতে স্মৃতিতে এবং ইতিহাসে।

বিক্রমাদিত্য : সেখানে যে সব উলট পালট হয়ে যায়।

কালিদাস : তা বটে, কখনো সপ্তর্ষিমণ্ডল মাথার উপরে কখনো দিগন্তের ধারে। কিন্তু মহারাজ আমার এমন কি সাধ্য আছে যে গুপ্তবংশ কুলতিলককে আশ্রয়দান করি।

বিক্রমাদিত্য : আজ যদি কারো সে সাধ্য থাকে তবে তা তোমারই আছে।

কালিদাস : সেই কথাই তো বুঝতে পারছি না।

বিক্রমাদিত্য : তবে বিস্তারিত বলি। যেদিন কিশোর কবি তুমি আমার সভাস্থলে এসে উপস্থিত হলে নবোদিত শরৎদ্বিতীয়ার চন্দ্রকলার মতো সেদিন সেই নিঃসঙ্গ শঙ্কাতুর কবিকে আমি কি সাদরে বরণ করে নিইনি? সেদিন কী বা ছিল তোমার পরিচয়, প্রতিভার অদৃশ্য স্বর্ণকিরীট ছাড়া।

কালিদাস : অদৃশ্যকে দেখতেও যে প্রতিভার আবশ্যক হয় মহারাজ।

বিক্রমাদিত্য : বিজ্ঞজনের প্রতিবাদ, প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব অগ্রাহ্য করেও কি তোমাকে সভাকবির পদ দান করিনি?

কালিদাস : মহারাজের সাহস সুবিদিত।

বিক্রমাদিত্য : সেদিন এই বলে গর্ববোধ করেছিলাম যে একজন নিরাশ্রয় কবিকে আশ্রয়দান করলাম।

কালিদাস : সে কথা কি সত্য নয় মহারাজ?

বিক্রমাদিত্য : কিন্তু তখন কি জানতাম যে এক সময়ে আশ্রিতের কাছেই আশ্রয় যাচ্ঞা করতে হবে?

কালিদাস : রাজরহস্য সাধারণ বুদ্ধির অগম্য।

বিক্রমাদিত্য : রাজরহস্য! আজ আমি রাজাও নই আর এ রহস্যও নয়।

কালিদাস : তবে এ বিদ্রূপ।

বিক্রমাদিত্য : বিদ্রূপই বটে তবে আমার নয় অদৃষ্টের।

কালিদাস : অদৃষ্ট সকলের চেয়ে বলবান সত্য কিন্তু কোথায় তার বিদ্রূপ।

বিক্রমাদিত্য : কোথায় নয়? সেদিন তুমি ছিলে যার আশ্রিত আজ সে তোমার আশ্রয় ভিখারী। এর চেয়ে নিদারুণ পরিহাস আর কি হতে পারে?

কালিদাস : মহারাজ এ পরিহাস অদৃষ্টের নয় বস্তুধর্মের।

বিক্রমাদিত্য : সে কেমন?

কালিদাস : তবে শ্রবণ করুন মহারাজ—পাথরের দুর্গ ভাঙলে আর জোড়া লাগে না, ছেলেরা বালু দিয়ে দুর্গ গড়ে, ভেঙে পড়বামাত্র আবার তোলে গড়ে।

বিক্রমাদিত্য : সে তো কতদিন দেখেছি শিপ্রাতীরে পরিভ্রমণ কালে।

কালিদাস : তবু তো বালুর দুর্গ বাঞ্ছনীয় নয়।

বিক্রমাদিত্য : নিশ্চয়ই নয়।

কালিদাস : একেবারে অতখানি জোর দিয়ে বলতে চাইনে; যুদ্ধ করতে হলে পাথরের দুর্গ গড়তে হবে বইকি। কিন্তু খেলা যার উদ্দেশ্য সে গড়বে বালুর দুর্গ।

বিক্রমাদিত্য : বুঝেছি কবিবর, তুমি বলতে চাও আমি গড়েছিলাম পাথরের দুর্গ।

কালিদাস : কারণ যুদ্ধ আপনার উদ্দেশ্য ছিল।

বিক্রমাদিত্য : আর তুমি গড়েছিলে বালুর দুর্গ।

কালিদাস : কারণ খেলা আমার উদ্দেশ্য ছিল। মহারাজ দুজনের লক্ষ্য যে স্বতন্ত্র।

বিক্রমাদিত্য : তবু কোন বিচিত্র নিয়মের বশে আমার পাথরের দুর্গ আজ ভগ্নস্তূপ আর তোমার বালুর দুর্গ চির অটুট।

কালিদাস : মহারাজ! মহাকালকে প্রতিস্পর্ধা করে আপনি দুর্গ গড়ে তুলেছিলেন, মহাকাল প্রত্যাঘাত করে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে তাকে।

বিক্রমাদিত্য : আর তুমি?

কালিদাস : মহাকালকে খেলায় আহ্বান করে আমি দুর্গ গড়েছিলাম, মহাকাল সযত্নে তা রক্ষা করেছে। এতে কৃতিত্ব অকৃতিত্বের তর্ক ওঠে না।

বিক্রমাদিত্য : হয়তো। কিন্তু যা নিশ্চিত তা হচ্ছে প্রস্তর দুর্গের সম্রাট আজ বালুর দুর্গের শিল্পীর কাছে প্রার্থী।

কালিদাস : কেন যে এমন হল নিজমুখেই তা ইসারায় বলেছেন।

বিক্রমাদিত্য : কখন?

(২৭৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

* উড়িষ্যার ভক্তকবি * মধুসূদন রাও-এর পত্রাবলী

দ্বিতীয়া কন্যা অবন্তী দেবীকে লিখিত।

কটক,
৩০।৪।১৯০১

মা আমার,

শত শত কথা মনে পড়িতেছে। কি লিখি! বোধ হয় ১৫ দিন হইয়া গিয়াছে তোমাকে পত্র লিখি নাই। কি যে লিখি ভাবিয়া পাই না। যাহা হউক, আজ ২।১টি কথা লিখিব।

আমরা ২০টি বৎসর মাত্র তোমার পিতামাতা ছিলাম। এখন নামেই পিতামাতা রহিলাম। তোমার অভাব বা প্রয়োজন বুঝার ভার আর আমাদের হাতে নাই। যখন ছিল, তখনও ভাল করিয়া বুঝি নাই। যে স্বামীর হাতে দিয়াছি, তিনি পরম স্নেহবান। যে নূতন পিতামাতা পাইয়াছ, তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ। তথাপি মন কেন ব্যাকুল হইতেছে বুঝিতে পারিতেছি না।

বাবা প্রিয়নাথ বিদেশে; তোমরা মিলিত হওয়ার পরই পরস্পর হইতে দূরে দূরে থাকিতে হইতেছে। তোমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী রুগ্ন, শ্বশুর মহাশয় ভোলা মহাদেবের মত উদাসীন। তোমাদের নিজের বাড়ী নাই। তোমার শরীর দুর্বল, আর তুমি ত অবোধ বালিকামাত্র, অনেক গুরু কার্যভার তোমার উপর পড়িয়াছে। তুমি এই সব সামলাইয়া কি করিয়া প্রসন্ন হইয়া থাকিবে। আমার মনে বার বার এই সব চিন্তা উঠিতেছে। কিন্তু আমার একান্ত আশা এবং বিশ্বাস যে, তুমি প্রভুর চরণে নির্ভর রাখিয়া সকল পরীক্ষা সকল ক্লেশের মধ্যে প্রসন্নতা রক্ষা করিতে পারিবে।

* * * *

শান্তির নিকট লিখিত তোমার পত্র এইমাত্র আসিল। বিধাতার কৃপায় তুমি তোমার দায়িত্ব এত সুন্দরভাবে বুঝিতে পারিতেছ দেখিয়া ধন্য হইলাম। প্রভু তোমাদের দুইজনকে নিরন্তর রক্ষা করুন। ইতি—

তোমার বাবা

দ্বিতীয়া কন্যা অবন্তী দেবীকে তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী প্রসন্নময়ী দেবীর মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া লিখিত।

৭।৬।১৯০১

মা আমার,

দুইটি মাস মাত্র; কিন্তু মা তোর জীবনের এই দুইটি মাস কি মহাশিক্ষায় পরিপূর্ণ। বধূ-জীবনের আরম্ভেই বিধাতা, তোকে সুখ-দুঃখ, ভয়-ভাবনার ভিতর দিয়া, মৃত্যুর অতীত প্রেমানন্দ-ধামের অমৃত রহস্যময় বার্তা জানাইতেছেন। তোর শ্বশ্রূদেবীকে কি তুই একেবারে হারাইয়াছিস্? না মা, ঐ যে তাঁর প্রসন্নময়ী স্বরূপ কেমন সুন্দর প্রসন্নভাবে তোমাদের উপর পবিত্র স্নেহাশীর্বাদ বর্ষণ করিতেছে। তোমরা তাঁর পুত্র এবং পুত্রবধূ, তাঁকে দেবাদিদেবের ভিতর নিত্য দর্শন করিতে শিক্ষা কর এবং তাঁহার জীবনের মাধুরী আস্বাদ করিয়া লও।

মা, এ-প্রাণ আমার চিরদিন প্রেমের ভিখারী, তোর শ্বশুরদেবের হৃদয়ের প্রেম-বিভব দেখিয়াই আমি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি। আগে জানিতাম না যে, তোর শ্বশ্রূদেবীও নিজ পতির মত প্রেমে আত্মহারা। পরে বুঝিতে পারিয়াছি, তিনি কি রত্ন ছিলেন। হায়, এমন সম্বন্ধিনীর সঙ্গে বিধাতার কৃপায় সম্বন্ধ হইয়াও তাঁহার স্নেহাদর সম্ভোগ করিতে পারিলাম না! ইহ-পরলোকের পরম দেবতা পরলোকগতা দেবীর পুণ্য প্রভাব আমাদের জীবনে বিশেষভাবে নিত্য বিস্তার করুন।

মা, এই কদিন তোর শ্বশুরদেবের কথা বার বার মনে পড়িতেছে। তাঁহার হৃদয়ের ভিতরে এই ঘটনায় কি আন্দোলন-প্রবাহ চলিতেছে, তাহা কে জানিবে! এ সময়ে নীরবে তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। এ-সংসারে এরূপ ইচ্ছা সচরাচর পূর্ণ হয় না। কল্পনার চক্ষে তাঁহার কাছে বসিয়া তাঁহাকে স্বর্গীয় আশ্বাসে আশ্বস্ত দেখিতে পাইতেছি। আমার হইয়া তুমি এ-সময়ে নীরবে সসংকোচে তাঁর পদতলে বসিয়া জীবনকে গম্ভীর করিয়া লও।

বাবা প্রিয়নাথ তাঁহার মায়ের প্রতি কেমন ভক্তিমান, তাহা আমি তাঁহার পত্রগুলি হইতে বুঝিতে পারিতেছি। আহা, তাঁর মা তাঁহাকে দেখিবার জন্য কেমন ব্যাকুল ছিলেন! পুত্রকে বিবাহিত দেখিবেন বলিয়া বহুকাল অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার সেই চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবামাত্র যেন চলিয়া গেলেন। মা, তোমাকে পাইয়া তিনি যে মনের মত পুত্রবধূ পাইয়াছিলেন, ইহা আমি জানিতে পারিয়া ধন্য হইয়াছি! এখন তোমাদের উভয়ের সম্মিলিত জীবন তোমাদের শ্বশুরকুলের উপযুক্ত হউক, তোমাদের মা স্বর্গ হইতে তোমাদের উপর আশীর্বাদকুসুম বর্ষণ করুন।

তোমাদের হেমদিদি পিতামাতার উপযুক্ত সন্তান বটেন। পিতামাতার প্রতি এমন স্নেহভক্তি-ময়ী কন্যা আমি আর দেখি নাই। আশা করি, তুমি তাঁহাকে বিশেষভাবে স্নেহভক্তি কর, তাঁর মত ননদ থাকিতে তুমি পতিগৃহে আপনাকে মাতৃহীনা মনে করিবে না। তোমাদের সম্বন্ধে তিনি অনেক পরিমাণে তাঁর মায়ের স্থান পূর্ণ করিতে পারিবেন—এই আমার বিশ্বাস।

মা, আমার শরীর ভাল নাই। আবার উদরাময় দেখা দিয়াছে। আজ এই পর্যন্ত। কল্য বাবা প্রিয়নাথকে পত্র লিখিব মনে করিয়াছি। তোমার শ্বশুরদেবকে আমার প্রণাম এবং মা হেমলতা প্রভৃতিকে আমার স্নেহাশীর্বাদ জানাইতেছি। ইতি—

শ্রীমধুসূদন

পরবর্তী পত্র তিনখানি মধুসূদনের জ্যেষ্ঠ জামাতা সুকবি ও সুপণ্ডিত বিজয়চন্দ্র মজুমদারকে লিখিত।

কটক
৩১।৪।০৩

ওঁ

কটক

প্রাণাধিকেষু,

আশা করি বামন (১) এবং হেমাঙ্গিনী সেখানে গিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইতে পারিয়াছেন এবং হেমাঙ্গিনী সেখানে কিছুকাল থাকিলে তাহার শরীরের অবস্থাও ভাল হইবে।...

"যযাতি কেশরী" প্রবন্ধে যে তিনখানি তাম্র-লিপির উল্লেখ আছে তাহার প্রতিলিপি কাহারও হাতে লিখিয়া পাঠাইলে উপকৃত হইব। শিব গুপ্ত কি মগধের রাজা ছিলেন? দক্ষিণ কোশল কোন দেশ? ভারতে অনেকগুলি অন্ততঃ দুইটি গুপ্ত বংশের রাজগণ রাজত্ব করিতেন, ইঁহাদের মধ্যে শিব গুপ্ত কোন্ বংশের রাজা? যযাতি কেশরী প্রবন্ধের সিদ্ধান্ত আমি এখনও গ্রহণ করিতে পারি নাই। এ বিষয়ে আরও পুস্তকাদি পড়িতে হইবে। সেগুলির নামোল্লেখ করিয়া দিলে সুখী হইব। 'বিষ্ণুপুরাণ' আর অধিক দিন রাখিবার প্রয়োজন আছে কি? যদি না থাকে তাহা হইলে রেলওয়ে পার্সেলে পাঠাইয়া দিলে ভাল হয়।

শুনিলাম ব্যবসার দিকে সমুচিত দৃষ্টি নাই, তাই পূর্বাপেক্ষা আয় কমিয়া যাইতেছে। সাহিত্য-চর্চার আকর্ষণ ব্যবসার আকর্ষণ অপেক্ষা বলবত্তর হওয়া ক্ষোভের বিষয় নহে, কিন্তু ব্যবসায়ের দৃষ্টি দাওয়া যাহা, তাহা তাহাকে না দেওয়াও ঠিক নয়। যদি আমার অনুমান ঠিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে সাহিত্য ও ব্যবসায় উভয়ের দিকে যথাযথ দৃষ্টি রাখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। সাহিত্যের দিকে আমার আকর্ষণ থাকিলেও আমি সংসারের জন্য দোষে সে আকর্ষণ এড়াইতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু তজ্জন্য অনেক সময় বিলাপ না করিয়া থাকিতে পারি না ...

এবার পূজার ছুটিতে সপরিবারে সম্বলপুর যাইব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, জয়ন্তও সেখানে যাইবার জন্য একান্ত ব্যাকুল। কিন্তু এখন টাকার সম্বন্ধে বড়ই টানাটানি উপস্থিত সুতরাং বড়দিনের ছুটি পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত মনে করিতেছি।

মঙ্গলময় তোমাদিগকে নিরন্তর রক্ষা করুন।

শ্রীমধুসূদন

(১) বিজয়চন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বামনদাস মজুমদার মধুসূদনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কটক টেকনিক্যাল হাই স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যু ঘটায় বামনদাস বাবু, শোকাতুরা স্ত্রীকে লইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট সম্বলপুরে গমন করেন।

কটক
১০।১০।০৪

ওঁ

কটক

প্রাণাধিকেষু বাবা,—

'যজ্ঞভস্ম' (ক) ও 'ফুলশর' (খ) পাইয়াছি এবং যাহাকে যাহাকে দিবার নির্দেশ ছিল, তাহাদিগকে দিয়াছি। কেবল একখানি "ফুলশর" এখনো দেওয়া হয় নাই। মনে করিতেছি তাহা যোগেশ বাবুকে (১) দিব এবং আমার জন্য যেখানি আসিয়াছে, তাহা পড়িয়া সমালোচনার্থ বিশ্বনাথকে (২) দিব। আমি এখনও সব কবিতাগুলি পড়ি নাই। "প্রেমবিকাশ" প্রধানতঃ স্পেকুলেশনের ফল। কবির হৃদয়ের উচ্ছ্বাস তাহাতে স্থানে স্থানে থাকিলেও বিচার বিতর্কের সংক্রমণে প্রকৃত কবিত্ব কিয়ৎ পরিমাণে বিঘ্নিত হইয়াছে। কিন্তু নূতনত্ব হিসাবে বঙ্গ-সাহিত্যে প্রেমবিকাশ এবং যুগপদ্ধতির স্থান গৌরবযুক্ত হইবেই হইবে। কবি-ভারতীর প্রত্যেক কবিতাই কবি-ভারতীর উপযুক্ত হইয়াছে। আমি সেইগুলি দুইবার পড়িয়াছি। তবুও হৃদয় আবার পড়িতে চায়। 'সুরলাসিকা" নামের সার্থকতা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু তাহাতে কবি-কল্পনার যে বিদগ্ধ-বিলাস প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মাধুরী আস্বাদন করিয়া সুখী হইলাম। অন্যান্য কবিতা-গুলি শীঘ্রই পড়িব।

বাসন্ডার রাজা এখানে ৩।৪ ঘণ্টা মাত্র ছিলেন।......

(শেষাংশ ২৮৮ পৃষ্ঠায়)

প্রথম জানতে পেরেই মৃণালিনী রিনির নাক আর মুখ খামচে ধরে প্রাণপণ শক্তিতে নেড়ে দিয়েছিলেন। তারপর দাঁতে-দাঁত ঘষে দুই হাতের আঙ্গুল দিয়ে মেয়ের দুই গাল টেনে ছিঁড়ে ফেলবার যোগাড় করেছিলেন। নরম চামড়ার উপর নখ বসে গিয়েছিল। রান্নাঘরের কাদড়াবার কথাটা মনে পড়েনি। রান্নাঘরের দেয়ালে মেয়ের মাথা ঠুকে দিয়েই শোবার ঘরের দিকে ভয়ে তাকিয়েছিলেন—অন্য ছেলেমেয়েরা শুনে ফেলল বুঝি শব্দটা। এরই ভয়ে চটাপট মারেননি, চেঁচিয়ে গালাগাল দেননি, হাউ-হাউ করে কাঁদেননি। মেয়েটাও কাঁদেনি; ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

'এখন আমি কি করি এই মেয়েকে নিয়ে!' কপালকে অভিশাপ দেবার এই তাঁর নিজস্ব ভঙ্গী। ভয়-পাওয়া ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলায় বলা। কিছু ভেবে বলা নয়; আপনা থেকে বেরিয়ে এসেছিল কথাটা।

বিপদে দিশেহারা হবার মেয়ে তিনি নন। আপদ-বিপদ তাঁর চিরদিনের সাথী। ওই তো স্বামী। সংসারের ঝড়ঝাপ্টা সামলাবার ভার যে তাঁর একার উপর সে কথা মৃণালিনী জানেন। অভাবের সংসার। কাজেই বিপদ-আপদেরও অভাব নাই। একা সামলাতে সামলাতে এখন নিজের উপর একটা বিশ্বাস এসে গিয়েছে।

......বিপদ আসে, আবার কেটেও যায়। ভগবান আছেন! কিন্তু এ বিপদটা যে অন্য রকমের! এর কথা যে বলা যায় না কারও কাছে। বলা যায় এক শুধু রিনির বাবার কাছে, কিন্তু সেখানে বলাও যা, না বলাও তাই! শুনে হাঁও বলবে না, না-ও বলবে না—মুখের কথার যে দাম আছে—ছাতাটা নিয়ে সিগারেট টানতে টানতে বেরিয়ে যাবে! ছেলেমেয়েরা যে আমার একার—তার তো নয়!......মাইনের পঁচাশি টাকা মাস পয়লা এসে হয়তো তুলে দেওয়া ছাড়া, আর কোন সম্বন্ধ নাই এ সংসারের সঙ্গে! বাড়ীর কেউ অসুখ হয়ে মরল কিনা, আজকে হাঁড়ি চড়ল কিনা—কোন কিছু জানবার প্রয়োজন নাই! শুধু নিজের দরকারের জিনিষগুলো হাতের কাছে পাওয়া চাই। তা হলেই হল!......আর এ বিষয়টাতে তো সে আরও বেশী চুপ করে থাকবে। মুখ ফুটে বলবে না, কিন্তু চুপ করে থেকে বুঝিয়ে দেবে যে, গানের মাষ্টার নিতাইকে রেখেছিলে যখন তুমি, তখন এ বিষয়ে দায়িত্বও তোমার; যা উচিত বোঝ কর।......এই কি বাড়ীর কর্তার উপযুক্ত কথা?......

এর জবাব ইচ্ছা করলে মৃণালিনীও দিতে পারেন। গানের মাষ্টারকে প্রথম এ বাড়ীতে ধরে এনেছিলেন বাড়ীর কর্তা নিজে। কীর্তন শোনবার জন্য। মৃণালিনীর স্বামী প্রতি অমাবস্যার রাত্রিটা কালীবাড়ীতে কাটান। বলেন তো পূজা করতে যান; কি করেন তিনিই জানেন; তাঁর একটা কথাও মৃণালিনী বিশ্বাস করেন না। কালীবাড়ী থেকেই নিতাইকে ধরে এনে বলেছিলেন—চাকরির চেষ্টায় এখানে নতুন এসেছে ছেলেটা। চমৎকার গান গায়। ভাল ছেলে। চাকরির জন্য ধরেছে। পেন্সনের মুখে সাহেবকে বললে সাহেব কি সে অনুরোধ ঠেলতে পারবেন! হয়েই যাবে একটা ছোটখাটো চাকরি।

স্ত্রীর ধারণা স্বামী নিতাই-এর কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন সাহেবকে ঘুষ খাওয়াবার নাম করে।

...তোমাকে চিনতে তো আমার বাকি নেই। নইলে ছোঁড়াটা অমন করে আঁকড়ে তোমাকে ধরবেই বা কেন? তুমিই বা তাকে বাড়ীতে খাতির করে এনে চা খাওয়াতে যাবে কেন? কোন কাজ তো তুমি সোজা করে করতে জান না; সব নাক ঘুরিয়ে। ভাবো অন্য সবাই বোকা।......কি ভেবে কি করেছ তা তুমিই জান। আমি পরের বাড়ীর মেয়ে— আমার কাছে বাড়ীর কোন কথা বলতে তোমার কোষ্ঠীতে বাধে। আমার দোষের মধ্যে, আমি ভাবলাম— মেয়েটাকে স্কুলেও দিলে না, লেখাপড়াও শেখালে না; যদি একটু গান-বাজনা শেখে, তাহলে হয়ত বিয়ের বাজারে একটু সুবিধা হতে পারে।...সে সব করতে তো হবে আমাকেই! আর পেন্সনের সময় তো কবে হয়ে গিয়েছে—দয়া করে এখনও চাকরিতে রেখেছে—তাই!'

রিনির পর আরও তিনটি মেয়ে আছে যে! আর রিনির দিদি রাধাকেই বা বাদ দিই কি করে। নাই বা হল সে নিজের পেটের মেয়ে, থাকলই বা সে তার চাকরে দাদাদের কাছে, তবু এখানে পাড়ার লোকে আমাকে যে রাধার মা বলেই ডাকে। রাধার বিয়ের চেষ্টাই তো আগে করা উচিত।......

চেষ্টা করেওছিলেন মৃণালিনী। স্বামীকে কত খুঁচিয়েছেন এ নিয়ে। রাধার দাদারা কতবার বাবাকে চিঠি দিয়েছে বোনের বিয়ের সম্বন্ধে। বোনের বিয়ের খরচ তারাই দেবে; তারাই পাত্রের সন্ধান দেবে; তারাই সব করবে; বাবাকে শুধু সঙ্গে থাকতে বলে। তারা চেনে তো তাদের বাবাকে। হয়ত মেয়ের বিয়ের সময় যাবেই না। পাত্রের খোঁজ করতে বেরুলেই বরপক্ষ মেয়ের বাপের কথা জিজ্ঞাসা করে। মেয়ের বাপ যদি চিঠিখানা পর্যন্ত না দেয় বরপক্ষকে তাহলে কি কেউ চায় সে রকম বাড়ীর মেয়ে নিতে?

......মাঝ থেকে নিমিত্তের ভাগী হলাম আমি! ছেলেরা বিশ্বাস করবে না হয়ত, কিন্তু ভগবান সাক্ষী, আমি কতদিন তাদের বাবাকে রাধার বিয়ের খোঁজে বেরুতে বলেছি। বাবা গায়ে মাখে তবে তো। ছাতাটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া হল রাজকার্যে! এই এক ধরণের মানুষ! হচ্ছে হবে—না হলেই বা কি আসে যায়, এমনি একটা ভাব। আর আমি যে খুব দায়-সারা ভাবে তাগিদ দিয়েছি তা-ও না। আমারও স্বার্থ ছিল যে। রাধার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত

তো রিনির বিয়ের কথাটা তুলতে পারি না তাদের বাপের কাছে। কালেক্টর সাহেবের নাজির তাদেব বাপ। চাকরিতে থাকতে থাকতে রিনির বিয়েটা কোন রকমে দিয়ে দিতে পারলে সুবিধা হত। লোকজন, আরদালী, চাপরাসী, দইটা, মাছটা সব নাজিরের হাতের মধ্যে। কিন্তু পেন্সন নেবার পর আগেকার নাজিরকে কে পুছবে! আর পাড়াপড়শীর মধ্যে যে সুনাম! পাড়ার কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে কোনদিন মেলামেশা আছে রিনির বাবার! ভিন-পাড়ার যত সব ছোটলোকদের সঙ্গে মেলামেশা চলাফেরা। পাড়ার লোকে কত কি কানাঘুষো করে—কানে তো সবই আসে।......

সেই মানুষের কাছেই বলতে হল মুখপুড়ী রিনির এখনকার বিপদের কথাটা। সন্ধ্যার সময় নাজিরবাবু অফিস থেকে বাড়ী ফেরেন। এসে মুখে কিছু পড়ল কি না পড়ল, তখনি বাড়ী থেকে বেরুনে চাই। কারও কোন কথা শোনবার ফুরসত তখন তাঁর থাকে না। তবু মৃণালিনী এক মুহূর্তও দেরী করতে চাননি এ রকম ব্যাপারে। এমন একটা খবর নিজের মেয়ের সম্বন্ধে; কিন্তু নাজিরবাবুর মুখ দেখে বোঝা গেল না তিনি রাগ করলেন, আশ্চর্য হলেন বা দুঃখ পেলেন হঠাৎ কথাটা শুনে। স্ত্রী বলছেন তখনই গানের মাষ্টারকে গিয়ে ধরতে—আর ভাল কথা বলে হ'ক, কেঁদেকেটে হ'ক, মারধর করে হ'ক, ভয় দেখিয়ে হ'ক, যেমন করে হ'ক, রিনির সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দিতে। রিনির বাবা শুধু বললেন, 'দেখা যাক।' তারপর ছাতাটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যার সময় বেরুনো; আকাশে মেঘ নাই; তবু ছাতা নেওয়া তাঁর চাই-ই চাই। ছাতাটা মৃণালিনীর দু চক্ষের বিষ। শীতের সময় খাঁদুরে টুপি, ফাগুন-চোতে সুতীর চাদর, অন্য সময় ছাতা—এ না হলে নাজিরবাবুর চলে না। লোকে বলে সময়ে অসময়ে মুখ লুকোবার দরকার পড়লে, এ জিনিষগুলো কাজে দেয়। সত্য কি মিথ্যা ভগবান জানেন। তবে পাড়ার শুভাকাঙ্ক্ষিণীদের দৌলতে এই খবরটা মৃণালিনীরও অজানা নয়।

......'দেখা যাক।' কথার ধরণ দেখ! দেখবে যা সে তো জানা! বাড়ীর অন্য সব জিনিষও যে রকম দেখছ, এটাকেও সেই রকমই দেখবে! এমন লোক সন্তানের বাপ হয় কেন?

যাক, নিতাইকে ডাকিয়ে আনতে হয়নি। অন্য দিনের মত সন্ধ্যাবেলায় নিজে থেকেই এসেছিল। তাকে যতটা খারাপ ভাবতেন, ততটা খারাপ লোক সে নয়। কান্নাকাটি করে সব কথা তাকে বুঝিয়ে বলতেই সে রাজী হয়ে গিয়েছিল।

—যেদিন বলবেন সেই দিনই। আমি নিজেই দুই-একদিনের মধ্যে কথাটা বলব মনে করছিলাম রিনার বাবার কাছে।'

সম্ভব হলে উচিত ছিল সেই রাত্রিতেই বিয়ে দেওয়া; কিন্তু সব উচিত কাজ কি করতে পারা যায়? নানান দিককার নানান জিনিষের কথা ভেবে, তবে কাজ করতে হয়। লোকের নজরে যত কম পড়ে, ততই ভাল। পাঁজি দেখা হল। ভাগ্যক্রমে, ছয়দিন পরে শ্রাবণ মাসের মধ্যেই দিন ছিল। ঠিক হয়ে গেল বিয়ে। সমস্যা কি শুধু একটা। পাড়ার লোকের কত রকমের প্রশ্নের জবাব দিতে হয়; কিন্তু সব চেয়ে বড় জবাবদিহি রাধার কাছে, আর রাধার দাদাদের কাছে। রিনির বাবা স্ত্রীকে বলেন,—'দরকার কি তাদের খবর দিয়ে?'

দরকার তাদের, না দরকার আমার। সতীনপোরা কোনদিন ভাল ব্যবহারও করেনি, মন্দ ব্যবহারও করেনি আমার সঙ্গে। ওই এক রকম আলগা আলগা এড়িয়ে এড়িয়ে থাকা। মনের মিল না থাকুক, লোক-দেখান বাইরের সৌষ্ঠব খানিকটা রাখতে হয়ই, এ সংসারে থাকতে গেলে। রাধাকে আসতে লেখা যায় না তার ছোট বোনের বিয়েতে। তবে তার দাদাদের আসতে লিখতেই হয়। চিঠি পেয়ে নিশ্চয় তারা চটে উঠবে। তাদের সাহোদর বোন বড়; সে রইল পড়ে; তার বিয়ের খোঁজে বাপ একখানা চিঠি লিখে পর্যন্ত উপকার করে না; আর তাদের ছোট বোনের বিয়ের উদ্যোগ সাত তাড়াতাড়ি করছে সৎমা'র কথায়! আমার হাতে লেখা চিঠি পেলে তো চটবে আরও বেশী।......

তাই মৃণালিনী স্বামীকে দিয়ে চিঠি লিখিয়েছিলেন ছেলেদের। তিনি জানতেন ছেলেরা আসবে না এ বিয়েতে। তবে মনের মধ্যে ক্ষীণ আশা ছিল যে, রিনিকে দেবার জন্য কিছু টাকা বোধ হয় পাঠিয়ে দেবে। ছয়দিন পরে বিয়ের দিন স্থির করবার কারণগুলোর মধ্যে এটাও একটা ছিল।

মেয়ের বিয়ে দিতে সবাই সময় চায়। জোগাড়-যাগাড়, কেনা-কাটা, আনা-নেওয়া, কত রকমের কত কিছু আছে তো! এ ছাই-এর বিয়েতে হাতের ছয় দিনের সময় যেন কাটতে চায় না। ছোঁড়াটা ছ' দিনের সময় পেয়ে আবার না পালায় এরই মধ্যে। মত বদলাতে কতক্ষণ! আর সুপরামর্শ দেবার লোকেরও অভাব হবে না পাড়ায়। চব্বিশ ঘন্টা ভগবানকে বলি— হে ভগবান ও যেন না পালায়! কোন রকমে বিয়েটা নমো নমো করে হয়ে গেলে, গলার কাঁটা নামে। কাঁটা বলে কাঁটা! একমাত্র ভরসা যে চাকরি পাবার লোভে যদি না পালায়। নিতাই বলে তো যে তার মা, বাবা আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। সত্যি-মিথ্যে ভগবান জানেন। তিনকুলে কেউ নাই এমন লোকও হয় নাকি পৃথিবীতে কে জানে!......

'এখন তো নিতাই আমাদেরই হয়ে গেল। এবার সত্যি করে চেষ্টা কর ওর চাকরির জন্য।'

'সত্যি করে' কথাটা মুখ থেকে অসংযত মুহূর্তে বেরিয়ে যেতেই ভয়ে কেঁপে উঠেছে তাঁর বুক। স্বামীর কাছে স্পষ্ট কথা বলবার সাহস তিনি কোনদিন পাননি। গরীব বিধবার মেয়ে তিনি। দোজবরে বুড়োর সঙ্গে মেয়েব বিয়ে দিতে পেরে বিধবা কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিলেন। আর সেই প্রথম দিন থেকেই, অত বড় চেহারার গম্ভীর প্রকৃতির প্রৌঢ় লোকটির সঙ্গে মৃণালিনীর যে সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিল, সেটা ভয়ের।

স্বামী বলেন,—'দেখা যাক।'

তবু ভাল যে চটে ওঠেননি।

বাড়ীর কর্তার কাছ থেকে রিনির বিয়ের জন্য এক টাকাও যে পাওয়া যাবে না একথা মৃণালিনীর জানা। ধার রিনির বাবাকে কেউ দেবে না—এমনই তাঁর সুনাম বাজারে। পাড়ার লোক আর অফিসের আরদালীদের মুখে শোনা যে নাজিরের চাকরিতে উপরি রোজগার বেশ আছে। আছে ঠিকই; কিন্তু মাইনের পঁচাশি টাকার অতিরিক্ত এক পয়সাও স্ত্রী কখনও স্বামীর কাছ থেকে পাননি। উপরি রোজগারের টাকা কিসে খরচ করেন তিনিই জানেন। সে কথা জিজ্ঞাসা করবার সাহস কোনদিন মৃণালিনীর হয়নি। এখন দরকার টাকার। যতই সংক্ষেপে সারবার চেষ্টা কর, কিছু খরচ তো করতেই হয় বিয়েতে। মেয়ে জামাইকে কিছু না দিলে কি চলে? তাঁর সম্বলের মধ্যে আছে দুখান গয়না। একটা বিছে হার আর একজোড়া বালা। বেশ ভারী। বিয়ের সময় স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া। অতি সাবধানে এতদিন বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। সে দুটোকে স্বামীর হাতে দিয়ে, বিক্রী করে দিতে বললেন। নাজিরবাবু গয়না দুটোকে পকেটে পুরে ছাতা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, ভাল লাগে না তার এত সব বাড়ীর ঝামেলা।

সতীনের ব্যবহার করা জিনিষ গয়না দুটো। এতকাল সংকল্প ছিল এই দিয়ে রাধার বিয়ের সময় গয়না গাড়িয়ে দেবে।—তার মায়েরই জিনিষ। লোকে যা সংকল্প করে তা কি রাখতে পারে! এ তো আবার আমার মত মানুষ নিয়ে কথা! যখন যা ভেবে রেখেছি, ঠিক তার উল্টোটি হয়েছে; যা ধরেছি ফসকে গিয়েছে! সারা জীবন এই রকম গেল! দেখে দেখে দেখে আজকাল কোন বিষয় আগে থেকে ভেবে ঠিক করে রাখা ছেড়ে দিয়েছি। আমার মত অবস্থার লোকের ওসব বাড়াবাড়ি সাজে না। কত পাপই যে করেছিলাম আগের জন্মে! রাধার তবু দাদারা আছে। রিনির কে আছে, দেবার মত? সবাই থেকেও কেউ নাই! এখন এই গয়না বিক্রীর টাকাটাও হাতে পেলে হয়। কিছু বিশ্বাস নাই রিনির বাবাকে! আর এদিকে, পাড়ার লোকে যে জ্বালাতন করে খেল। রসিয়ে রসিয়ে, বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কত রকমের যে কথা জিজ্ঞাসা করে! হঠাৎ বিয়ে? বড় তাড়াতাড়ি বিয়ে? রেজিস্টারী করে বিয়ে নাকি? বড় আনন্দের কথা, আজকাল তো এরকম হয়েইছে। রাধা আসবে না? বিয়ের পর মেয়ে জামাই এখানেই থাকবে নাকি রাধার মা? আরও কত কথা। যত পার বলে যাও! কানে গুঁজেছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো। গায়ে মাখি না। বুঝেও বুঝি না। ন্যাকা ন্যাকা প্রশ্নের ন্যাকা ন্যাকা উত্তর দিই। তারা মুচকে হাসলে, হো হো করে হেসে সায় দিই।......

যাক্—বিয়েটা ভালয় ভালয় হয়ে গেল। নিতাই পালায়নি। গয়না-বেচা টাকাটা যতদূর সম্ভব পুরোই হাতে এসেছিল। সবই ভগবানের আশীর্বাদ। ভরা শ্রাবণ মাসে বৃষ্টিটা পর্যন্ত হয়নি সেদিন। শুধু একটা বিষয়ে একটু গোলমাল হয়ে গেল। ছেলেরা আসেনি। টাকা পাঠায়নি। চিঠির জবাব পর্যন্ত দেয়নি। বাপ আর ছেলেদের মধ্যের চাপা মনোমালিন্যটা একটু পাকাপাকি গোছের হয়ে গেল এই থেকে। তারা জীবনে আর কখন চিঠি দেবে কিনা এ সম্বন্ধে মৃণালিনীর সন্দেহ আছে। বুড়ো বরের সঙ্গে বিয়ে হবার সময় থেকে ভবিষ্যতের ভয়টা তাঁর বেশ প্রবল। নিজের এতগুলি ছেলেমেয়ে। দুঃসময়ের ভরসা ছিল সতীনপোরা এতদিন পর্যন্ত। কিন্তু সে সব শেষ হয়ে গেল ওই মুখপুড়ী রিনিটার জন্য।

স্ত্রীর অনুরোধে বাড়ীর কর্তা অফিস থেকে

(শেষাংশ ২৮১ পৃষ্ঠায়)

বিছানায় শুয়ে একখানা বই পড়ছিলাম, বাংলা গল্পের বই। নায়ক-নায়িকার মধ্যে কলহ শুরু হয়ে গেছে বিয়ের কিছুকাল পরেই।

মন বই থেকে অন্যত্র সরে গেল। ভাবলাম এর পরেই নিশ্চয় বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপার ঘটবে।

কিন্তু মনের জাহাজখানা বিবাহ বিচ্ছেদের সংকীর্ণ বিন্দুতেও নোঙর ফেলতে রাজি হল না, ভেসে চলল আপন খেয়ালে। বন্ধন-মুক্তির গোনার কথা মনে এলো। পৃথিবীর সমস্ত দেশে মানুষ নিজ হাতে নিজের বন্ধন রচনা করেছে এবং সেই নিজের রচা বাঁধন নিজেই ছিঁড়ে যাবার জন্যও ঠিক একই রকম চেষ্টা করেছে। মন্ত্রতন্ত্র, নরকের ভয়, স্বর্গের লোভ, তোতেম, টাবু—কৃত্রিম বন্ধন রচনার কত শত আয়োজন।

ভববন্ধন থেকে মুক্তি কথাটাও তো আমাদেরই। জীবনটাই বন্ধন, এ বাঁধন ছিঁড়ে কোনো রকমে পালাতে পারলে বাঁচি, এমন কথা আমরা অনেকদিন বিশ্বাস করেছি, এখনো অনেকে বিশ্বাস করি। পাছে ভুলে যাই এজন্য শাস্ত্রকারেরা তৎপর ছিলেন। গঙ্গাতীরবাসী আর্য ঋষিরা গঙ্গাকেই ভববন্ধন থেকে মুক্তির একটা মধ্যপথরূপে কল্পনা করে গেছেন। "তব চেন্মাতঃ স্রোতঃ স্নাতঃ, পুনরপি জঠরে কোঽপি ন জাতঃ।"

কিন্তু আমি ঠিক এই ভয়ে আজ পর্যন্ত গঙ্গা স্নান করিনি, কি জানি যদি কথাটা সত্যি হয়। পৃথিবীর মায়া কাটানো আমার পছন্দ নয়, এখনও শুধু বন্ধনের পর বন্ধন পরে চলেছি। এ পৃথিবীতে পুনরপি ফিরে না আসা দূরে থাক, আমার ইচ্ছা যে আমি বার বার এখানেই ফিরে আসি—এমনকি দুঃখের জীবনের ভাঙা ঘরে থাকা সত্ত্বেও। এবং ফিরে এসে এক জীবনে না হয়, দশ বারোটা জীবনেও যদি পারি তবে দক্ষিণ কলকাতায় সামান্য জমি কিনতে চাই। তারপর আরও কয়েক জন্ম পরে তার উপর বাড়ি তোলার বাসনা।

অ্যাম্বিশন বেশি নয় বলছেন? কিন্তু কম বা বেশি সবই আপেক্ষিক। একের পক্ষে যা কম, অন্যের পক্ষে তা বেশি। যাঁরা আর এ পৃথিবীতে ফিরবেন না বলে নিয়মিত চেষ্টা করছেন, তাঁদের এ কাজে আমি রীতিমতো উস্কানি দিয়ে থাকি। তার মানে ভবিষ্যতে ওঁদের সঙ্গে আর যাতে কোনো বিষয়ে প্রতিযোগিতা করতে না হয় সেই আমার কাম্য। যাঁরা অবিশ্বাসী তাঁরাই হয়তো বার বার এ পৃথিবীতে ফিরবেন, তাঁদেরই সঙ্গে আমি ভবিষ্যতে বাস করতে চাই। যাঁরা আর ফিরতে চান না বলে গঙ্গা স্নান করেন, এবং আরও নানা চেষ্টা করেন, তাঁরা জমির দর অত্যন্ত বেশি হাঁকেন।

বন্ধন থেকে মুক্তি আমি আদৌ চাই না, একথা বলি না। চাই, কিন্তু অল্পদিনের জন্য চাই! পারমানেন্ট মুক্তি কাজের কথা নয়। ভববন্ধন থেকে মুক্তি চাইবার উপযুক্ত সময় এখনো আমার আসেনি। মনে হয় ওটাও চাইব, কিন্তু শাস্ত্রকারদের দৃষ্টান্তে নয়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাঘের দৃষ্টান্তেও নয়, যদিও এই বাঘের দৃষ্টান্তটি মুক্তির একটি অভিনব দৃষ্টান্ত। সুন্দরবনের বাঘ এক কাঠুরেকে ধরেছিল কিন্তু ফকিরের মন্ত্রে তার মুখ বন্ধ থাকায় শুধু থাবা দিয়ে ধরেছিল! কাঠুরে সহজেই থাবা থেকে মুক্ত হয়ে বাঘের লেজ একটা গাছের সঙ্গে শক্ত ক'রে জড়িয়ে ফেলল। বাঘ পালাতে পারে না। অবশেষে লেজ ছিঁড়ে পালানো স্থির করল, সে সমস্ত শক্তিতে টানতে লাগল; ভীষণ শক্তি তার, কারণ "এ তোমার চিতে বাঘ নয়, গুলে বাঘ নয়, এ বাবা টাইগার!"

শেষকালে মরীয়া হয়ে এক হ্যাঁচকা টান মারায় চামড়া থেকে তার সমস্ত দেহটা বেরিয়ে এলো, পাকা আমের নিচের দিকটা টিপলে যেমন ক'রে আঁটিটা বেরিয়ে আসে তেমনি। তারপর সে ছাল ফেলে পালিয়ে গেল।

কিন্তু এটি প্রাণভয়ে মুক্তি, অত্যন্ত অপমানজনক, দৃষ্টিকটুও বটে। আমি চাই সাপের নির্মোক মোচনের মুক্তি। সাপ এইভাবে বার বার নতুন মুক্তি লাভ করে। এই টেম্পোরারি মুক্তি বড় সুন্দর।

বিজ্ঞানীরা যে আর এক ধরনের মুক্তি খুঁজছেন তাতেও আমার আকর্ষণ। এই মুক্তির আর এক নাম দেওয়া যেতে পারে ভববন্ধন থেকে মুক্তি। বিধাতা মানুষকে এবং সমস্ত প্রাণীকে পৃথিবীর বাঁধনে বেঁধে রাখার চেষ্টা করেছেন নানাভাবে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণের বাঁধন, আর একটা বায়ুমণ্ডলের বাঁধন। সূর্যের যেটুকু রশ্মি আমাদের পক্ষে জীবন, তা বাতাস ভেদ ক'রে আসবে, কিন্তু যে সব রশ্মি আমাদের পক্ষে মৃত্যু, বাতাস তাদের ঠেকিয়ে রাখবে, আমাদের কাছে পৌঁছতে দেবে না। বিধাতার এমন ইচ্ছে নয় যে মানুষ এর বাইরে যায়, অন্তত দেখে শুনে তাই মনে হয়। কিন্তু মানুষ এই মাধ্যাকর্ষণ আর বায়ুর বাঁধন ছিঁড়ে অন্য গ্রহে পৌঁছবার পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। কৃত্রিম গ্রহ উপগ্রহ বানিয়েছে, তারা সবাই পৃথিবীর আকর্ষণের বাইরে। ১৪ই সেপ্টেম্বরের খবরে প্রকাশ, রুশ রকেট চাঁদে গিয়ে পৌঁছেছে। ১৯৫৯ সালে এই জাতীয় সব বন্ধন মোচনের সাফল্য সংবাদ।

মানুষ নিজের বাঁধন নিজে কাটে তার অর্থ বুঝি, কিন্তু মানুষ বিধাতার বাঁধন কাটতে চলল, এটি নিঃসন্দেহে প্রকৃতিশক্তির বিরুদ্ধে মানুষের চ্যালেঞ্জ। মানুষ আজ মহাশক্তিধর। ভববন্ধন থেকে মুক্তির এই একটিমাত্র অর্থই আজ আমার মনে আসছে।—রকেট বাহনে মহাশূন্যে মুক্তি। অবশ্য পৃথিবীতে আবার ফিরে আসার প্রত্যাশা রেখেই পৃথিবীর বন্ধন থেকে এই মুক্তির চেষ্টা। তবে যদি নতুন কোনো গ্রহে নতুন সম্পত্তি লাভ হয়, জমির দর আরও শস্তা হয়, আবহাওয়া অনুকূল হয়, তাহলে নতুন গ্রহ-বন্ধনে আপত্তি কি?

কিন্তু বিধাতাকে যত নির্বোধ ভাবি তিনি তত নির্বোধ নন। তাঁর অভিপ্রেত মাটির বন্ধন কাটা পার্থিব প্রাণীর পক্ষে ততদিন সম্পূর্ণ সম্ভব কখনো হবে না যতদিন বিধাতা নিজেই আমাদের সূর্যটাকে জ্বালিয়ে শেষ করে না দিচ্ছেন—অর্থাৎ হাইড্রোজেন পুড়িয়ে হীলিয়াম না করছেন। তবে উক্ত কার্যটিতে যে তিনি অনেক দূর এগিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার আগে মাধ্যাকর্ষণ-বলয় পার হয়ে যাবার যত চেষ্টাই করা হোক, এই পৃথিবীর স্নেহপ্রেম-মায়া-মমতা, সুখ-দুঃখ, হাসিকান্না, দ্বন্দ্ব-কলহ তাকে বার বার এই পৃথিবীতেই ফিরিয়ে আনবে, এ থেকে মুক্তি কোথায়?

এ সূর্য নিশ্চিত ধ্বংস হবে একদিন এবং তখন সৌর জগতের গ্রহগুলো ধুঁকতে থাকবে। বিজ্ঞানীরা যাই বলুন, তারা আর কোন আশায় কাকে কেন্দ্র করে ঘুরবে? তারাও তখন দায়মুক্ত। সূর্য রিটায়ার করলে অন্য কোনো নবীন নক্ষত্র সূর্যের পদে এসে বসবে এমন আশা করাই যায় না। তা ভিন্ন গ্রহরা নতুন ধর্মপিতাকে মানবে এমন নিশ্চয়তা কোথায়? অতএব মনে কর শেষের সে দিন—

কিন্তু তার আগে তো সে সামান্য দিন নয়। কত লক্ষ কোটি বছর তার ধারণা করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এতদিন বাঁধা থাকতে হবে এই পৃথিবীর বুকে। 'গ্র্যাভিটেশন্যাল বন্ড' কাটিয়ে মহাশূন্যে মানুষ যাবে, অন্য গ্রহেও যাবে, কিন্তু তা ছুটি কাটানোর জন্য, স্থায়ীভাবে বাস

মন কণিকা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

২৩।৫।১৯৫০

অতি-বিশ্বাস যেমন কুসংস্কারের লক্ষণ, অতি-অবিশ্বাসও তেমনি। বৈজ্ঞানিক যুগের আগে মানুষের বিশ্বাসের অন্ত ছিল না; ভূত প্রেত তুক্-তাক্ স্বর্গ নরক সমস্তই সে একবাক্যে বিশ্বাস করিত। ইহা যে ঘোরতর কুসংস্কার ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলে মানুষের যুক্তি-পরিচালিত বুদ্ধির অবনতি ঘটিয়াছিল। গীতা বলিয়াছেন, বুদ্ধির শরণ লও, নচেৎ ফলভোগ করিবে। অন্ধ সংস্কারের বশবর্তী হইয়া আমরা যে দারুণ ফলভোগ করিয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই।

বর্তমানে ইহার উল্টা মনোবৃত্তি দেখা দিয়াছে। বিজ্ঞানের প্রভাবে এখন আমরা সব-কিছুই অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কেহ যদি বলে অমাবস্যায় পূর্ণিমায় শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়, সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি তাহা অবিশ্বাস করিবেন। অথচ কথাটা অবিশ্বাস্য নয়। যাঁহারা এ তথ্য পর্যালোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন ইহা সত্য। গঙ্গার জলে রোগ-নিবারণী শক্তি আছে ইহা পরীক্ষীকৃত সত্য, অথচ কেহ বিশ্বাস করে না।

অবিশ্বাসও কুসংস্কার হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

২৪।৫।৫০

বিখ্যাত মার্কিণ সাহিত্যিক Mark Twain ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—

'. . . in certain ways the foul and derided Ganges water is the most puissant purifier in the world! This curious fact, as I have said, had just been added to the treasury of modern science. It had long been noted as a strange thing that while Benares is often afflicted with the cholera she does not spread it beyond her borders. This could not be accounted for. Mr. Henkin, the scientist in the employment of the Government at Agra concluded to examine the water. He went to Benares and made his tests. He got water at the mouths of the sewers where they empty into the river at the bathing ghats; a cubic centimetre of it contained millions of cholera germs; at the end of six hours they were all dead. He caught a floating corpse, towed it to the shore, and from beside it he dipped up water that was swarming with cholera germs; at the end of six hours they were all dead. He added swarm after swarm of cholera germs to this water; within six hours they always died, to the last sample. Repeatedly he took pure well water which was barran of animal life, and put into it a few cholera germs; they always began to propagate at once, and always within six hours they swarmed—and were numberable by millions upon millions.

'. . . . The Hindus have been laughed at, these many generations, but the laughter will need to modify itself from now on. . . . .'

অবিশ্বাসীর ব্যঙ্গ-হাসা কিন্তু এখনও থামে নাই।

৫।৭।৫০

বর্তমান বাংলা সাহিত্যে যে কয়জন সৃষ্টি-ধর্মী লেখক শীর্ষস্থানীয় বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের লেখা আজকাল পড়িলে মনে হয়, তাঁহাদের আগুন নিভিয়া গিয়াছে। তাই তাঁহারা ভস্ম উড়াইয়া পাঠকের চোখে ধুলা দিতেছেন; বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে, ভস্ম যখন আছে তখন আগুনও আছে।

অবশ্য আগুন কোনও কালেই বেশী ছিল না। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ যেখানে প্রতিভার মশাল হাতে লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শরৎচন্দ্র যেখানে প্রদীপ জ্বালিয়া সন্ধ্যারতি করিয়াছিলেন, আধুনিক লেখকেরা সেখানে বিড়ি টানিতে টানিতে নামিয়াছেন। বাঙালী সাহিত্যরসিক দৈন্যের দায়ে বিড়িকে মশাল মনে করিয়া আত্ম-প্রবঞ্চনা করিতেছিলেন, কিন্তু দুঃখের কথা, বিড়ির আগুনটুকুও নিভিয়া গিয়াছে।

প্রশ্ন এই—কেন এমন হইল?

৬।৭।৫০

ইংরেজিতে একটা কথা আছে—burning the Candle at both ends। মোমবাতির এই উপমাটা আমদানি করিলে বলিতে হয়, আধুনিক বাঙালী সাহিত্যিক তাঁহাদের প্রতিভার ল্যাজামুড়া দুইদিকেই আগুন ধরাইয়াছেন। একদিকে আগুন দিলে যতটুকু আলো হয় তাহাতে তাঁরা সন্তুষ্ট নন, তাঁরা মোমবাতিকে মশালে পরিণত করিতে চান। ফল এই হইয়াছে যে, মোমবাতি পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আলো বাড়ে নাই। বাংলা সাহিত্যে যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রহিয়া গিয়াছে।

আর একটা কথা, যে বস্তু পরিমাণে অল্প তাহা যত সন্তর্পণেই খরচ করা যাক, শীঘ্র ফুরাইয়া যায়। ইহা প্রকৃতির নিয়ম, ইহার উপর মানুষের হাত নাই। আধুনিক লেখকদের রসের ভাণ্ড যে এত শীঘ্র খালি হইয়া গিয়াছে তাহার কারণ ভাঁড়ে রস বেশী ছিল না। শূন্য ভাঁড়ে জল ঢালিয়া তাঁহারা এখন যে পানীয় পরিবেশন করিতেছেন তাহাতে ভাঁড়ের গন্ধটুকুই আছে, তাহা পান করিয়া কাহারও নেশা জমিতেছে না।

১০।৭।৫০

কিছুদিন যাবৎ একটি বঙ্গ মহিলার সহিত পরিচয় হইয়াছে; তিনি সাহিত্যিক হইবার জন্য বড় উৎসুক। মহিলাটির বয়স অনুমান ত্রিশ-বত্রিশ বছর, বাংলা-ইংরেজী লেখাপড়া জানেন, বেশ বুদ্ধিমতী, আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল। সুতরাং সাহিত্য সাধনার পক্ষে তাঁহার জীবন বেশ অনুকূল।

কিন্তু তিনি একটু বেশী মিশুকে। ইংরেজীতে যাহাকে Society Woman বলে তিনি তাই। বন্ধুদের বাড়ীতে নিত্য যাতায়াত, সঙ্গীত ও সাহিত্যের আসর, বন্ধু-বান্ধবীর সহযোগে ক্ষুদ্র নাটকের অভিনয়, এই সব কর্ম তাঁহার দিনচর্যা। সাহিত্যিক খ্যাতির প্রতি লোভ আছে, কিন্তু সময় পান না।

আমার পরামর্শ চাহিলেন। যথাসাধ্য শিষ্টতা বজায় রাখিয়া বলিলাম, "বন্ধুদের নিয়ে হুল্লোড় করে বেড়ালে সাহিত্য হয় না। একটাকে ছাড়তে হবে। ye, cannot serve God and Mammon. কবীর বলেছেন—'ইক্ লে দুজি ডার।'

তিনি তর্ক আরম্ভ করলেন।

১১।৭।৫০

মহিলা: অসামাজিক না হলে কি সাহিত্যিক হওয়া যায় না?

করতে নয়; কেননা মানুষের উপযুক্ত পরিমণ্ডল এবং পরিবেশ আর কোথাও সে পেতে পারে না এই পৃথিবীর বাইরে। সংসারত্যাগী সাধক দু'চারজন যেতেও পারেন। তাঁরা সংসার থেকে পালিয়ে হিমালয়ের চির তুষারের দেশে কুড়ি-বাইশ হাজার ফুট উঁচুতে উঠে সাধনা করছেন, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে পড়েছি। অন্য গ্রহের সন্ধান পেলে তাঁরা সম্ভবতঃ সেখানেই যাবেন, কেননা, মাটির টান তাঁদের একটু বেশি প্রবল বলেই তাঁরা অত উঁচুতে পালিয়েছেন। মাটিতে বসে মাটির মায়া কাটানো যে কত কঠিন তা আনাতোল ফ্রাঁসের থাইস বইতে দেখানো হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন প্রকৃতির প্রতিশোধে। মাটিতে বসে, আমরা যে মুক্তির বড়াই করি, সে মুক্তি অ্যামিবা নামক এককোষ প্রাণীর জেলিদেহের হঠাৎ এক একটা অংশ প্রলম্বিত করার মতো। অংশ প্রলম্বিত হয়ে কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে দেহের সঙ্গে মিলিয়ে যায়।

"তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ঐ শব্দরেখা ধ'রে চকিতে হইতে দিশাহারা
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।"

এ দিশাহারা হওয়াও সত্যি সত্যিই মাটির বন্ধন ফেলে নয়। মাটিতে এক পা রেখে আর এক পা শূন্যে তুললে তবে তো এগিয়ে যাওয়া যায়। বন্ধন থেকে মুক্তি ক্ষণস্থায়ী, যেমন ক্ষণস্থায়ী মুক্তি থেকে বন্ধন।

কিন্তু হঠাৎ খেয়াল হল, আমার এলোমেলো চিন্তাজালের বাঁধনে আমিই তো বাঁধা পড়েছি, এ জাল ছিঁড়ে ঘুমোতে হবে। হঠাৎ চমকে উঠতেই হাত থেকে বইখানা মাটিতে পড়ে গেল, বিছানা ছেড়ে বইখানা তুলতে গিয়ে দেখি সবগুলো পাতা তাদের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়েছে।

আবার সব গুছিয়ে নিয়ে কালই ছুটতে হবে দপ্তরির বাড়িতে। মুক্ত পাতার পুনর্বন্ধনে নির্ঘাত আড়াইটি টাকা যাবে। সমস্ত মুক্তিতত্ত্বের মধ্যে সেইটিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা।

আমি ঃ অসামাজিক হবার দরকার নেই। কিন্তু মনটাকে স্থির করা দরকার, মন চারিদিকে ছড়িয়ে থাকলে কী লিখবেন? মন নিয়েই তো সাহিত্য।

মহিলা ঃ শুধু মন নিয়ে সাহিত্য? ঘরে দোর বন্ধ করে বসে থাকলে মনের মাল-মশলা আসবে কোত্থেকে?

আমি ঃ মাল-মশলা আপনার যথেষ্ট আছে আর বেশী দরকার নেই। পৃথিবীতে যত মাল-মশলা আছে সব কি আপনি ব্যবহার করতে পারবেন? একটা কথা বুঝুন—মন নিয়ে সাহিত্য, পৃথিবী নিয়ে নয়। আপনার মন পৃথিবী-ছাড়া একটা নিরলম্ব বস্তু নয়, তার মধ্যেই বিশ্বজগৎ আছে। মনকে একান্তে নিয়ে তার সঙ্গে বোঝাপড়া করুন, তাকে একটু বিশ্রাম দিন। বীজকে মাটির তলায় পুঁতে রাখলে তবে চারা গজায়।

আমার কথা কিন্তু মহিলার মনঃপুত হইল না। তাঁহার লক্ষ্য All this and Heaven too.

২২।৭।৫০

শিল্পসৃষ্টির ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত। লেখকের মন বিষয়বস্তুতে ধ্যানাবিষ্ট হয়; মনের মধ্যে অসংলগ্ন চিত্রাবলী ফুটিয়া উঠিতে থাকে; ক্রমে তাহারা একটি সুসংবদ্ধ মূর্তি পরিগ্রহণ করে।

কিন্তু এখানেই শেষ নয় ইহা কেবল কাঠামো মাত্র। মনের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া কিভাবে অগ্রসর হয়, তাহার সুন্দর বর্ণনা Aldous Huxley দিয়াছেন—

It is by long obedience and hard work that the artist comes to unforced spontansity and consummate mastery. Knowing that he can never create anything on his own account, out of the top-layers, so to speak, of his consciousness, he submits obediently to the workings of inspiration; and knowing that the medium in which he works has its own self-nature, which must not be ignored or violently overridden, he makes himself its patient servant, and in this way achieves perfect freedom of expression.—The Perennial Philosophy.

২৪।৭।৫০

সম্প্রতি দুইখানি বাংলা বই পড়িলাম। গিরীন্দ্রশেখর বসুর পুরাণ প্রবেশ এবং নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙালীর ইতিহাস। শেষোক্ত বইখানি নূতন বাহির হইয়াছে; পুরাণ প্রবেশ কয়েক বছরের পুরানো।

পুরাণ প্রবেশ পুস্তকে গিরীন্দ্রবাবু যে-চেষ্টা করিয়াছেন তাহা অতীব প্রশংসনীয় কিন্তু অতীব দুরূহ। এক কথায়, তিনি পুরাণকে ইতিহাস ধরিয়া লইয়া তাহা হইতে বহু প্রাচীনকালের একটা ধারাবাহিক বৃত্তান্ত ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। স্বায়ংভুব মনু হইতে সূর্যবংশের শেষ রাজা পর্যন্ত একটি তালিকা তৈয়ার করিয়া কে কোন্ সময় ছিলেন তাহা নির্ধারণ করিয়াছেন। এই কার্যে তিনি বৈজ্ঞানিক পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন।

তিনি পরিশ্রম করিয়াছেন অগাধ। প্রতিভার পরিচয়ও যথেষ্ট দিয়াছেন। কিন্তু বিষয়টি এতই জটিল এবং পুরাণের প্রচ্ছন্ন

গোপন প্রেম

মূল জার্মান থেকে অনুবাদ ঃ

মানস রায়

তরুশীর্ষে আর অঙ্কুরে
চারদিকে এই সূর্যস্রোতে—
কে পারে কল্পনা করতে,
কে নিয়ে এসেছে এই সম্ভার?
চিন্তাস্রোতে দেয় দোলা,
রাত্রি থাকে স্তব্ধ হয়ে,
চিন্তা স্রোত পায় মুক্তি।

শুধু একজনের কথাই ভাবি,
স্মরণে এসেছে যে,
নিকুঞ্জের মর্মরধ্বনিতে,
যখন কেউ নেই জেগে
শুধু মেঘগুলো চলেছে ভেসে—
আমার ভালবাসাও রয়েছে গোপনে
রাত্রির মত সুন্দর হয়ে।

(য়োসেফ ফন আইশেনদর্ফ, ১৭৮৮-১৮৫৭)

ইঙ্গিত হইতে প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করা এতই কষ্টসাধ্য যে, গিরীন্দ্রবাবুর উদ্যম আধাআধি সার্থক হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

২৫।৭।৫০

দশরথ-পুত্র রাম বা মান্ধাতা বা বৈবস্বত মনু আজ হইতে কতদিন আগে ছিলেন পুরাণ-সমুদ্র মন্থন করিয়া এই তথ্য আবিষ্কার করা সহজ কাজ নয়। অথচ পুরাণ ছাড়া অন্য কোনও সূত্র হইতে এই তথ্য আবিষ্কার করার উপায় নাই। গিরীন্দ্রবাবু যে-পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহাই একমাত্র পন্থা এবং সে-পথে তিনি অনেক দূর অগ্রসরও হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি যে সবই অভ্রান্ত তাহা মনে করা সম্ভব নয়।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। মহাভারত পাঠে জানা যায় চন্দ্রবংশীয় রাজা শান্তনু ছিলেন চন্দ্রবংশীয় ভিন্ন শাখার রাজা উপরিচর বসুর জামাতা। অথচ গিরীন্দ্রবাবু চন্দ্রবংশের যে তালিকা দিয়াছেন তাহাতে শান্তনু ও উপরিচর বসুর মধ্যে নয় পুরুষের ব্যবধান, অর্থাৎ শ্বশুর ও জামাতার মধ্যে ন্যূনাধিক আড়াইশত বছরের তফাৎ!!

আমার বিশ্বাস গিরীন্দ্রশেখরবাবু যে পথ-নির্দেশ করিয়াছেন সেই পথে আরও গবেষণা করিলে সত্য সন-তারিখ উদ্ধার করা যাইবে।

২৬।৭।৫০

নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙালীর ইতিহাস পুস্তকটিকে বাঙালী প্রতিভার বিজয়স্তম্ভ বলিতে পারি। আর একবার প্রমাণ হইল, বাঙালী যখন যাহা করিয়াছে একাকী করিয়াছে: পাঁচজনে মিলিয়া যখন কিছু করিতে গিয়াছে তখনই কর্ম পণ্ড হইয়াছে। তাই শিল্প ও বিদ্যার ক্ষেত্রে বাঙালীর শক্তি বেশী, রাজনীতির ক্ষেত্রে সে দুর্বল।

অতি আদিমকাল হইতে বাঙালী জাতি কি করিয়া একটা স্বতন্ত্র কৃষ্টি গড়িয়া তুলিল, অশেষ অধ্যবসায় সহকারে নীহাররঞ্জনবাবু তাহা দেখাইয়াছেন। অধ্যবসায় বা Capacity for taking infinite pains প্রতিভার একটি লক্ষণ। অন্যান্য লক্ষণও নীহারবাবুর প্রচুর পরিমাণে আছে। অন্তর্দৃষ্টি বিচারবুদ্ধি অভিব্যক্তির শক্তি সবই এই পুস্তকে আছে। আর আছে চিত্তরঞ্জিনী শক্তি। লেখার গুণে ৯০০ পৃষ্ঠার বিরাট বই উপন্যাসের ন্যায় সুখপাঠ্য হইয়াছে।

বাঙালীর মনীষা কালের বিড়ম্বনায় এখনও নিঃশেষ হয় নাই তাহা প্রমাণ করিয়া নীহাররঞ্জনবাবু আবার আমাদের প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছেন।

২৭।৭।৫০

ভাবিয়াছিলাম 'কালের মন্দিরা'র পর বড় আর কিছু লিখিব না, ইহাই বঙ্গবাণীর চরণে আমার শেষ অর্ঘ্য। বয়স বাড়িতেছে, জীবন জটিলতর হইয়া উঠিতেছে, এর পর দীর্ঘ রচনা আর সম্ভব হইবে না। কিন্তু নীহাররঞ্জনের 'বাঙালীর ইতিহাস' পড়িয়া আবার মাথায় একটি উপন্যাস আসিয়াছে, লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি।

প্রাচীন বাংলাদেশ লইয়া গল্প লিখিবার ইচ্ছা অনেকদিন হইতে ছিল; কিন্তু বাংলাদেশের বিশিষ্ট আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার মত মালমশলা কোথাও পাই নাই। নীহাররঞ্জনের বইখানি পড়িয়া প্রচুর উপাদান পাইয়াছি এবং তাহাই অবলম্বন করিয়া উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। শশাঙ্কদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বাংলাদেশে যে শতাব্দীব্যাপী মাৎস্য-ন্যায় আরম্ভ হইয়াছিল তাহারই সূচনা আমার গল্পে আছে। বাঙালীর জীবনে ইহা এক মহা ক্রান্তিকাল। আধুনিক বাঙালীর জন্ম এই সময়।

১।৯।৫০

অনেকের ধারণা democracy বা গণতন্ত্রের অর্থ সাধারণ মানুষ রাজ্য শাসন করিবে—Government by the people ইহার চেয়ে হাস্যকর ভ্রান্তি আর হইতে পারে না। মার্কিণ দেশের লোকেরা Government of the people by the people for the people— এই বাক্যটি সৃজন করিয়া এই ভ্রান্তির পোষকতা করিয়াছে। সাধারণ মানুষের মনে করা স্বাভাবিক যে, গণতান্ত্রিক দেশে সাধারণ মানুষই বুঝি রাজ্য শাসন করে, সেখানে অসাধারণ বা প্রতিভাবান মানুষের প্রয়োজন নাই।

সাধারণ মানুষ যদি কখনও রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করে তবে তিন দিনে সে রাজ্য রসাতলে যাইবে; রাজ্য শাসন করা সাধারণ মানুষের কর্ম নয়। আসলে গণতন্ত্রের মহিমা এই যে, সে প্রত্যেক সাধারণ মানুষকে অসাধারণ হইবার সুযোগ দান করে। তাহার চক্ষে উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র নাই। এই সমদৃষ্টিই democracy'র পরম দান।

২।৯।৫০

বর্তমান ধনিকতন্ত্রের অধিকারে ডিমোক্রেসীর যাহা মূল মন্ত্র সেই সত্য অবহেলিত হইতেছে; কেবল ভোট দিবার অধিকার দিয়া জনসাধারণকে ভুলাইয়া রাখা হইয়াছে। জনসাধারণ ভাবিয়া দেখে না যে, ভোট ছাড়া

(শেষাংশ ১৫৯ পৃষ্ঠায়)

স্মৃতিকথা

শ্রীকালিদাস রায়

আজ স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে নটকুল-চূড়ামণি শিশিরকুমারের কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ছে। শিশির ও আমি এক বয়েসী ছিলাম, পৃথক পৃথক কলেজে একই ক্লাসে পড়তাম। সে চলে গেল, আমারও সময় হয়েছে, একই পথের যাত্রী, দু'দিন আগে-পিছে—কাজেই অভিনয়ের মহাগুরুর শোকে অভিনয় করা সাজে না। যাদের এখনও ওপথে যেতে দেরি আছে, তাদেরই শোক করবার কথা।

শিশির আমার ৪৮ বছরের বন্ধু। ১৯১১ সালে তার সংগে আলাপ হয় কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে, দুজনেই তখন ঐ প্রতিষ্ঠানের চাঁদা সভ্য।

শিশিরের চলাফেরা, কথাবার্তা, ভাবভংগী, বাচনভংগী, উচ্চারণ ছিল সবই অসাধারণ। দেখেই মনে হয়েছিল—এই যুবকটি আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মানুষ। তবে কোন্ পথে তার স্বাতন্ত্র্য অসামান্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হবে, তা তখন পর্যন্ত ঠিক করতে পারিনি। শিশির ইংরাজী, বাংলা কবিতা চমৎকার আবৃত্তি করত, যেমন সুনীতিকুমার সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি করত চমৎকার। যখন তখন তার গলায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা উদ্গীরিত হত স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। ইনস্টিটিউট হলে ঢুকতে সে আবৃত্তি করতে করতে। শিশির কবিতা খুব ভালবাসত, আমি তখনকার ছাত্র-সভ্যগণের মধ্যে একাই কবিতা লিখতাম। কাজেই আমার সংগে বন্ধুত্ব সহজেই ঘনীভূত হয়েছিল। তখন আমার কবিতা বেরোত ভারতী, প্রবাসী ইত্যাদি পত্রিকায়—শিশির সেগুলো সাগ্রহে পড়ত এবং যাতে আবৃত্তিযোগ্য কবিতা আমি বেশি বেশি লিখি সেজন্য আমাকে উৎসাহিত করত। শিশিরের ভাবগদ্গদ ভংগী, তন্ময়তাবোধ, বাহ্য বিষয়ে ঔদাস্য আবৃত্তির তরংগতে উদ্দীপ্ত দেখে মনে হত—সে নিশ্চয়ই কবিতা লেখে। পরে বুঝলাম, সে কবিতা লেখে না—তার জীবনটাই একখানি রসাঢ্য কাব্য।

আমার মনে হয় ১৯১০—১৩ সাল আমাদের ইনস্টিটিউটের বিক্রমাদিত্যের যুগ (Augustan age)। তখন ইনস্টিটিউটে যাঁরা সভ্য ছিলেন, তাঁদের কেউ দেশ ও সমাজে পরবর্তী জীবনে নগণ্য হয়ে থাকেন নি। আমি তাঁদের সকলেরই বন্ধুত্ব লাভ করেছিলাম, বিশেষ করে কবি বলেই। প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই আমাদের একটি স্বতন্ত্র বন্ধুগোষ্ঠী ছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমরা কলেজ স্কোয়ারের সামনে হলের বারেন্দায় কাঁখানি চেয়ারে বসতাম, সামনে ছিল গাঁদা বন। সুনীতিকুমার তার নাম দিয়েছিল মেরি গোল্ড ক্লাব। রসিকতাই ছিল এর প্রধান উপজীব্য। শ্রীশ (সোপান্তা শিল্পবিশারদ) ছিল সবচেয়ে রঙ্গরসিক। শিশির আবৃত্তি করে আমাদের বৈঠকটিকে সঞ্জীবিত রাখত। আমি আমার বল্লরী নামক কবিতার বই খানিকে সুনীতিকুমার-শিশিরকুমার প্রমুখ মেরি গোল্ড ক্লাবের বন্ধুদের উদ্দেশ্যে এই বলে উৎসর্গ করেছিলাম। শিশির উৎসর্গ পুস্তক পেয়ে আমাকে বলেছিল—"যাক, আমাদের মেরি গোল্ড ক্লাব স্মরণীয় হয়ে থাকল, কিন্তু এ বইটাতে একটাও আবৃত্তিযোগ্য কবিতা নেই—আমি এর প্রতিদান দেব কি করে?"

ইনস্টিটিউটে বছর বছর নতুন নতুন নাটকের অভিনয় হত। সেই উপলক্ষেই শিশিরের অভিনয়-শক্তির প্রথম স্ফুরণ। নাট্যাভিনয়ে শিশিরের সহযোগী ছিল নরেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীশ চক্রবর্তী, কান্তি মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়, রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি। জনা ও চন্দ্রগুপ্ত নাটকে এদের অভিনয় দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। অভিনয়কলা যে এত উন্নত হতে পারে, তা আগে ভাবতেই পারিনি। শিশির ছিল এদের মধ্যমণি, সবচেয়ে প্রধান ও দুঃসাধ্য ভূমিকাই শিশির নিত এবং আর সকলের সংগে নিজের অভিনয়কলার সামঞ্জস্য সাধন করে নিত। গানের দিকে ব্যবস্থাপনা ছিল জ্ঞানপ্রিয় দাদার, আর অভিনয়ের দিকটার পুরো ভার নিত শিশির। নেপথ্য-বিধানের প্রধান উদ্যোক্তা ছিল সুনীতিকুমার।

শিশির অভিনয়কলায় অসামান্য কৃতিত্ব দেখালেও আমাদের শিক্ষাগুরু অধ্যাপক মন্মথনাথ বসুর উপদেশ ও পরিচালনা গ্রহণে ছাত্রত্ব স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হত না।

রবীন্দ্র সাহিত্য এবং রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে তখনকার কাব্য-সাহিত্যে রোমান্টিক যুগ চলছে—শিশির তার অভিনয়েও রোমান্টিক ধারার প্রবর্তন করল। কথা-সাহিত্যে রিয়ালিষ্টিক ভংগীর সুরু হয়েছে, শিশির অভিনয়কে পুরোপুরি রিয়ালিষ্টিক করেও তুলল। সেকালের রংগমঞ্চে শুধু মুখেই অভিনয় করত, শিশির সর্বাংগ দিয়ে অভিনয় করবার প্রথা প্রবর্তন করল। শিশিরের ছন্দোবদ্ধ নাটকের অভিনয়ও আবৃত্তি মাত্র ছিল না, তাতে সে জীবনী-শক্তির সঞ্চার করেছিল। যে চরিত্রের ভূমিকা সে গ্রহণ করত, তার ভাবে সে এমনি আবিষ্ট হত যে, তার মুখ দিয়ে নাটকের ভাষার সংগে রস-সামঞ্জস্য রক্ষা করে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তার নিজের কথাও কিছু কিছু বেরিয়ে পড়ত। রংগমঞ্চের উপর তার প্রবেশ নিষ্ক্রমণও ছিল অপূর্ব—তার প্রবেশকে আবির্ভাব বা উদয় বলতে হয়, আর নিষ্ক্রমণকে বলতে হয় অস্তগমন বা তিরোধান। তার অভিনয়ে বিন্দুমাত্র দ্বিধা, সংকোচ, জড়তা ছিল না, সহজ, স্বাভাবিক, এক কথায় বলতে হয় বাংলার রংগমঞ্চের বিগ্রহে সে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিল, তার পরে তার অনুগামী পূজারীরা তারই ধারা অনুসরণ করে সে বিগ্রহের সেবার্চনা করছে। শিশিরই রংগমঞ্চে অভিনয় বিদ্যার ভরতোপম যুগ-প্রবর্তক।

সদাকারে ছন্দে লেখা নাটকের অভিনয়ের আসল চমৎকার রূপ আমরা শিশিরের সৃষ্টিতেই পেয়েছিলাম। গিরিশচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর ছন্দ যে রোমান্টিক অভিনয়ের পক্ষে কত উপযোগী তা নাটক পড়েও বুঝিনি, রংগমঞ্চে অন্যের অভিনয় দেখেও বুঝিনি। গিরিশচন্দ্রের শ্লথ-মন্থর ছন্দে শিশির প্রাণ-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

যাক—এখন যা বলছিলাম, জনা অথবা চন্দ্রগুপ্তের অভিনয়ের আগে শিশির আমাকে বল্লে, "তুমি ভাই একটা উদ্বোধন গান লিখে দাও দেখি বিনয়েন্দ্রবাবুর শোকসভার মতো (অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন আমাদের ইনস্টিটিউটের সেক্রেটারী ছিলেন, পরে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র সেক্রেটারী হন। গান নয়, কোরাসে গাওয়া হবে, দ্বিজেন্দ্রলালের **ঘখন সঘন গগন গরজে বরিষে করকা ধারা** গানটির সুরে। অভিনয় আরম্ভ হবার আগে সমবেত কণ্ঠে রংগমঞ্চে গাওয়া হবে। আমি লিখলাম—

দ্যুলোক ভূলোক পুলোক আলোকে
জননী আমার রাজে,
অযুত ভক্ত অমল রক্ত মর্ম কমল মাঝে
মঞ্জরে ফুল চরণে ভৃংগ গুঞ্জরে মধুবাণী
আমার বংগবাণী এ অখিল জ্ঞান ভুবনের রাণী।

ইত্যাদি এ-গান অষ্টম বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলনেরও উদ্বোধন সংগীত হয়েছিল। ইনস্টিটিউটের দলই গেয়েছিল সে গান। শিশির বললে, "তোমাকেও গানের সময় মঞ্চের উপরে চারণদের সংগে দাঁড়াতে হবে।" আমি কিছুতেই রাজী হচ্ছিলাম না। শেষে তার জেদাজেদিতে দাঁড়াতে হল। সেই আমার জীবনে প্রথম ও শেষ রংগমঞ্চে দাঁড়ানো।

১৯১২ সালে আমার বিয়ে হল। বন্ধুদের জন্য নিমন্ত্রণপত্র রচনা করেছিলাম কৌতুক কবিতায়, তার প্রথম চরণ ছিল, 'ওগো বিংশ শতাব্দীর লঘু কালিদাস।' শেষে ছিল—

চড়ি তবে খণ্ডবর   চলিবে এ ভণ্ড দ্বন্দ্ব
কৃষ্ণ অংগ শুভ্র কার ভস্মের ভূষণে
যারা ভাই সহচর   আছে তার বরাবর
অবশ্য যাইবে সাথে 'নন্দীর' শাসনে

(মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর বাড়ী থেকে বিয়ে হয়েছিল)

শিশির সে পত্র পেয়ে দুবার আবৃত্তি করল। পরে সেটা তার অধিকাংশ মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। সে বলল—এই যে শেষে যা লিখেছ তাতে তো আমাদের ভূত বানিয়েছ। আমরা কিন্তু গিয়ে ভৌতিক উপদ্রবই করব, শ্বশুর-বাড়ীতে সাবধান করে দিও। উপদ্রব অবশ্য সে করেনি। তবে উপদ্রব করবার বন্ধুর অভাব হয়নি। জীবনের একটা মহা-সন্ধিক্ষণে শিশির আমার সংগী ছিল, তা আজ ৪৭ বৎসর পরে স্মরণ করছি।

শিশিরের অধ্যাপনা সম্বন্ধে আমি তার ছাত্রদের কাছে শুনেছি, ইংরাজি সাহিত্যের এমন অপূর্ব অধ্যাপনা তারা কোথাও শোনে নি। তারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শিশিরের অধ্যাপনা শোনে। কেবল চমৎকার অভিনয়াত্মক আবৃত্তি করে সে শেক্সপীয়ার পড়াত যে, শুধু আবৃত্তি শুনেই তাদের অনেকটা অর্থবোধ হয়ে যেত।

আর এক ছুটিতে এসে ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর সংগে দেখা করতে গেলাম। জলধরবাবু সংগে করে নিয়ে গিয়েছিলেন—নাম করতেই সর্বাধিকারী মশায় বললেন—শ্রীমান্ শিশির ভাদুড়ী আগেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। স্যার আশুতোষের বিদায়-সভায় শ্রীমান্ ওঁর "নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার" কবিতাটার এমন চমৎকার আবৃত্তি করেছিলেন যে, নতুন করে বৃন্দাবন অন্ধকার হলো বলে আমরা অশ্রু সংবরণ করতে পারিনি।"

শিশির আরো দু'চারটে সভায় ঐ কবিতা আবৃত্তি করেছিলো। অতএব ঐ কবিতার অযথা খ্যাতির জন্য সে-ও কতকটা দায়ী। আমার সাহিত্য-সেবার প্রারম্ভে আমি শিশিরকুমার ও সুনীতি-কুমারের কাছে যথেষ্ট ঋণী।

সুনীতিকুমারের মেয়ের বিয়েতে দেখা হলে—আমার বিয়ের কবিতায় লেখা চিঠিখানা মুখস্থ বলে সে আমাকে সম্ভাষণ করল। অসাধারণ মেধা বলতে হবে। প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার তুচ্ছ লেখাটা সে মুখস্থ রেখেছিল।

শ্রীকুমারবাবুর বাড়ীতে বি-এ অনার্সের জন্য পাঠ্যগ্রন্থ নির্বাচন উপলক্ষে পরামর্শ সভায় শিশিরকে আহ্বান করা হয়েছিল। শিশির এসে আমাদের সহায়তা করল। তার মন্তব্য আমার মনে আছে। অভিনয়-বিদ্যার যতই উন্নতি হোক, তদুপযোগী নাটক লেখা একেবারেই হচ্ছে না।

(শেষাংশ ৬৪ পৃষ্ঠায়)

চারটি মেয়ে ওরা এক-সঙ্গে থাকে। দু-জনে হাসপাতালের নার্স, একটি ইস্কুলের মিস্ট্রেস আর একটি টুইশানি করে ও এম-এ পড়ে। বয়স কম, অতএব কবিতায় বড় অনুরাগ। ঘরে গাদা গাদা কবিতার বই। লেখেও বোধ হয় একটু আধটু। তবে খুব গোপনে, কেউ কারো কাছে স্বীকার করে না।

স্বাতীর আবার রান্নার শখ আছে। রবি-বারের দিন কখনো কখনো বাজারে বেরোয়, দু-একটা তরকারি নিজ হাতে রান্না করে, সকলে আমোদ করে খায়। আজকেও বেরিয়েছিল। কিন্তু এক কবিকে পেয়ে তাকে সঙ্গে করে ফিরে চলে এল। বাজার অবধি যাওয়া হল না।

কবির ঠিক যেমনটি হতে হয়। উচ্ছৃংখল লম্বা লম্বা চুল, গুন্ডা পাঁচশত দাড়ি থুতনির উপর, পরনে পাঞ্জাবি ও পাজামা। এক বাড়ীর রোয়াকে বসে খাতা খুলে কবিতা পড়ছে। সুরেলা কণ্ঠ। পাড়ার পাঁচ-ছটা বাচ্চা হাঁ করে দেখছে। স্বাতী তাদের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

হঠাৎ মুখ তুলে কবি ভুবনমোহন হাসি হেসে বলে, চা খাওয়াতে পারেন? গলা শুকিয়ে আসছে।

এমন কবিতা বাচ্চাদের কাছে পড়া—বেনাবনে মুক্তো ছড়ানো হচ্ছে। স্বাতীর মোটে ভাল লাগে না। বলে, আমাদের বাড়ি আসুন। ওই যে, তিনটে বাড়ির পর।

কাঁধে ঝোলানো কাপড়ের ব্যাগ, হাতে কবিতার খাতা—কবি এসে মেঝের সতরঞ্চির উপর আসন নিলেন। স্বাতী চা করতে যাচ্ছে। বলে, চুপচাপ কেন, পড়ুন দু-একটা। জোরে জোরে পড়ুন, রান্নাঘর থেকে শুনব।

নিবেদিতা কোণের টেবিলে বসে ক্লাসের নোট টুকছিল খাতায়। বলে, পড়ুন। লিখতে লিখতে শোনা যাবে।

সুভদ্রা রবিবার বলে শাড়ি-ব্লাউস বনেটে সাবান দিচ্ছে। কলতলা থেকে বলছে, খাসা কবিতা। পড়ে

তপতী কেবল নেই, চিঠি ডাকে দিতে গেছে। শনিবারে রাত-দুপুর অবধি চিঠি লিখে সকালবেলা নিজের হাতে ডাকে ফেলে আসে। এই একটা বাঁধা কাজ তার। কাকে চিঠি লেখে, কখনো তা বলবে না।

কবি পর পর তিনটে কবিতা পড়ল। নিবেদিতা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, আপনি লিখেছেন?

সমস্ত। খাতাখানা তুলে ধরে সগর্বে কবি বলে, এত বড় খাতার মধ্যে একটি পাতা সাদা নেই। কিন্তু একটু থাক এখন। চায়ে গলা ভিজিয়ে নিয়ে তারপরে হবে।

পুবের জানলাটা খুলে দিল কবি। শীতের রোদ এসে ঘরে পড়েছে। গাঁদা দোপাটি আর ঝুমকো-জবায় উঠান আলো হয়ে আছে। মগন হয়ে স্বভাবের শোভা দেখে। জানলার উপরে টুকিটাকি জিনিষপত্র—টুথপেস্ট হরলিকসের শিশিতে কাজুবাদাম, পাউডারের কৌটো, চুলের ফিতে—কাগজের বাক্সে পাটালি আছে খানকতক। সুগন্ধ নলেনের পাটালি—শোভা দেখতে দেখতে পাটালিগুলো কবি ঝোলানো ব্যাগের ভিতর ফেলল।

নিবেদিতা ইতিমধ্যে মেঝের উপর উবু হয়ে বসে কবিতার খাতা উলটাচ্ছে। স্বাতী চা করে নিয়ে এল।

সুভদ্রা বলছে, শুধু চা দিও না স্বাতী। বিস্কুট তো ফুরিয়ে গেছে। মুড়ি আছে, সেই বরঞ্চ চাট্টি দাও। আর তপতীর বাড়ি থেকে কাল যে পাটালি এসেছিল—

স্বাতী বলে, পাটালি তো পাচ্ছিনে সুভদ্রা-দি।

জানলার উপরে তো ছিল। তপতী তাহলে তুলে রেখে গেছে কোথাও। সেই কখন চিঠি ফেলতে গেছে—

কবি তাড়াতাড়ি বলে, পাটালি খাব না। মিষ্টিতে চায়ের স্বাদ পাওয়া যায় না। মুড়ি-চা-ই ভাল।

এমনি সময় তপতী ফিরল। সঙ্গে গীটার নিয়ে আর একটি মেয়ে—মালতী। এরা সকলে কলরব করে উঠল : কী আশ্চর্য! কোন্‌দিকে আজ সূর্য উঠল গো—মালতী-দি আমাদের বাড়ি।

তপতী বলে, আর কোথায়ও বাজাতে যাচ্ছিলেন। বললাম, রোজ ফাঁকি দেন। ছুটির দিন আছে, আজ আমাদের ওখানে বাজাবেন। জোর করে ধরে এনেছি।

মুড়ি-চা শেষ করে কবি ওদিকে উঠে দাঁড়িয়েছে : আমি যাচ্ছি। আবার একদিন আসা যাবে।

স্বাতী বলে, আসছে রবিবার আসবেন—কথা দিয়ে যান। অনেক কবিতা পড়তে হবে। আমাদের ইস্কুলের হেড মিস্ট্রেসকে আসতে বলব। তিনি কবিতার ভক্ত।

সুভদ্রা উঠে এসে বলে, আমিও ভাবছি নার্সেস হস্টেলের দু-একটিকে ডাকব। যদি কিছু মনে না করেন—পাঞ্জাবি পাজামা কেচে-কুচে আসবেন সেদিন।

দুটো টাকা সে কবির সামনে সতরঞ্চির উপর রাখল।

নিবেদিতা তার উপরে আরও তিন টাকা রেখে দিয়ে বলে, পাঞ্জাবি তো শতচ্ছিন্ন। নতুনই একটা কিনে নেবেন। আমার ক্লাসের কয়েকটা মেয়েও আসবে। কবিতা শুনে কি করবে দেখবেন তারা!

স্বাতী তারও উপরে একটা টাকা দিয়ে বলে, মাথার চুল ছেঁটে দাড়ি কামিয়ে বেশ ভদ্রস্থ হয়ে আসবেন।

স্মিতহাস্যে কবি ছেঁড়া পাঞ্জাবির পকেটে টাকাগুলো তুলে নিল। নিবেদিতা বলে, কবিতার খাতাটা রেখে যান না কেন!

কি হবে?

সলজ্জে নিবেদিতা বলে, কয়েকটা কবিতা টুকে নেব। মুখস্থ করব আমি।

হঃ রদ্দি এক খাতা—তার থেকে কবিতা টুকে নিতে হবে!

এবারে তো দস্তুরমতো ঝগড়ার ব্যাপার। নিবেদিতা করকর করে ওঠে : কেন টুকব না? কত ভাল ভাল কবিতা লিখেছেন, তার কোন ধারণা আছে আপনার? মূল্য বোঝেন?

কবি সহজভাবে বলে, ভাল তো বটেই! একশবার ভাল। রবি ঠাকুরের কবিতা ভাল হবে

(শেষাংশ ৫১ পৃষ্ঠায়)

সন্ধ্যা হয়ে আসে

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

বাংলাদেশে আমার কথা শোনবার কি আর লোক আছে?

চোখের সামনে দেখছি, মেয়ে-পুরুষ সবাই পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে শুধু দুবেলা দুমুঠো ভাতের জন্যে। সকলেরই নিজের দুঃখই এককাহন। অন্যের কথা শোনার সময় কই?

তবু যে নিজের কাহিনী বলছি, সে শুধু মনের ঝোঁকে। শোনাবার জন্যে নয়। কেবল অবসরে যদি কেউ শোনে ভালোই, না শোনে তার জন্যেও দুঃখ করব না। যা দিন পড়েছে, দুঃখ আজ আর কেউ কিছুরই জন্যে করে না। কারও জন্যেই না। নিজের জন্যেও না।

আমি একটি উদ্বাস্তু মেয়ে। আমার নাম বরদা।

অনেকদিন আগে আরও অনেক মেয়ে-পুরুষ, বুড়ো-বুড়ী ছেলেপুলের সঙ্গে জোয়ারের জলে ভাসতে ভাসতে পশ্চিমবঙ্গের ঘাটে এসে লাগলাম। কতদূরের অখ্যাত একটি ছোট্ট গ্রাম থেকে একেবারে কলকাতার রাজধানী শহরে।

মনে কত ভয়। কত আশা।

চারিদিকে গিস গিস করছে কত লোক। ভয় করত তাদের দেখে। আশাও জাগত। এত লোকের মধ্যে এসে পড়লাম। এরা আমাদের বাঁচাবে।

শেয়ালদা ষ্টেশনে ঘর বাঁধলাম।

বরুণের বাপ-মাও আমাদের সঙ্গেই আসছিল। অথবা গ্রাম ছেড়ে আমরা সবাই এক-সঙ্গেই আসছিলাম। গোয়ালন্দে পৌঁছে দেখা গেল, তারা কেউ নেই। শুধু বরুণ রয়েছে।

সে এক দুশ্চিন্তা!

কোথায় গেলেন তাঁরা? কোনখানে পিছিয়ে পড়লেন এবং এই অবস্থায় কি অবস্থায়ই আছেন তাঁরা। বেঁচে আছেন কিনা তাই বা কে জানে!

আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব। অনেকদিনকার বন্ধুত্ব। সেই বন্ধুত্ব আরও বেড়েছে বরুণের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা পাকা হবার পর। বৈশাখ মাসে ঠিক হয়েছিল অঘ্রানে বিয়ে হবে।

ইতিমধ্যে এই কাণ্ড।

দেশ বিভাগ। হিন্দুস্থান আর পাকিস্তান। দেশ ছেড়ে পালাবার হিড়িক।

গ্রাম ছেড়ে যখন বার হই তখন এই চলা আর কোনোদিন থামবে না। চলতে চলতে কোনোদিনই আর অঘ্রানে এসে পৌঁছুব না। যে গাঁটছড়া মনের মধ্যে বাঁধা হয়ে গেছে, বাইরে তা বাঁধবার আর সময় পাওয়া যাবে না।

বাপ-মাকে হারিয়ে বরুণ কাঁদতে লাগল। কিন্তু কাঁদবার সময় তখন নয়। বুক বাঁধবার সময়। পিছনে চাওয়া নিষ্ফল। পিছনে শুধু অন্ধকার। মরা মানুষের হাসিতে সেই অন্ধকার পঙ্কিল হয়ে উঠেছে।

আমার বাবা-মা তাকে বোঝালেন। আমিও সান্ত্বনা দিলাম। তাঁদের খুঁজতে ফিরে যাওয়ার কোনো মানে হত না। সেই ডামাডোলে মানুষে তার নিজের হাত খুঁজে পাচ্ছে না। তার চেয়ে ভালোয় ভালোয় কলকাতা গিয়ে পৌঁছুতে পারলে তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করা যাবে। এছাড়া উপায় নেই।

মা সান্ত্বনা দিলেন, হয়তো কোনো ট্রেণ ফেল করেছে। কিংবা ষ্টীমার। পরের ষ্টীমারে ঠিক সবাই পৌঁছে যাবেন।

কাঁদতে কাঁদতে বরুণ আমাদের সঙ্গে এল।

শেয়ালদা ষ্টেশনেই আমাদের আশ্রয় হল। আর পাঁচজনের মতো আমরাও বাক্স-বিছানা, ইট-কাঠ দিয়ে আমাদের ঘর করে নিলাম।

বরুণ হাসল।

বললে, দেখ মানুষগুলোর কাণ্ড! সবাই ঘর-ছাড়া। ষ্টেশনের সরকারী প্ল্যাটফর্মে আশ্রয় যদি মিলল, সঙ্গে সঙ্গে ঘর বাঁধতে বসে গেল! ক'দিনের ঘর কেউ জানে না।

হাসির কথাই বটে। সম্পত্তিবোধ তার রক্তের মধ্যে রয়েছে। যেখানেই সে বাস করবে সেখানেই তার নিজস্ব ঘর চাই। একলা তার,—তার নিজের, তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার। অন্য কারও নয়।

আমরা সবাই বেড়া দিয়ে আমাদের নিজের নিজের সীমানা ঠিক করে নিলাম।

দুটি মেয়ের সঙ্গে এখানে ভাব হল। আমারই সমবয়সী। দু'এক বছরের বড় হতেও পারে। একজনের নাম করুণা, আর একজনের

—মাছ? এহানে মাছ কই?

আমরা সবাই উদ্বাস্তু। বাড়ি হয়তো এক জেলায় নয়। ভাষারও তফাৎ ছিল। কিন্তু সেকথা মনেই হত না। শেয়ালদা ষ্টেশনে বসে মনে হত, ঢাকা, বরিশাল আর কুমিল্লার সেই তিনটি গ্রাম যেন পাশাপাশি। একই অশ্রুর নদী যেন তিনখানি গাঁয়েরই পাশ দিয়ে বয়ে চলেছিল। আর আমরা তিনজনেই তা বয়ে নিয়ে এসেছি এই শেয়ালদা পর্যন্ত আমাদের চোখে করে, অবিশ্যি আরও অসংখ্য লোকের সঙ্গে। তবু তাদের সকলের চেয়ে ওই দুটি মেয়ের সঙ্গেই ভাব হয়েছিল বেশি।

এমন হয়। কেন হয় জানি না।

কাছাকাছি আমাদের ঘর। চলতে-ফিরতে দেখা তো হতই। তাছাড়া অনেক সময়। হাতে যখন কাজ থাকত না, তিনজনে একসঙ্গে বসে গল্প করতাম।

দুঃখের গল্পই বেশি।

করুণার বাবা ছোট-খাটো বুড়োমানুষ, নিঃশব্দে বসে অনর্গল তামাক খেতেন। কেমন কুঁজো হয়ে গেছলেন। করুণা বলে কুঁজো নাকি ছিলেন না। পূর্ববঙ্গ থেকে এই পথটা আসতে কুঁজো হয়ে গেলেন! কারও সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলতেন না। নিজের বাড়ির লোক-জনের সঙ্গেও না। ডাকলে খেতে যেতেন। না ডাকলে তাও যেতেন না, আপনমনেই তামাক খেয়ে চলতেন।

অনেক সময় দেখতাম, হুঁকো থেকে ধোঁয়া উঠত না। তবু হুঁকো টানার বিরাম নেই!

সব সময় অন্যমনস্ক। চোখ মাটির দিকে। চোখ তুলে কখনও কারও দিকে চাইতে দেখিনি।

ভারি কষ্ট হত তাঁকে দেখে।

তার চেয়েও কষ্ট হত সরমার দাদাকে দেখে। যোয়ান ছেলে। সব সময় দুটো কাঠি নিয়ে জাল বুনে চলেছে, বিনি সুতোয়।

ঠাট্টা করে জিগ্যেস করতাম, কি কর হেমন্তদা?

—জাল বুনতাছি, দেখস্ না?

কি জানি কি জাল, কিন্তু চোখে দেখা যেত না।

জিগ্যেস করতাম, কি অইব জাল বুইনা?

—মাছ দরুম। খাইতে অইব না?

সরমা।

—আছে।

হেমন্তদা আর কথা কইত না। আবার জাল-বোনায় মনঃসংযোগ করত।

স্টেশনে নিরিবিলি জায়গা ছিল না। সর্বত্র ভিড়। সর্বত্র মানুষের ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি। কিন্তু ঘর থেকে একটু দূরে হলে সেইটেই আমরা ভাবতাম নিরিবিলি।

হয় এদিকের বেড়ার ধারে, নয় ওদিকের খোলা জায়গাটায়, কারও দিকে না চাইলেই সেই তো নিরিবিলি। তেমনি করেই নিজেদের অভ্যেস করে নিয়েছিলাম।

এর মধ্যে একদিন করুণার ছোট, সব চেয়ে ছোট ভাইটি মারা গেল। আশ্চর্য করুণার বাবা কোলের ছেলেটার জন্যে এতটুকু কাঁদলেন না। চেয়ে দেখলেন না পর্যন্ত। যেন কিছুই হয়নি। প্রতিবেশীরা যেন তাকে কোলে করে বেড়াতে নিয়ে গেল।

বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন তাঁরও গাড়ি এসে গেছে। পরের ট্রেণেই যাবেন তিনি ছেলের কাছে।

গেলেনও তাই।

করুণাদের পরিবারে সে কী দুর্দিন! আমরা তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু তাতে কোনো ফল হত কিনা বোঝা যেত না। সব কথা সে নিঃশব্দে শুনত শুধু।

একদিন দেখলাম, দূরে স্টেশনের ফটকের কাছ বরাবর একটি লোকের সঙ্গে কি যেন বলছে করুণা। চেনা লোক নয়, উদ্বাস্তু তো নয়ই। দিব্যি ফিটফাট একটি ছোকরা।

আর একদিন সন্ধোবেলায় তাকে ডাকতে গিয়ে দেখি সে নেই। কোথায় গেছে তার মা-ও বলতে পারলেন না।

দেখতে দেখতে তার বেশভূষায় যেন পারিপাট্য এল। চাল-চলন, কথাবার্তা বদলে গেল।

মা আমাকে নিষেধ করে দিলে ওর সঙ্গে মিশতে। উদ্বাস্তুদের অনেক পরিবারেই কানাঘুষো চলতে লাগল: বাপ মারা গেছেন। মাথার ওপর কেউ তো নেই। মেয়েটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে।

করুণা কেমন করে যেন সেটা বুঝতে পারলে। আমাদের ঘরে সে আর আসত না। সরমাদের ঘরেও না। কিন্তু অভিভাবকদের চোখের আড়ালে আমরা মিশতাম। আগের মতো অত বেশি যদিও নয়।

দেখতে দেখতে সরমারও হালচাল বদলালো। সন্ধ্যের পর সেজে-গুজে, মুখে স্নো-পাউডার, ঠোঁটে লিপস্টিক আর চোখে কাজল দিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে করুণার মতো সেও বেরুতে লাগল।

ব্যাধিটা বোধ হয় সংক্রামক। দেখতে দেখতে অনেক মেয়েরই সাজগোজ করে সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরুবার অভ্যাস দেখা যেতে লাগল। কোনো মেয়ে মা-বাপের সম্মতিক্রমেই বেরুতে লাগল, কেউ বা মৌন সম্মতিক্রমে, আবার কেউ বা বাপ-মার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই উদ্ধত ভঙ্গীতে।

শেষের দল বাপ-মাকে শেয়ালদা স্টেশনে রেখে একে একে উধাও হয়ে গেল। তাই দেখে অন্য বাপ-মা, পাছে মেয়েরা চলে যায় সেই ভয়ে চুপ করে গেলেন। মেয়েদের বাধা দিতে সাহস করলেন না।

দেখা গেল, যাদের ঘরে এই বয়সের মেয়ে আছে এবং মেয়েরা সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরোয়, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের আশ্রয় তারা একে একে ত্যাগ করতে লাগল।

ঠোঁট বেঁকিয়ে মা বললেন, অরা বারি করছে। মুখে আগুন বারির।

এর মধ্যে একদিন করুণা আর সরমা এল বিদায় নিতে। তারাও বাড়ি করেছে আগড়পাড়া না কোথায় যেন। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের জন্যে।

ভগবান।

সন্ধ্যেবেলায় বরুণ ইসারায় ডাকলে।

দিনরাত্রি ঘুরছে বরুণ। এক-মুহূর্ত তাকে বিশ্রাম নিতে দেখি না। এই আসছে, তখনই আবার চলে যাচ্ছে। কিন্তু দেহপাত করা ছাড়া আর কিছু হচ্ছে বলে মনে হয় না। অন্ততঃ মুখ দেখে তো নয়।

অনেক দিন পরে এমন করে ইসারা করলে। বলা যায় অনেক দিন পরে ওকে দেখলাম।

কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

—চল, একটু চা খাইয়া আসি।—বরুণ বললে।

—না।

—সিনেমা যাইবা?

—না।

—না ক্যান? মন হয় না?

—না।

বরুণ ছাড়বে না। অবশেষে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গভীর লজ্জায় বলতে হল, সিনেমা যাওয়ার শাড়ি কোথায়? এই ছেঁড়া শাড়িটা পরে তো সিনেমা যাওয়া যায় না! এমন কি, ওই দোকানটাতেও না।

বরুণ মাথা নীচু করলে।

সত্যি।

বললে, কি করণ যায় কও।

কিছুই করার নেই নিঃশব্দে দিনগত পাপক্ষয় করা ছাড়া। কিন্তু সেকথা না বলে নতমুখে চুপ করে রইলাম।

বরুণও।

তখন যেকথা আমাদের দুজনের মাথার মধ্যেই টগবগ করে ফুটছিল সে এই যে, এই কলকাতা সহরে কত আলো, কত হাসি, কত আনন্দ। কিন্তু তাতে একটি চুমুক দেবার অধিকারও কি আমাদের নেই?

অনেকক্ষণ পরে বরুণ বললে, ওই মাইয়াটার নাম কি য্যান। করুণা না কি?

—হ। করুণা। ক্যান?

—দেখি একটা ট্যাক্সি কইরা কই য্যান ছুটতাছে।

—আইজ?

হ।

আবার বরুণ কি যেন ভাবতে লাগল।

একটু পরে জিগ্যেস করলে, সে বারি করছে শুনছ?

—শুনছি। মুখে আগুন বারির।

বরুণ বললে, আর আমাগো এই শেয়ালদার ইস্টিশানটা খুব বালো, না? সগ্‌গো।

হঠাৎ সে বারুদের মতো ফেটে পড়ল: এর মাথায় একটা বাজ পড়ে না?

বরুণ আর পারছেনা। সে রেগে গেছে। ধীরে ধীরে ওর কাঁধের উপর একটা হাত রাখলাম। সঙ্গে সঙ্গে মেঘ ভেঙে বৃষ্টি নামল।

দুই হাতে মুখ ঢেকে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

এর কিছুদিন পরে।

কিছুই ভালো লাগছিল না। শরীরের গিঁটগুলো যেন ঢিলে হয়ে গেছে। বুকের ভিতরটা একেবারে খালি। দূরে বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। বিশেষ কিছুই নয়। অথবা সব কিছুই।

দেখছিলাম স্টেশন ভর্তি উদ্বাস্তুদের দিকে। ওরা যেন আমি নই, অন্য। ওরা যেন কেউ নয়, কতকগুলো যন্ত্র। ঘুরছে ফিরছে, উনোন ধরাচ্ছে, রান্নাবাড়া করছে, ঝগড়া করছে পরস্পর কিন্তু সেও যেন ওরা নয়। নাচের-পুতুল যেমন অন্যের ইঙ্গিতে ঘোরে, ফেরে, নাচে, তেমনি। তার চোখ আছে কিন্তু দেখতে পায় না, কান আছে কিন্তু শুনতে পায় না, মুখ আছে কিন্তু কথা বলে না। তার নিজের কোনো সত্ত্বা নেই। যেন ছায়া।

বরুণকে জিগ্যেস করেছিলাম, এখানে, এই নরকে আর কতদিন থাকতে হবে?

জবাব দিয়েছিল, ভগবান জানেন।

আমাদের বিয়ে হচ্ছে কবে?

তাও সে জানে না, ভগবান জানেন।

কিন্তু তিনিও জানেন কি না সন্দেহ। তাঁর রাজ্যে তো আমরা বাস করি না। জানে শয়তান, এই রাজ্য যে চালাচ্ছে।

তারপরে আর তাকে কোনো কথা জিগ্যেস করিনি। করা নিরর্থক। কি করে বিয়ে হয়? স্টেশন প্ল্যাটফর্ম তো নব-দম্পতির বাসরঘর হতে পারে না!

বিয়ের কথা ভাবাই যায় না।

একা দাঁড়িয়ে সেকথাও ভাবছিলাম।

গম্ভীর শব্দে একটা ট্রেণ এসে দাঁড়াল।

ট্রেণ সম্বন্ধে আর কোনো আগ্রহ বোধ করি না। ট্রেণ আসছে, যাচ্ছে। ক্রমাগত। সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত। ট্রেণের শব্দে সচকিত হওয়া দূরে থাক এখন আর কানেও যায় না। গেলেও গ্রাহ্য করি না।

এও গ্রাহ্য করলাম না।

ভাবছিলাম আর তার সঙ্গে এলোমেলো চাইছিলাম। দৃষ্টিহীন চাওয়া। কোনো বিশেষ দিকে নয়। হঠাৎ এক সময় দৃষ্টি যেন থমকে গেল।

করুণা না?

হ্যাঁ, সেই। যদিও চেনবার উপায় নেই। একটি চটকদার তরুণী। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চাইছে। কাকে খুঁজছে যেন। দৃষ্টিটা আমাদের ঘরের দিকেই।

কিন্তু কোনো উৎসাহ বোধ করলাম না। করুণার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক!

একদিন, হঠাৎ একদিন, জোয়ারে ভাসতে ভাসতে এক ঘাটে এসে ঠেকেছিলাম। দুদিনের জন্যে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল সত্যি। কিন্তু এখন সে কোথায় আর আমি কোথায়?

(শেষাংশ ৬৪ পৃষ্ঠায়)

সবার মুখেই এক কথা
রেনবো
কালি
আজকাল প্রায় সবাই 'রেনবো' ফাউন্টেনপেন কালি ব্যবহার করছেন কারণ এতে ঝরঝরে লেখা হয়, তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়, সাবলীল গতিতে কালি নামে
Rainbow
Ink
রেনবো ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
২।২এ, আর্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
IPB/R9

বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব
দুর্গাপূজা
আর
পাখার জগতে
মার্কনী ফ্যান
প্রস্তুতকারক :—
মার্কনী ইলেকট্রিক
কর্পোঃ (প্রাঃ) লিঃ
১১৭, কেশব সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৯। ফোনঃ ৩৫-৩০৪৮
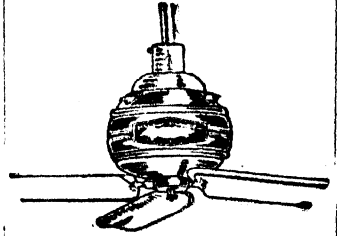
[লেখক-পরিচিতি : ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসের 'এশিয়া ম্যাগাজিন'-এ প্রকাশিত এই গল্পটির লেখক আরেফ এল্-খোরি সিরিয়ার নবীন লেখকদের অন্যতম এবং বহু দেশ-দেশান্তর ভ্রমণ করেছেন।]

ছোট্ট মিষ্টি শহর হাস্‌বায়া। বাসিন্দারা বলে, হারমন পর্বত ও ভূমধ্যসাগরের মাঝে সবচেয়ে বড় ছোট শহর। গাছের সারির ফাঁকে ফাঁকে সাদা এবং ধূসর রঙের পাথরের বাড়ীগুলি নদীর দু পাশে লেপ্টে বসে আছে। কোন বাড়ীর ছাদ পিরামিডের মত কোণাচে, আবার কোনটি বা সাধারণ সমতল। পান্নানীল সমুদ্রে যেন মিনার কারুকার্যখচিত।

হাস্‌বায়ার সবচেয়ে পরিচিত ইমারত হল আদালত গৃহটা। প্রাচীন ক্রুশেডারদের দুর্গের পাশে তুর্কীরা এই বাড়ীটি তৈরী করেছিল। পরে যখন প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে রাজা ফয়জল সিরিয়ার শাসন-কর্তৃত্ব লাভ করেন, তখন সে বাড়ীটি আসে আরবদের হাতে। তারও পরে ফরাসীরা যখন হাস্‌বায়াকে লেবানন পর্বতের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেয়, তখন সেই গৃহটি লেবানীজ সরকারের অধিকারে আসে।

উষ্ণ বসন্তের দিন, রোদে ঝকঝক করছে। সিরিয়ার প্রদীপ্ত সূর্যালোক পান্না-নীল সমুদ্রের বুকে আরামে জলকেলি করছে। শুকনো হাওয়া ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে গৈরিক ও সবুজ পাহাড়ের বুকে। কাসিদ নামে একটি কিশোর আর হিন্দ নামে একটি কিশোরী আদালত-গৃহের সামনে বিরাট তোরণের মুখে এসে থমকে দাঁড়াল। পাথরের মূর্তির মত কঠিন ও নিশ্চল এক লেবানীজ সৈনিক বেয়নেট হাতে প্রহরারত।

কিশোরযুগলের পরনে ঘরে-বোনা পোশাক, পায়ে কালো চামড়ার মোটা পেরেকওয়ালা গেঁয়ো জুতো। কাসিদের মাথায় সাদা মসলিনের আবরণ, ছাগলের লোমে বিনুনি করা কালো 'ইঘল' দিয়ে বাঁধা। হাঁটু পর্যন্ত লাল রঙের আঁটসাট 'আবা'র নীচে নক্সা কাটা কালো কাপড়ের ছোট জামা, আর তারও তলায় ঝকঝকে সাদা কামিজ। কোমরে বাদামী রঙের সিল্কের মোটা বন্ধনীর সঙ্গে একটা বাঁকা ছোরা আট-কানো। নীলরঙের পায়জামাটা বেঢপ, ফুলে রয়েছে। হিন্দের স্নিগ্ধ বাদামী চোখ দুটিতে ঘন করে সুর্মা মাখানো, আঙুলের ডগা হেনার রঙে রাঙানো। সাদা মসলিনের 'মনদিল'টা মাথা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত নেমে এসেছে। তার ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ছে তার নীল জামা ও কালো কুর্তা।

চার পাশের প্রত্যেকটি জিনিস অসীম ঔৎসুক্য নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ওরা। ধীর পদে নীরবে চত্বরের দিকে এগিয়ে যায়। সেখানে একদল সৈন্য বসে রোদ পোয়াচ্ছে। কিশোরযুগল সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে রাখে, যেন 'জ্বীন' দেখলে যাত্রা অশুভ হবে। চোখ ফিরিয়ে বাঁ দিকে তাকায়, কি করবে বুঝতে পারে না।

দেয়ালে কালো বোর্ডে অনেকগুলি বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়ে। কাসিদ এগিয়ে যায় সেদিকে, একটু চোখ বুলিয়েই হিন্দের কাছে ফিরে আসে। ইঙ্গিতে পিছনে পিছনে আসবার নির্দেশ জানায়।

দালানের শেষ প্রান্তে পৌঁছে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে কাসিদ, ডানদিকে কয়েকটা দরজা, তাই দেখতে পেয়ে আর একবার হিন্দকে অনুসরণ করতে ইসারা করে। দরজাগুলির উপর কি সব লেখা, সেগুলি পড়তে থাকে কাসিদ। একটা দুটো তিনটে দরজার উপরকার লেখা পড়ে কাসিদ বুঝতে পারে, সে যে আপিস খুঁজছে তার কোনটাই এখানে নেই। দোতলা-মুখো একটা ঘোরানো সিঁড়ি দেখতে পেয়ে তারই গোড়ায় এসে দাঁড়ায়।

খাড়াই সিঁড়ি আর বিশ্রী দেয়ালগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে দেখে কাসিদ, তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকে। হিন্দকেও উঠে আসতে বলে। প্রতি পদক্ষেপে ওদের অনিশ্চয়তা ও সংশয়, পাহাড়িয়ার পক্ষে সমতল ভূমিতে চলার অভ্যাসের ফল। হিন্দও চলেছে মুখ বুজে কাসিদের পিছন পিছন। কাসিদ এগোয় দু পাশের দেয়ালের দিকে তাকাতে তাকাতে, আর মাঝে মাঝে একবার ঘাড় ফিরিয়ে হিন্দকে দেখে নেয়। প্রতি পদক্ষেপে সিঁড়িটা সম্পর্কে তার সংশয় বাড়ে।

শেষ পর্যন্ত একটা দরজা পেয়ে যায়। তার গায়ের লেখা দেখে সে নিশ্চিন্ত হয়, এই ঘরই বোধ হয় সে খুঁজছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দরজার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যেন কোন বেড়াল শিকারী কুকুরের সামনে পড়ে গেছে।

ঢুকে যা, কাসিদ হাত নেড়ে হিন্দের উপর হুকুম চালায়।

তুই ঢোক, তোর হাতে তো ছোরা আছে, বলে হিন্দ।

কাসিদ নাছোড়বান্দা। হিন্দ ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। ছেলে মানুষের মত হেসে ওঠে কাসিদ, হিন্দ চোখ ফিরিয়ে দেয়ালের দিকে তাকায়। কাসিদ মুখটা এগিয়ে আনে হিন্দের কাছে, হিন্দও কাসিদের দিকে চোখ ফেরায়। হিন্দই মুখ খোলে আগে, আমরা এখন কি করব?

আমি কি জানি, আল্লাহ্‌ জানে। তার বলিষ্ঠ কাঁধ দুটোকে ঝাঁকানি দিয়ে বলে কাসিদ। এ ওর দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকায়। কাসিদ সাহস করে দু-পা এগিয়ে যায় দরজার দিকে। দৃষ্টি দিয়ে তাকে অনুসরণ করতে হিন্দের রাঙা ঠোঁটে একটু শুকনো হাসি ফুটে ওঠে। হঠাৎ থেমে যায় কাসিদ, চুপ করে একটু কি ভেবে, তারপর ধপ্‌ করে সিঁড়ির উপর বসে পড়ে। হিন্দও এসে বসে পড়ে তার পাশে। এমন সহজভাবে বসে ওরা যেন যে-যার বাড়ীর সিঁড়িতে বসে আছে।

তুই ঢুকলি না কেন, জিজ্ঞাসা করে কাসিদ।

তুইই আগে ঢুকে ওটা নিয়ে আয় না কেন, প্রস্তাব করে হিন্দ।

কাসিদ মাথা নাড়ে, বুঝিয়ে দেয় হিন্দের প্রস্তাবটা অনুমোদন করতে পারল না।

হঠাৎ পায়ের শব্দ শোনা যায়। সিঁড়ির আরও একটু উপর থেকে আসছে শব্দটা, সঙ্গে সঙ্গে ওরা দুজন ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়, দেখে ইউরোপীয় পোশাকে সজ্জিত কে একজন ওদের দিকে নেমে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে ওরা চোখ ফিরিয়ে নেয়। লোকটি কিন্তু নেমেই আসে। ওদের চেয়ে দু ধাপ উপরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে।

জিজ্ঞাসা করে, কি করছ তোমরা এখানে?

ওরা কোন জবাব করে না, মুচকে হাসে শুধু।

কি করছ তোমরা এখানে, কি চাই? এবার-কার প্রশ্নের মধ্যে অধৈর্য প্রকাশ পায়।

ওরা উঠে দাঁড়ায়। সেই ঘরটার দিকে আঙুল

(শেষাংশ ১৫৯ পৃষ্ঠায়)

শুনেছি রোদসী শব্দটা বৈদিক এবং ওর অর্থ স্বর্গ-মর্ত্য এক-সংগে। রবীন্দ্রনাথ কবিতার খাতিরে শব্দটাকে ক্রন্দসী করেছেন এবং মহাকবি-প্রয়োগ রূপে সেটাও চল হয়েছে।

আমি কিন্তু ক্রন্দসী কথাটা ক্রন্দনময়ী নারীর বিশেষণ হিসাবে ব্যবহারেরই পক্ষপাতী। জানি না বন্ধু সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কি অর্থে এই শব্দটি তাঁর কবিতা পুস্তকের নামকরণে প্রয়োগ করেছেন। যদি আমার অর্থে করে থাকেন, তাহলে তাঁকে দুনো ধন্যবাদ।

কিন্তু এই লেখায় আমি শব্দতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে বসিনি। সে কাজের ব্যাপারী যাঁরা, পারতপক্ষে আমি তাঁদের ত্রিসীমানায় ঘেঁষি না। লক্ষ করে দেখেছি, বেশীক্ষণ তাঁদের কথাবার্তা শুনলেও রক্তের চাপ বাড়ে।

আমি এক সত্যিকার ক্রন্দসীর কাহিনী বিবৃত করছি। ধরুন তাঁর নাম অপর্ণা। প্রতিবেশী কন্যা, আমার চেয়ে বছর পাঁচেকের ছোট। আমি যেবার বি-এ দিলাম, তিনি সেবার দিলেন ম্যাট্রিক।

একদিন দেখলাম, বড়বৌদির কাছে বসে হাপুসনয়নে কাঁদছেন অপর্ণা। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে বৌদি? তিনি বললেন, তিন নম্বরের জন্যে অংকে ফেল করে গেছে বেচারী। কিছু করতে পারো ঠাকুরপো?

বছর দেড়েক পরে আর একদিন বিকালে দেখলাম, মার কাছে বসে অপর্ণা আর তাঁর মা। এদিনও দেখলাম অপর্ণা অবিরাম ফোঁপাচ্ছেন, আর আঁচল দিয়ে চোখ মুছছেন।

মার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। মা বললেন, তেরো তারিখে অপুর বিয়ে। অতো এতদিনের ঘরবাড়ী বাপ মা ভাইবোন সব ছেড়ে যেতে মনটা কেমন করে না! একথায় আরো জোরে কেঁদে উঠলেন অপর্ণা।

হয়ত বছর দু-তিন পরে। একদিন শুনলাম অপর্ণা পিত্রালয়ে এসেছেন। দিন-দুই পরে একদিন আসতেও দেখলাম তাঁকে আমাদের বাড়ীতে। অবাক কাণ্ড, সেই আগের মতো মার কাছে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। মা আমাকে ডেকে বললেন, কামলা হয়ে ওর ছেলেটা না বাঁচার মতো হয়েছে রে। তোর বন্ধু সেই ডাক্তারকে একবার দেখা না এনে? প্রথম সন্তান!

দিন-দশেক পরে গোটা বাড়ী ভরে উঠল কান্নার রোলে। বড়বৌদি বললেন, অপুর ছেলেটা মারা গেল। আহা-হা, এমন সর্বনাশ যেন পরমশত্রুরও না হয়। ছেলেমানুষ, কি করে এ শোক ভুলবে জানি না।

বড়দা কাছে দাঁড়িয়ে দাঁতন চিবুচ্ছিলেন। বেজার হয়ে বললেন, ব্যস্ত হচ্ছো কেন? যেমন করে সবাই ভোলে, তেমনি করেই ভুলবে। গয়েকে আর গোবরাকে তুমি ভুললে কি করে? বৌদি আর কিছু বললেন না, অগ্নি-দৃষ্টিতে বড়দার দিকে তাকালেন শুধু। সেইদিনেই কি তারপরের দিন, কাঁদতে কাঁদতে ট্যাক্সিতে উঠতে দেখলাম অপর্ণাকে। শুনলাম শ্বশুরবাড়ী চলে যাচ্ছেন।

গোটা পাঁচেক বছর হয়ে গেল। আমি তখন সবে ঢুকেছি প্রফেসারিতে। একদিন দেখলাম বছর-চারের একটি ন্যাড়া মাথা বাচ্চা ছেলের হাত-ধরে এবং একটি বাচ্চা মেয়ে কোলে নিয়ে অপর্ণা ঢুকলেন বড়বৌদির রান্নাঘরে। তাঁর পরনে সাদা থান, দুহাত খালি। একটু পরেই দেখলাম বড়বৌদির গলা জড়িয়ে ধরে হু হু করে কাঁদছেন অপর্ণা।

বড়বৌদি আমায় বললেন, সর্বনাশ হয়েছে ঠাকুরপো। মেয়েটাকে অকূলে ভাসিয়ে গেছেন ভদ্রলোক। প্রভিডেন্ট ফণ্ডে আর ইনসিওরেন্সে কিছু আছে। সেটা যদি তুলিয়ে দিতে পারো, তবেই ছেলেমেয়ে দুটো রক্ষে পাবে। কিন্তু এক জোচ্চোর ভাসুর আছে, সে চেষ্টা করছে সব হাতিয়ে নিতে।

বেশ কিছুদিন পরে, বোধ হয় সাত-আট বছর হবে। আমার ভাইপো টাবল এসে বলল, কাকু, দীপুর মা তোমাকে ডাকছেন। দেখি বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপর্ণা ভেউ ভেউ করে কাঁদছেন। বড়বৌদি তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, কিন্তু তিনি ঠাণ্ডা হচ্ছেন না কিছুতেই।

বললাম, কি বৌদি, হয়েছে কি? বৌদি বললেন, অপুর ছেলেটা সকালে পার্কের স্কুলে পড়তে গিয়েছিল, এখন বারোটা বাজে, এখনো ফেরেনি। একবার দেখো না ঠাকুরপো খোঁজ করে। অন্ধের নড়ি, ওর প্রাণটা কি রেছে, বুঝতেই পারছ ত!

বেলা চারটের সময় এক পুলিশ কনস্টেবল হাত-ধরে নিয়ে এল দীপুকে। হাঁটতে হাঁটতে সে নাকি মেটেবুরুজে চলে গিয়েছিল, তারপর এক বুড়ো দর্জি তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে বস্তির মধ্যে আটকেছিল। পাড়ার লোক পুলিশে খবর দেওয়ায়, শেষ পর্যন্ত উদ্ধার পেয়েছে!

আরো বছর আষ্টেক পরে অপর্ণাকে দেখলাম, আমারি শোওয়ার ঘরে আমার সহধর্মিণীর কাছে বসে অজস্রধারায় চোখের জল ফেলছেন। আমি ঢুকতেই সামলে নিয়ে উঠে গেলেন তিনি। স্ত্রী বললেন, দীপেন মা-র বাক্স ভেঙে টাকা-গয়না চুরি করছে, নেশা করছে, জুয়া খেলছে। একেবারেই বয়ে গেছে ছেলেটা। বিশ বছরের ছেলে, বিধবা মা-র অবস্থা বোঝে না! পারো ত দাও না একটা কাজ-কর্ম জুটিয়ে!

বছরখানেক পরে একদিন রাত্রে বাড়ী ফিরেছি, হঠাৎ হে হে করে কাঁদতে কাঁদতে অপর্ণা বাড়ী ঢুকলেন আমাদের। বড়বৌদি আর সবিতা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে। তাঁদের দেখে ডুকরে কেঁদে অপর্ণা বললেন, বড়মাগো, সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে ছেলে আর বৌ আমায় গলা-ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় নামিয়ে দিলে! আজ রাত্তিটুকু তোমাদের আশ্রয়ে থাকতে দাও, কাল সকালে বারাসত চলে যাব আমি।

কাঁদতে কাঁদতে বারাসতে মেয়ে-জামাইয়ের কাছে চলে গেলেন অপর্ণা। বড়বৌদি বললেন, আহা, ছোটবেলা থেকে মেয়ের মতো কাছে কাছে মানুষ। বুকটা ফেটে যায় যেন ওর কথা ভাবলে। সবিতা এ সংসারে নবাগতা, তিনি বললেন, এই রকম শয়তান ছেলেকে জেলে দিতে হয়। বড়বৌদি বললেন, মা হয়ে তাই কি পারে? কুপুত্র যদ্যপি হয়......

বছরখানেক পরে বড়বৌদি একদিন বললেন, ঠাকুরপো, ট্যাবল পারবে না। তার পরীক্ষা। তুমি ভাই শনিবার দিন একবার বারাসত নিয়ে চলো আমাকে। অপু অনেক কান্নাকাটি করে চিঠি লিখেছে। আর বোধ হয় বাঁচবে না।

(শেষাংশ ১৫৫ পৃষ্ঠায়)

অতশান্তিক

আশাপূর্ণা দেবী

এক শ্রেণীর লোক থাকে যারা মুহূর্তে পরকে আপন করে নিতে পারে। এক দিনেই 'পরিচিতের' সীমা থেকে 'বন্ধু' এবং দু'দিনে বন্ধু থেকে অন্দরের আত্মীয়ে পরিণত হবার ক্ষমতা তারা রাখে। কাজে কাজেই এই অসমতল অমসৃণ পৃথিবীর একেবারে মাঝখানে নিজের জন্য বেশ একটু মসৃণ সমতলভূমি তারা ঠিকই সংগ্রহ করে নেয়।

এদের জন্যে পৃথিবীর সমস্ত সুবিধের দরজা উন্মুক্ত।

কিন্তু আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা হৃদয়বিত্তে আদৌ দীন না হলেও, তাদের সমস্ত মনটাকে কে যেন ঢেকে রাখে একটা অকারণ কুণ্ঠার পুরু আবরণে। সেই আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে পড়বার ক্ষমতার অভাবেই অন্যের হৃদয়ের কাছাকাছি এসে পৌঁছতে পারে না তারা।

কেন এই কুণ্ঠা, তা তারা নিজেরাই জানে না। অথচ এই সহজ সপ্রতিভতার অভাবেই হয়তো তাদের নাম হয়—'অহঙ্কারী, উন্নাসিক, দেমাকী।' আর যারা তাদের কিছুটা বোঝে, তারা হয়তো বা কৃপা করে বলে 'লাজুক মুখচোরা।' এরা তাই চিরকালই জগতের এক পাশে পড়ে থাকে। এদের মনের মধ্যে কখনো অভিযোগ থাকে না, অনুযোগ থাকে না, বুঝি কারও কাছে কিছু প্রত্যাশাও থাকে না। শুধু হাসিমুখে সব রকম অসুবিধে সহ্য করে চালিয়ে যাবার এক আশ্চর্য ক্ষমতা তাদের থাকে। নিজেকে অপরের চোখ থেকে গুটিয়ে রাখতে পারলেই তাদের শান্তি।

বন্ধু এদের ভাগ্যে কচিৎ জোটে। তবে দৈবাৎ যদি জুটে যায়, সে বন্ধুত্ব সম্পর্ক রীতিমত গভীরই হয়। এদের যারা বুঝতে পারে, তারাই পারে এদের মনের উপরকার পুরু আবরণটা সরিয়ে ভিতরটাকে দেখতে। এমনি এক দরদী-দৃষ্টি নিয়ে একদা অমর চাটুয্যে দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর সহকর্মী বিজয় বসুকে।

তখন বিজয়বাবুর এখনকার এই পালিশ চকচকে সুমসৃণ টাকের জায়গাটায় ছিল এক গাদা কালো চকচকে কেশভার, আর এই ঈষৎ স্থূল ভারী থমথমে দেহটার কাঠামোখানা ছিল সোজা সতেজ বলিষ্ঠ। আর যে অমরবাবু তাঁর নামের মহিমা ব্যর্থ করে বহু দিন হলো মরজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন, তিনি তখন বাজী রেখে একটা আস্ত ছাগলের মাংস খেয়ে হজম করতে পারতেন, এবং অফিসের টিফিনে তাঁর বাড়ীর তৈরি একদিস্তে হাতে গড়া রুটি না হলে চলতোই না। সহকর্মী বিজয়বাবুর আহারে আচরণে মিতাচার লক্ষ্য করে হাসি-ঠাট্টা করতেন অমরবাবু, সেই সূত্রেই আলাপ।

কিন্তু হাসি-ঠাট্টার মধ্যে থেকেই অমর চাটুয্যে সহসা কেমন করে যেন মুখচোরা বিজয় বসুর ভিতরকার নির্মল পরিচ্ছন্ন খাঁটি মানুষটাকে আবিষ্কার করে বসেছিলেন। গড়ে উঠেছিল বন্ধুত্ব। নিবিড় গভীর বন্ধুত্ব।

অমরবাবুই নিজের চেষ্টা আর বুদ্ধির জোরে জানতে পেরেছিলেন, বিজয় বসুর সাংসারিক পরিস্থিতিটা কণ্টকাকীর্ণ। আর্থিক অবস্থা খারাপ নয়, কিন্তু সংসারে বিজয় বোস অবান্তর! বাপ বাল্যকালে গত, কিছুকাল হলো মাও সেই পথে। আর তদবধিই বৌদিযুগল মৃতা শাশুড়ীর এই 'ধেড়ে গোবিন্দ' অবিবাহিত ছেলেটিকে 'আপদ-বালাইয়ের' ঘরে জমা দিয়ে রেখেছেন।

আর্থিক অসঙ্গতি হয়তো নেই দাওরের, একটা পেট, চাকরী-বাকরী করে, মোটা টাকা খাইখরচ দিয়েই না হয় থাকে, কিন্তু সামর্থিক সঙ্গতিটার জোগান দেয় কে? দুজনেরই কোলে কাঁচ, শাশুড়ীর কোলের কাঁচকে দেখবার সময় কোথা? তাই কি সহজ মানুষ? অক্ষম অকর্মণ্য! খেতে না দিলে বলতে জানে না 'দাও।' বর্ষার দিনে ধুতি পায়জামা ভিজে থেকে গেলে, অম্লান বদনে ভিজেটাই টেনে পরে, বলে না যে 'ভিজে আছে।'

শুধু নিজের ব্যাপারে কেন, সব দিকেই অকর্মণ্য। দেহটাই শুধু জোয়ান বলিষ্ঠ!

এত বড় ধাড়ী ছেলে এক দিন গেরস্থের বাজারটা করে দিতে পারে না! 'পারবো না' একথা অবিশ্যি বলে না, কিন্তু গেলে এমন মাল কিনে আনে যে, দ্বিতীয় দিন আর বলতে সাধ যায় না। অথচ যত ইচ্ছে কড়া সমালোচনা করো, রাগ নেই।

রাগ অনুরাগহীন পুরুষকে সহ্য করা মেয়েমানুষের পক্ষে কঠিন! কাজেই বৌদিদেরও খুব দোষ দেওয়া যায় না যদি ভেবেচিন্তে সংসারটার মত, ওই কঠিন কাজটাকেও তাঁরা দুই জায়ে ভাগ করে নেবার ব্যবস্থা করে থাকেন।

ব্যবস্থা হয়েছিল দু'বেলায় দুই বৌদির কাছে খাবে বিজয়।

কিন্তু কখনো কখনো নাকি বাসুকীও পাশমোড়া দেন। সেই দৃষ্টান্তেই বোধহয় বিজয় এ ব্যবস্থার প্রতিবাদে একটা প্রতিকার চেষ্টা করে বসলো। দু' বেলাই হোটেলে খাওয়ার বন্দোবস্ত করে নিল সে।

অমরবাবুর সঙ্গে যখন ঘনিষ্ঠতা হলো, তখন বিজয় বোসের সেই 'হোটেল যুগ' চলছে এবং অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ায় আমাশা দেখা দিয়েছে।

অমরবাবু কিছুটা শুনে, আর কিছুটা অনুমান করে, এক অসমসাহসিক প্রস্তাব করে বসলেন।

প্রথমটা বিজয় বসু আকাশ থেকে পড়েছিলেন, কিন্তু পরিস্থিতির চাপে মত পাল্টালো। অমরবাবু তাঁর বৈঠকখানাটাকে খালি করে ধুইয়ে মুছিয়ে ঠিক করে রাখলেন।

বিজয় বোসের বৌদিরাই শুধু স্ত্রীলোকের দোষ-গুণের অধিকারিণী তা নয়, মুখনাড়া দিলেন বসুমতী দেবীও, বললেন, "তার মানে আমি তোমার সোহাগের বন্ধুর রাঁধুনীগিরি করবো, কেমন?"

অমরবাবু প্রবোধ দিলেন, "আ ছি ছি! কি যে বল! বাড়ীর লোকের মতন দু'বেলা দু'থাল

খাবে বৈ তো নয়! দেখো কোন ঝঞ্ঝাট নেই লোকটার। নিস্পৃহ নির্বিরোধী, যা দেবে তাই খাবে।"

বসুমতী খুঁতখুঁত করে বলেছিলেন, "তবু যাই বলো একটা পর লোক! চিন্তা বাড়লো বৈ কি!"

অমরবাবু মৃদু হেসে চুপি চুপি বললেন, "তেমনি কিছু চিন্তা তো কমলোও গো! এক খরচে, এক উঠোনে, ওই একখানা ঘর কে তোমার এতগুলো টাকা দিয়ে ভাড়া নিতো?"

বলেছিলেন বটে কথাটা অমরবাবু, কিন্তু সেটা স্ত্রীকে বুঝমানাতে, সত্যিই পয়সার লোভে নয়। বন্ধুটি তাঁর গেরস্থ বাড়ীর দুটো ভাত খেয়ে বাঁচুক, এই ছিল তাঁর বাসনা।

নীচেকার দালানের একটি কোণে বিজয়বাবুর জন্যে ছোট্ট একটি টেবিল বরাদ্দ করা হলো, আর একখানা লোহার-চেয়ার! লাজুক মানুষ বিজয়বাবু অমরবাবুর সঙ্গে এক সঙ্গে খাবারে বসে পারিবারিক পরিবেশে খেতে নিতান্ত কুণ্ঠিত, আর বসুমতীও বললেন, "তাই ভাল বাপু! মাথায় কাপড় টেনে থালাটা বসিয়ে দিয়ে চলে এলাম, নিশ্চিন্দি। রান্নাঘরে ঢুকলেই হাঁড়ির খবর জানাজানি। তাছাড়া অতটা মাখামাখির দরকারই বা কি? যতই হোক কায়স্থ"

তা তখনো মেয়েদের মনের মধ্যে ওই বামুন কায়েত সংস্কারটা রীতিমতই ছিল। সে তো আর আজকের কথা নয়! এ বাড়ীর বর্তমান কর্তা সমর চাটুয্যে তখন বছর তিনেকের শিশু।

তখন বসুমতী ভরা বর্ষার নদী।

কিন্তু উদ্দামতা ছিল না বসুমতীর। সংসারে তো শুধু স্বামী-স্ত্রী আর খোকা, তবু পরিমিত হাসি, পরিমিত কথা, চলনে বলনে সংযত গাম্ভীর্য। রঙিন শাড়ী কদাচিৎ পরতেন। তবে চওড়া পাড়ের সখটা একটু বেশীই ছিল। চওড়া পাড় ফরসা একখানি শাড়ীতে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে মুড়ে টেবিলের উপর জলের গেলাস দিয়ে "ঠাঁই" করে রেখে ভাতের থালাটা বসিয়ে দিয়ে যেতেন, এবং স্বামী অথবা শিশু পুত্রকে দিয়ে প্রশ্ন করতেন "কিছু চাই কিনা!"

কিন্তু কোন দিন কি কিছু চেয়েছেন বিজয়বাবু?

কই কিছুতেই মনে পড়লো না বসুমতীর। লজ্জিতমুখে শুধু "না না কিছু না" করে তাড়াতাড়ি খেয়ে চলে গেছেন ভদ্রলোক। খেয়েছেন কিন্তু থালা চেঁচে-পুছে নিতান্ত তৃপ্তির সঙ্গে। বাড়ীর ঝিটা হেসে হেসে বলতো, "বাবার বন্ধুর পাত থেকে পিঁপড়ে কেঁদে ফিরে যায়।"

কিন্তু বসুমতী এতে সন্তুষ্ট ছিলেন। একে তো জিনিসের 'ফেলাছড়া' অপচয় সেই ছেলেবেলা থেকেই তাঁর দু' চক্ষের বিষ, তাছাড়া এমনভাবে খাওয়ার মধ্যে রন্ধনকারিণীর প্রতি যেন একটা সম্মান প্রকাশ আছে।

স্বামীর হঠকারিতার জন্যে যে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন বসুমতী, সে বিরক্তি কখন বিলীন হয়ে গিয়েছিল। সত্যিই লোকটা এত নিস্পৃহ নির্লিপ্ত যে, বাড়ীতে আছে এ কথা মনেই পড়ে না। শেষ রাত্রে উঠে সকলের ঘুম ভাঙার আগে স্নান করে নেয়, সারা সকাল চুপচাপ কাগজ পড়ে, দাড়ি কামায়, নিঃশব্দে এক সময় অফিসের পোষাকে প্রস্তুত হয়ে এসে নীচের দালানের সেই নির্দিষ্ট কোণটিতে, লোহার চেয়ারটায় এসে বসে থাকে।

অমরবাবু দোতলা থেকে নেমে এসে ডাকহাঁক করেন, "কই গো ভাত বাড়নি? এ কী, বিজয় যে বসে! ছি, ছি, কি কাণ্ড! আচ্ছা তোমাকেও বলি বিজয়, বরাবর পরই রয়ে গেলে? অফিসের টাইম হয়ে গেছে, চুপ করে বসে আছ? "বৌদি ভাতটা দিয়ে দিন" এটুকু বলতে পার না?

"না না এইতো এলাম, এইতো এলাম!" আরক্ত মুখে বলেন বিজয়বাবু, "আপনিও তো অফিস যাবেন!"

না, এতো অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও অমরবাবুকে কখনো 'তুমি' বলেন নি বিজয়বাবু। নইলে বয়সে আর কতই তফাৎ ছিল? দু'এক বছরের। কোন ছলেই গণ্ডীর বাইরে যাবার সাহস সংগ্রহ করে উঠতে পারতেন না বিজয়বাবু। নইলে প্রতি দিনই তো সন্ধ্যার পর অমরবাবু দোতলা থেকে নেমে এসে বসেছেন বিজয়বাবুর ঘরে, কিন্তু বিজয়বাবু কি এই দীর্ঘকালের মধ্যে কোন দিনও দোতলায় উঠেছেন? হ্যাঁ উঠেছেন, মনে করতে পারেন বসুমতী, একদিন উঠেছিলেন।

যেদিন হঠাৎ অফিস প্রত্যাগত অমর চাটুয্যের সহজ হৃদযন্ত্রটা বিনা নোটিশে জবাব দিয়ে বসেছিল! বসুমতী আর্তনাদ করে উঠেছিলেন। ওই একটা দিনই।

হয়তো বিজয়বাবুর এই আড়ষ্টতার দোষেই বসুমতীও কখনো তাঁকে 'ঠাকুরপো' সম্বোধন করতে পারলেন না, পারলেন না ছেলেকে 'কাকা' ডাক ডাকাতে।

'ভরা বর্ষার নদী' কখন বালির চরায় মুখ লুকিয়েছে, হাতীপাড় শাড়ীর বর্ণলীলা কবে অন্তর্হিত হয়েছে নিঃসীম শাদার শূন্যতায়, এক ঢাল কালো রেশমের তাল সংক্ষিপ্ত হতে হতে নিজের সবটুকু বিসর্জন দিয়েছে কাঁচির কবলে, মাথাটা বেষ্টন করে রাখতে যেটুকু জের অবশিষ্ট আছে, তাতেও এখানে সেখানে কালের ধূসর স্বাক্ষর, তবু বিজয়বাবু, বিজয়বাবুই রয়ে গেলেন, কোন দিন কোন প্রয়োজনেও সরে এলেন না আত্মীয়তার সীমানায়।

এখনো সেই মাথার কাপড়টা একটু টেনে দালানের কোণের সেই টেবিলটায় ভাতের থালাখানা বসিয়ে দিয়ে যান বসুমতী, এখনো অন্যের মাধ্যমে জিজ্ঞেস করেন 'কিছু লাগবে কিনা।'

মাধ্যমের সুবিধাও হয়েছে। অন্য একজন নতুন এসেছে বাড়ীতে।

সমরের বৌ!

মাছের তরকারির বাটিটা আজকাল সমরের বৌ-ই দিয়ে যায়, বসুমতী আর আঁশ হেঁশেলটা ছোঁয়া নাড়া করেন না। বাটিটা বসিয়ে দিয়ে যাবার সময় বৌটিই প্রশ্ন করে "কিছু লাগবে?" না, 'কাকাবাবু' বা আর কিছু আত্মীয় সম্বোধন সেও করে না। বলতে শেখেনি।

তা' বিজয়বাবুও তো 'বৌমা' বলে ডেকে কথা বলতে শিখলেন না! প্রশ্নের উত্তরে সেই শান্তভাবে 'না না কিছু না' ছাড়া আর কোন কথাই তাঁর মুখ দিয়ে বেরোয় না।

অথচ উচিত ছিল না কি বিজয়বাবুর এই নবীনা রন্ধনকারিণীর রান্নার তারিফ করে উৎসাহ দেওয়া, কিছু চেয়ে খেতে তার আনন্দ বাড়ানো?

কিন্তু উচিত অনুচিত জ্ঞান থাকলেও উচিত কাজ করে উঠতে পারা কি সকলের পক্ষে সম্ভব?

অন্ততঃ বিজয়বাবুর পক্ষে সম্ভব নয়।

নইলে সমরের বিয়ের সময় 'বৌ মুখ' দেখানি হিসেবে যে নেকলেসটা দিয়েছিলেন তিনি, সেটা কিনা আড়ালে সমরের হাতে দেন? "তুমিই দিয়ে দিও, তুমিই দিয়ে দিও" বলে এক রকম পালিয়েই গিয়েছিলেন বিজয়বাবু, কিছুতেই প্যারেন নি সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে বৌয়ের কাছ পর্যন্ত পেঁছিতে!

সমর বিজয়বাবুকে ছেলেবেলা থেকে কাকাবাবু মামাবাবু কিছুই বলতো না, বলতো 'বিজয়বাবু।' এখন 'বিজয়বাবু'ও দৈবাৎ বলে, বড় হয়ে পর্যন্ত নাক সিঁটকে বলে 'জরদ্গব!'

অবশ্য খুব বেশী দোষও দেওয়া যায় না ওকে, বাড়ীতে একটা শক্ত সামর্থ্য পুরুষ উপস্থিত থাকতে, সেই পনেরো বছর বয়স থেকে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব মাথায় তুলে নিতে হয়েছে তাকেই! অথচ সে লোকটা খায়-দায়। হোক তিনটে মানুষের সংসার, তবু জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ কি নেই? কেবলমাত্র অমরবাবুর অফিসের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাটা, আর দুটো ইনসিওরের টাকা তোলাতুলির ব্যাপারে সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল বিজয়বাবুর।

ইনসিওর দুটো যে ছিল, তাই তো জানতেন না বসুমতী। তার কোন কাগজপত্রও কখনো চোখে দেখেন নি। মাইনের টাকার হিসেব থেকে ঘাটতিও ধরতে পারেন নি কোন দিন। অমরবাবু যে বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে দু-তিনবার মাইনে বাড়ার খবর বসুমতীর কাছে চেপে গিয়ে নাকি বন্ধুর নাম দিয়ে টাকা জমানোর ব্যবস্থা করেছিলেন, সে কথা জানতে পারলেন বিজয়বাবুরই কাছ থেকে। সমরকে বলেছিলেন বিজয়বাবু।

সমরের কিন্তু মনে মনে কেমন একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে সব টাকা দেন নি বিজয়বাবু, কিছুটা সরিয়েছেন। নইলে অত থতমত, অত বিচলিত ভাব কেন?

বসুমতী অবশ্য এ সন্দেহের আভাস পেয়ে বিরক্ত হয়ে বকেছিলেন ছেলেকে। বকেছিলেন তখনো নাবালক ছিল বলেই। বলেছিলেন, "ছি ছি তুই কি নীচ মনরে? আমি তো বিন্দু-বিসর্গও জানতাম না, সবটাই তো চেপে যেতে পারতেন! বিজয়বাবুর নামে পর্যন্ত ছিল।"

"অতটা সাহস বোধ হয় হয়নি!" বলে বেজার মুখে সরে গিয়েছিল সমর।

তা' এ সমস্তই তো অতীত কথা!

এখন আর বসুমতী কল্পনাই করতে পারেননা সমরের কোন ভুল-ত্রুটি কি অন্যায় মনোভাব দেখে তাকে তিরস্কার করবেন! অল্প বয়স থেকে 'বাড়ীর কর্তার' পোস্টটা পেয়ে বড় বেশী 'কর্তা' হয়ে গেছে সমর! প্রথম প্রথম বুঝতে পারতেন না অভ্যাসের বশে বকাঝকা করতে যেতেন, কিন্তু কোন প্রতিবাদ না করে এমন স্থির শান্তভাবে শুধু ভুরুটা একটু কুঁচকে তাকাতো সমর যে, বসুমতী যেন চোখে অন্ধকার দেখতেন! ধাক্কা খেতে খেতে অভ্যাসটা

(শেষাংশ ১৫৬ পৃষ্ঠায়)

গল্পের কাঠামো

কী গল্প লিখব বসে বসে ভাবছি—এমন সময় ছোট শালী এলেন প্রায় লাফাতে লাফাতে; অভিনবত্বের আনন্দ ও উত্তেজনায় তাঁর মুখ চোখ উদ্ভাসিত,—'জামাইবাবু শুনেছেন? আমাদের পাড়ায় এই মাত্র একটি মেয়ে গলায় দাড়ি দিয়ে মরেছে!'

চিন্তায় ছেদ পড়ল। তবু বিরক্তিটা প্রাণপণে চেপে বললুম, 'না শুনিনি। কিন্তু এ আর এমন কি একটা অসাধারণ খবর? হামেশাই ত কত মেয়ে গলায় দড়ি দিচ্ছে, বিষ খাচ্ছে! তা ব্যাপারটা কি? হতাশ প্রণয়? না গো মশাই!' বিজয় গর্বে মুখ ঘুরিয়ে বললেন তিনি 'অত সোজা নয়। তিন ছেলের মা, বড় ছেলেটির বয়স কম করেও আঠারো—থার্ড ইয়ারে পড়ে। বড় মেয়েটা এবার ম্যাট্রিক পাস করেছে। ছোটটিও মেয়ে—ইস্কুলে পড়ছে। বয়স চল্লিশের কম হবে না—স্বামী বড় চাকরী করে, আমাদের পাড়ায় নতুন বাড়ী করে উঠে এসেছে। গাড়ীর দরখাস্ত করে রেখেছে—পালা এলেই গাড়ীও কিনবে— সব ঠিকঠাক। বামুন চাকর আছে—স্বচ্ছল অবস্থা। শখ সৌখীনতা খুব, এ পাড়ায় এসে পর্যন্ত দেখি প্রায়ই স্বামী-স্ত্রী লেকে বেড়াতে যেত। হঠাৎ কী যে হল—বড় দুজন কলেজে গেছে, ছোটটার ছুটি—চাকরের সঙ্গে তাকে পাঠিয়েছে পয়সা দিয়ে চকলেট কিনতে। চাকরকে বলে দিয়েছে সেই সাদার্ন মার্কেট থেকে কিনে আনতে—সেখানকার নাকি জিনিষগুলো ভাল। মানে যতটা সময় পাওয়া যায় আর কি! ঠাকুর কোনদিনই দুপুরে বাড়ী থাকে না—ওদের দেশোয়ালী লোকের আড্ডা আছে, সেইখানে যায়। ফাঁকা বাড়ী—শোবার ঘরে ঢুকে দোর দিয়ে এই কাণ্ড। মেয়ে আর চাকর ফিরে দেখে সদর দোর খোলা—কেউ কোথাও নেই। খুঁজতে খুঁজতে ওপরে গিয়ে দেখে মার ঘরের দোর বন্ধ। ডাকাডাকি করে সাড়া পায় না—তখন চীৎকার করে পাড়ার লোক ডেকেছে। তা তিনটে চারটের সময় আমাদের পাড়ায় আর কটা লোক থাকে বলুন, ঘুম ভেঙে দু একজন মহিলা এসেছেন অনেক পরে—কী ভাগ্যি তাঁদেরই মধ্যে কে একজন বুদ্ধি করে পাশের বাড়ী থেকে পুলিশে ফোন করেছেন। পুলিশ আর বড়ছেলে একসঙ্গেই বাড়ী ঢুকেছে প্রায়—ওরা দোর ভেঙে দেখে এই কাণ্ড। চিঠিপত্র কিচ্ছু নেই—কী কারণ কিচ্ছু জানা যায় না।'

এক নিঃশ্বাসে এতটা বলে সম্ভবত দম নেবার জন্যই একবার থামলেন তিনি। কিন্তু দেখা গেল উত্তেজনার বাষ্প তখনও যথেষ্ট কমেনি, আরও কিছু বার হওয়া দরকার। বললেন, 'গুজব কিন্তু এখনই বেশ চালু হয়ে গেছে। এই ত ঘণ্টা-তিনেকের ব্যাপার—এর মধ্যেই কত রকম শুনছি। আসল কথা ঐ পুরুষটাই বদমাইস।'

'তা ত বটেই!' সবিনয়ে স্বীকার করলুম, 'মেয়েরা যা কিছু ভাল কাজ করেন সব তাঁদের গুণ—খারাপ কাজের দোষটা নির্ঘাৎভাবে পুরুষের।'

ভাগ্যিস আমার এসব বাজে কথায় তাঁর কান দেবার সময় ছিল না।—নইলে এই নিয়েই হয়ত আরও খানিক বকুনি চলত (বলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই অনুতপ্ত হয়েছিলুম)! তাঁর ভেতরের বাষ্পই তাঁকে ঠেলে নিয়ে চলল, কাছাকাছির মধ্যে যতগুলি আত্মীয় আছে, সবাইকে খবরটা দিতে। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম। স্ত্রী একটু হেসে বললেন, 'গল্প খুঁজছিলে—এই ত এসে গেল। এখন ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে, বানিয়ে বুনিয়ে একটা খাড়া করে ফেল—আর কি! তোমাদের ত ঐ কাজ!'

স্ত্রী-বাক্য অবশ্যই শিরোধার্য।

কিন্তু মুলে প্রশ্নটা যে থেকেই যাচ্ছে—লিখি কি? একটি চল্লিশ বছরের মহিলা আত্মহত্যা করেছেন—এটা অত্যন্ত রুক্ষ এবং বর্ণহীন তথ্য। বেলুনের চোপ্‌সানো মুলে বস্তুটার মতই আকারহীন সামান্য পদার্থ একটা। যতক্ষণ না এরমধ্যে কল্পনার বাতাস ভরে এর একটা আকার দেওয়া যাচ্ছে—ততক্ষণ এর কোন মূল্যই নেই। গৃহিণী ত বলেই খালাস—ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বানিয়ে বুনিয়ে খাড়া করা—কী দিয়ে ফোলাব সেইটেই ত ভেবে পাচ্ছি না!

আসলে এটা হল গল্পের পরিণতি। কবিগুরুর মতে এটা নিতান্তই তথ্য—তুচ্ছ। গল্পের সত্য হচ্ছে সেই বস্তু যাকে বাস্তব জীবনে কল্পনা ও মিথ্যা বলা হয়। সেই মিথ্যার ফুঁ দিয়ে ভরাতে না পারলে এই তথ্যের পদার্থ বাজারে চালানো যাবে না কিছুতেই।

অর্থাৎ এই আপাত অর্থহীন কাজের একটা জুৎসই লাগসই কারণ ভাবতে হবে। এই নিদারুণ পরিণতির একটি হৃদয়গ্রাহী পৃষ্ঠপট রচনা করতে হবে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। গৃহিণী নিচে তাঁর ছেলে-মেয়ে, কুকুর, বেড়াল, চাকর প্রভৃতি নিয়ে চেঁচামেচি বকাবকি শুরু করেছেন। ঘরে ঘরে আলো জ্বলেছে, আশ-পাশের বাড়ীতেও। সামনের বাড়ীর দুষ্টু ছেলেটা বোধকরি আজ বাপের ভয়ে একটু পড়তে বসেছে। ওপাশের বাড়ী থেকে আহ্লাদী মেয়েটার বেসুরো গলার প্রাণপণ চীৎকার ভেসে আসছে (তার বিশ্বাস সে গানই গাইছে; তার মায়ের আশা এই সুরের তরণী নিয়েই সে বিবাহসমুদ্রে পাড়ি জমাবে!)। তারই মধ্যে অন্ধকারে বসে বসে আমি ভাবছি ঐ মহিলাটির কথা।

কেন আত্মহত্যা করলেন তিনি? কী দুঃখে এত সাধের সাজানো ঘরকন্না ছেড়ে, ছেলে-মেয়ে স্বামী—নতুন বাড়ী, ভবিষ্যতের আরও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিলাসের সম্ভাবনা ছেড়ে নিজের জীবনে এমন অসময়ে অকালে ছেদ টানলেন?—বরণ করে নিলেন এই বীভৎস মৃত্যু?

সম্ভাব্য কারণ অনেক হতে পারে। অনেক সময় অনেক তুচ্ছ এবং হাস্যকর কারণে মানুষ আত্মহত্যা করে। বিশেষতঃ মেয়ে-মানুষ বৈজ্ঞানিকরা সে আত্মহত্যার একটিমাত্র কারণ নির্দেশ করে নিশ্চিন্ত হয়েছেন—সাময়িক উন্মত্ততা। কিন্তু তা দিয়ে আমার গল্প জমবে

না। সহজ মানুষের সাধারণ আচরণের কারণ আর গল্পের পাত্র-পাত্রীর আচরণের কারণ এক সূত্রে চলবে কেন?

সুতরাং আমাকে অন্য-রকম একটা কিছু ভাবতে হবে। জটিল মনস্তত্ত্বের গহন অরণ্য থেকে কাঁটার ফুল তুলে এনে গাঁথতে হবে এই কথার মালা।

অনেকক্ষণ বসে বসে ভাবলাম।

তিন রকমে সাজানো যায় গল্পটা। অন্ততঃ আমার এখন এই তিনটের কথাই মনে পড়ছে।

প্রথমতঃ ধরুন : আমার শালীর কথাই ঠিক। স্বামীটাই দায়ী পরোক্ষভাবে। তা যদি ধরা যায় তা হলে ঘটনাটা কী দাঁড়াবে?

মহিলার নাম মনে করুন—রমা। স্বামীর নাম নরেশ।

এই রমার যখন বিয়ে হয় তখন মনে হয়েছিল নরেশ সর্বদিক দিয়েই যোগ্য পাত্র। এম-এ পাশ ভাল চাকরীতে ঢুকেছে, পৈতৃক অবস্থাও মন্দ নয়। স্বভাবচরিত্র যত দূর জানা যায়—খুবই ভাল। সিগারেটটি পর্যন্ত খায় না। ...বিয়ের সময় মনে হয়েছিল পূর্বজন্মের তপস্যার ফলেই রমার এমন পাত্র মিলেছে। আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে অনেক অনূঢ়া কন্যার বাপ-মাই রীতিমত ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিলেন।

আনন্দ রমারও কম হয়নি। বিবাহের পর প্রথম কিছু দিন অব্যাহত ও নিরবচ্ছিন্ন ছিল সে আনন্দ। নবদম্পতির প্রেমগুঞ্জন মুখরিত সে স্বপন কল্পনার দিনগুলি সৌভাগ্যের এক সুখস্বর্গ রচনা করেছিল রমার জীবনে।

কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতেই রমা জানল একটা মস্ত বড় ফাঁকির ওপর এই স্বর্গ রচনা করেছে সে। যেটাকে সে প্রস্ফুটিত সৌভাগ্য পুষ্প বলে মনে করেছিল আসলে সেটা কীটদষ্ট। মদ-ভাঙ ত দূরের কথা—নরেশ বিড়ি সিগারেটও খায় না। কিন্তু এর চেয়ে মদ ভাঙ খাওয়াও বোধকরি ভাল ছিল। স্বামীর চরিত্রের যে দিকটা নিয়ে সব চেয়ে উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ মেয়েদের—সেইখানেই একটা বড় দুর্বলতা আছে নরেশের। ক্রমে আরও বুঝল রমা—এটা ওর সহজাত, স্বভাবের অংগীভূত। এর আর পরিবর্তন সম্ভব নয়।

অর্থাৎ বহু নারী ছাড়া নরেশের তৃপ্তি হয় না। এবং এ স্বভাব তার প্রকাশ পেয়েছে—বহুকাল—বলতে গেলে কৈশোরকাল থেকেই। রমার পূর্বেও বহু নারী এসেছে তার জীবনে—রমা আসাতে কয়েকটা দিন থেমেছিল মাত্র সে স্রোত, আবারও আসতে শুরু করেছে।

কিন্তু তবু যদি এতটুকু ভদ্র আচ্ছাদনও থাকত ওর এই ক্লেদাক্ত লোলুপতায়।

ক্রমে ক্রমে নরেশের পূর্ব-জীবনের বহু ইতিহাসই কানে যায় রমার। আত্মীয়স্বজনরা নাকি বয়স্থা মেয়ে নিয়ে আসতে সাহস করতেন না ওদের বাড়ীতে,—নিকট আত্মীয়ের কন্যারাও ওকে দেখে ত্রস্ত হয়ে উঠত।

তবু রমা আশা ছাড়ে নি প্রথমটা। মান-অভিমান, কান্নাকাটি, উপবাস—নারীর তূণে বিধাতা যে কটি অস্ত্র দিয়েছেন তার কোনটারই প্রয়োগে ত্রুটি হয়নি। কিন্তু তবু পেরে ওঠেনি সে স্বামীর সঙ্গে। লোকে কথায় বলে 'পায়ে ধরেরে ছাড়া ভার'—যে অপরাধী সঙ্গে সঙ্গে দোষ স্বীকার করে, অনুতপ্ত হয়—যে নিজেও চোখের জল ফেলে, উপবাস করে—তাকে কী করে সংশোধন করতে পারা যায়! অনুতাপ করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে—প্রতিজ্ঞা করে আর কখনও এমন করবে না—আবার পরক্ষণেই, প্রথম সুযোগ পাওয়া মাত্র সেই কাজ করে।

এই ভাবেই ওরা কাটিয়ে এসেছে দীর্ঘকাল। ছেলেপুলেও হয়েছে, তাদের প্রতি বা স্ত্রীর প্রতি অন্যান্য কর্তব্যে কখনও ত্রুটি করেনি নরেশ। অফিসেও খ্যাতি ছিল, বছর বছর পদোন্নতি হয়েছে। ঘরবাড়ী, সামাজিক প্রতিষ্ঠা সবই পেয়েছে সে। রমার মাও ওকে অনেকটা সান্ত্বনা দিয়েছিলেন; বুঝিয়েছিলেন, সেকালে সব বড় মানুষই রক্ষিতা রাখত, মনে কর এ তাই। তোর পিতামহ প্রপিতামহ যে গণ্ডাকতক করে বিয়ে করতেন—তার চেয়ে ত ভাল। সতীনের সঙ্গে অধিকারের ভাগ দিয়ে ত বাস করতে হচ্ছে না। তোর মর্যাদা ত ক্ষুণ্ণ করেনি সে। এদিকে-ওদিকে কি করে বেড়ায় তা নিয়ে আর মাথা ঘামাস্ নি।'

এই যুক্তি ত ছিলই—তা ছাড়াও রমা অনেক ব্যবস্থা করেছিল। সকালে বাড়ী থেকে বেরোতে দিত না, অফিস থেকে সকাল করে বাড়ী ফিরতে বাধ্য করেছিল—সন্ধ্যের সময় সঙ্গ ছাড়ত না। লেকেই হোক, সিনেমাই হোক আর খেলার মাঠই হোক—সর্বদা ছায়ার মত সঙ্গে থাকত। দুর্বল ও লোভীকে সুযোগ দিতে নেই—এটা সে বুঝেছিল ভালমতই।

কিন্তু পাহারা দিয়ে চরিত্র বাঁচানো যায় না—স্ত্রী-পুরুষ কারুরই না। আরব্য উপন্যাসের দৈত্য সিন্দুকে পুরে সমুদ্রে ডুবিয়ে রেখেও একটা মেয়ের চরিত্র সামলাতে পারে নি। ওটা উল্টো হলেও ফল বোধ হয় একই হ'ত।

রমা ঝি রাখা বন্ধ করেছে বহুকাল। কিন্তু পরের বাড়ীর ঝি কোনদিন কোনকালে আসবে না—এমন হ'তে পারে না। এখানে আসার পর পাশের বাড়ীর মিসেস সেনের সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। তিনি ভাল শিল্পী—তাঁর কাছে রমা বোনার নতুন প্যাটার্ণ শিখছিল। সেই উপলক্ষেই তাঁর অল্পবয়সী ঝি আসা-যাওয়া করত। গতকাল সন্ধ্যাতেও এমনি একটা প্রয়োজনেই সে এসেছিল। ছেলেমেয়েরা পড়ার ঘরে, রমা বাথরুমে—নরেশ অফিস থেকে এসে চা খাওয়া শেষ করে বসে কাগজ পড়ছিল। সামান্য একটু সময়। রমা পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বাথরুম থেকে বেরিয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেই কিছু অশোভন ঘটনা ঘটে গিয়ে থাকবে। ঝি বোনার নমুনাটা রমার গায়ের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে গেল, 'আর কখনও তোমাদের বাড়ী আসতে বোলনি বৌদি! ছি ছি, এই তোমাদের ভদ্দরনোকের বাড়ী? এই বাভার নেকাপড়া জানা বাবুদের? কী করে এমন মানুষের ঘর কর বৌদি?'

এর পর রমা যদি আজ এই কাণ্ড করেই থাকে ত ওকে খুব দোষ দেওয়া যায় কি?

এই পর্যন্ত গেল, সেকালের ভাষায় প্রথম প্রস্তাব।

আবার উল্টো ভাবেও ধরা যায় দৈবিক গল্পটা।

রোমাণ্টিক মেয়ে রমা। জীবনটা সে ছোট-বেলা থেকেই রঙ্গীন চশমার মধ্যে দিয়ে দেখতে চেয়েছে। পড়াতে শিখে বেছে বেছে শুধু প্রেমের কবিতা পড়ত, কেবল রোমাণ্টিক ধরণের কাহিনী পাঠেই ছিল তার আনন্দ। ছবি আঁকত, গান গাইত—ফুরফুরে হয়ে ঘুরে বেড়াত শুধু।

তাই নরেশের সঙ্গে যখন ওর বিয়ে হ'ল তখন সবাই সেটাকে পরম সৌভাগ্য বলে মনে করলেও, পূর্বজন্মের বহু তপস্যার ফল বলে ভাবলেও রমা তা ভাবতে পারেনি। বরং একটা আশাভঙ্গের বেদনাই অনুভব করেছিল মনে মনে। নরেশ ছিল স্থূল, বস্তুবাদী মানুষ। অফিস, কাজ, সংসার—এবং নিতান্তই সহজ-সাধারণ জীবন এ ছাড়া কিছু জানত না। স্বপ্ন কল্পনার ধার দিয়েও যেত না সে—কোনপ্রকার কাব্যের ধার ধারত না।

তবু ওদের জীবন এক রকম করে কেটেছে। বাইরের কেউ ওকে দেখে কোন ব্যর্থতা, কোন ক্ষোভের সন্ধান পায় নি। ছেলেপুলে, ঘর-সংসার, স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য—এরই মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিল রমা; মনে করেছিল অন্তরের সে বুভুক্ষু তৃষ্ণার্ত রোমাণ্টিক সত্তাটা একেবারেই শুকিয়ে মরে গিয়েছে।

(শেষাংশ ১৫৪ পৃষ্ঠায়)

রক্ত গোলাপ

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

যা চেয়েছ চিরদিন দিয়েছি তোমারে
ফিরায়ে দিয়াছ যাহা নিয়েছি ফিরায়ে
সেই মোর ভাগ্য লেখা।
সুখ-দুঃখ এক হয়ে বেঁধেছিল বাসা
অকুণ্ঠিত চিত্ততলে; তবু বারবার
দিয়েছি বলেই ছিল সান্ত্বনা আমার।
অনুযোগ করি নাই,
তিক্ততারে দিইনি প্রশ্রয়।
যখন বাঁকায়ে মুখ চলে গেছ দূরে
তাচ্ছিল্যের অবশেষ মালিন্যের স্পর্শটুকু আমি
গোপনে ধরেছি বুকে অলাঞ্ছিত কলঙ্কের মতো।

বহুদিন গত হল—
বহু দূরে এসে দেখি আজ
পড়ে গেছি দৃষ্টির আড়ালে।
যে-পথে এসেছি চলে ভুলে গেছি নিশানা তাহার
ভুলিতে পারি না শুধু একখানি মুখের আদল
ভুলিতে পারি না মোর কামনার জলাঞ্জলি শেষে
যে বহ্নি-উত্তাপ আজও দহিতেছে
সর্ব দেহে মোর।

তবু তুমি সুখী আজ
সে আমার পরম সান্ত্বনা;
এতদিন পরে তুমি লভিয়াছ চিত্তের প্রসাদ
নিষ্কৃতির সুখাবেশে তন্দ্রালু নয়ন;
নিদ্রাবতী রাজকন্যা
নিদ্রা যাও সুখশয্যা'পরে।
আমার কন্টক বনে রক্ত-গোলাপের কুঁড়িগুলি
ফুটিয়াছে এতদিনে—
তাই আজ যাবার বেলায়
স্মৃতির সৌরভে মোর সুরভিত অন্তর বাহির।
যাই আমি চলে যাই—
রেখে যাই দুয়ারে তোমার
দুটি গুচ্ছ রক্ত-গোলাপের
প্রভাতে মলিন হলে ফেলে দিও পথের ধুলায়।

নূপুর

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

কবিতা!
ছন্দ নাই। মৌন কবিতার সুর
অতন্দ্র নিশীথে
ঘুরে মরে রুদ্ধ বাতায়নে:
মনের আকাশে যেন গোধূলির রঙ—
অস্পষ্ট আভাস:
প্রেয়সীর ওষ্ঠপুটে প্রভাতফেরির ঘুমভাঙা হাসি,
মুছে-যাওয়া লিপ্‌স্টিক!
বাসবীর শিথিল শিথানে
ঝরে-পড়া কুরুবক!

ছন্দ নাই। তবু আছে সুর।
মানস কান্তারে কোন ফেলে-আসা অতীত মধুর।
একটি নূপুর!
জীবন-উৎসব শেষে যমুনার তটে
কদম্ব বিটপীতলে,
ছিন্নপত্র বিকীর্ণ-কেশর-স্তূপে
খুঁজে পাওয়া নির্জন প্রহরে
প্রদোষ বেলায়।

এমনি শ্রাবণ সন্ধ্যা
এলাইয়া মেঘের কুন্তল
এসেছিল বকুলের বনে,
শিরীষের শাখায় শাখায় ছড়াইয়া সজল নিঃশ্বাস।
নদীর ওপারে
নেমেছিল অন্ধকার তমালের শিরে।
ঝাউবনে বাতাসের গান।
সিক্ত মাটির গন্ধ ললাটে বুলায়
জননীর স্নেহস্পর্শ!

মন ছিল আনমনা আপনারে ঘিরে।
দুরন্ত যৌবন, ঘুমন্ত সাপের মত অন্তর বিবরে,
অবনত করি ফণা আপন কুণ্ডলবৃত্তে
ছিল শুধু স্পন্দিত নিঃশ্বাসে।
সহসা চকিতে—
চমকিত চকিত বিদ্যুৎ
মনের আকাশ-কোণে দিয়ে গেল আলোর ইসারা।
মৌন মন—নিরালম্ব তৃণ যেন
ভেসে ভেসে চলেছিল নিরুদ্দেশ পথে,
অবিচ্ছিন্ন তটভূমি হতে,
স্রোতের আবেগে!

তুমি এলে,
নীড়ভ্রষ্টা বিহংগীর মত:
সভয় চকিত দৃষ্টি—বেপথু পল্লব
নয়নের কোণে শ্রাবণের জলধারা।
আমার ছিল না ভাষা,
তোমার ছিল না কোন গান।
সেদিন বাসর রাত্রি তব!
নির্জন শ্রাবণ সন্ধ্যা।
এলো খোঁপা হতে একটি রজনীগন্ধা
হাতে দিলে তুলি:
কম্পিত অংগুলি
ক্ষণেক থামিল মোর হাতে।
মেঘের আড়ালে—
সপ্তমীর চাঁদ পলকে মেলিল আঁখি।
আবার মিলালো অন্ধকারে! সেই শেষ।

তারপর
টুকরো টুকরো দিন,
ফসলের শেষে
ঝাঁকে ঝাঁকে স্নাইপের মতো
উড়ে গেল সাদা আর কালো ডানা মেলি,
নদীর এপার হতে
ওপারের তমাল রেখায়।
আজ তার ভাষা নাই,
আছে শুধু সুর।
একটি রজনীগন্ধা—
তোমার চুলের গন্ধভরা,
জীবন যমুনাতটে
ছিন্নপত্র বিকীর্ণ-কেশরে
উৎসবের বিস্মৃত নূপুর!

মোহিনীর যাদু

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

হে মোহিনী মায়াবিনী, আদিকালে সমুদ্রমন্থনে
নারীরূপে ধরণীতে কী অমিয় করিলে বর্ষণ,
মহাবিজ্ঞানের মাঝে কবিতার রসমূর্তি ধরি
কী রহস্যে দেব আর অসুরেরে দিলে দরশন।
সেই হতে নিত্য তুমি আছ দেবী সুধাভাণ্ড হাতে
সংসারের সিন্ধুতটে মায়াময়ী নারীমূর্তি ধরি,
মানবের মনোরাজ্যে দেবতা ও অসুরের দল
লীলামত্ত হোল তব রূপেরসে সুধাপান করি।
বন্ধনে বন্ধনে ওগো এ সংসার মন্থনে মন্থনে
পাকে পাকে উঠে সুধা ঝরে পড়ে বিষহলাহল,
সারা বিশ্বমানবের দেবচিত্তে ক্ষুধার লাগিয়া
নিত্য তুমি রচো সুধা এ সৃষ্টির মথিয়া গরল।
সকল রসের আর সৌন্দর্যের তুমি যে গো ধাম,
হে মোহিনী তুমি যে গো নারীরূপা মায়ার মাধুরী
বিস্ময়েতে সারা বিশ্ব পদে তব করিছে প্রণাম
বিশ্বমানবের চিত্ত নাচিছে তোমারে ঘিরিঘিরি।
তোমার নয়নবাণে সারা সৃষ্টি করে টলমল,
যাদুমন্ত্রে শিবে তুমি রাখিয়াছ করিয়া পাগল?

স্বপ্ন ও বাস্তব

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

একদিন এসেছিল স্বপন এক উন্মুখ জীবনে,
স্বর্গ সে আসিবে নামি
মৃত্তিকার পৃথিবীর 'পরে
আমরা স্বাধীন হব, অপূর্ব সে আনন্দের ভরে
মূর্চ্ছিত উঠিবে জাগি নব-স্ফূর্ত প্রাণের স্পন্দনে
মুহূর্তে করিয়া চূর্ণ সুদুঃসহ সকল বন্ধনে,
তারি আবির্ভাবে হব পরিপূর্ণ বাহিরে-অন্তরে,
বাঞ্ছিত জীবন যাবে চির-চরিতার্থতায় ভরে।
স্বপন কি সফল? আজি সেকথা
শুধাই শ্রান্ত মনে।

অমৃত না হলাহল? শেষ হ'ল সমুদ্র-মন্থন।
এখনো কি দেরী আছে? রাত্রি গেছে,
এসেছে কি দিন?
ব্যথিত মানব, শুনি বুভুক্ষুর কাতর ক্রন্দন
বিষণ্ণ প্রভাত, হেরি মেঘে মেঘে সে আলো-মলিন।
বিশ্বের সভায় তবু আমাদের আছে আমন্ত্রণ;
আছে দুঃখ, আছে ব্যথা তবু
জানি আমরা স্বাধীন।

চন্দ্রগ্রহণ

শ্রীকৃষ্ণধন দে

একটু স্নেহের ছায়া পেতে চাই
মাতা ধরিত্রীর,
আমি চন্দ্র, দেখি সে স্বপন!
বাৎসল্যের ঘূর্ণাবর্তে
কবে মাতা ছিল যে অধীন,
—শ্লথ হো'ল তাই আলিংগন।
কোটী যোজনের পথে
ছিঁড়ে গেল সে বন্ধন ঘোর,
একদৃষ্টে চেয়ে থাকি
মাতৃমুখদর্শন বিভোর,
ধরিত্রীর দিক হতে
ফিরাইনা এ আনন মোর,
সে যে হায়, কতই আপন!

তবুও একটি লগন,
তারি লাগি জাগি অনুক্ষণ
ছায়া যবে নামে ধরিত্রীর
সাগর-পর্বত-নদী-
হ্রদ-মরু-প্রান্তর-কানন
কত স্মৃতি আনে সে ছবির!
সেই ছায়া-ক্রোড়ে আমি
ঢাকি মুখ অসীম হরষে,
কল্পান্তের ইতিহাস
ফিরে আসে বরষে বরষে,
ধরিত্রী-জননী যেন
আজো তার স্নেহের পরশে
ছায়াপাশে বাঁধে সুনিবিড়।

পৃথিবীর মিছিলে

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

(এক)

স্বদেশকে মনে হত বিদেশের মতো
আর বিদেশকে স্বদেশ, যখন ছিলাম
সদ্য-প্রত্যাগত। কখনও মদির দুই চোখ
বারবার ছেড়ে আসা বিপুল ধরিত্রীর
স্বপ্নে বিভোর। ঘন সবুজ মাঠ আর
ফুলের বাজারে জ্বলা গোধূলির রঙ
কিম্বা কত বিদেশিনীর ভারতীয় প্রীতি
প্রেমের প্রতীতি নীল আর কালো চোখে
ভুলেছি এখন। অনেক—অনেক তফাৎ,
রঙ নেই, শোভা নেই কালো রাত শুধু।
বাঁধাধরা অন্ধ এক সীমানায় তাই
ফুরিয়ে যায় বিদেশের রঙ লাগা যৌবন

(দুই)

আজ স্মৃতি শুধু আবছায়া বিলাসে
মনে নিয়ে আসে বিদেশের অন্য ছবি।
দরিদ্র পল্লীতে ঈষ্টার উৎসব সারারাত
লক্ষ প্রাণের কী বিপুল কলরব!
জীর্ণ বস্ত্রে ঢাকা শীর্ণ মুখ কত যে
বাঁচার প্রবল নেশায় বিভোর, উৎসুক।
পানশালা দীর্ণ করে ওরা শানিত চীৎ
যেন ঈষৎ ফুৎকারে ওরা সবল
দৈন্য দেবে উ

(তিন)

তখন আশ্চর্য মিল স্বদেশে বিদেশে
এ-বিশ্ব নিখিল তখন জীবনের গানে

বাসা

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

উষাদি বাসা বদল করলেন...

এই নিয়ে আটাশ বার। আটাশ বছরেই বিধবা হয়েছিলেন, দুটি নাবালক ছেলে আর একটি ছোট্ট মেয়ে নিয়ে। তারপর আটাশ বছরে আটাশ বাসা। আমি তো বলি রেকর্ড না...

তামাসার ব্যাপার নয়। একটু মন স্থির করে ভেবে দেখলে ঠাণ্ডা মাথাও ঘুলিয়ে যায়। অনন্ত ব্যোম,—তারি মধ্যে নগণ্য এই পৃথিবী ছোট্ট একটা লাট্টুর মতন ঘুরে চলেছে, নিয়ত জায়গা বদল করছে অথচ বিশাল সৌরজগতে তার অস্তিত্ব তুচ্ছ হলেও নির্দিষ্ট হয়ে আছে, হারিয়েও হারাচ্ছে না—উষাদির জীবনের এই পরিক্রমা অনেকটা সেই রকমই।

ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। পাঁচবার ছেড়ে দুবার বাসা বদল করতে গিয়ে আমার দেহ-মনের যে হাল হয়েছে, তাতে পরমায়ু তো কমেইছে। যেটুকু আয়ু বাকি আছে, বুক ঢিপ্ ঢিপ্ মাথাঘোরা আর নিদ্রাহীনতার মধ্যে কখন যে তা ক্ষীণবায়ুর সঙ্গে মিলিয়ে যাবে, তারই অপেক্ষায় সুনিশ্চিত হয়ে বেঁচে আছি। আবার লোকে বলে—বাড়ী করো একটা নিজের। মনে, বাড়ী তুলে চোখ বোজো, আমরা চোখ চেয়ে দেখি।

অথচ বিনা দুশ্চিন্তায় উষাদি বাসা বদল করলেন! দুশ্চিন্তা তাঁর ছিল একাধিক কিন্তু সেটা বাসা-বদল সম্পর্কে নয়। অন্যান্য বিষয়ে তাঁর দুর্ভাবনা এত প্রচুর পরিমাণেই ছিল যে বাসা বদলের দুশ্চিন্তা তার কাছে নস্য। অতীতের ভাবনা আর ভবিষ্যতের চিন্তা, এ দুয়ের মাঝখানে পড়ে বর্তমানের চিন্তা ঠাঁই পেত না। অবসর কোথায়? প্রথমতঃ বিগত দিনের দুঃখ-কষ্টের স্মৃতি, তারপর আর্থিক দুশ্চিন্তা, আবার আগামীকালের অনিশ্চয়তা। এর ওপর ছোট মেয়ের বিয়ে, উঠতি বয়সী ছেলেদের নৈতিক চরিত্ররক্ষা, আর বলতে ভুলেছি বিবাহিত বড় মেয়েটির অবস্থা সচ্ছল হলেও তার নানাবিধ সাংসারিক অশান্তি—এই সব দুর্ভাবনায় উষাদির লিভার ও মগজ এতই ওলট-পালট হয়ে থাকত যে তার কাছে বাসা বদল কিছুই নয়। তা ছাড়া, জ্যোতিষ-মতে তাঁর পরমায়ু আশী। অতএব আশী বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকলে তাঁর আর কতো দুর্ভোগ কপালে আছে এবং মরে গেলেই কি বিদেহী আত্মা নিশ্চিন্ত হবে, সূক্ষ্ম শরীরের দুর্ভাবনা থাকে কি থাকে না,—এই সব রাজ্যের দুশ্চিন্তা তাঁকে এতই উচাটন করে তুলত যে নিষ্ঠাবতী আচারপরায়ণার অদৃষ্টে একাদশীর দিন অমন দু-চারবার অন্ন গ্রহণের দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। এবং সে দুর্ঘটনার কারণ ও পরিণতির বিশ্লেষণে দুশ্চিন্তা আরও বেড়েছে বই কমে নি।

আপনার আমার কাছে একটি পরিচিত বাসস্থান ছেড়ে একটি অপরিচিত জায়গায় গিয়ে ওঠার মধ্যে যে আলস্য, আতঙ্ক এবং শারীরিক দুশ্চিন্তা ঘনিয়ে ওঠে, এ হেন উষাদির কাছে সেগুলো কিছুই নয়। ডাল-ভাতের সামিল। আলু-ভাতে এবং কড়াইয়ের ডাল, ঢ্যাঁড়স-চচ্চড়ি ও আমড়ার টক—এ দুই নিরামিষ আহারের মধ্যে যতটুকু পার্থক্য, উষাদির কাছে একটি বাসার সঙ্গে আর একটি বাসার তফাৎ ততটুকুই। কেবল মোটের ওপর অ-পরিচ্ছন্নতা তার বাড়ীওলার অথবা অন্য ভাড়াটের কোনও 'সোমত্ত' বয়সের মেয়ে না থাকলেই হল। তাঁর কাছে নর্দমা আর যুবতী দুটোই ছিল অচল। একটিতে দেহের অশুচিতা, অপরটিতে মনের। আমার মনে হয়, আমাদের কোনও কোনও প্রাচীন ঋষি উষাদির সঙ্গে পরামর্শ করে স্মৃতি-শাস্ত্র লিখেছিলেন। কারণ স্ত্রীলোক হয়ে স্ত্রীলোকের দুষ্ট বুদ্ধি, নীচতা এবং অপবিত্র মনোভাবের এমন নিদারুণ সাক্ষী ও নির্মম বিচারক আজ পর্যন্ত জন্মালেও নজরে পড়েনি।

উষাদি যখন প্রতিবেশিনী হয়ে এলেন, তখন আমি বালক। তারপর দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে তিনি যে আমার সঙ্গে স্নেহের সম্পর্ক বজায় রেখেছেন, এটা আমার বিশেষ সৌভাগ্য। তীক্ষ্ণদৃষ্টি, সন্দিগ্ধচিত্ত আর সমালোচকের মন নিয়েও তিনি যে আমাকে এতদিন বাতিল করেননি, বিশ্বাস করে এসেছেন দায়ে-অদায়ে সাহায্য পরামর্শ নিয়েছেন, তার কারণ আমার ঠিকুজী। আমার রাশিচক্রটি একবার চেয়ে নিয়ে বাজিয়ে দেখেছিলেন, খাঁটি না মেকি। কোষ্ঠীতে মঙ্গলের অবস্থান আর একাদশে বৃহস্পতি দেখে আমার গুরুযোচিত গুণপনায় এবং স্থির ও শুভ বুদ্ধিতে তিনি আশ্বস্ত হয়েছিলেন।

বাসা বদলের দরকার হলেই তিনি আমায় জরুরী খবর পাঠাতেন। মনস্থির করতে তাঁর সময় লাগত কিন্তু একবার স্থির করে ফেললে আর বিলম্ব সইত না। তাঁকে মধ্যে মধ্যে বোঝাবার চেষ্টা করেছি, বলেছি এভাবে হুট করে বাসা ছেড়ে অন্যত্র যাওয়া মোটেই কাজের কথা নয়। ওতে খরচ তো আছেই, ছেলেদের পড়াশুনোর অসুবিধে হবে, কারণ স্কুল-কলেজ তো চার মাস অন্তর বদল করা চলে না! কিন্তু উষাদির যে কথা, সেই কাজ। বাসা তিনি ছাড়বেনই। এত ঘন-ঘন বাসা বদলানো যায় কি করে, এটা আজও আমার বোধগম্য হল না। অথচ উষাদি চটপট নতুন বাসার সন্ধান পেয়েও যেতেন। অবশ্য, ছেলেদেরই সে ঝক্কি অনেকটা পোয়াতে হত। তারা মুখে গজ গজ করত কিন্তু শেষ পর্যন্ত মায়ের জেদ বজায় থাকত। কাছে পিঠে হলে ঠেলাগাড়ীতে দুটো বড় বিছানা, তৈজসপত্র, ঝাঁটা, বালতি, হ্যারিকেন আর সামান্য কিছু টুকি-

...াকি ধরে যেত আর ঊষাদি, মেয়ে আর চাবি দেওয়া হাত-বাক্সটি কোলে নিয়ে রিকশায় উঠতেন। কিন্তু শহরের আর এক প্রান্তে কিংবা শহরতলীতে নতুন বাসা হলে, ঊষাদির ছিল টানা ঘোড়ার গাড়ীর ব্যবস্থা।

প্রথম প্রথম হিসেবটা রেখেছিলুম, কটা বাড়ী নেওয়া হল আর ছাড়া হল। দশ-পনেরোটার পর হিসেব আর রইল না। মনে রাখাও মুস্কিল। ইতিহাসের ঝানু শিক্ষকও বোধ হয় সাল তারিখ দিয়ে এতগুলি বাসার 'ক্রনলজিকাল টেবল' মুখস্থ বলতে পারতেন না। কিন্তু ঊষাদি পারতেন অর্ধ-শিক্ষিতা সে-কালের মেয়ে হয়েও। শুধু তাই নয়, মনে থাকত—কোন্‌দিন কোন্‌ সময়ে কোথাকার নতুন বাসায় যাওয়া হল,—কি কারণে পুরোনো বাসা ছাড়া হল, অবশ্য চার-পাঁচ-ছয় মাসের বাস-স্থানকে যদি পুরোনো আর নতুন বলে আলাদা করা যায়। তারপর কোন বাড়ীওলা গামছা পরে কলতলায় ঘুরত, কোন্‌ বাড়ীর মালিকের গিন্নী যেখানে-সেখানে পানের পিক্‌ ফেলত, কোন্‌ বাসায় পাশের ঘরের রাঁধুনি অসম্ভব লঙ্কা-ফোড়ন আর পেঁয়াজ দিয়ে পচা না হোক দোরসা মাছ রাঁধত, কোন্‌ বাসায় এক-তলার নোংরা নর্দমা দিয়ে একটা ধাড়ী ছুঁচো রাত্রে তাঁর ঘরে ঢুকে তুলকালাম বাধিয়েছিল, এসব দুর্ঘটনার ক্রমিক ইতিহাস ছিল ঊষাদির নখদর্পণে। তাঁর কাছেই তো শুনলাম, এইবার কসবার নতুন বাসাটা হল আটাশ নম্বর। কেন জানি না, একথা যোগ করলেন—'এই যেন শেষ বাসা হয়। আর ঘুরতে পারি না এ-দোর থেকে সে-দোর! এইখানে মরলে হাড় জুড়োয়। তুমি তো কাছেই আছো—রেল লাইনের এপার ওপার বইতো নয়। খবর পেলে শেষ সময়টা দাঁড়িয়ো......তা তুমি করবে, জানি। তবে...'

'তবে কি?'

'নাঃ, বলছিলুম কি যে আশী বছর যদি বাঁচাতে হয়......'

'তুমি ওসব ভেবো না ঊষাদি। যা কাগজের মতন ফ্যাকাশে আর পাতলা চেহারা বানিয়ে এনেছ বড় মেয়ের বাড়ী থেকে এবার, তাতে ষাটের মধ্যেই কাবার হয়ে যাবে...'

'তাই বল ভাই। যেন ছেলে-মেয়েগুলো রেখে আর তোমায় রেখে যেতে পারি। কেওড়াতলা তো ক্রোশখানেকের মধ্যেই,—সোজা দক্ষিণদোর...'

'ভুল করলে ঊষাদি। এখান থেকে ওটা সোজা পশ্চিম। দক্ষিণে সেই আবাদ—সেখানে মা-কালী নেই, আদিগঙ্গাও নেই।'

ঊষাদির কাছে শুনেছি শিয়ালদ' ষ্টেশন থেকে আট-দশ মাইলের মধ্যেই তাঁর শ্বশুর-বাড়ী ছিল। বাপের বাড়ীতে তিনি প্রথম মেয়ে বলে খুব আদর-যত্নে মানুষ হন। কিন্তু বারো না পেরোতেই লোকনিন্দার ভয়ে তাঁকে পাত্রস্থ করা হয়। সংগতিপন্ন গৃহস্থ বাড়ীতেই তিনি পড়েছিলেন, কিন্তু তিনি যে আবহাওয়ায় মানুষ তার সঙ্গে শ্বশুরে বাড়ীর কোনও মিল ছিল না। তার ওপর ঊষাদি স্পষ্ট ও স্বল্পভাষী ব্যক্তি, তাঁর স্বভাবে স্ত্রীলোকসুলভ গুণের চেয়ে পুরুষালি ভাবটাই ছিল বেশি। একান্নবর্তী পরিবারে অন্ন যদি বা মেলে, তাকে গলাধঃকরণ করা শক্ত। তাই যৌথ সংসারের ক্ষুদ্রতা ও ছোট কথা, মনের ও দেহের পীড়ন তাঁর ধাতে সইল না। চেষ্টা করেছিলেন মিল খাওয়াবার জন্য কিন্তু হল না। তাই একদিন দেশের বাস ছেড়ে স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে কলকাতায় চাঁপাতলায় এক বাসায় এসে উঠলেন এবং সেই থেকেই বাসা-বদল।

ঊষাদি'র বদ্ধ ধারণা, বৃহৎ সংসার স্বার্থ-পরতার চরম আড্ডা। বাস্তু-সাপের সঙ্গে তবু ভিটেয় বাস করা চলে, তাকে না ঘাঁটালেই হল। কিন্তু যেখানে নানা জাতের খল সর্পই ঘুরে বেড়ায় সঙ্গোপনে, সেখানে অপমৃত্যু ঘটবেই। বিভীষিকায় আর নিত্য সংগ্রামে মানুষ হার মেনে হাল ছেড়ে দেয়। মরে, না হয় পালায়। তখন ভিটেয় ঘুঘু চরে। তাও সব ঘুঘু নয়। তাদেরও উড়তে হয়। শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকে একটি বাস্তু ঘুঘু, নীচতায় এবং অধিকার-রক্ষায় যে সকলকে পরাস্ত করে।

ঊষাদির মতামতগুলো খুব স্পষ্ট, তার নড়ন-চড়ন ছিল না। বিয়ে জিনিষটা একদিকে তাঁর কাছে যেমন পবিত্র ও শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান, অপরদিকে তেমনি একটা বিশ্রী ব্যাপার। কেন না, এরপর থেকেই মনুষ্যত্বের অধঃপতন শুরু হয়। পুরুষের মধ্যে যেটুকু স্বাভাবিক উদারতা, সেটুকু নাকি নষ্ট হবেই দাম্পত্য জীবনে। স্ত্রী তার স্বামীকে উঁচু দিকে তুলে ধরতে পারে যদি তার শিক্ষা সৎ হয়। নইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামীকে টেনে-হিঁচড়ে পাঁকে নামায়। আর স্বামী গোড়ার দিকে যতই ভালো আদর্শপরায়ণ মানুষ হোক, শেষ পর্যন্ত তাকে স্ত্রীর সূক্ষ্ম কৌশলের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়। পেরে ওঠে না। যে ব্যক্তি কাছের গোড়ায় নিত্য শোয় আর কানে কানে কথা কয়, তার ফুস্‌-মন্তর তো গুরুবাক্যের সমান হয়ে দাঁড়াবেই। আর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেহের শক্তি কমে, পুরুষের মন দুর্বল হতে থাকে আর স্ত্রীরা নাকি জাঁদরেল হয়ে চেপে বসে।

অথচ বিনা বিবাহে ধর্ম-রক্ষা হয় না। একমাত্র কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী সাধু পুরুষের পক্ষে অবিবাহিত থাকা সম্ভব, নইলে চরিত্র-স্খলন অনিবার্য। এক কথায় বিয়েটা হল প্রতিষেধক ওষুধ-বিশেষ। স্ত্রীলোক পাজি জীব হলেও তাকে ঘরে আনতেই হয়। কারণ নানা নজর-দায়িনীর উৎপাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে হলে রক্ষা-কবচের দরকার। ঊষাদি যে হামেশা বাসা-বদল করতেন, তার একটা হেতু এই ধরণের আশঙ্কা। তাঁর ছোট ছেলের সঙ্গে দোতলায় বাড়ীওলার একটি মেয়ে হেসে কথা কইত। ক্রমশঃ সেটা দাঁড়াল প্রতীক্ষায়। কলেজ থেকে ফেরবার সময় হলেই মেয়েটি নাকি ছটফট করত, বারান্দায় ঝুঁকে গলির মোড় পর্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করত এবং দূর থেকে তাকে দেখতে পেলেই নীচে নেমে এসে ঘুরঘুর করত। ঊষাদির দূরদর্শিতাও কম নয়। তলে-তলে বাসার খোঁজ করিয়ে একেবারে হুকুম করলেন ছেলেদের, তল্পি গোটাও। তারা হতভম্ব!

বড় ছেলে নিত্য ব্যায়াম করত পাড়ার ক্লাবে। বাড়ী ফিরে ঘরের কোলে রোয়াকে বসে যখন সে বিশ্রাম করত, পাশের ঘরের বিধবা মহিলা তার সঙ্গে এক আধটা কথা বলতেন। তাঁর নিজের ছেলেটি কলেজে পড়ে, সামনে তার পরীক্ষা। কাজেই বাজার করা সম্বন্ধে দু একটা অনুরোধও জানাতেন! ঊষাদি'র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুই এড়ায় না। তারপর একদিন দুপুরে তাঁর বড় ছেলে রোদ্দুরে ঘুরে এসে মাকে ঘুমোতে দেখে রোয়াকে এসে বসলে বিধবা মহিলাটি হাতপাখা এনে দেন ও এক গ্লাশ চিনির সরবৎ করে দেন। সেইদিন রাত্রেই আমার ডাক পড়ল। ব্যাপারটা যে মোটেই গুরুতর নয়, নিছক ভদ্রতা, হয়তো বা বাৎসল্যের প্রকাশ, একথা ঊষাদিকে বোঝাতে গিয়ে শুনতে হল—হতে পারে কু-ভাব কিছু নেই। কিন্তু হতে কতক্ষণ। নারী ও পুরুষের তিনি সেই আগুন আর ঘিয়ের সম্পর্কে চিহ্নিত করে আমাকে শেষ নির্দেশ দিলেন, অগ্নিকুণ্ডে জল ঢালতে গেলে ফোঁস-ফোঁসানির রব উঠবে। ব্যায়াম-পুষ্ট দেহে মগজের কাজ নাকি ধীর-মন্থর হয় আর চাপা-স্বভাব বিধবাকে ঘাঁটাতে নেই। অশেষ তার ছলা-কলা। অতএব ঘিয়ের ভাঁড়টিকে অঞ্চলাশ্রিত করে চটপট সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আর যে হেতু আমার একাদশে বৃহস্পতি এবং আমার সুবিবেচনায় ঊষাদি'র আস্থা আছে, আমাকেই একটি স্বাস্থ্যবতী পাত্রীর সন্ধানে লেগে যেতে হবে অবিলম্বে। পরের রবিবার গিয়ে দেখি বাঁধা-ছাঁদা শেষ, ছেলেরা গাড়ী ডাকতে গেছে। দুপুরে তুমুল বৃষ্টির মধ্যে টানা ঘোড়ার গাড়ীতে মালপত্র সমেত ঊষাদি'কে চাপিয়ে নিজে কোচম্যানের পাশে বসে ভিজতে ভিজতে নতুন বাসায় পৌঁছে দিয়ে এলাম। একেবারে দমদমার শেষ প্রান্তে। বিধবার পুত্রটি কিভাবে যেন খোঁজ পেয়ে একদিন বেড়াতে এসেছিল। ঊষাদি যত্ন করলেন, চা-জল খাবার দিলেন। কিন্তু দু' রবিবার পর পর আসাতে তিনি সতর্ক হলেন। ধারণা হল, স্থানের দূরত্বটা যথেষ্ট নিরাপদ নয়। সময় থাকতে এবং কিছু অঘটন ঘটবার আগেই প্রতিকারের প্রয়োজন। সেই চরম ব্যবস্থা-পত্র তিনি নিজ হাতেই লিখলেন
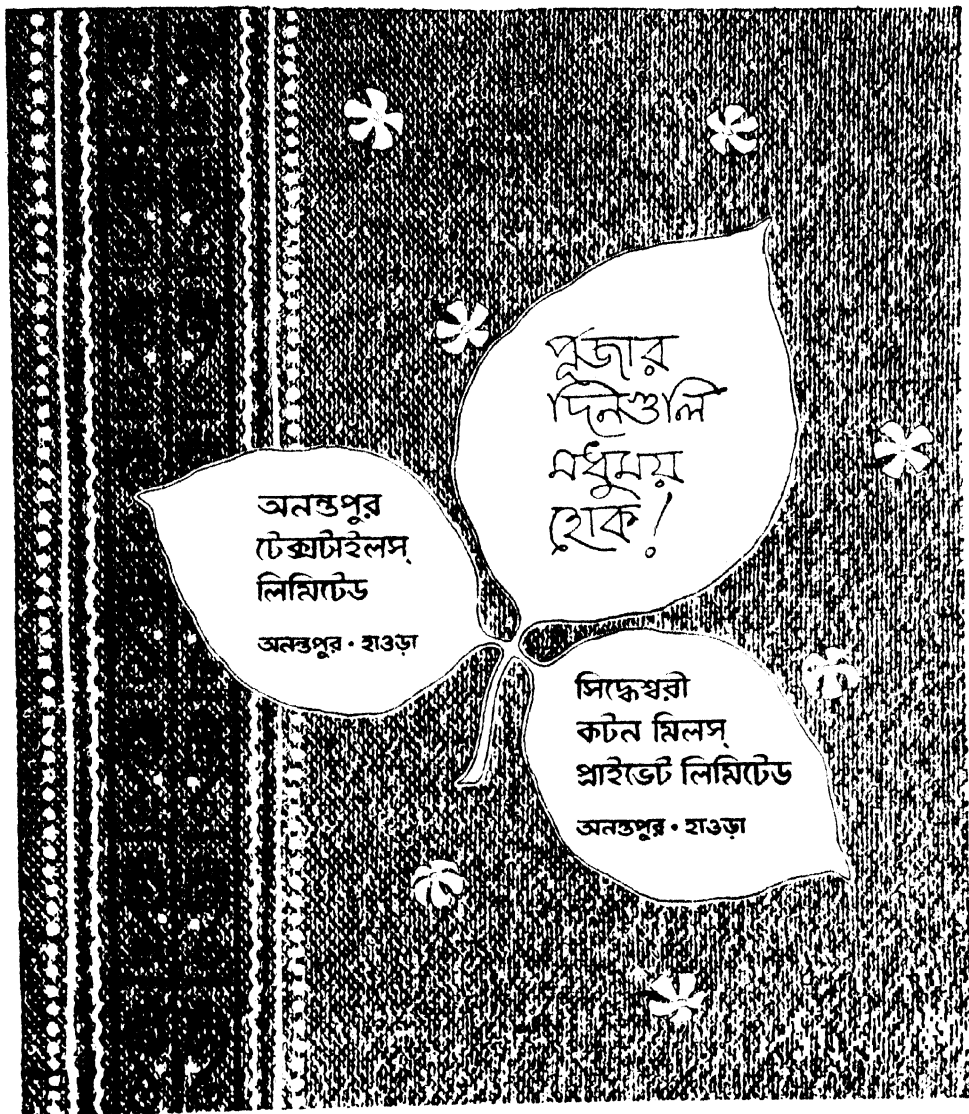
একটি গাছ

হরপ্রসাদ মিত্র

বাড়ি থেকে বেরিয়েই বিষ্টি-ধোওয়া
কী নধর গাছ
দেখলুম তা-ছাড়াও এটা-ওটা বখেড়া কতো কী—
প্রকাণ্ড বাড়ির টুকরো, সাদা ফুল,
সবুজ জানলা,
ধোঁয়ার কুণ্ডলী তোলা
সাধারণ বর্ষার বিকেল।
তারই অন্তেবাসী কবি সৌখীন স্বপ্নেতে
একান্তে বেঁধেছে তাঁবু,
সে কেবল বিচ্ছিন্ন হৃদয়!

কবিদের লোকাচার, শিল্পীদের
স্বপ্নের শিষ্টতা,
অনেক মার্জিত শব্দ—
'আলো', 'ফুল', 'অন্ধকার', 'দূর'
সমস্ত পেরিয়ে যাওয়া,—
এমন-কি,—'প্রেমও', 'সত্যও'!
যে পারে ডাকতে
কে সে?
হয়তো সে একা ঐ গাছ!

শ্রাবণের শেষেই বড় ছেলের বিয়ে দিয়ে দিলেন।

সেও আজ কতদিন হয়ে গেল! ছেলে-মেয়েদের ছেলে-পুলে হল, নাতি-নাতনিদের সংখ্যা বাড়ল। নিজের বাড়ী করা আর হল না। পয়সাই বাঁচে না, পুঁজি নেই তো ঘর তোলা! প্রথম জীবনে দারিদ্র্য, বার্ধক্যেও অসচ্ছলতা। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। যে অনটন নিয়ে সংসার শুরু, আজও তার সুরাহা হল না। ঊষাদি'র বহুদিনের যে মনোবাঞ্ছা,-সুচারুরূপে সংসার এবং স্বচ্ছলতার মধ্যে পরিপাটি গৃহস্থালি করা—তা আর পূর্ণ হতে পেল না। বাসা-বদলের পালাও ফুরোল না। তাঁর এ বাতিকের কথা নিজেই বুঝে কতবার হেসেছেন, আমাকে বলেছেনও—'দেখো, লোকে বাড়ী-ভাড়া না দিয়ে রাতারাতি পালায়। তারা হল অসৎ, উদ্দেশ্য প্রবঞ্চনা। আর আমি সৎ হয়েও ভীতু, বাতিকগ্রস্ত। ফল একই। কি করি বল! আজীবন ছেঁচড়ামি দেখে ইতরতার হাত থেকে রেহাই পেতে চেষ্টা করেছি। স্বার্থের জন্যে মন নীচুতে নেমেছে। ভালো যে দেখি না, তা নয়। কিন্তু মন্দটাই চোখে পড়ে বেশি। আর দুশ্চিন্তা সন্দেহ যদি একবার ঢুকল, মন থেকে তাড়াতে পারি না কিছুতেই। এ এক আচ্ছা জ্বালা! নিজের কাছে নিজেই ছোট হয়ে যাই। তাই পালিয়ে বেড়াই......'

সত্যিই তাই। আমার মনে হয় ঊষাদি'র চরিত্রে যেটুকু উদারতা ছিল, সেটুকু যেন সংশয়ে স্বার্থ চিন্তায় সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। ফলে স্পষ্টবাদিতায় কঠোর ভাবটাই ধরা পড়ত বেশি। এবার এলেন কসবায়। বরানগর থেকে সোজা ঘোড়ার গাড়ীতে। একখানা নয়, দুখানা এবং সাত টাকা করে ভাড়া দিয়ে। বললেন, 'ছিলুম ভালোই। গোড়ায় গোড়ায় বাড়ীওলার গিন্নী বেশ অমায়িক ভদ্র সেজেই ছিল। মাস তিনেকের মধ্যে নিজ মূর্তি বেরিয়ে পড়ল: আমার একটু জল খরচ করা অভ্যেস। তাই নিয়ে খিঁচ-মিচি। তাও সহ্য করছিলুম। কিন্তু মেয়েকে দিয়ে ভাঁড়ার চুরি বরদাস্ত হল না। আজ তেল নেই, কাল চিনি ফুরিয়েছে, পরশু চায়ের একটু দুধ—নিত্যি চাওয়া তো লেগেই আছে। তায় বড় বৌমার হুসপর্ব কিছু কম। দুপুরে ভাঁড়ার ঘরে একদিন চাবি দিতে ভুলেছি আর সেই সুযোগে মেয়েটাকে দিয়ে বড়ি, মুগের ডাল পাচার! নিরুপায় হয়েই উঠে এলুম ভাই......তুমি কাছে আছো এই ভরসা। বৌকে বোলো যেন বুড়ো ননদকে এক-আধবার দেখে যায়।'

যাচ্ছিলেন আমার স্ত্রী। মাঝে ঊষাদি দিন কয়েকের জন্যে ডানকুনিতে গেলেন বড় মেয়ের কাছে। অনেক করেছে এই মেয়ে। ছোট ভাই-বোনদের দেখেছে, মাকে যত্ন সাহায্য দিতে ত্রুটি করেনি। সাধারণতঃ ঊষাদি দশ পনেরো দিনের মধ্যেই ফেরেন কিন্তু এবার এলেন মাস দেড়েক কাটিয়ে। জ্বরে আর আমাশায় জীর্ণ শরীর নিয়ে ফিরলেন। দেখা করতে গেলুম দুজনেই। দেখে চমকে উঠলুম...ঊষাদি কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'মরতেই বসেছিলুম......অনেক কষ্টে মেয়ে বাঁচিয়ে তুলেছে। ডাক্তার বলেছে, শরীরে কিছু নেই। খুব সাবধানে হয়ে থাকতে হবে। নেহাৎ অ-গঙ্গার দেশে মরণ নেই, তাই আগার জোরে প্রাণটা নিয়ে কোনও রকমে ফিরে এসেছি আশী বছর পর্যন্ত এই দেহ নিয়ে...''

বললুম—'তুমি দুশ্চিন্তা কোরো না ঊষাদি। যাটের মধ্যেই যা চেহারা বাগিয়েছ, তাতে আশী হাসি-হাসি মুখে এগিয়ে এসেছে। এখন শুধু একটি হেঁচকি বাকি...

ঊষাদি হেসে ফেললেন। বললেন—'কাল একাদশী, যেতে পারবো না। পরশু, তোমার ওখানে বৌ, দ্বাদশীর দিন জল-টল খেয়ে বিকেলে চলে আসবো।' বারণ করেছিলুম, এ শরীরে উপোস কোরো না অযথা। ঊষাদি শোনেন নি। আমার বাসায় পরের দিন এলেন। আমার স্ত্রী যত্ন করে খাওয়ালেন, বিকেলে ওষুধ খাইয়ে রিকশা করে নিজেই পৌঁছে দিয়ে এলেন। বললেন, 'দিদির যা অবস্থা দেখছি, বেশিদিন আর নয়। চোখের কোণে এক ফোঁটা রক্ত নেই, ধারালো নাক-মুখ যেন আরও শক্ত হয়ে উঠেছে......

সারা সন্ধ্যাটা ঊষাদি'র ভাগ্য আলোচনা কাটল। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে যাব ঊষাদির বড় মেয়ের যে ছেলেটি ও'র কাছে থে[কে] পড়ত, সে এসে বলল, 'দিদিমার গতিক ভা[লো] বুঝছিনা, শুয়ে আছেন কিন্তু ঝিমিয়ে। জব[াব] দিচ্ছেন না......ছোট মামা ডাক্তার ডাক[তে] গেছেন, আপনি একবার আসুন।'

গেলাম দুজনেই। নাড়ী দেখলাম, প্র[াণ] নেই। ডাক্তার এসে ফিরে গেলেন। শুয়ে শু[য়ে] কখন যে প্রাণ বেরিয়েছে কেউ টের পায় [নি]। ছোট নাতনিটি বলল, 'দিদা শুধু একবার প[াশ] ফিরে শুয়েছিলেন, আর কিছু তো জানি না।'

আমি জানি। চাঁপাতলা থেকে কালীঘা[ট], গোয়াবাগান থেকে হাতীবাগান, টালা থে[কে] টালিগঞ্জ আর কাশীপুর থেকে কসবার দ[ীর্ঘ] পরিক্রমা সেরে এবার ভালো ও স্থায়ী ব[াসার] সন্ধানে গেলেন ঊষাদি। নব কলেবরে অ[ার] দুশ্চিন্তা আর থাকবে না।

কলঙ্কী চাঁদ

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

আমি সে কলঙ্কী চাঁদ, এই শুধু জানি মনে মনে,
আমার বুকের ব্যথা বয়ে যাই অতি সংগোপনে—
পাছে কেহ মনে করে, চাঁদিমার জোছনা-বিলাস
সে শুধু অলীক মায়া,—
মিথ্যা তার আলো-অভিলাষ;
পাণ্ডুর নীলিম নভে, আধ-ছায়া-স্বপ্নের আড়ালে,
মায়াবী চাঁদের হাসি অবলুপ্ত অমানিশা-কালে।

কেন এই বিধিলিপি, কেন এই জন্মের লিখন?
আগ্নেয়গিরির জ্বালা বক্ষ মাঝে সহি অনুক্ষণ,
একদা কখন এক বিস্ফোরণ বিদীর্ণ হিয়ায়
স্তিমিত সে জীবনের শেষ রাগ সুদূরে মিলায়!
তারপর নেমে আসে শান্ত হিম তুহিন-শীতল
অতলান্ত অন্ধকারে অন্তহীন অশ্রু অবিরল।

তবে কেন জাগে প্রাণ, কেন হয় স্পন্দিত জীবন,
কেন এ মর্মের কথা বহে বুকে মুগ্ধ সমীরণ?
আলোকের দূত আমি, তাই বুঝি ধরণীর 'পরে,
আমার আনন্দ-বিন্দু সুধা হয়ে নিত্য পড়ে ঝরে!
তাই বুঝে জেগে ওঠে নিত্য নব আশার আলোক--
তাই সে পূর্ণিমা আসে বিতরিয়া প্রেমের ঝলক!
রজনীগন্ধার বনে মল্লীশুভ্র মাধবী রজনী
যেন কী আবেগভরে
অঙ্গে টানে জ্যোৎস্না-আবরণী!
মুক্তধারা হাসি মোর ঝরে পড়ে অঝোর ধারায়,
সুধাপানে মত্ত ধরা কী আবেশে চেতনা হারায়!
যেন কোন্ সুন্দরের আবির্ভাব উপলব্ধি করি'
প্রকৃতির শ্যামাঞ্চলে বসুন্ধরা উঠিল শিহরি'!

নিরখি' আমারে তাই
শিল্পী আঁকে মোর আলো-ছবি;
আমারই মহিমা গায় নিখিলের রূপমুগ্ধ কবি।
আমারে উপমা করি', রমণীর রূপের লাবণি—
হিমাদ্রি শিখরে আমি সেই চারু চন্দ্রকান্তমণি:
আমি সে তাজের তাজ প্রেমিকের স্বপন-দোলায়,
মর্মরে মর্মের গানে আমি সুর পাষাণ-বীণায়।
বিরহের সাথী আমি সাক্ষী হই মিলন-বাসরে—
চিরন্তন ঠাঁই মোর প্রেমিকের প্রেমের আসরে।

আমারে চাহিয়া কাঁদে নিশিদিন জাগর সাগর—
ঊর্ধ্বে তুলি লক্ষ বাহু,
মোরে শুধু খোঁজে নিরন্তর—
উদ্বেল হৃদয় তার প্লাবনের কল কল নাদে—
বলে শুধু ফিরে দেরে, ফিরে দেরে
মোর প্রিয় চাঁদে!

আমি যে কলঙ্কী চাঁদ,
হায়, তবু, মানে না যে মন
আমার এ আলো নয় মরমের একান্ত আপন!
ক্ষণিকের লাগি শুধু বিথারিয়া ইন্দ্রজাল-মায়া,
দিগন্ত ব্যাপিয়া দোলে বিকম্পিত বেদনার ছায়া।
নিশিদিন শ্রান্তিহীন যারে খুঁজি অন্তরে বাহিরে,
চিরতরে অস্তমিত সেই আলো কোথাও না হিরে।
!
এত সুধা এত হাসি,
এ সবি যে ঋণের পশরা—
সহিতে পারিনা আর মর্মন্তুদ এই গ্লানিভরা
জীবনের বিড়ম্বনা, তাই বুঝি আমার আকাশে
সংশয়ের ছায়াসম অমানিশা ধীরে নেমে আসে।
কৃষ্ণপক্ষ নিশীথিনী তিলে তিলে মোরে গ্রাস করে
রাখিবারে চায় তার সীমাহীন বিলুপ্তি-বিবরে!

মেলিয়া কপিশ ছায়া আসে রাহু আমারে গ্রাসিতে,
শীতাংশু এ নাম মোর,
কালান্তক চাহে সে নাশিতে!
কী দুরন্ত অভিশাপে এ জনমে শুধু পরাজয়—
শুধুই লাঞ্ছনা-ভরা চিরন্তন আঁধারে বিলয়!
সেই সে কলঙ্ক মোর,
নিশিদিন তাহারি আঘাতে—
যে ক্ষত রয়েছে বুকে, অবিরাম দহন-জ্বালাতে
পুড়ে খাক হ'ল হিয়া, তাই জাগে কলঙ্কের ছবি
মৃত্যু-নীল অন্ধকারে ডুবে যায় জীবনের রবি।
তবু যে রবির আলো বারে বারে আমারে বাঁচায়—
তারি ছবি বুকে ধরি' হেসে উঠি ভরা জোছনায়

লক্ষ্মী কেবল মহিলাদের জন্যে

লীলা মজুমদার

আমার শাশুড়ী বলতেন টাকা বড় পাজী জিনিষ। মরলেনও তেমনি পিঠময় কারবাঙ্কল হয়ে। আমার মুখে অমন কথা কেউ শুনবে না, আমি জানি টাকা হল গিয়ে লক্ষ্মী। আমার ভাঁড়ার ঘরে দিদিমার লক্ষ্মীর ঝাঁপি আছে, তার মধ্যে মহারাণীর মুখ দেওয়া এই বড় রুপোর টাকা আছে, তাতে আমি সিঁদুর মাখিয়ে রোজ দুবেলা মাথা ঠেকাই। তবু যদি মা লক্ষ্মীর তেমন দয়া না হয় সেটা আমার দোষ নয়।

সত্যি কথা বলতে কি ঠাকুর-দেবতারা যে কিসে প্রসন্ন হন আর কিসে বা না হন বুঝে উঠিনে। ঐ পাশের বাড়ির হৈমন্তী, ওর মতো অলক্ষ্মী ভূ-ভারতে আরেকটা আছে কি না সন্দেহ, অথচ সৌভাগ্য ওর উথলে পড়ছে। তার ওপর বাবা, কি দেমাক! ঘরের কথা কারো কাছে ফাঁস করবে না! কেন, আমরা কি ওর পাকা ধানে মই দেব না কি! আর আমার বড় বৌমার সঙ্গে যেন একেবারে হরিহরাত্মা!

হপ্তায় একদিন করে ওদের বাড়িতে শিশি-বোতলওয়ালা একেবারে বাঁধা। পরের ব্যাপারে নাক গলানো আমার স্বভাব নয়, তবে আমাদের চানের ঘরে জল-চৌকিতে চড়ে, জানলার শিক ধরে একটু উঁকি মারলেই একেবারে ওদের ভেতর বাড়ির উঠোন দেখা যায়! নিজের চোখে দেখেছি ভাল ভাল দরকারী জিনিষপত্র শিশি-বোতলওয়ালার থলে করে পাচার হয়ে যাচ্ছে। ভালো ভালো শিশি-বোতল, কৌটো, কার্ড বোর্ডের বাক্স, ঠোঙ্গা সব। দেখে দেখে আমার সর্বাঙ্গ রী-রী করে!

আমি একটি জিনিষ কাকেও ফেলতে দিই না। তবে আমার কথামতো তো আর বাড়ি শুদ্ধু লোকে চলে না, কাজেই ময়লা কাগজের টুকরির থেকে অনেক জিনিষ কুড়িয়ে রাখতে হয়। এই যেমন বিয়ের নিমন্ত্রণের সব ভালো ভালো চিঠি, শক্ত রঙ্গীন কাগজের ঠোঙ্গা, রাশি-রাশি দড়ি। আচ্ছা, দড়ি কখনো ফেলে দিতে হয়? তা বড় বৌমা কিছুতেই বুঝবে না।

আমি কিছু ফেলি নে, বাক্সের ভেতর বাক্স পুরে, বড় কৌটোর ভেতর ছোট কৌটো তার ভেতর আরো ছোট কৌটো পুরে, ভাঁড়ার ঘরের আলমারির মাথায় ঢাই করে রেখে দিই। কখন কি কাজে লাগবে বলা তো যায় না। তখন আর পয়সা দিয়ে কিনতে হবে না। বড়বৌমার আর কি বলুন, ওকে তো পয়সা রোজগার করতে হয় না!

আমার হাত দিয়ে একটি কানা-কড়ি নষ্ট হয় না কখনো। বামুন-চাকরগুলো কি আর সাধে আমার ওপর হাড়চটা! আলু, পেঁয়াজ থেকে শুরু করে কয়লার টুকরো পর্যন্ত গুনে গুনে বের করে দিই। এক পয়সার জিনিষ আনতে দিই না কখনো ওদের দিয়ে। অর্ধেক তো খেয়ে আসবে, নয় তো তিন ছটাক এনে এক পোর দাম নেবে। ওসব আমার কাছে চলবে না।

কিন্তু ফলে কিই বা লাভ হয় আমার? সবার কাছে অপ্রিয় হই, বড় বৌমার মুখ হাঁড়ি, আর মাসকাবারে হয় তো বড়জোর পনেরোটি টাকা!!

ঐ হৈমন্তী, ঐ মোড়ের মাথায় মেয়েদের বড় ইস্কুলে মাস্টারী করে, মাস মাস নাকি আড়াইশো টাকা পায়, তাই থেকে ত্রিশ টাকা দিয়ে ওর বাপের বাড়ির পুরোনো বামুন ঠাকুরকে এনে রেখেছে। কর্তাও গেলেন আপিসে, ছেলেরা গেল ইস্কুলে আর উনিও অমনি নাকে মুখে ভাত গুঁজে চটর চটর করে চটি পরে দিয়ে ইস্কুলে গেলেন! রান্নাঘরের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই! বিকেলে জল-খাবার তৈরীর পাট নেই এক রকম! ডিম, রুটি, কলা, নয়তো মুড়ি, পেঁয়াজ কুচো, শশা। মাগো! কিন্তু বড় বৌমার চোখে ঐ হল গিয়ে স্বর্গ। নাকি ভিটামিন থাকে ওতে!!

হৈমন্তী আমার রান্নাঘরে একবার এসে দেখে গেলে পারে। কাঁচকলার খোসাটি ফেলি নে জানেন? সেদ্ধ করে, চটকে, কাঁচা লঙ্কা আর বেসন দিয়ে ভাসা তেলে যেমন বড়া ভেজে তুলি, কই, করুক তো দেখি ঐ বি-এ পাশ হৈমন্তী!

কিচ্ছু ফেলিনে, কমলা লেবুর খোসা শুকিয়ে রাখি। এক বাক্স বোঝাই আলপিন আছে আমার, ফেলে দেওয়া কাগজপত্র থেকে তুলে রেখেছি। এক কৌটো নানা রকম বীচি আছে, এখন আর কোনটা কিসের বীচি মনে নেই, কিন্তু সবগুলো পরিষ্কার শুকনো খট-খট করছে, পুঁতে দিলেই নল নলিয়ে বেড়ে উঠবে।

দাড়ি কামাবার পুরোনো ব্লেডই আছে একটি চুরুটের বাক্স বোঝাই। অল্প ভাঙ্গা চুরুট আছে আট-দশটা। একটা কুটো নষ্ট করি না। বেঁচে থাকুন মা লক্ষ্মী।

জীবন কাটে আমার রান্নাঘরে। প্রত্যেকটি জিনিষ নেড়েচেড়ে ঝেড়ে পুঁছে রাখি। দেখাক তো একটি আরশুলো কেউ। আর ঐ হৈমন্তী কি করে জানেন? সপ্তাহে একটি দিন ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে ছোট ছোট খুরির করে কি একটা সাদা গুঁড়ো কোণায় কোণায় রেখে আসে, আর মস্ত রাজ্যের আরশুলো মরে শুকিয়ে খড়ের মতো হয়ে পড়ে থাকে। সারাদিন খেটেখুটে রোজগার করা পয়সাগুলো ঐ সব কিনে খোলামকুচির মতো খরচ করে! আর ভাঁড়ার ঘরে ওসব কড়া ওষুধ কখনো দিতে আছে? তা বড় বৌমা যাই বলুক।

ছেঁড়া কাপড় এতটুকু ফেলিনে আমি, তোরঙ্গ বোঝাই করে রাখি। বছরে বছরে এত জমিয়ে ফেলেছি যে ভালো কাপড় রাখবার আর জায়গাই নেই। সে সব কাগজে জড়িয়ে বিছানার গদীর মধ্যে রাখতে হয়। তাই নিয়ে বাড়িতে খুব বকাবকিও হয়। কিন্তু কি করি বলুন, বামুন, চাকরের তো ঐ সবের পরেই যত লোভ, কোথায় কি খালি টিন, পুরোনো কাপড় সরানো যায়। নিচু নজর আর কাকে বলে। অথচ ঘরের তাকে তুলে রাখবার জো নেই, বাড়ির লোকের [illegible] হলে মহা অশান্তি করবে। এই সব সামলে সংসার করতে হয়। বড় বৌমার কাছ থেকে তো এসব দিকে এতটুকু সাহায্য পাবার জো নেই।

বলে, রান্নাঘরে একটু নড়বার জায়গা নেই। কি করে থাকবে? রবিবার, রবিবার যে দই-মিষ্টি আসে, তার ভালো ভালো মাটির হাঁড়ি-গুলো কি ফেলে দেব? ওতে করে ডাল রাঁধলে কি মিষ্টি খেতে হয় এরা কেউ তার খবর রাখে না! ছাদ পর্যন্ত উঁচু তিনটে পাহাড় জমিয়ে রেখেছি মাটির হাঁড়ির, তিন পুরুষের ডাল রাঁধবার ব্যবস্থা।

ঝুড়ি ঝোড়াই আছে আমার দুই খাটের তলা ভর্তি। জুতোর খালি বাক্স আছে পাঁচশটা। এত জিনিষ নষ্ট করে আমাদের

(শেষাংশ ৬৪ পৃষ্ঠায়)

দৃষ্টিবিজ্ঞানের আধুনিকতম বিস্ময়

শ্রীসুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী

আমাদের পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে চেতনা লাভের যে-সব উপায় সুদীর্ঘ বিবর্তনের ফলে আমরা লাভ করেছি আলোকের অনুভূতি তাদের সর্বাগ্রগণ্য। বর্তমানে আমাদের চোখ যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছে সে-বিষয়ে ভাবলে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, আমাদের চোখ একটি পরম বিস্ময়কর যন্ত্র। দৃষ্টি-বিজ্ঞানের অন্যতম জনক সুবিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী ফন্ হেলমহোলৎস এক শতক আগে মন্তব্য করেছিলেন যে, বীক্ষণ-যন্ত্র হিসাবে চক্ষু এমন কিছু আশ্চর্য যন্ত্র নয় এবং যন্ত্র হিসাবে কিনতে পাওয়া গেলে তিনি কিনতেন না। হেলমহোলৎসের উক্তিতে খানিকটা রহস্য অবশ্য ছিল কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে চোখের যে বিস্ময়কর ক্ষমতা দেখা যাচ্ছে সেটুকু জানবার সুযোগ ঘটলে তিনি নিশ্চয়ই এই মন্তব্য করতেন না।

কোন বস্তু থেকে নির্গত আলো যখন আমাদের চোখে প্রবেশ করে তখন আমরা বস্তুটি দেখতে পাই একথা সকলেই জানেন। কিন্তু আলোক বস্তুটি কি? বিজ্ঞানীদের মতে আলোক এক ধরণের তরঙ্গ। এই তরঙ্গ প্রবাহিত হবার জন্য কোন বস্তু মাধ্যমের প্রয়োজন নেই এবং শূন্য স্থানে এর বেগ এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বা ত্রিশ কোটি মীটার। গামা-রশ্মি, এক্স-রশ্মি, অতি বেগনি অদৃশ্য আলো, দৃশ্য আলো, বেতার তরঙ্গ সবগুলই মূলতঃ একই বস্তু, যা কিছু তফাৎ তা হচ্ছে তাদের কম্পনসংখ্যায় অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে কতবার স্পন্দন ঘটছে। এই তফাৎ অন্য ভাবেও প্রকাশ করা যায়, সেটা হচ্ছে তরঙ্গদৈর্ঘ্য। কোন নির্দিষ্ট তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এবং কম্পনসংখ্যার গুণফল সেই তরঙ্গের বেগের সমান। সুতরাং একটা জানলেই অপরটা জানা যায়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। আপনারা খবরের কাগজে নিশ্চয়ই দেখেছেন যে, কলকাতার একটি বেতার-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ৩০০ মীটার এবং এর কম্পন সংখ্যা দেওয়া থাকে ১০০০ কিলোসাইকল/সেকেণ্ড। কিলো অর্থ হাজার অর্থাৎ কম্পনসংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে ১,০০০,০০০ বার। কম্পনসংখ্যা ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য গুণ করলে আমরা পাই ৩০,০০,০০,০০০ মীটার/সেকেণ্ড।

বৈদ্যুতিক তরঙ্গের দৈর্ঘ্য মীটার, সেণ্টি-মীটার বা মিলিমীটারে মাপা চলে, কিন্তু দৃশ্য আলোর তরঙ্গ তারচেয়ে অনেক ছোট হওয়ায় তা সাধারণতঃ মাপা হয় মিলিমাইক্রনে। এক মিলিমাইক্রন মীটারের একশ কোটি ভাগ। দৃশ্য আলোর ব্যাপ্তি প্রায় এক সপ্তক মোটামুটি হিসাবে ৪০০ থেকে ৭০০ মিলিমাইক্রন।

সূর্যের আলো আমাদের চোখে সাদা দেখায় কিন্তু তা একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গের আলো নয়। বিজ্ঞানী নিউটন প্রথমে দেখান যে সাদা আলো খুব সহজে বিশ্লেষিত করে মোটামুটি সাতটা রঙের আলো পাওয়া যায়। নিউটন এই পরীক্ষা করেন প্রায় তিন শ' বছর আগে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে। তিনি একটি ত্রিভুজীয় প্রিজমের ভিতর দিয়ে এক ফালি রোদ পাঠিয়ে দেখালেন যে, সেই আলো শুধু যে বেঁকে যায় তাই নয় একটি পরদার উপর এই প্রতিসৃত আলো একটি চওড়া পটিতে বিস্তৃত হয়ে যায়, যার এক প্রান্তে লাল এবং অন্য প্রান্তে বেগুনি। এই রঙীন আলোর পটিকে বলা হয় বর্ণালী। সূর্যালোকের বর্ণালীতে এই সাতটি রঙ বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়—লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ, নীল, ঘন নীল এবং বেগুনি। মোটামুটি সাতটা ভাগ করা হলেও অভিজ্ঞ চোখে প্রায় শতখানেক পর্যন্ত পৃথক রঙ বোঝা যায়। বেগুনি থেকে লালের দিকে ক্রমশঃ তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে গেছে। বস্তুতঃ রঙের পদার্থ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হল তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য।

বহু বর্ণের একই ছবির সাদা-কালো ফোটোগ্রাফ। উপরেরটিতে লাল ও নিচেরটিতে সবুজ ফিলটার ব্যবহার করা হয়েছে। দুটিই স্বচ্ছ ফিল্মের উপর পজিটিভ ছবি।

আমাদের চোখের সবচেয়ে বিস্ময়কর ক্ষমতা বর্ণের অনুভূতি। অধিকাংশ প্রাণীর বর্ণের অনুভূতি নেই। পৃথিবীর এই আশ্চর্য বর্ণ-বৈচিত্র্য তাদের চোখে সম্পূর্ণ নিরর্থক। তারা যা কিছু দেখে তার চেহারা সাদা-কালো ফোটোগ্রাফের মতো। কোন কোন প্রাণীর বর্ণানুভূতির সীমা মানুষের চেয়ে বেশী কিন্তু বর্ণের সূক্ষ্ম তারতম্য মানুষের চোখে যতটা ধরা পড়ে আর কোন প্রাণীর চোখে তা ধরা পড়ে না।

নিউটন আরও দেখান যে, সূর্যের আলো যেমন অনেকগুলি রঙের সমবায়ে গঠিত, তেমনি সেই রঙগুলো মেলালে আবার সাদা রঙ ফিরে পাওয়া যায়। একটি প্রিজম দিয়ে যখন আলো বিশ্লেষণ করে বর্ণালী পাওয়া গেল তখন বর্ণালীর সাতটি অংশ আয়নার সাহায্যে প্রতি-ফলিত করে একটি পরদার একই জায়গায় ফেললে আর কোন পৃথক রঙ দেখা যাবে না, আবার সাদা আলো ফিরে পাওয়া যাবে।

এখন সূর্যালোকের উপাদানিক সবগুলো রঙের আলো না মিশিয়ে মাত্র দুটি বা তার বেশী মিশ্রিত করা হয় তাহলে আমাদের চোখে তা মাঝামাঝি কোন রঙ বলে বোধ হবে। এই পরীক্ষায় কোন্ কোন্ রঙের মিশ্রণে কি রঙ পাওয়া যাবে, তা নির্ণয় করবার অনেকগুলি সহজ উপায় আছে। পদার্থবিজ্ঞানের যে-কোন ছাত্র তা জানে, তা নিয়ে বেশী আলোচনা করবার প্রয়োজন নেই। তবে এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে মনে রাখা প্রয়োজন যে, এখানে যা কিছু আলোচনা করা হচ্ছে, তা কেবলমাত্র

রঙীন আলো সম্পর্কে প্রযোজ্য, রঞ্জকপদার্থ বা ইংরেজিতে যাদের 'পিগমেন্টস' বলা হয়, তাদের সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়।

আমরা কেন রঙ দেখি এই জিজ্ঞাসার কোন সন্তোষজনক উত্তর আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। বর্ণালীর রঙের মিশ্রণে কি রঙ পাওয়া যায় সে বিষয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন নিউটন এবং তাঁর পরবর্তী বিজ্ঞানীরা। ম্যাক্স-ওয়েল এবং ফন হেলমহোলৎস দেখান যে মাত্র তিনটি রঙের মিশ্রণে যে-কোন রঙের সৃষ্টি করা যায় এবং এই রঙগুলো বেছে নিতে হবে বর্ণালীর লাল সবুজ এবং নীল অংশ থেকে; এই রঙগুলোকে সেইজন্য মূল বর্ণ বা 'প্রাইমারী কালারস' বলা হয়।

বর্ণানুভূতির তত্ত্ব এই তিনটি মূল বর্ণের ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে। ইংরেজ বিজ্ঞানী ইয়াং এর ভিত্তি স্থাপন করেন ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে এবং সংস্কৃত রূপ দেন জার্মান বিজ্ঞানী হেলমহোলৎস ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে। এই মতবাদ বিজ্ঞানীদের কাছে ইয়াং-হেলমহোলৎস মতবাদ রূপে খ্যাত। একথা সবাই জানেন যে চোখের গড়ন ফোটোগ্রাফ তোলবার ক্যামেরার মতো। আমরা যখন কিছু দেখি তখনই সেই দৃশ্যের একটি বিম্ব অক্ষিগোলকের পিছনে অবস্থিত রেটিনার উপর পড়ে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, রেটিনায় লাল, সবুজ এবং নীল বর্ণ অনুভূতির জন্য পৃথক পৃথক বোধক অংশ বা 'রিসেপটর' আছে। বহির্দৃশ্যে কি কি মূল বর্ণ আছে তার উপর অনুভূতি নির্ভর কবরে এবং তাদের সমবায়ে আমরা বস্তুটির সামগ্রিক বর্ণবৈচিত্র্য অনুভব করে থাকি। গত এক শতাব্দীতে এই মতবাদের কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু মূল কথাটা কিছুমাত্র বদলায়নি। পরবর্তী বিজ্ঞানীরা 'রিসেপটর'-এর প্রকার বাড়িয়েছেন মাত্র।

সম্প্রতি মার্কিন বিজ্ঞানী এডউইন ল্যান্ড এবং তাঁর সহকর্মীরা অনেকগুলি পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, বর্ণবোধের এই প্রচলিত মতবাদের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই এবং যেখানে কোন বর্ণের বাস্তব অস্তিত্ব নেই সেখান থেকে চোখ বর্ণের একটি সম্পূর্ণ জগৎ তৈরী করে নিতে পারে।

বর্ণালীর দুটি পৃথক রঙ মেশালে কি ঘটবে তা আমরা জানি। একটি বর্ণালী যে পরদায় পড়েছে তাতে উপযুক্ত স্থানে দুটো ছিদ্র রাখলেই সেগুলো পরদার বাইরে চলে যাবে। এখন লেন্সের সাহায্যে এই দুটো রঙ অন্য একটি পরদার একই জায়গায় ফেললেই মিশ্রণের ফল বোঝা যাবে। ল্যান্ড এই পরীক্ষার সামান্য একটু পরিবর্তন করে বিস্ময়কর ফল পেয়েছেন।

মনে করা যাক এই ছিদ্র দুটি খোলা না রেখে সেখানে একই রঙীন দৃশ্যের দুটো সাদা-কালো অচ্ছ ফোটোগ্রাফ (ইংরেজিতে যাকে বলে 'ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট" ট্রান্সপেরেন্সি) রাখা হ'ল। ফোটোগ্রাফ দুটো একই দৃশ্যের কিন্তু দুটি বিভিন্ন রঙের আলোয় তোলা। অর্থাৎ সাদা-কালো ছবিদুটোর মধ্যে সাদা এবং কালোর গাঢ়ত্বের কিছু প্রভেদ মাত্র থাকবে। এই ছবি দুটো না থাকলে পরদার দুটো রঙের মাঝা-মাঝি কোন রঙ দেখা যাবে। রঙদুটো ছবির মধ্য দিয়ে গিয়ে পরদায় পড়তেই আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেল। মূল দৃশ্যে যেখানে যে-রঙ ছিল তার সবগুলোই মিলিত ছবিটায় ফুটে উঠতে দেখা গেল। একটি পরীক্ষায় দুটো রঙই ছিল হলুদ, একটি অংশের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৫৩৫ থেকে ৫৮৯ মিলিমাইক্রন এবং অপর অংশের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ৫৭৯ থেকে ৫৯৯ মিলিমাইক্রন। সুতরাং যে দুটো রঙ মেশানো হ'ল দুটোই হলুদ অথচ মূল দৃশ্যের লাল, ধূসর, হলদে কমলা, নীল, কালো, বাদামী এবং সাদা সবই মিলিত ছবিতে দেখা গেল। অবশ্য এই রঙগুলোর ঔজ্জ্বল্য মূলের চেয়ে অনেক কম কিন্তু রঙ-গুলো চিনতে কোন অসুবিধা হয় না।

এই পরীক্ষার গুরুত্ব আশাকরি আপনারা বুঝতে পারছেন। এই পরীক্ষা থেকে এই সিদ্ধান্ত অনস্বীকার্য হয়ে পড়ে যে আলোক-রশ্মির নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য যা তার বর্ণের দ্যোতক তা বর্ণানুভূতির জন্য অবশ্যই দায়ী নয়, কারণ, তা হলে যেসব বর্ণের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই তা কি করে দেখা সম্ভব। বরং তারা এমন কোন সংবাদ আমাদের কাছে বহন করে আনে যার সাহায্যে চোখ আপনিই রঙগুলো সৃষ্টি করে নিতে পারে। অথবা কোন বর্ণাঢ্য দৃশ্যের বর্ণহীন প্রতিচ্ছবিতেও বর্ণের ঐতিবৃত্ত সুপ্ত থাকে এবং অনুকূল অবস্থায় চোখ সেই সুপ্ত অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে পারে।

ল্যান্ড এবং তাঁর সহকর্মীরা এই বিষয়ে বহু পরীক্ষা করেছেন এবং এই বিষয়ে ব্যাপক গবেষণায় এখনও ব্যাপৃত রয়েছেন। তাঁদের পরীক্ষার সব দিক সাধারণ পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করার প্রয়োজন নেই। তাঁদের মোট বক্তব্য হচ্ছে এই। পরীক্ষার জন্য দুটি শাদা-কালো অচ্ছ ফোটোগ্রাফ প্রয়োজন এবং এ দুটো তুলতে হবে বিভিন্ন রঙের আলোতে। হ্রস্বতর তরঙ্গের আলোয় তোলা ছবিটিকে এঁরা আখ্যাত করেছেন 'হ্রস্ব রেকর্ড' বলে এবং দীর্ঘতর তরঙ্গের আলোয় তোলা ছবিটিকে বলছেন 'দীর্ঘ রেকর্ড'। এদের জন্য কোন বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের প্রয়োজন নেই, বর্ণালীর অনেকখানি বড় অংশ হলেও চলে। এমন কি হ্রস্ব রেকর্ডের জন্য গোটা বর্ণালী অর্থাৎ সাদা আলো ব্যবহার করা যায়। এখন হ্রস্ব রেকর্ডের মধ্য দিয়ে হ্রস্ব তরঙ্গের আলো এবং দীর্ঘ রেকর্ডের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ তরঙ্গের আলো দিয়ে দুটো ছবি এক জায়গায় মেলালেই মূল দৃশ্যের রঙগুলো দেখা যাবে। দুটো আলোর তীব্রতার যথেষ্ট তারতম্য ঘটলেও বর্ণবৈচিত্র্যের তারতম্য ঘটে না। দুটি তরঙ্গের মধ্যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সামান্য প্রভেদ থাকলেও রঙ দেখা যায়। নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে এই প্রভেদ কম হলে রঙ দেখা যাবে না। হ্রস্ব রেকর্ডের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ তরঙ্গের আলো এবং দীর্ঘ রেকর্ডের মধ্য দিয়ে হ্রস্ব তরঙ্গের আলো পাঠালে মূল দৃশ্যের প্রত্যেকটি বর্ণের জায়গায় তার পরিপূরক বর্ণ অর্থাৎ 'কমপ্লিমেন্টারি কালার' দেখা যাবে।

এখন আমরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবো যে, হেলমহোলৎস এক শ' বছর আগে যাই বলে থাকুন, আমাদের চোখ একটি অপূর্ব বিস্ময়কর যন্ত্র।

গাঁয়ের বউ হেমলতা

… রামেন্দ্র দেশমুখ্য …

মরা ছেলেকে কোলে নিয়ে
হেমলতা ভিক্ষায় বসে নি,
আমাকে চোখ বুজিয়ে দেখেও
পাথরের কালো মা কাঁদেনি,
তখনো ভিড় ছিল-না,
সকালের ফুরফুরে হাওয়ায়
আমি লজ্জায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।

সবে ভিড় বাড়ছিল,
গলির মোড়ে ডাকছিল ফেরিওয়ালা,
কাল রাত থেকে লাশ কোলে
আধ-ঘুমন্ত গাঁয়ের বউ হেমলতা
প্রবাসে ছায়াঘন ফুটপাথের উপর
মরা তারার দিকে ভেজা চোখে
রাতকে ফুরিয়ে দিয়েছিল।

কাছের দালানে ধনীর মেয়ে
কার স্মৃতিকে নিয়ে অভিমানে
একটি লাজুক গান শুরু করতেই
কাণ পেতে আমি ভাবতে বসলাম,
পলিমাটিতে পায়ের সজল দাগ এঁকে
করমচা আর বন ঝাউয়ের বুকে
হেমলতা আর তো ফিরে যাবে না।

দক্ষিণে পানকৌড়ির দেশ থেকে
কত বধূই না উড়তে উড়তে
ক্ষুধার জ্বালায় কলকাতা পালিয়ে
মৃত্যুর অলৌকিক ছাপ নিয়ে
আমার রোয়াকে ভিক্ষার অভিমানে
প্রথম অবধি স্মৃতির লজ্জায়
চোখের পাতাকে জলে ভেজায়।

এখনো চেঁচিয়ে ডাকলে
যদি সকলের ঘুম ভাঙানো যায়,
দৌড়তে দৌড়তে যন্ত্রণায়
গাঁয়ের হানা পদ্মপুকুরে গিয়ে
আমি গান ধরেছি উত্তেজনায়,
ফুটন্ত জীবনকে ভোমরা ডাকে,
ভোমরা কে কোথায়?

সঞ্চয়িতা

(৩৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

না? কিন্তু খাতা দেখে টুকতে হবে কেন? সঞ্চয়িতা বই আছে আপনাদের —ঐ দেখতে পাচ্ছি। তার মধ্যে এগুলো আছে, আরও কত রয়েছে।

নিবেদিতা স্তম্ভিত হয়ে বলে, তবে যে বললেন আপনি লিখেছেন?

লিখেছি বইকি। সঞ্চয়িতা কেনার অত টাকা কোথা? একটা বই যোগাড় করে বাছা বাছা কতকগুলো লিখে নিয়েছি। আপনাদের যে বই রয়েছে, লিখে মরতে যাবেন কেন?

গলি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সেই ভদ্রলোক বলেছিলেন, তখন রায়টের সময়—বুঝলেন! আমাদেরই মেসের একটি ছেলে ওই গলিটা দিয়ে শর্টকাট করছিল। প্রায় কারফিউয়ের মুখ—সন্ধ্যে হয়ে আসছে। ভেবেছে এইটুকু তো রাস্তা—চট করে পেরিয়ে যাব। কিন্তু পার হতে আর পারল না। উঁচু প্রাচীরটার ওপরে যেখানটায় আইভির ছায়া খুব ঘন হয়ে নেমেছে—সেখান থেকে শাঁ করে বেরিয়ে এল একজন লোক—ছেলেটা ভাল করে কিছু বোঝবার আগেই একখানা ছোরা একেবারে পেটের ভেতর।

এমন একটা বীভৎস ব্যাপারের বর্ণনা দিতে গিয়েও কী নির্বিকার ভদ্রলোক। একমুখ পান-জর্দা খেয়েছিলেন, পচাৎ করে পিক ফেললেন রাস্তার ধারে—পিচকারি দিয়ে খানিক রক্ত ছিটকে পড়ল যেন। তারপর একটা সিগারেট বের করে, দেশলাইয়ের ওপর ঠুকতে ঠুকতে বলে চললেন, ডেড বডিটা তিন-চারদিন পড়ে রইল ওখানেই। ফুলে প্রকাণ্ড হয়ে উঠল—উত্তর দিকের জানলা খুলে রাখলে হাওয়ায় পচা গন্ধ ভেসে আসত। সবচাইতে বিশ্রী লাগতো মশাই সামনের দিকে ছড়ানো ডান হাতটা—তার আঙুলে ছিল একটা তামার আংটি। এত দূর থেকেও দেখতে পেতুম সেই আংটিটা রোদে ঝিকমিক করছে।

ভদ্রলোক সিগারেট ধরিয়েছিলেন। একেবারে স্বাভাবিক ভাবেই। গল্পটা এর আগে নিশ্চয় আরো অনেককে বলেছেন—বলাতে বলতে প্রায় পার্ফেকশনে পৌঁছেছেন এখন। সেদিনের ভয়াবহ স্মৃতিটা এখন একটা নিপুণ বর্ণনায় পরিণত হয়েছে—সেরা আর্টিস্টের কাজের মতো ইমপার্সোন্যাল।

কিন্তু গলা শুকিয়ে উঠল অজিতের। ধড়ফড় করতে লাগল বুকের ভেতরে।

—থাক, থাক। আর বলবেন না।

টিউশন সেরে রাত্রে তাকে ফিরতে হয় ওই গলিটা দিয়েই। উত্তর কলকাতার মানুষ-গিস্ গিস্ করা এই অঞ্চলে এমন একটা আশ্চর্য গলি আছে না দেখলে কল্পনাই করা যায় না। প্রায় সতেরো আঠারো ফুট চওড়া, মাছের টান লাগা ছিপের মতো বেঁকে দুটো বড় রাস্তার সঙ্গে মিশেছে দুদিকে। গলির চৌদ্দ আনা অংশেই কোনো বসতি নেই—দুটো উঁচু প্রাচীর চলেছে দুধার দিয়ে। একদিকে পৌর-প্রতিষ্ঠানের ময়লা ফেলা গাড়ীর আস্তানা—আর একদিকে একটি মিশনারী কলেজ। কলেজের দেওয়ালের ওপর এখানে ওখানে ঝুলে পড়েছে আইভির ঝাড়—উঁচু হয়ে আছে পামের মাথা; আর পৌর-প্রতিষ্ঠানের নিশ্ছেদ কালো দেওয়াল আস্তর ঝড়া ইঁটে যেন একরাশ রক্তমাখা দাঁত মেলে রেখেছে।

দিনের বেলা তবু এক আধজন মানুষ চলে। কিন্তু রাত কিছু বেশী হলে—রায়টের এই এতদিন পরেও ছোরা নিয়ে এসে যে কেউ ঘাতক হয়ে দাঁড়াতে পারে সামনে। কিন্তু এখন আর কোনো ঘটনা ঘটে না এখানে। দিনে গলিটা শান্ত ছায়ার মধ্যে পড়ে থাকে—রাত্রের ঝিলমিলি আলোয় কখনো কখনো কলেজের দেওয়ালের ওপাশ থেকে আসা ফুলের গন্ধে ভরে যায়।

অজিতও ফিরেছে এতকাল। শুধু টিউশন করে নয়—অন্য কারণেও কতদিন রাত বেশি হয়ে গেছে, আর এই গলিতে পা দিয়েই খুশি হয়ে উঠেছে তার মন। আঃ এতক্ষণের ভিড়, এত বিশ্রী প্রগলভ আলো থেকে হঠাৎ যেন চোখের ছুটি, মনের ছুটি। মানুষ আর আলোর মরুভূমিতে ছায়া আর নির্জনতার মরূদ্যান। কোনো কোনোদিন পামের পাতা থেকে এসেছে অদ্ভুত মর্মর—মনে পড়েছে দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রতীরে তালবনের ঝঙ্কার। 'রাত-কী রাণী' এক ঝলক গন্ধ উপহার দিয়েছে—মনে পড়েছে জোৎস্না রাতে টাঙ্গায় চড়ে তাজমহলে যেতে যেতে এমনি গন্ধ পেয়েছে বাতাসে।

কিন্তু এখন থেকে অন্যরকম।

দেড়মাস আগে সুমিত্রার বিয়ে হয়ে গেছে এক এনজিনিয়ারের সঙ্গে। তীরের মতো এসে বিঁধেছিল খবরটা। না—সুমিত্রার দোষ নেই। একে তো ছেলেমানুষ—সবে সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রী। অজিতের জন্যে সে সারাজীবন অপেক্ষা করে থাকবে এ প্রতিশ্রুতি দেওয়া তার পক্ষে যেমন অবাস্তব—সেটা পালন করা আরো অসম্ভব। আর একটি সতেরো বছরের মেয়ে। নিজের মনকেই বা কতটুকু সে জানে?

অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হয়েছে দুদিন, মনে হয়েছে বুকের ভেতর থেকে হৃৎপিণ্ডটাকে টেনে উপড়ে নিয়েছে কেউ। কিন্তু সুমিত্রার ওপর অজিত রাগ করতে পারেনি। সামান্য কেরাণী তার বাবা। চার-চারটি মেয়ে—বড়টির বিয়ে দিয়েই ঘাড় গুঁজরে পড়েছিলেন। মেজো মেয়ে সুমিত্রার কপাল ভালো—মার রূপ আর বাবার লম্বাটে ছাঁদ পেয়েছিল বলে বিনা পণে এক এনজিনিয়ার ওকে তুলে নিয়ে গেলেন। রূপকথার নায়ক এসে উদ্ধার করল রাজকন্যাকে। সেখানে কী করে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াবে অজিত? নিতান্ত সাধারণ চেহারার শ্যামবর্ণ একটি মানুষ—থার্ড ক্লাশ এম-এ, স্কুল মাস্টার একজন?

সহজ করে নিতে চেয়েছে। তিনদিনের দাড়ি রেখে, দুদিন না খেয়ে, দুঃখ বিলাস করেনি। সময়ই বা কোথায়? টিউশন আছে স্কুল আছে, টার্মিনাল পরীক্ষার খাতা আছে। কোনো কাজে ত্রুটি হয়নি অজিতের—তার স্বভাব-গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে কেউ জিজ্ঞেস করেনি, 'ও মশাই হল-কী আপনার?' কেবল এক একদিন রাত্রে ঘুম

আসেনি, কেবল মেসের ঘরের দেওয়ালের সোঁদা গন্ধটা অসহ্য ঠেকেছে এক-এক সময়, কেবল কখনো কখনো এক আধটি সুশ্রী দীর্ঘছন্দা মেয়েকে পথে-ঘাটে দেখে চমকে উঠেছে চিন্তাটাঃ সুমিত্রা নয়-তো?

আর ভুলে গেছে এই গলিটাকে। অভ্যাসের বশেই শর্টকাট করেছে পথটা দিয়ে। অন্য যে কোনো পথের সঙ্গে এর আর তফাৎ নেই এখন। সেই পামের পাতায় দক্ষিণী বেলার তালমর্মর নেই—'রাত-কী রাণীর' গন্ধে আর তাজের চূড়ো জ্যোৎস্নার মেঘের মতো ভেসে ওঠেনি, আর ছায়া জড়ানো আলোর কণাগুলোকে মনে হয়নি সুমিত্রাদের বাড়ীর সামনের বকুল গাছটার এক-মুঠো ঝরা ফুলের মতো। যে-কোনো একটা পথ দিয়ে মেসে ফিরতে হবে, তাই এই গলি দিয়ে চলা। এ ছুতোরপাড়ার গলি হলেও কিছু আসে যায় না—নুরমহম্মদ লেন হলেও তার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।

তারপর এই ভদ্রলোক গল্পটা বললেন। বললেন, রাস্তার মোড়ে পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। জর্দা খেয়ে খানিকটা পিক ফেললেন সিগারেট ধরালেন, ধীরে সুস্থে হেঁটে গেলেন বাগবাজারের সি বাস-ষ্টপের দিকে। আজ ছুটির দিন—দক্ষিণেশ্বরে কোথায় মাছ ধরতে যাবেন।

পাকা আর্টিষ্টের মতো ইমপার্সোন্যাল। অনেকের কাছে বারবার বলে নিপুণ নিখুঁত বিবরণ। এমনকি, খুন হয়ে যাওয়া মানুষটার ছড়ানো ডান হাতে তামার আংটির ঝিকিমিকি পর্যন্ত।

না—এই ভদ্রলোকের ওপর রাগ করা চলে না। সেই রায়টের সময়! এক যুগেরও বেশি। এখন তো সবই স্মৃতির ওপর রঙ-চড়ানো—এখন তো সব কিছুই গল্প হয়ে যাওয়া। পনেরো বছর আগে এ্যাসিষ্ট্যান্ট হেডমাষ্টার বরদাবাবুর বড় ছেলে বাসের তলায় চাপা পড়ে মারা গিয়েছিল—সেদিনও তো টিফিনের সময় চা খেতে খেতে তার খুঁটিনাটি বিবরণ দিচ্ছিলেন বরদাবাবু। শুনতে শুনতে বরং অজিতের মনে হয়েছিল এক ধরণের আত্মপ্রসাদই পাচ্ছেন তিনি। সকলের ছেলেরই বাস চাপা পড়ে মরবার সুযোগ ঘটে না—বরদাবাবু হয়তো একটা বিশিষ্টতার গৌরবই অনুভব করছিলেন।

এ ভদ্রলোকের দোষ নেই। বরং তাঁর বাচন-কৌশল প্রশংসা করবার মতো। সেই কতদিন আগেকার একটা খুনের ঘটনাকে চোখের সামনে একেবারে জীবন্ত করে তুললেন। অজিত বেশি কথা বলতে পারে না—যা বলে তা-ও গুছিয়ে আসে না জিবের ডগায়। তাই বাকপটু মানুষদের সম্পর্কে সশ্রদ্ধ ঈর্ষা আছে তার মনে।

কিন্তু এই গলির পথটাই দুর্গম হয়ে উঠল আপাততঃ।

রাত্রে টিউশন থেকে ফিরে এই তার শর্ট-কাট। অথচ—

অথচ পা দিলেই সমস্ত স্নায়ুগুলো কুঁকড়ে আসে। আগের মতো এখনো মানুষের ভিড় আর কলকাতার অসহ্য অজস্র আলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সে। কিন্তু এ আর ছায়া-গন্ধের বৃন্দাবন নয়: আর সমুদ্র তীর নয়—তাজের প্রকাণ্ড গম্বুজটা আর জ্যোৎস্নার মেঘ হয়ে আকাশে পাখা মেলে দেয় না। অজিতের মনে হয়—মনে হয় একটা অদ্ভুত অনাত্মীয় জগতে পা দিয়েছে। বিলিতী বইতে পড়েছে মধ্য এশিয়ার এমন সব শহরের কথা, যেখানে এখনো ক্যারাভানে অনন্ত মরুভূমি পাড়ি দিয়ে গিয়ে পৌঁছুতে হয়; যেখানে সন্ধ্যার উত্তপ্ত অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে পুরু কম্বলের মতো—যেখানকার আঁকা বাঁকা রহস্যময় গলির আনাচ-কানাচ থেকে যে-কোনো সময় ছুরি ঝলকায়—রাইফেলের আগুন চমকে ওঠে।

সেই আশ্চর্য অচেনা দেশের অজানা ভয় এসে এক মুহূর্তে মস্তিষ্কের কোষে কোষে জমাট বাঁধে। ছুটে পালাতে চায় অজিত—পারে না; যেন এই ভয়টাকে আস্বাদন করবার জন্যেই সে আরো ধীরে ধীরে পা ফেলে হাঁটে। যত খারাপ লাগে, তত নেশা ধরে। অজিত শুনেছিল, সব নেশা পার হয়ে গেলে নাকি গোখরো সাপের ছোবল নেয় মানুষ। এই গলিটাও এখন একটা সাপ হয়ে তাকে ছোবল মারে আর তার বিষাক্ত উত্তেজনায় শরীর-মন আচ্ছন্ন হয়ে যায় অজিতের।

এই নেশার টানেই যত ভয় ধরে—তত ধীরে ধীরে হাঁটে এই গলি দিয়ে। এ পথ ছাড়াও তার দুটো যাবার রাস্তা আছে, অথচ এর মায়া সে কিছুতে কাটাতে পারে না। অজিত জানে, এ মৃত্যু। এ নেশাখোরের আত্মহত্যা। একটু একটু করে— দিনের পর দিন।

এক পা এক পা করে এগোয়—এক-একটা করে চমক লাগে। স্পষ্ট দেখে, আইভির ঝাড়টা বাঁ দিকের প্রাচীরটার তলায় যেখানে খানিক ছায়া জমিয়ে রেখেছে—সেখানে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়ে, নিঃশ্বাস বন্ধ করে, কে প্রতীক্ষা করছে যেন। তার একটা হাত লুকোনো আছে জামার তলায়, আর সেই হাতের শক্ত মুঠোয় কী যে ধরা আছে, তা-ও অজিতের অজানা নয়। চলতে চলতে অজিত চোখ বোজে—নিজের নিয়তির জন্যে অপেক্ষা করে। পায়ের পাতা থেকে একটা হিম ধীরে ধীরে উঠে আসতে থাকে হৃৎপিণ্ডের দিকে।

অথচ কিছুই না—এ-সব একেবারেই মতি-ভ্রম। সেই রায়ট এখন কত দূরে অতীতের কথা—নিতান্তই গল্প বানাবার উপকরণ। এক পেয়ালা চায়ে চুমুক দিয়ে কিম্বা পানের বোঁটায় ভিজে চূণ ছুঁইয়ে বলবার মতো গল্প। আজ চৌদ্দ বছর ধরে এই গলিটা উত্তর কলকাতার দিনে-রাতে ভিড়ের মধ্যেও তার ছায়া, শান্তি, স্যাঁতলার ছোপ, পামের মর্মর আর হাসনুহানার গন্ধ নিয়ে অবিশ্বাস্য নির্জনতায় এলিয়ে আছে। কোনো স্মরণযোগ্য ঘটনা এখানে আর ঘটেনি, হয়তো কোনোদিনই ঘটবে না।

তবু কী অদ্ভুত—কী অর্থহীন ভয়!

রাত্রে এই গলিটা সাপ হয়ে যায়। যেখানটায় বাঁক নিয়েছে—সেখানে স্পষ্ট অনুভব করে অজিত : আবছা অন্ধকারটা আস্তে আস্তে প্রকাণ্ড একটা পাতার মতো পরিষ্কার রূপ নিচ্ছে; পাতা নয়—ফণা। আর তার ওপরে দুটো অদ্ভুত ছোট আর আশ্চর্য কুটিল চোখ জ্বল-জ্বল করছে। অথচ অজিত জানে—ওটা নিতান্তই দেওয়ালের কোলে একটুখানি ছায়া—ওই চোখ দুটি পাশের মিশনারী কলেজের বাগান থেকে উড়ে আসা জোনাকি ছাড়া আর কিছুই নয়।

বর্ষার এক টুকরো জমাট জলকে আচমকা মনে হয়, রক্ত। মনে হয়, ঠিক পায়ের সামনেই কে উবুড় হয়ে পড়ে আছে—তার ছড়িয়ে দেওয়া হাতের আঙুলে চিকচিক করছে তামার আংটি।

সুমিত্রার বিয়ের পরে কিছুই করেনি অজিত। দাড়ি কামিয়েছে, দুবেলা খেয়েছে, নিয়মিত যাতায়াত করেছে স্কুলে, টিউশনি করেছে, টার্মিনাল পরীক্ষার খাতা দেখেছে। কিন্তু এতদিনে সেই অঘটনের আরম্ভ হয়ে গেল।

ক্লাসে পড়াতে পড়াতে এক সময় নিজেই থমকে গেল সে। ক্লাসশুদ্ধ ছেলে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে। অষ্টম শ্রেণীতে ইংরেজি পড়াচ্ছিল—এবার নিজের কণ্ঠস্বর কানে গেল তার। অজিত শুনল, সে আউড়ে চলেছে :

"The time has been,
That when the brains were out,
The man would die,
And there an end; but now they
rise again,
With twenty mortal murders on
their crowns—"

অজিত স্তব্ধ হয়ে গেল। ম্যাক্‌বেথ! ক্লাসে সে পড়াচ্ছিল অ্যানালিসিস—কোথা থেকে উঠে এল এই প্রেতাত্মা—রক্তমাখা বীভৎস রূপ নিয়ে এসে দাঁড়ালো তার সামনে!

একটু চুপ করে থেকে টেবিল থেকে বইটা তুলে নিলে সে। বললে, আজ আর পড়াব না—এই পর্যন্তই থাক।

স্টাফ রুমে এসে কুঁজো থেকে মস্ত এক গ্লাস বাসি জল গড়িয়ে খেলো, গুর গুর করে উঠল পেটের ভেতর। মাথায় আর চোখে দিলে জলের ছাট। তারপর দু হাতে মুখ গুঁজে বসে রইল চুপ-চাপ।

অঙ্কের মাষ্টার সত্যবাবু শব্দ করে খাড়ি আর ডাস্টার ছুঁড়ে ফেললেন। দুটো আরক্ত চোখ মেলে অজিত তাকালো।

—কী হয়েছে অজিতবাবু?—হাত ঝাড়তে ঝাড়তে সত্যবাবু জানতে চাইলেন।

—শরীরটা ভালো লাগছে না।

—তাই তো মনে হচ্ছে দেখে। যান যান, ছুটি নিয়ে চলে যান। খুব ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে মশাই, দিনকাল ভালো নয়।

—হ্যাঁ, তাই যাচ্ছি।

দুর্বল পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে অজিত রওনা হল হেড মাস্টারের ঘরের দিকে।

অসময়েই মেসে ফিরে এল সে। মেস খালি, চাকুরেরা বেরিয়ে গেছে সবাই—ফিরতে সেই পাঁচটা। ভাদ্রের লাগচে রোদের ওপর ছাড়া-ছাড়া মেঘের আসা-যাওয়া। ভাপসা গরম একটা। ঘরের একমাত্র পশ্চিমমুখো জানলাটি দিয়ে এক বিন্দুও বাতাস আসছে না। দেওয়ালের সোঁদা গন্ধটা বুকের ওপর চেপে বসছে।

পাখা নেই। এ ঘরের তিনটি মানুষ পাখা রাখবার বিলাসিতার কথা ভাবতে পারে না। অজিত হাত-পাখাটা তুলে নিলে। কবে একটা ছারপোকা মারা হয়েছিল পাখার ওপর—টানা রক্তের দাগ শুকিয়ে আছে। তার নিজের রক্ত।

পাখাটা ছুঁড়ে ফেলে, অজিত দু হাতে নিজের মাথায় ঝাঁকুনি দিলে কয়েকবার। বুঝতে পারছে। ওই গলি শুধু এখন আর তার রাত্রি-সহচর নয়, দিনেও অনুসরণ করছে তাকে। এর হাত থেকে তার মুক্তি আর নিস্তার নেই। এভাবে চললে সে পাগল হয়ে যাবে। চৌদ্দ বছর

আগেকার গল্প-হয়ে-যাওয়া একটা খুন পাগল করে দেবে তাকে।

অজিত দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো হাত-আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়ালো। এতদিন নিজের মুখখানাকে সে কি দেখেনি? গালে কপালে চামড়ার কোঁচকানো রেখা পড়েছে, চোখের কোণে কোণে কালি। দৃষ্টির ওপর কুয়াশার মতো খানিকটা স্তম্ভিত ভয় অল্প অল্প কাঁপছে। এ কী হল অজিতের—এ সে চলেছে কোথায়?

কলকাতায় যতদিন থাকবে—ওই গলির হাত থেকে পরিত্রাণ নেই তার। রাত্রে ফিরে আসবার জন্যে তার আরো দুটো পথ আছে—ওই গলিটা দিয়ে এলে তার যে দেড়-দুই মিনিটের বেশি সময় বাঁচে তা-ও নয়। তবু ওই পথেই সে আসবে—ওই অসহ্য ভয়টাকে আস্বাদন করবে—আর বুঝতে পারবে চরম নেশাখোরের মতো দিনে দিনে আত্মহত্যা করছে সে। পাগল হয়ে যাচ্ছে।

একবার ডাক্তার দেখালে কেমন হয়? কোনো সাইকো অ্যানালিস্টকে?

নাঃ, সে সাহসও নেই। ওরা ঝোপে ঝোপে বাঘ দেখে। মনের আড়াল থেকে কী বস্তু যে টেনে বের করে আনবে তা ধারণারও বাইরে। তারপরে শান্ত গলায় হয়তো বলতে থাকবে: আসলে আপনার কোনো শত্রুকে আপনি হত্যা করতে চান। গলিটায় পা দিলেই আপনার মনে হয়, এটাই হল খুন করবার পক্ষে আদর্শ জায়গা। তাই সংগে সংগে দেখতে পান—

অজিতের সাহস নেই। যে ভয়টা চেতনার ওপরে ভাসছে, সে আতঙ্কই তার পক্ষে যথেষ্ট; অন্ধকারকে নাড়া দিয়ে তুলে তার মধ্যে থেকে সে আর বিভীষিকার দৈত্যকে জাগাতে চায় না।

সে পাগল হয়ে যাবে। এ-ই তার পরিণাম। চৌদ্দ বছর আগেকার একটা খুন তিলে তিলে তাকে শুষে নিচ্ছে, কুরে কুরে খাচ্ছে তার মস্তিষ্ক। হয়তো কলকাতা ছেড়ে পালালে তার আশা আছে এখনো। আছে কি?

সারা দুপুর, বাইরে লালচে রোদের ওপর দিয়ে মেঘের পর মেঘ ভেসে গেলে ছারপোকার রক্ত আঁকা রক্তের দাগটা দেখে দেখে, ভাপ্‌সা গরমে সেদ্ধ হয়ে হয়ে—যন্ত্রণাভরা অবসাদে অজিত তলিয়ে রইল। তারপর ঘরের বাকী দুজন ফিরে এলে উঠে বসল তক্তাপোষের ওপর। তখন মুখের ভেতরে তেতো—জিভ আঠা আঠা।

—জ্বর হয়েছে নাকি অজিতবাবু?

—না, বড় মাথা ধরেছে।

—মাথা ধরার দোষ নেই—যা গুমোট গরম। তবু একটু হাওয়া দিয়েছে এতক্ষণে। যান না—বেড়িয়ে আসুন বাইরে।

—হুঁ, বেরুতেই হবে।—মুখের তিক্ততাকে আস্বাদ করতে করতে নীরস গলায় অজিত বললে, তা ছাড়া টিউশন আছে। আর—

বলতে যাচ্ছিল, 'গলিটাও আছে।' বলল না—জামা গলিয়ে, চটি টেনে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

আজ টিউশন নয়। একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে। এইভাবে নিজেকে কিছুতেই ভাগ্যের হাতে সঁপে দেওয়া চলবে না। এতদিন অজিত ভুলে গিয়েছিল চাকরী, টিউশন আর নের ভার ছাড়া সংসারে আরো কিছু আছে। ছ' মাসের মধ্যে সে সিনেমা দেখেনি—আজকে যা হোক কিছু একটা ছবি দেখে আসবে।

আলোতে খুশি হওয়া চৌরঙ্গী। ঝলমল্‌ মেট্রো সিনেমা। ট্রাম-বাস-মোটর-মানুষের পা—সব কিছুতে ভালো লাগার ছন্দ। কে যেন ব্যাঞ্জো বাজাচ্ছে। বিক্রী হচ্ছে বেলফুলের মালা।

কিছুক্ষণের জন্যে সহজ হল মনটা। একটা টিকেট কিনে ঢুকে পড়ল 'টাইগারেই'।

রক্‌-এন্‌-রোল দিয়ে শুরু—শেষ হল সস্তা নাচ-গানে ভরা প্রেমের গল্পে। কিন্তু হল থেকে বেরুবার আগেই টের পাচ্ছিল, ওই গলিটার বিষক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেছে তার মধ্যে। এই আলো—এই চৌরঙ্গী তার কাছে মরীচিকা। যা তার সত্য—তার পরিণাম—তা নিষ্ঠুরভাবে নাড়ী ধরে টান দিয়েছে।

চেনা জায়গায় এসে নামল বাস থেকে, অভ্যস্ত পথ ধরে এগিয়ে এল। তারপর—

সেই দেওয়ালের গায়ে গা মিলিয়ে, সেই আইভিলতার ছায়াপুঞ্জের তলায় কে দাঁড়িয়ে: জামার তলায় হাত মুঠো করে ধরে, রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছে। অজিত চোখ বুজে পার হতে গিয়েও পারল না। বুকের ওপর পরিষ্কার টের পেলো ছোরার আঁচড়—একটা অব্যক্ত আওয়াজ তুলে পড়ে গেল রাস্তায়।

কতক্ষণ? দু মিনিট? তিন মিনিট? পাঁচ মিনিট? মাটিতে দু হাতের ভর দিয়ে উঠে বসল, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল দুর্বল পায়ে। ছোরার আঁচড় নয়। একটা চামচিকে উড়ছে ঘুরে ঘুরে—সেইটেই হয়তো এসে পড়েছিল গায়ের ওপর। টলতে টলতে এগিয়ে চলল অজিত। মনে হল, সে খুন হয়ে গেছে—ছিটের শার্ট পরা তার শরীরটা এখন পড়ে আছে পথের ওপর। আর আড়ষ্ট পায়ে যে চলেছে সে তার আত্মা—ওই দেহটা থেকে বেরিয়ে এসেছে।

মন স্থির হয়ে গেছে। স্কুল থেকে ছুটি নেবে মাসখানেকের জন্যে। চলে যাবে কলকাতার বাইরে—যেখানে হোক। এই গলিটার আকর্ষণ থেকে পালাতে চেষ্টা করবে প্রাণপণে। এর মধ্যেই সে পাগল হতে শুরু করেছে, আর একটুও দেরী করা চলবে না তার।

বাগবাজারের টিউশনটার জন্যে একটু মায়া হচ্ছে। মেয়েটা লেখাপড়ায় ভালো। যদি অত চঞ্চল না হত, যদি গানের দিকে অত ঝোঁক না থাকত, তা হলে বেশ উঁচু প্লেশ পেত ইন্টার-মিডিয়েটে। কিন্তু অত ছটফটে মেয়ের কিছু হয় না। বাপ-মা নেই—বড় ভাইয়েরা আদর দিয়ে দিয়ে ছোট বোনটার মাথা খেয়েছে।

এই মেয়েটার জন্যে তার খাটতে ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আর উপায় নেই। অন্ধকারের ওই সাপটার নাগপাশ থেকে এখন তার মুক্তি চাই। এমন করে, নিজের মৃতদেহকে পথের ওপর ফেলে রেখে সে আর চলতে পারে না।

পড়বার ঘরে আলো জ্বলছে। গালে হাত দিয়ে বসে আছে তার ছাত্রী মল্লিকা। আস্তে আস্তে ঘরে পা দিলে অজিত, দুটো আশ্চর্য ভারী আর ভিজে চোখ তুলে মল্লিকা তাকালো।

—দুদিন কেন আসেন নি মাস্টার মশাই?

—শরীর ভালো ছিল না।

চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল অজিত। কেমন নতুন রকমের দেখাচ্ছে মল্লিকাকে। ভিজে আর শান্ত চোখ মেলে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। বলতে যাচ্ছিল, কাল থেকে আমি আর আসব না—কিন্তু এই মুহূর্তে কথাটা কিছুতেই বলা গেল না।

—আপনি খুব রোগা হয়ে গেছেন।

ক্লান্ত হাসি হাসল অজিত।

ও কিছু না। বই বার করো।

কিন্তু বই বের করল না মল্লিকা। চোখ নামিয়ে বলে, জানেন, পরশু আমার জন্মদিন ছিল।

ভুলে গিয়েছিল অজিত। এই দুদিন ধরে তার দেহ—তার আত্মা ওই গলির মধ্যে মূর্ছিত হয়ে পড়ে ছিল। আস্তে আস্তে বললে, শরীর ভালো ছিল না।

—কেন এত শরীর খারাপ হয় আপনার?—মল্লিকার চোখে জল এল: জানেন, পরশু রাত এগারটা পর্যন্ত আমি আপনার জন্যে আশা করে বসে ছিলুম? আপনি এলেন না—আমার একটুও ভালো লাগে নি, একটুও না।

চেয়ার থেকে উঠে, হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মল্লিকা।

আর একটা নতুন আঘাতে, একটা বিদ্যুতের চমকে জেগে উঠল অজিত। সুমিত্রা! আবার সুমিত্রার চোখ—আবার সুমিত্রার গলার স্বর। এই ছ' মাসের মধ্যে কিছুই টের পায়নি সে—তখন আগের সুমিত্রা তার চোখ মন সব আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল। তারপর এই দেড় মাস—

মল্লিকা ফিরে এল—হয়তো মুছে এল চোখের জল। মাথা নিচু করে বসে পড়ল আবার।

গলাটা একবার পরিষ্কার করে নিল অজিত।

—পড়বে না আজ?

—না।

—কেন?

এবার দুটো চোখ তুলে মল্লিকা সম্পূর্ণ ভাবে তাকালো অজিতের দিকে। সেই চঞ্চল গান-পাগলা মেয়েটা আর নেই। এ আর একজন ভুরু কুঁচকে বললে, পড়ব না—আমার খুশি। আপনার কেন শরীর খারাপ হয় এত?

না—আজ আর আইভির ছায়ায়, দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে নেই কেউ। গলিটা হাল্কা জ্যোৎস্নায় ঘুমুচ্ছে। টুকরো টুকরো আলো পড়েছে একরাশ বকুলের মতো। পায়ের পাতায় আবার সমুদ্র-মর্মর; তাজের পথে সেই 'রাত কী-রাণীর' গন্ধ।

অজিত বুঝেছে। এত দিন ওখানে ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে যে অপেক্ষা করত, সে সুমিত্রা। আবার নতুন করে শান্তি, বকুল, সমুদ্র আর হাসনুহানাকে মল্লিকা ফিরিয়ে আনল। চৌদ্দ বছর আগেকার খুনের রক্ত অনেক নবজাতকের পায়ে পায়ে মুছে গেছে অনেক দিন আগে।

চলতে চলতে মনে হল, হয়তো মল্লিকা এক দিন সুমিত্রার মতোই দূরে সরে যাবে। যদি তা-ও হয়, তবু আর ভয় পাবে না অজিত। বুঝেছে, ফাঁকা গলির ক্ষণিক দুঃস্বপ্নের চেয়ে অনেক বেশি সত্য ওই জ্যোৎস্নার বকুল—ও পায়ের পাতার গান।

চিরকালের গান॥

নির্বাণ

সম্বুদ্ধ

পাটলিপুত্রের রাজপথ। জনাকীর্ণ, কোলাহলমুখর। প্রশস্ত বর্ত্মের একপার্শ্বে, জনস্রোতের বাহিরে দাঁড়াইয়া জনৈক বিদেশীয় পর্যটক বিস্মিতনেত্রে নগরীর শ্রী অবলোকন করিতেছিলেন।

পর্যটকের শিরমুণ্ডিত, পরিধান গৈরিক চীবর। বুদ্ধি-দীপ্ত মুখশ্রী সুগঠিত দেহ। ইঁহার নাম ফা-হিয়ান।

ভারতে সদ্য পদার্পণ করিয়াছেন, চতুর্দিকে ঐশ্বর্য ও কর্মকোলাহলের বিচিত্র রূপ সন্দর্শন করিতে করিতে ফা-হিয়ান্ মন্থরপদে অন্যমনস্কভাবে পথ চলিতেছিলেন; বিশেষ লক্ষণীয় কোন বস্তু দৃষ্টিগোচর হইলে ক্ষণেক থামিয়া তাহাকে দেখিয়া লইতেছিলেন।

সম্মুখে, পথের অপর পার্শ্বে, একটি বৃহৎ ভবন। ভবন না বলিয়া তাহাকে প্রাসাদই বলিতে হয়। প্রাসাদের বহু দ্বার, প্রতি দ্বারে মুহূর্তে মুহূর্তে অগণিত মানব প্রবিষ্ট ও নির্গত হইতেছে; দ্বারে দ্বারে ভীমকায় সশস্ত্র প্রহরী। বহুদূরে বিস্তৃত, বহু-তল অত্যুচ্চ প্রস্তর-হর্ম্য এত দীর্ঘ যে তাহার ক্রমসজ্জিত বাতায়নবীথি একযোগে সম্যক দৃষ্টিগোচর হয় না। এতবড় প্রাসাদ, এ কাহার? একজন মানুষের কি এতখানি প্রয়োজন হয়? তাহার কতবড় পরিবার, কত পরিজন?

ফা-হিয়ান বাতায়নগুলি গণিতে লাগিলেন। উদ্দেশ্য, তাহা হইতে অনুমান করিবেন হর্ম্যের এক একটি তলে এক সারিতে কতগুলি কক্ষ আছে। গণিলেন, কিছুদূরে গিয়া চক্ষু বিভ্রান্ত হইল, গণনা ভুল হইল, আবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ কয়েকবার ঘটিল। বিরক্ত হইয়া গণনার প্রতি অধিকতর মনঃসংযোগ করিলেন। অর্ধাবধি গণা হইয়াছে এমন সময় আবার বাধা ঘটিল। ঊর্ধ্বমুখে গণিতেছিলেন, একব্যক্তি দ্রুতপদে চলিতে চলিতে অকস্মাৎ তাঁহার গায়ের উপর আসিয়া পড়িল।

পথিকের বেশ সামান্য, কিন্তু উজ্জ্বল-কান্তি। ফা-হিয়ান্ ফিরিয়া তাকাইতেই সে ব্যক্তি সবিনয়ে কহিল, ভদ্র, ক্ষন্তব্যম্ অনবধানম্।

ফা-হিয়ান কথাটা ঠিক বুঝিলেন না। কিন্তু বুঝিলেন ইনি ব্রাহ্মণ। ভাবিলেন, ভালই হইল, ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করি। প্রতি-নমস্কার করিয়া কহিলেন, ভদ্র, আপনাকে একটি প্রশ্ন করিতে চাহি, অনুগ্রহ করিয়া উত্তর দিলে দাস কৃতার্থ হইবে।

ব্রাহ্মণ উত্তর করিল না, একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

ফা-হিয়ানের কথা সে বুঝে নাই। ফা-হিয়ান বৌদ্ধ-শাস্ত্র পড়িয়াছেন, তাহার ভাষা পালি। ব্রাহ্মণ জাতি বৌদ্ধ-দ্বেষী, তাহাদের ভাষা সংস্কৃত। তাহাতে ফা-হিয়ান যেটুকু পালি শিখিয়াছিলেন তাহাও পুঁথিগত অর্থে ও উচ্চারণে। সে বিদ্যায় পুঁথি পড়া চলে, বাক্যালাপ চলে না। কারণ ভারতীয় ভাষায় লেখ্যে ও কথ্যে অনেক প্রভেদ।

ফা-হিয়ান এত কথা জানিতেন না। তিনি বুঝিলেন তিনি বিদেশীয়, তাঁহার মুখে এমন নির্ভুল ভাষা শুনিয়া এ ব্যক্তি চমৎকৃত হইয়াছে। উৎসাহিত হইয়া কহিলেন, এই হর্ম্যটিকে দেখিতেছিলাম। ইহাকে কোন রাজপ্রাসাদ, সেনানিবাস বা ধর্মাধিকরণ বলিয়া মনে হইতেছে না; অথচ একজন মাত্র ব্যক্তির নিজস্ব ভবন এরূপ মহা-বিস্তার হওয়াও সহজ কথা নহে। তথাপি, ভগবান তথাগতের উপদেশ, পার্থিব সম্পদে শান্তি নাই। তবে এ কোন্ মূঢ়, এই অকিঞ্চিৎকর ঐশ্বর্যে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে? জানিতে পারিলে প্রভু তথাগতের শিক্ষা ও উপদেশ ইঁহার গোচর করিতে চেষ্টা করিতে পারিতাম। ভদ্র, অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি, এই হর্ম্য কাহার, তিনি কি করেন, কোন কর্ম বা ভাগ্যের বলে তিনি এই বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াছেন?

ফা-হিয়ান যতক্ষণ কথা বলিতেছিলেন, ব্রাহ্মণ ততক্ষণ একদৃষ্টে তাঁহার দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিল। চন্দ্রাকৃতি মুখমণ্ডল, খর্ব নাসা, তির্যক্ চক্ষু। চীনদেশের নাম সে জানিত না; ক্ষুদ্র চক্ষু ও খর্ব নাসা দেখিয়া তাহার প্রতীতি হইল, এ ব্যক্তি হূণ।

হূণ ভারতের বৈরী তাহার সহিত বাক্যালাপ সঙ্গত নহে। হয়ত এ গুপ্তচর, কোন্ কথা হইতে কি বুঝিয়া লইবে বলা কঠিন। একে হূণ, তাহাতে আবার বৌদ্ধের পরিচ্ছদ। নিশ্চয় এ ইহার ছদ্মবেশ।

ফা-হিয়ানের কথা সে মন দিয়া শুনে নাই। শুনিলেও কিছুই বুঝিতে পারিত না। সে ভাষার গঠন চৈনিক, শব্দ পালি, উচ্চারণ কোন ভাষারই মত নহে। তদুপরি, এ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বলিয়া ইঁহার বোধ-সৌকর্যার্থে ফা-হিয়ান যথাসাধ্য সংস্কৃত বাক্য যোজনা করিয়াছেন, তাহাতে ভাষা অধিকতর ভয়াবহ হইয়াছে। উত্তরকালে গৌড়ীয় নাগরিকগণ এইরূপে মিশ্র-বিন্যাসে পাশ্চাত্য ভাষা বলিতেন।

উত্তর না পাইয়া ফা-হিয়ান পুনরপি কহিলেন, বলুন ভদ্র, এই হর্ম্যাধিকারীর কি নাম?

ব্রাহ্মণ চঞ্চল হইল। কহিল, বাক তে নোপলভাতে। বলিয়াই দ্রুতপদে স্থানত্যাগ করিল।

ফা-হিয়ান হৃষ্ট হইলেন। নামটা অন্ততঃ জানা গেল। এখন সন্ধান লইতে হইবে, এই নোপলভাতে মহাশয়ের সমীপস্থ কিরূপে হওয়া যায়। অজ্ঞানকে জ্ঞানলোকে, বিষয়াসক্ত অন্ধকে সংঘে আনয়ন করাই স্বধর্ম।

ভাবিতে ভাবিতে ফা-হিয়ান পুনরায় জনস্রোতে গতি মিলাইলেন। 'নোপলভাতে' নামটিকে বারংবার আবৃত্তি করিয়া কণ্ঠস্থ করিয়া লইলেন।

ফা-হিয়ান জানিতেন না, ব্রাহ্মণ তাঁহাকে হর্ম্যাধিকারীর নাম বলে নাই। তাঁহার প্রশ্নই সে বুঝিতে পারে নাই, এবং সেই কথাটাই বলিয়াছে। 'তোমার কথার অর্থ বুঝিলাম না।'

চলার কোন লক্ষ্য ছিল না। নগরে তিনি নবাগত, যথাসম্ভব ইহাকে দেখিয়া লওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য। চলিতে চলিতে অপরাহ্নকালে তিনি অকস্মাৎ নদীতটে উপস্থিত হইলেন।

নগর দেখিয়া ফা-হিয়ান বিস্মিত হইয়াছিলেন, নদীর ঘাট দেখিয়া বাক্যাহত হইলেন। যতদূর দৃষ্টি যায়, অজস্র অসংখ্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তরণী প্রতিমুহূর্তে তীরে আসিয়া লাগিতেছে, তীর হইতে ছাড়িয়া যাইতেছে। কেহ মনুষ্য ও দ্রব্যভার উদ্গীরণ করিতেছে কেহ উদরস্থ করিতেছে। বহুবিধ তরী, বহুবিধ পণ্য, বহুবিধ মনুষ্য। তরীর আকৃতি ও পণ্যের প্রকৃতি দেখিয়া বুঝা যায় উহারা এক দেশের নহে, বহু বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত; মনুষ্য

দিগের আকৃতি পরিচ্ছদ ও ভাষা হইতে বুঝা যায় ইহারাও বহু দিগ্‌দেশাগত। সমগ্র পৃথিবীর এক এক ক্ষুদ্রাংশ কি এই পাটলিপুত্রের নদীতটে আসিয়া সমবেত হইতেছে? এত নৌকা, এত পণ্য, এত মানুষ আসে কোথা হইতে, যায় কোথায়? ভগবান তথাগত বলিয়াছেন, ঐশ্বর্যে শান্তি নাই, শান্তি নির্বাণে। তবে কেন মূঢ় মানব এই ধনরাশি লইয়া অনুক্ষণ উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছে? হায়, তথাগতের জন্মভূমিতেই তাঁহার বাণী এমন অনাদৃত!

দেখিতে দেখিতে ও ভাবিতে ভাবিতে ফা-হিয়ান নদীতীর ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। আরও কিছুদূরে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, একখানি অতি বৃহৎ পোত একটি ঘাটে আসিয়া লাগিয়াছে। পোত অতিকায়, সুদৃঢ়, সুসজ্জিত—নদীচর সামান্য পোত নহে, দূর-সমুদ্রগামী। পোত বাঁধিয়া তাহার বাহিত পণ্য-সম্ভার তীরে নামানো হইতেছে। বহুশত ভারবাহী শ্রমিক সেই কার্যে একত্র নিযুক্ত। তীরের উপরে ভাগে ভাগে স্তরে স্তরে পোতাবতীর্ণ পণ্যরাজি সাজাইয়া রাখা হইতেছে, সে পণ্য অগণিত-প্রকার, স্তূপও অগণ্য। এত নামিয়াছে, আরও নামিতেছে, আরও কত নামিবে তাহার ইয়ত্তা নাই—মনে হয় যেন সমুদ্রের বারিকেই পাত্র ভরিয়া ভরিয়া উঠানো হইতেছে। যে পণ্য নামিয়াছে তাহারই পরিমাণ মনে হয় বহু সহস্র মণ, তথাপি পোতের অতি অল্পাংশই মাত্র জলের উপরে, এইটুকু পণ্য নামিয়া তাহার কুক্ষির একটি ক্ষুদ্র কোণও এখনও শূন্য হয় নাই।

ফা-হিয়ান নিঃশ্বাস ফেলিলেন। এই পোত, এই পণ্য-সম্ভার, ইহা কাহার? রাজার পোত কি, দূরস্থিত কোন প্রদেশ হইতে রাজস্ব লইয়া ফিরিল? তাহা যদি না হয়, কোন ব্যক্তিবিশেষের যদি হয়, তবে কে সেই ভাগ্যবান? ভাগ্যবান, না ভাগ্যহত, যে এই বিপুল বিত্ত-সাগরে ডুবিয়া মোহাচ্ছন্ন হইয়া আছে, মুক্তি বা নির্বাণের আভাস মাত্র যাহার কল্পনাতে রেখাপাত করে না?

ফা-হিয়ান চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ইতস্ততঃ দণ্ডায়মান কয়েকজন নায়ক ভারবাহীদিগকে পরিচালিত করিতেছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কাহাকেও প্রভু বলিয়া মনে হইল না। তাঁহারই মত আরও বহুলোক তীরে দাঁড়াইয়া পোত ও পণ্য দেখিতেছিল। নায়কদিগকে প্রশ্ন করিবেন বলিয়া অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় তাহাদিগের প্রতি ফা-হিয়ানের দৃষ্টি পড়িল। একজনকে চিনিলেন, প্রভাতের সেই ব্রাহ্মণ।

বিদেশে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রকেই বান্ধব বলিয়া জ্ঞান হয়। ফা-হিয়ান হৃষ্টচিত্তে তাঁহার সমীপবর্তী হইলেন, সস্মিত অভিবাদন করিয়া কহিলেন, এই যে, আপনিও আসিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ কথা কহিল না।

ফা-হিয়ান কহিলেন, আসিবারই কথা। এই পণ্য-সম্ভার, ইহা রাজার ঐশ্বর্য। কত দেশের কত মানবের কত কর্ম ও উদ্যমের ফল, কত কর্মীর শ্রম, কত শিল্পীর আনন্দ, কত ভাগ্যহতের অশ্রু ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে তাহার নিরূপণ কে করিবে? অপিচ, এই রাশিকৃত ধন যাহার একটি মাত্র পোতে বাহিত হইয়াছে, তাহার সমগ্র বিত্তের পরিমাণ কত হইতে পারে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই বিত্তের সদ্ব্যবহার করিলে সে ত্রিলোকের সকল সম্পদ লাভ করিতে পারিবে। আবার ইহার মোহে যদি অভিভূত হয় তবে সে অর্ধেক পৃথিবীকে নিজের সঙ্গে টানিয়া লইয়া নিরয়গামী হইতে পারিবে। কে সে জন, সে কি এই মগধ রাজ্যের অর্ধ-অধীশ্বর? আপনার যদি জানা থাকে, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলুন। লক্ষ্মীর একান্ত বরপুত্র বা মারের একান্ত অনুচর কে সেই ব্যক্তি?

ফা-হিয়ানের আকৃতি, পরিচ্ছদ, ভাষা সমবেত জনগণের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহারা নীরবে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছিল, ক্বচিৎ বা তাঁহার বাক্যের লক্ষ্যস্থল ব্রাহ্মণের প্রতিও তির্যক দৃষ্টিপাত করিতেছিল।

ব্রাহ্মণ চঞ্চল হইল, ঈষৎ বিরক্ত স্বরে কহিল, থাকুক তে নোপলভাতে। বলিয়া দ্রুতগতিতে জনতার মধ্যে মিলাইয়া গেল।

ফা-হিয়ান তাহার ব্যস্ততা লক্ষ্য করিলেন না। তাঁহার মন অকস্মাৎ একটা বৃহৎ সংশয় হইতে মুক্ত হইয়া আশ্বস্তি লাভ করিয়াছিল। নোপলভাতে মহাশয়ের বাড়িটি দেখিয়া সংশয়ে পড়িয়াছিলেন, এত বড় বাড়ি যাহার তাহার কিদৃশ অর্থাগম, এবং সে অর্থাগমের পথই বা কি। সে সংশয়ের উত্তর পাইয়াছেন। এই বিপুল পণ্য-সম্ভার যাহার বাণিজ্যের একটি মাত্র ক্ষেপে বাহিত হয়, তাহার বিত্ত যে গগন-স্পর্শী হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি।

ফা-হিয়ানের সংকল্প দৃঢ়তর হইল। এই নোপলভাতে মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় স্থাপন করিতেই হইবে, তাহাকে সদ্ধর্মে আনয়ন করিতেই হইবে। এই বিপুল ধনরাশি আয়ত্ত হইলে সংঘের মহতী শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

সারা রাত্রি ফা-হিয়ানের নিদ্রা আসিল না, এই চিন্তাতেই রাত্রি অতিবাহিত হইল।

পরদিন প্রভাতে আবার পথে বাহির হইলেন। দেখিলেন, একটি শোভাযাত্রা। কৌতূহল হইল, পথের পার্শ্বে একটি উচ্চতর স্থানে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

দীর্ঘ শোভাযাত্রা। শবযাত্রা। কাষ্ঠের লঘু খট্টায় বস্ত্রাবৃত শব, পুষ্পে চন্দনে আচ্ছন্ন। বাহকগণের সম্মুখে ও পশ্চাতে বহুতর ব্যক্তি শবানুগামী হইয়া চলিয়াছে, কেহ বিষণ্ণ, কেহ রোদন-পরায়ণ। চলিতে চলিতেই কেহ হরিধ্বনি করিতেছে, নিকটবর্তীরা কণ্ঠ মিলাইতেছে। স্থানে স্থানে কয়েকজন একত্রে হরিনাম সংকীর্তন করিতেছে। কেহ বা মুষ্টি পরিপূর্ণ করিয়া লাজ, গোধূম, কপর্দক ও তাম্রমুদ্রা বিকীর্ণ করিতেছেন; শোভাযাত্রার অনুগামী ভিক্ষুকেরা তাহা কাড়াকাড়ি করিয়া কুড়াইয়া লইতেছে। শোভাযাত্রার অগ্রভাগে ও পশ্চাতে বাদ্যভাণ্ড সহকারে হরিনাম হইতেছে। পশ্চাতে ভিক্ষুক কর্মহীন দর্শক ও বালকের সারি শোভাযাত্রারই সমান দীর্ঘ। পথের উভয় পার্শ্বে পথচারীরা দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। পথের আশে পাশে গৃহের দ্বারে ও বাতায়নে নারী ও শিশুর উৎসুক মুখ, ক্বচিৎ দ্বিতলের বাতায়ন ও গৃহশীর্ষ হইতে লাজমুষ্টি ও পুষ্পমুষ্টি নিক্ষিপ্ত হইতেছে।

ফা-হিয়ান চমৎকৃত হইলেন। মৃত্যু সকলেরই ধ্রুব, কিন্তু যাহার মৃত্যুতে একটি বিস্তীর্ণ নগরীর মহতী জনতা এইরূপ বিচলিত ও বিহ্বল, তাহারই মৃত্যু সার্থক, জন্ম সার্থক। কে এই ভাগ্যবান? জনস্রোত সমান গতিতে প্রবহমান। অকস্মাৎ দেখিলেন, জনতার মধ্যে তাঁহার পরিচিত সেই ব্রাহ্মণ, ঠিক তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে।

ফা-হিয়ান দ্রুতপদে পথে নামিয়া আসিলেন, ব্রাহ্মণের নিকটে আসিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন। কহিলেন, আপনিও চলিয়াছেন দেখিতেছি।

ব্রাহ্মণ কথা কহিল না, নীরবে হস্ত মুক্ত করিয়া লইবার ঈষৎ প্রচেষ্টা করিল। ফা-হিয়ান হস্ত মোচন করিলেন না, কহিলেন, না না, বাধা দিব না, চলুন আমিও আপনার সঙ্গেই যাইতেছি।

ফা-হিয়ানের লক্ষ্য হয় নাই, কিন্তু শবানুগামী জনতা বহুক্ষণই তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াছিল। দুটি একটি বক্র-মন্তব্যও উচ্চারিত হইতেছিল। শবযাত্রা মজা দেখিবার বস্তু নহে; তবে পথের পার্শ্বে উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া এই অজ্ঞাত-পরিচয় বৌদ্ধ শ্রমণ এমন আগ্রহে কী দেখিতেছে? একজন ব্রাহ্মণ মরিল, সদ্ধর্মের একটা শত্রু কমিল, ভাবিয়াই কি উল্লসিত হইতেছে? নচেৎ তাহার মুখে-চোখে এমন একটা প্রসাদ-দৃষ্টি কেন? নিতান্তই শবযাত্রা, অন্যথা হয়ত বহু পূর্বেই একাধিক লোষ্ট্রখণ্ড বা কর্দমপিণ্ড ফা-হিয়ানের অঙ্গ স্পর্শ করিত।

এক্ষণে তাঁহাকে অকস্মাৎ নামিয়া আসিয়া শোভাযাত্রীদেরই একজনকে সাগ্রহে সম্ভাষণ করিতে দেখিয়া নিকটবর্তী জনতা রুষ্ট হইল। কটাক্ষ, গুঞ্জন, ক্রমে উচ্চস্বরেই দুর্বাক্য নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। সেগুলি ফা-হিয়ানের প্রতি, ব্রাহ্মণেরও প্রতি উদ্দিষ্ট। ফা-হিয়ান তাহার অর্থ বুঝিলেন না। ব্রাহ্মণ বুঝিতেছিল। ইহার অচির ফল আরও কি হইতে পারে তাহাও বুঝিতেছিল।

ফা-হিয়ান চলিতে চলিতে কহিলেন বুঝিতেছি, আপনি শোকার্ত। অধিক বাক্য

স্কেচ : সুধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

ন্যারা আপনাকে ক্লিষ্ট করিব না। শুধু বলুন, যাঁহার শবদেহকে লইয়া জনতার এমন মর্মস্পর্শী বেদনা ও উচ্ছ্বাস, এই জনশ্রদ্ধাধন্য মহাশয়ের কে? কি তাঁহার নাম, কি তাঁহার পরিচয় ও সৎকর্মাবলী? তাঁহার নামটি স্মরণে রাখিয়া আমি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব। আপনারা ধন্য, আপনারা এই মহাত্মার সাহচর্য লাভ করিয়াছেন। আমি পরদেশী, আমি কি ইঁহার নামটিকেও শ্রদ্ধা নিবেদন করিব না?

চতুষ্পার্শ্বের তীব্র দৃষ্টি ও তিক্ত মন্তব্যে ব্রাহ্মণ অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। ফা-হিয়ানের কথা শেষ হইল না, তাহার মধ্যপথে ব্রাহ্মণ উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিল, অহো, বাক তে নোপলভাতে। তন্মুচাতাম্।

বলিয়াই, যাহাতে সকলের দৃষ্টিগোচর হয় এমনভাবে বেগে বাহু সঞ্চালন করিয়া নিজের হাত ছাড়াইয়া লইল এবং গতি দ্রুততর করিয়া ভিড়ের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ফা-হিয়ান জনতার পথরেখা ছাড়িয়া, এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখশ্রী উদ্ভাসিত, হৃদয় উদ্বেলিত, নোপলভাতে। সেই নোপলভাতে মহাশয়ের শবযাত্রা এটি। তাই এত সমারোহ, তাই এমন শোকোচ্ছ্বাস। হইবে না? বহু ধনের অধীশ্বর তিনি, নিশ্চয়ই বহু জনের অন্নদাতাও ছিলেন। আহা, এই ত সার্থক জীবন।

আবার ভাবিলেন, কিন্তু, এমন যে মহৎ জীবন, বিশাল হর্ম্য, বিপুল বিত্ত, বহুবিস্তৃত জনপ্রিয়তা, ইহারও ত অবসান হইল সেই মৃত্যুতেই!

ভগবান তথাগত, ব্যাধি জরা ও মৃত্যুকে দেখিয়াছিলেন; তাহা হইতে বুঝিয়াছিলেন, ইহারাই মানবের অদৃষ্ট-বিহিত, অতএব এই ঐহিক জীবনের মূল্য কিছুই নাই।

ফা-হিয়ান আজ দেখিলেন অন্যদিকের তত্ত্ব—কেবল ব্যাধি ও জরার নহে, বিত্ত ও বৈভবেরও শেষ মৃত্যুতে। তবে আর কেন বিড়ম্বনা, কেন ধন ও বৈভবের আকিঞ্চন। বৈভব ত মৃত্যুকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না! পারিল না ত এই মহাধন নোপলভাতে মহাশয়ের মৃত্যুকে রোধ করিতে! তাঁহার বিশাল প্রাসাদের পাষাণ প্রাচীর ছিল, তাঁহার সশস্ত্র বলিষ্ঠ প্রহরীরা ছিল। ইহারা মৃত্যুকে বাধা দিতে পারে নাই; তাঁহার অর্ণবপোত ছিল, তাহাতে চড়িয়া সমুদ্র পার হইয়াও তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। অতএব মৃত্যুই সত্য এবং শাশ্বত, কামনা অর্থহীন, নির্বাণই মানবের একান্ত কাম্য।

অপরের ধন দেখিলে আমরা মুগ্ধ হই, সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ ঈর্ষান্বিতও হই, আহা, আমার কেন এমন নাই! নোপলভাতে মহাশয়ের বিশাল প্রাসাদ, বিপুল বৈভব দেখিয়া ফা-হিয়ানেরও মনের অতি গূঢ় কোণে অতি ক্ষীণ ঈর্ষা বা ক্ষোভের উদয় হইয়াছিল কিনা আমরা জানি না; কিন্তু এটুকু জানি, নোপলভাতে মহাশয়ের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিবার পর আর সে ঈর্ষা বা ক্ষোভের বিন্দুমাত্র তাঁহার মনে অবশিষ্ট রহিল না। আকাশে মুখ তুলিয়া ভগবান তথাগতকে তিনি প্রণাম জানাইলেন, নিঃসংশয় কণ্ঠে কহিলেন, হে সম্যক-সম্বুদ্ধ, তুমিই যথার্থ সত্য পথের সন্ধান দিয়াছ, কামনার-নিরসনলক্ষ্য নির্বাণই মানবের একমাত্র পরম গতি।

শান্ত প্রহরের গান

উমা দেবী

ঐ যে দাঁড়িয়ে আছে শ্যামবর্ণা তন্বী এক মেয়ে
শুষ্ক মুখ—রুক্ষ চুল—অস্তিত্বের মর্মমূলে হতাশার চেয়ে
ক্লান্তি যার আরো বেশি—ওকে আমি চিনি
ও যদিও আপিসের সাধারণ কোনো এক কর্মভার-নিষ্পেষিত নীরব কর্মিনী,
তবু জেনো রত্ন-মণি উদ্ভাসিত কেনো বসুধার
ও মেয়ে গোপন করে রেখেছে আশ্চর্য এক রাজোচিত ঐশ্বর্য ভাণ্ডার।
বাল্য ওর কেটেছিল অযত্নেই—হয়তো বা সংসার পীড়িত এক মায়ের কাছেই,
অনটন অভাবের কলহ-জর্জর রীতি যেখানে আছে-ই।
যেখানে হৃতশ্রী—রূপ, স্মৃতিপর্যবসিত—গৌরব,
আদর্শ গার্হস্থ্য ধর্মে ছায়া ফেলে স্বার্থের রৌরব—
সেখানেও বাল্য ওর এনেছিল সুষমামণ্ডিত এক কল্পনা-রাজ্যের
স্বর্ণাভ শাসন যুগ অনন্তকালের।
মৌমাছির মৌচাকের মত—
মনের ভাণ্ডারে ওর মধুর সঞ্চয় বিন্দু জমেছে নিয়ত।
ও ছিল কিশোরী—এই—সে তো এই সেদিনের কথা—
কানে কানে গান গেয়ে জানিয়ে গিয়েছে তাকে যৌবন-বারতা,
কিন্তু দুর্ভাগ্যের দৈত্য নিষ্করুণ মায়াদণ্ডাঘাতে—
ডুবিয়ে দিয়েছে তার সব স্বপ্ন অশ্রুর প্রপাতে।
ক্ষুধাকে অপূরণীয় বলে জেনেছে—জেনেছে সে তো বাল্য বয়সেই—
কৈশোরের দীপ্তি নিভে যেই
যৌবন ছড়াল তার শাসনাজ্ঞা—সেই মুহূর্তেই
স্বাদু অন্ন নবনীতে দুধ শাক-সবজী ফল মূলে
দুষ্প্রাপ্য অলভ্য হল—সংসারের স্রোত প্রতিকূলে
ক্রমশঃ দুস্তীর্ণ হয়ে—পেশীগুলি হল পুষ্টিহীন
গণ্ড শীর্ণ—চক্ষু শুষ্ক—সর্ব দেহ রুক্ষতায় লীন।
তবু জানি এ মেয়ের মনে বয় যে গভীর বাসনার নদী
তাতে ডুব দিয়ে উঠে পৌঁছে যেতে পারে কেউ সৌন্দর্যের সীমান্ত অবধি।
সে সৌন্দর্য হৃদয়ের—হৃদয় সুধার,
এ মেয়ে গোপন ক'রে রেখেছে ঐশ্বর্য এক দৃপ্ত বসুধার।
কে জানে—বেজেছে কিনা কোনো দিন একবার বিবাহের মাঙ্গলিক শাঁখ,
কিম্বা সে শোনে নি আজও ঐতিহ্যের ডাক—
"এ আমার সীমন্তিনী নারী
জননী বলেছে যাকে সন্তান আমারি,
সিন্দূরের গর্বিত স্পর্ধায়—
দুঃখকে লংঘন করে চলে যেতে চায়
সর্বজন কল্যাণের সুখস্বর্গলোকে
নিষ্ঠা আর প্রেমের আলোকে।"
এ মেয়েকে চিনি আমি, তুমি চেনো—চেনে সর্বজন,
ক্লান্ত দেহে, ক্লান্ত মনে এও ফেরে সন্ধ্যায় যখন
ঘরে ঘরে জ্বলে আলো—পথের ইশারা
নির্বাক সমাপ্তি টানে। ইচ্ছা দিশাহারা
একবার টানে তাকে প্রেক্ষাগৃহে কিম্বা জনতায়
পথের পাশেই মেলা কিম্বা কোনো বইয়ের পাতায়
কিম্বা কোনো পত্রিকার প্রচ্ছদপত্রের প'রে রাখে দৃষ্টি তার
যেখানে রয়েছে ছবি অত্যল্পবসনা কোনো লাস্যময়ী চিত্রতারকার,
বৈদ্যুতিক আলো-জ্বলা দোকানের বিচিত্র বিভ্রম
হয় তো বা লাগে মনোরম।
কিম্বা কারো কথা মনে পড়ে অকস্মাৎ
ক্ষয়ে আসা দিবসের ম্লান আলো বলে—'সুপ্রভাত'।—
যতই দেখ না ওকে ম্লান রিক্ত শুষ্ক ও কঠোর—
ওরই মনে আছে জেনো নিবিড় ছায়ায় স্নিগ্ধ শান্ত সরোবর।
প্রতি রাত্রে নক্ষত্রেরা আলো ফেলে সে মনের শান্ত সরোবরে,
প্রতি রাত্রে পাখী ডাকে ঘুম-ভাঙা নিস্তব্ধ প্রহরে—
সন্ধ্যায় স্নানের শেষে ও যখন শুয়ে থাকে নিরালা ছাতের মাঝখানে
তখন বাতাসে লাগে সুর আর কবিতা ছড়ায় গানে গানে।
ও তখন রাজেন্দ্রাণী—নিজের মনের রাজ্যপাট
আবার বিনাস্ত করে।—বিশ্বের কপাট
ওর কাছে খুলে রাখে নিঃশেষে ভাণ্ডার তার গোপন সুধার—
ও মেয়ে নিজের কাছে রেখেছে আপন করে আশ্চর্য ঐশ্বর্য এক দৃপ্ত বসুধার।

ডাক্তার হিমাদ্রি রায় আমার নিকট-প্রতিবেশী। দেশী বিলাতী মিলিয়ে গোটা তিনেক ডিগ্রি আছে ওঁর নামের পিছনে। সেই আকর্ষণে গেটের সামনে প্রত্যহ নানা ধরণের গাড়ী এসে জমে। গাড়ী-চাপা বিশিষ্ট রোগী ছাড়াও পায়ে হাঁটার দল কম ভিড় জমায় না ওঁর চেম্বারে। শুধু ডিগ্রি নয়—ডাক্তারের হাতযশ আছে। এই গলিতে আরও দু'জন পুরাতন ডাক্তার থাকতেও অল্প দিনে ওঁর পশার জমে উঠেছে। মাত্র পাঁচ বছরে—ছোট একতলা বাড়ীটা ভেঙে দশাসই তিনতলা উঠল, মোটর কিনলেন, পরিবার নিয়ে সিমলে দারজিলিং ঘুরে এলেন, আরও কি কি যেন করলেন মনে নেই। ভাগ্যবান পুরুষ ডাক্তার হিমাদ্রি রায়।

একদিন আমাকে তাঁর বৈঠকখানায় ডাকিয়ে এইসব কথা বললেন।

বললেন, জানেন মুখুজ্জে মশায়—না খাটলে কিছুই হয় না। দৈব কিছু দেয় না—দেয় পুরুষকার। প্রথম যেবার বিলেত যাই নিজের চেষ্টায়—

সবিস্তারে সে গল্প শুনিয়ে বললেন, একটা ফরেন ডিগ্রি থাকলে মান সম্মান বাড়ে স্বীকার করি, কিন্তু ডিগ্রি তো টাকার আঁকশি দিয়ে পাড়া যায় না—রীতিমত স্টাডি—মানে খাটতে হয়। তারপর দেশে ফিরে এসে দেশের মানুষকে ভালবাসতে হয়। সে যোগ্যতা বেশীর ভাগ ডিগ্রিধারীর থাকে না। কেমন জানেন—যারা পয়সা অভাবে চিকিৎসা করাতে পারে না। কোন রকমে ওষুধ জোটে তো পথ্য জোটে না—পথ্য অভাবে রোগে ভোগে। জ্ঞানের অভাবে স্বাস্থ্যরক্ষায় প্রাথমিক বিধিগুলো কেমন করে পালন করতে হয় জানে না—তাদেরই বেছে নিতে হয় চিকিৎসার ক্ষেত্রে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়—এটা আর্থিক লোকসান। অথচ দেখুন—আমি ঠকিনি।

আত্মপ্রসাদের হাসিতে স্নিগ্ধ হয়ে উঠল ওঁর মুখখানি।

একটু থেমে বললেন, জানেন তো আমাদের হিস্ট্রি। বাবা সামান্য কেরাণীগিরি করতেন—টায়ে টোয়ে চলত সংসার। ছেলেকে জেনারেল লাইনে লেখাপড়া শেখানো তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল—ডাক্তারী পড়ানো তো স্বপ্নবৎ। অথচ আমি ওই লাইনটাই বেছে নিলাম। বিশ্বাস করবেন কি—ওই বয়সেই নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে অভ্যাস করেছিলাম। ছেলে পড়িয়ে—মহতের দয়া কুড়িয়ে ডাক্তারী পড়ার খরচ চালিয়েছি—বিলেত গিয়েছি। বলতে পারেন শ্বশুরের পয়সায়—কিন্তু সেও তো পণ বরাভরণ দান সামগ্রী কিছুই না নিয়ে সর্তসাপেক্ষে। উঃ—কি দারুণ পরিশ্রম যে করেছি! আবার এখনও দেখছেন দিন রাত্রির খাটছি। ভাবছেন টাকার জন্য। সে তো যথেষ্ট পেয়েছি। নিজের জন্য কতই বা প্রয়োজন! সে জন্য নয়। এই সব গরীব অভাজন—যারা ইচ্ছা সত্ত্বেও ভালভাবে চিকিৎসা করাতে পারে না.....

অনেকক্ষণ ধরে ওঁর কাহিনী শুনলাম। শুনে মনে হ'ল—এমন কাহিনী পরবর্তীদের জানা উচিত। এটি একটি মহৎ দৃষ্টান্ত। চিকিৎসা জিনিষটা আসলে জনসেবা—প্রত্যেক ডাক্তারের তা অনুধাবন করা উচিত। আর সেবার ভাবে চিকিৎসা চালালে দু'টি লোকে (ইহ এবং পর) উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। ইহলোকের ব্যাপার বাড়ী গাড়ী সম্পৎ বিত্তের পরিমাপে প্রত্যক্ষ করছি—অপর লোকের ব্যাপার চাক্ষুষ করা না গেলেও অপরোক্ষানুভূতিতে ধরতে পারছি। এত সম্পৎ প্রতিপত্তি লাভ সত্ত্বেও ডাক্তারের হৃদয় দরিদ্র জনের জন্য প্রসারিত।... মনুষ্য-প্রীতির মধ্য দিয়ে ধর্ম-প্রীতির প্রকাশ। আর ধার্মিকজন যে পরলোকেও অক্ষয় সম্পদের অধিকারী হন—একথা মহাজনেরা একবাক্যে বলেছেন।

ডাক্তারের কথা শুনতে শুনতে নিজের অজ্ঞাতে একটি অভিলাষ মনেতে কেমন করে না জানি দৃঢ় হ'ল।

ফিরে আসবার জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠেছি—ডাক্তার হেসে বললেন, আসবেন অবসরমত। আপনার সঙ্গে গল্প করে ভারি আনন্দ পাই। আবার আমার গল্প শুনলে আপনারও লাভ—লেখার মেটিরিয়াল্স পেয়ে যাবেন হয়তো।

হেসে বললাম, যদি বলি পেয়ে গেছি?

তাই নাকি? ডাক্তারের মুখ চক চক করে উঠল। কি পেলেন জানতে পারি কি? বসুন-বসুন, আর এক কাপ—

আজ থাক—আবার আসব একদিন আর ভরসা করছি সেদিন আপনাকে বিস্মিত করে দিতে পারব। সন্দেশ আনিয়ে রাখবেন।

নিশ্চয় নিশ্চয়। তা আজই—

আজ থাক। সেইদিন হবে, নমস্কার।

নমস্কার।

রোয়াক থেকে পথে নামতে যেটুকু দেরী, গল্পটা ছকে ফেলেছি মনে মনে। ডাক্তারকে নিয়ে গল্প লিখব। ওঁর গ্রাম জীবনের দারিদ্র্য, জীবন সংগ্রাম, স্বাবলম্বিতা, সহৃদয়তা, জনসেবা...

* * *

মাত্র ডাক্তারের বাড়ীর সীমানা ছাড়িয়েছি—কে যেন সামনে থেকে বলল, নমস্কার, ভাল আছেন?

গল্পের ছক নিয়ে নিবিষ্টচিত্ত ছিলাম—সামনের লোকটিকে লক্ষ্য করিনি। অবশ্য কোন-দিনই ওকে লক্ষ্য করার অবকাশ পাই না। ওর নাম পঞ্চানন কিংবা পাঁচুগোপাল হবে, কিন্তু আটপৌরে পাঁচু নামের আড়ালেই রয়ে গেছে পোষাকী নামটা—ঠিক যেমন ডাক্তারের তিন তলা ঝকঝকে বাড়ীর পাশেই ওর চুনবালিখসা একতলা বাড়ীটা সর্বক্ষণ ছায়াগ্রস্ত। অমন নব-যৌবনদীপ্ত সুন্দর বাড়ী ছেড়ে কে আর এই জরাজীর্ণ বাড়ীটাকে একটু ক্ষণের জন্যও বা চেয়ে দেখবে। মানুষটার সম্বন্ধেও এই একই কথা। আপিসে চাকরি করে না পাঁচু। বাজারের একটা মুদি দোকানে কাজ করে। নিজের দোকান নয়, কর্মচারী মাত্র। বাড়ীখানা উত্তরাধি-কারসূত্রে পাওয়া। উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে আর একটি জিনিস—দারিদ্র্য। বাড়ীর অবস্থা দেখলে বেশ বোঝা যায়—কয়েক পুরুষ ধরেই এর জের টেনে আসছে। এক সময়ে ডাক্তারের বাড়ীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এ বাড়ীটাও রোদ

হাওয়া সমান ভাগে ভাগ করে নিয়েছে। তাজ কিন্তু......

কিন্তু এসব চিন্তার অবকাশ ছিল না। পাঁচু বলল, একবার আসবেন বাড়ীর ভেতর? একটা দরকারি কথা আছে। অবশ্য বেশিক্ষণ আটকে রাখবো না আপনাকে।

বেশ তো চল।

বাড়ীর উঠোনে পা দিয়েই প্রচন্ড একটা ধাক্কা খেলাম। বাইরের কাঠামোটা তবু কোনমতে খাড়া আছে, কিন্তু ভিতরের উঠোন? যে ঘরে বসালে পাঁচু—সেই ঘরখানি? অতি কষ্টে উঠোনের বড় বড় গর্ত আর ফাটল পার হয়ে—কালচে দেওয়াল আর ইঁটখসা বরগা ঝুলেপড়া ঘরে নড়বড়ে তক্তাপোষে এসে বসলাম। দিনের বেলাতেও ঘরে একটা কেরোসিন কুপি জ্বলছে।

পাঁচু বলল, দু'চার মিনিট কষ্ট দেব আপনাকে। শুধু একটি কথা। ডাক্তারবাবু আপনাকে খাতির করেন বলেই কথাটা পাড়বার সাহস পাচ্ছি, না হলে—

বললাম, বল তুমি।

দেখুন আপনি সবই জানেন। ছেলেবেলা থেকে দেখছেন দু' বাড়ীর অবস্থা। অদৃষ্ট—ভগবান মেরেছেন আমাদের। না হলে—যাকগে ওসব কথা। ডাক্তারবাবু আমাকে ভিটে ছাড়া করতে চান। সাত পুরুষের ভিটে। এই মাগ্গি-গণ্ডার বাজারে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে কোথায় মাথা গুঁজবো বলুন তো! নিজের ভিটেয় কোনদিন আধপেটা খেয়ে, কোনদিন বা উপোস দিয়ে তবু নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারছি। ভিটে ছাড়া হলে—

বললাম, সবটা খুলে বল।

বলি। আজ্ঞে অভাবের সংসারে যা হয়। নিজের তো সামান্য উপার্জন—বড় ছেলেটারও তাই। কোন রকমে ধার-কর্জ করে চালাতে হয়—তাই ওনার কাছে কিছু টাকা কর্জ নিয়েছিলাম। তবে তো কোন স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নেই—এই বাড়ীখানা মর্টগেজ দিয়ে হাজার টাকা নিয়েছিলাম।

বুঝেছি। তা কতদিন হল?

তা এক যুগ উৎরে গেছে। সুদে আসলে ডবল হয়েছে টাকা। এ টাকা শোধবার ক্ষমতা আমার নেই। বড় ছেলেকে একটা দোকানে ঢুকিয়ে দিয়েছি। মেজটা পড়াশোনা করছে। এই বারেই পাশ দেবে। ওর চাকরিটুকু হলে মনে করেছি সেই টাকাটা আর সংসারে টানব না—মাস মাস দেনা শুধবো। তিনটে বছর যদি সবুর করেন ডাক্তারবাবু—তাহলে সাত পুরুষের ভিটে ছাড়তে হয় না। আপনি যদি বলেন ডাক্তারবাবুকে,—আপনাকে উনি মান্য করেন। আপনি বললেই—

বললাম, নিশ্চয় বলব। ডাক্তারবাবু তেমন লোক নন—ভারি সহৃদয়, আমার কথা নিশ্চয় রাখবেন।

আমার কপাল! বলে কপালে তর্জনী ঠেকিয়ে পাঁচু ম্লান হাসল।

তোমার সঙ্গে কি মনোমালিন্য—

আমারই কপাল! না হলে রাজ্যের লোক ওনার চিকিৎসায় ভাল হয়ে যাচ্ছে—শতমুখে ওনার সুখ্যাতি করছে—সবার সঙ্গে হেসে হেসে কথা কইছেন—......আমারই অদেষ্ট মাষ্টার মশায়।

বুঝলাম যে কোন কারণে হোক ডাক্তারের সঙ্গে পাঁচুর সদ্ভাব নাই। উত্তমর্ণ-অধমর্ণের সম্পর্ক কোন্ কালেই বা মধুর। ওকে অভয় দিলাম, নিশ্চিন্ত থাক পাঁচু—আমার যথাসাধ্য করব। আশা করি আমার অনুরোধ—

না না, মাষ্টারবাবু—ওইটি করবেন না। আমার হয়ে অনুরোধ করবেন না। পাঁচু তাড়াতাড়ি বলে উঠল।

আশ্চর্য হয়ে বললাম, তবে কি করব?

আমার জবানীতে ওঁকে বলবেন—পাঁচু অমুক কথা বলছিল। বরঞ্চ তার সঙ্গে জুড়ে দেবেন—গরীব লোক—প্রতিবেশী... এ আর আপনাকে কি শিখিয়ে দেব মাষ্টারবাবু—আপনি কত বই লিখেছেন, গুছিয়ে হিসেব করে কথা বলা শেখাব আপনাকে আমি! না মাষ্টারবাবু, আমি শুধু বলছি—আমার হয়ে অনুরোধ আপনি করবেন না। যদি ধরেন—দৈবাৎ কথাটা না রাখেন,—মানুষের মতিগতি কিছুই তো বলা যায় না, আমার জন্য আপনি কেন হেঁট হবেন।

তুমি কিন্তু করো না পাঁচু—যা বলবার আমি বলব।

বলে কতটুকুই বা এসেছি—ওই সদর দরজা পর্যন্ত। একটা পা পথে দিয়েছি কি না-দিয়েছি, পাঁচু খপ করে আমার একখানা হাত চেপে ধরল। ব্যাকুলভাবে বলল, না থাক মাষ্টারবাবু, আপনি কিছু বলবেন না।

অধিকতর আশ্চর্য হয়ে মুখ ফিরিয়ে বললাম, কি হল আবার?

না, থাকগে। ওঁকে কোন কথা বলবেন না আপনি। আমি বরঞ্চ নিজেই আর একবার মিনতি করব। আপনারা সবাই যখন বলছেন ডাক্তারবাবুর দয়ার শরীর—আমিই যাব'খন।

পাঁচুর আচরণটা রহস্যজনক। মনে হল কি যেন চেপে যাচ্ছে। কিন্তু এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আমার কি লাভ!

—পথে পা দিয়ে ডাক্তারের কথাই ভাবতে লাগলাম। ওর জীবনের এলোমেলো ঘটনাগুলি যে জুড়ে গল্পের কাঠামো কেমন করে খাড়া করব সেই চিন্তাই প্রবল হ'ল।

●

অথচ আশ্চর্য, গল্পের উপকরণ পেয়েও গল্পটাকে ঠিকমত দাঁড় করাতে পারছি না। কোথায় যেন কি ফাঁক রয়ে গেল মনে হচ্ছে। কাগজ কলম নিয়ে বসলেই পাঁচুর বাড়ীটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মনে হয়—ওই সাত পুরুষের ভিটে রক্ষার অনুরোধ নিয়ে ও কি ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল! ডাক্তার কি বলেছেন প্রত্যুত্তরে? যদিও ডাক্তারের সহৃদয়তাকে আমি সন্দেহ করি না—তবু ও সম্বন্ধে কৌতূহল আমার বেড়েই চলেছে। পাঁচু নিশ্চিন্ত না হলে ডাক্তারের মহত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছি না। ওই একটু খোঁচাতে গল্পটা আরম্ভ করেও সহজ ভাবে শেষ করতে পারছি না। ভাল এক চিন্তায় পেয়ে বসল দেখছি!

গল্পটা অসমাপ্ত রেখে সে দিন সন্ধ্যা বেলায় ডাক্তারখানায় এলাম। আমি আসতেই ডাক্তার খাতির করে বসালেন। গোটা তিনেক রোগী ছিল—তাদের চটপট্ বিদায় করে চায়ের হুকুম করলেন এবং জানতে চাইলেন আমার লেখার কাজ কেমন চলছে!

ভাসা ভাসা উত্তর দিয়ে ওঁকে সর্বাগ্রে যে প্রশ্নটা করলাম—তা পাঁচুরই কথা। পাঁচু যে ভাবে বলতে বলেছিল—ঠিক সে ভাবে নয়।

ডাক্তার গম্ভীর হয়ে বললেন, পেঁচো বুঝি আপনাকে ধরেছে?

বললাম, ঠিক তা নয়। যাইহোক আমাদেরই প্রতিবেশী, গরীব লোক।

ডাক্তারের মুখ আরও গম্ভীর হ'ল। বললেন, সে কি আমি বুঝি না! কিন্তু কথা হচ্ছে, ব্যক্তির স্বার্থকে বলি দেওয়ার প্রয়োজন যে হয় না সর্বসাধারণের উপকার হবে বুঝলে! আপনি বুদ্ধিমান লোক—আপনাকে বুঝিয়ে বলাই বাহুল্য। অনেক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন—মানুষের মনের খবর আপনাদের নখদর্পণে। আপনাকে বুঝিয়ে বলা মানে—

একটু থেমে বললেন, শুনুন তাহলে আসল বৃত্তান্ত। ওই বাড়ীটা দশের উপকারার্থে আমার চাই। ওই পচা পুরোনো বাড়ী—ওর একলার মাথা গুঁজে থাকা ছাড়া কি ইউটিলিটি বলতে পারেন? হয়তো দু'দিন পরে কোন বর্ষাকালে বাড়ী চাপা পড়ে গোটা ফ্যামিলিই শেষ হয়ে যাবে! অথচ ওটা ভেঙ্গে একটা মেটারনিটি যদি করা যায় শত শত গরীবের উপকার হবে কিনা? সে কি শত গুণে ভাল নয়! তা ছাড়া ওই পচা বাড়ীর জন্যে ওকে যা দেওয়া হবে তা ওর পক্ষে আশাতীত। সেই টাকাতে পাড়াগাঁয়ে জমি কিনে একখানা চালা তুলে ভদ্র ভাবে বাস করতে পারবে পাঁচু। শুনুন তা হলে আমার স্কীমটা—

বলে গুছিয়ে বসলেন ডাক্তারবাবু। এবং কি ভাবে জনহিতকর একটি শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চান তার বিবরণ বিবৃত করে চললেন।

শেষে বললেন, বলতে পারেন, পাঁচুকে ভিটে ছাড়া না করে অন্যত্র জমি নিয়েও কি মেটারনিটি করা যায় না? যায় অবশ্য, তবে মেটারনিটির সমস্ত দায়িত্ব যখন আমাকেই বইতে হবে তখন ওটি যাতে সর্বক্ষণ দেখাশুনা করতে পারি সে সুবিধাটুকু আমার চাই বই কি। আমি চাইনা টাকা খরচ করে এতবড় প্রতিষ্ঠান অন্যের সুপারভিসনে রাখি। তাতে আমারই বদনাম।...তাই আমার বাড়ীর লাগোয়া একটি জমি খুঁজছিলাম যাতে সর্বক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ওপর দৃষ্টি রাখতে পারি।

নানা যুক্তিতর্ক দিয়ে ডাক্তারবাবু তাঁর মহৎ উদ্দেশ্যের কথাটা বিস্তারিতভাবে ব্যক্ত করলেন। প্রমাণ করলেন বলাও চলে।

বলা বাহুল্য, যে কৌতূহল দিন কয়েক থেকে আমাকে অনবরত খোঁচা মারছিল তা আর রইল না। সেই দিন রাত্রিতেই গল্পটা শেষ করব ঠিক করলাম।

●

গল্প শেষ করে দেখি পাঁচুর ওই জরাজীর্ণ বাড়ীটা, যা নাকি ডাক্তারের অর্থানুকূল্যে নবকলেবর ধারণ করে জনকল্যাণব্রতে উৎসর্গীকৃত হবে—কখন স্থান করে নিয়েছে আমার গল্পে। সেই সঙ্গে পাঁচুরাও ভিড় জমিয়েছে।

ওদের গল্প আপাতত শেষ হল—আমার দুর্ভোগের কাহিনী সুরু হ'ল মাসখানেক বাদে— গল্পটি 'জন্মভূমি' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর।

শুভ সংবাদ নিয়ে একদিন সন্ধ্যাকালে ওই মাসিক পত্রিকাখানি হাতে করে ডাক্তারখানায়

(শেষাংশ ১৫৯ পৃষ্ঠায়)

এদেশ ওদেশ

শ্রীপদ্মনাভ

লন্ডনে প্রথমদিন ঘুম থেকে উঠে যেটি আমায় অবাক করল, সেটি ওদের জাতীয় পতাকার বাহার। প্রায় প্রতিটি বাড়ীর ছাদে আলো-ঝরা সকালে পত্ পত্ করে উড়ছে—রঙ-ভুলে-যাওয়া ইউনিয়ন জ্যাক্। ব্যাপার কি আজ কোনো পরব্ না কি! পরে জানলাম, ওরা আমাদের মত পনেরই আগষ্ট কি ছাব্বিশে জানুয়ারী পালন করে না—তাদের অতি প্রিয় জাতীয় পতাকা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে রোজই। পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্য দেশেই দেখেছি, নিজেদের পতাকার ওপর সমান দরদ—সর্বত্র দেখেছি গর্বিত পতাকার নিত্য উড্ডয়ন।

দেখতে লাগলাম রাস্তায় দাঁড়িয়ে যানবাহনের সংখ্যা আর তাদের গতি—দুইই বিস্ময়কর—যাকে বলে বাম্পার্ টু বাম্পার্—কিন্তু এমনই নিয়ম আর শৃংখলা, গতি তাদের অব্যাহত। অধিকাংশ রাস্তাই ওয়ান্ ওয়ে, আর গাড়ী চলেছে তিনটি লাইনে। আপনি যদি বাঁয়ে যেতে চান—গোড়ার থেকে ঠিক করে নিতে হবে—আপনি এগোবেন বাঁয়ের সারি ধরে। হঠাৎ ডাইনে যাবার কোনো উপায় নেই। আমি এমন জায়গা দেখেছি, যেখানে হেঁটে গেলে লাগে দশ মিনিট, আর গাড়ীতে কম? না, তা নয়, বরং বেশী সময়। গাড়ী পেরোনোর যেমন লাল নীল আলোর দরকার—মানুষ পেরোনোরও তেমনি। সানফ্রান্সিস্কোতে দেখেছিলাম, একটা ঘন্টা বেজে ওঠে, আর অগণিত মানুষ হুড়মুড় করে চলে যায় ওপারে। কোথাও বা দেখেছি, লেখা ফুটে উঠল "ওয়াক"—"ডোন্ট ওয়াক্"। জাপানে ইদানীং ব্যবস্থা হয়েছে—বড় ঘড়ি বসিয়ে পায়ে হাঁটা লোককে জানিয়ে দেওয়া আর কতটা সময় আছে পেরোবার।

কোনো দেশে, মনে পড়ে না,—কোনো লোক দেখেছি রাস্তার উপর। অথচ দেখেছি অগণিত পথচারী—বিশেষ করে সকালে, বিকালে আর সন্ধ্যায়। মনে করুন যেখানে ক'লকাতার লোক-সংখ্যা চল্লিশ লক্ষ, সেখানে নিউইয়র্ক, কি লন্ডন বা টোকিওতে তার দ্বিগুণ। নিউইয়র্ক সম্বন্ধে লোকে ঠাট্টা করে বলে, এ' একটা সহর যেখানে পাবে তুমি সত্তর লক্ষ লোক আর একশ চল্লিশ লক্ষ পদুই। কথাটা মিথ্যা নয়। আমার মনে হয় ফুটপাথ কথাটার একটা বাংলা প্রতিশব্দ থাকা উচিত—আমরা ভুলেই যাই যে, রাস্তাগুলো তৈরী হয়েছে শুধুই যানবাহন চলাচলের জন্য। তবে অবশ্যই ফুটপাথ প্রতি রাস্তায় চাই-ই, আর চাই সেগুলোকে হকারস্ কর্ণার থেকে মুক্ত রাখা। ওদের দেশ দেখে প্রথম বুঝলাম কেন মার্কিনী কাগজগুলো সুবিধা পেলেই আমাদের রাস্তায় গরুর ছবি সাড়ম্বরে ছাপে। বড় সহরগুলোতে বুঝলে যে পশু, পাখী কিম্বা বালক, বালিকা বলে কিছু ত্রিজগতে আছে, তা ধারণা করবারই উপায় থাকে না। রাস্তায় তাদের স্থান কোথায়?

পরের ক'দিন নিজেকে ভাসিয়ে দিলাম কর্ম-মুখর লন্ডনের দ্রুত লয়ের সংগে। পুরোন বন্ধুদের সংগে দেখা হলো—দীর্ঘদিনের ব্যবধানেও তাঁরা আছেন নিকটে।

একটি খুব বড় ব্যবসায়ী, যিনি ক'লকাতায় ছিলেন বেশ কিছুদিন—তাঁর দপ্তরে ঢুকে বড় [illegible]—তিনি সাজিয়ে রেখেছেন তাঁর ঘর টুকি টাকি জিনিষ দিয়ে—তার অধিকাংশই ভারতজাত।

সুযোগ মিলল শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মীর সংগে সাক্ষাৎকারের। তাঁকে নিবেদন করলাম আমার শ্রদ্ধার অর্ঘ্য—কয়েকটি শান্তিনিকেতনের শিল্প, আর অনুরোধ করলাম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নামে অন্ততঃ একটি প্রস্তরফলক যেন রাখা হয় লন্ডন ইউনিভারসিটিতে। তাঁকে মনে করিয়ে দিলাম যে, কবিগুরু যদিও অসংখ্য ডক্টরেট উপাধি পেয়েছিলেন, কিন্তু লন্ডন ইউনিভারসিটি ছাড়া কোথাও লেখাননি তাঁর নাম। লন্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গর্বিত হওয়া উচিত, তাঁকে ছাত্ররূপে পেয়ে। অবশ্য জানি, আমার আর্জি ফলপ্রসূ হয়নি আজও। আসছে বছর কবিগুরুর এক-শততম জন্মদিন—আবার আমি নিবেদন করি আমার প্রস্তাব।

'রোম ওয়াজ নট বিল্ট ইন্ এ ডে' কথাটির তাৎপর্য উপলব্ধি করলাম কয়েকদিন লন্ডন বাসের পরই। যেখানেই যাই, অনুশাসন। স্কুলবাড়ীতে লেখা রয়েছে—"এখানে হাত ধোও", "তোয়ালেতে হাত মোছ", "জামা টাঙাও এখানে", "বাঁ দিক দিয়ে যাও"—যখন শিশুরা কিন্ডারগার্টেন ক্লাসে পড়ছে, তখন থেকে সুরু হয়ে গেল—এই শিক্ষা। যান আপনি সাধারণ উদ্যানে সেখানেও দেখবেন একই কথা—"এ আপনাদের উদ্যান, পরিষ্কার রাখবার দায়িত্ব আপনাদের"। নিউইয়র্কে আবার দেখেছি আইনের ভ্রূকুটি, নোংরা করলে, ফুটপাথে থুথু ফেললে ফাইন্ হবে, জেলে যেতে হবে ইত্যাদি। এমন কি, যাতে আপনি শৌচাগার থেকে বেরবার সময় পাত্লুনের বোতাম আঁটতে ভুলে না যান—তার জন্যও আছে সতর্কবাণী। প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে, সর্বত্র আছে সতর্কী-করণের এই সব সযত্ন ব্যবস্থা—যার ফলে আমরা দেখি সুন্দর, পরিচ্ছন্ন সহরগুলো।

অবাক হলাম, বাড়ীর গায়ে তো বিজ্ঞাপন আঁটা নেই—তবে যে শুনেছিলাম—এরা বড় বিজ্ঞাপনে বিশ্বাসী।

বাস স্ট্যান্ডে পরিষ্কার করে লেখা আছে—কোথা দিয়ে সেই বাসটি যাবে—ভীড় থাকলেও মারামারি নেই—আবার যে কলেজের দিনগুলোর মত বাসে বাসে ঘুরে বেড়াতে পারব, বিলেত না এলে তা জানতেই পারতাম না। লোকপরম্পরায় শুনেলাম—সত্যি কি না বলতে পারব না, আমাদের বিধান ডাক্তারও নাকি লন্ডনে এসে বাসে চড়েন।

লন্ডনের ববি অর্থাৎ পুলিশ আর ক্যাব্ অর্থাৎ ট্যাক্সি উল্লেখযোগ্য। ক'লকাতার ট্যাক্সি! চড়লে তো বাড়ী এসে চান করতে হয়।—আর ওখানে শুনলাম, একটি যদি সিগারেটের তলা পড়ে থাকে—আপনি পারেন ট্যাক্সি-চালকের বিরুদ্ধে নালিশ করতে। পুরোন আমলের —বেঢপ্ দেখতে ক্যাবগুলি কিন্তু কালো সেগুলো কাজল কালির মতই। যদি ধরুন, ধাক্কা লেগে রং চটে যায়, কিম্বা তুবড়ে যায়—আপনি পারবেন না আর সোয়ারি নিতে—আপনাকে সোজা চলে যেতে হবে মিস্ত্রীখানায়। আরও বড় কথা, যদি ভুল করে আপনি কিছু ফেলে যান—তা কখনও খোয়া যাবে না। তবে মনে রাখবেন, ঢাকার গাড়োয়ানের মত ওরা সোজা অপমান করবে যদি নামবার সময় ভাড়ার সংগে অন্ততঃ টেন পারসেন্ট বকশিস না দেন।

জাপান ছাড়া, পৃথিবীর সর্বদেশে এই একটা বিড়ম্বনা—আপনার ভাল লাগুক আর না লাগুক, বকশিস আপনাকে প্রতি হাতে দিয়ে যেতেই হবে।

আমেরিকার আমার এক বন্ধু বলেছিলেন—[illegible] খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি, এক গেলাস জলের দাম আড়াই টাকা—অর্থাৎ পঞ্চাশ সেণ্ট বকশিস। আমি জাপানে দশ টাকা পর্যন্ত বকশিস দিয়ে জানবার চেষ্টা করেছিলাম কথাটা সত্যি কিনা।

কদিনের মধ্যে শীত কেটে গিয়ে বসন্তের আগমন সুরু হলো। মরা গাছ চিকন পাতায় ভরে উঠতে লাগল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য—কচি পাতার রঙিন রং আস্তে আস্তে হতে লাগল সবুজ, কুঁড়ি এলো—ফুটল ফুল। একদিন ভোরে বেড়াতে বেরিয়েছি দেখি এক বিরাট লরী তার থেকে নামছে, পুষ্পিত মরসুমী ফুলের গাছ। দাঁড়িয়ে পড়লাম। খানিকটা সময়ের মধ্যে রং বিহীন ব্যাঙ্ক বিল্ডিং ঝলমল করে উঠল ফুলের শোভায়। তারপর কয়েক দিনের মধ্যে দেখলাম প্রতি বাড়ীটির ফ্লাওয়ার বক্সগুলো ভরে উঠল। জার্মাণীর একটি ছোট সহরেও চোখে পড়েছিল—পড়ে থাকা একটা জমি পুষ্পোদ্যানে রূপান্তরিত হলো এক রাত্রের মধ্যে। সহরের লোকের সময় কই বীজ ফুটিয়ে চারা তৈরী করে তাকে বড় করার—তাইতো এই ব্যবস্থা।

টেমসের কথা না বললে বোধ হয় অনেকেই আমায় অরসিক বলবেন। টেমসের কথা বলব বই কি! এই নদীই পরিচয় করিয়ে দেয় ইংলণ্ডবাসীদের। একটি ছোট্ট নালার মতন আমরা যারা সত্যি নদী দেখেছি—তাদের কাছে হাস্যকর—কিন্তু তারই কদর কত। লন্ডনের বাইরে কোথাও দেখিনি, যেখানে এই ক্ষীণ নদীটির যত্নের কমতি। ছুটির দিনে এর দুই কূল ভরে ওঠে অগণিত নরনারীর সমাবেশে। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়—কি পরিষ্কার এর দুই তীর! কোথায় বা ভেসে বেড়াচ্ছে হংসপাতি। কোনো জায়গায় এরা রোপণ করেছে উইপিং উইলো, কোথাও ঝাউয়ের সারি, আর বাঁকগুলোকে সাজিয়েছে মনোরম রঙিন গুল্ম দিয়ে। অপরিসীম স্নেহে একে ওরা করে লালন—পরিপূর্ণভাবে ভোগ করে এর নৈসর্গিক শোভা। দরদী, স্নেহশীল ইংলণ্ডবাসীর টেমসই হচ্ছে প্রতীক।

প্রথম যেদিন ওখানে ট্রেণে করে বেড়াতে গেলাম, অবাক হলাম দু' ধারের পড়ে থাকা মাঠ দেখে। মাইলের পর মাইল—গভীর সবুজের বিস্তৃতি। কোথাও জমে নেই জল—কোথাও নেই ভাঙ্গা শুকনো গাছের ডাল, নেই ফেলে দেওয়া লোহা লক্কড়ের স্তূপ। সব চেয়ে অবাক লাগল দেখে টেনিস মাঠের মত ছাঁটা সবুজ মখমলের আস্তরণ। পড়ে থাকা জমি এমন হয় কি করে? ইংরেজরা পরিচয় না থাকলে কথা বলে না—এটা অনেক দিনই জানতাম—তবুও কৌতূহল নিবৃত্ত করতে না পেরে এক সহ-যাত্রীকে প্রশ্ন করে ফেললাম। তারই কাছে জানলাম, প্রতি কাউণ্টির ওপর ভার তার সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত জমিকে রাখতে হবে পরিষ্কার, ছাঁটতে হবে ঘাস নিয়মমত। শ্রদ্ধায় মাথা নত হলো।

বৃটিশ ইনফরমেশন অফিস আমার প্রোগ্রাম করে দিলেন বিলাতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জিনিষ দেখবার জন্য। দেখলাম কয়েকটি নবনির্মিত গাঁয়ের স্কুল। যেখানে ছাত্রদের মাহিনা দিতে হয় না। সব কটাই তৈরী হয়েছে যুদ্ধের পর—তাই দেখলাম কাচের সমারোহ—শীতের হাত থেকে বাঁচতে হবে, কিন্তু রোদের প্রতিটি তীর্যক রশ্মি যাতে ছেলে-মেয়েদের আশীর্বাদ করে, যাতে আলোর প্রতি কণা স্কুল রুমে পৌঁছোয়—তারই ব্যবস্থা করেছেন স্থপতিরা। একটি স্কুলের হেডমাস্টারমশাই দেখলাম বুকে রোটারীর ব্যাজ পরে রয়েছেন। সাহস করে নানা ঘরোয়া প্রশ্ন করলাম—তার মধ্যে একটি ছিল বড়লোকেদের ছেলেরা এই সাধারণ ছেলেদের সংগে

পড়ছে কিনা। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন সাধারণ ছেলেরা বড়লোকদের ছেলেদের চেয়ে মেধাবী কিনা। তিনি ক্ষোভ করে বললেন, এখনও পাবলিক স্কুলগুলো পুরোদমে চলছে—যদিও ফ্রী স্কুলগুলো তাঁর মতে খুবই ভাল। পাবলিক স্কুলের বেতনের অত্যন্ত চড়া হার সত্ত্বেও, এখনও প্রায় ছেলে জন্মাবার আগেই তাকে রেজিস্ট্রি করা চলেছে। সাধারণ পরিবারের ছেলেদের মেধা সম্বন্ধে তাঁর দেখলাম খুব উঁচু ধারণা। কলেজে অধ্যয়নের কথা উঠলে তিনি আমায় বললেন—শুধু যাঁরা অধ্যাপনা করবেন, কিম্বা বৈজ্ঞানিক বা অন্য প্রোফেশানে যাবেন—তাঁরাই অধিকার পান কলেজে যাবার। তিনি বোঝালেন কলেজী শিক্ষা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য—আর তা' ছাড়া, দরকার কি দেশে অত উচ্চ শিক্ষিতের। গড়-পড়তা মাত্র দশজন ছাত্র সুযোগ পায় কলেজে ঢুকতে। তিনি আমায় ওঁদের দেশের অসংখ্য টেকনিক্যাল স্কুলের কথা বললেন—বোঝালেন কারিগরি বিদ্যা ছাড়া তো দেশ সমৃদ্ধ হতে পারে না—তাই তাঁদের দেশের বালকেরা বেশী যায় এই দিকেই। দীর্ঘশ্বাস পড়ল আমার দেশের অবস্থা মনে করে।

গেছলাম আমি এক সুপ্রসিদ্ধ ওষুধের কারখানা পরিদর্শন করতে—সেখানকার পারসোনেল ডিরেক্টর আমায় আপ্যায়ন করলেন মধ্যাহ্ন-ভোজে। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলেন দেশের অনেক খবর। দেখলাম বহু লোককে উনি চেনেন। প্রশ্ন করে জানলাম তিনি একটি জাঁদরেল আই-সি-এস—যুদ্ধের সময় ছিলেন তিনি খাদ্য দপ্তরের সেক্রেটারী। মরিয়া হয়ে প্রশ্ন করলাম—বললাম, ভুল বুঝবেন না—এ সুযোগ ছাড়তে পারছি না—বুঝিয়ে দেবেন কি—কেন এবং কি করে আপনারা বাংলা দেশে অত বড় দুর্ভিক্ষ আনলেন। তিনি অবশ্য নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলেন—লোক-ক্ষয়ের নানা যুক্তি দিলেন—কিন্তু বোধ হয় আসল কথাটা এড়িয়ে গেলেন। তাঁর বক্তব্যের আসল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল—বর্মা হারাবার পর পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য যোগাড় করা সম্ভব হয় নি। সেই কথার সূত্র ধরে তাঁকে প্রশ্ন করলাম, আমাদের কবিরা বাংলাদেশ শস্যশ্যামলা বলে বর্ণনা করেছেন আর তা' ছাড়া—আপনারা জানতেন না এ' নয় যে, কি করে শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়—তবে করেন নি কেন—জলের, সারের, কি ভাল বীজের ব্যবস্থা?—উত্তর সমানই পেলাম—আমরা না কি ওদের কথা শুনি নি। যাক হোক আমি তাঁর অতিথি—আর ও-সব কথা যা আমরা ভুলতে চাই, তা' নিয়ে আর বেশী বাগাড়ম্বর করে লাভ কি। শুধু বলে দিলাম, শস্য উৎপাদন বাড়াবার দায়িত্ব আমরা নিয়েছি—আর এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই কিছুটা ফললাভ করেছি।

ডি পি ঘোষের ছেলে দীপংকর আমায় নিয়ে গিয়েছিল অক্সফোর্ডে। মনোরম লেগেছিল সেখানকার আবহাওয়া। সাময়িকভাবে হলো ক্ষোভ—আর সময় নেই—এ'জীবনে হলো না আর এখানে ছাত্ররূপে আসা। পুরোনো বৃটিশ স্থাপত্যের নিদর্শন রয়েছে—এখানকার কলেজ-গৃহগুলিতে শান্ত, আভিজাত্যপূর্ণ আবহাওয়া। মনে হলো, এখানে থাকলে পড়াটাই হয় সহজ। রাতে ওদের মক্‌ পার্লিয়ামেন্ট দেখলাম—একটি রাতেই বুঝলাম ওদের ডেমোক্রেসীর মূল কোথায়। কি সুন্দর লাগল—সেই ভাব-গম্ভীর আলোচনা সভা—সার্থক হলো আমার অক্সফোর্ড যাত্রা।

স্ট্র্যাটফোর্ড-অন-আভনে গেলাম সেক্সপীয়ারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাতে—দেখলাম বিখ্যাত একটি নাটক। প্রাচীন আর আধুনিকের সংমিশ্রণ এই গ্রাম—প্রতিনিয়ত দলে দলে অভিযাত্রী যাচ্ছে কয়েক মিনিটের জন্যও নিজেকে ভুলতে। অপূর্ব এর পরিবেশ—অ্যাভন নদীর উপর রঙ্গমঞ্চ দাঁড়িয়ে রয়েছে—ল্যান্ডস্কেপ আর্কিটেকচার যে কি রকম মনোহর হতে পারে তারই নিদর্শন। কবির স্মৃতিকে জাগরূক রাখবার কি প্রয়াস—কি যত্ন! কবির সৃষ্ট কয়েকটি বিখ্যাত চরিত্রের মর্মর-মূর্তি আপনাকে টেনে নিয়ে যাবে বহু দূরে অতীতে—মনে করিয়ে দেবে তাঁর সার্থক সৃষ্টি। রঙ্গমঞ্চের পরিধি দেখে আপনার নিউ এম্পায়ার খেলাঘর মনে হবে। ডেনমার্কে সমুদ্রের ওপর সেই অতি বৃহৎ হ্যাম্‌লেটের রাজপ্রাসাদ মনে পড়ে গেল—যেখানে মৃত-আত্মা পায়চারী করত রাতের পর রাত—বুকটা ছমছম করে উঠল। প্রার্থনা করি, আমরা যেন রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি ঘিরে রচনা করতে পারি এমনই সুমহান পরিবেশ।

অদ্ভুত নগরী এই লন্ডন—একদিকে চলেছে এর কর্ম-স্রোত, আর একদিকে চলেছে আনন্দের সমারোহ। কত যে সিনেমা, থিয়েটার, নাচঘর—তা গুণে শেষ করা যায় না। আপনি যেমন পাবেন ফিল-হারমনিক অরকেস্ট্রা, স্যাডলার ওয়েলস্‌ ব্যালে, তেমনি পাবেন নগ্ন কি অর্ধ-নগ্ন নারীর কুৎসিত লালসাময় নাচের জায়গা—এরা আবার অফিস খোলার মত সিনেমা আর নাচের ঘর খুলে দেয় সকাল দশটায়। তারপর চলে অবিরাম সারাদিনরাত। আরম্ভের সময় নেই—আপনার অবসর হলেই ঢুকে পড়তে পারেন—আপনি যদি ইচ্ছা করেন, এক টিকিটেই যতবার ইচ্ছা দেখে যেতে পারেন। —যতদূর শুনেছি তা অবশ্য কেউ করে না। দিনের নাচ দেখানর ব্যবস্থা শুনলাম ক্লান্ত ব্যবসায়ীদের জন্য—বুড়ো ও আধবুড়ো লোকে ঘর ভর্তি। আপনি ঢুকেই মঞ্চের দিকে প্রায়-উলঙ্গ নর্তকীদের দেখবেন—আগে দেখবেন 'হলে' আপনার চেনা লোক আছে কি-না। এতই কদর্য কিন্তু লোভনীয় সেই নাচ। অর্ধ-উলঙ্গ নাচ ইউরোপের প্রায় প্রতি সহরেই আছে—তবে মুকুটমণি হচ্ছে প্যারী—সেখানে অদ্ভুতভাবে তারা মিলিয়েছে যৌন আবেদনের সঙ্গে শিল্পকে। বার কাছে শুনেছিলাম এ' ব্যাপারেও জাপান পশ্চিমকে পরাস্ত করেছে—আসল রসিক সমাজ বলে টোকিওকে 'হেল ক্যাপিটল'। তবে সুখের কথা, পারভার্টের সংখ্যা সর্বত্রই সীমাবদ্ধ।

বেশ মনে পড়ে একটি রাতে একজন খাস প্যারী-বাসী ফরাসী আমায় "মোমার্ৎ" দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর গাড়ী করে। অসংখ্য নাইটক্লাবে সেই পাড়াটি জমজমাট—সেখানের সন্ধ্যা রাতে রূপান্তরিত হয় না—যত রাতই হোক—ভিড় কমে না এতটুকুও। "মোমার্ৎ" যে ফূর্তিকামীদের সর্বোজ্জ্বল তীর্থ কেন্দ্র। আমার বন্ধুটি আমায় বললেন, আপনি যদি এখানে নামতে প্রস্তুত থাকেন, তাহলে আপনাকে একটা মজার জিনিষ শোনাতে পারি। আমি বললাম, লোকে তো এখানে দেখতেই আসে—আপনি আমায় শোনাবেন কি। তিনি উৎসাহের সঙ্গে বললেন—আপনি দয়া করে কান পেতে থাকুন—আপনি শুনতে পাবেন পৃথিবীর যাবতীয় ভাষা—সব দেশের লোকই এখানে আসে কি-না—কিন্তু পাবেন না শুনতে একটিও ফরাসী কথা। সব দেশের ভাষা আমি জানিও না—আর সেই রাতে তাঁর কথা পরখ করবার অভিরুচিও ছিল না—তবে বুঝলাম তাঁর বক্তব্য। তিনি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বললেন—এটা আমাদের ব্যবসা—ফ্রান্স একটা মোটা অংক রোজগার করে ট্যুরিস্ট ট্রেডে। তারই আয়োজন "মোমার্তে"—ফরাসীরা এখানে আসেও না—আর পায়ও না আনন্দ।

ইংরাজদের আমরা বলি 'এ নেশন্ অব শপ্‌কিপারস্'। তারা শুধু আমাদের দেশেই দোকান সাজায়নি, দেখলাম অগণিত নয়নাভিরাম বিপণি, পণ্যদ্রব্যে সেগুলো ঠাসা—দেখলাম ওদের ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স—এক একটা সহর বিশেষ। আপনি পাবেন না হেন জিনিষ নেই—সেগুলো আবার বিভিন্ন আয়ের লোকের জন্য সাজান। কোনটি ধনীদের, কোনটা বা মধ্যবিত্তদের প্রয়োজন মেটায়। সারাদিন কেনা-বেচার পর তারা রাখবে কোথায় তাদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ কাঁচা টাকা, তা সে যেখানেই হোক বিপদের কারণ—এটা কারোও বোঝে—তাই এখানকার ব্যাঙ্কগুলো এক অভিনব ব্যবস্থা করেছে। বড় রাস্তার ওপর বিভিন্ন ব্যাঙ্কগুলি চিঠি ফেলা বাক্সের খাঁজের মত—দেওয়ালে মজবুত করে একটি খাঁজ কেটে রেখেছে—আপনি আপনার নাম-ঠিকানা আর কত টাকা রাখছেন তা' লিপিবদ্ধ করে ফেলে দিন সেই গহ্বরের মধ্যে। সেটি চলে যাবে ব্যাঙ্কের গর্ভে—পরের দিন যথারীতি তা জমা পড়বে আপনার হিসাবে। অবাক হলাম এদের বিশ্বাসের বহর দেখে—হিসাবের গরমিল কখনও হয় না।

কয়েকটি বিখ্যাত সংগ্রহশালা ঘুরে বেড়ালাম। দেখলাম অসংখ্য শিল্প নিদর্শন—এটা আমার প্যাশন—যে দেশেই গেছি—আগে দেখেছি, সেখানকার বিখ্যাত শিল্পশালা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেছে—তার ফলে দেখি নি আরও অনেক কিছু। তবু বলব যা' দেখেছি—তা' দিয়েই মন আমার ভরে গেছে—যাত্রা আমার সার্থক হয়েছে।

রোমে মাইকেল এঞ্জেলোর হাতের কাজ, লন্ডনের স্টেট গ্যালারী, প্যারীর লুভ্‌, আমস্টারড্যামে ডাচ শিল্পের নিদর্শনই বলুন আর কোপেনহাগেনে ইজিপ্টের 'মামী'ই বলুন, কি নিউইয়র্কে মেট্রপলিটন মিউজিয়াম অব মডার্ণ আর্ট—আরো কত শত দেখলাম। কিন্তু সব ছাড়িয়ে মনে ভেসে উঠছে রোঁদ্যার বিখ্যাত মূর্তি "থিঙ্কিং ম্যান্"। প্রথমে যখন দেখলাম একটা বাড়ীর পেছনের বাগানে, চিনতে পারি নি। কিন্তু সেখান থেকে নড়তেও পারি নি—কি সুমহান সেই মূর্তি। আর অবাক হয়েছিলাম অসলোতে ভিজিল্যান্ড পার্কে গিয়ে। শিল্পী ভিজিল্যান্ড বোধ হয় পৃথিবীর একমাত্র শিল্পী যিনি সুযোগ পেয়েছিলেন নিজেকে প্রকাশ করতে। তিনি তাঁর সরকার মহোদয়কে অনুরোধ করলেন, তাঁকে একটা বিরাট জায়গা দিতে, আর বললেন, আপনারা দেবেন আমায় কাঁচা মাল—আর খালি দুবেলার খাবার। আমি মূর্তি গড়ে সাজাব এক উদ্যান আমার মনের মতন করে। সরকার মঞ্জুর করলেন তাঁর প্রার্থনা। সর্বদেশে সর্বকালে সব শিল্পীই চেয়েছে নিজেকে প্রকাশ করতে, যেমন তিনি চেয়েছিলেন—কিন্তু ইতিহাস খুললে নিশ্চয়ই আর কারুর নাম খুঁজে পাওয়া যাবে না—ভিজিল্যান্ড ছাড়া। তিনি তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে নামলেন কাজে—সৃষ্টি হলো এই মনোরম উদ্যান। অসংখ্য মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে, সেই বিস্তৃত উদ্যানে—তাদের বক্তব্যই বলুন, আর নির্মাণ কৌশলই বলুন—সবটাই অভিনব, ভাব-গম্ভীর।

কাজের তাগিদে বারে বারে গেছি দেশের বাইরে—দেখেছি পর্যটকের চোখ নিয়ে। অভিজ্ঞতাই বলুন, আর জ্ঞানই বলুন—তার যে কিছু তারতম্য হয়েছে, সেটা স্বীকার করতে বাধে। ভাল লেগেছে নিশ্চয়ই—কিন্তু পেলাম কি? মানুষ সম্বন্ধেই বলুন, আর পৃথিবী সম্বন্ধেই বলুন—মনে পড়ে না—এমন কিছু পেয়েছি, যা' পাইনি আমার দেশে। তবু যাত্রী আমি—মন আমার সুদূর পানে টানে—সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়ি। আবার বেরিয়েই মন কাঁদে ঘরের জন্যে।

আরো কত কথা বলবার ছিল, কিন্তু যা' বললাম, সবই হের-ফের—তবু আবার যাব—সুযোগ পেলেই যাব। মানুষ আমি ভালবাসি—তাই মন ভরে ওঠে ওদের সেই মানুষকে মুক্তি দেবার সংগ্রাম দেখতে। মনে হয়, ওরা যদি পেয়ে থাকে—আমাদের অসাধ্য নয়। ওদেরই মধ্যে দেখি আমাদেরও ভবিষ্যতের সার্থক ছবি। মনে বল আসে। আমাদের সব আছে—নেই হয়ত শুধু ঈশ্বরের আশীর্বাদ। ভারত ছাড়বার পর নীল নদীর উপত্যকা অবধি দেখবেন হলদে ধূসর পুড়ে যাওয়া মৃত্তিকা—তারপর

(শেষাংশ ১৫৯ পৃষ্ঠায়)

সংস্কৃতি-সমাচার

নৃপেন্দ্র গোস্বামী

আধুনিক নৃবিজ্ঞানে একটি কথা চালু হয়েছে—diffusion বা সাংস্কৃতিক বিকিরণ। আলোক যেমন একটি কেন্দ্র হতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি একটি কেন্দ্র হতে সংস্কৃতি চারিদিকে প্রসারিত হতে থাকে,—diffusion-এর তাৎপর্য হচ্ছে এইরূপ। জাতীয় সংস্কৃতির নামে চালু জিনিষটির মধ্যে কতখানি বিজাতীয় অংশ আছে এ নিয়ে হিসাব-নিকাশ চলেছে গবেষণার ক্ষেত্রে এবং নৃবিজ্ঞানের দৌলতে জাতীয়তাবাদের গুমর কমে যাচ্ছে। বিশুদ্ধ নর-বংশ (race) বা বিশুদ্ধ সংস্কৃতি (culture) কোন দেশেই দাবীর বিষয় হতে পারে না। বর্তমানের কোন জাতিই শোণিত-বিশুদ্ধির বা সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের গর্ব করতে পারে না।

সাংস্কৃতিক বিকিরণের নিদর্শনগুলি বেশ চমকপ্রদ। কিছু কিছু নমুনা আলোচনা করা যেতে পারে। আমাদের বাঙালীদের মধ্যে প্রচলিত কয়েকটি নেশার দ্রব্যের কথাই ধরুন,—পান, তামাক, চা ও কফি। এর কোনটিই বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত নয়। সংস্কৃত শব্দ 'পর্ণ' হতে পান-এর ব্যুৎপত্তি করা যেতে পারে বটে, কিন্তু পান-এর অর্থবাচক মূল শব্দটি হচ্ছে তাম্বুল। খাসিয়া ভাষায় বল্ শব্দের অর্থ পান। অস্ট্রিক ভাষার প্রভাবে যে তাম্বুল শব্দটি সংস্কৃত শব্দকোষে প্রবেশ করেছে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পান খেয়ে ঠোঁট লাল করার রীতি ভারতে ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেই দেখতে পাওয়া যায়। তামাক এসেছে আমেরিকা থেকে ইউরোপের মারফৎ ভারতের মাটিতে। পোর্তুগীজরা আমাদের তামাকের নেশা করতে শিখিয়েছে। পোর্তুগীজ tobaco-এর সঙ্গে বাংলা তামাকের শব্দগত মিলও রয়েছে। একটি মত অনুসারে টোবাগো (Tobago) দ্বীপের নাম থেকে নাকি এই জনপ্রিয় শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। তামকূটের নেশার অন্যতম উপকরণ হুঁকা। হুঁকা নামটিও বাংলা নয়, আরবীমূলক। চায়ের সঙ্গেও জড়িত রয়েছে বিদেশীয় প্রভাবের কাহিনী। বাংলা চা এবং ইংরেজী Tea—উভয় শব্দের আমদানি হয়েছে চীন থেকে। মূল চীনা কথাটি হচ্ছে 'তা' বা 'চ' (te; ch'a)। এই নেশার জন্মদাতা নাকি চীনদেশ। কফির আদি উৎস হচ্ছে আরব। ইংরেজী 'কফি'—শব্দ এসেছে আরবী ক হ্বা (qa hwah) থেকে। (ক হ্বা—মাদক পানীয়)।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সামাজিক অনুমোদন ব্যতিরেকেও কিছু কিছু মাদক পানীয় শ্বেতাঙ্গ-শাসনের কৃপায় এদেশে প্রবেশলাভ করেছিল। এগুলি ওয়াইন্ (wine) পর্যায়ের, দ্রাক্ষারস থেকে প্রস্তুত। গ্রীক ওইনস্ ও লাতীন ভাইনাম্ (Oinos; Vinum) থেকে ওয়াইনের সূত্রপাত। এই দ্রাক্ষাজাত সুরা ভারতে ছিল না। বৈদিক আমলের তিনটি মাদক পানীয়ের নাম পাওয়া যায়। যথা—সোম, সুরা ও মধু। সোমরসের কোন নিশানা করা যায়নি এবং সোমলতার সনাক্তকরণ সম্ভব হয়নি। বৈদিক মধু সম্ভবতঃ চোলাই-করা মধু, এর গ্রীক প্রতিরূপ মেথু (methu) এবং ইংরেজী প্রতিরূপ মেড্ (mead)। মনু-কথিত মাধ্বী সুরা বৈদিক মধুর বংশধর। ঋগ্বেদীয় 'সুরা' বোধহয় যব থেকে প্রস্তুত করা হোত। ইংরেজদের মধ্যে প্রচলিত 'এল' (ale) বা 'বীয়ার (beer)-এর সঙ্গে এই সুরার সাদৃশ্য থাকতে পারে। মনু-কথিত পৈষ্টী সুরা যব বা চালের গুঁড়ো থেকে তৈরী হোত,—এই সূত্র ধরে বৈদিক সুরার সম্বন্ধে একটা কল্পনা করা যায়। মনু গৌড়ী সুরার কথাও বলেছেন। এই সুরা গুড় থেকে প্রস্তুত হোত। ওয়াইন পর্যায়ের সুরা এদেশে ইউরোপীয়েরা আমদানী করেছে বলে মনে হয়।

অ্যালকোহোল,—অর্থাৎ, চিনি থেকে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সুরার এই নামটি আরবীয়দের কাছ থেকে ইউরোপীয়েরা ধার করেছে,—সাংস্কৃতিক প্রভাবের একটি দৃষ্টান্ত। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আরবী ভাষায় এই শব্দের অর্থ হচ্ছে এন্টিমনির গুঁড়ো। চিনির ব্যবহার কি ইউরোপীয়েরা ভারতীয়ের কাছ থেকে শিখেছে? এই প্রশ্নও জাগে আমাদের মনে শব্দগত নজীর থেকে। কেউ কেউ বলেছেন, সংস্কৃত 'শর্করা' থেকে ফারসী ও আরবী ভাষার ভিতর দিয়ে ইংরেজী 'সুগার'-এর উৎপত্তি হয়েছে। শব্দগত ধ্বনি বস্তুগত ধ্বনি হতে পারে কিনা ভেবে দেখবার বিষয়।

অহিফেনের সঙ্গে বাঙালীর তথা ভারতবাসীর পরিচয় কি করে হয়েছিল জানা যায় না, যদিও বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী এই নেশার বস্তুটিকে **অমরতা দান করেছে। নির্যাস-বাচক গ্রীক ওপোস-এর সঙ্গে নামগত সাদৃশ্য থেকে মনে হয় এই জনপ্রিয়** কর্মনাশা বস্তুর প্রচলনের পশ্চাতে বৈদেশিক প্রভাব না থেকে পারে না। গাঁজা ও ভাঙ-এর স্বাদেশিকতা সম্বন্ধে অবশ্য সন্দেহের কারণ দেখি না।

আমাদের খাদ্য তালিকাটি নিপুণভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাবের চিত্র উদ্ঘাটিত হবে। পণ্ডিতদের মত অনুসারে নব ঋগ্বেদীয় শস্য, ধান্য অস্ট্রিক-ভাষীদের দ্বারা প্রচলিত হয়েছে এবং গম হচ্ছে দাক্ষিণী দ্রাবিড় কেরামতির ছাপ-মারা। দধি, দুগ্ধ, মাংস, যবের ছাতু (সক্তু), ঘোলে সিক্ত যবের চূর্ণ (করম্ভ), চিতাই পিঠা (পুরোডাশ)—বৈদিক আমলের স্মৃতি বহন করছে। কিন্তু মৎস্য ভক্ষণের রীতিটি নাকি অস্ট্রিক। পোলাও ও কোর্মা যথাক্রমে পারসীক ও তুর্কী রীতির **প্রমাণ দিচ্ছে। হালের চপ্, কাট্‌লেট্, প্রভৃতি নাগরিক অধিকারপ্রাপ্ত খাদ্যগুলি তো ইংরেজী রুচির পরিচায়ক।** 'কারি' (curry) কিন্তু **মূলত ইংরেজী** শব্দও নয়, ইংরেজী খাদ্যও নয়,—**তামিল ভাষা ও রুচির অবদান।** কারি **সহযোগে ঝোল খেতে** শিখেছে ইংরেজেরা **ভারতীয়দের কাছ থেকে।**

আধুনিকতা-দুরস্ত কলিকাতা নগরীর কেন্দ্রস্থিত একটি সুসজ্জিত বাঙালী কাফে বা রেস্তোরায় সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের দৃশ্য প্রণিধানযোগ্য। চেয়ার, টেবিল, ফ্যান প্রভৃতির জাঁকজমক কালাপানির ওপারের চাল; চা ও চায়ের পেয়ালায় চৈনিক সভ্যতা উঁকি মারছে; চায়ের উপকরণ পাঁউরুটিতে পোর্তুগীজ বণিকের **স্মারক-চিহ্ন; সুপেয় সরবতের নামে ও গুণে আরবী সংস্কৃতির একটি** কণিকা। উপস্থিত পান-ভোজনরত ভদ্রমণ্ডলীর বেশভূষা (কোট, প্যাণ্ট, সার্ট) এবং আধা-ইংরেজী আধা-বাংলা বুলীতে খাঁটি বিলিতী নকলনবিশী। এমনকি কাফে বা রেস্তোরা নামটিও অন্য অভিধান থেকে ধার করে নেওয়া হয়েছে। হোটেল, কাফে ও রেস্তোরার জুরী এদেশে ছিল না। মুসলমান আমলের সরাইখানা (পারসীক ঐতিহ্যের নিদর্শন) ছিল [illegible] প্রকৃতিসম্পন্ন। তারও পূর্বের 'পণা' নামে অভিহিত **সাধারণ ভোজনাগার (?) সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় না।** 'পণার' ভোজনের উপর নিষেধ জারী হওয়ায় প্রতিপন্ন হয় যে, 'পণা'র সামাজিক মর্যাদা উচ্চস্তরের ছিল না।

ভাষাতত্ত্ববিদেরা সাংস্কৃতিক প্রভাবের নানা খবর সরবরাহ করেছেন। ভাষাগত বিচারে প্রমাণিত হয়েছে যে, পোর্তুগীজ বণিকদের জাহাজের কৃপায় এদেশে আতা, নোনা, পেঁপে, আনারস, পেয়ারা প্রভৃতি ফল আমদানী হয়েছে। পেঁপে ও আনারস নাকি সুদূর আমেরিকা ভূখণ্ড থেকে ইউরোপ ঘুরে ভারতে পদার্পণ করেছে। মালয় থেকে এসেছে রোগের [illegible] সাগুদানা। এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, **ফল ও পুষ্পের সাংস্কৃতিক আয়োজন আর্য ঐতিহ্যের নির্দেশ** করে না। শব্দ হিসেবে 'ফল' হচ্ছে অস্ট্রিকমূলক এবং 'পুষ্প' হচ্ছে দ্রাবিড়মূলক। আমাদের পূজা-পার্বণের জন্য অবশ্যকীয় কদলী অস্ট্রিকদের দান এবং নারিকেল দ্রাবিড়দের দান।

ভাষাগত মিলের দু'একটা নমুনোর মধ্যে খণ্ড খণ্ড ইতিহাস লুকিয়ে থাকতেও পারে। তামিল চাউলবাচক শব্দ অরিশি, আরবী উরুজ্, গ্রীক ওরিজা-এর সঙ্গে ইংরেজী rice-এর আত্মীয়তা লক্ষিত হয়েছে। এ থেকে কি আন্দাজ করা যায় যে, চাউলের ব্যবসা ভারত থেকে মধ্যপ্রাচ্যে ও ইউরোপে প্রসারিত হয়েছিল? সিল্ক, সার্জ, গ্রীক সেরিকন এর পশ্চাতে একটি ইতিকাহিনী রয়েছে। 'সের' (Ser) নামীয় কোন এশিয়াবাসী জাতি গ্রীসে রেশমী পণ্য সরবরাহ করত। অনেকে বলেন যে 'সের' হচ্ছে চীনাদের নাম। ভারতবর্ষে রেশমী শিল্প সম্ভবতঃ দ্রাবিড় কীর্তি। পট ও পাট রেশমী বস্ত্রের বাচক এবং দ্রাবিড়মূলক। ভারতাগত আর্যেরা নাকি শুধু পশমের (উর্ণার) ব্যবহার জানতেন। কার্পাসের ব্যবহার তাঁরা হয়ত শিখেছিলেন হারাপ্পা-মোহেঞ্জোদারো সভ্যতার মানুষদের কাছ থেকে।

(শেষাংশ ১৫৯ পৃষ্ঠায়)

সেবাব্রতের প্রেরণায়

SILVER JUBILEE YEAR 1959
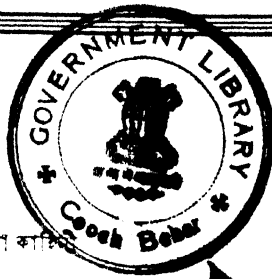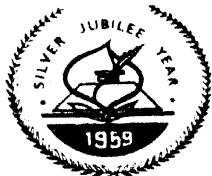
যাত্রা শুরু হয়েছিল সামান্যভাবেই, বহুসাধনের পথে বাধা-বিপত্তি ছিল অনেক। কিন্তু একদিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যেমন অন্ত ছিল না, তেমনি অন্যদিকে চল্লো দিগ্‌-বিজয়ের সংগ্রাম।

সুলেখার ... ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য নতুন একটি কারখানা গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে গবেষণার অগ্রগতিতেও বিরাম নেই। দীর্ঘ পঁচিশ বছরের সাধনায় সুলেখা আজও জাতির সেবায় রতী।

জাতির সেবায় পঁচিশ বছর

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

ফোন ঃ ২২-৩২৭৯
গ্রাম ঃ কৃষিসখা

দি ব্যাঙ্ক অফ বাঁকুড়া লিঃ

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

... লাভজনক সুদে আর সেভিংস-এ দেওয়া হয় শতকরা ২॥০ টাকা সুদ।

সেণ্ট্রাল অফিস:
৩৬ ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা—১

অন্যান্য অফিস:
বাঁকুড়া ও কলেজ ষ্ট্রীট, কলিঃ

হেড ম্যানেজার: শ্রীরবীন্দ্রনাথ কোলে

আরতী

অভিজাত প্রসাধনী

স্নো-পাউডার-আলতা
সিঁদুর ও কেশ-তৈল

'আরতী' প্রসাধন শিল্পে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক।

আরতী প্রডাক্টস
কলিকাতা—৩৬

স্মৃতিকথা

(৩৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সিনেমার প্রসারই এর প্রধান কারণ। দেশের লোকও রক্তমাংসে জীবন্ত মানুষের অভিনয় আর দেখতে চায় না—দেখতে চায় [illegible] ফোটোর অভিনয়। উপন্যাসকে কি ড্রামাটাইজ করে আসল নাটক বানানো যায়? দুই-এর রচনার টেক্‌নিকই আলাদা।

অমৃতলাল বসুর স্মৃতি-সভায় সভাপতিত্ব করতে গিয়েছিলাম। কি বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না—শিশির গিয়ে আমাকে রক্ষা করল। আমাকে আর বিশেষ কিছু বলতে হল না।

শরৎচন্দ্রের গৃহে তিন-চার বার শিশিরের সঙ্গে দেখা হয়েছে। একদিন শরৎদার উপর থেকে নামতে দেরী হচ্ছিল—শিশির তাঁর বাইরের ঘরে খাঁচার মধ্যে বাঘের মত ঘরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত জোরে জোরে পা ফেলে পর্যটন করছিল অস্থির হয়ে।

আমি বললাম—অস্থির হয়ে ঘুরছ কেন, বোসো। চিরকালই কি একভাবে যাবে?

শিশির বললে—"তুমি বুঝবে না, মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে, শান্ত হতে পারছি না যে। শরৎদা কি করছেন? অসুখ?—না এড়াচ্ছেন আমাকে? আমার একবার দেখা করতে হবেই। খোঁজ নাও না একবার।" এ হলো শিশিরের অস্থিরতা ও অসহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত।

১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটি থেকে শিশিরকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। তখন পর্যন্ত শিশিরের মনে রাজ্য সরকার সম্বন্ধে অভিমানটা প্রবল হয়ে ওঠেনি। তবু তার বক্তৃতায় অভিমানের সুরটা ধ্বনিত হয়েছিল। মাইকটা না হাতে করে দূরে সরিয়ে রেখে শিশির বক্তৃতায় আলোচনা করল নাট্য-জগতের বর্তমান অবস্থার কথা।

অহীন্দ্র চৌধুরী সভাপতিত্ব করেছিলেন। ভাষণে গুরুর প্রতি শিষ্যের নিবেদন যেরূপ হওয়া উচিত, এ-নিবেদন তাই।

আমাকে দেখে অভিমানের সুরে শিশির বলেছিল—"যাক্, তুমি এসেছ—চারিদিকে চেয়ে আমার পুরোনো বন্ধুদের খুঁজে পাচ্ছি না। যাক্‌গে সম্বর্ধনায় না এসে ভালোই করেছে।"

আমি বললাম—"সবাই তো নিমন্ত্রিত হয় না। টিকিট কিনে হয়ত ভিড়ের মধ্যে অনেকে আছে।"

পর বৎসর ঐ কমিটির দ্বারা আমি ও নরেশ মিত্র আমরা পুরোনো দুই বন্ধু সম্বর্ধিত হই।

নরেশ বলল—একা তুমিই এসেছ? শিশির এলো না?

অতুলবাবু বললেন—"তাঁকে আনতে চেষ্টার ত্রুটি হয়নি।" তিনি বললেন—"গাড়ী নেই কি করে যাব?" আমরা বলেছিলাম—"তিনি দয়া করে আসতে রাজী হলে পাঁচখানা গাড়ী পাঠাব। কিন্তু রাজী হলেন না।"

তখন শিশিরের অভিমানের পালা সুরু হয়েছে।

এইভাবে শিশিরের সঙ্গে দেখা হত আকস্মিক-ভাবে। যখনই দেখা হত, সে বলত—"কবিতা ত লিখলে বহু বৎসর ধরে? সারা জীবন কেউ কবিতা লেখে? নাটক লেখ, নাটক লেখ—ভালো নাটক চাই।"

আমি বলতাম—নাটক লেখা আমার অনধিকার চর্চা ভাই।

শিশির বলত—"কবি কথনো নাটক লেখার অনধিকারী হয়? আমি কবিতায় লেখা নাটকই চাই। তুমি লেখ,—আমি দেখেশুনে ঠিক করে দেব। তোমার উপর আমার সে অধিকার আছে।

এক কথা ঘ্যানর ঘ্যানর করে সারাজীবন ছন্দ গাঁথছ—কেউ পড়ে?"

তার অনুযোগের ভয়ে তাকে এড়িয়েই চলতে হত।

শিশির রবীন্দ্রনাথের কাব্য-নাট্য পড়ে ও কবিতার আবৃত্তি করে অভিনয়ে রোমাণ্টিক সুরটা পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতার আবৃত্তিতে সেই সুর অপূর্বভাবে পরিস্ফুট হত। কাজী নজরুলের কবিতা শিশির ভালবাসত আবৃত্তিযোগ্য বলে। বর্তমান যুগের কবিতার সম্বন্ধে সে বলত—যা আবৃত্তিতে জমানো যায় না, তা আবার কবিতা? যে কবিতা পড়লে মুখস্থ হয়ে যাবে, তাইত কবিতা।

নিজের শক্তির উপর শিশিরের অগাধ প্রত্যয় ছিল—তার স্বাতন্ত্র্যপ্রীতি ও আত্মমর্যাদাবোধ মাত্রাতীত ছিল। সে কারো তাঁবেদারি করতে বা কারো নির্দেশ মেনে চলতে পারত না। শেষ জীবনে সে অনেক কষ্ট পেয়েছে, তবু কোথাও উদ্ধত মস্তক নত করতে পারেনি। শিশিরের অসামান্য প্রতিভার অবদান বর্তমান যুগের অভিনেতাদের কৃতিত্বের অঙ্গীভূত হয়ে রইল। আজ দেশের নাট্যকলা যদি বৈরাগিণী হয়, তা হলেও শিশির নামাবলী তার অঙ্গে শোভা পাবে।

লক্ষ্মী কেবল মহিলাদের জন্যে

(৪৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বাড়ির লোকরা। ঐ দেখুন জানলার নিচে একটা কাগজের ক্লিপ পড়ে রয়েছে। হয় তো ঝাঁটিয়ে ফেলে দেবে, যদি না আমি তুলে রাখি। তিনটে ওষুধের বড়ির বাক্স আমি এই সব দিয়ে ভরে ফেলেছি। ভাঙ্গা ছুরি, কাঁচি আছে আমার একটা হাত বাক্স ঠাসা, চাবি দিয়ে রাখতে হয়। নইলে কে কখন তা থেকে সরাবে। বড়বৌমা তো বাক্সটাকে বিষ-নজরে দেখে।

ত্রিশ বছর বিয়ে হয়েছে, এই ত্রিশ বছর ধরেই এমনি করে ঘরের লক্ষ্মীশ্রী রক্ষে করে এসেছি। সবার বিরক্তির কারণ হয়েছি। কিন্তু এসব শিশি বোতল, কৌটো, কাগজ, দড়ি, হাঁড়ি, ন্যাকড়া কিছুই তো আর সঙ্গে নিয়ে যাব মনে করে জমাইনি। কুটি কুটি মোমবাতির টুকরোই আছে পঞ্চাশটা, সে সব কি আমার নিজের জন্যে রেখেছি? ঐ পুরোনো ছেঁড়া জুতোও কি আমি পরব নাকি!

যা করেন মা লক্ষ্মী। এখন পুজো লাগবার আগেই কর্তার সঙ্গে বেরুতে হবে, তীর্থে তীর্থে ঘোরা হবে কড়ি, কাঁড়ি পয়সা খরচ হবে। তা হোক গে, কিন্তু যেই না আমি বাড়ির বাইরে পা দেব, বড় বৌমাও অমনি ঐ হেমন্তীর শিশি বোতলওয়ালাকে ডেকে চেঁছে-পুঁছে সব নিকেশ করে দেবে। আমি ফিরে এসে দেখব সব খাঁ-খাঁ করছে, খাটের তলার এধার থেকে ওধার দেখা যাচ্ছে। হা ভগবান!

সন্ধ্যা হয়ে আসে

(৩৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

শক্ত হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। সন্দেহ ছিল, ও আমাকেই খুঁজছে। তাই আড়ে আড়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম, কি করে।

হাঁ, আমাকেই খুঁজছে। আমাকে দেখতে পেয়েছে। আমার দিকেই দ্রুতবেগে আসছে।

অন্যদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

মুহূর্তে মধ্যে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলে ও: করবী! কী হয়ে গেছিস! কি চেহারা হয়েছে! অসুখ-বিসুখ করেছিল নাকি?

মিথ্যে করে বললাম, হাঁ।

—দিনরাত্রি ঘরের মধ্যে, সেই আগের মতো?

—হাঁ। মাঝে মাঝে এখানে এসেও দাঁড়াই সেই আগের মতো।

—একটু বেরুস না কেন?

—কোথায়?

—সিনেমায়। কিংবা যেখানে হোক।

—কে নিয়ে যাবে?

—যাবি আমার সঙ্গে?

—না।

বরুণ কখন আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল টের পাইনি। আমাদের দুজনকেই [illegible] দিয়ে বলে উঠল: [illegible]

অবাক হয়ে ওর দিকে চাইলাম।

বরুণ জানে করুণা কেমন মেয়ে। [illegible] কোথায় থেকে আসে [illegible] লিপস্টিক। সেই বরুণ বলছে [illegible] হওয়াই স্বাভাবিক।

ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে তার দিকে চাইলাম। [illegible] করে শুনি? জামা-কাপড় কই?

বরুণের মুখ এতটুকু হয়ে গেল। [illegible] পরনে শতচ্ছিন্ন মলিন একখানা শাড়ি।

কিন্তু করুণা খিল খিল করে হেসে উঠল এই কথা! তার অসুবিধা হবে না। [illegible] এখনই আসছি।

সে হন হন করে কোথায় চলে গেল। [illegible] হয় জামা-কাপড় আনতে। মুখোমুখি আমরা দুজনে দাঁড়িয়ে। কারও মুখে কথা নেই।

অনেকক্ষণ পরে আমি জিগ্যেস করলাম, তুমি আমারে যাইতে কও?

—কই।

—তুমি করুণারে চেন না?

—চিনি। আমি তোমারেও চিনি। [illegible] পাইয়া বালোবাসা কারে কয় তাও চিনছি। [illegible] যাও। সন্ধ্যা হয়ে আসে।

স্টেশনের আলোগুলো জ্বলে উঠলো। [illegible] নয় কিন্তু দিনের মতো আলো।

দূরে দেখা গেল একটা প্যাকেট [illegible] করুণা হনহন করে আসছে। বোধ [illegible] আমার জামা-কাপড়, বরুণের অনুমতি [illegible] সে আমাকে নিয়ে যাবেই স্থির করেছে। কি এত শীঘ্র ফিরল কি করে? বোধ হয় ট্যা[illegible] করে গেল-এল।

রঙ্গমের আলমগীর (১৯৫৩)

পরিমল গোস্বামী

সম্ভব অসম্ভব

~ পশুপতি ভট্টাচার্য্য ~
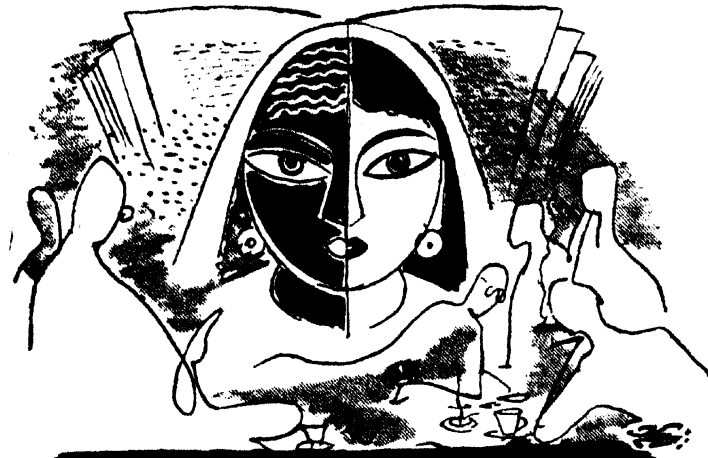
বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ার বৈদ্যনাথের বৈঠকখানায় রোজ বিকেলের পর থেকে আমাদের ব্রিজের আসর বসে। যার যখন খুশি সেখানে গিয়ে জোটে। যত বেশী রাত হয় ততই আড্ডা জমে ওঠে, রাত এগারোটা বাজার আগে তা ভাঙে না। ওখানকার আড্ডাটি এমন জমজমাট হবার কারণ, বৈদ্যনাথ এর জন্যে মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করতে কোনো দ্বিধা করে না। পান, সিগারেট, চা হরদম সাপ্লাই হতে থাকে। একজন চাকর সর্বদাই হাজির থাকে সকলের ফাইফরমাস খাটবার জন্যে। কাজেই এখানে আকর্ষণ যথেষ্ট। অনেক দূরে দূরে পাড়া থেকে আড্ডাধারী সভ্যেরা এসে হাজির হয় নিয়মিতভাবে প্রত্যহই, ঝড়জল দুর্যোগ দুর্ঘটনা কোনো কিছুতেই আটকায় না।

ব্রিজ খেলার ক্লাব হলেও ব্রিজ খেলাই যে এখানকার একমাত্র প্রোগ্রাম তা ঠিক নয়, আড্ডার স্রোত যেদিকে যেদিন গড়িয়ে যায় সেই দিকেই তাকে যেতে দেওয়া হয়। কোনোদিন বা হয়তো খেলাটাই এমন জমে উঠল যে ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে এগারোটা বাজবার পরে সকলের চৈতন্য হলো, অনেক রাত হয়ে গেছে। আবার কোনদিন বা খোসগল্পই চলতে থাকল, খেলার তাস প্যাকেটের মধ্যেই রয়ে গেল।

এই আড্ডাতে এসে যোগ দিতেন প্রৌঢ় ডাক্তার পতিতবাবু। আড্ডার সকলের চেয়েই তিনি বয়সে বড়ো। কিন্তু ডাক্তার হলেও আর বয়স বেশী হলেও তিনি গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ নন, যুবকদের হাসিঠাট্টাতেও তিনি সমানেই যোগ দিতেন। যখন তিনি আড্ডায় এসে বসতেন তখন আর তিনি ডাক্তার নন, অন্য সকলের মতো দলস্থ একজন আড্ডাধারী। তিনিও প্রত্যহই আসতেন, তবে তাঁর আসতে একটু রাত হতো। চেম্বারের কাজ শেষ ক'রে তবে তিনি আসতেন। যেদিন খেলা হতো সেদিন খেলতেই বসে যেতেন, আর যেদিন কোনো তর্ক হতো সেদিন তাতেও যোগ দিতেন।

একদিন তর্ক উঠল আধুনিক বাংলা সাহিত্য নিয়ে। একজন বললে—"আজকাল যে সব গল্প বেরোচ্ছে, একেবারে ট্রাশ। ভাষার তো কোনো মাথামুন্ডু নেই আর ঘটনাও যা থাকে একেবারে অসম্ভব। বাস্তবে যা হতে পারে না, গল্পের মধ্যে তা অনায়াসে হয়ে যাচ্ছে। এমন কি ভালো ভালো লেখকদেরও তা লিখতে আটকাচ্ছে না, আর সিনেমার কাগজগুলোতে জমকালো ছবি দিয়ে তাই ছাপা হয়ে বেরোচ্ছে। বাংলা সাহিত্য যে রসাতলে যাচ্ছে সেদিকে কারো ভ্রূক্ষেপ নেই।"

আর একজন বললে—"গল্পগুলো পড়লে মনে হয়, এখনকার কালের মেয়েরা কি এতটাই বদলে গেছে। তাদের কাছে কোনো প্রস্তাবনারও দরকার হয় না, পছন্দ অপছন্দেরও দরকার হয় না, সম্ভব অসম্ভব কোনো কিছুই ভাববার দরকার হয় না। পুরুষ দেখলেই তাদের মনের মধ্যে প্রেম গজিয়ে ওঠে, আর অমনি সুড় সুড় ক'রে তার দিকে এগিয়ে আসে। যাকে বলে কুলকাকুড় জ্ঞানটাও নেই।"

ডাক্তার পতিতবাবু এতক্ষণ চুপ ক'রে বসে শুনছিলেন। তাঁর মত চাওয়া হলে তখন তিনি বললেন—"সাহিত্যের দিকের ভালোমন্দ নিয়ে বিচার করতে যাওয়া আমাদের উচিত হয় না, সে বিচার সাহিত্যিকরাই করবে। যার যে লাইন, সে কেবল তার সম্বন্ধেই বলতে অধিকার রাখে। আমরা হচ্ছি পাঠকের দলে, আমরা কেবল এইটুকুই বলতে পারি যে, ভালো লাগল কিংবা লাগলো না। তবে অসম্ভব ব্যাপার শুধু গল্পেই কেন, বাস্তবেও অনেক রকম হয় বৈকি। তোমাদের তর্কগুলো শুনতে শুনতে আমার একটা সত্যিকার ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। এতদিন তা ভুলেই গিয়েছিলাম, এখন হঠাৎ সব মনে পড়ে যাচ্ছে। এর আগে হলে তা বলাই যেতো না, কিন্তু এখন আর বলতে কোনো বাধা নেই। তোমাদের সে গল্প বলি শোনো।"

"ডাক্তারি করতে করতে অনেক রকম লোকের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় হয়ে যায়। আমাদের পাড়াতে এক উকিল ভদ্রলোক ছিলেন। ইনকমট্যাক্সের উকিল, সেদিক দিয়ে খুব বেশী আয় হতো না। কিন্তু তিনি খুব চালাক চতুর মানুষ ছিলেন, অন্যদিক দিয়ে বেশ গুছিয়ে নিয়েছিলেন। মক্কেলদের টাকা নিয়ে জমি কেনাবেচার কাজ, তেজারতির কাজ এই সব তিনি করতেন। সুবিধা পেলে তাদের ফাঁকি দিয়ে নিজেও বেশ কিছু ক'রে নিতেন। এমনি ক'রে তাঁর ব্যাঙ্কেও বিলক্ষণ সঞ্চয় জমেছিল, একখানা মোটরগাড়িও হয়েছিল। কিন্তু একটি ছোটো বাচ্চা রেখে তাঁর স্ত্রী হঠাৎ মারা গেলেন। তিনি তখন আবার একটি বিয়ে করতে উৎসুক হয়ে উঠলেন। সকলের কাছে বলে বেড়াতে লাগলেন, একটি বড়োসড়ো শক্তসমর্থ মেয়ে পেলে এখনই তিনি বিয়ে করতে রাজী আছেন। পয়সাকড়ি কিছুই চাই না, এমনকি গহনাপত্রও দিতে হবে না, তিনি নিজেই তা গড়িয়ে দেবেন। আমার কাছে এসেও এই সব কথা অন্তরঙ্গভাবে প্রকাশ ক'রে তিনি বললেন, "আপনি আমার জন্যে এমনি একটি ভালো মেয়ে দেখে দিন না।"

"একজন প্রবীণ ডাক্তারকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম। তাঁর এক বিবাহযোগ্য মেয়ে ছিল, তার কথাই আমার স্মরণ হয়ে গেল। ভদ্রলোক ছিলেন অতি গোবেচারা ভালোমানুষ গোছের, উপার্জন বিশেষ কিছুই হতো না, কোনো গতিকে সংসার চালাতেন। তিনি যথেষ্টই জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু তাঁর সততা ছিল অপরিসীম। এই কারণেই তাঁর দুর্দশার অন্ত ছিল না। এমনকি মেয়েটিকে ম্যাট্রিকের পরে কলেজেও পড়াতে পারেননি, কিংবা ভালো একটি বর জুটিয়ে বিয়ে দিতেও পারেননি। মেয়ের বয়স ক্রমশঃ বেড়েই যাচ্ছিল, তাছাড়া সে দেখতেও তেমন সুন্দরী নয়। কিন্তু মেয়েটি বুদ্ধিমতী। দেখতে একটু কালো হলেও নাম তার সুবর্ণা, ডাকনাম রুবি। বোধ করি সুবর্ণা থেকে সুবি, তার থেকে রুবি। মেয়েটি আমাকে ডাকতো বড়দা বলে। তার দাদাও আমাকে তাই বলে ডাকতো। ওদের বাবা আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো ছিলেন, গুরুজনদের মতো ভেবে তাঁকে আমি প্রণাম করতাম। সেই কারণেই আমি ওদের বড়দা' হয়েছিলাম। মাঝে মাঝে ওঁদের বাড়িতে আমার যাতায়াত ছিল।

"আমি সেই উকিল ভদ্রলোকের প্রস্তাবটি ওঁদের কাছে শোনালাম। প্রবীণ ডাক্তার ভদ্রলোক এ প্রস্তাব শুনেই তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলেন। তিনি যেন অকূলে কূল পেলেন। কিন্তু রুবির মা আপত্তি করতে লাগলেন। মেয়ের দোজপক্ষে বিয়ে দিতে কোনোমতেই তিনি রাজী নন। আমি তাই শুনে চলে এলাম।

"কিন্তু দুদিন পরেই ওঁরা আবার আমাকে ডেকে পাঠালেন। গিয়ে শুনলাম যে মেয়ে নিজেই এখানে বিয়ে করতে চাইছে। কি কারণে তার এই বিয়েতে এতটা আগ্রহ হলো তা যদিও সে বলেনি, কিন্তু তার নিজের যখন মত রয়েছে,

আর তার বাপেরও মত রয়েছে, তখন মায়ের আপত্তি আর টিকলো না।

"অতএব ঐখানেই সেই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। গরিবের ঘর থেকে ধনীর ঘরে এসে তার সাজগোজ চালচলন সমস্তই বদলে গেল। আমি দেখেশুনে ভাবলাম, এইজন্যেই এখানে ওর বিয়েতে এত আগ্রহ হয়েছিল।

"কিন্তু পরে ক্রমশঃ দেখলাম যে তা নয়, ঐশ্বর্যে ওর কোনো পরিতৃপ্তি নেই। বাইরে যদিও সাজেগোজে, সবই করে, কিন্তু ভিতরে ওর কোনো সুখ নেই। দেহেও নেই, আর মনেও নেই।

"কেমন করে এত কথা বুঝলাম? বিয়ের পর থেকে প্রায়ই আমাকে ওদের বাড়িতে যেতে হতো। প্রায়ই ওর শরীর খারাপ হতো, আর একটু কিছু হলেই আমার ডাক পড়তো। তাই মাসের মধ্যে দু'চারবার সেখানে যাতায়াত করতেই হতো। ফী নিতে আমি কিছুতেই রাজী হতেম না, কারণ একে ডাক্তারের মেয়ে, তার আগের থেকে পরিচিত, তার শ্বশুরবাড়িতে তার জন্যেই গিয়ে টাকা নিই কেমন করে। কিন্তু ওর স্বামী কিছুতে ছাড়তো না, মোটরের তেলের দাম বলে আমার পকেটে টাকা গুঁজে দিতো। সেটা আবার পকেট থেকে বের করে নিয়ে ফেরত দেওয়া নিতান্ত অভদ্রতা বলে হয়। কাজেই তা নিয়ে নিতাম।

"যাই হোক, পাঁচবার যেতে যেতেই ওর অবস্থাটা আমি আন্দাজ করে নিলাম। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হওয়াতে যেমন আদর আব্দার পাওয়া উচিত ছিল, তা ও পায়নি। শ্বশুরবাড়িতে কর্ত্রী হয়ে থেকেও ও কোনো স্বাধীনতা পায়নি। ওর স্বামীই বাড়ির সর্বময় কর্তা, তার হুকুমেই সকলকে চলতে হয়, এমনকি ঐ মেয়েকে পর্যন্ত। লোকটা যাকে বলে বদ্রাগী, অত্যাচারী। নির্বিচারে সকলকেই গালমন্দ, চাকর থেকে শুরু করে বাড়ির গৃহিণীকে পর্যন্ত। তেড়ে তেড়ে আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলে, মন থেকে চুণটি খসলে কাউকে রেহাই দেয় না। তা ছাড়া পানদোষও কিছু আছে, অন্যরকম দোষও থাকতে পারে। সে যে স্ত্রীকে ভালোবাসে না তা নয়, কিন্তু সে যেন ধরে আনা শিকারের প্রতি শিকারীর ভালোবাসা। কেনা বাঁদীর প্রতি মনিবের ভালোবাসা।

"কিন্তু বেচারা রুবি মুখ বুজে সবই সহ্য করতো, কথাটি পর্যন্ত বলতো না। একদিন ওর স্বামী আমার সামনেই ওকে যাচ্ছেতাই করে গঞ্জনা করলে, সামান্য কি একটা ত্রুটি হয়েছিল তারই জন্যে। বোধ করি ইচ্ছে করে আমাকে দেখিয়ে দেখিয়েই সেটা করলে। সেখানে আমিও কিছু বলতে পারলাম না, আর সেও চুপ করে রইল।

"আমার মনে একটা খোঁচা লেগে রইল। বিয়ের সম্বন্ধটা আমিই করেছিলাম, ওর মনতরো দুঃখ পাবার জন্যে আমিই কতকটা দায়ী। ওকে হয়তো সারাজীবন ধরেই এমনি দুঃখভোগ করতে হবে। কিন্তু কি আর করা যাবে।

"কিন্তু টাকা খরচ করা সম্বন্ধে ওর যথেষ্টই স্বাধীনতা ছিল। যেমন ভাবে খুশি ও অর্থব্যয় করতে পারতো। সেদিক দিয়ে কোনো বাধা ছিলনা, কিসে টাকা খরচ করেছে তার জন্যে কখনো কৈফিয়ৎ দিতে হতো না। পুজোর ছুটিতে আর বড়দিনের ছুটিতে ওকে নিয়ে ওর স্বামী চেঞ্জে যেতো, নানাদেশ ঘুরে আসতো। আর ও যেখানেই যেতো সেখান থেকেই আমার জন্যে কিছু-না-কিছু উপহার সামগ্রী কিনে আনতো। ওর স্বামীর হাত দিয়েই তা আমার কাছে পাঠিয়ে দিতো।

"আমি আশ্চর্য হয়ে দেখতাম, আমার পক্ষে যেমন যেমন জিনিস কাজে লাগবে, ঠিক সেই ধরণের জিনিসই সে আমার জন্যে কেনে। একবার দিল্লী থেকে জার্মাণ মেকারের এক দামী ফাউন্টেন পেন কিনে আনলে। লক্ষ্ণৌ থেকে কিনে আনলে রূপোর উপর মিনার কাজ করা এক ফরশি, আমি বাড়িতে তামাক খেয়ে থাকি সে কথাটি সে জানে। একবার আনলে হাতির দাঁতের একটি মস্ত হাতি, আমার টেবিলে সাজিয়ে রাখার জন্যে। আর ফুলদানি প্রভৃতি আনতোই রকম রকম, আমি ফুল ভালোবাসি তাও সে জানে। আমি ভাবতাম, এগুলো ওর কৃতজ্ঞতার নিদর্শন।

"কিন্তু কিছুকাল পরে আমাদের পাড়া থেকে ওরা উঠে গেল। এখানে থাকতো ভাড়াবাড়িতে। বালিগঞ্জে জমি কিনে নতুন বাড়ি তৈরি করে সেখানেই ওরা বাস করতে লাগল। আমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেল।

"কিন্তু রুবির অসুখ-বিসুখ হলে সেখানেও আমাকে যেতে হতো। যাবার জন্যে ওরা নিজেদের গাড়ি পাঠিয়ে দিতো। প্রত্যেক বারেই গাড়িতে আসতো একটি করে ফুলের তোড়া, ওদের নিজেদের বাগানের ফুল।

"এমনি ভাবেই কিছুকাল চলল। তারপর রুবির একটি ছেলে হলো। সেই ছেলে হবার পর থেকেই ওর অসুস্থ হওয়ার মাত্রা যেন আরো বেশী বেড়ে গেল। প্রায়ই ভোগে, প্রায়ই ভোগে, নিত্য নানাবিধ অনির্দিষ্ট ব্যাধি। অরুচি, অক্ষুধা, পেটে ব্যথা, নার্ভের দোষ, নাড়ির দোষ। কত কি।

"আমি বললাম, ডেলিভারির পরে কেমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তা জানবার জন্যে ওর স্ত্রী-যন্ত্রগুলি পরীক্ষা করা দরকার। একজন বড়ো ডাক্তারকে এনে দেখিয়ে নেওয়া হোক। কিন্তু ও কাউকেই দেখাতে রাজী নয়। ওর স্বামী বললে, আপনারও তো স্ত্রীরোগের চিকিৎসায় কিছু সুনাম আছে, আপনিই পরীক্ষা করুননা। কিন্তু ও তাতেও রাজী হলো না। এমনই ওর লজ্জা সঙ্কোচ যে বুক পরীক্ষা করাতেও ওর মহা আপত্তি হয়। অনেক কষ্টে কাপড়চোপড়ের আবরণের উপর থেকেই ওকে পরীক্ষা করতে হয়। অথচ আমি ওর চেয়ে বয়সে কতই বড়ো, আর কতদিন থেকেই আমাকে দেখছে।

"অবশেষে ও নিজেই একদিন পরীক্ষা করাতে রাজী হলো। কিন্তু বললে, এখানে পারবো না, একদিন আপনার প্রাইভেট চেম্বারে যাবো, সেখানে যা হয় করবেন।

"তাই হলো, একদিন সন্ধ্যার পরে ও আমার চেম্বারে এসে হাজির হলো। সঙ্গে এসেছে ওর স্বামী। তাকে বাইরে বসিয়ে রেখে আমি ওকে মেয়েদের জন্যে আলাদা পরীক্ষার ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলাম।

ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজাটি বন্ধ করতেই ও বললে—"ছিটকিনি এঁটে দিন। নইলে এখানে হঠাৎ কেউ ঢুকে পড়তে পারে।"

আমি বন্ধ দরজার উপর পর্দা টেনে দিয়ে বললাম—"এ ঘরে ছিটকিনি নেই। কিন্তু তোমার কোনো ভাবনা নেই, আমার প্রাইভেট পরীক্ষার ঘরে এসে ঢুকবে এমন সাহস কারোরই হবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।"

তখন সে বললে—"কিন্তু আমার যে অনেক বলবার কথা আছে; উনি (অর্থাৎ ওর স্বামী) বাইরে বসে আছেন, কথা বললে উনি যদি শোনেন!"

আমি বললাম—"দেখছ না, এ ঘর চারদিকেই আঁটাসাঁটা, এখানে চেঁচিয়ে কথা বললেও তা বাইরে থেকে শোনা যায় না। তোমার যা বলার থাকে নিঃসঙ্কোচে আমায় বলতে পারো।"

"তবে নিঃসঙ্কোচেই বলি?" এই কথা বলতে বলতে অকস্মাৎ সে কেঁদে ফেললে। আর সঙ্গে সঙ্গেই মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বললে—"এতদিন পর্যন্ত চেপে চেপে আছি, কিন্তু আজ আর না বলে থাকতে পারছিনা। আপনিই আমার আরাধ্য, আপনিই আমার সব কিছু, আপনাকেই আমার সমস্ত হৃদয় নিবেদন করেছি। আপনার জন্যেই আমি এতদিন পর্যন্ত এমন করে বেঁচে আছি, নইলে—"

ও যে কি বলছে আর কি বলতে চাইছে, প্রথমটায় তা আমি বুঝতেই পারলাম না। ডাক্তার দেখাতে এসে, এ সব কি কথা? এ মেয়ে আমাকে বলে কি? আমার মশাই পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে, ঘাড়ের চুল সব সাদা হয়ে গেছে, ঐ ধরনের কথা শোনবার কিম্বা বোঝবার মতো বয়সই আমার নয়। এ সব কি আবোল-তাবোল ও বকছে।

আমি ওকে একটু ধমক দিয়ে বললাম—"কি যা তা বকছ? তোমার মাথা খারাপ হলো নাকি? ও কথা ছেড়ে তোমার রোগের কথা বলো। ওঠো ওঠো, ওখান থেকে উঠে এইখানে বোসো।"

ঘরের ভিতরকার নীচু টেবিলের উপর রেক্সিনমোড়া গদিটাতে তাকে হাত ধরে বসিয়ে দিলাম। চোখ মুছতে মুছতে সে উঠে বসলো। আমি বললাম—"এইবার বলো, তোমার রোগের সম্বন্ধে যদি কিছু বলবার থাকে।"

সে বললে—"এই তো আমার আসল রোগের কথা বলছি, এর থেকেই শরীরে আমার যা কিছু রোগ হচ্ছে। আমাদের জাতের শরীরের চেয়ে মনটাই বড়ো, মন অসুস্থ হলেই তার থেকে শরীর অসুস্থ হয়। আপনাকে আজ আমার মনের ভিতরকার কথা খুলেই বললাম, আপনিই আমার জীবনদেবতা। আপনি আমার মনের কষ্ট সারিয়ে দিন, তাহলেই শরীরের কষ্টও সেরে যাবে।"

আমি বললাম—"এ তুমি কি পাগলের মতো বলছ? তাই কখনো সম্ভব?"

সে বললে—"আপনি হয়তো কিছু ভুল বুঝেছেন। আমি আপনার কাছে অন্য কিছুই চাইছি না, কোনো কিছু চাইতে আমি আসিনি। কেবল এইটুকু চাই যে, আপনি বলুন, আমার অন্তরের ভালোবাসার নিবেদন আপনি গ্রহণ করলেন।"

আমি বললাম—"তোমার স্বামী থাকতে আমি কেন তোমার ভালোবাসা গ্রহণ করতে যাবো? তাঁরই ওতে ন্যায্য অধিকার। ওঁকে তুমি ভালোবাস না?"

সে একটু হাসলে। হেসে বললে—"ঐ মানুষকে ভালোবাসা যায় নাকি? যিনি আমার

আগে ছিলেন তিনিও পারেন নি। তা ছাড়া আমার পক্ষে তার তো কোনো উপায়ই নেই। ও'কে চোখে দেখার অনেক আগের থেকেই আপনাকে দেখে আমার মধ্যে যা হবার ছিল তা হয়ে গেছে। ও'কে আমি যথেষ্টই শ্রদ্ধা ভক্তি করি, আমাকে উনি খেতে পরতে দেন, আমার জন্যে অনেক কিছুই করেন, ও'র কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ। কিন্তু মনের ভালোবাসা হলো আলাদা জিনিস, সে এক অন্য রকমের ফুল। জানেন তো, অনেক এমন ফুলগাছ আছে যাতে কেবল একটি মাত্রই ফুল ফোটে, তার বেশী আর ফোটে না।"

আমি বললাম—"কিন্তু তাহলে তুমি নিজে ইচ্ছে করে এখানে বিয়ে করতে চাইলে কেন? তারই বা কারণ কি?"

সে আবার একটু হাসলে। হেসে বললে—"আপনিই যে এই সম্বন্ধটা এনেছিলেন, তাই। এখানে বিয়ে হ'লে আপনাকে আর একটু কাছে পাবো, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করলে আপনাকে দেখতে পাবো। মনে মনে বললাম যে, মরবার সময় পর্যন্ত আমার শিবের কাছাকাছি থাকবার জন্যে আমি এবার কাশীবাস করতে যাচ্ছি।"

ও যতই বেশী স্পষ্ট ক'রে বলুক, আমার ততই বেশী এ সব কথা যেন বিষের মতো লাগছিল। আমার নৈতিক বুদ্ধি আর পাপ-পুণ্যের সংস্কার ভিতর থেকে যেন টনটন ক'রে উঠছিল। তাই আমি বললাম—"এসকল কথা তোমার বলাও উচিত নয়, আর ভাবাও উচিত নয়। মনে তো কত রকমের কথাই আগাছার মতো গজিয়ে ওঠে, কিন্তু মন থেকে তাকে উপড়ে ফেলা উচিত।"

সে তেমনি ভাবেই একটু মলিন হেসে বললে—"এ তেমন আগাছা নয় বড়দা, এ একেবারে মস্ত বড়ো গাছ। এর শিকড় অনেকদূর পর্যন্ত ঢুকে চলে গিয়েছে। তাকে কখনো কি টেনে বের ক'রে দেওয়া যায়! তাকে ওপড়াতে হলে গোটা গাছ সুদ্ধ উপড়ে ফেলতে হয়।"

আমি বললাম—"কিন্তু তোমার এ সব কথা কানে শোনাও আমার উচিত হচ্ছে না। আমি একজন সংসারী মানুষ, ঘরে আমার স্ত্রী রয়েছে ছেলেপুলে রয়েছে—"

সে বললে—"তাতে কি হলো? ঘরে স্ত্রীপুত্র থাকলে কি আর অন্য কাউকে একটুখানি ভালোবাসা যায় না? অন্য কেউ ভালোবাসলে তা কি নেওয়াও যায় না, হাত দিয়ে ছোঁয়াও যায় না?"

আমি বললাম—"না, তাও যায় না। তাতেও যথেষ্ট অন্যায় কাজ হয়, পাপ হয়।"

সে অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—"এ জিনিসকে আপনি অন্যায় বলছেন, পাপ কাজ বলছেন! শুধু একটু মুখের কথা যে আমার নিবেদনটুকু আপনি গ্রহণ করলেন—"

আমি বিরক্ত হয়ে মাথা নেড়ে বললাম—"না, তাও আমি বলতে পারি না। চলো চলো, এ-ঘর থেকে বেরিয়ে চলো, অনেকক্ষণ হয়ে গেছে—"

সে আবার আমার পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে বললে—"আপনি নাই নিলেন, নাই নিলেন, তবু আমার দেওয়া রইল। আপনি আমাকে ঘৃণা করুন, অপমান করুন, মেরে তাড়িয়ে দিন, তবু আমার দেওয়া রইল। আমি ফিরে যাচ্ছি, কিন্তু আমার দেওয়া ফিরবে না। আমার সকল কথা এই আপনাকে শুনিয়ে দিলাম সকল দেওয়া এই আপনাকে দিয়ে দিলাম।"

সে বার বার আমার পায়ে মাথা কুটতে লাগল। আমি বিরক্ত হয়ে বললাম—"আচ্ছা, আচ্ছা, এবার বাইরে চলো, তোমার মাথার ঠিক নেই।"

সে জলভরা চোখে আমার দিকে চেয়ে বললে—"আমার মাথা খুব ঠিকই আছে, কেবল বুকে বড্ড কষ্ট হচ্ছে।"

আমি বললাম—"তার আমি ব্যবস্থা করছি। এই বেসিনে জল রয়েছে, ভালো ক'রে মুখেচোখে জল দিয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছে ফেল। ঐ আয়না রয়েছে, মাথার চুলটুলগুলো ঠিক ক'রে নিয়ে চলে এসো।"

ওর আগে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গম্ভীরভাবে প্রেসক্রিপশন লিখতে বসলাম। সেটি ওর স্বামীর হাতে দিয়ে বললাম—"বিশেষ কিছু হয়নি, এই ওষুধেই উপকার হবে। ওর মনকে একটু ভুলিয়ে রাখা দরকার।"

কিন্তু দু'তিন মাস পরেই মেয়েটি মারা গেল। কঠিন নিউমোনিয়া হয়েছিল। শুনলাম যে ইদানীং খুবই অত্যাচার করতো, বৃষ্টিতে ভিজতো, ভিজে কাপড়ে থাকতো। মরবার সময়ে আমি উপস্থিত ছিলাম। শেষকালে আমার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই তার চোখ দুটো বুজে গেল, স্বামীর দিকে একবারও চাইলে না।

তাই বলছি, মেয়েদের কাছে সম্ভব অসম্ভব বলে কিছু নেই। আর ওদের মতো নিজেকে হারিয়ে কেউ ভালোবাসতেও পারে না।"

ঠাকুরঝি'র বিয়ে

(৬৭ পৃষ্ঠার পর)

লীলা বলিল, আপনি আমাকে চিনলেন কি করে, তাই ভাবছি। দাদার বিয়ের সময় দেখেছিলেন, তার পরে আর আমাদের দেখা হয়নি।

দেখা না হলেও মনে কি থাকতে নেই?

শুনুন, আমাদের বাড়ীর কাছে এসে পড়েছি। গাড়ী থামান।

কেন? সে কথা এখন থাক। আপনাকে আমি একটা অনুরোধ করছি, আমার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে, একথা শাশ্বতীকে জানতে দেবেন না।

কেন?

সে কথা বুঝিয়ে বলতে সময় লাগবে। আর একদিন হবে। বলুন, আপনি আমার কথা রাখবেন।

আচ্ছা, রাখব।

লীলা গাড়ী হইতে নামিল। পরবর্তী শনিবারে আবার ঠিক একই স্থানে তাহাদের সাক্ষাৎ হইবে, এইরূপ স্থির করিয়া বিভাসের গাড়ী অদৃশ্য হইয়া গেল। লীলাও বাড়ী ফিরিল।

ইহার পর মধ্যে মধ্যে বিভাস তাহার ভগিনী শাশ্বতীদের বাড়ী বেড়াইতে আসে। কিন্তু লীলার সহিত কোন কথা বলে না। লীলার সহিত বিভাসের দেখা হয় মাঝে মাঝে, বোধ হয় মনের কথার বিনিময়ও হয়। ইহার পরই রটিয়া যায় লীলার বিবাহের কথা। ইহার পর হইতে বিভাস শাশ্বতীর বাড়ীতে কচিৎ আসে। নিজের বাড়ীতেও বিভাস লীলার কথা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করে না।

একদিন কথাচ্ছলে সুরেশ শাশ্বতীকে বলিয়াছিল, আচ্ছা, তোমার দাদা এখন ভাল চাকরি করেন। একটু বলে দেখ না, যদি লীলাকে তার পছন্দ হয়। অমন গুণের মেয়ে কেউ অপছন্দ করতে পারে না।

তোমার বোনের মত অমন গুণের মেয়ে গণ্ডায় গণ্ডায় পাওয়া যায়। আমার দাদা অমন চাকরি করেন, গাড়ী করেছেন, শিগ্‌গিরই আমাদের পুরোনো বাড়ী ছেড়ে একটা ভাল বাড়ীতে যাবেন, তিনি কেন বিয়ে করতে যাবেন একটা হাঘরের মেয়েকে! তুমি অমন কথা মুখে আনলে কেমন করে তাই ভাবছি।

সুরেশ ইহার পর এবিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করে নাই। একথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া শাশ্বতী লীলাকেও শুনাইয়া দিয়াছে।

মাঝে মাঝেই লীলার অফিস হইতে ফিরিতে দেরি হইতেছে। শাশ্বতী চটিতেছে এবং ঠাকুরঝি'র বিয়ের গুজব রটিতেছে।

একদিন লীলা অফিস হইতে আর বাড়ী ফিরিল না।

শাশ্বতী সুরেশকে বলিল, তোমার গুণের বোনের ধাক্কা এইবার সামলাও।

সুরেশ বলিল, লীলা কোন অন্যায় কাজ করেছে বলে আমি এখনও বিশ্বাস করি না। দেখি, খোঁজ-খবর করে।

কোন খোঁজ খবরই সেদিন পাওয়া গেল না। পরদিন সকালে একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল সুরেশদের বাড়ীতে। গাড়ীখানা বিভাসের। গাড়ী হইতে যাহারা নামিল তাহাদিগকে দেখিয়া শাশ্বতী ও সুরেশ স্তম্ভিত হইয়া গেল। নূতন বরের বেশে বিভাস আর নূতন বধূর বেশে লীলা। অমিয় এবং কমলা ছুটিয়া আসিয়া লীলাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, পিসিমা, তুমি আমাদের ফেলে কোথায় গিয়েছিলে? এমন সুন্দর জামা-কাপড় কোথায় পেলে?

সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কাল ছিলে কোথায়? তোমাদের বাড়ীতে খোঁজ করে তো পেলাম না।

বিভাস বলিল, মা এখনো কিছু জানেন না। আমরা একটা হোটেলে উঠেছি।

তারপর শাশ্বতীর দিকে চাহিয়া বিভাস বলিল, তুমি যাও না একবার মার কাছে। বুঝিয়ে শুঝিয়ে ঠিক কর। ততক্ষণ আমরা না হয় এখানেই আছি।

লীলা নির্বাক। শাশ্বতী কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সুরেশ ঈষৎ প্রসন্ন। অমিয় এবং কমলা আহ্লাদে নৃত্যপর। কেহই কিছু বলে না দেখিয়া বিভাস অগত্যা নিজেই একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িল।

'তোদের জন্য কি এনেছি, দেখে যা' এই কথা বলিয়া লীলা অমিয় এবং কমলাকে টানিয়া লইয়া নিজের শোবার ঘরে চলিয়া গেল। যাইবার সময়ে বিভাসকে একটু গোপন চোখে ইঙ্গিত করিল কি না বোঝা গেল না।

শাশ্বতী দেখিল, সুনন্দাদের জানালায় মেয়েপুরুষের ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে।

একটি প্রাচীর চিত্র

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মসৃণ দেয়ালের গায়ে খড়ি আর পেন্সিলের ছক-কাটা ঘরগুলো রঙে রঙে ভরাট হতে থাকে। গণেশের মনে হয়, রঙে-রসে ভরাট হতে থাকে, রঙে-ঢঙে ভরাট হতে থাকে। কাঁধ-উঁচু বিবর্ণ একটা টুলে বসে তুলি চালায় নিরঞ্জন। গণেশচন্দ্র মাথায় ছাতা ধরে, রঙের গেলাস বদলে দেয়, তুলি ধুয়ে দেয়। আর সশ্রদ্ধ নিষ্ঠায় ওস্তাদের তুলি চালনা দেখে।

মোটা তুলির ঘায়ে নারী দেহের আভাস স্পষ্ট আর উগ্র হতে থাকে। তুলি থামিয়ে মাঝে মাঝে দেখে নিরঞ্জন। হাতের ফোটোগ্রাফের সঙ্গে মেলায়। একটা চোখ বুজে যায় প্রায়ই, দুই চোখে যেন খুঁটিয়ে দেখা সম্পূর্ণ হয় না। হ্যাংলার মত হুমড়ি খেয়ে পড়ে রাস্তার লোক। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সকৌতুকে লাস্যময়ী নারীদেহ-রচনার স্থূল কারিগরি দেখে। তবে নিরঞ্জনের বিরস ভ্রূকুটি অথবা গণেশের গোল চোখের নীরব তর্জনে বেশি কাছে এসে কাজের ব্যাঘাত ঘটায় না তারা।

নিরঞ্জন হাতের ছবি দেখে আর তুলি চালায়, ছবি অনুযায়ীই আঁকতে হয় দেয়ালের প্রচার চিত্র। সব পার্টিরই সেই নির্দেশ। ছবির মত করেই আঁকে নিরঞ্জন। কিন্তু তার মধ্যেই আরো বাড়তি কিছু মেশাতে পারে, আরো জীবন্ত কিছু। নারী দেহের অংশবিশেষে বেপরোয়া তুলি চালায়, মুখের আদলে এক ধরনের স্থূল আমন্ত্রণ মেশায়, শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে রমণী-মাধুর্যের বিলোল রেখাগুলো যৌবন-তটের সীমানা উপচে উঠতে চায়।

নারী মূর্তি মনের মত রেখা-বন্দিনী হল কি না, সেটা আঁকার দিকে নয়, মানুষটার মুখের ওপর এক নজর চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারে গণেশচন্দ্র। শেষের দিকে তুলি আর তেতো দ্রুত চলে না নিরঞ্জনের। একটা দুটো করে আঁচড় ফেলে আর দেখে। একটা চোখ বুজে যায় ঘন ঘন। অন্য চোখটা জোরালো হয়ে ওঠে। তুলির বাঁট কোলের ওপর রেখে নিজের অগোচরে হাফ-শার্টের পকেট হাতড়ায়। বিড়ি আর দেশলাই উঠে আসে। খোঁচা-খোঁচা দাড়িভরা মুখে এক ধরনের হাসির আভাস দেখা দেয়। গণেশচন্দ্রের মনে হয় শুধু চোখ দুটো হাসে আর তার ছটায় গোটা মুখটা ওরকম দেখায়। নিরঞ্জন বিড়ি টানে আর চেয়ে চেয়ে দেখে। শিকারী যেন তার শিকারকে আওতার মধ্যে ফেলে শ্রান্ত তুষ্টিতে দুচোখ ভরে লেহন করে। তারপর বিড়ি ফেলে তুলি ধরে আবার। আর সবশেষে এই সমস্ত নারী-প্রাচুর্য কেমন করে যেন এক ধরনের কমনীয়তার আবরণে আটকে ফেলে সে।

এইখানেই সব থেকে বড় বাহাদুরী আর বড় কারিগরি নিরঞ্জনের। নইলে হয়ত অশ্লীলতার দায়ে মোটা জরিমানা হয়ে যেত তার অনেক পার্টির, আর নিজের পসারেও ভাঁটা পড়ত। তার বদলে হোমরাচোমরা চিত্র-নির্মাতাদের ঝকঝকে গাড়িগুলোকে যখন-তখন এসে থামতে দেখা যায় নিরঞ্জন বাগচীর নোনাধরা বসত-ঘরের সামনের ঘুপচি গলির মুখে। তাঁরা জানেন, লোকটার মেজাজ চড়িয়ে দিতে পারলে কাজ হয়। অতি বড় মুখচোরা পথচারীও প্রেক্ষাঘরের প্রাচীর চিত্রের দিকে এক নজর থমকে না তাকিয়ে পারে না। পথ-চলতি অনেক রূপসী মেয়েরও গোপন নিঃশ্বাস পড়ে।

নিজের কদর জানে নিরঞ্জন। তাই তার মেজাজ কড়া, দাম চড়া। অন্যান্য প্রাচীর-চিত্রকরের প্রায় ঈর্ষার পাত্র সে। এ-হেন ওস্তাদের সাগরেদ গণেশচন্দ্র, সতীর্থদের কাছে তারও মর্যাদা কম নয়।

কিন্তু ওস্তাদের কাণ্ড-কারখানা দেখে এই গণেশচন্দ্রই আজ কেমন যেন হকচকিয়ে যাচ্ছে। নিরঞ্জনের হাতের ফোটোখানা অবশ্য এখনো দেখার সুযোগ হয়নি তার। কিন্তু দেয়ালের গায়ে ক্রমশ যে রূপের প্রতিফলন ঘটছে, ফোটোতে তাই আছে বলে তো মনে হয় না। ফোটো না দেখুক, বাবুদের মুখের কথা শুনেছে। তাছাড়া লাইনের খবর-বার্তাও রাখে। কাল সেই নতুন ছবির শুভারম্ভ, যে ছবির প্রচার-সমারোহ শুরু হয়েছে প্রায় দুমাস আগে থেকেই। এক নবাগতা শিল্পীকে নিয়ে বেশ একটু ঔৎসুক্য দেখা যাচ্ছে ভাবী দর্শক-চিত্তে। নব-নায়িকাটির সম্বন্ধে শুধু কানে শুনেই ক্ষান্ত হয়নি গণেশচন্দ্র। চিত্র প্রস্তুতির সময় স্টুডিওতে গিয়ে স্বচক্ষে একদিন দেখেও এসেছে তাকে। যতটা রটেছে ততটা না হোক, কিছু তো বটেই!

বাবুরা ডেকে পাঠাননি নিরঞ্জনকে, মস্ত গাড়ি চেপে নিজেরাই এসেছিলেন চার-পাঁচ দিন আগে। সন্ধ্যার একটু পরেই। এঁদো গলি পেরিয়ে টিমটিমে আলোর খুপরি ঘরে নড়-বড়ে চৌকিটার ওপরেই বসেছেন পরমানন্দে। কথা পাড়ার আগেই একটা খাঁটি বিলিতি বোতল উপহার দিয়েছেন নিরঞ্জনকে। তারপর ফোটো বার করেছেন গোটাকতক। আর যা বলেছেন তার সারমর্ম, ফোটোতে আসলের কিছুই ওঠেনি—ক্যামেরা তো আর যাদু জানে না নিরঞ্জনের মত, ইত্যাদি—।

সব পার্টির মুখেই এ ধরনের কথা শুনে অভ্যস্ত নিরঞ্জন। কিছু না বলে ফোটো হাতে নিয়েছে। প্রথমেই নাচের ফোটো একটা। কোনো জম-জমাট দৃশ্যে প্রগলভ সমর্পণের ভঙ্গিতে নৃত্যরতা এক নারী। এটিই প্রধান প্রচার-চিত্র হবে।

৭

গণেশচন্দ্র লক্ষ্য করেছে ফোটোখানা হাতে নেবার পরেই মুখভাব কেমন যেন বদলে গেছে নিরঞ্জনের। চোখে-মুখে বোবা বিস্ময়। ভদ্রলোকেরা হাসি চেপে এবং আরো কিছু নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করেছেন। কিন্তু নিরঞ্জনের যেন হুঁস নেই তেমন। আত্মবিস্মৃত তন্ময়তায় ফোটোগুলো দেখছে। দেখছেই।

তারপর হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে নিরঞ্জন উঠল এক সময়। ঘরের কোণের ভাঙ্গা তোরঙ্গটা খুলল। তলা থেকে আর একখানা ফোটো টেনে বার করল। মলিন আবরণ দেখেই বোঝা যায় অনেক দিন আগের ফোটো সেটা। চৌকিতে ফিরে এসে সেই ফোটোর সঙ্গে সদ্যপ্রাপ্ত ফোটোগুলো একে একে মেলাতে লাগল। দূরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখছে গণেশচন্দ্র। কাছে এসে কৌতূহল মেটাবে সে সাহস নেই।

সবগুলো ফোটোই চৌকির ওপর রাখল সে। রাখল না, আছড়ে ফেলল। তারপর উঠে পার্টির দেওয়া বোতলটা খুলে ঢকঢক করে গলায় ঢেলে দিল খানিকটা। গণেশচন্দ্র ঘর ছেড়ে পালালো।

তোরঙ্গের ছবিখানা আবারও কোলের ওপর রেখে নিরঞ্জন কতক্ষণ গুম হয়ে বসেছিল, ঠিক নেই। এও নৃত্যরতা এক কিশোরী মেয়ের ছবি। দশ বছর আগের এক বেণী দোলানো মেয়ের ছবি। টাটকা যুঁই ফুলের মত। দশটা বছর যোগ করলে কি হয়? অন্য খোলা ছবিগুলোর দিকে বিরস চোখে একবার তাকালো - দেখল কি হয়। জঠরের তরল পদার্থের ক্রিয়া শুরু হয়েছে একটু একটু। ইচ্ছে হল, পার্টির দেওয়া ছবিগুলো ছিঁড়ে ফেলে টুকরো টুকরো করে। তার স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে বড়সড় কিছু একটা যেন চুরি হয়ে গেছে। সেই চুরিটা মেনে নিতে গিয়ে বুকের ভিতরটা টনটনিয়ে উঠছে কেমন। নিরঞ্জনের হাসিই পেল। জঠরের ক্ষুধা আর প্রবৃত্তি-ক্ষুধার তাড়নায় জঞ্জালের বোঝা তো কম চাপায়নি, তবু স্মৃতি এমন উদ্ভট হয় কি করে?

নিরঞ্জন হাসছে আর ভাবছে। ভাবতে নেশার মত লাগছে। বোতলের নেশার সঙ্গে এর মিল নেই। স্মৃতির পটে আর একখানা মুখ উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।.....কোথায় আছে প্রবীর এখন? ছেলেটা বোকা ভাবত ওকে, ভক্ত এমন ভক্ত আর নেই। বড়লোকের ছেলে। মফঃস্বল সহরের এস-ডি-ওর ছেলে মানেই বড় লোকের ছেলে।

বাপ মুহুরী বলেই হোক বা যে জন্যেই হোক, ছেলেবেলায় ওদের বাড়িতে বড় আসত না নিরঞ্জন। দেখা হত স্নানের ঘাটে, খেলার মাঠে, ফল বাগানে। তা ছাড়া ইস্কুল তো আছেই। প্রবীর কলেজে ঢোকার পর দেখা-শুনোটা কমে আসতে লাগল। তৃতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করার পরে নিরঞ্জনের পড়াশুনার পাট খতম হয়েছিল। তখন নিরঞ্জন মাঝে মাঝে ওদের বাড়ি আসত। আরো অনেকে আসত, বাইরের ঘরে বসত। কিন্তু নিরঞ্জন আসত কোনো এক ফাঁকে সেই বাড়ির একটি মেয়েকে দেখার জন্য। অন্য ঘরে তার টুকরো টুকরো কথা, খিল-খিল হাসি অথবা দাদার উদ্দেশে অসহিষ্ণু দু'চারটে হাঁক-ডাক শোনার জন্য। প্রবীরের বোন অনীতা। ম্যাট্রিক ক্লাসের ছাত্রী। এক গাদা বই বুকে করে লম্বা বেণী দুলিয়ে স্কুলে যেত। দু'বেলা ঠিক সময় ধরে সাইকেল নিয়ে বেরুতো নিরঞ্জন। সকলের চোখ এড়িয়ে যতক্ষণ সম্ভব দূর থেকে অনুসরণ করত, তারপর পাশ কাটিয়ে যেত। কোনদিন বা সামনের দিক থেকে আসত। এ যেন এক নেশার মত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কেউ সন্দেহ করতে পারেনি কখনো, ওই মেয়েও না। অবশ্য সন্দেহ করার মত তেমন পাকাপোক্ত বয়সও নয় সেটা অনীতার। তাছাড়া দাদার আড্ডায় নিরঞ্জনকে যদি দেখেও থাকে, খেয়াল করেনি। সেখানে নিরঞ্জন এমনিতেই নিষ্প্রভপ্রায়।

এক ছুটির দিনে প্রবীর প্রস্তাব করল, চল্ অনীতাদের স্কুলের থিয়েটার দেখে আসি—নেমন্তন্ন করেছে, ওরই আবার মেন্ রোল কিনা—।

নিরঞ্জনের নিস্পৃহ মুখভাবে মনে হবে, অনীতা বলে কোনো মেয়ের অস্তিত্বও জানা নেই তার। কিন্তু বুকের ভিতরে একটা দাপাদাপি শুরু হয়েছিল মনে আছে।

থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকা। নৃত্য-নাট্য সেই প্রথম দেখল নিরঞ্জন। পরের জীবনে আরো অনেক দেখেছে। কিন্তু সেদিন মোহাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। অনীতাকে নয়, নাচে-গানে সত্যিই যেন সুষমাভরে আনত এক চণ্ডালিনীর নিঃশেষিত সমর্পণ দেখেছে মন্ত্রমুগ্ধ বিস্ময়ে। এমন বিহ্বল হয়েছিল সারাক্ষণ যে, হঠাৎ একটা আলো ঝলসে উঠতে বিষম চমকে উঠেছিল নিরঞ্জন। পরে বুঝেছে, ফ্লাশ লাইটে নৃত্যরতা চণ্ডালিনীর ছবি নেওয়া হল।

সেই এক রাতের বিবশ আচ্ছন্নতা কাটতে কম করে তিন চারদিন লেগেছিল নিরঞ্জনের। ঘুমের মধ্যেও সেই সমর্পণের নূপুর-ধ্বনি শুনেছে। লম্বা বেণী দুলিয়ে আবার স্কুলে যেতে দেখেছে অনীতাকে। চলার ঠমকে তেমনি বেণী দুলেছে ডাইনে-বাঁয়ে। কিন্তু এ দেখার সঙ্গে আগের দেখার যেন অনেক তফাৎ হয়ে গেছে। ও যেন আর অনীতা নয়—চণ্ডালিনী, প্রকৃতি। সেই সাজ নেই, পায়ে নূপুর নেই—তবু নিরঞ্জনের চোখে অনীতা আর প্রকৃতি মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

এরপর একদিন হঠাৎ এক ফোটো তোলার দোকানের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে সে। নিজের চোখ দুটোকে যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারে না। শো-কেসএ অনীতার ছবি! অনীতার ছবি নয়, নৃত্যরতা চণ্ডালিনীর ছবি। নিরঞ্জনের মনে পড়ে ছবি তোলা হয়েছিল বটে। প্রবীরকে জিজ্ঞাসা করে জানল, ওই দোকানের ফোটোগ্রাফারকেই ফোটো তোলার জন্য ডাকা হয়েছিল। ছবিখানা খুব ভালো হওয়ায় তার বাবার কাছ থেকে একটা কপি শো-কেসএ রাখার পারমিশান আদায় করে ছেড়েছে দোকানের মালিক।

দিন কতক ওই দোকানের সামনে দাঁড়িয়েই ফোটো দেখেছে নিরঞ্জন। ইচ্ছে হয়েছে, শো-কেস ভেঙে ফোটোটা নিয়ে চলে যায়। দোকানের মালিকের সঙ্গেই আলাপ করেছে শেষ পর্যন্ত। আর তারপর যে-মূল্যে সেই ফোটো সংগ্রহ করেছে সেটা তার অনেক দিনের সঞ্চয়।

* * * *

একটা সিনেমা হল্-এর প্রাচীন-নক্সা শেষ হল। আরো দুটোর বাকি। দ্বিতীয় সিনেমা হল্এর কাজ ধরবে একটু রাত হলে, তৃতীয়টির কাজ শেষ করবে পরদিন [illegible]। [illegible] ফেলে নিরঞ্জন উঠে দাঁড়াল। [illegible] যথাবিধি নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান [illegible] ভালো করে তার মুখের দিকে [illegible] এবারের কারিগরি তেমন পছন্দ [illegible] চন্দ্রের। মনে মনে বেশ অবাক [illegible] বাবুরা অত খাতির করলেন, [illegible] গেলেন—তার বদলে এই! [illegible] আকার ধরনটাও অস্বাভাবিক [illegible] চোখে। তেমন করে রয়ে-সয়ে [illegible] দেখল না মাঝে সিঁড়ি ধরিয়ে [illegible] তাকালো না—একধার থেকে [illegible] এ রকমের ব্যতিক্রম গণেশচন্দ্র [illegible] মনে পড়ে না।

সরঞ্জাম গুছিয়ে [illegible] সে। কিন্তু তার আগেই [illegible] ঝকঝকে গাড়ি দাঁড়াল [illegible] [illegible] চিনল গণেশচন্দ্র। [illegible] সাজসজ্জা [illegible] মহিলাটির [illegible] খানিকটা [illegible] গণেশচন্দ্রের [illegible] ইনিই সেই [illegible] গাড়ির জানালা দিয়ে [illegible] ছবি [illegible] খুশির [illegible] গণেশচন্দ্র।

দরজা খুলে [illegible] রুক্ষ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, এই [illegible] এঁকেছে?

—নি নিরঞ্জন [illegible]

—কোথায় সে [illegible]

—বাড়ি গেল বলে গেছে রাতে [illegible] ছবিঘরে কাজ করবে।

—মাথা [illegible]—

গটগট করে গাড়িতে উঠলেন [illegible] গাড়ি ছুটল। প্রায় [illegible] নিরঞ্জনের বাড়ির গলির মুখে এসে থামল [illegible] গাড়ি। গাড়িতে প্রযোজকের [illegible] সহকর্মী।

চিৎপাত হয়ে চৌকিতে শুয়ে ছিল নিরঞ্জন [illegible] একটু আগে গণেশচন্দ্র ফিরেছে। [illegible] খবরটা জানাবে জানাবে ভাবছে, কিন্তু [illegible] যেন সাহস পাচ্ছে না। সহকর্মীরা ঘরে [illegible] বিনা ভণিতায় ঝাঁঝিয়ে উঠলেন প্রায়। [illegible] হয়েছে নিরঞ্জনবাবু? কি করেছেন? [illegible] দেখে এলাম—

নিরঞ্জন ধীরেসুস্থে উঠে বসেছে। [illegible] বসতে না বলে পাল্টা প্রশ্ন করল, [illegible] হয়েছে?

—কিছুই হয়নি, কিচ্ছু না, [illegible] রাবিশ!

হাতের কাছেই পার্টির দেওয়া [illegible] নমুনাটা ছিল। সেটা টেনে নিয়ে একবার [illegible] নিরঞ্জন। তারপর তাদের দিকে ওটা [illegible] দিয়ে বলল, মিলিয়ে দেখে আসুন, [illegible] আছে ওতেও তাই আছে।

সহকর্মীদের একজন বিরক্ত মুখে বল[illegible] তাতো আছে, কিন্তু আসল এফেক্ট কিছু[illegible] —মনে হচ্ছে যেন পুজোর নাচ নাচছে—[illegible] মেয়েটির কি ওই বয়েস নাকি! যা এঁকে

[illegible] হয় ফ্রক ছেড়ে সবে শাড়ি ধরেছে। একবার [illegible] দেখতেন তাহলে আর—

অন্যজন বললেন, যাকগে যা হয়েছে, [illegible]—শিল্পীর ওটা তুলে ফেলে আবার [illegible]—কর্তা ভয়ানক রেগে গেছেন। এক্ষুনি [illegible]।

নিস্পৃহ মুখে নিরঞ্জন জবাব দিল, আমার [illegible] আর অন্য রকম হবে না, আপনারা অন্য [illegible] দেখুন।

[illegible] বড় বালাই। হাবভাব দেখে সহ-[illegible]দের বিরক্তি উবে গেল। একজন বললেন, [illegible] কথা, আপনি আর্টিস্ট কম নাকি! মেজাজ [illegible] বলেই ওরকম হয়ে গেছে বোধ হয়—

একটা বিড়ি ধরিয়ে নিরাসক্ত মুখে সেই [illegible] দিল নিরঞ্জন, তার দ্বারা অন্যরকম [illegible] হবে না।

[illegible] না মানে? আবারও [illegible] উঠেন [illegible] দায়িত্ব নিয়েছেন [illegible] হবে না [illegible]?

[illegible] হয়ে বসে মুখের দিকে [illegible] সাফ জবাব দিল, তাহলে থানা [illegible]।

[illegible] ও পারিশ্রমিকের লোভ দেখিয়েও ফল [illegible] উঠে গেলেন। ঘণ্টাখানেক বাদে [illegible] মুখে এসে থামল সেই গাড়িটা।

[illegible] প্রযোজক।

[illegible] হওয়া সত্ত্বেও ঘরের আলো [illegible] চৌকির ওপর নিরঞ্জন তেমনি [illegible]। আগন্তুকের সাড়া পেয়ে [illegible] আলো জেলে দিল। নিরঞ্জন বিরক্ত [illegible]।

[illegible] বসে ভদ্রলোক মুখের সিগারেটটা [illegible] বললেন, ওদের পাঠানই ভুল [illegible] অন্ধকারে থাকলে তো! চলুন—

[illegible]ঞ্জনের দু' চোখ নীরব জিজ্ঞাসু।

[illegible] না মশাই, এই ভরসন্ধ্যায় ঘরে বসে [illegible] কি! উঠুন, আপনার সঙ্গে আলোচনা [illegible]।

[illegible] তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসতে [illegible] গাড়িতেও উঠতে হল। ড্রাইভার গাড়ি [illegible]লো। নিরঞ্জন ফিরে তাকালো। দৃষ্টিতে [illegible] রুক্ষতা। অর্থাৎ, কি বলার আছে [illegible] এবার—।

কিন্তু ভদ্রলোক বললেন না কিছুই। পকেট [illegible] দামী সিগারেটের টিনটা বার করে তার [illegible] এগিয়ে দিলেন।

প্রায় বিশ পঁচিশ মিনিট বাদে একটা [illegible]পরিচিত বাড়ির সামনে গাড়ি থামল। ভদ্রলোক [illegible] আহ্বান করলেন, আসুন—

নিরঞ্জন অনুসরণ করল তাঁকে। সামনের [illegible] ঘরে জোরালো আলো জ্বলছে। ঘরে ঢুকে [illegible] হকচকিয়ে গেল আরো। বিলাতি [illegible], মেঝেতে পা-ডোবানো কার্পেট, [illegible] দেয়াল-জোড়া সোনালী পাতে বাঁধানো [illegible] শৌখিন আয়না। তাতে নিজের আধময়লা [illegible] কাপড় আর খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা [illegible] দেখে নিরঞ্জনের মনে হল, সে যেন [illegible] অনুচর।

[illegible]ফায় বসে আছেন সেই দুজন সহকর্মী। [illegible] উঠে দাঁড়ালেন। প্রযোজক মশাই মৃদু [illegible] করলেন, তোমরাই এ'র মেজাজ বিগড়ে [illegible]ছ। ম্যাডাম কোথায়?

—আসছেন।

—বসুন নিরঞ্জনবাবু, বসুন।

প্রযোজকের আপ্যায়নে বসতে গিয়েও বসা হল না। তার আগেই অন্দর থেকে যে মহিলার আবির্ভাব, তার দিকে সপ্রশংস নেত্রে দুই এক মুহূর্ত চেয়ে থেকে প্রযোজক সানন্দে বলে উঠলেন, আসুন, একেবারে খোদ আসামী ধরে এনেছি।

নিরঞ্জন বিমূঢ় মুখে একটু হাসতে চেষ্টা করল শুধু। প্রবীরের বোন অনীতাই বটে. কিন্তু সেই অনীতা নয়। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ধপধপে শাদা সিল্কের ব্লাউজের ওপর সর্বাঙ্গ জড়ানো হাল্কা কলাপাতা রঙের দামী শিফনের সবুজাভায় ঘরের এমন রূপও যেন বদলে গেল। চোখে মুখে অধরে সূক্ষ্ম প্রসাধন-মাধুর্য। স্মিতহাস্যে দুহাত যুক্ত করে কপালে ঠেকালো। প্রযোজক পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্যোগ করতেই বাধা দিয়ে বলল, থাক এ লাইনে এসে ওঁকে না চিনে উপায় আছে নাকি?

—বসুন, দাঁড়িয়ে কেন!

নিজের অগোচরেই নিরঞ্জন বসে পড়ল। হাতখানেক তফাতে সেই কৌচেই নির্দ্বিধায় বসল অনীতাও। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল আবার, দাঁড়ান চা বলে আসি—কি খাবেন চা না কফি?

সামান্য একটা জবাব দেবার চেষ্টায় খাবি খেতে লাগল নিরঞ্জন। প্রযোজক বললেন, চা-ই হোক চট করে একটু—

অনীতা ভিতরে চলে গেল। সেই সাবলীল ভঙ্গিতেও শিফনের শাসন উপছানো তনু তরঙ্গ।

প্রযোজক সাথীদের কাছ থেকে আসল চিত্র মুক্তির কি খোঁজখবর নিচ্ছেন কানে এলো না নিরঞ্জনের। তার চোখে ভাসছে মফঃস্বল সহরের সেই রাস্তাটা আর সেই মেয়েটি। বই বুকে করে যে ইস্কুলে যেত, যার লম্বা বেণী দুলত ডাইনে বাঁয়ে। ফুলসাজে চণ্ডালিনী প্রকৃতি সেজেছিল যে মেয়ে, আর যে সমর্পণ দেখে পর পর ক' রাত্রি ঘুম ছিল না চোখে।

অনীতা ফিরে এলো একটু বাদেই। পিছনে বেয়ারার হাতে চায়ের সরঞ্জাম। নিরঞ্জনের মোহভঙ্গ হল। অনীতা সেই কৌচেই বসল আবার। হাতে হাতে চা পরিবেশন করে নিজের পেয়ালাটা নিয়ে ঘুরে বসে তাকালো তার দিকে। হাসল একটু। তারপর সরাসরি কাজের কথা পাড়ল একেবারে।—আজ যেটা এঁকেছেন দেখলাম নিরঞ্জনবাবু—

চায়ের পেয়ালা হাতে নিরঞ্জন আড়ষ্ট হয়ে বসে।

তেমনি হাল্কা সুরে অনীতা বলল, আপনার এত নাম-ডাক, কতজন উতরে গেল আপনার হাতে—আপনি আমার বেলায় এমন অকরুণ কেন?

বাকি তিনজন হেসে উঠলেন। নিরঞ্জনও হাসতে চেষ্টা করল। না পেরে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগল।

অনীতা ঘুরে বসেছে আরো একটু। গোটা পরিবেশ যেন তারই করায়ত্ত। আব্দার মেশানো অনুযোগের সুরে বলল আবার, এড়িয়ে গেলে চলবে না, মুখ তুলুন, যা এঁকেছেন ঠিক হয়েছে?

পেয়ালাটা রেখে নিরঞ্জন সত্যিই স্থির নেত্রে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। তারপর ঘাড় নাড়ল, হয়নি। উঠে দাঁড়িয়ে অ[illegible] বলল, ঠিক করে দিচ্ছি।

প্রযোজক সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে ড্রাইভারকে বললেন তাকে পৌঁছে দিতে। তারপর অনুচ্চ কণ্ঠে আশ্বাস দিলেন, ঠিক মত কাজটা করে দিন নিরঞ্জনবাবু, আপনার পরিশ্রম আমি পুষিয়ে দেব।

বাড়ি ফিরেই নিরঞ্জন গণেশচন্দ্রকে পাঠিয়ে দিল, দেয়ালের আঁকা ছবিটা তুলে ফেলতে এবং সব রেডি করে রাখতে।

সে চলে যেতেই দশ বছর আগের সেই ছবিখানা বার করল। দেখতে লাগল নিরীক্ষণ করে। খরচোখে বিস্মৃতির আভাস। কয়েক নিমেষ। তারপরেই খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ে ফেলল ফোটোখানা। টুকরোগুলো জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলল। কতক বাইরে পড়ল, কতক ঘরের মধ্যেই।

রাত মন্দ হয়নি। ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে পায়ে ব্যথা ধরে যাবার কথা গণেশচন্দ্রের। কিন্তু কিছুই টের পাচ্ছে না। উৎফুল্ল বিস্ময়ে ওস্তাদের আঁকা দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আনন্দে দুই একবার স্ফূর্তিসূচক শব্দ বার করে ফেলার মুখে জিভ কামড়ে সামলে নিয়েছে। দেখছে আর কিসের যেন একটা উষ্ণ স্রোত উপলব্ধি করছে সেও। লোকটা যেন নারীর সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটন না করে ছাড়বে না। আস্তে আস্তে বারবার দেখছে মানুষটাকে। শেষের মাথায় ঠিক তেমনি একটা দুটো করে আঁচড় ফেলছে আর দেখছে এক চোখ বুজে। অন্য চোখটা জোরালো হয়ে উঠছে তেমনি। তেমনি নয়, যেমন হয় তার থেকেও অনেক বেশি। তুলি কোলের ওপর ফেলে রেখে পকেট হাতড়াচ্ছে। বিড়ি ধরিয়ে দেখছে চেয়ে চেয়ে। খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা মুখের সেই পরিচিত চটা রঙের আলোয় চকচকে দেখাচ্ছে আরো। শিকারকে আওতার মধ্যে পেয়ে তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে শিকারীর তুষ্টি। বিড়ি ফেলে তুলি ধরেছে আবার।

শেষ হল।

স্বপ্নাভিভূত হয়ে দেখছিল গণেশচন্দ্র, হুঁস ফিরল। উঁচু টুল থেকে নেমে দাঁড়াল মানুষটা। বিড়ির খোঁজে আবার পকেট হাতড়াচ্ছে। মনের মত আঁকা হলে ওস্তাদের দিকে চেয়ে নীরবে শুধু একমুখ হাসে গণেশচন্দ্র। তারিফ করার আর কোনো ভাষা জানে না, অথবা জানলেও সাহসে কুলোয় না। আজকের হাসিটা একটু বেশিরকমই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল গণেশচন্দ্রের মুখে।

কিন্তু চোখোচোখি হতেই হকচকিয়ে গেল কেমন। হাসি তলিয়ে গেল। শিকারীর দুই চোখে চকচকে ছুরির ফলার মত ওই শানিত দৃষ্টি দেখে অভ্যস্ত সে।

কিন্তু ছুরির ফলাটা যেন জলে ভেজা।

বিবর্তন

খুঁটেপুরের পুঁটীরাণী কলকাতাতে এসে,
আধুনিকা মালবিকা হলেন কেশেবেশে।
নামতে গিয়ে সিনেমাতে,
টলিউডের হাতে হাতে,
ঘুরে ফিরে চোখের জলে পালটিয়ে ভোল শেষে,
খুঁটেপুরের পুঁটীরাণী ফিরেই গেলেন দেশে।

—ম-ব

কাতুপিসি উঠে সব জানলাগুলো বন্ধ করে দিলেন। দরজার হাতলটা টেনে টেনে দেখলেন, তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের সিটে ফিরে এসে বসলেন।

নন্দা একটা বই নিয়ে কোণের দিকে বসে ছিল। কাতুপিসির কাণ্ড দেখে বলল, ছি কাতুপিসি সব জানলা-দরজা বন্ধ করে দিলে, গরমে প্রাণ যাবে যে।

কাতুপিসি ভ্রূকুঞ্চিত করে নন্দার দিকে চাইলেন। মাথার ওপর বনবন করে দুটো পাখা ঘুরছে। তাও তোমার গরম লাগবে? ও গরম দু একটা জানলা খুললে যাবে না, কলকাতায় গিয়ে বাপকে বিয়ের বন্দোবস্ত করতে বলব।

কাতুপিসির মুখে কিছু আটকায় না। স্থান-কাল-পাত্র বিচার নেই। যা মনে আসে মুখে বলে ফেলেন। ছেলে-বুড়ো থেকে শুরু করে সকলের সরকারী পিসি। সাব বেচারাম দত্ত সেন ওঁকে পিসি বলে।

শিলিগুড়ি গিয়েছিলেন ভাইপোর কাছে। ফেরবার সময় একপাল দার্জিলিং ফেরত সঙ্গী পেয়ে গেলেন। বেচারাম দত্ত লোকের জন্য টিকেট [illegible] আর দুজন আসেনি, তবে কাতুপিসির কাছে আর কতক্ষণ অচেনা থাকবে। একটা গোটা কম্পার্টমেন্ট জাঁকিয়ে বসেছেন। দু-একটা স্টেশনে ছুটকো-ছাটকা মেয়েছেলে উঠতে এসেছিল, কাতুপিসির হুংকারে সভয়ে হাতল ছেড়ে পালিয়েছে।

একটু পরে কাতুপিসি নিজেই বললেন, সাধে আর আট-ঘাট সমস্ত বন্ধ করেছি। এই লাইনে রোজ চুরি, ডাকাতি হচ্ছে। বিশেষ করে এই মহারাজপুরের পর থেকে।

নতুন বৌ শুভ্রা ঢুলছিল, চুরি, ডাকাতির কথায় চমকে উঠে একেবারে কাতুপিসির গা ঘেঁসে বসল।

মাঝ বয়সী গিরিবালা একবার বন্ধ জানলা-দরজাগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে বলল, সর্বনাশ কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ভালোয় ভালোয় পৌঁছতে পারলে হয়।

চোর-ডাকাতের নামে নন্দা বই সরিয়ে উঠে বসেছিল। বলল, হ্যাঁ কাতুপিসির এক কথা। [illegible] অমনি চুরি, ডাকাতি হচ্ছে। আমরা এতগুলো লোক রয়েছি কামরায়।

কাতুপিসি পানটা মুখে দিয়ে সবে জর্দার কৌটোটা খুলেছিলেন, নন্দার কথায় কৌটো সরিয়ে রাখলেন, তবে আর কি, এতগুলো লোক রয়েছে তো, আর ভয় নেই। তারা সব খালি হাতে ওঠে কিনা। ছোরা, ছুরি, বন্দুক সব সময় সঙ্গে থাকে। টুঁ শব্দ করলে আর নিস্তার নেই।

কোণের দিকে দুর্গামোহিনী নামজপ করছিলেন, অবশ্য কান ছিল এদিকে। মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে বললেন, যত সব অলক্ষুণে কথা।

কাতুপিসি ঘাবড়ালেন না। নন্দার দিকে ফিরে বললেন, বেশী দিনের কথা নয়, বোধহয় বছর ঘোরেনি এখনো। এই লাইনে [illegible] সাহেবের ব্যাপারটা মনে আছে? খবরের কাগজে হৈ চৈ কাণ্ড। তোমরা তো লেখাপড়া জানা মেয়ে। সকালে খবরের কাগজ না দেখলে পেটের ভাত হজম হয় না।

সবাই কাতুপিসিকে ঘিরে বসল। এমন কি মালা সরিয়ে দুর্গামোহিনীও। কাতুপিসি উঠে একবার বাথরুমটা দেখে এলেন। বললেন, দাঁড়াও একবার দেখে আসি। ওটাই তো [illegible] পথ। সবাই ঘুমোচ্ছে, একেবারে বাথরুম দিয়ে উঠে পড়ে।

কাতুপিসিকে ঘিরে ভিড়টা আরো ঘন হল। একেবারে ছোট বাচ্চাটা একেবারে তাঁর কোলে উঠে বসল।

নন্দাই তাড়া দিল, বল পিসি, [illegible] সাহেবের কাহিনী কাগজে কিছু পড়েছি বলে তো মনে হচ্ছে না।

তা পড়বি কেন, এতক্ষণ পরে কাতুপিসি জর্দার ছিটে ছড়ালেন মুখে, তোদের নজর তো কেবল সিনেমার পাতায়।

কাতুপিসি জুৎ করে বসলেন, সেবারও এই দার্জিলিং থেকে ফেরার পথে। এক মাঝ বয়সী গিন্নি আর তার বোনপো। খুব বড়লোকের বৌ। ছেলেপুলে নেই বলে ওই বোনপোটিকে সঙ্গে নিয়ে সব জায়গায় ঘোরেন। কর্তাও সঙ্গে ছিলেন। খুব নাম করা কন্ট্রাক্টর। হঠাৎ জরুরী তার পেয়ে চলে এসেছেন কলকাতায়। শিলিগুড়িতে লোক ছিল তারাই গিন্নি আর বাচ্চাটাকে গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে গেছে। গার্ডকেও বলে গেছে। পথে দেখাশোনা করবে। সবই ঠিক হল। ঘাট পার হয়ে রিজার্ভ করা গাড়ীতে উঠে বসলেন। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আকাশে চাপ-চাপ মেঘ থাকায় অন্ধকারটা যেন আরো ঘন। হঠাৎ বন্ধ দরজায় শব্দ।

ভিড়ের চাপে কাতুপিসির দম ফেলা দায়। সকলে কোল ঘেঁসে বসেছে। বড় থেকে ছোট।

ভদ্রমহিলা আগে থেকেই জানলাগুলো সব বন্ধ করে দিয়েছিলেন। দরজার এ পাশ থেকে বললেন, কে, কে?

মা দয়া করে দরজাটা একটু খুলে দিন, আমি আর হাতল ধরে থাকতে পারছি না। ভদ্রমহিলা তখন একটা জানলা একটু খুলে দেখলেন।

ধন্যি সাহস বলতে হবে, দুর্গামোহিনী দুটো চোখ বিস্ফারিত করলেন, ওই সময় আবার জানলা খোলে!

জানলা খুলে দেখলেন, ধুতি, পাঞ্জাবী পরা এক ভদ্রলোক হাতল ধরে ঝুলছেন।

আপনি এ কামরায় উঠেছেন কেন? জানেন না এটা মেয়ে-কামরা।

অন্ধকারে বুঝতে পারিনি মা। উঠে পড়েছি। মেয়েটার অসুখ। মায়ের অবস্থা খুব খারাপ। আপনি দয়া করে দরজাটা খুলে দিন আমি দরজার কাছে বসে যাব। পরের স্টেশনে নেমে পড়ব। মা দুটি পায়ে পড়ি আপনার। আমি আর হাতল ধরে ঝুলতে পারছি না। এখনি একটা এক্সিডেন্ট হবে।

ভদ্রমহিলা একটু ইতস্ততঃ করলেন। আবছা অন্ধকারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন লোকটার মুখ তারপর এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলেন।

লোকটা ভেতরে ঢুকেই নিজ মূর্তি ধরল। প্রথমে চেপে দরজাটা বন্ধ করে দিল তারপর কোমর থেকে ছোরা বের ক'রে বলল, সঙ্গে কি আছে দিয়ে দাও। একটু চেঁচিয়েছ কি দেব একেবারে নিকেশ করে।

ভদ্রমহিলা ভাগলপুরের মেয়ে। দুধ ঘি খাওয়া চেহারা। লাফিয়ে গিয়ে চেন টানতে গেলেন কিন্তু চেন অবধি আর পৌঁছতে হল না। লোকটা তীরবেগে গিয়ে পথ আটকাল, খবরদার, আমি বাজে কথা বলি না। একেবারে

কুচি কুচি করে কাটব। ভালোয়, ভালোয় গয়নাগাটি, টাকাকড়ি যা সঙ্গে আছে বের করে দাও।

ভদ্রমহিলার বরাত। অদৃষ্টে মরণ নাচছে করবে কি। বেঁকে দাঁড়ালেন। বললেন, সোনার একটু টুকরো দেবে না গা থেকে। একটি পাই পয়সা নয়। কি করতে পারে করুক। বলেই ভদ্রমহিলা 'ডাকাত,' 'ডাকাত' বলে চেঁচাতে লাগলেন।

ব্যস, লোকটা একেবারে বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ল দেহের ওপর। টুকরো টুকরো করে কেটে তাঁরই পরনের শাড়ি দিয়ে টুকরোগুলো বেঁধে সিটের তলায় রেখে দিল। ভদ্রমহিলার বোনপো ব্যাপার দেখে কঁকিয়ে কেঁদে উঠেছিল। ছুরির ঘায়ে তাকেও খতম। তারপর গয়নাপত্র আর বাক্স ভেঙে টাকাপয়সা সব নিয়ে লোকটা বাথরুম দিয়ে পালাল।

সর্বনাশ, তারপর? দুর্গামোহিনী কাঁপা কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলেন।

তারপর আর কি, পরের দিন সকালে গার্ডের সন্দেহ হল। কি ব্যাপার, এত বেলা হল, জানলা দরজা খোলার নাম নেই। এখনো সব ঘুমাচ্ছে।

এক স্টেশনে গাড়ী থামতে গার্ড এসে দরজায় টোকা দিতে লাগল। কোন সাড়া শব্দ নেই, উত্তর তো দূরের কথা।

স্টেশনমাস্টার এল। রেলের পুলিশ। প্ল্যাটফর্মে লোক বোঝাই। গাড়ীর দরজা ভেঙে পুলিশ কামরায় ঢুকল। বীভৎস ব্যাপার। পুলিশও আঁতকে উঠল। তারপর চলল খানাতল্লাসী। আঙুলের ছাপ নেওয়া হল। মাংসের টুকরোগুলোর ফটো। খুঁজতে খুঁজতে বাথরুমের জলের ট্যাঙ্কের ওপর থেকে রক্তমাখা ছোট একটা প্যান্ট পাওয়া গেল। বোঝা গেল রক্তমাখা ছোরাটা সে ওতেই মুছেছে।

সেই সূত্র ধরে অনুসন্ধান চলল। প্যান্টের এককোণে ধোপার মার্কা ছিল। শহরের যত ধোপার ঘরে খোঁজ চলল। ধোপাদের ধরে ধমক গালাগাল। এ মার্কা কার ঘরের। প্রায় সাড়ে চারশো ধোপাকে টানাহেঁচড়া করে উল্টোডাঙার এক ধোপার ঘরে খোঁজ মিলল। এ মার্কা তার জানা, তবে কোন্ ঘরের তা সে প্রাণ গেলেও বলতে পারবে না।

বন্দুকের গুঁতোয় পরে সব স্বীকার করল। এ প্যান্টের মালিক বৃন্দাবন সাঁতরা। তার রক্তমাখা অনেক কাপড়-জামা তাকে মাঝে মাঝে কাচতে হয়। এরজন্য বাড়তি পয়সাও সে বেশ পায়।

ধোপাকে মাঝখানে রেখে পুলিশের দল বৃন্দাবনের বাড়ী গিয়ে হাজির, কিন্তু বাড়ী খালি, পাখী পালিয়েছে।

শ্রোতাদের মধ্যে নিরাশাব্যঞ্জক ধ্বনি উঠল।

নন্দা বলল, কেন কার্তুপিসি, আজকাল যে পুলিশের দুটো কুকুর এসেছে। শুঁকে শুঁকে অপরাধী ধরে ফেলে।

তুইও যেমন, ও হলে আর ভাবনা ছিল না। কার্তুপিসি ঠোঁট ওল্টালেন, ওই তো কুকুরের সামনে রক্তমাখা প্যান্টটা রাখা হয়েছিল, সেবার দুয়েক শুঁকে পুলিশের বড় কর্তার প্যান্ট ধরে টানাটানি সুরু করল। সবাই ভয়ে অস্থির। বহু কষ্টে কুকুরটাকে পোড়া রুটির লোভ দেখিয়ে সরিয়ে নিয়ে গেল।

তা হলে বৃন্দাবনকে আর ধরতে পারল না? শুভা মৃদু গলায় জিজ্ঞাসা করল। কই আর পারল, কার্তুপিসি আবার জোড়া খিলি মুখে দিলেন, তবে কে বলছিল মুখপোড়া নাকি সুরাটের ওদিকে কোথায় ট্রেণে কাটা পড়েছে।

পড়েছে? সকলের সম্মিলিত স্বস্তির নিশ্বাস শোনা গেল আর ঠিক সেই সঙ্গে সিটের নিচে থেকে খা টিনের তোরঙ্গটা হড় হড় করে সরে এল সামনের দিকে।

ও মাগো। শুভা নববধূর লজ্জা ভুলে গিয়ে কার্তুপিসিকে ডিঙিয়ে ওদিকে গিয়ে পড়ল। নন্দা বিছানাটা আঁকড়ে সোজা শুয়ে পড়ল মেঝের ওপর। দুর্গামোহিনী মালা হাতে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলেন। কার্তুপিসির দুটো চোখ কাচের মার্বেলের মতন জ্বলতে লাগল।

প্রথমে কদমছাঁট চুল, তারপর গোটা লোকটা সিটের তলা থেকে বেরিয়ে এল। মিশ কালো রং, খালি গা, পরনে আধময়লা কাপড়, মালকোঁচা দেওয়া। প্রায় ছ ফুট লম্বা।

লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়াল। সকলের দিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে দেখল, তারপর ভাঙা গলায় বলল, আমিই বৃন্দাবন। সুরাটে রেলে কাটা পড়িনি।

দুর্গামোহিনী সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়লেন বৃন্দাবনের পায়ের সামনে। শুভা হাতের চুড়ি আর গলার হার খুলতে আরম্ভ করল আর কার্তুপিসি সুপুরী কাটা জাঁতিটা সরিয়ে ফেললেন পিছনে।

চেঁচামেচি করে লাভ নেই। আমার কথা সবই ওঁর কাছে শুনেছেন। আমি দয়ামায়ার ধার ধারি না। পুলিশকে থোড়াই কেয়ার করি। যে যেখানে আছেন, চুপচাপ বসে থাকুন।

বৃন্দাবনের কথার সঙ্গে সঙ্গে কার্তুপিসি ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলেন, দোহাই ধর্মবাপ আমার, আমাদের কাছে সোনাদানা টাকাকড়ি যা আছে সব দিয়ে দিচ্ছি প্রাণে মেরো না কাউকে। আমরা টুঁ শব্দ করব না। তুমি সব নিয়ে দরজা খুলে নেমে পড়। ভদ্রলোকের ছেলে কেন সেবারের মতন বাথরুম দিয়ে নামতে যাবে।

ইতিমধ্যেই একজন সোনার গহনা খুলে বৃন্দাবনের পায়ের তলায় রেখে দিয়েছে। কেউ কেউ চামড়ার মণিব্যাগও পাশে রেখেছে। কার্তুপিসি কথা শেষ করে সেমিজের ভেতর থেকে রুমালে জড়ানো টাকাগুলো ছুঁড়ে দিলেন বৃন্দাবনের কাছে। বললেন, বাবা রুমালটা খুলে শুধু টিকেটটা আমায় দিয়ে দাও নয়তো হাওড়ার মুখপোড়ারা হেনস্তা করবে। টিকেটটা তো আর তোমার কোন কাজে লাগবে না।

বৃন্দাবন এক নজরে একবার টাকা-পয়সা আর অলঙ্কারগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিল তারপর দুর্গামোহিনীর দিকে চেয়ে বলল, এসবে আমার লোভ নেই। আমায় কিছু খেতে দিন। যা হোক কিছু।

কার্তুপিসি মতলবটা বুঝলেন। পাকা লোক। যাবার সময় গহনাগাটি, টাকা-পয়সা সব নিয়ে যাবে, তার আগে ফলারটাই বা ছাড়ে কেন।

দুর্গামোহিনী আগে উঠলেন। নাতি-নাতনীদের জন্য লুচি আর আলুর দম করে এনেছিলেন। সঙ্গে ক্ষীরের বরফি। কলাপাতা পেতে সব সাজিয়ে দিলেন বৃন্দাবনের সামনে।

শুভা আর নন্দা পাউরুটির টুকরো কেটে দিল মাখন লাগিয়ে।

বৃন্দাবন খেতে বসবার আগে সকলের দিকে একবার চেয়ে নিল তারপর খনখনে গলায় বলল, চেনের ওদিকে কেউ যাবেন না, সব এদিকে সরে আসুন।

সবাই এদিকেই ছিল, শুধু কার্তুপিসি খাবারের টিন আনতে ওদিকে যাচ্ছিলেন, বৃন্দাবনের কথার সঙ্গে হুড়মুড় করে একেবারে এপাশে এসে দাঁড়ালেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, টানুক না কে চেন টানবে। কার ঘাড়ের ওপর কটা মাথা। কার্তুবামনি বেঁচে থাকতে চেন অমনি ছুলেই হল!

বৃন্দাবন আর কথা বাড়াল না। কলাপাতা টেনে নিয়ে বসে পড়ল। বসেই এদিকে ওদিকে চেয়ে বলল, জল একটু।

দুর্গামোহিনী জিভ কামড়ে নন্দাকে ধমক দিয়ে উঠলেন, কি তোদের খেতে দেবার ছিরি। আসন নেই, জল নেই। ছি ছি ছি।

বাক্সর ওপর একটা তোয়ালে ছিল সেটা নিয়ে পেতে দিলেন, ততক্ষণে নন্দা কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে কাচের গ্লাসে ভরে দিল।

গ্লাসটা হাত দিয়ে চেপে ধরে নন্দা বলল, গাড়ী যা দুলছে, এখনি গ্লাসটা পড়ে যাবে। আমি বরং ধরে আছি আপনি খান।

কার্তুপিসি বৃন্দাবনের দিকে একটু এগিয়ে এসে বললেন, পোড়ারমুখো ইস্টার্ন রেলওয়ের লোকেদের তুমি একটু শায়েস্তা করে দিতে পার না বাবা। হতভাগারা রেল চালাচ্ছে না জগন্নাথের রথ চালাচ্ছে। একটা মানুষ সুস্থির হয়ে খাবে, তার যো আছে?

মিনিট দশেক, তারমধ্যে বৃন্দাবন সব পরিষ্কার করে ফেলল, তারপর দুর্গামোহিনীর দিকে চেয়ে বলল, পেট ভরল না তেমন। এতে আমাদের খিদে মরে না। কেবল মিঠের ব্যাপার আর কিছু নেই?

দুর্গামোহিনী নিরাশ চোখে এদিক ওদিক চাইলেন। কার্তুপিসি একমুখ হেসে বললেন, হাঁ বাবা, খই আছে, এক টিন দেব?

শুধু খই? বৃন্দাবন ভুরু কোঁচকাল, তারপর বলল, বেশ তাই দিন।

বালাই ষাট, দুর্গামোহিনী সখেদে বললেন, শুকনো খই খেতে যাবে কোন্ দুঃখে। তারপর গলায় আটকে একটা কাণ্ড বাধুক। তার চেয়ে ও নন্দা, রাখীর দুধটুকু তো রয়েছে, দেনা গরম করে।

নন্দা কোণের দিকে বাতাস বাঁচিয়ে স্টোভ জ্বালাল। দুধ গরম করা হল, তারপর একটা বাটিতে দুধ ঢেলে বৃন্দাবনের সামনে রাখল।

শুভা ভয়ে ভয়ে ঘোমটার ফাঁক দিয়ে দেখছিল, এবার টিফিনকারিয়ার থেকে গোটা কয়েক সন্দেশ বের করে আলগোছে পাতের ওপর ফেলে দিল।

দুর্গামোহিনী হাতড়ে হাতড়ে আমের আচার বের করলেন কিছুটা। পাতে দিতে দিতে বললেন, মিষ্টি খেয়ে মুখ মেরে গেছে, একটু আচারটুকু ভালই লাগবে বাবা। লজ্জা করো না, ভাল লাগে তো চেয়ে নিও। এই বুড়ো হাড়ে খেটে-খুটে এটুকু করেছিলাম, যাক এতদিন পরে সৎ কাজে লাগল।

বৃন্দাবন এত কথার কোন উত্তর দিল না, মাথা নিচু করে খেয়ে যেতে লাগল। মাঝে মাঝে শুধু মুখ তুলে গাড়ীর ভেতরের অবস্থা

(শেষাংশ ৭৯ পৃষ্ঠায়)

একজন যৌবনের সবুজ মাঠটা পেরিয়ে এসেছেন অনেকদিন। এখন বিশীর্ণ বন্ধ্যা মাটি তবু প্রসাধনের আপ্রাণ চায়। বে-থা করেননি আর। রোজগার ভাল, থাকেন মেসের বড় একটা কোঠা নিয়ে দোতলায়। বড়দা একা, কিন্তু অনেকগুলো তাঁর বিলাসের সামগ্রী। রেডিও, এসরাজ, আর্ট অ্যালবাম। এগুলো তাঁর মনের সজ্জা। মনের সাজ আরো বিচিত্র, তা হয়ত এখানে-ওখানে বাইরের ছড়ানো।

রাত বোধ হয় সাড়ে বারটা। কলিং বেলে শব্দ হল দু'তিনটি।

কে?

একটা ক্রিমের শিশি সবে খুলেছেন বড়দা। একটু আগে নামিয়ে রেখেছেন এসরাজটা। দোর খুলে দিতে যে ভিতরে ঢুকল, সে এখনো যৌবনের সবুজ মাঠে। কিন্তু মুখে বেদনার চিহ্ন, প্রসাধনের বালাই নেই। ছাই চাপা পড়েছে যেন জ্বলন্ত আগুন।

বড়দা?

বিস্মিত বড়দা ফিরে চাইলেন মেয়েটির দিকে। ধরাগলায় যে সম্বোধনটি ধ্বনিত হয়েছে, তার ভিতরেই একটা প্রশ্নের জবাবের দাবী ছিল, তা তিনি জানতেন? কিন্তু সে জন্য বড়দা বিস্মিত হননি। হয়েছেন অন্য কারণে।

তুমি এই কাপড় জামায় এ মেস বাড়িতে এসে কি রুচিতে? রাত কটা বাজে খেয়াল আছে কি? আমি তোমার আপন ভাই নই যে তাকে কিছু বললে মুখ চাপব। যাও, তাড়াতাড়ি ফিরে যাও বাড়ি। তোমার কি একটুও লজ্জা নেই? ছিঃ! ছিঃ!

মিলি অন্য দিন হলে কি করত বলা যায় না। আজ শুধু দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে রইল ছায়া যেমনটি কায়ার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে লজ্জা অপমান স্তুতি প্রশংসা অগ্রাহ্য করে। মিলি আধময়লা আঁচল দিয়ে ঘাম মুছল।

যাও বলছি। ছিঃ! ছিঃ! কি ভাবে যে এখানে এসেছ! তুমি কি জানো না যে, এটা ভদ্রলোকের বাসস্থান?

মিলি কোন জবাব না দিয়ে ঘরের ইতিউতি চাইতে লাগল। একটা নক্সা প্লেট দিয়ে একটা জলের কুঁজো ঢাকা ছিল পশ্চিম দিকের টি-পয়টার ওপর। মিলি একটা গ্লাস খুঁজে জল খেলো এক গ্লাস, তারপর আর এক গ্লাস। কর্পূরের গন্ধে তার মনটা যেন কেমন করে উঠল।

এতক্ষণ অপেক্ষা করে বড়দা দেখলেন সব, কিন্তু তাঁর মন নরম হল না। বরং আর একটু কঠিন হয়েই বললেন, এবার যাও। অতখানি পথ একা না যেতে পারো এই টর্চটা নাও। —তিনি দেরাজের দুয়ার খুলে ধরলেন। ছেলে মেয়ে দুটোকে বুঝি একা ফেলে এসেছ ঘরে? একেই বলে রাক্ষুসী মা। মেয়ে জাতটাকে চেনা কঠিন। ভাগ্যিস ফাঁদে পা দেইনি। উন্মুক্ত দুয়ারে দাঁড়িয়ে আরো অনুযোগ করলেন বড়দা। এবার ভালোয় ভালোয় যাও দেখি।

দুপুর রাত গড়িয়ে গেছে ঘড়ির কাঁটায় এবং মেস বাড়ির ঠাকুর চাকরের নিস্তব্ধতায়। চৈত্রের দুষ্টু দক্ষিণা হাওয়া এতক্ষণ যেন পথ খুঁজছিল। এবার নিচের সিঁড়ি বেয়ে দোতলার এই কোঠাটায় যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। মিলির মাথার আঁচলটা সরে গেল। রুক্ষ চুলে আধময়লা শাড়িতেও মেয়েটা কি সুন্দর! এই মেয়েটাকে বহুদিন ধরে দেখছেন বড়দা, কিন্তু আজ দেখাচ্ছে অপূর্ব। মা হয়ে যেটুকু শিথিল হয়েছে বাঁধ, তা যেন লাবণ্য ঝরে পড়ার পূর্বক্ষণ।

সলজ্জ মিলি মাথায় আঁচলটা টেনে দিয়ে নাক মুখ চাপল। নিচ থেকে একটা দুর্গন্ধ আসছে।

কিসের এ দুর্গন্ধ বড়দা নিমিষে বুঝলেন। তাঁর মগজের ঝিল্লিগুলো চনচন করে উঠল! সিঁড়ির নিচের ঘরটার একটা অস্পষ্ট ছবি ইতি-মধ্যেই ভেসে গেছে তাঁর মনের ওপর দিয়ে। রাশি রাশি টুকরো সিগ্রেট......ধোঁয়ার গন্ধে থমথমে ভিতরটা.....আট দশটা খালি কাপ...... কয়েকখানা প্লেট......গুটি কতক ভূতের মত মানুষ। হাতে তাস।

দোর গোড়ায় রাশন ব্যাগে চাল ও সকালের বাজারের মাছ। এখন ফুলে ঢাউস হয়েছে।

বড়দা রোজই ভোর বেলা বিছানা ছেড়ে ওঠেন। দাঁত মেজে মুখ হাত ধুয়ে দোতলার সিঁড়িটার কাছে এসে দাঁড়ান এক কাপ চা হাতে নিয়ে। এই যে নিখিল করে এলে, বৌমা ভাল আছেন তো?......ওহে জগদীশ ছেলের চাকরী হল?......পঞ্চাননের টি বি বলতে পারো কি করে একটা ফ্রি বেড পাওয়া যায়? এমনি নানা প্রসঙ্গ। বড়দার নিজের সংসার নেই, কিন্তু তাঁর ঘাড়ে যেন এ সহরের যাবতীয় দায়িত্ব ন্যস্ত।

যতক্ষণ কাগজগুলো না আসে এই ভাবেই বড়দার দৈনন্দিন প্রোগ্রাম তৈরী হয়। নিজের চাকরীর ফাঁকে ফাঁকে তাঁর এসহরের উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু রোজই সফর না করে উপায় নেই। এক এক দিন মেসে ফিরতে রাত দুপুর। তবু কি ছাই স্বস্তি আছে, না সুখ আছে। বড়দার মনটা প্রায়ই খিঁচড়ে থাকে এই যত অকৃতজ্ঞ বন্ধুজনের ব্যবহারে।

সপ্তাহখানেক আগের কথা। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা টেনিস গ্রাউণ্ডের পাশের পার্ক। বড়দা পায়চারী করছিলেন। মুখে জ্বলন্ত সিগ্রেট। মাথায় সফরের সূচী। এমনি সময় রমেনের সঙ্গে দেখা। এই রমেন বড়দার একখানা পঞ্চাশ টাকার চেক ভাঙাতে গিয়ে আর ফেরেনি।

কি গো গত জন্মের বন্ধু? চেহারাখানা এমন সিঁটে মারল কি করে?

বড়দা অ্যাপেণ্ডিসাইটিসে ভুগছি। দিনরাত ব্যথা, কিছু খেতে পারিনে।

ডাক্তার কি বল্লেন?

অপারেশন দরকার।

গলা না পেট?

রমেন মিলির মতই দাঁড়িয়ে থাকে।

চেকের কথা না তুলে বড়দা এক ধার থেকে বকে যান। একেবারে ভূত ভাগিয়ে দেবার জোগাড়। দায়িত্বহীন, নচ্ছার। এ সব লোকের কেন আবার সংসার পাতা ইত্যাদি।......

আবার দুষ্টু দক্ষিণা হাওয়াটা আবার সেই পচা গন্ধটা। মিলি মুখে নতুন করে আঁচল চাপা দিতে গিয়ে তার ঘোমটা খসে যায়। এবার বিলাসী বড়দা বিব্রত বোধ করেন।

নিচের তলায় [illegible] একটু গুঞ্জন শোনা

যায়। এবার হয়ত কারুর ষ্টোয়ো মিলেছে, অথবা ম্যাশিং ক্লাস।

বড়দা সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করলেন, তা হলে কি হাসপাতালে ভর্তি হতে চাও?

না হয়ে উপায় নেই। কিন্তু জানেনই তো হাসপাতালে একটা সিট পাওয়া কি কঠিন। হয়ত আমি কাবার হয়ে যাবো, তবু......

আচ্ছা আমার সঙ্গে কাল দেখা করিস।

কোথায় কখন বড়দা?

দশটার পর আমার অফিসে। একেবারে রেডি হয়ে যাবি কিন্তু।

রমেন পায়ের ধুলো নিয়ে বিদায় হল।

পরদিন একখানা সুপারিশ পত্র নিয়ে যাওয়া মাত্রই সিট খালি পেলো রমেন। হাসপাতালে ভর্তি হয়েই একখানা উচ্ছ্বাসভরা চিঠি। আপনি আমার গত জন্মের বন্ধু ছিলেন। আরো অনেক কিছু।

ক'দিন বাদে বড়দা হাসপাতালে গিয়ে উপস্থিত। গত জীবনের বন্ধুটি নেই। গোটা দুই ইনজেকসন নিয়ে পগাড় পার। খবর নিয়ে বড়দা শুনলেন, অপারেশন নাকি রমেনের সইবে না। সে হোমিওপ্যাথিক করাবে। বায়োকেমিকও হতে পারে।

শেখর এবং মিলিকে নিয়েও বড়দার এমনি অবস্থা। ঠিক এমনি বললে গুরুত্ব অনেক কমিয়ে বলা হয়, যথেষ্ট লাঞ্ছনা।

আর দেরী করো না, যাও বলছি। বড়দা টর্চটা এগিয়ে দিলেন।

মিলি হাতও তুললো না, এক পা নড়লোও না। মুখে তো আগে থেকেই রা নেই। ছেলে মেয়ে দুটোও তো কেঁদে উঠতে পারে। বড়দা বললেন, তোমার কি মনুষ্যত্বও নেই! ভেবে দ্যাখো কোথায় এসে ফেলেছ।

মিলির মুখখানা থমথম করছে। বড়দা বেশ একটু শঙ্কিত হলেন। কথা বলছে না, মুখ ছুটালে কি বলে বসে কে জানে। একটু চিন্তিত হয়ে পড়েন বড়দা।

প্রায় বছর দশেক আগে এই মেস বাড়িতে উঠে বড়দা হাঁফ ছাড়েন। কত খুঁজে খুঁজে যে এ কোঠাখানার হদিস মিলেছে! কিছুদিন বাদেই তাঁর নজর পড়ে নিচের তলার ঘরটির দিকে। আজো যেমন দোর ভেজান, তখনো ঠিক তেমনি ছিল...... তেমনি ধোঁয়া, তেমনি তিনটি বুমমেটে মিল। এদের সঙ্গে যথা সময়ে বড়দার আলাপ হল। ঘনিষ্ঠতাও জমাল। ঘোষ বোস এবং মিত্র কোম্পানী এ মেসের প্রথম পত্তনদার। তারা তিনটিতে বড়দার বিরাটত্ব স্বীকার করে নিলে। কিন্তু পত্র আবডাল দিয়ে বজায় রাখলে এই আস্তানাটি। দু একটি লোক মাঝে মাঝে বুক চিতিয়ে আসে, যাওয়ার বেলা কোল কুঁজো হয়ে ফিরে যায় নিঃশব্দে। ঘোষ বোস এবং মিত্র কোম্পানীর আর কোনো উৎপাত নেই।

বড়দা প্রথম প্রথম বোঝালেন, তারপর বকাবকা করলেন হয়ত। কিন্তু কোনো উপকার হল না। অবশেষে তিনি পুলিশের হুমকীও দেখালেন। কিন্তু তবু তাপ-উত্তাপ নেই তিনটির।

একদিন বড়দা একেবারে চমকে উঠলেন শেখরকে দেখে। আঠার উনিশ বছরের দিব্যি নধর ছেলে। বলতে গেলে এখনো এর মুখ দিয়ে দুধের গন্ধ যায়নি, এ এখানে কি চায়?

কি চাও হে?

একটা চাকরী।

কোথায় থাকা হয় চাঁদ?

নিকটেই। মা নেই, বাবা অসুস্থ, বড্ড মুসকিলে পড়েছি।

সেই মুসকিল আসান করতে বুঝি এখানে এসেছ? কে এ খোঁজ দিলে? ভারী তদ্বিরী ছেলে তো তুমি!

আমার এক বন্ধু এ ঠিকানাটা দিলে।

ভাল বন্ধু জুটিয়েছ তো ছোকরা! তা কি পর্যন্ত পড়েছ?

আই এ পরীক্ষা দিয়েছি।

বড়দা মাসখানেক চেষ্টার পর নিজের অফিসেই ঢুকিয়ে নিলেন বড় সাহেবকে অনেক বলে করে। আরো যে কত কাঠ খড় পোড়াতে হল তাঁকে।

এরপর বড়দা একখানা চরম পত্র পাঠিয়ে দিলেন নিচতলায় টাইপ করে।

জবাব আসতে দেরী হল না। ঘোষ বোস এবং মিত্র কোম্পানী সবিনয়ে লিখেছে—

নমস্কারান্তে নিবেদন বড়দা—

দীর্ঘ দিন ধরে আমরা এই পথে হেঁটে এসেছি, এখন নতুন করে পথের চিন্তা করাও অসম্ভব। এবাজারে একজনার মুখের রুটি কেড়ে নেয়া যত সহজ, তাকে দেয়া অনেক কঠিন। আমরা কখনো কারুকে এখানে হাত ধরে টেনে আনিনে, অতএব আমাদের কথাটা আর একটু সহানুভূতির সঙ্গে ভেবে দেখবেন।

প্রীতি নেবেন। অনুজ

পুনশ্চ: দয়া করে মনে রাখবেন এই মেস বাড়ীকে বাঁচিয়ে রাখতে গোড়া পত্তনে আমাদের অনেক রুধির খরচ হয়েছে। তখন টোম জুলিয়ে না রাখলে আজ বিজলীবাতি জ্বলত না।

পাকা মুসাবিদা। বড়দা একটু দমে গেলেন চিঠির জবাব পড়ে। শেষ পর্যন্ত তিনি যা করে বসে হাত গুটিয়ে নিলেন।

তাঁর ভিতরে হয়ত একটা অক্ষমতার আক্রোশ চাপা রইল। আজ তো বুঝি চূড়ান্ত রূপ নিয়ে চাইল মিলিকে দেখে। মিলি কিন্তু এখনো নির্বাক। সে বোধ হয় ধরে ফিরে যেতেও নারাজ।

শেখর পারমেনেন্ট হল এবং তা যে বড়দার চেষ্টাতেই হল এ কথা বলা অনাবশ্যক।

আবার একদিন সন্ধ্যা বেলা শেখরের সঙ্গে বড়দার দেখা। একজন নিচের তলায় নামছিলেন আর একজন চাইছিল যেন অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে।

এখানে কি?

আপনার খবর নিতে এলাম।

রোজই তো দেখা হচ্ছে অফিসে।

সেখানে বসে তো কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারি নে, এই খুঁটিনাটি কথা। এই—

কি জিজ্ঞাসা করবে এখন করো, কি তোমার খুঁটিনাটি প্রশ্ন?

শেখর জবাব খুঁজে পায় না।

বড়দা ধমক দিয়ে ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। মনে মনে মন্তব্য করেন, ডেঁপো ছোকরা।

পরদিন শেখরের বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কি যেন পরামর্শ করেন বড়দা। ফলে শেখর অনেক দূরে বদলি হয়ে যায় এক স্বাস্থ্যকর স্থানে একটা লিফট পেয়ে।

নিয়মিত টাকা আসে মনিঅর্ডার যোগে। তবে অঙ্কটা সময় সময় রদবদল হয়। তা হোক, তবু

ভালোবাসা

রাণা বসু

মা-মরা কাজল-কালো ছেলেটা
জল নিয়ে খেলতে কী ভালোবাসতো!
একদিন বললে : আমি সাগরে যাব।
সত্যিই একদিন
মেঘ-গোলা নীল জলের টানে সে সাগরে গেল।
আকাশ-মেশা থৈ-থৈ জল দেখে
তার মনে পড়ল,
ছেলেবেলায় ঠাকুমার মুখে শোনা :
রূপকথার জোয়ারা, ঝিনুকে শোয়া রাজকন্যা,
আশ্চর্য অতলপুরী॥

পুব থেকে পশ্চিমে রণপায়ে ছুটোছুটি করে,
রাতকানা বুড়ো সূর্য যখন দিনান্তে
সাগর অতলে গা এলাবে ঠিক করেছে
ছেলেটা বুড়োর কাঁধ ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে।
পরদিন ভোর-ভাঙা সূর্য
ধীর পায়ে জল সিঁড়ি বেয়ে
যথারীতি উঠে এল
ছেলেটা কিন্তু এল না :
জলের মা তাকে গান শুনিয়ে ঘুম পাড়িয়ে
রেখেছে।
ঠাকুমা তার ওদিকে কালো পাথরে মাথা
ঠুকছে॥

টাকা। দূর দেশে বসে শেখরও বোধহয় কিছু জমাচ্ছে। বাপ খুশি। তিনি বড়দার সঙ্গে দেখা হলেই বলেন, আপনার অনুগ্রহেই ছোকরা আমার মনের স্বাস্থ্যও পালটেছে।

বেশ কয়েকটা বছর কেটে গেল। হঠাৎ টাকা পয়সা অনিয়মিত হতে লাগল। বাপ সন্ত্রস্ত। বড়দা রইলেন শান্ত কারণ অনুসন্ধানের পথ সহজ নয় হেতু খুঁজে বার করা। তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

এখন কি করা যায়?

বাপ বললেন, যদি আপনাদের অফিসের মারফৎ কোনো হদিস খুঁজে বার করতে পারেন নইলে আর উপায় দেখছিনে।

অফিসের লেফাফা তো তার একদম পড়ে দুরস্ত। এতো নন্ অফিসিয়াল ব্যাপার আপনার ছেলে তো আমার চাইতে অনেক চালাক। এক সেখানে যদি হঠাৎ যেয়ে উঠতে পারতাম, কিন্তু তা কি এখন সম্ভব!

শেখরের বাবা ম্রিয়মাণ হয়ে রইলেন। একটি মাত্র অবলম্বন এবং শেষ অবলম্বন।

একদিন হাসতে হাসতে শেখর এসে হাজির উঠল। কি চমৎকার যে চেহারা ফিরেছে একেবারে যেন ফেটে পড়ছে রক্ত। সঙ্গে মিলি সারা মুখে মুঠো মুঠো খুশির হাসি। সে নির্দ্বিধায় বড়দার পায়ের ধুলো নিলে।

আরে থাক, থাক। এটি কে, এই লাজলোপহীন পরগাছাটি?

একটি মিসট্রেস, এখন আপনাদের—

রাঙা হয়ে উঠল শেখর। আর পরিচয় দিতে পারল না।

কবে এসেছ?

এইমাত্র। এখনো বাড়ি যাইনি। আপনাকে একটু সঙ্গে যেতে হবে।

আচ্ছা চলো যাচ্ছি, একটু বসো তোমরা। এই হেমা—।

ঐ ডাকেই চাকর হুকুমটা বুঝে নিলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চা-জলখাবার এলো প্রচুর। বড়দা অল্প সময়ের ভিতরই ফিটফাট হয়ে নিলেন।

আজ বড়দার সে উৎসাহ কোথায়? বড়দা একেবারে তেতো হয়ে গিয়েছেন। যে নামগোত্রহীনাকে সেদিন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আজ বলছেন কিনা, চলে যাও।

মিলি আসন্নপ্রসবা। শেখরের আবার কলকাতা পোস্টিং হল। নাতির মুখ দেখে শেখরের পিতা স্বর্গত হলেন। মিলির আরো একটি সন্তান হল। এবার পরিপূর্ণ সংসার। ঝাঞ্ঝ ঝামেলা ডাক্তার রেশন। প্রেমের সোনা তবু বড় কদিনেই ফিকে হয়ে এলো। তাই মিলির প্রায় প্রাত্যহিক জিজ্ঞাসা হয়ে দাঁড়াল, বড়দা, উনি কোথায়? এখনো যে ফেরেন না?

গোড়ার দিকে বড়দা নিত্য এসে খোঁজ নিয়েছেন। তারপর সান্ত্বনা দিয়েছেন মিলিকে। একদিন তো শেখরকে অপমান করতেও ছাড়েননি কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। মানুষ অভাবে নষ্ট হয় কিন্তু শেখরের বেলা এ যুক্তি অচল। কারণ তার রোজগার সাধারণ কেরাণীর তুলনায় অনেক বেশি। এখন বড়দা এদের ছায়াও মাড়াতে চান না। চুলোয় যাক সব। ভস্মে ঘি ঢেলে লাভ নেই।

আজ সকাল বেলা বড়দা বেরিয়ে যাওয়ার সময় যে রেশন ব্যাগ নিচের কোঠার দোরে দেখে গেছেন, এখন তার থেকেই মারাত্মক গন্ধ ছড়াচ্ছে। মানুষ পচালেও এক হাল!

মিলির মুখ দেখে বড়দার মনে হয়, আজ একটা বিষম কিছু ঘটেছে, নইলে ছেলে মেয়ে জড়িয়ে এভাবে আসতে পারে না। একটা দুটো উপোসে মানুষ এতটা মরিয়া হয় না। তবু বড়দা বললেন, চলে যাও। নিজেরা ডুবেছ আমাকে আর ডুবিও না।

এবার মুখ খুললে মিলি, বললে যাব না।

কেন যাবে না?

আমি আপনার হুকুম নিতে এসেছি। আমি যে যাব না, তা ঠিক নয়—একেবারে যাবো বলেই হুকুম নিতে এসেছি। যে দূর দেশ থেকে এসেছি, সেই দূরেই জন্মের মত চলে যাবো। কিন্তু আপনি বাপের মত বড়দা আপনার আদেশ চাই। আর ছেলে মেয়ে দুটোকে আপাততঃ রেখে যেতে চাই আপনার জিম্মায়। এখন ওদের ভবিষ্যৎ আমার আর না ভেবে গতি নেই।

চমৎকার প্রস্তাব। প্রেম হল, বিয়ে করলে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা নেই, তখন শিক্ষিতা সাবালিকা ইত্যাদি, এখন ফল দুটি আমার ঘাড়ে।

মিলি গভীর স্বরে জবাব দিলে, আমি ঠকেছি। ক্ষমা করুন।

বড়দা বললেন, আমি ক্ষমা করতে পারতাম যদি তুমি ওকে ফেরাতে পারতে। একটু থেমে তিনি একটা কড়া মন্তব্য করলেন, তুমি কেমন মেয়ে মানুষ! শুধু কি মাকালের মত দেখতে?

আমি নানা পথেই হেঁটে দেখেছি বড়দা, কিন্তু হেরে গেছি। ক্যাস-ফিস-ব্রিজে আমি পারিনি সব খেলাই আমি ওঁকে ধরে রাখতে বাধ্য হয়ে নিপুণভাবে শিখেছি, কিন্তু বিষয়

হার হয়েছে ভাগ্যের হাতে। এবার গলার সুর খাদে নামিয়ে মিলি যেন একান্তে বললে, আসল কথা যাদের রক্তে বিষ ঢুকেছে তা বোধহয় যায় না। তারা যতক্ষণ ঘরের পয়সা পরের হাতে তুলে না দিচ্ছে ততক্ষণ বুঝি ভাল লাগে না।

বড়দা আজ আর বরদাস্ত করবেন না। পুলিশ ডেকে এক্ষুণি ধরিয়ে দেবেন এদের। তিনি থানায় যাবার জন্য জামা গায় দেন। কিন্তু তিনি থমকে দাঁড়ান একটু।

রক্তের বিষ নষ্ট করতে পারে এমন থানার এ সহরে আজ কোথায় ঠিকানা?

ডাকাত

(৭৬ পৃষ্ঠার পর)

দেখে নিল। সবাই চুপচাপ বসে আছে কিনা।

ভরপেট খেয়ে বৃন্দাবন কাঁসিটা অলগা করতে কোমরে হাত ঠেকাতেই দুর্গামোহিনী ছিটকে সরে গেলেন। কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, দোহাই বাবা, ওসব জিনিসপত্তর বের কর না। গঙ্গার দিকে মুখ করে বলছি, সবাইয়ের সঙ্গে যা কিছু ছিল সব তোমার পায়ের কাছে রেখেছি। এই দেখো আমাদের গায়েও কিছু রাখিনি।

সত্যিই সবাই গায়ের যা কিছু সবই খুলে দিয়েছিল, এমনকি ছেলেদের গলার দুটো মাদুলিও। কেবল শুভার আঙুলে একটা আংটি ছিল। বিয়ের আংটি বলে খুলতে একটু ইতস্ততঃ করছিল, কিন্তু দুর্গামোহিনীর কথা শেষ হবার আগেই সে আংটিটা অলঙ্কারের স্তূপের ওপর ছুঁড়ে দিল।

দুবার ঢেকুর তুলে বৃন্দাবন সোজা হয়ে বসল। কাতুর্পিসির দিকে চেয়ে বলল, খাওয়ার পর একটু ইয়ে পেলে হত।

কি পান তো, কাতুর্পিসি হাসবার চেষ্টা করলেন, আমি তোমার জন্য ধরে বসে রয়েছি বাবা।

চারটে খিলি কাতুর্পিসি বৃন্দাবনের দিকে এগিয়ে দিলেন।

হাঁ বাবা, জর্দা চলে?

মাথাটাথা ঘুরবে না তো?

পাগল। এ একেবারে অন্য জিনিস। জোড়াবাগানের জর্দা। খেলে আড়াই দিন খোশবো থাকে।

হাতের তালুতে জর্দার গুঁড়ো নিয়ে বৃন্দাবন দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কচ্ছ বরাবর গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, আমি যাচ্ছি, কিন্তু কেউ যদি চেন টেনেছেন কি হৈ হল্লা করেছেন তো নিস্তার নেই জানবেন।

দুর্গামোহিনী দুটো হাত যোড় করে ফেললেন, কেন অবিশ্বাস করছ বাবা। আমরা কি সেই বংশের মেয়ে। চোর, ডাকাত পড়লে চেঁচামেচি করব। তুমি নির্ভয়ে চলে যাও; ও হাঁ বাবা, এগুলো যে ফেলে যাচ্ছ। তোয়ালেতে বেঁধে দেবো পোঁটলা করে?

বৃন্দাবন হাত নাড়ল, না দরকার নেই। ওসব আপনারা তুলে ফেলুন। ও রকম ছড়িয়ে রাখবেন না।

গাড়ীর গতি কমে এল। সামনে বোধ হয় ষ্টেশন।

দরজাটা খুলে বৃন্দাবন একেবারে ধারে গিয়ে দাঁড়াল। উঁকি দিয়ে বাইরেটা একবার দেখে নিয়ে এক পা এগিয়ে এসে বলল, যাবার আগে একটা কথা বলতে চাই।

দুর্গামোহিনী আর কাতুর্পিসি ইতিমধ্যেই গলায় আঁচল জড়িয়েছিলেন, কাতুর্পিসি গদগদ গলায় বললেন, একটা কেন বাবা, তুমি একশোটা কথা বল। তুমি ঘরের ছেলে কথা বলবে, তা আবার অনুমতি কিসের?

অপরাধ নেবেন না। আমিও বৃন্দাবন বটে, তবে সাঁতরা নই পাঁজা। জমি-জমা বসতবাটি যা কিছু ছিল, বন্যায় সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার। নিজের বলতে আর কিছু নেই। রেলের জানলায় জানলায় হাত পেতে কেবল গালাগাল পেয়েছি। তৈজসপত্র যেটুকু বন্যা রেহাই দিয়েছিল, সেটুকু খাজনার দায়ে কর্তারা নিয়েছে। এ ডাকাতির আর কোথায় নালিশ করি বলুন? শিলিগুড়িতে খালি সিটের তলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম পেটের জ্বালায়, জেগে আর এক বৃন্দাবনের গল্প শুনলাম। মাপ করবেন মা। আসি।

ট্রেন পুরো থামবার আগেই লোকটা অন্ধকারে মিশিয়ে গেল। কাতুর্পিসি ছুটে এসে দরজাটা সবলে চেপে ধরলেন। বাইরে নিকষ কালো অন্ধকারে তখনও চকচক করে জ্বলছে, বৃন্দাবন সাঁতরার ধারালো ছুরি নয়, বৃন্দাবন পাঁজার অগ্নিগর্ভ ক্ষুধার্ত দুটো চোখ।

আলেখ্য

সুনীল ভট্টাচার্য

যখন থাকবো না আমি। চলে যাব দূরে
সামান্য কয়েকটি দিন
উজ্জ্বল এই মেঘ রোদ্দুরের রঙে
হয়তো বিষণ্ণ হবে। হবে প্রজাপতি।

তুমি সব ভুলে যেও। উদাসীন
তুমি সব স্মৃতি।
সময়ের স্নেহশীল মায়ের শাসন
নির্মম আকাশ তুমি এঁকো না কাজলে।

সমস্তই অনাত্মীয়। সব কিছু অচেনা-অজানা
এখানে যা কিছু আছে
—'সে এক গল্পের দেশ।'
ওপরে চাঁদের চোখে অপলক কৌতূহল
মাঝখানে স্পর্শভীরু কুটিল বাতাস।

না, আমি চাই না কিছু। শঙ্খমালা
দুর্লভ কোন প্রতিশ্রুতি।
তুমি শুধু মাঝে মাঝে বৃষ্টির দুপুরে
জানালাটা খুলে রেখো :
নিঃশব্দে কখনো যদি
কোনদিন প্রার্থী হয় একখণ্ড মৌন মেঘদূত।

আমেরিকান সাহিত্যে ভারত

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমেরিকার সংগে প্রাচ্যের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ প্রথম ঘটেছে চীনের মাধ্যমে। ইংরেজ ব্যবসায়ীরা ভারতকে যেভাবে শোষণ করেছে আমেরিকান বণিকরাও ঠিক তেমনি করে চীনে ব্যবসায়ের জাল পেতেছিল। আমেরিকানরাই চীনকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংগে পরিচিত করিয়েছে।

চীনের সংগে আমেরিকার সম্পর্কটা মূলতঃ ছিল ব্যবসায়িক। চীনের প্রাচীন সভ্যতা আমেরিকার জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ভারতের সংগে আমেরিকার দীর্ঘকাল যাবৎ কোনো স্বার্থের সম্পর্ক ছিল না। তথাপি প্রাচীন ভারতের ধর্ম ও দর্শন আমেরিকার কয়েকজন খ্যাতনামা লেখকের রচনা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছে।

আমেরিকান পাদ্রিদের প্রথম ভারতে পাঠানো হয় ১৮১৩ সালে। ১৮৩০ সালে তাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পায়। এই পাদ্রিদের মারফৎ আমেরিকানরা ভারত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পেলো। তাদের ধারণা হল, ভারত রাজা, নবাব, যোগী, সাপ, বাঘ, কাশ্মীরী শাল ইত্যাদির দেশ। সাধারণ লোক 'ইন্ডিয়ান' ও 'রেড ইন্ডিয়ানের' মধ্যে গোলমাল করে ফেলত। তাই ভারতবাসীদের সম্বন্ধে তাদের ধারণা উচ্চ ছিল না। ১৮৯৩ সালে বিবেকানন্দের আমেরিকা ভ্রমণের পর থেকে আমেরিকার জনসাধারণের মধ্যে ভারতের ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি হয়। ক্যালিফোর্ণিয়া অঞ্চলে এত অধিক সংখ্যক যোগ ও বেদান্ত শিক্ষণকেন্দ্র স্থাপিত হতে থাকে যে এই "আক্রমণাত্মক হিন্দু অভিযানের' বিরুদ্ধে রক্ষণশীল আমেরিকানরা বিংশ শতকের প্রথম তিন দশক পর্যন্ত পুস্তিকাপত্র লিখে এবং সংবাদপত্রের স্তম্ভে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা ভ্রমণের অনেক পূর্বে ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তা একদল আমেরিকান মনীষীকে আকৃষ্ট করেছিল। প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় তাঁরা লাভ করেছেন প্রধানতঃ ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমে। স্যার উইলিয়াম জোন্স, উইলকিন্স, উইলসন, ম্যাক্সমূলার প্রভৃতির রচনাবলী পড়ে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত আমেরিকান ভারতকে জানবার সুযোগ লাভ করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রমণের ফলে আমেরিকান সমাজের সকল স্তরে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের মূল তত্ত্বগুলি প্রচারিত হল। পূর্ব থেকে ভারতের কথা আমেরিকান সাহিত্যে স্থান লাভ না করলে বিবেকানন্দের বাণী হয়ত এতটা সমাদৃত হত না।

আমেরিকান লেখক এবং দার্শনিকেরা জার্মান সাহিত্য থেকেও প্রাচীন ভারতকে জানবার প্রেরণা পেয়েছেন। জার্মান আইডিয়ালিজম ও রোমান্টিসিজম ভারতীয় মিস্টিসিজমের নিকট বিশেষরূপে ঋণী। স্লেগেল বলেছেন,

"The Indians possessed a knowledge of the true God." ঈশ্বরকে যারা প্রকৃতই জানতে পেরেছিল, তাদের সম্বন্ধে আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। শোপেন হাউয়ারও ভারতীয় দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে বলেছেনঃ

the ancient Hindus may have had perhaps more to say about philosophy and fundamental truths than many of our modern writers.

জার্মান মনীষীদের এরূপ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আমেরিকার চিন্তাশীল লেখকদের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করতে পেরেছিল। আমেরিকায় য়ুরোপের মূল ভূখণ্ড থেকে জার্মান এবং অন্যান্য জাতিও এসেছিল। প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের কথা তারাও মুখে মুখে কিছু প্রচার করত। ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সংস্কৃতির উপর প্রাচীন ভারতের প্রভাব অন্য সকল বৈদেশিক প্রভাব অপেক্ষা বেশী ছিল।

১৮৩৬ সালে নিউ ইংল্যান্ড অঞ্চলে কয়েকজন লেখক ও দার্শনিক একটি নতুনগোষ্ঠীর প্রবর্তন করলেন। এঁদের ক্লাবের নাম হল "ট্রান্সেনডেন্টাল ক্লাব" এবং এঁদের মতবাদ ট্রান্সেনডেন্টালিজম বা অতীন্দ্রিয়বাদ নামে পরিচিত হল। জার্মান দার্শনিক কান্টের "ক্রিটিক অব পিউর রীজন"-এর তত্ত্বকে এঁরা মেনে নিতে পারেননি। ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত এক জগতের অস্তিত্বে ছিল এঁদের বিশ্বাস। সুতরাং মিস্টিসিজম স্বাভাবিকরূপেই তাঁদের মতবাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ভারত ও পারস্যের মিস্টিসিজম অতীন্দ্রিয়বাদীদের বিশেষরূপে আকৃষ্ট করেছিল।

নতুন দেশ আমেরিকা। নতুন জন্মের বেদনা তাকে নানারূপে ভোগ করতে হয়েছে। যন্ত্র শিল্প প্রসারের সংগে সংগে সে বেদনা আরো বেড়েছে। আমেরিকার চিন্তাশীল ব্যক্তিরা শান্তির সন্ধানে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলেন।

অতীন্দ্রিয়বাদীগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য সদস্য ছিলেন র‍্যালফ ওয়াল্ডো ইমার্সন, হেনরি থোরো, ন্যাথানিয়েল হথর্ণ, থিওডোর পার্কার প্রভৃতি। এই দলের মুখপত্র "দি ডায়েল" ছিল তদানীন্তন আমেরিকার একটি অন্যতম সাহিত্য পত্র।

র‍্যালফ ওয়াল্ডো ইমার্সন (১৮০৩—১৮৮২) ছিলেন এই গোষ্ঠীর পুরোধা। ভারতীয় চিন্তাধারার সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছে তাঁর রচনাবলীতে। ছাত্রাবস্থায় ইমার্সনের ভারত সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা ছিল না। তাঁর পিতা ছিলেন পাদ্রি। ইমার্সনেরও উদ্দেশ্য ছিল পাদ্রি হবার। কলেজে ছাত্রদের নিজের নির্বাচিত বিষয়ের উপর রচনা লিখতে দেওয়া হত। ইমার্সন একবার লিখেছিলেন, "ভারতীয় কুসংস্কার" নামে একটি প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের প্রধান প্রতিপাদ্য ছিল যে, গ্রীষ্মের প্রাধান্যের জন্য ভারতবাসীরা এমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন; সাদে-র "দি কার্স অফ কেহামা" পড়ে তিনি এরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করেছিলেন।

কলেজ ত্যাগ করবার পর তিনি "এশিয়াটিক মিসেলেনি" ও মনুর শাস্ত্রগ্রন্থ পড়েও ভারতের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হতে পারেননি। হিন্দুধর্ম তাঁর কাছে কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু তাঁর পিসিমা মেরি প্রায়ই হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে শ্রদ্ধাপূর্ণ চিঠি লিখতেন। স্যার উইলিয়াম জোন্সের অনুবাদ থেকে হিন্দুধর্ম ও কাব্যগ্রন্থের উদ্ধৃতি তুলে দিতেন। পিসিমার চিঠি পড়ে ধীরে ধীরে তাঁর আগ্রহ জাগতে লাগল। বন্ধু থোরোও এ বিষয়ে খুব উৎসাহী। তাঁর কাছে জোন্স, উইলসন প্রভৃতির অনেক বই ছিল। এ সব বই পড়ে ইমার্সন ক্রমশঃ ভারতীয় দর্শনের গুণগ্রাহী ভক্ত হয়ে উঠলেন।

ইমার্সনের রচনাবলীর মধ্যে ভারতের প্রভাব ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। ভারতীয় চিন্তাধারা সর্বত্র চিহ্নিত করা যায় না; ইমার্সন ভারতীয় দর্শনের মূল তত্ত্বগুলি আত্মস্থ করে নিজের চিন্তা-ভাবনার বিশিষ্ট ছাপ দিয়ে তাদের প্রকাশ করেছেন। অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র আমেরিকা ভ্রমণ করতে গিয়ে সেখানকার পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে লিখেছেন : ইমার্সন ও প্রাচ্যের চিন্তাধারার মধ্যে আমি গভীর সাদৃশ্য উপলব্ধি করি। ইমার্সন একালের নবলব্ধ সত্যকে প্রাচীন বিশ্বাসের সংগে যুক্ত করে ভারতের বাণীকে নব-জীবন দান করেছেন।

ইমার্সনের চিন্তাধারায় "ওভার-সোল" একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছে। এই ওভার-সোল আমাদের "পরমাত্মারই" ইংরেজী অনুবাদ। উপনিষদের দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। মায়া বলে তিনি সংসারকে উপেক্ষা করেননি। আমাদের মায়াবাদকে সম্পূর্ণ গ্রহণ না করলেও মায়াবাদের উপর তিনি কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছেন। মানুষকে মুগ্ধ করাই মায়ার কাজ; এই দিকটাই ইমার্সনকে আকৃষ্ট করেছে :

Illusion works impenetrable
Weaving webs innumerable,
Her gay pictures never fail,
Crowds each other, veil on veil,
Charmen who will be believed
By man who thirsts to be
deceived.

ইমার্সন উপনিষদ ও ভগবদ্গীতা বহুবার পড়েছেন। তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধের অনেক জায়গায় এ সব গ্রন্থের উদ্ধৃতাংশের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ পাওয়া যায়। ইমার্সনের বিখ্যাত কবিতা "ব্রহ্ম" কঠোপনিষৎ এবং

গীতায় ব্যবহৃত ভাবধারার সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি: ইমার্সন প্রথম স্তবকে বলছেন :

If the red slayer think he slays,
Or if the slain think he is slain,
They know not well the subtle
ways
I keep, and pass, and turn again.

কঠোপনিষদের সংশ্লিষ্ট অংশের ইংরেজী অনুবাদ থেকে সাদৃশ্যটা স্পষ্ট দেখা যাবে :
If the slayer think that he slays, if the slain think that he is slain, neither of them knows the truth.

মনে হয়, ইমার্সন গদ্য অনুবাদকে শব্দে শব্দে রূপান্তরিত করেছেন। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঠিক এই কথারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যাবে :

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং
মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো
নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥

"ইমর্টালিটি" নামক প্রবন্ধে ইমার্সন, যম ও নচিকেতার প্রশ্নোত্তরের ইংরেজী অনুবাদ দিয়েছেন। তাঁর "জার্ণালের" অনেক জায়গায় বিষ্ণু পুরাণের কোনো কোনো অংশের আক্ষরিক অনুবাদ দেওয়া হয়েছে।

হেনরি ডেভিড থোরো (১৮১৭—৬২) ইমার্সনের বন্ধু, এবং ট্রানসেনডেনটাল ক্লাবের বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। তাঁর মতো পড়ার নেশা দেশের সভ্যদের মধ্যে আর কারও ছিল না। প্রাচ্য বিশ্ব সাহিত্যের ক্লাসিকগুলো সবই পড়েছিলেন। ভারতের শাস্ত্র গ্রন্থের প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। ঋগ্বেদ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে, মানব সভ্যতার প্রারম্ভে এমন ভাবসম্পদ গ্রন্থ যে রচিত হতে পারে, তা বিশ্বাস হয় না। সন্দেহ হয়, ইংরেজী অনুবাদক নতুন চিন্তা যোগ করে দিয়েছেন। থোরো তাঁর জার্নালে মন্তব্য করেছেন, হিন্দুরা হিব্রু জাতি অপেক্ষা অনেক বেশী ধার্মিক ছিল এবং তাদের ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি ছিল দৃঢ়তর।

থোরোর 'এসে অন সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স' টলস্টয় ও গান্ধীকে প্রভাবান্বিত করেছে। তাঁর বিখ্যাত বই Walden হল 'the spiritual autobiography of a rebel wearied by the machine age." এই বইটি পড়ার মধ্যেই ভারতীয় চিন্তাধারার প্রভাব দেখা যায়। বিশেষ করে "ওয়াল্ডেন"-এ থোরো নিজের জীবনচর্যাকে ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থের আলোকে বিচার করে দেখেছেন। বিশেষ করে একাদশ, চতুর্দশ, ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ অধ্যায়গুলির কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। থোরো বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, গীতা, কালিদাস ও কবীরের রচনাবলী থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং তাদের বিশ্লেষণ করেছেন। ষোড়শ অধ্যায়ে থোরো বলছেন, সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি গীতা পাঠ করেন; তার ফলে বুদ্ধিবৃত্তির শুচিস্নান হয় :

"In the morning I bathe my intellect in the stupendous and cosmogonal philosophy of the Bhagvat-Geeta, since whose composition years of the gods have elapsed, and in comparison with which our modern world and its literature seem puny and trivial; and I doubt if that philosophy is not to be referred to a previous state of existence, so remote is its sublimity from our conceptions."

পৃথিবীর মহৎ চিন্তাধারার মিশ্রণের দ্বারাই জীবনের সম্মুখে এক মহত্তর আদর্শ লাভ করা যেতে পারে। থোরো নিজের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে ভারতের জীবনদর্শন একাত্ম করতে পেরেছিলেন। সংসারের কোলাহল থেকে বিদায় নিয়ে তিনি বাস করতেন ওয়াল্ডেন হ্রদের তীরে। ওয়াল্ডেনের জলের সঙ্গে গঙ্গার জল মেশাতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন :
"The pure Walden water is mingled with the sacred water of the Ganges."

১৮৯৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দ লাহোরে অধ্যাপক রামতীর্থের বাড়িতে ওয়াল্ট হুইটম্যানের (১৮১৯—'৯২) Leaves of Grass দেখতে পান। এ বই পড়ে বিবেকানন্দ মুগ্ধ হয়েছিলেন—তিনি বলতেন, হুইটম্যান আমেরিকান সন্ন্যাসী। যে কোনো রসজ্ঞ পাঠকই "লীভস অব গ্রাস" পড়ে ভারতীয় ভাবধারার প্রগাঢ় প্রভাব উপলব্ধি করবেন। কবি তাঁর এই কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে বলেছেন :

This is no book;
Who touches this, touches a
man.

পাঠক "লীভস অব গ্রাস" পড়ে এক বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর হৃদয় স্পর্শ করবেন।

১৮৫৬ সালে থোরো "লীভস অব গ্রাস" পড়ে মন্তব্য করেছিলেন :
Wonderfuly like the orientals.
হুইটম্যান যে ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করেছেন, একথা থোরোর কাছে স্বীকার করেননি। কিন্তু পরে 'এ ব্যাকওয়ার্ড গ্ল্যান্স'-এ তিনি স্বীকার করেছেন যে "লীভস্ অব গ্রাস্" লেখার আগে প্রাচীন হিন্দু কাব্যগ্রন্থ পড়েছেন। এডওয়ার্ড কার্পেন্টার তাঁর "ডেজ উইথ ওয়াল্ট হুইটম্যান" গ্রন্থে উপনিষদের সঙ্গে "লীভস্ অব গ্রাস্" এর সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। হুইটম্যানের "সংগ অব মাইসেল্ফ" শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনকে উপদেশ দেবার প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়। গীতায় আত্মা সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে হুইটম্যানের "সেল্ফ"ও সেই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁর 'মি', 'মাইসেল্ফ' ও 'আই' অমর এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। আমাদের শাস্ত্রে পরমাত্মা ও জীবাত্মার কথা বলা হয়েছে। ইমার্সন পরমাত্মা বা ওভার-সোল-কে প্রাধান্য দিয়েছেন। হুইটম্যানের 'আমি' জীবাত্মা, ব্রহ্মের যে অংশটি মানুষের মধ্যে বাস করে ক্ষুদ্রের সঙ্গে বৃহতের, জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের সংযোগ রক্ষা করে চলে।

আনন্দ কুমারস্বামী তাঁর Bhudda and the Gospel of Bhuddhaism গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে বৌদ্ধ শাস্ত্রোক্ত চার প্রকার ব্রহ্মবিহারের (মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা) দৃষ্টান্ত হুইটম্যানের কবিতায় পাওয়া যায়। কুমারস্বামী উদ্ধৃতি সহ তাঁর বক্তব্য প্রমাণ করেছেন।

ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য এবং আরও ঐশ্বর্য আহরণের দুর্নিবার লোভ জাতির আত্মিক শক্তি ক্ষুণ্ণ করবে বলে আমেরিকান মনীষীদের আশঙ্কা হয়েছিল। ইমার্সন, থোরো এবং হুইটম্যান বিশ্বাস করতেন যে, ভারতের অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে পরিচিত হলে অর্থের জন্য উন্মত্ততা হয়ত কমবে।

সুয়েজ ক্যানেল ও প্যাসিফিক রেল রোডের কাজ সমাপ্ত হবার পর হুইটম্যান আমেরিকার সঙ্গে প্রাচ্যের যোগাযোগের পথ মুক্ত হবার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। এই উপলক্ষে ১৮৭১ সালে তাঁর কবিতা "প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া" প্রকাশিত হয়। তাঁর কাছে সুয়েজ বণিকের লোভের প্রকাশ নয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনে যে মহান বিশ্বসভ্যতা গড়ে উঠবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন এটা তারই সূচনা। মানবাত্মার জন্মভূমি ভারতে যাবার পথ সহজ হওয়ায় বিভ্রান্ত প্রতীচ্য আত্মস্থ হবার সুযোগ পাবে। হুইটম্যান ভারতের বন্দনা করে বলছেন :

ভারত পথ যাত্রী।

মনুষ প্রথম যেখানে ভূমিষ্ঠ সেই
সুদূর ককেশাসের শীতল বায়ু স্রোত
ইউফ্রেটিস-এর প্রবাহ।
পুনর্দীপ্ত অতীত।
হে হৃদয়, দেখো সেই বিগত দিন
আবার তোমার সামনে মেলা।
সবচেয়ে জনাকীর্ণ ধনাঢ্যতম সব পৃথিবীর
প্রাচীন দেশ
সিন্ধু আর গঙ্গার অসংখ্য ধারা
(আমেরিকার তীরে আমি ভ্রাম্যমাণ
আমার চোখে সব কিছুই আজ প্রতিভাত)
সমরাভিযাত্রী সেকেন্দারের আকস্মিক মৃত্যু
একদিকে চীনা আর একদিকে পারস্য ও আরব,
দক্ষিণের সেই বিশাল সমুদ্র-বঙ্গোপসাগর
প্রবহমান সাহিত্য, মহান সব মহাকাব্য,
ধর্মান্দোলন, জাতির পাঁতি,
আদি দুর্জ্ঞেয় ব্রহ্ম, অনন্ত অতীতে,
নবীন করুণ কোমল বুদ্ধ
কেন্দ্রীয় ও দাক্ষিণাত্যের সব সাম্রাজ্য
তাদের সম্পদ ও অধীশ্বর,
তৈমুর লঙের সংগ্রাম, আওরংগজেবের শাসনকাল
বণিক, শাসক, পর্যটক।

* * * *

হে হৃদয় চলো
সেই আদিম মননে
শুধু দেশে দেশে কি সাগরে নয়।
সেই প্রথম স্বচ্ছ সঞ্জীবনায়
জীবন বেদের মুকুল যেখানে জেগেছে
সেই খানে, প্রাণের তারুণ্য ও পুষ্পোদ্গমে।
(অনুবাদ : প্রেমেন্দ্র মিত্র)

ইমার্সন, থোরো ও হুইটম্যানের বর্তমান ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না। তাঁরা প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কোনো খ্যাতনামা ইংরেজ লেখক প্রাচীন ভারতের প্রতি এরূপ শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নি। যাঁরা করেছেন তাঁরা ভারতবিদ্যা বিশারদ, সাহিত্যিক হিসাবে তাঁদের প্রতিষ্ঠা নেই। শেক্সপীয়র থেকে আরম্ভ করে রোমান্টিক যুগ পর্যন্ত ইংরেজ লেখকরা ভারতের ঐশ্বর্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং ভীষণতার কথাই বলেছেন। ১৮৫৭ সালে বিপ্লবের পর থেকে ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংঘর্ষের সূচনা হয়। তার প্রভাব সমসাময়িক ইংরেজ সাহিত্যেও পড়েছে। কিপলিং-এর রচনা

(শেষাংশ ৯১ পৃষ্ঠায়)

রোম্যান্সের রাস্তায়

দেবেশ দাশ

রোম্যান্সের রাস্তায় পায়ে হেঁটে চলেছি। এটুকু জেনেই আপনি আমার সঙ্গ নিতে চাইবেন। আমিও তাই চাই। নেমে পড়ুন আমার সঙ্গে ইটালীর ছোট রাস্তায়, গলি ঘুচিতে, পায়ে হেঁটে। পদে পদে রোমান্স।

রোমের রোমিওদের কথা আগে থেকেই শুনে এসেছি। প্রায় পঁচিশ বছর আগে থেকে। ইংলণ্ডে তখন সবে ইয়ুথ হোস্টেল এসোসিয়েশন তৈরী হয়েছে। জার্মাণীর তরুণ-তরুণী ওয়াণ্ডারফগেলদের মত ইংলণ্ডেও পায়ে হেঁটে দেশ দেখে বেড়ানর সংঘ তৈরী হয়েছে। আমি আর দুজন বন্ধু এই ইয়ুথ হোস্টেল সংঘের প্রথম ভারতীয় সভ্য হলাম।

কয়েকটি ইংরেজ মেয়ে তখন ইটালীতে যাচ্ছিল। তাদের সাবধান করে দেওয়া হল যেন ওদেশে ওরা একলা কারো মোটরে 'লিফ্‌ট' না নেয়। ওদেশে অনেকেই নাকি উড়কো প্রেম করে নেবার জন্য পা বাড়িয়ে থাকে। পায়ে হেঁটে বিদেশিনী তরুণী দেশ দেখে বেড়াচ্ছে। সে যদি খানিকটা পথ কারো মোটরে চড়ে সেরে নিতে চায়, তার সে পথটা একটু স্বপ্নে ভরে দিলে দোষ কি? আমি ত তারই দিনের মধ্যে শুধু একটু মধু মিশিয়ে দিচ্ছি। ফাঁক তালে আমার যদি কিছু লাভ হয়ে যায় তাতে আপনার চোখ টাটায় কেন?

এই বোধ হয় রোমিওদের মনের কথা।

শুনে আমাদের মধ্যে কয়েকজন পুরুষ সভ্য খুব হেসেছিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলবার ভান করে বলেছিল,—রোমিওদের খবর ত শুনলাম। ইটালীর জুলিয়েটদের খবরটাও জানতে চাই।

যুব হোস্টেল সংঘের প্রবীণা ইংরেজ সেক্রেটারী চশমাটা নাকের প্রান্তে নামিয়ে আনলেন। হেসে বললেন,—ইংলণ্ডের নওজোয়ানরা বিদেশী জুলিয়েটের সন্ধানে ইংলিশ চ্যানেল পার হয় না।

শুনে মনে মনে ভেবেছিলাম,—সাবাস। ঠিক জনবুলের মত কথাই বটে।

তারপর শুনলাম তিনি গুরু গম্ভীরভাবে বাণী দিচ্ছেন,—আমাদের এসোসিয়েশনের সভ্যরা ব্রিটেনের পতাকা সব সময় উঁচু রাখে। বিদেশে গিয়ে বিদেশীদের সঙ্গে অশোভন কোন কিছু করে না।

মনে মনে টুকে নিলাম,—একেবারে পুরোপুরি জন বুল। বিদেশে গেলেও ইংরেজরা সে দেশের লোকদেরই বিদেশী মনে করে। এদের পেট এতই আত্মম্ভরিতায় ভরা।

শুনেছি যুদ্ধের পর ইটালীতে রোমিওদের রাজত্ব আরো বেড়েছে। এমনিতেই ল্যাটিন জাতের বিশেষত্বই হচ্ছে নিজেকে প্রকাশ করা। ওদের মনের কেটলিতে যখন ভাবের জল টগবগ করে ফুটে ওঠে সেই টগবগানি ঢাকনা খুলে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর সেই ভাবের চা পরিণত হয় ধন পাচনে।

সেই পাচনের গাঢ় রঙ আর তীব্র ঝাঁঝ দেখছিলাম একটা ছায়াছবিতে। ইটালিয়ানে যাকে বলে রিয়েলিস্‌মো অর্থাৎ বাস্তবতা একেবারে তাতে ভরা। নেপলসের সরু অন্ধকার গলিপথ পর্যন্ত সেই রিয়েলিস্‌মো পৌঁছে গেছে দেখলাম। সদরের চওড়া ঝকঝকে রাজপথ থেকে আরম্ভ করে অন্দর মহল পর্যন্ত। ছোকরাদের চুলগুলো এলোমেলো করে সামনের দিকে ঝোলানো। মেয়েদেরও তাই। এদিক সেদিক ছিটের ব্লাউজে স্কার্টে যত্ন করে কেটে বানানো ফুটো ফাটা উঁকি ঝুঁকি মারছে। যুদ্ধের পরের অভাবের বাজারে পোষাকের সংক্ষিপ্ত ছাটটা ছিল দরকার। রিয়েলিস্‌মোর কল্যাণে যেটা ছিল দরকার সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে বাহার।

রাতের 'শো'র পর হেঁটে ফিরে যাচ্ছি। না হাঁটলে যে সব কিছু দেখা যায় না। যায় না বোঝা। কিন্তু দুটো চোখ আর মোটে একটা মন দিয়ে সব কিছু অনুভব আর উপভোগ করি কি করে? এই ত আমার রাস্তার রোমান্স।

ভাবতে সময় পেলাম না। একটা প্রকাণ্ড লম্বা আলফা-রোমিয়ো মোটর ক্যাচ করে ব্রেক কষে থামল আমার প্রায় গায়ের উপর। চারদিক দেখেই রাস্তা পার হচ্ছিলাম। কোথাও কিছু ছিল না। কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে দামী গাড়ীর অন্যতম এই গাড়ীর চলন যেমন ঝড়ের মত, তার ইটালীয়ান ড্রাইভারের চালও তেমনি তেজস্বী। সে কি সব কথার তোড়ে পাগলা ঝোরার মত আমায় ভাসিয়ে দিয়ে গেল। শুধু এটুকু বুঝলাম যে সে আমায় শাসিয়ে গেল যে যে বিদেশী রাতে পায়ে হেঁটে বেড়ায় আলফা-রোমিয়ো মোটরের তলায় পড়ে মরবার যোগ্যতা তার নেই।

না থাক। অমন ভাগ্যে আমার কাজ নেই। তার চেয়ে পাশের ছোট রাস্তাগুলোয় হেঁটে যাক। হয়ত সেখানে হঠাৎ জুটে যাবে গাইয়ে তরুণ-তরুণী দল। একতারার মত যন্ত্র বাজিয়ে হাত তালি দিয়ে নাচতে নাচতে তারা গাইবে 'স্টর্ণেল্লি' গান। ইটালীর পথঘাটের গান। ওরা হয়ত গাইবে:—

"ওগো কাঁটায় ঘেরা ফুল,
পিরীত যদি শুকিয়ে গেল
আর সবি যে ভুল"

ওদের গানের আখর শুনতে শুনতে আত্মহারা হয়ে আমিও হয়ত তালে তাল দিয়ে গেয়ে উঠব:—

ওগো, গোলাপ কুঁড়ির সাকী,
খুসীর বানে ভাসি যদি
রইবে তুমি বাকী?

এ ত শুধু দুটো নিরামিষ্যি নমুনা। 'স্টর্ণেল্লি' গান গেয়ে ইটালীর ছেলে-মেয়েরা ঝাট- না দেওয়া রাস্তাগুলোকেও উজ্জ্বল করে তোলে হাসিতে খুসীতে।

আর কি সে গানের মাল মশলা। বাস্তবতায় এমন করে ঝাল-নুন-টক মেশানো যে কথাগুলো প্রায় অস্পষ্ট হয়ে যায়; সুরটাই থাকে শুধু পরিষ্কার হয়ে। যেন মাংসের ঝোলে মাংস গেছে গলে; শুধু গরম মশলা মাখা ঝোলটুকু আছে বাকী। তার ভাপ, তার ... যদি এখন আস্বাদ করতে পারি, আমার আবার

রাতে একা হেঁটে বেড়ান সার্থক হয়ে যাবে।

অন্ধকারে দেখলাম একজন নাবিক সেই চড়া গন্ধ আর কড়া আওয়াজে ভরা পুরোনো বন্দরের দিক থেকে টলতে টলতে আসছে। বিদেশী জাহাজের নাবিক নিশ্চয়ই। পেছনে পেছনে আসছে একটা বছর দশেকের ছোকরা। সুর করে বলছে,—তোমার মেয়ে চাই, মিস্টার? মেয়ে? আমার বোন আছে। সস্তা, খুব সস্তা।

ল্যাম্প পোস্টের আড়ালে দাঁড়ালাম। আর এগোন ঠিক নয়। এই সব বদমায়েস বখা ছোকরাদের নাম বিদেশে পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। আগে এদের বলত র‍্যাগাৎসিনি। এখন বলে স্কুগনিৎসি অর্থাৎ ঘুরভাই লাট্টু। শুধু চুরি, ছ্যাচড়ামি নয়, কালো বাজারের দালালি, চোরাই মালের পাচার অনেক কিছুই ওরা করে। খুব ছোট যারা তারা পোড়া সিগারেটের বাকী টুকরোগুলো কুড়োয়। মাত্র আট টাকা সেরে বিকোবে।

পুলিশ ওদের ধরে বটে। কিন্তু শোধরাতে পারে না। রিফর্মেটারীতে চরিত্র শোধরাবার জন্য হয়ত রেখে দেবে ছমাস। বাপ-মার কাছে হয়ত পৌঁছে দেবে সাবধানে দেখে রাখবার জন্য। তার পরই আবার ওরা রাতের রাস্তায় ফিরে আসবে। সমাজ করতে পারে না ওদের শাসন; রাষ্ট্র পারে না করতে ব্যবস্থা। অভাব নষ্ট করেছে ওদের স্বভাব।

দূর থেকে দেখলাম লস্কর বেচারার অবস্থা। হাত বাড়িয়ে ধাক্কা মেরে লাট্টুকে সরিয়ে দেবার দুর্বল চেষ্টা করল। কিন্তু ইঁদুরের মত চটপটে বাচ্চার সঙ্গে পেরে উঠল না। সে ওর বুক পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। মতলবটা খুব পরিষ্কার। লস্কর আবার ধাক্কা দিয়ে ওকে হটিয়ে দিল। তখন লাট্টু বো করে দিল ছুট। বোধ হয় বড় ছোকরাদের খবর দিতে গেল। মার ধোর করে কাপড় চোপড় জিনিষপত্র কেড়ে নেওয়া যায় এমন লোকের শুধু খবরটুকু ওদের পৌঁছে দিলেই এখানে নাকি পঁচিশ থেকে হাজার লিরা বখশিষ মেলে।

দৌড়ে এগিয়ে গেলাম। এই বেলা বেচারী বিদেশীকে সমঝিয়ে দিয়ে আসি কি বিপদের মুখে ও এসে পড়েছে। সম্ভব হলে ওকে হাত ধরে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেব। কিন্তু অতদূর এগোতে হল না। সামনে কোথা থেকে হাজির হল এক বয়স্ক বখা। হাঁক দিল "তুমি কে বট হে? মতলবটা কি?"

মতলব যে খারাপ নয় তা বোঝাবার জন্য হাত দুটো পকেটে গুজে শান্তভাবে দাঁড়ালাম।

ওর গলার আওয়াজ শুনে এবার ভয় হল। ভীষণ স্বরে বলল,—পকেট থেকে হাত দুটো বের করে আন চটপট।"

শান্তভাবেই জিজ্ঞেস করলাম,—কেন?

ও আর সময় নষ্ট করল না। সোজা একটা ক্ষুর নিয়ে তেড়ে এল। কিন্তু আমার ভাগ্য ভাল। এই নিশুতি রাতে দূর বিদেশে কোন লাট্টুর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করা বা তার হাতে মান বা জান খোয়ানর দরকার হল না। আরেক জন লোক পাশের রাস্তা দিয়ে খটাখট বুটের আওয়াজ করে আসছিলেন। সে আওয়াজে দুঃস্বপ্ন অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ভদ্রলোকের সঙ্গে [illegible] জিজ্ঞেস করলাম [illegible] ছোকরা তেড়ে আক্রমণ করতে এল কেন। তিনি হেসে বললেন,—আপনি দেখছি নেহাৎ অনভিজ্ঞ এসব বিষয়ে। লুকোনো হাত মানেই হচ্ছে লুকোনো হাতিয়ার।

আমিও হাসলাম—আর মাথার উপরে তোলা হাত মানেই বুক পকেটে হাত। অবশ্য বুকে নয়, অর্থাৎ হৃদয়ে নয়।

খুশী হয়ে গেলেন ভদ্রলোক,—বাঃ, আপনি ত দেখছি বেশ রসিক। এত বিপদে পড়েও রসিকতাটুকু ছাড়েন নি। বিদেশ এসেছেন কি দেশ দেখতে, না শেষ হতে? ধনে, না হয় জীবনে।

উত্তরে জানালাম,—কোনটাই নয়। ইটালী দেখে গেছি তন্ন তন্ন করে। নিজের দেশের চেয়েও বোধ হয় ভাল করে। তবু দেশ শুধু দেখা নয়, তলিয়ে দেখার আশা এখনো মেটেনি। এই নোংরা নিঃঝুম গলিকেও তাই মনে হচ্ছে যেন রোম্যান্সের রাস্তা।

উনি হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন,—যার সত্যিকারের দৃষ্টি আছে তার সে আশা বোধ হয় কোনদিনও মেটে না। সৃষ্টি হচ্ছে অনন্ত। দৃষ্টিও তাই অশেষ।

কথাগুলি যেন কেমন কেমন মনে হল। ভদ্রলোকের পরনে মামুলী পাৎলুন, পুরো হাতা সোয়েটার আর তোবড়ানো একটা ক্যাপ। কিন্তু মুখখানার সঙ্গে এ পোষাক তেমন খাপ খাচ্ছে না। কথাবার্তার সঙ্গে ত নয়ই।

একটু বাজিয়ে দেখতে হবে।

ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞেস করে বসলাম। পশ্চিমে আবার নাম ধাম পেশা সোজাসুজি জিজ্ঞেস করা চলে না। শিক্ষিত সমাজে অচল। তাই একটু বেঁকিয়ে প্রশ্ন করলাম,—এই নিশুতি রাতে একা আপনি আসছিলেন এ হেন রাস্তা বেয়ে। আপনি কি সাংবাদিক?

উনি হেসে বললেন,—ঠিক তা নয়। যদিও খবরাখবরের জন্যই বেরিয়েছি। কিন্তু সত্যি করে বলুন ত? বিদেশী হয়েও একা এ হেন এলাকায় এসেছেন কেন?

কি পরিচয় দিই? যে কাজে এদেশে এসেছি, দেশে যে কাজ করি তা এই পরিবেশে হয়ত বেমানান হবে। অন্ততঃপক্ষে আরো দুটো প্রশ্ন হতে পারে। বলে ফেললাম—আমি, আমি হচ্ছি একজন বিদেশী সাহিত্যিক।

মাথা হেলিয়ে সসম্মানে নমস্কার করে উনি বললেন,—দেখুন আপনি তাহলে আমার সম্মানের পাত্র। সাংবাদিক হচ্ছে সাময়িক আর সাহিত্যিক হচ্ছেন সময়াতীত।

বাধা দিলাম,—কিন্তু সৃষ্টির রস থাকলেই সাংবাদিক হয়ে ওঠেন সাহিত্যিক। আপনার মনে আছে সেই রস। এখন বলুন ত কিসের খবরাখবর আপনি নিয়ে বেড়াচ্ছেন এই রাস্তায়? এই রাতে?

উনি আমায় কাছাকাছি একটা পড়ো বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। বললেন—এইটে হচ্ছে আমার রাতের আস্তানা।

অচেনা লোক, অজানা জায়গা। চকিতে চোখ চালিয়ে দেখলাম দেওয়ালে ঝুলছে একটা কালো পোষাক। রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীর পোষাক আর সুন্দর একটি ক্রশ।

বললাম—উহুঃ; আপনার দিনের আশ্রয় কিন্তু অন্যত্র। আপনি ধর্মযাজক। কথা আর [illegible]।

উনি অস্বীকার করলেন না। হেসে বললেন,

—আপনি ধরেছেন ঠিক। যাদের হাতে এখনি পড়তে যাচ্ছিলেন, তাদেরই আমি খাচ্ছিলাম খবরে।

—কিন্তু পোষাক বদলালেন কেন?

—তার কারণ ওই 'স্কুগনিৎসি'রা সব সমাজকে এড়িয়ে চলে। ওদের চোখে সব 'অভিারই' সমান—কিবা পুলিশ, কিবা পাদ্রী।

—এই রাতে যদি বা ওরা পাদ্রীর পোষাককে ক্ষমা করত, সাধারণ লোক হিসাবে আপনি রেহাই পাবেন কি করে?

—রেহাই ত চাই না, ভাই। হতে চাই সহায়। তাই ওদেরই মত সাজে, ওদেরই পথে হাঁটি। ওদের সঙ্গে চলি ফিরি, মিশে যাই। কখনো বিপদে পড়লে বিপথ থেকে ওদের আমার পথে এই রাতের আস্তানায় নিয়ে আসি। আস্তানা তখন হয়ে ওঠে আশ্রয়। আস্তে আস্তে ওদের লেখা-পড়ার, কাজ শেখানর বন্দোবস্ত করা হয়।

বলতে বলতে ভদ্রলোকের গলা একটু ভারী হয়ে উঠল।

প্রশ্ন করলাম,—সে আশ্রয় ওদের ধরে রাখতে পারে কি? না, আবার পথে ভেসে যায়।

উজ্জ্বল দুটি চোখ সন্ধ্যাতারার মত সেই ম্লান আলোতে ফুটে রইল। একটু পরে মৃদু হেসে জানালেন,—সবাই ভেসে যায় না। যখন যায় তখন বুঝি যে এখনো আমি ওদের যোগ্য হয়ে উঠিনি। পরের দিন ভগবানের কাছে আরো প্রার্থনা করি যেন ওদের যোগ্য হতে পারি। যেন ওদের তাঁর পথে নিয়ে যেতে পারি।

মাথা নীচু করে বললাম—প্রার্থনা করি এই রাস্তায় আপনি অনন্ত সুখের সন্ধান পাবেন।

হেসে উনি উত্তর দিলেন—সন্ধান ত পেয়েইছি। এই হচ্ছে আমারো রোমান্সের রাস্তা।

আরতি

চিত্তরঞ্জন পাল

ঝরে ঝর ঝর শাওন মুখর টিনের চালে;
নেই ভাঙা ছাতি, কাদাপথে হাঁটি কাজের টানে;
বাঁচার ধাঁধায় বাচেনা কোকিল মনের তালে।

জীবনের কানু অণুপরমাণু, অভাব-বাণে
জর্জর; লেখাপড়া-শেখা মাথা দীনতা ভাঙে;
শো-কেসে তাকাই-খুঁজি জীবনের অন্য মানে।

লটারী-টিকিট কিনি-স্বপ্নের আঙিনা রাঙে।
পুশ-সাইকেল ঠেলে পথে পথে ক্যানভাসারী;
কমিশন কম। হালে নেই পানি সখের গাঙে।

মনে মনে তবু ছায়াছবি আঁকে অধরা নারী।
চাঁদি ফেটে যায় ঠা ঠা রোদ্দুরে চৈত্রদিনে—
ভরা ভাদরের আদর সর্দি-কাশিতে ভারী।

প্যাডেলে পা রেখে রোদে-জলে পথ চলছি চিনে
গুন্ গুন্ করে অজানা কী সুর মনের বীণে!

বড়ো বোন ছোট বোন

দক্ষিণারঞ্জন বসু

হ্যাঁ রে সুবীর চিনতেই পারছিস না যে কে, তুহিন না?—পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়েই সুবীর প্রশ্ন করে। প্রায় বছর ১২ পরে দেশে ফিরলেও গোটা মানুষটাতো তার একেবারে পাল্টে যায়নি। তাই এতকাল পর হঠাৎ দেখে একটু হকচকিয়ে উঠলেও সুবীরের অনুমান ভুল হয়নি। তা ছাড়া ছোটবেলার বন্ধুদের ভুলে যাওয়া খুব সহজও নয়।

আরে, ঠিক ধরেছিস তো! তারপর খবর-টবর কি সব বল।—বেশ একটু মুরুব্বিয়ানার চালেই তুহিন জিগ্যেস করে সুবীরকে।

আমাদের আবার কি খবর থাকবে, আমাদের সব খবরই সনাতন, শাশ্বত। তোর কি খবর তাই বল শুনি। চল, আমার বাড়িতে চল, এতদিন জার্মাণীতে বসে কি শিখলি, কি জানলি তা সব বাড়িতে বসেই নিরিবিলিতে জানা যাবে।

বেশ যাওয়া যাবেখন। ওয়ার্কশপ দেখা শেষ করে ফেরার পথে তোকে ডেকে নেবো।

তাই ভালো, আমিও হাতের কাজটা শেষ করে নি ততক্ষণে। তবে তুই তো এখন একটা হোমরাচোমরা মানুষ, গরীব বন্ধুর কথা ভুলে যাসনে আবার।—কাঁচড়াপাড়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপের একজন সাধারণ কর্মচারী যে তার ওপরওয়ালার সঙ্গে কথা বলছে তার বিন্দু-বিসর্গও তার জানা নেই। তুহিনকে সে শুধু তার ছোটবেলার ও কলেজ জীবনের বন্ধু বলেই জানে, তুহিন যে তাদের ডিপার্টমেণ্টের কর্তা হয়ে কাঁচড়াপাড়া ওয়ার্কশপে যোগ দিয়েছে তার কোনো খবরই সে রাখে না। নতুন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার তার বিভাগীয় কর্মচারীদের প্রথম দিনই একবার ইন-কর্পানিটা দেখে নিতে চেয়েছিলো। তার সেই ইচ্ছানুসারেই পি-এ'কে নিয়ে ডিপার্টমেন্ট ঘুরে দেখতে গিয়ে অতি আকস্মিকভাবে পুরোনো বন্ধু সুবীরের সঙ্গে দেখা। সুবীর ওয়ার্কশপের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্টেরই ডেসপাচ সেকশনের ক্লার্ক-ইনচার্জ। ছোট-বড়ো অনেকেই তো মাঝে মাঝে ওয়ার্কশপ দেখতে আসে, তুহিনও তেমনি এসে থাকবে এবং সে এখন একজন উচুঁ দরের লোক বলেই স্বয়ং পি-এ তাকে সব ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন, এই ছিলো সুবীরের ধারণা। সে কী করে জানবে তারই বন্ধু তাদের ডিপার্টমেণ্টের বস্ হয়ে এসেছে! আর অর্থনীতিতে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত গিয়ে সে যে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার হয়ে আসবে তাই বা কেমন কথা।

সেদিন শনিবার। শনিবারের অফিস তো পান চিবোতে চিবোতেই শেষ। তবে সুবীরের মতো বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন কর্মীরা শনিবারেও যে কাজে ঢিলে দেয় না তা দেখে নতুন মানব তুহিন মিত্র খুবই খুশি।

ছুটির ঘণ্টা পড়ার মিনিট তিন-চার আগেই ডেকে পাঠানো হল সুবীরকে। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারের ঘরে ঢুকে সুবীর তো অবাক।

তবে কি তুহিনই আমাদের ডিপার্টমেণ্টের নতুন কর্তা হয়ে এলো নাকি? তা না হলে ইঞ্জিনীয়ারের চেয়ারে গিয়ে সে বসবে কেন?—নিজেকেই নিজে মনে মনে প্রশ্ন করে সুবীর।

কী, খুব আশ্চর্য ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে বুঝি? তবে আমাকে এ চেয়ারে বসতে দেখে অন্তত তোর তো খুব খুশি হবারই কথা। যাক, এখন থাক ও সব আলোচনা। আগে চল তোর বাড়ি থেকে একবার ঘুরে আসি।—তুহিনের এ কথার পরে সুবীরের মনে আর কোনো সংশয়ই থাকে না যে সে-ই নতুন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার হয়ে এই কারখানায় যোগ দিয়েছে। কিন্তু ছিঃ, কি রকম তুই-তুকারি ভাষায় একটু আগে সে কথা বলেছে ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে সবার সামনে। নিজের আচরণের জন্যে নিজেই লজ্জা বোধ করে সুবীর। এখনই বা সে কিভাবে তুহিনের সঙ্গে কথা বলবে, তার কথার জবাব দেবে, সে আর এক চিন্তা। সব দিক বাঁচিয়ে সুবীর তবু উত্তর দেয়ঃ

বেশ তাই হোক। আমার আস্তানাতেই যাওয়া যাক। সেওতো আফিসেরই ঘর অর্থাৎ অফিস কোয়ার্টার। আফিসের কর্তার আফিসেই থাকা হবে, কোনো কিছুর জন্যেই আমার লজ্জার কোনো কারণ থাকবে না।

কিসের আবার লজ্জা? আর আগেই বলে দিচ্ছি, আফিসের বাইরে আমার সঙ্গে একেবারে সহজভাবে কথাবার্তা বলবি, আমার সঙ্গে তোর আগের সম্পর্কের একটুও যেন নড়চড় না হয়। চল।—বলেই সুবীরকে নিয়ে বেরিয়ে আসে তুহিন মিত্র। পুরোনো বন্ধুর উদার মনোভাবে মুগ্ধ হলেও সুবীর কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছে না কী করে সে আগের মতো করে তুহিনের সঙ্গে মিশতে পারবে। তুহিনের অফিস ঘরে তাকে একা পেয়েও তো তার সঙ্গে সে আর সেভাবে কথা বলতে পারলো না যেভাবে একটু আগেই সে কথা বলেছে নিজের আসনে বসে। তবু সে চেষ্টা করবে আগের মতো সহজভাবে তুহিনের সঙ্গে মিশতে। অন্তত তার নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে পুরোনো বন্ধুর মতোই সে আচরণ করবে তার সঙ্গে। মনে মনে এই ঠিক করে নিয়েই সে বাড়িতে নিয়ে আসে তুহিনকে। আসতে আসতে তুহিন বিলেতে অর্থনীতির পড়া ছেড়ে দিয়ে জার্মাণীতে গিয়ে কি করে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার হয়ে এলো সে গল্পটুকু বলে ফেলে।

আফিস থেকে খুব দূরে নয় সুবীরের কোয়ার্টার। চার-পাঁচ মিনিটের পথ। গেটের সামনে এসেই ছেলেমানুষের মতো চেঁচাতে আরম্ভ করে দেয় সুবীর, 'রূপশ্রী ও তন্দ্রশ্রী, দেখে যাও কাকে ধরে নিয়ে এসেছি। যে সে লোক নয়, আমার জার্মাণী ফেরৎ মনিব-বন্ধু তুহিন মিত্র।'

এমন করলে আমি আর তোর বাড়িতে পা-ই দেবো না বলে দিচ্ছি। এখনই এ্যাবাউট-টার্ন করবো। নিজেকে মনিব বলে কখনো কি আসতুম তোর সঙ্গে?

ঠিক আছে ভাই, আর কখনো মনিব না বললেই তো হলো! আর এতে অল্পতেই এমন রাগ করলে কি চলে ভাই।

—তুহিনের ধমক খেয়ে একটু ...

সুবীর। তারপরেই আবার জিগ্যেস করে, হ্যারে, তুই কবে ফিরলি। এবারে বিয়ে-থা কর।'

আচ্ছা সুবীর, তপতী কে রে? তোর বৌ? তা হলে অপর্ণা—ওর কি হলো?—সুবীরের কথা কানে না তুলে তুহিন এ প্রশ্ন তুলতেই ব্যস্তভাবে বাইরের ঘরে এসে উপস্থিত হয় তপতী। তাকে দেখলেই ধরা যায় কত তাড়াহুড়ো করে সে তার শাড়ি-সেমিজ বদলে এসেছে। স্বামীর বান্ধব, একটু সাজগোজ না করে আসা চলে তার সামনে? আবার দেরি হলেও তার হয়তো অসম্মান হবে। তাই অগোছালো ভাবেই পোষাকটা কোনোরকমে পাল্টে আসতে হয়েছে তাকে।

এতো অপর্ণা নয়।—মনে মনে ভাবে তুহিন, কিন্তু চুপ করে থাকে। তবে সুবীর একটুও দেরী করে না। তপতী ঘরে ঢুকে হাতজোড় করে নমস্কার করতেই বন্ধুকে সে পরিচয় করিয়ে দেয় তার সঙ্গে।

তুহিন আমাদের অনেক কালের বন্ধু। ওর কথা তোমাকে অনেক বলেছি, নিশ্চয়ই মনে আছে। উঃ ওকে পেয়ে অতীতের কত সব স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

কিন্তু তুমি যে আমায় ডেকে বল্লে তোমার বান্ধব এসেছে।

তাও মোটেই মিথ্যে নয় তপতী, সে কথা পরে শুনবে। যাও, তুমি চটপট করে চা-টা তৈরী করে নিয়ে এসো। তারপর বেশ গল্প করা যাবেখন। আমিও হাত-মুখটা একটু ধুয়ে মুছে আসছি। তুই একটু বোস তুহিন, কিছু মনে করিস না।—বলেই সুবীর আর তপতী বেরিয়ে যায়।

ভালোই হলো এতে তুহিনের। একটু স্মৃতি মন্থনের সুযোগ পেয়ে সে যেন সহজ হলো। বার বার কেবল অপর্ণার কথাই তার মনে হচ্ছে। অপর্ণার কি হলো? তপতী কিছুতেই অপর্ণা নয়। নাক-চোখ-মুখ এবং গড়নে অনেক মিল থাকলেও ওরা এক নয়। একা ঘরে বসে তুহিন গভীরভাবে ভেবে চলে :

'অপর্ণা তুমি অনন্যা' এতো সুবীরেরই কথা। ছোট আমাদের মফঃস্বল কলেজ। কো-এডুকেশনের ব্যবস্থা। থার্ড ইয়ার আর্টস-এ আমরা ছিলাম মাত্র কুড়িজন ছাত্র-ছাত্রী। ছাত্রী অল্প কয়েকজন, ছাত্ররাই সংখ্যায় বেশী। ছাত্রীদের মধ্যে অপর্ণা ছিলো তুখড় মেয়ে, লেখাপড়ায় যেমনি, বুদ্ধির দীপ্তিতেও তেমনি সে ছিলো ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল। তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে ক্লাসের মধ্যে এমন আর কেউ ছিলো না একমাত্র সুবীর ছাড়া। সাহিত্য, ইতিহাস ও অর্থনীতি সমস্ত বিষয়েই তাদের মধ্যে চলতো তীব্র প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতা দুটি মনকে কবে যে প্রণয়-বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলেছিলো সহপাঠীরা সঠিক তা জানতে না পারলেও সুবীরের আমরা কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুবীর-অপর্ণা সংবাদ না শুনে কোনোদিনই তৃপ্ত হতে পারতাম না। সুবীর সব কথা বলতো কিনা জানি না, কিন্তু যা বলতো তাতেই আমরা একেবারে রস-সাগরে ডুবে যেতাম। বি-এ ডিস্টিংশনে পাশ করে অপর্ণা আর পড়েনি। বাপের সংসার রক্ষার দায়িত্ব ওকে বাধ্য করেছে একটা গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা হ[illegible] চাইবাসায় চাকরি নিতে। আমরা দুই বন্ধুকে নিয়ে সুবীর এবং আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম।

কিন্তু সুবীরের যেন দিন কাটে না। কোনো দিন সে ক্লাসে আসে কোনো দিন আসে না। সাত-আট মাস পরে হঠাৎ একদিন সে বললো, 'দুটো দিন ছুটি রয়েছে, আজই রাতের ট্রেনে চাইবাসা যাচ্ছি।' আমরা থ্রি চিয়ারস দিয়ে বন্ধুকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এলাম। তারপর চাইবাসা থেকে ফিরে এসে সুবীরের সে কি গল্প। 'রেল স্টেশনের প্রায় গায়েই অপর্ণার কোয়ার্টার।'—সুবীর বলে চলছিলো আর আমরা তিনজন উন্মুখ হয়ে শুনছিলাম। 'বুঝলি, আসার দিন সন্ধ্যা থেকে সে কি তাড়া!—তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, আটটা বাজে। শুয়ে পড়লে কেন? দশটায় তো ট্রেণ! ঘুমিয়ে পড়লে আর একটা দিন পাওয়া যাবে, সেই মতলবেই আছ বুঝি? কিন্তু তা হবে না আগে থেকেই বলে দিচ্ছি। মা ভালো করে চোখে দেখতে না পেলেও মনে মনে বিরক্ত হচ্ছেন।—অপর্ণার এ কথার পর আর কি করে শুয়ে থাকি বল। শোয়া আর হলো না। খেয়েদেয়ে সাত-তাড়াতাড়ি স্টেশনে এলাম। সঙ্গে অপর্ণাও এলো। দূর থেকেই দেখতে পেলাম দুরন্ত গতিতে ট্রেণ এগিয়ে আসছে। ছোট স্টেশন। গাড়ি বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না এখানে। তাই ট্রেণ থামতেই উঠতে যাচ্ছি, হঠাৎ আমার ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে অপর্ণা বল্লে, থাক আজ আর গিয়ে কাজ নেই। কি হলো? যাঃ তা কি হয়!' বলে ব্যাগটা নিতে আনতে গিয়েই ট্রেণের আলোয় ওর চোখে চোখ পড়লো। অপর্ণার ঝিনুকের মতো একজোড়া চোখের করুণ আকর্ষণ আমায় থামিয়ে দিলো। ট্রেণও বেরিয়ে গেলো হুইসিলের সঙ্গে সঙ্গে। এমনি কত গল্প শুনেছি সুবীরের মুখে তার প্রতি অপর্ণার গভীর প্রেম সম্বন্ধে। সেই অপর্ণাকে বিয়ে করেনি সুবীর?—অতীত স্মৃতি সামনে তুলে ধরতেই এই একটি প্রশ্ন আলোড়িত করে তুলছিলো তুহিনের মনকে।

আর ঠিক সেই সময়েই হাতে একটা ট্রে নিয়ে বৈঠকখানায় এসে ঢুকলো তপতী। চিন্তায় ছেদ পড়লো তুহিনের। তার মুখের দিকে তাকিয়ে তপতী জিগ্যেস করলো, কী ভাবছেন অত?

না, তেমন কিছু নয়।—এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে তুহিন প্রশ্নকর্ত্রীকে আর একবার ভালো করে মিলিয়ে নেয় অপর্ণার সঙ্গে।

অনেক মিল রয়েছে দুজনের মধ্যে। তবু ওরা দুজনে এক নয়। সত্যি সত্যি অনেকটা অপর্ণারই মতো তপতী। তবে তপতী বোধ হয় অপর্ণার চেয়ে আরো একটু বেশি সপ্রতিভ।—মনে মনে অনুমান করে তুহিন।

চা-খাবারের ট্রে নামিয়ে রাখতে রাখতে তপতী বলে ওঠে, আমি জানি আপনি কি ভাবছিলেন। বলবো?

তখনই গা-হাত-পা মুছতে মুছতে সে ঘরে এসে ঢোকে সুবীর।

নে, নে সবটা খেয়ে নে। তুই তো আজকাল আবার বিদেশী খানায় অভ্যস্ত। স্যানডুইচ ইত্যাদি ছাড়া চা চলবে কিনা তা কিন্তু ভাই জানিনে।

আবার বাজে কথা বলছিস?—এই বলে সুবীরকে একটু ধমক দিয়ে একটা সিঙাড়া ভেঙে মুখে পুরে দেয় তুহিন। তারপর চায়ের কাপে একটি ছোট্ট চুমুক দিয়েই কাপটি নামিয়ে রাখে। চোখেমুখে তার কেমন একটা অন্যমনস্কতার ছাপ।

কি ভাবছেন, বলবো? ভাবছেন অপর্ণার জায়গাটা তপতী কি করে দখল করলো—তাই না?—তপতীর কথায় তুহিন চমকে ওঠে।

একি হচ্ছে? গায়ে পড়ে এ সব কথা [illegible] কী মানে হয়। যাওতো, তুমি এখন যাও এখান থেকে।—সুবীর চায়ের কাপ মুখের কাছ থেকে ফিরিয়ে এনে সংযত করার চেষ্টা করে গৃহিণীকে।

বারে, উনি সংশয় নিয়ে যাবেন কেন [illegible] থেকে। শুনেই যান না সবটা।—তপতী জবাব দেয়। স্ত্রীর জবাবে একটু বিরক্তই বোধ করে সুবীর। ঠিক সময়েই পাশের ঘরে খোকা কেঁদে ওঠে।

যাও, ছেলেটা কাঁদছে শুনতে পাচ্ছ [illegible] বেশ একটু বিরক্তির ঝাঁজ মেশানো সুবীরের কথায়। অগত্যা মনেই যেন তপতী বেরিয়ে যায়। তার তো আর বুঝতে বাকি নেই [illegible] কান্নাকে কেমন সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করা হলো তাকে তাড়ানোর জন্যে।

স্বামী-স্ত্রীর বিতর্কে তুহিনের [illegible] আরো বাড়ে। তপতী চলে যাওয়ায় [illegible] নিঃসংকোচ হয় সে। স্বামীর প্রশ্নে সুবীরের কাছ থেকেই সে জানতে চায় আসল রহস্য।

আবার সেই পুরোনো কাসুন্দি [illegible] বলছিস?—অপর্ণাকে ভুলে থাকারই চেষ্টা [illegible] সুবীর। তার সম্বন্ধে কোনো কথা উঠলে [illegible] যতো সম্ভব এড়িয়েই যায়। কিন্তু তুহিনের অনুরোধকে কি করে সে পাশ কাটিয়ে [illegible] কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও অতি পুরোনো [illegible] গল্পেই তাকে নতুন করে বলতে হয়।

আমি ভেবেছিলাম তুই সব জানিস। [illegible] তখন জামালপুরে নতুন রেলের চাকরিতে [illegible] দিয়েছি। হঠাৎ এক রবিবার বিকেলে [illegible] অপর্ণা এসে আমার বোর্ডিং-এ হাজির। [illegible] দেখে খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম আমি। [illegible] ওর মধ্যে কোনো আনন্দের ছাপ [illegible] ভাবিত হলাম। জিগ্যেস করলাম, কী [illegible] তাকে এমন কেন দেখাচ্ছে। উত্তরে সে [illegible] তাতে খুশি হতে পারলাম না। তার [illegible] সেক্রেটারী কিছুদিনের জন্যে জামালপুরে এসেছেন। একটা জরুরী বিষয় নিয়ে তাঁর [illegible] আলাপ করার জন্যেই অপর্ণাকে জামালপুরে আসতে হয়েছে এবং সে সন্ধ্যায়ই আবার [illegible] চাইবাসায় ফিরতে হবে। খুব দরকারী [illegible] কথা বলার জন্যে সে আমার বোর্ডিং-এ [illegible] জানালো এবং তাকে ট্রেণে তুলে দিয়ে [illegible] জন্যে আমায় অনুরোধ করলে। [illegible] বোর্ডিং থেকে স্টেশন খুব দূরে নয়। একটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে নিলাম। [illegible] গাড়িতে অপর্ণাকে বেশ একটু নিবিড় [illegible] পাওয়া যাবে। কিন্তু তাকে নিবিড় করে [illegible] তো দূরের কথা, গাড়িতে উঠে বসতে না [illegible] সে অদ্ভুত রকমের এক কথা পেড়ে বসলো।

কি বল্লে সে?—তুহিন নির্বাক হয়ে [illegible] শুনতে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে।

বল্লে, আমার একটা অনুরোধ রাখতেই হবে তোমাকে। আমি বল্লাম, তোমার অনুরোধটাই বা আমি না রাখি। [illegible] নিশ্চয়ই রাখবো। কী করে জানবো [illegible] অভাবনীয় অনুরোধ সে করে বসবে!

(শেষাংশ ৯৬ পৃষ্ঠায়)

প্রফুল্ল রায়

গগন মাঝির গল্প

সন্ধ্যের মুখে মুখে হিমিরা এসে পড়ল। হিমি আর তার সোয়ামী অক্কুর—অক্কুর জানা।

নৌকোর গলুইতে অস্থির হয়ে বসে ছিল গগন। ফুক ফুক করে বিড়ি ফুঁকছিল। আধপোড়া বিড়িটা নদীতে ছুঁড়ে সে টান টান হয়ে বসল।

দিনটা সবে মাত্র মরেছে। রোদ নেই। পশ্চিম আকাশে নিবু নিবু, বিষণ্ণ একটু আলো লেগে আছে। দেখতে দেখতে এই আলোটুকু মুছে যাবে।

আশ্চর্য! সকালে হিমি খবর পাঠিয়েছিল, ওর নৌকোয় তমলুকে সোয়ামীর ঘরে যাবে। গগন যেন বিকেলের দিকে ভেড়ি বাঁধের নীচে নৌকো লাগায়।

প্রথম প্রথম ঠিক করেছিল, হিমির কথা রাখবে না। কিন্তু নিজের ইচ্ছাটা নিজের ওপরেই কাজ করল না। কিসের একটা দুর্বোধ্য টানে দুপুরের আগে আগেই ভেড়ি বাঁধে নৌকো লাগিয়েছে গগন। আর সেই থেকে হিমির আশায় আশায় অস্থির হয়ে বসে আছে।

হিমি আর অক্কুর নৌকোর কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে।

হিমির দিকে নজর পড়তেই গগনের বুকের ভেতরটা ছ্যাঁক করে উঠল। অসহ্য, অনুক্ত একটা কান্না পাক খেতে খেতে কণ্ঠার কাছে এসে আটকে গেল। কান্নাটা বেরোয় না। অনড় হয়ে থাকে। হাজার চেষ্টা করে একটু নড়াতে পারল না গগন।

কাল সকালেও হিমিকে দেখেছে গগন। আজও দেখল। কালকের হিমি আর আজকের হিমির ভেতর কত তফাৎ!

কাল যখন হিমিকে দেখেছে, তখনও তার বিয়ে হয় নি। আর আজ? কপালে সিঁথিতে ডগডগে মেটে সিঁদুর লেপে, মাথায় ঘোমটা টেনে আহ্লাদে সোহাগে ডগমগ হয়ে সোয়ামীকে নিয়ে গগনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

নদীর ওপারে তমলুকে সোয়ামীর ঘর। সেখানেই চলেছে হিমি।

হিমির মনে কি আছে, কে জানে। আর কেউ জানুক, গগন অন্তত জানে না। নইলে মেয়েটা কোন ভরসায় তার নৌকোয় নদী পাড়ি দিয়ে সোয়ামীর ঘরে যেতে চায়, কে জানে।

অদ্ভুত একটা ঘোরের মধ্যে হিমির দিকে তাকিয়ে রয়েছে গগন।

হিমি খিলখিলিয়ে হেসে উঠল, বলল, 'অমন করে তাকিয়ে রয়েচ, গিলবে নাকি গো?'

বিব্রত গগন অন্য দিকে চোখ ফেরাল।

হিমি আর অক্কুর নৌকোয় উঠে ছই এর তলায় গিয়ে বসল।

বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল। পশ্চিমের আকাশ থেকে বিষণ্ণ আলোটুকু একেবারেই মুছে গিয়েছে। আকাশ, নদী, ভেড়ি বাঁধ—সমস্ত কিছুকে একটা ছায়া ছায়া ধোঁয়ারঙের পর্দা জড়িয়ে ধরেছে। সব কিছুই এখন আবছা, অস্পষ্ট।

ঠায় বসে আছে গগন। তার যেন হুঁশ নেই।

ছইএর ভেতর থেকে হিমি বলল, 'কী গো, নৌকো ছাড়বে নি? গোন মেরে নৌকো ছেড়ে কিছু লাভ হবে? ওপারে যেতে যেতে তো রাত পুইয়ে ছাড়বে। শ্বউরের ঘরে কখন যাব?'

হিমির কথায় বেহুঁশ, আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। ধড়মড় করে উঠে বাদাম খাটিয়ে নৌকো ছেড়ে দিল গগন।

এটা বছরের মধ্যম ঋতু। নদীতে এখন টলানি নেই, মাতামাতি নেই। এখন সুদিন। নদী এখন শান্ত, নিরুত্তেজ। গোন বুঝে নৌকো ছাড়লে এতটুকু কাঁপুনি কি ঝাঁকুনি নেই। তরতর করে নিস্তরঙ্গ নদীর ওপর দিয়ে ওপারে পৌঁছতে কতক্ষণ আর লাগে!

বাদাম খাটিয়ে হালের গোড়ে ধরে ঝিম মেরে বসে রয়েছে গগন।

ছইএর তলায় নতুন সোয়ামীকে নিয়ে হুটোপুটি করছে হিমি। হাসছে, ঢলছে। মেতে মেতে উঠছে। গগনকে শুনিয়ে শুনিয়ে সোহাগের কথা বলছে, 'হেই গো, তুমার ঘরে নিয়ে আমায় কী দেবে? সোনার হার দিতে হবে কিন্তুক, কোমরে বিছে দিতে হবে কিন্তুক, কানে কানপাশা দিতে হবে কিন্তুক—'

হিমির সোয়ামী অক্কুর বলে, 'দোব, দোব—'

নির্লাজ, ডাকাবুকো মাগী! কাল সবে বিয়ে হয়েছে। এর মধ্যে নতুন সোয়ামীর সঙ্গে করছে দ্যাখ না! লাজ সরমের মাথা একেবারেই খেয়ে বসেছে। অন্য একটা পুরুষ যে গলুইতে বসে আছে, গ্রাহ্যেই আনছে না হিমি। তার কলকল্লানি, ঢলানি একটু একটু করে বেড়েই চলেছে।

তাজ্জবের ব্যাপার!

জলো বাতাসে বাদামটা ফুলে উঠেছে। সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হিমির কথাই ভাবছিল গগন। যতই ভাবছিল, সুচের মুখের মত তীক্ষ্ণ, ধারাল, অসহ্য একটা যন্ত্রণা তাকে ক্রমাগত বিঁধছিল।

কুঞ্জ সাঁইদারের বেটি হল হিমি। তার সঙ্গে কি দু পাঁচ দিনের জানাশোনা!

হিমিদের ঠিক পাশের বাড়িটাই গগনের। বাড়ি আর কি! একটা মোটে ঘর, চারপাশে মাটির দেওয়াল, ওপরে ছনের চাল। তাও ঝড়ে বেঁকে আছে। দেওয়ালের মাটি ধ্বসে পড়েছে।

সংসারে আপন কইতে কেউ নেই গগনের। একটা দূর সম্বাদের পিসী ছিল। সে-ই দুবেলা দুটি ভাত ফুটিয়ে দিত। বছর পাঁচেক আগে ওলাউঠোয় মরল সে। পিছু টান আর রইল না।

গগন ভেবেছিল, ঘরদোর বেচে ডায়মণ্ড-হারবার চলে যাবে। ওখানেই যা হোক কিছু জুটিয়ে নেবে।

কাজের খোঁজে দিন দুই ডায়মণ্ডহারবারে কাটিয়েও এল গগন। এই দুদিনের মধ্যে একটা সার কথা বুঝল, ঘরদোর বেচা হবে না। বাপ না থাক, ভাই না থাক, পিসী না থাক,, তবু গ্রামে এমন একজন আছে, যাকে ছেড়ে এতদূরে, এই ডায়মণ্ডহারবারে এসে বুকের ভেতরটা টন-টন করে ওঠে। সেই একজন হ'ল হিমি।

আশ্চর্য! হিমির কথা এর আগে কোন-দিনই ভাবে নি গগন। পিসী মরার পর মনে হয়েছিল, সংসারের পিছু টানটা ঘুচেছে। কিন্তু ডায়মণ্ডহারবার এসে মনে হল, পিছুটান কোন সময় ঘোচে না। কেউ না কেউ পেছন থেকে জড়াতেই থাকে।

পরের দিনই গ্রামে ফিরে এসেছিল গগন।

পাশাপাশি বাড়ি।

সেই ছোটবেলা থেকে যখন-তখন এসেছে হিমি। চোখের ওপরেই দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠেছে। দেখেও দেখেনি গগন।

ডায়মণ্ডহারবার থেকে যেন নতুন চোখ নিয়ে ফিরে এসেছে গগন। আশ্চর্য! কখন যে কুঞ্জ সাঁইদারের বেটি অঢেল স্বাস্থ্যে যুবতী, অশেষ রূপে রূপসী হয়ে উঠেছে, এর আগে কোনদিন

খেয়াল হয় নি। ঘোর ঘোর চোখে, একদৃষ্টে হিমির দিকে চেয়েই থাকে সে।

ভাগ্যিস ডায়মণ্ডহারবার গিয়েছিল গগন। নইলে হিমিকে দেখার নতুন চোখ সে কোথায় পেত?

ডায়মণ্ডহারবার থেকে ফিরবার পরই ছুটতে ছুটতে এসেছিল হিমি। বলেছিল, 'এলে মিনসে? আমি জানতম, তুমি এসবেই।'

'কী করে বুঝলে, আমি এসবে?'

'বুঝলম।'

সূক্ষ্ম, ধূর্ত, চতুর হাসি হাসে হিমি।

নিটোল, মসৃণ হাত। উদোম পিঠ। চকচকে তামার মত চামড়া। গগনের মনে হয়, হাত রাখলে পিছলে যাবে। আঁটো শরীরে লাল ডুরে শাড়ি কি বশই না মেনেছে! চেয়ে চেয়ে সাধ আর মেটে না গগনের।

হিমি আবার বলেছিল, 'কুথাও যেও নি মিনসে। এখেনেই যা হোক এট্টা কিছু কর। বুঝলে?'

তাই ভাবচি। 'ভাবচি মাঝিগিরি ধরব।'

দিন কয়েকের মধ্যে একটা নৌকো কিনে মাঝিগিরি ধরল গগন।

দেখতে দেখতে দিন গিয়েছে। মাস গিয়েছে। ঋতুর চাকায় সময় পাক খেয়েছে।

পাঁচটা বছর পার হল।

এই পাঁচ বছরে হিমি যে কতবার গগনের কাছে এসেছে, লেখাজোখা নেই।

দিনে দিনে আরো যুবতী, আরো রূপসী হয়ে উঠেছে হিমি।

পাঁচ বছরে অনেক কানাকানি করেছে দুজনে। মন জানাজানি করেছে। প্রাণের কথাটা পরস্পরের কাছে আর গোপন নেই।

একদিন হিমি এসে বলল, 'দশ কুড়ি টাকা জোগাড় কর মিনসে।'

'কেন?'

অবাক হয়ে হিমির মুখের দিকে তাকিয়েছে গগন।

'কেন আবার? আমাকে পাবে আর আমার দাম দেবে না!'

খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছে হিমি। বলেছে, 'আমার পণ গো, পণ। পণের টাকা জোগাড় করে বাপের কাছে গিয়ে বে'র কথাটা পাড়।'

'পাড়ব।'

আস্তে, আস্তে মাথা নাড়ে গগন।

যাই যাই করেও কুঞ্জ সাঁইদারের কাছে যাওয়া হয় না। কুঞ্জ হল এই অঞ্চলের প্রধান। পঞ্চাশ বিঘে জমি রাখে। দশটা নৌকা, দুটো ভেড়ি, আর অঢেল পয়সার মালিক সে।

কুঞ্জ সাঁইদারের মেজাজ বড় সাংঘাতিক।

ছোট নৌকোর মাঝি হয়ে বড় সাঁইদারের বেটিকে বিয়ে করার বিপদ অনেক। বি'য়ের কথা পাড়ার সংগে সংগে বল্লম মেরে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে ফেলতে পারে কুঞ্জ সাঁইদার।

কুঞ্জর কথা যতই ভাবে, গগনের বুকের ভেতরটা ভয়ে দুরু দুরু করে।

প্রায়ই এসে তাড়া লাগায় হিমি, 'কই গো মিনসে, বাপের কাছে গেলে?'

'এই যে এবেরে ঠিক যাব।'

যাই-যাব—হাজার টাল-বাহানা করে গগন হিমিকে ঠেকায়। কুঞ্জ সাঁইদারের কাছে যেতে তার পা সরে না।

দিন কতক আগে এক দুপুরে ভেড়ি বাঁধের নীচে নৌকো লাগিয়ে জিরোচ্ছিল গগন। একটু আগে সওয়ারী নিয়ে নদীর ওপার থেকে এসেছে।

ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে হিমি এসে পড়ল। উত্তেজনায় কপালে কণা কণা ঘাম দেখা দিয়েছে। নাকের ডগাটা তির-তির করে কাঁপছে।

হিমি বলল, 'সব্বনাশ হয়ে গেছে মিনসে। তুমাকে কতবার বললাম, বাপের কাছে যাও। বে'র কথাটা পাড়। তা তো পাড়লে নি। ইদিকে বাপ আমার বে'র ঠিক করে ফেলেচে। তুমি আমায় কুথাও নে চল।'

বুকের ভেতরটা ধক করে উঠেছিল গগনের। শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়ে অদ্ভুত এক কাঁপুনি ছুটে বেড়াচ্ছিল।

হিমি আবার বলেছিল, 'হেই গো, কথা কইচ না কেন?'

'কি কইব?'

'তুমি কি কইবে, আমি বলে দোব?'

গগন জবাব দেয় নি। খানিকটা দাঁড়িয়ে থেকে যেমন ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে এসেছিল, ঠিক তেমনিই চলে গিয়েছিল হিমি।

তারপর এ ক'দিন সমানে এসেছে হিমি। একটা কথাই বার বার বলেছে, 'আমাকে কুথাও নে চল।'

পয়লা বারের মত কোন বারই জবাব দেয় নি গগন। কি করবে, কি করা উচিত, কিছুই বুঝে উঠতে পারে নি সে। শুধু অবুঝ, অসহ্য এক ব্যথায় বোবা হয়ে থেকেছে।

বার বার ফিরে গিয়েছে হিমি।

কাল সকালেও হিমি এসেছিল। উড়ু উড়ু রুক্ষ চুল। চোখ দুটো ফোলা ফোলা, লালচে। গালের ওপর চোখের জল শুকিয়ে দাগ পড়েছে। কুঞ্জ সাঁইদারের বেটিকে কেমন যেন ক্ষ্যাপা ক্ষ্যাপা দেখাচ্ছিল।

হিমিকে দেখেই চমকে উঠেছিল গগন।

হিমি বলেছিল, 'হেই গো, তুমার মতলব কী?'

'মতলব আবার কী?'

গগনের গলা আবছা, অস্ফুট শুনিয়েছিল।

এখনও সময় আছে, আমাকে নে ভেগে পড়। রাতের বেলায় আমার বে। একসাথে বড় হয়েচি। ছোটবেলা থেকে আমার মন তুমাকেও চেয়েচে মিনসে। তুমাকে ছেড়ে আমার চলবে নি।'

'কিন্তুক আমার ডর করে। তুমার বাপ জানতে পারলে তুমাকে আমাকে, দুজনকেই কেটে ফেলবে। তার চেয়ে তুমার বাপ যা চায়, তাই কর গে সাঁইদারের বিটি।'

হিমি ক্ষেপে উঠেছিল। ফোঁস ফোঁস করে গরম, রুদ্ধ নিশ্বাস ফেলছিল। নিশ্বাসের তালে তালে বুকটা উঠছিল, নামছিল। ক্ষোভে, দুঃখে, হতাশায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল কুঞ্জ সাঁইদারের বিটি। সমানে চেঁচাচ্ছিল, 'ডর নো কুত্তা! বুকের ভেতর অতই যদি ডর তবে সাঁইদারের বেটির সাথে পিরীত মারাতে গেছিলি কেন রে ঢ্যামনা?'

একটু থেমে দম নিয়ে আবার সুরু করেছিল, 'তাই করব। বাপ যেখেনে বে দিতে চায় সেখেনেই বে বসব। তোর আশায় থাকব নি।'

টলতে টলতে দৌড়তে দৌড়তে চলে গিয়েছিল হিমি।

হঠাৎ চটকা ভেঙে গেল।

ছইয়ের তলা থেকে অক্রুর অর্থাৎ হিমির সোয়ামী ডাকল, হেই গো—'

'খুব আস্তে গগন বলল, 'কী কইচেন?'

'তুমি তো আমার শ্বউর বাড়ির দেশের লোক। সম্পক্ক ধরলে শালা-সম্বন্ধীই হবে। কী বল মাঝি?'

যেন খুব একটা উঁচু দরের রসিকতা করেছে; এই ভেবে খেঁকিয়ে খেঁকিয়ে হাসে অক্রুর। তার সংগে তাল দিয়ে হিমিও ঢলে ঢলে হাসতে লাগল।

হাসির দাপট একটু কমলে অক্রুর আবার বলল, 'কাল রাতে বে করেচি। বোঝই তো বে'র রাতের কী ধকল! এটুও ঘুমুতে পারি নি। এখন এট্টু ঘুমুব। বিশ্বেস করে নিজের পেরাণটা আর বউকে তুমার জিম্মায় ছেড়ে দিলম মাঝি। আমি শুলুম। এবেরে তুমার ধম্ম তুমার কাছে।'

সত্যি সত্যিই টান টান হয়ে পাটাতনের ওপর শুয়ে পড়ল অক্রুর। শোয়ার সংগে সংগে তার নাক বেজে উঠল।

গলুইর ওপর ঝিম মেরে বসে রইল গগন।

এখন কত রাত কে বলবে?

এতক্ষণ নৌকো স্রোতের মুখে চলছিল। হঠাৎ বাতাসটা পড়ে গেল। এখন পুরোপুরি বে-গোন।

বাদাম নামিয়ে বোঠে ধরল গগন।

এটা কি তিথি, গগন জানে না। নৈঋত আকাশে এক ফালি ক্ষীণ, নিস্তেজ চাঁদ দেখা দিয়েছে। যতদূর তাকানো যায়, আবছা আবছা অন্ধকার। কেমন যেন দুজ্ঞেয়, রহস্যময়। নদীর জল খিলখিলিয়ে হাসে। ঢেউ-এর মাথাগুলি চিক-চিক করে।

লক্ষ ঢেউ-এর হাত তুলে নদীটা নৌকোর তলিতে অবিরাম ঘা মারছে।

বে-গোনে নৌকো চালানো বড় বিষম ব্যাপার। জলের সংগে যুঝে যুঝে বোঠে টানছে গগন। গা বেয়ে দর-দর ঘাম ঝরছে।

ছই-এর ভেতর থেকে নিঃশব্দে কখন যে হিমি বাইরের পাটাতনে এসে বসেছে, গগনের হুঁশ নেই।

ফিস ফিস করে হিমি ডাকল, 'হেই গো—'

গগন চমকে উঠল। গলাটা কেঁপে গেল তার, 'কী কইচ?'

বিড়ালীর মত গুঁড়ি মেরে—আরো একটু সামনে এগিয়ে এল হিমি। গগনের কানে মুখটা গুঁজে বলল, এখনও সময় আছে। এখনও তুমি আমায় পেতে পার।'

'কী কইচ সাঁইদারের বিটি! তুমার কী মাথা খারাপ হল!'

গগনের বুকটা থরথরিয়ে কাঁপে।

'মাথা আমার ঠিকই আছে! নইলে বে'র পর সোয়ামীকে নিয়ে তুমার নৌকোয় উঠতম নি। যাক, মিনসেটা ঘুমিয়েচে। নৌকো ডুবিয়ে দাও।'

'নৌকো ডুবিয়ে দোব!!'

গগন আঁতকে উঠল।

(শেষাংশ ৯৩ পৃষ্ঠায়)

পূজা বার্ষিকী
এবারে পূজোয়ে নূতন উপহার
দেব দেউল
দাম ২৲ টাকা
অপরাজিতা-৪
দেবালয়
ঠান দিদির থলে
বাঙ্কস খোক্কস
দাম ৩৲ টাকা
ছোটদের নূতন ধরনের উপন্যাস
—দৃষ্টিহীনের—
মা ! আমি অশোক
মূল্য—১৲ টাকা
শোনো শোনো গল্প শোনো
দাম ২৲ টাকা
পুরানো দিনের পুরানো গল্প
জয়যাত্রা
দাম ৪৲ টাকা
দেব সাহিত্য কুটীর
কলিকাতা-৯
জন্মদিনের উপহার

ঝাড়ফুঁক — সেকেলে ও আধুনিক

ডাঃ পূর্ণেন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায়

সব দেশেই বহু প্রাচীনকাল থেকে নানারকম মন্ত্রতন্ত্র, তুকতাক, ঝাড়ফুঁক দিয়ে রোগ সারাবার ব্যবস্থা প্রচলিত। এর মধ্যে কতগুলি আছে রোগমুক্তির জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনামূলক, কতগুলি অপদেবতা বা ভূত-প্রেতের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার নানা রকম প্রক্রিয়া। আবার কতগুলি আছে বিশেষ কোন আপাত নিরীহ বস্তুর অলৌকিক দ্রব্যগুণের উপর নির্ভরশীল। জীবনযুদ্ধে ভাগ্য বিপর্যয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে দিশাহারা মানুষ স্বভাবতই গ্রহ-নক্ষত্রকে নিজের ভাগ্য নিয়ন্তা বলে মেনে নিয়েছে। রোগ-ভোগের উপশমের জন্য কুপিত বা বিরূপ গ্রহের শান্তির ব্যবস্থাও নানা রকম আছে। এছাড়াও দৈনন্দিন জীবনের নানা রকম ঘটনা বা পরিবেশের মধ্যেও মানুষ অলক্ষণ-কুলক্ষণ দেখতে পায় এবং তার সঙ্গে শারীরিক সুস্থতা ও অসুস্থতা জড়িত করে।

অনেকে মনে করেন এ সমস্ত কু-সংস্কার ও অজ্ঞানতাপ্রসূত; শিক্ষা বিস্তারের এবং বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এ সবের প্রচলন উঠে যাচ্ছে। কিন্তু এই সব বিশ্বাস আমাদের মনে এমনই সুপ্রতিষ্ঠিত যে অনেক শিক্ষিত লোকের মধ্যে এবং সুসভ্য দেশেও এই সব ঝাড়ফুঁক এখনও পুরোমাত্রায় প্রচলিত। দৈব বা টোটকা ওষুধ হিসাবে লোকে যে কত রকম বিদঘুটে জিনিষ নির্বিবাদে খেতে পারে তা শুনলে অনেকে আশ্চর্য হবেন। প্রাচীন এবং মধ্য যুগের কথা ছেড়ে দিলেও এই বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় মাকড়সা, কেঁচো, গুগলি, শামুক, ব্যাং ইত্যাদি ওষুধ বলে লোকে খায় এ রকম দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া গেছে। বিলাতে ছোট ছেলেদের মুখে থ্রাস হলে (জিভে ও গালের ভিতর সাদা সাদা ছত্রাক জমা) জ্যান্ত ব্যাং রুমালে জড়িয়ে মুখে চুষাতে দেওয়া গ্রাম্য অঞ্চলের একটা খুব প্রচলিত টোটকা চিকিৎসা। দৈব বা অলৌকিক চিকিৎসাও বিলাতে গ্রাম্য অঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে। নানা রকম জিনিষ গোপন মন্ত্র বা ছড়া পড়ে রোগীর গায়ে ধারণ করিয়ে দেওয়া হয়। ঠাণ্ডা লেগে গলায় ব্যথা হলে সারাদিন পরা হয়েছে এ রকম একটা বাঁ পায়ের মোজা গলায় বাঁধলেই সেরে যাবে। তেমনি বাতের ব্যথায় পকেটে আলু রাখতে হয়। অনেকে মরচে পড়া পেরেক রেখেও উপকার পায়। নাক দিয়ে রক্ত পড়ার ওষুধ গলায় বা বাঁ হাতের তর্জনীতে লাল সিল্কের সুতো বাঁধা।

আমাদের দেশে দৈব চিকিৎসা এবং ঝাড়-ফুঁক ও টোটকা সম্বন্ধে সকলেরই পরিচয় আছে। গ্রাম্য অঞ্চলেও অশিক্ষিত লোকেদের মধ্যে ওঝা-রোজা বা ঝাড়ফুঁককারী চিকিৎসক মধ্যেও এ সব আছে তবে একটু অন্য রকমে। গ্রাম্য ওঝার জলপড়া সহুরে বাবুরা বিশ্বাস করেন না। কিন্তু একটু আধ্যাত্মিকতা বা একটু বৈজ্ঞানিক ছোঁয়াচ থাকলে আপত্তি নাই। কবচ, মাদুলীটা অনেকের কাছে সেকেলে। কিন্তু ইলেক্ট্রিফাইড তামার বালা পরতে আপত্তি ত নাই-ই বরং অতি আধুনিক তেজস্ক্রিয় বস্তু বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন গুরুদেবও গ্রহণীয়। তত্ত্বকথা শুনবার জন্য এঁদের কাছে যত লোক না যায়, রোগমুক্তি ও ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য তার চেয়ে বেশী ভিড়।

এই সব দৈব বা অলৌকিক চিকিৎসা পদ্ধতিকে কু-সংস্কার বললে অনেকে হয়ত রাগ করবেন। কারণ এই চিকিৎসার আশ্চর্যজনক ফলাফল সম্বন্ধে প্রায় সকলেরই দু-একটি উদাহরণ ব্যক্তিগতভাবে জানা আছে। সে সব অস্বীকার করবার উপায় নাই। ডাক্তারদেরও অনেকের এ রকম অভিজ্ঞতা আছে, যেখানে দুরারোগ্য রোগ দৈব চিকিৎসায় সেরে গেছে। আমি নিজেও একটি রোগীর কথা জানি। তার ডারম্যাল লিশম্যানিয়াসিস ছিল (কালাজ্বর জীবাণুজনিত গায়ে গুটি)। তাকে কালাজ্বরের বহু ইনজেকশন দিয়েও সারান যায় নাই। তারপর সে তারকেশ্বরে তিন দিন হত্যা দিয়ে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে যায়।

আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা সব জায়গায় এবং সকলের পক্ষে সুলভ নয় বলে হয়ত অনেকে দৈবের উপর বেশী নির্ভরশীল। কিন্তু সেটাই একমাত্র কারণ নয়। পাশ্চাত্য উন্নত দেশগুলিতে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা সকলের পক্ষেই সহজলভ্য। তবু সেখানেও অবৈজ্ঞানিক অদ্ভুত সব টোটকা ওষুধ এবং ঝাড়ফুঁক এখনও চলে কেন? সাধারণভাবে বলা যায় যে সহজ সরল মানুষের বিক্ষুব্ধ বিড়ম্বিত মনে শান্তি, আশ্বাস ও নির্ভরশীলতা আনতে বিজ্ঞানের ব্যর্থতা এর জন্য অনেকটা দায়ী। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাতেও মানুষের যাবতীয় সব রোগ নিরাময় হয় না। দুরারোগ্য রোগীকে ডাক্তার জবাব দিলেও বিজ্ঞানের বাইরে আরোগ্যের উপায় খোঁজা তার পক্ষে স্বাভাবিক। দৈব চিকিৎসায় কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যাশ্চর্য সফলতার কথা আগেই বলা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার আলোচনাতেও অনেক রোগে দৈব টোটকা বা ঝাড়ফুঁকের সাফল্য স্বীকৃত হয়েছে। এই সাফল্যের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পরীক্ষা করতে গিয়ে কিন্তু এই সব চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধ বা প্রক্রিয়ার কোনও বিশেষ রাসায়নিক অথবা দ্রব্যগুণের পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

এই সব টোটকা দৈব অথবা ঝাড়ফুঁক প্রধান অন্তরায় হচ্ছে যে এই সব চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধ ও প্রক্রিয়া প্রায়ই গোপন রাখা হয়। আর এর সঙ্গে প্রায়ই সাধু, সন্ন্যাসী পীর, ফকির, দেব-দেবী, গ্রহ-নক্ষত্রের অলৌকিক রহস্য জড়িত থাকে। অলৌকিক মাহাত্ম্য বা মোহ থেকে মুক্ত করে যখনই এই সব ওষুধের ফলাফল নিরপেক্ষভাবে যাচাই করা গেছে তখনই এ সবের কোন বিশেষ ভেষজ গুণ বা দ্রব্যগুণের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। তবে আমাদের শরীরের যাবতীয় কার্যাবলীর উপর মনের অদ্ভুত ও অপরিসীম প্রভাব সুপরিচিত ও স্বীকৃত। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে অনেক পরীক্ষাও হয়ে গিয়েছে। সব রকম ভুল-ত্রুটি ও বাহিক প্রভাবশূন্য পরিবেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত এই রকমের একটি পরীক্ষা খুব বিখ্যাত। এই পরীক্ষাটি হয়েছিল ১৯১৮ সালে বিলাতের হ্যাসলার ন্যাভেল হাসপাতালে। সেখানে একটি নাবিককে আগে একটা টকটকে লাল তপ্ত লোহার শলাকা দেখান হয়। তারপর তাকে হিপনটাইজ করে তার চোখ বেঁধে দেওয়া হয়। তখন তাকে বলা হয় যে এবার তার হাতে ঐ গরম লোহার শলাকা দিয়ে ছাঁকা দেওয়া হবে। কিন্তু গরম লোহার পরিবর্তে একটা ঠাণ্ডা লোহার শলাকাই তার হাতে লাগান হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার হাতে ফোস্কা দেখা যায় এবং যেখানে শলাকা লাগান হয়েছিল সেখানে পুড়ে যাওয়ার সব লক্ষণ প্রকাশ পায়। এর বিপরীত ঘটনাও অনেকের জানা আছে। ভারতীয় যোগীদের অনেকে আগুনের উপর দিয়ে অক্ষত অবস্থায় হেঁটে যেতে পারেন। এই রকম অনেক যোগী বিদেশী অনেক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসকের সামনে গনগনে আগুনের উপর হেঁটে দেখিয়েছেন তাঁদের পায়ে পুড়ে যাওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

বাইরের আগুনের বা উত্তাপের অস্তিত্ব না থাকাতেও যদি কেবল মানসিক কল্পনা থেকে শরীরের বিশেষ স্থানে পুড়ে যাওয়ার মত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি সম্ভব হয় তবে ওষুধের গুণ ছাড়াও কেবল রোগীর মনের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে তার শারীরিক কার্যপ্রণালী রোগ সারাবার মত নিয়ন্ত্রিত করাই বা সম্ভব হবে না কেন?

ওয়ার্ট বা আঁচিলের চিকিৎসায় এর উদাহরণ পাওয়া যায়। আঁচিলের নানা রকম টোটকা চিকিৎসা আছে। এদেশেও আছে পাশ্চাত্য দেশেও আছে। সব রকম টোটকাতেই কিছু কিছু সাফল্য দেখা যায়। একজন জার্মান ডাক্তার কেবলমাত্র চিকিৎসার ভান করে এবং রোগীর মনে চিকিৎসার সাফল্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আস্থা জন্মিয়ে আঁচিলের চিকিৎসার বিবরণ প্রকাশ করেন। তাঁর ১৭টি রোগীর মধ্যে ১৫টিই সেরে যায়। তিনি ওষুধ হিসাবে কেবল ফোটান জল ইনজেকসন করতেন। তাঁর সাফল্যের কথা পড়ে বিলাতের একজন ডাক্তার এই চিকিৎসা চেষ্টা করেন। তাঁর প্রথম রোগীটি একটি ১৫ বছরের মেয়ে। তার মুখে কয়েক মাস যাবৎ কতগুলি আঁচিল উঠেছিল এবং কিছুতেই সারছিল না। তাকে তিনি এই অত্যাশ্চর্য জার্মান ওষুধের সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত বর্ণনা দিয়ে ও প্রচুর আশ্বাস দিয়ে ফোটান জল [illegible]

সপ্তাহের মধ্যেই তার আঁচিল সব পড়ে যাবে। সত্যি-সত্যিই পনের দিনের মধ্যে মেয়েটির সব আঁচিল পড়ে যায়। এরপর তিনি আরও কয়েকটি রোগী ঐ রকম চিকিৎসা করেন, তবে তাদের সকলেরই আঁচিল সারে নাই। তারপর একদিন একটি ১৮ বছরের ছেলেকে তাঁর আঁচিলের চিকিৎসায় তিনি ঐ রকম ফোটান জল ইনজেকসন দেবার পর তার আঁচিল সারার পরিবর্তে আরও বেড়ে গিয়ে সারা গায়ে বেরুতে লাগল। বলা-বাহুল্য যে ফোটান জলের এমন কোনও বিশেষ গুণ বৈজ্ঞানিকদের জানা নাই যাতে আঁচিল সারতে পারে বা বাড়তে পারে।

সব ডাক্তারই এই রকম চিকিৎসার সঙ্গে পরিচিত। এক রকমের ওষুধ আছে যাকে বলা হয় প্ল্যাসেবো। অর্থাৎ যে ওষুধ কোন বিশেষ ভেষজ গুণের জন্য দেওয়া হয় না; কেবলমাত্র রোগীর মনে আশ্বাস ও আস্থা জন্মানর জন্য দেওয়া হয়।

আধুনিক ভেষজ ব্যবসায়ীরা নানা রকম পেটেন্ট ওষুধ বিক্রী করে। তাদের চটকদার লেবেলে বা প্লাসটিকের প্যাকেটে কি কি রোগ সেই ওষুধে সারে তার বৈজ্ঞানিক নাম শিক্ষিত লোকেদের আস্থা উৎপাদনের জন্য লেখা থাকে। খুঁত-খুঁতে লোকেদের সন্তুষ্ট করবার জন্য গভর্ণমেন্ট রেজিষ্টার্ড বলা হয়। উদ্দেশ্য বোধহয় যে গভর্ণমেন্ট যখন বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা সমর্থন করেন তখন তাঁরা রেজিষ্টারী করলে পর ওষুধের বৈজ্ঞানিকত্ব স্বীকার হয়েছে বলে লোকে বিশ্বাস করতে পারে। যাঁরা একটু দেশীয় চিকিৎসায় বিশ্বাসী তাঁদের জন্যও ব্যবস্থা থাকে। দেশীয় গাছ-গাছড়া থেকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত (বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষিত নয়) বলে বিজ্ঞাপনে লেখা থাকে। মনোহারী বিজ্ঞাপনে এই সব তথ্য দিয়ে এবং এই ওষুধ ব্যবহারে আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের সার্টিফিকেট দিয়ে সহজেই লোকেদের বিশ্বাস উৎপাদন করা যায়। এই সব ওষুধ বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করলে তার অনেকগুলিকেই প্ল্যাসেবো ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। অবশ্য এই সব পেটেন্ট ওষুধে কিছু যে ভেষজ থাকে না তা নয়। তবে সেগুলি নিরাপত্তার জন্য এতই কম মাত্রায় থাকে যে তাদের ভেষজ ক্রিয়া প্রায় নগণ্য।

আদিম বা আধুনিক যে রকমই হোক দৈব চিকিৎসা ঝাড়ফুঁক চিরকালই থাকবে। অনেকে বলেন আধুনিক চিকিৎসকরা এ সব যতই তুচ্ছ করুন না কেন এর মধ্যে অনেক ভাল ভাল জিনিষ আছে যা আধুনিক বিজ্ঞান এখনও আবিষ্কার করতে পারে নাই। তা না হলে এত লোক ভাল হচ্ছে কি করে। ভাল যে কেউ কেউ হচ্ছে সে কথা অস্বীকার করা যায় না। তবে একই রোগ একই চিকিৎসায় সকলের ভাল হচ্ছে না। আঁচিলের উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, কেউ কলাগাছের রস লাগিয়ে ভাল হচ্ছে, কেউ হোমিওপ্যাথির গুঁড়ো খেয়ে ভাল হচ্ছে, কেউ মন্ত্র পড়ায় ভাল হচ্ছে, কেউ বা জল ইনজেকসনে ভাল হচ্ছে, কেউ নাইট্রিক এসিডে, আবার অনেকে কোন চিকিৎসা না করেই ভাল হচ্ছে।

যেমন করেই হোক যে চিকিৎসাতেই হোক ভাল হওয়াই আসল কথা। রোগ যন্ত্রণায় কাতর লোক যদি একটা কবচ মাদুলী নিয়ে শান্তি পায় তাতে আপত্তির কি আছে? এমনও তো হতে পারে যে আমাদের শরীর যখন বিশ্বের সকল বস্তুর মতই দুরন্ত বেগে ঘূর্ণমান অসংখ্য পজিটিভ ও নেগেটিভ বিদ্যুৎ কণিকার সমষ্টি মাত্র তখন ঐ দুরন্ত বিদ্যুৎ-কণিকাগুলির ঘূর্ণমান নৃত্যের বিভিন্ন ছন্দের সঙ্গে শরীরের ভাল থাকা না থাকার সম্পর্ক আছে। মানুষের মনের খেয়াল-খুসী তৃপ্তি, অতৃপ্তি, রাগ, দ্বেষ ইত্যাদির সঙ্গে ঐ ছন্দ কোন তাল মেনে চলে আধুনিক বিজ্ঞান এখনও তার হদিস যখন পায় নাই তখন কিসে কি হয় সে কথা নিয়ে শেষ নিষ্পত্তি না করাই ভাল।

আমেরিকান সাহিত্যে ভারত

(৮১ পৃষ্ঠার পর)

ভারত বিদ্বেষ এবং বিশেষ করে হিন্দু বিদ্বেষ সুস্পষ্ট। কিপলিং-এর রচনা আমেরিকায় প্রচার লাভ করেছিল। কিপলিং-এর গল্প এবং ভারত-বিদ্বেষমূলক অন্যান্য কাহিনী বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে সিনেমায় রূপান্তরিত হয়ে আমেরিকায় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আমেরিকান সাংবাদিক মিস ক্যাথারিন মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়া' ভারতের বিরুদ্ধে কুৎসার এক অভূতপূর্ব দলিল। লুই ব্রমফিল্ডের "দি রেইনস কেম" ও "নাইট ইন বম্বে" এবং অন্যান্য লেখকের এই জাতীয় উপন্যাস সিনেমার দিকে চোখ রেখে লেখা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত আমেরিকানরা ভারতকে প্রধানতঃ ইংরেজী সাহিত্যের ও বৃটিশ দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে দেখেছে।

আমেরিকার সঙ্গে ভারতের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে। বিদেশে ভারত সম্বন্ধে আজকাল অধিকাংশ বই প্রকাশিত হয় আমেরিকায় বিচিত্র বিষয়ের বই। এ থেকে ভারতের প্রতি আমেরিকার গভীর আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ইমার্সন-থোরো-হুইটম্যানের মতো একান্ত নিঃস্বার্থ আগ্রহ নয়। ভারতের প্রতি এঁদের শ্রদ্ধা একমাত্র জার্মাণ পণ্ডিত ও লেখকদের ভারত প্রেমের সঙ্গে তুলনীয়।

ভারতের উপর আমেরিকায় অনেক বই লেখা হলেও সাহিত্য গ্রন্থের সংখ্যা খুবই কম। তথ্যমূলক বইয়ের প্রাধান্যটাই চোখে পড়ে। সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত আমেরিকান সাহিত্যে এ বিষয়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বই পার্ল বাকের 'কাম, মাই বিলাভেড'। আমেরিকান মিশনারী ভারতে এসেছে বিপুল ঐশ্বর্য ত্যাগ করে। তিন পুরুষ যাবৎ তারা ভারতের সেবা করেছে, স্বেচ্ছায় সকল দুঃখ বরণ করে এদেশের জীবনযাত্রা হাসিমুখে গ্রহণ করেছে। তৃতীয় পুরুষ থিওডোরের মেয়ে লিগি ভালোবাসল এ দেশের এক ডাক্তারকে। তাকে বিয়ে করতে চাইল। এবার থিওডোর পড়ল চরম পরীক্ষায়। ভারতের সেবার জন্য অকাতরে সে অর্থ দিয়েছে, নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে। কিন্তু এবার এলো শ্রেষ্ঠ দানের আহ্বান: শাদা মানুষের রক্তের সঙ্গে কালো মানুষের রক্তের মিলনের দাবী। এ দাবী সে মেনে নিতে পারল না, রক্তের শ্রেষ্ঠত্ববোধের সংস্কার তাকে বাধা দিল। থিওডোর সপরিবারে ভারত ত্যাগ করে সমস্যা এড়াল।

পার্ল বাক দেখিয়েছেন, শ্বেতকায়দের সঙ্গে ভারতের এতদিন যাবৎ যোগাযোগ হলেও স্থায়ী মিলন ঘটেনি দুই জাতির মধ্যে। মিলনের এত বড় সুযোগটা ব্যর্থ হয়ে গেল; কারণ, পাশ্চাত্যের শ্বেতকায় জাতি মিলনের জন্য রক্তের কৌলিন্য ত্যাগ করতে সম্মত হয় নি। থোরো ওয়াল্ডেনও গঙ্গার জল মিশিয়ে এক মহান নতুন সভ্যতা পত্তন করবার কথা বলেছিলেন। সুয়েজ ক্যানেল ভারত ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মিক সংযোগের সহায়ক হবে বলে হুইটম্যান বিশ্বাস করতেন। থোরো ও হুইটম্যানের এই আশা পূর্ণ হয় নি। কেন হয় নি পার্ল বাক তার উত্তর দিয়েছেন।

মনের আকাশ

কালিদাস দত্ত

ধূসর পৃথিবী এবং আকাশ যদিও
ছেঁড়া নীল শাড়ি
এখানে ওখানে ছেঁড়া তোষকের তুলো-মেঘ
ছানা কাটা-কাটা বড়ো এক বাটি
দুধের সাগর
অম্ল, হায় হায় হতাশায় ছেঁড়া দুধ বুঝি
তবু মাঝে মাঝে তারই ফাঁকে
অনেক সুদূর থেকে
খুব চেনা চেনা চোখের আলোর মতই নরম
দু একটি তারা এখনও তো
হাসে টিপে টিপে।

হয় তো বা চাঁদ নেই
সব দিন কোথায় বা থাকে
ভালোবাসি যে মেয়েকে
সব ক্ষণ সে কি কাছে থাকে?
চোখের এ পিঠ থেকে মনের ওপিঠে
তার সেই চোখ
হাসি লজ্জাবনত মুখ হঠাৎ ভেংচানি
অথবা হয় তো নাগিনী-ছোবল
রাগের বিজুরি
তারপর হিমে ভেজা হীরের মতন
দু চোখে উজল হাসি।

বিরহ-ধূসর মনের আকাশে
সেই ওরা— ওই স্মৃতিগুলি
তখন তারার মতই চোখ টিপে টিপে
মিটি মিটি হাসে
হাসে আর জ্বলে
যে আলো হাসির পথ ধরে ধরে
এই কালো রাতে
মনের পুতুল সেই মানসী চাঁদের দেশে
একদিন পৌঁছাব আমি।

তখন আবার জেনো পূর্ণিমা রাত
সবুজ সবুজ॥

"না-না—ক্ষিতিতা বিপুলে না—বিপুলে হইল গিয়া পুষ্তিডা........"

পন্ডিতমশাই মাথা নাড়েন। রোগা লেকের উপরে মাথাটা বেলের মত নড়ে উঠে। শুধু মাথাই নয়, মাথার মাঝখানে শিখাটিও একবার কেঁপে ওঠে। আর সেই কম্পমান শিখার উপরে এসে পড়ে একফালি সোনালী রোদ। ঝকঝকে সোনালী শরতের রোদ। ঝকঝকে সোনালী শরতের রোদ। রসিক ছাত্র অনামনস্ক হয়ে যায়। বর্ষার পর শরতের রোদ রসিককে আনমনা করে দেয়। রসিক দর্জা দিয়ে বাইরে তাকায়।

হ্যাঁ, মুচিদের আড্ডাটা আজও চলছে। ফুটপাথের কোণে ওরা গোল হয়ে বসেছে। বুড়ো মুচিটা ঘাড়টা বাঁদিকে কাত করে একটা লাল জুতোর উপরে বুরুশ চালাচ্ছে ত' চালাচ্ছেই। তার পাশের ঝাঁটাগোঁফ মুচি লোহার ফর্মার উপরে একটা জুতো উল্টো করে ধরে পেরেক ঠুকছে। আর ছোকরা মুচিটা ধারাল পাটাস দিয়ে একটা কাঠের টুকরো পালিশ করছে' ও বোধ হয় কাঠের টুকরোটা দিয়ে জুতো সেলাইয়ের গুণ ছুঁচের হাতল বানাবে। ওই কাঠটার উপরেও এসে পড়ে শরতের একফালি সোনালী রোদ।

এর ভিতরে পাশের বাড়ীর দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে দক্ষিণ ভারতীয় শিশু সোসাম্মা আর আপ্পু দুই ভাই-বোন। সোসাম্মাই বড়, সে হল দিদি, আপ্পু ছোট সে ভাই। আপ্পুটা এখনও হাটতে গেলে টলে, কাল আবলুস কাঠের মত রঙ ডাগরচোখ আপ্পু। আপ্পু টলতে টলতে এগিয়ে আসে মুচিদের দিকে আব পিছন দিকে ফিরে ফিরে দিদিকে ডাকে— "গেত্তালাইরবে বা..." (দিদি এদিকে এস)। আর দিদি বাধা দেয়" আত্তালাইরডে" (এদিকে ভাইটি)।

ওরা রোজই এই সময়ে ফুটপাথে নামে। আজই মুচিদের আড্ডায় আসে। মুচিরা জুতো পালিশ করার আর ওরা অত্যাচার করে।

সোসাম্মা হয়ত সিগারেটের মরচে ধরা কৌটায় ভরা জলের দিকেই হাত বাড়ায়— "পাচ্চা ভেলম!" (ঠান্ডা জল)।

আউমগড়ের জয়সোয়ার হয়ত ধমকে ওঠে "গন্দা পানি।"

সোসাম্মা পিছিয়ে যায়।

কেউ কারো কথা বোঝে না।

মুচিদের পিছনে বসে আখওয়ালা বিরাট একবোঝা আখ নিয়ে ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে রেখেছে। একটা করে আখ নিয়ে আড়াআড়িভাবে ধরে একটা জায়গায় নিপুণভাবে ছুরি দিয়ে দাগ দেয়। ডগার পাতাশুদ্ধ গোটা আখটাই ঘুরে যায়। তারপর একটু চাপ দেয় কাটাদাগের গোড়ার দিকে। টুক করে হাতখানিক কি তার চাইতেও ছোট একটুকরো আখ আলাদা হয়ে যায়। আখওয়ালা আবার ছুরি দিয়ে দাগ দেয়। আর মাঝে মাঝে গর্জন করে ওঠে "গান্ডারী গুলাব গান্ডারী।"

আপ্পুটা টলতে টলতে এগোয়। যায় ওই ছোকরা মুচিটার কাছে। যে মুচিটা রোজ কাঠ চেঁছে চেঁছে জুতো সিলাইয়ের গুণ ছুঁচের হাতল বানায়। আপ্পু হয়ত ভাবে ওটা লাটিম। নেবার জন্য হাত বাড়ায়। ছোকরা মুচি রোজই ধমক লাগায় একটা। আপ্পু পালিয়ে যায়।

আজকেও আপ্পু হাত বাড়ায় কিন্তু দাঁড়ায় না। আরও এগিয়ে যায় আখওয়ালার দিকে। ও যত যায় ওর পা তত টলে। ফুটপাথের আলগা খোয়াগুলোও বোধ হয় ওর পায়ে লাগে। ফুটপাথের প্রান্তে এসে ও একবার ডাইনে তাকায়। ডাইনে আখওয়ালা আখ বেচতেই ব্যস্ত। তারপর বাঁয়ে তাকায় সোসাম্মাও বাঁয়ে তাকায়। ওখানে পণ্ডু গোয়ালা গাই দোয়াচ্ছে। গাইটার পিছনের দু পা ভাল করে দড়ি দিয়ে বেঁধেছে। গোয়ালনীটা বাছুরটার গলার দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে। পণ্ডু উবু হয়ে বসে পায়ের ফাঁকে বালতী নিয়ে দুধ দুইয়েই চলছে "চ্যাক্ চো... চো চ্যাক" সোসাম্মার বোধ হয় লোভ হয় বাঁয়ে যেতে। আপ্পু কিন্তু ডাইনেই যায় আখওয়ালা আখ কাটে। আপ্পু এগোয় আখওয়ালা আখে ছুরি বসায়। আপ্পু আরও এগোয়। আখওয়ালা ছুরি দিয়ে দাগ দেয় ডগার পাতাশুদ্ধ আখটা ঘুরে যায়। কথা নেই বার্তা নেই আপ্পু যেয়ে টলতে টলতে ছুরিটাই চেপে ধরে।

আখওয়ালা কি ঘাবড়ে যায়? সোসাম্মা বুঝতে পারে না। আখওয়ালা কি রেগে যায়? তাও সোসাম্মা বুঝতে পারে না। তবে আখওয়ালা বোধ হয় একটু চোখ পাকিয়ে তাকায় আপ্পুর দিকে। আর বোধ হয় একটু জোরেই হাঁক দেয় "গান্ডারী-গুলাব গান্ডারী"।

আপ্পুটা ভড়কে যায়, কেঁদে ফেলে 'ভাঁ' করে। সোসাম্মা ফিরে তাকায়। ভাইকে ডাক দেয় "আপ্পুইরডা বা (আপ্পু এদিকে এস)।

আখওয়ালা কিরকম ড্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকিয়ে থাকে।

আপ্পুটা আবার কাঁদে। তার মুখে পড়ে নতুন শরতের সোনালী রোদ। সোসাম্মা যেয়ে ভাইয়ের গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। পণ্ডু গোয়ালা তাকায় আখওয়ালার দিকে। বোধ হয় বিরক্তি বের হয় চোখ দিয়ে। তারপর তাকায় আপ্পুর দিকে। পণ্ডুর মুখের একপাশে সোনালী রোদ পড়ে। ঘামে ভিজে কিরকম স্নিগ্ধ দেখায় মুখটা। ও তাকায় আপ্পুর দিকে।

বুড়ো মুচিটাও তাকায় আখওয়ালার দিকে। ওর চোখেও তিরস্কার। সে আবার তাকায় আপ্পুর দিকে। তার মুখের একপাশে শরতের সোনালী রোদ পড়ে। চোখ দুটো চকচক করে বোধ হয় বাৎসল্যই।

তারপর তাকায় ছোকরা মুচিটা। চোখ পাকিয়ে তাকায় আখওয়ালার দিকে। আবার চোখ ভিজিয়ে তাকায় আপ্পুর দিকে। ওকে ডাক দেয় চোখ ইশারায়।

ওর চোখে আপ্পু কি দেখে কে জানে। তবে ও আখওয়ালার দিকে তাকায় ভয়ে ভয়ে। সেও ডাক দেয় স্নিগ্ধ চোখে।

বেচারা আখওয়ালা। সবাই ভাবছে ও ধমকেছে আপ্পুকে। আসলে যে ও নিজেই ভয় পেয়েছে তা কেউ বোঝে না।

আপ্পু একটু একটু করে এগোয়। পিছন পিছন সোসাম্মাও এগোয়। দুজনেরই মুখের এক পাশ চকচক করে শরতের সোনালী রোদে।

আপ্পু একবার তাকায় ছোকরা মুচিটার দিকে। সে আপ্পুকে দেয় গুন ছুঁচের জন্যে তৈরি হাতলটা। আপ্পু এবার তাকায় একটু অবাক হয়ে। ছোকরা মুচি হাতলটাকে নিয়ে একটা লাটিমের মত ঘুরিয়ে দেয় রাস্তায়। আপ্পু ডান হাতে ধরে লাটিমের মত হাতলটা। তার ডান গালে পড়েছিল সোনালী রোদ এবার ঠোঁট দুটোও চকচক করে সোনালী হাসিতে। ও তাকায় বাঁদিকে। আখওয়ালা যেন কি ভাবে। এক টুকরো আখ দেয় আপ্পুর বাঁ হাতে।

টলতে টলতে আপ্পু একদম ঘুরে যায় সোসাম্মার দিকে। এক গাল দাঁত বার করে বলে "পেভলন এন্তো" (দিদি আমার)।

সোনালী রোদটা সোজাসুজি এসে পড়ে আপ্পুর মুখে। ওর মুখটা রাঙিয়ে দেয়।

দিদি কিন্তু রোদের দিকে পিছন ফিরে-ও ওর মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

বুড়ো মুচি, ছোকরা মুচি এমন কি আখ-ওয়ালার মুখে পর্যন্ত সোনালী আমেজ ভাসে।

রসিক ভুলে যায় পণ্ডিত মশাইকে।

সংস্কৃত কাব্যও ভুলে যায়।

বোধ হয় ভুলেই থাকত যদি না হঠাৎ খোকা ভাঙাতে বুধিরাম রাউতের বাচ্চাই গান।

হাঁ বুধিরাম ঘুঁটে বিক্রী করে। একটা বিরাট ঝাঁকায় ঘুঁটের উপর ঘুঁটে সাজায়। ঝাঁকার গভীরে যত ঘুঁটে থাকে ঝাঁকার উপরে থাকে তার চাইতেও বেশী। ওর মাথায় ঘুঁটের ঝাঁকা দেখলে হনুমান আর গন্ধমাদনের কথা আপনি মনে পড়ে।

সেই বুধিরাম যেন কখন এসে ঝাঁকাটা নামিয়ে রেখেছে ইলেকট্রিকের বাক্সের উপর। তারপর বোধ হয় দেখেছে সোনালী রোদ আর আখওয়ালা, আপ্পু আর ছোকরা মুচি, বুড়ো মুচি আর সোসাম্মা এইসব। তারপর হঠাৎ গেয়ে উঠেছে হো হো করে—

এক সময় ব্রহ্মাজি যা কর পহুঁছে
বনকে মাঝার।
ঘুমতে ঘুমত বনঞ অন্দর শোভা
দেখে অপরম্পর॥
হকর বৈঠ গায় শ্রীব্রহ্মাজি আলস
আয়ে নিদ অপার।
আঁখসে কিয়ে নিকাল ফোঁক ব্যায়াম
বিধান লিখে লালার।
উঁসি আঁখকে কিচরসে একপুত্র ভয়ে
শুনিয়ে মনমার॥
ছোড়পুত্র ব্রহ্মাজি আপনে চলে বরমপুর আর।
কহতে যদুমুত হুয়া হুঁসিয়ার ঘুমন
লাগে কিচক গুণবার॥

[এক সময়ে ব্রহ্মা বনের ভিতরে গিয়েছিলেন। বনের ভিতরের শোভা দেখতে দেখতে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে বসে ব্রহ্মা ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের ভিতর চোখ থেকে পিচুটি বের করে ফেলে দিলেন। ওই পিচুটি থেকে একটি ছেলে হল। ছেলেকে ফেলে ব্রহ্মা নিজে ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন। যদুমুত হুসিয়ার হয়ে বলছে সেই গুণী ছেলে কিচক ঘুরতে লাগল]।

একটা গান গেয়ে বুধিরাম একটু দম নেয়, তারপর আবার সুরু করে হো হো করে। সুরু করে শিশুর গান—

"কিচক খাতে কন্দ ফলমূলে কষ্টকথা সব ঝাই।
খাস দিন কিচক বনাম আপন জীবন বিতাই॥

[কিচক বনে ফলমূল খেয়ে নিজের জীবন কাটাতে লাগল]।

ভোজপুরী গান শুনে বোধ হয় রসিক আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসে। হ্যাঁ পণ্ডিতমশাই পড়াচ্ছেন।

"না, না, ক্ষিতিভা বিপুলে না......"। হ্যাঁ পণ্ডিতমশাই পড়াচ্ছেন—

ক্ষিতিরতি বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে,
ধরণি ধারণ কিণ চক্র গরিষ্ঠে।

অর্থাৎ—

পৃথিবী তোমার বিরাটতর পৃষ্ঠে আশ্রয় পেয়েছে। পৃথিবী ধারণ করে করে তোমার পিঠে কড়া পড়ে গিয়েছে। কিন্তু সে কড়ায় পিঠের গৌরব আরও বেড়েছে।

রসিক আর একবার তাকায় দরজা দিয়ে সোনালী রোদের দিকে। পণ্ডিতের দিকে তাকায়ই না। কিন্তু অর্থ বেশ সরল হয়ে যায়—

ক্ষিতিরতি বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে,
ধরণি ধারণ কিণ চক্র গরিষ্ঠে।

গগন মাঝির গল্প

(৮৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

'হ্যাঁ হ্যাঁ, মিনসে ঘুমের ঘোরে ডুবে মরুক। তুমি আমি সাঁতরে ওপারে গে উঠব। তা পর যেখেনে দুচোখ যায় চলে যাব।'

ঘোমটা খসে পড়েছে হিমির। তার গাঢ়, গরম নিঃশ্বাস পড়ছে গগনের বুকে। অস্থির গলায় হিমি বলে, 'তুমায় ছেড়ে আমার চলবে নি। সারা জন্ম তুমাকেই চেয়েছি মিনসে।'

হিমির মনে কি আছে, কে জানে! যে ডাকাবুকো মেয়ে বিয়ের পর সোয়ামীকে নিয়ে নাগরের নৌকোয় ওঠে, নাগরকে সোয়ামীসুদ্ধ নৌকো ডুবিয়ে দিতে বলে, তার মন বড় গহীন, বড় অথৈ। সে মনের নাগাল পায় না গগন।

একটু সরে বসেছে হিমি।

কী করবে? কী করা উচিত? এই কথাটা যতই ভাবল, বুকের ভেতরে তোলপাড় চলল। গগনের প্রাণটা ছটফট করতে লাগল।

হিমিকে কী সে চায়? চায়ই তো। নইলে পিসী মরার পর ডায়মণ্ডহারবার গিয়ে কার টানে ফিরে এল? নইলে হিমির বিয়েতে অবুঝ, অসহ্য যন্ত্রণায় তার প্রাণটা এমন বিকল হয়ে যায় কেন?

এই-ই শেষ সুযোগ। সে পাকা মাঝি। ইচ্ছে করলে চক্ষের পলকে সে নৌকো ডুবিয়ে দিতে পারে। নৌকো ডুবিয়ে হিমিকে নিয়ে ভেসে ভেসে সে পাড়ে উঠতে পারবেই।

এই সুযোগটা হারালে কোনদিনই আর হিমিকে পাবার আশা নেই।

গগন ঠিক করে ফেলল, নৌকোটা ডুবিয়েই দেবে।

বোঠে দিয়ে চাড় মেরে নৌকো কাত করে ফেলল গগন। আর একটু কাত হলেই জল উঠতে সুরু করবে।

হঠাৎ গগনের চোখে পড়ে গেল। ছই-এর তলায় অঘোরে ঘুমুচ্ছে অক্রূর। সেই অক্রূর যে বিশ্বাস করে নিজের প্রাণ আর বউকে তার ধর্মের ওপর রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছে।

হাতটা কেঁপে গেল গগনের। নৌকোটা বার দুই টাল খেয়ে আবার ঠিক হয়ে গেল।

হিমি বলল, 'কী হ'ল, নৌকো ডুবোলে নি?'

'না।'

হঠাৎ ঝেঁঝে উঠল গগন, 'যাও মাগী, ছই-এর তলায় গে বোস। সোয়ামী ঘুমুচ্ছে, ফাঁক পেয়ে ঢলাতে এসেচ? যাও—'

গগনের গলার আওয়াজে কি ছিল, কে জানে। হিমি কি বুঝল, সে-ই বলতে পারে। গুঁড়ি মেরে যেমন বেরিয়ে ছিল, ঠিক তেমনি ছই-এর তলায় গিয়ে ঘুমন্ত সোয়ামীর পাশে বসল।

গগন যদি একবার তাকাত, দেখত আবছা অন্ধকারে হিমির চোখ-দুটো ধক-ধক করছে। কিন্তু গগন তাকাল না। তাকাবার সময়ই নেই। কে-গোনের নদীকে টিট করে সে বোঠে মারতে লাগল।

ভোরের দিকে নৌকো ওপারে পৌঁছল।

হিমি আর অক্রূর নেমে গেল। খানিকটা গিয়েই একটা ক্ষিপ্র মোচড় খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল হিমি। পারের নরম কাদায় পা গিঁথে গিঁথে গগনের কাছে এল। ফিস ফিস করে বলল, 'সুযুগ করে দিলম, তবু পারলে নি। এ জন্মে আর আমাকে পেলে নি মিনসে।'

গগন জবাব দিল না।

হিমি চলে গেল।

এক সময় পুবের আকাশটা ফরসা হয়ে গেল।

গলুইর উপর চুপচাপ বসে ছিল গগন। পুব দিকের আলো আলো, ফরসা আকাশটার দিকে তাকিয়ে একটা কথাই মনে হচ্ছিল গগনের।

হিমিকে পেলে নিশ্চয়ই সে সুখী হত। কিন্তু সুখের চেয়ে অনেক বড় ধর্ম। সেই ধর্ম, যার ওপর নিজের প্রাণ আর বউকে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে অক্রূর ঘুমুতে পেরেছিল।

আবেদন

আকাশ প্রদীপ সুদূরে শূন্যে জ্বলছে;
তারাদের ডেকে কোন্ কথাটি সে বলছে?
আমার এ ক্ষীণ
আলোটিকে জ্বালালাম;
মনে রেখো ভাই,
ভুলোনাকো [illegible]।

[illegible]

বাড়ির নাম পয়স্বিনী

কালীপদ চট্টোপাধ্যায়

কাকলী চৌধুরী মফঃস্বলের মেয়ে। আই-এ পাস ক'রে কলকাতায় এক চাকরি পেয়ে বেঁচেছে। বাপ পরলোকে। মা বেঁচে আছেন আরও কয়েকটি কন্যার দায় ঘাড়ে ক'রে। খেয়ে-প'রে কেটে যাচ্ছে একরকম, কিন্তু পণ দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেবেন এমন অবস্থা নয়।

কলকাতায় কাকলী মেসে থাকে, চাকরি করে, গল্প লেখে—পত্রিকায় দেয় আর প্রতিবছর বি-এ পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈরী হবার চেষ্টা করে। মাইনে যা পায় নিজের খরচ চালাবার পরে তা থেকে আর বিশেষ-কিছু বাঁচে না। লেখার আয়টা বাঁচিয়ে মাঝেসাঝে পুজোয়-পার্বণে মাকে কিছু দেবার চেষ্টা করে—যা পেলে মা খুশী হন, না পেলে অখুশী হন না। চাকরির সঙ্গেই কাকলীর বিয়ে হয়ে গেছে—এই ভেবে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিশ্চিন্ত।

আরও একটা কর্ম করে কাকলী। অমল মিত্রের সঙ্গে প্রেম করে।

অমল মিত্র কী করে? সে বেকার। চাকরি নেই অর্থে বেকার। চাকরি নেই ব'লে তার রোজগার নেই তা নয়, সেও মফঃস্বলের ছেলে। ম্যাট্রিক পাস ক'রেই বাড়ির হালচাল বুঝে কপাল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। এক পাঠশালায় মাস্টারী করতে করতে আই-কম পাস করেছে। টিউশনি করতে করতে বি-কম পাস করেছে। সময়ের অভাবে এম-কম কি এম-এ পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈরী হতে পারছে না। সময় কোথায়? মেসে থাকার খরচ কম নয়। চাল বাঁচিয়ে চলতে হয়। টিউশনি করতে হয় দু'বেলা। খবরের কাগজে কাগজে নিয়মিতভাবে কর্মখালির বিজ্ঞাপন খুঁজতে হয় এবং নিয়তই নানা অফিসের উদ্দেশে দরখাস্ত ছাড়তে হয়। দুপুরটা ওই কর্মেই কাটে—একটু ঘুমোবার সময় পাওয়া যায় না। তাছাড়া, আরও এক কাজ জুটেছে তার।

[illegible] রেকর্ড কোম্পানীর লেখক অমল মিত্র। গত কয়েক বছরে একশ'র ওপর গান দিয়েছে সে ওই কোম্পানীকে। গ্রামোফোনের রেকর্ড তৈরীর বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ওটা। প্রতিটি গানের জন্যে কুড়ি টাকা ক'রে পায় অমল। কাকলীর সঙ্গে প্রেম জমে ওঠার পরে সে শপথ ক'রে বলেছে যে, জীবনে কখনও একটি লাইন গানও সে রচনা করেনি।

কাকলীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ই তো এ-সূত্রে। এক পত্রিকার অফিসে তার পরিচয় হয় অমল মিত্রের সঙ্গে। গীতিকবি অমল মিত্র—রেকর্ড কোম্পানীতে তার বিপুল প্রতিপত্তি। তাই জেনে আড়ালে কাকলী তাকে অনুরোধ জানিয়েছে, "আমার একটা গান নিন না দয়া ক'রে রেকর্ডের জন্যে।"

মিত্র বলেছে, "দেবেন আপনার লেখা কয়েকটা গান—দেখব চেষ্টা ক'রে।"

অবিলম্বেই কাকলী একটা খাতা দিয়েছে অমলকে। ষোলোটা গান। মাস ছয়েক পরে কাকলী যখন একরকম হতাশ হয়েই খাতাটি ফেরত চেয়েছে, তখন দু'জনের মধ্যে অন্তরঙ্গতা জমেছে প্রায় অচ্ছেদ্য। অমল বলেছে, "তোমার একটা গান নিতে পারি, তবে, আরও চারটে গান আমাকে দিতে হবে—আমার নিজের নামে চালাবার জন্যে।"

তথাস্তু। নবীন লেখিকা কাকলী অনেক নতুন লেখক-লেখিকার মতই অকৃপণ আনন্দে পাঁচটি গান দিয়েছে। তার নামে যে গানটি রেকর্ড হয়েছে সেটির জন্যে দশটি টাকাও পেয়েছে সে। বাকি চারটে গান চলেছে অমল মিত্রের নিজের নামে।

মেসে অমলের বিছানার পাশের তাকের ওপর নবীন কবিদের গানের খাতা প'ড়ে আছে ডজন ডজন। রাস্তায় বেরোলেই তার পেছনে তরুণ কবিদের ধর্ণা লেগেই আছে। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় রেস্টুরেন্টে নিখরচায় সুখাদ্য সহযোগে চা পান করতে হয় মিত্রকে এক রকম দায়ে পড়েই।

একটা বিশেষ গুণও আছে অমল মিত্রের। কাগজে যে সব নতুন গান বেরোয়, তার মধ্যে কোনটা পছন্দ হলে, সে দু-চারটে শব্দ পালটে নিজের নামে চালিয়ে দেয় রেকর্ডে। কবি যদি সেটা জানতে পারে, তবে উত্তেজিত হয়ে বন্ধুমহলে আস্ফালন করে, কিন্তু মামলা করতে উৎসাহ পায় না ব'লে দমে পড়ে।

মাস-কয়েক আগে অমল মিত্র রেকর্ড কোম্পানী থেকে শ্রেষ্ঠ লেখকরূপে সম্মান পেয়েছে। শুকনো সম্মান নয়। প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের নিয়ে রীতিমত এক সভা [illegible] হয়েছে, বাইরের একজন নামজাদা লেখককে করা হয়েছে প্রধান অতিথি। আর কোম্পানীর লালমুখো বিলাতি ম্যানেজার খোদ বসেছেন সভাপতির আসনে। হোমরাচোমরা সব অফিসারদের এবং নিমন্ত্রিত শিল্পীদের উপস্থিতিতে ঝলমল সেই সভায় বহু ব্যক্তি শ্রীঅমল মিত্রের অতুলনীয় প্রতিভার প্রশস্তিবাচন করেছেন। কোম্পানী থেকে তাকে একশ' টাকার চেক দেওয়া হয়েছে আর কর্মচারীদের সংঘ থেকে দেওয়া হয়েছে পঞ্চাশ টাকার বই।

তারপর থেকে অমল মিত্র নিজের নামের আগে 'গীতিকবি' উপাধি ব্যবহার করছে।

কাকলী চৌধুরী নিমন্ত্রণ পেয়েও অফিসের কাজের চাপে সেই সভায় উপস্থিত হতে পারে নি বলে, দুঃখ নিবেদন করে চিঠি লিখেছে অমলকে। তার উত্তরে সেদিন অমল মিত্র পাঁচটার পরে কাকলীর অফিসে এল। কাকলী নথিপত্র গুছিয়ে রেখে বলল, "চল"।

দুজনে বসল এসে গঙ্গাতীরের নিরালায়। কাকলী বলল, "এমন করে আর কতদিন চলবে?"

চিরকাল চলতে দিতেও আপত্তি নেই মিত্রের। বিয়ে করে সংসার পাতবার শখ যে নেই

তা নয়, কিন্তু বউ নিয়ে তো মেসে থাকা যায় না। অবশ্য বার-টালিগঞ্জে জবরদখলের কলোনীতে এক টুকরো জমি যোগাড় করেছে অমল, কিন্তু সরকার থেকে সেই কলোনীর বৈধীকরণ হব-হব করেও আর হচ্ছে না কিছুতেই। তার অপেক্ষায় না থেকে অনেকেই নিজের নিজের প্লটে পাকা বাড়ি তুলে ফেলেছেন। কিন্তু অমল মিত্রের হাতে অত টাকা কোথায়? তারপর আয় যা আছে তা অনিশ্চিত অনিয়মিত। টিউশনি কখন আছে, কখন নেই। এর ওপর নির্ভর করে বিয়ে করা চলে না। কাকলীর আয় অবশ্য নিয়মিত, কিন্তু তা থেকে বাড়িভাড়া দিয়ে আর সংসার করা চলে না।

অমল বলে, "বিয়ে করার ঝামেলা অনেক, দায়িত্ব বিস্তর, তার চেয়ে নির্ঝামেলায় বিনা-দায়িত্বে মন্দ চলছে কী?"

কিন্তু নিজের চারদিকে অবিরত সতর্ক দৃষ্টি মেলে, চোরের দায় ঘাড়ে নিয়ে চলতে কাকলীর মনে বাধে, মানে বাধে; এমন অনিশ্চিতের চলা চিরকাল চলতে পারে না।

এ নিয়ে সেদিন সেখানে অনেক রাত পর্যন্ত অনেক কথা, অনেক মতলব আঁটা, অনেক মান-অভিমান চলল, অনেক দীর্ঘশ্বাস পড়ল, গম্ভীর মুখে রইল, অবশেষে বিটের পাহারাদার পুলিস 'চায়' বলে হাঁক লাগাতে, দুজনে চমকে উঠে পড়ল।

সেবার পুজোর বাজার উপলক্ষে অমল মিত্র এক কৌতুক-নাটক দাখিল করল রেকর্ড কোম্পানীতে। কোম্পানী বলল, "প্রতিভা লুকিয়েও আছে! এ গুণ এতদিন লুকিয়ে রেখেছিলেন কেন?"

মিত্র বলল, "নাটকের চাহিদা কম, তাই এতদিন সাহস পাই নি।"

সেই নাটকের অভিনয় ধরা হল একটা রেকর্ডের দুপিঠে। রেকর্ডের লেবেলে তার ক্রমিক সংখ্যার নিচে নাম দেওয়া হল—'চাই দুধ'। তার তলায় ছাপা হল—"সংলাপ-রচনা: অমল মিত্র।"

রেকর্ড ছাড়া হল পুজোর বাজারে। হুহু করে বিক্রি হতে লাগল। সর্বত্র সর্বজনীন পুজোর মণ্ডপে মণ্ডপে মাইক। আর, যেখানে মাইক, সেখানেই "চাই দুধ"! শুনে লোকে হেসে লুটোপাটি। গয়লার পার্টের চাইতেও গোরুর অভিনয় হয়েছে নিখুঁত। হাম্বা, অম্ব, হুঁ, হুম, প্রভৃতি নানা রকম গোরবে গোটাচ্ছের রকেরকম অভিব্যক্তি ফোটানো হয়েছে!

পুজো গেল। বড়দিন গেল। ইংরেজী শুভ নববর্ষ উদযাপন করে রেকর্ড কোম্পানীর শাদা ম্যানেজার খোশ মেজাজে অফিসে এসেই পেলেন এক উকিলের চিঠি। চিঠি দিয়েছেন জেলা জজকোর্টের প্রবীণ উকিল শমনদমন দত্ত। লিখছেন: তাঁর মক্কেল কুমারী কাকলী চৌধুরী গল্পলেখিকা, বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকায় তাঁর গল্প হামেশাই প্রকাশিত হয়। গত বছরের 'শারদীয় কালান্তর'এ তাঁর কৌতুক-গল্প 'পয়স্বিনী' ছাপা হয়েছে। এ বছরের পুজো বাজারে রেকর্ড কোম্পানী 'চাই দুধ' নামে যে রেকর্ড ছেড়েছেন, দেখা যাচ্ছে, তার কাহিনী হুবহু নেওয়া হয়েছে কুমারী কাকলী চৌধুরীর সেই 'পয়স্বিনী' গল্প থেকে। এতদ্দ্বারা লেখিকার লেখস্বত্ব লঙ্ঘন করার দরুন রেকর্ড কোম্পানী তাঁর ক্ষতি পূরণ করতে বাধ্য। এ বিষয়ে সপ্তাহকালের মধ্যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত না হলে, বা চিঠির উত্তর না দেওয়া হলে কুমারী কাকলী চৌধুরী আইনসংগতভাবে আদালতে বিচার প্রার্থনা করতে বাধ্য হবেন।

চিঠি পড়ে সাহেব লাফিয়ে উঠলেন, "হোআট! ডাকো গুপ্টা সাহাবকো।"

এলেন রেকর্ডিং অফিসার গুপ্ত। চিঠি পড়ে বললেন, "আমি এর কী জবাব দেব, স্যার? মিত্রকে ডাকতে হয়।"

"বোলাও ব্লাডি মিটারকো।"

জরুরী তলব পেয়ে অমল মিত্র এসে দেখা করল। থমথমে মুখে সাহেব তাকে চিঠি দেখালেন। মিত্র চিঠি পড়ে বলল, "দেখুন, স্যার, স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্......কিন্তু আপনি তো সংস্কৃত বোঝেন না। ব্যাপার হচ্ছে, এক সময়ে এই কাকলী চৌধুরীর সঙ্গে আমার নিবিড় অন্তরঙ্গতা ছিল, তখন দুজনের সব ব্যাপার নিয়েই দুজনের মধ্যে আলোচনা হত। এই যে গল্প, এর কাহিনী মূলতঃ আমার। আমি সেই সময় তাকে এটা বলি। সে যে বিশ্বাসহন্ত্রী করে ইতিমধ্যে সেটা লিখে, একেবারে ছাপিয়েও ফেলেছে, আমি তা কী করে জানব!"

সাহেব বললেন, "আই সী! তা, তুমি ওই পত্রিকা পড় নি? ওই গল্প?"

মিত্র বলল, "বাঙলা দেশে অজস্র পুজো সংখ্যা বেরোচ্ছে, মশাই, তার সবগুলো পড়তে গেলে যে কয়েক বছর লেগে যাবে। সব পত্রিকা কিনব, তার পয়সা কোথায়? আর, আমি লিখবারই সময় পাইনে, পড়ব কখন?"

আইন আদালতের প্রশ্ন যেখানে রয়েছে, সেখানে সবকথা সরলভাবে বলা যায় না। এমন কি, আসল কথাও নাকি না বুঝে-সুঝে বলে ফেলা ঠিক নয়। রেকর্ড কোম্পানী থেকে শমন দত্তর চিঠির জবাব যা এল, তার সরলার্থ হচ্ছে: এই নাকি! আচ্ছা, কোন্ পত্রিকায় আপনার মক্কেলের গল্প বেরিয়েছে, সেটা পাঠিয়ে দেবেন তো। আমরা মিলিয়ে দেখব, কী ব্যাপার।

শমন দত্ত লিখলেন: ওই পত্রিকা তাঁর মক্কেলের একখানাই মাত্র আছে, সেটা হাতছাড়া করতে পারেন না। 'কালান্তর' বিখ্যাত পত্রিকা, তার শারদীয় সংখ্যা দেখবার জন্য অনেক সাধারণ পাঠাগারেই পাওয়া যেতে পারে। অথবা উক্ত পত্রিকার অফিসে খোঁজ করলে পুরোনো পত্রিকা হলেও, হয়তো কিনতেও পাওয়া যেতে পারে।

রেকর্ড কোম্পানী লিখল: আচ্ছা আমরা ওই পত্রিকার একখানা সংগ্রহ করবার চেষ্টায় রইলাম। যথাসময়ে আমাদের অভিমত জানাব।

কোম্পানীর প্রবীণ আইন উপদেশক সুখময় বসু বললেন, "ভদ্রমহিলার সঙ্গে মিটিয়ে ফেলাই ভাল। তিনি মামলা যদি করেন, আমাদের পক্ষে তো জোর দেখতে পাচ্ছি নে তেমন। তারপর, মামলা হলেই, তার খবর বেরোবে কাগজে কাগজে......"

গুপ্ত বললেন, "খবর বেরোলেই হল? আমাদের বিজ্ঞাপন পাবার কাঙ্গাল নয় কোন্ কাগজ শুনি?"

উকীল বললেন, 'কলকাতার বড় দৈনিক কাগজ-গুলো সম্বন্ধে আমার ধারণা অন্য রকম। যাক, আমি যা ভাল বুঝেছি, বললাম। লেখক-লেখিকাদের নিয়েই আমাদের কারবার, তাঁদের কারও বিরুদ্ধে......"

রেকর্ড কোম্পানীর যে সলিসিটর কোম্পানী তার যুবক ব্যারিস্টার টেবিলে চাপড় মেরে বললেন, "আপনার সাবেকি ধারণা-ফারণা নিয়ে আপনার উচিত এখন আইন ব্যবসা থেকে অবসর নেওয়া। আমি বলছি, ইওর কেকালী চাউডারি যদি মামলা করে, তা হলে মামলা আমরা লড়ব। উইল ফাইট। দেখবেন ওই মহিলা গোহারা হেরে যাবে। শী'ল বি ডিফীটেড জাস্ট লাইক এ কাউ, আই স্যাই।"

আইন-উপদেষ্টা প্রবীণ উকীল নিজের টাকে হাতচাপা দিয়ে এক মিনিট নতমুখে থেকে আত্মদমন করলেন, তারপর উঠে চলে গেলেন সেখান থেকে।

এদিকে শমন দত্ত কাকলীকে বললেন, "রেকর্ড কোম্পানীর ভাব-গতিক ভাল দেখছি নে, মা। আমাদের মামলা করতে হবে।"

জেলার জজকোর্টে মামলা দায়ের করল কাকলী চৌধুরী। তার অভিযোগ নিবেদন করে ধর্মাবতার বিচারকের নিকট প্রার্থনা করল, উক্ত কাহিনীর স্বত্ব তার বলে সাব্যস্ত হোক, সেই স্বত্ব লঙ্ঘন করার দরুন বিবাদীর কাছ থেকে তাকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেওয়া হোক এবং উক্ত রেকর্ড তৈরী করা, বিক্রি করা, ইত্যাদির উপর স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করা হোক।

কাকলী চৌধুরীর অভিযোগের জবাবে ম্যানেজারের কাছে অমল মিত্র যা বলেছিল, রেকর্ড কোম্পানীর ব্যারিস্টার বললেন, সেটা নিতান্ত দুর্বল উক্তি। তিনি একটা জোরালো জবাব দাঁড় করালেন। আদালতে সেই জবাব দাখিল করা হল। জবাবে বলা হল যে, কাকলী চৌধুরীর 'পয়স্বিনী' গল্পের এবং অমল মিত্রের 'চাই দুধ' রেকর্ডের কাহিনী যে এক, তার কারণ হচ্ছে, এক সময়ে এই দুই লেখক-লেখিকার মধ্যে আন্তরিক নিকট সম্বন্ধ ছিল, তখন লেখিকা প্রায়ই লেখকের টালিগঞ্জের উদ্যানে যেতেন; সেই পল্লীতে অনেকেই গোরু পোষে। সেখানকার একটি গোরুকে এবং তার পালককে দেখে লেখক আর লেখিকা দুজনেই তাঁদের কাহিনীর উপাদান সংগ্রহ করেছেন। সেইজন্যই দুজনের কাহিনীর মধ্যে হুবহু মিল রয়েছে।

কাকলী চৌধুরী তার জবানবন্দিতে বলল যে, সাধারণতঃ অনেক লেখক-লেখিকার মধ্যেই সামাজিক পরিচয় থাকে, অমল মিত্রের সঙ্গেও তার পরিচয় ছিল নয়, এখনও আছে। শ্রীমিত্রের বিরুদ্ধে সে কোন অভিযোগও দায়ের করে নি, তার অভিযোগ রেকর্ড কোম্পানীর বিরুদ্ধে।

জেরায় প্রমাণ হল যে, টালিগঞ্জে অমল মিত্রের কোন উদ্যান নেই; যা আছে, সেটা হচ্ছে জবরদখলী এক টুকরো জমি। সেখানে কাকলী কোনদিন যায় নি।

ব্যারিস্টার কাকলীকে প্রশ্ন করলেন, "ওয়েল, কুমারী মিটার, আপনি আপনার 'পেয়োশ্‌উইনি' গল্পটির প্লট কোথায় পেলেন, তা আমরা জানতে পারি কি?"

কাকলী বলল, "আমাদের বাড়ি পাড়াগাঁয়ে। আমাদের নিজেদেরই গোরু আছে। আমার কাকা তাঁর শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া একটি গোরুকে এমন বিশেষ ধরণে লালন করেন যার মধ্যে আমরা বাড়িসুদ্ধ লোকেই কতকগুলো হাস্যকর বিষয় দেখতে পেয়েছি। তা থেকেই আমার গল্পের সৃষ্টি।"

অমল মিত্র তার নিজস্ব বক্তব্যের সঙ্গে ব্যারিস্টারের সাজানো উক্তি গুলিয়ে ফেলে, জবানবন্দিতে হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি করল।

বিচারক তাঁর রায়ে বললেন যে, কোন সাধারণ সূত্র থেকে দুটি গল্পের বিষয়বস্তু নেওয়া হলেও, সেই দুটি গল্পের মধ্যে এমন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিন্যাসের প্রতিটি ধাপে ধাপে, পরপর অবিচ্ছিন্ন ধারায় মিল থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তিনি পূর্বের এবং পশ্চিমের অনেক মামলার নজির দেখিয়ে অতি স্পষ্ট ভাষায় বললেন যে, এ কাহিনীর স্বত্ব একান্তভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে কুমারী কাকলী চৌধুরীর। রেকর্ড কোম্পানী সেই স্বত্ব লঙ্ঘন করেছে। ওই রেকর্ডটি তৈরী করা, বিক্রি করা, ঘরে রাখা, প্রভৃতির উপর তিনি নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। রেকর্ড কোম্পানী গোরুর গল্পের মামলায় গো-হারা হেরে গেল--তাদের ব্যারিস্টারের ভাষায় "ডিফিটেড জাস্ট লাইক এ কাউ।"

বিচারকের রায়ের সারমর্ম সমেত মামলার বিবরণ কলকাতার বড়-ছোট সব খবরের কাগজে বেরিয়ে গেল।

অতঃপর ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের পর্ব।

ব্যারিস্টার বললেন, "এইবার আমাদের আসল পালা। ক্ষতিপূরণের টাকার অঙ্ক সম্বন্ধে বিচারক যা-তা আদেশ দিলে আমরা হাইকোর্ট পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত।"

রেকর্ড কোম্পানীর ম্যানেজার বললেন, "কিন্তু আমি সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। তোমাদের দৌড় তো দেখা গেল, এবার আমি বরং আমাদের বন্ধু উকীলের সঙ্গেই কথা বলতে চাই।"

এর চেয়ে 'বেরিয়ে যাও' বলা ঢের ভাল। গোমড়া মুখে ছোকরা ব্যারিস্টার স্থানত্যাগ করল। খবর পেয়ে এলেন আইন-উপদেষ্টা সুখময় বসু। সাহেব বললেন, "যা হবার হয়েছে। কেলেংকারি আর বাড়াতে চাই নে। এখন মেয়েটার সঙ্গে একটা মিটমাটের ব্যবস্থা করতে পারলে খুশী হই।"

শুনে সুখময় খুশি হলেন এবং নিজের টাকে হাত বুলিয়ে সেই খুশি প্রকাশ করলেন। সেই অবস্থায়ই তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

সুখময়কে পিতৃসম্মান দিয়ে, মিষ্টিগলায় কাকাবাবু সম্বোধন করে কাকলী করুণভাবে তার আসল ক্ষতির কথাটা জানাল। এক ফিল্ম কোম্পানীর সঙ্গে নাকি 'পয়স্বিনী' নিয়ে কথাবার্তা পাকা হয়ে এসেছিল। তাদের সঙ্গে একটা সর্ত ছিল, চিত্র মুক্তিলাভ করার আগে উপন্যাস-আকারে, নাটকাকারে বা গ্রামোফোন রেকর্ডে এ কাহিনী প্রকাশ করা চলবে না। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের মামলায় নাকি সেই ফিল্ম কোম্পানী সাক্ষ্য দেবে।

কাকলী চৌধুরী কি সহজে নরম হতে চায়। একদিন-দুদিন-তিনদিন বারবার হাঁটাহাঁটি করতে হল। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে পাঁচ হাজার টাকায় রাজি করা গেল--মিটমাট করতে।

কিন্তু কাকলী চেক-ফেক নেবে না। নগদ টাকা দিতে হবে। কোথায় বসে হবে সেই লেনদেন? সুখময় বললেন, "আমাদের বার-লাইব্রেরী বেশ জায়গা। সেখানে দু'পক্ষের উকীলেরা উপস্থিত থাকব আমরা। সেখানেই পাঁচ হাজার টাকা নগদ দিয়ে দেওয়া হবে, আপোশপত্র সই হয়ে যাবে, তারপর আদালতে একটা দরখাস্ত দিলেই হল যে, আপোশ-রফা হয়ে গেছে--মামলা আর চালানো হবে না।"

কাকলী বলল, "হ্যাঁ, তারপর সেই টাকা নিয়ে পথে আমি গুণ্ডার হাতে পড়ি আর কি। তার চেয়ে বরং আপনারা আমার মেসে আসুন, আমার উকিলও থাকবেন....."

সেটাই ঠিক হল।

যথাদিবসে মেসে কাকলীর ঘরে আপোশের আসর বসল। কাকলীর সঙ্গে শুধু তার উকিল, শমন দত্ত উপস্থিত থাকলেন। রেকর্ড কোম্পানীর পক্ষ থেকে টাকা নিয়ে এলেন তাদের মাথা হিসাবরক্ষক--মানে, চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট, উকিল সুখময়, তাঁর মুহুরী এবং আরও জনাকয়েক। কাকলী অভ্যাগতদের আপ্যায়নে ত্রুটি করল না।

বোঝাপড়া অনুযায়ী লেখাপড়া হয়ে গেল। হিসাবরক্ষক একশ টাকার পঞ্চাশখানা নোটের তাড়া কাকলীর হাতে তুলে দিলেন। কাকলী নাম সই করল। দু'পক্ষের উকিল সই করলেন। সব মিটে যাবার পর সকলে বিদায় নিলেন।

কাকলী একা রইল নিজের ঘরে। নোটগুলো আবার গুণে দেখতে লাগল। পেছন দোর দিয়ে ঘরে এল অমল মিত্র, বলল, 'রেকর্ড কোম্পানীর দরজাটা আমার জন্যে চিরতরে বন্ধ হল।' কাকলী বলল, "বয়ে গেছে। কী না আয়েস দরজা! এই মামলায় তুমি যা বিখ্যাত হয়ে গেলে--এই খ্যাতি ভাঙিয়ে এখন রোজগার কর না কত টাকা করবে।" তা ঠিক।

কাকলী বলল, "নাও, তোমার টালিগঞ্জের উদ্যানে এবার বাড়ি কর। ছোট্ট বাড়িটি। বক্স প্যাটার্নের। বাড়ির নাম দেব 'চাই দুধ'।"

"ধেৎ! লোকে ভাববে ডেয়ারি!" অমল মিত্র বলল, "বাড়ির নাম হবে 'পয়স্বিনী'।"

নিচে নেমে এসে গাড়িতে উঠতে যাবেন, অ্যাকাউন্ট্যান্টের খেয়াল হল, যে রুমালে বেঁধে নোটের তাড়া নিয়ে এসেছিলেন, সেটা ফেলে এসেছেন কাকলীর টেবিলে। দামি রুমাল--মায়া ছাড়া যায় না। মেয়েটিই বা ভাববে কি! ভদ্রলোকের বয়সও খুব বেশি নয়! ব্যাপারটা সুখময়কে জানিয়ে, তাঁর হাত ধরে বললেন, "চলুন আর একবার।"

সিঁড়ি ভাঙতে বৃদ্ধের আপত্তি। কিন্তু হিসাবী ছাড়লেন না, হাত ধরে উকিল মশাইকেও টেনে নিয়ে চললেন।

কাকলীর ঘরের খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে দুজনেরই চক্ষুস্থির! দুজনে একসঙ্গে দেখতে পেলেন, নোটের তাড়াটা--তার আয়তনটা তো ভদ্রলোকদের অনুভূতিতে প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে--হ্যাঁ, পাঁচ হাজার টাকার নোটের যেন পুরো তাড়াটাই, দেখলেন কাকলী চৌধুরী অমল মিত্রের হাতে তুলে দিচ্ছে!

বড়ো বোন ছোট বোন

(৮৬ পৃষ্ঠার পর)

কি অনুরোধ করলে, অপর্ণা?

সে আর কি বলবো ভাই, তার কথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো আমার মাথায়! নির্বিকারভাবে সে যখন বল্লে, শোনো, তপতীকে তোমায় বিয়ে করতে হবে। আমার পক্ষে আর তোমার জীবন-সঙ্গিনী হওয়া সম্ভব হলো না।' তখন আমি আর আমাতে নেই। তবু জোর করেই বল্লাম, 'পাগল, এও কি সম্ভব!' বলতে বলতেই ঘোড়ার গাড়ি স্টেশনে এসে গেলো আর অপর্ণাও গিয়ে লাফিয়ে ট্রেণে উঠলো। সেই তার সঙ্গে শেষ দেখা। খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, চাইবাসাতেও আর ফেরেনি অপর্ণা। কোথায় সে গেলো, কেন এমন হলো কেউ তার কোনো হদিশ দিতে পারলো না। তবু দু'বছর তার জন্যে অপেক্ষা করলাম যদি সে ফিরে আসে সেই আশায়। কিন্তু অপর্ণা আর ফিরে এলো না। তখন তারই অনুরোধ রাখলাম তার মার কথা মতো। কিন্তু ভাই, বলতে পারিস শান্তি কোথায়?--সুবীরের স্বরটা যেন কেঁপে ওঠে এই প্রশ্ন করতে গিয়ে।

কেন, বেশতো আছিস, সুন্দর ঘর-সংসার করছিস!--তুহিন বন্ধুকে একটু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। সে বেশ বুঝতে পেরেছে সুবীরের বুকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে অপর্ণার কাহিনীর বর্ণনা দিতে গিয়ে।

ঘর-সংসার করছি না ছাই!--বলেই মুখটা নিচু করে দুমুঠোতে মাথার চুলগুলো চেপে ধরে চুপ করে যায় সুবীর। পরক্ষণেই আবার বলতে শুরু করে:

আচ্ছা, বলতে পারিস তুহিন, অপর্ণা কেন আমায় এরকম একটা জীবন শাস্তি দিয়ে গেলো! কি ক্ষতি আমি তার করেছিলাম? গভীরভাবে তাকে ভালোবেসেছিলাম, সেটাই কি আমার অপরাধ? তপতীকে আমি বিয়ে করেছি। কিন্তু ওর ধারণা আজও আমি অপর্ণাকেই চাই, অপর্ণাকেই ভালোবাসি। তিন বছরেও ওর মনের এ সংশয় কাটলো না। ও সংসার করে, কিন্তু ওর ভাব-স্বভাবে আচার-আচরণে মনে হবে ও যেন অপর্ণারই সংসার বয়ে চলেছে। কি আর বলবো ভাই, না পেরেছিলাম অপর্ণাকে বুঝতে, না পারছি তার বোন তপতীকে বোঝাতে। এ যে আমার কী জ্বালা কে বুঝবে আর কাকেই বা বোঝাবো, কী করেই বা বোঝাবো!--বলতে বলতে কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে সুবীর। দুচোখ জলে ছলছল হয়ে ওঠে। চোখটা মুছে নিয়ে আবার সে আরম্ভ করে।

জানিস তুহিন, আজকাল এ রোগটা তপতীর আরো বেড়েছে। নতুন কেউ এলেই হলো, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তার কাছে ও অপর্ণার প্রসঙ্গ তুলবেই। কেউ জিগ্যেস করলে তো বলবেই, এমন কি না জিগ্যেস করলেও বলতে শুরু করে দেবে সে কাহিনী। কী যে করি!

এরপর আর কথা বাড়াতে চায় না তুহিন। সমস্ত আবহাওয়াটাই যেন বড্ড বেশি ভারী হয়ে উঠেছে। আধ-খাওয়া চায়ের কাপে সিগ্রেটের পোড়া মাথাটাকে ঝেড়ে ফেলে সে উঠে পড়ে। বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে যেতে ভাবে, একটু আর্থিক সচ্ছলতা এলেই সুবীরের সংসারে হয়তো শান্তি ফিরে আসবে।

ছেলের মুখে মাই ধরিয়ে দিয়ে তপতী তখনো খোকনকে ঘুম পাড়াতেই ব্যস্ত।
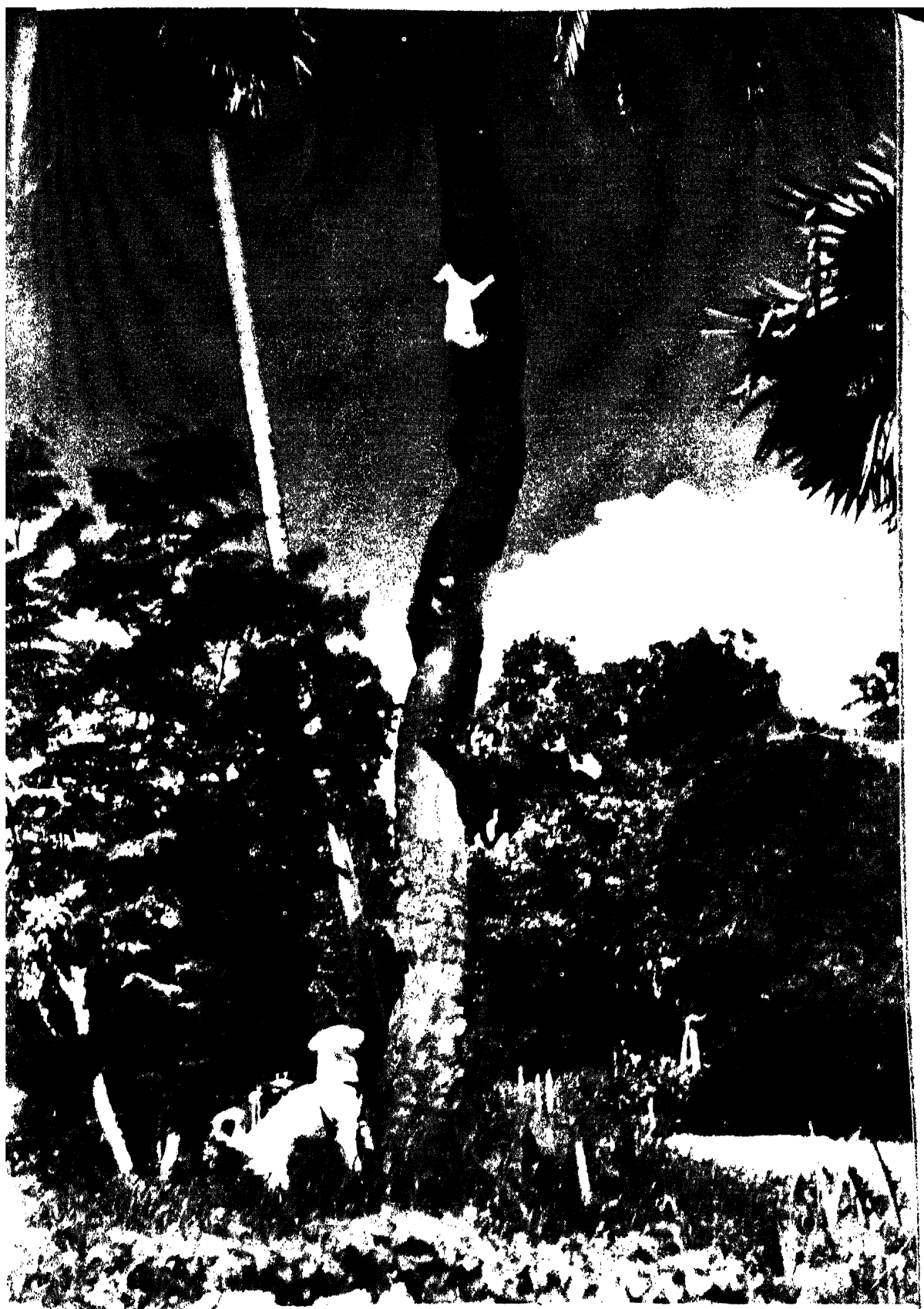
রসের সন্ধানে — মদন দত্ত

বহু পুরুষ

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

দশটা টাকা ধার দেবেন দাদা?.....পাঁচ [illegible]..... তিন টাকা?.....দু টাকা?..... [illegible] টাকা?.....নেহাৎ আট আনা আছে [illegible] এই [illegible] দরকার [illegible]।

কিন্তু ধার দিয়ে আর শোধ পাবেন না [illegible] ভাবছেন কি করে? আমি [illegible] পাগল নই [illegible] ধরে ফেলেছেন [illegible] কথাটা [illegible] না দাদা, তাহলে আর এখানে থাকতে [illegible]। এ জায়গা শুধু পাগলদের [illegible]।

[illegible] যে ডাক্তার [illegible] তাকে [illegible] আনন্দে [illegible] পাগল [illegible]..... আজ্ঞে না, সুপারিন্টেন্ডেন্ট, [illegible], নার্স, বেয়ারা এদের সবাইকে এবং [illegible] ধারে ঠিক রাখি। ডাক্তার করছেন [illegible] পুরো পুরুষের। এক বছর [illegible] চলেছে, কি হপ্তায় এক পুরুষ [illegible]। কি শনিবারে সারা রাত আমায় যে [illegible] সইতে হয় দাদা, সে আর বলবো [illegible].....।

তা হলে গোড়া থেকেই বলি শুনুন। আমার নাম ভজগোবিন্দ ভোজালী, আমার ছেলের নাম পরমানন্দ ভোজালী, নাতির নাম [illegible] ভোজালী, বাবার নাম যজ্ঞেশ্বর ভোজালী, ঠাকুর্দার নাম কৈলাস ভোজালী, ঠাকুর্দার বাবার নাম—কিন্তু এত নাম আপনি [illegible] রাখতে পারবেন না দাদা। শুধু জেনে রাখুন, আমাদের এই ভোজালী বংশ অতি প্রাচীন, অতি ধার্মিক বংশ, এ বংশের কুলধর্ম [illegible] একতরফা ধার নেয়া। আমাদের এক পুরুষ, দুই পুরুষ, তিন পুরুষ করে যত খুশী পেছন দিকে চলে যান, কোনো পুরুষে [illegible] কাউকে পাবেন না যিনি ধার করেননি, [illegible] ধার করে সে ধারের একটি আধলাও শোধ দিয়েছেন। আমরা মদ ছুঁইনে, গাঁজা-চণ্ডুর ছায়া মাড়াই নে, পান, তামাক, নস্যি, [illegible]পিং, বিড়ি, সিগ্রেট আমাদের ত্রিসীমানায় দেখতে পাবেন না, কিন্তু আমরা প্রত্যেকটি ভোজালী জন্মাই রক্তে ধারের নেশা নিয়ে। ভোজালী বংশে না জন্মালে আপনি এ নেশার [illegible]কি আন্দাজ করতে পারবেন না দাদা।

ধার নিয়ে ধার শোধ দেওয়া আমাদের কোনো পুরুষের কোষ্ঠীতে লেখেনি। তেমনি ধার আদায় করবার অসাধারণ প্রতিভাও আমাদের বংশগত। দেখলেন তো কি অনায়াসে আপনার কাছ থেকে আট আনা ধার নিলাম? এবং আপনার সঙ্গে ক' মিনিটের পরিচয়? আমার বড় ছেলে পরমানন্দ ভোজালী হাজার পাঁচেক টাকা ধার কুড়িয়ে সুদে খাটাচ্ছে। একটি পাই পয়সাও শোধ দেবে না; তেমন বাপের বেটাই নয় পরমানন্দ.....। হাঁ, পাওনাদারেরা তাগিদ দিতে আসে বই কি। কিন্তু রবি ঠাকুরের ঐ গানখানা শুনেছেন [illegible]—সে আসে ধীরে, যায় লাজে ফিরে? পাওনার তাগিদ দিতে এসে পাওনাদারেরা লজ্জা পেয়ে ফিরে যায়, এমনি অমায়িক বিগলিত বচনের ভেলকিতে তাদের একেবারে জল করে ছেড়ে দেয় পরমানন্দ। এই যে অমায়িক বচনের বিগলিত ভেলকি, এই যে জল করে ছেড়ে দেওয়া, এও জানবেন ভোজালী বংশের বিশিষ্ট ধারা। এ জাদু মিশে আছে প্রত্যেক ভোজালীর রক্তে। এই যে আপনি আট আনা ধার দিলেন, শোধ নেবার জন্যে তেড়ে এসে দেখুন একবার; এমন জল করে ছেড়ে দেবো আপনাকে, উল্টে আরো আট আনা দিয়ে যেতে ইচ্ছে করবে আপনার।

পরমানন্দ ভোজালীর বড় ছেলে গজানন ভোজালী বাপকা বেটা, ঠাকুর্দাকা নাতি। ভারি ধীর-স্থির প্রকৃতির, ছটফটানি একদম নেই, ছ' বছর ধরে কলেজের সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাসে পড়ছে, কলেজের প্রিন্সিপাল থেকে শুরু করে প্রফেসর আর বেয়ারা পর্যন্ত সবাই গজাননকে এক ডাকে চেনে। গজানন এখন দুশো সাতান্ন টাকা ধারে। ওর বয়সে ওর বাবা, মানে পরমানন্দ, আরো বেশী ধারত। পরমানন্দকে বলেছিলাম মন খারাপ কোরো না পরম। টাকার বাজার আগেকার চাইতে ঢের বেশী টাইট হয়ে গেছে, এইটে ভুলে যেয়ো না। তাছাড়া অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা। স্লো বাট শিওর উইনস্ দি রেস। দেখবে এই গজাননই একদিন ধারের পাল্লায় তোমায় আমায় খোকা বানিয়ে দেবে। ভোজালী বংশের পবিত্র ধারা মার খাবে না গজাননের হাতে।'

এবারে আমার কথা বলি। আমার ধার সর্বসাকুল্যে চার হাজার তিনশো পঁচানব্বুই। এ অবিশ্যি শুধু আসল, সুদ ধরিনি। শোধ যখন করব না তখন আর সুদের হিসেব করা কেন? আসল দেনা চার হাজার তিনশো পঁচানব্বুই, আর পাওনাদার সর্বসাকুল্যে তেতাল্লিশ জন; তা থেকে দুজন গঙ্গা পেয়েছেন, তাহলে ধরুন নীট একচল্লিশজন। এদের অনেক বছর ভাঁড়িয়ে ভাঁড়িয়ে রেখেছিলাম, তারপর সতেরোজন পাওনাদার ভারি ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করলে, আর তাই দেখে বাকি চব্বিশজনও ধরলে ঐ মহাজনী পন্থা। আমি তাদের বার বার নানা কায়দার মিঠে কথা বলে ফেরাতে লাগলাম। কিন্তু ফেরালে হবে কি? তারা বার বার ফিরে গিয়ে আবার বার বার ফিরে ফিরে আসতে লাগল, যেন সমুদ্দুরের নাছোড়বান্দা ঢেউয়ের দল। ক্রমে ক্রমে আমি ক্ষেপে উঠতে লাগলাম।

হাজার হোক, মানুষের সইবার একটা সীমা আছে তো? হলামই বা ভোজালী। তাছাড়া, তাগিদ যত মিঠে, যত মোলায়েমই হোক না কেন, তবু সে তাগিদ। সোনার চাবুকের মার কিছু সোনালী নয়। ওদের ভেতর আবার সব চেয়ে জাঁহাবাজ শয়তান হলো গিয়ে কেষ্টধন তলাপাত্র। মেয়ের বিয়ে, বৌমার ব্যামো, বীমার প্রিমিয়াম, অমুকের তমুকে, তমুকের অমুকে, হ্যানো-ত্যানো এক গাদা অজুহাত শুনিয়ে শুনিয়ে কান ঝালাপালা করতে লাগল, যেন আমার কাছ থেকে ঐ একশো সাড়ে তিন টাকা পাচ্ছে না বলেই ওর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু আটকে রয়েছে। শেষটায় জ্বালাতন হয়ে একবার ভাবলাম দুত্তোর, দিই কেষ্টোর কিছু টাকা শোধ করে। অম্নি শিরায় শিরায় শিউরে উঠে আমার ভোজালী রক্ত সিংহনাদে বলে উঠল 'ধিক!' আর সুবুদ্ধি হুঁসিয়ারী দিয়ে বললে 'সর্বনাশ, একবার দুর্বলতা দেখালে সবগুলো পাওনাদার এসে জোঁকের মত ছেঁকে ধরবে, তখন সামলাতে পারবিনে।'

দিলাম না, একটি আধলা দিলাম না কেষ্টোধনকে। এক গাল মিষ্টি অমায়িক হাসি হেসে এক গাদা পাল্টা অজুহাত শুনিয়ে

তাকে বিদেয় করলাম। আর একসংগে রাম চটা চটে উঠলাম সবগুলো পাওনাদারের ওপর। হতভাগারা বোঝে না কেন একটি আধলাও আমার হাত দিয়ে গলবে না? আর তাই বুঝে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে না কেন? ওদের জ্বালায় কি বাকি জীবনটা একটু স্বস্তিতেও কাটাতে পারব না।?

ওদের অপরাধে—বুঝলেন দাদা?—গোটা মানুষ জাতটার ওপরই ঘেন্না ধরে গেল। সেটা ভালো কথা নয় বুঝতে পারছি, কিন্তু হাজার হোক আমি মানুষ তো? গণ্ডার নই। জমা টাকা ভেংগে তো আর ধার শুধতে পারিনে? কথায় বলে বসে খেলে আর ঘরের টাকা ভেংগে ধার শুধলে রাজার ভাণ্ডারও ফুরিয়ে যায়।

চটে-মটে সাতান্ন টাকা ধার করে এক শনিবার বিকেলে সোজা চলে গেলাম রেসের ময়দানে। তার আগে কালীঘাটে গিয়ে মাকে পেন্নাম করে বলে গেলাম 'আজকের রেসের বাজীতে এক গাদা টাকা পাইয়ে দাও মা। চাঁদির জুতো মেরে পাওনাদারী মুখগুলো কিছুদিনের জন্যে বন্ধ করি।'

কিন্তু দাদা, ঐ করেই সর্বনাশ করলাম, মাকে চটিয়ে দিলাম। রেসের ময়দান থেকে ফিরলাম সাতান্ন টাকাই গচ্চা দিয়ে। শুধু কি তাই? মাকে চটানোর জের অত সহজে মিটবার নয়। বাড়ী ফিরে যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি বাড়ী নয়, হাসপাতালের বিছানা। গায়ে মাথায় ব্যাণ্ডেজ। ক'দিন পরে ব্যাণ্ডেজ খোলা হল তার হিসেব জানি নে। মনে হলো মগজের ভেতর যেন কি সব ওলোট-পালোট হয়ে গেছে, দিব্যি চোখ আর দিব্যি কান খুলে যাচ্ছে হঠাৎ হঠাৎ যখন-তখন। একদিন জনা সাতেক পাওনাদার এলো দল বেঁধে আমায় দেখতে, বোধ করি ভয় পেয়েছিল আমি গংগা পেয়ে ওদের পাওনা ঠকাব। তারা অমায়িক হেসে মুখে বললে 'এখন কেমন আছেন ভোজালী মশাই?' কিন্তু আমি পরিষ্কার জলের মতো শুনতে পেলাম, ওরা সব ক'টায় মনের ভেতর একসংগে কোরাসে চেঁচাচ্ছে:

'শালা একটি আধলাও শোধ না দিয়ে টেঁসবার মতলব আঁটছে।
'শালা একটি আধলাও শোধ না দিয়ে টেঁসবার মতলব আঁটছে।
'শালা একটি আধলাও শোধ না দিয়ে টেঁসবার মতলব আঁটছে।
শালা..............'

আমি সব সইতে পারি দাদা, কিন্তু মুখের ওপর কেউ শালা গাল দিয়ে যাবে তা সইতে পারি নে। বার বার ওদের কোরাসের শালা শুনে ক্ষেপে উঠে একা অভিমন্যুর মতো ঐ সপ্তরথীকে ছাতা পেটা করে তাড়ালাম। হাঁ-হাঁ করে আমাকে সামলাতে এসেছিল পরমানন্দ, তাকে দুই ধমকে ঠাণ্ডা বানিয়ে দিলাম। ছোঁড়া মুখে কিছু বললে না, কিন্তু পরিষ্কার শুনতে পেলাম মনে মনে বলছে 'বুড়োর হাতে পায়ে ডাণ্ডা বেড়ি লাগাতে হবে দেখছি।' শুনে রেগে চীৎকার করে বললাম 'তোর বাপের সাধ্যি কে আমায় ডাণ্ডা বেড়ি পরাবে? নিকালো। অভি নিকালো হিঁয়াসে।' বাপের তিরিক্ষি মেজাজ দেখে ভয়ে ভয়ে তখনকার মতো কেটে পড়ল পরমানন্দ। পাড়ায় পাড়ায় রটে গেল গাড়ীর ধাক্কা খেয়ে মগজ নড়ে গিয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে ভজগোবিন্দ ভোজালীর। দেখুন একবার কাণ্ড। দিব্য জ্ঞান খুলে যাওয়ার ঝকমারিটা বিবেচনা করুন একবার।

অশান্তিও বাড়ল। বৌমাকে ভাবতাম আমাকে শ্বশুর বলে একটু ভক্তিছেদ্দা করে। এখন দিব্য কানে হঠাৎ একদিন শুনলাম সে মনে মনে বলছে 'এবারে বুড়োটা গংগা পেলে হাড় জুড়োয়।' বৌমা মেয়ে মানুষ না হলে, মা কালীর দিব্যি বলছি আপনাকে, সেদিন ওকে ছাতা পেটা করে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিতাম।

কিন্তু—ঐ যে বোষ্টমরা বলে—এহ বাহ্য। আসল জ্বালার কথা এইবার শুনুন। মানে—ঐ যে গোড়াতে বলেছিলাম—পূর্ব পুরুষদের উৎপাত। শুরু হলো পিতৃদেবকে দিয়ে—মানে 'যজ্ঞেশ্বর ভোজালী। বাবা হাজির হলেন শনিবারের রাত্তিরে। খেয়ে দেয়ে বিছানা নেবার আগে একটু জিরিয়ে নিচ্ছি, তখন।

বাবা বললেন 'বাবা ভজগোবিন্দ, পরলোকে এসে অবধি একটি আধলা ধার করতে না পেরে নিদারুণ জ্বালায় জ্বলছি। আমায় বাঁচাও এ জ্বালা থেকে।'

আমি বললাম, 'কেন বাবা? তোমাদের ওখানে কি ধার দেবার লোক নেই?'

বাবা বললেন, 'আছে, কিন্তু ওপারের দেনা পুরো মেটানো না থাকলে এপারে একটি আধলাও ধার পাবার উপায় নেই। বড় কড়াকড়ি। তুমি ভোজালী বংশের ছেলে, বিনা ধারে থাকা যে কি দুঃসহ, তাতো তোমার অজানা নয় বাবা। সুদে-আসলে আমার ঋণ এক হাজার তিনশো একান্ন টাকা আনা পয়সা। এ ক'টা টাকা তুমি শোধ করে দাও, আমার এধারে ধার পাবার পথ পরিষ্কার হোক। বাঁচাও, বাঁচাও তুমি আমাকে ধার না করে থাকার এই অসহ্য যন্ত্রণা থেকে।'

বললে আপনি হয় তো বিশ্বাস করবেন না দাদা, পিতৃদেবের কথা শুনে আমি ব্যথিত, বিস্মিত, পুলকিত, চমকিত হলাম। ভোজালীর রক্তে মেশা ধারের নেশা ওপারে গিয়েও ঝাণ্ডা নীচু করে না, তেমনি জোরালো থাকে!!!

বললাম, 'কিন্তু ধার শোধ করা কি ভোজালী বংশের পবিত্র ঐতিহ্যের বিরোধী হবে না বাবা? এ কলংক মাথায় নিয়ে ভোজালী বংশের প্রথম কুলাংগার হতে বলছ তুমি আমাকে?'

বাবা বললেন, 'বৎস, পিতৃঋণ শোধে দোষ নেই, বিশেষ করে যখন আমার যে পরিমাণ ঋণ তুমি ওধারে শোধ করবে, তার বেশী পরিমাণ ঋণ আমি এধারে গ্রহণ করে কোনো দিন শোধ দেবো না।

আমি বললাম, 'কিন্তু ঘরের টাকা ভেঙে পিতৃঋণ শোধ করাটাও কি উচিত হবে বাবা?

বাবা বললেন, 'না। মহামতি চার্বাক বলে গেছেন ঋণ করে ঘি খেতে। তুমি ঋণ করে আমার ঋণ শোধ করতে পারবে না?'

'কিন্তু তারপর আমার ঋণ?'

'তোমার ঋণ যথাকালে শোধ করবে তোমার পুত্র পরমানন্দ। পরমানন্দের ঋণ শুধবে পরমানন্দের পুত্র গজানন। এইভাবে ভোজালী বংশের ধার শোধের ধারা বয়ে চলবে পুরুষানুক্রমে, পূর্বপুরুষ থেকে পরপুরুষে।'

বাবার অনুরোধ উপরোধ আর শাসানি শেষ পর্যন্ত এড়াতে পারলাম না। এক দুর্বল মুহূর্তে বলে ফেললাম 'তোমার ঋণ শোধের ভার আমি গ্রহণ করলাম বাবা। কিন্তু আমাকে সময় দিতে হবে। মনে রেখো: রোম নগরী একদিনে নির্মিত হয় নাই।'

'তুমি আমার ঋণভার গ্রহণ করলে, আমি নিশ্চিন্ত হলাম বাবা ভজগোবিন্দ।' বলে বাবা নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেলেন। বাবাকে বচন দিয়ে যে কি বিষম বিষবৃক্ষ রোপণ করলাম, তখন তার আভাষ মাত্র টের পাইনি।

খানিকটা আভাষ পেলাম তার পরের শনিবার রাতে। সে রাতে আবির্ভাব হলো ঠাকুর্দা কৈলাস ভোজালীর। ঠাকুর্দা বললেন 'বৎস ভজগোবিন্দ, তুমি পিতৃঋণ শোধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছ, এতে আমি প্রীত হয়ে আশীর্বাদ করতে এসেছি।'

আমি বললাম, 'করুন।'

আশীর্বাদ করে ঠাকুর্দা তাঁর নিজের ঋণ শোধ না করে যাওয়া ধারের যে ফিরিস্তি দিলেন সুদে-আসলে তা মোটের ওপর দাঁড়ায় সাড়ে ... শো টাকা। ঠাকুর্দা বললেন, 'এ ঋণ তোমার বাবারই শোধ করে আসবার কথা ছিল। সুতরাং এও তোমার পিতৃঋণ।'

প্রাণপণে এড়াতে চাইলাম, পারলাম না এড়াতে। ঠাকুর্দা বললেন, 'তোমার বাবা তো এই সেদিন এলো। আমি তার অনেক আগে থেকে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছি। তোমার ওপারের ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত এপারে একটি আধলা ধার পাবো না আমি। এ যন্ত্রণা থেকে আমায় বাঁচিয়ে উপযুক্ত নাতির কাজ করো ভজগোবিন্দ। যজ্ঞেশ্বর তোমার বাবা, আমি তোমার বাবার বাবা। বাবার ...

নতুন দিন

✳ প্রভা দত্ত ✳

নতুন ফসল হবে সে ফসলে পূর্ণ অধিকার,
আজ আর ভয় নেই, সে জীবন অতীত এখন:
বিষণ্ণ গোধূলি লগ্ন অন্তহীন প্রতীক্ষা কাহার
হয়ত কিষাণ কন্যা, তার চোখে নতুন বোধন।
সেদিন হয়েছে গত, মৃত্যু যার লাংগল ফলাকে;
ডুবেছে সোনালী সূর্য, হিম রাত্রি নেমে
আসে চোখে—
মদির করেছে মন ভীরু চোখ একটু ঝলকে,
আজিও তাকায়ে থাকে— রাত্রি কাঁদে
সে দিনের শোকে।
তোমরা প্রহর গোণ, দেবদারু গাছের ছায়ায়
সবুজ ধানের ক্ষেত, বেণুবনে কিসের ইসারা,
এখন জিজ্ঞাসা নয়, আজ কেউ নয় নিরুপায়—
কাজের পিচ্ছিল চাকা, প্রতি প্রান্তে
জীবন ফোয়ারা।
অন্তহীন এ প্রতীক্ষা, এ প্রতীক্ষা তোমার
আমার,
কিষাণের চোখে স্বপ্ন কালো মাটি সোনালী
ফসল:
অলস মধ্যাহ্ন শেষে গোধূলির ক্লান্ত অভিসার—
দামোদর মিথ্যে নয়, বাঁধ বাঁধা হয়েছে সফল।

...বের বাবাকে ভুললে চলবে না। সাবধান, জগোবিন্দ।'

ধমকানিতে ঘাবড়েই বলুন, সমবাথায় গলেই বলুন, অথবা কর্তব্যের ধাক্কা খেয়েই বলুন, ভেবে দেখলাম সত্যিই বাবার চাইতে বেশী দিন ধরে কষ্ট পাচ্ছেন তিনি। কথা দিলাম বাবার ঋণ শুধলে সেই সঙ্গে ঠাকুর্দার ঋণও শোধ দেবো।

তখনো টের পাইনি কি সর্বনাশের চোরাবালিতে পা দিলাম। এর পরের শনিবার মাঝরাতে এক বুড়ো এসে হাজির আমার একলা ঘরে।

'কে আপনি?'

'আমি তোমার ঠাকুর্দার বাবা রামকানাই ভোজালী।'

বুঝলাম ইনিও এঁর ইহলোকের ঋণের বোঝা আমার ঘাড়ে চাপাতে এসেছেন। বললাম, 'তার প্রমাণ? আমি আপনাকে দেখিনি, আপনার ছবিও নয়।'

রামকানাই ভোজালী হাঁকলেন, 'কৈলেস!'

সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজীর মতো কোথা থেকে এসে হাজির ঠাকুর্দা কৈলাস ভোজালী। রামকানাই বললেন, 'আমি তোর বাপ কিনা?' ঠাকুর্দা বললেন, 'আজ্ঞে।'

ঠাকুর্দার বাবা আবার হাঁকলেন, 'ভুজঙ্গ, কোথা গেলি রে ভুজঙ্গ?'

সঙ্গে সঙ্গে আমার বাবা, অর্থাৎ ভুজঙ্গধর [illegible] ভুজঙ্গ এসে হাজির।

রামকানাই ভোজালী বললেন, 'আমি তোর কে হই?'

বাবা বললেন, 'আজ্ঞে, ঠাকুর্দা।'

'এবার তোমরা চলে যেতে পারো।' [illegible] বাবা। চলে গিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন ঠাকুর্দা আর বাবা। ঠাকুর্দার বাবা বললেন, 'তোমার ঠাকুর্দা যদ্দিন বেঁচে ছিল, ভেবেছিলাম আমার ধারগুলো সব শুধে দেবে সুদে-আসলে। একটি আধলাও সে শুধে গেলো না। ওদিকে চক্রবৃদ্ধি সুদে আমার দেনা বাড়ছে, এদিকে সেই সঙ্গে আমার যন্ত্রণাও বাড়ছে চক্রবৃদ্ধি হারে গ্যালপিং থাইসিসের মতো। ওপারের দেনা সুদে-আসলে শোধ না হওয়া পর্যন্ত এপারে একটি আধলা ধার মিলবে না। উ-ও-ও-ও-ওফ্!!!' বলে এমন মর্মভেদী আর্তনাদ করলেন আমার ঠাকুর্দার বাবা, যে মনে হলো তার ধাক্কায় আমার বুকে ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত ঠাকুর্দার বাবার ঋণের দায়টাও নিতে হলো। ওঁর ঋণ চক্রবৃদ্ধি সুদে বেড়ে তখন হয়েছে আড়াই হাজার টাকা। মূলে পাওনাদারেরা তখন আর ইহলোকে নেই, তাদের বর্তমান বংশধরদের নাম ঠিকানা আর আলাদা পাওনার হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন রামকানাই ভোজালী। পুরো তিন পুরুষের ঋণের বোঝা মাথায় চাপল সুদে-আসলে। তারপর পুরো এক হপ্তা ভয়ে ভয়ে কাটালাম। শনিবারটা যতই এগিয়ে আসে ততই শিউরে উঠি। তবু শনিবার এলো। এলো রাত্তির। এবারে যিনি এলেন তাঁর বয়স ঠাকুর্দার বাবার চাইতে অনেক কম মনে হল। তিনি বললেন, 'আমি হচ্ছি দিগম্বর ভোজালী, রামকানাইর বাবা তোমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা। তুমি হলে আমার নাতির নাতি। রামকানাইর চাইতে আমি অনেক কম বয়সে মারা গিয়েছিলাম, তাই আমার চেহারা রামকানাইর চাইতে কাঁচা দেখছ। প্রমাণ চাও তো বলো রামকানাইকে ডাকি।'

আমি বললাম, 'দরকার নেই।' ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা যেন হিপনোটাইজ করে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে গেলেন তাঁর সুদে আসলে সাড়ে তিন হাজার টাকা ঋণের বোঝা, আর পাওনাদারদের সর্বশেষ বংশধরদের ফর্দ।

পরের শনিবার এলেন দিগম্বর ভোজালীর বাবা পীতাম্বর ভোজালী। তারপরের শনিবার পীতাম্বর ভোজালীর বাবা ব্যোমকেশ ভোজালী। তারপরের শনিবার ব্যোমকেশ ভোজালীর বাবা জগবন্ধু ভোজালী। পুরুষের পর পুরুষের চক্রবৃদ্ধি ঋণের বোঝা হপ্তার পর হপ্তা চাপতে লাগল আমার ওপর। শেষে আমার কাণ্ড দেখে অনেক হাঙ্গামা হুজ্জোত করে এখানে পাঠিয়ে দিলো পরমানন্দ, আমার বড় ছেলে।

আমার ইহলোকের একচল্লিশজন পাওনাদার হাল ছেড়ে দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, তারা আর এখান পর্যন্ত ধাওয়া করবে না। কিন্তু আমার পরলোকের পূর্বপুরুষদের হামলা বেড়েই চলেছে দাদা। তাঁরা যেখানে যখন খুশী অনায়াসে যেতে পারেন একটি আধলা খরচ নেই। ফি শনিবারে এক পুরুষ আগেকার পূর্বপুরুষ এসে তাঁর ঋণের বোঝা চাপিয়ে যাচ্ছেন আমার ওপর। গেল শনিবারে যিনি এসেছিলেন, তাঁর নাম মকরধ্বজ ভোজালী। আমি হচ্ছি তাঁর নাতি। পঁয়তাল্লিশ পুরুষের চক্রবৃদ্ধি ঋণের বোঝা চেপেছে আমার ঘাড়ে—সে যে হিসেব করলে কত লাখ টাকায় দাঁড়াবে তা বলা শক্ত।

আমার হাতে লেখা রয়েছে আমি আরো দশ বছর বাঁচব—আরো পাঁচ শো কুড়ি হপ্তা। এই পাঁচ শো কুড়ি হপ্তায় আরো পাঁচশো কুড়ি পুরুষের চক্রবৃদ্ধি ঋণের বোঝা আমার ঘাড়ে চাপবে। কি সাংঘাতিক ব্যাপার ভেবে দেখুন একবার। অবিশ্যি শেষ পর্যন্ত সবই আমি চাপিয়ে যাব পরমানন্দের ঘাড়ে, পরমানন্দ যথাক্রমে চাপাবে গজাননের ঘাড়ে, এমনি করে প্রত্যেক পুরুষ বোঝা চাপাবে তার পর পুরুষের ঘাড়ে। কিন্তু যদ্দিন ওপারে না পালাই, তদ্দিনের এই দশ বছর যে কি দুর্ভোগ আমায় সইতে হবে তা আর কহতব্য নয় দাদা। ফি শনিবারের রাতে পূর্ব-পুরুষদের দল বেঁধে তাগিদের জ্বালাতন সইতে হবে আমাকে। হপ্তার পর হপ্তা দিয়ে যেতে হবে ভুয়ো কৈফিয়তের পর ভুয়ো কৈফিয়ৎ, কেন তাঁদের ধারের একটি আধলাও শোধ হচ্ছে না। এ অত্যাচারে আর কতদিন মাথা ঠিক রাখতে পারব জানি নে। আসছে বছর যদি এ সময় আবার বেড়াতে আসেন, হয় তো দেখবেন আমি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেছি। যাবার আগে আমার শেষ বাণীটুকু শুনে যান: সাবধান, ভুলেও কোনোদিন ভোজালী বংশে জন্মাবেন না।

প্রতিযোগী

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

ভোরের নির্জন সুর বিছিয়েছে তোমার এ ঘরে;
রোদ আসে জানালায়। কি পরম স্নেহ-সুধা ভ'রে
সুন্দর গুছিয়ে রাখা বইগুলি, সেলাইর কল,
ঠাকুরের ছবি, ধূপ, প্লেটে রাখা কিছু ফুল-ফল
সাজিয়ে রেখেছ আজ। পরিচ্ছন্ন ভীরু
দুটি হাতে,
এনেছে এ সব অর্ঘ্য চলে-যাওয়া আমার প্রভাতে।

দেখেছি সে ঘরে তুমি লঘুপায়ে ফিরে ফিরে এসে
এটা-ওটা নিয়ে যাও, কালো দুটি শান্ত
চোখ মেলে
কতোবার বলে যাও, 'ব্যস্ত কেন অনেক সময়
জীবনের মোহানায় এই ঘর স্বপ্নের বিস্ময়';
আমি চুপ করে শুনি। তুমি যেন সেই ভোর থেকে
মধুর কৌমার্য দিয়ে সারা মন দিয়ে গেলে ঢেকে।

এখানে সন্ধ্যায় দেখি, ছোটো দুটি গন্ধরাজ চারা
তোমার হাতের স্নেহে যে পানীয় পেয়ে
থাকে তারা।
প্রতিদিন ভোর বেলা, তাহাদের ঈর্ষা করি, ভাবি,
ওরা বেশি ভাগ্যবান; ব্যর্থ হ'ল পথিকের দাবী।

পথচারী

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়

কবিতা-দয়িতা শুনি চুড়ির সিঞ্জিনী বাজে বারে
অহরহ ধ্যান-লোকে!
তবু কেন রহ না অন্তরে?
কত কাল ধরি তুমি দেখাইয়া উত্তরীয় মোরে
মুচকি হাসিয়া ফের, রক্তবিম্ব-মধুর-অধরে
দিগন্তের ইসারায় উড়াইয়া মনের ভ্রমরা
কুসুমের বনে বনে, কহ্লারের দলে দলে লও:
কী সৌরভে করিয়াছ ঘরছাড়া
পথচারী মোরে?—
কোন মধু লাগি আমি হইয়াছি
মাতোয়ালা বল?—
নিশি জাগি শুনি কাঁদে কোন
বিশ্ব-কবিতা-দয়িতা।
কুঁড়ি কাঁদে সূর্য ধ্যানে,
বিহগেরা আকাশের লাগি;
জঠরে কাঁদিছে ভ্রূণ নবযুগে নবজন্ম তরে;
যুগ-পাপ-মুক্তি চেয়ে কাঁদিতেছে
চির-বর্তমান;
এত কান্না সাথে রোজ কাঁদিলো
কবিতা তব লাগি!
তোমারে পেয়েছি আমি কাঁদনের
হয়ে অনুরাগী!!

রূপান্তর

অনন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভাই সুজাতা,

যে মেয়ে সাতদিন চিঠি না পেলে চঞ্চল হয়ে ওঠে—চিঠি লেখাকেই অবসর যাপনের আর্ট বলে বারবার প্রকাশ করেছে—তার পক্ষে তিন মাসের নীরবতা হয়ত বিস্ময়েরই হত—যদি না তিনমাস আগের ঐ দিনটিতে একটা থমথমে মুখ নিয়ে বিদায় দিতে ন আসতিস।

ট্রেনিং ক্যাম্পের ঘনিষ্ঠ পরিবেশের মধ্যে তোর সঙ্গে ভাল করে কথা বলবার সুযোগ হয়নি—যেটুকু হয়েছে তাতে মনে হয় তোর ভুল বোঝাকেই প্রশ্রয় দিয়েছি। তাই আজ তিনমাসের মধ্যে তোকে সাতখানা চিঠি দিয়েও জবাব পেলুম না। যদি মনেই করে নি যে, তোর সঙ্গে আমার মতান্তর হয়েছে তাতে মনান্তর কেন হবে এটুকু কিছুতেই বুঝতে পারিনি।

এক এক সময় ভারী আশ্চর্য মনে হয় সুজাতা, যখন ভাবি আমাদের চলার পথটা এমন আশ্চর্যভাবে এমন অদৃশ্য গাঁটছড়ায় বাঁধা পড়ল কি করে। রংপুরে তোরা এলি তোর বাবার বদলির সূত্রে। তোকে একদিন মণিকাদি ক্লাসে বসিয়ে দিয়ে গেল—তুই নাকি আমাদের স্কুলে আমাদেরই ক্লাসে ভর্তি হয়েছিস—আরো শুনলুম—তুই নাকি খুব ভাল মেয়ে—কোনদিন সেকেন্ড হসনি। গলা তুলে সেদিন তোকে দেখেছিলুম—একটু ভয়ও যে হয়নি তা নয়।—মিহি শান্ত চেহারায় বুদ্ধির দীপ্তি ছিল কিন্তু জৌলুস ছিল না—ভয় কাটল, কিন্তু প্রথম পরীক্ষায় নিজের গর্ব ঘুচল—কেঁদে ভাসিয়ে দিলুম—তবুও তোকে ভালবাসলুম। আমার কাছে আমার চেয়ে বড় প্রতিভার শুধু আবেদন নেই আকর্ষণও আছে। তারপর এক সঙ্গে কলেজ, তারপর আশ্চর্য হলুম—তোর বাবার আকস্মিক মৃত্যুর পর তুইও যখন স্কুলে চাকরী নিলি—আমাকে ত অনেক আগেই নিতে হয়েছিল।

আর পাঁচমাস আগে শিক্ষিকা শিক্ষণ কেন্দ্রে যখন তোর সঙ্গে হঠাৎ আবার দেখা হল—কি গভীর আগ্রহ ও আনন্দের স্পর্শেই না দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরেছিলুম।

শুধু ভাবছি বিদায়ের ক্ষণটা কেন এমন হল না? জীবনের দুখানা পাতা তোর সামনে হঠাৎ মেলে ধরেছিলুম সেইটাই কি আমার বড় অপরাধ? ট্রেণে তুলে দিতে এসেছিলি ঠিকই—কিন্তু ফেরার পথে বারবার মনে হয়েছে না এলেই বুঝি ভাল করতিস। নিষ্করুণ পাথরের মত একখানা মুখ আজো আমার বুকে চেপে আছে।

হয়ত অনিমেষ—হয়ত কেন, অনিমেষের ব্যাপারে তোর ভাবান্তর আর উষ্মা লক্ষ্য করেছিলুম। মনে হয়েছিল তুই তাকে চিনিস—হয়ত আমার চেয়ে ভাল করেই—কিংবা দীর্ঘদিনের অবিবাহিত মেয়েরা সকল পুরুষের সম্বন্ধে যেমন একধরণের বিদ্বেষ পোষণ করে এ হয়ত তাই।

প্রথমটা তোর ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি—তারপর সে হাসি বিদ্রুপে রূপান্তরিত হতে দেখলুম—তারপর রাগ। প্রেম কথাটা একবারও ভাল করে উচ্চারণ করিসনি, প্রতিবারই ব্যঙ্গ করে বলেছিলি—'প্রেম'—লজ্জা করে না বুড়ো বয়সে এমনি হ্যাংলামী করে করুণা কুড়োতে।' আরো অনেক কথা, আদর্শের কথা—জীবনের কথা। তোর কথায় ক্ষুরধার—অসংশয় আত্মপ্রত্যয়—কাঁপা ঠোঁট দুটো থেকে সেদিন যা বেরিয়েছিল—বাণী নয়, বুলেট।

তোর সেদিনের কথাগুলো আজ তিনমাস ধরে নানা দিক থেকে আমায় আক্রমণ করে একেবারে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছে। তবুও আজ তোর কাছেই আমার শেষ কথাটুকু বলে এই দাহ থেকে চিরকালের মত মুক্তি পেতে চাই।

তুই ঠিকই বলেছিলি, এই বয়সে কাউকে ভালবাসা যায় না, সুতরাং আজ আমার স্বীকার করতে লজ্জা নেই—অনিমেষকে আমি ভালবাসিনি। তাকে শ্রদ্ধা করেছি, তার প্রতিভার স্বাক্ষরে সেখানে সে ভাস্বর—সেখানে বোধ হয় আকর্ষণও বোধ করেছি—কিন্তু সে ভালবাসা নয়। বাঙ্গালী মেয়ের জীবন সুরুতেই শেষ হয়—তার জীবনের শুভলগ্ন গোধূলির মত—বাকী জীবনটাই ভ্রষ্টলগ্ন। এই ভ্রষ্টলগ্নে যে আসে সে যত মকরচূড় মুকুট পরেই আসুক না কেন—তাকে শ্রদ্ধা করা যায়, দয়া করা যায়, হয়ত কিছুটা ভাল লাগতেও পারে, কিন্তু ভালবাসা যায় না। অনিমেষকে আমি ভালবাসিনি—তবু—তবু সত্য কথাই বলি সুজাতা—অনিমেষ যদি সত্যিই আজ আমাকে বিয়ে করতে এগিয়ে আসে (ভয় নেই—সে সম্ভাবনার কোন সঙ্কেত নেই) আমি রাজী হব। তোর পাতলা ঠোঁট দুটো কুঁচকে উঠেছে—কিন্তু তোর পায়ে পড়ি ভাই—চিঠিটা শেষ পর্যন্ত না পড়ে ছিঁড়ে ফেলিসনি।

ভালবাসা নয়—ভাললাগাও নয়। যে তরণীর হাল ভেঙ্গে গেছে, পাল ছিঁড়ে গেছে সে একটা নিরাপদ বন্দর খুঁজছে। এই নিরাপত্তার বেশী তার দাবীও কিছু নেই, পাওনাও কিছু নেই। আর এটুকু জানি অনিমেষ যদি বিয়ে করতে রাজী হয়—এ নিরাপদ আশ্রয়টুকু সে দেবে।

নিজের হাতের উল্টোপিঠটা দেখলে নিজেই চমকে উঠি সুজাতা। যে কোন বড় ষ্টেশনের কাছে এসে লাইনগুলো যেমন কদর্যভাবে কিলবিল করে, নীল নীল ফুলো ফুলো শিরাগুলো হাতের উপর তেমনি কিলবিল করছে। অথচ, মনে আছে সুজাতা, এই হাতখানার প্রশংসা তুইই একদিন করেছিলি—যেদিন নিজের হাতের আংটি খুলে আমার আঙ্গুলে পরিয়ে দিয়ে বলেছিলি—"আংটি যার হাতে মানায় তারই পরা উচিত।" —রোগা আঙ্গুলে সে আংটি এখন থাকে না তাই বহুদিন হল খুলে তুলে রেখেছি।

এই হাতখানা দেখে সারা দেহ সারা মনকে উপলব্ধি করতে পারি সুজাতা। জীর্ণ, ক্লান্ত একটা জীবন ফুরিয়ে যাবার আগে আকুল হয়ে একটু আশ্রয় চাইছে। আর অনিমেষের কাছে যে সে আশ্রয় আছে—তা কবে জানতে পেরেছিলুম সে কথাও আজ তোকে বলব।

একাদেমী অফ ফাইন আর্টস'এর প্রদর্শনী দেখে বাইরে এসে অনিমেষ বললে—তার খুব মাথা ধরেছে। আমি গঙ্গার ধারে একটু বেড়াবার প্রস্তাব করেছিলুম। একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে কি ভেবে যেন রাজী হল। পথে ব্যক্তিগত কোন কথা হয়নি—ছবি থেকে দেশের ইতিহাস কতটুকু পাওয়া যায় সেই আলোচনাই হয়েছিল। কিছুক্ষণ বেড়িয়ে একটা

নিরিবিলি বোঞ্চতে গিয়ে আমরা দুজনে সলুম। গঙ্গায় জোয়ার শেষ হয়েছে—ভাটা এখনও সুরু হয়নি—নোঙ্গর করা জাহাজের আলোর মালার প্রতিফলন জলের উপর। কথা কইতে কইতে দুজনেই একসময় চুপ করলুম। ঠাৎ একসময় অনিমেষ আমার হাতখানা তার াতের মধ্যে তুলে নিলে। হাতটা কেঁপে উঠল. কমন একধরণের ভয়, এ মানুষটার কতটুকু ানি আমি—একজিবিসনের দরজা থেকে নিজের াড়ী ফিরিয়ে দিয়েছে—পুরানো ড্রাইভারের ক্ষাটুকুও রাখবে না বলে। হাতের শিরাগুলোর পর সযত্নে আঙ্গুল বোলাতে লাগল। ভয় াগল--লজ্জা হল--কুৎসিত দীন হাতখানা টেনে নতে ইচ্ছা হল--কিন্তু সাহস হল না। পুরুষের পর্শ যে মেয়ে বোঝে না বলে—সে ন্যাকামী রে। কিন্তু আমি দেখলুম তার সে স্পর্শে মনা নেই, প্রেম নেই, স্নেহও নেই—শুধু কটু করুণা। লোকালয় থেকে দূরে গঙ্গার রে একটা নিভৃত বেঞ্চিতে বসে একটি বলিষ্ঠ রুষ তার পার্শ্ববর্ত্তিনীকে করুণা করে রুতাপ স্পর্শ করছে। ইচ্ছে হল জলে ঝাঁপ য়ে লজ্জা ঢাকি—কিন্তু কোথায় যেন বুকের ধ্যে একটু আশ্বাস, একটু নির্ভরতা কটু আশ্রয়ের স্বপ্নও যেন সেই মুহূর্তে লেম। সেদিন ঠিক বুঝতে পারিনি, আজো বে বুঝেছি।

ভারী দুঃখ হয় সুজাতা—আজো আমাদের শে সে সমাজ গড়ে ওঠেনি, যে সমাজে কুমারী ক্ষিকা মাথা উঁচু করে সকলের সঙ্গে সমান য়ে চলতে পারে। তার সংসার নেই—তার ক্তও নেই। ছোটবেলার কথা মনে আছে ব, আমার রাস্তায় ঘাটে অপরিচিতা মেয়ে দের তার বুদ্ধি নিয়ে আন্দাজ করতুম। ত্রীবর্ণাদের দেখেছি—কেমন একটা রুক্ষ রশোর ছাপ বুদ্ধিহীন মুখে ড়িয়ে পড়েছে—নিজের জীবনে যখন ই বিড়ম্বনা এলো—বড় আয়নার সামনে ড়িয়ে নিজের সম্পূর্ণ চেহারাখানা দেখা দিন থেকে ছেড়ে দিয়েছি। ট্রেনিং ক্যাম্প দের সঙ্গে দেখা হত—তাদের সকলকে আমার যা বলে মনে হত।

একটা ঘটনা আমার মনে এমন দাগ রেখে ছে যে তারপর আর কোনদিন কোন ছাত্রীর ড়ী আর কখনও যাইনি। স্কুলেরই একটি য়ে—স্নেহ-মায়ায় কি করে যেন জড়িয়ে নিয়ে ল। অনেকবার অনুরোধ করতে একদিন র বাড়ীতে গিয়েছিলুম। ছোট্ট সংসার ড়ী মা, দাদা, দাদার বৌ আর সে। বৌটি গ্রহ নিয়ে আলাপ করতে এসেছিল—কিন্তু এমনভাবে আমার সিঁথি, হাতের চুড়ী বার- সবিস্ময়ে দেখতে লাগল যে, কেমন সায়াস্তি অনুভব করতে লাগলুম। বুড়ী- এসে বললেন—"আহা বিয়ে হয়নি বুঝি?" টির চোখের কোণে কেমন এক ধরণের পরি- ত স্বচ্ছ কৌতুকের হাসি—রাজরাণীর মত রাস সৌভাগ্যের যে আসনখানায় ও সহজ- বে গিয়ে বসেছে—সেখানে আমার হাত বারও যেন অধিকার নেই।

মেয়েদের শিক্ষা তাদের অধিকার, স্বাতন্ত্র্য- য নিয়ে আজ যদি তর্ক-সভা হয়—শাণিত দিয়ে প্রতিপক্ষের যুক্তি এখনও খান-খান দিতে পারব—কিন্তু যেখানে তর্ক নেই যেখানে জীবন তার সহজ ধারা মেনে নিয়েছে, যেখানে ঐ ক্লাস এইটের ফেলকরা অল্প-শিক্ষিত বৌটি তর্কাতীত সৌভাগ্য নিয়ে প্রতিদিনের নিরলস জীবনযাত্রার প্রবাহে ভেসে চলেছে তার শ্রেষ্ঠত্ব না মেনে উপায় নেই সুজাতা।

সুজাতা, আমি অনেক ভেবে দেখেছি—আমি নাম চাই, নিজেকে গোত্রান্তরিত করে প্রকাশ করতে চাই—যাকে তোরা বলবি 'স্ট্যাটস' —আমি সেই স্ট্যাটস চাই। তারপর স্বামী আমায় ত্যাগ করুন, কি আমি বিধবা হই—সে আমার ভাগ্য, তাকে আমি মেনে নোবো, কিন্তু বিগত-যৌবনা কুমারী শিক্ষিকার দুরপনেয় উপেক্ষার গ্লানি আর বইতে পারি না। জানি, তুই রাগ করছিস--'মরবিড' বলে নাক সেঁটকাচ্ছিস—কিন্তু আমি আমার সমাজের কথা লিখতে বসিনি—নিছক আমার নিজের কথাই বলছি—একেবারে আমার আপন কথা।

ভালবাসা? ভালবাসা নয় সুজাতা, ভাল-বাসার মুখোমীর বয়স আমার আর নেই। কে কার জীবনে অতীতে কতটুকু ছায়া ফেলেছে—কতটুকু বঞ্চনার ক্ষত কে কতখানি পোষণ করে এসেছে—এ কথা আজ আমার একবারও মনে হয় না। অনিমেষ যদি সত্যিই আমাকে কোন-দিন বিয়ে করে—তার ভালবাসার মূল্য আমি কখনও যাচাই করতে চাইব না—ভুল-ভ্রান্তির যে পথটাকে আমরা সাধারণ মানুষ সাধারণভাবে মাড়িয়ে এসেছি—সেও ঠিক তেমনিভাবেই এসেছে—তাকে তার ব্যতিক্রম বলে মনে করবার কোন কারণ নেই। আমি শুধু নিজেকে অশোকা মজুমদার বলে পরিচয় দিতে চাই, আর চাই স্কুলের ঘণ্টা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে প্রতিদিন ভাবলেশ-হীন কিংবা চটুল মেয়েদের সামনে অর্থহীন একই কথা বারবার বলার দায় থেকে মুক্তি পেতে।

অনিমেষের অর্থ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার দিকটা সেদিন বড়ভাবে ইঙ্গিত করেছিলি, সে কথাও ভেবে দেখেছি। যেখানে চাকরীর সর্ত হিসাবে পাঁচ টাকার ইনক্রিমেণ্টের ব্যবস্থা থাকে সেখানে কর্তৃপক্ষ যদি হঠাৎ খুসী হয়ে পনের টাকা মঞ্জুরী করে—তাহলে তোর কেমন লাগে সুজাতা। মনে হয় না—দুটো বাড়তি মাইল বাঁরিয়ে নি, একখানা শাড়ী, কিংবা বাড়তি টাকাটা আলাদা করে রেখে একজোড়া কান-পাশা?—এও তার বেশী নয়—হয়ত অমনি কোন বাড়তি শখ মিটিয়ে নেবো।

কিন্তু তার দরকার হবে না সুজাতা। সৌজন্যের হিসেব করা পথে যে মানুষটি চলে—পরিণত জীবনের ব্যর্থ নৈবেদ্য দিয়ে তাকে বশ করা যায় না—বিশ্বাস কর, আমি সে চেষ্টাও করিনি। সুতরাং তুই খুশী হ—এমন করে চুপ করে আর থাকিসনি।

ইতি—

তোর অশোকা

পুঃ চিঠিখানা আজ দুদিন হল শেষ করেছি। কিন্তু তোকে পাঠাব কি না দুদিন ধরে শুধু ভেবেছি। আজ একটু আগে অনিমেষের একটা টেলিগ্রাম আমার সব চিন্তা-ধারা ওলটপালট করে দিয়েছে। ব্যবসায় তার এমনিই নাকি মন্দা চলছিল। যথাসর্বস্ব স্টেক্ করে বেলজিয়াম থেকে এক জাহাজ কাঁচ আনা-চ্ছিল। বেশী লাভ করবে বলে ঠিকমত ইন্সি-ওর করায়নি। সুয়েজ সঙ্কটে যে একটি মাত্র জাহাজ জখম হয়েছে সে ওরই জাহাজ। আজ শুধু ব্যাঙ্কের খাতায় লাল অক্ষরে মোটা ওভারড্রাফট। সব রকমের সম্ভাব্য পরিণতির একটা নির্ভুল অংক কষা হিসেব দিয়েছে তার টেলিগ্রামে, কমা ফুলষ্টপ পর্যন্ত সংক্ষেপ করেনি—সব শেষে মনে হচ্ছে যেন ব্যঙ্গ করেই লিখেছে 'স্বামীকে ভরণপোষণ করবার সর্তে বিয়ে করতে রাজী হলে কোলকাতায় চলে এসো আজই—ষ্টেশনে গাড়ী নিয়ে থাকব—আমার ভূতপূর্ব গাড়ী—একবারের মত চেয়ে নোবো।" সুজাতা, এত বড় চিঠিতে তোকে ভুল বোঝাতে চেয়েছি—নিজেকেও। ভালবাসার যে কথা বারবার অস্বীকার করেছি—তার চেয়ে বড় ভুল আর নেই—আমি তাকে ভালবেসেছি—আমার শিক্ষা সংস্কার অহংকারের তলায় আমি যে সেই চিরকালের মেয়ে সুজাতা—ঠিক আমার মা ঠাকুমার মত—এতটুকু তফাৎ নেই। শুধু কুণ্ঠা ছিল তার ঐশ্বর্যের জন্য—তোর সঙ্গে তর্ক করলেও নিজের মনে মনে কিছুতেই সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারছিলুম না। আমার দুঃখ-রথের রাজা তার সর্বস্ব খুইয়ে আজ আমাকে রাণীর আসনে বসিয়ে দিয়েছে। আজ আমার কোন কুণ্ঠা নেই, সংকোচ নেই। আমি যাচ্ছি সুজাতা, যাবার পথে R M S-এ চিঠি পোষ্ট করলুম—হয়ত উপযুক্ত টিকিট লাগেনি—উপায় কি? কোলকাতায় আমার অনেক কাজ—একটু ফুরসৎ পেলেই তোকে ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখব।—অশোকা।

ফতেপুর সিক্রি

শতদল গোস্বামী

অবারিত রাজপথ: জনতার সেই জোটে ভিড়
দুরু-দুরু বক্ষে হাঁটি, রোমাঞ্চ শিহরে জাগে, ভয়:
তোমাকে করেছে বন্দী সুকঠিন উন্নত-প্রাচীর—
গভীর রহস্যে ঘেরা শতাব্দীর সে যে কি বিস্ময়!

পরিত্যক্ত রাজধানী: গর্বে স্ফীত 'বুলন্দ-দরোজা',
নির্বিকার উদাসীন, দ্বাররক্ষী কেউ সেথা নাই,
সিঁড়ি ভেঙে উঠি আমি, রুদ্ধশ্বাস, ঢুকে
পড়ি সোজা—
বিস্মিত-ব্যথিত-মুগ্ধ: তারপর নিজেকে হারাই!

নিজেকে হারাই আমি: তৃষ্ণা-চোখে পড়ি
ইতিহাস
মিনারে, গম্বুজে সৌধে কীর্তি স্তম্ভ, শিল্প
নিদর্শন—
ছড়ানো সে পাণ্ডুলিপি: কত অশ্রু, কত
দীর্ঘশ্বাস
রক্তের অক্ষরে লেখা কি বিচিত্র উত্থান-পতন!

সৌন্দর্যের স্বপ্নপুরী: তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকো
রাত্রিদিন—
রহস্যের জাল বোনো, তুমি শান্ত, তুমি ভয়ঙ্কর
নির্বাপিত অগ্নিশিখা, স্থির মৌন তুমি
উদাসীন:
স্মৃতিভারে জর্জরিত হিমস্তব্ধ মিনোর প্রহর!
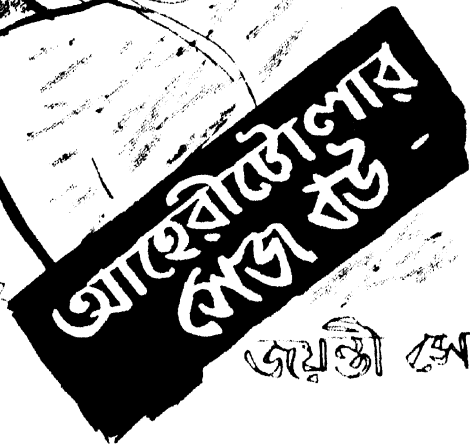
আহিরীটোলার সেজবউকে সত্যিই কেউ চিনতে পারেনি। গেটের কাছে যে দু-তিনটি অল্পবয়সী মেয়ে হাতে হাতে রজনীগন্ধার মালা আর ছাপানো কাগজে শোকগাথা তুলে ধরছিল, তাদেরও অবশ্য সেজবউ চিনতে পারলেন না। তিনি যখন প্রথম ও শেষবারের মত এ বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙিয়ে বেরিয়ে, তখন ওরা হয়ত জন্মায়নি। আর পাঁচজন অতিথি অভ্যাগতের মত তাঁকে পথ দেখিয়ে দোতলার চকমেলানো বারান্দায় নিয়ে গেল। সেখানে ফরাস বিছিয়ে বসার জায়গা করা হয়েছে। অনেকে আসর জাঁকিয়ে বসেছেন এবং মাঝে মাঝে দামী শাড়ীর আঁচলে চোখ মুছলেও যে যার পরিচিত জনের সঙ্গে বাক্য বিনিময়ে নিমগ্ন হয়ে আছেন। এ মহলে তবু চেনা মুখ দেখা গেল কিছু।

পশ্চিমের বড় থামের গায়ে সাদা জোড়ে মালা পাকে পাকে জড়ানো। তার পাশে শান্তিনিকেতনী মোড়া পেতে বসেছেন শেফালীদিদি। ফর্সা ধবধবে রং, সাদা থানের পাড়ের কাছে কুরুশে বোনা সূক্ষ্ম লেসের কারুকাজ। আঁচলে পালিশঘষা রুপোর চাবিচেন। হাত-পা নেড়ে সবিস্তারে অনেক কিছু বোঝাচ্ছেন সকলকে। আশে-পাশে নীহার খুড়িমা, বিনু ঠাকুরঝি, সুহাসিনী সকলে গালে হাত দিয়ে বসেছে।

কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে আহিরীটোলার সেজবউ বললেন—"কি গো ঠাকুরঝি, চিনতে পারছ?"

চেনা হয়তো যায়। পঁচিশ বছরের ব্যবধানেও বদলাননি তিনি। সেই পাতলা ছিপছিপে গড়ন, টিকোলো নাক মুখ, শ্যামবর্ণ, গালে চকচকে বাদামী তিল। শেফালীদিদি তবু কপালে [illegible] খাঁজ ফুটিয়ে চিন্তা করতে বসলেন। ভীড়ের মধ্যে কে বলে উঠল—"ওমা, সেজবউ না?"

কথাটা কানে যেতেই আচ্ছন্ন জড়তা কাটিয়ে [illegible] তাকালেন। কদিনের অনিয়মে ও শাসনের [illegible] [illegible] রুক্ষ চেহারা প্রায় চেনা যায় না।

"তুমি নও গো," কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন নীহার খুড়িমা, "আমিও চিনেছি এবারে। এ হল আহিরীটোলার সেজবউ।"

কথাটা কি করে ম্যাজিকের মত ছড়িয়ে গেল সারা বাড়ীতে। দুঃখ, শোকের বিশাল সমারোহের মাঝখানে এত চমকপ্রদ এবং অভাবনীয় ঘটনার আবির্ভাবে সকলে সচকিত হয়ে উঠল। পঁচিশ বছর আগে এ বাড়ীর সেজ কর্তার প্রথম পক্ষের বউ ঘরছাড়ার পর আজকে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরে এসেছে—। কিন্তু কেন? কি চান তিনি?

"আমার চোখকে অত সহজে ফাঁকি দেওয়া যায় না।" নীহার খুড়িমা বিজয় উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন।

"ফাঁকি দিতে চাইলে এভাবে [illegible] আসতুম না খুড়িমা।" অবিচলিত গলায় বেশ সপ্রতিভ সুরে বললেন আহিরীটোলার সেজবউ।

[illegible] এতকাল বাদে [illegible] উঠেছে। আহা সেজবউ, আর কদিন আগেও যদি মনে পড়ত তবে [illegible] মানুষটাকে দুচোখে একবার দেখতে পেতে। তাছাড়া সতীলক্ষ্মীর সেবা কাকে বলে তাও শিখতে।" নীহারখুড়িমা ছলছল চোখে একবার সেজবউ-এর দিকে তাকালেন একবার—। "সত্যি বলছি, আমাদের সেজবউএর এমন নিঃস্বার্থ সেবা শত্রু চোখে না দেখলে বিশ্বাস হত না।"

কথা বলতে বলতে চোখের পাতা, [illegible] স্বর ভিজিয়ে এল নীহারখুড়িমার। তাঁকে সমর্থন করে এবং ইচ্ছা করে খানিকটা [illegible] মূলক সমালোচনার সূত্রপাত করলেন অনেকে। কিন্তু কোন কথায় কথা না বলে আহিরীটোলার সেজবউ আগেকার মত ঠোঁট টিপে হাসলেন।

"তবু ভালো!" থাকতে না পেরে ছুরির ধার শানিয়ে শেফালীদিদি মুখ খুললেন—"আমাদের [illegible] বউ এর পায়ের ধুলো পেল!"

এবারে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আহিরীটোলার সেজবউ বললেন—

"থাক ঠাকুরঝি, এখানে আপনাদের [illegible] এতদিনকার [illegible] সম্পর্ক [illegible] আসিনি। এসেছি নিজের কাজেই।" [illegible] কটা কটু কথা। সেদিনকার সেই মানুষ পঁচিশ বছরে একটুও বদলায়নি। [illegible] বিরুদ্ধে এমনি মুখ তুলে [illegible] সে চলে গিয়েছিল। নিন্দের [illegible] ফুলের মালার মত গলায় পরে। অথচ [illegible] মাথা হেঁট হয়ে যায়নি।

"শুনেছিলাম তুমি কোথায় [illegible] বলতে—সেখানে [illegible]" [illegible] ঘুরিয়ে প্রশ্ন করেন নীহারখুড়িমা।

নীচে উঠানে সাদা ফরাস [illegible] কীর্তনের আসর বসেছে। শুধু সেজকর্তার ছবি নয়, এবাড়ীর বিগত স্মৃতির চিহ্ন [illegible] যে অনাদৃত [illegible] বারোমাস [illegible] হয়ে দেওয়ালে কোণে, তাদেরও [illegible] শামিয়ানার নীচে সাজানো হয়েছে। [illegible] অভ্যাগতের ভীড় সেখানে। রেলিং দিয়ে [illegible] পড়ে আহিরীটোলার সেজবউ একদৃষ্টে [illegible] কর্তার প্রকাণ্ড অয়েল পেন্টিং তন্ময় হয়ে দেখছেন। ছবির সামনে আলপনা, [illegible] শ্বেত পাথরের ডোঙা। ছবিতেও সেই [illegible] প্রচণ্ড, শক্তিশালী চেহারা। সদর্প, প্রখর উজ্জ্বল দৃষ্টি। অনেকদিন বাদে ফিরে এসেও এ বাড়ীর কোথাও কোন পরিবর্তনের চিহ্ন দেখতে না পেয়ে আশ্বস্ত হলেন তিনি। পঁচিশ বছরের কল্পনা আর বাস্তবের অমিল নেই কোথাও।

"শুনছ সেজবউ?" পিঠে ঠেলা মারলেন নীহারখুড়িমা—তোমার ছোট দেওর [illegible] কইতে চাইছে যে। চল জামতলার ঘরে। ওটা সেজকর্তার নিজস্ব ঘর। দেওয়ালের [illegible]

(শেষাংশ ১০৬ পৃষ্ঠায়)

পূজার গল্প

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

গৃহিণীকে লুকিয়ে চুরিয়ে আমাদের মহিমদার একটু লেখার বাতিক ছিল এককালে, আর এদিকওদিক যাবার রোগও অর্থাৎ তেমন কিছু সাংঘাতিক বা পরকীয়া নয়—এই সাহিত্যের আসরে বাসরে ঘুরঘুর করা বা গানের মজলিসে 'ময় ছোড়ো পিয়ারী' শুনে মশগুল হয়ে মাথা নাড়া।

সে সব দিনও গেছে, ক্ষণও গেছে, রামও নেই, অযোধ্যাও নেই—বয়স এসেছে গড়িয়ে, রং হয়েছে ফিকে। মুখের কথার ঝাপটানী আর চিন্তাধারার দাপটে মহিমদার মেয়েলী নাটুকেপনার সবটুকুই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে বললেই হয়। শুধু মাঝে মাঝে অন্তঃশীলা ফল্গু নদীর মত একটা সংস্কারের আবিষ্কার করে বইতে না হয় নয় তবে সেটা একেবারে গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে অর্থাৎ গৃহিণীর এবং প্রিয়াবিরহিত সংসারেই।

সেই গৃহিণীই যে দুশ্চরণ পার হয়ে কিশোরীর মত কাছে ঘেঁসে একদিন বলে বসলেন—দেখো, এককালে ত অনেক বাজে অনেক কিছুই লিখতে, তার চেয়ে দু'একটা গল্প উপন্যাস লেখোনা, সেকেন্ডর দু'পয়সা আসে, তেমন তেমন কপাল করলে কোন্ না সিনেমাতেও লেগে যেতে পারে।

মহিমদার মনটা হরি হরি করে উঠলো—একী কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে—তাঁর লেখার প্রতি গৃহিণীর কতো যে অনুরাগ ছিলো তাঁর অজানা নেই, সে চপলতার ইতিহাস লিখতে গেলে যেটুকু ফুটো প্রেম আজও আছে সেটুকুও চুপসে যাবে এক গণ্ডূষে। সামান্য প্রতিদিনের অনুচ্চ উচ্চছায়ায়, কতো মৃদু মোলায়েম সুরে গা মা থেকে পাধানি সাব উচ্চ গ্রামে গ্রামে অনুযোগ অভিযোগ জমতো, সে কথা গৃহিণী ভুললেও মহিমদার স্মৃতিপটে চিরদিনের জন্য আঁকা আছে, বাঁকা নিরুপমার সতীর অক্ষমা—সেই স্ফুরিত আননের ক্রোধ-চঞ্চল রৌদ্র মেঘের খেলা, সজল ফোঁসফোঁসানির স্তিমিত দীর্ঘশ্বাস, দীর্ঘদিবস, দীর্ঘ রজনী ধরে পিতৃগৃহে যাপন, ভাষায় চমক্ লাগানো হেলেফেলানো কাটুতা—যেন টয়েনবী সাহেবের ঐতিহাসিক প্যাটার্নে ফেলা একটা মনোরম মিছিল।

তবু মহিমদা শেষ চেষ্টা করে দেখলেন, বললেন—আজকাল গল্প লেখা ত নয়, যেন দলাইমলাই-এর ব্যাপার, রক্ এন্ড রোল্। আগেকার দিনে একটু প্রেমের ফোড়ন দিলেই ঝালমশলার কাজ করতো, একটু কিশোরী-ভজন, কিশোরী পূজন, দু'একটা অপাঙ্গে শাণিত দৃষ্টি, বড়জোর নিরালায় লেকের ধারে বসে থাকা না হয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ঘাসে ঘাসে চটির ঘর্ষণে চকিতে দেখা—চুকে গেল ল্যাঠা। এখন ইনিয়ে বিনিয়ে কাহিনী লেখো, বাস্তবতার নামে কয়েক ডোজ স্থূলে বিবরণ ঢুকিয়ে দাও, মনস্তত্ত্বের প্যাঁচ কষো, দুগুণ তিনগুণ করে চটচটে রস ঢালো—বাস্তবতার খাস্তা না হোক ভেজাল রসমাধুরী পেয়ে যাবে। প্রাতঃস্মরণীয়া কন্যারা নির্বিঘ্নে নিদ্রা দিন আয়ান ঘোষের ফুলো কলসীর জল আজকাল আর ভরতে হয় না। গৃহিণী চটে উত্তর দিলেন—তোমার বাপু সবতাতেই বাড়াবাড়ি, কেন আমাদের রবিকান্ত ত বেশ লেখে, রবিকান্ত সতীকান্তকে চিনি না তবে যা সব লেখা বেরুচ্ছে যেন আগামী দিনের সিনেমার সিনারিয়ো দেখছি—মেয়েদের খুব পছন্দ, না—কি যে বলো—গৃহিণী মন্তব্য কাটেন—বাঁদর ত তোমরা অর্থাৎ ঐ পুরুষগুলো—ডুবে ডুবে জল খাও, খনার বচন আওড়াও, ধরা পড়লেই মোহমুদ্গর ছাড়ো—কা তে কান্তা—কান্তাবা ঠিক আছেন, শিশুপাল বধে মন নেই।

মহিমদা অভিজ্ঞ লোক গৃহিণী যে এবিষয়ে ডারুইন ল্যামার্কের অনুরাগিণী সে কথা জানতেন তাই বক্তব্যটাকে হাল্কা ও লঘু করার প্রয়াসে ভয়ে ভয়ে বললেন—এক হাতে তালি বাজেন না দেবী, ওগো ত্রিকালজ্ঞা ত্রিদশকামিনী, আমি তোমার স্বামী, মহিমচন্দ্র মহিমার্ণব যদি মহান ঐতিহ্যযুক্ত বানরবংশ সমুদ্ভবই হই তবে তোমার পদবীটি কি হয়—লেকের গাছে দুলতে দুলতে বৃহন্নলাপালে যে দেবতাটি লম্ফ দেন তার সঙ্গে মহান শালক সম্প্রদায়ের আত্মীয়তা স্থাপন করবো নাকি?

মুখ নেড়ে গৃহিণী চলে গেলেন, বলে গেলেন—থামো ভাগিস্ বচনবাগীশ হয়েছিলে, কেবল কথার ভুড়ভুড়ি, অন্যদিকে ত লবডঙ্কা।

মহিমগিন্নী সেকালের মহাকালী পাঠশালায় দুলে দুলে অথ প্রজানামধিপঃ প্রভাতে জায়া প্রতিগ্রাহিত গন্ধমাল্যাম্ বা শিবমহিম্ন স্তব আওড়ালেও একালিনী বলে দাবী করতেন—প্রাকচল্লিশেও টসকাননি। বেথুনেও গিয়েছিলেন কিছুদিন, পিছনে একটা ছাপমারাও আছে। তারপরে মহিমদার মত অধমকে তারণের জন্য 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে' সেই ওগো পদ্মনন্দী সংসার সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিলেন—আজও সে ঝাঁপতাল বেজে যাচ্ছে বিলম্বিত দ্রুত মৃদু জলদে। তবে তাঁর কেরামতী ছিল, শুধুই তিনি গৃহিণী সচিবসখি মিথঃ প্রিয় শিষ্যা ছিলেন না, আপদে বিপদে ঝড়-ঝাপটায় হাল ধরতে পারতেন নিপুণ মাঝির মত। মহিমদার গলায় যখন তিনি মালা দেন তখন মহিমদা সবে নার্সব্যূহ ভেদ করে মেডিকালের মড়াকাটার মায়া কাটাচ্ছেন, দেখছেন বর্ষামঙ্গল, শুনেছেন কোথায় সীতা, কোথায় সীতা, পড়ছেন বসন্ত কাব্য। সেই সব মনের মৃদু কল্লোলী যুগে গ্রের এনাটমীর নীচে বেরুতো নাকীসুরের দিগগজী কবিতা, অসলারের বইএর পাতার আড়ালে অকরুণ প্রেমের বস্তাপচা বাসিরহস্য। ভাগ্যিস তখনো যুদ্ধ আসেনি, মন ভাঙেনি, ঘর ভাঙেনি, নদীর এপার-ওপার আলাদা হয়ে যায়নি। তৃতীয়বারে আতিকষ্টে তরে গেলেন মহিমদা। তারপর সব থিতিয়ে গেলো সুগৃহিণীর চাপে—বায়ুমণ্ডলে গর্ত আর রইলো না—ভরাট হয়ে গেলো প্রথম প্রণয় পরশমুগ্ধতায়। স্নিগ্ধ মহিমদা কবচ্ছরেই স্বরাট হয়ে উঠলেন—চেপে বসে গেলেন ডাক্তারীতে, ল্যাবোরেটরী প্র্যাকটিশে। লেখা ছাড়েননি তবে ডাক্তারীর কথাই লিখতেন, তাও বেশীর ভাগ ইংরাজীতে আর ঐ জাতীয় বুলেটিনে জার্নালে। উপদ্রব হতে হতে থেমে গেলো—

[illegible] বানাতে গেলে একটু নবীনতাশিল্প [illegible] এক ডোজ শক্‌থেরাপীও মন্দ নয়। [illegible] কয়েকখানা উগ্র বই এনে দিয়ে [illegible], পড়ে দেখো—কী লেখা, যেমন [illegible] তেমনি বর্ণনা, তেমনি হাবভাব তার [illegible]। শীলু বলছিল—নিরাপ চক্রবর্তী [illegible] লাগে, নোবেল প্রাইজ পাওয়া উচিত। [illegible] একদিন সম্বর্ধনা দেবে ঠিক করেছে। [illegible] পাচ্ছিল না—তা আমি বললাম বাপু—[illegible] বৈঠকখানায় দেনা—গোটা চল্লিশ [illegible] হবে। তা হোক—ওকে কী পাওয়া [illegible] এনগেজমেন্ট, আসর-বাসর বৈঠক [illegible] নিতুনিদ্ [illegible] বাড়ী [illegible]—

[illegible] হয়ে থাকেন মহিমদা—বাঃ, সব [illegible] গেছে নাকি—

গৃহিণী [illegible] চলে যেতে যেতে বলে [illegible] কি, তোমার পিত্তোপশ [illegible]।

মহিমদা [illegible] করে উঠলেন—আমার [illegible] লেখা, তাইতো এতো জ্বালার ছিল।

[illegible]

[illegible] যদি সাহিত্যে জাতে তুলতে [illegible] তার জন্য যে পরিশ্রম, বিশেষণ, শ্রী ও [illegible] দরকার তা নেই কিন্তু ও নিয়ে [illegible] ও ছেঁড়াছেঁড়ি ঠিক আছে। [illegible] করতে চায়—জীবনের ধর্মই তাই। [illegible] সম্বন্ধে প্রকৃতির পরিচয় না [illegible] তবে কিন্তু প্রশ্নটা যে থেকে যায়। [illegible] স্পর্শ আর আকাশের অনন্তও যে [illegible] বন্ধু।

এবার মহিমদার মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল, যেন এক পশলা বৃষ্টির পর তন্বযষ্টি-[illegible] শারদশ্রীর মত। হাত নিশপিশ করতে লাগলো—তিনিও লিখবেন। লিখলেনও তিনি—দিনের পর দিন, পাতার পর পাতা। তারপর পাঠিয়ে দিলেন কাগজে কাগজে। গৃহিণী [illegible] খুশী—মেয়েও খবর নেয়। যেদিন [illegible] বললেন—আজ শেষ হলো আপাততঃ সেদিন গৃহিণী এসে জিজ্ঞাসা করলেন—কই [illegible] কী লিখলে, মেয়ে এসে বললে—কই বাবা, [illegible] পড়ে শোনাও না। তিনি বললেন—কাগজে পাঠিয়ে দিয়েছি—ছাপায় ভরে তো।

শীলু বেশ অভিমানভরেই বললে—আমি [illegible] করে রতিদাকে বললাম—বাবা আবার লিখছে—ওকে ভাগ্যিস নিয়ে আসিনি—কী [illegible] কথা বলো তো—গৃহিণী কর্তার পক্ষ নিয়ে বললেন—আগে শোনালে পাছে চমকটা [illegible] যায়, তাই বুঝলি না, শীলু—

এর মধ্যে একদিন ঘটা করে রতিকান্ত সম্বর্ধনা হয়ে গেলো। মালা ছিল, চন্দন ছিল—মানপত্র ছিল, ইনিয়ে-বিনিয়ে অভিনন্দন, প্রধান অতিথির অভিভাষণ, সভাপতির বক্তৃতা। কেউ বললে—হে তরুণ তাপস, তুমি বদ্ধ জরদ্গব সমাজের বুকে শেল হেনেছো, তোমার তীব্র কশাঘাতে [illegible] চণ্ডভণ্ড হয়েছে [illegible] তুমি আধমরা যৌবনের জন্য এনেছো অমৃত বাণী নয়, নতুন ইনজেকসন। ময়ূরের মত তোমার মন নাচে, সাতরঙা পেখম তুলে নাচে কেউ বললে—জীবনের আদিমতাকে রহস্যের আবরণে না জড়িয়ে বাস্তবতার নগ্নতায় মূর্ত করে তুমি তাকে অভিষিক্ত করেছো—তুমি চলমান জীবনের দৈনন্দিন রীতিনীতির ঊর্ধ্বে শাশ্বত জীবন বৃক্ষকে শব্দে শব্দে ও ভাষায় গদগদ করে তোলোনি, তাকে উর্বর করে মিলনগ্রন্থির রসে সরস করেছো—তার বেদান্ত চড়কে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করোনি। কেউ বললেন—তুমি পঞ্চশরকে ভস্ম না করে মুখে হয়ে বুকে গেঁথে নিয়েছো—প্রতিটি শিরায় প্রতিটি অণুতে, রক্তের কণাতে তার স্বেদ, তার কম্প তার অনুভবকে ফুটিয়ে তুলেছো। তুমি বীর—তুমি কামকে করেছো বরণীয়, প্রেমকে করেছো স্মরণীয়, বিচ্ছেদকে করেছো সহনীয়—অবাধ মিলনকে করেছো সহজ—ও মোর দরদিয়া সহজিয়া বধূ।

রতিকান্তকে নিয়ে হৈহল্লাও হলো মন্দ নয়—গৃহিণীর আয়োজনও ছিল প্রচুর—চায়ের সঙ্গে কচুরী শিঙাড়া সন্দেশ ক্ষীর ইত্যাদি। শীলু নেচেছে—কামরাঙা নাচ—রতিকান্ত সম্প্রদায়েরই উদ্ভাবন—সম্প্রতি সিনেমায় চালু হয়েছে। রতিদা বলতে সে অজ্ঞান।

গৃহিণী কখন পাশে এসে বসেছিলেন, মহিমদা তবু [illegible] দেখছিলেন আর রোমে রোমে হর্ষিত না হোক শিহরিত। গৃহিণী এসে হাত [illegible] বললেন—[illegible] ভগবান যদি মুখ তুলে চান, ও হলে চারহাত এক করে দি—

মহিমদা হাঁ করে রইলেন—চারহাত কোথায় —চার পা বলো আহা চতুষ্পদ—আর ভগবান —তিনি মুখে মুখে যে কতোই ভূত পাঠান—

আমি রতিকান্তর কথা বলছি, বেঁচে থাক, সোনার চাঁদ ছেলে—মহিমদা এই প্রথম বিদ্রোহ করলেন—এই লোচ্চা ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে—লেভার, লেভার—উৎসাহের চোটে ভুলে যাওয়া হেমচন্দ্রের দু লাইন মনে পড়ে গেলো—লেভার সে অপমান, জানলে বিবেচনা [illegible] হলেও নয়।

গৃহিণী কথাটাকে তখন আর এগুতে দিলেন না।

কয়েকদিন পরে তিনি এসে বললেন—রতিকান্তকে বড়ই মনমরা দেখছি—কে একজন চাবুক বলে নাম দিয়ে ওর বইগুলো ধরে এমন কড়া সমালোচনা করছে যে বেচারীর বড্ডই মনে লেগেছে, আমায় বললে—আমার নিজের জন্য ভাবিনা—ভদ্রলোকের জন্য দুঃখ হয়—মশা মারতে কামান দাগছেন—বেদবেদান্ত পুরাণ-কোরান অরবিন্দ রবীন্দ্র 'কোট' করে কী অর একালে লেখা চলে—শুনেই লোকে বলবে সেকেলে প্রাচীনপন্থী—বিশেষ করে কথা-সাহিত্যে যেখানে মানুষের টাটকা মন নিয়ে কারবার। সেখানে পরের কথার ধারে বিক্রী নেই। উনি একালের অ আ ক খও জানেন না। স্যু হেমিংওয়ের নামই শোনেননি—একসিস্টেন্সিয়ালিসমের কথাই বোঝেন না।

তার তিনদিন পরে শীলু কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে—ওদের কলেজে নাকি ঐ সব সমালোচনা বেরুবার পর ছাত্রছাত্রী সমাজ দু'দল হয়ে গেছে—একদল রতিকান্তর বইগুলো দিয়ে কুশপুত্তলিকা দাহ করতে চায়, আর একদল ঐ মুখপোড়া সমালোচকটার শ্রাদ্ধ। আজ ত দু'দলে মারামারি ঘুষাঘুষি চলেছে, প্রিন্সিপ্যালকে এসে থামাতে হয়।

শীলুর বিস্রস্ত বেশবাস ও মুখের উপর কালশিরাতেই তার প্রমাণ দেখে ভবিষ্যৎ ভেবে শিউরে উঠলেন মহিমদা। গৃহিণী পর্যন্ত বিচলিত হয়ে বললেন—ও কীরে তুই সোমত্ত মেয়ে, ওসব ঘটাঘটির ভিতর যাস্ কেন?

তারপর স্বামীকে বললেন—ছেলেটার সব ভাল, কিন্তু রেখেঢেকে লিখতে জানে না—মহিমদা কিরকম কে জান—মেয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে বললে—জানো বাবা, আমার ইচ্ছা করছিল যিনি ঐ সব লিখেছেন তাকে তাঁর চাবুক দিয়েই চাবকাই—মহিমদা জননীকে গৃহিণীকে বললেন—সাবধান গিন্নী ব্যাপার সুবিধের নয়—এখানেই মদনকে ভস্মাবশেষ করো, নইলে তিনি বারে বারে উজ্জীবিত হয়ে উঠলে তখন নীলকণ্ঠেরও সাধ্য হবে না সে বিষকে হজম করতে—কোথায় সংহর্তা প্রভুর ব্যবস্থা করো তাড়াতাড়ি—

গৃহিণীও রেগে উঠলেন—বাঃ, তোমার আক্কেলটা কী—নিজের মুরোদে ত কিছু হলো না—জানো এবারে ওর বইটা দশ হাজার টাকায় সিনেমায় নিয়েছে—বম্বে যাচ্ছে রতিকান্ত। মহিমদা চক্ষু ছানাবড়া করে বসে থাকেন। সাড়ে চারশো টাকা মাইনের ডাক্তার তিনি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের। কতোদিনে কতো মাসে কতো বছরে খরচ খরচাবাদে দশ হাজার জমে তারই অঙ্কটা হিসাব করতে থাকেন মনে মনে।

এবারও পূজোর কাগজে মহিমদার গল্প বেরুলো না। কিন্তু রতিকান্ত ও তার সম্প্রদায়ের লেখার উপরে নানা ব্যঙ্গরচনা তীব্র কটাক্ষ ও ধারালো সমালোচনা বেরুলো বড় বড় কাগজে—সুস্থ সবল সহজ যুক্তিপূর্ণ লেখা কিন্তু লেখকের নাম নেই—গোত্রহীন সত্যকাম।

রতিকান্ত, শীলু, তার মা আরো চটলেন—চটলো রতিকান্তর ফ্যানেরা—কিন্তু খুশী হলো ওর প্রতিদ্বন্দ্বীরা আর ওরই ভিতর যারা একটু বিচার-বিবেচনা করে চলেন ফেরেন, তাঁরা বললেন—ছেলেটা বড্ড বাড়াবাড়ি করছিলো।

একদিন গভীর রাতে গৃহিণী আবার কাচ কিশোরীর মত কাছে এসে বসলেন। পুরোনো দিনগুলো যেন কোলের কাছে ফিরে এলো। আলোমেলো খানিকটা বকে তিনি কাজের কথা পাড়লেন—বলি শুনেছো, না কানের মাথা খেয়েছো—মহিমদা বললেন—কর্ণবিমর্দন পালা কি এখনও শেষ হয়নি—এখন ত বার্তাবিতাড়নের দিন।

কথার ছিরি দেখো—হ্যাঁ বলছিলুম, শীলুকে ত ভাবগতিক ভালো বুঝছি না—রতিকান্তর উপর এই যা-তা আক্রমণে ও-বেচারা একেবারেই ভেঙে পড়েছে—

মহিমদা বললেন—তা কয়েকডোজ ট্রেন-কুইলাইজার দেবো নাকি—চৌষট্টি কলার সব

কটি কলাকেই কদলী প্রদর্শন করা যায়—

তুমি একটি আস্ত ধূর্ত—তুমি মনে করো তুমিই চালাক—বলি সত্যপীর মহাশয়—এসব লেখা লিখছে কে—আমি বুঝি আর কিছুই জানি না—তোমার ড্রয়ারের নীচে কাগজের বান্ডিলগুলো কিসেব—লেখার ভঙ্গী দেখেই সন্দেহ হয়েছিল—সে যুগে অনেকবার তোমার লেখা নিয়ে ঘেটেছি, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছি, যদি কোন হদীশ পাওয়া যায় কাকে উদ্দেশ করে লেখা—চাবি দিলেই হয় না—চাবির চাবিও আছে।

মহিমদা বললেন—হ্যাঁ, লাঠির লাঠিও, রাম না হতেই রামায়ণ লেখা হয়েছিল সে কথা ভুলে গেলে বুঝি—সবই যে দেবী তব অলক্তকরাগ রঞ্জিত চরণের জন্য—থামো—বুড়ো বয়সে আর ঢং নয়—চেঁচামেচি করে কেলেংকারী বাড়িয়ে লাভ নেই—থাকগে ওসব কথা, এখন শীলুর কথা ভাবো—সাহিত্যিক হিসেবে রতিকান্ত যাই হোক বাঙালী ঘরের পাত্র হিসেবে বেশ সচল, তোমার মত কানাকড়ি নয়—

মহিমদা তবু বলেন—অমন মতিগতি যাদের—

একেবারে বোকারাম—ও সব বয়সকালের বুদ্বুদ, আপনি থিতিয়ে যাবে—তোমার যায়নি—

হায়রে পোড়াকপাল—মহিমদা আর রতিকান্ত। মহিমদা যুবা বয়সে বড়ো জোর একটু রাবীন্দ্রিক কাব্য বা কল্লোলীয় গীতিই গেয়েছেন—ফুরফুরে দখিন হাওয়া, মলয় বাতাস, মল্লিকা চামেলী চম্পকের সুগন্ধে কেশপাশ যাঁরা সুরভি করতেন বা কালাগুরুর গুরু গন্ধে সুবাসিত হতেন তাঁদের নিয়ে একটু সরস কাব্যালোচনা—বড়ো জোর বেথুনের ধারে উদাসীন হয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তার ট্রাম গোণা। না হয় সন্ধ্যেবেলায় গঙ্গার ধারে কার্জন পার্কে বা ইডেন উদ্যানে স্মরণ করিতে যদি হয় মন তবে আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে কুমুদ-কাহার ডেকে বলা—তবে কী হবে, তবে কী হবে। মানসীর বেশীর ভাগই অনামিকা—মনের আনাচে-কানাচেই তাঁদের যাতায়াত ছিল—তাঁদের নিয়ে কাব্য চলতো, ঘর নয়। রক্তেমাংসে তারা অদৃশ্য। আর এখন—স্ক্যান্ডলাস্ ! তারপর নিজের মনেই বলেন—নো নেভার—

হ্যাঁ জানি, আমার হাতে পড়েছিলে তাই—সাহিত্যিক বাতিকটুকু ঝেঁটিয়ে ঘুচিয়েছি—তা নাহলে তোমাদের আর চিনতে বাকী নেই—পুরুষ মানুষদের কেউ বিশ্বাস করে।

উত্তম থেকে অধমে পড়ে গেলেন মহিমদা, মধ্যপদবর্তী একেবারে বিশুদ্ধভাবে বিলোপ। মন্ত্রৌষধি শান্ত সাপের মত মাথা নুইয়ে গেলো তাঁর, বললেন—আচ্ছা, ভেবে দেখি—

ভাবতে আর হলো না, যাদের ভাববার তারাই ভাবলে। তিনদিন পরে মহিমদা আর তস্য গৃহিণী যখন সংসারের সুখ-দুঃখের সঙ্গে চালের দর আর শীলুর বিয়ের কথা ভাবছেন তখন শীলু আর রতিকান্ত যুগল মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে তাদের পায়ের কাছে আলগোছে যৌথভাবে একটা নমস্কার ঠুকে দিলে—টোপলক্কা ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের খাতায় দুটি আঁচড় টেনে রতিকান্ত মহিমদার সুযোগ্য [illegible]

যদস্তু হৃদয়ং তব—সে সব অনুক্ত নিরুক্ত হয়ে রইলো—সুবিধে যে কথার খেলাপ হবে না। গৃহিণী হতভম্ব। তিনি রাগে ফেটে পড়বেন না অনুরাগে রাজভোগের অর্ডার দেবেন—ভেবে না পেয়ে—শুধু মেয়েকে বললেন—আর তর সইলো না বুঝি—আমরা কি বিয়ে দিতুম না।

রতিকান্ত বম্বেতে যাচ্ছে, সেখানকার ফিল্মল্যান্ডেই তার চাকরী জুটেছে।

সেদিন রাত্রে গৃহিণী আবার কাছে ঘেঁসে ভাঙাগলায় স্বামীকে বললেন—ভালো লাগছে না, চলো কোথাও বেরিয়ে পড়ি—

মহিমদা বললেন—বেশ চলো, এবারে কিন্তু বদরিকা দ্বারকা কাশীকাঞ্চী কামরূপ কামাখ্যা নয়।

গৃহিণী আঁচলে চোখ মুছে বললেন—চলো কন্যাকুমারী যাই, যে দেবীর পতি এসে শেষ পর্যন্ত পৌঁছল না, সেই প্রতীক্ষমানকে নমস্কার করে আসি।

আহিরীটোলার সেজবউ

(১০২ পৃষ্ঠার পর)

চিহ্ন হিসেবে হরিণের, বাঘের চামড়া ঝোলানো। আলমারীতে থাকে থাকে বন্দুক, পিস্তল, গুলীর বাক্স। রুপো বাঁধানো মোটা লাঠিটা পর্যন্ত রয়েছে এখনো।

ছোট দেওর দরজা ভেজিয়ে চৌকির পাশে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন—"বসুন এইখানে কথা আছে কয়েকটা।!"

"কি কথা ?" অন্যমনস্কস্বরে জানতে চাইলেন আহিরীটোলার সেজবউ।

"সেজদা উইল করে গেছেন, সে কথা আপনি হয়ত জানেন না। উইলে ছেলেদের সব লিখে দিয়ে গেছেন। সেজবৌদির শুধু জীবনস্বত্ব। উইলের কোনরকম রদবদল করা এখন আর সম্ভব নয়, হয়তো বুঝতে পারছেন।" ছোট-দেওর একটু কেশে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার বললেন—"আপনি কদিন আগে এলেও অবশ্য লাভ হোত না। সেজদা কথাও কইতে পারতেন না, চোখের দৃষ্টিও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

অয়েল পেন্টিং-এর প্রচণ্ড শক্তিশালী মানুষের স্মৃতি বুঝি খান খান হয়ে পড়ল এতক্ষণে। শুকনো গলায় আহিরীটোলার সেজবউ বললেন—"কি হয়েছিল ?"

"প্যারালিসিস ! আপনি যাওয়ার বছর-খানেক বাদেই নানা অসুখে ধরল। শেষ ক'বছর একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন বিছানায়। খুব কষ্ট পেয়ে গেছেন শেষকালে, তাছাড়া আমাদের সম্পত্তিও কবে ভাগ হয়ে গেছে। কাজেই এখন আপনার কোন ব্যবস্থা করা আর সম্ভব নয়।

"উনি বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন নি তার !" ছোটদেওরের বৈষয়িক কথায় আগ্রহ না দেখিয়ে আহিরীটোলার সেজবউ নিজের মনেই কথা বলতে শুরু করলেন, "এ ঘরের সাজ-সরঞ্জাম কোন কাজেই লাগলনা তাহলে। বন্দুকের নলে মরচে ধরে গেছে নিশ্চয়। চাবুক-টাও বোধহয় দেওয়াল থেকে আর পাড়া হয়নি। আর একদিনও না!"

লাল হয়ে উঠল ছোটদেওরের মুখ। চাবুকের কথায় মনে পড়ে গেল পুরোনো কথাগুলো। ঐ চাবুক তুলে আহিরীটোলার সেজবউকে শাস্তি দিয়েছিলেন সেজক... অন্দরমহলের দেওয়ালের গন্ডী ছাড়িয়ে বাইরে সেজকর্তার কোন কোন আচরণের কৈফি... চাওয়ার সেই একমাত্র জবাব ছিল সে আমলে।

"উনি বদলে গেলেন তারপর। আমি চলে যাওয়ার পর!" হঠাৎ আক্ষেপের একটু... আভাস পাওয়া গেল সেজবউ-এর কথায়। ... কোন কথা না বলে তিনি উঠে স্নান ... বললেন "তাহলে চলি ঠাকুরপো।"

"একটু জলটল মুখে দেবেন না," নিশ্চিন্ত হয়ে ব্যস্ততার ভান দেখালেন ছোট দেওর।

"দরকার নেই ভাই। সকলকে আমার প্রণাম দেবেন।"

উঠোনে শ্রাদ্ধবাসরে অনেক ভীড়। ছবির দিকে শেষবারের মত আর একবার ঝাপসা চোখে তাকালেন আহিরীটোলার সেজবউ। এছবিকে ঘিরে তাঁর এতদিনের স্বপ্ন ভেঙে গেছে। চেনা মানুষকে অচেনা হতে দেখে হঠাৎ জীবনে মস্তবড় একটা বঞ্চনার জ্বালা তিনি আজ নতুন করে অনুভব করলেন। যার বিরুদ্ধে তিলে তিলে সংগ্রাম করে এতকাল মাথাতুলে দাঁড়িয়েছিলেন, নিজের সব শক্তি হারিয়েও সে মানুষ দ্বিতীয়বার তাঁকে চাবুক মেরে গেল।

এবারে কোনো প্রতিশোধের কথা আর ভাবতে পারলেন-না আহিরীটোলার সেজবউ।

মহেঞ্জোদড়ো

শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী

সময়ের সিঁড়িগুলি যত হই পার
মনে হয় হয়তো এবার
স্তব্ধ হলো জীবনের জীর্ণ ইতিহাস।
একদিন এ পৃথিবী, উদার আকাশ
ভরে দিয়েছিল প্রাণ কাহিনী ও গানে;
মনে হয় আজ কোনোখানে
তার কোনো চিহ্ন নেই, একে একে লুপ্তির কবরে
চিরতরে গেছে তারা চলে।
কে যেন তখন বলে—মূর্তি ধরে সামনে যে নাই
মাটির অতল গর্ভে পেয়েছে সে ঠাঁই।
আবিষ্কারের নেশা পেয়ে বসে সবার অজান্তে।
একা একা স্তব্ধ রাতে
মনের মহেঞ্জোদড়ো চলি খুঁড়ে খুঁড়ে;
চেয়ে দেখি—আছে পড়ে মাটির গহ্বর জুড়ে
ভুলে-যাওয়া কাহিনীর অসংখ্য ফসিল।
ভাঙা ভাঙা স্বপ্ন-সৌধ, সরল কুটিল
বহু রাজপথ, গলি অতীতের স্মৃতি বুকে নিয়ে
ঘুমন্ত নগরী ঘিরে চলেছে এগিয়ে।
অলিখিত ইতিহাস নিয়ে তার মৌন উপাদান
ক্লান্ত লেখনীকে ফের জানায় আহ্বান।
খুলে যায় জীবনের নতুন অধ্যায়,
ভরে ওঠে মূক মুখ অজস্র কথায়।

অনিল মুখোপাধ্যায়
রচিত
ইংরাজী কথাসাহিত্যের
এক অনুপম নৈবেদ্য

'মাই মাদার'

পূজা প্রকাশনায় এক
গরিমাদৃপ্ত আলেখ্য

বাঙলার শতাব্দীকালীন অশ্রুরুধিরসিঞ্চিত ইতিহাসের পটভূমিকায় সমাজ-বিপ্লবের তমসাঘন গগনে জ্যোতির্ময়ী জননীর নবজীবনের আশ্বাসবহী অমর ইংগিত।

বিবরণী : পোষ্ট বক্স ১৩৯
পাটনা—১

এবার পূজায়

প্রিয়জনকে স্থায়ী উপহার দিন। ইহা গৃহের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবে এবং মূল্যবান ধন-সম্পত্তির নিরাপত্তারও একটা সুব্যবস্থা হইবে।
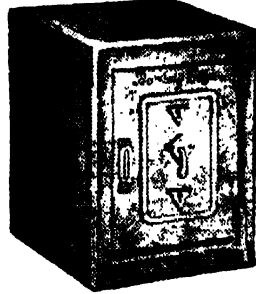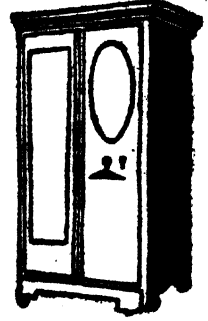
বোম্বে সেফের তৈরী ষ্টীলের আসবাবপত্র প্রকৃতই লোভনীয় উপহার।

বোম্বে সেফ এণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ

৫৬, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১
ফোন : ২২—১১৮১

মেট্রোপলিটন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(একটি তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক)

দক্ষতা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতেছে

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং-এর সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়

চেয়ারম্যান :

রায় বাহাদুর এস, সি, চৌধুরী

অন্যান্য ডিরেক্টরগণ :
শ্রী ডি এন ভট্টাচার্য

শ্রী জে এম বসু
শ্রী কে সি দাস

শ্রী এন ঘোষ
শ্রী এস এন বিশ্বাস

শ্রী বি এন বসু

শ্রী আর এম মিত্র, বি, এ, এ, আই, আই, বি
জেনারেল ম্যানেজার

হেড অফিস : ৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—১৩।
ব্যাঙ্কের যে কোন শাখা অফিসে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।
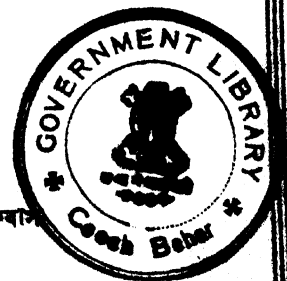
নাস্তিক

—শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য—

কালীতলার আড্ডা।

আড্ডাটা অবশ্য কালীতলায় বসে না। পাশেই কেষ্ট মুদীর দোকান। দোকানের রোয়াকেই আড্ডাটা বসে। শুধু ছেলে-ছোকরারা নয়, নবীন আর প্রবীণে আসরটা এক-একদিন বেশ সরগরম হয়ে ওঠে।

প্রবীণ শিবু দত্ত মশাইও মাঝে মাঝে আসেন। কিন্তু তাঁকে দেখতে পেলে ছেলে-ছোকরারা প্রায়ই নানা অছিলায় উঠে পড়ে। আর তিনিও তাদের দেখলে একটু অস্বস্তিবোধ করেন।

আড্ডাটা সেদিন খুব জমে উঠেছে। দাশু চক্রবর্তী আর অবিনাশ মণ্ডলের মধ্যে খুব তর্ক হচ্ছে। গোড়া থেকে যারা শোনেনি, তাদের পক্ষে কি নিয়ে যে তর্ক হচ্ছে, তা বুঝাই কঠিন।

অবিনাশ বললে, হ্যাঁ, দেখেছি ঠাকুর। তোমার সব চাচাকে জানতে আর বাকি নেই।

দাশু চক্রবর্তী উত্তেজিত হয়ে বললে—কাকে দেখালি অবিনাশ? ধর্মাধর্ম কি লোপ পেয়ে গেছে?

অবিনাশ বললে,—ঐ ঘন্টা নেড়ে নেড়ে কড়র-বড়র, কড়র-বড়র করলেই ধর্ম হয় না ঠাকুর! উনি যা করছেন, তা ভাল কাজই করছেন।

কেষ্ট মুদী সুদাম বাগদির ছেলেটাকে দু' পয়সার ডাল ওজন করে দিতে দিতে কথাটা শুনে জিজ্ঞাসা করলে,—কার কথা হচ্ছে চক্কোত্তি মশাই?

দাশু বললে,—কার আবার? যত সব অনাচ্ছিষ্টি কাণ্ড! বলত কেষ্ট! ধর্ম এক জিনিষ আর সৎ কাজ অন্য জিনিষ কিনা? সৎ কাজ করাটা ভাল বটে, কিন্তু ধর্মের কাজ —— [illegible] না।

অবিনাশ বললে,—তা হলে ওই পুজো-আর্চার নামই ধর্ম বলতে চাও ঠাকুর মশাই! লোকের উপকার করাটা কিছুই নয়?

এমন সময় খটাখট খড়মের আওয়াজ শোনা গেল।

হীরু সামন্ত বললে, যাঃ, দত্ত বুড়ো আসছে। সব মাটি করে দিলে বাবা!

সরকারদের শম্ভু তখন হুঁকোয় জোর দম লাগিয়েছে। বসুদের নিতাই তখন দত্তমশাইয়ের ছেলে পাঁচুর হাত থেকে সিগারেটটা কেড়ে নিয়ে সবেমাত্র একটা দম দিয়ে ধুঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলছে,—মাইরি! সেদিন যা দেখলাম।

হীরু বললে,—আর দেখতে হবে না বাবা! দত্তমশাই আসছে।

দত্তমশাইয়ের নাম শুনেই সব চমকে উঠল। একবার রাস্তার দিকে ফিরে তাকিয়েই শম্ভু তাড়াতাড়ি হুঁকোটা দাশু চক্রবর্তীর হাতে গুঁজে দিল। আর নিতাই—নিতাই সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে উঠল—জ্বালালে দেখছি। চল, চল, মাঠের দিকে চল।

হীরু, শম্ভু আর নিতাই চলে গেল। পাঁচুও তাদের পিছু পিছু গেল। নবীনদের মধ্যে শুধু বিশু রয়ে গেল। বিশু সহরে থাকে; মাঝে মাঝে দেশে গাঁয়ে আসে। তাকে প্রবীণেরাও একটু সমীহ করে চলেন।

শিবু দত্ত এসেই হাঁক দিলেন,—এই যে দাশু! বেশ আছত বাবা! শুধু ঘন্টা নেড়ে নেড়ে দিনটা কাটিয়ে দাও। কোন ভাবনা-চিন্তা ত নেই। দাও, দাও, হুঁকোটা দাও। তা আর ছেলে-ছোকরারা কিছু রেখেছে না কি?

দাশু হেসে হেসে জবাব দেয়,—তা খুড়ো যা বলেছেন!

দত্তমশাই হুঁকোয় দু-একবার দম টেনে বললেন,—হ্যাঁ! একেবারে মদন ভস্ম! কই হে কেষ্ট! দাও বাবা! কল্কেটা পাল্টে দাও। তোমার বংশী ছোঁড়াটা কোথা গেল?

কেষ্ট মুদী বললে,—আজ্ঞে আমিই [illegible] বংশীকে তাগাদায় পাঠিয়েছি।

দত্তমশাই বললেন,—তা পাঠাবে বৈকি। তোমাদের আর কি? যারা খায়, তারাই বোঝে। ছ'আনার ডাল, আজ বারো আনায় উঠেছে। তোমরাই করে-কম্মে নিলে হে!

দত্তমশাইয়ের মুখে রসিকতার হাসি ফুটে উঠল।

কেষ্ট মুদী কল্কেটা পাল্টে দিয়ে বললে,—তা কর্তা! কি আর বলব, মালপত্তরই পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা ত চুনোপুঁটি।

দত্তমশাই বললেন,—যথার্থই বলেছ [illegible] এই চুনোপুঁটিরাই আজকাল রাঘব বোয়াল হয়ে উঠেছে! তুমি যে কেন পারলে না, বুঝে পারি নে।

হেঃ-হেঃ-হেঃ!— দত্তমশাইয়ের হাসিতে আরো দু'চারজন যোগ দিলে।

দত্তমশাই বললেন,—হ্যাঁ দাশু! ওদিকের খবর কি?

দাশু বললে,—খবর বিশেষ ভাল নয় [illegible] মশাই! অই দেখুন না অবিনাশই ওঁর [illegible] কথা বলছে।

দত্তমশাই বললেন,—হ্যাঁ, বললেই ত [illegible] অবিনাশ, সেই বাগানটা নিশ্চয়ই বাগিয়ে [illegible]

দত্তমশাই অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন; তা[illegible] হুঁকোয় দম দিয়ে ধুঁয়ো ছাড়তে লাগলেন।

অবিনাশ বললে,—তার জন্য ন্যায্য [illegible] দিতে হয়েছে দত্তমশাই! এমনিতে হয়নি।

দত্তমশাই ব্যঙ্গ সুরে বললেন,—হেঃ ন্যায্য দাম ত আরো দশজন দিতে চেয়ে[illegible]

বাবা! তাতে মন গলল না। লোকটা হাড়-কিপ্পন, হাড়-কিপ্পন। নিশ্চয়ই কোন বদ মতলব আছে।

দাশু বললে,—তা যা বলেছেন। নিশ্চয়ই কোন বদ মতলব আছে।

দত্তমশাই বললেন,—তা আর বলতে। যাতে আমরা দশজন মরি, তাই করে আসছে। তা না হলে ওই হাড়-কিপ্পন লোকটা কি এ সব করে বাবা! শুধু জব্দ করবার মতলব।

অবিনাশ বললে,—কিন্তু একটা গুণ আছে ভদ্রলোকের। ন্যায্য গণ্ডার বেশি এক কানাকড়িও কারো কাছ থেকে নেন না।

দত্তমশাই বললেন,—কে কাকে কানাকড়ি বেশি দেয় হে বাপু! আসলই দিতে চায় না। সুদ দিতে হয়, লোকের শোক-দুঃখে না দিয়ে পারি? ওই দেখ না, দাসেদের বিধবা বউটা হাতে-পায়ে ধরে গলার হারটা ঘরে ফেলে দিয়ে চলে গেল। এখন বুঝো ঠেলা।

দাশু বললে,—হারটা ফেলে দিয়ে চলে গেল! বলেন কি?

দত্তমশাই বললেন,—হ্যাঁ ফেলে দিয়ে গেল [illegible] দুদুটো ছেলের টাইফয়েড? ভগবানের মার হে, ভগবানের মার। তুমি আমি কি করতে পারি?

দাশু বললে,—আহা-হা! বেচারা নিরুপায় হয়েই এসেছিল। এখন উপায়!

দত্তমশাই বললেন,—উপায়? আচ্ছা বল [illegible] আমাকে দেয় কে? আমিই বা পাই কোথায়? আর হারগাছি কেন, রাজত্বটা বাঁধা দিলেও ওই বিধবা বউটা শোধ করবে কোথা থেকে? হারের দাম কি কিছু রেখে গেছে?

দাশু বললে,—আহা-হা! মাথার উপরে ত আর কেউ নেই।

দত্তমশাই বললেন,—তোমরা ত [illegible] হবেই খালাস। আমাকে দিতেই হল। কি আর [illegible]। টাকাই বা কোথায়? সোমবারে খাজনার কিস্তি দিতে হবে। তার থেকে ভেঙ্গে দশটা টাকা নিজেই পৌঁছে দিয়ে এলাম। ছেলেগুলো কি বেঘোরে মারা পড়বে হে! একটা ধর্মাধর্মও দেখতে হয়!

অবিনাশ বললে,—মোটে দশ টাকা? ও হারটা ত শুনেছি চার ভরির উপর।

দত্তমশাই বললেন,—আরে বুঝো না, দশ ভরিই হোক আর চার ভরিই হোক, টাকা শোধ দেবে কি করে? দশটি টাকাই আমার চলে গেল হে!

দাশু বললে,—হ্যাঁ, তা যা বলেছেন। দশটি টাকাই শোধ করতে পারবে না।

দত্তমশাই বললেন,—তা হলে বুঝো: আমারই হ'ল বিপদ। এখন খাজনার টাকাটা সোমবারে দেই কি করে তাই ভাবছি। পরের উপকার করতে যাওয়ার ফ্যাসাদ কত! আজ-কালকার দিনে সোনাদানা ঘরে রাখাও বিপদ! যা দিনকাল পড়েছে, চোর-ডাকাতের ভয়ে রাত্রে ঘুমাতেও পারি না।

অবিনাশ রসিকতার সুরে বললে,—এ রকম উপকার করায় আখেরে লাভই হবে দত্তমশাই! বিপদে-আপদে আপনারাই ত দেখবেন।

দত্তমশাই হয়ত অবিনাশের রসিকতাটা বুঝতে পারলেন না। তিনি বললেন,—হ্যাঁ উপকার করায় আবার লাভ হবে? কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। এই ত বাগদিপাড়ার কিষাণ লোকে ন্যায্য মজুরী দিয়েও পাই না।

দাশু বললে,—তা আর বলতে? দিব্যি আছে সব। বাপের জামাই হয়ে গেছে ব্যাটারা! বিপদে পড়লেই নাকি কান্না!

দত্তমশাই বললেন,—সব ব্যাটা বিগড়ে গেছে। তা আর বিগড়াবে না?

দাশু বললে,—দেবদ্বিজে ভক্তি উঠে গেছে খুড়ো মশাই! অগ্নি পুরাণে লিখেছে কিনা,—কালস্য কুটিলা গতি।

দত্তমশাই হাঃ-হাঃ করে হেসে উঠে বললেন,—আর রেখে দাও তোমার দেবদ্বিজে ভক্তি। মা-বাপকেই মানে না ছোঁড়ারা। পথঘাটে ত বের হবার উপায় নাই। এদিকে-ওদিকে তাকালেই একটা না একটা কিছু বেয়াদপি চোখে পড়বেই। চোখ বুজে থাকতে হয় হে, চোখ বুজে থাকতে হয়।

দত্তমশাই চোখ বুজে হুঁকোয় দম লাগালেন।

দাশু বললে,—তাই জন্যই শাস্ত্রে বার্ধক্যে বানপ্রস্থ নিতে বলেছে খুড়োমশাই!

দত্তমশাই বললেন,—কি যে বল দাশু! সে যুগ কি আর আছে? যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। খেটে খেটেই মরতে হবে। বসে বসে খাবার দিন চলে গেছে বাবা! বলি বানপ্রস্থ যে নেবে, তোমায় খেতে দেবে কে?

দাশু বললে,—কলিযুগ। সত্যনারায়ণের পাঁচালিতে লিখেছে,—সব অনাচারী হয়ে যাবে।

দত্তমশাই বললেন,—হবে না? আলবৎ হবে। আমরাই ত যত নষ্টের গোড়া দাশু! তা না হলে বাগদিপাড়ায় কিষাণ মেলে না? তোমার সেই তিনিই ত সব নষ্ট করে দিচ্ছেন। একেই বলে "নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ!"

দাশু বললে,—তা যা বলেছেন। কলকাতায় কাজ-কারবার আছে। ওঁর আর কি বলুন? তার উপর সহর থেকে মাঝে মাঝে সব বাবুরা আসেন। কি বলে কংগ্রেস না কমিন্ট! তারাও উসকে দিয়ে যায়।

সরকারদের বিশু এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। এতক্ষণে সে মুখ খুললে,—না, না, কমিন্ট নয়, কম্যুনিষ্ট। তা আমাদের কংগ্রেসও বলছে, কাউকে চেপে রাখলে চলবে না।

দত্তমশাই বললেন,— রেখে দাও তোমার ওসব ভোট আদায়ের চালাকি। বলি, কে কার উস্কানির ধার ধারে হে। থাকত আমার তিনশো বিঘে ধানের জমি, তা হলে ব্যাটাদের বশে আনতে পারতাম। গায়ে ত লাগে না। মজুরী দিচ্ছে, বছরে তিনবার করে কাপড় দিচ্ছে, শীতের কম্বল দিচ্ছে। একেবারে দানছত্র খুলে বসেছে। চোরাবাজারের টাকা, বুঝলে না— হাড়-কিপ্পন লোকটা এ সব করে কেন, বুঝলে না?

দাশু বললে,—শুধু কি তাই? মাথাপিছু পাঁচ মণ করে ধানও দিচ্ছে।

দত্তমশাই বললেন,—দেবে না? তা না হলে ওই তিনশো বিঘে ত পড়ে থাকত হে! ওটা ত উপরি আয়, ওদিকে চোরাকারবারে লাল হয়ে উঠল।

বিশু বললে,—কেন? উনি ত ভাল কাজই করছেন।

দত্তমশাই বললেন,—আরে আমার ভাল কাজরে! দেশের মজুরদের বিগড়ে দিচ্ছে। তোমার আমার সর্বনাশ করছে।

দাশু বললে,—ঠিক বলেছেন খুড়োমশাই! ওঁর মতলব বুঝা ভার। নিজে ত ভাল-মন্দ কোন কিছুই খান না; ভাল পোষাক-টোশাকও পরেন না। সেই মামুলী গলাবন্ধ কোট, মোটা ধুতি, আর ক্যাম্বিসের জুতো। হাড়-কিপ্পন, হাড়-কিপ্পন!

বিশু বললে,—তা হলে মহাত্মাজীকেও কৃপণ বলতে হয় দাশুকাকা!

দাশু বলে,— হাসালে হে, হাসালে। কিসে আর কিসে, সোনার সঙ্গে সীসে। জানো না, ছেলেদের পর্যন্ত তাড়িয়ে দিয়েছেন।

দত্তমশাই ব্যঙ্গ সুরে বললেন,—হ্যাঁ তাড়িয়ে দিয়েছে না ঢোঁক করেছে। ও সব তুমি বুঝবে না দাশু! ইনকামট্যাক্স ফাঁকি দেবার মতলব। লোকটা হাড়ে হাড়ে শয়তান।

অবিনাশ বললে,—না দত্তমশাই! আপনার কথা মানতে পারলাম না। ছেলেদের তিনি তাড়িয়ে দেননি; আর কাউকে ফাঁকি দেবার লোকও তিনি নন। ছেলেরাও কাজ করছে, মাইনে পাচ্ছে। যার যেমন কাজ, তেমনি তার মাইনে।

দত্তমশাই বললেন,— বাপের আপিসে চাকরি বল?

অবিনাশ বললে,—তা আপনি বলতে পারেন। তিনি বলেন, উপযুক্ত হয়েছ, খেটে খাও। নিজে যা পাও, উড়িয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও আমি কিছুই বলব না।

দাশু বললে,—তাই বুঝি ছেলেরা দেশান্তরী হয়েছে?

অবিনাশ বললে,—না। তারা কলকাতারই দিব্যি বাড়ি ভাড়া করে আছে। ছেলেরাও খুব হিসাবী।

দাশু বললে,—হবেই ত, বাপকা বেটা।

দত্তমশাই বললেন,—তাহলে যা শুনেছি, তা সত্যি! বাপের অবর্তমানে ছেলেরা কারবারের মালিক হবে না?

অবিনাশ বললে,—তা কতকটা সত্যি। অন্য দশজন কর্মচারীর মত খাটবে, পয়সা পাবে। বিপদ-আপদের ব্যবস্থা অবশ্য রয়েছে।

বিশু বললে,—বাঃ! ঘোষালমশাই সেকেলে লোক হলেও দেখছি আমাদের এ যুগের আদর্শটা মেনে নিয়েছেন। সত্যি হি ইজ এ গুড সোল!

দত্তমশাই বিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এমন সময় বৃদ্ধ তর্করত্নমশাই দক্ষিণ-পাড়ার কি একটা পুজো সেরে ফিরছিলেন; তাঁর কানে কথাগুলো গিয়েছিল। তিনি বললেন,—কার কথা হচ্ছে দত্তমশাই!

দত্তমশাই উত্তর দিলেন,—আর কার কথা! ওই ঘোষালের কথাই হচ্ছিল। তর্করত্ন বললেন, আরে লোকটা ঘোরতর নাস্তিক। আমি বলেছিলাম, তা যখন সৎকর্মই করবে তখন দেশের সম্পত্তিটা দেবোত্তরই করে দাও না। আমিই সব ব্যবস্থা করব।

দত্তমশাই বললেন,—আপনিও যেমন। ঘোষাল করবে সৎকর্ম? ঘোষাল করবে দেবোত্তর?

দাশু বললে,—ছ্যাঃ, ছ্যাঃ! পুজো-আচ্চায় জন্মে কোনদিন এক পয়সা খরচ করেছে?

অবিনাশ বললে, শুনেছি বাড়িতে হাসপাতাল বসবে। সব না কি ঠিক হয়ে গেছে।

দত্তমশাই বিস্মিত হয়ে বললেন,—বাপ-

(শেষাংশ ১১১ পৃষ্ঠায়)

একখানি পোস্টকার্ড

রমেশচন্দ্র সেন

বেশ কাটছিল দিনগুলি।

রূপ, ধন-সম্পত্তি, খ্যাতি মর্যাদা, মানুষ যা চায় সবই পেয়েছিলেন হরিসাধন। ভাল মানুষ বলে সুনাম হয়েছে সমাজে। আর এই সুনামই তিনি সবচেয়ে বেশী কামনা করতেন। প্রভাতে আরম্ভ করেন স্ক্র্যাচ থেকে অর্থাৎ শূন্য থেকে। কর্মজীবন সুরু হওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই চাকা ঘুরে যায়। বাড়ী, গাড়ী, মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স হয়েছে সবই।

আজ তিনি কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন তবুও রেহাই নেই। প্রায়ই জুনিয়র উকিল, ব্যারিষ্টাররা আসেন কনসালটেশনের জন্য। গল্পচ্ছলে পরামর্শ দিয়ে মোটা টাকা গুণে নেন তিনি।

ছেলে দুটিও বেশ কৃতী হয়েছে। বড় ছেলে সুধাংশু বিলাত ফেরৎ ডাক্তার, জম-জমাট প্রাকটিশ। ছোট ছেলে বর্ধমানের এডিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেট।

জীবন সায়াহ্নে মানুষ চায় শান্তি। ভগবানের নাম কীর্তনের মধ্যে তিনি সেই শান্তি খোঁজেন। শনি, রবিবার, সপ্তাহে দুদিন তাঁর বাড়ীতে কীর্তন হয়। হরিসাধন কীর্তন রসে ডুবে থাকেন। খোল বাজাতে বাজাতে ভাবে বিভোর হয়ে যান।

তিনি ভেবেছিলেন জীবনের এই ধারায় কোন ছেদ পড়বে না, চিরও ধরবে না। এইভাবেই একদিন আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত হয়ে শেষ দিনের পাড়ি জমাবেন। লোকে বলবে হ্যাঁ, মানুষ বটে, যেমন ক্ষমতাবান তেমনি সজ্জন।

কিন্তু সব ওলট-পালট হয়ে গেল ছোট্ট একখানি পোস্ট কার্ডের জন্য।

সেদিন ছিল শনিবার। হরিসাধন বৈকাল পাঁচটায় নিজের খাটে শুয়ে সংবাদ পত্রে চোখ বুলোচ্ছেন, এমন সময় নাতি গৌতম তাঁর হাতে একখানা পোস্ট কার্ড এনে দিয়ে বলে, দাদু এই নাও তোমার চিঠি।

চিঠির উপর চোখ বুলিয়ে নিতেই তাঁর মাথা ঘুরে গেল। চোখের উপর অস্পষ্ট হয়ে গেল রেখাগুলো। কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। কেউ দেখলে মনে করত, কোন গুরুতর দুঃসংবাদ পেয়েছেন।

তাঁর ভয় হল, চিঠিখানা কারুর হাতে পড়েনি ত?

হরিসাধন গৌতমের কব্জির উপরটা ধরে জিজ্ঞাসা করেন, তোমায় এই চিঠি দিয়েছে কে?

পাঁচ বৎসরের গৌতম ভীত কণ্ঠে উত্তর করে, পিয়ন দাদু।

আর কেউ দেখেছে?

গৌতম মাথা নাড়িয়া জানায়, না, দেখেনি কেউ।

পিতামহ তার হাত ছেড়ে দেন, সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়। তার মনে হয়, কি কঠোর পরীক্ষায়ই না পড়েছিল সে।

হরিসাধন চিঠিখানা আবার পড়েন। মেয়েলী হাতের লেখা। তাঁর মনে হয় বেশ পরিচিত হস্তাক্ষর। কিন্তু হস্তাক্ষর যে কার— ঠিক করে উঠতে পারেন না। আবার পড়েন। পত্র প্রেরিকা লিখেছে—।

বড় হয়েছ তুমি, সজ্জন বলে খ্যাতিও লাভ করেছ। সপ্তাহে দুদিন নাকি বাড়ীতে কীর্তন কর। কিন্তু আমাদের কথা কি একবারও ভাবো, যে সব নর-নারীদের বিশেষ করে যে সব নারীদের পথে বসিয়েছ তুমি? মনে পড়ে— তোমার এই খ্যাতি ও অর্থাগমের পিছনের ইতিহাস? মনে পড়ে স্ত্রীকে, লক্ষ্মী স্বরূপিণী যে মহিলা তিলে-তিলে ক্ষয় পেয়েছেন তোমার জন্য? চলে গেছেন তিনি বহু তপ্ত নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। হয়ত ক্ষমাও করে গেছেন তোমায়।

কিন্তু যে সব ভ্রূণ হত্যা করেছ তুমি, তারা কি ক্ষমা করেছে তোমায়? তাদের হতভাগিনী জননীরা কি ক্ষমা করেছেন?

না, করেনি, যেমন করিনি আমি।

মনে করে দেখ, আমায় চিনতে পার কিনা। ইতি—

হরিসাধনের চোখের উপর ভেসে ওঠে নর-নারীর মিছিল। এক, দুই, তিন যেন সংখ্যাতীত তারা। এল সরযূ, এল সাবিত্রী, মণিকমালা, আরও অনেকে। এ মিছিল আর শেষ হয় না।

নারীর মধ্যে এসে ভিড় জমায় বহু পুরুষ। রুক্ষ কঠোর, কর্কশ মূর্তি, সকলেই অভিশাপ দেয় তাঁকে।

এদের মধ্যে কে লিখল এই চিঠি, কোন্ নারী?

যেই লিখুক, নিষ্ঠুর আঘাত করেছে সে। বিদ্ধ করেছে যেন বিষ শায়ক দিয়ে।

একখানা খামও জোটেনি? না, পোস্ট কার্ডে লিখেছে পাঁচজনের কাছে তাঁকে হেয় করার জন্য?

হরিসাধনের অপরাধগুলো পর পর বিচ্ছিন্ন। অপরাধ তিনি করেছেন সঙ্গোপনে। একজনের খবর অপরে জানে না। সমাজে তাই নিন্দা হয়নি। তাঁর ধারণা ছিল হতভাগ্য এই শিকারগুলিও নিজ নিজ ঘটনা ছাড়া অন্য ঘটনার খবর রাখে না। কিন্তু এই লেখিকা ত জানে অনেক কিছু। এত সব সে জানল কি করে?

সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘরখানাকে ছেয়ে ফেলল। তাঁর মনেও নামল সেই অন্ধকার। তিনি সর্বাঙ্গে সেই গাঢ় অন্ধকার জড়িয়ে বসে রইলেন। কাউকে আলো জ্বালাতে ডাকলেন না, নিজেও জ্বালালেন না। অতীত তমিস্রার মধ্যে স্মৃতির টর্চ ফেলে লেখিকাকে দেখার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ধরা পড়ল না তার মুখ।

গৌর দর

ঘরখানা নিস্তব্ধ, শেঠ টমাসের ক্লকটার টিক-টিক শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা যায় না। এই শব্দ অন্ধকারের নিস্তব্ধতাকে যেন গাম্ভীর্যে ভরিয়ে দিচ্ছিল।

খোলা জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে রাস্তার আলো এসে পড়েছে দেওয়ালের উপর। আলোর উপর সমান্তরালে ছটা গরাদের কালো রেখা। তার মধ্যে দু'টো রেখার মাঝখানে অস্পষ্ট একটি নারী মূর্তি।

হরিসাধন চেয়ে আছেন সেই দিকে। ভাবছেন কে-এ সরযূ, সাগরিকা? নাঃ—

জীবনে যে সব নারী এসেছে তাদের কারও সংগে এই মূর্তির কোন সাদৃশ্য খুঁজে পেলেন না। অন্ধকারে হাতরাতে লাগলেন।

এই সময় চাকর পিটার পল বিশ্বাস ঘরে এসে আলো জেবলে দেখল কর্তা ঘূর্ণায়মান পাখার নীচে বসে আছেন। খাটের পাশে টিপয়ের উপর ছানা, ছানার জল, আপেলের টুকরো ও সন্দেশ পড়ে আছে। বেলা পাঁচটারও আগে সে এগুলো রেখে যায়। কর্তা তা স্পর্শ করেননি। ছানার উপর মাছি বসেছে।

তিনি বসে আছেন পাষাণ মূর্তির মত, খাবার পড়ে আছে। এমনটি কখনও হয় না। পিটার হরিসাধনের নিজের চাকর, বিপত্নীক প্রভুর-দেখা-শুনোর ভার তার উপর।

সে একটু আবদারের সুরে বলল, ছানাটাও খাননি যে বাবু, শরীর খারাপ—?

হরিসাধন অর্ধস্পষ্ট গম্ভীর একটা আওয়াজ করলেন।

কি যে বললেন, বোঝা গেল না।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পিটার আবার বলল, একটু পরে ও'রা কীর্তন করতে আসবেন। জজ সাহেব, ব্যারিষ্টার সাহেব—

ধমক দিয়ে উঠলেন হরিসাধন, যাও, যাও।

অন্য কেউ হলে ক্ষুব্ধ হ'ত, ভাবত ব্যাপার কি! কিন্তু পিটারের প্রকৃতি অন্যরূপ। তার উপর সে গোঁড়া খৃষ্টান। প্রভুর কীর্তনে অরুচি দেখে সে খুশীই হল। জিজ্ঞাসা করল, বাবুরা এলে কি বলব?

কীর্তন হবে না। সংক্ষিপ্ত উত্তর, কিন্তু কন্ঠস্বর রুক্ষ্ম কর্কশ।

আচ্ছা বলে পিটার বেরিয়ে গেল।

হরিসাধনের বন্ধু-বান্ধবরা খানিকক্ষণ পরে কীর্তন করতে এলে পিটার একে একে তাঁদের সবাইকে বিদায় করে দিল। প্রায় প্রত্যেককেই বেশ একটু উল্লাসের সংগে বলল, বাবু আর কীর্তন করবেন না।

পিটার চলে গেলে চিঠির ছত্রগুলি আবার হরিসাধনের চোখের উপর স্পষ্ট হয়ে উঠল। জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে দেওয়ালের গায়ে আলোর যে ফালি এসে পড়েছে তার উপর চিঠির রেখাগুলো জবলছে। রেখা নয় যেন জবলন্ত অভিশাপ। সেগুলি ধীরে ধীরে মূর্তি পরিগ্রহ করল—সরযূর, সাগরিকার, মাণিকমালার হরনাথের, সন্তোষ সরকারের।

প্রথম এল সরযূ। তার বাবা দেবেন বসু ছিলেন কলকাতার কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক। কলকাতায় সিনেমা ব্যবসায়ের অন্যতম প্রবর্তক।

সরযূ হরিসাধনের সংগে কলেজে পড়ত। সে তাকে ভালবাসত। দেবেন মেয়ের এই দুর্বলতা লক্ষ্য করেন। মেয়ের প্রতি তার স্নেহ ছিল অপরিসীম। হরিসাধনকেও পছন্দ করতেন। সে পাশ করে হাইকোর্ট বারে যোগ দিলে দেবেনবাবু তাকে একখানা শেভ্রলে গাড়ী কিনে দেন। কলকাতায় জমি কেনেন তার ও সরযূর নামে। তাদের বিবাহ সম্বন্ধ তখন পাকা হয়ে গেছে।

কিছুদিনের মধ্যেই সরযূ লক্ষ্য করল তার প্রেমাস্পদ আর একটি মেয়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, মাতামাতি করছে তাকে নিয়ে। সে সহ্য করতে পারে না। ভেংগে পড়ে কিন্তু কাউকে কিছু বলে না। শুধু বাবার কাছে হরিসাধনের সংগে তার বিবাহের অস্বীকৃতি জানায়। জোরালো অস্বীকৃতি। কিন্তু তিনিও কারণ জানতে পারেননি।

সেই বিয়ে আর হয়নি, সরযূ চিরকুমারীই রয়ে গেছে। কিন্তু দেবেনবাবু হরিসাধনকে প্রদত্ত জমি আর ফিরিয়ে নিলেন না, কোন উচ্চ-বাচ্যও করলেন না।

এইভাবে হরিসাধনের প্রথম প্রেমের উপর যবনিকা পড়ে। তবে এই ধনীর দুলালীর প্রেমেই তাঁর সৌভাগ্যের সূত্রপাত।

এরপর এসেছে সাগরিকা, মাণিকমালা। তাঁর রূপ বহ্নিতে ঝাঁপ দিল তারা, আর সে তাদের পুড়িয়ে অংগার করে দিল।

সাগরিকা দূর সম্পর্কে তাঁর বৌদি, বয়সে তাঁর চেয়ে বড়। এই বিধবার বেশ কিছু বিষয়-সম্পত্তি ছিল, বৈষয়িক ব্যাপার নিয়েই প্রথম তাদের ঘনিষ্ঠতা, ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে, সাগরিকা রূপবান এই দেবরকে ভালবেসে ফেলে। একেবারে ডুবে যায়। অল্পদিনের মধ্যে হরিসাধনই কার্যতঃ তার সম্পত্তির মালিক হয়ে বসেন।

সন্তান সম্ভাবিতা হলে সাগরিকা তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে।

হরিসাধন বলেন, তুমি ত জান আমি বিবাহিত।

তাত জানি, কিন্তু আমার উপায়—একটু ভেবে সাগরিকা আবার বলে দুটো বিয়েও ত অনেকে করে।

সে আমি পারব না।

দুইজনে এই নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। শেষ পর্যন্ত হরিসাধন বলেন, একে ওল্ড ফসিল, তায় পরের উচ্ছিষ্ট। তাকে বিয়ে!

এরপর হরিসাধনের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করাই ছিল সাগরিকার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু সে তখন এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছিল যে তা আর সম্ভব হল না।

কিছুদিন পরে সাগরিকার একটি ছেলে হয়। সেই হরিসাধনের প্রথম পুত্র। হরিসাধন নবজাতককে ফুটন্ত গরম জলে ফেলে হত্যা করেন। এই দৃশ্য দেখে পাগল হয়ে যায় সাগরিকা। তারপর কোথায় যে সে চলে গেছে তা কেউ জানে না।

এত বড় একটা ঘটনা হরিসাধনকে বিচলিত করতে পারেনি, শয়তানের মত ছিল তাঁর মনের দৃঢ়তা। কিন্তু আজ ছোট্ট একখানা পোষ্ট কার্ড সেই দৃঢ়তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। তার মনে পড়ল গরম জলের টবে নিজের শিশু সন্তানের ছট-ফটানি, আর্তনাদ, চীৎকার করে উঠলেন হরিসাধন।

কিন্তু রেহাই নেই। পাশেই দাঁড়িয়ে মাণিকমালা। সে অট্টহাস্য করছে। ভিখারিণী মাণিকমালা—কিন্তু তার গলা এত চড়ল কি করে?

মাণিক পতিতার মেয়ে, পতিতা পল্লীতেই তার জন্ম। মার কাছ থেকে একখানা বাড়ী পেয়েছিল সে। তার চেহারায় হাব-ভাবে, ব্যবহারে ভদ্রজনোচিত সুরুচি ও শালীনতা ছিল। সে চমৎকার গান গাইত, বিশেষ করে রবীন্দ্রসংগীত।

হরিসাধন একদিন বন্ধুদের সংগে তার গান শুনতে যান। মাণিকমালা তাকে দেখেই ভুলে গেল, দু'দিন তার কাছে না গেলে সে গাড়ী করে হরিসাধনের বাড়ী উপস্থিত হত। অসহ মক্কেল সেজে, তার বিরহে কান্না-কাটি করত।

হরিসাধন বেশ কিছুদিন খেলিয়ে নিয়ে তাকেও শিকারী যেমন বঁড়শি দিয়ে মাছকে খেলায়। হতভাগিনী শেষটায় একদিন দেখল উকিলবাবু বাড়ীখানা নীলামে তুলে তাকে একেবারে পথে বসিয়েছেন। গৃহহারা, আশ্রয়হারা হয়ে আজ সে কোথায় আছে কেউ তা ঠিক জানে না। কেউ বলে কালীঘাটে ভিক্ষা করতে দেখেছে। কারও কারও মতে জগন্নাথঘাটের এক বৃদ্ধা ভিখারিণীর চেহারা অনেকটা মাণিকমালার মত।

হরিসাধন এইরূপে সর্বনাশ করেছেন অনেক অনেকের। একদিকে নারী নিয়ে ছিনিমিনি খেলাতে যেমন তাঁর বাধেনি, আর একদিকে ধনীদের বেপরোয়াভাবে ঠকিয়েছেন। বিত্তশালীদের মধ্যে হরনাথ ও সন্তোষ সরকার তাঁর শ্রেষ্ঠ শিকার।

হরনাথ কাপ্তেনি করতে গিয়ে এক একবারের মাইফেলের জন্য হাজার টাকা নিয়ে পাঁচ হাজার টাকার হ্যান্ডনোট লিখে দিয়েছে, অথচ এই টাকা বেশীর ভাগই উঠেছে হরিসাধনের সিন্দুকে। তিনি নিজেও ছিলেন এই আনন্দের ভাগীদার। এইরূপে পৈতৃক সম্পত্তি খুইয়ে হরনাথ হয় দেউলিয়া। সন্তোষ সরকারের মান সহ্য হত না। টাকার জন্য হরিসাধন তাকে মামলায় জড়ালেন। ফলে তার হল পক্ষাঘাত।

তিনি সুকৌশলে এক একজনের সর্বনাশ করতেন। অপরে তা জানত না। এমন কি যার সর্বনাশ হচ্ছে প্রথম প্রথম সেও ব্যাপারটা বুঝত না। দায়ী করত না তাঁকে, করতে পারতও না।

তাঁর স্ত্রী শিবানী দেবী কিন্তু নারীর সহজাত অনুভূতি দিয়ে বুঝতেন স্বামীর জীবনে নারী এসেছে অনেক। অন্যদিক দিয়েও ঠিক পথে চলছেন না তিনি। মহিলা এ নিয়ে সতর্ক বাণীও উচ্চারণ করেছেন।

হরিসাধন না বোঝার ভান করেছেন, বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, বলেছেন, তুমি আমায় সন্দেহ কর? আশ্চর্য!

শিবানী জানতেন, এ তাঁর অভিনয়, কিন্তু কেলেঙ্কারীর ভয়ে প্রতিবাদ করতেন না। আরও ভয় ছিল তাঁর, স্বামী পুত্রের অমংগলের আশংকা করতেন তিনি। তাঁর ভিতরে ভিতরে একটা জবালা ছিল, ফলে অল্প বয়সেই এই মহিলার মৃত্যু হয়।

স্ত্রীর মৃত্যুতে হরিসাধনের সামান্যতম সংকোচটুকুও লোপ পেয়ে গেল। বাধা দূর হল।

একে একে তাঁর চোখের উপর অনেকগুলি ছবি ভেসে উঠতে লাগল। যে সব মক্কেলকে ঠকিয়েছেন তাদের রক্তচক্ষু, যে স. নারীদের সংগে

ছলনা করেছেন তাদের ভ্রূকুটি। সবচেয়ে প্রবল হয়ে উঠল ফুটন্ত জলের মধ্যে নিজ নবজাত সন্তানের আর্তনাদ, তার মায়ের উন্মাদ হাসি, পাগল হয়ে গেছে সাগরিকা।

ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে মাণিকমালা পথে বসেছে, শ্রীমানীদের বাড়ী বিক্রী হয়েছে, সন্তোষ সরকারের জমিদারী লাটে উঠেছে, হরনাথের বিরাট পৈতৃক কারবার ফেল পড়েছে। সবই তাঁর জন্য।

তারা একে একে সবাই আজ সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে দেওয়ালের উপর। অভিশাপ দিচ্ছে তাঁকে।

শিবানীও তাঁর দিকে চেয়ে হাসছেন, বিদ্রূপের হাসি। তিনিও ক্ষমা করেননি?

হরিসাধন মনে করতেন পাপপুণ্য বলে কিছু নেই। আইনের চোখে, লোকের চোখে ধরা না পড়লেই হল, বিশেষ করে আইনের চোখে। কারও কাছে ধরা পড়েননি তিনি। এতদিন তাই একটা আত্মতৃপ্তি ছিল। আজ সেই তৃপ্তিটুকু লোপ পেয়েছে, এসেছে একটা দুর্দমনীয় ভীতি। বৃদ্ধ চীৎকার করে উঠলেন, ক্ষমা, আমায় ক্ষমা কর।

প্রত্যুত্তরে দেওয়ালে ঝংকৃত হয়ে উঠল অট্টহাসির কোরাস। ভয়ে তিনি কাঁপতে লাগলেন।

একবার ইচ্ছা হল জানালা বন্ধ করে আলোর প্রবেশ পথ রুদ্ধ করে দেন। ঐ মূর্তিগুলোকে ডুবিয়ে দেন অন্ধকারের মধ্যে। কিন্তু উঠতে পারলেন না।

খানিকক্ষণ পরে তাঁর পুত্রবধূ আভা এসে আলো জেলে শ্বশুরের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল, স্থাণুর মত বসে আছেন তিনি। মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, মুখের উপর পড়েছে যেন এ্যালুমিনিয়মের পাতলা একটা পোঁচ। কি হল? ভয় পেলেন নাকি? সে বলল, কি হয়েছে বাবা, অসুখ করেছে তোমার।

কোন উত্তর করলেন না হরিসাধন। বাঁ হাতের তালুর উপর ডান হাতের পাঁচটা আঙ্গুল ঠুকতে ঠুকতে কার্ডখানির দিকে তাকালেন।

আভারও চোখ পড়ল কার্ডখানার উপর। সে সেখানা তুলে নিতে যাচ্ছিল।

হরিসাধন গর্জন করে উঠলেন না-না, খবরদার—।

তার সঙ্গে শ্বশুরের এরূপ ব্যবহার এই প্রথম। তিনি তাকে একটি কড়া কথা কখনও বলেননি। আভার মনে হল ব্যাপার কি? কি আছে ঐ চিঠিখানায়।

একটু পরে হাত দিয়ে দেখল তাঁর কপাল যেন পুড়ে যাচ্ছে। জ্বর হল নাকি, না ব্লাড প্রেসার?

কিন্তু ব্লাড প্রেসারেও ত এত গরম হয় না। সে বলল, ডাক্তার ডাকব বাবা।

না, ডাক্তার আমার কিছু করতে পারবে না।

স্বামী বাড়ী নেই, মফঃস্বলে গেছেন রোগী দেখতে, আজ ফিরবেন না। দেবর বর্ধমানে। পরিবারের লোকের মধ্যে বাড়ীতে আছে শুধু সে আর তার ছেলে গোতম।

আভা আবার বলল, আমার বাবা ব মামাবাবুকে খবর দেই? মামাবাবু অর্থাৎ আভার মামা শ্বশুর।

আমায় বিরক্ত কর না বলছি, একটু একা থাকতে দেও।

আভা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একবার ভাবল তার বাবাকে ফোন করে দেয়। কিন্তু ফোন শ্বশুরের ঘরে, সেখান থেকে কাউকে ডাকা সম্ভব নয়। খবর দিয়ে তাদের আনালেও রেগে যাবেন।

বিকেল থেকে কিছু খাননি, হাত মুখ ধোননি, শনিবারের কীর্তন বন্ধ হয়ে গেছে। ব্যাপার কি? এসেছে নিশ্চয়ই গুরুতর কোন দুঃসংবাদ. কি সে খবর। আভার মন খারাপ হয়ে গেল।

গোতম পিতামহের অত্যন্ত প্রিয়। খানিকক্ষণ পরে তাকে নিয়ে এসে আভা শ্বশুরকে খাওয়ার জন্য অনুরোধ করল, অন্ততঃ একটু দুধ বা এক গ্লাস সরবৎ খাও বাবা। তিনি বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, না-না তোমায় ত আগেই বলেছি আমায় মাপ কর।

সারারাত হরিসাধন একই অবস্থায় খাটের উপর বসে রইলেন, একবারও নড়লেন না। আভা চাকরদের বলল, হরিসাধনের উপর নজর রাখতে, নিজেও বার বার এসে বাইরে থেকে দেখে যাচ্ছিল। একবার দেখল তিনি হাসছেন। অর্থহীন হাসি।

ভোরের দিকে শুনল তিনি কতকগুলো নাম আওড়াচ্ছেন, সরযূ, সাগরিকা, মাণিকমালা, হরনাথ, সন্তোষ—মাণিকমালা, সাগরিকা—।

নাম আওড়াতে আওড়াতে একবার বলে উঠলেন, এ্যাঁ! সেদ্ধ হয়ে গেল ফুটন্ত গরম জলে ইস-স......। ঐটুকু বাচ্চা।

আভার মনে হল এরা কারা। ফুটন্ত গরম জলেই বা সিদ্ধ হল কে? কার বাচ্চা? এদের সঙ্গে ওঁর কি সম্পর্ক।

সকালেই সুধাংশু মফঃস্বল থেকে ফিরল—বাবার অসুখের কথা শুনে প্রথমেই গেল তাঁর ঘরে। সে ভেবেই পেল না এক রাত্রের মধ্যে মানুষের চেহারারে কেমন করে এরূপ পরিবর্তন হয়। কালও মাথার চুল ছিল কাঁচা-পাকা আর আজ সব সাদা হয়ে গেছে। চোখ দুটি ঈষৎ লাল, চাহনি উদভ্রান্ত। চোখের নীচে পড়েছে গভীর কাল রেখা। মুখখানা কাগজের মত সাদা, দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনায় এক রাত্রির মধ্যেই এত ভেঙ্গে পড়েছেন! কি হল?

সে ডাকল বাবা।

সদ্য তন্দ্রোত্থিতের মতন হরিসাধন উত্তর করলেন, এ্যাঁ।

অসুখ করেছে তোমার, কি হয়েছে?

হরিসাধন নীরব।

সুধাংশু তাঁর গায়ে হাত দিয়ে দেখল গা পুড়ে যাচ্ছে। নাড়ী পরীক্ষা করে দেখল, রক্তের চাপ বেশ বেড়েছে। সে বলল, একবার যোগেশবাবুকে খবর দেই?

যোগেশবাবু সুধাংশুর সিনিয়র।

হরিসাধন বলে উঠলেন, না-না, দরকার নেই, কেন ডাকবে? আমার ত কোন অসুখ করেনি।

শুনলাম কাল সারা রাত ঘুমোওনি, বিকেল থেকে খাওনি কিছু।

হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠলেন হরিসাধন। সুধাংশুর ভয় হল মাথার শিরা না ছিঁড়ে যায়।

তাঁর হাসি থামল না।

সুধাংশু চেয়ে রইল।

একটু পরে হরিসাধন অনুচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলেন, শুধু একখানা পোষ্ট কার্ড। সবই জানে, গরম জলে সিদ্ধর খবর পর্যন্ত, উঃ।

সুধাংশু ত অবাক—এ সব কি বলছেন, পোষ্ট কার্ডেরই বা অর্থ কি?

হরিসাধন তখন বাইরের দিকে তাকিয়ে শূন্যে কি যেন খুঁজতে লাগলেন।

সিনিয়র ডাক্তার এলেন। হরিসাধন তাঁকে ঘরে ঢুকতেই দিলেন না। গর্জন করে উঠলেন, ওঁকে বিদায় করে দাও, মিকশ্চার, ট্যাবলেটের কর্ম নয়।

কিছুক্ষণ পরের কথা, সুধাংশু বাবার খাটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, পাশে আভা। শ্বশুরের মুখ ধোয়ার জল ও তোয়ালে নিয়ে এসেছে সে। সাধ্য সাধনা করছে। হরিসাধনের কানে সে কথা ঢুকছেই না।

তিনি পোষ্ট কার্ডখানা তুলে নিয়ে ছেলের দিকে চেয়ে বললেন, এই কার্ডখানার লেখিকাকে যে করে হোক খুঁজে বার কর। তাকে আমার সম্পত্তির একটা অংশ দিয়ে দিও।

তারপর গলার স্বর বেশ নামিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, তাহলেই আমার চিকিৎসা করা হবে। বুঝলে?

সুধাংশু কার্ডখানা নিয়ে পড়ল। দেখল কার্ডের এক কোণে তার বাবা উপরের কথা কয়টি লিখে রেখেছেন। এই যেন তার বিষয় ভোগ করার সর্ত। বৃদ্ধের শেষ উইল।

সুধাংশু কি যেন ভাবল। তার চোখের উপর ভেসে উঠল অপরিচিত একটা জগৎ। তার বাবা সেই জগতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, নায়ক।

বড়ই রূঢ় আঘাত পেল সে। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

আর আভা বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তাঁদের দিকে।

হরিসাধন তার পরও কিছুদিন বেঁচেছিলেন, বাড়ীতে কীর্তন হয় না, জুনিয়র উকিল ব্যারিষ্টাররা আসেন না। সুধাংশু, আভা এমন কি নাতি গোতমের সঙ্গেও তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। আছেন একা, সমস্ত দিন খাটের উপর বসে থাকেন, শূন্যের দিকে চেয়ে কি জানি ভাবেন, হাসেন।

এর মধ্যে দু-তিন দিন সুধাংশুকে ডেকে বলেছেন—সেই পত্র লেখিকার খোঁজ পেলে না?

চাঁদ ও পাখী

শ্রীনমিতা চক্রবর্তী

তুমি—আকাশের মাঝে
আধখানি বাঁকা চাঁদ
আমি—বনের পাখীটি
গাহিতেই মোর সাধ।
তুমি—ভুবন ভরিয়া
ঢালিছ তোমার আলো
আমি—তোমার পরশে
বেসেছি তোমারে ভালো।

নিঃশব্দে অপর্ণা ঘরে ঢুকলো। সামনেই টেবিলে মুখ নীচু করে মৃন্ময় লিখছে। ঘরের একপাশে ছোট খাট পাতা। সুন্দর বেডকভারে বিছানাটি ঢাকা। একদিকে পাশাপাশি দুটো বই-এর আলমারী। ওপাশে শেল্‌ফ. গোটাকতক বেতের চেয়ার, মাঝে ছোট একটা গোলটেবিল, তার ওপরেও বই। চারদিকে এলোমেলো বই ছড়ানো রয়েছে।

মেঝেতেও বুঝি পড়ে আছে গোটাকতক। দু'একপা এগুতেই অপর্ণার পায়ে ঠেকলো বুঝি তারি দু'একখানা। নীচু হয়ে বইগুলো তুলে মাথায় ঠেকিয়ে অপর্ণা টেবিলের ওপরে সেগুলোকে সাজিয়ে রাখলো।

একটু সাড়ীর খসখসানি, একটু বই রাখবার শব্দ, একটুবা চুড়ীর রিণিঝিনি। চমক ভাঙ্গলো মৃন্ময়ের। মুখ না তুলেই কলম চালাতে চালাতে বললে, "জল।"

অপর্ণা কাঁচের গ্লাসে জল এনে রাখলো টেবিলের ওপর। ঢাকা দিল একটা ডিশ দিয়ে। লেখায় তন্ময় স্বামীর দিকে চেয়ে বলল, "টেবিল ল্যাম্পটা জেবলেদি ?"

টেবিলের ওপর হাত দুটো রেখে একটু দাঁড়ালো অপর্ণা এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করলো বুঝি. তারপর আবার বললো, "তোমার কি দেরী হবে খুব ?"

এবার মুখ তুললো মৃন্ময়। অপর্ণা মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলো।

"খুব রাত হবেনা আমার। তুমি শুতে চলে যাও। ছেলেমেয়েরা সব ঘুমিয়েছে ?"

"হ্যাঁ, ওরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। তুমি কিন্তু বেশী রাত অবধি জেগে লিখোনা। ডাক্তারের মানা আছে, মনে থাকে যেন।"

খানিকক্ষণ একটানা লিখে লেখা বন্ধ করলো মৃন্ময়। কলমটা রাখলো টেবিলের ওপর। টেবিলল্যাম্পটার আলো মাত্র ঘরের এককোণে পড়েছে। আর মৃন্ময়ের মুখেচোখে। তারি আলোকে দেখা গেল তার প্রশান্ত সুদর্শন চেহারা। বাঁহাতে কপালের পাশের রগ দুটো টিপে ধরা, গভীর চিন্তান্বিত।

না। মনে আসছে না কিছুতেই। রেফারেন্স বুক চাই। চেয়ারটা সরিয়ে, ড্রয়ার থেকে চাবিটা নিয়ে আলমারী খুলে বই ঘাঁটিকাতে লাগলো মৃন্ময়। প্রয়োজনীয় বইটা হাতে নিয়ে সেটাকে খুলতে না খুলতেই ভেতর থেকে নীল রং-এর একখানা মুখবন্ধ করা খাম ঠক্‌ করে পড়ে গেল মেঝের ওপর।

নীচু হয়ে চিঠিটা তুললো। নীলরংএর খামখানার ওপর উজ্জ্বল টেবিলল্যাম্পের আলো পড়ে ঝিক্‌ ঝিক্‌ করে উঠলো। আর সেই সঙ্গে থর থর করে কেঁপে উঠল চিঠিসুদ্ধ মৃন্ময়ের হাতখানা।

সেই চিঠি! যে চিঠি সে আজও খোলেনি। যে চিঠির ভেতর বন্দী হয়ে আছে অনেক বেদনা, অনেক আনন্দ, অনেক স্বপ্ন আর স্মৃতি-জড়ানো তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায়টি!

একটা সুদুর্লভ সুক্ষ্ম মধুর সুগন্ধ যেন পোরা আছে একটা ভঙ্গুর কাঁচের শিশিতে। খুললেই যেটা মুহূর্তেই মিলিয়ে যাবে হাওয়ায়, চিরকালের মত।

টেবিলের সামনের জানালাটা খোলা। শীতের শেষ হয়ে গেছে। বসন্তের সুরু। ঝিরঝিরিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে আসছে, ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে মৃন্ময়কে, মৃন্ময়ের অশান্ত মনোবেদনাকে।

আকাশটা তেমন পরিষ্কার নয়। অল্প কুয়াশার জাল্‌বিছানো পাতলা চাদরের মত। তার ভেতর দিয়ে নক্ষত্রগুলো যেন আরো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে, সীমাহীন আকাশদিগন্তে। গোল হয়ে পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে ঝলমল করছে। আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে সমস্ত আকাশ।

সেইদিকে চোখ পড়তেই মনে মনে চমকে উঠলো মৃন্ময়। কি তিথি আজ ? আজও কি সেই পূর্ণিমা তিথি ? কতদিন কত বছর পার হয়ে হঠাৎ আজ পূর্ণিমার চাঁদ নতুন করে আকাশে দেখা দিল কেন ? এতদিন ও কি মৃন্ময়ের চোখের আড়ালে লুকিয়েছিল ঐ নীল খামখানার মত ?

সহসা একটা উজ্জ্বল আলোকরেখা টেনে একটা উল্কা ছুটে কোথায় মিলিয়ে গেল। অমনি করে কেন স্মৃতিগুলো মুছে যায় না মনের আকাশ থেকে ? স্মৃতির তারারা কেন ঢাকা পড়ে না বিস্মরণের কালোমেঘে ? সেইদিকে চেয়ে আবার ভাবলো মৃন্ময়।

* * *

মেয়েটি এসে দাঁড়ালো মৃন্ময়ের অফিস রুমে। একটু বুঝি ইতস্ততঃ করলো। তারপর ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে কার্ডখানা বার করে তার হাতে এগিয়ে দিলে।

"বসুন।" মৃন্ময়ের গম্ভীরকণ্ঠে নির্দেশের সুর। সামনের চেয়ারে মুখোমুখী বসে পড়লো অপরিচিতা মেয়েটি।

নিমন্ত্রণ। তবে কোনো সাহিত্যসভার বা অন্য কোনো ফাংশনের সভাপতিত্বের, অথবা প্রধান অতিথিরও নয়। সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মৃন্ময় রায়ের লিখিত একটা বই অভিনয় করানো হবে ছোটোদের দিয়ে, দর্শক হিসাবে তাঁর উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। সরস্বতী পুজোর দিন সন্ধ্যায় এই অভিনয় হবে। অন্যান্য অনুষ্ঠানও হবে অবশ্য এই সঙ্গে।

মৃন্ময় মাসিক পত্রিকার সম্পাদক। বাঙ্গালী সুসাহিত্যিক হিসাবে শুধু নাম নয়, দুর্নামও প্রচুর। প্রায়ই যোগ দিতে হয় সাহিত্যসভায়, এখানে-ওখানে, নানাবিধ অনুষ্ঠানে। তবে এ মেয়েটির নিমন্ত্রণে একটু বৈচিত্র্য আছে বৈকি ?

মৃন্ময় তাকালো মেয়েটির দিকে। "কিন্তু এই বইটা তো অভিনয় করানোর মত নয়। তাছাড়া ওটা ঠিক ছোটদের জন্যেও লেখা নয়।"

"আইডিয়াটা তো ভালো। আর শুধু ছোটদের জন্যে লেখাই ওদের দিয়ে অভিনয় করানো হবে কেন ?" আর আমি কিন্তু আপনার বইটাকে কিছু অদলবদল করে নিয়েছি। ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে জানি না। আপনাকে কিন্তু যেতেই হবে। কোনো আপত্তি শুনব না, আগে থেকেই বলে দিচ্ছি।"

আরো খানিকক্ষণ বসলো মেয়েটি। মৃন্ময়ের সঙ্গে অভিনয়, তার লেখা অন্যান্য বইগুলির আলোচনা করলো আরো কিছুক্ষণ। আর সেই কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে মৃন্ময়ও ভালো করে দেখে নিলে মেয়েটিকে। মনোহারিণী। সাধারণ সাজসজ্জা, দু-একটি অলংকারে সৌন্দর্য আর সুরুচির পরিচয় ফুটে বেরুচ্ছে। সপ্রতিভ, তবে নির্লজ্জ নয়। কথা বলার ভংগীটিও বড় চমৎকার, একেবারে মনের ভেতরে গিয়ে ঘা দেয়।

অনেক মান্যগণ্য অতিথিই সেদিন ওখানে এসেছিলেন। অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল সেই মেয়েটি, তার গৃহকর্তা।

একফাঁকে মৃন্ময় মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলো, "মাপ করবেন, আপনার নামটাই আমার জানা হয়নি এখনো।"

কিন্তু সময় ছিল না মেয়েটির দাঁড়াবার, কথা বলবার। সর্বদিকে ওকে নজর রাখতে হচ্ছে, ম্যানেজ করতে হচ্ছে অভিনয়, অভ্যর্থনা ইত্যাদি খুঁটিনাটিতে। এমন সময় ভেতর থেকে কল্পনা বলে কে যেন চীৎকার করে ওকে ডাকলো। মৃন্ময়ের কথার উত্তরে একটু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে ব্যস্তভাবে চলে গেল সে ভেতরে। নামটা ওকে আর নিজমুখে বলতে হল না বলে যেন ভারী খুসী হল সে।

আর মৃন্ময়ের মনে হল ভারী চমৎকার নাম কিন্তু মেয়েটির! কল্পনা! কল্পনাই বটে। এমন নাম বুঝি একমাত্র ওকেই মানায়!

গৃহকর্তা পাশের চেয়ারে এসে বসলেন। আলাপ জমালেন মৃন্ময়ের সঙ্গে। কথায় কথায় জানালেন, আজকের এই উৎসব অভিনয় অনুষ্ঠানের মূলে শ্রীমতী কল্পনার অদম্য উৎসাহ ও পরিকল্পনা। কল্পনা তাঁদের কোন আত্মীয়া নয়, ছেলেমেয়েদের শিক্ষিকা। শুধু শিক্ষিকা বললেও বোঝায় তাও নয়, আপনার জনেরও বেশী। ছেলেমেয়েদের সর্বদা দেখাশোনা, গানবাজনা, পড়ানোর ভারও তারই ওপরে। সেই তার ছাত্র-ছাত্রীদের, আর আরো কটি ছেলেমেয়েদের জুটিয়ে এই গানবাজনা, অভিনয় করাচ্ছে।

সেই সুরু। তার পরের দিনগুলি কি ভোলা যায়? যেন অখণ্ড, পরিপূর্ণ স্বপ্নভরা একটি মধুর মায়ারাত। কেমন করে, কোথা দিয়ে কেটে গেছে স্বপ্ন দেখার মতই, কিন্তু কিছুই তো মুছে যায়নি মন থেকে!

তারপর আরো কতবার দেখা! কত কথা! অন্তরঙ্গ মধুগুঞ্জন ভরা সেইদিনগুলি! দুজনের মন বুঝি যুগযুগান্ত থেকে ব্যাকুল হয়ে ছিল দুজনের জন্যে! দুজনের জীবনে যেন উন্মেষ হল এক পরমাশ্চর্য অনুভূতি আর চেতনার।

কিন্তু আশ্চর্য মেয়ে কল্পনা। যতটুকু পরিচয় পেয়েছিল, তার বেশী আর এতটুকুও ওর সম্বন্ধে জানতে পারল না মৃন্ময়। কল্পনার মা-বাপ নেই। সাদার্ণ এভেন্যুর সেই ভদ্রলোকটির বাড়ীতে থাকে আর কাজ করে। মাত্র এইটুকু পরিচয়। অথচ কল্পনা সব কিছু জেনে নিল তার কাছ থেকে একে একে। তার ঘর-সংসার, স্ত্রী অপর্ণা, ছেলেমেয়ে সব কথা। সব পরিচয়। আর মৃন্ময়ের সমস্ত প্রশ্নের, সমস্ত কৌতূহলের উত্তরে কল্পনা সুকৌশলে নিজেকে এড়িয়ে রাখলো।

নব উপলব্ধির নতুন প্রকাশ ভংগীতে এমনদিনেই মৃন্ময়ের নতুন প্রেমের উপন্যাস বাজারে বেরুলো। নিটোল প্রেমের এমন সার্থক উপন্যাস বহুদিন বাজারে আসেনি। যেন মৃন্ময়েরই জীবনের অপরূপ প্রতিচ্ছবি।

মৃন্ময় তার এক কপি উপহার দিলো একদিন কল্পনাকে।

সেইদিন উচ্ছ্বসিত আনন্দের আবেগভরে কল্পনা বলে ফেলেছিল মৃন্ময়কে, "তুমিতো জানো, তোমাকে দেবার মত আমার কিছুই নেই। কিন্তু চাইবার আছে অনেক।"

মৃন্ময় ব্যাকুল হয়ে বলেছিল, "কল্পনা, তুমি নিজেই জান না—তুমি আমায় কী দিয়েছো। তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই।"

কল্পনা বলেছিল "তুমি শুধু সাহিত্যিক নও। তুমি শুধু লেখক নও, তুমি স্রষ্টা। নিত্য নতুন সৃষ্টিতেই তোমার আনন্দ। সেই আনন্দই তোমার আত্মা, তোমার জীবন। তোমার সেই আনন্দ দিয়ে আমাকে নতুন করে তোমার কোনো উপন্যাসে নায়িকা করে রেখো। একথা তুমিও জানো, আমিও জানি, তোমার কাছ থেকে একদিন আমাকে দূরে চলে যেতেই হবে। তবু—যত দূরেই থাকি না কেন, মনে হবে আমি বেঁচে আছি, জড়িয়ে আছি—ছড়িয়ে আছি তোমার লেখার মধ্যে, তোমার জীবনের মধ্যে, তোমার মনের মধ্যে।"

এ যেন আর এক কল্পনা! উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে মৃন্ময় বললে, "তুমি আমার সকল সত্তায় মিশে রয়েছ, তোমাকে বাদ দিয়ে আমার সকল সৃষ্টিই নিষ্ফল, একথা কি তুমি আজো জান না কল্পনা?" কী আনন্দ! কী আনন্দ! পূর্ণ হল তার সকল কামনা বাসনা। পরিপূর্ণতার, সফলতার আনন্দে তার সমস্ত দেহমন যেন থর থর করে কাঁপছে! তার জন্ম-জন্মান্তর সার্থক হল প্রিয়তমের ভালবাসার স্বীকৃতিতে। সার্থক সে আজ। তার আর কিছুই চাইবার নেই!

দিন কাটলো। সপ্তাহ কাটলো। মাস কাটলো। বর্ষা কাটলো। শরৎ চলে গেল। হেমন্তেরও বিদায় নেবার সময় হয়ে এলো। অনেক ফুল ফুটলো। অনেক পাতা ঝরলো। অনেক পাখী উড়ে গেল মানস সরোবরে। দেশ দেশান্তরে। অনেক নদীর একূল ভাঙলো। নতুন চর জাগলো অন্য কূলে। অনেক সূর্যাস্তের শেষে অনেকবার চাঁদ উঠলো, এক-কলা থেকে পূর্ণ হল ষোলকলার পূর্ণিমায়। আর অনেকবার ওরা দুজনে আর দেখা করবে না, এই শেষ দেখা, মনে স্থির করেও আবার—আবার অনেক অনেক বার দেখা করলো।

হেমন্তের পাতা ঝরতে সুরু হওয়া গাছগুলোতে বসন্তের কুঁড়ি ফুটতে এখনো অনেক দেরী আছে। শীত আসবে তার আগে। যেটুকু বাহার আছে, তাও থাকবে না। প্রকৃতি নিষ্ঠুর হাতে তার সবটুকু আভরণ আর সজ্জা খসিয়ে ফেলবে।

এমন এক নিঃস্ব রিক্ত সন্ধ্যায় মৃন্ময় কল্পনাকে বললে, "এতদিন তোমাকে দেখলাম, কিন্তু বুঝতে পারলাম না। ঠিক প্রথম দেখার দিনের মতই তুমি অনেক দূরের রহস্যময়ী অধরা হয়ে রইলে। আমাকে কি এখনও বিশ্বাস কর না কল্পনা?

সেদিন কল্পনা বড় বেশী বিষণ্ণ ছিল। অত্যন্ত উন্মনা, বেদনাময়ী। সহসা মৃন্ময়ের হাত চেপে ধরলো সে।

"চল একটু ওধারে গিয়ে বসি, আজ আমার মন ভাল নেই। আজ তুমি মনে কিছু কোরো না।"

দুজনে পায়ে পায়ে পাশাপাশি এগিয়ে চললো। সামনেই সাদার্ণ এভেন্যুর ওপারে রেলিং ঘেরা পার্কের মত সবুজ ঘাস ছাওয়া মাঠ। শীত পড়ো পড়ো বলে সন্ধ্যার কিছু পরেই জনবিরল হয়ে যায়। দুজনে এককোণে বসলো পাশাপাশি। কেটে গেল অনেকক্ষণ, সময়ের অশান্ত ঢেউ-এর সমুদ্রে বুঝি ডুবে গেল, দুজন! এক সময়ে মৃন্ময়ই নীরবতা ভংগ করলো। "আজ কি তুমি কিছুই বলবে না কল্পনা? কোন কথাই কি তোমার বলবার নেই আমাকে? কিছু বল। এমন করে চুপ করে থেকো না।"

প্রাণপণশক্তিতে অন্তর্নিহিত অব্যক্ত বেদনাকে অবরুদ্ধ রেখে কী যেন বলতে গেল কল্পনা। কিন্তু কোন কথাই মুখ দিয়ে বার হল না। থর থর করে ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠলো। নত মুখের ওপর নবদূর্বাদলে শিশির বিন্দুর মত ফোঁটায় ফোঁটায় শুধু কয়েকবিন্দু চোখের জল ঝরে পড়লো।

কী ভেবে দুহাত দিয়ে কল্পনার মুখখানা তুলে ধরেই চমকে উঠলো মৃন্ময়। ব্যাকুল হয়ে বললে "কী হয়েছে তোমার আজ বল লক্ষ্মীটি!"

তবু কোন উত্তর দিল না কল্পনা। বুঝি সে শক্তিও ছিল না তার। শুধু আঁচল দিয়ে চোখ মুখ মুছে নিঃশব্দে বসে রইলো মৃন্ময়ের পাশে।

আরো অনেকক্ষণ কেটে গেল। কেউ কোন কথা কইল না। তাদের দুজনকে ঘিরে পাতলা অন্ধকার কথা কইল, হাওয়ার সঙ্গে ফিস ফিসিয়ে। সামনের লম্বা লম্বা গাছগুলো মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে সায় দিতে লাগলো সেই কথায়। কোথা থেকে কী একটা নাম না জানা পাখী হঠাৎ কিচ্‌কিচিয়ে উঠলো। অন্ধকারে ভেঙে পড়লো তার চীৎকার। আর সেই অন্ধকারে কোথা থেকে হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে আসা মাতাল করা ফুলের গন্ধ আছড়ে পড়লো, ভেঙে টুক্‌রো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো সেই গন্ধ বাতাস মৃন্ময় আর কল্পনাকে ঘিরে।

(শেষাংশ ১২০ পৃষ্ঠায়)

গান শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়

অজানা পথের শেষ কতদূর আমি যে গো
পথশ্রান্ত!
ক্ষণিকের তরে শুধু দেখা দাও, বলে দাও
ওগো পান্থ!

আর কতদিন চলিব এ পথে,
তোমারি প্রেমের চির মনোরথে,
বলো ও গো শুধু কবে দিবে দেখা
বিরোহী মন ক্লান্ত।

মায়াবী রাতের ফুলের শিথানে
ঝরা বকুলের হাসিটি,
মাধবীর কথা ভুলে গেছি সব
বিদায় বেলার বাঁশীটি,

সেই স্মৃতি স্মরি জীবনের সাঁঝে
আনমনে চলি নিতি পথ মাঝে,
জানি এ হৃদয় আজি অবেলায় চির করুণ
অশান্ত!

ঘুম-রাত্রি-ঝড়-সূর্যভ্রমর
বিমলচন্দ্র ঘোষ

দু'চোখ পাথর ঠাণ্ডা দিঘি মন,
ঝড়ের আগুন অপ্রমেয় শোকে
মনকে রক্ত করায় উদ্‌যাপন
মরণ-রক্ত তুষার প্রেমলোকে ॥
মাঝরাতে চাঁদ থমকে তাকায় ঝড়ে
শোকের জ্বালায় আকাশ যে হয় কবি,
সমুদ্রে নীল শূন্য ভেঙে পড়ে
কান্না ভরা হাজার তারায় ছবি ॥
দীপক সুরে কৃষ্ণচূড়ার ডালে
রক্তের রাঙা তরঙ্গে চৈতালি
রুক্ষ মাটির বিষণ্ণ কঙ্কালে
পাপড়ি ঝরায় বাজায় করতালি॥
প্রেমের অপমৃত্যু চলে রোজ
ওপর নিচে নগর সহর গ্রামে
জীবনধারার কেই বা রাখে খোঁজ
ঝড়ের দোলায় শোকার্ত সংগ্রামে॥
ঠাণ্ডা অসাড় বিদগ্ধ মন ঘুমায়
তামস রাতের সুকন্ন স্বগতোক্তি
কাব্যে শুনি হাল্কা ঠোঁটের চুমায়
আত্মরতির রসাল অনুরক্তি॥
গেরুয়া দুপুর হঠাৎ আসে ঘুরে
এ পিঠ কালো ও পিঠ আলো ধরায়।
শুকনো চিতার ধোঁয়ায় স্বর্গপুরে
দেবতারা সব জীবকে বাঁচায় মরায়॥
সোনার চূড়ো গুঁড়িয়ে পড়ার আগে
শহীদ হ'ল তলায় কত জীব,
দক্ষ কবে পাগল হবে, রাগে
শ্মশান মশান মাড়িয়ে ছোটে শিব॥
তুষার ফুলে উষার আলো কাঁপে
সূর্য-ভ্রমর তুহিন কেশর রাঙায়
অন্ধ গুহায় রাত্রিরা সন্তাপে
মরণ-ঘুমের মারণ-নেশা ভাঙায় ॥

পারমিতা
কৃষ্ণ ধর

আজ আর কোনো কথা বলব না।
কথার অতিবেল তটে আমি মৌন
নির্বাক রাত্রির আকাশ যামিনী রায়ের আঁকা পট
জোনাকীরা বুটিদার শাড়ির আঁচলের মতো
ছোপ ছোপ আলো বুনে চলেছে।
তোমাকে দেখে মনে পড়ছে,
মহাবলীপুরমের সেই পাষাণ-উৎকীর্ণ
দ্রৌপদীর রথের কথা।
আজ আর কোনো কথা বলবো না আমি।
এই পৃথিবীর হ'য়ে কী কথা বলবে তুমি
পারমিতা,
তুমি কোন সন্ততির কথা ভাবছো,
নিরবধি কালের কথা।
যে শিশুর কণ্ঠ নদীর কলরোলে মিশে গেছে
তাকে কোথায় খুঁজবে তুমি,
কোন্ মৌনের অতল গভীরতায়?
আমি আজ কিছুই বলব না।
আমার বুক থেকে এক কান্নার ঢেউ উঠছে,
এই প্রতিমার মতো নিটোল রাত্রিতে,
জলের এত কাছাকাছি,
আমি সেই হারানো শিশুর কথা শুনতে পাই।
তোমাকে কী সান্ত্বনা দেব?
নৌকোর পালগুলো দেশান্তরের হাওয়ায়
যৌবনবতী নারীর মতো লাস্যে দুলছে।
তীরের বেগে ছুটে চলেছে মকরমুখ,
ভরা গাঙের কোন কথা তারা শুনতে পেয়েছে,
আমাকে তো কিছুই বলছে না।
পারমিতা, তুমি আমায় অন্ধকারে ঠেলে দিওনা,
আমি আলোর কিনারে দাঁড়িয়ে আছি
নির্বাকের ভিতরে।
আমাকে কথায় কথায়,
এই নীলাম্বরী রাত্রিতে ভরিয়ে দাও।
আমি আজ কিছুই বলব না।

প্রবাহিনী
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

কেবল হতাশাস্তূপে জড়ো
তুমি ক'রো না প্রেমিক!
এখনো সময় আছে:
রিক্ত গাছ পাতা ফলেফুলে
একদিন পূর্ণ হবে,
একদিন প্রেমিকার চুলে
বনাঢেউ জাগবেই,
ভীরু চোখ আবার নির্ভীক

হবে স্নিগ্ধ দীপের উদ্ভাসে।

পরিশুদ্ধ আন্তরিক
প্রবল জীবনবেগ
যেখানে নিয়ত ওঠে দুলে,
নদীর স্পন্দন আসে
প্রতিরুদ্ধ হাতের আঙুলে—
ভ্রান্তি বিলাসের ফাঁকে
সেখানেই খুঁজে পায় দিক্

সতর্ক নাবিক সময়ের।

আর, যে সয় সে থাকে
সমস্ত হারিয়ে তবু
কালান্তর হাওয়ার সম্মুখে
অনন্য সৃষ্টির স্বপ্নে
অভিভূত হয়ে। বুকে রাখে
আষাঢ়ধারায় ভেজা
আর্দ্রবীজ নিভৃত কৌতুকে।

যে সয় সে বেঁচে থাকে;
সান্ধ্যলগ্নে প্রাণের উত্তাপে
মুহূর্ত রঙীন হয়,
মরে না সে ব্যর্থ অপলাপে।।

কোথায় দিশারী?
বিভা সরকার

আকাশ দিগন্তে মাতা অনন্ত এ খেলা
ঢেউগুলি আছাড়িছে কঠিন পাষাণে
অশান্ত বেদনে জাগে আত্মার ক্রন্দন
এ রুদ্র মাতনে মাতা বিরহীর প্রাণে।
কিবা চাও কারে চাও রহস্য অপার
অতলান্ত হে গভীর কোথা ব্যথা বাজে
পাওনিকি আপনার জীবন দর্শন
এ অনন্ত অন্তহীন অসীমের মাঝে।
চিরযাত্রী হে মানব জন্ম যাযাবর
নিশিদিন ঘুরে মরে পায়না ঠিকানা
যাওয়া আসা কাঁদা হাসা ভঙ্গুর জীবনে
আলেয়ায় আপনারে যায় না তো জানা!
বল কোথা লক্ষ্য তব হৃদি বিহঙ্গম
শংকাহরা লঘু পক্ষযুক্ত নভচারী
ক্লান্ত পক্ষশান্ত মন আজি কেন হায়
কাতরে শুধায় শুধু কোথায় দিশারী?

লগ্ন
শ্রীমতী কনক মুখোপাধ্যায়

জানি
আকাশের চোখে আজ ঘুম নেই
বুকভাঙা রাত্রির কিনারে
ক্লান্ত চোখের কোণে কালিমা
শ্রাবণের চোখে নামে অশ্রু।

দেখ
কি দারুণ জীবনের পিপাসা
মৃত্যুর পেয়ালায় শূন্য—
জীবনের বুকজ্বালা তৃষ্ণা,
মরুময় প্রান্তর গভীরে
সৃষ্টির লগ্নেরা বন্দী।

এস
চোখে চোখে চকমকি জ্বালারে
যতটুকু আলো হয় তাই সই
তারাহারা রাত্রির আকাশে
আলোময় স্বপ্নের যাত্রার
এ লগ্ন বয়ে যেতে দিও না।

রূপসী রাত্রি
অতসী চৌধুরী

রাত্রি! পরেছো আসমনে রঙা শাড়িটি—
বসনাঞ্চলে বসানো তারার চুমকি;
এসেছো সাজিয়া অপরূপ বেশে আজিকে—
হরণ করিতে আমার সাধের ঘুম, কি?

তোমার এমন অপরূপ দর্শনে—
মেঘেরা ভুলেছে দুখাশ্রু বর্ষণে।
তোমার ললাটে শোভিতেছে ওই—
চন্দ্রমা কুমকুম, কি?

রাত্রি! এসেছো রূপসাগরেতে নেয়ে,
ওগো, ও রাত্রি! তুমি রূপবতী মেয়ে।

হাসনাহানার সুগন্ধ তব অঙ্গে,
মেঘ এলো চুল ছড়ায়ে দিয়েছো রঙ্গে।
ঝিল্লী ঝননে শুনিতেছি তব—
নূপুরের রুমঝুম, কি?

প্রাচীন ভারতে অপরাধ-বিজ্ঞান

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল

সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে, সর্বাপেক্ষা আধুনিক বিজ্ঞান হচ্ছে অপরাধ বিজ্ঞান এবং ইহা য়ুরোপে য়ুরোপীয় মনীষীর দ্বারা সর্বপ্রথম সৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু আমি এই প্রবন্ধে দেখাবো যে এই আধুনিকতম বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজন্যবর্গের উৎসাহে সর্বপ্রথম উদ্ভাবিত হয়েছিল। মূল অপরাধ বিজ্ঞান বা ক্রিমিনলজিকে তিনটি প্রধান ভাগে অধুনাকালে বিভক্ত করা হয়ে থাকে, যথা (১) ফোরেন্সিক সায়েন্স, (২) ক্রিমিন্যাল সাইকোলজী এবং (৩) এপ্লায়েড ক্রিমিনলজি বা ব্যবহারিক অপরাধ বিজ্ঞান। অপরাধ সম্পর্কীয় তদন্ত রীতি এই শেষোক্ত বিভাগের অন্তর্গত একটি বিভাগ। এই বিষয় বুঝাবার জন্য প্রথমে হিন্দুভারতে প্রচলিত একটি ফোরেন্সিক সায়েন্স সম্পর্কীয় বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। এই ঘটনাটি ঘটেছিল প্রায় সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে প্রাচীন ভারতের একটি হিন্দু রাজ্যে। কোনও এক মালিনী কার্পাসসূত্রে গ্রথিত স্বর্ণগুটিকা সম্বলিত একটি হার পুষ্করিণীর একটি সোপানে রক্ষা করে জলে পাদধৌত করছিল। কিছু পরে উপরে উঠে সে দেখতে পেলো যে, ঐ হারটি এক স্থানীয় মালিকনী গলদেশে ধারণ করে ঐ স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। এরপর স্বভাবতঃই ঐ স্বর্ণের গুটী হারের মালিকানা নিয়ে উভয়ের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হলো। পরিশেষে উভয় নারী ঐ রাজ্যের নগরকোটালের নিকট বিচারার্থে উপস্থিত হলে নগরকোটাল ভীষণ বিপাকে পড়ে গেলেন। প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য-সাবুতের অভাবে এই হারের মালিকানা সম্বন্ধে তিনি কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে পারলেন না। এরপর এই বাদিনী ও বিবাদিনীকে ঐ রাজ্যের ধর্মাধিকরণের নিকট উপস্থিত করা হলে তিনি সকল কথা শুনে একটি শুদ্ধ জলপূর্ণ পাত্র দৌবারিককে সেখানে আনয়ন করবার জন্য আদেশ দিলেন। এরপর ঐ স্বর্ণ হারটি ছিন্ন করে তা থেকে কার্পাস সূত্রটি বার করে নিয়ে সেটি ঐ পাত্রের জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে ঐ পাত্রের উপরকার ঢাকনিটি দ্বারা উহা ঢেকে দিলেন। এর কয়েক পল পর ঐ পাত্রের ঢাকনা খুলে উহার ভিতরকার জলের আঘ্রাণ গ্রহণ করে বলে দিলেন যে, ঐ স্বর্ণ হারের প্রকৃত মালিক হচ্ছে ঐ মালিনী। মিথ্যাবাদিনী মালিকনীকে তিনি চৌর্য অপরাধে অভিযুক্ত করে ঐ স্বর্ণ হারটি ঐ মালিনীকেই প্রত্যর্পণ করেছিলেন। ঐ প্রাচীন ভারতীয় ধর্মাধিকরণের জানা ছিল যে প্রতিদিন ফুল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার জন্য ঐ ফুলের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রেণুসমূহ অলক্ষ্যে ঐ হারের কার্পাস সূত্রে সন্নিবেশিত হতে বাধ্য। এতদ্ব্যতীত তাঁর একথাও জানা ছিল যে, কিছুক্ষণ ঐ কৌটা ঢাকনা দ্বারা ঢাকা থাকলে ফুলের রেণুসমূহ বাষ্পের সংগে উবে না গিয়ে জলের মধ্যে জমা হলে তা থেকে সহজেই পুষ্পের সুগন্ধ আঘ্রাণ নাসিকারন্ধ্রে সুস্পষ্টরূপে প্রকট হয়ে উঠবে। আমাদের স্বীকার করতে বাধা নেই যে, অধুনাকালে য়ুরোপীয় ফোরেন্সিক বিদ্যার সাহায্যে হুবহু অনুরূপ পদ্ধতিতেই অপরাধ নির্ণয়ের কার্য সমাধা করা হয়ে থাকে। প্রাচীন ভারতে যে এই ফোরেন্সিক সাইন্সে সুগঠিত ছিল তা প্রমাণ করবার জন্য এই একটি উদাহরণ যথেষ্ট। অপরাধ বিজ্ঞানের দ্বিতীয় বিভাগ হচ্ছে ক্রিমিনাল সাইকোলজি। কিন্তু এই বিভাগ সম্বন্ধীয় জ্ঞানও প্রাচীন ভারতীয়দের ছিল অসামান্য। এই ক্ষেত্রেও আমি মাত্র একটি কাহিনীর উল্লেখ করে ইহা সম্যকরূপে প্রমাণ করবো। অতি আধুনিক অপরাধ বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন যে, পরিবেশ এবং কুসংগ মানুষের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক অপস্পৃহার বহির্বিকাশের অন্যতম কারণ। এই সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দু মনীষিগণের জ্ঞান কিরূপ গভীর ছিল তা নিম্নোক্ত আখ্যান ভাগটি থেকে বোঝা যাবে। এই উপখ্যানটি আমাদের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। কোনও এক ব্রাহ্মণ পর্যটন ব্যপদেশে এক গৃহস্থের বাটীতে এসে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। গৃহস্থ ব্রাহ্মণকে চর্ব্যচোষ্যপেয় আহারাদির দ্বারা তৃপ্ত করে তার জন্য পৃথক একটি গৃহে দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় শয়নেরও ব্যবস্থা করেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরে সহসা জাগ্রত হয়ে ব্রাহ্মণ একটি সুমধুর ঘণ্টার ধ্বনি শুনতে পেলেন। তাঁর জানালার নীচে রক্ষিত একটি গবয়ের গলদেশে ঐ ঘণ্টাটি বাঁধা ছিল। এই জন্য তা থেকে সুমধুর একটি সুর বেজে উঠছিল। সহসা ঐ ব্রাহ্মণের মনে ঐ ঘণ্টাটি পাওয়ার জন্য একটি দুর্দমনীয় লোভ জেগে উঠলো। ব্রাহ্মণ ভাবলেন ঐ ঘণ্টাটি ঐ গৃহস্থের কাছে চাইলে সে কি তা দেবে? যদি সে তাঁকে না দেয়। তার চেয়ে ঐটি না বলে নিলে কি হয়। এইবার ব্রাহ্মণের মনে হলো, এ কি পাপ চিন্তা তার মনে আসছে? আবার ব্রাহ্মণ নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাতে হয়েছে কি? তিনি তো ঠাকুর ঘরে ঠাকুরের জন্য ঐ ঘণ্টাটি নিচ্ছেন। নিজের ব্যবহারের জন্য তো তিনি উহা নিচ্ছেন না। এরপর ব্রাহ্মণ শিউরে উঠে আপন মনে বলে উঠলেন, চুরির দ্রব্য দিয়ে দেবতার পূজো হবে? ছিঃ ছিঃ এ কি চিন্তা বারে বারে আমার মনে উদয় হচ্ছে। অতিকষ্টে তাঁর এই লোভ দমন করে ব্রাহ্মণ পরিশেষে নিদ্রামগ্ন হলেন। প্রত্যুষে গৃহস্বামীকে দেখা মাত্র ব্রাহ্মণ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সত্য করে বলো তো তোমার পেশা কি? নিশ্চয় তোমার বৃত্তি হচ্ছে চৌর্যবৃত্তি। পুরো একটি দিন আমি তোমার আহার্য গ্রহণ করে তোমার সংগে একত্রে বসবাস করেছি। নিশ্চয়ই এই জন্যই সারারাত এইরূপে পাপ চিন্তা বারে বারে আমাকে পীড়া দিয়েছে। ব্রাহ্মণের এই প্রশ্নে বিস্মিত হয়ে ঐ গৃহস্থ উত্তর করেছিল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন প্রভু। আমার পেশা হচ্ছে চৌর্যবৃত্তি।

তৎকালীন প্রথানুযায়ী উপমাস্থলে ব্যক্ত হলেও এই কাহিনীটি হতে প্রাচীন হিন্দুদের অপরাধ-বিজ্ঞানের পরিবেশ সম্ভূত বিশেষ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। পরিবেশের শক্তির ন্যায় বাক্ প্রয়োগের (Suggestion) ক্ষমতা সম্বন্ধেও তাঁদের জ্ঞান ছিল প্রচুর। কিভাবে কয়েকজন প্রবঞ্চক একজন ব্রাহ্মণকে তার ক্রীত ছাগশিশুকে একটি কুকুররূপে বিশ্বাস করিয়ে তাঁকে তা পরিত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল তা হিতোপদেশের একটি গল্পে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, মনোবিজ্ঞানে বাক-প্রয়োগ বা সাজেসসনের ক্ষমতা যে সুদূরপ্রসারী তা ঐ সময়কার ভারতীয়-দের সম্যকরূপে জানা ছিল।

অপরাধ-বিজ্ঞানের তৃতীয় বা শেষ বিভাগ যে তদন্ত-বিজ্ঞান তা ইতিপূর্বেই আমি বলেছি। এক্ষণে আমি দেখাবো যে, এই তদন্ত-বিজ্ঞানেও প্রাচীন হিন্দুদের জ্ঞান আধুনিক শান্তিরক্ষকদের জ্ঞান অপেক্ষা কোনও অংশে কম ছিল না। এই সম্বন্ধে 'মহাবীর চরিত্র' নামক প্রাচীন গ্রন্থে ১১,১-১১০ সর্গে উল্লিখিত একটি কাহিনীর অবতারণা করা যেতে পারে। এই কাহিনী থেকে বৌদ্ধ ও হিন্দু ভারতের অপরাধ সম্পর্কীয় তদন্তরীতি সম্বন্ধে বহু তথ্য অবগত হওয়া যায়। এই সময় রাজগৃহের রাজধানীতে রৌহিণ্য নামক এক তস্করের আবির্ভাব হয়। প্রতি রাত্রিতে শহরের অগণিত ব্যক্তির ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করতে সে সমর্থ হতো। নাগরিকগণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে ঐ শহরের উপরাজনের নিকট উপস্থিত হয়ে নগররক্ষীদের অক্ষমতার কথা জ্ঞাপন করলে উপরাজন নগরের প্রধান রক্ষীকে ডেকে আনিয়ে ভৎর্সনা করে বললেন, 'তোমাদের এতো রাজ-কোষের টাকা দিয়ে কি আমরা অকারণে পোষণ করছি। যদি এই চুরির প্রাবল্য তোমরা রোধ করতে না পারো তাহলে যে সব রক্ষীরা তা পারবে তাদের আমি অন্যত্র থেকে এই নগরীতে এনে বহাল করবো। তারা তোমাদের করণীয় কার্য সুষ্ঠুরূপে সমাধা করতে পারলে জানবে যে, তোমাদের আমাকে বিদায় দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। এইভাবে ভর্ৎসিত হয়ে নগরের মহারক্ষী করযোড়ে রাজাকে জানালেন, 'রাজন! এই লোকটি এক দুর্ধর্ষ তস্কর। গ্রেপ্তার করতে গেলে ছাদ থেকে ছাদে সে উল্লম্ফন দেয়। এমন কি প্রয়োজন হলে খাড়া পাঁচিল বেয়ে উপরে উঠতেও সে সক্ষম। এই কথা শুনে রাজা এইদিন শহরের রক্ষী বিভাগ স্বহস্তে গ্রহণ করে দুর্গ থেকে তাঁর চতুরংগ সেনাকে তলব করলেন। এরপর রক্ষী ও সেনাবাহিনীর প্রধানদের গুপ্ত সমাবেশে তিনি সেনাবাহিনীকে নগরীর চারিটি প্রাচীরের বহির্দেশে অতি সংগোপনে অবস্থান করবার জন্যে আদেশ দিয়ে রক্ষীবাহিনীকে শহরের অভ্যন্তরভাগে ঐ রাত্রে তোলপাড় করে ঐ তস্করকে প্রাচীরের বাইরে প্রেরণ করবার জন্য উপদেশ দিলেন। এরপর রাজা সমাগত সকলকে এই মন্ত্রগুপ্তি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সাবধানতা গ্রহণের জন্য উপদেশ দিয়ে বললেন যে, ঐ তস্কর প্রাচীর উল্লম্ফন করে বাইরে আসামাত্র গোপন স্থানে অবস্থিত সেনা-বাহিনী দ্বারা নিশ্চয়ই ধরা পড়বে। বলাবাহুল্য যে যেমন করে হরিণ ব্যাধের দ্বারা স্থাপিত জালের মধ্যে অতি সহজে ধরা পড়ে ঠিক সেই ভাবে এই ব্যবস্থার ফলে ঐ তস্করও ঐ রাত্রে ধরা পড়েছিল। পরদিন নগর কোটাল হস্তপদ বদ্ধ অবস্থায় ঐ তস্করকে রাজার দরবারে উপস্থিত করে বললেন এই তস্করের এখুনি শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। নগর কোটালের এই আর্জির উত্তরে রাজা বলেছিলেন, যেহেতু এই তস্কর অপহৃত দ্রব্য সহ ধরা পড়েনি সেই হেতু তদন্ত না করে এখুনি তাকে শাস্তি দেওয়া যায় না। এরপর রাজা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে নগর কোটাল তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কোন্ স্থানের অধিবাসী? তোমার নাম কি রৌহিণ্য? তোমার প্রকৃত পেশা বা বৃত্তি কি? এই নগরে এতো রাত্রে তোমার আগমনের হেতু কি? এরপর নিম্নোক্তরূপে একটি বিবৃতি নগর কোটাল রৌহিণ্য নামে তস্করের নিকট থেকে গ্রহণ করে তা তিনি লিপিবদ্ধ করলেন—"আমার নাম দুর্গাচাঁদ, কালী নামক গ্রামে আমি বাস করি। আমি দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য এই শহরে আসি। পরে রাত্র হয়ে যাওয়ায় শহরের এক মন্দিরে

যদি স্বপ্ন হয়

হরপদ চট্টোপাধ্যায়

এতোখানি অজস্রতা, এতোখানি আনন্দের মাঝে
ব্যাপ্ত যদি হয় প্রাণ—হোক।
এককের বিপুল গাম্ভীর্য,
নাই যদি থাকে প্রাণে—যাক।
মহীরূহ হয়ে থাকা না-ই যদি হয় এ জীবনে,
তুচ্ছ হয়ে যাক সে সমৃদ্ধি।
নীহারিকা-চন্দনের চর্চিত এ বিপুল আকাশে,
মুঠো মুঠো জোছনার ফুলঝুরি হওয়া—
এই মোর হোক মনসাধ।
অবরুদ্ধ উদ্যানের সম্ভ্রম-লালিত পুষ্প
নাই বা হলাম!

তার চেয়ে হয়ে থাকি
প্রান্তরের এক প্রান্তে ছোটো ঘাসফুল!
মানুষের দৃষ্টি-ধোয়া শ্যামল প্রান্তর;—
সেই মোর মোক্ষ লাভ,—সেই মোর
………… মুক্তির আস্বাদ।
আর যদি এ-ও স্বপ্ন হয়!
হোক স্বপ্ন, তাও মোর ক্লান্ত প্রাণে
অক্ষয়, অব্যয়।

আমি আশ্রয় গ্রহণ করি। এরপর ভোর রাত্রে আমি বাটী ফিরে যাচ্ছিলাম। এমন সময় দানবতুল্য কয়েক-জন নগররক্ষী আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অকারণে আমাকে মারধর সুরু করলো। এরপর ভীত হয়ে আমি নগর প্রাচীর উল্লম্ফন করা মাত্র বাইরে অপেক্ষমাণ সেনাবাহিনী কর্তৃক আমি ধৃত হই। আমার মত একজন সাধু প্রজাকে সাধারণ তস্করের ন্যায় হস্তপদ বন্ধ করা এই দেশে প্রচলিত নীতির সহিত সামঞ্জস্যহীন। এই জন্য আমিও আপনার নিকট রক্ষীদের বিরুদ্ধে একটি পৃথক অভিযোগ দায়ের করতে চাই।" এই বিবৃতি অনুধাবন করে রাজা তদন্ত সাপেক্ষে রৌহিণ্যকে কারাগারে প্রেরণ করে নগর কোটালকে এই বিবৃতি সত্য কিনা তা যাচাই করাবার জন্যে জনৈক অধস্তন রক্ষীকে রৌহিণ্যের স্বগ্রামে প্রেরণের জন্য আদেশ দিলেন। এদিকে ঐ গ্রামের অধিকাংশ ব্যক্তিকে রৌহিণ্য ইতিপূর্বেই উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করে রেখেছিল। রাজার দূত ঐ স্থানে তদন্তে এলে তারা একবাক্যে রৌহিণ্যকে দুর্গাচাঁদ রূপে সনাক্ত করে তার চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করে বিবৃতি দিতে থাকে। অগত্যা তাকে বিচারে রাজন্ প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করেও আইনের ফাঁকে তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাকে মুক্তি দিয়ে রাজা বলে উঠেছিলেন, হায়! স্বয়ং ব্রহ্মাও উত্তম রূপে বুনা প্রবঞ্চনার জাল ছিন্ন করতে অক্ষম।

উপরের এই তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, দুই সহস্র বৎসর পূর্বেও ভারতে অধুনাকালের ন্যায় আইনানুরাগ ও সুষ্ঠু তদন্ত প্রণালীর প্রচলন ছিল। এই সব তদন্ত কার্যে পদচিহ্ন বিদ্যা সহ টীপ বিদ্যারও (Finger print) সাহায্য নেওয়া হতো বলে মনে হয়। তৎকালে লিখিত শ্লোকে উল্লিখিত এই বিদ্যা দুইটি সম্পর্কীয় পরিভাষা সমূহ থেকে এটি সম্যক রূপে বোঝা যায়। যথা, পদচিহ্ন, দন্ড চক্র, অঙ্কুশ, চম্প, কলস, বজ্র, শ্রীবাস্তব, মৎস্য, ইত্যাদি। পদতলের বিবিধ হিজিবিজি ও চিহ্নের এইরূপে নাম দেওয়া হয়েছিল। এইরূপে অঙ্গুলীর তলদেশের চিহ্নগুলিরও প্রানুরূপভাবে নামকরণ করা হয়েছিল, যথা, চক্র (হোলস্), শঙ্খ, পদ্ম, সীপ্ ইত্যাদি।

নীল খাম

(১১৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

একটী একটী করে অনেক তারার ফুল পাঁপড়ী মেলে ফুটে উঠলো আকাশে। লেকের ওপারের লাইন দিয়ে একটা গাড়ী গম গম শব্দ করে ছুটে বেরিয়ে গেল। তার চলে যাওয়ার ঘোষণায় থর থর করে কেঁপে উঠলো সমস্ত জায়গাটা। আর সেই শব্দে যেন ধাক্কা খেয়ে চমকে উঠে দাঁড়ালো কল্পনা।

বিহ্বল মৃন্ময়ের বুকের মধ্যে তীব্র তীক্ষ্ণ একটা যন্ত্রণা ধাক্কা মারলো। অভাবনীয় একটা কিছু হয়েছে কল্পনার। আজ তাকে বড় দুর্বোধ্য, অন্য এক জগতের বলে মনে হচ্ছে। অনেক কাছে থেকেও সে যেন অনেক দূরে সরে গেছে। বিদায় মুহূর্তে আত্মসংবরণ করে কল্পনা বললে, "এতদিন তোমাকে কখনও আমার কাছে যেতে বলিনি। পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যার পর তুমি ঐ বাড়ীতে যেও। আমি জানি ঐদিন তোমার ছুটি আছে, অফিস বন্ধ।"

এই অভাবিত নিমন্ত্রণে আশ্চর্য হয়ে গেল মৃন্ময়। সেই প্রথম দিনটি ছাড়া আর কখনও সে কল্পনার ওখানে যায়নি, যেতে বলেনি সে কখনো।

নির্দিষ্ট দিনে যখন তারাদের সভা বসলো স্বচ্ছ সুনির্মল আকাশে আর সে সভা আলো করে পূর্ণিমার চাঁদ উঠলো গোল হয়ে, মৃন্ময় এসে পৌঁছুলো সেই বাড়ীতে। বেল টিপলো।

একটু পরেই একটী লোক বেরিয়ে এলো বাড়ী থেকে। "কাকে চান আপনি?"

"কল্পনা দেবী আমাকে আজ সন্ধ্যায় এখানে আসতে বলেছিলেন।" মৃন্ময় উত্তর দিল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটী তাকালো তার দিকে। "আপনি মৃন্ময় রায়?"

বিস্মিতভাবে মৃন্ময় উত্তর দিল, "হ্যাঁ"।

লোকটী ওকে দাঁড় করিয়ে রেখেই ভেতরে চলে গেল। মিনিট খানেকের মধ্যেই মুখ বন্ধ করা উজ্জ্বল নীল রং এর একখানা চিঠি এনে মৃন্ময়ের হাতে দিলো। খামের ওপরে মৃন্ময়ের নাম লেখা মুক্তোর অক্ষরে।

রুদ্ধশ্বাস মৃন্ময় অস্ফুটকণ্ঠে কোনমতে জিজ্ঞাসা করলো, "উনি নেই? কোথায় গেছেন? কবে ফিরবেন?

"কোন কথাই বলে যান নি। পরে হয়ত চিঠিতে জানাবেন।"

সাদার্ণ এভেন্যুর জনবিরল রাস্তার একটা লাইটপোষ্টে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো মৃন্ময়। হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে এসেছে তার দু'চোখের সামনে। সব অস্পষ্ট, সব ঝাপ্‌সা। সব যেন কুয়াশায় আচ্ছন্ন! আলো নেই, বাতাস নেই, কোথাও কিছু নেই। থর থর করে কাঁপছে চিঠিসুদ্ধ হাতখানা। বুকের ভেতর একটা তীর বেঁধা রক্তাক্ত পাখী যেন ডানা ঝাপটাচ্ছে। তার বোবা কান্না ছড়িয়ে পড়েছে আকাশের তারায় তারায়, বাতাসের শিরশিরানিতে। নির্লজ্জ পূর্ণিমার মস্তোবড়ো গোল হয়ে ওঠা চাঁদটাও যেন কেঁপে উঠলো সেই কান্নার ছোঁয়া লেগে।

আত্মসংবরণ করে চিঠিখানা তুলে ধরলো চোখের সামনে। নীল রং! বড় প্রিয় রং মৃন্ময়ের! নীল [illegible] নয়নলোভা, নীল আকাশ হৃদয় লোভনীয়, কিন্তু বিষ কি নীল নয়? তবে কেন ভস্মভূষণ মহেশ্বরের বিষ পান করে নীলকণ্ঠ হল?

বন্ধ খামখানা খুলতে গিয়ে হঠাৎ কি ভেবে নিরস্ত হল সে। না থাক্, কি হবে খুলে? সে তো জানে কী আছে এর ভেতরে! সে তো জানে কল্পনার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের দিনে তার অভূতপূর্ব ব্যবহার! তার চেয়ে থাক স্মৃতির সুধায় ভরা, চিররহস্য ভরা, না বলা বাণীর ইঙ্গিত ভরা, এই না খোলা চিঠি!

বুকপকেটে রেখে দিলে সে খামখানা। একবার তাকালো নীল আকাশের পূর্ণিমার চাঁদের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে চলতে লাগল বাড়ীর দিকে মূর্চ্ছাহতের মত।

* * *

অনেক রাত হয়েছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল অপর্ণার। মৃন্ময় এখনো শুতে আসেনি। স্বামী না শোওয়া পর্যন্ত কিছুতেই নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে না সে।

উঠে এলো এ ঘরে। অসমাপ্ত লেখার ওপর নীল রং-এর খামখানা পড়ে রয়েছে। টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় তার উজ্জ্বল নীল রং ঝকঝক করছে, তারই ওপরে দুই হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে মৃন্ময়।

অপর্ণা আস্তে আস্তে চিঠিটা তুলে নিয়ে আবার ভরে রাখলো সেই বইটার মধ্যে। স্বামীর মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে ডাকলো, "ওঠো, ওঠো, শোবে চল, অনেক রাত হয়েছে।"

ঘুমচোখে বিহ্বল মৃন্ময় অপর্ণার দিকে তাকালো। তারপর তাকালো টেবিলের ওপর।

"কল্পনার চিঠি যেখানে ছিল, সেখানেই আবার রেখে দিয়েছি।"

"তবে তুমি জানতে কল্পনার কথা? ওই চিঠির কথা?"

"হ্যাঁ জানতাম। সব মেয়েমানুষেই যে জানতে পারে। প্রথম যেদিন তুমি ঐ চিঠিটা নিয়ে বাড়ীতে ফিরে এসেছিলে, তোমার চোখ মুখ চেহারা দেখে সেইদিনই বুঝতে পেরেছিলাম। চিঠিটা পড়ে আবার বন্ধ করে রেখেছিলাম আমি।"

"তবে কেন কোনোদিন জিজ্ঞাসা করনি আমাকে কিছু?"

"ভেবেছিলাম, সময় হলেই তুমি নিজ থেকে আমাকে সব খুলে বলবে।"

মৃন্ময় জড়িয়ে ধরলো অপর্ণাকে "শুনবে তুমি? শুনবে তার সব কথা? বিশ্বাস করবে আমাকে?"

স্বামীর আরো কাছে সরে এসে অপর্ণা বললে, "শুনবো বৈকি! জানতাম একদিন তোমার সময় হবে, তুমি আমাকে কাছে ডাকবে, সব কথা বলবে, এতদিন আমি যে তারই প্রতীক্ষা করেছি। আজ সময় হয়েছে তোমার বলবার, আমার শোনবার। চলো।"

শোবার ঘরে যাবার আগে মৃন্ময় একবার থমকে দাঁড়িয়ে তাকালো আকাশের দিকে। সেই খসেপড়া চিরউজ্জ্বল স্মৃতির নক্ষত্রটি কোথায়? কোন অদৃশ্যলোকে হারিয়ে গেছে সে?

না। সে হারায়নি, আবার নতুন করে জ্বলবে সে, তমসার শেষে সূর্যোদয়ের মত, নতুন আকাশের পটভূমিকায়!

সোঁক হারাতে পারে?
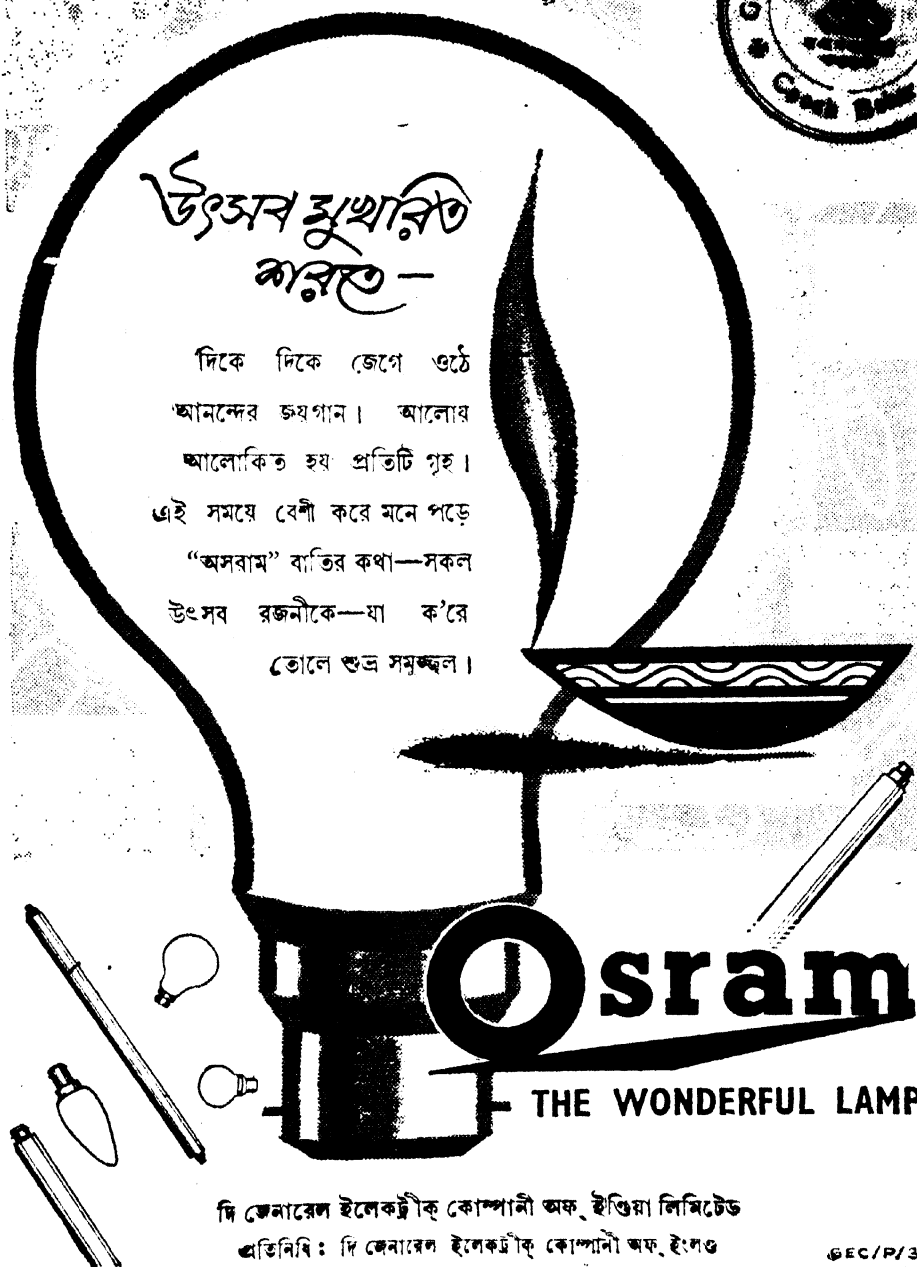
চক্রবৎ পরিবর্তন্তে

ডক্টর নবগোপাল দাস

অমিতাভ বসু মাত্র কয়েকমাস হ'ল দিল্লীতে এসেছেন। এরই মধ্যে এখানকার বাঙ্গালী গোষ্ঠীতে নিজের একটা প্রতিষ্ঠা তিনি অর্জন করে নিয়েছেন, যদিও তাঁর আচমকা উপ্‌চে-ওঠা আত্মম্ভরিতা মাঝে মাঝে কটু সমালোচনার বিষয়বস্তু হয়ে পড়ে।

কি কাজ তিনি করেন তা সঠিক কেউই বলতে পারে না। সরকারী বা বেসরকারী কোন দপ্তরেই তিনি চাকুরী করেন না এটা ঠিক, তবু প্রতিদিন (রবিবার এবং ছুটিরদিন বাদে) ঘড়িতে দশটা বাজবার কয়েক মিনিট আগেই তিনি বেরিয়ে পড়েন তাঁর ছোট অস্টিন গাড়ীটা নিয়ে। সারাদিনের পর ফ্ল্যাট্‌এ ফিরে আসেন ছটা সাড়ে ছটার সময় আন্দাজ।

অনেকে বলে, তিনি নাকি ফ্রীল্যান্স জার্নালিস্ট। কারও মতে তিনি কোন বৈদেশিক দূতাবাস থেকে মোটা রকমের দক্ষিণা পান, তাদের হয়ে প্রোপাগাণ্ডার গন্ধবিহীন প্রোপাগাণ্ডা করবার জন্য। সে যাই হোক্, গল্‌ফ্ ক্লাব রোড-এ ছোট একটি ফ্ল্যাট্-এ থাকবার এবং মাঝে মাঝে বন্ধুদের নেমন্তন্ন করে খাওয়াবার পয়সার অভাব তাঁর হয় না।

বলা বাহুল্য, তিনি ব্যাচেলার, অন্ততঃ দিল্লীর সমাজে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যাচেলার বলেই পরিচিত। তাঁর দিল্লী-পূর্ব জীবনের কাহিনী জানবার ঔৎসুক্য অনেকেরই হয়েছে। কিন্তু এই অধ্যায় সম্পর্কে নিতান্ত ছোট একটি বিবৃতিও অমিতাভ বসু দেননি। তবু যারা এসম্বন্ধে স্বাধীনভাবে রিসার্চ করেছে তাদের মতে অমিতাভ বসু ব্যাচেলার নন, বিপত্নীক। কয়েক বছর আগে নাকি স্ত্রী মারা যান। তারপর তিনি অধিকাংশ সময় কাটান ইউরোপে এবং আমেরিকায়, দেশে ফিরেছেন মাস কয়েক হ'ল, বন্ধনহীন। সোজা দিল্লীতে এসে আস্তানা গেড়েছেন। প্রথমে ছিলেন হোটেলে। কিন্তু হোটেলের কোলাহল এবং হরেকরকম লোকের সংস্রব বরদাস্ত হয়না বলে দু'ঘরওয়ালা এই ছোট্ট ফ্ল্যাটটি তিনি নিয়েছেন।

সুপ্রিয়কে তিনি যেন একটু বিশেষ স্নেহ করতে সুরু করেছিলেন। অনেক সময়ই লক্ষ্য করেছি, একঘর লোকের মাঝখানে সুপ্রিয়কে খুঁজে নিয়ে তিনি কুশল প্রশ্ন করতেন, জিজ্ঞাসা করতেন বস্-এর সম্বন্ধে তার প্রথম ভীতিটা কেটে গেছে কিনা। সুপ্রিয় সম্প্রতি সেক্রেটারিয়েটে ঢুকেছে, অ্যাসিষ্ট্যান্ট্ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হিসেবে। নতুন চাকুরী।

তবু সে একটু চম্‌কে উঠেছিল যখন তার সতীর্থ মহাদেবন্ তাকে এসে বল্‌ল যে কে একজন মিঃ বসু টেলিফোনে ডাক্‌ছেন।

মিঃ বসু? অমিতাভ বসু নয় ত?

সুপ্রিয় ছুটে গেল টেলিফোনে। না, ভুল হয়নি, অমিতাভ বসুই বটে।

—সুপ্রিয়, আজ সন্ধ্যায় তুমি কি করছ...টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে প্রশ্ন এল।

—বিশেষ কিছুই না। সুপ্রিয় জবাব দিল।

—তাহলে আমার এখানে খেতে এসো। আন্দাজ আটটায়। আর কেউ থাক্‌বে না, কেবল তুমি আর আমি।

কৌতূহল সম্বরণ করতে পারল্ না সুপ্রিয়। প্রশ্ন কর্‌ল, উপলক্ষ্যটা কি, মিঃ বসু?

—এলেই দেখতে পাবে। এসো কিন্তু। বলে তিনি টেলিফোনটা ছেড়ে দিলেন।

আটটার বেশ কয়েক মিনিট আগেই সুপ্রিয় পৌঁছল মিঃ বসুর ফ্ল্যাটে। তিনি বোধহয় অনুমান করতে পেরেছিলেন যে সুপ্রিয় একটু আগেই আস্‌বে। কলিং বেল্‌টা টিপতেই দরজা খুলে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

—এসো, এসো।... সাগ্রহে অভ্যর্থনা জানালেন তিনি।

আগেই বলেছি, দু'খানা ঘরওয়ালা ফ্ল্যাট, ছোট্ট একটি বারান্দা, বিলিতি কায়দায় বাথরুম এবং রান্নাঘর। অত্যন্ত ফিটফাট ব্যবস্থা।

শোবার ঘরে প্রবেশ করবার সৌভাগ্য সুপ্রিয়র এখন পর্যন্ত হয়নি, তবে বস্‌বার ঘর অর্থাৎ লিভিংরুমটা অত্যন্ত কেতাদুরস্তভাবে সাজানো। অপ্রয়োজনীয় আস্‌বাবের আবর্জনা নেই, আছে দেয়াল ঘেঁষা একটা ডিভ্যান, গোটা দুই হেলান দেওয়া চেয়ার, গোটা দুই পুফে, একপাশে ছোট টেবিল এবং তিনটে চেয়ার, এটাতে লেখার এবং খাওয়ার কাজ উভয়ই সম্পন্ন হয়, আর এককোণে ইরোকুই আমেরিকান্ ইণ্ডিয়ানদের একজন প্রধানের বিরাট এক কাঠের মূর্তি।......হ্যাঁ, আরও একটা জিনিষ ঢুকলেই নজরে আসে, খোলা সেল্‌ফে একগাদা বই, মিঃ বসুর বিস্তৃত সুরুচির পরিচায়ক, আর তার ওপর একটি মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের ছবি, নামকরা স্টুডিওতে তোলা। ছবিটা কার, এর আগে সুপ্রিয় একদিন প্রশ্ন করেছিল, তিনি সংক্ষেপে জবাব দিয়েছিলেন, আমার এক বন্ধুর। বন্ধুর পরিচয় বা ইতিবৃত্ত এমনকি তাঁর নাম পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করতে সুপ্রিয় সাহস পায় নি, এমনই গম্ভীরভাবে মিঃ বসু জবাব দিয়েছিলেন।

ঘরে ঢুকেই সুপ্রিয়র নজর গেল দেয়ালের দিকে। ঐ দেয়াল এতদিন ছিল একেবারে ফাঁকা, দেখলে সেখানে পরপর তিনখানা ছবি টাঙানো রয়েছে। আর্ট-অনভিজ্ঞ সুপ্রিয়ও স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল যে তার মধ্যে দু'খানা অত্যন্ত অনবদ্য, যদিও সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্টাইলে আঁকা। তৃতীয় ছবিখানা নিতান্ত গতানুগতিক।

সুপ্রিয়র চোখ অনুসরণ করছিলেন মিঃ বসু। বললেন, পরশুদিন এসেছে এই ছবি তিনখানা।

—কোন একজিবিশন্ থেকে কিনেছেন বুঝি? ...প্রশ্ন করল সে। দু'খানা ছবি খুবই ভাল লাগছে, কে এই দু'জন আর্টিস্ট? ঐ তৃতীয় ছবিখানা কিন্তু এদুটোর সঙ্গে একেবারেই মানায় নি।

—কিনেছি গত কয়েক বছরে। তিনখানা ছবিই এককালে প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। এই তিনটে ছবিই এঁকেছেন একজন আর্টিস্ট, অবশ্য জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে।

—হ'তেই পারে না!......অবিশ্বাসের সুরে প্রতিবাদ জানাল সুপ্রিয়।

—আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয় বটে, কিন্তু সত্যি বলছি, আর্টিস্ট একই লোক এবং এখনও বেঁচে আছেন।

ছবিগুলোর কাছে এগিয়ে গেল সুপ্রিয়। কে বল্‌বে একই লোকের হাতের স্পর্শ রয়েছে এই ছবি তিনখানায়? আর্টের সুক্ষ্মানুসুক্ষ্ম রূপ সুপ্রিয় হয়ত বুঝতে পারে না, তবু তার স্থূল দৃষ্টি এতখানি ভুল করতে পারে?

—কে এই আর্টিস্ট?......প্রশ্ন কর্‌ল সে।

—পরে বল্‌ব। তার আগে খাওয়াটা সেরে নেই আমরা। তোমার খিদে পেয়েছে নিশ্চয়?

খিদে যদিও তেমন পায়নি, (খিদের চেয়ে

কৌতূহলই পেয়েছিল বেশী) তবু সুপ্রিয় বুঝতে পেরেছিল যে মিঃ বসু তার কৌতূহল অবিলম্বে চরিতার্থ করতে নিতান্তই অনিচ্ছুক। কাজেই বললে, বেশ!

রান্নার ব্যাপারেও মিঃ বসুর খানিকটা দখল আছে। বেয়ারা শুকুল সিং-এর সহায়তায় তিনি যে ডিনারটা তৈরী করেছিলেন তা' অপূর্ব না হলেও চলনসই-এর অনেক উর্ধ্বে। যাকে বলে উপভোগ করা, ডিনারটা সত্যি উপভোগ করলে সুপ্রিয়।

টেবিল পরিষ্কার করে ট্রের ওপর কফির যাবতীয় সাজসরঞ্জাম রেখে সেলাম করে শুকুল চলে গেল। মিঃ বসু একটা হাভানা চুরুট ধরালেন।

তারপর বললেন, তোমার তাড়া নেই ত?

ঘাড় নেড়ে সুপ্রিয় জবাব দিল, না।

মিঃ বসু সুরু করলেন ছবি তিনখানার ইতিবৃত্ত।

সে আজ প্রায় সাত-আট বছর আগেকার কথা। আর্টিস্ট সদাশিব লাহিড়ীর নাম লোকে সবেমাত্র জানতে সুরু করেছে। কলকাতার গভর্ণমেন্ট স্কুল অব আর্ট থেকে পাশ করে দশ-বারো বছর ধরে সদাশিব চেষ্টা করছে আর্টিস্ট হিসেবে অন্ততঃ মাঝারি রকমের একটা প্রতিষ্ঠা জোগাড় করতে, কিন্তু সফলকাম হয়নি। তেমন কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার ছিল না, স্ত্রী, বিধবা মা এবং নিজের জন্য মোটামুটি ডালভাতের ব্যবস্থা হলেই সে খুসী হয়, আর চায় খানিকটা উদবৃত্ত পয়সা যা দিয়ে রং, তুলি, ক্যানভাস এবং কাগজের খরচটা সে মেটাতে পারে। কিন্তু আর্টিস্টদের দুর্দশার কথা ত তুমি জান। শুধু আমাদের দেশে কেন, ওদেশেও যে ক'জন আর্টিস্ট খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখতে পেয়েছেন তাঁদের সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়। সদাশিব কিছুতেই একটা হিল্লে করে উঠতে পারছিল না এবং মরিয়া হয়ে ভাবছিল যে সোজাসুজি একটা পাবলিসিটি ফার্মে কমার্শিয়াল আর্টিস্ট-এর চাকুরীতে ঢুকে পড়বে কিনা।

এমন সময় হঠাৎ আমার সঙ্গে তার পরিচয় হয়ে গেল এক বন্ধুর বিয়ে বাড়ীতে। সদাশিব এবং আমি উভয়েই ছিলাম সেখানে আমন্ত্রিত অতিথি।

আমি তখন সবে মাত্র বিলেত থেকে ফিরেছি, ব্যারিস্টারি পাশ করে। বাবা মারা গেছেন, অনেক টাকার একমাত্র উত্তরাধিকারী আমি। অনুপার্জিত এই অর্থের সদ্ব্যবহার করতে হবে এই রকম একটা অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা আমার মনের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কিভাবে তা করা যায়, অথচ আমিও একটু বাহবা পাই, তা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ......সদাশিবের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলার পর আমি যেন একটা পথ খুঁজে পেলাম।

বললাম, আমার মনে হয় আপনার ছবির একটা একজিবিশন করা উচিত। আর তার আগে এবং সে সময়ে বেশ খানিকটা প্রোপাগান্ডা করতে হবে। আপনার নিজের এবং আপনার স্টাইল অব পেন্টিং সম্বন্ধে।

ম্লান হাসি হেসে সদাশিব বলল, অনেক টাকার দরকার মিঃ বসু। ছবি আঁকার সাজ-সরঞ্জাম কেনবার মত পয়সাই জোগাড় করতে পারি না, আর জাঁকজমক করে একজিবিশন করব!

আমি বললাম, আমাকে বিশ্বাস করুন, সদাশিববাবু, আমি নিজেকে খুবই কৃতার্থ মনে করব, যদি আপনাকে আমাদের দেশের গুণী-লোকদের সামনে উপস্থাপিত করবার সুযোগটুকু আমি পাই। ...তবে তার আগে আপনার ছবির সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়া দরকার।

স্থির হলো যে, পরের দিন আমি সদাশিব লাহিড়ীর বাড়ীতে যাব, তার আঁকা ছবি দেখব এবং আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি সেখানেই বসে ঠিক করব।

স্টুডিওটা সদাশিবের নিজের বাড়ীতেই। উত্তর কলকাতার সরু নোংরা এক গলির মধ্যে এই বাড়ী। তারই তিনতলার চিলেকোঠায় তার স্টুডিও, কারণ তবু খানিকটা আলোবাতাস এখানে পাওয়া যায়।

সদাশিবের আঁকা ছবিগুলো দেখলাম। দশবারো বছরের পরিশ্রমের ফল, কতকগুলো নিতান্ত চলনসই, কতকগুলো তার উর্ধ্বে, কয়েকখানা খুবই উঁচুদরের। বিদেশের আর্ট-গ্যালারির ঘুরে ঘুরে ছবি সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান আমি অর্জন করেছিলাম। আমার মনে হ'ল, সদাশিবের মধ্যে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, উপযুক্ত উৎসাহ পেলে আরও নিখুঁত কাজ তার হাত দিয়ে বেরুতে পারে।

তবু হয়ত আমি এত তাড়াতাড়ি তার পেট্রন হতে রাজী হতাম না, যদি সেদিনই সেখানে না দেখতাম বনলতাকে।

বনলতা সদাশিবের স্ত্রী। বনের হরিণীর মত ভীরু, চঞ্চল তার চোখ, আর বনের লতার মত উচ্ছল তার প্রকাশ। লক্ষ্য করলাম, সদাশিব বনলতাকে গভীরভাবে ভালবাসে, একমুহূর্ত চোখের আড়াল হতে দেয় না।

চা এবং আহার্য বনলতা নিজেই নিয়ে এসে-ছিল, আলাপ পরিচয় সহজেই হয়ে গেল। বন-লতাকে বললাম আমার আইডিয়ার কথা। একটু বাড়িয়েই বললাম সদাশিবের ছবির সম্বন্ধে আমার সপ্রশংস অভিমত।

কৃতজ্ঞভাবে বনলতা তাকিয়ে রইল আমার দিকে। বুঝলাম, প্রথম পরিচয়েই সে আমাকে তাদের ছোট্ট পরিধির মধ্যে টেনে নিয়েছে। সদা-শিব আমার সাহায্য গ্রহণ করতে একটু ইতস্ততঃ করছিল, কিন্তু আমি তার কুণ্ঠাকে অপসারণ করে দিলাম আমার বস্তুতান্ত্রিক লজিকের আঘাতে। নিশ্চুপ থেকেও বনলতা আমার লজিককে সমর্থন করল।

মাস কয়েক পরে কলকাতার সৌখীন পাড়া পার্ক স্ট্রীটে আমার পেট্রনেজে উদ্ঘাটিত হ'ল শিল্পী সদাশিব লাহিড়ীর চিত্রপ্রদর্শনী।

আমার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হল। জনসাধারণ দেখতে পেল যে সদাশিবের আর্টের মধ্যে আছে নতুন রকমের একটা বলিষ্ঠতা, তার সঙ্গে মেশানো রয়েছে বাংলাদেশের রোমান্টিক আলো-ছায়ার অস্পষ্টতা। প্রায় দশবারোখানা ছবি বিক্রী হ'ল, তার মধ্যে আমি বেনামীতে কিনলাম এই ছবিখানা—সদাশিব এর নাম দিয়েছিল "মধু-মিলন"।

এই প্রদর্শনী উপলক্ষে আমাকে বারবার যেতে হয়েছে সদাশিবদের বাড়ীতে, আর সদাশিব বনলতাও এসেছে আমার কাছে বালিগঞ্জে। অনেক সময় বনলতা একাই এসেছে, কারণ সদা-শিবকে হয়ত ব্যস্ত থাকতে হয়েছে ছবিগুলো বাঁধাই করা, তার ডেলিভারি নেওয়া ইত্যাদি নানা কাজে।

যা' অবশ্যম্ভাবী এবং স্বাভাবিক তাই হ'ল। বনলতা আমার প্রেমে পড়ল।

আমার কথা জিজ্ঞাসা করছ? পুরুষ মানুষেরা ঠিক প্রেমে পড়তে জানে না, প্রেমের আনাচে-কানাচে তারা ঘুরে বেড়ায় মাত্র। কাজেই বনলতার প্রেমে আমি পড়েছিলাম একথা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারব না।

তবে বনলতাকে আমার খুবই ভাল লেগে-ছিল এবং খুবই আনন্দ পেয়েছিলাম আমার প্রতি তার ভালবাসায়। সদাশিবকে এবং চির-কালের সংস্কারকে অতিক্রম ক'রে যে সে আমাকে বেছে নিয়েছে এই অনুভূতিই আমাকে তৃপ্তি দিয়েছিল সব চেয়ে বেশী।

প্রদর্শনী শেষ হবার বছরখানেকের মধ্যে বনলতাকে নিয়ে আমি চলে গেলাম সিঙাপুরে। হিন্দু বিবাহবিচ্ছেদ আইন তখনও প্রবর্তিত হয়নি, তাই তাকে বিয়ে করতে পারলাম না, কিন্তু সিঙাপুরের সমাজে বনলতাকে আমার বিবাহিতা স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে এতটুকু সঙ্কোচ আমার হয়নি। আমার বন্ধু এবং সতীর্থরাও তাকে গ্রহণ করল মিসেস বসুরূপে।

সদাশিবের খোঁজখবর রাখিনি অনেকদিন। বছর দুই পরে একটা কেস্ উপলক্ষে আমাকে আসতে হ'ল কলকাতায়। বনলতাকে সঙ্গে নিয়ে আসিনি।

আমার মক্কেলদের মাধ্যমে খোঁজ নিলাম সদাশিবের। শুনলাম, বনলতার অন্তর্ধানে সে একেবারে ভেঙে পড়েছে, হাতে তুলি ধরতেই চায় না, প্রদর্শনীতে দেখানো ছবি এবং তারপর যে কয়মাস বনলতা তার কাছে ছিল সেসময়কার আঁকা কয়েকখানা ছবি বিক্রী করে কোন রকমে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে। ...একবার ইচ্ছা হয়েছিল সদাশিবের সঙ্গে দেখা করতে, তার কাছে ক্ষমা চাইতে, কিন্তু মেলোড্রামা আমি কোন-দিনই পছন্দ করিনা, তাই ইচ্ছাটা চেপে গেলাম।

কাজ শেষ করে ফিরে এলাম সিঙাপুরে। লক্ষ্য করলাম, আমার অনুপস্থিতিতে বনলতার খানিকটা পরিবর্তন ঘটেছে। সে আজকাল অনেক সময়ই অন্যমনস্ক হয়ে থাকে, বাইরে কোথাও বেরুতে চায় না, যে উদ্দাম ভালবাসার বন্যায় ভেসে সে আমার কাছে এসেছিল তাতে যেন ভাটা লেগেছে।

ডাক্তার বন্ধুরা বললেন, একটি ছেলে বা মেয়ে হ'লে এ মেলাংকোলিয়া হয়ত সেরে যাবে। কিন্তু চাইলেই ত পাওয়া যায় না।

আরও বছরখানেক কেটে গেল এইভাবে। আমি অনুভব করতে লাগলাম যে বনলতা অন্য লোকের মারফৎ সদাশিবের খোঁজখবর নিচ্ছে। বুঝতে বাকী রইলনা যে, দ্বিতীয় রাউণ্ডে আমি জিতলেও তৃতীয় রাউণ্ডে সদাশিব জিততে সুরু করেছে। ঈর্ষার ঢেউ আমার মনকে উদ্বেলিত ক'রে তুলল।

সে বিকেলটা আমার বেশ মনে পড়ে। কোর্ট থেকে এসেছি, কোট এবং টাই খুলে আরাম-কেদারায় বসব, এমন সময় বনলতা নিঃশব্দে

এসে আমার হাতে দিয়ে গেল কল্‌কাতা থেকে প্রকাশিত একটি বাংলা সংবাদপত্র। নীল পেন্সিলে দাগ দেওয়া আছে প্রায় আধকলম।

পড়্‌লাম। সংবাদপত্রের নিজস্ব আর্ট রিপোর্টারের বিবরণী। সুদীর্ঘ চার বছর পরে শ্রীসদাশিব লাহিড়ী আবার এক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন—এবার উদ্‌ঘাটন করেছেন সরকারের একজন মন্ত্রী। আর্টিষ্ট-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করার প্রসঙ্গে রিপোর্টার বলেছেন, "অনেকের হয়ত মনে আছে চার বছর আগে সহরের এই অঞ্চলেই এঁর প্রথম চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। আর্টিষ্ট হিসাবে তাঁর খ্যাতি তখন থেকেই। তারপর পারিবারিক বিপর্যয়ে তিনি প্রায় তিন বছর ছবি আঁকা বন্ধ রাখেন। কিন্তু গত এক বছর ধরে তিনি সম্পূর্ণ নতুন টেক্‌নিক-এ ছবি আঁকতে সুরু করেছেন। চিত্রানুরাগীরা তার নিদর্শন পাবেন এই প্রদর্শনীতে। প্রদর্শনীতে ঢুকতেই দর্শকদের চোখে পড়বে তাঁর তীব্র নির্মম ছবি "ঝড়ের পরে।" এই যে ঝড় এ নৈসর্গিক ঝড় নয়, এ হচ্ছে আত্মিক ঝড়, যার আঘাত মানুষের কমনীয় সব বৃত্তিকেই করে দেয় বিধ্বস্ত। ধ্বংসের এই রূপ শিল্পী ফুটিয়ে তুলেছেন একটি তরুণীর মুখের কয়েকটি রেখায়, তার চোখের ভঙ্গীতে। সবাই প্রশ্ন করছে, কে এই তরুণী?"

আরো নানাকথা বলেছিলেন আর্ট রিপোর্টার, কিন্তু সেগুলো অনেকখানি অপ্রাসঙ্গিক।

আমি তাকালাম বনলতার দিকে। দেখি, সে থরথর করে কাঁপছে।...চেষ্টা কর্‌লাম তাকে শান্ত করতে।

কিন্তু ব্যর্থ হ'ল আমার প্রয়াস। পরেরদিন বনলতা আমাকে বল্‌লে যে, সে কল্‌কাতায় ফিরে যাবে, সদাশিবের কাছে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর বল্‌লাম, তুমি চলে যেতে চাও, আমার দিক থেকে আপত্তি তুলব না, কিন্তু একটা প্রশ্ন কর্‌ছি, সদাশিব কি তোমাকে গ্রহণ করবে?

উজ্জ্বল বিশ্বাসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ল বনলতার মুখ। বল্‌লে, আমি জানি, আমি কাছে গিয়ে দাঁড়ালে উনি আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন না।

—কিন্তু এই তিন বছরের অধ্যায় ত একেবারে মুছে ফেলে দিতে পারবে না সে। তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবন কি সুখের হবে?

তেমনি দৃঢ়তাব্যঞ্জক সুরে বনলতা বল্‌লে, আমি চেষ্টা কর্‌লে সব সম্ভব হবে।

এমন বিশ্বাসের সঙ্গে তর্ক করা নিরর্থক। বনলতাকে তুলে দিলাম কল্‌কাতাগামী প্লেনে। সঙ্গে সঙ্গে আমার এক মক্কেলের কাছে পাঠিয়ে দিলাম টেলিগ্রাম, তিনি যেন দমদমে উপস্থিত থাকেন। আর বল্‌লাম যে, সদাশিব লাহিড়ীর প্রদর্শনীতে "ঝড়ের পরে" ছবিটা যেন অবিলম্বে আমার জন্য বেনামীতে কেনা হয়—দাম যাই হোক্‌ না কেন।

চুরুটটা শেষ হয়ে এসেছিল, অমিতাভ বসু একটু থামলেন। টুকরোটা অ্যাস্‌ট্রেতে ফেলে দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন ছবিটার সামনে, সুপ্রিয়কে কাছে ডাকলেন।

—সদাশিব চিরকাল বেঁচে থাকবে শুধু এই ছবিটার জন্য।...অথচ, এর জন্য কৃতিত্ব দাবী করতে পারি আমি, যে সদাশিবের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করেছিলাম।

জিজ্ঞাসুভাবে সুপ্রিয় তাকাল।

বুঝতে পারলে না, সুপ্রিয়? সদাশিবের "মধুমিলন" উঁচু শ্রেণীর ছবি সন্দেহ নেই কিন্তু ওটা হচ্ছে মিলনের তারে বাঁধা, তাই ওটা যেন একটু বেশী সম্পূর্ণ। এরই পাশে "ঝড়ের পরে" ছবিটা দেখ। এখানে সে রূপ দিয়েছে বনলতাকে হারিয়ে তার মনে যে বিপ্লবের সৃষ্টি হয়েছিল তারই খানিকটা অংশকে। ভুলে যেয়োনা যে ছবিটা সে এঁকেছিল বনলতা চলে যাবার অনেকদিন পরে, যখন তার মুহ্যমান অবস্থা কেটে গেছে, তার স্থানে এসেছে তীব্র নিষ্ঠুরতা। বনলতার এই রূপক ছবির মধ্যে সে ঢেলে দিয়েছে তার ঘৃণামিশ্রিত অনুকম্পা।

ছবিটা ভাল করে দেখল সুপ্রিয়। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন মিঃ বসু।

তারপর প্রশ্ন কর্‌ল, আর এই তৃতীয় ছবিটা? এটাও ত সদাশিববাবুর আঁকা বল্‌ছেন, এটা কি তাঁর অল্পবয়সের আঁকা ছবি?

অমিতাভ বসু একটু হাস্‌লেন। বল্‌লেন, না, এটা হচ্ছে তার এখনকার ছবি। সেদিন কল্‌কাতায় সে আর একটা প্রদর্শনী করেছিল, আমি দেখতে গিয়েছিলাম। যে কখানা ছবি ছিল তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে কম নিকৃষ্ট মনে হ'ল, তাই কিনে ফেল্‌লাম। প্রদর্শনী শেষ হয়ে গেছে, আমার মক্কেল তিনখানা ছবিই একসঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

—কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, মিঃ বসু, যে আর্টিষ্টের কাছ থেকে আমরা "মধুমিলন" আর "ঝড়ের পরে" পেয়েছি তাঁর হাত দিয়ে এমন ছবি বেরুলো কি করে? বিশেষ করে এত বছর সাধনার পর?

অমিতাভ বসু আবার সুরু করলেন তাঁর কাহিনী।

বনলতা যখন সদাশিবের কাছে ফিরে গেল তখন আমি এই ভয়ই করেছিলাম। আমার মতে, সদাশিবের আর্টিষ্টিক অবচেতন মন খুব বেশী শক্ খেল যখন বনলতা তার সামনে এসে দাঁড়াল অনুশোচনার পরিধেয় প'রে। প্রেমের বন্যায় বনলতা তার কাছ থেকে চলে যাওয়াটাকেও অবশেষে সে মেনে নিতে পেরেছিল, কিন্তু কোনই সঙ্গতি সে খুঁজে পেল না তার এই হাস্যকর প্রত্যাবর্তনে। সমস্ত জিনিষটা তার কাছে মনে হ'ল একটা বিরাট প্রহসন, যেন একমাত্র তাকেই কেন্দ্র করে। স্বভাবসুলভ ঔদার্য তাকে বাধা দিল বনলতাকে রূঢ়ভাবে ফিরিয়ে দিতে, কিন্তু যে ব্যালান্স সে ধীরে ধীরে খুঁজে পেয়েছিল এবং যার ফলে সে সৃষ্টি করতে পেরেছিল "ঝড়ের পরে"র মত ছবি তা আবার হারিয়ে গেল বনলতার এই স্বার্থপর ব্যবহারে। ...আমি বনলতাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারব না।

—কিন্তু আর কোন পথ খোলা ছিল কি তার?

—কেন, বাকী জীবনটা কি সে সিঙ্গাপুরে কাটিয়ে দিতে পারত না? আর তা' যদি নিতান্তই অসম্ভব হয়ে উঠেছিল তাহ'লে সে আলাদা হয়ে থাকতে নিশ্চয়ই পারত। আমি এতটুকু বাধা দিতাম না। সদাশিবের জীবন আবার বিপর্যস্ত কর্‌বার কোনই অধিকার ছিল না তার!

—ওঁদের দাম্পত্যজীবন এখন কেমন চল্‌ছে আপনি জানেন কি?

—জানি বৈকি। সদাশিব ত আমারই বন্ধু, ওর খবর আমি সব সময়ই রাখি। ...বাইরে থেকে দেখতে গেলে তারা দুজনে সুখে ঘরসংসার কর্‌ছে, অর্থাৎ যে তিন বছর বনলতা আমার কাছে ছিল সেটা ভুলে যেতে চেষ্টা কর্‌ছে। কিন্তু ভোলা কি এতই সহজ? বিশেষ করে সদাশিবের মত আর্টিষ্ট-এর পক্ষে?

—এবারকার প্রদর্শনীতে সদাশিববাবুর সুখ্যাতি কেমন হ'ল?

—সুখ্যাতি? সুখ্যাতির বদলে চারিদিক থেকে টিট্‌কারি পেয়েছে সে। সবাই বল্‌ছে, সদাশিব লাহিড়ীর বানপ্রস্থে যাবার সময় হয়ে এসেছে, তিনি যেন ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়ে ভগবানের চিন্তায় মনোনিবেশ করেন।

—লোকেদের এ ভারী অন্যায় কিন্তু!

—তা' আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু তুমিই বলো, সুপ্রিয়, "মধুমিলন" আর "ঝড়ের পরে"র পাশাপাশি প্রবীণ বয়সে আঁকা এই "চক্রবৎ পরিবর্তন্তে" কি বিসদৃশই না ঠেকছে!

অমিতাভ বসুর প্রগল্‌ভতায় সুপ্রিয়র সাহস অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল। প্রশ্ন কর্‌ল, বনলতা দেবীর কোন ফটো আপনার কাছে নেই?

হাস্‌লেন অমিতাভ বসু। বল্‌লেন, ফটো? তা' অ্যালবাম খুঁজলে স্ন্যাপ্‌শট্‌-এর মধ্যে নিশ্চয়ই দু'একটা পাওয়া যাবে। তবে ষ্টুডিয়ো ফটো যাকে তোমরা বলো তা' নেই—যে কখানা ছিল সব বঙ্গোপসাগরে বিসর্জন দিয়ে এসেছি। আর তোমাকে ত আগেই বলেছি, আমার যথার্থ বন্ধু হচ্ছে সদাশিব, তার ফটো ঐ সেল্‌ফ-এর ওপর রয়েছে!

ওটা তাহ'লে সদাশিব লাহিড়ীর ফটো? আজ অসতর্ক মুহূর্তে ফটোটার পরিচিতি দিয়ে ফেল্‌লেন অমিতাভ বসু।

পূজাঞ্জলি

অনিল ভট্টাচার্য

আমার মন চাহে না পূজাঞ্জলি
দিতে চরণ তলায়
ফুল যা আছে মালা গেঁথে
পরাতে চাই গলায়।।
ওগো আমার প্রেমের ঠাকুর
তোমার হাতের বাঁশীর সুরে
নিত্য আমার অন্ধ-মনে
প্রেমের প্রদীপ জ্বালায়।
ফুল যা আছে মালা গেঁথে
পরাতে চাই গলায়।।
সাধ জাগে মোর দেউল ছেড়ে
এস আমার ঘরে
আমার দুটি নয়ন রহুক
তোমার নয়ন পরে—
শূন্য হাতের প্রণাম রেখে
মন ভরে না তোমায় ডেকে
অভিসারের স্বপ্ন দেখি
জীবন-পথের চলায়।
ফুল যা আছে মালা গেঁথে
পরাতে চাই গলায়।।

সোনাডাঙ্গার চর

রনজিৎকুমার সেন

এখানে ঝিঁঝিঁর ডাক, ওখানে কুকুরের আর্তনাদ ও পাশের জঙ্গল থেকে শেয়ালের চিৎকার ভেসে আসছে, এ পাশের সরু খালে জলের ক্ষীণ স্রোত। যমদের আস্তানা এখান থেকে বেশী দূরে না। এক একটা মড়া এসে হাজির হচ্ছে এই শ্মশানে, নিতাই ডোম আর তার ডোমনী কোমরে গামছা জড়িয়ে এসে চিতা জ্বালিয়ে দিচ্ছে। যাদের মড়া, তাদের হাতের চারটে আধুলি পেলেই তারা খুসী। কাছে যে বনঝাউ আর আশ-স্যাওড়ার মাথায় মাথায় বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ চ'লেছে। গ্রামবাংলার শ্মশানের এই রূপ হয়তো তুমি দেখনি মালতি, তবু বার বার তুমি আমার কাছে পাড়াগাঁয়ের গল্প শুনতে চেয়েছ। কতবার কত গল্পই তো তোমাকে ব'লেছি! ব'লেছি—কাঁচা মাটির রাস্তায় বর্ষার জল জ'মে কেমন কাদা হয়ে যায়, ঘন ঘাসের বুক ঠেলে গর্ত থেকে জোঁক বেরোয়, কেঁচো বেরোয়, সাপ আসে ফণা উঁচিয়ে। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের মানুষের তাতে ভয় নেই; পায়ের তলায় সমস্ত সরীসৃপকে মাড়িয়ে ক্রোশের পর ক্রোশ সেখানে কত মানুষ অন্ধকারে পথ চলে! ক'লকাতার ইলেকট্রিকের আলোয় জ'ন্মে স্বচ্ছ মোজাইক ঘরে যৌবন কাটিয়ে তুমি তা কল্পনাই ক'রতে পারো না মালতি। কতবার শুনতে গিয়ে তোমার গা শিউরে উঠেছে, ব'লেছ : 'বাব্বাঃ, সেখানে নাকি আবার মানুষ থাকে!' কিন্তু থাকে, তবু থাকে, থাকে ব'লেই তো আজও তারা ক্ষেতে খামারে ফসল ফলিয়ে গাড়িতে গাড়িতে চালান দিয়ে ক'লকাতার সুখী মানুষগুলোর ক্ষুধা নিবৃত্ত ক'রছে! তুমি তা জানো না, জানতে চাওনি, তুমি শুধু চেয়েছ গল্প শুনতে। এখনও এই যে এত রাত হলো, বারোটার ঘর পেরিয়ে গেল কাঁটা, এই যে মাথার উপরে পাখা ঘুরছে, তবু তোমার ঘুম আসছে না, তবু ব'লছো : 'গল্প বলো, পাড়াগাঁয়ের গল্প।'

তোমাকে গল্প শোনাতেই তাই আমার জেগে থাকা। ঘড়িতে বারোটার ঘর পেরিয়ে গেছে কাঁটা। আর জেগে থাকা উচিত নয়, শরীর খারাপ হবে, আবার তো কাল সেই ভোরে উঠেই গৃহস্থালীর মধ্যে জড়িয়ে ফেলবে নিজেকে। ঘুমোও, এবারে ঘুমোও তুমি, আমি গল্প বলছি, পাড়াগাঁয়েরই গল্প। শেষ গল্প পাড়াগাঁয়ের, শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ো তুমি মালতি। তুমি ঘুমোলে তবে আমার ছুটি। কাল থেকে তোমাকে শুধু সহরের গল্প শোনাবো; ছোট সহর, বড় সহর, নানা সহরের গল্প। আজকের গল্প শেষ গল্প পাড়াগাঁয়ের। ঘুমোও তুমি মালতি, আমি গল্প বলছি।

সেদিনও আজকের এই রাত্রির মতই ঘড়িতে বারোটার ঘর পেরিয়ে গেছে কাঁটা। সোনাডাঙ্গা গাঁয়ে তখন কেউ আর জেগে নেই। কিন্তু কেন যেন চোখে আমার আসি-আসি ক'রেও ঘুম আসছে না। মামারবাড়িতে থাকি, বছর খানেক আগে মামিমা সংসার থেকে বিদায় নিয়েছেন। সেই থেকে মামা তাঁর ছোট ছোট দুটি ছেলেকে পাশে নিয়ে বড়ঘরে শোন; দাওয়ার একটা পাশ টিন দিয়ে ঘেরাও ক'রে নেওয়া হয়েছিল, সেখানেই একটা ভাঙা তক্তপোষে আমার শোবার যায়গা। সামনের দিকে একটা দরজা, তার দু'পাশে দু'টো জানালা। জানালা দু'টো খোলাই থাক'তো, দরজা খুলে ইচ্ছে খুসী মতো বাইরে বেরোতে পারতাম। ভয় ব'লে কিছু জানতাম না। তবু মাঝে মাঝে মামা ভয় ধরিয়ে দিতে চাইতেন; ব'লতেন : 'অনেক সময় মধ্য রাত্রে বাইরে গিয়ে তুই আর ঘরে এসে দরজা বন্ধ ক'রে শুস্‌ না কার্তিক; শেষ পর্যন্ত যা দু'চারখানা কাপড়-চোপড় আছে, তাও চুরি হ'য়ে যাবে।'

ব'লতাম, 'কই, এমন তো মনে পড়ে না। বাইরে গেলেও আমি তো ঘরে এসে আবার দরজা বন্ধ ক'রেই শুই!'

মামা ব'লতেন, 'আমার ঘুম খুব পাতলা, জানিস তো! দরজা বন্ধ ক'রলে তার আওয়াজ আমি নিশ্চয়ই টের পাই। তোকে বোধ করি নিশির ডাকে পায় কার্তিক, কখন বেরিয়ে গিয়ে আবার কখন এসে শুয়ে পড়িস, তা তুই নিজেই জানিস না।'

ভাবলাম, এ বলেন কি মামা! তা যদি হয় তবে তো ভালো নয়। কিন্তু মন্দের দিকটা যে রক্ষা ক'রবে, সংসারে এমন মানুষ ছিল না। নিঃসঙ্গ শয্যায় সারা রাত একা একা ছট্‌ফট্‌ ক'রে কাটাই। কতই বা তখন বয়স, খুব বেশী হ'লে চব্বিশ কি পঁচিশ। গায়ে আমার অমিত শক্তি, মনে আমার অফুরন্ত উৎসাহ। কিন্তু সেই মনে মাঝে মাঝে যে বিষণ্ণতা এসে ভর না ক'রতো, এমন নয়। তার দু'টো কারণ ছিল। প্রথমটা—বেকার হ'য়ে মামার ধিক্কারের পাত্র হ'য়ে আছি, আর দ্বিতীয়টা—আমার জীবনে পর পর অনেকগুলো শোক। বাবা গেলেন, মা গেলেন, একমাত্র দিদি ছিল সে গেল, তারপর যে মামিমা সংসারের ভাগেন মাত্রেরই বিভীষিকা সদৃশ, আমি সেই মামিমার অফুরন্ত স্নেহ লাভ ক'রেও দীর্ঘদিন তাঁকে কাছে পেলাম না, তিনিও চ'লে গেলেন। এতগুলো শোক পর পর সহ্য ক'রেও আমি যে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারতাম, সেইটেই আশ্চর্য্যের।

কিন্তু কই, এখনও তুমি চোখ মিট্‌মিট্‌ ক'রছো মালতি, এখনও তোমার ঘুম আসছে না? আজ তোমার কি হ'লো, বলো তো? দৈনিক মুখে মুখে তোমাকে গল্প না শুনিয়ে আমি যদি কাগজ-কলম নিয়ে গল্প লিখতাম, তবে তোমার মতো বাংলাদেশের অনেক মালতির কাছে আমি এতদিনে মস্ত বড় সাহিত্যিক নাম কিনতে পারতাম। শুনে অভিমানে তোমার ঠোঁট ফুললো তো? কিন্তু না, না লক্ষ্মীটি, এই আমি গল্প বল্‌ছি, একটুও আর থাম্‌বো না, একটুও আর তোমার চোখের পাতার দিকে তাকিয়ে অনামনস্ক হবো না, আমি গল্প ব'লছি, শোনো।—

—সেই রাতটা কি যেন আমার কী হ'লো! রাত বারোটা অবধি বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট্‌ ক'রলাম। ভিতর-ঘরে দু' ছেলেকে দু'পাশে

এসে আমার হাতে দিয়ে গেল কল্‌কাতা থেকে প্রকাশিত একটি বাংলা সংবাদপত্র। নীল পেন্সিলে দাগ দেওয়া আছে প্রায় আধকলম।

পড়্‌লাম। সংবাদপত্রের নিজস্ব আর্ট রিপোর্টারের বিবরণী। সুদীর্ঘ চার বছর পরে শ্রীসদাশিব লাহিড়ী আবার এক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন—দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছেন সরকারের একজন মন্ত্রী। আর্টিস্ট-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করার প্রসঙ্গে রিপোর্টার বলেছেন, "অনেকের হয়ত মনে আছে চার বছর আগে সহরের এই অঞ্চলেই এ'র প্রথম চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। আর্টিস্ট হিসাবে তাঁর খ্যাতি তখন থেকেই। তারপর পারিবারিক বিপর্যয়ে তিনি প্রায় তিন বছর ছবি আঁকা বন্ধ রাখেন। কিন্তু গত এক বছর ধরে তিনি সম্পূর্ণ নতুন টেক্‌নিক-এ ছবি আঁকতে সুরু করেছেন। চিত্রানুরাগীরা তার নিদর্শন পাবেন এই প্রদর্শনীতে। প্রদর্শনীতে ঢুক্‌তেই দর্শকদের চোখে পড়বে তাঁর তীব্র নির্মম ছবি "ঝড়ের পরে।" এই যে ঝড় এ নৈসর্গিক ঝড় নয়, এ হচ্ছে আত্মিক ঝড়, যার আঘাত মানুষের কমনীয় সব বৃত্তিকেই করে দেয় বিধ্বস্ত। ধ্বংসের এই রূপ শিল্পী ফুটিয়ে তুলেছেন একটি তরুণীর মুখের কয়েকটি রেখায়, তার চোখের ভঙ্গীতে। সবাই প্রশ্ন করছে, কে এই তরুণী?"

আরো নানাকথা বলেছিলেন আর্ট রিপোর্টার, কিন্তু সেগুলো অনেকখানি অপ্রাসঙ্গিক।

আমি তাকালাম বনলতার দিকে। দেখি, সে থর্‌থর্ ক'রে কাঁপছে।...চেষ্টা কর্‌লাম তাকে শান্ত করাতে।

কিন্তু ব্যর্থ হ'ল আমার প্রয়াস। পরেরদিন বনলতা আমাকে বল্‌লে যে, সে কল্‌কাতায় ফিরে যাবে, সদাশিবের কাছে।

আমি স্তম্ভিত হ'য়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর বল্‌লাম, তুমি চলে যেতে চাও, আমার দিক থেকে আপত্তি তুলব না, কিন্তু একটা প্রশ্ন করছি, সদাশিব কি তোমাকে গ্রহণ করবে?

উজ্জ্বল বিশ্বাসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ল বনলতার মুখ। বল্‌লে, আমি জানি, আমি কাছে গিয়ে দাঁড়ালে উনি আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন না।

—কিন্তু এই তিন বছরের অধ্যায় কি একেবারে মুছে ফেলে দিতে পারবে না সে? তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবন কি সুখের হবে?

তেমনি দৃঢ়তাব্যঞ্জক সুরে বনলতা বল্‌লে, আমি চেষ্টা কর্‌লে সব সম্ভব হবে।

এমন বিশ্বাসের সঙ্গে তর্ক করা নিরর্থক। বনলতাকে তুলে দিলাম কল্‌কাতাগামী প্লেনে। সঙ্গে সঙ্গে আমার এক মক্কেলের কাছে পাঠিয়ে দিলাম টেলিগ্রাম, তিনি যেন দমদমে উপস্থিত থাকেন। আর বল্‌লাম যে, সদাশিব লাহিড়ীর প্রদর্শনীতে "ঝড়ের পরে" ছবিটা যেন অবিলম্বে আমার জন্য বেনামীতে কেনা হয়—দাম যাই হোক্ না কেন।

চুরুটটা শেষ হয়ে এসেছিল, অমিতাভ বসু একটু থামলেন। টুকরোটা অ্যাস্‌ট্রেতে ফেলে দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন ছবিটার সামনে, [illegible] এরই কাছে ডাকলেন।

—সদাশিব চিরকাল বেঁচে থাকবে শুধু এই ছবিটার জন্য।...অথচ, এর জন্য কৃতিত্ব দাবী [illegible] ত পারি আমি, যে সদাশিবের সবচেয়ে বেশী [illegible] করেছিলাম।

জিজ্ঞাসুভাবে সুপ্রিয় তাকাল।

বুঝতে পারলে না, সুপ্রিয়? সদাশিবের "মধুমিলন" উঁচু শ্রেণীর ছবি সন্দেহ নেই, কিন্তু ওটা হচ্ছে মিলনের তারে বাঁধা, তাই ওটা যেন একটু বেশী সম্পূর্ণ। এরই পাশে "ঝড়ের পরে" ছবিটা দেখ। এখানে সে রূপ দিয়েছে বনলতাকে হারিয়ে তার মনে যে বিপ্লবের সৃষ্টি হয়েছিল তারই খানিকটা অংশকে। ভুলে যেয়োনা যে ছবিটা সে এঁকেছিল বনলতা চলে যাবার অনেকদিন পরে, যখন তার মুহ্যমান অবস্থা কেটে গেছে, তার স্থানে এসেছে তীব্র নিষ্ঠুরতা। বনলতার এই রূপক ছবির মধ্যে সে ঢেলে দিয়েছে তার ঘৃণামিশ্রিত অনুকম্পা।

ছবিটা ভাল ক'রে দেখল সুপ্রিয়। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন মিঃ বসু।

তারপর প্রশ্ন কর্‌ল, আর এই তৃতীয় ছবিটা? এটাও ত সদাশিববাবুর আঁকা বল্‌ছেন, এটা কি তাঁর অল্পবয়সের আঁকা ছবি?

অমিতাভ বসু একটু হাস্‌লেন। বল্‌লেন, না, এটা হচ্ছে তার এখনকার ছবি। সেদিন কল্‌কাতায় সে আর একটা প্রদর্শনী করেছিল, আমি দেখতে গিয়েছিলাম। যে কখানা ছবি ছিল তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে কম নিকৃষ্ট মনে হ'ল, তাই কিনে ফেল্‌লাম। প্রদর্শনী শেষ হয়ে গেছে, আমার মক্কেল তিনখানা ছবিই একসঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

—কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, মিঃ বসু, যে আর্টিস্টের কাছ থেকে আমরা "মধুমিলন" আর "ঝড়ের পরে" পেয়েছি তাঁর হাত দিয়ে এমন ছবি বেরুলো কি ক'রে? বিশেষ ক'রে এত বছর সাধনার পর?

অমিতাভ বসু আবার সুরু করলেন তাঁর কাহিনী।

বনলতা যখন সদাশিবের কাছে ফিরে গেল তখন আমি এই ভয়ই করেছিলাম। আমার মতে, সদাশিবের আর্টিস্টিক অবচেতন মন খুব বেশী শক্ত খেল যখন বনলতা তার সামনে এসে দাঁড়াল অনুশোচনার পরিধেয় প'রে। প্রেমের বন্যায় বনলতা তার কাছ থেকে চলে যাওয়াটাকেও অবশেষে সে মেনে নিতে পেরেছিল, কিন্তু কোনই সঙ্গতি সে খুঁজে পেল না তার এই হাস্যকর প্রত্যাবর্তনে। সমস্ত জিনিষটা তার কাছে মনে হ'ল একটা বিরাট প্রহসন, যেন একমাত্র তাকেই কেন্দ্র ক'রে। স্বভাবসুলভ ঔদার্য তাকে বাধা দিল বনলতাকে রূঢ়ভাবে ফিরিয়ে দিতে, কিন্তু যে ব্যালান্স সে ধীরে ধীরে খুঁজে পেয়েছিল এবং যার ফলে সে সৃষ্টি করতে পেরেছিল "ঝড়ের পরে"র মত ছবি তা আবার হারিয়ে গেল বনলতার এই স্বেচ্ছাচারী ব্যবহারে। ...আমি বনলতাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারব না।

—কিন্তু আর কোন পথ খোলা ছিল কি তার?

—কেন, বাকী জীবনটা কি সে সিঙ্গাপুরে কাটিয়ে দিতে পারত না? আর তা' যদি নিতান্তই অসম্ভব হয়ে উঠেছিল তাহ'লে সে আলাদা হয়ে থাকতে নিশ্চয়ই পারত। আমি এতটুকু বাধা দিতাম না! সদাশিবের জীবন আবার বিপর্যস্ত করবার কোনই অধিকার ছিল না তার!

—ওঁদের যুগ্মজীবন এখন কেমন চল্‌ছে আপনি জানেন কি?

—জানি বৈকি। সদাশিব ত আমারই বন্ধু, ওর খবর আমি সব সময়ই রাখি। ...বাইরে থেকে দেখতে গেলে তারা দুজনে সুখে ঘরসংসার করছে, অর্থাৎ যে তিন বছর বনলতা চলে গিয়েছিল সেটা ভুলে যেতে চেষ্টা করছে। কিন্তু ভোলা কি এতই সহজ? বিশেষ ক'রে সদাশিবের মত আর্টিস্ট-এর পক্ষে?

—এবারকার প্রদর্শনীতে সদাশিববাবুর সুখ্যাতি কেমন হ'ল?

—সুখ্যাতি? সুখ্যাতির বদলে চারদিক থেকে টিট্‌কারি পেয়েছে সে। সবাই বল্‌ছে, সদাশিব লাহিড়ীর বানপ্রস্থে যাবার সময় হয়ে এসেছে, তিনি যেন ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়ে ভগবানের চিন্তায় মনোনিবেশ করেন।

—লোকেদের এ ভারী অন্যায় কিন্তু!

—তা' আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু তুমিই বলো, সুপ্রিয়, "মধুমিলন" আর "ঝড়ের পরে"র পাশাপাশি প্রবীণ বয়সে আঁকা এই "চক্রবৎ পরিবর্তন্তে" কি বিসদৃশই না ঠেকছে!

অমিতাভ বসুর প্রগল্‌ভতায় সুপ্রিয়র সাহস অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল। প্রশ্ন কর্‌ল, বনলতা দেবীর কোন ফটো আপনার কাছে নেই?

হাস্‌লেন অমিতাভ বসু। বল্‌লেন, ফটো? তা' অ্যাল্‌বাম খুঁজলে স্ন্যাপ্‌শট্-এর মধ্যে নিশ্চয়ই দু'একটা পাওয়া যাবে। তবে স্টুডিওতে ফটো যাকে তোমরা বলো তা' নেই—যে কখানা ছিল সব বঙ্গোপসাগরে বিসর্জন দিয়ে এসেছি। আর তোমাকে ত আগেই বলেছি, আমার যথার্থ বন্ধু হচ্ছে সদাশিব, তার ফটো ঐ সেল্‌ফ-এর ওপর রয়েছে!

ওটা তাহ'লে সদাশিব লাহিড়ীর ফটো? আজ অসতর্ক মুহূর্তে ফটোটার পরিচিতি দিয়ে ফেল্‌লেন অমিতাভ বসু।

পূজাঞ্জলি

অনিল ভট্টাচার্য

আমার মন চাহে না পূজাঞ্জলি
দিতে চরণ তলায়
ফুল যা আছে মালা গেঁথে
পরাতে চাই গলায়।।

ওগো আমার প্রেমের ঠাকুর
তোমার হাতের বাঁশীর সুরে
নিত্য আমার জন্ম-মনে
প্রেমের প্রদীপ জ্বালায়।
ফুল যা আছে মালা গেঁথে
পরাতে চাই গলায়।।

সাধ জাগে মোর দেউল ছেড়ে
এস আমার ঘরে
আমার দুটি নয়ন রহুক
তোমার নয়ন পরে—
শূন্য হাতের প্রণাম রেখে
মন ভরে না তোমায় ডেকে
অভিসারের স্বপন দেখে
জীবন-পথের ঢলায়।
ফুল যা আছে মালা গেঁথে
পরাতে চাই গলায়।।

সোনাডাঙ্গার চর

রনজিৎকুমার সেন

এখানে ঝিঁঝির ডাক, ওখানে কুকুরের আর্তনাদ ও পাশের জঙ্গল থেকে শেয়ালের চিৎকার ভেসে আসছে.

ও পাশের সরু খালে জলের ক্ষীণ স্রোত। রামদেব আস্তানা এখান থেকে বেশী দূরে নয়। এক একটা মড়া এসে হাজির হচ্ছে এই শ্মশানে, নিতাই ডোম আর চাঁদ, জোয়ানী মদ্দ কোমরে গামছা জড়িয়ে এসে চিতা জ্বেলে দিচ্ছে। যাদের মড়া, তাদের হাতের টাকাটা আধুলি পেলেই তারা খুশী। কাছে বনঝাউ আর আশ-স্যাওড়ার মাথায় মাথায় বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ চলেছে। গ্রাম-বাংলার শ্মশানের এই রূপ হয়তো তুমি দেখোনি মালতি, তবু বার বার তুমি আমার কাছে পাড়াগাঁয়ের গল্প শুনতে চেয়েছ। কতবার কত গল্পই তো তোমাকে ব'লেছি। ব'লেছি—কাঁচা মাটির রাস্তায় বর্ষার জল জমে কেমন কাদা হয়ে যায়, ঘন ঘাসের বুক ঠেলে গর্ত থেকে জোঁক বেরোয়, কেঁচো বেরোয়, সাপ আসে ফণা উঁচিয়ে। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের মানুষের তাতে ভয় নেই; পায়ের তলায় সমস্ত সরীসৃপকে মাড়িয়ে ক্রোশের পর ক্রোশ সেখানে কত মানুষ অন্ধকারে পথ চলে! কলকাতার ইলেকট্রিকের আলোয় জন্মে স্বচ্ছ মোজাইক ঘরে যৌবন কাটিয়ে তুমি তা কল্পনাই করতে পারো না মালতি। কতবার শুনতে গিয়ে তোমার গা শিউরে উঠেছে, ব'লেছ : 'বাব্বাঃ, সেখানে নাকি আবার মানুষ থাকে!' কিন্তু থাকে, তবু থাকে, থাকে ব'লেই তো আজও তারা ক্ষেতে খামারে ফসল ফলিয়ে গাড়িতে গাড়িতে চালান দিয়ে ক'লকাতার সুখী মানুষগুলোর ক্ষুধা নিবৃত্ত ক'রছে! তুমি তা জানো না, জানতে চাওনি, তুমি শুধু চেয়েছ গল্প শুনতে। এখনও এই যে এত রাত হলো, বারোটার ঘর পেরিয়ে গেল কাঁটা, এই যে মাথার উপরে পাখা ঘুরছে, তবু তোমার ঘুম আসছে না, তবু ব'লছো : 'গল্প বলো, পাড়াগাঁয়ের গল্প।'

তোমাকে গল্প শোনাতেই তাই আমার জেগে থাকা। ঘড়িতে বারোটার ঘর পেরিয়ে গেছে কাঁটা। আর জেগে থাকা উচিত নয়, শরীর খারাপ হবে, তোমার তো কাল সেই ভোরে উঠেই সংসারের মধ্যে জড়িয়ে ফেলবে নিজেকে। ঘুমোও, এবারে ঘুমোও তুমি, আমি গল্প বলছি, পাড়াগাঁয়েরই গল্প। শেষ গল্প পাড়াগাঁয়ের শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ো তুমি মালতি। তুমি ঘুমোলে তবে আমার ছুটি। কাল থেকে তোমাকে শুধু শহরের গল্প শোনাবো; ছোট শহর, বড় শহর, নানা শহরের গল্প। আজকের শেষ গল্প পাড়াগাঁয়ের। ঘুমোও তুমি মালতি, আমি গল্প বলছি।

সেদিনও আমাদের এই বাড়ির মতই ঘড়িতে বারোটার ঘর পেরিয়ে গেছে কাঁটা। সোনাডাঙ্গা গাঁয়ে তখন কেউ আর জেগে নেই। কিন্তু কেন [illegible] ঘুম আসি [illegible] ঘুম আসছে না। মামাবাড়িতে থাকি. বছর খানেক আগে মামিমা সংসার থেকে বিদায় নিয়েছেন। সেই থেকে মামা তাঁর ছোট্ট ছোট্ট দুটি ছেলেকে পাশে নিয়ে ভিতরের কোঠায় [illegible] একটা পাশ টিন দিয়ে ঘেরাও ক'রে দেওয়া হয়েছিল, সেখানেই একটা তক্তা তক্তপোষে আমার শোবার ব্যবস্থা। সামনের দিকে একটা দরজা, তার দু'পাশে দুটো জানালা। জানালা দুটো খোলাই থাকতো। দরজা খুলে ইচ্ছে খুশী মতো বাইরে বেরোতে পারতাম। তাই এসব কিছু জানতাম না। তবু মাঝে মাঝে মামা ভয় দেখিয়ে দিতে চাইতেন; বলতেন : 'অনেক সময় মধ্য রাতে বাইরে গিয়ে তুই আর ঘরে এসে দরজা বন্ধ ক'রে শুস্ না কার্তিক; শেষ পর্যন্ত যা দু'চারখানা কাপড়-চোপড় আছে, তাও চুরি হয়ে যাবে।'

বললাম, 'কই, এমন তো মনে পড়ে না। বাইরে গেলেও আমি তো ঘরে এসে আবার দরজা বন্ধ ক'রেই শুই!'

মামা ব'লতেন, 'আমার ঘুম খুব পাতলা, জানিস তো! দরজা বন্ধ ক'রলে তার আওয়াজ আমি নিশ্চয়ই টের পাই। তোকে বোধ করি নিশির ডাকে পায় কার্তিক, কখন বেরিয়ে গিয়ে আবার কখন এসে শুয়ে পড়িস, তা তুই নিজেই জানিস না।'

ভাবলাম, এ বলেন কি মামা! তা যদি হয় তবে তো ভালো নয়। কিন্তু মন্দের দিকটা যে রক্ষা করবে, সংসারে এমন মানুষ ছিল না। নিঃসঙ্গ শয্যায় সারা রাত একা একা ছটফট ক'রে কাটাই। কতই বা তখন বয়স, খুব বেশী হলে চব্বিশ কি পঁচিশ। গায়ে আমার অমিত শক্তি, মনে আমার অফুরন্ত উৎসাহ। কিন্তু সেই মনে মাঝে মাঝে যে বিষণ্ণতা এসে ভর না করতো, এমন নয়। তার দুটো কারণ ছিল। প্রথমটা—বেকার হ'য়ে মামার ধিক্কারের পাত্র হ'য়ে আছি, আর দ্বিতীয়টা—আমার জীবনে পর পর অনেকগুলো শোক। বাবা গেলেন, মা গেলেন, একমাত্র দিদি ছিল সে গেল, তারপর সে মামিমা সংসারের ভাগ্নে মাত্রেরই নির্ভরশীলা [illegible]. আমি সেই মামিমার অফুরন্ত স্নেহ লাভ করেও দীর্ঘদিন তাঁকে কাছে পেলাম না, তিনিও চলে গেলেন। এতগুলো শোক পর পর সহ্য করেও আমি যে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারতাম, সেইটেই আশ্চর্য।

কিন্তু কই, এখনও তুমি চোখ মিটমিট ক'রছো মালতি, এখনও তোমার ঘুম আসছে না? আজ তোমার কি হ'লো, বলো তো? দৈনিক মুখে মুখে তোমাকে গল্প না শুনিয়ে আমি যদি কাগজ-কলম নিয়ে গল্প লিখতাম, তবে তোমার মতো বাংলাদেশের অনেক মালতির কাছে আমি এতদিনে মস্ত বড় সাহিত্যিক নাম কিনতে পারতাম। শুনে অভিমানে তোমার ঠোঁট ফুললো তো? কিন্তু না, না লক্ষ্মীটি, এই আমি গল্প ব'লছি, একটুও আর থামবো না, একটুও আর তোমার চোখে[illegible] পাতার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হবো না, [illegible] আমি গল্প ব'লছি, শোনো।—

—সেই রাতটা কি যেন আমার কী হ'লো! রাত বারোটা অবধি বিছানায় শুয়ে ছটফট ক'রলাম। ভিতর-ঘরে দু' ছেলেকে দু'পাশে

নিয়ে মামা নাক ডাকাচ্ছেন কিনা, শুনতে পেলাম না। আমার মনের অবস্থাটা তখন কি, আজ আর মনে নেই। তোমাকে পাবার পর থেকে আগেকার অনেক কথাই আমি ভুলে গেছি। কিন্তু সেই রাতটার কথা এখনও স্পষ্ট মনে আছে। কখন যে নিজের অগোচরেই সেই রাত বারোটায় ঘর থেকে বেরিয়ে হাঁটতে সুরু ক'রলাম, তা নিজেই জানি না। হাঁটতে হাঁটতে একসময়ে এসে শ্মশানে ব'সে প'ড়লাম। আগে আগে লোকে ব'লতো সোনাডাঙ্গার চর, নদী মজে গিয়ে চর জেগেছিল; এখন শ্মশান। এখানে ঝিঁঝির ডাক, ওখানে কুকুরের আর্তনাদ, ওপাশের জঙ্গল থেকে শেয়ালের চিৎকার ভেসে আসচে। এ পাশের সরু খালে জলের ক্ষীণ স্রোত। এক একটা মড়া এসে হাজির হচ্ছে শ্মশানে, নিতাই ডোম আর চার, ডোমনী অমনি কোমরে গামছা জড়িয়ে এসে চিত সাজিয়ে দিচ্ছে। কাছে-দূরে বনঝাউ আর আশ-স্যাওড়ার মাথায় মাথায় বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ চ'লেছে। সোনাডাঙ্গার চরকে আজ আর কেউ চর বলে না, বলে শ্মশান। এতটুকুও গা ছমছম্ ক'রলো না, বরং চিতার লেলিহান শিখায় মাটমেটে শীতের সেই রাতে বেশ আরামই লাগ্‌লো। সেই আরাম নিয়েই খালের একটা পাশ ঘেঁষে ব'সে চোখ দুটোকে প্রসারিত ক'রে দিলাম সামনের অপরিত অন্ধকারের দিকে।

কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। মনে হ'লো—একটি রথুরে বিধবা বুড়ি এসে আমার সামনে দাঁড়ালো। বুড়ি হ'লেও চেহারায় তার পরিসীম লাবণ্য। ব'ল্‌লো : 'তোমাকে দেখে আমার কেন যেন তোমাকে বড় বিশ্বাস ক'রতে ইচ্ছে হচ্ছে! ধরবে, আমার হাতখানি একবার ধরবে তুমি? দু'পা যে সামনে বাড়াই, এমন শক্তি নেই। চার কুড়ি বয়স হ'য়ে তবে তো আমার এই দশা! তুমি যদি আমাকে ধরে নিয়ে আমার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসো, তবে আমি হাত তুলে তোমাকে আশীর্বাদ ক'রবো।'

জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'যদি চল্‌তেই না পারবে, তবে এত রাতে একা একা এখানে এলে কি ক'রে? এ যে শ্মশান, এখানে কাছাকাছি বাড়ি-ঘরই বা কোথায়?'

বুকের মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে নিয়ে বুড়ি বললো : 'জীবনে যখন যেখানে থাকা হয়, সেইটেই বাড়ি-ঘর। কিন্তু কথা তো নয়, তাই আমার ঘর আছে। তিন ছেলে, তিন ছেলের বউ, নাতি-নাতনি, দেওর দেওরের বউ তার ছেলেমেয়ে। আমার কত বড় সংসার, তুমি ভাবতেই পারবে না। এই তো এখান থেকে এক পাশ পা বাড়ালেই ঝিল্‌পাটি, কত বড় জমজমাট মেলানো বাড়ি আমাদের! আমার কর্তা যেদিন চ'লে গেলেন, সারা ঝিল্‌পাটি সেদিন কেঁদেছিল।' ব'লে কেমন একটা ভাবাবেগে আবারে চোখ দু'টো মুছে নিল বুড়ি।

ব'ল্‌লাম, 'বুঝতে পারছি, নিশ্চয়ই তিনি খুব সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন, সারা ঝিল্‌পাটির লোক তাঁকে ভাল বাসতো; প্রিয়জনের বিয়োগ স্বভাবতঃই মানুষের মনে দাগ কাটে, ঝিল্‌পাটির লোকের মনেও কেটেছিল। তা—কতদিন হ'লো গত হয়েছেন তিনি, কি হ'য়েছিল তাঁর?'

বুড়ি ব'ল্‌লো, 'কি আবার হবে, প্রথম দু'দিন ঘুষঘুষে জ্বর, বদ্যি এসে ব'ল্‌লে—বুকে জল জ'মেছে, কিন্তু সে জল আর নামানো গেল না; বুকে অসহ্য ব্যথা নিয়েই এক সময় তিনি চোখ বুজলেন। তারপর সাত সাতটা বছর কেটে গেল।'

ইতিমধ্যে চিতার পাশ থেকে কে যেন একবার হরিধ্বনি ক'রে উঠ্‌লো! সঙ্গে সঙ্গে কানে আঙুল গুঁজে কেমন একটা বিকট চিৎকার ক'রে উঠ্‌লো বুড়ি।

ব'ল্‌লাম, 'সে কি, হরিধ্বনি শুনে যেন ভয় পেলে ব'লে মনে হ'লো!'

কিন্তু সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে কেমন বিবর্ণ হ'য়ে ব'সে প'ড়লো বুড়ি। তারপর আস্তে আস্তে ব'ল্‌লো, 'ঐ শব্দটাকে আমি বড় ভয় করি। শব্দটা শুন্‌লেই আমার কেন যেন মনে হয়, আমার স্বামীর মতো আমিও এ সংসারে ফুরিয়ে গেছি, আমাকে নিয়ে সংসারের কোনো মানুষের আর কোনো কাজ নেই।'

ভাবলাম—এই বয়সেও যার এত সংসারে টান, পরকালে গিয়েও হবে শান্তি নেই। কিন্তু তা নিয়ে বুড়িকে মনে আঘাত দিয়ে লাভ নেই। ব'ল্‌লাম, 'হ্যাঁ—অনেকেরই ওরকম মনে হয়। কিন্তু ভাবছি, এত রাতে তোমার মত বড় সংসারের সংসার ফেলে তুমি এই একা কোন্ দূরে এখানে এলে কি ক'রে? কে তোমাকে রেখে গেল এখানে?'

—কে আবার রেখে যাবে? আমি নিজেই এসেছি।' বুড়ি ব'ল্‌লো, 'কিন্তু এখন আর চল্‌তে পারছি না। তাই তো বলি, যদি ধ'রে আমাকে একটি বার পার ক'রে দাও, তবে ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারি।'

ব'ল্‌লাম, 'ঝিলপাটী যাই তোমার বাড়ির লোকদের কাছে দেখো। তুমি যে এই এত দূরে একা একা এলে, আস্‌তে দিল তারা?'

—'আস্‌তে দেবে না কি ব'ল্‌ছো? তারাই তো আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেল!'

—'কি আশ্চর্য! এই ব'ল্‌লে তুমি নিজেই এসেছ, আবার এই ব'ল্‌ছো তোমাকে তারা পৌঁছে দিয়ে গেছে। এর মধ্যে কোন্‌টা সত্যি, আর কোন্‌টা যে মিথ্যে, তাই তো বুঝতে পারছি নে।'

—'ও তুমি বুঝবে না।' বুড়ি ব'ল্‌লো, 'আমার মতো চার কুড়ি বয়স হ'লে তুমিও সত্যিমিথ্যে সব ঘুলিয়ে ফেল্‌তে।' ব'লে কেমন যেন একটা বিদ্রূপের দৃষ্টি তুলে ধরলো বুড়ি আমার মুখের দিকে।

সে-দৃষ্টির দিকে তাকালে ভয়ে গলা শুকিয়ে আসে। কিন্তু বেশীক্ষণের জন্যে নয়। একটুকাল বাদেই দৃষ্টি পরিবর্তন ক'রে আক্ষেপের কণ্ঠে বুড়ি ব'ল্‌লো : 'সংসারে আমার দেওর আর দেওরের বউ-ছেলে-মেয়ে আছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু কি ব'ল্‌বো তোমাকে, আমার সোনার সংসারে ওরাই যা একটু মন-গুমরো মানুষ। আমার কর্তার অবর্তমানে নিজের ভাগের দাবী ক'রে আমার দেওর একদিন ক্ষেপে উঠ্‌লো। বল্‌লো : আমার চার আনা বিষয় আমাকে ভাগ ক'রে দাও বৌদি, আমি বেঁচে থাকতে থাকতে আমার ছেলেমেয়েদের দেখিয়ে শুনিয়ে রেখে যেতে চাই। —শুনে বড় ঘেন্না হ'লো আমার। শুনেছিলাম—ছোটবেলা থেকে এই দেওর আমার কর্তার বুকে-পিঠে চ'ড়েই মানুষ। আজ তার ভাগ সে বুঝে না নিলে, কে নেবে? সেদিনই উকিল ডেকে ব'ল্‌লাম, লিখে নাও তোমার ভাগ। কিন্তু উকিলের সঙ্গে সলা-পরামর্শ ক'রে চার-আনার যায়গায় সে দশ আনাই নিজের নামে লিখিয়ে নিলে। আমার ছেলেরা বড় হ'লেও বিষয়-আশয়ে কোনোদিন মাথা গলায়নি। আমি মেয়ে মানুষ, আমিও কি ছাই ভালো ক'রে সব বুঝেছি! এক বাড়িতেই সংসারটা দশ আনা ছ' আনা হ'য়ে গেল। তবু দেওরকে কোনোদিন দু'টো কড়া কথা ব'ল্‌তে পারিনি। যে আমার স্বামীর বুকে-পিঠে চ'ড়ে মানুষ, ঠগ্ হোক, জোচ্চোর হোক, তবু সে কি আমার কম স্নেহের পাত্র! সেই স্নেহেই আটকে রইলাম। কিন্তু ভিতরে ভিতরে দেহটা যে আমার ক্রমেই ভেঙে প'ড়ছিল, বুঝতে পারিনি। একদিন একেবারেই শয্যা নিলুম, তারপর কখন যে ভালো হ'লাম, কখন যে এখানে এলাম, কিছুই জানিনে।'

একদমে অনেকক্ষণ কথা ব'লে যেন হাঁপাতে লাগলো বুড়ি।

রাত ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতর হ'চ্ছে। ঘন কুয়াশায় আকাশটা যেন ঢাকা প'ড়ে গেছে, তাই আকাশে তারা আছে কিনা বোঝা যাচ্ছিল না। বুড়ির কথা শুনে [illegible] হচ্ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সংসারে কিছু [illegible] ভাবনা আস্‌ছিল না মনে।

একটুকাল থেমে বুড়ি এবারে নিজে থেকেই আবার সেই পুরনো প্রশ্ন তুলে ধরলো : [illegible] ক'রে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। [illegible] দিনের একাদশী গেছে, শরীর আর [illegible] পারছি নে। ধরো না আমার হাতখানি বাবা, [illegible] একবারটি আমাকে আমার ঘরে পৌঁছে দাও, ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।'

ইতিমধ্যে আর একবার চিতার পাশ থেকে হরিধ্বনি ভেসে আস্‌তেই তেম্‌নি ক'রে তীব্র আর্তনাদে ফেটে প'ড়ে বুড়ি বললো : 'ওগো, আমাকে শীগ্‌গির ধরো, ওরা আমাকে [illegible] ফেল্‌লো, আমার সংসার গেল, আমার সব গেল।'

এবারে আর নিশ্চেষ্টভাবে ব'সে থাকতে পারলুম না। হরিধ্বনিতে বুড়ির বড় ভয়। ভয় পেয়ে এমন কত সময়ই তো মানুষে মারা যায়। শেষ পর্যন্ত আমার পায়ের সামনে যদি বুড়ি মুখ থুবড়ে প'ড়ে যায়, লোকে জানলে আমাকেই তো ভেবে অপরাধী ক'রবে। [illegible] চাইতে একটু না হয় কষ্ট হোক্, বুড়িকে তবু তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরতে যেতেই হঠাৎ আমার চোখ দু'টো কেমন ধেঁধে গেল। বুড়ি নেই, কেউ নেই, কিচ্ছু নেই। শুধু গচ্ছে গচ্ছে কুয়াশায় চারদিক ছেয়ে আছে। এতক্ষণ যারে এত কথা যে বল্‌লো, ভয় পেয়ে দু' দুবার যে চিৎকার ক'রে আমার হাত চেপে ধরতে চাইল, হঠাৎ এই মুহূর্তে আলেয়ার মতো কোথায় সে মিলিয়ে গেল? এ কি [illegible] স্বপ্ন দেখছি?

সোনাডাঙ্গার চরে এলে চর শ্মশান হ'য়ে দেখা দেয়, সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই চরে ব'সে এমনি ক'রে আর কোনোদিন কি কেউ আমার মতো এমন স্বপ্ন দেখেছে? অলক্ষ্যে বুকের মধ্যেটা একবার ছমছম্ ক'রে উঠ্‌লো। ভাবলাম—উঠে পড়ি, খালের এই নিভৃত পরিবেশ ছেড়ে

(শেষাংশ ১২৮ পৃষ্ঠায়)

চলিয়া যাইব। শ্রীধর বলিলেন, তুমি ব্রাহ্মণ, বিষ্ণু অংশ। মহাপ্রভু উত্তর করিলেন, আমাকে তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান বলিতেছ, আমি তো নিজেকে গোয়ালা বলিয়া মনে করি। শ্রীধর বোধ হয় পন্ডিতের মস্তিষ্কের সুস্থতায় সন্দিহান হইলেন। তিনি হাসিতে লাগিলেন। বিপদ তখনো কাটে নাই। বিশ্বম্ভর বলিলেন, শ্রীধর তোমায় তত্ত্ব কথা বলিতেছি শোন। তোমার গঙ্গার যে মহিমার কথা জান, সে সমস্তই আমারই কৃপায় পাওয়া। এবার আর শ্রীধর থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন, ওহে নিমাই পন্ডিত, গঙ্গাকেও কি তোমার ভয় নাই। বয়স বাড়িলে লোক কোথায় স্থির-ধীর হইবে, তা নয় তোমার চাপল্য আরো দ্বিগুণ বাড়িয়াছে দেখিতেছি।

শ্রীধর যে স্বতঃই পবিত্র, তাঁহার বৈষ্ণবতা যে বিতর্কের অতীত, সর্বজন সমক্ষে শ্রীধরের উঠানে পড়িয়া থাকা একটা ফুটা লৌহ পাত্র হইতে জল পান করিয়া মহাপ্রভু একদিন সকলকেই সে কথা জানাইয়া দিয়াছিলেন। কৃষ্ণভক্তি যে নিত্য-সিদ্ধ, এই ভক্তি ধন, জন, কৌলীন্যে পাওয়া যায় না, বিদ্যায় তাহা লাভ হয় না, ভগবৎ কৃপায়, অথবা ভগবৎভক্তের কৃপায় শ্রীভগবানের নাম-লীলা গুণ শ্রবণাদি হেতু বিশুদ্ধ চিত্তে তাহা স্ফুরিত হয়, শ্রীধরের জীবন তাহার উজ্জ্বল উদাহরণ।

ভাগ্যবান শ্রীধর। তাঁহার সৌভাগ্য সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশের দিনে। এই মহাপ্রকাশ "সাত প্রহরিয়া ভাব" নামে বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত। শ্রীবৃন্দাবন দাস বলিতেছেন—

সাত প্রহরিয়াভাবে সর্বজনে জনে।
অ-মায়ায় প্রভু কৃপা করেন আপনে॥
আজ্ঞা হৈল শ্রীধরেরে ঝাট গিয়া আন।
আসিয়া দেখুক মোর প্রকাশ বিধান॥
প্রভু নিদর্শন বলিয়া দিলেন—
নগরের অন্তে গিয়া থাকিহ বসিয়া।
যে মোরে ডাকয়ে তারে আনিও ধরিয়া॥

বৈষ্ণবগণ ধাইয়া চলিলেন। দিবসের কেনা-বেচা সারিয়া শ্রীধর সর্ব রাত্রি দীঘল আহ্বানে হরিকে ডাকিতেন। লোকে বিরক্ত হইত। ব্যাটার চীৎকারে আমরা ঘুমাইতে পাই না। ব্যাটা মহা-চাষা, ক্ষুধায় যত পেট জ্বলে, সারা রাত তত চীৎকার করে। শ্রীধর কাহারো কথায় কর্ণপাত করিতেন না। মহাপ্রভুর প্রেরিত ভাগবতগণ অর্ধ পথ হইতেই শ্রীধরের হরিধ্বনি শুনিতে পাইলেন। ধ্বনি অনুসারে শ্রীধরের ভবনে গিয়া তাঁহারা বলিলেন—

চল চল মহাশয় প্রভু দেখিবা।
আমরা পবিত্র হই তোমা পরশিয়া।

কিছুদিন হইতেই শ্রীধর দেখিতেছিলেন, আর তো কই খোলা পাতা কাড়িবার জন্য কেহ তাঁহার নিকট আসে না। এই বিরহ শ্রীধরের অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার উপর শ্রীবাস অঙ্গনের নাটুয়ার সকল সংবাদই তিনি শুনিয়া-ছিলেন। দেখিবার সাধ হইলেও সাহস করিয়া একটি দিনের জন্যও তিনি শ্রীবাসভবনের পথে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। আপনার মনের কথা প্রকাশ করিবারও সাহস হয় নাই। শ্রীধরের যখন এই দশা, এমনই দিনে আহ্বান আসিল "প্রভু দেখিসিয়া" শ্রীধর আনন্দে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া একেবারে প্রভুর সম্মুখে লইয়া উপস্থিত করিলেন। দীন ব্রাহ্মণ স্বকর্ণে শুনিলেন অভীষ্টদেব তাঁহাকে স্বাগত জানাইতেছেন, 'শ্রীধর আমাকে দেখ।' আনন্দ কি রাখিবার স্থান আছে। স্পন্দ কি ... করিয়াই বাস্তবে মূর্তি পরিগ্রহ করে?

শ্রীধর স্বকর্ণে শুনিতেছেন—কি সুধা-স্যন্দী সর্বাঙ্গ স্বপন কণ্ঠধ্বনি! "এস, এস শ্রীধর, বহু জন্ম আমার প্রেমে তুমি জীবন ত্যাগ করিয়াছ। এ জন্মেও আমার বহু সেবা করিলে। তোমার প্রদত্ত খোলায় বহুদিন অন্ন গ্রহণ করিলাম। তোমার হস্তের বহু দ্রব্য ভোজন করিলাম। আমার রূপ দেখ শ্রীধর। আমি আজ অণিমাদি অষ্টমহাসিদ্ধিকে তোমার করতলগত করিয়া দিলাম।"

শ্রীধর দেখিলেন শ্যামলমূর্তি। হাতে মোহন বাঁশী। মহাজ্যোতির্ময় রূপ। লক্ষ্মীদেবী তাম্বুল জোগাইতেছেন। শিব সনকাদি বন্দনা গাহিতেছেন। চতুর্দিকে স্তুতিকারিণী সুন্দরী রমণীগণের সংখ্যা হয় না। শ্রীধর পৃথিবীতে ঢলিয়া পড়িলেন। আদেশ হইল উঠ শ্রীধর আমার স্তুতি পাঠ কর। শ্রীধর বলিলেন—মূর্খ আমি কি স্তব করিব প্রভু? মহাপ্রভু বলিলেন, তুমি যাহা বলিবে সেই আমার স্তুতি। শ্রীধর বলিতে আরম্ভ করিলেন, মহাপ্রভু বিশ্বম্ভরের জয় হউক। নবদ্বীপ পুরন্দরের জয় হউক। অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের নাথ শচীদুলালের জয় হউক। যুগধর্মপালক বেদগোপ্য বিপ্ররাজ তোমার জয় হউক, জয় হউক, জয় হউক। শ্রীধরের মুখে আজ সরস্বতী অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন। স্তব শুনিয়া ভক্তগণ তো অবাক। মহাপ্রভু বলিলেন, বর গ্রহণ কর শ্রীধর। আমি তোমাকে রাজ্যখণ্ড দান করিব। শ্রীধর বর প্রার্থনা করিলেন, বর দিবে প্রভু!

শ্রীধর বোলয়ে প্রভু দেহ এই বর॥
যে ব্রাহ্মণ কাড়িলেন মোর খোলাপাত।
সে ব্রাহ্মণ হউ মোর জন্মে জন্মে নাথ॥
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কন্দল।
মোর প্রভু হউ তার চরণ যুগল॥

ভালো আছ

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

ভালো আছ,
তোমায় দেখিনি বহু দিন,
কি কর, কি ভাব দিন-রাত
সুদূরের পানে চেয়ে চেয়ে।

আমার দিন কাটে যন্ত্রণায়,
রাশি-রাশি ব্যর্থতা ঘিরে আছে,
উন্মাদের মতো দিন-রাত
শুধু ঘুরে বেড়াই এখানে-সেখানে
যদি কোথাও দেখা পাই তোমার,
অসংখ্য মুখের মাঝে একটা মুখ
চৈতন্যে ছেয়ে আছে।

আজও কি ভালোবাসো,
সেই পরস্পরের কাছে এসে
সোহাগের সব কথা ঢালা
স্পর্শে আর চাহনিতে,
মনে পড়ে নাকি
সেই সব সকাল আর রাত
আর পরস্পর নিবিড়তা।

না। জানি তুমি ভুলে যাবে।
দুঃখ-শোক, জ্বালা শুধু বয়ে বেড়াব
আমি আবহমানকাল।
মাঝ রাতে বৃষ্টির গোঙানির মতো
কান্না শুধু শোনা যাবে
আমার রক্তাক্ত মনের।
তবু বলি ভালো থাক
এই-ই শেষ চাওয়া।।

সময় তো নেই

মণিমালা দাশগুপ্ত

খবর পেয়েছি অনেক খবর
এসে পৌঁছেছে আজ—।
সময়তো নেই খবর কুড়োবো
এখনও অনেক কাজ।
তবু দূর থেকে চেয়ে চেয়ে দেখি
কুয়াশার বুক ভেঙে,
আকাশের নীচে কি যেন কথারা
ভেসে ওঠে রঙে রঙে। কঠোর কঠিন
দিনের সীমানা পার হোয়ে
এসে ওরা,
উদ্দাম হোয়ে রঙ ছুঁড়ে ছুঁড়ে
ফোটা ফুলে দেয় ধরা।
সেই রঙ বুঝি উড়ে এসে এসে
বটের শাখায় দোলে—
ঝির ঝির ঝুরি নুয়ে নুয়ে
নুয়ে, মাটিতে স্বপ্ন মেলে।
এদিকে-ওদিকে গুঞ্জন ওঠে
ফিস্‌ফিস্ কানাকানি—।
উন্মাদনায় হাতছানি দেয়
নিবিড় অরণ্যানী।
লক্ষ তারারা কেঁপে কেঁপে সারা
আকাশে অন্ধকারে
নদীতে নদীতে ঢেউদের মুখে
উচ্ছল আবেগ ঝরে।
তবু ফিরে যাবে খবরের হাওয়া
সময়তো নেই আজ, সময়তো
নেই খবর কুড়োবো, এখনও
অনেক কাজ॥

সোনাডাঙ্গার চর

(১২৬ পৃষ্ঠার পর)

উঠে গিয়ে চিতার কাছাকাছি লোকালয়ের আশ্রয় নিই। কিন্তু বৃথা। রাত বোধ করি শেষ হয়ে এসেছে। ওপারের জঙ্গল থেকে সমস্বরে একবার প্রহর ঘোষণা ডাক ডেকে উঠলো শেয়ালগুলো। আর একটু ফর্সা হলেই হয়তো শ্মশানবাসিনীর পুজো দিতে আসবে কেউ কেউ। একাদশী রাত্রির শেষ প্রহর। কিন্তু কিছুতেই আমার ঘোর কাটলো না। যতই বুড়ি সম্পর্কে ভাবছি, ঘেমে উঠছি নিজের মধ্যে। সোনাডাঙ্গার শীত সহ্য করা যেতো না, তবু তার মধ্যে ঘামে আমার সারা দেহ জল হয়ে গেল। তাকিয়ে দেখলাম—শেষ চিতা কখন নিভে গিয়ে অঙ্গারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে শ্মশান। এখানে হাড়, ওখানে মড়ার মাথার খুলি। তার মধ্যেই দুজনে বাহুপাশে আবদ্ধ হয়ে প্রণয় বিলাসে পড়ে আছে নিতাই ডোম আর চারু ডোমনী; মাঝে মাঝে বাঁশের চোঙ্গার ছিপি খুলে ঢক্ ঢক্ করে তাড়ি খেয়ে নিয়ে হি হি করে হেসে উঠছে। করোটি-কঙ্কালের চিতাভূমির উপর জীবনের সহজ সরল হাসি।

াক্ষ, লালকিল্লা — ফটো— হীরেন চৌধুরী

সাগরী

ফটো— রবীন সেনগুপ্ত
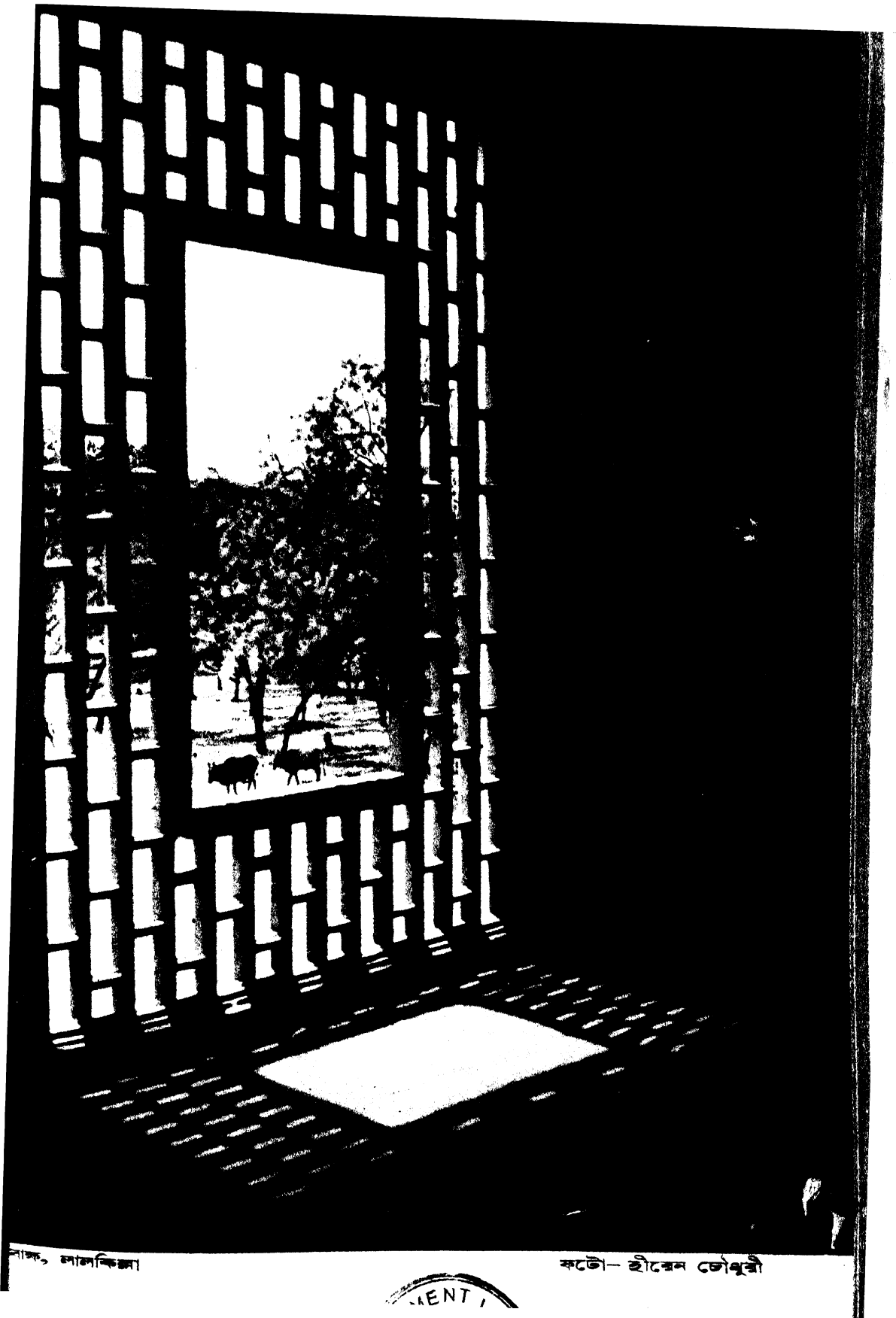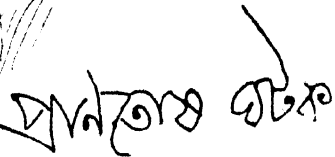
চঞ্চলা হরিণী মালতীমালা। ধানক্ষেতে লুকোচুরি খেলে। ফসল পাহারা দেয় বাপের। প্রকৃতি-কন্যার মত সবুজের মাঝে ঘোরাফেরা করে পাখী তাড়ায়, খরগোসের পিছু ধাওয়া করে। গরু আর ছাগলকে তাড়া করে হেঁটে হেঁটে। মালতী যখন ছুটে ছুটে বেড়ায় তখন তার এলোকেশ আর নীলাম্বরী শাড়ীর ছিন্ন আঁচল পিছনে উড়তে থাকে।

আলিজান বলে,—তুমি আমার সোনামণি, আমার সোনার রাণী। আমার লয়লা বেগম।

মিষ্টি মিষ্টি হাসি ফোটে তখন মালতীর পাতলা ঠোঁটের কোণে। শ্রুতিমধুর কথাগুলি শুনতে শুনতে চোখ বন্ধ করে। খুশী আর আনন্দে মৃদুমন্দ হাসে। আলিজান সেই ফাঁকে মালতীর মিষ্টিমুখে চুমা খায় অনেকগুলো। অনেকক্ষণ বুকে চেপে ধরে রাখে মালতীকে। ছাড়তে চায় না যেন কোনদিন।

—একটা কথা বলতেছি। কথা বলে আলিজান।

মালতী তার মুখ চেপে ধরে খিলখিল হাসতে হাসতে। বলে,—থাক, তুমি যা বলতি চাও তা আমার জানতি আর বাকী নাই।

—বলতি চাই যে—

কথার মধ্যপথে আবার আলিজানের কথা থামিয়ে দেয় মালতী। হাসতে হাসতে বলে,—হাঁ আমি জানি গো, তুমি কি চাইতিছ।

—দাও তবে।

—উঁহু। না। ঐটি হইব না। আর যা চাও আমি দিমু। হাসির তুফান তুলে ছুটে পালিয়ে যায় মালতী। একটা ছুটন্ত ছাগলের পিছু ধাওয়া করে।

চান্দুরিয়া থেকে ফিরতি পথ ধরেছিল আলিজান।

কি এক বদ খেয়াল চাপলো মাথায়। জুয়ার আড্ডায় ভিড়ে গেল পথিমধ্যে।

সাদা আদ্দির সার্ট-জামার পকেটে দুচার টাকার অস্তিত্ব। কপাল ঠুকে বসে গেল খেলতে যদি কিছু মিলে যায় বরাতজোরে। আড্ডায় শুধু মাত্র জুয়া খেলা হয় না, চোরাই চালানের মাল সস্তা দরে কেনাবেচা হয়। তোমার দেশে যা মহার্ঘ, আমার দেশে তার নগণ্য মূল্য। আমার দেশে যা দুর্লভ, তোমার দেশে তার ফেলাছড়া। মাল পাচার হয় জুয়ার আড্ডা থেকে। চেক-পোস্টের চোখ ফাঁকিয়ে।

খেলতে খেলতে রাত ঘন হয়, খেয়াল থাকে না আলিজানের।

চোর-কুঠুরীতে একটা রেড়ির তেলের লম্প জ্বলছে, দেখতে পায় না। অনুমানেও বুঝতে পারে না কুঠুরীর বাইরে আঁধার ঘনিয়েছে। ঝিঁঝিঁ ডাকছে।

হঠাৎ জ্ঞানের উদয় হয় খেলায় মত্ত আলিজানের। সে বেশ বুঝতে পারে, তাকে ঠকানো হচ্ছে। আর তিনজন খেলুড়ে একই দলের লোক। পরস্পরে যোগসূত্র আছে। আলিজান স্রেফ একা।

আশপাশের আর এক আড্ডায় কে যেন আহত হয়েছে। ছোরা খেয়েছে পেটে। পাঁজরার ঠিক তলায়। গোঙানির সুরটা যেন বিশ্রী ধরনের। হয়তো রক্ষা পাবে না এ যাত্রায়। শেষ পর্যন্ত গুম খুন হবে। লাস লোপাট হয়ে যাবে কোথায়।

আড্ডা ছেড়ে উঠে পড়ে আলিজান। পানি-পানের অজুহাত দেখিয়ে কেটে পড়ে অন্ধকারে। দুলদুল আর আলিজান। নক্ষত্রের বেগে ছুটতে থাকে গহন অন্ধকারে। পথের শেষ নেই। বাঁধা-ধরা সোজা রাস্তায় নয়। আল টপকাতে হয়, সাঁকো পেরোতে হয়, মজা-হাজা পুকুরের কাদা-জল কাটতে চরাই আর উৎরাই ভাঙতে হয়।

আলিজান আর দুলদুল ছুটতে থাকে ক্ষিপ্রবেগে। তাদের পেছনে তাড়া লেগেছে। ছুরি আর ছোরা উঁচিয়ে পিছু নিয়েছে আড্ডার একটা দল।

মৃত্যুভয় পিছনে। আলিজান অনেক দূর এগিয়ে বুঝতে পারে, পথ ভুল হয়ে গেছে রাতের অন্ধকারে। গন্তব্য ছেড়ে অন্যদিকে ছুটেছে দিকভোলা।

প্রথম রাত্রি শেষ হয়ে যায় পথ খুঁজে খুঁজে।

ভোরের আলোয় সন্ধান পায় আসল পথের। আলিজান আর দুলদুল সেই পথ ধরে ছুটতে শুরু করে। কে জানে কে, যারা পিছু নিয়েছে তাদের যদি আবার দেখা মেলে বন-জঙ্গলে। দিনের আলোয়।

এমন সময়ে আকাশ কাঁপিয়ে মেসিনগান ডেকে উঠলো।

বর্ডার লাইনের মিলিটারী ক্যাম্প থেকে গুলী ছুটলো ঝাঁক ঝাঁক। গাছের শাখায় শাখায় কার্তুজের ঘা লাগছে খট-খট খট-খট।

আলিজান ইদিক-সিদিক দেখে ভয়ের দৃষ্টিতে। কোন্ দিক থেকে আসছে গুলীর ঝাঁক। কারা দাগছে মেসিনগান। কারা স্টেনগান ছুটিয়েছে।

যতটা পথ শেষ হয় ততই ভাল। আলিজান থামতে বলে না দুলদুলকে। রাশ টেনে ধরে না। বুঝেবুঝে ঘণ্টা বাজিয়ে দুলদুল ছুটতে থাকে বিপদের এলাকায়।

তাকে রুখবে যারা নির্ঘাৎ। আন্দাজ করে আলিজান। তাই থামে না হয়তো। নিষেধ জানায় না দুলদুলকে। রাশ টানে না।

জানে না আলিজান। মিলিটারী ক্যাম্প থেকে মাস্কেট কিম্বা রাইফেল দাগছে না। সেকেলে দিন নেই আর। এখন মেসিনগানের যুগ আমাদের দেশে। ব্রেনগান আর স্টেনগানের আমল। অনেক জনতাকে রুখতে হবে, মারতে হবে এক সঙ্গে।

কোন দিক থেকে আসছে এই আকাশকাঁপা আওয়াজ। থেমেও যেন থামতে চাইছে না। বেনাপোল থেকে গুলী ছুটছে? না, পেত্রাপোল থেকে গুলীর ঝাঁক উড়ছে? কি আশ্চর্য, ঠাওরাতে পারে না আলিজান।

দুলদুল ছুটতে ছুটতে হঠাৎ সমুখের দুই পা তুলে সোজা দাঁড়িয়ে পড়লো। চিঁহি চিঁহি ডাকল করে। গুলী বিঁধেছে পায়ে। জঙ্গল কেঁপে কেঁপে উঠছে দুলদুলের আর্ত চীৎকারে।

আলিজানকে ফেলে দেয় দুলদুল, না সে আপনিই ছিটকে লাফিয়ে পড়লো বোঝা যায় না। দুলদুল এত নিষ্করুণ নয়। সে শুধু আঘাতে জর্জর হয়ে ডেকেছে, লাফিয়েছে।

দুলদুল চলতে পারে না, দাঁড়াতে পারে না।

সমুদ্রে ভোর : কন্যাকুমারিকা

শচীন দত্ত

এ যেন অসহ্য রাত্রির আবেগে থরো থরো
করুণ গানের মীড়ে নিশিগন্ধার মসৃণতা;
না, পাপড়ি-ঝরা বিষণ্ণ বাতাসে স্বপ্ন-রঙীন
মন্থরতা; কিম্বা দূর-দৃষ্টি সম্মোহের বৃষ্টি
ভেজা পারাবত মন।

যুগ-যুগান্ত ব্যাকুলতা ব্যর্থতায় অশ্রু-উম্মন
বন্ধ্যা আকাশ শেষ বর্ষণের গৌরবে ভরপুর;
দৃষ্টি-সুদূর বাতিঘর এলোমেলো হাওয়ায়
কেঁপে কেঁপে নৈশব্দের অতল গভীরে
সমাহিত।

কালো মেঘের বুক চিরে দমকা হাওয়ার অবাধ—
অকারণ নিরবধি যাতায়াতের পালা সাঙ্গ
ক্লান্তির অক্ষরে আঁকা রোমাঞ্চঘন
অম্লান নিস্তব্ধ ব্যঞ্জনা। দূর দিগন্তে
একটি অবাক সংগীতের জন্মের
পূর্বাভাষ।।

আশিটার এক চাপড়ানো ছটফট করে এপাশ ওপাশ।

চোখ ফেটে জল ঝরে আলিজানের। দরদর বেগে রক্ত ঝরছে ক্ষতচিহ্ন থেকে। মাংস উপড়ে গেছে বেশ এক চাকলা।

খানিক যেতে না যেতেই মাথার পরে শকুন চোখ মেলে দেখলো আলিজান, একপাল শকুন পাক দিয়ে দিয়ে উড়ছে চক্রাকারে। শকুনগুলোর ছুঁচালো আর ধারালো ঠোঁটে কত লোভ যেন।

ঝাঁক ঝাঁক গুলীর ফুলঝুরি ছুটছে তাদের মাথার ওপর দিয়ে। দুম দুম দুম দুম! আলিজান কাঁদছে। তাজা আর লাল রক্তের ধারায় শুকনো-মাটি ভিজে গেছে। দুলদুল তীব্র যন্ত্রণায় কাতরে কাতরে উঠছে। তার নিষ্পাপ দুই চোখের কোণে প্রথম জলবিন্দু টলমলিয়ে ওঠে।

শকুনগুলো পাক দিতে দিতে তাকায় নীচের দিকে। ভয় দেখায় যেন কুটিল চোখের তির্যক চাউনি হেনে হেনে।

দুলদুলের চকচকে কাঁধ আর নরম কেশর জড়িয়ে ধরে আলিজান। গালে গাল দিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দেয় অতি সন্তর্পণে। মাথা একটু তুললেই আহত হওয়ার সম্ভাবনা। মাথার খুলি উড়ে যাবে হয়তো ব্রেনগানের গুলীতে। ধড় থেকে মাথা উড়ে যাবে সেই গাছের শিখরে। রক্তের নদী বইবে।

কত আদরের, কত যত্নের, কত কাছের দুলদুল। সোয়াগে শাসনে আছে আলিজানের কাছে। সুখ আর দুঃখের অংশীদারের মত।

বুড়ো বাপজান নোসের আলী দিয়েছে তার একটা মাত্র পোলাপানকে। সেবার হজে গিয়েছিল বুড়ো। এদেশ-সেদেশ ঘুরতে বেরিয়েছিল। তীর্থ সেরে ফিরে এসে ছেলেকে বাপ উপহার দিয়েছে।

আলিজান যশোর জেলার সদর মহকুমা বাগেরপাড়ায় কাজ করে সরকারী রেজিষ্ট্রি অফিসে। দপ্তরীর কাজ করে। তাই যেতে-আসতে হয় অনেকটা রাস্তা। বাসগ্রাম বাসন্তিয়া থেকে বাগেরপাড়া যাওয়া-আসা বন্ধুর পথের কষ্ট আর অসুবিধা দুলদুলই দূর করলো। আলিজানের বাহন হয় দুলদুল।

একটা দিন দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যায়। একটি রাত কাটলো অনেক কষ্ট আর দুর্দশায়। গুলীর আওয়াজ শুনে শুনে কানে তালা লেগে আছে যেন।

আবার আজ ভোর হতে শকুনগুলোকে দেখেই চমকে শিউরে উঠলো আলিজান। জলের সবুজ বোতলটা একবার নাড়াচাড়া করলো। জানে একেবারে শূন্য, তবু একবার পরখ করে যেন। এক-বিন্দু জল নেই আর। বোতলটা পরিখায় ছুঁড়ে ফেলে দেয় বিতৃষ্ণায়।

দিনের আলোয় দুলদুলের মুখখানা দেখতে পাওয়া যায় আবার। জলের ধারা নেমে শুকিয়ে গেছে চোখের প্রান্ত থেকে। কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে সে। বিশাল আর গভীর চোখ এখন স্তিমিত, অর্ধ নিমীলিত। আলিজান জড়িয়ে আছে দুলদুলকে। তার মসৃণ পিঠে মাথা রেখে কাঁদছে। মাঝে মাঝে বিশ্বাস হয় না যেন। আলিজান কান পাতে দুলদুলের বুকে। আছে না নেই কে জানে। আলিজান শুনতে পায় বুকটা তার ধক্ ধক্ করছে। থেমে থেমে বেজে চলেছে।

—তুই তো মরবা এহনই। আমার গতিটা কি হইবা দুলদুল? কুথাকে যামু আমি? ফিসফিস কথা আলিজানের কণ্ঠে। কান্নার সুর। আলিজান কাঁদছে ডুকরে ডুকরে। ফুঁপিয়ে উঠছে।

দুলদুল চোখের চাউনি ঘোরায়। একবার দেখে তার আলিজানের মুখখানা।

আকাশে শকুনের পাল উড়ছে। তাদের পাখার ছায়া পড়ছে মাঝে মাঝে দুলদুলের অচঞ্চল দেহবপুতে আলিজানের মাথায়।

—আমার রাজা। আমার দুলদুল। চলতি পারবা কি দ্যাখ না একটাবার উঠা। আবার বললে আলিজান, স্নেহ-মিনতির সুরে।

আদরের ডাক শুনেও সাড়া দেয় না দুলদুল। জল ছলছল চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে শুধু তার আলিজানকে। মুখ থেকে ফেনা পড়ছে সাদা সাবান-জলের মত। সযত্নে মুছিয়ে দেয় আলিজান। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে দুলদুলের নাক-মুখ নিজের লাল রুমালে মুছিয়ে দেয়। নাকের রাশ-দাঁড়টা আলগা করে দেয়।

দুলদুল শূন্য বোতলটার দিকে তাকায় স্তিমিত দৃষ্টিতে। সবুজ বোতলটা পড়ে আছে পরিখার এক পাশে। সিগারেটের একটা প্যাকেট আর দিয়াশলাইটা পড়ে গেছে কখন। সাহসে কুলায়নি, ইচ্ছাও তেমন হয়নি যে একটা সিগারেট ধরাবে আলিজান।

খটখটে দিনের আলো। সূর্য উঠতে না উঠতে মাটঘাটে চড়চড় ফাট ধরছে। আগুনের ঝলক বইতে শুরু করেছে। তপ্ত ধুলো উড়ছে সর্পিলগতিতে।

টা টা করছে আলিজান। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাবে হয়তো। আর সহ্য হয় না। প্রখর উত্তাপ। আষাঢ় পড়েছে, তবু এক-ফোঁটা বৃষ্টির নামগন্ধ নেই। প্রকৃতিটাই বেবাক বদলে গিয়েছে। শীতে ঠাণ্ডা নেই, বর্ষায় জল নেই শুধু গ্রীষ্মের অগ্নিবাণ আছে।

শকুনের পাল পাকচক্রের আয়তন পরিধি হ্রাস করলো কখন। কত কাছে এগিয়ে এসেছে যেন আশায় আশায়। ব্রেনগানের গুলী চলেছে ঝাঁকে ঝাঁকে, ভয়-ডর নেই যেন। তবু দু-একটা গুলী খেয়ে পড়েছে বন-বাদাড়ে।

দুলদুলের কষ্ট আর কাতরানি আর যেন চোখে দেখা যায় না।

আলিজান পায়জামার বেল্টে হাত দেয়। কি যেন খুঁজতে থাকে। কোমরের চামড়ার বেল্ট থেকে ঝুলছে একখানা ছোট ভোজালী।

বুড়ো নৌসের আলী সেবার নেপাল থেকে এনে দিয়েছে ছেলেকে। বলেছিল,—পথে-বিপথে যাওয়া-আওয়া করতি হয়, কাছে কাছে রাখবা এটাকে। দরকারে অদরকারে—

ভোজালী বের করলো আলিজান। পরিখার শুকনো মাটিতে ঠুকে ঠং শব্দ তুললো একটা। ভোজালীখানা দুলদুলের ঠিক বুকের কাছে ধরলো একান্ত নিষ্ঠুরের মত!

চোখ থেকে জল ঝরছে আলিজানের। কেঁদে কেঁদে কথা বললে আবার। ফিসফিস গুঞ্জন। বললে,—দুলদুল, তুই চইলা যা তাড়াতাড়ি। আমি আর দেখুম না তোর এই কষ্ট। শকুনগুলোকে আমি একাই সামাল দিমু।

কথার শেষে দুলদুলের মসৃণ বুকে ভোজালীখানা সজোরে বিঁধিয়ে দেয় আলিজান।

দুলদুল শেষবারের মত দেখতে আর দৌড়তে চেষ্টা করে যেন। দেহটা তার থরথর কাঁপতে থাকে। কেমন একটা শব্দ ফোটে দুলদুলের দীর্ঘকণ্ঠে। স্তিমিত চোখের কোণে কোণে জল টলটল করে। তার আলিজানকে শেষ দেখা দেখে নেয় দুলদুল। কত যেন কৃতজ্ঞতা ঐ ঘন-কালো চোখে। দুলদুলের মাথাটা নেতিয়ে পড়লো। শেষ শ্বাস ফেলেছে দুলদুল।

গুলী ছুটছে কোন্ তরফ থেকে! আলিজান ঠাওরাতে পারে না। বেনাপোল ক্যাম্প থেকে? পেত্রাপোল ক্যাম্প থেকে? ডাকলে সাড়া দেবে না মিলিটারী ভাইরা? এক-পক্ষ ডাকলে, অন্য পক্ষ থেমে থাকবে। ডাক লাগে না লাগে, অভ্যাসটা বজায় থাকবে তবু। গুলী বিনিময়ের আমোদ-আহ্লাদেই খুশী থাকবে ভারত-পাকিস্থানের ভি, আই, পি।

আর সবুর সয় না আলিজানের। ভোজালীখানা টেনে বের করে নেয়। বাপজান বলেছে,—পথে, বিপথে রাখবা কাছে কাছে এটা। জানমালটা রক্ষা করবা!

পরিখা থেকে উঠে পড়লো আলিজান। ঝাঁক-ঝাঁক গুলী ছোটাছুটি করছে মাথার পরে খেয়াল হয় না তার। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাবে হয়তো। এক আঁজলা পানি চাই আলিজানের। কোথায় মিলবে কে জানে। বেনাপোলে মিলবে কি এক আঁজলা পানি? পেত্রাপোলে মিলবে কি? কোনদিকে যাবে আলিজান, সমঝাতে পারে না নিজেকে।

বাসন্তিয়ার রাস্তাটা কোন্ দিকে চিনতে পারে না আলিজান। তার বাসঘর সেখানে। বুড়ো বাপজান নৌসের আলী কত ভাবছে হয়তো বুড়ো। পোলাপান [illegible] যে নিরুদ্দেশ হয়েছে, বুড়ো ধরতে পারে না। ভেবে ভেবে সারা হয় নৌসের আলি। [illegible] শুধোয়। দিনকাল ভাল নয়, সীমানায় [illegible] চলেছে দুই পক্ষে।

খানিক যেতে যেতে আলিজান [illegible] দিতে শুরু করলো। বলা যায় না, কোথা থেকে আসবে আর বিঁধবে মাথায় কিম্বা বুকে। রুপালী-শুভ্র আকাশে চোখ তুললো একবার। আলিজান দেখলো, একজোড়া শকুন [illegible] নিয়েছে। উড়তে উড়তে আসছে। ভয় ভয় করে আলিজানের। ওদের চোখে কি হিংস্র [illegible] কুটিল দৃষ্টি! কি অব্যর্থ লক্ষ্য ঐ সূক্ষ্ম চোখে!

হামাগুড়ি দিয়ে ছুটে চলেছে আলিজান। কাঁটাগুল্মে তার হাত আর হাঁটু ক্ষত-বিক্ষত তবুও বেপরোয়া এগিয়ে চলেছে যেদিকে বাসন্তিয়া সেদিকে।

অবসারভেশন টাওয়ার থেকে রাইফেল দাগলো কে হঠাৎ। বেনাপোল থেকে দাগলো কি! না পেত্রাপোল থেকে!

ঠাওরাতে পারে না আলিজান। তার আগেই সে শুকনো আর ফাটধরা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। রাইফেলের গুলী লেগেছে বুকে। তাজা আর লাল রক্তে ভিজে উঠছে আদ্দির সার্ট-জামা। আলিজান শেষ কথা বলে আকাশে চোখ মেলে। বলে,—হা আল্লা।

খানিক আগে গেছে দুলদুল। হয়তো ধরে ফেলবে তাকে আলিজান। আবার তাকে বুকে জড়িয়ে তার পিঠে হাত বুলিয়ে কত আদর করবে আলিজান!

বুড়ো নৌসের আলীকে কে দেখবে তার এই শেষ সময়ে? কে আদর করবে আলিজানের মালতীমালাকে?

আশায় আশায় থাকবে তারা। জানবে, আলিজান নিরুদ্দেশ হয়েছে কি খেয়ালে। ইচ্ছা হলেই আসবে আবার, মন বদল হলেই ফিরে আসবে। তারা জানবে না, আর আসবে না আলিজান। দুলদুলও আসবে না।

•অতৃপ্তি•

সুশীলকুমার লাহিড়ী

কী জানি কেন যে হাজার বাসনা
মনটাকে ছেড়ে যায় না।
অনেক পেয়েও অনেক পাবার নিত্য-নতুন বায়না
ছাড়ে না এ মন কিছুতে—
ও'পরে ওঠার দুরাকাঙ্ক্ষাটা
যন্ত্রণা আনে নীচুতে।
সুদূর শূন্যে যখনি উধাও
পাখ্না দু'খানি উড়লো—
মাটি-মুখো-মন তখনি আবার
খোলা ডানা দু'টি মুড়লো।
অনেক পেয়েও—অনেক পাবার
আকাঙ্ক্ষা তবু মিট্‌ল' কই?
পাওয়া না-পাওয়ার একই যন্ত্রণা সমানে বই।

চর্মা মুখ শীর্ণ হয়ে গিয়েছে। অনিদ্রায় লাল চোখে অপ্রকৃতিস্থ চাহনি। হাতের আঙুলগুলো অজান্তে খুলছে আর বন্ধ হ[illegible]। মাত্র দুই বছর বাদে দেখা। কিন্তু যুধাজিৎবাবুকে চিনতে অসুবিধা হয় ডাক্তারের। বদলে যায় মানুষ? মনের বিস্ময় মুখে প্রকাশ করেন না ডাক্তার। বলেন—বলুন! যুধাজিৎবাবু ঝুঁকে পড়েন। বলেন—আমার সম্পর্কে অনীতা আপনাকে কি বলেছে? বলেছে আমি পাগল?

ঠিক তা-ই বলেছেন যুধাজিৎবাবুর স্ত্রী, [illegible]র সেকথা বলেন না। বলেন—

মিসেস সেন বলছিলেন ঘুম হয় না আপনার! কতদিন হলো কষ্ট পাচ্ছেন?

অস্থির আঙুলগুলোকে বাধ্য করে [illegible] যুধাজিৎবাবু কাগজে তামাক [illegible]লেন। দেশলাই জ্বালালেন। তারপর বলেন—ঘুম আমার হয় না। না ঘুমোতে ঘুমোতে পাগল হয়তো আমি সত্যিই হয়ে যাবো।

ডাক্তার বড় আলোটা নিভিয়ে ছোট বাতিটা জ্বালেন। নীল ও ঠাণ্ডা একটা আলো ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। যুধাজিৎবাবু চোখের ওপর থেকে হাতটা নামান। হেলান দিয়ে বসেন। তারপর কষ্টে হাসির চেষ্টা করেন। বলেন—শুনে আমাকে কি পাগল মনে করবেন? কিন্তু না বলে আমার উপায় নেই। বেরাল, একটা বেরাল আমাকে পাগল করে দিচ্ছে ডাক্তার!

—বলুন!

পেশাদারী ধৈর্যে চুপ করে থাকেন ডাক্তার। যুধাজিৎবাবু বলেন—

দুই বছর আগে আপনার কাছে ইনজেকশান নিয়ে গেলাম মনে পড়ে আপনার?

খুব মনে আছে ডাক্তারের। তখন যুধাজিৎবাবু ইনজেকশান নিচ্ছিলেন সাময়িকভাবে নষ্ট পৌরুষ ফিরে পাবার জন্য। আসন্ন বিবাহের আগে প্রয়োজন হয়েছিল। অবশ্য যুধাজিৎবাবুকে সেদিনও কেমন গোলমেলে লেগেছিল ডাক্তারের। যুধাজিৎবাবুরা ঐ রকমই। বাইরে থেকে দেখে ওদের বোঝা যায় না। [illegible] যে এরা বাপ খাবে, তাও [illegible]। সেদিন যুধাজিৎবাবু ছিলেন [illegible] চোখ-মুখ ফ্যাকাশে, ছোট ছোট মঙ্গোলীয় চোখ—[illegible] হাতে কড়াপড়া—বহিরঙ্গে পৌরুষের প্রতীক। তবে সেদিনও তাঁকে ঠিক বোঝা যায়নি। আজ সেই যুধাজিৎবাবুর [illegible] বিয়ের পর, হঠাৎ একটা বেরাল[illegible] লোক। আজও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ওর নিজের সম্পর্কে কি যে বললেন ভদ্রলোক ডাক্তার [illegible] শুনেছেন। যুধাজিৎবাবুর স্ত্রী সবকথাই বলেছেন। বলেছেন—দেখবেন, আমি যা বললাম—অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাবে।

যুধাজিৎবাবু বলেন—তখনো আপনাকে [illegible] সব কথা বলা হয়নি। অনীতাকে বিয়ে করবার জন্যে আমাকে আমার পরিবারের কাছ থেকে কত কথা শুনতে হয়নি ডাক্তার! পরিবার ছাড়তে আমার আপত্তি হলো না। বললে, বাড়ি ছাড়তে [illegible] দিয়ে বললাম—অনীতার জন্যে একটা [illegible] পুরোনো বাড়ী আর ঠাকুরেটা [illegible] মাথাধারার আমলের পাপ সম্পর্ক—ছাড়া যায় না কি?

মৃদু হেসে ডাক্তার বলেন—বলুন!

—চমৎকার ছিলাম আমরা। সেবার আমরা ঘাটশীলাতে—অনীতা হঠাৎ জেদ করে একটা বেরাল কিনলো। কালো আর ব্রাউন মেশানো একটা অ্যাঙোরা বেরাল। বিশ্রী দেখতে! বলতে বলতে যুধাজিৎবাবুর শরীরে যেন ছোট ছোট বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলতে থাকে। তিনি উত্তেজিত হয়ে সোজা হয়ে বসেন। বলেন—

—একটা বেরাল! ভাবতে পারেন আপনি? আমি অনীতাকে নিয়ে মুরির লেকে গিয়েছি—কাশ্মীর নিয়ে গিয়েছি—কি করতাম না আমি তার জন্যে? কিন্তু একটা বেরাল কিনে বসলো অনীতা!

বেরাল, কথাটা এমন করে উচ্চারণ করেন যুধাজিৎবাবু, যে মনে হয় সাপ বা বাঘের কথা বলছেন! যুধাজিৎবাবু বলেন—

—আমাদের বাড়ীর ব্যাপার জানেন ত?

ছাঁটলোহার কারবারী এক পুরনো ধনী পরিবারের ছেলে যুধাজিৎবাবু। ডাক্তার জানেন ততটাই, যতটুকু সবাই জানে। ও বাড়ীতে সম্পত্তির জন্যে ভাই ভাইকে খুন করতে চেষ্টা করেছে, মা-কে ছেলেরা বিশ্বাস করেনি—দুর্নীতি, ব্যভিচার আর পাপ ও বাড়ীর উত্তরাধিকার। যুধাজিৎবাবু বলেন—

—ছোটবেলা থেকে চাকর ঝি-র হাতে মানুষ—আর ভুতুড়ে গল্প শুনেই হোক, বা ঝিদের ভয় দেখাবার জন্যই হোক বেরালকে আমি ভীষণ ঘেন্না করি—ভয় করি বললেই ঠিক হয়।

মানসিক বিকারগ্রস্ত, দুর্বলচিত্ত হতভাগ্য মানুষটির দিকে চেয়ে থাকেন ডাক্তার। যুধাজিৎ বলেন,—

—আমার ছোট একটা ভাই ডিপথিরিয়ায় মরে যায়। বেরাল সম্পর্কে সেজন্যও ভয় ছিল। অথচ, আমার ঝি আমার বিছানায় কালো একটা বেরাল এনে ভয় দেখিয়ে কান্না থামাত। ব্রেণফিভার-ও হয়েছিল আমার! অথচ সে ভয়ের কথা বললে মা হাসতেন। মা আমাকে বাঁচাতেন না। ভয়ের মধ্যে ঠেলে ঠেলে দিতেন। আমার পরিবারের ওপর......আমার কোনো টান হয়নি—আমি ওদের-ও ঘেন্না করি......অনীতা সব জানতো। তবু অনীতা বেরাল কিনলো! বুঝতেই পারছেন তারপর থেকে আমাদের সম্পর্কটা কি রকম হয়ে দাঁড়ালো!

যুধাজিৎবাবু ডাক্তারকে মুগ্ধ করেছেন

এতকাল। ডাক্তার চেয়ে চেয়ে ভদ্রলোকের মনের গোলকধাঁধার আঁধার চোরাগলিগুলো বুঝতে চেষ্টা করেন। যুধাজিৎ এবার বলেন, ফিসফিস করে—অনীতা আমার চেয়ে বেরালটাকে অনেক ভালবাসতো ডাক্তারবাবু! আমার অক্ষমতার জন্যে অনীতা আমাকে হয়তো ঘেন্না করতো! একটা মানুষকে ভালবাসলেও বুঝতাম! কিন্তু একটা বেরাল। বলবো কি—বেরালটা ওর সংগে খেতো, ঘুমোত, বেড়াতে যেত। আমি যদি ওর কাছে যেতাম—বেরালটা পিঠ বাঁকিয়ে এমন করতো—যে ভয়ে আমি সরে আসতাম। ঐ বেরালটা নিয়ে আমাদের মধ্যে মনোমালিন্য বাড়তে বাড়তে এমন হলো, যে বিশ্বাস করবেন কি? বেরালটা ওর হয়ে শোধ নিতে লাগলো আমার ওপরে! কেমন করে জানেন?

মনে করতেও শরীরে কষ্ট হচ্ছে, এমনই আর্ত মুখ করে যুধাজিৎ বলেন—আমি একলা ঘুমোই। রাতের বেলা ঘুমভাঙতে দেখি, দুঃস্বপ্নের মতো বেরালটা আমার দিকে চেয়ে আছে। চোখ দুটো সবুজ আলোর মতো জ্বলছে—ডাক্তার! যদি বুঝতেন!

হাত দুটো মোচড়াতে থাকেন যুধাজিৎ। তারপর অসহায়ের মতো জল খান ঢকঢকিয়ে। একটু বাদে বলেন—তারপর আমি বেরালটাকে মারতে বাধ্য হয়েছি।

—কি করেছেন?

—মেরে ফেলেছি। গুলী করেছি।

ডাক্তারের এবার কেমন যেন ঘেন্না ঘেন্না লাগে। একটা বেরালকে গুলী করে মারবার পরে লোকটা বসে বসে সেই কথা বলছে? যুধাজিৎ নীচু হয়ে বলেন—তবু কি জানেন ডাক্তার বেরালটা মরেও মরেনি। বেরালটাকে মারলাম যখন, তার আগে তিন-চারদিন ধরে ঝগড়া চলছিল আমাদের। আমি বলেছিলাম অনীতাকে সুযোগ পেলেই আমি শেষ করবো বেরালটাকে। এই রাত্রির দুঃস্বপ্ন আর সহ্য করবো না। এত বলবার পরেও সে রাতে বেরালটাকে খাঁচা থেকে খুলে দিলো অনীতা। নিশ্চয় অনীতা-ই খুলে দিয়েছিলো—নইলে সে রাতে, আমার সে বন্ধ ঘরে......রাতের অন্ধকারে...

যুধাজিৎবাবু এবার কাঁদতে থাকেন। অসহায়ভাবে চোখ দিয়ে জল পড়ে। গলা দিয়ে বিশ্রী ভাঙা ভাঙা শব্দ বেরোয়। ডাক্তার বলেন—কেন ভাবছেন আর? বেরালটা মরে গিয়েছে। আর কোন দিন-ও সে আসবে না।

মাথা নাড়েন যুধাজিৎ। বলেন—কেমন করে তা বিশ্বাস করি ডাক্তার? তারপর কি হয়েছে জানেন?

এবার যুধাজিৎবাবু যা বলেন, তা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনই ভয়ঙ্কর। মানুষের মনের চোরাগলির অন্ধকার পিচ্ছিল পথে যেসব বিকৃত চিন্তাধারা বাস করে, যদি কখনো তার মুখ দিনের আলোয় দেখা যায়—দর্শকের চোখ বুঝি আতঙ্কিত হবে! যুধাজিৎ এবার যা [illegible] তার উৎপত্তি কোন্ জটিল মনোবিকারে? [illegible]তর সঞ্চিত কুসংস্কার, ভয় আর অক্ষম অপরিণত এক মনের গহনে বুঝি এইসব ক্লেদাক্ত চিন্তা জন্ম নেয়।

যুধাজিতের কথায় জানা যায়—বেরালটা মরবার পর অনীতা এসে দাঁড়িয়েছিল। অনীতাকে চোখে দেখেননি ডাক্তার। ফোনে তার গলা শুনেছেন। অনীতা নাকি আশ্চর্য ফর্সা। বেরালটার দিকে চেয়ে চেয়ে তার ফর্সা মুখ আরো অনেক সাদা হয়ে গিয়েছিলো। সে তাকিয়েছিলো যুধাজিতের দিকে। মুখে কিছু বলেনি। তারপর মুখ ঢেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো ঘর থেকে।

এই ঘটনার পর আশ্চর্যভাবে অনীতা চুপচাপ হয়ে গেল। যুধাজিৎবাবুরও মনে অনুশোচনা হয়েছিলো। তিনিও সুযোগ খুঁজছিলেন কেমন করে অনীতাকে খুশী করা যায়। অন্ততঃ তিনি এটুকু বলতে চেয়েছিলেন—যা হয়েছে, তা এ্যাক্সিডেন্ট। সেজন্য যেন অনীতা মনে দুঃখ না রাখে। তাঁর ওপর অভিযোগ না রাখে। অনীতা তেমন কিছু বলতে সুযোগ দেয়নি। তবে একজোড়া কুকুর কেনবার প্রস্তাবে সে বলেছিলো—আর নতুন করে কিছু পুষবার তার ইচ্ছে নেই। সে শখ তার মিটে গিয়েছে। এই কথার মধ্যে রাগের চেয়ে দুঃখের প্রকাশই বেশী দেখেছিলেন যুধাজিৎবাবু। তিনি জোর করেননি।

এমনি করে ছ'মাস কাটলো। যুধাজিৎবাবুর মনটাও খানিকটা সহজ হয়ে এলো। এটা কিছুই নয়। বিকারমাত্র—এ রকমও ভাবতে লাগলেন তিনি। আর আশ্চর্যভাবে অনীতার মধ্যে এলো একটা পরিবর্তন। সে যুধাজিৎবাবু সম্পর্কে সহসা মনোযোগী হয়ে উঠলো। তাঁর খাওয়া-দাওয়া দেখে। চাকরদের ঘরে আসতে দেয় না। নিজে খেতে দেয়। নিজে কাছে বসে বই পড়ে। নিজে ড্রাইভ করে বেড়াতে নিয়ে যায়। জামা বা জুতো পর্যন্ত পরতে সাহায্য করে তাঁকে। এইখানে কথা থামিয়ে যুধাজিৎবাবু বলেন—

—নিজে আমি কিছু করিনা ডাক্তার........ সব বিষয়ে আমি পরনির্ভরশীল!

ডাক্তার বোঝেন হতভাগ্য একটা জীবন-যাপন করবার জন্যেই এইসব মানুষ সৃষ্ট হয়। আবার সেই কাগজে তামাক ভরে—সিগার পাকিয়ে ধরাবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা মিনিট দশেক বাদে সফল হয়। যুধাজিৎ বলে চলেন।

দুইমাস আগে এক রাতে তাঁর সহসা ঘুমের মধ্যেই একটা বিপদের অনুভূতি হয়। বিপদ এবং আতঙ্ক। ঘুম থেকে যেন তাঁকে উঠতেই হবে। অথচ উঠলে পরে যা দেখবেন, তাতেও তাঁর আতঙ্ক হবে! আশ্চর্য এই যে ঘুম ভাঙতে ভাঙতেই এসব কথা তিনি বুঝতে পারছিলেন। তারপর তাঁর ঘুম ভাঙলো। ঘুম ভাঙতে তিনি পাশ ফিরে অনীতার দিকে তাকালেন। যুধাজিতের গলা এবার নেমে এসেছে। তিনি ভাঙাভাঙা গলায় বলেন ভয়বিকৃত সুরে—ঘরে সবুজ বাতি জ্বলছে। সবুজ বাতির আলোয় সমস্ত ঘরটা অদ্ভুত দেখাচ্ছে। আমার বিছানার পর একটা টেবিল। তার ওপাশে অনীতার বিছানা। সেই বিছানায় গুঁড়ি মেরে বসে আছে অনীতা। বুকের কাছে শাদা জামাটা এক হাতে ধরে আছে, আর গুঁড়িমেরে বসে চেয়ে আছে আমার দিকে। কালো চুলগুলো ঝুলছে মুখের সামনে। কোঁকড়া কোঁকড়া গোছা গোছা। সমস্ত শরীরটা অদ্ভুত এক ভঙ্গীতে বাঁকানো—আর তার চোখ......

তার চোখ যে কার মতো মনে হলো......ওঃ ডাক্তার, ডাক্তার, ডাক্তার......।

তোয়ালে দিয়ে যুধাজিৎবাবুর মাথা আর মুখ মুছিয়ে দেন ডাক্তার। মাথা তোলেন যুধাজিৎবাবু। বলেন—আমি বলেছিলাম, অনীতা তুমি অমন করে চেয়ে আছ কেন? অনীতা, আমার ভয় করছে। অনীতা শোনেনি। অনীতা হাসলো—সে হাসি যদি দেখতেন ডাক্তার। আমি চীৎকার করেছিলাম। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। ওরা এসে আমাকে তোলে। আমার সেকথা জ্ঞান নেই। ......তারপর...তারপর থেকে আমি আলাদা ঘরে ঘুমোই! ঘুমোই কি বলবো ডাক্তার ঘুম আমার আসে না......কেউ আমার কথা বিশ্বাস করে না। সবাইকে অনীতা বুঝিয়েছে পাগল আমি! রাতের পর রাত..... একটা রাত-ও আমার ঘুম আসে না। ঘুমের ওষুধ খাই, ইন্‌জেকশন নিই......কিন্তু রাত হলেই আমার আতঙ্ক বাড়ে! দরজার নিচের ফাঁক দিয়ে দেখেছি অনীতা চলাফেরা করছে। দেখেছি তার পায়ের ছায়াটা দাঁড়িয়ে আছে। দেখি আর ভয়ে আমার চোখে পাতা নামে না। কত রাতে··কত রাতে অনীতা দরজাটা আঁচড়ায় আস্তে আস্তে......দেখে খোলা আছে না কি। কত রাতে আমাকে ডাকে নিচুগলায়—যুধাজিৎ, যুধাজিৎ, যুধাজিৎ! সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমি জেগে দুঃস্বপন দেখি...মনে হয় দেওয়ালে বুঝি ছায়া পড়লো......মনে হয় আঁধার থেকে কালো, সাদা, ব্রাউন মেলানো একটা বেরাল টলতে টলতে উঠে দাঁড়াচ্ছে। বালিসের নিচে হাত দিতে ভয় করে......না ঘুমিয়ে এইসব ভাবতে ভাবতে আমি যদি পাগল হয়ে যাই ডাক্তার।

ডাক্তার বলেন—নতুন একটা ঘুমের ওষুধ দিলাম। আমার মনে হয় আপনার ঘরে রাতে কারুর থাকা প্রয়োজন। নিদেনপক্ষে কুকুর রাখুন ঘরে।

—কুকুর পুষতে দেয়না অনীতা।

—কোনো চাকর থাকতে পারে না?

—অনীতা দেবে না।

—চড়াবাতি জেলে ঘুমোবেন তবে! ঘরে কারুকে রাখবেন—সব বিষয়ে শুনবেন কেন স্ত্রী-র কথা? এ ওষুধটায় আপনার উপকার হবে। আর দরকার হলেই আমায় ফোন করবেন।

—রাতে থাকতে পারেন আপনি আমার কাছে?

ছোট বাচ্চাকে সান্ত্বনা দেবার গলাতে বলেন ডাক্তার—দরকার হলে আমরা তাও করি বৈ কি! তবে দরকার আপনার হবে না। আপনি তিনদিন ব্যবহার করুন!

এবার ওঠেন যুধাজিৎবাবু। তাঁর সেক্রেটারী ধরে ধরে তাঁকে নিয়ে যান। সেক্রেটারীকে বোঝাতে বোঝাতে এগিয়ে যান ডাক্তার কিছুটা! বেরিয়ে যায় নিঃশব্দ হাডসন গাড়ীটা।

এবার ডাক্তারের ফোনটা গুঞ্জন করে ওঠে। ফোন ধরতেই যুধাজিৎবাবুর স্ত্রী-র গলাটা আকুল প্রশ্ন করে—ডাক্তার কেমন দেখলেন?

আশ্চর্য কণ্ঠ। যেন আদর করে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কথা কইছে তার সংগে। ডাক্তার ইতিমধ্যেই আকৃষ্ট হয়েছেন। ফোনের কথাবার্তায় যেটুকু বুঝেছেন, মহিলা যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনই তাঁর ব্যক্তিত্ব। পরম দুর্ভাগা অনীতা দেবীর যে তাঁর নিয়তি ওরকম একজন জীবন্মৃত ব্যক্তির

সূত্রে গ্রথিত। ডাক্তারের অন্ততঃ তাই মনে হয়। তিনি বলেন—আপনি যা যা বলেছিলেন, সবই মিলে গেল। তবে কষ্ট যে উনি পাচ্ছেন তা আর মনগড়া নয়। আর, কারণে নয়, অকারণেই হোক, আপনার সম্পর্কে একটা ধারণা যখন ও'র মনে বাসা বেঁধেছে তখন......

—তখন কি? ......

নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনছেন মহিলা সেটাও তাঁর ফোনে ধরা পড়ছে। ডাক্তার মনে মনে ভেবে নেন দ্রুত। তাঁর দীর্ঘদিনের পেশার অভিজ্ঞতায় এমনিধারা আরো রুগী এসেছে। এইসব নিয়ে, টাকাটা কোন মতে খরচ করতে পারলে যারা বেঁচে যায়—তাদের কখনোই চটাতে নেই। মনোবিকারের রুগী যুধাজিৎ বা তাঁর স্ত্রী অনীতা, কারুকেই চটাতে পারেন না তিনি। তিনি বলেন—তখন আপনার উচিত হচ্ছে ও'কে এড়িয়ে চলা। ও'কে না হয় কটাদিন আলাদা থাকতে দিন। সেক্রেটারীর সঙ্গে হোটেলে...বা আপনিই না হয় .....

—আপনার নার্সিংহোমে পাঠাব ও'কে?

—দুঃখিত, একেবারে যে জায়গা নেই!

—তবে আর কোথায় পাঠাব বলুন? কে ও'র খাওয়া দেখবে, কি করবে? কি যে শিশুর মতো অসহায় তিনি......কি জানেন ডাক্তার ও'র শৈশব থেকে আফিং ধরিয়ে ঝি-চাকরগুলো ও'র মাথাটা নষ্ট করে দিয়েছে। নইলে আমাকে উনি অবিশ্বাস করেন? যাক্ দরকার হলেই আপনাকে পাব তো?

—নিশ্চয়।

ছেড়ে দেন ডাক্তার।

তারপর দু'তিনটে দিন যায়। প্রতি মুহূর্তে প্রতীক্ষা করেন ডাক্তার যে এবার সেই আকাঙ্ক্ষিত ফোন আসবে। সেই আশ্চর্য কণ্ঠ আবার শুনতে পাবেন তিনি। কি গলা! যেন মধু ঝরে ঝরে পড়ছে গলন্ত মোমের মত। শুধু গলায় যার এত মাধুরী, সে দেখতে কেমন? শুনেছেন যে সুন্দরী। শুনেছেন তাঁর অপর এক প্রাক্তন রোগীর কাছ থেকে। পেশাদারী আদবকেতা বিরুদ্ধ জেনেও অনীতার সম্পর্কে তিনি কৌতূহল জানিয়েছেন। তাঁর প্রাক্তন রোগী বিশেষ কিছু বলতে পারেন নি। অনীতা সম্পর্কে জানবার ইচ্ছেটা তাই অপূর্ণই রয়ে গিয়েছে। যা জেনেছেন তা টুকরো টুকরো কথা! জেনেছেন যে মেয়েটি খানিকটা অজ্ঞাতকুলশীল। সম্ভবতঃ টাকা-পয়সার জন্যেই বিয়ে করেছিলো যুধাজিৎকে। অন্যথায় ওরকম অসম্পূর্ণ একটা মানুষকে বিয়ে করবার কোন কারণ পাওয়া যায় না। আবার যুধাজিতের সম্পর্কে তাঁর স্ত্রীর আন্তরিক উদ্বেগ ও চিন্তা, সে পরিচয় তো ডাক্তার নিজেই পেয়েছেন। এইসব টুকরো টুকরো কথা জুড়ে কি একটা ছবি হয়? একটি মেয়ের ছবি? যাকে চোখে দেখা যায়নি, আর যার কণ্ঠ এক আশ্চর্য সম্পদ? মধুর, মাদকতাভরা—যে কণ্ঠের কথা শুনলে মনে হয় কথাগুলো যেন আদর করছে মুখ ছুঁয়ে, গলা ছুঁয়ে!

ফোন এলো চারদিনের দিন। সন্ধ্যারাতে। নার্সিংহোম থেকে করিডোর পেরিয়ে ঘরে আসতে আসতেই ডাক্তার শুনতে পাচ্ছিলেন বিপদের S O S-এর মতো ফোনটা তীক্ষ্ণ তীব্রভাবে বেজে চলেছে। আরো কি, ফোনটা শুনেই তিনি বুঝেছিলেন যে এটা যুধাজিতের কোন খবর এনেছে। ফোনটা তুলে নিতে না নিতে সেই গলা এবার আকুতি নিয়ে ঝরে পড়লো তাঁর পায়ে—অজস্র বৃষ্টিধারার মতো! এ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে। বিশ্রী একটা এ্যাক্সিডেণ্ট। এখন ডাক্তারকে চাই। গাড়ী যাচ্ছে নার্সিংহোমে। আর একথাও তিনি বলে আসতে পারেন যে ফিরতে তাঁর রাত হবে। বাঁ-হাতে ফোনটা ধরে ডাক্তার ডানহাতে কলিং বেলটা টিপতে থাকেন। যান্ত্রিক সুরে শব্দ হতে থাকে। এই শব্দ ডাকবে বেয়ারাকে। বেয়ারা ডাকবে জুনিয়র এ্যাসিস্ট্যাণ্টকে। নির্দেশ দিয়ে যাবেন ডাক্তার। যাচ্ছেন একটু দূরে। ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে।

একটু দূর নয় অনেক দূর। বড়বড় গাছ বেড়ে উঠেছে। অযত্নের ঘাসে ঢাকা কম্পাউণ্ড। একদিনের সুপরিকল্পিত বাগান আজ জংলা হয়ে গিয়েছে। দেড়তলা বাড়ীটা যেন ঝাউগাছের সবুজে ডুবে আছে। কি চমৎকার! যুধাজিতের বিশ্রাম নেবার উপযুক্ত স্থান বটে। ড্রাইভেও ঘাস জন্মেছে। গাড়ীর শব্দ ডুবে যায়। ভাগ্যে গাড়ী এসেছিলো। নয়তো তাঁর পথ চিনে আসতে অসুবিধে হতো।

গাড়ীবারান্দার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে যে মহিলা দুই হাত মোচড়াচ্ছিলেন আর ফোঁপাচ্ছিলেন—যাঁর পেছনে, আশে-পাশে কয়েকজন চাকর, দাসী, সবাই চিত্রিত পুতুলের মতো দাঁড়িয়েছিলো অদ্ভুত একটা ছবির কম্পোজিশানে—তিনিই অনীতা। ডাক্তারের দুইহাত তিনি চেপে ধরেন—কি হবে ডাক্তার? এ কি হলো?

কি যে হয়েছে, তা-ই বলতে বলতে ঘরে চলতে থাকেন মহিলা। চড়াবাতি জেলে দিনে-রাতে বন্ধ ঘরে বসেছিলেন যুধাজিৎ সেন—ডাক্তারের কাছ থেকে আসবার পর। তারপর, আজ বিকালে...চাকরদের ছুটি ছিলো—অনীতা আর সহ্য করতে পারেন নি। না খেয়ে থাকতে পারে মানুষ ওরকম? এক রকম জোর করেই বাথরুমের দরজা দিয়ে তিনি ঢুকেছিলেন এক পেয়ালা দুধ হাতে। সঙ্গে সঙ্গে যুধাজিৎ আতঙ্কে চেঁচিয়ে ওঠেন। সে চীৎকার মালী আর অন্যরা শুনেছে। তারপরেই নাকি তিনি পিস্তল তোলেন। অনীতা তাঁর হাত চেপে ধরেন। তার ফলেই এমন একটা এ্যাক্সিডেন্ট হলো।

যে ঘরে অজ্ঞানে শুয়ে আছেন যুধাজিৎ সে ঘরে যান না ডাক্তার। তার আগের ঘরটায় ঢুকেই অনীতা প্রায় ভেঙে পড়েন ডাক্তারের পায়ে—পুলিশের সামনে আমি যেতে পারব না ডাক্তার। আপনি বাঁচান আমাকে। কি হবে বলুন কেলেঙ্কারী করে? ও ফিরে আসবে? ওকে বাঁচানো যাবে? ডাক্তার!

দরজা বন্ধ করে দেন মহিলা। কাছে এসে বলেন—টাকাটা কোন প্রশ্ন নয়। সেটা বুঝেছেন?

সব মিটে গিয়েছে। সেই সন্ধেরাতটা গড়িয়ে গড়িয়ে এখন অনেক রাত হয়েছে। বৃষ্টি নেমেছে অনেকক্ষণ। এমনি বিষ্টিতে জল জমে এদিকের পথে। আর জল জমলে গাড়ী চলে না। জলে ভিজে রাতটা বেশ আমেজি হয়ে উঠেছে।

লোকজন সবাই চলে গিয়েছে। একটা সবুজ বাতি মাথার কাছে জেলে শান্ত হয়ে শুয়ে আছে এমন একটা কিছু, যাকে আজ সন্ধ্যা অবধি যুধাজিৎ সেন বলে ডাকা চলতো, আর এখন যাকে যে কোন নামে ডাকা না ডাকা সমান।

লোহার আলমারীটায় বন্ধ রয়েছে একটা মুখ আঁটা খাম। ডাক্তারের হাতে লেখা ডেথ্‌সার্টিফিকেট।

এখন এই ঘরটায় কেউ নেই। ডাক্তার আর অনীতা বসে আছেন। ডাক্তারের সামনে ছোট একটা গ্লাস। কিন্তু হলফ করে ডাক্তার বলতে পারেন, তাতে চুমুক না দিলে-ও অনীতাকে তাঁর ভাল লাগতো।

দুই পা গুটিয়ে বসে আছে অনীতা। শাদা ঘাড় আর কাঁধ ছেড়ে শাদা সিল্কের আঁচলটা লুটিয়ে আছে সোফায়। ঘাড় কাৎ করে অনীতা চেয়ে আছে তাঁর দিকে। কোঁকড়া কোঁকড়া গোছা-গোছা- চুল ঝুলেছে। মুখে মিঠে মিঠে হাসি। আর ব্রাউন চোখ দুটো কিন্তু ভীষণ সজাগ। তাঁকে লক্ষ্য করছে। অনীতা বলে—

—কি যেন লিখলেন ডাক্তার?

যুধাজিৎ পাগল? স্যুইসাইডের ঝোঁক ছিল তাঁর? যে কথাগুলো লেখা হয় সেগুলো বিশ্বাস করেন?

কথা নয়। ডাক্তারের মনে হয়—শাদা থাবা দিয়ে কথাগুলোকে আদর করে লুফে লুফে তাঁর দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে অনীতা। কথাগুলো এবার নরম পালকের বলের মতো তাঁর আশে-পাশে ঝরে ঝরে পড়ছে। খুব ভাল লাগছে তাঁর। এত ভালো লাগছে, তবু তাঁর মাথা ঠিক আছে। কথাগুলো জড়িয়ে যাবে এই ভয়ে তিনি খুব আস্তে বলেন—না।

—না?

—না মিসেস্ সেন।

—কি বলতে চান?

কিছু না। যুধাজিৎ সেনের মৃত্যুর সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে—সব হবে—যা যা আপনার প্ল্যান ছিলো। হবে না-ই বা কেন? সবকথা ত' আর প্রকাশ পাবে না।

—কি কথা!

প্রায় শোনা যাচ্ছে না অনীতার গলা।

ডাক্তার গ্লাসটার ভেতর দিয়ে শূন্যের দিকে তাকিয়ে বলেন যে আপনি মিথ্যা পরিচয় দিয়ে বিয়ে করেছিলেন যুধাজিৎকে। আপনি কোনদিনও গভর্ণেস ছিলেন না দার্জিলিংয়ে। আসলে আপনি অভিনেত্রী। বোম্বাইয়ে ট্যুরিং একটা পার্টিতে আপনি ছিলেন। আপনার গলা আমাকে চার বছর আগে সুরাটের এক স্টেজে মুগ্ধ করেছিলো। সেই থেকে ভাবছি আর ভাবছি! এখন সবটা [illegible] পেরেছি।

—কি করতে চান?

—কিছু না। কোন প্রমাণ অবধি আমার হাতে নেই। আর আমি কি আর কিছু মনে রেখেছি? প্রমাণ আমি করতে চাইব-ই বা কেন মিসেস সেন?—আমি আপনাকে টাকা দিই নি?

(শেষাংশ ১৬০ পৃষ্ঠায়)

চাপা-রোগ

—কুমারেশ ঘোষ—

হৈ-হল্লা ও চিল্লাচিল্লি কিছু নয়,
সব ফাঁকা!
আসলে আমরা সবাই চাপছি
সব কিছু দাঁত চেপে!
কেরানি চাপছে ফাইল
এবং কর্তা চাপেন টাকা,
পেটের খিদে ছেলেটা চাপছে,
বাপ বায় পাছে ক্ষেপে।

•

গৃহিণী চাপেন বাজারের কড়ি,
আখেরে লাগবে কাজে
আসল রংটা চাপতে মেয়েটা
ঘসছে সাবান রুজে!
পাত্রপক্ষ পণদ চাপতে
বলছে অনেক বাজে,
বাইরে গলাটা কাটালেও
ঘরে চুপচাপ গুজ্ গুজ্!

•

ফুসফুস আর গুজগুজ শুধু,
লুকোচুরি দেখি চলে,
চাপছে সবাই খবর
খাবার টাটকা এবং বাসি,
সব্বাই চাপা পড়ে স্বার্থের চাপে
এই মত লোকে বলে,
আমি বলি : হায়, চাপা থাকে না যে,
প্রেম ধোঁয়া আর কাশি!

॥ বৃন্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

লেফাফায় ভরা একটি চিঠিতে
লিখেছিলে দুটি কথা। নির্জন অবসরে
সে দুটি লাইনে উৎসুক হয়ে—
এলোচুলে দিয়ে ফিতে,
কতবার যেন কতবার আমি
পড়েছি তো মন ভরে॥

কি জানি কেমনে কখন জানি না
হারিয়ে গেল সে চিঠি।
কত তো খুঁজেছি এখানে ওখানে
জীবনভোরই। শুধু খাম আছে,
ওপরে লিখিত 'রীণা',
এ-ইতিবৃত্ত কেউতো জানে না—
শুধু আমি আর মন জানে॥

কখনো সখনো কি ভাবি জানো কি আকাশে চেয়ে,
চিঠিটাই নেই, পড়ে আছে খালি জীর্ণ খাম,
খোলসেই খুঁজি প্রাণ-সান্ত্বনা নিরুপায়ে
স্পর্শবিহীন ধরেছি শুধুই শুকনো নীরস নাম॥
...ের
আমার তো ভাবি এখনও এ-মন,
এই নিরালায় তোমাকে ভেবেই অহংকৃত
নাইবা থাকলো তোমার লিখিত চিঠি। যদিও নেই
তবু তুমি মনে হওনিতো আজো অপসৃত
ধরে তো রেখেছি এই অবলম্বনে জীবনকেই॥

ভুলেছে নিজেকে সে-ও

আবুলকাশেম রহিমউদ্দীন

নিরুৎসুক তুলসী তলে
ভীরুশিখা-প্রদীপের মতো
হয়তো সে কোনো এক সংসারের দূরাতীত ভীড়ে
ভেবেছিল জেগে রবে সত্তার উৎসর্গে অবিরত
একটি লোকেরই ক্লান্ত
আকাঙ্ক্ষার নিরুদ্বিগ্ন নীড়ে!

আজও সে পায় না ভেবে :
দাঙ্গা-ঝড়ে কি করে কখন
কালের নিয়ম ভাঙে, ভিত্তি নড়ে সেই সংসারের!
ভেসে আসে এ-নগরে অলক্ষুণে ঋতুর মতন,
বুকেতে বংশের কুঁড়ি—
কী দুঃসহ শাস্তি অকালের!

কৈশোরে শিবের পূজো,
যৌবনে গানের বিনিময়ে—
বহু প্রতীক্ষার পর কোনো এক মদির সন্ধ্যায়
বিজয়ী স্বপ্নের মতো পেয়েছিল
যাকে সে হৃদয়ে,
সে বুঝি এখানে নেই,
হারিয়েছে তাকে সে কোথায়!

ভুলেছে নিজেকে সে-ও যৌবনে নেমেছে মন্বন্তর,
শ্মশানে মৃতের ভীড়ে
অ-পূজারী চামুণ্ডার মতো
এখানে অস্তিত্ব তার করুণারও চোখে ভয়ংকর!
মুখ তার যাত্রা-নাস্তি
সনাতন সংস্কারে নিয়ত।

নিঃশ্বাসে ছড়ায় বিষ,
চলনেও পথ যায় সরে,
পথিকের আয়ু কমে নাকি
তার চোখের চাওয়ায়!
সে যখন কথা বলে—সে-কথাও নিশিডাক হয়ে
আজও নাকি প্রতিরাতে
অন্ধকারে দুঃস্বপ্ন ছড়ায়!

এই অভিযোগে নিত্য লাঞ্ছনা ও ঘৃণার পাথরে
নীরবে আঘাত সয়ে বেঁচে
আছে আজও সেই মেয়ে!
মন্ত্রহীন অন্ত্যজের বঞ্চনার মতো, অনাদরে
কোলের দুঃসহ শাস্তি কাঁদেনা,
নীরবে থাকে চেয়ে।

কারণ দৃষ্টিতে তার সে-মায়ের বাৎসল্যসিত মন
বিকশিত হয়তো বা, হয়তো
সে দ্যাখে চুপে চুপে
শুচিসত্তা—কৃষ্ণপক্ষে ফুল ফোটা লগ্নের মতন
অথবা মেঘের বুকে বিদ্যুতের ললিত স্বরূপে!

হয়তো পলির স্বপ্নে বুকে পাতে প্রতীক্ষার তীর,
মরা গাঙে ঢল নামে অশ্রুর ফোঁটায় সে নারীর॥

সাবিত্রী-পৃথিবী

দিলীপ দাশগুপ্ত

কণ্টকিত করো একবার।
রক্ত গোলাপ হ'য়ে সেই বৃন্তে ফুটে ওঠবার
সহজ সামর্থ্য দিয়ে পূর্ণ ক'রে দাও।
পারো যদি নাও
বরি-শৈত্য ক্লেদ যতো, সব মিথ্যা ছাই।
আগ্নেয় দাহিকা যদি চাই—
অপচয়ে তাকে যদি প্রজ্বলন্ত প্রেম-পরীক্ষায়
কামাচারী করে দাও : মর্মের দীক্ষায়
আবার ফিরায়ে নিয়ো কুলভাঙা প্লাবনের টা
মানবী-দেবীর পদে এতকাল স্তুতি আর গা
অলস বেলায়,
ফুল-ফুলে খেলার খেলায়
তোমাকে চেয়েছি পেতে। আসনিতো!
ভাগ্য প্রকা
দিয়ো সুধা পাত্র পূর্ণ করে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,
দেহাতীত কী যে আছে, কতোদূরে,
কোন লোকে তা
ভেবে মরি। স্বপনমাঝে পূর্ণতার কিছু যদি
সে ভাবনা ছিঁড়ে যায়
মনান্ত সীমায়!
তারপরে কিছু নাই। মানবীর কায়া মূর্তি
জীবন দেবীর ছায়া স্থির লক্ষ্য হয়ে মুহূর্তে
মূল্যবান করে দেয় কোনো শুভক্ষণে।
তবু প্রাণপণে
অলস মুহূর্ত থেকে কাঁটা ফেলে তুলে নিতে
হই যে আকুল
এক মিতা সাবিত্রী-পৃথিবী থেকে দূরে
অযুতরূপিণী হয়ে ডাকে নানা সুরে।

পরাজয়ে

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

পারি আমি অনেক কিছুই
অন্যে যা পারে না, তবু আছে এমনো যা
পারি না কিছুতে আমি,
অনেকের কাছে হয়তো বা
মনে হবে যা নিতান্ত সোজা।

অথচ সে কাজ আমি পারি না কিছুতে;
যুক্তি নয়, বুদ্ধি নয়, নয় কোন কিছু—
মনে হয় চিরকাল যেন কারো গর্বের সমীপে

মানুষের গর্ব তার মাথা করে নিচু।

অপরাজেয় সে গর্ব :
মানুষের—আমার—হৃদয়,
যে হৃদয় সীমাহীন, নেই যার তল
প্রিয়তমা, হয়ে তারি সম্রাজ্ঞী দর্পিতা
আমায় করেছ তীব্র যন্ত্রণা-বিহ্বল।

পারি সব পারি, শুধু পারি না কিছুতে
তোমাকে বোঝাতে মানে হৃদয়ের শেষ কথাটি
কী করে বোঝাবো বলো আকাশ কতটা উঁচু, অ
সমুদ্র কতটা সুগভীর?

PHILIPS

সাম্প্রতিক সাহিত্যের লক্ষণ

✻ ✻ **নারায়ণ চৌধুরী** ✻ ✻

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের লক্ষণ নিরূপণ চেষ্টায় অগ্রসর হয়ে প্রথমেই যে বিসদৃশ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় তা হ'ল দেহবাদী সাহিত্যের আতিশয্য। গত পাঁচ-সাত বছর যাবৎ বাংলা কথা-সাহিত্যে যৌনতা-ঘেঁষা লেখার এতদূর আধিপত্য বেড়েছে যে, অতি বড় স্থূলদর্শী পাঠকেরও তা চোখে না পড়ে উপায় নেই। এই লক্ষণটি বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির পক্ষে এক প্রচণ্ড অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে, তা আশা করি ধীরবুদ্ধি ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন।

তরুণ লেখক-সমাজের একাংশ বিকৃত আদর্শের দ্বারা চালিত হয়ে নর-নারীর প্রেম-চিত্রণের নামে খোলাখুলি যৌনচিত্রণের দ্বারস্থ হয়েছেন, সেটা ভয়ের কথা হলেও একমাত্র ভয়ের কথা নয় বা ভয়ের কারণ সেখানেই শুধু সীমাবদ্ধ নয়। তার চেয়েও যা বেশী আশঙ্কার বিষয় তা হল, ধীরস্থির বলে কথিত বিজ্ঞ বলে বিজ্ঞাপিত বিচক্ষণ প্রবীণদের দ্বারা এই সব ভ্রান্ত রচনাদর্শের সমর্থন। প্রবীণের সস্নেহ প্রশ্রয়ে নবীনদের স্বেচ্ছাচার প্রায় সীমাহীন হয়ে উঠেছে বললেও চলে। এরকম অবস্থা বাংলা-সাহিত্যের কোন পর্বে কোন পর্যায়ে এর আগে দেখা দেয়নি। চারদিকের ধারাধরণ হাল-চাল দেখে মনে হচ্ছে প্রবীণদের শুভবুদ্ধির সঞ্চয় বোধহয় একালে প্রায় নিঃশেষ হয়ে এল। এরকম অবস্থা যে শুধুমাত্র সাহিত্যেরই অবনত অবস্থা সৃষ্টি করে তা-ই নয়, সামগ্রিক-ভাবে সামাজিক অবস্থা ব্যবস্থার অপকর্ষও এর দ্বারা প্রমাণিত হয়। আমরা একটা প্রচণ্ড ডিকাডেন্ট (Decadent) অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, এ লক্ষণ অতি স্পষ্ট। যে যুগে সমাজের প্রবীণ স্তরের লোকেরা নানাবিধ সাহিত্যিক অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অত্যাবশ্যক জেনেও নীরব থাকেন বা তৎপ্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন, যাঁদের প্রতিবাদ করবার কথা তাঁরা তরুণদের উৎসাহ দেবার নামে তরুণের ভ্রান্ত-বুদ্ধিপ্রসূত সাহিত্য সৃষ্টিকে সমর্থন দান করেন—সেই যুগ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু আশা করবার নেই। বর্তমানে এমনতর নৈরাশ্য-জনক অবস্থারই সৃষ্টি হয়েছে বাংলা দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে। এ-যুগের আদর্শভ্রংশতার বস্তু পূর্ণ হয়েছে বললেও বোধ হয় বাড়িয়ে বলা হয় না।

আজ থেকে তিরিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে একবার 'কল্লোল' 'কালি-কলম' প্রভৃতি নবীন পত্রিকাকে আশ্রয় করে বাংলা সাহিত্যে অনাচারের প্রবল বন্যাস্রোত উন্মুক্ত হয়েছিল। তৎকালীন ... লেখকেরা যুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শের পোষকতাবশে ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নীতির প্রতি আনুগত্যের নামে উচ্ছৃঙ্খলতায় মেতে উঠেছিলেন। বাংলা-সাহিত্যের দীর্ঘকালীন ঐতিহ্যপুষ্ট সংযম ও শালীনতার আদর্শে জলাঞ্জলি দিয়ে এঁদের লেখনী নগ্ন ভোগবাদের রূপায়ণে সবিশেষ উদ্যতমুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু আশার কথা, এই অনিয়ন্ত্রিত ভোগবাদকে প্রতিহত করবার মত শুভবুদ্ধিও তখন আমাদের জাতীয় মানসে যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত ছিল। সমাজ ও জাতিকল্যাণ বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত বহু বহু ব্যক্তি তখন ওই সকল সাহিত্যিক ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন এবং তদ্দ্বারা সাহিত্যক্ষেত্রে বেশ একটা সবল প্রতিবাদের আবহাওয়া চাগিয়ে তুলতে সমর্থ হন। এই প্রতিবাদকারীদের প্রতিবাদে জোর ছিল, ফলে কিছুকালের মধ্যেই কল্লোল-কালিকলমের উচ্ছৃঙ্খলতার দাপাদাপি মাতামাতি স্তিমিত হয়ে যায় এবং এক সময়ে তা একেবারেই স্তব্ধ হয়ে যায়।

আজ আর সেকথা বলা চলে না। এখন নবীনদের ভ্রষ্টাচার শুধু যে নবীন সমাজেরই সোৎসাহ সমর্থন পাচ্ছে তা-ই নয়, প্রবীণদেরও সপ্রশ্রয় আনুকূল্য আকর্ষণে সমর্থিত হচ্ছে। গোটা সমাজ জুড়ে অমিতাচার আর অনীতির পক্ষে একটা নৈতিক সমর্থনের আবহাওয়া তৈরী হয়েছে। বড় বড় অধ্যাপকেরা দেশী-বিদেশী সাহিত্যশাস্ত্রের নজির উদ্ধার করে পাঁতি দিচ্ছেন সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতার বিচার অবান্তর, প্রিয় হোক অপ্রিয় হোক বাস্তব সত্য মাত্রই সাহিত্যভুক্ত হবার যোগ্য। প্রবীণ সমালোচকেরা এমন সব বইয়ের প্রশংসা করছেন যে গুলিকে উদারতম কল্পনায়ও সাহিত্য শ্রেণীর অন্তর্গত করা যায় কিনা সন্দেহ। পোর্নোগ্রাফীর বাড়া ক্লেদাক্ত মনোযোগ যেসব বইয়ের প্রাপ্য নয় সেসব বই এখন বিজ্ঞ অধ্যাপকদের সমর্থনের দৌলতে পাঠকবর্গের সশ্রদ্ধ মনোযোগের বিষয়ীভূত হয়ে উঠেছে। প্রকাশকেরা আর সৎ-সাহিত্য ছাপতে রাজী নন, অতিরিক্ত মুনাফার লোভে এই শ্রেণীর বই-ই এখন লুফে নেবার জন্য ব্যাকুল। চারিদিকে অনীতির অনুকূলে এমন একটা প্রশ্রয়ের ভাব সৃষ্টি হয়েছে যে, সেই প্রশ্রয়ের দ্বারা পুষ্ট হয়ে কোন কোন সাময়িক পত্রিকা নিতান্ত বেপরোয়া আর নিরঙ্কুশভাবেই অশ্লীল সাহিত্য প্রচারের বেসাতিতে আত্ম-নিয়োগ করেছে। এইরূপ একটি পত্রিকা সপ্তাহের পর সপ্তাহ নিয়মিতভাবে পাঠক-সাধারণের স্থূল প্রবৃত্তির উদ্দীপক গল্প উপন্যাস ছাপিয়ে সাহিত্য-সমাজে একটা শঙ্কা-জনক অবস্থার সৃষ্টি করেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই পত্রিকাতেই কিছুকাল আগে এমন একটি ঘৃণ্য বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল, পুলিশের দৃষ্টি তা কি করে এড়াল তা ভেবে অবাক হই। অথচ সমাজের কোন অংশ থেকে এর কোন প্রতিবাদ হয় না। কেউ এ-জাতীয় প্রতিবাদ করাকে তাঁর সামাজিক কৃত্য ও দায়িত্বের অঙ্গ বলে মনে করেন না। যে দু-একজন দেশ ও জাতির প্রতি কর্তব্যের প্রেরণার বশে প্রতিবাদের জন্য মুখ খুলতে যান তাঁদের কণ্ঠস্বর সর্বব্যাপী অনীতি আর রুচিহীনতার ডামাডোলের মধ্যে হারিয়ে যায়। তাঁরা নিতান্ত সংখ্যালঘু বলেই সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মিলিত কোলাহলকে ছাপিয়ে তাঁদের শুভবুদ্ধির স্বর জনসাধারণের কানে গিয়ে পৌঁছুতে পারে না। পাকেচক্রে এদের প্রতিবাদকে নিস্তব্ধ করে দেবার জন্য স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহলগুলি থেকে পরিকল্পিত তৎপরতারও অন্ত নেই। মাথাগুণতির জোরের সঙ্গে অপ-কৌশল যুক্ত হলে তার ফল কী বিষময় হতে পারে তা, সহজেই অনুমেয়।

আমাদের সাহিত্যের বর্তমান অবস্থা যে কতদূর অসহনীয় তা একটি দৃষ্টান্ত দিলেই পরিষ্কার হবে। বর্তমান সাময়িক পত্রের জগতে এখন সিনেমা-পত্রেরই সবচেয়ে বেশী চাহিদা। এরকম অবস্থা আগে ছিল না। তখন সিনেমার কাগজকে লোকে সিনেমার কাগজ বলেই গণ্য করত এবং এরকম সস্তা কাগজের যা মূল্য সেই মূল্যই তাকে দিত। এখন আর সেকথা বলা যায় না। এখন সাহিত্যিক ঐতিহ্যসম্পন্ন কাগজগুলিকেও ছাপিয়ে সিনেমা-কাগজের জনপ্রিয়তা বেড়ে গিয়েছে। শুধু জনপ্রিয়তাই নয়, সেই সঙ্গে ওই ন্যাকড়া কাগজগুলি পাঠকের চোখে বেশ কিছুটা কৌলীন্যেরও অধিকারী হয়েছে। শুধু যে স্কুল-কলেজের ছেলে-ছোকরারাই এ-জাতীয় কাগজ পড়ে তা নয়, তাদের অভিভাবকস্থানীয় ব্যক্তিরাও লুকিয়ে লুকিয়ে এমন একখানি কাগজ সংগ্রহ করে পড়তে পারলে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন। নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার পরিণাম শুভ নয় জেনেও সাময়িক রোমাঞ্চ অনুভবের উত্তেজনায় এখন এরকম আপাত-মধুর ফলের প্রতি লোভাতুর রসনাগুলিকে বেশী ঘুরঘুর করতে দেখা যায়। আর শুধু কি পাঠক, লেখকদের মধ্যেও আজকাল আড়াআড়ি রেষারেষি কে ওই সব কাগজে কার আগে লিখবেন ওই নিয়ে। আমাদের বর্তমান বাংলা সাহিত্যের যিনি সবচেয়ে অগ্রণী কথা-সাহিত্যিকরূপে পরিচিত তাঁর পরিচয় এই যে, তিনি একটি বাট-হাজারী সিনেমা পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক। তাঁর এখনকার প্রধান পরিচয় হল তিনি এই কাগজের একচ্ছত্র লেখক এবং সেকথা বিজ্ঞাপনে তারস্বরে প্রচার করাতেও তাঁর মর্যাদাবোধে বাধে না। সংশ্লিষ্ট লেখককে কোনপ্রকারে ছোট প্রতিপন্ন করবার জন্য একথা বলছি না, বলছি শুধু আমাদের সাহিত্যের হাওয়া কোন্ দিকে বইছে সে বিষয়ে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্য। আমার এই উক্তি যত না ক্ষোভপ্রসূত তার চেয়ে অনেক বেশী বেদনাপ্রসূত। বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অবস্থা দেখে মন এক-এক সময় নৈরাশ্যে ব্যথায় ভেঙে পড়তে চায়, সেকথা অস্বীকার করব না।

গণ্যমান্য লেখকেরা কোথায় সাহিত্যের মান উন্নীত করতে তাঁদের শক্তি ও প্রতিপত্তি নিয়োগ করবেন, তা নয়, তাঁরাই সাহিত্যের রুচি অধোগামী করবার কাজে সবচেয়ে বেশী সহায়তা করছেন! জনতার স্থূল রুচির স্তরে নেমে গিয়ে তাঁরা জনতার ভজনা করতে শুরু করেছেন। সমাজজীবনে প্রকৃত পথ-চলার নির্দেশের জন্য লোকে যাঁদের বিবেচনা-বুদ্ধির উপর নির্ভর করতে অভ্যস্ত, সেই সব মান্য ব্যক্তিরা জনতার প্রতি তাঁদের দায়িত্ব ভুলে নিজেরাই এখন জনতার ভিড়ে মিশে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। জনতাকে তাঁরা হাত

ধরে টেনে তুলছেন না, তাঁরা নিজেরাই জনতার রুচির পর্যায়ে নেমে যাচ্ছেন। সংস্কৃতির অগ্রগতির পক্ষে এমনতর অবস্থা অতিশয় শঙ্কাজনক। যে সমাজে বড়রা বড়ত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টার বদলে নীচু হবার জন্য সাধনা করেন, সে সমাজকে মহতী বিনষ্টির কবল থেকে কোন্ দৈবপ্রভাবে রক্ষা করা যায় আমাদের সে রহস্য জানা নেই। বাংলা সাহিত্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এখন সর্বনাশের হাওয়া বইছে, এই আবিল বায়ুপ্রবাহ রোধ করে চারিদিকে শুচি-শুভ্র নির্মল আবহাওয়া সঞ্চারে সংখ্যালঘুর খণ্ডিত চেষ্টাই যথেষ্ট নয়, সকলের এককালীন শুভবুদ্ধির জাগরণ প্রয়োজন। ব্যাধি যেখানে কঠিন, সেখানে প্রতিষেধ ব্যবস্থাও যথেষ্ট দূরপ্রসারী হওয়া আবশ্যক।

বাংলা সাহিত্যের বর্তমান মানাপকর্ষ ও রুচিহীনতার মূলে একটি যে প্রধান হেতু সক্রিয় রয়েছে বলে আমার মনে হয় তা হল রসের সঙ্গে জ্ঞানের বিচ্ছেদ। এখনকার সাহিত্য তথাকথিত রসসৃষ্টির নামে ও অজুহাতে বড় বেশী কল্পনাশক্তির আদর্শের উপর ঝোঁক দিচ্ছে বলে সন্দেহ হয়। আমরা স্বকপোল কল্পনার উদ্ভাবনী নৈপুণ্যকেই একমাত্র সার বলে জেনেছি। জ্ঞানানুশীলনের দিকে আমাদের মনোযোগ প্রভাবিত হয় নি। অথচ একথা আমাদের বোঝা আবশ্যক যে, জ্ঞানের ও বিদ্যার পরিবেশহীন সৃষ্টিক্ষমতার তেমন কোন মানে নেই। বিদ্যার পটভূমিবিবর্জিত রস রস নামের যোগ্য নয়। রসকে ধারণ করবার জন্য আধারের প্রয়োজন হয়—এই আধার জ্ঞানভাণ্ডার ও প্রজ্ঞার দ্বারা নির্মিত। কিন্তু এখন আধারহীন রসতরলতারই কাল। নিরবচ্ছিন্ন রসচর্চার আবেশে বিভোর হয়ে গদগদচিত্ততায় আমাদের উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করা শুধু বাকী। তথাকথিত সৃষ্টিধর্মিতার রসে টইটম্বুর হয়ে থাকাটাই যদি আমরা পরমার্থ বলে না মানতুম তা হলে আমরা দেখতে পেতুম বিদ্যা ও বৈদগ্ধ্যের (culture) অনুশীলন বাদ দিয়ে রসসাহিত্য চর্চার কোন মানে হয় না। উপরে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির বর্ণনা করা হয়েছে তা এই রকমের একদেশদর্শী রসচর্চারই পরিণামফল। সাহিত্যক্ষেত্র থেকে যখন বিদ্যা বিদায় নেয়, জ্ঞানের সংস্কার লুপ্ত হবার উপক্রম দেখা দেয়, তখন সাহিত্যিকের সাংস্কৃতিক রুচির স্তর আর জনতার সাংস্কৃতিক রুচির স্তরে বিশেষ কোন তারতম্য থাকে না। সাধারণ পাঠক তখন নিছক রুচিসাজুয্যের দৌলতেই কুলীন লেখকের কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলবার এক্তিয়ার লাভ করে। কুলীন বলে পরিচিত লেখকেরা নিজেদের অচেতনতার দ্বারা সমাজবোধের অভাবের দ্বারা এই অনুচিত আত্মীয়তাকরণের প্রক্রিয়াকে আরও বেশী ত্বরান্বিত করে তোলেন। গুণবত্তায় ও কৃতিত্বে পাঠকের সঙ্গে লেখকের সর্বদাই কিঞ্চিৎ দূর-ব্যবধান থাকা প্রয়োজন। তা নয় তো লেখকের সাহিত্যসৃষ্টির দ্বারা পাঠকের উপকৃত হবার সম্ভাবনা খুব কমই থাকে। কিন্তু এখন সেসব নেই, জনতার সঙ্গে লেখকের সবরকম সাংস্কৃতিক ও বৈদগ্ধ্যগত ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে আমরা সাহিত্যের হরিহরছত্র মেলায় সব এককাট্টা হয়ে বসেছি। জনতার সঙ্গে পা ঘেঁষাঘেঁষি করে চলতে না পারলে আমরা যে জনপ্রিয় লেখক সে কথার প্রমাণ দেওয়া হয় না। গণতন্ত্র ভাল জিনিষ, আদর্শ হিসাবে তা নিশ্চয় শত সহস্রবার মান্য; কিন্তু রুচির আভিজাত্য খুইয়ে, সাংস্কৃতিক বৈদগ্ধ্য-চেতনাকে হারিয়ে যে গণতন্ত্রের ভজনা তেমন গণতন্ত্রকে আমরা দূর থেকে দণ্ডবৎ করি।

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে এখন এই তথাকথিত জনমুখী গণতান্ত্রিক আদর্শেরই জয়জয়কার। এ সাহিত্যে বিদ্যাবত্তার সম্মান নেই, পাণ্ডিত্য অবহেলিত, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীপ্রসূত যুক্তিচর্চার ঐতিহ্যের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না; কেবল রস আর রসের বিরামহীন একনিষ্ঠ চর্চা। লেখকের মধ্যে প্রায় সকলেই পাঁচানব্বুইজন খেয়ে না খেয়ে, কিছু লেখক কেবলমাত্র আদাজল খেয়ে, 'রসসাহিত্য' সৃষ্টিতে অনন্যচিত্তভাবে মগ্ন হয়ে আছেন। তান্ত্রিক আভিচারিক সাধনাতেও বোধ হয় এমন দৃঢ় হওয়ার দৃষ্টান্ত মেলে না! তথাকথিত রস-সাহিত্যিকদের ধারণা তাঁদের রচনা যেহেতু যে-কোন রকমের একটা মনগড়া কল্পনার সূত্র থেকে আহরিত, সেই কারণে তাঁদের লেখাই একমাত্র পাঠ্য লেখা, আর সব লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে অবান্তর, অনাবশ্যক, অকিঞ্চিৎকর। এই শ্রেষ্ঠত্ব চেতনার দ্বারা নিজেরাই যে শুধু তাঁরা ডগমগ তা-ই নয়, অন্যান্য লেখকদের মধ্যে ওই সূত্রে এবং ওই দম্ভী মনোভাবের প্রক্রিয়ায় হীনমন্যতার বোধ সঞ্চারেও তাঁরা সবিশেষ পটু! ক্ষোভ এই যে, অনেক যোগ্য লেখক—বিদ্যাবত্তার দ্বারা মণ্ডিত শক্তিমান লেখক—শুধু তাঁরা তথাকথিত সৃষ্টিধর্মী শিল্পী নন বলেই শেষোক্ত লেখকশ্রেণী থেকে আপনাদের হীনতর মনে করে অজান্তে শেষোক্তদের সযত্নে গড়া ফাঁদে পা দেন। তাঁদের হীনমন্যতার প্রমাণ, তাঁরা নিজেদের নেপথ্যে রেখে, প্রয়োজন হলে স্বীয় শক্তিকে দাবিয়ে, সর্বদা তথাকথিত রসবাদী লেখকদের ঢাক-পিটানোয় তাঁদের শক্তি ব্যয় করেন এবং ওইতেই তাঁদের অস্তিত্বের সার্থকতা অনুভব করেন। কিন্তু রসবাদের ধারণার দ্বারা তাঁদের চিত্ত যদি আবিষ্ট না হত তাহলে তাঁরা নিজেরাই বুঝতে পারতেন, জ্ঞানহীন রসচর্চার চেয়ে নিছক জ্ঞানচর্চার মূল্য বেশী। কুড়ি কুড়ি গল্প-উপন্যাসের বই লিখে যে কাজ না হয় তার চেয়ে অনেক বেশী কাজ হয় একটি সত্যিকারের জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ রচনার দ্বারা। সমাজমানসে ভাবরোমাঞ্চ সৃষ্টির একটানা চেষ্টার বদলে আমরা যদি বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গী, যুক্তিনিষ্ঠা তথ্যনিষ্ঠা ও বিদ্যানুরাগের ঐতিহ্যসৃষ্টির কাজে বেশী সময় দিতে পারতুম তো এ সমাজের বেশী উপকার হত। কিন্তু এসব কথা কে কাকে বোঝায়! শুভবুদ্ধির পরামর্শে কান দেবার মত ধৈর্য বা বিবেচনাশক্তি যদি বর্তমান সমাজে থাকবেই তবে নতুন করে আবার সাহিত্যে দেহবাদী বা যৌন সংস্কারের উজ্জীবন হয় কী প্রকারে, সিনেমা-সাহিত্য আর সব সাহিত্যকে হটিয়ে দিয়ে জাঁকিয়ে বসে কেমন করে, মানী লেখক মান খুইয়ে সিনেমার খাতায় নাম লেখান কোন্ যুক্তিতে, সাহিত্যক্ষেত্র থেকে বিদ্যা ও বৈদগ্ধ্যকে কুলোর বাতাস দিয়ে খেদিয়ে সবাই রম্যতার চর্চায় গা ঢেলে দেন কেন?

আসলে বিদ্যার প্রতি আমাদের কোনরূপ সম্ভ্রম নেই, শ্রদ্ধাবোধ নেই। তাই এখনকার সাহিত্য কেবল গল্পোপন্যাস রচনার হিড়িক, আর গল্পোপন্যাসের বেলায়ও কেবল পর্যবেক্ষণ-নির্ভর কাহিনীবয়নের দিকেই ঝোঁক। শুধু চোখে দেখার দ্বারা যে জীবনকে চিত্রিত করা যায় না তা নয়, তবে সে দেখার পিছনে মননের গভীরতা আর প্রজ্ঞাবুদ্ধির নিবিড় দ্যোতনা না থাকলে সে লেখা শুধু স্থূলরুচি পাঠকেরই গ্রহণীয় হয়, বিচক্ষণ পাঠকের গ্রাহ্য হয় না। এখন গণতন্ত্রের যুগ, পাইকারী হারে সাহিত্য সৃষ্টির যুগ, জনতার সঙ্গে অতিরিক্ত কাঁধ ঘেঁষাঘেঁষির ফলে আভিজাত্যের জাত খোয়াবার

(শেষাংশ ১৬০ পৃষ্ঠায়)

কাক

সুকোমল বসু

খুব ভোরে, খুব জোরে—
যখন কাগজওলা, অব্যর্থ হাতের টিপে
দোতলায় ছুঁড়ে মারে সুতো-বাঁধা সংবাদ পত্রিকা
এক কাপ চা নিয়ে—প্রথম জানার গর্বে—
তুলি আমি সংবাদের গূঢ় যবনিকা!

ঠিক, ঠিক সে সময়,
রাত্রির মৌনতা-ভাঙা কাকদের স্বর
আমার কানেতে এসে ঝরে পড়ে
অমর্ত সুন্দর!

প্রথম সংবাদ পাঠ, প্রথম চায়ের স্বাদ
কাকদের প্রথম সে স্বর,
মালার ফুলের মত অচ্ছেদ্য অপরিহার্য
সংযোগের অপূর্ব স্বাক্ষর!

মানুষের অনাদৃত কাক!
কোথায় কুড়িয়ে পায় খুব ভোরে
এ মোহিনী ডাক!

নেশা

লাবণ্য পালিত

সারাটি সন্ধ্যে ঝরেছে বৃষ্টিধারা
তোমার সঙ্গে আমিও আপনহারা ...।
বর্ষা নেশায় ক্লান্ত শ্রাবণ রাতে
আমিও ক্লান্ত ভিজে পাখিটার সাথে।
তবুও বাদল নেশা
আমার হৃদয়ে মেশা ...।

নাম জানি না কো ভিজে গন্ধের মায়া—
ঘিরে আছে আজ স্তব্ধ রাতের কায়া ...।
এমনিই বুঝি জীবনে জীবনে আঁকে
হাসি খেলা শেষে মায়ার নেশার ফাঁকে
সুনিপুণ হাতে ছবি
মদিরোচ্ছল কবি ...।

কোন্ অজানায় মনটা ভরায় সুরে
এ কেমন নেশা মনের অন্তঃপুরে!
ঝম্ঝম্ আর শব্দ নেই তো গাছে
মর্তলোকের নেশা ভেঙে যায় পাছে।
সে কোন্ প্রহরী জাগে
কবিতার অনুরাগে... ।

ক থা কও!

মহাকালের কোলে নিদ্রামগ্ন, হে অতীত জেগে ওঠো!

শিল্পকলার আবাসভূমি রোমের ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রাচীন ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষগুলি মুখরিত হয়ে উঠুক। ধ্বংসস্তূপ থেকে ধ্বনিত হোক অলিম্পিক ক্রীড়ার সুমহান আদর্শবাণী—সিটিয়াস, আলটিয়াস, ফর্টিয়াস—ত্বরীয়ান, তুঙ্গীয়ান, বলীয়ান!

চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের প্রাচীন ও আধুনিক নিদর্শনে সমৃদ্ধ রোম ১৯৬০ সালের সপ্তদশ অলিম্পিক ক্রীড়ার অনুষ্ঠান কেন্দ্র নির্বাচিত হয়েছে। শিল্প সৌন্দর্যের সমাবেশে সপ্তদশ অলিম্পিয়াড যে অনবদ্য হয়ে উঠবে তা বলাই বাহুল্য। রোমের অলিম্পিক সংগঠকগণ প্রাচীন ও রেনাসাঁ যুগের শিল্প নিদর্শনগুলির সঙ্গে আধুনিক স্থাপত্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে অলিম্পিক ক্রীড়া কেন্দ্রটিকে অতুলনীয় সুষমায় মণ্ডিত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

অলিম্পিক ক্রীড়ার বিভিন্ন বিভাগের প্রতিযোগিতা প্রায় পনেরটি স্বতন্ত্র ক্রীড়াঙ্গন ও স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলি রোম শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে।

ম্যারাথন দৌড়ের পথ

ম্যারাথন দৌড়ের দীর্ঘ ২৬ মাইল (৩৮৫ গজ) দৌড় পথ নির্বাচনে সংগঠকদের প্রশংসা করতে হবে। দূরপাল্লার দৌড়বীররা প্রতিযোগিতার উদ্বেগ, উত্তেজনা ও পথক্লেশ ভুলতে পারলে, দীর্ঘ পথের মনোরম পরিবেশ উপভোগ করতে পারতেন। এক দৌড়ে তাঁরা রোম শহর পরিক্রমা করবেন। কিন্তু পথের দৃশ্যাবলী দেখে মুগ্ধ হবার অবকাশ তাঁদের থাকবে না।

রোমের জিয়াসের মন্দির ক্যাপিটলের সম্মুখে অবস্থিত মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর পিঞ্জাদেল ক্যাম্পিডোগলিওর সোপান-শ্রেণীর সামনে ম্যারাথন দৌড় সুরু হবে। এখান থেকে দৌড়বীররা রোমের প্রাচীন ফোরামকে ঘুরে ক্যারাকালা স্নানাগারের কিছু দূর দিয়ে প্রাচীন আপিয়ান সড়ক দিয়ে মোড় ঘুরবেন এবং কলোসিয়ামের পুরোভাগে অবস্থিত কনস্টানটাইনের আর্চে এসে দৌড় শেষ করবেন। মনোরম পরিবেশ সন্দেহ নেই—কিন্তু তা উপভোগ করার মতন মনের অবস্থা প্রতিযোগীদের থাকবে না!

মল্লক্রীড়া ও জিমনাষ্টিকস

প্রাচীন রোমের ফোরামের ধ্বংসপ্রায় ক্রীড়াঙ্গনগুলির (আরেনা) বৃহত্তম ব্যাসিলিকা ম্যাকেসনটিয়াসে মল্লক্রীড়ার আয়োজন করা হবে।

এরই অদূরে ক্যারাকালা স্নানাগারের ধ্বংসাবশেষের কাছে মুক্ত প্রাঙ্গণে জিমনাষ্টিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এখানে খৃষ্টপূর্বাব্দ ২১৫ সালে নির্মিত বিশালায়তন চতুষ্কোণ দুইটি স্তম্ভের মধ্যে প্যারালাল ও ... রাইজিং রিং ইত্যাদি জিমনাষ্টিক প্রতিযোগিতার ক্রীড়াসরঞ্জাম স্থাপন করা হচ্ছে। ... প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলির অন্যতম ... অধুনা অব্যবহৃত নয়। এখানে গত ... বছর ধরে রোম অপেরা কোম্পানী ... আকাশের নীচে তাঁদের গীতিনাট্য ... করছেন।

অশ্বারোহণ প্রতিযোগিতা ... আয়োজন করা হয়েছে রেনাসাঁ যুগের ... শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পিয়াজো ডি সিয়েনা ... বর্ঘিসের উদ্যানের আকাশচুম্বী ...
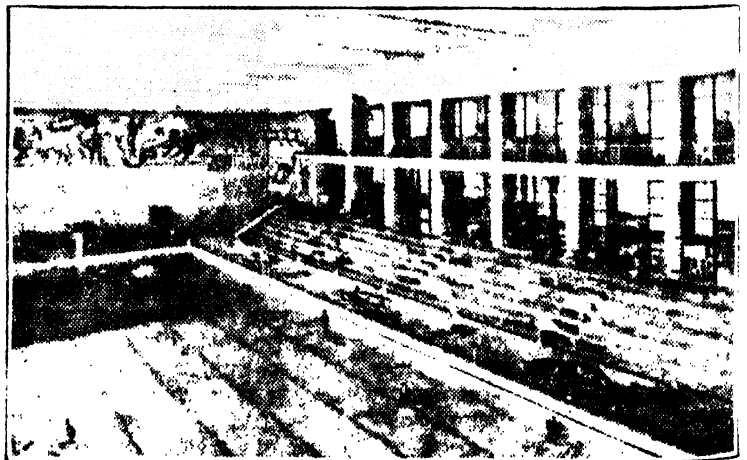
ফোরো ইটালীকোতে ইনডোর সুইমিং পুল। নানা রং পাথরে বাঁধানো মেঝে, দেওয়ালে জলদেব-দেবীর চিত্রিত প্রতিমূর্তি

এক বৃন্তে দুটি ফুল যেন। ফুটেছে একদিনে, প্রায় একই সময়ে। আকৃতি ও প্রকৃতিতে সমান। এক নজরে দেখে ঠাওর পাওয়া যায় না কোন্‌টি কে।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার। জাতীয় ক্রীড়ার এক আসরে তাদের দেখে কেমন জানি সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। দুটি কিশোরী চলনে বলনে, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে, সাজে সজ্জায় অবিকল এক। বয়স সমান। কিশোরীরা হাইজাম্প করছে। ক্রীড়াভঙ্গীতেও কোনো পার্থক্য নেই। তফাৎ রয়েছে শুধু দক্ষতার নজীরে। একজন শেষ পর্যন্ত আর একজনের চেয়ে বেশী লাফালো। তারা কম বেশী লাফালো বলেই জানতে পারলাম যে দুজনের কে কোনজন। নইলে চেহারা দেখে ধরার উপায় ছিল না যমজ ভগ্নীর কোনটি বসন্তকুমারী আর কেই বা বিজয়াকুমারী।

কেরালার যমজ বিজয়াকুমারী ও জাতীয় চ্যাম্পিয়ন বসন্তকুমারী

খেলাধুলোর ক্ষেত্রে যমজদের আবির্ভাব একেবারে দুর্লভ নয়। তবে সে আবির্ভাব যেমন আকস্মিক তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। স্বভাবের টানে তারা একই পথে চলে। চলতে চলতে কৌতূহলী জনতাকে টেনে আনে তাদেরই আশে পাশে। যেমন টেনেছে ভারতের ক্রীড়ানুরাগী জনতাকে কেরালার যমজ ভগ্নী বসন্ত ও বিজয়াকুমারী।

শুধু যমজ বলেই নয় ব্যক্তিগত ক্রীড়া-নৈপুণ্যের পরিচয়ে দুবোন, বসন্ত ও বিজয়া-কুমারী আমাদের দেশের খেলাধুলোর ইতিহাসে সুপরিচিত ও সুখ্যাত। বসন্তের প্রতিভা বেশী। কৈশোরে পা দিয়েই সে জাতীয় চ্যাম্পিয়নের মর্যাদা পেয়েছিল। সে মর্যাদা পরবর্তী কালের আরও দুটি অনুষ্ঠানে সে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিল। পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি ডিঙিয়ে বসন্তকুমারী ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্যের যে নজীর রেখেছে, মহিলাদের হাইজাম্পে আজও সেটি সর্বভারতীয় রেকর্ডরূপে স্বীকৃত হয়ে আছে।

বিজয়াকুমারী হার্ডল দৌড় ও রডজাম্পেও পারদর্শিনী কিন্তু যমজ-এর যাথার্থ্য বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে সেও হাইজাম্পে হাত পাকিয়েছে বেশী করেই। বসন্তকুমারী না থাকলে হয়তো একদিন বিজয়াকুমারীকেই ভারতের জাতীয় চ্যাম্পিয়নের আসন দখল করতে দেখা যেতো। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই। ১৯৫৮ সালের জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের ইতিহাসেই তার প্রমাণ থেকে গিয়েছে। সেবার চার ফুট আট ইঞ্চি লাফিয়ে বিজয়াকুমারী বসন্তকুমারীকে প্রায় ধরেই ফেলেছিল। আরও মজার কথা, বসন্ত—বিজয়ার বড়ভাই গোপালকৃষ্ণ অ্যাথলেটিকে অনুরাগী এবং তিনিও ভারতের শীর্ষস্থানীয় হাইজাম্পারদের অন্যতম।

ভারতীয় ক্রীড়াভূমিতে বসন্ত-বিজয়াকুমারীর ভূমিকা বিচিত্র কিন্তু একেবারে অভিনব নয়। এদের আগে ও পরে জোড়ায় জোড়ায় যমজদের আবির্ভাব ঘটেছে এদেশে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দিল্লীর মানমোহিনী ও ইন্দরমোহিনী এবং উড়িষ্যার কাঞ্চন ও কানন জেনার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁদের মধ্যে মানমোহিনী ও ইন্দরমোহিনীর নাম অনেকেরই জানা। কারণ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা জাতীয় ক্রীড়ার আসরে সময়কালে তাঁদের যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল।

দিল্লীর ইন্দরমোহিনী ও মানমোহিনী

মানমোহিনী ও ইন্দরমোহিনী লাফাতেন না, তবে দুজনেই এক জাতীয় খেলাধুলোয় ব্যস্ত থাকতেন। তাঁরা চাকতি ছুড়তেন, গোলক নিক্ষেপ করতেন,। অ্যাথলেটিক মহলে যাকে বলে ডিস্কাস থ্রো ও শটপুট।

প্রস্তুতি ও চিন্তার চাহিদা

তেজেশ সোম

যে দেশ থেকেই আমদানী হয়ে থাকুক না কেন, ফুটবল আজ আমাদের দেশে জাতীয় খেলার মর্যাদা পেয়ে রয়েছে। ফুটবলের প্রসার যেমন ব্যাপক, তেমনি তার জনপ্রিয়তা অশেষ। রকমারি খেলাধুলোর আয়োজনের মাঝে থেকেও ফুটবল এখনও '[illegible] সকার', একচ্ছত্র অধিপতির মতো তার ভূমিকা অবিসম্বাদিত।

ঘরের কোণে ফুটবল আমাদের কাছে আনন্দ ও উৎসাহ বর্ধনের সহায়ক এক অনুষ্ঠান, আর ঘরের বাইরে তার লক্ষ্য বিদেশীদের সঙ্গে সেতু গড়ে তোলার। ফুটবলের সূত্র ধরেই আজকাল আমরা দেশ থেকে দেশান্তরে চলেছি, [illegible] অনেক আন্তর্জাতিক ক্রীড়াভূমিতে। সেখানে নিজেদের পরিচয় দিনে দিনে যতোই বড় হয়ে উঠবে, বিদেশীদের অন্তরে ভারতের পরিচয়ও তেমনিভাবে আঁকা হবে মহান থেকে মহানের রূপে।

কিন্তু সে পরিচয় রাখতে হলে আগে চাই প্রস্তুতি, চাই প্রারম্ভিক ও প্রাথমিক চিন্তা। সে প্রস্তুতি ও চিন্তা আমাদের কতোটা রয়েছে তা সকলেই জানেন। কিন্তু সকলের চিন্তাই আজ এই এক খাতে বয়ে চলেছে যে, আমাদের আরও ভাল খেলতে হবে, এশিয়ার ক্রীড়াভূমিতে সুবিস্তৃত আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর আসরে ভারতের ফুটবলকে করতে হবে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

কেমন করে সে কাজ সুসম্পন্ন করা যায়? সমস্যাটা যতো বড়ই হোক না কেন, সমাধানের পথ যে কারুর জানা নেই তা মনে করা যায় না। এক কথায় এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর দিতে পারি যে, ফুটবল খেলা শিখতে হবে, শেখাতে হবে এবং মূল শিক্ষণ পরিকল্পনাকে কার্যকরী রাখতে হবে খেলোয়াড়দের বাল্যে ও কৈশোরে।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে 'কাচ দেম ইয়ং' অর্থাৎ শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে চাও যদি তাহলে ছেলেবেলাতেই তাদের ধরো। একেবারে খাঁটি কথা। ধরতে হলে সময় থাকতেই ধরা উচিত, ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা নিরর্থক। বাল্যে ও কৈশোরে যখন তাদের শরীর ও মন দুই থাকে নরম, তখনই তাদের গড়ে পিটে নেওয়া যায়, যেমন ইচ্ছে তেমনিভাবেই বাঁকানো যায়, পরিচালিত করা যায় যেদিকে খুসী। পরিণত বয়সে সামগ্রিক আচরণের সামান্য সংশোধন করা যায়, হয়তো যায় কিঞ্চিৎ মার্জিত করাও কিন্তু ধরণ-ধারণ পুরোপুরি বদলে দেওয়া, যাকে বলে ঢেলে সাজা, তা একেবারেই অসম্ভব। মনের ছাপ মুছে ফেলাও দুঃসাধ্য।

ভাল খেলতে হলে ছেলেবেলায় শিক্ষার ভিত গড়া চাই একেবারে পাকা হাতে। শক্ত বুনিয়াদী ভিত, যার ওপর ভবিষ্যতে ইমারত গড়া চলে। দুঃখের কথা, সমগ্রভাবে আমাদের নজর রয়েছে ইমারতের দিকে, তার ভিতের দিকে নয়। ভিতটা আজও রয়েছে নড়বড়ে, তাই চারতলা-পাঁচতলার ইমারত এখনও আমরা গড়ে তুলতে পারি নি।

ভিত গড়বে কে? এও এক সমস্যা। এ সমস্যার অনেকটা সমাধান করতে পারেন আমাদের দেশের ফুটবল নিয়ন্ত্রণ সংস্থা আর কিছুটা পারেন ছেলেদের অভিভাবকেরা। নিজের ছেলে ভাল খেলুক এই অভিপ্রায় তো অভিভাবকের মনে দানা বেঁধে রয়েছে। তাদেরও কিছু করণীয় আছে বৈকি। তার প্রধান করণীয় ছেলেটিকে বুঝতে চেষ্টা করা। কোন খেলায় ছেলেটির হাত পাকবার সম্ভাবনা আছে সেটা জেনে, বুঝে সেইদিকে তাকে উৎসাহিত করা। যেমন করে তিনি তাকে লেখাপড়ায় উৎসাহ দেন, ঠিক তেমনি নিষ্ঠাভরে ও আন্তরিকতার সঙ্গে। দ্বিতীয় করণীয় ছেলেটির স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখা। সব খেলাতেই স্বাস্থ্যের দরকার, ফুটবলে তা অপরিহার্য। উন্নত ক্রীড়াকৌশল কোনো গোঁজামিলের বন্দোবস্তের সঙ্গে রফা করে না।

উৎসাহ ও স্বাস্থ্যের পর আসবে নির্ভেজাল শিক্ষণ ব্যবস্থা, যেটি পুরোপুরি সদগুরুর ওপর নির্ভরশীল। কেমন করে গতি বা দ্রুতি বাড়াতে হয়, বল আয়ত্তে আনতে হয়, সট করতে, নিশানা ঠিক রাখতে হয়, এইসব প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ দেবেন স্বয়ং গুরু। সব গুরুই কিন্তু কিশোরদের পক্ষে সদ্গুরু নন। সদ্গুরু তিনিই যিনি পারেন ছেলেদের মন বুঝতে, পারেন তিরস্কারের চেয়ে উৎসাহের মূল্যকে বড় করে বুঝতে। ছেলেদের চাঞ্চল্য সহজাত ও স্বভাবের ধর্ম। সেই স্বভাব সংশোধনের একমাত্র রাস্তা যে তিরস্কার করা নয়, এ কথাটা যতো তাড়াতাড়ি আমরা বুঝতে শিখি ততোই আমাদের মঙ্গল।

আমাদের দেশে স্কুলে স্কুলে ছেলেদের খেলা শেখাবার কোনো ব্যবস্থা নেই বললে অত্যুক্তি করা হয় না। অথচ যারা ফুটবল ও অন্য খেলাধুলোর ক্ষেত্রে এগিয়েছে, তারা এই ব্যবস্থাকে কায়মনোবাক্যে মেনে নিয়েছেন। যে দেশ ভারতবর্ষকে ফুটবল উপহার দিয়েছে তাদেরই একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি যদিও সে দৃষ্টান্ত বিচ্ছিন্ন নয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর নিয়মিত চর্চা ও অনুশীলনের অভাবে ইংলণ্ডের ফুটবল খেলার মানের অনেক অবনতি ঘটেছিল। আন্তর্জাতিক খেলায় বার-বার হেরে ইংলণ্ড যেন সম্বিৎ ফিরে পেলো। ফিরে গেল সেই সনাতনী শিক্ষণের পরিকল্পনায়। সে পরিকল্পনা স্কুলের ছেলেদের শিক্ষা ব্যবস্থারই নামান্তর। এফ-এর তৎকালীন কর্মকর্তারা এক বৈঠকে বসে স্থির করলেন যে, দিকে দিকে, স্কুলে স্কুলে নামকরা খেলোয়াড় ও অবসরপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদদের পাঠাতে হবে। যেমন পরিকল্পনা, তেমনি কাজ। অনেক খেলোয়াড় স্কুলে স্কুলে ছুটলেন, নিয়মিত কাজ করলেন সেখানকার শিক্ষাভূমিতে। পরিণামে কিন্তু দেখা গেল যে, ছেলেদের উৎসাহ ফিরে এসেছে বটে, কিন্তু ফিরে পাওয়া গেল না ইংলণ্ডের পুরানো দিনের উন্নত ক্রীড়ামান।

কেন সুফল পাওয়া গেল না? গেল না এই কারণে যে, যাঁরা শিক্ষকতার ভার নিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই সদগুরু ছিলেন না। সবাই ছিলেন ভাল খেলোয়াড়, তাঁরা ফুটবলের কলাকৌশল সবকিছুই নিজেরা জানতেন, কিন্তু ছেলেদের জানানোর কৌশল তাঁদেরই অজানা ছিল। এর ফলে আবার এফ-এর কর্মকর্তাদের মাথা ঘামাতে হলো। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষকদের নির্দিষ্ট পাঠে রপ্ত করে নিয়ে আবার তাঁদের ফেরৎ পাঠানো হলো শিক্ষার্থীদের কাছে। বলা বাহুল্য যে, শেষ পরিকল্পনায় অনেকটা সুফল ফলেছে। ইংলণ্ড এখন বিশ্বের সেরা দল বলে গণ্য না হলেও, ইংলণ্ডের ফুটবল যে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

আমাদের স্কুলের ছেলেরা সময়মতো খেলা শিক্ষার সুযোগ পায় না বলেই বৃহত্তর ক্ষেত্রে জাতীয় ক্রীড়ার মানও আশানুরূপ উন্নয়নশীল হতে পারছে না। ছেলেরা খেলা শেখার সুযোগ পায় না কেন? অর্থাভাব? বলা মনে হয় না, সেটি মূল কারণ। একটি বিদ্যায়তনের সঙ্গতি না থাকলে আরও পাঁচটি স্কুল মিলে অর্থাভাব পূরণ করে একজন উপযুক্ত ক্রীড়া-শিক্ষক তো নিয়োগ করতে পারেন। এক্ষেত্রে অর্থাভাবই বোধ হয় একমাত্র কারণ নয়, আসল কারণ সম্ভবতঃ

(শেষাংশ ১৪৭ পৃষ্ঠায়)

স্বভাবজাত গুণে কোমলতা। এই কোমলতা যাতে রক্ষা পায়—এ রকম ভাবে শারীরিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম তৈরী করাই যুক্তিযুক্ত। রাশিয়া প্রয়োজনবোধে মেয়েদের শারীরিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম রচনা করেছেন।

ছাত্রী অবস্থায় সল্ট লেক সিটি ইউটাতে পাঁচশ আমেরিকান নর-নারীর এক বিরাট স্কোয়ার ড্যান্সের সমাবেশ দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। "ধন্যবাদ দেবার দিন" এই নৃত্যের আয়োজন হয়েছিল। ইউটা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেডিয়ামে এই নৃত্যের ব্যবস্থা ছিল। এই নৃত্যে সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা থেকে যুবক-যুবতী সকলেই অংশ গ্রহণ করেছিলেন। মেয়েরা সকলেই লাল, নীল, হলুদ ও সবুজ পোষাক পরিধান করেছিলেন। এই পোষাক মেয়েরাই তৈরী করেছিলেন ছেঁড়া বিছানার চাদর দিয়ে। জোড়া জোড়ায় এই নৃত্য করতে হয়। প্রত্যেকটি স্কোয়ারে ৪ জোড়া নরনারী থাকে এবং তারা একটি স্কোয়ারের আকারে দাঁড়ায়। তারপর গান ও বাজনার সঙ্গে পরিচালকের আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য চলতে থাকে। এই নৃত্যের একটি বিশেষ স্থান আছে—সামাজিক উৎসবে। এই ৫০০ জন নরনারী একত্রীভূত হয়ে যে আনন্দ উপভোগ করছিলেন, সামাজিক উৎসবে এর স্থান খুবই উচ্চে।

বর্তমানে মেয়েদের শারীরিক শিক্ষা পাঠক্রমে আমেরিকায় মডার্ণ ড্যান্স বা আধুনিক নৃত্যের খুব বেশী প্রচলন হয়েছে। শ্রীমতী উরথী এইনসওয়ার্থ President of American Association for Health, physical Education and Recreation আমাকে "মডার্ণ ড্যান্সের" বা আধুনিক নৃত্যের একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। উনি বলেছিলেন, "বর্তমান সভ্য সমাজে মানুষকে প্রতিদিন যে পরিমাণ গতিশীলতা, পরিবর্তন ও যন্ত্রের মধ্যে বাস করতে হয়, তাতে মানুষ মনের দিক থেকে বড়ই দৈন্য অনুভব করে থাকে। বিশেষ করে, মেয়েরা এই গতিশীলতা ও পরিবর্তন সহ্য করতে অভ্যস্ত নয়। এই যন্ত্রের যুগের যন্ত্রীয় সভ্যতার গণ্ডী থেকে মুক্তি পেতে চাইলে, স্বাভাবিকভাবে আত্মবিকাশের পথ চাই। তাই অবসর সময়ে, স্বাভাবিক ভংগীমার মধ্য দিয়ে অন্তরের সুস্পষ্ট ভাব ও অনুভূতিকে প্রকাশ করতে হলে যে দৈহিক ভংগীর প্রকাশ দরকার, আধুনিক নৃত্যের মধ্যমে সেই ভাবই আমরা প্রকাশ করতে চাই।"

আমাদের দেশের মেয়েদের এখনও শারীরিক শিক্ষা সম্বন্ধে আকর্ষণ বিশেষ নাই। এখনও আমাদের মেয়েদের শারীরিক শিক্ষাদান প্রসঙ্গে অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন, কবে আমাদের মেয়েরা অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ করতে যাবেন। মেয়েদের শারীরিক শিক্ষার মান এখনও Athletics-এর পটভূমিকাতে নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের চেষ্টায় অনেক জনকল্যাণমূলক সংস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও দেশে অনেক সংস্থা আছে, যারা লোককল্যাণমূলক কাজ করে থাকেন। এই সব লোককল্যাণমূলক সংস্থার মাধ্যমে যদি গ্রামে গ্রামে মেয়েদের মধ্যে দৈহিক উপযুক্ততা অর্জন করবার প্রয়াস পাওয়া যায়, তবে সুফল পাওয়া যেতে পারে। মেয়েদের মধ্যে শারীরিক শিক্ষা দেবার আগ্রহ জাগানো প্রত্যেক জনকল্যাণমূলক কাজের অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে একটি অন্যতম কর্মসূচী বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। ক্ষেত্র প্রস্তুত না থাকলে বীজ ফলপ্রসূ হয় না। তৃতীয় যোজনায়, শারীরিক শিক্ষাকে সফল করতে হলে আমাদের শারীরশিক্ষাবিদেরা প্রস্তুতি হিসাবে প্রচারকার্য এখন থেকেই চালিয়ে যেতে পারেন। মেয়েদের জন্য ব্যাপক ভাবে মুক্তহাতে ব্যায়াম ও সঙ্ঘবদ্ধ ব্যায়ামের প্রচলন হওয়া উচিত।

আজ যে সব মেয়েরা বিদ্যালয়ে ও মহাবিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ পাচ্ছেন—তাঁরাই হবেন ভবিষ্যতের মাতা ও গৃহিণী। প্রত্যেকটি পরিবারে মাতার শিক্ষার প্রভাব অত্যন্ত বেশী। মাতাই শিশুকে প্রথম শিক্ষা দিতে সুরু করেন। যদি ছেলেবেলা থেকে মাতা সন্তানের মধ্যে শারীরিক শিক্ষা নেবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে পারেন—তবে আশা করা যায় তৃতীয় যোজনায় অনেক বাধাবিঘ্ন দূর হবে।

রোমে শিল্প সৌন্দর্যের অনুপম সমাবেশ

(২৪১ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

প্রদর্শনী কেন্দ্র হিসেবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সংঘাতে নির্মাণ পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হয়। অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আগে পার্ক ভিলা, সুন্দর স্কোয়ার, ইত্যাদির সঙ্গে স্টেডিয়াম ও ভেলোড্রোমো নির্মাণের কাজে পুনরায় হাত দেওয়া হয়েছে।

রোমে অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে সপ্তদশ অলিম্পিক উপলক্ষে ইতালীর শিক্ষা মন্ত্রণালয় খেলাধূলা বিষয়ক প্রাচীন ও আধুনিক চিত্রকলা ইত্যাদি প্রদর্শনের আয়োজন করেছেন।
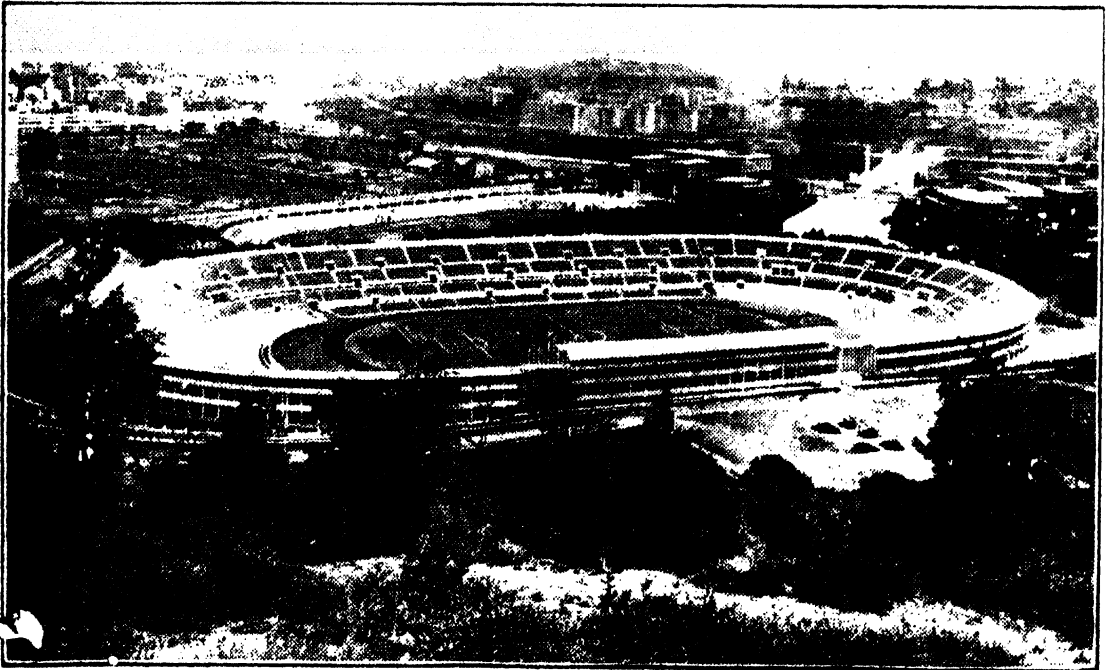
রোমের উত্তরে নবনির্মিত স্টেডিয়াম, সপ্তদশ অলিম্পিক ক্রীড়ার মূল অনুষ্ঠান কেন্দ্র। রোম অলিম্পিক স্টেডিয়াম আধুনিককালের অন্যতম সেরা ক্রীড়াঙ্গন। অন্যূন এক লক্ষ দর্শক-আসনের ব্যবস্থা আছে এখানে।
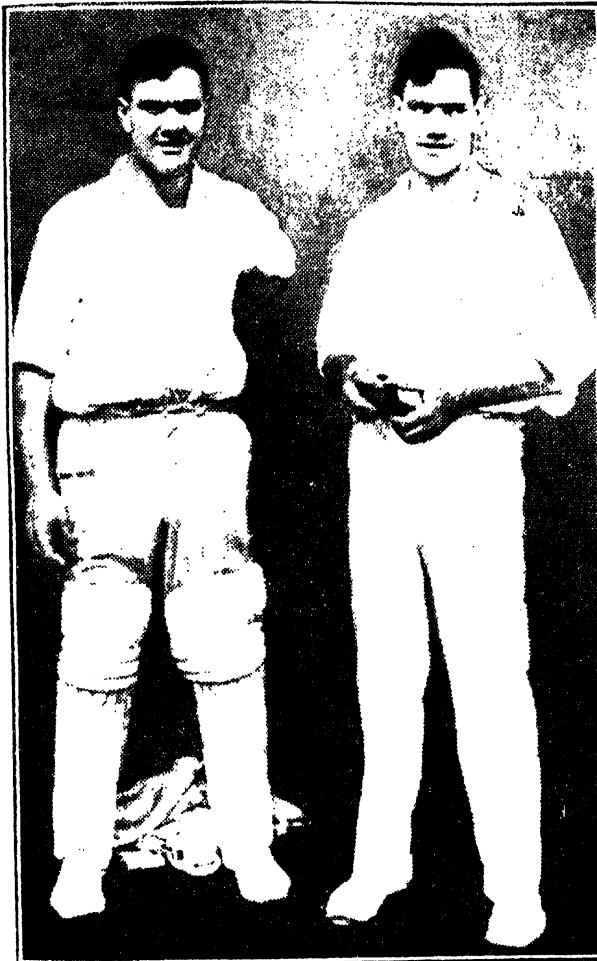
ক্রীড়াক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ যমজ বেডসার ভ্রাতৃদ্বয়। বামে এরিক ও তাঁর দক্ষিণে আলেক বেডসার।

এক বৃন্তে ....

(১৪৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বিধেয়। বেডসারের বন্ধুবান্ধবদের সেদিন দক্ষিণ আফ্রিকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের বুঝিয়ে তুলতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

ক্রিকেটের আর জানা যমজ হলেন স্টিফেন্স ভ্রাতৃদ্বয়—জর্জ ও ফ্র্যাঙ্ক। অপেশাদার হিসেবে ওঁরা খেলতেন ইংলণ্ডের ওয়ারউইকশায়ারের কাউন্টি ক্লাবে। তাঁদেরও ছিল এইরকম দেখতে। এমনই সাদৃশ্য যে একদিন জর্জ আউট হওয়ার পর ফ্র্যাঙ্ক ব্যাট করতে নামলে ডার্বিশায়ারের অধিনায়ক জে চ্যাপম্যান প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হলেন 'এ কি করে হয়? একজন খেলোয়াড় তো দু-বার ব্যাট করতে পারেন না।' আম্পায়ার তখন চ্যাপম্যানকে আসল ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেন। ডেন্টন ভায়েরাও ছিলেন এমনিতরো সম-আকৃতির যমজ। তাঁরা খেলতেন ডার্বিশায়ারের কাউন্টি দলে। আম্পায়ার অধিনায়ক এবং বিশেষভাবে স্কোরাররা তাঁদের নিয়ে মাঝে মাঝে বেশ অসুবিধায় পড়তেন।

মুষ্টিযুদ্ধের রিংয়েও কখনো কখনো যমজ-দের আবির্ভাব ঘটেছে। যেমন ধরা যাক্ মিলান এবং গার্টরিজ ভায়েদের কথা। মিলানদের একজন হ্যারি ১৯২০ সালে এ্যান্টোয়ার্প ও ১৯২৪ সালে প্যারিসে অলিম্পিক আসরে মিডলওয়েটে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। যমজ মুষ্টিযোদ্ধা গার্টরিজদের জীবন আরও বিচিত্র। অন্যদের ভুল ভাঙাতে তাঁরা প্রত্যেকে নিজেদের কোটের পকেটে আদ্য নামটি লিখে রাখতেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যমজ গার্টরিজ সেনা-বাহিনীর একই রেজিমেন্টভুক্ত থেকে একই অঞ্চলে যুদ্ধ করেছেন এবং ১৯১৬ সালে সোমের এক রণক্ষেত্রে শরীরের একই জায়গায় গুলীবিদ্ধ হয়ে দুজনেই আহত হয়ে পড়েন।

কেবলমাত্র এ্যাথলেটিক, ক্রিকেট ও মুষ্টি-যুদ্ধ জগতেই যমজদের আবির্ভাব ঘটেনি। বলতে গেলে খেলাধুলোর প্রায় সমগ্র বিভাগেই যমজদের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছে। যমজ জর্জ ও জ্যাক্ ফিসার ফুটবল খেলতেন, এলান ও জন হার্ভে এবং জন ও ডমিনিক ফোর্ট রেসের জকি ছিলেন, জ্যাক ও বার্ট ওয়ারড্রপ সাঁতার কাটতেন, ডিয়েন ও রোজালিণ্ড রোয় টেবল টেনিস খেলতেন এবং এখনও খেলেন এই রোয়ী যমজের বেডসারদের মতোই বিশ্ব বিশ্রুত ও অবিকল একই রূপের। তবে টেবল টেনিস খেলার আসরে ডিয়েন আর রোজা লিণ্ডের পরিচয় জানাটা তেমন অসুবিধাজনক ব্যাপার নয়। কারণ, রোজালিণ্ড খেলেন ডান হাতে আর ডিয়েন বাঁ হাতে।

খেলাধুলোর আসরে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক যমজ খেলোয়াড় উপহার দেওয়ার কৃতিত্ব ইংলণ্ড দাবী করতে পারে। এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ভূমিতে বোধ হয় সর্বপ্রথম ইংলণ্ডের যমজেরা এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। ইংলণ্ডের আর্নেস্ট ও উইলি রেনশ সম্ভবতঃ এবিষয়ে পথিকৃৎ। রেনশদের পরই আবার একজোড়া যমজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় ওই উইম্বলেডন টেনিস আসরে। ওরাও ছিলেন ইংলণ্ডের অধিবাসী, নাম উইলিয়াম ও হ্যারি ব্যাডলি।

...প্রস্তুতি ও চিন্তার চাহিদা

(১৪৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সচেতনতার অভাব, অভাব সুচিন্তিত পরি-কল্পনার।

এই অভাবে আমাদের অনেকেও ভুগতে হচ্ছে। সরকারী আনুকূল্যে আজকাল মাঝে-মাঝে বিদেশের অভিজ্ঞ কোচেরা এদেশে আসছেন এবং স্বল্পকালীন পরিকল্পনার মাধ্যমে রাতারাতি অনেককে সুদক্ষ খেলোয়াড়ে পরিণত করার ব্যর্থ চেষ্টা চলছে। স্বল্পকালীন শিক্ষণ ব্যবস্থায় স্থায়ী সুফল পাওয়া যাবে না।

বিদেশী কোচ আনার বিপক্ষে আমি নই। বরং সে রীতিরই সমর্থক। তবে তাঁদের আনিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া চাই। তাঁরা আসুন, বহু দিন থাকুন ভারতে এবং ভারতে থেকেই সম্ভাব্য বাছাই শিক্ষকদের শিক্ষা দিন ও সেই সঙ্গে কোনো বাছাই দলকে যথা সর্বভারতীয় দলকে গড়ে-পিঠে তুলুন।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের খেলার পদ্ধতি, শিক্ষণ-পদ্ধতিও স্বতন্ত্র। তাই একবার এক পথ, অপর-বার অন্য পথ অনুসরণ করা মোটেই সমর্থনীয় নয়। একবার বৃটিশ কোচ, অপরবার হাঙ্গেরীয় কোচ আসেন কেন? এই নজীর অস্থির-চিত্ততা দুর্বলতারই লক্ষণ।

'স্পিড' ও 'স্কিল'-এর গোড়ার কথা হলো স্বাস্থ্য। কিন্তু এমন পরম প্রয়োজনীয় বস্তু-টিকে গড়ে তুলতে আমরা তেমন যত্নবান নই। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে স্বাস্থ্য ধরে রাখতে হলে পরি-শ্রমেরও রাশ টেনে রাখা চাই। অসংখ্য প্রতি-যোগিতার ব্যবস্থা, অগুন্তি খেলার আয়োজন খেলোয়াড়দের শরীর গড়তে সহায়তা করে না, করে শরীরটিকে ভেঙে দিতে। এই ভাঙা-চোরার লক্ষণ হয়তো স্পষ্ট নয়, কিন্তু তা সত্য।

ফুল আর সবজী

তারাপদ রায়

আমার তেতলার ছোট্ট ঘরটি থেকে তিন দিকের দৃশ্য বেশ ভাল চোখে পড়ে। দক্ষিণের দরজা দিয়ে খোলা ছাদে বেরিয়ে যাওয়া যায়। পূব-পশ্চিম উত্তরে জানালা। নিরালায় নির্বিঘ্নে কাজ করব বলে দিনের অধিকাংশ সময় আমি এই ঘরে কাটাই। লেখা সব সময় আসে না, ক্লান্তির পরও মন বিশ্রাম চায়, তা ছাড়া লোকে কর্মহীন মুহূর্তগুলি নিয়ে বিলাস করতে চায়—তখন এই তিনটি খোলা জানালা দিয়ে—ঘরে বসেই বাহির্বিশ্বের সংগে আমার যোগাযোগ ঘটে। রিভলভিং চেয়ারটা ঘুরিয়ে পশ্চিমে চাইলে চোখে পড়ে গড়িয়াহাট রোড বেয়ে চলেছে বাস, মোটর, রিক্সা, গরুর গাড়ী আর জীবন্ত মানুষের ছাড়া ছাড়া দল,—পূবে ঘুরালে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে কর্ণভেদকারী সিটি বাজানো বজবজের যাত্রীবাহী ট্রেণ আর মালগাড়ী,—কখনও দেখি অধ্যাপক ঘোষের তরুণী বধূমাতা সুমিত্রার সযত্ন কেশবিন্যাস, প্রসাধন,—দত্ত বাড়ীর ছাদে তুষারধবল কপোত-কপোতীর পক্ষ সঞ্চালন। এ সব একটু দেখার পরই নয়ন-মন ক্লান্ত হয়ে আসে। চেয়ারের মুখ উত্তরের দিক ফিরিয়ে কিন্তু আমি সারাদিন ক্লান্তিহীন নিমেষহীন চোখে চেয়ে থাকতে পারি। নিকট দূরের আর সব দৃশ্য তুচ্ছ হয়ে যায়,—চোখ দুটি গিয়ে পড়ে কাঠা দুয়েক মাঠের উপরে—সেখানে স্বর্গের নন্দন-কানন থেকে যেন একটু করে জমি খসে পড়েছে।

কাব্য ছেড়ে সহজ কথায়ই বলি,—দেখি আমি ছোট্ট একটি ফুলের বাগান আর তাতেই কর্মরত শ্বেত চন্দ্রমল্লিকার মত শুভ্রকেশ এক বৃদ্ধকে। ফুলের সংগে অংগাঙ্গিভাবে মিশে রয়েছেন এই বৃদ্ধ। বৃদ্ধকে ছাড়া ফুলের বাগানটির কথা আমি কল্পনা করতে পারি না;—কারণ বাগানে কাজ করবার যে সময়,—অর্থাৎ বেলা সাতটা থেকে দ[ুপু]র তিনটে থেকে সাড়ে পাঁচ,—তা তাঁকে অন্য কাজে কখনও ব্যয় করতে দেখা যায় না।

এ পাড়ায় আসা অবধি তাঁকে কোন বাড়িতে আড্ডা দিতে দেখিনি,—পাড়ায় মাঝে মাঝে কীর্তন হয় তাতে যোগদান করতে দেখিনি—কোন রকম পূজোপাঠ করতে দেখিনি,—একমাত্র ফুলের বাগানে কাজ করাই ছিল তাঁর দেবসেবা। ফুলের বাগানের শেষে একেবারে উত্তর প্রান্তে ছিল একটি বাঁশের মাচা,—তাতে মাঝে মাঝে লাউ, কুমড়ো উঠত, কখনও সীম, কখনও পুঁই ডাঁটা। কিন্তু এ সবের সংগে তাঁর কিছু সংস্রব ছিল না,—এ সব ছিল তাঁর স্ত্রীর কীর্তি। মাঝে মাঝে মনে হ'ত মাচার এই শাক আভটুকু বাগানের সংগে ম্যাচ করেছে— মাঝে মাঝে মনে হ'ত—ওটা একটা উপদ্রব,—স্বর্গের সুষমার সংগে ঐ জৈব ক্ষুধার সংমিশ্রণ,—নিতান্তই বেখাপ্পা,—ঠিক বুঝে উঠতাম না।

বাগানে কাজ করতে করতে বৃদ্ধ ঐ মাচাটির দিকে কখনও কখনও চাইতেন, তখন আমার মনে হ'ত—তাঁর ভ্রূ যুগল বুঝি ঈষৎ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। আবার এ নাও হতে পারে,—হয়ত বা এ আমার চোখেরই ভুল। হয়ত এ আমার নিজেরই মনের প্রতিক্রিয়া। ঐ মাচা নিয়ে তাঁর স্ত্রীকে কোনদিন ভর্ৎসনা করতে শুনিনি। কোন কথা কাটাকাটি হয়নি।

আসলে কথাও তিনি বড় কম বলতেন,—বিশেষ প্রয়োজন না হলে কোন কথা বেরুতেই দেখিনি তাঁর মুখ থেকে। কিন্তু এ থেকে তাঁকে গোমরা ভাবলে ভুল করা হবে,—কারণ দু-একটি কথা তিনি যখন বলতেন তখন তাঁর মুখে এমন স্নিগ্ধ মধুর হাসি দেখা যেত যার সংগে কবির ভাষায় ফুলের হাসিরই তুলনা করা যায়।

দেহের বর্ণও ছিল—যৌবনে হয়ত চাঁপা ফুলেরই মত,—শেষ জীবনে বাগানে কাজ করে করে তাতে—একটু তামাটের আমেজ লেগেছিল। ফুলের বাগানের সংগে তিনি এমনি একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন, যে তাঁর কোন কিছুর বর্ণনা দিতে গেলে—আমি ফুলের উপমা না নিয়ে পারি না।

ভদ্রলোকের নাম ছিল বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়,—সবাই বলত বিশুবাবু। নামটি প্রথম শুনি আমি পাড়ার কয়েকটি ছোট মেয়ের মুখে। ওরা ভোরে ফুলের সাজি হাতে ফুল তুলে বেড়াচ্ছিল—একজন আর একজনকে বলছিল,—তুই বিশুবাবুর বাগান থেকে যদি ফুল [illegible] আনতে পারিস,—তবেই বলি হাঁ—

ও উত্তর করলে,—জানিস, বিশুবাবু [illegible] আমায় অনেকগুলো ফুল অমনি দিয়েছেন [illegible] আমায় খুব ভালবাসে।

ফুঃ—ভালবাসে না [illegible] ফুল ও [illegible] মেয়েকেই দেয়,—কিন্তু সে সবই ঝরা [illegible] শুকনো পচা ফুল। টাটকা ফুল পেয়েছ [illegible] কোনদিন ওর হাত থেকে!—বলে ঠাকুর-দেব[illegible] জন্য একটা ফুল দেয় না—[illegible]

ওদের মাঝে সব চেয়ে যে বয়সে [illegible] সে একটু গম্ভীরভাবে বললে, একদিন [illegible] ছিলাম আমি বিশুবাবুকে,—দাদু,—[illegible] জন্যে ফুল দেন না কেন আপনি। বললে[illegible], পুজো ত এইখানেই হচ্ছে,—ছিঁড়ে-ছুটে [illegible] অন্য জায়গায় নেবার দরকার কি?

কথাটা বড় ভাল লাগল শুনে।

আর একটা মেয়ে ওর কথার [illegible] বললে,—বললি না কেন, তবে ফুল আবার কেটে ফেলে দেন, বিলিয়ে দেন কেন?

ও উত্তর দিলে,—তা ত তিনি বলেনই পুজো হয়ে গেলে—বাসি ফুল যেমন জলে ভাসিয়ে দেয়, ফেলে দেয়—এ তাই।

বিশুবাবুর জীবনদর্শনের সেইদিনই আমি যেন কিছুটা পরিচয় পাই।

নিরাকার দেবতা সাকাররূপে দেখা দেন—কারো প্রিয়জনের মাঝে, কারো সুরের মাঝে, কারো এই পৃথিবীর সৌন্দর্যের মাঝে। বিশুবাবু বোধহয় ফুলের সৌন্দর্য আর সৌরভের মাঝে তাঁর দেখা পেয়েছিলেন,—তাই এ সবের সেবাযত্নেরও তাঁর সীমা-পরিসীমা ছিল না। উদ্যান যেন তাঁর মন্দির। এ মন্দিরে একটি ঘাসের দল, শুকনো পাতা, কাঁকর পড়ে থাকতে দেখিনি কোনদিন। ভক্ত পূজারী যেমন নিপুণ হাতে প্রতিদিন মন্দির চত্বর মার্জনা করে বিশুবাবু তেমনি—নিড়ানী হাতে দুবেলা উদ্যান পরিচর্যা করতেন। বাগানের চারিদিকে হাত দেড়েক উঁচু ঘন মেহেদী গাছের বেড়া। প্রতিদিন কাঁচি দিয়ে ছেঁটে ছেঁটে তাকে রাজমিস্ত্রীর গাঁথা সমতল সমকোণ দেয়ালের

মত রাখতেন। বাগানে ঢুকবার ছোট একটা গেটের মত ছিল, তার উপরে লোহার জাফরির উপর পাটকেলি মার্শাল নীলের ঝোপ। কাছে গেলে স্তবকে স্তবকে ফোটা অসংখ্য ফুলের গন্ধে নেশা লাগে। বেড়ার ধারে ধারে নানা জাতীয় লিলি, তার পরেই বেল, যুঁইয়ের ঝাড়। নিয়মিত দূরত্ব রেখে নানা জাতীয় গোলাপের মেলা। বাগানের ঠিক মধ্য ভাগে একটি নাতি-দীর্ঘ সতেজ ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডি ফ্লোরা। বাগানের চার কোণে চারটি কামিনী। গাঁদা আর চন্দ্রমল্লিকার জন্য বিশেষ বিশেষ জায়গা নির্দিষ্ট ছিল। আর ছিল ম্যাগনোলিয়ার চারিপাশে আয়তক্ষেত্রের আকারে বেশ কিছুটা জায়গা বিলেতী মরশুমী ফুলের জন্য। বর্ষায় পাতাসার আর বৈজ্ঞানিক অ্যামোনিয়াম সালফেট দেওয়া হত এই সব জায়গায়। বলা-বাহুল্য অন্যান্য গাছের গোড়ায়ও নিয়মিত সার দেওয়া হ'ত।

উত্তরের জানালা দিয়ে পরম বিস্ময়ানন্দে দেখতাম আমি বিশুবাবুর পুষ্পোদ্যান চর্চা। কখনও ছোট কোদালি দিয়ে মাটি কোপানো, লাঠি দিয়ে মাটি ভেঙে গুঁড়ো করা,—কখনও নিড়ানি দিয়ে গাছের গোড়ার মাটি খোঁড়া, গ্রীষ্মে সিরিঞ্জ দিয়ে জল দেওয়া। সে এক বিচিত্র সাধনা। সাধনায় তুষ্ট হয়ে চিরসুন্দর দেখা দিতেন বিশুবাবুর উদ্যানে। স্বর্গের দেবতা ধূলার-ধরণীতে আত্মপ্রকাশ করতেন। হরিৎ পত্রাবকাশীর্ষে পূর্ণ বিকশিত পুষ্পের দিকে চেয়ে বিশুবাবু এমন বিভোর হয়ে যেতেন যে দেখে মনে হ'ত তাঁর দিব্যদর্শন ঘটছে।

ফুলগুলি আউরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওদের সযত্নে বৃন্তচ্যুত করতেন। এ জন্য তাঁর বাগানে সর্বদা যেন এক শাশ্বত যৌবনের রূপই দেখা যেত। কোন গাছে একটা শুকনো বা পাতা দেখা যেত না। দুবেলা কাঁচি চালিয়ে তিনি এদের অবাঞ্ছিত লোক পাঠাতেন। স্ত্রীর সবজী মাচায় যে সব লাউ, কুমড়ো উঠত তার আর কোন যত্ন করতেন না তিনি—কিন্তু শুকনো পাতা বা ডগা দেখলে ছেঁটে দিতেন।

স্ত্রীর মাচায় ভাল লাউ, কুমড়ো হলে তিনি যখন স্বামীকে বিশেষ গর্বের সঙ্গে দেখাতেন তখন বিশুবাবু মৃদু হেসে বলতেন,—বেশ সুন্দর।

কিন্তু তোমার ও সব কি কাজে লাগে, আমি যা জন্মেছি তা আজ কাজে লাগবে,—এই জায়গায় অত যত্ন করে সবজীর ক্ষেত করতে ত কোন কিছু কিনতেই লাগত না আমাদের তা ছাড়া টাটকা কত কি খেতে পেতে।

শুনে বিশুবাবু শুধু মৃদু হাসতেন—কখনও বলতেন উপোষ করে ত নেই। এ নিয়ে বেশি কথা আর হ'ত না।

বিশুবাবুর স্ত্রীর কথাগুলি কিন্তু আমার তেমন ভাল লাগত না। ঐ ফুলের বাগানের জায়গায় একটা সবজীর ক্ষেত কল্পনা করতে গেলে মনটা যেন আমার হাহাকার করে উঠত। বিশুবাবুর পাশে তাঁর স্ত্রীর কল্পনাও আমার কেমন এক অস্বস্তিকর অনুভূতির উদ্রেক করত। চলা-ফেরা, কাপড়-চোপড়, সাজগোজ, রুচি কোন কিছুর মধ্যেই যেন বিন্দুমাত্র মিল খুঁজে পেতাম না। ফুল বাগান আর বিশুবাবুর মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল, সামঞ্জস্য ছিল না স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে।

বছরে একবার পুজোর সময় বিশুবাবুর দুই ছেলে তাঁদের ছেলেমেয়ে নিয়ে বিদেশ থেকে বাড়ি আসতেন। বিশুবাবুর কাজ তখন বেড়ে যেত,—নাতি-নাতনীকে বড় সুন্দর ম্যাচ করা জামা-কাপড়, ফ্রক জুতো পরিয়ে তিনি নিজের হাতে সাজিয়ে সন্ধ্যাকালে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। দেখে মনে হ'ত কতকগুলি জীবন্ত ফুল চলেছে লাইন বেঁধে। বিশুবাবুকে এখানেও দিব্যি মানাত। ওদের ঠাকুরমা ব্যস্ত হয়ে উঠতেন—ওদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে। এমনি করে নাতি-নাতনীর আদরের রীতিও দেখতাম স্বতন্ত্র।

শুষ্ক প্রায় বিবর্ণ যে ফুলগুলি বিশুবাবু বাগান থেকে ছেঁটে ছেঁটে ফেলতেন একদিন দেখলাম বিশুবাবুর অজ্ঞাতে তাঁর স্ত্রী তাদের দুই নাতনী পুষ্প আর মালার মাথায় গুঁজে দিয়েছেন, সেদিনও আমার মনে হ'ল বিশুবাবুর ভ্রূ দুটি ঈষৎ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। দেখলাম বিশুবাবু ও দুটি ফুল ওদের মাথা থেকে ফেলে দিয়ে নব প্রস্ফুটিত দুইটি ব্লাকপ্রিন্স ওদের মাথায় গুঁজে দিলেন। বিশুবাবুর হাতে নবপুষ্প ছেদন দেখলাম এই প্রথম।

ম্যাগনোলিয়ার চারিধারের আয়তক্ষেত্রটি কিছুদিন আগেই কোপানো হয়েছিল। কয়েক-দিনের খরায় মাটি বেশ শুকিয়ে গেলে—ডেলা ভেঙে ঘাস, দূর্বা কাঁকর বেছে মাটি বেশ তৈরী করা হ'ল। তারপর তাতে পড়ল পাতাসার। কয়েকদিন পর দেখলাম—শুষ্ক প্রায় পাতাসার তাতে মেশানোও হয়ে গেল। মোট কথা জমি বেশ তৈরী হয়ে গেল। কল্পনা নেত্রে দেখলাম—হরিৎ বসনে সজ্জি,—কুসুমে ভরিয়া সাজি—কত ক্ষুদে ক্ষুদে পরী আত্মপ্রকাশ করেছে ঐখানে,—শীতকালে। সিজন ফ্লাওয়ারের মেলা। মনে মনে বিশুবাবুকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালাম, মনে হ'ল পুষ্পোদ্যান শিল্প অন্যান্য শিল্পের মতই শুধু শিল্পীরই মনোরঞ্জন করে না,—দর্শকেরও বিমলানন্দের কারণ ঘটায়।

পুজোর ছুটির শেষে বিশুবাবুর ছেলে দুটি তাঁদের স্ত্রী ছেলেপিলে নিয়ে কর্মস্থানে চলে গেলেন। এবার বিশুবাবুও তাঁদের সঙ্গে গেলেন। বাড়িতে রইলেন শুধু তাঁর স্ত্রী আর সাবেক ভৃত্য,—একাধারে—ভৃত্য এবং পাচক। বিশুবাবুর বাগানের দিকে চেয়ে রীতিমত দুঃখ পেতাম আমি। কয়েকদিন পর থেকেই গাছ থেকে বিবর্ণ শুষ্ক পুষ্পদল ঝরে ঝরে পড়তে লাগল। পত্রগুচ্ছের মাঝে মাঝে কীটদংষ্ট জীর্ণ পাতা উঁকি মারতে লাগল। মাটিতে ঘাস, দূর্বা দেখা দিল। দেখে দেখে ভাবতাম বিশুবাবু এসে তাঁর বাগানের দশা দেখে কি দুঃখ যে পাবেন!

বিশেষ একটা জরুরী কাজে হপ্তাখানেকের জন্য বাইরে যেতে হয়েছিল আমার। ফিরে এসে বাগানের দিকে চেয়ে আমার ত একেবারে চক্ষু স্থির: ম্যাগনোলিয়া গাছের চারিদিকে যে আয়তক্ষেত্র জায়গাটায় সার দিয়ে কুপিয়ে বিশুবাবু সিজন ফ্লাওয়ারের জায়গা করেছিলেন সেখানে উদ্ধত আবেগে একটা সবুজের আস্তরণ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ওটা শাক জাতীয় একটা কিছু এটা বেশ বুঝা যাচ্ছিল,—কি শাক তা বুঝছিলাম না। কয়েকদিন পরে বুঝলাম এ পালন। আরও বুঝলাম:— এ বিশুবাবুর গিন্নীরই কীর্তি। বিশুবাবু এসে এ দেখবার পর তাঁর মনের অবস্থা কি রকমটি হবে ভেবে আমি আতঙ্কে শিউরে উঠেছিলাম।

বিশুবাবু ফিরে এলেন আরও দিন পনের পর। বিকেল পাঁচটার কাছাকাছি, যা ভেবে-ছিলাম তাই হ'ল। কুলির মাথা থেকে মাল নামানোর পর বাগানের দিকে দৃষ্টি পড়তেই তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন,— কোথায় তুমি?

বিশুবাবুকে এত উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলতে শুনিনি কোনদিন। গিন্নী তাড়াতাড়ি এগিয়ে পান দোক্তায় কালো দশনশ্রেণী বেশ কিছুটা উন্মাটিত করে এক গাল হেসে বললেন,—এই যে,—কখন এলে,—ওরা সব ভাল ত?

সে কথা পরে হবে,—কিন্তু এ তুমি করেছ কি?

গিন্নীর মুখে তখনও মৃদু হাসি: কি করেছি?

আমার 'সিজন ফ্লাওয়ারের জায়গায়—এ তুমি কি করেছ?

ওমা, এতেও দোষ হয়ে গেল? জায়গাটা পড়ে রয়েছে দেখে দুটো পালন শাক বুনেছি, এতে তুমি এমন খাপ্পা হচ্ছ কেন? বাজারে কদিনের বাসি পালন কিনে খাওয়া হয়, তোমরাই বলো ওতে কি যেন আছে শরীর ভাল থাকে,—আর এ খেতে পাবে টাটকা পালন, সে গুণটা আরও বেশি থাকবে এতে। তা ছাড়া বাড়ীতে সবজী করলে তবুও যা হ'ক দুটো পয়সা বাঁচে,—কিন্তু তোমার ওতে কি হয়? দিন রাত্তির ফুল, ফুল আর ফুল। ফুল ধুয়ে কি জল খাব?—

বিশুবাবু অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন,—খাওয়া ছাড়াও যে মানুষের জীবনে আর কিছু চাওয়া থাকতে পারে একথা বুঝবে না তুমি,—বোঝ নি,—বুঝতে পার না তুমি,—বুঝলে—

বল, থামলে কেন তুমি,—বুঝলে কি করতাম,—আর এখনই বা কি করি না তোমার জন্য?

কর,—করবে না কেন,—পেট ভরে দুটো খাওয়ার ব্যবস্থা কর,—কিন্তু খাওয়াই মানুষের সব নয়,—অন্য ক্ষুধাও মানুষের আছে,—সে ক্ষুধা মেটানোর কোন চেষ্টাই কর নি তুমি কোনদিন, আবার অন্যদিক দিয়ে তা মেটাবারও কোন সুযোগ দেবে না!

কি যে সব বলছ,—কিছুই বুঝছি না আমি— ও সব হেঁয়ালি কথা আমার মাথায় ঢোকে না,—ক্ষুধা ত মানুষের একটি জিনিষের জন্যেই থাকে,—সে হচ্ছে খাবার। তার ব্যবস্থা করতে কোনদিন কোন অবহেলা করেছি এ কথা পরম শত্রুও আমায় কোনদিন বলতে পারবে না। দুই দুটো ছেলেও তোমার পেটে ধরেছি,—আবার কি ক্ষুধা?

শুনে অট্টহাস্য করে উঠলো বিশুবাবু: তাইত বলছিলাম, বুঝবে না তুমি,—একথা তোমার মাথায় ঢুকবে না।

ঢুকবে না কেন,—খোলসা করে বল না কেন,—দেখি ঢোকে কিনা।

বিশুবাবু একটু স্থির কণ্ঠে বললেন,—দেখ,—শুনে দুঃখ করো না,—দুঃখ আমি কাউকে দিতে চাই না,—অন্য চেয়েও কিছু [illegible] চাই না,—কিন্তু ভেবে দেখ,—চোখ [illegible] মানুষের একটা জিনিস আছে,—সে-ও ক্ষুধিত

(শেষাংশ ১৬০ পৃষ্ঠায়)

গুজবে বিশ্বাস করিও না

* * * * রমা নিয়োগী

নাঃ গুজবে আর কে বিশ্বাস করে। তবু গুজব ওঠে আর বেশ দ্রুত গতিতেই তা রটে। আপনাকে আমাকে যে বলে সে প্রথমেই সতর্ক করে নেয়—বিশ্বাস করো না, তারপর গুজবটি নিপুণভাবে পরিবেশন করে। আপনি আমিও তেমনি যত্নে যথারীতি এদের আর ওদের কাছে গুজবের বার্তা বহন করে থাকি। এ নিতান্তই কলিধর্ম নয়, সত্যযুগেও হালচাল এমনি ছিল মনে হয়; কারণ তখনকার-দিনে গুজবকে মার্জিত ভাষায় বলত কিংবদন্তি, যার অর্থ শোনার সময় 'কি যে বলে', আর শোনাবার সময় 'সবাই যে বলছে, অতএব আমিও—'।

গুজবের চিরকালীন এই জনপ্রিয়তার কারণও আছে। ইতিহাসের শক্ত ঊষর জমিতে সাবধানে পথ চলতে চলতে মানুষ যখন হাঁফিয়ে ওঠে, কল্পনার অবিরাম ঘোড় দৌড়ে দম যখন ফুরিয়ে আসে, তখনই মানুষ চায় একখানি গুজবের ঢালা ফরাসে এলিয়ে পড়ে বেহিসাবী এপাশ ওপাশ করতে: সত্যমিথ্যার অবাধ মিশ্রণে গড়া হাল্কা কটা মুহূর্ত কাটে একমাত্র এখানেই। ব্ল্যাকআউট কিম্বা হাজার ওয়াট বাতিতে যখন চোখ জ্বালা করে তখন মানুষ খোঁজে আলো-ছায়ায় গড়া মনোরম স্নিগ্ধতা।

আগেকার দিনে ভারতকে কেন্দ্র করে যে সব গুজব রটেছিল বিদেশের বাজারে তার জনপ্রিয়তা সম্বন্ধেও সন্দেহ করার উপায় নেই; কারণ বহু শতাব্দীর পর বহু পণ্ডিতের ভ্রুকুটি সত্ত্বেও, এ সব গুজব পৌঁছেছে আমাদের হাতে। ভ্রুকুটি করলেও পণ্ডিতরা একেবারে বাতিল করে দেননি গুজবগুলি, কোনও দিন হয়ত পঁচানব্বই ভাগ মিথ্যার থেকে পাঁচভাগ কোনো অমূল্য সত্যকে ছেঁকে তোলা যাবে এই ভরসায়। ইতিমধ্যে অপণ্ডিত সাধারণ পরমানন্দে শুনেছে আর শুনিয়েছে এ সব গুজব যুগ যুগ ধরে।

ভারতের বিষয়ে সব চেয়ে প্রাচীন গুজব বোধহয় পাওয়া যায় হোমারের অডিসিতে। এতে বলা হয়েছে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শেষ-প্রান্তে অবস্থিত ইথিওপিয়ারই এক অংশ, পূর্ব ইথিওপিয়া! এই গুজবজাত ধারণার ফলে অনেক সময় ইথিওপিয়া বা আফ্রিকার বহু বৈশিষ্ট্য চাপান হয়েছিল ভারতের ঘাড়ে। ভারতের গেছো পশমের গুজবটিও বেশ প্রাচীন। এর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় হেরোডোটাসের ইতিহাসে; তিনি বলেছেন পারসিকরা যখন গ্রীস আক্রমণ করেছিল তখন সঙ্গে এনেছিল কিছু ভারতীয় সৈন্য; তাদের পরিধানে ছিল পশমের কাপড়, আর সে পশম ফলতো গাছে। পরে মেগাস্থিনিস প্রভৃতি লেখকও এই গেছো পশম বা ভেজিটেবল উল-এর কথা বলেছেন। আরও পরে ইয়োরোপীয় এক চিত্রকরের আঁকা ভারতীয় পশমগাছে এ গুজবের চরম পরিণতি দেখা যায়—গাছটির ডালে ডালে পাকা ফলের মত নানা ভঙ্গীতে ঝুলছে নানা আকারের ভেড়া!

ভারত সম্বন্ধে গুজবের সেরা আজগুবি গুজব বহু পৌঁছেছিল প্রাচীন গ্রীস আর রোমে। এসব গুজব বিশ্লেষণ করতে বসলে মনে হয় ভারতের উপাখ্যান রূপকথা আর নানা সাহিত্যিক অত্যুক্তি চোলাই করে এদের জন্ম হয়েছে। বামন জাতির কথা হোমারের মহা-কাব্যেও পাওয়া যায়: কেউ বলে এরা থাকতো ভারতে, কেউ বলে ইথিওপিয়ায়। এদের উচ্চতা ছিল তিন বা পাঁচ বিঘৎ। এরা বস্ত্র ব্যবহার করতো না কারণ দীর্ঘ চুলেই এদের সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত থাকতো। ভারতের রাজার সৈন্যদলে নাকি তিন হাজার বামন ধনুর্ধর ছিল। আলেক-জান্দারকেও নাকি এমনি এক বামন সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল ভারতে, পরে অবশ্য দেখা যায় এরা আসলে বানর সৈন্য। এ গুজবের রহস্য ভেদ করার চেষ্টায় অনেকে বলেছেন, বালখিল্য ঋষিদের উপাখ্যান আছে এর মূলে। কিন্তু তাঁরা যে ধনুর্ধর ছিলেন এ তথ্য কোথাও নেই। অনেকে আবার বলেন, খর্বকায় কিরাত সৈন্যদের কেন্দ্র করে হয়ত এগুজব রটেছিল। বানর সৈন্যের উল্লেখে আবার রামায়ণের বানর সৈন্যের কথাই মনে করায়।

ভারতবাসী বহু বিচিত্র জাতির বর্ণনা আছে বিদেশের প্রাচীন সাহিত্যে। এনোক্টোকয়টাই (Enoctokaitai) জাতির কান ছিল পা পর্যন্ত লম্বা, কাজেই ওরা কান পেতেই স্বচ্ছন্দে ঘুমোতো। স্কিয়োপোডিদের পায়ের পাতা এত বড় ছিল যে শুয়ে পড়ে পা উঁচু করলে পায়ের পাতাই ছাতার কাজ করতো। আর এক জাতির পায়ের আঙুল ছিল পিছন দিকে। নাসিকাহীন এ জাতিও ছিল ভারতে। পণ্ডিতরা বলেন, এমন অনেক জাতির নাম আছে মহাভারত প্রভৃতি বই-এতে যেমন কর্ণপ্রাবরণ, পশ্চাদঙ্গুলেয়। এর অনেক-গুলিই প্রকৃতপক্ষে সভ্যজাতির বর্বর বর্ণনা প্রসঙ্গে সাহিত্যিক অত্যুক্তি। বেদে ত আর্য-শত্রুদের বর্ণনা দিতে গিয়ে স্পষ্টই বলা হয়েছে ওরা ছিল অনাস বা নাসিকাহীন—বোঁচা নাকের প্রতি উন্নাসিক আর্যদের নিষ্করুণ কটাক্ষ!

বহু ক্ষেত্রেই অবশ্য এ সব জাতি বর্ণনার মূল এত সহজে ধরা যায় না। এক জাতির বিবরণে আছে এদের শিশু জন্মায় দাঁতশুদ্ধ, চুল আর ভ্রূ থাকে ধবধবে সাদা। পরে তিরিশ থেকে ষাট বছরের মধ্যে এদের চুল কেঁচে কুচকুচে কালো হয়। এদের হাতে পায়ে আটটা করে আঙুল আর কান লম্বা কনুই পর্যন্ত। মুখ-বিহীন এক জাতির কয়েকটি নমুনা নাকি একদা এসেছিল চন্দ্রগুপ্তের সভায়। এদের মুখের বদলে ছিল ঘ্রাণ গ্রহণের দুটি ছিদ্র। এরা পোড়া মাংস আর সুগন্ধ ফলফুলের ঘ্রাণ গ্রহণ করেই বেঁচে থাকত, দুর্গন্ধ এদের পক্ষে বড় ক্লেশকর, এমনকি মারাত্মক ছিল। 'ঘ্রাণেন অর্ধভোজনম্' প্রবাদটির সঙ্গে এ গুজবের কোনও ক্ষীণ যোগসূত্র আছে কিনা কে জানে।

ভারতের জীবজন্তু সম্বন্ধেও বহু রোম-হর্ষক গুজব তখন প্রচলিত ছিল। কোটৌজোন লে জন্তুটি ছিল ঘোড়ার মত, হলদে নরম লোমে তার গা ঢাকা; সন্ধিহীন পা গড়নে হাতীর পায়ের মত, আর লেজ শুয়োরের মত। এর দুই ভ্রূর মাঝখানে একটি তীক্ষ্ণ কালো রঙের পাকানো শিং, মাথায় একটি ঝুঁটি। গলার স্বর উচ্চ কর্কশ। নিজেদের মধ্যে এরা ঝগড়া করতো বটে তবে অন্য জন্তুর সঙ্গে অসদ্ভাব ছিল না। প্রাচ্য দেশের দরবারে নাকি ষাঁড়ের লড়াই এর মত বাচ্চা কোটৌজোনের লড়াই হতো। আর এক জন্তুর নাম ছিল মার্তিখোয়া; এদের মুখ মানুষের, শরীর সিংহের মত, গায়ের রং লাল, চোয়ালে তিন সারি করে দাঁত মানুষের মত তবে বড় আকারের কান। হাতখানেকের একটা লেজ আছে এদের। তার ডগা বিছের হুলের মত তীক্ষ্ণ আর খাড়া খাড়া লম্বা কাঁটায় সে লেজ ভর্তি; আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এরা নাকি কাঁটা ছুড়ে মারতো, পরে আবার লেজে কাঁটা গজাত। এদুটি জন্তুর বর্ণনা পড়তে পড়তে আরব্যোপন্যাসের ট্যাঁশগরু আর হাঁসজারুদের কথা মনে পড়ে। একাধিক জন্তুর বৈশিষ্ট্য নিয়ে এদুটি জন্তুর উদ্ভব, তাতে সন্দেহ নাই।

ভারতের সোনা খোঁড়া পিঁপড়ের কাহিনী বেশ জনপ্রিয় ছিল বিদেশে। এরা আকারে নাকি শেয়ালের চেয়েও বড় ছিল; থাকত ভারতের পূর্বপ্রান্তে সোনার খনিতে। শীতকালে মাটি খুঁড়ে গর্ত করে এরা গর্তের মুখে গুঁড়ো সোনা জমা করতো। আশপাশের লোকেরা এই সোনা সরাবার এক উপায় বার করেছিল। গর্ত থেকে দূরে দূরে মাংসের টুকরো রেখে দিত, মাংস খেতে পিঁপড়েরা যখন ব্যস্ত থাকত সেই সুযোগে এরা স্বর্ণ রেণু নিয়ে পালাত। এই স্বর্ণখনক পিপীলিকার কাহিনী দেশ বিদেশে বহু দিন প্রচলিত ছিল। শুধু গ্রীক রোমান নয়, আরবী লেখকরাও এর কথা বলেছেন। নিয়ার্কাস বলেছেন আলেকজান্দারের শিবিরে নাকি এই পিঁপড়ের চামড়া অনেকগুলি এসেছিল। মহাভারতে পিপীলিকা স্বর্ণের কথা পাওয়া যায়। অনেকের অনুমান এ পিঁপড়ে নাকি আসলে খর্বকায় তিব্বতীয় খনিকার।

যুগে যুগে এই সব গুজবের মত আরও অনেক গুজব রটেছে ভারত সম্বন্ধে। এ ধরণের সর্বাধুনিক বহুপ্রচারিত গুজব বোধ হয় হিমালয়ের রহস্যময় বৃহৎ কটি পায়ের ছাপকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। য়েতি বা তুষার মানবের অস্তিত্ব আছে কিনা তা নিয়ে পণ্ডিত এবং প্রাকৃত জনের মধ্যে বহু প্রকার আলোচনার পর অবশেষে এ বিষয়ে অনু-সন্ধানের উদ্দেশ্যে এক অভিযাত্রী দল রওনা হয়ে গিয়েছে। বর্তমানের সব চেয়ে রোমাঞ্চকর গুজবটি অবশ্য ভারতীয় কিছু সম্বন্ধে নয়, এমন কি পার্থিব কিছুর বিষয়েও নয়; এ হলো নাকি অপার্থিব এক বস্তু সম্বন্ধে—ফ্লাইং সসার বা উড়ন্ত চাকা। বিশেষজ্ঞ মহলেও এ সম্বন্ধে নানা মত,—এক দল বলেন এ ব্যোমযানটি আসে অন্য কোনও গ্রহ থেকে, একবার নাকি নেমে ছিল ফ্রান্সের মাটিতে আর তার থেকে বার হয়েছিল মানুষের-মত-নয় এক প্রাণী। আর এক দল বলেন ওসব বাজে, ফ্লাইং সসার পৃথিবীরই কোনও দেশের ব্যোমযানের উন্নততর নমুনা—এখনও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্যায় পার হয় নি বলে এর বিষয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয় নি

(শেষাংশ ১৬০ পৃষ্ঠায়)

সময় সঙ্কেত

অঞ্জলি বসু (সরকার)

তখন সুকানে চাকা লাগিয়ে গান শুনতে হোতো, ঘরে ঘরে রেডিও সেট তখন কল্পনার রাজ্যেরও বাইরে। সুতরাং সেই দুপুরে একটায় কেল্লার তোপ দেগে তবে লোককে দিনান্তে একবার ঘড়ি মেলাতে পারত। চাও আর না চাও দিনে দুবার সাত সুরে কানের কাছে কেউ সময়ের গান শুনিয়ে যেত না। কিন্তু তবু এ হেন প্রাচীন যুগেও গোপীকেষ্ট গোয়ালা লেনের ঐ একবারো গৃহের ভাগ্যবান গৃহস্থ, তাঁরাই অতি প্রত্যুষে দৈনিক সময় সংকেতে সচেতন হতেন—নিজের অজান্তেই ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখতেন—হ্যাঁ সময় হয়েছে তো।

সে সংকেত শুধু কর্ণ স্পর্শ করেই সরে যেত না, কানের ভিতর দিয়ে মর্ম বিদীর্ণ করে প্লীহা পর্যন্ত চমকিত করে তুলত—

'নাথি মেরে ওঠা! সেজবৌকে নাথি মেরে ওঠা!' মিনিট দশেক ধরে মাঝে মাঝে থেমে থেমে ইষ্টমন্ত্রের মত জপ করে যেতেন রাজীবলোচনবাবু, যতক্ষণ না সেজবৌকে ওঠানো হোতো। কে কোন্ উপায়ে কাজটি সমাধা করত তা অবশ্য দেখতে পেতেন না প্রতিবেশীরা, কিন্তু বুঝতে পারতেন। সকাল সাতটা বাজা আর উনপঞ্চাশ নম্বর বাড়ীর সেজবৌয়ের ঘুম ভাঙানো পর্ব একার্থক হয়ে গিয়েছিল এই গলিটার মানুষগুলোর কাছে।—

বেশীদিন নয়, বছর দুই হোলো রাজীবলোচনবাবু এসেছেন এ পাড়ায়। ছাদে বারান্দায় জানালায় চার পাঁচটি বৌয়ের মুখ দেখা যায় দিনে রাতে। তার মধ্যে কোন্টি আয়ুষ্মতী সেজবৌ অনেক গবেষণা করেও পাড়ার মহিলা-সমাজ স্থির করতে পারেন নি। আর স্থির করতে পারেন নি কেন সেজবৌ 'বিনা পদাঘাতে নাহি তেয়াগিব শয্যা' প্রতিজ্ঞা নিয়েছে।—

ফলে সেজবৌ সম্বন্ধে কে কোন্ ফ্রন্ট নেবেন—সহানুভূতির না নাসিকা কুঞ্চনের শ্বশুরের না বধূমাতার—তা'ও কোনোদিন স্থির হোলো না। কেউ বলেন "আহা ছেলেমানুষ বোধহয়—সকাল সকাল ওঠার অভ্যেস ছিল না বাপের বাড়ীতে'—পাল্টা বলেন কেউ—'ওমা! ছেলেমানুষ আবার কে ও বাড়ীতে? তাছাড়া পাঁচটা বৌয়ের ভেতর সেজবৌ-ই যদি ছেলেমানুষ হবে, তবে বাকী দুটো তো ফ্রক পরে ঘুরে বেড়াত—তা তো কই দেখি নি বাপু!'

কেউ বা বলেন—'হয় তো হার্টের অসুখ আছে কি হাঁপানি—রাত্রে ভাল ঘুমোতে পারে না, ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ে, উঠতে বেলা হয়ে যায়—যার এ যুক্তি পছন্দ নয় তিনি বলেন—'অসুখ না ছাই! বারো মাস তিরিশ দিন কারো সমান অসুখ থাকে? কোনোদিন বা বাড়াবাড়ি হোলো, কোনদিন বা ভাল থাকল! একদিনও কি সকাল সকাল ঘুম ভাঙতে নেই? ওসব হোলো ন্যাকামি!'

রোমান্সপ্রিয় কেউ ব্যাপারটায় একটু কাব্যের প্রলেপ দিতে চান—'বর হয়তো খুব ভালবাসে সেজবৌকে, বাপের দাপটে সারাদিনে তো কথাটি বলতে পায় না! রাত্রে কাছে পেয়ে হয়তো আর ছাড়তে চায় না—বেলা পর্যন্ত ধরে রেখে দ্যায়!' মুখ ঝামটা দ্যান অপরপক্ষ—'মরণদশা আর কি! নিত্যি সকালে যে শ্বশুরের লাথি খাচ্ছে তার আবার বেলা সাতটা পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে বরের সোহাগ খাবার সাধ থাকে, না বুকের পাটা থাকে! ঘেন্নায় মরে যাই, বাবাগো!'

আর একজন ভেবে ভেবে বল্লেন—'বৌয়ের হয়তো ছেলেপুলে হবে—শরীরের ঘুম ছাড়তে চায় না'—গালে হাত দিলেন আর একজন—'অবাক করলে বাপু! পোয়াতি বৌকে কারণ নেই অকারণ নেই লাথি মেরে ওঠায় কোনও শ্বশুর? তারই বংশধর তো ওর পেটে! যত সব অনাছিষ্টি কথা তোমাদের!'

মোটের উপর সিদ্ধান্ত হোলো না কিছুই—মোটামুটি ধরে নিল সকলে যে সেজবৌয়ের শরীরে হোক মনে হোক কোথাও আছে একটা অসুস্থতা আর রাজীবলোচনবাবুর মাথায় আছে কিছু ছিট্।—

ফলে সকাল সাতটার সময় ধ্বনি নিয়মিত বাজতে লাগল আর পাড়া প্রতিবেশীর কান ক্রমশঃ অভ্যস্ত হয়ে যেতে লাগল রাজীবলোচনবাবুর নিরুত্তাপ কণ্ঠের অনুত্তেজিত ভাষায়—'নাথি মেরে ওঠাও!'

আরও বছর খানেক কেটে গেল। একদিন সকালে হঠাৎ গোপীকেষ্ট গোয়ালা লেনে সময়ের গতি শ্লথ হয়ে এল—ঘড়ির দিকে চেয়ে স্থির হয়ে এল জোড়া জোড়া চক্ষু—সাতটা বেজে গেছে কখন! সাড়ে সাতটাও পেরিয়ে ঘড়ির কাঁটা আটটার ঘর ছোঁয় ছোঁয়। কি হোলো? বাজারের থলি হাতে নিয়ে কর্তা উঠোনের মাঝেই দাঁড়িয়ে রইলেন। ডাল সাঁতলাতে গিয়ে কড়ায় তেল চড়িয়ে ফোড়ন দিতে ভুলে গেলেন গিন্নী। পড়া থেকে মুখ তুলে ছেলেমেয়েরা ঘড়ির দিকে চেয়ে চমকে উঠল। এও সম্ভব? দুর্ঘটনা নয় তো? কচি ছেলেকে দুধ খাওয়াবার সময় পার হয়ে গেছে অজান্তে-অসময়ে ছেলেকে কাঁদতে শুনে ঘড়ির দিকে চাইল নতুন মা। তাই তো। এ রকম তো কোনোদিন হয় না!

ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে ছুটে গেল শাশুড়ীর কাছে—'মা সেজ বৌয়ের বোধহয় কিছু হয়ে গেল!' 'ঝাট ঝাট' করে উঠলেন শাশুড়ী—'কি জানি মা! উনপঞ্চাশ নম্বর তো একদম চুপ হয়ে গেছে। আজ তিন বছর ধরে একনাগাড়ে সকাল ঠিক সাতটার সময়ে ঘড়ি ধরে শুনে আসছি রাজীবলোচনবাবুর গলা—"নাথি মেরে ওঠা—সেজবৌকে নাথি মেরে ওঠা"—বৌকি একদিনের জন্য বাপের বাড়ী যায়নি? বুড়ো শ্বশুরের কি একদিনের জন্য শরীর খারাপ হয়নি? কিন্তু আজ দেখ—সকাল থেকে একদম চুপ মেরে গেছে বাড়ীখানা! কি হোলো কে জানে! কর্তাকে একবার পাঠাই খবর করতে—বিপদকালে পড়শীতে না দেখলে দেখবে কে?'

অনেক বাড়ীর গিন্নীই পাঠালেন। অনেক কর্তাই গিয়ে জড়ো হলেন উনপঞ্চাশ নম্বরের সামনে। কিন্তু সদর বন্ধ!

যখন সদর খুলল, তখন পুরুষেরা সব কর্মস্থলে—ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজে। বাড়ীর মায়েরা বৌরা দেখলেন বারান্দায় দরজায় রোয়াকে দাঁড়িয়ে সেজবৌ নয়, এবারে ঘুমিয়ে পড়েছেন রাজীবলোচনবাবু নিজেই। খট্টারূঢ় স্কন্ধ-বাহন হয়ে চলেছেন সেই দেশে যে দেশে ঘুম থেকে ওঠারূপ বিরক্তিকর এবং ঘুম থেকে ওঠানোরূপ পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজের কোনোটাই করতে হয় না।

যথাকালে পারলৌকিক কাজ সমাধা হোলো। নিমন্ত্রিত হলেন পাড়ার ভদ্রলোকেরা সকলেই। গৃহিণী পদবাচ্য কেউ ছিলেন না উনপঞ্চাশ নম্বরে—বউদের চিনতেন না পাড়ার কোনো

মহিলা—সুতরাং তাঁরা যেতে পারেননি শোক-জ্ঞাপন করতে— হননি নিমন্ত্রিত। কর্তারা ভূরি-ভোজন করে এলেন, খাওয়ার ফর্দ শোনালেন লম্বা। কিন্তু অন্দর মহলের খবর, সেজবৌয়ের হদিশ দিতে পারলেন না কেউ। শেষ আশা ছিল পাড়ার মেয়েদের তাও নিভে গেল।

নিভে গেল ঊনপঞ্চাশ নম্বরের আলোও এক এক করে। কর্তার পর গেলেন বড়বৌ তারপর গেল ছোটবৌয়ের ছেলে, তারপরে মেজবৌয়ের হাবা মেয়েটা। সব শেষে গেলেন রাজীবলোচন-বাবুর সেজ ছেলে—সেজ বৌয়ের স্বামী। বছর দুয়ের ভিতর অর্ধেক বাড়ী খালি হয়ে গেল। অর্ধেক ঘরের জানলা দরজা সারাদিনই বন্ধ থাকে। অর্ধেক মহল থাকে অন্ধকারে।

পাড়ার লোকেরও চোখের উপর দেখে দেখে সব সয়ে এল। সেজবৌকে নিয়ে আর মাথা ঘামায় না কেউ। ঊনপঞ্চাশ নম্বর নিয়ে কৌতূহল জাগে না কারো। আড়াল করা পর্দাটা তুলে দেখবার আগ্রহ মিলিয়ে গেছে সকলেরই।

কিন্তু পর্দাটা আপন মনে দুলতে দুলতে হঠাৎ একদিন উঠে গেল নিজেই। আবার যেন কথা কয়ে হেসে উঠল ঊনপঞ্চাশ নম্বর। বন্ধ করা জানালার খিলখিলি খুলে গেল, আলোর চমক জাগল এদিকে ওদিকে ঘরে বারান্দায়। অনেক দিন পরে ঊনপঞ্চাশ নম্বরের ঘুম ভাঙলো, ঘুম ভাঙালো পাড়ার সকলের। সেজ বৌ বিলেত যাচ্ছে। কি যেন পড়তে যাচ্ছে। আত্মীয় বন্ধু কুটুম্ব সব দেখা করতে এসেছে।

সেই সেজ বৌ! বড় বাড়ীর সব কাণ্ডই বড়! যাকে ঘুম থেকে তুলতে শ্বশুরের লাঠি তুলতে হোতো—যার স্বামী মরেছে আজ পাঁচ বছরও পুরো হয়নি—সেই ধামসীর বিলেত যাওয়ার সখ! আজ আর নিন্দাও হোলো না কেউ—সেজ বৌয়ের জন্য সহানুভূতির বাষ্প-টুকুও রইলো না কারো মনে। কলির শেষ হতে আর কত বাকী তাই শুধু ভাবতে বসলো সকলে।

সকাল থেকে শুধু ঘর আর বার। ভাতের হাঁড়া ধরে গেল, কোনো নজর পড়ল না। ছেলেরা শুধু আলুসেদ্ধ ভাত খেয়ে স্কুলে গেল, খোকার গরম দুধ ঠাণ্ডা হয়ে সর পড়ে গেল—তবু নিশ্চিন্ত হয়ে একসঙ্গে দুদণ্ড ঘরে থাকতে পারছে না কেউ—এই বুঝি চলে গেল নিঃশব্দেই বুঝি ট্যাক্সিটা বেরিয়ে গেল। শেষ দেখা দেখে নেবে সেজবৌকে, তা বুঝি আর ভাগ্যে হোলো না! শুধু শেষই বা কেন—এই তো প্রথম। কতদিনের কত কল্পনার সেজবৌ—চোখে দেখেছে কি কেউ আজ পর্যন্ত? আর এই শেষ নয় তো কি? বিধবা মেয়েমানুষ কালাপানি পার হয়ে এলে তার মুখ দেখে কোনও গেরস্ত?

কিন্তু ট্যাক্সি যখন এল আর সেজবৌ যখন সেটাতে উঠল—তখন অনেক উঁকি মেরে গলা অনেকখানি লম্বা করেও কি প্রথম কি শেষ কোনো দেখাই তাকে কেউ দেখতে পেল না। কালোপাড় কাপড় ব্রাহ্মধরণে পরা, মাথায় কপাল ঢাকা ঘোমটা, পায় হিল তোলা জুতো, হাতে ব্যাগ—এই নিয়ে আত্মীয়বন্ধু পরিবেষ্টিত হয়ে সেজবৌ ট্যাক্সিতে উঠল এইটুকুই দেখল সবাই। দেখল গড়নটি ভাল, গায়ের রংটি ফর্সা, হেসে কথা বলে সবায়ের সঙ্গে।

ট্যাক্সি চোখের আড়াল হতে সকলের মনে পড়ল রাজীবলোচনবাবুকে। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুক থেকে। কেন, কে জানে!

পরদিন থেকে ঊনপঞ্চাশ নম্বরের জিনিষ-পত্র সরতে লাগল। দুদিন পরে বাড়ী খালি হয়ে গেল। আট বছর পরে সেজবৌয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজীবলোচনবাবুর পরিবার বিদায় নিল গোপীকেষ্ট গোয়ালা লেনের কাছ থেকে।

পনেরো বছর সময় কম নয়। আট বছরের খুকী আজ তেইশ বছরের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ছাত্রী। ছুটতে ছুটতে ঢুকল গিয়ে রান্নাঘরে—হাঁফাতে হাঁফাতে এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলল—'পেয়েছি মা! কিন্তু সে কি কষ্টে! যদিও বা পেলাম, আসতে রাজী হন না কিছুতে—বললেন, রবিবার সকাল নটা থেকে সন্ধ্যে ছটা পর্যন্ত আমার গোটাছয়েক এনগেজমেণ্ট আছে—সাহিত্য সভা, সংস্কৃতি সভা, মহিলা সভা, স্কুলের দ্বারোদঘাটন, প্রতিকৃতি উন্মোচন শিশু উৎসব—এতগুলো সব কি করে কি! তোমাদেরটা পরের রবিবার করলে হয় না? সেদিন না হয় অন্য এনগেজমেণ্ট বেশী রাখব না।" আমি নাছোড়—পরে কিছুতেই হয় না—আমাদের সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। চার দিন ধরে চেষ্টা করছি আপনার সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু দুর্ভাগ্য একবারও কোনোদিনই পাই না—আজ যখন পেয়েছি, তখন আর কিছুতেই ফিরব না।"

শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন?'

রাজী কি হতে চান? শুধু বললেন—তোমাদের সমিতির কাজ কি? কতদিন চলছে? সভা সংখ্যা কত? ভাড়া বাড়ী না নিজেদের বাড়ী? বাড়ীর ঠিকানা কি?—কত প্রশ্ন। ঐ শেষ কথাটায়। ঠিকানা শুনে চমকে উঠলেন—"গোপীকেষ্ট গোয়ালা লেন? বল কি? আমি যে আট বছর একটানা কাটিয়েছি ঐ গলিটায়। তোমাদের মনে থাকবার কথা নয়—সে আজ পনেরো বছর আগের কথা তো! শ্বশুর বাড়ীর বৌ আমি তখন! শ্বশুরমশায় ছিলেন সেকালের বড়ো লোক—বাড়ীর মেয়েদের লেখাপড়া শিখবে এ তাঁর সহ্য হোতো না। কিন্তু লেখাপড়া শেখার ঝোঁক আমার অদম্য। বাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে পড়লে খাটের তলা থেকে লুকিয়ে রাখা কুপী বার করে সেই আলোতে রাত একটা দেড়টা পর্যন্ত পড়াশুনো করতাম। সারাদিন সংসারের খাটুনীর পর ঐ রাত জেগে পড়া—উঠতে বেলা হয়ে যেত। শ্বশুরমশায় খুব বকাবকি করতেন।

তোমার মা-ঠাকুমারা হয়তো শুনেও থাকবেন—আমারও খুব লজ্জা করত, পাড়ার লোক সব শুনতে পাচ্ছে! কিন্তু কি করব। তা যাব নিশ্চয়—তোমাদের সমিতির অনুষ্ঠানে ঠিক যাব। সেই গোপীকেষ্ট গোয়ালা লেন—অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে ওখানে। যাব যাব।"—একটু দম নিতে থামল মেয়েটি।

'তোমাদের মনে আছে মা সুলোচনা দেবীকে? আমি তো কিছু মনে করতে পারলাম না'—

মনে নেই?' গভীর স্মৃতি মন্থন করে সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন এ-বাড়ী ও-বাড়ীর মা মাসি পিসী খুড়ী—'সেই সেজবৌ! ঘুরে ফিরে সেই সেজবৌ! দেশবিশ্রুতা বিলেত প্রত্যাগতা সমাজসেবী শিক্ষাব্রতী সুলোচনা দেবী সেজবৌ! রাজীবলোচনবাবু একবার সামনে দিয়ে ঘুরে গেলেন। মনটা বিস্বাদ হয়ে গেল। কেন, কে জানে!

এল রবিবার। এলেন সুলোচনা দেবী। এলেন গোপীকেষ্ট গোয়ালা লেনের [illegible] গৃহের প্রতিটি কন্যা বধূ গৃহিণী। সুলোচনা দেবীর দর্শন পাওয়া ভাগ্যের কথা [illegible] সুদীর্ঘ বারো বছর পাশ্চাত্য দেশে কাটিয়ে [illegible] স্বদেশভূমিতে যিনি দেশসেবা [illegible] শিক্ষাদান করছেন, তাঁর সঙ্গে পরিচয় হবার [illegible] কেউ ছাড়ে কি? [illegible]

সময়ের মানুষ সুলোচনা দেবী। [illegible] কাঁটায় পোনে সাতটায় সভার উদ্বোধন [illegible]। মাল্যভূষিতা সুলোচনা দেবীকে [illegible] সকলের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

কিন্তু আশ্চর্য! [illegible] [illegible] উঠেছে যেন সুলোচনা দেবীর [illegible] [illegible] আলোর আভা পড়েছে সম্মুখে সমাসীন মহিলাবৃন্দের মুখে চোখে—।

মেয়েটি ওঁদেরকে দেখছে। ওঁরা দেখছে রাজীবলোচনবাবুকে। ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন কি যেন বলছেন। শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু সভাকক্ষের দেওয়াল ঘড়িটায় জোর করে ঢং ঢং করে সাতটা বাজছে কিনা তখন।

আলোর লিখন

চাঁদ ডেকে বলে মাটির প্রদীপটিকে,
"আলোক লিখন আঁধারেতে যাই লিখে।
জ্যোৎস্নার ধারা ছড়ায়ে ভুবনময়,
তমসাকে করি জয়।
ব্যর্থ তোমার ও-জীবনে কিবা ফল?"
প্রদীপ কহিল, "এই মোর সম্বল।
অমাবস্যার নীরন্ধ্র রজনী
সার্থক, পারি যতটুকু আলো দিতে।"

—ম-

নতুন
জীবনের
নতুন
দাবী
জননীকে পুষ্টিকর
ভাইনো-মল্ট
সাহায্য করে
ফিরিয়ে আনে।
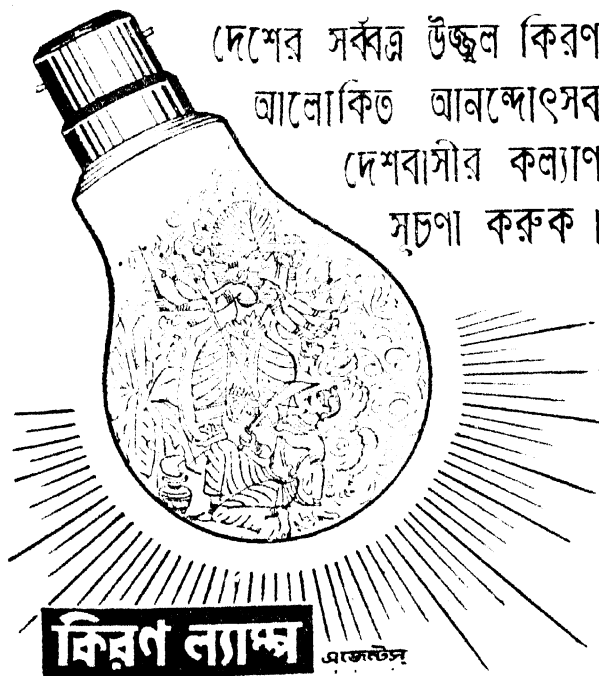
আনন্দ উৎসবে
কে, হোড়ের
প্রসাধন
সামগ্রী
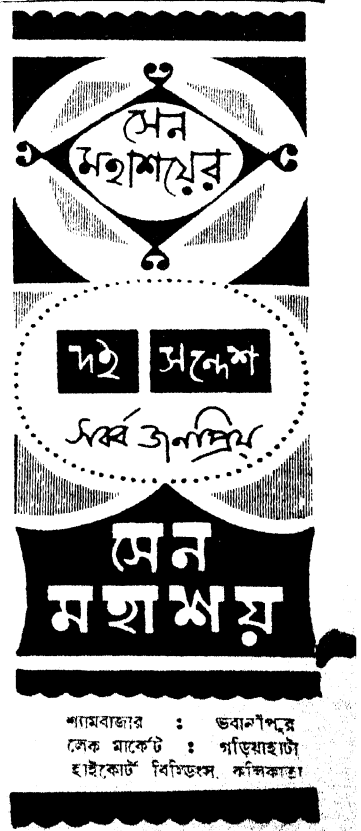
দেশের সর্ব্বত্র উজ্জ্বল কিরণ
আলোকিত আনন্দোৎসব
দেশবাসীর কল্যাণ
সূচণা করুক।
কিরণ ল্যাম্প
এজেন্টস্
দি ওরিয়েন্টাল মার্কেন্টাইল কোং লিঃ
কলিকাতা • দিল্লী • কানপুর • বোম্বাই • মাদ্রাজ
O.K/6

সেন
মহাশয়ের
দই
সন্দেশ
সর্ব্ব জনপ্রিয়
সেন
মহাশয়

গল্পের কাঠামো

(৪৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

তার পর—এই এতকাল পরে, কোথা থেকে এল বিমল, ওর ছেলেমেয়ের তরুণ প্রাইভেট টিউটার। এম-এতে ফার্স্ট হয়েও কোন ভাল চাকুরীর চেষ্টা করেনি বা করতে পারে নি—সম্ভবত উদ্যমের অভাবেই। একটা বেসরকারী কলেজে প্রফেসারী করে আর নিতান্ত সাংসারিক কারণে করে এই অতিরিক্ত পাঠনের কাজটুকু—এই টিউশনী। কিন্তু কাজ ওর ভাল লাগে না, ও চায় পড়তে—বিশেষ করে কবিতা পড়তে।

পাতলা ছিপ্‌ছিপে চেহারা, অবিন্যস্ত চুল, বেশভূষা যৎপরোনাস্তি শিথিল ও আলুথালু—চায়ের পেয়ালা হাতে করে ধরে বসে থাকে এক ঘণ্টা, খেতে মনে থাকে না। ট্র্যামে উঠে আবিষ্কার করে মনিব্যাগটা বাড়ীতে ফেলে এসেছে। টাকার গোছা বাজে কাগজ মনে করে বাইরে ফেলে বাড়ীতে ঢোকে। চোখের দৃষ্টি সর্বদা উদ্‌ভ্রান্ত, অন্যমনস্ক ও স্বপ্নালু।

ওকে দেখে প্রথম দিন থেকেই আকৃষ্ট হয়েছিল রমা। ওকে যত্ন করবার জন্য, ওর অভিভাবকত্ব করার জন্য সর্বপ্রকারে প্রশ্রয় দিয়ে ওর অন্তরের কবি-প্রকৃতিকে সযত্নে লালন করবার জন্য রমার সমস্ত অন্তর লালায়িত হয়ে উঠেছিল। এ-ই ত তার স্বপ্নের পুরুষ, এমনি লোকই ত সে চেয়েছিল সারাজীবন।

বিমলও ওকে দেখে কম চমৎকৃত হয়নি। বস্তুত ছাত্রছাত্রীর মা মধ্যবয়সী এক মহিলার মধ্যে এমন একটি কাব্যরসিক রসবুভুক্ষু মন সে আবিষ্কার করবে তা রমার সঙ্গে পরিচিত হবার আগে স্বপ্নেও ভাবে নি। ছাত্রছাত্রীকে পড়ায় ফাঁকি দিয়ে কাব্যচর্চা করলে তাদের অভিভাবিকা অসন্তুষ্ট হন না—বরং খুশী হন, এ অভিজ্ঞতা যে একেবারে অভিনব।

বিমল যথার্থই যাকে বলে কাব্যপাগলা—তাই। তার হাতের খাবার মুখে তুলতে মনে থাকে না, আগের মুহূর্তে কোন জিনিস পকেটে পুরে পরের মুহূর্তে সে পকেট ছাড়া সর্বত্র খুঁজে বেড়ায়—কিন্তু কবিতা তার আশ্চর্য মুখস্থ থাকে। রাশি রাশি কবিতা শোনায় সে রমাকে—শুধু বাংলা নয়, ইংরিজিও। সে সব কবিতার অর্থ বুঝতে পারে না রমা কিন্তু তার ধ্বনি, বিমলের আশ্চর্য নরম আবেগ থরো থরো গলায় আবেদন, তাকে অভিভূত করে। তারও মনে পড়ে যায় বহুদিনের পড়া কবিতাগুলো—এতকাল পরেও সে ভোলে নি সেগুলো। এও এক আবিষ্কার তার কাছে। অবাক হয়ে যায় সে নিজে নিজেই। বুঝতে পারে যে, যে মন তার চিরকালের জন্য মরে গেছে ভেবে সে নিশ্চিন্ত হয়েছিল—তা আসলে সংসারের স্থূল বাস্তবতার চাপে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল মাত্র। সামান্য দক্ষিণা বাতাস পাওয়া মাত্রই তা আবার নবীন করে অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে।

রমার মনে হ'ত—প্রথম কৈশোরের সেই স্বপ্নে ও সংগীতে মেশা দিনগুলিতে যদি এর সঙ্গে দেখা হ'ত!

বিমল প্রকাশ্যেই বলত, 'জীবনপথে যদি আপনার মত কোন সঙ্গিনী পেতাম বৌদি!'

অসংগত—এতটা সাংসারিক জ্ঞান আজও হয়নি বিমলের। আর সেটা আশাও করে না রমা। এ জ্ঞান নেই বলেই বিমলকে তার এত ভাল লাগে। সে প্রসন্নকৌতুকহাস্যে মুখ রঞ্জিত করে অভয় দেয়, 'খুঁজুন পাবেন বৈকি! অনেক মেয়ের মধ্যেই আমার মত মন ঘুমিয়ে আছে, ঠিক মানুষটি ছুঁলেই তা জেগে উঠবে!'

এই ভাবেই চলছিল—হঠাৎ একদিন এসে বিমল বলল, 'বৌদি, আপনার কাছে যদি খুব অসংগত এবং অন্যায় একটা আবদার করি—আপনি কি খুব রাগ করবেন?'

চমকে কেঁপে উঠল রমা। বুকের রক্ত যেন ছলাৎ করে উঠল একবার। রক্তহীন বিবর্ণ হয়ে গেল সমস্ত মুখ। অতিকষ্টে শুধু বলল, 'বলেই দেখুন না!'

তবুও অনেক ইতস্তত করে, অনেক মাথা চুলকে অবশেষে বিমল বলেছিল কথাটা—'যদি শ' পাঁচেক টাকা ধার চাই?'

আশ্বস্ত হল কি হতাশ হ'ল—রমা তা নিজেও বুঝল না। তবে উত্তর দিতে একটু দেরি হ'ল তার। বলল, 'ও, এই! এর জন্যে এত ভূমিকা কেন, এখনই দিচ্ছি!'

যাকে অনেক, অনেক বেশী দেওয়া যায়, তার হাতে মাত্র পাঁচ শ টাকা তুলে দেওয়াটা কি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়নি সেদিন?

কৌতূহলও হয়েছিল বৈকি, তবু মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারে নি—হঠাৎ এত টাকার কী দরকার হ'ল বিমলের।

অনুচ্চারিত সে প্রশ্নের জবাব পেলে রমা দিন তিনেক পরেই। বিমল তার কলেজের একটি ছাত্রীকে বিয়ে করেছে। স্ব-শ্রেণীর মেয়ে নয় বলে বাপ-মা তাকে ঘরে তুলতে রাজী হন নি, সেই জন্যে নতুন বাসা ভাড়া করে, সে বাসা সাজিয়ে সেইখানে এনে তুলতে হয়েছে বৌকে। সলজ্জ হেসে বললে বিমল, 'সেই জন্যেই হঠাৎ অত টাকার দরকার হয়েছিল। আপনার দয়াতেই এ যাত্রা অনেক দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের হাত থেকে অব্যাহতি পেলাম। হয়ত বিয়ে করাই হ'ত না এখন—টাকাটা না পেলে। আপনার কাছে আমার ঋণের অন্ত রইল না।... যদি অনুমতি করেন ত একদিন নিয়ে আসব—আপনাকে দেখিয়ে যাব!'

আশাভঙ্গের বেদনা অনুভব করেছিল রমা? প্রতারক বলে মনে হয়েছিল বিমলকে? বিদ্বেষ বা, ঘৃণাবোধ হয়েছিল ঐ লোকটা সম্বন্ধে? ঠিক কী হয়েছিল তা রমা নিজেও বোধকরি জানে না।

তবে দিন কতক একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল ওর মধ্যে, এটা ঠিক। বহুকাল যে স্বামীর সঙ্গে ওর বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না, সেই স্বামীকে নিয়েই অকস্মাৎ যেন মেতে উঠল ও। এক দণ্ড ছাড়তে চায় না—চায় না একটি মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল করতে। জোর করে টেনে নিয়ে যায় লেক-এ, নিয়ে যায় সিনেমায়, খেলার মাঠে। এক একদিন শুধুই যে-কোন ট্র্যামে বা বাস-এ চেপে বেরিয়ে পড়ে—পাশাপাশি বসে অনির্দেশ্য পথে যাত্রার রোমাঞ্চ উপভোগ করতে।

করতে চেয়েছিল সে স্বামীকে—অথবা চেয়েছিল মানসিক পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে।

নরেশেরও মন্দ লাগে নি ব্যাপারটা। সে নিজেকে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছিল স্ত্রীর এই প্রেমের আতিশয্যের মধ্যে। হয়ত তারও—এত দিনের নীরস, একঘেয়ে বিবর্ণ জীবনযাত্রার মধ্যে এ বর্ণ-বৈচিত্র্যটুকু ভালই লেগেছিল।

কিন্তু—

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রমা সামলাতে পারল না নিজেকে। এই কাণ্ড করে বসল!

এও এক রকম হতে পারে গল্প। কিন্তু ধরুন যদি এ দুটোর কোনটাই না করা যায়?

যদি ধরা যায় যে, নরেশ আর রমা দুজনেই সহজ, স্বাভাবিক, সুস্থ মানুষ ছিল।

মনে করা যাক—ওরা সুখীই হয়েছিল পরস্পরকে পেয়ে। দুজনেই দুজনকে ভালবেসেছিল। বিবাহের আগে যে জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল রমা, যে সুখ-সৌভাগ্য সে কল্পনা করেছিল তার অনেকখানিই মিলে গিয়েছিল বাস্তবের সঙ্গে। স্বামী পুত্রকন্যা—সবই মনের মত দিয়েছিলেন বিধাতা। যেটুকু সাধ ছিল—ভাল পল্লীতে নিজস্ব একটি বাড়ী, তাও পূর্ণ হয়েছিল, বরং আশার অতীত ভাবেই হয়েছিল। লেকের ধারে তার বাড়ী হবে—এতটা সে কল্পনা বা প্রার্থনাও করেনি কখনও।

হয়ত এতটা সুখ-সৌভাগ্যই কাল হ'ল শেষ পর্যন্ত। এই কথাটাই স্বামী-স্ত্রীর আলোচ্য বিষয় হয়েছিল ইদানীং। আচ্ছা, মৃত্যুর পরে পরলোকে গিয়েও তাদের এই জীবন এমনি থাকবে ত? এমনি পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় অন্তরঙ্গ-বন্ধনে বাঁধা—এমনি মধুর সুখের জীবন? এপারে ওপারে পার্থক্যের মধ্যে যদি শুধু এই দেহটার অভাবই একমাত্র হয়ত আপত্তি নেই ওদের। কিন্তু—কিন্তু যদি এই সাময়িক বিচ্ছেদই চিরবিচ্ছেদ হয়?

আলোচনাটা শুরু হয়েছিল হয়ত এমনি খুব হাল্‌কাভাবেই, কিন্তু ক্রমশঃ সেটা ওদের পেয়ে বসল। আবিষ্ট হয়ে উঠল ঐ চিন্তাতে। মনস্তাত্ত্বিকরা যাকে অবসেসান বলেন তাই হয়ে দাঁড়াল।

শেষে এমন হল—ভোরবেলা ঘুম ভেঙে প্রথম কথা উঠত ঐটেই। তার পর অবশ্য প্রাত্যহিক সংসারের কাজে সেটা মুলতুবী রাখতে হ'ত—কিন্তু নরেশ অফিস থেকে ফেরা মাত্র আবার শুরু হয়ে যেত আলোচনাটা। বাড়ীতে তেমন জমত না বলে ইদানীং ওরা সন্ধ্যার পর লেকের ধারে চলে যেত, সেখানে পরিচিত পরিবেশের বাইরে নির্জন অন্ধকারে প্রসঙ্গটা জমে উঠত ভাল। এক একদিন ভাবতে ভাবতে যখন মাথা গরম হয়ে যেত, অজানা রহস্যের বধির-অন্ধ সেই কঠিন যবনিকার মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে অন্তর রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠত, তখন এক একদিন ওরা বেড়িয়ে পড়ত অনির্দেশ যাত্রায়—সামনে যে কোন পথের যে কোন বাস বা ট্রাম পেত তাতেই উঠে পড়ত এবং যতক্ষণ না একেবারে লাইন বন্ধ হবার উপক্রম হ'ত ততক্ষণ পর্যন্ত তেমনি পাশাপাশি বসে থাকত ওরা স্তব্ধ হয়ে—নিবিড়ভাবে পরস্পরের সাহচর্য অনুভব করত শুধু।

সমস্ত প্রশ্ন এখন শুধু একটি কেন্দ্রবিন্দুতে এসে সংহত হয়েছিল : জীবনের

পরেও কোন জীবন আছে কি না? কেউ কি বলতে পারে না 'ওপারের' খবর? কেউ কি জানে না? জানা কি সম্ভব নয় কোনমতেই—মরণের পরে কে কোথায় যায়?

এই বিষয়ে লেখা প্রচুর বিলিতী বই সংগ্রহ করেছিল নরেশ, লাইব্রেরী থেকেও আনত গাদা গাদা। নিজে পড়ে তার মর্মার্থটা বুঝিয়ে দিত রমাকে—কিন্তু ওদের কারুরই তাতে মন ভরত না। ঠিক বিশ্বাস হ'ত না যেন। যে সব বন্ধু-বান্ধবরা প্ল্যানচেট ক্লেয়ারভয়েনস্ ইত্যাদির সাহায্যে পরলোকের খবর জানবার চেষ্টা করতেন—তাঁদের বৈঠকেও দু'চার বার যোগ দিয়েছে ওরা। কিন্তু সবটাই বিরাট ধাপ্পাবাজী বলে মনে হয়েছে। নিজেরাও দু'চারবার চেষ্টা করেছিল—সুবিধা হয়নি। একবার নরেশ ভূতাবিষ্ট হয়ে প্ল্যানচেটে অনেক প্রশ্নের জবাব ঠিক ঠিক লিখে ফেলেছিল। কিন্তু সন্দিগ্ধ ও অবিশ্বাসিনী রমা তার মাসীমার শ্বশুরের নাম জিজ্ঞাসা করাতে এমন হাস্যকর সব জবাব আসতে লাগল যে সে হেসে উঠে প্ল্যানচেটের টেবিল ঠেলে ফেলে দিয়ে এক কাণ্ড বাধিয়ে বসল।

অবশেষে একদিন রমা এক অদ্ভুত প্রস্তাব করে বসল : সে নিজে মরে এই খবর সংগ্রহ করবে।

নরেশ শিউরে উঠে ওর দুটো হাত চেপে ধরলে, ছি ছি, রমা এমন কথাও মুখে এনো না।

না গো। এ অনিশ্চয়তা, এ সংশয় আমার অসহ্য লাগছে। দেহটা থাকতে যদি এ যবনিকার ওপারে পৌঁছনো না যায়—দেহটা ত্যাগ করেই না হয় গেলাম! তবু—জানতেই হবে আমাকে, না জেনে থাকতে পারছি না আর!'

কী বলছ যা-তা। পাগল হয়ে গেলে নাকি? তুমি গেলে ছেলেমেয়েগুলোর কী অবস্থা হবে বল ত? আমিই বা কি করব?'

দ্যাখো, আর কে কী পারে না পারে তা জানি না—কিন্তু আমি তোমাকে জানাবই—এ আমি কথা দিচ্ছি। যদি মৃত্যুর ওপারে কোন রকম জীবনের অস্তিত্ব থাকে, যদি সত্যিই তোমার আমার কোন অবিচ্ছেদ্য অনন্ত মিলনের সম্ভাবনা থাকে ত তোমাকে আমি সে খবরটুকু পৌঁছে দেবই—যেমন করে হোক। তখন তুমিও এই পথে গিয়েই মিলবে আমার সঙ্গে। আর কোন ভয়, কোন সংশয় থাকবে না—কোনদিন কোন মৃত্যু এসে আর আমাদের আলাদা করতে পারবে না। সেই ত ভাল গো!"

কিন্তু যদি আর কোন জীবনের অস্তিত্ব না থাকে? যদি নিতান্তই পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চভূতে মিশে যায়। আত্মা পরলোক যদি সব মিথ্যা, সব বাজে কথা হয়? তখন?

তাহলে এই জীবনের প্রেম ভালবাসা আকর্ষণ—এসবেরও ত কোন মূল্য থাকে না। তাহলে বেঁচেই বা লাভ কি? যা এত ক্ষণস্থায়ী, এত অল্পে যার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি—সে জীবন আঁকড়ে ধরে থেকেই বা লাভ কি? এত সাধনা এত সংগ্রাম কিসের জন্যে তাহলে?'

কিন্তু ছেলেমেয়েগুলো? তাদের কথা ভাবছ না? তাদের আমরাই এ পৃথিবীতে এনেছি—তাঁরা স্বাধীনভাবে জীবন আরম্ভ না করা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করা উচিত।'

'দ্যাখো কত রকমেই ত আমার মৃত্যু হতে পারে। যে কোন দিন যে কোন রোগে—যে কোন একটা অ্যাকসিডেণ্টে। তখন ওরা কি করবে? সে অবস্থায় যা করত—এখনও না হয় তাই করবে। তোমার পয়সা আছে, ঝি চাকর রেখে চালাতে পারবে ওরা। খোকা ত আর এক বছর পরেই বি-এ পাশ করবে—ওর জীবন ত শুরুই হয়ে যাবে বলতে গেলে!'

খানিকটা চুপ করে থেকে নরেশ আবারও যেন শিউরে উঠে সবলে ওকে জড়িয়ে ধরল, 'না না রমা, এ সব ছেলেমানুষী কোর না। আমাদেরই ভুল হয়ে গিয়েছিল এ সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে এত মাথা ঘামানো। ভূত ভূত করতে ভূতেই ভর করে বসেছে। ছিঃ! পরে যা আছে তা পরেই দেখব। এখন ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই—।

রমা তখনকার মত চুপ করে গেল।

এর পর দিনকতক নরেশ ওকে নিয়ে খুব হৈ-চৈ করে বেড়াল। পর পর সিনেমায় গেল ক'দিন; থিয়েটার, ম্যাজিক—কিছু বাদ দিলে না। আত্মীয়স্বজনদের বাড়ী গেল খুঁজে খুঁজে, তাদের নেমন্তন্ন করলে নিজেদের বাড়ী—অর্থাৎ একটা নিরবচ্ছিন্ন ব্যস্ততার, একটা নিরন্ধ্র নিরবসরতার ঘূর্ণাবর্তে রমার মনের এই বুক-চাপা চিন্তাটাকে উড়িয়ে দিতে চাইলে।

এই পর্ব চলেছিল দিন পনেরো ধরে। এই সপ্তাহটাই ক্লান্ত হয়ে থেমেছিল নরেশ। স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে আসতে চেয়েছিল—যদিও এসব প্রসঙ্গ যত্ন সহকারে এড়িয়ে গেছে।

রমার আচরণ বরাবরই সহজ ও স্বাভাবিক। আজেই এই পাগলামির ভূতটা তার ঘাড় থেকে নামল কিনা তা বুঝতে পারলে না নরেশ। তবু তার মনে হল যে, অনেকটা প্রকৃতিস্থই হয়েছে নিশ্চয়। এতদিনে যখন ও প্রসঙ্গ একবারও তোলে নি—তখন অন্তত আগের মত আচ্ছন্ন করে নেই নিশ্চয় চিন্তাটা।

সেইখানেই ভুল হয়ে গিয়েছিল। বাইরের প্রশান্তি দেখে অন্তরের আলোড়নটা আন্দাজ করতে পারে নি।

কারণ তার পরেই ত এই কাণ্ড ঘটল।

এখন হয়ত নরেশের কতকটা উদ্‌ভ্রান্তের মত অবস্থা। হয়ত নিজেকেই দায়ী মনে হচ্ছে এই সর্বনাশের জন্য। আবার রমার কথাটা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিতেও পারছে না। রমা যে এই কারণেই আর এই উদ্দেশ্যেই স্বেচ্ছায় মরেছে তাতে নরেশের কোন সন্দেহ নেই। কৌতূহলে ও ঔৎসুক্যে আগু বেড়ে গেছে মৃত্যুর দিকে।

সত্যি কি পারবে রমা কোন সংবাদ পাঠাতে। পাঠানো কি সম্ভব?

সেই সংশয়, সেই অন্তহীন প্রশ্ন। শুধু তার সঙ্গে যোগ হবে একটা সীমাহীন সমাপ্তিহীন প্রতীক্ষা।...একটা ক্ষীণ আশা উন্মুখ উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করবে, ওপারের সামান্য একটু ইঙ্গিতের জন্য।

কিন্তু যদি সত্যিই সে ইঙ্গিত কোনদিন আসে—নরেশ কি পারবে রমার মত সেই অপার্থিব বিদেহি চিরমিলনের আশায় পার্থিব ভোগসুখ এবং এই দেহটার মায়া কাটাতে? পারবে কি অমনি প্রশান্তমুখে স্বেচ্ছায় ওপারের দিকে পা বাড়াতে?

আর যদি কোনদিনই না আসে সে ইঙ্গিত, সে সংবাদ?

একটি অবিচ্ছিন্ন কান্না

(৩৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

উদুরী হয়েছে। একবার দেখতে চায় আমাকে। তোমার কথাও লিখেছে, লিখেছে তাঁকে শেষবার একটা প্রণাম করব।

কেমন-কেমন করতে লাগল মনটা কথাটা শুনে। শনিবার দিন গেলাম বড়বৌদিকে নিয়ে বারাসতে। যা শুনেছিলাম, তার চেয়েও খারাপ অবস্থা। জীর্ণ পাণ্ডুর দেহ, গালে হাতে নীল নীল শিরা ঠেলে উঠেছে। মাথায় চুল প্রায় নেই। হাসিটা দেখলে এখনো চেনা যায়, নইলে আর কিছুই নেই সেই পুরোনো অপর্ণার।

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন অপর্ণা বড়-বৌদিকে দেখে। বললেন, বড়মা, পায়ের ধুলো দাও। আশীর্বাদ করো যেন এজন্মের সব দুঃখ আমার এখানেই শেষ হয়ে যায়। আবার যদি মানুষ হয়ে জন্মাই, তাহলে যেন......

বড়বৌদি বললেন, ঠাকুরপো, অপু পায়ের ধুলো চাইছে তোমার। ওকে আশীর্বাদ করো, বড় অভাগিনী ও। অত রূপ, অত বুদ্ধি, অত সৎ-স্বভাব, তবু পোড়াকপালে জীবনটা ও কেঁদেই কাটাল। আহা, জোর করে তখন যদি তোমার সঙ্গেই বিয়ে দিতাম ওর! কি হয় বামুনে কায়েতে বিয়ে হলে? সাহস পাইনি!

চমকে তাকালাম কথাটা শুনে। যেন একটা বন্ধ দরজা হঠাৎ খুলে গেল চোখের সামনে। প্রায় পঁচিশ বছরের চেনাশোনা অপর্ণার সঙ্গে আমার। চিরদিন এসেছেন তিনি আমাদের বাড়ী। বহু ব্যাপারে নিয়েছেন আমার সাহায্যও। কিন্তু কোনদিন একটি কথাও হয়নি দুজনে। কি এর আসল রহস্য? হয়ত বড়-বৌদিই জানতেন তা!

কয়েকদিন পরে অপর্ণার মেয়ে করুণা লিখল বড়বৌদিকে, মৃত্যু হয়েছে তার মা-র। মৃত্যুকালে তিনি বড়বৌদির, আমার, তার লক্ষ্মীছাড়া ছেলে দীপেনের নাম করেছেন বার বার। অনুপম দাদা, আর জন্মে যেন তোমার পায়ে ঠাঁই হয় আমার, এই বলতে বলতেই নাকি শেষ নিঃশ্বাস পড়েছে তাঁর।

খবরটা শুনলাম। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ ইতিহাসটা মনে পড়ল অপর্ণার। কৈশোর থেকে প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত, সমস্ত জীবনটা তাঁর যেন একটা অবিচ্ছিন্ন কান্নার ইতিহাস। একটা দিনও এমন মনে পড়ে না, যখন তাঁকে হাসতে দেখেছি। এই জন্যেই তাঁর নাম দিয়েছি আমি ক্রন্দসী এবং তাঁকে মনে করি আমি সাধারণ বাঙালী কন্যার প্রতীক স্বরূপ।'

তখন নিজের মূঢ়তায় অনুশোচনায় জর্জরিত হয়ে এই ক্লান্ত নিঃসঙ্গ জীবনই কি টেনে বেড়াবে সে?

কে জানে!

মোটামুটি গল্পের কাঠামোগুলো এই। এর মধ্যে কোনটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রং চড়িয়ে খাড়া করতে পারলে পাঠকদের পছন্দ হবে তাই ভাবছি। সেইটে ঠিক করতে পারলেই লিখতে বসে যাব।

অতলান্তিক

(৪১ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

নিঃশেষ হয়ে গেছে। এখন শুধু অপেক্ষা করেন, 'সমর কি বলে, বৌমা কি বলে।'

কোন কিছুতে আশ্চর্য হওয়া অবাক হওয়া ছেড়ে দিয়েছেন।

কিন্তু আজ সমর এমন একটা সংবাদ পরিবেশন করে বসলো যে বসুমতী চমকে না উঠে পারলেন না। না বলে পারলেন না "সে কী!"

অবিশ্যি জানতেন বছর তিনেক ডাক্তারী পড়ে পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দিয়ে সমর কী না কি একটা ব্যবসা ফেঁদেছে দু তিনজন বন্ধুর সঙ্গে, এবং এও টের পাচ্ছিলেন সেই ব্যবসার পথ ধরে মা লক্ষ্মী যেন একটু হুড়মুড়িয়েই আসছেন। কিন্তু এটা এক মুহূর্তের জন্যও আন্দাজ করতে পারেন নি যে, লক্ষ্মীর বাড় বাড়ন্তে এতটাই মাপে বেড়ে গেছে সমর যে, ঠাকুরদার আমলের এই খোলামেলা আলো ধবধবে বাড়ীখানায় তাকে আর আঁটছে না। আর স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন নি, লক্ষ্মীমন্ত সমর লক্ষ্মীমন্তদের পাড়ায় নিজের মাপ অনুযায়ী পুরোপুরি একখানা বাড়ী তৈরী করে ফেলবে বসুমতীর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে।

সংবাদটা জানালো সমর এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার উপলক্ষে শুভদিন দেখতে পাঁজী খোঁজার অজুহাতে। পাঁজী খোঁজার প্রশ্ন ভুলে বসুমতী অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রশ্ন করলেন "সে কী!"

সমর আজকে স্বভাবগত ভুরু কোঁচকানোর পরিবর্তে একটু প্রসন্নমনে বললো, "কেমন তাক লাগিয়ে দিলাম? ওই জন্যে আগে থেকে বলিনি। তলে তলে করেছি সমস্ত।"

কিন্তু 'তাক'টা যেন একটু বেশীই লাগলো বসুমতীর।

স্থির হতে বেশ কিছুটা সময় লাগলো। তারপর পাঁজীটা এনে দিয়ে বললেন, "এ বাড়ীটার তাহলে কি হবে?"

"ভাড়া দিয়ে দেব, আবার কি হবে!" পাঁজীর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললো সমর, "যা বাড়ীর চাহিদা আজকাল, এই পুরনো ছোট্ট বাড়ীটারও শ' আড়াই টাকা ভাড়া হতে পারে।"

শেষের কথাটা কানে গেল না বসুমতীর, আগের কথাটাই ধ্বক্ করে প্রাণে বেজেছে: "ছোট্ট বাড়ী!" বাড়ীটা যে ছোট্ট একথা তো কই বসুমতী কোন দিন টের পান নি, সমরের চোখে ধরা পড়লো কি করে?

সমর তখন মহোৎসাহে বলছে, "এই যে পেয়েছি! তোমাদের শুভদিনের নির্ঘণ্টেই রয়েছে ১৬ই শ্রাবণ, ২রা আগস্ট গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ ইত্যাদি। ব্যস, তোড়জোড় সুরু করো। তোমার তো আবার লক্ষ্মী-ষষ্ঠী-ঘেঁটু-মনসা অনেক কিছু ব্যাপার।" অনেক দিন পরে খোলা গলায় হা হা করে হেসে ওঠে সমর, "তোমাদের সর্ব সামলে সুমলে পাকড়ে নিয়ে যেতে বেশ কিছু ব্রেণ খরচ করতে হবে তো? তা' ফার্স্ট ক্লাশ একখানা ঠাকুরঘর তুমি পাবে এবার। একেবারে তিনতলার ওপর। সিঁড়ির [illegible] বটে কিন্তু চওড়া সিঁড়িতো, ঘরটাও দালান, ইচ্ছে করলে তুমি সেখানেই ছোট একটা তোলা উনুনে তোমার রান্নাটা করে নিতে পারো। একেবারে শুদ্ধাচারে! এই সব মুরগীখেকো স্লেচ্ছদের সংস্পর্শেও আসতে হবে না।' আরও একবার হেসে ওঠে সমর খাপছাড়াভাবে।

হয়তো মার সেই তাকলাগা মুখটা একটু নাড়া দিয়ে ফেলেছিল তাকে, তাই এই খাপছাড়া স্বভাবছাড়া হাসি।

কিন্তু বসুমতী যে তবুও কথা বলছেন না। কি দেখছেন ঘরের মেজের গায়ে?

আরও একবার চেষ্টা করে সমর। "ইয়ে তোমার বৌকে এক দিন দেখিয়ে এনেছিলাম বুঝলে? সে তো তোমার শোবার ঘর দেখে ভারী খুসি! বলে "কি চমৎকার ছোট্টখাট্টো সুন্দর! আর মোজেক করা মেজেও মার খুব পছন্দসই!" তাই না কি মা, তুমি মোজেক করা মেজে ভালবাসো?"

এবার বসুমতীর মুখ নড়ে।

কিন্তু বসুমতী কি এতক্ষণ কানে সীসে ঢেলে বসেছিলেন? না, এ জগতে ছিলেনই না? নইলে সমরের এত মুখনাড়া আর হাতপা নাড়া বৃথা গেল কেন?

এতক্ষণ পরে মুখ খুলে বললেন কি না বসুমতী "এ বাড়ীটা সব ভাড়া দিয়ে যাবে বলছো, তাহলে বিজয়বাবুর কি হবে?"

এ পৃথিবীতে আদি অন্তকাল হতে 'ছন্দপতনের' যতো উদাহরণ আছে, এর কাছে কি লাগে?

অন্তত সমরের তাই মনে হলো। সঙ্গে সঙ্গে ওর ভুরু দুটো কঠিন হয়ে জুড়ে এলো।

আরও কঠিন হলো মুখের চেহারা। সেই মুখ থেকে রায়টা বেরোলো মুহূর্তে। "বিজয়বাবুর ভাবনাটা আর তুমি আমি ভাবতে যাবো কেন? তিনিই ভাববেন।"

স্তিমিত দৃষ্টিতে তাকালেন বসুমতী। কেমন অন্যমনস্কের মত বললেন, "নিজের ভাবনা ভাববার মত মানুষই বটে! তাছাড়া ওই তো রোগের দেহ, এ বয়সে যাবেনই বা কোথায়?"

সমর মনে মনে কিছু বললো কিনা কে জানে, মুখে কিছু না বলেই চলে গেল জ্বলন্ত দৃষ্টিতে, আর ভুরুটা আরও কুঁচকে। সংকল্প করেছে বাড়ীখানা একবার একটু কলি ফিরিয়ে পুরো করে একজনকে ভাড়া দেবে। রাস্তার উপরকার অত বড় ভালো ঘরখানাই যদি বেহাত থাকে, আশানুরূপ ভাড়া কি আর পাওয়া যাবে?

ঠিক আছে বিজয়বাবুকে আজই জানিয়ে দেবে।

আর কোন কথা হয় না মায়ে ছেলেতে, কি শাশুড়ী বৌতে। শুধু বসুমতী অনুভব করতে থাকেন তলে তলে সংসার ওঠানোর গোছ চলছে। শেষ পর্যন্ত শুধু লক্ষ্মী, ষষ্ঠী, ঘেঁটু, মনসাটুকুই হয়তো বসুমতীর জন্যে বাকী থাকবে, সমরের বৌ সবই ম্যানেজ করে নেবে।

সম্প্রতি একটা বাচ্চা চাকর রাখা হয়েছে, সেটাকে গাধার মতন খাটাচ্ছে বৌ, নিজেও খাটছে যথেষ্ট। তিন পুরুষের সংসারের শিকড় [illegible] লাগবে। কোন্‌টা নেবার যোগ্য, কোন্‌টা ফেলে দেবার যোগ্য সেটা বিবেচনা না করতেও সময় চাই বৈকি।

কাল চলে যাবার দিন!

দোতলার ব্যাপার প্রায় সবই মিটেছে, রাত্রে শোবার মত বিছানাগুলো শুধু খালি মেজের গোটানো গোটানো রয়েছে, আর রয়েছে বসুমতীর ওই লক্ষ্মী ষষ্ঠীর সরঞ্জাম!

লক্ষ্মীর কাঠা কৌটো বৌমা হাতে করে নিয়ে গৃহপ্রবেশ করবে, আলতা সিঁদুর নতুন শাড়ী পরে। এ নির্দেশ নাকি পুরোহিত দিয়েছেন, বাকী আলটু-বালটু ঠাকুরগুলি গুছিয়ে নিতে নতুন একটা টিনের সুটকেশ আনিয়ে দিয়েছে বৌমা। বলেছে "এ একেবারে নতুন মা, গঙ্গা জলে ধুয়ে নিয়ে ওতেই সব ভরে নেবেন, তাহলে আর আপনার ছোঁওয়ার দোষ লাগবে না।"

বৌমাটির কথাবার্তা ভাল, বসুমতীর দেব-দ্বিজ আচার বিচারের ব্যাপারে তার এলার্জি মোটেই নেই, বরং পূর্ণ সহযোগিতাই আছে। সমর কোন সময় বাদ-বিতণ্ডা করলে তার সঙ্গে তর্ক করে বলে, "আচ্ছা এতে তোমার আপত্তি কিসের? বিধবা মানুষদের তো এই রকম আচার বিচার করতেই হয়। আমার দিদিমা-টিদিমাদের তো দেখেছি বরাবর।"

না, বৌয়ের ব্যবহারে কোন দোষ নেই। মায়ামমতাও আছে।

সমরই চিররুক্ষ, চিরনির্মম। ছেলেবেলা থেকে মায়ের দায় বইতে বইতেই হয়তো সর্বদা ওর 'মাতৃদায়গ্রস্ত' মানসিকতা।

লরী এসেছিল, বৌমা বাড়ীর আর যা ভারী জিনিস এখনো পড়ে রয়েছে সেই সব তোলাচ্ছিলেন তাতে। রয়েছে বৈ কি, এখনো কিছু রয়েছে, দালানের বড় দেয়ালে বাসনের বড় র‍্যাকটা রয়েছে, এ পাশে রয়েছে দুখানা জলচৌকী আর টুল একটা। রয়েছে লেপের গাদি। হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে বেচারা ছেলেমানুষ বৌটা।

সব কিছু ব্যবস্থা করতে করতে ও চাকরটাকে ডেকে বলে ওঠে "দেখ দীনবন্ধু, ওই বিচ্ছিরি লোহার চেয়ারটা আর ওবাড়ীতে নিয়ে যেতে হবে না, বসে বসে দুমড়ে গেছে। ওটা ছাতে ফেলে রেখে আয়, আর ওই ছোট টেবিলটাকে সাবানের গুঁড়ো দিয়ে একটু ঘসে ধুয়ে তুলে দে লরীতে। ভাল করে ধুস বাপু, নইলে এক্ষুনি ঠাকুমা বলবেন ওই রে সব এঁটোকাঁটা হলো।" শেষের কথাটায় বসুমতীর কণ্ঠস্বরের সুর। এই নকল করা ভঙ্গী দেখে হি হি করে হাসতে হাসতে দীনবন্ধু মহোল্লাসে ঘড় ঘড় করে চেয়ারটা টান মেরে টেনে আনে।

পুজো করতে বসে চন্দন ঘষছিলেন বসুমতী।

বেলা হয়ে গেছে, অসময়ে পুজো করতে বসেছেন রেঁধে রেখে এসে। তাই ব্যস্ত হাত!

চেয়ারটার শব্দে চমকে হাত থামালেন। এমন শব্দ হলো কেন? এভাবে শব্দ করে চেয়ার টেনে তো কখনো বসেন না বিজয়বাবু, তাছাড়া ঠিক খাবার টাইমই কি হয়েছে! কি জানি কাজে কাজে—চন্দন কাঠ হাত থেকে নামিয়ে বেরিয়ে এলেন। এসেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

দালানের ওই কোণাটার লাল সিমেন্ট মেজেটা যেন আলোয় ফেটে পড়ছে।

চেয়ার টেবিল দু'টোর মিলিয়ে আটখানা পায়া ওখানে বসানো থাকতো, জানালার আলোটা এমন করে মেজেয় এসে পড়তো না কখনো!

পড়তো অনেক অনেক বছর আগে। সাল তারিখের হিসেব নেই, হিসেব আছে শুধু সমরের বয়েস দিয়ে। তিন আড়াই বছরের ছেলে তখন সমর। ডিঙি মেরে কোন রকমে টেবিলের মাথাটা ছুঁতে পারে।

কিন্তু ওই আলোটা অত কড়া দেখাচ্ছে কেন? লাল সিমেন্টের ওপর পড়েছে বলে?

ছেলের বৌয়ের দিকে তাকালেন বসুমতী।

আজ ও'র ভুরুর গড়নটা ঠিক সমরের মতন দেখাল। বললেন, "বিজয়বাবুর খাওয়ার আগেই ওগুলো টানা-হেঁচড়া করাচ্ছ কেন বৌমা?"

বৌমা সরল চোখে তাকিয়ে বললো, "আজ থেকে তো আর উনি খাবেন না।"

বসুমতী কি রকম একটু ঠান্ডা ঠান্ডা গলায় বলেন, "আজ থেকেই কেন? আজ তো এ বাড়ীতে রান্নাবান্না হবে।"

"তা তো জানি না। আপনার ছেলে বলে-ছিলেন ওঁকে পয়লা থেকে অন্য ব্যবস্থা করে নিতে বলেছেন না কি। আমাকে তো তাই বলে গেছেন।"

"উনি কিছু ব্যবস্থা করেছেন?"

বৌমা উত্তর দেয় "তা জানি না অত। উনি যা বলেছেন, করছি।"

অনেকটা সময় দালানের ওই ফাঁকা কোণটার দিকে তাকিয়ে রইলেন বসুমতী, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "সমর বাড়ী আছে?"

দীনবন্ধু বলে, "বাড়ীতে নেই। বাইরে ওই মোড়ের পাড়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছে বাবু।"

বসুমতী ঈষৎ দৃঢ় সুরে বলেন, "যা একবার ডেকে আন দিকি।"

"ডেকে? লবীর কাছে হবে দাঁড়াবে কেন?"

"তুই দাঁড়াগে যা! তাড়াতাড়ি আসতে বলিস, বেলা হয়েছে, পুজো হয় নি।"

এতো অবাধ্য ছেলে ভাবলে সমর নয় যে, মা ডাকছেন শুনে আসবে না।

একটু পরেই এলো।

একটু বিস্মিত হয়েই বললো, "আমাকে কিছু বলছো?"

"হ্যাঁ।" বসুমতী ছেলের মুখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলেন, "বলছি! বিজয়বাবুর খাওয়া দাওয়ার কি ব্যবস্থা হলো?"

রাস্তা থেকে ডাকিয়ে এনে এই আয়োজনের পর বক্তব্য কিনা সেই বিজয়বাবুর খাওয়া!

রাগে আপাদমস্তক জ্বলে গেল সমরের। বললো, "এই কথার জন্যে কাজ থেকে ডাকলে?" কি হলো তা আমি কেমন করে জানবো, আমায় ডেকে উনি বললেন? "ঘরটাতো এখনো দিন পনেরোর জন্যে আটকে রাখলেন। খুঁজছেন, কি কোথায় খুঁজছেন, বলবেন।"

"তা' আর কি করে বলবেন!" বসুমতী বলেন, বলবার মানুষ উনি? কিন্তু ভালমত একটা ব্যবস্থা না হলেই বা—"

থেমে যান বসুমতী!

সমর রেগে আগুন হয়ে চড়া গলায় বলে ওঠে, "না হলে কি করতে হবে? ও'কে সুদ্ধ ঘাড়ে করে নিয়ে যেতে হবে?"

বসুমতী একটু বিরক্তভাবে বলেন, "তা তোমার বিবেচনায় কি হয় তাই বল?"

"আমার বিবেচনায় যা হয় তাই বলেছি। হয় ও'র নিজের ভাইপোদের কাছে গিয়ে থাকুন, না হয় তো একটা মেস-টেস ঠিক করুন। অভাবগ্রস্ত তো নয়!"

বসুমতী এবার কেমন অবুঝের মত স্বরে বলেন, "আহা টাকার অভাবটাই না হয় নেই সমর, কিন্তু আর কি আছে মানুষটার? একটা মেস জুটিয়ে নেবার ক্ষমতাই কি আছে? না ওই পেটরোগা ধাতে মেসের ভাত খেয়ে হজম করবার ক্ষমতা আছে? আর ভাইপোদের কথা বাদ দে। জন্মাবধি দেখলো না তারা!"

"চমৎকার, নিজের ভাইপোদের কথা বাদ দিয়ে আমার ঘাড়ে দায় চাপানোর চেষ্টা! কেন? কি জন্যে? ও'র সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা কি? 'পেয়িং গেস্ট' ছাড়া তো আর কিছুই নয়? চিরদিন তাঁর ভাবনা ভাবতে হবে এমন কোন লেখাপড়া আছে?"

বসুমতী অবাক হয়ে যান ছেলের কথায়।

তিনি তো কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না বিজয়বাবুর খাওয়া দাওয়ার একটা ব্যবস্থা না করে দিয়ে এখান থেকে চাটিবাটি গুটিয়ে চলে যাওয়া সম্ভব। সমর আদৌ ওর এই অসম্ভাব্যতাটা বুঝতে পারছে না কেন? ছোটছেলে বলে কি এতই অবুঝ হতে হয়? ছেলের বৌয়ের দিকে তাকাল বসুমতী। যেন সালিশ মানার ভঙ্গীতে। বলেন, "আচ্ছা তুমিই বল তো বৌমা, যে মানুষটা সাতাশ বছর ধরে এ বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করছে, হঠাৎ তাকে বলা যায় 'কাল থেকে তুমি যেখানে পারো খেও।' তায় আবার বুড়ো মানুষ, রোগা মানুষ! একটু তেল মশলার রান্না সহ্য হয় না।"

বৌমা নির্লিপ্ত মুখে বলে, "এ কথার আর আমি কি উত্তর দেব বলুন? তবে সম্পর্কের দায় যখন নেই তখন শুধু শুধু একটা দায় ঘাড়ে করার মানেও আমি বুঝি না। তেল মশলা খেলে সহ্য হয় না, এ রকম মানুষ কি আর জগতে নেই? তাদের যা হয় তাই হবে।"

বসুমতী চিরদিনই নির্বোধ!

জগতের কোথায় কি হচ্ছে, পৃথিবী কোন্ তালে চলছে, বাতাস কোন্ মুখো বইছে, এ সব কোন খবরই কখনো রাখেন না তিনি। খবর রাখেন বাজার দরের, আর খবর রাখেন রান্না ভাঁড়ারের। মানুষ চিনতে তিনি সত্যিই পারেন না। তাই বৌমার কথায় আহত হলেন।

সত্যি, কিছুতেই বুঝতে পারছেন না বসুমতী, একটা নিতান্ত সহজ কথা, একেবারে সাধারণ মানব ধর্মের কথা, সেটুকু ওরা কিছুতে বুঝতে পারছে না কেন? পারছে না, না মনে হচ্ছে বুঝতে চাইছে না? কি আশ্চর্য! কি অনাসৃষ্টি!

আহত হলেন বসুমতী।

বললেন, "মেয়েমানুষ হয়েও বেটাছেলের মতন কথা কইলে বৌমা? তা' তোমারই বা দোষ কি, তুমি আর ক'দিনের? সমরই যখন—কিন্তু বাঙালীর মেয়ে এটুকুও কি জানো না, গেরস্থর বাড়ীতে যদি একটা পোষা কুকুর বেড়ালও থাকে তো তার খাওয়ার একটা ব্যবস্থা করে তবে গেরস্থ নড়ে চড়ে। আর এ একটা মানুষ—"

"মানুষ বলেই তো মা!" বৌমা হঠাৎ হেসে ওঠে, "কুকুর বেড়াল অবোলা জীব, তাদের কথা ভাবতে হবে বৈকি! কিন্তু মানুষ তো আর অবোলা জীব নয়?" সহসা আরও একটু জোরে হেসে ওঠে বৌমা, "অবশ্য উনি প্রায় তাদের সমগোত্রই। কিন্তু তার জন্যে আর আমরা ভাবতে যাই কেন?"

বসুমতীর কানে ওই হাসির শব্দটা ক্ষণ-পূর্বের সেই চেয়ার টানার শব্দটার মত খট্ করে লাগে। একবার বৌমার মুখের দিকে তাকান, আর একবার দালানের ওই ফাঁকা জায়গাটার দিকে তাকান তিনি, তারপর ছেলের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর দৃঢ় স্বরে বলেন, "এ বাড়ীটা তো আমার স্বামী শ্বশুরের বাড়ী সমর? জীবনস্বত্ব অবশ্যই আছে? এখানে এক-খানা ঘরে পড়ে থাকতে চাইলে কি কেউ বাধা দিতে পারবে?"

সমর মুহূর্তে কথার টোন্ ধরে ফেলে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, "কেন, তুমি তাহলে বিজয়-বাবুর ঝাল মশলাহীন ঝোল রেঁধে দেবার জন্যে এ বাড়ীতেই থেকে যাবে না কি?"

"কি জন্যে থাকবো, সে কথা থাক সমর, আমার থাকার অধিকার আছে কিনা সেইটাই জানতে চাইছি। আমি যদি আমার চিরদিনের বসবাসের ঘরখানায় বাস করতে চাই, তোমার আদালতের পেয়াদা এসে টেনে-হিঁচড়ে বার করে দিতে পারে কিনা?"

সমর গম্ভীরমুখে বলে, "আদালতের কথাই যদি তুলতে পারলে, তাহলে আদালতকেই জিগ্যেস কোরো মা!"

"আচ্ছা!" বলে মুখ ফিরিয়ে চাকরটাকে উদ্দেশ করে বলেন বসুমতী, "দীনবন্ধু, চেয়ারটা টেবিলটা কোথায় ফেলেছিস, এনে ঠিক জায়গায় রেখে দে।"

বৌমা আরক্ত মুখে বলে, "একজন বাইরের লোকের সামান্য 'খাওয়া খাওয়া' নিয়ে আপনি নিজের ছেলেকে ত্যাগ করবেন?"

"বালাই ষাট! ত্যাগ করবো কেন? তোমরা বেঁচে-বর্তে থেকে জন্ম জন্ম ভোগজাত করো। কিন্তু কোন্‌টা 'সামান্য' কোন্‌টা 'অসামান্য', কি বাইরের, কি ভেতরের, এ সব হিসেব বড় গোলমেলে বৌমা! বোঝা শক্ত। দেখি আমার ইষ্টদেবতা কি বলেন!" বলে এতক্ষণ পরে ফের ঠাকুর ঘরে গিয়ে বসেন বসুমতী।

দ্বিতীয়

গোরাচাঁদ নন্দী

প্রথম চুমার পরে যখন তোমার বুকে
মুখ লুকিয়ে বলেছিল 'ভুলবে না ত?'
তুমি কঠিন প্রতিজ্ঞার ছাপ
এঁকে দিয়েছিলে তার দেহে মনে।

শেষ চুমার পরে যখন সে চোখ বুজল
চাওয়া পাওয়া পেরিয়ে গেল—
তুমি তোমার কথা রাখলে
আর একজনের মধ্যে তাকে বসিয়ে।

পাহাড়িয়া
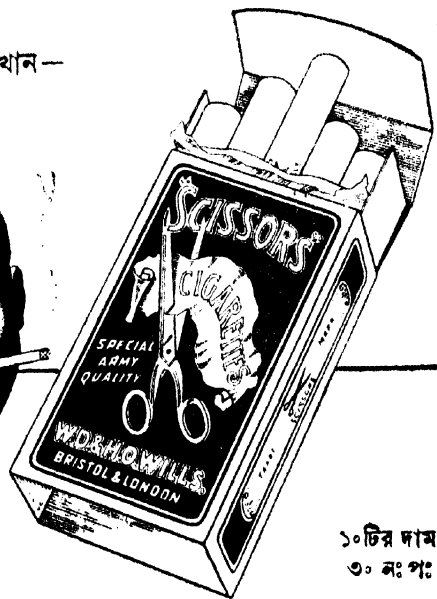
(৩৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

চেঁচিয়ে কাসিদ বলে, ওই ঘরে ঢুকতে চাই আমরা।

এবার লোকটি হেসে ফেলে বলে, এসো, ওটা আমারই আপিস।

এগিয়ে গিয়ে সে দরজাটা খুলে দেয়। তার পিছনে কাসিদ এবং হিন্দও ঢুকে পড়ে। ওদের চলন দেখলে বোঝা যায়, ওদের পা কাঁপছে।

আপিসে ঢুকে লোকটি একটা চওড়া টেবিলের ওপাশে গিয়ে চেয়ারে বসে। তারপর কেতাব-দুরস্তভাবে বলে, বলো তোমাদের জন্যে আমি কি করতে পারি।

আমরা বিয়ের লাইসেন্স চাই। কথাটা বলতে লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে কাসিদ। হিন্দ খিলখিল করে হেসে ওঠে।

লোকটিও সহৃদয় হাসি হাসে। তারপর দেরাজ টেনে একখানা কাগজ বের করে টেবিলের ওপারে কাসিদের হাতে দেয়, বলে, ফরমটা পূর্ণ করো।

কাগজটা নিতে কাসিদের হাত কাঁপে। তারপর হিন্দের দিকে একবার তাকিয়ে ইঙ্গিত করে ওর সঙ্গে আসতে। ঘরের এক প্রান্তে আর একটা টেবিল চেয়ার নিয়ে বসে পড়ে কাসিদ। কালি-কলম-ব্লটার—সব কিছু সাজানো আছে সেখানে।

হিন্দকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই কাসিদ একটা পড়ে লিখতে সুরু করে দেয়। তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে স্নেহের হাসি হাসতে থাকে হিন্দ।

শেষ পর্যন্ত তৃপ্তির নিঃশ্বাস নিয়ে উঠে দাঁড়ায় কাসিদ। আবার হিন্দকে সঙ্গে আসবার ইঙ্গিত করে। এগিয়ে যায় সেই লোকটির টেবিলের দিকে।

কাগজখানা হাতে নিয়ে লোকটি পড়তে সুরু করে, কি লিখেছে কাসিদ, হাতের লেখা যা, তা আর বলে কাজ নেই। দুজনের নাম লিখেছে, বয়স লিখেছে, অবস্থা, জন্মস্থান বাপ-মায়ের নাম, পেশা ও ঠিকানা লিখেছে—সব শেষে তারিখও বসিয়েছে। কাগজখানি আর একবার ভাল করে পড়ে নিয়ে মৃদু হেসে মাথা নাড়তে থাকে লোকটি।

দেখো বাপু, তোমাদের কারুরই বিয়ে করবার বয়স হয় নি, সমবেদনার সুরে বলে লোকটি।

আল্লাহো আকবর! সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠে কাসিদ ও হিন্দ।

বাজপাখির মত তীক্ষ্ণ মুখে ভ্রুকুটি ফুটিয়ে কাসিদ প্রশ্ন করে, কত বয়স হতে হবে আমাদের?

আইনসম্মত বয়সের উল্লেখ শুনে লোকটির গলায় তর্ক করতে শুরু করে কাসিদ, ও বয়স আমাদের হয় নি, কিন্তু বিয়ে আমরা করতে চাই।

তাহলে কাগজটায় তোমাদের বাপ-মায়ের সই লাগবে। সে সই পেলেই আমি লাইসেন্স দিতে পারি, বলে লোকটি কাসিদের হাতে কাগজটি তুলে দেয়।

আমাদের বাপ-মা কেউ নেই। গত বিদ্রোহের সময় ফরাসীদের হাতে মারা গেছে, কাসিদের গলার সুরে হৃদয়ের বেদনা ফুটে ওঠে।

খুব দুঃখের কথা, বলে লোকটি। কিন্তু উপায় নেই, বয়স না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের অপেক্ষা করতেই হবে।

মুখটা বাঁকিয়ে কাসিদ পাশে-দাঁড়ানো হিন্দের দিকে তাকায়। হঠাৎ তাকে বড় অসহায়, বড় আবেগাতুর, বড় অসহায় বলে মনে হয়। চট করে সে কাগজখানা ফিরিয়ে দেয়, তারপর ডান হাতটা ছোরার হাতলে রেখে বাঁ হাত দিয়ে হিন্দকে জড়িয়ে ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। কানে কানে বলে, আল্লাহ তো কিতাবে এ কথা লেখেনি।

সংস্কৃতি—সমাচার

(৬২ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

তিনটি ঘরোয়া খেলা—**তাস, দাবা ও পাশা—আঞ্চলিক পরিধি ডিঙিয়ে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়েছে।** তাসখেলা নাকি চীনের আবিষ্কার। অক্ষক্রীড়ায় আযত্বের ছাপ রয়েছে। ঋগ্বেদে অক্ষক্রীড়কের দুর্দশার আলেখ্য আছে এবং মহাভারতে পাশাখেলার পরিণাম চমৎকারভাবে চিত্রিত হয়েছে। ইংরেজী 'হ্যাজার্ড' (hazard) খেলায় কিন্তু আরবী প্রভাব ধরা পড়ছে, আরবী 'আলজার' (=পাশা) **থেকে সম্ভবত** হ্যাজার্ডের উদ্ভব হয়েছে। দাবাখেলার সংস্কৃত নাম চতুরঙ্গ, আরবী নাম শতরঞ্জ। **'বিজারিশন্ ই চতুরঙ্গ'** নামক পহ্লবী পুস্তকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, চতুরঙ্গ-ক্রীড়া ভারত হতে ইরাণে প্রবেশলাভ করে। খুব সম্ভব এই ভারতীয় ক্রীড়াটি ইরাণ ও আরবের মধ্যস্থতায় ইউরোপীয় 'চেস' (chess)-এর আকৃতি গ্রহণ করেছে। বর্তমানে খেলার মাঠটিতে ইউরোপীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠিত। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি ভারতীয় খেলাটিকে গ্রাস করে ফেলেছে। ঘোড়দৌড়ের আকৃতি ও প্রকৃতিতে ইংরেজী রীতি প্রকট হলেও এর মধ্যে আদি আর্য উত্তরাধিকার লুকিয়ে থাকতে পারে। এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বৈদিক যুগের **'আজি'** বা রথ চালনা প্রতিযোগিতা।

বর্তমানে সাংস্কৃতিক বিকিরণ বা diffusion-এর কেন্দ্রভূমি হচ্ছে ইউরোপ বা আমেরিকা। আমাদের ইস্কুল-কলেজ, শিক্ষা-পদ্ধতি, ছাত্র-মাস্টারের চালচলন প্রভৃতির দিকে তাকালে বোঝা যায় দিন দিন ইংরেজী বা আমেরিকান মডেল কি পরিমাণে চালু হয়ে গেছে। অতীতের আচার্যের আশ্রম বা অ্যাকাডেমীর টোল (আর সঙ্গে তুলনীয় **প্রাচীন গ্রীসের আকাদেমিয়া)** নিছক স্মৃতি মাত্র। সাধারণভাবে চাল-চলনে ভাষণে ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষ কিছুই চোখে পড়বে না। এমনকি ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা রীতিটিও ভারতীয় নয়। সংস্কৃত চর্চার পরমায়ুও বোধহয় শেষ হয়ে আসছে এবং অতীতের প্রতি বিমুখতা প্রবল হয়ে উঠছে **যান্ত্রিক আদর্শের প্লাবনের ফলে। আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি ইউরোপ-আমেরিকার** লেবেলযুক্ত হয়ে এদেশে প্রবেশ করছে সর্বাত্মক যান্ত্রিকতাকে বহন করে। এই ধাক্কায় জাতীয়তাকে টিকিয়ে রাখা শক্ত। বোধহয় বিজাতীয়করণকে (denationalisation) ত্বরান্বিত করবে নবাগত যান্ত্রিক পরিবেশ। গায়ের চামড়াটা অবশ্য বদলাবে না। তাই ভারতীয়রূপে পরিচয় দেওয়ার অন্তত একটা সূত্র টিকে থাকবে।

মানস কন্যাকে

॥ তুষার চট্টোপাধ্যায় ॥

কতদিন কতরাত স্বপ্নের প্রত্যাশা
সংকোচের বেড়া ভেঙে ঠোঁটের পিপাসা
কতবার ক্লান্ত হল তোমার লজ্জায়
নিরংকুশ নিবিড়তা রাতের শয্যায়।
তুমি থাক অচঞ্চল তারার তিমিরে
আমি ক্লান্ত ধূপছায়া তোমাকেই ঘিরে॥

এদেশ-ওদেশ

(৬৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সবুজ হলো শস্য-শ্যামলা সবুজের ছড়াছড়ি। **সুইজার-**ল্যাণ্ডের পথে পথে অর্পিতা **অনুভব করবেন** ঈশ্বরের প্রসন্নতা—দেখবেন তাঁর হাতের **ছোঁয়া—**ইউরোপের সর্বত্র। কেন এমন হলো? **আমরা** নিষ্ঠাবান, ভগবৎ-প্রেমিক-আমরা পেলাম **না তাঁকে—**আর উনি দিলেন তাদের উজাড় করে **তাঁর আশী-**র্বাদ। কোথাও গভীর কারণ একটা **আছে। আমার** বিশ্বাস কর্মযোগে মিলবে তাঁর আশীর্বাদ**—আমাদের** আত্মকেন্দ্রিকতা দূর করে করতে হবে **অন্যের সেবা**—আমাদের দেশও ভরে উঠবে সবুজের **সমারোহে।**

ধনিকপ্রধান দেশগুলি আজ বুঝেছে **তাদের** দুর্বলতা—তাইতো তারা আজ খবরা দিচ্ছে **আপামর** সকলকে—তারা খুলে দিয়েছে **তাদের বিরাট** প্যালেসের দ্বার, করছে **পরামর্শ কুলির সর্দারের** সঙ্গে, জোগাচ্ছে জনগণকে আনন্দের **খোরাক, এক** পংক্তিতে আজ তারা সর্বসাধারণের **সঙ্গে বসে খাচ্ছে।** ডেমোক্রেসীর স্রোত আজ বইছে ইউরোপে, **আমে-**রিকায়। তার তরঙ্গ গিয়ে পৌঁছেছে **দুর্ধর্ষ** জাপানেও। আজ ওরা স্বীকার করে **নিয়েছে** সাধারণ মানুষকে—মুখে না বললেও, **সবার ওপর** মানুষ সত্য—আমাদের এ বাণী **যেন তাদেরই বাণী** হয়ে উঠেছে। ছোট হয়ে এসেছে **আজকের পৃথিবী,** সকলে আমরা এক—আমাদের **পিছিয়ে থাকার দিনের** অবসান হলো বলে—এগিয়ে **যাওয়া দেশগুলি পরম** উদারতার সঙ্গে আমাদের সাহায্য **করবার প্রতিশ্রুতি** দিয়েছে—ঈশ্বর, আমরা সব প্রস্তুত থাকি, **যেন** নিতে পারি হাতে তুলে যে মহৎ আশীর্বাদ। **একটি** মাত্র বাণীই আমি ওদের দেশ থেকে বহন **করে** এনেছি। তারা বলেছে, হয়তো বলতে **চাইছে—**আমরা তোমাদের বন্ধু—আমাদের গ্রহণ কর,**—এসো,** আমরা চলি এক সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে।

একটি বে-হিসাবী গল্প

(৫৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

গেলাম। তখন একটি মাত্র রোগী **চেম্বারে।** পরীক্ষা শেষে ব্যবস্থাপত্র লিখতে **লিখতে** ডাক্তারবাবু তাকে কি যেন উপদেশ **দিচ্ছিলেন।** আমাকে অপাঙ্গে নিরীক্ষণ করে গম্ভীর মুখে একটু নড় করলেন—বসতে বললেন না। তারপর তাড়াতাড়ি ব্যবস্থাপত্রখানা **রোগীর** দিকে সরিয়ে দিয়ে বললেন, সরি, এখুনি একটা জরুরি কলে বাইরে যেতে হবে। গুড নাইট।

ঘটাং করে চেয়ারখানা টেনে **গম্ভীর মুখে** গট্ গট্ করে বেরিয়ে গেলেন **ডাক্তারবাবু।**

চেয়ে দেখি ওঁর টেবিলের **উপর** একখানি সদ্য প্রকাশিত **'জন্মভূমি'।**

নীলমণি রা

ংলার পশুরাজ

ছবিঃ- কাফী খাঁ ঃঃ ছড়াঃ- হরেন ঘট

মহা আকাশ পাড়ি দেবে এই রকেটে চেপে?
কথা তোমার শুনেই খুড়ো উঠছে যে বুক কেঁপে!

তুই যে নেহাৎ ছেলেমানুষ তাই পেয়েছিস ভয়,
এই জীবনে দেখবি আরো কত না বিস্ময়!
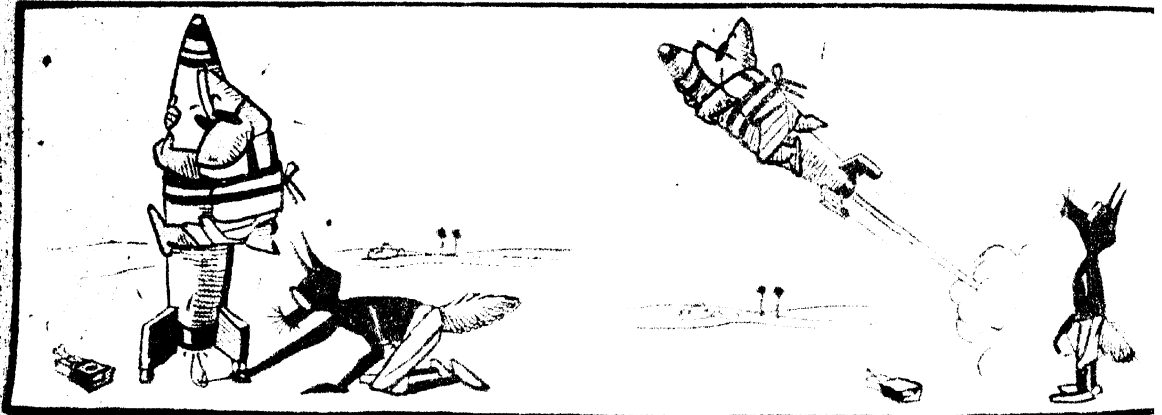
ভাবনা কী তোর? চট্ ক'রে তুই দেশলাই ধর জেলে,
ভীষণ বেগে ছুটবে রকেট পুচ্ছে আগুন পেলে।

সাবাস খুড়ো! এই বয়সে খেল দেখালে কত!
অসীম তোমার কীর্তি দেখে করছি মাথা নত।
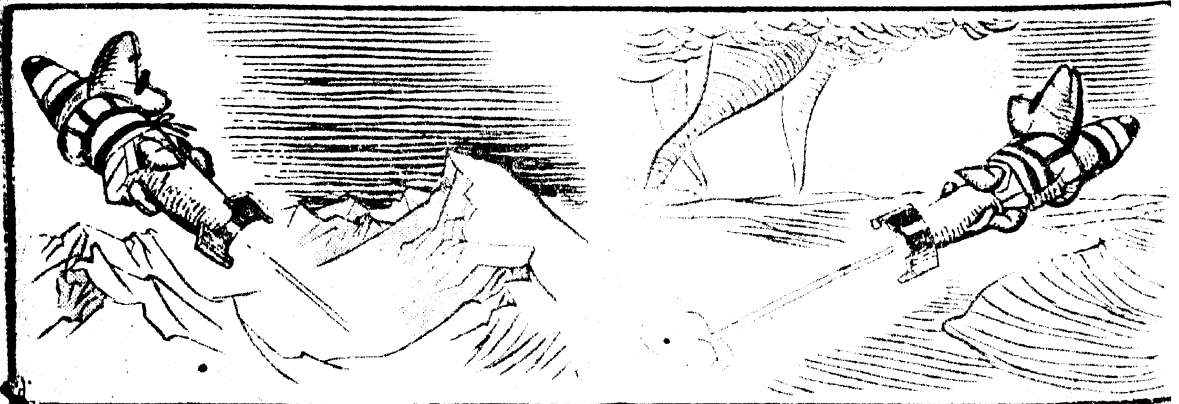
ভারত-মাতার মাথার মুকুট এই তো হিমালয়!
বিশ্ববাসীর হৃদয় যে আজ রাখলো ক'রে জয়।

ওরে ব্বাবা! ঘূর্ণি-ঝড় উঠলো বালুকার,
ভীষণ এ কি রুদ্র রূপ দেখছি সাহারার!
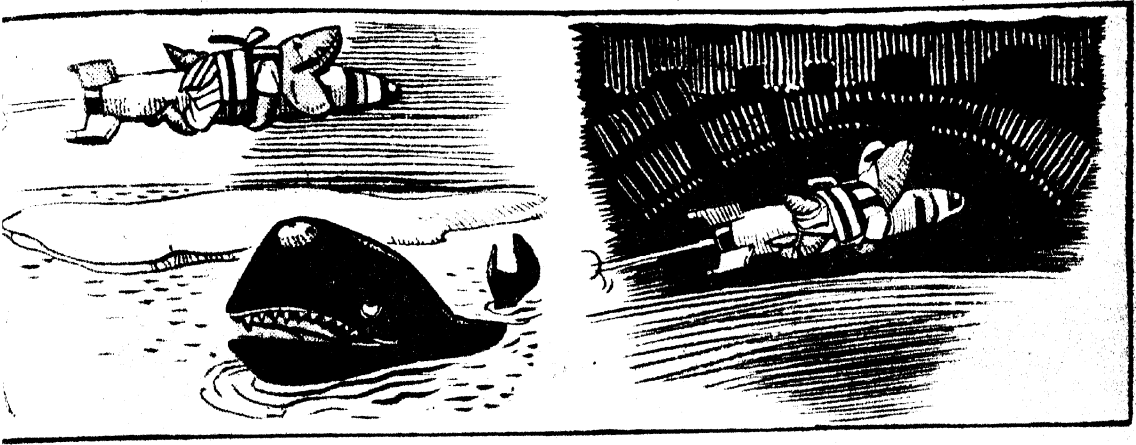
তিমির দেশে এসে গেছি নাই তাতে সন্দেহ!
স্তন্যপায়ী জলের জীব বিরাট এদের দেহ।

উত্তর এ মেরুতে হঠাৎ এসে গেলাম সোজা,
অরোরার এই আলোর বাহার! দেখলেই যায় বোঝা।

দক্ষিণ মেরুতে বোধ হয় পৌঁছে গেছি এসে,
কারণ সিন্ধুঘোটক এবং পেঙ্গুইনের দেশে।

নিজের হাতে তৈরী করা মোর রকেটে উড়ি',
বিশ্ব-পরিক্রমা হলো ঘণ্টাখানেক ঘুরি'।
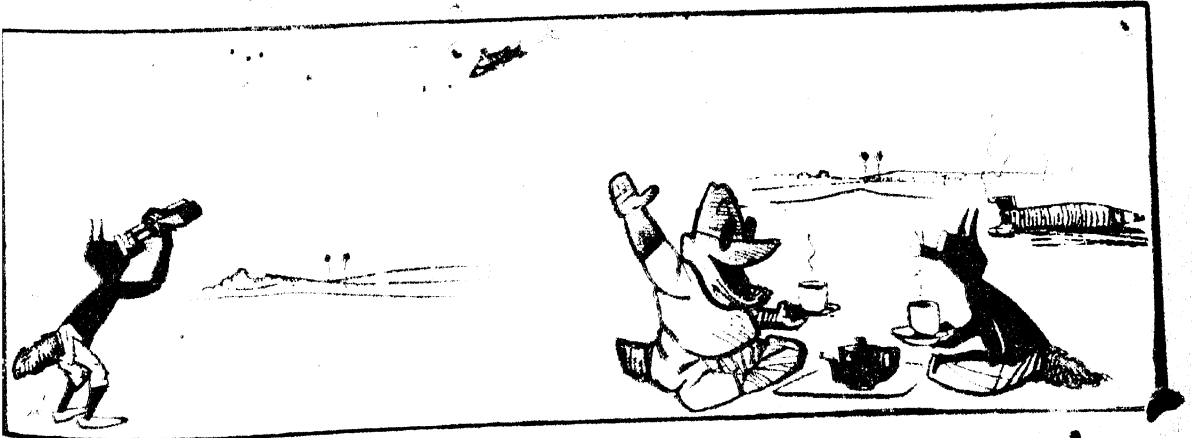
খুড়োমশাই এসে গেছেন বা রে! মজা বা রে!
স্বদেশবাসী অভিনন্দন জানাবে আজ তাঁরে।

ভবিষ্যতে ভ্রমণ সবাই ক'রবে চন্দ্রলোকে,
সেদিন আসার খুব দেরী নেই, রাখছি বোলে তোকে।

ছোটদের পাততাড়ি

পূজা সংখ্যা—১৩৬৬
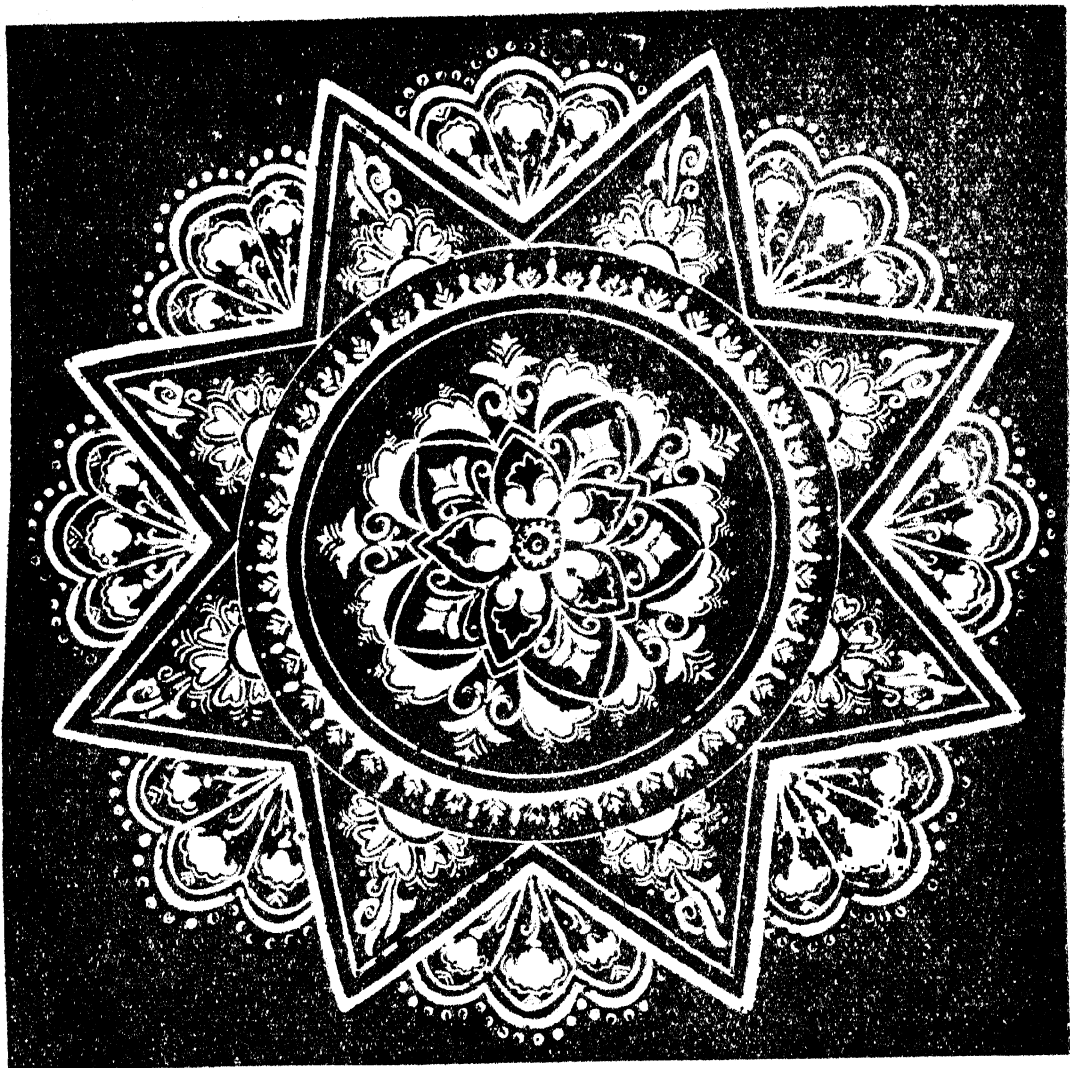
আলপনা—ইন্দিরা বিশ্বাস

তোমরা কচি, তোমরা সবুজ—

তোমরা কচি, তোমরা সবুজ তনুর কিশলয়ে,
তোমরা সূর্য্যকলি, প্রকাশ হয়ো সূর্য্য হয়ে।
তোমরা মানুষ, ভগবানের তোমরা প্রতিনিধি,
আনন্দধাম লুকিয়ে রাখে তোমাদের ঐ হৃদি।
বড় হয়ে মানুষ হয়ো, অভয় দিও ভীতে,
আনন্দধাম আসবে নেমে মাটীর পৃথিবীতে।
আমরা করতে পারি নি যা, তোমরা তাহা করো,
ফুলের মতন ফুটে উঠে ফুলের মতন ঝরো।

নজরুল ইসলাম
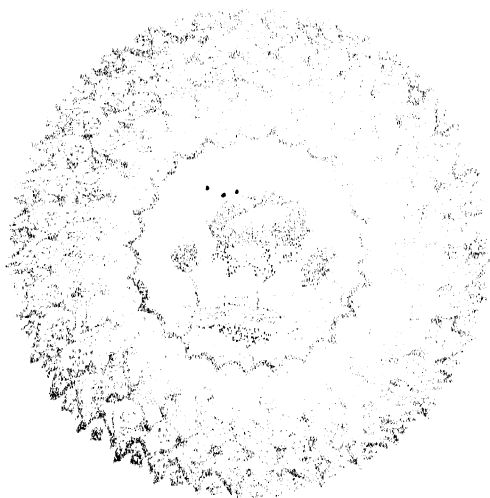
আলপনা—শিল্পী অনুরাধা ঘোষ
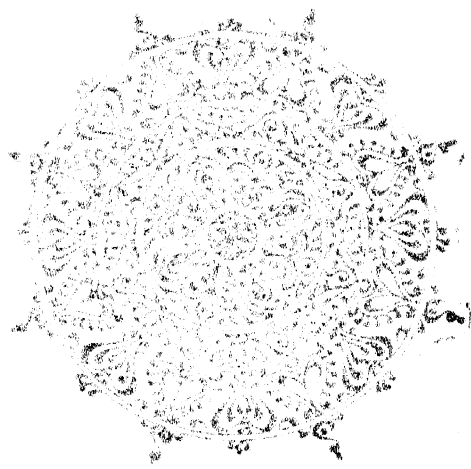
আলপনা—শিল্পী রেবা রায়চৌধুরী
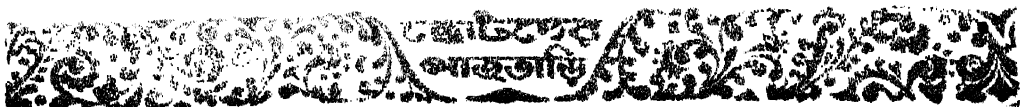
তোমরা অনেকেই পড়েছো বোধ হয়, রাইডার হ্যাগার্ডের অপূর্ব গল্প "সলোমান রাজার খনি"—এই সলোমান ছিলেন ইশরাইলের রাজা ইহুদী-রাজ। খৃষ্ট-জন্মের ৯৭৪ পূর্বে তিনি রাজা হন। তাঁর ছিল যেমন জ্ঞানবুদ্ধি, তেমনি ঐশ্বর্য। আমাদের দেশে রাজা বিক্রমাদিত্যের যেমন খ্যাতি,—রাজা সলোমানেরও তেমনি খ্যাতি। তাঁর প্রতিপত্তিও ছিল অপরিসীম। তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর সুখে-শান্তিতে রাজ্য করেছিলেন।

তাঁর ঐশ্বর্য এবং জ্ঞানবুদ্ধির কত কাহিনীই না কত দেশের লেখক কতভাবেই না লিখেছেন। তাঁর জ্ঞানবুদ্ধির একটি কাহিনী বলছি,—শোনো।

তাঁর আমোলে মিশরে সেবা রাজ্যে ছিলেন রাণী, কুইন অফ সেবা নামে ইতিহাসে তাঁর প্রসিদ্ধি।

তাঁরো ছিল যেমন শক্তি, তেমনি বুদ্ধি, তার উপর তিনি ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। তিনি শুনেছেন রাজা সলোমানের ঐশ্বর্যের গল্প, জ্ঞানবুদ্ধির গল্প—কেমন তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি, পরখ করবার জন্য রাণীর বাসনা হলো খুব তীব্র—তিনি এলেন তাঁর রূপসী সখীর দল আর সেপাই-সান্ত্রী নিয়ে ইশরাইল রাজ্যে স্বচক্ষে রাজা সলোমানকে দেখতে এবং তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি প্রত্যক্ষ করতে। রাজা সলোমান তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। রাজার সভায় মণিমাণিক গাঁথা সিংহাসনে বসে রাজা সলোমান—সভায় বসেছেন জমকালো পোষাক পরা মন্ত্রী-পাত্রমিত্র অমাত্যের দল,—রাণী এলেন রাজার সভায় তাঁর রূপসী সখীদের নিয়ে—সঙ্গে এনেছেন রাজাকে নজর দেবার জন্য কত রকমের সামগ্রী উপঢৌকন—মিশরের ঐশ্বর্যের অপূর্ব নিদর্শন!

রাজা আর রাণীর এ সাক্ষাৎ যেন সূর্য আর চন্দ্রের মিলন। রাজা যেমন বয়সে তরুণ এবং অপরূপ তাঁর রূপ, রাণীও তেমনি বয়সে তরুণী এবং রূপে রূপময়ী! তাঁর সখীরাও বয়সে তরুণীরূপে রাণীর যোগ্য সঙ্গিনী। রাজসভা রূপের-আলোয় আলো হয়ে উঠলো।

রাজা সিংহাসন ছেড়ে উঠে রাণীর হাত ধরে রাণীকে বসালেন তাঁর পাশে আর একখানি রত্ন-সিংহাসনে।

তারপর উপঢৌকন-দান। রাজার সেরা সেরা সামগ্রী এনেছেন রাণী—সে সব সামগ্রীর কতকগুলি রাণী তৈরি করেছেন তাঁর যাদু-মন্ত্রে, আর কতকগুলি মিশরের সেরা শিল্পদের হাতের তৈরি—এমন সামগ্রী রাজা সলোমান কখনো চোখে দেখেননি;

সে সব সামগ্রীর মধ্যে একটি সোনার তৈরি পাখী—এ পাখী ঠিক জীবন্ত পাখীর মতো ওড়ে আবার জীবন্ত পাখীর মতোই কত রকম বুলি বলে,—দেখলে কে বলবে, সত্যিকারের জীবন্ত পাখী নয়—সোনার পাখী, মানুষের তৈরি!

এমনি অসংখ্য সামগ্রী রাজা দেখলেন, সভার সকলে দেখলেন—দেখে যেমন বিস্মিত হচ্ছেন তেমনি শতমুখে শিল্পীর প্রশংসা করছেন।

রাণী বললেন তাঁর সখীদের—সেই দুটি ফুলদানী—ফুলদানীতে ফুলের তোড়া সমেত নিয়ে এসো।

গন্ধভরা নানা রঙের অজস্র ফুলে ভরা বড় বড় দুটি তোড়া—দুটি অপরূপ ফুলদানীতে সাজানো সখীরা নিয়ে এলো। সে দুটি তোড়া রাজার সিংহাসনের সামনে রেখে রাণী বললেন রাজাকে—মহারাজা, আপনার মতো জ্ঞানী দুনিয়ায় আর নেই—জ্ঞানে এবং বুদ্ধিতে আপনি হলেন দুনিয়ার সব মানুষের সেরা—আপনার যেমন ঐশ্বর্য, তেমনি প্রতিপত্তি আর আমি হলুম মিশরের ক্ষুদ্র রাজ্য সেবা—সেই সেবার অতি তুচ্ছ রাণী তার উপর জ্ঞানবুদ্ধিহীন নারী—আপনার চরণে আপনার যোগ্য উপহার দেবো, এমন সামর্থ্য আমার নেই। তুচ্ছ কতকগুলো খেলনা আমি এনেছি আপনার চরণে উপহার দিতে। সে-খেলনার সঙ্গে এনেছি এ দুটি ফুলদানীতে রং-বেরঙীন গন্ধফুলের দুটি তোড়া। এ দুটি তোড়ার মধ্যে একটি তোড়া আসল সত্যিকারের ফুলে রচা আর একটি হলো আমার হাতের তৈরি নকল ফুলের তোড়া—মণিমাণিক দিয়ে রচা ফুলের রঙে রং মিলিয়ে রচা। আপনি দেখে বলে দিন,—এ দুটি তোড়ার মধ্যে কোনটি আসল ফুলের—আর কোনটি নকল ফুলের তোড়া। যেটি আসল ফুলের তোড়া, সেটি আপনি স্বহস্তে গ্রহণ করুন—আমি তাহলে কৃতার্থ হবো। হাতে নিয়ে তোড়া দুটি পরখ করা চলবে না—চোখে দেখে বুঝে আসল সত্যিকারের তোড়াটি আপনি হাতে নেবেন।

একথা বলে রাণী হাসলেন—মৃদু হাসি। ভাবলেন, রাজা যদি ঠিক না ধরতে পারেন তাহলে তাঁর জ্ঞানবুদ্ধির দর্প খানিকটা মলিন হবে!

রাজা হাসলেন, রাণীকে বললেন—আমার জন্য এত সব সামগ্রী এনেছেন—আমাকে দিচ্ছেন তার জন্য আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একথা বলে তিনি ফুলের তোড়া দুটি দেখতে লাগলেন—তোড়া স্পর্শ না করে বেশ একাগ্র দৃষ্টিতে। তাঁর যেমন বিস্ময় তেমনি দুশ্চিন্তা। আশ্চর্য—হাতের ফুল এমন চমৎকার তৈরি যে, আসলের সঙ্গে কোথাও এতটুকু তফাৎ নেই। ঐ পদ্মের দল, গোলাপের রাশি, জুঁইবেল... দুটি তোড়ার প্রত্যেকটি ফুল এক রকমের—ফুলের সঙ্গে ডাঁটি পাতা—বর্ণে-চেহারায় কোনো তফাৎ নেই। দুটি তোড়ার ফুলেই শিশির-কণা.....

রাজা প্রমাদ গণলেন তাইতো ফুলে হাত না দিয়ে শুধু চোখে দেখে ঠিক করতে হচ্ছে কোন্ তোড়ার ফুলগুলি আসল, কোন্ তোড়ার ফুল হাতের তৈরি—নকল!

রাজা চিন্তিত হলেন—সিংহাসন ত্যাগ করে ফুলদানী দুটির সামনে বসে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দুটি তোড়ার ফুল পরীক্ষা করতে লাগলেন—কোনো তোড়ার ফুলে এতটুকু খুঁত আছে কিনা, যাতে করে আসল-নকলের তফাৎ নির্ণয় করতে পারেন। বহুক্ষণ পরীক্ষা করবার পর তিনি দেখলেন, একটি তোড়ার একটি ডাঁটির পাতা শুকনো পানা। তিনি ভাবলেন, এইটিই তাহলে আসল। সে তোড়াটি হাতে নেবেন—হঠাৎ মনে হলো, ও তোড়াটি আর একবার ভালো করে দেখি। তখন তিনি লক্ষ্য করলেন, এ তোড়াতেও একটি ডাঁটির পাতা শুকিয়ে

(এক)

পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই জননী কুন্তীদেবী এবং দ্রৌপদীকে সহ যখন অজ্ঞাতবাস করিতেছিলেন সে সময়ে, সময় সময় নানা বনে বাস করিতেন। তাঁহারা যখন রাজর্ষি বৃষপর্বার আশ্রমে বাস করেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে মহাবীর ভীমসেন নিজ ইচ্ছামত ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন হিমালয় পর্বতের নিম্নভাগে একটি অতি স্বাস্থ্যকর মনোরম স্থান দেখিতে পাইলেন। বড় সুন্দর সে বন। সে বনের স্থানে স্থানে নির্ঝরের তীরে কোথাও কোকিল, ভৃঙ্গরাজ পাখীরা ডাকিতেছে, কোথাও চকোর, চক্রবাক, কোথাও তুষারশুভ্র হংস, কারণ্ডব পার্বত্য নদীর বুকে বুকে খেলা করিতেছে। কোথাও সরল সুন্দর সারি সারি দেবদারু বন, হরিচন্দন মিশ্রিত পুন্নাগ ও নানা জাতীয় বৃক্ষশ্রেণী নীল মেঘের মত পাহাড়ের গায়ে শোভা পাইতেছে। কত [illegible] নির্ভয়ে পাহাড়ের সমতল প্রদেশে বিচরণ করিতেছে।

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

পড়ার মতোই শব্দ হলো। তিনি চমকে উঠলেন—তাইতো দুটি তোড়া ফুলে পাতায় কোথাও একটুও তফাৎ নেই যে!

তবে কি?

তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। সভাগৃহ নিস্তব্ধ—রাজা নিস্তব্ধ মনে চিন্তা করছেন, রাণী নিস্তব্ধ হয়ে রাজার দিকে চেয়ে আছেন... সবাই লক্ষ্য করছেন; রাণীর মনে জয়ের উল্লাস। সভাসদেরা নীরবে বিস্ময়ে চাইছে একবার রাজার দিকে পরক্ষণে রাণীর দিকে।

রাজা চিন্তা করছেন...চিন্তা করছেন...হঠাৎ মনে হলো এখন বসন্তকাল—একথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চাইলেন সিংহাসনের পিছনে প্রকাণ্ড জানলা—সেই জানলার দিকে—জানলার সামনে মখমলের মোটা পর্দা। রাজা আদেশ দিলেন ও পর্দা সরাও। পর্দা সরানো হলো। প্রকাণ্ড খোলা জানলা দিয়ে এক ঝলক রৌদ্র আর বসন্ত বাতাসের প্রবেশ। সে জানলার নীচে বাহিরে ওদিকে রাজার প্রকাণ্ড বাগান—বাগানে বর্ণে-গন্ধে কত ফুল ফুটে আছে—গাছে গাছে... বাগান আলো করে কত রঙের গোলাপ, পদ্ম, বেল, মল্লিকা, জুঁই... ফুলে ফুলে মৌমাছিরা উড়ে বেড়াচ্ছে দলে দলে...মৌমাছিদের গুঞ্জন রব শোনা গেল।

খোলা জানলা দিয়ে আসল মিশরী ফুলের গন্ধ বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়লো বাগানে—এক ঝাঁক মৌমাছি উড়তে উড়তে সভা-ঘরে ঢুকলো... ঢুকেই তারা এসে বসলো আসল ফুলের তোড়ায়......

দেখে রাজা পেলেন অকূলে যেন কূল। তিনি তখন মৌমাছি-বসা ফুলের তোড়াটি নিলেন হাতে!

রাণী উঠে রাজার সিংহাসনের সামনে প্রণিপাতে নিজেকে লুণ্ঠিত করে বললেন—ধন্য হলুম, কৃতার্থ হলুম আজ আপনার জ্ঞানবুদ্ধির পরিচয় প্রত্যক্ষ করে।

ঘুম-পিসী

সুখলতা রাও

খোকন সোনা মায়ের কোলে দোলে
রাত্রি এল সেথায় চুপি চুপি,
সবার ঘরে উঠলো বাতি জ্বলে।

ঘুমের মাসি ঘুমের পিসী
ছায়ার মত ছায়ায় মিশি
এল অন্ধকারের তলে তলে।

আনল তারা কাঠের ঘোড়া,
রেলের গাড়ী, জাহাজ জোড়া
রঙের হাতী, পুতুল পরী,
মোহন বাঁশী, খেলার দড়ি,
দুহাত ভরে সোনায় দেবে বলে;

তার কপালে হাত বুলিয়ে,
আদর করে ঘুম পাড়িয়ে
স্বপন দেবে চোখের কোলে কোলে।

মহাবাহু ভীমসেন চারিদিকের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন ও বনমধ্যে তিনি নির্ভয়ে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভৈরব গর্জনে হস্তী, ব্যাঘ্র এবং নানা জাতির হিংস্র প্রাণী গুহা ও বন ত্যাগ করিতে লাগিল। ভীমসেন বনমধ্যে বনচরের ন্যায় ভ্রমণ করিতে করিতে এক গভীর গিরি গহ্বর কাছে আসিয়া দেখিলেন এক লোমহর্ষ মহাকায় অজগর সর্প। ঐ সর্প নিজ শরীর দিয়া গিরি গহ্বর আবরণ করিয়া ফেলিয়াছে। অতি বৃহৎ তার শরীর। তাহার সেই বিরাট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নানা বর্ণে চিত্রিত। মুখ গহ্বর মত বড় এবং চারিটা তার তীক্ষ্ণ বৃহৎ দন্ত, চক্ষু প্রদীপ্ত ও অতি তাম্রবর্ণ। কালান্তক যমের মত এই ভীষণ ভুজঙ্গ মুহুর্মুহুঃ তাহার সুতীক্ষ্ণ জিহ্বা বাহির করিয়া লেহন করিতেছে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ভীষণ শব্দে মনে হইতেছে যেন ঝড় বহিতেছে।

সেই অজগর সর্প সহসা ভীমকে নিকটে দেখিয়া গর্জন করিয়া উঠিল এবং অতি ক্রোধের সঙ্গে বলপূর্বক ভীমের বাহুযুগল জড়াইয়া ধরিল। সেই সাপ যেমন ভীমসেনের গাত্র স্পর্শ করিল তখনি ভীমসেন সংজ্ঞাশূন্য হইলেন! যে ভীমসেন ছিলেন অযুত হাতীর ন্যায় বলশালী, সেই ভীমসেন ঐ অজগর সাপের কবলে পড়িয়া সাপের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রভাবে বিমোহিত হইয়া একেবারে হতবল হইয়া পড়িলেন। কোনরূপেই মুক্ত হইতে পারিতেছিলেন না। যতই ভীম বলিতে লাগিলেন, হে ভুজঙ্গ, জাননা আমি কে? আমি ধর্মরাজের কনিষ্ঠ পাণ্ডু পুত্র, আমার নাম ভীমসেন, আমি অযুত নাগের বল ধারণ করি। রাক্ষস, পিশাচ, যক্ষ, রক্ষ, আমার কাছে হয় পরাজিত, সেই আমি ভীমসেন, তুমি আমাকে পরাজিত করিলে, তাই মনে হয় মানুষের বিক্রম ও সাহস কিছুই নয়।

এইভাবে ভীমসেন নানা কথা বলিতেছেন, কিন্তু সেই ভীষণ অজগর সর্প তাঁহাকে তাহার বিরাট শরীর দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিল এবং তাহাকে নিগ্রহ করিয়া বলিতে লাগিল, "শোন ভীমসেন আমি বহুকাল থেকে ক্ষুধিত রয়েছি, দেবতারা আমার ভাগ্যক্রমে অদ্য তোমাকে আমার খাদ্যরূপে এনে দিয়েছেন। জ্ঞান দেহধারী জীবমাত্রেই আমাদের অতি প্রিয় খাদ্য। এ কথা বলিয়া সেই মহাভুজঙ্গ এমনভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করিল যে বন-অরণ্য দাবানলের মত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ভীমসেনকে সর্প তাহার দেহ দিয়া সম্পূর্ণরূপে জড়াইয়া ধরিল। ভীমসেন কত দুঃখ প্রকাশ করিলেন, ভ্রাতাগণের কথা স্মরণ করাইয়া মুক্তি চাহিলেন, কিন্তু হায়! কোথায় মুক্তি! কে শোনে তার কথা!

(দুই)

এদিকে রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে দেখিতে না পাইয়া দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভীম কোথায়?"

দ্রৌপদী কহিলেন—বৃকোদর অনেকক্ষণ এখান হতে গিয়েছেন। মহাচিন্তিত হইলেন একথা শুনিয়া রাজা যুধিষ্ঠির। চারিদিকে অনিষ্টসূচক চিহ্ন সব দেখিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয়কে এবং নকুল সহদেব তিন ভ্রাতাকে দ্রৌপদীকে এবং পরিবার পরিজন ও ব্রাহ্মণ তপস্বীদের রক্ষার ভার দিয়া ঋষি ধৌম্যের সহিত ভীমসেনের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন যুধিষ্ঠির। আশ্রম হইতে ভীমের পদচিহ্ন দেখিয়া মহারণ্যের পথে চলিতে চলিতে এক ভীষণ অরণ্যানীর কাছে দেখিতে পাইলেন এক গিরি-গহ্বর। চারিদিকে কণ্টক বন, শাখাহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিটপী জনশূন্য ঊষর প্রদেশ, সেখানে গিয়া দেখিলেন ভীমসেন এক মহাসর্প কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া নিশ্চল অবস্থায় পড়িয়া আছেন।

যুধিষ্ঠির ব্যথিত চিত্তে কহিলেন—ভীমসেন ভ্রাতা, তুমি কিভাবে এখানে আসিলে? কেমন করে এই সর্পের কবলে পড়িলে? কেমন করে এমন আপদে পড়িলে?

তখন ভীম তাঁহার অগ্রজ ভ্রাতার কাছে সমস্ত বিবরণ বর্ণনা করিলেন এবং বলিলেন যে, এই মহাবলী সর্প আমাকে ভক্ষ্যার্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

যুধিষ্ঠির তখন সেই অজগর সর্পকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে ভুজঙ্গ! আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমার অমিতবিক্রমশালী ভ্রাতাকে কেন গ্রহণ করিলে? আমরা তোমার জন্য প্রচুর খাদ্য সংগ্রহ করে দিচ্ছি।

'এই রাজপুত্র আমার আহার। আমি তাকে আমার মুখের কাছে পেয়েছি। তুমি চলে যাও, এখানে থেকোনা, এখানে থাকলে তুমি হবে আমার কল্যের আহার, কেন না তুমিও আমার অধিকারে এসেছ। আমার ব্রত এই যে, যে ব্যক্তি আমার অধিকারে আসবে, সেই হবে আমার ভক্ষ্য। আমি বহুকাল পরে তোমার এই অনুজকে পেয়েছি। অতএব ইহাকে আমি ত্যাগ করব না এবং অন্য আহারও কামনা করি না।'

যুধিষ্ঠির কিছুটা সময় নীরব থাকিয়া হিলেন—হে সর্প! আমি যুধিষ্ঠির তোমাকে জিজ্ঞাসা করি তুমি দেবতা, কি দৈত্য? কিম্বা উরগ, যে হও সত্য করে বল। হে ভুজঙ্গ, তুমি কি নিমিত্ত ভীমসেনকে ভক্ষণ করিতেছ? কি বস্তু তোমাকে সংগ্রহ করে এনে দিলে কিম্বা কি তুমি চাও জানতে পারলে, কিসে তোমার প্রীতি জন্মে? তোমাকে আহার দিব এবং কি কাজ করলে তুমি প্রীত হয়ে আমার ভ্রাতাকে মুক্ত করবে বল?

(তিন)

সর্প কহিল—শোন রাজা আমার কথা। শোন তোমার বংশের পরিচয়। আমি তোমার পূর্বপুরুষ সোম বংশের আয়ু রাজার পুত্র। সোম হইতে পঞ্চম পুরুষে নহুষ নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলাম। আমি যজ্ঞ, তপস্যা, দম ও বিক্রম দ্বারা সহজেই লাভ করেছিলাম ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য। সেই অতুল ঐশ্বর্য পেয়ে আমার হয়েছিল দর্প। সে সময়ে সহস্র ব্রাহ্মণ আমার শিবিকা বহন করতে লাগলো। আমি ঐশ্বর্যমদে মত্ত হয়ে দ্বিজগণকে অবজ্ঞা করতে আরম্ভ করলাম। শিবিকা বহন করবার সময়—"অগস্ত্যের দেহে মম ঠেকিল চরণ।" মহাঋষি অগস্ত্য আমাকে অভিশাপ দিলেন—সে অভিশাপের দরুণ আমার এই অবস্থা হয়েছে। হে রাজা যুধিষ্ঠির, আমি অগস্ত্যের শাপে সর্পদশা পেয়েছি বটে—তবে আমি জ্ঞানহারা হই নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন—তোমার এখন কি বলবার আছে বল?

হে রাজন, ঋষি অগস্ত্যের অনুগ্রহেই আমি তোমার ভ্রাতা ভীমসেনকে দিবসের ষষ্ঠ ভাগে আহার পেয়েছি, অতএব আমি ইহাকে পরিত্যাগ করবো না এবং অন্য আহারও চাই না। তবে এক কথা।

কি কথা বল ভুজঙ্গ?

অজগর বলিল—আমি তোমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করবো, যদি তুমি আমার মুখে উচ্চারিত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান কর, তা হলে তোমার ভ্রাতা বৃকোদরের বন্ধন মোচন করবো।

(চার)

যুধিষ্ঠির বলিলেন—যাহা তোমার ইচ্ছা হয় বল। আমি তোমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিব, যদি আমার উত্তরে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে আমার ভ্রাতাকে মুক্ত কর তবে আমি ধন্য হব।

সর্প প্রশ্ন করিল—"ব্রাহ্মণ কে এবং বেদ-ই বা কাহাকে বলে?"

উত্তর দিলেন রাজা—

সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, তপ, দয়া যাঁর
তিনিই ব্রাহ্মণ বলি বিদিত সংসার।

আর যিনি সুখ-দুঃখ বিরহিত, ও যাঁহাকে জানিলে মনুষ্য শোক প্রাপ্ত হয় না, সেই পরমব্রহ্মই বেদ—

যাঁহারে জানিলে সুখ দুঃখ নাহি রয়।
সুখ দুঃখ শূন্য যিনি সকল সময়।
সেই এক ব্রহ্ম শুধু জ্ঞাতব্য বিষয়
অপর জ্ঞাতব্য আর নাহি মহাশয়।

৫
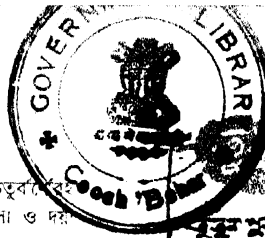
সর্প ভীমসেনের একটি বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল।
আর তোমার কি প্রশ্ন আছে বল?

সর্প কহিল—যুধিষ্ঠির অপৌরুষেয় সত্য, বেদবাক্য চতুর্বর্ণের হিতকর, প্রমাণ এবং প্রতিপাদ্য সত্যদান, অক্রোধ, অহিংসা ও দয়া শূদ্রতেও যে দৃষ্ট হইতেছে! আর তুমি সুখ-দুঃখহীন বস্তুকে বেদ বলে নির্দেশ করলে কিন্তু সুখ-দুঃখহীন অন্য কোন বস্তু আছে, ইহা বোধ হয় না।

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন—

শূদ্রেও থাকিতে পারে ব্রাহ্মণ-লক্ষণ।
ব্রাহ্মণেও শূদ্র চিহ্ন করি নিরীক্ষণ।
শূদ্রই যে শূদ্র হয়, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ।
এরূপ নিয়ম কিছু না দেখি কখন।।
সে ব্রাহ্মণ যারে দেখি বৈদিক আচার।
সেই শূদ্র যাহে দেখি বিপরীত তার।

সর্প বলিল—বল রাজা বল দেখি কি কর্ম করলে জীবের সদগতি হয়?

যুধিষ্ঠির বলিলেন :—

যে জন অহিংসাপর হইয়া সংসারে
সত্য প্রিয় বাক্যে সৎপাত্রে দান করে।
সেই জন স্বর্গলাভ করে সুনিশ্চয়।
এই মোর বাক্য কভু অন্যথা না হয়।।

প্রশ্ন করিল সর্প—বল দেখি রাজা, দান, সত্য এ দুটির মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ, অহিংসা, প্রিয়ত্ব এ দুয়ের মধ্যেই বা কে শ্রেষ্ঠ!

উত্তর দিলেন যুধিষ্ঠির,—শোন সর্প, কখনও দান হতে সত্য শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা যায়, আর কখনওবা সত্য হতে দান শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিতে হয়।

প্রিয় অপেক্ষায় কভু অহিংসার মান।
অহিংসা হতেও কভু সত্যের প্রধান।।

অজগর আবার প্রশ্ন করিল—মন, বুদ্ধি দুইটির কিরূপ লক্ষণ। আমাকে বুঝিয়ে বল রাজা।

রাজা যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন :

দেহের সহিত মন জন্মলাভ করে।
কার্য হতে বুদ্ধি কিন্তু জন্মে এ সংসারে।
মন ত সগুণ, আর বুদ্ধি ত নির্গুণ।
এইরূপ দুয়ের ভেদ মন দিয়া শুন।।
আপনিত সুবুদ্ধিমান, তবে কি কারণ।
করিলেন ঋষি দেহে চরণ অর্পণ।।

তখন সর্প বলিল—

বিদ্যা বুদ্ধি থাকুক না যত
ধন যদি থাকে তার, মোহ জন্মে তত।
ধন মদে মত্ত হয়ে আমিও রাজন্।
করিয়াছি অগস্ত্যের দেহে পদার্পণ।।

অজগর অবশেষে বলিল :—হে মহারাজা যুধিষ্ঠির! আমি তোমার বাক্য শুনলাম, তুমি জ্ঞানী, বিজ্ঞ, আমার প্রশ্নের তুমি উত্তর দিলে—

এত দিনে হল মোর শাপ বিমোচন।
শাপ মুক্ত করি তবে জুড়ালে জীবন।

যুধিষ্ঠির আনন্দিত হইয়া বলিলেন, আপনার মুখে আমি আপনার প্রতি শাপের পূর্বকথা ও মুক্তির বিবরণ শুনিতে চাই, অনুগ্রহ করে বলুন :—

ঝুমুর ঝুমুর নাচতে পারে
চোখের কাজল ঘষতে পারে
মুখময় সে ঘষতে পারে
টানতে পারে হামা
পেনি ছেড়ে পরবে এবার
ছোট্ট রঙীন জামা।
আশপাশে তার হাতের কাছে
ধরেছে যা-কিছু আছে
—ভাঙাচোরার মতন আছে
হানা দেবে এগিয়ে এসে, মানবে না সে মানা
জবাব দেবে নতুন কথায়—
দাঁত ফোটার দিন,
ওপর পাটি নীচের পাটি
দিচ্ছে উঁকি দু'চারিটি
—ছোট্ট সাদা দু'চারিটি
কুটুর কুটুর দাঁত।
ভাবছে কিবা গোড়া আগ্র—
হাসির দুলে দাঁত দেখিয়ে—
হাসছে হিহি হাসছে হা হা
করছে আসর মাৎ।
দাঁড়ায় ধরে চৌকী-চেয়ার
পড়ছে ধপাস নেইকো কেয়ার
উঠছে আবার হাসছে সে আর—
হাসে আর সে এগিয়ে আসে
হাঁটি হাঁটি পা পা
মনের খুশী উপচে পড়ে, থাকছে না আর চাপা
হাসছে হি হি হা হা—
আপনাকে সে তারিফ করে বা-আ বাবা বাপি।

সর্প কহিল :—শোন রাজা পূর্ব কথা : আমি পৃথিবীর ও স্বর্গের ছিলাম অধীশ্বর—দিব্য বিমানারোহণে যেতাম স্বর্গে, অভিমানে মনে হত আমার তুল্য মহাশক্তিমান নরপতি স্বর্গে মর্ত্যে কেহ নেই। আমার শিবিকা বহন করে নিত সহস্র ব্রহ্মর্ষি। শোন যুধিষ্ঠির সেই কুনীতি হতেই হল আমার সর্বনাশ।

শোন সেই কথা!

দয়া করে বলুন সর্প!

সেকথা শোন,—একদিন অগস্ত্য ঋষি আমার শিবিকা বহন করছিলেন, সে সময়ে আমার পদস্বারা স্পৃষ্ট হলেন। তখন ঋষি ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন—তুমি সর্পমূর্তি প্রাপ্ত হও। তিনি এইরূপ বলামাত্র, আমি ভ্রষ্ট হয়ে সেই বিমান হতে অধোমুখে পড়তে পড়তে আপনাকে সর্পরূপে দেখতে পেলাম। তখন বিমর্ষ-চিত্তে অগস্ত্যের নিকট আমার অভিশাপের প্রতিকার প্রার্থনা করে বললাম—আমি অহঙ্কারে বিমূঢ় হয়েছিলাম, আমাকে আপনি ক্ষমা

(শেষাংশ ১৬৯ পৃষ্ঠায়)
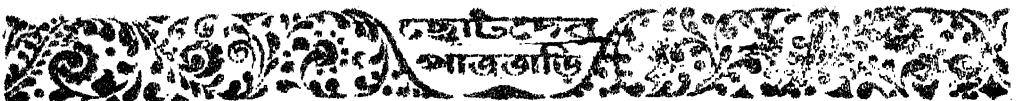
বরেন্দ্রভূমিতে চলন বিল নামে এক অতি বিস্তীর্ণ হ্রদ ছিল। বর্ষাকালে এই হ্রদের মাঝখানে থাকলে কূল-কিনারা নজর হোত না, এমনি ছিল বিরাট-বিস্তীর্ণ। এই হ্রদ এখন শুকিয়ে। কিছুই নেই এর শুধু স্মৃতি আছে। এ বহুশত বছর আগেকার কথা।

এই চলন বিলের মধ্যে একটা দ্বীপে এক ডাকাত থাকতো। একে বলতো লোকে পণ্ডিত ডাকাত। এই পণ্ডিত ডাকাতের দলবল চতুর্দিকে ডাকাতি করতো। এর নাম পণ্ডিত ডাকাত হোল কেন?

আসল নাম এঁর বেণী রায়। ইনি কুলীন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, আর নিরীহ গৃহস্থ ছিলেন। একজন মুসলমান সর্দার হঠাৎ এঁদের উপর ভয়ানক অত্যাচার করায় ইনি সংসার ত্যাগ করে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করেন। বেণী রায় খুব সবল, স্বাস্থ্যবান ও সাহসী ছিলেন। ইনি দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করাতে বহুলোক এঁর দলে এলো। বহু হিন্দু এঁর দলভুক্ত হোল। ইনি মুসলমানদের উপর জাতক্রোধ হয়ে চলনবিলের মধ্যে একটা দ্বীপে বাস করতে থাকেন, আর "যবন মর্দিণী" নামে এক কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। নানাদেশ থেকে মুসলমানদের ধরে ধরে এনে ইনি এই কালীর সম্মুখে বলি দিতেন, আর তাদের মুণ্ডুগুলি এক জায়গায় জড়ো করে রেখে, দেহগুলো চলনবিলে ফেলে দিতেন। তাঁর বাসের জায়গার নাম হোল, "পণ্ডিত ডাকাতের ভিটা।" মুসলমানেরা বলতো, "শয়তানের ভিটা।"

মুসলমানেরা তাঁকে শয়তান বলতো বটে, কিন্তু তিনি শয়তানের মতো নিষ্ঠুর ছিলেন না। ডাকাতি করতে গিয়ে কারো উপর অত্যাচার করতেন না। দরিদ্র হিন্দুর কখনো কোনো অনিষ্ট করেননি। তাঁর যত জুলুম ছিল ধনীদের উপর। তিনি ধনীদের ধন নিতেন, কিন্তু অকারণে কারো প্রাণ নিতেন না। অনর্থক অনিষ্ট করতেন না। স্ত্রীলোকের গায়ে বা বালক-বালিকার গায়ে অলংকার থাকলে সে সব কেড়ে নিতেন না। তাঁর উপর মুসলমানের অত্যাচার হওয়াতেই তাঁর মনোভাব বদলে গিয়ে, তিনি ডাকাত বা দস্যু হয়ে ওঠেন। কিন্তু সত্যিই কি তিনি ডাকাত বা দস্যু ছিলেন? তা ছিলেন না। যে ধন তিনি লুঠ করে আনতেন, সে সব গরীব-কাঙালদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন, "আমি ধনীদের কাছ থেকে সাহায্য নিই মাত্র। ধনীরা যদি আমায় প্রকাশ্যভাবে দান করে, তবে মুসলমান সরকার ধনীদের দণ্ড দেবে—শাস্তি দেবে। সেই কারণেই ধন লুঠ করা হোল আমার কাজ।"

কোন হিন্দু জমিদার বেণী রায়কে দমন করবার চেষ্টা করেন না। বেণী রায় সদলে কোন বাড়ীতে উপস্থিত হলে, যদি বাড়ীর সম্মুখে কিছু অর্থ, কাপড় বা খাবার ইত্যাদি রেখে দেওয়া হোতো, তো তিনি তাই নিয়ে চলে যেতেন। বাড়ীর মধ্যে ঢুকতেন না লুঠ করবার জন্য কাউকে কিছু বলতেন না।

গল্প আছে যে, এক বড় জমিদারের বাড়ীতে মেয়ের বিবাহ হচ্ছিল, খুব ধুম-ধাম, খুব বাজনা-বাদ্য, খুব খাওয়া-দাওয়া, খুব আনন্দ বহুলোকের নিমন্ত্রণ। এমন সময় ডাকাত বেণী রায় সদলে হৈ-হৈ করতে করতে এসে হাজির। সর্বনাশ! কি উপায় হবে? মহা ভয় সকলের। এখনি লুঠপাট করে নিয়ে পালাবে। জমিদার মশাই সকলকে অভয় দিয়ে বললেন, "কোন ভয় নেই, আমি ব্যবস্থা করেছি।" বেণী রায়ের সম্মুখে এগিয়ে এসে বললেন, "বাবা ঠাকুর, আপনার প্রণামী আগেই রেখে দিয়েছি, [illegible] এই নিন।" এই বলে বেণী রায়ের হাতে বড় এক টাকার থলি প্রণামী দিলেন। বেণী রায় তাই নিয়ে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন। বেণী রায়ের ডাকাতি ছিল এই রকমের।

বেণীরায় ব্রাহ্মণ তো! তিনি সাতোড়ের সান্যালদের [illegible] ভদ্রবংশীয়। এ রকম হয়েছিলেন কেন, আগেই তা বলেছি। সাতোড়ের বিখ্যাত সান্যাল বংশের অনেকে তাঁর দলভুক্ত হয়। অনেক কায়স্থও তাঁর দলে আসে। এর ভেতর সান্যালদের যুগলকিশোর সান্যাল ও কায়স্থ চণ্ডীপ্রসাদ রায় ছিল প্রধান।

এই ডাকাতির কাজ শেষে কিন্তু তিনি ছেড়ে দিলেন। কি করে ছাড়লেন? আকবর বাদশার সেনাপতি রাজা মানসিংহের ভাই ঠাকুর ভানু সিংহ এঁকে দমন করবার জন্য এলেন বাংলা দেশে। [illegible] সমস্ত হিন্দু-জমিদারদের তলব করলেন। জমিদারেরা তাঁকে বেণী রায় সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। তাঁর দানের কথা, লোকের হিতচেষ্টার কথা, তিনি যে অত্যাচারী নন, সে কথা সব [illegible] বোঝালেন। শেষে বললেন, বেণী রায়কে সদ্ভাবে বশে আনতে হবে। বলপ্রয়োগ করলে বহু লোকের অনিষ্ট হবে এবং তা সফল নাও হতে পারে।

ঠাকুর ভানু সিংহ বিবেচক ছিলেন। এই সব কথা শুনে বেণী রায়ের উপর তাঁর শ্রদ্ধা হোল। তিনি তাঁকে সদ্ভাবে বশে আনবার সংকল্প করলেন। বলে পাঠালেন বেণী রায়কে, 'আপনি ব্রাহ্মণ, ভদ্রবংশীয় এবং গুরুস্থানীয়। একজন মুসলমানের অপরাধে, অন্য সব নির্দোষ মুসলমানদের হিংসা করা কি ধর্মসঙ্গত কাজ? একথা আপনি বিবেচনা করুন। আপনি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়। আমি আপনার অনিষ্ট করতে চাই না। আপনি শান্তি গ্রহণ করুন। শান্তি গ্রহণ করলে আপনি যথেষ্ট পুরস্কৃত হবেন।'

ভানু সিংহের কথায় বেণী রায় শান্ত হলেন। চারিদিক তখন শান্ত হোল। ফল খুব ভালই হোল। বেণী রায় পেলেন এক পরগণা জমিদারী, আর তাঁর কালীদেবীর জন্য বারোশত বিঘা দেবত্র জমি। বেণী রায়ের অনুরোধে যুগলকিশোর সান্যাল পেলেন জমিদারী এবং চণ্ডীপ্রসাদ রায়ও পেলেন জমিদারী। উপরন্তু, চণ্ডীপ্রসাদ নবাবী দরবারের পেস্কারের পদ পেলেন।

মুসলমানেরা কিন্তু খুব অসন্তুষ্ট। তারা যুগলকিশোর সান্যালকে বলতো, "কাল জোগলা" আর চণ্ডীপ্রসাদকে বলতো "কাল চণ্ডিয়া।" লোকেরা বেণী রায়ের দলের লোকদের বলতো "বেণী পঠীর কুলীন।" পণ্ডিত ডাকাত আর তাঁর চেলাদের বীরত্ব, দয়া, চতুরতা এবং প্রতিহিংসার অনেক অনেক গল্প শুনতে পাওয়া যেতো রাজসাহী, পাবনা, বগুড়া প্রভৃতি স্থানে। এসব বহুকালের কথা। সে মহিমময় চলনবিলও এখন লোপ পেয়ে গেছে।
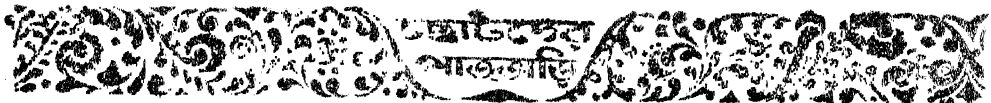
পূজোর বাজার করতে হবে শুনেই দাদুর রাগ,
ঢাকের বাঁদা গরম করে তুলছে মাথার টাক।
কোন কথা বলতে গেলেই বলেন—'ওসব থাক্
এখন কেবল আসল কথা হোক্।'
কী যে তাঁহার আসল কথা, বলেন না তো খুলে,
মাথায় রেখে গামছা ভিজে বেড়ান দুলে দুলে,
ভাবনাতে তাঁর নধর ভুঁড়ি পড়ছে যেন ঝুলে
ভাঁটার মত ঘুরছে দুটি চোখ।

কেমন করে করবো বাজার লোকের ভিড় ঠেলে!
গাঁটকাটারা আসবে ছুটে টাকার গন্ধ পেলে।—
দাদুর কথা ঠানদি শুনে নয়ন দুটি মেলে
বলেন—'বুড়ো, মরণ তোমার নেই?'
নাকের ভেতর নাসাপুরে নিটোল শরীর নিয়ে
চুপটি করে থাকেন দাদু ঘরে দুয়ার দিয়ে,
ঠানদি শেষে বসেন ধ্যানে শ্রীঠাকুরঘরে গিয়ে,
হারিয়ে গেল আসল কথার খেই।

দাদুর কাছে টাকার তোড়া, ঠানদি রাখেন চাবি
চেঁচিয়ে বলি মানতে হবে মোদের পুজোর দাবী,
কাকার চিঠি পাইনি আজো, বাবার কথা ভাবি,
এমনদিনে দুজন কেন দূরে?
পরছে সবাই নতুন কাপড়, নতুন জামা-জুতো,
মনের ঘুড়ি উড়িয়ে শুধু ছাড়ছি মোরা সুতো।
এবার বুঝি পুজোর সময় আমরা খাবো গুঁতো
দাদুর মত দেখিনি ভাই কুঁড়ে।
দল বেঁধে সব করতে থাকি জোরসে পিকেটিং,
টেলিফোনের উঠছে আওয়াজ কেবল ক্রিং ক্রিং!
চাকরটারে ডাকেন দাদু—কোথায় রাম সিং
তিড়িং বিড়িং করতে থাকেন ঘরে।
'মোদের দাবী মানতে হবে' বলতে থাকি সবে,
পাড়ার লোক পালিয়ে গেল মোদের কলরবে।
বাজিয়ে ঢাক দাদুর দ্বারে সন্ধি হোলো তবে,
পুজোর বাজার করতে যাবো পরে।

অমরনাথ তীর্থের নাম সবারই জানা। কাশ্মীরের পূর্ব কোণে হিমালয়ের বুকে তুষারলিঙ্গ অমরনাথের মন্দির। তীর্থ যাত্রীদের কাছে হিমগিরি শিরে অবস্থিত কেদারনাথ আর বদরীনাথ মন্দিরের চেয়ে অমরনাথ অধিকতর আকর্ষণীয়। কিন্তু অমরনাথের পথ আরও বেশি দুর্গম। যাত্রাও বিপদসংকুল। তাই অনেকেরই ইচ্ছা থাকলেও বেশি লোক যেতে পারেন না।

বহুদিন আগে এমন এক সময় ছিল যখন অমরনাথ তীর্থে যাঁরা আসতেন তাঁরা আর বাড়ী ফিরে যেতেন না। তবে কি তাঁরা মন্দিরে থেকে যেতেন? না। মন্দিরে থাকা অসম্ভব। ছমাস মন্দির বরফে ঢাকা থাকে। তাহলে তীর্থযাত্রীরা অমরনাথ দর্শনে এসে কোথায় থাকতেন? তাঁরা সশরীরে স্বর্গে যাবার লোভে উঁচো পর্বতের উপর থেকে উঁচো পাহাড়ের খাদে ঝাঁপ দিয়ে পরে প্রাণ বিসর্জন দিতেন। ধর্মের নামে পাগল যারা, ধর্মের জন্য তাঁদের অসাধ্য কাজ কিছু ছিল না।

অমরনাথ তীর্থ কাশ্মীর রাজ্যের এলাকার মধ্যে পড়েছে। কাশ্মীর সরকারের চেষ্টায় ধর্মের নামে এই আত্মহত্যার অনুষ্ঠান অনেকদিন হোল বন্ধ হয়েছে। পথের কষ্টও আজকাল অনেক কমেছে। এখন কাশ্মীর প্রান্তের পহলগাম পর্যন্ত মোটর গাড়ীতে যেতে পারা যায় এমন ভাল রাস্তা তৈরি হয়েছে।

অমরনাথ যাত্রীদের মন্দিরে যাবার যা কিছু প্রয়োজনীয় আয়োজন সব এই পহলগামে এসে করতে হয়। ঘোড়া, ডাণ্ডী, ঝাম্পান, কুলি সবই এখানে পাওয়া যায়। অনেকে পথের মাঝে বিশ্রামের জন্য তাঁবুও সঙ্গে নেন, যদিও মাঝে মাঝে পথের ধারে যাত্রীদের অবস্থানের জন্য চটি আছে একাধিক। কিন্তু এক চটি থেকে আর এক চটিতে যাবার দূরত্ব অনেকখানি। তাই কেউ কেউ তাঁবু সঙ্গে রাখেন। যেখানে প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব মনোরম, স্নান ও পানের জল পাওয়া যায় সেখানেই তাঁরা তাঁবু গেড়ে দুএকদিন থেকে যান।

পহলগাম কাশ্মীরের একটি অতি সুন্দর পার্বত্য জনপদ। এ স্থানটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় সাত হাজার দুশো ফিট উঁচুতে। কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর থেকে একষট্টি মাইল দূরে। চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা বরফে ঢাকা একটি ছোট্ট মনোরম উপত্যকা। কোলাই আর শেষনাগ এই দুটি শৈল-স্রোতস্বিনীর সঙ্গমস্থল। এখান থেকে যে পথটুকু অতিক্রম করে মন্দির পর্যন্ত যেতে হয় সেটি সত্যিই বড় দুর্গম। কিন্তু, এই পথের দুপাশে যে অপূর্ব সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য তা ভারি নয়নাভিরাম।

নদীর ধারে ধারে সরু পথটি এঁকে বেঁকে চলেছে অবশ্য, মাঝে মাঝে পাহাড়ের চূড়ো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে এই পথের অখণ্ডতাটুকু ক্ষুণ্ণ করায় যাত্রীদের একটানা গতি ব্যাহত হয়। পার্বত্য
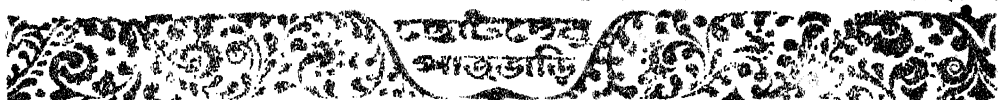
নদীগুলো ছোটই হোক আর বড়ই হোক, মনে হয় ওরা যেন স্বভাবতঃই পাগল। ক্ষিপ্রবেগে ছুটেচে পথ চিরে, পাহাড় ফুড়ে! কঠিন শিলা বিক্ষুব্ধ তাদের বক্ষ। এই নদীগুলোর দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকলে বুকের ভিতরটা কেমন যেন আতঙ্কে গুরুগুরু করে ওঠে। মনে হয় এই বুঝি টেনে নিলে!

তীর্থযাত্রীরা পহলগ্রাম থেকে যে যার প্রয়োজন মতো পথের খাদ্য সংগ্রহ করে নেয়। কারণ পথের ধারে দোকানপাট কিছু নেই। পরবর্তী চটিতে না পৌঁছানো পর্যন্ত ভোজ্য ও পানীয় পাবার সম্ভাবনা নেই। পহলগ্রাম থেকে ন'মাইল এগিয়ে এলে 'চন্দনবাড়ী' বলে একটি আস্তানায় এসে পৌঁছানো যায়। চন্দনবাড়ী ৯৫০০ ফিট উঁচুতে। যাত্রীরা সবাই পাহাড়ের চড়াই ওতরাই ভেঙে এই ন'মাইল পথ হেঁটে উপরে উঠে এসে তবে একটু বিশ্রাম করবার আশ্রয় পায়।

চন্দনবাড়ী থেকে পথ আরও বেশি কঠিন এবং কষ্টকর। চন্দনবাড়ীতে এলে ফুলের শোভা দেখে চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। চারিদিকে অজস্র বনফুলের ছড়াছড়ি। যেন পাহাড়ের উপর কারা ফুলশয্যা রচনা করে রেখেছে। অসংখ্য ভূর্জতরুর ঘনকুঞ্জে চন্দনবাড়ীর পাষাণ অঙ্গ যেন শ্যামস্নিগ্ধ সৌন্দর্য অপরূপ হয়ে উঠেছে। আশে-পাশে পার্বত্য নির্ঝরিণীর মৃদু কলধ্বনি যেন গান গেয়ে গেয়ে সারাটা পথ যাত্রীদের সঙ্গী হয়ে তাদের পথশ্রম নিবারণ করছে।

এখানে শেষনাগ স্রোতস্বিনীর উপর একটি সুমোহন তুষার সেতু আছে। এই আশ্চর্য বরফের সেতুটি দেখে যাত্রীদের বিস্ময় ও আনন্দের অবধি থাকে না। চারিদিকে এমন একটি স্তব্ধ মধুর শান্তি আর প্রকৃতির পরিপূর্ণ বিশ্রান্তিভরা নিভৃত নির্জনতা বিরাজ করছে যে কল-কোলাহলময় নগরের কর্মক্লান্ত মানুষের মন এখানে এসে একটা পরম প্রশান্ত আরাম অনুভব করে। তার সমগ্র চিত্ত এমনভাবে এই গিরিভূমির অপূর্ব সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে যে এস্থান ছেড়ে আর এক পাও তার যেতে ইচ্ছে করে না।

কিন্তু এখানে রয়ে গেলে যে অমরনাথ দর্শন হবে না। তাই চন্দনবাড়ী ছেড়ে যেতেই হ'ল এগিয়ে। চন্দনবাড়ীর পর থেকেই খাড়া চড়াই শুরু হয়ে যায়। প্রায় দেড় মাইল পথ এইভাবে উপরদিকে উঠে চলেছে। একে বলে পিশুখাটি। ভীষণ ঠান্ডা এখানে। হাড়ের ভিতর পর্যন্ত যেন কন্‌কন্ করে ওঠে! অমরনাথ যাত্রাপথের এই অংশটুকুই সবচেয়ে কঠিন ও দুরারোহ। এখানে পথের দু'ধারে অসংখ্য লতা-গুল্ম। কিন্তু সবগুলিই দারুণ বিষাক্ত। এই বিষাক্ত লতাগুল্মের সঙ্গে মিলেমিশে এত অজস্র সুন্দর বনফুল ফুটে থাকে যে, পুষ্পপ্রিয় পথিকেরা এই পিশুখাটির পথে ফুলের লোভ সম্বরণ করে সাবধানে ও সতর্কভাবে না চললে বিপন্ন হয়ে পড়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। কারণ এই লতা গুল্ম গায়ে ঠেকলেই সর্বাঙ্গ বিষিয়ে উঠবে।

কোনও রকমে কষ্ট স্বীকার করে এই পিশুখাটি উত্তীর্ণ হয়ে শৈল শিখরে পৌঁছতে পারলে যাত্রীদের পথশ্রমের সমস্ত ক্লান্তি যেন নিমেষে দূর হয়ে যায়। এখানে এসে ভূর্জ তরুর কুঞ্জ ঘেরা ছোট্ট একটি স্নিগ্ধ শ্যামল অঙ্গনে দাঁড়িয়ে চারিদিকের কুসুম সমারোহে ঘেরা তাজা সবুজের শোভায় দুই চোখ যেন জুড়িয়ে যায়! এতক্ষণ আমাদের দৃষ্টিকে যেন ঝলসে দিয়ে চারিদিকের তুষার-স্তূপ ক্রমাগত পীড়া দিচ্ছিল। অবশ্য এখানে যে তারা একেবারে অদৃশ্য হয়েছে তা নয়। তুষার কিরীটিনী? গিরি শিখর মালা অদূরেই আমাদের চারিদিক ঘিরে যেন দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে মনে হয়। কিন্তু, সবুজের স্নিগ্ধ শ্যামলতার কাছে তারা যেন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

এই জায়গাটি এমন একটি আশ্চর্য সুন্দর শৈল-প্রাঙ্গণ যে, তার সৌন্দর্য দেখতে দেখতে মনে হয় যেন একটুকরো স্বর্গ বুঝি কেমন করে পৃথিবীর বুকে খসে পড়েছে! কাশ্মীরকে কেন লোকে 'স্বর্গ' বলে—তার রহস্য এখানে যেমন পরিস্ফুট হয়েছে তেমনটি আর কাশ্মীরের অন্য কোথাও চোখে পড়ে না। দাল লেক, উলা[...] তীর, শ্রীনগরের শোভা, নিশাতবাগ, সালেমার বাগ, চাশমাসাই প্র[...] কাশ্মীরের যে সব প্রসিদ্ধ আকর্ষণীয় স্থান, এখানে এলে মনে হয় সব কত তুচ্ছ! এ স্বর্গীয় দৃশ্য দেখে যাবার সৌভাগ্য যাদের হবে তাদের স্মৃতিপটে এর অপরূপ রূপ অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। যাঁরা ভ্রমণের দিনলিপি রাখেন তাঁদের খাতার পাতায় এই পর[...] প্রকৃতির সৌন্দর্যের স্মরণিকা আজীবন অক্ষয় হয়ে থাকবে।

কিন্তু প্রদীপের আলোক শিখার নীচেই যেমন অন্ধকার বিরা[...] করে তেমনি এখান থেকে যে পথে অগ্রসর হতে হয়।তা আরও দু[...] আর বিপজ্জনক। খুব সরু এতটুকু এক পায়ে চলা পথ। পথ[...] মাঝে মাঝে পার্বত্য ঝর্ণা আর গিরি প্রস্রবণের বুকের উপর দিয়ে চ[...] গেছে। পথের একদিকে আকাশ-ছোঁয়া সুদৃঢ় কঠিন পাষাণ প্রা[...] যেন কেবলই একপাশ থেকে পথিকদের ধাক্কা দিচ্ছে বলে মনে হ[...] আর অন্য পাশে একেবারে অতল গভীর পাতালস্পর্শী খাদ[...] পথিককে গেলবার লালসায় পাশে পাশে হাঁ করে চলেছে। চলতে চল[...] সেদিকে চাইলে দুঃসাহসী তরুণদের কি মনে হয় জানি না, কি[...] আমাদের মতো প্রবীণ মানুষদের সহসা মাথা ঘুরে যায়। আমার মি[...] পাহাড়ে চড়ায় অভ্যস্ত অতি সাবধানী ঘোড়াগুলোরও এ পথে [...] ফেলতে নিশ্চয় পা কেঁপে ওঠে। আর পাহাড়ী ডান্ডীওলা কুলিদে[...] বোধকরি প্রাণ হাতে করে এগুতে হয়। কারণ নিজেদের ভুলে ক্ষণি[...] দুর্বলতায় এতটুকু পদস্খলন হলেই তৎক্ষণাৎ একেবারে এক মুহূর্তে[...] অনন্ত সমাধি সুনিশ্চিত।

এই সঙ্কটময় পথে প্রাণটি হাতে নিয়ে পাঁচ মাইল রাস্তা ম[...] বাঁচি করে কোনও রকমে পার হয়ে আমরা এসে পড়লুম একেবা[...] শেষনাগের উৎস মুখের স্নিগ্ধ সরোবরে। এই শেষনাগের নি[...] সরোবরটি আমাদের কৈলাস পর্বতস্থ মানস সরোবরের অপূর্ব শো[...] ও সৌন্দর্য স্মরণ করিয়ে দেয়। এর অনিন্দ্য-সুন্দর রূপ শু[...] অবর্ণনীয় নয়, অনির্বচনীয়ও বটে! মনে হয় এ শোভা, এ রূপে[...] বুঝি আর তুলনা নেই!

এই শেষনাগ উপসাগরের তিনদিকে গগন-স্পর্শী পর্বতশ্রে[...] যার আপাদ-মস্তক চির-তুষারাবৃত। এই নিরবচ্ছিন্ন নীহার মুকু[...] ধারী শৈলরাজি থেকেও অসংখ্য জলপ্রপাত ও গিরি-নির্ঝর ঝর[...] শব্দে ঝরে পড়ছে সেই উপসাগর বক্ষে। এখানে এত ঠান্ডা যে ম[...] হয় যেন শরীরের রক্তও বুঝি জমাট বেঁধে বরফ হয়ে যাচ্ছে। কিন্[...] তবুও দেখে দেখে যেন আশ মেটে না। গিরি-প্রস্রবণগুলি যেন স্ব[...] স্ফটিক ধারার মতো ঝক-মকিয়ে ঝরে পড়ছে। এ-জল যেমনি সুস্বা[...] তেমনি তৃষাহরা। আমাকে জল পান করতে দেখে সাথীরা চমকে উ[...] বললেন, 'খেয়ো না! খেয়ো না! এমন পেটের অসুখ ধরবে যে [...] আর সারবে না!' কিন্তু আমি আজও নীরোগ!

এইবার আমরা তুষারাচ্ছন্ন গিরি বেষ্টনীর মধ্যে 'পাঁচতর[...]' বলে একটি জায়গায় এসে পড়লুম। এখানে পাশাপাশি পাঁচটি নদী যেন পঞ্চবানের মতো তীরবেগে ছুটেছে! এদের এই অপূর্ব নৃত্য[...] ভঙ্গীতে পাশাপাশি যাওয়ার দৃশ্য ভারি চমৎকার লাগলো। পাঁচতরণী[...] তীরে এসে পৌঁছবার আগে আরও অনেকগুলি পার্বত্য নদী পার হ[...] আসতে হয়েছে। মাটির বুকের নদীর চেয়ে পাহাড়ের বুকের এ[...] নদীর রূপ অনেক সুন্দর। এখানে আর এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখলুম[...] এতক্ষণ তুষার শুভ্র হিমানী দেখে এসেছি, এবার কাজল কালো কৃষ্ণব[...] তুষাররাশি চোখে পড়লো। মনে হল রজতগিরি সন্নিভ শিব যেন ঘোর[...] ঘনপ্রভা কালী মূর্তি ধরেছে।

এখান থেকে অমরনাথের মন্দির আর মাত্র পাঁচ মাইল পথ[...] আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। তবে আর কি? এসে পড়েছি তো[...] অমরনাথের মন্দির শুনে কেউ যেন কেদার বদ্রীর মন্দির মনে কোর না।
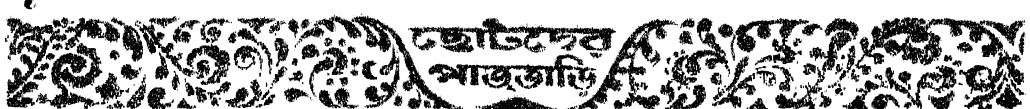
অমরনাথের মন্দির একটি পর্বতগুহা মাত্র! এই গুহামুখের আড়াই মাইল পথ একেবারে বরফে-ঢাকা! এই চিরন্তন অক্ষয় তুষার পিন্ডের উপর দিয়েই যাত্রীদের হেঁটে যেতে হয়। গুহার মুখের কাছে এক মাইল পথ বেশ সোজা। অনেক চড়াই উৎরাই ভেঙে এই পথে এসে যাত্রীরা খুব যেন আরাম পায়। এই পথের দুপাশে দুটি উঁচু পাহাড়। একটিকে বলে এরা 'কৈলাস', আর একটি সেই আগেই বলে রেখেছি ভৈরো। পাহাড় দুটিকে দেখলে ভয় করে, মনে হয় যেন দুই দৈত্য পাহারা দিচ্ছে! কিন্তু এদের গা-বেয়েও ঝর্ণা নেমে আসছে। আর এর জল ঠিক দুধের মতো ধবধবে সাদা!

এইবার আমরা এসে অমরনাথের গুহামন্দিরে প্রবেশ করলুম। প্রকাণ্ড গুহা। ষাট ফিট লম্বা আর পঞ্চান্ন ফিট চওড়া। উঁচু হবে প্রায় ৪৫ ফিট। অর্থাৎ চারতলা বাড়ীর সমান। পাহাড়ের যে অংশের পাথর কেটে এই গুহা তৈরি হয়েছে শিলাতত্ত্ববিদরা সে পাথরকে বলে জিপসাম। দেরাদুনের 'সহস্র ধারা'র মতো এ-গুহার ছাদ দিয়েও চুইয়ে চুইয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে জল পড়ে। কিন্তু এর সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, যা' বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরাও অনেক চেষ্টা করে বুঝতে পারেন নি সে হল এই গুহার মাঝামাঝি এক জায়গায় ছাদের জল ঝরে পড়ে বরফ হয়ে জমে উঠছে অবিকল তুষারে তৈরি একটি শিবলিঙ্গের মতো! এই শিবলিঙ্গের আকার সম্পূর্ণ হতে পনেরো দিন লাগে। প্রতি পূর্ণিমায় এই তুষারে গঠিত শিবলিঙ্গটি পূর্ণ রূপেতে প্রকাশ হয়! তারপরই কিন্তু গলতে আরম্ভ করে এবং ঠিক পনেরো দিন পরে অমাবস্যা তিথিতে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সে এক আশ্চর্য অদ্ভুত বিস্ময়কর ব্যাপার! আরও আশ্চর্য এই যে, এ তুষার গঠিত শিবলিঙ্গের বর্ণ কিন্তু তুষার শুভ্র নয়। একেবারে মনে হয় যেন পান্নায় গড়া উজ্জ্বল সবুজ বর্ণ জহরতের মূর্তি। আর শেষ আশ্চর্য হল এই ঠাণ্ডা বরফের গুহার ভিতর একজোড়া পায়রা থাকে। এখানকার লোকেরা বলে এই কপোত-কপোতী নাকি হর-পার্বতী! অনাদি কাল থেকেই মৃত্যুঞ্জয় হয়ে এখানে বাস করছে। গুহার ভিতরটা যেন পাতাল গর্ভের মতো নিস্তব্ধ কিন্তু ঠাণ্ডা খুব বেশি।

ভীমসেন ও সাপ

(১৬৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

করলে আমার অভিশাপের ক্ষান্ত হউক, তখন তিনি দয়া করে বলেছিলেন—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে শাপ হতে মুক্ত করবেন। তোমার অহঙ্কার ও অভিমান ক্ষয় হলে তুমি পুণ্যফল প্রাপ্ত হবে। পরে তাঁর সেই তপোবল দেখে আমার বিস্ময় হয়েছিল। তাই তোমাকে আমি ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করেছিলাম। মহারাজা! তোমার মহাবল ভ্রাতা মুক্ত হলেন—তোমার মঙ্গল হউক, আমি পুনরায় স্বর্গে গমন করি।

মহারাজা নহুষ সর্পদেহ ত্যাগ করে দিব্য দেহ ধারণ করে স্বর্গে গমন করলেন।

যুধিষ্ঠির ঋষি ধৌম্য এবং ভ্রাতা ভীমসেনসহ আশ্রমে ফিরে এলেন। অর্জুন এবং সকল ভ্রাতাদের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন।

তপোবনের ঋষিরা সকলে পাণ্ডবদের হিত কামনা করিয়া মহাবল ভীমসেনকে ভয়মুক্ত দেখিয়া কহিলেন—শোন ভীমসেন, কোন দুঃসাহসিক কাজে হাত দিও না।

পাণ্ডবদের সকলকে জয়যুক্ত হবার আশীর্বাদ করিয়া ঋষিরা নিজ নিজ তপোবনে চলিয়া গেলেন।

সম্পাদক-বুড়ো দাদার তাগিদের তো অন্ত নেই!—'পাততাড়ির লেখা তাড়াতাড়ি পাঠাও!' যেমন তেমন একটা কিছু লিখে পাঠালেই খুশি হবেন না তিনি। ফরমাস দিয়েছেন—জ্ঞান-বিজ্ঞানের লেখা চাই, বছর বছর যেমন লেখো।

তাই সেদিন খুব তোড়জোড় করে, মরিয়া হয়ে কাগজ-কলম নিয়ে বসে পড়লাম পাততাড়ি পেতে। কলম কাগজ কাজে লাগবে, মগজ থেকে কিছু বেরুলে। কিছু বেরুতে চায় না। ভেবেই পাই না ছাই, কি নিয়ে লিখি। কলমটার মাথা কামড়াচ্ছি, আর ভাবছি।

তেমন সময় হঠাৎ ঘরের বাইরে একটা ভয়ানক সোরগোল—ভীষণ চীৎকার—! 'গঙ্গা-ফড়িং! গঙ্গা ফড়িং!'

গোলমাল সদলবলে ঘরে ঢুকে পড়লো—দেখি সন্টু, নিতু, মিঠু, শঙ্কর, মনুয়া পঞ্চপাণ্ডব! একেবারে তাণ্ডব নৃত্য!

কী ব্যাপার! দেখি সন্টু মাস্টার কোঁচার খুঁটে কী যেন একটা মুঠো করে চেপে নিয়ে এগুচ্ছে—আর ওরা চেঁচাচ্ছে 'গঙ্গা ফড়িং—গঙ্গা ফড়িং!' লাফাচ্ছে তিড়িং বিড়িং করে!

আমিও লাফিয়ে উঠে বললাম—"কোথায় রে গঙ্গা ফড়িং!"—"এ্যাইতো দেখ না! বলেই সন্টু কোঁচার খুঁটের পুঁটলী পাকানো জায়গাটা একটু ফাঁক করলে, ফাঁক করতেই তড়াক্ করে আমার বিছানায় লাফিয়ে পড়লো—ইঞ্চি তিনেক লম্বা সবুজ রঙের মস্ত একটা গঙ্গা-ফড়িং।

আর যায় কোথা! ফড়িং-শিকারীর দলও হাঁউ-মাঁউ করে চেঁচিয়ে উঠলো—"ধরো ধরো শিগ্গিরী ধরো নইলে ওটা পালিয়ে যাবে।" ওটা পালিয়ে যাবে।" "না! বাপুরা ক্ষান্ত হও, অত সহজে উনি পালাবার পাত্র নন্। ওটি একটি রীতিমতো রাক্ষস!"

'রাক্ষস' কথাটা শুনেই—সব কটি বীর আঁৎকে উঠে, শিউরে সরে দাঁড়ালো। গঙ্গা ফড়িংটা তখন লম্বা লম্বা ঠ্যাং বাড়িয়ে এগুচ্ছে আর মাথার ওপরের শুঁড় আর চোখ দুটো ঘোরাচ্ছে।

সন্টু বললে—"রাক্ষসটাকে তাড়িয়ে দাও তুমি তাহলে!"

—"তাড়িয়ে দিলেও এখন উনি যাবেন না! তোমরা ওকে ধরে এনেছ, টেপন-টাপোন দিয়ে চটিয়েছ যে!

শঙ্কর বললে—"তোমার জন্যেই তো ধরে এনেছি—তুমি যে বলেছিলে—নতুন কিছু দেখলেই ধরে আনবি, গল্প বলবে, লিখবে তাকে নিয়ে নতুন লেখা।"

মিঠু বলল—"রাক্ষস যখন ধরে এনেছি তখন—রাক্ষসের গল্পই লেখো—খুব মজা হবে।"

নিতু বললে—"ধোৎ! বাজে কথা, গঙ্গা ফড়িং বুঝি রাক্ষস হতে পারে। ওসব মৌমাছির বানানো কথা।"

মনুয়া এতক্ষণ চুপ করে ছিল বললে—"রাক্ষসরাতো সব খায়, গঙ্গা ফড়িং কি খায় বলতো?"
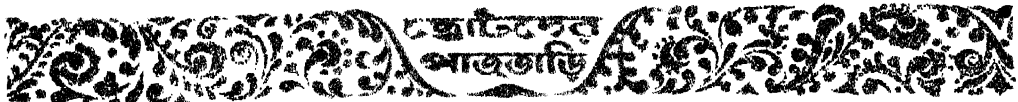
গম্ভীরভাবে বললাম—"সব খায় ওরা—পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা ওরা খায় না। দড়িতে শুকুতে দেওয়া গামছাটার খানিকটা খামচা মেরে খেয়ে ফেলতে পারে। ঘাস, পাতা, শেকড় সবই খেয়ে থাকেন ওঁরা। এক রাত্তিরেই শাক-সব্জীর ক্ষেত ওরা উজাড় করে দিতে পারে, দল বেঁধে এলে। এমনকি গঙ্গা ফড়িংরা নিজেদের জাতভাইদের মরা দেহগুলোও খায়। জ্যান্ত জাতভাইদেরও তাড়া করে—ধরে ধ'রে খায়। চাষের ক্ষেতে ঘুমন্ত মানুষকে ওরা আক্রমণ ক'রে মাংস কুরে খেয়ে যায়। পচা-মরা জন্তু-জানোয়ারতো ওদের নেমতন্ন বাড়ির ভোজ রে বাপু!"

আমার কথা শুনে ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকে।

শংকর বললে—"আগের জন্মে ওরা রাক্ষস ছিল, এখন গঙ্গা ফড়িং হয়েছে।"

মিঠু সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো—"ওদের জন্ম কবে হয়েছে তাহলে?"

আমি বললাম—"মানুষের আদি-পুরুষরা যখন বনে বনে ঘুরে বেড়াতো—গুহায় থাকতো—তখনও ওরা ছিল। ওদের সঙ্গে মানুষদের লড়াই করতে হতো তখনও, এসব কিন্তু বইতেই লেখা আছে।

"মানুষের চিরকালের শত্রু ওরা। বরাবরই গঙ্গা ফড়িং বা পঙ্গপালের দল মানুষের ক্ষতি করে আসছে। প্রতি বছর গড়ে ওরা চাষের ক্ষেতে হামলা করে পৃথিবীর প্রায় তিরিশ-চল্লিশ কোটি টাকা ক্ষতি করে দেয়। এক আমেরিকাতেই এখনও প্রতি বছরে গড়ে ২৫ কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয়, তোমার ঐ গঙ্গা ফড়িংটির জাত-ভাইদের অত্যাচারে।

"উ রেঃ বাস্‌রে—গঙ্গা ফড়িংরা সাংঘাতিক তো তাহলে!" বললে সন্টু। "কখন, কেমন করে ওরা ফসল আর গাছ-পালাগুলো খায়?"—"যখন আবহাওয়া বেশ গরম শুকনো থাকে, তখনই ওদের খিদেটা চন্‌চনে হ'য়ে বেড়ে ওঠে। খাই খাই করে ছোটে তখন কোটি কোটি পঙ্গপাল। দল বেঁধে উড়ে গিয়ে নেমে পড়ে ক্ষেতে, বাগানে, মাঠে। ওরা ধান, গম, যব ও আর আর ঘাস ও গাছ-পালার শীষ বা ডগাটাতে নেমে পড়ে। সেখান থেকেই খেতে শুরু করে কুরে কামড়ে। ওরা সময় সময় এমনি ক'রে গাছ-পালার মাথা মুড়িয়ে খেয়ে যায় যে কয়েক বছরের মতো তাদের বাড়-বাড়ন্তের দফা-রফা!" সন্টু বললে—"উরে বাস্‌রে। কী সর্বনেশে রাক্ষস!"

"আরে বাপু! এছাড়া আরও সর্বনাশ, আরও ক্ষতি করেন ঐ গঙ্গা ফড়িংয়ের জাতভাইয়েরা। ক্ষেত-খামার ছাড়া—মালের গুদাম, মালগাড়ী, মাল জাহাজে ঢুকে পড়েও মালপত্তরের বাণ্ডিল, গাঁট-গাঁটরির দড়ি, টোয়াইন, সব কামড়ে কেটে দিয়ে অনেক ক্ষতি, অনেক অসুবিধা করে মানুষের। তাছাড়া ঘরের কার্পেট, দরজা-জানলার পর্দায় যদি এসে বসতে পারেন তোমার আমার চোখে ধুলো দিয়ে তাহলে ঘন্টা খানেকের মধ্যেই খুবলে খাবলে খেয়ে যাবেন খানিকটা! সৈন্য-সেপাইদের ছাউনি যেখানে পড়ে—তাদের তাঁবু আক্রমণ ক'রে ওরা কয়েক ঘন্টার মধ্যেই গর্ত ফুটো করে দিয়ে পালায়। তাইতো পঙ্গপালদের ঝাঁক বেঁধে উড়ে আসতে দেখলে—সব দেশের মানুষই ভয়ে আতঙ্কে শিউরে ওঠে।"

"ওরা বুঝি খুব উঁচু দিয়ে খুব জোরে উড়ে যেতে পারে?" জিজ্ঞেস করলে নিতু।

জবাব দিই—"সেকথা আর বলতে। উড়ো জাহাজের পাইলটরা দেখেছেন—লক্ষ লক্ষ পঙ্গপালের ঝাঁক উড়ে চলেছে মাটি থেকে কয়েক হাজার ফুট উঁচু দিয়ে। আর যখন ওরা দল বেঁধে দূরপাল্লা পাড়ি দিয়ে উড়ে যায়—তখন ঘন্টায় ওরা ১০ মাইল বেগে উড়ে যায়। আর এইভাবে ২৫ থেকে ৫০ মাইল পর্যন্ত একটানা দৌড়ে যেতে পারে—এক একদিনে।"

মিঠু ধরে আনা গঙ্গা ফড়িংটার দিকে আঙুল দিয়ে মন্তব্য করলে—"চেহারাটাও ভয়ঙ্কর ওর না? দেখ না ফড়িংটা চোখ দুটো কীরকম ঘোরাচ্ছে।"

"ও দুটো চোখ ছাড়া—আরও তিনটে করে চোখ আছে ওদের!"

—"তাই নাকি! অতগুলো চোখ দিয়ে ওরা কি করে গো?"

—"বড় দুটো চোখ দিয়ে দেখে, আর যে তিনটে চোখ, বিজ্ঞানীরা বলেন—সেগুলো ওদের শরীরের উত্তাপটা যাতে ঠিক থাকে—সেই কাজে লাগে বেশি।"

গঙ্গা ফড়িংটাকে এবার তুলে নিলুম হাতে করে—ওর মাথার ওপরের শুঁড় দুটো কলমের নিবটা দিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখিয়ে দিলাম—ঐ দুটো শুঁড় দিয়ে ওরা ওদের খাবার-দাবার পরখ করে—দেখে নেয় কামড়াতে খেতে গিয়ে দাঁতটাঁত ভাঙবে কিনা? মুখের ভেতর ওদের আছে ভারী মজবুত চোয়াল, আর বেয়াড়া বেয়াড়া ধরণের দাঁত।

ওরা সব্বাই চোখ বড়ো বড়ো করে হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

—"এই দেখ। ওদের দু'জোড়া ডানা থাকে। এক জোড়া ডানা ছোট আর একজোড়া বেশ বড়ো। দু'পাশের বড় ডানা জোড়া ছোট ডানা জোড়াকে ঢেকেঢুকে রক্ষা করে—আর ওগুলোই উড়ে ভেসে-চলার কাজে লাগে।"

সন্টু বললে—"উড়েই যদি চলে—তবে অতগুলো ঠ্যাং দিয়ে কোন্ কর্ম করে।"—"মাত্র ছ'টা পা ওদের। সামনের ছোট ঠ্যাং জোড়া দিয়ে ওরা গুটি গুটি হাঁটে—আর হাতের কাজ চালায় খাবার দাবার সামলাতে, খেতে। মাঝখানের আরও একটু বড়ো যে পা-জোড়া, সে দুটো কাজে লাগে জোরে হাঁটার সময়। আর শেষকালের যে মস্ত লম্বা ভাঁজ করা পা-জোড়া দেখছো—কী ভীষণ পা'রে বাবা! ঐ পা দুখানার জোরেও ওরা লম্বা লাফ মারতে পারে।"

সন্টু বললে—"ওরা যে লাফায়, হাই জাম্প না লং জাম্প?"

—"সব রকম লাফই পারে ওরা দিতে। লাফ দেওয়ার শক্তিতে মানুষ ক্যাঙারু, ব্যাঙ সব্বাইকে ওরা টেক্কা মেরেছে। ওদের পায়ের মাসল বা পেশী যে-রকমভাবে তৈরী ও টন্‌কো, মানুষের তেমনটি থাকলে, সে দাঁড়িয়ে লাফ মেরেই এক লাফে ১০০ ফুট ডিঙোতে পারতো!"

কথা আর শেষ করতে হলো না। গঙ্গা ফড়িং মশাই আমার হাতের চেটোর ওপর থেকে তিড়িং করে লাফ মেরে বেরিয়ে গেল—জানালা গলে। শংকর, মিঠু, মিতু ওদের চোখগুলোও সব লাফিয়ে কপালে উঠলো। সন্টু বললে—"বাব্বাঃ বাঁচা গেল! রাক্ষসটা ভালয় ভালয় পালালো!"

আমি বললাম—"ভালয় ভালয় তোমরাও পালাও এখন—নতুন জিনিসের নতুন কথা—স্বপনবুড়োকেই লিখে পাঠাই।"

ওরা বললে—"বেশ যাচ্ছি কিন্তু আমাদের সকলের নাম যেন থাকে লেখাটায়।।"

—"আলবৎ থাকবে! গুড্‌বাই।"
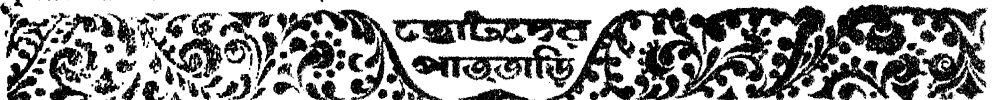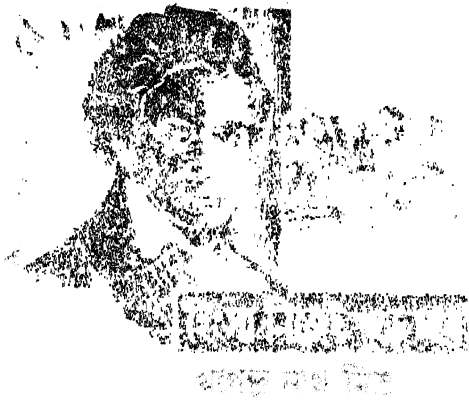
এক ভদ্রলোকের একটি ছেলে ছিল। ছেলেটির নাম হাউয়েল। ভদ্রলোকটি ছেলেটিকে সুশিক্ষিত করে তুলেছিলেন। হাউয়েল যখন বড় হলো তখন সে একদিন তার বাবাকে বলে, "আমি ভাগ্যান্বেষণে যেতে চাই।"

তার বাবা বলেন, "যাও। কিন্তু তোমাকে একটি উপদেশ দিই। যেখানে গুজব চর্চা হবে সেখানে তা শুনে চলে যেও না।"

হাউয়েল বাবার উপদেশ নিয়ে পৃথিবীর পথে যাত্রা করে।

সে চলেছে। চলতে চলতে অনেক পথ পার হয়ে আসে সমুদ্র-তীরে। পথটি গেছে সমুদ্র-তীর বরাবর বহু দূরে। হাউয়েল তার হাতে পরিব্রাজকের লাঠিখানি দিয়ে বালিতে বড় বড় হরফে একটি পুরনো প্রবাদ লেখে, "যে তার প্রতিবেশীর অনিষ্ট কামনা করে, তার নিজেরও অনিষ্ট হবে।"

সে লিখছে, এমন সময়ে সেখানে এলেন এক সম্ভ্রান্ত লোক। বালিতে সুন্দর লেখা পড়ে তিনি বুঝতে পারেন লেখক সাধারণ কোনো লোক নয়। তিনি হাউয়েলকে তখন প্রশ্ন করতে থাকেন, সে কোথা থেকে আসছে, সে কে, কোথায় যাবে।

হাউয়েল বিনয়ের সঙ্গে তাঁর প্রশ্নগুলির উত্তর দেয়।

তাই শুনে সম্ভ্রান্ত লোকটি খুব খুশী হন, হাউয়েলের ব্যবহারের প্রশংসা করেন এবং বলেন, "তুমি আমার সংগে যদি যাও তাহলে তোমাকে আমার সরকার করে রাখবো। আমার লেখাপড়ার জ্ঞানচর্চার সব কাজ তোমায় করতে হবে। এজন্য আমি তোমায় ভদ্রলোকের যোগ্য মাইনে দেবো।"

হাউয়েল তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে তাঁর সংগে গেল।

তারপর থেকে হাউয়েল তাঁর বাড়িতে থাকে। সম্ভ্রান্ত লোকটির সংগে যে সব অভিজাত শ্রেণীর লোক ও নাইটগণ দেখা করতে আসেন তাঁরা হাউয়েলের পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান দেখে চমৎকৃত হন। তারা এমন প্রশংসা করেন যে, সম্ভ্রান্ত লোকটির হিংসা হয়। হাউয়েল যে তার চেয়ে বহু গুণে পণ্ডিত, জ্ঞানী ও মার্জিত এ তিনি কিছুতেই সইতে পারেন না।

হাউয়েলের খ্যাতি উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে আর এদিকে তার মনিব সেই সম্ভ্রান্ত লোকটির মনে উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে হিংসা।

একদিন তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেন, "হাউয়েল আমার বিস্তর অনিষ্ট করেছে। আমার অসম্মান ঘটিয়েছে। ওকে মেরে ফেলা দরকার। কিভাবে কাজটা করা যায় বলো তো?"

(শেষাংশ ১৪০ পৃষ্ঠায়)

। একাঙ্কিকা ।

। গভীর অরণ্য। বনবাসী এক কাঠুরিয়ার কুটির অভ্যন্তর। সহরের কোনো স্কুলের একদল ছাত্র ভয়চকিত অবস্থায় সন্ত্রস্ত। সন্ধ্যা আসন্ন। ।

সূর্য ॥ কই আর তো শোনা যাচ্ছে না?

ইন্দ্র ॥ এখন আমার মনে হচ্ছে, আমরা যেটা শুনলাম সেটা বাঘের ডাক নয়।

চন্দ্র ॥ তুই কালা, তাই শুনিস নি।

বরুণ ॥ ডাক শুনে পিলে চমকে গেলো, বলছে বাঘের ডাক নয়!

লণ্ঠন ॥ আঃ, কথা কাটাকাটি না করে এখন কি করে বাড়ী ফেরা যায় এই ভাব। সূয্যি ঠাকুর তো ডুবুডুবু। দেখছো না সূর্যদা!

সূর্য ॥ তাতে আর ভাবনা কি। তোর নাম লণ্ঠন। তোকে সামনে রেখে আমরা পথ চলবো।

লণ্ঠন ॥ না না, সামনে আমি থাকতে পারবো না। আমি ছোট্ট মানুষটি থাকবো তোমাদের মাঝে।

বরুণ ॥ আচ্ছা আচ্ছা তাই হবে। সূর্য ডুবলেই বা ভাবনা কি? আমাদের মধ্যে এখনও চন্দ্র চৌধুরী রয়েছে। রাতে পথ দেখানোর ভার ওর।

চন্দ্র ॥ সে গুড়ে বালি। এটা কৃষ্ণপক্ষ। বোধ হয় আজ অমাবস্যাই হবে।

সূর্য ॥ ও বাবা তাই নাকি? যাকগে তাতে কি হয়েছে? সাহস করে বেরিয়ে পড়লেই হয়। আমি সূর্য রায়, তুমি ইন্দ্র সেন—তুমি চন্দ্র চৌধুরী, তুমি বরুণ নাগ, আমরা এতগুলো দেবতা ভয়টা কিসের?

লণ্ঠন ॥ আর আমি?

সূর্য ॥ আরে তুই তো হলি গিয়ে টিমটিমে একটা ভাঙা লণ্ঠন। পথ চলতে গিয়ে নিজেই দশবার হোঁচট খাস। কখন যে নিভে যাস সেই আমাদের ভয়।

বরুণ ॥ তা হলে কি এখন আমরা দুর্গা দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়বো সূর্যদা?
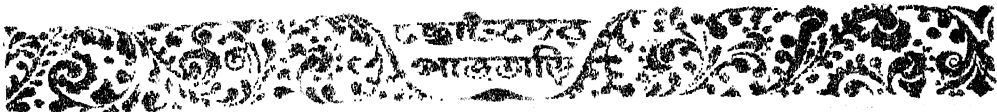
চন্দ্র॥ পুরো চারটি মাইল পথ।

ইন্দ্র॥ তায় এমন জঙ্গল। যাকে বলে অরণ্য।

বরুণ॥ ওরে বাবা, ফেরবার কথা মনে হতেই গা কাঁপছে। সেই সাপটা এখনো হয়তো পথের ধারেই ফণা তুলে ওত পেতে বসে আছে।

সূর্য॥ হ্যাঁ বসে আছে। ওর বুঝি আর প্রাণের ভয় নেই?

লণ্ঠন॥ সাপের চেয়ে ভয় করি বেশী বাঘ। কোথা থেকে কখন যে কার ওপর লাফিয়ে পড়বে কে জানে?

সূর্য॥ তোকে আসতে বলেছিলো কে?

লণ্ঠন॥ তোমরা সবাই এলে তাই এলাম।

সূর্য॥ আমরা এলাম বুনো ফুল যোগাড় করতে। বটানির মাষ্টারের হুকুমে। তুই ক্লাস এইটের ছাত্র। তুই এলি কেন? তোমার মাষ্টার তো তোমাকে আর বুনোফুল নিয়ে গবেষণা করতে বলেনি?

ইন্দ্র॥ অমন করে বকলে কিন্তু ও এখনি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলবে সূর্যদা।

বরুণ॥ [দূরে কিসের শব্দ শুনিয়া] চুপ, ওই আবার।

চন্দ্র॥ হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু এতো বাঘের ডাক বলে মনে হচ্ছে না।

[ছুটিয়া আসিল জংলী। বছর ১৪ বয়স সে এই কুটিরের মালিক কাঠুরিয়ার পুত্র।]

জংলী॥ আবার বাঘ বেরিয়েছে।

সকলে॥ এ্যাঁ?

জংলী॥ হ্যাঁ বাবুরা, আবার বাঘ বেরিয়েছে!

চন্দ্র॥ আমরা তবে বেরুবো না?

জংলী॥ বাঘের পেটে যাবার সাধ হবে তো বেরুবে।

লণ্ঠন॥ ওরে বাবা। তোমার জলের বোতলটা কোথায় সূর্যদা?

বরুণ॥ আমারও তেষ্টা পেয়েছে।

সূর্য॥ জল আর নেই। [জংলীকে] এই ছোঁড়া, এক কলসী জল এনে দিতে পারিস? পয়সা দেবো।

জংলী॥ পয়সা দিয়ে পানি পিবে?

সূর্য॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, দেবো, পয়সা দেবো। তুই বাবা এক কলস জল এনে দে তো।

জংলী॥ এটা সহর না আছে। পানি হামরা বেচি না।

ইন্দ্র॥ বেশ তো, বেশ তো। দাম না নিস না নিবি। জলটা আন।

বরুণ॥ আন বাবা আন। জলদি আন। বকশিস দেবো।

জংলী॥ বকশিস দিবি? তোরা সব সহুরে বাবু, খুব টাকার গরম আছে তোদের।

ইন্দ্র॥ আরে এ ব্যাটা তো আচ্ছা। [চটিয়া] জল আনবি কিনা বল?

জংলী॥ আনবে না। তোদের টাকা ধুয়ে তোরা জল খা।

[রাগতভাবে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলো]

চন্দ্র॥ কি বিপদ! পয়সা দিয়ে জল পাওয়া যায় না—এ আমরা কোথায় এলাম রে বাবা!

লণ্ঠন॥ আমরা বনবাসে এসেছি। জল না পেলে আমি বাঁচবো না।

সূর্য॥ তোর মরাই ভালো। [বাহিরে যাইতে উদ্যত]

চন্দ্র॥ এ কি কোথায় যাচ্ছিস সূর্য?

সূর্য॥ দেখছি আশে-পাশে জল মেলে কি না।

বরুণ॥ একা যাবি?

সূর্য॥ সাহস থাকে সঙ্গে এসো।

ইন্দ্র॥ না না দাঁড়াও। [কান পাতিয়া] ওই ডাকটা আবার শোনা যাচ্ছে না?

সূর্য॥ [কান পাতিয়া] হুঁ।

চন্দ্র॥ এই এই লণ্ঠন, তোর প্যান্টটা খসে যাচ্ছে।

লণ্ঠন॥ [কাঁপিতে কাঁপিতে প্যান্টটা কোনো রকমে ধরিয়া] তোমরা কেউ বেঁধে দাও। আমি পারছি না।

সূর্য॥ জংলীটা আবার আসছে।

ইন্দ্র॥ আসছে? ব্যাটাকে এবার শায়েস্তা করবো।

[জংলীর প্রবেশ]

জংলী॥ আবার হামি এলাম। পানি পিবে তো আও। একটা ক… আছে—আধা মাইল দূরে। পথটা হামি বাতলাবো। যা… খুসী হবে যাও।

বরুণ॥ আধ মাইল দূরে? ওরে বাবা!

চন্দ্র॥ আরে ব্যাটা তুই এনে দে না?

জংলী॥ হামি না যাবে।

সূর্য॥ তোর বাবা কাঠ কেটে ক' টাকা রোজগার করে?

জংলী॥ দো রুপিয়া, তিন রুপিয়া রোজ কামাবে।

সূর্য॥ [পকেট হইতে একটি পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া] এই … পাঁচ রুপিয়া। এক কলসী জল এনে দে। এখুনি।

জংলী॥ হামার বাবা ইটা জানে, তোদের কাছে বহুত টাকা … ইটা জানে। হামাকে চুপিচুপি বললে—

সূর্য॥ চুপিচুপি বললো? কি বললো?

জংলী॥ বললে, ওরে ব্যাটা জংলী, বাবুগুলোনকে চোখে চোখে রাখ…

সূর্য॥ চোখে চোখে রাখবি? সে কি রে? কেন?

জংলী॥ উটা হামি বলবে না।

বরুণ॥ বলবে না?

ইন্দ্র॥ কেন বলবি না?

জংলী॥ হামার বাবার একটা মতলব আছে।

চন্দ্র॥ মতলব? ওরে বাবা! কি মতলব?

জংলী॥ হামি জানে। তবে উটা হামার বলবার কথা নয়।

সূর্য॥ ব্যাপার কি বল না বাবা।

জংলী॥ [কান পাতিয়া] শুনেছিস?

ইন্দ্র॥ হ্যাঁ। একটা শব্দ শুনেছি এই ঘরের পিছনে।

জংলী॥ [হাসিয়া] শব্দটা না চিনিস?

সূর্য॥ মনে হচ্ছে ছুরি শানাচ্ছে।

জংলী॥ তুই ঠিক ধরলি। তু বাহাদুর আছিস?

বরুণ॥ এই লণ্ঠন, শুয়ে পড় তোর প্যান্ট খসে যাচ্ছে।

চন্দ্র॥ ছুরি শানাচ্ছে? কাঠুরিয়াটা ছুরি শানাচ্ছে?

ইন্দ্র॥ তবে ছুরি নয়, কুড়ুল।

জংলী॥ তু ঠিক ধরেছিস। তু বাহাদুর আছিস।

বরুণ॥ গাছ কাটতে, না?

জংলী॥ [হাসিয়া] হুঁ হুঁ, কাটবে, গাছ না [ইহাদের দেখাইয়া] কচুগাছ

চন্দ্র॥ শোন বাবা জংলী, আমাদের যার কাছে যা আছে, সব আমরা দিয়ে দিচ্ছি তোকে।

ইন্দ্র॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, তোর বাবাকে গিয়ে বল, কচুগাছ কেটে হাত … ময়লা করবে।

জংলী॥ [খিল খিল হাসিয়া] দে, কার কাছে কি আছে দে।

সূর্য॥ না। [সঙ্গীদের প্রতি] তোরা সব মানুষের বাচ্চা না?

চন্দ্র॥ কিন্তু এটা সহর নয় সূর্যদা।

লণ্ঠন [প্রায় কাঁদিয়া] এখানে পুলিশ নেই সূর্যদা।

জংলী॥ [খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল] হি-হি-হি।

সূর্য॥ কিন্তু এভাবে আমি মরতে পারবো না। আমি যদি ম… লড়াই করে মরবো। তোরা এত কাপুরুষ?

ইন্দ্র॥ এখন আমারো তাই মনে হচ্ছে সূর্যদা। আমরা যদি সবাই এ… সঙ্গে রুখে দাঁড়াই—
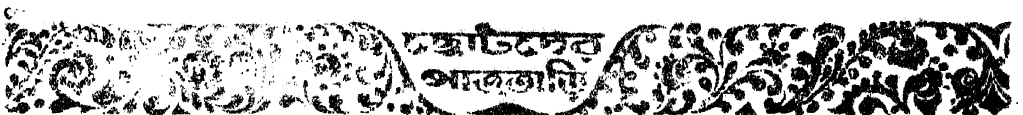
চন্দ্র॥ তোমাদের কি? তোমাদের আরো সব ভাই টাই আছে। [প্রায় কাঁদিয়া] আমি আমার মায়ের একমাত্র ছেলে। আর ওই লণ্ঠনটা—

লণ্ঠন॥ প্যান্টটাকে নিয়েই আমার বিপদ। এটা যদি তোমরা কেউ খুব ক'ষে বেঁধে দাও—

ইন্দ্র॥ বেশ তো তাই না হয় দিচ্ছি। তুই ওটা কোনমতে একটু ধরে রাখ—

জংলী॥ তুদের খুব সাহস দেখছি। হামার বাপের একটা কুড়ুল আছে, একটা ছুরি আছে। হামার আছে একটা দাও। তুদের টাকার গরম আছে, হামাদের উটা না আছে। এবার দেখবো কে হারে, কে জিতে।

ইন্দ্র॥ আমাদের মারলে তোরাই ভাবছিস বেঁচে যাবি?

সূর্য॥ ফাঁসী কাঠে ঝুলবি তোরা। ফাঁসী কাঠে ঝুলবি।

জংলী॥ [হাসিয়া উঠিল] হাঃ হাঃ হাঃ, মরবার ভয় হামাদের না আছে। বাঘ, ভালুক, সাপের সাথে হামাদের বসত। মরবার ভয় তো হামাদের রোজ আছে। বাঘের কামড়ে মরলে, মরবে। ফাঁসীতে ঝুললে ভি মরবে। উ তো একই বাত আছে। উ ভয়টা হামাদের না দেখাবে। ইবার বল তুরা কি ঠিক করলি? —টাকা দিবি না জান দিবি?

লণ্ঠন॥ [ইতিমধ্যে তাহার প্যান্ট ইন্দ্র বাঁধিয়া দিয়াছে] আর প্যান্ট খসবে না। দাও হাতে নেবার আগেই এসো আমরা ওকে সাবাড় করি।

॥ ও একা। যদি লড়তেই হয় তবে ওর সঙ্গে একজন লড়বি। সবাই নয়।

॥ তবে আয় জংলী। আমার সঙ্গে লড়বি আয়।

॥ হ্, তোর মায়ের একটা ছেলে।

॥ মায়ের দুধ আমি খেয়েছি আমি সব চেয়ে বেশী। তার জোর কি ... আয় সেটা তোকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

॥ কসে প্যান্ট পরা থাকলে আমি যে কে সেটা যদি বুঝতে চাস, আয়!

॥ [হাসিয়া] তুরা যে মানুষের বাচ্চা আছিস, সিটা এখন বুঝা গেল। মরবার ভয় যাদের না আছে এক তারাই মানুষ আছে। এখন দেখছি হামরা ভি মানুষ, তুরা ভি মানুষ। তবু একটা বাত হামি বলছে—

॥ কি বলবি।

॥ তুরা কেমন মানুষ? হামার ঘরে তুরা থাকবি আর রুপেয়া দিয়ে কিনতে চাস পিয়াসের পানি। হামরা গরিব তাই তোরা চাঁদির জুতা মারলি হামাদের।

॥ [অনুতপ্ত কণ্ঠে] এটা সত্যিই আমাদের অন্যায় হয়েছে জংলী।

॥ হামি যদি তোর বাড়ী যাবো, পানি চাইবো, তু কি হামার কাছে দাম চাবি?

[ছেলেরা মাথা হেঁট করিল]

॥ আমাদের মাপ কর জংলী।

॥ এবার তবে তোরা শুন, ছুরি শানের শব্দ শুনলি।

[সকলে মাথা নাড়িয়া জানাইল 'হ্যাঁ']

হামার বাবা বলছে, আজ রাতে জঙ্গলের পথে তুরা ঘরে ফিরতে না পারবি। তুদের রাতটা আজ হামার ঘরে কাটবে। [সানন্দে] হ্যাঁ হ্যাঁ, হামার বাবা ছুরিতে শান দিলো। এইবার শুন,—কিছু শুনলি? বুনো মুরগীর আওয়াজ? হামার বাবা ছুটা মুরগী ধরলো। এখন কাটছে তোদের জন্যে।

ন॥ এ্যাঁ? আজ রাতে তবে আমাদের এখানে বুনো মুরগীর ভোজ হচ্ছে?

জংলী॥ হ্যাঁ হচ্ছে। কিন্তু হুসিয়ার। দাম দিতে চাবি তো বাবার হাতে মুরগী জবাই না হবে, জবাই হবি তোরা।

সূর্য॥ [এবং অন্যান্য সকলে] না-না-না, আর নয়—।

লণ্ঠন॥ ভোজ হবে? বুনো মুরগীর ভোজ? এই তোমরা কেউ আমার প্যান্টের বাঁধনটা একটু আলগা করে দাও না।

[সকলে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল।]

যবনিকা
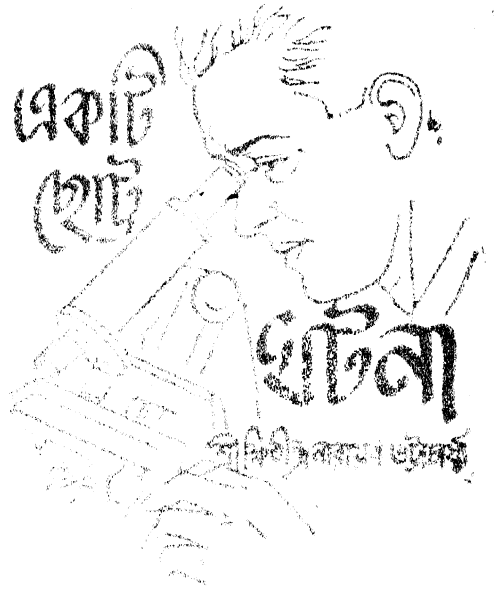
একটি ছোট্ট ঘটনা থেকে কত বড় ব্যাপার ঘটতে পারে!

ঘটনাটা পরে বলব, আগে তার ফলটা ব'লে নিই।

১৮৪৩ সাল। ভারতের নানা জায়গায়—বিশেষ ক'রে এই বাংলা দেশে হঠাৎ দেখা দিল এক মহামারী। সুস্থ মানুষটা,—এই ঘুরেছে ফিরছে, হঠাৎ সুরু হ'ল দারুণ পেটের গোলমাল,—সঙ্গে সঙ্গে ভেদবমি। তারপর দেখতে দেখতে, চব্বিশ ঘন্টা না পেরোতেই, রোগীর দফা শেষ। সবাই বললে, "ওরেঃ বাবা, সাক্ষাৎ ওলাবিবির দয়া! ওর কি আর চিকিৎসে আছে? ও রোগে ধরাও যা স্বয়ং যমে এসে ধরাও তা।

সেকালে অনেক রোগেরই এই রকম এক-একটি বিশেষ বিশেষ অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন ব'লে লোকের ধারণা ছিল। যেমন বসন্ত রোগের দেবী শীতলা, তেমনি ওলাওঠা,—ভাল কথায় যাকে বলে বিসূচিকা (আর ইংরাজীতে বলে কলেরা) রোগেরও দেবী হচ্ছেন এই ওলা দেবী বা ওলাবিবি। অনেকে মনে করত তাঁর দয়া হ'লে—তাঁর পুজো করলে তবেই ও রোগ সারতে পারে, অন্য কোনও উপায় নেই। কেন এ রোগ হয়, কি করলে এ রোগের আক্রমণ থেকে সরে থাকা যায়, রোগে ধরলে কি করে ওর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়—এসব সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন জ্ঞান অনেক শিক্ষিত লোকেরও ছিল না। এমন কি ডাক্তাররাও এ ব্যাপারে কোন কূল-কিনারা খুঁজে পেতেন না। পুরোনো কলকাতার বিবরণ পড়লে দেখা যায় তখনকার অনেক মনীষী ব্যক্তিই প্রাণ হারিয়েছেন এই মারাত্মক রোগে।

কিন্তু ১৮৮৩ সালে যে ধরণের কলেরা দেখা দিল তার আর তুলনা নেই। শুধু বাংলা দেশেই নয়, এই মহামারীর আক্রমণে গোটা ভারতবর্ষই বিব্রত হয়ে পড়ল। তারপর এই রোগ ছড়াতে ছড়াতে ক্রমে এশিয়া পার হয়ে গিয়ে হাজির হ'ল আফ্রিকায়—একেবারে ভূমধ্যসাগরের পারে।

এবারে ইয়োরোপের লোকেরাও ত্রস্ত হয়ে উঠল ভয়ে। এই সাংঘাতিক রোগ যদি শেষে ইয়োরোপেও ছড়িয়ে পড়ে; তা হ'লে কি আর রক্ষা আছে? অবশেষে এই মারাত্মক রোগের কি কারণ, আর প্রতিষেধকই বা কি ইত্যাদি নিয়ে গবেষণার জন্য কয়েকজন বড় বড় ডাক্তার রওনা হলেন আফ্রিকার উদ্দেশ্যে।—ডাক্তার এবং বিজ্ঞানী। ভূমধ্যসাগরের এপারে ইয়োরোপ, ওপারে আফ্রিকা। আর আফ্রিকায়ই তখন চলছে ঐ রোগের তান্ডব নৃত্য,—যদিও রোগটা নাকি এশিয়া থেকেই এসেছে এবং সেজন্য ওর নামও দেওয়া হয়েছে "এশিয়াটিক কলেরা।"

এই ডাক্তারদের মধ্যে একজন ছিলেন জার্মাণ্। তাঁর নাম রবার্ট্ কক্।

এর কিছুদিন আগে বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর জীবাণুর আবিষ্কার করে পৃথিবীতে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। আমাদের যত কিছু রোগ সবারই মূলে যে রয়েছে কতকগুলি অদৃশ্য জীবাণু—এ তথ্য তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। জীবাণু হচ্ছে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থ—জীবন্ত প্রাণীই বলা যায়,—খালি চোখে তাদের দেখা যায় না, কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ে। আমাদের আশপাশে—আকাশে-বাতাসে সর্বত্র এই সব জীবাণু ঘুরে বেড়াচ্ছে, খাচ্ছেদাচ্ছে, বংশ বাড়াচ্ছে, আর এরাই মানুষের শরীরে ঢুকে ঘটাচ্ছে যত রকম রোগ। পাস্তুর হচ্ছেন জীবাণু-বিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক আর কক্ ছিলেন তাঁরই একজন প্রধান অনুগামী। পাস্তুরের প্রদর্শিত পথে গবেষণা করে জীবাণু বিজ্ঞানকে তিনি অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম প্রমাণ করেছিলেন যে প্রত্যেকটি বিশেষ রোগের মূলে রয়েছে এক একটি বিশেষ জাতের জীবাণু।

যাই হোক, কক্ তো এলেন আফ্রিকার মিশর দেশে। কয়েকজন ফরাসী বিজ্ঞানীও এলেন। এঁরা পাস্তুরের শিষ্য এবং পাস্তুরই তাঁদের পাঠিয়েছিলেন। স্বতন্ত্রভাবে তাঁরা কাজ সুরু করলেন এই এশিয়াটিক কলেরা নিয়ে।

ঠান্ডা দেশের লোক তাঁরা, আর মিশর হচ্ছে অসহ্য গরম দেশ। আবার যে সময়টা তাঁরা বেছে নিয়েছেন সেটাও হচ্ছে বছরের মধ্যে সবচেয়ে গরম কাল। কিন্তু তাতে এই বিজ্ঞানীদের ভ্রূক্ষেপ নেই। ছোট্ট ঘরের এক কোণে বসে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁরা। একমনে। সামনে পড়ে রয়েছে রোগীর মৃতদেহ,—এশিয়াটিক কলেরায় মৃত রোগী, যার সংস্পর্শের ভয়ে নিকট-আত্মীয়রা পর্যন্ত ত্রিসীমানায় থাকতে চায় না। মৃতের শরীরের নানা অংশ নিয়ে স্লাইড্ তৈরী করে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছেন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে। কোন্ জীবাণুর কীর্তি এই ভয়াবহ রোগ তাই বার করবেন খুঁজে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কী কঠিন এই তপস্যা তা কল্পনা করাও শক্ত।

এরই মধ্যে একদিন ঐ ফরাসী বিজ্ঞানীদের একজন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হ্যাঁ তাঁকেও আক্রমণ করেছে ঐ দুরন্ত রোগ—এশিয়াটিক কলেরা। বহু চেষ্টা করেও বাঁচানো গেল না তাঁকে। মানুষের জীবনকে রোগমুক্ত করবার সাধনায় প্রাণ বিসর্জন দিলেন এই অসমসাহসী বিজ্ঞানী—মঃ থুয়েলিয়ে।

এই আকস্মিক বাধায় হয়তো বিচলিত হলেন কক্, কিন্তু যে কাজের ভার নিয়েছেন তা থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করা গেল না। অবশেষে হঠাৎ একদিন অণুবীক্ষণের তলায়, মনে হ'ল, কেমন যেন একটা নতুন ধরণের জীবাণু ভেসে বেড়াচ্ছে কয়েকটা। দেখতে ঠিক 'কমা' (,) চিহ্নের মত, কিন্তু জীবন্ত। সদ্যমৃত একটি কলেরা রোগীর পাকস্থলীর মধ্যে পাওয়া গেছে ওগুলি।

আরও—আরও রোগী চাই। চাই আরও ঐ জীবাণু। টাটকা জীবাণু, পরিমাণে অসংখ্য। অসম্পূর্ণ রাখতে পারেন না কক্ তাঁর গবেষণা। কিন্তু তার পরেই, হয়তো ঋতু পরিবর্তনের জন্যই কিংবা অন্য কোনও অজ্ঞাত কারণে, ঐ দুরন্ত রোগ থেমে গেল মিশরে। কক্ তাঁর গবেষণা শেষ করতে পারলেন না।

ফিরে এলেন কক্ জার্মেণীতে। কিন্তু মন তাঁর ছট্ফট্ করছে। আজ না হয় এশিয়াটিক কলেরা থেমে গেছে কিন্তু আবার নতুন করে সুরু হতে কতক্ষণ? আবার যদি সুরু হয় হাজার হাজার লোকের প্রাণ না নিয়ে ছাড়বে না তো! চাই কি, আরও ভয়ংকর চেহারা নিয়ে দেখা দিতে পারে এবং খোদ ইয়োরোপেই। কাজেই যে জীবাণুর সন্ধান তিনি পেয়েছেন তা নিয়ে কাজ শেষ করতেই হবে।

তা হলে?—হ্যাঁ, ঐ কলেরার উৎপত্তি স্থান ভারতবর্ষেই যাবেন তিনি।

আবার নীল সমুদ্রে ভাসল জাহাজ। সেই জাহাজে রয়েছেন রবার্ট কক্, তাঁর প্রিয় অণুবীক্ষণ আর আনুষঙ্গিক কয়েকটি যন্ত্রপাতি। আর রয়েছে অর্ধশত ইঁদুর। ইঁদুর দিয়ে কি হবে? কলেরার জীবাণু যদি পাওয়া যায় তখন তো এদেরই ওপর দিয়ে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে হবে।

সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিয়ে জাহাজ এসে ভিড়ল কলকাতার বন্দরে। কলকাতার মাটি ধন্য হ'ল বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর পদস্পর্শে। আগেই ব্যবস্থা করা ছিল, কলকাতার মেডিকেল কলেজের এক নিভৃত কক্ষে সুরু হ'ল ককের অবিশ্রান্ত সাধনা। কলেরা রোগীর অভাব নেই বাংলা দেশে। আগেই বলেছি—সে যুগে এ রোগে ধরলে আর কারও নিস্তার ছিল না,—চিকিৎসাও প্রায় ছিল না বললেই চলে। এক এক করে প্রায় চল্লিশটি কলেরা রোগীর মৃতদেহ নিয়ে পরীক্ষা করলেন কক্। কি দেখলেন? হ্যাঁ, সেই জীবাণু—যা একবার আফ্রিকায় দেখেছিলেন। সেই ছোট্ট ছোট্ট কমা চিহ্নের মত জীবাণু কিল্বিল্ করছে ঐ সব মৃতদেহে—মানুষের পাকস্থলীতে।

সুস্থ মানুষের পাকস্থলীর রস, রক্ত, শরীরের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করলেন কক্। না, সুস্থ দেহে কোথাও ঐ জীবাণু নেই। মানুষ ছেড়ে জীবজন্তুর দেহ নিয়েও চালালেন পরীক্ষা। সুস্থ ইঁদুর, সুস্থ মুরগী, ছাগল, ভেড়া, গরু এমন কি হাতীর শরীরেও খুঁজে দেখলেন তন্ন তন্ন করে। না, সুস্থ প্রাণীর কোথাও কলেরার জীবাণু 'কমা ব্যাসিলাস্' পাওয়া গেল না। তা হ'লে? নিশ্চয়ই অন্য কোথাও থেকে আসছে এই জীবাণু। মানুষের শরীরে ঢুকে তবেই সৃষ্টি করছে ঐ রোগ। কিন্তু কোথা থেকে আসছে?

আবার চলল্ অনুসন্ধান। সম্ভব-অসম্ভব সব জায়গা খুঁজে দেখতে লাগলেন কক্। শেষে একদিন খোঁজ পেয়েও গেলেন। [illegible] জীবাণু আসছে নোংরা জল থেকে। নোংরা, অপরিস্রুত জল—বিশেষ করে এঁদো পুষ্করিণীর জলে অতি সহজেই এই জীবাণু সংক্রমিত হয় আর পুষ্টিলাভ করে। আর, ঐ জলে যদি কলেরা রোগীর জামাকাপড়—বিশেষ করে মলযুক্ত জামাকাপড় ধোয়া হয়, তবে তো কথাই নেই! নির্ঘাত ঐ জল কলেরার জীবাণুতে পূর্ণ হয়ে উঠবে। তার পর সে জল যদি কেউ খায় বা অন্য কোনও উপায়ে তার পাকস্থলীতে বা অন্ত্রে গিয়ে ঢোকে তা হলেই তার দেহে দেখা দেবে ঐ দুরন্ত রোগ।

কক্ শুধু কলেরার জীবাণুই আবিষ্কার করলেন না—যে অবস্থায়, যে পরিবেশে এই জীবাণু জন্মায়, বংশবৃদ্ধি করে সেই
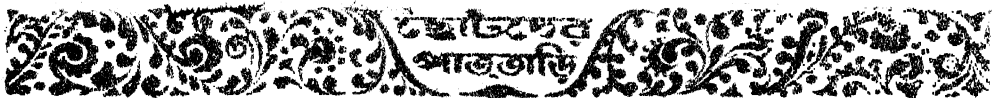
অবস্থা, সেই পরিবেশ সৃষ্টি করে দস্তুরমত কলেরার জীবাণুর চাষ করতেও ছাড়লেন না। তার পর সেই চাষ করে পাওয়া জীবাণু নিয়ে তাঁর সঙ্গে-আনা ইঁদুরগুলোর ওপর নানাভাবে প্রয়োগ করে পরীক্ষা করতে লাগলেন। এক কথায় কলেরা রোগ সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য আবিষ্কার করে ফিরে এলেন তিনি নিজের দেশে।

কলকাতার প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালের এক কোণে ব'সে ম্যালেরিয়ার রহস্য বার করেছিলেন ইংরেজ বিজ্ঞানী রোনাল্ড রস্। আর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এক নিভৃত কোণে ব'সে কলেরার রহস্য উদ্ঘাটন করেছিলেন জার্মাণ বিজ্ঞানী রবার্ট কক্। বিদেশীর হাতে হ'লেও এই দুই দুরন্ত রোগেরই রহস্য উদ্ধার ঘটেছিল এই একই সহরের বুকে ব'সে।

শুধু কলেরার তথ্য উদ্ঘাটনই কিন্তুককের জীবনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব নয়। গরু-ভেড়ার মারাত্মক রোগ এনথ্রাক্স-এর জীবাণু— যা পাস্তুর নিজে আবিষ্কার করে জীবাণু-বিজ্ঞানের পথ খুলে দেন, তারও প্রায় শেষ কথা আমরা জানতে পেরেছি ককেরই দৌলতে। বলতে কি, ঐ জীবাণুর গোটা জীবন ইতিহাসই তিনি উদ্ঘাটন করে গেছেন। কিন্তু এর চেয়েও তাঁর বড় আবিষ্কার হচ্ছে যক্ষ্মা রোগের জীবাণু আবিষ্কার। কিন্তু সে আর এক কাহিনী এবং এক রোমাঞ্চকর কাহিনী।

এইবারে সেই ছোট্ট ঘটনাটির উল্লেখ করি। বিশেষ কিছু নয়। কক তখন সবে জার্মেণীর ভলস্টাইন শহরে ডাক্তারী সুরু করেছেন। বয়স বছর আটাশ হবে। পসার বিশেষ হয় নি। হবেই বা কেমন করে? চিকিৎসা করার চাইতে রোগের ভিতরকার রহস্য জানার আগ্রহই যে ছিল তাঁর বেশী! শুধু রোগের দেহ—সব কিছুতে। ছোট্ট একটা ম্যাগনিফাইং লেন্স সর্বদাই থাকতো তাঁর পকেটে। হাতের কাছে যা পান তাই পরীক্ষা করে দেখেন ঐ লেন্স দিয়ে। লোকে ভাবে, বাতিক।

ব্যাপারটা তাঁর স্ত্রীও লক্ষ্য করলেন। হয়তো কেমন মায়া হ'ল স্বামীর কাণ্ড দেখে। ভাবলেন, আহা, যখন দেখছে ভাল করেই দেখুক। স্বামীর জন্মদিনে তিনি তাই তাঁকে উপহার দিয়ে বসলেন একটা ছোট মাইক্রস্কোপ্, অর্থাৎ অণুবীক্ষণ যন্ত্র। এই উপহার দেওয়ার ঘটনাটিকেই ছোট্ট বলছি। কিন্তু ককের জীবনে—শুধু ককের জীবনে কেন, সমগ্র মানবজাতির জীবনে, এই ছোট্ট ঘটনাটি শেষ পর্যন্ত কত বড় ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে তা কি কেউ জানত? এই অণুবীক্ষণটি হাতে পেয়েই কক্ মেতে উঠলেন জীবাণু পরীক্ষায়— জীবাণুর গবেষণায়। চুলোয় গেল তাঁর ডাক্তারী ব্যবসা—রোগীর পয়সা আহরণ করে পসার বাড়ানো। সমস্ত প্রলোভন ছেড়েছুড়ে তিনি মেতে উঠলেন এই নতুন শাস্ত্রের চর্চায়। ঘন্টার পর ঘন্টা— দিন যায়- মাস যায়—বছর যায়, দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় তাঁর কাটতে থাকে ঐ অণুবীক্ষণ যন্ত্রটির ওপর ঝুঁকে পড়ে। এরই সাহায্যে এক অদৃশ্য, অজ্ঞাত জগতের রহস্য উদ্ঘাটন করবেন তিনি।

তা তিনি করেছিলেন—যার ফলে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সূচনা করে গেছেন এক নতুন যুগ। ছোট্ট ঘটনাটিকে তাই ছোট্ট বলি কি করে?

বিজ্ঞান সাধনার পুরস্কারস্বরূপ ১৯০৫ সালে কককে বিশ্ব-বিখ্যাত নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯১০ সালে এই মহাবিজ্ঞানী ইহলোক ত্যাগ করেন।

রাজা অনেক দিন থেকেই ভাবছেন—একটা কিছু এমন তৈরী করে রাখবেন যাতে তিনি যখন পৃথিবীতে থাকবেন না তখনও যেন পৃথিবীর লোক তাঁকে মনে রাখে। ভেবে ভেবে অবশেষে স্থির করলেন রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি যে স্থানটি আছে সেইখানে তিনি একটি বিরাট মন্দির নির্মাণ করে দেবেন। দেবতার মন্দির—যেখানে এসে ধর্মার্থীরা, পুণ্যার্থীরা দেবতা দর্শন করতে পারেন, শান্তি পেতে পারেন—দেবতার কৃপালাভ করতে পারেন। রাজার মনস্থির করার সঙ্গে সঙ্গে কাজ সুরু হলো। কাজ সুরু হওয়া তো নয়—রাজার কাজ, তাঁর ইচ্ছামত মন্দির হচ্ছে, যে দেশের যা ভালো তাই আসতে লাগল—ইঁট কাঠ দিলেই তো সব হবে না, ভালো ভালো পাথর, দামী দামী মণি মুক্তো দেশ বিদেশ থেকে রাশি রাশি আনানো হলো। মন্দিরের ভাস্কর্য কেমন হবে তারজন্য কত শিল্পী এলেন, নক্সা তৈরী করতে ইঞ্জিনীয়ার এলেন—যাকে বলে রাজকীয় ব্যাপার।

অনেক দিন পরে অনেকের অনেক পরিশ্রমে অবশেষে এক অপূর্ব মন্দির নির্মাণ হলো। সত্যই দেখবার মত মন্দির, দেশের লোক তো রাজাকে ধন্য ধন্য করতে লাগলো। রাজা সবই শুনতে পাচ্ছেন তবু কেন মন তাঁর ঠিক পরিতৃপ্ত হচ্ছে না। ঘুরে ফিরে বারে বারে মন্দিরের শিল্প দেখছেন—সামান্য ত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করাচ্ছেন—এইরকম দেখতে দেখতে মন্দিরের সামনে এসে মনে হলো অনেকটা স্থান খালি রয়েছে—ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছে, এই জায়গাটায় একটা মূর্তি বসালে বেশ ভালো হয়। কিন্তু কি মূর্তি বসাবেন—কিছু তো তেমন মনে হচ্ছে না—কোনো বিগ্রহ মূর্তি দিয়ে লাভ নেই—মন্দিরের মধ্যেই তো বিরাট বিগ্রহ রয়েছেন—তাহ'লে? অনেক ভেবে রাজা ঠিক করলেন ঐ শূন্য স্থানে তিনি তাঁরই একটা প্রতিমূর্তি বসাবেন। দেশের লোক তাঁকে মনে করবে, যদি প্রতিদিনই এই মূর্তি দেখতে পায়—তাছাড়া দেশ দেশান্তর থেকে যাঁরা আসবেন তাঁরাও মন্দির নির্মাতাকে দেখবেন—। এই যুক্তি খুবই ভালো, সঙ্গে সঙ্গে রাজা কারিগরকে ডেকে বলে দিলেন মন্দিরের সামনেই যে স্থানটা খালি আছে সেখানে তাঁর একটি মূর্তি তৈরী করে বসাতে।

রাজার আদেশ—তখনি কাজ সুরু হয়ে গেল।

রাজা মনে মনে ভাবলেন—এই বেশ ভালো হলো।

মন্দির তৈরী সুরু হওয়া থেকেই রাজার মনে আর কোনো চিন্তাই স্থান পেতো না—সব সময় মন্দিরের কথাই ভাবতেন, কেমন করে কি করলে এমন সৌধ নির্মাণ হবে যে, দর্শনার্থীরা বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকবেন। সব সময়ই রাজার এই চিন্তা ছিল।

সেদিন রাত্রে এইসব চিন্তা করতে করতেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। স্বপ্ন দেখছেন—জাগ্রত অবস্থায় তিনি যেমন মন্দিরের সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়ান অমনি ঘুরছেন, ঘুরতে ঘুরতে কোথায় যেন এসে পড়লেন, স্থানটি নিতান্তই অপরিচিত। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে একটা ভাঙ্গা বাড়ীর সামনে এসে পড়লেন। বাড়ীটিতে কেউ আছে বলে মনে হয় না এমন জরাজীর্ণ অবস্থা। ভাঙ্গা দরজার সামনে এসে দেখলেন—ক্লান্ত তৃষ্ণার্ত ক্ষুধার্ত দুটি ভিক্ষুক অবসন্ন হয়ে
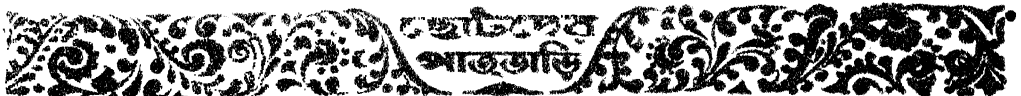
বসে পড়েছে। একজনের কপাল দিয়ে ঘাম ঝরছে, মুখটি রক্তরাঙা হয়ে উঠেছে,—অপরজন ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে ভিক্ষা চাইছে। রাজা যেন কিছু বলতে চেষ্টা করছিলেন কিন্তু পারলেন না, আবার দেখলেন বাড়ীর ভিতর থেকে একটি সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে বেরিয়ে এলো, হাতে জলের ঘটি, তালপাখা। প্রথম ভিক্ষুকের কপালের ঘাম মুছিয়ে দিল মেয়েটি তার ছোট্ট আধময়লা শাড়ীর আঁচল দিয়ে, তারপর তাকে হাত-পাখায় বাতাস করলো, তারপর জলের ঘটি এগিয়ে দিলো। ভিক্ষুক জলপান করে ক্লান্তি দূর করলো। দ্বিতীয় জনের সামনে এনে দিল অতি সাধারণ আহার্য। ভিক্ষুক পরম পরিতৃপ্তি করে সেই খাবার গ্রহণ করলো। মেয়েটি অনেকক্ষণ তাদের কাছে বসে রইল; অবশেষে তারা তাকে আশীর্বাদ করে চলে গেল—মেয়েটিও বাড়ীর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘুম ভেঙ্গে গেল রাজার। একি স্বপ্ন তিনি দেখলেন এতক্ষণ? এক মুহূর্তে রাজার মন বদলে গেল—প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এসে দেখলেন—গত রাত্রের অনেক পরিশ্রমে তাঁর আদেশমত মন্দিরের সামনে তাঁর এক বিরাট প্রতিমূর্তি বসান হয়েছে—রাজার জীবন্ত চেহারা যেন দাঁড়িয়ে। শিল্পীরা এগিয়ে এলেন—প্রশংসা শুনবার আশায়—বহু পরিশ্রমে তবে একাজ তাঁরা করতে পেরেছেন, পুরস্কার ও প্রশংসা দুইই তাঁদের প্রাপ্য, সুতরাং আশা করবেন বৈকি। কিন্তু রাজা একী আদেশ দিলেন? এখনি ঐ মূর্তি ওখান থেকে অপসারিত করতে হবে? এতদিন নিদারুণ কষ্ট করে যা তাঁরা নির্মাণ করেছেন তা অপসারণ করতে হবে?

হ্যাঁ, তাই রাজাদেশ।

রাজমূর্তি অপসারিত হলো। রাজা ডাকলেন ভাস্করদের—স্বপ্নে দেখা এই সেবামূর্তি নির্মাণ করো। যত অর্থ ব্যয় হোক যত পরিশ্রম হোক, যত নির্মাতা লাগুক—কিছুর জন্যই রাজভাণ্ডারে অর্থের অভাব হবে না কিন্তু স্বপ্নে দেখা এমনি একটি শান্ত সেবা মূর্তি চাই—তবে তাঁর স্বপ্ন সার্থক হবে।

রাজা ভাবলেন তিনি তাঁর মূর্তি দিয়ে সকলের কাছে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চেয়েছিলেন,—কি ভ্রান্তিই না তাঁর ঘটেছিল—মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের মালিক তিনি নন—তিনি প্রজা পালনের অধিকারী মাত্র। আত্মম্ভরিতার কথা ভেবে তাঁর মনে অনুতাপ এলো। রাজা নিজে প্রতিদিন উপস্থিত থেকে সেই মূর্তি নির্মাণ করিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণের সামনে রাখলেন।

অপূর্ব প্রাণময় মূর্তি! সকলে ধন্য ধন্য করতে লাগলো।

বহুকাল কেটে গেছে। রাজাও বহুদিন লোকান্তরিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর নির্মিত মন্দির আজও সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে, প্রভাতের আলো মধ্যাহ্নের সূর্য, রাত্রির চন্দ্রালোক মন্দিরের গায়ে খেলা করে আরো উজ্জ্বল, আরো শ্রীমণ্ডিত করে তোলে। দূর দূরান্তর থেকে দলে দলে লোক আসে, ধর্মার্থী, পুণ্যার্থী আসে, ভিক্ষুক আসে, পথিক পথ চলতে চলতে থমকে দাঁড়ায়,—সকলেরই মনে হয়—এই দৃশ্য আর তাদের দৃষ্টিতে পড়েনি। মন্দিরে শুধু দেবতা দর্শনই হয় না, অতিথিশালায় তারা বিশ্রাম, আহার পায়—আর মন্দিরের সম্মুখে মুগ্ধনেত্রে দেখে অপরূপ সেই করুণাময়ী মূর্তি। ক্ষুধিতকে অন্নদান ও তৃষ্ণার্তের ক্লান্তি দূর করা সেবা-মূর্তিকে তারা প্রণাম জানিয়ে যায়। রাজা অক্ষয় হয়ে থাকেন মানুষের মনে।

আমেরিকার অন্তর্গত ইয়েল সহরের আর্ট স্কুলে একটি বিখ্যাত চিত্র রক্ষিত আছে। চিত্রটির নাম "হারকিউলিসের মৃত্যু।" এক তরুণ বয়সী মার্কিণ শিল্পী এই ছবি আঁকেন। লণ্ডনের রয়াল অ্যাকাডেমির প্রদর্শনীতে দু'হাজার ছবির মধ্যে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় এর শিল্পীকে স্বর্ণপদক দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। এটি ঘটে এখন থেকে প্রায় দেড়-শ বছর আগে। তখন শিল্পীর বয়স মোটে বাইশ বছর। এর পরও তিনি দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন, কিন্তু চিত্রকর হিসেবে তাঁর নাম আর কেউ কোনোদিন শোনে নি। দেশের কোনো ড্রয়িং-এর শিক্ষকতা করেছেন কিন্তু শিল্প সৃষ্টির দিকে তুলি আর ধরেন নি।

আশ্চর্য হওয়ার কথা! দুঃখিত হওয়ার কথাও বটে! মনে হয়—হায়! এমন প্রতিভা নষ্ট হল!

দুঃখিত যে হয় হোক, আমি বলি ভালই হয়েছে। প্রতিভা নষ্ট হয়নি, পথ বদলেছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইনি যে অমূল্য আবিষ্কার করে গেছেন সারা পৃথিবী আজও তার সুফল ভোগ করছে। তাঁর বৈজ্ঞানিক কীর্তির মধ্যে দিয়েই তিনি অমর হয়েছেন। তাঁর নাম যত লোকে জানে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীদের নামও তত জন জানে না। টেলিগ্রাফের আবিষ্কারক স্যামুয়েল মর্স-এর নাম কে না জানে? টরে-টক্কা, টরে-টক্কা, টরে-টক্কা—ডাকঘরে, রেল-স্টেশনে, জাহাজে, সাবমেরিনে, এরোপ্লেনে যেখানেই কান পাত শুনতে পাবে টরে-টক্কা—জলে টরে-টক্কা, স্থলে টরে-টক্কা, অন্তরীক্ষে টরে-টক্কা। 'টরে' আর 'টক্কা' দুটি ধ্বনির বন্ধনে বেঁধেছেন সমগ্র মনুষ্য জাতিকে। দূরের মানুষ আজ এসেছে একান্ত নিকটে। তাঁর উদ্ভাবিত মন্ত্রে মুহূর্তে আমরা হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান মুহূর্তে অতিক্রম করছি।

শিল্পী হঠাৎ শিল্প ছেড়ে বিজ্ঞানে মন দিলেন কেন? সে এক বিচিত্র ঘটনা। পৃথিবীর অধিকাংশ আবিষ্কারই যেমন আকস্মিক, টেলিগ্রাফও তেমনি। সেই আকস্মিকতার ইতিহাস বলছি।

মর্সের জন্ম হয় ১৭৯১ সালে বস্টন সহর থেকে কিছু দূরে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফ্রাঙ্কলিনেরও জন্ম হয়েছিল এখানে। স্কুলের লেখাপড়া শেষ করে মর্স এলেন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৮১০ সালে এখান থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে তিনি চলে গেলেন ইউরোপে চিত্রবিদ্যা শেখার জন্যে। তিন বছর ধরে সে বিদ্যার সাধনা চলল। সাধনা যে নিষ্ফল হয়নি ঐ "হারকিউলিসের মৃত্যু"ই তার প্রমাণ। ঐ ছবি এঁকে তিনি যে অসামান্য গৌরব অর্জন করলেন বাইশ বছর বয়সের আর কোন শিল্পীর অদৃষ্টে তা জুটেছে বলে তো জানি না।

এই সম্মান লাভের পর মর্স দেশে ফেরার উদ্‌যোগ করলেন, উঠলেন জাহাজে। জাহাজটির নাম 'সুলি'। এই জাহাজে বস্টনের এক ডাক্তার ছিলেন তাঁর নাম জ্যাকসন—চার্লস টি জ্যাকসন। এই জ্যাকসন একদিন একটি খেলনা নিয়ে জাহাজের যাত্রীদের এক মজার খেলা দেখাচ্ছিলেন।

যে খেলনার কথা বলা হচ্ছে তার চেহারা কতকটা এই রকম:

(ক) একটি বৈদ্যুতিকচুম্বক। চেহারা খানিকটা সুতোর কাটিমের মত। মাঝখানে সরু পেন্সিলের মত লোহার শিক, তার গায়ে পাকে পাকে জড়ানো সরু তামার তার। (খ) একটা ক্ল্যাম্প (ক)-কে ধরে রেখেছে। ইচ্ছে করলে (ক)-কে ওঠানো নামানো যায়। (ক)-এর গায়ে যে তার জড়ানো আছে তার দুই প্রান্ত খোলা। এরই একটা প্রান্ত গিয়ে লাগল (গ)-এর (গ-১) মুখে।

(গ) একটি সেল। সেলের কাজ বিদ্যুৎ তৈরি করা। টর্চ লাইটের যে ব্যাটারি আমরা ব্যবহার করি সেগুলিও এক-রকমের সেল। কাজেই দেখা যাচ্ছে সেলেরও দুটি মুখ। একটি পজিটিভ, আর একটি নেগেটিভ। পজিটিভের নাম দিলাম (গ-১) নেগেটিভের (গ-২)।

(ঘ) একটি সুইচ। সেলের (গ-২) মুখ থেকে একটি তার এসে সুইচের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

(ক) কাটিমের দ্বিতীয় প্রান্তটিও এসে লাগল এই সুইচের সঙ্গে। সুইচটি হল লাইনটির যোগসূত্র। আঙ্গুল দিয়ে বোতামটি টিপলেই সমস্ত লাইনটির মধ্যে বিদ্যুৎশক্তি চালু হবে। ছেড়ে দিলেই লাইন বন্ধ।

(ঙ) একটি লোহার পেরেক।

(চ) কাঠের পাটাতন। পেরেকটি পাটাতনের উপর ফেলে রাখা হয়েছে। কাটিমটি ঠিক তার আধ ইঞ্চি উপরে।

এবার সুইচটি টেপা হল। ফল কি হবে? সমস্ত লাইনটার মধ্যে বিদ্যুৎ চলবে। তার ফল কি হবে? কাটিমের মাঝখানে যে লোহার শিকটা সেটা চুম্বকত্ব পাবে। তার ফল কি হবে, না, পাটাতনের পেরেকটাকে টেনে তুলবে। সুইচটা ছেড়ে দিলে পেরেকটা পাটাতনে পড়ে যাবে। আবার যদি টিপি আবার উঠবে।

জ্যাকসন যখন সুইচ একবার টিপে একবার ছেড়ে পেরেকের নাচ দেখাচ্ছিলেন তখন মর্স ও ছিলেন দর্শকদের মধ্যে।

খেলা দেখে মর্সের মনে এক নোতুন চিন্তার উদয় হল। তাঁর মনে হল—তারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুতের প্রবাহ কখনও প্রেরণ আর কখনও সংহরণ করে যদি একটা পেরেক ওঠানো নামানো যায়, তাহলে ঠিক এইভাবে বিদ্যুতের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে সংবাদের সংকেত পাঠানোও তো অসম্ভব হবে না। আনন্দের উচ্ছ্বাসে সে কথা তিনি সবার সামনে বলেও ফেললেন।

সুলির যাত্রীরা সেদিন সেকথা শুনে হেসেছিল, আড়ালে কেউ কেউ পাগল বলে ঠাট্টাও করেছিল। কিন্তু সে হাসি-ঠাট্টার আঘাত পাগলের মনকে স্পর্শও করল না। তিনি সেই মুহূর্ত থেকেই তাঁর চিন্তাকে রূপ দেওয়ার কাজে লাগলেন। কোলের উপর একটি খাতা রেখে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে নক্‌শা এঁকে যেতে লাগলেন। নিউইয়র্কে জাহাজ এসে যখন পৌছল তখন তাঁর নক্‌শার খাতাও পূর্ণ হয়েছে। সে খাতাও নষ্ট হয়নি। ওয়াশিংটনের জাতীয় মিউজিয়মে সে খাতাও সযত্নে রক্ষিত আছে। "হারকিউলিসের মৃত্যু"র চেয়ে এই নক্‌শাগুলির মূল্য কম না বেশী?

হাতীর শুঁড়ের মতন যদি
থাকতো দাদুর একটা শুঁড়,
কলাগাছের ফলার খেতো
উজাড় ক'রে সিঙ্গাপুর!

• • •

বেড়াল-মাসির গোঁফের মতন
দিদার যদি থাকতো গোঁফ,
ভোজের ঘটায় দুইজনাতে
ইঁদুর-বংশ করতো লোপ!

• • • •

ময়ূর নাচে পেখম তুলে,
লেজটি দাদু কোথায় পায়?
পেখম ধরার সখ মেটাতে
তাই তো শুয়ে ঠ্যাং নাচায়!

• • • •

চিল-শকুনের মতন যদি
থাকতো পাখা দিদার পিঠে
স্পুটনিকেরে পেছন ফেলে
পৌঁছতো চাঁদে এক-মিনিটে!

• • •

নন্দলালের বাবা নন্দলালকে কিছুতে শায়েস্তা করা... পরে ঠিক করলেন তাকে একটা চাকরীতে বহাল করিয়ে দি... কুড়ি-একুশ বয়েস হতে চলল—তার না হল সাংসারিক জ্ঞান, ন... লেখাপড়া,—ম্যাট্রিক পাশ করে—গ্রামেই রয়ে গেল, কিন্তু ... তাকে একদণ্ড ধরে রাখা যায় না। আজ মারামারি—কাল মড়া পো... —পরশু চোর-ধরা এই সব করে বেড়ায় তার নামই ... ডানপিটে নন্দ।

শেষ পর্যন্ত দিনেশ কাকার সঙ্গে সে ...পুরের জমিদার চৌধুরীদের বাড়ী চাকরী করতে গেল।

দিনেশ গ্রামসম্বাদে নন্দর কাকা হয়। দিনেশ চৌধুরী এস্টেটের ম্যানেজার, তাই নন্দকে জমিদারি কাজেতে লাগিয়ে দিলে।

জমিদার শশাঙ্কশেখরের বয়েস বেশী নয়; বত্রিশ-তে... হবে। খুব শিক্ষিত ছেলে, এম, এ, পড়াতে পড়াতে সারা ... সে ঘুরে এসেছে।

শুধু জমিদারি দেখা নয়, গ্রামে থেকে গ্রামের উন্নতি ক... তার উদ্দেশ্য। পনর বছর বয়সে সে পিতৃহীন হয়। মা তার ... কয়েক বছর পরেই মারা যান। মামারা কলকাতার বিশিষ্ট ... তাদের কাছে থেকেই সে মানুষ হয়েছে।

মাকে শশাঙ্কর প্রায় মনেই পড়ে না; বাবার কথা তার ... মনে পড়ে। হরিনারায়ণ চৌধুরী খুব বিষয়ী লোক ছিলেন, ... তার প্রকৃতিটা বড় শান্ত ছিল। কখনও মারপিট দাঙ্গা-হাঙ্গা... যেতেন না। নিজের জমিদারি দেখাশোনা নিয়েই থাকতেন।

হরিনারায়ণবাবুর মৃত্যুটা অকস্মাৎ ঘটেছিল—এবং ম... কারণও আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত। ম্যানেজার ও হরিনারায়ণবাবু রাতার...

...দাদু?—শিং কি আছে
ভেড়ার মত তার মাথায়?
থাকতো যদি, বুঝতে ঠ্যালা,—
ঢুঁ দেখাতো এক গুঁতোর!

ভাগ্যে দিদা হয়নি শকুন,
দাদুর ভাগ্য—হয়নি মেষ,
হলেই, হ'তো ভাগাড় ঘেঁটে
নয়, খেয়ে ঘাস জীবন শেষ!
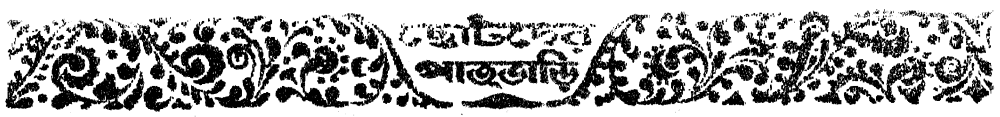
কোথায় যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন—তা পুলিশও হদিশ করতে পারল না।

শশাঙ্ক গ্রামে এসে সব নূতন লোক জমিদারির কাজে বহাল করলে। আর দিনরাত গ্রাম উন্নয়নকল্পে কৃষি-শিল্প ইত্যাদির জন্য নানা যন্ত্রপাতি আনিয়ে সকলকে কাজে উৎসাহিত করতে লাগল।

শশাঙ্কশেখর নন্দকে দেখে বেশ খুসী হল। নন্দকে কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে ম্যানেজারকে ডেকে বললে, "আপনি নন্দবাবুর থাকার ব্যবস্থা করে দিন—নূতন কোয়ার্টারের যে কোনটা ওঁর পছন্দ হয় ঠিক করে দিন। খাওয়াদাওয়া আমার বাড়ীতেই হবে।"

"যে আজ্ঞে," বলে দিনেশ নন্দকে নিয়ে তার থাকার ব্যবস্থা করতে গেল।

দিগন্তবিস্তৃত সবুজ মাঠের উপর ছোট ছোট বাড়ীগুলি বেশ, একখানি করে ঘর, কল, পায়খানা, এপাশে একটি ছোট ঘর, একফালি উঠোন। একা থাকার পক্ষে ভারি সুন্দর। কোয়ার্টারগুলো বেশ দূরে দূরে।

প্রথম কোয়ার্টারে ঢুকেই নন্দ জানলা থেকে দেখতে পেলে,—মাঠ ছাড়িয়ে রাস্তা, বাঁদিকে খানিকটা গিয়েই একখানা সুন্দর বাংলো। চারিদিকে অনেক জমি, বাগান ফুলে ফুলে ছাওয়া—নানা ফলমূলের গাছ—কুয়ো, কত কি।

নন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাংলোখানা দেখিয়ে দিনেশকে বললে "হ্যাঁ কাকা ঐ বাড়ীখানা কার? কে থাকে ওখানে?" বলেই সে মাঠ পেরিয়ে রাস্তার কাছে এসে পড়ল।

দিনেশ নন্দর সঙ্গে এসে তাকে দাঁড়াতে বললে, "থাম—থাম, ও বাড়ী এমনি পড়েই থাকে, ওদিকেই কেউ যায় না, তুমি তাহলে এই কোয়ার্টারটাতেই থাক, আমাদের খুব কাছে হবে।"

নন্দ অমন বাড়ীটা দূর থেকে মুগ্ধ হয়ে দেখতে দেখতে বললে, "বাড়ীটা কার বললে না ত, মানুষ জন থাকে নাই-বা কেন? এমন চমৎকার ছোট্ট বাড়ীটি, যেন ছবি!"

"তোমার ছবি এখন রাখ, বাড়ী আবার কার হবে, শশাঙ্কবাবুর বাবা সখ করে করিয়েছিলেন। স্ত্রী মারা যাবার পর ঐ বাড়ীটাতেই থাকতেন। এখন চল দেখি—বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হতে চলল।" বলেই দিনেশ বাড়ীর দিকে পা বাড়াল।

নন্দ ডাকল, "কাকা একটু দাঁড়ান, বাড়ীটায় কেউ থাকে না, কেন, কারণটা কি?"

দিনেশ এবার বিরক্তির সুরে জবাব দিলে, "থাকে না কেন? তোমার অত গুষ্টির খবরে কি দরকার? ও বাড়ীতে কোনো লোক থাকে না, এবার হল ত? এখন যাবে, না বাড়ী দেখবে? জ্বালা আপদ জুটল, তুই সামান্য কর্মচারি কোয়ার্টারে থাকবি। তোর অত বাংলোর খবরে কি দরকার বল্ ত?"

"আহা, বলি বাড়ীটা যখন পড়েই থাকে, তখন দু'দিন আরাম করে থাকলে দোষটা কি!—যে থাকে সে মরে যায়, ব্যাপারটা কি বলুন তো? ভূতের বাড়ী, না হানাবাড়ী? ওসব বাজে কথা—চোর-ডাকাতেরা আড্ডা করে ভয় দেখায় আর কি! তাইতেই রটে গেছে ভূতের বাড়ী।—এ যদি না হয়—"

"তোর বিধান কে শুনেছে? বলে ও বাড়ীর ত্রিসীমানায় কেউ যায় না, উনি থাকবেন এই বাড়ীতে, যেদিন থাকবি, তার পরদিন ত আর ফিরবি না, তোর বাপ-মাকে বলব কি! ছোঁড়ার মাথা খারাপ, অন্ধকার হয়ে এল।" দিনেশ আবার যাবার জন্য এগোল।

"আচ্ছা কাকা আমার মনে হয়—তেমন কিছু নয়, নইলে বাড়ীটা ভেঙ্গে ফেলত। এমন বাড়ী মানুষে থাকবে না—বাঃ আপনি চলুন ত জমিদারের কাছে, আমি বলে দেখব—আমায় থাকতে দেবেন কিনা!"

এবার দিনেশ ভীষণ রেগে গিয়ে বললে, "যা তোর চাকরী করে কাজ নেই, কালই বাড়ী চলে যা, কথার একটা মাথা-মুন্ড নেই, আচ্ছা কাটগোঁয়ার ছেলে। বাপ-মাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে—"

নন্দ বাধা দিয়ে বললে, "আমি সেই কথাই-ত বলছি যে ভয়ের একটা মাথা-মুন্ড আছে ত, ভয় হলেই হল? চলুন আমি গিয়ে বলছি।"

দিনেশ পথে গজ-গজ করতে করতে চলল।

নন্দ বাড়ীর দিকে চাইতে চাইতে বললে, "কি ফুলের গন্ধ! এমন বাড়ীতে দুদিন থেকে মরাও ভাল!"

দিনেশ খেঁকিয়ে উঠল এবার—"বলে নেইকো যার ধাম, তার রাধাকিষ্ট নাম! তিরিশ টাকা মাইনের চাকরী করতে এসে—ফুলের গন্ধ—ছোঃ!"

শশাঙ্কশেখর নন্দর কথা শুনে বিরক্ত না হয়ে হেসে বললে, "তা সব শুনেও থাকতে চাইছ ও বাড়ীতে? সাহস আছে দেখছি! আমি কতটা রিস্ক নিতে চাই না, সবাই যখন ভয় পায়, ভয়ে মরেও গেছে শুনেছি তখন থাকাটা কি ঠিক হবে?"

"আজ্ঞে স্যার খুব ঠিক হবে,—এর আর রিস্ক কি আছে! আমি না হয় লিখে দিচ্ছি যে—স্বেচ্ছায় ঐ হানাবাড়ীতে থাকছি!"

শশাঙ্ক হাসতে লাগল। সাহস পেয়ে নন্দ বললে, "দেখবেন স্যার—ভূত-টুত কিসসু নয়। আমি অমন অনেক বাড়ীতে থেকে চোর-ডাকাত বদমাইসকে পুলিশে দিয়েছি, তাহলে স্যার—!" নন্দ হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রইল।—

শশাঙ্ক দিনেশকে ডেকে বললে, "যান নন্দবাবুকে ঐ বাড়ীতেই থাকার ব্যবস্থা করে দিন। তবে দুজন লোক যেন ওখানে রাতে শোয়—বলা যায় না—যদি ভয়-টয় পায়!"

দিনেশ "যে আজ্ঞে হুজুর" বলে ব্যবস্থা করতে গেল, একবার নন্দর দিকে চেয়ে শুধু বললে, "ডানপিটে কি সাধে বলে!"

নন্দলাল তোফা আরামসে জমিদার বাড়ীর চর্ব্য-চোষ্য খেয়ে, বাংলো বাড়ীখানাতে ঢুকল।

ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে, আসবাবপত্রে ভর্তি সাজান-গোছান, বাগানের দিকে ঘরখানাতে নন্দর বিছানা হয়েছে, মাথার কাছে কুঁজোতে জল। নন্দ খাটখানা জানলার ধারে টেনে এনে খুসীমনে বললে—"আঃ ফুলের কি গন্ধ! এইবার আলো নিভিয়ে শোওয়া যাক।"

রাত তখন কটা হবে কে জানে! নন্দর ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। মনে হল পাশের ঘরটায় কে যেন ঘোরাঘুরি করছে। আলো জ্বলছে সে ঘরেও—"কে আবার!" বলেই নন্দ মাথার বালিশের নীচে দা'খানা বার করে নিলে। একবার সামনে জানলার দিকে বাইরে চেয়ে দেখলে ঘুটঘুটে অন্ধকার—ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাক ছাড়া কিছু শোনা যায় না।

আলোটা জেলে ফেললে নন্দ। তারপর পা টিপে টিপে গিয়ে পাশের ঘরটায় উঁকি মারলে—এ-আবার কি—এতরাতে এক ভদ্রলোক একটা আলমারি খুলে কি সব হাঁটকাচ্ছেন। কে রে বাবা!"

নন্দ ভদ্রলোকের পেছনে গিয়ে বললে, "কে মশাই?"

ভদ্রলোক ফিরে দাঁড়ালেন। বয়েস চল্লিশের বেশী মনে হয় না। সৌম্য চেহারা—রং ধবধবে ফর্সা। পরনে কুরতো ও ধুতি।

নন্দকে দেখে প্রথমটা যেন অবাক হলেন, তারপর খুসী হয়ে আলমারির ভেতরটা দেখতে বললেন।

"আলমারিতে কি? এত রাতে আপনি কি করছেন? টাকাকড়ি বুঝি? তা থাকেন কোথায়?"—নন্দ বললে।

"এইখানেই থাকি, এতো আমারই বাড়ী।" ভদ্রলোক ইসারায় বললেন।

নন্দ আলমারিতে হাতড়ে কোন হদিশ পেলে না। হঠাৎ বলে বসল "থাকেন ত শুয়েছিলেন কোথা?"

কোন জবাব না দিয়ে ভদ্রলোক বললেন সম্পূর্ণ ইংগিতে যে, "আমার সংগে একবার বাগানে চলত বাবা, একবার দেখিয়ে না দিলে আমার মুক্তি হচ্ছে না।"

নন্দ একটু আপত্তি করলে, বললে, "কাল হবেখন, আজ এইরাতে তায় অন্ধকার, কি? মাটিতে টাকাকড়ি পোঁতা আছে বুঝি!"

ভদ্রলোক নন্দর কথা গ্রাহ্যই করলেন না, ইসারায় অনুরোধ করে বললেন, "চল না বাবা এমন সুযোগ আর কি হবে! এস এস আমার সংগে।" নন্দ না বলতে পারল না, ভদ্রলোকের মুখখানি ভারি বিষন্ন ও করুণ দেখাচ্ছিল—কান্নায় যেন তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছে—বার বার দীর্ঘশ্বাস পড়ছে—সে দীর্ঘশ্বাস যেন হিমশীতল।.........

নন্দ ভদ্রলোকের সংগে বাগান পেরিয়ে চলল কুয়োতলা পর্যন্ত। থামলেন তিনি—উঃ কি অন্ধকার! কিছু দেখা যাচ্ছে না। ভদ্রলোক হঠাৎ গাছের নীচে বসে দু'হাতে মাটি খুঁড়তে লাগলেন।

নন্দ বললে, "করেন কি মশায়—এইখানেই মোহর-টোহর আছে বুঝি, সরুন আমি এই দা দিয়ে খুঁড়ে দি—কাল সকালে ঠিক হতো—কি যে ব্যাপার, আপনি বোবা হয়েই মাটি করেছেন কিনা!" বলেই নন্দ বসে পড়ে মাটি খুঁড়তে লাগল—কিছু দেখা যাচ্ছে না—অজানা একজনের সংগে ঘরের বাইরে এসে, চারিদিক নিস্তব্ধ রিমঝিম করছে। দূরে মাঠের মাঝে শিয়াল, কুকুর, একসংগে বিকট চীৎকার করে উঠল। নন্দর কেমন যেন বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। সে বললে," দেখুন আজ হবে না বুঝলেন? এ্যাঁ আরে বাস এখুনি এখুনি গেলেন কোথা? এ্যাঁ কি তাজ্জব রে বাবা—তবে কি মানুষ নয় না কি? ভূত দেখলুম নাকি? নইলে জলজ্যান্ত মানুষ কি নিমেষে অদৃশ্য হয়! ওরে বাবা তাই বলি—" বলেই নন্দ গেটের দিকে দৌড়ল ......

কাছেই ওপাশের কোয়ার্টারে দরোয়ানরা লাঠি সড়কি নিয়ে বসে-ছিল—নন্দকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল তারা "আরে বাবু আপনি বাঁচিয়ে আছেন?"

এরপর আর শশাঙ্কর সব বুঝতে বাকী রইল না যে, আগের ম্যানেজার তার বাবাকে খুন করে কুয়োতলায় পুঁতে ফেলেছিল। মাটি খুঁড়তেই একটি গোটা মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গেল। আর আলমারি থেকে পুরান দলিল কাগজপত্তর ও বিস্তর টাকাও মিলল।

বলা বাহুল্য, জমিদার শশাঙ্কশেখরের অনুগ্রহে নন্দলালেরও বরাত খুলে গেল।

হিংসা নিজেই পুড়ে মরে

(১৭১ পৃষ্ঠার পর)

তাঁর স্ত্রী তাঁকে খুব ভালবাসেন, বললেন, "তাই তো! ভেবে দেখা যাক কি উপায়ে ওকে মেরে ফেলা যায়।"

এখন, ঐ সম্ভ্রান্ত লোকটির জমি-জমার এক জায়গায় চুন পোড়ানো হচ্ছিল। তাঁর স্ত্রী গেলেন সেখানকার মজুরদের কাছে। তাদের বলেন, "দেখ, তোমাদের এই মোহরগুলো বখশিস দিচ্ছি এই সর্তে যে, কাল সকালে প্রথমেই যে লোকটি রসের হাঁড়ি নিয়ে তোমাদের কাছে আসবে তাকে তোমরা চুন পোড়ানো ঐ জ্বলন্ত ভাটিতে ফেলে দেবে।"

লোকগুলি বলে, "তাই হবে।"

মহিলাটি বাড়ি ফিরে তাঁর স্বামীকে এই ফন্দির কথা জানালেন।

সম্ভ্রান্ত লোকটি তাতে খুব খুশী হলেন। তারপর দুজনে একটা বড় হাঁড়ি রসে ভর্তি করে পরদিন হাউয়েলকে সেটি দিয়ে বলেন, "চুন-পোড়ানো মজুরদের দিয়ে এসো।"

হাউয়েল হাঁড়িটা নিয়ে চলেছে। পথে এক জায়গায় এক বৃদ্ধ ধর্মপুস্তক পড়ছিলেন। সেখানে কয়েকজন লোক বসে শুনছে। অমনি হাউয়েলের মনে পড়ে তার বাবার উপদেশটি। সে পাঠ শুনতে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং সেখানে অনেকক্ষণ কাটায়।

ওদিকে হাউয়েলকে আর ফিরতে না দেখে সম্ভ্রান্ত লোকটি মনে করেন, মজুররা তাকে ভাটিতে পুড়িয়ে মেরেছে। তিনি খুশী হয়ে তাদের বখশিস দেবার জন্যে আর এক হাঁড়ি রস নিয়ে চুন-খোলার দিকে রওনা হলেন। তারপর সেখানে পৌঁছতেই মজুররা তাঁকে ধরে জ্বলন্ত চুল্লীতে দিয়ে ফেললে। তিনি পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন।

এইভাবে হিংসা নিজেকে পুড়িয়ে মারে। *

* ওয়েলস্ দেশের একটি গল্প।
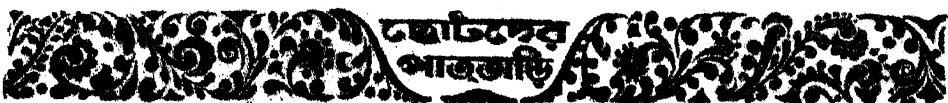
[আসামী রূপকথা)

আসামের লুসাই পাহাড়। গভীর জঙ্গল। জঙ্গলের পাশ দিয়েই বয়ে গেছে ব্রহ্মপুত্র নদ। জঙ্গলে থাকে যত বনের জানোয়ার আর নদীতে থাকে কুমীর। জঙ্গলের ধারে থাকে দু'চার ঘর গরীব মানুষ।

একদিন এক গরীব কাঠুরে বনের ধারে নদীর কিনারায় বসে কুড়ুল শানাচ্ছিল। পাথরে কুড়ুল ঘষার ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস শব্দ এক বাচ্চা কাঁকড়ার ভালো লাগলো না, সে কামড়ে দিল কাঠুরের পায়ে। বুড়ো কাঠুরে কাঁকড়াটিকে মারতে গিয়ে কুড়ুলের এক কোপ মেরে বসলো এক গাছের গোড়ায়। গাছ টলমল করে উঠলো। বেল গাছ। দোলা লেগে একটি পাকা বেল পড়ে গেল। বেলটি মাটিতে পড়লো না, পড়লো এক কাঠবিড়ালীর পিঠের উপর। পিঠ ভেঙে গেল বুঝি। যাতনায় কাঠবিড়ালী মাটিতে পড়ে পা ছুঁড়তে লাগলো।

সেখানে ছিল এক পিঁপড়ের বাসা। কাঠবিড়ালীর পা লেগে সেই বাসা ভেঙে গেল। রাগে গম্‌গম্‌ করতে করতে পিঁপড়েরা গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো। সামনেই ছিল এক সাপ। পিঁপড়েরা কামড়ে ধরলো সেই সাপকে। ছিটফিট করে সাপ ছুটলো। সামনে পেল এক বুনো শুয়োর, দিল তাকে কামড়ে। সাপের কামড়ের জ্বালায় বুনো শুয়োর ক্ষেপে গেল, সাপটা কলাগাছের আড়ালে পালিয়েছে দেখে সে কলাগাছের গোড়া কাটতে সুরু করলো। কলাগাছের মাথায় ছিল চামচিকের বাসা। চামচিকে ভয় পেয়ে উড়ে গেল। দিনের আলোয় চামচিকে চোখে দেখে না। গর্ত মনে করে গিয়ে ঢুকলো এক হাতীর কানের মধ্যে। কানের মধ্যে চামচিকে ফরফর করে, আর হাতী পাগল হয়ে ছুটে বেড়ায় বনে। হাতীর দাপাদাপিতে কত গাছ থেঁৎলে যায়, কত বা ভেঙে পড়ে। একটা গাছ ভেঙে পড়ে গড়াতে গড়াতে এসে পড়লো পাহাড়ের নীচে। একখানি কুঁড়ে ঘর ছিল সেখানে, গাছের ধাক্কায় ভেঙে পড়লো। সে ঘরে থাকতো এক ডাইনীবুড়ী। সে তো রেগেই খুন। পাহাড়ের মাথায় হাতীকে দেখে সে জিজ্ঞাসা করলে—ঘর ভাঙলি, আমি এখন থাকি কোথায়?

হাতী বললো—আমি কি করবো? কানের মধ্যে কি একটা ঢুকেছে।

—কে ঢুকেছিস কানে বেরিয়ে আয়।

চামচিকে বেরিয়ে এলো। ডাইনী বললো—কানের মধ্যে ঢুকেছিস কেন?

চামচিকে বললো—কলাগাছ নড়লো কেন? দোষ তো সব ওই বুনো শুয়োরটার।

বুড়ী ডাকলো বন-শুয়োরকে, বললো—এসব কী?

চট্‌পট্‌ ব'লে ফেল'—ঝাল্‌ কোন্‌ দেশ?
'লংকা' গো 'লঙ্কা', বুঝলে রমেশ!
আগে মাটি পরে জল,—মাঝে তার মাঝ?
'ভূমধ্যসাগর' সেটা, জানো রসরাজ!
কোন্‌ খাল ডেকে বলে—নামাও চরণ?
'পানামা' তা জানো না কি অনিল বরণ!
দেখতে কি ভালোবাসো—যেটা নয় টক?
ভেবে ভেবে হ'লে সারা সেটা যে 'নাটক'!
এবার বলো তো কোন দেশে নেই রবি?
'নাইরোবি', 'নাইরোবি,'—জানতে কি ছবি!
বল্‌ দেখি কোন্‌ হ্রদে—শুধুই বিকাল?
'বৈকাল' নাম তার, জানলি কৃপাল!
কোন্‌ সে মিঠাই বল্‌ দাম যার খুব?
'দরবেশ'.—জানিস না? আচ্ছা বেকুব!
বল্‌ কোন্‌ পাহাড়ের নাকে ঝোলে মই?
'মৈনাক', 'মৈনাক'.—পড়িস না বই।
ওল্‌টালে কোন ফল বেড়ে মজা হয়?
'জাম'-টা উল্টে দেখ, হয় কি না হয়॥

বনশুয়োর বললো—সাপে আমায় কামড়ালো কেন? বিষের জ্বালায় মরছি।

বুড়ী ডাকলো সাপকে, বললো—এসব কী?

সাপ বললো—দোষ তো পিঁপড়ের। ওরা আমাকে কামড়ালো, আমিও যাকে পেলাম কামড়ে দিলাম।

বুড়ী ডাকলো পিঁপড়ের রাজাকে, বললো—এসব কী?

পিঁপড়ে বললো—দোষ তো কাঠবিড়ালীর, আমার বাসা ভেঙে দিলে আমাদের রাগ হবে না?

বুড়ী ডাকলো কাঠবিড়ালীকে, বললো—এসব কী?

কাঠবিড়ালী বললো—আমি কি ইচ্ছা করে ভেঙেছি, বেল পড়ে পিঠ ভেঙে গেল যে!

বুড়ী গেল বেলগাছের কাছে, বললো—এসব কী? যখন-তখন বেল পড়লেই হলো?

গাছ বললো—দোষ তো কাঠুরের, হঠাৎ এক কোপ বসিয়ে দিলে।

বুড়ী গেল কাঠুরের কাছে। বললো—তুমি ফলন্ত বেলগাছ কোপালে কেন?

কাঠুরে বললো—দোষ তো কাঁকড়ার। ওকে মারতে গিয়েই হাত ফসকে গাছে কোপ পড়ে গেল।

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)
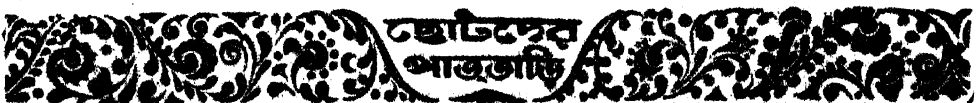
(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বুড়ী নদীর তীরে গিয়ে কাঁকড়াকে ডাকলো, বললো—কাঠুরের পায়ে তুই কামড়ালি কেন?

কাঁকড়া বললো—কুড়ুল শান দেবার ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দ আমার ভাল লাগছিল না। তাই কামড়ে দিলাম।

বুড়ী বললো—এ বড় অন্যায় কথা, এর সাজা হবে। বনে বাস করে অন্যায় করা চলবে না। আমার ঘরখানা যে পড়ে গেল, আমি থাকবো কোথায়?

সব জানোয়াররা বললো—সত্যি কথাই তো! ওকে সাজা দিতে হবে।

বুড়ী বললো—তুমিই বল, কি সাজা দেব ওকে?

জানোয়াররা বললো—অমন দুষ্টু কাঁকড়ার মরাই ভাল।

বুড়ী বললো—বেশ, তাহলে তোমাকে মরতে হবে। কিভাবে তুমি মরতে চাও বল? জলে ডুবে, আগুনে পুড়ে, বিষ খেয়ে, খেঁৎলে—কিভাবে মরবে?

কাঁকড়া বললো—আমি জলে ডুবে মরবো। সেই ভালো।

বুড়ী বললো—তাহলে তৈরী হও!

কাঁকড়া বললো—আমি তৈরী।

তারপরেই কাঁকড়া লাফিয়ে পড়লো জলে।

সবাই বললো—একি হলো, ও তো জলেই থাকে।

বুড়ী বললো—তাইত খুব ঠকিয়েছে!

বুড়ী তখনই কুমীরকে ডাকলো, বললো—কাঁকড়াটাকে ধরে এনে দাও!

কুমীর এক ডুবে কাঁকড়াটাকে ধরে নিয়ে এলো।

জানোয়াররা বললো—ওকে পুড়িয়ে মার।

কুমীর বললো—পুড়লে তো ছাই হয়ে যাবে। তার চেয়ে ওকে গরম জলে সিদ্ধ করো। সিদ্ধ হলে তুমি ওকে খাবে। ও যেমন তোমার ঘর ভেঙেছে তেমনি সাজা পাবে!

কথাটা সবাইকার মনে লাগলো। কাঠুরে কাঠ কুড়িয়ে আনলো। বুড়ী আগুন জ্বাললো। হাঁড়িতে জল ফুটলো। কাঁকড়াটিকে ফেলে দেওয়া হলো তার মধ্যে। কাঁকড়া সিদ্ধ হতে লাগলো। সবাই বসে রইল চারিপাশে।

খানিক বাদে কুমীর এগিয়ে এলো। হাঁড়ির মধ্যে উঁকি মেরে বললো—একি? এতো জলে কখনও কাঁকড়া সিদ্ধ হয়? খানিকটা জল কমিয়ে দিই।

হাঁড়ির মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে এক চুমুকে গরম জল কুমীর খেয়ে নিল।

আবার কিছুক্ষণ কেটে গেল, সবাই বললো—কি হলো, জল ফুটছে?

কুমীর দেখে বললো—না, এখনও জল বেশী রয়েছে, একটু কমিয়ে দিই।

আবার কুমীর এক চুমুকে জল খেয়ে নিল।

বুড়ী উনুনে কাঠ ঠেলে দেয়। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। জানোয়াররা বলে—এবার হলো?

কুমীর দেখে বললো—সবে জল ফুটছে, আরেকটু হোক্!

আরো কিছুক্ষণ যায়। জানোয়াররা বলে—হলো?

কুমীর বললো—আরেকটু বাকি।

বুড়ী বললো—না, আর বাকি নেই, এখনি নামাবো!

অনেক কষ্টে বুড়ী হাঁড়ি নামালো। সবাই ঝুঁকে পড়লো দেখতে। কিন্তু কই? হাঁড়ীতে তো কাঁকড়া নেই।

সবাই কুমীরকে বললো—কাঁকড়া কোথায়?

কুমীর বললো—তাইত! তাইত! এই তো ছিল।

—তাহলে তুমিই তাকে খেয়েছ?

—তা হবে, জলে যখন চুমুক দিয়েছি তখন পেটে চলে গেছে, টের পাইনি!

—টের পাওনি? বটে।

সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লো কুমীরের উপর। আঁচড়ে কামড়ে চড়চাপড় মেরে তাকে নাস্তানাবুদ করে তুললো, বললো—ব্যাটা জোচ্চোর!

কুমীর কোনরকমে পালিয়ে নদীতে গিয়ে নামলো, তবে প্রাণ বাঁচে। কিন্তু সেই মারের দাগ তার পিঠে চিরদিন রয়ে গেল। কুমীরের পিঠ তাই অমন এবড়ো-খেবড়ো।

খুকুর দুঃখ
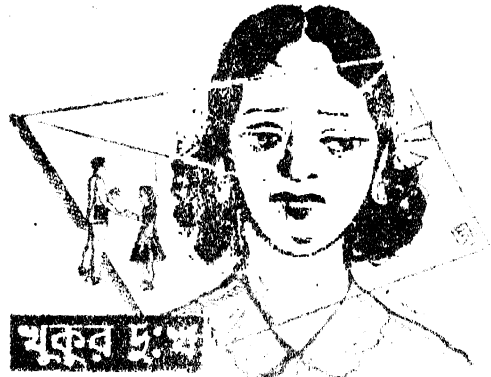
শ্রী প্রভাত কিরণ বসু

আমার নামে কোনো চিঠি
কেউ লেখেনি কক্ষণো।
লিখ্‌বে যে কেউ, পাচ্ছিনাতো
আজো তেমন লক্ষণও।
পড়তে আমি নাই বা পারি,
লিখতে না হয় নাই জানি;
আমার নামে একটা চিঠি,
তবুও আমার চাই, জানি।
পিয়ন যেদিন বল্‌বে এসে—
'তোমার চিঠি এই, খুকু!'—
সেদিন কত খুসি হব,
কে জানে আর সেইটুকু?
আমি যেদিন বড়ো হব,
এই ব্যবহার ভুলব্‌ না;
আমার কেনা পোষ্টোকার্ডে
কারুর নামই তুলব্‌ না।
সেদিন যেন রাগ করে না
আমার চিঠি চায় যারা!
শোধ নোব ঠিক্, শোধ নোব ঠিক্,—
তাইতো কষি পাঁয়তারা।
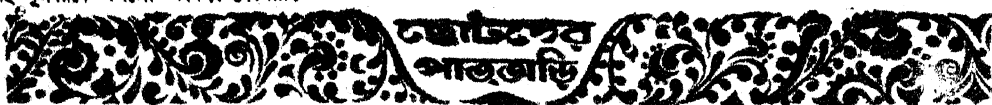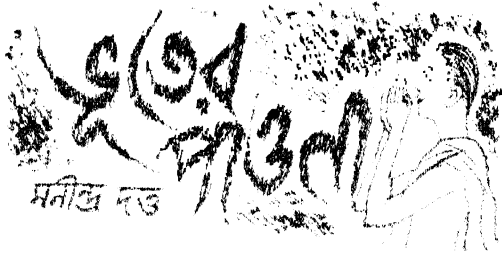
এক ছিল গরীব মানুষ।

বেচারি!

নুন জোগাতে তার পান্তা ফুরোয়—এমনি হাঁড়ির হাল।

একদিন—

অমাবস্যার রাত। ঘুরঘুট্টি আঁধার। কোলের মানুষ চেনা যায় না। নিজের নিঃশ্বাস শুনে নিজেরই ভয় করে। এমনি রাতে—

যা থাকে কপালে—বলে গরীব মানুষ হাজির হল নদীর ধারে শ্যাওড়া গাছের নীচে।

সেই গাছে নাকি থাকে এক কন্দকাটা বেহ্মদত্তি।

চোখ বুজে হাতজোড় করে গরীব মানুষ বলল, হেই বাবা কন্দকাটা বেহ্মদত্তি, আমাকে একটা মোহর দাও, না হয় দুটো মোহর দাও। সেই মোহর দিয়ে দিনমান ব্যবসা করে যা লাভ করব তার অর্ধেক যোগ করে সুদে-আসলে তোমার মোহর তোমাকে ফিরিয়ে দেব কাল।

কথা বলতে না বলতেই আজব কান্ড!

মড় মড় করে উঠল শ্যাওড়া গাছের ডাল।

কর কর করে বাজ ডাকল আকাশে। শন্ শন্ করে হাওয়া উঠল চারদিকে।

চোখের সামনে নেমে এল এক জলজ্যান্ত কন্দকাটা বেহ্মদত্তি।

তাই না দেখে গরীব মানুষের তো চক্ষু ছানাবড়া—বুক ধুকপুক—প্রাণ যাই-যাই। বেহ্মদত্তি মিহি সুরে বলল, এই নে দুই মোহর। কাল ফিরিয়ে দিবি তো?

গরীব মানুষ হাত পেতে মোহর নিয়ে ঢোক গিলে বলল, দেব—দেব—দেব। দুই মোহর দেব—আরো লাভ দেব। কাল দেব—কাল দেব—কাল দেব।

বেহ্মদত্তি হাত বাড়িয়ে শ্যাওড়া গাছের ডাল থেকে একখানা খাতা পেড়ে কি যেন হিজিবিজি লিখতে লিখতে পাতার আড়ালে হাওয়া হয়ে গেল।

গরীব মানুষও দুই মোহর ট্যাঁকে গুঁজে বন্দরের পথ ধরল।

বন্দরে পেঁৗছে সারা দিনমান সে জিনিষ কিনল আর বেচল। আবার কিনল, আবার বেচল। এমনি করে অনেক লাভ হল। আর সেই লাভের টাকা দিয়ে ভাল ভাল খাদ্য-খাবার কিনে তাই দিয়ে ভুরি ভোজ করে কসে লাগাল একখানা টানা ঘুম।

এমন সময়—

ঠক্ ঠক্ ঠক—

ও কি? দরজায় কড়া নাড়ে কে?

চোখ রগড়ে উঠে বসল গরীব মানুষ।

—ওঃ, তুমি বাবা কন্দকাটা বেহ্মদত্তি!

তা বাবা, তোমার এমন মতিভ্রম কেন? তোমাকে ত পাওনা দেবার কথা কাল। তা'হলে তুমি আজ এসেছ কেন?

কি যেন বলতে যাচ্ছিল বেহ্মদত্তি। গরীব মানুষ তাকে ধমকে উঠল, যাও যাও, মেলা ফ্যাচর ফ্যাচর করো না। কাল এসো, তোমার পাওনাগন্ডা সুদে আসলে বুঝে নিও।

কি আর করে। এক পা দু-পা করে বেহ্মদত্তি হাওয়া হয়ে গেল।

পরদিন আবার নড়ে উঠল গরীব মানুষের দরজার কড়া। বেহ্মদত্তি বলল, আজ হয় আমার মোহর দিবি, নইলে তোকে বেঁধে নিয়ে যাব বেহ্মদত্তিপুরে। সেখানে তোর বিচার হবে।

গরীব মানুষ চোখ কুঁচকে বলল, সেই ভাল। বেহ্মদত্তিপুরের বিচারই আমি চাই। সেখানে তোমার খাতাপত্তর দেখিও। কিন্তু মনে রেখ, তাতে লেখা আছে, তোমার পাওনা তুমি পাবে কাল, আজ নয়। এখন ভাগো। আমার ঘুমের ব্যাঘাত করো না।

বেহ্মদত্তি দেখল, এ তো মহা-ফ্যাসাদ। রোজই তো 'আজ' হয়।

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

সর্ষেতে তেল হয়, কুমড়োতে হয় না—
গোরুদের শিং রয়—হাতিদের রয় না।
প্যাঁচাদের খাসা চোখ—তবু দ্যাখো নাক নেই,
পাখিদের ঝুঁটি আছে—কারো তবু টাক নেই।
ছাগলের দাড়ি আছে—কোনো দিন চাঁছে না—
কাকাতুয়া বকে কত—ভুলে কভু হাঁচে না!

বাঘেরা তো কোনদিন মাসীবাড়ী যায় না—
মাছ খায় বেড়ালেরা—মুলো শাক খায় না?
যত ভাবি ঘাবড়াই—
ভোঁতা লাগে বুদ্ধিটা—চাঁদিটাকে থাবড়াই!

হাওড়ার খাঁদু পিসি—কী ভীষণ হাঁক তার—
পিসে কেন চুপচাপ—কেন ডাকে নাক তার?
কিনলে ঘুগনিদানা—দাম কেন চায় সে?
"জল খাবো" বলে মামা—লুচি কেন খায় সে?
এলোমেলো কত কী যে ঘটছেই দিন রাত—
যত ভাবি মাথা ধরে—শুয়ে থাকে চিৎপাত।
কেউ মোরে কয় না :
অঙ্ক স্যারের কেন জ্বর কভু হয় না?

—
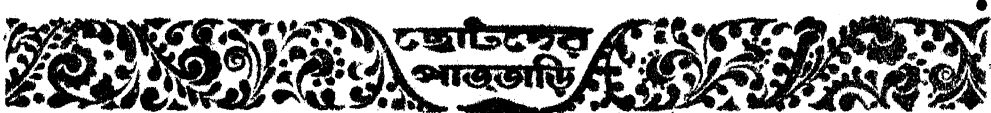
(সত্য ঘটনা)

বাসরঘর। বরকে ঘিরে বসে আছে মেয়ের দল, আশী বছরের ঠানদি থেকে বারো বছরের কিশোরীর ভীড় সেখানে; আর মাঝে মাঝে উঠছে হাসির ঝঙ্কার কারণে ও অকারণে। 'ও ভাই বর একখানা গান শোনাও না' আবদার করেন ঠানদি, সাথে সাথে ওঠে কলরব সমর্থন। ভয়ে বরের গলা শুকিয়ে যায়, সে বেচারা ঢোক গেলে। 'ও ভাই দেখ, দেখ, বর গলায় শান দিচ্ছে' উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে এক কিশোরী। এবার লজ্জায় হেঁট হয়ে যায় বরের মাথাটা' মাটির দিকে তাকিয়েই গান করবে নাকি ভাই' প্রশ্ন করেন সুরসিকা ঠানদি। বরের মুখে এবার ফুটে ওঠে এক কঠিন সম্কল্প। 'গান আমি শোনাব, তবে তার আগে একবার বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিন' হাসি মুখে বর বলে ওঠে। 'তা যাও ভাই, মাঠে গিয়ে গলা সেধে এস' ঠানদির কলকণ্ঠ আবার বেজে ওঠে। ধীরে ধীরে বাইরে চলে যায় নূতন বর।

মিনিট কুড়ি পর বাসরে ফিরে আসে বর। 'আনুন হারমোনিয়ম আর তবলা' বেশ জোর গলাতেই বর এবার তার দাবী জানায়। আসে হারমোনিয়ম আর তবলাসহ বাদক। একের পর এক গান গেয়ে চলেছে বর। কি অপূর্ব সে সুর ঝঙ্কার; বাসর ছাড়িয়ে বয়ে বাড়ী ছাড়িয়ে, গোটা গ্রামটাই যেন ভেসে যায়, সে সুরের জোয়ারে। বাসর ভরে গিয়েছে লোকে, জানালায়, দরজায় লোকের ভীড়, উঠানেও স্থান করে নিয়েছে গ্রামের সব লোক। মন্ত্রমুগ্ধের মত সবাই শুনছে সেই গান। পুরো দু ঘণ্টা গান গেয়ে বর বাসর ছেড়ে বাইরে যায়। প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ, এত বড় গায়ক এই বর? ঘোমটার আড়ালে নব বধূর চোখ দুটোও বোধ হয় আনন্দে বেশ একটু চিক্-চিক্ করে ওঠে।

আসল ব্যাপারটা কি তোমরা কেউ বুঝতে পারলে? ছোট ভাই-এর বিয়ে সে বেচারা গান জানে না, তাই বাইরে গিয়ে তার যমজ বড় ভাইকে বাসরে পাঠিয়ে দিয়েছে গান শোনাতে, তার জামা-কাপড় দিয়েছে পরিয়ে মায় মুখে চন্দন এঁকে আর হাতে লাল সুতো বেঁধে। যমজ দু ভায়ের চেহারাই শুধু এক রকম নয়, গলার স্বর পর্যন্ত এক। কেউ চিনতে পারেন না এই নকল গায়ক বরকে।

* * * *

'পনেরো দিনের ছুটি দিন স্যার, বিয়ে করতে যাব' আবেদন জানান এক যুবক কর্মচারী। কলিকাতার এক প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠান। 'বিয়ের ছুটি পাঁচ দিন' গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দেন ভারপ্রাপ্ত পদস্থ কর্মচারী। মুখ নীচু করে ফিরে আসে ব্যথাহত যুবক। দাড়ি, গোঁফ-ওয়ালা এক যুবককে নিয়ে সে কাজে আসে পরদিন। সহকর্মীদের জানায় এ এক বেকার, কিছু কাজ শিখতে চায়। যথাসময়ে বিয়ে করতে চলে যায় যুবক মাত্র পাঁচ দিনের ছুটি নিয়ে; ছুটি অন্তে কাজে ঠিক সময়ে যোগদানও সে করে।

আসল ব্যাপারটা কি জান? তবে বলি শোন। বড় ভাই-এর বিয়ে। যখন পাঁচ দিনের বেশী ছুটি পাবে না জানতে পারল, তখন তার যমজ ছোট ভাইকে নকল দাড়ি, গোঁফ পড়িয়ে অফিসে নিয়ে এলো তার কাজ শিখিয়ে দিতে। তারপর ছুটির পাঁচ দিন পর ছোট ভাই এসে কাজে যোগ দিল। এবার আর নকল দাড়ি, গোঁফ নাই। কেউ চিনতে পারল না এই নকল কর্মচারীকে। যমজ দু ভায়ের চেহারা আর গলার স্বরই যে শুধু এক রকম তা নয়, হাতের লেখাও এক রকম। পনেরো দিন পরে এই নকল কর্মচারী মিলিয়ে গেলো হাওয়ায় আর আসল কর্মচারী ফিরে এলো তার কাজে।

* * * *

'ও ভাই ময়রা ভর পেট রসগোল্লার দাম কত?' প্রশ্ন করে বারো-তের বছরের এক কিশোর বালক। তিন-চার আনা সের দরে তখন রসগোল্লা বিক্রী হত। পেট চুক্তি মেঠাই বিক্রীর প্রচলন তখন ছিল। এতে দৈবাৎ কখনও ক্ষতি হলেও দোকানী কিছু মনে করত না। 'এতটুকু ছেলে কত আর খাবে?' মনে মনে হিসাব করে ফিরিওয়ালা 'তা খোকাবাবু, চার আনা দিও' জবাব দেয় ময়রা। 'আমি কিন্তু ভাই খাওয়ার মাঝে এক দৌড়ে বাড়ীর ভিতর থেকে একটু জল খেয়ে আসব' বলে কিশোর বৃকোদর, হাসি মুখে সমর্থন পায় তার দাবীর। প্রায় এক সের রসগোল্লা উদরস্থ করে এক দৌড়ে বাড়ীর ভিতরে জল খেতে যায় বালক; ফিরে এসে গোগ্রাসে খাওয়া সুরু করে। দেখতে দেখতে উঠে যায় এক সের রসগোল্লা, বেকুব বনে যায় ফিরিওয়ালা। এমন সময়ে বাবা এসে পড়ায় রস ভঙ্গ হয়। আসল ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে পুরো দামটাই মিটিয়ে দেন তিনি।

ব্যাপারটা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ। বড় ভাই এক দৌড়ে বাড়ীর ভিতরে যেয়ে তার গেঞ্জী আর প্যান্ট পরিয়ে যমজ ছোট ভাইকে পাঠিয়ে দিয়েছিল রসগোল্লা খেতে।

* * * *

এদের জীবনে এমন অনেক হাসির ঘটনা আছে। এঁরা আজও বেঁচে আছেন, বয়স এখন প্রায় পঞ্চাশ। বয়স বেড়ে একজন সামান্য একটু মোটা হওয়ায় এঁদের চিনতে খুব বেশী অসুবিধা হয় না। তবে স্বল্প পরিচিতদের কাছে এঁরা সব সময়েই অচেনা, যতক্ষণ না নিজের নাম নিজেই বলেন। গলার স্বর আজও এক।

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

কাল' কেমন করে 'আজ' হবে? অনেক ভেবেচিন্তে বেহুদাত্তি স্থির করল, একদিন বাদ দিয়ে সে মোহরের তাগাদায় আসবে। তাহলেই তো আগামী কালটা 'আজ' হয়ে যাবে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ' একদিন বাদ দিয়ে গরীব মানুষের দরজায় পৌঁছে বেহুদাত্তি দেখল, সেখানে একখানা নোটিশ টাঙানো রয়েছে। তাতে লেখা আছে: দয়া করে তোমার পাওনার জন্যে গতকাল এসো। কারণ লিখিতমত সেইটেই তো তোমার পাওনার তারিখ।

বেহুদাত্তি তো গালে হাত দিয়ে বসে পড়ল।

—নাঃ একালের নাগাল সে আর কোনদিনই পাবে না—না আগামীকাল, না গতকাল। এ পাওনা তার একেবারেই বরবাদ হল।*

*একটি রুশ লোক-কাহিনী অবলম্বনে।
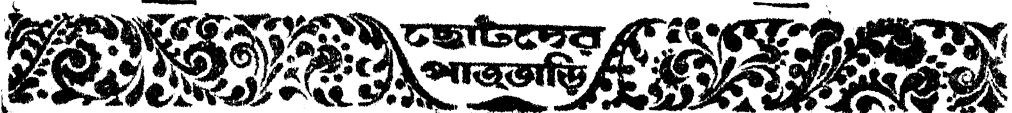
পাশাপাশি দুটো লাঠি,—তার একটার মাথায় হাত ও অন্যটার মাথায় পা রেখে হনুমান মশাই একটু আরাম করবেন বলে যেই বসেছেন অমনি কোথা থেকে একটা দুষ্টু ছেলে এসে ওই দুটো লাঠির একটা একটু ঠেলে দিলো,—সঙ্গে সঙ্গেই হনুমান মশাই তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলেন।

ওপরে যা বললুম ঠিক ওই রকম একটা লম্ফমান হনুমানের খেলনাও তোমরা তৈরী করে নিতে পারো। এর জন্যে যে সব জিনিস লাগবে তার একটা ফর্দ দিলুমঃ—

(১) নং ১ ছবির মাপের এক টুকরো বেশ শক্ত পিচবোর্ড।
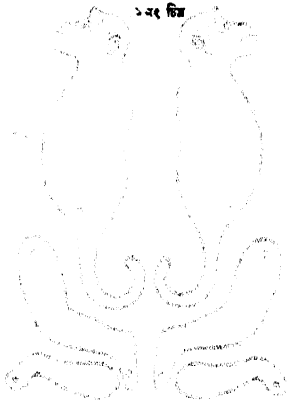
(২) ছ'ইঞ্চি লম্বা ও সিকি ইঞ্চি চওড়া খুব পুরু পিচবোর্ডের দুটো লম্বা কাঠি অথবা ওই মাপের দুটো পাতলা বাঁশের চটা। যেটাই নাও—সিরিশ কাগজ ঘষে ধারগুলো প্লেন করে নেবে।

(৩) পোস্টকার্ডের মতো মোটা অথচ মজবুত কাগজের আধ ইঞ্চি চওড়া ও সওয়া এক ইঞ্চি লম্বা দুটো টুকরো।

(৪) ময়দার লেই বা গঁদের আঠা।

(৫) টোয়াইন সুতো।

(৬) কাঁচি।

প্রথমে কাঁচি দিয়ে ১নং ছবিটা কেটে নাও। তারপর ওই ছবি থেকে 'ক' চিহ্ন দেওয়া হনুমানের সমস্ত ধড়টা কাঁচি দিয়ে কেটে একপাশে রেখে দাও এবং বাকি অংশটাতে আঠা লাগিয়ে পিচবোর্ডের গায়ে বেশ করে জুড়ে দিয়ে একটা ভারি বই-এর তলায় চাপা দিয়ে রেখে দাও, তা না হোলে ছবি মারা পিচবোর্ডটা বেঁকে দুমড়ে যাবে। যখন বুঝবে সেটা শুকিয়ে গেছে তখন বই-এর তলা থেকে সেটা বের করে হনুমানের দেহের অংশগুলো সাবধানে কাঁচি দিয়ে আলাদা আলাদা করে কেটে নাও। তারপর আগের সেই সরিয়ে রাখা 'ক' চিহ্ন দেওয়া অংশটাতে আঠা মাখিয়ে পিচবোর্ডে মারা অনুরূপ অংশটির অপর পিঠে বেশ করে মিলিয়ে জুড়ে দাও। এতে দু'পিঠেই হনুমানের সমস্ত ধড়ের ছবি মারা একটা টুকরো পাবে।
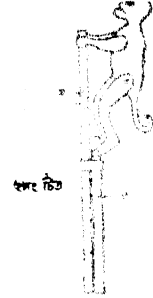
এবারে ২নং ছবিতে যেমন করে দেখানো আছে ঠিক তেমনি করে হনুমানের কাটা হাত দুটো কাঁধের দু'পিঠে আঠা দিয়ে জুড়ে দাও। এখন হনুমানের পেটের নীচে এবং হাত ও পাগুলোতে যেখানে যেখানে গোল ফুটকি দেওয়া আছে খাতা সেলাই করা ছুঁচ দিয়ে সেই সব জায়গায় ফুটো করো। তারপর ২নং ছবির মতো হনুমানের ধড়ের দু'পিঠে দুটো পা রেখে পায়ের ওপরকার ফুটোর সঙ্গে পেটের ফুটো মিলিয়ে এপার থেকে ওপার টোয়াইন সুতো গলিয়ে দু'পিঠেই মোটা করে গেরো দিয়ে পাদুটো আটকে দাও। দেখো, খুব যেন টাইট না হয়। মনে রেখো পা দুটো ঘোরা চাই।

এবারে ছ'ইঞ্চি লম্বা সিকি ইঞ্চি চওড়া পিচবোর্ড বা বাঁশের কাঠি দুটোর একদিকে একটা করে ফুটো করো। তারপরে ২নং ছবিতে যেমন দেখানো আছে ঠিক তেমনি করে কাঠি দুটো উঁচু'নীচু করে সাজিয়ে পোস্টকার্ডের মতো কাগজের আধ ইঞ্চি চওড়া ও সওয়া এক ইঞ্চি লম্বা টুকরো দুটোতে আঠা লাগিয়ে আটকে দাও। এই টুকরো দুটো কিন্তু একটু কায়দা করে লাগাতে হবে। এই দুটো টুকরোরই একটা প্রান্ত 'ক' চিহ্নিত কাঠির গায়ে আটকে দিয়ে অন্য প্রান্ত ওপাশে নিয়ে গিয়ে আবার সেই 'ক' চিহ্নিত কাঠিরই ওপিঠে জুড়ে দেবে। এটা এমনভাবে করতে হবে যাতে পিচবোর্ডের এই টুকরো দুটোর সাহায্যে 'ক' চিহ্নিত কাঠিটা 'খ' চিহ্নিত কাঠিটাকে নিজের পাশে ধরে রাখবে, অথচ ঠেললে 'খ' চিহ্নিত কাঠিটা ওপর নীচে যাওয়া আসা করবে।

এইবার 'ক' চিহ্নিত কাঠির মাথায় হনুমানের হাতের তেলো দুটো ওপাশে রেখে টোয়াইন সুতো ঢুকিয়ে দু'পিঠে গেরো দিয়ে আটকে দাও। ঠিক এমনি করেই 'খ' চিহ্নিত কাঠির মাথায় হনুমানের পায়ের পাতা দুটো দুপাশে রেখে সুতোর গেরো দিয়ে আটকে দাও।

এইবার আসল খেলা। বাঁ হাতের দুটো আঙুলে দিয়ে 'ক' চিহ্নিত কাঠিটার গায়ে আটকানো ওপরের বেড়টা টিপে ধরে 'খ' চিহ্নিত কাঠিটির নীচের প্রান্ত ডান হাতের আঙুলে ধরে ওপরের দিকে ঠ্যালো ও নীচের দিকে টানো। দেখবে ঐ নাড়ার সঙ্গে হনুমান বাবাজী কেমন লাফাতে আরম্ভ করবে।

সোঁ-সোঁ শব্দে ঘুড়িটা উড়ছিল..............

: ভোঁ-কাটা—
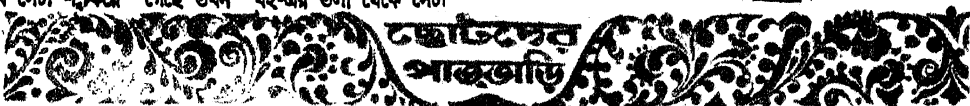
আশ্চর্য হ'য়ে ভাবতে থাকি..........এমন কৌশল সিরাজ শিখলো কোথা থেকে? সত্যি, ওর সংগে প্যাঁচ খেলে কেউ-ই পারে না। আমাদের এতো দিনের গর্বের গোপালদাও আজ কেটে গেল...... ও কি যাদু জানে?

ভাবতে ভাবতে সবুজ ঘাসের আকর্ষণে পা দুটো নিজের অলক্ষ্যেই যেন এগিয়ে চলে..........সিরাজ..........আমাদের ক্লাসের সিরাজ........লাস্ট বেঞ্চের লাস্ট বয়, একটু লাজুক প্রকৃতির ছেলেটি. আমাদের গ্রামে আজ মাস চারেক এসেছে ওরা; কিন্তু এর মধ্যেই ঘুড়ি ওড়ানোতে ও বেশ নাম কিনেছে। ওর বয়েস? এই বছর আটেক হবে আর কি। আমার-ই সমবয়েসী।..........ভাবতে ভাবতে পা দুটো যায় আরো এগিয়ে, শ্যামল মাঠের প্রান্তে যেখানে পদ্মা সুছন্দ গতিতে বহে চলেছে—বসে পড়ি তারই একটা নির্জন ধারে..........ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। এমনি ক'রে চলে যায় একটার পর একটা দিন।

* * *

অনেকদিন ইচ্ছে হ'য়েছে ওর সংগে আলাপ ক'রে কৌশলে মাঞ্জা দেওয়ার কায়দাটা শিখেনি, কিন্তু ওর লাজুক প্রকৃতি কোনদিনই সে সুযোগ দেয় নি। সেদিন হঠাৎ............

: তোমার 'ইতিহাস' বইটা আমাকে একদিনের জন্যে দেবে ভাই?

—চমকে উঠে পিছনে তাকিয়ে দেখি সিরাজ তার ডান-হাতটা আমার কাঁধের ওপর রেখে হাসিমাখা মুখে দাঁড়িয়ে র'য়েছে.........

বিস্ময়ের ভাবটা মুহূর্তে কাটিয়ে উঠে বলি, নিশ্চয়,—নিশ্চয় দেবো ভাই!!

তারপর?

তারপর দিনের পর দিন, মাসের পর মাস—বছরের পর বছর গেছে চলে........আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ক্রমে নিবিড় থেকে নিবিড়তর হ'য়েছে..........যতোই সিরাজের সংগে মিশেছি, ততোই অবাক হ'য়েছি ওর বহুমুখী প্রতিভার বিচিত্র স্ফুরণ দেখে.......... খেলাধুলো, সাঁতার, ছবি আঁকা, কবিতা লেখা,—সব দিকে সিরাজ ছিল ক্লাসের সেরা ছেলে। শুধু পড়াশুনায় তার কেন জানি মন বসত না; সেই লাস্ট বেঞ্চের লাস্ট প্লেস-ই ছিল তার একচেটে আসন।

* * *

আমরা তখন ক্লাস এইটে পড়ি।

হঠাৎ একদিন দেখি—সিরাজ ক্লাসে এলো না। এই সুদীর্ঘ-কালের মধ্যে সিরাজকে কোনদিনই স্কুল কামাই করতে দেখিনি। আমার মতন শারীরিক অসুস্থতার জন্যে তাকে কোনদিন ছুটি নিতে হয়নি; তাই ওর এই আকস্মিক স্কুলে না আসাতে বেশ অবাক হ'লাম।

খোকন কেন কখন যেনো
চড় মেরেছে খুকুরে,
তাই না খুকু হারিয়ে গেল—
দেখলো খোকন দুকুরে!
তারপরে কী কান্না ছেলের।
ছুটলো বাড়ী পান্না জেলের,
ধন্না দিয়ে আনলে ডেকে—
ফেলবে সে জাল পুকুরে।
হারিয়ে গেছে খুকুরে!
খোকন ভাবে—ছোট বোনটি,
করতে হতো আদর তো.
তা নয়, তাকে মারতে গেলাম,
আচ্ছা আমি বাঁদর তো!
করেছে হায় ভুলই সে কি!
খবর দেবে পুলিশে কি?
বার করে দিক খুকুরে তার
লাকি-মিত্তা কুকুরে।
হারিয়ে গেছে খুকুরে!
খুঁজলো খোকন সবার বাড়ী,
বুড়ির ভিটে, খাটালটা—
ধানের গোলা, পানের বরজ,
সেনের পড়ো চাতালটা।
খুঁজতে বাবার খাটের তলায়
কান্না ঠেলে আসছে গলায়,
বুকখানা হায় দুঃখে ভয়ে
করছে ধুকু-ধুকুরে!
অবশেষে খাটের তলায়
দেখতে পেলো খুকুরে!!
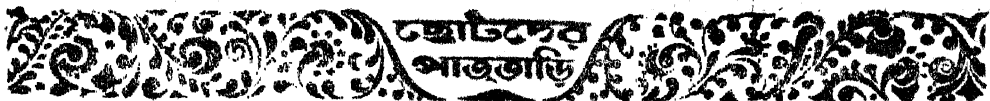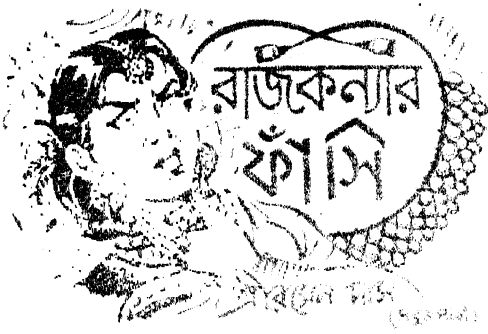
হবু রাজার গবু মন্ত্রী রাজকুমারের জন্যে
আনলো দেখে অপূর্ব এক সুন্দরী রাজকন্যে।
রাজপুরীতে বাজলো সানাই, হরেক রকম বাদ্য।
সাত-রাজ্যের সাতসীমানায় কান রাখে কার সাধ্য!
বেজায় খুশী রাজামশায়,
অতিথ-বিতিথ ডেকে বসায়,
খোস মেজাজে দিলবাহাদুর নেশায় হলেন মগ্ন;
এমন সময় ঘনিয়ে এলো বিয়ের পরম লগ্ন!
লগ্ন এলো, ভগ্ন-মনের হঠাৎ সে চীৎকার—
কাঁপিয়ে দিলো, এদিক-ওদিক হৃদয় সবাকার!
থামলো সানাই, বাদ্য-বাঁশী, রোশনাই ঢাক-ঢোল,
রাজপুরীতে উঠলো এবার কান্নার সোরগোল।
বদ্যি এলেন, এলেন হাকিম, সবার চোখেই জল;
সবাই বলে ঃ "পোড়া কপাল এই কী হলো ফল"
কী হলো তার সঠিক খবর চেষ্টা-চরিত করে
জানতে পেলাম অনেক খুঁজে, হপ্তাখানেক পরে।
সঙ্গেতে গিয়ে রাজকুমারীর গয়নাগাটির ভারে—
ফাঁস লেগেছে গলায় যে হায় একশ' গিনির হারে!

বিকেলে বাড়ী যাবার পথে সিরাজের বাড়ী গিয়ে দেখলাম—সেখানে হুলস্থূল কাণ্ড!

সিরাজের বাবা এবং মা—দুজনকেই সাপে কামড়িয়েছে। ওর মা সেইদিনই সন্ধ্যায় মারা গেল............দিন দুয়েক পরে ওর বাবাও—

ওদের সংসারে ওরা ছিল মাত্র তিনজন প্রাণী। কাজেই বেচারা সিরাজের মাথায় যেন অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হ'ল। ওর সেদিনের কান্নার-কথা ভাবলে আজও চোখে জল আসে।

কিন্তু............

দিন পাঁচেক পরে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার পর সিরাজ আমাদের বাড়ী এসে উপস্থিত হ'ল।

ঃ আমি পড়াশুনা ছেড়ে দেবো রে রাজু—

ঃ বিস্মিত কণ্ঠে বললাম, কেন রে? —ভয় কি, আমরা তো রয়েছি!!

কিন্তু এর পর ও যে কথা বলল, তাতে আমারই ভয়ে সারা গায় কাঁটা দিয়ে উঠল। ও বলল, ও সাপুড়ে হ'বে। পাহাড়ে পাহাড়ে—জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবে,—বিষধরদের বিষ সংগ্রহ করে ওষুধ তৈরী করবে।—আর ওর বাবা-মার মতন যাঁরা অসহায়ভাবে সাপের বিষে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে, ওর সেই ওষুধ তাদের আনবে জীবনের পথে ফিরিয়ে...........

সিরাজের সংকল্পের মহত্ত্ব অনুভব করলেও—সেদিন ওকে উৎসাহ দেবার সাহস পাইনি। বনে-জঙ্গলে সিরাজ সাপুড়ে হ'য়ে ঘুরে বেড়াবে? কিন্তু এতে যে, যে কোনও মুহূর্তে ওর প্রাণ নাশ হ'তে পারে।—নাঃ নাঃ, এ আমি কিছুতেই হ'তে দেবো না। সিরাজ...... আমার সিরাজ...

* * *

তারপর............?

আমার অশ্রুমাখা চোখ পারল না সেই তেজোদীপ্ত আদর্শবানকে তার সংকল্পের পথ থেকে টেনে রাখতে............

আজ সিরাজ কোথায় জানি না; আমাদের সেই পূর্ববঙ্গের শ্যামল মাঠের সঙ্গে জন্মের মতো সব সম্পর্ক ত্যাগ ক'রে চলে এসেছি শহর—কলকাতায়............বাস্তবের রূঢ় দিনগুলোর মধ্যে এখনও বেঁচে আছি—কোটি কোটি মানুষের মতো আমারও আজ পরিচয় খুব সাধারণ——"বাস্তুহারা"। বহুলোকের কৃপার পাত্র আমরা—নিজেকে নিজেই ভুলে যেতে বসেছি...........কিন্তু ভুলিনি সিরাজকে; আজও আমার জলভরা কালো চোখ দু'টো সাপুড়ে দেখলেই বিস্ফারিত হ'য়ে ওঠে, কিন্তু কোথায়? আমার সিরাজ তো আজও এলো না......!

টাট্‌কা খবর দিচ্ছি শোনো, গ্রামের মধ্যে গয়লা
লম্বা যেমন ঢিঙ্গিপনা—দেখতে তেমন ময়লা।
ইঞ্চি পাঁচেক চওড়া কপাল, নাকটি উঁচু পর্বত
দাঁতগুলো ঠিক মুলোর মত দেখায় সাদা মরকত।
ঢং দেখে তার ঠাট্টা ক'রে—চ্যাংড়া-ছেলে ছোক্‌রা
আলাপ ছেড়ে পালিয়ে থাকে আশে পাশের গোপ্‌রা।
মেয়েরা সব কে-কি-বলে, সেটিও শোনো তোমরা
মেয়েমাসী ভেংচিয়ে মুখ ডাকে সাধের ভোমরা।
পথে ঘাটে কি অপমান হয় যে-বুধো নিত্য
সেই দশাটি দেখলে চোখে পুড়বে দেহের পিত্ত।
ঠাট্টা হাসি থেকে পাবে কেমন ক'রে মুক্তি—
সেই কথাটা ভেবে শেষে, করল—সে এক যুক্তি।
গায়ের কালো রং-টি এবার পাল্টে সে ঠিক ফেলবে
বিজ্ঞানীদের তাক লাগিয়ে—নতুন খেল্ এক খেলবে।
ভেবে গুণে লগ্ন বুঝে ফাগুন মাসের পয়লা
রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে পাথুরে এক করলা।
ঘষে ঘষে সারা দেহের ফেলল্ তুলে চামড়া
তার পরে যা ঘট্‌ল দশা দেখে-ই যে চোখ আমড়া।
রক্তদেহে লক্ষ-ক্ষত সঙ্গে মাছি জুটলো—
বাক্স থেকে রেস্ত টাকা—তার ফলে সব ছুটলো।
চিকিৎসাতে সুস্থ হ'য়ে উঠলো বটে শেষটা
কিন্তু বেটার বুদ্ধি দেখে অবাক হোলো দেশটা।

দেহের নিয়ম মেনে চল

শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

একটা কথা তোমাদের বলছি। প্রায়ই দেখতে পাই তোমাদের মধ্যে অনেকেই পেটের অসুখ, আমাশা, দাঁতের ব্যথা, সর্দি, জ্বর **ইত্যাদিতে ভোগ। এর কারণ কি কেউ হয় তো সে বিষয় ভাব না। ভাববার প্রয়োজনও মনে কর না। একেই বলে অজ্ঞতা।** আবার **হয় তো দেখতে পাও, তোমাদের বয়সী** খোকা-খুকুরা বেশ সুস্থ আছে,—মানে তাদের অসুখ-বিসুখ কম। এরও কারণ আছে। যদি **একটু খবর নাও, দেখবে ওরা** তোমাদের চেয়ে স্বাস্থ্যের নিয়ম **বেশী পালন করে।**

তোমরা বোধহয় লক্ষ্য করেছ—যারা সর্বদা অসুখে পড়ে তাদের দেহ ক্ষীণ হয়, শক্তি কম, দেহের সৌন্দর্যও নষ্ট হয়ে যায়। আর যারা অসুখে কম ভোগে, তারা হয় হৃষ্ট-পুষ্ট, কান্তিযুক্ত। সে সকল বালক-বালিকারা হয় মেধাবী, উদ্যমশীল। দুষ্টবুদ্ধিও তাদের কম।

তোমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা, দেহকে সুস্থ রাখতে হলে অনেক কিছু হাঙ্গামা করত হয়। ভাল ভাল খাবার খেতে হয়, তাদের সে ধারণা ভুল। স্বাস্থ্য ভাল রাখতে হলে আমরা সাধারণ যে সকল খাদ্য খাই তাই যথেষ্ট। তোমরা হয় ত বলবে সে কোন করে সম্ভব হয়? তোমাদের কাছে সেই কথাই বলব।

তোমরা দৈনন্দিন যে কাজ কর, তারি মধ্যে যদি একটু সতর্ক হয়ে চল, দেখবে তোমাদের স্বাস্থ্য নিজের থেকেই গড়ে উঠবে। শুধু কি তাই, রোগ হবে খুব কম।

এখন শোন, কাজের কথা বলি। তোমরা দৈনন্দিন কি কাজ কর—মানে ঘুম থেকে ওঠা থেকে রাত্রে ঘুমুনো পর্যন্ত। কি কর—খাও, দাও, পড়, খেলা কর—এই ত? না হয় বাবা-মা'র খুঁটিনাটি কাজ করে দাও এর বেশী তোমাদের কিছু করতে হয় না।

কিন্তু আমি বলি এরি মধ্যে স্বাস্থ্যের নিয়ম মেনে চল। ধর যেমন তোমাদের মধ্যে অনেকেই সকালে ঘুম থেকে উঠেই চোখ, মুখ না ধুয়েই জলখাবার খেতে বসো। এ অভ্যাস খুব খারাপ। এতে কি হয় জানো? দাঁতে যন্ত্রণা হয়, আমাশা, উদরাময় হয়। কেন হয় সে কথাই বুঝিয়ে দিচ্ছি।

তোমরা সারা দিন যা খাও, তার কিছু অংশ দাঁতের ফাঁকে থেকে যায়। রাত্রে যখন ঘুমাও, খাদ্যের সেই কণাগুলি মুখের লালার সঙ্গে মিশে পচতে থাকে। সকালে ঘুম থেকে উঠে, দাঁত যদি না মাজ, মুখ যদি না ধোও খাদ্যে ঐ পচা কণাগুলো সকালের জলখাবারের সঙ্গে পেটে চলে যায়। এভাবে প্রতিদিন যেতে যেতে ঐ দূষিত পদার্থকে পেট হজম করতে পারবে না—ফলে হবে আমাশা পেটের অসুখ।

আবার ঐ খাদ্যের কণাগুলো পচে দাঁত খারাপ করে দেয়। দাঁতের ফাঁকে খাদ্য কণাগুলো পচে উঠলে ওর মধ্যে সূক্ষ্ম এক প্রকার পোকা জন্মায়। ঐ পোকাগুলো একটু একটু করে—দাঁতকে ক্ষয় করে দিয়ে নিজেদের বাসা পরবর্তী পোকার জন্য তৈরী করে রাখে। ফলে তোমাদের দাঁতে পোকা লাগে—দাঁত কন-কন করে। যারা নিয়মিতভাবে দাঁত মাজে তাদের মুখে পোকা জন্মাতে পারে না।

তোমাদের মধ্যে অনেকেই ঘুম থেকে ওঠ বেলাতে। অভ্যাস করলে প্রত্যেকেই সকালে উঠতে পারবে। সকালে উঠে মুখ হাত ভাল করে ধোবে—মল-মূত্র ত্যাগ করবে। পরে ছাদে না হয় বারান্দায় ঘুরে বেড়াবে, দৌড়াবে—না হয় স্কিপিং কর, বেশী নয় ৪।৫ মিনিট। কয়েকদিন গেলেই বুঝতে পারবে তোমার ক্ষিধে বাড়ছে, দেহে শক্তি পাচ্ছ।

আর একটা কথা তোমাদের মনে করিয়ে দিই। তোমরা খেতে বসে তাড়াহুড়ো করে খাবে না। খাবার সময়—চেঁচামেচি করবে না। বেশ ধীর, সুস্থভাবে চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে। খাদ্য যত চিবুবে ততই সে হজম হবে। কিছুদিন গেলেই লক্ষ্য করে দেখবে—তোমাদের পায়খানা পরিষ্কার হচ্ছে—ক্ষিধে হচ্ছে প্রচুর আর স্বাস্থ্যও গড়ে উঠছে।

আর একটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। রাত্রে কখনও পেট ভর্তি করে খাবে না। একটু কম খাবে। যারা রাত্রে পেট বোঝাই করে খায়, তাদের রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। আজে বাজে স্বপ্ন দেখে, হাই তোলে, ঘুমের মধ্যে কথা বলে হাসে, এপাশ ওপাশ করে। বারে বারে উঠে জল খেতে চায়। রাত্রে যারা কম খায় তাদের রাত্রে ঘুম ভাল হয়। শরীর ঝরঝরে থাকে। হজমও হয় ভাল। আমার বিশ্বাস এই নিয়ম রক্ষা করা খুব কষ্টকর নয়। ইচ্ছা কল্লে তোমরা পার।

মা এসেছেন নূতন সাজে
আয়রে ত্বরা করি
চরণতলে নুইয়ে মাথা
মোদের মাকে বরি।।
নূতন করে পূজোর ঘন্টা
বাজলো সবার ঘরে,
পূজোর বেদী সাজায় সবে
আপন হাতে করে।।
শিশুরে দলে জাগলো আবার
আনন্দেরই ঢেউ
মায়ের পূজোর ফুলটি নিতে
ভুলবে নাকো কেউ।।
বছর বছর মা যে আসেন
এই বাংলার বুকে।
নূতন করে হাসি ফোটান
সব শিশুদের মুখে।।
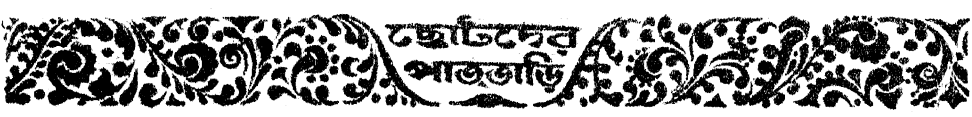
পুজোর ছুটীতে এবার আমাদের নাটক অভিনয় হবে; কিন্তু লোক পাওয়া যাচ্ছে না। ভাল ভাল যারা অভিনেতা ছিল উদ্যোক্তা ছিল তারা সব দেশে ফিরে গেছে ও যাচ্ছে। কাজেই এবার অভিনয় করা হবে কিনা বলতে পারি না, তবে তোমরা যে অভিনয় করবে তা আমি বলতে পারি।

এখন কেমন করে অভিনয় করতে হয় জান? তোমরা মনে করছো যে গড় গড় করে কথা বলে গেলেই অভিনয় করা হয়, তাই না?

কিন্তু তা ঠিক নয়।

অভিনয় করতে হলে প্রথমে নাট্যকারের নাটকখানা পড়তে হবে। ভাল করে বুঝতে হবে যে নাট্যকার তাঁর নাটকের মধ্যে কি কি বলতে চেয়েছেন? তখন সেই অনুযায়ী নাট্যকারের মনের কথা বুঝে নিয়ে সবাইকে শোনাতে হবে দোভাষীর মত। দোভাষীরা যেমন অপরের কথা বুঝে নিয়ে নিজের ভাষায় অপরদের বুঝিয়ে দেয়—তেমনি অভিনেতারা নাট্যকারের কথা বুঝে নিয়ে শ্রোতাদের বুঝিয়ে দেয়।

তবে যারা ভাল করে বুঝতে পারে না—তারা অপরদের বোঝাতে পারে না, এর জন্য চাই দূরদৃষ্টি।

এখন ধর, স্বপনবুড়োর কোন নাটক অভিনয় করবে। তখন পড়ে নিতে হবে ভাল করে আগে। না বুঝতে পারলে স্বপনবুড়োকে চিঠি লিখে জেনে নেবে যে তিনি কি বলতে চেয়েছেন। যখন তাঁর মনের কথা বুঝতে পারবে—তখন খুঁজে দেখতে হবে যে কাকে কাকে দিয়ে অভিনয় করাবে। এমনভাবে অভিনেতা বাছতে হবে যাতে চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায়। ধর যেখানে ক্ষুধার্ত লোক চাই—সেইখানে হৃষ্টপুষ্ট লোক দিলে মানাবে কি? যেখানে রামচন্দ্রের মত একটা চরিত্র অভিনয় করতে হবে—সেখানে বেঁটে অভিনেতাকে নামালে কেমন মানাবে বলতে পার?

যারা অভিনয় করবে তারা মনে মনে ঠিক করে নেবে যে কিভাবে চরিত্রে রূপ দিতে হবে। স্বাভাবিক অভিনয় করা মানে যেভাবে দিন-রাত ব্যবহার কর তা করা নয়। অভিনয় করতে হলে মনে ছবিকে রূপ দিতে হবে। অনুকরণ করতে না পারলে অভিনয় হয় না। মনের ছবিকে অনুকরণ করতে হবে। শিক্ষক বা অন্য কাউকে নয়।

অভিনয় করতে হলে মনের উদ্দেশ্যকে সফলামণ্ডিত করতে হবে। মঞ্চে নামলে চুপ করে থেক না, একটু কিছু কর। অন্ততঃ যে বাণী দিচ্ছে তা শোন—আর সেই অনুযায়ী ভাব, দেখবে মনের ভাব বদলে যাবে। নাটক অভিনয় করা মানে চরিত্র ফুটিয়ে তোলা। এর জন্য হাবভাব চাই, গতি চাই আর সাজ-পোষাক চাই। কথা যাতে শেষ পর্যন্ত গিয়ে হাজির হয় তা দেখতে হবে। কথা না বোঝাতে পারলে অভিনয় করা সার্থক হয় কি!

আল্‌তা পায়ে চালতা মুখী বসল এসে মাদুরে
ডাগর আঁখি কাজল টানা ধীর চাহনি আদুরে
সরু গলায় বলছ মিঠে হার মেনে যায় কোকিলে
হাত পা যে তা'র অবশ হ'বে একটু খানি বোকিলে
আদর করে যতই ডাক আয় এদিকে রূপসী
ফেল্‌ফেলিয়ে থাক্‌বে চেয়ে খায়নি যেন উপোসী
ক্ষীরের খোয়া মুক্তির মোয়া হয়ত দিলে পাটালী
"ছাই ভস্ম গিলতে নারি, মিথ্যে ডেকে হ্যাটালি"।
বল্‌বে খুকী গোম্‌রা মুখী "খাব ডিমের পরোটা
ছোট্টগুলো তোমরা খেও আমার জন্যে বড়োটা"
যেই না দেওয়া সান্‌কি হাতে, বিগ্‌ড়ে তেলে বেগুনে
বলবে খুকী "একটা কেন, একশ আমায় দে গুণে"
একটু মিঠে হাসির ছিটে নাইকি মুখে মাখান
ধমক্‌ ঠাসা চোখ দুটিতে আগুন ধরা তাকান
গায় গতরে ব্যাজার ঝরে চল্‌তে নারে এগিয়ে
ধুম্‌সো ধুমী দ্যায়না সাড়া, সাধ্‌বে তাকে কে গিয়ে
ভাব্‌টি মুখের হাড় জ্বলান রেগেই আছে জানো ত
ব্যাজার বদন দেখ্‌তে চেয়ে আয়নাখানা আনো ত।

সেইজন্য নাট্যকারের লেখা খুব ভাল করে মুখস্থ করবে। তা হলে নাট্যকারের লেখা মুখ দিয়ে বার হয়ে আসবে নিজস্ব কথা হয়ে

মিষ্টি করে ভাব দিয়ে কথা বলতে পারলে দর্শকদের মন আকর্ষণ করতে পারবে। যদি ভাব উপযুক্তভাবে তৈরী হয়েছে—মনে বিশ্বাস আছে—তখন দেখবে যে অভিনয় ভাল হয়েছে।

যখন অভিনয় করবে দেহের ও কণ্ঠের পেশী শিথিল রাখবে তাতে বাণী ভাল করে বার হয়ে আসে। মঞ্চে খুব সজাগ থাকতে হয়। অন্য কথা ভাবতে থাকলে নিজের কথা ভুলে যেতে হয় অনেক সময়। মাথা কিভাবে থাকবে আর মুখের ভাব কি হবে তা মনে থাকে যেন।

আবেগ ফোটাতে না পারলে অভিনয় করা সার্থক হয় না। সময় জ্ঞান দরকার। ঠিক সময় মত কথা বলতে না পারলে অনেক সময় ভাব হারাতে হয়। ভাব আনবার জন্য নানারকম কাব্য-কবিতার বই পড়বে। তাতে মনে চেতনা আসে।

ধর রাগতে হবে। তখন কোন ঘটনার কথা মনে করতে থাক— বা কোন গল্পের কথা মনে করতে থাক দেখবে চোখে-মুখে ভাব ফুটে উঠেছে। দেখতে হবে মনের ছবি চোখে ফুটে ওঠে যেন।

ভাবতে না পারলে অপরদের মনে ভাব আনা যায় না।

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)
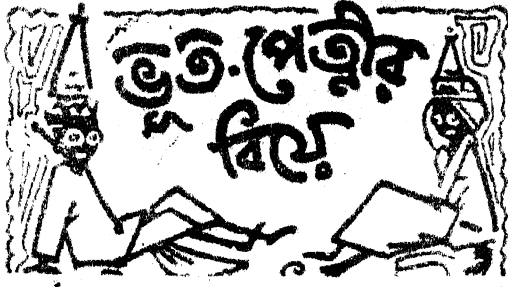
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

এক যে ছিল ভূত
কান দুটো তার কুলোর মত
চোখ দুটো ঠিক চুলোর মত
(আর ওই) হুলোর মত মুখখানাতে
মুলোর মতন টুথ্
এক যে ছিল ভূত

শ্যাওড়া গাছে থাকত্ যে তার
শাঁখচুন্নী পিসি
তাল-ঢেঙ্গা সে শুঁটকি ছিল
খ্যাংড়া চুলে ঝুঁটকি ছিল
সেই চুলে সে কলপ দিত
দাঁতে দিত মিসি
শাঁখচুন্নী পিসি

হঠাৎ পিসি অক্কাপটাং
কালকে তাঁহার শ্রাদ্ধ
ভাঙ্গা কাঁশির শানাই বাজে
ডিমকুরাকুর বাদ্য
রান্নাঘরে রান্না করে
গদাকাটা ঠাকুর
বেলোয়ারী তরকারী সব
ফুল-ফুলুরী পাকুর

ইঁদুর দিয়ে লাউঘণ্ট
বাঁদর দিয়ে এঁচোড়
চামচিকে চপ্ চাটনী ছুঁচো
বেঙ্ বেঙাচি কেঁচোর

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

অভিনয় করতে গেলে অনেক কিছুই শিখতে হয়, দাঁড়ান, বসা, হাঁটুগাড়া, কিছু ধরা, ঘাড় ফেরানো—দেখা—এগোনো পেছোনো প্রভৃতির কৌশল ভাব অনুযায়ী শিখতে হয়।

আসল কথা হচ্ছে কি, নিজের কথা ভুলে গিয়ে চরিত্রের ভাবে ন দাও আর এমন কিছু নূতন ধরণের ভাবভঙ্গী দিয়ে অভিনয় কা া দেখলে সকলে ভাল বলবে।

আজ আসি. জানিও যে আমার কথাগুলো কাজে লেগেছে ক না!
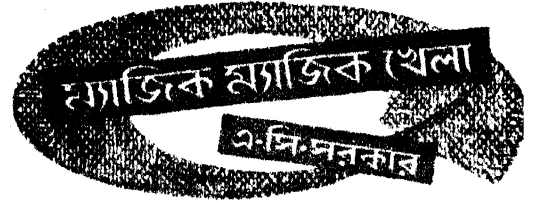
থালাতে জল, মধ্যে টাকা
কাঁচের গ্লাসে রয়েছে ঢাকা।
গ্লাস তুলে নাও দেখবে ভাই,
আধুলি শুধু, রুপেয়া নাই!

ম্যাচের কাঠি নিয়ে
'এল্' বানাও বাঁকিয়ে,
ছবির মতন ক'রে,
আধুলি চেপে ধ'রে,
কাঠিতে আগুন দাও,
জ্বল্‌লে তা দাউ দাউ,
গ্লাস দিয়ে দাও ঢাকা,
আধুলি হবে টাকা!

হুঁকো হাতে ঝিমুচ্ছিল
বেম্মদাত্তি মামা
ইয়াব্বড় ভুঁড়িটা তার
হেঁড়ে মুণ্ডু কুঁড়িটা তার
চমকে উঠে ধমকে বলে
থামা থামা থামা
ওরে পাজী হতচ্ছাড়া
নাক-ডাকানি থামা

(নইলে) কানদুটো তোর পট্‌কে দেব
চোখ দুটোকে চট্‌কে দেব
ঘাড়-গলা সব মট্‌কে দেব
ঘোসবো নাকে ঝামা
কান ফাটানো ঝড় বওয়ানো
নাক-ডাকানি থামা

তেপান্তরের মাঠের ধারে
বদ্ধজলার উপর
এঁটো পুকুরের পেত্নী ছিল
মাথায় পড়ে টোপর

সুরুৎ করে
গাছের থেকে
নেমে এলো

পরুত ডেকে
ভূতের গলায়
মালা দিলো

(আর) বিয়ের বাদ্যি বেজে উঠলো
ভোঁপর ভোঁপর ভোঁপর!!
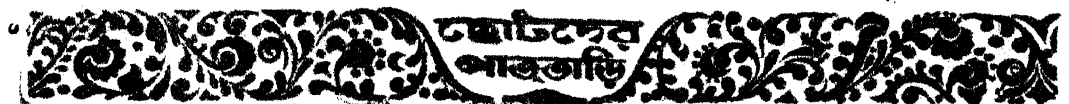
স্নান অবসানে

ভগবতী শঙ্কর দে

অমরনাথের পথে যাত্রীদল

সমরেন্দ্রনাথ মিত্র

আকাশে শ্রাবণ সর্বরী। বর্ষাপীড়িত আকাশে দিকচক্রবালমন্থনকারী দিগ্‌হস্তির দল। কাজরী গানের পরিবেশ নয়। ভয়াবহ বন্য বর্ষণসংকুল গভীর কালো সন্ধ্যা।

দ্বারের পার্শ্বচারিণী বন্য গোলাপ কুঞ্জের কাঁটায় খোঁচা খেয়ে কারুবকী মিত্র বলে উঠলেন, "আঃ! এখানে এভাবে ফুল ফোটাবার মানে হয় না।"

নিঃশব্দে অগ্রসর হয়ে ঘরে তাঁকে বসালাম। তাঁর আগমন অপ্রত্যাশিত। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠা কিন্তু আমার বান্ধবী। আমার চিরকুমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ওঁর পাণিপ্রার্থীর শ্রেণীবদ্ধ ছিলেন যৌবনে। এখন বসন্ত বিদায়ের পালা দুই-জনেরই দেহ-মনে লেখা হয়ে গেছে। নতুন পাণ্ডুলিপির প্রস্তুতি আর হয়তো হয় না।

তিনি আরাম চেয়ারে দোদুল্যমান হলেন। নীচু জানালার কাচ বাসনার মত রক্তিম বন্ধনী আবৃত। কারুবকী মিত্র লম্বা কালো হোল্ডারে চুরোটকা ধরালেন। তাঁর কতকগুলি কদভ্যাসের মধ্যে একটি। এই দেশে রঙিন অধরে ধূমযষ্ঠী মানায় না।

"তোমার ঘরটি সুন্দর, বিদ্যা। তাই এমন বর্ষার দিনেও চলে এলাম। তুমি কবি, কবিতা শোনাও।"

আয়া জাপানী ট্রে-বাহিত কফির আয়োজন রেখে গেল। আমি বুককেস্ থেকে বোদে-লেয়ারের 'লে ফ্লোর দু ম' টেনে নিলাম। এক-তলায় উদ্যান বেষ্টিত আমার ঘরটিতে এমন বর্ষা ফরাশী সাহিত্যের 'কলুষ-কুসুমকেই' ডেকে আনে।

......"And I will give thee, my dark one,
Kisses as icy as the moon,
Careless as of snakes that crawl
In circles round a cistern wall."

শ্যামলী আমার, চন্দ্রের মত শীতল চুম্বন আমি তোমাকে দেব—সাপের মত আলিঙ্গন—

"না, না; তোমার ফরাশী কবিতা ছেড়ে নিজের লেখা পড়ো না।"

আমি বুঝলাম কুরুবকী আজ ঠিক মেজাজে নেই। জিজ্ঞাসা চিহ্নের প্রথায় নির্মিত ভ্রূভঙ্গে তাঁর বিরক্তি। পাপির মত লাল মাংসল অধরে তাঁর লেখা আছে অসন্তোষ। কালো চুলের অরণ্যে ফ্লোর ল্যাম্পের আলো পিচ্ছিল হয়ে দুই-একটি শাদা শস্য দেখিয়ে দিল।

আমার কবিতাই এল তখন।

অরণ্য গভীর এই আফ্রিকা-মানস,
অনেক গোপন গুহা সিংহ ধ্বনিময়,
অনেক পর্বতে ফেরে সতৃষ্ণ হায়েনা,
অনেক লেপের নীচে উষ্ণ ধারা বয়।

"তুমি যে আবার আফ্রিকা মহাদেশ টেনে আনলে।" সিগারেটের ছাই ঝেড়ে কুরুবকী আপত্তি জানালেন—"প্রত্যেকের মনে প্রত্যন্ত প্রদেশ আছে। এমন বর্ষার দিনে তুমি কি চোরাবালি খুঁড়তে চাও?"

আমি হেসে বল্লাম, "তবে ছড়া শুনুন—
" 'Tyger, tyger, burning bright'—
বাঘ, তুমি উজ্জ্বল জ্বলো—"

কুরুবকী উঠে দাঁড়ালেন, "নাঃ, আজ কবিতা শোনানোর ক্ষমতা তোমার বেনো জলে ধুয়ে মুছে গেছে। বাঘকে নিয়ে কাব্য হয় না, হয় বাস্তব উপন্যাস।"

"হ্যাঁ, জিম্ করবেট তো—"

"সে তো শিকার কাহিনী, উপন্যাস নয়। জীবন্ত গল্প জানি আমি, লিখতে পারি না। তোমরা লিখে-টিকে থাকো, কিন্তু অভিজ্ঞতা নেই। একটা গল্প শুনবে? সহ্য করতে পারবে তো? প্রাকৃত গল্প, তোমাদের শুদ্ধ সাহিত্যের বস্তু নয়। বরঞ্চ এর আখ্যানবস্তু নিয়ে ফরাশী কবি বোদেলেয়রের কবিতাগুচ্ছ 'Flowers of Evils' বা কলুষ কুসুম লেখা চলে।"

আমার গল্পের দিন শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং অন্যের গল্প শুনতেই প্রস্তুত হলাম। বাইরের ভ্রূকুটিবক্র আকাশ, বাগানের বিনম্র-বিসিক্ত লতাগুচ্ছ, বিলাপী বাতাস সাহায্য করল পরিবেশে। সমাহিত সত্তা কুরুবকী বলে চললেন তাঁর উপন্যাস।

ভুলে যাও এই বাগানের ভদ্রজনোচিত লতা-বেষ্টন। আমি তোমাকে যেতে বলব তরাইয়ের গভীর বনসম্ভারে। পার হয়ে যাও অভ্রনীল-তুহিন শুভ্র তুষারগিরি সুনীল আকাশের পট-ভূমিকায়। গভীর অরণ্যানীর মধ্যে প্রবিষ্ট হও।

চা-বাগানের বাংলো একটি কল্পনা করে নাও। সেখানে সভ্যতার সমস্ত উপকরণ সন্নি-বিষ্ট হয়েছে। মনে হবে তোমার নব্য কোন হোটেলে আছ। প্রাঙ্গণে মরশুমী ফুলের রং। কিন্তু হাতা পার হলেই প্রকৃতির ভীষণতা। তার বুকে বাংলোটির বিস্তৃতি। যেন রুক্ষ মরুভূমির বিশুষ্ক বালুচরে রসমধুর একটি আপেল।

চা-বাংলোতে অতিথি এসেছে। মালিকের আত্মীয় ও বন্ধু। বাঘ শিকার হবে। মুভী ক্যামেরায় বাঘের ছবি ধরা হবে। বিশ্বের ভয়ঙ্করতম জন্তু বাঘ। তার সন্ধানে চলো তড়াই।

পোড়া হলুদ, কালচে সবুজ গুল্মঝোপ, মধ্যে মধ্যে সমতল ভূমির সবুজ দাক্ষিণ্য। মাচা বাঁধা হয়েছে সারি সারি। এক-একটি মাচায় মালিক ও বন্ধু বসে। হাতে কারুর কারুর বন্দুক। ভাড়া করা শিকারীও দুই-একজন আছে। সখ করে কয়েকজন মহিলাও এসেছিলেন। ফুল্লরা তার মধ্যে একজন।

ক্যামেরায় ছবি তুলতে হলে দিনের বাঘকে চাই। একটা প্রকাণ্ড মহিষ বধ্য হয়েছে বাঘের উদ্দেশে। মাটিতে গর্ত খোঁড়া হয়েছে দীর্ঘ। লোহার শিকল দৃঢ় বন্ধন দিয়ে দুইপার মহিষকে বাঁধা হয়েছে। সেই শিকল গর্তের গজালে আবদ্ধ।

ফুল্লরা দেখছে ভীত-কম্পিত বক্ষে। তার শহুরে ভয় দেখে শ্রেষ্ঠ শিকারীকে মাচায় এক সঙ্গে দেওয়া হয়েছে। দূরের মাচায় মুভী ক্যামেরাপাণি তার জ্যাঠতুতো জামাইবাবু। মালিকের পুত্র। পাশে তাঁর ছোট ভাই। আরও কয়েকটি মাচায় নানা উৎসুক ব্যক্তি।

তড়াইয়ের গহন বনের রূপ দেখেছ? ডালের কাঠে তীব্র বেগে কাঠঠোকরা ঘা দিয়ে চলেছে। বাবুই-এর সজ্জিত বাসা ঝুলছে সারি সারি। সবুজ গাঢ় বর্ণ পাতায় ঢাকা বাসার অলক্ষিতে কত ডিমের কারাগার থেকে নূতন পাখী-জন্ম দেখা দেয়। কত বাদামী পাতার শয্যায় দৃষ্টি-বিমোহন তরুণ সবুজ রংয়ের বনটীয়ার পালক চিকমিক করে ওঠে। গাছের এক ডাল থেকে অন্য ডালে বাঁদুরের পাল লক্ষ

লক্ষে যাতায়াত করছে। কোমর-সমান উঁচু ঝোপের পাশে, গাছের মাথা পেরিয়ে যায়—তারি বুকে পদক্ষেপ ফেলে সতর্ক দৃষ্টি চারপাশে মেলে এখনি আসবে সে—রয়েল বেংগল টাইগার।

নিষ্কম্প বুঝি গাছের পাতা, মানুষ প্রায় নিঃশ্বাস রোধ করে বসে আছে। একটু সামান্য শব্দও বাঘের কান এড়িয়ে যাবে না।

এমনি বহু প্রতীক্ষার দিন চলে যায়। দিনের বেলায় জংগলের শ্রেষ্ঠ প্রাণীটিকে পাওয়া সহজ নয়। কয়েকটি মহিষ পর পর হত্যা করা হ'ল বাঘকে প্রলুব্ধ করার আশায়।

অনন্ত বনপরিধির মধ্যেও দুরন্ত বসন্ত আসে। বাদামী কাল সবুজের বর্ণবৈচিত্র্যে নয়নাভিরাম তরল হরিৎ দেখা দেয়। গুল্মের শীর্ষে শীর্ষে জাগে ব্যাকুল বর্ণসম্ভার। মাটির স্তরে স্তরে জীবনের দ্বিদল: বিটপীর যৌবন সঙ্গমের চিহ্ন বর্ণবহুল কুসুম স্তবকে। তারাও কি কলুষ-কুসুম?

হয়তো এমন দিনের পর দিনের সান্নিধ্যের বেড়ায় কখনও নির্জন কোন অর্কিড ফুটে ওঠে। সে সুবাসবিহীন, শুধু বর্ণগরীয়ান। বনের অসংখ্য পাতার সূচীশিল্প তাকে আবৃত করে রাখে। নিভৃত অপরাহ্নে কোন যৌবন-বিহ্বল ঘনশ্বাস কোন তরুণীর শঙ্খ-শুভ্র গ্রীবায় স্পর্শ রাখে। কোন শিকারী-বাহুর দৃঢ় পেশী কারও কটাক্ষকে মোহিত করে। সেই মাচায় হঠাৎ জ্বলন্ত অগ্নির উত্তাপ অনুভূত হয় শ্যামল ছায়ার নীচে। ফুল্লরার কলিকাতার পাঠ্য জীবন কোথায় হারিয়ে যায়।

ফুল্লরার বিস্মিত দৃষ্টি অবশেষে দেখল তাকে। রাজার মত মর্যাদায় অতিসুন্দর, বন-দেবতার মত সুন্দর ব্যাঘ্রদেবতা। হলুদ-কালো ডোরাটানা নমনীয় শরীর, সমস্ত দেহ দিয়ে বিন্দু বিন্দু লাবণ্য ক্ষরিত হচ্ছে। প্রাণচ্ছন্দে সাবলীল বনের বাঘ। কাবুলী বিড়াল শুধু কণামাত্র সেই লাবণ্য ধার পেয়েছে। ভয়ংকর তবু কি সুন্দর!

বাঘ সতর্ক দৃষ্টি মেলে রাজকীয় গতি-ভঙ্গির সঙ্গে মাংসের লোভে অগ্রসর হ'ল। ইতিপূর্বে তার আগমনবার্তা বনের কন্দরে কন্দরে সূচিত করে দিয়েছিল বানর। নিস্তব্ধ-নির্জন ভয়ার্ত বনের শ্যাম কূলে সে উদয় হ'ল অভিসারে বুঝি।

মাখনে-গড়া শরীর ভেলভেটের থাবায় ভর করে চলেছে মৃত মহিষের কাছে। চারিদিক বার বার লক্ষ্য করে করে অবশেষে আহারে প্রবৃত্ত হ'ল সে।

তোমরা চিড়িয়াখানায় অর্ধাহারী বন্দী বাঘের হাড়গোড় দেখ শুধু। বনের মধ্যের তাজা বাঘের রূপ দেখেছ? জিম করবেটও যে কথা বলেন নি। আমি বলছি: যাই কিছু সে করুক না কেন বাঘ কখনও কুশ্রী নয়। এই যে নিদারুণ হিংসামূলক কাজ সে করে যাচ্ছে, তবু বিতৃষ্ণা হয় না। খাবলে খাবলে মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে সে, মনে হয় খেলা করছে। গলা জড়িয়ে ধরে কোলে টেনে নিতে ইচ্ছা হয়। অবশ্য চোখের সবুজ আগুনে তার হিংসা জ্বলে। তাই চোখের দিকে চেওনা।

এক-একটি আকর্ষণে শিকল বন্ধ মহিষের ভারী কাল দেহ যেন সোনার পুতুলের মত উদ্ভাসিত হচ্ছে। আর তখনই বোঝা যায় বাঘের ওই নমনীয়, মাধুর্যময় দেহ কি অপরিসীম শক্তিধর। যাকে ভালবাসতে ইচ্ছা করে, তখন তাকে দেখে ভয় হয়।

বাঘের ছবি তোলা হ'ল সিনেমার প্রথায়। দড়ির ফাঁদে দুইটি বাঘের ছানা ধরা হ'বার পরে বাঘকে শিকারের আয়োজন চলল। এবার মাচায় রাত্রি। কখনও কাল বাদুড়ের পাখায় ঢাকা রাত, কখনও বা রুপালী জড়িমোড়া রাত। বাঘ আসবে।

এক দিন বাঘ এল, ঝোপের আড়ালে দেহ ঢাকা, ল্যাজের ডগা পর্যন্ত নিথর। অন্য মাচায় শিকারীর বন্দুক গর্জন করে উঠল। ফুল্লরার মাচার শ্রেষ্ঠ শিকারীর অস্ত্র তখন বোবা।

হিমানী জারিত দুইটি স্রোত তখন ফুল্লরার তরুণ তনু গ্রাস করে ধরেছে। চিৎকার করা দূরের কথা, নিঃশ্বাসে তার কৃচ্ছ্র। ফুল্লরার কোমল অধর অন্য দুই অধরের কবল-গত নিষ্ঠুর পীড়নের বেদনায়। কথা-বলার পথ নেই তার। তার দেহের অধোভাগও শিলা-কঠোর জানুর প্রকোপগ্রস্ত। ফুল্লরার জীবনের প্রথম দিন।

বাঘ পালিয়ে গেল। জামাইবাবুর প্রশ্নের উত্তরে ভাড়া-করা পাহাড়ী শিকারী জানাল যে প্রথম বন্দুকের লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে জেনে সে বৃথা বন্দুক ছোঁড়ে নি। আবার প্রতীক্ষার পালা।

ফুল্লরা তার পরে কেন নির্বাক রইল? তাম্রবর্ণ, দীর্ঘদেহী তরুণ শিকারী। জাত তার পার্বত্য। অনেক দিন সে বাঁশের মাচায় ফুল্লরাকে নীরব বন্দনা জানিয়েছে স্পর্শাতীত বিরহে। ফুল্লরার ভয় তার তৃষিত অধরে সকৌতুক হাসি এনেছে। এই অরণ্য তার মাতা, বিপদ তার কাছে বিলাস। ললিতদেহা নাগরিকার আদিম জীবনের সম্মুখে এত ভয় কেন?

আবার বাঘের আশায় শিকারীর সঙ্গে এক মাচায় বসেছিল ফুল্লরা। টাটকা-চেরা বাঁশের গন্ধে, বনের ঘাস-পাতার গন্ধে তাম্রকূটে কটু রুক্ষ অধর আবার কুমারীর নম্র মুখের বাক্-শক্তি গ্রাস করে রইল নিরবচ্ছিন্ন সংযোগের মাদকতায়—বাধা সেখানে যৌতুক, নিষেধ সেখানে সম্মতি।

ঐশ্বর্যশালী পিতার কন্যা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী আধুনিকা ফুল্লরার ব্যক্তিত্ব কামার্ত আলিঙ্গনের পাকে পাকে ধৃত হ'ল। বাঘ দেখতে ভালবেসে সে বাঘের শিকারীকে ভাল-বেসেছে। না, বাঘকেই ভালবেসেছে সে।

শেষ দিনে দুই চোখের মধ্যের ললাটে শিকারীর গুলী নিয়ে মরল বাঘ। বহু শিকারীকে ব্যর্থ করলেও এই শিকারীর একটির বেশী গুলী প্রয়োজন হয় নি।

আদিম তড়াই-এর জংগলের আদিম অন্ধকার। সেখানে রক্ত হয় সৌরভ, মাংসের দেহ শৃঙ্গ-উপত্যকা সমন্বিত অরণ্য হয়ে যায়। চুলের শিবিরে মৃগনাভির গন্ধ ভাসে। সোনালী তরঙ্গ ওঠে, উত্তপ্ত দিকসীমায় বিহ্বল বাসনা উদ্দাম নীবিবন্ধ উন্মোচন করে আহ্বান জানায়। সেখানে পূর্ব স্মৃতির পাখীরা ডানায় মুখ ঢেকে ঘুমোয়। সবুজ অন্ধকারে জ্বলে শুধু উজ্জ্বল ব্যাঘ্রশরীর— burning bright. জ্বলে ওঠে অশান্ত বাসনা, দেহের শিখরে শিখরে হীরা, মুক্তা, চুণী বিতরণ করে। দেহ হয় ঐশ্বর্যশালী। আদিম পাপের সংগীত দ্বিতীয় বোদেলেয়ার রচনা করে যায়—

"Thou that hast seen in darkness
and canst bring to light
The gems a jealous God has hidden
from our sight,
Satan, have pity upon me in my
deep distress!

ঈর্ষিত ঈশ্বর দৃষ্টির অগোচরে যে রত্ন গোপন রেখেছেন, তুমি অন্ধকারে দেখতে পাও এবং তাদের আলোকে আন। হে শয়তান, তুমি আমার গুরু প্রমাদে আমাদের দয়া করো।

তারপর? আর নেই। গল্প এখানেই শেষ। অবশ্য তুমি ছাড়বে না, বিদ্যা। সুতরাং এস শেষ করি।

ফুল্লরার কাছে এখনও সে পাহাড়ী শিকারী আছে—ফুল্লরার অনুচর হিসাবে। ফুল্লরার গাড়ী সেই চালায়। ফুল্লরা চিরকুমারী,, কিন্তু নিঃসঙ্গ নয়।

কুরুবকী চুপ করে গেলেন। বাইরে তখন নিবিড় অন্ধকার নিবিড়তর হয়েছে। দরজার বন্য গোলাপ পরাগ ঝরিয়ে গন্ধ বিলিয়ে যাচ্ছে।

রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলাম, "আর একটু বলুন। ওরা কি সুখে আছে?"

"সুখের অর্থ কি এক? বোদেলেয়ার পড়া তোমার বৃথা হয়েছে প্রেম অর্থেই হৃদয়-বিনিময় নয়। দেহও প্রেম দিতে জানে। ফুল্লরা অসুখী নয়। কিন্তু, শিকারী একটু দেশীয় মদ্য পান পছন্দ করে। মাত্রাতিরিক্ত হ'লে ফুল্লরা বাড়ী ছেড়ে একা চলে আসে। তবু ওই বাঘেরি মত বাঘের শিকারী কোন অবস্থায়ই অপ্রীতিকর নয়।"

কুরুবকী বিদায় গ্রহণ করতে উদ্যত হলেন।

প্রশ্ন করলাম, "বড়দা বাড়ী আছেন—ডাকবো?"

"না, ওঁকে দিয়ে আমার প্রয়োজন নেই।"

আমি গাড়ী ডেকে দিলাম। আজ কুরুবকী মিত্র ট্যাক্সি করে এসেছেন, নিজের গাড়ীতে নয়। আজ তাঁর ড্রাইভার মাতাল হয়েছে, আমি জানি।

স্বীকারোক্তি না করেও নিজের গল্প বলে দেওয়া যায়। কুরুবকী মিত্রকে বিদায় দিয়ে আমার বাগানের বকুলঝরা পথে ঘরে ফিরে এলাম গভীর মেঘছায়ায় রাত্রির অন্ধকারে। তড়াইয়ের বনের রাত্রি এমন সিক্ত সুরভিত ছিল না, কিন্তু এমনি কি অন্ধকার ছিল? সেই অন্ধকার রাত্রি বুকে বেঁধে কুরুবকী প্রতি রাত্রে শিকারীর শিকার হ'ল। তড়াইয়ের ব্যাঘ্রসন্তান নখদন্তের চিহ্নে প্রৌঢ় দেহ তাঁর বিক্ষত। আমার দাদাকে কুরুবকী মিত্রের প্রয়োজন নেই। সেই আদিম বনবেষ্টনীতে যে স্বাদ তিনি পেয়েছেন, কোন শিক্ষিত ভদ্র পুরুষ তাঁকে সেই স্বাদ দিতে পারবে না। কলুষ কুসুম একবার যে ডালে ফুটেছে, সে ডাল দ্বিতীয় কুসুমপ্রসূ হয় না।

শুধু শ্রাবণ রাত্রের মেঘকালিমার মধ্যে ক্ষীণ চন্দ্রের পথ চেয়ে বললাম মনে মনে: যন্ত্রণা-স্পন্দিত-নির্বোধ অন্ধকারের শেষ প্রান্তে কি চন্দ্রোদয় লেখা নেই? আর কুরুবকী মিত্র বাঘকে ভালবেসে যে পশুজন্ম যাপন করে চলেছেন, সেই পশুজন্ম কি মানুষের ভালবাসায় কখনও প্রাণ পেয়ে ধন্য হয়ে উঠবে না?

———

পূর্বপুরুষদের দান

তখনো ইতিহাস লেখা হয়নি। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে মানুষ যে ফসল প্রথম ফলাতে সুরু করেছিল তা হচ্ছে বার্লি। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। খৃষ্টজন্মের তিন হাজার বছর আগেকার মিশরের মিনার-এর যে ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে যে শস্যের নিদর্শন রয়েছে তা বার্লি বলেই পণ্ডিতেরা বলেন। তাছাড়া, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালী ও স্যাভয়ের প্রাচীন সভ্যতার যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতেও বার্লির প্রাচীনত্বের প্রমাণ মেলে। খৃষ্টজন্মের ২৭০০ বছর আগে সম্রাট সেংসুঙ্‌ এর চাষ সুরু করেছিলেন চীনে।

আমাদের সংস্কৃত পুরাণ ও শাস্ত্রাদিতে যবের উল্লেখ রয়েছে। মহেঞ্জোদড়োয় সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারের মধ্যেও জানা গেছে যে বার্লির ফলন খৃষ্টজন্মের ৩০০০ বছর আগে ভারতবর্ষে ছিল। বেদে যবের উল্লেখ থেকে আরো মনে হয় ধান বা গম চাষের অনেক আগেই ভারতবাসীর প্রধান খাদ্য ছিল বার্লিশস্য। আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা বার্লির পুষ্টিকর গুণগুলির কথা জানতেন। পাল-পার্বণ ও উৎসবে এবং প্রাত্যহিক আহার্য ও পানীয় হিসেবে বার্লির ব্যবহার ছিল। এই কারণে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে বার্লিশস্য একাত্ম হয়ে আছে।

আজো বার্লি মানুষের একটি বিশিষ্ট খাদ্য। বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষে অসংখ্য মানুষ বার্লির পানীয় দিয়েই জীবনধারণ করে। বার্লিশস্য থেকে উৎপন্ন পাল বার্লি ও গুঁড়ো বার্লি সহজে হজম হয় এবং শারীর ক্রিয়ার সহায়ক ব'লে রুগ্নদের জন্যেই এর বহুল ব্যবহার।

শস্য উৎপাদন পদ্ধতি ও যান্ত্রিক উন্নয়নের ফলে বার্লির চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলেছে। 'পিউরিটি বার্লি' প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিঃ-এর সর্বাধুনিক কারখানায় উঁচুজাতের বার্লিশস্য থেকে স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে বার্লি তৈরী হয়। এই জন্যেই 'পিউরিটি বার্লি' রুগ্ন, শিশু ও প্রসূতিদের ব্যবস্থা দেওয়া হয়। যুবা ও বৃদ্ধরাও এই বার্লি খেয়ে উপকার পান।

অ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিঃ (ইংল্যাণ্ডে সংগঠিত)

PTY 3084

মনে-মনে

বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত

পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে মোহন বললে, "কাকা! আমি পাশ করেছি।"

তা বেশ! তা বেশ! পলকের হাসি হেসে বললেন কাকা শেখরবাবু। তোমার কাকীমাকে খবরটা দিয়ে এসো।

কাকীমা রান্নাঘরে তরকারী কুটছিলেন। খবর শুনে বললেন, পাশ করেছো, বেশ করেছো। এবারে একটা কাজ কম্মো দেখে সংসারের কিছু সাহায্যের চেষ্টা করো।

সংসারের সাহায্য! কথাটা ত কোন দিনই মনে পড়েনি মোহনের। সংসারে খিটিমিটি আছে বটে, কিন্তু অভাবের দৃশ্য ত কোন দিন চোখে পড়েনি! ব্যাঙ্কে কাকার অনেক টাকা আছে। খুড়তুতো ভাই তপন ছাপাখানা করেছে। টাকার কথা ত তাকে কেউ বলেনি! চিলপড়া জলের মতো তার হর্ষের তরঙ্গের তাল কেটে গেল। বি-এ পাশ অনেকেই করে, অনার্স পেয়েছে সে, কত স্বপ্ন তার মাথায় খেলছে! মাথা চুলকে মোহন বললে কেন এম-এ পড়াবো না কাকীমা?

সে আমি বলতে পারিনে বাপু, তোমার কাকাকে জিজ্ঞেস করে দেখো,' বঁটিটা কাৎ করে রেখে ভাঁড়ারের দিক চলে গেলেন কাকীমা।

কাকা বললেন, দ্যাখো! চেষ্টা করে দ্যাখো যদি ভর্তি হতে পারো ত ভালোই!

কেবল তপনই আনন্দে অধীর হ'য়ে পাড়াময় ছুটোছুটি করতে থাকে। পরিচিত যাকে দেখে, তাকে ধরেই বলে, শুনেছিস মোহনদা বি-এতে অনার্স পেয়েছে। পাড়ার বাঙ্গাল মেয়ে রত্না যাচ্ছিল বই খাতা নিয়ে ইস্কুলে, তপন চেঁচিয়ে ডাকে এই রত্না শোন্! শোন্! খবরটা শুনে যা!

আড়ালের কথা আড়ালে থাকে। মনীষীরা বলেন, বঞ্চনা আর অপমানের কথা মতিমানেরা প্রকাশ করেন না। তপন বুঝতে পারবে কি করে, তার বাবা-মায়ের ব্যথা কোথায়? নিজের ছেলের পেছনে তিনজন প্রাইভেট মাস্টার রেখেও তপনকে দিয়ে স্কুলফাইনাল পার করানো যায়নি। আর মা নেই, বাপ নেই সেই ঘরেরই ভাই-এর ছেলে মোহন পড়বে এম-এ। কলকাতায় বাড়ী আছে, ব্যাঙ্ক টাকাও আছে; কিন্তু কি করে তা হয়েছে, এক শেখর বাবু ছাড়া তার খোঁজ কে রাখে?

নীচের একতলায় মোহনের পড়ার ঘরের দরজাটা খোলাই থাকে। রবিবার রবিবার রত্না আসে সেখানে, তার স্কুল ফাইনালের পড়া বুঝে নিতে। একে বাঙ্গাল, তায় উদ্বাস্তু। বাপ নেই, মা নেই, মামার আশ্রয়ে কোনমতে মাথা গুঁজে থাকে তেরো নম্বর বাড়ীর একতলায়। এ সংসারে মাতৃ-পিতৃহীন মেয়েদের মামারাই একমাত্র আশ্রয়, তারও ভরসা আছে মামার স্নেহে সে একদিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে।

তপনই ধরেছিল মোহনকে। 'ওর কেউ নেই। পরীক্ষার আগের ক'টা মাস একটু দাও না দেখিয়ে। সপ্তাহে ত মাত্র একটি দিন, না হয় রবিবারেই হোক। এক ঘণ্টা, ধরো দশটা থেকে এগারোটা, বেশী দিন ত আর আসবে না।'

রত্না আসে। কাকীমা ঘুরে ঘুরে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখে যান। মাঝে মাঝে পুত্র তপনকে বকেন, নিজে ত বিদ্যের জাহাজ হয়েচো, এখন রত্নার পড়ার জন্যে তোমার ঘুম নেই। এত আদিখ্যেতা কেন? তপন বিরক্তির সুরে বলে—যা বোঝ না, তা নিয়ে বক্ বক্ করতে এসো না।

সপ্তাহে এক ঘণ্টা পাড়ার একটি মেয়ে এসে পড়ে যাচ্ছে বিষয়টা এমন কিছুই নয়। কিন্তু সন্দেহের বয়স হলেই মায়েরা ছেলেমেয়ে সম্পর্কে স্থির থাকতে পারেন না। তাই ঝুঁকির দুর্ভাবনাতেই উঁকিঝুঁকি চলতে থাকে। নিজের ছেলে তপন যা-তা, কিন্তু মোহন কাদের ত ভেবে চিন্তে চলার বয়স হয় নি। বয়স না হোক্, বুদ্ধি ত আছে। বুদ্ধি যার বল তার। তবু শেখর গিন্নি ভাবেন বল থাকলেও তা দুর্বল হ'য়ে পড়তে কতক্ষণ? অতএব পড়ার সঙ্গে চৌকিদারীও চলে।

শাড়ির শেষাংশ পিঠে ফেলে উঠবার সময় একদিন রত্নার আঁচলটা দেয়ালের একটা বড় পেরেকে আটকে গেল। শাড়ি গেল ফসকে, নিজেকে সামলাতে গিয়ে রত্না পড়ে গেলে মোহনের চেয়ারের পাশে। অতিত্রস্তে উঠবার চেষ্টায় পেরেকে-আঁটা আঁচলটাও গেল প্রায় বিঘৎ খানেক ছিঁড়ে।

'আহা! আহা!' লাগলো নাকি খুব? মোহন ঝুঁকে পড়ে রত্নাকে ধরতে গেল।

'না! না! কিছু লাগেনি, কিছু লাগেনি বলতে বলতেই রত্না দে ছুট।

শেখর-গিন্নির দৃষ্টি এড়ায়নি! নিঃশব্দে অন্তর্হিত হ'লেন বারান্দা থেকে।

বাইরে বেরোবার একটা শাড়িই সম্বল, আর সেই এক শাড়ি পরেই রত্না পড়তে আসে। পুরানো কমলা রঙের ঠিক সেই ধরণেরই আর একখানা শাড়ি কবে থেকে সে পরে আসছে এবং সেটা তাকে কে দিয়েছে তা আর কেউ না জানলেও শেখর গিন্নি জানেন।

মোহনই দিয়েছে। কিন্তু সে টাকা পায় কোথায়?

শেখর বাবু নির্বিকার। সালঙ্কারে ইতিহাসটা বিবৃত হওয়া সত্ত্বেও তিনি জানালেন, কোন্ কাগজে কি লিখে দিয়ে সে পনেরো টাকা পেয়েছে, মোহন সেটা শেখরবাবুকেই দিয়েছিল, তিনি বলেছেন, তাকেই সে টাকা খরচ করতে।

এতে কোন গিন্নির রাগ শান্ত হবার কথা নয়।

মাসখানেক পরে এ পরিচ্ছেদের শেষ হ'ল। রত্না আর আসে না। [illegible]

ফাইনাল পাশ করেছে। মোহনও এম-এ দিয়েছে। এখন ঘরের গিন্নি থাকেন কি নিয়ে?

শেখরবাবুর দেশের গাঁয়ে নতুন সেটল-মেন্টের নোটিশ পড়েছে। জমির জরীপ হবে দু-মাস পরে। কর্তা বললেন মোহন! এবারে উপস্থিত না থাকলে জমিজমা সব হাতছাড়া হয়ে যাবে।

কি আছে আর কি না আছে, তার কোন খবরই যে রাখে না, সে এর গুরুত্ব কি বুঝবে? কলকাতার ইট-পাথরের সহর ছেড়ে পল্লীর ছায়াও সে দেখেনি কোন দিন। তবু গ্রামের যে সব কাহিনী সে বই-কেতাবে পড়েছে শুনেছে তারই হয় তো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করা যাবে।

পাড়াগাঁয়ের লোক কলকাতায় এলে কেউ তার খবর নেয় না। প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যেখানে যোগ নেই, সবই বিয়োগ, সেখানে সে প্রথম প্রথম আপনাকেই হারিয়ে ফেলে। পল্লীগ্রামের প্রকৃতি পরিবেষ্টন অন্য ধরণের। সহুরে লোক গাঁয়ে গেলে ঘরে ঘরে সাড়া পড়ে যায়। আত্মীয়-অনাত্মীয় সবাই ছুটে আসে, নয় ত খোঁজ খবর নেয়। অনেক কিছু জানবার ও শুনবার জন্যে তাদের আগ্রহ জাগে। মোহনের ভারি ভালো লাগল। সন্তু, নন্তু, কেলো, ভুতো থেকে সুশান্ত, প্রশান্ত, প্রিয়ব্রত, শান্তিরঞ্জন, হরিপ্রসাদের দল তাকে ঘিরে রাখে। ছোট ছেলে মেয়েরা সহুরে লোক দেখে যায় ভয়ে সম্ভ্রমে। বুড়োবুড়ীর দল আসে নিঃস্বার্থ আশীর্বাদ নিয়ে।

এই যে! তুমি বরেনের ছেলে? বেঁচে থাকো বাবা বেঁচে থাকো। গায়ে মাথায় হাত বুলোতে থাকে স্নেহ মমতা দিয়ে। বলাই চাটুয্যে উঠোনে পা দিয়ে হাঁকেন, কই গো শুনে এলাম বরেনের ছেলে এসেছে, দেখি! দেখি! বাঃ তুমিই বরেনের ছেলে? নাক মুখ চোখ চেহারা সবই ত বরেনের ছাপ দেখছি। জগ-মোহন বাবু বলেন, বরেন এ গাঁয়ের সবাইকে কত ভালো বাসতো, এমন কি আর হয় রে বাপু! মোহনকে দেখে তাঁর চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে যায়। শুধু চেয়ে থাকে। মোহনের বাবা তার জন্যে এই পাড়াগাঁয়ের অভ্যন্তরে যে এত আন্তরিক স্নেহ-সম্পদ রেখে গেছেন তা ভেবে সে কেমন অবশ, অভিভূত হয়ে পড়ে। কুমোর কামার যুগী তাঁতি সবাই বলে, বরেনবাবু এখানে বসে আমাদের কত খোঁজ নিত। ছেলের দল বলে, বেলা বয়ে যাচ্ছে। মোহনদা, গাঙ্গুলীদের আম বাগান দেখবে চলো। একজন হাঁকে—বারে! মনসার দীঘিটা আগে দেখবে না। কোন বাড়ীতে দেয় খই-মুড়কি। কেউ নিয়ে আসে চিড়েগুড়। কলকাতায় ত অনেক খাও বাবা, আমাদের গাঁয়ের খাদাটাও একটু চেখে যাও। বসু গিন্নির ললাটে বড় সিঁদুরটিপ, পরনে লাল চওড়াপেড়ে শাড়ি। একবার মোহনের পায়ের দিকে আবার মাথার দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নেন। তার ষোড়শী কন্যা দূরে দাঁড়িয়ে থাকে, কুণ্ঠার চেয়ে তার কৌতূহল বেশী। গ্রামের বনশ্রেণীও যেন মায়ায় ঘেরা। একবার দেখলে ভোলা যায় না।

মোহনের বাবার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিলেন রমেনবাবু। সবাইকে সরিয়ে দিয়ে একান্তে তিনি মোহনকে একটা কথা [illegible], না শুনলেই
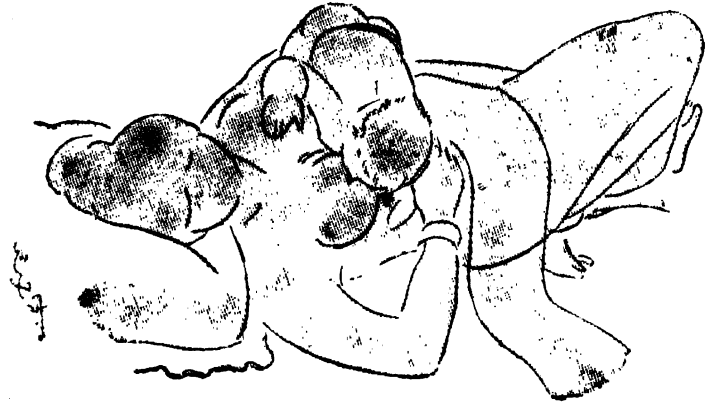
স্কেচ : মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়

হয়তো ছিল ভালো। শুধু রমেনবাবু নন, পরে তার বাবার অনেক বন্ধুর মুখেই সে কথাটা সে আরও শুনেছে। রতনপুরের এই যে জমিজমা বিষয়সম্পত্তি এ সবই মোহনের বাবা বরেনবাবুর। তাঁর বিধবা পত্নীকে ঠকিয়ে, শেখর-বাবু গ্রাস করেছেন। অবশেষে গাঁয়ে টিকতে না পেরে কলকাতায় গিয়ে যে বাড়ী করেছেন, তাও মোহনের বাবার টাকায়। মোহনের কাকা শেখরবাবু মামলা-মোকদ্দমা ছাড়া জীবনে আর কিছু করেননি। ব্যক্তিগত উপার্জন তার কোন-কালেই কিছু ছিল না।

বই-এ এ ধরণের উপন্যাস সে পড়েছে বটে, কিন্তু কাকার সম্পর্কে একথা সে বিশ্বাস করতে চায় না। অথচ অবিশ্বাসেরও পথ নেই। একজনের নয়, অনেকের মুখেই সে একথা শুনেছে। যাঁরা গ্রাম্য দলাদলিতে থাকেন না, তাঁরাও বলেছেন।

মোহনের ঘুম হ'ল না। মায়ের বিষাদক্লিষ্ট মুখখানার কথা তার বারেবারেই মনে পড়ছে। তিনি যে কেন শেখরবাবুর পরিবারে ভয়ে ভয়ে নিঃশব্দে কাটিয়ে গেছেন, তাও এখন সে অনুমান করতে পারছে।

শেখরবাবুর মনে এ আশঙ্কা আগেই ছিল এখন তাঁরও সন্দেহ হয়েছে, গাঁয়ের লোক মোহনকে সব জানিয়েছে। মোহনকে রতনপুরে আনার ইচ্ছা তাঁর ছিল না, কিন্তু সেটলমেণ্টে তার থাকা প্রয়োজন বলেই আনতে বাধ্য হয়েছেন।

পরদিন মোহন বললে 'কাকা! আমি কলকাতায় ফিরে যাবো।' কাকা আপত্তি না ক'রে কতকগুলো দলিলপত্রে সই করিয়ে নিয়ে বললেন, ভালো যখন লাগছে না, তখন যাও।'

এম্-এ পড়ার সঙ্গে আইন পড়তে মোহনের প্রবল ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কেন কাকা তাতে রাজী হননি এখন তা বোঝা যাচ্ছে। আইন পাশ করলে পুরোনো পাপ ফাঁস হয়ে যাবে, হয়তো এটাই ছিল তাঁর আপত্তির প্রধান কারণ। তবু যে আইনে পাপীর নিষ্কৃতির সহস্র পথ খোলা রাখা হয়েছে, শয়তানের শাস্তি এড়ানোর সুযোগ রয়েছে, সে-না শিখে সে ভালোই করেছে।

ছলনা-প্রতারণা যেখানে থাকে থাকুক, সে তার কাছে যাবে না। অধ্যাপনার পথই সে বেছে নেবে। আচমকা মনে আসে রত্নার জীবনের ইতিহাসেও এমন কোন প্রতারণা জড়িত নেই ত?

নৌকোয় গঙ্গা পাড়ি দিয়ে ওপারে গিয়ে ট্রেণ ধরতে হয়। বিদায়বেলা নৌকোর সামনে শত নরনারী এসে ভীড় করে দাঁড়ালো। এই অনাত্মীয় অথচ এত কাছের মানুষদের জন্যে এত কান্না মনে মনে জমে থাকে কেন? বাষ্পরুদ্ধ চোখে সে গ্রামবাসীর দিকে তাকিয়ে রইল।

কলকাতার একটা স্পনসর্ড কলেজ থেকে অধ্যাপকের পদের আহ্বান এসেছে, আর একটা এসেছে লক্ষ্ণৌ থেকে। কলকাতায় থাকার সাধ নেই, মোহন স্থির করলে সে লক্ষ্ণৌ যাবে, রত্নার মামা বাসা ছেড়ে উঠে গেছে, যাবার আগে তার সঙ্গে কি একবার দেখা হয় না? নিজের পারিবারিক প্রতারণার ইতিহাস শুনে অসহায় রত্নার জন্য তার একটা মায়া জড়িয়ে গেছে। পরীক্ষার পড়াবার সময় যেকথা তার একদিনও মনে আসেনি, আজ ঘুরে ঘুরে সেই কথাই মনে আসে। উদ্বাস্তু হয়ে রত্নার সব গেছে, কিন্তু মনুষ্যত্ব রয়েছে, তারও সম্পত্তি গেছে, সম্পদ যায়নি। জীবনে বিদ্যাই ত পরম সম্পদ, রত্নার বিদ্যার্জনের আগ্রহের মধ্যেও সে সম্পদের ইঙ্গিত লক্ষ্য করেছে।

যাকে খুঁজে পাওয়া যায় না, আকস্মিক-ভাবেই সে কাছে আছে। তপনকে নিয়ে বাজার থেকে ফিরবার পথে ধর্মতলার মোড়ে তপনই চেঁচিয়ে উঠলো, ওই যে রত্না যাচ্ছে। রত্না ও রত্না, তোর ত ভারি গুমর দেখ্‌ছি। পরীক্ষা পাশের খবরটাও দিলিনে, দাদার এম-এ পাশের দিনে খেতে নিমন্ত্রণ করে এলুম, তাও এলিনে! এত গুমর কেনরে তোর?

"গুমর!" রত্না খানিক দাঁড়িয়ে চুপ করে রইল। মোহনের দিকে একবার তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে অশ্রুরোধের চেষ্টা করল। তারপর হন্ হন্ করে চৌরঙ্গীর দিকে এগিয়ে চলল। মোহন বিমূঢ় হয়ে দেখলো রত্না ছুটছে আর ঘন ঘন চোখ মুছছে।

মায়াপুরী

সুশীল রায়

খবর পেয়ে সন্ধ্যার কিছু পরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। খবর পেয়েছিলাম, আর বেশী দেরী নেই, আর বড়জোর আধঘন্টা। পৌঁছে দেখি, লোকে লোকারণ্য। লোক, অর্থাৎ মেয়েলোক। মেয়েদের একটা মস্ত মেলা বসে গিয়েছে।

পুরুষের মধ্যে শুধু আমি, আর অ্যাটেন্ডিং ফিজিশিয়ান ডক্টর চোপরা।

মিস মল্লিকা গুপ্ত মারা যাচ্ছেন।

খবরটা ছোট না। মিস মল্লিকার সঙ্গে এই ইনস্টিটিউশনের যোগ একেবারে নাড়ির। এই স্কুলের তিনি রক্ত আর মাংসই নন, অস্থি আর মজ্জাও। এইজন্যে তাঁর অন্তিম অবস্থায় খবর পেয়েই ছুটে এসেছে তাঁর প্রাক্তন ছাত্রীর দল, বর্তমান ছাত্রীরা এবং নূতন ও পুরাতন সহকর্মীরা।

পঞ্চাশ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই ইনস্টিটিউশন—গত মাসে জন্মের অর্ধশত পূর্তি উপলক্ষ্যে সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হল। অতবড় একটা উৎসব একা পরিচালনা করেছিলেন মিস মল্লিকা।

বাইরে তিনি রুড আর রাফ, কিন্তু তাঁর মনটা খুব সফ্‌ট্‌। এইজন্যে সকলে তাঁকে ভয়ও করে যেমন, ভালোও বাসে সেই অনুপাতে।

তাঁর ছাত্রীর সংখ্যা কম না। সারা বাংলা দেশে, শুধু বাংলাদেশ কেন, সারা ইণ্ডিয়াতেও বলা যেতে পারে, তাঁর ছাত্রীর দল ছড়ানো। তাঁর প্রথম আমলের ছাত্রীরা এখন সবাই দিদিমা—ঠাকুরমা হয়ে গিয়েছে। এই রকম একটা গল্প তিনি করেছেন।।

গল্পটা করতে করতে কি হাসি। ঝকঝকে দাঁতে অমন পরিষ্কার আর পরিচ্ছন্ন হাসি খুব কম দেখা গিয়াছে। এই দাঁতগুলো অবশ্য ফল্‌স্‌, হাসিটা কিন্তু একবিন্দু মেকি না।

বললেন, "তোমরা জান, প্রত্যেক ভেকেশানে আমার বাইরে যাওয়া চাই। এবার গিয়েছিলাম উটিতে। উঃ, অমন ফাইন ভ্যালি, অমন নীট হীলস্‌, আর অমন গ্লোরিয়াস চাঁদ আর কোথাও দেখিনি। মাউন্ট আবু হচ্ছে ফ্যাসিনেটিং, কিন্তু উটকামণ্ড হচ্ছে অ্যালিওরিং।"

একটু থেমে বললেন, "কিন্তু যে কথা বলছিলাম—ওখানে গিয়ে দেখা হল এক বুড়ির সঙ্গে, একদল গ্র্যাণ্ড ওল্ড লেডির সঙ্গে। মাথায় তাঁর সাদা ফুরফুরে চুল, পরনে সাদা সিল্কের শাড়ি—চেহারা ভারি সুইট। আমার পাশের সিটেই তিনি বসে নাচ দেখছিলেন। ইন্টারভ্যালে আলো জ্বলল। বুড়িটাকে ভালো করে দেখছি। তারপর আলাপ করার লোভ হল। তাঁর ছেলে নাকি ওখানে মিলিটারি অফিসার। কিছুক্ষণ গল্প করার পর, ও মাই গড্‌—!"

মিস মল্লিকা তাঁর নতুন চকচকে দাঁত দুই ঠোঁট দিয়ে সন্তর্পণে চাপা দেবার চেষ্টা করতে করতে হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়েন যেন, দম নিয়ে বললেন, "সে কে জান? আমার ছাত্রী, আমার স্কুলের প্রথম ব্যাচের মেয়ে—মায়া, মায়া নন্দী।"

উটিতে গিয়ে তিনি নাকি প্রথম বুঝতে পারলেন যে, তাঁর বয়স হয়েছে। অনেক জায়গায় অনেকবার অনেক ছাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছে তাঁর, কিন্তু এমন বুড়ি ছাত্রীর সঙ্গে দেখা এই প্রথম। তাঁর নিজের বয়সের হিসাব করার সময়ই নাকি তিনি পাননি। মেয়েদের ভর্তি করা নিয়ে, তাদের পরীক্ষা নিয়ে, খাতা দেখা নিয়েই সময় কাটে। তার উপর এই হস্‌টেল—এখানেও তো একপাল মেয়ে—তাদের উপর চোখ রাখা, তাদের গার্ডিয়ানদের নালিশ শোনা, অসুখ-বিসুখ হলে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা—এই নিয়েই তাঁর সময় কেটেছে। এরমধ্যে নিজের কথা ভাবার সময়ই নাকি পাননি।

নিজের কথা ভাবার সময় পান নি হয়তো, কিন্তু নিজেকে ছিমছাম আর পরিপাটি-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্যে যত্নের ত্রুটি তাঁর কখনো হয় নি। তা যে হয়নি, তা তাঁর চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। তাঁকে দেখে তাঁর বয়স আন্দাজ করা কঠিন।

মায়া নন্দী নাকি তাঁর মল্লিকাদিকে দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। এখনো তিনি সেই স্কুলেই সমানে লেগে আছেন শুনে সে নাকি আকাশ থেকে পড়ে।

"আকাশ থেকে পড়ে সে কি করল জান? আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। প্রণাম করে বলল, আপনি আমার টিচার ছিলেন বলেই শুধু এ প্রণাম না, আপনি নিজেকে কি সুন্দর রাখতে পেরেছেন—এইজন্যেও।"

শুনে নাকি লজ্জিত হন মল্লিকাদি এবং সেই সঙ্গে গর্বিতও।

গর্বিত হয়ে তিনি ফিরে এলেন। ফিরে এসেই মস্ত কাজে নামতে হল তাঁকে—এই ইনস্টিটিউশনের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে।

সারাটা জীবন হস্‌টেলেই কাটালেন তিনি। অন্যের তদারক করে করেই কাটালেন জীবন। তাঁকে কেউ কোনোদিন তদারক করার সুযোগই পেল না।

আজ বুঝি তাই সুদে-আসলে সব দেনা শোধ করার জন্যে হস্‌টেল একেবারে লোকে লোকারণ্য। লোকে, অর্থাৎ মেয়েলোকে—অবশ্য আমি আর ডাক্তারবাবু ছাড়া।

মল্লিকাদি আমার কেউ না—কিন্তু তবু তিনি আমার দিদি। আমার মেজদি তাঁর ছাত্রী ছিলেন। তারপর এই স্কুলেই মেজদি কিছুদিন মাস্টারিও করেছেন। মাস্টারি তিনি পেয়েছিলেন মল্লিকাদির জন্যেই—মেজদিকে তাঁর খুব পছন্দ ছিল; বি এ পাস করার পর মেজদি চাকরি খুঁজছেন জানতে পেরে মল্লিকাদি তাঁকে ডেকে নেন। সেই থেকে মল্লিকাদি প্রায় প্রত্যেক রবিবারে আমাদের বাসায় আসতেন, বলতেন, "বা, কী চমৎকার রান্না রে। হস্‌টেলে এমন রান্না রাঁধে না কেন ওরা?"

আসলে ঝি-চাকরের হাতের রান্না খেয়ে যারা অভ্যস্ত, যে-কোনো বাড়ির ঘরোয়া রান্না তাদের মুখে অমৃত বলে মনে হয়। মল্লিকাদিরও তাই হত।

এইভাবে আমাদের বাড়িটা তাঁর কাছে প্রায় নিজের বাড়ি হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে মেজদির বিয়ে হয়ে গেল, চাকরি ছেড়ে দিয়ে সে চলে গেল দেরাদুনে; কিন্তু মল্লিকাদি আমাদের ছাড়লেন না।

সেই মল্লিকাদি আজ মারা যাচ্ছেন—মিস মল্লিকা গুপ্ত। খবর পাওয়া মাত্র তাই ছুটে এসেছি।

প্রকাণ্ড হসটেলবাড়ির চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছি আর ভাবছি, এ বুঝি মল্লিকাদিরই একটা স্মৃতিস্তম্ভ। তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে আর থাকবেন না, কিন্তু ওই স্কুলবাড়ি আর এই হসটেলবাড়ি ঠিক এইভাবেই দাঁড়িয়ে থাকবে। এর ইঁটগুলো যেন মল্লিকাদির জীবনের এক এক খণ্ড আয়ু দিয়ে তৈরি বলে মনে হতে লাগল আমার।

স্টেথসকোপের মালা গলায় জড়িয়ে পাশের ইজিচেয়ারে ডাক্তার চোপরা গা এলিয়ে পড়ে আছেন।

দোতলার বারান্দা-রেলিঙের কিনার ঘেঁষে জনতায় ঠাসা। ঘরের মধ্যে মল্লিকাদির খাটের চারপাশে, কেউ মোড়ার উপর, কেউ মেঝেয় বসে, মল্লিকাদির শ্বাসের শব্দ শুনছে।

নাইট-শিফটে কাজ হচ্ছে এ্যালুমিনিয়াম কারখানায়, তার রোগা আর লম্বা চোঙ দিয়ে ধোঁয়া উঠে আকাশের খানিকটা জায়গা নোংরা করে দিল। মল্লিকাদির কথা মনে হল, তিনি দেখলে নিশ্চয় রাগ করতেন—নোংরামি একেবারেই পছন্দ নয় তাঁর। কালো ধোঁয়া অনেকটা জায়গায় ছড়িয়ে যেতেই পঞ্চমীর চাঁদটা ঝাপসা হয়ে গেল।

ভিতর থেকে মল্লিকাদির শ্বাসের শব্দ যেন একটু জোরে শোনা গেল। মেঝে থেকে উঠে গিয়ে কয়েকজন খাটের কাছে দাঁড়াল।

উটকামন্ডের সেই গ্লোরিয়াস চাঁদ বুঝি ওই মুমূর্ষুর চোখে এখনো জাদুর মত লেগে আছে—কে জানে।

রাত্রি গভীর হচ্ছে ধীরে ধীরে। চাঁদের ফিকে আলোয় হাতের ঘড়িটা দেখার চেষ্টা করলাম—দেখা গেল না ভালো করে। মনে হল যেন এগারোটা।

আবছা আলোয় এলাকাটা একটা মায়াপুরী বলে মনে হচ্ছে। কাউকেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু স্পষ্ট দেখতে না পাওয়াতেই রহস্য যেন ঘনীভূত হয়ে উঠছে। এই মহিলার জনতার মধ্যে বসে নিজেকে মহাসমুদ্রের বুকে একখণ্ড তৃণের মত মনে হতে লাগল।

সত্যিই বুঝি মায়াপুরী এটা—চাপা গলায় কি কথা বলাবলি করছে ওরা কিছু শোনা যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে না—কিন্তু ওটা যে উদ্বেগের আর অশান্তির চাপা গুঞ্জন তা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না।

ঐ ছিপছিপে এক মহিলা তরতর করে যাতায়াত করছেন, বারবারই ঘর-বার করছেন। তাঁর চলাটা এবং চালচলনটা লক্ষ্যও করছিলাম বসে বসে।

কিন্তু কতক্ষণ ঐ একই দৃশ্য দেখা যায়, যতই মনোহারী হোক-না [illegible]

আধঘণ্টাও যার টেকার কোনো কথা না, সেই মানুষ কি যুদ্ধটাই করছে মৃত্যুর সঙ্গে। আর, আমরা এখানে বসে যে-যুদ্ধটা করছি, তাও বুঝি কম না। এ-রকম প্রতীক্ষা করে থাকা যুদ্ধ ছাড়া কি।

এই মহাসমুদ্রের মধ্যে একটা চটুল ঢেউ বারবারই ছলকে উঠছে। নামটা জেনে ফেললাম ওঁর—কল্যাণী। কল্যাণী দেবী ঐ জনতার মধ্যে থেকে উপচে বেরিয়ে আসছেন মাঝে-মাঝেই। খুব চঞ্চল হয়ে চলাফেরা করছেন।

পাশে চেয়ে দেখি, ডাক্তার চোপরা অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ডেথ-সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্যে তাঁকে আটকে রাখা হয়েছে, কিন্তু সেকথা তিনি বুঝি ভুলে গেছেন।

হঠাৎ কল্যাণী দেবী থামলেন, আমার চেয়ারের হাতলে ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বললেন, "কটা বাজে? কী স্ট্রাগলটাই করছেন উনি দেখছেন? উটিতে যাওয়াই কাল হল তাঁর।"

উঠে দাঁড়ালাম আমি, দেখলাম কল্যাণী দেবীর এলোখোঁপাটা, দেখলাম, সেই খোঁপার মধ্যে দুটি বেলকুঁড়ি গোঁজা।

কল্যাণী দেবী বললেন, "ওখান থেকে ফিরে এসেই তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেল যে, তাঁর বয়স হয়েছে। তাতেও হয়তো বিশেষ-কিছু হত না, হয়তো কাটিয়ে উঠতে পারতেন সে শকটা। কিন্তু তারপরেই স্কুলের জুবিলি নিয়ে খাটনি। একাই একশজনের কাজ করছেন। ওতেই ভেঙে পড়লেন।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি এখানে কতদিন আছেন?"

"আমি? বছর বারো হবে। কলেজ থেকে বেরিয়েই।"

আমি হিসাব করতে লাগলাম তাঁর বয়সটা। তাঁর বয়স দিয়ে আমার যে কী কাজ জানি নে, তবু হিসেব করা যেন একটা বাতিক।

বয়সের মতন অবশ্য দেখাচ্ছে না ওঁকে—ফিগারটা স্লিম বলেই বয়স অনেক চাপা পড়ে গিয়েছে। নাক, মুখ, চোখ দেখে নিলাম—বেশ শার্প।

যারা অদূরেই দাঁড়িয়ে আছে রেলিঙের ধারে ও বারান্দায় তারা ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে আমাদের দু-জনকে দেখতে লাগল। এটা বুঝি একটা মজার দৃশ্য—ঘরে যে মুমূর্ষু একটা রুগী, এ খেয়ালই বুঝি তাদের নেই।

মল্লিকাদির অন্তিম সময়ে এসেছি, তাঁর প্রতি মায়া-মমতা, ভক্তি-শ্রদ্ধা সবই আছে; কিন্তু একটু চাপা গলাতেই বলি, এই মায়াপুরীতে এই রোমাঞ্চকর অবস্থায় দাঁড়িয়ে মনে হল—মল্লিকাদি দীর্ঘজীবী হোন।

দীর্ঘজীবী হোন—অর্থাৎ, তাঁর ঐ কষ্টটা আরো দীর্ঘস্থায়ী হোক। বেশি না, অন্তত, এই রাত্রিটা তিনি বেঁচে থাকুন।

মনে হল, একজন সঙ্গী যখন পাওয়া গেলই, আরো আগে থেকে তবে কেন পাওয়া গেল না।

আমরা দু-জন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অনেক গল্প করতে লাগলাম। আকাশের দিকেও তাকালাম—হয়তো গ্লোরিয়াস চাঁদ দেখার জন্যেই; কিন্তু চাঁদ কই? এ্যালুমিনিয়াম-কারখানার ধোঁয়ায় উহ্য হয়ে গিয়েছে চাঁদের চেহারা।

খুব হাসিখুশি, খুব স্মার্ট, আর খুব চালাক-চতুর মানুষ বলে মনে হল মিস কল্যাণীকে।

খোঁপার বেলকুঁড়ি দুটো মাঝেমাঝেই আমার চোখ-দুটোকে যেন টেনে ধরেছে।

মনের মধ্যে অনেক স্বপ্ন ও কল্পনা জটলা করতে লাগল। পঞ্চমীর চাঁদটার মত মনের বক্র আশাটা মাঝেমাঝেই জ্বলজ্বল করে উঠতে লাগল, মাঝেমাঝেই যেন আচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগল ধোঁয়ায়।

হঠাৎ ইচ্ছে হল, বলে ফেলি কথাটা। এই একান্ত অবসরেই তো কথাটা বলার উপযুক্ত সুযোগ।

বলি-বলি করছি, বলতে পারছিনে।

মিস কল্যাণী বললেন, "কি টরচার বলুন।"

"কিসের কথা বলছেন?"

তিনি বললেন, "এই প্রতীক্ষা।"

সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল আমার। দু'হাত ঘেমে উঠল। মুখ ফসকে কথাটা প্রায় বেরিয়ে এসেছিল আমার, এমন সময় মিস কল্যাণী বললেন, "এ প্রতীক্ষা অসহ্য। ওঁর মৃত্যু চাই নে, কিন্তু মৃত্যু ওঁর হবেই ডক্টর চোপরা বলেছেন। কিন্তু সেই বিকেল থেকে এই গভীর রাত পর্যন্ত কিভাবে ঐ মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আছি বলুন।"

মনে-মনে জিভ কেটে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, "সত্যিই টরচার।"

এমন সময় ঘরের মধ্যে থেকে হৈ-চৈ শব্দ এল। কে-যেন ছুটে এসে ডাক্তার চোপরাকে ধাক্কা দিল। তিনি উঠে ভিতরে গেলেন। কিছুক্ষণ বাদে মাথা নীচু করে বেরিয়ে এলেন।

সব ঠাণ্ডা। সব চুপ-চাপ। আলপিন পড়লে শব্দ শোনা যায় এমনি নিঃশব্দ চারদিক।

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন মিস কল্যাণী। হঠাৎ তিনি ছুটে গেলেন ঘরের মধ্যে, মল্লিকাদির মৃত বুকের মধ্যে আছড়ে পড়ে কেঁদে উঠলেন চীৎকার করে।

জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগলাম দৃশ্যটা।

কল্যাণী কাঁদছে, বলছে, "বেশ মানুষ, বেশ মানুষ, বেশ মানুষ। আর আমি থাকব না মল্লিকাদি এ স্কুলে। আমাকে ছুটি দিয়ে দাও। ছুটি দাও।"

যেন চমক লাগল আমার। অমন করে কাঁদার মানে? যত-সব ন্যাকামি।

মনে-মনে ন্যাকামি বললাম বটে, কিন্তু লজ্জা পেয়ে গেলাম নিজের কাছেই। জানলা থেকে সরে এসে কাঠের সিঁড়িটা বেয়ে নীচে নেমে এলাম।

কাজের কথা

ফুল ফোটে; ঝরে; মাঝখানে পাবে
যতটুকু অবসর—
মন মৌচাকে মধু ভরে নাও
কিছু নাই তারপর।

—ম-বি

কল্যাণীর আনন্দময় — পরিবেশে —

জল—আর মাটি—

হাসিরাশি দেবী

ঘরের মধ্যে যেন লঙ্কাকাণ্ড সুরু হয়েছে। চৌকি আর মেঝে জুড়ে দাপাদাপি, চেঁচা-চেঁচি—আর এর মাঝে মাঝে ন্যাকা কান্না!

কান্নাটা বিক্ষোভের'

কিন্তু এসব উত্তরেও এর বান্ন কানে আসছে ওদের মায়ের গলার আওয়াজে। সেটা শাসনের হুমকি

এ পর্ব সুরু হয়েছে রাত ভোর হতেই; আর এখন তো প্রায় আটটা। সামনের ছাদের কার্ণিশ থেকে রোদটা নামছে গড়িয়ে গড়িয়ে; আর নিচের ঘরের বারান্দায় ব'সে কাপের চাটুকু নিঃশব্দে শেষ ক'রছে নরেন্দ্র।

বারান্দার পাশেই সিঁড়ি। দোতলাবাসীদের যাতায়াতের পথ।—

ওদিকে নজর পড়তেই দেখা গেল ওপোরের ভাড়াটে অনিমেষ নামছে।

দুই হাতের মুঠোয় ওর পাৎলুনের দুটো দিক্ গোটান,—যাতে সিঁড়ির জল-কাদা—কি আর কিছু না লাগে।

নিচে নামবার পথে নরেন্দুর দিকে নজর পড়তেই ব'ললে—

: আজ এখনও কাজে যাননি?—"

: কাজ! কাজ কোথায়?—"

নরেন্দু হাসবার চেষ্টা ক'রলে। এবড়ো-খেবড়ো দাঁতের ফাঁকে চিবিয়ে চিবিয়ে ব'ললে--

: ও পাপ তো মিটেছে তিন-চার মাস আগেই; মানে, ছাটাইয়ের দলে পড়েছি। আর, তাইতো সেদিন তোমায় ব'লছিলাম, যে ভাই—! তোমরা তো দেশের কত ভাবনাই ভাবো, কত উবগারও কর মানুষের। তা—আমার জন্যে যদি একটু—মানে—

ওর কথার টোনটা এবার যেন বুকের কোন্ অতল থেকে বার হ'য়ে এল—প্রার্থনার সুরে—

: মানে—এতবড় সংসার, আর এইসব কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে—" কথার শেষের দিকটায় গলার আওয়াজ ডুবে গেল একটা খক্‌খকে কাশিতে॥ রোগা দেহটা নুয়ে এল' সামনের দিকে, তারপর বুকের বাঁদিকটা চেপে ধ'রে কাশতে লাগল—

—খক—খক্......

কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ।

কোলের মেয়েটাকে কাঁকালে তুলে বাইরে এসে দাঁড়াল বাসন্তী।

বড় মেয়ে মিনিট—পুতুল সাজাচ্ছে এখনও; আর ছেলে—খোকন কি একটা জিনিস ভেঙে আবার নতুন ক'রে তৈরীতে ব্যস্ত।—

নরেন্দু বসেছিল আবার। এখন—পেছনের মানুষগুলোর অস্তিত্ব অনুভব ক'রেই যেন অস্বস্তিতে উঠে দাঁড়াল। কাঁধের ওপোর জামাটাকে তুলে নিতেই বাসন্তী প্রশ্ন করলে—

: কোথায় যাওয়া হ'চ্ছে?—"

: কোথায় আর,—"যমালয়ে।"

মুখ না ফিরিয়েও জবাবটা দিলে নরেন্দু, তারপর যেন একটু তাড়াতাড়িই পার হ'তে চাইল' সামনের প্যাসেজটা। যাতে চোখের সামনে কিছু না পড়ে।

কিন্তু তাও যেন হবার নয়, তাই তখনি কানে এল বাসন্তীর সেই ঝাঁঝাল গলার আওয়াজ—

: সংসারটা কা আমারই, নয়?—"

নরেন্দু মুখ ফেরাল' যেন চাবুক খেয়ে—

: কেন? কে ব'লেছে সেকথা? দোকান—বাজার কণ্ট্রোল এসব তোমার কেন আপনজন ক'রে দেয়,—শুনি?—মানে, তোমার কোন—হ'য়ে......?...

যে কথাটা ব'লতে গিয়েও ও থেমে গেল, সেই কথাটাকেই যেন টেনে নিয়ে ছুড়ে মারতে চাইল বাসন্তী—

: কি,—থামলে কেন?—কি ব'লতে চাও—তাই ব'লেই ফেলনা, শুনি! যা যা বরাতে আছে,—তা ঘটে যাক্ তোমার হাতেই। অন্য লোকের দরকার কি?—"

এবার বোধহয় কান্না এল।

চোখের ওপোর আঁচল চেপে—ও ঠোঁটটাকে কামড়ে ধ'রলে নিজের।

বাড়িটা দোতলা; কিন্তু প্রায় প্রতিতলেই এক-একজন ভাড়াটে। এক-একটা আলাদা সংসার। এর মধ্যে পাশের ঘরের বৌটি,—নাম ওর যাই থাক,—সেজ'বৌ ব'লেই ডাকে সকলে—সেই সেজ'বৌ এগিয়ে এল' বেলা বাড়তেই। ব'ললে—

: রান্না চড়ালেনা দিদি?—'

: রান্না? ও—'

দরোজায় ঠেস দিয়ে ব'সে এতক্ষণ যে সময়টা কাটাচ্ছিল বাসন্তী, তার মাঝখানে ছেদ প'ড়ল যেন। ব'ললে—

: এইবার চড়াব।

: তবে, উনুনে আঁচ দাওনি যে?

: দিলেই তো ধ'রে যাবে। ভাবছি, এত সকাল সকাল আঁচ ধরিয়েই বা কি করবো—'

তা-ই:—

যেন জোর ক'রে ঠোঁটের ওপোর হাসিটুকু টেনে আনল' বাসন্তী; তারপর কাচের চুড়িপরা হাতখানার ওপোর আলতোভাবে কোলে ঘুমান মেয়েটাকে তুলে নিয়ে উঠে গেল শুইয়ে দিতে। শুইয়ে দিয়ে বাইরে এল' আবার তখনি। ডাকলে—

: খোকন? এই—

হাতের কাজ ফেলে খোকন উঠে এল। ওর দিকে তাকিয়ে বাসন্তী ব'ললে—

: ঐ যাঃ! বাজারের পয়সাই চেয়ে নেওয়া হয়নি তোর বাপের কাছ থেকে। তুই এক কাজ কর বরঞ্চ—

সেজ'বৌ তখনও নিজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে এ বারান্দার দিকে তাকিয়ে আছে কৌতূহলী দৃষ্টিতে। ঐদিকে তাকিয়েই বাসন্তী যেন ওকে শুনিয়ে ব'ললে—

: দৌড়ে যা। এই গলির মোড়ে যে লাল বাড়িখানা আছে, ঐখানেই গিয়েছে সে মানুষ। মানে,—তাসের আড্ডা কি-না। ওবাড়ির বাবুর আবার নাকি আমাদের এঁকে না[illegible]লা খেলাই জমে না। তাইতো ঘরে কেউ মরুক আর বাঁচুক ওখানে ও'র যাওয়া চাই-ই। তাই গিয়েছে। তুই যা দিকিন ওখানে, ছুটে যা। ব'ল্‌গে যা—বাজারের পয়সা দাও।"

খোকন ওর ধুলিধূসর আর ঘামাচিতে

ভরা পিঠটাকে দেওয়ালের গায়ে একবার ঘসে নিলে। বল্লে—

: কিন্তু যদি বকে? যদি বলে কে এখানে আসতে ব'লেছে তোকে?—

: ব'ক্‌বেনা, যা। আর কিছু ব'ললে—ব'লবি, মা পাঠিয়েছে।

খোকন, মায়ের হুকুম নিয়ে অদৃশ্য হ'তেই সেজবৌ হেসে উঠল'—

: খোকার বাবার সঙ্গে মতান্তর বাধিয়েছ বুঝি? তোমার বাপু ঐ এক রোগ। ঐ জন্যেই অমন সোনার দেহ পর্যন্ত কালি হ'য়েছে।—

সোনার দেহ!

কথাটা কানে যেতেই একধার যেন চ'মকে উঠল' বাসন্তী। অনেকদিন আগে ও কথাটা হামেশাই কানে আসত বটে, এমনকি নরেন্দুর মুখেও নিজের রূপের প্রশংসা শুনে লজ্জা পেয়েছে। কিন্তু আজ?......

নিজের অজ্ঞাতেই যেন ভাঙা আয়নাটার দিকে তাকাল ও। —মনে হ'ল—সেজবৌ মিথ্যে বলেনি। রূপ আজ আর তার দেহে নেই।—কেবল আছে ওর একটা ফেলে যাওয়া ছাপ। সে ছাপ ওর মুখে চোখে—আর এই কঙ্কালসার দেহটা ঘিরে যেন ঠাট্টার হাসি হাসছে।—

আয়নার সামনে থেকে স'রে দাঁড়াল' বাসন্তী—।

রোজকার মত খোকনের আনা আনাজ আর কুচোচিংড়ির ঝোলমাখা ভাতগুলো নির্বাকে গিলে নরেন্দু এসে শুলে' চৌকির একপাশে।

দেখতে দেখতে সুরু হ'ল ওর নাকের ডাক। মেঝেয় শুয়ে বাসন্তীও যেন এইটুকুরই প্রতীক্ষায় ছিল এতক্ষণ। এইবার সে উঠল'। শাড়ি সেমিজ ব'দলে, টেনে নিলে বহুকাল আগে তুলে রাখা চটিজোড়া। ওটা পায়ে দিয়ে বার হ'তে গিয়েও থমকে দাঁড়াল একটু। খোকনের দিকে তাকিয়ে ব'ললে—

"চৌকির নিচে বাটি ঢাকা আছে। খুকী উঠলে একটু খাইয়ে দিস্—বুঝলি; আর ঐ জামবাটিতে আছে আমার পাতের ভাত-তরকারী। খিদে পেলে খেও' দু'ভাইবোনে। ঝগড়া ক'রোনা যেন।"

পায়ের শব্দ না করেই ও বার হ'য়ে প'ড়ল ঘর ছেড়ে,—তারপর পার হ'য়ে গেল প্যাসেজটা।

এরপরেই চোখ খুললে নরেন্দু। প্রশ্ন ক'রলে—

: হ্যাঁই!—তোর মা কোথায় গেল রে?—

খোকন ব'ললে—

: "জানিনে!"

: জানিনে!—

মুখ ভেংচি কাটলে নরেন্দু।

: এতবড় ছেলে হ'ল,—তবু যদি ঘটে কিছু বুদ্ধি থাকে। কোথায় কখন যাচ্ছে মানুষ,—সেটা বুদ্ধি ক'রে জেনে নিতে হয়তো!—

জবাব দিলেনা খোকন, কেবল বড় বড় চোখ দুটো মেলে তাকিয়ে রইল বাপের দিকে।—

শোওয়া ছেড়ে এবার উঠে ব'সলে নরেন্দু। ছেলেকে কাছে ডেকে নিজের হাতের তালুতে স্পর্শ ক'রলে ওর পিঠখানা—

: ইস্! বড্ড ঘামাচি বেরিয়েছে রে!—

চাকরি ছাড়বার পরে বোধহয় এই প্রথম সস্নেহ স্পর্শ ওর। খোকনের চোখ দুটো এ স্পর্শে ছল্ ছল্ ক'রে উঠল। নির্বাকে ওর মাথায়, পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে নরেন্দু ব'ললে—

: বড্ড কষ্টেই দিন যাচ্ছে, না—রে?

—খোকন নির্বাক।

মা'র যাবার সময়কার শুকনো ঠোঁট দুটো বোধহয় মনে প'ড়ছিল' ওর।

নরেন্দু ব'ললে—

: জানিস,—চেষ্টা ক'রছি বৈকি,—একটা না একটা কাজ পাবই। আর তার জন্যে খুব চেষ্টা ক'রছি। কাজটা পেলেই কষ্ট যাবে,—দেখিস্। আচ্ছা—হ্যাঁ—

বিড়ি একটা ধরাতে গিয়ে মনে প'ড়ল'—ইস্কুলের কথা কি সেদিন ব'লছিলি যেন! কি?—

ভয়ে ভয়ে খোকন ব'ললে—

: হ্যাঁ, ঐ মাইনের কথা।—

: মাইনের কথাটা কি, তাও খুলে ব'লবি তো!—

: ঐ যে, মাইনে দিতে পারিনি ব'লে নাম কেটে দেবে ব'লছে,—

: ই—স্!—

হাতখানা সরিয়ে নিয়ে নরেন্দু ব'ললে—

: মাইরি আর কি, নাম কেটে দিলেই হ'ল! দু'মাস নয় তিন মাস মাইনে দিতে পারিনি। পরে দেব, সুদ সমেত মিটিয়ে দেব—। তার জন্যে নাম কেটে দেবে?—দিকনা দেখি একবার আমিও যদি উপরওলার কাছে রিপোর্ট না করি তখন—

হাতের বিড়িটা ফেলে ও উঠে দাঁড়াল'—।

প্রায় সন্ধ্যের মুখোমুখি ফিরল বাসন্তী। সামনেই দেখা সেজ'বৌয়ের সঙ্গে। মুচকি-হাসিতে প্রশ্নটা যেন ছুঁড়ে মারলে ও।

: কোথায় গিয়েছিলে গো দিদি?—

কানের ভেতরটা জ্বালা ক'রে উঠল যেন! তবু একটু হেসে ব'ললে—

—: কোথায় আর,—এই এখেনেই,—মানে—কাছাকাছি। অনেকদিন তো কারো সঙ্গে দেখা-শোনার নাম নেই!—বার হওয়াও যেন ঘুচে গেছে। তাই ভাবলাম,—সময় পেয়েছি যখন, তখন দেখে আসি' একবার'।—

মতামতের অপেক্ষা না রেখেই বারান্দা পার হ'য়ে ঘরে ঢুকল। দেখলে,—এর মধ্যে হ্যারিকেনটা জ্বালা হ'য়েছে, আর ওরই আলোয় খেলছে মিনি আর খুকী। ইচ্ছে হ'লো—ওদের জিজ্ঞাসা করে, খুকী কাঁদেনি তো!—কিন্তু, তার আগেই চৌকির ওদিক থেকে নরেন্দুর গলা শোনা গেল—

: কোথায় যাওয়া হ'য়েছিল?

এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল বাসন্তী, তারপর বেশ জোরের সঙ্গেই জবাব দিল—

—: কাজের চেষ্টায়,—মানে চাকরির খোঁজে।

: কাজ? চাকরি?—

নরেন্দু উঠে এগিয়ে এল। যেন, সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ঐ বাসন্তীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত সবকিছুই খুঁটিয়ে দেখছে ও—। হ্যাঁ, ভাল ক'রেই দেখছে।

একপাশে জ্বলছে হ্যারিকেনের আলো আর সেই আলোটার বিপরীত দিকে বীভৎস দেখাচ্ছে ওর সমস্ত মুখখানা। তা দেখাক্।

কপালের শিরা উপশিরাগুলো ফুলে উঠেছে উত্তেজনায়। তা উঠুক। ফেটে যদি রক্ত ছুটতে চায়,—তা-ও ছুটুক। তবু এ-ব্যাপারের একটা ফয়শালা করবে সে,—এবং তা আজই।

ব'ললে—পেয়েছ? দিয়েছে কেউ?—কিন্তু কিসের চাকরি? রাগে, বোধহয় দুঃখেও ওর কেঁপে ওঠা ঠোঁট দুটোর দিকে তাকিয়ে বাসন্তী ব'ললে—

পাইনি, কিন্তু খুঁজছি। আর কিসের চাকরি—খুঁজছি শুনবে? রান্নার, ঘরের কাজের, নয় ছেলেপুলে রাখার।

: বাহবা কি বাহবা :

ভেংচি কেটে, আরও বিশ্রী, আরও বীভৎস ক'রে তুললে নরেন্দু নিজের মুখখানা—

: এমন না হ'লে আর গৃহলক্ষ্মী! ঘরে যার ছেলেপুলে কেঁদেকেটে খুন হ'চ্ছে, সে যাচ্ছে পরের সংসার সামলাতে? চমৎকার!—

বাসন্তী আজ মনের রাগটাকে বাধা মানাতে পারছিল না যেন। ব'লে ব'সল—

: চমৎকার একবার নয়, একশোবার। আর এ চমৎকারের কথা তুমি বুঝবে না, বুঝবে, যে মেয়েকে বাইরের ভদ্রতা বাঁচিয়েও পেটের খোরাক জোটাতে হয় ঠোঙা বানিয়ে, সুপুরী কেটে, আর সেলাই ক'রে।"—

: কিন্তু, এত ক'রবার তো দরকার ছিল না—মুখখানাকে ঝুঁকিয়ে নিয়ে এল' নরেন্দু—

: তোমার রূপ আছে, বয়েসও যায়নি, এত কষ্টের দরকারটা কি, শুনি?—

বাসন্তী একমুহূর্তের মত যেন পাথর হ'য়ে গেল, তারপরে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল'—

: তাই ক'রবো, বুঝলে—দরকার হ'লে তাই ক'রবো; তবু চোখের সামনে ছেলেমেয়ে ক'টাকে না খাইয়ে মারতে পারবো না,—কক্ষনো নয়।

জবাব এল' না নরেন্দুর মুখে।

বাসন্তী তখনও গজরাচ্ছে—

—: লজ্জা করে না, বাপ হ'য়ে যে ছেলে-মেয়েকে দুটো ভাত জোটাতে পারে না পেটভরাতে, গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছে করে না তার?—

নরেন্দু যেন মিইয়ে গেল। এই মুহূর্তে মনে হ'ল—জেনে হোক্, আর না জেনে হোক্, সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই যে মেয়েটাকে সে আঘাত ক'রেছে, তার বুকের মধ্যেকার ঘুমানো গোখুরোটা জেগে উঠেছে সে আঘাতে, তাই ফণা ধরে উঁচু হ'য়ে উঠছে ক্রমশঃ! হয়তো এখনি ছোবল মারবে।—

আবার নিজের জামাটা তুলে নিয়ে ও বার হ'য়ে গেল ঘর ছেড়ে।—

অনেক রাত্তে পাড়া যখন প্রায় নিশুতি হ'য়ে এসেছে, তখন খোকন এসে ঢুকল' সেই লাল বাড়িটায়। জানতে চাইল—

বাবা এসেছে? আমার বাবা?—

ব'ইরের ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। তাস খেলারও সেটা বোধহয় শেষপর্ব, তাই কারও কানেই গেলনা ও কথাটা।

উত্তর না নিয়েই ফিরে এল খোকন। কত কি ভাবতে ভাবতে চৌকির একপাশে শুয়ে ঘুমিয়েও প'ড়ল সে, কিন্তু ঘুমোতে পারল না বাসন্তী।

শরতের আবির্ভাবে উৎসবের
ঘণ্টা বেজে উঠেছে
মেঘগুলি সরে গেছে—আকাশ পরিষ্কার। উৎসবের ঘণ্টা বেজে উঠেছে।
আনন্দের ঋতু শরৎকে আগমনী জানাচ্ছে। আনন্দ এবং সুখ বয়ে এনে শরৎ এল আপনাকে আমোদিত করতে।
বাদল হোক, আর বসন্ত হোক, শীত হোক, গ্রীষ্ম হোক, সারাবছরই আপনার চুলের জন্য চাই একই প্রকারের যত্ন। সারা বছর ধরে আপনার চুলকে অপরূপ কালো এবং সুস্থ রাখবার যত্ন। চুল কালো করবার জন্যে সর্বত্র প্রশংসিত "লোমা" এই যত্ন নিতে সক্ষম। আর মনে রাখবেন "লোমা" শুধু শাদা চুলকেই কালো করে না, চুলের শাদা হয়ে ওঠাও রোধ করে। যে দিক থেকেই দেখুন না কেন, তুলনায় এটা আরও ভালো।
লোমা
একমাত্র পরিবেশক : এম্ এম্ খাম্বাটাওয়ালা, আমেদাবাদ—১
এজেণ্ট : সি, নরোত্তম এণ্ড কোং, বম্বে—২

সমস্ত রাতটা কেটে গেল ওর, খোলা দরোজায় একা ব'সে।

পরের দিন সকালে ফিরল' নবেন্দু।

ঘামেভেজা জামাটা খুলে ফেললে পায়ের কাছে। তার সঙ্গে একখানা সাবান, আর একটু নীল—।

বাসন্তী তখন গেছে নিচের কলতলায় কাপড় কাচতে।—

নবেন্দু ডাক দিলে—

: খোকা। এই—সামনে আসতেই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল'—

: বলি, কানে কি ডাকটাও শুনতে পাও না নাকি? না—এসব শিক্ষা পাচ্ছ মায়ের কাছ থেকে?

মাথা আর কপাল ঢাকা রুক্ষ চুলের মধ্যে থেকে চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠল' খোকনের। সেই চোখের দিকে তাকিয়েই বোধহয় মনটা নরম হ'য়ে এল নবেন্দুর। ব'ললে—

: সামনের দোকানীটাকে শুনিয়ে দিয়ে আসতে পারবি দু'কথা?—

একটা পাঁচ টাকার নোট ওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ব'ললে—এইটে' দিয়ে ব'লবি যে, ধারে খায় ব'লে কি পাওনাগণ্ডা বাকি রাখে নবেন্দু মিত্তির? যে অমন চড় কথায় তাগাদা পাঠিয়েছ? এই নাও—বাকি যা থাকে, পরে মিটিয়ে দেওয়া যাবে। পারবি তো ব'লতে?—

"পারবো।"

নোটটা কুড়িয়ে খোকন ঘরের বার হ'তে না হ'তেই দেখা দিল বাসন্তী।

ভিজে কাপড়ে সারা দেহটা জড়িয়ে—হাতের জলভরা বালতিটা নামিয়ে রাখলে ঘরেরই একপাশে; তারপর শুকনো শাড়ি আর সেমিজটা তুলে নিয়ে বার হ'য়ে গেল বারান্দায়।

নবেন্দু ওদিকে ফিরেও তাকাল না। কিন্তু এবার ডাক দিলে মেয়েকে—

মিনি!

মিনি এগিয়ে আসতে ব'ললে—

: আজ আর চা-ই হয়নি বুঝি সকালে? কিন্তু, চা না হ'লে আমার চ'লবে না,—ব'লে দে। আর ব'লে দে, সারারাত ঠাণ্ডায় কাটিয়ে এখন সমস্ত মাথাটা দপ্‌দপ্‌ করছে। খুব কড়া ক'রে এক কাপ চা দিতে বল্—এখুনি। দুধ না থাকে, র'-চা দিলেও হবে। বোঝেছিস?

মাথাটা হেলিয়ে মিনি বার হ'য়ে গেল বারান্দায়।—

এবার বাকি রইল খুকীটা।

ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে খেলা ক'রছে ও: কখনও হাসছে,—কখনও চাইছে কথা ব'লতে।

নবেন্দু আর একটু ভাল করে তাকালে ওর দিকে। ইচ্ছে ছিল আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে; কিন্তু তা হল না।

কি একটা কাজে বাসন্তী এসে ঘরে ঢুকল, —আর চ'মকে মুখ ফিরিয়ে নিলে নবেন্দু।

'বৌদি!'—

কে ডাকে?—

গলার আওয়াজটা চেনা হ'লেও মুখ বাড়ালে বাসন্তী। দেখলে, ওপোরের ভাড়াটে, ঐ ছেলেটিই বটে! নাম—যার অনিমেষ।

হ্যাঁ, আজ সেই ডাকছে বটে—বারান্দায় দাঁড়িয়ে। এগিয়ে এল বাসন্তী—

: কিছু ব'লবেন আমাকে?—

: হ্যাঁ।

ছেলেটি দুই একবার ঢোক গিল'ল,—একটু ইতস্ততঃও করলে বোধ হয়। তারপর বললে—

: একটা কাজের কথা ব'লছিলাম। মানে, কাজটা অবশ্য ভালই,—সমাজ সেবার। আর তার জন্যেই কয়েকজন 'ওয়ার্কার' চায় আমাদের সমিতি। কিছু হাত খরচ দেবে। তাই আমি আপনার নামটা লিখিয়ে দিয়েছি—।

আনন্দ আর কৃতজ্ঞতায় বাসন্তীর চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠল। অনিমেষ ব'ললে—

: কাজটা অবশ্য বিশেষ কিছু নয়। মানে এ পাড়া ও-পাড়ার বস্তিতে বস্তিতে ঘোরা, আর ওদের ছেলেমেয়েদের একটু লেখাপড়া শেখান। পারবেন না?

: পারবো, খুব পারবো—।

: কিন্তু, নবেন্দুদা যদি—

অনিমেষ যে আশঙ্কাটা কথায় প্রকাশ করতে চাইল,—বাসন্তী তাকে তার আগেই থামিয়ে দিলে। ব'ললে—

: উনি তো এখন ঘরে নেই! আর ঘরে এলেও যে ওঁর সম্মতি নিয়েই আমায় বার হ'তে হবে, তারও কোনও লেখাপড়া নেই। আমার সুবিধা অসুবিধা আমি যত বুঝবো, তত উনিও বুঝবেন না।

: বেশ।—

নিশ্চিন্ত মনেই অনিমেষ এবার ব'ললে—

: তাহ'লে, কাল থেকেই কাজটায় হাত দিন, কি বলুন?

মাথাটাকে নেড়ে সম্মতি জানালে বাসন্তী, আর তার সঙ্গে ভেবে রাখলে পরের দিনের কাজটা।

কতক্ষণই বা!— খোকন স্কুলে গেলেও, মিনির জিম্মায় খুকীকে রেখে যাওয়া চলে; আর তাই যাবেও। কারণ খুকী এখন একেবারেই কচি নেই। খেলতে পারে,—হামাটেনে চ'লতে পারে—খানিকটা পর্যন্ত। আর মিনি!—সে বেশ খেলা দিতে শিখেছে।

সেই কালকের দিনটা এসে প'ড়ল রাত পোহাতেই। যাবার জন্যে সমস্ত গুছিয়ে নিলে বাসন্তী। কেবল জানালে না নবেন্দুকে।—

খোকন গেল স্কুলে; আর নবেন্দুও খাওয়া-দাওয়া সেরে বার হ'ল কোথায়।

বোধ হয় কাজের খোঁজেই। তা যাক। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে চুলটাকে ঠিক ক'রে বাঁধলে বাসন্তী;—পাটভাঙা শাড়িটাকেও ঘুরিয়ে পরলে, আগের মত মুখের ওপোর পাউডারের পাফটা বুলোতে বুলোতে মিনিকে ব'ললে—

: সাবধানে থাকবি, দরোজায় খিল দিয়ে, বুঝলি?

রাত্রি তখনও ক'লকাতার ওপোর নামেনি, কেবল সহরের নিচের তলার কায়েমী অন্ধকার আর একটু ঘন হ'য়েছে মাত্র।—

বাসার দরোজায় এসে থমকে দাঁড়াল বাসন্তী।

চারিদিকে ভেসে বেড়াচ্ছে একটা পোড়া দুর্গন্ধ। কিন্তু দরোজায় য়্যাম্বুলেন্স কেন? আর তারই ঘরের দরোজায় এত ভিড়ই-বা কি জন্যে?—

বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে উঠল। কিন্তু কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই খবরটা নিয়ে এগিয়ে এল সেজবৌ—

: তুমি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে?—

শুকনো জিভটাকে চেটে বাসন্তী ব'ললে—

: কেন—?

: কেন আর?

সেজবৌ কেঁদে ফেললে—

: কচি মেয়ে দুটোকে ঘরে রেখে বাইরে যায় কেউ?—

দুই হাতে ভিড় সরিয়ে বাসন্তী ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর। একবার মাত্র তাকিয়ে দেখলে—ওর আধপোড়া মেয়ে দুটোকে কারা যেন কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, আর ঘরময় ছড়ানো পোড়া বিছানা কাপড়ের ছাইয়ের ওপোর উপুড় হ'য়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে নবেন্দু।

—দিন তবু চ'লে গেল, রাতও শেষ হ'য়ে গেল দেখতে দেখতে—।

রোদের ছোঁয়া যেন সমস্ত ঝিমুনো ভাবটাকে সরিয়ে দিলে আবার। আবার নবেন্দু উঠে বসলে চৌকির ওপোর। দেখলে খোকন তখনও পাশে শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

কিন্তু, বাসন্তী ঘরে নাই।

নবেন্দু লাফিয়ে নামল চৌকি থেকে—; কিন্তু ঘরের বাইরে এসেই থমকে দাঁড়াল—' দেখলে—

কয়লার উনুনে ভাত বসিয়ে বাসন্তী চুপ করে বসে আছে। দৃষ্টি ওর উনুনের দিকে নয়, ভাতের দিকেও নয়, —যে ধোঁয়াগুলো উড়ে যাচ্ছে, তার দিকে—।

নবেন্দু ডাকলে—

: বাসন্তি!'

ফিরে তাকাল ও। বোধহয় হাসতে চেষ্টাও ক'রলে একটু। তারপর ভিজে চুলগুলো কাঁধের ওপোর থেকে সরিয়ে ব'ললে—

: সব পরিষ্কার করে ফেলেছি। স্নান সেরে ভাত চড়িয়েছি আবার। খোকনকে নিয়ে তুমিও স্নান সেরে এসো, কাল যে কেউ কিছু খাওনি!—

কি একটা বলতে গিয়ে ব'লতে পারলে না নবেন্দু। শুধু উচ্চারণ ক'রলে—

: আর, আর তুমি?—

: আমিও খাব; ভাবনা কি?

নবেন্দু তাকিয়ে রইল ওর দিকে, শুনলে,—আজকের এ বসন্তী যেন কালকের কেউ নয়,—তাই আস্তে আস্তে উচ্চারণ করছে—

: যা গেছে, তা যাক; কিন্তু যা আছে, তাকে আর আমি হারাতে চাইনে—।

নবেন্দু দেখলে —বাসন্তীর মুখ অবিকৃত; কিন্তু চোখের জল ফোঁটার পর ফোঁটা হ'য়ে নামছে বুকের ওপোর,—আর তারই সামনে কাঁপছে—ভাতের হাঁড়ির সেই ধোঁয়াটা।

—————

পিপাসিত

অন্তহীন তৃষ্ণা লয়ে, বালুচরে খেয়ালের খেলা,
সমুদ্রের লোনা জলে, ভরে নাকো তৃষ্ণার পেয়ালা।

—ম-ব

দেহ এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

এ জীবনের হাটে সবাই কারবারী। কেউ আদার, কেউ জাহাজের, কেউ কোন ব্যাপারে নেই বললে জলজ্যান্ত মিথ্যা বলা হবে। আপনি, আমি আর সবাই নিজের নিজের দেহটি নিয়ে এক-একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী খুলে বসেছি। যেখান দিয়ে অহরহ কত কি তৈরী হচ্ছে, ভসভস করে কখনও রাগ বার হচ্ছে, কখনও খোস মেজাজে বহাল তবিয়তে শুধু সুখ উথলে পড়ছে, কখনও নিদারুণ ব্যথার ভারে দুঃখ-অবসাদ আসছে। আবার কখনও প্রেম বলে দুনিয়ার যে এক অসার পদার্থ আছে তাও তৈরী হয়ে বার হচ্ছে। এ রকম নরম-গরম অনুভূতির নানান বর্ণাঢ্য উপকরণ এ রাসায়নিক কোম্পানী দিন-রাত তৈরী করে চলেছে। এর জুড়ি আর ভূ-ভারতে নেই। এ পৃথিবীর ট্যারা-বাঁকা সোজা তাবৎ চিন্তা রাশি, অর্থ-অনর্থ সব কটি আসল-নকল বৃত্তান্ত এ কোম্পানীর তৈরী ফলস্বরূপে ধরা যায়।

রক্ষে এই যে, এ কোম্পানী খুলতে কোন মূলধনের জন্যে হন্যে হয়ে যেতে হয় না। বাবা-মার পুণ্যের ফলে আমাদের দুর্লভ মানব জন্মটা পেলেই যথেষ্ট সে পাওয়ায় যে পায় তার হাত থাকে না যদিও। অবশ্য সব কোম্পানীর কাজ কারবার একেবারে এক নয়। কারুর পেটের ব্যথার কারবার, কারুর পিলে চমকানোর কারবার, কারুর কারণে-অকারণে বুকে ধড়ফড় করার, কারুর বাতের ব্যথা, কারুর কেবল খাই-খাই বাই।

আপাদমস্তক শরীরটাই আপনার কারখানা। আপনি যে পয়সারই হোন—আপনি মিল-ওনার। মালিকানা স্বয়ং আপনার। কিন্তু শরীরের মধ্যে তোলপাড় করে যে কারবার চলছে আপনার কথায় তার নড়চড় নেই। রোববার, সোমবার নেই, দিন-রাত্রি নেই, শীত-গ্রীষ্ম নেই, কোম্পানী আপনার খেয়ালে আপনি চলছে। আপনি আছেন এই পর্যন্ত। অবশ্য এ সব কোম্পানীতে সচরাচর স্ট্রাইক হয় না। একমাত্র যখন বল হরি, হরি বোল রব ওঠে তখন বুঝতে হবে কারোর কোম্পানীটা লাটে নয় একেবারে খাটে উঠে চললো। কোথায়? গঙ্গায়।

এমন প্রকৃতি দত্ত রাসায়নিক কারখানার কাছে সিন্ধ্রির সার তৈরীর কারখানাও হার মানবে। সিন্ধ্রির কারখানায় সার ও অসার দুই-ই সমান স্কেলে তৈরী হয়। তনু মধ্যে হাড়ের বুনিয়াদের উপর মেদ-মজ্জাকে ঢাকা দিয়ে আছে বাইরের চামড়ার আবরণ—যা চোখের শোভা বর্ধন করে। এ চলমান কোম্পানী—যার ক্ষিদে-তেষ্টা আছে, অনুভূতি আছে। শঙ্কিত হলে লোমকূপ থেকে লোমরা মাথা তুলে হাজিরা জানায়। ক্ষেপলে কোম্পানীর আর রক্ষে নেই—পাগলা কোম্পানী থেকে সাবধান। দরকার হলে কোম্পানী সেদিন ঢিলে চলে, খুব বেশী কিছু একটা অসুখ-বিসুখ হলে এখন স্ট্রেপটো, সালফার, ওরিয়ো, পেনিসিলিন কোম্পানীর মধ্যে জুড়ে দিতে হয়। মানুষের সজীব কল-কারখানা ভাল বোঝেন বিধান রায়। তাই কারু কল বিগড়ালে বিকলতা দূর করতে যান তাঁর কাছে।

আপনি মনে করলেন সকালে ঘুম ভেঙ্গে উঠে চোখ মেলে চাওয়ার মধ্যে দিয়ে বুঝি আপনার কোম্পানীর জেগে ওঠার সুরু। মোটেই না, সকাল, সন্ধ্যা চব্বিশ ঘণ্টা কোম্পানীতে ডে-সিফটে আর নাইট-সিফটে কাজ হচ্ছে। কখনও কোন মুহূর্তে বিরাম নেই। মুখের মধ্য দিয়ে খাবার গুঁজে দিয়েই আমরা নিশ্চিন্ত। সেই খাবার থেকে কারখানার কাজ। প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, ভিটামিন বেছে কারখানায় সার গ্রহণ আর অসার বর্জন হয়। একদিন পেটের একটু গোলমাল হলেই হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায় কোম্পানীর কাজের অসামান্যতা কোথায়। তা থেকে ইস্তফা দিলে পরিণামটা কি হয়!

সারাদিন কোম্পানীর মধ্যে হাওয়া পুরে দিচ্ছি। যার নাম নিঃশ্বাস নেওয়া। সেখানের কারখানার হাপরের কাজ হচ্ছে অক্সিজেন নেওয়া আর কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়া। ফলে রক্ত নির্মল হয়ে শরীরের দিকে দিকে পাঠিয়ে দেওয়া। প্রতি মুহূর্তে রক্তের লোহিত কণিকার সঙ্গে অক্সিজেন মিলিত হয়ে সৃষ্টি করছে অক্সি-হিমোগ্লোবিন। যা দেহের তন্তুতে তন্তুতে রসদ বহন করে নিয়ে যায়। লোহিত কণিকা মজ্জার মধ্যে তৈরী হয়ে থাকে। দৃষ্টির অগোচরে পাকস্থলীতে পেপসিন প্রোটিনকে পেপটোনে পরিণত করছে। রেণিন দুধকে ছানায়। হাইড্রো ক্লোরিক অ্যাসিড অজস্র ব্যাকটিরিয়াকে বিনাশ করছে।

কারখানার কর্ম-নৈপুণ্য যে কত তা বলে বোঝান সহজ নয়। হৃদযন্ত্রটি তো একটি পাম্প-বিশেষ। দিন-রাত চলছে। মস্তক তো নয়, ভাবনা চিন্তার টেলিফোন এক্সচেঞ্জ। চোখে দেখা তো নয়, ক্যামেরায় ছবি তোলা। কানে শোনা তো নয়, যেন পিয়ানোর সংকেত জ্ঞাপন করা। চলাফেরা, হাঁটা যেন লাগামে বাঁধা ঘোড়-সওয়ারের দিগ্বিজয়।

দিন-রাত দেহের রাসায়নিক কারখানাটিতে বিভিন্ন রকমের রসায়নের কত যে রূপান্তর ঘটে চলেছে তা কহতব্য নয়। শরীর কারখানার মূল কল-কব্জা হিসাবে কতগুলি গ্রন্থিহীন প্ল্যাণ্ডের কার্যক্ষমতা বিচিত্র। এই সব গ্রন্থি-গুলি থেকে যাবতীয় ক্ষরণ ঘটে—যা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। রোগা হওয়া, মোটা হওয়া, লম্বা বা বেঁটে হওয়া, মেজাজ শরীফ বা খিট-খিটে হওয়া, যৌন ব্যাপারে পারঙ্গম হওয়া বা না হওয়া—সব এদের ওপর নির্ভর করে। এই সব গ্রন্থি শূন্য প্ল্যাণ্ডের মধ্যে পিটুইটারি, থাইরয়েড, প্যারা থাইরয়েড, এডরেনাল, প্যানক্রিয়াসের মধ্যকার আইলেট অফ ল্যাঙ্গারহ্যান, ডিম্বাশয় ও শুক্রাশয় উল্লেখযোগ্য। থাইরয়েড শ্বাসনালীর উপরে অবস্থিত। সেখান থেকে থাইরক্সিন বের হয়। থাইরয়েডের কাজ শরীরের সাধারণ কর্মদক্ষতা বজায় রাখা, দেহের বাড় ও যৌন গ্রন্থির পরিস্ফুটন। থাইরয়েডের পেছনে প্যারা থাইরয়েড নামে যে গ্রন্থিটি আছে তার কাজ রক্তের মধ্যে ক্যালসিয়ামের ভাগ নিয়ন্ত্রণ করা। বৃক্কের উপরে এডরিনাল গ্রন্থি আছে। এডরিনাল শরীরের মধ্যে গ্লাইকোজেনকে গ্লুকোজে সহজে রূপান্তরিত করে। রাগে বা ভয়ে স্বল্প হলে তৎক্ষণাৎ রক্তে এডরিনাল থেকে নিঃসৃত রস এসে হাজির হয়, যার ফলে পেশীর সংকোচন ঘটে। এডরিনাল থেকে জারক রস নিঃসৃত হওয়া বা না হওয়ায় নার্ভের যোগ আছে। প্যানক্রিয়াসের ভিতরে যে আইলেট অফ ল্যাংগারহ্যানস আছে তার কাজ হলো দেহের মধ্যকার কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ও শর্করা বিপাক ক্রিয়ার সহায়তা করা। কোন রোগ-জনিত অবস্থায় ইনসুলিন বেশী তৈরী হলে রক্তের শর্করা ভাগ কমে যায়। ডিম্বাশয় ও শুক্রাশয় দেহকে যৌন সচেতন করে তোলে। ডিম্বাণু ও শুক্রাণু তৈরী করে ভবিষ্যৎ জীবনের ধারাকে অটুট রাখে। এনডোক্রিন প্ল্যাণ্ডের মধ্যে পিটুইটারী গ্রন্থি সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পিটুইটারীর ক্ষমতাও অত্যধিক। অন্যান্য গ্রন্থিগুলির উপর এর হুঁসিয়ারী থাকে। গ্রীক ভাষায় হর্মোণকে বলা হয় Hormao, সেই অর্থে I urge। এই সব প্ল্যাণ্ডের গোলমালে কোম্পানী জাহান্নমে চলে যায়।

এ পৃথিবীতে যত লোক তত কোম্পানী। ছেলে কোম্পানী বা মেয়ে কোম্পানীতে বেশী উৎসুক। তার মধ্যে সুন্দর মুখওয়ালা কোম্পানীদের সমাদর সর্বত্র। এমনিতে রাশিয়ান কোম্পানীরা আমেরিকান কোম্পানী-দের বরদাস্ত করতে পারে না। মারবো মারবো ভাব করে আছে। কিন্তু রাশিয়ান ছেলে কোম্পানী আমেরিকান মেয়ে কোম্পানীদের ব্যাপারে অত মারমুখী নয়। কেন নয় বলুন তো? ব্যাপারটা তা হলে খুলেই বলি। কোম্পানীর সর্বস্বত্বাধিকার যদিও আপনারই থাকে কিন্তু এমন একটা সময় আসে যখন নিজের কোম্পানী আর একজন নীলামে ডেকে নিয়ে মালিকানা দাখিল করে। এর নাম বেনামে বিক্রী হয়ে যাওয়া। ব্যানার্জি কোম্পানী নাম বদলে তখন মুখার্জি কোম্পানীতে বদলে যায়। ঘোষ কোম্পানী বদলে হয় বোস কোম্পানী। পরের কাছে দাসখৎ লিখে কোম্পানী দেওয়ার নাম তুমি আমার আমি তোমার হওয়া। বাবা কোম্পানী ছিল, মা কোম্পানী এলো—তারও পরে ছেলে কোম্পানীর আবির্ভাব।

বুড়ো হলে দেহ কোম্পানী ঠিক চলে না। প্রায় কোম্পানী বিকল হয়। রোগে ভুগে ভুগে মনে হয় কোম্পানী এবার উঠবো উঠবো করে। তখন ত্রাহি ত্রাহি মধুসূদন ডাক ওঠে। হাঁপানী আসে। পেটে পুরানো বয়লার, চোখে পুরানো ক্যামেরা, কানে পুরানো পিয়ানো, হৃদয়ে পুরানো পাম্প। সবই তখন আর তেমন কাজ

রনাথ

মঞ্জুলকান্তি ঘোষ
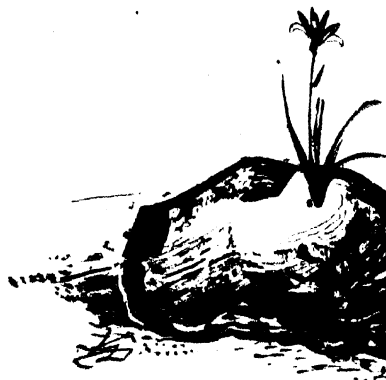
দেবাঃ ন জানন্তি

। সুমথনাথ ঘোষ।

সদানন্দ দা এই বয়সে বিয়ে করছেন শুনে এতটুকু দুঃখিত হইনি বরং সত্যি কথা বলতে কি খুশীই হয়েছিলুম মনে মনে। যাক্, এত দিনে তাহলে সুবুদ্ধি হয়েছে। 'বেটার লেট্ দ্যান নেভার!' হোক্ না সাতান্ন! এর পরে সাতষট্টি এবং তারো পরে সাতাত্তোর ত আছে, তখন কে দেখবে? ওষুধের গেলাসটা মুখে ধরতে গেলেও ত একজন মানুষের দরকার! অথচ কে না জানে, ইচ্ছা করলে এই সদানন্দ দা এক দিন একটা কেন দশটা বিয়ে করতে পারতেন। কেবল বাপের সম্পত্তির জোরে নয়, রূপ, যৌবন এবং সব চেয়ে বড় কথা 'ব্রেণটা' ছিল তার অসাধারণ। আমাদের কলেজের সে ছিল একটা রত্ন বিশেষ। আই-সি-এস কিম্বা বি-সি-এস হবার মত প্রতিভাশালী ছাত্র। কিন্তু কোথা দিয়ে যেন সব ওলট পালট হয়ে গেল। বি এ পরীক্ষা না দিয়ে গান্ধীজীর আহ্বানে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো দেশের কাজে। তার পর জেল, হাজতবাস, সত্যাগ্রহ ও নানা আন্দোলন করতে করতে সংসার ধর্ম বিবাহের কথা কেবল ভুলে গেল না, নিজেকে এ সব থেকে বিচ্ছিন্ন করে শৃঙ্খলিত জন্মভূমির দুঃখ ঘোচাবার জন্যে তপস্বীর মত সাধনায় হলো নিমগ্ন! গুরুর মত তাকে আমি ভক্তি করতুম। অমন দেবচরিত্র মানুষ এ যুগে সত্যি বিরল। তাই সদানন্দ দার নামটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে এখনো চোখের সামনে তার সেই চেহারাটা ভেসে ওঠে। খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবীর ওপর কাঁধে একখানা খদ্দরের চাদর, মাথায় গান্ধী ক্যাপ, পায়ে এক জোড়া চপ্পল, কি শীত, কি গ্রীষ্ম ওই এক বেশ ছাড়া কখনো অন্য কিছু পরতে দেখিনি। মাথায় বড় বড় চুল, এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ, মাসে এক দিন কি দু' দিন বড়জোর কামান—দেখলেই মনে হয় যেন কোন অশৌচ পালন করছে। কিন্তু মুখে একটা প্রশান্ত হাসি সব সময়। গত পঁচিশ বৎসর আমি তাকে ওই একভাবে দেখেছি তাই বরবেশে সদানন্দ দার মূর্তিটা কেমন হবে, কল্পনা করতে গিয়ে সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায়!

সেদিন রবিবার। সকাল থেকেই বাড়ীটা খাঁ খাঁ করছে। গৃহিণী দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে চলে গেছেন বাপের বাড়ী নেমন্তন্ন রক্ষা করতে। খবরের কাগজের পাতা খুলে সম্পাদকের সরকার-বিরোধী মন্তব্যের পিছনে কতটা যুক্তি আছে, একা ঘরে বসে মনে মনে বিচার করছিলুম এমন সময় সহসা দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো। তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলেই দেখি সামনে এক সাহেবী পোষাক পরা অপরিচিত মূর্তি, মুখে তার একটা মোটা বর্মা চুরুট জ্বলছে! কি করে জানবো যে উনি আমাদের সেই চিরপরিচিত সদানন্দ দা। কোথায় সেই খদ্দর বেশ, কোথায় সেই কাঁচা-পাকা চুল? শেষ যে দিন দেখা হয়েছিল, বোধ হয় বছর ছয়েক আগে, ডালহৌসী স্কোয়ারে অফিস যাবার পথে তখনো সেই একই বেশ দেখেছি, তাছাড়া সামনের দু'-তিনটে দাঁত পড়ে গিয়েছিল বলে তা নিয়ে কত ঠাট্টাও করে-ছিলুম। তার পরিবর্তে ওই এক মাথা কুচ-কুচে কলপ দেওয়া চুল, বাঁধান দাঁতের পাটি, প্যান্টকোট পরা ওই মানুষটিকে দেখে যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলুম না।

সদানন্দ দা আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলো। তার পর চুরুটটা মুখ থেকে খপ্ করে সরিয়ে নিয়ে বললে, সুকুমার আমি সদানন্দ দা চিনতে পারছিস না?

কি করে চিনবো। তুমি যে এইভাবে একে-বারে ভোল পাল্টাবে, তা যে কোন দিন কল্পনা করিনি! তবু বলবো চমৎকার মানিয়েছে। বয়েস তোমার বোধ হয় দশ বছর কম দেখাচ্ছে এই স্যুটটা পরে। কিন্তু হঠাৎ একি পরিবর্তন তোমার সদানন্দ দা?

সদানন্দ দা আমার সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বললে, পরিবর্তনশীল জগৎ যে ভাই। বিস্মিত হবার কি আছে! বলে চুরুটে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললে, বোম্বে একটা ভাল চাকরী পেয়েছি আজ পাঁচ বছর হলো। বিরাট কোম্পানী, তাদের 'লিয়াইজন অফিসার' হয়েছি। দেশ বিদেশের লোকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে হয়। তাই ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের সদ্ পরামর্শ অবহেলা করতে পারিনি।

ভালই করেছো। বললুম যে পুজোর যে মন্ত্র! যারা এত টাকা মাইনে দেবে, তাদের কথা-মত চলতে হবে বৈকি? যাক্, ভারী খুশি হলুম তুমি চাকরী করছো শুনে, আর সব চেয়ে বেশী খুশি হয়েছি তোমার এই সাহেবী পোষাক দেখে! সত্যি বলছি বিশ্বাস করো সদানন্দ দা।

আমার মুখের কথা শেষ করতে না দিয়ে সদানন্দ দা বলে উঠলো, এ কিন্তু দেশী তাঁতের কাপড় থেকে তৈরী। বলে চট্ করে পকেট থেকে একটা ছাপানো বিয়ের চিঠি বার করে আমার হাতে দিলো। তার পর মুচকি হাসি ঠোঁটের কোণে চেপে বললে, পড়ে দেখ, আরো খুশি হবি তুই, আমি জানি। তাই চিঠি না পাঠিয়ে নিজে ছুটে এসেছি তোকে নেমন্তন্ন করতে!

কিন্তু চিঠিখানা না পড়েই আমি যেই বললুম, 'শুনেছি তুমি বিয়ে করছো,' অমনি যেন তার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল: ভ্রু-কুঁচকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার মুখের ওপর নিক্ষেপ করে বলে উঠলো, শুধু ওই শুনেছো না তার সঙ্গে আরো কিছু?

তার মানে? ওর মধ্যে আরো কিছু শোনবার মত আছে নাকি?

এবার সদানন্দ দার চোখ দুটো দীপ্ত হয়ে উঠলো। নিভে যাওয়া চুরুটটা আর একটা কাঠি জ্বালিয়ে ধরিয়ে বললে, হাঁ, অনেকের মুখে

করতে পারে না। বুড়ো হাড় নুয়ে পড়ে। জীবনটাই পুরোনো। যৌবনের গুডউইল নিঃশেষপ্রায়। বদ হজমের সুরু, মেজাজ তিরিক্ষি। তখন কোম্পানী তুলে দিতে পারলেই ভাল, দু'পা বাড়িয়েই আছে। লোডিং আর লোডিং ঠিক হয় না। ওভার লোডিং হতে কিন্তু দ্বিধা নেই। সবাই নিজের নিজের কোম্পানী সামলাতে ব্যস্ত। অন্য কোম্পানীতেও আর উৎসাহ থাকে না। কোম্পানী তেমন খারাপ হলে সারাবার তেমন মিস্ত্রী কোথায়। কারখানার নাট-বল্টু যদি টাইট রাখতে হয় তবে খাও-দাও একসারসাইজ কর—করোণারি হবে না। কোম্পানীতেও হঠাৎ লাল বাতি জ্বলবে না।

চালু কোম্পানীর দিকে চেয়ে চেয়ে আমার মনে হয় এ সব দুরকম দেহ কোম্পানীর নাম রাখা উচিত ছিল জটিলেশ্বর নয় তো জটিলেশ্বরী।

হয়ত অনেক রকম কুৎসা শুনতে পাবে কিন্তু বিশ্বাস করো না কারুর কথা। কেমন যেন মনে সন্দেহ এনে দিলে সদানন্দ দা। একটু ভেবে বললুম, তোমার নামে কুৎসা? কেন যাঁকে বিয়ে করতে যাচ্ছো, তিনি কি করেন? তোমার অফিসে চাকরী-ট্যাকরী করেন নাকি? শুনতে পাই বোম্বের দিকে নাকি এই রকম বিয়ে আজকাল হরদম হচ্ছে।

এবার গল্পটা কেশে একটু পরিষ্কার করে নিয়ে সদানন্দ দা বললে, মোটেই তা নয়। মেয়ে এই বাংলা দেশেরই এ বছর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে—বয়েসটা খুবই কম এই পূর্ণ ষোল।

যেন আলো জ্বালতে গিয়ে সুইচের বদলে তারে হাত লেগে গেল। 'সক' খেয়ে শিউরে উঠলুম। বললুম, ষোল বছরের মেয়েকে তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছো? তোমার মত জ্ঞানী, শিক্ষিত লোকের কাছ থেকে সত্যি বলছি আমি এটা আশা করিনি সদানন্দ দা। এ দস্তুর-মত 'ক্রিমিন্যাল অফেন্স!'

সদানন্দ দা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে। বুড়ো বয়সে বিয়ে করছি বলে আমার ভীমরতি হয়েছে এ কথা তোরা ভাবলে সত্যি আমি দুঃখিত হবো। আমি উন্মাদ নই। 'স্যানিটি' আমার পুরোদস্তুর আছে। বলতে বলতে গলাটা একটু খাটো করে এনে বললে, বিশ্বাস কর ভাই, আমি অনেক চেষ্টা করেছিলুম, ওর মাও কম বোঝায় নি কিন্তু মেয়ে কিছুতেই রাজী নয়। বলে অন্য কারুর সঙ্গে বিয়ে দিলে আত্মহত্যা করবো! কাজেই 'ক্রিমিন্যাল অফেন্স'র দায়ে না পড়ি বরং সেই জন্যেই এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছি বলতে পার!

তুমি যে নভেল নাটককেও হার মানালে সদানন্দ দা? তবু এর মধ্যে কোথাও একটা কিছু গণ্ডগোল আছে, বলে আমার মনে হয়।

সদানন্দ দা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে, সেও আর এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা! গণ্ডগোল যদি কোথাও হয়ে থাকে ত তার জন্যে দায়ী আমারই এই স্যুট, আর বেশ পরিবর্তন!

কি রকম! ব্যাপারটার মধ্যে যেন রহস্য রোমাঞ্চের গন্ধ পাচ্ছি। শুনি শুনি। বলে সদানন্দ দাকে চেপে ধরলুম। বললুম, কিছু গোপন না করে সব কথাই তুমি আমায় বিশ্বাস করে বলতে পারো আমার কাছ থেকে আর দ্বিতীয় প্রাণীও জানতে পারবে না।

সদানন্দ দা বললে, ব্যাপারটা এমন কিছুই গোপনীয় নয়। বিয়াল্লিশের 'মুভমেণ্টের' সময় গা ঢাকা দেবার জন্যে আমি ওদের বাড়ী হাওড়া জেলার নরেন্দ্রপুরে গ্রামে কয়েকটা দিন আশ্রয় নিয়েছিলুম সেই সময় এই মেয়েটির মা ছিল অরক্ষণীয়া কুমারী। জানতুম না যে ওর মা-বাপ সাতাশ-আঠাশ বছরের ওই আইবুড়ো মেয়েব কোথাও বিয়ের স্থির করতে না পেরে নিদ্রাহীন রাত কাটাচ্ছিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই মেয়েটি সেবাযত্নে আমাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলে। সেই সময় ওর মা-বাপের আসল উদ্দেশ্যটা বুঝতে পেরে এক দিন গভীর রাত্রে চুপি চুপি পালিয়ে যাই ওদের বাড়ী থেকে ছোট্ট দু' লাইন চিঠি লিখে রেখে আসি মেয়েটির নামে যে পুলিশের লোক আমার সন্ধান পেয়েছে, সন্দেহ করেই আমি পালাতে বাধ্য হচ্ছি। তার পর বেশ কয়েকটা বছর কেটে গেছে। কর্মের স্রোতে কখন কোথায় যাই কোন স্থিরতা নেই। হঠাৎ ওই গ্রামে স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষে সভাপতিত্ব করতে গিয়ে ওর বাবার সঙ্গে আমার দেখা। তিনি একেবারে হাতটা ধরে ঝর ঝর করে কাঁদতে লাগলেন। সে কান্নার অর্থ বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করতে তিনি বললেন, তাঁর সেই মেয়েটি বিধবা হয়েছে বিয়ের দু' বছর পরেই—একটি বাচ্চা মেয়ে নিয়ে আবার সে ফিরে এসে তার ঘাড়ে চেপেছে—নিজেই খেতে পাই না কি করে যে কি করবো জানি না। আপনারা দশের উপকার করে বেড়াচ্ছেন। আমার এই নাতনীটাকে যদি কোন একটা আশ্রমে-টাশ্রমে রেখে লেখাপড়া শেখবার ব্যবস্থা করে দেন, ত চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। বলে সভার শেষে এক রকম জোর করে আমায় তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন।

বিধবা মেয়েটি আমায় দেখে আগে ডুকরে ডুকরে খুব খানিকটা কাঁদলে। তারপর সিপ্রা, সিপ্রা বলে ডাকতে একটি বছর ছয়-সাতের মেয়ে ছুটে এসে আমার পায়ের ওপর নমস্কার করলে। সিপ্রার মায়ের নাম ললিতা। ললিতা তখন চোখের জল মুছতে মুছতে বললে, সিপ্রার বাবার নাকি ইচ্ছা ছিল, কলকাতার বোর্ডিংয়ে মেয়ে রেখে ভাল করে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবেন। কাজেই মেয়েটার যদি লেখাপড়ার কোন ব্যবস্থা আমি করে দিই, তাহলে ললিতা সারা জীবন এ উপকার কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে!

এক রকম কথাই দিয়ে এলুম। ওর লেখা-পড়ার একটা ভাল ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবো বলে। সেই বছর জানুয়ারী মাসে সিপ্রাকে কলকাতায় এনে মিশনারী গার্লস স্কুলে ভর্তি করে দিলুম। সেখানে বোর্ডিংয়ে থেকে লেখা-পড়া শিখবে। যা খরচ লাগে মাসে মাসে আমি বহন করবো। ওর দাদু সঙ্গে এসেছিলেন। সিপ্রার থাকা খাওয়া ও লেখাপড়া শেখারও ওই সুন্দর ব্যবস্থা দেখে একেবারে আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। বললেন, আমি পাড়াগাঁয় পড়ে থাকি, কলকাতায় আসতে-যেতে হলে খরচাও বড় কম নয়—আপনি দয়া করে মধ্যে মধ্যে মেয়েটার একটু খোঁজখবর করবেন। এই শেষ অনুরোধ টুকু জানাচ্ছি। সিপ্রাও নমস্কার করে বললে, সদানন্দ মামা আপনি আবার করে আসবেন?

যাইহোক এর পরে দু'তিন মাস নিজেই মাসের শেষে একবার করে গিয়ে সিপ্রার মাইনেটা দিয়ে আসতুম এবং ওর কিছু জিনিষ-পত্র লাগবে কিনা জিজ্ঞেস করতুম।

তারপর কাজের গতিকে নানাস্থানে আমায় ঘুরে বেড়াতে হয় বলে, আর নিজে সিপ্রার স্কুলে আসতে পারতুম না। যখন যাকে হাতের কাছে পেতুম টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দিতুম স্কুলে। আর সিপ্রার একটু খবর নিয়ে আসতে বলতুম। কখনো বা মণিঅর্ডার করে টাকাটা দিতুম পাঠিয়ে। ওদিকে স্কুলের ছুটিছাটার সময় ওর দাদু এসে ওকে নিয়ে যেতেন দেশে, আবার দিয়েও যেতেন।

আমার সঙ্গে অনেকদিন আর সিপ্রার সাক্ষাৎ নেই। ইচ্ছা থাকলেও কিছুতেই আর সময় করে উঠতে পারি না। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি ওই মেয়েদের স্কুলে যাতায়াতেও কেমন একটু সংকোচ হতো আমার মনে, এইভাবে পাঁচটা বছর কেটে যাবার পর একদিন আমি সময় করে নিজেই গেলুম সিপ্রার সঙ্গে দেখা করতে। ওর মা চিঠি লিখতো আমায় মধ্যে মধ্যে। বছরে দু'তিনখানা। সে লিখেছিল, সিপ্রা খুব দুঃখ করে, বলে সদানন্দ মামা আমাকে ভুলে গেছেন, একবারও আর দেখতে আসেন না। এতদিন পরে সিপ্রার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। তাই বোম্বে থেকে কতগুলো ভাল ভাল জামার ছিট, গল্পের কিছু ইংরেজী ছবিওলা বই, এক টিন বিস্কুট, কিছু চকলেট্ কিনে নিয়ে গিয়েছিলুম। সিপ্রা কিন্তু আমাকে চিনতেই পারলে না। মনে করলে, যেমন অন্য লোক দিয়ে মধ্যে মধ্যে আমি ওর খোঁজ নিতে পাঠাই, আমি বুঝি তেমনি একজন কেউ। অবশ্য আমার এই স্যুটপরা চেহারা দেখে তুমিই যখন চিনতে পারো নি, তখন ওইটুকু মেয়ের কি অপরাধ। ও আমার খদ্দর পরা চেহারাই দেখেছিল এবং তাও বছর পাঁচেক আগে—বার তিনেক। কাজেই আমাকে চিনতে না পেরে সে শুধু ওই জামার ছিটগুলো ফিরিয়ে দিয়ে বললে, এ রকম ফ্যাশানেবল জামা যে স্কুলের ছাত্রী হয়ে আমি পরি সদানন্দ মামা তা পছন্দ করেন না। আপনি এগুলো নিয়ে যান। তিনি যদি শোনেন ত রাগ করবেন। মা আমাকে বারবার নিষেধ করে দিয়েছেন।

সিপ্রার তখন বয়েস তেরো কি চোদ্দ হবে। ক্লাশ এইটে পড়ছে। আদর-যত্নে থেকে দেখতে-শুনতেও বেশ লাভ্লি হয়ে উঠেছে। ওর মুখ থেকে ওই পাকাপাকা কথাগুলো শুনে বেশ মজা লাগল। একটু থেমে বললুম, আচ্ছা তুমি নাওনা এগুলো, সদানন্দ মামা জানবেন কি করে আমিত তাকে বলতে যাচ্ছি না। তিনি আমাকে কিছু জামার ভাল ছিট তোমায় কিনে দিতে বলেছিলেন, তাই এনেছি।

জামার ওই ছিটগুলো যে তার খুব পছন্দসই ছিল, তা ওর চোখের লোলুপ দৃষ্টি থেকেই বুঝতে পেরেছিলুম। সিপ্রাও তাই আমার ওই কথার ওপর বিশ্বাস করে সেগুলো নিয়ে ভেতরে চলে গেলো!

এরপর যখনই বোম্বে থেকে কোন কাজ নিয়ে হেড অফিসে আসতে হতো তখনই আমি নিজে সিপ্রার সঙ্গে দেখা করতুম এবং এক একদিন এক একটা সৌখীন জিনিষ কিনে এনে ওর মনোরঞ্জন করতুম।

ও কিন্তু সব সময় ভয়ে ভয়ে জিনিষগুলো নিতো এবং প্রত্যেকবার-ই বলতো দেখবেন, সদানন্দ মামা যেন না ঘুণাক্ষরেও এসব টের পান। তাহলে মা আমায় পুঁতে ফেলবেন।

এইভাবে দেখতে দেখতে আমি তার একমাত্র বিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠলুম। তার মনের গোপন ইচ্ছা কিছুই আমি অপূর্ণ রাখতুম না। কখনো বলতো ভাল ফিতে, মাথার ক্লিপ কিনে দিতে, কখনো বলতো পাউডার, স্নো কিনে দিতে, কখনো বা ভাল সাড়ী।

একদিন একখানা ভাল সাড়ী কিনে নিয়ে যেতে, সিপ্রা বললে, ম্যাগো এর রংটা বিশ্রী, এ আমি পরবো না। তখন আমি বললুম, তাহলে তুমি আমার সঙ্গে চলো নিউ মার্কেটে, নিজেই পছন্দ করে কিনবে!

থমকে দাঁড়িয়ে সিপ্রা বললে, কিন্তু আপনার সঙ্গে আমাকে ত বাইরে বেরুতে দেবে

না সুপারিনটেনডেণ্ট। সদানন্দ মামা যে লোকাল গার্ডিয়ান, তাঁর চিঠি ছাড়া ত হবে না। আমি একটু মুচকি হেসে বললুম, আচ্ছা আমি সে ব্যবস্থা করছি, তুমি ততক্ষণ সাজগোজ করে এসো!

এই পর্যন্ত বলে সদানন্দ দা একটু থামলেন। চুরুটের আগুন নিভে গিয়েছিল। আবার সেটা ধরিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করলেন। সিপ্রা ইতিমধ্যে আমার খুব অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলো। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমাকে আমি কি বলে ডাকবো, নাম ত জানি না। আমি বলেছিলুম, আনন্দ মামা বলে ডেকো।

না-না মামা নয়। আনন্দ দা বলে ডাকবো। কেমন?

আমি আপত্তি করিনি। শুধু বলেছিলুম যেমন তোমার ইচ্ছা!

সুপারিনটেনডেণ্টও আমায় চিনতে পারেন নি। তিনি তাই বললেন, একটা দরখাস্ত এই বলে লিখে দিন যে, আপনি সিপ্রাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চান। সঙ্গে সঙ্গে আমি চিঠিটা লিখে দিতে তিনি অপিসে চলে গেলেন এবং আলমারী খুলে বোধহয় আমার নামসইটা মিলিয়ে দেখে তখনি ফিরে এসে অনুমতি দিলেন।

সিপ্রা রাস্তায় বেরিয়ে চুপি চুপি আমায় প্রশ্ন করলে, তুমি কি করে সুপারিনটেনডেণ্টের কাছ থেকে অনুমতি বার করলে। আর কত মেয়ে তার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে এমনিভাবে বাইরে যেতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে, তারি কাহিনী সবিস্তারে বলতে থাকে সিপ্রা।

আমি নীচু স্বরে সিপ্রাকে বললুম, তোমার সুপারিনটেনডেণ্ট আমাকেই ভেবেছেন তোমার সদানন্দ মামা। ভালই হয়েছে। তোমাকে জিজ্ঞেস করলে যেন তাঁর এ ভুলটা ভেঙ্গে দিয়ো না। তাহলে আর আমি তোমায় নিয়ে বেরুতে পারবো না বুঝতেই ত পারছো।

আমার কি বয়ে গেছে সেকথা বলবার!

এমনি করে কলকাতায় এলে সিপ্রাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতুম সারা শহরটায়। কখনো সে বলতো সিনেমা দেখবো, কখনো বলতো রেষ্টুরেণ্টে খাবো, কখনো বা বলতো মোটর চড়ে বেড়াতে যাবো ডায়মণ্ডহারবার।

আমি কোনদিন তার ইচ্ছায় বাধা দিতুম না। বেচারীর বাপ নেই, তা বলে কি ওর মনের বাসনা অপূর্ণ থাকবে! আর তাছাড়া ভগবানের কৃপায় আমার যখন অভাব নেই পয়সার। আর খাবেই বা কে! এমন করে আবদারের সুরে জীবনে ত কেউ কোনদিন কিছু চায় নি। কাজেই বুঝতে পারো, আমার মনের অবস্থাটা বলে সদানন্দ দা জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকালেন আমার দিকে।

আমি অখণ্ড মনোযোগসহকারে শুনে যাচ্ছিলুম তার কথা। পাছে কোন বিরুদ্ধ সমালোচনা করলে সদানন্দ দা থেমে যায় কিংবা কোনকিছু গোপন করে, তাই সবেতেই উৎসাহ দেখিয়ে তার মনের আসল ছবিটা দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে ছিলুম। সদানন্দ দাও মনের আবেগে বলে চলেছিলেন!

সিপ্রা তখন ক্লাশ টেন-এ পড়ছে। সামনে টেষ্ট পরীক্ষা। হঠাৎ ওর মার কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়ে একেবারে যাকে বলে হতভম্ব হয়ে গেলুম। ওর মা লিখেছে, সিপ্রা এবার পুজোর ছুটিতে দেশে গেলে বারোয়ারী ঠাকুরতলায় ওকে দেখে দুটি ছেলে বিয়ে করার জন্য সেধে খবর দেয়। একজন হাওড়া কলেজের অধ্যাপক, আর একজন বি এস-সি পাস করে চিত্তরঞ্জন কারখানায় সাড়ে চারশো টাকা মাইনের চাকরী করে। কিন্তু সিপ্রা নাকি দুজনকেই নাকচ করে দিয়েছে, পছন্দ নয় বলে। ওর এক সমবয়সী বন্ধু আছে পাড়ায় তার কাছে নাকি গল্প করেছে কে এক আনন্দ দা ওর স্কুলে খবরদারী করতে যান, তাকেই ও ভালবেসে ফেলেছে। তাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। তাই সেই আনন্দ দা যাতে ওর সঙ্গে আর মেলামেশা করতে না পারে তারজন্যে অনুরোধ করেছে এবং সেইসঙ্গে অন্য কোন ভাল পাত্রের কথাও খোঁজ করতে লিখেছে। সর্বনাশ! চিঠি পড়ে ত আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। এ কখনো সম্ভব! হতেই পারে না। নিশ্চয় এর মধ্যে ওর মায়ের কোন কারসাজী আছে। মনে করে নিজেই দু'তিনজন ভাল পাত্রের সন্ধান করে সিপ্রার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলুম।

আশ্চর্য, তাদের প্রত্যেকেরই সিপ্রাকে পছন্দ, শুধু তার পছন্দ নয় কাউকেই। শেষে বেশী পীড়াপীড়ি করতে সে কেঁদে ফেললে। আবার ভুলিয়ে, ভাল কথায় সান্ত্বনা দিয়ে, ট্যাক্সিতে করে একদিন গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে তাকে বললুম, কেন তুমি ওদের পছন্দ করছো না—অমন সব হীরের টুকরো ছেলে! মেয়েছেলে হয়ে যখন জন্মেছো তখন ত একদিন বিয়ে করতেই হবে। এই সময় বয়স থাকতে বিয়ে করাই সর্বদিক থেকে ভাল! বলো, চুপ করে থেকো না।

সিপ্রা কিছুক্ষণ মৌন থেকে একেবারে আমার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। বললে, না-না তোমার মুখ থেকে আমি একথা শুনতে পারবো না আনন্দ দা। যদি কারো গলায় মালা দিতেই হয় ত তোমাকেই দেবো!

আমার সারা গায়ে তখন কাঁটা দিয়ে উঠলো, বলে কি? শেষে তাকে অনেক বুঝিয়ে রাজী করাতে না পেরে বললুম, কিন্তু তোমার সদানন্দ মামা কিছুতেই রাজী হবেন না। তিনি চান, ওদের কোন একটি পাত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে হোক!

এবার তার দু'গাল বেয়ে অশ্রুর প্লাবন নামে। বলে, তিনি যদি জোর করেন, তা'হলে আমার মৃতদেহের সঙ্গে তাদের কারুর বিয়ে দেবেন। স্থির জেনো, আনন্দ দা।

আমি তখন সঙ্কোচ জড়িত স্বরে তাকে বললুম, কিন্তু তোমার মা, সদানন্দ মামা সকলের মতের বিরুদ্ধে কাজ করতে আমি পারবো না। বিশেষ করে সদানন্দ মামার মত না পেলে, আমি রাজী নই।

বেশ, আমি নিজে সদানন্দ মামাকে চিঠি লিখবো—দেখি তিনি কি বলেন। বলে সিপ্রা চোখের জল মুছে আমার কাঁধের ওপর মাথাটা রাখলে।

আমি বললুম, তার দরকার নেই—তিনি আর দু'হপ্তা পরে কলকাতায় আসছেন। তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা করে, যা বলবার বলো, কেমন?

সেই ভালো। তারপর তাঁর মত পেলে মাকে গিয়ে বলবো। কেমন? আশার আনন্দে তার চোখ দুটো যেন সহসা জ্বলে উঠলো!

দু'হপ্তা পরে গ্রেট্ ইষ্টার্ণ হোটেলে একটা ঘরে সিপ্রাকে ডেকে পাঠালুম। একজন লোক মারফৎ ওর সুপারিনটেন্ডেণ্টের কাছে চিঠি পাঠালুম যে, আমি খুব অসুস্থ ওকে যেন এখনি একবার আসতে অনুমতি দেন তিনি, আবার সন্ধ্যার সময় ওকে হোস্টেলে পৌঁছে দেওয়া হবে।

ঘরে ঢুকে আমার মুখের দিকে চেয়ে শুধু অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলো সিপ্রা। আমার একগাল গোঁফ-দাড়ি, খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবী, চাদর, মাথায় গান্ধী ক্যাপ।

অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে ছিল সিপ্রা দরজাটার কাছে। আস্তে আস্তে এক এক পা করে এগিয়ে এসে আমার চোখের ওপর চোখ রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। তুমি তাহলে আনন্দ দা নও, সদানন্দ মামা?

আমি একটু চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে শুধু বললুম, হাঁ। তোমার যদি কিছু বলার থাকে, বলতে পারো অসঙ্কোচে।

সিপ্রা এবার দু'হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল, যা বলবার শেষ কথা ত আমি বলে দিয়েছি তোমাকে—ওছাড়া আর কিছু বলার নেই। বলে সদানন্দ দা থেমে গেলেন।

আমি শুধু একটা প্রশ্ন করলুম। ওর মা এতে মত দিয়েছেন?

সদানন্দ দা বললে, হাঁ। তবে একটা সর্ত্তে। বিয়ের পরের দিনই তিনি কাশী চলে যাবেন। তাঁকে সেখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে

বর্ষাভিসার

শ্রীশান্তি পাল

কড়্ কড়্ ডাকে দেয়া বাজে জগঝম্প।
বিদ্যুৎ চমকায় লাগে হৃদিকম্প।
ঝরঝর জলধার—অবিরাম বৃষ্টি।
উচ্ছল, খাল-বিল, ভেসে যায় সৃষ্টি।
মৃত্তির সৌরভ সিঞ্চন-স্নিগ্ধ।
পৃথ্বীর অঞ্চল কর্দম-দিগ্ধ।
নির্জন পথ-ঘাট, নিশ্চল পল্লী।
রঙ্গন মৌচুষি ফোটে জুঁই মল্লী।
নারকেল-শাল-তাল-খর্জুর শীর্ষ—
লটপট লটকায়—অপরূপ দৃশ্য।
শ্যাম্বল শৈবালে হরিতের দীপ্তি।
চঞ্চল চাতকের তৃষ্ণায় তৃপ্তি।
টলমল সরঃ-জল, মেলে দল পদ্ম।
দাদরীর কলনাদ, ভোলে বক ছদ্ম।
কৈরব ভৈরবে বিস্তারে গন্ধ।
ঝিল্লীর ঝঙ্কারে জাগে নব ছন্দ।
এই ঘোর দুর্যোগে সুন্দরী রঙ্গে,
একলাই বাহিরায় শঙ্কিত অঙ্গে।
সন্ধ্যার অভিসারে পল্লীর প্রান্তে,
সঙ্কেত স্থানে তার উল্লসে কান্তে।
কেতকীর ঘেড়া ঘেরা মাধবীর কুঞ্জে,
স্বর্গের আস্বাদ মর্ত্তেই ভুঞ্জে।।

আড়াই কাঠা ছাদ

ধনঞ্জয় বৈরাগী

আড়াই কাঠা ছাদেই তাদের রাজত্ব। একপাল দস্যি ছেলে-মেয়ে। সারা পাড়ার লোকজনকে জ্বালিয়ে এসে ঘাপটি মেরে বসে থাকে পাঁচিলের আড়ালে। কেউ তাদের টিকি দেখতে পায় না। সারাদিন লেখাপড়া নেই, মাথায় শুধু দুষ্টুবুদ্ধি খেলছে কিভাবে কার পেছনে লাগা যায়। তেরো বছরের টিয়া ওদের লীডার। কিটকিটে রোগা, পাকানো দড়ীর মত শুকনো চেহারা। রুক্ষ চুলে শাড়ীর পাড় দিয়ে অযত্নে বিনুনী বাঁধা। চোখের তলায় কালি পড়েছে। কোন পুজোর সময় তৈরী শতছিন্ন সিল্কের ফ্রক পরে ছাদের পাঁচিলের ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়ায়। যারা দেখে ভয় পায়, কিন্তু টিয়া হি-হি করে হাসে। ভাই-বোনগুলো দিদির বাহাদুরী দেখে হাততালি দেয়, ধিন তা ধিনা নাচে।

কে জানে সবাই ওরা ভাই-বোন কিনা। হয়ত কিছু পাড়ার ছেলেও থাকতে পারে। ওদেরই বন্ধু। দুষ্টুমী করার সংগী। শুধু দুষ্ট হলে কেউ অত গা করত না হাজার হোক বয়েস ওদের অল্প। কিন্তু ওরা অসভ্যও। দুপুরে অফিস ইস্কুলের সময় পাড়ার বাড়ী-গুলো যখন ফাঁকা হয়ে যায় টিয়া এণ্ড কোম্পানীর দৌরাত্ম্য হয় সুরু। সযত্নে লাগানো ফুলগাছ থেকে ফুল ছেঁড়া। কাঁচা আম আর ডাঁসা পেয়ারা পাড়তে গিয়ে দরোয়ানের খাটিয়া ভেঙ্গে ফেলা ওদের নিত্য কর্ম। যে বাড়ী থেকে নালিশ করে ওদের নামে পরদিন তাদের ঘরে নোংরা ফেলে আসে। বিকেল থেকে ছাদের ওপর উঠে সে বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের নামে ছড়া কাটে। অশ্লীল ছড়া।

মোড়ের চা-ওয়ালার দোকানে যেদিন লেড়ী বিস্কুটের হিসেব মেলে না কিংবা মিষ্টির দোকানে ক্যাশের গোলমাল হয় ওরা নিঃসংকোচে সন্দেহ প্রকাশ করে, "দত্তবাড়ীর ছেলে-মেয়ে-গুলো এদিকে ঘোরাঘুরি করছিল—এ নিশ্চয় ওদের কাজ।"

এ অভিযোগও মিথ্যে নয়। হাতের কাছে জিনিষ পেলে ওরা সরায়। পুরোন দোকানে বিক্রী করে সিনেমা দেখার পয়সা যোগাড় করে। আবার কত সময় সন্ধ্যের অন্ধকারে বেপাড়ার লোক দেখলে ভিক্ষে চাইতেও দ্বিধা করে না। টিয়া এদের লীডার হলেও নিজে এসব করে না, আড়াই কাঠা ছাদে বসে বসে সাঙ্গ-পাঙ্গদের হুকুম করে। পাড়ার মায়েরা তা ভাল করেই জানে। তাই টিয়ার নাম দিয়েছে 'পালের গোদা'।

কতদিন শোনা যায় পাঁচবাড়ীর ছাদ থেকে মেয়েরা বিরক্ত হয়ে টিয়ার মাকে ডাকে, বেশ করে শুনিয়ে দিয়ে বলে "আর কতবার বলব তোমায় সরমা, ছেলে-মেয়েদের সামলাও। আমাদের যে প্রাণ অতিষ্ঠ করে মারছে। কোনদিন পাড়ার ছেলেদের কাছে মারধোর খাবে সেটা কি ভাল হবে?"

সরমা প্রথমটা চুপ করে সকলের মুখের দিকে তাকায়। তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, "আমি তার কি করবো, আমাকে বলছো কেন?"

"বা, তোমারই তো ছেলে-মেয়ে, কাকে আর বলবো?"

সরমা তেঁতো গলায় বলে, আমার ছেলে-মেয়ে কেউ নেই, ওরা আমার শত্রু। যা তোমাদের ইচ্ছে করো। মারো, ধরো, মাটিতে পুঁতে ফেলো, আমাকে বিরক্ত কোর না।

সরমা আর ছাদে না দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে চলে যায়। অতগুলো মেয়ের শানদেওয়া জিভের সামনে দাঁড়াবার সাহস ওর নেই। প্রথমে এরা ভর্ৎসনা দিয়ে সুরু করে, তারপর সহানুভূতি, তারপর করুণা। সব সহ্য হয় কিন্তু ওদের ওই মায়াকান্না সরমার কাছে অসহ্য। 'আহা ছেলে-মেয়েগুলো মানুষ হোল না,' 'আহা তোমার কি কষ্ট'—শুনে শুনে ওর কান পচে গেছে।

সরমার কানে বাজছে এরাই একদিন বলতো। এরা কিম্বা এদের মায়েরা, "আহা কি চমৎকার বৌ। যেন লক্ষ্মী প্রতিমা।" "আহা কি মিষ্টি স্বভাব, এতটুকু দেমাক নেই।"

সে প্রায় ষোল বছর আগেকার কথা। সরমা তখন নতুন বৌ হয়ে এই দত্ত বাড়ীতে ঢুকেছে, একমাত্র ছেলের বৌ। ঢলঢলে মোমের পুতুলের মত চেহারা। দুধে আলতা রং, এক-মাথা চুল, টানা টানা চোখ। রূপ দেখে শ্বশুর-শাশুড়ী গরীবের ঘর থেকে মেয়ে নিয়ে এসেছিলেন। সত্যিই সরমা রূপসী ছিল, তা না হলে কি আর নামজাদা দত্ত বাড়ীর বৌ হতে পারত!

তখনকার দত্ত-বাড়ীর সৌক বোলবোলা। মোড়ের ওপর তিনতলা বাড়ী, সাদা হাঁসের মত রং। সারা বছর মিস্ত্রী লেগে থাকত যাতে না রং ময়লা হয়ে যায়। রাস্তার উপর তিনখানা গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকত। পাড়ার সকলের অসুবিধে হলেও কেউ মুখ ফুটে বলতে পারত না। আর বলবেই বা কোন মুখে, এপাড়ায় এমন কোন লোক ছিল না যে বলতে পারে দত্তবাড়ীর কাছ থেকে কোন সাহায্য নেয় নি। মেয়ের বিয়েতে টাকার দরকার, ছেলের চাকরী কিম্বা নিদেনপক্ষে একটা ভালো সার্টিফিকেট চাইতেও সে দত্ত-বাড়ীতে ধর্ণা দিতে হয়েছে। আর একথাও সত্যি দত্তবুড়ো খানিকটা খোসামুদি পছন্দ করলেও কাউকে নিরাশ করতেন না সহজে।

গেটে দারোয়ান, বাড়ী ভর্তি ঝি-চাকর। একতলায় কাছারি আর বৈঠকখানা, দোতলায় কর্তা-গিন্নী। তিনতলায় ছেলে, ছেলের বৌ। তার উপরে এই আড়াই কাঠা ছাদ। এইছিল সরমার হাঁফ ছাড়ার জায়গা। সারাদিন আত্মীয়-স্বজনের ভীড়ে যখন বাড়ী গম-গম করত, কিম্বা পাঁচ পাড়ার বৌদের নির্লজ্জ খোসামুদি শুনে-শুনে প্রায় হাঁপিয়ে উঠত, ও ছুটে চলে আসতো ছাদের ধারে। এইখানে এসে সে সহজ হ'ত, মাথার ঘোমটা খুলে স্বচ্ছন্দভাবে ঘুরে বেড়াত চারদিকে। হয়তো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পাশের বাড়ীর সমবয়েসী কুমারী মেয়েদের সঙ্গে গল্প করতো। এইখানে এসে সে ভাবতে পারতো, গরীব বাপমায়ের কথা, ভাই-বোনদের কথা। পাড়ার মেয়েরা নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করত 'সত্যি সরমাদি কি চমৎকার মেয়ে। যখন ছাদে এসে গল্প করে ঠিক যেন আমাদেরই মত বড়লোকের বৌ বলে এতটুকু তফাৎ বোঝবার জো নেই।"

সরমা শুনতে পেলে হেসে উত্তর দিত "তফাৎ কি ভাই, আমি যে গরীবের মেয়ে ছোট্ট ভাড়া বাড়ীতে মানুষ। সেখানেও একফালি ছাদ আছে। তাই তো এই ছাদে আসতেই আমার সবচেয়ে বেশী ভালো লাগে।

আমিও যেমন চাঁদ দেখছি, বাবাও সেখানে ছাতে শুয়ে এমনি করেই চাঁদ দেখছেন।'

কথাটা বলেই সরমা অন্যমনস্ক হয়ে যেত। তারপর এক সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলত, "আমার এই গায়ের গয়নাগুলো দেখে তোমরা আমায় বড়লোক বল, না? আমার কিন্তু পরতে ভাল লাগে না, কিন্তু কি করব শাশুড়ী যে কিছুতেই খুলতে দেন না, নতুন বৌ কি না?"

মেয়েরা বলত, "পরবে বৈকি, তোমার আছে কেন পরবে না?"

তারা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত সরমার গায়ের ঝলমল করা গহনাগুলো। কানে, গলায় হাতে কত রকম অলঙকার। তারা বলত, শুধু গয়না পরলেই তো হয় না, তোমার মত চেহারা থাকা চাই। ঠিক যেন লক্ষ্মী-প্রতিমা।

সরমা লজ্জায় মুখ নীচু করত।

তখনকার দিনের মত আজও সরমার সবচেয়ে বড় বন্ধু এই আড়াই কাঠা ছাদ। তবে দিনের আলোয় আগের মত সে এখানে আর বেরুতে পারে না, পাছে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে যায়। শুনতে হয় পাঁচ রকম সহানুভূতিভরা কথা। কিম্বা ছেলে-মেয়েদের নামে হাজারো নালিশ। রাতের অন্ধকারে সারাপাড়া যখন ঘুমিয়ে পড়ে, মোড়ের দোকান-গুলোতেও ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যায়, তখনই চুপি চুপি সরমা বেরিয়ে আসে ছাদে, কিছুক্ষণের জন্যে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। সারাদিনের এক ঘেয়ে ক্লান্তিভরা জীবনের কথা ভুলে যায়, ভুলে যায় এই ক'বছরের মধ্যে তার জীবনের নাটকীয় পরিবর্তনের কথা। যারা এই দত্ত-বাড়ীকে ঈর্ষার চোখে দেখত আজ তারাই করুণা করে। বাড়ীর সামনে আজও গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকে তবে সেগুলো দত্ত-বাড়ীর নয়, ভাড়াটেদের। একতলায় আর কাছারী ঘর নেই, সেখানে বসবাস করে গুজরাটী দম্পতী। দোতলা ভাড়া নিয়েছে দুটি মাদ্রাজী পরিবার, তিনতলার দুখানা ঘরে কোন রকমে সরমা তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকে। হাত-পা ছড়াবার জায়গা নেই। এই আড়াই কাঠা ছাদে এসেই ছেলে-মেয়েগুলো যা একটু খেলতে পায়।

সরমার স্বামী মার্কামারা বড়লোকের ছেলে। সব রকম ঘোড়া রোগই তার ছিল। কর্তা-গিন্নী বেঁচে থাকতে লক্ষণগুলো প্রকাশ পেলেও তা প্রকট হয়ে ফুটে উঠতে পারেনি। কিন্তু বাবা-মা মারা যাবার পর নিজে কর্তা হয়ে এতদিনের পোষা সখগুলো মেটাতে চেষ্টা করলেন খুব অল্প সময়ের মধ্যে। পাঁচ বছরের মধ্যে সাফ হয়ে গেল বিষয় সম্পত্তি, বাঁধা পড়ল সরমার গায়ের গয়নাগুলো স্যাকরার দোকানে। শুধু দেবোত্তর বলে বেঁচে গেল দত্ত-বাড়ী। তারই দুটোতলা ভাড়া দিয়ে মাস গেলে যা আয় হয় তাই দিয়ে এতগুলো লোকের ডাল-ভাতের খরচা চলে। সরমার স্বামীর নেশার খরচাও চালাতে হয় ঐ টাকায়। তাই নিয়েই মারামারি, লাঠালাঠি।

হঠাৎ মাঝরাতে নিঃঝুম পাড়ায় দরজা ধাক্কানোর শব্দ পাওয়া যায়। মাতাল স্বামী ফিরে এসে দরজা ঠেলে। ছাদের নির্জন আশ্রয় থেকে নেমে এসে দরজা খোলে সরমা, কঠিন স্বরে বলে, অনেক রাত হয়েছে আর বেশী গোল কোর না ওপরে চল।

মাতাল দরজাটা ধরে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, আমি ওপরে যাব না।

—তবে এলে কেন?

দুটো টাকা দাও, নেশাটা এখনও জমেনি।

—টাকা নেই।

—আলবৎ আছে।

মাতাল সরমাকে ধরতে যায়, সরমা ছুটে ওপরে ওঠে। মাতালও টলতে টলতে পেছনে ধাওয়া করে। তারপরের ইতিহাস একঘেয়ে, চীৎকার, চেঁচামেচি। কদর্য ভাষায় গালাগালি। মাতাল সরমাকে মারে, সরমার অস্ফুট কান্না ক্রমে গোঙানীতে পরিণত হয়। প্রথম প্রথম পাড়ার লোকেরা ভয় পেতো, শঙ্কিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসত। এখন সব সয়ে গেছে। এমন কি পাশের ঘরে ছেলে-মেয়েরাও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোয়। শুধু সকাল বেলা উঠে মার মুখ, হাত গুলো আড়চোখে দেখে আরও কোথায় নতুন কালশিরে পড়েছে।

তবে ঝড় যেদিন বেশী বয়, মারের ধাক্কা সামলাতে না পেরে সরমা অজ্ঞান হয়ে পড়ে। সেদিন জ্ঞান হলে লক্ষ্য করে তার মাথার কাছে বসে বিন্দু টিয়া জলে আর্নিকা গুলে তুলো দিয়ে মায়ের সারা গায়ে লাগিয়ে দিচ্ছে। এত দুঃখেও সরমার চোখে জল আসে। কিন্তু কথা বলতে পারে না। মা মেয়ের এই সহানুভূতিভরা নীরব অধ্যায় টুকুর কথা সকলেরই অজানা থেকে যায়।

রাতের এ টিয়ার সঙ্গে সকালের টিয়ার যেন কোন সম্পর্ক নেই। আটটা ভাই-বোন নিয়ে সে যেন ইচ্ছে করে পাঁচজনের ক্ষতি করে বেড়ায়। বাড়ীর ওপর দিয়ে ঘুড়ী উড়ে গেলে তিলাওগার করে নামিয়ে নিয়ে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলে, ওড়াতে চায় না। পেরেক ফুটিয়ে সাইকেলের চাকা ফুটো করে দেয়। বিপদগ্রস্ত সাইকেলওয়ালা যখন পাড়ার ছেলেদের নামে গালাগাল করে, টিয়া তখন ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে। নিশ্চিন্ত আরামে যে পাখী বাসা বেঁধেছে গাছে সেটা ফেলে দিতে না পারলে যেন টিয়ার ঘুম হয় না। তাইতো সবাই বলাবলি করে অমন মায়ের কি করে এত নিষ্ঠুর মেয়ে হ'ল।

টিয়াদের সঙ্গে বাবার কোন সম্পর্ক নেই। ঘুম থেকে উঠে টিয়া এণ্ড কোম্পানী দুষ্টুমীর খোঁজে বেরিয়ে পড়ে পাড়ায়, বেপাড়ায়। বাবা তখন ঘুমোয়। ঘুম থেকে উঠে চায়ের দোকানে চা খেয়ে সেই যে তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান, বাড়ী ফেরেন একেবারে মাঝরাতে, নেশায় রঙগীন হয়ে। টিয়ারা তখন ঘুমোয়। বাবার সঙ্গে দেখা না হলেও তারা মনে মনে তাকে ভয় করে। তাই যেদিন অসুস্থ হয়ে দুপুরের দিকেও বাবা বাড়ীতে থাকে, ওরা পারতপক্ষে বাড়ীতে ঢুকতেই চায় না। কিন্তু আশ্চর্য টিয়ার দৌরাত্ম্যে পাড়ার সকলে অস্থির হয়ে পড়লেও ভাড়াটেরা একদিনও নালিশ করেনি। এই বিদেশী পরিবারগুলি মাসের শেষে ভাড়ার টাকা মায়ের হাতে তুলে দিয়ে যায়, যা দিয়ে ওদের সংসার চলে। বাবা চাইলেও তার হাতে দেয় না। এইজন্যেই বোধ-হয় টিয়ার কাছ থেকে তারা সহানুভূতি পেয়েছে যা প্রকাশ পায় তাদের উপর উপদ্রব না করায়।

দত্তবাড়ীকে কাজেকর্মে বড় একটা আজ-কাল কেউ নিমন্ত্রণ করে না। টিয়া এণ্ড কোম্পানীর অসভ্যতার ভয়েই অবশ্য। তবে মোড়ের মাথায় যে নতুন বাড়ী উঠেছে তারই গৃহপ্রবেশের জন্যে নতুন বাড়ীওয়ালা নেমন্তন্ন করেছে অনেক লোক। জমিটা আগে দত্তবাড়ীরই ছিল, তাই এরাও আজ বাদ পড়েনি। সরমা আজকাল কোথাও বেরয় না। আজকেও যে সে যাবে না সবাই জানত। একদিনের নামকরা রূপসী সরমা তার এই বিবর্ণ কাকতাড়ুয়া চেহারাটা নিয়ে কারুর সামনে আসতে চায় না। রোজকার মত স্বামীও তার বেরিয়ে গেছে রাত্রের অভিসারে। কিন্তু টিয়া তার ভাই-বোনেদের নিয়ে হাজির হয়েছে নেমন্তন্ন বাড়ীতে। অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, বড়লোকটার নতুন জৌলুষ। গেটের ওপর সানাই বসেছে। চারদিকে লোকের ভীড়, কি সাজপোষাকের বাহার, কত রকম গাড়ীর হর্ণ। মাঠের ওপর বিরাট সামিয়ানা পড়েছে। সেখানে বাজছে ইংরিজী ব্যাণ্ড। নতুন বাড়ীর ঘরে ঘরে আলো কতরকমের আসবাব, টিয়ারা যেন স্বপ্নরাজ্যের রাজপুরীতে এসে পড়েছে। খেতে বসে আনন্দের আর শেষ নেই, মাছ, মাংস, পোলাও দই, রাবড়ী। একবার খেয়ে যেন স্বাদ মেটে না। সারা বাড়ী কলরব করে ওরা ঘুরে বেড়ায়। কারা তাদের দেখে ভুরু কোঁচকাচ্ছে, কোন মা নিজের ছেলেদের সামলে নিয়ে গেল সেদিকে তাদের খেয়াল নেই।

রাত তখন ন'টা হবে। ছোট ভাই-বোনগুলো ঘুমে ঢুলছে। টিয়া তাদের সবাইকে নিয়ে বাড়ী ফিরে এল। সরমা ছাদে শুয়েছিল, আজ ক বছর বাদে একটা নিশ্চিন্ত সন্ধ্যা সে পেয়েছে। সন্ধ্যে থেকে উনুন জেলে হেঁসেল ঠেলতে হয়নি, পড়শীরা সকলেই গেছে নেমন্তন্ন বাড়ীতে। তাদের কৌতূহলী চোখ এই আড়াই কাঠা ছাদের ওপর পড়বে না। তাই নির্ভয়ে সন্ধ্যে থেকে এখানে এসে বসেছে। মন দিয়ে শুনেছে সানাই-এর বাজনা। ছেলেমেয়েরা ফিরে আসতে সে উঠে বসল। সকলের মুখেই হৈ-হৈ আনন্দের কথা, কতরকম খাওয়ার গল্প। সরমার মুখে হাসি ফুটে ওঠে, 'অনেক রাত হ'ল, তোরা যা শুয়ে পড়। টিয়া ছোটটার গায়ে একটা চাদর দিয়ে দিস্, সর্দিমত হয়েছে।'

টিয়ারা চলে গেলে সরমা আবার শুয়ে পড়ে। আজকাল আর ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে বসে দু'দণ্ড কথা বলারও সময় হয় না। সারাদিনে কত কাজ। বেশ দেখাচ্ছিল ওদের হাসি-খুশী মুখ। নূতন বাড়ীর জাঁক-জমক দেখে ওরা অবাক হয়েছে। তাতো হবেই। টিয়া যখন এক বছরের মেয়ে তখন থেকে দত্ত বাড়ীর অবস্থা পড়তে সুরু করেছে। বাও-বা বছর পাঁচেক পর্যন্ত টিয়া কিছু ভাল-মন্দ খেতে পেয়েছে অন্যগুলোত কিছুই পায়নি। মানুষ হয়েছে এই আস্তাকুঁড়ের মধ্যে। দূরের ঐ সানাই-এর শব্দ এই নিঃঝুম একলা রাতে কত রকম স্বপ্নের বুদ-বুদ ফোটাচ্ছে, সরমার চোখে।

টিয়ার কথায় তার চমক ভেঙ্গে যায়।

—মা, তুমি তো রান্না করনি, খাবে না?

সরমা ম্লান হাসে, মারে খিদে নেই।

—কেন তোমার শরীর খারাপ হয়েছে?

(শেষাংশ ২২৪ পৃষ্ঠায়)

আমি দেখেছি তোমাকে। হ্যাঁ, অনুতা, তোমাকেই আমি দেখেছি। জানি তুমি নিজেকে আড়াল করে রাখতে চেয়েছিলে, তবু পারো নি আমার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে। অনেক ভুলই আমি জীবনে করেছি—কিন্তু তোমাকে এক পলকের দেখায় চিনতে আমার ভুল হয় নি। শুধু তোমাকেই চেনা নয়—সেই সঙ্গে যেন সারা দুনিয়াটাকেই আমি চিনে ফেললাম। তুমিই এই দুনিয়ার ব্যারোমিটার—এই সত্যটিই আমি আবিষ্কার করেছি আজ সন্ধ্যায়।

যে সন্ধ্যাটি আমায় কয়েক ঘন্টা আগে পরিক্রম করে গেল তা যে আমার মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অতখানি বেদনার বারুদ উদ্গীরণ করে দিয়ে যাবে—তা কি কখনো আমি ভেবেছিলাম। আমি ডাক্তার—অহরহ নানা মানুষের ঘরে ঘরে আমার আনাগোনা। তাদেরই কারো প্রতিবেশীর গৃহে যে এতবড় নাট্যভূমি হয়ে উঠবে তাও কি কখনো ভেবেছিলাম!

এক বছর ধরে জানি—তুমি বেঁচে নেই।

কত বিনিদ্র রাতের উক্ত মুহূর্তে মনটাকে আমি এই বিশাল পৃথিবীর প্রত্যন্ত দেশে নিষ্ফল আগ্রহে বারে বারে পাঠিয়েছি তোমার অন্বেষণে। নিভৃত বেদনার খেয়ালে ভেবেছি—এমন ডাকঘর কি দুনিয়ায় আছে যেখানে আমার মনের দুটি কথা জমা দিলে তোমার কাছে গিয়ে পোঁছবে! আজ সন্ধ্যায় জানলুম—তুমি আছ—আছ এই সহরেই। যে কোন ডাকঘরই আজ আমার কথা তোমার কাছে পোঁছে দেবে। হয়ত সেই 'দুটি কথা' আর বলা হবে না। চাই-ও না বলতে। কিন্তু যা আজ বলতে চাই—তা যে বলতেই হবে। তাই তো আমার এই চিঠি লেখা।

অনুতা, তোমার মৃত্যুর চেয়েও তোমার বেঁচে থাকা আমার কাছে আজ নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। কেন এমন হলো?—

শুনছ—

থামতে হলো নিরঞ্জনকে।

কুন্তলার ডাক। বড় মিষ্টি নরম সুরে ও ডাকে। অনেক অশান্ত মুহূর্তে ওর ঐ ছোট্ট ডাকটুকু নিরঞ্জনকে শান্তি দিয়েছে।

কেন কিছু বলছ? জবাব দিল নিরঞ্জন।

পাশের ঘর থেকে কয়েকটা কথা ভেসে এল,—হ্যাঁ, সেই দুটি মুখে দিয়ে এসে ঘরে ঢুকেছ, কি করছ?—শোবে না?

একটু থমকে গিয়ে বললে নিরঞ্জন একটু দেরী হবে কুন্তলা। তুমি বরং শুয়ে পড়। এই কাজটা সেরেই—

: কাজটা না হয় একটু পরেই হবে। একবার এসোই না এই ঘরে।

একটা অবাধ্য হাতছানি কুন্তলার গলার স্বরে। নিরঞ্জন এড়াতে পারে না। কলমটা টেবিলে রেখে ধীর পায়ে উঠে যায়। চমকে ওঠে পাশের ঘরে এসে। চেয়ে থাকে স্থির দৃষ্টিতে।

খাটের আলসেয় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে কুন্তলা। সারা অঙ্গ অলংকারে ঝলমল করছে। সলজ্জ হাসির আড়ালে এক নির্বাক নিবেদন নিজেকে যেন বিশেষভাবে নিরঞ্জনের কাছে তুলে ধরার আকুতি।

কিন্তু কোন সাড়া নেই—বড় যেন তীক্ষ্ণ, নির্মম চাউনি নিরঞ্জনের। নিমেষে মুষড়ে যায় কুন্তলা। হতাশ বিহ্বলতায় চেয়ে থাকে ফ্যাল ফ্যাল করে। ঘরময় একটা নৈঃশব্দ নেমে আসে। পরক্ষণে ভেঙে যায় নিরঞ্জনের কর্কশ কণ্ঠস্বরে।

: কেন ওগুলো পরেছ? লজ্জা করে না! আমায় আবার ডেকে দেখাচ্ছ—আশ্চর্য। খুলে ফ্যালো ও সব। আর—আর তোমার গায়ে যেন কখনো ঐ গয়না আমি না দেখি—

ঝড়ের মত বেরিয়ে এসে পাশের ঘরে বসে পড়লো চেয়ারে। টেবিলে রাখা অসমাপ্ত চিঠির দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর অবিশ্রান্ত কলমের আঁচড়ে চিঠিখানি ক্ষতবিক্ষত করে তুললো।

নতুন করে সুরু করবে নিরঞ্জন।

অনুতা বড় বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এত স্পষ্ট যে ভনিতা করে লিখবার কিছু নেই। নিরঞ্জন শুধু এইটুকুই লিখে জানিয়ে দেবে যে অনেক আগেই তার বোঝা উচিত ছিল—

পাশের ঘর থেকে একটা চাপা কান্নার আওয়াজ এসে নিরঞ্জনের উদ্যত কলমকে স্তব্ধ করে দিল।

নিরঞ্জন তৎক্ষণাৎ অনুভব করলো—কুন্তলাকে বড় বেশী বলা হয়ে গেছে। না কুন্তলাকে সে যা বলতে চেয়েছিল তা একেবারেই বোঝাতে পারে নি। নিমেষে নিরঞ্জনের মনটা অসীম অনুকম্পায় আর্দ্র হয়ে এল।

আজ ছ'মাস কুন্তলাকে সে বিয়ে করেছে। নিরঞ্জন দেখেছে—ওর সরলতায় এক অদ্ভুত সরসতা। অতি অল্প সময়েই সে শুধু নিরঞ্জনকেই নয়—তার সব কিছুকেই আপনার করে নিয়েছে। বয়সের ব্যবধান কিন্তু কুন্তলাকে একটুও দূরে সরিয়ে দেয় নি—যেমন আশংকা করেছিল নিরঞ্জন। প্রথম রাতেই সে জিগেস করেছিল ভীরু আগ্রহে,—আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে তো?

উত্তরে জবাব পেয়েছিল,—পছন্দ! সে আবার কী, এ কি দোকানের খেলনা যে পছন্দ না হলে কিনবো না?

কুন্তলার প্রথম সম্ভাষণ। একবারও ঢোক গিলতে হয় নি—একেবারে সহজ ভঙ্গিতে কথাগুলো বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু তবু লক্ষ্য করেছিল নিরঞ্জন, কথার সঙ্গে সঙ্গে একটা লজ্জারঙীন আভা তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। আজো পড়ে—সব কথাতেই। ওটা ওর সহজাত। তাই তার মনের কোন ভাবই কথা হয়ে ফুটে উঠতে থমকে যায় না।

নিরঞ্জন আরো দেখেছে এই ছ'মাস ধরে যে কুন্তলার সফল প্রচেষ্টার ভেতর ওকে আনন্দ দেওয়া—খুসী করার এক অদম্য স্পৃহা। কে জানে—হয়ত ওকে খুসী করার জন্যেই কুন্তলার ঐ আভরণ সজ্জা।

কান্নার রেশ তখনো কানে আসছে।

নিরঞ্জন উঠলো। পাশের ঘরে এসে দেখে আয়নাদানির গায়ে স্তূপীকৃত অলংকার। বিছানায় আধশোয়া হয়ে মুখ গুঁজে কুন্তলা ফুলে ফুলে কাঁদছে।

: কুন্তলা, কেঁদো না—শোন—

নিরঞ্জন ওকে কাছে টেনে নিল। টেনে নিল একেবারে কোলের কাছে। দুহাতে মুখ ঢেকে কুন্তলা অবাধ্য কান্নায় ভেঙে পড়লো। নিরঞ্জন কী বলবে—কী বলে ওকে শান্ত করবে ঠিক করতে পারছে না। কুন্তলাকে নিয়ে এমন অবস্থায় এর আগে আর কখনো পড়ে নি। এই-ই প্রথম।

অবশেষে বললে,—কুন্তলা আমি যা বলবো ভেবেছিলাম তা বলতে পারি নি। তাই কী সব

বলে বসলাম—তুমি রাগ করো না।—এই কথাটাই বার বার করে বললে নিরঞ্জন।

এক সময় কুন্তলা জবাব দিল। কান্নার দমকে দমকে বেরিয়ে এল কথাগুলো।

: আমি এখন বুঝতে পেরেছি তুমি কি বলতে চাও অথচ বলতে পারো না। আমি বোকা তাই আগে বুঝতে পারি নি। যা বলেছ তাই বিশ্বাস করেছি। তুমিই তো বলেছিলে ফুলশয্যার রাত্রে—একগোছা চাবি হাতে দিয়ে—এই নাও চাবিকাঠি—এ বাড়ীর যা কিছু সব তোমার। তখন কি জানি ও শুধু কথাই—ওতে মনের সায় নেই। আজ বুঝেছি—দিদির কোন-কিছু আমি পারি তুমি তা চাও না—

: কুন্তলা,—

: তুমি যা চাও না তা আমি করবো না। আমি কখনো আর পারবো না ও সব। ---সরে গিয়ে বালিশে মুখ লুকিয়ে বলল—বারে বারে বললে, আর পরবো না—আর পরবো না—

: কুন্তলা তুমি ভুল বুঝেছ—আমি বলছি তুমি ভুল বুঝেছ। শান্ত হয়ে আমার কথা শোন—দোহাই তোমার, আমার কথা শোন। কুন্তলাকে টেনে তুলে একেবারে মুখোমুখি বসালো। কান্না থেমে গেছে কুন্তলার। থেমে গেছে যখনি তার কথাগুলো বলা শেষ হয়েছে। নিরশ্রু চোখে চেয়ে সোজা নিরঞ্জনের দিকে চেয়ে রইল।

: কুন্তলা, তোমার ধারণা ভুল। ওগুলো পরতে আমি বারণ করেছিলাম, কারণ ওগুলো নকল।

: নকল!—আঁৎকে উঠলো কুন্তলা।

: হ্যাঁ, নকল।

: তুমি বল কি!—কুন্তলা চক্ষের নিমেষে গয়নাগুলি সামনে নিয়ে এসে বিছানার ওপর রাখলো। তারপর এক একটা তোলে আর প্রশ্ন করে,—তুমি বলছ কি! এটা হীরের দুল নয়?

: না, নকল।

: এটা মুক্তোর হার নয়?

: না।

: এটা জড়োয়ার গয়না নয়?

: না। সব নকল।

: তুমি কি বলছ! আমি যে দেখেছি—আমার দিদিমার এসব গয়না ছিল—তিনি তো জমিদারের মেয়ে ছিলেন। ঠিক এমনিই তো। তবে নকল বলছ কেন হ্যা গো?

: নকল তো আসলের মতই দেখতে হয়—কিন্তু আসল নয় কুন্তলা। তুমি যদি চাও আমি আসল হীরে-মুক্তোর গয়না তোমায় কিনে দেব। আমার টাকা-পয়সা সবই তো তোমার জন্যে। যদি চাও—আমি কিনে দেব যত টাকা লাগে। কিন্তু ঐ নকল গয়নাগুলো তুমি পরো না।

: হীরে জহরতের দাম তো অনেক! কুন্তলা বিহ্বল স্বরে বলে।

হ্যাঁ অনেক। হাজার পাঁচশেক হলে এক সেট হবে হয়ত।

: হাজার পাঁচশেক!

: হ্যাঁ।

: আর, এগুলোর দাম কত?

: কত আর হবে। সব মিলিয়ে কুড়ি পঁচিশ টাকা।

: এ্যাঁ!—কুন্তলা কেমন যেন হতভম্ব হয়ে যায়। ঢোক গিলে বলে,—তা হলে এইগুলোই তো ভাল। এত কম দাম—অথচ ঠিক এক রকমই তো দেখতে।

: কিন্তু ও যে নকল।—বেশ জোর দিয়ে বললে নিরঞ্জন।

: তাতে কি হয়েছে। কে বুঝবে ওটা নকল। সবাই ভাববে ওটা আসলই। তুমি এতবড় ডাক্তার—এত টাকা—লোকে কি আর ভাববে তুমি বৌকে নকল গয়না পরিয়েছ?

নিরঞ্জন খানিকক্ষণ চুপ করে রইল।

তারপরে একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে,—কুন্তলা, নকল জিনিস বেশীদিন টেঁকে না।

তৎক্ষণাৎ জবাব পেল—না টেঁকে ওগুলো ফেলে দিয়ে আবার আর এক সেট আনবো। কতই বা দাম। কোথায় পাওয়া যায় গো?

নিরঞ্জন আর কথা বাড়াতে চাইল না। অকস্মাৎ যেন ঘড়ির দিকে নজর পড়লো। ব্যস্ত হয়ে বললে—অনেক রাত হয়ে গেছে—শুয়ে পড় এবার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আলো নিভলো ঘরে।

নিশ্চুপ অন্ধকারে অনেকখানি সময় কেটে গেল। দুজনেই জানে কেউ নিদ্রিত নয়। হঠাৎ কুন্তলা কাছ ঘেঁসে এসে ফিস্‌ফিস্ করে বললে,—ঐ নকল মুক্তোর গয়না আমি আর পরবো না—তাই বলে তোমায় আসল মুক্তোর গয়নাও কিনে দিতে হবে না।

নিরঞ্জন কিছু বলতে পারলো না। শুধু কুন্তলাকে যেন অন্ধকারের ভেতর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে বুকের ওপর একবার চেপে ধরলো।

: কিন্তু একটা কথা বলবে আমায়?—বড় একান্ত সুরে বললে কুন্তলা—যা তুমি আমায় পরতে দিতে চাও না—দিদিকে কেন তুমি তা-ই কিনে দিয়েছিলে?

: আমি কিনে দিই নি। সে-ই কিনতো।

: কেন?

: বোধ হয় নকলের ওপর তার টান ছিল বেশী।

: বারণ কর নি কেন—যেমন আমায় বারণ করলে।

: করা উচিৎ ছিল আজ বুঝতে পারছি—তখন বুঝি নি।

আর কোন কথা নেই। একেবারে চুপ।

এক সময় নিরঞ্জন শুনলো কুন্তলা বলছে,—দিদির কিন্তু পছন্দ ছিল। নকল হোক আর যাই হোক—কি সুন্দর জিনিসগুলো! তবে হ্যাঁ, ওগুলো আমি পরবো না। কি হবে মানুষকে মিথ্যে বুঝিয়ে যে আমি হীরে-জহরতের গয়না পরেছি!

নিরঞ্জন জবাব দিল না—যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হলো না নিরঞ্জনের যে কুন্তলা টোপ গিলেছে—অনুতার টোপ।

বড় অস্বস্তি নিয়ে রাত কাটলো।

পরদিন সময় করে নিরঞ্জন বসলো তার পড়ার ঘরে। অনুতাকে চিঠি লিখবে। অনেক ভেবে চিন্তে সুরু করলো,—

অনুতা আমি ডাক্তার—অস্থিবিশারদ। মানুষের দেহের ওপরকার যে রূপসম্ভার—চিকণ মসৃণ পেলবতা—প্রসাধনের হাজারো তুলির পোচ-লাগানো যে চমক তা আমার চোখ ঝলসায় নি কখনো। আমার দৃষ্টি সেই বর্ণাঢ্য আবরণ ভেদ করে দেখতে চেয়েছে—যার ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে ঐ অঙ্গ-সৌষ্ঠব আর বর্ণবাহার—তাতে ঘুণ ধরলো কিনা! এ শুধু আমার পেশা নয়—নেশাও। কিন্তু সব চেয়ে কাছের যে মানুষ তার শুধু বাইরেটাই দেখেছি—দেখতে পাই নি ভিতরটা। তাই রোগটা ধরতে পারি নি। আমি সতর্ক হয়ে গেছি। কুন্তলাকে বাঁচাতে হবে—ঐ রোগের সংক্রমণ থেকে। বাঁচাতেই হবে। কুন্তলা কে জানো? আমার দ্বিতীয়া স্ত্রী।

আচমকা কলম থেমে গেল নিরঞ্জনের। যেন কোন অচেনা স্ত্রীলোক তার ঘরে ঢুকে পড়েছে—এমনভাবে জড়সড় হয়ে তাকালো সে।

কুন্তলা চা হাতে নিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে।

সত্যিই চেনা যায় না কুন্তলাকে। চেহারা একেবারে পাল্টে গেছে। ধব ধব করছে ফর্সা।

নিরঞ্জন শুকনো গলায় কোনমতে বললে,—এ কি?

চায়ের কাপটা টেবিলে রেখে নিরঞ্জনের গা ঘেঁসে বললে, দেখেছ আমি কী রকম হঠাৎ ফর্সা হয়ে গেছি! দিদি তো এই রকমই ফর্সা ছিল, না? বল না—অমন হাঁ করে তাকিয়ে আছ কেন?

: কুন্তলা ঐ সব কী?

নিরঞ্জনের গলার সুর কুন্তলার সুরে

সে সেখানে

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য্য

সে পাখী উড়েই গেছে
মালাবারে অথবা কম্বোজে
কিম্বা শ্যাম উপদ্বীপে
নয়ত বা উত্তর সাগরে
তাই আর সাড়া নেই,
যত কেন ডাকি নাম ধ'রে,
বিস্মৃতির মায়ালোকে,
বৃথা হায় যাওয়া তার খোঁজে।
তার কিবা আসে যায়
সূর্য্যমুখী যদি আঁখি বোজে,
যদি রাত নাই কাটে,
দীর্ঘ হয় প্রহরে প্রহরে,
সেতারের তার ছেঁড়ে,
সুর থামে নিষ্প্রদীপ ঘরে—
তবু সেতো নির্বিকার,
রুদ্ধশ্বাস গানের মরজে।

তবু তাকে খুঁজে মরি
ছায়ানীল শ্যামস্নিগ্ধ বনে,
কপোলকল্পিত কুঞ্জে
বালুচরে কিম্বা নীলিমায়,
জলঢাকা নদীতীরে,
সাহারায় উত্তপ্ত দুপুরে।
প্রতিটি তারায় খুঁজি,
নীহারিকা বন্দিত সুদূরে,
হিমালয় চূড়ে, চূড়ে
সাগরের উদাত্ত বেলায়;
অন্তঃপুরে ফিরে আসি
সে সেখানে হাসে আনমনে।

মেলে নি। বুঝলে কুন্তলা। তাই সহজ করে বললে—ড্রেসিং টেবিলের দেরাজে একটা স্নো দেখলাম। সেটা মুখে মাখতেই কেমন ফর্সা দেখালো—তাই মুখে-হাতে মাখলুম। শিবুকে দিয়ে আরো একটা কিনে আনিয়েছি।

: কেন ওসব মাখতে গেলে?

: ভাবলুম তুমি খুসী হবে। আমি তো কালো—ওটা মাখলে ফর্সা লাগবে—তুমি খুসী হবে।

: কুন্তলা ওতে তোমায় একটুও ভাল দেখাচ্ছে না। যে সুন্দর সে সুন্দরই, তার যা কিছু নিজস্ব তাই তাকে সুন্দর করে।

খানিকক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবলো কুন্তলা—কে জানে। বললে,—চাটা খেয়ে নাও—ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। আমি চানের ঘরে যাচ্ছি—এগুলো সব ধুয়ে মুছে আসি। কাল থেকে কী যেন তোমার হয়েছে—সব কিছুতেই অখুসী—

চলে গেল কুন্তলা।

নিরঞ্জন কী করবে কী করবে ভেবে কিছু ঠিক করতে না পেরে মনে মনে রুষ্ট হয়ে উঠলো। অগত্যা অনুভাকে লেখা অসমাপ্ত চিঠিখানি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললো। আর একখানা কাগজ টেনে লিখতে সুরু করলো,—

অনুভা,—ছোট ছলনা করতে করতেই মানুষ বড় ছলনার দিকে এগিয়ে যায়। ছলনা করাটা তখন তার নেশা হয়ে দাঁড়ায়। নিজেকে সুন্দর করবার নিজেকে ঐশ্বর্যময় করবার জন্যে সাধনা চাই—অক্লান্ত নিষ্ঠায় সাধনা করতে হয় মানুষকে—তবেই সে সত্যিকারের সৌন্দর্য আর ঐশ্বর্যের সন্ধান পায়। আজকের মানুষের সে তেজ নেই—শক্তি নেই—বিনা আয়াসে সব পেতে চায়। আর বিনা আয়াসে পেতে গিয়েই যা কিছু মেকি যা কিছু নকল তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হয়। এমনি নকলের মোহে পড়ে নিজের ভেতর যা কিছু খাঁটি তাও জলাঞ্জলি দিয়ে বসে। তোমার হয়েছে তাই। তোমাকে দোষ দিই না। এই তো চলতি জগতের রীতি।

সবই আমার চোখে সহজ হয়ে আসছে। কুন্তলাকে বাধা দেব না। তোমার পথই তার পথ—তবে ভুল পথ।—

ফোন বেজে উঠলো। রোগীর ডাক—রোগের খবর। চিকিৎসক নিরঞ্জন উঠে দাঁড়ালো।

কটা দিন কেটে গেল দুরন্ত ব্যস্ততায়। এক মুহূর্ত অবসর ছিল না নিরঞ্জনের যে একটু একান্ত ভাবনায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে।

যেদিন ফুরসৎ মিললো—সেদিন অবেলায় বাড়ী ফিরলো যেমন সময় সে কোন দিন ঘরে ফেরে না।

কুন্তলা মেঝেয় বসে চুল বাঁধছে। এতই নিবিষ্ট যে, নিরঞ্জন এসেছে এ খবরটুকুও তার অজানা থেকে গেল।

খানিক পরে বেণীর বুনুনি সেরে উঠে গেল কুন্তলা। নিরঞ্জন দেখলো,—অনুভায় আলমারী খুলে বার করে আনলো এক গোছা চুল। সেটা অর্ধেক বোনা বেণীর সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে আবার বিনোতে সুরু করলো। তারপর বাঁধলো খোঁপা। নিরঞ্জন দেখলো কুন্তলার খোঁপা মাথাকে ছাড়িয়ে গেছে।

: ও মা তুমি! চমকে উঠেছে কুন্তলা।

: হ্যাঁ আমি।

: অসুখ করে নি তো?

: না।

আর কথা না বাড়িয়ে চলে এল নিরঞ্জন তার পড়ার ঘরে। ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

অনেকক্ষণ বসে রইল চুপ করে।

সেদিনকার মাঝ পথে থেমে যাওয়া চিঠিখানা বার করে পড়লো। মনে হলো—এ সব বলা কেন? কোন লাভ নেই। ছিঁড়ে ফেললো চিঠিখানি। ছিঁড়তে ছিঁড়তে আবার নতুন করে মনে এল কয়েকটা কথা যা না লিখলেই যেন নয়। হয়ত শেষ পর্যন্ত চিঠি অনুভার কাছে আর পাঠানোই হবে না। তবু সে লিখবে—এবং খুব সহজ করেই।—

অনুভা : চার বছর তুমি আমার সঙ্গে ঘর করেছ। তোমাকে আমি ভালবাসতাম। জানতাম—আমার ভালবাসা তোমার মনে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তাই তো তোমার সকল কথায় সকল ব্যবহারেই আমি ভালবাসার সন্ধান পেতাম। তখন তো বুঝি নি—যা কিছু চকচক করে তাই সোনা নয়। নকল মুক্তো আসলের মত দেখালেও তা যে নকলই।

যেদিন তুমি কাশী যাচ্ছো বলে বিদায় নিয়ে গেলে, সেদিন আমি ষ্টেশনে গিয়ে তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু একলা ফিরে আসতে মনে দুঃখ পাবো বলে আমাকে সঙ্গে নিলে না। তোমার আসন্ন বিরহের দুঃখ ছাপিয়ে একটা তৃপ্তি এবং আনন্দ আমি তখন অনুভব করেছিলাম যে কত বেশী করে আমার মনটা তুমি বুঝেছ। তখন তো বুঝি নি—তুমি আমাকে এড়াতে চেয়েছিলে পাছে তোমার কাশী যাওয়ার ফাঁকি আমি ধরে ফেলি।

যে ট্রেণ লক্ষ্য করে তুমি চলে গেলে—পরদিন কাগজে সেই ট্রেণ-দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সারা দুনিয়াটা অন্ধকার দেখেছিলাম। দিগ্বিদিকে ছোটাছুটি—খবরাখবর করেও তোমার হদিস পেলাম না। তখন কি বুঝেছিলাম যে, ঐ অগণিত মানুষের মৃত্যু-মিছিলের সুযোগ নিয়ে তুমি আত্মগোপন করলে! তোমার মৃত্যু সাব্যস্ত হলো—তুমি যে ঐ ট্রেণের যাত্রী ছিলে না—তা কেমন করে জানবো! আজ ভাবি, ট্রেণ এ্যাক্সিডেণ্ট যদি না-ই হতো, তাহলে না জানি আর কোন্ অভিনব ছলনায় নিজেকে সরিয়ে নিতে। যাক্ সে কথা।

কদিন হলো জেনেছি তোমার খবর। তোমার সব খবর। তোমার কাছে আমার শুধু একটাই প্রশ্ন, অনুভা আজ না হয় নকলের নেশায় নকল মৃত্যু দিয়ে আমায় ফাঁকি দিলে—যেদিন সত্যিকার মৃত্যু আসবে—পারবে তাকে ফাঁকি দিতে? ইতি।

ঘন ঘন করাঘাত দরজায়।

: শুনছ—শুনছ,—কুন্তলার ডাক।

নিরঞ্জন তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দেয়।

: শোন, ঠাকুরপো এসেছেন,—কি জরুরি কথা আছে তোমার সঙ্গে,—নীচেয় বসে আছেন—তুমি নীচেয় আসবে, না তিনি ওপরে আসবেন?

: কি জরুরি কথা! নিরঞ্জন চিন্তাগ্রস্ত হয়ে জিগেস করে।

দিদির জন্য

*** পরিমল চক্রবর্তী ***

এখন তোমার সাদম্ন সংসারের ঢেউ
কেবলি আছড়ে পড়ে। চারিদিকে কেউ
নেই যেন, শূন্যতায় থই থই হৃদে
জীবন নিমজ্জ প্রায় প্রতি পদে পদে
তবুও স্বপ্নের আলো বিচ্ছুরিত হয়
এবং চেতনা খোঁজে হারানো অন্বয়
দূরগন্ধা অতীতের। স্মৃতির শিকড়
সত্তার মাটির নিচে আবেগের ঘর
গড়ে তোলে তোমার সে জনয়িত্রী মন
সুরু করে মাতৃত্বের ভুবন ভ্রমণ
সব কিছু ভুলে গিয়ে: পুত্র কন্যাকার
সুখ-দুঃখ এক হয়ে হৃদয়ে অপার
যন্ত্রণার ঢেউ তোলে;... আর সেই টানে
ভাস তুমি জীবনের স্রোতের উজানে
সর্বকিছু পণ করে। ভুলে যাও সব—
আপনার সুখ-দুঃখ, আশার বিভব
আদিম সে—রূপকল্পে।

তোমার হৃদয়,
সন্তানের মুখ চেয়ে ভোলে মৃত্যুভয়।।

: কি জানি, তোমাকে ছাড়া নাকি কাউকে বলা যাবে না।

: এখানে পাঠিয়ে দাও।

নিরঞ্জনের আপন ভাই নয় সঞ্জয়। তবু ভাই বলতে ঐ সঞ্জয়ই। সব দুঃসময়ে ও হাজির। একটা অত্যন্ত গোপনীয় দুঃসংবাদের প্রতিচ্ছবি হয়ে ঘরে ঢুকলো সঞ্জয়।

: কি খবর? ওর মুখ চোখ দেখে সভয়ে প্রশ্ন করলো নিরঞ্জন।

: দাদা সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! আমি ভাজ্জব হয়ে গেছি।

: কি হয়েছে তাই বল না।—

: একডালিয়া রোডে এক বন্ধুর বাড়ী বসে গল্প করছি—এমন সময় কাছাকাছি বাড়ীতে একটা হঠাৎ-মৃত্যুর হট্টগোল শোনা গেল। কি ব্যাপার! না, মিঃ সোমের স্ত্রী হার্টফেল করে মারা গেছেন। ওরা সবাই গেল—আমিও।

নিরঞ্জনের মুখটা কঠিন হয়ে এল।

:—নিজের চোখকে আমি বিশ্বাস করতে পারি নি দাদা—মিঃ সোমের স্ত্রী পুনর্নবা সোমকে দেখে—

: আমি জানি সঞ্জয়।

: জানো! কী জানো তুমি?

: মিঃ সোমের স্ত্রী পুনর্নবা সোম তোমার অনুভা বৌদি।

: এ্যাঁ! তুমি—তুমি কি করে জানলে?

: জানি। অল্পদিন হলো জেনেছি। কিন্তু হঠাৎ মারা গেল—কি ব্যাপার? অসুখটা কী?

: শুনলাম—রক্তশূন্যতা।

: ও।

: কিন্তু কিছু বোঝার উপায় নেই দাদা চেহারা দেখে। সেই রকম চকচকে চেহারা।

: হুঁ।—চুপ করে গেল নিরঞ্জন।

অনুভাকে লেখা চিঠিখানির দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল শুধু।

কালিদাসে গ্রহ-নক্ষত্র

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

প্রাণভয়ে দ্রুতবেগে পলায়মান মৃগের অনুসরণ করতে করতে ধনুর্বাণধারী রথোপবিষ্ট রাজা দুষ্মন্ত সারথিসহ এসে উপস্থিত হলেন মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে। একবার তাঁর নিক্ষেপোদ্যত রাজার এবং আরেকবার ক্ষিপ্রগতিতে ধাবমান চিত্র-হরিণের পানে তাকিয়ে রাজাকে সম্বোধন করে সারথি বললে :

আয়ুষ্মন্ !

কৃষ্ণসারে দদচ্চক্ষুস্ত্বয়ি চাধিজ্যকার্মুকে।
মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকিনম্॥

—অভিজ্ঞান শকুন্তলম্।
—প্রথম অঙ্ক — ১৩

অর্থাৎ

হে আয়ুষ্মান ! ধনুকে জ্যা রোপণ করে শর নিক্ষেপে সমুদ্যত হয়ে আপনি ছুটেছেন হরিণের পেছনে পেছনে। আর আমি যেন প্রত্যক্ষ করছি মৃগানুসরণ তৎপর সাক্ষাৎ পিনাকীকে।

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের একেবারে গোড়ার দিকে মহাকবি কালিদাস যে উপমান প্রয়োগ করেছেন, তার জ্যোতিষিক তাৎপর্য আছে।

হিন্দু পুরাণ মতে—রূপবতী রোহিণী দক্ষ প্রজাপতির সাতাশ কন্যার এক কন্যা, রোহিণীর রূপলাবণ্যে মোহিত হয়ে তাঁর জনক প্রজাপতি ব্রহ্মা পর্যন্ত তাঁর নিকট কামবাসনা প্রকাশ করেছিলেন। উপায়ান্তরবিহীন হয়ে রোহিণী তখন মৃগীরূপ ধারণ করলেন। ব্রহ্মা তখন মৃগরূপ পরিগ্রহ করে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলে পর রুদ্র পিনাকে শরসন্ধানপূর্বক মৃগরূপী ব্রহ্মার অনুসরণ করতে লাগলেন। এই মৃগকে মহাভারতের বনপর্বে তারামৃগ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি তাঁর "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" গ্রন্থে বহু প্রমাণপ্রয়োগে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এই তারামৃগ কালপুরুষ নক্ষত্র। কালপুরুষকে পাশ্চাত্য জ্যোতিষে বলা হয় Orion বা ওরায়ন। Peter lun তাঁর The Stars in our Heaven নামক পুস্তকে রোহিণীর প্রসঙ্গে বলেছেন—

"Her own father pursued her across the sky in the form of the giant hunter orion......"

তেরোটি তারা নিয়ে গঠিত এই কালপুরুষ দক্ষিণ আকাশের একটি বিশিষ্ট নক্ষত্রমণ্ডল। হিন্দু পুরাণের ন্যায় গ্রীক এবং রোমান পুরাণেও এই কালপুরুষকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে অনেকগুলি উপাখ্যান।

কালিদাস অভিজ্ঞান শকুন্তলমের আরো কোনো কোনো স্থানে উপমাচ্ছলে নক্ষত্রদের কথা উল্লেখ করেছেন। এতে ছায়াপথেরও (Milky way) চমৎকার বর্ণনাও আছে। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ ছাড়া মহাকবি কৃত রঘুবংশম্, কুমারসম্ভবম্—এ-দু'টি মহাকাব্যে এবং বিক্রমোর্বশী নাটকে গ্রহ-নক্ষত্রদের কথা আছে।

তারকাখচিত অন্ধকার নিশীথে আকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত যে দুগ্ধ-শুভ্র বলয়ার্ধ দেখা যায়, ইংরেজীতে তাকে বলে Milky way—গ্রীক পুরাণে একে বর্ণনা করা হয়েছে স্বর্গের প্রধান সরণী বলে। হিন্দু পুরাণে এর বিভিন্ন নাম। যথাঃ—সরিৎগঙ্গা, বিয়দগঙ্গা, স্বর্ণদা, সুরদীর্ঘিকা, আকাশগঙ্গা প্রভৃতি। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল—এই তিন পথে প্রবাহিতা বলে গঙ্গার আর এক নাম ত্রিপথগা। এই তিনটি ধারার মধ্যে আকাশমার্গে যেটি প্রবহমান, তারই নাম আকাশগঙ্গা। কালিদাস এই আকাশগঙ্গার নাম রেখেছিলেন ছায়াপথ (পৌরাণিক উপাখ্যান, পৃঃ ৬৭ ঃ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি)। অন্যান্য নামের পরিবর্তে মহাকবির প্রদত্ত এই ছায়াপথই এখন অধিকতর পরিচিত এবং কি সাহিত্যে-কাব্যে, কি জ্যোতির্বিষক আলোচনায়—এই অভিধাই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। রঘুবংশে মহাকবি ছায়াপথকে উপমান হিসেবে ব্যবহার করে যে শ্লোকটি রচনা করেছেন, তা' পরম উপভোগ্য।

দশাননকে সবংশে নিধন করে রাম জানকীসহ পুষ্পক বিমানে আরোহণ করে আকাশপথে প্রত্যাবর্তন করছেন। নিম্নাভিমুখে দৃষ্টিপাত করে তাঁর চোখে পড়ল সেতুবন্ধের উভয় পার্শ্বে সমুদ্রের নীলাম্বুরাশির অনন্ত বিস্তার। সঙ্গে সঙ্গেই হর্ষোৎফুল্ল হয়ে সীতাকে সম্বোধন করে তিনি বললেন :

বৈদেহি ! পশ্যামলয়াদ্ বিভক্তং, মৎসেতুনা
ফেনিলাম্বুরাশিম্।
ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসন্নমাকাশমাবিষ্কৃত
চারুতারম্॥

রঘুবংশ ১৩/২

অর্থাৎ, "বৈদেহি ! দেখ আমার নির্মিত সেতু দ্বারা দ্বিধা-বিভক্ত ফেনিল অম্বুরাশিতে পূর্ণ সাগর এবং মলয় পর্বত শোভা পাচ্ছে যেন ছায়াপথ দ্বারা বিভক্ত চারু-তারকা-সমাকীর্ণ প্রসন্ন শারদাকাশের ন্যায়।"

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্-এও ত্রিপথগা গঙ্গা বা ছায়াপথের বর্ণনা আছে।

ইন্দ্র প্রেরিত রথে আরোহণ করে দানব দলনের উদ্দেশ্যে রাজা দুষ্মন্ত আকাশপথে চলেছেন স্বর্গলোকের অভিমুখে। রথের সারথি মাতলি। রাজা সারথিকে কোন্ বায়ুর অধিকারভুক্ত পথে তাঁরা চলছেন—এ-কথা জিজ্ঞাসা করলে মাতলি বললেন :

ত্রিস্রোতসং বহতি যো গগন-প্রতিষ্ঠাং জ্যোতিংষী
বর্তয়তি চক্রবিভক্ত রশ্মিঃ।
তস্য ব্যপেতরজসঃ প্রবহস্য বায়োর্মার্গো
দ্বিতীয় হরিবিক্রমপূত এষঃ॥

অর্থাৎ, গগনমার্গে সংস্থিত থেকে যে বায়ু ধারণ করে আছে, মন্দাকিনী, অলকানন্দা এবং ভোগবতী নামক ত্রিপথগা গঙ্গাত্রয়ীর মধ্যে আকাশবর্তিনী মন্দাকিনী বা আকাশগঙ্গাকে, যা চক্রাকারে আবর্তিত হয়ে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর রশ্মিমালা অশ্বগণের মুখরশ্মির ন্যায় ধরে রেখেছে এবং যাতে কোনো রজোমিশ্রণের সম্ভাবনা নেই, সেই প্রবহ নামক বায়ুর এই পথ। বামনরূপী ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর পদন্যাসে এই পথ সর্ববিধ কলুষমুক্ত পবিত্র।

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্-এ ছায়াপথ ছাড়া নক্ষত্রদের উল্লেখও পাওয়া যায়। আমরা নক্ষত্র ও তারা সমার্থক বলে মনে করি। জ্যোতিষিক মতে কিন্তু এ-দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। কাছাকাছি অবস্থিত কয়েকটি তারায় মিলে এক-একটি নক্ষত্র হয় এবং নক্ষত্র বলতে প্রধানত রাশিচক্রের ২৭।২৮টি নক্ষত্র বুঝায়। ইংরেজীতে বলা হয়—Luner asterism, চন্দ্র এই নক্ষত্র-চক্রের ভিতর দিয়েই আকাশ পরিক্রমা করে। কালিদাস যে নক্ষত্র ও তারার পার্থক্যের কথা জানতেন, তা' রঘুবংশের 'নক্ষত্রতারাগ্রহ সংকুলানি' এই শ্লোকাংশ থেকে প্রমাণিত হয়।

অভিজ্ঞান শকুন্তলায় আছে—বৃক্ষান্তরালে দাঁড়িয়ে রাজা দুষ্মন্ত দেখলেন, শিলাপট্টে শায়িতা শকুন্তলা, তাঁর দুই পার্শ্বে উপবিষ্টা সখিদ্বয়—অনুসূয়া আর প্রিয়ংবদা। রাজা কান পেতে শুনতে লাগলেন তিন সখির নিভৃত বিশ্রম্ভালাপ। বুঝতে পারলেন, দুই সখিরই এক সুর, শকুন্তলার মতেই তাদের মত, তখন তিনি বলে উঠলেন :

কিমত্র চিত্রং যদি বিশাখে শশাঙ্কলেখামনুবর্তেতে

অর্থাৎ, "কেনই বা তা হবে না ! বিশাখাযুগল যে সকল সময়েই শশাঙ্কলেখার অনুবর্তন করবে, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে ?"

এই বিশাখা নক্ষত্রচক্রের ষোড়শ নক্ষত্র, তুলা-রাশির (Libra) অন্তর্গত। মহাকবি যে দ্বিবচনান্ত বিশাখা শব্দটি ব্যবহার করেছেন, সে শুধু সখিদ্বয়ের সঙ্গে উপমা দেবার জন্যে নয়, এর জ্যোতির্বিষক তাৎপর্যও আছে। কালিদাসের সময়ে কোনো কোনো জ্যোতিষীরা মনে করতেন যে, দুইটি তারায় বিশাখা নক্ষত্র, বিশাখা নক্ষত্রের দেবতাও দু'টি—ইন্দ্র আর অগ্নি। বরাহমতে কিন্তু পাঁচটি তারায় বিশাখা নক্ষত্র। যাই হোক্, মহাকবি কিন্তু শাকল্য সংহিতার মতানুসারী হয়ে 'বিশাখে' এই শব্দটি দ্বারা অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা এই দুই সখিকে বুঝিয়েছেন।

দীর্ঘ বিরহের অবসানে স্বর্গলোকে প্রজাপতি মারীচের আশ্রমে যখন শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্মন্তের পুনর্মিলন হল, তখন দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে সম্বোধন করে বললেন :

"প্রিয়ে ! স্মৃতি-ভিন্ন-মোহতমসো দিষ্ট্যা
প্রমুখে স্থিতাসি মে সুমুখি !
উপরাগান্তে শশিনঃ সমুপগতা রোহিণীযোগম্।"

অর্থাৎ, প্রিয়ে আজ কি আনন্দের দিন ! যে বিস্মৃতিমোহে হৃদয় আমার আচ্ছন্ন ছিল, তা' আজ অপগত হয়েছে। সুমুখি ! তুমি এসে দাঁড়িয়েছ আমার সুমুখে, একি আমার কম সৌভাগ্য ! রোহিণী যেন আজ গ্রহণের অন্তে পুনর্মিলিতা হলেন চন্দ্রের সঙ্গে।

নক্ষত্রচক্রের পঞ্চম নক্ষত্র এই রোহিণী। যে পাঁচটি তারায় রোহিণী নক্ষত্রকে শকটের আকারে কল্পনা করা হয়েছে ইংরেজীতে, তাদের বলা হয় Hyades, আর পাশ্চাত্য জ্যোতিষে রোহিণী তারাটির নাম হচ্ছে Aldebaran—বৃষরাশির অন্তর্গত এই লাল রঙের প্রথম প্রভার তারাটিকে পাশ্চাত্য জ্যোতিষে বৃষের একটি চক্ষু বলে কল্পনা করা হয়। (The Stars in our Heaven P. 136) এর প্রশস্ত স্কন্ধের উপরেই শোভা পাচ্ছে অপূর্ব মনোহর তারাগুচ্ছ কৃত্তিকাপুঞ্জ Pleiades.

এই রোহিণী নক্ষত্রকে নিয়ে হিন্দু পুরাণে অনেকগুলি কাহিনী আছে। রূপবতী রোহিণী যে দক্ষ প্রজাপতির সাতাশ কন্যার এক কন্যা, সে-কথা আগেই বলেছি। দক্ষ সাতাশটি কন্যাই চন্দ্রকে সম্প্রদান করেছিলেন, চন্দ্র কিন্তু অন্য কন্যাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে রোহিণীর প্রতিই অত্যাসক্ত হয়ে পড়লেন। ফলে দক্ষ তাঁকে এই বলে অভিশাপ দিলেন যে, তিনি যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হবেন।

স্বর্ণদ্বীপে শিলাচিত্র

চিত্তরঞ্জন মাইতি

আমাদের মধ্যে এক দক্ষ সদাগর
কোন এক শুভলগ্নে পণ্যভার নিয়ে
পূর্বগামী তরণীতে পাল তুলে দিয়ে
পাড়ি দিল দুঃসাহসে দুস্তর সাগর।
মনে মনে কেটে চলে ছক
কাচখণ্ড বিনিময়ে নিতে হবে অমূল্য হীরক।

হঠাৎ হাওয়ায় এক গন্ধ ভেসে এল
দারুচিনি বন হতে আশ্চর্য মদির
বণিকের চিত্ত হল অশান্ত অধীর
স্বর্ণদ্বীপে সপ্তডিঙা বাঁধা পড়ে গেল।

সে বণিক সংগীদের নিয়ে
মায়াবতী সেই দ্বীপে
একদিন গেল যে হারিয়ে।

তারপর ভ্রষ্টলক্ষ্য সেই সদাগর
তাদের স্বদেশ আর সভ্যতাকে নিয়ে
পাষাণের বুকে বুকে তুলল ফুটিয়ে
অনির্বাচ্য ইতিকথা—ভাস্কর্যে অমর।

আজ তারা শিলীভূত
শুধু এক শিল্পী জেগে রয়
তাহাদের পরিত্যক্ত
কাচখণ্ড হল হিরণ্ময়।

আকাশ কুসুম

অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়

ঝক-ঝকে খোলামেলা ঐ যে আকাশ
ওকি ঐ স্বর্গের মাঠ।
এখানে ঘাসের বুকে
রকমারি ফুল ফুটে থাকে,
ওখানেতে নীল লাল হলুদ বরণ
তারাফুল দোলে অনুখন।

আরও আছে,
চাঁদমল্লিকা আর সূর্যমুখী দুটো।
ভোরের শিশির ফোঁটা পাতায় পাতায়
ঝিকমিক করে,
কোথা থেকে আসে ভাবি,
বুঝি ঐ আকাশ কুসুম মধু
পড়ে ঝরে ঝরে।

ঝোড়ো আর হাল্কা হাওয়ায়
ভেসে ভেসে যায়
কাল সাদা মেঘ।

ওরা হ'ল অশ্বথ, বট
আর ফোলা ফোলা ঝাউ,
ওদের ছায়ায়,
আতপ্ত পৃথিবীর বুকটা জুড়ায়।
যেই জোরে বৃষ্টিটা নামে,
কোথায় মাঠের শেষ আকাশের সুরু
বোঝা যায় নাক
দৃষ্টিটা থামে।

সাতাশজন পত্নীর মধ্যে একমাত্র রোহিণীই চন্দ্রের প্রেয়সী কেন এবং কেনই বা তাঁকে রোহিণীতে পুনঃ পুনঃ উপগত হতে দেখা যায়, তার সুসঙ্গত ব্যাখ্যা * করেছেন আচার্য যোগেশচন্দ্র তাঁর 'পৌরাণিক কাহিনী' নামক গ্রন্থে। তিনি বলেন, রোহিণী নক্ষত্র রবিপথ থেকে ৩ ডিগ্রী অংশ ও ৬ ডিগ্রী অংশের মধ্যে অবস্থিত বলে চন্দ্র কর্তৃক আচ্ছাদিত হতে পারে না। চন্দ্রের রশ্মিতে তার নিকটবর্তী সব তারাই অদৃশ্য হয়ে যায়, হয় না শুধু মঘা আর রোহিণী। কিন্তু মঘা অপেক্ষা রোহিণী ঢের বেশী উজ্জ্বল বলে রোহিণী-চন্দ্র সমাগম অতি অনায়াসে সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ গোচর হয়।

আকাশে এই চন্দ্র-রোহিণীর মিলন-দৃশ্য যে কি নয়নানন্দকর, তা' নক্ষত্রদর্শীরা জানেন। এই দৃশ্য যে রূপরসিক মহাকবির দৃষ্টিকে বিমুগ্ধ করেছিল, সে পরিচয় পাই বিক্রমোর্বশী নাটকের নানা স্থানে।

কাশীরাজ-কন্যা ঔশীনরী চন্দ্রালোকিত নিশীথে মণিহর্ম্য প্রাসাদে এসেছেন প্রিয়-প্রসাধন ব্রতের অনুষ্ঠান করতে। ব্রত উদযাপনের পর, চাঁদের পানে তাকিয়ে প্রিয় সখিকে তিনি বলছেন :

"এসো রোহিণীজোত্তণ অহিঅং সোহদি ভঅবং মিঅলঞ্ছন।"

অর্থাৎ, "রোহিণীর সহিত মিলিত হওয়াতে আজ চাঁদের কি অপূর্ব শোভাই না হয়েছে।"

রাজাকে পূজা করে তাঁকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণামান্তে দেবী ঔশীনরী বললেন :

"এসা দেবদাম্পদুং রোহিণীমিঅলঞ্ছনং সক্খী-করিঅ অজ্জউত্তং অনুপ্ পসাদেমি।"

অর্থাৎ, এই আকাশবিহারী রোহিণী এবং রোহিণী-পতি চন্দ্রদেব এই দেবদম্পতিকে সাক্ষী রেখে আমি আর্যপুত্রের প্রসন্নতাবিধানের জন্য শপথ করছি।

এই পরম শুভলগ্নে সখী নিপুণিকা পাটরাণীকে বলছে :

প্রিয় মিলনের লগ্ন এসেছে
দেবী, এ মাধবী রাতে।"
কহে নিপুণিকা, "অয়ি বরাননে!
জাগো মধু নিশা প্রিয়তম সনে
যাবৎ রোহিণী জ্যোৎস্না গগনে
বিরাজে চন্দ্র সাথে।"

(**বিক্রমোর্বশী :** কুঞ্জরাম ভট্টাচার্যের অনুবাদ)

রোহিণী নক্ষত্র যে রাশিতে আছে সেই বৃষ রাশির এবং কর্কট রাশির মাঝখানে মিথুন রাশির অবস্থান। এই রাশিতে পাশাপাশি অবস্থিত ক্যাষ্টর (Castor) এবং পোলাক্স (Pollux) নামক তারা দুটিকে সহজেই চিনতে পারা যায়, কেননা সমগ্র উত্তর আকাশে এত কাছাকাছি এমন দীপ্তিমান তারকা যুগল আর নেই। উত্তরেরটির নাম ক্যাষ্টর আর দক্ষিণেরটির নাম পোলাক্স। এই তারকাদ্বয়ের মধ্যে পোলাক্সই হচ্ছে প্রথম প্রভার তারা ক্যাষ্টর দ্বিতীয় প্রভার।

আমাদের জ্যোতিষে এই উজ্জ্বল প্রভাবান তারকা দুটির নাম পুনর্বসুদ্বয়। কালিদাস এই তারকা যুগলকে চিনতেন। রঘুবংশে তিনি রাম-লক্ষ্মণকে পুনর্বসুদ্বয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

রাজর্ষি জনকের নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে বিশ্বামিত্র মুনি রাম-লক্ষ্মণকে সঙ্গে করে রাজধানী মিথিলার নিকটে মহাতপা গৌতম মুনির আশ্রমে গিয়ে পৌঁছলেন, এই সংবাদ পেয়েই জনকরাজা তাঁর প্রত্যুদগমন করবার জন্যে পাদ্য অর্ঘ্য সহ প্রজাপুঞ্জ পরিবৃত হয়ে অগ্রসর হলেন : তখন :

তৌ বিদেহনগরী-নিবাসিনাং গাং গতাবিব
দিবঃ পুনর্বসূ। রঘুবংশ ১১।৩৬

অর্থাৎ মিথিলাবাসিগণ গগনমণ্ডল থেকে ভূতলে অবতীর্ণ পুনর্বসুযুগল সদৃশ ভ্রাতৃদ্বয়কে সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

আকাশ পটে পাশাপাশি অবস্থিত প্রায় সমপ্রভ পুনর্বসুদ্বয় বা ক্যাষ্টর এবং পোলাক্স যাঁরা চেনেন, তাঁরাই শুধু বুঝতে পারবেন কিরূপ সুপ্রযুক্ত হয়েছে মহাকবির এই উপমা।

রঘুবংশে কালিদাস গ্রহদের সঙ্গেও রাম-লক্ষ্মণের তুলনা করেছেন।

লঙ্কা বিজয়ের পর রাম সীতাকে নিয়ে পুষ্পক বিমানে আরোহণ করে অযোধ্যার উদ্দেশে রওনা হলেন। দীর্ঘ আকাশ পথ অতিক্রমণের পর বিমান এসে অবতীর্ণ হল অযোধ্যার সরযূতীরে। ভরতের সঙ্গে সরযূতীরে সমাগত প্রজাপুঞ্জ বিস্ময় সহকারে সেই বিমান দেখতে লাগল। রামচন্দ্র বিমান থেকে অবতরণ করলেন। ভরতের সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলন হল। তার পর :

ভূয়স্ততো রঘুপতির্বিলসৎ পতাকা মধ্যাস্ত কামগতি

সাবরজো বিমানম্।
দোষাতনং বুধ বৃহস্পতি যোগ দৃশ্য স্তারাপতি-স্তরল
বিদ্যুং দিবাভ্রবৃন্দম্।।
রঘুবংশ ১৩।৭৬

অর্থাৎ, তদনন্তর রামচন্দ্র ভরত ও লক্ষ্মণের সহিত পতাকাশোভিত একখানি রথে পুনরায় আরূঢ় হলেন। দেখে মনে হল যেন তারাপতি চন্দ্র বুধ ও গুরুর সহিত সংযোগ স্থাপন করে নৈশ আকাশের বিদ্যুৎঝলকিত মেঘপুঞ্জে আরোহণ করলেন।

এক রাশিতে বা নক্ষত্র মণ্ডলে বৃহস্পতি শুক্রের মত দুইটি দীপ্তিশালী গ্রহ, অথবা চন্দ্র বৃহস্পতির সহাবস্থানে নৈশ আকাশের পটে যে কি অপূর্ব শোভার সঞ্চার হয়, তা কেবলমাত্র গ্রহনক্ষত্র-দর্শীরাই জানেন। ১৯৫৭ সালে বৃহস্পতি শুক্রের একত্রে অবস্থিতি রাতের আকাশকে এক অপূর্ব গরিমায় প্রদীপ্ত করে তুলেছিল। কালিদাসও হয় তো সুদূর অতীতে কোনো এক বিশেষ সময়ে চন্দ্র বৃহস্পতি এবং বুধ এই গ্রহত্রয়ের সহাবস্থান প্রত্যক্ষ করে মুগ্ধ বিস্ময়ে আত্মহারা হয়েছিলেন। তাই এই শ্রীর সঙ্গে তুলনা দিতে গিয়ে সেই ছবিটিই ভেসে উঠেছিল তাঁর মানসপটে। আর এ হচ্ছে নিশাগমের সময়কার বা নিশাবসানকালের আকাশের ছবি। কেননা বুধ রবিকে ছেড়ে কখনো ২৮ অংশের বেশী দূরে যায় না বলে সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে এবং সূর্যোদয়ের আগে পূর্বাকাশে এর খোঁজ করতে হয়, অন্য সময়ে বুধ বড় একটা দৃষ্টিগোচর হয় না।

কালিদাসের কাব্য-নাটকের যে সকল শ্লোকে এবং সংলাপে গ্রহনক্ষত্রের কথা আছে সেগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে মহাকবির জ্যোতিষিক জ্ঞান শুধু পুস্তকলব্ধই ছিল না, আকাশ পর্যবেক্ষণ তিনি করতেন এবং গ্রহনক্ষত্রদের সঙ্গে ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয়। ছায়াপথের নিরুপম শোভা, চন্দ্র রোহিণীর মিলন পুনর্বসুদ্বয়ের নিকটাবস্থান, বৃহস্পতি চন্দ্র বুধের এক রাশিতে অবস্থিতি এ সকল আন্তরীক্ষ দৃশ্য যে তাঁর কল্পনাকে কতখানি উদ্বুদ্ধ করেছিল সে পরিচয় কতকটা পাওয়া যায় তাঁর কাব্য নাটকাদিতে। এবং যে সকল শ্লোকে জ্যোতিষ্কসমূহের কথা বলা হয়েছে সেগুলির পরিপূর্ণ রসোপলব্ধি শুধু তাঁরাই করতে সক্ষম হবেন, যাঁদের মোটামুটি এক-রকম নক্ষত্র পরিচয় হয়েছে।

আতিথ্য

কৃষ্ণকলি

কোন এক সম্পূর্ণ অজানা অচেনা পরিবেশের মধ্যে আমাদের নামিয়ে দিয়ে, রাশি রাশি ধোঁয়া উড়িয়ে গাড়ীটা যখন চোখের পলক ফেলারও আগে অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন মনে হলো এমনভাবে দল ছাড়া করে শূন্যের মধ্যে আমাদের হারিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া ওর উচিত হলো না। আমরা শুধু নীরব অসহায় দৃষ্টি মেলে ওর গমন পথের দিকে চেয়ে রইলাম। সারা পথটা হঠাৎ কেমন খাপছাড়াভাবে উদ্বেলিত হয়ে ধাবমান যন্ত্রযানটার পিছু পিছু ছুটে চললো। মনে হলো, ও যেন লোহ ইস্পাত প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত কোন অচেতন পদার্থ নয়, ও যেন আমাদেরই স্নেহে প্রেমে ভালবাসায় রক্তমাংসের তৈরী কোন নিকট আত্মজন। এতক্ষণ গভীর মমতায় ওর পক্ষপুটে আগলে নিয়ে এসে, হঠাৎ এই দুর্যোগপূর্ণ জনহীন পরিবেশে এমন একান্ত অসহায়ের মাঝে ফেলে চলে গেল কেন? আমরা বেহিসাবী বাউণ্ডুলে যাই হই, তবু আমরা প্রাণের স্পন্দন চাই, জীবন চাই, ছন্দ চাই। মৃত্যুর সংগে এমন করে মুখোমুখি দাঁড়াবার আমাদের সাহস নেই, ধৈর্য নেই, প্রয়োজনও নেই। বন্ধু যে চলে গেল, তাকে পাই কোথা? যে নীরব উপেক্ষায় মুখ ফেরাল, তার কাছে চাইবার মত আমাদের কিছু থাকলেও আমাদের নিতে বাধে। সুতরাং, আমরা ভয়সন্ত্রস্ত মনে আকাশের দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়েই রইলাম।

অতি প্রত্যুষের আকাশ আঁধার অন্ধকার করে গুরু গুরু মেঘ-ডম্বরু বেজে চলেছে সমানে। ঊর্ধ্ব গগনের ঘষা কাঁচের আলোয় চারিদিক যেন মৃত্যু নগরীর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। ঝমঝমে বৃষ্টির তীর ভেদ করে দৃষ্টি বেশী দূরে যায় না। জনমানবহীন শূন্যের মাঝে চোখে পড়ছে না, প্রায় এমনই সাইনবোর্ড বিহীন দু-একখানা দোকান ঘর। ভগ্ন জীর্ণ এখানে ওখানে খাপছাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকা পোড়ো বাড়ীর অবস্থিতি, এরই মাঝে, দূর হতে দূরে মিলিয়ে যাওয়া রেল গাড়ীর ঝিক্ ঝিক্ আওয়াজ, সব মিলিয়ে মিশিয়ে যেমনই বিচিত্র, তেমনই সংশয়াকুল। এমন দলভ্রষ্ট, সঙ্গচ্যুত, অসহায়া অবস্থায় কখনও পড়িনি। বুকের মধ্যে ভয়ের বাসা কেমন দানা বেঁধে উঠছে। বাস্তব যে এত ভীতিপূর্ণ এ খেয়াল আমাদের ছিল না। এই আকাশ আর প্রান্তর জুড়ে হুড়মুড় করে হঠাৎ আসা অঝরে বৃষ্টি আমাদের চিন্তিত ব্যাকুল ও উদ্বেগপূর্ণ করে তুললো।

হু হু হাওয়ার একটানা শো শো শব্দ বুকের মধ্যে কাঁপুনি ধরাচ্ছে। কি একটা হবে, কি একটা হতে চলেছে, যা থেকে আমাদের পরিত্রাণ নেই।—রোজাবেলা'র ইভ্‌ল সাইন্‌স্‌-এর কথা মনে আছে তোমার?

কথাটা যখন মনের ভিতর শিকড় গেড়ে বসে ভয়ের কথাটা তখনই বেশী করে মনে পড়ে। জগতে যত কিছু ভয়ের জন্ম সবই দুর্বল মনের কাল্পনিক পরিস্থিতি থেকে উদ্ভব। পরিবেশ আমাদের দুর্বল করেছে, কেউ কোথাও নেই, বিশ্ব দুনিয়া যেন ডুবে যাচ্ছে—ভেসে যাচ্ছে—তারই মাঝে আমরা নিতান্তই অসহায় দুটি প্রাণী। বেঁচে থাকার জন্য চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না, পারবো না। প্লাবন আর দুর্যোগ সব কিছুর মত আমাদেরও গ্রাস করবে। গ্রাস করার জন্য ধ্বংস করার জন্য ছুটে আসছে—এই মানসিক বোধ আমাদের ভীত সন্ত্রস্ত ও দুর্বল করে তুলেছিল। সুতরাং অতি অপ্রিয় সত্য ভাষণ, কোথাকার কোন বইয়ের পাতায় পড়া ভয়সংকুল দৃশ্যের অবতারণায়, বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠলেও, ভাঁড়ামি দেখাতে গেল এবং তারই বাহ্য প্রকাশস্বরূপ মহাকবির একান্তই এ অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কবিতা—ঐ আসে, ঐ অতি ভৈরব হরষে, জল সিঞ্চিত, ক্ষিতি সৌরভ রভসে—আওড়াতে যেয়ে গলা দিয়ে না বেরুলো সুর না কথা। মুখের বাক্য আর মনের ভাষা দুটি বিভিন্ন ধারায় বইলে, সুর ছন্দ ও মাধুর্য যে কতখানি পৃথক হয়ে যায়, সেদিন বুঝলাম।

ঐ আসে, ঐ অতি ভৈরব হরষে—এর যে কি রূপ, সে যে কি বস্তু, সে আসার যে কি ভয়ঙ্কর মৃত্যুঞ্জয়ী সুষমা, না জেনেই আমরা ঘরের কোণে বসে কবিতা মুখস্থ করে এসেছি এ যাবৎ। আজ বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারলাম, সেই এসে পড়া কি ভীষণ বস্তু।

কিন্তু এ আমরাই বা এলাম কোথা। স্থান কাল আর পাত্রের কোথাও কোন উদ্দেশ্যের সন্ধান না দিয়েই বাষ্পযান যে আমাদের এমন করে ফেলে পালাল, সেই আমরা এমন ঘন দুর্যোগে কোথায় কার কাছে যেয়ে দাঁড়াই, কার কাছে সাহায্য ভিক্ষা করি। মানুষ আর তার স্নেহপূর্ণ প্রসারিত হাত, আমাদের এ দুটোই যে বড় প্রয়োজন।

অন্ধের মত এদিক-ওদিক দৃষ্টি ঘোরাতে ফিরাতে যেয়ে নজরে পড়লো প্রান্তরের মাঝে, মালুম পাওয়া যায় না, এমনই একটা দোকানে ঝাঁপ উঠছে। হঠাৎ মানুষের অস্তিত্বের পরিচয়ে নিবন্ত মনটা চকিত হোল। ওখানে যেয়ে বসলে, আর কিছু না হোক, একটুখানি আচ্ছাদন পাওয়া যেতে পারে অন্তত।

মানুষের, বিশেষ করে বিপদগ্রস্ত মানুষের উপস্থিতিতে দোকানী প্রফুল্ল হোল না। শুধু ওর নীরব মুখখানা আরও বেশী কঠিন হয়ে আমাদের নজরে পড়লো। টিনের চালার আচ্ছাদনে গড়ে উঠেছে অতি অপলকভাবে এই দোকান ঘরখানা। দুখানা পাশাপাশি তক্তপোষ পাতা। একখানা তক্তপোষের সামনে দুটি কাঁচের ঢাকনা দেওয়া পাত্র। তার একটার মধ্যে বহুদিনের পড়ে থাকা বিবর্ণ খানকয়েক পাঁউরুটি, অপরটায় সামান্য কয়েকটি বাতাসা, একটি মুখখোলা কালো কৌটায় মাখনের অবশিষ্টাংশ নজরে পড়ছে। ঝাঁপ তুলে খদ্দের বিহীন দোকানী একখানা সিনেমা পত্রিকায় অতি নিবিষ্টভাবে ডুব দিয়েছে।

অপর তক্তপোষের মালিক নিঃসন্দেহে দরজী। খান চারপাঁচ ময়লা ছিট একটা দড়িতে ছড়ান রয়েছে এবং মরচে ধরা ক্ষয়পড়া সেলায়ের কল টেলারিংএর সমস্ত স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। বিনা আমন্ত্রণে আমরা কমবাইন্ড রেস্টুরান্ট এণ্ড টেলারিং শপের তক্তপোষের একধারে পা ঝুলিয়ে বসলাম।

কিন্তু আকাশে এত জল ছিল কোথায়। শুকনো খটখটে পরিচ্ছন্ন আকাশ এমন বিদীর্ণ হয়ে চলে পড়ছে কেন? পৃথিবীর বুকে মানুষ জন কলকোলাহলমুখর প্রাণের স্পন্দন প্রভৃতি জীবনের সকল চিহ্ন কি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায় অদৃশ্য কোন নিষ্ঠুর রচয়িতা।

মাথার উপর টিনের শেডের ছেঁদা দিয়ে গায়ে মাথায় জল গড়িয়ে পড়ছে। অদূরে একটা চায়ের খদ্দেরবিহীন দোকানে গনগনে উনুনে বসানো কেটলিটা দিয়ে হু হু শব্দে ধোঁয়া উঠে দূরে শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। চায়ের দোকানের খানিক পাশেই টিনের শেডের তলায় সাইনবোর্ড ঝুলছে—"দি বঙ্গলক্ষ্মী, জুয়েলারী হাউস্।" খাঁটি সোনার ও আসল হীরা-জহরতের নানাবিধ গহনা বিক্রয়ার্থ সব সময়ই মজুত থাকে।

হীরা জহরতের টিনের জন্য সর্বদিক দিয়েই আঁটঘাট বন্ধ। সমস্ত [illegible] দোকানীর দাজানের [illegible]

মুটেরা মাথার উপর তরকারীর বোঝা চাপিয়ে ছুটে ছুটে চলেছে সেই পথ দিয়ে। জলে ঝড়ে কাদায় তাদের অবস্থা অতি কাহিল। এ দুর্যোগে কোন জীবজন্তুও পথে নামেনি। কিন্তু যারা নেমেছে দেখা যাচ্ছে, মনুষ্য নামধেয় জীব ছাড়া তারাও অপর কিছু নয়।

না দেখেও বুঝতে পারছি, পিছন হতে পড়ুয়া দোকানীর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি আমাদের পিঠে তীরের মত বিঁধছে। মানুষের অবজ্ঞা আর অবহেলার চাইতে আমাদের ঝড় ভাল, ঝন্ঝা ভাল তুফান ভাল। সুতরাং দোকান ছেড়ে আমরা পথে নামলাম। উপেক্ষার মাঝে বেঁচে থাকার চাইতে আহ্বানের মধ্যে মৃত্যুও শ্রেয়।

পথ চলার একটা নেশা আছে, আনন্দ আছে। এ চলা বাধাহীন বল্গাহীন মুক্তি, শুধু মুক্তি নয়, যৌবনের মুক্ত ধারাও। পথের মাঝের হু-হু শব্দের হাওয়ার ঝাপটা ধাক্কা মেরে যাচ্ছে। গোঁ গোঁ শব্দে কোথাকার কোন্ দৈত্যপুরের কোন্ দানবের হঠাৎ জাগার ক্রুদ্ধ গর্জন কানে যেন তালা ধরায়। পথের ধারে কোন এক বড় মানুষের ভগ্ন জীর্ণ বাগান বাড়ীর দেওয়াল ঘেঁষে একটি পরিবার ঘর বেঁধেছে। দাঁড়াতে হোল ওদের নব গঠিত দুয়ারের সামনে।

হাত পাঁচ-সাত উঁচু করে ত্রিপল দিয়ে তৈরী বাসা। তিনদিকে আচ্ছাদন, সামনের দিক খোলা। ভিতরে কতগুলি কিলবিলে মানুষ অসহায় দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে সামনের পানে। দেখছে প্রকৃতির ঘনঘটা। এরা জন্তু নয়, মানুষ। মানুষ বলেই যৌবনের এত উপেক্ষিত অবহেলিত। সমস্ত দুর্যোগে মহামারীর দুর্ভিক্ষ আর হতাশার পথ আঁকড়িয়ে আঁকড়িয়ে মানুষই পারে বাঁচতে। সেই জন্যেই এরা এত নিপীড়িত হতাদরের পথের জঞ্জালের চাইতেও তুচ্ছতম বস্তু।

—ভিতরে এসে দাঁড়াবেন? বাইরে বড় ভিজছেন।

কুণ্ঠিত ভীত মানুষগুলি আহ্বান জানাচ্ছে। এদের নিজেদের স্থান নেই বলেই, স্থান দিতে এত আগ্রহী। যার কিছু নেই, সেই দিতে চায়। কিন্তু এই আতিথ্য আমরা নেই কি করে? পথ আমাদের টানছে। সুখ সম্ভোগ স্থান আর ঠিকানা আমাদের পিঠে চাবুক মারে।

মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া আমাদের গায়ে ছুঁচ বেঁধাচ্ছে। তারই অনুকূল বাতাসে ভর দিয়ে আমরা চলেছি—তো চলেছি। সেই দূরে অনেক দূরের পথে। সে পথ আমরা জানিনে, চিনিনে, ঠিক আর ঠিকানা হতে অনেক ঘুরে পথে ঘুরে সে পথের বাঁকের যে কোথায় শেষ আর কোথায় সীমানা, আমরা কিছু জানিনে, আমরা শুধু চলেছি।

শিশুকালে দিদিমার মুখে গল্প শুনেছিলাম সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারের এক রাজ্য। সেখানে সব আছে, শুধু জীবন নেই, প্রাণ-চাঞ্চল্যহীন রাজপুরীর সবাই গভীর ঘুমে অচেতন। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা বার-বার সেই গল্পই স্মরণ করাচ্ছে। হঠাৎ এসে পড়া তেপান্তরের মাঠ ভেঙে আমরাও যেন তেমনই চলেছি ঘুমন্ত নগরীর সন্ধানে, হাতে আমাদের মরণকাঠি জীয়নকাঠি। যদি পারি, যদি ক্ষমতায় কুলায় আমরা আমাদের হাতের যাদুদণ্ডে মৃত্যু-পুরীর ঘুম ভাঙ্গাব।

কৌতূহল আর কৌতুক এক জায়গায় এসে ধাক্কা খেল। প্রতিক্ষণের সীমাহীন ধারণা আমাদের ভাঙ্গালো। জীবন নেই নয়, জীবন আছে। দূরে, অনেক দূরে ঘন সবুজ ঘাসের গালিচা বিছানো জমির উপর অজস্র জিনিয়ার অপূর্ব সম্ভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। অবাধ অনন্ত দিকদিগন্তে মাথা তুলে হেলেদুলে লাল, নীল, হলুদ, [illegible] জিনিয়াগুলি নাচছে। ওদের নৃত্যপর সভায় যাবার আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, গভীর ছলনায় হাতছানি দিচ্ছে, আমাদের ডাকছে। কিন্তু যাব কি করে? কঠিন কাঁটা তারের বেড়া আমাদের রোধ করে রয়েছে।—মালী—

কণ্ঠস্বরের রেশটা তরঙ্গায়িত হয়ে, দূরে, বহুদূরে প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়লো। একবার, দুবার, তিনবার। বড়লোকের সুসজ্জিত বাগান-বাড়ীর একধারে নড়বড়ে জীর্ণ একখানা কুটির হতে হাফপ্যান্ট হাফসার্ট মাথায় টুপি একজন সামনে এসে দাঁড়াল—আপনারা মালীকে খুঁজছেন?

—আমরা ফুল নেব, জিনিয়া।

লোকটি প্রাণখুলে হাসলো,—ফুলে হাত দেওয়া তো নিষেধ।

—নিষেধ বলেই তো নেব। কাঁটা তারের বেড়া আমাদের ভিতরে যাবার পথ বন্ধ করেছে। তাই মালীকে ডাকছি।

—আমিই মালী। হলদে রং, মাথায় কুচো কুচো চুল, মুখের মাঝে হারিয়ে যাওয়া অতি ক্ষুদ্র চোখ, প্রাণখোলা হাসি,—সমস্ত মিলিয়ে আকর্ষক চরিত্র মানুষ।

—তোমার নাম কি মালী? তোমার বাড়ী কোথা?

বীর বাহাদুর। দার্জিলিং আমার বাড়ী। কিন্তু আপনারা যে বড্ড ভিজে গিয়েছেন। এমন দুর্যোগে কি পথে বেরয়।

—আচ্ছা, বীর বাহাদুর, পথে যখন বেরিয়েছি, তখন পথের মানুষের বাড়ে আশ্রয় নিলে কেমন হয়।

—ভালই হয়। হাসির ধমকে মালীর হলদে রং লাল হয়ে উঠলো। ও যেন কখনও এমন আশ্চর্য কথা শোনেনি। বললো—কিন্তু এখানে তেমন মানুষ কোথা? এটা যে অসময়, কেউ তো জেগে নেই, সবাই যে ঘুমিয়ে রয়েছে। আপনাদের ডাক তাদের কানে পৌঁছবে কেন?

—ঠিক যেমন করে তোমার কানে পৌঁছলো। বীরবাহাদুর, আশ্রয় আর আতিথ্য যদি নিতেই হয়, তবে তোমার কাছেই চেয়ে নেব।

—তেমন সৌভাগ্য কি আমার হবে! আচ্ছা, একটু দাঁড়ান, আমি আপনাদের জিনিয়াগুলো নিয়ে আসি।

নেপালী বীরবাহাদুর মাথার টুপি ঘাসের উপর ফেলে ছুটে চলে গেল জিনিয়া তুলতে। ধারে কাছে কোথাও মানুষ নেই, কোথাকার কোন ধনীর বিলাস নিকুঞ্জ এটি, আমরা জানিনে, জানার প্রয়োজনও নেই। তবে দেখলাম, এ বিলাসকুঞ্জকে প্রাণ দিয়ে প্রাণবন্ত করে রেখেছে, একটা মানুষ, বীর বাহাদুর। তার কোন সুদূর দার্জিলিংএ ঘর-সংসার রয়ে গিয়েছে। সেখানে আছে বউ, ছেলে, মেয়ে, প্রিয়জন। কতদিন, কত বছর পরে একদিন দুদিনের জন্য তাদের সঙ্গে দেখা হয়, কি হয় না। সঙ্গীহীন, আত্মীয়স্বজন বান্ধবহীন, বীর বাহাদুরের মস্তবড় মন কঠিন কাঁটা তারের বেড়ার মত আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে, সব কিছু হতে, মাত্র সামান্য কিছু অর্থের মূল্যে।

মানুষ না থাক, মানুষের অস্তিত্বকে ভর করে মানুষ। বীরবাহাদুর ভয়চকিত দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে অজস্র জিনিয়া তুলে আনলো। কিন্তু লাল নীল হলুদের অপূর্ব সৌন্দর্যযুক্ত ফুলগুলি, যা এতক্ষণ প্রাণচাঞ্চল্যে উল্লাস ভরে প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে হেলছিল দুলছিল ভাসছিল,—তার এই মৃত, পঙ্গু, স্থির অবস্থিতি ভারাক্রান্ত করলো,—বীর বাহাদুর এত জিনিয়া তুললে, তোমায় কেউ বকবে না।

—এ জিনিয়া তো আমিই ফুটিয়েছি।

বীর বাহাদুর শব্দ হাসে। উদার অনন্ত প্রকৃতির সঙ্গে বীর বাহাদুরের হাসি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আকাশের ঝরো ঝরো জল, দুন্দুভি হাওয়ার গর্জন, অসংখ্য জিনিয়ার নৃত্যের সঙ্গে, বীর বাহাদুরের হাসি না থাকলে অনেকখানি ফাঁক আর ফাঁকি থেকে যেত।

—বীর বাহাদুর, তোমার ঘর কোথায় এখানে?

—ঐ যে—একটি ভাঙ্গা টালির শেডে ছাওয়া জরাজীর্ণ ঘরের দিকে আঙ্গুল দেখালো বীর বাহাদুর। ঐ ঘর থেকেই বেরতে দেখেছিলাম বটে ওকে। এ ঘরকে, ঘর বললে ভুল হয়। রাতের চাঁদ, দিনের সূর্য, বর্ষার বৃষ্টি, ঝড়ে উড়ে আসা জঞ্জাল নিয়ে—সব কিছুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এ কুটির, বড়লোকের বাগান-বাড়ীর ফুল রক্ষক বীর বাহাদুরের।

একটি বৃদ্ধা কাঁধে কলসী নিয়ে মুখে হরিনাম করতে করতে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ওর গমন পথের ছপ-ছপ চলার ধ্বনি এক সময় দূরে মিলাল,—বীর বাহাদুর, এখানে কি কোথাও নদী আছে?

—ঐ যে রাস্তাটা সোজা চলে গিয়েছে, ওরই সমান রাস্তা ধরে, বাঁ দিকে বাঁক ঘুরলে, ও-পাশে গঙ্গা।

—তবে আমরা সেখানেই যাই।

—আপনারা যে বসবেন বলেছিলেন।

—ফিরে এসে বসবো। আর শোন, তোমার কথা আমরা কখনও ভুলবো না।

আমাদের মুখের কথাটা বীর বাহাদুরের কানে গেল কিনা জানা হোল না। বীর বাহাদুরের মুখের হাসি দিকে-দিগন্তে ছড়ালো কিনা শোনা গেল না। শুধু আমাদের কণ্ঠের ধ্বনি বাতাসের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল।

সোজা পথের ধাঁধা ছেড়ে, অনেক ঘুর পথ আর ভুল পথের নির্দেশ অতিক্রম করে এসে পৌঁছলাম। সামনে অনন্ত অবারিত গঙ্গা। গেরুয়া জল কুলু-কুলু করে বয়ে চলেছে তার

শেষের রাত্রি

আনন্দ বাগচী

কাল কালিন্দীর মত
ঝাপসা ওই পথটুকু দেখি,
বাইরে শুধু বাঁধা আর বাঁধা,
শুধু জল আর জল
ট্রাম-বাস ছুটছে শুধু
অবয়ব হীন অন্ধকারে
রজনী শাওন ঘন
হল আজ অন্তরে বাহিরে।
ছোট্ট চিঠি হাতে নিয়ে
বসে আছি, লণ্ঠনের আলো
স্মৃতির হৃদয় জুড়ে জ্বলছে,
হাসপাতালে এখন
সমস্ত অসুস্থ মুখে
ছায়াচ্ছন্ন স্থবিরতা।
ফাটা বোতলের আভা
টেবিলে জ্বলছে রক্তমুখী,
বহুরূপী শিশি, গ্লাস,
কমলা কি আঙুর
আজ মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
মৃত্যু, আঙিনার মাঝে
অভিসারী বন্ধু ভেজে : ছোট্ট চিঠি :
অদ্য শেষ রজনী আমার
প্রীতিভাজনেষু, তুমি কাল আসবে,
কাল জেনেছি তা।

কোন অনির্দিষ্ট যাত্রাপথে। ভরা বর্ষার জোয়ারে জল দুকূল ছাপিয়ে উপচে পড়ছে। কাদা জল আর পাঁকের রাস্তা বেয়ে কিছু দূরে খানকয়েক বিরাট বিরাট নৌকো নোঙর করে রয়েছে। দুর্যোগের ঘনঘটায় স্নানার্থীরা আজ আসেনি। কেউ। আকাশ-বাতাস আরও আঁধার আর অন্ধকারে ছেয়ে যাচ্ছে। পরপার, মেঘে-ঢাকা যেন অপর কোন রাজ্য। ছবি, ছায়াময়, অস্পষ্ট, ঘন কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। সবটাই যেন নূতন; ভয়ংকর কিছু একটা হবে তারই পূর্ব প্রস্তুতির সাজসজ্জা আড়ম্বর। জীবনটা যেন কিছু নয়, সবটাই শুধু খেলা-ভাঙ্গার খেলা। কোথাও জীবন নেই, তার স্পন্দন নেই, তবু দূরে পায়ের কাছে ভাঙ্গা চিনেবাদামের খোলা। রাশি রাশি পরিত্যক্ত ফুল, ভেসে আসা ফুল, সব কেমন যেন এক হয়ে গিয়েছে।

পিচ্ছল পথে পা টিপে টিপে, কাদার ভিতর দিয়ে দূরে ছৈ বাধা নৌকাগুলির অদৃশ্য হাতছানি শত বাহু মেলে আকর্ষণ করছে। ওরা ডাকছে, সাদরে আহ্বান আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

শক্ত কঠিন বাঁশের পাটাতনে দৌড়-ঝাঁপের আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গেছে জলচর মাঝিকুলের,—কে? নৌকোর উপর দুপদাপ করে কে?

ভয় নেই গো মাঝি, আমরা।

ভয়ার্ত মাঝি মুখ বার করলো ছৈ-এর ভিতর থেকে,—আপনারা? কোথা থেকে আইছেন?

—সে অনেক দূর থেকে।

—তা বসেন! জলের ভিতর ভিজেটিজে, এ যে দেখি একসা কাণ্ড। অসুখ বিসুখ করার ভয় নেই।

—না। অসুখ করার জন্যে ভয় করে না মাঝি, ভয় করে অসুখ হলে কেউ ভাববে কি না ভেবে। তোমার কি দেশ ঘর-বাড়ী নেই?

মুখে লম্বা দাড়ি, মাথায় পাকা চুলের রাশ করিম মাঝি আসন দিয়ে ওর হুঁকো ধরাতে ধরাতে বললো—ছিল, মাদারীপুরে, পাকিস্থানে। আজ আর কিছু নেই।

—তোমার ছেলেমেয়ে বউ? তারা কেউ নেই?

—আছে। এই নৌকো, জাল, আর সামনের ঐ জল।

একলা একলা থাক, তোমার ভয় করে না করিম মাঝি?

—ভয় কি! মানুষের চাইতে জল অনেক ভাল। এরা বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবু এদের চেনা যায়।

পাশ দিয়ে কুল-কুল শব্দে ছুটে চলেছে জলরাশি। করিমের বন্ধু, আত্মজন, চিরদিনের চেনা জানা। এরা বিশ্বাসঘাতকতা করলেও এদের চেনা যায়। এরা যা করে, তা জানিয়ে করে। এরা ছলনা জানে না, চাতুরী জানে না। এরা সহজ সরল সাধারণ।

এই সহজ সরল সাধারণের কাছে আতিথ্য নিলে কেমন হয়? এদের সঙ্গে বন্ধুত্বের রাখী বাঁধলে তা কি করিম মাঝির মত চিরকাল চিরদিন অম্লান থাকবে না। করিমের যখন থাকে, আমাদের তখন থাকবে না কেন? করিম কি জিনিষ পেয়েছে, সে কত বড় প্রাপ্য যা সমাজ-সংসার আত্মজনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নদীর সঙ্গে এমন নিবিড় আত্মীয়তার নিগড়ে বেঁধে রেখেছে।

দৃষ্টি আছড়ে যেয়ে পড়লো। অবাধ অনন্ত গেরুয়া জলরাশি ছুটে চলেছে—চলেছে—চলেছে। কোথায় ওর গতি, কোথায় শেষ, কিছু জানা নেই, তবু যাচ্ছে। এই যাবার সাথী হতে গভীর ছলনায় ও হাতছানি দিচ্ছে। ওর সঙ্গে একাত্ম হতে, গভীর বাঁধনে বাঁধতে যাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। ও কি জেনেছে ছন্নছাড়া গৃহভ্রষ্ট কক্ষচ্যুত আমরাও ওর সঙ্গে এক হতে চাই? অনেক পথ আর অনেক পরিশ্রম করেছি আমরা সে জন্য। অনেক সুখ সৌভাগ্যকে পিছনে ফেলে—বাহির হয়েছি, অনন্ত-শয়ন করিয়া হেলা, রাত্রিবেলা।—ও কি জেনেছে?

সারা অন্তরটা যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে। যা চেয়েছিলাম, সেটা যে কি, জানতাম না। কিন্তু জেনেছি। এই মুহূর্তে, এইক্ষণে, আমরা যাব, নিশ্চয়ই যাব। এমন সুযোগ, এমন পরমক্ষণ হেলায় অতিবাহিত করার আমাদের সময় নেই, ইচ্ছা নেই।

করিম মাঝি বাধা দিল—চললেন কেন? বসেন!

আসছি মাঝি, একটু দাঁড়াও।

হড়হড়ে কাদা, ভাঙ্গা ইঁটের টুকরো ডিঙ্গিয়ে চলতে গেলে হোঁচট খেয়ে পড়তে হয়। কত জায়গা ছিঁড়লো, ক্ষত হলো, রক্ত ঝরলো। তা হোক, জীবনে অনেক ক্ষতের সঞ্চয় নিয়েই চলার পথে চলতে হবে।

অতি প্রত্যুষের দুর্যোগপূর্ণ জনহীন ঘাটে একটি মাত্র বৃদ্ধ স্নান করছিল। জপ আর ধ্যান সেরে সেও চলে গেল তার ঝোলাঝুলিসহ। নির্জনতা এবার সম্পূর্ণ হোল। ঠিক এইটুকুই যেন প্রয়োজন ছিল। ঘাটের অতি পিছল পথ বেয়ে জলের ধারে নেমে পড়লাম। বর্ষার জল কূলে-কূলে ভরে উঠেছে। পায়ের উপর আছড়ে আছড়ে পড়ছে। ছলাৎ ছলাৎ করে পায়ের তলাটা ভাসিয়ে দিয়ে সরে যাচ্ছে, একবার ছোঁয়া দিয়ে যেন ধরা ছোঁয়ার বাইরে পালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের ডাকছে। সুগভীর কৌতুকে আকর্ষণ করছে। আমাদের শত বাহু মেলে আহ্বান জানাচ্ছে। আমরা যাব, যাচ্ছি—আমাদের আর হবে না দেরী।

মনেরও অজান্তে কখন যেন জলের একেবারে ভিতরে যেয়ে দাঁড়িয়েছি। খেয়াল হলো এক ঝলক জল এসে মুখের উপর ঝাপটা দিয়ে চলে যেতে জানিয়ে গেল। জীবনটা যেন কিছুই নয়। সবটাই যেন খেলা খেলা, একটা মিছিমিছি, শিশু-কালের পুতুল খেলার মত, সত্য, তবু অবাস্তব।

—আমাদের আতিথ্য নেবার পরিকল্পনা, এতক্ষণে ঠিক হয়েছে, না?

—হ্যাঁ, এই বেশ হলো। এই ভালো হলো। সংসার অনভিজ্ঞ আমাদের কাছে এ আতিথ্যের মূল্য অনেক। আমরা এইটাই তো চাই। চেয়েছি।

আকাশ যেন ধোঁয়ায় মেঘে অন্ধকার। দিগন্ত-হারা পরপার যেন ফ্রেমে বাঁধান একখণ্ড ছবি, অচল অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবটাই ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট। অন্ধকার। এত ধোঁয়ার আচ্ছন্নতা কোথায় ছিল? তবে কি পাতালপুরীর অন্ধকার গুহা গহ্বরে আগুন লেগেছে কোথাও? এ কি আমাদের নিমন্ত্রণের পূর্ব নির্ধারিত কোন পরিকল্পনা।

দৃষ্টিটা আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। সমস্ত শরীরটা অবশ, ভার। কেমন যেন একটা তীব্র মাদকতায় ঘুম ঘুম পাচ্ছে। আতিথ্য নেবার পূর্বে শ্রান্ত-ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত দেহটার বিশ্রামের বড় প্রয়োজন। সারা দিনের অনেক পরিশ্রমের এখানেই যেন শেষ যবনিকা টানা যায়।

—আচ্ছা, আমরা যদি মরে যাই?

—মরবো কেন? বরং মরার রাজ্যটা কেমন একবার দেখে নেব। যাকে জানিনে। ভয় পাই শুধু তাকেই। মৃত্যুর রাজ্যে যেতে, ভয় যদি সেখানে প্রহরী হয়, যদি সে তার বিশাল ভয়ংকর মুখ-গহ্বর নিয়ে তেড়ে আসে, তবু আমরা তাকে মাড়িয়ে পিষে ভেঙ্গে চুরমার করে এগিয়ে যাব। তাইতো আজ প্রলয় আর দুর্যোগকে সাথী করে পথে বেরিয়েছি।

—আয়রে ঝন্‌ঝা পরাণবধূর, আবরণরাশি
করিয়া দে দূর।
করি লুণ্ঠন, অবগুণ্ঠন বসন খোল,
দে দোল,—দোল।

সমস্ত শরীরটা কেমন দুলছে। থর থর করে কাঁপছে। পায়ের তলাটা ক্রমশঃই আলগা হয়ে আসছে। সারা দেহটা যেন হাল্কা পালকের মত। চারিদিক ধোঁয়া ধোঁয়া। কিছু নজরে আসছে না। কেউ কোথাও নেই। করিম মাঝি সম্ভবতঃ চাদর-মুড়ি দিয়ে ছৈ-এর ভিতর আবার শুয়েছে। বীর বাহাদুর তার জীর্ণ ঘরের মধ্যে বসে কারো জন্য প্রত্যাশা করছে। আমরা কোথাও যাব না। কোন মানব সন্তানের কাছে নয়। আমরা পেয়েছি নূতন ঠিকানার নূতন সন্ধান। আমরা সেখানেই চলেছি। কবে কোথায়, কোনখানে যেন দেখেছিলাম, আমাদের মত কোন একজন এমন করেই সাগর-দোলায় চেপে পাতালপুরীর রাজ্যে চলেছিলেন। ঠিক তেমন করে আমরাও চলেছি পাতালপুরীর রাজ্যে, আতিথ্য নিয়ে। হেলতে-দুলতে-ভাসতে-ভাসতে। এ আতিথ্যের তুলনা নেই। এখানে যারা থাকে, তারা ছলনা জানে না, চাতুরী জানে না। এরা আকর্ষণ করে, ভালবাসে, কাছে রেখে দেয় চিরদিনের জন্য। এরা মানুষের মত হতাদরে অবহেলায় ছুঁড়ে গুঁড়িয়ে মাড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিতে শেখেনি। দেয় না। তাই তো আমরা সেখানেই যাব, যাচ্ছি—

ব্যথার বাতাসে

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

ব্যথার বাতাস হতাশ বুকের পাঁজরেই যদি লাগে
একটুখানির নিবিড় হৃদয় কেঁপে ওঠে যন্ত্রণায় ;
একটু আশার একটু নেশার প্রদীপ অধীর শিখা
বেদনা চঞ্চল, মেঘলা সময়ে বিরাগে বা অনুরাগে
কখনো হয়তো পারবো জানতে আলাপের মূর্ছনায়
এ-হৃদয় মন ভরে আছে কিনা দেখে
কোন জলাটিকা।
যেখানে হারালো একটি ময়ূরী কলাপে
বিলাপ করে
বেহাগ বেদনা গুমরে উঠেই অভাবের বালুচরে।

জীবনের তীরে হাজারো ফেনার বুদবুদ গজরায়।
কেন জানিনা তো ভাললাগে তবু
ক্ষণিকের দেখাশোনা,
অঝোর ধারার বৃষ্টির ফোঁটাও শুষে নেয়
বালু বেলা ;
তবু তো বর্ষার জলতরঙ্গেই সুরটুকু
খুঁজে পায়—
অগাধ তৃষ্ণার তৃপ্তির কোথায় একটি আসন বোনা
যেখানে হৃদয় দেহের সীমায় খুঁজেছে
আপন খেলা।
একটি অসার অনুভূতি এসে সীমাহীন বেদনার
দানা বেঁধে রাখে, বিঁধে রাখে শর
জেনেছি হাজার বার।

নির্মল দু-চোখে চাউনি রেখেছে করুণ
মিনতি দিয়ে,
সেখানে জানবো হীরের কুচির
দু-ফোঁটা চোখের জল
ঝরবে একটু ; বললে মনটি ভুলিয়ে রাখলে হয়
বাইরে যতই ঝড়ের আভাস আসুক প্রলয় নিয়ে
একটি হৃদয়ে বীজ পুঁতে যাই
নিজের আশার স্থল ;
তবু যদি হাতো ভাবি খাঁটি এক জীবনের পরিচয়
একটু ফাঁকির ফিকির খুঁজেছি
জীবনের কারবারে
ব্যথার হাপরে ফুলে ওঠা বুক হতাশার দরবারে।

[illegible]র থেকে লয়

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

পৌরাণিক কথানুযায়ী কালযুগে মানুষের আয়ু শতবর্ষব্যাপী। একশ বছর পর্যন্ত আমরা পেঁৗছুতে প্রায়ই পারি না। যাঁরা পেঁৗছান তাঁদের অধিকাংশ অথর্ব জরাগ্রস্ত হয়ে সংসারের গ্লানি হয়ে বেঁচে থাকেন। বার্ধক্যের জরা যখন শরীরকে জর্জরিত করে দেয়, তখন সংসারে কেউই তাঁকে আর আমল দিতে চান না, কারণ তাঁর শ্রমশক্তি তখন বিনষ্ট। একমাত্র যদি বৃদ্ধা স্ত্রী বেঁচে থাকেন, তিনি তাঁর জরাগ্রস্ত হাতে স্বামীর সেবা আপ্রাণ করে যান আর নীরবে অতীতের সুখ সম্পদের কথা ভেবে আঁচলে চোখ মোছেন।

বর্তমান যুগে মানুষের দৈহিক ও মানসিক কর্মক্ষমতা কতদিন পর্যন্ত থাকতে পারে, তার হিসেব বৈজ্ঞানিকগণ ধার্য করেছেন এবং তার একটা নক্সা এ-স্থানে পরিবেশিত করা হল।

এই নক্সা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একজন মানুষের দৈহিক কাজ করবার ক্ষমতা দশ থেকে ষাট বছর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দায়িত্ববোধ পঁচিশ থেকে পঞ্চান্ন বছর অবধি পরিপূর্ণভাবে থাকে তারপর ক্রমশঃ কমতে থাকে এবং ষাটের পর আর থাকে না বললেই চলে। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা কুড়ি থেকে উঠতে আরম্ভ করে পঁয়তাল্লিশ বছরে শিখরে ওঠে। তারপর ধীরে ধীরে নামতে আরম্ভ করে আশী বছরে একস্থানে এসে স্থির হয়ে যায় ও মৃত্যু অবধি অল্পবিস্তর সেই একই স্থানে থেকে যায়।

পৌরাণিক মতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে এবং ঐতিহাসিক মতে বৈদিক যুগে মানুষের আয়ু বর্তমান যুগের চেয়ে বেশী ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমানকালের বৈজ্ঞানিকরা বলেন, মানুষের আয়ুকে দীর্ঘতর করা হয়েছে। সত্যই হয়েছে। উন্নত ধরণের চিকিৎসা এবং বিচিত্র ধরণের ওষুধ দিয়ে মানুষের অকালমৃত্যুকে রোধ করা হয়েছে অনেক খানি। কিছুকাল পূর্বেও নিউমোনিয়ার কোন ওষুধ ছিল না, টাইফয়েড চিকিৎসার বাইরে ছিল। এখন আর তা নেই। অমোঘ ওষুধের কল্যাণে মৃত্যুকে ঠেকানো যায় কিন্তু উন্নত ধরণের স্বাস্থ্য তৈরী করা সম্ভব নয়।

বার্ধক্য এসে গেলে তাকে সারানো সম্ভব নয়। মানুষের জীবনের যাত্রা আরম্ভ হয় শিশুকালে, তার সমাপ্তি বার্ধক্যে। শৈশব থেকে কৈশোর; কৈশোর থেকে যৌবন যেমন আসবেই ঠিক তেমনি যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্ব ও সর্বশেষে বার্ধক্য নেমে আসবে। তাই বার্ধক্যকে রোধ করতে হলে, তার প্রস্তুতি যৌবন থেকেই করতে হয়, সারা জীবন ধরে করতে পারলে আরও ভাল।

অকালবার্ধক্যকে রোধ করতে হলে সমস্ত জীবন ধরে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। অতি-ভোজন মানুষের মৃত্যুকে কাছে টেনে আনে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোজনের জন্য বাত, মধুমেহ, রক্তচাপ বৃদ্ধি, হৃৎপিণ্ডের রোগ প্রভৃতি জন্মায়। অতি-ভোজন ও অল্প-ভোজনের মধ্যে, অল্প-ভোজনেই মানুষ বেশী দীর্ঘায়ু হয়। শারমান্ (Sherman) পরীক্ষায় দেখেছেন খাদ্যের মধ্যে ভিটামিন এ, ক্যালসিয়াম ও রিবোফ্লেবিন্ মানুষকে অনেক দিন পর্যন্ত কর্মঠ করে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

মানুষের শরীরকে যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করলেও, মানুষের অভ্যন্তর অত্যন্ত জটিল। বৈজ্ঞানিকরা বিজ্ঞানের সাহায্যে চন্দ্রলোক অবধি জয় করতে চলেছেন, অথচ তাঁর নিজের ভিতরে প্রতিনিয়ত যে রসায়ন শাস্ত্রের বিরাট প্রক্রিয়া চলছে, সে বিষয়ে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমরা এখনও অনেক অনেক জিনিষ জানি না কেন ঘটছে, আমরা, ঘটছে শুধু এইটুকু জানি।

মানুষের আয়ু দীর্ঘ হয় অনেক সময় বংশানুক্রমে। ভৌগোলিক আবহাওয়া, সামাজিক পরিবেশ, জীবন যাত্রার প্রণালী সমস্ত মিলিয়ে জীবনকে দীর্ঘ করে দেয়।

দীর্ঘায়ু ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার প্রণালী পর্যবেক্ষণ করলে একটা জিনিষ দেখা যায়, তারা সমস্ত জীবন নিজেদের খুসীমতো চলেছেন। ইংলণ্ডের ইতিহাসের পাতা ওল্টালে গ্লাডস্টোনকে ভোলা কোন মতেই যায় না। পঁচাশী বছর অবধি অমিতবিক্রমে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক কর্ণধার ছিলেন একথা ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই জানেন। উইলিয়ম উয়ার্ট গ্লাডস্টোন ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে যেদিন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে বেরিয়ে আসেন, সেই দিনই তিনি স্থির করেছিলেন আমি বক্তা হবো। আমি বক্তৃতা দেবার জন্য জন্মগ্রহণ করেছি, আমি যা বলবো, সকলেই তা শুনবে। এই আত্মবিশ্বাস তিনি সারা জীবন ধরে বহন করে এসেছেন। কোন দিন তা থেকে বিচ্যুত হন নি।

চার্চিলকে চেনেন না এমন লোক পৃথিবীতে নেই। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে জন্মে আজও তিনি বেঁচে আছেন। সমস্ত জীবন তিনি যুদ্ধ করেছেন। যৌবনে প্রথম মহাযুদ্ধ। প্রৌঢ়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। তাঁর জীবনে কর্মময় জীবন যাত্রাই তাঁকে দীর্ঘজীবন দান করেছে। অবসর সময়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। কর্মঠ জীবনযাত্রার জন্য শরীরের রোগের প্রতি নজর দেবার অবকাশ পান নি, তাই দীর্ঘায়ু হয়েছেন।

জর্জ বার্ণার্ড শ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে জন্মেছিলেন। এই মানুষটির দৃঢ় ধারণা ছিল তিনি লেখক হবেন। প্রথম জীবনে দুর্ভাগ্য এসেছে, কিন্তু তিনি পেছপাও হন নি। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ ও ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি পাঁচখানা উপন্যাস সৃষ্টি করেন কিন্তু একখানাও বিক্রি হয় না। তিনি হতাশ না হয়ে চেষ্টা করতে লাগলেন, বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলেন; নিজের বক্তব্য সকলকে বললেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম মরিস ও অ্যানি বেসান্তের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ফেবিয়ান সোসাইটির সভ্য হলেন। তারপর জীবনযাত্রার ধারা বদলে গেল। এই স্তরের মানুষও আপন চেষ্টায় আপন অধ্যবসায়ে একদিন নোবেল প্রাইজও লাভ করেছিলেন। সারা জীবন একাগ্র সাধনা করবার জন্যই এত দীর্ঘদিন কর্মঠ হয়ে বেঁচেছিলেন। হঠাৎ ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে দুর্ঘটনা না ঘটলে আরও দীর্ঘদিন বাঁচতেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল আজও জীবিত। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রাজনৈতিক সংসারে জন্মেও তিনি আংকিক ও বৈজ্ঞানিক দার্শনিক হয়েছেন। তিনি নিজের মনমত পেশা বেছে নিয়েছিলেন বলেই মনের যে শান্তি পেয়েছিলেন তারই ক্ষমতায় এত দীর্ঘ জীবন লাভ করতে পেরেছেন আজও তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করে বিশ্বের লোক নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করছে।

আমাদের সমাজ থেকে পাশ্চাত্য সমাজ সমস্ত দিক থেকে পৃথক। আমরা যদি ইউরোপীয় পদ্ধতিতে জীবনযাত্রা সুরু করি, তাহলেই যে দীর্ঘায়ু লাভ করবো, তার কোন অর্থ নেই। আমাদের দেশে সম্পূর্ণ ভারতীয় পন্থায় জীবন যাপন করে দীর্ঘদিন পৃথিবীর আলো অনেকে সুস্থভাবে উপভোগ করে গেছেন ও বর্তমানে করছেন। এর জন্যে চাই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়া, ইংরিজীতে যাকে বলে Adaptation লিও টলস্টয় জীবনে নিরামিষ ভক্ষণ করেও দীর্ঘদিন বেঁচেছিলেন। তাঁর এই নিরামিষ ভক্ষণ, কৃষকের মতো বেশভূষা তাঁর ছেলেমেয়েরা পছন্দ করতো না এবং তাঁকে নানা প্রকার গঞ্জনা দিত। তিনি ভ্রুক্ষেপও করতেন না, ভ্রুক্ষেপ করলে অতদিন বাঁচতেন না বোধহয়।

জীবনে অসুখ হলে ওষুধ খাওয়ার চেয়ে, অসুখ যাতে না হয়, তার চেষ্টা সর্বতোভাবে ভালো একথা সর্বকালে, সমস্ত মনীষীরা বার বার বলেছেন। [illegible] বেলাতেও সেই কথা প্রযোজ্য। বৃদ্ধত্ব এসে পড়লে, তাকে নিবারণ করার চেয়ে, বৃদ্ধত্ব আসবার পূর্বেই তাকে প্রতিহত করা অনেক গুণে ভালো। মানুষের প্রত্যেকটি দেহকোষ জন্মের ক্ষণ থেকে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে চলেছেন, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে। এই যুদ্ধে তার ক্ষয় হচ্ছে; সেই ক্ষয়কে পূরণ করবার জন্য প্রত্যহ নতুন পুষ্টি প্রয়োজন, যা আমরা প্রত্যহ খাদ্যের ভিতর থেকে গ্রহণ করছি। দেহের কোষসমষ্টিকে আরও [illegible], আরও দুর্বল করে দেয় নানা প্রকারের নেশা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাত্রায় প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ আশী বছর পর্যন্ত তাঁর প্রতিভার দান বিশ্বে বিতরণ করেছিলেন, দেহের প্রতি অতি যত্ন গ্রহণ করতেন বলে। তিনি জীবনে কোন নেশা করেন নি। নেশা করতেন না বলেই এত দীর্ঘদিন অত সুস্থ ছিলেন। তাঁর দৈনন্দিন খাদ্যও অতি পরিমিত ছিল।

দীর্ঘায়ু লাভ করবার জন্য অনেকে অনেক প্রকারের উপদেশ দান করে থাকেন। অনেকে বলেন অমুক এই ভাবে থেকে বহু দিন বেঁচেছেন। কিন্তু একটা কথা আছে। আমি হয়তো যে অবস্থার মধ্যে মানুষ হলে অধিক দিন বাঁচবো, আর একজন হয়তো সেই অবস্থায় বেশীদিন বাঁচতে পারবে না তাই একজনের বিধান আর একজনের পক্ষে বিষময় হয়ে উঠতে পারে।

শরীর অধিক দিন সুস্থ রাখবার অন্যতম উপায় হচ্ছে, মনের শান্তি অক্ষুন্ন রাখা। জীবনের যে সময়ে যখন যে অবস্থার সৃষ্টি হবে, সেই অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়াই অধিক দিন বাঁচবার একটা পন্থা। আজ যুদ্ধক্লান্ত বিধ্বস্ত সমাজের উপর বসে মানসিক শান্তির কথা বলা হাস্যকর উক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়, তবু আমাদের শান্তি তৈরী করে নিতে হবে। সুখাদ্য পাওয়া আজ কল্পনাতীত। সুন্দর পরিবেশ আজ হারিয়ে গেছে। দেশ বিভক্ত হওয়ার জন্য সমস্যা আরও জটিলতর হয়েছে; এর মধ্যে শান্তি কোথায়? আশা কোথায়?

তবু, তারই মধ্যে খোঁজ করে পথ বেছে নিয়ে চলতে হবে। বাঁচতে হবে। দীর্ঘায়ু হতে হবে খাদ্যের মধ্যে কম দামে হয়তো মধু পাওয়া যাবে মধুর মধ্যে নানা প্রকারের ভিটামিন আছে এবং পুষ্টিকর বস্তু আছে। প্রত্যহ যদি সকাল-বিকেল মধু খাওয়া যায় তাহলে কিছু পুষ্টিকর খাদ্য পেটে পড়ে। ভাত খাওয়ায় শরীর খারাপ সহজে

...না। ভাত আমাদের দেশের পক্ষে শ্রেষ্ঠ খাদ্য, বিশেষতঃ বাংলা দেশে। বৃদ্ধদের ভাত একটু নরম খাওয়াই ভাল কারণ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দাঁতের জোরও কমে যায়। শক্ত ভাত ভালভাবে চিবোনো যায় না ফলে ভালো হজম হবে না। আলুভাতে বার্ধক্যের একটা উপাদেয় খাদ্য। আলু থেকে শরীরের পুষ্টিও কিছু হয়। প্রৌঢ়ত্বের প্রারম্ভ থেকেই নিয়মিত শাক খাওয়া উচিত। পালং, কলমী, হিঞ্চে, শুশুনে প্রভৃতি শাকে শরীরের স্নিগ্ধতা বাড়ে, শরীরকে শীতল রাখে এবং অযথা রক্তের চাপের বৃদ্ধি হতে দেয় না। তাছাড়া শাক এবং অন্যান্য সবুজ সব্জীতে ক্লোরোফিল্ বলে একটি পদার্থ থাকে এবং তাতে শরীরের পুষ্টি বৃদ্ধি পায়, বিশেষতঃ রক্ত তৈরী করতে সাহায্য করে। শাক প্রভৃতি খাদ্যে দাস্ত পরিষ্কার থাকে, এবং নিয়মিত দাস্ত পরিষ্কার থাকলে রোগ হবার সম্ভাবনা কম থাকে। অল্প মূল্যে আর একটি পুষ্টিকর খাদ্য ছোলা। প্রত্যহ সকালে অল্প পরিমাণ ভিজে ছোলা আদা দিয়ে খেলে স্বাস্থ্য বেশ ভাল থাকে। বার্ধক্যে কচু, ওল প্রভৃতি খাদ্য না খাওয়াই ভাল। কচু, ওল প্রভৃতি খাদ্যে অক্সালিক এ্যাসিড থাকে। এই এ্যাসিড খুব সহজেই ক্যালসিয়ামের সঙ্গে মিশে যায়। ওল খেলে গলা চুলকোয় একথা সবাই জানেন, এর অন্তর্নিহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়া হল ওলের অক্সালিক এ্যাসিড, লালার ক্যালসিয়ামের সঙ্গে মিলে ক্যালসিয়াম অক্সালেট ক্রিস্টাল তৈরী হয়। এই ক্রিস্টাল গলায় খচ্ খচ্ করে লাগে বলে বলা হয় চুলকোয়। বৃদ্ধ বয়সে ক্যালসিয়াম খুব প্রয়োজন; যদি ওল প্রভৃতি খাদ্য অধিক পরিমাণে খাওয়া হয়, তাহলে শরীরের ক্যালসিয়াম অযথা ওলের এ্যাসিডের সঙ্গে মিশিয়ে যাবে। শরীরে কোন কাজে লাগবে না।

জল বার্ধক্যের অতি প্রয়োজনীয় বস্তু, আমাদের দেহের প্রত্যেকটি কোষ জলপূর্ণ। জল কমে গেলে কোষের অন্তর্নিহিত রসায়ন ক্রিয়াও বদলে যায়। শরীরের প্রতিনিয়ত কর্মতৎপরতায় যে দূষিত পদার্থ কোষের মধ্যে সঞ্চিত হয়, জলের অল্পতায় তা আর কোষের বাইরে আসতে পারে না। এই সমস্ত দূষিত পদার্থ শরীরের কোষসমষ্টিকে ক্রমশঃ বিষাক্ত করে যার ফলে কোষগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে। বৃদ্ধ বয়সে একবার কোষ দুর্বল হয়ে গেলে আর সবল করে তোলা যায় না।

দীর্ঘায়ু লাভ করবার জন্য যে মাছ-মাংসের একান্ত প্রয়োজন সে কথা বোধ হয় ঠিক নয়। নিরামিষাশী বহু ব্যক্তি আজও দীর্ঘায়ু লাভ করে বেঁচে আছেন। ছানা, দুধ প্রভৃতি থেকে যে প্রোটিন পাওয়া যায়, তা থেকে যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করতে পারলে প্রয়োজনমত প্রোটিন পাওয়া যাবে। অতিরিক্ত মাংস আমাদের দেশের পক্ষে ভালো নয়। ডাল থেকেও আমরা প্রোটিন পাই। শারীরতত্ত্ববিদেরা মুসুর ডালকে 'গরীবের মাংস' নামে আখ্যা দিয়েছেন। প্রত্যহ ভাতের সঙ্গে কিছু পরিমাণ ডাল খেলে দেহ সুস্থ থাকে। অধিকাংশ সংসারে মাংস অধিক মশলা দিয়ে রান্না করা হয় ফলে গুরুপাক হয়ে পড়ে। বার্ধক্যে গুরুপাক জিনিষ না খাওয়াই ভাল কারণ বৃদ্ধ বয়সে পাকস্থলী এবং অন্ত্রের ক্ষমতা কিছু পরিমাণে কমে যায়। দুর্বল অন্ত্রে গুরুপাচ্য বস্তু পড়লে বদ-হজম হয় এবং তা থেকে নানা প্রকার রোগের সৃষ্টি হয়।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের উত্তেজক রসগ্রন্থিগুলি (Hormonic gland) ক্রমশঃ শুকিয়ে যেতে থাকে। এই গ্রন্থিগুলির কার্যক্ষমতা কমবার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক স্থিরতাও চঞ্চল হয়ে পড়ে। কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করবার সময়ও গ্রন্থিগুলি হঠাৎ বেশী রসনিস্রণ আরম্ভ করে দেয় এবং তারই প্রভাবে একজন উদীয়মান যুবক স্বপ্ন দেখে। ঠিক তেমনি বার্ধক্যের প্রারম্ভে গ্রন্থির রসনিস্রণ হঠাৎ কমে যায় এবং তারজন্য মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়, কোন কাজই আর ভাল লাগে না। পৃথিবীর সবুজ রংয়ের উপর কালো রং নেমে আসে।

মনের এই অশান্তি থেকেই নানা রোগের উৎপত্তি হয়। কোন কর্মরত লোক কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করবার পরই রক্তচাপ বেড়ে যায়। তার মনে তখন ক্ষোভ আসে, এতদিনের কর্মশক্তি ছিল আমার অথচ আমাকে অথর্ব বলে সরিয়ে দিল। এই ক্ষোভ আরও বেড়ে যায় যখন সংসারের কর্তৃত্ব ক্রমশঃ সন্তানের হাতে চলে যায়। এই মানসিক অশান্তি থেকে 'রক্তচাপবৃদ্ধি' 'অন্ত্রে ঘা' (Peptic Ulcer) প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয়। মানসিক অশান্তি সৃষ্টি হলে, খাওয়া দাওয়া ভালো করে হয় না এবং তার জন্য কোষসমষ্টি দুর্বল হয়ে পড়ে, ফলে বহুবিধ রোগের সৃষ্টি হয়। তাই বৃদ্ধ বয়সে মানসিক শান্তির খুবই প্রয়োজন। সাংসারিক জীবনে পরিপূর্ণ শান্তি পাওয়া সম্ভব নয়, বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত সংসারে। দৈনন্দিন রাশিকৃত দৈন্য যেখানে দৈত্যের মতো হাঁ করে বসে রয়েছে, সেখানে শান্তির প্রত্যাশা করাই মূর্খতা। তবু এরই মধ্যে শান্তি খুঁজে নিতে হবে। সন্তান যদি তার স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা হয়ে যায়, তবে তার জন্য ক্ষোভ না করাই ভাল। অতীতের কথা ভাবতে গেলে ক্ষোভ আসবে, তার চেয়ে, এই ভাবাই ভালো যে আলাদা হয়েছে প্রত্যেকের সুবিধের জন্য। থাক তারা সুখে থাক। যদি কোন সন্তানের অকালমৃত্যু হয়, তার জন্য শোক করবার কিছু নেই। মানুষের মৃত্যুকে কেউ রোধ করতে পারে না। মৃত সন্তানকে ভুলে আরো যে কটি পুত্র বেঁচে আছে তাদের মানুষ করবার জন্য কাজ করে যেতে হবে। আমি এক ভদ্রলোককে দেখেছিলাম, আশী বছর বয়সে তাঁর পঞ্চাশ বছরের পুত্র মারা যায়। সবাই ভাবলো বৃদ্ধ বোধহয় এ শোক সামলাতে পারবেন না। কিন্তু তিনি বিচলিত হলেন না, শোকে ভেঙে পড়লেন না; ধীর স্থির কণ্ঠে বললেন, আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। যতদিন না নাবালক নাতি সাবালক হয়ে সংসারের ভার গ্রহণ করতে পারে, ততদিন আমি বাঁচবো। সত্যই তিনি বেঁচেছেন। আজও অটুট স্বাস্থ্য নিয়ে শিলিগুড়িতে প্রত্যহ সকাল বিকেল বেড়াতে বের হন। হাতে লাঠি নেই, পাশে কোন সাহায্য নেই।

বৃদ্ধ বয়সে প্রত্যহ কিছু কাজ করা একান্ত প্রয়োজন। কোন কিছু কাজ না থাকলে অন্ততঃ নিজের দৈনন্দিন কাজগুলিও নিজে নিজে করলে শারীরিক তৎপরতা অক্ষুণ্ণ থাকে। একেবারে চুপচাপ বসে থাকলে মানসিক নানা প্রকারের অশান্তি আসে। কর্মের অভাবে মনের স্থবিরতা আসে এবং তার জন্য বাত প্রভৃতি রোগের বৃদ্ধি পায়।

অধিক বাঁচতে হলে, বাঁচবার একটা স্পৃহা চাই। আমাদের মনে বাঁচবার আগ্রহ থেকে মরবার ভয়ই বেশী। এই মৃত্যুভয়ই মানুষের আয়ুকে ক্রমশঃ কমিয়ে দেয়। মৃত্যু কখন আসে না। মৃত্যু জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মৃত্যু আগে আসে তারপর জন্ম হয়। জন্মের বৈজ্ঞানিক ইতিবৃত্ত দেখলেই এ কথা বেশ ভালভাবে বোঝা যায়। শিশু যেই জন্মগ্রহণ করল, মায়ের জরায়ুর মধ্যে ফুলের (Placenta) সেই মুহূর্তে মৃত্যু ঘটলো। ফুলের মৃত্যু না ঘটলে শিশুর জন্মও হতো না। সেই মৃত্যু সারাজীবন ধরে জীবনের সঙ্গে চলতে লাগলো। যখনই সুযোগ পায় মৃত্যু জীবনকে গ্রাস করে। দৈনিক জীবনের সঙ্গে মৃত্যু তো আছেই, তাই তাকে অযথা ভয় পাবার কোন কারণ নেই। জীবনের স্পৃহা, জীবনের আকাঙ্ক্ষা ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না। পুষ্টিকর খাদ্য, সুন্দর পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়েও অনেক ধনীর সন্তান অকালে প্রাণ হারাচ্ছে। প্রেরণা ছাড়া জীবনের গতি আসে না। ভেঙে পড়লেই, জীবনে চড়াভাঙা এলেই মন ভেঙে পড়বে। মন ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে দেহ ভাঙবে এবং ভাঙা দেহের সুযোগ নিয়ে মৃত্যু তার জয়ধ্বজা ওড়াবে। প্রত্যেক দীর্ঘায়ু ব্যক্তির জীবনী আলোচনায় দেখা যায় তাঁদের প্রত্যেকের জীবনে কিছু না কিছু প্রেরণা ছিল এবং সেই প্রেরণার তাড়াতেই জীবনের আয়ু দীর্ঘতর হয়েছিল। এই প্রেরণাকে বৈজ্ঞানিকের ভাষায় বলা হয় ইম্‌পেটাস এবং কবির কথায়ঃ

> "অরুণ বহ্নি জ্বালাও চিত্ত মাঝে
> মৃত্যুর হোক লয়।"

বর্ষারাতের কবিতা

* গোপাল ভৌমিক

বর্ষার মেদুর মেঘ
বিলম্বিত হলেও সে আসে,
হাসে রোদে পোড়া মাঠ
কচি কচি ঘাসে।
টুপ টাপ ঝুপ ঝাপ
সারারাত ঝরে শুধু জল;
নিবিড় আঁধারে ঢাকা
পৃথিবীর মন উতরোল
স্বপ্নের নরম ছোঁয়া
আনে দাব দাহে পোড়া মনে,
গোটা রাত কেটে যায়
কিছু ঘুম কিছু জাগরণে।

ভোর বেলা উঠে দেখি
জানালাটা খুলে
মেঘে ঢাকা আকাশটা
রইলেও ঝুলে
অপরূপ নেয়ে ওঠা
পৃথিবীর ছবি,
কামিনী ফুলের গাছ
ছড়ায় সুরভি।
কিছুতে চায় না যেতে
ঘুম ঘুম ভাব;
কি পেলাম কি দিলাম
হল কি যে লাভ
সে কথা শুনতে মন
হয় নাকো রাজি,
জলে ভেজা দিনে রাখি
নিজেকেই বাজি।

টুপটাপ ঝুপঝাপ
প্রহর গড়ায়,
পাটে যেতে যেতে রবি
যে সোনা ছড়ায়
মুঠো করে তার কিছু
তুলে নেই হাতে;
তাই আলো দেখি মেঘে
তারাহীন রাতে।
রাতে শুনি ঝম ঝম
বাদলের গান
ভেক আর ঝিঁঝিঁদের
নব ঐকতান।

আড়াই কাঠা ছাদ

(২১৩ পৃষ্ঠার পর)

শরীর খারাপ হবে কেন, এমনি বেশ আরাম করে শুয়ে আছি। আয় না, বোস এখানে।

টিয়া গিয়ে মার কাছে বসে, কপালে হাত বুলিয়ে দেয়। সরমা অন্যমনস্ক সুরে বলে, তোর যখন বিয়ে হবে দত্ত বাড়ীতে এই রকম সানাই বাজবে রে।

কথাটা সামান্য, কিন্তু বলতে গিয়ে চোখে জল এল সরমার।

টিয়া তা মুছে দিল।

টিয়ার হাতটা ধরে ফেলে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদল সরমা, নিজের বুকটা হাল্কা করল, অনেকক্ষণ ধরে।

কোন্ সময় টিয়া উঠে চলে গেছে তা লক্ষ্যও করেনি। খেয়াল হতে ভাবল নিশ্চয় শুতে গেছে।

টিয়া কিন্তু শুতে যায়নি। আবার সে ফিরে গেল সেই উৎসবের বাড়ীতে। দেখল তখনও হৈ-হৈ আনন্দ চলছে আগের মতই সমান তালে। যারা চেনে কেউ কেউ জিজ্ঞেস করল, কিরে টিয়া ঘুম পায়নি?

টিয়া ছোট্ট উত্তর দেয়, না।

এক সময় সুবিধে মত গিন্নীমার সঙ্গে দেখা করে। টিয়ার দৌরাত্ম্যির খবর তিনি রাখতেন। তাই তাকে দেখে খুব খুশী হলেন না। বল্লেন, বাচ্চারা সব শুয়ে পড়েছে, কিছু চাই তোমার?

টিয়া কোন উত্তর দিতে পারে না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

—কিছু বলবে তো বল, আমার অন্য কাজ আছে।

—খাবার নিয়ে যাব।

—কেন, তোমরা খাওনি?

—খেয়েছি, টিয়া মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে, মা আসতে পারেনি।

গিন্নীমা সরমাকে চিনতেন, কাজের বাড়ীতে তাকে দেখেননি তাও মনে পড়ল। জিজ্ঞেস করলেন, কেন এলেন না?

টিয়া মিথ্যে বল্ল, শরীর খারাপ।

—বেশ কি খাবার নেবে নিয়ে যাও।

চাকরকে পাঠিয়ে দিলেন টিয়ার সঙ্গে, টিয়া একটা হাড়ী করে সাজিয়ে নিল লুচি, তরকারী, মাছ, মিষ্টি। রাত অনেক হয়ে গেছে। ভীড় পাতলা হয়ে এসেছে। নহবৎ বাজছে তবে মাঝে মাঝে, আর একটানা নয়।

এই কয়েক ঘন্টার মধ্যে টিয়ার যেন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেই দুষ্টু টিয়া আর নেই। সারা রাস্তা ভাবতে ভাবতে আসছে আজ সে মাকে ছাদে বসিয়ে খাওয়াবে। কতদিন এসব জিনিষ বাড়ীতে রান্না হয়নি, মা নিশ্চয় খুব খুশী হবেন। কিন্তু বাড়ীর সিঁড়িতে এসে পা দিতেই সে ভয়ে শিউরে উঠল। ওপরে চীৎকার শোনা যাচ্ছে। বাবার গলা। সেই এক ঘেয়ে চেঁচামিচি, মার মুখ বোজা কান্না। খাবারের হাঁড়ি নিয়ে সে নিঃশব্দে ছাদে উঠে এল। সযত্নে এক কোণে রেখে নেমে এল মার ঘরে। সে এক বীভৎস দৃশ্য। মা মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে আর তারই সামনে আরেক জনের উন্মত্ত চীৎকার, 'টাকা দাও, নয়ত আজ আমি তোমায় মেরেই ফেলব।'

সভয়ে ছুটতে ছুটতে ছাদে উঠে এল টিয়া। চীৎকার করে বলে, কে কোথায় আছ শিগগীরী এস, মরে গেল, আমার মা মরে গেল।

পাগলের মত কাঁদতে কাঁদতে টিয়া উঠে দাঁড়াল সেই পাঁচিলের ওপর, যেখানে দাঁড়িয়ে অসভ্য ভাষায় চীৎকার করে ছড়া কেটে জ্বালাতন করত পড়শীদের। আজ সেইখানেই দাঁড়িয়ে সমস্ত প্রাণ নিংড়ে সকলের কাছে আবেদন করল, 'কে কোথায় আছ এস, আমার মাকে বাঁচাও।

এই তার শেষ কথা। উচ্ছ্বাসের বসে টাল সামলাতে না পেরে তিনতলার পাঁচিল থেকে পড়ে গেল টিয়া। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। পাড়ার লোকেরা ছুটে বেরিয়ে এল। উৎসব বাড়ীর সানাই গেল থেমে, আর সেই সঙ্গে দত্ত বাড়ীর তিনতলার ঘরে দাম্পত্য কলহের করুণ নাটকও।

মাতাল বাপ হাউ-হাউ করে কাঁদল। যারা এতদিন দু'চোক্ষে টিয়াকে দেখতে পারত না তারাও আজ চোখের জল না ফেলে পারল না।

যে কাঁদেনি, সে সরমা।

দত্ত বাড়ীর আড়াই কাঠা ছাদে এখন আর ছোটদের উঠতে দেওয়া হয় না। রাতের অন্ধকারে সরমাই সেখানে ঘুরে বেড়ায়। অভিশপ্ত দত্ত বাড়ীর সব কিছু চলে গিয়েও সেই গৌরবোজ্জ্বল দিনের স্বাদ পাওয়া একটি কিশোরী বেঁচে ছিল। তাই বোধহয় সে এই ছন্নছাড়া জীবনটার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারল না। অন্য ছেলেগুলো ঠিক বেঁচে থাকবে। আগাছার মত। সরমারও বেঁচে থাকার সান্ত্বনা আছে, আর কিছু না থাক সকলের কাছেই সে সহানুভূতি পেয়েছে। কিন্তু টিয়া? সে বেঁচে থাকত কিসের ভরসায়, তার ছোট্ট জীবনের করুণ ট্র্যাজিডী বুঝতে পারত কে?

পথ দিয়ে হাঁটি আর ভাবি

জগন্নাথ চক্রবর্তী

পথ দিয়ে হাঁটি আর ভাবি—
এই পথে হেঁটেছেন তারা
ক্ষণজন্মা পুরুষেরা।
অনেক পায়ের চিহ্ন যুগ যুগ ধরে
মিশেছে ধুলায়
অনেক উড়েছে বালি
ফাল্গুনের চৈত্রের সন্ধ্যায়।

এপথ হয়েছে শেষ আরো—পথে
এই চলা মিশেছে চলায়—
সেই ভালো।

সেই সব ক্ষণজন্মা পুরুষেরা
আমি জানি আজও
পথ হেঁটে চলেছেন আমাদেরই সাথে
যুগান্তের নূতন সংঘাতে।

সভ্যতার উত্তরণে আজ কিম্বা কাল
এ-পথ নূতন পথ পাবে—
মানুষ নূতন সাজে সাজাবে নিজেকে
প্রতিভার নূতন কিংখাবে।

এই পথ ফুরাবে না,
বেঁকে যাবে মহাকাশ পারে
শুরু হবে আরেক প্রভাতে
সেই ভাল।

সেই সব ক্ষণজন্মা পুরুষেরা—
অন্ধকার আকাশের নক্ষত্রেরা—
তাঁদের পায়ের স্পর্শ সেখানেও রবে
যেমন এখানে আছে এই পথে,
এই চেনা পথে।

পথ দিয়ে হাঁটি আর ভাবি।

স্কেচ : অরুণ সেনগুপ্ত

বাণিজ্য যাত্রা ● দেব দত্ত

খিলেনমার্গ, কাশ্মীর

রবি দত্ত
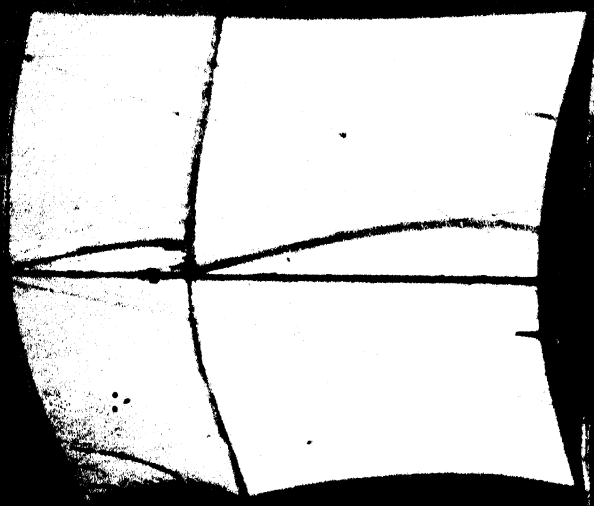
মধ্যযুগের একজন আরব ঐতিহাসিক

রেজাউল করীম

বর্তমান যুগে ইতিহাস রচনার পদ্ধতির বহু পরিবর্তন হয়েছে। এখন কোন ঐতিহাসিক কেবলমাত্র ঘটনাবলীর বিবরণ লিখে ইতিহাস রচনার কাজ শেষ করেন না, ঘটনার সহিত আরও নানা বিষয় সন্নিবিষ্ট করেন। দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং পারিপার্শ্বিক আরও নানা বিষয়ের সহিত একটা ঘটনার পারস্পরিক সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়। নতুবা কোন ইতিহাসই সম্পূর্ণ হয় না। ইতিহাস রচনার এই পদ্ধতিকেই বলা হয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। অতীত যুগে কোন কোন ইতিবৃত্তকার এই প্রকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁদেরকে ইতিহাস রচনার পথিকৃৎ বলা চলে। তাঁরা নূতন কালের ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। মধ্যযুগের আরব জগতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন এরূপ একজন ঐতিহাসিকের আবির্ভাব ঘটেছিল—তিনি ইতিহাস রচনার এক নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর নাম ইবনে খালদুন।

আজ ইবনে খালদুন বর্তমান যুগের সুধী মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর প্রধান কারণ এই যে, তিনি তাঁর রচিত বিশ্ব ইতিহাসের মুখবন্ধে (Prolegomena) এমন সব বিষয় আলোচনা করেছেন যার জন্য তাঁকে 'আধুনিক' বলা যেতে পারে। তিনি কেবল ঘটনাবলী বর্ণনা করে ক্ষান্ত থাকেন নি। তিনি দিয়েছেন "সমাজ-বিজ্ঞান" সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা। মধ্যযুগের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে বাস করে মানুষের পক্ষে যতদূর জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব ছিল, তিনি ইতিহাসের পটভূমিকায় তা প্রায় সবই দান করেছেন। মধ্যযুগে মুসলিম জগতে আরও বহু সুধী ছিলেন, যথা—আল বেরুনী, ইবনে সিনা, ইবনে রোশদ, আল গাজ্জালী ইত্যাদি। দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের দিক দিয়ে তাঁদের জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি ছিল আরও গভীর। ইবনে খালদুন তাঁদের দর্শন ও চিন্তাধারার দ্বারা উপকৃত হয়েছিলেন, কিন্তু সামাজিক ঘটনাবলীকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করার ব্যাপারে তিনি তাঁদেরকে অতিক্রম করেছেন। বস্তুতঃ সমাজ-বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ হিসাবে তিনি আরিস্টটল ও মেকিয়াভেলীর মধ্যবর্তী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। সুতরাং যাঁরা সমাজ-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক বিবরণ জানতে চান, তাঁরা ইবনে খালদুনকে অবজ্ঞা করতে পারেন না। কি ইউরোপে, কি আরব জগতে তাঁর সমসাময়িক যুগে তাঁর মত আর কোন লেখকই আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ইতিহাস রচনা করেন নি। ইতিহাস লিখতে আরম্ভ করে তিনি নানা বিষয় চিন্তা করেছেন—যথা সমাজের প্রকৃতি কিরূপ, দেশের জল-বায়ু, শিক্ষা-নীতি, মানুষের বৃত্তি ও আর্থিক অবস্থা কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে বা করতে পারে, এ-সব বিষয় নিয়ে তিনি সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করেছেন। মধ্যযুগের মানুষ হয়েও তিনি ছিলেন একেবারেই 'আধুনিক'।

তাঁর সম্পূর্ণ নাম আবু জায়েদ আব্দুর রহমান ইবনে খালদুন। ১৩৩২ খৃষ্টাব্দে টিউনিস নগরে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পূর্বপুরুষগণের আদি বাসভূমি ছিল আরব দেশের হাজারমাউত অঞ্চলে। আরবগণ কর্তৃক স্পেন অধিকারের কিছুকাল পরে তাঁরা টিউনিস থেকে স্পেনে চলে গেলেন। তাঁর আত্মীয়স্বজনের অনেকে স্পেনের সেভিল নগরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন। নবম শতাব্দীতে স্পেনে আরব শাসকদের গৃহযুদ্ধে তাঁরা এক পক্ষে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যখন সেভিলে একটি ছোট প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হল, তখন খালদুন বংশের অনেকেই সেই রাষ্ট্র পরিচালনায় নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু যখন খৃষ্টান শক্তি পুনরায় স্পেন অধিকার করল তখন বহু মুসলিম আফ্রিকায় আশ্রয় গ্রহণ করল। ইতিমধ্যে ১২৪৮ সালে তৃতীয় ফার্ডিনাণ্ড সেভিল অধিকার করলেন। তখন খালদুন বংশের অধিকাংশ স্পেন ত্যাগ করে টিউনিসে আশ্রয় নিলেন। তাঁরা শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে খুব উন্নত ছিলেন। ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের পিতামহ টিউনিসের রাজার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর পুত্র শাসক ও সৈনিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু এসব বৃত্তি তাঁর ভাল লাগল না। তিনি রাজকার্য পরিত্যাগ করে ধর্ম ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন এবং ১৩৪৯ সালের মহামারীতে তিনি দেহত্যাগ করলেন।

তাঁর পুত্র আব্দুর রহমান ইবনে খালদুন খুব মেধাবী ছিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যে নানা বিদ্যায় প্রচুর পাণ্ডিত্য লাভ করলেন। নানা শাস্ত্র আয়ত্ত করে তিনি কুড়ি বছর বয়সে সরকারী কাজে যোগ দিলেন। কিন্তু সেই সময় উত্তর আফ্রিকা নানা প্রকার অশান্তির দ্বারা চঞ্চল হয়ে উঠল। তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ইবনে খালদুন টিউনিসের সুলতানের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হলেন। এমন কি তাঁকে দু' বছর কারাবাস করতে হয়েছিল। তারপর ১৩৬২ সালে ইবনে খালদুন স্পেনে আশ্রয় নিলেন এবং গ্রানাডার সুলতানের অধীনে একটা চাকরী গ্রহণ করলেন। এই সুলতান তাঁকে কাস্টিলের রাজা পেদ্রোর নিকট দূতরূপে প্রেরণ করলেন। স্পেনে অবস্থানকালে তিনি সেভিলে তাঁর পূর্বপুরুষগণের গৌরবের নিদর্শনগুলি স্বচক্ষে দেখলেন।

তাঁর পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতার পরিচয় পেয়ে কাস্টিলের রাজা নিজের অধীনে ইবনে খালদুনকে একটা উচ্চপদ দিতে চাইলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু খালদুন রাজার দান প্রত্যাখ্যান করলেন। দৌত্যকার্য শেষ করে তিনি গ্রানাডায় প্রত্যাবর্তন করলেন এবং আফ্রিকা থেকে পরিবারবর্গকে আনিয়ে নিলেন। কিন্তু সুলতানের প্রধানমন্ত্রী তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। ফলে তিনি গ্রানাডা পরিত্যাগ করে আলজিরিয়ার সুলতানের প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করলেন। কিন্তু এখানেও ষড়যন্ত্রের হাত থেকে উদ্ধার পেলেন না। অবশেষে ১৩৭৫ সালে কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করলেন এবং "ওরাণের" নিকট ইবনে সালামার কেল্লাতে আশ্রয় নিলেন। এখানে তাঁর কাটল চার বছর। এই চার বছর তিনি তাঁর বিখ্যাত "বিশ্ব ইতিহাস গ্রন্থের" ততোধিক বিখ্যাত "মুখবন্ধের" খসড়া রচনায় মন দিলেন। কিছুদূর লিখার পর তিনি উপাদানের জন্য দলিলপত্র ও অন্যান্য প্রমাণাদির অভাব অনুভব করলেন। আরও উপাদান সংগ্রহ করবার জন্য টিউনিসে চলে এলেন। এখানকার পাঠাগারে বিস্তর পড়াশুনা করতে লাগলেন। ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দিলেন। এর ফলে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়ে গেল। কিন্তু সেই জন্য বোধ হয় দরবারী লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাতে লাগল। তিনি এখানে থাকা নিরাপদ মনে করলেন না। সব ছেড়ে-ছুড়ে মক্কা-তীর্থে ভ্রমণ করবার জন্য মন তাঁর চঞ্চল হয়ে উঠল। আলেকজান্দ্রাগামী একটা জাহাজে চড়ে মিশরের দিকে রওয়ানা হলেন এবং বহু অসুবিধার পর রাজধানী কাইরো নগরে উপস্থিত হলেন। ইতিমধ্যে তাঁর বিদ্যাবত্তা ও অপার প্রতিভার কথা মিশরে ছড়িয়ে পড়েছে এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাইরোর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করলেন। পরে মিশরের মেমলুক সুলতানের অধীনে প্রধান বিচারপদ গ্রহণ করলেন। এই পদে থাকাকালে তিনি বিচার বিভাগ থেকে সর্বপ্রকার দুর্নীতি বন্ধ করতে মনস্থ করলেন। কিন্তু এ কাজ যে অত্যন্ত দুঃসাধ্য তা তিনি শীঘ্রই উপলব্ধি করলেন। বলা বাহুল্য যে, বহু কায়েমী স্বার্থ তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করল। তাঁদের চক্রান্তে তাঁর একপাল শত্রু সৃষ্টি হল। তাঁর চাকরীকালের কার্যকলাপের তদন্ত করবার জন্য একটি কমিশনও নিযুক্ত হল। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই প্রমাণিত হল না। তবুও শাসকবর্গ দেখলেন যে, যাঁর বিরুদ্ধে রাজ্যের ওমরাহগণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন সেরূপ ব্যক্তিকে প্রধান বিচারপতির পদে বহাল রাখা সমীচীন নয়। সুতরাং তাঁকে পদত্যাগ করতে হল। ইতিমধ্যে তিনি টিউনিস থেকে তাঁর পরিবারবর্গকে আনাবার ব্যবস্থা করলেন। এখন একেবারে বেকার। তাঁর অর্থকষ্ট হতে থাকল। কিন্তু তাতে তিনি ভেঙে পড়লেন না। প্রার্থনার মধ্যে তিনি পেলেন অসীম সান্ত্বনা। এবার বহু অভীপ্সিত তীর্থ করতে চলে গেলেন এবং তীর্থক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তন করে শান্তিতে বসবাস করবার জন্য পুনরায় মিশরে চলে এলেন।

কিন্তু ভাগ্যদেবতা তাঁর জন্য আর একটা নাটকীয় ঘটনা নির্ধারিত করে রেখেছিলেন,—১৪০০ সালে মিশরের মেমলুক সুলতান সদলবলে দামেস্কনগরে ভ্রমণ করতে এলেন। সেই সময় তৈমুরলঙ্গ তাঁর অগণিত সৈন্যদল দ্বারা দামেস্ক-নগর অবরোধ করলেন। বহু কৌশলে একদল মিশরীয় সৈন্যগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করল। কিন্তু ইবনে খালদুন সেইখানেই থেকে গেলেন। তৈমুরের সঙ্গে আপোষ আলোচনার জন্য তাঁর মত উপযুক্ত লোক আর ত কেউ ছিল না! সুতরাং মেমলুক সুলতান তাঁকেই সেই ভার দিলেন। তাঁকে দড়ির সাহায্যে নগরের বাইরে নামিয়ে দেওয়া হল। প্রথমেই তাতার বীর তৈমুর এই বিখ্যাত ঐতিহাসিকের আকৃতি দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ইবনে খালদুন যখন ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে তৈমুর সংক্রান্ত বিবরণগুলি পড়ে শুনালেন, তখন তিনি বিস্মিত হলেন। তিনি তৈমুরকে বল্লেন, "যদি আমার বর্ণনার মধ্যে ভুলভ্রান্তি থাকে, তবে দেখিয়ে দিন।" কিন্তু তৈমুর তাতে সংশোধন করবার কিছু পেলেন না। তারপর তৈমুর তাঁকে একটি উচ্চপদ দিতে চাইলেন। কিন্তু ইবনে খালদুন তাতে সম্মত হলেন না। নগর অধিকার করে তাতারগণ যখন লুঠতরাজ আরম্ভ করল, তখন ইবনে খালদুনের মধ্যস্থতায় তা বন্ধ হয়ে গেল এবং বহু ব্যক্তির জীবন রক্ষা পেল। তারপর তিনি মিশরে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং আবার প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত হলেন। এই পদে কাজ করতে করতে ১৪০৬ সালে

দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৭৪ বৎসর।

তাঁর সমগ্র জীবন ছিল ঘটনাবহুল ও চাঞ্চল্যকর। জীবনে তিনি বহু লোকের সংস্পর্শে এসেছিলেন। পশ্চিমদিকে পেড্রো থেকে আরম্ভ করে পূর্বদিকে তৈমুরলংগ—এই সব লোকের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। আবার জনসাধারণের সংগেও তিনি প্রচুর মেলামেশা করেছেন। ইতিহাসের মালমশলা সংগ্রহ করবার জন্য তিনি বহু অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত জাতির কুটিরে বাস করেছেন; আবার রাজা-রাজড়াদের প্রাসাদেও অবস্থান করেছেন। দাগী আসামীদের সংগে কারা-জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, আবার বিচারকের সর্বোচ্চ আসনকেও অলংকৃত করেছেন। অশিক্ষিতদের সংগে সখ্যতা স্থাপন করেছেন, আবার বিদ্বান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সুধীদের সংগে জ্ঞানালোচনা করেছেন। অতীতের জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে প্রচুর জ্ঞান আহরণ করেছেন। সমসাময়িক যুগের কর্মকোলাহলের মধ্যে, দারিদ্র্য ও অভাবের মধ্যে, প্রাচুর্য ও আনন্দের মধ্যে, সকল অবস্থা থেকেই তিনি প্রচুর জ্ঞান আহরণ করেছেন। তিনি জ্ঞানের সেই গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছেন, যেখানে আত্মা জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য সন্ধান করে বেড়ায়।

এবার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করে এই প্রবন্ধ শেষ করব। যে-গ্রন্থ তাঁকে বিশেষভাবে অমরতা দান করেছে, তার নাম "বিশ্ব ইতিহাস"—(Universal History)। এই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব কেবল নিরপেক্ষ ঘটনা বর্ণনার উপর নির্ভরশীল নয়। এর প্রধান শ্রেষ্ঠত্ব এর দার্শনিকত্ব। ইবনে খালদুন এক নূতন দৃষ্টিভংগী দিয়ে ইতিহাস রচনা করেছেন। গ্রন্থের মুখবন্ধ বা ভূমিকাটাই এর শ্রেষ্ঠ অংশ। ইতিহাস কি, কোন্ কোন্ বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত, মানুষের জীবনের সংগে এর সম্পর্ক কি, এই সব বিষয় "মুখবন্ধের" আলোচ্য। বস্তুতঃ এই মুখবন্ধে তিনি আধুনিক মনের পরিচয় দিয়েছেন। এতে আছে সমাজের প্রকৃতি এবং তার বিকাশের ধারার বিস্তৃত আলোচনা। তিনি ইতিহাস লেখকের কাছে ইতিহাস লেখার এমন একটা মানদণ্ড স্থাপন করেছেন, যার সাহায্য নিয়ে ইতিহাসকারগণ বর্ণিত ঘটনাবলীর ও তাদের বিবর্তন ও পরিবর্তনের কারণগুলি সম্বন্ধে গবেষণা করতে পারেন। এক স্থানে তিনি বলেছেন,—
"The past resembles the future, as water resembles water"
তাঁর মতে, সমাজ-বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনা করতে গেলে বর্তমান যুগকেও ভাল করে জানতে হবে। সে সম্বন্ধে নিরপেক্ষ আলোচনা করতে হবে। বর্তমান যুগের ইতিহাসের সম্যক্ জ্ঞান ও ধারণা অতীত ইতিহাসের উপরও যথেষ্ট আলোক বিতরণ করতে পারে। বিভিন্ন দিক দিয়ে মানব-সমাজকে জানবার চেষ্টার নাম সমাজ-বিজ্ঞান। সমাজের বিকাশের প্রত্যেকটি স্তর, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য এবং যে-সব Law বা বিধি সমাজকে প্রভাবিত করে, বিকশিত করে, এই সব বিষয় সমাজ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত। তাঁর "মুখবন্ধের" প্রথম খণ্ডে তিনি সাধারণভাবে সমাজ-বিজ্ঞান নিয়েই আলোচনা করেছেন।

মুখবন্ধের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে আলোচিত হয়েছে রাজনীতির সমাজ-বিজ্ঞান, চতুর্থ খণ্ডে নগর-জীবনের সমাজ-বিজ্ঞান, পঞ্চম খণ্ডে অর্থনীতির সমাজ-বিজ্ঞান এবং ষষ্ঠ খণ্ডে আর গঠিত হয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সমাজ-বিজ্ঞান৹ এ-কথা বিনা প্রতিবাদে বলা যেতে পারে যে, মধ্যযুগে ইবনে খালদুনই বোধ হয় প্রথম মনীষী, যিনি সুস্পষ্ট ও সচেতনভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, ইতিহাসের মধ্যে এই সব বিষয় থাকা উচিত। কতকগুলি মৌলিক নীতি, যার উপর সমাজ-জীবন নির্ভর করে, তিনি ইতিহাস রচনায় সেগুলি যথাসাধ্য প্রয়োগ করেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, Social phenomena বা কতকগুলি সামাজিক ঘটনা কতিপয় Law বা নিয়ম মেনে চলে। সেগুলি রাষ্ট্রীয় বিধির মত Absolute নয় বটে, কিন্তু তার পরিবর্তন কদাচিৎ হয়ে থাকে। সেই Law বা নিয়মগুলি সামাজিক ঘটনাকে একটা Regular and well defined pattern—একটা সুষম, সুনিয়মিত পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং এই সব বিধি বা নিয়ম সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা দরকার। তবেই সমাজ-বিজ্ঞানকে এবং তার পারিপার্শ্বিক ঘটনার গতি-প্রকৃতিকে বুঝতে পারা যায়।

তাঁর মতে এই সব বিধি জনসাধারণের উপর সক্রিয়ভাবে কাজ করে। সমাজ বিচ্ছিন্নভাবে কোন একজন মানুষের দ্বারা গভীরভাবে ও স্থায়ীভাবে প্রভাবিত হয় না। ইবনে খালদুনের ইতিহাসে "ব্যক্তির" স্থান নগণ্য। তিনি বলেন যে, ব্যক্তির রুচি ও বিশ্বাস তার পারিপার্শ্বিকের দ্বারা সীমিত। তাঁর মতে ইতিহাসের বড় বড় ব্যক্তিগণ ঘটনা প্রবাহের উপর খুব কম প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। তিনি একটা উদাহরণ দিয়েছেন : বহু সমাজ-সংস্কারক দুর্নীতিপূর্ণ সমাজকে সংস্কার করতে চেয়েছেন। কিন্তু নিজেদের একক চেষ্টায় বেশী সফলতা লাভ করতে পারেন নি। নানা পরিবেশ তাঁদেরকে সাহায্য করেছে। একজন ব্যক্তির প্রচেষ্টা প্রচণ্ড সামাজিক শক্তির নিকট পরাভূত হয়।

তিনি আর একটা কথা বলেছেন, সেটাও উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে, সব লেখক এই সব বিধি আবিষ্কার করতে পারেন না। এ-সব বিধি আবিষ্কার করতে হলে নিরপেক্ষভাবে প্রচুর ঘটনা ও তথ্য আবিষ্কার করতে হবে। বহু আনুষংগিক ঘটনা ও তাদের পরিণতি সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করতে হবে। অতীতের ঘটনাবলীর রেকর্ড এবং বর্তমান যুগের ঘটনার পর্যবেক্ষণ—এই দু'টিকেই সুষ্ঠুভাবে বিচার করা দরকার। এইভাবে মালমশলা সংগ্রহ করে তারপর করতে হবে তার ব্যাখ্যান বা ভাষ্য। অতীত ও বর্তমানের সহিত ঘটনাবলীর মধ্যে সামঞ্জস্য ও পারস্পরিক সম্পর্কের দিকে লক্ষ্য রেখেই ভাষ্য বা ব্যাখ্যা করতে হবে। তাছাড়া মনোবিজ্ঞান ও প্রাণী-বিজ্ঞানের সর্বস্বীকৃত নীতিগুলিও লক্ষ্য করা দরকার। এই সব-কিছুর মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। সেইটা বর্ণনা করার নামই ব্যাখ্যান বা ভাষ্য।

ইবনে খালদুন আর একটা বিষয় লক্ষ্য করেছেন যে, স্থান ও কালের ব্যবধান একটা সমাজকে যতই পৃথক করুক না কেন, একই প্রকার সামাজিক আইন ও সামাজিক কাঠামো গোটা সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর এই মন্তব্য যাযাবর জাতির জন্য যেমন প্রযোজ্য, ঠিক তেমনিভাবে প্রযোজ্য আরব-বেদুঈনদের বেলায়। অন্যান্য দেশের যাযাবর জাতিদের সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, আরব দেশের যাযাবর জাতির জন্য তা সমানভাবে সত্য। বারবার (Berber), টুর্কোগম্যান, কুর্দ জাতি পৃথিবীর যেখানেই থাকুক না কেন, তাদের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য প্রায় একই রূপ। এদের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না।

সেই মধ্যযুগে ইবনে খালদুন আর একটা বিষয় লক্ষ্য করেছেন যে, সমাজ নিশ্চল বা গতি-শূন্য নয়। কালের প্রভাবে মানুষের সামাজিক বহিরংগের পরিবর্তন হয়, ক্রমবিকাশ হয়। যে-সব ঘটনার ফলে এই পরিবর্তন হয়, তার একটির উপর তিনি জোর দিয়েছেন—বিভিন্ন মানুষ ও শ্রেণীর মধ্যে সংযোগসাধন। এই সংযোগের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে অনুকরণ ও সংমিশ্রণ। ঐতিহাসিক কারণে ক্রমবিকাশের (Evolution) কথা তিনি স্বীকার করেছেন। সে-যুগে এরূপ উপলব্ধি যে খুবই আশ্চর্যজনক, তা স্বীকার করতেই হবে। তিনি বলেছেন যে, সমাজের বিকাশের এক স্তরে যে-সব Tendency বা প্রবণতা দেখা যায়, তার পরবর্তী স্তরে অপরিহার্য রূপে থাকে না। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, সামাজিক অর্থনীতির পরিবর্তনের ফলে একটা শ্রেণীর মর্যাদা ও পরিবর্তন হয়। সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবেশ সৃষ্টি করতে আবহাওয়া ও খাদ্য যে খুবই সহায়ক, তা তিনি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন। সেই সংগে তিনি এটাও দেখিয়েছেন যে, সংশক্তি (Co-hesion), সংযোগ, বৃত্তি, অর্থ প্রভৃতি সমাজের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। যখন তিনি আরব ও য়িহুদীদের জাতীয় চরিত্রের বিষয় আলোচনা করেছেন, তখন একটা বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন যে, আরব-বেদুঈনদের অবাধ্যতা ও য়িহুদীদের চালাকী তাদের জাতিগত মৌলিক বৈশিষ্ট্য নয়, এগুলি সম্ভব হয়েছে তাদের জীবন-ধারা ও অতীতের ঐতিহ্যের জন্য।

যে ভিত্তির উপর সমাজ-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তার একটা সুস্পষ্ট আভাষ পাই তাঁর 'মুখবন্ধে'। বর্তমান যুগের সমাজ-বিজ্ঞানীরা যেসব পদ্ধতির সাহায্যে সমাজের বিবিধ ঘটনার ব্যাখ্যা করেন, তিনি সেই মধ্যযুগে সেগুলির কতকগুলি প্রয়োগ করেছেন। বর্তমান যুগের সমাজ-বিজ্ঞানীদের বহু কর্মধারা ও পদ্ধতির উপর তিনি আলোকপাত করেছেন। তাঁর গ্রন্থের একস্থানে তিনি দেখিয়েছেন যে, বিজিত ও পদানত জাতি, বিজয়ী জাতির প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের অনুকরণ করে থাকে। তাদের মনে একটা সাইকলজিক্যাল হীনভাব জাগ্রত হয়। তাদের নৈতিক অধোগতির জন্য যে তাদের পতন হয়েছে, এটা তারা স্বীকার করতে চায় না। তারা মনে করে যে, তাদের উপর বিজয়ী শক্তি যে জয়লাভ করেছে তার মূল কারণ বিজয়ী শক্তির শ্রেষ্ঠতর টেকনিক, তাদের উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র ও সমর-কৌশল।

(শেষাংশ ২৩৩ পৃষ্ঠায়)

আলো

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

সুন্দরী নয় সে জানি। তবু তার আয়ত গভীর
দু'চোখের দৃষ্টি টানে আমাকে নিভৃতে বারে বারে।
যদিও চটুল নয়, তবুও সে অস্থির অধীর ;
যখন দাঁড়ায় কাছে, দু'হাতে কী যেন শুধু নাড়ে,
হয়তো লজ্জাকে তার।
হয়তো সে পালাতে পালাতে
মুহূর্তের তরে যেন ধরা দেয় কুমারী সংকোচে,
হয়তো দেয় না ধরা। সে কখনো চায় না ভোলাতে
তির্যক কটাক্ষে কিম্বা
লজ্জাহীন দৃষ্টির উৎকোচে॥

তাই তাকে ভালো লাগে।
ভালোবাসি ভালোবাসি তাকে।
যদিও এ'কথা বুঝি সে কখনো আসবে না কাছে,
এবং জানিনা আজো মন তার চায় শুধু কাকে
কিম্বা চায় না কাকে,—
তবুও সে কাছে কাছে আছে॥

যতবার একা হই মনের নিভৃত নীল ঘরে
সে এসে শ্যামল হাতে
স্মিতমুখে আলো তুলে ধরে॥
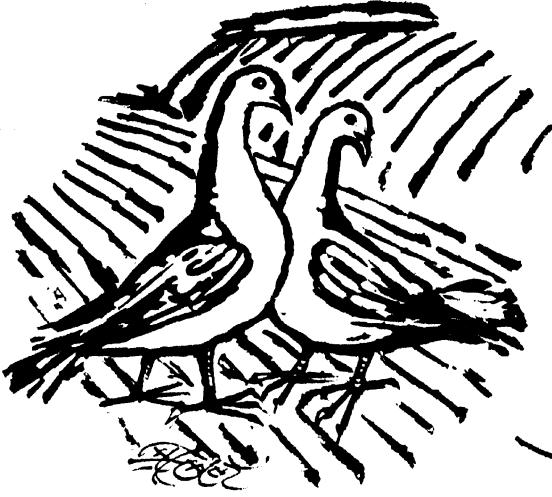
আকাঙ্ক্ষা

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

কোথা থেকে এল—কেন এল—কিসের জন্য আমারই এই নির্জন ঘরটিতে এত যত্নের সংগে আশ্রয় দেওয়া হ'য়েছে এ প্রশ্ন নিরর্থক। অশান্তির সৃষ্টি হবে। শেষ পর্যন্ত হয়ত' আমাকেই একটা নিরিবিলি আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে। তার চেয়ে যেমন আছে থাক। বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি না করলে মেনে নিয়ে মানিয়ে চলাই ভাল।

নিঃশব্দে ঘরের দরজা খুলেই নতুন আগন্তুকের উপস্থিতির কথা জানতে পারলাম। আশ্রয় স্থান থেকে মুখ বাড়িয়ে একবার চেয়ে দেখে অস্ফুট কণ্ঠে ডেকে উঠল। কচি দুখানি ঠোঁট ফাঁক ক'রে হয়ত' কিছু আহার্যের প্রত্যাশা করে পুনরায় স্থির হ'য়ে বসল।

একটি সিগারেট ধরিয়ে বসে বসে টানছিলাম আর ভাবছিলাম আমার স্ত্রী সীমার কথা আর তাঁর এই বিচিত্র রুচির কথা।

সাড়া দিয়ে সীমা ঘরে ঢুকলেন। বললেন, কখন এলে?

অনেক্ষণ—বললাম, কিন্তু ওটাকে আবার কোথা থেকে জোটালে?

সীমা হেসে জবাব দিলেন, আপনি জুটে গেলো।

সীমার সাড়া পেয়ে চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে তাঁর আশ্রিত জীবটি। দুখানি কদর্য ঠোঁট ফাঁক করে এক প্রকার শব্দ করে এগিয়ে আসতে চাইছে। সেই দিকে দৃষ্টি পড়তেই তিনি দ্রুত পদে চলে গেলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই কিছু আহার্য হাতে নিয়ে ফিরে এলেন।

পরম যত্নের সংগ তিনি খাইয়ে দিচ্ছেন, আর পারাবত শিশুটি সর্বাংগে একটা পুলক শিহরণ জাগিয়ে একাগ্রভাবে গিলে চলেছে।

নির্বিকারভাবে বসে বসে সিগারেট টানছিলাম আর চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম শ্রীমতীর কার্যকলাপ।

একটা কুৎসিত জীব। একতাল মাংস। হয়ত দিন কয়েক হ'ল সবে আলোর মুখ দেখেছে। সারা দেহে ফিকে হলদে রংয়ের অল্প অল্প পালক দেখা দিয়েছে।

খাইয়ে দাইয়ে পারাবত শাবকটিকে পুনরায় যথাস্থানে রেখে দিয়ে সীমা আমার পাশে ফিরে এসে বললেন, রান্না ঘরের ভেণ্টিলেটারে কোথা থেকে দুটো পায়রা এসে বাসা বেঁধে ছিল, তাদেরই বাচ্চা এটা।

মুখ থেকে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললাম, কবুতর মাতা হঠাৎ তার শাবকটির ভার তোমার উপর চাপিয়ে দিয়ে গেলেন কোথায়? এটাকে আবার যথাস্থানে রেখে দিলেই হতো।

সীমা জবাব দিলেন, না তা হ'তো না।

জিজ্ঞেস ক'রলাম, কারণ?

সীমা বলেন, গত দুদিন ধরে কবুতর মাতা আসছেন না। আর চেঁচিয়ে বাচ্চাটা আমার মাথা খারাপ করে তুলেছিলো।

বললাম, আবার যদি ওর মা ফিরে আসে?

বাধা দিয়ে সীমা বললেন, বেঁচে থাকলে তো আসবে। বটুবাবুর শিক্ষিত পায়রাটি ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আর তিনি আনন্দ করে রোষ্ট ক'রে খেয়েছেন।

হেসে বললাম, বটুবাবুর রুচিবোধ আছে' পিজিয়ান রোষ্ট সত্যিই বড় ভাল জিনিষ। তা এটাকেও ওর হাতে তুলে দিলে না কেন?

সীমা একবার কটমট ক'রে আমার পানে তাকিয়ে নিঃশব্দে চলে গেলেন। পুনরায় আর একটি সিগারেট ধরিয়ে চোখ বুজে টানতে সুরু ক'রলাম।

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে। পারাবত শাবকটির দেহে অল্প অল্প পালক দেখা দিয়েছে। একতাল মাংসে রূপের ছোঁয়া লেগেছে। ইদানিং আমার দৃষ্টি এড়িয়ে মাঝে মাঝে আশ্রয় স্থান থেকে নেমে আসতে সুরু করেছে। আজও আমাকে কিছুটা ভয় করে। কাছে আসবার সাহস নেই—আগ্রহ আছে। মনে মনে কৌতুক বোধ করি। প্রশ্রয় দিই না।

এক মনে লিখতে লিখতে হয়ত অজ্ঞাতসারে কখনও আমার দৃষ্টি গিয়ে পক্ষী শাবকটির উপর পড়েছে। আশ্চর্য দুটি ভীরু আর কৌতূহলী চোখের সন্ধান পাই। গলা উঁচু করে এদিকেই চেয়েছিল। আমি মুখ ফেরাতেই ও মুখ লুকাল। আমার বিরাগ আর অসন্তুষ্টির কথা একটা পাখীর কাছেও অজানা নেই। লেখা বন্ধ করে কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু বুদ্ধি যুক্তির কাছে হার মানে।

সেদিন সন্ধ্যায় আমার এক বাল্য বন্ধু এসে উপস্থিত হ'ল। বহুদিন পরে এসেছে। সাদর আহ্বান জানালাম, অমলেন্দু যে ভিতরে এসো।

অমলেন্দু ঘরে এল। মামুলী ধরণের আলাপ-আলোচনা চলল কিছুক্ষণ ধরে। তারপরে এক সময় আলোচনার ধারা এপথ ওপথ ঘুরে এসে পারাবত শাবকটিকে ঘিরে পাক খেতে সুরু ক'রল। আমার পায়রা পোষার বিদঘুটে সখ দেখে অমলেন্দু রীতিমত চটে গেল। আমার ঘরের মধ্যে নাকি এমন ভাপসা গন্ধ হয়েছে যে, এরপরে কোন ভদ্রলোক এ ঘরে এসে আর ব'সতে চাইবে না। সব অভিযোগ নীরবে শুনে গেলাম। ইচ্ছে ক'রেই প্রতিবাদ ক'রলাম না। কি জানি হয়ত কাছে পিঠেই কোথাও সীমা উপস্থিত আছেন। কি ব'লতে কি বলে বসব' তারপরে সামলান দায় হবে।

আমি পারাবত প্রসংগটা একটু সহজ ক'রে নেবার উদ্দেশ্যে ব'ললাম, তুমি গোড়ায় গলদ ক'রে বসে আছো অমলেন্দু।

অমলেন্দু মুখ তুলে তাকাল।

আমি মৃদু কণ্ঠে বললাম, ওটি তোমার বৌদির আশ্রিত। নইলে বহু আগেই বিদায় ক'রতাম।

অমলেন্দু চুপসে গেল। ফিস ফিস ক'রে বলল, আহাম্মক—এ কথা আগে বলতে হয়তো—কি ভাগ্যি আরও কিছু বেফাঁস কথা বলে বসিনি।

পুনরায় বলি, আর সবচেয়ে আশ্চর্য কি জানো? আমি যে পায়রাটিকে ভাল চোখে দেখি না তা ও জানে।

অমলেন্দু বিস্মিত কণ্ঠে বলে, অর্থাৎ?

জবাব দিলাম, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে লক্ষ্য ক'রে দেখলে তুমিও আপনা থেকেই বুঝতে পারবে। লুকিয়ে লুকিয়ে পাখীটা

আমার নড়া-চড়া, কথা বলা সব কিছুই লক্ষ্য করে। চোখে চোখ পড়লেই ভয় পেয়ে মুখ লুকোয়।

অমলেন্দু হেসে বলে, পায়রাটা নিশ্চয়ই মেয়ে জাতের শংকর। নইলে এতো লুকো-চুরি কেন—

দুজনেই এক সংগে হাসতে থাকি। আমা-দের হাসির শব্দে আকৃষ্ট হ'য়েই হোক কিংবা অন্য কোন কারণেই হোক সীমা এসে উপস্থিত হ'লেন। আমাদের হাসি বন্ধ হল। পারাবত শাবকটি চঞ্চল হয়ে উঠল। পাখা ঝটপট করে লাফিয়ে লাফিয়ে খানিক এগিয়ে এসে আবার ফিরে গেল। চিঁ চিঁ করে ডেকে উঠল। সীমা ধমক দিলেন, চুপ—তারপরেই অমলেন্দুর পানে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, ভাল বিপদেই পড়েছি। দেখুন দেখি কার বোঝা কাকে বইতে হচ্ছে।

সীমা কি বলতে চাইছেন ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে অমলেন্দু চেয়ে রইল। আমি ধরিয়ে দিলাম, তোমার বৌদি পায়রার কথা ব'লছেন।

অমলেন্দু এক মুহূর্তে দার্শনিক হয়ে উঠল। বলল, কার বোঝা কে বয়ে থাকে বৌদি। তাছাড়া লক্ষ্মীমন্ত ঘরেই লক্ষ্মীর আবির্ভাব ঘটে। পায়রা যে লক্ষ্মী।

সীমার মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল। বুঝলাম, হতভাগা নির্দয়ভাবে আমার পকেট কাটার ফিকিরে আছে। আগামীকাল বাজার যাব না ভেবে গোটা কয়েক ডিম এনে রেখেছি—সে কটি ওরই সেবায় ব্যয় হবে......আর ঐ সংগে আধ পাউন্ড রুটি এবং টিনের অবশিষ্ট মাখনটুকুও যে অমলেন্দুর কল্যাণে নিঃশেষ হবে, তাও আমি দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি।

তাছাড়া—অমলেন্দু পুনরায় একমুখ হেসে বলল, এরই মধ্যে যা চেহারার জৌলুস হ'য়েছে, এমন সচরাচর দেখা যায় না। মনে হয় খুব ভাল জাতের পায়রা।

সীমা স্নিগ্ধ হেসে জবাব দিলেন, জাতের কথা ভাববার সময় ছিল না ঠাকুরপো। ওর অসহায় অবস্থার কথাটাই বড় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পায়রার কথা থাক। আপনারা বসুন আমি আপনাদের জন্য চা করে নিয়ে আসছি।

অমলেন্দু ব'লল, অতি উত্তম প্রস্তাব। তবে আমি কিন্তু সোজা অপিস থেকে আসছি বৌদি।

সীমা মিষ্টি হেসে চলে গেলেন।

আমি বললাম, এটা কি হলো অমলেন্দু?

অমলেন্দু হাসতে হাসতে জবাব দিল, ভবিষ্যতের ব্যবস্থা। তোমার আর কি—বাপের রেখে যাওয়া কিছু পয়সা পেয়েছো। বসে বসে খাও, আর সাহিত্য চর্চা করো। আমাদের মত ক'রতে চাকরী তাহ'লে বুঝতে কতো হ্যাঁ কে না, আর না-কে হ্যাঁ ক'রে ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করতে হয়। এদিক ওদিক ক'রেছো কি চতুর্দিক অন্ধকার—বাধা দিয়ে বললাম, কিন্তু আমার বাড়ীতো তোমার কর্মস্থল নয় অমলেন্দু—অমলেন্দু দ্বিধাহীন কণ্ঠে জবাব দিল, তোমার বাড়ীতেও যে পেটের ব্যবস্থা আছে শংকর।

আরও কয়েক সপ্তাহ পরে। পারাবত শাবকের নামকরণ হয়েছে নন্দিনী। নামটি আমারই দেওয়া। নন্দিনীর [illegible] ছুটে গেছে। আজকাল রীতিমত নেচে কুঁদে বেড়ায়। দেখে শুনে মনে হয় নন্দিনী তার জীবনের সুরুতে এসে পৌঁছেছে। সারা দেহে ওর রূপের ঢেউ বয়ে যায়। সাদা ধপধপে পালকে ওর সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত হয়েছে। চোখ জুড়ান রূপ। ভালই লাগে দেখতে। আমার মনের সে বিতৃষ্ণার ভাব আর সেই বরং অনেক-খানি দুর্বল আর নরম হয়ে পড়েছে। ঘরে প্রবেশ করে সর্বপ্রথমেই নন্দিনীর পানে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। হাত বাড়িয়ে একটু আদর করতে উদ্যত হই। বার কয়েক আগুপিছু করে আস্তে আস্তে ঠোকর দেয়। আমি এগিয়েছি। ওর সাহস বেড়েছে। দৃষ্টিতে পূর্বের সে ভীত-চকিত ভাব নেই। অনেকখানি সহজ আর অনেকখানি স্বভাবিক হয়ে উঠেছে। মন্দ লাগে না। মাঝে মাঝে মনে একটা সূক্ষ্ম চিন্তা দেখা দেয়। চিন্তাটা নন্দিনীকে কেন্দ্র করেই দেখা দেয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা অনেক দূরে এগিয়ে যায়। নন্দিনী গৌণ হ'য়ে জীবনের মূলতত্ত্ব সেখানে বড় হয়ে ওঠে। আশা আকাঙ্ক্ষা ভরা জীবনের সুরু থেকে শেষের মধ্যবর্তী অংশের নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ স্তরগুলি বর্ণময় হয়ে ওঠে।

চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে যায়। আমার অন্য-মনস্কতার সুযোগ নিয়ে নন্দিনী এসে আমার টেবিলের এক অংশে বসেছে। মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই সেখান থেকে মেঝেতে নেমে গেল। আমার চোখের সম্মুখেই বার কয়েক ওঠানামা করে এক সময় গিয়ে জানালার উপর বসল। চমকে উঠলাম। এখনও ভাল করে উড়তে শেখেনি।

নন্দিনী আনন্দ চঞ্চলভাবে ঘাড় বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চতুর্দিকে দেখছে। পাথরের মত নিশ্চল হয়ে বসে আমি লক্ষ্য করছি ওর অংগভংগী। নড়তে-চড়তেও ভয় পাচ্ছি!

রহস্যময় নীল আকাশের পানে ওর দৃষ্টি। ডানায় ওর শক্তি এসেছে। চোখে ফুটে উঠেছে জিজ্ঞাসার চিহ্ন। আমি বাধা দেবার কে? দিলেইবা নন্দিনী ত শুনবে কেন। হয়ত আরও বেপরোয়া হয়ে উঠবে।

ঘাড় বাঁকিয়ে আমার দিকে বার কয়েক চেয়ে দেখে এক সময় উড়ে গিয়ে ছাদের কার্ণিশের উপর বসল।

উঠে গিয়ে সীমাকে খবরটা দিলাম। তিনি বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য দেখলেন না। বরং উপেক্ষা ভরে বললেন, তাড়া দিও না। আপনি ফিরে আসবে। কদিন ধরে রোজই এমনি করছে।

সীমা ঠিকই বলেছেন। নন্দিনীর পৃথিবীর আয়তন একটু একটু করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমার ছোট্ট ঘরের মধ্যে তাই আর আটক থাকতে চাইছে না। তবে ভয় ওর ভাঙেনি। তাই দু'পা এগিয়ে আবার তিনপা পিছিয়ে আসছে। এমনি দু চারবার আসা-যাওয়া করতে করতে এক সময় সহজ হয়ে উঠল নন্দিনী। একটু একটু করে ভয় ভাঙছে আর সেই সংগে সাহস বাড়ছে। নেচে নেচে কার্ণিশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পাশ দিয়ে দুটো কাক উড়ে গেল। নন্দিনী চমকে স্থির হয়ে দাঁড়াল। মাথা নেড়ে নেড়ে চতুর্দিকে কি দেখে নিয়ে পুনরায় ঘরে ফিরে এল। প্রথমে আমার টেবিলের উপর, সেখান থেকে সোজা গিয়ে আলমারীর মাথায় বসল। মনে মনে আশ্বস্ত হ'লাম।

সীমা চা দিতে এসে হেসে বললেন, আমার কথা ঠিক কিনা দেখলেতো?

নন্দিনী একবার তার ডানা দুটি ঊর্ধ্ব-পানে গুটিয়ে একবার বিস্তার করে পুনরায় অস্থিরভাবে মেঝেতে নেমে এল। তারপর গুটি গুটি এগিয়ে এসে সীমার পায়ের একটি আঙুল কামড়ে দিল।

সীমা হেসে বলল, ঠুকরে খেতে শিখেছে কিনা—

রহস্য করে জবাব দিলাম, খাদ্যদ্রব্যটি ভালই বাছাই করেছে—

সীমা কিন্তু রহস্যের ধার দিয়েও গেলেন না। বললেন, বেশ যাহোক। কাগজ, মাটি, দেশলাইর কাঠি এগুলো বুঝি কাউকে মুখে পুরতে দেখোনি? • তোমার হাতের আঙুলে দাঁত বসাবার কথা কি এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

ভুলিনি কিছুই। সীমার চিন্তাধারার গতি প্রকৃতি আর একবার ভাল করে পরখ করে দেখছিলাম, কিন্তু মনের কথা মুখে প্রকাশ করলাম না। শুধু একটুখানি হাসলাম।

সীমা চলে যেতেই চেয়ারটা টেনে নিয়ে গিয়ে টেবিলের কাছে বসলাম। কলমটি তুলে নিয়ে কিছু লেখা যায় কিনা তারই ব্যর্থ চেষ্টা করতে থাকি।

নন্দিনী পুনরায় মেঝে থেকে আলমারীর উপর উড়ে গিয়ে বসল। আবার সেখান থেকে নেমে এল টেবিলের উপর। আমি বাধা দিলাম না। ঘাড় কাত করে কি দেখে নিয়ে এক সময় গলাটা লম্বা করে এগিয়ে এনে আমার কলমটির উপর ঠোকর দিল। বাধা না পেয়ে আরও একটু এগিয়ে এসে আমার কোলের উপর ব'সল। আস্তে আস্তে নন্দিনীর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে থাকি। আধবোজা চোখে

সকালের কাগজে ছবি

·······সুনীল বসু·······

উড়ো মেঘ যত ধরেছে রঙের বর্ণবাহার
চিকচিকে রোদ খুশি হয়ে হাসে
ঘরের মধ্যে, উঠোনের ঘাসে
শীত চলে যায়, গলে যায় যত বরফ ব্যথার।
ভোর জাগানোর গান ঝরে পড়ে পাখির গলায়
পাতলা চাদরে তনুর আদর
খুলে যায় মনে ভিতর সদর
অন্ধকারের অজন্তা গুহা হীরায়-পলায়।
দীঘি হল দেখি পারদ রোদের মায়াবী-মুকুর
পেয়ালার গানে চায়ের দোকান
তাজা গন্ধে কি খুশি করে ঘ্রাণ
বাসি গোলাপের পাপড়িরা খসে খোঁপাতে বধূর।
গাছ আঁচড়ায় বাতাস এখন সোনার চিরুণী
কর্পূর শেষ রাত্রি প্রহর,
সুরেলা কণ্ঠে তাসের সহর
জাগায় একলা বস্তিতে এক কোকিল-তরুণী॥

নিঃশব্দে অনুভব করে এই স্নেহ স্পর্শের মধুর উত্তাপ।

আরও কিছুদিন অতীত হ'য়ে গেছে। আজ আর ভাবতেও পারা যায় না যে, মাস কয়েক পূর্বে রান্নাঘরের ভেণ্টিলেটারের ফোকর থেকে একটা কুৎসিত পারাবত শাবককে সীমা নিয়ে এসেছিলেন। নন্দিনীর দেহে আজ যৌবনের জোয়ার এসেছে। সাদা সাদা পালকগুলিতে, গর্বিত চলাফেরার মধ্যে একটি নিটোল পরিণতির পরিপূর্ণ আভাস সুপরিস্ফুট। নন্দিনী তার পারাবত জীবনের একটি পরম সন্ধিক্ষণে এসে উপস্থিত হ'য়েছে। আরম্ভের উন্মাদনায় তাই টগবগ করে বেড়াচ্ছে—নিজেকে নিয়ে নানাভাবে লুকোচুরি খেলছে ক্ষণে ক্ষণে। কখনও দুর্বোধ্য কখনও আড়ষ্ট ওর গতিবিধি।

নন্দিনী আজ সম্পূর্ণ একটি পারাবত। মানুষের স্পর্শ, তাদের আদর যত্ন ওর কাছে সবচেয়ে বড় কাম্যবস্তু নয়। অনেক বড় হয়ে উঠেছে জীবনের অনাস্বাদিত রহস্য। যে রহস্য সন্ধানে ওর আগ্রহের অন্ত নেই।

গত দুদিন ধরে একটি পুরুষ পারাবত ঘরের আশেপাশে আনাগোনা করছে। একটানা কূজন করে করে ক্লান্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছে—আবার এসে দেখা দিচ্ছে। বাইরের এ আহ্বানে নন্দিনী চঞ্চল হয়ে উঠলেও সাড়া দিয়ে এগিয়ে যেতে পারেনি, কিন্তু বারে বারে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে চেয়ে দেখছে। এ আহ্বানকে শেষ পর্যন্ত হয়ত নন্দিনী উপেক্ষা ক'রতে পারবে না। আরম্ভের সংকোচ আর ভয় হয়তো ওকে দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলেছে।

আজও আবার দেখা দিয়েছে পুরুষ পারাবতটি। বুক ফুলিয়ে নেচে নেচে আকুল আহ্বান জানাচ্ছে যৌবন গর্বিতাকে। উভয়ের মধ্যের ব্যবধান আজ অনেক কমেছে। হয়তবা মন গলেছে—ভয় ভাঙেনি। খুশীর রঙিন আমেজ ওর চোখের দৃষ্টিতে। ক্ষণে ক্ষণে চকিত হয়ে উঠছে। চাঞ্চল্য প্রকাশ পাচ্ছে।

এগিয়ে গিয়ে সশব্দে জানালাটা বন্ধ ক'রে দিলাম। একটা মিষ্টি হাসির শব্দ কানে এল।

প্রশ্ন ক'রলাম, হাসছো কেন?

নিরীহ কণ্ঠে সীমা জবাব দিলেন, তোমার কাণ্ড দেখে। কি বন্ধ করে তুমি কাকে ঠেকাতে চাইছো?

আবার তিনি হেসে উঠলেন। ইঙ্গিতটা এতই স্পষ্ট যে, এরপরে আর যুক্তি-তর্কের প্রশ্ন ওঠে না।

সীমার কথাকটি যে কত সত্য, তা পরদিনই আমি টের পেলাম। আমার ঘরের পরিধি আর কতটুকু—বাইরে রয়েছে বৃহৎ পৃথিবী। কতদিকের কত দরজা, জানালা বন্ধ করে আমি রাখব। নন্দিনী আজ আর পরনির্ভরশীল নয়। ইচ্ছেমত সে চলতে-ফিরতে পারে, নাচতে পারে, উড়তে পারে, আরও হয়তো অনেক কিছুই পারে। সচেতন হয়ে উঠেছে নিজের সম্বন্ধে। জানতে চায়, বুঝতে চায় ওর জীবনটাকে। দুটিখানি খাওয়া কিংবা বাস করবার জন্য সীমাবদ্ধ একটু স্থান আজ আর যথেষ্ট নয়। বৃহত্তর জীবনের সন্ধান ক'রতে নন্দিনীর আজ আগ্রহ দেখা দিয়েছে।

আজ আর দূরে নয়। জানালার পাশে কার্ণিশের উপর এসে বসেছে পুরুষ পারাবতটি। দ্বিগুণ উৎসাহে বুক ফুলিয়ে নেচে নেচে আহ্বান জানাচ্ছে। মুখরিত হয়ে উঠেছে দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধতা। একটা মাতাল করা সুর অনুরণিত হ'য়ে উঠেছে। গর্বিতার গর্ব বুঝি আর থাকে না। জেগে উঠেছে তার যৌবন। নেচে উঠেছে গরম রক্ত। চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে সমগ্র চেতনা।

দ্রুত উড়ে চলে গেল নন্দিনী। ওর পাখার ঝাপটায় বাতাসে ঢেউ উঠেছে। টেবিলের উপর থেকে কাগজপত্র সব ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল।

সামান্য দূরত্ব রেখে নন্দিনী গিয়ে স্থির হ'য়ে বসল। চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। কি তার বসার ভংগী আর চাহনীর মাধুর্য। ধরা দিয়েও ধরা না দেওয়ার একটি চমৎকার অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। যেন কৃতার্থ হ'তে ও যায়নি কৃতার্থ ক'রবার জন্যই ওর আগমন।

বুক ফুলিয়ে ফুলিয়ে ডাকছে পুরুষ পারাবতটি আর নেচে নেচে এগিয়ে আসছে এবং পিছিয়ে যাচ্ছে। রকম দেখে মনে হয় ওর আনন্দ আর ধরছে না—উপচে পড়ছে। খুশীতে জ্ঞান হারিয়েছে। দিশা পাচ্ছে না কেমন ক'রে ভিতরের আবেগ প্রকাশ ক'রবে। কেমন ক'রে নিবেদন ক'রবে রূপসীর পায়ে।

ওর নৃত্য থেমেছে। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে নন্দিনীর গা ঘেঁসে বসেছে। বাধা পেল না, উৎসাহও মিলল না। পটে আঁকা ছবির মত দুটিতে পাশাপাশি ব'সে আছে। নিঃশব্দে একে অপরের উপস্থিতি সান্নিধ্যের ভিতর হয়ত অনুভব ক'রছে।

এক সময় পুরুষ চঞ্চল হ'য়ে উঠল। সাবধানে গলা বাড়িয়ে নন্দিনীর ঠোঁটের কাছে ওর ঠোঁট এগিয়ে নিয়ে গেল। নন্দিনী মুখ ফিরিয়ে নিতেই মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল পুরুষ, পরক্ষণেই নন্দিনীর ধপধপে সাদা পালকের উপর দিয়ে ঠোঁট বুলিয়ে নিল। এবারে আর কোন বাধা পেল না। ওর সাহস একটু একটু ক'রে বাড়ছে। দেহ থেকে পুনরায় ঠোঁটের কাছে ঠোঁট এগিয়ে এল। এবারে মুখ সরিয়ে না নিয়ে নন্দিনী মাথা নীচু ক'রল। চোখ বুজে কিছু যেন অনুভব ক'রছে বলে মনে হ'ল। কিংবা এটা হয়ত ওর আত্মসমর্পণের নীরব ইংগিত।

হঠাৎ অসম্ভব রকম চমকে উঠল ওরা। কোথা থেকে আর এক প্রতিদ্বন্দ্বী এসে উপস্থিত হ'য়েছে। নন্দিনী ভয় পেয়ে ঘরে চলে এল। আর পুরুষ তার সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করল নবাগতকে। দূর থেকে নন্দিনী মাথা তুলে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষের দ্বন্দ সাগ্রহে দেখছে। উঠে গিয়ে জানালাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে এলাম। কেন তা জানি না।

নিজের অজ্ঞাতে কখন যে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলাম জানি না। আমার মনের অনেকখানি ওদের এই বিচিত্র গতিবিধির মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। আত্মস্থ হ'লাম আমার একটি আঙ্গুলে টান পড়ায়। আমার আঙ্গুলটিকে কামড়ে ধরে নন্দিনী বারে বারে ঝাঁকি দিচ্ছে। আঙ্গুলটি সাবধানে ছাড়িয়ে নিতেই সে আমার কাঁধের উপর উড়ে এসে বসল। আমার চুলের উপর ধীরে ধীরে ঠোঁট বুলোতে লাগল। স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইলাম—

ঘরে ঢুকে উত্তেজিত হ'য়ে উঠলাম। সদ্য শেষ করা একটি গল্পের পাণ্ডুলিপি টেবিলের উপর চাপা দিয়ে রেখে গিয়েছিলাম। তার দুরবস্থা দেখে মাথায় আমার খুন চেপে গেল। সীমাকে ডেকে যা নয় তাই বলে অনুযোগ দিলাম।

কাগজ ক'খানার সংগে রীতিমত লড়াই করা হ'য়েছে। কোনটা দুমড়েছে, কোনখানা ছিঁড়েছে, খানকয়েক আলমারীর তলায় আর চেয়ারের নীচে গড়াগড়ি যাচ্ছে। আর নন্দিনী আমার টেবিলের একটি অর্ধোন্মুক্ত ড্রয়ারের মধ্যে চুপ ক'রে বসে আছে।

আমার গল্পের দুরবস্থা দেখে সীমা দুঃখ প্রকাশ ক'রলেও আমাকে অনুযোগ দিতে ভুললেন না। বললেন, ভুল হয়তো আমি ক'রেছি কিন্তু সে ভুলকে যখন তুমি মেনে নিয়েছো তখন তোমারও আর একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল। দেখতেই তো পাচ্ছ নন্দিনী এখন ঘর বাঁধবার চেষ্টা ক'রছে।

কথাটা হয়ত সীমা ঠিকই বলেছেন। প্রাকৃতিক নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রম কোথাও ঘটেনি। প্রাকৃতিক নিয়মেই ওর জন্ম হ'য়েছে... একই নিয়মে আস্তে আস্তে বেড়ে উঠেছে... দেখা দিয়েছে যৌবন...নির্বাচন করেছে ওর সংগী। সুতরাং নিজের মত তার ঘর চাই নইলে মনের মত সংসার পাতবে কেমন ক'রে।

সবই সত্য কিন্তু আমার যে ক্ষতি আজ নন্দিনী ক'রেছে তা ভুলতে আমি রাজি নই। সীমাকে লক্ষ্য ক'রে ব'ললাম, ভুল কার সে তর্ক থাক কিন্তু আজ থেকে আমার ঘরে নন্দিনীর স্থান হবে না।

নন্দিনী সন্তর্পণে ড্রয়ার থেকে বার হ'য়ে এসে সোজা বাইরে গিয়ে বসল। সঙ্গে সংগে ওর পুরুষ সংগীটিও এসে জুটল। আজ কিন্তু নিজে থেকে নন্দিনী এগিয়ে গেল। ডাকার অপেক্ষায় রইল না। উপরন্তু মুখ বাড়িয়ে কিছু প্রাপ্তির আশায় কাংগালের মত অপেক্ষা ক'রতে লাগল।

সীমার মুখের পানে তাকালাম। তিনি হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

●

শেষ পর্যন্ত নন্দিনীকে আশ্রয়চ্যুত করা সম্ভব হয়নি তার উপর ওর সংগীটিও নিয়মিত আসা যাওয়া সুরু করেছে। মুখে করে খড়কুটা বহন করে নিয়ে আসছে পুরুষ আর ঘরে বসে গৃহসজ্জায় আত্মনিয়োগ করেছে নন্দিনী। আলমারীর উপরে কোণের দিকের একটি অন্ধকার অংশ মনোনীত করা হ'য়েছে। দিন কয়েক পূর্বে আমার গল্পের পাণ্ডুলিপি দিয়ে যে কাজের সূচনা হ'য়েছিল আজ খড়কুটা দিয়ে সেই অসমাপ্ত কাজই হয়ত সমাপ্ত করতে আত্মনিয়োগ করেছে।

আমার চোখে স্পষ্ট হ'য়ে দেখা দিল একতাল নরম মাংস। দেখে বিরক্ত হ'য়েছিলাম। যদিও সীমা ঐ মাংসপিণ্ডটিকেই সযত্নে লালন পালন ক'রে এত বড়টি ক'রেছেন। সেই মাংসপিণ্ডই আজ একটি সম্পূর্ণ পারাবত। সংগী জুটিয়েছে, সংসার পেতেছে....

আরও কয়েকদিন গত হ'য়েছে।

আজ [illegible] আলমারীর উপর থেকে একবারও নন্দিনী নেমে আসেনি। খাবার [illegible]

ভুলে গেছে। অবাক হ'লাম। ইদানিং নন্দিনীর খাওয়ানোর ভার আমিই নিয়েছি। বার বার ডাকাডাকি ক'রতে মাথা তুলে একবার নিজের উপস্থিতির কথা জানিয়ে দিয়ে আবার অদৃশ্য হ'য়ে গেল। আমাকেও যেন আর চিনতে পারছে না। চেয়ারটা টেনে এনে তার উপর দাঁড়িয়ে দেখবার চেষ্টা ক'রলাম কি রহস্য আলমারীর উপরের ঐ অন্ধকার অংশে ওর জন্য জমা হ'য়ে রয়েছে। কৃতকার্য হ'লাম না। আলমারীর মাথায় হাত রাখতেই আমার একটা আঙ্গুলে প্রচণ্ড বেগে ঠুকরে দিল। সাড়া দিলাম, ওরে আমি— কিন্তু কোন ফল হ'ল না। দ্বিতীয়বার ঠুকরে দিল।

সীমাকে খবরটা দিতেই তিনি হেসে ব'ললেন, কি দেখতে গিয়েছিলে তুমি? বুঝতে পারছো না নন্দিনী ডিমে বসেছে।

বোঝা উচিত ছিল স্বীকার ক'রে নিতে হ'ল। নন্দিনী সংসারে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হ'তে চ'লেছে, আর কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানেই ও জননীর মর্যাদা পাবে। তারই সাধনায় রত আছে ঐকান্তিক একাগ্রতা নিয়ে। তাই রুষ্ট হ'য়েছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওর সাধনা ব্যর্থ হ'ল। ডিম দুটি নষ্ট হ'য়ে গেছে। আলমারীর অন্ধকার কোণ থেকে নন্দিনী আবার নেমে এসেছে। দেহের সে জলুস আর নেই। সাদা পালকগুলিতে পাটকিলে রংয়ের ছোপ ধরেছে। চেহারার মধ্যে কেমন একটা ক্লান্ত আর বিমর্ষ ভাব স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। সামান্য শব্দেই ভয় পেয়ে চমকে চমকে ওঠে। অবশ্য এ ভাব বেশীদিন স্থায়ী হয় না। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই নন্দিনী আবার নবউৎসাহ নিয়ে জেগে উঠল। আবার ওদের মিলিত কূজনে চতুর্দিক মুখরিত হ'য়ে উঠল। আবার আলমারীর অন্ধকার কোণে আত্মগোপন ক'রল নন্দিনী।

দ্বিতীয়বার ডিমে বসেছে নন্দিনী। এবারে আর ভুল করিনি। দূর থেকেই শুধু লক্ষ্য ক'রেছি। কাছে গিয়ে ব্যাঘাত ঘটাইনি।

ভাবছিলাম জীব জগতের সৃষ্টির নেশার কথা। অনাদিকাল ধ'রে একই নিয়মে ধারাবাহিক ভাবে চলে আসছে। ক্লান্তি নেই... বিরতি নেই। কিসের আশায় এই দুশ্চর তপস্যা আর এত কষ্ট স্বীকার...এত দুঃখ আর এত আশাভঙ্গের বিনিময়ে কোন্ মোক্ষলাভ ঘটে!

কিছু আহার্য গ্রহণ ক'রতে নেমে এসেছে নন্দিনী। চমকে উঠলাম। এত রূপ ওর কোথায় গেল। মাথার পালকগুলি সব ঝরে গেছে। দেহের অবস্থাও অবর্ণনীয়। চেহারায় সে কমনীয়তা নেই। কিন্তু চোখ দুটির মধ্যে দেহের সবটুকু মাধুর্য গিয়ে বাসা বেঁধেছে। আশ্চর্য রকমের নরম আর স্নিগ্ধ একটি ভাব নন্দিনীর চোখ দুটিতে টলমল ক'রছে।

হয়ত নতুন কিছুই নয়। তথাপি চেয়ে চেয়ে দেখি। নিজেকে নিঃশেষে ক্ষয় ক'রে আপন সৃষ্টির মাঝে বেঁচে থাকার চিরন্তন উন্মাদ আকাঙ্ক্ষার একটি সুন্দর নগ্ন রূপ। এই আকাঙ্ক্ষার বুঝি কোনদিন মৃত্যু নেই।

কোলের উপর উড়ে এসে বসেছে নন্দিনী। নীরবে ঘাড় কাত ক'রে আমার মুখের পানে খানিক চেয়ে থেকে এক সময় আমার হাতের উপর আস্তে আস্তে মুখ ঘষতে থাকে। হাল্কা হাতে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিই। খানিক চুপ ক'রে থেকে এক সময় নন্দিনী চলে যায়।

ক'দিন ধরে নন্দিনীর সংগীটির আর দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। কথাটা সীমা আমাকে প্রথমে জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ও নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই।

●

নন্দিনী পুনরায় আলমারীর উপরের আশ্রয়স্থান ত্যাগ ক'রে তার পুরাতন বাসস্থানে ফিরে এসেছে। আমি চেষ্টা করেও ওখানে ফেরৎ পাঠাতে পারিনি। কামড়ে আর পাখার ঝাপটা মেরে অনিচ্ছা প্রকাশ ক'রেছে। বুঝলাম এবারের সাধনাও নন্দিনীর ব্যর্থ হ'য়েছে তাই নতুন বাঁধা ঘরের প্রতিও ওর আকর্ষণ ফুরিয়ে গেছে।

দিন চলে যায়, সময় ওর মনের উপর প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। নন্দিনী তার হৃতস্বাস্থ্য আবার ফিরে পেয়েছে। মাথায় নতুন পালক গজিয়েছে। সারা দেহে আবার লাবণ্য ফিরে এসেছে। কিন্তু দৃষ্টিতে আর চলাফেরার মধ্যে পূর্বের সে উচ্ছ্বসিত ভাব নেই। অকারণে কান খাড়া ক'রে মাঝে মাঝে কিছু শুনতে চেষ্টা করে—কখনও ঘর ছেড়ে কোথায় চলে যায়। আবার ফিরে আসে। আবার যায়। কোথায় যায় জানি না কিন্তু ফিরে এসে কেমন যেন হতাশ ভাবে বসে বসে ঝিমতে থাকে। মনে হয় নন্দিনী তার একক সাথীছাড়া জীবনটাকে ঠিক মেনে নিতে পারছে না। তাই কখনও হতাশায় একেবারে থেমে যায় কখনও বা অস্থির ভাবে ছটফট করে বেড়ায় ওর সংগীর ফিরে আসার প্রতীক্ষায়।

এমনি দিনে আবার নন্দিনীর জীবনের প্রবেশ পথের প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব ঘটল। আকুল আহ্বানে মুখরিত হ'য়ে উঠল দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধতা। নেচে নেচে ঘুরে বেড়াচ্ছে নবাগত।

চমকে উঠে মুখ তুলে তাকাল নন্দিনী। ঘাড় বাঁকিয়ে খানিক চেয়ে থেকে সহসা উড়ে গিয়ে নবাগতর মুখোমুখি হ'য়ে ব'সল।

নবাগত নেচে নেচে কূজন ক'রতে ক'রতে এগিয়ে এল। নন্দিনী জবাব দিল প্রচণ্ড রোষে—আক্রমণ ক'রে ঠোঁটের আঘাতে পাখার ঝাপটায় ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলল আগন্তুককে।

অবাক হ'য়ে লক্ষ্য ক'রছিলাম—মার খেয়েও ফিরে মারল না নবাগত। বরং সকল আঘাত আর সমস্ত অপমান নিঃশব্দে হজম ক'রে উড়ে চলে গেল।

সীমা বলছিলেন, এইটিই নাকি বটু-বাবুর শিক্ষিত পারাবত। এরই জন্য নন্দিনী আজ মাতৃহারা—সংগীহারা।

সীমার কথায় চমকে উঠলাম। মনে পড়ল আর একদিনের কথা......

এই ঘটনার পর নন্দিনী বড় একটা ঘরের বাইরে যায় না। পুরাতন আশ্রয়ে মন বসাবার চেষ্টা ক'রছে হয়ত। কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হ'তে পারছে না। যা ও পেয়েছিল তাই সম্ভবত ও আবার ফিরে পেতে চায়। তাই মাঝে মাঝে ছটফট করে...গুমরে গুমরে কুজন ক'রে ভিতরের জ্বালা প্রকাশ করে।

দুদিন হ'ল নন্দিনী নিরুদ্দেশ। শেষ পর্যন্ত কি আবার নতুন ক'রে ঘর বাঁধবার জন্যই পুরাতন আশ্রয় ত্যাগ ক'রে গেল। অতীত আর বর্তমান একেবারে মুছে গেল!

কিছুই আশ্চর্য নয়। আশে পাশে তাকালে এমন বহু নজির চোখে পড়ে। স্নেহ, ভালবাসা। দয়া দাক্ষিণ্য এ সবের কতটুকু মূল্য আর কতখানি মর্যাদা পাওয়া যায়। তবুও একই পথ ধরে চলার বিরাম নেই।......

সীমা ব'লছিলেন, চুপ ক'রে ব'সে কি অতো ভাবছো?

চমকে স্ত্রীর মুখের পানে তাকালাম। তারপর সেই দৃষ্টি আরও কোমল আরও নরম হ'য়ে নেমে এল পার্শ্বে দণ্ডায়মান আমার শিশু কন্যার মুখের উপর।......

ব'ললাম, নিমকহারাম। এতদিন ধরে খাইয়ে পরিয়ে এতো বড় করা হ'লো আর...

কথাটা শেষ করা হ'ল না। নন্দিনী এই মাত্র ফিরে এসে ঘরে প্রবেশ ক'রেছে।

সীমার মুখে ভারী সুন্দর এক টুকরো হাসি দেখা দিল।

বিশ্রাম

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

আকাশে জ্যোৎস্নার বন্যাধারা,
রোগের কল্লোলে জাগুক ঝড়;
কুঞ্জে জোনাকির থাক ইসারা
অভ্রে ঝলসাক বালুর চর!

সীতার বনে-বনে উঠুক গান,
পাহাড়ী দেওদারে নবীন পাতা,
হ্রদে জলে থাক দাঁড়ের টান,
গড়াক ময়দানে রঙিন ছাতা!

আমরা ফিরে যাব চুপটি করে;—
পুরেছে—ভেবে নেব মনস্কাম;
থাকবে খুঁইবাস তাঁবুটি ভরে.
প্রেমের কাম্যও এ-বিশ্রাম!

চিরন্তনী

দুর্গাদাস সরকার

তখন ছিল লজ্জানত চোখের কোণে দীপ্তি,
চলনে ধীর রণন, মনে অতৃপ্তিতে তৃপ্তি।
ফোটার আগে যেমন কুঁড়ি দুলতে থাকে বৃন্তে,
সংকুচিত তেমনি তুমি আসতে যেতে; চিনতে
পারোনি হায় চিনেও, কথা বলতে ছিল লজ্জা,
যৌবনেরি স্পর্শে ছিল কুঁড়িরই স্বতঃসজ্জা।
গোপনে ঐ গুঞ্জরিত তোমার মনই জানতো—
চিত্তে দোলা দিলেও ছিলে তখন কতো শান্ত!
এখন তুমি অন্তঃপুরে পুরাও যদি বাসনা—
যেমন ভাল বাসতে তুমি তেমন ভাল বাসনা।
দৃপ্ত তুমি তৃপ্ত, আমি ভুবনে ঘুরি বিরহে;
অনেকে বলে, বিদায় দিয়ে হৃদয় করো দৃঢ় হে।
তবু যে কোন স্বপ্নে দেখে তোমায়, আমি অন্ধ
যন্ত্রণাতে তোমাতে খুঁজি চিরকালের ছন্দ!!

চক্ষে আমার তৃষ্ণা

বটকৃষ্ণ দে

"—তবুও হৃদয় কেন বুঝিস না
পাওনাটুকু তোর।
তোর ভাগ্যে নেই যদি
সূর্যাস্ত মেঘের সোনা রঙ্,
নেই যদি শিউলি-শুভ্র
মুক্তা-শিশু শিশিরের ভোর
তা নিয়ে আক্ষেপ ক'রে
কী-বা হবে। তার চেয়ে বরং
পেয়েছিস্ যেটুকু,
তাতেই পরিতৃপ্ত থাকা ভালো!"—
বুঝিয়েছিলেম। কিন্তু,
মন তবু বোঝে না, তাকায়
হাততালি দেয়, দেখে,
শাওনের মতন মেয়েকে,
যার নীল-কালো চোখে
সর্বনাশ আঁকা। তবু যায়
বহ্নি-পতঙ্গের মত,
তারই কাছে ছুটে, এ'কে-বে'কে
গোল হ'য়ে ঘোরে, বুঝি,
আশা তার একটিবার আলো
মেঘ-মেদুর রাত্রি ভেঙ্গে
সেই চোখে ঝলকাবে! (এই প্রেম!)
এই লগ্ন হৃদয়-কে শূন্যতার নেই-নেই
থেকে দূরে রাখে। হায়, জানে না সে,
চাওয়ার পিপাসা
পাওয়ায় মেটে না কভু:
চাতকের মতোই কেবল
আকাশ কাঁপায় শুধু
কান্নার প্রার্থনা : 'জল, জল'।
—সব শান্তি হয়ে যায়,
পেলে এক বিন্দু ভালোবাসা॥

চাঁদের অংশ

॥ মানস রায় চৌধুরী ॥

অনেকদিন গিয়েছে কেটে জলধারার মত
মনে এখন ফুল ফুটছে। আমরা ইতস্ততঃ
যে বীজগুলি রোপণ করেছিলাম গোধূলিতে
তারা এখন আত্মলীন আপন সৌরভে।
মনে পড়ছে, সন্ধ্যাবেলা ওপথে হে'টে আসা
ক্লান্তিহীন পায়ের তলে শুধু বন্ধুরতা...
এই সময় শূন্যতার মাঝে আচম্বিতে
পেলাম এক পান্থশালা, আঁধার তার ঘরে
সাজানো ছিল খাদ্য, সুরা, শয্যা থরে থরে।

ফেরার সময় আলো জেগেছে। ভোরের মৃদু হাওয়া
পটভূমিতে এনেছে এক ভিন্ন প্রতিবেশ।
তোমারই গাছ, তোমারই ফুল—
তাকাও ভালো করে
চিহ্ন কেন যাওনি রেখে? নিশীথে দ্রুত যাওয়া
আহা মাটির কি দোষ তুমি ভাবো শান্ত হয়ে
শিশিরে ধুয়ে গিয়েছে ছাপ, সারারাত্রি ধরে
কত কথাই বলেছি ঐ বুকের শাদা শিলা
সব ছবি কি রাখতে পারে? একটি নয় দু'টি
নয়ন জলে অমাগুলি ক্রমশঃ লুণ্ঠিত।

পূজার খেলা

—শ্রীহরেন্দ্রনাথ সিংহ—

মহানদী তীরে মোরে
কতদিন রঙীন সন্ধ্যায়,
পূজা অর্ঘ্য সাজায়েছি
প্রিয়া তুমি কাছে ছিলে বোলে,
বাস্তব বাঁচিয়া আছে
পথ চেয়ে বর্তমান কোলে,
ধ্যানের মুরতি ধরি
বেদনায় মোহিনী মায়ায়।

বুকের স্পন্দনে পাই
নিশিদিন তোমার স্পন্দন,
জীবন সন্ধ্যায় তীরে
মনে পড়ে মহানদী তীর।
প্রথম প্রণয়ে যেথা
গড়েছিনু প্রেমের মন্দির,
ধুয়ে-মুছে যায়নিকো
পূজার সে কুসুম চন্দন।

অতীতের কত কথা
জীবনের ব্যর্থ ইতিহাসে,
প্রাক্তনের চিরন্তন রবে
আলো স্মৃতির গৌরব।
শয়নে-স্বপনে ধ্যানে
তোমায় যে করি অনুভব।
উদ্ভাসিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল
ধ্রুবতারা হৃদয় আকাশে।

রমাস্থান "হীরাকুদ"
হোল আজি বিখ্যাত ভারতে,
একদা সেখানে মোরা
মহানন্দে "মহানদী" দিয়ে—
পুলকিত জ্যোৎস্না রাতে
নৌকাযোগে ফিরেছি বেড়িয়ে;
প্রকৃতি দেখায়েছিল
বিশ্বরূপ—পূর্ণিমা শরতে।

বিরহের হোম অগ্নি
প্রাণে নিয়ে বেলা বয়ে যায়,
নৈবেদ্যের লাগি মালা
কে রচিবে পূজার মেলায়।

ডুবলে পরে

—অবিনাশ রায়—

তুমি সাগরে ঘট ভরেছ।
তোমার অহংকার
তুমি নাকি সমুদ্রেরই কেউ,
ডুবলে পরে অন্ধকার
এবং অন্ধকার
ভাসিয়ে দাও লোনা জলের ঢেউ।
যখন আমি স্পর্শ করি
তখন সে-দুর্বার
রক্ত যেন আগুন হয়ে গলে,
ডুবলে পরে অন্ধকার
এবং আকাঙ্ক্ষার
সাগর ঠিক আপন পথে চলে।

নীড়

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যাবার সময় হ'লে দুই চোখ
সন্ধ্যাতারার মত রেখে শুধালে,
'আবার কবে আসবে?'

কী বলব তোমাকে?...
চোখ তুলে তাকালেম জানালার দিকে,—
মনের মধ্যে ঘুরে-ফিরে ভাবি
কী বলব তোমাকে?......
ঐখানে জানালার পথে
একটু আকাশ আর একটু পৃথিবী
আপন চঞ্চলতায় দোলে।
বাতাসে কাঁপে গাছের ঝাঁকড়া মাথা।
অলস পাখীর কোন ডাক ভেসে আসে।
শিশু করে খেলা।
মাঝে মাঝে পথিকের মেলা।
শুধু যাওয়া শুধু আসা সারাবেলা!
পাখী যায় একবার আকাশে উড়ে
আবার ঐ গাছে এসে বসবে বলে।
তবু ওড়ে। তবু বসে থাকে।

আমি ঐ পৃথিবীর জানালার থেকে
চোখের আকাশে চোখ ফিরিয়ে বললুম,
'কখন তোমার সময় হবে?'

দুষ্কৃত বিষাদ

শংকর চট্টোপাধ্যায়

স্মরণে নেভাও আলো, তুমি
মাল্যহীন রক্তাক্ত আহত
বিমুগ্ধ বিস্মিত, বনভূমি
দর্পময়ী নিজকর্মরত।

বাসভূমি যৌবন চূড়ায়
মাধুর্যের সম্ভারে আনত
পুষ্পলুব্ধ বসন্ত ফুরায়
অবশেষে লগ্ন সমাগত।

পরিণামে পরিবর্তমান
তুমি জানি অমৃতা পরমা
গভীরে অনন্ত অভিমান
রেখে যাও পরিশুদ্ধ ক্ষমা।

সর্বনাশ দূরপরাহত
স্মরকুঞ্জে রোমাঞ্চিত অলি
রিক্তপটে পূর্ণতর ক্ষত
অনন্যসহ প্রপঞ্চ কেবলি।

স্মরণে নেভাও আলো, সীমা
নেই জেনো জলস্থলে, পাপ
বর্ণচোরা, নির্মল নীলিমা।
দিগ্বিজয়ী আমার সন্তাপ।

প্যানেল ডোনার

অনিলবরণ ঘোষ

বিশ্ববিদ্যালয়ের টব বারান্দাগুলিতে ফুল ফুটেছে, মেয়েরা বারান্দায় বারান্দায় গল্প-গুজব হাসি-ঠাট্টা করছে। একটা টবে একটি মেয়ে উচ্ছল আনন্দে বান্ধবীদের বলে, তোরা আজ চায়ের পয়সা দে, বাকী খরচ আমার। যা 'ফার্স্ট-ক্লাশ ফিস-ফ্রাই'-এর খোঁজ পেয়েছি।

মেয়েরা সানন্দে রাজী হয়ে যায়, কলরবে ওরা বারান্দা ছাড়ে। একটা টবের এক গুচ্ছ ফুল ঝরে পড়ে:

রাস্তার উল্টোধারের লাইট পোস্টে ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে একটি লোক দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বয়েস বোঝবার উপায় নেই। পাণ্ডুর মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথার চুলে বহুদিন তেল নাই, গালদুটি শুকিয়ে বসে গেছে, মলিন জামার নীচে বুঝি শুধু হাড়ের কাঠামো, কিন্তু অদ্ভুত দুটি চোখ, কোটরে জ্বলছে।

বড় রাস্তা পেরিয়ে নানা গলি ঘুরে লোকটি গিয়ে ঢোকে তারই মত দুর্দশাগ্রস্ত একটা রেষ্টুরেণ্টে। বাঁ হাতের নাড়িটা ডান হাতে টিপে ধরে গুম মেরে রেষ্টুরেণ্টের একটা বেঞ্চিতে সে বসে থাকে। মুখ গোমরা দেয়াল ঘড়িটা প্রতিটি সেকেণ্ডের জানানি দিয়ে যাচ্ছে; নিজের নাড়ির স্পন্দনের সঙ্গে ঘড়ির হৃদস্পন্দন সে মিলিয়ে দেখে। মাঝে মাঝে আঁৎকে ওঠে। মনে হয়, আঙুলের টিপে ধরা নাড়িটা বুঝি থেমে গেছে। আর মহানন্দে মাথা দুলিয়ে ঠিক হ্যায় ঠিক হ্যায় করে চলেছে ঘড়িটা।

বিশ্বনাথ দ্বিগুণ মনোযোগে নাড়িটা টিপে ধরে, ঘড়ির সঙ্গে স্পন্দন মিলায়। আশ্বস্থ হয়, ঠিকই চলেছে ঘড়ি আর নাড়ি, কোথাও গোলমাল নাই।

কিন্তু গোলমাল আর গরমিল কল্পনা আর বাস্তবে। সেদিন বিশ্বনাথ একটুও চিন্তা করেনি, একটুও ভাবেনি, শুধু দুর্নিবার এক ভালবাসার প্লাবনে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিল। বড় বেশী ভালবেসে ফেলেছিল উর্মিলাকে,- বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই উচ্ছল মেয়েটিকে। বামনের চাঁদে হাত দেবার বাসনা, ভিখারীর রাজকন্যায় প্রেম। উর্মিলার তুলনায় বিশ্বনাথ ভিখারী বই কি! অন্ততঃ উর্মিলার বাবা ভিখারী বলেই ত ওকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, দরওয়ানের ভয় দেখিয়েছিলেন, পুলিশের ভয় দেখিয়েছিলেন। অথচ একটি রাত্রে এই মহারাজটিই তার কন্যার জন্য বিশ্বনাথের হাতে পায়ে ধরে কত না কাকুতিতে ভেঙে পড়েছিলেন—

স্মৃতির রোমন্থনে বিশ্বনাথের চোখ দুটি জ্বলে ওঠে। আঙুলের টিপে ধরা নাড়ি ছেড়ে দেয়, পাণ্ডুর মুখে অস্বাভাবিক রক্তোচ্ছ্বাস।

আজ মনে হয়, সে রাতটি না এলেই বুঝি ভাল ছিল, বেশ ত চলে যাচ্ছিল দিন। ব্লাড-ব্যাংকে মাসে একবার চান্স পাওয়া যায়, পাঁচশো সি, সি রক্তের বদলে পঞ্চাশ টাকা। ত্রিশটি টাকা দাদার হাতে ফেলে দিয়ে খাবার আর শোবার নিশ্চিন্তি। ত্রিশ বছরের জীবনেই স্থবিরত্ব এসে গেছে। আশা আকাঙ্ক্ষায় উত্তাপ নেই। বরফ শীতল জীবন।

বড় হঠাৎই অঘটন ঘটে গেল, স্বপ্ন জাগল। সেদিন ব্লাড-ব্যাঙ্কের ছোট্ট একটা ঘরে কয়েকজন লোকের সঙ্গে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসেছিল বিশ্বনাথ। দরজার দিকে কাউকে আসতে দেখলেই সকলে উৎসুক হয়ে ওঠে। অচেনা মুখ সব, উঁকি দিয়েই চলে যায়, আর ঘরের লোকগুলির মুখ বিরক্তিতে ভারী হয়ে ওঠে।

কোণের দিকে বসে এক মনে বিড়ি টানছিল বিশ্বনাথ। ক'দিন ধরে ভাল ঘুম নেই, শরীরটা কেমন ম্যাজম্যাজে। আবার পাঁঠার লিভার সেদ্ধ কয়েকদিন খেতে হবে। যা বিশ্রী গন্ধ, কিন্তু উপায় নেই, অল্প পয়সায় ওর চেয়ে বড় টনিক আর নেই।

চেনা মুখ দেখা যায় দরজায়। ব্লাড ব্যাংকের চাপরাশি জনার্দন ঘরে ঢোকে। সকলে জনার্দনকে ঘিরে ধরে। জনার্দন ঘোষণা করে, এ গ্রুপের আজ দরকার নেই। এ—বি গ্রুপের যারা এক পাশে সরে যাও, তোমাদের এক্ষুণি ডাক পড়বে।—বলেই মহাব্যস্ত জনার্দন চলে যায়।

ঘরের এক পাশে অ্যাংলো জোন্স হু হু করে কেঁদে ওঠে। আমার কি হবে গো, তিন দিন ধরে ফিরে যাচ্ছি, আজ টাকা না নিয়ে গেলে বাড়ীওয়ালা যে ঘর থেকে বার করে দেবে, চার মাস বাড়ী ভাড়া বাকী—

কে কাকে সান্ত্বনা দেবে। রক্ত বিক্রী করতে এসেও ক্রেতার অভাবে ফিরে যেতে হয়।

যদি ওবেলায় ডাক পড়ে, আশায় আশায় বসে থাকে জোন্স, বসে থাকে আরও অনেকে। বলা ত যায় না, কখন চাহিদা হবে। যদিও ওদের ঠিকানা ব্লাড-ব্যাঙ্কের খাতায় লেখা আছে দরকার পড়লে রাত দুপুরে গাড়ী পাঠিয়ে নিয়ে আসে; কিন্তু তেমন রাত আসে কদাচিৎ।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল পেরিয়ে যায়। এ—বি গ্রুপের ওরা রক্ত দিয়ে চলে যায়। জোন্স ঘরময় ছটফট করে ঘুরছে, গালাগাল দিচ্ছে বিনি পয়সায় যারা রক্ত দিয়ে যায় তাদের।

পকেটে মাত্র দুটো বিড়ি অবশিষ্ট। আর অহেতুক আশা। বিশ্বনাথ উঠে দাঁড়ায়। ওর ঘর ভাড়ার তাগিদ নেই, কিন্তু দাদাকে টাকা দেবার সময় হয়ে এসেছে।

জোন্স, ইব্রাহিম, ভকতরাম আর বিশ্বনাথ ব্লাড-ব্যাঙ্কের পুরনো বন্ধু। রক্তের এ গ্রুপের লোক জোন্স, বি-গ্রুপের ইব্রাহিম, ভকতরাম এ—বি গ্রুপের আর বিশ্বনাথ জিরো গ্রুপের। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের রক্ত এই চার গ্রুপে ভাগ করা। রোগী ইংরাজ, বাঙালী, চীনা আর নিগ্রো; যে জাতেরই হোক না কেন, বহুজন ওদের রক্তের বদলে জীবন ফিরে পেয়েছে।

বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিশ্বনাথ ব্লাড-ব্যাঙ্ক ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। একটা পার্কের বেঞ্চিতে অনেকক্ষণ শুয়ে বেশ রাত করে বাড়ী ফেরে। খেয়েদেয়ে আর কিছু নয়, একটানা ঘুম। কিন্তু খাবার অনেক দেরী। দাদা বৌদি সিনেমায় গিয়েছেন, রাত ন'টায় শো ভাঙবে, তারপর ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে ফিরতে আরও এক ঘণ্টা। কাচ্চা-বাচ্চাগুলি পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। ওদের একজন উঠে এসে দরজা খুলে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ে। ক্ষিধে চেপে বিশ্বনাথও ওদের পথ ধরে। বিছানায় গা এলিয়ে দেয়।

কখন চোখ বুজে গিয়েছে খেয়াল নেই। ভাইপোর ডাকে ঘুম ভাঙে। গাড়ী এসেছে, ডাকছে। নিজের কানকে বিশ্বেস হয় না, বুঝি স্বপ্ন দেখছে, পাশ ফিরে শোয় বিশ্বনাথ। জানালা দিয়ে দৃষ্টি পড়ে রাস্তায়। সত্যি, একটা প্রকাণ্ড গাড়ী দাঁড়িয়ে। চোখদুটি দুহাতের মুঠিতে রগড়ে সে উঠে বসে, মুহূর্তে বাইরে এসে দাঁড়ায়।

এক গাল হেসে এগিয়ে আসে জনার্দন। বিশ্বনাথের একটা হাত ধরে বলে, চলো—

মাথার ভেতরে সব যেন কেমন গোলমাল পাকিয়ে যায়। হঠাৎ প্রচন্ড একটা অভিমান জাগে, আত্মাভিমান। তু করে ডাকলেই দৌড়তে হবে, নিশ্চয়ই নয়। জনার্দনের আহ্বানে নিরস-কণ্ঠে বলে, শরীর ভাল নেই, আজ আর যাব না। ভয়ংকর রকম অবাক হয়ে যায় জনার্দন। প্যানেল-ডোনার টাকা পেয়ে রক্ত দেয় না, এমন ত সে দেখেনি কখনও। লোকটা দেশাটেশা করেছে নাকি। বিশ্বনাথের শরীর ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে জনার্দন হুমকি দেয়। কি সব বাজে বোকছো, বাবুরা সব গাড়ীতে বসে আছেন, এসো—

—: টাকা দিলে কতলোক রক্ত দেবে, বাবুদের খুঁজে নিতে বলো গে—

—: কি হয়েছে, কি বলছে, গাড়ী থেকে নেমে এসেছেন রাশভারী একজন লোক। জনার্দন তাকে ঘটনাটা বলে। শুনে ভদ্রলোকের মুখ শুকিয়ে যায়। এগিয়ে যান বিশ্বনাথের দিকে। ওর দু'হাত ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে বলেন, আমার মেয়েকে তুমি বাঁচাও, আজ রাতেই ওকে রক্ত দিতে হবে, যত টাকা চাও দেবো।

বিশ্বনাথ আজ বুঝি ভূতগ্রস্ত অভদ্র-কণ্ঠে বলে, টাকার গরম অন্য কোথাও দেখালে কাজ দেবে।

গাড়ী থেকে নেমে আসেন আরেকজন লোক। ব্যাপারটা তিনি সবই শুনতে পেয়েছেন। আস্তে বিশ্বনাথের কাঁধে হাত রেখে বলেন, লক্ষ্মী ভাই আমার, অমন চটে উঠলে কেন? টাকা দিয়ে কি রক্তের ঋণ পরিশোধ করা যায়। ভদ্দুর আমার মাথার ঠিক নেই। একমাত্র মেয়ে, সবে সতের পেরিয়েছে। দুধে আলতা গায়ের রঙ, পটোল চেরা চোখ, তিল ফুল নাসা, মেঘবরণ চুল, ইতিহাসের পদ্মিনীও বুঝি হার মানে সৌন্দর্যে; কিন্তু সকলই বুঝি ব্যর্থ হয়ে যায়। তুমি ভাই শুধু একবার দেখবে চলো। তোমারি মমতা জাগবে। অমন সুন্দর একটি ফুল নিশ্চয়ই অকালে ঝড়ে যেতে দেবে না। তোমার রক্ত ওর শিরায় শিরায় বইবে, ওর মেদ মজ্জা তোমার রক্তে গড়ে উঠবে. ওকে তুমি নতুন জীবন দেবে, নতুন জীবনে ওযে তোমারই—

কি সুন্দর বলছেন ভদ্রলোক। যেন স্বপ্ন দেখছে বিশ্বনাথ। রূপকথার রাজপুত্রের মত সে পাতালপুরীর রাজকন্যাকে জীয়ন কাঠি ছুইয়ে বাঁচিয়ে দিচ্ছে, চোখ মেলে রাজকন্যা ওর দিকে তাকাবে, ওর দেহের নতুন রক্ত বলে দেবে পরিচয়, লজ্জায় দু'চোখ নামিয়ে নেবে রাজকন্যা......

আর ভাবতে পারে না বিশ্বনাথ। পুলক শিহরণে দম বুঝি বন্ধ হয়ে যাবে; বুঝি ফুসফুস ফেটে যাবে। ভদ্রলোক এ মুহূর্তটির প্রতীক্ষাই করছিলেন। বিহ্বল বিশ্বনাথকে জোর করে ধরে নিয়ে গাড়ীতে বসালেন, নিয়ে আসেন প্রাসাদোপম এক বাড়ীতে। রাজকন্যার ঘরেই ওকে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

বিশ্বনাথ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ওর মনে হয়, বুঝি একটুকরো চাঁদের আলো। বন্দিনী হয়ে পড়ে আছে বিছানায়, মূর্চ্ছা গেছে নিষ্ঠুর মানুষের নিঃশ্বাসে।

রক্ত নেওয়া হ'ল পাঁচশো সি, সির জায়গায় আট শো সি, সি। এক গোছা নোট ওর হাতে গুজে দিতে চাইলেন ভদ্রলোক। ম্লান হাসিতে টাকা ক'টা ফিরিয়ে দিয়ে চলে আসে বিশ্বনাথ।

ওর দেউলিয়া যৌবন আবার জেগে উঠেছে। আবার স্বপ্ন জেগেছে। ঊর্মিলা.....ঊর্মিলা, নামটি বড় সুন্দর, বড় সুন্দর চাঁদের দেশের মেয়েটি। মেয়েটির রূপোলী দেহের শিরায় শিরায় প্রতি কোষে কোষে ওর কামনার বাসনার উদ্বেল রক্ত কণিকা ছোটাছুটি করছে, কি মজা।

এর পর। এর পরের ইতিহাসে ছায়া-মারীচের ভ্রান্তি, রক্তের দাবী ব্যর্থ। প্রথম দিন খোঁজ নিতে গিয়ে রুগিণীর সুস্থতার খবর নিয়ে ফিরে আসে। কিন্তু দ্বিতীয় দিন শুনতে হ'ল শাসানি। ফের এ মুখো হলে মেরে হাড় চুর চুর করা হবে।

স্বপ্ন রাজ্যের চাবিটি হারিয়ে ফিরে আসে বিশ্বনাথ। একটা প্রচন্ড বিতৃষ্ণা দুনিয়ার উপর। আর এক ফোঁটা রক্তও কারুর জন্য নয়। না খেয়ে শুকিয়ে মরবে, ব্লাড-ব্যাঙ্ক আর নয়।

তবু মাঝে মাঝে অলস নিরালায় ভুল করে বিশ্বনাথ। রাতের আঁধার আর দিনের আলোয়, মানুষের হাসি আর কান্নায় কি যেন যাদু লুকিয়ে। ভুল করে বিশ্বনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সতৃষ্ণ নয়নে উপর পানে তাকায়। কোনদিন ঊর্মিলাকে দেখা যায়, কোনদিন যায় না।

কিন্তু বিশ্বনাথের মনে অদ্ভুত এক তৃপ্তি। ওরা যতই অস্বীকার করুন না কেন, রাজকন্যার প্রতিটি ধমনীতে যে বিশ্বনাথের রক্তের ছোঁয়াচ, তার সর্বশরীরে যে ছড়িয়ে আছে বিশ্বনাথ। এ অস্বীকার করবার ক্ষমতা আছে কার?

মধ্যযুগের একজন আরব ঐতিহাসিক

(২২৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

পরাজিত জাতি আরও বিশ্বাস করে যে, তাদের উপর বিজয়ী জাতির সাফল্যের গোপন কথা হচ্ছে একটা অভ্যাস। যদি সেই অভ্যাসকে অনুকরণ করতে পারা যায়, তবে জীবনে আরও সফলতা লাভ করবে।

বর্তমান যুগের সমাজবাদীদের বহু সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তিনি ছিলেন পূর্বগামী। শক্তির ভারসাম্য জীবনের ক্রমবিকাশ ও ক্ষয়-জীব-বিদ্যার এই সমস্ত বিধি প্রয়োগ করে সামাজিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেছেন। এবং সেই মানদন্ডের সাহায্যে ইতিহাসের ঘটনার ব্যাখ্যা করেছেন। সমাজ-আইনের উপর অর্থনীতির প্রভাব যে অত্যন্ত গভীর, তাও তিনি প্রয়োগ করতে ভোলেন নি। বর্তমান যুগে অর্থনীতির আদর্শের বহু পরিবর্তন হয়েছে। তবুও অর্থনীতি সম্বন্ধে তিনি যে মতামত প্রকাশ করেছেন, তা বহু দিক দিয়ে আধুনিক। তিনি মনে করতেন যে, অর্থনীতি Ethics বা নীতিশাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল নয়। নীতি আর অর্থনীতি দু'টো আলাদা বস্তু। অর্থের নৈতিক মূল্যের উপর তিনি জোর দেন নি।—জোর দিয়েছেন তার বাস্তব ও পার্থিব দিকটার উপর।

ইবনে খালদুন আরও উপলব্ধি করেছিলেন যে, জাতীয় সম্পদের উৎস ব্যবসা-বাণিজ্য নয়, মূল উৎস হচ্ছে উৎপাদন। সোনা-রূপা ইত্যাদি মোটেই সম্পদ নয়, এগুলি লোহের মত ধাতু বিশেষ। এগুলিকে মূল্য দেওয়া হয় এই জন্য যে, বিনিময়ের দিক দিয়ে এগুলি অধিকতর কার্যকরী। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে, বিভিন্ন দেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় স্বর্ণ গ্রহণ করে। যে-দেশে স্বর্ণ পাওয়া যায়, সে-দেশ স্বতঃসিদ্ধ-ভাবে ধনী নয়।

খুব পরিষ্কার করে না হলেও ইবনে খালদুন এ আভাষও দিয়েছেন যে, সরবরাহ ও চাহিদা দ্রব্যের মূল্য ও শ্রমের মজুরীর উপর প্রভাব বিস্তার করে। তিনি বলেছেন যে, একটা দ্রব্যের মূল্য নির্ধারিত হয়, তা উৎপাদন করতে যে শ্রমশক্তি নিযুক্ত হয়, তার উপর। দ্রব্য মূল্যের উঠানামা অন্য দ্রব্যের মূল্যকেও প্রভাবিত করে। ইবনে খালদুন ব্যবসায়ের অবাধ, মুক্ত প্রতিযোগিতার সমর্থন করেন এবং ব্যক্তি-বিশেষের একচেটিয়া অধিকারের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। চিকিৎসা, শিক্ষাদান, সঙ্গীত বিদ্যা, এগুলিকে তিনি উৎপন্ন দ্রব্য বলে বর্ণনা করেছেন। যেরূপ গতিতে সভ্যতা অগ্রসর হয়, সেইরূপে গতিতে কৃষিজাত দ্রব্যের আপেক্ষিক মূল্য কমে আসে। আর চাকরীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। আজ তাঁর কোন কোন মত ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। যে-যুগে এসব কথা কেউ চিন্তা করতনা, সে-যুগে তিনি মৌলিক ভাবে বহু বিষয় গবেষণা করেছিলেন, সেইটাই তাঁর কৃতিত্ব—তাঁর পন্থা পরে অনেকেই অবলম্বন করেছিলেন।

আধুনিক যুগের বিখ্যাত ঐতিহাসিক টয়েনবি (Toynbe) ইবনে খালদুনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন—

"In his chosen field of intellectual activity he (Ibne Khaldun) appears to have been inspired by no predecessors and to have found no kindred souls amor his contemporaries, and to have kindled no answering spark of inspiration in any successors; and yet in his prolegomena to his Universal History he has conceived and formulated a philosophy of history which is undoubtedly the greatest work of its kind that has ever yet been created by any mind in any time or place."

একথা সত্য যে, তাঁর প্রভাব আরব জগতে বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। একদিক দিয়ে বলা যেতে পারে যে, এটা তাঁর দুর্ভাগ্য যে সুদীর্ঘকাল তিনি তাঁর একাকীত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি যদি আরও দু'শো বছর পূর্বে জন্ম নিতেন, তবে হয়ত তাঁর গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হত। কারণ, সে সময় বহু আরবী গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছিল। তাঁর গ্রন্থ ল্যাটিনে অনুবাদ হলে তিনি তাঁর গ্রন্থের মারফতে পশ্চিম দেশে পরিচিত হতে পারতেন ও তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন। আবার তিনি যদি আরও দু'শো বছর পরে জন্ম নিতেন, তবে তিনি পাশ্চাত্য দেশের উদ্ভাবিত ও আবিষ্কৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে উপকৃত হতেন। এবং তাঁরা গ্রন্থকে আরও নিখুঁত ও নির্ভুল করতে পারতেন। তাঁর গ্রন্থে যে-সব ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, তিনি তখন সেগুলি সংশোধন করতে পারতেন। তবুও বলব, যখন তিনি আবিষ্কৃত হলেন, তখন প্রত্যেক পাঠক, তাঁর দূরদর্শিতা, স্বাধীন চিন্তা ও বলিষ্ঠ মনন-শীলতা দেখে মুগ্ধ হল। পাঁচ শ' বছর তিনি একরূপ অজ্ঞাত ছিলেন। মাত্র কিছুদিন পূর্বে তাঁর প্রতিভার উপর সুধীবৃন্দের দৃষ্টি পড়েছে। আজ পশ্চিম দেশের সমাজবাদী ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, চতুর্দশ শতাব্দীর মানুষ হয়েও ইবনে খালদুন ছিলেন, একেবারেই আধুনিক।

আদিম সমাজে জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ

শ্রীনিখিল মৈত্র

উপলবমুখর আদিম জীবনে নবজাত শিশুর আগমন বার্তা সূচিত হয় বিভিন্ন ধর্মীয় ও লৌকিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। সাধারণভাবে প্রতি পরিবারকে শিশু জন্মের পর কিছুদিন ধরে অশৌচ অবস্থা পালন করতে হয়। নিকোবর দ্বীপমালার আদিবাসী সমাজে সন্তান জন্মের পূর্বে দম্পতিকে গিয়ে থাকতে হয় সমুদ্র সৈকতে জন্ম-কুটীরে। সেইখানে শিশু জন্মের পরও কয়েকমাস স্বামী-স্ত্রী এক-সঙ্গে বসবাস করে। তাদের অন্যান্য ছেলেমেয়ে বা আত্মীয়স্বজন দেখাশুনো করতে এখানে আসে। কিন্তু, বিশেষ প্রয়োজন না হলে অন্য কেউ "জন্ম-গৃহে" রাত্রি বাস করে না। সাগরের অশ্রান্ত গর্জনগানের মধ্যে শিশুর জন্ম হয় এবং মায়ের কোলে বসেই সমুদ্রের সঙ্গে তার পরিচয়।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে, পুরাণে, কাব্যে, কিংবদন্তীতে শাওরা আদিবাসীর পরিচয় মেলে। রামায়ণের শবরী ও রামচন্দ্রের কাহিনী সুবিদিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে শবর জাতি বিশ্বামিত্রের বংশজ। পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করার অপরাধে তারা অভিশপ্ত ও অপবিত্র। শাওরা তরুণ-তরুণীরা ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গী নিজেরা নির্বাচন করে। পাত্রের পিতা একটা তীর, সাদা সারসের পালক এবং নিজেদের তৈরী সালফি মদ কন্যার পিতার কাছে পাঠায়। অনেক সময় কন্যাপক্ষের লোকজন এই সব উপঢৌকন ফেলে দেয়। এর অর্থ অবশ্য এ নয় যে, বিবাহ প্রস্তাবে তাদের বিশেষ অসম্মতি আছে। অনেকটা আনুষ্ঠানিক হাস্য পরিহাসের ব্যাপার। মানিনীর মান-ভঞ্জনের জন্যে বার বার এমনি করে উপঢৌকন আনা-নেওয়া হয়। তার মধ্যে কিছু দর-দস্তুরও চলে। তারপর, পাওনা-গণ্ডা ঠিক হয়ে গেলে বিবাহ হয়। অনেক যুবক-যুবতী আবার এইভাবে অকারণে বিবাহের দিন পিছিয়ে দিতে রাজী হয় না। তারা তখন সহজ পথ খুঁজে নেয়। বর-কন্যা কাউকে কিছু না বলে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। সেখানে কিছুদিন স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করার পর, তারা যখন গ্রামে ফিরে আসে তখন সমাজ নব-দম্পতির বিবাহ-বন্ধনকে পূর্ণ স্বীকৃতি দান করে। অতীত যুগে শাওরাদের মধ্যে বর-কন্যাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে বিবাহ করার বিধি প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী এখনও কোথাও কোথাও বিবাহের পর কন্যাকে বর ধরে নিয়ে যেতে গেলে লোক দেখান বাধা কন্যার আত্মীয়স্বজন দেয়।

প্রকৃতির বর্ণবৈচিত্র্যময় পরিবেশের ওঁরাও আদিম জাতির বাসভূমি। ছোটনাগপুর মাল-ভূমি প্রায় দুই হাজার ফিট উচ্চতাতে তাদের গ্রাম। চারদিকে ছোট ছোট পাহাড়। এককালে এখানে বিরাট শালবন আর তার ভেতর বাঘ ভালুক, চিতা, নেকড়ে, হরিণ, নীলগাই প্রভৃতি ছিল। এখন সেই বনানী অদৃশ্য হয়েছে এবং ভালুক ছাড়া অন্য জীব-জানোয়ারের সাক্ষাৎ কদাচিৎ মেলে। কোথাও প্রকৃতির রূপ সম্পূর্ণ বন্ধ্যার—বিরাট পাথরের স্তূপ উদ্ভিদ জগতকে প্রবেশ নিষেধ বলে সতর্ক করে দিয়েছে। ওঁরাও সমাজ কয়েকটি গোত্রে ('কিল্লীতে) বিভক্ত। এক কিল্লীর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। সামাজিক কোন বাধা না থাকলেও এক কিল্লীর মধ্যে বিবাহ সাধারণতঃ হয় না। যুবক-যুবতী তাদের নির্বাচনের কথা পিতা-মাতাকে জানাবার পর, বরপক্ষকেই অগ্রণী হয়ে বিবাহের সমস্ত ব্যবস্থা করতে হয়। বরপক্ষকে কন্যার জন্য পণ দিতে হয়। কন্যার বাড়ীর সামনে নতুন এক মণ্ডপে সংক্ষিপ্ত অনু-ষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বর-বধূর বিবাহ-বন্ধনকে সমাজ স্বীকার করে নেয়। এই আদিবাসী সমাজের বিবাহ উৎসবে হিন্দু আচারের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। সিন্দুরদান ও গাত্র হরিদ্রা বিবাহের অন্যতম অবশ্য করণীয় বিধি। সমাজে অবিবাহিত যুবকের স্থান বিবাহিতের নীচে। কোন কুমার পাহানা—গ্রাম প্রধান হতে পারে না।

ভারত-তিব্বত সীমান্তের গা ঘেঁষে মিশমী পর্বতশ্রেণী। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পূর্ব সীমান্তে মিশমী শৈলশ্রেণী গড়ে প্রায় ৭—৮ হাজার ফিট উঁচু, সর্বোচ্চ শিখরের উচ্চতা প্রায় পনের হাজার ফিট। লোহিত উপত্যকায় যেসব মিশমী বসবাস করে তারা মিজু ও দিগারু শাখায় বিভক্ত। এ নাম বহিরা-গতদের দেওয়া। মিজুরা নিজেদের কমান এবং দিগারুরা তরা বলে নিজেদের অভিহিত করে। লোহিত নদীর গতিপথের উত্তরাঞ্চলে মিজু মিশমীদের বাস। তার দক্ষিণ-পশ্চিমে দিগারু মিশমীদের বসতি। এছাড়া, ডিবাং নদীর ধারে ইদু বা মিদু মিশমীদের বাস। সন্তান-সম্ভবা মিশমী জননীর জন্যে বাসগৃহের পাশেই ছোট প্রসূতি আগার তৈরী করা হয়। সেখানে কোন পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই। পুত্র-সন্তান হলে জননীকে দশ দিন প্রসূতি আগারে অশৌচ পালন করতে হয়, আর কন্যা সন্তানের জন্যে আট দিন। সাধারণতঃ শুয়োরের মাংস, বন্য পাখী ও ইঁদুর ছাড়া অন্য মাংস খাওয়া মিশমী রমণীদের নিষিদ্ধ। সন্তান জন্মের কিছুদিন আগে থেকে অশৌচ অবস্থা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন মিশমী জননী মাংস বা মাছ খায় না। মিশমী যুবক-যুবতী স্বাধীনভাবে নিজেদের সঙ্গী নির্বাচন করে। বিবাহের প্রস্তাব পাত্রপক্ষ উত্থাপন করে। গ্রামের একজন প্রবীণা কন্যার সম্মতির কথা দুই-পক্ষকেই জানিয়ে দেয়। কন্যা-মূল্য আলাপ-আলোচনা করে স্থির হয়। কন্যাকে দেয় যৌতুক বেশ কিছুদিন ধরে বিভিন্ন কিস্তীতে দেওয়া যেতে পারে। প্রথম দফায় যৌতুক দেবার পরেই স্বামী-স্ত্রী হিসেবে নব বিবাহিত দম্পতির সম্বন্ধ সমাজ স্বীকার করে নেয়। পুরো পাওনা না দেওয়া পর্যন্ত কিন্তু স্বামীর অধিকার নেই স্ত্রীকে স্বগৃহে নিয়ে যাওয়ার।

আসামের সংখ্যাবহুল আদিবাসী কাছাড়ী-দের মধ্যে শবদাহ বিধি প্রচলিত। কিন্তু আর্থিক কারণে এখন অনেক ক্ষেত্রেই শবদাহ না করে কবর দেওয়া হচ্ছে। মৃত্যুর পর গ্রামের প্রবীণদের সামনে মৃতের স্ত্রী বা অন্য কোন বৃদ্ধা শবের মাথার কাছে মন্ত্র উচ্চারণ করে। মন্ত্র মৃতের পূর্বপুরুষকে উদ্দেশ করে আহ্বান জানায় যে, তারা যেন নিজেদের সন্তানকে গ্রহণ করে। শ্মশান বা কবর স্থান সাধারণতঃ কোন নদী বা ঝরণার ধারে অবস্থিত। মৃতদেহ চিতায় রাখার পর আত্মীয়-বান্ধবরা কয়েকবার শব প্রদক্ষিণ করে। শব ভস্মের ওপর চারটে খুঁটি পুঁতে তার ওপরে ছোট্ট সামিয়ানা খাটিয়ে দেবার বিধিও প্রচলিত। রৌদ্র-বৃষ্টি যেন প্রিয়জনকে কোন রকমে কষ্ট না দেয়।

ভারতবর্ষের সব থেকে বড় আদিবাসী গোষ্ঠী গোণ্ড। মারাঠা দেশ পার হয়ে গোদাবরী যেখানে দাক্ষিণাপথের প্রাচীন মাল-ভূমি ভেদ করে সমুদ্রগামিনী, তারই উত্তর থেকে সুদূর বিন্ধ্যগিরির সানুদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে গোণ্ড আদিবাসী। গোণ্ড আদিম সমাজের এক শাখা মারিয়া আদিবাসী। এই সমাজে সন্তান জন্মের পর জননী কয়েক সপ্তাহ অশৌচ পালন করে। সেই সময়ে সন্তানের পিতা ক্ষেতের কোন কাজ করতে পারে না। অশৌচ অবস্থা পার হয়ে যাবার পর সন্তান জন্ম ও নামকরণের উৎসব লোন-ওয়াইনা অনুষ্ঠানে আত্মীয় পরিজনকে আপ্যায়িত করা হয়। তারপরেই সূতিকাগার থেকে জননী স্বগৃহে চলে আসতে পারে।

মারিয়া আদিবাসীদের এক শাখা বাইসন শৃঙ্গী বা সিংমারিয়া নামে বহিরাগতদের কাছে পরিচিত। তাদের মধ্যে বিবাহ নৃত্য অত্যন্ত প্রাণবন্ত। নবদম্পতিকে গ্রামের বাল-বৃদ্ধ-বনিতারা স্বাগত সম্ভাষণ জানায় নৃত্য ও ছন্দের মধ্যে দিয়ে। নাচের আসরে আমন্ত্রণ জানাবার পদ্ধতিও বৈচিত্র। বিকেল থেকে জয়ঢাকের ওপর ডুম্ ডুম্ আওয়াজ সুরু হয়। সেই শব্দ শুনে যে কেউ নাচের আসরে আসতে পারে। পুরুষ নাচিয়েরা বন্য মহিষ-শৃঙ্গ, কড়ি, পাখীর উজ্জ্বল পালক দিয়ে তৈরী তুরা-গুচ্ছ মুকুট পরে। তাই থেকে এই আদি-বাসী শাখার নাম বহিরাগত মানুষ বাইসন শৃঙ্গী বা সিংমারিয়া বলে অভিহিত করেছে। নাচের অভিনয়ে যুবক-যুবতীরা সেজেগুজে জড়ো হয়। প্রথমদিকে কিছুটা জড়তা থাকে। কিন্তু একটু পরে উন্মুক্ত আকাশের নীচে সমবেত দর্শকের হাসি পরিহাসে নৃত্য-ছন্দ উদ্দাম হয়ে ওঠে। ঘাসের তৈরী ছোট আংটি নৃত্য প্রাঙ্গণে দর্শকের দল ফেলে দেয় আর নৃত্য ছন্দে শিং দিয়ে সেই আংটি তুলে নিয়ে নাচিয়ে বাহবা পায়। যে বর-বধূর দৈবত জীবনের সূচনায় এই আনন্দোচ্ছ্বাস তাদের বিবাহিত জীবন সুখী এবং সুন্দর হতে বাধ্য।

সৃষ্টির অনাদিকাল থেকে মানুষ সৌন্দর্যের পূজারী। যে যুগে সে গৃহ নির্মাণ করতে শেখেনি, বন্য পশুর সঙ্গে নিয়ত যুদ্ধ করে জীবনধারণ করতো, সেই আদিম প্রস্তর যুগেও তার সৌন্দর্য পিপাসা ছিল আর তার রুচি অনুরূপ নিজেকে সুন্দর করে তুলতে চাইত। নারী সৌন্দর্যের প্রতীক—শিল্পী তাকে সাজায় জগতের সব কিছু ভালো জিনিস দিয়ে।

যুগ যুগ ধরে নারী প্রসাধনে প্রধানা স্থান অধিকার করে এসেছে! প্রাচীন যুগের মূর্তি কিম্বা পুরনো ছবি, অজন্তা ইলোরার অপূর্ব ফ্রেস্কো, প্রাচীন সাহিত্য—এ সবেরই সাক্ষ্য দেয়। আজানুলম্বিত ঘন কালো কেশ যেমন নারীর সৌন্দর্যের প্রধান পরিচায়ক তার পরিচর্যা ও তা দিয়ে বিভিন্ন রকমের কবরী রচনা পদ্ধতিও সকল যুগের নারী জগতে অতি আদরে সম্মানের স্থান লাভ করে এসেছে।

বাংলা সাহিত্যের গল্পগুলির মধ্যেও অনেক জায়গায় নারীর কেশ বর্ণনার চিত্র দেখা যায়। কাঞ্চনমালার গল্পে রাজকুমার ধোপার মেয়ে কাঞ্চনমালার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কবি সে রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে, বাংলার মেয়ের কেশ বর্ণনার উল্লেখে বলেছেন, "কাঞ্চনের মাথার চুল পৃষ্ঠদেশ হইতে নিবিড় মেঘের লহরীর মত নিম্নে লুটাইয়া পড়িয়াছে।" আর রাজকুমার সেই রূপে মুগ্ধ হয়ে বলছেন—

"আমি যে পাগল হৈছি
দেখি মাথার চুল।"

আবার ময়নামতীর গানে পাওয়া যায়—রাণী অদুনা চুল বাঁধছেন। একবার বিনুনী বাঁধবার এমনি কৌশল দেখালেন যে, তাতে পূজারী ব্রাহ্মণের ছবি ফুটে উঠলো, কিন্তু সে চুল বাঁধা তাঁর মনের মত হল না। তখন আবার চুল বাঁধতে বসলেন, তাতে ক্রীড়াশীল শিশুদের মূর্তি দেখা দিল, আর একবার চুলের সজ্জায় ফোটা ফুল তৈরী করলেন, এইভাবে চিত্রকরের ছবি আঁকার মত নানাভাবে খোঁপার বাহার করতে লাগলেন। কাজেই চুলবাঁধা ও নানা রকমের খোঁপা বাঁধার মধ্যে যে সত্যিই একটা শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায়, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সর্বাঙ্গ সুন্দর নারীই যথার্থ সুন্দরী; কাজেই নিজেকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার দিকেই থাকবে প্রত্যেক প্রসাধনকারিণীর সজাগ দৃষ্টি! বহুদিনের অযত্নে যা মৃতপ্রায়, একদিনের প্রসাধন দ্বারাই তাকে জাগিয়ে সুন্দর করে তোলা যায় না। কাজেই যেভাবে যত্ন নিলে সব-

কিছুই সুন্দর রাখা সম্ভব সেই পন্থাই অবলম্বন করা প্রয়োজন।

প্রথমেই ধরুন মাথার চুল। চুলের স্বাস্থ্য এবং প্রসাধন দুই-ই চাই নিখুঁত। যাই হোক, সে আলোচনা আপাততঃ বন্ধ রেখে আমি চুল বাঁধার কথাই আলোচনা করবো।

দেহের গঠন অনুযায়ী পোষাক পরার মতই মুখের গড়নের অনুপাতে চুল বাঁধার ধরণ বেছে নেওয়া উচিত। একই রকমের কেশ প্রসাধন যে সকলের মুখে মানায় না, এ কথাটি এমনভাবে মনে জাগিয়ে রাখতে হবে যাতে, নতুনের প্রলোভন কিছুতেই না বিচারশক্তিকে হার মানাতে পারে। প্রথমে কার কি রকম চুলবাঁধা উচিত, তার একটা সাধারণ হিসাব ভাগ করে নিতে হয়।

সাধারণতঃ মেয়েদের মুখের গড়ন দেখা যায় তিন রকমের—লম্বা, বাদামী এবং গোল। অবশ্য এর মধ্যে আবার ছোট এবং বড় সাইজ আছে।

যাদের মুখের ও গলার গড়ন লম্বা ধরণের, তাঁদের উচিত মাঝে সিঁথি করে দু'পাশে চুল অল্প করে আলগা রেখে পিছনে নীচু করে ঘাড়ের কাছে বড় করে খোঁপা বাঁধা। এ খোঁপা এলো বা বিনুনী করা যেমনই হোক, কেবল দৃষ্টি রাখবেন যেন খোঁপাটি এমনভাবে বাঁধা হয় যাতে সামনে থেকে দেখলে কানের নীচে, গলার দু'পাশ দিয়ে খোঁপাটির কিছু অংশ চোখে পড়ে। এর জন্য খোঁপার সাইজ হওয়া চাই বেশ বড়—যাঁদের বড় চুল তাঁদের অবশ্য ভাবনা নেই। কিন্তু যাঁদের চুল অল্প, তাঁদের এভাবে বাঁধতে হলে খোঁপাটি বড় করবার জন্য খোঁপার মাঝখানে একটি বড় ব্রোচ, ফুল বা কারুকার্য করা চিরুণী গেঁথে রেখে তারই চারপাশে চুল ঘুরিয়ে দিতে হবে। সেই আগের দিনের মত মাঝে চিরুণী দেওয়া খোঁপারই এটি নিখুঁত অনুকরণ হলেও স্থান বদল করায় অর্থাৎ নীচু করে ঘাড়ের কাছে খোঁপা করায় এর রূপ সম্পূর্ণ বদলে যাবে। আজকাল বেণীতে দেবার সোনালী রুপালী থোপ্না দেওয়া অনেক রকমের ফিতা পাওয়া যায়—সেই রকম জরীর থোপ্না দেওয়া একটি ফিতাকে চুলের সঙ্গে সুন্দর করে জড়িয়ে নিয়ে তার প্রান্তের জরির থোপ্নাটি মাঝখানে রেখেও খোঁপার পরিধি অনায়াসেই বাড়ানো যায়।

যাঁদের মুখ গোল এবং গলাও বেশী লম্বা নয়, তাঁদের উচিত প্রথমে কপাল থেকে চুল সম্পূর্ণ সরিয়ে নিয়ে কপালে বড় করে একটি টিপ পরে মাথার পিছনে একটি গোল খোঁপা করা, তাতে বেশ মানাবে।

যাঁদের এই অতি সাধারণ পুরনো ধরণের গোল খোঁপা বাঁধবার নির্দেশ দেওয়া হল, তাঁরা মনে করতে পারেন যে, তাঁদের নতুন ফ্যাসানে চুলবাঁধার নতুনত্ব থেকে হয় তো বঞ্চিত করা হোল—কিন্তু চেষ্টা করলেই এই গোল খোঁপায় আবার অনেক রকমের বৈচিত্র্য আনা সম্ভব।

যেমন এক রকম হতে পারে—চুলকে তিন ভাগ করে নেবেন। সাধারণভাবেই দু'পাশে কিছু কম ও মাঝখানের ভাগে থাকবে কিছু বেশী চুল। এবার মাঝের অংশের চুলটি নিয়ে খোঁপা বেঁধে ফেলুন। যেভাবে আমরা সাধারণতঃ চুল বেঁধে থাকি, সেইভাবেই খোঁপাটি বাঁধবেন। তবে বিনুনী করে নয়, এলো চুলে। এবার দু'পাশে যে দু' গোছা চুল বাদ আছে, সেগুলি নিয়ে দুটি বিনুনী করুন, এইবার ঐ বেণী দুটি খোঁপার চারপাশে দিয়ে ঘুরিয়ে দিন, দেখতে খুবই সুন্দর হবে।

দ্বিতীয় রকমের এলোখোঁপাটি যা আপনাদের বলছি, এটি আমি একবার এক 'এলো খোঁপা প্রতিযোগিতায় বিচারক হয়ে দেখেছিলাম এবং আমার এত ভাল লেগেছিল যে, প্রতিযোগিনীর কাছে নিয়মকানুনটি পরে জেনে নিয়েছিলাম, তাই আপনাদের জানাচ্ছি। এটি এলো খোঁপা হলেও অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য এবং এতে কাঁটাও লাগবে বেশী। তাছাড়া দরকার হবে একটি মসৃণভাবে পালিশ করা লম্বা কাঠের টুকরো, এটি দেখতে হওয়া চাই একটি বড় পেন্সিল বা চুরুটের মত। এর বেড় হওয়া চাই অন্ততঃপক্ষে এক ইঞ্চি। এ রকম একটি কাঠের টুকরো জোগাড় করুন। প্রথমে মাথার পিছনে পিঠের উপর চুলকে সমান পাঁচ ভাগে ভাগ করে, চুলের গোছাগুলি আলাদা সাজিয়ে দিন—তারপর দু'পাশের দুটি গোছা কাঁধের উপর দিয়ে সামনের দিকে এনে ঝুলিয়ে রাখুন। ওদের প্রয়োজন হবে সবশেষে। এবার পিঠের উপরকার বাকী তিন গোছা দিয়ে কাজ সুরু

(শেষাংশ ২৪০ পৃষ্ঠায়)

অসম্ভব রকম মোটা শরীর আর পায়ে গোদ নিয়ে বোস গিন্নী সারাটা দিল-খুশা লেনে আধিপত্য বিস্তার করে আছেন। দোর্দণ্ড তাঁর প্রতাপ। প্রত্যেক বাড়ীর হাঁড়ির খবর তাঁর নখদর্পণে। পাড়ার ছেলে-মেয়েরা কোন রকম বেলেল্লাপনা করলে তাদের আর নিস্তার থাকে না—এমন কি তাদের অভিভাবকদেরও ছেড়ে কথা বলেন না তিনি।

একমাত্র পাশের বাড়ীর চাটুজ্জে গিন্নী আদৌ আমল দেন না আমাদের বোস গিন্নীকে। এদের বাড়ীতে গিয়ে কয়েকবার আধিক্যেতা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিলেন বোস গিন্নী কিন্তু নিক্তিমাপা কাটা কাটা জবাব পেয়ে তিনি আর কোনদিন ও বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙ্গোন নি। এরপর থেকে কোন একটা ছুতোয় চাটুজ্জে গিন্নীর সঙ্গে ঝগড়া বাধাবার জন্য সর্বদাই ওৎ পেতে থাকেন বোস গিন্নী। মাছের আঁশ, তর-কারীর খোসা ছাই ইত্যাদি চাটুজ্জে গিন্নীর বাড়ীর আঙিনায় ফেলেও তাঁকে জব্দ করা গেল না। বোস গিন্নীর অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে—তারাও মায়ের নির্দেশ অনুযায়ী আমের আঁটি, লিচুর আঁটি, কলার খোসা পাশের বাড়ীর দিকে এলোপাতাড়ি ছুঁড়ে ফেলেও কলহের সৃষ্টি করতে সক্ষম হল না।

চাটুজ্জে গিন্নী নিপট ভালমানুষ—কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই। নিজের বাড়ীতে আপন মনে সংসারের কাজকর্ম করেন। কোনও দিন কারো গলা জড়িয়ে ধরে পরচর্চা করতে কিম্বা কোমর বেঁধে বাজখাঁই গলায় কারো সঙ্গে ঝগড়া করতে কেউ কোনদিন দেখে নি। অথচ এই চাটুজ্জে গিন্নীকে দেখলেই বোস গিন্নী মুখ গোমড়া করে গজর গজর করতে থাকেন কিম্বা সামনের বাড়ীর মিত্তির গিন্নীকে ডেকে ঠাস্ দিয়ে এমন টিপ্পনী কাটতে থাকেন যে শুনলে গা জ্বলে যায়।

সেদিন দুপুর বেলা বাড়ীর কর্তারা যে যার কাজে বেরিয়ে গেছেন। চাটুজ্জে গিন্নী বাড়ীর পেছনে খোলা বাগানে কাপড় শুখাতে দিচ্ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বোস গিন্নী আর মিত্তির গিন্নী যে যার জানালায় এসে দাঁড়ালেন। এঁদের দুজনের নজর যেন চব্বিশ ঘণ্টাই চাটুজ্জেদের বাড়ীর দিকে। চাটুজ্জে গিন্নী বাগানে বেরুলেই এঁরা ঠিক ঘড়ির কাঁটার মত যে যার জানালায় এসে দাঁড়াতেন।

মিত্তির গিন্নী পান-দোক্তা খাওয়া দাঁতগুলো বার করে একগাল হেসে বললেন, কি দিদি কাজকর্ম সারা হল?

চাটুজ্জে গিন্নীর দিকে বক্রদৃষ্টি রেখে বোস গিন্নী তাঁর মোটা ঠোঁটটা বাঁকিয়ে বললেন, এ ক আর আঁটকুড়ো, হাড়হাবাতের বাড়ী যে সাত সকালে কাজ শেষ হয়ে যাবে।

বোস গিন্নীর আটটি সন্তান আর চাটুজ্জে গিন্নীর মাত্র একটি ছেলে, তাও মায়ের কাছে থাকে না, দার্জিলিং-এ সাহেবদের ইস্কুলে পড়ে। মিত্তির গিন্নী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খুক খুক করে হেসে নিয়ে বললেন, তাত বটেই আজ ত আবার তোমার বাড়ীতে আসবাবপত্র পালিশ হচ্ছে।

বোস গিন্নী জানালার বাইরে তাঁর বিরাট বপুর কিয়দংশ বার করে বললেন, ভদ্দর পাড়ায় বাস করতে গেলেই খাট, পালং, ড্রেসিং টেবল, সোফা সেট্ চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে রাখতেই হয়। আমরা ত বাপু বস্তিতে বাস করিনে যে কেরাসিন কাঠের তক্তপোষ আর রংচটা হাড়গোড়ভাঙ্গা আলমারী ঘরের মধ্যে সাজিয়ে রাখব।

বলাবাহুল্য চাটুজ্জে বাড়ীর আসবাবপত্রের হিসাব বোস গিন্নীর অবিদিত নয়। মিত্তির গিন্নী আবার একচোট্ খুক্ খুক্ করে হেসে নিয়ে বললেন, তা যা বলেছ দিদি, বস্তিও হার মেনে যায় এমন ছিরি করে রাখে ঘরদোরের। পয়সা নেই তা অত ফুটুনি কেন? ভদ্দর লোকের পাড়ায় বাস করবার যুগ্যি নয় যারা তারা বস্তিতে খোলার বাড়ী ভাড়া করে থাকলেই ত পারে।

বোস গিন্নী তাঁর পুরু ঠোঁটজোড়া যতদূর সম্ভব বিকৃত করে বললেন, ছ্যা ছ্যা ঘেন্না ধরিয়ে দিলে। কুঁজোর আবার চিৎ হয়ে শোয়ার সখ' পচা চিংড়ি ছাড়া যার বাজার করার মুরোদ নেই, পরনের কাপড়ে যার সাতভালি তার আবার ছেলেকে ইংরেজী ইস্কুলে পড়িয়ে সায়েব বানাবার সখ কেন?

চাটুজ্জে গিন্নী যেন কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না এমনিভাবে কাঠফাটা রোদের ভেতর নিজের কাজ সেরে নিয়ে ঘরের মধ্যে চলে গেলেন। বোস গিন্নী ফোঁস করে উঠলেন, ইশ্, দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না। আচ্ছা মন্টুর মা, তুমি দেখে নিও আমিও ঐ বামনীকে পাড়াছাড়া করে ছাড়ব।

তারপর যে যার জানালা সশব্দে বন্ধ করে চলে গেলেন। খানিক পরে বোস গিন্নী মালসায় করে মাছ ধোয়া জল এনে চাটুজ্জেদের বেড়ার কাছে এসে একবার এদিক ওদিক দেখে নিয়ে হুস্ করে জলটা ছুঁড়ে দিলেন চাটুজ্জে গিন্নী কর্তৃক সদ্য মেলে দেওয়া ধোওয়া কাপড়গুলোর দিকে। যেন একটা রাজ্য জয় করে ফিরলেন এমনি ভাব নিয়ে গদাইলস্করী চালে বোস গিন্নী তাঁর ঘরে চলে গেলেন।

কাণ্ডটা চাটুজ্জে গিন্নীর নজর এড়ায় নি। তিনি বেশ বিরক্ত হয়েই এসে নোংরা কাপড়-গুলো তুলে নিয়ে গেলেন। মনে মনে ভাবতে লাগলেন কি করে এই উপদ্রব থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এ নিয়ে কিছু বলতে যাওয়া মানেই ছোটলোকদের মত ঝগড়া করা। অনুনয়-বিনয় করে বললেও ফল হবে না, বরং মনে করবে খুব ভয় পেয়েছে। মনে মনে মতলব ঠাওরাতে থাকেন।

ক'দিন থেকেই চাটুজ্জে গিন্নী তার বাগানের এক পাশে রাজ্যের ছেঁড়া কাপড়, ছেঁড়া কাগজ, শালপাতা, শুকনো ডালপালা ইত্যাদি জড়ো করতে সুরু করেছেন। এক সপ্তাহ ধরে এমনিধারা রাবিশ স্তূপীকৃত হল। এদিকে বোস গিন্নীর বাড়ীতে পালিশের কাজ শেষ হয়েছে, ঘরে কলি ফেরানো হয়েছে, দরজা জানালাগুলোয় রং হচ্ছে। বোসগিন্নী সেদিন একরাশ বিছানার চাদর, বালিশের ওয়ার, টেবিল ক্লথ্ সব ধুয়ে কেচে রোদে দিয়েছেন।

চাটুজ্জে গিন্নীর সতর্ক দৃষ্টি আছে পাশের বাড়ীর দিকে। খানিকটা প্যারাফিন আর আলকাতরা সংগ্রহ করে সেগুলো ঐ ছেঁড়া কাপড়, কাগজের রাবিশের ওপর ঢেলে দিলেন।

স্বপ্নকমল

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

তোমাকে রেখেছি মনে। কান্নার সাগরে
গড়েছি তোমার মুখ প্রবালের মত,
সত্তার আকাশে ঘন নীলিমার ঘরে
জ্বেলেছি তোমার রূপ সূর্যে অবিরত।

তোমার প্রেমের স্বপ্নে ক্লান্ত দুই হাতে
মৃত্যু ঠেলি, শুধে যাই সময়ের ঋণ,
জাগাই জীবনে গান আঘাতে আঘাতে,
স্বপ্নের প্রচ্ছদ কত বিচিত্র রঙিন!

তোমার স্মরণে রাত গ'লে ভোর নামে
ধূসর প্রান্তরে, শীর্ণ অন্ধকার বন
বসন্ত বন্যায় কাঁপে, বাতাসের খামে
অসীমের চিঠি আসে, নদী হয় মন।

তোমাকে রেখেছি মনে তাই এ হৃদয়
রিক্ত নয়, এত রঙ স্বপ্নের সঞ্চয়!

স্মরণ

সুশীলকুমার গুপ্ত

এখানেও রাত নামে লুব্ধ কামনায়।
হামাগুড়ি দিয়ে চলে আকাশের তারা।
রাতজাগা পাখী ডাকি বেদনা জানায়।
বেকার বাতাস হাঁটে মাঠে দিশেহারা।

এখানেও নীড় খুঁজে যাযাবর মন।
পেতে চায় এতটুকু কবোষ্ণ পরশ।
জীবন ছন্দের স্বপ্নে হয় সে উন্মন,
নিতে চায়, দিতে চায় প্রাণের হরষ।

পুষ্পপল্ল সৌরভে তব আজো ভরা দেহ।
রজনী বহে যে তার বার্তা নিরবধি।
হৃদয়ের মানচিত্র যদি দেখে কেহ
দেখিবে সে তব প্রেমে ভরা যত নদী।

স্বপ্নে করি আসা যাওয়া, যত আয়োজন।
এ স্বপ্ন সফল হয়ে ভরুক জীবন।

তারপর নিজের ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দিয়ে সেই স্তূপে একটা দেশলাই ঠুকে দিলেন এবং সদর দরজায় তালা দিয়ে তিনি মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

খানিক পরে মিত্তির গিন্নীর গলা শোনা গেল, ও দিদি, শিগ্গির বেরিয়ে এসো, এ মা, ছি-ছি, একি কান্ড হয়েছে—

বোস গিন্নী থপ্-থপ্ করে ভিজে কাপড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেই আঁতকে উঠলেন। আঁতকে উঠবারই কথা। এমন বিদিকিচ্ছির কান্ড কেউ কোনদিন কল্পনাও করতে পারে নি। বোস-গিন্নীর বাড়ীর লাগাও বেড়ার ধারেই রাবিশের স্তূপ থেকে পুঞ্জীভূত কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে বোস গিন্নীর বাড়ীটা যেন গিলে খেতে আসছে। সেই ধোঁয়ার রাশি থেকে ঝুরঝুর করে ঝুল-কালি পড়ছে উঠনে মেলে দেওয়া ধোয়া কাপড়ের ওপর, নতুন রং করা দরজা-জানালায় নতুন কলি ফেরানো ঘরের দেয়ালে, নতুন পালিশ করা খাট, পালং, আলমারী সোফাসেটে। পূবের মৃদুমন্দ বাতাস চাটুজ্জে গিন্নীর আঙিনার ধোঁয়াগুলোকে যেন হিসেব করে ঠিক বোস গিন্নীর বাড়ীর দিকেই ঠেলে দিচ্ছে।

বোস গিন্নী তাঁর বিরাট শরীর আর গোদা পা নিয়ে তিড়িং বিড়িং করে লাফাতে সুরু করে দিয়েছেন। কি যে করবেন ঠিক করতে পারছেন না, একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। হঠাৎ কি মনে হতে ছুটে চলে গেলেন সদর দরজা খুলে বাড়ীর বাইরে এবং পাশে চাটুজ্জেদের বাড়ীর দরজায় সজোরে ধাক্কা দিতে লাগলেন। ক্রমাগত ধাক্কা দিয়ে যখন হাতে কালশিটে পড়ে গেল তখন তাঁর নজরে পড়ল দরজার সামনে বিরাট এক তালা ঝুলছে আর মজা দেখবার জন্য পাড়ার লোক আশেপাশে জড় হয়ে গেছে।

রাগে গরগর করতে করতে বোস গিন্নী নিজের বাড়ীতে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর এক বালতি জল নিয়ে বাগানে বেড়ার ধারে নিয়ে হুস করে আগুনের ওপর ঢেলে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বাবাগো বলে বালতি ফেলে দিয়ে দুই হাতে মুখ ঢাকলেন। গরম ধোঁয়ায় চোখদুটো কানা হবার জোগাড় আর কি। কোন রকমে সামলে নিয়ে ঝুলকালি মেখে ভূত সেজে বোস গিন্নী বালতি হাতে আবার ছুটলেন জল আনতে। জলের বালতি নিয়ে বেড়ার ধারে এসে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়ে বোস গিন্নী নিজেই কাদার ওপর আছাড় খেলেন। মোটা শরীর নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে সেই পেছলের ওপর বার তিনেক হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

আশেপাশের বাড়ীর গিন্নীরা তাদের ছেলে-পুলে, নাতি-নাতিনীদের নিয়ে সবাই তামাশা দেখছিলেন আর মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে কুটিপাটি হচ্ছিলেন। তাই না দেখে বোস গিন্নী একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। কিন্তু পাছে সবাই চটে যায় এই ভয়ে তাদের দুটো কড়া কথা বলতেও ভরসা পাচ্ছেন না। মিত্তির গিন্নীকে তাঁর বাড়ীর জানালায় দেখতে পেয়ে খেঁকিয়ে উঠলেন, অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কি? এদিকে ছিষ্টি রসাতলে গেল যে! এসে দু'বালতি জল ঢেলে দিয়ে যাওনা ঐ বামনীর চিতের।

অগত্যা মিত্তির গিন্নীকেও আসতে হল এবং উভয়ের প্রাণপণ চেষ্টায় সম্পূর্ণ এক চৌবাচ্চা জল ঢালার পর সে আগুন নেভান সম্ভব হল কিন্তু ঝুলকালিমাখা ধোঁয়া এত বেশি পরিমাণে মিত্তির গিন্নীর বাড়ীতে ঢুকল যে বাড়ীর কুটোটি পর্যন্ত অকলঙ্ক রইল না। চৌবাচ্চায় জল নেই, কলের জল চলে গেছে অথচ রান্নার জিনিষপত্তর সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে ফেলতে না পারলে ঐ চটচটে ময়লা পরিষ্কার করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। ঘরের চুনকাম, দরজা জানালার রং, আসবাবপত্রের পালিশ নতুন করে সবই করতে হবে।

বোস গিন্নী একেবারে হন্যে হয়ে আছেন। নিজের ছেলেমেয়ে এবং পাড়ার ছেলেমেয়েদের বলে দিলেন চাটুজ্জে গিন্নীকে বাড়ী ফিরতে দেখলেই যেন তাঁকে খবর দেওয়া হয়। ছেলে-মেয়েরা আবার পাড়ায় যে যেখানে আছে সবাইকে বলে রাখল চাটুজ্জে গিন্নীকে দেখতে পেলেই যেন বোস গিন্নীর কাছে সংবাদ পৌঁছয়।

পাড়ার ছেলেবুড়ো, মেয়েমরদ সবাই তটস্থ হয়ে আছে। আজ একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে। সারাদিনের মধ্যে চাটুজ্জে গিন্নীর খোঁপা দেখতে পাওয়া গেল না। বোস গিন্নী একটা মুড়োঝাঁটা হাতে নিয়ে থপ থপ করে এঘর-ওঘর করছেন আর থেকে থেকে সদর দরজায় এসে দাঁড়াচ্ছেন। ভাবখানা যেন চাটুজ্জে গিন্নীকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে তবে তিনি জলগ্রহণ করবেন। ছেলেমেয়েরা সব কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছে, বাড়ীর মধ্যে তিষ্ঠানো অসম্ভব।

সন্ধ্যার অন্ধকারে দূরে মোড়ের মাথায় দেখা গেল চাটুজ্জে গিন্নী আসছেন! বাস, সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার দুধারের বাড়ী থেকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা 'আসছে, এসে গেছে' বলে তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে সুরু করে দিল। বোসগিন্নী মুড়োঝাঁটাটা শক্ত করে ধরে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আজ তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে চাটুজ্জে গিন্নীকে আগাপাস্তলা ঝাঁটাপেটা করবেন তাতে যা থাকে কপালে। প্রত্যেক বাড়ীর দরজা জানালায় লোকে লোকারণ্য, সবাই উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে অপেক্ষা করছে যেন এখনি একটা বিরাট বিস্ফোরণ ঘটবে।

নির্বিকারচিত্তে কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে চাটুজ্জে গিন্নী এগিয়ে আসছেন, দুই হাতে কি যেন একটা ভারি বস্তু রয়েছে অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। বাড়ীর কাছে এসে চাটুজ্জে গিন্নী নিজের বাড়ীতে না ঢুকে বোস গিন্নীর সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। মুড়ো-ঝাঁটাটা আরও শক্ত করে ধরে বোস গিন্নী দু'পা এগিয়ে এলেন এবং চাটুজ্জে গিন্নীর কাছে গিয়েই ঝাঁটা ফেলে দিয়ে আঁতকে উঠলেন, ওমা, একি সর্বনাশ হল গো আমার, আজ আমি কার মুখ দেখে উঠেছিলুম গো।

বোস গিন্নীকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে চাটুজ্জে গিন্নী সোজা ঢুকে গেলেন বাড়ীর মধ্যে। বোস গিন্নীও ব্যস্তভাবে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। একটা বিছানার ওপর বোস গিন্নীর ছোট ছেলেটাকে শুইয়ে দিয়ে চাটুজ্জে গিন্নী বললেন, একটু গরম জল আর ডেটল নিয়ে আসুন।

বোস গিন্নী ডুকরে কেঁদে বললেন, হ্যাঁগা ভালমানুষের মেয়ে আমার বাছা বেঁচে আছে ত?

চাটুজ্জে গিন্নী তাড়া দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এর কিছুই হয়নি। একটা চলন্ত ঘোড়ার-গাড়ীর পেছনে চড়তে গিয়ে হাত ফসকে পড়ে যায়, তাইতে কপালটা একটু কেটে গেছে। আমি ওকে দেখতে পেয়ে কোলে তুলে নিয়ে চলে এলুম। আমার ফার্স্টএড্ জানা আছে, যা যা বলি করুন, এখনি সব ঠিক হয়ে যাবে।

ছেলেটার কপালের ক্ষত পরিষ্কার করে তাতে ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে চাটুজ্জে গিন্নী গম্ভীরভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন। বোস গিন্নী ফ্যাল ফ্যাল করে মিত্তির গিন্নীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার প্ল্যান সব ভণ্ডুল করে দিলে। ও হারামজাদা মরতে গাড়ী চড়তে না গেলে বামনী আজ আমার গালে চড় মেরে বেরিয়ে যেতে পারত না। যাই ঘর-দোরগুলো পরিষ্কার করি গে।

একটি মানুষ : কয়েকটি কাহিনী

কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

কতই বা আর বয়েস ছেলেটির—দশ, এগার, বড় জোর বারো। ছেলে মেধাবী, অধ্যয়নে মতি আছে, সংস্কৃতে আগ্রহও যথেষ্ট। নাটকের প্রতিও তার প্রবল অনুরাগ, বড় ইচ্ছা সে অভিনয় করে, কিন্তু সেইখানেই বাধা, অভিভাবকরা নিশ্চয়ই তার এ ইচ্ছায় সম্মতি প্রকাশ করবেন না। অথচ মনের আশাও অদম্য। যাত্রা দেখে, কবির লড়াই শোনে, থিয়েটারও সে দেখেছে। নাটক আর নাটকের অভিনয়—এই চিন্তাই তাকে অহোরাত্র বেষ্টন করে থাকে। নির্জনে যেখানে কোলাহল নেই, যেখানে সে ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী নেই, ফাঁকা বারান্দায়, বাড়ীর ছাতে, উন্মুক্ত প্রান্তরে—আপন মনে সে অভিনয় করে চলে, কখনো কোন দেখা নাটকের অংশবিশেষ, কখনো আপন মন থেকেই সংলাপ তৈরী করে—এইটুকুতেই তার আনন্দ, তার পরিতৃপ্তি, তার শান্তি। লোক-চক্ষুর অন্তরালে এইভাবে সে মেটাতে থাকে মনের পিপাসা, তবে সেও জানে না যে, দূর থেকে এক জোড়া কৌতূহলী চোখ কখনো কখনো তাকে অনুসরণ করে—একদিন সেই জোড়া চোখের অধিকারী যিনি তিনি আর দূরে রইলেন না, একেবারে ছেলেটির পিছনে এসে দাঁড়ালেন—বালক আপন মনে অভিনয় করে চলেছে, হঠাৎ সে শুনল তার পিছন থেকে কে যেন বলছেন —একেবারে গলাটা অত চড়ায় তুলিস নি, আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে তোল, চমকে পিছন ফিরে তাকায় ছেলেটি—ভদ্রলোক তখনও বলছেন, বলে যা, বলে যা, একটু ঘুরে ঘুরে বল, একেবারে কাঠের মত দাঁড়িয়ে থাকিস নি। ভদ্রলোক তালিম দেন ছেলেটিকে। তাকে বলেন, আন্তরিক সাধনা কখনো ব্যর্থ হয় না, তোর নিষ্ঠার যোগ্য সমাদর তুই একদিন পাবিই, বাধা আছে থাক। সেই বাধাকে পেরিয়ে যা, এড়িয়ে যাস নি—বাঙলার সাধারণ রঙ্গালয়ের ইতিহাস স্রষ্টাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান পুরুষ নটকুলশেখর অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীর অভিনয় পিপাসু বালকচিত্তকে এইভাবে উৎসাহদানে হয় তো কোন অলস অপরাহ্নে ভরিয়ে তুলেছেন বাঙলার ক্ষণজন্মা পুরুষ জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর। গোপীমোহন ঠাকুরের নাতি। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ছেলে। প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার।

আইনজ্ঞ হিসেবে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের তখন দেশজোড়া নাম। অতি অল্পসংখ্যক আইনজীবীদের তালিকায় প্রথম পংক্তিতে প্রসন্নকুমারের নামোল্লেখ বিন্দুমাত্র অসমীচিন নয়। অসংখ্য আইন, বিধি, বিধানের প্রণেতা ধুরন্ধর আইনবিদ প্রসন্নকুমার ঠাকুর। একমাত্র ছেলে তাঁর জ্ঞানেন্দ্রমোহন, প্রবল বাসনা, সে ডাক্তারী পড়ুক। চিকিৎসা জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুক। চিকিৎসকদের ইতিহাসে অম্লান অক্ষরে লেখা থাক তার নাম। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ।—ডাক্তারী পড়ছেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন, আর অল্পকাল পরেই তাঁর পঠদ্দশা হবে সমাপ্ত। এ-হেন সময়ে হঠাৎ একদিন সোজাসুজি পিতৃদেবকে জানালেন—ডাক্তারি আমি পড়ব না। পড়া ছেড়ে দেব। চমকে ওঠেন প্রসন্নকুমার। অবাক বিস্ময়ে তেজোদৃপ্ত তরুণের উজ্জ্বল আননের দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন প্রসন্নকুমারের সংগে কথোপকথনরত তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা ঠাকুর পরিবারের আর একজন শ্রদ্ধেয় পুরুষ রায়তবন্ধু মহারাজা রমানাথ ঠাকুর। রমানাথ প্রশ্ন করেন—কেন হল কি, হঠাৎ এ বাসনা কেন?

আমায় মার্জনা করবেন কাকামশায়, আমার ব্যক্তি-স্বাধীনতায় আঘাত লেগেছে।

খুলে বল তো, ব্যাপারটি কি—প্রসন্নকুমার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করেন। আমার আত্মমর্যাদায় ঘা লেগেছে বাবামশায়, অধ্যয়নকালে শিক্ষাদাতার সংগে পাঠ্য বিষয় নিয়েই একটি আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, আমার কথা শেষ তো হলই না, অধিকন্তু তিনি বললেন যে, আমি শিক্ষার্থী, আমার নিজস্ব কোন মতবাদ থাকতে পারে না, তাঁর মতই আমার মত এবং তিনি যখন শিক্ষাদাতা তখন তাঁর মতকে মেনে নিতে আমি সর্বতোভাবে বাধ্য। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য যেখানে স্বীকৃতি পায় না, সে পরিবেশের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। ব্যক্তিত্ববান জ্ঞানেন্দ্রমোহনের সুনির্ভীক উত্তর।

তা হলে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি স্থির করলে বল? পুত্রের প্রতি পিতার জিজ্ঞাসা।

আমি আইন পড়ব, বিলেতে গিয়ে—ওদের দেশের লোকের বড় গর্ব যে, ভারতবাসীদের মধ্যে ব্যারিস্টার কেউ নেই, সেই গর্ব আমি খর্ব করব। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের দৃঢ়তাসহ উত্তর।

পুত্রের ইচ্ছাই পূর্ণ হল, বিলেতে গিয়ে দেখলেন, ব্যারিস্টারী পড়ার সময়-সীমার তিন-চতুর্থাংশ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। মাত্র এক-চতুর্থাংশ সময় অবশিষ্ট। ঐ অত্যল্প সময়ের মধ্যেই পাঠ সমাপ্ত করলেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন। ফল যখন বেরোল, ভারতবর্ষে পিতা প্রসন্নকুমার জানতে পারলেন যে, সাগরপারে পুত্র তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে ইংল্যান্ডকে বিস্মিত করে দিয়েছে। ভারতবাসীদের মধ্যে প্রথম ব্যারিস্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহন তো হলেনই, তার উপরও সারা ইংল্যান্ড পরিচয় পেল তাঁর আশ্চর্য প্রতিভার।

গণিতশাস্ত্রে অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল গোপীমোহনের, পিতার সেই গুণের উত্তরাধিকারী হলেন কনিষ্ঠ পুত্র প্রসন্নকুমার। পরবর্তীকালে প্রকাশ পেল যে, গণিতজ্ঞ হিসেবে জ্ঞানেন্দ্রমোহনের কাছে গোপীমোহন বা প্রসন্নকুমার শিশু ছাড়া কিছু নন। বিরাট, দুরূহ, জটিল যে সকল অংক, সেগুলি কানে শোনা মাত্র সংগে সঙ্গে তার উত্তর বলে দিতেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন, বলা বাহুল্য, উত্তর নির্ভুল হোত। গণিতশাস্ত্রে এতখানি নিরঙ্কুশ অধিকার গোপীমোহন-প্রসন্নকুমার উভয়ের মধ্যে কারোরই ছিল না।

সংস্কৃত কাব্যসম্ভার জ্ঞানেন্দ্রমোহনের কণ্ঠস্থ ছিল, যে কোন কাব্যের যে কোন অংশ তিনি অনর্গল বলে যেতে পারতেন, সুললিত ছিল তাঁর কণ্ঠ। আবৃত্তি করতেন চমৎকার। শাস্ত্র সম্বন্ধে, দর্শন সম্বন্ধে, সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অভ্রভেদী। গোপীমোহনের পঞ্চম পুত্র সর্বশাস্ত্রের অসামান্য ভাষ্যকার পুণ্যশ্লোক মহাত্মা হরকুমার ঠাকুর (নৃপকবি যতীন্দ্রমোহন ও গীতগুরু সৌরীন্দ্রমোহনের পিতৃদেব) এবং প্রসন্নকুমারের সান্ধ্য দরবারে মিলিত হতেন দেশের বুধমণ্ডলী, সুধীবরের দল, শাস্ত্রানিপুণেরা। এ-রকম বহু দিন ঘটেছে কাব্য, দর্শন ললিতকলা, সংস্কৃত ভাষা বা শাস্ত্র সম্বন্ধে একেকজন দিকপাল পণ্ডিতের সংগে তুমুল তর্ক চলেছে জ্ঞানেন্দ্রমোহনের—সে কি উত্তেজনা যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, এক এক করে অনেকেই পণ্ডিতের পক্ষ সমর্থন করতে এগিয়ে আসতেন, অন্যদিকে তরুণ জ্ঞানেন্দ্রমোহন একা। তর্ক থামে না, মহাত্মা হরকুমার, প্রসন্নকুমার, মহারাজা রমানাথ কেউ পারেন না সে তর্ক থামাতে, সর্বশেষে অকাট্য প্রমাণ, অপরিহার্য যুক্তি ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের সাহায্যে জ্ঞানেন্দ্রমোহন জয়লাভ করতেন তর্কে, বুধমণ্ডলী সহস্র ক্ষমতাতেও পারতেন না সেই যুক্তি ও প্রমাণকে উপেক্ষা করতে। তবে তাঁরাও প্রকৃত পণ্ডিত, তাঁরা পাণ্ডিত্যগর্বী। পুত্র বা পৌত্রের বয়সী জ্ঞানেন্দ্রমোহনের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না, এই অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ক্রমবিকাশ তাঁরা কামনা করতেন অন্তর দিয়ে। তর্কশেষে জ্ঞানেন্দ্রমোহনও তাঁদের পদধূলি গ্রহণ করে বলতেন—আশীর্বাদ করুন, আপনাদের স্নেহধারা থেকে যেন কখনো বঞ্চিত না হই।

জ্ঞানেন্দ্রমোহনের আবৃত্তি করার ভঙ্গীমা ছিল অননুকরণীয়। ও রকম আবৃত্তিকার তখন বাঙলাদেশে দ্বিতীয় জন কেউ ছিলেন না। পাথুরেঘাটার বাড়ীতে কেবলমাত্র তাঁর আবৃত্তির আকর্ষণে যে কত লোকের আনাগোনা হোত তার তুলনা মেলে না।

আশা করি, একথা সকলেরই জানা আছে যে, মধ্য জীবনে কোন একটি পারিবারিক ঘটনার প্রভাবে জ্ঞানেন্দ্রমোহন তাঁর জন্মভূমি ত্যাগ করে চলে যান ইংল্যান্ডে এবং সেইখানেই তিনি স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন, মাঝে বার দুই তিনি ভারতে এসেছিলেন। ১৮৬৮ সালে পিতৃবিয়োগের সংবাদে শেষবারের মত তিনি ভারতবর্ষে আসেন, তার পর তিনি বেঁচেছিলেন আরও ২২টি বছর। ১৮৯০ সালের জানুয়ারী মাসে ৬৫ বছর বয়সে তাঁর দেহান্তর হয়। এর মধ্যে আর তিনি ভারতে আসেন নি। পিকাডিলী অঞ্চল লণ্ডনের মধ্যে অমরাবতী নন্দনকানন, স্বপ্নপুরী। 'সাহেবসা সাহেব' বলতে যাঁদের বোঝায় কেবল তাঁরাই ছিলেন এই অঞ্চলের বাসিন্দা। পিকাডিলী অঞ্চলে বাস করার সুযোগ পাওয়া যে কোন সাহেবের পক্ষেও সৌভাগ্য বলে গণ্য হোত, সেই পিকাডিলী অঞ্চলে বাড়ী করলেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন, গৃহ-প্রবেশ করলেন সম্পূর্ণ দেশীয় প্রথায় (যতদূর সম্ভব), বাড়ীর নাম রাখলেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন, কোন ইংরিজী নাম নয়, বাংলাদেশের বুকের উপর বহু বাঙালী—হাউস, লজ, ভিলা, ন্যানর প্রভৃতি বিদেশী শব্দের সাহায্যে বাড়ীর নামকরণ করেন, কিন্তু খাস বিলেতের তখনকার দিনে বিশেষ করে পিকাডিলী অঞ্চলে জ্ঞানেন্দ্রমোহন বাড়ীর নাম দিলেন বৈঠকখানা। বাড়ী সাজালেন মনের মত করে। চেয়ার-টেবিল দিয়ে নয়—গালচে, সতরঞ্চি, কার্পেট, মছলন্দ দিয়ে বাড়ীর দেওয়ালে পরম শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে টাঙালেন হিন্দু দেব-দেবীর ছবি। সে সময়ে সারা বাংলাদেশে রব উঠেছিল যে, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ধর্মদ্রোহী, দেশদ্রোহী, জাতিদ্রোহী—এই কি তার নিদর্শন?

বিলেতে গিয়ে দেশ-বিদেশের ভাষা আয়ত্তে আনতে সুরু করলেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন, উদ্দেশ্য—সকল দেশের গ্রন্থগুলি মূল ভাষায় অধ্যয়ন করা—পৃথিবীর প্রায় বারো-চৌদ্দটি ভাষা আয়ত্তে এনেছিলেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন, সেই সব ভাষায় অনর্গল লিখতে বা বলতে পারতেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন। শ্রীমধুসূদন যখন বিলেতে সেই সময়ে জ্ঞানেন্দ্রমোহনের সংগে তাঁর সখ্যতা গড়ে ওঠে (এর আগে এঁদের পারস্পরিক পরিচয় ছিল কিনা, সে বিষয়ে নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না)। মধুসূদনের সংগে জ্ঞানেন্দ্রমোহনের চলত ভাষা, সাহিত্য ও শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বাঙালীর প্রথম নিজস্ব যে রঙ্গালয় স্থাপিত হল

(শেষাংশ ২৪২ পৃষ্ঠায়)

মোগলযুগে নারী-শিক্ষা

অমিয়া সরকার

অনেকের ধারণায় মোগল আমলে ভারতবর্ষে স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন একেবারেই ছিল না। সমাজের উঁচু স্তরের মহিলাদের বিষয়ে এ কথা কিন্তু ইতিহাস সমর্থন করে না। অনেক ঐতিহাসিক গ্রন্থে আমরা হারেম-বাসিনীদের শিক্ষার বিষয় জানতে পারি। তাঁরা অজ্ঞানের অন্ধকারে থেকে বিলাসব্যসনে জীবন কাটাতেন না বা কেবলমাত্র পুরুষের বিলাসের উপাদান হিসাবে হারেমের মধ্যে থাকতেন না।

সে যুগের সাধারণ গৃহস্থ ঘরের বালিকা ও স্ত্রীলোকদের মধ্যে যে বিদ্যা ও জ্ঞানের চর্চার খুব বেশী প্রচলন ছিল না এটা আমরা ইতিহাস থেকে পাই। তবে কোন একটা নির্দিষ্ট বয়স (সাত আট বৎসর) পর্যন্ত সাধারণ ঘরের মুসলমান মেয়েরা প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে যেতেন। তখন দেশের আর্থিক মান উন্নত না থাকার জন্য জনসাধারণের মধ্যে বাড়ীতে শিক্ষয়িত্রীর সাহায্যে শিক্ষা লাভের সুযোগ ঘটে উঠত না। কিন্তু সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের ও সম্রাট বংশীয়াদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা লাভের যথেষ্ট সুযোগ ছিল। শাহ্‌জাদীদের পাঁচ বৎসর বয়স থেকেই প্রাথমিক শিক্ষা অবশ্যই আরম্ভ করতে হত। অবশ্য সাধারণ গৃহস্থ মেয়েদের মতন তাঁদেরকে প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে যেতে হতো না। হারেমের মধ্যে 'আতুন' বা গৃহশিক্ষয়িত্রীর কাছে শিক্ষালাভ করতেন। এ সম্বন্ধে আমরা Mr. Smith -এর (Architecture of Fathipur Sikri) নক্সা (Plan) থেকে আকবরের রাজত্বে ফতেপুর সিক্রীর ভিতর কয়েকখানি ঘরে শাহ্‌জাদীদের জন্য নির্দিষ্ট যে পাঠাগার ছিল, তার প্রমাণ পাই। ১৭।১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত শাহ্‌জাদীরা অবিবাহিতা থাকতেন এবং এই সময় পর্যন্ত তাঁরা পুঁথিগত বিদ্যা, সংগীত, শিল্প নানা প্রকার কলাবিদ্যার চর্চায় আত্মনিয়োগ করে সময় কাটাতেন।

যে সকল পুণ্যশীলা, দানরতা, জ্ঞানগরিমা-শালিনী মহীয়সী মহিলার নাম মোগল ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে "বেগম গুলবদনের" নাম তার মধ্যে অন্যতম। ইনি সম্রাট আকবরের পিতৃস্বসা, হুমায়ুনের বৈমাত্রেয় ভগ্নী এবং ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের কন্যা। বেগম গুলবদন রচিত "হুমায়ুননামা" ঐতিহাসিক গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই যে, গুলবদন এক স্থানে লিখেছেন, "সম্রাট আকবর আদেশ প্রচার করেন বাবর ও হুমায়ুনের বিষয় যাহা জান লিপিবদ্ধ কর।" এই রাজ অনুজ্ঞায় গুলবদন "হুমায়ুন-নামা" রচনা করেন। এই ঐতিহাসিক পুস্তক প্রকাশিত না হ'লে আমাদের কাছে বাবর ও হুমায়ুনের রাজত্বকালীন দেশের, সমাজের অবস্থা, বাবরের পুত্র কন্যা, আত্মীয়-স্বজন এবং অন্যান্য কয়েকটি পরিবারের সঠিক বৃত্তান্ত অজানা থেকে যেত। কেবল এই একটিমাত্র কাজেই তিনি ইতিহাসবেত্তাগণের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য লাভের অধিকারিণী। যদিও 'আবুল ফজল' হুমায়ুননামা সম্বন্ধে নির্বাক। তবে তিনি যে "আকবর নামা" রচনাকালে বেগমের পুস্তকের সাহায্য নিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে আমরা (Humayunnama, Page 78. IV.) প্রমাণ পাই এবং এই থেকে দেখা যায় যে, হুমায়ুননামা ন্যূনাধিক ১৫৫৭ খৃঃ অব্দে (৯৯৫ হিজরা) লেখা হয়। বৃটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত "হুমায়ুননামার" পুঁথিগুলি ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে Col. George William Hamilton এর বিধবার কাছ হ'তে ক্রয় করা হয় এবং Mrs. Beveridge এই মহামূল্য গ্রন্থখানির ইংরাজী অনুবাদ করেছেন। গুলবদনের অধ্যয়নস্পৃহা অত্যন্ত প্রবল ছিল এবং তিনি নানা স্থান হ'তে বহু পুস্তক সংগ্রহ ক'রে একটি পুস্তকাগার (Library) স্থাপন করেন।

বাবরের দৌহিত্রী, বয়রাম খাঁর বিধবা এবং আকবর মহিষী "সলীমা সুলতান বেগম" নামে আর এক বিদুষী, বুদ্ধিমতী মহিলার পরিচয় আমরা ইতিহাসে পেয়ে থাকি। বিদুষী সলীমার অধ্যয়নস্পৃহা যেমন বলবতী, তাঁহার অধীত পুস্তকের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য তেমনি বিশাল ছিল। "মখ্‌ফী" (গুপ্ত ব্যক্তি) এই ছদ্মনামে তিনি বহু ফার্সী কবিতা রচনা করেন।

আকবরের রাজত্বকালে, আকবরের প্রধানা ধাত্রী "মাহম্ আনসারের শিক্ষা জগতে বিশেষ দান ছিল। তিনি একজন শিক্ষিতা ও বিদ্যোৎ-সাহিনী রমণী ছিলেন। শিক্ষা জগতে তাঁহার প্রভূত দান ছিল। শিক্ষার প্রসারকল্পে তিনি দিল্লীতে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এই মাদ্রাসা "মাহম্ আনসার মাদ্রাসা" নামে পরিচিত ছিল।

জাহাঙ্গীর মহিষী নূরজাহানের নাম সর্বজনবিদিত। ঐতিহাসিকগণ মুক্তকণ্ঠে জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ ভাগকে নূর-জাহানেরই রাজত্বকাল ব'লে স্বীকার করেন। এই বিদুষী ললনা রাজকার্যে যেমন পার-দর্শিনী ছিলেন, সেই রকম তাঁহার সৌন্দর্য-বোধ, উদ্ভাবনী শক্তি এবং ললিতশিল্পকলা জ্ঞানও অনন্যসাধারণ ছিল। শোনা যায়, "অতর-ই-জাহাঙ্গীরী" নামে গোলাপসার তাঁহারই আবিষ্কার। পেশোয়াজের দুদামী (ওজনের দুই দাম, তামার ৪০ দামে ১৲ টাকা) পাঁচতোলিয়া (পাঁচ তোলা ওজনে) কাপড়, বাদ্‌লা কিনারী (lace) নূরমহলী এবং ফরস্-ই-চন্দনী (চন্দন কাঠের রং-এর কার্পেট) তাঁহারই কারু-কল্পনার সার্থক রূপ।

অভিনব ডিজাইনের স্বর্ণালংকার ও নারী পরিচ্ছদের প্রচলন করে নূরজাহান স্বীয় বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন। লক্ষ্ণৌ শহরের সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারা এখনকার দিনে নূরজাহান ব্যবহৃত আপাদ-লম্বিত নিচোলের অনুকরণে নূতন ধরণের নিচোল ও এক রকম আঙিয়া ব্যবহার করতেন। ক্রমশঃ ইহা সাধারণেরও ব্যবহার্য হয়। ওড়নার ব্যবহারে তিনিই পথ প্রদর্শিকা।

রন্ধন নৈপুণ্য এবং ভোজনাধার সুসজ্জিত করবার অভিনব প্রণালী ও উপায় তিনিই উদ্ভাবন করেন। ভোজ্যবস্তুর অপূর্ব সুন্দর বিন্যাস করার তিনিই আবিষ্কর্ত্রী।

তাঁহার মত সংগীতজ্ঞা এবং সংগীতানু-রাগিণী ইতিহাসে খুবই বিরল। মৃগয়া ব্যাপারে ইঁহার অদ্ভুত পটুত্ব ছিল। 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী'তে (জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনীতে) সম্রাট স্পষ্টই লিখেছেন, তিনি এরূপ অব্যর্থ লক্ষ্যে ব্যাঘ্র শিকার দেখেননি। আরবী ও ফার্সী সাহিত্যে এই বিদুষী মহিলা বিশেষরূপে ব্যুৎপন্না ছিলেন এবং "মুখফী" ছদ্মনামে পারস্য ভাষায় বহু কবিতা রচনা করেন। জন-সাধারণের এই ধারণা যে, লাহোরে তাঁহার সমাধিগাত্রে খোদিত কবিতাটি তাঁহারই স্বরচিত।

শাহ্‌জাহান মহিষী "মমতাজ মহল" পারস্য ভাষায় বিশেষ শিক্ষিতা ছিলেন এবং তিনি ফার্সী ভাষায় বহু কবিতা রচনা করেন।

শাহ্‌জাহান ও মমতাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা 'জাহান আরার' পাণ্ডিত্য, ধর্মনিষ্ঠা ও পিতৃভক্তি মোগল যুগের ইতিহাসে অতুলনীয়। "মমতাজ মহল" 'সিত্তীউন্নিসা' নামে এক উচ্চ শিক্ষিতা, সদ্বংশজাতা মহিলাকে কন্যার উপযুক্ত শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করেন। সেই যুগে ইরাণ ও পারস্য হ'তে আগত শিক্ষয়িত্রী, তুরাণের ফেরীওয়ালী, আরবের স্ত্রী-হাজী ও অন্যান্য বিদেশিনীদের মাধ্যমে হারেমের ভিতর দেশ-বিদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির হাওয়া প্রবেশ করত, জ্ঞানের আদান-প্রদান চলত। সিত্তী-উন্নিসা এই রকম এক কর্মবীর ও দানশীলা রমণী পারস্য দেশ হ'তে স্বামীর সাথে ভারতে আসেন। ভারতে স্বামীর মৃত্যুর পর সিত্তী-উন্নিসা সম্রাজ্ঞী মমতাজমহলের অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন। সিত্তীউন্নিসা অতি সুন্দরভাবে কোরাণ পাঠ করতেন। পারস্য গদ্য ও কাব্যে এবং চিকিৎসাশাস্ত্রেও তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। এই শিক্ষিতা মহিলার একাগ্র চেষ্টায় জাহানারা অল্পকালের মধ্যেই সুশিক্ষিতা হন। কোরাণে তাঁহার প্রকৃষ্ট অধিকার ছিল। এই ধর্মগ্রন্থ হ'তে উদ্ধৃত প্রাসঙ্গিক রচনাবলী তাঁহার রচিত প্রবন্ধাদিতে প্রায়ই দেখা যায়। জাহানারা অনেক ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে ১৬৩৯-৪০ খৃঃ অব্দে (১০৪৯ হিজরা) রচিত 'মুনিস্-উল্-আরওয়া' নামে একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইহাতে আজমীরের বিখ্যাত সাধু 'মুঈন-উদ্দীন চিশ্‌তী' ও তাঁহার কয়েকজন শিষ্যের জীবন কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। জাহানারা 'সুফী' সম্প্রদায়ভুক্তা চিশ্‌তী সাধুদের শিষ্যা ছিলেন। ইঁহার লিখন-ভঙ্গী প্রাঞ্জল ও গাম্ভীর্যপূর্ণ। সমসাময়িক ফার্সী

(শেষাংশ ২৪২ পৃষ্ঠায়)

পুষ্পলতা নাগ দেশসেবিকা। যে বয়সে এদেশের মেয়েরা একটি বিশেষ ব্যক্তির কাছে জীবন উৎসর্গ করে থাকে সেই তেমনি পনেরো বছর বয়স থেকেই পুষ্পলতা সমষ্টির কাছে প্রাণ সমর্পণ করেছে। আর সেই থেকে আজ পর্যন্ত তার নিষ্ঠার কমতি নেই। শিশুকাল থেকে স্বদেশীর আবহাওয়ার মানুষ ওরা। বাপ কাকা কেউ চাকরী করেননি, পাছে বিদেশীর অধীনে চাকরী করতে হয়। কাকা সেযুগে ডেপুটির পদ পেয়েও নিলেন না। তাই বাপ কাকা দুজনেই উকীল। কিন্তু বিনে পয়সায় স্বদেশী মামলার কাজ করতে করতেই প্রায় মাস কাবার হোত। তবু দারিদ্র্যের জন্যে তখন ওদের কারো নালিশ ছিল না। আর তাছাড়া যে কারণেই হোক, তখন দিনচলা এত ভার ছিল না। তাই শত বাধা সত্ত্বেও 'স্বদেশী' করতে ওদের বাধেনি। মা খুড়ী থেকে বাড়ীর কাচ্চাবাচ্চা পর্যন্ত সবাই ছিল স্বাদেশিক, সবাই গান্ধীভক্ত, সবাই খদ্দরিস্ট, সবাই কংগ্রেসী। মহাত্মা গান্ধী কলকাতায় এলে শান্তনু আর পুষ্পলতা দুভাইবোন আর যত তাদের বন্ধু-বান্ধবী সবাই মিলে চাঁদার তলা ক্ষইয়ে ফেলত চাঁদা আদায় করতে। বিয়ের কথা যে কেউ একেবারেই ভাবেনি তা নয়, সেই পনেরো বছর বয়স থেকেই কথাটা ঠাকুমার মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করে কাঁটা বিঁধিয়েছে। আর মায়ের মনেও পড়েছে তার একটু একটু ছায়া। কিন্তু মা সেটাকে আমল দেননি কোনদিনও। বাবার কথাতেই সায় দিয়ে এসেছেন। ছেলেমেয়ের বিয়ে দেবার মত বিলাসিতার কথা ভাবাও এখন অন্যায়—সমস্ত দেশ যখন এক মহাযজ্ঞে মেতেছে। যদি কোনদিন দরকার আর সময় হয়, নিজেদের সঙ্গী ওরা নিজেরাই বেছে নেবে! মনের সেই স্বাধীনতাটুকুও ওদের দাও।

স্বাধীনতা পেয়ে কিন্তু কাজে খাটায়নি পুষ্পলতা। বলে এখনো সময় আসেনি। পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত বিয়ে সম্বন্ধে একটা স্বপ্ন ছিল, সেটা এত শৌখিন, এমন-যেমন-তেমন-ভাবে সেরে ফেলতে মন চায়নি। আর পাত্রই বা কৈ, তার মত দেশসেবিকার উপযুক্ত দেশসেবক? তারপরে পঁচিশের স্বপ্ন ভেঙে ছাব্বিশে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই সেই অলিখিত অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটে গেল। সরকারী অফিসগুলির মাথায় তিনরঙা পতাকা পত্ পত্ করে উড়তে লাগল। দেশটাকে চিরে দু ভাগ করে দিয়ে ইংরেজ "পালাব, পালাব" করতে লাগল। অর্থাৎ এককথায় দেশ স্বাধীন হোল। অবশ্য ভাঙা দেশ, তা হোক, একেই মেজেঘষে সারিয়ে-সুরিয়ে নেয়া যাবে। হাতে যখন পাওয়া গেছে। আর হাতে বলে হাতে, একেবারে মুঠোর ভিতর। বিশেষ করে ওদের মত লোকদের যাদের বাড়ীতে মা বাবা ভাই বোন সবাই একবার না একবার জেলে গেছে।

দেশের জন্যে জেলে যেতে যাদের বাধেনি, এখন দেশ চালাবার ব্যাপারেও যে তাদেরই হাত থাকবে এ তো বলাই বাহুল্য। দেশটাকে কি করে গড়ে তোলা যায়, সেই হোল শুধু এখন ভাবনা। এতবড় দেশ, সোজা তো নয়। আরও মুস্কিল এই যে, কেউ কথা শোনে না, ভেবে ভেবে পুষ্পলতা নাগের মাথা খারাপ হবার যোগাড়। শান্তনু ওর দুবছরের বড়। সে বললে,—"দেশটা যখন হাতেই এসে গেছে তখন আবার ভাবনা কী? দেশের দুঃখ দূর করতে পণ করেছিলি, করেছিস। আর কি করবি? মাথা নেই তো মাথা ব্যথা।"

—"সব কথায় আজকাল ঠেস দিয়ে কথা বল তুমি, এর মানে কী? বল, তোমাকে আজ বলতেই হবে কী তুমি আসলে বলতে চাও।"

—"আরে চটছিস কেন?" শান্তনু হাসে। ও আজকাল সব কথাতেই হাসে। এমনি বিদ্রূপের হাসি।

—"না তুমি বল—"

—"আমি বলি, দেশের জন্যে লড়েছিস তোরা, জয় করেছিস, এখন তো লুটের মাল ভাগ করবারই সময়। গোটা দেশটাই তো War Spoil হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাকে আবার গড়বি কি। যা টুকরো টুকরো করে কেটে মুখে পোরবার জিনিষ তা নিয়ে থেকে থেকে নাকে কান্না কাঁদিস কেন!"

—"দাদা তুমি এত নীচ, এত হীন, এত দীন? কম্যুনিষ্ট হয়ে গেছ বলে কি দেশপ্রেম গেছে সত্যিই, এতই কি নীচু নামতে হয়?"

বারান্দার রেলিং ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল পুষ্পলতা। হঠাৎ একটা অব্যক্ত বেদনা যেন সন্ধ্যার আকাশ থেকে নেমে এসে তীরের মত ওর বক্ষভেদ করে প্রাণের মধ্যে গুমরে গুমরে উঠতে লাগল। হঠাৎ যেন কান্না পেল। আর ওর সামনে দিয়ে দিনের আলো ছায়াচ্ছন্ন প্রদোষের মধ্যে মিলিয়ে গেল। হঠাৎ কে যেন খুট করে আলো জ্বালল, আর সেই আলোয় দপ্ করে কেটে গেল সন্ধ্যার বিষাদঘন মায়া। এমন করে একমুহূর্তও কখনো একা একা দাঁড়িয়েছে বলে মনে পড়ল না পুষ্পলতার। সময় কোথায় ছিল তার নিজেকে নিয়ে ভাববার মত বিলাসিতার?

এখনি কি সময় আছে?—দিদিমণি কাকাবাবু ডাকছেন, কারা সব এসেছে বাইরে। ওঃ, ভুলে গিয়েছিল এখুনি বেরুতে হবে, এক্ষুণি। বাবা কাকা দুজনেই দুই কনস্টিটুয়েন্সি থেকে ইলেকসনে দাঁড়িয়েছেন। এটাকে সাকসেসফুল করে তুলতেই হবে। প্রাণ দিয়ে খাটছে পুষ্পলতা। শান্তনুর কিন্তু দেখাই পাওয়া যায় না। এই নিয়ে বাড়ীশুদ্ধ সকলের মনেই দুঃখ। কাকার মেয়েরাও সব পুষ্পলতার অন্ধ ভক্ত। সে যে তাদের দিদিরু মত দিদি, কিন্তু কাকার ছেলেরা বোধহয় শান্তনুকেই বেশী ভালোবাসে। তার কারণও যে পুষ্পলতা না জানে এমন নয়। কারণ শান্তনু আজকাল খদ্দর ছেড়েছে আর সিগারেট ধরেছে। জীবনটা অনেকখানি হাল্কা করে এনে কম্যুনিষ্ট খাতায় নাম লেখাব লেখাব করছে। আর মুখে খুব লম্বা লম্বা বুলি কপচাচ্ছে, আর সেই বড়কথার লোভ দেখিয়ে পাড়ার ছোড়াদের বেশ বশে এনে ফেলেছে।

তা করুক, তাতে ক্ষতি নেই। কারণ, পুষ্পলতা জানে দরকারে পড়লে ঐ ছোড়াগুলিই তার কাছে এসে "হেঁ হেঁ" করতে একবারও দ্বিধা করবে না। শান্তনু যা খুসী করুক, বলুক, পুষ্প তো তাতে কথা কইতে যায় না। অথচ ও কেন সব সময় পুষ্পকে খোঁচাতে থাকে। সবকিছুই ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিতে চায়। কেমন একটা পেসিমিস্ট ভাব। বাবা কাকাকেও যেন আর মানতে চায় না। শুধু যেন লোকদেখানো একটু
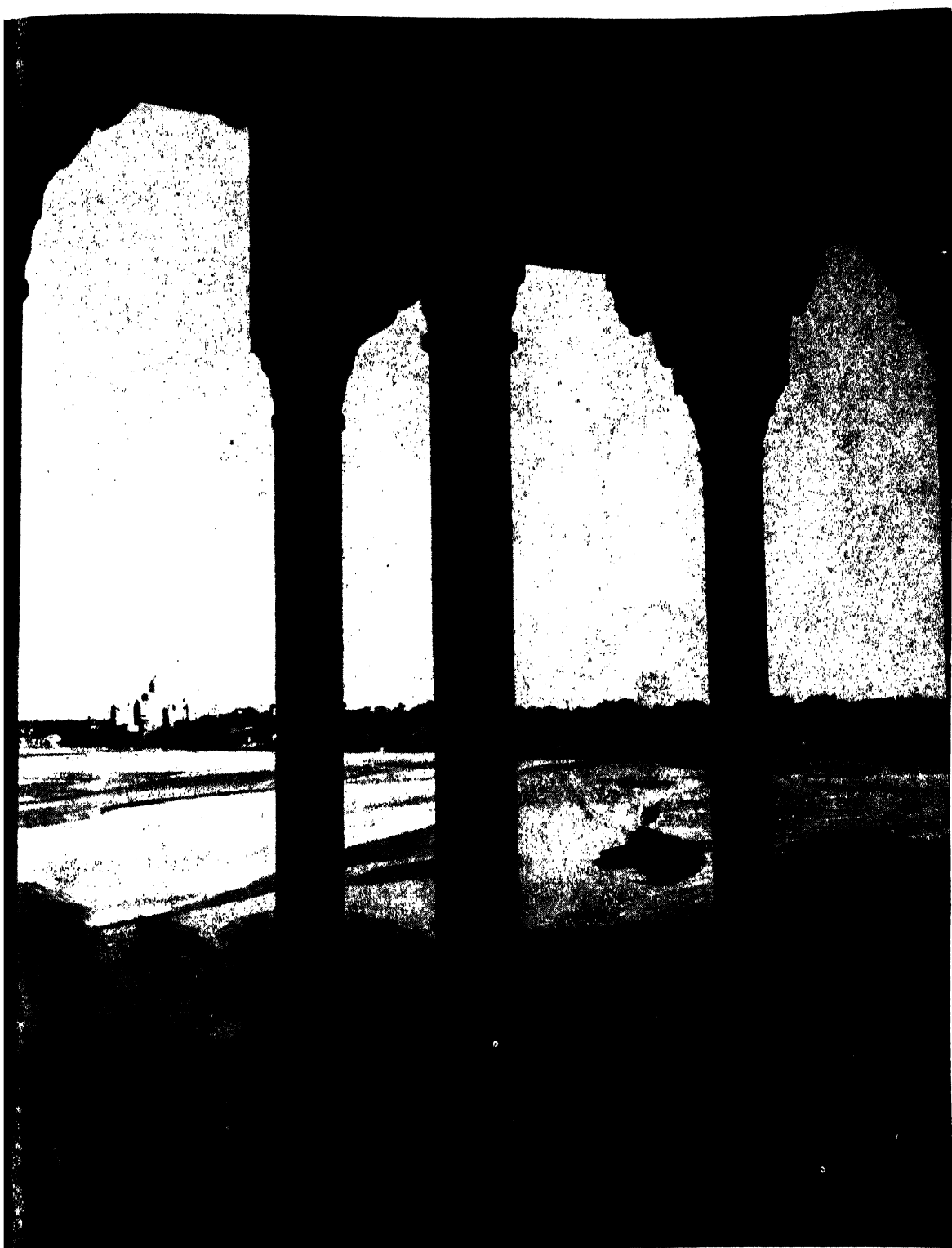
...উ সে এখানে নাই"

নেপাল মুখোপাধ্যায়
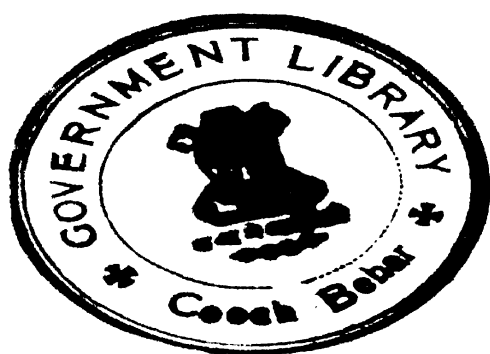
হনা। কথায় কথায় ঠোকর দেওয়া যেন ট্রলেক্সনে দাঁড়ানোই একটা মহাঅপরাধ হয়েছে তাঁদের। যাকগে যাক্, কে আর ওনিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। কাকা ঠিকই বলেন, কম্যুনিস্টরা দেশের মহাশত্রু। উঃ, দাদাটা যে এভাবে নেমে যাবে ভাবতে পারেনি পুষ্পলতা।

ঠিক এই কথাই শান্তনু ভাবে। পুষ্পলতা যে এভাবে নেমে যাবে ভাবতে পারেনি সে। নেমে যাবে? বন্ধুরা হাসে শান্তনু পাগল। উঠে যাওয়াকে কি নেমে যাওয়া বলে? এই দশ বছরে পুষ্পলতা কোথায় উঠে গেছে, তার দিকে যেন আর তাকানো যায় না। একেবারে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গিয়ে শেষ ধাপটার দিকে পা বাড়িয়েছে। —"ঠিক বলেছিস্।" হা হা করে হেসে ওঠে শান্তনু,—"ওই ধাপটাতে উঠতে পারলেই একেবারে পতনও"। "ছি ছি, কি বলছিস,—তোর না বোন? তার মৃত্যু চাস তুই?"—"ভুল করিস না, মৃত্যু নয়, পতন। অত উঁচু থেকে পড়বে যখন, সেই উড়ন্ত ঝাঁপটা কেমন দেখাবে ভাবছি আমি।" অবাক হয়ে বন্ধু বললে—"ছিঃ!"—"ছি কেন?" গর্জে উঠল শান্তনু। "কেন তাও বলতে হবে!" বন্ধু বলে, "বোনকে ঈর্ষা করিস তুই।" "ঈর্ষা?" হা হা, শান্তনু হাসে। "তা একটু করি হয়ত, ওর ক্ষমতা আছে, আমার নেই—" "এবং থাকলে তুমিও ঐ জিনিষই হতে", বন্ধুর গলায় অধৈর্য। "হয়ত তাই", শান্তনু বলে, "আর তাহলে তোরা যেমন আমার জন্যে মৃত্যুই কামনা করতি প্রশান্ত তার কম কিছু নয়—অবশ্য যদি তখনো আমায় ভালোবাসতি।" —"কেন এত কি হয়েছে?" প্রশান্ত সাধারণ মানুষ, কম্যুনিস্টও নয়—কংগ্রেসীও নয়। সে বুঝতে পারে না এত কী হয়েছে!

—"তাই কি আর এত? মাত্র তো একটা মিনিস্টার হয়েছে পুষ্প। এবং মাঝে মাঝে গুজব শোনা যাচ্ছে কোন প্রদেশে গভর্ণরের পদ খালি হলে সেটা এবারে পুষ্পলতাই পাবে। পুষ্পলতার যে এত ক্ষমতা ছিল কে তা জানত? আর এত নাম? যেখানে যাও সবাই চেনে পুষ্পলতা নাগকে। অবশ্য শান্তনু নাগকেও যে লোকে চেনে না এমন নয়, কিন্তু সেটা অন্যতরফ।

শান্তনু এখন র‍্যাংক কম্যুনিস্ট। কিন্তু চেহারা দেখে বোঝার যো নেই। "ইজমে"র উগ্রমা অর্থাৎ মতের গোঁড়ামি এখনো ওর মুখের রেখাগুলিকে তেমন কঠিন করে তুলতে পারেনি। তাই আটত্রিশ বছর বয়সেও শান্তনুকে দেখতে ছোকরার মতই দেখায়। ওর আর একটা মোহ ঘনচুলের এলোমেলো উস্কখুস্কতা। আর মজা এই—ওর স্বপ্ন দেখা চোখ আজো মাঝে মাঝে জ্বলে ওঠে।

তবু শান্তনুর রোজগার মাসে পঁচাত্তর। কি একটা সাপ্তাহিকে সম্পাদক হিসেবে পায়। পুষ্পলতার আয় মাসে আড়াই হাজার। সংসারটা চালায় ওই। শান্তনুকেও যে মাঝে মাঝে ওর কাছে হাত পাততে হয় না এমন নয়।—বাবা রিটায়ার করেছেন, কাকা এখনো কোর্টে যান। —তাছাড়া দুটিতনটে ছোটখাট কোম্পানীর ডিরেক্টর। বাবাও সম্প্রতি 'স্মিথ এণ্ড মেকঞ্জী'র অন্যতম ডিরেক্টর হয়েছেন। সবই পুষ্পলতার দৌলতে। ওরি চেনাশোনা 'ফার্ম'। ওরই কাছে আসে নানান কাজে কর্মে নানা ফেভার চাইতে। আর সেই সুযোগে এসে বাবা কাকাদের একটু 'ফেভার' দেখিয়ে যায়। অবশ্য এমনভাবে, যেন ওইটুকু করতে পেয়ে ধন্য হচ্ছে তারা। কি আর করা যায়,—শুধু শুধু লোকের মনে আঘাত দিয়ে লাভ কী? একটু নাম পেলেই যদি তারা খুশী হয়,—আর ওই নামটুকুর বদলে যদি বেশ কিছু টাকা আসে ঘরে।

সবাই পুষ্পলতার ভক্ত হয়ে পড়েছে, ভাই-বোন, মাসী-পিসী সবাই। কি মেয়ে! বংশের নাম রেখেছে। ছেলে যা পারল না, মেয়ে তার বাড়া করেছে। মেয়ের নামের তোড়ে বাপ-কাকার নাম কোথায় ভেসে গেছে।—সবাই আসে পুষ্পলতার সঙ্গে দেখা করতে। ছোকরার দল এসে বাণী নিয়ে যায়, বুড়োর দল নিয়ে যায় প্রসাদ। ছেলের চাকরী, জামাইয়ের ঠিকেদারী।—কি নয়?—"মা, তুমি একটু বলে-টলে দাও। তোমার এক কলমের খোঁচড়ে কন্ট্রাক্টটা হয়ে যাবে। এটা না হলে সব না খেয়ে মারা পড়ব। তোমরা গদীতে বসেছ আমাদের ভরসা,—আর মা বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী না দেখলে দেখবে কে? ঠিক কথা।—তবু সব সময় কি এরকম প্রাদেশিকতা করা যায় না করা উচিত? বাঙ্গালীর অবস্থা পুষ্প না জানে এমন নয়। আজন্মকাল সেই তো দেখে আসছে। নুন আসতে চাল নেই। চাল আসতে নুন। তার উপরে আবার আছে বিদ্যে আর আদর্শ-বাদের বিলাসিতা। —আজকাল আবার সংস্কৃতি বলে একটা জিনিষ হয়েছে, যার জন্যে বেশ কিছু খরচ হয়। কাজেই বাঙ্গালীর অবস্থা কে না জানে। কিন্তু তাই বলে অন্য প্রদেশগুলি তো আর শুকিয়ে মরতে পারে না। আর তাছাড়া টাকা করার নিত্য নবপন্ধতি ওরা জানে। সেই টাকার ওপরে ট্যাক্স করে সরকারের কত লাভ হবে। ওদের অর্ডার না দিয়ে কতগুলো অপোগণ্ড ছেলেকে দিতে হবে। যেহেতু তারা বাঙ্গালী? এমন প্রাদেশিকতা পুষ্পর মত মেয়ে করতে পারে না। আর তাছাড়া উপরওলাদের ইচ্ছার ইঙ্গিতও তো মেনে চলতে হবে। বাবাঃ মেয়ে হয়ে সে যা করে, পাঁচজনের সঙ্গে মানিয়ে ওপরওলার সঙ্গে বনিয়ে এতসব ব্যাপার করছে, ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। শুধু টাকা রোজগারই নয়, সেই সঙ্গেই দেশেরও কাজ।

আগে অর্থাৎ বাপ-কাকাদের আমলে, দেশের কাজের সঙ্গে টাকার ছিল আড়াআড়ি সম্পর্ক। টাকা রোজগার করেছ কি গেছ। আর দেশের কাজে তোমার যোগ্যতা রইল না। অথচ টাকা নইলে দেশের কাজ জমত না। তাই চেয়ে চিন্তে ভিক্ষে, না হয়ত চুরি ডাকাতি করেও সেই রোজগেরে লোকদের কাছ থেকেই টাকা সংগ্রহ করতে হোত।

আজ দৃষ্টিভঙ্গী বদলেছে। অর্থলাভ, যশোলাভ ও দেশ সেবা একসঙ্গে হচ্ছে।

"ঘেঁচু হচ্ছে,—ঘেঁচু আর কচু।" শান্তনু তার রুক্ষ চুলের মধ্যে সরু সরু আঙুল চালাতে চালাতে খেঁকিয়ে ওঠে, এর নাম দেশের কাজ? 'দেশ' কথাটা আর মুখে উচ্চারণ করিস নে তোরা—" কথায় কথায় আজকাল এমনি খেঁকিয়ে ওঠে শান্তনু। ওর মনের ভিতরটা বিরক্তিতে যেন চিড় খেয়ে খেয়ে ফেটে গেছে। একটা অসাফল্যের ব্যর্থতা না ঈর্ষার জ্বলুনি, বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন মা। শুধু মায়ের মুখ থেকেই আজকাল আর দেশের নাম শোনা যায় না। ব্যথিত বিস্ময়ে নিজের সন্তানদের দিকে চেয়ে থাকেন। শান্তনু বলে,—"দেশের দুঃখ দূর করছিস না নিজেদের? দেশের পেট ভরছে না নিজেদের?—"বেশ তো এত যদি দরদ, তুইই বা কিছু করিস না কেন? দেশ তো তোদেরও"।—

—"করি বই কী,—যে কাজ আমরা ঠিক মনে করি—"

—"সে তো শুধু লোক ক্ষেপানো আর লোক ঠকানো।—সত্যি করে বল দেখি যে শ্রমিকদের জন্যে তোরা সব্বাইকে নাস্তানাবুদ করছিস তাদের জন্যে তোদের কানাকড়িও সহানুভূতি আছে কিনা।—তাদের ব্যবহার করছিস তোরা শুধু অস্ত্র হিসেবে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার অস্ত্র।"—

—"নিশ্চয়ই—কে না জানে মানুষের চেয়ে মনুষ্যত্বের মূল্য বেশী আমাদের কাছে। ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টির।"—

—"তবে ওদের মনুষ্যত্ব না জাগিয়ে মারামারি কাটাকাটি শিখিয়ে মনুষ্যত্ব দূর করবার চেষ্টা করছিস কেন।—ওদের যাতে সত্যি উপকার হয় সেই চেষ্টা না করে—"

"—তাদের বাড়াচ্ছি এখন, কেবল তোদের সরাব বলে। তোদের সরিয়ে আগে 'পাওয়ার' 'ক্যাপচার' করে নি।—"

—"ততদিনে দেশ যদি মরে ভূত হয়ে যায়?"

—"যায় যাক্ সবই তো গেছে,— বাকীটুকুও যাক্।"—বিরক্ত হলে, আজকাল আর নিজেকে সংযত করতে পারে না শান্তনু।

পুষ্পর বিরক্তি কিন্তু এমন তীব্র হয়ে ওঠে না। ওর মধ্যে শান্তির একটা ভান আছে। ও যে সফলতার আস্বাদ পেয়েছে, আস্বাদ পেয়েছে হাতে টাকা নেবার সুখের।—তাই দাদাটাকে দরদ দেখাতে ওর বাধে নাই "আঃ মা, দাদাটাকে ধরে এবারে বিয়ে দাও না। অনেক মেয়ে ওকে বিয়ে করার জন্যে পাগল হয়ে আছে।" —"নিজে খেতে পায় না, বউকে খাওয়াবে কী?" একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস মায়ের বক্ষ ভেদ করে বেরিয়ে আসে। প্রেমহীন জীবনের দুর্বহভার পুরুষকে দিনে দিনে ব্যর্থ করে তোলে, একথা মা বিদুষী না হলেও অন্তর দিয়ে জানেন।—পুরুষ সন্ন্যাসী হতে পারে, তবু নারীর প্রেম তার চাই,—দেহকে অস্বীকার করলেও মনকে উপোষী ওরা রাখতে পারে না।—তাই যতবড় সন্ন্যাসী তার চারিদিকে তত মেয়েদের ভিড়। নারীর প্রেম, নারীর ভক্তিই পুরুষের ব্রহ্মচর্যকে সার্থকতা দান করে। মনের দিক থেকে এ দানটুকু তাদের বড় প্রয়োজন।

কিন্তু শান্তনু কোন মেয়েকেই আমল দেবে না, এই যেন পণ করেছে। মেয়েজাতটার উপরেই ও যেন ভিতরে ভিতরে ক্রমশ খাপ্পা হয়ে যাচ্ছে। বিয়ে তো নয়ই, এমন কি হাসি-তামাসা, গল্পগুজবও নয়। মেয়েদের সঙ্গে বাইরে ওর যত বেশী ঘোরাঘুরি, মনের মধ্যে তত বেশীই যেন ছাড়াছাড়ি,—দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা ভাবেন,—কেন?—কিন্তু পুষ্পর তো পুরুষের প্রতি ঘৃণা নেই, বরং তাদের সঙ্গেই কাজে-কর্মে ওর জমে ভালো,—মনের কোন তারে ছোঁয়া

(শেষাংশ ২৪৩ পৃষ্ঠায়)

একটি মানুষ ঃ কয়েকটি কাহিনী

(২৩৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

(হিন্দু থিয়েটার), তার প্রতিষ্ঠাতা প্রসন্নকুমার। নাট্যানুরাগ জ্ঞানেন্দ্রমোহনেরও থাকা অস্বাভাবিক নয়। মধুসূদনকে নাটক রচনায় মনোনিবেশ করার জন্যে প্রভূত অভিনন্দন জানালেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন, বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলন যাতে প্রসারলাভ করে এবং স্বতঃস্ফূর্ত হয়, সে বিষয়ে যত্নবান হতে শ্রীমধুসূদনকে বিশেষ অনুরোধ জানালেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন।

আর একটি বিশেষ অনুরোধ জ্ঞানেন্দ্রমোহন মধুসূদনকে করেছিলেন, গুরুত্ব তার কম নয়। তিনি বললেন, ব্যয়ভারের জন্যে চিন্তা কোর না, সে আমি বহন করব, তুমি দেশে ফিরে তোমার নাটকগুলি এবং আমাদের দেশের অন্যান্য নাট্যকারদের তোমার মতে যেগুলি শ্রেষ্ঠ নাটক, সেগুলি আমায় পাঠিও ভাই, ভবিষ্যতেও আমায় যখন যা ভালো নাটক বেরোবে, পাঠাতে ভুলো না। মধুসূদন প্রশ্ন করেন—তুমি আমাদের দেশের নতুন নাটক পড়তে চাও? জ্ঞানেন্দ্রমোহন উত্তর দেন—পড়তে তো চাই-ই, তাছাড়াও আমার আরও একটি উদ্দেশ্য আছে।

—জানতে পারি সেই উদ্দেশ্যটি—মহাকবির কৌতূহলী কবি-মনের জিজ্ঞাসা, নিশ্চয়ই পার জ্ঞানেন্দ্রমোহন বলেন—আমি চাই, এদের বাংলা শিখিয়ে, এদেরই দিয়ে এখানকার প্রধান রঙ্গমঞ্চে আমি বাংলা নাটকের অভিনয় করাব। এদের সামনে আমি এইটেই দেখাতে চাই যে, নাট্যান্দোলনেও আমরা পিছিয়ে নেই, বাংলাদেশের নাট্য সাহিত্যের ব্যাপক বিস্তার আমার বিশেষ কাম্য।

আমার পূজনীয়া পিতামহী স্বর্গীয়া মনমোহিনী দেবী (স্বর্গীয় ডাঃ স্যার বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী)র মুখে শুনেছি যে, মধুসূদনের হাতে জ্ঞানেন্দ্রমোহন তার সম্পর্কিত নাতি-নাতনীদের জন্যে স্নেহাশীর্বাদস্বরূপ বহু সৌখীন দ্রব্য উপহার পাঠিয়ে দেন। মধুসূদনই বিলেত থেকে আসার সময় জ্ঞানেন্দ্রমোহনের রচিত অনেকগুলি অপ্রকাশিত কবিতা এ-দেশে আনেন ও তাঁর পরিজনবর্গের হাতে সেই কবিতাগুলি অর্পণ করেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের ভাষানুশীলনের বিষয় মধুসূদনের মারফতেই তাঁর পরিজনেরা জানতে পারেন।

বৈষয়িক কর্মের জন্যে তাঁর ভাগ্নেদের প্রতিনিধিস্বরূপ এক ভদ্রলোককে (অনেক চেষ্টা করেও এঁর নাম উদ্ধার করতে পারিনি) বিলেতে পাঠানো হল জ্ঞানেন্দ্রমোহনের কাছে। পরম সমাদরে তাঁকে অতিথিরূপে বরণ করেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন, দেশীয় প্রথায় তাঁর আদর-আপ্যায়ন করেন। তাঁকে বার বার অনুরোধ জানালেন যে, দেশে ফিরে যখন যে বাংলা বই বেরোবে, নিয়মিতভাবে তাঁকে সমস্ত বাংলা বই যেন তিনি সরবরাহ করেন। অবশ্য ব্যয়ভার জ্ঞানেন্দ্রমোহনই বহন করবেন—এ-প্রতিশ্রুতি দিতেও তিনি ভোলেন নি। প্রতিনিধির কাছে জ্ঞানেন্দ্রমোহন আপন প্রবল বাসনা প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন—আমি এ-দেশে এক বিরাট গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে চাই। বাংলা সাহিত্য যে কত সমৃদ্ধ, কত উন্নত এবং কত বৈরাট, সেই বিষয়ে জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই হবে আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। আমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এবং বাংলাদেশের ইতিহাসের এ-দেশে প্রচারের ভার গ্রহণ করব। আমার মাতৃভূমির ঐশ্বর্যে এদের পূর্ণ করে তুলব।

বিলেতের সমাজে জ্ঞানেন্দ্রমোহন শুধু শ্রদ্ধাস্পদ পুরুষই ছিলেন না, পূজনীয় পুরুষও ছিলেন বলা যায়। বিলেতের তৎকালীন প্রাতঃস্মরণীয় এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তির দল নিয়মিত আসতেন জ্ঞানেন্দ্রমোহনের গৃহে. যে-কোন বিষয়ে জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিমত অসীম মূল্য বহন করত তাঁদের কাছে। সমাজ-জীবনে জ্ঞানেন্দ্রমোহনের প্রভাব ছিল প্রায় অনতিক্রম্য। সেখানকার নানাবিধ জনহিতকর প্রচেষ্টার সঙ্গেও তাঁর যোগসূত্র অবিচ্ছেদ্য বললেই চলে। সাহেবদের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যে দেখা যেত যে, জ্ঞানেন্দ্রমোহন নিজের দেশ ও দেশবাসীর স্বকীয়তা, বৈশিষ্ট্য, মহিমা প্রচারেই যেন বেশী উৎসুক।

ভারতবর্ষ থেকে যে-কেউ বিলেতে গেছেন, যে-কোন কারণেই হোক্, তাঁকে নিয়ে জ্ঞানেন্দ্রমোহন যে কি করবেন ভেবে যেন কূলকিনারা পেতেন না। দেশবাসীকে দেখতে পেয়ে মাঝে মাঝে আনন্দের আতিশয্যে এমন এক একটি কাণ্ড করে বসতেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন, যাকে বালসুলভ চপলতা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

লণ্ডন প্রবাসী বাঙালীরা সম্বর্ধনা দিলেন জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে। প্রত্যুত্তরে জ্ঞানেন্দ্রমোহন বলেছিলেন—তোমাদের কাছে, বিশেষ করে খৃষ্টধর্মাবলম্বী বাঙালীদের কাছে এই বৃদ্ধের সনির্বন্ধ অনুরোধ—যেখানেই থাক, যে অবস্থাতেই থাক, যে-কোন পরিবেশের মধ্যেই থাক, পরধর্মও যদি অবলম্বন করে থাক, একটা কথা কিছুতেই ভুলো না যে, তোমরা বাঙালী, তোমাদের দেহের প্রতিটি শিরায়, ধমনীতে-ধমনীতে বাঙালীর রক্ত প্রবহমান, এই নশ্বর দেহ তোমাদের পুষ্টিলাভ করেছে বাংলাদেশের অন্নজলে। আমৃত্যু মনে রেখ, তোমরা কি ও কে? তোমরা বাঙালী, ক্ষমতা থাকে (না থাকে তো সাধনা কর সেই ক্ষমতার জন্যে) তো সারা জগতকে উদ্দেশ করে সদম্ভে বল—আমরা বাঙালী। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের মধ্যে দেশপ্রীতি আদৌ ছিল না বলে যে মিথ্যাচারীর দল রটনা করেছেন, উপরোক্ত ঘটনার তাৎপর্য অনুধাবন করলে সেই কপটভাষীদের প্রতি রাগ বা বিদ্বেষ না ঘৃণা কিছুই হয় না। যা হয়, তার নাম করুণা।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার বিলেতে গিয়ে বসবাস সুরু করেন, বাড়ীর নাম রাখেন বৈঠকখানা প্রমুখ উল্লেখ করে তাঁর সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দায়সারা গোছের কর্তব্য সমাধা করেছেন ঐতিহাসিকের দল। কিন্তু বাংলার গর্ব ও গৌরব এই আদর্শ পুরুষের চরিত্রের বিভিন্ন দিকের প্রতি আলোকপাত করার চেষ্টা করেন নি তথ্যান্বেষীর দল (ধরে নেব কি যে তাঁরা প্রয়োজনই অনুভব করেন নি)। বুকভরা বেদনা নিয়ে দেশ থেকে চলে যেতে হয়েছে জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে। চরম আঘাত তিনি পেয়েছেন তাঁর দেশের কাছ থেকে, তা সত্ত্বেও বিদেশে সারা জীবন ধরে দেশীয় সভ্যতার প্রচারে ও বিস্তারেই পুণ্যকর্মে তিনি নিজেকে করলেন নিয়োজিত। ভারতের শাশ্বত ঐতিহ্যের প্রচারকর্মের মহান্ দায়িত্ব গৌরবের সঙ্গে তিনি পালন করে গেলেন আমরণ—আর তারই প্রতিদানে আজকের বাঙালী তাঁকে একরকম তো ভুলেই গেছে। স্মৃতির মিছিলে আজ জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর অনুপস্থিত এবং সযত্নে পরিত্যক্ত।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, জীবন দেবতার তিনি ধন্য উপাসক, সম্পূর্ণ সার্থক তাঁর নামকরণ। আজ সত্তর বছর হতে চলল, পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর কায়িক যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছে। এর … পৃথিবীর বুকের উপর পড়েছে অনেকগুলো বছরের স্পর্শ, কালের কষ্টিপাথরে তাঁর ক… কীর্তি লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, তার মূল্যা… একদিন না একদিন হবেই। সময়ের ব্যবধান হে… না দীর্ঘ, কালজয়ী প্রতিভা তাতে কি কখ… ম্লান হয়ে যায়! গবেষকদের দলের পূর্বসূরী… অবদানের মধ্যে যেটুকু অভাব পরিলক্ষিত হয়ে… উত্তরসূরীদের অবদান সেই অভাব নিশ্চয়ই পূ… করবে—এটুকু আশাও কি মনে মনে পোষণ কর… আমরা পারি না?

সারা বাংলার গর্ব ও গৌরব ঠাকুর পরিবা… উপেক্ষিত, অনাদৃত ও নির্বাসিত সন্তান—… সুযোগে তোমায় স্বজাতি হিসেবে, তোমার পিতৃ… পুত্রের কল্যাকুলের এক নগণ্য প্রতিনিধি হিসে… তোমাকে প্রাণের প্রণাম উৎসর্গ করি।

মোগল যুগে নারীশিক্ষা

(২৩৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

লেখকগণের মত অনাবশ্যক উপমা ও অলঙ্কারে… ভারে ভারগ্রস্ত নয়।

সম্রাট আওরংজীবের রাজত্বকালেও আম… মোগল হারেমে তিনজন বিদুষী বাদ্‌শাহ্‌জাদী… পরিচয় পাই। দারা-সুকোর কন্যা জাহান-জে… বানু ওরফে জানী বেগম, আওরংজীবের জ্যেষ্ঠ… কন্যা জেব উন্নিসা ও আওরংজীবের তৃতীয়… কন্যা বদর-উন্নিসা।

মানুচি লিখিয়াছেন, "বাদশাহী হারে… শাহ্‌জাদী ও অন্যান্য মোগল পুরবাসিনী… বৃন্দকে সঙ্গীত শিক্ষা দেবার জন্য বহি… ভোগিনী শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হইত… তাঁহাদের সহিত রাজবংশের কোন প্রক… আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল না, কেবলমাত্র স্ব… গুণানুযায়ী তাঁহারা বাদ্‌শাহদের দ্বারা নিযু… হতেন। মোগল সম্রাটদিগের কাছে যে সমস্ত… হস্তলিখিত দৈনিক সংবাদপত্র আসত, সে… পত্রিকা পাঠ করে শোনাবার ভার মহলে… বেতনভোগিনী মহিলাদের উপর ন্যস্ত ছিল… রাত্রি ৯টার সময় তাঁহারা সম্রাটকে সংবাদগুলি… পড়ে শোনাতেন।" মানুচির এই সকল উক্তি… থেকে স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে, রাজপ্রসাদ… অভিলাষী সাধারণ ও মধ্যবিত্ত এমন কি নিম্ন… পরিবারেও স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল। সভ্যতা… শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য সমাজে… উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তরে সঞ্চারিত হয়… ইহাই চিরন্তন ধারা। যে সমস্ত আচার-ব্যবহার… ধনী সম্ভ্রান্ত গৃহে অনুসৃত হয়, সাধারণ… দেখা যায় যে, মধ্যবিত্ত ও দুঃস্থ পরিবারে… তাহার অনুকরণ করা হয়। মানব মনস্তত্ত্বে এ… ব্যবস্থাই যুগে যুগে চলে আসছে—মোগ… যুগেও ইহার ব্যতিক্রম নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে… যখন সাম্রাজ্যের ভাঙন ধরল, দেশময় অশান্তি… বিপ্লব দেখা গেল তখন হতে ভারতে… মুসলমান পুরনারীগণ যথার্থই অন্ধকা… বন্দিনী হলেন।

খোঁপার বাহার

(২৩৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

করুন। বাঁদিকের গোছাটি বেশ করে আঁচড়ে পরিষ্কার করে নিয়ে হাতে করে সেটি টান করে মাথার উপর তুলে ধরুন। এবার ঐ কাঠের টুকরোর উপর চুলের গোছাটি ডগার দিক থেকে জড়িয়ে যান, সমস্ত টুকরো যাতে প্রায় ঢেকে যায় এমনভাবে জড়াতে হবে, কেবলমাত্র দু'পাশে অল্প অল্প কাঠ দেখা যাবে, যা থাকবে আপনার হাতে ধরা। এইবার এই চুলের রোলটি (Roll) ঘাড়ের বেশ খানিকটা উপরে বসান এমন আন্দাজ করে রাখবেন যাতে প্রথমটির নীচে ঐ মাপেরই আরো দুটি রোলের জায়গা থাকে। এবারে বাঁ হাতে করে চুলের রোলটি মাথার সঙ্গে চেপে ধরে ডান হাত দিয়ে আস্তে আস্তে কাঠের টুকরোটি ভেতর থেকে খুলে নিন—এই যে চুলে যা নলটি হল তাকে নষ্ট না করে সাবধানে দুটি বব্ পিন আগে আটকে দিয়ে তারপর দু'পাশে এবং উপর ও নীচে কাঁটা দিয়ে শক্ত করে আটকে নিন। এবার আর একটি গোছ চুল নিয়ে ঠিক ঐভাবে জড়িয়ে নিন কাঠের টুকরোটির উপর এবং দ্বিতীয় রোলটি বসান প্রথমটির নীচে—দুটির মধ্যে যেন ফাঁক না থাকে। তারপর তৃতীয়টি বসান এবার তার নীচে! আপনার মাথার পিছনে এতক্ষণে তিনটি বেশ মোটা-সোটা চুলের নল বা রোল আটকে দেওয়া হয়েছে। এবার ঐ যে দু' গোছা চুল কাঁধের উপর দিয়ে সামনে ঝুলেছে তাদের প্রথম খোঁপার তলা দিয়ে ডানটা বাঁ দিকে এবং কাঁধেরটা ডান দিকে নিন—এবার একে একে বেশ করে আঁচড়ে নিয়ে অল্প ছাড়িয়ে দিয়ে চওড়া করে নিয়ে ঐ নলগুলির খোলা মুখগুলো ঢেকে খোঁপার চার পাশে দিয়ে গোছাটি একে একে জড়িয়ে নিয়ে কাঁটা দিয়ে আটকে দিন। সুন্দর দেখতে রোল খোঁপা বাঁধা হল; কাজেই দেখছেন মাথার পিছনে গোল করে খোঁপা বাঁধার মধ্যেও অনেক নতুনত্ব আনা যেতে পারে।

আর এক রকম খোঁপা বাঁধার কথা বলি—প্রথমে চুল আঁচড়ে, চুলের গোড়া ফিতে দিয়ে বেশ শক্ত করে বেঁধে চুলটাকে সমান তিন ভাগে ভাগ করবেন। দু'পাশের দু'ভাগ দিয়ে দুটি আলাদা বিনুনী করে, মাঝখানের আল্‌গা চুল দিয়ে একটি ফাঁস তৈরী করুন। ফাঁস তৈরী করে, তার আগার দিকের চুল দিয়ে এই মাঝখানের আলগা চুলের গোছার দিকে জড়িয়ে দেবেন। তারপর আঙুল দিয়ে ফাঁসটা টেনে টেনে কিছুটা লম্বা করে এই ফাঁসের নীচের দিকটি চওড়া করে দিন। মাঝখানের চুলের ফাঁসটা যাতে খুলে না যায়, সেজন্য তাতে কয়েকটা কাঁটা গুঁজে দেবেন। তারপর ফাঁসের গোড়ায় জড়ানো চুলের কিছু উপরে বাঁ দিকের বিনুনীটা খোঁপার আকারে চ্যাপ্টা করে ঘুরিয়ে আনুন। গোল করে আঁটা বাঁ পাশের বিনুনীর উপর দিয়ে ডান পাশের বিনুনীটা গোলাকারে চ্যাপ্টা করে ঘুরিয়ে আনুন এবং খোঁপার আকারে সাজানো বিনুনী দুটি চুলের কাঁটা দিয়ে এঁটে দিন। এবারে বিনুনী গোলাকারে বেশ ছাড়িয়ে দিয়ে সাধারণ খোঁপার মত সাজাতে হবে। গোলাকারে সাজানো বিনুনী দুটির ভিতর দিয়ে আল্‌গা চুলের ফাঁসটা বেরিয়ে নীচের দিকে ঝুলে থাকবে। এখন মাঝখানের আল্‌গা চুলের গোড়ায় জড়ানো চুলের উপর রুপোর পান-কাঁটা, ফুল-কাঁটা বা ব্রোচ এঁটে দিন। ইচ্ছে করলে গোলাকারে ফুলের মালাও সাজিয়ে দিতে পারেন।

যে কয় রকম খোঁপা বাঁধার কথা বললাম, তা থেকে নিজের দেহ, মুখ, গলা ও ঘাড়ের গড়ন অনুযায়ী খোঁপা বাঁধবেন, তাহলেই মুখের সৌন্দর্য বজায় থাকবে।

পুষ্পলতা নাগ

(২৪১ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

দিয়ে খানিকটা সুখ হয়ত ওর জীবনের মূলে রস যোগায় ও নিজেও জানতে পারে না। —কিন্তু ছেলের জীবন কি এমনি যাবে? তাঁর এমন সুন্দর এমন গুণবান ছেলে কি এমনি ছন্নছাড়া হয়েই রইবে। মেয়ের চেয়ে ছেলের জন্যে তাঁর বেশী ভাবনা হয়। অথচ উল্টোটাই তো হবার কথা। মেয়ের বিয়ের কথাই তো বেশী করে ভাবা উচিত। ভেবেওছেন এক সময়ে খুব। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে উঠে বসে শুধু ওই কথাই ভেবেছেন, কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছে। দেশের কথা স্রেফ ভুলে গিয়ে, শুধু মেয়ের কথাই ভেবেছেন। তখন ছেলের কথা মনেই হয়নি। ও পুরুষ মানুষ: যুদ্ধ করাই ওর কাজ। করুক সেসব।—আগে দেশোদ্ধারটা হয়ে যাক পরে ওর কথা ভাবলেই চলবে। —কিন্তু মেয়ের জীবন যে মুহূর্তে মুহূর্তে ব্যর্থ হচ্ছে—ঝরে যাচ্ছে যৌবন, জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলি একে একে পার হয়ে যাচ্ছে।

এখন মেয়ে সম্বন্ধে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন তিনি। আর ভাবেন না। মেয়ে তাঁর ভাবনাকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে অনেক বড় হয়ে গেছে। হোক,—আর তিনি মেয়ের কথা ভাবেন না। ও নাম করেছে করুক। কিন্তু তাতে তাঁর কী?—মেয়ের সাফল্যে তাঁর কী হবে? তিনি এ ব্যাপারে ছেলেরই সাফল্য চেয়েছিলেন বেশী। তারপরে মেয়েরও যদি কিছু হয়তো ভালো। ছেলেই করুক খ্যাতিলাভ। কৃতী হয়ে উঠুক, নাম করুক অনেক অনেক।—

মেয়ের নাম হোক শ্বশুর বাড়ীতে। ভালো বলে, সুগৃহিণী বলে, এইতো সব মায়েরা চায়। তিনিও বোধহয় ভিতরে ভিতরে তাই চেয়েছিলেন। মুখে স্বীকার করেন নি। সেই মিথ্যাচার আজ সত্যি সত্যি মেয়েকে তাঁর ছেলের চেয়ে বড় করে তুলেছে।

পুষ্পলতা হাসল—"এমন মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দাও যে রোজগার করে দাদাকে খাওয়াবে। আর 'কম্যুনিজম্' ইত্যাদি তার সখের বিলাসিতাগুলিও পুষতে পারবে। বলতো বলি, আমাদের শ্যামলিমা দত্তকে। মানে আমাদের জগু সেনের উপমন্ত্রী। দেখেছো তাকে তুমি অনেকবার। সেই যে ময়লা ময়লা রং, বেঁটে মতন, চোখে চশমা,—সেই যে।—বল্লে এখুনি হাতে স্বর্গ পায়। তোমার ছেলেটির আর যাই থাক না থাক রমণীমনোহর চেহারাটাতো আছে, —বলতে বলতে পুষ্পলতার দৃষ্টি পড়ল সামনের আয়নার দিকে। কে দাঁড়িয়ে আছে,—হঠাৎ যেন চিনতে পারল না পুষ্প। নিতান্ত সাধারণ চেহারার মাঝবয়সী একটি মহিলা।—এই তার পরিচয়?—তার শাম্ শাম্ রঙের সেই যে একটা মার্জিত জৌলুষ ছিল সেটা কবে ঝরে গেছে, লক্ষ্য করে নি এতদিন পুষ্পলতা।

মুহূর্তে হঠাৎ মনে পড়ল কবে যেন একদিন আয়নায় নিজের চেহারা দেখে এমনি অবাক হয়ে গিয়েছিলো আর একবার পুষ্পলতা, —সে কবে। কোন যুগ আগে। কেমন যেন একটা মিষ্টি মিষ্টি নরম নরম চেহারা। দেখে নিজেকে সেদিন অন্যরকম লেগেছিল পুষ্পের, যেন চিনতেই পারে নি, সে যেন অন্য কোন মেয়ে। চোখে মুখে স্বপ্নের মত কী যেন মাখা মাখা। লঘু শরীরের ঢেউএ ঢেউএ উড়ন্ত আঁচলের পাখা,—সে কবে, মনে পড়ছে না পুষ্পলতার,—কিন্তু এইখানেই, ওই আয়নায় সে একদিন ওই সুন্দরীর ছায়া দেখেছিল। কবে যেন গালের উপরে গোলাপী আভা দেখে আপন মনে হেসেছিল পুষ্প। তারপরে কাজের তাড়ায় ভুলেই গেল,—কবে সে রং মুছে গেছে। পুরুষের সঙ্গে এখন পুরুষের মতই কাজ আর গল্প করে পুষ্প। তাতেই বেশ ভালো লাগে। নিজে যে মেয়ে সেকথা শুধু ওই ভোলে নি, ওর আশেপাশের আর সবাইও ভুলেছে নিশ্চয়। কবে ফুল ফুটেছিলো কবে ঝরে গেল কে তার সন তারিখ মুখস্থ রেখেছে। এখন আয়নার সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সেই নিতান্ত সাধারণ নারী মূর্তিকে নিজের ছবি বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না পুষ্পর।—জীবনের সফলতা ওকে এতই কি বিরস শ্রীহীন করে তুলেছে। এরই মধ্যে মধ্য বয়সী স্থূলতায় ওর হাত-পা মুখ কেমন আঁট সাঁট ফুলো ফুলো হয়ে উঠেছে। কি জানি, এর ভিতরে কোথাও হয়তো কিছু ভুল আছে, কোন অবিশ্বাস্য রকমের ভুল। শুধু তার নয়,—বিধাতারও ভুল? হঠাৎ মায়ের দিকে চোখ তুলে তাকাতে লজ্জা পেল পুষ্প। আর মেয়ের সেই লজ্জা সাপের মত মায়ের অনুভবকে জড়িয়ে জড়িয়ে বেষ্টন করে ধরল। সেই মুহূর্তে মায়ের হৃদয় হাজার টুকরো হয়ে ছুটে গেল মেয়ের দিকে। শুধু ছেলে নয় মেয়েও তাঁর সমানই দুঃখী।

মেয়ের অবশ্য বেশী নাম। কিন্তু ছেলেও তার নিজের মহলে কম নাম করে নি। তবু ওরা দুজনেই এত বেশী রকম দুঃখী কেন? এত সাফল্যে কেন এত ব্যর্থতা। আর ওরা এত ব্যর্থ বলেই ওদের কাজ এত মিথ্যা, ওদের ব্রত এত ভঙ্গুর আর ওদের দেশ এতই অবাস্তব স্বপ্ন।

দুর্লভ

মনের মতন মন কি বন্ধু মিলিয়াছে এ জীবনে?
যুগে যুগে বৃথা খুঁজে ফিরিতেছ
সেই দুর্লভ ধনে।

—ম-ব

কোন একটা জাতির বিশেষ বিশেষ আত্ম-প্রকাশের সময় সেই জাতির নাট্যকাররা যে নাটকের মাধ্যমে দর্শকদেরকে নাট্যরস সাগরে পরিতৃপ্ত রাখতে পারেন, সেই নাটকই সেই জাতির সেই যুগোপযোগী নাটক বলে স্বীকৃতি পায়। কেন না, সেই নাটকের ভিতর দিয়ে সেই যুগের মানুষের, সমাজের, সমস্যার, রুচির, জীবনাদর্শের এবং পরিণতির প্রয়াসেরই কেবল যে পরিচয় পাওয়া যায় তা নয়—জাতির মানসিক সম্পদের আর বৈনোরও পরিচয় পাওয়া যায়।

যুগের নাটকের মাঝে কোন-কোন নাটক যুগোত্তীর্ণও হয়, কালোত্তীর্ণও হতে পারে। কিন্তু কোন একখানা নাটক যুগোপযুক্ত অথবা যুগোত্তীর্ণ অথবা কালোত্তীর্ণ হলেই যে তা জাতীয় নাটক হবে, তা মনে করবার কোন কারণ নেই। একটা যুগ একটা জাতির সামগ্রিক চেতনাকে, আবেগকে, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমগ্রভাবে প্রকট করে না; বিশেষ কোন চেতনাকে, বিশেষ কোন আবেগকে, বিশেষ কোন সাংস্কৃতিক প্রয়াসকে অপর সব কিছুর চেয়ে প্রবল-তর করে তোলে। যুগের লক্ষণই তাই। এক দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক দেওয়াই হচ্ছে যুগের ধর্ম। এক যুগ এক দিকে ঝোঁক দেয়, অপর যুগ দেয় আর এক দিকে। এই দুয়ের ভারসাম্য হয় যখন, তখনই হয় জাতির অগ্রগতির ফল লাভ।

যদি এমন প্রত্যাশা করা হয় যে, সব নাটকই কালোত্তীর্ণ হবে অথবা এমন অনুশাসন প্রবর্তন করা হয় যে, কালোত্তীর্ণ হবার লক্ষণ যে নাটকে পাওয়া যাবে না, তাকে নাটকই বলা হবে না,—তা হলে প্রত্যাশা পূর্ণ হবার সম্ভাবনাও যেমন দূরে সরে যাবে, তেমন যুগ-দাবীকে অগ্রাহ্য করবার ফলে জাতিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে।

ভারতবর্ষের নানা বিশেষত্বের মাঝে একটা বিশেষত্ব এই যে, ভারতবর্ষ যেমন গুণানুযায়ী জাতিভেদ ঘটিয়েছিল, তেমন সর্বাত্মক মিলনের পথও খোলা রেখেছিল। খুব কড়া-কড়া সামাজিক বিধি ও নিষেধ দিয়ে সে ব্রাহ্মণকে অব্রাহ্মণ থেকে পৃথক করে রাখতে চেয়েছিল, আবার ক্ষেত্র-বিশেষে অব্রাহ্মণকে, শূদ্রকেও গুরু হবার অধিকার দিয়েছিল, জাতিভেদ সমর্থন করবার জন্য আমি এ কথা বলছি না; বলছি ভারতের এই বৈশিষ্ট্যের দিকেই মনোযোগ আকর্ষণ করতে যে, বিধি-নিষেধের নিগড় যেমন অসংখ্য ছিল, তেমন হৃদয়বত্তার ও মানবতার প্রসারেরও অবসর দেওয়া হয়েছিল প্রচুর।

নাটক সম্বন্ধেও বিধি-নিষেধ বড় অল্প ছিল না। বিষয়বস্তু এই হওয়া চাই, চরিত্র এই হওয়া চাই, এই ধরণের নাটকে এই ক'টি চরিত্র থাকা চাই, সংলাপ এই রকম হওয়া চাই, পরিণতি এই রকম হওয়া চাই, দর্শক এই ভাবাপন্ন হওয়া চাই, আরো কত কি! সব বিধি কালিদাসও মেনে চলতে পারেন নি। কিন্তু অত সব বিধি-নিষেধের অনুশাসন বহাল করেও নাট্যবেদজ্ঞরা বলে গেলেন গুণানুসারে রূপকে-উপরূপকে মিলিয়ে ষোল থেকে বিশ রকম রচনা নাটক বলে স্বীকৃতি পেতে পারে। রচয়িতাদের ওপর এই দরদ, তাদেরকে স্বাধীনতা দেবার এই উদারতা, অল্প দেশেই দেখা যায়।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মনীষী আরিস্টটল কাব্যজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হয়ে যে তত্ত্ব জ্ঞান হলেন, তাতে প্রজ্ঞার অভাব রইল না, অভাব রইল হৃদয়ের, উদারতার। তিনি একেবারে বজ্রদৃঢ় হয়ে বল্লেন, হবে না—যে রচনায় এই সব সর্ত্ত-পূর্তির পরিচয় পাওয়া যাবে না, তাকে নাটকের আসরে অপাংক্তেয় রাখা হবে। ভারতের বিধি-নিষেধও বিজ্ঞানপ্রসূত, আরিস্টটলেরও তাই। কিন্তু আরিস্টটলের কাব্যজিজ্ঞাসার পর গ্রীসে আর এস্কাইলাস সোফোক্লিস জন্মান নি। গ্রীসের পতনের পর রোম যখন বড় হয়ে উঠল, তখনকার রোমান নাট্যকাররা তাঁদের নাটককে কাব্যধর্মী করে ফেল্লেন বেশী। ফলে দর্শকরা নাটক দেখতে আর আকৃষ্ট হোত না। তখন মাইম, সার্কাস, মানুষে-পশুতে যুদ্ধ রোমানদের প্রিয় হয়ে উঠল, নাচ-গানও নাটকে ঢুকল। প্রায় আড়াই শ' বছর ধরে গ্রীক নাটক রোমানদের হাতে পড়ে এই অবস্থায় উপনীত হোলো।

এর প্রায় সতেরো শত বছর পরে রোমের ভগ্ন-স্তূপের উপর ইতালিয়ান রেনেসাঁর শতদল ফুটে উঠল। তাই গ্রীক আর রোমান নাটককে ইউরোপে ছড়িয়ে দিল। শেকস্‌পীয়ার, মলেয়ার উৎসের সন্ধান
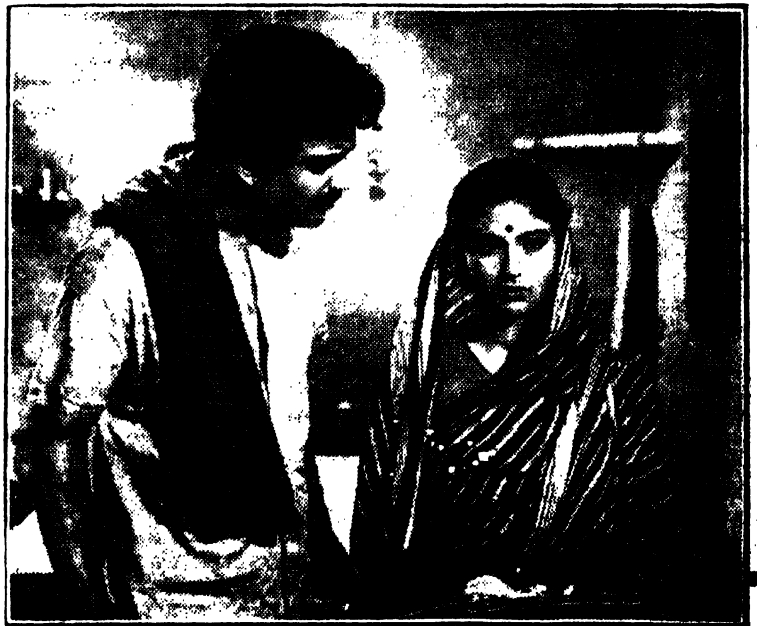
অগ্রদূত পরিচালনা ও প্রযোজনাধীন রবীন্দ্রনাথের 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'এর একটি দৃশ্যে নায়ক-ভৃত্য রামচরণ বেশে উত্তমকুমার ও নবাগতা সুচরিতা সান্যাল।

গেলেন। শেকস্‌পীয়ার কাব্যধর্মী রোমান নাটকের (প্লটাস, সেনেকা) থেকে যেমন রূপ নিলেন, তেমন নিলেন মাইম, নিলেন গ্লাডিটোরিয়াল দ্বন্দ্ব থেকে নানা উপাদান তাঁর ঐতিহাসিক নাটক গড়ে তোলবার জন্য ফরাসীদের মাঝে রেসিন কার্ণেইল তাই নিলেন, কিন্তু মলেয়ার নিলেন লঘু দিক।

[২]

সংস্কৃত নাটক সর্ব-পূর্ববর্তী যা পাওয়া গেছে, তা হচ্ছে ভাসের। তাঁর সময় জানা নেই। কালিদাসের নাটকে তাঁর নাম পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন তিনি খৃষ্টমৃত্যুর সাড়ে তিনশ' বছর পরেকার লোক। এই ভাসের নাটকের কাহিনী পুরাণ থেকে নেওয়া, যেমন গ্রীক নাটকের কাহিনী পুরাণ থেকে নেওয়া। রামায়ণ আর মহাভারত গ্রীকদের দি ইলিয়াড আর দি ওডেসি থেকে যেমন পৃথক, তেমন সংস্কৃত নাটকও গ্রীক নাটক থেকে পৃথক। সাধারণত ভারতীয় নাটক একেবারে সব নয়, জীবনকে ছন্দোবন্ধ করবার আবেদন, তীব্রতা নেই যদিচ নানা সংঘাত আছে। ট্রাজিক ঘটনা আছে, কিন্তু ট্রাজেডি নেই; মহান আত্মত্যাগ আছে কিন্তু তার দহন নেই; কামনা আছে কিন্তু ব্যর্থতার বিলাপ নেই; ব্যর্থতা আছে কিন্তু হতাশা নেই। রামায়ণ মহাভারতে যে প্যাশন আছে, নাটকে তা নেই। এই ধারাটি কিন্তু বাংলা নাটকে বয়ে এসেছে পুরাণ থেকে, এবং বিশেষ রূপ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বৌদ্ধ জীবনাদর্শকেও রূপ দিয়েছেন। ভাস, কালিদাস, শূদ্রক, অশ্বঘোষ, শ্রীহর্ষদেব প্রভৃতি আজ নতুন করে পড়া দরকার। রুশীরা তাই করেছে। জীবন-মৃত্যুর সম্বন্ধ মধুর করবার হদিস নাটকের একটা উদ্দেশ্য। গ্রীক নাট্যকাররা তার সন্ধান করেছেন। কিন্তু তা একটা প্রতিবিধিৎসা নিয়ে। তাই প্রেতাত্মা ওদের নাটকে বড় একটা অংশ গ্রহণ করে। এস্কাইলাস স্বামীহন্ত্রী ও পুত্রের কাছে হত ক্লাইটিমনেস্ত্রার প্রেতাত্মাকে এনেছেন তার ফিউরিজ নাটকে। তেমন শেক্‌সপীয়ার হ্যামলেটের বাপের প্রেতমূর্তিকে মঞ্চে এনেছেন ওই একই উত্তেজনা জাগাতে; ব্যাঙ্কোর প্রেত-মূর্তিকে (নির্বাক) এনেছেন ভয় দেখাতে, জুলিয়াস সীজারের প্রেত-মূর্তিকে আনিয়েছেন ব্রুটাসের অনুতাপকে আত্মঘাতী করে তুলতে।

হত্যা সম্বন্ধে সুবিচারের দাবী আজও মানুষ করে থাকে। কিন্তু মৃত্যু সম্বন্ধে এবং আত্মহত্যা সম্বন্ধে ভারতের ধারণা জীবনাবসানেই শেষ নয়। এর একটা রূপ পাই গিরিশের নাটকে, আর একটা পাই রবীন্দ্রনাথের নাটকে। দুয়ে যেমন পার্থক্য আছে, তেমন মিলও আছে। গিরিশ স্বাভাবিক মৃত্যু এবং আত্মহত্যা, দ্বিবিধ মৃত্যুকেই আত্মসমর্পণ দেখিয়েছেন, হয় ইষ্টের কাছে, নয় অদৃষ্টের কাছে। এই অদৃষ্ট গ্রীক ডেস্টিনি নয়। অদৃষ্ট হচ্ছে পরিণতির ইঙ্গিত, নব-জীবনের সম্ভাবনা। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে অমৃত আহরণের এবং অমৃত থাকার প্রস্তুতি হিসেবে বুঝিয়েছেন। গিরিশ ভক্তিকে পরম পরিণতির উপায় বলে জেনেছিলেন, ভারত যা জেনেছিল কয়েক শতাব্দীকাল। রবীন্দ্র উপনিষদের বাণী থেকে সত্যকে জেনেছিলেন। গিরিশ ভাগবত থেকে প্রেরণা নিয়েছিলেন। উপনিষৎ আর ভাগবত দুই-ই ভারতীয় সংস্কৃতির বাহক। গিরিশের নাটকে ভক্তিকে পাই জীবনের অবলম্বন হিসেবে, রবীন্দ্রনাথের নাটকে পাই সত্যের সন্ধানকে। গিরিশের নাটকে শ্রীকৃষ্ণের অথবা ইষ্টের কাছে আত্মসমর্পণ যাঁরা অবাস্তব আজগুবি বলেন, তাঁরা কিন্তু গ্রীক নাটকের দেব-দেবীদের আবির্ভাব এবং শেকস্‌পীয়ারের নাটকের প্রেত-মূর্তির প্রাধান্যকে তা বলেন না—এথেনা, এপোলো, এফ্রোডাইট, আর্টে-মিস, থেসপিস প্রভৃতি দেব-দেবীগণের গ্রীক ট্রাজিডিতে অংশ

রাজেন তরফদার পরিচালিত সিনে আর্ট প্রোডাক্‌সন্সের নির্মীয়মাণ ছবি "গঙ্গা"র একটি আবেগমধুর মুহূর্তে রুমা গঙ্গোপাধ্যায় ও নবাগত নিরঞ্জন রায়।

গ্রহণ নাটকের দৌর্বল্য বলে প্রচার করেন না, শেক্‌সপীয়ারের নাটকের ডাইনী-ভূতীদের এবং নানা প্রেত-মূর্তির অপরিহার্যতা প্রমাণ করবার জন্য কোমর বেঁধে তর্ক করেন,—যেমন কোমর বেঁধে তর্ক করেন বিল্বমঙ্গালের রূপান্তর অথবা তপতীর আত্ম-বিসর্জনের অবাস্তবতা প্রমাণ করবার জন্য। ও তর্ক সমালোচনা নয়, সত্যানুসন্ধানও নয়, মত প্রচারণা এবং পড়া বুলি শুনিয়ে বিদ্যার পরিচয় দেওয়া।

বাংলা-নাটকে নৃত্য-গীতের সমাবেশ যেমন গিরিশের নাটকে দেখতে পাই, তেমন রবীন্দ্রনাথের নাটকেও দেখতে পাই; গ্রীক নাটকেও দেখতে পাই, রোমান নাটকেও দেখতে পাই। গান শেক্‌স-পীয়ারের নাটকে যে একেবারেই দেখতে পাই না তা নয়—সংস্কৃতে ভাসের নাটকে পাই না, কালিদাসের নাটকে পাইনা,—নট-নটীর অংশে আবহ সৃষ্টির প্রয়োজনে ছাড়া। গিরিশের কোন-কোন নাটকে শেষ যবনিকা পড়বার মুখে কোরাস গান পাই, গ্রীক নাটকেও তাই পাই; অনেক চীনা অপেরায় তার অস্তিত্ব দেখে এসেছি।

কিন্তু গ্রীক নাটকে হত্যার, ব্যভিচারের, নির্মমতার, অনিয়মের উৎসব সত্ত্বেও যে নাটকীয়তার, যে গভীরতার, যে সীমাহীনতার পরিচয় পাই ইংরেজী তর্জমার ভিতর দিয়েও, তা বাংলা কোন নাটকেই পাই না, রবীন্দ্রনাথের কোন কোন নাটকের কোন কোন অংশে ছাড়া। শেক্‌সপীয়ারের প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি বাক্যে যে গভীর নাটকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়, গ্যায়টে ইবসেন ছাড়া তা দুর্লভ। বাংলা ভাষার উৎপত্তি এবং বয়েস ভাবতে হবে ও-সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে। মনে রাখতে হবে, বাংলা গদ্য এবং বাংলা নাট্য-পদ্য পঞ্চাশ বছরে পা দেবার আগেই বর্তমান বাংলা নাটক, উপন্যাস, কাব্য রূপ পরিগ্রহ করেছিল। ইংরেজী ভাষার তুলনায় বয়েসের দিক দিয়ে আজও বাংলা ভাষা একান্তই নাবালিকা।

প্রবন্ধের ভূমিকা হিসেবে এত সব কথা লিখলাম শুধু এই কথাটাই বোঝাতে যে, নাটক দেশে দেশে যুগে যুগে রূপ থেকে রূপান্তর গ্রহণ করেছে এবং তার মশলা গ্রহণ করেছে নাট্যশাস্ত্র থেকে নয়—জীবন থেকে, জীবনের রস থেকে, জাতির উত্থান-পতনের দ্বন্দ্ব থেকে এবং অনেক সময় পরম পরিণতি সম্বন্ধে জাতীয় আদর্শ থেকে। নানা জাতির নাটকের মাঝে যেমন নানা বৈষম্য রয়েছে, তেমন সাম্যও রয়েছে। এর কারণ, এক জাতি যেমন আর এক জাতির কাছ থেকে ধার করেছে, তেমন সকল জাতির মানুষই কতগুলি সম-অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। বিভিন্ন ভাষার ভিতরেও এমন একটা সাম্য দেখা যায়। বিভিন্ন ভাষার শব্দের উৎপত্তি পৃথক হলেও দেখা যায় মানুষের বিশেষ বিশেষ ভাব ও আবেগ প্রকাশের সময় মানুষ একই রকম শব্দ নির্বাচন করেছে, বাক্য গঠনও প্রায় একই রকম করেছে। নাটক সম্বন্ধেও ওই কথা বলা যায়, কাব্য উপন্যাস সম্বন্ধেও অবশ্যই বলা যায়।

(৩)

শেকস্‌পীয়ার যত পরের লেখা, পরের ভাব ভাষা ও বাক্য আত্মসাৎ করেছেন, সমালোচকরা বলেন, তত আর কেউ করেন নি। অথচ শেকস্‌পীয়ার যে খুব বড় স্কলার ছিলেন, সে কথাও কেউ বলেন নি। দীর্ঘকাল ধরে বাক-বিতণ্ডা চলেছিল, শেকস্‌পীয়ারের নাটক বলে যা পরিচিত তা আসলে শেকস্‌পীয়ারের লেখা, না বেন জনসনের লেখা। ইংরেজী রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় যখন রবীন্দ্রনাথ দিলেন, তখনো অনেকে প্রশ্ন করেছিলেন ও-রচনা কি সত্যই তাঁর নিজের, না রবীন্দ্রানুরাগী কোন ইংরেজের? শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বড় দর্শন ও সর্বধর্ম সমন্বয়বাদ তখনকার র‍্যাশনালিস্টদের সন্দেহের ও বিস্ময়ের বিষয় হয়েছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ (নরেন্দ্রনাথরূপে) 'বুজরুকি'র পরিচয় সংগ্রহ করবার কৌতূহল নিয়েই দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন—কে এ-কথা ভেবে যান নি, যে-কারণে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়েছিল, যে-কারণে রামমোহনের আবির্ভাব হয়েছিল, সেই কারণে পরমহংসদেবের আবির্ভাব হয়েছিল। বিপ্লবী অরবিন্দ যখন শ্রীঅরবিন্দরূপে দিব্য জীবনের বাণী শোনালেন তখন অনেকে বিস্মিত হলেন, ভেবে দেখলেন না তাঁর বিপ্লব কেবলমাত্র রাজনীতিক বিপ্লবে
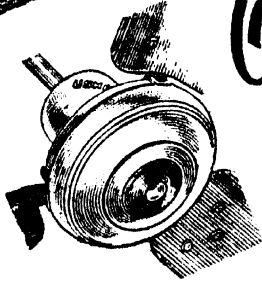
অপূর্ব সুযোগ
সহজ কিস্তিতে কিনুন—কোন বাড়তি খরচ নেই।
● ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৫৯ পর্য্যন্ত এই সুযোগ পাবেন।
● যত শীঘ্র কিনবেন কিস্তির হারে ততই সুবিধা হবে।
ঊষা
ফ্যান
বিনা খরচায় মেশিনের গুণাবলী দেখে নিন
আপনার নিকটতম ঊষা বিক্রেতাকে বলা মাত্রই সে আপনার বাড়িতে এসে বিনা খরচায় আপনাকে ঊষা মেশিনের গুণাবলী কল চালিয়ে দেখিয়ে যাবে। আপনার কোনও রকম বাধ্যবাধকতা থাকবে না।
ঊষা
সেলাই মেশিন
জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ, কলিকাতা

মাঝেই তিনি সীমাবদ্ধ রাখেন নি, কেন না, ওই বিপ্লবের সার্থকতাই জাতির সর্বাত্মক সার্থকতা নয়। তা যে নয়, এই বারো বছরেই তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং আর একটা রাজনীতির বিপ্লবের সম্ভাবনা এরই মাঝে প্রকট হয়েছে, তার প্রকাশে রূপ যা-ই হোক না কেন।

শেকসপীয়ার নানা স্থান থেকে উপাদান সংগ্রহ করে যে সব নাটকের রূপ দিয়েছেন, তা কিন্তু ইংলিশ রূপই পেয়েছে। আবার শেকসপীয়ারের নাটকের রূপই ইংলিশ নাটকের একমাত্র রূপ নয়, এমন কি এলিজাবেথীয় যুগের সকল নাট্যকারের নাটকেরও এক রূপ নয়, এক গঠনও নয়, এক সম্পদেরও অধিকারী নয়। কিন্তু শেকসপীয়ারকে যাঁরা শ্রদ্ধা করেছেন, তাঁরা বেন জনসন, বিউমণ্ট, ফ্লেচার, ওয়েবস্টার, মাঁসিঞ্জারের প্রভৃতিকে অশ্রদ্ধা করেন নি; ত্রুটি দেখিয়েছেন কিন্তু দানও স্বীকার করেছেন। নাটক যেমন লেখা হয়েছে জাতির আবেগ-আকাঙ্ক্ষা আদর্শ থেকে প্রেরণা নিয়ে, তেমন তার বিচারও করা হয়েছে ওই সবেরই পরিপ্রেক্ষিতে। ফর্মের দিক দিয়ে, শিল্প-শৈলীর দিক দিয়ে যে করা হয়নি, তা কিন্তু বলছি না। তাও করা হয়েছে।

তাই করতে করতে যখনই নাটক ফরমালিজম-এর কাঠামোয় আবদ্ধ হয়েছে, আবেগহারা হয়ে পড়েছে তখনই ফর্ম না মানবার তাড়া দেখা দিয়েছে; এমন কি ফ্রেম ভাঙবারও এমন তাগিদ দেখা দিয়েছে, যাতে করে দর্শকদের সান্নিধ্য ও সাযুজ্য বেশি করে পাওয়া যায়। ও-সব যে সব সময় পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলেই এসেছে তা নয়, সমসাময়িক প্রয়াস হিসেবেও এসেছে। রাইনহার্ট সেটিংসকে যেমন বাস্তব করবার চূড়ান্ত প্রয়াস করেছেন, তেমন সেটিংসকে একেবারে বর্জন করবার কথাও ভেবেছেন। স্টানিস্লাভস্কি যেমন ঐতিহাসিকতা বজায় রেখে চলতে চেয়েছেন, তেমন প্রয়োজনবোধে ভাবাশ্রয়ীও হয়েছেন, গর্ডনক্রেগকেও অনুশীলন করবার অধিকার দিয়েছেন। ওঁদের তাগিদে ওঁরা নাটককে অনেক বদল করে নিয়েছেন, নতুন রূপারোপও করেছেন। রাইনহার্ড দর্শকদের সাযুজ্য সম্বন্ধে এমন সব পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, যা আমাদের যাত্রায় দেখা যায়। পিকিং অপেরাতেও এমন অনেক পদ্ধতি দেখে এসেছি, রুমানিয়ান নৃত্যনাট্যেও দেখেছি, চীনা অপেরাতেও দেখেছি। একজন ফরাসী প্রযোজক জন-নাট্য সম্বন্ধে আলোচনার জন্য আহূত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আমাদেরকে শুনিয়েই বলেছেন— তোমরা জেনেছ জন-নাট্য কি, আমরা জানিনি। সব-কিছু বিবেচনা করে দেখা যায় যে, সর্ব যুগেই নাটক সবচেয়ে বেশি করে যা চেয়েছে, তা হচ্ছে জন-সংযোগ। আর তার সহায়ক যে ফর্ম যে শিল্প-শৈলী গ্রহণ ও বর্জন করেছে তা ওই গণ-সংযোগের দিকে দৃষ্টি রেখেই করেছে। কিন্তু দেখা গেছে, জাতির সাময়িক আবেগ, জাতির সংস্কৃতির এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে যে-নাটক যত বেশি যোগ রক্ষা করেছে, সে-নাটক তত বেশি জনপ্রিয় হয়েছে।

কিন্তু জনপ্রিয় করাই যদি নাটকের একমাত্র লক্ষ্য করা হয়, তাহলে নাটকের অবনতির পথ প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। কেন না, সকল সময়ে সমাজের সকল লোকের রুচি এক রকম থাকে না। শুধু একটা টেনসনের মুখে জাতির সর্বস্তরের আবেগ এক খাতে প্রবাহিত হবার একটা পথ খোঁজে। তখন জাতি নাটকের কাছে যা দাবী করে, অপেক্ষাকৃত স্বস্তির সময় তা করে না। তখন শ্রেণীগত বা ব্যক্তিগত রুচির দাবী দেখা দেয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে জাতির আবেগ এক ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। তার উৎসমুখ খুঁজে পেয়েছিল উনবিংশ শতকের রেনেসাঁর সময়। সেই সময় থেকে স্বাধীনতা লাভের সময় পর্যন্ত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের দাবী ছিল নতুন শক্তি অর্জন এবং সেই শক্তির সহায়তায় যা অকল্যাণকর তাই ভাঙা, যা কল্যাণকর তাই গড়া, এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করা। ওই সময়ে যা সার্থক সৃষ্টি হয়েছে, তা জাতিকে এগিয়ে নিয়েছে; যা সার্থক হয়নি তা পিছনে পড়ে রয়েছে, জাতিকে পিছিয়ে দেয় নি। কিন্তু ওই সময়ে জাতির সাহিত্যে, নাটকে যা প্রতিফলিত হয়েছে, তাতে প্রায়শঃই জাতির ভগ্নাংশ, অর্থাৎ শিক্ষিতাংশই প্রতিফলিত হয়েছে।

দীনবন্ধু 'নীলদর্পণ' নাটকে নীলচাষীদের অভাবের কথা, বেদনার কথা, লাঞ্ছনার কথা তুলে ধরলেন, কিন্তু নাটক শেষ করলেন একটি শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের এমন ট্রাজেডি দিয়ে, যাতে করে ওই চাষীদের দাবী ফিকে হয়ে গেল। আর না করেই বা করবেন কি? বই চাষীরা পড়তেও পারবে না, অভিনয় দেখবার সুযোগও পাবে না। যারা পড়বে, যারা দেখবে, যারা তারিফ করবে অথবা অনুপ্রাণিত হবে, তারা শিক্ষিত। নাটকের বিচারে সুরের সঙ্গে শেষের যে সঙ্গতি থাকা আবশ্যক ছিল, নীলদর্পণে তার অভাবজনিত ত্রুটি রয়ে গেল। কিন্তু তবুও সুফল যা দিয়ে গেল, তা ওই সংগঠনের ত্রুটি শুধরে দিল; জাতীয় নাট্য সৃষ্টিতে অমর হয়ে রইল। মাইকেল 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-তে কিন্তু সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সঙ্গতি রেখে সমাজের নীচের মহলের মর্যাদার ও শক্তির প্রতি সুবিচার করলেন। নাটকের গঠনের দিক দিয়ে নীলদর্পণের চেয়ে সুগঠিত হলেও নীলদর্পণ যে-কাজ করল, 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' তা করতে পারল না। না পারবার কারণ যদি ধরা যায়, নীলদর্পণে যে উত্তেজনা আছে, বুড়ো শালিকে তা নেই, তাহলে তা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। নাটকের কাছে উত্তেজনার দাবী কিছু থাকেই। কিন্তু ওটাকে একমাত্র কারণ বলা যায় না যখন দেখা যায় যে, যারা ওই নাটকখানি এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' অভিনয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, তাঁরাই অভিনয় বন্ধ করে দিয়েছিলেন; ইংরেজ সরকার নয়। বন্ধ করে দিয়েছিলেন ভণ্ড সমাজপতির যবনী-সংস্রবের বাসনারও পরিচয় ছিল বলে। ওই চাষী পরিবারটি যদি হিন্দু হোতো, তাহলে বন্ধ করে দেওয়া হোত কিনা কে জানে? হয়ত হোত না। সব চেয়ে বিদ্রোহী ইয়ং বেঙ্গল বিদ্রোহকাল উত্তীর্ণ হয়ে লিখলেন—'একেই কি বলে সভ্যতা?' আর তাও কিনা বন্ধ করে দেওয়া হলো মাইকেলের তুলনায় নগণ্য ইয়ং বেঙ্গলের চাপে!

আমরা ১৮৭৬ সালের ড্রামাটিক পারফর্মেন্সেস য়্যাক্ট জারী করবার জন্য তখনকার ইংরেজ সরকারকে যখন দায়ী করি, তখন মনে রাখি না যে, মাইকেলের ওই দুখানা নাটক তার আগে দেশের লোকেরাই বন্ধ করে দিয়েছিল। গজদানন্দ বন্ধ করবার দায় ইংরেজের বেশি ছিল না, সুরেন্দ্র-সরোজিনী বন্ধ করবার দায় যদিওবা থাকতে পারে। আজ যখন দেখি এত আলোচনা-আন্দোলন করেও, এই স্বাধীন ভারতেও, ওই আইন রদ করানো গেল না, তখন ভাবতে পারি, সব দেশেই রক্ষণশীলরা এবং ক্ষমতার অধিকারীরা ওই রকম আইন চালু রাখেন নিজেদের স্বার্থের এবং প্রতিষ্ঠার কথা ভেবে। ওই আইন চালু থাকবার ফলে অপর অনেক ক্ষতির মাঝে নাটকের সংগঠনেরও ক্ষতি হয়েছে। আইন আবেগকে রোধ করতে পারে না। কাজেই নাটককার আইনকে ফাঁকি দিয়ে আবেগকে নানা ছলে নাটকে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করেন, তার জন্য নাটক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(S)

আজ যদি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের আইন তুলেও দেওয়া যায়, তাহলেও বিশেষ কোন সুফল হবে না। কেননা আজও অতীতের মতো সরকার ছাড়াও দেশের লোকের দলগত সেন্সারশিপ রয়েছে। স্বাধীনতার পর আমি একখানা নাটক লিখি, যাতে করে উদ্বাস্তুদের জন্য দেশের কি কি সমস্যা দেখা দেবে, তারই একটা ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করেছিলাম এবং বলেছিলাম স্বাধীন রাষ্ট্রকেই ওর সমাধান করতে হবে। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে নাটকখানি অভিনীত হয়। নাটকখানা ভালো কি মন্দ হয়েছিল, তা আলোচনার কথা নয়। আলোচনার কথা এই যে, পরস্পর-বিরোধী রাজনৈতিক দলেরা, মায় হিন্দু মহাসভা ওর অভিনয় বন্ধ করবার জন্য প্রচারণা করতে লাগলেন এবং অভিনেতৃদেরকে কোন একটি দল ভয়ও দেখালেন যে, স্টেজের ওপর অভিনয়কালেই বোমা ফেলা হবে। মালিক একদিন নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দিলেন। ওতে স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিয়েছিলাম, কংগ্রেসের নীতির কিছু সমালোচনা করেছিলাম এবং একটি হিন্দু মেয়ের সঙ্গে একটি মুসলমান ছেলের প্রণয় এবং প্রণয়-ভঙ্গ দেখিয়েছিলাম। ওই আমার মঞ্চে অভিনীত কিন্তু শেষ নাটক।

সে যাই হোক, ওই সমস্যা নিয়ে নতুন লেখকরা প্রচুর নাটক লেখেন। দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন সর্বাগ্রে, ঋত্বিক ঘটক লেখেন, সলিল সেন লেখেন, তুলসী লাহিড়ী লেখেন, আমি যত ঝামেলা সৃষ্টি করেছিলাম, তা না করে। সেগুলি অভিনীত হয়, অভিনয়োপযোগী ভালো নাটক বলে খ্যাতিও পায়। কিন্তু হলে হবে কি? সাধারণ রঙ্গালয়গুলি ও-নাটক অভিনয় করতে চাইলেন না, যে-সব শিল্পী ওতে অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করলেন, তাঁদেরকে নিয়ে এলেন। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের আবির্ভাব এমনই একটি দলের ভিতর দিয়ে হয়, গণনাট্যের ভিতর দিয়ে হয় অনেকের। কিন্তু যতদিন তাঁরা দল থেকে বার না হয়ে এসেছেন, ততদিন তাঁরা সন্দেহজনক পাত্র-পাত্রী ছিলেন।

তাঁরা যদিবা দলত্যাগ করে জাতে উঠলেন, নাট্যকাররা সন্দেহভাজন হয়েই রইলেন। এক পক্ষের সন্দেহভাজন হলেন তাঁরা, আর অপর পক্ষের হলেন তাঁরা অনুশাসনের পাত্র, অর্থাৎ কতটা তিক্ততার অভাব রয়েছে, শ্রেণী-সংঘর্ষের সম্ভাবনা কতটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তারও পরিমাপ চললো। কিন্তু তবুও জাতির অত বড় একটা সংকটে বাংলার তরুণ নাট্যকাররা সাড়া না দিয়ে পারেন নি। যাঁরা কোন নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন, এমন লেখকদের মাঝেও কেউ কেউ ও-বিষয় নিয়ে নাটক লিখেছেন। এমন কি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বর্তমান সর্বাধ্যক্ষ ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ও ওই বিষয় নিয়ে একখানি ভালো নাটক লিখেছেন। এমন আরো কেউ কেউ হয়তো লিখেছেন, যা আমার জানা নেই। কিন্তু লিখলে হবে কি? অভিনয় কোথায় হবে? সব লেখকেরই ত একটি করে নাট্যগোষ্ঠী গড়ে নেবার সুযোগ ঘটে না।

আসল কথা, এই উদ্বাস্তুদের নিয়ে তেমন একটা আবেগের সৃষ্টি হোল না বলেই এই নাটকগুলি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আসবার সুযোগ পেল না। যদি সে রকম আবেগ সৃষ্টি হোতো, তাহলে মঞ্চ-মালিকরা যেচে এই সব নাটক সংগ্রহ করতেন—যেমন করতেন স্বদেশী-স্বাধীনতার যুগে, এখনও যেমন করেন নাটকে ফিল্ম-এর গন্ধ পেলে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা, উদ্বাস্তু আগন্তুকরা বাঙালীর বুকের দরদ পেল না। সে দুর্ভাগ্য কেবল উদ্বাস্তুদেরই নয়, সমগ্র বাঙালী জাতির। কী বৃহৎ একটা শক্তির অপচয় হয়ে গেল এবং উদ্বাস্তুরা দগ্ধ হতে হতে কত কালি বাংলার সমাজ-অঙ্গে মাখিয়ে রেখে গেল তার বোধোদয় আজও হোল না, কিন্তু একদিন হবে। সেদিন

(শেষাংশ ২৫৪ পৃষ্ঠায়)

বাংলা দেশে একবার ঝড় আসে, সে-রকম দুরন্ত দীর্ঘ ঝড় বাংলার লিখিত ইতিহাসে আর কখন আসেনি।

ঝড়ের দুরন্ত দাপটে এক পলিমাটি উল্টে উড়ে গেল।

সে-ঝড় আসে ইংরেজের সংগে। সাত-সমুদ্দুর পেরিয়ে সে-ঝড়ে উড়ে এলো রেল ইঞ্জিন, টেলিগ্রাফের তার, মিল্, বেন্থাম্......

আর এলো স্কচ হুইস্কী আর ইংরেজী সাহিত্য।

লাগাম-ছেঁড়া পাগলা ঘোড়ার মত সে-ঝড় কেশর ফুলিয়ে টগ্‌বগিয়ে মাঝরাস্তা দিয়ে ছুটলো।

তার প্রচণ্ড গতিবেগে ছিল উন্মাদনার নেশা।

সেই নেশা পেয়ে বসলো এক তরুণ বাঙালীকে। লাফিয়ে উঠে দুমুঠো দিয়ে তার ঘাড়ের কেশর চেপে ধরলো। পাগলা ঝড়ে সওয়ার হলো ক্ষেপা বাঙালীর ছেলে।

ঝড়ে আর ঝড়ের সওয়ারীতে চলে সংগ্রাম।

[২]

ছিট্‌কে পড়ে যায় সওয়ারী। ঝড় এগিয়ে চলে।

একশো বছর ধরে সমানে সে বয়ে চলে।

যে-কেউ তাকে সওয়ার করতে চেয়েছে, তাকেই সে আছড়ে ফেলে দিয়েছে।

কিন্তু প্রত্যেক দুরন্ত সওয়ারী নিজের অকাল-মৃত্যু দিয়ে হরণ করেছে ঝড়ের শক্তিকে।

শেষ সওয়ারীকে আছড়ে ফেলার সংগে সংগে সে-ঝড়ও আজ নিস্তেজ হয়ে মিলিয়ে গেল।

আজকের বাংলায় আর সে-ঝড়ের চিহ্ন নেই।

[৩]

সে-ঝড়ের প্রথম সওয়ারী যিনি ছিলেন, তাঁর নাম মাইকেল।

সে-ঝড়ের শেষ সওয়ারী যিনি, তাঁর নাম শিশিরকুমার।

এই দুটি নামের বেড়ার মধ্যে আছে এক প্রচণ্ড ঝড়ের সম্পূর্ণ ইতিহাস। মাইকেলে যার আরম্ভ, শিশিরকুমারে তার নিঃশেষ সমাপ্তি।

তাই মাইকেলকে শিশিরকুমার পরমাত্মীয়ের মতন ভালবাসতেন। একান্ত আপনার জন বলে চিনতেন।

জীবনের শেষ সৃজন-প্রয়াসে তাই মাইকেলকে বাংলা রংগমঞ্চে জীবন্ত করে গেলেন। এটা তাঁর জীবনের অধিনায়ক ঝড়ের দেবতাকে তাঁর শেষ প্রণাম।

একই মৃত্যু-তারিখ দুজনের একাত্মতাকে সম্পূর্ণ করে দিলো।

[৪]

মাইকেলের আবির্ভাবে যে-যুগের বৃত্ত গোল হয়ে ওঠে, শিশিরকুমারের তিরোধানে সে-বৃত্ত সম্পূর্ণ গোলাকার হয়ে গেল। একটা শতাব্দী সম্পূর্ণ হলো।

বাংলার সব চেয়ে বিচিত্র শতাব্দীর শেষ প্রতিনিধি হলেন শিশিরকুমার।

বাংলার রংগমঞ্চের নব-স্রষ্টা তিনি কিন্তু তাঁর জীবন বিগত শতাব্দীর। সে-শতাব্দী যেখানে থেমেছে, তাঁর মনও সেখানে থেমেছে। বিগত শতাব্দীর শেষ সীমারেখায় দাঁড়িয়ে, দেখেছি তাঁর প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্ব। তাঁর শেষ জীবন এই নিঃসংগ অন্তর্দ্বন্দ্বের এপিক ট্রাজেডী, এস্‌কাইলাসের মতন নাট্যকারের বিষয়বস্তু।

[৫]

শিশিরকুমার যখন শেষরক্ষা প্রযোজনা করেন, তখন তাঁর মনে একটা তীব্র বাসনা জেগে ওঠে, দর্শক আর রংগমঞ্চের মধ্যে যে-ব্যবধান, অভিনয়ের অগ্রগতির সংগে সংগে সেই ব্যবধানকে মুছে ফেলবেন......

অভিনয়ের মধ্যে এমন একটা জীবন্ত মুহূর্ত সৃষ্টি করবেন, যখন প্রেক্ষাগৃহ আর রংগমঞ্চ এক হয়ে যাবে, দর্শকরা হয়ে উঠবেন অভিনয়ের মানসিক অংশীদার, অভিনেতা আর দর্শকে থাকবে না কোন ব্যবধান।

বহু বার তিনি চেষ্টা করেছিলেন দর্শক আর অভিনেতাদের ব্যবধান দূর করে একটা দিব্য মুহূর্ত সৃষ্টি করতে। কিন্তু তাঁর সে-চেষ্টা সফল হয়নি।

জীবনেও চেয়েছিলেন অনুরূপ একটা বেদনা-দায়ক ব্যবধানকে দূর করতে। সমাজ আর অভিনেতার জীবনের মাঝখানের ব্যবধান।

বিলেতে যে-যুগে পেশাদার রংগমঞ্চের জন্ম হয়, সেদিন ইংলণ্ডের সমাজ-নেতারা থিয়েটারকে শহর থেকে সরিয়ে শহরের বাইরে জায়গা করে দিয়েছিলেন। আমাদের দেশে পেশাদার থিয়েটার বাহ্যত শহরের ভেতর জায়গা পেলেও, দেশের লোকের মনে পেশাদার নট-নটীর জায়গা সমাজের বাইরেই নির্দিষ্ট ছিল। অসামাজিকতার অভিশাপ নিয়ে আমাদের নট-নটীদের মঞ্চ-জীবনের সূচনা হয়। ইংরেজী সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক তাঁর জীবনে চেয়েছিলেন, সমাজ ও রংগমঞ্চের এই মানসিক ব্যবধান দূর করতে।

তার জন্যে একান্ত নিষ্ঠা নিয়ে, কঠোর সংকল্প করে এই মাঝখানের গর্ত ভরাট করবার কাজে ব্রতী হন। এই গর্ত ভরাট করে মাঝখানের ব্যবধান দূর করবার জন্যে যা যা উপকরণের দরকার, সবই তাঁর ছিল।

অর্ধেক গর্ত যখন ভরাট হয়ে এসেছে, তখন তাঁর ক্লান্ত-কম্পিত কর থেকে হাতিয়ার পড়ে গেল। তিনি থেমে গেলেন।

কিন্তু যে-কাজ আরম্ভ করেছিলেন, তার গতিবেগ তাঁকে ছাড়িয়ে এগিয়ে চললো। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত পরবর্তীর দল তাঁর অসমাপ্ত দায়িত্বকেই আজ সম্পূর্ণ করতে চলেছে। কালশক্তি আজ পরবর্তীদের সহায়।

[৬]

যে-পাখী সারাদিন আকাশে বিহার করে, সন্ধ্যায় আকাশ থেকে ডানা গুটিয়ে ফেরবার জন্যে তার নীড়ের একান্ত প্রয়োজন।

আকাশ বিরাট কিন্তু তাতে, নীড় রচনার মত এতটুকু জায়গা নেই।

বহু লোকের মাঝখানে শিশিরকুমার ছিলেন নিঃসংগ। বিষ-মুখ কণ্টকের মতন এই নিঃসংগতা তাঁর হৃৎপিণ্ডে বিঁধে ছিল। পৌরুষের অভিমানে এই ব্যথাকে তিনি সাত-পুরু চামড়ার তলায় লুকিয়ে রাখতেন। মাতাল যেমন মদের পাত্রকে খোঁজে, তেমনি তিনি খুঁজতেন বন্ধুজনের সংগ। খোঁজবার প্রয়োজন হতো না, তাঁর সংগ-সুখের জন্যে বন্ধুরাই ছুটে আসতেন। সব সময়ই তিনি চাইতেন বন্ধু পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতে। অন্তরের সংগোপন নিঃসংগতার আতংকে বহুজন সংগ কামনা করতেন। বহু লোকও তাঁর বন্ধুতায় গর্ব-বোধ করতেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই তাঁর বাইরের বৈঠকখানার লোক, তাঁর মনের অন্তঃপুরে, তিনি জানতেন, তিনি নিঃসংগ।

সন্ধ্যা হলো, আলো জ্বললো, যবনিকার ওধারে যেমন লোকের ভিড়, যবনিকার এধারেও তেমনি লোকের ভিড়...আলাপ, আলোচনা, হাসি, ঠাট্টা...রংগমঞ্চে কান্না-হাসির ঢেউ...সহস্র লোকের আনন্দিত করতালি...তারপর অভিনয়ের শেষে যে-যার ঘরে ফিরে গেল... একে একে বিরাট প্রেক্ষাগৃহের, রংগমঞ্চের সব আলো নিভে গেল... মাঝরাতের নিঃশব্দ নিশুতি অন্ধকার...সেইখানেই তাঁর ঘর......

অনেক দিন দেখেছি, সেই অন্ধকারে শূন্য রংগমঞ্চে এসে শিশিরকুমার নির্বাপিত আলো

(শেষাংশ ২৫২ পৃষ্ঠায়)

শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র পরিচালিত চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার আগামী 'শুভ বিবাহ' চিত্রে কমলা মুখোপাধ্যায় ও বহুরূপী-খ্যাত অমর গংগোপাধ্যায়।

ছবির জগতের সঙ্গে অনেকদিনের যোগ বলে ওই বিষয়ে কোন কথা কানে এলেই সাগ্রহে শোনা আমার স্বভাবে দাঁড়িয়েছে। সেদিন তাই একটি অপরিচিত পরিবেশে দুই বন্ধুর আলোচনায় হঠাৎ আকৃষ্ট হয়ে পড়লুম। আলোচনা হচ্ছিল আধুনিক হিন্দী-বাংলা-ইংরেজী ফিল্ম নিয়ে। দুই বন্ধুই গুটি-কয়েক ছবি সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করলেন, তারপর একবাক্যে মন্তব্য করলেন: ইংরেজী ছবি তবু দেখা যায়, কিন্তু দিশী ছবি-গুলো একদম বাজে, বৈচিত্র্যহীন এবং ভদ্রজনের দেখার অনুপযুক্ত। আলোচনায় একটি জিনিস লক্ষ্য করলুম, বৈচিত্র্যহীন কথাটার ওপরই ও'রা বার বার জোর দিচ্ছিলেন।

ফিল্ম জগতেও চলতি ছবি সম্পর্কে প্রায়ই ওই মন্তব্যটি শুনতে পাই। কী বৈচিত্র্যহীন আর কী নয়, এ-নিয়ে চিত্রনির্মাতা-দেরও ভাবনার অন্ত নেই। আমি নিজেও ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি। কিন্তু বৈচিত্র্য নামক ওই সুবর্ণ লোভনীয় চীজটি যে কী তা এখনও বুঝে উঠতে পারিনি।

কিন্তু ওই বৈচিত্র্যের খোরাক যোগাতে গিয়ে অর্থাৎ ছবিকে পপুলার করতে গিয়ে এখনকার ছবির রূপ যে কী দাঁড়িয়েছে তা তো প্রায় প্রতিদিন প্রতিটি ছবির অঙ্গেই দেখতে পাচ্ছি। সত্যি কথা বলতে কী, এই বিচিত্র-আলেয়ার পেছনে ছুটতে গিয়ে আজকের অনেক ছবিই যেন রুচিবিকৃতির একটা চূড়ান্ত নিদর্শনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। বৈচিত্র্যের নামে পাবলিকের খেয়াল মেটাতে প্রডিউসারেরা অসামাজিক প্রেম, জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন উদ্ভট কাহিনী, মার্কিন মুল্লুকের অপরাধ-প্রবণতা, স্থূল রঙ্গকৌতুক ইত্যাদি সহযোগে ফিল্মকে এক উত্তেজক পানীয় করে তোলার তরল আনন্দে যেন মেতে উঠেছেন।

দুনিয়াশুদ্ধ এই ব্যাপার চলছে। শুধু ভারতবর্ষ কেন, আধুনিক ফিল্মের জন্মভূমি আমেরিকা থেকে সুরু করে জাপান ইতালী ফ্রান্স জার্মানী সর্বত্রই যুগের চাহিদা যোগান দিতে গিয়ে ফিল্মের রূপ ও গঠন এইভাবে নানা রকমের ভোজবাজী দেখানোর চেষ্টা করছে। এ-ছাড়া নাকি গত্যন্তর নেই। কারণ ছবি ব্যবসায়ীর পণ্য; এবং যেহেতু এটি একটি পণ্য এবং অর্থোপার্জনই এর লক্ষ্য সে-হেতু যুগের চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করা ছাড়া নাকি উপায় নেই।

অনেকে অবশ্য বলেন, বর্তমান যুগে ছবির যে এই বিকৃত, অশোভন ও অস্বাস্থ্যকর চেহারা তার জন্য দর্শকের ওপর দোষ দিয়ে লাভ নেই। দর্শকের দাবী একটা ভাল ছবি দেখতে পাওয়া ছাড়া এতটুকু বেশী কিছু নয়। আসলে ওটা চিত্রনির্মাতাদেরই খেয়াল-খুসীর ব্যাপার নতুবা স্রেফ অর্থোপার্জনের ফন্দী।

সত্য-মিথ্যা যাই হোক, আধুনিক পাঁচ-মিশালী ছবিগুলো যে দর্শককে কিছুটা মোহগ্রস্ত করেছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

একদিন এক বিশিষ্ট চিত্রপ্রযোজকের কাছে কথাটা তুললুম। অভিযোগ শুনে তিনি প্রতি-বাদ করে বল্লেন, সরাসরি প্রডিউসারের ঘাড়েও দোষ চাপিয়ে লাভ নেই। তারপর তিনি অনুযোগের সুরে বল্লেন, অনেক প্রডিউসার তথা-কথিত জনপ্রিয় ছবি অর্থের লোভে করেছে বটে, তবে কেউ কেউ আবার 'পরশপাথর', 'অযান্ত্রিক' এবং হালে 'কিছুক্ষণ'এর মতও ছবি করেছে; কিন্তু পয়সা পেয়েছে কি?—পায়নি। কাগজে কাগজে খুব প্রশংসা হয়েছে, সম্মানও পেয়েছে সত্যি; কিন্তু সম্মান-প্রশংসায় পেট ভরে না। তারপর তিনি তাঁর কথার রেশ টেনে গম্ভীর হয়ে এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন, পঞ্চজনের পাতে দেওয়ার মত উপভোগ্য ছবি, সুক্ষ্মরসের ছবি অর্থাৎ ভাল ছবি যাকে বলা হয় তা সব দেশেই কিছু কিছু হয়েছে এবং হচ্ছেও। তবে ওই অবধি—নাম আর প্রেস্‌টিজ পর্যন্তই, তার বেশী কিছু নয়। তাই ছবি যিনি ব্যবসা হিসেবে করবেন, ও-পথ তাঁর পথ নয়। তা ছাড়া পথটি হয়ত নিরাপদও নয়,—এই বলে বিজ্ঞ-ভাবে তিনি দম ছাড়লেন।

এতক্ষণে কথা বলার একটু সুযোগ পেয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কেন, নিরাপদ নয় কেন?

(শেষাংশ ২৫৬ পৃষ্ঠায়)

সরকার প্রোডাকসন্স প্রাঃ লিমিটেড ও নিউ থিয়েটার্স (একজিবিটার্স) প্রাঃ লিমিটেড নিবেদিত 'নতুন ফসল' চিত্রের নায়িকা সুপ্রিয়া চৌধুরী।

যবনিকার অন্তরালে

(২৪৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

জনশূন্য প্রেক্ষাগৃহের দিকে চেয়ে নিঃস্তব্ধ দাঁড়িয়ে...বড় বিচিত্র লাগে অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহের সেই নিঃশব্দ অকস্মাৎ নির্জনতা...তাঁর নিজের ভেতর জীবনের মতন শূন্য, নিস্তব্ধ, অন্ধকার...

আকাশ আছে, ফেরবার নীড় নেই!

জীবনের সূচনার মুখে একদা এক অকস্মাৎ দুর্যোগে সে-নীড় পুড়ে যায়।

এইখানেই ছিল তাঁর জীবনের ট্রাজেডীর মর্মমূল।

ষোড়শীর জীবানন্দের অভিনয়ে তাঁর সমস্ত গতি, এমন কি তাঁর ক্লান্ত পদচারণার মধ্যে যে সহজ চেষ্টাহীন নিঃসঙ্গতার ব্যথা ফুটে উঠতো, সে-নিঃসঙ্গতা যতখানি জীবানন্দের, ঠিক ততখানি শিশিরকুমারের। পৌরাণিক রাম চরিত্রের অভিনয়ে যে মানবীয় বেদনার আর্তনাদ জেগে উঠতো, তার মধ্যে মিশে থাকতো অভিনেতার নিজের জীবনের আর্তনাদ। যোগেশচন্দ্র শিশিরকুমারের অন্তরের খবর জানতেন, তাই জেনেশুনেই তিনি লিখেছিলেন, সহস্র বান্ধব মাঝে রহিবে একাকী।

এই নিঃসঙ্গতার অভিশাপকে তিনি প্রচণ্ড উপেক্ষায় অস্বীকার করতে চাইতেন। কিন্তু যাকে বাইরে অস্বীকার করেছেন, সে তাঁর চেতনার গভীরে গিয়ে তাঁর অলক্ষ্যে তাঁর জীবনকে প্রচণ্ডভাবে দোলা দেয়। বেদনাকে সৃজনে রূপান্তরিত করতে হলে মনের যে বিশেষ প্রস্তুতির প্রয়োজন, সে-প্রস্তুতি তাঁর ছিল না। অশ্রু-জলের তর্পণে বেদনাকে কণ্টকহীন করতে হলে যে অশ্রুর প্রয়োজন, তাঁর চোখে সে-অশ্রু ছিল না। তাঁর অভিনয়ের যে-সব মুহূর্তে দর্শকেরা কেঁদে ভাসিয়েছেন, সে-সব মুহূর্তেও তাঁর চোখে অশ্রু-বাষ্প আসতো না।

সৃজনে যে বেদনা রূপান্তরিত হলো না, অশ্রুজলে যা নিঃশেষিত হলো না, তাঁর জীবনের গভীর অন্তরালে থেকে সে-বেদনা লুকনো কাঠের ভেতর আগুনের কণার মত নিঃশব্দে তাঁকে দহন করেছে, এনে দিয়েছে বিচিত্র সব অসংগতি... অপচয়ের ভেতর দিয়ে অপহরণ করে নিয়েছে তাঁর প্রাণশক্তি, যে-প্রাণশক্তির সাহায্যে তিনি অনায়াসে পারতেন তাঁর জীবনের স্বপ্নকে সত্য করে তুলতে, রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়াই পারতেন গড়ে তুলতে ভারতের জাতীয় রংগমঞ্চকে, তাঁর প্রতিভা দিয়ে পারতেন সমগ্র জাতির নাট্য-প্রতিভাকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে। গ্যেটের ফাউস্টের মত জীবনের এক আত্মবিস্মৃত লগ্নে তিনি মেফিস্টোফিলিসের সঙ্গে বন্ধুত্বের চুক্তি করেন...ফাউস্টের মতন জীবনের উল্‌পারগাস্‌ রাত্রির বিভীষিকা থেকে উদ্ধার করবার জন্যে তাঁরও দরকার ছিল মার্গারেটের মতন নারীর সংকট-মোচন ব্রত।

মার্গারেটের স্বপ্ন নিয়ে তাঁর জীবনের তমিস্র লগ্নে এক নারী এসেছিলেনও। কিন্তু ভ্রষ্ট লগ্নের জন্যে ব্যর্থ হয়ে গেল তাঁর আত্মাহুতি।

[৭]

শিশিরকুমারের সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে একটী স্বপ্ন ছিল, সে স্বপ্ন হলো জাতীয় রংগমঞ্চ গড়ে তোলা। তাঁর নিজস্ব একটা স্থায়ী রংগমঞ্চ, যাকে বলতে পারবেন, এ আমার।

শিশিরকুমারের সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে একটী অভিমান ছিল, সে অভিমান হলো—তিন যুগ ধরে তিনি যে আনন্দ পরিবেশন করেছেন, তার বিনিময়ে তাঁর জাতি বা রাষ্ট্র তাঁকে এই রংগমঞ্চ গড়ে দেবে।

গত যুগের বাংলার রংগমঞ্চের উত্থান-পতনের ইতিহাস [illegible] ইতিহাসকারের লেখা হবে, সেদিন দেখা যাবে, এই স্থায়ী রংগমঞ্চের অভাব কি মর্মান্তিকভাবে সে-যুগের সমস্ত নাট্য-প্রচেষ্টার মূলে কুঠারাঘাত করেছে। শিশিরকুমার যে নিজস্ব রংগমঞ্চের স্বপ্ন দেখতেন, সেটা স্বপ্ন দেখতে ভাল লাগে বলে নয়, তার পেছনে ছিল একান্ত রূঢ় মর্মান্তিক বেদনার বাস্তবতা। তাঁর জীবনের ব্যর্থতার মূলে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে, এই নিজস্ব রংগমঞ্চের অভাব। শুধু তাঁর নয়, সে সময়কার বহু নাট্য-প্রচেষ্টার ব্যর্থতার মূলে আছে এই অভাব। যে থিয়েটারে তিনি অভিনয় করছেন, সে থিয়েটার-বাড়ীর মালিক যিনি, তিনি মাসে মাসে ঠিক ভাড়া না পেলে, সে-রংগমঞ্চে তাঁকে তিনি অভিনয় করতে দিতে পারেন না। এবং থিয়েটার-বাড়ীর যে ভাড়া তখন ছিল, তা এত বেশী যে কোন একখানা বই ভাল না চল্লেই থিয়েটার-বাড়ীর ভাড়া আর উঠতো না। সেই-জন্যেই আমরা দেখতে পাই, এক একটী রংগমঞ্চে কিছুদিন এক সম্প্রদায় অভিনয় করছেন, কয়েক মাস। পরেই সেখানে আর এক সম্প্রদায় এসে উপস্থিত। এবং নাট্য-শিল্প এমন একটা জিনিস যার জন্যে একটা রংগমঞ্চ চাই, একটা প্রেক্ষাগৃহ চাই, প্রেক্ষাগৃহে আসন ও আলো চাই। শিশিরকুমার প্রথম ইডেন গার্ডেনে তাঁবু ফেলে পেশাদারী থিয়েটারের সূচনা করেন, তার পর থেকে বেদেদের মতন এক তাঁবু থেকে আর এক তাঁবুতেই তাঁকে ঘুরতে হয়েছে। যে রংগমঞ্চে অভিনেতা অভিনয় করেন, কিছুদিন সেখানে নিয়মিত অভিনয় করার ফলে সেই রংগমঞ্চের সংগে তাঁর মনের একটা সাইকিক্‌ যোগ হয়ে যায়, অকস্মাৎ যদি সেই রংগমঞ্চ ছেড়ে যেতে হয় অভিনেতার মনে প্রিয়-বিচ্ছেদ ব্যথা জাগে। তার ওপর, এক রংগমঞ্চ ছেড়ে অন্য রংগমঞ্চে যাওয়া শুধু স্থানান্তরে যাওয়ার ব্যাপার ছিল না, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তার পেছনে থাকতো, আদালত, নালিস, অপমান। থিয়েটার বাড়ীর মালিক আর সেই থিয়েটারের ভাড়াটে প্রযোজকের সঙ্গে দ্বন্দ্ব লেগেই থাকতো এবং এই দ্বন্দ্বের শেষে ভাড়াটে প্রযোজককেই হারতে হতো। টাকা না পাওয়ার রাগটা বাড়ীওলা নিদারুণ অপমানে মেটাতে চেষ্টা করতেন। কোন সময়ে কিভাবে ভাড়াটে প্রযোজককে তাঁর বাড়ী থেকে হটাতে পারলে এই রাগের জ্বালা মিটবে, তা তাঁরা জেনে-চিন্তে সুকৌশলে নির্ধারণ করতেন। বলা বাহুল্য পুলিশের লোকের সাহায্যেই এই বিতাড়ন-পর্ব পরিচালিত হতো। '—' রংগমঞ্চ থেকে যেদিন শিশিরকুমারকে চলে আসতে হয়, সেদিনকার দৃশ্য চোখের ওপর ভাসছে। ঘুম থেকে উঠে সকালবেলাই দেখলেন, বাড়ীওলার লোক তাঁর জিনিস-পত্র সমস্ত বাইরে রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে। গায়ে জামাটা দিয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে শিশিরকুমার রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। তখন রাস্তা দিয়ে কাতারে কাতারে লোক চলেছে, তাঁর ভক্তের দল, ট্রাম-বাস থেকে তাঁরা উঁকি মেরে দেখেন, পায়ে হেঁটে যাঁরা চলছিলেন তাঁরা কাছে এসে ঘিরে দাঁড়ান। কোন কোন রসিক লোক মন্তব্য করে ওঠেন। বাধ্য হয়ে শিশিরকুমারকে সেখান থেকে সরে যেতে হয়। এ-জাতীয় ঘটনার ব্যথা দেহের ভেতর হাড়ের সঙ্গে লেগে থাকে। শিশিরকুমারের ছিল। তাই স্থায়ী রংগমঞ্চের আশা, তাঁর কাছে শুধু স্বপ্ন ছিল না, সেইটেই ছিল তাঁর অস্তিত্ব। তা থেকে বঞ্চিত হয়ে তাই তাঁর মনে ছিল প্রচণ্ড অভিমান। যে অভিমান শেষের দিকে অচল, অনড়, আত্মঘাতী বেদনা হয়ে দাঁড়ায়।

[৮]

দেশ যখন পরাধীন ছিল তখন সেই পরাধীন দেশের এক নেতা শিশিরকুমারের এই স্থায়ী রংগমঞ্চের স্বপ্নকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি তাঁর আন্তরিক আশ্বাসবাণী দিয়ে সেই স্বপ্নকে সম্ভাব্য আশায় পরিণত করেছিলেন। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে শিশিরকুমার এই স্বপ্নকে আরো বেশী করে আঁকড়ে ধরেন। সেই নেতার নাম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

শত কাজের ভিড়ের মধ্যে দেশবন্ধু আসতেন শিশিরকুমারের অভিনয় দেখবার জন্যে। শিশিরকুমারের অভিনয়ে তিনি শুধু আনন্দই পেতেন না, একটা গর্ব অনুভব করতেন। তাঁর কবিচিত্তে জেগে উঠতো দুর্বার আকাঙ্ক্ষা, রংগমঞ্চের ভেতর দিয়ে জাতির অন্তরকে স্পর্শ করা। এই নিয়ে বহু আলোচনা তিনি শিশিরকুমারের সংগে করতেন এবং এই রকম এক আলোচনার মধ্যে তিনি বলেছিলেন, শিশির, যেমন করে পারি, তোমাকে নিয়ে গড়ে তুলবো জাতীয় রংগমঞ্চ। ফরিদপুরে কনফারেন্সে যাবার কিছুদিন আগেও তিনি একবার শিশিরকুমারের অভিনয় দেখতে এসেছিলেন, সেদিনও তিনি বলে গিয়েছিলেন, শিশির, ফরিদপুর থেকে ফিরে এসে এবার একটা ব্যবস্থা করবোই।

কিন্তু দেশবন্ধু আর ফিরে আসতে পারেন নি। যে আশ্বাস সেই দেশনেতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন, শিশিরকুমারের মনে একটা সংগোপন নিশ্বাস ছিল, দেশ স্বাধীন হলে, তাঁর দেশের নেতারা বা তাঁদের পরিচালিত রাষ্ট্র বাঙালীর দেড়শো বছরের নাট্য-সাধনাকে ব্যক্তিগত চেষ্টার আর্থিক অনিশ্চয়তাকে উদ্ধার করবেন, সোভিয়েট রাশিয়া যেমন করেছে এবং সে প্রচেষ্টার অধিনায়কত্ব স্বভাবতই তিনি পাবেন।

শেষ জীবনের নিঃসঙ্গতা এবং ঘনায়মান আর্থিক দৈন্যের বিভীষিকার মধ্যে তিনি রূঢ়ভাবে অনুভব করেন, তাঁর অন্তরের স্বপ্নকে স্বেচ্ছায় সার্থক করে তোলবার জন্যে কোন দেশবন্ধু নেই। যে অভিনেতা গোষ্ঠীকে তিনি অপরিচয়ের অন্ধকার থেকে টেনে তুলে খ্যাতির আলোয় প্রতিষ্ঠিত করেন, তিনি শুধু তাঁদের আচার্য ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাঁদের বড়দা, তাঁর মানস-সন্তানের মত তাঁদের তিনি আঁকড়ে ধরে থাকতেন, তাঁদের মধ্যে কেউ যদি দলভ্রষ্ট হয়ে চলে যেতো, তাঁর বুকের পাঁজরায় আঘাত লাগতো। এমন একদিন এলো যখন আশ্রয়হীন মঞ্চহীন তাঁকে স্বেচ্ছায় তাঁদের বলতে হয়েছিল, তোমরা যেখানে কাজ পাও, চলে যাও। এবং দলপতির ক্ষতবিক্ষত অভিমানে তাঁকে দেখতে হয়েছে, তাঁরা একে একে নিরুপায় হয়ে তাঁর কাছ থেকে সরে গিয়েছেন, সখীর দলের মহড়ায় দাঁড়াবার যে-সব মেয়ের ক্ষমতা নেই তাদের নায়িকা সাজিয়ে তাঁকে অভিনয় করতে হয়েছে...... নিছক অন্ন-সংস্থানের জন্যে এই অভিনয়-চেষ্টায় তাঁর শিল্পী মন যে-আর্তনাদ করতো, সে-আর্তনাদ বাইরে কেই-বা শুনতে পেতো? ব্যর্থ-স্বপ্ন শিল্পীর সমস্ত অভিমান বাইরে ফুটে উঠতো হঠাৎ রাগে, অকস্মাৎ তিক্ত ভাষণে এবং এমন সব উক্তিতে যা দম্ভ বলে মনে হতে পারতো। শেষকালে এই অভিমান এমন একটা কম্‌প্লেকসে পরিণত হয়েছিল যে, কেউ যদি আন্তরিকভাবে তাঁর জন্যে কিছু করতে চাইতো, তাঁর মনে হতো, তাঁকে যেন করুণা করা হচ্ছে। তাঁর শিল্পী মন তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহী হয়ে উঠতো।

এই রকম এক মুহূর্তেই তিনি রাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রাপ্ত পদ্মভূষণ উপাধি বর্জন করেছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার দশ বছর পরে সরকারী দফতরের এই ক্রম-মাফিক সম্মাননাকে যে-শিল্পীর দম্ভে তিনি কার্পণ্যের মুষ্টি ভিক্ষা বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সেটা রাষ্ট্রের প্রতি অবজ্ঞা নয়, সেটা হলো শিল্পীর নিমজ্জমান আত্মমর্যাদাকে রক্ষা করবার শেষ প্রচেষ্টা। •

জীবনের অন্তিমলগ্নে এই শিল্পীর আত্ম-মর্যাদাবোধকেই সঙ্গে নিয়ে তিনি পৃথিবী ত্যাগ

(শেষাংশ ২৫৬ পৃষ্ঠায়)

যেথায় সবচেয়ে বেশী দরকার

পল্লী বাংলার দুর্দশা বর্ণনার ভাষা নেই। কৃষি জমির যা পরিমাণ, তাতে কোটি কোটি লোকের অন্ন সংস্থান অসম্ভব। আধুনিক শিল্প সংস্থা পশ্চিম বাংলায় যা কিছু আছে তার প্রায় সব ক'টিই কলকাতার আশেপাশে একটা ক্ষ্:দ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ আর পল্লী বাংলার অধিকাংশ লোক বছরের বেশীর ভাগ সময় বেকার থেকে দারিদ্র্য ভোগ করেন। এ দুঃসহ অবস্থার যথাসাধ্য প্রতিকারের জন্যই 'বেঙ্গল টেক্সটাইলের যাবতীয় উদ্যম। বেঙ্গল টেক্সটাইলের আধুনিক কারখানাটি স্থাপিত হয়েছে পল্লী বাংলারই কোলে—মুর্শিদাবাদ জেলার কাশিমবাজারে। ফলে সেখানে আজ বহু লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। এখন আবার মিলটিকে অনেকখানি বাড়িয়ে তোলার কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে—যাতে আরো বেশী সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়।

পল্লী বাংলার একটা অঞ্চল আধুনিক যন্ত্রশিল্পের যাদুস্পর্শে কতটা সজীব হয়ে উঠতে পারে, তার পরিচয় পাওয়া যায় কাশিমবাজারে। কাল যা ছিল বেকারী ও হতাশার রাজত্ব, আজ তাই হয়েছে আশা-উদ্দীপনা আর কম-চাঞ্চল্যের এক অপূর্ব ছবি।

বেঙ্গল টেকস্টাইল মিলস লিঃ

অন্যতম ডি, এন, চৌধুরী শিল্প প্রতিষ্ঠান

হেড অফিস—পি-৪১, বি, কে, পাল এভেন্যু, কলিকাতা—৫।

মিল—কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বাংলা

পুনশ্চ নাটকের পুরোণো কথা

(২৪৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বাংলার নাট্যকারদেরকে অন্তত লজ্জায় মাথা নত করতে হবে না।

যে নবীন নাট্যকারদের নামোল্লেখ করেছি, তাঁরা সমাজের নীচের মহলের লোকদের নিয়ে আরো নাটক লিখেছেন এবং লিখেছেন নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে, কল্পনা থেকে নয়। তার মাঝে দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তরঙ্গ', তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান', 'ছেঁড়া তার', সবচেয়ে বেশি করে 'ছেঁড়া তার' কম খ্যাতি অর্জন করেনি। এই সব নাটকের বিষয়বস্তুর প্রতি এবং চরিত্রের প্রতি জাতির যদি সত্যিকারের সহানুভূতি থাকত, তাহলে ওই ধরণের নাটক অভিনয় করবার জন্য একটি রঙ্গালয় গড়ে তোলা অসম্ভব হোত না। শুধু নাটকের বিক্রয় দিয়ে রঙ্গালয় গড়ে তোলবার নজীর বাংলাদেশে আছে। কিন্তু সে দুকূল ছাপানো আবেগই এলো না। তাই নাটকগুলি যা করতে পারত, তা করতে পারল না।

শ্রমিক নিয়ে বাংলায় কম নাটক লেখা হয়নি। কিন্তু লেখকরা বাংলার সমাজের সঙ্গে যেমন পরিচিত, শ্রমিক সমাজের সঙ্গে তেমন পরিচিত নন। দ্বিতীয়ত বাংলার কল-কারখানায় বাঙালী শ্রমিকরাই কেবল কাজ করে না, হয়ত বেশির ভাগ শ্রমিকই অ-বাঙালী। এদেরকে খুসি করবার জন্য যে নাটক লেখা হয়েছে, তার যতগুলি আমি দেখেছি, তা প্রায় শ্রমিক ইউনিয়নের মিটিংয়ের বৈঠক বলে মনে হয়েছে।

যাদের নিয়ে আলোচনা করছি, তাঁরা শক্তি নিয়েই এসেছেন। তাঁদের নাটকের অভিনয়ও কম হয়নি। কিন্তু তবুও তাঁদের নাটক সে উদ্দীপনা জাগাতে পারল না কেন, যে উদ্দীপনা মঞ্চে সফল একখানি নাটক জাগিয়ে থাকে? ওর দুটি কারণ আছে। একটি কারণ, ওই সব নাটকে যে সমস্যাকে এবং যে সব চরিত্রকে রূপ দেওয়া হয়েছে, জাতি গঠনে তাদের গুরুত্ব ও ভূমিকা আজও জাতির হৃদয়ঙ্গম হয়নি। আর একটি কারণ, প্রায় সবগুলি নাটক নৈতিবাচক হয়েছে। বলা হয়ে থাকে ওটা বাস্তবতার খাতিরে করা হয়েছে এবং রোমান্টিসিজম এড়াবার জন্য করা হয়েছে। কিন্তু নাটক যতই বাস্তব হোক, সে ত নাটক। নাটকের বাস্তবতা আর বাস্তব জীবনের বাস্তবতা এক নয়। নাটকে রোমান্সকেও যে বাস্তব রূপ দেওয়া যায়, বড় বড় নাট্যকাররা তার অনেক দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তাঁরা বলেন, উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়নি বলে তাঁরা দুঃখিত নন।

তাঁরা দুঃখিত নন, কিন্তু আমি দুঃখিত। এই কারণেই দুঃখিত যে, জাতিকে ও-বিষয়ে সচেতন করে তোলা দরকার হয়েছে। আরো কিছুদিন যদি সংশয়ের দোলায় জাতির জনগণকে দুলিয়ে রাখা হয়, তাহলে জাতি নিজেকে গড়ে তোলবার অবসর পাবে না। আমাদের যৌবনে আমরা একটা কথার উপর খুব জোর দিতাম। কথাটা ছিল 'ডিভাইন ডিসকন্টেন্ট'। আমরা ওর অর্থ করে নিয়েছিলাম অসন্তোষের এমনই দিব্য-ক্ষমতা আছে, যা নব-সৃষ্টির প্রেরণা দেয়। আমরা অবশ্য ইংরেজের পরবশতার অবসান কামনা করেই অসন্তোষকে জাগিয়ে তুলতে চাইতাম। কিন্তু তা জাতির চাওয়া থেকে পৃথক ছিল না; ইংরেজ রাগতো, কিন্তু জাতি রাগতো না। আজ জাতির মাঝেই যে রাগারাগি চলছে। আজ দল বড় হতে চাইছে জাতির চাইতে। পরস্পরের উদ্দীপনার পরস্পর জল ঢেলে দিতে চাইছেন, আর সকলেই নিজ-নিজ ঈপ্সিত উদ্দীপনীর অভাব অনুভব করছেন।

(৫)

কিন্তু তবুও নাটকের ক্ষেত্রে একটা প্লাবন এসেছে আকাদেমীগুলি প্রতিষ্ঠিত হবার পর, আকাদেমীর এবং বিভিন্ন দফতরের অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থার পর, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার, আকাদেমী পুরস্কার প্রভৃতি চালু হবার পর, কালচুরাল ডেলিগেশনের যাওয়া-আসার পর। এখন যত নাটক লেখা হচ্ছে, অভিনীত হচ্ছে, তত নাটক আগে কখনো লেখা হয়নি; অভিনীতও হয়নি। শুধু নাটক বেশি সংখ্যায় লিখিত আর অভিনীতই হচ্ছে না, ছাপাও হচ্ছে বেশি, ভালো করে ছাপা হচ্ছে, এবং বিক্রীও হচ্ছে বেশি। প্রতিযোগিতার হিড়িক সারা ভারতময় পড়ে গেছে। নানা রাষ্ট্রে এই প্রতিযোগিতায় বিচারক হয়ে যাবার সুযোগ আমার হয়েছে, নানা ভাষার নাটক আমি দেখেছি। তাতে দুটো জিনিষ লক্ষ্য করেছি—বিদেশী নাটককে তাড়াতাড়ি করে স্বদেশী করবার চেষ্টা, আর ফিল্‌ম-এর সঙ্গে মিলিয়ে অভিনয়।

অভিনয় আর নাটক হালে সারা ভারতে প্রায় ঐক্য এনে ফেলেছে। শুনি ভারতে নাটক নেই, আর দেখি নাটকেও ভারতও নেই। এটাকেও কিন্তু উন্নয়ন বলা হচ্ছে! তার কারণ এ-সব নাটকে কোন আদর্শকে প্রতিষ্ঠা দেবার চেষ্টা হচ্ছে না। আদর্শহীনতাই কাম্য হয়ে উঠেছে। কেন না, কোন্ আদর্শ জাতির সামনে কে তুলে ধরে, তাই নিয়ে সকলেরই শঙ্কা। লেখকরাই যদি আদর্শ স্থাপন করেন তাহলে মন্ত্রীরা আর নায়করা কি করবেন?

বাংলা দেশের একজন আচার্যকে উপদেশ দিতে শুনলাম—শ্লেট মুছে ফেলে নতুন করে শুরু কর। একথা আগেও শুনেছি তরুণদের মুখে। এখন প্রবীণদের মুখ থেকেও শুনছি। কিন্তু আমার সন্দেহ হয়েছে ওটা প্রগতি, না রাজনীতি? আদর্শটা অনেকেরই চক্ষুশূল হয়েছে। শ্লেট মুছে ফেলা খুব সহজ কাজ। কিন্তু মোছা-শ্লেটে নতুন করে আঁক-কষে তাকে জনগ্রাহ্য করা বড় শক্ত কাজ। সোবিয়েৎ শ্লেট মুছেই ফেলেছিল। কিন্তু তাতে বড় সুবিধে করতে না পেরে আজও ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের লেখা আনাকারেনিনা উপন্যাসের নাট্যরূপ অভিনয় করে, পিটার দি গ্রেট অভিনয় করে, চেকভকে পুনরায় স্বীকার করে, পুরোনো অপেরাগুলির নতুন রূপ দেয়। সোবিয়েতের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই স্টানিস্লাভস্কিকে বলা হয়েছিল মস্কো আর্ট থিয়েটারের শ্লেট মুছে ফেলে নাটকের নতুন আঁক কষ। স্বয়ং স্টানিস্লাভস্কি তিন তিনবার চেষ্টা করে ফল মিলিয়ে দিতে পারলেন না। তিনি অক্ষমতা স্বীকার করে অবসর নিলেন। মায়ারহোল্ড বল্লেন তিনি শ্লেট মুছতেও জানেন, নতুন আঁক কষতেও পারেন। কিছুদিন বাদে শ্লেট তাঁর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হোলো, আর তাঁর কোন খোঁজও পাওয়া গেল না! অথচ বিপ্লবের আগে নতুন শ্লেটে নতুন আঁক তিনি কষেছিলেন। মায়ারহোল্ড রইলেন না, কিন্তু স্টানিস্লাভস্কি মরবার পরও অমর হয়ে রইলেন—সোবিয়েত থিয়েটারে, অপেরায়, নাট্য-বিদ্যালয়ে। সোবিয়েৎ আজ বলে ট্রাডিশনকে ছেড় না।

যাঁরা নতুন শ্লেটে আঁক কষবার ভুল উপদেশ দিচ্ছেন, তাঁরা জেনে-বুঝে জাতির ক্ষতি করছেন। যাঁরা ওই উপদেশ শুনে প্রমত্ত হচ্ছেন, তাঁরা স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখেই তা করছেন। অবশ্য শ্লেট প্রায় মুছে দেওয়াই হয়েছে। যে নাট্যশালাগুলি জন্ম পেল বাঙলার নাট্য-ঐতিহ্য গড়ে ওঠবার ফলে তারাই ট্রাডিশনাল নাটকের অভিনয় করে না, সৌখীন দলরাও নয়। কয়েক বছর পরে বাংলা লোক জানবেও না যে, বাংলার একটা বলিষ্ঠ নাট্য ট্রাডিশন ছিল, যা ব্রিটিশ ব্যুরোক্রেশিকে, প্রতিক্রিয়াশীল সমাজকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল; যা অশিক্ষিতদেরকে শিক্ষিতদের পাশে এনে বসিয়েছিল; ভাষাহীন দেশে ভাষার প্লাবন বহিয়েছিল; গানহীন দেশে গান শুনিয়েছিল; নৃত্যহারা জাতিকে নাচের ছন্দ দিয়েছিল; নিরক্ষর নর-নারীর কানে নিয়ে গিয়েছিল উপনিষদের পুরাণের বাণী, ইতিহাসের কাহিনী, সমাজের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা।

অগ্রদূত পরিচালিত 'কুহক'-এর একটি দৃশ্যে গঙ্গাপদ বসু ও উত্তমকুমার

(৬)

রোয়াব তোলা হয়েছে ভারতীয় নাটক গড়ে তোল। সংস্কৃত নাটক ত একটি সম্প্রদায়ের নাটক। বাংলা, গুজরাতী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি নাটক ত প্রাদেশিক নাটক। ওর কোনটাই ত ভারতীয় নয়; ভারতীয় সংস্কৃতিই ত ভারতীয় নয়!
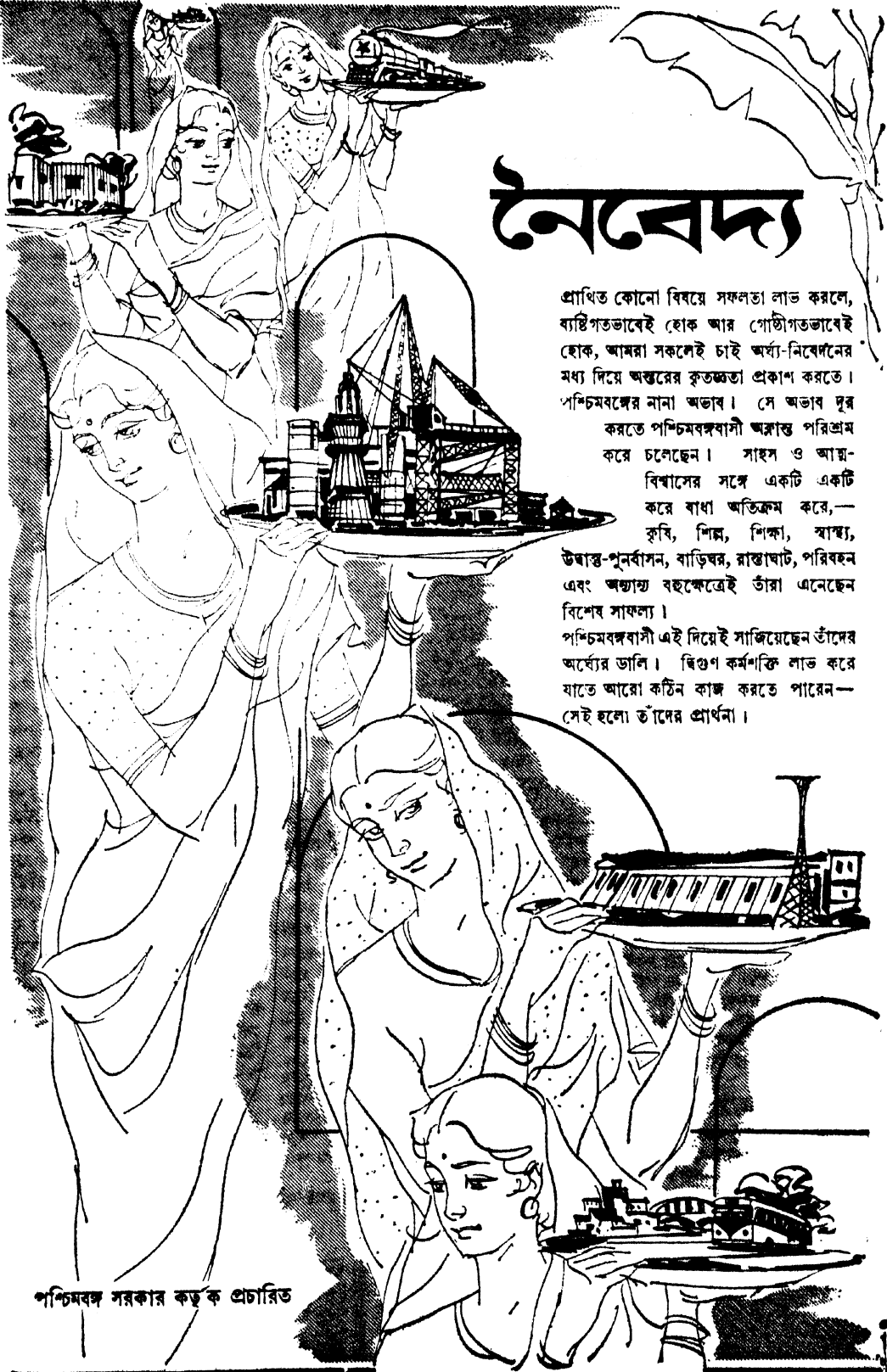
নৈবেদ্য
প্রার্থিত কোনো বিষয়ে সফলতা লাভ করলে, ব্যষ্টিগতভাবেই হোক আর গোষ্ঠীগতভাবেই হোক, আমরা সকলেই চাই অর্ঘ্য-নিবেদনের মধ্য দিয়ে অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে। পশ্চিমবঙ্গের নানা অভাব। সে অভাব দূর করতে পশ্চিমবঙ্গবাসী অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। সাহস ও আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে একটি একটি করে বাধা অতিক্রম করে,—কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন, বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, পরিবহন এবং অন্যান্য বহুক্ষেত্রেই তাঁরা এনেছেন বিশেষ সাফল্য।
পশ্চিমবঙ্গবাসী এই দিয়েই সাজিয়েছেন তাঁদের অর্ঘ্যের ডালি। দ্বিগুণ কর্মশক্তি লাভ করে যাতে আরো কঠিন কাজ করতে পারেন—সেই হলো তাঁদের প্রার্থনা।
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত
WBF-1-59.

আর একটি রোয়াব তোলা হয়েছে নাটকের মাধ্যমে শহরের আর মফঃস্বলের ব্যবধান কেমন করে দূর করা যায়! ভারতবর্ষ যেন কোন কালেই তা করেনি। যে নাটক, যে নাট্য-সংস্কৃতি তা করেছিল, তাকে সাবাড় করে নতুন সেতু রচনার অর্থ কি, দেশের লোক শিগ্‌গীরই তা বুঝতে পারবেন।

অথচ বাংলা দেশে যে নাটকের জোয়ার এসেছে, তা বাংলার ট্রাডিশনকে অবলম্বন করে বাংলা নাটকের নতুন রূপ দিতে পারত। নতুন লেখকদের দৃষ্টি অনেক দিকে প্রসারিত হয়েছে, সমাজের নানা স্তরের দিকে তাঁদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে। বিদেশী নাটককে দেশীয় করণের প্রবল উদ্যম পরিলক্ষিত হচ্ছে। অন্ততঃ একজন নাট্যকারকে জানি, যিনি ইবসেন-চেকভকে এবং আরো বিদেশী নাট্যকারকে বাঙালী করবার চেষ্টা করছেন এবং নচিকেতাও লেখা আবশ্যক মনে করেছেন। তিনি হচ্ছেন অজিত গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁর নাটকও অভিনীত হচ্ছে না, সিনেমা-ধর্মী নয় বলে। অধিকাংশ নাটকে লজিক মানা হয় না। সংঘাতকে তীক্ষ্ণ করে তোলা হয় না; চুরি, হত্যা, ব্যভিচার, মিথ্যাচার প্রভৃতির পরিণাম দেখানো হয় না। প্লট, চরিত্র, ক্লাইমেক্স সব কিছু উপেক্ষা করে তাড়াতাড়ি একটা স্ক্রিপ্ট তৈরি করে নিয়ে নিজেদের একটা দল গড়ে, নিজেদের দলের সামনে অভিনয় করে, দিল্লীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য ছুটোছুটি করা, হাঁক-ডাক করা, গালি-গালাজ করা রেওয়াজ হয়ে উঠেছে। তার চেয়েও মজার কথা হচ্ছে একটি দল একখানি নাটক সফল করবার পর আর নিজেদের দলকেও সইতে পারছে না; এক একটি দল ভেঙে দুটি দল, তিন-দল হয়ে যাচ্ছে। কে প্রগ্রেসিভ রয়েছে, কে রিঅ্যাকশনারি হয়ে যাচ্ছে, তাই নিয়ে তুমুল তর্ক। একটি নাট্যকার আর একটি ডিরেক্টরকে কেন্দ্র করে আট-দশ জন লোক নিয়ে এক-একটি দল তাড়াহুড়ো করে নাটক পরিবেশন করে চলেছে।

আমি দেখে খুব বিস্মিত হই যে, খাদ্য-সমস্যা এত প্রবল হওয়া সত্ত্বেও কোন 'প্রগ্রেসিভ' দলই 'নবান্ন' নাটকখানি অভিনয় করবার কথা ভাবলেন না! কেন ভাবলেন না? কারণ হচ্ছে অপরের কথা—তা দেশেরই হোক, দশেরই হোক—ভাববার অবসর খুব কম; নিজের কথাই হচ্ছে বড় কথা। নবান্ন নিয়ে আমি বড়াই করিনি, তাঁরাই করেছেন। তার অভিনয় যদি এখন করা হোতো, তাহলে ওই যুগের নাটকখানি যুগোত্তীর্ণ হতো। একটা ট্রাডিশন গড়ে ওঠবার অবসর পেত, আরো দশখানা ওই রকম নাটক লেখা হোতো, অভিনীতও হোতো। লক্ষ্যহারা দিশাহারা উদ্দীপনা জাতীয় শক্তির কতটা অপচয় ঘটাচ্ছে, কলেক্টিভিজম-এর বুলি কণ্ঠে নিয়ে ইনডিভিজুয়্যালিজম-এর কী লীলা-খেলা চলছে, তা ভাববার সময় কি আজও হয়নি?

যবনিকার অন্তরালে

(২৫২ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

করেন। চরম অভিমানে অন্তিম মুহূর্তে তিনি বলেন, তাঁর মৃতদেহকে যেন কোন থিয়েটারের সামনে নিয়ে যাওয়া না হয়!

এই অন্তিম আত্ম-নিগ্রহের পেছনে স্তব্ধ হয়ে আছে একটা সমগ্র জীবনের কান্না!.....................

বাংলা রঙ্গমঞ্চের অধিষ্ঠাতা দেবতা হলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ। প্রত্যেক রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ-মুখে আছে তাঁর ছবি। তাঁকে প্রণাম করে অভিনেতারা মঞ্চে প্রবেশ করেন। তাঁরই দেহাবশেষ পূত শ্মশানের এক পাশে ক্লান্ত অভিনেতার শেষ শয্যা রচিত হয়।

শিশিরকুমারের জীবনে এইটেই সব চেয়ে বড় প্রাপ্তি।

বৈচিত্র্যের খোঁজে

(২৫১ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আমার আগ্রহ দেখে তিনি বিষণ্ণ ভাব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে খুসী হয়েই বল্লেন, তা-হলে ঘটনাটা খুলেই বলি—। এই বলে তিনি সুরু করলেন :

সেবার আমেরিকা একখানা বস্তুনিষ্ঠ ছবি করেছিল। ছবিটির নাম 'মার্টি'। জাঁকজমক নয়, বহু-তারকাখচিতও নয়, নিতান্তই একটি সাধারণ মানুষের প্রেমের কাহিনী নিয়ে একটি ভাল ছবি। ছবিটি 'অস্কার' পুরস্কার পেয়েছিল। জানেন তো, অস্কারের ওদেশে ভারী কদর। তাই হাউসওয়ালারা ছবিটি নিয়ে পুরস্কারের

তপন সিংহ পরিচালিত 'ক্ষণিকের অতিথি' চিত্রের নায়িকা রুমা গঙ্গোপাধ্যায়

লেবেল এঁটে ফলাও করে বিজ্ঞাপন দিলে। দর্শকও এলো দলে দলে। কিন্তু ছবিটি দেখার পর একটি প্রকাণ্ড দর্শক-দল একজোট হয়ে মারতে এলো ম্যানেজারকে। অপরাধ কী, না—ছবিটি তাদের ভাল লাগেনি—বিজ্ঞাপনের কথাগুলো সব ভুয়ো। শুধু তাই নয়, তাদের দাবী পয়সা ফেরত দিতে হবে। তার পর তিনি বল্লেন পয়সা ফেরত পেয়েছিল কিনা, তা জানিনে, তবে যাবার সময় ম্যানেজারকে এই বলে শাসিয়ে গিয়েছিল যে, ভবিষ্যতে যদি 'মার্টি'র মত ছবি ওখানে দেখানো হয় তবে তারা ওই প্রেক্ষাগারই বয়কট করবে। এরপর তিনি বল্লেন এইখানেই এ ঘটনার শেষ হলে কথা ছিল না কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে ব্যাপারটা আরো জটি রূপ নিল। দলে দলে লোক রাস্তায় প্রসেসা করে 'মার্টি'র মত ছবি আমেরিকায় দেখা চলবে না বলে শ্লোগান দিয়ে প্রতি জানালো। বক্তব্যের শেষে ভদ্রলোক জানাল এ-ঘটনা বেশী দিনের নয়, বোধকরি তিন চা বছর হবে এবং নেহাৎ গল্পকথাও ন রীতিমত ছাপানো সংবাদ। বিদায় নেবার প মুহূর্তে ভদ্রলোক নৈরাশ্যের সুরে বল্লেন, এ যদি অবস্থা হয়, তবে ছবিওয়ালাদের ব বিড়ম্বনা ভাবুন!

বিড়ম্বনাই বটে! তবে সুখের বিষ ভারতবর্ষ আমেরিকা নয়। সাধারণ মানুষে জীবনের সাধারণ কথা বলেছে বলেই যে লোক সে ছবি দেখবে না বা দেখে ভাল লাগে বলে তেড়ে মারতে আসবে, আমি বিশ্বাস ক তেমন দুর্মতি এ-দেশে হবে না। কি এ-ঘটনা যে দেশেরই হোক ব্যাপারটা যে গ্লা কর তা স্বীকার না করে পারছি না।

বস্তুতপক্ষে যুদ্ধোত্তর কালে অন্যান্য বিষয়ে মত শিল্পকলার ক্ষেত্রেও মানুষের রুচি প্রকৃ ও মতিগতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। নত পুরাতন, সামাজিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণি রোমান্টিক, কমেডি বা প্রহসন কোনো কিছু তারা তেমন খুসী হতে পারছে না। দর্শকের রুচি-বিভ্রমের কুহেলিকায় পড়ে চিত্র-নির্মাতার খানিকটা হাবুডুবু খাচ্ছেন একথা একে মিথ্যে নয়। সৎ, অসৎ ও ভাল সব বিচার-বুদ্ধিই তাদের বানচাল হয়ে যাচ্ছে বাস্তবিকই এ এক করুণ চিত্র। বৈচিত্র্য-সন্ধা বিভ্রান্ত চিত্র-নির্মাতাকে তবু একটা কথা বলতে ইচ্ছে করে আমার, বৈচিত্র্যের খোঁ হিমসিম না খেয়ে তাঁরা যদি প্রতিটি ছ শিল্প সৌন্দর্যটুকুই বড় করে দেখেন, কে হয়? কথাটা যত সহজে বলা গেল কাজটা সহজ যে নয় সন্দেহ নেই। কিন্তু সুন্দরের প্র গভীর নিষ্ঠাবোধের থেকে রসোত্তীর্ণ বৈচি তার কী হতে পারে? ভোরের প্রথম আ রোজ দেখি, কিন্তু রোজই কি নতুন নয় সে তেমনি জীবনের নানা রূপ ঘু ফিরিয়ে শুধু সুন্দরের পটভূমিতে ফেলে ক্ষতি কী? বৈচিত্র্য হবে না সেটা? এক হয়তো আসবে যখন মানুষ যুগোপযোগী শি প্রবর্তন ও পরিপূর্ণ শিক্ষায়ন দ্বারা এই স থেকে মুক্তি পাবে, মানুষ আবার সুন্দ পূজারী হবে। কিন্তু সেই শুভ দিনটি আসবে তা আমি জানি না।

ফটো— জহরলাল ঘোষ

'চারদিকে জল তরল অমল' ফটো— হিমাংশু বর্মন

পারীর জার্নাল থেকে--- কয়েক পাতা

॥ শিবনারায়ণ রায় ॥
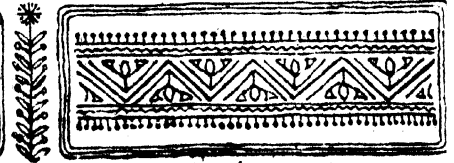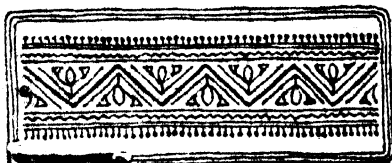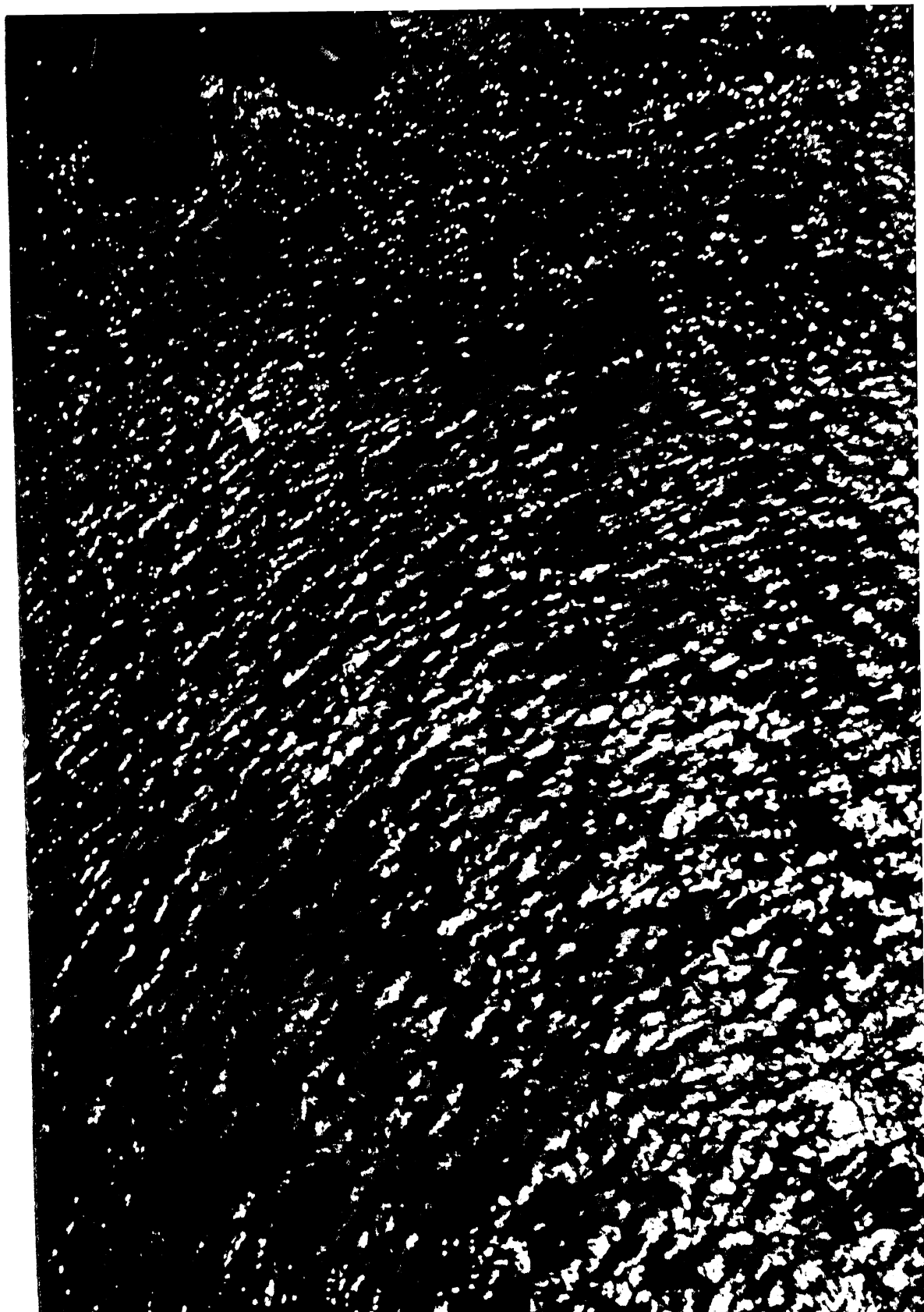
জুলাই-অগস্ট, ১৯৫৭॥

রসিকতা যে ফরাসী সাহিত্যের প্রাণ, ও সাহিত্যে যাঁর বর্ণপরিচয় ঘটেছে, তিনিও সে-কথা জানেন। কিন্তু ফ্রান্সে সাধারণ মানুষেরাও যে রসিক, তার পরিচয় পাওয়া গেল পারীতে প্ল্যাটফর্মে পা দেওয়ার একটু পরেই। আমি এখানে যাঁদের গৃহে পাঁচ সপ্তাহের জন্য অতিথি, সেই সুশঁ পরিবারের গৃহিণী মাদাম্ সোলাঁজ্ সুশঁ ষ্টেশনে আমাকে নিতে এসেছিলেন। আসছি লণ্ডন থেকে, সুতরাং মালপত্র ছাড়াবার জন্য দুজনে প্রথমেই গেলাম কাষ্টমস বিভাগে। অফিসারটির সরু গোঁফ, পমেড-চকচকে সুমসৃণ ঢেউ, ভুরুটাও বোধ হয় সযত্নে আঁচড়ানো। প্রশ্ন হোল, "ভ্যালিসে শুল্ক দেবার মত কিছু আছে কিনা।" নিবেদন করলাম, "বই-কাগজপত্র এবং জামা-কাপড় ছাড়া আর কিছু আনিনি।" অফিসারটি ঠোঁটের কোণে একটু মৃদু হাসি ফুটিয়ে আড়চোখে শ্রীমতী সুশঁ-র দিকে একবার চেয়ে বললেন, "সে কি, মাদামের জন্যে কিছু গোপন উপহারও আনেন নি? মাদাম, আপনার বন্ধুটি ত দেখছি একজন সেণ্ট বিশেষ।" তারপর আমাকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই ভ্যালিসে খড়ির দাগ টেনে : "মঁশিয়-র পবিত্রতা অক্ষয় হোক।"

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ (তখনো তিনি শ্রীঅরবিন্দ হননি), তাঁর New Lamps for Old প্রবন্ধমালায় লিখেছিলেন যে, ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য, তারা ইংরেজকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে। আসলে ফরাসীরা আধুনিক কালের সব চাইতে সভ্য জাতি এবং ইংরেজদের তুলনায় ফরাসীদের সঙ্গে আমাদের চরিত্রগত মিল বেশী। ("French mind is clearer, subtler, lighter than the English. France is the most civilized of modern countries. . . . We are far more allied to the French and Athenian.") সভ্যতার অনেকগুলো দিক আছে, এবং কোনো কোনো দিকে ফরাসীরা শ্রেষ্ঠ হলেও সব মিলিয়ে ফরাসী জাতীয় চরিত্র ইংরেজ জাতীয় চরিত্রের চাইতে উৎকৃষ্ট বলে আমার অন্ততঃ মনে হয়নি। আর ভারতবাসীর জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে কিছু না বলাই বোধ হয় ভাল। তবে বাঙালীদের সঙ্গে ফরাসীদের মিল অনেক ব্যাপারেই চোখে পড়েছে। এরাও আমাদের মত আড্ডাবাজ, কাজের চাইতে কথার মার-প্যাঁচ নিয়ে বেশী ব্যস্ত, ব্যবসায়ী অথবা বিত্তবানদের তুলনায় লেখক, অভিনেতা, চিত্রকর, বাজিয়ে-গাইয়েদের বেশী খাতির করে, অমিত রায়ের মত এদেরও বোধহয় ধারণা যে "সময় যাদের কিন্তুর তাদেরই পাংকচুয়াল হওয়া শোভা পায়....আমাদের মেয়াদ অল্প, পাংকচুয়াল হতে গিয়ে সময় নষ্ট করা আমাদের পক্ষে অমিতব্যয়িতা।" আর বাঙালীদের মত (বিশেষ করে পদ্মাপারের) এরাও খেতে ভালবাসে—নানা পদ, নানা প্রকরণ, বিচিত্র স্বাদ, বিচিত্রতর সজ্জা। (পানীয়র কথাটা বাদ দিলাম, ওটাতো আমাদের শিক্ষিত নিম্নমধ্যবিত্ত পাঠক-পাঠিকা সমাজে শুধু অনাচরণীয় নয়, একেবারে অনুচ্চার্য)। সমাজতাত্ত্বিকরা নানা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, ফ্রান্সে গণতন্ত্রের ভিত কাঁচা, কারণ এখানে নাকি ফরাসী বিপ্লবের কাল থেকেই বুর্জোয়া সম্প্রদায় আত্মপ্রত্যয়হীন। আমার সন্দেহ হয় যে, বাঙালীদের মত ফরাসীরাও উপার্জনের প্রায় সবটাই খানা-পিনা ফূর্তির পেছনে উড়িয়ে দেয় বলে এখানে বণিক-সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। যে পিউরিটান মনোবৃত্তি ধনতন্ত্রের অন্যতম ধারক, ইংরেজি ইতিহাসে যার প্রভাব খুব প্রকট, যার ফলে সম্ভোগের চাইতে সঞ্চয়কে মানুষ বেশী মূল্য দেয়, ফরাসী সমাজে কোনো দিনই তা বিশেষ আমল পায়নি।

তবে আমাদের (এবং ইংরেজদের) সঙ্গে ফরাসীদের একটা মস্ত ফারাক এখানে দু চার দিন বাস করলেই চোখে পড়ে। কোলকাতার লোকেদের ধারণা যে, ভারতবাসীদের মধ্যে তারাই নাকি সব চাইতে বিদগ্ধ। অথচ কোলকাতার পথঘাটের নামকরণ (এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নোতুন করে নামকরণ) থেকে কোনো বিদেশীর পক্ষে অনুমান করা শক্ত যে, এই শহরে গত দেড় শ' বছরের মধ্যে ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অনেকটাই রচিত হয়েছে। কোলকাতার গলিঘুঁজির কথা বলতে পারব না, কিন্তু কোলকাতার কটা বড় শড়কের নাম এদেশের কবি, সুরকার, চিত্রশিল্পীর নাম অনুসারে করা হয়েছে? দেশবন্ধু, চিত্তরঞ্জন, রাসবিহারী ঘোষ, সম্প্রতিকালে মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্ল রায়, মায় নির্মল চন্দ্রের নামেও বড় রাস্তা আছে। কিন্তু রামমোহন রায়, ডিরোজিও, মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু, ত্রৈলোক্যনাথ, কামিনী রায়, প্রমথ চৌধুরী, সুকুমার রায়, হ্যাভেল, অবনীন্দ্রনাথ এমন কি শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের নামে? চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, নিধুবাবু কিম্বা ঈশ্বর গুপ্ত এঁদের কথাত বাদই দিলাম। বিলেতেও শেক্সপীয়র, ডন, মিল্টন, ব্লেক, শেলী, কীটস, হোগার্থ, টার্নার কিম্বা হুইসলারের নামে কোনো বড় রাস্তা আমার চোখে পড়ে নি। কিন্তু ফ্রান্সে যেখানেই গেছি দেখেছি স্রেফ শড়কের নাম থেকেই দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে চমৎকার পাঠ নেওয়া যায়।

পারীর কথাই বলি। আমার আবাস শহর-তলীতে; সাঁ-ক্লু দরোয়াজা থেকে বেরিয়ে বোয়া দ বুলোন-এর একটু আগে। শড়কের নাম রু দাঁফ্যার রশরো, বেরিয়েছে আভেন্যু বিক্তর উগো থেকে। (Victor Hugo-র নামে এ দেশে যে কতগুলো রাস্তা আছে তার হিসেব করা শক্ত)। পারীর সুড়ঙ্গ ট্রেণ খুব চমৎকার; বাসেরও ভালো বন্দোবস্ত; তবু বিশেষ কোনো কাজের তাড়া না থাকলে আমি প্রায়ই হেঁটে শাঁজ্-এলিজে পর্যন্ত যাই। পথে কোনো শড়কের নাম মিশেল-আঁজ (অর্থাৎ মিকেল আঞ্জেলো), কোনোটার নাম আভেন্যু মোৎসার্ট, কোথাও বা রু বোয়ালো, কোথাও রু লা ফঁতেন্। কে নেই? আছেন তেয়োফিল গোতিএ, গীওম আপলিনেয়ার, এমিল জোলা, আনাতোল ফ্রাঁস, অঁরি বারবুস, জাঁ জিবাদু, পোল ভলেরি, মোলিয়ের, রাসিন, পিতাগ়ুর দুমো, আলফাঁস দোদে, বলজাক, গোয়েটে বেঠোফেন, বার্লিওজ, শোপ্যাঁ, রোদ্যাঁ, দেকার্ত, স্পিনোজা, মালব্রাঁশ, রুশো, ভলতেয়ার, দিদেরো, কোঁৎ বার্গস'। ফরাসীরা শুকদেবের মত পেট থেকেই পণ্ডিত হয়ে নিশ্চয় জন্মায় না; কিন্তু জন্ম থেকেই এই সব পথঘাটের নামের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলে পশ্চিমের সাংস্কৃতিক-ঐতিহ্যের সঙ্গে পারীর ছেলেমেয়ের যে ধরণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে ওঠে তেমনটি বোধ হয় ইয়োরোপের আর কোনো শহরে কল্পনা করা যায় না।

পারীতে পোঁছবার পর দ্বিতীয় দিনে বুলভার হাউসম্যান-এ "প্রাভ" (Preiuves) সাহিত্য-পত্রের সম্পাদক ফ্রাঁসোয়া বঁদির সঙ্গে দেখা। আমি দূর থেকে ওগুস্তিন-এর গীর্জা দেখছিলাম; উনি সস্ত্রীক গাড়ী করে রু লা পোপিনিএর থেকে বেরোচ্ছিলেন। ডেকে গাড়ীতে তুলে নিলেন। ভদ্রলোক জাতে সুইস। "প্রাভ" আর বিলেতের "এনকাউন্টার" একই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পত্রিকা; তবে ফরাসী কাগজটিতে রাজনীতি-সমাজ-[illegible] চাইতে শিল্প সাহিত্যের প্রাধান্য বেশী স্পষ্ট। বঁদি সাহেবের সঙ্গে প্রথম আলাপ কোলকাতায়; ওঁকে আউটরাম ঘাটের রেস্তোরাঁতে নিয়ে গিয়েছিলাম। উনি আমাকে নিয়ে গেলেন "লেজাল" (Les Halles) পাড়ার এক রেস্তোরাঁয়। এটা পারীর কেন্দ্রীয় বাজার, তৃতীয় নাপলিয়ঁ-র আমলে তৈরী, বিরাট অট্টালিকার সারি, সেখানে মাঝ রাত থেকে এসে জমা হয় গাড়ী গাড়ী তরিতরকারী, ফলমূল, মাছ, মাংস আর বলা বাহুল্য মদ। রেস্তোরাঁ-র চেহারা দেখে বিশেষ ভক্তি হয় না, কিন্তু আহা, খাদ্য-পানীয়ের সে কি রাজসিক বন্দোবস্ত। (পরে কয়েকবার শেষ রাতে মাদাম এবং মঁশিয় সুশঁ-র সঙ্গে এ-পাড়ায় এসেছি এখানকার বিখ্যাত পেঁয়াজের সুরুয়া, শূকরশিশুর কচি আঙুলের কাবাব আর কালো কফি চাখার লোভে।)

বঁদি সাহেবের কাছে ফরাসী মানস সম্বন্ধে প্রথম পাঠ নেওয়া গেল। তাঁর মতে ফরাসী মন একই সঙ্গে দুই স্তরে কাজ করে। একদিকে এরা কট্টোর যুক্তিবাদী, অন্য দিকে এরা কাঁচা সেণ্টিমেণ্টাল। তর্কের সময়ে এরা যে কোনো সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করতে সিদ্ধহস্ত, অথচ বুলির খপ্পরে পড়ে নাচতে-কুঁদতে এদের জুড়ি মেলা ভার। সব রকম আদর্শকে নিয়ে তামাশা করা এদের স্বভাব, অথচ তামাশাকে সত্যি ভেবে ক্ষেপে উঠতেও এদের বেশী সময় লাগে না। ঘরের বাইরে এরা পরকীয়া তত্ত্বের মস্ত অ্যাডভোকেট, অথচ ঘরের মধ্যে এদের তুল্য কনজারভেটিব বোধ হয় জার্মাণরাও নয়। ফরাসীদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ভুবন-বিদিত, অথচ দল বেঁধে শক্তিমানের কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে এদের একটুও বাধে না। বিলেতে ক্রমওয়েলকে নিয়ে উচ্ছ্বাস বড় একটা দেখতে পাবেন না, কিন্তু এদেশে সওদালের মত ঝানু লোকও নাপলিয়ঁ বোনাপার্ত-এর গোঁড়া ভক্ত। যুক্তিশীলতা এদের চরিত্রে সৌষম্য কিম্বা পরিণতি আনেনি। দেকার্ত, ভলতেয়ার-এর দেশে তাই বুদ্ধি-জীবীদের ওপরেও কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং ক্যাথলিক চার্চ-এর প্রভাব এত প্রবল।

বোঝা গেল ফ্রান্সে বাস করলেও এবং উঁচু-দরের ফরাসী পত্রিকার সম্পাদক হলেও মঁশিয় বঁদি ফরাসী জাতের ওপরে খুব একটা শ্রদ্ধাশীল নন। তবে বঁদি সাহেব বিদেশী, কিন্তু খাস ফরাসীদের ব্যাখ্যান শুনেও ফরাসী চরিত্র সম্বন্ধে খুব একটা উৎফুল্ল বোধ করা কঠিন। কয়েক বছর আগে কোলকাতায় শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ফ্ল্যাটে এক সন্ধ্যাবেলা নিকোলাস নাবকভ নামে পারী শহরবাসী একজন রাশিয়ান সঙ্গীত শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। (ইনি কংগ্রেস-ফর কালচারাল ফ্রীডম নামে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক।) আমি যখন পারী যাই তিনি তখন কিছুদিনের জন্য ফ্রান্সের বাইরে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তার আগেই আমাকে চিঠি লিখে জানান যে, পারীতে শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে আমার দেখা-

সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার জন্য তিনি তাঁর সহকর্মী রেনি তাব্যার্নিয়েকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তাব্যার্নিয়ে সাহেবের উদ্যোগে পারীতে পৌঁছবার কয়েক দিনের মধ্যেই জাঁ পোল্হা, জাঁ গ্রেনিয়ে, রেম' আর', মানে স্পর্ব্যার প্রমুখ প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের সঙ্গে আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটে। তাছাড়া কিছুটা অন্য সূত্রে, কিছুটা নিজের চেষ্টায় আমি আঁদ্রে মালরো, সিমোন দ্য বোভোয়া, শার্ল মেইয়ার, 'এসপ্রি' পত্রিকার সম্পাদক মসিয় দোমেনাখ, ক্লোদ বুর্দে, আঁদ্রে ফিলিপ প্রমুখ অন্য মনীষীদের সঙ্গেও দেখা করি এবং ঔপন্যাসিক আলবেয়ার কামুর সঙ্গে পত্রালাপে পরিচিত হই। কিন্তু সে সব বিবরণ আরেক দিনের জন্যে তোলা থাক। আপাততঃ শুধু তাব্যার্নিয়ে এবং বুর্দের সঙ্গে আলাপের কথা বলি।

রেনি তাব্যার্নিয়ে যেমন সুপুরুষ, তেমনি সজ্জন। যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সের অন্যতম ক্ষমতাবান যুবক কবি হিসেবে তাঁর উল্লেখ কোনো কোনো সমালোচকের মুখে শুনেছি। নানা শিল্পী মনীষীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া ছাড়াও আমাকে তিনি নানা দর্শনীয় স্থানে নিয়ে গেছেন, যত্নের সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন সে সব যায়গার ইতিহাস এবং বৈশিষ্ট্য, সাহায্য করেছেন পারী শহরের জটিল সাংস্কৃতিক মানচিত্রের কিছুটা হদিশ পেতে। তাঁর সঙ্গে দেলাক্রোয়া, বলজাক, উগো এবং রোদাঁ মিউজিয়ম দেখেছি, একোল দে বোজার্ত-এর তরুণ শিল্পীদের সঙ্গে আলাপ করেছি, সেন নদীর ওপরে অপরূপ সেতুর সারি দেখে মোহিত হয়েছি, নদীর দুধারে কোয়ের ওপর বুকিনিস্তদের কালো কালো সিন্দুকের গহ্বরে আমার অতি প্রিয় ফরাসী কবিদের কাব্যগ্রন্থ আবিষ্কার করে লোভে কম্পমান এবং অবিশ্বাস্য রকমের সস্তা দামে তার কিছু কিছু বই কিনতে পেরে পুলকে চঞ্চল হয়েছি, এবং তাঁর সঙ্গে না হলেও তাঁর উপদেশে বিশ্ববিখ্যাত পের লাশেজ-এর সমাধিক্ষেত্রে ঘুরে ঘুরে স্মৃতিবাপ্লুত কৌতূহলে ফরাসী সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের কবর দেখে বেড়িয়েছি। (এখানেই এক ধারে অস্কার ওয়াইল্ড-এর সমাধির ওপরে উড্ডীয়মান সেই বিরাট দেবদূত মূর্তি বর্তমান যার পুরুষাঙ্গকে শিল্পী এপস্টাইন ডুমুরের পাতা দিয়ে আবৃত না করায় রাবলে-দিদেরো-বলজাক'এর দেশবাসী সরমে সংকুচিত হয়ে পুরো মূর্তিটিকেই বহু বছর কালো বোরখায় মুড়ে রেখেছিলেন)। এঁর কাছ থেকে হদিশ না পেলে জাদর্ঁা দে পোয়েত (কবিদের বাগিচা) আবিষ্কার করা আমার অসাধ্য ছিল, শাঁসনিয়েরদের কবিগান বা কাব্য-কৌতুক শোনার সৌভাগ্য আমার ঘটত না।

এক রাত্তে স্যাঁ জার্ম্যাঁ-দে-প্রে পাড়ায় সাহিত্যিক পৃষ্ঠপোষিত এক রেস্তোরাঁয় এঁর সঙ্গে পানাহার করতে গেছি। (শোনা গেল, এক সময়ে মমার্ত ছিল শিল্পী-সাহিত্যিকদের পাড়া, সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে তাঁরা মঁপারনাস-এ উপনিবেশ করেন, এখন সেখান থেকেও সরে এসে স্যাঁ জার্ম্যাঁ-র আশ্রয় নিয়েছেন)। সুখাদ্য, সুপেয়, বাদ্যগীত এবং সুনবীনাদের চিত্তচঞ্চলকারী উপস্থিতিকে ছাপিয়ে টেবিলে টেবিলে ছড়িয়ে পড়েছে লেখক-শিল্পীদের উত্তেজিত কলগুঞ্জন। তাব্যার্নিয়ে মার্জিত মৃদু কণ্ঠে বললেন, "পারীকে বলা হয় সব শহরের প্লেটনিক আর্কেটাইপ। কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, পারী একটা গণ্ডগ্রাম মাত্র, যেখানে শহরের সব সুযোগ-সুবিধে আছে, কিন্তু শহুরে মন আজো গড়ে উঠেনি। সত্যিকারের শহরে ভীড়ের মধ্যেও নির্জনতা আছে, আর গ্রামে নির্জনতার মধ্যেও প্রাইভেসী নেই। গ্রামে যেমন এক পরিবারে কিছু ঘটলে সুব পরিবার সে কেচ্ছা টেলিপ্যাথিযোগে অবিলম্বে জানতে পায়, পারীতেও তেমনি শিল্প-সাধনায় কোনো আড়াল-আবডাল নেই, শিল্পীরাও তা চান না। পরস্পরের কেচ্ছা রসিয়ে রসিয়ে বলতে এবং শুনতে তাঁদের উৎসাহ অপরিমিত। তাছাড়া এঁরা কোনো কিছু নিয়ে নোতুন পরীক্ষা করতে গিয়ে গোড়াতেই পাঁচজনে মিলে দল বাঁধেন, তাতে বিজ্ঞাপনের সুবিধে হয়। এই সব গোষ্ঠীদের প্রত্যেকেরই আপন আপন পৃষ্ঠপোষিত কাফে কিম্বা নাইট ক্লাব আছে। কিন্তু লক্ষ্য করলেই দেখবেন, প্রতি রাত্তে এই সব শিল্পী-সাহিত্যিকরা এক কাফে থেকে আরেক কাফেতে ঘুরে বেড়ান, নিজেদের খবর ছড়াতে এবং অন্যদের খবর সংগ্রহ করতে। আমাদের সংস্কৃতির গোড়ার গলদ হোল, আমরা সৃষ্টির জন্যে নিভৃতির প্রয়োজন মানি না। তাই আত্মোপলব্ধি আমাদের কাছে আনন্দের উৎস নয়, তা শুধু অ্যাঁগোয়াস্-এর (Angoisse) জনক।

ফরাসী সাহিত্য এবং চিত্রকলার আকৈশোর অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও এধরণের কথা ইতিপূর্বে কখনো আমার মনে হয় নি। কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম, "আপনার অভিযোগ যদি সত্যিও হয়, তাতে ফরাসী সাহিত্যের কি কোনো ক্ষতি হয়েছে? তাছাড়া বোদলেয়ারের আলবাত্রোস কি শিল্পীর নিঃসঙ্গ সাধনায় প্রতীক নয়? অথবা মালার্মের রাজহংস?"

"ক্ষতিও হয়েছে, লাভও হয়েছে। লাভের কথা সকলেই জানেন। আমরা অপর-সচেতন বলে আমাদের ভাষা সব সময়েই মাজাঘষা, আমাদের হাসি-কান্না, রাগ-ভালবাসা সবই পরিশীলিত, উজ্জ্বল, মসৃণ। পরস্পরের কাছে আমাদের কোনো কিছু গোপন না থাকায় মানুষের কাহিনী লিখতে বসে আমরা ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দিই না। আব্রু না থাকায় একদিকে আমরা যেমন সদাই ফিটফাট, অন্যদিকে তেমনি কোনো মানুষকে মহামানব কিংবা কোনো স্ত্রীলোককে দেবী বলে গদগদ হতে আমরা অনভ্যস্ত। গল্প-উপন্যাস লেখায় আমরা তাই ইয়োরোপের গুরু। লোকসান হোল, প্রসাধনকে আমরা প্রায়ই স্বাস্থ্য বলে ভুল করি; একান্ত কোনো অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই; আমরা ভালবাসতে অক্ষম; তন্ময়তা আমাদের অসাধ্য। আমরা কবিতা লিখতে বসেও সামনে আরেকজনকে খাড়া করে তর্ক জুড়ি; নিজে ফুটে ওঠার চাইতে অন্যের চোখ ঝল্সানোতেই আমাদের আগ্রহ বেশী। ফরাসী সাহিত্যে তাই লিরিক কবিতা দুর্লভ; আমাদের মেজাজটা আসলে রেটরিক-ঘেঁষা।"

"অর্থাৎ ফরাসী লেখক রসের চাইতে ব্যঞ্জনার বেশী অনুরাগী?" এই বলে আমি সংক্ষেপে এই যুবক ফরাসী কবিকে আমার সাধ্যমত ব্যাখ্যা করে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের উপরোক্ত বিকল্প বোঝাবার চেষ্টা করলাম।

"ঠিক তাই। ফলে প্রকরণে আমরা সিদ্ধহস্ত, কিন্তু আমাদের বক্তব্য প্রায়শই তলপৃষ্ঠ, অগভীর। আমরা কথার ফেনায় ভাবের সাত রঙা আলো প্রতিফলিত করতে পারি। কিন্তু নীরব হয়ে অস্তিত্বের গভীরতায় ডুবে যেতে শিখিনি। আমাদের কল্পনার ভিত্তি অনুভব নয়, ডায়লগ্। শেক্সপীয়রের কথা বাদ দিলেও ব্লেক কিংবা বার্ন্স্, কোল্রিজ অথবা কীটস্-এর মত কবিও আমাদের সাহিত্যে দুর্লভ। বোদ্লেয়ারের আলবাত্রোস্-এর কথা বলছিলেন? কিন্তু সেই সিন্ধু-শকুনের আকাশ-বিহারের আনন্দ বোদ্লেয়ার তাঁর কাব্যে কোথাও সঞ্চারিত করতে পারেন নি; নাবিকদের হাতে তার দুরবস্থার ছবিটি তাঁকে বেশী আকৃষ্ট করেছে। নিজের একাকীত্বের গভীরতায় ডুবতে শিখিনি বলেই Milieu de hue'es-কে আমরা কিছুক্ষণের জন্যও চেতনা থেকে মুছতে পারিনি। আধুনিক কালে সব দেশের লেখকরাই আগের তুলনায় অতিরিক্ত রকমের পরিবেশ-সচেতন; তাই ফরাসী সাহিত্যে তারা নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখে তারিফ করে।"

তাব্যার্নিয়ের সঙ্গে আমি পুরো একমত হতে পারিনি, কিন্তু তাঁর কথাটা ভেবে দেখার মত। তবে তাঁর সমালোচনার মধ্যে বিষণ্ণতা থাকলেও, তিক্ততা ছিল না। অপর পক্ষে বিখ্যাত বামপন্থী ফরাসী রাজনৈতিক সাপ্তাহিক "ফ্রাঁস অপ্-জ্যাভেতার" (FRANCE OBSERVATEUR)-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সম্পাদক ক্লোদ্ বুর্দে-র চেহারাটা যেমন অস্বস্তিকর, তাঁর বক্তব্য তেমনি তীক্ষ্ণ, তাঁর বলার ঢঙ তেমনি বিদ্রূপশাণিত। অক্সফোর্ড-এর "লেফ্ট্ রিভিয়ু" গোষ্ঠীর সূত্রে এঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। (আমার "প্রবাসের জার্নাল" বইটির গোড়ার দিকে উক্ত গোষ্ঠীর কথা লিখেছি)। বুর্দের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয় তাঁর ফ্ল্যাটে। ঘরের আসবাব-উপকরণে বিত্ত এবং বৈদগ্ধ্যের পরিচয় স্পষ্ট। দামী পোষাক এবং ঘষামাজা চেহারা সত্ত্বেও, ঘরের বিলাসী পটভূমিতে তাঁর দৃষ্টির অস্বাভাবিকতা এবং মুখের রুক্ষতা বড় বেমানানভাবে ফুটে উঠেছিল। শুনলাম, যুদ্ধের সময় তিনি ফ্রান্সের গুপ্ত প্রতিরোধ আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন; যুদ্ধের শেষদিকে নাৎশী কনসেনট্রেশান ক্যাম্পেও তাঁর কিছুকাল কেটেছে। তাঁর সাপ্তাহিক পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা সোয়া লাখের ওপরে। বুর্দে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী, তিনি আলজেরিয়া এবং অন্যান্য ফরাসী উপনিবেশে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার একজন প্রধান সমর্থক; তিনি রাশিয়া এবং আমেরিকার প্রভাবমুক্ত স্বাধীন, শক্তিশালী, সংযুক্ত ইয়োরোপের স্বপ্ন দেখেন। সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদ এবং ফরাসী কম্যুনিষ্ট পার্টির মস্কো মুখাপেক্ষিতা ও গণতন্ত্রবিরোধী সংগঠনের তিনি একজন অক্লান্ত সমালোচক। কিন্তু তিনি বোধ হয় তোরে-র চাইতেও গী মোলেকে বেশী ঘৃণা করেন। ফরাসী সোস্যালিষ্ট পার্টির আদর্শহীন, সুবিধাবাদী ক্রিয়াকলাপ এবং তার সংকীর্ণ স্বাজাত্যাভিমান ও রক্ষণশীলতা তিনি অক্লান্তভাবে আক্রমণ করে চলেছেন। "নুভেল্ গোশ্" (নব্য বামপন্থী) নামে তাঁর নিজের একটি দল আছে, এর অধিকাংশ সদস্য যুদ্ধের সময় রেজিস্ট্যান্স আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যায় প্লাস্ দু ত্যার্ত্র্-এর একটা টেবিলে তারা ঝলমল আকাশের নীচে আমরা পানাহার করছিলাম। মমার্ত্-এর টিলার চুড়োয় বৈজন্তীয় স্থাপত্যরীতিতে গড়া সাক্রে ক্যর্ গীর্জা দেখতে খুব সুন্দর না হলেও ভুবনবিদিত। তারি সামান্য দূরে রেস্তরাঁ-বেষ্টিত এই খোলা যায়গাটির তুলনা পারী সহরেও মেলা অসম্ভব। পুচ্চিনি তাঁর বিখ্যাত অপেরা "লা বোহেম্"-এ এই যায়গাটিকে অন্যতম পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। দূরে এক কোণে জিপ্সী ব্যাণ্ড বাজছে, চারধারের কাবারে থেকে গান-বাজনার টুক্রো ভেসে আসছে। বুর্দে বলছিলেন, "আমরা, ফরাসীরা জাত হিসেবে যেমন চতুর, তেমনি ফূর্তিবাজ। আসলে দু'এরি উৎস হোল আমাদের দায়িত্ববিমুখতা। আমরা কট্টোর যুক্তিবাদী, কিন্তু যুক্তিকে আমরা ব্যবহার করে থাকি অভিজ্ঞতা থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছবার উপায় হিসেবে নয়, একই অভিজ্ঞতা থেকে যে নানা বিকল্প সিদ্ধান্ত টানা যায়, সেটি প্রতিষ্ঠিত করার উপায় হিসেবে। ক্যাজুইস্ট্রিতে হাত পাকানো আমাদের বুদ্ধিজীবীদের সাধনা, দরকার মত সাদাকে কালো এবং কালোকে সাদা প্রতিপন্ন করতে পারায় আমাদের পরম আনন্দ। আমাদের মনে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিতের মধ্যে কোনো অনতিক্রম্য

বিরোধ নেই। গ্রীক সফিস্টরা শুনতে পাই ধর্মীয় গোঁড়ামির হাত থেকে মানুষের সহজাত কৌতূহলকে বাঁচাবার জন্যে ডায়ালেক্‌টিক্‌ তর্ক-পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিলেন। আমরা ফরাসীরা আমাদের ভাবনা-চিন্তা, ব্যবহার, জীবনযাত্রা, সব-কিছুকেই ডায়ালেক্‌টিকস্‌-এর ওপরে প্রতিষ্ঠিত করেছি। ফলে সুবিধে মত সব কিছুকেই আমরা যুক্তি দিয়ে সমর্থন করতে পারি। আমাদের কোনো বিবেকের বালাই নেই। আমাদের একমাত্র সাধনা হোল, সবরকম ঝুঁকি-ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে নিজেদের আরামটুকু বাঁচিয়ে রাখা।...

"আমাদের যুক্তিশীলতার প্রশ্রয়ে যেমন দায়িত্ব-হীন মনোভাব পুষ্টি পাচ্ছে, আমাদের ফূর্তি-বাজীর পেছনে তেমনি প্রচ্ছন্ন আছে নির্মম স্বার্থপরতা। ফরাসী প্রথমে বোঝে নিজের সুখ, তারপর পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্য, তারপর হয়ত নিজের বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থ। তার বাইরে অপরের সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে সে একেবারে উদাসীন। পারীর মত কসমোপলিট্যান সহরে আল-জিরিয়ানরা কিভাবে বাস করে, দেখেছেন? (তখনো দেখিনি, পরে মঁসিয় সুশে'র সংগে দেখতে গিয়েছিলাম)। চুরি, বেশ্যাবৃত্তি এবং বেশ্যাদের টাউটগিরি ছাড়া তাদের জন্যে জীবিকা উপার্জনের আর কি পথ আমরা খোলা রেখেছি? উপনিবেশ-গুলোতে আমরা যে এত অত্যাচার করছি, গড়-পড়তা ফরাসী তা দিয়ে লজ্জা পর্যন্ত বোধ করে না। এই দায়িত্ববিমুখ স্বার্থপরতা আমাদের জাতীয় জীবনকে যদি বিষাক্ত না করে তুলত, তাহলে স্রেফ হিটলারের হুমকীতে ফ্রান্সের পতন ঘটত না। নাট্‌শীরা যখন পারী দখল করতে আসছে, তখন গড়পড়তা ফরাসীর একমাত্র দুর্ভাবনা ছিল এই বেরসিক গুণ্ডাদের হাত থেকে তাদের মদের ভাঁড়ার কি করে রক্ষা করবে!"

"আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন ফরাসীদের মধ্যে চরিত্রবল কিংবা আদর্শনিষ্ঠা একেবারেই নেই?"

"না, সেটা হয়ত বাড়িয়ে বলা হবে। তরুণদের মধ্যে বিবেকবোধ যে একেবারে লোপ পায়নি, তার প্রমাণ আমাদের নুভেল গোশ্‌, তরুণ ক্যাথলিক ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের Movement de Literation du Peuple. এমন কি, কম্যুনিষ্ট গুপ্ত পত্রিকা এত্যাঁসেল্‌ (ETINCELLE) বা স্ফুলিংগ। শেষোক্ত কাগজটির কয়েক কপি আপনাকে দিচ্ছি, পড়ে দেখবেন। ফরাসী কম্যুনিষ্ট পার্টির কিছু তরুণ কর্মী এটি গোপন রোণিও করে বার করে। পার্টি নেতৃত্বের এরা কড়া সমালোচক; শুনতে পাই পিকাসো প্রমুখ অনেক কম্যুনিষ্ট মনীষী এর পৃষ্ঠপোষক। তবে ফরাসী জনসাধারণের ওপরে এই সব ছোটখাট গোষ্ঠীর প্রভাব খুব সামান্য। ফরাসীদের মধ্যে যদি বিবেক-বোধের উজ্জীবন না ঘটে, তাহলে এ-দেশেও আজ বা কাল ডিক্‌টেটরশিপের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য—সেটা তোরে-র নেতৃত্বেই হোক্‌, অথবা দ্য গলের নেতৃত্বেই হোক্‌।"

বুর্দে, তাব্যার্নিয়ে এবং বঁদির এ-সব অভি-যোগের মধ্যে কতটা সত্য আছে? কোনো দেশে মোটে পাঁচ সপ্তাহ কাটাবার পরে এ-ধরণের প্রশ্নের জবাব দেওয়া শক্ত, বোধ হয় অসম্ভব। তবু আকৈশোর ফরাসী শিল্প-সাহিত্যের অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও এ-কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, এঁদের এই সব সমালোচনা শুনে এবং এই সামান্য কিছুদিনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে ফরাসী সংস্কৃতির প্রতি আমার শ্রদ্ধায় বেশ খানিকটা চিড় ধরেছে। অন্ততঃ বুর্দের আশঙ্কা যে একেবারে অমূলক ছিল না, গত দু বছরের ফরাসী রাজনৈতিক ইতিহাস তারি প্রমাণ। আমার বিশ্বাস ফ্রান্সের অভিজ্ঞতা থেকে বাঙালীদের অনেক কিছু শেখার আছে। এ-বিষয়ে আমি যেটুকু ভেবেছি, যদি কোনো দিন সময় এবং সুযোগ মেলে, বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের কাছে পেশ করার ইচ্ছে রইল।

—

মন কণিকা

(৩১ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

জীবনের আর কোনও ক্ষেত্রেই সে সাম্য পায় নাই।

বস্তুতঃ দেশের শাসনতন্ত্র যে নামেই পরিচিত হোক, যেখানে ধন-সাম্য নাই সেখানে ডিমোক্রেসী তামাসা ছাড়া আর কিছু নয়। ধন সাম্য না থাকিলে ধনী-দরিদ্র থাকিবে, ধনীর পুত্র দরিদ্রের পুত্র অপেক্ষা অধিক সুযোগ পাইবে। দরিদ্রের পুত্র যদি প্রতিভাবান হয় তবু সুযোগের অভাবে তাহার প্রতিভার স্ফুরণ হইবে না। ধনী-পুত্র সর্বগুণে অধম হইলেও তাহাকে ছাড়াইয়া যাইবে।

এই অবিচার যে সমাজের ভিত্তি তাহার ইষ্ট নাই। সমাজ-ব্যবস্থার দোষে গুণবানকে যেখানে নির্গুণে পরাস্ত করে সেখানে মঙ্গল নাই। 'গুণকর্মবিভাগশঃ'—মানুষের এই স্বভাবধর্মকে ফুটাইয়া তোলা democracyর কাজ।

৫।৯।৫০

Shakespeare of London নামে মহাকবির একটি নূতন জীবনী-গ্রন্থ পড়িলাম। কবির জীবন সম্বন্ধে যে দুই-চারিটি কথা নিঃসংশয়ভাবে জানা যায় তাহাই সাজাইয়া-গুছাইয়া অতি সুন্দরভাবে লেখিকা পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাৎকালিক জীবন-চিত্র, বিশেষতঃ নট-কুশীলব—কবি নাট্যকার সম্প্রদায়ের চিত্র চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শেকস্‌পীয়র শুধু নাট্যকার ছিলেন না, অভিনেতাও ছিলেন। জীবদ্দশায় তিনি নাট্যকার হিসাবে প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু উচ্চ-ভ্রূ সমালোচক ও সাহিত্যিকের দল তাঁহাকে আমল দেয় নাই। তিনি পণ্ডিত ছিলেন না, ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি অল্প ছিল—little Latin and less Greek. সমসাময়িক দিক্‌পাল নাট্যকারগণ তাঁহার জনপ্রিয়তায় পীড়িত হইয়া তাঁহাকে অনেক ব্যঙ্গবিদ্রূপও করিয়াছিলেন।

এই দিকপালেরা আজ কোথায়? তাঁহাদের লেখা আজকাল কে পড়ে? সাহিত্যের প্রত্নবিৎ ছাড়া তাঁহাদের নামও সকলে ভুলিয়া গিয়াছে।

২৪।১২।৫০

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। অকাল মৃত্যুই বলিতে হইবে। সে আরও দশ বছর বাঁচিয়া থাকিলে হয়তো আরণ্যকের মত কোনও রচনা তাঁহার হাত দিয়া বাহির হইতে পারিত। কিন্তু সেটা একটা অনিশ্চিত সম্ভাবনা।

পৌষ মাসের কথা সাহিত্যে দেখিলাম অনেকেই তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া-ছেন। এই সব লেখা হইতে জানিতে পারিলাম, বিভূতির জীবনের একটা আধ্যাত্মিক দিক ছিল, ভূত ভগবান লইয়া সে তর্ক করিতে ভালবাসিত। উপনিষৎ পড়িয়াছিল। নাম জপ বিশ্বাস করিত। এই cynical যুগে ইহাও কম কথা নয়। আমি লক্ষ্য করিয়াছি ভারতীয় সাহিত্যিকের মনের গতি অধ্যাত্মমুখী, মন যত পরিণত হয় ততই ধর্মের দিকে যায়। একমাত্র শরৎচন্দ্র বোধ হয় ইহার ব্যতিক্রম।

বিভূতির সাহিত্যকৃতি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা পড়িলাম। কিন্তু দেখিতেছি, তাঁহার সাহিত্যবুদ্ধি সম্বন্ধে আমার যা ধারণা তাঁহার নিজের মুখের কথাই তাহা সমর্থন করিতেছে; সে conscious artist ছিল না। কালিদাস রায় লিখিয়াছেন—'একদিন নিভৃতে বিভূতি বলল—দাদা, আমি কিছুই ভেবে লিখি না। লেখার সময় মনে যা-যা আসে তাই লিখে যাই— ।' কথা সাহিত্য, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭।

৩।২।১৯৫১

'দিদি' রচয়িত্রী শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর মৃত্যু হইয়াছে। একটি মাত্র বই লিখিয়া এমন ভাবে একটি জাতির চিত্ত জয় করিতে বোধ হয় আর কেহ পারে নাই। নিরুপমা আরও কয়েকটি বই লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন 'দিদি'র জন্য।

অনেক দিনের পুরানো কথা মনে পড়ে। তখনও কৈশোর অতিক্রম করি নাই। প্রবাসীতে দিদি বাহির হইতেছে; মাসের পর মাস প্রবাসীর পথ চাহিয়া থাকিতাম। সুরমা চারু অমরনাথ উমা—চরিত্রগুলিকে চোখের সামনে দেখিতে পাইতাম, তাহাদের সহিত মনে মনে কত মধুর সম্পর্ক পাতাইয়া ফেলিয়াছিলাম। তারপর যখন কাহিনী শেষ হইল তখন পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে মন ভরিয়া উঠিল। এমন satisfying সমাপ্তি বাংলাভাষায় আর আছে কিনা সন্দেহ।

নিরুপমা দেবী যে রস প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করিয়াছিলেন তাহা প্রীতির রস। অনির্বচনীয় প্রীতি তাঁহার রচনায় ওতপ্রোত। এই সাক্ষাৎ প্রীতিস্বরূপিণীর উদ্দেশে প্রণাম জানাই।

২০।২।৫১

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, যে জাতির ইতি-হাস নাই তাহার ভবিষ্যৎ নাই। আমাদের ইতিহাস আছে, চার-পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস আছে; কিন্তু আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। ইতিহাসের পরিবর্তে কতকগুলো রূপকথা মনে করিয়া রাখিয়াছি। পুরাণের শাঁস ফেলিয়া ছোবড়া চুষিতেছি।

আমাদের যদি সংস্কৃতির ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি থাকিত তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতাম যে, জীবনকে আমরা একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত দেখিয়াছি এবং অন্যান্য জাতির দৃষ্টিভঙ্গী হইতে তাহা স্থিতিশীল। প্রত্যেক সভ্যতারই একটি বিশিষ্ট দৃষ্টি-ভংগী আছে; কেহ বস্তু জগৎকে বড় করিয়া দেখিয়াছে, কেহ অন্ত-র্লোকের প্রাধান্য দিয়াছে। ভারতীয় কৃষ্টির স্বধর্ম এই যে, উহা কিছুকেই অবজ্ঞা করে না; ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—সবগুলিই তাহার কাছে সমান আদরণীয়। কোনও বিশিষ্ট পন্থার প্রতি তাহার বিরাগ নাই; জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা। মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। ইহাই আমাদের সংস্কৃতির মর্মকথা; ইহাই আমাদের ইতি-হাস। ঘটনার ইতিহাস নয়, ধাতু-প্রকৃতির ইতিহাস।

—
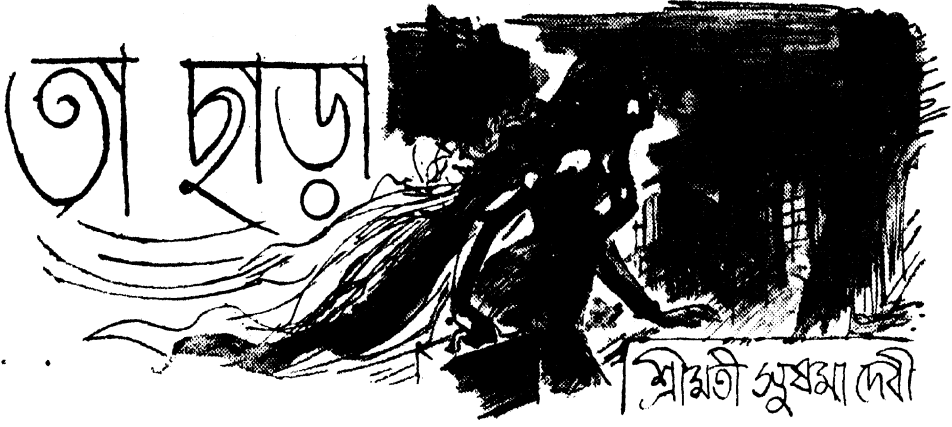
"শীগগির আয় লেখা, সময় হয়ে গেল। বাব্বা! একি সোজা সিঁড়ি, খাড়া পাহাড়ের মতো। সিঁড়ি উঠতে হাঁপিয়ে মরি। বাবাকে কতবার বলেছি, 'পুরনোগুলো ভেঙে নতুন ধরণের করো', তা 'করব', 'করব'ই শুনি, করা আর হয় না।" হাঁপাতে হাঁপাতে সুলেখা উঠে সামনের দালানে এল। পত্রলেখাকে দেখে সে রেগে উঠল। "ওমা, এখনও তোর সাজগোজ হয় নি? টেলিফোনে তা হলে জানালাম কী?"

"যাব না ঠিক করেছি বলেই তৈরি হইনি, দিদি।"

"তার মানে? যখন ফোনে জানিয়েছিলাম, তখন এ কথাটা বলতে কী হয়েছিল? টিকিট করে দরজায় গাড়ি নিয়ে হাজির হলাম, এখন বলা হচ্ছে—'যাব না।' ন্যাকামি রাখ, ও সব শুনতে চাই না। তাড়াতাড়ি একটা শাড়ি জড়িয়ে চলে আয়। শিউ-ঠাকুরপো এসেছে আজমীঢ় থেকে, মাত্র ছ' দিনের ছুটিতে, রোজই নানা কাজে সে ব্যস্ত। আজ অনেক জোর-জবরদস্তি করে তার সময় করিয়ে এনেছি। গাড়িতে বসে আছে, দেরি হলে রাগ করবে। ওরা মিলিটারি অফিসার, সময়ের নড়চড় একটুও সহ্য করতে পারে না। আমি ততক্ষণ কেণ্টকে বলি, ওপরে এনে বসবার ঘরে ওকে বসাতে।"

বিষণ্ণ মুখখানা তুলে পত্রলেখা আবার বলল—"আজ আমি নেই বা গেলাম, দিদি? বাবাকে বলা হয়নি, তিনি এখনও অফিস থেকে ফেরেন নি। বাড়িঘর চাকরদের কাছে রেখে যেতে ভয় করে।"

"তুই থাম্ ত? আর গিন্নীপনা করে কাজ নেই। কলেজে যখন যাস, তখন কে বাড়ি আগলে বসে থাকে? ঐ ঠাকুর চাকরই ত! আমার সঙ্গে সিনেমায় গেছিস জানলে বাবা রাগ করবেন না, নিশ্চিন্তই হবেন। মাঝে মাঝে এখানে-সেখানে গিয়ে যখন ধিঙ্গিপনা করে বেড়াস, তখন কী হয়? যা, চলে যা, আর সময় নেই। মুখটায় অমনি একটু পাউডার বুলিয়ে আসবি, বড্ড চকচক করছে। যা, শীগ্‌গির চলে যা।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও পত্রলেখাকে যেতে হল। দিদির হুকুম না শুনলে এখনই বাড়ি মাথায় করবেন। ভাইবোনের ভিতর উনিই সব চেয়ে বড়ো। ওদিকে তপনের আসবার সময় সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়। এসে ওকে দেখতে না পেলে রেগে সে আগুন হবে। কিন্তু উপায় নেই, দিদিকে মুখ ফুটে সেকথা বলতে পারল না। সে নিজে কুমারী মেয়ে, তায় আবার দিদি একটু সেকেলে ধরণের, অনাত্মীয় ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা তিনি পছন্দ করেন না।

"কেন, তোর বুঝি আর শাড়ি ছিল না? তাই দেখে দেখে যেটা আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না, সেইটে পরে এলি! গেল পুজোয় আসমানী রঙের যে শিফনটা দিয়েছিলাম, সেটা পরতে কী হয়েছিল? আহা, কী ছিরিই দেখাচ্ছে!" সুলেখা বোনের চুলের সাম্‌নেটা ধরে টানাটানি করে কপালের দিকে একটু নামাতে চেষ্টা করল। "তোদের ফ্যাশানে অরুচি ধরিয়ে দিলি। কি চুল বাঁধাই আজকাল হয়েছে! ছোট কপাল চুলের টানে চওড়া হয়ে যাচ্ছে। করবীকে আমি এসব করতে দিই না। মা থাকলে তোরও এতখানি স্বাধীনতা চলত না, লেখা।"

"যাবে ত দিদি লাইটহাউসে, তাতে আবার এত সাজ পোষাকের কী দরকার?"

"দরকার আছে, না আছে, তা তুই কী বুঝবি? বি-এ পাস করে এম-এ পড়ছিস কি না, তাই দিন দিন খুকীপনা বাড়ছে। অত বড়ো মেয়ে, একটু বোঝবারও ক্ষমতা নেই!" সেইখান থেকেই গলার স্বর এক পর্দা উঁচুতে তুলে সুলেখা ডাকল—"শিউ-ঠাকুরপো, বেরিয়ে এসো। আমাদের হয়ে গেছে।"

বসবার ঘরের পর্দা ঠেলে যে লোকটি বেরিয়ে এল, তাকে দেখে পত্রলেখা একটু হকচকিয়ে গেল। একেবারে মিলিটারিম্যান, কোথাও একটু এদিক-ওদিক নেই। মুখ নীচু করে হাতঘড়ির দিকে চেয়ে আগন্তুক বলল—"দেরি করলেন, বৌদি। 'শো' আরম্ভ হয়ে গেল।"

"কী করব ভাই? লেখার জন্যেই এইটি হল।"

"যাক, আর দাঁড়াবেন না, এগিয়ে চলুন, বৌদি।"

"যাই ঠাকুরপো। তার আগে আমার বোনের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। পত্রলেখা আমার একেবারে নিজের বোন। আমাদের মুখ দেখলেই বুঝবে দুজনের কী রকম মিল আছে। লেখা ভারি সুন্দর গান করে, তোমায় শোনাব একদিন। হ্যাঁ, আর এই হচ্ছে ক্যাপ্‌টেন শিহরণ লাহিড়ী, আমার শিউ-ঠাকুরপো। তোমাকে আগেই বলেছি, লেখা।"

তারা দুজনে হাত তুলে পরস্পরকে নমস্কার করল, তার পর সুলেখার সঙ্গে নীচে নেমে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

যখন তারা লাইট হাউসে নামল তখন 'শো' আরম্ভ হয়ে গেছে। সিনেমার কর্মচারী অন্ধকার 'হলে' টর্চের সাহায্যে তাদের জন্য রাখা তিনটি খালি সীট দেখিয়ে দিল। সুলেখা আগেই গিয়ে সব শেষের স্থানটি দখল করে নিল ও পত্রলেখাকে মাঝের সীটটিতে বসাল। তখন শিহরণ শেষের আসনে পত্রলেখার পাশে বসল।

নিঃশব্দে ওরা ছবি দেখে চলেছে, কেউই কোনও কথা বলচে না। সুলেখার অস্বস্তি হতে লাগল। যে উদ্দেশ্য নিয়ে সে ওদের নিয়ে এসেছে, তা পণ্ড হবে-না ত! কেউই ত কারও দিকে ফিরে দেখছে না? ছবি দেখা ছেড়ে বারে বারে ওদের দিকে চেয়ে সুলেখা চিন্তায় পড়ে গেল।

মাত্র চার বছর আগে তাদের মা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। বাবা এখনও তাঁর শোক ভুলতে পারেন নি, সবেতেই কেমন যেন উদাসীন ভাব। অফিসের কাজ করেন, বাড়ি ফিরে বই পড়েন। সংসার সম্বন্ধে একেবারেই নির্লিপ্ত। মাস গেলে ছোট মেয়ের হাতে বেশ মোটা টাকা ফেলে দেন, তাই নিয়ে সে-ই সংসার চালায়। তাই সুলেখার হয়েছে যত জ্বালা। অত বড়ো মেয়ের যে বিয়ে দেওয়া দরকার, তা কিছুতেই বাবার খেয়াল হয় না। পত্রলেখাই বাড়ির হর্তা-কর্তা বিধাতা। একলা থাকে, যা ইচ্ছে করে বেড়ায়। বাধা দেবার কেউ নেই, বলবারও কেউ নেই—এক সে ছাড়া। সেই জন্যই সুলেখা কিছুদিন থেকে উঠে-পড়ে লেগেছে বোনকে পার করতে। একমাত্র ভাই সুমোহন বিলাতে গিয়ে দিব্যি বসে আছে, আর বছর বছর ফেল করছে, বাবার টাকাগুলো জলে দিচ্ছে। টাকা পাঠাতে বারণ করলেও উনি শোনেন না।

ইনটারভ্যাল হতে আলোগুলো জ্বলে উঠল। শিহরণ পাশ ফিরে পত্রলেখার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল—"কেমন লাগছে?"

"ভালোই।"

"কফি খাবেন? চলুন, রেস্তোরাঁয় যাই।"

"না, অনেক ধন্যবাদ। আমি এখন খাব না। আপনি বরং খেয়ে আসুন, ক্যাপটেন লাহিড়ী।"

ইসারা করে সুলেখা বোনকে [illegible]—"[illegible]

অলঙ্কার শিল্পে প্রগতির প্রতীক

সেনকো জুয়েলারী ষ্টোর্স

প্রাইভেট লিমিটেড

১৮৭, বহুবাজার স্ট্রীট • কলিকাতা-১২

এ যুগের সাহিত্য

ছোট গল্প

ননী ভৌমিক : চৈত্রদিন	৪·০০
অরুণ চৌধুরী : সীমানা	১·৭৫

উপন্যাস

অমরেন্দ্র ঘোষ : চরকাশেম	৩·৭৫

কবিতা

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় কটি কবিতা ও একলব্য	২·০০

প্রবন্ধ ও ইতিহাস

নরহরি কবিরাজ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা	৫·০০
নীরেন্দ্রনাথ রায় : সাহিত্যবীক্ষা	৩·০০
মুজফ্ফর আহ্মদ : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ	০·৩৭

বিশ্ব সাহিত্যের অনুবাদ

মিখাইল শলোখফের

ধীর প্রবাহিনী ডন

And Quiet Flows The Don

এর অনুবাদ ৯·০০

সাগরে মিলায় ডন

Don Flows Home to the Sea

এর অনুবাদ ৬·০০

—সম্পূর্ণ তালিকার জন্য লিখুন—

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ

১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২

১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা—১৩

প্রিয় গোপাল বিষয়ী

(সিল্ক ও তাঁত বস্ত্র বিক্রেতা)

সবার প্রিয়

৭০, খেংরাপটি স্ট্রীট
বড়বাজার-কলিকাতা-৭
ফোন: ৩৩-৬৪০৯

লেখা? শিউ-ঠাকুরপো বলছে, খেয়ে আয়। তা ছাড়া ওর হয়ত গলা শুকিয়ে গেছে।"

মৃদু হেসে শিহরণ বলল—"কী যে আপনি বলেন, বৌদি! আমি কি বোবি যে গলা শুকিয়ে যাবে? বেশ ত, আপনারা কফি না খান তবে চকোলেট খান? তাতে ত আপত্তি নেই?" চকোলেটের দুখানা স্ল্যাব কিনে শিহরণ দুই ভগ্নীর দিকে এগিয়ে ধরল। সুলেখা নিল, পত্রলেখা মাথা নেড়ে মৃদুস্বরে বলল—"আমি মিষ্টি খাই না।"

"কেন? ভয়ে বুঝি? একদিন খেলে ফিগারের কিছু হবে না। আজ কাল প্রায়ই লেডীজদের কাছে এই একই কথা শুনি। আপনাদের দেখে পুরুষেরাও আরম্ভ করেছেন, তাঁরাও ফিগার ঠিক রাখতে সব সময়ে সাবধান হয়ে উঠেছেন। নিন না, মিস ভাদুড়ী? আপনি বৌদির বোন, অরুণদার সঙ্গে আপনার বিশেষ মধুর সম্পর্ক। আমি আবার তাঁর আপনার লোক। লজ্জার কী আছে?"

পত্রলেখা ফোঁস করে উঠল—"আমি অত লজ্জার ধার ধারি না। তা যদি ভেবে থাকেন, ভুল করবেন, ক্যাপটেন লাহিড়ী।"

শিহরণ অপ্রস্তুত হল, কথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল—"এখানে প্রায়ই আসেন?"

"না, আজেবাজে ছবি আমি দেখি না। তবে ভালো ছবি এলে আসি বইকি। না এলে আমার বয়-ফ্রেন্ডসরা রেহাই দেয় না। কি?"

সুলেখার চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল। হতভাগা মেয়ে বলে কী? মান মর্যাদা আর কিছু রাখলে না। এ সব শুনে শিউ-ঠাকুরপো আর ঐ মেয়ের দিকে চাইবে? সে ডাকল—"লেখা—"। ডাক শুনে দিদির মুখের দিকে চেয়েই পত্রলেখা চোখ নামিয়ে নিল, তার মুখে দুষ্টামির হাসি খেলে গেল। রাগে সুলেখার কাণ-মাথা গরম হয়ে উঠল, ভাবল এখন আসল ছবিটা আরম্ভ হলে বাঁচা যায়।

শিহরণ ঘাড় ফিরিয়ে পত্রলেখাকে জিজ্ঞাসা করল—"আপনি রাজস্থানের দিকে কখনও বেড়াতে গেছেন?"

"কই আর গেলাম? আমার ফ্রেন্ড তপন অবশ্য বলেছে অনেক দেশ দেখাবে। গত পুজোর ছুটিতে নিয়ে যাবার চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু বাবার জন্যেই যেতে পারলাম না। কার কাছে ওঁকে রেখে যাব? দাদার ত আর ফেরবার নাম নেই, যা দেখছি, শেষ পর্যন্ত বিলেতেই বাস করবে। এবার মনে করছি, জোরজার করে বেরিয়ে পড়ব, নইলে আর হবে না।"

"বেশ ত, এবারের ছুটিতে আজমীরেই আসুন না? অবশ্য ওখানে গেলে কষ্ট বই আরাম হবে না। তা ছাড়া কোনও মেয়েই আমার বাড়িতে নেই। তবে ওদিককার সব জায়গাগুলো আমি দেখিয়ে দিতে পারব।"

"অনেক ধন্যবাদ। আমার কোনও আপত্তি নেই। বলুন না আমার দিদিকে? বাবাকে রাজি করানো এক মিনিটের কাজ। আমি জানি, দিদি রাজি হবেন না।"

"কেন রাজি হব না, লেখা? তোর যেমন কথা! শিউ-ঠাকুরপোর ওখানে যদি যাস, অরাজি হবার কি আছে? করবীও তোর সঙ্গে যেতে পারবে। অনিলকেও পাঠিয়ে দোব। ইনিও নয় ক'দিনের জন্যে যাবেন। বাবার কাছে আমিই থাকব।"

ইনটারভ্যালের পর মূল ছবি আরম্ভ হল। 'শো' শেষ হতে ওরা ভিড় ঠেলে মোটরে গিয়ে উঠল। গাড়িতে সকলেই চুপচাপ। ছবিটা ছিল বিয়োগান্ত, শেষ দৃশ্যটা সকলেরই মনে রেখাপাত করেছে। ওরা তিনজনেই সেইটের কথা ভাবছে। গাড়ি হাজরা রোডে এসে থামতেই সুলেখা বলল—"চলো না ঠাকুরপো, আমার বাবার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই? তিনি তোমায় দেখলে খুব খুশী হবেন।"

"আজ আর হয় না বৌদি, এখনই আমায় একটা ডিনারে যেতে হবে।"

ছোট্ট একটা নমস্কার করে পত্রলেখা নিঃশব্দে গাড়ি থেকে নেমে গেল। উপরে উঠেই সে দেখল, বসবার ঘরে আলো জ্বলছে। পর্দা ফাঁক করে তপনকে দেখে তার বুকখানা ধক করে উঠল। তপন গালে হাত দিয়ে দেওয়ালের দিকে চেয়ে কী ভাবছে। পত্রলেখা ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল—"তুমি এখনও বসে যে? রাত্রির ত অনেক হয়েছে, প্রায় ন'টা বাজে।"

"জানি ইচ্ছে করেই বসে আছি। এতক্ষণে তোমার আমোদ-আহ্লাদ শেষ হল বুঝি? সে নতুন আগন্তুকটি কই? দেখতে পাচ্ছি না যে?"

উত্তর না দিয়ে পত্রলেখা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"দাঁড়িয়ে রইলে যে? এখানে এসে বোসো। আমার যা বলবার আছে, তা আজই বলে যাব। আশা করি সেটুকু শোনবার তোমার সময় হবে।"

আবার তার মুখের দিকে তপন চাইল, দেখল পত্রলেখার মুখখানা থমথম করছে, যেন মোমের পুতুল, তাতে প্রাণের কোনও চিহ্ন নেই। অল্প একটু পরেই তার ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল, সে বলল—"এখনই খেতে যেতে হবে। বাবা আমার জন্যে বসে আছেন। তিনি জেনেছেন, আমি এসেছি।"

রাগে তপনের মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল তার চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি যেন পত্রলেখাকে জ্বালিয়ে দিতে চাইল। উঠে এগিয়ে গিয়ে তপন আর একটা হাত ধরে টেনে এনে পাশে বসাল। "বাবা ওঁর জন্যে বসে আছেন, আর আমি বসে নেই? সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টা থেকে এই এখন পর্যন্ত বসে আছি। তা এটা বুঝি গ্রাহ্য করবার জিনিষ নয়? মিলিটারী অফিসারকে দেখে মুহূর্তের মধ্যেই বুঝি মাথা ঘুরে গেছে? ছি, ছি, তোমরা এত হাল্কা? এই যদি তোমার মনের ভাব, তা হলে আমাকে কথা দিয়েছিলে কেন? ধনীর দুলালী তোমরা গরীবকে ভালবাসতে জানো, না কদর করতে পারো? তোমরা মানুষের ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স দেখেই বেড়াও, আর নিজেদের দরকার মেটাবার জন্য গরীবদের কৃপা করে, বাঁদরের মতন তাদের নাচাও। আমি যদি গরীব না হতুম, তা হলে আজ তোমার ঐ কুসংস্কার ভরা মোটা দিদিটি আমারই পায়ে এসে লুটিয়ে পড়ত বোনকে উদ্ধার করবার জন্যে। কিসের জন্যে তুমি আমার এতখানি ক্ষতি করলে? তোমার ঐ মুখের কথায় না ভুললে আমার জীবনের মোড় আজ ঘুরে যেত। জানি, বড়োলোকের মেয়ে তুমি গরীবের সংসারে আসবে না। অকারণ আমায় নিয়ে কেবল পুতুল খেলা করলে!" থরথর করে তপনের সারা শরীর কাঁপতে লাগল।

নীচে থেকে ব্রজেনবাবু ডাকলেন—"লেখা, লেখা, কোথায় গেলে? আমি তোমার জন্যে বসে আছি। খাবে এসো।"

পত্রলেখা চমকে উঠল। উদ্যত কান্না জোর করে চেপে সে দাঁড়িয়ে উঠে বলল—"চললাম তপন, বাবা ডাকছেন।" জলভরা চোখে তার দিকে চেয়ে এক ঝলক দৃষ্টি দিয়েই পত্রলেখা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

(২)

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শেষ হলে পত্রলেখা গঙ্গার ধারে গিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল, সন্ধ্যা নামবার পর বাড়ি ফিরল। মন তার খুব খারাপ হয়ে আছে। সেদিন রাত্রে সেই যে তপন চলে গেছে, তারপর ওর তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। তার মেসে খবর নিয়ে জেনেছে, গত সপ্তাহে সে কোথায় বাইরে গেছে, কী কাজের চেষ্টায়। তাকে অনেক কিছু ওর বলবার ছিল। সেদিন তপনের অতগুলো কথার একটারও সে জবাব দিতে পারেনি, শুধু সময়ের অভাবেই। অমন অসময় যদি না হত, বাবা যদি না ওকে খেতে ডাকতেন, তা হলে পত্রলেখা তপনের প্রত্যেক কথারই উত্তর দিতে পারত।

তপন কী করে ভাবতে পারল, তিল তিল করে গড়ে ওঠা তাদের এতদিনের ভালবাসা এক মুহূর্তে শেষ হয়ে যাবে? তাই কি কখনও যায়? গরীব বলে পত্রলেখা তাকে ঘৃণা করেছে! গরীব ত সে চিরকালই। যখন স্কটিশচার্চ কলেজে থার্ড ইয়ার ক্লাসে প্রথম তার সঙ্গে দেখা হয়, তখনই ত সে জেনেছিল তপন কী দুরবস্থায় থাকে। সেজন্য সে আপনা থেকেই তাদের সংসার খরচের টাকা থেকে কতদিন তপনের কলেজের মাইনে দিয়েছে, পড়বার বই কিনে প্রেজেন্ট করেছে, তা ছাড়া এটা-ওটা ত আছেই। কী করেনি পত্রলেখা? সংসারের টাকা মাস কাবার হবার অনেক আগেই শেষ হয়ে যাওয়াতে বাবা কতদিন বিরক্ত হয়েছেন। তবুও সে তাঁকে কোনও দিন কোনও কিছু বলে নি।

মা মারা যাবার পর থেকেই তার মনটা সব সময়ে ফাঁকা হয়ে থাকত। তপনই প্রথম তার সঙ্গ দিয়ে হাসিগল্পে তার মনটা স্বাভাবিক করে দিয়েছিল। মিটিংএ, জলসায়, নাচের আসরে তপনই প্রথম ওকে নিয়ে যেতে শুরু করে। এমনি করে ওদের বন্ধুত্ব ক্রমশঃ নিবিড় প্রেমে পরিণত হল। মাঝে মাঝে পত্রলেখা অবাক হয়ে ভাবে, কী করে কী হল? গরীব ত তপন ছোট বেলা থেকেই। কোন্ শৈশবে সে বাবা-মাকে হারিয়েছে, ঠিক করে বলতেও পারে না। পরের আশ্রয়ে থেকে নিজের আপ্রাণ চেষ্টায় সে লেখাপড়া শেখে। শেষে স্কুল ফাইন্যাল পাস করে কলেজে ঢোকে। তার অনেক ইতিহাস।

ভালো করে বি-এ পাস করেছিল তপন, এম-এও পড়ছে। তা ছাড়া কাজের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আই-এ-এস, আই-এ-এ-এস ইত্যাদি একটার পর একটা পরীক্ষা সে দিচ্ছে, কিন্তু কৃতকার্য হতে পারছে না। সে বলে—একটা কিছু কাজ জুটে গেলেই পত্রলেখাকে বিয়ে করে সে ঘর বাঁধবে। এ সুখের স্বপ্ন ওরা দুজনে প্রায়ই দেখে। লেকের ধারে, কি গঙ্গার জেটির উপরে বসে কত দিন কত সময়ে ওরা এই সব আলোচনা করে। তপনকে না পেলে পত্রলেখা বাঁচবে না। ওকে ছাড়া অন্য কাউকে সে স্বামী বলে ভাবতেও পারবে না। শুধু এই জন্যই ক'দিন ধরে পত্রলেখা বাবার কাছে গিয়ে সব

কথা বলব-বলব করেও বলতে পারছে না, কেমন যেন একটা সংকোচ এসে তার গলা চেপে ধরে।

তপনের বিলাত যাবার এত শখ। কত সময়ে বলে, 'কেউ যদি টাকা দিয়ে আমায় সাহায্য করে, তা হলে ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত যাই। ফিরে এসে রোজগার করে আমি তার সমস্ত সুদে আসলে শোধ করে দোব। আমার বলবার শক্তি আছে, মুখ যদি একবার খুলে যায়, আমি হাজার হাজার টাকা উপায় করব।' কিন্তু কে ওকে টাকা দিচ্ছে? পত্রলেখা ভাবে, ইচ্ছা করলে বাবাই ত বিলেত পাঠিয়ে দিতে পারেন। দাদার জন্যে রাশি রাশি টাকা ঢালছেন, শুধু জলে যাচ্ছে। তপনকে দিলে সে টাকার সদ্ব্যয় হত, কাজ করে আসতে পারত।

এমনি করে আর কতদিন অপেক্ষা করা যায়? তার চেয়ে দুজনে রোজগার করে সংসার চালাবে। না হয় কষ্ট করেই চলবে, উপায় কী? এদিকে এ ভাবে চললে দিদির উৎপাত বেড়ে যাবে।

এই সব ভাবতে ভাবতে বাড়ি এসে উপরে উঠতেই পত্রলেখার দেখা হল করবীর সঙ্গে। সতেরো বছরের মেয়ে, স্কুল ফাইন্যাল পাস করে সবে কলেজে ঢুকেছে। করবীর মুখের দুপাশে দুটি বেণী লম্বা হয়ে সাপের মতো দুলছে। ছুটে এসে পত্রলেখাকে জড়িয়ে ধরে সে বলল— "মাসীমা, এখন বুঝি ইউনিভার্সিটির লেকচার হয়? সেই কখন বিকেলে আমরা এসেছি, সন্ধ্যে হয়ে গেল, আমাদের ফেরবার সময় হল, অথচ তোমার দেখা নেই। শিউ-কাকা শুদ্ধ এসেছিলেন। পার্টি আছে বলে এই একটু আগে চলে গেলেন।"

"তোরা আসবি, তা আমি কী করে জানব? আগে কিছু জানিয়েছিলি?"

"কী করে জানাবেন মা? শিউ-কাকার আসবার কিছু ঠিক ছিল না। হঠাৎ সময় পেলেন, তাই ত আমাদের আসা হল। উঃ, কী এনগেজমেন্টই ভদ্রলোকের রয়েছে, নিঃশ্বেস ফেলবার সময় পান না। জান মাসীমা, আমি কত করে তাঁকে বললাম, 'কেল্লার ভেতরটা একবার দেখিয়ে দাও, কখনও দেখিনি।' তা 'দেখাব', 'দেখাব'ই বলেছেন। কালই ত রাত্তিরে শিউ-কাকার কেল্লায় ডিনার ছিল। তুমিও যেমন, উনি আর দেখিয়েছেন! সময় কোথায়? কালই ত চলে যাচ্ছেন। সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে কেন এসো না? দাদু যে তোমায় ডাকছিলেন, আগে তাঁর কাছে যাও, কী দরকার আছে।" করবীর চোখ-মুখ দিয়ে হাসি ফেটে বেরোচ্ছে। পত্রলেখার একটা হাত ধরে টানতে টানতে সে ব্রজেনবাবুর ঘরের ভিতর নিয়ে গেল। "এই যে দাদু, তোমার মেয়ে হাজির, কী বলবে বলো। দাও দেখি তোমার বই-খাতা, মাসীমা? আমি এগুলো তোমার পড়ার ঘরে রেখে আসি।" পত্রলেখার হাত থেকে বই-খাতা নিয়ে করবী চলে গেল।

বিরক্তি ভরা গলায় সুলেখা জিজ্ঞাসা করল —হ্যাঁরে লেখা, গিয়েছিলি কোথায়? বাড়িতে কেউ বলবার নেই বলে যা ইচ্ছে করে বেড়াবি? আর দরকার নেই তোর এম-এ পড়ে। পড়া বন্ধ না হলে তোর ট্যাং ট্যাং করে ঘোরাও বন্ধ হবে না। বাবা, সত্যি এবারে ওর পড়া বন্ধ করো। যত বলি, তুমি ত কথা কানে নাও না। লেখা যদি একটা বিপদে পড়ে যায়, তখন কী করবে?"

স্নিগ্ধস্বরে ব্রজেনবাবু মেয়েকে ডাকলেন— "এসো লেখা, এখানে এসে বোসো, মা। আজ এত দেরি হল কেন?" পত্রলেখা তাঁর পায়ের কাছে বসতেই তিনি তাকে টেনে নিয়ে পাশে বসালেন।

সুলেখা বলল—"বাবার কথার উত্তর দে, চুপ করে আছিস কেন?"

"গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম, বাবা।"

তীক্ষ্মস্বরে সুলেখা বলে উঠল—"রাত দুপুরে সেখানে কী আছে, শুনি? বুড়ো মেয়ের সন্ধ্যে অবধি চরে চরে বেড়ানো আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। যা, এবার আজমীঢ় গিয়ে মজা বুঝবি! বেড়ানো তোর বন্ধ হবে।" একটু থেমে সুলেখা আবার বললে—"অনেক কষ্টে শিউ-ঠাকুরপোকে রাজি করিয়েছি। ও কি সহজে রাজি হয়? আজকালকার ছেলেমেয়ে সকলেই অমনি! এখন ভালোয় ভালোয় শুভ কাজ মিটে গেলে বাঁচি। বলেছে, দুমাস পরে ছুটি নিয়ে আসতে পারে। তার আগে সম্ভব নয়। এদিকে আমাদেরও ত জোগাড় করতে সময় লাগবে?"

"তার মানে?" ভ্রু কুঁচকে পত্রলেখা বিরক্তিপূর্ণ মুখে দিদির দিকে চাইল। আধখোলা চুলগুলো তাল পাকিয়ে পিঠে দুলছে। শাড়ি-ব্লাউজ ঘামে ভেজা। আঁচল দিয়ে মুখখানা রগড়ে মুছে নিয়ে পত্রলেখা আবার তীক্ষ্ম-দৃষ্টিতে উত্তরের অপেক্ষায় দিদির দিকে চেয়ে রইল।

তার মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হাসতে হাসতে সুলেখা ব্রজেনবাবুকে বলল—"বাবা, ওকে ভালো করে বুঝিয়ে বলো না? আমি ত চিরকালই ওকে দেখতে পারি না, সব তাতেই বাধা দিই! ওর জন্যে কে কিছু করবে?"

ব্রজেনবাবু পত্রলেখার গলা জড়িয়ে আরও একটু কাছে টেনে এনে বললেন—"জানো মা, লেখা, ছেলেটিকে আমার ভালোই লাগল! ওরা ওর খোঁজ-খবরও নিয়েছে, কোনও খুঁত নেই। তোমার মা নেই, দিদিই সে জায়গা নিয়েছে। কাজেই এ বিয়ের বিষয়ে আমি নিশ্চিন্তই হয়েছি। তা ছাড়া ছেলেটির সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমিও বেশ তৃপ্তি পেলাম। তোমার অযোগ্য হবে না। দেখে-শুনে আমি নিজেই তাকে এ বিয়ে হবে বলে মত দিয়েছি।"

"কেন তুমি তাঁকে কথা দিলে বাবা? তুমি দিলেই আমি বিয়ে করব?"

ব্রজেনবাবু থতমত খেলেন। সুলেখা স্তম্ভিত হল। সে ভাবটা চট করে চেপে সে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—"বাবার কথায় তোর বিয়ে হবে না ত কার কথায় হবে? তোর নিজের কথায়?"

"নিশ্চয়ই। বিয়ে আমি করব, কাজেই আমার যাকে ভালো লাগবে, পছন্দ হবে, তাকেই করব। এ বিষয়ে তোমাদের কারও কথা শুনব না।" রেগে লাফিয়ে পত্রলেখা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অপমানে ব্রজেনবাবুর মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। খানিকক্ষণ স্থির হয়ে চুপ করে বসে তিনি বললেন—"সু, তুমি ওর কথায় কিছু মনে কোরো না, মা। তোমাদের মা গিয়ে ও অমনি আবদেরে হয়ে উঠেছে। লেখার মাথা ঠান্ডা হলে ওকে বুঝিয়ে বলে দেখব।"

রাগে ফুলতে ফুলতে সুলেখা উত্তর দিল— "হাঁ, তোমার কথা শুনতে ত ওর বয়ে গেছে! শুধু এই জন্যেই আমি ওর বিয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। দিনরাত যত ছোঁড়ার দল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়! তুমি তার কতটুকু খবর জানো, বাবা? আমি জানি বলেই শিউ-ঠাকুরপোকে ধরতে গিয়েছিলাম। আমি আর ও মেয়ের কোনও কিছুর মধ্যে নেই, তুমি বোঝো গে। শিউ-ঠাকুরপোর বিয়ের অভাব হবে না, হাজারটা মেয়ের বাপ এই ক'দিনেই আমার দরজা ক্ষইয়ে ফেললে!" সুলেখা দাঁড়িয়ে উঠে বাবাকে প্রণাম করে চলে গেল। ব্রজেনবাবু ফ্যাল ফ্যাল করে তার যাবার পথে চেয়ে রইলেন।

(৩)

নিজের ঘরে গিয়ে পত্রলেখা দরজা বন্ধ করে কান্নায় ভেঙে পড়ল। খাটের উপর আছড়ে পড়ে সে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। বাবাকে, দিদিকে তার শত্রু বলে মনে হল। এই শত্রুপুরীতে থাকতে হবে ভাবতেই যেন তার শ্বাস বন্ধ হয়ে এল। না, আজ রাতেই যা হয় একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে, এ বাড়ি ছেড়ে সে চলে যাবে, কিছুতেই এখানে থাকবে না। তপনকে না পেলে ওর জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে! আহা, কী সব ও'দের অন্ধ কুসংস্কার! দিদির কোন্ কালে তেরো কি চৌদ্দ বছর বয়সে বাবা-মা নিজেরা দেখে তার বিয়ে দিয়েছিলেন, আর দিদি তাই মেনে নিয়েছিলেন বলে পত্রলেখা বাইশ বছর বয়সেও তাইতে রাজি হবে? অজানা, অচেনা পুরুষকে বিয়ে করে কেন নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবে? ও'দের ইচ্ছায় সে নিজেকে বলি দিতে পারবে না।

দরজায় ঘা পড়ল—"খাবার দেওয়া হয়েছে, ছোটদি। খাবেন আসুন। বাবু বসে আছেন।"

"আঃ"—বিরক্ত হয়ে পত্রলেখা উঠে দাঁড়াল, দরজার এ পিঠ থেকে উত্তর দিল—"আমি খাব না, বাবুকে খেতে বলোগে।"

চাকর ফিরে গেল। আর কেউ তাকে বিরক্ত করতে এল না, বাবাও নয়। আলমারি থেকে কয়েকটা জামা-কাপড় ও কিছু টাকা বার করে নিয়ে পত্রলেখা যাবার জন্য তৈরি হল। রাত তখন দশটা বেজে গেছে। নিঃশব্দে সে ঘরের দরজা খুলল। রাস্তায় তখনও বাস, ট্যাক্সি চলাফেরা করছে। ব্রজেনবাবুর ঘর থেকে নাক ডাকার শব্দ আসছে। নীচে চাকর বামুন শুয়ে পড়েছে। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। নীচে গিয়ে পত্রলেখা সদর দরজা খুলে পথে নামল, দরজাটা ভেজিয়ে দিল। মোড়ে গিয়ে বাস ধরে কালীঘাটের পুল পার হয়ে গোপালনগর রোডে নামল। চেৎলার দিকে অল্প দূর গিয়েই একটা মেস বাড়ির সামনে এল। সে বাড়ির সদর দরজা তখনও খোলা। ভিতরে আলো জ্বলছে, লোকজনের গলা শোনা যাচ্ছে। পত্রলেখা দরজার কড়া নাড়ল।

মেসের চাকর বেরিয়ে এসে অত রাত্রে একটি মেয়েকে সামনে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল—"কে আপনি? কাকে চান? বাবুরা সব শুয়ে পড়েছেন। এটা মেস বাড়ী, জানেন কি?"

"জানি। তুমি তপন বাবুকে একবার ডেকে দাও।"

"তিনি ত এখানে ছিলেন না। সবে আজ বিদেশ থেকে ফিরেছেন। সকাল সকাল খেয়েই শুয়ে পড়েছেন।"

"তা হোক, তাঁকে উঠিয়ে দিয়ে বলো, বড়ো জরুরী দরকার, একবার যেন নীচে আসেন।"

তপন ঘুমচোখে নেমে এসে সামনে পত্রলেখাকে দেখে চমকে উঠল, মুখ দিয়ে তার কথা বেরোল না।

"অমন করে চেয়ে আছ কেন? কথা আছে! চলো, বাইরে কোনও পার্কে যাই।"

"পাগল নাকি? এত রাত্তিরে পার্কে গিয়ে পুলিশের হাতে পড়ি! প্রয়োজন থাকলে ডেকে পাঠালেই হত, আসবার কি দরকার? আজ বরং ফিরে যাও, কাল সকালে তোমার ওখানে যাব।" হাই তুলে চোখ রগড়ে তপন বলল—"আমিও বড্ড ক্লান্ত, সবে আজ ফিরেছি কিনা।"

"আজই তোমায় শুনতে হবে, তপন। কাল আমার সময় হবে না। আমি বাড়ি থেকে চলে এসেছি, আর সেখানে ফিরব না। চলো, আমরা কোথাও পালিয়ে যাই। টাকার জন্যে ভেবো না, সঙ্গে এনেছি।"

একটু থেমে সে বলল—"কী করব বলো? দিদির অত্যাচারে বাধ্য হয়েই এ পথ আমায় নিতে হল। নইলে ভেবেছিলাম, তোমার একটা কাজ-টাজ জুটলে তারপর যা হয় করব। কিন্তু এখন দেখছি তার উপায় নেই। সব আগে আমাদের বিয়েটা সেরে ফেলা দরকার। কী হল তোমার? আকাশ থেকে পড়লে যেন! কিছু নতুন কথা শুনিয়েছি নাকি?"

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে তপন জিজ্ঞাসা করল—"তোমার মাথাটা ঠিক আছে ত?"

"কেন, না-ঠিক থাকবার কিছু লক্ষণ দেখছ?"

"তা দেখছি বই কি, লেখা। তোমরা বিরূপ হতেও যেমন, করুণা করতেও তেমন! কিন্তু আমি আমার মনকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করেছি।"

বাড়ির ভিতর ঢুকে পত্রলেখা পাশেই একটা ছোট খালি ঘর দেখে সেখানে ঢুকল। তপনও তার পিছু পিছু গেল।

পত্রলেখা বলল—"বললাম,—'চলো, কোথাও বসিগে।' রাজি হলে না।"

"কী করব বলো? পুলিশের হাতে পড়লে তোমরা ছাড়ান পেতে পারবে, তোমাদের পয়সা আছে। কিন্তু আমরা গরীব, মারা পড়ব যে? ফিরে যাও লেখা, ছেলেমানুষি কোরো না। আমার ঘরে তোমায় মানাবে না। তোমার দিদি যা করছেন তাতে রাজি হও গে।"

অভিমানে দুঃখে পত্রলেখা থর থর করে কেঁপে উঠল। চোখ দিয়ে তার দর দর বেগে জল গড়িয়ে পড়ল। "এত বড়ো কথা তুমি মুখ দিয়ে বার করতে পারলে, তপন? যার জন্যে আমি সর্বস্ব ত্যাগ করে এলাম, ভিখারীর মতো যার কাছে আশ্রয় চাইতে এলাম, সে এই কথা বললে? দিনকে রাত বললেও আমি বিশ্বাস করতে পারতাম তপন, কিন্তু তোমার এ কথা বিশ্বাস করতে পারছি না। আমায় ভুল বুঝো না। সেদিন রাগ করে চলে গেলে, কিন্তু আমার কোনও দোষ ছিল না।"

নির্বিকার মুখে তপন জবাব দিল—"যা সত্যি, তাই বলেছি, লেখা। আস্তে কথা বলো, ঠাকুর বামুন জেগে আছে, শুনতে পাবে। তা ছাড়া যোর যে যাই করুক, তোমার মতো মেয়ের এভাবে সীন করা উচিত হয় না।"

চাপা গলায় কান্নাভরা স্বরে পত্রলেখা বলল—"তা হলে সত্যিকারের ভালো তুমি আমায় কোনও দিনই বাসতে না? তা যদি বাসতে, এমনি করে ফিরিয়ে দিতে পারতে? আগে আমি তোমার প্রেম ভিক্ষে করতে যাইনি, তুমি নিজেই আমার সর্বনাশ করেছ।"

"হয়ত তাই। কিন্তু মানুষ সহজে ত তার নিজের ভুল বুঝতে পারে না? আমিও তাই পারিনি। তবে যে মুহূর্তে বুঝেছি, তখন থেকেই নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করেছি।"

একটু ইতস্ততঃ করে তপন আবার বলল—"তা ছাড়া, তা ছাড়া, গত সপ্তাহে জিয়নহাটির জমিদারের মেয়েকে আমি বিয়ে করেছি। মেয়েটি ময়লা, লেখাপড়াও বিশেষ জানে না। কিন্তু জমিদারী এখন না থাকলেও তাঁরা পয়সাওয়ালা লোক, শীগ্‌গির আমায় বিলেত পাঠিয়ে দিচ্ছেন, বলেছেন—মানুষ হবার অনেক সুযোগ সুবিধে করে দেবেন।......"

চমকে উঠে পত্রলেখা সোজা হয়ে দাঁড়াল। মুহূর্তের মধ্যে তার সমস্ত চেহারা বদলে গেল। চোখ ফেটে যেন আগুন বেরিয়ে আসছে, সারা মুখ থেকে ঘৃণা উপচে পড়ছে। দাঁতে দাঁত চেপে কঠিন স্বরে সে বলল—"তা হলে টাকাটাই তোমার সব ছিল? এখন বুঝতে পারছি, ভালবাসার ভান করে অনেক টাকাই আমার কাছ থেকে তুমি নিয়েছিলে, শুধু নিজের সুবিধের জন্যে। সুবিধাবাদী, স্বার্থপর, এ্যাডভেঞ্চারার কোথাকার! এতদিন আগে এ মুখোশ খোলোনি কেন?"

পিছন ফিরেই উত্তরের অপেক্ষা না করে পত্রলেখা ঝড়ের বেগে ছুটতে লাগল। বাড়িটা পেরিয়ে সে জনশূন্য রাস্তায় এসে পড়ল। হাতে তার এ্যাটাশে কেস, আঁচল লুটোচ্ছে, চুল উড়ছে। পত্রলেখা দিশাহারার মতো একইভাবে ছুটছে।

চন্দ্র-সূর্য কথা

(১৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

পারলাম না। বল শুনি, কোন্ স্থান রবীন্দ্রনাথের।"

শরৎচন্দ্র বললেন, "রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়।"

দ্বিতীয়!

শরৎচন্দ্র যদি বলতেন, 'রবীন্দ্রনাথ চতুর্বিংশ—তাহলে তাঁর ওপরে তেইশজন কা'রা তা' জানতে নিশ্চয়ই ব্যস্ত হতাম না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বলতে যে-প্রশ্নটি তড়িৎ বেগে মনে উদিত হল, শরৎচন্দ্র ঠিক সেই প্রশ্নটিই ক'রে বসলেন। বললেন, "এবার বল প্রথম কে?"

একটু চিন্তা ক'রে বললাম, "এ প্রশ্ন আরও কঠিন। ফেল করলাম। তুমি বল প্রথম কে।"

শরৎচন্দ্র বললেন, "প্রথম বেদব্যাস।"

বেদব্যাস! ও হরি! ওদিকের কথা ত' একবারও ভাবিই নি! বললাম, "কালিদাস, বাল্মীকি, ভবভূতি,—এঁরা?"

শরৎচন্দ্র বললেন, "এঁরা অনেক পরে। প্রথম হ'তে দ্বিতীয়র যা' ব্যবধান, দ্বিতীয় হ'তে তৃতীয়র ব্যবধান তার চেয়ে অনেক বেশি।"

বকল্যাণ্ড ব্রিজের গল্প শেষ করে চেয়ে দেখি রবীন্দ্রনাথের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের আর অপরাধ কোথায়? স্বয়ং বিধাতাকে যদি বলা যায়, লেখকদের মধ্যে বেদব্যাস প্রথম, আপনি দ্বিতীয়,—তাহলে তাঁর মুখও আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

বললাম, "এই আপনার রবীন্দ্রবিদ্বেষী শরৎচন্দ্র। আপনার সেরা ভক্তদের কারোর চেয়ে সে খাটো নয়। নিয়ে আসবো তাকে আপনার কাছে?—গ্রহণ করবেন তাকে?"

দুই বাহু প্রসারিত করে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "দু'হাত দিয়ে।"

আর কথাটি নয়। সোজা অশ্বিনী দত্ত রোডে গিয়ে শরৎচন্দ্রের কাছে হানা দিলাম। বললাম, "যেতে হবে তোমাকে রবীন্দ্রনাথের কাছে,—ও ছাই-ভস্ম মনোমালিন্য ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে হবে।"

বিদেয় করতে পারলে ত' শরৎচন্দ্র স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচেন। মনে মনে তিনি কম অসুখী ছিলেন না। কিন্তু মনের মধ্যে উদ্বেগও ছিল যথেষ্ট। কম গুলি ত' মারেননি রবীন্দ্রনাথকে। বললেন, "গিয়ে কাজ নেই উপীন। রেগে আছেন আমার ওপর। হয়ত খুব বকাবকি করবেন।"

বললাম, "না, করবেন না। বলেছেন, তুমি গেলে দু'হাত দিয়ে তোমাকে গ্রহণ করবেন। এর পর তুমি যদি না যাও, ত হলে তুমিই হারলে।"

এ কথার পর সম্মত না হয়ে আর উপায় রইল না। পরদিন অপরাহ্নে শরৎ ও আমি বরানগরে প্রশান্তবাবুর বাসায় উপস্থিত হলাম।

দীর্ঘ বারান্দার শেষপ্রান্তে রবীন্দ্রনাথ একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে ছিলেন। আমাদের দেখে সোজা হয়ে বসে হর্ষোৎফুল্ল মুখে বললেন, "এস শরৎ!"

দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে নত হ'য়ে রবীন্দ্রনাথের পায়ের ধুলো গ্রহণ করে শরৎচন্দ্র পাশের চেয়ারে উপবেশন করলেন।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "তারপর, কেমন আছ বল?"

সহজ সুরে সাধারণ কথা আরম্ভ হয়ে গেল। বিরোধের কথা কেউ উল্লেখ করলে না, কোনো কৈফিয়ৎ দিলে না কেউ। উভয়ের চিত্তভূমি যে চিড় খেয়েছিল, তা' একেবারে বেদাগ মিলিয়ে গেল।

দুর্লভ

সব পেতে পারো, পাবেনা কেবল
মনের মতন মন,
পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে সেরা
সে যে দুর্লভ ধন।

—ম-ব

দুর্লভ নায়িকা

রাণু ভৌমিক

পদ্মকে নিয়েই গল্প লিখব ঠিক করলাম। পদ্ম আমাদের ঠিকে ঝি। প্রস্তাব শুনে একজন বললেন, হ্যাঁ, তাই লেখ। বর্তমান জগতের দুর্লভতম বস্তু। তারপরে একটু হেসে আবার বললেন, বয়স কত? চেহারা?

আমি উত্তর দিলাম, সে সবই ঠিক আছে। —বলতে বলতেই পদ্ম যেন আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়াল। প্রথম দিনের পদ্ম—আজকের পদ্ম।

আজ সকালে ওর প্রতিবেশিনী বুড়ী ঝিটা এসে খবর দিল, পদ্ম আসবে নি। সংবাদ শুনেই চিত্ত-চমৎকার। সেই অবসন্নতার মধ্যেই শুনতে পেলাম বুড়ী ওকে রাশি রাশি গাল দিচ্ছে।

—অসুখ করেছে তা তুমি গাল দিচ্ছ কেন? নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করি।

—গাল দেব নি? গর্জে ওঠে বুড়ী, মুখপুড়ীর গায়ের জ্বালা এত জ্বালা! এতগুলি কাচ্চাবাচ্চাকে খেতে দিতে পারে না, না খেয়ে সেদিন একটা মল। তবু আবার... লজ্জা নেই! বুড়ীর বাক্যস্রোত অবিরাম ধারায় বইতে থাকে।

এতক্ষণে বুঝতে পারি, কি ঘটেছে। স্তব্ধ হয়ে যাই। শুধু বুঝি না, কেন? প্রথম দিনের কথা মনে পড়ে।

সেদিনও এই বুড়ীই নিয়ে এসেছিল পদ্মকে। কালো শীর্ণ একটি মেয়ে। বয়স খুব বেশি হলে পঁচিশ। বুড়ী এসেই কাঁদুনি গাইতে শুরু করল, বড় গরীব, ছ'টি ছেলে-মেয়ে নিয়ে অবলা নারী ...

ছ'টি! আশ্চর্য! এই বয়সে?...ওর স্বামী কি করে?

শুনলাম সে কিছুই করে না। তাস খেলে আর তবলা বাজিয়ে বেকার জীবন কেটে যায় তার। সুবিধেমত দিনে দুবেলা এসে খাবারের অধিকাংশই খেয়ে চলে যায় নির্বিকার-ভাবে। তাই পাড়ার পাঁচজনে মিলে ঠিক করে দিয়েছে যে যতদিন সে 'রোজগার' না করতে পারবে ততদিন ঘেঁষতে পারবে না পদ্মর ত্রিসীমায়। তাতেও তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে নিজে কিছু রোজগার করে খায় আর মনের আনন্দে তাস খেলে। সংসারের দিকে ফিরেও তাকায় না। চূড়ান্ত স্বার্থপর ও দায়িত্বজ্ঞানহীন।

পদ্ম কাজ শুরু করে আমাদের বাড়ীতে। দিন দিন ওর চেহারা চিকন আর চোখ চকচকে হয়ে ওঠে। আর সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে ওর চরিত্র।

ঠিকে ঝি—আমার কাছে এতদিন এই ছিল ওদের একমাত্র পরিচয়। আজ দেখলাম ওরা সমষ্টি নয় ব্যষ্টি—প্রত্যেকে একক। সবুজ পাতায় কালিতে টানা স্বতন্ত্র এক একটি রেখা।

পদ্মের মন সূক্ষ্ম। ঠোঁটের চাপা রেখায় আর উজ্জ্বলতায় ফুটে উঠত ওর মনের ভাব। কখনও দেখতাম, ঘরের কোণে পড়ে থাকা শুকনো ফুল বেঁধে রেখেছে আঁচলে, কখনও দেখতাম দেয়ালে টাঙানো বড় বড় শিল্পীর আঁকা ছবিগুলির দিকে তাকিয়ে আছে এক-দৃষ্টে—যেন বুঝতে পারছে তাদের রূপরেখার রহস্য।

একদিন শুনলাম জানালার বাইরে থেকে কে ডাকছে—ডলি, ডলি। তাকিয়ে দেখি, অচেনা একটি মেয়ে—ঝি বলেই মনে হল। ডলি আমার একটি অতি উগ্র আধুনিকা বব্‌ড্‌-চুল, নখ ও ওষ্ঠরঞ্জনী-রঞ্জিতা বান্ধবীর নাম। সেই নাম ধরে একটি ঝি এত পরিচিতের মত ডাকছে দেখে হাসি পেল। ডলি এখানে উপস্থিত থাকলে তার মনের অবস্থা কি হত ভাবতে ভাবতে কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে রইলাম—দেখি কে ওর ডলি!

ঝিটি আবার ডাকে, ডলি, এই ডলি।

জলের কলসী নিয়ে ফিরছিল পদ্ম। ওকে দেখেই একগাল হেসে নবাগতা বলে, এই যে, তোকেই এতক্ষণ খুঁজছিলাম।

আমি অবাক! তাহলে পদ্মই ডলি। মনে পড়ে দুদিন আগেই ডলি বেড়াতে এসেছিল। তীক্ষ্ণ চোখ আর চাপা ঠোঁটে অনেকক্ষণ ওকে পর্যবেক্ষণ করেছিল পদ্ম। চলে যাবার পর প্রশ্ন করেছিল, ওঁর নাম কি? সেদিন থেকেই তাহলে পদ্মের 'ডলি' হবার ইচ্ছে হয়েছে!

এইভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল। সুখেই ছিলাম আমরা। আজকালকার দিনে পদ্মের মত চেহারায় এবং কাজে নিখুঁত ঝি পাওয়া দুর্লভ। পদ্মও বোধ হয় বেশ খুশীই ছিল। সংসারে কর্ত্রী ও-ই। ওরই পছন্দমত সব কাজ হত। নিজেদের রুচিতে ওকে চালাতে না পেরে ওর রুচিই মেনে নিয়েছিলাম আমরা।

বুড়ী নিজের মনেই বলে চলেছে, এই রকম হলে ও আর কোনও কাজ করতে পারে না। শুয়ে থাকতে হয় দিনরাত। এখন না খেয়ে মরুক সব। কেন যে ...

কেন? —ভ্রূ কুঁচকে ভাবতে থাকি আমি। মনে পড়ে সেদিনের কথা—যেদিন ওর বড় ছেলেটি মারা গেল। না খেতে পেয়ে আগে থেকেই শুকিয়েছিল। চাকরী পেয়েও তাকে বাঁচাতে পারে নি পদ্ম। রাত্রে ছেলেটি মারা গেল, সকালেও সে যথারীতি কাজে এসেছিল। মুখে নেই কোন ভাবের প্রকাশ। শুধু খাবার সময়ে দেখলাম ভাতের গ্রাস হাতে নিয়ে বসে আছে আর দুচোখ দিয়ে জল পড়ছে।

সেদিন বিকেলে ঘর ঝাঁট দিতে দিতে আপন মনে বলে, মানুষ তো নয়, পিশাচ।

কে? —প্রশ্ন করি আমি।

উত্তর না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয় পদ্ম। একটু পরে আবার বলে, একবার তো চোখের দেখাও দেখতে এল না। নিজেরই তো ছেলে...

কানে গেল, বুড়ী বলছে, সোয়ামীর কি দোষ! তুই নিজে তাকে ডেকে নিয়ে এলি। লজ্জা করল না তোর। আমরা পাঁচজনে মিলে কত করে ওকে তাড়ালুম...

ডেকে নিয়ে এল? অবাক হয়ে আমি বললাম, কবে?

—ঐ যে, যেদিন তোমাদের বাড়ীতে এক দিদিমণির বিয়ে হল।

বুঝেছি। মুখর হয়ে উঠতে চায় আমার মন। উত্তর পেয়েছি আমার প্রশ্নের। স্পষ্ট হয়ে গেছে ওর এই প্রহেলিকাময় ব্যবহারের কারণ।

আমার এক ধনী আত্মীয় মেয়ের বিয়ে

(শেষাংশ ২৬৮ পৃষ্ঠায়)

নীলগিরির স্বপ্ন উটাকামান্ড্

স্বর্ণপ্রভা ভাদুড়ী
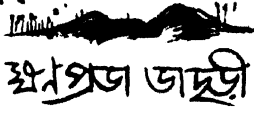
নীলগিরি পর্বতের কোলে ঘন ইউক্যালিপটাস আর পাইনারণ্যের সবুজ সুষমার মধ্যে ঘুমিয়ে আছে কিন্নরী দেশ উটাকামান্ড্। তার স্বপ্ন পুষ্প হয়ে ফুটে ওঠে পাহাড়ে আর বনে। পথিকের পদশব্দে হঠাৎ ঘুম ভেঙে সে দিশাহারা হয়ে হারিয়ে যায় কফি আর টোপিওকার নেশা-রঙগীন চাষের মধ্যে। এখানে নীলগিরির একচোখে পর্বত গুহাশ্রিত অরণ্য আদিম টোডা জাতির ভীরু সারল্য। অন্য চোখে আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার সুস্থ উন্নত জীবনায়নের সফল প্রতিভাস।

সমতল ভূমি থেকে সাড়ে সাত হাজার ফুট উঁচুতে মাদ্রাজের এই শৈলসহরটি অবস্থিত। মেটোপোলায়াম থেকে উটী সুদীর্ঘ ৭০ মাইল পথ নীলগিরি পর্বতমালার অঙ্গ বেষ্টন করে উপরে উঠে এসেছে। ভোরবেলা রওয়ানা হয়ে বেলা প্রায় ১০টার সময় আমরা এসে নামলুম উটী সহরের কেন্দ্রবিন্দুতে একটি পার্কের সামনে। একটা মনোমত আস্তানা খুঁজে নিতে বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল। সমস্ত দাক্ষিণাত্যেই দেখেছি সাধারণ মানুষের মনে ব্রাহ্মণ অ-ব্রাহ্মণের প্রশ্ন বেশ উৎকট হয়ে জেগে আছে। উতাকামান্দের মত পাশ্চাত্যভাবাপন্ন দেশে আজও সে মনোভাবের বিলুপ্তি ঘটেনি। যাহোক এ-পথ সে-পথ ঘুরে অবশেষে একটি হোটেলে ঘর পাওয়া গেল। কিন্তু ঘরের স্বাচ্ছন্দ্য বাঁধবে কাকে? আমাদের তখন চারিদিক থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে পথের ধারে গোলাপ-লতা আর ইউক্যালিপটাসের বন। এমন নিবিড় গভীর ইউক্যালিপটাস বন অন্য কোনও শৈল-সহরে আমি দেখিনি। এদিকে দেখেছি ১টা ১॥টার পরে কোনও হোটেলে আর দুপুরের আহার পাওয়া যায় না। থাকে শুধু প্যাকেটের ভাত। অর্থাৎ দই মিশ্রিত ভাত। কিন্তু এখানে তখনও সব খাদ্যই মজুত ছিল।

আহারাদির পরে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। মাথার উপর বিদায়ী মধ্যাহ্ন সূর্য জ্বল-জ্বল করছে, কিন্তু বাতাসে বরফ-শীতল স্পর্শ। উটী ইংরেজের তৈরী সহর। কাজেই এর সর্বত্র পাশ্চাত্য প্রভাব সুস্পষ্ট। এখানকার মানুষের মধ্যে দুটি ভাগ আছে। ধনী আর দরিদ্র। একদিকে রয়েছে বিত্তশালী ভ্রমণকারী, অবসরপ্রাপ্ত ইংরাজ পরিবার, হোটেল বাস, বাজার, দোকান প্রভৃতির মালিকরা; অপরদিকে রয়েছে বৃহৎ এক শ্রমজীবী সংখ্যা। এরাই নীলগিরি পর্বতের আত্মজ। এদের মধ্যে অনেকে নিরক্ষর হলেও কাজ চালাবার মত ইংরাজী কথা সকলেই কিছু কিছু জানে। উতাকামান্দের রেস-কোর্সের ধারে একটি বলিষ্ঠ কর্মঠ মানুষের চোখের দিকে তাকালেই এক মিনিটে জানা হয়ে যাবে তাদের জীবনেতিহাস। কফি খেতে গিয়ে ভাদুড়ীর সঙ্গে আলাপ হোল এক রেস্তোরাঁ মালিকের। মালায়ালী ভদ্রলোক বেশ অমায়িক। বাড়ী তাঁর কালিকটে। এখানে আছেন ব্যবসার জন্য। এই রেস্তোরাঁর উপরতলায় তাঁর প্রকান্ড বোর্ডিং হাউস। তাছাড়া বেকারী কারখানা আছে। তাঁর স্ত্রী ডাক্তার। বেশ পসার ও সুনাম আছে তাঁর উটীতে। এই শ্রেণীর মানুষেরা সকলেই সচ্ছল অবস্থাপন্ন। এদের নিয়েই গড়ে উঠেছে আনন্দবিলাসময়ী, পর্বত-ঐশ্বর্যভূষিতা উটাকামান্ড্ সহর।

আমরা ঘুরতে ঘুরতে এসে উপস্থিত হলুম মার্লিমান্ড লেকের ধারে। এদিকে বিখ্যাত হ্রদ এটী। নীল জল তার কানায় কানায় ছল-ছল করছে। এপাড়ে ওপাড়ে শুধু অরণ্যবেষ্টিত নীল পাহাড়। সর্পিল গতিতে এঁকে-বেঁকে চলে গেছে হ্রদ পাহাড়ের অঙ্গ ঘিরে। তার তটপ্রান্তে মূর্ছিতের মত পড়ে আছে পীচের রাস্তা। কেউ কেউ দল বেঁধে জলের বুকে নৌকা-বিহার করছে। একটি ইউক্যালিপটাস গাছের নীচে পুরু ঘাসের উপর আমরা গিয়ে বসলুম। ঘাসের মধ্যে ফুটে রয়েছে নানা রং-এর অজস্র ফুল। ঠিক যেন মাটিতে এমব্রয়ডারী করা। আর ঘাসেরই বা কত মনভুলানো বাহার। সবই অযত্ন-বর্ধিত। প্রকৃতির নিজস্ব সম্পদ। এখানেই মানুষের মন দেখতে পায় নিজের প্রতিকৃতি। ছন্দা পাঁপড়ি মুঠো ভরে ফুল তুলে মাথায় পরছে। বাঁশ-ঝাড়ের মধ্যে থেকে মুখ বাড়িয়ে ওদের দেখছে কাঠবিড়ালী। নীলগিরি পাহাড়ের মাথায় ধূসর গুণ্ঠন টেনে নেমে আসছে সন্ধ্যা। হ্রদের জলে কাঁপছে গেরুয়া আলো। ইউক্যালিপটাস পাতার সুগন্ধে বাতাস হয়ে উঠেছে মেদুর। কেমন যেন উদাস আর করুণ। কোথায় কোন্ অলক্ষ্যে কে যেন বসে আছে তার বিশাল হৃদয় সম্প্রসারিত করে। মানুষ দেখতে পায়না তাকে। তাই সন্ধ্যা বাতাসে থম-থম করে একটা সকরুণ ঔদাস্য।

ভ্রমণার্থীরা একে একে সকলে চলে যাচ্ছে। আমরাও এবার উঠবো। কিন্তু হ্রদের জলে কালো ছায়া ফেলে রাতের রহস্যময় নীলগিরি বলছে, "আরো একটু বোসো—এখনি যেও না।"

"ধ্যান গম্ভীর ওই যে ভূধর,
নদী জপমালা ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হের পবিত্র ধরিত্রীরে

এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে"—
রেডিওর গানে ঘুম ভেঙে গেল। দারুণ শীতে কম্বলের মধ্যে সকলে আরাম করে ঘুমোচ্ছিলুম। চোখ খুলেতেই মনে পড়ে গেল আজ ২৫শে বৈশাখ। বিশ্ব-বিখ্যাত বাঙ্গালী কবিকে তাঁর শুভ জন্মতিথির মধ্যে দিয়ে স্মরণ করছে তামিলনাদের মানুষ। আনন্দে গৌরবে মন ভরে উঠল। হোটেলের হলঘরে বিবেকানন্দ-নেতাজীর পাশে টাঙ্গানো ছিল রবীন্দ্রনাথের একটি সুদৃশ্য আলেখ্য। মনে মনে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করলুম কবির চরণে।

নিবিড় কুয়াসায় দিগন্ত আবৃত। হু হু করে বইছে ঠান্ডা বাতাস। শীতে সমস্ত শরীর ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছে। তবুও ভালো লাগছে এর মধ্যে দিয়ে পথ চলতে। পথের পাশে ঝোপে জঙ্গলে ফুটে রয়েছে লতানো ঝাড়ে অজস্র গোলাপী আর রক্ত গোলাপ। পাইন গাছের শাখায় শাখায় কূজন করছে সদ্য ঘুম-ভাঙ্গা পাখীর দল। ইংরেজদের ছেলেমেয়েরা পনীতে চড়ে বেরিয়েছে প্রাতঃভ্রমণে। আমাদের গতিপথ অনিশ্চিত। গোলাপলতার হাতছানিতে চলেছি এগিয়ে। কিছু ইউক্যালিপটাস তেল আর সেন্ট কিনতে হবে। উটীতে একটা জিনিষ লক্ষণীয় যে, এখানে পাহাড়ের অনেক উচ্চস্তর পর্যন্ত সর্ববিধ যানবাহন চলাচল করতে পারে। পথে চড়াই উৎরাই থাকলেও খুব প্রশস্ত। এখানে ডোডাবেটাপিক, আমব্রেলাট্রী আর মার্লিমান্ড লেক বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান। এই স্থানগুলি থেকে সমস্ত উটী সহরটিকে সুন্দর ছবির মত দেখা যায়। পাইকারা ড্যাম এখান থেকে ১৮ মাইল দূরে। এখান থেকে সমস্ত সহরে জল-বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। উটী থেকে মাইসোর যাবার পথে আমরা প্রকান্ড পাইকারা বাঁধ দেখেছি। এখানকার নীলগিরি লাইব্রেরী খুব বিখ্যাত। এই গ্রন্থাগারে অনেক প্রাচীন ও দুর্লভ গ্রন্থাদি আছে এবং গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় কুড়ি সহস্রের ঊর্ধ্বে হবে। নীলগিরি পর্বতে ফুল ফোটে অজস্র। তাই এখানে প্রায়ই পুষ্প প্রদর্শনী হয়।

আমরা একটি সুন্দর এ্যাকুইরিয়াম দেখে প্রহরাধীন রাজভবনের সামনে এসে দাঁড়ালুম। সে মর্মর প্রাসাদে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। বাইরে থেকে তরুরাজি বেষ্টিত প্রকান্ড প্রাসাদটিকে দেখে আমরা এলুম উটীর বিখ্যাত বোটানিক্যাল বাগানে। সুন্দর সুরক্ষিত প্রকান্ড এই উদ্ভিদশালা। বহু বিচিত্র ও বিভিন্ন ধরণের সুন্দর সুন্দর বৃক্ষলতা ও বনস্পতি সমাচ্ছন্ন বাগানটি সত্যই ভারী মনোমুগ্ধকর। মনে হয় বুঝি কোনও মহারণ্যে প্রবেশ করেছি। এই বনস্পতিরাজির মধ্যে যুগ-যুগান্তের তপস্যা সমাহিত হয়ে রয়েছে। একটির পর একটি কুঞ্জ-বীথিকায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কোথাও কোনও সাড়া-শব্দ নেই। শুধু বাতাসে মর্মরিত হচ্ছে বৃক্ষরাজির শাখা-পত্র। মাঝে মাঝে প্রস্ফুটিত পুষ্পোদ্যান ভুলিয়ে দিচ্ছে পথের দিশা। নানা রং-এর ফুল ফুটিয়ে একটি কুঞ্জকে ঠিক ভারতবর্ষের মানচিত্রের আকারে রূপায়িত করে রাখা হয়েছে। তার মধ্যে পুষ্পবিন্যাসে লিখিত হয়েছে জয় হিন্দ। ভারী সুন্দর হয়েছে এই পুষ্পালেখ্যটি।

নীলগিরির মাটিতে রং-এর খনি আছে। তাই তার মাটির সম্পদে এত রং-এর বাহার। ঝরণার ঝরঝরাণি গানে এক সময় আমাদের খেয়াল হোল যে, আমরা এসে পড়েছি ঘন বনের মধ্যে। যেদিকে তাকাও শুধু সবুজ আর সবুজ। কানে বাজছে ঝরণার মিষ্ট কলতান। আমরা এখন ফিরবো কোন পথে? সব পথেরই ত এক রূপ। একটি মানুষও কোথাও দেখা যাচ্ছে না, এ কোথায় এসেছি আমরা? এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে একটি গোলাপ-লতা আচ্ছাদিত কাঁচের কুটীরের ছাদ দেখা গেল। সেই কুটীর লক্ষ্য করে আমরা এগিয়ে এলুম। ভাদুড়ী উপরে উঠে গিয়ে অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করার পর কুটীরের বাতায়নের মধ্যে একটি মানুষের মুখ দেখা গেল। ভদ্রলোক এই নার্সারীর কর্মাধ্যক্ষ।

তাঁর কাছে পথের দিশা জেনে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা এসে উপস্থিত হলুম একটি মুক্ত প্রাঙ্গণে। এইখানে বাস করে নীলগিরির আদিবাসী সামান্য সংখ্যক টোডা সম্প্রদায়। সভ্য মানুষের পাশে বন্য আদিম মানুষের বসবাস কেমন যেন অবিশ্বাস্য লাগে। একজন প্রহরী বেড়া ডিঙিয়ে আমাদের ওদের এলাকার মধ্যে নিয়ে গেল। মানুষগুলির চোখের দৃষ্টিতে একটা ভীরু বন্য ভাব সুস্পষ্ট। ওরা একটু সন্দিগ্ধভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। আগের দিন হলে বোধ হয় বিষাক্ত বাণে আমাদের মেরে ফেলতো। কিন্তু সুদীর্ঘকাল ইংরেজের শাসনাধীনে থাকায় ওদের হাত থেকে খসে পড়েছে অব্যর্থ লক্ষ্য তীর-ধনুক-বল্লম আর বর্শা। এদের মেয়ে-পুরুষ উভয়েরই কেশ-বিন্যাসের বেশ বাহার আছে। আমাদের দেখে মেয়েরা প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ওদের কুঁড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। আমরা নীচু হয়ে কুঁড়ের মধ্যে দেখলুম কয়েকটি মেয়ে বসে সেলাই করছে। ঘরগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ভাদুড়ী ফটো তুলতে চাইলেন কিন্তু ওদের পুরুষরা কিছুতেই রাজী হোল না। এদের চেহারার বিশেষত্ব হোল কপালের উপর পাতানো কালো চুলের গোছা, আর কালো উজ্জ্বল চোখের তারা।

এই নীলগিরি অধিত্যকায় একদিন বহু টোডার বাস ছিল। এই স্থানটিকে টোডা রাজ্য বলা হোত। বাগাদা নামীয় আর একটি উপ-জাতি ও ইংরেজ এ দেশে প্রবেশ করার পর থেকে টোডাদের অবস্থা খারাপ হতে সুরু করল। কুনুর উটাকামান্ড প্রভৃতি স্থান নাম-মাত্র মূল্যে টোডাদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে এবং তাদের জন্মভূমি থেকে উচ্ছেদ করে ইংরেজ টোডাদের সমূহ ক্ষতি করেছে। চা-বাগান, কাফি ক্ষেত প্রভৃতি তৈরী হয়ে অজস্র টোডা গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। টোডারা অতি প্রাচীন জাতি। নিকটস্থ নীলগিরি পর্বতগাত্রে যে সব সুন্দর গুহা আছে সেগুলি টোডাদের পূর্ব-পুরুষ দ্বারা নির্মিত বলে কথিত আছে। টোডারা মহিষকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে। মহিষ পালন তাদের জীবিকা। চাষও করে ওরা। কিন্তু রোগে দারিদ্র্যে বর্তমানে টোডাদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হয়ে আসছে। এভাবে এ জাতি আর বেশী দিন পৃথিবীতে থাকবে বলে মনে হয় না। এই রকেট আর স্পুটনিকের যুগের পটভূমিকায় একটা ধ্বংসোন্মুখ সুপ্রাচীন জাতির বন্য সরলতা দেখে মন কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে গেল। ভারাক্রান্ত মনে আমরা ফিরে এলুম টোডাদের বাসভূমি থেকে।

ইউক্যালিপটাস গাছের ছায়ায় পাথরে পাথরে ফুটে রয়েছে নানা রং-এর অজস্র বন্য ফুল। চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে তার সুমিষ্ট সৌরভ। উদ্ভিদশালার অপর প্রান্তে তখন পুষ্প প্রদর্শনীর জন্য কুঞ্জে কুঞ্জে অমরাবতী রচনা হচ্ছে। কিন্তু এই অজস্র পুষ্প বৈভবের মধ্যে উটাকামান্ডের টোডা জাতির মত তার বন্য ফুলের প্রাচুর্যও কি একদিন মানুষের অবহেলায় মাটী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? নীলগিরির স্বপ্ন যদি ভেঙে যায় তাহলে সে কি ক্ষমা করবে মানুষকে?৫

দুর্লভ নায়িকা

(২৬৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

দেবার জন্যে এখানে এসেছিলেন। এই উপলক্ষে অনেক আত্মীয় সমাগম হয়েছিল।

অনেকদিন থেকে পদ্ম রয়েছে আমাদের সঙ্গে। সংসারটা যেন ওর নিজেরই হয়ে গিয়েছিল; ওর ইচ্ছাকে মূল্য দিয়ে চলতাম আমরা। কিন্তু নবাগত আত্মীয়রা কেন তাকাবে ওর মুখের দিকে। তাই ও যেন এক মুহূর্তেই অবহেলিত অবজ্ঞাত ভৃত্য পর্যায়ে নেমে যায়। পদ্ম নয়—ঝি।

শুধু আদেশ আর আদেশ। কাজ শেষ হয়ে গেলেই বিরক্ত-বিরস ঝঙ্কার। ওর অপ্রসন্ন গম্ভীর ভাবকে কাজের অনিচ্ছা এবং স্বভাবগত আলস্য বলেই ধরে নেয় সবাই এবং কথা শোনাতে ছাড়ে না।

সেদিন আমিও খুব ব্যস্ত ছিলাম। তবু তারি ফাঁকে দু-একবার পদ্মের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়েছি। ঠিক যেন প্রতিদিনের পদ্ম এ নয়। এ পদ্মকে চেনা যায় না। সূক্ষ্ম আবরণে ওর মুখ ঢাকা—সে আবরণের রং চিনতে পারি নি আমি। তখন এত ব্যস্ত ছিলাম যে চেনবার চেষ্টাও করি নি।

আজ এই মুহূর্তে আমি যেন দেখতে পাই সেই আবরণের রং—এই মুহূর্তে আমি বুঝতে পারি ওর অদ্ভুত ব্যবহারের রহস্য। চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই অপমানিতা অবহেলিতা নারীর মুখ—যে সেদিন পদ্ম নয় শুধু ঝি, মানবী নয়, এক মানব-যন্ত্র।

আমি যেন দেখতে পাই ওর কালো কর্ম-চঞ্চল দেহে ধূসর-কঠিন নিশ্চল দুটি চোখ তাকিয়ে আছে উৎসব দিনের উজ্জ্বলতার দিকে। সে দেখেছে তারই সমবয়সী মেয়েদের শাড়ির বাহার আর গয়নার ঝলক। স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে উচ্ছল ছোট ছেলেমেয়েদের অপরূপ পোষাক-পারিপাট্য।

কত আনন্দ, কত আলো, কত প্রাচুর্য, কত উজ্জ্বলতা। কিন্তু এই আনন্দ-সমুদ্রের ছিটেফোঁটারও অধিকারী নয় সে। নেই—কিছুই নেই তার।

রক্তাক্তক্লিষ্ট হৃদয়কে লুকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে সেই মেয়েটি নীরবে নতমুখে সব কাজ করে গিয়েছিল। সমগ্র পরিবারের আনন্দ-ধারায় শুধু একটি মাত্র নারী অস্নাত ছিল—তার কথা কেউ ভাবে নি। কেউ এক বিন্দু ভালবাসার অপব্যয় করে নি তার জন্য। অবহেলিতা সেই নারী শান্ত পদে অশান্ত চিত্তে প্রত্যাগমন করেছিল গৃহে। সেখানে সেই অশান্ত অভিমানী মন খুঁজে দেখেছিল চারিপাশ। নেই—কোথাও নেই এক টুকরো শান্তি।

হয়তো তখনই ওর হঠাৎ মনে পড়ে বাসর-সজ্জার জন্য ঘর পরিষ্কার করতে করতে শোনা কয়েকটি কথা—'সুখের হবে না এ বিয়ে'।

'সুখের হবে না এ বিয়ে। বর চায় না এবং কোনদিনই চাইবে না কনেকে'... ফিস-ফিসিয়ে এই কয়টি কথা সেদিন ঘুরে বেড়াচ্ছিল সমস্ত বাড়ীতে। মেয়েটি কুৎসিত, পঙ্গু। সবাই জানত ছেলেটি শুধুমাত্র টাকার জন্যে বিয়ে করছে। সে কোনদিনই ভালবাসবে না স্ত্রীকে।

ভালবাসা! অভিমানী মেয়েটি হঠাৎ যেন থমকে তাকায়—ভালবাসা! এরই জন্য সে আজ উৎসব-আনন্দের মধ্যেও গর্বিতা, ধনীগৃহিণী মেয়ের মাকে বারবার চোখের জল ফেলতে দেখেছে, মেয়ের বাপের মুখে দেখেছে করুণ গাম্ভীর্য। মেয়েটির মুখে অপ্রতিভ শঙ্কা।

স্বামীর ভালবাসা। ও যেন মানসচক্ষে দেখতে পায় সেই ভালবাসার একটি উদ্ভাসিত ছবি—স্মৃতির আলোয় উজ্জ্বল অতি পরিচিত সেই ছবি। একটি বলিষ্ঠ পুরুষ পূর্ণভাবে তারই অধীন, কত ভাবেই না সে তার ভালবাসা জানিয়েছে তাকে, কত ভাবেই না তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছে। সামান্য ব্যাপারে, সামান্য খুঁটিনাটি নিয়ে তাকে কতবার কঠিন ভর্ৎসনা করেছে পদ্ম। রাগ করে চলে গেছে, তবু সে আবার ফিরে আসত। আর সেই রাত্রি—সেই উৎসবময়ী রাত্রিগুলির কথা ভেবে পদ্মের মুখ লাল হয়ে ওঠে—পুলক শিহরণ জাগে দেহে।

কিন্তু সেই ভালবাসাকে সে অপমানিত করেছে, থেঁতলে দিয়েছে দুই পায়ে—দূরে দূরে করে তাড়িয়ে দিয়েছে।

এখানেই ছিল তার একমাত্র স্বাধীনতা, এখানেই সে ছিল সুখী—ওদের সমক্ষে।

শুধু সমকক্ষ নয়, ওদের চেয়ে অনেক ধনী। ও যেন কল্পনার চোখে অনুভব করতে থাকে স্বামীর বলিষ্ঠ প্রেমের উচ্ছল উল্লাস। মনে মনে বলতে থাকে, আমি বড়—ওদের চেয়ে অনেক বড়।

একটি রাতের বিজয়-উল্লাস ডেকে আনে এক বৎসরের যন্ত্রণা।

একটি নামের স্মৃতি

কামাখ্যা সরকার

একটি নামের স্মৃতি একটি হৃদয়,
পিছে রাখা কয়েকটি পুরানো বছর;
ক্ষয়ে যাওয়া জীবনের তালিকা কুড়ায়
কেন আসে, ভীড় করে, কেন ভাঙে ঘর।

বেদনায় ফুটে উঠে সুরভি কমল,
ব্যথায় কি জেগে উঠে কান্নার মন!
কি যেন হারিয়ে গেছে দুরান্তে অতল;
তোমার নামের গন্ধে স্মৃতির স্বপন।

কি জানি তবুও কেন কান্নার মনে,
একটি নামের স্মৃতি একটি হৃদয়;
সেই সুর গীতিকার আজি আনমনে।
বেদনার রূপ রেখা সব কথা কয়।

কত ভুল জীবনের কত ভাঙা গড়া,
অনেক বিস্মৃতি আর কিছু স্মৃতিময়;
সকালে যে ফুল ফোটে সায়াহ্নে সে ঝরা,
তার শেষ ব্যথা নিয়ে শেষ পরিচয়।

অরুন্ধতী

সাধনা দেবী

উত্তরায়ণের পথে আদিত্যের শাশ্বত পরিক্রমা সমুদ্র হইবার লগ্ন প্রায় আসিয়া পড়িল। আশ্রমের সম্মুখ প্রাঙ্গণে প্রস্তর কুট্টিমে মহাচার্য উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার চিন্তাকুঞ্চিত নেত্র সূর্যের যাত্রাকক্ষ নির্ণয়কল্পে প্রযুক্ত ছিল। কর্কট রাশিতে মার্কণ্ডাবস্থিতির ক্ষণ চলিতেছে বর্তমানে—তাহা হইলে......তাহা হইলে.....

চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। লতাবিতানের পার্শ্বে কে যেন আসিয়া দাড়াইয়াছে।

মহাচার্য মুখ তুলিলেন। তাঁহার সৌম্য আনন বিমল স্নেহে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। জনশ্রুতি এই যে, অতুলনীয় মেধাসম্পন্ন এই ছাত্রটি তাঁহার বড়োই প্রিয়।

"কিছু বলিবে বীতরুণে?"

বীতরুণকে কেমন অনামনস্ক মনে হইতেছিল। সে ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিল। তাহার পর কহিল,

"আপনার বিঘ্ন ঘটাইলাম গুরুদেব।"

"অপ্রয়োজনে বিঘ্ন ঘটাইবার পাত্র তুমি নহ। বলো কি প্রয়োজন?"

"গুরুদেব আজ অনধ্যায়।"

"কারণ?"

"সৌরসেন জীবহিংসা করিয়াছে!"

"জীবহিংসা? আমার আশ্রমে?"

মহাচার্য চমকিয়া ঋজু হইয়া বসিলেন।

"সৌরসেনকে অবিলম্বে আমার নিকট প্রেরণ করো।"

কিন্তু অবিলম্বে সৌরসেন আসিল না। আসিল অতিবিলম্বে। মহাচার্যের সহিষ্ণুতাও তখন সীমা অতিক্রম করিয়াছে।

"সৌরসেন—উপাকর্মণ অনুষ্ঠানের সময়ে তুমি কয়েকটি শপথ গ্রহণ করিয়াছিলে। স্মরণ আছে?"

"আছে গুরুদেব।"

"পুনরাবৃত্তি করো।"

"অহম ইদ বিসর্জন, অধিশাস্তা সংগঠন; নাটকাসক্তি, পুস্তক শুশ্রূষা, নারী, দিবানিদ্রা, আলস্য ও দ্যূতক্রীড়া ত্যাগ—শান্ত দান্ত, উপরতো, তিতিক্ষা ও সমাহিত ভবীকরণ—চিত্তবৃত্তি নিরোধ।"

"শপথগুলি তুমি কণ্ঠস্থ করিয়াছ শুধু—অন্তরস্থ করো নাই। সৌরসেন—শপথ ভঙ্গের পাপে তুমি মহাপাপী।"

"কেমন করিয়া গুরুদেব?"

"জীবহিংসা করিয়া।"

"কিন্তু জীবহিংসা যে নিষিদ্ধ এ কথা তো শপথে উল্লিখিত নাই?"

"উপনয়নের পর মনুর বিধান অনুযায়ী ব্রহ্মজন্ম লাভ করিয়া ব্রহ্মচর্য পালনকালে আশ্রমে যে কেহ জীবহিংসা করিতে পারে তাহা পুরাকালীন বিধানবেত্তাগণ স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন নাই, তাই সম্ভবতঃ সুস্পষ্টরূপে জীবহিংসা প্রত্যক্ষ নামে উল্লিখিত নাই। কিন্তু তথাপি পরোক্ষার্থে প্রযুক্ত আছে। চিত্তবৃত্তিনিরোধ বলিতে তুমি কি বুঝিয়াছ?"

"ষড়রিপু দমন।"

"হিংসা কি তাহার মধ্যে পড়ে না?"

"কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যের মধ্যে হিংসার স্থান কোথায়?"

"ক্রোধের সংজ্ঞা কি?"

"কিন্তু ক্রুদ্ধ হইয়া তো আমি বন্য বরাহ বধ করি নাই। করিয়াছি নিতান্তই লীলাচ্ছলে—আমার শোণিত শিরায় শিরায় মৃগয়ার উন্মাদনা চাঞ্চল্য জাগাইয়া তোলে, তাহাকে কি করিয়া অস্বীকার করিব?"

"মহাক্ষত্রপ কুলজাতকের ধর্মই জীবহিংসা, তাহাকে অস্বীকার করা সম্ভবও নয়। মহারাজ যজ্ঞসেনকে আমি তখনি বলিয়াছিলাম, ব্রহ্মচর্যাশ্রম যুবরাজের উপযুক্ত স্থান নহে। কিন্তু মহারাজের একান্ত অভিলাষ........ যাহা হউক বৎস, বন্যবরাহ তপস্বীদের আক্রমণ করিতে পারিত, সুতরাং এক্ষেত্রে তোমার কৃতকর্ম নিন্দনীয় হয় নাই। কিন্তু ভবিষ্যতে মনে রাখিও রিরংসা ও জিঘাংসা ক্রোধ অপেক্ষাও মারাত্মক রিপু।"

সৌরসেন নতমস্তকে দাড়াইয়া রহিল। তাহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, প্রতিবাদের ভাষা যেন তাহার কণ্ঠ অবধি ফেনাইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু মহাচার্যের সম্মুখে তাহারা উচ্চারিত হইবার মতো সাহস সঞ্চয় করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। অনামনস্ক মহাচার্য তাহা লক্ষ্য করিলেন না বটে, কিন্তু লক্ষ্য করিলেন, আশ্রম কুটিরাভ্যন্তর হইতে আচার্যা বিদ্যাত্রেয়ী। ধীর মন্থর পদক্ষেপে কুটির হইতে নির্গত হইয়া আচার্যা সৌরসেনের সম্মুখে আসিয়া দাড়াইলেন। সৌরসেন ক্ষণকালের জন্য চক্ষু তুলিল, পরক্ষণেই দৃষ্টি ভূমিলগ্ন করিয়া একভাবে দাড়াইয়া রহিল।

আচার্যা প্রশ্ন করিলেন, "তোমার কিছু বক্তব্য আছে? যাহা বলিবার বলিয়া ফেল—মনের মধ্যে জমা করিয়া রাখিয়া লাভ কি?"

সৌরসেন মুখ তুলিল। মহাচার্যের কনিষ্ঠা ভগিনী আশ্রমাচার্যার নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ আয়ত অক্ষিযুগল তাহারই প্রতি নিবদ্ধ। উগ্র পিঙ্গল দুইটি চক্ষুতে যেন বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠিল, দৃঢ় সুগম্ভীর কণ্ঠে সৌরসেন প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট করিয়া করিয়া উচ্চারণ করিল, "মৃগয়া ক্ষত্রপকুল ধর্ম। তজ্জন্যই শাস্ত্রে মৃগয়ার্থে জীবহিংসাকে রিপু নাম দিয়া অবদমন করার নির্দেশ দেওয়া নাই। 'গুরুদ্বারে তে বিরক্তাঃ প্রয়াস্তি স্বধর্ম কুলাচারেৎ'—স্বধর্মভ্রষ্ট হওয়া কি অপরাধ নহে?"

"ব্রতচারী মন্ত্রবিদ শিষ্যের পক্ষে নহে; ব্রহ্মচর্য গ্রহণকালীন তুমি ব্রাহ্মণের সমস্থানীয়—সমাবর্তন অবধি দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরকাল ব্রাহ্মণ স্থলাভিষিক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে যাহাকে, সে অধ্যয়ন, পঠন, পাঠন, গুরুসেবা, যজন, গোচারণ, সমিধাহরণ ও যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালন—এই অষ্টাধ্যায়ী কর্ম ব্যতীত আর একটিমাত্র কার্য করিবে—সে কার্য ভিক্ষা। সে কার্য হিংসা নহে। হিংসা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পরিপন্থী।"

"ব্রাহ্মণ স্থলাভিষিক্ত!! কে? আমি??" হাঃ হাঃ হাঃ—হাঃ—হাঃ—বিদ্রোহী শিষ্যের উচ্চহাস্যে সারা গগন বনস্থলী পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

"আচার্যা—ব্রাহ্মণ বিদ্যাভিলাষীকে ব্রাহ্মণ স্থলাভিলাষী বলিয়া ভ্রম করিবেন না। ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ শিষ্য ঐ বীতরুণের সহিত আমার কোনো পার্থক্য আপনারা করেন না? বীতরুণের দণ্ড মস্তক পর্যন্ত দীর্ঘ, আমার

ললাট অবধি। সে কৃষ্ণবর্ণ অজিন পরিধান করে, আমার অজিন চিত্রিত। তাহার অধোবাস ক্ষোম, আমার কুশ। তাহার মেখলা ও আমার মেখলা ভিন্ন প্রকার। আমার শিখাপেক্ষা তাহার শিখা দীর্ঘ, আমার উপবীতের সহিত তাহার উপবীতের পার্থক্য আছে। ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর উপনয়নের কাল বারো বৎসর অবধি; তাহাদের যেখানে শেষ, আমাদের সেখানে আরম্ভ—বারো বৎসর হইতে আমাদের উপনয়ন কালারম্ভ। কারণ? কারণ ব্রাহ্মণদের চিত্ত পূর্ব হইতেই পরিশুদ্ধ হইয়া আছে, তাই বীতরুণ আমাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও আমাকে তাহাকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে। যেহেতু সে ব্রাহ্মণ। আচার্যা—জন্মস্বত্ব অত সহজে অস্বীকার করা যায় না; আপনাদের উচিত ছিল দীক্ষার সময়ে ক্ষত্রিয় কুলজাতকদের আত্মস্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিতে হইবে এইরূপ ধরণের কোনো প্রতিশ্রুতি পালন করানো। আশা করি ভবিষ্যতে এ ত্রুটি সংশোধিত হইবে।"

হাসিতে হাসিতেই বিদায় অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়া সৌরসেন নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

আচার্যা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার চম্পাগৌর মুখশ্রী ক্রোধে আরক্তিম হইয়া উঠিল। লক্ষ্য করিয়া মহাচার্য সস্নেহ হাসি হাসিলেন।

"আত্রেয়ী—জ্ঞানশ্রী উপাধি লাভ করিয়াও তুমি তোমার অল্প বয়সের পরিচয় প্রতিপদে দিতে থাক—ইহা তো ঠিক নহে।"

"কিন্তু সৌরসেন আমাকে অপমান করিয়া গেল।"

"অপমান শব্দের অর্থ-বিভ্রান্তি ঘটিয়াছে তোমার দেখিতেছি। অপমান নহে, তোমার মান সৌরসেন অধিকতর উন্নত করিয়া গেল—একদিন একথা বুঝিতে পারিবে।"

মহাজ্ঞানী পিতৃসম জ্যেষ্ঠ সহোদরের প্রতিবাদ করা উচিত নয়, সম্ভবও নয়। সংশয়-পীড়িত চিত্তে আচার্যা কহিলেন, "কিন্তু ভ্রাতঃ, একটিমাত্র দূষিত স্ফোটক সারা দেহ বিষাক্ত করিয়া তোলে। সৌরসেনকে আশ্রমে রাখা কি নিরাপদ হইবে? ভবিষ্যতে বহুমুখী অনিষ্টের বীজ রোপণ করিতে সৌরসেন উদ্যত হইয়াছে—"

"শুধু উদ্যত হইয়াছে নহে—সে বদ্ধ-পরিকর।"

"তথাপি?"

"তথাপি। জ্ঞানাশ্রমে শরণার্থিগণকে বিদ্যাদান আমি দয়া করিয়া করি না—উহা আমার কর্তব্যের অঙ্গ, উহা আমার ধর্ম। সৌরসেনকে আমি একদা গ্রহণ করিয়াছি—আচার্যকুলবাসী শিষ্যকে পুত্রসম রক্ষণাবেক্ষণ করিতে আমি বাধ্য, একথা তো তোমার অজানা নহে আত্রেয়ী। শত অপরাধ সত্ত্বেও পিতা কি পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে পারে?"

ভ্রূকুটি করিয়া আচার্যা স্বীয় কক্ষের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন।

পৌষ পূর্ণিমায় ইন্দ্রপূজা সমাপনান্তে উৎসর্জন অনুষ্ঠান সম্প্রতি সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আপস্তম্ভ, ঐতরেয়, সম্বত প্রভৃতি সকল আশ্রমের আচার্য, উপাধ্যায়, অধ্বর্যু, উদ্গাতা, শিষ্যমণ্ডলী সকলে মহাচার্যাশ্রমে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। আশ্রমের সম্মুখস্থ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বিশালকায় মণ্ডপ নির্মিত হইয়াছে। মহাচার্য পূর্বাহ্নেই জানাইয়াছেন, সভায় তিনি কোনো গুরুতর বিষয় উপস্থাপিত করিবেন। সকলে তাহারি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

যথাসময়ে মহাচার্য ধীরপদে সভাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সমাভিব্যাহারে কনিষ্ঠা ভগিনী জ্ঞানশ্রী আচার্যা বিদ্যাত্রেয়ী। অভ্যাগতবর্গ সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণাদি জ্ঞাপন করিয়া মহাচার্য কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করিলেন। তাহার পর আসল প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন।

"মহদাশয়গণ—আপনারা দীনের কুটিরে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আমাকে বিশেষ সম্মানিত করিয়াছেন। অনুগ্রহপূর্বক এখন আমার বক্তব্য অনুধাবন করুন। আপনারা সকলেই অবগত আছেন সংসারে আমার এই কনিষ্ঠা ভগিনী ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো বন্ধন নাই। আমার সাধ্যমত উহাকে সুশিক্ষিতা করিয়া তুলিয়াছি, অতিগুরু।"

অতিগুরু কৌশিক সমর্থন করিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ। তোমার ভগিনী আত্রেয়ীর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দেশ দেশান্তর অবধি পৌঁছিয়াছে।"

"কিন্তু অতিগুরু—সংসারে আমার এই শেষ এবং একমাত্র বন্ধনের এমন একটি অবলম্বন করিয়া দিতে চাই, যাহাতে আমার অবর্তমানে সে আশ্রয়চ্যুতা না হয়। তাহা হইলেই আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি, আমার লৌকিক কর্তব্য সমাধা হয়। অবশ্য সর্বজীবের মূলাধার, বিশ্বস্রষ্টা পরমব্রহ্ম আত্রেয়ীর অবলম্বন তো আছেনই, তথাপি পার্থিব অপর কোনো আশ্রয় যাহাতে—"

বাধা দিয়া অতিগুরু প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কি কোনো পাত্র স্থির করিয়াছ?"

"একরূপ স্থির করিয়াছি অতিগুরু।"

"আত্রেয়ীর যোগ্য পাত্র.........তোমার শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কি?"

"অতিগুরু! আপনি তো বীতরুণকে দেখিয়াছেন। আমার আশ্রমের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল রত্ন।"

আত্রেয়ী মাথা নত করিলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সভামধ্যে একটা গোলযোগ উত্থিত হইল। মহাচার্য বিস্মিত নেত্রে ইতস্ততঃ তাকাইতে লাগিলেন। একটি শিষ্য দৌড়াইয়া আসিয়া সঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিল, "গুরুদেব, সৌরসেন কৃত-প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে।"

"কারণ?"

"সৌরসেন অপরাধ করিয়াছে। সর্বসমক্ষে সে অপরাধ স্বীকার করিয়া দোষস্খালন করিবে।"

আত্রেয়ী ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন।

সৌরসেন!! ক্ষত্রিয় রাজপুত্র বিদ্রোহী সৌরসেন যেন বিপ্লবের বীজ বপন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া আশ্রমে আসিয়াছে। আশ্রমের কলঙ্ক শিষ্য!! বিরক্ত স্বরে মহাচার্য কহিলেন, "সৌরসেন পদে পদে বিঘ্ন ঘটায়। এই দণ্ডে উহার অপরাধ স্বীকার না করিলে চলিতেছিল না?"

দূরে সৌরসেন আসিতেছে দেখা গেল। ললাট ভস্মলিপ্ত, শুদ্ধ গৈরিক উত্তরীয় ও অধোবাস ব্যতীত দেহে আর কোনোরূপ বস্ত্র অথবা আভরণ নাই। কৃত প্রায়শ্চিত্তের বেশ। দৃপ্ত পদক্ষেপ দেখিয়া কে বলিবে যে, সে অপরাধ স্বীকার করিতে আসিতেছে? ক্ষত্রিয় রাজকুমার যোগ্য ব্যূঢ়োরস্ক, বৃষস্কন্ধ বলিষ্ঠ দেহ, উগ্র গৌর অঙ্গবর্ণ, উগ্র পিঙ্গল চক্ষু—

সমস্ত অবয়ব ঘিরিয়া উচ্ছ্বসিত কঠিন রূপশ্রী কি যেন এক অজানা মোহাকর্ষণে মনকে টানিতে থাকে।

ধীরে সুস্থে সৌরসেন আসিয়া উপস্থিত হইল।

"গুরুদেব অপরাধ করিয়াছি।"

"প্রকাশ করো।"

"গুরুদেব—ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যাহা নিষিদ্ধ তাহাই করিয়াছি। নারীকে হৃদয়দান করিয়া ফেলিয়াছি।"

"সৌরসেন!!!" বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে মহাচার্য

(শেষাংশ ২৭৩ পৃষ্ঠায়)

কুয়াশা

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

সমুদ্র উদ্বেল হয়, মনের উত্তাল আবেগে
হঠাৎ জোয়ার আসে,
সবুজ পতাকা নাড়ে—বহুক্ষণ-পড়ে-থাকা
ভাগ্যহত কোনো এক প্যাসেঞ্জার গাড়ী
পথ পায়। তেমনি কি কাঁকনের ধ্বনি
ক্রাচে-ভর-করে-হাঁটা পংগুদেহ খোঁড়ার হৃদয়ে
সুর তোলে, নরম আদুরে ছোট
লজ্জানত হাতের ইসারা—
আগাছার বনে তবু দু-চারটে বেল কিম্বা যুঁই
ফুটে ওঠে? হঠাৎ উদ্দীপ্ত হয় মনের আবেগ,
হঠাৎ জোয়ার জাগে সাগরে সাগরে,
হৃদয়ের তটে তটে অশ্রান্ত কল্লোল!

যখন কুয়াশা ঢাকে—এই ম্লান শহরটিকে তবু
কুলবধূ মনে হয় রেশমী গুণ্ঠনে ঢাকা
ব্রীড়াবতী, কুণ্ঠার আড়ালে ধরা
প্রেমে প্রাণে যেন এক অনবদ্য নারী—
যেন এক অনবদ্য নারী খেলা করে!
ফুল ছোড়ে, কাছে ডাকে, সোহাগ জানায়!

ধুলো ও ধোঁয়ার রূপ স্বপ্নময়, বিমুগ্ধ ধূসর
রুক্ষদীর্ণ রূঢ়তাও ঢাকা পড়ে যায়—
ময়লা গেঞ্জিকে ঢেকে
ওপরে চড়ানো যেন পাটভাঙা সুন্দর পাঞ্জাবি।

তেমনি একেকদিন—জীবনের সাগরে জোয়ার
হঠাৎ উদ্বেল হলে, কুয়াশার মায়া জাগে,
মনের বেদনা ঢাকে,
ফুল খেলে,
ছড়ায় কৌতুক।
তোমাকেও কাছে পাই, জীবনের সকল অলিন্দে
ধুলোতেও রঙ ধরে, গান জাগে!
হঠাৎ কিসের মন্ত্রে পিতলকেও সোনা মনে হয়,
মরুভূমি মরূদ্যান ভাবি?
কুয়াশা কি যাদু জানে?

কুয়াশা কি শুধু কুয়াশাই?
অথবা দুর্দশা-আতুর মনে পীরিতের ছোপ,
জীবন-জাগরে তার উদ্বেল জোয়ার ডেকে
সোহাগ জাগানো!

দুর্গোৎসব

সৃষ্টির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে আছে ধ্বনি, সুপ্রাচীন ধর্মশাস্ত্র অথবা ভারতীয় রাগসংগীত—যারই চর্চা আমরা করি না কেন, নাদব্রহ্মের সত্যতা আমাদের এক নিগূঢ় শক্তির আশ্রয় দান করে। দেবদেবীর আরাধনা ও মন্ত্রের সুগম্ভীর ধ্বনিও মুহূর্তে আমাদের এক অকল্পনীয় ভাবলোকে নিয়ে যায়। সেখানে চরিত্র, বীর্য, মহত্ত্ব ও শান্তি। আগমনী গানের সুরসৃষ্টিতে দেবী দুর্গার আবাহনে সেই ভাবলোকের নিরন্তর শান্তি আজ বাঙালীর জীবনে সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ।

কে, সি, দাস প্রাইভেট লিঃ

আবিষ্কারক ***রসোমালাই***

কলিকাতা।

পূজায় সকলকে অভিনন্দন জানাই :—
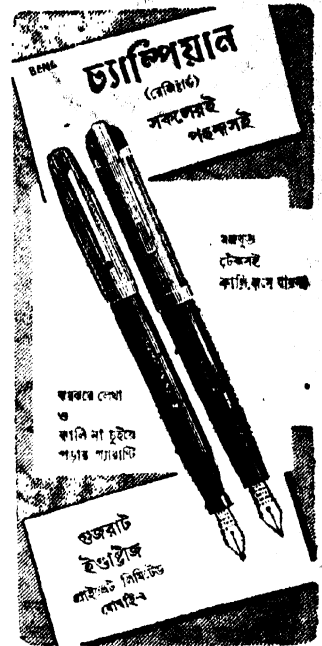
এজেণ্টস :—মেসার্স অলকা ট্রেডার্স
বি-২১৪, বাগ্রী মার্কেট, ৭১, ক্যানিং ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১

হেড অফিস বিল্ডিং

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৮৬৫

চার্টার্ড ব্যাঙ্কের সহিত সংশ্লিষ্ট

অনুমোদিত মূলধন	...	...	১,০০,০০,০০০, টাকা
বিক্রীত মূলধন	...	...	৬০,০০,০০০, টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	...	...	৪৫,৫০,০০০, টাকা
সংরক্ষিত তহবিল	...	...	১,০৮,০০,০০০, টাকা

হেড অফিস : ১৪, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস

কলিকাতাস্থ অন্যান্য শাখা :

বড়বাজার	•	৩৫, যমুনালাল বাজাজ ষ্ট্রীট
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট	•	২২৪।৫, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
শ্যামবাজার	•	১২৫, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
দক্ষিণ কলিকাতা	•	১১১, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড

হেড অফিস, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, শ্যামবাজার ও দক্ষিণ কলিকাতা শাখাসমূহে সেফ্ ডিপোজিট্ লকার পাওয়া যায়।

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার
কাজ-কারবার করা হয়।

এম জে ম্যাকলারেন
জেনারেল ম্যানেজার
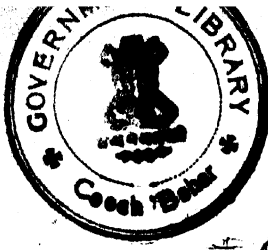
লেডি ক্যানভাসার

— নীলিমা মুখোপাধ্যায়

জল জমেছে হাঁটু ছাড়িয়ে, কাদা ছপছপে গাঁয়ের মেঠো পথ। কাপড়টা সাবধানে আর একটু ওপর দিকে তুলে নেয় শ্যামলী। প্যাঁচপ্যাঁচে ছেঁড়া জুতোটায় আর একটু শক্ত করে পা দুটো গলিয়ে নিয়ে মস্তবড় ঝোলা ব্যাগটা ঠিক করে কাঁধে বসিয়ে নেয় আর একবার। অনেকখানি পথ যেতে হবে এখনও— অনেকটা দূরে।

সেই পাখী না-ডাকা অন্ধকার ভোরে রাতের ঘুম ভাঙিয়েছিল শিবনাথ। ভুষোধরা লণ্ঠনের পলতেটা আর একটুখানি উস্কে দিয়ে গায়ে ঠেলা দিয়েছিল খুব আস্তে করে। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর অসহায় ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে থাকা কোমল মুখটার দিকে চেয়ে ডাকতে মায়া হয় শিবনাথের। কিন্তু তবু উপায় তো নেই। ভোর ছ'টা সতেরোয় আসবে প্রথম প্যাসেঞ্জার ট্রেণ। গাঁয়ের ষ্টেশনে ধরবে আধ মিনিট। সেই ট্রেণটাই যেমন করে হোক ধরতেই হবে শ্যামলীকে—নয়ত শুধুই হয়রানিতে শেষ হয়ে যাবে বুঝি সারা দিনের সব কিছু।

ধড়মড় করে উঠে বসে শ্যামলী। প্রাত্যহিক নৈমিত্তিকতায় আড়ামুড়ি ভাঙে বিছানা ছেড়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে। তারপরেই দাঁতে দাঁতন দিয়ে মাথায় এক খাবলা তেল চাপড়াতে চাপড়াতে ছোটে কলঘরে। ঘড়িতে এখন সবে চারটে এগারো। দিনের ঘানিতে কসি বাঁধবার আরও ঘণ্টা কয়েক বাকি। কিন্তু তবু রাতের চাঁদ শেষ আকাশে ডুব দেবার অনেক আগেই বিছানা ছেড়ে আসে শ্যামলী।

"থাক না, আর নাইবা করলে এত ঝামেলা।" ওর প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসা বাস্ত শরীরটার দিকে চেয়ে রোজই ক্ষীণ আপত্তি তোলে শিবনাথ।

কিন্তু সবে সুরু হওয়া দিনের সঙ্গে সঙ্গেই ছেড়ে যাওয়া অসহায় মানুষটার সব ব্যবস্থা করে যে দিতেই হবে সারাদিনের। সারা-দিনের যা কিছু করণীয় তাই তার যাবার আগেই শেষ করে শ্যামলী। পোঁটলা বেঁধে খাবারটাও ওর মাথার কাছে ঢেকে রেখে যায় সযত্নে। তারপর ভারী ঝুলিটা আবার কাঁধে ঝুলিয়ে পথে এসে দাঁড়ায় শ্যামলী। সবে ঘুমজাগা ভোরের পাখী আলস্য ভেঙে তখন শিষ দিয়েছে গাছের ডালে ডালে। হিম জড়ানো শীতশীতে বাতাস বয়ে যায় ঝিরঝির করে। আর কয়েকটা ঘণ্টা বিরতি। আরও কয়েকটা ঘণ্টা কথা না বলে থাকতে পারবে শ্যামলী। তারপর ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেণ কলকাতার বুকে স্পর্শ করা মাত্র সুরু হবে দিনের কাজ।

ক্লান্ত দেহটাকে সকলের শেষে টেনে নিয়ে নিজের জন্যে প্রায় নির্দিষ্ট জায়গাটাতে এসে বসে শ্যামলী। আর কয়েকটা ঘণ্টা। আরও কয়েকটা জমে থাকা মুহূর্ত শুধুই নিজের মতন খরচ করতে পারে শ্যামলী। নিছক চেয়ে থাকার বিলাসিতায় বাইরে অসীম অবকাশে ছড়িয়ে থাকে বিশ্বপ্রকৃতির দিকে চোখ মেলে বসে থাকতে পারে চুপ করে। ভাবতে পারে নিজের কথা। নিজের বর্তমান, শিবনাথের ভবিষ্যৎ। শিবনাথ! ভাবতে গিয়ে নিজের মনেই আস্তে যেন একটু শিউরে ওঠে শ্যামলী। সেই শক্ত সমর্থ জোয়ান মানুষটা দেখতে দেখতে এমন করে কটা হাড়ের কাঠামোতে এসে ঠেকল শ্যামলীরই দু'চোখের ওপর দিয়ে। হাড় জির-জিরে খাবিখাওয়া একটা মানুষের কঙ্কাল অবিশ্রান্তবেগে সারাদিন কাশে হাঁপায় আর উন্মুখ একাগ্রতায় বসে থাকে ঘনিয়ে আসা দিনের শেষে শ্যামলীর আসার চেনা পথটুকু চেয়ে।

সুদূর দিগন্তে মেলে দেওয়া ক্লান্ত চোখ দুটোকে জোর করে ভেতর দিকে টেনে এনে যেন নিজের দিক থেকেই সভয়ে চোখ ফেরায় শ্যামলী।

"নাঃ শ্যামলী, তোমায় নিয়ে আর পারা গেল না, রোজ রোজ এত দেরী করে এলে.." অসমাপ্ত কথার মাঝেই রেকর্ড নোট আর বুকিং স্লিপটা ওর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে ভ্রূ-ভঙ্গি করেন লেডি সুপারভাইজার।

"আর সরমাদি"......থামে শ্যামলী। কুঁজো থেকে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল গড়িয়ে গিলে ফেলে ঢকঢক করে আর অল্প অল্প হাঁপান বুকে ওর হাত থেকে টেনে নিয়ে একবার চোখ বোলায় স্লিপটার ওপর। আজকেও পাড়ি দিতে হবে প্রায় সহর শেষ হওয়া টালিগঞ্জের সেই শেষ সীমানায়। গলিতে গলিতে পথে পথে প্রতি বাড়ীটির গায়ে কড়া নাড়তে হবে খুটখুটিয়ে।

"নমস্কার", বাড়ীর যে কেউ দরজাটা খুললেই এক ঝলক মিষ্টি হাসিতে সমস্ত মুখটা ঝলমলিয়ে বলবে শ্যামলী "আমি কাদম্বিনী অয়েল কোম্পানী থেকে এসেছি।" তারপর সারা দেহে আরও একটু মিষ্টি ভঙ্গির সুমধুর এক হিল্লোল তুলে বলবে আবার "আচ্ছা কাপড় কাচতে কি সাবান আপনারা ব্যবহার করেন?" পর মুহূর্তেই নেহাতই হঠাৎ যেন গৃহবধূর দিকে চোখ পড়তেই উজ্জ্বল প্রশংসায় হাসিটা আরও একটু দীর্ঘায়িত করবে শ্যামলী। "মাথায় কিন্তু বেশ চুল আপনার। আচ্ছা উঠে যেতে আরম্ভ করলে কি করে চুলের যত্ন নিতে আরম্ভ করেন আপনি বলুন তো?"

প্রতিটি বাড়ীর দরজায় প্রতিটি ঘরে দিক থেকে দিগন্তের মিষ্টি হাসির সুমধুর হিল্লোল ছড়িয়ে বেড়াবে শ্যামলী। মিষ্টি কথায় মিষ্টতর সুরে জানাবে কত অল্প খরচে সব কিছু মলিনতাকে অপূর্ব শুভ্রতায় ঝকঝকে করে তোলার সহজতম উপায়। কোন গৃহবধূর রাশি রাশি দীঘল ঘন কালো চুলকে পড়তে না দিয়ে থরে থরে সৌন্দর্যের লক্ষ্মীশ্রীকে বন্দিনী করে রাখবার সহজতম পথ।

দুপুরের সূর্য আস্তে আস্তে পশ্চিম আকাশে ঢলে আসবে কখন। ক্লান্ত অবসন্ন শ্যামলীর মুখের দিকে চেয়ে কেউ প্রশ্ন করবে না এত অল্প খরচে এত সহজ উপায়টি জানা থাকা সত্ত্বেও শ্যামলীর প্রায় রং ধরে আসা বিবর্ণ সাদা সাড়ীর আঁচল কেন নিষ্কলুষ শুভ্রতায় হেসে ওঠে না ঝকমক্ করে। কেন সৌন্দর্যের

চিত্র সাহিত্য

চাঁদের মৃত্যু
(DEATH OF ROMANCE)

চাঁদের জন্ম
(সমুদ্র মন্থন)

চাঁদে প্রাণ প্রতিষ্ঠা
(আদিম মানুষ)

চাঁদের শৈশব
(আয় চাঁদ আয় চাঁদ)

চাঁদের যৌবন
("পূর্ণ চাঁদ হাসে আকাশ কোলে
আলোকছায়া শিবশিবানী
সাগরজলে দোলে")

চাঁদের বার্দ্ধক্য
(যন্ত্রযুগ)

চাঁদের মৃত্যু
(সবার উপরে যন্ত্র সত্য)

শামলদার সুগাত্তম !
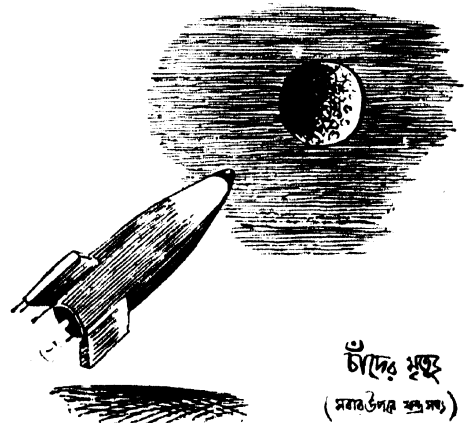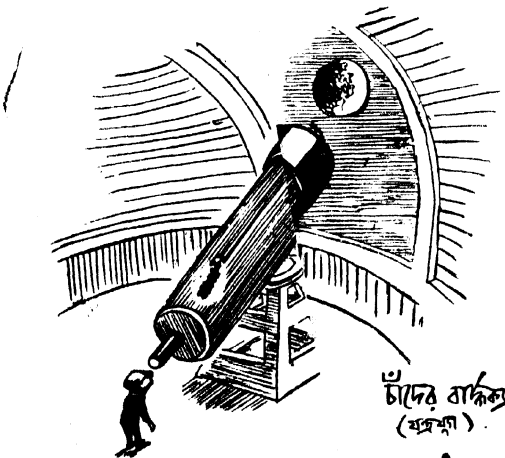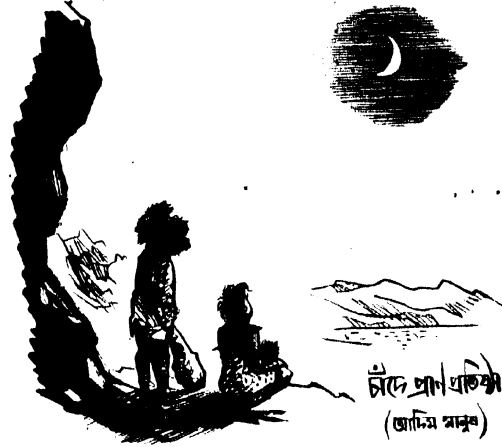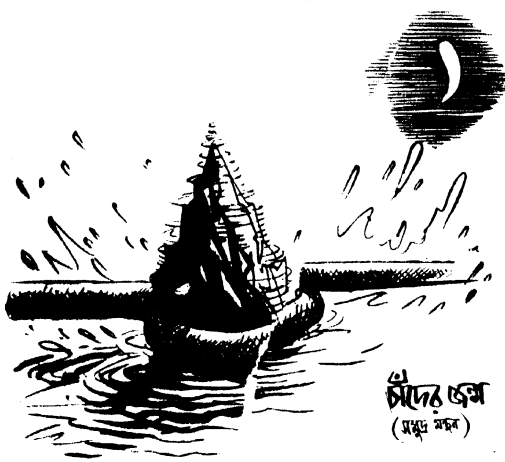
সবকটি চাবিকাঠি তার ঘরে বন্দী থেকে, তারই শ্যামল মুখের সব সৌন্দর্য ঢলে পড়ে পশ্চিম আকাশের শেষ সূর্যের মতন এলিয়ে পড়ে গভীর ক্লান্তিতে। ভাবতে গিয়ে যেন হাসি আসে মুহূর্তের নিঃশ্বাসটুকুও বুকে ভরে টেনে নেবার সময় না-পাওয়া শ্যামলীর নিজেরই।

অফিস ফিরে কোনরকমে রেকর্ড স্লিপটা কেরাণীবাবুর ডেস্কে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে যায় শ্যামলী লেডি সুপারভাইজারের ঘরে। সারা দিনের শেষে মুখে মুখে খানিকটা খবর অন্তত জানাতেই হবে তাকে। দিতে হবে সারাদিনের লাভক্ষতি বিকিকিনির খানিকটা হিসেব। অনেকখানি দূরে ফেলে আসা পথের বাঁকে কোন ঘরে সন্ধ্যার অন্ধকার তখন হয়ত নেমে আসছে ধীরে ধীরে। কেশে কেশে হাঁপিয়ে ওঠা বুকটাকে দুহাতে চেপে ধরে আবছা হয়ে আসা পথটার দিকে চেয়ে চেয়ে ব্যাকুল প্রতীক্ষায় হয়ত প্রহর গোণে শিবনাথ। ঘরে ঘরে বেজে শেষ হ'ল সন্ধ্যার শাঁখ। ফাইভ ডাউন কোন লগ্নে এক মুহূর্তের বিরতিতে এসে থামবে পথের বাঁকে হারিয়ে যাওয়া পথখানির শেষে।

ক্লান্ত হাতে তাড়াতাড়ি শাড়ীটাকে আর একবার গুছিয়ে নেয় শ্যামলী। প্রতিদিনের অভ্যস্ত হাতে ঝোলা ব্যাগটাকে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে আর এক মুহূর্তে নেমে পড়বে পথে। প্রাত্যহিক অভ্যস্ততায় যান্ত্রিক নিয়মে এসে নামবে প্রায় ছাড়ো ছাড়ো ফাইভ ডাউনের প্রায় নির্দিষ্ট জায়গাটিতে তারপর শুধু মেলে থাকা ক্লান্ত দুটি কালো চোখ হারিয়ে যাবে নিঃসীম অন্ধকারে একা জেগে থাকা মহাকালের অসীম সীমাহীনতায়।

বর্ষা বুঝি নামল আকাশ ভেঙে। পথে জল জমেছে তাই হাঁটু ছাপিয়ে। তা হোক—তবু চেনা পথে ক্লান্ত পা দুটো গতি বাড়ায় বুঝি কোন উৎসবের আশ্বাসে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বিছানার ওপরেই উঠে বসে শিবনাথ। রক্তলেশ নিষ্প্রভ কোটরে চোখ দুটো হয়ত ঝিকমিক করে ওঠে মুহূর্তের খুশীতে।

ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপটাও যদি শুধু জ্বালা থাকত। অন্ধকার হাতড়ে সাবধানে ঝোলাটা দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে আস্তে একটা নিঃশ্বাস নেয় শ্যামলী।

"ফাইভ ডাউনটাই পেকৌছিলে তবে ঠিক সময়।" প্রতিদিনের প্রশ্ন, প্রতিদিনের মতন একই সুরে জিজ্ঞাসা করে শিবনাথ। জিজ্ঞাসা করে না সারাদিন চুপচুপ বুকে এক মুহূর্তের মুক্তির নিঃশ্বাস আকুল আগ্রহে কতগুলো শব্দের সৃষ্টি করে বুঝি শুধু।

"হুঁ"। প্রত্যেকদিনের মতন আরও আস্তে উত্তর দেয় শ্যামলী।

"যা বৃষ্টিটা নেমেছে কদিন ধরে আমি ভাবলাম..." আগল ভাঙা স্রোতের জলের মতন কথার জোয়ারে শুধু যেন ভেসে চলে শিবনাথ।

নিঃশব্দে অন্ধকার হাতড়ে শাড়ীটা বদলাবার চেষ্টা করে শ্যামলী।

"আমাকেও যখন যেতে হত রোজ ঐ সেভেন আপে বুঝলে শ্যামলী......"

"ওষুধগুলো খেয়েছিলে ঠিক সময় মতন।" সারাদিনের ক্লান্ত দেহটাকে মাটিতে এলিয়ে দিতে দিতে খুব আস্তে থুঁড়িয়ে চলা কথাগুলোকে কোনরকমে যেন দূরে থেকে গড়িয়ে দেয় শ্যামলী। আর ঘুমে জড়িয়ে আসা অবোধ অবাধ্য চোখ দুটোকে টেনে খুলে রাখবার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় এক্ষণে যেন জল ভেসে আসে দুচোখের কূল ছাপিয়ে।

"হ্যাঁ আমাকেও যখন রোজ যেতে হত ঐ সেভেন আপে......" খুশী উচ্ছল আগ্রহ আকুল স্বরে হারিয়ে যাওয়া কথা আবার খেই ধরে শিবনাথ, "তখন বুঝলে শ্যামলী......।" শ্যামলী......নিঃশব্দে অন্ধকারটার দিকে চেয়ে— অধীর আকাঙ্ক্ষায় স্মৃতি রোমন্থনে উৎপীড়িত ওঠা শিবনাথের চমক ভাঙেনা হঠাৎ যেন।

"শ্যামলী" খুব আস্তে প্রায় অস্পষ্ট ফিসফিস করে আর একবার ডাকে শিবনাথ। শ্যামলী স্পষ্ট উঠে নিভে আসা প্রদীপের সলতে ......র দেয় আর একটু! নিঃশব্দে ......করে ভেরচা শিখা শিরশিরিয়ে কেঁপে ওঠে ওর গভীর ঘুমে এলিয়ে যাওয়া ক্লান্ত দুটি চোখের পাতায়।

এক ফুঁয়ে প্রদীপ এবার একেবারে নিবিয়ে দেয় শিবনাথ। বিছানায় এসে গায়ের চাদরটা আবার টেনে নেয় বুক পর্যন্ত। দুঃখ নয়, অভিমান নয়, শুধু অদ্ভুত এক নিঃসীম শূন্যতায় অসাড় হয়ে আসে ওর সমস্ত চেতনা।

ঘুমুতে চায়নি শ্যামলী। জানে তো শিবনাথ। জানে অন্ধকারে ঐ হাড় জিরজিরে বুকটার দিকে চেয়ে অদ্ভুত মমতায় বুকের ভেতরটা অহরহ গলে যেতে থাকে শ্যামলীর। সারাদিন এই দমবন্ধকরা নিঃস্তব্ধতায় জমে জমে যে হিম হয়ে গেল ওর বুকের গোনা গোনা পাঁজরাগুলো।

কিন্তু সারাদিন অনেক কথা বলেছে শ্যামলী। কথা, কথা—অবিশ্রান্ত কথা—নানা ভাবে নানা ভঙ্গিতে ক্লান্ত দেহটার বাঁকে বাঁকে বিদ্যুৎচমকানো হাসির হিল্লোল ছড়িয়ে ছড়িয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে শুধু কথার ফুলঝুরি। আর তাই শেষ হয়ে যাওয়া বারুদের মতন দিনশেষের অন্ধকার ঘরে, রোগপাণ্ডুর ক্লান্ত স্বামীর পাশে অবশেষের রেশটুকুও আর যে কিছুতেই টেনে রাখতে পারে না সে।

অরুন্ধতী

(২৭০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

উচ্চারণ করিলেন। "প্রগলভতার একটা সীমা আছে।"

"গুরুদেব আমি অকপটচিত্তে দোষ স্বীকার করিতে আসিয়াছি। যাহা করিয়াছি তাহাই তো বলিব—এ দোষটা প্রতিকটু বলিয়া অপর একটি দোষ সাজাইয়া বলিবার শিক্ষা তো আপনার নিকট হইতে পাই নাই।"

"সৌরসেন!!"

অতিগুরু বাধ দিলেন। "সত্যই তো মহাচার্য সৌরসেন কপটতা করিতেছে না। এখন উহার কি প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিবেন তাহাই করুন।"

"এই দণ্ডে আশ্রম হইতে বহিষ্কার।"

"যথা আজ্ঞা গুরুদেব।"

নত হইয়া দুইজনকে প্রণাম করিয়া সৌরসেন ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

তাহার পর আর কোনো বিঘ্ন ঘটিল না। বিঘ্ন উৎপাদনকারীই যখন বহিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে তখন তো আর গোলযোগ ঘটিবার কারণ নাই। নির্বিঘ্নেই বীতরুণ ও বিদ্যাত্রেয়ীর পাণপত্রানুষ্ঠান সমাধা হইয়া গেল।

তাহার পর আচার্য স্বীয় মন্দিরায় ফিরিয়া আসিলেন। কক্ষে প্রবেশ করিয়া দীপ জ্বালিতে যাইবেন—পরিচিত কণ্ঠে কে যেন আহ্বান করিল, "আচার্য!"

আত্রেয়ীর কুঞ্চিত ভ্রূ কুঞ্চিততর হইয়া উঠিল। দীপাধার ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করিয়া দেখিলেন, কক্ষের বাহিরে গবাক্ষের নীচে শক্তিকাসনে কে যেন বসিয়া আছে। রূঢ় কণ্ঠে আচার্য কহিলেন "তোমার প্রতি না বহিষ্কারের দণ্ডবিধান করা হইয়াছে? তথাপি কোন্ সাহসে এখানে বসিয়া আছ?"

"কিন্তু গুরুদেব আমাকে আশ্রম হইতে বহিষ্কার দণ্ড দিয়াছেন আর তোমার কুটির তো আশ্রম সীমানার বাহিরে পড়ে! ভয় নাই—আমি চলিয়াই যাইব—বহুদূরে আমার যাত্রাপথ, আর কোনোদিন ফিরিয়া আসিব না। আত্রেয়ী, তোমাকে শুধু একটিমাত্র কথা বলিবার জন্যই প্রতীক্ষা করিয়া আছি। নারীকে হৃদয়দান করিয়াছি সত্য কিন্তু তাহার উপরে অপরাধ আর বাড়াইব না—তোমার পবিত্রতাকে কোনোদিন আমার সান্নিধ্য, আমার স্পর্শ দ্বারা আবিল করিয়া তুলিব না। তোমাকে আজীবন আমার আরাধ্যাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলাম।"

গবাক্ষ পার্শ্ববর্তী ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে গহন অন্ধকারের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

আশ্রম প্রকোষ্ঠে বেদিকার উপরে মহাচার্য করতলন্যস্তকপোলে উদাস নেত্রে তাকাইয়া বসিয়াছিলেন। গৃহাসক্তে ভাষ্যকরণে মন লাগিতেছে না—কোথায় যেন কেমন করিয়া একটা ছন্দপতন ঘটিয়া গিয়াছে—কিসের শূন্যতা অন্তরলোকে?

মন্থর পদক্ষেপে কে যেন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দীপশিখা উজ্জ্বল করিয়া দিল। মহাচার্য ফিরিয়া তাকাইলেন। "আত্রেয়ী? এত রাত্রে?"

"বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ আসিলাম।"

"প্রয়োজন ব্যক্ত কর।"

"বীতরুণকে আমি বিবাহ করিতে পারিব না।"

"কিন্তু পাণপত্রের সময়ে তো তুমি সম্মতি দিয়াছিলে?"

আত্রেয়ীর চম্পাগৌর মুখশ্রী সুরক্তিম হইয়া উঠিল

"আমি ঠিক নিজের মনকে তখন অনুধাবন করিতে পারি নাই তাত। আমি বিবাহই করিব না। ব্রহ্মচারিণীর জীবন শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিতেছি।"

মহাচার্য গাঢ়স্বরে কহিলেন, "বুঝিয়াছি। বেশ, তাহাই হইবে।"

আত্রেয়ীর দুইটি আয়ত নয়নপ্রান্তে দুই বিন্দু অশ্রু দীপালোকে চকচক করিয়া উঠিল।

পথ-চাওয়া

মানবেন্দ্র পাল

এ গ্রামের ঐ বুড়ো বটগাছ—তার পিছনেও ইতিহাস আছে। ঐ পীর-তলা ওর পিছনেও তাই। এক টুকরো কালো পাথর—সর্বাঙ্গে তার সিঁদুরের প্রলেপ। ঐ পাথরও নাকি স্বপ্ন দেয় ভক্তকে! এ গ্রামের বাঁশতলার পথে নির্জন দ্বিপ্রহরে কিম্বা সন্ধ্যার পর চলতে আজও গায়ে কাঁটা দেয়। কেন, তা কে জানে! ভাঙ্গা মন্দিরের কবেকার পুরনো বুড়ো শিব আজও নাকি শিবরাত্তিরের মাঝ-প্রহরে জেগে ওঠেন। তখন কেউ কাছে যেতে সাহস পায় না। দূরে থেকে শুনতে পায় গুড়ুম্ গুড়ুম্ শব্দ! ডমরু বাজছে বাবা রুদ্রেশ্বরের হাতে।

কিন্তু এ ছাড়া আরও কত অলৌকিক ঘটনা ঘটে কিনা ক'জনই বা তার খবর রাখে?

এ-গ্রামের চক্রবর্তীদের বিরাট পুরনো বাড়িখানা দেখলে আজও মনের মধ্যে কেমন করে ওঠে। ঐ এলোকেশী পুকুরের পাড় দিয়ে তালবাগানের দক্ষিণ কোণে তার ভাঙ্গা গেট। এককালে ঐ চক্রবর্তীদের প্রতাপ ছিল গ্রাম জুড়ে। দুর্ধর্ষ নরেন্দ্র চক্রবর্তীর সে-কাহিনী কেউ কি ভুলবে কোনো দিন? প্রতি বছর ঘটা করে দুর্গোৎসব হত। চারদিন ধরে ভূরি-ভোজন। বহুকালের পুজো। কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটল সেবার। হঠাৎ নবমীর দিন বলি গেল বেধে। কামার খাঁড়া ফেলে দিয়ে টলতে টলতে চলে গেল! তারপর—

তারপর থেকেই শুরু হল অপমৃত্যু। দেখতে দেখতে অত বড় বাড়িখানা শূন্য হয়ে গেল। লোকে বলল, নরেন্দ্র চক্রবর্তীর পাপের ফল এমনিভাবেই ফলল।

আজ দীর্ঘ দিন পর এ-বাড়ীতে শুধু টিম্ টিম্ করছে তিনটি প্রাণী, পঁয়ষট্টি বছরের এক বৃদ্ধা—তার এক পুত্রবধূ আর এক দেওর-পো শংকর।

সে-দোল দুর্গোৎসব নেই—অন্নক্ষেত্র নেই। কিন্তু তবু আজও বাইরের বিরাট হল-ঘরে তাস-দাবা পড়ে। শংকরের বন্ধুরা আড্ডা দেয়। মাঝে মধ্যে মহকুমা শহর থেকে এক এক বন্ধু আসে শিকারে।

এ-বাড়ীতে ঘরের অভাব নেই। বাইরে বিরাট হল-ঘর। তার পরেই অতিথিশালা—তারপরে বাঁকা বারান্দা। সেই বারান্দা পার হয়ে তবে অন্তঃপুরে। অতিথিশালা আজ খাঁ খাঁ করে। তবু মাঝে মধ্যে কখনো কদাচিৎ সে-ঘরে ঝাঁট পড়ে—পুরনো গদি রোদে দেওয়া হয়। কি না ছোটোবাবুর কোন্ শিকারী বন্ধু আসবে বর্ধমান থেকে।

কিন্তু কেউ জানে না এক এক গভীর রাতে সেই অতিথিশালার ঘরের জানলায় একটুকরো আলো এসে পড়ে। ম্লান আলো। থর্ থর্ করে কাঁপে তার শিখা।

না, ঘরের মানুষ টের পায় না। তার চোখে তখন গভীর ঘুম।

তারপর কখন ভোর হয়। অতিথি ঘুম থেকে ওঠে। খিল খোলে। না, কিছুই তেমন লক্ষ্যে পড়ে না। তবে দেখতে পায়, উঠনের ধারে রজনীগন্ধার ডালভরা কুঁড়িগুলো কখন ফুলে ফুলে ভরে গিয়েছে।

অতিথি চলে যায়। কিন্তু রাতের সেই আলোর খবর কেউ কি জানে এ গাঁয়ের? বোধ হয় না। শুধু জানে একজন।

বৌমা!

থমকে দাঁড়ালো বধূ। শ্বেত শতদলের মতো পাদুখানি যেন আটকে গেল মাটির সঙ্গে।

—কোথায় যাচ্ছ?

বধূ উত্তর দিল না।

বৃদ্ধা এগিয়ে এলেন কাছে। গম্ভীর স্বরে বললেন—না, সন্ধ্যা দিতে বাইরের ঘরে তোমায় যেতে হবে না। দেখছ না, শংকরের এক বন্ধু এসেছে আজ?

প্রদীপখানি মাটিতে নামিয়ে রেখে বধূ ফিরে গেল ধীরে ধীরে।

বৃদ্ধা তুলে নিলেন সেই প্রদীপ। ঘরের চৌকাঠে জলের ছিটে দিলেন, প্রদীপ দেখালেন, ধুনো দিলেন। তাপর ডাকলেন শংকরকে।

শংকর উঠে এল একটু বিরক্ত হয়ে।

বৃদ্ধা বললেন—তোমার ঐ বন্ধু কি আজ এখানে থাকবে?

—হ্যাঁ, থাকবে না তো যাবে কোথায়? আজ দু'দিন ধরেই তো তোমায় বলছি।

বৃদ্ধা গম্ভীর হয়ে চলে গেলেন।

শংকরের ভালো লাগল না সে গাম্ভীর্য। বললে—আমার বন্ধুরা এলেই তোমার মুখ ভার! কেন, তোমার বৌমাকে সামলাতে পার না? তালা দিয়ে রাখবে।

বৃদ্ধা থমকে দাঁড়ালেন।

—শংকর!

বৃদ্ধার সে কণ্ঠস্বরে শংকর সংযত হল। মাথা নিচু করে চলে গেল।

অনেক রাত্রে বৃষ্টি নামল আকাশ ভেঙ্গে। ঘুম ভেঙ্গে গেল বৃদ্ধার। এমনিতেই বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে ঘুম চলে গিয়েছে। এখন আবার নতুন দুশ্চিন্তা! একটু ঘুম এলেই চমকে ঘু ভেঙ্গে যায়। তাড়াতাড়ি পাশেই কাকে যেন খোঁজেন। আজও খুঁজলেন। দেখলেন বিছান শূন্য। ধড়মড় করে উঠে বসলেন। ঐ যে দরোজ খুলে কে যেন পা টিপে টিপে নিঃশব্দে বেরিয়ে যাচ্ছে। হাতে তার জ্বলন্ত প্রদীপ।

বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন।

চাপা স্বরে ডাকলেন—বৌমা!

শক্ত করে ধরলেন হাত। আর একটু হলে শাঁখাটা ভাঙ্গত। ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলে আলো—পাছে কেউ দেখতে পায়।

—ঘরে এসো।

যন্ত্র চালিতের মতো বধূ ঘরে এসে বসল

—ছি ছি বৌমা! এ তুমি কী করছ তোমার জন্যে কি আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব

কথাটা বলেই চমকে উঠলেন বৃদ্ধা। না-না গলায় দড়ির কথাটা বলা ভালো হল না। ক জানি কখন কী করে বসে।

তখন আস্তে আস্তে বৌয়ের মাথাটা বুকে চেপে আদর করে বললেন—হ্যাঁ মা, এমনি করে কি তোমায় চিরদিন আমি আগলে বেড়াব? লোকে ভাববে কি? এত বড়ো বংশের বৌ—

বৃদ্ধার স্বর অশ্রুরুদ্ধ হল।

—সে কি ফিরে আসে? সে যে আর ফের নয়। সে আসবে না—আসবে না—আসবে না বৌমা, শোনো, আমি তার মা হয়ে বলছি, সে আর নেই—সে মরে গেছে।

থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল বৃদ্ধার জরাজীর্ণ দেহখানা। ঘোলাটে চোখের কোণ ঠেলে বেরিয়ে এল জল।

—বৌমা! এ কী তুমি কাঁদছ! সত্যি কাঁদছ!

সত্যি বধূ কাঁদছে নিঃশব্দে।

বৃদ্ধা চমকে উঠলেন, তবে কি এতদিন পর পাষাণীর চেতনা ফিরল? এতদিন পর সত্যিই কি আজ বুঝল, সে-মানুষ আর ফিরবে না!

রাত তখন গভীর হয়েছে। বাইরে বৃষ্টি নেমেছে। নারকেল গাছের পাতায় পাতায়, দেবদারুর শাখায় শাখায় ঝড় যেন আর্তনাদ করে ফিরছে। মেঘ ডাকছে গুরুগম্ভীর স্বরে। খোলা জানালা দিয়ে ছিটকে আসছে বিদ্যুতের চমকে-ওঠা আলো। বৃদ্ধা সেই আলোয় ঝুঁকে পড়ে কী দেখলেন যেন।

হ্যাঁ, বৌমা ঘুমিয়ে পড়েছে। শান্ত মুখশ্রী। কালো ঘন চোখের পাতা বুজে রয়েছে। সিঁথিতে সিঁদুর। কপালে বড়ো করে আঁকা টিপ।

আহা সেই কচি মুখখানি আজও তেমনি আছে। কে বলবে সাত বছর চলে গিয়েছে এর মধ্যে।

হঠাৎ বৃদ্ধা চমকে উঠলেন। কে যেন দরজা ঠেলছে না?

না, বাতাস।

সে-রাত্রেও এমনি ভাবেই বধূ ঘুমিয়ে পড়েছিল। চৌদ্দ বছরের বউ। বৃদ্ধা উঠে দেখেন মেয়ে ঘুমুচ্ছে অকাতরে। একটুখানি জায়গায় কোনো রকমে শুয়েছে কুঁকড়ে। মাথায় তেল নেই—রুক্ষ চুল জট পাকিয়ে উঠেছে। শুধু সিঁথিতে দপ দপ করে জ্বলছে সিঁদুর।

বৌ ছিল খুব হাসিখুশি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বিকেল হলেই রোজ যেত পুকুরে গা ধুতে। প্রথমে পা হাত ধুতো সাবান দিয়ে। খোসা দিয়ে রগড়াতো গা। তারপর খোঁপা বাঁচিয়ে মুখে ঘাড়ে সাবান দিত।

শাশুড়ি মাঝে মধ্যে বকতেন—বৌমা, অতক্ষণ জলে থেকো না। অসুখে বিসুখ করবে!

বৌ তার উত্তর দিত না। একটু হাসত মাত্র।

গা ধুয়ে এসে কাপড় ছেড়ে যখন সে রান্নাঘরে এসে ঢুকত, তখন শাশুড়ি মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতেন। ছোট্ট কপালে গোল করে সিঁদুরের ফোঁটাটি—আহা এমন কপাল নইলে কি সিঁদুরের ফোঁটা মানায়।

কিন্তু বিভাস যেদিন রোগে পড়ল—

রোগ কি আর একটা? মাথার বিকৃতি ঘটেছিল অনেকদিন থেকেই। সামান্য বিকৃতি। বাইরে থেকে হঠাৎ কেউ বুঝতে পারত না। সারা দুপুর ঘুরে বেড়াত একা একা তাদের ভাঙা বাড়ির আনাচে-কানাচে। পুরনো নহবতখানার নীচে দাঁড়িয়ে কী ভাবত এক মনে। মনে হত, সেই সব পুরনো যুগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যেন কথা বলছে।

সন্ধ্যে উৎরে যেত, তবু ফেরার নাম নেই। একখানা কালো ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে চক্রবর্তী বংশের জ্যেষ্ঠ বংশধর। দূরে থেকে কিশোরী বধূ দেখে ছুটে আসত শাশুড়ির কাছে। ঐ ভাঙা ইঁটের স্তূপে—কী না বেরোতে পারে এই সন্ধ্যে বেলায়!

বৃদ্ধা নিজে যেতেন ডাকতে।

—খোকা!

স্বপ্ন ঘোর থেকে উঠত বিভাস।

—মা।

—কী করছিস এখানে

উত্তর দিত না। বাধ্য ছেলেটির মতো চলে আসত মায়ের পিছু পিছু।

আবার এক একদিন গভীর রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ত। নববধূর ঘুম ভেঙে যেত। সভয়ে তাকাতো স্বামীর পানে।

—কোথায় যাচ্ছ গো?

—আমি আর সহ্য করতে পারছি না। কঙ্কালের মতো ঐ ভাঙা বাড়ি যেন এগিয়ে আসছে সব গ্রাস করতে। এর হাত থেকে আমাদের বাঁচতে হবে। আবার সেই আগের দিন আমায় ফিরিয়ে আনতেই হবে। শুনতে পাচ্ছ না তুমি নহবতখানায় বেহাগের সুর কেঁদে উঠছে।

বধূ চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে। ঘুম ভেঙে যায় বৃদ্ধার। ছুটে আসেন। —খোকা!

—মা!

বাধ্য ছেলেটির মতো শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

এ রোগ তো ছিলই। তবু এতে ক্ষতি ছিল না। এতো আর রোজকার ব্যাধি নয়। এমনিতে ভালো মানুষ। খায় দায় গল্প করে। স্ত্রীর সঙ্গে ঠাট্টা গল্পেরও অন্ত নেই। তখন কে বলবে অমন ব্যাধি লুকোনো? কিন্তু হঠাৎ এবার পড়ল কঠিন রোগে। জ্বর আর জ্বর। জ্বর আর ছাড়ে না। বৌমার হাসি মিলিয়ে গেল। সাজ গেল ঘুচে। সেবা করবার সুযোগ পেত না, সেই অক্ষমতার জন্যে তার লজ্জার সীমা ছিল না। ছেলেমানুষ বলে শাশুড়ি কোনো দায়িত্ব দিতেন না বৌ-এর ওপর। ছেলের সেবার ভার নিজেই নিয়েছিলেন তুলে। বেচারি বউ ম্লান মুখে ঘুরত শাশুড়ির সঙ্গে সঙ্গে—যদি কিছু কাজ দেন দয়া করে। কোনো কাজই যখন পেত না তখন বসত পাখা নিয়ে। বাতাস করতে। কিন্তু বেশিক্ষণ বসতে পারত না। পোড়া ঢুলুনি নামত চোখে।

সেদিন অমনি ঢুলছে আর পাখা গিয়ে লেগেছে বিভাসের কপালে। তখনো বেঘোর হয়নি বিভাস। হেসে বললে, —বাঃ বাঃ খুব হয়েছে! তুমি যাও ঘুমোওগে।

বৌ লজ্জায় মাথা নিচু করে দ্বিগুণ জোরে বাতাস করতে লাগল।

পাড়াগাঁ—চিকিৎসার সুযোগ ছিল না। রোগ বেড়ে চলল। জ্বরে বেহুঁশ। সেই সঙ্গে ভুল বকা। শেষ পর্যন্ত বেঘোরে বিছানা থেকে উঠে পড়ে। ছিটকে চলে যেতে চায়। সারা রাত শাশুড়ি বৌ মিলে চেপে ধরে থাকে। তবু কি সামলানো যায়!

পরের দিন বৃদ্ধা অনেক কষ্টে একে ওকে ধরে সদর থেকে ডাক্তার আনালেন। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করলে। তারপর একবার গা ফুঁড়ে ওষুধ দিয়ে গম্ভীর মুখে চলে গেল।

বৃদ্ধা কাতর স্বরে বললেন—ডাক্তার বাবা—

ডাক্তার বললেন—এখন কিছু বলতে পারি না। কিন্তু সাবধান রুগী যেন কিছুতেই উঠে না বসে।

সারা রাত রোগী অজ্ঞানের মতো পড়ে রইল। আর সেই উন্মত্ততা নেই। বৃদ্ধা খুশি হলেন। মনে মনে নারায়ণ স্মরণ করলেন।

—বৌমা!

মনে মনে হাসলেন বৃদ্ধা। আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

—বৃদ্ধার শরীর আর চলছিল না। পর পর ক'রাত্রি জাগরণ। চোখের পাতা টেনে আসছিল। তা ছাড়া আজ রুগীর অবস্থাও অনেক ভালো। এবার তিনি বৌকে তুলে দিলেন।

—এবার তুমি একটু বোসো তো বৌমা, আমি একটু গাটা গড়িয়ে নিই।

খুশি মনে বধূ উঠে এসে বসল স্বামীর মাথার কাছে। ডুরে শাড়িখানি পরণে। কপালে সিঁদুর জ্বল জ্বল করছে। রুক্ষ অগোছাল চুল, মাথায় কাপড়। আজ এতদিন পরে পেয়েছে স্বামী সেবার পূর্ণ অধিকার। গর্বে বুক দুলে উঠল। পাখা নেড়ে চলল। পাখা নেড়ে চলল আর তাকিয়ে রইল স্বামীর মুখের দিকে। কি নিশ্চিন্ত ঘুম। আহা এমন ঘুম উনি কতদিন ঘুমোননি। শুধু উনি? এ বাড়িতে কেউ ঘুমিয়েছে —এক শঙ্কর ছাড়া? বড়ো স্বার্থপর ছেলে।

অন্তর্দ্বন্দ্ব

শ্রীসুলেখা ঘোষ

তোমার ঐ কালোচোখে
বেদনার সুগম্ভীর ছায়া,
শ্রাবণ মেঘের মতো
আমার মনের নীলাকাশে
আবির ছড়িয়ে যেন
এঁকে চলে স্বপ্নময় মায়া
তারি ছোঁয়া লাগে বুঝি
অরণ্যের মহুয়া পলাশে।

তোমার চোখের চাওয়া
আঁধার রাতের ভীরু পাখী,
ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে ওঠে
সজল করুণ পল্লব—
সরম জড়ান চোখে আমি
তাই শুধু চেয়ে থাকি
ভুলে যাই নিখিলের
হিংস্রতার মত্ত কলরব।

আকাশে তারার দীপ,
বাতাসে ফুলের মধুবাস,
তোমার হৃদয়ে বুঝি
সমুদ্র ঝড়ের আলাপন,
মুকুতা অশ্রুজলে মুছে দিয়ে
সব উল্লাস
হৃদয় নদীতে বুঝি
জোয়ারের লেগেছে কাঁপন

কেন এ অশান্ত মন,
কেন এ বেদনা সুগম্ভীর?
মরীচিকা সম আজ ছুটে চলে
সাহারার বুকে
যাহার সন্ধানে: সে কি
বাঁধিবারে চায় মায়া নীড়?
তারে তুমি দেখেছ কি তোমার ঐ
চোখের আলোকে?

তোমার মরমে আজ উঠেছে যে
সাহারার ঝড়
খুঁজে দেখো তারো মনে
সে ঝড় বহিছে নিরন্তর।

সীমায়িত

সুখেন্দু পুরকায়স্থ

সকালে ছিলে ঘরের তুমি, বিকালে বলো কার?
শিশিরে ভেজা মন
শুকোতে দিলে আলোর হাতে, দরোজা খুলে তার
নিজেকে নিয়ে খুশীর রঙে হেসেছো সারাক্ষণ!
মেলেছো পিঠে চুলের মায়া, পরেছো ডুরে শাড়ি,
সকালে ছিলে নিজের,
কোথা বিকালে দিলে পাড়ি!

দুপুরে নিলে আঁচল ভ'রে সকালে ফোটা ফুল,
বিকালে হ'লে কার?
আকাশে ছুঁড়ে মনের সীমা, পলাশে বেঁধে চুল
নিয়েছো তুলে বুকের মাঝে গোধূলি-গাঁথা হার!
দিয়েছো সাড়া পথের ডাকে : দুপুরে তাড়াতাড়ি
পিছনে ফেলে ঘরের মায়া বিকালে দিলে পাড়ি।
এবারে মেয়ে সাঁঝের মুখে ঠিকানা পাবে তার,
প্রদীপে জেবলে মনের বাতি বলতো তুমি কার!

প্রেমাধীন

শ্রীদিলীপকুমার রায়

যতই কেন চাও না হরি,
পারবে না গো বিদায় দিতে।
যতই খেলো নিঠুর খেলা,
পারবে না মুখ ফিরিয়ে নিতে॥

প্রেম শেখে দাও যতই ফাঁকি
করলে তোমায় ডাকাডাকি,
না দাও দেখা কাছে টেনে,
আপনে না আপন মেনে,
আমরা তোমায় রাখলে মনে
পারবে না তো মন ভাঙিতে॥

যদি ধ'রে দোষই কেবল
পাষাণ করো হৃদয়কমল,
নেই কোনো গুণ ব'লে পায়ে
ঠেলো যদি অসহায়ে
শিশুর মত আমরা কেঁদে
ধরব তোমার চরণ হৃদে।

দুঃখ বা সুখ যাই দাও, ছল,
রবো পায়ে বিছিয়ে আঁচল,
উঠবেই একদিন সে ভ'রে—
আশায় রবো চরণ ধ'রে
শরণ চেয়ে—বিমুখ হ'তে
পারবে না, হবেই ঝরিতে।

মলিন মীরা—জানি মোহন,
তুমি যখন পতিতপাবন,
এক তৃষা যার তুমি, হরি,
ডোবে কি তার জীবনতরী?
বাঁধব তোমায় এমনি প্রেমে—
পারবে না সে ডোর ছিঁড়িতে।

[ইন্দিরা দেবীর সমাধিশ্রুত হিন্দী ভজনের অনুবাদ (৭-৭-'৫৯)]।

লিপি

শ্রীমতী মায়া পণ্ডিত

নিষ্ফলের লজ্জা মাঝে রাত্রির আঁধার হবে জাগি
তবু একি সত্য নয়?
প্রভাতের সাফল্যের বাণী,
ঊষার নির্মলহাস্যে লেখা রয়
রাত্রির প্রভাতে—
মালিন্যের মেদুরতা মুছে লয় আপনার হাতে।

সয়েছ যে নিরানন্দ
বহেছ যে কঠিন অভাব অভিশাপ,
গোপন অন্তর মাঝে ব্যর্থতার জ্বালা দুর্বিষহ
সয়েছ কঠিন দুঃখ।
সেই তব অতি প্রিয়জন
আমার অন্তরতম—
তাহার সর্বস্ব দিয়ে নিজেরে নিঃশেষে নিবেদন
সুযোগ্য সম্মান তার
পারনি রাখনি সেই ক্ষণে,
শরণার্থি আর্তত্রায় নির্যাতিত হল অপমানে।

তাই ভাবি সংগোপনে, তাই-ই সত্য নাকি?
সে স্বপন কি মিথ্যা নয়?
নাহি কিছু বাকি?
সত্য শুধু অন্ধকার ঘনঘোর অমানিশিথিনী?
ভয় ছিল আঁধারের সীমা
শেষ বুঝি নাহি হবে এ জীবন লক্ষে।
হেন কালে তুমি ফিরে এলে—
অন্ধকার রাত্রি শেষে,
অনুরাগ দৃষ্টিদীপ জেবলে, হৃদয় আকাশে।

চিত্ত মোর স্তব্ধ আত্মহারা—
কি দেখে আঁধার রাতে?
সে কি নব সূর্যের ইশারা?

এখন থেকেই যা তৈরী হচ্ছে! তা ছাড়া কেমন করে যেন তাকায় তার দিকে। বুক কেঁপে ওঠে। না, এমন ঘুম তার শাশুড়িও কত দিন ঘুমোতে পারেন নি। সেও না। যদিও একটু একটু চোখ বুজিয়েছে অমনি চমকে উঠেছে—এই বুঝি শাশুড়ি ডাকছে।

স্বামীর সেই ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চতুর্দশী বধূ কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়ল। ঘরে শুধু তিনটি প্রাণী—তিনজনেই ঘুমে অচেতন। শুধু মাথার কাছে হারিকেনটা ম্লান আলোয় পাহারা দিচ্ছিল। সেটাও নিভে গেল কখন। অন্ধকার—শুধু অন্ধকার। দরোজাটায় পর্যন্ত খিল আঁটা হয়নি।

তারপর এক সময় কখন ভোর হল। পাখি ডাকল। জানলা দিয়ে একফালি নতুন দিনের আলো এসে পড়ল বধূর মুখে।

কি যেন দুঃস্বপ্ন দেখে শাশুড়ি উঠলেন ধড়মড় করে। আজও তাঁর স্পষ্ট মনে আছে সেই মুহূর্তগুলো। উঃ কি ভয়ংকর।

—খোকা!

—বৌমা—

বধূও উঠে পড়ল। প্রথমটা সেও বুঝতে পারেনি।

—ঘুমিয়ে পড়েছিলি সব্বনাশী! আমার ছেলে কোথায়?

অপরাধীর মতো বধূ তাকাতে লাগল চারিদিকে। শূন্য বিছানা। সে মানুষ যাবেই বা কোথায়? যে আজ তিন দিন জ্ঞান হারা? চারিদিকে খোঁজা খুঁজি হল। নিদয় মানুষরা পুকুরে জাল ফেললে—নদীর জলে নৌকো ভাসালে। কৌতূহলীর দল ছুটল গ্রামে গ্রামে। কিন্তু খোঁজ পাওয়া গেল না।

তারপর কত গণনা—কত [illegible]চালা—হাত-চালা—কাঁড়চালা! কত মানত—উপবাস! মালতীপুরের আকাশ বাতাস চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু সে-মানুষ আর ফিরল না।

চতুর্দশী বালিকাবধূ সেদিন এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেনি। কাঠের মতো নির্বাক নিষ্পন্দ হয়ে রইল।

সেই মৌন তার আজও ভাঙে নি। আর চোখের জল? সেই চোখের জল কি আজই প্রথম পড়ল মায়ের কথায়? প্রদীপ-হাতে আপন মানুষ খুঁজে বেড়ানো কি আজ শেষ হল? হল প্রতীক্ষার অবসান? এতদিনে কি সত্যিই বুঝল—সে-মানুষ আর নেই! কোনো ছলনায় কোনো ছদ্মবেশে সে আর ফিরে আসবে না।

কিন্তু সত্যিই কি নেই? সে যে নেই তারই বা প্রমাণ কি? সে কি ফিরে আসতে পারে না—অন্ততঃ একটি দিনের জন্যে—একটি মুহূর্তের জন্যে? মাগো—কেমন আছ?

বৃদ্ধার পাথরের মতো কঠিন হৃদয় হাহাকার করে উঠল।

যদি সে এই বর্ষার রাত্তিরে এসে বন্ধ দরোজায় ডেকে ডেকে ফিরে যায়? ঐ তো শব্দও হচ্ছে যেন!

উঠে বসলেন বৃদ্ধা। বুক কাঁপছে দুরু দুরু। চুপি চুপি দরজা খুললেন। না, বৌমা টের পাবে না। সাবধানে জ্বাললেন প্রদীপখানি। হাতের আড়ালে শিখাটি বাঁচিয়ে এগিয়ে চললেন বৃদ্ধা।

মালতীপুরের এও এক আশ্চর্য রাত্রি—আশ্চর্য এই শেষ প্রহর। কে জানবে বলো এ রহস্যের ইতিহাস?

ম্লান আলো কাঁপা কাঁপা ছায়া ফেলে এগিয়ে চলেছে টানা বারান্দা পার হয়ে কুয়োতলার পাশ দিয়ে খিড়কি-দরজার দিকে।

হঠাৎ চমকে উঠলেন বৃদ্ধা। পায়ের শব্দ না? চকিতে পিছন ফিরে তাকালেন,—এ কী তুমি!

উত্তর দিল না।

—দেখতে এলাম খিড়কির দরোজা[illegible] কিনা, সেখানেও তুমি পিছু নেবে!

বধূ অপরাধীর মতো সজল [illegible] দাঁড়িয়ে রইল।

[illegible] তোমার!

[illegible]র জোর।

পূতি গন্ধ

(২৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ছুটি নিয়েছিলেন বিয়ের দিন। কিন্তু বিকাল বেলায় স্ত্রীর অনুরোধ উপেক্ষা করে যথারীতি বেরিয়েছিলেন ছাতা হাতে নিয়ে। স্ত্রী বলেছিলেন, মেয়ের বিয়ের দিন উপোস করতে হয় বাপকে, সম্প্রদানের সময় পর্যন্ত। শুনে তিনি হেসে বলেছিলেন—'ওটাকে যা ভাবছ তা নয়। ওটা ওষুধ। ভিটামিন। ডাক্তারে খেতে বলেছে।'

মেয়ের বিয়ের খাতিরে সেদিন ফিরেছিলেন একটু তাড়াতাড়ি, আর পকেটে নেড়ে বিস্কুট ছিল না।

মৃণালিনী যখন এখানে প্রথম এসেছিলেন, তখন বুঝতে পারতেন না স্বামীর মুখের ওই টিঞ্চার আইডিনের মত গন্ধটা কিসের। রাতে বাড়ী ফিরবার সময় তাঁর কুড়মুড় কুড়মুড় করে ঝাল নেড়ে বিস্কুট চিবানর অভ্যাসও উনি সেই সময় থেকে দেখে আসছেন। পরে আন্দাজে বুঝেছিলেন যে ঝাল বিস্কুট চিবুলে জিভের সাড় ফিরে আসে, আর বোধ হয় মুখের গন্ধটাও একটু কমে। [illegible]র পকেটের উদ্বৃত্ত ঝাল বিস্কুটগুলো [illegible] উপরি পাওনা মৃণালিনীর সংসারের [illegible]ক। এরই লোভে ছেলেমেয়েরা সন্ধ্যা [illegible]না ঘুমিয়ে, উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করত [illegible]র বাড়ী ফেরবার। এই সময়টুকুতেই শুধু তাদের মনে পড়ত বাবার কথা। বাবার [illegible] এ সময় কারও কথা মনে রাখবার মত [illegible] থাকত না।

অফিস [illegible] কিছুতেই করতে চাইতেন না নাজিরবাবু। [illegible]র গায়েও তাঁকে কতদিন অফিস যেতে [illegible]ন মৃণালিনী। বলতেন, 'তুমি না গেলে [illegible]ক অফিস অচল।' স্ত্রীর ধারণা ছিল [illegible] পাওনার লোভেই তিনি অসুখ করলেও [illegible] যান। তাই রিনির বিয়ের পরদিন [illegible] অফিস যেতে দেখে তিনি আশ্চর্য হননি। [illegible] যাবার সময় মনে পড়িয়ে দিয়েছিলেন, [illegible]এর চাকরির চেষ্টাটা আজকে একটু [illegible]র করতে।

সন্ধ্যা হয়ে [illegible]বে, বাড়ীর কর্তা সেদিন ফিরলেন না [illegible]কে। জামাই-এর চাকরির কতদূর কি হল [illegible]র জন্য মৃণালিনী একটু উৎকণ্ঠিত হয়ে [illegible]। আটটা বাজল, নটা বাজল—কর্তার [illegible]ই। জামাই-এর চাকরির চেষ্টায় ঠিক কত [illegible] লাগতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁর [illegible] নাই। তবে এত রাত্রি যে সে জন্য হচ্ছে [illegible] কথা তিনি বুঝে গিয়েছেন ততক্ষণে। [illegible]জিরবাবু ফিরলেন রাত দশটার পর। এসে [illegible]য় পড়লেন তক্তাপোশে। কী আবার হল [illegible] খারাপ? কোন কথার জবাব দেন না। [illegible]বে নিলেন রিনির মা। ঝাল বিস্কুট চিবোচ্ছেন [illegible] সে গন্ধটাও নাকে আসছে না। [illegible]র এ ভাব তিনি কখন দেখেননি এর আগে।

বাড়ীর লোকে [illegible]ব খবর জানতে পারে সব চেয়ে শেষে। [illegible] গুরুতর। মৃণালিনী জানতে পারলেন [illegible]পাড়ার জনকয়েক প্রবীণ ব্যক্তি রাত এগারটার [illegible] কর্তার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। [illegible] বাবা বাড়ী থেকে কিছুতেই বেরুবেন না, [illegible]জ হয়ে বসে রয়েছেন খাটের উপর। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোকরা ভিতরে এলেন।

"যা ধরা পড়েছে, তা ছাড়া আরও অন্য গণ্ডগোল বেরুতে পারে নাকি পুরনো বই-খাতা ঘাটলে?"

"না।"

"টাকা কিছু রেখেছেন?"

"না।"

"যোগাড় করতে পারবেন টাকাটা কোন রকমে?"

"না।"

এছাড়া আর একটি কথাও বার করা গেল না তাঁর মুখ থেকে। শুভার্থীরা চলে গেলেন।

তারপর সবই জানতে পারলেন মৃণালিনী নতুন জামাই-এর কাছ থেকে। রিনির বাবার লেখা হিসাবের খাতায় গোলমাল বেরিয়েছে। কাল উনি ছুটি নেওয়ায় যিনি ওঁর জায়গায় কাজ করেন তাঁরই প্রথম খটকা লেগেছিল। তিনিই সাহেবকে দেখান। তারপর আজ ওঁর সম্মুখে সাহেব এত রাত পর্যন্ত সেই খাতা পরীক্ষা করেন। দেড় হাজার টাকার গোলমাল বেরিয়েছে। সাহেব একদিনের সময় দিয়েছেন টাকাটা ফেরত দেবার জন্য। ফেরত দিলে থানা-পুলিশ করবেন না বলেছেন।

সে রাত্রিতে শুধু তাঁদের কেন, প্রতিবেশীদেরও ঘুম হল না। ভোর বেলাতে মৃণালিনী স্বামীর নাম দিয়ে ছেলেদের কাছে 'প্রিপেড' টেলিগ্রাম পাঠালেন—'ভীষণ বিপদ; অবশ্য আসবে; জবাব দিও।'

সারা দিন রাতের মধ্যে কোন জবাব পাওয়া গেল না সে টেলিগ্রামের। গত কয়েক বছরের হিসাবের খাতা-বই পরীক্ষা করায় আরও ছয়-সাত হাজার টাকা তছরুপের প্রমাণ পাওয়া গেল। বাড়ীশুদ্ধ লোকের কান্নাকাটির মধ্যে পুলিশ নাজিরবাবুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল।

থানা পুলিশ, লোকজন—একেবারে ঝড় বয়ে গেল বাড়ীর উপর দিয়ে। গত সপ্তাহের বিপদটার চাইতেও এ সমস্যাটা অনেক বড়। বর্তমান বিপদটার সঙ্গে তাঁর ভবিষ্যৎ জড়ান। যে দুঃসময়ের বিভীষিকা তিনি দেখতেন চিরকাল, সেইটা হঠাৎ কাছে এসে গিয়েছে বৈধব্যের আগেই। ছেলেদের টেলিগ্রামের জবাব না আসায়, তাঁর আতঙ্ক বেড়েছে আরও বেশী। ভয় কি শুধু এক জিনিসের? পুলিশের লোকরা খবর সংগ্রহের জন্য আনাগোনা আরম্ভ করেছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা রকমের উদ্ভট প্রশ্ন করে বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েদের পর্যন্ত উত্যক্ত করে তুলল। বাড়ীর লোকদের আরও কত রকমে জ্বালাতন করবে কে জানে! লোকবলও নাই, অর্থবলও নাই। শুধু মনের জোর সম্বল করে কি এরকম প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করা যায়! এতগুলো কাচ্চা-বাচ্চাকে দুবেলা খাওয়াতে হবে; মোকদ্দমা চালাতে হবে, স্বামীকে জেল থেকে খালাস করাবার জন্য, আরও কত কি করতে হবে; দরকার টাকার। পুলিশ জামাইকেও থানাতে ডেকেছিল। তিন ঘণ্টা ধরে প্রশ্ন করেছে। যদিই বা না পালাত, এখন এই পুলিশের ভয়েই হয়ত পালাবে। তাহলেই ষোলকলা পূর্ণ হয়। ও পালালে মোকদ্দমায় তদ্বির করবার লোকটা পর্যন্ত থাকবে না।

কত দিক যে মৃণালিনীকে সামলাতে হচ্ছে একা তার ঠিক নাই। পাড়ার লোকের কাছে স্বামীর তহবিল তছরুপের কথাটা এখন আর অস্বীকার করবার কোন অর্থ হয় না। তাই প্রতিবেশিনীদের কাছে অযাচিতভাবে বলা আরম্ভ করেছেন যে, নাজিরবাবুর সব টাকা খরচ হয়েছে তাঁর সংসার আর ছেলেমেয়েদের জন্য। বদ খেয়ালের জন্য তহবিল তছরুপের লজ্জা যে আরও বেশী। ছেলেমেয়েদেরও শিখিয়ে দিলেন বন্ধুদের কাছে এই ভাবেই কথা বলতে। কিন্তু পুলিশের লোকের কাছে এ ধরণের কথা বলা চলে না। তাদের কাছে বলতে হয়—স্বামীর মাইনের চেয়ে সংসারের খরচ বেশী ছিল না; আর রিনির বিয়ের খরচটা চলেছে পুরনো গয়না বেচে।

কাজটা খুব সহজ নয়। ছেলেপিলেরা সব গুলিয়ে ফেলল। তারা পুলিশের লোকের কাছে বলল যে, রিনির বিয়ের খরচ বাবা দিয়েছেন; আর পাড়ার লোকের কাছে বলল যে, টাকাটা এসেছে পুরনো গহনা বেচে।

শুধু কি তাই। গুজব রটেছে যে, সি-আই-ডি'র লোকরা ঘুরছে চারিদিকে হাঁড়ির খবর জানবার জন্য। কে হিতৈষী, আর কে পুলিশের চর বোঝা দায়। ভয়ে মরেন রিনির মা। আত্মরক্ষার কৌশল বদলাতে হল তাঁকে তিন দিনের দিন। ছেলেমেয়েদের উপর হুকুম হয়ে গেল, তারা যেন কারও সঙ্গে কথা না বলে আর।

সব চেয়ে মুশকিল হচ্ছে যে, সরকারী হিসাব-নিরীক্ষক পুরনো হিসাবের খাতা দেখে প্রত্যহ কিছু কিছু নতুন চুরির হদিস পাচ্ছেন। স্বামীর বদখেয়ালে খরচ ছিল, জানতেন। কিন্তু অত টাকা! ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে ওঠে। সারা রাত জেগে থাকেন মৃণালিনী। নিজের জন্য তিনি ভাবেন না। ডুবে মরতে পারেন, যেখানে দু'চোখ যায় চলে যেতে পারেন; কিন্তু অপোগণ্ড ছেলেমেয়েগুলো যে আছে! এগুলোর বাবা তো এই! আর মা-ও যদি চলে যায় তাহলে যে ভেসে যাবে এরা! তিনি থাকতেও হয়ত ভেসে যাবে! দু'হাতে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে রাখলেও হয়ত ভেসে যাবে! নিষ্করুণ সংসারের একটানা বিপদের তোড়ে আড়াল করে দাঁড়ান কি তাঁর মত মেয়েমানুষের কাজ! তিনি একা কতটুকু কি করতে পারেন! ভেবে কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

এরই মধ্যে একটা মেয়েমানুষ হাউ-হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে উঠোনের মধ্যে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বুক চাপড়ায়, আর কাঁদে, আর কত কি বলে। কে? ঘুরনি কাহারণী! এ আবার কেন? এও তাঁর কপালে ছিল! সাহস দেখ! জামাই, ছেলে মেয়ে সবাই বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছা করে! গুটি গুটি পাড়ার ছেলে-মেয়েরাও এসে ঢুকছে এক এক করে বাড়ীর ভিতর। পাড়ার ছেলেরা মজা করছে যে, দিন কয়েক থেকে এই বাড়ীতে একটার পর আর একটা মজার ব্যাপার ঘটছে। বাড়ীতেও এই গল্প, স্কুলেও এই গল্প, বাজারেও এই গল্প। এরই মধ্যে যে কথাটা বড়রা আকারে ইঙ্গিতে বলতেন, ছোটদের না বুঝতে দেবার জন্য এবং ছোটরা প্রত্যেকেই বুঝত—

সেই ফিস ফিস করে বলা কথাটা হঠাৎ জীয়ন্ত হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে নাজিরবাবুর বাড়ীর উঠোনে।

ঘুরনি কাহারণী বলছে যে, খানিক আগে একজন পুলিশ কনস্টেবল গিয়েছিল তার বাড়ীতে, নাজিরবাবু তাকে কি কি গহনা দিয়েছেন জানতে। তাকে নাকি ওই গহনাগুলোর জন্য জেলে পোরা হবে, দারোগাবাবু ঠিক করেছেন। নৃসিংহ স্যাকরা নাকি পুলিশের সাক্ষী। কনস্টেবল বলেছে যে, গহনাগুলো সে যদি দারোগাবাবুকে দিয়ে দেয়, তাহলেই এক সে হাজতবাস থেকে বাঁচতে পারে।

"এখন মা আপনিই বলুন, আমার কি দোষ এর মধ্যে? চুরিও করিনি, ডাকাতিও করিনি। যে চুরি করেছে তাকে ফাঁসি দাও, জেল দাও, যা ইচ্ছা কর। কিন্তু আমাকে নিয়ে টানাটানি—এটা কি ঠিক হবে?"

আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারলেন না মৃণালিনী। "বেরো! বেরিয়ে যা বলছি আমার বাড়ী থেকে এখনি! এখনও গেলি না! দাঁড়া তোরে!"

পাশে রাখা কর্তার ছাতাটাকে হাতে নিয়ে তুলতেই ঘুরনি কাহারণী শাপ-শাপান্ত করতে করতে বেরিয়ে গেল।

"যাকে চিনি না—যার মুখ কখনও জীবনে দেখিনি—সে বাড়ীর উপর উজিয়ে এসেছে গালাগালি করতে।" চোখ ফেটে জল এল তাঁর কথাটা বলতে বলতে। কাঁদিতে কাঁদিতেই পাড়ার ছেলেমেয়েদের তাড়া দিয়ে উঠলেন—"তোরা কি মজা দেখতে এসেছিস? বেরো! বেরো আমার বাড়ী থেকে।"

ঘুরনি কাহারণী তাঁর কাছে ন্যায়বিচার পাবার আশায় কেন এসেছিল, সে কথা তিনি বহু ভেবেও ঠিক করতে পারলেন না। তবে কি সে ভেবে নিয়েছে যে, তিনি পুলিশের কাছে তার বিরুদ্ধে কিছু বলেছেন? বিচিত্র নয় কিছু। কত দুঃখই যে তাঁর কপালে আছে!

উত্তর নাই বা এল; তবু তিনি প্রত্যহ ছেলেদের কাকুতি মিনতি করে চিঠি দিয়ে যাচ্ছেন। জামাই প্রথম দুদিন একটু দৌড়ঝাঁপ করেছিল শ্বশুরের মোকদ্দমার তদ্বিরে। এখন ঢিলে পড়েছে। একটু যেন অন্য রকমের ভাব। জেলখানায় আর টিফিন কোরিয়ারে করে ভাত নিয়ে যেতে রাজী নয় সে। এর মধ্যে মৃণালিনী অন্য একটা আশঙ্কার গন্ধ পাচ্ছেন—পিঁপড়ের যেমন করে আগে থেকে জল ঝড়ের সূচনা পায়, তেমনি করে। জামাইও একটু যেন শাশুড়ীকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে। হতে পারে যে, নিতাই এখন ঘরের কোণায় বসে রিনির সঙ্গে হাসি গল্প করতে চায়; তাই শ্বশুরের ব্যাপারে মন লাগাচ্ছে না; কিন্তু মৃণালিনীর মন বলছে অন্য কথা।

পাড়ার একটি ছেলে নতুন উকিল হয়েছে। জামাইএর হাতে চারটে টাকা দিয়ে সেই উকিলের কাছে পাঠিয়েছিলেন, মোকদ্দমার দেখাশোনা করবার জন্য। নিতাই উকিলবাবুর বাড়ী থেকে এসে বলল—"অনেক টাকার দরকার আসামীকে খালাস করতে গেলে। আমি বরঞ্চ দাদাদের ওখানে নিজে গিয়ে একবার দেখি। কি বলেন? আসতে যদি রাজী নাও হন, তাহলেও গিয়ে পা জড়িয়ে ধরলে অন্ততঃ কিছু টাকা না দিয়ে পারবেন না। জামাই শ্বশুরের জন্য এত করছে, আর ছেলে হয়ে বাপের জন্য করবে না। চক্ষু-লজ্জা বলেও তো একটা জিনিস আছে।"

বুক দুর দুর করছে মৃণালিনীর!

"এখানে একজন পুরুষ মানুষ থাকা দরকার। এ কি মেয়েমানুষে পারে?"

"দুটো দিন কোন রকমে চালিয়ে নিন। কাল, পরশু,—আমি তরশু দিনই ফিরে আসবো।"

হঠাৎ এক বুদ্ধি খেলল মৃণালিনীর মাথায়।

"নতুন জামাইএর একা সেখানে যাওয়া ভাল দেখায় না। বরঞ্চ রিনিকে সঙ্গে নিয়ে যাও।"

"না না। এখন একটা পয়সার দাম আছে আপনার সংসারে। একজন মানুষের যাতায়াতের খরচ আছে তো।"

তিনি বারণ করলেন। রিনিকে দিয়ে বারণ করালেন। তবু জামাইকে আটকানো গেল না কিছুতেই। জানা কথা যে সে আর ফিরবে না। বোকা মেয়েটা এখনও বোঝেনি সে কথা। ভাবছে—পালালে, বিয়ের আগেই পালাত। রিনিটা ভুলে গিয়েছে যে তখনও নিতাই চাকরি পাবার আশা রাখত শ্বশুরের তদ্বিরের জোরে।

...এতদিনে ষোলকলা পূর্ণ হ'ল। যেদিকে তাকাও—অন্ধকার। যেদিকে পা বাড়াও, হোঁচট খাবে! ইচ্ছা থাকলেও কিছু করবার নাই। কোন উপায় কি রেখেছে সেই লোকটা! যে লোকটার হাতে মা তাঁকে সাতপাক দিয়ে সঁপে দিয়েছিল, নিজে কোনরকমে দায়মুক্ত হ'বার জন্য! হাত-পা দড়ি দিয়ে বেঁধে গঙ্গায় ফেলে দিতে পারল না? যবে থেকে এ বাড়ীতে এসেছি, তবে থেকে জ্বলে পুড়ে মরছি। কুকুর বিড়ালের মত দু-বেলা দু-মুঠো খেতে দিয়েছে ঠিকই; কিন্তু একদিনও একটা ভাল করে কথা বলেছে? জানে না। ওসব শেখেনি কোনদিন! ভদ্র ব্যবহার শিখতে হয়। শিখতে হলে ভদ্দর লোকদের সঙ্গে মিশতে হয়। ওর আলাপ পরিচয় সব যে ছোটলোকদের সঙ্গে! বদ যত সব! লজ্জাও করে না! গম্ভীর হয়ে থাকে—ভারিক্কী চাল! যেন কত বড় জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি! ভয়ে একদিনও একটা জোর গলায় কথা বলতে পারিনি ওই মানুষটার সঙ্গে। ওরই জন্য আজ আমার এই খোয়ার! লোকের কাছে মাথা হেঁট করে থাকতে হয় অষ্টপ্রহর! ছেলে-মেয়ে ঘরবাড়ী কিছুর উপর নিজের বলে একটা টান নাই লোকটার! অদ্ভুত! নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না! এমন যার বৈরাগী বৈরাগী ভাব, একটা বউ মরলে সে আবার বিয়ে করতে যায় কেন? বছর বছর কুকুর বিড়ালের মত ছেলেপিলেই বা হয় কেন তার? যে জিনিস-গুলোকে দশজনে খারাপ বলে, টান শুধু সেই-গুলোর উপর। ছি ছি ছি! এত স্বার্থপর! এত অবুঝ! নিজের বদ খেয়ালটাই হল আসল। ভাসিয়ে দিয়ে গেল সকলকে! জেলে পচে মরাই উচিত ওরকম লোকের!.........

"মাসিমা!"

পাড়ার সেই উকিল ছেলেটি এসেছে। ধড়-মড়িয়ে উঠে তাকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে এসে বসালেন। তার কাছ থেকেই শুনলেন স্বামীর খবর। এখন সে একবার জেলখানাতে তাঁর স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে মোকদ্দমার তদ্বিরের সূত্রে। উকিলকে দেখা করতে দেয়। জেলরবাবুর সঙ্গে আলাপ আছে। বলা আছে তাঁকে। মৃণালিনী যদি যান এই সময় তাহলে স্বামীর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারে সে। কত কিছু তো বলবার থাকতে পারে। গেলে, সাড়ে দশটার সময় জেলের সম্মুখের গাছতলায় যেন অপেক্ষা করেন তার জন্য। এই উকিল ছেলেটির কাছ থেকেই মৃণালিনী কথায় কথায় জানতে পারলেন যে, সেই চারটে টাকা জামাই তাকে দেয়নি।

সব সমান! যত সব জোটেও কি তাঁরই কপালে! কথাটা রিনিকে বললেন না; মেয়েটার সারাজীবন যে চোখের জলেই কাটবে! তার বোঝা আর বাড়িয়ে লাভ কি!

জেলখানায় স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যাবার ইচ্ছা তাঁর আদপেই ছিল না। স্বামী জামাইএর মারফত বিড়ি সিগারেট চেয়ে পাঠিয়ে-ছিলেন। প্রথম দুইদিন দেওয়া হয়েছিল। জামাই চলে যাওয়ায় ভেবেছিলেন এ খরচটা বাঁচল। দেখা করতে গেলে আবার সেই কথাটা উঠবে। কাজেই না দেখা করাই ভাল, এই ছিল তাঁর মনোভাব। যে লোকটার হাতে পড়ে, সারাজীবন জ্বলে পুড়ে মরছেন, তার সঙ্গে বলবার মত নূতন কথা কীই বা থাকতে পারে? তবু না বলতে পারলেন না উকিল ছেলেটির কাছে। স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যান না, কথাটা এমনিতেই দেখাত খারাপ। তার উপর ছেলেটি নিজে থেকে জেলরবাবুকে বলে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে এসেছে তাঁর। এক্ষেত্রে দেখা করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করাটা আরও অশোভন হ'ত। তাই তাঁকে যেতেই হ'ল।

টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল। বাড়ীর একমাত্র ছাতাটাকে না নিয়ে উপায় ছিল না। যে জিনিষগুলোকে তিনি অপছন্দ করেন, ঠিক সেইগুলোই তাঁর ঘাড়ে এসে চাপে, এ তিনি চিরকাল লক্ষ্য করে আসছেন! ছাতার বাঁট থেকে ভক ভক করে সিগারেটের গন্ধ বার হচ্ছে। এ গন্ধ বৃষ্টিতে ধুলেও যায় না।

স্বামীর জন্য বিড়ি সিগারেট ইচ্ছা করেই নিলেন না। অত বাজে খরচ করবার মত পয়সা তাঁর নাই। এ নিয়ে আজ যদি স্বামী রাগারাগি করেন, তাহলে তাঁকে বেশ করে দুক কথা শুনিয়ে দেবেন তিনি। অনেককাল মুখ বুজে সব অত্যাচার সহ্য করেছেন; আর তিনি চুপ করে থাকবেন না। ছেলেপিলের মুখে দুটি অন্ন দেওয়ার চেয়েও তাঁর নেশাটাই বড় হ'ল নাকি?

বাড়ী থেকে বার হবার সময় থেকে লজ্জা লজ্জা করছে। লোকে বোধ হয় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তাঁকে চিনিয়ে দিচ্ছে—'ওই দেখ চোরের বউ যাচ্ছে। সেই যে, লোকটাকে হাতকড়ি দিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে জেলে ধরে নিয়ে গিয়েছে তেলের ঘানি ঘোরাবার জন্য—তার বউ। ঘুরনি কাহারণীর সঙ্গে ওর কুটোকুটি ঝগড়া।......

......ছি ছি ছি! এই জীবন নিয়ে আবার বেঁচে থাকা! এই মুখ আবার বাইরের লোককে দেখানো!

ছাতাটা সঙ্গে থাকায় একটু সুবিধা হয়েছে। তবু একটু মুখ লুকোবার আড়াল পাওয়া যাচ্ছে। জেলখানায় যাওয়ার রাস্তায় যত এগোচ্ছেন ততই চলবার ভঙ্গী আড়ষ্ট হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে যে, পথচারীরা নিঃসন্দেহে ধরতে পারছে তিনি কোথায় যাচ্ছেন। মাথার কাপড় টেনে দিতে গিয়ে নিজের হাতের তামাকের গন্ধটা নাকে গেল। গা ঘিন ঘিন করে উঠছে। ছাতার বাঁটের গন্ধটা তাঁর হাতে

(শেষাংশ ২৮৮ পৃষ্ঠায়)

শব্দ মাহাত্ম্য

(১৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ব্যাপার কি?

'ইনস্পেক্টর আসিতেছেন।'

ইনস্পেক্টর পূর্বে কখনো দেখি নাই। এবার দেখিলাম। বেশ কড়া মেজাজের ভারিক্কি লোক বলিয়া মনে হইল।

ইনস্পেক্টর প্রথমে ছেলেদের পরীক্ষা করিলেন। শেষে আমাদের লইয়া পড়িলেন। আমাকে বলিলেন, 'আপনি ঋজুপাঠ পড়ান?'

'আজ্ঞে, হাঁ।'

'ঋজুপাঠ কোন্ বই থেকে নেওয়া হয়েছে, আপনার ছেলেরা তা জানে?'

'জানে কি না, ঠিক জানি না।'

'বইটা কার লেখা, তা তারা জানে?'

'তাও জানি না।'

'বিষ্ণুশর্মা কোন সালের লোক তা জানে কি না?'

'জানি না।'

'আপনি নিজে জানেন?'

'আজ্ঞে, না।'

'শিক্ষক হয়ে আপনি সব কথায় 'জানি না জানি না' ব'লে যাচ্ছেন? এই বিদ্যা নিয়ে ছেলেদের শিক্ষা দেবেন?'

'আজ্ঞে, আমি নীচু ক্লাসের ছেলেদের সংস্কৃত আর বাংলা পড়াই। সেটুকু বিদ্যা আমার আছে। ইতিহাসের কথা শেখাবার জন্য এখানে আলাদা মাষ্টার আছেন?'

ইনস্পেক্টর গর্জন করিয়া উঠিলেন, "দি চীক!"

'চীক' মানে ত গাল। ওয়ার্ড বুকে পড়িয়াছি। 'দি চীক' মানে কি? উনি কি আমার গালটাই দেখিতেছেন? গালে চড় মারিবার ইচ্ছা হইতেছে?

শুনিলাম ইনস্পেক্টর আমার বিরুদ্ধে খুব কড়া মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন। এবং আমাকে শীঘ্র তাড়াইবার পরামর্শ দিয়াছেন।

খবর পাইলাম, গভর্নিং বডি আমাকে তাড়াইতে চায় না। ভাল শিক্ষক পাইলে, তবে তাড়াইবার কথা। কিন্তু ভাল শিক্ষক তাঁহারা কিছুতে খুঁজিয়া পাইবেন না, অবশ্য, যতদিন ইনস্পেক্টর সাহেবের চাকুরী বাহাল থাকে।

(৪)

এই দুর্যোগের সময় ভাগ্যক্রমে যোগেশের দেখা পাইলাম। যোগেশ আমার পুরানো ছাত্র। এখন কোন কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক।

আমার বিপদের কথা শুনিয়া যোগেশ বলিল, "একটা বড় ভুল করিয়াছেন, পণ্ডিত মশাই। উপরওলা চাকুরের কাছে 'জানি না' বলিতে নাই। জানি না শুনিলেই তাহাদের মনে হয়, লোকটা অজ্ঞ, আনাড়ী, ভোঁদা, হাঁদা নির্বোধ। এ যখন ট্রানসিসটারের মানে জানে না, তখন শাল্মলিতরুর মানে জানিবে কিরূপে? হুজুরদের জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিবেন। অন্য মুখে আজ্ঞে বলিয়া যাইবেন। সত্য, মিথ্যা, ন্যায্য, অন্যায্য, কিছুই বিচার করিবেন না। আপনার ভুল ধরিবার বা মিথ্যা ধরিবার মত বিদ্যা ইন্‌স্পেক্টরদের নাই। এবং বাসায় গিয়া, পুঁথির পাতা হাতড়াইয়া, আপনার ভুল ধরিবার মত অবসর ও এনার্জি তাঁহাদের নাই। আমি আপনাকে কতকগুলি কথার একটা লিস্ট্ দিতেছি। এগুলি ওয়ার্ড-বুকের মত মুখস্থ করিবেন এবং কথা কহিবার সময়, যেখানে সেখানে বসাইয়া দিবেন।"

বলিলাম, 'যদি ধরিয়া ফেলে।'

'ধরিয়া ফেলিলে, আপনার উপর তাহাদের শ্রদ্ধা বাড়িয়াই যাইবে। এমন একটি সপ্রতিভ লোককে তাঁহারা সহজে ছাড়িবেন না। এমন কি, সেক্রেটেরিয়েটে একটি ভাল চাকুরীও পাইয়া যাইতে পারেন।'

কিছুদিন পরে শিক্ষামন্ত্রী স্বয়ং আসিলেন, স্কুল পরিদর্শনে। এবারে আর ডাব পাড়াইতে হইল না। কারণ, মন্ত্রী মহাশয় উঠিয়াছেন, ঠিকাদার স্বরূপচাঁদের বাড়ীতে।

স্কুল পরিদর্শন শেষ করিয়া, মন্ত্রী মহাশয় যখন ফিরিয়া যাইতেছেন, তখন আমরা সঙ্গে চলিলাম।

মন্ত্রী মহাশয় গেটের পাশে একটি গাছ দেখাইয়া প্রশ্ন করিলেন, 'এটা কি গাছ?'

হেডমাষ্টার বলিলেন, 'আজ্ঞে ওটা ফোলিয়েজের জন্য। ওর বিশেষ কোনও নাম নেই।'

আমি বলিয়া উঠিলাম, 'আজ্ঞে ওটার নাম ম্যাক্রোডফসা মেগালোফিলিয়া।'

মন্ত্রী মহাশয় বিস্মিত হইয়া আমার দিকে চাহিলেন। এবং প্রশ্ন করিলেন, 'আপনার বটানি পড়া আছে না কি?'

বলিলাম, 'কিছু কিছু পাতা উল্টাইয়াছি।'

সংস্কৃত পণ্ডিতের বটানীতে রুচি! আশ্চর্য! ইংরাজী জানেন না কি?'

'আজ্ঞে না, আমি বাংলায় লেখা বই পড়েছি।'

'বাংলায় বটানি? সে ত ছোট বই।'

'আজ্ঞে, আপনারা ইংরেজী, জার্মান পড়েন। বাংলা বই-এর খবর রাখবার দরকারই হয় না।'

'কিন্তু কি বই?'

'আজ্ঞে বইটার নাম 'উদ্ভিদ পরিচয়' না কি। ত্রিলোচন সুরের লেখা। ১৮৮২ সালে ছাপা হয়। সে বই আর এখন পাওয়া যায় না।'

'যাই হোক, বড় সুখী হলুম, আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে। আচ্ছা, নমস্কার।'

তারপর আর সকলকে নমস্কার করিয়া তিনি গাড়িতে উঠিলেন।

এবার ইনস্পেক্টরের ফুটন্ত রিপোর্টের উপর তেলের ছিটা পড়িল।

কিন্তু জ্বলিয়া উঠিলেন হেডমাষ্টার।

যোগেশ এ দিকটা সামলাইতে শেখায় নাই।

এবার ভাবিতেছি পঞ্জীর গোড়া আর কতদিন দেখিতে পাইব।

"L • L"

(এল্ এল.)

(২৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ভাবতে পারিনি দাদা; তাঁর দয়া। ওপরে নিয়ে গিয়ে আদর ক'রে বসিয়ে চা-টোষ্ট-কেক্। তারপর একটা গোলাপী খামের ভেতর থেকে একখানি চিঠি। ......মিষ্টার গোবর এখানে তোমায় একটু পড়ে বুঝিয়ে দিতে হবে আমায়। ভেরি সরি (very sorry), বাংলা আমি জানি না।

আজ্ঞে হ্যাঁ দাদা, এটা বাংলায়। আর ঐ L. L.। খাম আর চিঠির কোণে প্রজাপতি। ......সে আকুলি-বিকুলি, সব তো আপনাকে বলা যায় না, দাদা, তবে আসল কথা, যাতে আমার কাজ—শেষের দিকে ঐ আব্দার—লিখছে আমি বাঙালীর মেয়ে, ইংরেজী জানি না—কলকাতার অনেক সায়েব বাংলা জানে, সেই ভরসাতেই চিঠি দিচ্ছি, যদি না জান তো শিখে তাইতেই উত্তর দিতে হবে, আমি দু' মাস, চার মাস, এক বছর, দু' বছর অপেক্ষা করব। ...এসব চিঠিতে যেমন থাকে। পড়া বোঝানো শেষ হলে হাতে একখানি দশ টাকার নোট, আমার মেহনতের দাম, আর একটা ভালো বাংলা কোচ জোগাড় করে দিতে হবে, যা লাগে।

সংক্ষেপেই বলি দাদা, আর কত লজ্জার মাথা খাব? টেলর থেকে ব্রাউন, ব্রাউন থেকে রবার্টসন, রবার্টসন থেকে মার্টিমার সব বেটার টাকা আছে, রিটায়ার্ড আর স্ত্রী নেই। প্রথমে যুবোদের কথা ভেবেছিলাম, তারপর টেলরকে দেখেই বুদ্ধি খুলে গেল আমার। ভেবে দেখলাম—এরা অত খতিয়ে দেখবে না, তাড়া-হুড়োও আছে, কবরে ঢুকতে যাচ্ছে তো? ...ঐ এক ইতিহাস দাদা, ঐ আব্দার, বাংলা শিখে বাংলায় উত্তর দিতে হবে। দু'বছর, চার বছর, যতদিন......" "কিন্তু গোবর,—এরকম একটা নোংরা ব্যাপারে আমাদের টানতে......"

গোবর একেবারে দুটো হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে উঠল। সেই রকম লজ্জিত হাসি টেনে বলল—"নোংরা—সে যদি সত্যি কোন মেয়ে-ছেলের লেখা হোত, কিন্তু যদি কোন ব্যাটা-ছেলে রাত জেগে মাথা ঘামিয়ে......"

চোখ বড় বড় ক'রে ওর দিকে চেয়ে রইলাম, দুষ্টুমির চিত্রটা পরিষ্কার হয়ে গিয়ে আমার মুখে হাসিও ফুটে উঠে থাকবে। গোবর এগিয়ে এসে পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়াল, ওর মুখটাও উজ্জ্বল হয়ে এসেছে, বলল—"সাত পুরুষে কেউ কখনও সাহিত্য চর্চা করেনি...মানে, ভাগ্যে ঘটেনি দাদা, কিন্তু চালিয়ে তো নিলাম আপনার আশীর্বাদে এক রকম করে।"

তৃষা

ক্ষুধিত আমার তৃষা চিরদিন অনির্বাণ জানি
প্রাণের প্রদীপে জ্বলে, আসক্তির
অগ্নিশিখাখানি।

—[illegible]

রঙ্গমঞ্চের যাদুকর

(১৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

…থেলো দেখেছি। আমি নিঃসন্দেহে বলতে …র শিশিরের এই আলমগীর অভিনয় তাকেও …পেছে ছাড়িয়ে উঠেছিল। শুধু আমি নই, …মত সেদিন অনেকেই প্রকাশ করেছিলেন।

কিন্তু ম্যাডান থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে …শিরের বেশি দিন বনল না। ম্যাডান কোম্পানি …চিত্রের ফিল্ম তৈরি করতেন। তাদের …ডিওতে দিনকয়েক গিয়ে শিশিরের খেয়াল …সেই ছবি করবে। গ্রহবৈগুণ্যে একজন এই …র টাকা দিতেও রাজি হ'য়ে গেলেন। …শিরের সঙ্গে তাঁর কি বন্দোবস্ত হয়েছিল …নিনে, সে ম্যাডান কোম্পানিকে ছেড়ে দেবার …টিশ দিলে। ম্যাডান কোম্পানির কর্ণধার …লেন ম্যাডান সাহেবের জামাই রুস্তমজী …তিওয়ালা। ইনি বহুদেশী ছিলেন এবং …স্ত ভারতবর্ষব্যাপী এক বিরাট প্রতিষ্ঠান …াতেন। রুস্তমজী আমাদের বলেছিলেন— …ভ্রিকে আমাদের থিয়েটার ছেড়ে যেতে …ণ কর। কারণ তাদের যে কোম্পানি তা …দনও চলবে না। সে যদি চায় তাহলে আমরা …ক হাজার টাকা মাইনে দিতে রাজি আছি। …শির তখন ছ'শ টাকা মাইনে পেত। কিন্তু …াদের কথা সে কানেই তুললে না।

…দমদমায় প্রকান্ড একটা বাগান ভাড়া নিয়ে …াদের কোম্পানি খোলা হল। নাম হল …রমহল ফিল্ম কোম্পানি। ওরা রবীন্দ্রনাথের …ভগ্নন গল্পের ছায়াছবি তৈরি করতে লাগল। …রাও সেখানে যাতায়াত করতুন। …ন্তু মাস দু'তিনের মধ্যে শিশিরের সঙ্গে …দের কি হল, সে সেই কোম্পানি ছেড়ে দিলে। …স্তমজীর কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল।

শিশিরের ফাঁড়া তখনও একেবারে কাটেনি। …কাতা থেকে তাদের বাগানে কর্মচারীদের …য় যাওয়ার জন্যে একটা বাস ছিল। বাসটির …স্থা ছিল অত্যন্ত খারাপ। একদিন …শিরকে নিয়ে বাসখানি উল্টে গেল রাস্তায়। …ন শিশিরের কোমরে বিষম চোট লাগল। সে …য় আবার তার বাড়ীর কেউ এখানে ছিলেন … অবশ্য সেজন্যে তার কোনো অসুবিধে …নি। তার বাড়ীতে গিয়ে দেখলুম, অনুগত …া-চামুন্ডার দলে বাড়ী গমগম করছে। কেউ …ছে, কেউ তার সেবা করছে, কেউবা ঘর ঝাঁট …চ্ছ। এর ওপরে তার একটি ফোঁড়া অপারেশন …তে হল। কিছুদিন শয্যাশায়ী থাকার পর সে …ভার, চাকুরীভার—সব ভার থেকে মুক্ত হয়ে …না ছেড়ে উঠল।

বিলেতে ব্রিটিশ এম্পায়ার একজিবিশন …র মহড়াস্বরূপ তখন ভারতের ভিন্ন ভিন্ন …গায় একজিবিশন হচ্ছিল। সেই সূত্রে …কাতার ইডেন গার্ডেনে খুব বড় একটা …র্শনী খোলা হয়। এখানকার আনন্দ পরি-…বেশক দলেরা শিশিরকে ডাকলেন তাঁদের …নে অভিনয় করবার জন্যে। এইখানে ভাঙা …র ওপর ভাঙা দল নিয়ে শিশির দ্বিজেন্দ্রলা…লের সীতা নাটক অভিনয় করলে। এখানে শিশির রামের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। …নয় খুব উচুদরের হয়েছিল। সে …

ঠিক করলে কোনো একটা স্টেজ সে ভাড়া নেবে এবং দ্বিজেন্দ্রলালের সীতা নাটক দিয়ে প্রথম অভিনয় আরম্ভ করবে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে নেমে দেখা গেল সীতা নাটকখানি ইতিমধ্যেই বেহাত হয়ে গেছে।

কিন্তু তাতে সে দমল না। হ্যারিসন রোডে অ্যালফ্রেড স্টেজ ভাড়া নিয়ে কতকগুলি গানের সমষ্টি দিয়ে সে বসন্ত-লীলা নামে একটি গীতিনাট্যের অভিনয় সুরু করে দিলে। অবশ্য তাতে শিশিরের কোন ভূমিকা ছিল না। এইখানেই শিশির ম্যাডান কোম্পানির অনুমতি নিয়ে আবার আলমগীর করতে সুরু করে দিলে। অভিনয় খুবই জমল। প্রেক্ষাগৃহও পূর্ণ হতে লাগল। কিন্তু ম্যাডান থিয়েটারে আলমগীর অভিনয়ে যে উৎকর্ষে শিশির উঠেছিল সেখানে সে পৌঁছতে পারল না। এর পরেও অনেকবারই সে আলমগীর ভূমিকায় অভিনয় করেছে কিন্তু সে উৎকর্ষে আর কোনোদিনই পৌঁছতে পারে নি।

অ্যালফ্রেড থিয়েটারের পরে শিশির মনোমোহন স্টেজ ভাড়া নিলে। এইখানে নতুন ক'রে সীতা নাটক খোলা হল। যোগেশচন্দ্র চৌধুরীকে দিয়ে শিশির নতুন করে এই নাটকটি লিখিয়েছিল। এই সীতা নাটক বাংলা রঙ্গমঞ্চে যুগান্তর উপস্থিত করেছিল। শিশিরের অনেক বন্ধু সীতা নাটক খোলবার সময় তাকে নানাভাবে সাহায্য করেছিল। তাদের কারও কারও নাম যতদূর মনে পড়ছে প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতি। বাংলাদেশের চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে অভিনয়ের পূর্বে যে কনসার্ট বাজত শিশির তা বন্ধ করে দিলে। প্রথমদিন সানাই বেজেছিল, তারপর শুধু শঙ্খ-ঘণ্টা দিয়েই সে কাজ হত। আমার মনে হয় এইখানে রামের অভিনয়ে শিশির তার আগের আলমগীরের অভিনয়ের অভিনয়োৎকর্ষের মানকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। প্রতি অভিনয়ে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হ'য়ে যেত এবং সকলে অশ্রুভারাক্রান্তলোচনে শিশিরের অভিনয় দেখত।

এখানে বলে রাখা ভালো—ভবিষ্যতে শিশির আরো অনেকবার অন্যান্য রঙ্গমঞ্চে সীতা অভিনয় করেছিল কিন্তু এখানকার উৎকর্ষের মান অবধি সে আর উঠতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ সীতা দেখে শিশিরের এবং তাঁর প্রয়োগনৈপুণ্যের প্রশংসা করেছিলেন।

মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে কিছুকাল থিয়েটার চালিয়ে শিশির আবার ম্যাডানের স্টেজ ভাড়া নিলে। এখানেই সে প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নটরূপে আবির্ভূত হয়েছিল। এখানে যোগেশ চৌধুরীর দিগ্বিজয়ী, শরৎচন্দ্রের ষোড়শী ও পল্লীসমাজ নাটকে তার অভিনয় উল্লেখযোগ্য। এখানে সে একবার রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকেও অভিনয় করেছিল।

এরই কিছুদিন পরে শিশির সদলবলে আমেরিকা গিয়েছিল। সেখানে তারা নিন্দিত বা প্রশংসিত হয়েছিল তা আমার জানা নেই, কিন্তু এখানেও শিশির কোনো স্থায়ী প্রতিষ্ঠান …

এরপর সে কলকাতা শহরের প্রায় প্রত্যেক রঙ্গমঞ্চেই কিছু-না-কিছুদিন অভিনয় করেছে, কিন্তু কোথাও সে স্থায়ী হতে পারেনি।

রঙ্গালয়ের জীবনে শিশিরকুমার অসংখ্য ভূমিকা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে এবং প্রত্যেকটি ভূমিকার সার্থক রূপদান করেছে। … তার সমকক্ষ আর কোনো নট হয়েছেন কিনা জানি না। এদিক দিয়ে তাকে রঙ্গমঞ্চের যাদুকর বলা যেতে পারে। ম্যাডানের চাকরী ছাড়ার পর শিশির আর কারো চাকরী গ্রহণ করে নি।

বাল্যকালের কথা ছেড়ে দিলেও শিশিরের সঙ্গে আমার কিংবা আমাদের বললেও চলে, চল্লিশ বৎসরের ঘনিষ্ঠতা ছিল। অতীত চল্লিশ বৎসরের অন্ধকারে কত কৌতুকাবহ ঘটনা, কত হাস্য-অশ্রুর কাহিনী, কত বন্ধুবিয়োগের ব্যথার ইতিহাস নিহিত আছে। সে সব কথা আলোচনা করে কোনো লাভ নেই; কারণ সে সব আমাদের একান্তই ব্যক্তিগত।

নিত্যকালের উৎসবে শিশির এসেছিল তার নির্দিষ্ট প্রদীপটি জ্বালিয়ে যেতে। সে কাজ পরিপূর্ণভাবে সমাধা করে সে চলে গিয়েছে। মহাকালের ফুৎকারে সে সুন্দর দীপশিখার জ্যোতিঃচ্ছুরণ কিঞ্চিৎ স্তিমিত হলেও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে সে অমর হয়েই রইল।

স্বরূপ

(২০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

একটু পরেই একটা স্টেশনে এসে ট্রেন থামল।

"এই স্টেশনে নামব আমি। আচ্ছা, চলি।"

মাস খানেক পরে। তখনও গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হয় নি। রাত্রে শুয়ে ঘুমুচ্ছি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দেখি আমার মুখে টর্চের আলো পড়েছে। তড়াক উঠে বসে' বেড সুইচটা টিপলুম। দেখি সেই লোকটা। ফিস ফিস করে' বললে, "আরে, এ তোমার বাড়ি না কি! তাতো জানতুম না। আর তুমিতো আমায় একটি কথাও শোন নি দেখছি। মিছি মিছি 'সিঁধ কেটে হয়রান হলাম। চেঁচামেচি কোরো না। চললুম—"

নিমেষে অন্তর্ধান করল। হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম আমি। তার পর উঠে দেখলাম, প্রকাণ্ড একটা সিঁধ কেটেছে আমারই ঘরের দেওয়ালে। বাবা-মা উপরে ঘুমুচ্ছিলেন, তাঁদের আর জাগালাম না। কারণ দেখলাম ঘরের একটি জিনিসও চুরি যায় নি।

দিন সাতেক পরে একটি লোক এসে একখানি চিঠি দিয়ে চলে' গেল। চিঠির মধ্যে দেখি দুটো দশ টাকার নোট রয়েছে। আর ছোট্ট একটা চিঠি—"দেওয়ালের ফুটোটা সারিয়ে নিও। অন্য জায়গায় বেশ কিছু হাতিয়েছি। ইতি স্বরূপ।"

মাস খানেক পরে আবার তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। তখন তার হাতে হাতকড়ি, সঙ্গে কনেস্টবল। আমাকে দেখে মুচকি হাসল।

"টাকা পেয়েছিলে?"

"একজন স্বরূপ কুড়ি টাকা পাঠিয়েছিল।"

"আমার নামই স্বরূপ।"